তিন গোয়েন্দা সিরিজ

সেবা প্রকাশনী

বই পরিচিতি

তিন গোয়েন্দা সিরিজ

সেবা প্রকাশনী

Code Done by attuD nayA

তিন গোয়েন্দা সিরিজ

1. বই পরিচিতি
2. ০০১. কঙ্কাল দ্বীপ
3. ০০১. ছায়াশ্বাপদ
4. ০০১. তিন গোয়েন্দা
5. ০০১. মমি
6. ০০১. রত্নদানো
7. ০০১. রূপালী মাকড়সা
8. ০০২. জলদস্যুর দ্বীপ ১
9. ০০২. জলদস্যুর দ্বীপ ২
10. ০০২. প্রেতসাধনা
11. ০০২. রক্তচক্ষু
12. ০০২. সবুজ ভূত
13. ০০২. সাগরসৈকত
14. ০০৩. কাকাতুয়া রহস্য
15. ০০৩. ছুটি
16. ০০৩. ভূতের হাসি
17. ০০৩. মুক্তোশিকারী
18. ০০৩. মৃত্যুখনি
19. ০০৩. হারানো তিমি
20. ০০৪. গুহামানব
21. ০০৪. ছিনতাই
22. ০০৪. ড্রাগন
23. ০০৪. ভীষণ অরণ্য ১
24. ০০৪. ভীষণ অরণ্য ২
25. ০০৪. হারানো উপত্যকা
26. ০০৭. পুরনো শত্রু
27. ০০৭. বোম্বেটে
28. ০০৭. ভূতুড়ে সুড়ঙ্গ
29. ০০৯. কানা বেড়াল
30. ০০৯. ঘড়ির গোলমাল

31. ০০৯. পোচার
32. ০১০. অথৈ সাগর ১
33. ০১০. অথৈ সাগর ২
34. ০১০. খোঁড়া গোয়েন্দা
35. ০১০. বাক্সটা প্রয়োজন
36. ০১১. গোলাপী মুক্তো
37. ০১১. বুদ্ধির ঝিলিক
38. ০১২. পাগল সংঘ
39. ০১২. প্রজাপতির খামার
40. ০১২. ভাঙা ঘোড়া
41. ০১৩. জলকন্যা
42. ০১৩. ঢাকায় তিন গোয়েন্দা
43. ০১৩. বেগুনী জলদস্যু
44. ০১৬. দক্ষিণের দ্বীপ
45. ০১৬. প্রাচীন মূর্তি
46. ০১৭. ঈশ্বরের অশ্রু
47. ০১৭. তিন পিশাচ
48. ০১৭. নকল কিশোর
49. ০১৮. অবাক কাণ্ড
50. ০১৮. ওয়ার্নিং বেল
51. ০১৮. খাবারে বিষ
52. ০১৯. গোরস্তানে আতঙ্ক
53. ০১৯. বিমান দুর্ঘটনা
54. ০১৯. রেসের ঘোড়া
55. ০২৫. কুকুর খেকো ডাইনী
56. ০২৫. গুপ্তচর শিকারি
57. ০২৫. জিনার সেই দ্বীপ
58. ০২৮. ডাকাতের পিছে
59. ০২৮. বিপজ্জনক খেলা
60. ০২৮. ভ্যাম্পায়ারের দ্বীপ
61. ০২৯. আরেক ফ্রাঙ্কেনস্টাইন
62. ০২৯. মায়াজাল
63. ০২৯. সৈকতে সাবধান

64. ০৩৫. তিন বিঘা
65. ০৩৫. নকশা
66. ০৩৫. মৃত্যুঘড়ি
67. ০৪১. পিশাচকন্যা
68. ০৪৯. ডীপ ফ্রিজ
69. ০৪৯. মঞ্চভীতি
70. ০৪৯. মাছির সার্কাস
71. ০৫০. কবরের প্রহরী
72. ০৫০. খেলনা ভালুক
73. ০৫০. তাসের খেলা
74. ০৫১. পেঁচার ডাক
75. ০৫১. প্রেতের অভিশাপ
76. ০৫১. রক্তমাখা ছোরা
77. ০৫৪. গরমের ছুটি
78. ০৫৪. চাঁদের পাহাড়
79. ০৫৪. স্বর্গদ্বীপ
80. ০৬০. শুঁটকি শত্রু
81. ০৬০. টাইম ট্রাভেল
82. ০৬০. শুঁটকি বাহিনী
83. ০৯০. খেপা জাদুকর
84. ০৯০. সাগরে শঙ্কা
85. ০৯০. হিমগিরিতে সাবধান!
86. ১০৪. খাবারচোর
87. ১০৪. গোরস্থানে সাবধান!
88. ১০৪. নেকড়ের বনে
89. ১০৯. আবার মায়ানেকড়ে
90. ১০৯. টি-রেক্স-রহস্য
91. ১০৯. বনের ডায়েরি
92. ১১৪. অরণ্যের প্রতিশোধ
93. ১১৪. কালঘুম
94. ১১৪. বুদ্ধির খেলা
95. ১১৪. ভুতুড়ে বিমান
96. ১১৪. মঞ্চনাটক

97. ১১৪. ম্যাজিক শো
98. ১১৫. পাহাড়ে আতঙ্ক
99. ১১৫. ভুতুড়ে বর্ম
100. ১১৫. ভূমিকম্প
101. ১১৬. আঁধারে কে
102. ১১৬. জলাভূমির আতঙ্ক
103. ১১৬. ভুতুড়ে দুর্গ
104. ১১৭. আমাজানের গহীনে
105. ১১৭. আমিই কিশোর
106. ১১৭. আলাস্কা অভিযান
107. ১১৭. বড়দিনের ছুটি
108. ১১৮. আমাজনের ভয়ঙ্কর!
109. ১১৮. জিন্দালাশ ভার্সেস তিন গোয়েন্দা
110. ১১৮. বিভীষিকার প্রহর

ভলিউম ১ – কঙ্কাল দ্বীপ – তিন গোয়েন্দা – রকিব হাসান – সেবা প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৫

ডুবুরি-পোশাক পরে সাগরে ডুব দিয়েছ কখনও? জিজ্ঞেস করলেন ডেভিস ক্রিস্টোফার।

প্যাসিফিক স্টুডিও। বিখ্যাত চিত্রপরিচালকের অফিসে বসে আছে তিন গোয়েন্দা।

বিশাল টেবিলের ওপাশে বসা মিসটার ক্রিস্টোফারের দিকে চেয়ে বলল মুসা আমান, হ্যাঁ, স্যার, ডুবেছি। গতকাল শেষ পরীক্ষা নিয়েছেন আমাদের ইনস্ট্রাকটর। পাস করেছি। ভালভাবেই।

অভিজ্ঞ ডুবুরি নই আমরা, যোগ করল কিশোর পাশা। তবে নিয়মকানুন সব জানি। ফেস মাস্ক আর ফ্লিপার আছে আমাদের তিনজনেরই।

গ্যাস ট্যাংক আর অন্যান্য যন্ত্রপাতি? জানতে চাইলেন চিত্রপরিচালক।

গুড, বললেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। মনে হয় কাজটা করতে পারবে তোমরা।

কাজ! বলে উঠল রবিন।

হ্যাঁ, বললেন চিত্রপরিচালক। একটা রহস্যের কিনারা করতে হবে। সেজন্যেই ডেকেছি তোমাদের। আর হ্যাঁ, এক-আধটু অভিনয়ও করতে হবে।

অভিনয়? ভুরু কোঁচকাল মুসা। কিন্তু আমরা তো স্যার, অভিনেতা নই। কিশোর অবশ্য মাঝেমধ্যে টেলিভিশনে…

অভিজ্ঞ অভিনেতার দরকার নেই ওদের, বললেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। মুসা, তোমার বাবা কোথায় আছে এখন, জান?

জানি স্যার, অভিজ্ঞ টেকনিশিয়ান মুসার বাবা রাফাত আমান। ছবির শুটিঙের সময় বিভিন্ন যন্ত্রপাতি তদারকির ভার থাকে তাঁর ওপর। ফিলাডেলফিয়ায়।

ভুল বললে, হাসলেন পরিচালক। রাফাত এখন একটা দ্বীপে।

কিন্তু বাবা তো গিয়েছিল ডিরেক্টর জন নেবারের সঙ্গে। এসকেপ ছবির শুটিঙে।

জনের সঙ্গেই আছে। ছবির একটা বিশেষ দৃশ্যের জন্যে পুরানো পার্ক দরকার। স্কেলিটন আইল্যান্ডে আছে তেমনি একটা পার্ক।

স্কেলিটন আইল্যান্ডা ভুরু কুঁচকে গেছে। রবিনের। শুনে মনে হচ্ছে জলদস্যুদের দ্বীপ।

ঠিকই ধরেছ, বললেন পরিচালক। এককালে জলদস্যুদের ঘাঁটি ছিল ওই দ্বীপ। নামটা সত্যিই অদ্ভুত। আজও নাকি ভূতের উপদ্রব রয়েছে ওখানে। বালির তলা থেকে মাঝে মধ্যেই বেড়িয়ে পড়ে মানুষের কঙ্কাল। ভীষণ ঝড়ের পর কখনও-সখনও সৈকতে পড়ে থাকতে দেখা যায় সোনার মোহর। বেশি না, একটা দুটো। ভেবে বস না, গুপ্তধন আছে স্কেলিটন আইল্যান্ডে। অনেক খোঁজাখুঁজি করা

হয়েছে, পাওয়া যায়নি। উপসাগরের তলায় হয়ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে কিছু মোহর। ঝড়ের সময় ঢেউয়ের ধাক্কায় সৈকতে এসে পড়ে।
এবং ওই দ্বীপেই যেতে বলছেন আমাদেরকে? আগ্রহে সামনে বুকল কিশোর। রহস্যের কিনারা করতে?
হ্যাঁ, এক হাতের আঙুলের মাথা সব একত্র করে মোচার মত বানালেন পরিচালক। দুজন সহকমীকে নিয়ে আছে ওখানে মুসার বাবা। পার্কটার জঞ্জাল পরিষ্কারের জন্যে লোক লাগিয়েছে। কিন্তু গোলমাল শুরু হয়ে গেছে। প্রথম দিন থেকেই। জিনিসপত্র চুরি যাচ্ছে। স্থানীয় একজন লোককে পাহারাদার নিযুক্ত করা হয়েছে, কিন্তু চুরি ঠেকানো যাচ্ছে না। ভাবনায় পড়ে গেছে জন। খবর পাঠিয়েছে আমাকে।
আমাদের কাজ কি? জানতে চাইল কিশোর।
আসছি সে কথায়, হাত তুললেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। এসকেপ ছবিটার প্রযোজক আমি। ঠিক করেছি, তোমাদেরকে পাঠাব। নাম যা-ই হোক, দ্বীপটা কিন্তু খুব সুন্দর। চারদিক ঘিরে আছে আটলান্টিক উপসাগর, গভীরতা খুবই কম। ওখানে ইচ্ছেমত ডোবাডুবি করতে পারবে তোমরা। কেউ কিছু সন্দেহ করবে না। ভাববে, তিনটে ছেলে গুপ্তধন খুঁজছে।
খুব...খুবই ভাল হবে, স্যার, বলল কিশোর।
জনের সঙ্গে কোম্পানির একজন লোক আছে, জোসেফ গ্র্যাহাম। দক্ষ ডুবুরি। ভাল ছবি তুলতে পারে, বিশেষ করে পানির তলায়। দরকার পড়লে সে তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারবে। আরও একজন আছে, জনের সহকারী, পিটার সিমনস। সে-ও সাহায্য করবে তোমাদের। তাছাড়া মুসার বাবা তো আছেই। গুপ্তধন শিকারির ছদ্মবেশে চোর ধরার চেষ্টা করবে। আর হ্যাঁ, তোমরা গোয়েন্দা, অপরিচিত কারও কাছে সে কথা ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করবে না।
খুব মজা হবে। তবে, রবিনের গলায় দ্বিধা, বাবা যেতে দিলে হয়।
না দেবার তো কোন কারণ দেখি না, বললেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। খরচ-খরচা সব কোম্পানির। তোমাদের স্কুল ছুটি। তাছাড়া ওখানে মুসার বাবা আছে। দরকার হলে আমিও নাহয় ফোন করব। মিস্টার মিলফোর্ডকে। কিশোর, তোমার কোন অসুবিধে আছে?
নাহ। মুসা আর রবিন যাচ্ছে। তাছাড়া রাফাত চাচা আছে ওখানে, অমত করবে না মেরিচাচী।
তো কখন রওনা হচ্ছি। আমরা? পরিচালকের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল মুসা।
বাড়িতে গিয়ে জিনিসপত্র গুছিয়ে নাওগে। বিকেলে প্লেনের টিকেট পাঠিয়ে দেব।
হ্যাঁ, রবিন, তোমাকে একটা জিনিস দিচ্ছি, ড্রয়ার খুললেন পরিচালক। একটা বড়

খাম বের করে ঠেলে দিলেন টেবিলের ওপর দিয়ে। এতে একটা ম্যাগাজিন আছে। রেকর্ড আর রিসার্চের ভার যখন তোমার ওপর, তুমি রাখ এটা। স্কেলিটন আইল্যান্ডের ওপর একটা সচিত্র ফিচার আছে। পড়ে দেখ। অনেক কিছু জানতে পারবে দ্বীপটা সম্পর্কে।
উঠে দাঁড়াল তিন গোয়েন্দা।
যাত্রা শুভ হোক তোমাদের, বললেন মিস্টার ক্রিস্টোফার।
থ্যাংকু, স্যার, বলে বেরিয়ে এলো তিন কিশোর।
ওই যে কঙ্কাল দ্বীপ, প্রায় চেঁচিয়ে উঠল রবিন। এই বাংলা নামটা শিখেছে কিশোরের কাছ থেকে। স্কেলিটন আইল্যান্ড-এর চেয়ে ছন্দময়।
কই।...কোথায়া বলে উঠল কিশোর।
দেখি দেখি! বলল মুসা।
দুজনে একই সঙ্গে বুকে এলো জানালার কাছে, রবিনের গায়ের ওপর দিয়ে।
লম্বা, সরু উপসাগরের ওপর দিয়ে উড়ে চলেছে প্লেন। আঙুল তুলে দেখাল রবিন। তাদের নিচেই একটা ছোট্ট দ্বীপ। ঠিক যেন একটা মানুষের মাথার খুলি।
ম্যাপের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে, বললো রবিন।
কৌতূহলী চোখে অদ্ভুত দ্বীপটার দিকে চেয়ে আছে তিন গোয়েন্দা। মিস্টার ক্রিস্টোফারের দেয়া ম্যাগাজিন পড়ে জেনেছে। ওরা অনেক কিছু। তিনশো বছরেরও বেশি আগে জলদস্যুদের ঘাঁটি ছিল কঙ্কাল দ্বীপ। অনেক খোঁজাখুঁজি করা হয়েছে, পাওয়া যায়নি গুপ্তধন। তার মানে এই নয় যে, ধনরত্ন লুকানো নেই। হয়তো দ্বীপে নেই, কিন্তু উপসাগরের তলায় থাকতে বাধা কোথায়? নিশ্চয় পানির তলায় কোথাও লুকানো আছেই। গুপ্তধন। তিন গোয়েন্দার আশা, খুঁজে পাবে ওরা।
আরেকটা ছোট দ্বীপ নজরে পড়ল।
ওই যে, দ্য হ্যান্ডা বলল কিশোর। হস্ত।
আর ওগুলো নিশ্চয় দ্য বোনস, যোগ করল মুসা। আঙুল তুলে দেখাল। কঙ্কাল দ্বীপ আর হস্তের মাঝামাঝি এক সারি ছোট প্রবাল-প্রাচীর দেখিয়ে বলল মুসা। ইয়াল্লা! এত তাড়াতাড়ি এসে পড়লাম! দুপুরের খাওয়াই হজম হয়নি এখনও!
দেখ, দেখা বলল রবিন। হাতের আঙুল। ওগুলো সরু প্রবালপ্রাচীরা পানির তলায় রয়েছে, অথচ ওপর থেকে কি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে!
হস্তে যাব একদিন, বলল কিশোর। প্রাকৃতিক ফোয়ারা দেখব। কখনও দেখিনি।
দ্বীপগুলোকে পেছনে ফেলে এল প্লেন। মূল ভূখণ্ডের ওপর এসে পড়েছে। নিচে একটা গ্রাম। নাম ফিশিংপোর্ট। ওখানেই উঠবে তিন গোয়েন্দা। একটা বোডিং হাউসে ঘর ভাড়া করে রাখা হয়েছে তাদের জন্যে।

ফিশিংপোর্ট ছাড়িয়ে এল প্লেন। দ্রুত উচ্চতা হারাচ্ছে। ডানে ছোট্ট একটা শহর। নাম মেলভিল। এয়ারপোর্ট ওখানেই। কয়েক মুহূরুত পরেই রানওয়ে ছুলো প্লেনের চাকা। এয়ার টার্মিনাল বিল্ডিঙের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল।
প্লেন থেকে নেমে এল তিন কিশোর। একপাশে তারের জালের বেড়া। বেড়ার ওপাশে লোকের ভিড়।
রাফাত চাচা এসেছেন। কিনা কে জানে! বলল রবিন।
ফোনে তো বলল আসবে, ভিড়ের দিকে চেয়ে হাঁটছে মুসা। কোন কারণে নিজে না আসতে পারলে অন্য কাউকে নিশ্চয়ই পাঠাবে।
বেড়ার বাইরে এসে দাঁড়াল তিনজন। এদিক ওদিক চাইল। মুসার বাবাকে দেখা গেল না।
অন্য কেউই এসেছে, নিচু গলায় বলল রবিন। ওই যে, আমাদের দিকে এগোচ্ছে।
ভিড়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে এগিয়ে আসছে বেঁটে মোটা এক লোক। লালচে নাক।
এই যে, কাছে এসে বলল লোকটা। নিশ্চয়ই হলিউড থেকে এসেছ? তোমাদেরকে নিয়ে যেতে পাঠানো হয়েছে আমাকে। তিন কিশোরকে দেখছে সে। ছোট ছোট চোখে শীতল চাহনি। কিন্তু তোমরা গোয়েন্দা! বয়স্ক লোক আশা করেছিলাম আমি।
স্থির হয়ে গেল। রবিনের পাশে দাঁড়ানো কিশোর। আমরা গোয়েন্দা আপনার তো জানার কথা নয়!
আরও অনেক কিছুই জানি, দাঁত বের করে হাসল লোকটা। এখন এসো। গাড়ি অপেক্ষা করছে। তোমাদের মালপত্র যাবে অন্য গাড়িতে। আমারটায় জায়গা নেই। হলিউড থেকে অনেক জিনিসপত্র এসেছে, বোঝাই হয়ে গেছে।
ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল লোকটা। পেছনে চলল। তিন গোয়েন্দা। পুরানো একটা স্টেশন ওয়াগনের সামনে এসে দাঁড়াল।
জলদি উঠে পড় গাড়িতে। আধা ঘণ্টা লেগে যাবে যেতে। আকাশের দিকে তাকাল। তার আগেই ঝড় এসে পড়বে। কিনা কে জানে!
আকাশের দিকে মুখ তুলল রবিন। পশ্চিম দিগন্তে ছোট্ট এক টুকরো কালো মেঘ, ছড়িয়ে পড়ছে ধীরে ধীরে। ঢাকা পড়েছে সূর্য। আজ আর বেরোতে পারবে বলে মনে হয় না। মেঘের চুড়ার কাছে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে থেকে থেকে। ঝড় আসবে, ভীষণ ঝড়।
পেছনের সিটে উঠে বসল। তিন কিশোর। ড্রাইভিং সিটে বসল। লোকটা। গাড়ি ছাড়ল। এয়ারপোর্ট ছাড়িয়ে এসে রওনা হল উত্তরে।
আপনার সঙ্গে এখনও পরিচয়ই হল না, মিস্টার... থেমে গোল কিশোর।

হান্ট বলেই ডাকবে আমাকে। সবাই তাই ডাকে, বলতে বলতে এক্সিলারেটরে পায়ের চাপ বাড়াল লোকটা। তাড়াতাড়ি যেতে হবে। দ্রুত নামছে অন্ধকার।
হ্যাঁ, মিস্টার হান্ট, আবার বলল কিশোর, আপনি কি সিনেমা কোম্পানিতে কাজ করেন?
সব সময় না, জবাব দিল হান্ট। এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে আপন মনেই বিড়বিড় করল, ঝড় আসছে। রাত নামতে দেরি নেই। নিশ্চয় বেরোবে আজ নাগরদোলার ভূতা ইস্স্, বোকামিই করলাম! বেরোনোই উচিত হয়নি!
শিরশির করে একটা শীতল স্রোত নেমে গেল। রবিনের মেরুদন্ড বেয়ে। নাগরদোলার ভূত! কঙ্কাল দ্বীপের ওই ভূতের কথা লেখা আছে ম্যাগাজিনে। বাইশ বছর আগে প্লেজার পর্কের নাগরদোলায় চড়েছিল। এক সুন্দরী তরুণী। নাম, স্যালি ফ্যারিংটন। হঠাৎ উঠল ঝড়। পর্কে আরও অনেকেই এসেছিল সেদিন, তাড়াহুড়ো করে পালাল। থেমে গোল নাগরদোলা। স্যালিকে নামতে বলল দোলার চালক। কিন্তু নামিল না। মেয়েটা। দোলা আবার চালাতে অনুরোধ করল। ঝড়ের মধ্যে নাগরদোলায় চড়তে কেমন লাগে, দেখতে চায়।
কিছুতেই মেয়েটাকে নামাতে পারল না চালক। ঝড় বেড়েই চলল। নিরাপদ জায়গায় গিয়ে আশ্রয় নিলো সে। স্যালি বসে রইল কাঠের ঘোড়ার গলা আঁকড়ে ধরে। হঠাৎ পড়ল বাজ। পড়ল এসে একেবারে নাগরদোলার ওপর।
বজ্রপাতে মারা গেল স্যালি। এর কয়েক হস্তপ্ত পরেই আরেক ঝড়ের রাতে নাকি দেখা গেল, আলো জ্বলে উঠেছে নাগরদোলার। পার্ক বন্ধ হয়ে গেছে বিকেলেই। কে জ্বলিলো আলো! কয়েকজন লোক সঙ্গে নিয়ে মোটরবোটে করে দেখতে গেলেন পার্কের মালিক মিস্টার স্মিথ। দ্বীপের কাছে গিয়ে দেখলেন, ঘুরছে নাগরদোলা। একটা কাঠের ঘোড়ায় চেপে বসেছে সাদা একটা মূর্তি। হঠাৎ দপ করে নিভে গেল সমস্ত আলো। থেমে গেল দোলা। কয়েক মিনিট পরে তীরে ভিড়ল বোট। দোলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল লোকেরা। একটা রুমাল খুঁজে পেল, মহিলাদের রুমাল। এক কোণে সুতো দিয়ে তোলা হয়েছে দুটো অক্ষরঃ এস এফ।
খবরটা ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করলেন মিস্টার স্মিথ, নইলে বন্ধ হয়ে যাবে পার্ক। কিন্তু গুজব ঠেকানো গেল না। পরদিন সকাল হতে না। হতেই ছড়িয়ে পড়লা খবর। লোকে জানল, ভূতের উপদ্রব শুরু হয়েছে পার্কে। ওটার কাছ থেকে দূরে রইল সবাই। পড়ে পড়ে নষ্ট হতে লাগল নাগরদোলা, নাগরদোলা, দোলনা।
স্যালি ফ্যারিংটনের ভূত নাকি আজও দেখা যায়। ইদানীং নাকি বেড়েছে। প্রায় ঝড়ের রাতেই জেলেরা দেখতে পায়, সাদা একটা মূর্তি। ঘুরে বেড়াচ্ছে দ্বীপে। নষ্ট হয়ে গেছে নাগরদোলা। লোকের ধারণা, ওটা আবার চালু হবার অপেক্ষায় আছে স্যালির প্রেতাত্মা।

বহু বছর ধরে নির্জন পড়েছিল। কঙ্কাল দ্বীপ। গ্রীষ্মকালে মাঝে মধ্যে দুচারজন বিদেশী যেত ওখানে পিকনিক করতে, তবে দিনের বেলা।
সিনেমা কোম্পানি ঠিক করছে আবার নাগরদোলাটা, বলল হান্ট। স্যালির প্রেতাত্মা তাহলে খুব খুশি হবে। আবার চড়তে পারবে... থেমে গেল সে। জানালার কাচে ধাক্কা দিতে শুরু করেছে ঝড়ো বাতাস। গাড়ি চালনায় মন দিল হান্ট।
পথের দুধারে জলাভূমি, লোক বসতির চিহ্নও নেই। আধা ঘণ্টা পর একটা জায়গায় এসে পৌঁছুল গাড়ি। সামনে দুদিকে ভাগ হয়ে গেছে রাস্তাটা। বাঁদিকের পথের পাশে মাইলপোস্ট। লেখাঃ ফিশিংপোর্টঃ ২ মাইল। ছেলেদেরকে অবাক করে দিয়ে ডানে গাড়ি ঘোরাল হান্ট। খানিক পরেই শেষ হয়ে এল পিচঢালা পথ। সামনে কাঁকর বিছানো ধুলোভরা কাঁচা রাস্তা।
মাইলপোস্ট বসানো বাঁয়ের রাস্তার পাশে, বলেই ফেলল মুসা। এ পথে যাচ্ছি কেন আমরা, মিস্টার হান্ট?
দ্বীপে নিয়ে যেতে বলেছেন, মিস্টার আমান, কাঁধের ওপর দিয়ে বলল হান্ট। আজ রাতে বোডিং হাউসে যেতে মানা করেছেন।
অ! চুপ করে গেল মুসা। কিন্তু সন্তুষ্ট হতে পারল না। কোথায় যেন একটা খটকা রয়ে গেল!
ঝাঁকুনি খেতে খেতে এগোল গাড়ি। গতি কম। মাইল দুয়েক এসে থেমে পড়ল। হেডলাইটের আলোয় চোখে পড়ল একটা নড়বড়ে জেটি। ছোট, ঝরঝরে একটা মাছ ধরা বোট বাঁধা আছে জেটিতে। জলদি বেরোও! বলল হান্ট। গড নোজা ঝড় এসে গেলেই...
গাড়ি থেকে নামল তিন গোয়েন্দা। বোটটা দেখে অবাক। এতবড় মুভি-কোম্পানি, এর চেয়ে ভাল কোন বোট জোগাড় করতে পারল না! নাকি হান্টের নিজের বোট ওটা?
আমাদের মালপত্র? হান্ট নামতেই জিজ্ঞেস করল কিশোর।
ওগুলোর জন্যে ভাবতে হবে না তোমাদের, বলল হান্ট। নিরাপদেই পৌঁছে যাবে বোর্ডিং হাউসে। জলদি এসো, বোটে ওঠ। এখনও অনেক পথ বাকি।
বোটে উঠল ওরা। মোটরের ওপর বুকল হান্ট। একটা বোতাম টিপে দিতেই স্টার্ট হয়ে গেল পুরানো ইঞ্জিন। ঢেউ কেটে ধুঁকতে ধুঁকতে এগিয়ে চলল বোট। একবার। এদিক কাত হচ্ছে একবার ওদিক। ডুবেই যাবে যেন। ভয়ে বুক কাঁপছে তিন কিশোরের।
এলো বৃষ্টি। প্রথমে গুড়ি গুড়ি, জোর বাতাসের ধাক্কায় রেণু রেণু হয়ে আছড়ে পড়ল গায়ে। তারপর নামল বড় বড় ফোঁটায়। পাতলা ক্যানভাসের ঢাকনার

তলায় গুটিসুটি হয়ে বসল। তিন কিশোর। অল্পক্ষণেই ভিজে চুপচুপে হয়ে গেল।
রেনকোট নেই? চেঁচিয়ে বলল মুসা। এভাবে বসে থাকলে বোট ডুবে যাবার আগেই মরব।
মাথা ঝোঁকাল হান্ট। দড়ি দিয়ে বাঁধল হুইলের একটা স্পোক। দড়ির অন্য মাথা দিয়ে বাঁধল বোটের গায়ে একটা খুঁটির সঙ্গে। কোনদিকেই এখন ঘুরতে পারবে না হুইল। উঠে গিয়ে একটা ছোট আলমারি খুলল। বের করে আনল চারটে হলুদ রেনকোট। একটা নিজে পরল। বাকি তিনটে দিল তিন কিশোরকে।
পরে ফেল, চেঁচেইয়ে বলল হান্ট। বাতাসের গর্জন, আস্তে কথা বললে শোনা যায় না। বোটেই রাখতে হয়। এগুলো। কখন বৃষ্টি আসে, ঠিকাঠিকানা তো নেই।
মুসার গায়ে ঠিকমত লাগল কোট, কিশোর আর রবিনের গায়ে বড় হল। তাতে কিছু যায় আসে না এখন। গায়ে পানি না লাগলেই হল।
আবার গিয়ে হুইল ধরল হান্ট। অনবরত বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বেড়েছে বাতাসের বেগ। আকারে বড় হয়েছে ঢেউ। ধরেই নিয়েছে ছেলেরা, যে কোন মুহূর্তে উল্টে যেতে পারে বোট।
বিদ্যুতের আলোয় ডাঙা দেখা গেল সামনে। ছেলেদের মনে হল, জেটি ছাড়ার পর কয়েক যুগ পেরিয়ে গেছে।
ডাঙার কাছে চলে এলো বোট। জেটি চোখে পড়ল না। অবাক হয়ে দেখল ছেলেরা, চ্যাপ্টা একটা পাথরের ধারে এসে বোট রেখেছে হান্ট। পানির তলা থেকে বেরিয়ে আছে পাথরটা।
লাফাও, লাফিয়ে নাম! চেঁচিয়ে বলল হান্ট। গড নোজ!
নীরবে একে একে লাফিয়ে তীরে নেমে এলো ছেলেরা।
আপনি নামবেন না? চেঁচিয়ে বলল কিশোর।
ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে বোট। নামা যাবে না, চেঁচিয়ে জবাব দিল হান্ট। পথ ধরে এগোও। ক্যাম্পে পৌঁছে যাবে।
ইঞ্জিনের আওয়াজ বাড়ল। দ্রুত সরে গেল বোট। দেখতে দেখতে হারিয়ে গেল ঝড়ো রাতের অন্ধকারে।
বাতাসের তাড়নায় গায়ে যেন সুচ ফুটাচ্ছে বৃষ্টি। মাথা নুইয়ে রাখতে হল তিন কিশোরকে।
চল, পথটা খুঁজে বের করি বলল মুসা।
মাথা বুকিয়ে সায় দিল কিশোর।
হঠাৎ শোনা গেল শব্দটা। অদ্ভুত। জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছে যেন কোন বিশাল দানব। হু-উ-উ-উ-উ-হু-ই-শ-শ! হু-উ-উ-উ-উ-হু-ই-শ-শ!
শুনছ! চেঁচিয়ে উঠল রবিন। কিসের শব্দ!

আবার শোনা গেল অদ্ভুত আওয়াজ।
কিছু একটা আছে দ্বীপো বলল কিশোর। আবার বিদ্যুৎ চমকালেই দেখার চেষ্টা করব! তোমরাও কর।
যেদিক থেকে শব্দ এসেছে, সেদিকে তাকিয়ে রইল তিন গোয়েন্দা। বিদ্যুৎ চমকাল। ক্ষণিকের জন্যে দেখল। ওরা, ছোট্ট এক দ্বীপে দাঁড়িয়ে আছে। এটা অন্য কোন দ্বীপ, কঙ্কাল দ্বীপ। এত ছোট না।
একটা টিলা, উটের কুঁজের মত ঠেলে বেরিয়ে আছে দ্বীপের গা থেকে। আশপাশে ছোটবড় পাথরের ছড়াছড়ি। এদিক ওদিক দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটা গাছ, বাতাসের ঝাপটায় মাথা নুইয়ে ফেলেছে। কোন পথ চোখে পড়ল না, দেখা গেল না ক্যাম্প।
অদ্ভুত শব্দ হল আবার। ঠিক এই সময় আবার বিদ্যুৎ চমকাল। অবাক হয়ে দেখল তিন কিশোর, কুঁজের ঠিক মাঝখান থেকে তীব্র গতিতে আকাশে উঠে যাচ্ছে পানি, বিশাল এক ফোয়ারা। বাতাসের আঘাতে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে ছিটকে পড়ছে পানি, অদ্ভুত আওয়াজ হচ্ছে সে-জন্যেই।
প্রাকৃতিক ফোয়ারা বলে উঠল কিশোর। কঙ্কাল দ্বীপ না, এটা হস্ত!
স্তব্ধ হয়ে গেল অন্য দুজন।
তাদেরকে হস্তে নামিয়ে দিয়ে গেল কেন হান্ট? এই ভয়াবহ ঝড়ের রাতে নির্জন দ্বীপে ফেলে রেখে গেল কেন?
কুঁজের গায়ে একটা ছোট্ট খোঁড়ল। ওতেই ঠাঁই নিল তিন গোয়েন্দা। কোনমতে গাদাগাদি করে বসল। কষ্ট হচ্ছে বটে, কিন্তু বাতাস আর বৃষ্টির কবল থেকে রেহাই মিলল এখানে।
কয়েক মিনিট আগে খোঁড়লটা খুঁজে বের করেছে ওরা। নিশ্চিত হয়ে গেছে, এটা হস্ত দ্বীপ। দ্বীপে ক্যাম্প নেই, মানুষ নেই, জেটি নেই, বোট নেই।
এখানে নামিয়ে দিয়ে গেল কেন হান্ট, কপালে লেগে থাকা পানির কণা মুছতে মুছতে বলল মুসা, বুঝতে পারছি না।
ভুল করেছে। হয়ত, বলল রবিন। কঙ্কাল দ্বীপ ভেবে হস্তে নামিয়ে দিয়ে গেছে।
না, মাথা নাড়ল কিশোর। ভুল করেনি। ইচ্ছে করেই এখানে ফেলে গেছে ব্যাটা। প্রথম থেকেই লোকটাকে ভাল লাগেনি। আমরা গোয়েন্দা, জানল কি করে! কোথাও কিছু একটা গোলমাল হয়েছে।
যা খুশি হোকগে, মুসার গলায় হতাশা। না খেয়ে না মরলেই হল।
সকালে খুঁজে পাবে, বলল কিশোর। ভর রাতেই মাছ ধরতে বেরোয় জেলেরা।
কিন্তু এদিকে কোন জেলে-নৌকা আসার কথা না, রবিনের গলায় সন্দেহ। পড়নি, এক ধরনের লাল পরজীবী কীটের আক্রমণে নষ্ট হয়ে গেছে। এখানকার ঝিনুক?

খাওয়া নিরাপদ নয়। মেলভিলের একেবারে দক্ষিণে ঝিনুক তুলতে যায় এখন জেলেরা। ফিশিংপোর্টের এদিকে আসে না। আর কিছুদিন এভাবে চললে গ্রাম ছেড়ে চলে যাবে সবাই।
তবু, কেউ না কেউ আসবেই, জোর দিয়ে বলল কিশোর। আমরা নিরুদ্দেশ হয়েছি, জানবেন। রাফাত চাচা। খোঁজখবর শুরু হয়ে যাবে। আজ এখানে নেমে বরং ভালই হল। ফেয়ারাটা দেখতে পেলাম।
আর বিশেষ কিছু বলার নেই কারও। চুপ হয়ে গেল ওরা। বাইরে ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছে, কিন্তু খোঁড়লের ভেতর মোটামুটি নিরাপদ। যেমন হঠাৎ আসে, তেমনি হঠাৎই আবার চলে যায়, এ-অঞ্চলের ঝড়। তিন কিশোর আশা করল, সকাল নাগাদ থেমে যাবে। শিগগিরই ঢুলতে শুরু করল ওরা।
হঠাৎ তন্দ্রা টুটে গেল মুসার। কোথায় আছে বুঝতেই পেরিয়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত। তারা চোখে পড়ল। ঝড় থেমে গেছে। তন্দ্রা ছুটে যাবার এটাই কি কারণ? না। চোখে আলো পড়েছিল। এখন আবার পড়ল। শখানেক গজ দূর থেকে আসছে, তীব্র আলোর রশ্মি। এক মুহূর্ত স্থির থাকিল, তারপরই সরে গেল। আবার আলো।
লাফিয়ে দাঁড়াতে গিয়ে মাথায় বাড়ি খেল মুসা। ইয়াল্লা বলে চেঁচিয়ে উঠে আবার বসে পড়ল। সাবধানে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল খোঁড়লের বাইরে।। গা থেকে রেনকোট খুলে নাড়তে নাড়তে চেঁচিয়ে বলল, এখানে আমরা এ-খা-নে!
মুসার পাশে এসে দাঁড়াল রবিন আর কিশোর।
আবার আলো পড়ল মুসার গায়ে। তারপরই সরে এসে পড়ল। রবিন আর কিশোরের ওপর। এক মুহূর্ত স্থির রইল। চকিতের জন্যে একবার উঠে গেল আকাশের দিকে। একশো গজ দূরে নৌকার পাল দেখতে পেল তিন গোয়েন্দা।
দ্বীপের গায়ে ভিড়েছে নৌকা বলে উঠল মুসা। আমাদেরকে যেতে বলছে...
আকাশে তারার আলো। আবছা অন্ধকার। হাঁটতে শুরু করল তিন গোয়েন্দা।
আবার জ্বলে উঠল টর্চ।
দেখ দেখ! চেঁচিয়ে উঠল রবিন। আমাদেরকে পথ দেখাচ্ছে।
বৃষ্টিতে ভিজে পিচ্ছিল হয়ে আছে মাটি। দৌড়ানো তো দূরের কথা, তাড়াতাড়ি হাঁটাই যাচ্ছে না। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে একবার আছাড় খেল মুসা। পাথরে ঘষা লেগে ছড়ে গেল হাঁটু।
পানির কিনারে এসে থামল তিন গোয়েন্দা। তীরে ভিড়েছে ছোট একটা পালতোলা নৌকা। পাশে বালিতে দাঁড়িয়ে আছে তাদেরই বয়েসী। এক কিশোর। পরনে পানি নিরোধক জ্যাকেট। প্যান্টটা গুটিয়ে হাঁটুর কাছে তুলে নিয়েছে।
তিন গোয়েন্দার মুখে আলো ফেলল। ছেলেটা। দেখল। তারপর নিজের মুখে আলো ফেলে দেখাল ওদেরকে। হাসিখুশি একটা মুখ। রোদোপোড়া তামাটে

চামড়া। কোঁকড়া কালো চুল। কালো উজ্জ্বল এক জোড়া প্রাণবন্ত চোখ।
হাল্লো! ইংরেজিতে বলল ছেলেটা। কথায় বিদেশী টান। তোমরা তিন গোয়েন্দা, না?
অবাক হল তিন কিশোর। তাদের পরিচয় এখানে গোপন নেই কারও কাছেই! ঢোল পিটিয়ে জানানো হয়েছে যেন!
হ্যাঁ, আমরা তিন গোয়েন্দা, বলল কিশোর। খুঁজে পেলে কি করে?
কোথায় খুঁজতে হবে, জানতাম, বলল ছেলেটা। মুসার সমান লম্বা। হালকা-পাতলা। আমি পাপালো হারকুস। পাপু ডাকে বন্ধুরা।
তো, পাপু, বলল মুসা। হাসিখুশি ছেলেটাকে ভালই লাগছে তার। কোথায় খুঁজতে হবে, কি করে জানলে?
অনেক লম্বা কাহিনী, বলল পাপালো। এসো, নৌকায় ওঠ। সিনেমা কোম্পানির লোকজন খুব ভাবনায় পড়ে গেছে।
এসকেপ ছবিতে কোন কাজ করছ তুমি? নৌকায় উঠতে উঠতে জিজ্ঞেস করল রবিন।
না না, ধাক্কা দিয়ে নৌকাটা বালির ওপর থেকে পানিতে ঠেলে দিল পাপালো। লাফ দিয়ে উঠে পড়ল। গলুইয়ে। দাঁড় ধরল। পালে হাওয়া লাগতেই তরতর করে ছুটে চলল হালকা নৌকা। দূরে দেখা যাচ্ছে ফিশিংপোট গ্রামের আলো।
কথায় কথায় তিন গোয়েন্দার কাছে নিজের পরিচয় দিল পাপালো। বাড়ি গ্রীসের এক ছোট্ট গাঁয়ে। বড় হয়েছে ভূমধ্যসাগর উপকূলে। মা নেই। বাবা স্পঞ্জ শিকারি জেলে। সাগরের তল থেকে স্পঞ্জ তুলে বিক্রি করত। এই ছিল জীবিকা।
খুব দরিদ্র গ্রীসের স্পঞ্জ শিকারিরা। ডুবুরির সাজ-সরঞ্জাম কেনার পয়সা নেই তাদের। ফলে কোন যন্ত্রপাতি ছাড়াই ডুব দিতে হয়। দুহাতে একটা ভারি পাথর নিয়ে পানিতে ছেড়ে দেয় শরীর। দ্রুত ডুবে যায় তলায়। পাথর ছেড়ে দিয়ে স্পঞ্জ কুড়িয়ে নিয়ে ভেসে ওঠে ওপরে। পাপালোর বাবাও এই কায়দায় স্পঞ্জ তুলে আনত। হঠাৎ একদিন আক্রান্ত হল স্পঞ্জ-শিকারির অভিশাপ বেণ্ড রোগে। অকেজো হয়ে গেল। বন্ধ হয়ে গেল রোজগার। কিছুদিন চলল সঙ্গী জেলেদের দয়ায়। ওই সময় ফিশিংপোটে জেলের কাজ করত পাপালোর চাচা। ভাইয়ের দুরবস্থার খবর পেয়ে কিছু টাকা পাঠিয়ে দিল। ভাই ভাতিজাকে নিয়ে এল নিজের কাছে।
কয়েক বছর ভালই কাটল, বলল পাপালো। তারপরই দেখা দিল দুর্ভাগ্য। লাল কীট আক্রমণ করল। ঝিনুককে। ব্যবসা খতম। নৌকা বেচে দিয়ে নিউ ইয়র্কে চাকরি নিয়ে চলে গেল। চাচা। আমি আর বাবা রয়ে গেলাম এখানে। না থেকেই বা কি করব। মাছধরা ছাড়া আর কোন কাজ জানি না। বাবা পঙ্গু। তাকে নিয়ে

কোথায় যাব? চাচার ঘাড়ে গিয়ে সওয়ার হতে ইচ্ছে হল না। নিজেরই চলে না, তবু কিছু কিছু করে বাঁচিয়ে মাসে মাসেই টাকা পাঠায় বাবাকে। খুব কষ্টে দিন কাটে আমাদের। একদিন খবর পেলাম, ফিশিংপোটে এক সিনেমা কোম্পানি আসছে। দ্বীপে ক্যাম্প করবে ওরা, ছবির শুটিং করবে। ডুবুরির কাজটা খুব ভাল পারি। আশা হল, একটা কাজ পেয়ে যাব সিনেমা কোম্পানিতে। দ্বীপে ক্যাম্প করবে যখন, নিশ্চয় সাগরের তলায় শুটিং করবে। ডুবুরির দরকার হবে। এল ওরা। গেলাম। কিন্তু কাজ দিল না। আমি বিদেশী। বিদেশীকে দেখতে পারে না। এখানকার লোকে। তবে, আশা ছাড়িনি আমি এখনও।

এগিয়ে চলেছে নৌকা। কানে আসছে কঠিন কিছুতে ঢেউ আছড়ে পড়ার শব্দ।

কোথায় আছি। এখন? জানতে চাইল মুসা। অন্ধকারে নিশানা ঠিক রাখতে পার? অন্ধকারে ডুবো পাহাড়ে বাড়ি লেগে যেতে পারে নৌকা!

শব্দ শুনেই বুঝতে পারি। আমি, কোন পথে চলেছি, বলল পাপালো। ওই যে, ঢেউ আছড়ে পড়ছে প্রবাল প্রাচীরে, বাঁয়ে। দ্য বোনস-এর পাশ দিয়ে চলেছি আমরা। সামনে স্কেলিটন আইল্যান্ড।

সামনে তাকাল তিন গোয়েন্দা। অন্ধকারে পরিষ্কার দেখা গেল না। কঙ্কাল দ্বীপ। কিন্তু অবয়বটা মনে গাঁথা আছে। ওদের। প্লেন থেকে দেখেছে, খুলির আকার। ম্যাপে দেখেছে। মিস্টার ক্রিস্টোফারের দেয়া ম্যাগাজিন পড়ে জেনেছে অনেক খুঁটিনাটি।

আমেরিকার দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে এই দ্বীপ। একে ঘিরে আছে আটলান্টিক উপসাগর। ১৫৬৫ সালে আবিষ্কার করেছিলেন এক ইংরেজ নাবিক, ক্যাপ্টেন হোয়াইট। দ্বীপে নেমেছিলেন ক্যাপ্টেন। এটা ছিল তখন স্থানীয় ইণ্ডিয়ানদের গোরস্থান। কবর বেশি গভীর করে খুড়ত না ইণ্ডিয়ানরা। ফলে পানি আর বাতাসে কবরের ওপরের বালিমাটি সরে গিয়ে বেরিয়ে পড়ত মরার হাড়গোড়। অনেক কঙ্কাল দেখেছিলেন তিনি। দ্বীপের নাম রাখলেন, স্কেলিটন আইল্যান্ড। তারপর কাছের আরেকটা দ্বীপে নামলেন। অনেকটা চৌকোণা ওই দ্বীপ, এক প্রান্ত থেকে লম্বা হয়ে বেরিয়ে গেছে সরু সরু পাঁচটা প্রবাল প্রাচীর। ওটার নাম রাখলেন দ্য হ্যান্ড। দুটো দ্বীপের মাঝের একসারি প্রবাল-প্রাচীরের নাম রাখলেন দ্য বোনস। তারপর একদিন আবার জাহাজ নিয়ে চলে গেলেন। ক্যাপ্টেন।

এর অনেক বছর পর দ্বীপগুলোর খোঁজ পেল জলদস্যুরা। ওগুলোকে শীতকালের ঘাঁটি বানাল ওরা। আশপাশে তখনও শহর ছিল। ডাকাতি করে আনা সোনার মোহর খরচ করতে যেত ওরা ওসব শহরে। দুর্দান্ত জলদসুযু ব্ল্যাকবিয়ার্ডও এক শীতে বেরিয়ে গিয়েছিল এখান থেকে।

উৎপাত বেড়ে গেল জলদস্যুদের। ইংরেজ নৌ-বাহিনী তাদেরকে তাড়া করে আনল। এখান পর্যন্ত। দলবল সহ একে একে মেরে শেষ করল দস্যু সর্দারদের। ১৭১৭ সালে মারা পড়ল ব্ল্যাকবিয়ার্ড। এ-অঞ্চলে বাকি রইল। শুধু তখন দুর্দান্ত দস্যু ক্যাপ্টেন ওয়ান-ইয়ার (এক কান কাটা বলেই এই নাম) আর তার দল। ঠাঁই নিল এসে কঙ্কাল দ্বীপে।

গোলমাল শুনে এক রাতে ঘুম থেকে হঠাৎ জেগে উঠল। দস্যুরা। দেখল, তাদেরকে ঘিরে ফেলেছে নৌ-বাহিনীর লোক।

নির্বিচারে ডাকাত জবাই শুরু করল নৌ-বাহিনীর লোকেরা। ওয়ানইয়ার বুঝল, লড়াই করে টিকতে পারবে না। গোলমালের ফাঁকে একটা লংবোটে করে কেটে পড়ল সে। সঙ্গে নিল তার মোহরের সিন্দুক, আর অতি বিশ্বস্ত কয়েকজন সহচর।

দ্বীপে যে কজন ডাকাত ছিল, একটাকেও ছাড়ল না নৌ-বাহিনী, সবকটাকে হত্যা করল। এরপর খেয়াল হল ওদের, এক-কান-কাটা মারা পড়েনি। খোঁজ খোঁজ খোঁজ। বুঝে ফেলল ওরা, পালিয়েছে ওয়ান-ইয়ার। জাহাজ নিয়ে তাড়া করল পেছনে। বেগতিক দেখে নৌকার মোড় ফেরাল ডাকাত সর্দার। হস্তে এসে লুকানোর চেষ্টা করল। শেষরক্ষা করতে পারল না সো। ধরা পড়ল নৌ-বাহিনীর হাতে।

ইংরেজ জাহাজের ক্যাপ্টেন প্রথমেই জানতে চাইল, মোহরগুলো কোথায়?

খিকখিক করে হেসে উঠল এক-কান-কাটা। বলল, সাগর দেবতার খাজাঞ্চিখানায়। চাওগে ওর কাছে। হাতে পায়ে ধরলে দিয়েও দিতে পারে।

অনেক নির্যাতন করা হল এক-কান-কাটা আর তার সহচরদের ওপর। কিন্তু কেউ মুখ খুলল না। ফাঁসির দড়িতে ঝোলার আগেও বলল না কেউ কোথায় আছে মোহরগুলো। তন্নতন্ন করে খোঁজা হল হস্ত আর তার আশপাশের দ্বীপগুলো। কিন্তু মোহরের চিহ্নও মিলল না। ধরেই নিল ইংরেজ ক্যাপ্টেন, মোহরগুলো সব উপসাগরে ফেলে দিয়েছে এক-কানকাটা। ওগুলো আর উদ্ধারের কোন আশা নেই। খানিকটা হতাশ হয়েই দেশে ফিরে গেল ক্যাপ্টেন।

এদিককার সাগর নিশ্চয় তোমার চেনা, তাই না, পাপু? সামনের অন্ধকারের দিকে চেয়ে বলল কিশোর।

নিজের হাতের তালুর মত, জবাব দিল পাপালো। সুযোগ পেলেই এদিকে চলে আসি। ডুব দিই সাগরে। মোহর খুঁজি।

শুনেছি, অনেকেই মোহর খোঁজে। এখানে, বলল রবিন। পায়ও কেউ কেউ।

তুমি পাও-টাও? পাপালোকে জিজ্ঞেস করল মুসা।

দ্বিধা করল পাপালো। তারপর বলল, পাই। তবে ওটাকে না পাওয়া বললেও চলে।

শেষ কবে পেয়েছ? জানতে চাইল কিশোর।

গত হপ্তায়, বলল পাপালো। কোথায় পেয়েছি, বলব না। এটা আমার সিক্রেট। শক্ত হয়ে বস, মোড় ঘোরাব।
মোড় ঘোরালে কেন শক্ত হয়ে বসতে হবে, জিজ্ঞেস করতে গিয়েও থেমে গেল মুসা। জোরে একবার কেঁপে উঠল নৌকা। একপাশে কাত হয়ে গেল পাল, সেই সঙ্গে নৌকাটাও। পাশে আঘাত হানল ঢেউ। ছিটকে পানি এসে লাগল ছেলেদের গায়ে। শক্ত করে দাঁড় ধরে রইল পাপালো।
আরেকবার কেঁপে উঠেই সোজা হয়ে গেল নৌকা। এগিয়ে চলল আবার। সামনে দেখা যাচ্ছে ফিশিংপোর্টের আলো।
স্কেলিটন আইল্যান্ড এখন পিছনে, বলল পাপালো। গাঁয়ের দিকে এগোচ্ছি আমরা।
পেছনে ফিরে চাইল তিন গোয়েন্দা। দেখা যাচ্ছে না দ্বীপ। শুধু কালো অন্ধকার।
হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল রবিন, দেখ দেখা আলো!
একসঙ্গে জ্বলে উঠেছে অনেকগুলো আলো, ঘুরছে। শোনা যাচ্ছে অদ্ভুত একটা ধাতব শব্দ। আস্তে আস্তে বাড়ছে ঘোরার বেগ। দেখতে দেখতে আলোর এক বিশাল আংটি তৈরি হয়ে গেল।
ইয়াল্লা! ফিসফিস করে বলল মুসা। নাগরদোলা নিশ্চয় ঘোড়ায় চেপে বসেছে স্যালি…
পাপু মুসার কথা শেষ হবার আগেই বলল কিশোর। নৌকা ঘোরাও! দেখব, কিসে ঘোরাচ্ছে নাগরদোলা!
আমি পারব না। মাথা নাড়ল পাপালো। স্যালির ভূত; ঝড় থেমেছে একটু আগে। এখন এসেছে দোলায় চড়তো ইসস, নৌকাটা আরও জোরে চলছে না কেন! একটা মোটর যদি থাকত…
সোজা ফিশিংপোর্টের দিকে ছুটে চলেছে নৌকা। খুশিই হয়েছে মুসা। আর রবিন। হতাশ হয়ে কিশোর। সত্যিকারের ভূত দেখার ইচ্ছে তার অনেক দিনের। এমন একটা সুযোগ হাত-ছাড়া হয়ে গেল।
অন্ধকারে উজ্জ্বল আলোর রিঙ তৈরি করে ঘুরেই চলেছে নাগরদোলা। বাইশ বছর আগে মরে যাওয়া তরুণীর প্রেতাত্মা. কথাটা ভাবতেই শিউরে উঠল রবিন।
হঠাৎ থেমে গেল ধাতব শব্দ। নিভে গেল। আলো। এত তাড়াতাড়ি নাগরদোলা চড়ার শখ মিটে গেল স্যালির প্রেতাত্মার. আশ্চর্যা-ভাবলী কিশোর। অন্ধকারের দিকে চেয়ে বসে আছে সে। চিমটি কাটছে নিচের ঠোঁটে।
আরও আধা ঘণ্টা পর মিসেস ওয়েলটনের বোডিং হাউসে এসে উঠল তিন গোয়েন্দা। সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোনে সিনেমা কোম্পানিকে জানিয়ে দিল মিসেস।
গরম পানিতে গোসল করল তিন গোয়েন্দা। খাওয়া সারল। গরম বিছানায় উঠল।

কম্বলটা গায়ের ওপর টেনে দিতে দিতে বলল কিশোর, ভূতটা দেখতে পারলে ভাল হতা
আমার তা মনে হয় না, ঘুমজড়িত গলায় বলল মুসা। শুয়ে পড়ে কম্বলটা টেনে নিল গায়ের ওপর।
রবিন কিছু বলল না। ঘুমিয়ে পড়েছে।
ঘুম ভাঙল রবিনের। চোখে পড়ল ঢালু হয়ে নেমে যাওয়া চাল। মনে পড়ল, বাড়িতে নেই সে। রকি বীচ থেকে তিন হাজার মাইল দূরে ফিশিংপোটের এক বোডিং হাউসে শুয়ে আছে।
উঠে বসে চারদিকে তাকাল রবিন। একটা ডাবল-বাংকের ওপরের তাকে রয়েছে। নিচের তাকে ঘুমাচ্ছে মুসা। কয়েক ফুট দূরে আরেকটা বাংকে কিশোর।
আবার শুয়ে পড়ল রবিন। আগের রাতে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো ছবির মত খেলতে লাগল। মনের পর্দায়।
দরজায় টোকা দেবার শব্দ হল। খুলে গেল পাল্লা। ঘরে এসে ঢুকল হাসিখুশি, বেঁটে-মোটা এক প্রৌঢ়া। মিসেস ওয়েলটন, বাড়িওয়ালি। রবিনকে জেগে থাকতে দেখে বলল, এই যে, ওঠ, উঠে পড়। নাস্তা তৈরি। নিচে দুজন লোক দেখা করতে এসেছেন তোমাদের সঙ্গে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে এসো।
বেরিয়ে গেল মিসেস ওয়েলটন।
লাফ দিয়ে বাংক থেকে নেমে এল রবিন। মুসা কিংবা কিশোরকে ডাকতে হল না। বাড়িওয়ালির গলা শুনে জেগে উঠেছে দুজনেই।
দ্রুত তৈরি হয়ে নিচে নেমে এল ওরা। উজ্জ্বল হলুদ রঙ করা ডাইনিং রুমের দেয়াল, ছাত। সামুদ্রিক জীবজন্তুর খোলস দিয়ে সাজানো হয়েছে। টেবিলে নাস্তা তৈরি। এক ধারে দুটো চেয়ারে বসে কফি খাচ্ছে দুজন লোক। কথা বলছেন নিচু গলায়।
ছেলেদেরকে ঢুকতে দেখেই উঠে দাঁড়াল একজন। বিশালদেহী! কুচকুচে কালো গায়ের রঙ। কোঁকড়া চুল। হাসলেন। ঝিকি করে উঠল। ঝকঝকে সাদা দাঁত। কেমন আছ তোমরা, মুসা ঠিক প্রশ্ন নয়। জবাবের অপেক্ষা না করেই বললেন মিস্টার রাফাত আমান, গতরাতেই এসেছিলাম। ঘুমিয়ে পড়েছিলে। আর জাগালাম না। তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে হয়েছে আবার দ্বীপে। উফফ, যা ভাবনায় পড়েছি না প্রতিটি মিনিটই পাহারা দিয়ে রাখতে হয় জিনিসপত্র। কাঁহাতক আর পারা যায়। থামলেন তিনি। তিন কিশোরের ওপর চোখ বুলিয়ে আনলেন একবার। তারপর বললেন, তারপর? তোমাদের কাহিনী বল। গতরাতে কি হয়েছিল?
চেয়ারে বসা দ্বিতীয় লোকটির ওপর চোখ মুসার।

পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি, বললেন মিস্টার আমান। ইনি মিস্টার হোভারসন। এখানকার পুলিশ-চীফ।
পরিচয়ের পালা শেষ হল। চেয়ারে এসে বসল। তিন গোয়েন্দা। নাস্তার ফাঁকে ফাঁকে জানাল তাদের কাহিনী।
পাইপ দাঁতে কামড়ে ধরে চুপচাপ সব শুনলেন হোভারসন। হান্টের কথা আসতেই হাত তুললেন। হান্টা চেহারা কেমন?
জানাল ছেলেরা।
হুমম। চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা দোলালেন পুলিশ-চীফ। হান্ট গিল্ডার মনে হচ্ছে!
চেনেন নাকি? জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার আমান।
ভালমত। কয়েকবার জেল খেটেছে। টাকার জন্যে পারে না, এমন কোন কাজ নেই। ধরতে পারলে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করতাম!
আমারও কয়েকটা প্রশ্ন ছিল, গম্ভীর হয়ে বললেন মিস্টার আমান। জিজ্ঞেস করতাম, কি করে জানল, ছেলেরা আসছে? কি করে জানল, ওরা গোয়েন্দা? আর গতরাতে কেন নির্জন দ্বীপে ফেলে রেখে এল ওদের? ভাগ্যিস, পাপু খুঁজে পেয়েছিল! নইলে জানতেই পারতাম না আমরা!
ঠিক, সায় দিলেন চীফ। প্লেন থেকে নেমেছে ওরা, শুধু এটুকুই জেনেছিলাম। এরপর কি হয়েছিল, কিছুই বুঝতে পারিনি। রোড ব্যারিকেন্ড দিয়ে গাড়ি থামিয়ে কত লোককে যে জিজ্ঞেস করেছিলাম...।
পাপু কি করে জানল, তোমরা দ্য হ্যান্ডে আছ? মুসার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার আমান। কি বলেছে?
মুসা জানাল, একবার জিজ্ঞেস করেছিল, উত্তরটা এড়িয়ে গেছে পাপালো। পরে আর জিজ্ঞেস করার কথা মনে ছিল না। তারপর উঠল ভূতের কথা।
ভূত দেখেছিলো ভুরু কোঁচকালেন মিস্টার আমান। অসম্ভব! ঝড়ের রাতে নাগরদোলা চড়তে আসে। ভূত, এটা এ এলাকার একটা গুজব।
গুজবই বা বলি কি করে? বললেন হোভারসন। গত দুবছরে অনেকবার দেখা গেছে। ওই ভূত। ঝড়ের রাতে। জেলেরা দেখেছে। স্কেলিটন আইল্যান্ডের ধারে কাছে যেতে চায় না। এখন আর লোকে। থামলেন চীফ। হাসলেন। বিশ্বাস হচ্ছে না। আমার কথা? বেরিয়ে জিজ্ঞেস করে দেখুন লোককে। গতরাতেও দেখা গেছে ভূত, খবরটা ছড়িয়ে পড়েছে। সারা গাঁয়ে। অনেকেই শুনেছে নাগরদোলা ঘোরার শব্দ। আলো দেখেছে স্পাইগ্লাস লাগানো টেলিস্কোপ দিয়ে, কেউ কেউ ভূতকেও দেখেছে। নাগরদোলার একটা ঘোড়ায় চেপে বসেছিল নাকি একটা সাদা মূর্তি। এই শেষ কথাটা অবশ্য বিশ্বাস করিনি। আমি...

কুসংস্কারে খুব বেশি বিশ্বাসী এ গাঁয়ের লোক, বললেন মিস্টার আমান। মাথা দোলালেন। বুঝতে পারছি, আজ আর কেউ যাবে না দ্বীপে কাজ করতে। বিপদেই পড়ে গেলাম দেখছি!
আগামীকালও কাউকে নিতে পারবেন বলে মনে হয় না, বললেন। হোভারসন। তো, মিস্টার আমান, আমি উঠি।। দেখি, হান্টকে ধরতে পারি। কিনা। কিন্তু একটা প্রশ্ন বেশি খচখচ করছে মনে, পাপু কি করে। জানল ছেলেরা দ্য হ্যান্ডে আছে?
সন্দেহের কথা? বললেন মিস্টার আমান। আমার কাছে চাকরির জন্যে এসেছিল একদিন। এখানকার লোকে ভাল চোখে দেখে না। ছেলেটাকে। ও নাকি চোর। এটা জেনে কাজ দিইনি। আমাদের জিনিসপত্র হয়ত ওই চুরি করে, কে জানে!
না, বাবা, জোরে মাথা নাড়ল মুসা, পাপু চোর না! গতরাতে অনেক কথা বলেছি। ওকে ভাল ছেলে বলেই মনে হল। অসুস্থ বাপের দেখাশোনা করে। সময় পেলেই উপসাগরে বেরিয়ে পড়ে নৌকা নিয়ে। মোহর খুঁজে বেড়ায়। না, পাপু খারাপ ছেলে না।
মুসা ঠিকই বলছে, সায় দিলেন পুলিশ-চীফ। ছেলেটাকে দেখতে পারে না লোকে, সেটা অন্য কারণে। এখানকার লোক বিদেশী পছন্দ করে না। ওদের ধারণা, যত কুকাজ, সব বিদেশীরা করে।
যা-ই বলুন, ছেলেটাকে সন্দেহ করি আমি, বললেন মিস্টার আমান। অসুস্থ বাপকে খাওয়ানোর জন্যেই হয়ত চুরি করে। একটা সৎ কাজ করতে গিয়ে আরেকটা অসৎ কাজের সাহায্য নেয়াকে ভাল বলা যায় না। উঠে দাঁড়ালেন তিনি। ছেলেরা, এসো যাই। এতক্ষণে হয়ত দ্বীপে গিয়ে বসে আছেন মিস্টার নেবার। চীফ, পরে আবার দেখা করব। আপনার সঙ্গে। আশা করি, হান্টকে ধরে জেলে পুরতে পারবেন।
কয়েক মিনিট পর। দ্রুতগতি একটা স্পীডবোটে বসে আছে তিন গোয়েন্দা। কঙ্কাল দ্বীপের দিকে ছুটে চলেছে বোট। ফিশিংপোর্টকে গ্রাম বলা হয়, আসলে ছোটখাটো শহর ওটা। ঘুরে দেখার ইচ্ছে ছিল ওদের, কিন্তু সময় মেলেনি।
রাতের বেলা অন্ধকারে কিছুই দেখেনি ছেলেরা। এখন দেখল, অসংখ্য ডক আর জেটি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। এদিক ওদিক। সেই তুলনায় নৌকা-জাহাজ অনেক কম। বুঝতে পারল, ওগুলো সব চলে গেছে উপসাগরের দক্ষিণে। ফিশিংপোর্টের সীমানা খুব বেশি বড় না। লোকসংখ্যা আগে অনেক ছিল, ইদানীং নাকি কমে গেছে। ব্যবসা ভাল না, থেকে কি করবে। লোকে?
কৌতূহলী চোখে কঙ্কাল দ্বীপের দিকে তাকিয়ে আছে ওরা। মাইলখানেক দূরে আছে এখনও। প্রচুর গাছপালা দ্বীপে। উত্তরপ্রান্তে একটা ছোট পাহাড়।

কঙ্কাল দ্বীপের দক্ষিণে একটা পুরানো জেটির গায়ে এসে ভিড়ল বোট। পাশেই খুঁটিতে বাঁধা আরেকটা মোটরবোট। একপাশ থেকে বুলিছে বিশেষ সিঁড়ি। স্কুবা ডাইভিঙের সময় খুব কাজে লাগে।
জেটির ধার থেকে পথ চলে গেছে। আগে আগে চললেন মিস্টার আমান। পেছনে তিন কিশোর। শিগগিরই একটা খোলা জায়গায় এসে পৌঁছুল ওরা। ঝোপঝাড় কেটে পরিষ্কার করে ফেলা হয়ে জায়গাটা। একপাশে দুটো ট্রেলার দাঁড়িয়ে আছে। বড় বড় কয়েকটা তাঁবু খাটানো হয়েছে মাঝখানে।
ওই যে, মিস্টার জন নেবার, ডিরেক্টর, বললেন মুসার বাবা। গতকাল এসে পৌঁছেছেন ফিলাডেলফিয়া থেকে। জরুরি কাজ সেরে আজই ফিরে যাবেন আবার।
হর্ন-রিমি চশমা পরা একজন লোক এগিয়ে আসছেন। বয়েস চল্লিশের কাছাকাছি। পেছনে তিনজন লোক। একজনের চুল ধূসর। সে গোয়েন্দা। আরেকজনের চুল সোনালি, নাবিকদের মত ছোট ছোট করে। ছাঁটা। যুবক। জোসেফ গ্র্যাহাম। তার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে বিশালদেহী এক লোক। চওড়া বুকের ছাতি। বাঁ হাতটা বুলছে বেকায়দা ভঙ্গিতে, বোঝাই যায়। অকেজো। কোমরে বুলছে রিভলভার। জিম রিভান, গার্ড।
আমাদের ক্যাম্প, তাঁবুগুলো দেখিয়ে বললেন মিস্টার আমান। বার্জে করে আনা হয়েছে ভারি মালপত্র। আমরা এখন লোক কম। কয়েকদিন পরে শুটিঙের কাজ শুরু হলেই আসবে। আরও অনেকে। আসবে দামি যন্ত্রপাতি। তখন আর ওই তাঁবুতে কুলাবে না। আরও কয়েকটা ট্রেলার দরকার পড়বে।
কাছে এসে গেলেন পরিচালক।
সরি, মিস্টার নেবার, বললেন রাফাত আমান, দেরিই হয়ে গেল।
না না, ঠিক আছে, হাত তুললেন পরিচালক। ছেলেদের দিকে একবার তাকালেন। আবার ফিরলেন মিস্টার আমানের দিকে। কিন্তু এখানকার অবস্থা তো বিশেষ সুবিধের মনে হচ্ছে না। সবই বলেছে। পিটার। আর হস্তখানেকের ভেতর নাগরদোলাটা ঠিক না করা গেলে, স্কেলিটন আইল্যান্ডের আশা বাদই দেব। ক্যালিফোনিয়ায় ফিরে গিয়ে স্টুডিওতেই একটা পার্ক সাজিয়ে নেব। নাগরদোলা আনা যাবে ভাড়া করে। তবে এখানে করতে পারলেই ভাল হত। সবকিছু আসল। তাছাড়া দ্বীপের দৃশ্য, উপসাগরের দৃশ্য, খুবই চমৎকার।
আশা করছি, ঠিক করে ফেলতে পারব, বললেন মিস্টার আমান। কাঠমিস্ত্রিকে খবর দিয়ে পাঠিয়েছি।
তা পাঠিয়েছেন, কিন্তু আসবে কিনা যথেষ্ট সন্দেহ আছে, গম্ভীর গলায় বললেন পরিচালক। সারা শহর জেনে গেছে, গতরাতে ভূত দেখা গিয়েছে। নাগরদোলা

ঘুরেছে।
ভূত ভূত ভূত! মুঠো হয়ে গেল মিস্টার আমানের হাত। চেহারা কঠোর। ওই ভূতের শেষ দেখে ছাড়ব আমি।
পায়ে পায়ে এসে পরিচালকের পেছনে দাঁড়িয়েছে জিম রিভান। আস্তে করে কেশে উঠল। মাফ করবেন, স্যার, গতরাতের ভূতটা বোধহয় আমিই।
গত রাতে, খুলে বলল সব জিম, একা ছিলাম। আমি দ্বীপে। মিস্টার আমানের দিকে চেয়ে বলল, আপনারা সব চলে গেলেন ছেলেদেরকে খুঁজতে। পাহারা দিচ্ছিলাম। হঠাৎ কানো এল মোটরবোটের শব্দ। চোরটোর এল মনে করে দেখতে চললাম। পার্কের কাছ দিয়ে চলেছি, হঠাৎ মনে হল নাগরদোলাটার কাছে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। এগোলাম। দৌড়ে চলে গেল একটা মূর্তি। তাড়া করলাম, কিন্তু ধরতে পারলাম না। কোথায় জানি লুকিয়ে পড়ল। অবাক হলাম! ব্যাটা নাগরদোলার কাছে কি করছিল? নতুন বসানো মোটরটা চুরি করতে আসেনি তো? পরীক্ষা করে দেখলাম মোটরটা। দুটো স্ক্রু খোলা। হ্যাঁ মোটর চুরি করতেই এসেছিল। আবার স্ক্রু টাইট দিয়ে সব ঠিক আছে কিনা দেখার জন্যে সুইচ টিপলাম। চালু হয়ে গেল মোটর, আলো জ্বলে উঠল, ঘুরতে লাগল। নাগরদোলা। ঠিক আছে সব। আবার অফ করে দিলাম মোটর। এটাই দেখেছিল লোকে।
কিন্তু ভূত বলে উঠলেন মিস্টার আমান। সাদা পোশাক পরা ভূত দেখেছে লোকে। এর কি ব্যাখ্যা?
রেনকোট পরেছিলাম, স্যার, বলল, গার্ড। হলুদ রঙের। হুডও ছিল মাথায়। দূর থেকে অন্ধকারে সাদা ধরে নিয়েছে লোকে।
হুঁ। মাথা ঝোঁকালেন মুসার বাবা। বুঝেছি। কিন্তু একটা কাজ ভুল হয়ে গেছে, জিম। সকালেই শহরে যাওয়া উচিত ছিল, তোমার। তুমিই গতরাতে নাগরদোলা ঘুরিয়েছ, জানিয়ে এলে ভাল করতে।
ঠিকই বলেছেন, স্যার, মাথা নিচু করে বলল জিম। ভুলই হয়ে গেছে।
এক কাজ কর, বললেন মিস্টার আমান। আরও দুজন গার্ড নিয়ে এসো ফিশিংপোর্টে গিয়ে। বুঝতে পারছি, একা কুলাতে পারবে না। চোর আবার আসবে। কয়েকজন যদি আসে, একা পারবে না। ওদের সঙ্গে। হ্যাঁ, জেলেফেলেদের কাউকে এনে না। ওগুলোকে বিশ্বাস নেই। নিজেরাই চুরি করে বসতে পারে। ভাল লোক আনবে।
চেষ্টা করে দেখব, স্যার।
চোরের ওপর চোখ রাখার জন্যে এনেছিলাম ছেলেদেরকে, পরিচালককে বললেন মুসার বাবা। কিন্তু হল না। সারা শহর জেনে গেছে, ওরা গোয়েন্দা। কি করে জানল, বুঝতে পারছি না।

মনে হয় আমি পারছি, স্যার, বলল জিম। ছোট্ট শহর ফিশিংপোর্ট। ঘটনা খুব বেশি ঘটে না। ওখানে। ছোটখাট কিছু ঘটলেই সেটা নিয়ে হৈচৈ পড়ে যায়। আপনি আর মিস্টার নেবার ফোনে আলাপ করেছেন। প্রযোজকের সঙ্গে। শুনেছে অপারেটর। ওই মেয়েগুলো কেমন হয়, জানেনই তো! কোন কথাই পেটে রাখতে পারে না। আর এত বড় একটা খবর, চুরি হচ্ছে সিনেমা কোম্পানির জিনিসপত্র। হলিউড থেকে গোয়েন্দা আসছে। তদন্ত করতে। কি করে চেপে রাখবে? আপনার ফোন ছেড়েছেন একদিকে, অন্যদিকে রঙ চড়িয়ে বন্ধু-বান্ধবদের কাছে খবর পরিবেশন সারা হয়ে গেছে অপারেটরদের। দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়েছে মুখরোচক খবর।
প্রায় গুঙিয়ে উঠলেন চীফ টেকনিশিয়ান। এসব হতচ্ছাড়া এলাকায় কাজ করাই মুশকিল! শেষ পর্যন্ত হলিউডেই বুঝি ফিরে যেতে হবে!
থাকতে পারলেই ভাল হত, রাফাত, বললেন পরিচালক। চেষ্টা করে দেখুন, নাগরদোলাটা ঠিক করতে পারেন কিনা। আমাকে এখুনি ফিরে যেতে হচ্ছে। এদিকটা সামলান, যেভাবে পারেন। জোসেফ, প্লীজ ফিশিংপোটে পৌঁছে দেবে আমাকে?
চলুন, বল সহকারী-পরিচালক। ঘুরে হাঁটতে শুরু করল জেটির দিকে।
ছেলেদের দিকে ফিরলেন মুসার বাবা। চল, পার্কটা দেখিয়ে আনি তোমাদের। জোসেফ ফিরে এলে ডাইভিং করাতে নিয়ে যাবে।
খুব ভাল হবে, বাবা, চল, বলল মুসা।
খুব বেশি হাটতে হল না। ধসে পড়া একটা বেড়া ডিঙিয়ে পার্কে ঢুকাল ওরা। পরিত্যক্ত পার্ক। এককালে সাইনবোর্ডে নাম ছিলঃ প্লেজার পার্ক। এখন আর সাইনবোর্ড নেই, অনেক আগেই নষ্ট হয়ে গেছে। দুটো খুঁটির একটা আছে, তা-ও হেলে রয়েছে। সিমেন্টে তৈরি বিশ্রাম নেবার আসনগুলো বেশিরভাগই ভেঙেচুরে নষ্ট হয়ে গেছে। বেঁকেচুরে মরচে অংশ খুলে ভেঙে পড়ে আছে কাঠামোর কাছেই। খুব শক্ত করে তৈরি নাগরদোলাটাকে। দাঁড়িয়ে আছে এখনও, তবে শরীরের বেশিরভাগই ক্ষতবিক্ষত। একই অবস্থা হয়েছিল হয়ত নাগরদোলাটারিও, কিন্তু এখন মেরামত হয়েছে। জায়গায় জায়গায় নতুন কাঠ। সিরিষা দিয়ে ঘষে তুলে ফেলা হয়েছে রঙ, নতুন করে লাগানো হবে। কেমন যেন ভূতুড়ে চেহারা। এই দিনের বেলায়ও গা ছমছম করে উঠল মুসার।
এই পার্ক আর এর প্রমোদ্যযন্ত্রগুলো কি কাজে লাগবে, খুলে বললেন মিস্টার আমানঃ একটা লোককে ভুল করে খুনের দায়ে দণ্ডিত করা হয়েছে, সে-ই নায়ক। আসল খুনী অন্য লোক। পুলিশের হাত থেকে পালিয়ে গেল দণ্ডিত লোকটা। খোঁজখবর নিয়ে বের করে ফেলল। কে খুনী। পিছু নিল। টের পেয়ে পালাতে

চাইল খুনী। কিন্তু পারল না। তার পেছনে লেগে রইল নায়ক। শেষে স্কেলিটন আইল্যান্ডে এসে লুকাল খুনী। শেষ দৃশ্যটা এরকমঃ একদল লোক আসবে এই পুরানো পার্কে পিকনিক করতে। তাদের সঙ্গে মিশে গিয়ে গা ঢাকা দিতে চাইবে খুনী। কিন্তু নায়কের চোখ এড়াতে পারবে না। নাগরদোলায় চড়ার সময় ঠিক তাকে চিনে ফেলবে। তাড়া করবে। মারপিট গোলাগুলি শুরু হবে। ভয় পেয়ে হুড়াহুড়ি ছুটাছুটি শুরু করবে পিকনিকে আসা দলটা। কিছুতেই নায়কের সঙ্গে পেরে উঠবে না খুনী। শেষে গিয়ে উঠবে নাগরদোলায়। দোলাটা চলতেই থাকবে, ওই অবস্থায়ই নায়কের সঙ্গে মারপিট হবে তার। দোলা থেকে পড়ে গিয়ে মরবে খুনী।

খাইছে! দারুণ কাহিনী প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মুসা। ছবিটা দেখতেই হবে!

এখানে শুটিং করা গেলে, দৃশ্যটা আরও আগেই দেখতে পারবে, হেসে বললেন মিস্টার আমান। তো আমি যাই। কিছু কাজ করি গিয়ে। তোমরা ঘুরেফিরে দেখ। আধঘণ্টার ভেতরেই ফিরে আসব জোসেফ। পা বাড়াতে গিয়েও থেমে পড়লেন। আর হ্যাঁ, খবরদার, গুপ্তধনের খোঁজখবর বেশি কোরো না! লোকে ঘুণাক্ষরেও যদি ভেবে বসে মোহরের খোঁজ পেয়ে গেছ তোমরা, তাহলে সর্বনাশ হবো দলে দলে লোক ছুটে আসবে। মোহর খুঁজতে শুরু করবে। বারোটা বাজবে শুটিঙের। গত পঞ্চাশ বছরে খুব একটা খোঁজাখুঁজি হয়নি, মোহর পাওয়া যায়নি সৈকতে। লোকে ভুলেই গেছে ব্যাপারটা। ভুলেই থাকতে দাও।

পাহাড়ের ওদিকে গেলে কোন ক্ষতি আছে? জিজ্ঞেস করল কিশোর। ওতে নাকি একটা গুহা আছে। কথিত আছে, জলদস্যুরা বন্দীকে ধরে এনে ওখানে পুরে রাখত।

আমিও শুনেছি, বললেন মিস্টার আমান। যেতে চাইলে যাও। কিন্তু আধঘণ্টার ভেতর ফিরবে। ঘুরে হাটতে শুরু করলেন তিনি।

ঘুরে ঘুরে পার্কটা দেখতে লাগল তিন কিশোর।

জায়গাটা কেমন যেন ভূতুড়ো বিড়বিড় করে বলল মুসা। গা ছমছম করছে আমার।

কিশোর, তুমি চুপ করে আছ কেন? জিজ্ঞেস করল রবিন। কিছু ভাবছ মনে হচ্ছে?

অ্যাঁ...হ্যাঁ, নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটা থামাল কিশোর। রাফাত চাচার ধারণা, চুরি করছে জেলেরা। সিনেমা কোম্পানির আর সবারও তাই ধারণা, তোমরা দুজনও হয়ত এটাই ভাবছ।

ভাবছি তো। জেলে ব্যাটাদেরই কাজ, বলল মুসা। ব্যবসা খারাপ। খেতে পায় না। সেজন্যেই চুরি করছে।

আমার কিন্তু তা মনে হয় না, বলল কিশোর।
অপেক্ষা করে রইল রবিন আর মুসা।
যন্ত্রপাতি চুরি করার পেছনে অন্য কারণও থাকতে পারে, বলল গোয়েন্দাপ্রধান। কঙ্কাল দ্বীপ থেকে সিনেমা কোম্পানিকে তাড়াতে চাইছে হয়ত কেউ। বাইশ বছর ধরে নির্জন পড়ে আছে দ্বীপটা। তা-ই থাকুক, এটাই হয়ত চায় ওই লোক।
টেরর ক্যাসলের ওপর জন ফিলবির যেমন মায়া বসে গিয়েছিল, হাসল মুসা। কঙ্কাল দ্বীপের ওপরও তেমনি কারও আকর্ষণ আছে বলতে চাইছ? নইলে সিনেমা কোম্পানিকে তাড়াতে চাইবে কেন?
সেটাই রহস্য, মাথা ঝোঁকাল কিশোর। চল, গুহাটা দেখে আসি।
পার্ক থেকে বেরিয়ে এল ওরা। গাছপালার ভেতর দিয়ে পাহাড়ের দিকে উঠে গেছে একটা পায়ে চলা পথ। আগের রাতের ঝড়ে ভেঙে পড়েছে অনেক গাছপালা। পথের ওপর ডালপাতা বিছিয়ে আছে। ওসবের মধ্যে দিয়ে চলতে অসুবিধে হচ্ছে, বিশেষ করে রবিনের। তার ভাঙা পা সারেনি পুরোপুরি।
দশ মিনিট পর পাহাড়ের মাথার কাছে উঠে এলো ওরা। পাহাড় না। বলে বড় টিলা বলাই উচিত। কিন্তু নাম পাহাড়, জলদসুযুর পাহাড়। ঠিক চুড়ার কাছে গুহামুখ, খুদে একটা আগ্নেয়গিরি যেন। ভেতরে উঁকি দিল তিন গোয়েন্দা। অন্ধকার।
ভেতরে পা রাখল ওরা। তেরছা হয়ে নেমে গেছে। সুড়ঙ্গ। সুড়ঙ্গ পেরিয়ে একটা গুহায় এসে ঢুকল তিন কিশোর। বেশ বড় হলরুমের মত গুহা। লম্বাটে। শেষ প্রান্তটা সরু। সুড়ঙ্গ দিয়ে আলো এসে পড়ছে, গুহার ভেতরে আবছা অন্ধকার।
গুহার মাটি আলগা, হাঁটতে গেলে পা দেবে যায়। অসংখ্যবার খোঁড়া হয়েছে প্রতিটি ইঞ্চি, তার প্রমাণ।
নিচু হয়ে একমুঠো মাটি তুলে নিলো কিশোর। আঙুলের ফাঁক দিয়ে ছাড়তে ছাড়তে বলল, গুপ্তধন খুঁজেছে লোকে। গত সোয়াশো বছরে কয় সোয়াশো বার খোঁড়া হয়েছে। এখানকার মাটি, আল্লাই জানে! সব গাধা! এমন একটা খোলা জায়গায় এনে গুপ্তধন লুকিয়ে রাখবে, জলদস্যুদের এত বোকা ভাবল কি করে!
ঠিক, মাথা ঝাঁকাল মুসা। আঙুল তুলে সরু প্রান্তটা দেখিয়ে বলল, ভেতরে আরও গুহা আছে মনে হচ্ছে টর্চ আনলে ঢুকতে পারতাম।
গোয়েন্দাগিরি করছ, গুহায় ঢুকতে এসেছ, টর্চ আননি কেন? হাসল কিশোর। রবিনের দিকে ফিরল, তুমি এনেছ?
গুহায় ঢুকব, ভাবিনি।
আমিও ভাবিনি, বলল রবিন।
গোয়েন্দাদের জন্যে টর্চ একটা অতি দরকারি জিনিস, সব সময় সঙ্গে রাখা উচিত, আবার হাসল কিশোর। তবে, আমিও রাখতে ভুলে যাই। আজ গুহায়

ঢুকব, জানি, তাই মনে করে সঙ্গে নিয়ে এসেছি!
গুহার সরু প্রান্তে এসে দাঁড়াল ওরা। টর্চ জ্বালল কিশোর। পাথুরে দেয়াল। দেয়ালে অসংখ্য তাক, প্রাকৃতিক। মসৃণ। এখানেই ঘুমাত হয়ত জলদস্যুরা, ঘষায় ঘষায় মসৃণ হয়ে গেছে। কে জানে, বন্দিদেরকে হয়ত হাত-পা বেঁধে এখানেই ফেলে রাখা হত। অসংখ্য ফাটল, খাঁজ দেখা গেল। দেয়ালের এখানে ওখানে। একপাশে, মাটি থেকে ফুট ছয়েক উচুতে একটা খাঁজে এসে স্থির হয়ে গেল টর্চের আলো। সাদা একটা বস্তু। ওপরের দিকটা গোল।
খাইছে রে! চেঁচিয়ে উঠল মুসা। ঘুরে দাঁড়িয়েই ছুটি লাগাতে গেল। তারপরেই ঘটল অদ্ভুত একটা কান্ড চমকে থেমে গেল সে।
তাকের ওপর বসে আছে যেন মানুষের মাথার খুলিটা। চক্ষু কোটির দুটো এদিকে ফেরানো। দাঁতগুলো বীভৎস ভঙ্গিতে হাসছে নীরব হাসি, দুই পাটি দাঁতের মাঝে সামান্য ফাঁক। ওই ফাঁক দিয়েই এলো যেন কথাগুলোঃ ভাগ, ভোগে যাও জলদি।
দীর্ঘশ্বাস পড়ল। আমাকে শান্তিতে একা থাকতে দাও! এখানে কোন গুপ্তধন নেই।
কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই ছুটতে শুরু করল মুসা। ঠিক তার পেছনেই রবিন। প্রায় উড়ে চলে এল যেন সুড়ঙ্গমুখের কাছে। পাথরে হোচট খেল মুসা। হুমড়ি খেয়ে পড়ল। তার গায়ে পা বেধে গিয়ে গোয়েন্দা সহকারীর ওপরই পড়ল নথি। দুই সহকারীর গায়ে হোচট খেতে গিয়েও কোনমতে নিজেকে সামলে নিল গোয়েন্দাপ্রধান।
হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠে দাঁড়াচ্ছে দুই সহকারী। ফিরে চাইল একবার কিশোর। না, তাড়া করে আসছে না খুলি। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল আবার। নিচু হয়ে তুলে নিল টর্চটা। ভয়ে হাত থেকে খসে পড়েছিল।
মড়ার খুলি কথা বলতে পারে না, সময় পেয়ে সামলে নিয়েছে আবার কিশোর। উঠে দাঁড়িয়েছে দুই সহকারী, পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের দিকে ফিরে বলল, কথা বলতে হলে জিহবা দরকার, কণ্ঠনালী দরকার। খুলির ওসব কিছুই নেই।
হা হা করে হেসে উঠল খুলি। চমকে আবার দৌড় দিতে যাচ্ছিল দুই সহকারী, থেমে গেল খাঁজের পেছনে চোখ পড়তেই। না, খুলি হাসেনি। একটা মাথা দেখা যাচ্ছে। কোঁকড়া চুল। খুলি হাতে নিয়ে লাফিয়ে নেমে এল মাথার মালিক। আবার হাসল জোরে জোরে। নিষ্পাপ। কালো দুটো চোখের মণি জ্বলজ্বল করছে টর্চের আলোয়।
তারপর? খুলিটা পেছনে ছুড়ে ফেলে দিল পাপালো হারকুস। চিনতে পার?
নিশ্চয়, জবাব দিল কিশোর। প্রথমে দৌড় দিয়েছিলাম, তারপরই মনে হল গলাটা কেমন চেনা চেনা। টর্চ তুলে নিতে আসার সাহস করেছি সেজন্যেই।

তারমানে, ভয় পাইয়ে দিতে পেরেছি। তোমাদের? আবার হাসল পাপালো। জলদস্যুর ভূত ভেবে কি একখান কান্ডই না করলে! মুসা আর রবিনের গোমড়া মুখের দিকে চেয়ে আবার হা হা করে হেসে উঠল সে।
আমি ভয় পাইনি, গম্ভীর গলায় বলল কিশোর। শুধু চমকে গিয়েছিলাম। মুসা আর রবিন... দুই সহকারীর পক্ষে সাফাই গাইতে গিয়ে থমকে গেল সে। ভেড়া বনে গেছে যেন মুসা আর রবিন।
আমিও ভয় পাইনি, বিড়বিড় করে বলল রবিন। পা দুটো কথা শুনল না, কি করব! খালি ভাগিয়ে নিয়ে যেতে চাইল...
আমারও একই ব্যাপারা বলল মুসা। খুলির ওদিক থেকে কথা শোনা যেতেই পা দুটো চনমান করে উঠল। ছুটিয়ে বের করে নিয়ে যেতে চাইল গুহার বাইরে। তাই, ইচ্ছে করেই তো হোচট খেলাম...
হো হো করে হেসে উঠল পাপালো। দারুণ কৌতুক! হাঃ হাঃ হাঃ...
কিশোরও হেসে ফেলল। হাসিটা সংক্রমিত হল মুসা আর রবিনের মাঝেও ।
চল, বাইরে যাই, হাসি থামিয়ে বলল কিশোর। খোলা হাওয়ায় বসে আলাপ করি।
বাইরে বেরিয়ে এল। চার কিশোর। পাহাড়ের গায়ে হেলান দিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে বসল।
এখানে কখন এলে? পাপালোকে জিজ্ঞেস করল কিশোর। কি করে জানলে, আমরা গুহায় ঢুকব?
সহজ, বলল পাপালো। নৌকা নিয়ে ঘোরাফেরা করছিলাম। তোমাদের বোট চোখে পড়ল। কোথায় যাবে, বুঝতে পারলাম। দ্বীপের উল্টো দিকে বোট ভিড়িয়ে নেমে পড়লাম। গাছপালার আড়ালে আড়ালে চলে গেলাম ক্যাম্পের কাছে। দেখলাম, পার্কের দিকে যাচ্ছি। নাগরদোলাটার কাছেই একটা ঝোপের ভেতর লুকিয়ে বসে রইলাম। জানলাম, গুহায় ঢুকবে তোমরা। চট করে ঝোপ থেকে বেরিয়ে গাছের আড়ালে আড়ালে চলে এলাম এখানে। লুকিয়ে বসে রইলাম খাঁজের আড়ালে। খুলিটা ছিল অন্য একটা তাকে। খাঁজে নিয়ে গেছি। আমিই।
কিন্তু লুকিয়ে দ্বীপে নামতে গেলে কেন?? জানতে চাইল রবিন। জেটিতে নৌকা বেঁধে এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করলেই পারতে? এতসব লুকোচুরি কেন?
গার্ড শান্ত গলায় বলল পাপালো। জিম রিভানের ভয়ে। দেখলেই তাড়া করে। এখানকার সবাই তাড়া করে আমাকে। উজ্জ্বল চোখ দুটোতে বিষণ্নতা।
কেন? জিজ্ঞেস করল মুসা।
লোকের ধারণা, আমি খারাপ, ধীরে ধীরে বলল পাপালো। আমরা গরীব, তারওপর বিদেশী, কাজেই চোর। ফিশিংপোর্টে অনেক লোক আছে, যারা সত্যিই খারাপ। ওরাই চুরি করে, নাম দেয়। আমার। বলেঃ ওই গ্রেশান কুত্তাটার কাজ।

পাপালোর জন্যে দুঃখ হল তিন গোয়েন্দার।
আমরা তোমাকে অবিশ্বাস করি না, পাপু, বলল মুসা। কত রকমের লোক আছে দুনিয়ায়। মানুষকে কষ্ট দিয়ে মজা পায়। ওদের কথায় কান দিও না... আচ্ছা, গতরাতে এত তাড়াতাড়ি আমাদেরকে খুঁজে পেলে কি করে, বল তো?
সেটাই সহজ, উজ্জ্বল হয়ে উঠল আবার কালো চোখজোড়া। হাক স্টিভেনের রেস্তোরাঁয় ঝাড় দিই। আমি। বাসনপেয়ালা মেজে দিই। দুডলার করে পাই রোজ। খুব ভাল লোক হাক। ও সাহায্য না করলে না খেয়েই মরতে হত...
দুডলারে দুজন মানুষের খাওয়া হয়। চোখ কপালে উঠল। রবিনের। বেঁচে আছ কি করে?
আছি, কোনমতে, সহজ গলায় বলল পাপালো। পুরানো ভাঙা একটা কুড়ে ঘরে ঘুমাই। এক সময় ঝিনুক রাখত। ওখানে জেলেরা। কাজে লাগে না এখন, ফেলে রেখেছে। ভাড়া দিতে হয় না। আমাকে। সীম আর রুটি কিনতেই খরচ হয়ে যায় দুডলার। মাছ ধরতে জানি, তাই বেঁচে আছি। বাবা অসুস্থ। ভাল খাওয়া দরকার। কিন্তু কোথায় পাব? মাঝে মাঝে বাবার কষ্ট দেখলে আর সইতে পারি না। ছুটে বেরিয়ে আসি কুড়ে থেকে। পাগলের মত ঘুরে বেড়াই উপসাগরে, খুঁজে ফিরি সোনার মোহর। মানুষের দয়া আমি চাই না, ঈশ্বর আমাকে সাহায্য করলেই যথেষ্ট।
অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা বলতে পারল না। আর। নোনাপানি ছুয়ে ছয়ে আসছে। হাওয়া, শই শই শব্দ, সাগরের দীর্ঘশ্বাস যেন।
কোমরের বেল্টে গোঁজা ছুরি খুলে নিয়ে খামোখাই মাটিতে গাঁথছে পাপালো। থমথমে পরিবেশ হালকা করার জন্যে হাসল। নিজের দুঃখের সাতকাহনই গেয়ে চলেছি। আসল কথা থেকে দূরে সরে গেছি। অনেক। হ্যাঁ, কি যেন জিজ্ঞেস করছিলে?
গতরাতে এত তাড়াতাড়ি আমাদেরকে খুঁজে পেলে কি করে? মনে করিয়ে দিল মুসা।
সকালে হাক স্টিভেনের ওখানে বাসন মাজছিলাম। হঠাৎ কানে এলো, হাসাহাসি করছে কয়েকজন লোক। একজন বললঃ গোয়েন্দা, না! গোয়েন্দা আনাচ্ছে। আসুক না আগে হাত দেখিয়ে ছাড়ব ব্যাটাদের!
নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে কাটতে হঠাৎ থেমে গেল কিশোর। হাতা শব্দটা কোন বিশেষ ভঙ্গিতে উচ্চারণ করেছিল?
তুমি কি করে বুঝলে ভুরু কোঁচকাল পাপালো। জবাবের অপেক্ষা না করেই বলল, ওই শব্দটা বলার সময় জোর দেয় সে। ঝড়ের সময়ই তোমাদের

নিরুদ্দেশের খবর ছড়িয়ে পড়ল। বুঝে গেলাম, কোথায় পাওয়া যাবে তোমাদেরকে।
দ্যা হ্যানড…হস্ত…হাত, বিড়বিড় করল কিশোর। চিমটি কাটছে ঠোঁটে।
পুরানো গলাবন্ধ শার্টের তলায় হাত ঢোকাল পাপালো। আমাকে যখন বিশ্বাস কর তোমরা…একটা জিনিস দেখাচ্ছি… ছুরিটি মাটিতে রেখে চামড়ার তেল চিটচিটে একটা থলে বের করে আনল সে। প্লাস্টিকের সুতোয় বাঁধা মুখ।
বাঁধন খুলল পাপালো। চোখ বন্ধ করা সবাই, হাসি হাসি গলায় বলল। হাত বাড়াও।
হাসল তিন গোয়েন্দা। চোখ বন্ধ করে হাত সামনে বাড়াল। সবার ডান হাতের তালুতে একটা করে বস্তু রাখল পাপালো। এবার চোখ খোল!
অবাক হয়ে দেখল তিন গোয়েন্দা, তিনটে পুরানো সোনার মোহর।
বুড়ো আঙুলের সাহায্যে চকচকে মুদ্রার ধারটা পরীক্ষা করল রবিন। ক্ষয়ে গেছে। লেখা পড়ল। ষোলোশো পনেরো! চোখ বড়বড় হয়ে গেছে তার। এত পুরানো।
স্প্যানিশ ডাবলুন! হাতের মোহরটার দিকে চেয়ে আছে কিশোর। জলদস্যুদের গুপ্তধন!
ইয়াল্লা! কোথায়, কোথায় পেয়েছ এগুলো?
সাগরের তলায়, বালিতে পড়েছিল, বলল পাপালো। খুঁজলে আরও পাওয়া যেতে পারে। সিন্দুক কোথাও লুকিয়ে রাখেনি ওয়ান-ইয়ার, নৌকা থেকে পানিতে ফেলে দিয়েছিল। অনেক আগের ঘটনা। সিন্দুকটা নিশ্চয় পাচে ভেঙে নষ্ট হয়ে গেছে। মোহরগুলো ছড়িয়ে পড়েছে বালিতে। ঢেউয়ের জন্যে এক জায়গায় নেই। আর এখন। একটা পেয়েছি স্কেলিটন আইল্যান্ডের দক্ষিণে, একটা ডুবে যাওয়া ইয়টের কাছে। সুন্দর ইয়ট ছিল। এককালে, ধ্বংস হয়ে গেছে এখন। কয়েকদিন পরেই দুটো মোহর পেয়েছি আরেক জায়গায়। মনে হয়। ওখানে আরও…
জোরে গাল দিয়ে উঠল। কেউ, এই হারামজাদা, শুয়োরের বাচ্চা, এখানে কি করছিস!
চমকে ফিরে তাকাল তিন গোয়েন্দা। বিনয়ী জিম রিভানের এ-কি। মূর্তিা রাগে কাঁপছে। চোখ মুখ লাল। ছুটে আসছে। বেকায়দা ভঙ্গিতে পাশে ঝুলছে অকেজো হাতটা। হারামজাদা আবার গাল দিয়ে উঠল। সে। একবার না বলেছি, এদিক মাড়াবি না। আজ অ্যায়সা ধোলাই দেব… থেমে গোল সে।
জিমের দৃষ্টি অনুসরণ করে ফিরে তাকাল তিন গোয়েন্দা। তাদের পাশে নেই পাপালো। ছায়ার মত নিঃশব্দে উঠে চলে গেছে ওখান থেকে।
চোরটা কি চায়? ভারি গলায় জিজ্ঞেস করল জিম। তোমাদেরকে এখানে নিয়ে এসেছে কেন?

কিছুই চায় না, গম্ভীর হয়ে বলল কিশোর। ও আনেনি আমাদেরকে, নিজেরাই এসেছি। গুহাটা দেখতে।
কিশোরের দিকে চাইল একবার জিম। নরম হল গলার স্বর, ছেলেটা ভাল না। পাকা চোর, হাতেনাতে কেউ ধরতে পারেনি। আজ পর্যন্ত। ওর কাছ থেকে দূরে থাকার পরামর্শই দেব আমি। এখন এসো। জোসেফ গ্র্যাহাম ফিরে এসেছে। তোমাদেরকে যেতে বলেছে।
ক্যাম্পের দিকে রওনা হল ওরা। রাগ পড়ে গেছে জিমের, অন্তরঙ্গ হয়ে উঠছে ছেলেদের সঙ্গে।
গুহায় কেন গিয়েছিলে? এক সময় জিজ্ঞেস করল জিম। গুপ্তধন খুঁজতে? কিছু নেই। সাগরের তলায় ছড়িয়ে গেছে মোহর। কোনদিনই আর পাওয়া যাবে না। তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে লোকে, পায়নি। কচিত কখনও এক-আধটা মোহর সৈকতে পড়ে থাকতে দেখা যেত আগে। আজকাল আর তা-ও দেখা যায় না। হাসল গার্ড। সাগরদেবতা কোন জিনিস নিলে আর ফেরত দেয় না। এই তো, বছর দুই আগে, দশ লাখ ডলার নিল...
দশ লাখ ডলার! ভুরু কুঁচকে গেছে কিশোরের।
হ্যাঁ, অকেজো বাঁ হাত দেখিয়ে বলল জিম। ওই টাকার জন্যেই আমার হাতটা গেল...
কৌতূহলী হয়ে পড়ল তিন গোয়েন্দা। কাহিনীটা শোনাতে অনুরোধ করল জিমকে।
এক পরিবহন কোম্পানিতে চাকরি করতাম। সে সময়। টাকা-পয়সা কিংবা মূল্যবান জিনিসপত্র এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব নিত কোম্পানি। আমি ছিলাম একটা আমার কারের গার্ড। ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে পৌঁছে দিতে হত বিভিন্ন জায়গায়। কিছু নিয়মিত কাজ ছিল। তার মধ্যে একটাঃ প্রাইভেট ব্যাংক থেকে টাকা তুলে নিয়ে মেলভিলের ন্যাশনাল ব্যাংকে জমা দিয়ে আসা। দিয়ে আসতাম। ঠিকঠাক মতই চলছিল সব। নির্দিষ্ট কোন একটা পথে চলাচল করতাম না আমরা।
আজ এ পথে গেলে পরের বার অন্য পথে, তারপরের বার আরেক পথে। নির্দিষ্ট কোন সময়ও মেনে চলতাম না। ডাকাত লুটেরাকে ফাঁকি দেবার জন্যেই এই সাবধানতা। কিন্তু তারপরেও একদিন ঘটে গেল। অঘটন...
জিমের কথা থেকে জানা গেল, ঘটনার দিন, ফিশিংপোর্টের এক ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে মেলভিলে চলেছিল আর্মর কার। গাড়িতে দুজন লোক। ড্রাইভার আর জিম। পথে এক জায়গায় গাড়ি থামিয়ে দুপুরের খাবার খেতে নামল দুজনে। গাড়িটা পথের পাশে পার্ক করে তালা লাগাল সিন্দুকে। তারপর ঢুকল রেস্টুরেন্টে। বসল গিয়ে জানালার কাছে, ওখান থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল গাড়িটা।

/খাওয়া শেষ করে বেরোল দুজনে। হঠাৎ পাশের একটা পুরানো সিডান গাড়ি থেকে বেড়িয়ে এলো মুখোশপরা দুজন লোক। হাতে রভলভার। ড্রাইভারের পায়ে গুলি করল। একজন। আরেকজন বাড়ি মোরল জিমের কাঁধে, মাথায়। সঙ্গে সঙ্গে বেহুশ হয়ে পড়ল জিম।
গার্ডের পকেট থেকে সিন্দুকের চাবি বের করে নিলো ডাকাতেরা। আমার কারে উঠে বসল। গুলির শব্দ কানে গিয়েছিল একজন কনস্টেবলের। ছুটে এলো সে। গুলি করল দুই ডাকাতকে লক্ষ্য করে। একজনের হাতে গুলি লাগল। গাড়ি নিয়ে পালিয়ে গেল। ডাকাতেরা।
পুলিশ স্টেশনে ফোন করে দিল কনস্টেবল। সাড়া পড়ে গেল। রোড ব্লক করে দিল পুলিশ। কড়া পাহারা বসে গেল রাস্তায় রাস্তায়।
সাঁঝের একটু পরে পাওয়া গেল গাড়িটা, রক্তাক্ত। খালি। একটা পরিত্যক্ত বোট হাউসের কয়েক মাইল দূরে। বোঝা গেল, জলপথে পালিয়েছে ডাকাতেরা।
মাঝরাতে কোস্ট গার্ডদের পেট্রল বোট একটা সাধারণ বোটিকে ভাসতে দেখল উপসাগরে, কঙ্কাল দ্বীপের কাছাকাছি। বোটের একজন কি যেন ফেলছে পানিতে। তাড়াতাড়ি কাছে চলে এলো কোস্ট গার্ডের বোট। দুজন লোক অন্য বোটটাতে। দুই ভাই, ডিক এবং বার্ড ফিশার। দুজনেই খুব ক্লান্ত, হাল ছেড়ে দিয়েছে। বাডের বাহুতে গুলির ক্ষত, রক্ত ঝরছে। লুট করা টাকার একটি নোটও পাওয়া গেল না বোটে।
ব্যাপারটা বুঝেছ তো? নোটের বাণ্ডিল পানিতে ফেলে দিয়েছিল দুই ডাকাত। অনেক খোঁজাখুঁজি করা হয়েছে। পরে, কিন্তু একটা নোটও আর পাওয়া যায়নি। পানিতে ভিজে নিশ্চয় গলে—ছিড়ে গিয়েছিল কাগজের নোট।
টাকা ফেরত দিল না। তা ব্যাটাদের জেল হয়েছিল তো?
হয়েছিল। হোভারসনের রিভলভারের বুলেটে আহত হয়েছে বাড। কিন্তু বিমল ধরা যায়নি, তাই মাত্র চার বছর করে জেল হয়ে গেল দুই ভাইয়ের। জেলখানায় ভাল ব্যাবহারের জন্যে অর্ধেক শাস্তি মওকুফ করে। দেয়া হয়েছে ওদের। ছাড়া পেয়েছে হপ্ত দুয়েক আগে। কিন্তু আমার হাত আর ফিরে পেলাম না, জিমের কণ্ঠে ক্ষোভ। কাজও গেল কোম্পানি থেকে। এরপর আর ভাল কোন কাজ পাইনি আজ পর্যন্ত। ইচ্ছে করে, ব্যাটাদেরও হাত ভেঙে দিই...
মুসার বাবা দাঁড়িয়ে আছেন জেটিতে। মোটর বোটে ডুবুরির পোশাক আর অন্যান্য যন্ত্রপাতি তুলছে জোসেফ গ্র্যাহাম।
এই যে, তিন গোয়েন্দাকে দেখে বলে উঠলেন মিস্টার আমান। যাও, বোটে উঠে পড়। চোখ বুজে নির্ভর করতে পার জোসেফের ওপর। খুব ভাল ডুবুরি।
ছেলেদেরকে বোটে তুলে দিয়ে চলে গেলেন মুসার বাবা।

বোট ছাড়ল জোসেফ গ্র্যাহাম। বেশ বড়সড় বোট। এক জায়গায় স্তুপ করে রাখা ডুবুরির সাজ-সরঞ্জাম। ওগুলো দেখিয়ে বলল জোসেফ, আধুনিক জিনিস। খুব ভাল। তো, ডুবুরির কাজ কেমন জান-টান?

মুসা জানাল, প্রাথমিক পরীক্ষায় পাশ করেছে ওরা। সুরকেল ব্যবহার করতে জানে ভালই।

গুড, খুশি হয়ে বলল জোসেফ। এ-বি-সি-ডি থেকে আর শুরু করতে হল না।

দ্রুত এগিয়ে চলেছে বোট। হলুদ একটা বিয়ার কাছে এসে থামিয়ে দিল জোসেফ। নোঙর ফেলল। বলল, আমাদের নিচে একটা ভাঙা জাহাজ আছে। না না, কোন গুপ্তধন নেই। ডুবে যাওয়া বেশ কয়েকটা জাহাজ আছে। এদিককার পানিতে। সব কটাই তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে ডুবুরিরা। আমাদের নিচে আছে একটা স্প্যানিশ ইয়ট, অনেক বছর আগে ডুবেছে। এখানে মাত্র পঁচিশ ফুট গভীর পানি। নিশ্চিন্তে ডুব দিতে পোর। ডিকম্প্রেশনের ভয় নেই।

ফেস মাস্ক আর ফ্লিপার পরে নিলো ছেলেরা। টেনেন্টুনে পরীক্ষা করে দেখল জোসেফ। ঠিকমতই পরা হয়েছে। একটা আলমারি খুলে গ্যাস ট্যাংক, হোস কানেকশন আর ভারি ডাইভিং বেল্ট বের করল সে। বলল, এখানকার পানি খুব ভাল। পরিষ্কার, গরম। ওয়েটসুট পরার দরকার নেই। রবিন, প্রথমে তুমি চল আমার সঙ্গে। সব সময় কাছাকাছি থাকবে, আলাদা হবে না। মুহূর্তের জন্যেও। বুঝেছ?

মাথা কাত করে সায় দিল রবিন।

গ্যাস ট্যাংক, বেল্ট বাড়িয়ে দিল জোসেফ। এগুলো পরে নাও।

পরে নিতে লাগল রবিন। তীক্ষ্ম চোখে তার দিকে চেয়ে রইল জোসেফ। নাহ, পরতে জানে ছেলেটা। ভালই শিক্ষা দিয়েছে ইনস্ট্রাকটর, ভাবল সে।

বোটের পাশ থেকে ঝুলে আছে দড়ির সিঁড়ি। সিঁড়ি বেয়ে পানিতে নামল জোসেফ। সাগরের দিকে পিঠি দিয়ে হাত ছেড়ে দিল সিড়ি থেকে। ঝুপ করে পড়ল চিত হয়ে। ডুবে গেল। তার পর পরই একই কায়দায় ডুবল রবিন।

ফ্লিপার নেড়ে দ্রুত ডুবে চলল। জোড়া লেগে গেছে পায়ের ভাঙা হাড়। কোন অসুবিধে হচ্ছে না। সাঁতরাতে। কুসুম গরম পানি। স্বচ্ছ। খুব ভাল লাগছে তার। নতুন এক পৃথিবীতে এসে প্রবেশ করেছে যেন। নিচে একটা বিশাল কালো ছায়া! ডুবে যাওয়া ইয়ট। জোসেফের পাশাপাশি জাহাজটার দিকে নেমে চলল রবিন।

কাত হয়ে পড়ে আছে। ইয়ট। সামনের দিকে বিরাট এক ফাটল হাঁ করে আছে। আরও কাছে গিয়ে দেখা গেল, শ্যাওলায় ঢেকে আছে জাহাজের গা। আশেপাশে সাঁতরে বেড়াচ্ছে ছোট ছোট মাছ।

রবিনের আগে আগে সাঁতরাচ্ছে এখন জোসেফ। ফ্লিপার নেড়ে চলে গেল জাহাজের ওপর দিয়ে, পেছন দিকে।
দুটো বড় গলদা চিংড়ির ওপর নজর আটকে গেল। রবিনের। আরও কাছ থেকে দেখার জন্যে এগিয়ে গেল। হঠাৎ জোরে ঝাঁকুনি লাগল পায়ে। থেমে যেতে হল। কিছু একটা শক্ত করে চেপে ধরেছে তার ডান পা।
পানির তলায় এই প্রথম বিপদে পড়ল রবিন। আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। জোরে লাথি মেরে পা ছাড়ানোর চেষ্টা করল। পারল না। চাপ বাড়ল পায়ে। পেছনে টানছে।
পেছনে ফিরে চাইতে গেল রবিন। ফেস মাস্কে হাত লেগে গেল। নিজের অজান্তেই। সঙ্গে সঙ্গে যেন অন্ধ হয়ে গেল সে, সামনের কিছুই দেখা যাচ্ছে না। পানি ঢুকে পড়েছে মাস্কের ভেতর। উত্তেজনায় ভুলে গেল, কি করে পানি বের করে দিতে হয়।
হঠাৎ কাঁধ চেপে ধরল। কেউ। চমকে উঠল রবিন। ধরেই নিলো, দানবটা এবার শেষ করতে এসেছে তাকে। কিন্তু না, পিঠের ট্যাংকে তিন বার আলতো টোকা পড়ল। জোসেফ ফিরে এসেছে তাকে উদ্ধার করতে।
শান্ত হয়ে এলো রবিন। উত্তেজনা আর আতঙ্ক চলে গেল। মনে পড়ল, কি করে পানি বের করে দিতে হয়।
মাথা ডানে ঘোরোল রবিন। আস্তে করে এক আঙুলে চাপ দিল মাস্কের বা পাশে। সামান্য ফাঁকা হল মাস্ক। জোরে শ্বাস ফেলল। সে। বুদবুদ তুলে বেরিয়ে গেল বাতাস, সঙ্গে নিয়ে গেল মাস্কের ভেতরের পানি। আঙুল সরিয়ে আনতেই আবার জায়গামত বসে গেল মাস্ক। অন্ধকার সরে গেল চোখের সামনে থেকে।
প্রথমেই জোসেফের ওপর চোখ পড়ল। রবিনের। এদিক ওদিক মাথা নাড়ছে লোকটা। আঙুল তুলে পেছনে দেখাল। ফিরে চাইল রবিন। হায় হায়, এর জন্যেই এত ভয় পেয়েছে সো জাহাজের একটা দড়ি পেচিয়ে গেছে তার পায়ে।
বাঁকা হয়ে দড়ি ধরল রবিন। খুলে ফেলল। পা থেকে। নিজের ওপরই রাগ হচ্ছে। অযথা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। কয়েক ফুট দূরে সরে গেছে জোসেফ। হয়ত এখুনি ওঠার ইঙ্গিত করবে।
কিন্তু না, উঠল না জোসেফ। ডান হাতের বুড়ো আঙুল আর তর্জনীর মাথা এক করে একটা রিং তৈরি করল। দেখাল। রবিনকে। তার মানে, সব কিছু ঠিকঠাকই আছে। পাশে চলে এলো রবিন। দুজনে সাঁতরে চলল অ্যাবার।
পুরো জাহাজের সামনে থেকে পেছনে একবার সাঁতরাল ওরা। তারপর চারদিকে এক চক্কর দিল। আশেপাশে ঘোরাফেরা করছে ছোট ছোট মাছ। ভয় পাচ্ছে না। দুজন সাঁতারুকে বড় জাতের কোন মাছ মনে করছে। হয়ত।

অসংখ্য গলদা চিংড়ি দেখতে পেল রবিন। ইস, একটা স্পীয়ার গান যদি থাকত সঙ্গে। কয়েকটাকে ধরে নিয়ে যাওয়া যেত।
আরও কিছুক্ষণ সাঁতরাল ওরা। তারপর ওপরে ওঠার ইঙ্গিত করল জোসেফ।
ধীরে ধীরে ওপরের দিকে উঠতে লাগল। দুজনে, কোনরকম তাড়াহুড়ো করল না। মোটর বোটের তলা দেখা যাচ্ছে, অদ্ভুত কোন দানব যেন। ভুসূস করে পানির ওপর মাথা তুলল দুজনে।
দড়ির সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল জোসেফ। তাকে অনুসরণ করল রবিন।
কেমন লাগল? আগ্রহী গলায় বলল মুসা। হাত ধরে রবিনকে বোটে উঠতে সাহায্য করল।
ভালই লাগত, কিন্তু গুবলেট করে ফেলেছি, বলল রবিন। দাঁড়ি পেচিয়ে গিয়েছিল পায়ে। মাথা ঠিক রাখতে পারিনি।
জোসেফও জানাল, কিছু কিছু ভুল করেছে রবিন। পানির তলায় কোন কারণেই আতঙ্কিত হয়ে পড়া চলবে না, এর ওপর ছোটখাট এক বক্তৃতা দিল। বলল, এরপর ইয়টের কাছ থেকে দূরে থাকতে হবে।
মন খারাপ করার কিছু নেই, হেসে বলল জোসেফ। পানির তলায় হঠাৎ কোন বিপদে পড়ে গেলে মাথা ঠিক রাখা সত্যি কঠিন। রবিনের কপাল ভাল, দড়িতে আটকেছে পা। অক্টোপাসের কবলে পড়েনি। তবে, অক্টোপাস কিংবা হাঙর আক্রমণ করে বসলেও মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। না না, চমকে ওঠার কিছুই নেই। এদিককার পানিতে ওই দুটো জীব দেখা যায় না খুব একটা। হ্যাঁ, এবার মুসার পালা।
তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিল মুসা।
দড়ির সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল দুই ডাইভার। পানির তলায় ডুবে গেল মাথা। কি কি ঘটেছে পানির তলায়, কিশোরকে খুলে বলল রবিন। শেষে বলল, পরের বার আর এমন ভুল...
একটা ডাক শুনে থেমে গেল রবিন। চাইল। একশো গজ দূরে ছোট একটা পালের নৌকা। নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে। হাত নেড়ে তাদের ডাকছে পাপালো।
দেখতে দেখতে কাছে চলে এল নৌকা। দ্রুত অভ্যস্ত হাতে পাল নামিয়ে ফেলল পাপালো। হাসল। ঝকঝাঁক করে উঠল সাদা দাঁত।
আমার সম্পর্কে নিশ্চয় অনেক খারাপ কথা বলেছে। জিম, বলল পাপালো। বিশ্বাস করেছ তো?
না, বলল রবিন। বিশ্বাস করিনি। তোমার সম্পর্কে কোনরকম খারাপ ধারণা আমাদের নেই।

খুব খুশি হলাম, হাসল আবার পাপালো। বোটের গায়ে হাত ঠেকিয়ে নৌকা থামাল।
বোটে ফেলে রাখা ডুবুরির-সরঞ্জামগুলোর দিকে চাইল একবার সে, চকচক করছে চোখ। গলার স্বর নির্লিপ্ত রেখে বলল, ইয়টটার কাছে যেতে এত সাজসরঞ্জাম লাগে না। পানি খুবই অল্প। কোন যন্ত্রপাতি ছাড়াই যেতে পারি। আমি ওখানে।
শুনেছি, গ্রীক স্পঞ্জ শিকারিরা যন্ত্রপাতি ছাড়াই একশো ফুটের বেশি পানির তলায় ডুব দিতে পারে, বলল রবিন।
ঠিকই শুনেছি, গর্বিত স্বরে বলল পাপালো। আমার বাপ দুশো ফুট নিচে চলে যেতে পারত। কোমরে একটা দড়ি বাঁধা থাকত শুধু, টেনে তোলার জন্যে। দাম রাখতে পারত তিন মিনিট। মেঘ ঘনিয়ে এল। তার চেহারায়। কিন্তু অসুস্থ হয়ে পড়েছে। বাবা। আর কোনদিন ডুব দিতে পারবে না। প্রায়ই বলে, আবার গ্রীসে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে তার। কিন্তু টাকা কোথায়? যদি কোনদিন গুপ্তধন পেয়ে যাই, বাবাকে নিয়ে দেশে চলে যাব আমি। একটা মোটরবোট কিনিব। মাছ ধরব সাগরে। আহা, ওখানকার জেলেদের জীবন কত সুন্দরা আবার হাসি ফিরল। পাপালোর চেহারায়। দ্বিধা করল এক মুহূর্ত। তারপর বলল, আগামীকাল গুপ্তধন খুঁজতে যাব। আমার সঙ্গে যাবে তোমরা?
নিশ্চয়!। প্রায় চেঁচিয়ে উঠল রবিন। খুব মজা হবে।
এতক্ষণ চুপচাপ কথা শুনছিল কিশোর। বলল, শুধু গুপ্তধন খুঁজলে, আর সাঁতার কেটে বেড়ালে তো চলবে না। আমাদের। যে কাজে এসেছি, তা-ও কিছু করার দরকার। তারপর দুজনকেই অবাক করে দিয়ে জোরে হ্যাঁ-চু-চোহা। করে উঠল সে।
ঠাণ্ডা লাগল নাকি তোমার? গোয়েন্দাপ্রধানের দিকে চেয়ে বলল রবিন।
কিশোর কোন জবাব দেয়ার আগেই বলে উঠল। পাপালো, খবরদার, ঠাণ্ডা লাগলে ডুব দিতে যেয়ো না! ভীষণ কানব্যথা করবে। আচ্ছা, চলি এখন। কাজ আছে। কাল দেখা হবে।
আবার পাল তুলে দিল পাপালো। চলতে শুরু করল নৌকা। রোদে চকচক করছে উপসাগরের পানি। তাতে ভর করে উড়ে চলল যেন হালকা পালের নৌকা।
কয়েক মিনিট পর। পানির ওপর মাথা তুলল। মুসা আর জোসেফ। বোটে উঠে এল।
ফেস মাস্ক খুলে ফেলল মুসা। হাসল। দারুণ! কিশোর, এবার তোমার পালা।
খুব একটা আগ্রহী মনে হল না কিশোরকে। শরীর ভাল লাগছে না। পিঠে ট্যাংক বেঁধে মাস্কটা টেনে নামাল মুখের ওপর। জোসেফের পিছু পিছু পানিতে নেমে গেল

সিঁড়ি বেয়ে।
রবিন! উত্তেজিত মনে হল মুসাকে। জন, কি দেখেছি?
কি?
কিছু একটা দেখেছি। ইয়টের ফুট পঞ্চাশেক তফাতে। উঠে আসছি তখন। বালিতে পড়ে আছে, চকচকো আমার মনে হয় মোহর! আবার যখন ডুব দেব, দেখে আসব ওটা।
তুমি শিওর?
ঠিক শিওর না। তবে চকচকে কিছু একটা দেখেছি, এটা ভুল নয়। এখানকার লোকে তো বলেই, উপসাগরের তলায় ছড়িয়ে গেছে মোহর।
মাঝে মধ্যে পাওয়াও যায়।
কিছু একটা বলতে গিয়েও থেমে গেল রবিন। ভেসে উঠেছে। কিশোরের মাথা। তার পাশেই জোসেফ। কিশোরের ফেস মাস্ক সরে গেছে একপাশে। তাকে ধরে রেখেছে জোসেফ। ঠেলে দিচ্ছে বোটের দিকে।
কি হয়েছে? জিজ্ঞেস করল রবিন।
তেমন কিছু না, অভয় দিয়ে বলল জোসেফ। কি করে জানি মাস্ক সরে গেল ওর। ভাগ্য ভাল, গভীর পানিতে ছিল না।
বোটে উঠে এল দুজনে। বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে কিশোরের চেহারা। মাস্ক খুলে রাখতে রাখতে বলল, কান ব্যথা করছিল। হাঁচি পেল হঠাৎ। আটকাতে পারলাম না। মাস্ক সরে গেল। পানি ঢুকে গেল মুখে। মাস্ক আর জায়গামত সরাতে পারলাম না।
আবার হাঁচি দিল কিশোর।
ঠাণ্ডা লেগেছে, বলল জোসেফ। আজ আর ডুব দিতে পারবে না। আগামী তিন-চার দিনেও পারবে বলে মনে হয় না।
আমারও তাই মনে হচ্ছে, সায় দিয়ে বলল কিশোর। গতকাল প্লেনে এয়ারকুলারের বাতাস একটু বেশি ঠাণ্ডা ছিল। তার ওপর রাতে বৃষ্টিতে ভিজেছি। ঠাণ্ডা ধরে ফেলেছে।
পুরোপুরি সুস্থ না হয়ে আর ডুবতে এসো না, পরামর্শ দিল জোসেফ। হাঁচি কিংবা কাশি থাকলে তো নয়ই। ঠিক আছে, তুমি বাস। মুসা আর রবিনকে ঘুরিয়ে আনি কয়েকবার। নাকি তোমরাও আর যেতে চাও না?
না না, যেতে চাইব না কেন? বলে উঠল মুসা।
পালা করে ডুব দিতে লাগল মুসা আর রবিন। প্রথমবারের চেয়ে বেশিক্ষণ ডুবে থাকে এখন। চকচকে জিনিসটা আবার দেখা যায়। কিনা, সেদিকে নজর রাখল। দুজনেই। কিন্তু দেখতে পেল না। আর।

বিকেল হয়ে গেল। আর কোনরকম বিপদ ঘটল না। সেদিনকার মত ডোবার কাজে ইস্তফা দেবার সিদ্ধান্ত নিল জোসেফ। একা একা একবার ডুব দেবার অনুমতি চাইল মুসা। কি ভেবে রাজি হয়ে গেল তাদের ইনস্ট্রাক্টর।
অনেকক্ষণ পরে, শঙ্কিত হয়ে পড়েছে জোসেফ, এই সময় ভেসে উঠল মুসার মাথা। বোটে এসে উঠল। এক হাতে মুঠো করে রেখেছে কি যেন।
ফেস মাস্ক খুলে ফেলল মুসা। দেখ!
মুসার খোলা মুঠোর দিকে চাইল তিনজনে। একটা উজ্জ্বল বড় মুদ্রা। ধারগুলো ক্ষয়ে গেছে।
এ-কি! চেঁচিয়ে উঠল। জোসেফ। চোখ বড় বড় হয়ে গেছে। ডাবলুনা মুসার হাত থেকে মোহরটা তুলে নিয়ে দেখল ভাল করে। সতেরোশো বারো সালের। স্প্যানিশ। মুসা, খবরদার এটার কথা কাউকে বোলো না!
কেন? অবাক হল মুসা। ছিনিয়ে নেবে?
না, তা নেবে না। তবে শয়ে শয়ে লোক চলে আসবে গুপ্তধন খুঁজতে। বারোটা বাজিয়ে ছাড়বে আমাদের শুটিঙের।
সে রাতে সকাল সকাল শুতে যাবার জন্যে তৈরি হল তিন কিশোর।
সারাদিন ডোবাডুবি করেছে, ভীষণ ক্লান্ত মুসা আর রবিন। চোখ জড়িয়ে আসছে ঘুমে।
কিশোরের অসুখ আরও বেড়েছে। নাক দিয়ে পানি গড়াচ্ছে। হাঁচি দিয়ে চলেছে একের পর এক।
মিসেস ওয়েলটনের বোডিং হাউসে ছেলেদের সঙ্গেই রাতের খাবার খেয়েছেন মিস্টার আমান। এখন ফিরে যাবেন কঙ্কাল দ্বীপে। অনেক কাজ পড়ে আছে।
নাগরদোলার ভূতের গল্প সারা শহরে ছড়িয়ে পড়েছে, ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললেন মুসার বাবা। জিম শহরে গিয়ে বলে এসেছে গতরাতে সে-ই নাগরদোলা ঘুরিয়েছিল, কিন্তু কেউ বিশ্বাস করতে চায় না। গার্ড জোগাড় করতে পারেনি। কাজের লোকও আসেনি। দেখি, যাই, যদি কাঠমিস্ত্রি জোগার করতে পারি...
বেরিয়ে গেলেন মিস্টার আমান।
নিজেদের ঘরে এসে ঢুকল ছেলেরা। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কয়েকবার দেখা হয়ে গেছে মোহরটা, আরেকবার বের করল ওটা মুসা। হাতে নিয়ে ওজন আন্দাজ করল, আঙুল দিয়ে ছয়ে ধারগুলো পরীক্ষা করল, লেখাগুলো দেখল। কোথায় রাখবে? জামার পকেটে? না, পড়ে যেতে পারে—ভাবল সে। রেখে দিল নিজের বালিশের তলায়। বিছানায় উঠে শুয়ে পড়ল। রবিন আর কিশোর আগেই শুয়ে পড়েছে।
সকালে মিসেস ওয়েলটনের ডাকে ঘুম ভাঙল তিন গোয়েন্দার।

ওঠ, ছেলেরা দরজার বাইরে থেকে ডাকছে বাড়িওয়ালি। নাস্তা তৈরি। মুসা, তোমার বাবা এসেছেন। জলদি এসো।
তাড়াহুড়ো করে তৈরি হয়ে নিল তিন কিশোর। নেমে এল একতলায়।
মিস্টার আমান বসে আছেন। ছেলেদেরকে দেখে বললেন, এই যে, এসেছি। একটা কথা বলতে এসেছি। আজ তোমাদের ব্যবস্থা তোমাদেরকেই করে নিতে হবে। আমি খুব ব্যস্ত থাকব। জোসেফও সঙ্গে যেতে পারবে না। কোথাও যেতে চাইলে, নিজেরাই যাও। কিশোর, তোমার শরীর কেমন এখন?
ভাল না, বলল কিশোর। ভীষণ জোরে হ্যাঁচাচো করে উঠল। রুমাল দিয়ে নাক মুছতে মুছতে বলল, সরিা চেপে রাখতে পারিনি!
হুমম। গম্ভীর হয়ে মাথা ঝোঁকালেন মিস্টার আমান। সত্যি খারাপা তুমি ওদের সঙ্গে বেরিও না। ঘরেই থাক দু-এক দিন। ডক্টর রোজারকে ফোন করে দিচ্ছি। খুব ভাল লোক। আমার বন্ধু। স্কেলিটন দ্বীপের মালিক। গিয়ে দেখিয়ে এস ওকে।
বসে পড়ল ছেলেরা। নাস্তা দিয়ে গেল মিসেস ওয়েলটন।
ফোনের কাছে উঠে গেলেন মিস্টার আমান। ফিরে এসে জানালেন, দুপুর নাগাদ কয়েক মিনিটের জন্যে সময় দিতে পারবেন ডাক্তার রোজার। একটা কাগজে ডাক্তারের নাম-ঠিকানা লিখে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।
ব্যাপারটা খুব খারাপ হয়ে গেল, কিশোর, বলল মুসা। তুমি বেরোতে পারবে না। ভাবছিলাম, মোটর বোটটা নিয়ে আমরা একাই যাব।
কি আর করব! যাকগে, ভালই হল, ভাবার সুযোগ পেলাম, বলল কিশোর। নিজের জন্যে করুণা হচ্ছে তার, কিন্তু প্রকাশ করতে চায় না। অনেক কিছু ভাবার আছে। কঙ্কাল দ্বীপের কথাই ধর না, কিছু একটা রহস্য রয়েছে। ওটার। কিন্তু কি, বুঝতে পারছি না।
কি রহস্যের কথা বলছ? জিজ্ঞেস করল মিসেস ওয়েলটন। বড় এক প্লেট কেক নিয়ে ফিরে এসেছে।
স্কেলিটন আইল্যান্ড।
স্কেলিটন আইল্যান্ড? ওই ভয়ানক জায়গাটা জান, পরশু রাতেও নাগরদোলায় চড়েছে স্যালি ফ্যারিংটনের ভূত?
জানি, শান্ত গলায় জবাব দিল কিশোর। আসলে কি ঘটেছিল, তাও জানি। ভূত-ফুত কিছু না। ব্যাপারটা খুলে বলল মিসেস ওয়েলটনকে।
তা হতে পারে! বিশ্বাস করতে পারছে না মিসেস ওয়েলটন। তবু, সবাই বলে, ওখানে ভূতের উপদ্রব আছে। এত ধোঁয়া, তলায় নিশ্চয় আগুন আছে।
আবার বেরিয়ে গেল বাড়িওয়ালি।

নাক দিয়ে অদ্ভুত একটা শব্দ করল কিশোর। এতেই বোঝা যায়, লোকের বিশ্বাস ভাঙানো কত কঠিন!
জানালায় টোকার শব্দ হল। একই সঙ্গে সেদিকে ঘুরে গেল। তিন জোড়া চোখ। রোদে পোড়া একটা মুখ। উজ্জ্বল কালো এক জোড়া চোখ চেয়ে আছে। ওদের দিকে। পাপালো হারিকুস।
পাপু চাপা গলায় বলে উঠল রবিন। উঠে দ্রুত এগিয়ে গেল। জানালার দিকে।
গুপ্তধন খুঁজতে যাচ্ছি, ফিসফিস করে বলল পাপালো। তোমরা যাবে?
নিশ্চয়! তবে আমি আর মুসা। কিশোর যেতে পারছে না।
ঠাণ্ডা আরও বেড়েছে না? থাকুক, কি আর করা যাচ্ছি। জেটির পাশে থাকব। ডুবুরির সাজসরঞ্জাম নিয়ে এসো।
চলে গেল পাপালো।
ফিরে এল রবিন। পাপালোর সঙ্গে কি কথা হয়েছে জানাল দুই বন্ধুকে।
দারুণ! উজ্জ্বল হয়ে উঠল মুসার মুখ। হয়ত আরেকটা মোহর খুঁজে পাবা! চল, তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়ি।
যাচ্ছি, বলল রবিন। কিশোর যেতে পারছে না, সত্যি খুব খারাপ লাগছে।
কিশোরের চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে, তারও খুব খারাপ লাগছে। কিন্তু মুখে প্রকাশ করল না সেকথা। আমি পারছি না, তাতে কি? তোমরা যাও। অসুখের সঙ্গে তো আর কথা নেই।
লাঞ্চের সময় ফিরে আসব। আমরা, বেরিয়ে গেল মুসা। পেছনে রবিন। দ্রুত জেটির দিকে এগিয়ে চলেছে দুজনে।
পুরানো ভাঙাচোরা জেটির পাশে নৌকা নিয়ে অপেক্ষা করছে পাপালো। দুই বন্ধুকে দেখেই হাত তুলে ডাকল।
নৌকায় উঠল দুই গোয়েন্দা। নৌকা ছাড়ল পাপালো। গুপ্তধনের খোঁজে চলল। তিন কিশোর।
বন্ধুদেরকে বেরিয়ে যেতে দেখল কিশোর। দীর্ঘশ্বাস ফেলল। চেয়ার ঠেলে সরিয়ে উঠে দাঁড়াল। স্কেলিটন আইল্যান্ডের ওপর লেখা ফিচারটা আরেকবার খুঁটিয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে শোবার ঘরে এসে ঢুকাল।
বিছানা গোছগাছ করছে মিসেস ওয়েলটন। মুসার বালিশটা টান দিয়ে সরিয়েই স্থির হয়ে গেল। চেঁচিয়ে উঠল, আরো সোনার মোহরা এটা এলো কোত্থেকো ভুরু কুঁচকে তাকাল কিশোরের দিকে। তোমরা খুঁজে পেয়েছ, না? স্কেলিটন আইল্যান্ডে?
মুসা পেয়েছে, বলল কিশোর। কানে বাজছে জোসেফ গ্র্যাহামের হুশিয়ারিঃ খবরদার ! কেউ যেন জানতে না পারে! কিন্তু চেপে রাখা গেল না। ফাঁস হয়ে গেল

মুসার বোকামির জন্যে।
স্কেলিটন আইল্যান্ডেই পেয়েছে তো?
না, উপসাগরে। দ্বীপ থেকে অনেক দূরে।
তাজ্জব কাণ্ড! প্রথম দিন পানিতে ডুব দিয়েই মোহর পেয়ে গেল! কিশোরের দিকে তাকাল। চোখে সন্দেহ। লোকের ধারণা, শূটঙ-ফুটিঙ কিছু না, আসলে মোহর খুঁজতে এসেছে দলটা। ক্যাম্প করেছে। দ্বীপে। ক্যাপ্টেন ওয়ান ইয়ারের আসল ম্যাপটা পেয়ে গেছে। ওরা কোনভাবে।
হুঁ, চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা ঝোঁকাল কিশোর। সেজন্যেই কি বিরক্ত করা হচ্ছে সিনেমা কোম্পানিকে। কেউ হয়ত চাইছে, কোম্পানি দ্বীপ থেকে চলে যাক। ... কিন্তু মিসেস ওয়েলটন, সত্যি বলছি, কোন ম্যাপ নেই কোম্পানির কাছে। ওরা গুপ্তধন খুঁজতে আসেনি। ছবি তুলতেই এসেছে। আপনার এখানে অনেকেই আসে, তাদের ভুল বিশ্বাস ভেঙে দেবার চেষ্টা করবেন।
তা করব। কিন্তু আমার কথা বিশ্বাস করবে বলে মনে হয় না। একবার কোন কথা ওদের মাথায় ঢুকলে আর সহজে বেরোতে চায় না।
হ্যাঁ, মাথা ঝোঁকাল কিশোর। এই যেমন, নাগরদোলার ভূতের কথাও বেরোতে চাইছে না। আচ্ছা, আপনাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করব, জবাব দেবেন? সারাজীবন এখানেই বাস আপনার, এখানকার অনেক কিছুই জানেন।
নিশ্চয় বলব, যা জানি, হাসল মহিলা। ঘরটা গুছিয়ে নিই। নিচেও কয়েকটা কাজ আছে। তুমিও নিচেই চলে এসো। কফি খেতে খেতে কথা বলব।
ঠিক আছে, বলল কিশোর। রবিনের ব্যাগ থেকে ম্যাগাজিনটা বের করে নিলো। আমি যাচ্ছি। আপনি আসুন। ড্রইংরুমে এসে বসল কিশোর। পড়ায় মন দিল।
কাজ সেরে এলো মিসেস ওয়েলটন। হাতে দুকাপ কফি।
ম্যাগাজিনটা বন্ধ করে পাশে রেখে দিল কিশোর। হাত বাড়িয়ে একটা কাপ তুলে নিলো।
আরেকটা সোফায় বসে পড়ল মিসেস ওয়েলটন। হ্যাঁ, এবার কি বলতে চাও?
ওই স্কেলিটন আইল্যান্ড, বলল কিশোর। প্রথমেই বলুন, ওটা ভূতুড়ে হল কি করে? জানা আছে তার, তবু স্থানীয় একজনের মুখে শুনতে চায়।
খুলে বলল সব মিসেস ওয়েলটন। ফিচারে লেখা তথ্যের সঙ্গে তার কথা হুবহু মিলে গেল। একটা কথা জানা গেল, যেটা লেখা নেই। প্লেজার পার্ক পরিত্যক্ত হবার অনেক বছর পর আবার দেখা দিতে শুরু করেছে। স্যালি ফ্যারিংটনের ভূতা বেশ ঘন ঘন দেখা যাচ্ছে ইদানীং।
জেলেরা, যারা দেখেছে, বলল কিশোর, তাদেরকে কতখানি বিশ্বাস করা যায়?

তা সঠিক বলা মুশকিল! তিলকে তাল করার অভ্যাস আছে জেলেদের। তবে ওই তিলটা থাকতেই হবে। আরেকটা ব্যাপার, স্কেলিটন আইল্যান্ডে ভূত আছে, শুধু শুধু বানিয়ে বলতে যাবে কেন ওরা?
কেন বলতে যাবে, কোন ধারণা নেই কিশোরের। তবে, জেলেরা পুরোপুরি মিছে কথা বলেছে, এটাও ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না। তার।
ঠিক কবছর আগে থেকে দেখা দিতে শুরু করেছে স্যালি ফ্যারিংটনের ভূত?
সঠিক বলতে পারব না, বলল মিসেস ওয়েলটন। তবে বছর দুইতিন আগে থেকে। কিশোরের দিকে তাকাল বাড়িওয়ালি। সিনেমা কোম্পানি এলো, ক্যাম্প করল দ্বীপে। চুরি যেতে লাগল তাদের জিনিসপত্র, কিন্তু চোর ধরা পড়ল না। ভূতে নিয়ে যায় যেন জিনিসপত্রগুলো একেবারে গায়েবা নাহ, কিছু একটা রহস্য আছে দ্বীপটীয়া কি, বলতে পারব না।
কিশোরও মিসেস ওয়েলটনের সঙ্গে একমত। কিছু একটা রহস্য আছে কঙ্কাল দ্বীপের। কিন্তু কি সে রহস্য!
চমৎকার হাওয়া, ফুলে উঠেছে পোল। তরতর করে এগোচ্ছে ছোট নৌকা। আশেপাশে কোন নৌকা-জাহাজ নেই। অনেক দূরে দক্ষিণ দিগন্তে কয়েকটা কালো বস্তু, মাছ ধরা নৌকা।
কঙ্কাল দ্বীপের জেটিতে এসে নৌকা বাঁধল পাপালো, রবিন আর মুসার অনুরোধ। ডুবুরির সাজসরঞ্জাম নেবে ওরা। তবে আগে জোসেফ গ্রাহামের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে।
অনুমতি দিল জোসেফ। তাড়াহুড়ো করে চলে গেল প্লেজার পর্কের দিকে।
ট্যাংক। দুজনের জন্যে। পাপালোর দরকার নেই। ওসব সরঞ্জাম ছাড়াই সাগরে ডুব দিতে অভ্যস্ত সে। কি ভেবে, পানির তলায় ব্যবহারের উপযোগী দুটো টর্চও নিয়ে নিলো।
আবার এসে উঠল। ওরা নৌকায়। বাঁধন খুলল পাপালো। আবার নৌকা ছাড়ল।
উজ্জ্বল রোদে ঝিকমিক করছে পানি। ছোট ছোট ঢেউয়ে তালে। তালে দুলছে নৌকা। চুপ করে বসে থাকতে থাকতে ঝিমুনি এসে গেল। দুই গোয়েন্দার।
গান ধরল পাপালো। ভাষাটা বুঝতে পারল না। দুই গোয়েন্দা। নিশ্চয় গ্রীক। চোখ মেলে চাইল ওরা। চোখে পড়ল দ্য হ্যান্ড, হস্ত। যেখানে দুরাত আগে রহস্যজনকভাবে আটকা পড়েছিল ওরা।
রাতে ভালমত দেখতে পারেনি, দিনের আলোয় এখন দেখল। ওরা দ্বীপটা। সোয়া এক মাইল লম্বা, শদুয়েক গজ চওড়া। রুক্ষ, পাথুরে, মানুষ বসবাসের অযোগ্য। ফোয়ারা দেখা যাচ্ছে না এখন, শুধু ঝড়ের সময় দেখা যায়।
ফোয়ারার কথা পাপালোকে জিজ্ঞেস করল রবিন।

সাগর আজ শান্ত, বলল পাপালো। খুব বেশি অশান্ত হলে তবেই পানি ছিটায় ওই ফোয়ারা।...দ্বীপের তলায় কোন ধরনের সুড়ঙ্গ আছে। ওটা দিয়েই পানি ঢুকে ছিটকে বেরোয় টিলার ওপরের ছিদ্র দিয়ে। তিমির ফেয়ারার মত।
দ্বীপের মূলভূমির একশো গজ দূরে নৌকা রাখল পাপালো। পাল নামিয়ে নোঙর ফেলল। এখন ভাটা। পানি কম। এদিকে। পুরো জোয়ারের সময়ই কেবল দ্বীপ পর্যন্ত নৌকা নিয়ে যাওয়া যায়।
ঢেউয়ে নাচছে নোঙরে-বাঁধা নৌকা। সাজ-সরঞ্জাম পরে নিল রবিন আর মুসা। পাপালোর ওসব দরকার নেই। নিজের ফেস মাস্কটা শুধু পরে নিয়েছে।
আস্তে করে নৌকা থেকে পানিতে পড়ল পাপালো। আগে আগে সাঁতরে চলল। তাকে অনুসরণ করল দুই গোয়েন্দা।
কয়েক গজ গিয়ে থেমে গেল পাপালো। দাঁড়িয়ে পড়ল। কয়েক ফুট এগিয়েই হাঁটু পানিতে উঠে এল। ফিরে চেয়ে দুই সঙ্গীকে বলল, বলেছি না, পানি একেবারে কম। যা চোখা পাথর। খোঁচা লাগলে নৌকা শেষ। এজন্যেই ওখানে রেখে আসতে হয় নৌকা।
ছপাৎ ছপাৎ আওয়াজ তুলে হেঁটে চলল ওরা। দ্বীপে উঠল। একপাশে একটা ছোট খাঁড়ি। তলায় বালি। বিশ ফুট গভীর। তল দেখা
যায়।
গত হাপ্তায় ওই খাঁড়িতেই দুটো মোহর পেয়েছি, পাপালো বলল। কপাল ভাল হলে আজও পেয়ে যেতে পারি কয়েকটা।
খাঁড়িতে নেমে পড়ল তিন কিশোর। ডুব দিল।
এখানে ওখানে পড়ে আছে ছোটবড় পাথর। পাথর ঘিরে জন্মেছে নানারকম সামুদ্রিক আগাছা। হলদে বালিতে পড়ে আছে উজ্জ্বল রঙের তারা মাছ। আশপাশে ঘুরছে ছোট রঙিন মাছের দল। আর আছে কাঁকড়া। অগুণতি। বিচিত্র ভঙ্গিতে পাশে হেঁটে এগোচ্ছে, তাড়া করলেই সুড়ুৎ করে লুকিয়ে পড়ছে ছোট ছোট গর্তে। অনেক কিছুই দেখল তিন ডুবুরি, কিন্তু একটা মোহরও চোখে পড়ল না।
ওঠার ইশারা করল মুসা। ভুসস করে ভেসে উঠল তিনজনে।
বেশি গভীর না, মাউথপিস খুলে নিয়ে বলল মুসা। এখানে গ্যাস নষ্ট করে লাভ নেই। এক কাজ করলেই তো পারি। সব কিছু রেখে পাপুর মত শুধু মাস্ক পরে ডুব দিলে অসুবিধে কি? ও পারছে, আমরা পারব না কেন?
রাজি হল রবিন। তীরে এসে উঠল। দুজনে। মাস্ক ছাড়া আর সব সরঞ্জাম খুলে রাখল পাথরের ওপর। আবার নেমে এল খাঁড়িতে।
পুরো খাঁড়ির কোথাও খোঁজা বাদ রাখল না ওরা। কিন্তু মোহরের চিহ্নও চোখে পড়ল না।

ক্লান্ত হয়ে তীরে এসে উঠল তিনজনে, বিশ্রাম নিতে।
আজ ভাগ্য বিরূপ, হতাশ কণ্ঠে বলল পাপালো। তবে পেলে কাজ হত। বাবার অসুখ বেড়েছে। চল, আরেক জায়গায় যাই। একটা জায়গা চিনি। অনেক দিন আগে ওখানে একটা মোহর পেয়েছিলাম। ওখানে গিয়ে... হঠাৎ থেমে গেল সে। চেয়ে আছে উপসাগরের দিকে।
কানে ঢুকল ইঞ্জিনের শব্দ। ফিরে চাইল রবিন। ধূসর একটা মোটর বোট। পুরানো। দ্রুত গতিতে ছুটে আসছে।
এদিকেই আসছে। বলল পাপালো। ওরাও মোহর খুঁজতে আসছে কিনা কে জানে!
দ্রুত এগিয়ে আসছে বোট। গতি কমছে না মোটেই। লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল পাপালো। আরে, পাথরে বাড়ি লাগবে তো! তলা খসাবে! চেঁচিয়ে উঠল সে। এ-ই-ই বোট থামাও! বাড়ি লাগবে পাথরে!
কমল না বোটের গতি। ইঞ্জিনের শব্দে পাপালোর চিৎকার কানে গেল না হয়ত চালকের।
উঠে দাঁড়াল মুসা আর রবিন। তিনজনে হাত নেড়ে নেড়ে চিৎকার করতে লাগল, বোট থামাতে বলল।
আরও এগিয়ে এলো বোট। হুইল ধরে রাখা চালককে দেখা যাচ্ছে। মাথার বড় হ্যাটের কাণা টেনে নামানো। চেনা গেল না লোকটাকে। ছেলেদের চিৎকার তার কানো গেল। কিনা বোঝা গেল না, তবে হঠাৎ বদলে গেল ইঞ্জিনের শব্দ। গতি কমে গেল বোটের। ব্যাক গীয়ার দিয়েছে হয়ত।
সাঁ করে ঘুরে গেল বোটের নাক। গতি এখনও অনেক। কান্ত হয়ে গেল একপাশে, উল্টেই যাবে যেন। সোজা হয়ে গেল। আবার। তারপরই ঘটল অঘটন।
বোটের ঠিক সামনেই পাপালোর নৌকা। শেষ মুহূর্তে নৌকাটা দেখতে পেল বোধহয় চালক। সরে যাবার চেষ্টা করল। কিনা, বোঝা গেল। না। প্রচণ্ড জোরে আঘাত হানল ইস্পাতের তৈরি ভরি বোটের নাক, নৌকার মাঝামাঝি। ঢুকে গেল ভেতরে। একটা মুহূর্ত এক হয়ে রইল দুটো জলযান! জোরে গর্জে উঠল মোটর বোটের ইঞ্জিন। ঝটিকা দিয়ে। নৌকার ভেতর থেকে বের করে আনল নাক। মোড় ঘুরে সোজা ছুটীল খোলা সাগরের দিকে।
বোবা হয়ে গেছে যেন ছেলে তিনটে। হাঁ করে চেয়ে আছে ভাঙা নৌকাটার দিকে। দ্রুত তলিয়ে যাচ্ছে ওটা।
ইয়াল্লা! গুঙিয়ে উঠল মুসা। কাপড়-চোপড়, ঘড়ি, সব গোল আমাদের!
বাড়ি ফেরার পথ বন্ধা বিড়বিড় করল রবিন। আটকা পড়লাম এই দ্বীপে।

স্তব্ধ হয়ে গেছে পাপালো। কিছুই বলার নেই তার। মুঠো হয়ে গেছে হাত। বোবা চোখে চেয়ে আছে সাগরের দিকে। তার সব আশা সব ভরসা যেন তলিয়ে গেছে। ওই ছোট নৌকাটার সঙ্গে সঙ্গে।

পুরো ফিচারটা আরেকবার খুঁটিয়ে পড়ল কিশোর। এতই মগ্ন রইল পড়ায়, সময় কোনদিক দিয়ে বেরিয়ে গেল টেরই পেল না।

দুপুরের খাবার দেবে কিনা জিজ্ঞেস করতে এল মিসেস ওয়েলটন। মুসা আর রবিনকে না দেখে ওরা কোথায় গেছে জানতে চাইল।

চোখ মিটমিট করে তাকাল কিশোর। তাই তো! লাঞ্চের সময় তো ওদের ফিরে আসার কথা! মোহরের খোঁজ করতে করতে খিদেই ভুলে গেল!

বাইরে গেছে, মিসেস ওয়েলটনকে বলল কিশোর। এসে যাবে। যে-কোন মুহূর্তে। আমার খাবার দিন। ডাক্তারের কাছে যাবার সময় হয়ে গেছে।

নাক দিয়ে অনবরত পানি গড়াচ্ছে। রুচি নেই। এক গ্লাস দুধ দিয়ে কোনমতে একটা স্যান্ডউইচ গিলে নিলো কিশোর। তারপর বেরিয়ে পড়ল।

বোর্ডিং হাইসের কয়েকটা বাড়ি পরেই ডাক্তার রজারের চেম্বার, মিসেস ওয়েলটনকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিয়েছে কিশোর।

রাস্তায় লোকজন কম। কলোনি টাইপের কয়েকটা বাড়ি পেরিয়ে এলো কিশোর। রঙ চটে গেছে, প্লাস্টার উঠে গেছে জায়গায় জায়গায়। কয়েকটা খালি দোকান পেরোল। দরজায় ঝুলছে ভাড়া দেওয়া হইবে নোটিশ। পরিষ্কার বোঝা যায়, ফিশিংপোর্টের সময় খুব খারাপ যাচ্ছে।

আশেপাশের বাড়িগুলোর তুলনায় ডাক্তার রোজারের বাড়িটা নতুন। লাল ইটের তৈরি, ছোটখাট, ছিমছাম। ওয়েটিং রুমে ঢুকল কিশোর। দুটো বাচ্চা নিয়ে বসে আছে এক মহিলা। খানিক দূরে বসেছে দুজন বৃদ্ধ, শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সামনের দেয়ালের দিকে।

কিশোরের দিকে তাকাল ডেস্কের ওপারে বসা নার্স। ডাক্তারের চেম্বারের দরজা দেখিয়ে দিল। সোজা ঢুকে যেতে বলল।

মাঝারি আকারের একটা কামরা। এক পাশে একটা ছোট ডেস্ক। কাছেই একটা বিছানা, ওতে শুইয়ে পরীক্ষা করা হয় রোগীকে। দুপাশের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটা আলমারি। সাদা রঙ করা। ওষুধের শিশি বোতলে ঠাসা।

ডেস্কের ওপাশে বসে আছেন ডাক্তার রোজার। ধূসর হয়ে এসেছে চুল। একটা স্যান্ডউইচ খাচ্ছেন।

অপেক্ষা করছি। এসো, বসে।

স্যান্ডউইচটা খেয়ে নিলেন ডাক্তার। এক ঢোক কফি খেয়ে উঠে দাঁড়ালেন। বিছানায় গিয়ে শুতে ইঙ্গিত করলেন কিশোরকে।

দ্রুত অভ্যস্ত হাতে কিশোরের নাক গলা কান পরীক্ষা করলেন ডাক্তার। গলায় স্টেথো লাগিয়ে হাটবিট শুনলেন। টোকা দিয়ে পরীক্ষা করলেন বুক। তারপর ব্লাডপ্রেশার দেখলেন।
হুমম, মাথা ঝোঁকালেন ডাক্তার। ঠাণ্ডা লাগিয়েছ ভাল মতই। এখানকার আবহাওয়া সহ্য হয়নি…
আলমারি খুলে একটা শিশি বের করলেন ডাক্তার। একটা ছোট খামে কয়েকটা বড়ি ঢেলে নিলেন। খামটা কিশোরের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, ভাবনা নেই। চার ঘণ্টা পর পর দুটো করে বড়ি খেয়ো। দুদিনেই সেরে যাবে। তবে হ্যাঁ, নড়াচড়া বেশি করে না, বিশ্রাম নেবে। সাগরের ধারে কাছে যাবে না।
ঠিক আছে, বলল কিশোর। এক মুহূর্ত দ্বিধা করল। আচ্ছা, স্যার, আমাকে কয়েক মিনিট সময় দিতে পারবেন? কিছু কথা…
লাঞ্চ টাইম, কিশোরের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন ডাক্তার। খেতে খেতে কথা বলতে পারব। ওইটুকু সময় পাবে। ঘুরে ডেস্কের ওপাশে চেয়ারে বসে পড়লেন আবার তিনি। হ্যাঁ, শুরু কর। কি জানতে চাও?
আমি মানে…কিছু তথ্য দরকার, বলল কিশোর। শুনলাম আপনি স্কেলিটন আইল্যান্ডের মালিক…
স্কেলিটন আইল্যান্ড! হাত তুললেন ডাক্তার। ওই হতচ্ছাড়া দ্বীপের কথা রাখা শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেছে। মরার আর জায়গা পেল না হতভাগিটা! মরে নাকি ভূত হয়েছে।
তাহলে ভূত মানেন না আপনি? জেলেদের কথা বিশ্বাস করেন না? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
আরে দূত্তোর! ভূত আছে নাকি! সব ব্যাটা জেলেদের কুসংস্কার। স্যালি মারা যাবার পর কোন পাঁজি লোক ভূত সেজে গিয়ে নাগরদোলায় চড়েছিল হয়ত। মেয়েটার একটা রুমাল জোগাড় করে নিয়ে ফেলে। এসেছিল পার্কে। সব সাজানো ব্যাপার। জানি কার কাজ। কিন্তু প্রমাণ করতে পারব না। দ্বীপে যাতে লোকজন না যায়, সেজন্যেই এই শয়তানী।
মাথা ঝোঁকাল কিশোর। ডাক্তারের কথায় যুক্তি আছে।
দুর্ঘটনায় মারা গেল একটা মেয়ে, আবার বললেন ডাক্তার। কয়েক রাত পরে দেখা গেল তার ভূত। ব্যস, আর কি যেতে চায় কেউ ওখানে। ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে গেল প্লেজার পার্ক। জাঁকিয়ে উঠল মেলভিলের আরেকটা পার্ক। প্লেজার পার্কের সব কাস্টোমার চলে গেল ওখানে। ব্যাটারা মনে করেছে, আমি কিছু বুঝি না।
কাপে কফি ঢাললেন ডাক্তার। আরেকটা স্যান্ডউইচ তুলে নিলেন। সামনের প্লেট থেকে। নাও, তুমি খাও।

মাথা নাড়ল কিশোর। না, আপনি খান। আমি খেয়ে এসেছি।
পার্কটা চালাত আমার বাবা, স্যান্ডউইচ চিবাতে চিবাতে বলল ডাক্তার। আমি তখন ছাত্র। বাবার মৃত্যুর পর দ্বীপের মালিক হলাম আমি। কিন্তু ওই পর্যন্তই। একটা কানাকড়িও এল না। ওখান থেকে। ...অনেক বছর পর সিনেমা কোম্পানি এসে ভাড়া নিল দ্বীপটা। কিছু পয়সা পাব। এবার। হঠাৎ সামনে বুকে এলেন তিনি। আচ্ছা, সত্যি শুটিঙের জন্যেই এসেছে তো দলটা? গুজব শুনছি, ওয়ান-ইয়ারের ম্যাপ নিয়ে নাকি...
ভুল শুনেছেন, বাধা দিয়ে বলল কিশোর। ছবির শুটিং করতেই এসেছে দলটা।
হুমম! সত্যি হলেই ভাল। দ্বীপটা আমার। ওতে গুপ্তধন থাকলে ওগুলো আমারই হওয়া উচিত, তাই জিজ্ঞেস করলাম।
আমার মনে হয়, নেই। কোন জায়গা তো আর খোঁজা বাদ রাখেনি। লোকে। থাকলে, পেয়ে যেতই।
তা-ও ঠিক, আবার স্যান্ডউইচে কামড় দিলেন ডাক্তার।
আচ্ছা, ডক্টর, বলল কিশোর, সিনেমা কোম্পানির জিনিসপত্র চুরি যাচ্ছে, নিশ্চয় শুনেছেন। কারা, কেন চুরি করছে, কিছু অনুমান করতে পারেন?
অবশিষ্ট স্যান্ডউইচটুকু মুখে পুরলেন ডাক্তার। চিবিয়ে গিলে ফেললেন। কফির কাপ টেনে নিতে নিতে বললেন, অনুমান তো কত কিছুই করা যায়। এই যেমন, কেউ একজন চায় না, দ্বীপে শুটিং করুক। সিনেমা কোম্পানি। মেলভিলের সেই পার্কের মালিকও হতে পারে। দ্বীপটাতে লোক যাতায়াত শুরু করলে হয়ত আবার চালু হতে পারে। প্লেজার পার্ক। সেজন্যেই তাড়াতে চাইছে সিনেমা কোম্পানিকে। অন্য কারণেও হতে পারে চুরি। এখানকার লোক বড় গরীব। ঝিনুকে রোগ দেখা দেবার পর থেকে অনেকেরই রুটি জোটে না। ওদের কেউ পেটের দায়ে চুরি করছে হয়ত জিনিসপত্র।
কিন্তু ঠিক যেন মিলছে না চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর।
রহস্যের সমাধান করতে চাইছ না? হাসলেন ডাক্তার। গোয়েন্দাগিরি?
পকেট থেকে একটা কার্ড বের করল কিশোর। ডাক্তারের দিকে বাড়িয়ে ধরল।
কার্ডটা নিয়ে পড়লেন ডাক্তার। হাসলেন আবার। ফিরিয়ে দিতে দিতে বললেন, তাহলে সত্যিই তোমরা গোয়েন্দা? বেশ বেশ। আত্মবিশ্বাস থাকা ভাল। তোমাদেরকেই তাহলে দ্য হ্যান্ডে ফেলে রেখে এসেছিল হান্ট গিল্ডার। কেন, বল তো?
হয়ত ভয় দেখাতে, বলর কিশোর। কেউ একজন হয়ত চায়, আমরা আবার হলিউডে ফিরে যাই। এখানে থাকলে, খোঁজখবর করলে, তার অসুবিধে হবে।

হুমম ভুরু কুঁচকে কিশোরের দিকে চেয়ে আছেন ডাক্তার। তোমার কথায় যুক্তি আছে। ফেলে দেয়া যায় না।
আচ্ছা, স্যার, আরেকটা কথা, ডাক্তারের দিকে তাকাল কিশোর। ঠিক কবে থেকে আবার দেখা দিতে শুরু করেছে নাগরদোলার ভূত? বলতে পারবেন?
কবে থেকে? নিজের চিবুকে আলতো টোকা দিলেন ডাক্তার। দুই. হ্যাঁ, দুবছরই হবে। হঠাৎ দেখা দিতে শুরু করল ভূতটা। বেশ ঘন ঘন। কেন, একথা জানতে চাইছ কেন?
শিওর না হয়ে বলা উচিত না, স্যার। আচ্ছা, উঠি। আপনার অনেক সময় নষ্ট করে দিলাম।
না না, ও কিছু না, উঠে দাঁড়ালেন ডাক্তার। ভূত রহস্যের সমাধান করতে পারলে জানিও আমাকে। আর হ্যাঁ, আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি, দ্বীপে গুপ্তধন থাকলে, তার মালিক কিন্তু আমি।
ডাক্তারকে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এল কিশোর। চিন্তিত। বেশ কয়েকটা রহস্য একসঙ্গে এসে জড় হয়েছে। কিছুতেই জট ছাড়ানো যাচ্ছে না। এ-নিয়ে আরও অনেক বেশি ভাবতে হবে।
পথে এসে নামল কিশোর। পাশ কাটিয়ে চলে গেল একটা গাড়ি। ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষার আওয়াজ হল। পিছিয়ে এলো গাড়িটা। কিশোরের পাশে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল।
এই যে, খোকা, জানোলা দিয়ে মুখ বের করে ডাকলেন পুলিশ চীফ হোভারসন, কোথায় গিয়েছিলে?
ডাক্তারের কাছে, বলল কিশোর।
কেন?
সর্দি।
ও। হ্যাঁ, শুনেছি, হান্টকে ধরতে পারিনি। ব্যাটা পালিয়েছে।
পালিয়েছে? একটা মালবাহী জাহাজে কাজ নিয়েছে। আজ সকালে ছেড়ে গেছে জাহাজটা। কয়েক মাসের মধ্যে ফিরবে না। ওর এক বন্ধুকে ধরেছিলাম। ওই ব্যাটা বলল, গোয়েন্দা জেনে তোমাদেরকে নিয়ে একটু মজা করছে হান্ট। আমার কিন্তু বিশ্বাস হচ্ছে না।
আমারও না, বলল কিশোর।
কিন্তু কি আর করা? ব্যাটাকে তো ধরতে পারলাম না, বললেন হোভারসন। ঠিক আছে, চলি। তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখব। নতুন কিছু জানতে পারলে জনাব।

গাড়ি চালিয়ে চলে গেলেন হোভারসন। আবার বোডিং হাউসের দিকে হাঁটতে লাগল কিশোর। চিমটি কাটছে নিচের ঠোঁটে।
লোকটার ওপর প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল কিশোর। পাশের এক গলি থেকে আচমকা বেরিয়ে এসে পথ রোধ করেছে তার। হালকা-পাতলা। কুৎসিত হাসিতে বিকৃত হয়ে আছে মুখ।
এই ছেলে, দাঁড়াও, আঙুল তুলল লোকটা। তোমাকে কিছু উপদেশ দেব।
নিশ্চয়, নিশ্চয়, বলুন কি বলবেন? চেহারা বোকা বোকা করে রেখেছে কিশোর। ইচ্ছে করলেই চেহারাটাকে এমন হাবাগোবা করে তুলতে পারে সে। এতে কাজ দেয় অনেক সময়, দেখেছে।
আমার উপদেশ, হাড়গোড় আস্ত রাখতে চাইলে হলিউডে ফিরে যাও। সঙ্গে নিয়ে যাও সিনেমা কোম্পানিকে। ফিশিংপোটে তোমাদেরকে কেউ চায় না।
দুদিকের কান পর্যন্ত বিস্তৃত হল লোকটার কুৎসিত হাসি। তার হাতের দিকে চোখ পড়ল। কিশোরের। বাঁ হাতের উল্টো পিঠে উল্কিতে আঁকা ছবি। স্পষ্ট নয়। তবে বুঝতে অসুবিধে হয় না, ছবিটা জলকুমারীর। ভয়ের ঠাণ্ডা একটা শিহরণ উঠে গেল কিশোরের মেরুদন্ড বেয়ে।
ঠিক আছে, স্যার, ভোঁতা গলায় বলল কিশোর। বলব ওদেরকে। কিন্তু কে যেতে বলছে, কার নাম বলব?
বেশি চালাকির চেষ্টা কোরো না, ছেলে' কর্কশ গলায় বলল লোকটা। ভাল চাইলে আজই ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও।
হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল লোকটা। গট গট করে হেঁটে আবার ঢুকে পড়ল গলিতে।
লোকটা চলে যাবার পরও কয়েক মুহূর্ত তার গমন পথের দিকে চেয়ে রইল কিশোর। চেপে রাখা শ্বাসটা ফেলল শব্দ করে। তারপর আবার হাটতে শুরু করল বোডিং হাউসের দিকে।
একটা ব্যাপারে এখন নিশ্চিত কিশোর। দ্বীপে সিনেমা কোম্পানির থাকাটা বরদাস্ত করতে পারছে না কেউ একজন।
আমার নৌকা, বিড়বিড় করে বলল পাপালো। জোর করে ঠেকিয়ে রেখেছে চোখের পানি। নৌকা নেই। গুপ্তধন খোঁজার আশা শেষ।
তই তো! পাপালোর কত বড় ক্ষতি হয়ে গেছে, এতক্ষণে বুঝতে পারল যেন রবিন। কিন্তু একাজ করল কেন লোকটা? দুর্ঘটনা, নাকি ইচ্ছে করেই?
ইচ্ছে করে! রাগ প্রকাশ পেল পাপালোর গলায়। নইলে থামত ও। এসে জিজ্ঞেস করত, বোটটা কার। দুঃখ প্রকাশ করত।
ঠিকই বলেছ বলল রবিন। কিন্তু কেন? তোমার নৌকা ভেঙে দিল কেন? কার কি লাভ?

আমি মোহর খুঁজে বেড়াই, এটা লোকের পছন্দ না, কাঁদো কাঁদো গলায় বলল পাপালো। জেলেরা দেখতে পারে না। আমাকে। এই উপসাগর ওদের। এতে বাইরের কারও ভাগ বসানো সইতে পারে না। দীর্ঘ এক মুহূর্ত নীরবতা। যতদূর চোখ যায়, কোন নৌকা বা জাহাজের চিহ্নও নেই। আর কতক্ষণ থাকতে হবে এ-দ্বীপে?

তোমার নৌকা গেল, অবশেষে বলল রবিন। দামি অনেক জিনিসপত্র গেল আমাদেরও।

হ্যাঁ, গম্ভীর হয়ে আছে মুসা। অনেক দামি। একে অন্যের দিকে চেয়ে আছে দুই গোয়েন্দা। দুজনের মনে একই ভাবনা। এক সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল দুজনে, ওগুলো তো তুলে আনতে পারি। আমরা!

বিষণ্নতা ঝেড়ে ফেলল পাপালো। হাসল। নিশ্চয় পারি। চল। আমি সাহায্য করব তোমাদেরকে।

মুসা। পানিতে নামল। হেঁটে চলল। ডুব দিল গভীর পানিতে এসে।

পানির ওপরে রোদ। ছোট ছোট ঢেউ। তলার বালিতে শুয়ে থাকা নৌকার গায়ে বিচিত্র ভঙ্গিতে নাচছে সূর্যের আলো। ফ্লিপার নাচিয়ে দ্রুত নেমে চলেছে। রবিন আর মুসা। পাপালোর ওসব দরকার নেই। ভারি একটা পাথর ধরে রেখেছে দুহাতে। দুই সঙ্গীর চেয়ে অনেক দ্রুত নামছে

পাথরের ভারে।

নৌকার কাছে পৌঁছে গেল পাপালো। অর্ধেক পথও নামতে পারেনি এখনও অন্য দুজন। এক পাশে কাত হয়ে আছে নৌকাটা। জিনিসপত্র ভেতরে কিছু কিছু ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। আশপাশে। দুহাতে যা পারল, নিয়ে রওনা হয়ে গেল। আবার ওপরে।

পাশ দিয়ে নামার সময় পাপালোকে হাসতে দেখল দুই গোয়েন্দা। সাগরের শান্ত তলদেশে এসে কেমন এক ধরনের অনুভূতি জাগল। বিপদে পড়েছে, ভুলেই গেল। পাশাপাশি নেমে এল নৌকাটার ধারে। সাপের মত নাচছে পালের দড়ি। দড়ির কাছ থেকে দূরে থাকল রবিন। কি জানি, আবার যদি পায়ে পেচিয়ে যায়! নিজের একটা প্যান্ট পড়ে থাকতে দেখে তুলে নিল। পাপালোর জুতো জোড়া তুলে নিল মুসা। আরও জিনিসের জন্যে চাইল এদিক ওদিক।

খুব ধীরে ধীরে এপোশ ওপোশ দোল খাচ্ছে নৌকাটা, ছেড়া পালটাও দুলছে তালে তালে। বেশ জোরালো স্রোত বইছে পানির তলায়।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই যা তোলার, তুলে ফেলল ওরা। অগভীর পানিতে এসে দাঁড়াল। তিনজনেরই দুহাত বোঝাই জিনিসপত্রে।

মনে হয়। আর কিছু নেই, হেসে বলল পাপালো। সবই তুলে এনেছি।

তই তো মনে হচ্ছে, বলল মুসা। ছপাৎ ছপাৎ আওয়াজ তুলে হেঁটে চলল। ওরা তীরের দিকে। তীরে পৌঁছে ভেজা জিনিসপত্র নামিয়ে রাখল। বসে পড়ল। ওগুলোর পাশে।
হঠাৎ কি মনে পড়তেই কাপড়ের স্তুপে খুঁজতে শুরু করল পাপালো। পেল না। আরে! আমার কম্পাস কই! তোমরা তোলনি?
এদিক ওদিক মাথা নাড়ল দুই গোয়েন্দা।
তোমরা বস। আমি নিয়ে আসছি। আবার পানিতে নামল গিয়ে পাপালো।
কাপড়গুলো চিপে ছড়িয়ে দেয়া দরকার। শুকাক। বলল মুসা।
মাথা বুকিয়ে সায় দিল রবিন।
কাপড় শুকাতে দিয়ে এসে আবার আগের জায়গায় বসল ওরা।
খবর পাঠানোর কোন উপায় নেই সাগরের দিকে চেয়ে বলল রবিন। রাফাত চাচা গাধা ভাববেন আমাদেরকে। বোকার মত আবার আটকা পড়েছি এসে এই দ্বীপে।
এটা আমাদের দোষ নয়, পাপালোরও না, ভারি একটা টর্চের পানি ঝাড়তে ঝাড়তে বলল মুসা। এখন না পারলেও অন্ধকার হলে পারব। টর্চের সাহায্যে।
কিন্তু অন্ধকার হতে এখনও অনেক দেরি, আকাশের দিকে তাকাল একবার রবিন। খিদেয় পেট জ্বলছে। এতক্ষণ সইব কি করো
কাপড়গুলো শুকাক আগে। খিদের ব্যাপারটা নিয়ে পরে ভাবা যাবে, পাপালো আসুক।
এই সময় মনে হল ওদের, পাপালো গেছে অনেকক্ষণ। এতক্ষণ ফিরে আসার কথা তার। ফিরে তো এলই না, একবার ভাসেওনি এপর্যন্ত। সঙ্গে গ্যাস ট্যাংক নেই। একটানা পনেরো মিনিট দিম আটকে রাখতে পারে না কোন মানুষ সতর্ক হয়ে উঠল ওরা। বিপদের গন্ধ পেল। নিশ্চয়, বিড়বিড় করে বলল রবিন। নিশ্চয় কোন বিপদে পড়েছে!
কোন কিছুতে আটকে যায়নি তো! ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুসার মুখ। জলদি চল, দেখি কি ঘটেছে।
দ্রুত আবার ডুবুরির সরঞ্জাম পরে নিল দুজনে। পানিতে এসে নামল। হেঁটে চলে এল গভীর পানির ধারে। সবুজ পানিতে উজ্জ্বল রোদ নিচের দিকে তাকাল ওরা একবার। পেছন ফিরে চিত হয়ে পড়ল পানিতে। ডুব দিল।
আগের মতই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে তলার বাকি। কিন্তু পাপালো কোথায়? নৌকাটাও নেই। দ্রুত নেমে চলল দুজনে। ধড়াস ধড়াস করছে বুকের ভেতর।
ওপরের দিকে কয়েক ফুট ঢালু হয়ে নেমেছে পাথরের দেয়াল, তারপর একেবারে খাড়া। ছোটবড় অনেক গর্ত দেয়ালে। ওগুলোর পাপালোকে টেনে নিয়েছে, ভাবল রবিন।

না, নৌকাটা আছে। আগের জায়গায় নয়। ওখান থেকে বিশ ফুট দূরে। দেয়ালের গা ঘেঁষে পড়ে আছে। দুলছে ধীরে ধীরে। বাড়ি খাচ্ছে পাথুরে দেয়ালে।
তাড়াতাড়ি নৌকার দিকে সাঁতরে চলল দুই গোয়েন্দা। কাছে চলে এল। কিন্তু কোথায় পাপালো? নৌকার তলায় মরে পড়ে নেই তো?
বালিতে এসে ঠেকল রবিন। ভয়ে ভয়ে উঁকি দিল নৌকার তলায়। না, নেই। ওখানে পাপালো। গেল কোথায়! এখানকার পানিতে হাঙর নেই, জানা আছে। রবিনের। অক্টোপাস বা ওই ধরনের কোন ভয়াবহ সামুদ্রিক জীবও নেই। তাহলে?
বাহুতে ছোঁয়া লাগতেই প্রায় চমকে উঠল রবিন। ফিরে চাইল মুসা। দুটো আঙুল জড়ো করে দেখাল গোয়েন্দা সহকারী। ইঙ্গিতটা বুঝল রবিন। পাশাপাশি থাকতে বলছে। আঙুল তুলে একটা গর্ত দেখোল মুসা। তারপর সাঁতরাতে শুরু করল ওদিকে।
পাশাপাশি কয়েকটা গর্ত। উঁকি দিয়ে দেখল দুজনে। ভেতরটা অন্ধকার। টর্চ আনা উচিত ছিল। গর্তের মুখে পানিতে হাত দিয়ে নাড়া দিয়ে দেখল। কোন জবাব এল না। বেরিয়ে এল শুধু ছোট মাছের দল।
বড় বড় কিছু গর্তের মুখে ঘন হয়ে জন্মেছে শেওলা। ওপরের দিকে মাথা তুলে দুলছে তালে তালে। দুহাতে ওগুলো সরিয়ে উঁকি দিতে হচ্ছে ওসব গর্তের ভেতরে। কিন্তু অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ছে না।
পাঁচ মিনিট পেরিয়ে গেল। দেয়ালের ধার ধরে ধরে প্রায় শখানেক ফুট চলে এসেছে ওরা নৌকার কাছ থেকে। কিন্তু পাপালোর কোন চিহ্নই নেই।
থেমে গেল ওরা। মুখ কাছাকাছি নিয়ে এল। মাস্কের ভেতরে দুজনের চোখ দেখতে পাচ্ছে দুজনে। মুসার চোখ বড় বড় হয়ে গেল, দেখল রবিন। উদ্বেগ প্রকাশ পাচ্ছে। বুড়ো আঙুল তুলে উল্টো দিক দেখাল সে। মাথা ঝোঁকাল মুসা। দুজনে আবার এগিয়ে চলল নৌকাটার দিকে।
নৌকার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে ওরা। এই সময় দেখতে পেল ওকে। দ্রুত উঠে যাচ্ছে ওপরে পাপালো। আশ্চর্য বিশ মিনিট পানির তলায় দম আটকে রাখতে পারলা অবাক হল দুই গোয়েন্দা। ওরাও উঠতে শুরু করল ওপরের দিকে।
ভুসস করে মাথা তুলল দুই গোয়েন্দা। কোমর পানিতে দাঁড়িয়ে আছে পাপালো। হাঁ করে শ্বাস নিচ্ছে জোরে জোরে। অক্ষতই মনে হচ্ছে। ওদেরকে দেখে হাসল।
পাপালোর পাশে চলে এল দুই গোয়েন্দা। ঠেলে মুখের একপাশে সরিয়ে দিল মাস্ক।
পাপু হাঁপাতে হাঁপাতে বলল মুসা। ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে আমাদেরকে।
কোথায় ছিলে তুমি? বন্ধুকে সুস্থ দেখে হাসি ফুটেছে। রবিনের মুখে। কি হয়েছিল?
হাসল আবার পাপালো। একটা জিনিস পেয়েছি। বলত কি?

তোমার কম্পাস?
এদিক ওদিক মাথা নাড়ল গ্রীক কিশোর। জ্বলজ্বল করছে কালো চোখের তারা। হয়নি। আবার বল।
বুঝেছি! মোহর চেঁচিয়ে উঠল মুসা।
হাসছে পাপালো। ডান হাত বাড়াল। মুঠো খুলল। এক টুকরো সোনা। মুদ্রা ছিল এককালে। বেঁকেচুরে গেছে ধারগুলো।
মোহরের সিন্দুকটা পেয়েছ নাকি? জানতে চাইল রবিন।
না। দেয়ালের একটা গর্ত দিয়ে মাছ ঢুকতে বেরোতে দেখলাম। ভাবলাম, মাছেরা যদি পারে, পাপুও পারবে। ঢুকে পড়লাম ভেতরে। চুপ করল পাপালো। নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল, দ্বীপের তলায় এক গুহা আবিষ্কার করেছি। ওখানেই পেয়েছি। এই সোনার টুকরো। বাজি ধরে বলতে পারি, আরও অনেক মোহর আছে ওখানে।
পাশাপাশি ভেসে আছে মুসা আর রবিন। তল থেকে পাঁচ ফুট ওপরে। বিচিত্র শব্দ তুলে ব্রীদিং টিউব থেকে বেরিয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে বুদবুদ। পাশ দিয়ে অলস ভঙ্গিতে ভেসে চলে গেল এক ঝাঁক সাগর-কই, ঢুকে পড়ল সামনে দেয়ালের গর্তে, হারিয়ে গেল অন্ধকারে।
মণি ছাড়া বিশাল এক চোখের মত দেখতে লাগছে। সুড়ঙ্গমুখটাকে। এক কোণ থেকে আরেক কোণের দৈর্ঘ্য বারো ফুট। চোখের মাঝামাঝি জায়গার উচ্চতা ফুট পাঁচেক। ধারগুলো মসৃণ, শেওলা জন্মাতে পারে না স্রোতের জন্যে।
সুড়ঙ্গমুখের বিশ ফুট দূরে পড়ে আছে পাপালোর নৌকাটা। দুলছে। জায়গা বদল করছে। ধীরে ধীরে। এগিয়ে আসছে। এদিকেই। সেদিকে একবার চেয়েই চোখ ফিরিয়ে নিলো রবিন। নৌকার প্রতি খেয়াল দেবার সময় নেই এখন।
দুই গোয়েন্দার হাতে টর্চ। সুড়ঙ্গে ঢুকতে ইতস্তত করছে।
পাপালোর কথামত, কোন বিপদ নেই গুহায়। কম্পাস খুঁজতে এসেছিল সে। পায়নি। উঠে যাবার সময়ই নজরে পড়েছে সুড়ঙ্গমুখটা। কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে এসেছে। ওটার কাছে। ঢুকে পড়েছে।
ভেতরের দিকে প্রথমে সরু হয়ে, তারপর ধীরে ধীরে প্রশস্ত হয়ে গেছে সুড়ঙ্গ। খানিকটা এগিয়ে পেছনে ফিরে চেয়েছে পাপালো। সুড়ঙ্গমুখ দেখা যাচ্ছে, ইচ্ছে করলে ফিরে যাওয়া যায়। কিন্তু ফেরেনি সে। সামনে কি আছে, দেখার ইচ্ছে।
দম ফুরিয়ে আসতেই টনক নড়েছে পাপালোর। সামনে অন্ধকার, কি আছে কে জানে! পেছনে তাকিয়ে দেখেছে, অনেক দূরে আলো। এতদূর যেতে পারবে না, তার আগেই দম ফুরিয়ে যাবে।
আতঙ্কে ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল হাত-পা, দুই গোয়েন্দাকে বলছে পাপালো। কিন্তু মাথা গরম করলাম না। ফিরে যাবার চেষ্টা করলে মরবো। সামনে এগোলে হয়ত

বেঁচে যাব। সুড়ঙ্গটা কোন গুহায় গিয়ে শেষ হলে বাতাস পেয়ে যেতে পারি। প্রাণপণে সাঁতরে চললাম। খানিকটা এগোতেই আলো চোখে পড়ল। ভরসা পেলাম। আলোর দিকে উঠতে লাগলাম। ভুসস করে মাথা ভেসে উঠল পানির ওপরে। দম নিয়ে তোকালাম চারদিকে। আবছা অন্ধকার। একটা গুহায় ঢুকেছি। আমি। দ্বীপের তলায়। শেওলায় ঢাকা একটা পাথুরে তাকে উঠে বসলাম। জিরিয়ে নিয়ে নামব ভাবছি, এই সময়ই হাতে লাগল শক্ত জিনিসটা। শেওলার ভেতরে আটকে আছে। কৌতূহল হল। তুলে নিলাম। ও মা! সোনা!! তালগোল পাকানো মোহরা গুহার তলায় অন্ধকার। দেখা যায় না। কিছু। আমার বিশ্বাস, আরও গুপ্তধন আছে ওখানে।

পানির তলায় গুহা, জলদস্যুর গুপ্তধন, আর কি চাই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল দুই গোয়েন্দা, ঢুকবে ওখানে। কোনরকম সরঞ্জাম ছাড়া পাপালো যদি পারে, আধুনিক ডুবুরির সরঞ্জাম নিয়ে ওরা ঢুকতে পারবে না কেন? তাড়াতাড়ি চলে এসেছে এখানে। কিন্তু সুড়ঙ্গমুখের চেহারা দেখেই ভয় ঢুকে গেছে মনে। ইতস্তত করছে ভেতরে ঢুকতে।

এই সময় ওপর থেকে নেমে এলো পাপালো। দুই গোয়েন্দার পাশ কাটিয়ে সুড়ুৎ করে ঢুকে পড়ল সুড়ঙ্গে। আর দ্বিধা করার কোন মানে হয় না। যা থাকে কপালে, ভেবে, ঢুকে পড়ল দুজনে।

দুটো টর্চের জোরালো আলোয় অন্ধকার কেটে গেল। পরিষ্কার পানি, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সামনের অনেক দূর পর্যন্ত। ধীরে ধীরে প্রশস্ত হচ্ছে সুড়ঙ্গ। পাথুরে দেয়ালের খাঁজে খাঁজে ভরি হয়ে জন্মেছে শেওলা। উজ্জ্বল আলোয় চমকে গেল মাছের দল। এদিক ওদিক ছুটে পালাল। অন্ধকার ছোট একটা গুহার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একটা সবুজ মাথা।। হাঁ করা কুৎসিত মুখে খুরের মত ধারালো দাঁতের সারি। কুতকুতে চোখ। বান পরিবারের এক ভয়ানক সদস্য, মোরে ঈল। মাছটার ওপর চোখ রেখে অনেক দূর দিয়ে সরে এল দুই গোয়েন্দা।

পাপালোকে দেখা যাচ্ছে। অনেক সামনে রয়েছে সে। ওর মত তাড়াতাড়ি সাঁতার কাটতে পারছে না। দুই গোয়েন্দা। পাথুরে দেয়ালে ঘষা লাগলে ছল চামড়া উঠে যাবে। টিউব কিংবা পিঠের ট্যাংকের ক্ষতি হতে পারে। তাই সতর্ক থাকতে হচ্ছে ওদের।

মাঝে মধ্যে উপরের দিকে টর্চের আলো ফেলছে ওরা। হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল পাথরের দেয়াল। উঠতে শুরু করল দুই গোয়েন্দা। বিশ ফুট. তিরিশ ফুট... আচমকা মাস্ক বেরিয়ে এলো পানির ওপরে।

টর্চের আলো ফেলল দুজনে। একটা পাথরের তাকে উঠে বসে আছে পাপালো। পা দুটো বুলছে পানিতে। মাথার চার পাঁচ ফুট ওপরে গুহার ছাত এবড়োখেবড়ো,

রুক্ষ। পিচ্ছিল শেওলায় ঢাকা তাকে পাপালোর পাশে সাবধানে উঠেবসলো দুই গোয়েন্দা।
দ্য হ্যান্ডের পেটে এসে ঢুকেছি। আমরা, বলল পাপালো। কেমন লাগছে। গুহায় ঢুকে?
বেশ ভালই তো! জবাব দিল রবিন। আমাদের আগে নিশ্চয় এখানে কেউ ঢোকেনি!
চারদিকে টর্চের আলো ঘুরিয়ে আনল একবার রবিন। নির্দিষ্ট কোন আকার নেই গুহাটার। পানির সমতল থেকে ছাতের উচ্চতা একেক জায়গায় একেক রকম, চার থেকে ছয় ফুটের মধ্যে। গুহার এক প্রান্তে দুদিকের দেয়াল অনেক কাছাকাছি, মাঝে পরিসর কম। আলো আসছে ওদিক থেকেই।
টর্চ নিভিয়ে নিলো ওরা। আবছা আলো গুহার ভেতরে। পাথরে পাথরে ধাক্কা খেয়ে কুলকুল শব্দ তুলছে পানি। দেয়ালের গা আঁকড়ে ধরে আছে সরু শেওলা জাতীয় উদ্ভিদ। ঢেউয়ের তালে তালে দুলছে, ওঠানামা করছে ভয়াবহ কোন অজানা দানবের রোম যেন। শিউরে উঠল রবিন। নিশ্চয় কোন ফাটল আছে গুহার ছাতে। আলো আসছে ওপথেই। গুহার দূরতম প্রান্তের দিকে চেয়ে বলল সে।
ফোয়ারা! প্রায় চেঁচিয়ে উঠল পাপালো। এবার বুঝেছি। ওই ফাটল দিয়েই পানি ছিটকে বেরোয় ঝড়ের সময়। কেউ জানে না, তলায় একটা গুহা আছে। লোকের ধারণা, ফাটলাটা সাগরের অতলে কোথাও নেমে গেছে।
ঠিক ঠিক! বলে উঠল রবিন। মনে পড়ল, দুরাত আগে ঝড়ের সময় কি করে পানি ছিটকে উঠেছিল টিলার চুড়ার ছিদ্র দিয়ে। অনেক আগেই ওই ফোয়ারা আবিষ্কার করেছে লোকে। জানত না, কেন শুধু ঝড়ের রাতেই পানি ছিটায় ওটা।
একটা কথা। হতাশ কণ্ঠে বলল রবিন। আমরাই যদি গুহাটা প্রথম আবিষ্কার করে থাকি, গুপ্তধন আসবে কোথা থেকে এখানে?
তাই তো! গুঙিয়ে উঠল মুসা। এটা তো ভাবিনি।
আমরাই প্রথম নই, তাই বা জনছি কি করে? প্রশ্ন রাখল পাপালো। এত হতাশ হবার কিছু নেই। একটা মোহর যখন পেয়েছি, আরও পাবার আশা আছে। রবিন, টর্চটা দাও তো, দেখে আসি।
ওপরে বসে ধীরে ধীরে পানির তলায় আলো নেমে যেতে দেখল দুই গোয়েন্দা।
মোহর লুকানোর জন্যে এরচে ভাল জায়গা আর হয় না, বলল মুসা। কিন্তু রবিন, মনে হয় তোমার কথাই ঠিক। আমাদের আগেও কেউ এসেছিল এখানে।
তলায় নেমে গেছে পাপালো। এদিক ওদিক আলো নড়তে দেখল মুসা আর রবিন।

সময় কেটে যাচ্ছে। পাপালো আর ওঠে না। নিচে আলো নড়াচড়া করছে। নাহ্, দাম রাখতে পারে বটে। গ্রীক ডুবুরির ছেলে। ঝাড়া আড়াই মিনিট পরে উঠে এলো পাপালো। উঠে বসিল দুই গোয়েন্দার পাশে।
ঠিকই বলেছি, রবিন, বলল পাপালো। গুপ্তধন নেই এখানে। শামুক-গুগলির সঙ্গে কিছু কিছু এ-জিনিস আছে। মুঠো খুলে দেখাল সে।
অবাক হয়ে দেখল দুই গোয়েন্দা, পাপালোর হাতে দুটো মোহর।
ইয়াল্লা! চেঁচিয়ে উঠল মুসা। গুপ্তধন নেই, তাহলে এগুলো কি?
আমি বলতে চাইছি, হাজার হাজার মোহর এক জায়গায় স্তুপ করে রাখা নেই। একটা দুটো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বালিতে।
হাত থেকে হাতে ঘুরতে লাগিল মোহর দুটো। ভারি। ধারগুলো বেশি ক্ষয়ে যায়নি এ-দুটোর।
মোট তিনটে পেলাম! বলল পাপালো। একেকজনের ভাগে একটা করে।
না, তুমি পেয়েছ। ওগুলো, প্রতিবাদ করল রবিন। তিনটেই তোমার।
এক সঙ্গে এসেছি। যে-ই পাই, সমান ভাগে ভাগ করে নেব, দৃঢ় গলায় বলল পাপালো। চল, তিনজনে যাই এবার। আরও পাওয়া যাবে। হয়ত নতুন আরেকটা নৌকা কিনতে পারব। বাবার চিকিৎসা করতে পারব। চল চল!
দ্রুত হাতে ফেস মাস্ক পরে নিল মুসা আর রবিন। পাপালোর সঙ্গে সঙ্গে নেমে পড়ল পানিতে।
তলার বালিতে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য শামুক-গুগলি, ঝিনুক। নামার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পাথুরে দেয়ালের কাছে চকচকে বস্তুটা দেখতে পেল মুসা। কান্ত হয়ে আছে একটা ডাবলুন, অর্ধেকটা ডুবে আছে বালিতে।
আলতো করে ফ্লিপার নেড়ে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগল রবিন। শিগগিরই একটা ঝিনুকের তলা থেকে বেরিয়ে থাকা মোহরের অর্ধেকটা চোখে পড়ল। তুলে নিল ওটা।
উত্তেজিত হয়ে পড়ল তিন কিশোর। আরও মোহর আছে। এই গুহায়, বুঝতে পারল। সেগুলো খুঁজে বের করতেই হবে।
মোহর খুঁজতে খুঁজতে খিদে ভুলে গেল ওরা। সময়ের হিসেব রাখল না। এক ধার থেকে প্রতিটি ঝিনুক-শামুক উল্টে দেখতে লাগল। ফ্লিপার কিংবা হাতের নাড়া লেগে বালির মেঘ উঠছে মাঝে মাঝে, আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে দৃষ্টি। থেমে, বালি নেমে যাবার অপেক্ষা করতে হচ্ছে তখন। তারপরই আবার শুরু হচ্ছে খোঁজা।
দেখতে দেহকতে প্রায় দেড় ডজন মোহর বের করে ফেলল মুসা আর রবিন। একেকজনের ভাগে ছয়টা করে। হাতে আর জায়গা নেই। মুসার গায়ে টোকা দিল

রবিন। ওঠার ইঙ্গিত করল। দাম ফুরিয়ে যাওয়ায় ওদের আগেই উঠে গেছে পাপালো।
তাকে উঠে এল তিন কিশোর। পানি থেকে দূরে তাকের এক জায়গায় রাখল। মোহরগুলো।
ঠিকই বলেছ, পাপু মাস্ক সরিয়ে বলল রবিন। মোহর আছে এখানে আরও আছে।
হ্যাঁ, আছে। আরও আছে, বলল পাপালো। হাসল। হাতের মুঠো খুলে দেখাল। শেওলার তলায় এই তিনটে পেয়েছি আমি।
মোট হল চব্বিশটা বলল রবিন। কিন্তু মোহরগুলো এই গুহায় এল কি করে!
সেটা পরে ভাবলেও চলবে, বলল মুসা। চল, আরও কিছু তুলে আনি।
নেশা বড় ভয়ানক ব্যাপার, বিশেষ করে গুপ্তধনের নেশা। হুশ জ্ঞান হারিয়ে ফেলে মানুষ। সেই নেশায় পেয়েছে তিন কিশোরকে। পাগল হয়ে উঠেছে যেন ওরা। পুরো গুহার প্রতি বর্গ ইঞ্চি জায়গা খুঁজে দেখতে লাগল ওরা। কি ভীষণ বিপদে পড়তে যাচ্ছে, জানতেই পারল না।
স্রোতের টানে আস্তে আস্তে কাছে চলে এসেছে পাপালোর ভাঙা নৌকা। ছেলেদের বেরোনোর পথ বন্ধ করে দিয়ে বোতলের মুখে কর্কের ছিপির মত আটকে গেছে সুড়ঙ্গমুখে।
উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে কিশোর। লাঞ্চের সময় ফেরার কথা, অথচ বিকেল হয়ে গেল, এখনও ফেরেনি। রবিন আর মুসা। কোন অঘটন ঘটেনি তো?
ম্যাগাজিনটা টেবিলে রেখে উঠে দাঁড়াল কিশোর। জানালার সামনে এসে দাঁড়াল। উপসাগরের পুরো উত্তর প্রান্তটা চোখে পড়ে এখান থেকে। কিন্তু কই, কোন ছোট পালের নৌকা তো চোখে পড়ছে না!
ঘরে এসে ঢুকল মিসেস ওয়েলটন। হাতে দুধের গ্লাস আর কিছু বিস্কুট। টেবিলে নামিয়ে রাখল।
নিশ্চয় খিদে পেয়েছে তোমার, কিশোর, পেছন থেকে বলল বাড়িওয়ালি। নাও, এগুলো খেয়ে নাও। রবিন আর মুসা ফেরেনি এখনও?
না, ঘুরে দাঁড়াল কিশোর। লাঞ্চের সময়ই ফেরার কথা, এখনও ফিরছে না! কোন বিপদেই পড়েছে মনে হয়।
এত ভাবছ কেন? বলল মিসেস ওয়েলটন। হয়ত বড়শি ফেলে মাছ ধরছে। ভুলেই গেছে ফেরার কথা।
বেরিয়ে গেল বাড়িওয়ালি।
নিশ্চিন্ত হতে পারল না কিশোর। বসে পড়ল টেবিলের সামনে। বিস্কুট চিবোতে চিবোতে ম্যাগাজিনটা টেনে নিলো আবার। কঙ্কাল দ্বীপ নিয়ে লেখা ফিচারের

জায়গায় জায়গায় পেন্সিল দিয়ে দাগ দিয়েছে। আবার দেখতে লাগল ওগুলো। ভাবনা চলছে। মাথায়।
বাইশ বছর আগে বজ্রপাতে মারা গেছে স্যালি ফ্যারিংটন। সুযোগটা নিয়েছে মেলভিলের পর্কের মালিক। গুজব ছড়িয়ে দিয়েছে স্যালির ভূত দেখা গেছে প্লেজার পর্কে। তারপর? প্রায় বিশ বছর আর ভূতের দেখা নেই। হঠাৎ করেই দেখা দিতে শুরু করেছে। আবার বছর দুই আগে থেকে। দেখেছে অশিক্ষিত, কুসংস্কারে ঘোর বিশ্বাসী জেলেরা। তাদের কথায় বিশ্বাস করে কঙ্কাল দ্বীপে লোক যাতায়াত বন্ধ হয়ে গেছে।
এলো সিনেমা কোম্পানি। প্লেজার পার্কে কয়েকটা দৃশ্য শুটিং করবে। তাদেরকে উত্যক্ত করা শুরু হল। কেন? দ্বীপে ক্যাম্প করে তারা কার কি ক্ষতি করছে? মালিক বিরূপ নয়। তাদের ওপর, তাহলে ভাড়াই দিত না। তাহলে কে?
ঝটিকা দিয়ে খুলে গেল দরজা। ভাবনার জগৎ থেকে ফিরে এলো কিশোর। ঘরে এসে ঢুকল জোসেফ গ্র্যাহাম। উত্তেজিত।
কিশোর, বলল জোসেফ। পাপালো হারকুসকে দেখেছ?
সকালে দেখেছি, জবাব দিল কিশোর। ওর নৌকায় করে সাঁতার কাটতে গেছে। রবিন আর মুসা। ফেরেনি এখনও।
সারাদিন পাপালোর সঙ্গে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল। জোসেফ। ওরা দুসেট একোয়ালঙ নিয়ে গেছে। প্র্যাকটিস করবে বলল, দিয়ে দিলামা কালো হয়ে গেছে তার মুখ। ওই হারামি গ্রেসানটার সঙ্গে গুপ্তধন খুঁজছে না-তো ওরা?
জবাব দিল না কিশোর। চেয়ে আছে জোসেফের মুখের দিকে। সতর্ক হয়ে উঠেছে।
ওদেরকে খুঁজতে যাওয়া দরকার। আবার বলল জোসেফ, ওই গ্রেসানের বাচ্চা এমনিতেই যা করেছে, তার ওপর আরও কিছু... থেমে গেল সে। কিশোরের দিকে তাকাল। আমি চললাম খুঁজতে।
আমিও যাব, সর্দি লেগেছে, ভুলে গেল কিশোর। তার এখন ভাবনা, তিন বন্ধুকে খুঁজে বের করা।
এসো, বলেই ঘুরে দাঁড়াল জোসেফ।
জেটিতে বাঁধা আছে ছোট একটা মোটর বোট। উঠে বসিল জোসেফ আর কিশোর। ইঞ্জিন গর্জে উঠল। ছুটে চলল বোট।
এমনিতেই যা করেছে... কথাটার মানে কি, জানার কৌতূহল হচ্ছে কিশোরের। কিন্তু জিজ্ঞেস করতে পারল না। কথা বলার মেজাজে নেই জোসেফ। থমথমে গভীর মুখ। হুইলে চেপে বসেছে আঙুল।

কঙ্কাল দ্বীপের জেটিতে এসে বোট রাখল জোসেফ। একটা খুঁটির সঙ্গে বেঁধে ফেলল।
পাঁচজনের জায়গা হবে না। এই বোটে, বলল জোসেফ। তাছাড়া সব সরঞ্জাম নিয়ে তৈরি হয়ে যেতে চাই। ডুব দেবার দরকার পড়বে। কিনা কে জানে!
কি ব্যাপার? এত দুশ্চিন্তা কেন জোসেফের?—ভাবল কিশোর। পাপালোর সঙ্গে ডুব দিতে গেছে। রবিন আর মুসা, কি হয়েছে তাতে? কোন অঘটন। আশা করছে জোসেফ?
পাশের বড় বোটটায় উঠে গেল জোসেফ। কিশোরও উঠল।
গর্জে উঠল বোটের শক্তিশালী ইঞ্জিন। নাক ঘুরিয়ে তীব্র গতিতে ছুটল উপসাগরের পানি কেটে।
প্রথমে পুরো কঙ্কাল দ্বীপের চারপাশে একবার চক্কর দিল জোসেফ। পাপালোর বোটের চিহ্নও নেই। দ্য হ্যান্ডের দিকে রওনা দিল সে।
শিগগিরই পৌঁছে গেল দ্য হ্যান্ডে। দ্বীপের চারপাশে দুবার চক্কর দিল।
নেই, ইঞ্জিন নিউট্রাল করে বলল জোসেফ। কঙ্কাল দ্বীপে নেই, দ্য হ্যান্ডে নেই। তারমানে, একটা দিকেই গেছে নৌকাটা। উপসাগরের পুবে। ঠিক, ওদিকেই গেছে।
চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা ঝোঁকাল কিশোর।
আবার গিয়ার দিল জোসেফ। চলতে শুরু করল বোট। নাক ঘুরে গেল পূর্ব দিকে।
তাকে উঠে বসে আছে। রবিন, মুসা আর পাপালো। কোমরের কাছে উঠে এসেছে পানি। আগের চেয়ে দুফুট বেড়েছে। পাথুরে দেয়ালে বাড়ি মারছে ছলাৎ-ছল-ছলা ছলাৎ-ছল-ছলা। ধীরে ধীরে কমে আসছে। গুহার ভেতরে আলো।
মোহরের নেশায় আর কোন দিকেই খেয়াল নেই তিনজনের। গোটা পঞ্চাশেক। মোহর খুঁজে পেয়েছে। কোমরের থলেতে ঢুকিয়ে রেখেছে ওগুলো পাপালো।
জোয়ার এসেছে, প্রথম খেয়াল করল পাপালো। চল, বেরিয়ে পড়ি। আর মোহর নেই এখানে।
ঠিক, সায় দিয়ে বলল মুসা। গত আধা ঘণ্টায় আর একটাও পাইনি। খিদেও লেগেছে। চল, যাই।
আগে আগে চলল মুসা। সুড়ঙ্গমুখে আটকে থাকা নৌকাটা প্রথম দেখতে পেল সে-ই। ওপরের দিকটা এপাশে। সুড়ঙ্গের ছাতের একটা খাঁজে ঢুকে গেছে মাস্তুলের আগা। বাইরে থেকে ধাক্কা দিচ্ছে স্রোত। শক্ত হয়ে আটকে গেছে নৌকা।
টর্চের আলোয় সব পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে মুসা। নৌকার চারপাশে ফাঁক নেই বললেই চলে। আটকে গেছে ওরা, বুঝতে অসুবিধে হল না তার।

মুসার পাশে চলে এসেছে রবিন। সামনের দৃশ্য সে-ও দেখল। এগিয়ে গেল দুজনে। ধাক্কা দিল নৌকার গায়ে। নড়াতে পারল না। পারবেও না, বুঝে গেল।
ঠিক এই সময় ওদের পাশে এসে থামল পাপালো। এক মুহূর্ত চেয়ে রইল নৌকাটার দিকে। বুঝে গেল। যা বোঝার। ডিগবাজি খেয়ে ঘুরল। তীরের মত ছুটে চলে গেল। গুহার দিকে। তার দম ফুরিয়ে গেছে। গুহায় ফিরে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।
মুসা আর রবিনও খেয়াল করল এতক্ষণে, ট্যাংকে গ্যাস ফুরিয়ে এসেছে। আরেকবার প্রাণপণ চেষ্টা করল নৌকাটা সরানোর। ব্যর্থ হয়ে পাপালোর পথ অনুসরণ করল।
মিনিট দুয়েক পর। তাকে বসে আছে তিন কিশোর। কোমর ছাড়িয়ে উঠে এসেছে পানি।
ভালমতো ফাঁদে আটকেছি। আমরা বলল পাপালো। জোয়ার যতই বাড়বে, নৌকাটা আরও শক্ত হয়ে আটকাবে।
হ্যাঁ, বিষণ্ন কণ্ঠে বলল মুসা। এমন কান্ড ঘটবে, কে জানত?
টানে ধীরে ধীরে সরে আসছে নৌকাটা। গুরুত্ব দিইনি। তখন ব্যাপারটাকে। যা হবার তা-তো হল, এখন কি করব?
দীর্ঘ নীরবতা। কেউ কোন পরামর্শ দিতে পারল না।
জোয়ার নামার সময় হয়ত টানের চোটে নেমে যাবে নৌকাটা, বলল পাপালো।
কিন্তু কয়েক ঘণ্টা থাকবে জোয়ারা গুঙিয়ে উঠল মুসা। তারপরও যদি নৌকা না নামে?
ততক্ষণ আমরা বাঁচব কিনা তাই বা কে জানে! রবিনের গলায় আতঙ্ক। আরও বড় সমস্যা আসছে।
কি বললে? বট করে রবিনের দিকে ফিরল পাপালো।
দেখ! বলল রবিন। হাতের টর্চের আলো পড়েছে ছাতে। ভেজা ভেজা। শেওলা লেগে আছে।
তাতে কি? মুসার প্রশ্ন।
জোয়ারের সময় ওখানে উঠে যায় পানি, রবিনের গলা কাঁপছে। খাঁচায় ভরে ইদুরকে পানিতে চুবিয়ে রাখলে যা হয়, আমাদেরও সেই অবস্থা হবে!
কারও মুখে কথা নেই। আর। গুহার দেয়াল ছলাৎ-ছল।াৎ বাড়ি মারছে পানি। ধীরে ধীরে উঠে আসছে ওপরে।

দ্বীপের দিকে চেয়ে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল কিশোর, মিস্টার গ্রাহাম! বোট ফেরান। কি যেন দেখা যাচ্ছে!

ভুরু কোঁচকাল জোসেফ। কিন্তু বোট ফেরাল।
এক মিনিট পরেই দ্বীপের এক পাশে খুদে সৈকতের ধারে এসে থামল বোট। লাফ দিয়ে নেমে এল কিশোর। ছুটল। চলে এল অন্য পাশে, যেখানে জিনিসগুলো দেখেছিল।
আছে। পাথরের ওপর বিছিয়ে আছে কাপড়। শুকিয়ে এসেছে। পায়ের আওয়াজ শুনে ফিরে চাইল কিশোর। জোসেফ গ্র্যাহাম আসছে।
ওদের কাপড়, বলল কিশোর। কাছেপিঠেই নিশ্চয় কোথাও আছে ওরা। দেখি, টিলাটায় চড়ে দেখে আসি আমি।
ছেলেদের কাপড়গুলোর দিকে চেয়ে আছে জোসেফ। হতবুদ্ধি হয়ে গেছে যেন! কিশোরের দিকে ফিরে চেঁচিয়ে বলল, নৌকাটা নেই, আমি শিওরা এখানে কাপড়চোপড় খুলে রেখে কোন কারণে...
জোসেফের কথা শোনার অপেক্ষা করছে না কিশোর। ছুটে যাচ্ছে টিলার দিকে।
চুড়ায় উঠে এল কিশোর। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। কোথাও দেখা যাচ্ছে না নৌকাটা। ধাপ করে একটা পাথরের ওপর বসে পড়ল। হতাশ ভঙ্গিতে।
পাশে এসে দাঁড়াল জোসেফ। পুরো দ্বীপটা দুবার চক্কর দিয়েছি। দেখিনি ওদের। তারমানে এখানে নেই! লাথি মারাল একটা ছোট পাথরে। ক্ষোভ চাপা দিতে পারছে না।
গড়াতে গড়াতে গিয়ে ছোট একটা গর্তে পড়ল পাথরটা। এক মুহূর্ত পরেই পানিতে পড়ার চাপা শব্দ কানে এল। ব্যাপারটা খেয়াল করল। কিনা। ওরা, বোঝা গেল না।
উপকূলেই খুঁজতে হবে। কিন্তু কাপড় এখানে ফেলে গেল কেন ওরা
চল, বলল জোসেফ। আগে কোস্ট গার্ডকে খবর দিতে হবে। সাঁঝের বেশি বাকি নেই। অন্ধকার নামার আগেই খুঁজে বের করতে হবে ওদের।
বোটের দিকে এগিয়ে চলল জোসেফ। অনুসরণ করল কিশোর। চিমটি কাটছে নিচের ঠোঁটে।
পেয়েছি। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। পাই করে ঘুরেই ছুটল টিলার দিকে। ছোট গর্তটার ওপর গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল।
গর্তের মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চেঁচিয়ে ডাকল, মুসা রবি-ই- ন! তোমরা আছ ওখানে? বলেই কান রাখল গর্তের ওপর।
এক মুহূর্তনীরবতা। বুকের ভেতর ধড়াস ধড়াস করছে কিশোরের। তবে কি ভুল করেছে সে? অনুমান ঠিক হয়নি?

হঠাৎ শোনা গেল। জবাব। চাপা, কিন্তু পরিষ্কার। মুসার গলা। কিশোরা ফাঁদে আটকে গেছি। তাড়াতাড়ি বের করা আমাদের! জোয়ার এসেছে পানি আরও বেড়ে গেলে ডুবে মরব। জলদি, জলদি করা কি-শো-ও-র-র-র...

দ্রুত বাড়ছে পানি।

গুহার দেয়ালে জন্মে থাকা জলজ আগাছা আঁকড়ে ধরে আছে ওরা। ঝাঁপাঝাঁপি করছে পানি দেয়ালে দেয়ালে। ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে চাইছে ওদেরকে তাক থেকে। আর বেশি বাকি নেই, ছাতে গিয়ে ঠেকবে পানি। এত দেরি করছে কেন বিড়বিড় করল মুসা। কাঁপছে ঠাণ্ডায়, ভয়ে। তার মনে হচ্ছে, এক যুগ আগে গড়িয়ে পড়েছিল ছোট পাথরটা। চমকে উঠেছিল ওরা। খানিক পরেই ডাক শোনা গিয়েছিল। কিশোরের। বিপদে আছে, জানিয়েছে মুসা। তার মানে সাহায্য আসবেই। কিন্তু আর কত দেরি?

অপেক্ষা ছাড়া করার আর কিছুই নেই। কাজেই অপেক্ষা করতে লাগল ওরা। মাঝে মাঝে টর্চ জ্বেলে দেখে নিচ্ছে, ছাতে পানি ঠেকতে আর কত বাকি ব্যাটারিও ফুরিয়ে এসেছে। আলোর উজ্জ্বলতা নেই। তবু, অন্ধকারে স্নান ওই আভাটুকুই সাহায্য করছে অনেক।

শোন! হঠাৎ বলল পাপালো। মোহর পেয়েছি, এটা ফাঁস করব না আমরা।

কেন?? জানতে চাইল রবিন। এখানে কি করতে এসেছি, বলতে হবে না?

বলব ডুবে ডুবে সাঁতার কাটছিলাম। হঠাৎ নজরে পড়ে গেল গর্তটা! বুঝলাম সুড়ঙ্গ। ভেতরে কি আছে দেখার জন্যে ঢুকে পড়লাম, বলল পাপালো। মোহর পেয়েছি বললে ফিরে এসে আবার খোঁজার সুযোগ হারাবা।

হারালে হারাব, বলল রবিন। এখানে দ্বিতীয়বার আর ঢুকতে চাই না। আমি। মোহরের বস্তা পড়ে থাকলেও না। যার খুশি এসে নিয়ে যাক।

আমারও একই কথা, সায় দিয়ে বলল মুসা। পাপালোকে বলল, এত ভাবছ কেন? যা মোহর ছিল, সব তুলে নিয়েছি আমরা। আর নেই। জোয়ারের সময় কোনভাবে এসে পড়েছিল হয়ত। ভেবো না, সিন্দুকফিন্দুক নেই এখানে।

তা হয়ত নেই, কিন্তু বালির তলায় আরও মোহর থাকতে পারে, বোঝানোর চেষ্টা করল পাপালো। এটাই আমার শেষ সুযোগ। আরেকটা নৌকা কিনতে হবে, বাপকে বাঁচাতে হবে। কটা মোহর পেয়েছি? চল্লিশ? পঞ্চাশ? তিন ভাগের এক ভাগ কাটা হবে? নৌকাই তো কিনতে পারব না।

ঠিক আছে, পাপালোর কথা মেনে নিল রবিন। আপাতত ব্যাপারটা ফাঁস করব না আমরা। আরেকবার খুঁজে দেখার সুযোগ...

মুসা আমান আর আসছে না। এই গুহায়া বাধা দিয়ে বলল গোয়েন্দা সহকারী। তুমি আসতে চাইলে আসতে পার, পাপু। কোথায় মোহর পেয়েছি কাউকে না

বললেই তো হল।
মোহর পেয়েছি, এই কথাটাও গোপন রাখতে চাই এখন, থলেতে আঙুলের চাপ শক্ত হল পাপালোর। একবার কেন, আরও দশবার আসতেও ভয় পাব না। আমি। কপাল খারাপ তাই বিপদে পড়ে গেছি। কে ভাবতে পেরেছিল, সুড়ঙ্গমুখে এসে নৌকা আটকাবে? এমন ঘটনা সব সময় ঘটে না।
জোসেফ আর কিশোর কতখানি কি করছে, কে জানে! গুঙিয়ে উঠল মুসা। কোস্ট গার্ডকে খবর দিতে গিয়ে থাকলেই সেরেছে। ফিরে এসে আর পাবে না আমাদেরকে।
নৌকাটা সরাতে শক্তি দরকারম বলল রবিন। ভেঙে ফেলতে হবে, কিংবা শাবল দিয়ে চাড় মেরে বের করে নিতে হবে।
অনেক সময় লেগে যাবে তাতে, ঢেউয়ের ধাক্কায় কাত হয়ে গেল মুসা। আগাছা আঁকড়ে ধরে সামলে নিল। তাক থেকেই ফেলে দেবে। দেখছি... হ্যাঁ, যা বলছিলাম। কমসে কম দুঘণ্টা তো লাগবেই। ততক্ষণে আমরা শেষ।
কিশোর জেনেছে আমরা এখানে আছি, নিরাশ হচ্ছে না রবিন। কিছু একটা ব্যবস্থা করে ফেলবেই ও। ঠিক বের করে নিয়ে যাবে। আমাদের, দেখা।
সেই প্রার্থনাই কর, নিচু গলায় বলল পাপালো।
***
মুসার কাছ থেকে সাড়া পাবার পর মাত্র পনেরো মিনিট পেরিয়েছে।
তীর থেকে শখানেক ফুট দূরে ভাসছে এখন মোটর বোট। ইঞ্জিন নিউট্রাল। হাল ধরেছে কিশোর। জোসেফ ডুবুরির পোশাক পরছে।
পাগলামির সীমা থাকা উচিত। আপনমনেই বিড়বিড় করল। জোসেফ। ওয়েট বেল্ট আটল কোমরে। বোটের কিনারে গিয়ে দাঁড়াল। ফিরে চাইল। এখানেই থাক। পরিস্থিতি দেখে আসি আমি। কোস্ট গার্ডকে খবর দেয়ার সময় আছে কিনা কে জানে! ফেস মাস্ক টেনে দিল সে। একটা আন্ডারওয়াটার টর্চ হাতে নিয়ে নেমে গেল পানিতে।
বড় একা একা লাগছে কিশোরের। দক্ষিণে অনেক দূরে এক সারি নৌকা, মাছ ধরা শেষ করে ফিরে চলেছে ফিশিংপোর্টে। এদিকে কেউ আসবে না। গুহায় আটকা পড়ে মরতে বসেছে তিন বন্ধু। ওদেরকে কি উদ্ধার করতে পারবে শেষ পর্যন্ত? মুসা যা বলল, সুড়ঙ্গমুখে বেশ শক্ত করেই আটকেছে। ভাঙা নৌকা।
অতি ধীরে গড়িয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে যেন সময়। কিশোরের মনে হল এক ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখল, জোসেফ গেছে মাত্র পাঁচ মিনিট আগে। আরও পাঁচ মিনিট পরে ভেসে উঠল। জোসেফের মাস্কে ঢাকা মুখ। দ্রুত উঠে এল সে বোটে। মাস্ক সরাল মুখ থেকে। চেহারা ফ্যাকাসে, উদ্বিগ্ন।

সাংঘাতিক শক্ত হয়ে আটকেছে। বলল জোসেফ। কোথাও ধরে যে টান দেব, সে জায়গাই নেই। কোস্ট গার্ডকেই খবর দিতে হবে। শাবল কিংবা ক্রো-বার ছাড়া হবে না।
জোসেফের মুখের দিকে চেয়ে আছে কিশোর। তাতে তো অনেক সময় লাগবো কমপক্ষে দুঘণ্টা!
আস্তে মাথা ঝাঁকাল জোসেফ। তা-তো লাগবেই। কিন্তু আর কি করার আছে? বড় কোন গর্ত নেই টিলার। থাকলে ও পথে দড়ি নামিয়ে দিয়ে টেনে তোলা যেত।
জোসেফের কথা কানে ঢুকছে কিনা কিশোরের, বোঝা গেল না। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে সে।
মিস্টার গ্র্যাহামা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। নৌকাটাকে টেনে বের করে আনলেই হয়।
টেনে বের করবা ভুরু কুঁচকে গেল জোসেফের। কি করে?
মোটর বোটের সাহায্যে, বলল কিশোর। খুব শক্তিশালী ইঞ্জিন এই বোটটার। নোঙরের দড়িও অনেক লম্বা। নোঙরের একটা আকশি নৌকায় গেঁথে…
কিশোর, তুমি একটা জিনিয়াস! চেঁচিয়ে উঠল জোসেফ। ঠিক বলেছ! এখুনি যাচ্ছি। আমি!
দ্রুত হাত চালাল জোসেফ। ক্যাপস্ট্যান থেকে খুলে আনল দড়িসহ নোঙর। দড়ির অন্য মাথা বাঁধল বোটের পেছনের একটা রিঙবোল্টে। পানিতে ছুড়ে ফেলে দিল নোঙর।
আমি যাচ্ছি। দড়ি ধরে তিনবার টানব। ফাস্ট-গিয়ারে দিয়ে আস্তে আস্তে জোর বাড়াবে। নৌকাটা সুড়ঙ্গমুখ থেকে খসে এলে বুঝতেই পারবে। থেমে যাবে তখন। গুহায় ঢুকে ওদেরকে বের করে আনব আমি। …আর হ্যাঁ, টানতে টানতে হঠাৎ যদি সামনে লাফ দিয়ে ছুটতে শুরু করে বোট, বুঝবে, নৌকা থেকে নোঙর খসে গেছে। এখানে নিয়ে আসবে। আবার বোট। আমার ওঠার অপেক্ষা করবে। ঠিক আছে?
মাথা ঝোঁকাল কিশোর।
নেমে গোল জোসেফ।
আবার অপেক্ষার পালা। দড়ি ধরে বসে রইল কিশোর। দুরুদুরু করছে বুকের ভেতর। একবার টান পড়ল দড়িতে। নোঙর গাঁথছে হয়ত জোসেফ। এক মিনিট কাটল.. দুই মিনিট… হঠাৎ টান পড়ল দড়িতে। জোরে জোরে, তিন বার।
লাফ দিয়ে উঠে এল কিশোর। ড্রাইভিং সিটে বসেই গিয়ার দিল। ধীরে ধীরে চলতে শুরু করল বোট। তারপর থেমে গেল। হঠাৎ করেই। টান টান হয়ে গেছে দড়ি।

এক্সিলেটরে চাপ বাড়াচ্ছে কিশোর। হুইলে হাতের আঙুল চেপে বসেছে। নোঙর বাঁধা দড়ির মতই টান টান হয়ে গেছে তার স্নায়ু। গর্জন বাড়ছে শক্তিশালী ইঞ্জিনের।
প্রথম কয়েক মুহূর্ত কিছুই ঘটল না। তারপর সামনে বাড়তে লাগল। বোট, ধীরে, অতি ধীরে। এক ইঞ্চি দুইঞ্চি করে। বিশাল মরা তিমিকে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে যেন টাগবোট। হঠাৎ সামনে লাফ দিল বোট। সেরেছে—ভাবল কিশোর। গেছে হয়ত ছুটে। কিন্তু না, যতখানি জোরে ছোটা উচিত তত জোরে এগোচ্ছে না তো বোটা তারমানে নৌকাটা আটকে আছে নোঙরে। ওটাকে টেনে নিয়ে চলেছে বোট। বিশ ফুট... পঞ্চাশ ফুট... একশো ফুট দূরে গিয়ে ইঞ্জিন নিউট্রাল করে দিল কিশোর। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই থেমে দাঁড়াল বোটটা।
সিট থেকে উঠে পেছনে চলে এল কিশোর। কোমরের বেল্ট থেকে ছুরি খুলে নিয়ে কেটে নিল দড়ি। ফিরে এসে বসল। আবার ড্রাইভিং সিটে।
আবার আগের জায়গায় বোট ফিরিয়ে নিয়ে এল কিশোর। অপেক্ষা করতে লাগল। এক মিনিট... দুই মিনিট... ভুসস করে বোটের পাশেই ভেসে উঠল একটা মাথা। জোরে শব্দ করে শ্বাস নিল পাপালো হারকুস। বোটের গা ঘেঁষে এল। থলেটা ছুড়ে দিল ভেতরে। চেঁচিয়ে বলল, জলদি লুকাও ওটা! ভেতরে মোহর কারও কাছে ফাঁস করা চলবে না এখন।
হাত ধরে আগে পাপালোকে বোটে উঠতে সাহায্য করল কিশোর। তারপর ভেজা থলেটা তুলে নিয়ে সিটে রেখে ওটার ওপরেই বসে পড়ল। লুকানোর এর চেয়ে ভাল জায়গা আর নেই বোটে।
কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল পাপালো, এই সময় ভেসে উঠল রবিন। পরীক্ষণেই মুসা। দুজনকে উঠতে সাহায্য করল কিশোর আর পাপালো।
যাক, উদ্ধার করলে শেষ পর্যন্ত! স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মুসা। বাঁচার আশা ছিলই না!
জোসেফের ভাবভঙ্গিতে মনে হল, খুব রেগে গেছে, বলল রবিন।
সব শুনলে বাবাও খেপবে! কথার ধরনেই বোঝা গেল, ভয় পাচ্ছে মুসা। তবে যা-ই হোক, কিছু মোহর পেয়েছি। পাপু বলেনি?
থলেটার ওপরেই বসে আছি, বলল কিশোর। এখন মোহরের কথা থাক। পরে সব শুনিব।
কাজটা খুব খারাপ হয়ে গেছে, পিঠে বাঁধা গ্যাস ট্যাংক খুলতে খুলতে বলল রবিন। কিন্তু দোষ আমাদের নয়। পাপালোর নৌকাটাকে
চুপ! রবিনকে থামিয়ে দিল কিশোর। জোসেফ। সব জানানোর দরকার নেই ওকে। রেখেঢেকে বলবে।

বোটের পাশে ভেসে উঠেছে জোসেফ। এক হাতে দড়ির কাটা প্রান্ত। বাড়িয়ে দিল ওটা। ধরল কিশোর। বেঁধে দিল ক্যাপস্ট্যানের সঙ্গে। তাড়াতাড়ি এসে বসল। আবার সিটে।
বোটে উঠে এল জোসেফ। ধীরেসুস্থে খুলে নিল ফেস মাস্ক, ফ্লিপার, গ্যাস ট্যাংক।
নীরবে অপেক্ষা করছে ছেলেরা। ওদের দিকে তাকাল জোসেফ। তারপর? খুব তো দেখালে!
আমরা... শুরু করেও থেমে গেল রবিন।
হাত তুলেছে জোসেফ। আর সাফাই গাইতে হবে না। যা করার করেছি। তবে তোমাদের ডাইভিং এখানেই শেষ। গোয়েন্দাগিরিও। মিস্টার আমানও তাই বললেন। শুরু থেকেই আমার মত ছিল না। বাচ্চাকাচ্চা দিয়ে কাজ হবে না কিছুই। শুধু শুধু বাড়তি ঝামেলা!
নীরব রইল ছেলেরা।
পাপালোর দিকে ফিরল জোসেফ। তারপর? চোরের কি খবর? অনেক হারামীপনা করেছ, এবার জেল খাটগে।
জোসেফ কি বলছে, কিছুই বুঝতে পারল না ছেলেরা।
হাঁ করে আছ কেন? পাপালোর দিকে চেয়ে বলল জোসেফ। গতরাতে একটা ট্রেলারের জানালা ভাঙা হয়েছে। ছোট ফোকর। বড় মানুষ ঢুকতে পারবে না। ওই ফোকর দিয়ে, গোটা দুয়েক দামি লেন্স চুরি গেছে। কম করে হলেও হাজার ডলার দাম। ভুল করে একটা ছুরি ফেলে গেছে চোর। স্থির চোখে পাপালোর দিকে তাকিয়ে আছে সে। ছুরিটা কার, জোন? তোমার! আর জানালার ওই ফোকর দিয়ে তোমার পক্ষেই ঢোকা সম্ভব।
বোবা হয়ে গেছে যেন চার কিশোর। হাঁ করে চেয়ে আছে জোসেফের দিকে।
তোমার শয়তানী খতম, বলল জোসেফ। হোভারসনকে খবর দেয়া হয়েছে। ফিশিংপোর্টে ফিরে গিয়েই তার দেখা পাবে। কপালে তোমার অনেক দুঃখ আছে, পাপালো হারকুস, এই বলে দিলাম।
পাপালোকে পুলিশে দিল ওরা! বিষণ্ন কণ্ঠে বলল রবিন। কাজটা উচিত হয়নি।
হ্যাঁ, আস্তে মাথা দোলাল মুসা। আমার কিন্তু এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না, লেন্সগুলো ও চুরি করেছে। কিশোর, তুমি কি বল?
কোন জবাব দিল না গোয়েন্দাপ্রধান, যেন শুনতেই পায়নি। দুই বন্ধুর কাছ থেকে দূরে, লিভিং রুমের আরেক প্রান্তে সোফায় বসে আছে। গভীর চিন্তায় মগ্ন।
বিকেলের মাঝামাঝি। বাইরে ঝমোঝম বৃষ্টি। সারাদিন বাইরে বেরুতে পারেনি ওরা। বৃষ্টি না থাকলেও অবশ্য পারত না। মিস্টার আমানের কড়া নির্দেশঃ একা কোথাও যেতে পারবে না ওরা। যেতে হলে তাঁকে জানাতে হবে। লোক সঙ্গে দিয়ে

দেবেন। গতকাল বিকেলে ছেলেদের অবাধ্যতার ওপর কড়া বক্তৃতা দিয়েছেন তিনি। আন্তরিক দুঃখিত হয়েছেন ওদের কাজে, সেটাও জানিয়েছেন বার বার।
কিশোরা গলা চড়িয়ে ডাকল মুসা। কি বলছি, শুনিছ? আমার ধারণা, লেন্স পাপু চুরি করেনি। তুমি কি বল?
কেশে উঠল কিশোর। এখনও পুরোপুরি যায়নি সর্দি।
না, বলল গোয়েন্দাপ্রধান। পাপু চুরি করেনি। সাক্ষী প্রমাণ সব ওর বিরুদ্ধেই যাচ্ছে যদিও। ওর ছুরি পাওয়া গেছে ট্রেলারের ভেতর, তাজ্জব কান্ড!
দুই দিন আগে হারিয়েছিল ওটা, বলল রবিন। ও তাই বলেছে।
এখন কেউ বিশ্বাস করবে না একথা, বলেই আবার কাশতে লাগল কিশোর। কাশি থামলে বলল, ধরেই নিয়েছে সিনেমা কোম্পানি, তাদের সমস্যা শেষ। চোর ধরা পড়েছে, আর কি?
কঙ্কাল দ্বীপের রহস্যটা আসলে কি? জিজ্ঞেস করল রবিন। অনুমান করেছ কিছু??
কেউ একজন চায় না, কঙ্কাল দ্বীপে লোক যাতায়াত করুক, কিংবা বাস করুক, বলল কিশোর। এ-ব্যাপারে। আমি শিওর। কিন্তু কেন চায় না, বুঝতে পারছি না এখনও।
দরজায় টোকা পড়ল। সাড়া দিল মিসেস ওয়েলটন। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল। পেছনে পুলিশ চীফ হোভারসন। রেনকোট থেকে পানি ঝরছে।
এই যে, ছেলেরা, বলল বাড়িওয়ালি, চীফ কথা বলতে চান তোমাদের সঙ্গে।
মিসেস ওয়েলটন, বলল হোভারসন, ওদের সঙ্গে একটু একা কথা বলতে চাই, প্লীজ...
ওহ, শিওর শিওর, দরজা ভেজিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল মিসেস ওয়েলটন।
রেনকোটটা খুলে দরজার পাশের হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে রাখলেন চীফ। সোফায় বসলেন। সিগারেট বের করে ধরালেন ধীরেসুস্থে।
তারপর, ছেলেরা, কথা শুরু করলেন হোভারসন, পাপুর পজিশন খুব খারাপ। লেন্স দুটো পাওয়া গেছে। ওর বিছানার তলায়।
কিন্তু পাপালো চুরি করেনি, রাগ প্রকাশ পেল রবিনের গলায়। আমরা জানি, ও করেনি।
হয়ত করেনি, মাথা ঝোঁকালেন হোভারসন। কিন্তু সব সাক্ষীপ্রমাণ ওর বিরুদ্ধে যাচ্ছে। সবাই জানে, বাবার চিকিৎসার জন্যে গ্রীসে ফিরে যাবার জন্যে, পাগল হয়ে উঠেছে ও।
উঠেছে, ঠিক, বলল মুসা। কিন্তু সেজন্যে চুরি করবে না সে। তাছাড়া টাকা তার আছে। এবং আরও পাবার সম্ভাবনা আছে।

তাই। তিনজনের দিকেই একবার করে তাকালেন হোভারসন। ওর টাকা আছে? আরও পাবার সম্ভাবনা আছে! কি করে?
মুখ ফসকে কথা বেশি বলে ফেলেছে, এখন আর ফেরার পথ নেই। মোহরের কথা বলতেই হবে চীফকে। তবু চুপ করে রইল মুসা।
ছেলেরা, আবার বললেন হোভারসন, পাপুকে আমি পছন্দ করি, তার ভাল চাই। এখন বলত, সত্যি সত্যি কি ঘটেছিল গতকাল। বিপদে পড়েছি, এবং উদ্ধার করে আনা হয়েছে, ঠিকই। কিন্তু কেন পড়েছ বিপদে? কেন গিয়ে ঢুকেছ ওই সুড়ঙ্গে। শুধুই কৌতূহল? নিশ্চয় না। হয়ত তোমাদের ভয়, গুপ্তধনের কথা ফাঁস হয়ে গেলে দলে দলে ছুটে আসবে লোক। শুটিঙে বিঘ্ন ঘটাবে। কিন্তু পাপুর দিকটাও ভেবে দেখতে হবে তোমাদের। ওকে হাজত থেকে বের করে আনতে চাও না?
দ্বিধা করছে তিন গোয়েন্দা। শেষে মন স্থির করে নিল কিশোর। হ্যাঁ, স্যার, চাই। মুসার দিকে ফিরল। থলেটা নিয়ে এসো।
দোতলায় চলে গেল মুসা। পাপালোর থলেটা নিয়ে ফিরে এল। থলের মুখ খুলে হোভারসনের পাশে ঢেলে দিল মোহরগুলো। মৃদুটুংটাং আওয়াজ তুলে সোফায় পড়ল পয়তাল্লিশটা স্প্যানিশ ডাবলুন।
বড় বড় হয়ে গেল হোভারসনের চোখ। মাই গাডা জলদস্যুর গুপ্তধন। পাপু পেয়েছে?
পাপু, মুসা আর রবিন, বলল কিশোর। দ্য হ্যান্ডের গুহায়। ফিরে গিয়ে আরও খোঁজার ইচ্ছে আছে পাপালোর। সেজন্যেই গোপন রেখেছি ব্যাপারটা।
হুমমা ঝট করে চোখ তুললেন হোভারসন। আমিও তোমাদের দলে। মোহর পেয়েছ, কাউকে বলব না।
তাহলে বুঝতেই পারছেন, স্যার, আগের কথার খেই ধরল রবিন, টাকার জন্যে চুরি করার দরকার নেই পাপুর।
কিন্তু, বললেন হোভারসন, তাতে প্রমাণ হয় না, পাপু চুরি করেনি। মোহরগুলো পাওয়া গেছে লেন্স চুরি যাবার পর। পাপালো তখন জানত না, মোহর পাবে।
ঠিকই বলেছেন পুলিশ চীফ। মুখ কালো করে ফেলল। আবার রবিন। সজোরে পকেটে হাত ঢোকাল মুসা।
রুমাল বের করা নাক মুছল কিশোর। তারপর বলল, রাফাত চাচা, মিস্টার সিমনস আর মিস্টার গ্র্যাহামের ধারণা স্কেলিটন আইল্যান্ডের রহস্যের সমাধান হয়ে গেছে। তাঁরা মনে করছেন, যত নষ্টের মূলে ছিল ওই পাপু। কিন্তু, তাঁরা ভুল করছেন। সমস্ত শয়তানীর পেছনে রয়েছে অন্য কেউ। ঘটনাগুলো সব খতিয়ে দেখলেই অনেক কিছু পরিষ্কার হয়ে যায়। গোড়া থেকেই শুরু করছি. কেশে উঠল সে।

আপনি সবই জানেন, কাশি থামলে বলল কিশোর, তবু গোড়া থেকেই শুরু করছি। মাঝে অনেক দিন বিরতি দিয়ে, হঠাৎ করে আবার স্কেলিটন আইল্যান্ডে ভূতের উপদ্রব শুরু হল কেন? সিনেমা কোম্পানির ওপর ওই বিশেষ নজর কেন চোরের? প্লেন থেকে নামতে না নামতে কার কি এমন ক্ষতি করে ফেললাম, যে ঝড়ের রাতে দ্য হ্যান্ডে নির্বাসন দিয়ে আসা হল আমাদেরকে? সবগুলো প্রশ্নের একটাই সহজ উত্তরঃ কেউ একজন চায় না, স্কেলিটন আইল্যান্ডে লোক যাতায়াত করুক, কিংবা বাস করুক, কিংবা ওটার ব্যাপারে খোঁজখবর করুক। এবং সেটার প্রমাণও পেয়েছি। গতকাল বিকেলে ডাক্তার রোজারের চেম্বার থেকে ফিরছিলাম, হঠাৎ পাশের গলি থেকে বেরিয়ে এল। একজন লোক। ঢেঙা, রোগাটে, হাত উল্কি দিয়ে আঁকা জলকুমারীর ছবি…
ডিক, চোয়ালে হাত ঘষছেন। চীফ। ডিক ফিশারা মাত্র জেল থেকে বেরোল ব্যাটা, এরই মাঝে শুরু করে দিলা.ঠিক আছে বলে যাও।
দ্বীপগুলোর আশপাশে খুব বেশি ঘোরাফেরা করে পাপু, তাই তার নৌকা ভেঙে দেয়া হল, বলল কিশোর। শুধু তাই না, চক্রান্ত করে তাকে জেলে পাঠানোর ব্যবস্থা করল।
কিন্তু কেন? প্রশ্ন করল রবিন।
সেটাই বুঝতে পারছি না, বলল কিশোর। তাহলে সব রহস্যেরই সমাধান হয়ে যেত।
হু-হা চিন্তিত দেখাচ্ছে হোভারসনকে। ব্যাপারটা ভাল করে ভেবে দেখব। এখন আমি উঠি।। দেখি, পাপুর কোন ব্যবস্থা করা যায়। কিনা। হাক স্টিভেন ওরা জামিন হতে রাজি আছে। কাগজপত্র তৈরি করতেও দেরি হবে না। জজ সাহেব একটা কাজে বাইরে গেছেন। তিনি ফিরে এলেই সই করিয়ে নেয়া যায়। হ্যাঁ, আমাকে না জানিয়ে কোন কিছু করে। বোসো না। বিপদে পড়ে যেতে পার। চলি, গুড বাই।
বেরিয়ে গেলেন হোভারসন।
তাড়াতাড়ি আবার মোহরগুলো থলেতে ভরে নিল মুসা। মুখ বেঁধে নিয়ে গিয়ে রেখে এল দোতলায়, নিজেদের ঘরে, সুটকেসে। ফিরে এল নিচের ঘরে।
ঘরে ঢুকল মিসেস ওয়েলটন। খাবার দেবে কিনা জানতে চাইল। দিতে বলল ছেলেরা।
টেবিলে খাবার দেয়া হল। খেতে বসল। ছেলেরা। কাছেই একটা চেয়ারে বসে এটা ওটা বাড়িয়ে দিচ্ছে মিসেস ওয়েলটন। বলি বলি করছে কি যেন। শেষ পর্যন্ত আর থাকতে না পেরে বলেই ফেলল, গুপ্তধন খোঁজার জন্যেই তাহলে এসেছে তোমরা। দেখলাম…

ঝট করে মাথা তুলল কিশোর। কি দেখেছেন?
সত্যি বলছি, চুরি করে কারও কিছু দেখার অভ্যোস নেই আমার। দেখতে এসেছিলাম, চীফ চলে গিয়েছে কিনা। দেখলাম, বসে আছে, পাশে একগাদা ডাবলুন। ভাবলাম, খুব জরুরী কোন কথা আলোচনা করছ তোমরা। বিরক্ত না করে চলে গেলাম।
একে অন্যের দিকে চাওয়া-চাওয়ি করল তিন গোয়েন্দা। খাওয়া বন্ধ।
কাউকে বলেছেন একথা? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
কোন কথা?
আমরা গুপ্তধন খুঁজে পেয়েছি…
নাহ, এদিক ওদিক মাথা নড়ল মিসেস ওয়েলটন, তেমন কাউকে না। ফোনে শুধু আমার ঘনিষ্ঠ তিন বান্ধবীকে জানিয়েছি। আমারই মত কম কথা বলে। পেটে বোমা মারলেও আমারই মত মুখে তালা লাগিয়ে রাখবে। কাউকে কিছু বলবে না…
হুঁ, চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল কিশোর। কয়েকটা মোহর পেয়েছে মুসা আর রবিন। তবে স্কেলিটন আইল্যান্ডে নয়।
আমাকে বোকা বানাতে পারবে না, ইয়ং ম্যান, নিজের বুদ্ধির ওপর খুব বেশি ভক্তি মিসেস ওয়েলটনের। আগামী কাল ভোর থেকেই লোক যেতে শুরু করবে। স্কেলিটন আইল্যান্ডে। গুপ্তধন খুঁজতে… বলতে গিয়েই থেমে গেল। মনে পড়ে গেছে, একটু আগে বান্ধবীদের প্রশংসা করে। বলেছে, মুখে তালা লাগিয়ে রাখবে ওরা। কথা ঘোরানোর চেষ্টা করল, মানে, আমি বলতে চাইছি, যদি আর কেউ শুনে ফেলে। আর কি! চীফ হোভারসনও তো জেনে গেল….
তিনি কাউকে বলবেন না, কথা দিয়েছেন, বলল কিশোর।
ওহ, আমি যাই। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল মিসেস ওয়েলটন। দুধ পুড়ে যাচ্ছে…
কাম সারছে কিশোরের মুখে শোনা বাঙালি বুলি ঝাড়ল মুসা। এতক্ষণে জেনে গেছে হয়ত আদেক শহর আগামী কাল ভোর হতে না। হতেই ভিড় লেগে যাবে কঙ্কাল দ্বীপে। শুটিঙের বারোটা বাজলা সব দোষ আমাদের!
এরপর রাফাত চাচাকে মুখ দেখাব কি করে আমরা বলল রবিন।
লোক ঠেকাতে না পারলে সর্বনাশ হয়ে যাবে ফিল্ম কোম্পানির! বলল মুসা। কিশোর, তুমি কিছু বল।
চুপচাপ খেয়ে যাচ্ছে কিশোর। নির্লিপ্ত। মুখ তুলল, একটা বুদ্ধি এসেছে আমার মাথায়। আগে খেয়ে নিই, তারপর বলছি। তোমরাও খেয়ে নাও।
শেষ হল খাওয়া। হাতমুখ ধুয়ে এসে বসল। আবার আগের জায়গায়।
কি বুদ্ধি, বল, জানতে চাইল মুসা।

খুলে গেল দরজা। ঘরে এসে ঢুকলেন মিস্টার আমান, পেছনে পিটার সিমনস।
মিস্টার আমান জানালেন, আগামী কাল সকালেই এসে পৌঁছুবেন। পরিচালক জন নেবার। এসকেপ ছবির শুটিং শুরু হবে।
আঁতকে উঠল মুসা আর রবিন।
কিশোর নির্লিপ্ত। ধীরে ধীরে জানাল, কি ঘটেছে। আগামী কাল সকালে কি ঝামেলায় পড়তে যাচ্ছে সিনেমা কোম্পানি।
মুখ কালো হয়ে গেল পিটার সিমানসের।
গেল, সব সর্বনাশ হয়ে গেলা প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন মিস্টার আমান। পিঙ্গপালের মত ঝাঁপিয়ে পড়বে গুপ্তধন শিকারির দলা বলে কাউকে বোঝাতে পারব না, মোহর নেই কঙ্কাল দ্বীপে।
বলে বোঝানোর দরকার কি? বলল কিশোর।
ভুরু কুঁচকে গেছে, হাঁ করে কিশোরের দিকে তাকিয়ে আছেন। মিস্টার আমান।
একটা বুদ্ধি এসেছে মাথায়, বলল কিশোর। এক কাজ করলেই তো হয়। গুপ্তধন শিকারিদের ছবি তুলে নিন। কোথায় খুঁজছে, কি করছে। না করছে, সব। ট্রেজার হান্টার নাম দিয়ে কম দৈর্ঘ্যের একটা ছবি বানিয়ে ফেলুন। ভাড়া করে লোক এনে গুপ্তধন খোঁজার ছবি বানানো সম্ভব, কিন্তু এত নিখুঁত, এত জ্যান্ত হবে না।
কি যেন ভাবল সিমনস। বলল, ঠিকই বলেছ। শুধু এভাবেই গুপ্তধন শিকারিদের হাত থেকে নিস্তার পাব আমরা। ডাক্তার রোজারকে বলে পাঠাব, স্থানীয় রেডিওতে গিয়ে ঘোষণা করুক, আগামী কাল গুপ্তধন খোঁজা চলবে ব্যাপক হারে। যে গুপ্তধন খুঁজে পাবে, পাঁচশো ডলার পুরস্কার পাবে সে আমাদের কোম্পানির কাছ থেকে। তবে, একটা শর্ত থাকবে, নাগরদোলা নাগরদোলার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। খুঁজেপেতে কিছুই না পেয়ে চলে যাবে ওরা। বুঝে যাবে, কোন গোপন ম্যাপ পাইনি আমরা, গুপ্তধন খুঁজতে আসিনি। তাহলে এভাবে লোককে আমন্ত্রিত করতাম না। আর কখনও আমাদের বিরক্ত করতে আসবে না ওরা। নিরাপদে এসকেপ ছবির শুটিং চালিয়ে যেতে পারব। মাঝে থেকে গুপ্তধন শিকারের ওপর চমৎকার একটা ছবিও তৈরি হয়ে যাবে। খুব ভাল বুদ্ধি
হুঁ-উঁ! ধীরে মাথা ঝাঁকালেন মিস্টার আমান। ঠিকই। তাহলে এখুনি ফোন করে সব কথা জানানো উচিত মিস্টার নেবারকে। তিন গোয়েন্দার দিকে ফিরলেন। রাত অনেক হয়েছে। আর জেগে থেকে না। শুতে যাও। সকালে উঠে দেখতে পাবে খেলা…
কিন্তু বাবা, পাপু… বলতে গিয়ে বাধা পেল মুসা।
ওই চোরটার কিছু শিক্ষা হওয়া দরকার, উঠে দাঁড়ালেন মিস্টার আমান। পিটার, চল যাই। ডাক্তার রোজারকেও খবর পাঠাতে হবে…

তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে গেল দুজনে। উফফা বাঁচলাম আরাম করে হেলান দিয়ে বসল মুসা। কি ঘাবড়েই না গিয়েছিলাম! কিন্তু পাপুর ব্যাপারটা কি হবে? কানই দিল না বাবা!
বড়রা ছোটদের কথায় কান দেয় না, এটাই নিয়ম, ক্ষোভ প্রকাশ পেল রবিনের কথায়। তারা যা ভাবে, সেটাই ঠিক, আমাদের কথা কিছু না...। যাকগে, কিশোরের কথায় কান দিয়েছে ওরা, এটাই বাঁচোয়া। আমি তো কোন উপায়ই দেখছিলাম না. তুমি আবার কি ভাবতে শুরু
অত বেশি ভেব না, হাসল মুসা। মগজটাকে একটু বিশ্রাম দাও। নইলে বেয়ারিং জ্বলে যাবে...
কেশে উঠল কিশোর। থামল। স্বস্তি ফুটেছে চেহারায়।
কি, কিশোর? জিজ্ঞেস করল রবিন। প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেছ মনে হচ্ছে?
কণ্ঠে বলল কিশোর।
পারছ। চেঁচিয়ে উঠল মুসা। বলে ফেল! জলদি!
চল, ওপরে চলে যাই বলল কিশোর।
কিশোরের পিছু পিছু দোতলায় শোবার ঘরে এসে ঢুকল দুই সহকারী গোয়েন্দা। উত্তেজিত।
বল এবার, ঘরে ঢুকেই বলে উঠল রবিন।
নিজের বিছানায় গিয়ে বসল কিশোর। ক্যাপ্টেন এক কান-কাটা কোথায় ধরা পড়েছিল, মনে আছে? হস্তে। মোহরগুলো রেখে খালি সিন্দুকটা উপসাগরে ফেলে দিয়েছিল সে। দ্বীপে গিয়ে উঠেছিল। তারপর টিলার ওপরের গর্ত দিয়ে সব মোহর ফেলে দিয়েছিল নিচের গুহায়। এজন্যেই একটা মোহরাও খুঁজে পায়নি ব্রিটিশ যুদ্ধ-জাহাজের ক্যাপ্টেন। তাহলে আরও অনেক মোহর আছে গুহায়! উত্তেজনায় কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে মুসার। পাপুর কথাই ঠিক
মনে হয় না, মাথা নাড়ল কিশোর। তিনশো বছর ধরে জোয়ার আসছে। গুহায়। নিশ্চয় বেশির ভাগ মোহরই বের করে নিয়ে গেছে খোলা সাগরে। ওপরে যা ছিল, পেয়ে গেছ। আর কিছু থাকলেও, বালির অনেক গভীরে ঢুকে গেছে। ওগুলো। খুঁজে পাওয়া কঠিন।
চেপে রাখা শ্বাসটা ফেলল মুসা। ঠিকই বলেছ। তবে আরও কিছু পাওয়া গেলে খুব ভাল হত, উপকার হত পাপুর। ওর বাবাকে গ্রীসে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারত।
পাপালোর কথা উঠতেই আবার চুপ হয়ে গেল ওরা। বন্ধুকে সাহায্য করার কোন উপায় ঠিক করতে পারল না। বিষণ্ন মুখে শুতে গেল।
শোবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল মুসা আর রবিন। কিশোরের চোখে ঘুম এল না। ভাবনার ঝড় বইছে মাথায়। অনেক দিন পরে হঠাৎ আবার দেখা দিল কেন স্যালি

ফ্যারিংটনের ভূত? কঙ্কাল দ্বীপে লোক যাতায়াত করলে কার কি অসুবিধে? তাদেরকে হস্তে ফেলে রেখে এসেছিল। কেন হান্ট গিল্ডার? কেন হুমকি দিল ডিক.ডিক.তড়িাক করে। লাফিয়ে উঠে বসল কিশোর। বুঝে গেছে!
মুসা, রবিন, জলদি ওঠা চেঁচিয়ে ডাকল কিশোর। রহস্যের সমাধান করে ফেলেছি।
চোখ মেলল দুই সহকারী গোয়েন্দা। হাই তুলতে তুলতে তাকাল কিশোরের দিকে।
কি হয়েছে? ঘুমজড়িত গলায় জানতে চাইল মুসা। দুঃস্বপ্ন দেখেছ?
না উত্তেজিত কণ্ঠ কিশোরের। জলদি কাপড় পর কঙ্কাল দ্বীপ যেতে হবে! রহস্যের সমাধান করে ফেলেছি।
লাফ দিয়ে বিছানায় উঠে বসিল মুসা আর রবিন।
ইয়াল্লা! চেঁচিয়ে উঠল মুসা। বল বল…
বলল কিশোর।
কিশোর, তোমার তুলনা নেই? বন্ধুর প্রশংসা না করে পারল না রবিন। ঠিক ঠিক বলেছ একেবারে খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে সব কিছু।
ইস্‌স্‌, একটা গাধা আমি রবিনের কথায় কান দিল না কিশোর। আরও আগেই বোঝা উচিত ছিল জলদি যাও। আমিই যেতাম, কিন্তু সারা শরীরে প্রচণ্ড ব্যথা…
না না, তোমার যাবার দরকার নেই, হাত নেড়ে বলল মুসা। তুমি শুয়ে থাক। আমরাই পারব। কিন্তু বাবাকে জানালেই তো পারি। জিমকে নিয়ে তারাও আমাদের সঙ্গে গেলে…
না, মাথা নাড়ল কিশোর। আমার অনুমান ভুলও হতে পারে। তা হলে খেপে যাবেন রাফাত চাচা। তোমরা দুজনেই খুঁজে বের করগে আগে। পেলে, সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে জানাবে তাদেরকে।
পাঁচ মিনিটেই কাপড় পরে তৈরি হয়ে গেল। রবিন আর মুসা। টর্চ নিলো দুজনেই। দরজা খুলে বেরিয়ে গেল নিঃশব্দে।
শুয়ে পড়ল আবার কিশোর। ঘুম এলো না। ক্ষোভে-দুঃখে ছটফট করছে। কেন লাগল ঠাণ্ডা? কেন এই হতচ্ছাড়া সর্দি ধরে বসল। তাকে! নইলে তো রবিন আর মুসার সঙ্গে সে-ও যেতে পারত। রাতটা দ্বীপেই থেকে যেত। তারপর ভোর না হতেই গুপ্তধন শিকারিদের খেলা. গুপ্তধন শিকারি! আবার লাফিয়ে উঠে বসল কিশোর। ভুল হয়ে গেছে, মস্ত ভুল! ভয়ানক বিপদে ঠেলে পাঠানো হয়েছে। রবিন আর মুসাকে! খুন হয়ে যেতে পারে ওরা, খুন…
গায়ের জোরে দাঁড় টানছে মুসা। প্রায় উড়ে চলেছে ছোট্ট নৌকা। এক জেলের কাছ থেকে নৌকাটা ভাড়া নিয়েছে সে। সামনের গলুইয়ের কাছে বসে আছে

রবিন। চেয়ে আছে সামনের দিকে। তারার আলোয় অদ্ভুত দেখাচ্ছে কঙ্কাল দ্বীপকে।
এসে গেছি! বলে উঠল রবিন।
মোড় ফেরাল মুসা। জেটির কাছে গেল না। প্লেজার পার্কের দিকে এগিয়ে চলল।
ঘ্যাঁচ করে বালিতে এসে ঠেকাল নৌকার সামনের অংশ। লাফিয়ে নেমে পড়ল রবিন। মুসাও নামল। দুজনে টেনে নৌকাটাকে তুলে আনল ডাঙায়।
চল, পার্কের ভেতর দিয়ে এগেই, নিচু গলায় বলল মুসা। পার্ক পেরিয়ে পথে নামব, সেদিন যৌপথে গুহায় গিয়েছিলাম। খুব সাবধান। জিম টের পেলে চোঁচামেচি শুরু করবে।
হ্যাঁ, মাথা ঝোঁকাল রবিন। তবে সঙ্গে ও গেলে ভালই হত। ...অন্ধকারে গুহাটা খুঁজে পাব তো?
মনে হচ্ছে পাব, জবাব দিল মুসা। দ্বিধা করল এক মুহূর্ত। গাঢ় অন্ধকার। নীরব-নিস্তব্ধ। সৈকতে ঢেউ আছড়ে পড়ার একটানা মৃদু ছলছলাৎ শব্দ নীরবতাকে আরও গভীর করে তুলেছে যেন। চল, এগোই।
আগে আগে চলেছে মুসা। মাঝেমাঝে টর্চ জ্বেলে দেখে নিচ্ছে সামনের পথ। এসে ঢুকাল পার্কে।
কালো আকাশের পটভূমিতে কিম্ভূত এক দানবের মত দেখাচ্ছে নাগরদোলাটাকে। পাশ কাটিয়ে নাগরদোলার কাছে চলে এলো দুজনে। মোড় ঘুরে এগোল। পেছনের ভাঙা বেড়ার কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল।
নাহ, একা যাব না ফিসফিস করে বলল মুসা। বাবাকে জগাব। গিয়ে। ভয় পাচ্ছি, তা নয়। আমাদেরকে বোডিং হাউস থেকে বেরোতে নিষেধ করেছে, তবু বেরিয়েছি। কোন বিপদে পড়ার আগেই তাকে জানিয়ে রাখা ভাল।
ঠিকই বলেছ, সায় দিল রবিন। চল যাই। তাঁকে জানিয়ে গেলে আর কোন ভয় থাকবে না। আমাদের।
ক্যাম্পের দিকে পা বাড়াতে গিয়েই থমকে গেল দুজনে। ধড়াস করে উঠল। বুকের ভেতর।
কেউ এসে দাঁড়িয়েছে পেছনে। বিশালদেহী কেউ। খবরদার! যেখানে আছ, দাঁড়িয়ে থাকা শোনা গেল গর্জন।
বরফের মত জমে গেল যেন দুই গোয়েন্দা।
আলো জ্বলে উঠল। সামনে চলে এল টর্চের মালিক। দুই কিশোরের মুখে আলো ফেলেই স্থির হয়ে গেল। অবাক কণ্ঠে বলে উঠল, আরে একি! তোমরা এত রাতে চোরের মত এখানে কি করছ?

দুজনের চোখের ওপর থেকে আলো সরাল জিম, নিচের দিকে ফেলল। ভাগ্যিস, মেরে বসিনি! এতরাতে এখানে কি করছ তোমরা?
অনুমান ঠিক কিনা দেখতে এসেছি।
দ্বীপের রহস্য অবাক কণ্ঠ জিমের। কি বলতে চাইছ?
সত্যিই গুপ্তধন লুকানো আছে। এখানে, বলল মুসা। কিশোরের তাই ধারণা।
গুপ্তধন! ছেলেদের কথা বিশ্বাস করতে পারছে না যেন গার্ড। কিসের গুপ্তধন?
ওই যে... থেমে গেল মুসা। তার আগেই কথা বলতে শুরু করেছে রবিন। আপনার কথা থেকেই সূত্র খুঁজে পেয়েছে কিশোর।
আমার কথা থেকে। বিড়বিড় করল জিম। কিছুই বুঝতে পারছি না!
সেদিন সকালে বললেন না, বলল রবিন, দুই বছর আগে আর্মার্ড কার লুট করেছিল দুই ভাই? ডিক আর বাড ফিশার? যারা বাঁ হাত নষ্ট করে দিয়েছে। আপনার।
হ্যাঁ হ্যাঁ। কিন্তু তাতে কি?
আপনি আরও বলেছেন, রবিনের কথার খেই ধরল মুসা। কোস্ট গার্ডেরা দুজনকে ধরে ফেলে। উপসাগরে একটা বোটে ছিল দুই ভাই। কিছু ফেলছিল পানিতে। চোরাই টাকা ফেলেছিল ওরা, লোকের ধারণা।
তই তো করেছিল।
এবং, মুসার কথার খেই ধরল রবিন। ঠিক দুই বছর আগে থেকেই কঙ্কাল দ্বীপে আবার ভূতের উপদ্রব শুরু হল। টাকা লুট হল দুবছর আগে, স্কেলিটন আইল্যান্ডের পাশে ধরা পড়ল দুই ডাকাত, দীর্ঘ বিশ বছর পর আবার গোলমাল শুরু করল দ্বীপের ভূত। ভয় দেখাতে লাগল লোককে। ঘটনাগুলো একটার সঙ্গে আরেকটার মিল যেন খুব বেশি। সন্দেহ জাগল কিশোরের।
এত ভণিতা না করে আসল কথা বলে ফেল তো! অধৈর্য হয়ে উঠেছে জিম।
বুঝতে পারছেন না এখনও? বলল মুসা। বোটে করে পালাতে গেল দুই ডাকাত, ইঞ্জিন খারাপ হয়ে গেল। হঠাৎ। ওরা তখন স্কেলিটন আইল্যান্ডের কাছাকাছি। এত বুকি নিয়ে এতগুলো টাকা লুট করেছে, পানিতে ফেলে দেবে সহজে? মোটেই না। কোনভাবে বোটটা তীরে ভিড়িয়ে দ্বীপে উঠেছিল ওরা। টাকাগুলো লুকিয়ে রেখেছিল। তারপর বোট নিয়ে ভেসে পড়েছিল আবার। কোস্টগার্ডের বোট আসতে দেখে টাকা পানিতে ফেলার ভান করেছিল, ফেলেছিল আসলে অন্যকিছু। ভারি কিছু, যা সঙ্গে সঙ্গে তলিয়ে গিয়েছিল। বিমল ধরা না পড়লে খুব বেশি দিন জেল হবে না, ঠিকই বুঝতে পেরেছিল ওরা। জেল থেকে বেরোলে আর কোন ভয় নেই। দ্বীপে এসে টাকাটা নিয়ে দূর কোন দেশে চলে যাবে। কেউ কিছু সন্দেহ করবে না। মাত্র হস্তাদুয়েক হল ছাড়া পেয়েছে ওরা। সেদিন কিংবা তার

পরের দিনই এসে টাকা নিয়ে যেতে পারত, কিন্ত মুশকিল করেছে সিনেমা কোম্পানি। দিকে এলে ওদের চোখে পড়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। ডিক আর বাডকে ঘোরাফেরা করতে দেখলে পুলিশের সন্দেহ জাগতে পারে। সে বুকি ওরা নেয়নি।
সর্বনাশা বলে উঠল জিম। কি গল্প শোনাচ্ছি। এখানেই টাকা লুকিয়ে রেখেছে ডিক আর বাডা কোথায়, কিছু বলেছে কিশোর?
কিশোরের ধারণা, বলল রবিন। শুকনো উচু কোন জায়গায় লুকানো হয়েছে। কাপড়ের ব্যাগে ভরা কাগজের টাকা, মাটির তলায় পুঁতে রাখলে পচে যাবে। শুকনো উচু সবচেয়ে ভাল জায়গা দ্বীপে....
গুহা! প্রায় চেঁচিয়ে উঠল জিম। সেই পুরানো গুহার ভেতরো কোন তাকের পেছনের খাঁজো খাঁজের ভেতরে থলেগুলো ঢুকিয়ে সামনে কয়েকটা পাথর ফেলে রাখলেই কেউ দেখতে পাবে না! সন্দেহও করবে না কিছু!
কিশোরেরও তাই ধারণা, বলল মুসা। টাকাগুলো একমাত্র ওখানেই নিরাপদে থাকবে।
ইস্‌স্‌, অস্থির হয়ে উঠছে জিম, ফুটো বছর ধরে টাকাগুলো ওখানে রয়েছে। ঘুণাক্ষরেও মাথায় এলো না ব্যাপারটা যদি কোনভাবে বুঝতে পারতাম... ইস্‌স্‌! চল চল, দেখি, সত্যিই আছে নাকি...
আগে রাফাত চাচাকে ডেকে নিয়ে আসি, বলল রবিন।
দরকার নেই, মাথা নাড়ল জিম। ওঁরা ঘুমোক। আমরা বের করে। নিয়ে আসি আগে। টাকার বস্তা দেখিয়ে চমকে দেব ওঁদেরকে।
কিন্তু... বলতে গিয়েও থেমে গেল মুসা।
ঘুরে হাঁটতে শুরু করেছে জিম। ফিরে চেয়ে বলল, এসো আমার সঙ্গে।
অন্ধকারে দুপাশের গাছপালাগুলোকে অদ্ভুত দেখাচ্ছে। জিমের পিছু পিছু এগিয়ে চলেছে দুই গোয়েন্দা। কেন যেন খচখচ করছে দুজনের মন। এভাবে যাওয়া ঠিক হচ্ছে না।
উফফা হঠাৎ শোনা গেল। রবিনের চিৎকার। গাছের আড়াল থেকে বেরিয়া এসে জোরে কাঁধ খামচে ধরেছে। কেউ। মিস্টার রিভান! কে জানি... মুখ চেপে ধরল। কঠিন একটা থাবা।
পেছনে আরেকটা চাপা শব্দ শুনতে পেল রবিন। মুসার মুখও আটকে দেয়া হয়েছে, অনুমান করল।
ফিরে দাঁড়াল জিম। এগিয়ে এলো কাছে। কিন্তু এ-কি! সামান্যতম অবাক হল না তো! কোমরের খাপ থেকে রিভলভারও বের করল না! চমৎকার! বলে উঠল গার্ড। চেচামেচি করতে পারেনি।

আমরা করতে দিইনি বলে, বলে উঠল রবিনকে ধরে রাখা লোকটা। নৌকা দ্বীপে ভেড়াবে, এটাই তো বিশ্বাস হচ্ছিল না তোমার। আরেকটু হলেই তো দিয়েছিল! ক্যাম্পে নিয়ে ওদেরকে জাগালেই…
কিন্তু যেতে তো পারেনি, অস্বস্তি বোধ করছে জিম। এখন আর কোন ভয় নেই…
কে বলল তোমাকে? বলল মুসাকে ধরে রাখা লোকটা। টাকাগুলো নিয়ে কেটে পড়ার আগে নিরাপদ নই। যে-কোন মুহূর্তে যা খুশি ঘটে যেতে পারে! এই বিচ্ছু দুটোর ব্যবস্থা করা দরকার। চল, বেঁধে নৌকায় ফেলে রাখি। পরে দেখব, কি করা যায়।
ঠিক আছে, রাজি হল জিম। আচ্ছা, ডিক, টাকাগুলো কোথায়?
গুহায় রেখেছ?
ওসব জেনে কাজ নেই তোমার, ভারি গলায় বলল ডিক। সেটা আমাদের ব্যাপার।
আমারও! গম্ভীর কণ্ঠ জিমের। তিন ভাগের এক ভাগ আমার। তোমাদের মতই দুটো বছর অপেক্ষা করেছি। আমিও। বাঁ হাতটার কথা বাদই দিলাম। যদিও, এটা হারিয়েছি তোমাদের দোষে।
থাম! বড় বেশি কথা বল তুমি বলল রবিনকে ধরে রাখা লোকটা। তোমার ভাগ তুমি পাবে। এখন এক কাজ কর। গায়ের শার্টটা খুলে ছিড়ে ফেল। এ-দুটোকে বাঁধতে হবে।
কিন্তু…
জলদি করা ধমকে উঠল লোকটা।
শার্ট খুলে নিল জিম। ছিড়ে লম্বা লম্বা ফালি করতে লাগল।
ভাবছে রবিন। ডাকাতদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে জিম। আমার কার লুট করতে সাহায্য করেছিল ডিক আর বাডকে। ওকে সন্দেহমুক্ত রাখতে পিস্তল দিয়ে বাড়ি মেরেছিল ডিক। আঘাতটা একটু জোরেই হয়ে গিয়েছিল। কাঁধের হাড় ভেঙে গিয়েছিল। জিমের। ফলে অকেজো হয়ে গেছে বাঁ-হাতটা…
মুখের ওপর থেকে হাত সরে যেতেই চেঁচিয়ে উঠতে গেল রবিন। কিন্তু তার আগেই কাপড় গুজে দেয়া হল। মুখের ওপর দিয়ে পেঁচিয়ে নিয়ে গিয়ে মাথার পেছনে বেঁধে দেয়া হল একটা ফালি। জিভ দিয়ে ঠেলে আর গোঁজটা খুলতে পারবে না সে। দুহাত পিছমোড়া করে বেঁধে দেয়া হল এরপর।
একইভাবে মুসাকেও বাঁধা হল। পেছন থেকে দুই গোয়েন্দার জ্যাকেটের কলার চেপে ধরল। দুই ভাই।
এবার, বিচক্ষুরা, বলল ডিক, হাট। কোনরকম চালাকির চেষ্টা করবে না। দুঃখ পাবে তাহলে।

জোর ধাক্কায় প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ার উপক্রম হল, কিন্তু কলার ধরে আছে ডিক, পড়ল না রবিন। পাশে চেয়ে দেখল, একই ভাবে ধাক্কা খেয়ে এগোচ্ছে মুসা।
দ্বীপের অন্য প্রান্তে নিয়ে আসা হল ওদেরকে। সৈকতে বিছিয়ে আছে পাথর। তীরের কাছে নোঙর করা একটা বড় মোটর বোট।
ওঠা। রবিনের কাঁধে ধাক্কা মারাল ডিক। উঠে পড়ল দুই গোয়েন্দা। ইঞ্জিনের সামনের খোলা জায়গাটুকুতে নিয়ে আসা হল ওদেরকে।
বস, বসে পড়া কাঁধে চাপ পড়ল। রবিনের। বাড, দড়ি বের করা তো। শক্ত করে বাঁধতে হবে, যেন পালাতে না পারে।
কাছেই পড়ে আছে বোট বাঁধার দড়ি। অনেক লম্বা। হ্যাঁচকা টান দিয়ে মুসাকে চিত করে শুইয়ে ফেলল বাড। দড়ি তুলে নিয়ে পেঁচিয়ে বেঁধে ফেলল। মুসার পা। বাড়তি অংশটুকু দিয়ে রবিনের পা বাঁধল। আরেক টুকরো দড়ি এনে দুজনের বুকে বুক লাগিয়ে পেঁচিয়ে বাঁধল।
ব্যস ব্যস, বলল ডিক ফিশার। আর ছুটতে পারবে না। চল, তাড়াতাড়ি করতে হবে। এমনিতেই অনেক সময় নষ্ট করে ফেলেছি। গুপ্তধন, ইঁহা খোঁজার জন্যে যে-কোন সময় চলে আসতে পারে ব্যাটারা
বোট থেকে নেমে গেল দুই ফিশার।
তুমি এখানেই থাক, জিম, শোনা গেল ডিকের কথা। চোখ রাখ চারদিকে। সন্দেহজনক কিছু দেখলে প্যাঁচার ডাক ডাকবে।
ছেলে দুটোকে কি করবে? জিমের গলা। ওরা বলে দেবে সব! আমি…
বলবে না, কেমন অদ্ভুত শোনাল ডিকের গলা। খানিক পরেই ফিরে আসছি আমরা। বোট নিয়ে চলে যাব। তখন ওদের নৌকাটা উল্টো করে ভাসিয়ে দেবে। আগামী কাল ওভাবেই পাওয়া যাবে ওটা। লোকে ধরে নেবে কোন কারণে সাগরে ডুবে মরেছে…
বুঝেছি, বুঝেছি, বলে উঠল জিম।
পায়ের শব্দ কানে এল, দুজোড়া।। চলে যাচ্ছে। তারপর নীরবতা। কথা বলার চেষ্টা করল রবিন। পারল না। অদ্ভুত একটা চাপা। আয়োজ বেরোল শুধু। বাঁধন খোলা যাবে না। বাঁচার উপায় নেই।
কি ভীষণ বিপদে পড়েছে, বুঝতে অসুবিধে হল না দুই গোয়েন্দার।
ভাবছে। রবিন, ঠিকই অনুমান করেছে কিশোর। কঙ্কাল দ্বীপের ওই পুরানো গুহাতেই লুকানো আছে টাকাগুলো। কিন্তু দুই ফিশারের সঙ্গে জিমেরও যোগসাজশ আছে, একথা কিশোরও কল্পনা করেনি। আজ রাতেই টাকা নিতে আসবে দুই ডাকাত, এটাও ভাবেনি। আগামী কাল ভোর থেকেই শুরু হবে গুপ্তধন খোঁজা, নিশ্চয় ঘোষণা করা হয়েছে রেডিওতে। দ্বীপের কোন জায়গা খোঁজা বাদ

রাখবে না ওরা। কেউ না। কেউ আবিষ্কার করে ফেলবে টাকার থলেগুলো। তাই, বুকি নিয়েও চলে এসেছে ওরা। টাকাগুলো বের করে নিয়ে যাবার জন্যে। যাবার আগে ওকে আর মুসাকে…
আর ভাবতে চাইল না রবিন। চারদিক নীরব নিঃশব্দ। কানে আসছে। শুধু নৌকার গায়ে ঢেউয়ের বাড়ি লাগার মৃদু ছলছলাৎ।
হঠাৎ আরেকটা শব্দ কানে এলো রবিনের। খুবই মৃদু। বোটের সঙ্গে কিছুর ঘষা লেগেছে, আলতো করে একবার দুলে উঠল। চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল সে, বোটের ধারে একটা মাথা। আবছা।
অতি সাবধানে উঠতে লাগল। মাথাটা। গলা দেখা গেল. কাঁধ. বোটের ভেতরে চলে এলো সে। হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে এলো। উঁকি দিয়ে তাকাল একবার তীরের দিকে। আবার মাথা নামাল। রবিন আর মুসার পাশে এসে থামল।
এক মুহূর্ত ঘন ঘন শ্বাস ফেলার শব্দ কানে এলো রবিনের। কানের কাছে ফিসফিস করে উঠল একটা কণ্ঠ, চুপ! আমি পাপালো!
পাপালো! ও কি করে এলো এখানো অবাক হয়ে গেল দুই গোয়েন্দা। ওর তো এখন জেলে থাকার কথা!
কিছু একটা বলতে চেষ্টা করল রবিন, গোঙানির শব্দ হল।
চুপ! আবার বলল পাপলো। কোন কথা নয়। ছুরি দিয়ে বাঁধন কাটতে লাগল পাপালো। মাত্র কয়েক সেকেন্ড, কিন্তু রবিনের মনে হল। কয়েক যুগ পেরিয়ে যাচ্ছে।
কাটা হয়ে গেল বাঁধন। মাথাতুলতে গেল মুসা। হাত দিয়ে চেপে নামিয়ে দিল পাপালো। ফিসফিস করে বলল, খবরদার, দেখে ফেলবো পেছনের দিকে এগোও। পানিতে নামতে হবে।
হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেল মুসা। তার পেছনে রবিন। সবার পেছনে পাপালো।
নেমে পড়া বলল পাপালো। খুব সাবধান! কোন শব্দ যেন না হয়! হালের দন্ডটা ধরে থাকবে। আমি আসছি।
হাজারো প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছে মনে, পরে জিজ্ঞেস করবে। পাপালোকে। আস্তে করে নেমে এলো রবিন। শব্দ হল অতি সামান্য, ঢেউয়ের ছলছলাৎ ঢেকে দিল সে শব্দ।
রবিনের পর পরই নামল মুসা। চলে এলো পেছনে। রবিন ধরে রেখেছে হালের দন্ড। সে-ও এসে ধরল।
খাইছে! রবিনের কাছে মুখ এনে বলল মুসা। ও এলো কি করে!
জানি না! তবে এসে পড়ায় বেঁচে গেলাম বোধহয়া ফিসফিস করে বলল রবিন।
বান মাছের মত পিছলে পানিতে নামল পাপালো। নিঃশব্দে। দুই গোয়েন্দার কাছে চলে এলো। এসো আমার সঙ্গে। খুব সাবধানে সাঁতরাবো কোন আওয়াজ যেন না

হয়।
তীরের ধার ধরে সাঁতরে চলল পাপালো, নিঃশব্দে। তাকে অনুসরণ করল। দুই গোয়েন্দা। রবিন ভাবছে, জ্যাকেট আর প্যান্ট খুলে নিতে পারলে ভাল হত।
কালো পানি। আবছা কালো তিনটে মাথা, ভাল করে খেয়াল না। করলে দেখাই যায় না। কোনরকম শব্দও করল না ওরা। মিনিট দশেক পরে একটা জায়গায় এসে পৌঁছুল। সাগরের দিকে সামান্য ঠেলে বেরিয়ে আছে এখানে সৈকত। ওটা ঘুরে আরেক পাশে চলে এলো। বোটটা আর দেখা যাচ্ছে না। জিম রিভানের দৃষ্টির বাইরে চলে এসেছে ওরা।
তীরের দিকে ফিরে সাঁতরাতে শুরু করল পাপালো। অনুসরণ করল। দুই গোয়েন্দা।
বালিতে ঢাকা সৈকত নেই এখানে। পানির ওপর নেমে এসেছে ঝোপ ঝাড় আর ছোট ছোট গাছ। একটা শেকড় ধরে উঠে গেল পাপালো। এগিয়ে গিয়ে থামল দুটো বড় পাথরের মাঝে। মুখ বের করে উঁকি দিল। তার পাশে এসে বসেছে দুই গোয়েন্দা। ওরাও উঁকি দিল।
প্রায় তিনশো ফুট দূরে মোটর বোটটা। তারার আলোয় আবছা। জিম রিভানের মূর্তিটা আরও কাছে।
এবার কথা বলতে পারি, নিচু গলায় বলল পাপালো। আমাদেরকে দেখতে পাবে না ওরা।
এখানে এলে কি করে? একই সঙ্গে প্রশ্ন করল দুই গোয়েন্দা।
মুখ টিপে হাসল পাপালো। তোমাদের সঙ্গে কথা বলে শিওর হয়ে এসেছেন হোভারসন, আমি চোর নই। কাজ শেষ করে ফিরে এসেছেন। তখন জিজ সাহেব। নিজের পকেট থেকে জামিনের পঞ্চাশ ডলার দিয়ে দিয়েছেন চীফ। জামিন হয়েছে হাক স্টিভেন। হাজত থেকে বাড়ি নিয়ে গেলেন। আমাকে হোভারসন। খাওয়ালেন। তারপর ছাড়লেন।
কিন্তু এখানে এলে কি করে? কি করে জানলে আমরা এখানে এসেছি? জিজ্ঞেস করল রবিন।
সোজা বাসায় চলে গেলাম, বলল পাপলো। বাবাকে যতটা খারাপ অবস্থায় দেখব ভেবেছিলাম, তত খারাপ নয়। পড়শি এক মহিলা দেখাশোনা করেছেন। বেরিয়ে এলাম। বাইরে। সাগরের দিকে চেয়ে বসে ভাবতে লাগলাম। ছুরিটা ট্রেলারে গেল কি করে? আমাকে চোর বানানোর জন্যে কেউ একজন ফেলে রেখেছিল ওখানে ছুরিটা, কে? ছুরিটা হারিয়েছি। পরশু, যেদিন গুহায় ঢুকেছিলাম। জিম রিভান তাড়া করল, পালালাম। তার পর থেকেই আর পাইনি ছুরিটা। তারমানে তাড়াহুড়োয় খেয়াল করিনি, ওটা রেখেই পালিয়েছিলাম। এরপর একটা মাত্র

লোকের হাতেই পড়তে পারে জিনিসটা, জিম রিভান। তার পক্ষেই ট্রেলারে ঢোকা সহজ, অবশ্যই দরজা দিয়ে। লেন্স চুরি করা সহজ। ট্রেলারের জানালা ওই ভেঙেছে, ছুরিটা ফেলে রেখেছে মেঝেতে। ব্যাটার ওপর চোখ রাখা দরকার মনে করলাম। ঘাটে বাঁধা একটা নৌকা চুরি করে নিয়ে চলে এলাম দ্বীপে। থামল সে। তারপর বলল, নৌকাটা একটা ঝোপের ধারে বেঁধে রেখে চলে গেলাম ক্যাম্পের কাছে। পার্কের দিকে এগোতে দেখলাম জিমকে। পিছু নিলাম। পার্কের পরে ছোট একটা জংলা পেরিয়ে সৈকতে বেরোল সে। দূরে একটা মোটর বোট দেখলাম। হাতের টর্চ সেদিকে করে তিনবার জ্বালাল-নেভাল জিম। তীরে এসে ভিড়ল বোট। তাজ্জব হয়ে দেখলাম, নামল। দুই ভাই, ডিক আর বাড ফিশার।
মুসার দিকে ফিরল পাপালো। হাসল। দাঁড় খুব ভাল টানতে পোর। না তুমি, মুসা। ছপাৎ ছপাৎ শব্দ হচ্ছিল। লুকিয়ে পড়ল তিনজনে। তোমাদের তীরে ওঠার অপেক্ষায় রইল। তারপর আর কি? বোকার মত
সত্যি, তুমি না এলে প্রাণেই মারা পড়তাম আজ। পাপালোর কাঁধে। হাত রাখল। রবিন।
শ শ শ ঠোঁটে আঙুল রাখল পাপালো। ফিশার ব্যাটারা আসছে। দুটো মূর্তি এগিয়ে এসে দাঁড়াল জিমের কাছে। দুজনের হাতে দুটো বড় প্যাকেট, দশ লক্ষ ডলার।
সব ঠিক আছে? স্পষ্ট ভেসে এল ডিকের গলা। কোন গোলমাল নেই তো?
না, গোলমাল নেই, জবাব দিল জিম। শোন, আমার ভাগের টাকাটা দিয়ে দাও।
পরে, বলল বাড ফিশার। বোটে উঠে দেব। ডিক, জলদি করা। চল উঠে পড়ি।
পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে জিম। ধাক্কা দিয়ে তাকে সরিয়ে দিল। বাড। এগিয়ে গেল বোটের দিকে।
বোটে উঠে পড়ল দুই ভাই।
আরে! চেঁচিয়ে উঠল বাড। বিচ্ছু দুটো কোথায়! জিম, তুমি ছেড়ে দিয়েছ ওদেরকে।
আমি ছাড়িনি! রেগে গিয়ে বলল জিম। যাবে কোথায়? আছে, দেখ!
নেই। কর্কশ গলা বাডের।
কই, দেখি, বলতে বলতে এগিয়ে এলো জিম। আলো ফেলল। বোটে। আরে, সত্যিই নেই দেখছি! গেল কোথায়! এক চুল নড়িনি। আমি জায়গা ছেড়ে।
দেখি, প্যাকেটটা দাও, হাত বাড়াল ডিক। জলদি নেমে গিয়ে ধাক্কা দাও। এখুনি পালাতে হবে।
কিন্তু আমার ভাগ? বলল জিম। দুটো বছর অপেক্ষা করেছি। পুরো দশ লাখ পেলেও আমার হাতের দাম হবে না। সেটা না হয় না-ই বললাম। তোমরা তো

পালাবে, আমি যাব কোথায়? ছেলে দুটো পালিয়েছে। গিয়ে বলে দেবে সব। জেলে যাব তো!
সেটা তোমার ব্যাপার, হাত নেড়ে বলল ডিক। বাড, ধাক্কা দাও। সটাটারে চাপ দিল সে।
ধাক্কা দিতে গিয়েও থেমে গেল বাড। গায়ে ওপর ঘেষে এসেছে জিম। খবরদারা প্যাকেট দুটো দিতে বল ডিককে। নইলে…
ব্যাডা শোনা গেল ডিকের আতঙ্কিত চিৎকার। বাড, স্টার্ট নিচ্ছে না! জিম, ইঞ্জিনের কি করেছ?
আমি কিছু করিনি, জবাব দিল গার্ড।
ইঞ্জিন তো স্টার্ট নিচ্ছে না, এখন কি করব?
সেটা তোমাদের ব্যাপার। প্যাকেট দুটো দাও, জলদি!
আবার চেষ্টা করল ডিক, আবার, কিন্তু সন্টার্ট হল না ইঞ্জিন। অবাক হয়ে দেখল দুই গোয়েন্দা, নীরব হাসিতে ফেটে পড়ছে পাপালো।
কি হল! ফিসফিস করে বলল রবিন।
স্পার্কিং প্ল্যাগের তার ছিড়ে ফেলে দিয়েছি, বলল পাপালো। হারামজাদারা! এবার যাও! পালাও! ওই হারামির বাচ্চা ডিকই আমার নৌকা ভেঙেছে। ওই বোট দিয়েই। এইবার পেয়েছি কায়দায়। চল, ক্যাম্পে গিয়ে লোক ডেকে আনি।
উঠতে যাবে, এমন সময় কানে এলো ইঞ্জিনের শব্দ। বসে পড়ল আবার পাপালো, দ্বীপের দিকেই এগিয়ে আসছে একটা বড় মোটর লঞ্চ।
কাছে এসে গেল লঞ্চ। আলো জ্বলে উঠল, সার্চ লাইট। সোজা এসে পড়ল ফিসারদের বোটের ওপর।
এক লাফে বোট থেকে নেমে এলো ডিক। ছুটল। হকচকিয়ে গেল জিম। এই সুযোগে থাবা মেরে তার হাতের রিভলভার ফেলে দিল বাড। ভাইয়ের পেছনে ছুটল সে-ও।
আরে! বলে উঠল পাপালো। ব্যাটারা এদিকেই আসছে। দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা! দ্রুত হামাগুড়ি দিয়ে সামনে এগোল সে।
কাছে এসে গেল ডিক। আর দুকদম ফেললেই ঝোপ পেরিয়ে যাবে। ঠিক তার পেছনেই রয়েছে বাড।
দাঁড়িয়ে উঠে হঠাৎ সামনে পা বাড়িয়ে দিল পাপালো। হোঁচট খেল ডিক। হুমড়ি খেয়ে পড়ল মাটিতে। ভাইয়ের গায়ে হোঁচট খেল বাড। পড়ে গেল সে-ও।
ডিকের ওপর গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো পাপালো। একনাগাড়ে কিল ঘুষি মারতে লাগল। চেঁচাতে লাগল, হারামজাদা! আমাকে হাজতে পাঠিয়েছিলি! ডাকাতের বাচ্চা ডাকাত! চোর বানিয়েছিলি আমাকে…

উঠে দাঁড়াল বাড। পাপালোর চুল ধরে হ্যাঁচকা টানে সরিয়ে আনল ভাইয়ের ওপর থেকে। চিত করে শুইয়ে ফেলল। পাথরে জোরে ঠুকে দিল মাথা। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পা তুলল পাপালোর বুক সই করে।
মাথা নুইয়ে ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মত ছুটে গেলো মুসা। নিগ্রোর খুলি কতখানি শক্ত, তলপেটে অনুভব করল বাড। হুকক করে একটা শব্দ বেরোল মুখ থেকে। চিত হয়ে পড়ে গেল। তার ওপর পড়ল মুসা।
চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে উঠতে গেল ডিক, পারল না। পিঠের ওপর লাফিয়ে এসে বসেছে রবিন। আবার হাত-পা ছড়িয়ে উপুড় হয়ে পড়ে গেল সে।
ঝাড়া দিয়ে গায়ের ওপর থেকে মুসাকে ফেলে দিল বাড। উঠে দাঁড়াল হাঁচড়ে-পাঁচড়ে। এই সময় এসে পড়ল জিম। জ্যাকেটের কলার চেপে ধরে সোজা করল বাডকে। ঠেলে নিয়ে চলল। সামনের দিকে। ষাঁড়ের জোর তার গায়ে। ওর এক হাতের সঙ্গেই পেরে উঠল না বাড।
ঠেলে বাডকে পানির ধারে নিয়ে চলল জিম। আমার সঙ্গে চালাকি দেখাচ্ছি। মজা!
বাডকে নিয়ে পানিতে পড়ল জিম। কোমর পানি। উঠে দাঁড়াল আবার। মাথা তুলল বাড। জ্যাকেটের কলার এখনও জিমের হাতে।
বাডকে ঠিকমত দম নিতে দিল না জিম। চুবাতে লাগল। একনাগাড়ে। রাগে পাগল হয়ে উঠছে সে। হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে।
রবিনকে গায়ের ওপর থেকে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াতে গেল ডিক। এবারেও পারল না। প্রায় এক সঙ্গে এসে হাজির হয়েছে মুসা আর পাপালো। দুহাতে ডিকের দুপা ধরে উচু করে ফেলল মুসা। টান দিল। হাত বাড়িয়ে একটা ছোট গাছের গোড়া ধরে ফেলল। ডিক। লাথি মেরে হাতটা সরিয়ে দিল পাপালো। এ হারামজাদাকেও পানিতে ফেল!
তিন কিশোরের সঙ্গে পেরে উঠলো না ডিক। হিড়হিড় করে টেনে তাকে পানির ধারে নিয়ে এলো ওরা।
বাডকে ছাড়ছে না। জিম। চোবাচ্ছে এখনও। মেরেই ফেলবে যেন। তার পাশেই ডিককে নিয়ে এসে পড়ল তিন কিশোর।
বাডকে ছেড়ে দিয়েই ডিকের ঘাড় চেপে ধরল জিম। তাকে চুবাতে শুরু করল।
হয়েছে ছাড়া শোনা গেল একটা গম্ভীর আদেশ। মেরে ফেলবে তো!
চমকে ফিরে চাইল তিন কিশোর। তাদের পেছনে কয়েক হাত দূরে এসে গেছে দুটো নৌকা। একটা নৌকায় দাঁড়িয়ে আছেন পুলিশ চীফ হোভারসন। এক হাতে রিভলভার, আরেক হাতে টর্চ।
ছাড়া আবার আদেশ দিলেন হোভারসন। এই জিম শুনতে পাচ্ছ।

ডিককে ছেড়ে দিল জিম। সরে যাবার তাল করছিল বাড, তাকে চেপে ধরল। দিল আরেক চুবানি।
হয়েছে হয়েছে। মেরে ফেলবে, ছেড়ে দাও! বললেন পুলিশ চীফ।
দুই ডাকাত আর জিমকে টেনে ডাঙায় তুলল। কয়েকজন পুলিশ। হাতকড়া পরিয়ে দিল।
ধপাস করে মাটিতে বসে পড়ল দুই ফিশার। প্রচুর মার খেয়েছে। দাঁড়িয়ে থাকার শক্তি নেই।
তিন কিশোরের ওপর আলো ফেললেন হোভারসন। একটা কাজের কাজ করেছ তোমরা। পাপু, তুমি এখানে এলে কি করে?
প্রশংসা সব ওরই পাওয়া উচিত, চীফ, পাপালো কিছু বলার আগেই বলে উঠল রবিন। ও না এলে আমাকে আর মুসাকে মেরে পানিতে ফেলে দিত ডাকাতগুলো।
কিন্তু আপনি এলেন কেন? আজি রাতেই ব্যাটারা টাকা নিতে আসবে জানতেন?
না, মাথা নাড়লেন হোভারসন। ব্যাটারা স্কেলিটন আইল্যান্ডে টাকা লুকিয়ে রেখেছে, কল্পনাই করিনি কখনও! কিশোর, তোমাদের বন্ধু কিশোর পাশা... মিনিট চল্লিশেক আগে ঝড়ের বেগে এসে ঢুকাল থানায়। অদ্ভুত এক গল্প শোনাল। বলল, ফিশার ব্যাটাদের বমল ধরতে হলে এখুনি যান। এমনভাবে বলল, ওর কথা বিশ্বাস না করে পারলাম না। তাড়াতাড়ি লঞ্চ নিয়ে ছুটে এলাম।
কিশোর কোথায়? জিজ্ঞেস করল মুসা।
লঞ্চে, বললেন চীফ। জোর করে রেখে এসেছি। গোলাগুলি চলতে পারে, তাই আনিনি।
বিশাল টেবিলে পড়ে থাকা মোহরের ছোট স্তূপের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে আছেন মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফার।
গুপ্তধন তাহলে পেলো অবশেষে বললেন পরিচালক। সব পাওনি, ঠিক, তবে কিছু তো পেয়েছ।
মোট পঁয়তাল্লিশটা, বলল কিশোর। এখানে আছে তিরিশটা, মুসা। আর রবিনের ভাগের। ক্যাপ্টেন ওয়ান-ইয়ারের ধনরাশির তুলনায় কিছুই কী।
তবু তো ধন, সোনার ডাবলুন, বললেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। এখন বল, কেন মনে হল, লুটের টাকা স্কেলিটন আইল্যান্ডে লুকানো আছে?
সন্দেহটা ঢোকাল স্কেলিটন আইল্যান্ডের ভূত, বলল কিশোর। ওসব কুসংস্কারে বিশ্বাস করি না। শুনেই বুঝলাম, দ্বীপে ভূত দেখা যাওয়ার পেছনে মানুষের কারসাজি রয়েছে। কেউ একজন চায় না, ওই দ্বীপে মানুষ যাতায়াত করুক। তখনই প্রশ্ন জাগল মনে, কেন? মূল্যবান কিছু রয়েছে? ক্যাপ্টেন ওয়ান-ইয়ারের গুপ্তধন? ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি। এই সময় দ্য হ্যান্ডের নিচের গুহা

আবিষ্কার করে বসল পাপালো। মোহর পেল ওখানে। বুঝে গেলাম, স্কেলিটন আইল্যান্ডে ওয়ান-ইয়ারের গুপ্তধন নেই। তাহলে? একসঙ্গে তিনটে কথা এল মনে। প্রায় বিশ বছর পরে হঠাৎ দেখা যেতে শুরু করেছে স্যালি ফ্যারিংটনের ভূত, বছর দুই আগে থেকে। ঠিক দুই বছর আগে লুট হয়েছে দশ লক্ষ ডলার। স্কেলিটন আইল্যান্ডের পাশে উপসাগরে ধরা পড়েছে দুই ভাই, ডিক আর বাড ফিশার। ক্যাপ্টেন ওয়ান-ইয়ারের ধরা পড়ার সঙ্গে কোথায় যেন মিল রয়েছে। একটু ভাবতেই বুঝে ফেললাম ব্যাপারটা। ক্যাপ্টেন ওয়ান-ইয়ার মোহর সাগরে ফেলে দেয়নি, লুকিয়ে ফেলেছিল। হ্যান্ডের গুহায়। ফিশাররাও টাকা পানিতে ফেলে দেয়নি, লুকিয়ে ফেলেছে স্কেলিটন আইল্যান্ডের গুহায়। ব্রিটিশ জাহাজের ক্যাপ্টেনকে ফাঁকি দিয়েছিল ওয়ান-ইয়ার, একই কায়দায় পুলিশকে ফাঁকি দিয়েছে ফিশাররা।

চমৎকার! বললেন পরিচালক। আরেকটা প্রশ্ন। ডিক আর বাড তো জেলে, ভূত সাজল কে?

হান্ট গিল্ডার, এটা আমার অনুমান, বলল কিশোর, জেলে দুই ফিশারের সঙ্গে দেখা করত সে। কোনভাবে ওকে নিয়মিত টাকা দেবার বন্দোবস্ত করেছিল দুই ভাই। বিনিময়ে মাঝে মাঝেই দ্বীপে গিয়ে ভূত সেজে জেলেদেরকে দেখা দিত হান্ট। আসল কারণটা নিশ্চয় জানত না, তাহলে টাকাগুলো খুঁজে বের করে নিয়ে চলে যেত।

যেমন যেত গার্ড জিম রিভান, বললেন মিস্টার ক্রিস্টোফার।

হ্যাঁ, মাথা ঝোঁকাল কিশোর। জিম জানত না, দ্বীপেই লুকানো আছে টাকাগুলো। শুধু এটুকু জানত, কোথাও লুকিয়ে রেখেছে দুই ভাই। জেল থেকে বেরিয়ে এসে বের করবে। তার ভাগ তাকে দিয়ে দেবে।

যখন জানল, তার নাকের ডগায়ই রয়েছে টাকাগুলো, হেসে বলল রবিন, কি আফসোসই না করলা

হ্যাঁ, কিশোরের গলায় ক্ষোভ। নিশ্চয় দেখার মত হয়েছিল তার মুখের ভাবা সর্দির জন্যে তো যেতে পারলাম না...

সিনেমা কোম্পানির জিনিসপত্র চুরি করল কে? জিজ্ঞেস করলেন পরিচালক। জিম আসার আগেই তো শুরু হয়েছিল চুরি!

নিশ্চয় হান্ট, বলল কিশোর। চোর হিসেবে বদনাম আছে। ওর এমনিতেই। চুরি কুরতে গিয়ে ধরা পড়লে, ব্যাপারটাকে সাধারণ চুরি হিসেবেই নিত পুলিশ। অন্য কিছু সন্দেহ করত না।

কাজটা অন্যকে দিয়ে করানোর কি দরকার? বললেন পরিচালক। জেল থেকে তো বেরিয়েছে তখন দুভাই। ওরা করলেই পারত? আর এত সব ঝামেলার মধ্যে

গেল কেন? চুপচাপ এক রাতে গিয়ে টাকাগুলো বের করে নিয়ে চলে আসতে পারত।
পারত না, বলল কিশোর। আমার ধারণা, হান্ট টাকার গন্ধ পেয়ে গিয়েছিল। দুবছর ভূত সেজেছে সে। অনেক টাকা পেয়েছে দুই ভাইয়ের কাছ থেকে। এত টাকা খামোকা ব্যয় করেনি। ডিক আর বাড, এটা বুঝবে না, অত বোকা নয় সে। দুই ফিশারের ভয় ছিল, টাকা আনতে গেলে পিছু নেবেই হান্ট, দেখে ফেলবে। তখন তাকে একটা ভাগ দিতে হবে। হান্টের ব্ল্যাকমেলের শিকার হবারও ভয় ছিল ওদের। তাই তো কৌশলে সরাল ওকে।
কি কৌশল? জানতে চাইলেন পরিচালক।
আমরা যাব, কথাটা ছড়িয়ে পড়ল শহরে। জেনে গেল ডিক আর বাড। বুঝল, হান্টকে সরানোর এই সুযোগ। আমাদেরকে কিডন্যাপ করে। দ্য হ্যান্ডে রেখে আসতে ওকে পাঠাল ওরা। নিশ্চয় অনেক টাকা পেয়েছে, বোকার মত কাজটা করে বসল। হান্ট। ফিরে এসে সব কথা জানালাম আমরা পুলিশকে। পিছু লাগল পুলিশ। শহর ছেড়ে পালাতে বাধ্য হল হান্ট। থামল কিশোর। তারপর আবার বলে চলল, হান্ট চলে গেল। সিনেমা কোম্পানি থেকেই গেল দ্বীপে। চুরি বন্ধ করা চলবে না। জিমকে ধরল দুই ভাই। সুন্দর সুযোগ। কোম্পানি একজন গার্ড চায়। জিম হলে খুব ভাল হবে। নিজেই চাকরির দরখাস্ত নিয়ে গেল জিম। হয়ে গেল চাকরি। ঘরের ইদুর বেড়া কাটতে লাগল। দ্বীপটার আশেপাশে খুব বেশি ঘোরাফেরা করে পাপালো। গুপ্তধন খুঁজে বেড়ায়। যদি কখনও গুহায় ঢুকে টাকার বাণ্ডিল দেখে ফেলে, এই ভয়ে তার ওদিকে যাওয়া বন্ধ করতে চাইল দুই ফিশার। গুজব রটিয়ে দিল, পাপালো চোর। সিনেমা কোম্পানির জিনিসপত্র সে-ই চুরি করে। তাকে দেখলেই লাঠি নিয়ে তাড়া করে জিম। এই সময় আমরা গিয়ে হাজির হলাম। জোর পেল পাপালো। শুধু গুজব রটিয়ে ওকে আর ঠেকানো যাবে না, বুঝতে পারল দুই ভাই। সময় মত জিম পেয়ে গেল পাপালোর ছুরিটা। জানাল দুই ডাকাতকে। সুযোগটা লুফে নিল ওরা। লেন্স চুরি করোল জিমকে দিয়ে, ট্রেলারের জানালা ভাঙল, মেঝেতে ছুরিটা ফেলে রাখা হল, লেন্সগুলো নিয়ে গিয়ে পাপালোর বিছানার নিচে রেখে দিয়ে এল ডিক কিংবা বাড। পরের দিন আরেকটা সুযোগ পেয়ে গেল ডিক। দ্য হ্যান্ডের দিকে গিয়েছে পাপালো, জানল কোনভাবে। পিছু নিল। ভেঙে দিয়ে এল নৌকাটা। ব্যস, একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে গেল। কোন কারণে যদি পাপালোকে ছেড়েও দেয় পুলিশ, ও আর গুপ্তধন খুঁজতে যেতে পারবে না। কিন্তু বড় একরোখা পাপালো হারকুস, ওকে শেষ অবধি ঠেকাতে পারল না। দুই ফিশার। ওরই জন্যে ধরা পড়েছে ওরা, প্রাণে বেঁচেছে মুসা আর রবিন।

হাঁ আস্তে মাথা ঝাঁকালেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। আচ্ছা, কিছু করে এসেছি। ওর জন্যে? সাহায্যের কথা বলছি।
আমাদের কিছু করতে হয়নি, কথা বলল মুসা। নিজের ব্যবস্থা নিজেই করে নিয়েছে পাপু।
কি?
গুপ্তধন শিকারের ওপর যে ছবিটা করা হয়েছে, তাতে মূল ভূমিকা তার দেখানো হয়েছে। দ্য হ্যান্ডের গুহা থেকে ডুবে ডুবে মোহর তুলে আনছে সে, এই দৃশ্যের ছবিও তোলা হয়েছে। মিস্টার জন নেবারের সঙ্গে আলোচনা করে বেশ মোটা অংকের পারিশ্রমিক দিয়েছে তাকে বাবা। ট্রেজার-হান্টার ছবিতে অভিনয়ের জন্যে।
খুব ভাল, খুব ভাল, খুশি হলেন পরিচালক। আর কিছু?
পরিবহন কোম্পানির দশ লাখ ডলার ফিরে পাওয়ার ব্যাপারে পাপালোর কৃতিত্বই বেশি, বলল কিশোর। তাকে একটা পুরস্কার দিয়েছে কোম্পানি। পঁচিশ হাজার ডলার।
বাহ্, বেশ বড় পুরস্কার তো! বললেন পরিচালক।
বাবাকে নিয়ে দেশে ফিরে যাবে পাপালো, বলল কিশোর। ভালভাবে চিকিৎসা করবে। একটা বোট কিনে মাছের ব্যবসা শুরু করবে। আশা পূরণ হয়েছে তার।
হুমম, মাথা ঝোঁকালেন পরিচালক। তোমাদের এই অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী নিয়ে খুব ভাল একটা ছবি হবে। ভাবছি, পুরোটাই শুটিং করব। স্কেলিটন আইল্যান্ড আর আশেপাশের দ্বীপগুলোতে। যেখানে যা যা যেভাবে ঘটেছে, ঠিক তেমনি ভাবে। পাপালোর চরিত্রটা তাকে দিয়েই অভিনয় করালে কেমন হয়?
খুব ভাল হয়। একই সঙ্গে বলে উঠল তিন গোয়েন্দা।
ঘড়ি দেখলেন পরিচালক। ঠিক আছে। নতুন কোন রহস্যের খোঁজ পেলে জানাব।
ইঙ্গিতটা বুঝল তিন কিশোর। উঠে দাঁড়াল। মোহরগুলো টেনে নিলো মুসা। বেছে বেছে একটা ভাল মোহর-যেটা কম ক্ষয় হয়েছে, তুলে নিয়ে বাড়িয়ে ধরল। এটা আপনাকে দিলাম, স্যার। আপনার সংগ্রহে রেখে দেবেন।
থ্যাংক ইউ, মাই বয়, মোহরটা নিতে নিতে বললেন পরিচালক।
ঘর থেকে বেরিয়ে গেল তিন গোয়েন্দা।
হাতের তালুতে নিয়ে মোহরটার দিকে চেয়ে রইলেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। বিড়বিড় করে বললেন, সত্যিকারের জলদস্যুর গুপ্তধন! হাসলেন আপন মনেই। দারুণ ছেলেগুলো কী সুন্দর সুন্দর কাহিনীর জন্ম দিচ্ছে ভাবছি, এরপর কি আসাইনমেন্ট দেয়া যায় তিন গোয়েন্দাকে!

ভলিউম ১ – ছায়াশ্বাপদ – তিন গোয়েন্দা – রকিব হাসান – সেবা প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি, ১৯৮৬

শেষ ডিসেম্বরের এক হিমেল সন্ধ্যা। প্যাসিও প্লেসে। এসে ঢুকেছে তিন গোয়েন্দা। হেঁটে যাচ্ছে একটা পার্কের পাশ দিয়ে। এই শীতেও মৌসুমের শেষ কয়েকটা গোলাপ ফুটে আছে। পার্কের পাশে একটা আস্তরবিহীন লাল ইটের বাড়ি, সেইন্ট জুডস রেকটরি-গির্জার যাজকদের বাসভবন। রেকটরির ওপাশে ছোট্ট গির্জা, ঘষা-কাঁচের ভেতর দিয়ে আলো আসছে। ভেতরে বাজছে অর্গান, কখনও উঁচু পর্দায়। কখনও একেবারে খাদে নেমে যাচ্ছে সুর। অর্গানের শব্দ ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছে বাচ্চা। ছেলেমেয়েদের গলা, তালে তালে সুর করে পবিত্র শ্লোক আওড়াচ্ছে কবিতার মত।

রেকটরি আর গির্জার পাশ দিয়ে হেঁটে এসে ছিমছাম নীরব একটা বাড়ির সামনে দাঁড়াল তিন গোয়েন্দা, একটা অ্যাপার্টমেন্ট হাউস। বাড়িটার একপাশে রাস্তার সমতলে কয়েকটা গ্যারেজ। দ্বিতল বাড়ি, প্রতিটি জানালায় পর্দা, বদ্ধ কাঁচের শার্সি। বাইরের জগৎ থেকে নিজেদেরকে একেবারে আলাদা করে রেখেছে যেন। ভাড়াটেরা।

এটাই, বলল কিশোর পাশা, তিনশো তেরো নাম্বার, প্যাসিও প্লেস। এখন বাজে সাড়ে পাঁচটা। একেবারে কাঁটায় কাঁটায় ঠিক সময়ে হাজির হয়েছি।

গ্যারেজগুলোর ডানে পাথরের চওড়া সিঁড়ি, গেটের কাছে উঠে শেষ হয়েছে। সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল খাকি রঙের জ্যাকেট পরা একটা লোক। তিন গোয়েন্দার দিকে তাকালও না, পাশ দিয়ে হেঁটে চলে গেল।

সিঁড়িতে পা রাখল কিশোর। উঠতে শুরু করল। ঠিক পেছনেই রয়েছে মুসা আর রবিন।

হঠাৎ অস্ফুট একটা শব্দ করে উঠল মুসা। লাফিয়ে সরে গেল একপাশে।

থেমে গেল কিশোর। চোখের কোণ দিয়ে দেখল, প্রায় উড়ে নিচে নেমে যাচ্ছে একটা কালো কিছু।

বেড়াল, সহজ গলায় বলল রবিন।

প্রায় মাড়িয়ে দিয়েছিলাম! কেঁপে উঠল মুসা। দুপাশ থেকে স্কি-জ্যাকেটের দুই প্রান্ত টেনে এনে চেন তুলে দিল। কালো বেড়াল!

হেসে ফেলল রবিন। তাতে কি? কুলক্ষণ ভাবছ নাকি?...এস।

গেটের খিলের দিকে হাত বাড়াল কিশোর। ওপাশে পাথরের বিরাট চত্বর। মাঝখানে বড় একটা সুইমিং পুল, ওটা ঘিরে লোহার চেয়ার-টেবিল সাজানো। চত্বরের চারপাশে লতাগুল্মের ঝাড়।

গেট খুলল কিশোর। এই সময় জ্বলে উঠল ফ্লাডলাইট, সুইমিং পুলের ভেতরে, লতাগুল্মের ফাঁকে ফাঁকে।
এখানে কি চাই! কিশোরের প্রায় কানের কাছে কথা বলে উঠল খসখসে নাকী একটা গলা।
গেটের পাশেই বাড়ির একটা দরজা খুলে গেছে। দাঁড়িয়ে আছে এক মোটাসোটা মহিলা। লাল চুল। রিমলেস চশমার ভেতর দিয়ে কড়া চোখে তাকিয়ে আছে তিন গোয়েন্দার দিকে।
ম্যাগাজিন বিক্রি করতে এসেছ? আবার বলল মহিলা, চকলেট? নাকি সাহায্য চাইতে এসেছ ক্যানারি পাখির এতিম বাচ্চার জন্যে? তা যে-জন্যেই এসে থাক, বিদেয় হও। আমার ভাড়াটেদের বিরক্ত করা চলবে না।
মিসেস ডেনভার!
ডাক শুনে ফিরে তাকাল মহিলা। চত্বরের দিকে মুখ-করা একটা ব্যালকনি থেকে নেমে এসেছে সিঁড়ি। সিঁড়ির গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছেন এক বৃদ্ধ। মনে হয়, ওরাই আমার লোক।
আমি কিশোর পাশা, বলল গোয়েন্দাপ্রধান। বয়েসের তুলনায় ভারিক্কি গলা, ভাবভঙ্গি। অপরিচিত কারও সঙ্গে এভাবেই কথা বলে সে। সমান্য পাশে সরে দুই সহকারীকে দেখিয়ে বলল, মুসা আমান, রবিন মিলফোর্ড। আপনিই মিস্টার ফ্র্যাঙ্ক অলিভার?
হ্যাঁ, বললেন বৃদ্ধ। দরজায় দাঁড়ানো মহিলার দিকে তাকালেন। আপনাকে দরকার নেই, মিসেস ডেনভার।
বেশ! রাগ প্রকাশ পেল মহিলার গলায়। গটমট করে নিজের ঘরে ঢুকে পড়ল। দড়াম করে বন্ধ করে দিল দরজা।
নাকা বুড়ি, বিড়বিড় করলেন ফ্র্যাঙ্ক অলিভার। ওর ব্যবহারে কিছু মনে। কোরো না। ভেবে বোসো না, এ-বাড়ির সবাই এমনি। তা নয়। আর সবাই খুব ভাল। এস।
বৃদ্ধকে অনুসরণ করে ব্যালকনিতে উঠে এল তিন গোয়েন্দা। কয়েক ফুট দূরে দরজা। তালা খুললেন মিস্টার অলিভার। ছেলেদেরকে নিয়ে ঢুকলেন ঘরে। ছাতের কড়িকাঠ থেকে ঝুলছে পুরানো আমলের বড় দামি ঝাড়বাতি। টেবিলের ওপর দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে একটা কৃত্রিম ক্রিসমাস গাছ, চমৎকার করে সাজানো।
বস, কয়েকটা চেয়ার দেখিয়ে বললেন মিস্টার অলিভার। দরজা বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দিলেন।
ঠিক সময়ে এসেছ, বললেন বৃদ্ধ, ভাল। আর কোন কাজ নেই তো। তোমাদের? মানে, ক্রিসমাস সপ্তাটা কাটানর জন্যে অন্য কোন প্ল্যান নেই তো?

কাজ আছে, তবে সময় বের করে নিতে পারব আমরা, ভারিক্কি ভাবটা বজায় রাখল কিশোর। স্কুল খুলবে আগামী হপ্তায়। তার আগেই বেশ কিছু কাজ সেরে নিতে হবে। আপনাকে সময় দিতে পারব।
কষ্ট করে হাসি চাপল মুসা। কি কাজ, খুব ভালই জানা আছে তার। কয়েকদিন ধরেই মেরিচাচী খুব খাঁটিয়ে মারছেন তিনজনকে, লোভনীয় পারিশ্রমিক দিচ্ছেন। অবশ্যই। কিন্তু ওই একঘেয়ে কাজ আর ভাল লাগছে না তিন গোয়েন্দার। অথচ এমনভাবে বলছে কিশোর, যেন কি সাংঘাতিক জরুরি কাজ পড়ে আছে! নিজেদের দাম বাড়াচ্ছে আসলে।
তো, আবার বলল কিশোর, কি জন্যে ডেকেছেন? শুনি আগে সব, তারপর বলতে পারব, আমাদের দিয়ে সাহায্য হবে কি না।
হবে কিনা! কিশোরের কথার প্রতিধ্বনি করলেন যেন অলিভার। হতেই হবে। মানে, সাহায্য করতেই হবে আমাকে। এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। হঠাৎ কেঁপে উঠল তার গলা, তীক্ষ্ণ হয়ে এল। এখানে যা ঘটছে, আর সওয়া যাচ্ছে না!
চুপ করলেন অলিভার। উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। শান্ত করার চেষ্টা করছেন। নিজেকে। তোমরা তিন গোয়েন্দা, না? এটা তোমাদের কার্ড? ওয়ালেট থেকে একটা কার্ড বের করে বাড়িয়ে ধরলেন। তাতে লেখা:
তিন গোয়েন্দা
প্রধান: কিশোর পাশা
সহকারী: মুসা আমান
নথিরক্ষক ও গবেষকঃ রবিন মিলফোর্ড
কার্ডটার দিকে একবার চেয়েই মাথা ঝোকাল কিশোর।
ডেভিস দিয়েছে আমাকে কার্ডটা, বললেন অলিভার। চিত্রপরিচালক ডেভিস ক্রিস্টোফার। আমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু সে। বলেছে, তোমরা গোয়েন্দা। বিশেষ করে, অদ্ভুত রহস্যের প্রতি তোমাদের আকর্ষণ নাকি বেশি?
ঠিক, স্বীকার করল কিশোর। প্রশ্নবোধকগুলো সেজন্যেই বসিয়েছি। যতরকম আজব, উদ্ভট, অস্বাভাবিক রহস্য ভেদ করতে আগ্রহী আমরা। কয়েকটা রহস্যের সমাধানও করেছি। তো, আপনার অসুবিধেটা কি? না শুনে বলতে পারছি না, সাহায্য করতে পারব কিনা। তবে চেষ্টা অবশ্যই করব। ইতিমধ্যেই আপনার সম্পর্কে কিছু কিছু খোঁজখবর করেছি। আপনি কে, কি, জানা হয়ে গেছে আমাদের।
কি? প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন বৃদ্ধ। আমার ব্যাপারে খোঁজখবর করেছ?
নিশ্চয়। মক্কেলের ব্যাপারে খোঁজ নেব না? আপনি কি বলেন? পাল্টা প্রশ্ন। করে বসল কিশোর।

আড়ালে থাকতেই পছন্দ করি আমি, বললেন বৃদ্ধ। লোকের সঙ্গে বেশি মেলামেশা ভাল লাগে না।
পুরোপুরি আড়ালে কেউই থাকতে পারে না রবিনকে দেখিয়ে বলল কিশোর। কাগজপত্র ঘেঁটে লোকের পরিচয় বের কব্রার ব্যাপারে ওর তুলনা নেই। রবিন, মিস্টার অলিভারকে বল কি কি জেনেছ।
হাসল রবিন। লোকের সঙ্গে কথা বলতে পারে বটে কিশোর। মনে মনে বন্ধুর প্রতি আরেকবার শ্রদ্ধা জানাল গবেষক। পকেট থেকে ছোট একটা নোটবই বের করে খুলল। লস অ্যাঞ্জেলেসে জন্য আপনার, মিস্টার অলিভার বয়স সত্তর চলছে। আপনার বাবা, মিস্টার হারল্ড অলিভার, বিরাট বড়লোক ছিলেন। অনেক সম্পত্তি রেখে গেছেন, আপনার নামে। বাপের সম্পত্তি নষ্ট করেননি আপনি, বহাল রেখেছেন ঠিকমতই। চিরকুমার রয়ে গেছেন। এমণে প্রচণ্ড নেশা, শিল্পের প্রতি বেজায় ঝোঁক। মাঝে মাঝেই বিভিন্ন মিউজিয়ম আর দরিদ্র শিল্পীদের দান-খয়রাত করেন। শিল্পের সমঝদার বলে আখ্যায়িত করেছে আপনাকে খবরের কাগজগুলো।
বড় বেশি বাড়িয়ে লেখে ব্যাটারা, গজগজ করলেন অলিভার। সেজন্যেই খবরের কাগজ নিয়ে মাথা ঘামাই না আমি।
কিন্তু ওরা আপনাকে নিয়ে ঘামায়, বলল কিশোর। তবে, খুব বেশি বাড়িয়ে লিখেছে বলে তো মনে হয় না। ঘরের বিভিন্ন জায়গায় সাজিয়ে রাখা শিল্পকর্মগুলো দেখাল সে।
বেশ বড়সড় একটা শো-কেস রয়েছে ঘরের এক প্রান্তে। তাতে নানারকম দামি সংগ্রহ। তাছাড়া দেয়ালে ঝুলছে চমৎকার সব চিত্র, টেবিলে চীনামাটির তৈরি অসংখ্য মূর্তি। এখানে ওখানে কায়দা করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে বেশ কয়েকটা প্রদীপ, নিশ্চয় ইংল্যাণ্ডের মূরদের কোন প্রাসাদ থেকে এসেছে।
ওসব কথা থাক, বললেন অলিভার। সুন্দর জিনিসের প্রতি মানুষের আকর্ষণ। থাকেই, এর জন্যে অতিমানব হওয়ার দরকার পড়ে না। কিন্তু এখানে যা ঘটছে, ওসবের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই।
– কি ঘটছে? জানতে চাইল কিশোর।
কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে তাকালেন মিস্টার অলিভার। পাশের ঘরে তাঁর কথা কেউ শুনতে পাচ্ছে, আশঙ্কা করছেন যেন। ফিসফিস করে বললেন, ভূতের চোখ পড়েছে আমার ওপর!
একদৃষ্টিতে বৃদ্ধের দিকে চেয়ে আছে তিন গোয়েন্দা।
বিশ্বাস করতে পারছ না? আবার বললেন অলিভার, কিন্তু সত্যি বলছি, ভূতের চোখ পড়েছে। আমি বাইরে গেলেই কেউ একজন এসে ঢোকে এখানে।

জিনিসপত্র নাড়াচাড়া করে। যেটা যেখানে রেখে যাই, ফিরে এসে আর সেখানে পাই না। একবার দেখলাম, ডেস্কের ড্রয়ার খোলা চিঠিপত্র অগোছাল। অনেক বড় অ্যাপার্টমেন্ট হাউস আপনার, বলল কিশোর। ম্যানেজার নেই? নিশ্চয় মাস্টার কী রয়েছে তার কাছে?

নাক কোচকালেন অলিভার। ওই নাকা বুড়িটাই আমার ম্যানেজার। তবে চাবি নেই ওর কাছে। তাছাড়া আমার ঘরে বিশেষ তালা লাগিয়েছি। কোন চাকর-বাকর নেই। জানালা দিয়ে ঢোকে না কেউ, আমি শিওর। জানালা খোলা রেখে কখনও বেরোই না। আর খোলা রাখলেও ঢোকা সহজ না। রাস্তা থেকে বিশ ফুট ওপরে। রয়েছে ওগুলো। উঠতে হলে উঁচু মই দরকার। এবং সেটা করতে গেলে লোকের চোখে পড়ে যাবেই সে।

হয়ত বাড়তি চাবি আছে কারও কাছে, বলল মুসা। আপনি বেরিয়ে গেলেই তালা খুলে—

হাত তুললেন অলিভার। না না, সেটা নয়। আগে শোন সবটা। বেরিয়ে গেলেই যে শুধু ঢোকে, তা নয়। পুরো ঘরে চোখ বোলালেন তিনি, নিশ্চিত হয়ে নিলেন ছেলেরা ছাড়া আর কেউ নেই। কখনও-কখনও আমি ঘরে থাকলেও সে ঢোকে। আমি—আমি—দেখেছি।—ও আসে, যায়, দরজা খোলার দরকারই পড়ে

কেমন দেখতে? জিজ্ঞেস করল কিশোর।

তালুতে তালু ডলছেন অলিভার। অস্বস্তি বোধ করছেন, বোঝা যাচ্ছে। পুলিশকে বললে তারাও এ প্রশ্নই করত, মুখ তুললেন। তবে, আমার জবাব। বিশ্বাস করত না তারা। সেজন্যেই তাদেরকে ডাকিনি, তোমাদেরকে ডেকেছি। আমি যাকে দেখেছি—সে মানুষ নয়, মানুষের ছায়া বললেই ঠিক হবে। বসে হয়ত কখনও পড়ছি, হঠাৎ অনুভব করি তার অস্তিত্ব। চোখ তুলে তাকালেই দেখতে পাই। একবার দেখেছি হলঘরে। লম্বা, রোগা টিঙটিঙে। কথা বললাম। কোন জবাব দিল না। শেষে চেঁচিয়ে উঠলাম। ফিরেও তাকাল না। সোজা ঢুকে পড়ল আমার কাজের ঘরে। পেছন পেছন গেলাম। নেই। অদৃশ্য হয়ে গেছে।

কাজের ঘরটা দেখতে পারি? বলল কিশোর।

নিশ্চয়। এস।

মিস্টার অলিভারের পেছন পেছন ছোট একটা হলঘরে এসে ঢুকল কিশোর। ওটা পেরিয়ে এসে ঢুকল বড় আরেকটা ঘরে। স্লান আলো জ্বলছে। অসংখ্য বুকশেলফ বইয়ে ঠাসা। বড় একটা পুরানো আমলের টেবিল। কয়েকটা চামড়া মোড়া পুরু গদিটাকা চেয়ার। ঘরের এক প্রান্তের দেয়ালে কয়েকটা জানালা, ওটা বাড়ির পেছন দিক। পর্দা ফাঁক করে তাকাল কিলোর। কাছেই গির্জাটা। অর্গান থেমে

গেছে, ছেলেমেয়েদের গলাও কানে আসছে না আর। বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেছে নিশ্চয়।
হলঘরের ভেতর দিয়ে ছাড়া এ ঘর থেকে বেরোনর আর কোন দরজা নেই, বললেন অলিভার। কোনরকম গোপন প্রবেশ পথ নেই। বহু বছর ধরে আছি এ বাড়িতে, তেমন কোন পথ থাকলে আমার অন্তত অজানা থাকত না।
কতদিন ধরে ঘটছে এটা? প্রশ্ন করল কিশোর। এই যে ছায়ার উপস্থিতি?
কয়েক মাস। প্রথমে বিশ্বাস করতে চাইনি। ভেবেছি, ওসব আমার কল্পনা। কিন্তু আজকাল এত বেশি ঘটছে, আর ওটাকে কল্পনা বলে মেনে নিতে পারছি না।
অলিভারের দিকে চেয়ে আছে কিশোর, চিমটি কাটছে নিচের ঠোঁটে। ছায়ার উপস্থিতি সত্যিই বিশ্বাস করছেন বৃদ্ধ। অনেক অদ্ভুত ঘটনাই ঘটে এ-পৃথিবীতে! আপনমনেই বিড়বিড় করল গোয়েন্দাপ্রধান।
তাহলে কেসটা নিচ্ছ? হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন অলিভার। তদন্ত করছ এ ব্যাপারে?
অ্যাঁ! চমকে যেন বাস্তবে ফিরে এল কিশোর। ও হ্যাঁ–আগে আমার বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ করতে হবে। এখুনি কোন কথা দিতে পারছি না। আগামীকাল সকালে। জানাব আপনাকে।
বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা ঝোঁকালেন বৃদ্ধ। এগিয়ে গেলেন দরজার দিকে। বেরিয়ে গেলেন।
এগোতে গিয়েও দ্বিধা করল কিশোর। পা বাড়িয়ে থেমে গেল হঠাৎ। ঘরের ছায়াঢাকা কোণে একটা বুকশেলফের পাশে নড়ে উঠেছে কিছু!
হাঁ করে চেয়ে আছে কিশোর। মুসা!
আমাকে ডাকছ? হলঘর থেকে মুসার কথা শোনা গেল।
মুসা! চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। লাফ দিয়ে এগোল সুইচবোর্ডের দিকে।
এক সেকেণ্ড পরেই মাথার ওপরে জ্বলে উঠল উজ্জ্বল আলো। অন্ধকার দূর হয়ে। গেল ঘর থেকে। দরজার কাছ থেকে শোনা গেল মুসার কথা, কি হল?
তুমি-তুমি ওঘরে ছিলে, যখন আমি ডেকেছিলাম! প্রায় ফিসফিস করে বলল কিশোর।
হ্যাঁ। কেন? ভূত দেখেছ বলে মনে হচ্ছে?
মনে হল তোমাকে দেখলাম! আঙুল তুলে ঘরের কোণ দেখাল কিশোর। ওখানে। তুমিই যেন দাঁড়িয়েছিলে! জোরে জোরে মাথা নাড়ল। হয়ত চোখের ভুল! বুকশেলফের ছায়াই দেখেছি! বিমূঢ় মুসার পাশ কাটিয়ে অন্য ঘরে চলে এল
বসার ঘরে এসে ঢুকল কিশোর। আগামীকাল অবশ্যই যোগাযোগ করব আপনার সঙ্গে।

ঠিক আছে, কিশোরের দিকে না চেয়েই বললেন মিস্টার অলিভার। দরজার তালা খুললেন। পাশে সরে ছেলেদেরকে বেরোনর জায়গা করে দিলেন।
হঠাই কানে এল তীক্ষ্ণ শব্দটা। গাড়ির ইঞ্জিনের মিসফায়ারের মত। গুলির শব্দ?
প্রায় লাফিয়ে দরজার কাছে চলে এল মুসা। ব্যালকনির রেলিঙে পেট ঠেকিয়ে। দাঁড়াল। নিচে শূন্য চত্বর। বাড়িটার পেছনে শোনা যাচ্ছে লোকের চিৎকার। জোরে গেট বন্ধ হওয়ার আওয়াজ হল, পাথরের কোন সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। দেখা যাচ্ছে না লোকটাকে এখান থেকে। বাড়ির পাশের সরু একটা গলিপথ দিয়ে ছুটে চত্বরে বেরিয়ে এল একটা মূর্তি। গায়ে কালো উইণ্ডব্রেকার, কালো স্কি-হুঁডে ঢাকা মাথা। সুইমিং পুলের পাশ দিয়ে ছুটে গিয়ে সামনের গেট পেরিয়ে রাস্তায় নামল।
সিঁড়িগুলো যেন উড়ে টপকালো মুসা। গেট পেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে সবে পথে নেমেছে, সামনে এসে দাঁড়াল একজন পুলিশ। চত্বরের একপাশ ঘুরে বেরিয়ে এসেছে।
ব্যস, ব্যস, যথেষ্ট হয়েছে! বলল পুলিশ। থাম এবার, দোস্ত। নইলে গুলি খাবে।
চতুরের একই পাশ দিয়ে আরেকজন পুলিশ বেরিয়ে এল। ওর হাতেও রিভলভার। মুসা দেখল, দুটো নলই চেয়ে আছে ওর দিকে। পাথরের মত স্থির হয়ে গেল সে। ধীরে, অতি ধীরে মাথার ওপর তুলে আনছে দুই হাত।

.

ডিক, বলল প্রথম পুলিশটা, দুজনের মাঝে তার বয়েস কম। আমার মনে হয় ও না!
কালো উইণ্ডব্রেকার, হালকা রঙের ট্রাউজার! মুসার আপাদমস্তক দেখছে দ্বিতীয় পুলিশ। হয়ত স্কি-হুঁডটা খুলে ফেলে দিয়েছে!
ওই লোকটার কথা বলছেন? বলল মুসা। এদিক দিয়েই গেছে সে। গেট পেরিয়ে রাস্তায় নেমেছিল, আমি দেখেছি।
কিশোর আর রবিন পৌঁছে গেল। তাদের পেছনে দাঁড়ালেন মিস্টার অলিভার।
কাকে আটকেছেন আপনারা? হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন বৃদ্ধ। গত আধঘণ্টা ধরে আমার ঘরে ছিল ছেলেটা।
সাইরেনের তীক্ষ্ণ শব্দ শোনা গেল। ছুটে আসছে পুলিশ পেট্রলকার।
এস, ডিক, বলল তরুণ পুলিশ অফিসার। খামোকা সময় নষ্ট করছি এখানে।
দুঃখিত, মিস্টার অলিভার।
ছুট লাগাল আবার পুলিশ দুজন। ঠিক এই সময় খুলে গেল মিসেস ডেনভারের দরজা।
মিস্টার অলিভার, নাকী গলা শোনা গেল, কি অঘটন ঘটিয়েছে ছেলেগুলো?

চত্বরের ডানে আরেকটা ঘরের দরজা খুলে গেল। ছুটে বেরিয়ে এল এক তরুণ। চোখ ডলছে, সদ্য ঘুম থেকে উঠে এসেছে মনে হয়। ওর দিকে চেয়ে একটু যেন চমকে উঠল কিশোর।
ব্যাপারটা লক্ষ্য করল রবিন। ফিসফিস করে বলল, কি ব্যাপার?
কিছু না, চাপা গলায় বলল কিশোর। পরে বলব।
মিস্টার অলিভার, ঝাঁঝ প্রকাশ পেল মিসেস ডেনভারের গলায়, আমার। কথার জবাব দেননি! কি করেছে?
— সেটা আপনার ব্যাপার নয়! ধমকে উঠলেন অলিভার। কথাটা বেশি কড়া হয়ে গেছে বুঝে স্বর নরম করলেন। ওরা কিছু করেনি। কাকে যেন খুঁজছে পুলিশ! বাড়ির পেছন থেকে এসে গেট দিয়ে বেরিয়ে চলে গেছে। ধাওয়া করে এসেছে পুলিশ!
চোর-ছ্যাচোড় হবে! পেছন থেকে বলে উঠল তরুণ। পরনে কালো সোয়েটার, হালকা বাদামি ট্রাউজার। পায়ে চপ্পল।
খুটিয়ে দেখছে ওকে কিশোর। রোগাপাতলা লোকটা, মাথায় কালো চুল, কতদিন আগে ধুয়েছে, কে জানে! তবে খুব শিগগির নয়। মুসার মতই লম্বা, তবে অনেক রোগা।
বাহ্, বেশ বুদ্ধি তো তোমার, টমি! মুখ বাঁকাল মিসেস ডেনভার। কি করে জানলে, চোর-ছাচোড়কে খুঁজছে পুলিশ?
অপ্রস্তুত হয়ে গেল টমি গিলবার্ট ঢোক গিলল। গলাবন্ধ সোয়েটারের ওপরে উঠে আবার নেমে পড়ল কণ্ঠ। চোর-ছ্যাচোড় ছাড়া আর কে হবে?
ছড়িয়ে পড়! বড় রাস্তার দিক থেকে চিৎকার শোনা গেল। গলিপথগুলো আটকাও! গির্জার ভেতরে দেখ!
গোটা চারেক পেট্রলকার দেখা গেল রাস্তার মোড়ে। নাচানাচি করছে টর্চের আলো। প্রতিটি কোণ, গলিঘুপচি, ঝোঁপঝাড়ের ভেতর উঁকি দিয়ে দিয়ে দেখছে। পুলিশ। প্রচণ্ড শব্দ তুলে মাথার ওপরে চলে এল একটা হেলিকপ্টার, ঘুরে ঘুরে চক্কর দিতে শুরু করল পুরো এলাকাটায়। সার্চলাইটের আলো ফেলে খুঁজছে লোকটাকে। পথে, বাড়ির দরজায় বেরিয়ে এসেছে কৌতূহলী লোকজন।
বেশি দূরে যেতে পারেনি, বলে উঠল একজন পুলিশ। নিশ্চয় এদিকেই কোথাও লুকিয়েছে।
ফুটপাতে দাঁড়িয়ে আছে মোটাসোটা একজন লোক। মাথায় ধূসর ঘন চুল। উত্তেজিত ভঙ্গিতে লেফটেন্যান্টের সঙ্গে কথা বলছে পুলিশ। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল লোকটা। এগিয়ে এল অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের গেটের দিকে। ফ্র্যাঙ্ক। ডাকল। লোকটা। ফ্র্যাঙ্ক অলিভার।

এগিয়ে গেলেন অলিভার। তার হাত ধরল লোকটা। নিচু গলায় বলল কি যেন। গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনছেন অলিভার। ভুলেই গেছেন যেন ছেলেদের উপস্থিতি।
কিশোরকে খোঁচা লাগাল মুসা। চল, দেখি গির্জায় কি করছে পুলিশ!
অনেকেই এগিয়ে যাচ্ছে গির্জার দিকে। তিন গোয়েন্দাও এগোল।
ইতিমধ্যেই গির্জার চত্বরে ভিড় জমিয়েছে অনেক লোক, তাদের মাঝে মিসেস ডেনভারও আছে। খোলা দরজা দিয়ে সবাই উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে। ভেতরে খোঁজাখুজি করছে দুজন পুলিশ। কোথাও বাদ দিচ্ছে না ওরা। নুয়ে পড়ে বেঞ্চগুলোর তলায়ও দেখছে।
জনতার ভেতর দিয়ে পথ করে এগিয়ে গেল কিশোর। গির্জার সিঁড়ির দুটো ধাপ উঠল। তাকাল ভেতরে। বেদিতে জ্বলছে সারি সারি লাল নীল সবুজ মোমবাতি, খানিক আগে অনুষ্ঠান হয়েছিল, তার সাক্ষী। বেশ কিছু স্থির মূর্তি চোখে পড়ল তার। স্ট্যাচু। দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে ছোট নিচু বেদিতে, মেঝেতে, ঘরের কোণে দেয়ালে ঠেস দিয়ে। একগাদা ছোট পুস্তিকা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বেঁটেখাট মোটা এক লোক, লাল মুখ। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ সার্জেন্ট।
আমি বলছি, কেউ ঢোকেনি এখানে, বলল মোটা লোকটা। সারাক্ষণ এখানে ছিলাম আমি। কেউ ঢুকলে অবশ্যই দেখতে পেতাম।
তা হয়ত পেতেন, চেঁচিয়ে বলল সার্জেন্ট। দয়া করে বেরিয়ে যান এখন। ভাল করে খুঁজব আমরা। ফিরে তাকাল সে। কিশোরের ওপর চোখ পড়তেই বলল, এখানে কি করছ, খোকা? যাও।
পুস্তিকা হাতে বেরিয়ে এল মোটা লোকটা। তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সিঁড়ি থেকে নেমে পড়ল কিশোর।
জনতার সঙ্গে এসে যোগ দিয়েছেন এখন রোগাপাতলা, মাঝবয়েসী একজন লোক। গায়ে কালো আলখেল্লা, সাদা কলার, পাদ্রীর পোশাক। তার সঙ্গে রয়েছে। এক বেঁটে মহিলা। ধূসর চুল ঘাড়ের ওপর পরিচ্ছন্ন করে বাঁধা। পোশাকেই বোঝা যায়, গির্জায় কাজ করে।
ফাদার স্মিথ! চেঁচিয়ে উঠল পুস্তিকা-হাতে লোকটা। ওদেরকে বলুন আপনি। এ সারাক্ষণ গির্জায় ছিলাম আমি। আমার চোখ এড়িয়ে কারও পক্ষে ঢাকা সম্ভব ছিল না।
আহ, চুপ কর, পল! বিরক্ত গলায় বললেন ফাদার। খুঁজুক না ওরা, তোমার কি?
কি বললেন? কানের ওপর হাত রেখে ফাদারের দিকে চোখ ফেরাল পল।
খুঁজুক ওরা! চেঁচিয়ে বললেন ফাদার। কোথায় ছিলে তুমি?
চিলেকোঠায় উঠেছিলাম, পুস্তিকা পাড়তে।

তাহলে তো হয়েছেই! হেসে ফেলল ধূসর-চুল মহিলা। গির্জার ভেতরে হাজারখানেক হাতি ঢুকে দাপাদাপি করলেও ওখান থেকে শুনতে পাবে না তুমি। রোজই বলছি ডাক্তার দেখাও, কানের ব্যামো সারাতে পার কিনা দেখ। তবে দেখালেও সারবে কিনা, যথেষ্ট সন্দেহ আছে।
জনতার ভেতর থেকে হেসে উঠল কেউ।
মিসেস ব্রাইস, শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে বললেন পাদ্রী, ইচ্ছে করে কেউ বধির হতে চায় না। ওভাবে কারও সম্পর্কে কথা বলা উচিত নয়। এস, রেকটরিতে যাই। চা খেতে ইচ্ছে করছে। পল, তুমিও চল। পুলিশের খোঁজা শেষ হলে এসে দরজায় তালা লাগিও। এখানে আমাদের দাঁড়িয়ে থাকার দরকার নেই।
সরে পথ করে দিল জনতা। পাশের আস্তরবিহীন বাড়িটার দিকে চলে গেলেন ফাদার, পল আর ব্রাইস।
তিন গোয়েন্দার দিকে চেয়ে হাসল জনতার একজন। তোমরা কি এদিকেই কোথাও থাক? ফিরে এসেছে হেলিকপ্টার, প্রচণ্ড শব্দ। জোরে কথা বলতে হচ্ছে। লোকটাকে।
না, জবাব দিল রবিন।
তাহলে জান না, মজার সব লোক বাস করে ওখানে, রেকটরির দিকে ইঙ্গিত। করে বলল লোকটা। পল মিনের ধারণা, গির্জাটা সে-ই চালাচ্ছে। তামারা ব্রাইস মনে করে, সে না থাকলে বন্ধই হয়ে যেত গির্জা। অথচ একজন দারোয়ান, আরেকজন হাউসকিপার! ওদের দুজনকে সামলাতে হিমশিম খেয়ে যান ফাদার স্মিথ।
ঠিকই, লোকটার কথায় সায় দিল এক মহিলা। ফাদারকে জ্বালিয়ে মারে ওরা। আইরিশ মেয়েমানুষটা ভাবে, সে-ই গির্জার সব। আরও দোষ আছে ওর। প্রায়ই ভূত দেখে গির্জার ভেতরে। তার ধারণা, অন্ধকার জায়গা মানেই ভূতের আস্তানা। আর ওই দারোয়ানটা, পল, সে তো ভাবে, সে না থাকলে ধসেই পড়ে যেত গির্জাটা।
গির্জা থেকে কনস্টেবল দুজনকে নিয়ে বেরিয়ে এল সার্জেন্ট। চতুরে দাঁড়ানো। জনতার ওপর চোখ বোলাল একবার। এখানকার চার্জে রয়েছেন কে?
তিনি চা খেতে গেছেন রেকটরিতে, বলল তিন গোয়েন্দার সঙ্গে কথা বলছিল যে লোকটা। দাঁড়ান, ডেকে আনছি।
শেষবারের মত মাথার ওপর চক্কর দিয়ে গেল পুলিশ হেলিকপ্টার। চলে গেল উত্তরে।
মিস্টার অলিভার আর তার মোটা সঙ্গীর সঙ্গে কথা বলছিল লেফটেন্যান্ট, এগিয়ে এল।

গির্জার ভেতরে নেই, জানাল সার্জেন্ট।
কাঁধ ঝাঁকাল লেফটেন্যান্ট। আশ্চর্য! এত তাড়াতাড়ি পালাল কি করে? হেলিকপ্টারের চোখ এড়িয়ে পালিয়ে গেল! নাহ, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। আজ রাতে আর কিছুই করার নেই আমাদের, সার্জেন্ট।
প্রায় ছুটতে ছুটতে এল পল। ছুটে গেল গির্জার দিকে। দড়াম করে বন্ধ করে দিল দরজা।
কয়েক মিনিট পর, পুলিশের গাড়িগুলো চলে গেল। একে একে যার যার বাড়ির দিকে চলে গেল জনতা।
অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের দিকে চলল তিন গোয়েন্দা। গেটের কাছে সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে সেই মোটা লোকটার সঙ্গে এখনও কথা বলছেন মিস্টার অলিভার।
মিস্টার অলিভার, বলল কিলোর। আপনাদের আলোচনায় বাধা দিলাম না
না না, তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন অলিভার। তার সঙ্গীর দিকে কিশোরকে তাকাতে দেখে বললেন, ও, এ হল মিকো, মিকো ইলিয়ট। কি হয়েছিল, ওর কাছেই জানলাম।
আমার ভাইয়ের ঘরে চোর ঢুকেছিল, তিন গোয়েন্দাকে জানাল মিকো। লুকান কোর্টে তার বাসা। এই রাস্তার পরের রাস্তাটাই।
সত্যিই, মিকো, বললেন অলিভার। আমারই খারাপ লাগছে, তোমার তো লাগবেই।
লাগারই কথা, মাথা ঝোঁকাল মিকো। যাকগে, এখন আর ওসব ভেবে লাভ নেই। যাই। সকালে দেখা হবে।
অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের চত্বরে উঠে পড়ল মিকো। বাড়ির পাশের সরু পথ ধরে হেঁটে চলে গেল পেছনে।
ধপ করে সিঁড়ির ওপরেই বসে পড়লেন অলিভার। হতাশ। কি সর্বনাশ করেছে, কে জানে!
কি? চুরি? জানতে চাইল রবিন।
মিকোর ভাই জ্যাক ছিল আমার বন্ধু, জানালেন মিস্টার অলিভার। আমার বন্ধু, গুরু এবং মস্তবড় শিল্পী। হপ্তা দুয়েক আগে মারা গেছে, নিউমোনিয়ায়।
চুপ করে আছে ছেলেরা।
বড় রকমের ক্ষতি, আবার বললেন অলিভার। বিশেষ করে আমার জন্যে, শিল্পরসিকদের জন্যে। তার ঘরে চোর ঢোকাটা—নাহ, ভারি খারাপ কথা!
কিছু চুরি হয়েছে? জিজ্ঞেস করল রবিন।
এখনও জানে না মিকো। পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে ঢুকে দেখবে আজ রাতেই।

পায়ের শব্দ হল। ফিরে তাকাল রবিন আর মুসা। হাসিখুশি একটা লোক আসছে। গায়ে ধূসর রঙের পশমী-সায়েটার। বলিষ্ঠ, স্বচ্ছন্দ পদক্ষেপ। কাছে এসে–দাঁড়িয়ে পড়ল লোকটা। কি ব্যাপার?
পড়শীর বাড়িতে চোর ঢুকেছিল, মিস্টার জ্যাকবস, বললেন অলিভার। পুলিশ এসেছিল।
তাই, বলল আগন্তুক। সেজন্যেই কয়েকটা স্কোয়াড-কারের আওয়াজ শুনলাম। চোর ধরতে পেরেছে?
নাহ!
খুব খারাপ কথা, বলল জ্যাকবস। অলিভারের পাশ কাটিয়ে সিঁড়িতে উঠে পড়ল। গেট পেরিয়ে ঢুকে গেল চত্বরে। খানিক পরেই অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের একটা দরজা খোলা এবং বন্ধ হওয়ার আওয়াজ হল।
আমিও যাই, বললেন অলিভার। যেন খুব দুর্বল লাগছে, এমন ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালেন। হ্যাঁ, আগামীকাল সকালেই তোমাদের সিদ্ধান্ত জানিও। এসব আর সইতে পারছি না। প্রথমে ভূত, তারপর জ্যাকের মৃত্যু, এখন এই চোর! আমার মত বুড়োর জন্যে অনেক বেশি হয়ে গেছে!

.

পরদিন, খুব ভোরে, পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে এসে হাজির হল রবিন আর মুসা।
ডিসেম্বরের এই হিমেল সকালে একজন খদ্দেরও নেই ইয়ার্ডে। কেমন যেন মৃত মনে হচ্ছে নির্জন, বিশাল, বাতিল মালের ডিপোটাকে। মেরিচাচী আর রাশেদ চাচা ঘুম থেকে ওঠেনি এখনও।
বড় করে হাই তুলল মুসা। মাঝে মাঝে মনে হয়, কিশোর পাশার সঙ্গে বন্ধুত্ব না হলেই ভাল হত। সক্কাল বেলা, এখনও কাকপক্ষী ওঠেনি, ঘুম থেকে ডেকে তুলে আনল! কটা বাজে? বড় জোর ছটা।
না এলেই পারতে, বলল রবিন। কিশোর তত তোমাকে জোর করেনি। নিশ্চয় জরুরি কোন ব্যাপার আছে, নইলে এভাবে ডেকে পাঠাত না।
ইয়ার্ডের বড় লোহার গেটটা আবার বন্ধ করে দিল ওরা। এগোল।
দুই সুড়ঙ্গের কাছে চলে এল। বিশাল গ্যালভানাইজড় পাইপের মুখ থেকে লোহার পাতটা সরিয়ে ঢুকে পড়ল রবিন। পেছনে ঢুকল মুসা। ভেতর থেকেই হাত বাড়িয়ে আবার জায়গামত দাঁড় করিয়ে দিল পাতটা।
হামাগুড়ি দিয়ে এসে হেডকোয়ার্টারে ঢুকল ওরা।
এত দেরি করলে কেন? দেখেই বলে উঠল কিশোর।
রবিন জবাব দিল না।

গোঁ গোঁ করে উঠল মুসা। দেরি? ঘুম থেকে উঠেই তো ছুট লাগালাম। দাঁত মাজার সময়ও পাইনি। খাওয়া তো দূরের কথা। কিশোরের দিকে তাকাল। তা। ভোররাতে এই জরুরি তলব কেন? হাতে ওটা কিসের জার? ব্যাঙ-ট্যাঙ ধরে। ভরেছ?
দুআঙুলে ধরে আছে কিশোর চীনামাটির ছোট একটা জার। মুখ খোলা। সামান্য একটু কাত করল। ভেতরে সাদা পাউডার দেখতে পেল মুসা আর রবিন।
ম্যাজিক পাউডার, বলল কিশোর।
ধপ করে একটা আধপোড়া চেয়ারে বসে পড়ল মুসা। একটা ফাইল কেবিনেটে কাঁধ ঠেকিয়ে হেলান দিল। ওভাবে রহস্য করে যখন কথা বল না, বড় বিরক্ত লাগে! ওই পাউডার দেখানর জন্যে কম্বলের তলা থেকে তুলে এনেছ?
জবাব দিল না কিশোর। হাতের কাছের তাক থেকে একটা ফ্লাস্ক নামাল। মুখ। খুলে কয়েক ফোঁটা পানি ঢেলে দিল পাউডারে। ছোট একটা প্লাস্টিকের চামচ নিয়ে। নাড়তে শুরু করল। এটা এক ধরনের স্ফটিকের গুঁড়ো, মেটালিক কম্পাউণ্ড। অনেক পুরানো আমলের একটা অপরাধ বিজ্ঞানের বইয়ে পড়েছি এটার কথা। পানিতে গলে যায় এই পাউডার।
ভুরু কোঁচকাল রবিন। কেমিস্ট্রির ওপর লেকচার দিতে ডেকেছ নাকি?
শুনে যাও, ড্রয়ার খুলে টুথপেস্টের টিউবের মত একটা টিউব বের করল কিশোর। মুখ খুলে টিপ দিতেই টুথপেস্টের মতই সাদা জিনিস বেরোল। খানিকটা ফেলল জারে। তারপর মুখ বন্ধ করে রেখে দিল ড্রয়ারে। চামচ দিয়ে জোরে জোরে নেড়ে পাউডারের সঙ্গে মেশাতে লাগল পানি আর পেস্ট। এক ধরনের মলম তৈরি করছি।
কপালে লাগাবে? মস্তিষ্ক বিকৃতির ওষুধ? হতাশ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল মুসা।
জবাব দিল না কিশোর। গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখছে, কি জিনিস বানিয়েছে। পানি, পেস্ট আর পাউডার মিলে চমৎকার এক ধরনের ক্রীমমত তৈরি হয়েছে। ব্যস, এতেই চলবে। ঘোষণা করল গোয়েন্দাপ্রধান। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে লাগিয়ে দিল। জারের মুখ। এখন আমাদের কাছেও আছে ম্যাজিক অয়েন্টমেন্ট।
তাতে কি? কৈফিয়ত চাওয়ার মত করে বলল মুসা।
ধর, কোথাও এই মলম মাখিয়ে দিলাম, বলল কিশোর। মিস্টার অলিভারের। ডেস্কের কথাই ধর। ড্রয়ারের হাতলে লাগাতে পারি, ওটা চীনামাটির তৈরি। পাতলা করে মাখলে দেখা যাবে না। হাতল ধরলেই মলম লেগে যাবে হাতে। আধঘণ্টা পর। কালো কালো দাগ পড়ে যাবে লোকটার আঙুলে। হাজার ধুয়েও পুরোপুরি ভোলা যায় না ওই দাগ, অন্তত কয়েকদিন তো নয়ই।
অ, এই ব্যাপার, চেপে রাখা শ্বাসটা শব্দ করে ফেলল রবিন। তাহলে কেসটা নিচ্ছি আমরা?

গতরাতেই ফোন করেছিলেন মিস্টার অলিভার, বলল কিশোর। জানিয়েছেন, তিনি ঘুমোতে পারছেন না। আমরা চলে আসার পর কয়েকবার নাকি ওই ভূতটা ঢুকেছিল তাঁর ঘরে। অস্তিত্ব টের পেয়েছেন, ছায়াটা দেখেছেন। ভয় পাচ্ছেন। তিনি।

ইয়াল্লা! কিশোর, ওই লোকটার মতিভ্রম ঘটেছে, বলে উঠল মুসা। ওর জন্যে আমাদের কিছুই করার নেই।

হয়ত, মাথা ঝোকাল কিশোর। নিঃসঙ্গ লোকের বেলায় এটা বেশি ঘটে। অনেক উদ্ভট কল্পনা আসে মাথায়, একসময় সেটাকে বাস্তব বলে ধরে নেয়। এজন্যেই কেসটা নিতে দ্বিধা করেছিলাম কাল। কিন্তু, পুরো ব্যাপারটা তদন্ত না করেই যদি সরে আসি, মানুষটার প্রতি অবিচার হয়ে যাবে। একটা কথা তো ঠিক, পুলিশকে বললে বিশ্বাস করবে না তার কথা। বড় কোন গোয়েন্দা সংস্থার কাছে যেতে পারেন, কিন্তু তারাও বিশ্বাস করবে না। যদি সত্যিই পুরো ব্যাপারটা তার কল্পনা হয়ে থাকে, আমাদের কিছুই করার নেই। কিন্তু কোন বদলোকের শয়তানীও। হতে পারে এটা। তাহলে ধরতে হবে লোকটাকে। মিস্টার অলিভারকে এই মানসিক অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। একে একে দুই সঙ্গীর দিকেই তাকাল। গোয়েন্দাপ্রধান। কি বল? ওঁকে বলব, আমরা অসিছি?

রবিন হাসল। খামোকা জিজ্ঞেস করছ কেন আমাদেরকে? জবাবটা তো তুমি জানই।

গুড, বলল কিশোর। ইসস, একটা মাস ফুড়ৎ করে উড়ে চলে গেল। গাড়িটা থাকলে কি ভালই না হত...।

ওটা তো প্রায় ব্যবহারই করতে পারলাম না আমরা, বিষণ্ন কণ্ঠে বলল রবিন। বাইরে বাইরেই কাটালাম। সত্যি একটা গাড়ি থাকলে—

নেই যখন, ভেবে আর কি লাভ? বাধা দিয়ে বলল কিশোর। সকাল সাতটায় লস অ্যাঞ্জেলেসের বাস, রকি বীচ থেকে ছাড়ে, খোঁজ নিয়েছি। ওটাই ধরব আমিরা। চাচী ওঠেনি এখনও। একটা চিঠি লিখে রেখে যাব।

আমি যাচ্ছি না, গম্ভীর কণ্ঠে ঘোষণা করল মুসা।

যাচ্ছ না মানে! প্রায় একই সঙ্গে প্রশ্ন করল কিশোর আর রবিন।

কিছু না খেয়ে এক কদম নড়ছি না আমি এখান থেকে। এত সকালে গরম গরম না পাওয়া যাক, বাসি পান্তা হলেও চলবে—

হেসে ফেলল অন্য দুজন।

বেশ, হাসতে হাসতে বলল কিশোর। চল। রান্নাঘর থেকে ঠাণ্ডা স্যাণ্ডউইচ নিয়ে নেব। গতরাতে ইয়া বড় এক কেক বানিয়েছেন চাচী। অর্ধেকটা মেরে দেব আমরা। চলবে?

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল মুসা। দুই নাম্বার সুড়ঙ্গে নেমে পড়ল সবার আগে।

.

আটটা নাগাদ উইলশায়ারে বাস থেকে নামল তিন গোয়েন্দা। কাছেই প্যাসিও প্লেস। হেঁটেই চলল ওরা।

রেকটরির সামনে পকেটে হাত ঢুকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন সেইন্ট জুডস গির্জার যাজক ফাদার স্মিথ। তিন গোয়েন্দাকে দেখে মৃদু হাসলেন। মাথা সামান্য নুইয়ে গুড মর্নিং বললেন।

ছেলেদের আশঙ্কা ছিল, মিসেস ডেনভারের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। হল না। নিরাপদেই সিঁড়ি বেয়ে ব্যালকনিতে উঠে এল ওরা। দরজা বন্ধ। টেপ দিয়ে আটকানো রয়েছে একটা কাগজ। তাতে লেখা: ছেলেরা আমি ২১৩, লুকান কোর্টে গেলাম। ওখানেই পাবে আমাকে। এই বাড়ির ঠিক পেছনের বাড়িটাই। পাশের সরু পথটা পেরোলেই ওটার সামনের দরজায় পৌঁছে যাবে। তোমাদের অপেক্ষায় রইলাম।-ফ্র্যাঙ্ক অলিভার।

কাগজটা তুলে নিয়ে পকেটে ভরল কিশোর। ওই বাড়িতেই চোর ঢুকেছিল গতরাতে।

অ্যাই, তোমরা ওখানে কি করছ? নাকী একটা কণ্ঠ।

ঝট করে ফিরল তিন গোয়েন্দা। নিচে তাকাল। নিচের ঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে মিসেস ডেনভার। পরনে ড্রেসিং গাউন। লাল চুল এলোমেলো।

ছেলেরা চাইতেই জিজ্ঞেস করল মহিলা, মিস্টার অলিভার আছেন ঘরে?

মনে হচ্ছে না, জবাব দিল কিশোর।

এই সকাল বেলায় কোথায় বেরোলেন! নিজেকেই যেন, প্রশ্ন করল মিসেস ডেনভার।

জবাব দিল না তিন গোয়েন্দা। নামতে শুরু করছে সিঁড়ি বেয়ে। মিসেস ডেনভারের দিকে ফিরেও তাকাল না ওরা। পাশের সরু পথটা ধরে এগোল। একটা লঞ্জি আর একটা স্টোর রুম পেরিয়ে এল। বেরিয়ে এল পাশের গলিতে। অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের এক কোণে একটা ডাস্টবিন। পথের ওপাশে আরেকটা বাড়ি, দরজাটা গলি পথের দিকে ফেরানো।

গেটেই তামার ফলকে লেখা রয়েছে: ২১৩, লুকান কোর্ট। একতলা, প্রায় স্কয়ার সাইজের ছোট একটা বাড়ি।

ঘণ্টা বাজাল মুসা। খানিক খুলে গেল দরজা। দাঁড়িয়ে আছে মিকো ইলিয়ট। কেমন যেন উদ্ভ্রান্ত চেহারা।

এস, একপাশে সরে ঢোকার জায়গা করে দিল মিকো।

শোবার ঘর আর স্টুডিওর মিশ্রণ বলা যায় এমন একটা ঘরে এসে ঢুকল তিন গোয়েন্দা। সিলিংয়ে স্কাইলাইট। কার্পেট নেই মেঝেতে, আসবাবপত্রও খুব সামান্য। বড়সড় একটা ড্রইং টেবিল আর একটা ইজেল রাখা আছে এক জায়গায়। নানা। রকম ছবি আর স্কেচ ঝুলছে দেয়ালে, আস্তরই দেখা যায় না প্রায়। যেখানে সেখানে। বইয়ের স্তূপ। ছোট্ট একটা টেলিভিশন, বড়সড় দামি একটা রেকর্ড প্লেয়ার আর একগাদা রেকর্ড অযত্নে পড়ে আছে।
বড়সড় একটা ডিভানে গালে হাত দিয়ে বসে আছেন মিস্টার অলিভার। মুখচোখ শুকনো। নিজেকে শান্ত রাখার জোর চেষ্টা চালাচ্ছেন তিনি, দেখেই বোঝা। যায়। ছেলেদেরকে গুড মর্নিং জানালেন। বললেন, আরও একটা রহস্য যোগ হয়েছে। গতরাতে চোর ঢুকেছিল এ বাড়িতে। সর্বনাশ করে গেছে আমার।
ভেবে আর কি করবে, ফ্র্যাঙ্ক, সান্তনা দিল মিকো। এটা নিতান্তই দুর্ঘটনা। পুলিশ তাড়া না করলে আরও কিছু নিয়ে যেত ব্যাটা। ছেলেদের দিকে ফিরল সে। ফ্র্যাঙ্কের কাছে শুনলাম, তোমাদের নাকি গোয়েন্দা হওয়ার শখ। এখানে তেমন রহস্যজনক কিছু পাবে বলে মনে হয় না। রান্নাঘরের জানালা খুলে ঢুকেছিল চোর। গ্লাস-কাটার দিয়ে কাঁচ কেটে ভেতরে হাত ঢুকিয়েছে। খুলে ফেলেছে ছিটকিনি। তারপর হাউণ্ডটা নিয়ে বেরিয়ে চলে গেছে। খুব সাধারণ চুরি।
কিন্তু শুধু হাউণ্ডটাই নিয়ে গেছে ব্যাটা! বলে উঠলেন অলিভার।
ওতে অস্বাভাবিক কিছু নেই, পুলিশের তাই ধারণা, বলল মিকো। তাছাড়া ওটা ছাড়া ঘরে মূল্যবান আর কিছু নেইও। টেলিভিশনটা, মাত্র নইঞ্চি স্ক্রীন, কোন দামই নেই ওটার। রেকর্ড প্লেয়ারের বডি আর স্পীকারের ফ্রেমে আমার ভাইয়ের নাম খোদাই করা আছে। নিয়ে গেলেও বিক্রি করতে পারত না ওটা। এছাড়া নেবার মত আর কি আছে? জানই তো খুব সাধারণ জীবনযাপন করত আমার ভাই।
অনেক বড় শিল্পী ছিল ও, অলিভারের কণ্ঠে গভীর শ্রদ্ধা। বেঁচে ছিল শুধু। শিল্পসৃষ্টি নিয়েই। দুনিয়ার আর কোনদিকে খেয়াল থাকলে তো!
হাউণ্ডটা কি জিনিস? জানতে চাইল মুসা।
মৃদু হাসল মিকো। একটা কুকুরের মূর্তি। এমন একটা কুকুর, যার কোন অস্তিত্ব নেই। বেঁচে আছে শুধু কুসংস্কারে বিশ্বাসী কিছু মানুষের মনে। খুব রোমাঞ্চপ্রিয় ছিল আমার ভাই, রোমান্টিকতা ফুটিয়ে তুলেছে তার প্রতিটি শিল্পকর্মে। ভূতুড়ে কুকুরের কাহিনী নিশ্চয়ই শুনে থাকবে। কার্পাথিয়ান পর্বতমালার পাদদেশে তেমনি একটা কুকুরের কাহিনী শোনা যায়।
হ্যাঁ, মাথা ঝোকাল কিশোর। জায়গাটার নাম ট্রানসিলভানিয়া। ব্রাম। স্টোকারের ড্রাকুলা ওখানেই বাস করত।

ঠিক, বলল মিকো। কিন্তু ওই কুকুরটা রক্তচোষাও না, মায়ানেকড়েও না। ওই গাঁয়ের লোকের ধারণা, ওটা আসলে এক জমিদারের প্রেতাত্মা, কুকুরের রূপ নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। এ-সম্পর্কে চমৎকার একটা গল্পও আছে। ওই জমিদার ছিল দুর্ধর্ষ শিকারী, একপাল ভয়ঙ্কর আধবুনো কুকুর ছিল তার। নেকড়ের রক্ত ছিল কুকুরগুলোর শিরায়। জানোয়ারগুলোকে সব সময় তৎপর রাখার জন্যে পুরোপুরি খেতে দিত না লোকটা। একদিন, পেটে খিদে নিয়ে কি করে জানি খেয়াড় থেকে বেরিয়ে পড়ল একটা কুকুর।

সর্বনাশ! বিড়বিড় করল রবিন।

হ্যাঁ, বেরিয়ে পড়ল। তারপর ঘটল মর্মান্তিক ঘটনা। এটা কিন্তু সত্যি, বানানো নয়। একটা শিশুকে খুন করে বসল কুকুরটা। রাগে কাঁপতে কাঁপতে জমিদারের। কাছে ছুটে এল সন্তানহারা পিতা। সবগুলো নেকড়ে-কুকুরকে মেরে ফেলার দাবি জানাল। প্রত্যাখ্যান করল জমিদার। উল্টে, টিটকিরি দিয়ে বলল, চাইলে শিশুটার। বিনিময়ে কয়েকটা পয়সা দিতে পারে সে বাপকে। আর রাগ সামলাতে পারল না বাবা। বিশাল এক পাথর তুলে নিয়ে আক্রমণ করল জমিদারকে। মারা গেল। জমিদার। মৃত্যুর আগে অভিশাপ দিয়ে গেল। আবার সে আসবে গাঁয়ে, অন্য রূপে। গায়ের কাউকে শান্তিতে থাকতে দেবে না।

তারপর নিশ্চয় কুকুর হয়ে ফিরে এসেছিল লোকটা? বলল মুসা।

হ্যাঁ। এক বিশাল হাউণ্ড, আগের কথার খেই ধরল মিকো, জমিদারের সবকটা কুকুরকে মেরে ফেলল গাঁয়ের লোকজন। তারপর, এক অন্ধকার দুর্যোগের রাতে ঘটল ঘটনা। বিরাট এক কুকুরকে দেখা গেল গাঁয়ের পথে। গোঙাচ্ছিল, মাঝে মাঝেই হাঁক ছাড়ছিল ক্ষুধার্ত কণ্ঠে। চামড়ার ওপর দিয়ে পাঁজরার হাড় গোনা যাচ্ছিল। আতঙ্কিত হয়ে পড়ল লোকেরা। দুএকজন দুঃসাহসী লোক খাবার এনে। রাখল কুকুটার সামনে। কিন্তু চুলোও না হাউণ্ডটা। কারও কোন ক্ষতিও করল না। এরপর থেকে প্রতি অমাবস্যার রাতেই নাকি ফিরে আসতে লাগল কুকুরটা। লোকজন গ্রাম ছেড়ে পালাল। আজও নাকি দেখা দেয় ওই কুকুর। পোড়ো গ্রামটায় ঘুরে ঘুরে বেড়ায় অন্ধকার রাতে, হাঁক ছাড়ে ক্ষুধার্ত গলায়। হতে পারে, কাহিনীটা। বানানো। রোমাঞ্চকর এক ভূতুড়ে গপ্পো!

ওই কুকুরটার ছবি এঁকেছিলেন আপনার ভাই, জিজ্ঞেস করল কিশোর।

ছবি নয়, মূর্তি। প্রতিকৃতি, বলল মিকো। কাঁচ আর স্ফটিকের বিশেষজ্ঞ বলা যেত তাকে। ওই জিনিস দিয়েই বানিয়েছিল।

অপূর্ব একটা শিল্পকর্ম ওই হাউণ্ডের মূর্তি, অনেকক্ষণ পর কথা বললেন অলিভার। আমার জন্যেই বানিয়েছিল। ওটা, জ্যাক। মাসখানেক আগে শেষ করেছিল কাজ। মূলার গ্যালারিতে একটা শো হওয়ার কথা ছিল তার শিল্পের।

ওখানে দেখানর জন্যে রেখে দিয়েছিল মূর্তিটা। আমার কোন আপত্তি ছিল না। চুরি যাবে জানলে কি আর রাখতে দিতাম!
কাঁচের একটা কুকুর, না? বলল রবিন।
স্ফটিক, শুধরে দিলেন অলিভার। স্ফটিক এবং স্বর্ণ।
স্ফটিকও এক ধরনের কাঁচই, বলল মিকো। তবে স্পেশাল কাঁচ। অতি মিহি সিলিকার সঙ্গে লেড অক্সাইড মিশিয়ে তৈরি। সাধারণ কাঁচের চেয়ে ভারি, অনেক বেশি উজ্জ্বল। কাঁচ কিংবা স্ফটিক গলিয়ে নিয়ে কাজ করত আমার ভাই। বারবার গরম করে, বিভিন্ন যন্ত্রপাতির সাহায্যে বানিয়ে নিত কোন একটা মূর্তি। ঘষেমেজে তারপর অ্যাসিডে চুবিয়ে মসৃণ করে নিত ওপরটা। এক অসামান্য সৃষ্টি ওই হাউণ্ড। সোনালি রঙে আঁকা চোখগুলো দেখে মনে হত একেবারে জ্যান্ত। দুই কশে ফেনাও তৈরি হয়েছে স্বর্ণ দিয়ে।
হয়ত আবার ফিরে পাওয়া যাবে ওটা, আশা প্রকাশ করল রবিন। ও ধরনের একটা জিনিস বিক্রি করা এত সহজ না।
কঠিনও না, বললেন অলিভার। এসব জিনিসের প্রতি যাদের লোভ আছে, যারা জ্যাক ইলিয়টকে চেনে, তারা ঠিকই কিনে নেবে।
পুরো ঘরটায় চোখ বোলাচ্ছে কিশোর। এখানেই কি কাজ করতেন তিনি? কাঁচ গোনর চুলা কোথায়?
এখানে না, জবাব দিল মিকো। পূর্ব লস অ্যাঞ্জেলেসে তার ওয়ার্কশপ। চব্বিশ ঘণ্টার বিশ ঘণ্টাই ওখানে কাটাত সে।
তার তৈরি আর কোন মূর্তি নেই। নিজের জন্যে কিছুই রাখেননি? নাকি ওয়ার্কশপে রয়ে গেছে?
বেশ কিছু সংগ্রহ তার আছে। নিজের আর অন্যান্য শিল্পীদের তৈরি। এই ঘরেই রাখত ওগুলো। জ্যাকের মৃত্যুর পর, একে একে সব জিনিসই সরিয়ে নিয়ে। গেছি আমি নিরাপদ জায়গায়। শুধু ওই একটা জিনিসই বাকি ছিল। ব্যাপারটা নিতান্তই দুর্ঘটনা।
দীর্ঘশ্বাস ফেললেন অলিভার।
আমার ভাইয়ের গ্যালারি শো শেষ হয়েছে মাত্র দুই দিন আগে, বলল মিকো। অনেকের কাছেই মূর্তি বিক্রি কিরেছিল জ্যাক। ভাল ভাল কয়েকটা জিনিস আবার কয়েকদিনের জন্যে চেয়ে এনে শোতে পাঠিয়েছিল। একে একে ওগুলো আবার যার যার কাছে পৌঁছে দিয়েছি। আমি গত বিকেলে হাউণ্ডটা নিয়ে ফিরেছি মিউজিয়ম থেকে। এ ঘরে ঢুকেছি অন্য কারও কোন জিনিস রয়ে গেল কিনা, দেখার জন্যে। আসলে, আগে গিয়ে হাউণ্ডটা দিয়ে আসা উচিত ছিল ফ্র্যাঙ্ককে, তাহলে আর এ অঘটন ঘটত না।—যাই হোক, এসে ঢুকলাম। বইগুলো তুলে তুলে

দেখছি, তলায়। কিছু পড়ে আছে কিনা। কিছুই পেলাম না। পায়খানা চাপল এই সময়। গিয়ে ঢুকলাম বাথরুমে। বাথরুম থেকেই একটা খুটখাট আওয়াজ শুনেছি। বেড়াল টেড়াল হতে পারে ভেবে বেশি আগ্রহ করলাম না। বাথরুম থেকে বেরোতেই দেখি, একটা লোক ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে। চোর ছাড়া কিছু না, ধরেই নিলাম। রাস্তার মোড়েই ছিল পুলিশ। ছুটে এল। উত্তেজনায় তখন ভুলেই গিয়েছিলাম মূর্তিটার কথা! ভয়।

বড় বেশি খামখেয়ালি করেছ তুমি, মিকো, গোমড়ামুখে বললেন অলিভার। তোমাকে সকালেই তো ফোনে বলেছিলাম, মূর্তিটা নিয়ে আগে আমার ওখানে চলে। যেও।

আর লজ্জা দিও না, ফ্র্যাঙ্ক। অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে মিকো, ভুলই হয়ে গেছে!

আর কেউ জানত, গতকাল কুকুরটা নিয়ে আসা হবে গ্যালারি থেকে? অলিভারের দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। পৌঁছে দেয়া হবে আপনার ওখানে?

মাথা নাড়লেন অলিভার আর মিকো, দুজনেই।

জিনিসটীর বীমা করা ছিল? জানতে চাইল রবিন।

ছিল, কিন্তু তাতে কি? জবাব দিলেন অলিভার। তাতে তো আর জিনিসটা ফিরে পাওয়া যাবে না, টাকা পাওয়া যাবে। টাকা আমি চাই না। শিল্পের ক্ষতিপূরণ টাকা দিয়ে হয় না।

আঙুলের ছাপ বা চোখের অন্য কোন চিহ্ন খুঁজেছে পুলিশ? জিজ্ঞেস করল কিশোর।

গতরাতের অর্ধেকটাই ওসব খুঁজে পার করেছে পুলিশ, জবাব দিল মিকো। সারা ঘরে পাউডার ছড়িয়ে আঙুলের ছাপ খুঁজেছে। কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেনি ওরা। এখন ফাইল ঘাটাঘাটি করছে। ওস্তাদ সব শিল্প-চোরের ছাপের সঙ্গে এ-বাড়িতে পাওয়া আঙুলের ছাপগুলো মিলিয়ে দেখছে।

কোন সম্ভাবনাই বাদ রাখে না পুলিশ, প্রশংসা করল কিশোর। সব ওরাই করছে, হাউণ্ড চুরির ব্যাপারে আমরা আর কি করব?

ঠিকই, মাথা ঝোকালেন অলিভার। উঠে পড়লেন। মিকো ইলিয়টের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ছেলেদের সঙ্গে বেরিয়ে এলেন ওখান থেকে। নিজের বাড়িতে যাবেন।

চত্বরেই দেখা গেল মিসেস ডেনভারকে। ফুলের ঝাড় থেকে মরা পাতা বাছছে। ওকে অগ্রাহ্য করলেন অলিভার। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করলেন ওপরে। পেছনে তিন গোয়েন্দা।

বসার ঘরে এসে ঢুকল ওরা। দরজা বন্ধ করে দিয়ে এসে বসলেন অলিভার।

পকেট থেকে ছোট জারটা বের করল কিশোর। কি আছে ওতে, জানাল প্রথমে। বলল, আপনার ডেস্কের ড্রয়ারের হাতল মাখিয়ে রাখব। তারপর বেরিয়ে যাব আমরা সবাই। কেউ ড্রয়ার খোলার জন্যে হাতল ধরলেই হাতে কালো দাগ পড়ে যাবে তার।
সেজন্যে বেরিয়ে যাবার দরকার নেই, বললেন অলিভার। আমি থাকলেও ঘরে ঢোকে সে। বন্ধ দরজা এমনকি দেয়ালও তার কাছে কোন বাধা নয়। ওগুলো গলেই চলে আসে স্বচ্ছন্দে। ড্রয়ারের সামান্য কাঠ ঠেকাতে পারবে না তাকে। হাতলে হাত দেয়ার দরকারই পড়বে না।
মিস্টার অলিভার, জোর দিয়ে বলল কিশোর। আগে চেষ্টা করে দেখতে হবে। আমাদের। হবে না বলে কিছুই না করলে, সত্যি সত্যি হবে না। আপনিই তো বলেছেন, বাইরে থেকে ফিরে এসে খোলা পেয়েছেন ড্রয়ার।
বেশ, বিশেষ ভরসা পাচ্ছেন বলে মনে হল না, তবু সম্মতি দিলেন অলিভার। সব রকমভাবে চেষ্টা করে দেখতে রাজি আছি আমি। যাও, মাখাও তোমার মলম। তারপর চল, বাইরে কোথাও গিয়ে খেয়ে আসি। খুব খিদে পেয়েছে।
ঠিক, চেঁচিয়ে উঠল মুসা। খুব ভাল কথা বলেছেন। খিদেয় নাড়িভুড়িই হজম হয়ে যাচ্ছে আমার!
ড্রয়ারের হাতলে সাবধানে মলম মাখাল কিশোর। হাত লাগাল না, কাগজের তোয়ালেতে লাগিয়ে নিল আগে, তারপর ডলে ডলে ভালমত লাগাল চীনামাটির হাতলে।
তিন গোয়েন্দাকে নিয়ে বেরিয়ে এলেন অলিভার। কোথায় খেলে ভাল হয়, প্রস্তাব দিল মুসা। উত্তেজনায় জোরে জোরে কথা বলছে সে। দরজা বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দিলেন অলিভার। সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন ওরা চারজন।
শূন্য চত্বর। গেটের কাছে সাক্ষাৎ হয়ে গেল মিসেস ডেনভারের সঙ্গে। আরও একজন দাঁড়িয়ে আছে তার কাছাকাছি। টমি গিলবার্ট। গির্জার দিকে তাকিয়ে আছে। ওরা।
গির্জার চত্বরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটা অ্যামবুলেন্স।
কি হয়েছে? জিজ্ঞেস করল মুসা।
গির্জার দারোয়ান, বলল টমি। মারাত্মক আহত! এই খানিক আগে চিলেকোঠায় ওঠার সিঁড়ির গোড়ায় পাওয়া গেছে তাকে। বেহুশ! দেখতে পেয়েছেন, ফাদার স্মিথ!

.

গির্জায় ছুটে গেল তিন গোয়েন্দা আর মিস্টার অলিভার।

একটা স্ট্রেচার তুলে নিয়েছে সাদা পোশাক পরা দুজন লোক। তাতে দারোয়ান পল, গলা পর্যন্ত টেনে দেয়া হয়েছে চাদর।
গির্জা থেকে বেরিয়ে এলেন ফাদার স্মিথ। পেছনে এল মিসেস ব্রাইস।
ওকে মেরে ফেলেছে! বিলাপ করে কেঁদে উঠল ব্রাইস। মেরে ফেলেছে! খুন! খুন করেছে বেচারাকে!
ব্রাইস, ভুল বলছ, শান্ত গলায় বললেন ফাদার। মেরে ফেলেনি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, চেহারা ফ্যাকাসে। কম্পিত হাতে গির্জার দরজায় তালা লাগালেন তিনি। গতরাতে ওর সঙ্গে আসা উচিত ছিল আমার! একা তালা লাগাতে পাঠানো উচিত হয়নি মোটেই! ইসস, সারাটা রাত ঠাণ্ডার মধ্যে পড়ে ছিল বেচারা!
সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন ফাদার। সব আমার দোষ! ওরও বাড়াবাড়ি আছে! কতবার বলেছি, রাতে বাতি নেবে না। অন্ধকার রাখবে না চত্বর। না, কথা শুনবে না। বিদ্যুতের খরচ বাঁচায়। এখন হল তো!
বুদ্বু! একেবারে গাধা!কাঁদতে কাঁদতে বলল ব্রাইস। কি এমন খরচ বাঁচত! এখন? এখন তো থাকবে হাসপাতালে পড়ে!
ওসব ভেবে কিছু হবে না, ব্রাইস, বললেন ফাদার। যাও...যাও, চমৎকার এক কাপ চা বানিয়ে খাও গিয়ে। ভাল লাগবে। অ্যামবুলেন্সের পেছনের সিটে গিয়ে উঠলেন তিনি। দরজা বন্ধ করে দেয়া হল। স্টার্ট নিয়ে চলে গেল গাড়ি।
শুনেছেন, চা! অলিভারের দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে উঠল ব্রাইস। চমৎকার এক কাপ চা খেতে বলছে! ওদিকে বোধহয় মারাই গেল লোকটা! আমাকে চা খেয়ে শান্ত, হতে বলছে! ঈশ্বর! লোকটার এক্কেবারে মায়াদয়া নেই! ভূতটা হয়ত শেষই করে দিল পল বেচারাকে... ঝড়ের মত ছুটে চলে গেল মহিলা রেকটরির দিকে।
ভূত? অলিভারের দিকে চেয়ে বলল রবিন।
মিসেস ব্রাইসের ধারণা, গির্জার আশপাশে ভূত আছে, বললেন অলিভার। দেখেছেও নাকি সে। এর আগের ফাদার, বৃদ্ধ হয়ে মারা গেছিলেন এখানেই। বছর তিনেক আগে। কারও কারও ধারণা, গির্জার মায়া ত্যাগ করতে পারেননি তিনি। মৃত্যুর পরেও এসে ঘুরে বেড়ান এর ভেতরে। চল, খাওয়ার কাজটা সেরে ফেলি।
উইলশীয়ার বুলভার্ড-এর দিকে চলল ওরা।
মিস্টার অলিভার, হাঁটতে হাঁটতে বলল রবিন। আপনার ঘরে যে আসে, সে আর এই গির্জার ভূত কি একই? কি মনে হয় আপনার?
নিশ্চয় না! জোর দিয়ে বললেন অলিভার। ফাদারের ভূত হলে দেখামাত্রই চিনতাম। তবে সেটা আছে কিনা, শিওর না আমি। আজ অবধি শুধু মিসেস ব্রাইসই দেখেছে ওটা, আর কেউ না। মহিলা বলে, রাতে, মোমবাতি হাতে গির্জার ভেতরে ঘুরে বেড়ায় ফাদারের প্রেতাত্মা। আমার বিশ্বাস হয় না। কেন সেটা

করবেন তিনি? খুব ভাল লোক ছিলেন। ভাল লোকেরা মৃত্যুর পর ভূত হয় না। কতদিন তাঁর সঙ্গে দাবা খেলেছি। নাহ্, তার ভূত হতেই পারে না।
আড় নিল ওরা। কয়েকটা ব্লক পেরিয়ে এসে একটা রেস্টুরেন্টের সামনে। দাঁড়াল। তিন গোয়েন্দাকে নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লেন অলিভার।
সুন্দর রেস্টুরেন্ট। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। দরজার পেতলের হাতলগুলোও নিয়মিত। ঘষামাজায় ঝকঝক করছে। টেবিলে পরিষ্কার টেবিলক্লথ, কড়া মাড় দিয়ে ইস্তিরি করা। প্রতিটি টেবিলের মাঝখানে ফুলদানীতে ফুল। কৃত্রিম, কিন্তু ভাল করে খেয়াল না করলে বোঝাই যায় না, মনে হয় আসল। খদ্দের নেই। অসময়। নাশতার সময় পেরিয়ে গেছে অনেক আগে, আবার লাঞ্চেরও সময় হয়নি এখনও। ওরা চারজন আর একজন ওয়েটার ছাড়া কোন লোক নেই পুরো ঘটাতে।
খাবার এল।
মিস্টার অলিভার, প্লেট টেনে নিতে নিতে বলল কিশোর, আপনার অ্যাপার্টমেন্ট হাউসটা অনেক বড়। সেই তুলনায় তোক দেখিনি। ভাড়াটে কি নেই? শুধু মিসেস ডেনভার—
মহিলার নামটা শুনেই মুখ বাঁকালেন অলিভার।
..মিসেস ডেনভার, আবার বলল কিশোর। আর টমি গিলবার্ট। বড় অসময়ে বাসায় দেখা যায় লোকটাকে।
ভারমন্টে, বাজারের এক দোকানে কাজ করে, মাঝরাত থেকে সকাল পর্যন্ত, বললেন অলিভার। ছেলেটার, চালচলন কেমন একটু অদ্ভুতই মনে হয় আমার কাছে। টমি, নামটাও যেন কেমন। বুড়ো হলেও টমি বলে ডাকা হবে, ভাবতেই হাসি পায়। আমার সবচেয়ে ছোট অ্যাপার্টমেন্টটা ভাড়া নিয়েছে সে। তেমন আয় নেই, বোঝা যায়। একটা মেয়েও ভাড়া থাকে আমার বাড়িতে। লারিসা, লারিসা ল্যাটনিনা। টমির বয়েসী, ওর পাশের অ্যাপার্টমেন্টটা নিয়েছে। শহরতলীতে একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে চাকরি করে। আর, ফ্র্যাঙ্কলিন জ্যাকবস একজন স্টকব্রোকার।
পুলিশ চলে যাবার পর গত সন্ধ্যায় যে লোকটাকে দেখলাম? জানতে চাইল রবিন।
হ্যাঁ। বাড়ির শেষ মাথায় কোণের একটা ফ্ল্যাট নিয়েছে। খুব সকালে বেরিয়ে অফিসে চলে যায়, দুপুরের পর ফেরে। ওর এক ভাগ্নে, বব বারোজ, কলেজে পড়ে। জ্যাকবসের কাছেই থাকে। আরও একজন থাকে আমার বাড়িতে। ব্রায়ান এনড্রু, ওরফে বেড়াল-মানব।
বেড়াল-মানব! বিশাল এক স্যাণ্ডউইচে কামড় বসাতে গিয়েও থেমে গেছে মুসা।

হাসলেন অলিভার। আমিই ওই নাম রেখেছি। বেড়াল নিয়ে মেতে থাকে। রোজ বিকেল পাঁচটায় পাড়ার যত ভবঘুরে বেড়াল আছে, এসে হাজির হয় ওর ঘরে। ওগুলোকে খাবার দেয় সে। নিজের পোষা একটা বিড়াল আছে, একটা সিয়ামিজ বেড়াল।
কাজকর্ম কি করে? জানতে চাইল মুসা।
কিছু না, বললেন অলিভার। ব্যাংকে বোধহয় জমানো টাকা আছে। তুলে আনে, আর খরচ করে। সারাদিনই প্রায় বাইরে বাইরে ঘোরে। ভবঘুরে বেড়াল ধরে আনে, যেগুলো তার বাড়ির সন্ধান পায়নি। আহত, বা রোগা বেড়াল দেখলে, তুলে নিয়ে গিয়ে নিজের খরচে পৌঁছে দিয়ে আসে পশু হাসপাতালে।
আর কে কে বাস করে আপনার বাড়িতে? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
আরও অনেকেই থাকে। মোটমাট বিশজন ভাড়াটে। বেশির ভাগই খেটে খাওয়া মানুষ। যাদের নাম বললাম, তারা ছাড়া আর সবাই ছুটিতে বাইরে গেছে। আত্মীয়-স্বজন কিংবা বন্ধুদের ওখানে বড়দিন পালন করবে। ছুটি শেষ হলেই ফিরে আসবে আবার। ব্রায়ানের ভাগ্নেকে ধরলে, এখন মোট সাতজন আছে আমার। বাড়িতে।
ভালই, বলল কিশোর। সন্দেহের আওতা খুব সীমিত।
ঝট করে চোখ তুললেন অলিভার। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। তুমি কি ভাড়াটেদের কাউকে সন্দেহ করছ? ওদেরই কেউ আমার ঘরে ঢোকে, ভাবছ?
আরও প্রমাণ দরকার, নইলে শিওর হয়ে বলতে পারব না। তবে, লোকটা এমন কেউ, যে জানে, কখন আপনি বাড়ি থাকেন, কখন থাকেন না। আমরা বেরিয়ে এসেছি দেখে থাকলে, আজও ঢুকতে পারে আপনার ঘরে।
কাঁধ ঝাঁকালেন মিস্টার অলিভার। হয়ত তোমার কথাই ঠিক, কিশোর। আমার ডেস্ক ঘাটার অনেক সময় পেয়েছে সে আজ।
খাওয়া শেষ হল। ওয়েটারকে বিল আনতে বললেন অলিভার।
রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে এল চারজনে। উইলশায়ার রোড ধরে এসে ঢুকল। প্যাসিও প্লেসে। গির্জার সামনের রাস্তা একেবারে নির্জন। অ্যাপার্টমেন্ট হাউসে এসে পৌঁছুল ওরা। ঘরের ভেতরে বাসন-পেয়ালা ধুচ্ছে মিসেস ডেনভার, গেট থেকেই শব্দ শোনা যাচ্ছে।
ওই মেয়েমানুষটাকেও খেতে হয় মাঝে মাঝে, বলে উঠলেন অলিভার, তাই রক্ষে! নইলে চব্বিশ ঘণ্টায় কখনও বুড়িটার চোখের আড়ালে থাকতে পারতাম না। শকুনি, শকুনি!
হেসে ফেলল মুসা। খুব বেশি বিরক্ত করে বুঝি?

করে মানে? সারাক্ষণ ভাড়াটেদের পেছনে লেগে আছে। কে কখন কি করছে না করছে, চোখ রাখছে। উদ্ভট সব প্রশ্ন করে বসছে মাঝে মাঝেই। শুধু তাই না, কে কি খায় না খায়, তা-ও ডাস্টবিনে ফেলে দেয়া উচ্ছিষ্ট ঘেঁটে দেখে আসে। কয়েকবার ডাস্টবিন ঘটতে দেখেছি আমি ওকে। বুড়িটার বকবকানির দৌলতে কে কি খায়, কি করে, আমারও জানা হয়ে গেছে অনেকখানি। জানি, লারিসার প্রিয় জিনিস চকলেট, ডিনার খায় ঠাণ্ডা করে। ব্রায়ানের বেড়ালগুলো হপ্তায় চল্লিশ টিন। খাবার সাবাড় করে, এটাও জানি। এ-বাড়িতে থেকে কারও গোপনীয়তা বলে আর কিছু রইল না। সব ওই বুড়িটার কল্যাণে।

অলিভারের পিছু পিছু ব্যালকনিতে এসে উঠল তিন গোয়েন্দা। তালা খুললেন তিনি। দরজা খুলে ঘরে ঢুকলেন। ছেলেরাও ঢুকল।

খবরদার! ঘরে ঢুকেই সাবধান করল কিশোর। কেউ কোন জিনিসে হাত দেবে না। পকেট থেকে ছোট একটা আতশী কাঁচ বের করে সোজা গিয়ে ঢুকল। মিস্টার অলিভারের কাজের ঘরে। কাঁচের ভেতর দিয়ে পরীক্ষা করল ড্রয়ারের হাতল।

বাহ্, চমৎকার! চেঁচিয়ে উঠল গোয়েন্দাপ্রধান।

প্রায় ছুটে দরজায় এসে দাঁড়ালেন অলিভার।

ড্রয়ার খুলেছিল কেউ, জানাল কিশোর। হাত দিয়েছিল হাতলে। মানুষের হাত, ভূত-ফুত না। মলমে ছাপ পড়ে আছে।—রবিন, একটা তোয়ালে, প্লীজ।

তাড়াতাড়ি রান্নাঘর থেকে একটা কাগজের তোয়ালে এনে দিল রবিন।

সাবধানে হাতলটা মুছে ফেলল কিশোর।

ড্রয়ার খুলব? জানতে চাইলেন অলিভার।

নিশ্চয়।...আমিই খুলছি, ড্রয়ারটা টেনে খুলল কিশোর। দেখুন, কিছু চুরি হয়েছে কিনা।

দেখলেন অলিভার। না, সব ঠিকই আছে। অবশ্য কখনোই কিছু চুরি হয়নি। ঘাটাঘাটি করে যায় শুধু। আজ টেলিফোনের বিলটা খুলে দেখেছে কেউ। সকালে, ড্রয়ারের শেষ দিকে ছিল ওটা, ভাজ করা। খামে ভরা।

খামের ওপর মলম লেগে আছে, খুশিতে দাঁত বেরিয়ে পড়েছে কিশোরের। খুব ভালমতই হাতে লাগিয়েছে মলম।

ও-ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল কিশোর। বসার ঘর পেরিয়ে সামনের দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। ঝুঁকে ভালমত পরীক্ষা করল হাতলটা। এখানে মলম মাখাইনি। কিন্তু এখন লেগে আছে।

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, কোন্ পথে বেরিয়ে গেছে চোর, কিশোরের কথার পিঠে বলল রবিন। দরজা খুলে হেঁটে চলে গেছে আর দশজন সাধারণ মানুষের মতই।

এবং দরজায় আবার তালা লাগিয়ে গেছে, বলল কিশোর। দরজা খুলে বাইরের দিকের বোল্ট-লক পরীক্ষা করল। মলম লেগে আছে হালকাভাবে। হুমম! চাবি আছে ওর কাছে!
অসম্ভব! প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন অলিভার। ওটা স্পেশাল লক। চাবি থাকতেই পারে না কারও কাছে!
কিন্তু আছে, দৃঢ় কণ্ঠে বলল কিশোর। দরজা বন্ধ করে দিল আবার।
সবকটা ঘরে তন্ন তন্ন করে মলমের দাগ খুঁজল ওরা এরপর। বাথরুমের আয়নায় পাওয়া গেল ছাপ। পাওয়া গেল ওষুধের বাক্সের গায়ে।
মেডিসিন কেবিনেটও খুলেছিল সে, হাসল কিশোর।
ঘোঁৎ ধরনের একটা শব্দ করলেন অলিভার। রেগে গেছেন।
যাক, উন্নতি হচ্ছে তদন্তের, আবার বলল কিশোর।
তাই কি?
নিশ্চয়, গভীর আস্থা কিশোরের কণ্ঠে। প্রথমেই জেনে গেলাম, আপনার ঘরে ঢুকে ড্রয়ার, জিনিসপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করে যে, তার হাতে মলম লাগে। তারমানে অশরীরী নয়। আর দশজন মানুষের মতই স্বাভাবিকভাবে দরজা খুলে ঢুকেছিল সে আজ সকালে, বেরিয়ে গেছে আবার দরজা দিয়েই। অর্থাৎ, দেয়াল কিংবা কাঠের দরজা ভেদ করে সে আসে না। এবার গিয়ে চত্বরে বসব। চোখ রাখব, কারা। আসছে, কারা যাচ্ছে। হাতের দিকে নজর রাখব। কালো দাগ দেখলেই ধরব ক্যাক করে।
এখানে যারা থাকে, তাদের কেউ যদি না হয়? বললেন অলিভার।
আমি শিওর, এ-বাড়িতেই থাকে সে। এমন কেউ, যে সকালে আমাদেরকে বেরিয়ে যেতে দেখেছে।
অলিভারকে ঘরে রেখে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা। চত্বরে নামল। বসে পড়ল গিয়ে সুইমিং পুলের কিনারে সাজানো চেয়ারে।
দারুণ একখান পুলি! চোখ চকচক করছে মুসার।
কেউ কোন জবাব দিল না।
কি ভেবে উঠে পড়ল রবিন। পুলের কিনারে গিয়ে বসে পড়ল। তাকাল নিচে। টলটলে পরিষ্কার পানি। তলায় নীল আর সোনালি রঙের মোজাইক। খুব সৌখিন লোকের কাজ! স্যান সিমেঅন-এর হাস্ট ক্যাসলে আছে এমন একটা পুল, দেখেছি। পানিতে হাত রাখল সে। উষ্ণ রাখা হয়েছে কৃত্রিম উপায়ে।
গেটের বাইরে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হল। লাফিয়ে ভেতরে এসে ঢুকল একটা ধূসর বেড়াল, পেছনে একজন লোক। তামাটে চুল। সাদা সোয়েটারের ওপর খাকি। রঙের জ্যাকেট। ছেলেদের দিকে একবার তাকাল। কোনরকম আগ্রহ দেখাল না।

বেড়ালটার পিছু পিছু চত্বর পেরিয়ে চলে গেল বাড়ির এক প্রান্তের একটা দরজার কাছে। বেড়ালটাকে দরজার গোড়ায় রেখে ভেতরে ঢুকে পড়ল। মাত্র কয়েক সেকেণ্ড পরেই বেরিয়ে এল আবার, হাতে খাবারের প্লেট। নামিয়ে রাখল। খাবারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল বেড়াল। ঝুঁকে গভীর আগ্রহে ওটার খাওয়া দেখতে লাগল। লোকটা।

ব্রায়ান, ফিসফিস করে বলল রবিন। গত সন্ধ্যায়ও দেখেছি ওকে আমরা।

নতুন একটা ভবঘুরে খুঁজে পেয়েছে, ইঙ্গিতে বেড়ালটাকে দেখাল মুসা। অসময়ে খাওয়াচ্ছে দেখছ না। পাঁচটায় খাবার সময়, জানা নেই ওটার।

দ্রুত খাওয়া শেষ করল বেড়ালটা, নিঃশব্দে চলে গেল বাড়ির পেছনে। শূন্য প্লেটটা তুলে নিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ল ব্রায়ান এনড্রু।

সিঁড়িতে আবার শোনা গেল পায়ের শব্দ, আবার খুলে গেল গেট। ভেতরে ঢুকল বলিষ্ঠ সেই লোকটা। জ্যাকবস। ঠোঁটের কোণে সিগারেট। ছেলেদের দিকে চেয়ে সামান্য মাথা ঝোকাল সে। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে রেখে হাসল। তারপর চলে গেল নিজের অ্যাপার্টমেন্টের দিকে, ব্রায়ানের পাশের ফ্ল্যাটটাই তার। ও হাত দেবার আগেই ভেতর থেকে খুলে গেল দরজা। বেরোল একটা ছেলে। আঠারো-উনিশ বছর বয়েস।

মামা, ভ্রুকুটি করল ছেলেটা, সিগারেট একবারও সরাতে পার না মুখ থেকে!

বকিসনে, বব। দিনটা খুব খারাপ যাচ্ছে আজ। অ্যাশট্রেটা দিবি?

ধুয়ে রেখে দিয়েছি পুলের কাছে। নাওগে। উহ, কি বিচ্ছিরি গন্ধ! বাড়ির আবহাওয়াই দূষিত করে দিচ্ছ!

ঘুরে দাঁড়াল জ্যাকবস। লম্বা লম্বা পা ফেলে এসে পুলের ধার থেকে তুলে নিল বিশাল, ছোটখাট একটা গামলার মত অ্যাশট্রে। ছেলেদের পাশের একটা চেয়ারে বসে পড়ে অ্যাশট্রেতে ছাই ঝাড়ল সিগারেটের। ধূমপান করে চলল নীরবে।

আমার ভাগ্নেটার মত নিশ্চয় পাকামো কর না তোমরা? এক সময় কথা বলল। জ্যাকবস। গুরুজনদের কোন ব্যাপারে নাক গলাও না তো?

আমার বাবা-মা সিগারেট খায় না, সাফ জবাব দিয়ে দিল মুসা।

ঘোৎ করে উঠল জ্যাকবস। আমারও খাওয়া উচিত হচ্ছে না। তবে, সাবধানে থাকি আমি। যেখানে-সেখানে ছাই ঝাড়ি না, আগুন লাগিয়ে দিই না। এমনভাবে বলছে সে, যেন আগুন লাগিয়ে দেয়াটাই সিগারেট খাওয়ার একমাত্র দোষ। অফিসে এ-রকম আরেকটা অ্যাশট্রে আছে আমার। কাজ করার সময়ও সতর্ক থাকি আমি। অ্যাশট্রের মাঝখানে পোড়া সিগারেট খুঁজে রেখে তারপর কাজে হাত দিই।

সিগারেটে সুখটান দিল জ্যাকবস। পোড়া টুকরোটা অ্যাশট্রেতে ঠেসে নিভিয়ে উঠে দাঁড়াল। অ্যাশট্রেটা নিয়ে চলে গেল তার ঘরে।
কত রকমের মুদ্রাদোষ যে থাকে মানুষের বাধা পেয়ে থেমে গেল মুসা।
তোমার যেমন ইয়াল্লা আর খাইছে, ফস করে বলে বসল রবিন।
কথাটা কানে তুলল না মুসা। পুলের ওপাশে আরেকটা ফ্ল্যাটের দরজার দিকে চেয়ে আছে। টমি গিলবার্ট কি ঘরেই আছে! পর্দা টানা! কিশোরের দিকে তাকাল।
চল না, বেল বাজাই? দেখি আছে কিনা—
চুপ! হঠাৎ শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেছে কিশোরের।
চত্বরে বেরিয়ে এসেছে মিসেস ডেনভার। এক টুকরো টিপেপার দিয়ে জোরে জোরে ডলছে হাত। পুলের কাছে ছেলেপিলেদের বসা নিষেধ। নাকী গলায় খেঁকিয়ে উঠল সে।
উঠে দাঁড়াল কিশোর। এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল মহিলার সামনে। মিসেস ডেনভার, কি হয়েছে আপনার হাতে? কি লাগিয়েছেন?
মানে?
হাত দুটো দেখাবেন? জোরে জোরে বলল গোয়েন্দাপ্রধান।
কিশোরের গলা শোনার অপেক্ষায়ই ছিলেন অলিভার। ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ালেন।
আপনার হাতে কালো দাগ, কিসের? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
এই ইয়ে, মানে— থতমত খেয়ে গেছে মিসেস ডেনভার। রান্নাঘরে—
আপনি মিস্টার অলিভারের ঘরে ঢুকেছিলেন, কঠিন কণ্ঠে বলল কিশোর। তাঁর ডেস্কের ড্রয়ার খুলেছেন, কাগজপত্র ঘেঁটেছেন, চিঠিপত্র পড়েছেন, মেডিসিন কেবিনেট খুলেছেন, বাথরুমের আয়নায় হাত দিয়েছেন। কেন?
জীবনে বোধহয় এই প্রথম বাকশক্তি হারিয়ে ফেলল মিসেস ডেনভার। হাঁ করে চেয়ে আছে কিশোরের দিকে। রক্ত জমেছে মুখে, লাল, আরও লাল হয়ে উঠছে।
ডলে ফল হবে না, বলল কিশোর। সহজে উঠবে না ওই দাগ।
নেমে এসে ছেলেদের পাশে দাঁড়ালেন অলিভার। মিসেস ডেনভার, আপনার। সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে আমার।
অলিভারের কথায় চমকে যেন বাস্তবে ফিরে এল ম্যানেজার। নাকী গলায় চেঁচিয়ে উঠল, জানেন, এই বিচ্ছটা কি বলেছে আমাকে? চোর বলেছে!
জানি। ঠিকই বলেছে! জবাব দিলেন অলিভার। বাড়ির সবাই জানুক, এটা নিশ্চয় চান না? মিসেস ডেনভারের দরজার দিকে এগোলেন। আসুন। কথা বলব।
ছায়াশ্বাপদ।

আমি…আমি ব্যস্ত, গলার স্বর খাদে নেমে গেছে ম্যানেজারের। অনেক-অনেক কাজ পড়ে আছে, জানেন আপনি।
জানি, জানি, বললেন অলিভার। আপনার তো চব্বিশ ঘন্টাই কাজ! তো, আজ আর কি কি করার ইচ্ছে? ডাস্টবিন ঘটবেন? আর কারও ঘরে ঢুকবেন?…আসুন, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বকতে পারব না।–নাকি, উকিলকে টেলিফোন করব?
আর কিছু বলতে হল না। প্রায় উড়ে গিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে পড়ল মিসেস ডেনভার।
তিন গোয়েন্দার দিকে চেয়ে হাসলেন অলিভার। তোমাদের আসা উচিত হবে না। ওখানে বস। আমি কথা বলে আসছি।
দরজা খোলা। ভেতরে ঢুকে পড়লেন অলিভার। বন্ধ করে দিলেন দরজা।
চুপচাপ বসে রইল তিন গোয়েন্দা। কান খাড়া। মিসেস ডেনভারের তীক্ষ্ণ, নাকী গলা শোনা যাচ্ছে। কিন্তু কি বলছে, বোঝা যাচ্ছে না। খানিক পর পরই থেমে। যাচ্ছে তার গলা। ছেলেরা বুঝতে পারছে, তখন নিচু গলায় কথা বলছেন অলিভার। তাঁর গলা শোনা যাচ্ছে না।
খুব ভালমানুষ, এক সময় বলল মুসা। কিন্তু, আমার মনে হয়, প্রয়োজনে সাংঘাতিক কঠোর হতে পারেন তিনি। মোলায়েম গলায় কি ধমকটাই না লাগালেন ম্যানেজারকে।
পুলের ওপাশে দরজা খোলার শব্দ হল। ফিরে তাকাল তিন গোয়েন্দা। বেরিয়ে। আসছে টমি গিলবার্ট। রোদের দিকে চেয়ে চোখ মিটমিট করছে, অন্ধকারের জীবের মত। পরনে মোটা সুতার পাজামা, দলে-মুচড়ে আছে। শার্টের কয়েকটা বোতাম। নেই। পা খালি। হাই তুলল সে।
গুড মর্নিং, বলল কিশোর।
আবার চোখ মিটমিট করল টমি। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে রগড়াল। চুল-মুখ অপরিষ্কার, ধোয়া হয়নি।
আবার হাই তুলল টমি। জিভ আর টাকরার সাহায্যে অদ্ভুত আঁ-ম আঁ-ম শব্দ করল। চোখে যেন কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। একটা চেয়ারে হোঁচট খেয়ে পড়তে পড়তে কোনমতে সামলে নিল। মাথা ঝাড়া দিয়ে তাকাল একবার পুলের দিকে। ছেলেদের দিকে ফিরল। বসবে কি বসবে না, দ্বিধা করছে।
অবশেষে ধপ করে পাথুরে চত্বরেই বসে পড়ল। গুটিয়ে হাঁটুর ওপর তুলে নিল পাজামার নিচের দিকটা। তারপর একটা বিশেষ ভঙ্গিতে বসল।
ভঙ্গিটা চেনে কিশোর। যোগ ব্যায়ামের একটা আসন, পদ্মাসন। গুড মর্নিং, আবার বলল সে।

ফ্যাকাসে মুখটা কিশোরের দিকে ফেরাল টমি। পুরো এক সেকেণ্ড স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। চোখের কোন নির্দিষ্ট রঙ বোঝা যাচ্ছে না। মণির চারপাশের সাদা অংশটা টকটকে লাল, ঘুমিয়ে ছিল, কিন্তু ঘুম ভাল হয়নি যেন!
এখনও সকালই রয়েছে? অবশেষে কথা বলল টমি।
হাতঘড়ির দিকে তাকাল কিলোর। না, তা নেই। একটা বেজে গেছে।
আবার হাই তুলল টমি।
মিস্টার অলিভারের কাছে শুনলাম, আপনি ভারমন্টের একটা নাইটশপে কাজ করেন? বলল কিশোর।
সামান্য সতর্ক মনে হল টমিকে। মৃদু হাসল। মাঝরাত থেকে সকালতক। খুব খারাপ সময়। তবে ভাল পয়সা দেয় ওরা। ওই সময়টীর জন্য আলাদা ভাতা দেয়। কাজেই ছাড়ি না। তাছাড়া সারাদিন আর রাতের অর্ধেকটা সময়ই থাকে আমার। পড়াশোনা করতে পারি।
স্কুলে পড়েন? জানতে চাইল কিশোর।
মুখ বাঁকাল টমি, হাত নাড়ল বিশেষ ভঙ্গিতে, যেন স্কুলে যাওয়াটা বেহুদা সময় নষ্ট। বহু আগেই ওই পাট চুকিয়েছি। বাপ চেয়েছে, আমি কলেজে যাই। তারপর ডেন্টিস্ট হই। কোন মানে খুঁজে পেলাম না এর। কে যায়, সারাদিন দাঁড়িয়ে থেকে। লোকের মাড়ি খোঁচাখুঁচি করতে? আসলে, ও-সবই এক ধরনের মোহ, মায়া।
মোহ! বিড়বিড় করল মুসা।
হা। সবই মোহ। পুরো দুনিয়াটাই একটা মায়া। সবাই আসলে ঘুমে অচেতন আমরা, ঘুমের ঘোরে দুঃস্বপ্ন দেখছি। ব্যাপারটা বুঝে গেছি আমি। তাই জেগে ওঠার চেষ্টা চালাচ্ছি।
মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল রবিন আর মুসা। মনের ভাব, মাতাল নয় তো ব্যাটা?
কি নিয়ে পড়াশোনা করছেন? জিজ্ঞেস করল কিলোর।
ধ্যানতত্ত্ব, বলল টমি। পূর্ণ-সচেতনতায় পৌঁছতে হলে এর ব্যাপক চর্চা দরকার। আসনমুক্ত হয়ে দাঁড়াল সে। ছেলে তিনটেকে চোখ বড় বড় করে চেয়ে থাকতে দেখে মজা পাচ্ছে।
টাকা জমাচ্ছি, আসরের মধ্যমণি হয়ে উঠেছে, বুঝতে পারছে টমি। ভারতে যাব গুরু খুঁজতে। ধ্যানতত্ত্বের সবচেয়ে বড় শিক্ষক একমাত্র ভারতেই আছে। তাই কষ্ট হলেও রাতে কাজ করি, বেশি টাকার জন্যে। শিগগিরই বেশ কিছু টাকা জমে যাবে আমার, ভারতে গিয়ে তিন-বছর থাকার মত হয়ে যাবে। ধর্ম আমি বিশ্বাস করি না, বিজ্ঞান মানি না। কোন জিনিসে আমার লোভ নেই।
সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে রবিন। তা থাকেও না—চাওয়ার যা যা আছে, সব জিনিস যদি থাকে কারও—

না, না! প্রায় চেঁচিয়ে উঠল টমি। বুঝতে পারছ না—
বোঝার দরকার আছে বলেও মনে হয় না! ফস করে বলে ফেলল মুসা।
খুব সহজ ব্যাপার, মুসার টিপ্পনীতে কান দিল না টমি। চাহিদা, লোভ থেকেই সব গোলমালের সৃষ্টি। ওই যে বুড়ো অলিভার, সারাক্ষণ খালি নিজের সংগ্রহ নিয়েই ব্যস্ত। আরও চাই, আরও চাই এই-ই করছে খালি। পরের জন্মে—আমার মনে হয়, পরের জন্মে ভাঁড়ারের ইঁদুর হয়ে জন্মাবে!
কি যা-তা বলছেন ভদ্রলোক সম্পর্কে রেগে গেল মুসা। ওঁর মত মানুষ হয় নাকি?
মুসার বোকামিতে হতাশ হল যেন খুব, এদিক ওদিক মাথা নাড়ল টমি। কারও কাছ থেকে চুরি করে কিংবা ছিনিয়ে এনেছে বা আনছে, তা বলিনি। বলছি, এত আছে, আরও চাইছে কেন? কেন বুঝতে পারছে না, মরীচিৎকার পেছনেই ছুটছে শুধু? জান, ওর কাছে মহামূল্যবান একটা মান্দালা আছে, অথচ জানেই না ওটা কি করে ব্যবহার করতে হয়। দেয়ালে ঝুলিয়ে রেখে দিয়েছে, যেন আরেকটা অতি সাধারণ চিত্র।
মান্দালাটা আবার কি জিনিস? ভুরু কুঁচকে গেছে মুসার।
প্রায় ছুটে নিজের ঘরে চলে গেল টমি। সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে এল আবার। হাতে ছোট একটা বই। ছেলেদের কাছে এসে বলল, ওরকম একটা মান্দালা আমার খুবই দরকার। এক ধরনের নকশা, মহাবিশ্বের। ওটার ওপর চোখ রেখে ধ্যান করলে মেকি দুনিয়ার সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে উঠে যাবে তুমি, সৌরজগৎ কিংবা আরও বড় কোন জগতের একজন হয়ে পড়বে। বই খুলে রঙিন একটা ছোট নকশা দেখাল সে। বেশ কয়েকটা ত্রিভুজ একটার ওপর আরেকটা ফেলে তারকা তৈরি করা হয়েছে। ওটাকে ঘিরে রেখেছে ছোটবড় অনেকগুলো বৃত্ত। সবচেয়ে বড় বৃত্তটাকে ছুঁয়ে আঁকা হয়েছে একটা চতুর্ভুজ। এটা একটা মান্দালা।
কই, মিস্টার অলিভারের ঘরে তো এ ধরনের জিনিস দেখিনি! বলল মুসা।
আছে। আমারটার চেয়ে অনেক বেশি জটিল। তিব্বত থেকে এসেছে। অনেক পুরানো দেবদেবীর ছবি আছে ওটাতে, বই বন্ধ করল টমি। ওরকম একটা জিনিস জোগাড় করবই আমি। কোন গুরুকে দিয়ে আঁকিয়ে নেব। এখন টেলিভিশন দিয়েই কাজ চালাই।
টেলিভিশন! রবিন অবাক।
হ্যাঁ, টেলিভিশন, আবার বলল টমি। বর্তমানের সঙ্গে বন্ধনমুক্ত হতে সাহায্য করে আমাকে। দোকানের কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরি। তারপর খুলে দিই টেলিভিশন, সাউণ্ড বন্ধ করে রাখি। শুধু ছবি। প্রথমে পর্দার ঠিক মাঝখানে দৃষ্টি স্থির। করি, ধীরে ধীরে সরিয়ে নিই কোন এক কোনার দিকে। পর্দায় কি ঘটছে না ঘটছে, কিছু

চোখে পড়ে না আর। রঙের প্রতিকৃতিগুলোর দিকে চেয়ে থাকি শুধু। একসময় হারিয়ে যাই অদ্ভুত এক জগতে, সেটাই আসল জগৎ।
ঘুমিয়ে পড়েন নিশ্চয়! মন্তব্য করল রবিন।
অপ্রতিভ মনে হল টমিকে। ধ্যানমগ্নতার–হ্যাঁ, ধ্যানমগ্নতার এটাই অসুবিধে! স্বীকার করল সে। মাঝে মাঝে এত বেশি শান্ত হয়ে যায় মন, ঘুমিয়ে পড়ি, স্বপ্ন দেখি তখন.. বাধা পেয়ে থেমে গেল টমি।
দরজায় শব্দ। বেরিয়ে এসেছেন মিস্টার অলিভার। চেয়ে আছেন তিন গোয়েন্দার দিকে।
দুঃখিত, বলে উঠল কিশোর। আপনার সব কথা শোনা হল না। আমাদেরকে যেতে হচ্ছে।
না না, দুঃখিত হবার কিছু নেই, তাড়াতাড়ি বলল টমি। যখন খুশি, যে সময় খুশি, আমার ঘরে এস। যদি তখন ধ্যানে না বসি, কথা বলব। এ-সম্পর্কে, মান্দালা সম্পর্কে যা জানতে চাও, জানাব।...আর হ্যাঁ, আমার ভারতে যাবার ব্যাপারেও বলব...
ধন্যবাদ জানিয়ে ব্যালকনির সিঁড়ির দিকে রওনা হল তিন গোয়েন্দা।
ঘরে ঢুকেই বড় নিচু একটা চেয়ারে ধপ করে বসে পড়লেন অলিভার।
আরেকটা চাবি আছে মিসেস ডেনভারের কাছে, না? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
হ্যাঁ, আছে, মাথা ঝোঁকালেন অলিভার। ঠিকই অনুমান করেছিলে তুমি, আরেকটা চাবি আছে কারও কাছে। নাকা বুড়ি! উকিলকে ডেকে ওর চাকরির চুক্তিপত্রে আরও কিছু শর্ত ঢোকাব আমি। এরপর থাকলে থাকবে, না থাকলে চলে যাবে।
চাবিটা জোগাড় করল কোথা থেকে? জানতে চাইল রবিন।
খুব সহজে। মাস দুই আগে ইউরোপে গিয়েছিলাম। পরিচিত এক চাবিঅলাকে ডেকে আনল বুড়ি। বলল, এ-ঘরের তালার চাবি হারিয়ে ফেলেছে, আরেকটা চাবি বানিয়ে নিতে হবে। ম্যানেজার বলছে, কাজেই কোনরকম সন্দেহ করল না চাবিঅলা। বানিয়ে দিল আরেকটা চাবি।
আজব মহিলা! বিড়বিড় করল কিশোর।
আজব? মুখ বাঁকালেন অলিভার। আমার তো মনে হয় মাথায় গোলমাল আছে! যাক, রহস্যটার সমাধান হয়ে গেল। ঘরে ঢুকে জিনিসপত্র তছনছ করত কে, বোঝা গেল। আর ঢুকতে পারবে না। চাবিটা নিয়ে নিয়েছি ওর কাছ থেকে। আর একটা বানিয়ে নেবার সাহস হবে না, খুব ধমকে দিয়েছি। তোমরা আমার মস্ত উপকার করলে, হেসে যোগ করলেন, জেনে ভাল লাগছে, ভূত-ফুত কিছু না, রক্তমাংসের জ্যান্ত মানুষই ঘরে ঢুকত। ছায়া দেখাটা আসলে কল্পনা, এখন বুঝতে

পারছি। ওই তামারা ব্রাইসের ভূতের গল্পই শেকড় গেড়েছিল মনে! আর কিছু না! কি বোকামিই করেছেন এতদিন ভেবে, আপনমনেই মাথা নাড়লেন তিনি।
অলিভারের কথা কিশোরের কানে ঢুকেছে বলে মনে হল না। আপনমনে নিচের ঠোঁটে চিমটি কেটে চলেছে সে। হঠাৎ যেন বাস্তবে ফিরে এল। হাসল বৃদ্ধের দিকে চেয়ে। যাক, রহস্যের সমাধান হয়ে গেল। আপনার উপকার করতে পেরেছি, খুব ভাল লাগছে। উঠে দাঁড়াল। আচ্ছা, মিস্টার অলিভার, আপনার কাছে কি একটা মান্দালা আছে?
তুমি জানলে কি করে? ভুরু কুঁচকে গেছে অলিভারের। কেন, দেখতে চাও?
মাথা ঝোকাল কিশোর।
গোয়েন্দাপ্রধানকে নিয়ে এসে কাজের ঘরে ঢুকলেন অলিভার। ফ্রেমে বাঁধাই করা একটা বিচিত্র নকশা ঝুলছে ডেস্কের ওপরে, দেয়ালে। উজ্জ্বল রঙে আঁকা। টমির কাছে যেটা রয়েছে, অনেকটা ওটার মতই। তবে অনেক বড়। আর, বৃত্তগুলো। ঘেঁষে খুদেখুদে অক্ষরে প্রাচীন দুর্বোধ্য কোন ভাষায় লেখা রয়েছে কি যেন। চার কোণে অনেকগুলো দেব-দেবীর ছবি।
এক তরুণ আর্টিস্টের কাছ থেকে কিনেছি, বললেন অলিভার। দেশে-বিদেশে ঘুরে বেড়াত সে। তিব্বত থেকে এনেছে মান্দালাটা। ওর জন্যেই নাকি বানিয়ে দিয়েছিল এক গুরু। এটা অনেক দিন আগের কথা। আর্টিস্ট এখন নেই, মারা গেছে।
মিস্টার অলিভার, গম্ভীর হয়ে আছে কিশোর। এ ঘরে টমি গিলবার্ট ঢুকেছিল?
না-তো, ভুরু কোঁচকালেন অলিভার। ওই নাকা বুড়িটা ছাড়া এ-বাড়ির আর কেউ ঢোকেনি এ ঘরে। একা থাকতে পছন্দ করি আমি, জানই। আচ্ছা ভাল লাগে না। আর টমিটাকে ঢুকতে দেবার তো প্রশ্নই ওঠে না। সারাদিনই কেমন যেন। মাতাল মাতাল একটা ভাব, অপরিষ্কার, গন্ধ বেরোয় চুল থেকে।
তা ঠিক, একমত হল কিশোর। ওই মান্দালাটা বাইরে বের করেছিলেন কখনও? ফ্রেম-ট্রেম ঠিক করার জন্যে?।
এদিক ওদিক মাথা নাড়লেন অলিভার। গত দশ বছর ধরে ওখানে ওভাবেই ঝুলে আছে ওটা। বছর বছর দেয়ালে রঙ দেবার সময় শুধু নামাই, তা-ও নিজের হাতে। আলমারিতে তালাবদ্ধ করে রাখি সে-সময়টা। রঙের কাজ শেষ হলে আবার ঝুলিয়ে দিই। কেন?
টমি জানল কি করে আপনার কাছে একটা মান্দালা আছে?
জানে?
জানে। এ-ও জানে, ওটা তিব্বতের জিনিস। ওর কাছে একটা মান্দালা আছে।

কাঁধ ঝাঁকালেন অলিভার। কি জানি! ওই হতচ্ছাড়া খবরের কাগজঅলাদের কাজ হবে হয়ত! আমার সংগ্রহে কি কি আছে, ছেপে বসেছিল হয়ত কখনও। কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব জানে, কি আছে আমার সংগ্রহে। ওরাই হয়ত কেউ জানিয়েছিল খবরের কাগজঅলাদের।
অনিশ্চিত ভঙ্গিতে মাথা ঝোকাল কিশোর। দরজার দিকে এগোল।
কিশোর, হালকা গলায় বললেন অলিভার। আরেকটা রহস্য খুঁজছ? লাভ নেই। আর কোন রহস্য নেই এখানে।
হয়ত, একমত হতে পারছে না গোয়েন্দাপ্রধান। না থাকলেই ভাল। কিন্তু আবার কোন কিছু ঘটতে আরম্ভ করলেই ডেকে পাঠাবেন আমাদের, দ্বিধা করবেন না।
নিশ্চয়, নিশ্চয়।
তিন গোয়েন্দার সঙ্গে একে একে হাত মেলালেন অলিভার। দরজার বাইরে এগিয়ে দিয়ে এলেন ওদের।
রাস্তায় এসে নামল তিন ছেলে।
গেল শেষ হয়ে! বাস-স্টেশনের দিকে হাঁটতে হাঁটতে বলল মুসা। এত সহজ কেস আর হাতে আসেনি। ছুটির বাকি দিনগুলো কি করে কাটাব?
প্রথম কাজ, পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ড থেকে দূরে থাকব, বলে উঠল রবিন। মেরিচাচীর আইসক্রীম কেকের লোভ এবারের মত ত্যাগ করতে হবে। আরিব্বাপরে, যা জঞ্জাল এনে জমিয়েছেন রাশেদ চাচা। সাফ করতে... ইঙ্গিতে বাকিটুকু বুঝিয়ে দিল গবেষক। কিশোর, তুমি কি বল?
আঁ-হা! জবাব দিল কিশোর। সঙ্গীদের কথায় মন নেই। গভীর চিন্তা চলেছে তার মাথায়।
সারাটা পথ চুপচাপ থাকল কিশোর। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ভাবনায় ডুবে রইল।
রকি বীচে পৌঁছুল বাস। নামল তিন গোয়েন্দা। পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে হেঁটেই চলে এল। কিশোরের কাছ থেকে বিদায় নিল অন্য দুজন।
টেলিফোনের কাছাকাছি থেক, ডেকে বলল গোয়েন্দাপ্রধান। শিগগিরই আবার কাজে নামতে হবে। মিস্টার অলিভারের কাছ থেকে ডাক এল বলে।
বিস্মিত দুই সঙ্গীর দিকে চেয়ে হাসল কিশোর। হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে রওনা হয়ে গেল ইয়ার্ডের দিকে।

.

একগাদা লোহা-লক্কড়ের মাঝে দাঁড়িয়ে আছেন মেরিচাচী। কিশোরকে দেখেই মুখ তুলে তাকালেন। এসেছিস! তুই কি, বল তো কিশোর! মানুষকে ভাবনায় ফেলে। দিয়ে মজা পাস! বলা নেই কওয়া নেই, হুট করে সেই সক্কাল বেলা বেরিয়ে

চলে গেছিস! বালিশের ওপর একটা চিঠি ফেলে রেখে গেলেই হল? কেন, বলে যেতে কি অসুবিধে ছিল…।
ঘুমিয়েছিলে, বলল কিশোর, জাগাতে চাইনি…
দরদ! এই সারাটাদিন দুঃশ্চিন্তায় ভোগানর চেয়ে ঘুম ভাঙানো অনেক ভাল ছিল। তোরা চাচা-ভাতিজা মিলে আমাকে জ্বালিয়ে খেলি। তুই থাকবি বাইরে বাইরে, টো টো করে ঘুরবি, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবি। কার বেড়াল হারাল, কার কুকুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল, তাতে তোর কি?…আর তোর চাচা, রাজ্যের যত জঞ্জাল এনে ফেলবে আমার ঘাড়ে! এগুলো না হয় বিক্রি, না কিছু, খালি জায়গা আর সময় নষ্ট। টাকাও!
হাসল কিশোর, ভেব না, চাচী। সারাটা বিকেল পড়ে রয়েছে। আজই সাফ করে ফেলব সব। এখন খেতে দাও তো, খুব খিদে পেয়েছে।
ভুরু কোঁচকালেন মেরিচাচী। সে তো চেহারা দেখেই বুঝতে পারছি! আয়, জলদি আয়! হাত মুখ ধুয়ে নে-গে। আমি খাবার বাড়ছি। তাড়াহুড়ো করে জঞ্জালের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি। বাড়ির দিকে চললেন।
জঞ্জালের দিকে চেয়ে আছে কিশোর। হাসিতে ভরে গেছে মুখ। প্রচুর জিনিস বেরোবে ওগুলোর ভেতর থেকে, হেডকোয়ার্টারে নিয়ে গিয়ে ঢোকাতে পারবে। কাজে লাগবে তিন গোয়েন্দার।
পুরো বিকেল জঞ্জাল ঘটল কিশোর। সন্ধে ছটায় চলল ঘরে, রাতের খাবার খেতে। এর ঠিক এক ঘণ্টা পরে বাজল ফোন।
ফোন ধরলেন মেরিচাচী। কিশোরের দিকে চেয়ে বললেন, তোর ফোন।
চকচক করে উঠল কিশোরের চোখ। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। প্রায় ছুটে এসে ধরল ফোন। কানে ঠেকাল রিসিভার। কিশোর পাশা।
কিশোর, কাঁপা কাঁপা কণ্ঠ। আমি ফ্র্যাঙ্ক অলিভার। কিশোর, বললে বিশ্বাস করবে না আমার, আমার ঘরে আবার ভূতের উপদ্রব শুরু হয়েছে
বলুন, শান্ত গোয়েন্দাপ্রধান।
মিসেস ডেনভারকে ধরার পর ভেবেছিলাম, ছায়ার ব্যাপারটা আমার কল্পনা, বললেন অলিভার। কিন্তু তা নয়! আবার দেখেছি আমি ছায়াটা! মাথা-টাথা খারাপ হয়ে গেল কিনা, বুঝতে পারছি না!
আপনার বাড়িতে আসতে বলছেন আমাদেরকে?
প্লীজ! যদি আজই পার, খুব ভাল হয়। রাতটা আমার এখানেই কাটাবে। একা থাকতে খুব খারাপ লাগছে। যে-কোন সময় আবার এসে পড়বে ছায়াটা…সইতে পারব না আর! নার্ভের ওপর খুব চাপ পড়ছে!

ঠিক আছে, আমরা আসছি, যত তাড়াতাড়ি পারি, রিসিভার নামিয়ে রাখল কিশোর।
আবার ভাগার তালে আছিস? গম্ভীর হয়ে গেছেন মেরিচাচী।
সব কথা খুলে বলল কিশোর। বুঝিয়ে বলল চাচীকে।
তাই! সব শুনে বললেন চাচী। আহা, মানুষটার জন্যে খারাপই লাগছে! বিয়ে। করল না, সঙ্গীসাথী নেই, একা মানুষ, কাটায় কি করে! ঠিক আছে, যা। বাসে যাবার দরকার নেই। তোর চাচাকে বলছি, গাড়িতে করে দিয়ে আসবে।
চাচীকে জড়িয়ে ধরল কিশোর। টুক করে তার গালে চুমু খেয়ে বলল, এ জন্যেই তোমাকে এত ভালবাসি, চাচী!
মুসা আর রবিনকে টেলিফোন করল কিশোর।
কয়েক মিনিট পরেই ইয়ার্ডের গেট দিয়ে বেরিয়ে গেল ছোট পিক-আপ ট্রাকটা। পেছনে গাদাগাদি করে বসেছে তিন গোয়েন্দা।
কিশোর, আবার তোমার কথাই ঠিক হল, ঠেলেঠুলে দুই বন্ধুর মাঝখানে আরেকটু জায়গা করে নেবার চেষ্টা চালাল মুসা। কি করে জানলে, আবার খবর দেবেন, মিস্টার অলিভার?
কারণ, আমি শিওর, ছায়া দেখাটা ওঁর কল্পনা নয়। আমি নিজেও দেখেছি। ওটা?
তুমি দেখেছ! প্রায় চেঁচিয়ে উঠল রবিন। কখন?
গতকাল। মিস্টার অলিভারের কাজের ঘরে। একটা বুকশেলফের পাশে। প্রথমে মনে করেছি, মুসা এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু পরে জানলাম, ও তখন বসার ঘরে ছিল।
হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে, বলে উঠল মুসা। কিন্তু পরে যে বললে, বুকশেলফের ছায়া?
তখন তাই মনে করেছিলাম। এটাই যুক্তিসঙ্গত ছিল। কিন্তু টমি গিলবার্টকে দেখার পর…
চমকে উঠেছিলে! কিশোরের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল রবিন। গতকাল পুলিশ আসার পর ঘর থেকে বেরিয়েছিল টমি। তাকে দেখেই কেমন চমকে উঠেছিলে তুমি।
হ্যাঁ। একটা ব্যাপার খেয়াল করেছ, মুসার সমানই লম্বা সে? বলল কিশোর।
দাঁড়াও, দাঁড়াও! তাড়াতাড়ি বলল মুসা। ওর মত দেখতে নই আমি। ও আমার চেয়ে বড়, বিশের কম হবে না বয়েস। তাছাড়া হাড্ডিসার…
আমি বলেছি টমি তোমার সমান লম্বা, বাধা দিয়ে বলল কিশোর। তোমার। কালো চুল, ওরও। ও গতরাতে কালো সোয়েটার পরেছিল, তোমার গায়ে ছিল। কালো জ্যাকেট। মিস্টার অলিভারের কাজের ঘরে তখন ম্লান আলো জ্বলছিল। ঘরের

বেশির ভাগই ছিল অন্ধকার। টমিকে তুমি বলে ভুল করাটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়।
চুপ করে রইল মুসা আর রবিন। ব্যাপারটা পর্যালোচনা করে দেখছে মনে মনে।
কিন্তু ও ঢুকল কি করে? অবশেষে বলল রবিন। দরজায় তালা দেয়া ছিল।
জানি না, মাথা নাড়ল কিশোর। টমিকেই দেখেছি, সেটাও শিওর হয়ে বলতে পারছি না। তবে, কেউ একজন ঢুকেছিল। কি করে ঢুকেছিল, এটা জানতে পারলেই অনেক কিছু সহজ হয়ে যাবে।
ঘন্টাখানেকের ভেতরই প্যাসিও প্লেসে পৌঁছে গেল পিক-আপ। চত্বরের সামনে তিন গোয়েন্দাকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেলেন রাশেদ চাচা।
বেল টিপল কিশোর।
এসে পড়েছ! দরজা খুলে দাঁড়িয়েছেন মিস্টার অলিভার। গুড। সত্যি বলছি, ভয়ই পেতে শুরু করেছি আমি!
বুঝতে পারছি, মাথা ঝোঁকাল কিশোর। ঘরটা ঘুরেফিরে দেখি? ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বলল সে।
মাথা কাত করলেন মিস্টার অলিভার।
প্রথমেই সোজাঁ কাজের ঘরের দিকে ছুটে গেল কিশোর। কোণের দিকে ডেস্কের ওপর জলছে শুধু টেবিল ল্যাম্পটা। ঘরে আলো-আঁধারির খেলা। পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছে শুধু একটা বুকশেলফের একপাশের কয়েকটা বই, চীনামাটির তৈরি কয়েকটা মূর্তি, আর দেয়ালে ঝোলানো মান্দালা। ভুরু কুঁচকে নকশাটার দিকে চেয়ে রইল গোয়েন্দাপ্রধান। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটা শুরু হয়ে গেছে।
হঠাৎ, গত বিকেলের মতই উপলব্ধি করল, ঘরে একা নয় সে। আরও কেউ একজন রয়েছে। নীরবে লক্ষ্য করছে তাকে। পাঁই করে ঘুরে দাঁড়াল কিশোর।
গত দিন যেটার কাছে দেখেছিল, সেখানেই আজও দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল ছায়াটাকে। সে ফিরে তাকাতেই কোণের দিকে সরে যেতে লাগল দ্রুত। বাতাসে জানালার পর্দা কাঁপার মত কাঁপছে থিরথির করে।
লাফ দিয়েই ছুটল কিশোর। ঘরের কোণে এসে খামচে ধরার চেষ্টা করল। ছায়াটাকে। হাতে ঠেকল দেয়াল, শুধুই দেয়াল। ছুটে এসে সুইচ টিপে মাথার ওপরের তীব্র আলো জ্বেলে দিল। পাগলের মত তাকাল চারদিকে। নেই। কোথাও নেই ছায়াটা।
ছুটে কাজের ঘর থেকে বেরোল কিশোর। সবাইকে অবাক করে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে এল ব্যালকনিতে। নিচে তাকাল।
উজ্জ্বল ফ্লাডলাইট জ্বলছে। নীল-সাদা আলোয় জ্বলজ্বল করছে সুইমিং পুলের সোনালি আর নীল মোজাইক করা তল। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে টমি গিলবার্টের

ফ্ল্যাটটা। জানালার পর্দা সরানো। রঙিন আলোর আবছা ঝিলিক চোখে পড়ছে, তার মানে টেলিভিশন খোলা। দেখা যাচ্ছে টমিকে। চুপচাপ মেঝেতে বসে আছে সে, পদ্মাসনে, বুকের ওপর ঝুলে পড়েছে মাথা।
কি হল? কানের কাছে ফিসফিস করল রবিনের কণ্ঠ।
আবার দেখেছি ওটা! বিড়বিড় করল কিশোর। কেঁপে উঠল একবার। কিছু না, ডিসেম্বরের ঠাণ্ডার জন্যেই এই কাঁপুনি নিজেকে প্রবোধ দিল সে। কাজের ঘরে—মান্দালাটার দিকে চেয়ে ছিলাম। হঠাৎ টের পেলাম, আরও কেউ রয়েছে ঘরে। ঘুরে তাকালাম। দেখলাম ছাঁয়াটাকে। এখন মনে হচ্ছে, টমি নয়। ওই যে টমি, তার ঘরে, বসে বসে ঝিমোচ্ছে। কিন্তু ঢুকল কি করে ছায়া! বেরিয়েই বা গেল কি করে! আশ্চর্য!
কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে তাকাল কিশোর। দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন অলিভার।
ওকে তুমিও দেখছ, না? কম্পিত কণ্ঠ বৃদ্ধের। তারমানে, পাগল হয়ে যাইনি আমি!
নীরবে ঘরে ঢুকে গেল ছেলেরা। দরজা বন্ধ করে দিল।
না, মিস্টার অলিভার, বলল কিশোর, পাগল হয়ে যাননি! গতকালও দেখেছি ওটা আমি। কি মনে হয় আপনার? টমি গিলবার্টের সঙ্গে কোন মিল রয়েছে?
জানি না!—এত দ্রুত আসে-যায় ছায়াটা! খামোকা কাউকে দোষ দিয়ে লাভ নেই, তবে–তবে, টমির সঙ্গে মিল আছে!
কিন্তু তাই বা কি করে হয়? আপনমনেই বলল কিশোর। দুই দুই বার ওটা দেখেছি, দুবারই টমি ছিল তার ঘরে। একই সঙ্গে দুটো জায়গায় কি করে যাবে সে? জোরে জোরে মাথা নাড়ল গোয়েন্দাপ্রধান। না, হতে পারে না!—মিস্টার অলিভার, টমি সম্পর্কে কতখানি জানেন আপনি?
খুবই সামান্য, বললেন অলিভার। মাস ছয়েক হল, আমার বাড়িতে ভাড়া এসেছে সে।
টমি আসার আগে কি ওই ছায়ার উপস্থিতি টের পেয়েছেন কখনও?
ভাবলেন অলিভার। মাথা নাড়লেন। না। ব্যাপারটা নতুন।
আপনার মান্দালার ওপর লোভ আছে ওর, বলল কিশোর। ভাল করে ভেবে দেখুন তো, ওটার কথা কখনও বলেছেন কিনা ওর কাছে?
কক্ষনও না, সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিলেন অলিভার। ওর সঙ্গে পারতপক্ষে কথা বলি না আমি এড়িয়ে চলি। তবে মাঝেমধ্যে লারিসার সঙ্গে কথা বলি। মেয়েটা ভারি মিশুক। তবে সে-ও খুব একটা মিশতে চায় না টমির সঙ্গে। মোটা হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আতঙ্ক রয়েছে মেয়েটার। রোজ রাতে নিয়মিত সাঁতার কাটে পুলে। অনেক সময় পুলের কাছে বসে থাকে টমি। মেয়েটা উঠে এলে তার সঙ্গে আলাপ জমানর চেষ্টা করে। কিন্তু পাত্তা দেয় না লারিসা। আমাকে বলেছে, ছেলেটাকে

দেখলেই কেমন একটা অনুভূতি হয়-বিছে, মাকড়সা কিংবা কেঁচো দেখলে যেমন হয় কারও কারও!।
এ-বাড়ির কোথাও কোন গোপন পথ নেই তো? বলল রবিন। আপনার ঘরে ঢোকার?
মনে হয় না, অলিভারের হয়ে জবাব দিল কিশোর। এসব আধুনিক বাড়িতে গোপন পথ বানায় না লোকে। সেসব ছিল আগের দিনে, দুর্গ-টুর্গগুলোতে।
সন্দেহ থাকলে খুঁজে দেখতে পার, বললেন অলিভার। আমার বাবা আরেকজনের কাছ থেকে কিনেছিলেন এ-বাড়ি। পুরানো আমলের লোক ছিল আগের মালিক। বলা যায় না, যদি তেমন কোন পথ বানিয়ে রেখে গিয়ে থাকে।
তন্নতন্ন করে খুঁজল ওরা। বিশেষ করে কাজের ঘরে। কিন্তু গোপন পথ তো দূরের কথা, ইঁদুর বেরোনর মত বাড়তি একটা ফোকরও নেই দরজা-জানালা ভেন্টিলেটর আর পানি নিষ্কাশনের সরু ছিদ্র ছাড়া। দেয়াল বা মেঝের কোথাও কোন ফাঁপা জায়গা নেই। দরজা ছাড়া আর কোন পথে মানুষের ঢোকার উপায় নেই।
সত্যিই আশ্চর্য! অবশেষে বলল রবিন।
মাথা ঝোঁকালেন অলিভার। বহু বছর ধরে আছি এ-বাড়িতে। আরও কয়েকটা বাড়ি আছে আমার, কিন্তু এটাই সবচেয়ে বেশি পছন্দ। তাই এখান থেকে নড়ি না। তবে এবার বোধহয় তল্পি গোটাতেই হল। এই ভূতুড়ে কাণ্ডকারখানা এভাবে ঘটতে থাকলে পাগলই হয়ে যাব!
এরপর ঘাপটি মেরে কাজের ঘরে বসে রইল তিন গোয়েন্দা। কিন্তু আর এল ছায়াটা। রাত বাড়ছে। শেষে ওঘর থেকে বেরিয়ে এল ওরা। শোবার ঘরে শুয়ে। শুয়ে বই পড়ছেন অলিভার। কোনরকম শব্দ হলেই চমকে উঠছেন। তাকে জানাল কিশোর, সারারাত পাহারা দেবে ওরা পালা করে। তিনি যেন নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়েন।
বসার ঘরে সোফার ওপর রাত কাটাবে রবিন। মুসা থাকবে কাজের ঘরে। একটা কাউচে। কিশোর অন্য কোন একটা ঘরে শুতে পারবে।
রাতের প্রথম প্রহরে পাহারায় রইল কিশোর। সদর দরজার গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে চুপচাপ বসে রইল সে। কান খাড়া রাখল।
এগারোটা বাজল। নিথর নীরব চারদিকটা। শোনার মত তেমন কিছুই নেই। রাস্তায় গাড়িঘোড়ার শব্দও থেমে গেছে অনেক আগেই। এই সময় কানে এল। পানিতে ঝুপঝাঁপ শব্দ। নিশ্চয় লারিসা ল্যাটনিনা সাঁতার কাটতে নেমেছে। স্বাস্থ্যের প্রতি কি দৃষ্টি! কনকনে ঠাণ্ডায় এই মাঝরাতেও নিয়মের ব্যতিক্রম করেনি।

কিশোর? কাজের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে মুসা। জলদি এস! একটা জিনিস দেখবে!
উঠে পড়ল কিশোর। রবিন ঘুমিয়ে পড়েছে। মুসাকে অনুসরণ করে কাজের ঘরে চলে এল সে। জানালার কাছে এসে দাঁড়াল। গির্জার ভেতরে আলো!
বোধহয় ফাদার স্মিথ, বলল কিশোর। ঠিকঠাক আছে কিনা সব, দেখতে এসেছেন!
কিন্তু এত রাতে!
ঠিকই বলেছ, ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল কিশোর। সন্দেহজনকই! দাঁড়াও, দেখে আসছি।
আমি আসি তোমার সঙ্গে, বলল মুসা।
না, জোর দিয়ে বলল কিশোর। তুমি এখানেই থাক। পাহারা দাও। আমি যাব আর আসব।
বসার ঘরে চেয়ার থেকে জ্যাকেটটা তুলে নিয়ে গায়ে চড়াল কিশোর। দরজা খুলে বেরিয়ে এল ব্যালকনিতে। চত্বরের আলো নিবে গেছে। নির্জন, শূন্য। সুইমিং পুলেও কেউ নেই। কেঁপে উঠল একবার কিশোর, বোধহয় ঠাণ্ডার জন্যেই। দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল নিচে।
রাস্তায় এসে নামল কিশোর। গির্জার জানালায় আলোটা দেখা যাচ্ছে এখনও। ঘষা কাঁচের শার্সিতে ঘোলা প্রতিফলন। কাঁপছে অল্প অল্প। বৈদ্যুতিক আলো নয়!
গির্জার সদর-দরজা বন্ধ। সিঁড়ি বেয়ে পাল্লার কাছে উঠে এল কিশোর। আস্তে করে ঠেলা দিল। ভেজানই রয়েছে পাল্লা। খুলে গেল নিঃশব্দে। ভেতরে ঢুকে গেল সে।
পেছন ফিরে একটা বেদির কাছে দাঁড়িয়ে আছে মূর্তিটা। কালো আলখেল্লা। সাদা কলার। হাতে মোমবাতি।
শব্দ শুনে ঘুরল মূর্তি। স্থির হয়ে গেল কিশোর। পাদ্রীর পোশাক পরা একজন। মানুষ। বৃদ্ধ। লম্বা লম্বা চুল সব সাদা। গাল আর কপালের চামড়া কোঁচকানো।
কথা বলল না লোকটা। হাতের মোমবাতি তুলে নীরবে দেখছে কিশোরকে।
মাপ করবেন, ফাদার, কাঁপা গলায় বলল কিশোর, বাইরে থেকে আলো দেখলাম। চোরের উৎপাত রয়েছে তো। তাই দেখতে এসেছি। (অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাত নাড়ল লোকটা। তারপর হাত দিয়ে বাতাস করে নিবিয়ে। দিল মোম। গাঢ় অন্ধকার গ্রাস করল ঘরটাকে।
ফাদার! চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। ঘাড়ের কাছে লোম খাড়া হয়ে গেছে তার। মেরুদণ্ড বেয়ে শিরশির করে নেমে গেল ঠাণ্ডা ভয়ের স্রোত। পিছিয়ে এল এক পা। বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করল।

পাশ দিয়ে দমকা হাওয়ার মত ছুটে গেল কিছু একটা। জোর ধাক্কায় হুমড়ি খেয়ে মেঝেতে পড়ে গেল কিশোর। পরক্ষণেই পেছনে দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল ভারি দরজা।
কালিগোলা অন্ধকার। হুড়মুড় করে আবার উঠে পড়ল কিশোর। হাতড়ে হাতড়ে খুঁজে বের করল দরজার হাতল। টান দিল।
ইঞ্চিখানেক ফাঁক হল পাল্লা, তার বেশি না। কিসে যেন আটকে গেছে! জোরে ঠেলা দিয়েই আবার হ্যাঁচকা টান দিল কিশোর। আবারও সেই এক ইঞ্চি ফাঁক।
বাইরে থেকে তালা আটকে দেয়া হয়েছে দরজায়।

.

দরজার পাশে দেয়াল হাতড়াচ্ছে কিশোর। হাতে ঠেকে গেল সুইচ বোর্ড। একটার পর একটা সুইচ টিপে গেল সে। উজ্জ্বল আলো জ্বলে উঠল মাথার ওপর। আলোয়। ভরে গেল বিরাট ঘর।
দেয়ালের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াল কিশোর। ধীরে ধীরে ডান থেকে বায়ে সরাল নজর। কেউ নেই। আস্তে করে এগোল। এসে থামল, খানিক আগে যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল মূর্তিটা সেখানে। মেঝেতে পড়ে আছে কয়েক ফোঁটা মোম।
আবার দরজার কাছে ফিরে এল কিশোর। হাতল ধরে টান দিল। খুলল না। মনে হয়, বিড়বিড় করল সে আপনমনেই, ডাকার সময় হয়েছে! চৌকাঠ আর পাল্লার ফাঁকে মুখ রেখে চেঁচাতে শুরু করল সে, কে আছেন! আসুন! আমি আটকে গেছি! কে আছেন—চুপ করল। কান পাতল! কোন আওয়াজ নেই। দরজার গায়ে। জোরে জোরে চাপড় দিতে লাগল। মুসা! ফাদার স্মিথ! আমি আটকে গেছি!
জবাব নেই।
অপেক্ষা করল কিশোর, তারপর আবার চেঁচাল। আবার অপেক্ষার পালা।
ওখানে যাওয়া উচিত হবে না, ফাদার! শোনা গেল একটা মহিলাকণ্ঠ।
খামোকা ভয় পাচ্ছ, ব্রাইস, ফাদার স্মিথের গলা চিনতে পারল কিশোর। একা যাচ্ছি না আমি। পুলিশে ফোন করেছি। যে-কোন মুহূর্তে এসে পড়বে-..
ফাদার স্মিথ! চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। আমি কিশোর পাশা! তালা দিয়ে। আটকে রেখে গেছে আমাকে!
কিশোর পাশা? বাইরে দরজার কাছেই শোনা গেল ফাদারের বিস্মিত কণ্ঠ।
উইলশায়ারের দিক থেকে সাইরেনের শব্দ শোনা গেল। দরজার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল কিশোর। বুঝে গেছে, পুলিশ আসার আগে তালা খুলবেন না ফাদার। পুলিশের সঙ্গে সাক্ষাৎকারটা তার বিশেষ সুখকর হবে না, এটাও বুঝতে পারছে। গির্জার ভেতরে চোখ বোলাতে বোলাতে কুটি করল সে।

কাছে, আরও কাছে এসে গেল সাইরেনের শব্দ। থেমে গেল হঠাৎ।
তালায় চাবি ঢোকানর শব্দ হল। খুলে গেল দরজা।
শোবার পোশাক পরে দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন ফাদার স্মিথ। তার পাশে মিসেস ব্রাইস। ঘাড়ের ওপর নেমেছে চুল, তাড়াহুড়ো করে বেঁধেছে, দেখেই বোঝা যায়।
একটু সরুন, প্লীজ, ব্রাইসের পেছন থেকে বলল একজন পুলিশ।
বাঁ পাশে এক পা সরল ব্রাইস। তরুণ পেট্রলম্যানের চোখে চোখ পড়ল কিশোরের। আগের রাতে গির্জায় চোর খুঁজতে যারা যারা এসেছিল, এই লোকটাও তাদের একজন। পাশে আরেকজন, হাতে রিভলভার।
কি ব্যাপার? জিজ্ঞেস করল তরুণ অফিসার।
আঙুল তুলে দেখাল কিশোর, যেখানে পাদ্রীর পোশাক পরা লোকটাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল। গির্জার ভেতরে আলো জ্বলতে দেখলাম। এতরাতে কে ঢুকল, দেখতে এলাম। দেখি, ফাদারের পোশাক পরা এক বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে আছে ওখানটায়, হাতে মোম। আমাকে দেখেই আলো নিবিয়ে দিল। অন্ধকারে ধাক্কা দিয়ে ফেলে বেরিয়ে চলে গেল। তালা আটকে দিল দরজায়।
দেখতে এসেছিলে? বলল আরেক অফিসার।
হ্যাঁ। মিস্টার অলিভারের ঘরের জানালা থেকে দেখেছি, গির্জায় আলো।
ও, হা হা, মনে পড়েছে, বলে উঠলেন ফাদার। সকালে মিস্টার অলিভারের সঙ্গে দেখেছি তোমাকে। কিন্তু এত রাতে এখানে এক পাদ্রীকে দেখেছ! সেই সন্ধ্যা ছটায় আমি নিজে তালা লাগিয়ে গেছি দরজায়। আমি ছাড়া আর কোন ফাদার নেই এখানে। নিশ্চয় ভুল করেছ।
না করেনি! চেঁচিয়ে উঠল ব্রাইস। ফাদার, আপনি জানেন ও ভুল করেনি!
আহ্, আবার শুরু করলে! বিরক্ত কণ্ঠ ফাদারের। তোমার কি ধারণা, আবার সেই বৃদ্ধ পাদ্রী!
চুপ করুন আপনারা! পেছনে শোনা গেল আরেকটা কণ্ঠ। ফ্র্যাঙ্ক অলিভার। সঙ্গে এসেছে মুসা।
ওই ছেলেটা আমার মেহমান, কিশোরকে দেখিয়ে বললেন অলিভার। আজ রাতে ও আর ওর দুই বন্ধু আমার ঘরেই থাকছে। এই যে, এ হল মুসা আমান। আমাকে বলেছে, খানিক আগে গির্জার ভেতরে আলো দেখেছিল। কিশোরকে ডেকে দেখিয়েছে আলোটা। ব্যাপার কি দেখতে এসেছে কিশোর পাশা।
বিরক্ত চোখে কিশোরের দিক থেকে চোখ ফেরাল দ্বিতীয় পুলিশ অফিসার। মুসাকে দেখল, তারপর তাকাল অলিভারের দিকে। বাচ্চাদের এভাবে চোর-পুলিশ খেলা উচিত না। তাদের পক্ষে একজন বয়স্ক লোকের সাফাই গাওয়া আরও অনুচিত।

স্থির হয়ে গেলেন অলিভার। নাক কোচকালেন।
কিন্তু গির্জার ভেতরে আলো দেখেছি আমি! জোর দিয়ে বলল মুসা।
এবং কেউ একজন ছিল, যযাগ করল কিশোর। কালো আলখেল্লা, সাদা কলার। ফাদার স্মিথ, আপনি যেমন পরেন, তেমনি। ধবধবে সাদা লম্বা লম্বা চুল। হাতে ছিল একটা মোমবাতি।
পোলাপানের গপ্পো! বিড়বিড় করল পুলিশ অফিসার। খোকা, বল না যেন, কিছু চুরি গেছে গির্জা থেকে।
গেছেই তো, বলে বসল কিশোর। গতরাতে ছিল ওটা, এখন নেই। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল ফাদারের দিকে। একটা স্ট্যাচু ছিল ওখানটায়, একটা জানালার পাশে দেয়ালের একটা জায়গা নির্দেশ করল সে। সবুজ ফতুয়া গায়ে, মাথায় চোখা লম্বা, চুড়াঅলা টুপি, হাতে লাঠি।
ফাদারকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দরজার গোড়ায় এসে দাঁড়াল দুই পুলিশ অফিসার।
সত্যিই তো! ঠিকই বলেছে ছেলেটা, বলে উঠল তরুণ অফিসার। গতরাতে একটা মূর্তি ছিল ওখানে, সেইন্ট প্যাট্রিকের মূর্তি সম্ভবত! সব সময় যিনি সবুজ ফতুয়া পরে থাকেন, মাথায় বিশপের টুপি-কি যেন নাম টুপিটার, ফাদার?
দেয়ালের দিক থেকে চোখ ফেরালেন ফাদার। মাইটার, বিড়বিড় করে বললেন। সব সময়ই মাইটার মাথায় রাখেন সেইন্ট প্যাট্রিক, হাতে বিশপের। লাঠি।
তো কোথায় গেল মূর্তিটা? জানতে চাইল পুলিশ অফিসার।
এ গির্জায় কখনও সেইন্ট প্যাট্রিকের মূর্তি ছিল না, অস্বস্তি বোধ করছেন। ফাদার, কণ্ঠস্বরেই বোঝা যাচ্ছে। থাকার কথাও না। এটা সেইন্ট জুডসের গির্জা। অসম্ভবকে সম্ভব করার ব্যাপারে খ্যাতি আছে তার।
হু, তরুণ অফিসারের কণ্ঠে অবিশ্বাস। আপনার হাউসকীপার প্রায়ই বৃদ্ধ ফাদারকে দেখতে পায়, যেটা অসম্ভব। এই ছেলেটা তাকে দেখেছে, এটা অসম্ভব। গতরাতে আমরা কয়েকজন দেখেছি একটা মূর্তি, যা নাকি কখনও ছিলই না এ গির্জায়, এটা আরেক অসম্ভব। এই গির্জার কোথাও এক-আধটা মাইটার আছে?
চমকে উঠলেন যেন ফাদার। গতকাল আনা হয়েছিল। একটা মাইটার আর একটা বিশপের লাঠি।
কেন?
একটা বিশেষ অনুষ্ঠান ছিল, বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করলেন ফাদার। বড়দিন উপলক্ষে। গুরুজনদের সামনে অভিনয় করেছিল বাচ্চা-কাচ্চারা। মধ্যযুগে যেমন হত। ন্যাটিভিটি আর তিন জ্ঞানী লোকের ঘটনা অভিনীত হয়েছিল। অভিনয়ের শেষদিকে এসে ঢোকেন সমস্ত বিখ্যাত ব্যক্তি আর সাধুরা, তাঁদের মাঝে সেইন্ট

প্যাট্রিকও থাকেন। সেইন্ট প্যাট্রিক সাজানর জন্যেই ফতুয়া, টুপি আর লাঠি ভাড়া করে আনা হয়েছে। আজ আবার ফিরিয়ে দিয়ে এসেছি ওগুলো যেখান থেকে এনেছিলাম।
হ্যাঁ, হা! চেপে রাখা শ্বাসটা শব্দ করে ফেলল কিশোর। এতক্ষণে বুঝতে পারছি, কোথায় হাওয়া হয়ে গিয়েছিল চোরটা!
মানে? ভুরু কোঁচকাল তরুণ পুলিশ অফিসার।
একেবারে খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে, ভারিক্কি ভাবটা চেহারায় ফুটিয়ে তুলল কিশোর! গত সন্ধ্যায় এসেছিল এ-পাড়ায়। পাশের গলির এক বাড়িতে ঢুকেছিল। পুলিশের তাড়া খেয়ে এসে ঢুকল গির্জায়। বুঝতে পারল, এখানে ঢুকেও সহজে রেহাই পাবে না। পুলিশ আসবেই। চোখ পড়ল ফতুয়া, মাইটার আর লাঠির ওপর। উপস্থিত বুদ্ধি আছে চোরটার, কোন সন্দেহ নেই। তাড়াতাড়ি সেইন্ট প্যাট্রিক সেজে দেয়ালের গা ঘেঁষে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে গেল। চোখ এড়িয়ে গেল আপনাদের।
কিশোরের দিকে চেয়ে আছে দুই অফিসার। বিস্ময় ফুটেছে চোখে।
আপনারা খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে চলে গেলেন, বলে গেল কিশোর। গির্জার দরজায় তালা দিতে এল দারোয়ান, পল মিন। তখনও বেরোয়নি চোর, কিন্তু বেরোতে হবে। দরজা ছাড়া আর কোন পথ নেই। সেদিক দিয়ে বেরোতে গেলেই চোখে পড়ে যাবে দারোয়ানের। অগত্যা তাকে কোন কিছু দিয়ে মেরে বেহুশ করে পালিয়ে গেল। ফাদার, পলের হুশ ফিরেছে? কথা মনে করতে পারছে সে?
মাথা নাড়লেন ফাদার। তেমন কিছুই না। ও বলেছে, পেছন থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল কেউ। তারপর আর কিছু মনে নেই। ওর সঙ্গে বেশিক্ষণ কথা বলতে দেয়নি ডাক্তার। অবস্থা খারাপই!
হ্যাঁ, শানের ওপর পড়েছিল হয়ত, বলল কিশোর। জোরে বাড়ি খেয়েছে মাথায়। ভাল হয়ে উঠুক। চুরির ব্যাপারে কিছু একটা আলোকপাত করতে পারবে হয়ত—
বেচারা! বিড়বিড় করলেন ফাদার। মস্ত বোকামি করেছি কাল! ওর সঙ্গে আমারও আসা উচিত ছিল!
পুরো ব্যাপারটাই কেমন উদ্ভট! আপনমনেই বলল তরুণ অফিসার। রিপোর্ট কি লিখব! এক চোর, সেইন্টের পোশাক পরে লুকিয়ে থেকেছে! একটা বাচ্চা ছেলে বলছে, সে ভূত দেখেছে…
পাদ্রীর পোশাক পরা একজন মানুষকে দেখেছি, শুধরে দিল কিশোর। ভূত দেখেছি, একবারও বলিনি।
মানুষ কি করে ঢুকল? বলে উঠল তামারা ব্রাইস। তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর। দরজায় তালা দেয়া ছিল! ফাদার স্মিথ নিজে দিয়েছেন! ভূতই দেখেছ তুমি, খোকা! বুড়ো

ফাদারের ভূত। যাকে আমি দেখেছি।
দরজা যদি বন্ধই থাকবে, এই ছেলেটা ঢুকল কি করে? প্রশ্ন রাখল দ্বিতীয়। অফিসার। আসলে যে ঢুকেছে, সে তালা খুলেই ঢুকেছে। ফাদার, তালার চাবি কার কাছে থাকে?
অবশ্যই আমার কাছে, বললেন ফাদার। মাঝেসাঝে ব্রাইসের কাছেও দিই...আর একটা, দারোয়ান পলের কাছে—ওটা সম্ভবত হাসপাতালে, পকেটের আর সব জিনিসের সঙ্গে রয়েছে। আমারটা কিংবা পলেরটা হারিয়ে যেতে পারে, তাই বাড়তি আরও একটা চাবি আছে। রেকটরির নিচতলায়, কোট রাখার হ্যাঁঙারের পাশে, ছোট একটা হুকে ঝোলানো থাকে।
এখনও কি আছে চাবিটা, ফাদার? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
ঝট করে কিশোরের দিকে চোখ ফেরালেন ফাদার। দেখলেন এক মুহূর্ত। তারপর ঘুরে প্রায় ছুটে চলে গেলেন। কয়েক মিনিট পরেই ফিরে এলেন রেকটরি থেকে। মুখচোখ শুকনো। নেই!
কেউ কোন কথা বলল না।
এটা—এটা এক ধরনের বোকামি, আপনমনেই বললেন ফাদার। দুদুটো চাবি থাকতেও বাড়তি আরেকটা চাবি খোলা জায়গায় ঝুলিয়ে রাখা! তাহলে আর দরজায় তালা দেবার মানে কি হল!
সেটা আপনারা জানেন, ফস করে বলে বসল দ্বিতীয় অফিসার। ফাদার, মনে হচ্ছে, যে কেউ যে-কোন সময় ওখান থেকে চাবিটা নিতে পারে?
মাথা ঝোঁকালেন ফাদার। থমথমে চেহারা।
লেফটেন্যান্টকে ডাকা দরকার, সঙ্গীর দিকে চেয়ে বলল অফিসার। নিজের। কানেই শুনে যাক, সেইন্টের ছদ্মবেশে হাওয়া হয়ে গিয়েছে চোর। চাবি চুরি করে গির্জায় এসে ঢুকেছে পাদ্রীর প্রেতাত্মা!
নিচু গলায় বিড়বিড় করে কি পড়ছে তামারা ব্রাইস। ক্রুশ আঁকছে বুকে।
হাউসকীপারের দিকে চেয়ে বললেন ফাদার, আর কোন কাজ নেই এখানে আমাদের, ব্রাইস। চল, রেকটরিতে চল। চমৎকার এক কাপ চা খাওয়াবে আমাকে!

.

অলিভারের ঘরে থেকে, বাকি রাতটা পাহারা দিয়েই কাটাল তিন গোয়েন্দা। চোর বা ভূত, কোনটাই আর কোন উপদ্রব করল না। খুব ভোরে উঠলেন মিস্টার অলিভার। ডিম ভাজলেন, টোস্ট তৈরি করলেন। এসে ঢুকলেন বসার ঘরে।
এই যে, ছেলেরা, বললেন অলিভার। নাশতা রেডি। খেতে এস।
নীরবে কয়েক মিনিট খাওয়া চলল।

তারপর? জিজ্ঞেস করলেন অলিভার। কোন সিদ্ধান্তে আসতে পেরেছ?
হ্যাঁ, একটা ডিমের বেশির ভাগই মুখে পুরে দিয়েছে মুসা। চিবোতে চিবোতে বলল, এ-রহস্যের সমাধান করা আমাদের কম্মো নয়!
খুব তাড়াতাড়ি হতাশ হয়ে যাও তুমি, মুসা, গম্ভীর হয়ে বলল কিশোর। সবে। তো খেল রু। জমাট বাঁধতে শুরু করেছে রহস্য। প্রচুর চিন্তাভাবনা আর সময় ব্যয় করতে হবে এর পেছনে।
যেমন?
যেমন, চোর। গির্জায় কেন ঢুকেছিল, জানা দরকার। অন্তত অনুমান করতে পারা দরকার।
তাছাড়া, বললেন অলিভার, জানা দরকার, আমার ঘরে আসে যে ছায়াটা, ওটার সঙ্গে চোরের কি সম্পর্ক!
হ্যাঁ, বলল কিশোর। ঠিকই বলেছেন। ছায়া আর চোরের সঙ্গে যোগসাজশ থাকাটাও বিচিত্র নয়। আচ্ছা, মিস্টার অলিভার, ছায়াটা কি নির্দিষ্ট কোন একটা সময়েই দেখা যায়? দিনে বা রাতে? আমি দেখেছি দুবার, দুবারই সন্ধ্যাবেলা। আপনি?
ভাবলেন অলিভার। সাধারণত, শেষ বিকেলে কিংবা সন্ধ্যাবেলায়। দুএকবার দুপুরের পরেও দেখেছি।
মাঝরাতে, বা তারপর?
তখন তো ঘুমিয়েই থাকি। তবে কোন-কোনদিন আগে জেগে উঠি, এই পেচ্ছাপ-টেচ্ছাপ করার জন্যে। তবে ওসময় কখনও দেখিনি।
মাথা ঝোকাল কিশোর। তাহলে, আজ আর সারাদিন আমাদের থাকার কোন দরকার নেই। চলে যাব এখন। বিকেল নাগাদ ফিরে আসব। রকি বীচে যেতে হবে। কাজ আছে। বোঝা যাচ্ছে, ততক্ষণ আপনি নিরাপদ। আশা করছি, ছায়াটা ঢুকবে না ততক্ষণে।
নাশতা শেষ করে উঠে পড়ল ছেলেরা। বেরিয়ে এল ঘর থেকে। সিঁড়ি দিয়ে সবে চত্বরে নেমেছে, পুলের ধারে একটা চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল টমি গিলবার্ট।
এই যে ছেলেরা, ডাকল টমি। শুনলাম, গির্জায় নাকি ভূত দেখেছ গতরাতে? ওসব ব্যাপারে আমার খুব আগ্রহ। আমাকে যদি ডাকতে তখন!
ডাকব? টমির দিকে চেয়ে আছে কিশোর। কি করে? তখন তো আপনার কাজের সময়, দোকানে থাকার কথা।
গতরাতে ছুটি ছিল আমার। রোজই কাজ করে না লোকে।
ভূত দেখা গেছে, কি করে জানলেন? জিজ্ঞেস করল মুসা।

এ আর এমন কি কঠিন? যে পাড়ায় মিসেস ডেনভার আর ব্রাইস রয়েছে, সে পাড়ার লোকের খবর জানতে অসুবিধে হয় নাকি? ভোর হবার আগেই ছড়িয়ে পড়েছে খবর। বেড়ালটার কাছে শুনলাম।
বেড়াল! বিস্মিত রবিন।
ওই আর কি। বেড়াল-মানব, ব্রায়ান এনড্রু।
গেটের দিকে এগোল তিন গোয়েন্দা। সিঁড়ি বেয়ে রাস্তায় নামল। তাদের পিছু। নিল টমি।
একটু দাঁড়াও, ডাকল টমি। সত্যিই তোমরা তাকে দেখেছ?
কোন একজনকে দেখেছি, জবাব দিল কিশোর।
দাঁড়াল না তিন গোয়েন্দা। পেছনে টমিকে হাঁ করিয়ে রেখে দ্রুত হেঁটে এসে পড়ল উইলশায়ার স্ট্রীটে। বাস স্টেশনের দিকে চলল।
ওটাকে দেখলেই কেমন জানি গা ছমছম করে! বলল মুসা। ওই টমিটা! বাসে উঠে বসেছে ওরা।
কারণ সে ভূত-প্রেত সম্পর্কে আগ্রহী, বলল কিশোর। অতিপ্রাকৃত ব্যাপার স্যাপারে বিশ্বাসী। ওসব নিয়ে কথা বলতে ভালবাসে, সিটের পেছনে হেলান দিল গোয়েন্দাপ্রধান। ওর কিছু কিছু বিশ্বাস একেবারে অমূলক নয়। বড় বড় সব ধর্মেই বলে, লোভ আর খুব বেশি টাকা পয়সা থাকা ক্ষতিকর।
অর্থই সকল অনর্থের মূল, বলল রবিন।
খাঁটি কথা। তবে, আসলে তুমি কি বলতে চেয়েছ, বুঝেছি, মুসা। ওই টমি গিলবার্টের মাঝে অদ্ভুত কিছু একটা রয়েছে। রহস্যজনক কিছু একটা!
ঠিক সকাল সাড়ে নটায় রকি বীচে ফিরে এল তিন গোয়েন্দা।
প্যাসিও প্লেসে যা যা ঘটেছে, সব আবার তলিয়ে দেখা দরকার, বলল কিশোর। চল, আগে হেডকোয়ার্টারে যাই।
দশ মিনিট পর ট্রেলারের ভেতর এসে ঢুকল ওরা। পুরানোপোড়া ডেস্কটা ঘিরে বসল।
একসঙ্গে তিনটে রহস্যের সমাধান করতে হচ্ছে এখন আমাদের, আলোচনা শুরু করল কিশোর। এক নাম্বার, ওই ছায়া। কি ওটা, কার ছায়া, কি করে ঢোকে মিস্টার অলিভারের ঘরে? দুই, চোর-কুকুরের মূর্তিটা যে চুরি করেছে। কে সে? গির্জায় কি কাজ তার? শেষ, এবং তিন নাম্বারটা হল, পাদ্রীর ভূত। আসলেই কি সে ভূত? ছায়া, আর চোরের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক?
ছায়াটা কার, তা-তো জানিই আমরা, বলল মুসা। তুমি আর মিস্টার অলিভার, দুজনেই চিনতে পেরেছ। টমি গিলবার্ট।

দেখেছি সত্যি, মাথা ঝাঁকাল কিশোর, তবে চিনতে পেরেছি বলব না। পলকের জন্যে দেখেছি। তাই নিশ্চিত হতে পারছি না। তোমরা দুজনও যদি দেখতে, একমত হওয়া যেত।
ছায়াটা আর যাই হোক, বলল রবিন, মিসেস ডেনভারের নয়। সে শুধু তালা খুলে দরজা দিয়েই ঘরে ঢুকত, দেয়াল গলে আসত না।
আবার মাথা ঝোঁকাল কিশোর। এবং আকারেও ছায়াটার সঙ্গে অনেক অমিল। মহিলা বেঁটে, মোটা। ছায়াটা লম্বা, হালকা-পাতলা। টমির সঙ্গে মিলে যায়। কিন্তু বুঝতে পারছি না, কোন পথে কি করে ঢোকে সে এত নিঃশব্দে! আর, একজন। লোক একই সময়ে দুজায়গায় থাকে কি করে? দুবার তাকে মিস্টার অলিভারের ঘরে দেখেছি, দুবারই ওই সময়ে নিজের ঘরে ছিল সে। ঘুমোচ্ছিল, এবং ঝিমোচ্ছিল।
কাঁধ ঝাঁকাল মুসা। হয়ত অন্য কারও ছায়া!
কিন্তু মান্দালাটার কথা জানে টমি, মনে করিয়ে দিল রবিন। নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছে, যেন দেখেছে নিজের চোখে। মিস্টার অলিভার কখনও তাকে ঘরে ডেকে নেননি, এ-ব্যাপারেও সন্দেহ নেই।
অর্থাৎ, ছায়ার ব্যাপারে আমাদের প্রধান সন্দেহ, টমি গিলবার্ট, ব্যাপারটার ওপর আপাতত ইতি টানল কিশোর। তবে আমাদের হাতে কোন প্রমাণ নেই, কোনরকম ব্যাখ্যাও দিতে পারছি না ছায়াটার। আচ্ছা, এবার চোরের কথায় আসা যাক। নিশ্চয় ব্যাটা মিস্টার অলিভারের ভাড়াটে, কিংবা কোন প্রতিবেশী। কারণ, তার জানা আছে, গির্জার একটা চাবি ঝোলানো থাকে কোটের হ্যাঁঙারের পাশে, রেকটরিতে। তার আরও জানা আছে, কুকুরের মূর্তি...আচ্ছা, বার বার এই মূর্তি মূর্তি বলতে ভাল্লাগছে না! একটা কিছু নাম দেয়া যাক এর। কি নাম? বন্ধুদের দিকে তাকাল সে।
ভূতুড়ে কুকুর, বলল মুসা।
নাহ, ভাল্লাগছে না, মাথা নাড়ল রবিন। কাঁপাথিয়ান হাউণ্ড?...নাহ্, এটাও পছন্দ না...তাহলে কি? কিশোর, তুমি একটা বল।
শ্বাপদ-শ্বাপদ-হলে কেমন হয়?
ছায়াশ্বাপদ! চমৎকার! মুসা, তুমি কি বল?
মাথা দুলিয়ে সায় দিল মুসা।
বেশ, আবার আগের কথার খেই ধরল কিশোর। এবং এর মূল্য কতখানি, জানা আছে চোরের। কে জানতে পারে?
ছায়াটা, অনুমান করতে চাইছে মুসা, মিস্টার অলিভারের ঘরে ঢুকে তার ডায়েরীতে হয়ত লেখা দেখেছে। কিংবা ফোনে তিনি কারও সঙ্গে আলাপ

করেছিলেন, সে-সময় শুনেছে।
মিসেস ডেনভার হতে পারে? বলল রবিন। ও-তো মিস্টার অলিভারের কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করেছে। দেখে ফেলাটা অসম্ভব নয়।
ও জানলে ওই পুরো এলাকা জেনে যেত ওটার কথা, প্রতিবাদ করল মুসা।
জানেনি, কি করে শিওর হচ্ছ? কিশোর, তোমার কি মনে হয়? গোয়েন্দাপ্রধানের দিকে তাকাল রবিন। চুরি করার উদ্দেশ্যেই কি জ্যাক ইলিয়টের ঘরে ঢুকেছিল চোর?
বলা শক্ত। কি করে সে জানল, তখন রয়েছে ওখানে? হয়ত মূল্যবান কিছু চুরির উদ্দেশ্যেই ঢুকেছিল, পেয়ে গেছে মূর্তিটা। ওই পাড়ার কেউ হয়ে। থাকলে, নিশ্চয় জানা ছিল, বাড়িটা খালি পড়ে আছে। ঢুকে পড়েছে। ওর কপাল খারাপ, রাস্তার মোড়েই ছিল পুলিশ। মিকোর চেঁচামেচি শুনে তাড়া করে এল তারা। ছুটে গিয়ে গির্জায় ঢুকে পড়ল চোর। সেইন্ট প্যাট্রিকের স্ট্যাচু সেজে দাঁড়িয়ে গেল দেয়াল ঘেষে। সাহস আছে বলতে হবে!
তারপর, পুলিশ চলে গেল, কিশোরের কথার পিঠে বলল রবিন। তালা দিতে এল দারোয়ান পল। তাকে আহত করে পালাল চোর।
আমার মনে হয়, শুধু বেরিয়ে যাবার জন্যে পলকে আহত করেনি চোর, বলল কিশোর। তাহলে এত গুরুতর জখম করত না হয়ত, ওকে হাসপাতালে কিছু দিনের জন্যে সরিয়ে দিতেই কাজটা করেছে সে। গির্জায়ই কোথাও লুকিয়ে। রেখেছিল ছায়াশ্বাপদ। পরের রাতে এসে আবার নিয়ে যাবার ইচ্ছে। পল থাকলে। সেটা করতে অসুবিধে। তাই বেচারাকে প্রচণ্ড মার খেতে হল। মেরেই ফেলতে চেয়েছিল কিনা, কে জানে!
কিন্তু কেন? প্রশ্ন রাখল মুসা। যা শুনেছি, জিনিসটা খুব বেশি বড় নয়। পকেটে নিয়েই স্বচ্ছন্দে বেরিয়ে যেতে পারত চোর। এত সব ঝামেলায় গেল কেন?
পারত, কিন্তু খুব বেশি ঝুঁকি হয়ে যেত, বলল কিশোর। ওর হয়ত ভয় ছিল, স্কোয়াড কারগুলো আবার ফিরে আসতে পারে, কিংবা সবগুলো তখনও যায়ইনি এলাকা ছেড়ে-আড়ালে থেকে গির্জার ওপর চোখ রেখেছে পুলিশ। কিংবা হয়ত পাড়ার সব বাড়িতে তল্লাশি চালাবে রাতের কোন এক সময়ে। তারচেয়ে গির্জায় লুকিয়ে রেখে যাওয়াটাই নিরাপদ মনে করেছিল সে।
তারপর পাদ্রীর ভূতের ছদ্মবেশে গতরাতে আবার এসে ঢুকেছে গির্জায়?
আমার তাই ধারণা। এমনিতেই এমন একটা গুজব ছড়িয়ে আছে ওই এলাকায়। বৃদ্ধ পাদ্রীর ছদ্মবেশ নিয়ে সে বুদ্ধিমানের কাজই করেছে। আমি সামনাসামনি দেখেও চিনতে পারিনি। হয়ত কেউই পারত না। বরং তাৎক্ষণিক একটা ধাঁধায় ফেলে দিত যে-কোন দর্শককে, আমাকে যেমন দিয়েছিল।

বেশ, বলল রবিন, বুঝলাম। কিন্তু এই সাধু পুরুষটি কে?
আর কে? সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিয়ে দিল মুসা, টমি গিলবার্ট। ভূত-প্রেত তার বিষয়। তাছাড়া গতরাতে ডিউটি ছিল না তার। ওই অদ্ভুত ছদ্মবেশ নেবার কথা তার মাথায়ই তো আসবে!
আমি কিন্তু মানতে পারছি না, গম্ভীর হয়ে আছে কিশোর। টাকাপয়সার লোভ তার আছে বলে মনে হয় না। এ-ধরনের অদ্ভুত সাধনা যারা করে, তাদের। প্রথম পাঠই হল, জাগতিক লোভ আর আকর্ষণ ত্যাগ করা।
কিন্তু ওর টাকার দরকার, উত্তেজিত হয়ে পড়েছে রবিন। ভারতে যাবার জন্যে প্রচুর টাকা দরকার।
ঠিক, ঠিকই বলেছে রবিন! প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মুসা।
ভুলে যাচ্ছ কেন, পুলিশ যখন চোরটাকে তাড়া করেছিল, টমি ঘুমিয়ে ছিল। তার ঘরে, মনে করিয়ে দিল কিশোর। পুলিশ যখন গির্জার ভেতরে খোঁজাখুঁজি করছে, টমি আমাদের সঙ্গেই বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। চোর তখন মূর্তি সেজে গির্জার ভেতরেই ছিল।
কিন্তু, একই সঙ্গে দুজায়গায় থাকতে পারে শুধু টমি, যুক্তি দেখাল রবিন। তার পক্ষেই গির্জার ভেতরে-বাইরে একই সময়ে থাকা সম্ভব।
জোরে জোরে মাথা নাড়ল কিশোর। অতি কল্পনা! তবে, টমি কিছু একটা ঘটাচ্ছে, এতে কোন সন্দেহ নেই। লোকটার ওপর চোখ রাখা দরকার... থেমে গেল টেলিফোনের শব্দে। প্রায় ছোঁ মেরে তুলে নিল রিসিভার। হ্যালো..ও, মিস্টার অলিভার?...এক সেকেণ্ড। একটা সুইচ টিপে দিল। হ্যাঁ, এবার বলুন।
টেলিফোন লাইনের সঙ্গে স্পীকারের যোগাযোগ করে নিয়েছে কিশোর। হেডকোয়ার্টারে বসা সবাই একই সঙ্গে কথা শোনার জন্যে।
এইমাত্র টেলিফোন করেছিল একটা লোক, স্পীকারে শোনা গেল অলিভারের কথা, কাঁপা কাঁপা, উত্তেজিত। কুকুরের মূর্তিটা আছে এখন ওর কাছে। তোমাদের সন্দেহ ছিল, এমন একটা জিনিস বিক্রি করতে পারবে না সে সহজে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, পারছে। ভাল ক্রেতাকেই খুঁজে বের করেছে সে। আমি। দশ হাজার ডলার। দাম চেয়েছে সে আমার কাছে!

.

বোমা ফেটেছে যেন ট্রেলারের ভেতর। স্তব্ধ হয়ে গেছে তিন গোয়েন্দা।
কিশোর? আছ তুমি ওখানে? আবার শোনা গেল অলিভারের উত্তেজিত কণ্ঠ।
আঁ-হা! বলুন! কোনমতে বলল কিশোর।
আমি...আমি মনস্থির করতে পারছি না, বললেন অলিভার। একটা চোরের সঙ্গে হাত মেলাব? কিন্তু মূর্তিটাও যে আমার দরকার! ওটা হাতছাড়া করতে পারব না

কিছুতেই। টাকাটা দিয়েই দেব কিনা ভাবছি! আমারই জিনিস ওটা। জ্যাককে টাকা মিটিয়ে দিয়েছি। কাজেই চোরের কাছ থেকে আমি আবার ওটা কিনে নিলে কারও কিছু বলার নেই। দুদিন সময় দিয়েছে সে আমাকে।
পুলিশকে জানিয়েছেন?
ইচ্ছে নেই। চোরটাকে ভয় পাইয়ে দিতে চাই না। তাহলে হয়ত চিরদিনের জন্যেই হারাব মূর্তিটা।
ভেবে দেখুন ভাল করে, বলল কিশোর। ভয়ানক এক অপরাধীর সঙ্গে হাত মেলাতে যাচ্ছেন। পলকে কি করেছে সে, জানেন।
জানি। ভয় পেয়ে গিয়েছিল চোরটা, জান বাঁচানো ফরজ ভেবেছে। পলকে বেহুশ করে পালিয়ে গেছে। আমাকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই তার, তেমন কিছু করব না।
তো, তোমরা কখন আসছ? একা একা ভাল লাগছে না আমার, কেমন যেন। অস্বস্তি বোধ করছি।
ছায়াটা এসেছিল আর?
না। তবে, এসে পড়তে পারে...সত্যি বড় ভয় পাচ্ছি আমি!
তিনটার বাস ধরব আমরা, দুই সঙ্গীর দিকে তাকাল কিশোর। ওদের মত জানতে চাইছে। মাথা ঝোকাল ওরা। আঁধার নামার আগেই পৌঁছে যাব।
গুড বাই জানিয়ে রিসিভার রেখে দিল কিশোর। মেরেছে। এবার চোরের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে তাঁকে! বাড়তি কিছু কাপড়-চোপড় সঙ্গে নেব, ভাবছি। মিস্টার অলিভারের ওখানে দিনকয়েক থাকার দরকার হতে পারে। তিনটার আগেই বাস স্টেশনে চলে এস। ঠিক আছে?
মাথা ঝোকাল মুসা। টমির ওপর চোখ রাখবে বললে...
পরে আলোচনা করব ওসব নিয়ে। এখন কিছু জরুরি কাজ সারতে হবে।
বেরিয়ে চলে গেল রবিন আর মুসা। রবিনের কিছু কাজ আছে লাইব্রেরিতে, সেখানে যাবে। মুসা সোজা চলে গেল বাড়িতে। তার খিদে পেয়েছে।
কিশোরও বেরোল। লোহার একটা আলমারির মরচে পরিষ্কার করায় মন দিল। সিরিশ কাগজ দিয়ে ঘষে। আসলে কোন একটা কাজে মগ্ন থেকে ভাবতে চাইছে সে ঠাণ্ডা মাথায়। দুপুরের খাবার খেতে ডাকলেন মেরিচাচী। খেয়ে এসে সোজা নিজের ওয়ার্কশপে ঢুকল কিশোর। ইলেকট্রনিক কিছু যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ শুরু করে দিল। শেষে যন্ত্রপাতিগুলো বাক্সে গুছিয়ে ভরে নিল। সময় হয়ে গেছে। বাক্সটা নিয়ে বাস স্টেশনের দিকে রওনা হল সে।
আরে! ওই বাক্সের ভেতর কি? কৌতূহল ঝরল রবিনের গলায়। নতুন কোন আবিষ্কার?

একটা ক্লোজড-সার্কিট টেলিভিশন ক্যামেরা আর রিসিভার, জানাল। কিশোর। একটা ডিপার্টমেন্ট স্টোরে ব্যবহার হয়েছে।
হ্যাঁ, বলল মুসাঁ। আজকাল বেশির ভাগ বড় দোকানেই এ-জিনিস ব্যবহার হচ্ছে। চোর ধরার জন্যে।
তোমারটা কোথায় পেলে? জানতে চাইল রবিন।
স্টোরে আগুন লেগেছিল, বলল কিশোর। অনেক জিনিসপত্র নষ্ট হয়েছে। এটাও নষ্ট হয়েছিল। অন্যান্য জিনিসপত্রের সঙ্গে চাচা কিনে নিয়ে এসেছেন। খুলে দেখলাম, খুব বেশি কিছু খারাপ হয়নি। সহজেই ঠিক করে নিলাম।
এর সাহায্যেই টমির ওপর চোখ রাখব?
হ্যাঁ। চত্বরের দিকে কোন জানালা নেই মিস্টার অলিভারের ঘরে। ব্যালকনিতে বসে চোখ রাখা যাবে না। আমরা যাকে দেখব, সে-ও আমাদের দেখে ফেলবে। কাজেই, এই যন্ত্রটা ছাড়া উপায় নেই। সিঁড়ির নিচে বড় একটা ফুল গাছের ঝাড় আছে। ওটার ভেতর লুকিয়ে রাখব ক্যামেরাটা। ঘরে বসে আরামসে চোখ রাখতে পারব।
খাইছে! কিশোর, তোমার তুলনা হয় না! জোরে হাততালি দিল মুসা। ব্যক্তিগত চ্যানেলে টিভি দেখব আজ!
এক ঘণ্টা পর। মিস্টার অলিভারের বাড়িতে এসে পৌঁছল তিন গোয়েন্দা। ঢোকার মুখেই গেটে দেখা হয়ে গেল সদা-উপস্থিত মিসেস ডেনভারের সঙ্গে।
আবার এসেছ? বাক্সটার দিকে চেয়ে আছে মহিলা। এটার ভেতর কি?
একটা টেলিভিশন সেট, সহজ গলায় বলল কিশোর। মিস্টার অলিভারের জন্যে বড়দিনের উপহার।
মহিলার কাঁধের ওপর দিয়ে তাকাল গোয়েন্দাপ্রধান। পুলের ধারে চেয়ারে বসে ধূমপান করছে জ্যাকবস। উপভোগ করছে পড়ন্ত বেলার রোদ। পাশে গামলার মত সেই অ্যাশট্রেটা। প্রতি দুই কি তিন সেকেণ্ড পর পরই ছাই ঝাড়ছে তাতে।
কিশোর তাকাতেই হাসল। মিস্টার অলিভারের ওখানে থাকবে আজ রাতে?
ইচ্ছে আছে, জবাব দিল কিশোর।
ভাল, অ্যাশট্রেতে ঠেসে সিগারেট নেবাল জ্যাকবস। পরীক্ষা করে দেখল, সত্যিই নিবেছে কিনা আগুন। চোখ তুলল। মানুষটা বড় বেশি একা। মাঝেমধ্যে সঙ্গ পেলে ভালই লাগবে। আমি তো একা থাকতেই পারি না। আমার ভাগ্নেটা গেছে তার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে। দুদিনেই একা একা লাগতে শুরু করেছে আমার। উঠে দাঁড়াল সে। চলে গেল তার ফ্ল্যাটের দিকে।
দোরগোড়াতেই ছেলেদের জন্যে অপেক্ষা করছেন অলিভার। টেলিভিশন ক্যামেরাটা দেখে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন তিনি। কখন সেট করবে?

সাঁঝের দিকে, বলল কিশোর, অন্ধকার হয়ে এলে। এই সাড়ে পাঁচটা নাগাদ।
হ্যাঁ, সেটাই উপযুক্ত সময়, বললেন অলিভার। তবে তাড়াতাড়ি করতে হবে। তোমাকে। অন্ধকার হয়ে যাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চত্বরে আলো জ্বলে ওঠে আপনাআপনি।
৫-২০-এ ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াল কিশোর। আশপাশটা দেখল। পেছনে। চেয়ে নিচু গলায় বলল, বের করে নিয়ে এস। কেউ নেই।
দ্রুত সিঁড়ির গোড়ায় এসে দাঁড়াল তিন গোয়েন্দা। একটা ধাতব তেপায়ার ওপর ক্যামেরাটা বসাল কিশোর, কায়দা করে লুকিয়ে রাখল ফুলঝাড়ের ভেতর। দ্রুতহাতে লেন্স অ্যাডজাস্ট করল, প্রায় পুরো চত্বরটাই এসে গেল ক্যামেরার চোখের নাগালে।
ট্রানজিসটরাইজড করা আছে ক্যামেরাটা, আবার ঘরে ঢুকে দুই সঙ্গীকে বলল কিশোর। ব্যাটারিতে চলে। দূরত্ব খুব বেশি না, তবে আমাদের কাজের জন্যে যথেষ্ট।
সদর দরজা বন্ধ করে দিল কিশোর। একটা বুককেসের ওপর রাখল টেলিভিশনটা। বৈদ্যুতিক লাইনের সঙ্গে কানেকশন করে দিয়ে ডায়াল ঘোরাল।– সেকেণ্ডখানেক পরেই আবছা আলো দেখা গেল পর্দায়, কাঁপছে।
কই? বলে উঠল মুসা, কিছুই তো দেখা যাচ্ছে না!
যাবে, বলল গোয়েন্দাপ্রধান। চত্বরে আলো জ্বলে উঠলেই দেখতে পাবে।
মিনিট কয়েক পরেই দপ করে জ্বলে উঠল আলো। উৎসুক চোখে তাকিয়ে আছে ওরা টেলিভিশনের পর্দার দিকে। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে পুরো চত্বরটী। নির্জন।
প্রথমে টমি গিলবার্টকে দেখা গেল। ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে পাশের সরু গলি ধরে চলে গেল। ফিরে এল খানিক পরেই। হাতে একটা লন্ড্রি ব্যাগ। আবার নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল সে।
তারপর দেখা গেল একটা মেয়েকে, সোনালি চুল। সামনের গেট দিয়ে চত্বরে ঢুকল।
লারিসা ল্যাটনিনা, বললেন অলিভার।
গটগট করে নিজের ফ্ল্যাটের সামনে গিয়ে দাঁড়াল লারিসা। চাবি বের করে তালায় ঢোকাল। ঠিক এই সময় তার পেছনে এসে উদয় হল মিসেস ডেনভার। হাতে ছোট একটা প্যাকেট।
নিশ্চয় ডাকে এসেছে, কিংবা কেউ দিয়ে গেছে প্যাকেটটা, বললেন অলিভার। লারিসার জন্যে। ভাড়াটেরা যখন বাড়ি থাকে না, তাদের কোন জিনিস এলে সই করে রেখে দেয় ম্যানেজার। এটা তার দায়িত্ব।
নিশ্চয় কাজটা তার খুব পছন্দ, বলল মুসা।

ঠিক ধরেছ, বললেন অলিভার। চুরি করে খুলে দেখে নিশ্চয়। ভাড়াটেদের সম্পর্কে জ্ঞান আরও বাড়ে তার। বদস্বভাব!
প্যাকেটটা লারিসার হাতে তুলে দিয়েছে ম্যানেজার। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। নিশ্চয় জানতে চাইছে ভেতরে কি আছে।
হতাশ একটা ভঙ্গি ফুটল লারিসার হাবভাবে। হাতের ব্যাগটা নামিয়ে রেখে, প্যাকেটের মোড়ক খুলতে শুরু করল।
এই সময় নিজের ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে এল জ্যাকবস। থেমে দাঁড়াল। লারিসা আর মিসেস ডেনভার কি করছে, দেখছে।
লোকের গোপনীয়তা বলতে কিছু নেই এ-বাড়িতে! বলেই ফেলল মুসা।
বিরক্তিতে মুখ বাঁকালেন অলিভার। ওই বুড়িটার কথা কেন শুনছে লারিসা! দেখাব না, বলে মানা করে দিলেই হত! খুব বেশি সরল।
মোড়ক খুলে ফেলেছে লারিসা। একটা টিনের বাক্স। ডালা খুলল। হাসি ফুটল তার মুখে। দুই আঙুলে কিছু একটা বের করে এনেই মুখে ফেলল। মিসেস ডেনভারকেও সাধল। মাথা নাড়ল ম্যানেজার।
চকলেট, বলল কিশোর।
খামোকা সাঁতার কাটে! বললেন অলিভার। অতিরিক্ত মিষ্টি খাওয়া বাদ। দিলেই হয়ে যেত। মোটা হয়ে যাওয়ার ভয় থাকত না আর।
বাক্স থেকে আরেকটা চকলেট বের করে মুখে ফেলল লারিসা। ডালা বন্ধ করল। হঠাৎ ঝটকা দিয়ে গলার কাছে উঠে এল তার হাত। বাক্সটা খসে পড়ে গেল। ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেল চকলেটগুলো।
আরে...! কথা আটকে গেল মুসার।
টলে উঠল লারিসা। সামনের দিকে বাঁকা হয়ে গেল। পড়ে গেল হুমড়ি খেয়ে। হাত-পা ছুঁড়ছে, মোচড়াচ্ছে শরীরটা।
লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল তিন কিশোর। হ্যাঁচকা টানে সদর দরজা খুলে ফেলল কিশোর, বেরিয়ে এল। এক এক লাফে তিনটে করে সিঁড়ি টপকে নেমে চলল নিচে।
মিস ল্যাটনিনা! কানে আসছে ম্যানেজারের শঙ্কিত কণ্ঠ। কি হয়েছে?
ব্যথা! গুঙিয়ে উঠল লারিসা। জ্বলে যাচ্ছে...ওহহ!...মাগো...
ছুটে এসে দাঁড়াল কিশোর। নিচু হয়ে একটা চকলেট তুলে নিল। পাশে এসে দাঁড়াল মুসা আর রবিন। অলিভার এলেন। হাঁপাচ্ছেন তিনি।
তীক্ষ্ণ চোখে চকলেটটা দেখল কিশোর। নাকের কাছে তুলে এনে শুকল। ফিরে চাইল।

লারিসার ওপর ঝুঁকে বসেছে জ্যাকবস। টমি গিলবার্টও বেরিয়ে এসেছে। বেরোচ্ছে ব্রায়ান এনড্রু।
কিশোরের হাত খামচে ধরল মিসেস ডেনভার। কি…কি আছে ওটাতে?
তালুতে রেখেই চাপ দিয়ে চকলেটটা দলে-মুচড়ে ফেলল কিশোর। আবার। নিয়ে এল নাকের কাছে। শুকল। চেঁচিয়ে উঠল, জলদি! জলদি অ্যামবুলেন্স ডাকুন! মনে হয় বিষ খাওয়ানো হয়েছে মিস ল্যাটনিনাকে!
অ্যামবুলেন্স ডাকার সময় নেই! চেঁচিয়ে বলল জ্যাকবস। আমার গাড়িতে করেই নিয়ে যাচ্ছি ইমার্জেন্সীতে!
আমি যাব আপনার সঙ্গে! বলে উঠল মিসেস ডেনভার।
বাক্সতে তুলে চকলেটগুলোও নিয়ে যান, বলল কিশোর। পরীক্ষা করে দেখতে পারবে।
গ্যারেজ থেকে দ্রুত গাড়ি বের করল জ্যাকবস। পাজাকোলা করে লারিসাকে তুলে নিল মুসা। গাড়িতে তুলে দিল। একটা কম্বল এনে মেয়েটার গায়ে জড়াল। মিসেস ডেনভার। চকলেটসহ বাক্সটা তার হাতে গুঁজে দিল কিশোর। ছুটে বেরিয়ে গেল গাড়িটা।
বিষ! এতক্ষণে কথা বললেন অলিভার। বেচারি! বিষ খাওয়াল কে?
বিষই কিনা জানি না, মিস্টার অলিভার! পুলের দিকে চেয়ে আছে কিশোর। অদ্ভুত একটা গন্ধ পেলাম চকলেটটাতে!
দুই ঘণ্টা পরে ফিরে এল জ্যাকবস আর মিসেস ডেনভার। সেন্ট্রাল হসপিটালে রেখে এসেছে লারিসাকে। ক্লান্ত, বিষণ্ন চেহারা দুজনেরই।
নিজেকে এত অপরাধী মনে হয়নি আর কখনও! বলল ম্যানেজার।
কি হয়েছে? জিজ্ঞেস করলেন অলিভার। তিন গোয়েন্দাকে নিয়ে সবে রাতের খাওয়া শেষ করেছেন, এই সময় জ্যাকবসের গাড়ির শব্দ কানে এল। চারজনেই ছুটে নেমে এসেছে চত্বরে।
পুলিশ! মুখ বাঁকাল মিসেস ডেনভার। বিচ্ছিরি সব প্রশ্ন করতে শুরু করল! কতক্ষণ বাক্সটা আমার কাছে রেখেছি, কোথায় রেখেছি, কেন রেখেছি, এমনি সব প্রশ্ন। আমি কি করেছি না করেছি তাতে তোমাদের কি, বাপু!
আসলে কি ঘটেছে, বের করার চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ, জ্যাকবসের কণ্ঠে ক্লান্তি।
বের করার চেষ্টা চালাচ্ছে? ওদের কি ধারণা, আমি বিষ খাইয়েছি মেয়েটাকে? ওদের জানা উচিত, জীবনে মানুষ তো দূরের কথা, কোন ইঁদুরকেও বিষ খাওয়াইনি আমি! শেষদিকে ধরে এল ম্যানেজারের গলা। গটমট করে হেঁটে গিয়ে দরজা খুলে ফেলল নিজের ফ্ল্যাটের। ভেতরে ঢুকে দড়াম করে বন্ধ করে দিল। আবার। তালা লাগানর শব্দ হল।

কি হয়েছিল, জ্যাকবস? বেরিয়ে এসেছে এনড্রু।
বিষাক্ত কিছু ছিল চকলেটে, জানাল জ্যাকবস, ডাক্তারদের ধারণা। হাসপাতালের ল্যাবরেটরিতে নিয়ে গেছে অ্যানালাইসিসের জন্যে। মিস ল্যাটনিনার স্টমাক ওয়াশ করে একটা প্রাইভেট রুমে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সারারাত পর্যবেক্ষণে রাখবে ডাক্তারুরা। পুলিশকে খবর দেয়া হল। ওরা এসেই ঘেঁকে ধরল মিসেস ডেনভারকে। প্রশ্নের পর প্রশ্ন, নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছে বেচারিকে। ভালই হয়েছে। শিক্ষা হবে এতে কিছুটা। আক্কেল থাকলে জীবনে আর অন্যের ব্যাপারে নাক গলাবে না। ব্যাপারটা যেভাবে ঘটেছে, যে কারোরই প্রথম সন্দেহ পড়বে তার ওপর।
চকলেট এসেছে কিভাবে, জানেন? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
ডাকে। অস্বাভাবিক কিছু নয়।
খুলে গেল মিসেস ডেনভারের দরজা। এরই মাঝে অনেকটা সামলে নিয়েছে। বেরিয়েই পুলের দিকে তাকাল। প্রতিটি খারাপ ঘটনার একটা ভাল দিকও থাকে। যা আবহাওয়া আর ঠাণ্ডা, ইদানীং শুধু লারিসাই নামত পুলে। দিন কয়েক আর নামতে পারবে না। এই সুযোগে পানি সরিয়ে পুলটা পরিষ্কার করে ফেলতে পারব। অনেকদিন পরিষ্কার করা হয়নি।
কি যেন বলার জন্যে মুখ খুলেও থেমে গেল জ্যাকবস। কাঁধ ঝাঁকাল। সিগারেট ধরিয়ে টানতে টানতে চলে গেল নিজের ঘরের দিকে। এনড্রুও চলে গেল।
ম্যানেজারের দিকে তাকালেন অলিভার। চোখে ঘৃণা- তিনিও এগিয়ে গেলেন সিঁড়ির দিকে। ব্যালকনিতে উঠে দাঁড়ালেন। ছেলেদের দিকে চেয়ে বললেন, মায়ামমতা বলতে কিছু নেই বুড়িটার! ওদিকে মারা যাচ্ছে মেয়েটা! আর বুড়ি বলছে, ভালই হয়েছে! পুল পরিষ্কারের সময় পাওয়া গেল! ওটাকে এবার তাড়াব আমি!
কে বিষ খাওয়াল মেয়েটাকে? ঘরে ঢুকেই আরেকবার প্রশ্নটা করলেন অলিভার।
এমন কেউ, যে মিস ল্যাটনিনার স্বভাব-চরিত্র জানে, বলল কিশোর, যে জানে, সে কখন কি করে না করে। জানে, চকলেট তার প্রিয় জিনিস, পেলেই খাবে। কিন্তু আমার প্রশ্ন, কেন বিষ খাওয়ানো হল তাকে?।
কেউ কোন জবাব দিল না।
আড়াআড়ি পা মুড়ে মেঝেতেই বসে পড়ল কিশোর। টেলিভিশনের ওপর চোখ রাখতে সুবিধে।
বেশ মজার জায়গায় বাস করেন আপনি, মিস্টার অলিভার, টিভির পর্দার দিকে চেয়ে আছে কিশোর। শূন্য চতুর। মাত্র তিন দিন আপনার সঙ্গে আমাদের পরিচয়। এখানে এসেছি, সে-ও তিন দিন। এরই মাঝে কয়টা ঘটনা ঘটল! দুবার অদ্ভুত

এক ছায়াকে দেখলাম, চুরি করে ঘরে ঢুকে ধরা পড়ল মিসেস ডেনভার, দামি। একটা জিনিস চুরি হল, তারপর সেই জিনিসের জন্যে টাকাও দাবি করল চোর। এখন, আপনার এক ভাড়াটেকে বিছু খাওয়াল কেউ।
গির্জার দারোয়ানের কথা বাদ দিলে কেন? মনে করিয়ে দিল রবিন। তাকে মেরে বেহুশ করে ফেলে রেখে গেল। তুমি গিয়ে ভূত দেখলে গির্জায়, আটকা পড়লে।
একটা ঘটনার সঙ্গে আরেকটা ঠিক মেলে না! আপনমনেই বলল গোয়েন্দাপ্রধান। কিন্তু, আমার ধারণা, প্রতিটি ঘটনার সঙ্গে কোথাও একটা যোগসূত্র রয়েছে। একটা জিনিস বোঝা যাচ্ছে। ঘটনার কেন্দ্রস্থল এই বাড়িটা। যা-ই ঘটছে, এর ভেতরে, কিংবা আশপাশে, কাছাকাছি।
হ্যাঁ, সায় দিল মুসা। আর ঘটছে, টমি গিলবার্ট যখন বাড়ি থাকছে তখন। ও কাজে চলে গেলে আর কিছু ঘটে না।
ঝট করে মাথা তুললেন অলিভার। দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন পুরো ঘরে। চাপা গলায় বললেন, আস্তে! কে জানে, এ মুহূর্তে হয়ত এ-ঘরেই রয়েছে সে। ছায়া হয়ে। আমাদের কথা শুনছে!
উঠে পড়ল রবিন। সব কটা আলো জ্বেলে প্রতিটি কামরা ভাল করে দেখে এল। না, কোথাও ছায়াটা চোখে পড়ল না। কিন্তু তবু নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না অলিভার। শঙ্কা গেল না চেহারা থেকে। উঠে গিয়ে এঁটো বাসন-পেয়ালা ধোয়ায় মন দিলেন। টেলিভিশনের সামনে বসে রইল তিন গোয়েন্দা।
পরের কয়েকটা ঘণ্টা কিছুই ঘটল না। চত্বরে কেউই বেরোল না, মিসেস ডেনভার ছাড়া। ময়লা ফেলার জন্য বেরিয়েছিল। ডাস্টবিনে ফেলে দিয়েই আবার গিয়ে ঘরে ঢুকেছে। বিরক্ত হয়ে উঠছে ছেলেরা, চোখে ঘুম।
দেখ! হঠাৎ শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল কিশোরের।
পর্দায় দেখা গেল, ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে টমি। পুলের কিনারে এসে দাঁড়াল। চেয়ে আছে পানির দিকে। ঘুম চলে গেল মুসা আর রবিনের চোখ থেকেও।
জ্যাকবসের ঘরের দরজা খুলে গেল এই সময়। বেরিয়ে এল সে। ঠোঁটে সিগারেট, হাতে অ্যাশট্রে। কাছে এসে মাথাটা সামান্য একটু নোয়াল টমির দিকে চেয়ে। একটা টেবিলে অ্যাশট্রে রেখে তাতে সিগারেট চেপে নেবাল। গেট দিয়ে বেরিয়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত পরেই গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ শোনা গেল। মুসা গিয়ে দাঁড়াল একটা জানালার কাছে, রাস্তার দিকে তাকাল।
কোথাও যাচ্ছে সে, জানালার কাছ থেকেই বলল মুসা। খুব জোরে চালাচ্ছে।
হয়ত হাওয়া খেতে যাচ্ছে, বললেন অলিভার। ঘুম আসছে না হয়ত। অস্বস্তি বোধ করছে। হাসপাতাল থেকে ফিরে অনেকেরই এমন হয়।
ঘরে ফিরে গেল টমি। পর্দা টেনে দিল জানালার।

খাইছে! আবার টেলিভিশনের সামনে এসে বসেছে মুসা। ব্যাটা কি করছে, দেখতে পাব না আর!
কাপড় পরছে হয়ত, বলল কিশোর। কাজে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছে। মাঝরাত থেকে তার ডিউটি।
ঠিক এই সময় নিবে গেল চত্বরের আলো। সেই সঙ্গে নিবে গেল টেলিভিশনের পর্দার আলো। হালকা ধূসর-নীল একটা উজ্জ্বলতা রয়েছে শুধু, টমির জানালার আলো কোনাকুনিভাবে পড়েছে ক্যামেরার চোখে।
আরও ভাল হয়েছে! চেঁচিয়ে উঠল মুসা। এবার আর কিছুই দেখতে পাব না।
অটোমেটিক টাইমার লাগানো আছে চত্বরের লাইটিং সিসটেমের সঙ্গে, বললেন অলিভার। ঠিক এগারোটায় অফ হয়ে যায় বাতি।
আমাদেরও টেলিভিশন অফ করে দিতে হচ্ছে, উঠে গিয়ে সুইচ টিপে সেটটা বন্ধ করে দিল কিশোর।
হ্যাঁ, আর দরকার কি ওটার? বলল মুসা। তবে, টমি ব্যাটা কোথায় যাচ্ছে, দেখা দরকার। তোমরা বস। আমি ব্যালকনিতে যাচ্ছি। অন্ধকারে ও আমাকে দেখতে পাবে বলে মনে হয় না। তেমন বুঝলে নেমে গিয়ে ফুলঝাড়ের আড়ালে লুকিয়ে থেকে দেখব।
খবরদার, বেল-টেল বাজাবে না! হুশিয়ার করে দিল কিশোর। আস্তে করে টোকা দেবে দরজায়। আমরা বেরোব।
ঠিক আছে, উঠে গিয়ে স্কি-জ্যাকেটটা তুলে নিল মুসা। গায়ে চড়াল। সুইচ টিপে বসার ঘরের আলো নিবিয়ে দিল রবিন। মুহূর্তে দরজা খুলে ব্যালকনিতে বেরিয়ে এল মুসা। পেছনে আবার বন্ধ হয়ে গেল দরজা। তবে এবার তালা লাগানো হল না ভেতর থেকে।
এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়িয়ে রইল মুসা। জানে, দরজার ওপাশে তার জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে কিশোর আর রবিন। সে ইঙ্গিত দেয়ামাত্র ছুটে বেরোবে ওরা।
আরও খানিকক্ষণ জ্বলল টমির ঘরের আলো, তারপর নিবে গেল। অপেক্ষা করে রইল মুসা। যে-কোন মুহূর্তে বেরিয়ে আসতে পারে টমি। সময় যাচ্ছে। কিন্তু বেরোল না সে। রাস্তার ল্যাম্পপোস্টের আলোর একটা রশ্মি এসে পড়েছে পুলের পানিতে, অন্ধকার গাঢ় হতে পারছে না ওই জায়গাটুকুতে। ওই আলোর জন্যেই আবছাভাবে চোখে পড়ছে টমির ঘরের বারান্দা। মুসার চোখ এড়িয়ে দরজা দিয়ে। বেরোতে পারবে না সে।
সময় যাচ্ছে। মাঝরাত পেরোল। শোনা গেল গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ। খানিক পরেই গেটে দেখা গেল একটা লোককে। সতর্ক হয়ে উঠল মুসা। পরক্ষণেই ঢিলা পড়ে

গেল আবার সতর্কতায়। পুলের টেবিলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে মূর্তিটা। ফ্র্যাঙ্কলিন জ্যাকবস। অ্যাশট্রেটা তুলে নিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল। পরক্ষণেই আলো জ্বলল তার পর্দা ঢাকা জানালায়।
চোখ মিটমিট করল মুসা। মাত্র কয়েকটা সেকেণ্ড জ্যাকবসের ওপর চোখ ছিল, দৃষ্টি সরে গিয়েছিল বারান্দার ওপর থেকে। ঠিক ওই সময়ে বেরিয়ে এসেছে টমি। জ্যাকবসের ঘরের আবছা আলো পড়ছে তার ওপর। ঘুমোনর পোশাক পরনে। পুলের ধার ধরে নিঃশব্দে এগোচ্ছে জ্যাকবসের ঘরের দিকে। হঠাৎ...
আবার চোখ মিটমিট করল মুসা। দুহাতে রগড়াল। স্বপ্ন দেখছে না তো! টমি নেই! হঠাৎ উধাও হয়ে গেছে!
দ্রুত দরজায় টোকা দিল মুসা। পরক্ষণেই সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করল। দ্রুত চতুর পেরিয়ে গিয়ে টমির দরজা আগলে দাঁড়াবে। কোন্ পথে ঘরে ঢোকে টমি, দেখবে।
ছুটছে মুসা। পুলের ধারে পৌঁছতেই পায়ের তলায় পড়ল কি যেন! নরম, জ্যান্ত! তীক্ষ্ণ আর্তনাদ শোনা গেল!
আঁতকে উঠে লাফিয়ে একপাশে সরে গেল মুসা। সে পা তুলতে না তুলতেই ওটাও লাফ দিয়েছে। পড়ল গিয়ে তার আরেক পায়ের তলায়। আরও জোরে আর্তনাদ করে উঠল। চেঁচিয়ে উঠে আবার সামনে লাফ দিল মুসা। মাটিতে পা ঠেকল না। টের পাচ্ছে, প্যান্টের ঝুল আঁকড়ে ধরে ঝুলছে কিছু একটা। আঁচড় লাগছে পায়ের চামড়ায়। ঝপাং করে পড়ল গিয়ে সে পানিতে।
ঝট করে খুলে গেল এনড্রুর ঘরের দরজা।
দপ করে আবার জ্বলে উঠল চত্বরের আলো।
পুলের ধার খামচে ধরে নিজেকে টেনে তোলার চেষ্টা করছে মুসা। শব্দ তুলে মুখ থেকে ফেলছে ক্লোরিন মেশানো পানি।
তার কাছাকাছিই পুলের ধার ধরে সাঁতরাচ্ছে আরেকটা জীব। নিচু হয়ে ঘাড়ের চামড়া ধরে ওটাকে তুলে নিল এনড্রু। কালো একটা বেড়াল।
তুমি...তুমি একটা অমানুষ! মুসার দিকে চেয়ে ধমকে উঠল বেড়াল-মানব।
হাঁচড়ে-পাঁচড়ে কোনমতে ডাঙায় উঠে এল মুসা। ভেজা শরীরে সূঁচ ফোঁটাচ্ছে যেন কনকনে ঠাণ্ডা।
মিস্টার অলিভার! নাকা তীক্ষ্ণ গলা। চেঁচিয়ে ডাকাডাকি করছে মিসেস ডেনভার। গায়ে কম্বল জড়ানো। এলোমেলো চুল। মিস্টার অলিভার, ছেলেগুলোকে আটকে তালা দিয়ে রাখলেন না কেন? লোকের ঘুম নষ্ট করছে! এমনভাবে বলল মহিলা, যেন সে-ই এই বাড়ির মালিক।
অলিভারের সাড়া নেই। সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসেছে কিশোর।

হঠাৎ আবার উদয় হয়েছে টমি তার ঘরের দরজায়।
আমার—আমার ঘুম আসছিল না, বিড়বিড় করে বলল মুসা।
জ্যাকবসের দরজাও খুলে গেছে। ওখান থেকেই চেঁচিয়ে জানতে চাইল সে, আবার কি হল?
আমার বেড়ালটাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল ছোঁড়াটা! রাগ এখনও পড়েনি। বেড়াল-মানবের। ভেজা, চুপচুপে জানোয়ারটাকে কোলে তুলে নিয়েছে, হাত বোলাচ্ছে গায়ে। আর ভয় নেই, থোকা, মোলায়েম গলায় বলল এনড্রু। চল, গা মুছিয়ে দিচ্ছি। চুলার ধারে বসলেই গা গরম হয়ে যাবে আবার। বাজে ছেলেদের। ব্যবহারই ওরকম, মন খারাপ কোরো না।
আর যেন তোমাকে এসব করতে না দেখি! মুসাকে হুশিয়ার করল মিসেস ডেনভার।
না, ম্যাডাম, করব না, তাড়াতাড়ি বলল গোয়েন্দা সহকারী।
অদ্ভুত মুখভঙ্গি করে ঝটকা দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল মিসেস ডেনভার। গটমট করে হেঁটে গিয়ে ঢুকল তার ঘরে।
আজও ছুটি। টমির দিকে চেয়ে আছে কিশোর।
মাথা ঝোঁকাল টমি।
কেমন কাটছে ছুটি? ভাল?
না-হা—ঠিক তা না!—কি যেন…
কি?
না, কিছু না, চোখ রগড়াচ্ছে টমি। মনে হয় স্বপ্ন দেখছিলাম!…চলি…
দ্রুত ফিরে গিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ল টমি।
অলিভারের ঘরে এসে ঢুকল মুসা, পেছনে কিশোর। বড় একটা তোয়ালে নিয়ে অপেক্ষা করছেন অলিভার। বাথরুমে গরম পানির শাওয়ার ছেড়ে দিয়েছে রবিন।
টমি কোত্থেকে উদয় হল? কিশোরের দিকে চেয়ে জ্যাকেট খুলছে মুসা। পুলের ধার ধরে জ্যাকবসের ঘরের দিকে যেতে দেখলাম। হঠাৎ গায়েব হয়ে গেল সে! ওকে খুঁজতে গিয়েই এই বিপত্তি!
ওর ঘর থেকেই তো বেরোতে দেখলাম, বলল কিশোর। তুমি তখন পানিতে।
অসম্ভব! জ্যাকেটের চেনে আঙুল থেমে গেছে মুসার। আমি যখন পুলে পড়েছি, টমি তার ঘরে ছিল না। নিজের চোখে দেখেছি, জ্যাকবসের ঘরের দিকে এগোচ্ছে। খানিকটা এগিয়েই হঠাৎ গায়েব হয়ে গেল সে। কোন দিকে গেল, দেখিনি। তবে নিজের ঘরে যায়নি, আমি শিওর!
.

বাকি রাতটা ব্যালকনিতে বসে পালা করে পাহারা দিয়ে কাটাল রবিন আর কিশোর। অন্ধকার চত্বর। আলো নিবিয়ে দিয়েছে আবার মিসেস ডেনভার। চত্বরের বাতির মেইন সুইচ তার ঘরে। নির্দিষ্ট সময়ে অটোমেটিক কাজ করে লাইটিং সিসটেম, তবে। দরকার পড়লে যে-কোন সময় ওই সুইচ টিপে আলো জ্বালানো-নেবানো যায়।

ভোর চারটা অবধি নির্জন, শূন্য রইল চত্বর। তারপরই বেরিয়ে এল মিসেস ডেনভার। পরনে টুইডের ভারি কোট। তাকে দেখেই ভেতরে ঢুকে গেল কিশোর।

সারাটা রাত বসার ঘরে সোফায় বসে থেকেছেন মিস্টার অলিভার। ঘুমোতে যাননি। ওখানেই বসে বসে ঢুলেছেন।

মিসেস ডেনভার বাইরে যাচ্ছে, বলল কিশোর।

এতে অবাক হবার কিছু নেই, শান্ত রয়েছেন অলিভার।

এই ভোর রাতে!

হাই তুললেন অলিভার। চব্বিশ ঘণ্টাই বাজার খোলা থাকে, জানই। হপ্তায় একবার বাজার করে ডেনভার, বিষাদ বারে। ভোর চারটের সময় বেরোয়।

অলিভারের দিকে চেয়ে আছে কিশোর।

তার বক্তব্য, এই সময় বাজারে ভিড় থাকে না, বললেন অলিভার। কেনাকাটা করতে সুবিধে। আমার ধারণা অন্য। এ-সময়ে ভাড়াটেরা সব ঘুমিয়ে থাকে। বুড়িটারও দেখার কিছু নেই। জ্যাকবস অফিসে যায় ভোর পাঁচটায়। এক ঘণ্টা সময় হাতে থাকছে ডেনভারের। বাজার সেরে ফিরে আসতে পারে সে। নিশ্চিন্তে।

কথাবার্তায় তন্দ্রা থেকে জেগে উঠেছে রবিন আর মুসা।

তার মানে, বলল মুসা, আপনি বলতে চাইছেন, লোকে কে কি করছে না করছে, দেখার জন্যে বাড়ি থেকেই বেরোয় না মিসেস ডেনভার? ভাড়াটেরা সব না, ঘুমোলে বাজারেও যায় না?

তাই, মাথা ঝোঁকালেন অলিভার। আশ্চর্য এক চরিত্র! জাল ছেড়ে যেমন মাকড়সা কোথাও যায় না, ওই বুড়িটাও তেমনি। এই বাড়ি ছেড়ে নড়তেই চায় না। খালি লোকের ওপর চোখ। যেন এসব দেখার জন্যেই বেঁচে আছে সে!

উঠে গিয়ে রাস্তার দিকের জানালার সামনে দাঁড়াল রবিন। টেনে পর্দা সরিয়ে দিল। গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ কানে আসছে। ধূসর সিডান গাড়িটাকে দেখতে পেল সে।

আশ্চর্য! হপ্তায় মাত্র একবার গাড়িটা চালায়! জানালার কাছ থেকেই বলল রবিন। ব্যাটারি ডাউন হয়ে যায় না?

প্রায়ই দেখি গ্যারেজে খবর দেয়, বললেন অলিভার। মেকানিকস আসে।

এগিয়ে যাচ্ছে গাড়ি। সামনেই মোড়। ঠিক এই সময় বুমম করে শব্দ হল। শোনা গেল তীক্ষ্ণ চিৎকার।

লাফ দিয়ে সোফা থেকে উঠে দাঁড়ালেন অলিভার।
কিশোর আগেই উঠে পড়েছে। ছুটে যাচ্ছে জানালার দিকে।
পাগলের মত ডানে-বাঁয়ে কাটছে সিডানের নাক। হুডের নিচ থেকে ধোয়া বেরোচ্ছে।
আবার চেঁচিয়ে উঠল মিসেস ডেনভার। পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে গাড়ি, দেখেই বোঝা যাচ্ছে। সামনের একপাশ দিয়ে গুতো মারল রাস্তার পাশের দেয়ালে। ঘষে এগোল। বাম্পারের ধাক্কা লাগাল মোটা একটা পানির পাইপে। ভোঁতা শব্দ তুলে মাটির কয়েক ইঞ্চি ওপর থেকে ছিঁড়ে গেল পাইপ। ওটার ওপরে এসে গাড়ি থামল। চারপাশ থেকে ফোয়ারার মত ছিটকে বেরোচ্ছে পানি। আবার শোনা গেল মিসেস ডেনভারের চিত্তার।
দমকল ডাকতে হবে! ফোন করতে ছুটল মুসা।
দরজার দিকে ছুট লাগিয়েছে রবিন। আগে বের করে আনা দরকার মহিলাকে!
কিশোরও ছুটল রবিনের পেছনে।
হুড়মুড় করে চত্বরে নেমে এল দুজনে। বেরিয়ে এসেছে জ্যাকবস, গায়ে ঘুমানর পোশাক। টমি গিলবার্টও বেরিয়েছে। পাজামা পরনে, গায়ে তাড়াহুড়ো করে একটা কোট চাপিয়েছে। গেটের দিকে ছুটেছে।
সবার আগে ছুটছে জ্যাকবস। মিসেস ডেনভার! চেঁচিয়ে উঠল সে সিডান টাকে দেখেই।
টমির পাশ কাটিয়ে এল ছেলেরা, জ্যাকবসকে পেছনে ফেলে এল। ছুটে এসে দাঁড়াল গাড়িটার পাশে। বরফ-শীতল পানি ভিজিয়ে দিচ্ছে সারা শরীর, গ্রাহ্যই করছে না।
স্টিয়ারিঙের পেছনে অদ্ভুত ভঙ্গিতে বসে চেঁচাচ্ছে মিসেস ডেনভার। তার এ চিৎকার যেন বন্ধ হবে না আর কোনদিন।
মিসেস ডেনভার! হাতল ধরে হ্যাঁচকা টান লাগাল কিশোর। খুলল না দরজা। বোধহয় তালা আটকানো।
কিশোরের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে জ্যাকবস। জানালায় থাবা দিচ্ছে জোরে জোরে।
খুব ধীরে ধীরে মুখ ফেরাল মিসেস ডেনভার। শূন্য দৃষ্টি। চেঁচানো থামেনি।
দরজা খুলুন! চেঁচিয়ে উঠল জ্যাকবস। তালা লাগিয়েছেন কেন?
হঠাৎ যেন বাস্তবে ফিরে এল মিসেস ডেনভার। থাবা মারল লক-বাটনের দিকে। এক সেকেণ্ড পরেই হাতল ধরে হ্যাঁচকা টানে দরজা খুলে ফেলল জ্যাকবস। টেনে-হিঁচড়ে মহিলাকে বের করে আনতে লাগল, রবিন সাহায্য করল তাকে।

সাইরেনের শব্দ কানে এল। কয়েক মুহূর্ত পরেই মোড়ের কাছে দেখা গেল ফায়ার ব্রিগেডের ইমার্জেন্সী ট্রাক। কাছে এসে টায়ারের তীব্র কর্কশ আর্তনাদ তুলে থেমে গেল গাড়ি। লাফিয়ে নেমে এল একদল কালো রেনকোট পরা লোক। এক পলক দেখেই পুরো অবস্থাটা যাচাই করে নিল তাদের অফিসার। চেঁচিয়ে আদেশ দিল।
আবার চলতে শুরু করল ট্রাক। গিয়ে থামল মোড়ের কাছে। কয়েক মুহূর্ত পরেই বন্ধ হয়ে গেল পানির ফোয়ারা।
মিসেস ডেনভারকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে কিশোর, রবিন, জ্যাকবস আর টমি। স্তব্ধ হয়ে গেছে মহিলা। প্রচণ্ড শক খেয়েছে।
পানি বন্ধ করলেন কি করে? একজন ফায়ারম্যানের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল। জ্যাকবস।
মোড়ের কাছে মাস্টার ভালভ আছে একটা, জানাল ফায়ারম্যান। মিসেস ডেনভারের দিকে তাকাল। কোথায় চলেছিলেন?
জবাব দিল না মিসেস ডেনভার।
ঘরে নিয়ে যাওয়া দরকার, বলল জ্যাকবস। ঠাণ্ডা লেগে যাবে। নিউমোনিয়া বাধিয়ে বসলেও অবাক হব না!
দুদিক থেকে ধরে প্রায় শূন্যে তুলে মিসেস ডেনভারকে তার ফ্ল্যাটে নিয়ে এল। কিশোর আর রবিন। গাড়িতে পড়ে থাকা হ্যাঁণ্ডব্যাগ খুলে ঘরের চাবি নিয়ে এসেছে। জ্যাকবস। সঙ্গে এসেছে একজন ফায়ারম্যান। একজন পুলিশ অফিসারও এসে হাজির হয়েছে পেছন পেছন।
কি হয়েছিল? জানতে চাইল অফিসার।
বসার ঘরে দাঁড়িয়ে কাঁপছে মিসেস ডেনভার। কেউ গুলি করেছিল আমাকে। চাঁপা গলা। ঠোঁট নড়লই না যেন কথা বলার সময়।
ভেজা কাপড় খুলে ফেলুন জলদি, শান্ত কণ্ঠে বলল অফিসার। তারপর, ভাল বোধ করলে, কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দেবেন।
মাথা ঝোকাল মিসেস ডেনভার। টলমল করে হেঁটে গিয়ে ঢুকল শোবার ঘরে।
তারও দাঁতে দাতে বাড়ি লাগছে, এতক্ষণে খেয়াল করল যেন কিশোর। আমারও কাপড় বদলানো দরকার!
কিছু দেখেছিলে? জিজ্ঞেস করল পুলিশ অফিসার।
আমি দেখেছি, বলে উঠল রবিন। দাঁতে দাঁত বাড়ি খাচ্ছে তারও। গাড়িটা এগিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ একটা শব্দ...
যাও, রবিন আর কিশোরকে বলল অফিসার। আগে কাপড় বদলে এস। তারপর শুনব।

বেরিয়ে এল দুই গোয়েন্দা। কাঁপতে কাঁপতে এসে ঢুকল অলিভারের বসার ঘরে। জানালার কাছে দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে আছেন অলিভার আর মুসা। দরজা খোলার শব্দে ফিরে তাকাল দুজনেই।
বুড়িটার কি অবস্থা? জানতে চাইলেন অলিভার।
ভালই, বলল কিশোর। ঠাণ্ডায় কাঁপছে, আর কিছু না।
হু, আবার রাস্তার দিকে ফিরলেন অলিভার।
তাড়াতাড়ি ভেজা কাপড় ছেড়ে শুকনো কাপড় পরে নিল রবিন আর কিশোর। বেরিয়ে এল ঘর থেকে। আবার এসে ঢুকল মিসেস ডেনভারের ঘরে। পুলিশ অফিসার নেই, ঘটনাস্থলে চলে গেছে।
বেরিয়ে এল দুই গোয়েন্দা। দুর্ঘটনাস্থলে চলল।
ফায়ার ব্রিগেডের আরও একটি ট্রাক আর দুটো পুলিশের গাড়ি এসে হাজির হয়েছে। সাদা পোশাক পরা পুলিশের গোয়েন্দাও এসেছে একজন। তার সঙ্গে কথা বলছে পুলিশ অফিসার।
দুই গোয়েন্দাকে দেখেই এগিয়ে এল অফিসার।
যা যা দেখেছে, শুনেছে, পুলিশকে জানাল কিশোর আর রবিন।
কেউ মহিলাকে গুলি করে থাকলে, মিস করেছে, বলল সাদা-পোশাক পরা। গোয়েন্দা।
ঠিক গুলির শব্দ না, বলল কিশোর। বোমা বিস্ফোরণের আওয়াজ।
গাড়িটা পরীক্ষা করছিল দুজন পুলিশ এগিয়ে এল ওরা। গুলির ছিদ্র নেই।
পানির পাইপের ওপর থেকে গাড়ি সরানর কাজে লাগল দমকল বাহিনী। সিডানের বাম্পারে শিকল বেঁধে, শিকলের অন্য মাথা আটকাল ট্রাকের পেছনের হুকে। টান দিল। সরে এল সিডান।
অন্য ট্রাকের হেডলাইটের আলো পড়েছে সিডানটা এতক্ষণ যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেখানে। মাটিতে পড়ে থাকা লালচেমত এক টুকরো কাগজ দৃষ্টি আকর্ষণ করল কিশোরের। এগিয়ে গিয়ে নিচু হয়ে তুলে নিল ওটা। দেখল। ধোয়ার। কালি মনে হচ্ছে!
কি? ফিরে তাকাল গোয়েন্দা।
ধোয়ার কালি, আবার বলল কিশোর। শব্দটা হবার পর গাড়ির হুডের তলা থেকে কালো ধোঁয়া বেরোচ্ছিল।
দ্রুতপায়ে সিডানের কাছে এগিয়ে গেল গোয়েন্দা বনেট তুলে ফেলল। তার। পাশে দাঁড়িয়ে ভেতরে টর্চের আলো ফেলল পুলিশ অফিসার। কিশোরও এসে দাঁড়াল পাশে।

ইঞ্জিন-ব্লকের ওপর পড়ে আছে কয়েক টুকরো লালচে কাগজ, আর পোড়া আধপোড়া কিছু তুলো। পুড়ে গেছে রেডিয়েটর হোস, ফ্যানের বেল্ট ছেঁড়া।
না, গুলি করেনি, মাথা নাড়াল সাদা-পোশাক পরা গোয়েন্দা। বিস্ফোরণ। বোমা ফাটানো হয়েছে।
ঘটাং করে বনেটটা আবার নামিয়ে রাখল গোয়েন্দা। নিয়ে যাও! ট্রাকের ড্রাইভারের দিকে চেয়ে বলল। পুলিশ গ্যারেজে নিয়ে রাখবে।
জ্যাকবস এসে হাজির হয়েছে আবার। কিশোরের প্রায় ঘাড়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে আছে টমি গিলবার্ট। বেড়াল-মানব এনড্রুও এসে হাজির হয়েছে, পরনে পাজামা, গায়ে একটা কম্বল জড়ানো।
ওকে কেউ খুন করতে চেয়েছিল! বলে উঠল এনড্রু।
ঘুরে চাইল গোয়েন্দা। কোন শত্রু ছিল মহিলার?
ছিল মানে? জবাবটা দিল জ্যাকবস। পুরো এক বাড়ি ভর্তি শত্রু। তবে ওদের কেউ বোমা মেরে মারতে চায় ওকে, মনে হয় না? এত শত্রুতা নেই।
আপনি? জিজ্ঞেস করল গোয়েন্দা। আমার নাম ফ্র্যাঙ্কলিন জ্যাকবস, হাই তুলল স্টকব্রোকার। মিস্টার অলিভারের বাড়িতে ভাড়া থাকি।
আপনি কিছু দেখেছেন?
না। বিস্ফোরণের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। বেরিয়ে এসে দেখি, গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে দেয়াল ঘেঁষে। পাইপ ছেঁড়া, ফোয়ারার মত পানি ছিটকে বেরোচ্ছে। এই ছেলেগুলোর সাহায্যে মহিলাকে গাড়ির ভেতর থেকে টেনে বের করলাম, আবার হাই তুলল জ্যাকবস। রাতে ভাল ঘুম হয়নি।...াই, ঘুমোইগে।...যদি আপনার। কিছু জিজ্ঞেস করার থাকে, দুপুরে আসবেন। তার আগে আর ঘুম থেকে উঠছি না আমি। হাই তুলতে তুলতে চলে গেল সে।
চিন্তিত ভঙ্গিতে জ্যাকবসের গমন পথের দিকে তাকাল পুলিশ অফিসার। তারপর তাকাল অলিভারের বাড়িটার দিকে। বিড়বিড় করল, আশ্চর্য? গত দুদিনে। জায়গাটাতে কয়েকটা অঘটন ঘটল পর পর! মাথামুণ্ড কিছুই বোঝা যাচ্ছে না!
পুবের আকাশে ধূসর আলো। সূর্য ওঠার দেরি নেই।
চল, আমরাও যাই, রবিনের দিকে চেয়ে বলল কিশোর। ঘুম পেয়েছে।
চল, বড় করে হাই তুলল রবিন।

.

রাতে ঘুম হয়নি, তাছাড়া প্রচণ্ড উত্তেজনা গেছে। হাত-পা অবশ হয়ে আসতে চাইছে অলিভারের। বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন তিনি। তিন গোয়েন্দাও ঘুমোতে গেল।
অনেক বেলায় উঠলেন অলিভার। নাশতা তৈরি করে ডাকলেন ছেলেদের।

নাশতা শেষ হল। বসার ঘরে চলে এল সবাই। টেলিভিশন অন করে দিল। কিশোর। খালি চত্বর। পুরো বাড়িটা নীরব।
ব্যাংকে যেতে হবে আমাকে, বললেন অলিভার। দশ হাজার ডলার তুলব। ছোট ছোট নোটে। তোমরা কেউ যাবে আমার সঙ্গে? এস না? খুশি হব।
নিশ্চয় যাব, বলল কিশোর। তবে, কি করতে যাচ্ছেন, পুলিশকে জানিয়ে রাখলে ভাল হত না?
না। ঝুঁকি কিছুতেই নেব না আমি। বিপদ দেখলে হাউণ্ডটা ধ্বংসই করে ফেলতে পারে চোর। ওর নির্দেশ মানতেই হচ্ছে আমাকে।
জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল কিশোর, গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ শুনেছে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে ট্যাক্সি। বড় একটা সুটকেস এনে গাড়িতে তুলল ড্রাইভার। পেছনেই এল মিসেস ডেনভার।
আপনার ম্যানেজার চলে যাচ্ছে, চোখ না ফিরিয়েই বলল কিশোর।
সান্তা মনিকায় বুড়িটার এক বোন থাকে, বলল অলিভার। অসুস্থ হলে, কিংবা কোনরকম বিপদে পড়লে, ওখানেই গিয়ে ওঠে।
চলতে শুরু করল ট্যাক্সি। দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে মোড়ের দিকে।
ভাল বিপদে পড়েছে এবার, টিপ্পনী কাটল মুসা। খালি ছোঁক ছোঁক করে লোকের পেছনে। এইবার দিয়েছে টাইট…
কাঁচ ভাঙার প্রচণ্ড শব্দে থেমে গেল মুসা।
আগুন! আগুন! চেঁচিয়ে উঠল কেউ। আগুন লেগেছে!
চোখের পলকে দরজার কাছে ছুটে গেল চারজনে। দরজা খুলে বেরিয়ে এল। ব্যালকনিতে।
চত্বরের একপাশে ধোঁয়া। জ্যাকবসের ঘরের জানালা দিয়ে বেরোচ্ছে। একটা লোহার চেয়ার তুলে নিয়ে দমাদম পিটিয়ে শার্সির কাঁচ ভাঙছে টমি। পরনে ঘুমানর পোশাক। খালি পা। ঘাড়ের কাছের চুল খাড়া হয়ে গেছে।
মাই গড! চেঁচিয়ে উঠলেন অলিভার। ছুটে আবার ঘরে গিয়ে ঢুকলেন, ফায়ার ব্রিগেডকে ফোন করবেন।
রবিন আর কিশোর নড়ার আগেই সিঁড়ির মাঝামাঝি নেমে গেছে মুসা। লাফিয়ে এসে নামল চত্বরে। পুলের ধার থেকে আরেকটা চেয়ার তুলে নিয়ে ছুটল।
ঝট করে, বেড়াল-মানবের ঘরের দরজা খুলে গেল। প্রায় ছিটকে বেরিয়ে এল। এনড্রু।
মিস্টার জ্যাকবস! ভাঙা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠল মুসা।
জবাব নেই।

তাড়াতাড়ি চৌকাঠে পড়ে থাকা কাঠের টুকরো সরিয়ে ফেলতে লাগল মুসা। পর্দায় আগুন ধরে গেছে। অনেকখানি পুড়ে গেছে ইতিমধ্যেই। থাবা দিয়ে নেবানর চেষ্টা করল পর্দার আগুন।
এই যে! চিৎকার শোনা গেল কিশোরের। পাশে কুলুঙ্গিতে হুকে ঝোলানো অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রটা দেখতে পেয়েছে। ছুটে গিয়ে ওটা খুলে নিয়ে এল সে।
তীক্ষ্ণ হিসহিস শব্দ উঠল। যন্ত্রের মুখ থেকে সাদা ফেনামত জিনিস ছুটে গিয়ে পড়তে থাকল জ্বলন্ত পর্দায়। ছ্যাক করে উঠল আগুনের শিখা, নিবে গেল। চেয়ার দিয়ে বাড়ি মেরে জানালার পাল্লার ছিটকিনি ভেঙে ফেলল মুসা, ঝটকা দিয়ে দুপাশে সরে গেল পাল্লাদুটো। চৌকাঠে উঠে বসল টমি, তার পাশেই কিশোর। জানালার ঠিক নিচেই রয়েছে সোফা, জ্বলছে। পাশেই ক্রিসমাস গাছ, ওটাতেও আগুন ধরে গেছে প্রায়। নির্বাপক যন্ত্রের মুখ ঘোরাল কিশোর, একনাগাড়ে ফেনা নিক্ষেপ করে গেল আগুনের ওপর।
মুসা আর রবিনও উঠে বসেছে চৌকাঠে। ধোয়ার জন্য শ্বাস নিতে পারছে না ঠিকমত, চোখ জ্বালা করছে। চেঁচিয়ে ডাকা হল জ্যাকবসের নাম ধরে, কিন্তু কোন। সাড়া এল না।
লাফিয়ে ঘরের মেঝেতে নেমে পড়ল কিশোর আর মুসা। ঝুঁকে চোখ বাঁচানর চেষ্টা করতে করতে এগোল ধোয়ার ভিতর দিয়ে।
বসার ঘর আর শোবার ঘরের দরজার মাঝামাঝি পাওয়া গেল জ্যাকসকে। উপুড় হয়ে পড়ে আছে মেঝেতে।
জলদি বের করে নিয়ে যেতে হবে ওকে! ধোয়া ঢুকে যাচ্ছে নাক-মুখ দিয়ে, কেশে উঠল মুসা। নিচু হয়ে বাহু ধরে টেনে চিত করল জ্যাকসকে। জোরে চড় লাগাল দুই গালে।
নড়লও না জ্যাকবস।
এখানে হবে না! চেঁচিয়ে বলল কিশোর। বের করে নিয়ে যেতে হবে!
দুদিক থেকে দুহাত ধরে টেনে-হিঁচড়ে জ্যাকবসকে নিয়ে চলল দুজনে। ততক্ষণে নেমে পড়েছে রবিন আর টমি। একজন ছুটে গেল দরজা খুলতে, আরেকজন সাহায্য করতে এল মুসা আর কিশোরকে।
জ্যাকবসের পায়ের দিকে তুলে ধরল রবিন। তিনজনে মিলে বয়ে নিয়ে চলল দরজার দিকে।
কাশছে টমি। খুলে ফেলল দরজা।
দম বন্ধ হয়ে আসছে তিন গোয়েন্দার। ভারি দেহটাকে বয়ে নিয়ে কোনমতে এসে পৌঁছুল দরজায়। হাত লাগাল টমি। জ্যাকবসকে নিয়ে আসা হল পুলের ধারে।

চিত করে শুইয়ে দেয়া হল। জ্যাকবসের মুখে এসে পড়ছে রোদ। ফেকাসে চেহারা, রক্ত নেই যেন মুখে।
ঈশ্বর! বিড়বিড় করলেন অলিভার।
স্থির দৃষ্টিতে জ্যাকবসের মুখের দিকে চেয়ে আছে এনড্রু। ও কি..ও কি...।
উবু হয়ে বসে লোকটার বুকে কান পেতেছে মুসা। সোজা হয়ে বলল, না, বেঁচেই আছে।
পৌঁছে গেল দমকল বাহিনী। অক্সিজেন আর অ্যামবুলেন্স নিয়ে এসেছে। এখনও ধোঁয়া বেরোচ্ছে জ্যাকবসের ঘর থেকে। সেদিকে ছুটে গেল কয়েকজন ফায়ারম্যান।
ছুটে এসে চত্বরে ঢুকল দমকল বাহিনীর এক ক্যাপ্টেন। সোজা ছুটে গেল জ্যাকবসের ঘরের দিকে।
অক্সিজেন মাস্ক নিয়ে দুজন ফায়ারম্যান এসে বসল জ্যাকবসের দুপাশে। নাকে মুখে চেপে ধরল মাস্ক। ধীরে ধীরে চোখ মেলল স্টকব্রোকার। মিটমিট করল। ঘড়ঘড়ে আওয়াজ বেরোচ্ছে গলার ভেতর থেকে। দুর্বল একটা হাত বাড়িয়ে ঠেলে মাস্কটা নাকের ওপর থেকে সরিয়ে দিল সে।
ভয় নেই, মিস্টার, বলল একজন ফায়ারম্যান। খানিকটা ধোয়া ঢুকে গিয়েছিল ফুসফুসে, আর কিছু না।
উঠে বসার চেষ্টা করল জ্যাকবস।
না না, উঠবেন না, বাধা দিল আরেক ফায়ারম্যান। ইমার্জেন্সীতে নিয়ে যাব আপনাকে।
প্রতিবাদ করবে মনে হল, কিন্তু শেষে কি মনে করে করল না জ্যাকবস। শুয়ে পড়ল আবার পাথরের চত্বরে।
জর্জ, স্ট্রেচারটা নিয়ে এস, সঙ্গীকে বলল এক ফায়ারম্যান।
স্ট্রেচার এল। তাতে তুলে নেয়া হল জ্যাকসকে। শান্ত রইল সে। কোনরকম বাধা দিল না। ধূসর একটা কম্বল দিয়ে ঢেকে দেয়া হল তার দেহ। স্ট্রেচার তুলে। নিল দুজন ফায়ারম্যান।
ওর সঙ্গে কারও যাওয়া দরকার, বলল এনড্রু।
আমার ভাগ্নে, দুর্বল গলায় বলল জ্যাকবস। আমার ভাগ্নেকে একটা খবর দেবেন। ও শুনলেই চলে আসবে।
অ্যামবুলেন্সে তোলা হল জ্যাকসকে। সাইরেন বাজিয়ে চলে গেল গাড়ি।
জ্যাকবসের ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল ক্যাপ্টেন। সেই পুরানো কাহিনী। আধপোড়া একটা সিগারেটের টুকরো ধরে আছে দুআঙুলে, দেখাল। সিগারেট

জ্বালিয়ে রেখেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। কোনভাবে সোফায় পড়েছে টুকরোটা, আগুন ধরে গেছে পর্দায়…
কপাল ভাল ওর, বলে উঠল টমি। এখনও খালি পায়েই রয়েছে। চেহারা ফেকাসে। সময়মত দেখতে পেয়েছিলাম…
হ্যাঁ, সত্যিই ভাল, মাথা ঝোঁকাল ক্যাপ্টেন। আরেকটু হলেই আগুন ধরে যেত ক্রিসমাস গাছটায়। সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়ত আগুন।
সিগারেট জ্বালিয়ে রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিল? বিশ্বাস করতে পারছে না যেন কিশোর।
অনেকেই এ-কাণ্ড করে, খোকা, বলল ক্যাপ্টেন। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।
কিন্তু একটা গামলার সমান অ্যাশট্রে আছে ওর, ক্যাপ্টেনের কথা মানতে পারছে না গোয়েন্দাপ্রধান। ওতে সিগারেট কেন, জ্বলন্ত কয়লার টুকরো রেখে দিলেও ভয় নেই। সিগারেটটা অ্যাশট্রের বাইরে পড়ল কি করে?
ঘুমের ঘোরে হয়ত অ্যাশট্রের ভেতরে রাখতে চেয়েছিল। ভেতরে না রেখে, বাইরেই ফেলেছে। ব্যস, ধরে গেছে আগুন। এটা স্বাভাবিক।
হ্যাঁ, মাথা ঝোকাল রবিন। খুব নাকি ঘুম পেয়েছিল তার। সারারাত ঘুমাতে পারেননি। দুপুর পর্যন্ত টানা ঘুম দেবেন, বলেছেন সকালে। হয়ত এসে সোফাতেই শুয়ে পড়েছিলেন, সিগারেট ধরিয়েছিলেন। তারপর আর চোখ খুলে রাখতে পারেননি।
কিন্তু ওকে মাঝের দরজায় পেয়েছি, বেডরুমের দিকে মুখ। সোফায় ঘুমোলে, ঘুম থেকে উঠে বারান্দার দরজার দিকে না গিয়ে বেডরুমের দরজায় গেল কেন? বেরোনর চেষ্টা না করে ঘরের আরও ভেতরে গেল কেন? ক্যাপ্টেনের দিকে তাকাল। কিশোর। আপনার কি মনে হয়?
হঠাৎ ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। ঘর ভর্তি ধোয়া, দ্বিধায় পড়ে গিয়েছিল বেচারা! জবাব দিল ক্যাপ্টেন। রওনা দিয়েছিল বেডরুমের দরজার দিকে। এগোতে পারেনি বেশি দূর। ধোয়া কাহিল করে ফেলেছিল।
পোড়া সোফার অবশিষ্ট বয়ে এনে ধুপ করে বাইরে ফেলল দুজন ফায়ারম্যান।
যা নোংরা হয়েছে, পরিষ্কার করতে গেলে বোঝা যাবে, বলে উঠল বেড়াল মানব।
মিসেস ডেনভার এ-অবস্থা দেখলে, তাকেও আবার হাসপাতালে পাঠানর দরকার হবে, হাসল টমি। গেল কোথায় মহিলা? এত হৈ চৈয়েও দেখা নেই!
খানিক আগে ট্যাক্সিতে করে চলে গেছে, বললেন অলিভার। যাবে আর কোথায়? বোনের ওখানে গেছে হয়ত।
ক্যাপ্টেনের দিকে তাকাল কিশোর। মিস্টার জ্যাকবসকে কোথায় নেবে?

সেন্ট্রাল হাসপাতালে। প্রাথমিক চিকিৎসা করলেই চলবে বুঝলে, তাই করে ছেড়ে দেবে ডাক্তাররা। অবস্থা খারাপ দেখলে ভর্তি করে নেবে।
সেন্ট্রাল হাসপাতাল! চিন্তিত দেখাচ্ছে কিশোরকে। মিস ল্যাটনিনাকেও ওখানেই নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু মিস্টার জ্যাকবস-জ্যাকবসও ওখানে...
ওখানেই তো নেবে, প্রথমে বাধা দিয়ে বলল ক্যাপ্টেন। ওটা ইমার্জেন্সী হাসপাতাল, সরকারী। রোগী পয়সা খরচ করতে রাজি থাকলে দেবে কোন প্রাইভেট ক্লিনিকে পাঠিয়ে।
আমি সে কথা বলছি না, মাথা নাড়ল কিশোর। সিগারেটের ব্যাপারে, আগুনের ব্যাপারে এত সতর্ক লোকটা! সিগারেট খাবার সময় অ্যাশট্রে সঙ্গে রাখে! অথচ অসাবধানে সে-ই আগুন ধরিয়ে দিল ঘরে! নাহ, বোঝা যাচ্ছে না!

.

জিনের আসর হয়েছে বাড়িটাতে! দমকল বাহিনী চলে যেতেই ঘোষণা করল এনড্রু। প্রথমে লারিসা, তারপর মিসেস ডেনভার, এখন আবার জ্যাকবস!
সব কিছুর মূলে ওই চুরি, বললেন অলিভার। আড়চোখে টমির দিকে তাকালেন। লাউঞ্জে একটা চেয়ার বের করে তাতে আধশোয়া হয়ে আছে। চোখ আধবোজা, বোধহয় রোদের দিকে সরাসরি চেয়ে আছে বলেই। তিন রাত আগেও এসব কিছুই ঘটেনি। চোরটা গেল চত্বর দিয়ে, শুরু হয়ে গেল যত গণ্ডগোল।
মাথা ঝোঁকাল কিশোর। এর একটাই মানে। ছায়াশ্বাপদটা রয়েছে
ছায়া—কি বললে? ভুরু কোঁচকালেন অলিভার।
ছায়াশ্বাপদ, হাউটার নাম রেখেছি আমি। বাংলা শব্দ। ইংরেজিতে ইনভিজিবল ডগ বলতে পারেন। হ্যাঁ, যা বলছিলাম। এ-বাড়ির সীমানার মধ্যেই কোথাও রয়েছে ছায়াশ্বাপদ। আর চোরও নিশ্চয় এ-বাড়িরই কেউ।
কি বলছ, খোকা? চোখ কপালে উঠেছে বেড়াল-মানবের। এ-বাড়িতে কুকুর। নেই, খালি বেড়াল।
জ্যান্ত কুকুর না ওটা, বললেন অলিভার। ক্রিস্টালে তৈরি একটা মূর্তি। আর্টিস্ট জ্যাক ইলিয়ট বানিয়েছিল। সোমবার রাতে ওটার জন্যই এসেছিল চোর, জ্যাকের বাড়ি থেকে নিয়ে গেছে।
খুকখুক করে হেসে উঠল এনড্রু। তাই বলুন! মিসেস ডেনভার কবেই এসে বলেছে আমাকে, আপনি একটা কুকুর আনবেন। আমার বেড়াল যেন সাবধানে। রাখি। হাহ হাহ! এখন শুনছি একটা কাঁচের কুকুর! হাহ!
কাঁধ ঝাঁকালেন অলিভার। ওই বুড়িটার জন্যে আর গোপন রইল না কিছু! কুকুরটার কথা লিখেছি ডায়েরীতে। আমার কাগজপত্র ঘেঁটেছে। নিশ্চয় ওটা

পড়েছে বুড়ি। আপনাকে যখন বলেছে, আরও অনেককেই হয়ত বলেছে। জানাজানি হয়ে গেছে। চোরের কানেও গেছে কথাটা।
হু! আমাকে সন্দেহ-টন্দেহ করছেন না তো? হাসি উধাও হয়ে গেছে বেড়াল মানবের মুখ থেকে। যা-ই হোক, আর আমি এখানে থাকছি না। যা শুরু হয়েছে, প্রাণের নিরাপত্তাই নেই। কখন দেবে বিষ খাইয়ে, কিংবা বোমা মেরে গাড়ি উড়িয়ে, কে জানে! তার চেয়ে কোন মোটেলে চলে যাব।
নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল এনড্রু। বেরিয়ে এল শিগগিরই। এক হাতে সুটকেস, আরেক হাতে পোষা কালো বেড়ালটা। বিকেল পাঁচটায় একবার আসতেই হচ্ছে। বেড়ালগুলো আসবে, আমি না থাকলে না খেয়ে ফিরে যাবে। ওদেরকে মোটেলটা চিনিয়ে দেব নিয়ে গিয়ে। যদি কোন কারণে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করার দরকার পড়ে, উইলশায়ার ইন-এ খোঁজ করবেন। ফ্ল্যাটটা ছাড়ছি না। এখানকার পরিস্থিতি শান্ত হলেই ফিরে আসব আবার।
চলতে গিয়েও কি ভেবে দাঁড়িয়ে পড়ল বেড়াল-মানব। অলিভারের দিকে তাকাল। আমি নেই, চট করে আবার আমার ঘরে ঢুকে পড়বেন না। তল্লাশি চালাতে চাইলে, পুলিশ এবং সার্চ ওয়ারেন্ট নিয়ে আসবেন।
গটগট করে হেঁটে চলে গেল এনড্রু। খানিক পরেই গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ হল।
চাইলে আমার ঘরে খুঁজে দেখতে পারেন, মিস্টার অলিভার, বলল টমি। গিলবার্ট। দুপুরে বাইরে যাব, কাজ আছে। তখন ঢুকতে পারেন ইচ্ছে করলে। সার্চ ওয়ারেন্ট লাগবে না।
দুপুরে? ভুরু কোঁচকাল রবিন। আপনার ডিউটি রাতে না?
আজ দিনের শিফটে কাজ করব, বলল টমি। আমার এক কলিগ অসুস্থ। তার কাজটা চালিয়ে নিতে হবে।
আমি জানি, আপনার ঘরে নেই ছায়াশ্বাপদ, শান্ত কণ্ঠে বলে উঠল কিশোর। এ-বাড়ির কোন ঘরেই নেই।
একটু যেন হতাশ মনে হল টমিকে। কাঁধ ঝাঁকাল। ঘুরে গিয়ে ঢুকে পড়ল নিজের ঘরে।
এত নিশ্চিত হচ্ছ কি করে? জানতে চাইলেন অলিভার।
সহজ, বলল কিশোর। তাহলে মিসেস ডেনভারের শকুনি-চোখে এড়াতো না জিনিসটা। কার ঘরে কোথায় কোন সুতোটা আছে, আমার মনে হয় তা-ও তার জানা। নকল চাবি বানিয়ে মালিকের ঘরে ঢোকার যার সাহস আছে, ভাড়াটেদের ঘরে সুযোগ পেলেই ঢুকবে সে, এতে কোন সন্দেহ নেই। সবারই বাক্স-পেটরা ড্রয়ার ঘাটে সে, আমি শিওর।
হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ।

তবে, এর মানে এই নয়, কাছাকাছি নেই মূর্তিটা। নইলে, এখান থেকে লোকজন সরাতে চাইছে কেন চোর? গতকাল মিস ল্যাটনিনাকে বিষ খাওয়াল। আজ বোমা ফাটাল মিসেস ডেনভারের গাড়িতে। মিস্টার জ্যাকবসের ঘরে আগুন লাগিয়ে তাকে খেদাল। ভয়েই পালাল বেড়াল-মানব-মিস্টার অলিভার, জ্যাকবসের সঙ্গে কথা বলতে চাই আমি। ও হয়ত কিছু জানাতে পারবে। কি করে আগুন। লাগল, হয়ত কিছুটা আলোকপাত করতে পারবে।
ভ্রূকুটি করল রবিন। তোমার ধারণা, ওই আগুন লাগা নিছক দুর্ঘটনা নয়?
সম্ভবত।
তাহলে? কে লাগিয়েছে আগুন? টমি? সবার আগে ও-ই হাজির হয়েছে। ওকে। আসতে দেখেনি কেউ। হয়ত, দেয়াল গলে জ্যাকবসের ঘরে ঢুকে পড়েছিল। আগুন। লাগিয়ে আবার দেয়াল গলেই বেরিয়ে এসেছে। তারপর যেন বাঁচাচ্ছে জ্যাকবসকে, এরকম অভিনয় করে গেছে।
দূর! প্রতিবাদ করল মুসা। অতিকল্পনা!
ব্যাপারটা প্রমাণ করে ছাড়ব আমি, দৃঢ় কণ্ঠে বলল রবিন। ডক্টর রোজারের সঙ্গে কথা বলব। ডক্টর লিসা রোজারকে চেনে কিশোর আর মুসাও। রবিনের দূর সম্পর্কের খালা। রুক্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যারাসাইকোলজির প্রফেসর, হেড অভ দ্য ডিপার্টমেন্ট। প্রেততত্ত্ব আর ডাকিনী বিদ্যার ওপর প্রচুর পড়াশোনা আছে, ওসবের ওপর গবেষণা করছেন এখন। আগুন লাগাক বা না লাগাক, দেয়াল গলে যে টমিই আসে-যায়, এতে কোন সন্দেহ নেই। কিভাবে কাজটা করে সে, জানতে হবে।
ওসব ভূত-প্রেতের মধ্যে আমি নেই, বলল মুসা। বাস্তব কাজ করব। টমিকে অনুসরণ করব আজ দুপুরে। কোথায় যায়, দেখব। সত্যিই বাজারে কাজে যায়। কিনা, দেখতে হবে। আর, এনড্রুর ব্যাপারেও খোঁজখবর নেব। দেখে আসব, সত্যি উইলশায়ার ইন-এ গিয়েছে কিনা।
আমি যাব হাসপাতালে, ঘোষণা করল কিশোর। কয়েকটা হাসপাতাল ঘুরে আসতে হবে হয়ত কিছু তথ্য দরকার। আশা করছি, ল্যাটনিনা আর জ্যাকবসের কাছ থেকে জানা যাবে কিছু।
হঠাৎ মনে পড়ে গেল যেন অলিভারের, আরে! আমার ব্যাংকে যাওয়া! তোমাদের একজন যাবে বলেছিলে। এত টাকা একা আনার সাহস আমার নেই, এখন!
যাব, তবে আগে কাজগুলো সেরে আসি, বলল কিশোর।
ততক্ষণ একা থাক! একটা লোক নেই এতবড় বাড়িটায়! আমি পারব না! আঁতকে উঠেছেন অলিভার।
আপনার কোন বন্ধু নেই?

ওই মিকো ইলিয়ট, সে-ই কাছাকাছি থাকে।
তাকেই ডাকুন। বসে বসে গল্প করুন দুজনে। আমরা বেশি দেরি করব না।
আবার বসার ঘরে ঢুকল চারজনে। ফোন করতে গেলেন অলিভার। কয়েক মিনিটের মধ্যেই চলে আসবে, কথা দিল মিকো।
দ্রুত তৈরি হয়ে নিল রবিন। বেরিয়ে এল ঘর থেকে। রুক্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে চলল।
মিনিট বিশেক পরেই বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে পৌঁছুল রবিন। প্রফেসর লিসা রোজারকে তার অফিসেই পাওয়া গেল। সুন্দর চেহারা। বয়েস চল্লিশ মত হবে।
টাকমাথা, গোলগাল চেহারার এক প্রৌঢ়ের সঙ্গে কথা বলছেন লিসা রোজার, রবিনের সাড়া পেয়ে চোখ তুলে তাকালেন। আরে, রবিন! তুই হঠাৎ!...আয়, আয়!
ডেস্কের সামনে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল রবিন। কেমন আছ, খালা?
ভাল। তোরা সব কেমন? তোর মা কেমন আছে?
ভাল। তারপর? কি মনে করে? খালাকে দেখতে আসার সময় হল তোর?
খালা, একটা কাজ। মানে, ইয়ে... দ্বিধা করছে রবিন। টাকমাথা ভদ্রলোকের দিকে তাকাল। একটা কথা...
ইনি প্রফেসর ডোনাল্ড রস, পরিচয় করিয়ে দিলেন মহিলা। অ্যাপলজির প্রফেসর। ডোনাল্ড, ও শেলি, মানে আমার বোনের ছেলে। ওর কথা বলেছি তোমাকে। গোয়েন্দাগিরির শখ।
তাই নাকি? খুব ভাল শখ, হাত বাড়িয়ে দিলেন প্রফেসর রস।
প্রফেসরের সঙ্গে হাত মেলাল রবিন।
হ্যাঁ, কি বলছিলি, বল, বললেন ডক্টর রোজার।
খালা, একটা উদ্ভট ঘটনা, দ্বিধা যাচ্ছে না রবিনের। মানে ভূতুড়ে...
এত দ্বিধা করছিস কেন? ভূতুড়ে ব্যাপার-স্যাপার নিয়েই আমার কারবার, জানিসই তো, ডেস্কে পেপারওয়েট চাপা দেয়া একটা চিঠি দেখালেন মহিলা। এই যে চিঠিটা, ডুবুক থেকে এক লোক পাঠিয়েছে। তার বোনের ভূত নাকি তাড়া করে। তাকে আজকাল। মজার ব্যাপার হল, তার কোন বোনই নেই, ছিলও না কখনও।
যতসব বদ্ধ পাগল নিয়ে তোমার কারবার, লিসা, চেয়ারে হেলান দিলেন রস। ইয়াংম্যান, ভূতের কথা কি যেন বলছিলে?
অলিভারের বাড়িতে ভূতুড়ে যা যা ঘটেছে, সব খুলে বলল রবিন। গির্জায় পাদ্রীর প্রেতাত্মা দেখেছে কিশোর, সে কথাও বাদ দিল না।
হুমম! গম্ভীর হয়ে মাথা ঝোঁকালেন লিসা রোজার। আমি গিয়েছিলাম ওই গির্জায়।

তুমি শুনেছ প্রেতাত্মার কথা? জিজ্ঞেস করল রবিন।
শুনেছি, বললেন লিসা রোজার। যেখানেই এই ধরনের গুজব শুনি, যাই। সরেজমিনে তদন্ত করি। তোর বন্ধু কিশোর যাকে দেখেছে, তার সঙ্গে বছর তিনেক আগে মারা যাওয়া পাদ্রীর নাকি মিল আছে। লম্বা সাদা চুল, বৃদ্ধ-। খোঁজ নিয়ে জেনেছি, শুধু হাউসকীপার তামারা ব্রাইসই দেখেছে ভূতটাকে। তামারার ব্যাপারে খোঁজখবর করেছি। আয়ারল্যাণ্ডের এক ছোট্ট শহর ডুঙ্গালওয়ে থেকে এসেছে সে। ওখানকার গির্জায় ভূত আছে, অনেকেই বলে। ভূতের ব্যাপারে রীতিমত বিখ্যাত জায়গাটা। বহুদিন আগে নাকি কোথায় যাবার জন্যে জাহাজে চেপেছিল এক পাদ্রী। সাগরে রহস্যজনকভাবে হারিয়ে যান তিনি। লোকে বলে, তারই প্রেতাত্মা এসে ঠাই নিয়েছে ডুঙ্গালওয়ে গির্জায়। গিয়েছিলাম। কয়েক রাত কাটিয়েছি ওখানে। কোন ভূত-টুত আমার নজরে পড়েনি। ওখান থেকে এসেছে তো, গির্জায় পাদ্রীর ভূত থাকবেই, বদ্ধমূল ধারণা জন্মে গেছে হয়ত তামারা ব্রাইসের। যাই হোক, অলিভারের। ঘরে ঢোকে যে ছায়াটা, ওটা পাদ্রীর প্রেতাত্মা নয়।
আমারও তাই ধারণা। ও নিশ্চয় টমি গিলবার্ট।
সামনে ঝুঁকলেন লিসা রোজার। বলছিস, দুবার ছায়াটা দেখেছে কিশোর। এবং দুবারই টমি তার ঘরে সেই সময় ঘুমিয়েছিল?
হ্যাঁ, ছিল।
মৃদু হাসলেন ডক্টর রোজার। চমৎকার! নীরবে ঘুরে বেড়াতে ভালবাসে ছেলেটা!
মিস্টার অলিভারের কাছে ব্যাপারটা মোটেই চমৎকার নয়, গম্ভীর হয়ে গেছে।
রবিন। কিভাবে করে টমি?
উঠে গিয়ে ফাইল ক্যাবিনেট খুললেন লিসা রোজার। ফিতে বাধা কয়েকটা ফাইল বের করে এনে রাখলেন ডেস্কে। আমার মনে হয়, ঘুমের ঘোরে ছায়া শরীরে বেরিয়ে আসে সে। ঘুরে বেড়ায়।
হাঁ হয়ে গেল রবিন।
আবার চেয়ারে বসলেন প্রফেসর রোজার। একটা ফাইল খুললেন। ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা চালিয়েছি আমরা এ-ব্যাপারে, তবে খুব কমই সে-সুযোগ পাওয়া যায়। এসব যারা করে, লোককে জানিয়ে করে না। ল্যাবরেটরিতে আসা তো দূরের কথা। অনেক খোঁজখবর নিয়ে, এমন এক-আধজনকে বের করে, অনেক বলে কয়ে নিয়ে আসতে হয়। কারও কারও ধারণা, অন্য কাউকে জানালে তার এ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যাবে। গত বছর এসেছিল এক মহিলা, সাধারণ এক গৃহবধূ। মনট্রোজে থাকে। ওর নাম বলতে চাই না।
মাথা ঝোকাল রবিন।

মহিলার ব্যাপারটা একটু অন্যরকম, বললেন আবার লিসা রোজার। ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখে এবং সেটা সত্যি।
তারমানে, আগ্রহে সামনে ঝুঁকল প্রফেসর রস। তুমি বলতে চাইছ, মহিলা যা দেখে, সেটা পরে সত্যি হয়?
ঠিক তা নয়। কয়েকটা উদাহরণ দিচ্ছি, ফাইলের কাগজে চোখ বোলালেন লিসা রোজার। ঘুমের ঘোরেই আকনে তার মায়ের জন্মদিনের উৎসবে হাজির হয়েছিল ওই মহিলা। সে সবাইকে দেখেছিল, তাকে কেউ দেখেনি। পরিষ্কার বলেছে সে, কি কি দেখেছে। তার দুই বোন সেদিন সেই উৎসবে হাজির ছিল। মাঝারি সাইজের একটা কেক, সাদা মাখনের একটা প্রলেপ, তার ওপর লাল চিনি। দিয়ে লেখা ছিল মহিলার মায়ের নাম। কটা মোম কোন কোন রঙের ছিল, ঠিক ঠিক বলে দিয়েছে সে। রাতে স্বপ্ন দেখেছে। সকালে উঠে তার স্বামীকে বলল ব্যাপারটা। হেসে উড়িয়ে দিল স্বামী। দিন কয়েক পরেই একটা চিঠি আর কয়েকটা ছবি এল। মহিলার মায়ের কাছ থেকে। জন্মদিনের উৎসবে তোলা, রঙিন-ফটোগ্রাফ। যা যা স্বপ্নে দেখেছিল মহিলা, ঠিক মিলে গেল ছবির সঙ্গে। অস্বস্তিতে পড়ে গেল স্বামী বেচারা। এরপর আরও কয়েকটা ঘটনা ঘটল ওরকম। কোথাও গিয়েছে, হয়ত স্বপ্নে দেখে মহিলা। পরে খোঁজ নিয়ে দেখা যায়, তার বর্ণনার সঙ্গে ঠিক মিলে যায় সব, অথচ ওই জায়গায় সশরীরে কখনও যায়নি মহিলা। রীতিমত চিন্তিত হয়ে পড়ল। স্বামী। খোঁজখবর নিয়ে শেষে একদিন আমার কাছে নিয়ে এল স্ত্রীকে।
ল্যাবরেটরিতে মহিলার ওপর পরীক্ষা চালিয়েছ? জিজ্ঞেস করল রবিন।
হ্যাঁ। কয়েকদিন ল্যাবরেটরির একটা ঘরে রেখে দিয়েছিলাম মহিলাকে। একটা মাত্র দরজা ঘরটার। রাতে বন্ধ করে দিতাম। চোখ রাখতাম বিশেষভাবে তৈরি। একটা ফোকর দিয়ে। ওখান দিয়ে পুরো ঘরটাই ভালমত দেখা যায়। প্রথম রাতে। মহিলা ঘুমিয়ে পড়লে পা টিপে টিপে তার ঘরে ঢুকলাম। দেয়াল-তাক আছে ওঘরে কয়েকটা। সবচেয়ে ওপরের তাকে রাখলাম মুখবন্ধ একটা খাম! ভেতরে এক টুকরো কাগজে দশ অঙ্কের একটা সংখ্যা লিখেছি। সংখ্যাটা আমি ছাড়া আর কেউ জানে না। খামটা রেখে দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে এলাম। চোখ রাখলাম ফোকরে। যতক্ষণ ঘুমিয়েছিল মহিলা, নড়িনি ওখান থেকে। একবারও ঘুম ভাঙেনি তার। সারারাতে। সকালে উঠে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, ঘরে কি কি আছে। প্রথমেই খামটার কথা বলল মহিলা। রঙ, আকার সব ঠিক ঠিক। তবে ভেতরে কি আছে, বলতে পারল না। পরের রাতে মহিলা ঘুমিয়ে পড়লে তার অজান্তে আবার রেখে এলাম খামটা, আরেকটা তাকে। খামের ভেতরের কাগজটা সেদিন বের করে নিয়েছি, ওটা রাখলাম খামের ওপরে, নাম্বার লেখা

পিঠটা ওপরের দিকে। ভোরে উঠে জিজ্ঞেস করতেই কাগজটার কথা বলল মহিলা। ঠিক বলে দিল নাম্বারটা।
সেদিনও সারারাত চোখ রেখেছিলে ওর ওপর? বিশ্বাস করতে পারছে না যেন। রবিন। রাতে একবারও ঘুম ভাঙেনি মহিলার? কোন ফাঁকে উঠে দেখে নেয়নি তো নাম্বারটা?
আমি নিজে চোখ রেখেছি ফোকরে, বললেন প্রফেসর। মুহূর্তের জন্যে চোখ সরাইনি। একবারও ঘুম ভাঙেনি মহিলার, বিছানা ছেড়ে ওঠার তো প্রশ্নই ওঠে না। তবে, নিশ্চয় তার শরীরের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিল ছায়া শরীর। ঘুরে বেড়িয়েছিল সারা ঘরে।
কি যেন ভাবছে রবিন। বলল, কিন্তু এতে কিছুই প্রমাণ হয় না!
নিশ্চয় প্রমাণ হয়, ছায়া শরীরে মিস্টার অলিভারের ঘরে ঢুকেছিল টমি, জবাবটা দিলেন ডক্টর রস। মান্দালার কথা জেনেছে সে ওভাবেই।
কিন্তু তার ছায়া দেখা গেছে, প্রতিবাদ করল রবিন। মহিলার দেখা যায়নি।
বেশ, বললেন লিসা রোজার। আরেকটা ঘটনার কথা বলছি। অরেঞ্জে বাস করে এক লোক, আমার এক রোগী। সারাজীবন স্বপ্নে যা যা দেখেছে, সব সত্যি ঘটেছে। মনট্রোজের ওই গৃহবধূর মত। তবে, মহিলার সঙ্গে একটা পার্থক্য আছে, তার ছায়া শরীর দেখা গেছে, আবার ফাইল দেখলেন প্রফেসর। হলিউডে লোকটার এক বন্ধু আছে। আসল নাম বলব না, ধরে নিই, তার নাম জোনস। একরাতে, জোনস তার ঘরে বসে বই পড়ছে। হঠাৎ জোরে ঘেউ ঘেউ করে উঠল। তার কুকুরটা। জোনস ভাবল, নিশ্চয় আঙিনায় চোর ঢুকেছে। দেখতে চলল সে। হলঘরেই দেখা হয়ে গেল অরেঞ্জে বাস করে যে, সে বন্ধুর সঙ্গে। এতরাতে বন্ধুকে দেখে অবাক হল জোনস। কেন এসেছে, জানতে চাইল। কোন কথা বলল না বন্ধু। নিঃশব্দে দোতলার সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল। বোকা হয়ে গেল যেন জোনস। শেষে দোতলার সিঁড়ি বেয়ে সে-ও উঠে এল। কোথাও নেই তার বন্ধু। একেবারে হাওয়া। তখুনি অরেঞ্জে ফোন করল জোনস। বাড়িতেই পাওয়া গেল বন্ধুকে। কয়েকবার রিঙ হবার পর ফোন ধরেছে। ঘুমজড়িত গলা, স্পষ্ট। কেন ফোন করেছে, জানতে চাইল বন্ধু। জানাল জোনস। বন্ধু, আশ্চর্য হল। সে-ও নাকি স্বপ্ন দেখছিল জেনসকে দেখেছে, শোবার ঘরে বসে বই পড়ছে। কুকুর ডেকে উঠল। জোনস এসে ঢুকল হলঘরে। বন্ধু এত রাতে কেন এসেছে জিজ্ঞেস করল। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল সে। আর কিছু মনে নেই তার। এর পর পরই টেলিফোন ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছে।
আশ্চর্য! বিড়বিড় করে বলল রবিন।

হ্যাঁ, মাথা ঝোকালেন লিসা রোজার। আশ্চর্যই, এবং ভয় পাওয়ার মত। স্বপ্নে যে ঘুরে বেড়ায়, ঘুম থেকে উঠে সে-ও ভয় পায়, তাকে যারা ঘুরতে দেখে, তারাও।
টমির ছায়া দেখে ভয় পান মিস্টার অলিভার, সন্দেহ নেই, বলল রবিন। কিন্তু ঘুম থেকে উঠে টমি ভয় পায় বলে তো মনে হয় না!
তার কেসটা একটু আলাদা। যা শুনলাম, এই ঘুরে বেড়ানো রীতিমত চর্চাই করে সে।
তার মানে, ঘাবড়ে গেছে রবিন। তাকে ঠেকানর কোন উপায়ই নেই মিস্টার অলিভারের?
না। তবে অলিভারের ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এসব ঘুরে বেড়ানো লোকেরা ক্ষতিকর নয়। ছায়া শরীর নিয়ে কারও কোন ক্ষতি করতে পারে না এরা। শুধু দেখা বা শোনার ক্ষমতা থাকে তখন।
তুমি বলছ, কোন জিনিস ছুঁতে পারে না ওরা?
হয়ত ছুতে পারে, বললেন লিসা রোজার। তবে নড়াতে পারে না। মনট্রোজের মহিলার কথাই ধরা যাক, সাধারণ একটা খাম খুলতে পারেনি সে।
সুতরাং, ছায়া শরীরে ঘুরে বেড়ানর সময় কোন কিছু ধরতে, বা চুরি করতে পারবে না টমি গিলবার্ট?–
আমার তো মনে হয়, না।
টমি গিলবার্ট ভারতে যেতে চাইছে, খবরটা জানাল রবিন। ওখানে গিয়ে ধ্যানতত্ত্ব নিয়ে প্রচুর গবেষণা আর চর্চা করার ইচ্ছে।
মাথা ঝোঁকালেন প্রফেসর। শুনেছি, ভারতীয় ঋষিরা নাকি এসব বিদ্যায় ওস্তাদ। আমাদের দেশে অবশ্য.ওসব গালগল্প বিশ্বাস করে না লোকে। তবে, পুরো ব্যাপারটা একেবারে ভিত্তিহীন হয়ত নয়। সম্মোহন কিংবা ভেন্ট্রিলোকুইজম-এ তো বিশ্বাস করে লোকে। আজকাল ছায়া শরীর নিয়েও গবেষণা হচ্ছে, বিশ্বাস করতে
আরম্ভ করেছেন কিছু কিছু বিজ্ঞানী।
বুঝলাম, তুমিও বিশ্বাস কর, বলল রবিন। কিন্তু পাদ্রীর ভূতের ব্যাপারটা কি? ওটা বিশ্বাস কর?
কাঁধ ঝাঁকালেন লিসা রোজার। বিশ্বাস করার মত কোন প্রমাণ পাইনি এখনও। যেখানেই ভূত আছে শুনেছি, ছুটে গিয়েছি। রাত কাটিয়েছি। কিন্তু আজ অবধি কোন ভূতের ছায়াও নজরে পড়েনি। এই বিশ্বাস কেন জন্মাল লোকের মনে, সেটা নিয়ে অনেক পড়াশোনা করেছি, অনেক ভেবেছি। কোন কূল-কিনারা পাইনি। শেষে দুত্তোর বলে হাল ছেড়ে দিয়েছি। সেই সৃষ্টির শুরু থেকেই সম্ভবত, ভূত বিশ্বাস করে আসছে লোকে। কেন? কে জানে!

.
রবিন বেরিয়ে যাবার পর পরই সেন্ট্রাল হাসপাতালে ফোন করল কিশোর। জানল, জ্যাকবসকে হ্যামলিন ক্লিনিকে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। দিন দুয়েক তাকে পর্যবেক্ষণে রাখতে চান ডাক্তাররা। লারিসা ল্যাটনিনা এখনও সেন্ট্রাল হাসপাতালে রয়েছে। প্রথমে তার সঙ্গে কথা বলা স্থির করল কিশোর। বেরিয়ে পড়ল।
সহজেই কেবিনটা খুঁজে বের করল কিশোর। খাটের ওপর আধশোয়া হয়ে আছে লারিসা। বালিশে হেলান দিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে আছে। বিষণ্ন।
আরে! দরজায় সাড়া পেয়েই ফিরে তাকিয়েছে লারিসা। তুমি মিস্টার অলিভারের মেহমান না?
হ্যাঁ, বলল কিশোর। কিশোর পাশা। কেমন লাগছে এখন?
ভাল না খারাপও না, মুখ বাঁকাল লারিসা। তবে বিষ খাওয়াতে চেয়েছিল আমাকে কেউ, ভাবলেই মনটা খারাপ হয়ে যায়। তাছাড়া খিদে। জাউ আর দুধ ছাড়া কিছু খেতে দেয় না ডাক্তাররা, বিরক্ত ভঙ্গিতে পায়ের ওপর ফেলে রাখা কম্বলটায় লাথি লাগল সে।একটা উপদেশ দিচ্ছি, কক্ষণো বিষ খেও না!
চেষ্টা করব না খেতে! হাসল কিশোর। ভাল করে তাকাল লারিসার দিকে। স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে গেছে। ঠোঁটের কোণে কেমন এক ধরনের ঘা, সাদা সাদা। কি বিষ ছিল, জেনেছেন?
জিজ্ঞেস করেছিলাম, লারিসার কণ্ঠে বিরক্তি। সাধারণ কি একটা কেমিক্যালের কথা বলল ওরা, নামটা মনে করতে পারছি না এখন। তবে আর্সেনিক কিংবা স্ট্রিকনিন নয়, এটা শিওর।
বেঁচে গেছেন সেজন্যেই, মাথা দোলাল কিশোর। স্ট্রিকনিন খেলে আর এখন এখানে থাকতেন না।
জানি! এরপর থেকে চকলেট খাওয়াই বাদ দেব কিনা, ভাবছি, বিষণ্ন হাসি হাসল লারিসা।
কোথা থেকে এসেছে ওগুলো, জানতে পেরেছে পুলিশ?
না। সাধারণ কেমিক্যাল, যে-কোন কেমিস্টের দোকান থেকে কেনা যায়। আর চকলেট তো একটা বাচ্চা ছেলেও কিনতে পারে।
সারা ঘরে নজর বোলাল কিশোর। ছোট একটা আলমারির ওপর রাখা ফুলদানীতে একগোছা ফুলের ওপর এসে থামল দৃষ্টি। কারও উপহার?
মাথা ঝোকাল লারিসা। এক বান্ধবী দিয়েছে। একই জায়গায় কাজ করি আমরা। রোজই এক গোছা করে দিয়ে যায়। কথা বলে যায় খানিকক্ষণ।
লোকের সঙ্গে মেশামেশি ভালই আছে আপনার, না?

হেসে ফেলল লারিসা। পুলিশের মত জেরা শুরু করে দিয়েছ। পুরো সকালটা আজ জ্বালিয়ে খেয়েছে। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে গেছে। জানার চেষ্টা করেছে, আমার কোন শত্রু আছে কিনা। যত্তোসব! লোকের সাথেও নেই আমি, পাঁচেও নেই, আমার শত্রু থাকতে যাবে কেন?

আমারও তাই ধারণা, মাথা ঝোকাল কিশোর। হ্যাঁ, মিস্টার অলিভার আপনাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। আবার তার বাড়িতে ফিরে গেলে তিনি খুশি হবেন।

খুব ভাল লোক, বলল লারিসা। আমি খুব পছন্দ করি। ভাল লোকের ওপরই যতরকম অত্যাচার। চোর-ছ্যাচোড়-বদমাশ—হ্যাঁ, ভাল কথা, কুকুরটা কি এসেছে তার?

স্থির হয়ে গেল হঠাৎ কিশোর। কুকুর!

হ্যাঁ। ওটা এলে চোরের উপদ্রব কমবে।

মিস্টার অলিভার বলেছেন?

না, মাথা নাড়ল লারিসা। মিসেস ডেনভার।–কবে যেন বলল, কবে যেন—হ্যাঁ হ্যাঁ, গত শনিবারে। পুলে সাঁতার কাটছিলাম, কিনারে বসে ডাকপিয়নের অপেক্ষা করছিল মহিলা, আর বকর বকর করছিল। মিস্টার অলিভার কুকুর আনাচ্ছেন জেনে ম্যানেজারের খুব দুশ্চিন্তা। বলেছে আমাকে। আমি বললাম, রাজ্যের যত বেড়ালকে যখন সইতে পারছেন, একটা কুকুর সইতে পারবেন না কেন?

মাথা ঝোঁকাল কিশোর। হু!—আচ্ছা, বাসায় রয়ে গেছে, এমন কোন জিনিস দরকার আপনার? বললে দিয়ে যাব এক সময়।

না, দরকার নেই, মাথা নাড়ল লারিসা। যা যা লাগে, চাইলেই পাওয়া যায় এখানে। খালি পছন্দসই খাবার দিতে চায় না। এছাড়া সব রকমভাবে সাহায্য করে নার্সেরা। চুপ করল একটু। হয়ত, আগামীকালই ছেড়ে দেবে ওরা আমাকে। কাল নাহলে পশু তো ছাড়বেই।

লারিসাকে গুড বাই জানিয়ে বেরিয়ে এল কিশোর। মনে ভাবনা। যা সন্দেহ করেছিল, মিসেস ডেনভারের কল্যাণে ছায়াশ্বাপদের কথা অলিভারের বাড়ির আর কারও জানতে বাকি নেই। বাইরেরও কজন জানে, কে জানে! ডাকপিয়নসহ হয়ত পোস্ট অফিসেরও সবাই জানে। গির্জার ওরাও জানে নিশ্চয়। হয়ত পুরো পাড়াই খবরটা জেনে গেছে। তবে, লোকেরা জানে, জ্যান্ত কুকুর আনবেন অলিভার।

মূর্তিটার কথা কজন জানে? টমি গিলবার্ট? জ্যাকবস? জিজ্ঞেস করতে হবে স্টকব্রোকারকে। ওখানেই যাবে এখন কিশোর। হ্যামলিন ক্লিনিক কোথায়, চেনে না সে। ট্যাক্সি নেয়া স্থির করল।

ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডে চলে এল কিশোর। সারির সবচেয়ে আগের গাড়ির ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করল, হ্যামলিন ক্লিনিক কোথায়, চেনেন?
অবশ্যই। উইলশায়ার আর ইয়েলের মাঝামাঝি
যাবেন?
এস।
অবাক হয়ে দেখল কিশোর, প্যাসিও প্লেসের দিকে ছুটেছে ট্যাক্সি। আরে! মিস্টার অলিভারের বাড়িতে চলে যাবে নাকি? দূর, কি বোকামি করেছে! অলিভারকে জিজ্ঞেস করলেই হত। তার বাড়ির মাত্র দুটো ব্লক দূরে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল ট্যাক্সি। ছোটখাট একটা আধুনিক বাড়ি। গেটের কপালে বড় করে লেখা: হ্যামলিন ক্লিনিক।
ড্রাইভারের ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে হাসপাতালে ঢুকে পড়ল কিশোর। রিসেপশন রুমে ঢুকেই থমকে গেল। সেন্ট্রাল হাসপাতালের তুলনায় এটা রাজবাড়ি। প্রাইভেট ক্লিনিক, যারা প্রচুর পয়সা খরচ করতে পারে, তাদের জন্যে। পুরু কার্পেটে ঢাকা মেঝে। দামি আসবাবপত্র। ঝকঝকে একটা ডেস্কের ওপাশে বসে আছে হালকা। লাল পোশাক পরা স্মার্ট রিসেপশনিস্ট। কাছে এসে জ্যাকবসের রুম নাম্বার জানতে চাইল কিশোর। মিষ্টি করে হাসল মেয়েটা। একটা খাতা খুলে নাম মিলিয়ে কেবিন নাম্বার বলে দিল।
দোতলায় কোণের দিকে বেশ বড়সড় একটা ঘর। দুটো খোলা জানালা দিয়ে। রোদ ঢুকছে। বিছানায় শুয়ে আছে জ্যাকবস। লাল মুখ ফেকাসে সাদা হয়ে গেছে। বিছানার পায়ের কাছে একটা আর্মচেয়ারে বসে আছে তার ভাগ্নে বব বারোজ। চোখমুখ কালো করে রেখেছে।
কিশোরকে দেখেই বলে উঠল জ্যাকবস, উপদেশ দিতে এসেছ তো? যেতে পার। অনেক হয়েছে। সারাটা দিন আমার কান ঝালাপালা করে ফেলেছে বব।
সব সময় বলেছি, আবারও বলছি, ঘোষণা করল বব। ওই সিগারেট তোমাকে খাবে! এবারে বেঁচ্ছে কোনমতে, এর পরের বার আর বাঁচবে না।
একশো বার বলছি, আমি ক্লান্ত ছিলাম, মুখ গোমড়া করে ফেলেছে। জ্যাকবস। ক্লান্ত ছিলাম, সেজন্যেই ঘটল এটা। জানিসই তো, খুব হুঁশিয়ার থাকি আমি। সিগারেট নিয়ে বেডরুমেও যাই না।
তাহলে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে খাওয়ার জন্যে বুঝি সোফায় শুয়েছিলে?
গুঙিয়ে উঠল জ্যাকবস। উফ, আর পারি না! বাঁচাল ভাগ্নের চেয়ে খারাপ জীব আর কিছু নেই পৃথিবীতে!
তাই ঘটেছিল, না? মাঝখান থেকে কথা বলে উঠল কিশোর। সিগারেট মুখে। নিয়ে সোফায় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন?

তাই হয়ত হবে! স্বীকার করল জ্যাকবস। এছাড়া আর কি হতে পারে? মনে আছে, মিসেস ডেনভার অ্যাক্সিডেন্ট করার পর ঘরে ঢুকেছি...ভীষণ ঘুম পেয়েছিল—শেষ একটা সিগারেট ধরিয়ে ছিলাম সোফায় বসে-তারপর আর কিছু মনে নেই। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। জেগে উঠে দেখলাম ধোয়ায় ভরে গেছে ঘর। চোখ জ্বালা করছে। ভাল দেখতে পাচ্ছি না। এর মাঝেই দরজাটা খুঁজে বের করতে গেলাম। তারপর তো বেহুশ!

ভুল দিকে দরজা খুঁজতে গিয়েছিলেন, বলল কিশোর। বেডরুমের দিকে চলে গিয়েছিলেন।

মাথা ঝোঁকাল জ্যাকবস। তুমি বের করে এনেছ আমাকে।

আমি একা নই, জানাল কিশোর। রবিন, মুসা আর টমিও সঙ্গে ছিল। টমিকেই ধন্যবাদ দেয়া উচিত আপনার। আগুন লেগেছে, সে-ই দেখেছে প্রথমে।

অদ্ভুত একটা ছেলে! বিড়বিড় করল জ্যাকবস। দেখতে পারতাম না ওকে। অথচ ও-ই আমার জান বাঁচাল।

মিস্টার জ্যাকবস, বলল কিশোর। মিস্টার অলিভার একটা কুকুর আনাচ্ছেন, শুনেছেন আপনি?

কুকুর! বালিশ থেকে মাথা তুলে ফেলল জ্যাকবস। কুকুর দিয়ে কি করবে?

জানি না। শুনলাম, কুকুর আনবে শুনে মিসেস ডেনভার খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছেন।

ওই মহিলা! ও-তো খামোকাই চিন্তিত হয়ে পড়ে। কতখানি সত্যি বলেছে তাই বা কে জানে! এত বেশিকথা বলে, মিথ্যে না বললে পাবে কোথায় কথা? আবার বালিশে মাথা রাখল জ্যাকবস। টান টান করল শরীরটা। ওই বাড়িতে আর থাকছি না আমি। কিশোরের দিকে তাকাল। তোমরাও চলে যাও ওখান থেকে। বাড়িটা মোটেই নিরাপদ না।

উঠে দুপা এগিয়ে এল বব। ওসব নিয়ে ভেব না এখন। ডাক্তার বলেছে, চুপচাপ বিশ্রাম নিতে। আমি যাচ্ছি, ঘরদোর পরিষ্কার করে ফেলিগে। কিছু মেরামতের থাকলে তা-ও করে ফেলব। আগে ভাল হয়ে ওঠো, তারপর খুঁজে পেতে। ভাল আরেকটা বাড়ি দেখে উঠে যাব।

হাসল জ্যাকবস। আসলে ছেলেটা তুই খারাপ না, বব। একেক সময় ভাবি, . আমি তোর গার্জেন, না তুই আমার!

যাচ্ছি, কিশোরের দিকে ফিরল বব। তুমি?

আমিও যাব।

ক্লিনিক থেকে বেরিয়ে এল দুজনে।

খুব বেশি বিড়ি খায় আমার মামা, তিক্ত কণ্ঠে বলল বব। খাটেও সাংঘাতিক, দুশ্চিন্তাও বেশি। আগুন লেগেছে, একদিক থেকে ভালই হয়েছে।
ঝট করে চোখ ফেরাল কিশোর ববের দিকে।
না না, খারাপ অর্থে বলিনি, তাড়াতাড়ি বলল বব। হাসপাতালে একটু বিশ্রাম নিতে পারবে। ইদানীং খুব বেশি নার্ভাস হয়ে পড়েছিল, ঘুমাতই না বলতে গেলে। বড় বেশি ভাবত। অযথাই চমকে চমকে উঠত। এটা লক্ষ করছি ক্রিসমাসের পর থেকে। ব্যবসা সুবিধের যাচ্ছে না কিছুদিন ধরে। সেটাই কারণ হতে পারে। তার ওপর অতিরিক্ত সিগারেট। শরীর তো খারাপ হবেই। এবার আর না ঘুমিয়ে পারবে না। ঘুমোতে না চাইলে ঘুমের বড়ি খাওয়াবে ডাক্তাররা। সিগারেট ছুতেও দেবে না। দিন দুয়েক বিশ্রাম হবে।
এবং সেটা ভালই হবে, রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে, হাঁটতে হাঁটতে বলল কিশোর। ইদানীং ওই বাড়িটাতেও অদ্ভুত সব কাণ্ডকারখানা ঘটছে! যে রাতে চোর এসেছিল, তুমি ও-বাড়িতে ছিলে না, না?
নাহ্…একটা মজা মিস করেছি। বন্ধুর বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলাম। মামার কাছে শুনলাম, চোর এসেছিল।
মিস্টার অলিভার যে কুকুর আনাচ্ছেন, এটা শুনেছ?
না। বুড়িটাকে সহ্যই করতে পারি না আমি, কথা বলতে এলে পালাই। নইলে হয়ত শুনতে পেতাম।
অ্যাপার্টমেন্ট হাউসে এসে পৌঁছুল ওরা। চত্বর পেরিয়ে জ্যাকবসের ফ্ল্যাটের কাছে এল।
ভাঙা জানালার দিকে চেয়ে শিস দিয়ে উঠল বব। শার্সিতে ভাঙা কাঁচের কয়েকটা টুকরো লেগে আছে এখনও। পর্দার জায়গায় ঝুলছে কয়েক ফালি পোড়া ন্যাকড়া।
কাঁচের মিস্ত্রিকে খন্ত্র দিতে হবে আগে, পকেট থেকে চাবির গোছা বের করল বব। একটা চাবি বেছে নিয়ে তালায় ঢোকাল। বাইরের অবস্থা দেখেই ভেতরে কি হয়েছে বুঝতে পারছি। এমন হবে জানলে কে যেত মামাকে একা ফেলে! মোচড়। দিয়ে তালা খুলে ফেলল। দরজা খুলে ঢুকে গেল ভেতরে।– কিশোরও ঘুরে দাঁড়াল। ব্যালকনির সিঁড়ির দিকে এগোল। মনে ভাবনা।
লারিসা ল্যাটনিনার বিষ খাওয়াটা কি নিছকই দুর্ঘটনা? জ্যাকবস কি সত্যিই জানে না। কুকুর আনার কথা? যতখানি নিরীহ আর নিরপরাধ মনে হচ্ছে বব বারোজকে, আসলেও কি তাই? তাই যদি হয়ে থাকে, তাহলে সন্দেহ পুরোপুরি গিয়ে পড়ে টমি গিলবার্টের ওপর। সে-ই একমাত্র লোক, যে জানতে পারে হাউণ্ডের মূর্তিটার কথা। আরও একটা যদি আছে এখানে-যদি সত্যিই মিস্টার

অলিভারের ঘরের ছায়াটা সে-ই হয়। আরেকটা কথা মনে এল কিশোরের। কেউ একজন চাইছে, অ্যাপার্টমেন্ট হাউসটা আর তার আশপাশের এলাকা থেকে লোকজন সরিয়ে দিতে। তা-ই যদি হয়ে থাকে, তাহলে এরপর কাকে সরানর পালা? নিশ্চয় তিন গোয়েন্দা!

বেল বাজাল কিশোর।

দরজা খুলে দিল মিকো ইলিয়ট। এস। মাত্র ফিরেছে তোমার বন্ধু রবিন। কিছু একটা শোনার জন্যে অস্থির হয়ে আছে। তোমার অপেক্ষাই করছে।

একটা সোফায় বসে আছে রবিন। কোলের ওপর খোলা নোট বুক।

পুরানো ধাঁচের একটা চেয়ারে বসা মিস্টার অলিভার। কিশোরকে দেখেই জিজ্ঞেস করলেন, লারিসা কেমন আছে?

ভাল, জানাল কিশোর।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। জ্যাকবস? তাকে দেখতে গিয়েছিলে?

গিয়েছিলাম। তেমন আহত মনে হল না। তবে বিশ্রাম দরকার। ভীষণ নার্ভাস হয়ে পড়েছে। ডাক্তাররা পর্যবেক্ষণে রাখতে চাইছেন।

অ।

আপনার কোন অসুবিধে হয়নি তো?

না, মাথা নাড়লেন অলিভার। বসে না থেকে মিকোকে নিয়ে ব্যাংকে গিয়েছিলাম। টাকা তুলে নিয়ে এসেছি, ল্যাম্প রাখা টেবিলটা দেখালেন। মুদি দোকান থেকে জিনিসপত্র আনার একটা বাদামী ব্যাগ পড়ে আছে। টাকা কত তুলে এনেছি, কত জমা দিয়েছি। জীবনে এত অস্বস্তি বোধ করিনি আর কখনও!

বুদ্ধিটা ভালই বের করেছ, বলে উঠল মিকো। বাজারের ব্যাগে করে টাকা নিয়ে আসা। দশ হাজার ডলার! কেউ কল্পনাই করতে পারবে না।

ব্যাগের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে হাসল কিশোর। হ্যাঁ, ভাল বুদ্ধি।

আবার বাজল বেল। উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল মিকো।

মুসা ঢুকল। ধপাস করে বসে পড়ল রবিনের পাশে। কোন লাভ হল না! হতাশ কণ্ঠ। মিথ্যে কথা বলেনি টমি। কাজেই গেছে। আর ব্রায়ান এনড্রুও মিছে কথা বলেনি। সে-ও মোটেলে উঠেছে।

লাভ হল না বলছ কেন? জেনে আসাতে সুবিধেই হয়েছে, মুসাকে আর কিছু– বলার সুযোগ না দিয়ে সামনে ঝুঁকল রবিন। সবাই এসে গেছ। এবার আমার কথা শুরু করি।

কি জেনে এসেছ? জিজ্ঞেস করল কিশোর।

একই সময়ে একই সঙ্গে দুজায়গায় থাকতে পারে কিছু কিছু মানুষ, কণ্ঠে রহস্য ঢালল রবিন। ধীরে ধীরে বলে গেল সব, যা যা জেনে এসেছে প্রফেসর লিসা

রোজারের কাছ থেকে।
তার মানে, রবিন থামলে বলল কিশোর। টমি দেয়াল ভেদ করে যেখানে খুশি ঢুকতে পারে, এটা বৈজ্ঞানিক সত্য।
লিসা খালা তো তাই বলল।
যাক! আজ নিশ্চিন্ত! জোরে শ্বাস ফেলল মুসা। ম্যানেজারকে ফাঁকি দিয়ে ঢুকতে পারবে না ব্যাটা। কাজেই ছায়া হয়ে এ-ঘরে আসতে পারবে না।
উঠে গিয়ে ব্যাগটাসহ টাকাগুলো ছোট একটা আলমারিতে ভরে তালা দিয়ে দিলেন অলিভার। সতকর্তা। আশা করি, ছায়া মাথাটা এই আলমারিতে সেঁধিয়ে দিতে পারবে না হারামজাদা!–
যদি পারেও, ব্যাগটা ছাড়া আর কিছু দেখতে পারবে না, কথার পিঠে বলল রবিন। ছায়া চোখ দিয়ে লোকে দেখতে পারে, কিন্তু ছায়া আঙুল দিয়ে কিছু নাড়তে পারে না। কাজেই ভয় নেই।
এজন্যেই, মিসেস ডেনভারের কাছ থেকে চাবিটা নিয়ে নেবার পর আর কোন জিনিস নাড়াচাড়া হয়নি, বললেন অলিভার। ঘাটাঘাটি করত শুধু ওই বুড়িটাই। টমি ব্যাটা শুধু বাইরে যা আছে দেখতে পারে, দেখে চলে যায়।
হ্যাঁ, মাথা ঝোকাল কিশোর। এখন বোঝা যাচ্ছে, মান্দালাটার কথা জানল কি করে টমি। ছায়াশ্বাপদের কথাও সে জানে। আপনি মিস্টার ইলিয়টের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছিলেন, সে শুনেছিল। তবে, যেহেতু ছায়া শরীর কিছু ধরতে পারে। না, চোর টমি নয়। চুরিটা যখন হয়, তার ঘরে ঢুকছিল টমি। বারদুই নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল সে। বিশ্বাস করা কঠিন। তবে ডক্টর ক্লোজারের কথা অবিশ্বাসও করা যায় না। তিনি বিজ্ঞানী। আলতু-ফালতু কথা বলেন না। তাছাড়া, ওই ছায়ার। ব্যাপারটার সঙ্গে তাঁর থিওরি পুরোপুরি মিলে যাচ্ছে।
অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না আর।
জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে মুসা। দৃষ্টি রাস্তার দিকে। হঠাৎ বলল সে, জ্যাকবসের ভাগ্নে চলে যাচ্ছে।
তারমানে, এ বাড়িতে এখন আমরা ছাড়া আর কেউ নেই, যে আলমারিতে টাকা রেখেছেন অলিভার, সেটার দিকে চেয়ে আছে কিশোর। ব্যাগ ভর্তি টাকা! রহস্যময় শোনাল তার কণ্ঠ। যেহেতু ব্যাগের ভেতরে রয়েছে, টাকাগুলো অদৃশ্য! হাসি ফুটল তার ঠোঁটে। হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল দুই চোখ। কোন জিনিস আরেকটা জিনিসের ভেতরে থাকলেই অদৃশ্য!
কিশোর, কি বলছ, কিছু বুঝতে পারছি না! বলল রবিন।
একটা গল্প শোনাব?
কিশোর! গুঙিয়ে উঠল মুসা। ফিরে তাকিয়েছে। আর ভুগিও না! বলে ফেল!

খুনের গল্প, কারও দিকেই তাকাল না কিশোর। অনেকদিন আগে একটা বইয়ে পড়েছিলাম। অদৃশ্য একটা অস্ত্র দিয়ে খুন করা হয়েছিল লোকটাকে।
তাই? আগ্রহী হয়ে উঠেছেন অলিভার।
ঘরে বসে ডিনার খাচ্ছিল একটা লোক আর তার স্ত্রী, বলল কিশোর। তাদের সঙ্গে সেরাতে খেতে বসেছিল লোকটার এক বন্ধু। দরজা-জানালা সব বন্ধ ঘরের। কি একটা ব্যাপার নিয়ে কথা কাটাকাটি শুরু হল লোকটা আর তার বন্ধুর মাঝে। হাতাহাতি শুরু হল এক পর্যায়ে। হাতের নাড়া লেগে টেবিলে বসানো একমাত্র মেমিটা উল্টে পড়ে নিভে গেল। অন্ধকার হয়ে গেল ঘর। অন্ধকারে স্বামীর আর্তনাদ শুনতে পেল স্ত্রী। টের পেল, তার জামার ঝুলে টান পড়েছে। আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠল। মহিলা। চিৎকার শুনে ছুটোছুটি করে এল চাকর-বাকরেরা। আবার আলো জ্বালানো হল। দেখা গেল, মেঝেতে মরে পড়ে আছে লোকটা। রক্তাক্ত। বুকের বাঁ পাশে একটা ক্ষত। ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে কাঁপছে বন্ধুটি। মহিলার জামার নিচের দিকে রক্তের দাগ। পুলিশ এল। কিন্তু বন্ধুকে ধরে নিয়ে গিয়েও আবার ছেড়ে দিতে হল। কারণ, যে অস্ত্র দিয়ে মারা হয়েছে লোকটাকে, সেটা পাওয়া গেল না।
আশ্চর্য! বলে উঠল মিকো। কি দিয়ে খুন করা হয়েছিল?
হাসল কিলোর। ব্যাপারটা মেনে নিতে পারল না লোকটার স্ত্রী। তাঁদড় এক গোয়েন্দার কাছে গিয়ে ধর্না দিল। পাওয়া গেল অস্ত্রটা। আবার বন্ধুকে অ্যারেস্ট করল পুলিশ। ঠাণ্ডা মাথায় মানুষ খুনের দায়ে ঝুলিয়ে দিল ফাঁসিতে। খুন করা হয়েছিল ছুরি দিয়ে।
ছুরি! চেঁচিয়ে উঠল মিকো। কোথায় লুকিয়ে রেখেছিল?
বড় একটা কাঁচের ফানেলে পানি ভরে তাতে মানিপ্ল্যান্ট লাগিয়েছিল খুন হওয়া লোকটার স্ত্রী। খুন করেই মহিলার জামায় ছুরির রক্ত মুছে ফেলল বন্ধুটা। ছুরিটা নিয়ে ঢুকিয়ে রাখল ফানেলে।
ওটা তো প্রথমেই পুলিশের চোখে পড়ে যাবার কথা! হাঁ হয়ে গেছে মুসা।
না, কথা না। কারণ ছুরিটা তৈরি হয়েছিল শক্ত ক্রিস্টাল দিয়ে। পানিভর্তি কাঁচের ফানেলে ঢুকিয়ে রাখতেই অদৃশ্য হয়ে গেল। পানি আর কাঁচের সঙ্গে মিশে গেল স্বচ্ছ জিনিসটা। অলিভারের দিকে তাকাল সে হঠাৎ। মিস্টার অলিভার, কেন বিষ খাওয়ানো হল মিস ল্যাটনিনাকে? কারণ, রোজ রাতে নিয়মিত সাঁতার কটিতে। নামত সে সুইমিং পুলে।
ঈশ্বর! চেঁচিয়ে উঠল মিকো।
এবং মিসেস ডেনভার, বলে গেল কিশোর, যতই ছোঁক ছোঁক করুক, আগে তো কেউ কোন ক্ষতি করেনি তার। তার গাড়িতে বোমা মারা হল কবে? পুলের পানি

পরিষ্কার করবে, বলার পর। মিস্টার অলিভার, আমরা ক্রিস্টালে তৈরি একটা মূর্তি খুঁজছি। যেটা ওই ছুরির মত জিনিস দিয়েই তৈরি। যেটা পানিতে অদৃশ্য হয়ে যায়।
পুল! চেঁচিয়ে উঠল রবিন। পুলের পানিতে লুকিয়ে রাখা হয়েছে মূর্তিটা!
কোমরে হাত রেখে হাসিমুখে উঠে দাঁড়াল কিশোর। আগামীকাল দশ হাজার ডলার দিয়ে মূর্তিটা কিনতে হবে, মিস্টার অলিভার। কেন? আজই যদি পুল থেকে তুলে নিয়ে আসি ওটা? এখনই উপযুক্ত সময়। বাইরের কেউ নেই এখন বাড়িতে।
ঠিক! ঠিক বলেছ! উত্তেজনায় কাঁপছেন অলিভার।
হাসল কিশোর। রবিন, পেছনের গেটে গিয়ে দাঁড়াও তুমি। কেউ আসে কিনা দেখবে। মুসা, সামনের গেটে তুমি থাকবে। রাস্তার দিকে নজর রাখবে।
তুমি? জানতে চাইল মুসা।
সাঁতার কাটতে যাব, শার্টের বোতাম খুলতে শুরু করেছে কিশোর।
রবিন আর মুসা গিয়ে দাঁড়াল দুই গেটে। কিশোরকে অনুসরণ করে পুলের কিনারে এসে দাঁড়ালেন অলিভার আর মিকো।
খালি গা। ঠাণ্ডায় কেঁপে উঠল কিশোর। একটু দ্বিধা করে নেমে পড়ল সে পানিতে। গলা পানিতে এসে ডুব দিল।
অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে রইলেন অলিভার আর মিকো। এত দেরি করছে। কেন কিশোর! আসলে তিরিশ সেকেণ্ডও যায়নি, এটা খেয়াল করছে না তারা।
ভুসস করে ভেসে উঠল কিশোর। ডান হাতটা তুলল পানির ওপর। হাতে কিছু। একটা ধা।
পেয়েছে। পেয়েছে! প্রায় নাচতে শুরু করলেন অলিভার।
চুপ! আস্তে! থামিয়ে দিল তাঁকে মিকো।
পুলের কিনারে চলে এল কিশোর। জিনিসটা বাড়িয়ে দিল অলিভারের দিকে।
কাঁপা কাঁপা হাতে নিলেন অলিভার। অপূর্ব একটা শিল্পকর্ম। নিখুঁত সৃষ্টি। পেশীগুলো পরিষ্কার, প্রায় চৌকোনা ভোতা মাথাটাকে জ্যান্তই মনে হচ্ছে। বড় বড় চোখ দুটো সোনালি, দুই কশে সোনালি ফেনা। সামনের পায়ের নিচ থেকে কানের ডগার উচ্চতা ছয় ইঞ্চি। সামনের দুই পায়ের ফাঁকে ক্রিস্টালে তৈরি মানুষের খুলির একটা খুদে প্রতিকৃতি আঁকড়ে ধরে রেখেছে। কুকুরটার কোমরে মোটা লম্বা সুতো বাধা। স্বচ্ছ, প্লাস্টিকের সুতো।
এত সহজ! বলল কিশোর। পানিতে নামারও দরকার হয়নি চোরের। সুতোয় ধরে আস্তে করে পানিতে ছেড়ে দিয়েছে মূর্তিটা, ঢাল বেয়ে ধীরে ধীরে গভীর পানিতে চলে গেছে ওটা। হাত থেকে সুতো ছেড়ে দিয়েছে চোর। স্বচ্ছ সুতো, পানির ভেতর

অদৃশ্য হয়ে গেছে। কুকুরটার চোখ আর কশের ফেনা সোনালি, তলার সোনালি মোজাইকের সঙ্গে মিলে গেছে।
বুদ্ধি আছে চোর-ব্যাটার! স্বীকার করল মিকো।
দিন ওটা। অলিভারের দিকে হাত বাড়াল কিশোর।
দেব!
হ্যাঁ। আবার পুলের তলায় রেখে দেব।
কেন!
কারণ, আজ রাতে এটা নিতে আসবে চোর। টেলিভিশন মনিটর অন করে দেব। ঘরে বসেই দেখতে পাব চোরকে।
বুঝেছি, মূর্তিটা ফিরিয়ে দিতে দ্বিধা করছেন অলিভার।
দিয়ে দাও, ফ্র্যাঙ্ক, বলল মিকো।
কিন্তু-কিন্তু মূর্তিটার ক্ষতি হতে পারে!–ভেঙেটেঙে ফেলতে পারে—
ভাঙবে না। ও ব্যাপারে হুশিয়ার থাকবে চোর। ভাঙা মূর্তি বিকোবে না।
ইচ্ছের বিরুদ্ধে মূর্তিটা আবার কিশোরের হাতে তুলে দিলেন অলিভার।
ডুব দিয়ে আবার আগের জায়গায় জিনিসটা রেখে এল কিশোর। ঠাণ্ডায়। কাঁপতে কাঁপতে পানি থেকে উঠে এল। একটা তোয়ালে আর কিছু ন্যাকড়া দরকার। পুলের ধারে এত পানি দেখলে সন্দেহ করে বসবে চোর। পানিতে নেমেছি, অনুমান করে ফেলবে। তাছাড়া চত্বরে ভেজা ছাপ থাকাও উচিত না।
প্রায় ছুটে চলে গেল মিকো। মিনিটখানেক পরেই অলিভারের ঘর থেকে একটা তোয়ালে আর কিছু ছেঁড়া কাপড় নিয়ে এল। তোয়ালেটা কিশোরের হাতে তুলে দিয়ে নিজে পুলের কিনারে ঝরে পড়া পানি পরিষ্কার করতে লেগে গেল।
দ্রুতহাতে গা মুছতে লাগল কিশোর।
সামনের গেট থেকে ছুটে এল মুসা। এনড্রু আসছে!
রবিনকে ডাকো! মিকোর দিকে চেয়ে বলল কিশোর, আপনারা দুজন ওপরে চলে যান! তাড়াতাড়ি ভেজা পায়ের তলা মুছে ফেলতে লাগল সে।
সবার শেষে অলিভারের বসার ঘরে ঢুকল কিশোর। অন্য চারজন আগেই ঢুকে পড়েছে। দরজা বন্ধ করে দিল মিকো। টেলিভিশনের সুইচ অন করল কিশোর।
গেটে দেখা দিল বেড়াল-মানব। চত্বর দিয়ে হেঁটে চলল নিজের ফ্ল্যাটের দিকে।
পুলের দিকে তাকালও না! বিড়বিড় করল কিশোর। ভেজা প্যান্ট খুলে ফেলে তোয়ালে জড়িয়ে নিয়েছে কোমরে।
কেন? রবিন শুকনো একটা শার্ট এনে দিল বন্ধুকে। তাকাল না কেন?
মনে হয় গেট থেকেই খেয়াল করেছে, পুলের পানিতে ঢেউ। বোঝাই যায়, কেউ নেমেছিল। কিনারের পানিও পুরোপুরি মুছে ফেলা যায়নি।

ও চোর নয় তাহলে! বলল মুসা।
হয় চোর নয়, কিংবা সন্দেহ করে ফেলেছে, পুলে নেমেছিল কেউ। মূর্তিটা পাওয়া গেছে। আড়াল থেকে লক্ষ্য রাখা হচ্ছে তার ওপর। তা যদি হয়ে থাকে, অসম্ভব ধূর্ত সে!—দেখা যাক, কি হয়!
একটা দুটো করে বেড়াল ঢুকতে শুরু করল চত্বরে। এনড্রুর ঘরের বারান্দায় জমায়েত হল কয়েক ডজন। অর্ধচন্দ্রকারে বসে পড়ল। একগাদা প্লেট হাতে বেরিয়ে এল এনড্রু। একটা করে প্লেট রাখল প্রতিটা বেড়ালের সামনে। আবার ঘরে ঢুকল। বড় একটা পাত্রে করে খাবার নিয়ে বেরোল। প্লেট ভরে খাবার দিল। বেড়ালগুলোকে।
জানোয়ারগুলো খাচ্ছে, আর সামনে বসে দেখছে এনড্রু। কথা বলছে ওগুলোর সঙ্গে। আশ্চর্য শৃঙ্খলা! একে অন্যের সঙ্গে মারামারি করল না বেড়ালগুলো, কামড়াকামড়ি খামচাখামচি কিছুই করল না। শান্তভাবে যার যার প্লেটের খাবার শেষ করে চলে গেল একে একে।
প্লেটগুলো নিয়ে আবার ঘরে ঢুকে গেল এনড্রু। খানিক পরেই দরজায় তালা লাগিয়ে বেরিয়ে চলে গেল সে-ও।
টেলিভিশনের পর্দায় একনাগাড়ে চোখ রাখল তিন গোয়েন্দা। এগারোটার সময় যথারীতি আলো নিবে গেল। বেড়াল-মানবের পর আর কেউ ঢোকেনি চত্বরে। বসার ঘরে বসেই ডিনার খেয়ে নিয়েছে ওরা তিনজনে।
জ্যাকেট তুলে নিল মুসা সোফার ওপর থেকে। গায়ে চড়াল। ব্যালকনিতে যাচ্ছি। লুকিয়ে থেকে চোখ রাখব।
আমিও আসছি, উঠে দাঁড়াল কিলোর। টেলিভিশনের সুইচ অফ করে দিল।
আমিও, রবিনও উঠল। আজ রাতে কিছু একটা ঘটবেই। মিস করতে চাই না। বঞ্চিত করতে চাই না চোখকে।

.

মাঝরাতে গেট খোলার শব্দ হল। চত্বরে ঢুকল টমি গিলবার্ট। ঘরে চলে গেল। কয়েক মিনিট আলো দেখা গেল তার জানালায়, তারপর নিবে গেল।
ব্যালকনিতে অপেক্ষা করে আছে তিন গোয়েন্দা।
একটা দরজা খুলল, বন্ধ হল, শোনা গেল মৃদু আওয়াজ।
পুলের ওপাশে একটা ছায়া দেখা গেল। কিশোরের হাত খামচে ধরল মুসা।
ধীরে ধীরে পুলের ধারে এসে দাঁড়াল ছায়াটা। আস্তে করে নেমে পড়ল পানিতে। ল্যাম্পপোস্টের আলো পড়েছে পানিতে এক জায়গায়, দেখা গেল ছোট ছোট ঢেউ, সাতরে এগোচ্ছে ছায়াটা।

পুলের ঠিক মাঝখানে দেখা গেল একটা মাথা, আবছা! পরক্ষণেই ডুবে গেল। পানির নিচে দেখা গেল আলোর রশ্মি। পানি-নিরোধক টর্চ। নড়াচড়া করছে রশ্মিটা।
হঠাৎ নিবে গেল আলো। পানির ওপরে প্রায় নিঃশব্দে ভেসে উঠল আবার মাথাটা।
যেখান দিয়ে নেমেছিল, সেখান দিয়েই আবার উঠে পড়ল ছায়াটা। ফিরে চলল।
মৃদু শব্দ হল দরজা খোলা এবং বন্ধ হবার।
আস্তে করে দরজায় টোকা দিল মুসা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই খুলে গেল দরজাটা। টমি! ফিসফিস করে বলল সে।
দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল তিন গোয়েন্দা। পেছনে মিস্টার অলিভার আর মিকো ইলিয়ট।
অন্ধকারই রয়েছে টমির জানালা।
ছায়া শরীরে বেরিয়েছিল হয়ত! ফিসফিস করল মুসা।
মোটেই না! সবার আগে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে কিশোর। বেল বাজাল। এক সেকেণ্ড অপেক্ষা করে আবার বাজাল। গিলবার্ট! ডাকল চেঁচিয়ে। গিলবার্ট, দরজা খুলুন! নইলে পুলিশ ডাকব। ওরা দরজা ভেঙে ঢুকবে।
দরজা খুলে গেল। ঘুমোনর পোশাক পরে দাঁড়িয়ে আছে টমি। খালি পা, আবছা দেখা যাচ্ছে। কি হয়েছে? মাঝরাতে ডাকাডাকি কেন? ঘুমিয়েছিলাম...।
ঘরে ঢুকে সুইচ টিপে দিয়েছে কিশোর। আলো জ্বলে উঠল। ঘাড়ের ওপর। লেপটে আছে টমির ভেজা চুল।
ঘুমোননি, শান্ত কণ্ঠে বলল কিশোর। পুলে নেমেছিলেন।
না-আ! আমি— থেমে গেল টমি। চুল বেয়ে টপ করে পানি পড়েছে এক ফোঁটা। আমি শাওয়ারে গোসল করছিলাম।
আগে বললেন ঘুমিয়েছিলেন, এখন শওয়ার। দুটোই মিথ্যে কথা, শুধরে দিল কিশোর। আসলে পুলে নেমেছিলেন। পুলের ধার থেকে আপনার দরজা পর্যন্ত এসেছে ভেজা পায়ের ছাপ।
দরজার বাইরে তাকাল টমি। সত্যিই, দরজায় ভেজা ছাপ। কাঁধ ঝাঁকাল সে। বেশ, নেমেছিলাম পুলে। তাতে কোন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল? সারাদিন। পরিশ্রম করেছি, সাঁতার কেটে শান্ত করে নিয়েছি শরীরটাকে।
হাউণ্ডটা কোথায়? প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন অলিভার। বজ্জাত! চোর!
কি যা-তা বলছেন! কিছুই বুঝতে না পারার ভান। কিন্তু সামাল দিতে পারল না টমি। বিশ্বাসঘাতকতা করেছে চোখ, ঝট করে ঘুরে গেছে রান্নাঘরের দিকে।

কোন একটা তাকে রেখেছেন নিশ্চয়, রান্নাঘরের দরজার দিকে চেয়ে আছে কিশোর। খুব বেশি তাড়াতাড়ি চলে এসেছি। লুকোনর সময় পাননি।
মাথা খারাপ হয়ে গেছে তোমার! বিড়বিড় করল টমি।
মিস্টার অলিভার, বলল কিশোর। পুলিশই ডাকুন। সঙ্গে একটা সার্চ ওয়ারেন্ট নিয়ে আসতে বলবেন।
জোর করে কারও বাড়ি সার্চ করার নিয়ম নেই! বলল টমি। তাছাড়া মাঝরাতে ওয়ারেন্ট জোগাড় করতে পারবে না পুলিশ!
সেটা তাদের ব্যাপার, শান্ত কিশোর। না পারলে সকালতক অপেক্ষা করব। ইতিমধ্যে চত্বর থেকে নড়ছি না। আপনার ফ্ল্যাট ঘিরে রাখব আমরা। আমাদের চোখ এড়িয়ে বেরোতে পারবেন না, মূর্তিটা কোথাও ফেলেও দিয়ে আসতে পারবেন না।
তোমরা তোমরা তা করতে পার না! চেঁচাতে শুরু করেছে টমি। আমাকে, আমাকে অপমান করা হচ্ছে।
অপমান করলাম কোথায়? হাত নাড়ল কিশোর। চতুরে বসে থাকব আমরা, আপনার দরজার দিকে চেয়ে থাকব, এতে কোন দোষ ধরতে পারবে না উকিল। কেন অযথা ঝামেলা বাড়াচ্ছেন? মূর্তিটা দিয়ে দিন, আমরা সব ভুলে যাব। পুলিশ ডাকার দরকারই হবে না।
ঝাড়া কয়েক সেকেণ্ড কিশোরের দিকে চেয়ে রইল টমি। পিছিয়ে গেল দরজার কাছ থেকে। চুলোর ভেতরে রেখেছি। মুখ কালো হয়ে গেছে তার। খামোকা। এসব করতে গেলেন, মিস্টার অলিভার। মুর্তিটা আপনাকেই দিয়ে দিতাম।
ব্যঙ্গ করে হাসলেন অলিভার। তাই নাকি? নিশ্চয় দশ হাজার দেবার পর?
দশ হাজার! সত্যিই বিস্মিত হয়েছে টমি। কিসের দশ হাজার?
জানেন না? জিজ্ঞেস করল কিশোর। সত্যিই জানেন না টাকাটার কথা?
ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল টমি। ভেবেছিলাম, মূর্তিটা মিস্টার অলিভারকে দিলে কিছু পুরস্কার পাব। কিন্তু দশ হাজার ডলার, জানতাম না!
টমির পাশ কাটিয়ে গিয়ে রান্নাঘরে ঢুকলেন অলিভার। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে এলেন আবার। হাতে হাউণ্ডের মূর্তি। কোমরে বাঁধা সুতো মূর্তির শরীরে পেঁচানো।
মিস্টার অলিভার, বলে উঠল কিশোর। টমি চোর নয়। ঘুমের ভেতরে তার ছায়া শরীর শুধু ঘুরে বেড়ায়, দেখে, শোনে। তার বেশি কিছু করতে পারে না।
চমকে উঠল টমি। ফেকাসে হয়ে গেল চেহারা। উঠল-নামল কণ্ঠা, ঢোক গিলেছে।
কি দেখেছিলেন, গিলবার্ট? প্রশ্ন করল কিশোর। ঘুমের ঘোরে মূর্তিটার ব্যাপারে কি দেখেছিলেন? কি শুনেছিলেন?

কাঁপছে টমি। ইচ্ছে করে দেখিনি, শুনিওনি! ছায়া শরীর ঘুরে বেড়ায়, এতে আমার কোন দোষ নেই! ওটা এক ধরনের স্বপ্ন!
কি দেখেছেন স্বপ্নে? আবার প্রশ্ন করল কিশোর।
একটা কুকুর, কাঁচের। দেখলাম, অনেক রাতে, অন্ধকারে পুলের ধারে এসে বসল একটা মানুষ। পানিতে নামিয়ে রাখছে কাঁচের কুকুরটা। মুখ ঢেকে রেখেছিল মানুষটা, চিনতে পারিনি।
আমার মনে হয়, সঙ্গীদের দিকে ফিরল কিশোর, টমি গিলবার্ট সত্যি কথাই বলছেন।

.
রক্ত ফিরে আসছে টমির মুখে। দেখ, কিশোর, মূর্তিটা আমি পুল থেকে তুলে এনেছি ঠিকই। কিন্তু সত্যি বলছি, ওটা সকালেই দিয়ে দিতাম মিস্টার অলিভারকে। আমি ওটা চুরি করিনি।
বুঝতে পারছি, বলল কিশোর, আপনি করেননি। চুরিটা যখন হয়, আপনি ঘুমিয়ে ছিলেন। তবে, মূর্তিটা তুলে সঙ্গে সঙ্গে মিস্টার অলিভারের কাছে যাওয়া উচিত ছিল। লুকিয়ে রাখলেন কেন? কাজটা অন্যায় করেছেন।
দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াল মিকো। যাও, জলদি কাপড় বদলে এস, টমি। অলিভারের ঘরে থাকবে। তোমাকে চোখে চোখে রাখতে পারব।
জ্বলন্ত চোখে মিকোর দিকে তাকাল টমি। আপনি আমাকে আদেশ করার। কে? চেঁচিয়ে উঠল। বাড়িটা কি আপনার?
একই কথা তোমার বেলায়ও খাটে, বলে উঠলেন অলিভার। ছায়া শরীরেই হোক আর তরল শরীরেই হোক, তুমি আমার ঘরে ঢোকো কার হুকুমে? মিকো যা বলছে কর, নইলে জেলের ভাত খাওয়াব, চুরি করে অন্যের ঘরে ঢোকার অপরাধে। চোরাই মাল লুকিয়ে রাখার অপরাধে।
ঝটকা দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল টমি। গটমট করে হেঁটে গিয়ে ঢুকল শোবার ঘরে। টান দিয়ে খুলল আলমারির পাল্লা। কয়েক মুহূর্ত পরে বন্ধ করে দিল ধাক্কা দিয়ে। মিনিট কয়েক পরেই ফিরে এল সে। গায়ে কালো সোয়েটার, পরনে হালকা রঙের প্যান্ট।
রাতটা আমার বসার ঘরে কাটবে, এবং ঘুমোতে পারবে না! কড়া আদেশ জারি করলেন অলিভার।
গোমড়ামুখে মাথা ঝোঁকাল টমি।
মূর্তিটা এক হাত থেকে আরেক হাতে নিলেন অলিভার। কিশোর, তুমি বলেছিলে, আজ রাতে চোরটাকে ধরবে!

ধরতে তো চাই। তবে চেঁচামেচি করে ভাগিয়ে দিলাম কিনা, কে জানে! এখনও সময় আছে অবশ্য। আবার ফিরে আসতে পারে সে।
নীরবে মূর্তিটা কিশোরের হাতে তুলে দিলেন অলিভার। মিকো আর টমিকে নিয়ে রওনা হলেন তাঁর ঘরে।
আবার আস্তে করে পুলের পানিতে মূর্তিটা ছেড়ে দিল কিশোর। দুই সঙ্গীকে নিয়ে বসল ব্যালকনিতে। ঠাণ্ডা, অন্ধকার দীর্ঘ মুহূর্তগুলো পেরিয়ে গেল ধীরে ধীরে। পুব আকাশে ধলপহর দেখা দিল। ধীর পায়ে এগিয়ে এল শীতের কুয়াশামাখা ধূসর ভোর। চোর আর এল না সে রাতে।
আরও আগেই বোঝা উচিত ছিল, লাল চোখ ডলছে কিশোর। চোরটার আসার কোন দরকারই নেই। আগে টাকাটা নিয়ে নেবে মিস্টার অলিভারের কাছ থেকে, তারপর জানিয়ে দেবে কোথায় রেখেছে হাউণ্ডের মূর্তি। খুব সহজ। কেন খামোকা নিজে ওটা তুলে নিতে আসার ঝুঁকি নেবে?
পেছনে খুলে গেল দরজা। দাঁড়িয়ে আছেন অলিভার। নাশতা? ফিটফাট পোশাক পরনে, বেশ তাজা দেখাচ্ছে তাকে।
সবাই খেতে বসল, টমি গিলবার্ট ছাড়া। কাজের ঘরে একটা চেয়ারে বসে আছে গোমড়ামুখে। কিছু খেতে কিংবা কারও সঙ্গে কথা বলতে চায় না সে।
নাশতা শেষ করেই কাজে লেগে গেল কিশোর। পুরানো একগাদা খবরের কাগজ আর কাচি নিয়ে বসল। কেটে কেটে একের পর এক আয়তক্ষেত্র বানাচ্ছে। প্রতিটি ক্ষেত্র দুই ইঞ্চি চওড়া, পাঁচ ইঞ্চি লম্বা।
কি করছ? আর থাকতে না পেরে জিজ্ঞেস করে ফেলল রবিন।
শিগগিরই চোরটা জানাবে, কখন টাকা দিতে হবে তাকে। ওর জন্যে টাকার তোড়া তৈরি করে রাখছি, হাসল কিশোর। কুকুরটা কোথায়, জানেন এখন মিস্টার অলিভার। কাজেই সত্যি সত্যি টাকা দেবার কোন দরকারই নেই আর।
তাহলে ওই কাগজের তোড়া দেবারই দরকার কি? জানতে চাইল মুসা।
চোরটা কে জানার জন্যে, বলল কিশোর। তোড়াগুলোতে ম্যাজিক অয়েন্টমেন্ট মাখিয়ে দেব। ব্যাগটা ফেলে দিয়ে এলেই হল। তোড়ায় হাত দেবে
কালো দাগ পড়ে যাবে হাতে। তারপর চেপে ধরব ওকে।
এমনভাবে বলছ, যেন লোকটা আমাদের পরিচিত, বললেন অলিভার।
অবশ্যই পরিচিত, কিশোরের গলায় খুশির আমেজ। ও জানে, লারিসা ল্যাটনিনা চকলেটের পাগল। জানে, মিসেস ডেনভার ভোর চারটেয় বাজার করতে যায়। নিশ্চয় চোর এ-বাড়ির ভাড়াটে।
ব্রায়ান এনড্রু! চেঁচিয়ে উঠল মুসা। এ ছাড়া আর কেউ না!
হাসিল শুধু কিশোর, কিছু বলল না।

তুমি জান, সে কে? জিজ্ঞেস করলেন অলিভার।
জানি, কিন্তু প্রমাণ করতে পারব না, বলল কিশোর। টাকাটা নিতে এলে প্যাকেটটা ধরলে, তখন আর অসুবিধে হবে না।
নীরবে কাজ করে চলল কিলোর।
ডাকপিয়ন এল বেলা দশটায়। ততক্ষণে দশটা তোড়া বানিয়ে ফেলেছে। কিশোর। সাজিয়ে রেখেছে বসার ঘরের টেবিলে।
ডাকবাক্সে একটা মাত্র চিঠি ফেলে গেল পিয়ন।
খামটা নিয়ে এল কিশোর। ওপরে টাইপ করে লেখা অলিভারের ঠিকানা। তার দিকে তাকাল গোয়েন্দাপ্রধান। মাথা কাত করলেন অলিভার।
খামটা ছিঁড়ে ফেলল কিশোর। ভেতর থেকে বেরোল একটা ভাজ করা কাগজ। তাতে টাইপ করে ইংরেজিতে লেখা বাদামী কাগজে মুড়ে টাকাগুলো পার্কের কোণের ডাস্টবিনে ফেলে রেখে আসতে হবে আজ বিকেল ঠিক পাঁচটায়।
খামটা উল্টেপাল্টে দেখল কিশোর। উইলশায়ার ডাকঘরের ছাপ। গতকালের তারিখ। গুড, হাসল গোয়েন্দাপ্রধান। অয়েন্টমেন্ট মাখাতে শুরু করল কাগজের তোড়ায়। সবকটা তোড়াতে ভালমত মাখাল। তারপর বাদামী একটা বড় কাগজ পেচিয়ে সুন্দর করে প্যাকেট করল। বাইরে থেকে বোঝার কোন উপায় নেই, ভেতরে টাকা আছে, না শুধু খবরের কাগজ কাটা।
ব্যস, হয়ে গেল, অলিভারের দিকে তাকাল কিশোর। বিকেল পাঁচটায় গিয়ে ডাস্টবিনে প্যাকেটটা রেখে আসবেন। দস্তানা পরে নেবেন। প্যাকেটের ওপরেও মলম মাখিয়েছি। আগে পুলিশে একটা ফোন করে নেবেন। হয়ত প্যাকেটটা তুলে নেবার সময়ই চোরকে ধরতে পারবে ওরা।
যদি অন্য কেউ তুলে নেয় প্যাকেটটা? বললেন অলিভার। সুন্দর প্যাকেট। কোন ছেলেছোকরার চোখে পড়লে তুলে নিতেও পারে।
তা পারে। তবে সেটা হতে দেবে না চোর। নিশ্চয় আড়ালে ঘাপটি মেরে বসে থাকবে। আপনি ফেলে দিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে এসে তুলে নেবে।
আমরা কি যাব? জানতে চাইল মুসা।
হ্যাঁ। পাঁচটায় আমরাও গিয়ে লুকিয়ে থাকব, চোখ রাখব ডাস্টবিনটার ওপর। মিস্টার অলিভার, আপনি আমাদেরকে দেখার চেষ্টা করবেন না। কোনদিকেই তাকাবেন না। সোজা গিয়ে প্যাকেটটা ফেলে রেখে চলে আসবেন।

.

বিকেল চারটে পঁয়তাল্লিশ মিনিট।
রেকটরির পাশের ছোট্ট ফুলের ঝোপে লুকিয়ে বসে আছে তিন গোয়েন্দা। রাস্তার ধারের ছোট পাকটা নির্জন। শুধু একজন ঝাড়দার রয়েছে। একটা ঝুড়ি আর

ঝাড় হাতে নিয়ে পার্কের ময়লা পরিষ্কার করছে। চকলেটের মোড়ক, বিস্কুটের বাক্স, ছেঁড়া কাগজের টুকরো-টাকরা ইত্যাদি তুলে নিয়ে রাখছে ঝুড়িতে। ভরে নিয়ে গিয়ে ফেলে দেবে ডাস্টবিনে।
উইলশায়ারের দিক থেকে আসবে চোর, ফিসফিস করে বলল কিশোর।
একটা খবরের কাগজের ভ্যান এসে থামল পার্কের গেটের সামনে। পেছন। থেকে লাফিয়ে নামল, একজন হকার, বগলে একগাদা কাগজ। পথের পাশের ফুটপাতে কাগজগুলো সাজিয়ে রাখতে শুরু করল। চলে গেল ভ্যানটা। খদ্দেরের অপেক্ষা করছে হকার। পরিচিত দৃশ্য।
ছেলেদের মাথার ওপরে নিঃশব্দে খুলে গেল একটা জানালা। মনে হয়, শোনা গেল একটা পরিচিত কণ্ঠ, তোমরা আমার ঘরে এসে বসলেই বেশি আরাম পাবে। বাইরে ঠাণ্ডা।
মুখ তুলে তাকাল মুসা। খোলা জানালায় মুখ বাড়িয়ে আছে ফাদার স্মিথ। দাঁতের ফাঁকে পাইপ। ওই ঝোঁপের ভেতরে কেন? ঘরে এস। সামনের দরজা খুলে দিচ্ছি। ঘুরে চল এস।
অনুভব করল কিশোর, ঝাঝা করছে কান।
এত ছোট ঝোপে লুকোনো যায় না, আবার বললেন ফাদার। দেখে ফেলবেই। চলে এস। আবার পুলিশের কাজে নাক গলাচ্ছ, দেখলে খেপে যাবে ওরা।
আর কি করবে? উঠে দাঁড়াল তিন গোয়েন্দা। রেকটরির পাশ ঘুরে এসে দাঁড়াল। সদর দরজার সামনে। খুলে গেল দরজা। ভেতরে ঢুকে পড়ল তিন গোয়েন্দা।
তোমাদেরকে আসতে দেখেছি, বললেন ফাদার। ওই যে দুজন লোক, একজন ঝাড়দার, আরেকজন হকার, কারও জন্যে অপেক্ষা করছে ওরা। ব্যাপারটা কি? গির্জায় চোর ঢোকার সঙ্গে কোন সম্পর্ক আছে?
ওরা দুজন কারও অপেক্ষা করছে, কি করে জানলেন? পাল্টা প্রশ্ন করল। কিশোর। আমরা তো বুঝতে পারিনি!
একজনকে চিনি আমি, হাসলেন ফাদার। ছদ্মবেশ নিয়েও ফাঁকি দিতে পারেনি আমাকে। সার্জেন্ট হোন। হাসপাতালে পলকে জেরা করতে গিয়েছিল। ওখানেই ওর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে আমার। অন্য লোকটাকে চিনি না। তবে হকার সে নয়, বাজি রেখে বলতে পারি।
ধর্মপ্রচারে না এসে ডিটেকটিভ হওয়া উচিত ছিল আপনার, ফাদার! বলে উঠল রবিন। পল কেমন আছে?
ভালই। চোর ওকে মেরেছে, এতে দুঃখ পাওয়ার চেয়ে খুশিই হয়েছে সে বেশি। খবরের কাগজে নাম উঠেছে তার। বোকা গাধা!দাঁতের ফাঁক থেকে পাইপ সরালেন ফাদার। বোকা মেয়ে মানুষটাও নেই আজ, বিকেলটা ছুটি। কোথায়

জানি গেছে। এখানে, এই পার্লারে দাঁড়িয়ে পাইপ টানতে পারছি সেজন্যেই। নইলে এতক্ষণে চেঁচিয়ে আমার মাথা খারাপ করে দিত।
হেসে ফেলল কিশোর। হাত ঘড়ির দিকে তাকাল। পাঁচটা বাজে প্রায়!
ঘোষণা করল সে।
মিস্টার অলিভারকে আসতে দেখা গেল, তাতে বাদামী কাগজের প্যাকেট। পার্কে যাওয়ার রাস্তাটার মাথায় এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন। কোণের দিকে একটা ডাস্টবিন, উপচে পড়ছে, এখান থেকেই দেখা যাচ্ছে। এগিয়ে গিয়ে ওটার সামনে দাঁড়ালেন অলিভার। এদিক-ওদিক তাকালেন, তারপর কয়েকটা বাক্সের ওপর আস্তে করে রেখে দিলেন প্যাকেটটা। আর কোনদিকে না তাকিয়ে হন হন করে হেঁটে ফিরে আসতে লাগলেন।
প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উইলশায়ারের রাস্তার মোড়ে দাঁড়ানো লোকটা হাঁটতে শুরু করল। ভবঘুরে। ছেঁড়া ময়লা কোট, নিচে শার্ট নেই। প্যান্টের এক পায়ের নিচের দিকে ঝুল প্রায় আধ হাত নেই, ছিঁড়ে পড়ে গেছে কোন্ কালে।
আহা! আস্তে মাথা নাড়লেন ফাদার। বেচারা!
পার্কের গেটের দিকে এগোচ্ছে ভবঘুরে। তার কাছ থেকে কয়েক গজ দূরে রয়েছে ঝাড়দার। নুয়ে ঘাসের ওপর পড়ে থাকা কি যেন তুলছে। কাগজ গুনছে হকার।
ডাস্টবিনের কাছে এসে দাঁড়াল ভবঘুরে। ডাস্টবিন ঘাঁটতে শুরু করল। পরিত্যক্ত খাবার খুঁজছে যেন। কয়েক মুহূর্ত পরেই সোজা হয়ে দাঁড়াল সে। হাতে বাদামী প্যাকেট। চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল ওটা তার কোটের ভেতরে।
লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল হকার। ছুটল ভবঘুরের দিকে।
হাত থেকে ঝাড়-ঝুড়ি ফেলে দিয়ে ছুটল সার্জেন্ট হেগান।
দুটো লোককে প্রায় একই সঙ্গে ছুটে আসতে দেখল ভবঘুরে। ঘুরেই সে ছুটল উল্টো দিকে। জানালার চৌকাঠে উঠে গেল মুসা। লাফিয়ে পড়ল বাইরে, মাটিতে।
তীব্র হর্ন বাজাল একটা ছুটন্ত কার, কোনমতে পাশ কাটিয়ে ভবঘুরেকে ধাক্কা দেয়া এড়াল। কেয়ারই করল না লোকটা। ছুটছে প্রাণপণে।
প্রায় লাফিয়ে এসে রাস্তায় উঠল মুসা, ছুটল। চেঁচিয়ে উঠল একজন পুলিশ, রিভলভারের মুখ আকাশের দিকে করে বাতাসে গুলি ছুঁড়ল। রাস্তার মোড়ে পৌঁছে গেছে ভবঘুরে, ডানে ঘুরে ছুটে অদৃশ্য হয়ে গেল।
আর থাকতে পারছি না, ফাদার! বলেই জানালার চৌকাঠে উঠে বসল কিশোর। লাফিয়ে নামল মাটিতে। ছুটল। তাকে অনুসরণ করছে রবিন।
এই যে, ছেলেরা! চেঁচিয়ে উঠল একজন পুলিশ, যে হকারের ছদ্মবেশ নিয়েছে, পথ থেকে সর! গোলাগুলি চলতে পারে!

শাঁ করে মোড় নিল একটা স্কোয়াড কার, টায়ারের কর্কশ শব্দ উঠল। কাছে চলে এল নিমেষে। জানালা দিয়ে মুখ বের করে আছে একজন পুলিশ। চেঁচিয়ে তাকে বলল সার্জেন্ট হেগান, সামনের মোড়ের দিকে গেছে!
দাঁড়ান! পেছন থেকে চেঁচিয়ে ডাকল কিশোর।
ফিরে তাকাল সার্জেন্ট। গাড়িটা দাঁড়িয়ে পড়েছে। কিশোরের গলা শুনে দাঁড়িয়ে গেছে মুসাও।
কি হল? জিজ্ঞেস করল হেগান।
তাড়াহুড়োর কিছু নেই, কাছে এসে দাঁড়াল কিশোর। হাঁপাচ্ছে। কোথায় গেছে লোকটা, জানি আমি। লুকোতে চেষ্টা করবে না সে। চমৎকার অ্যালিবাই রয়েছে।
ও, তুমিই সেই ছেলে, যার প্রশংসায় পঞ্চমুখ মিস্টার অলিভার, বলল সার্জেন্ট। তো, খোকা, কোথায় পাওয়া যাবে তাকে?
এখান থেকে মাত্র কয়েক ব্লক দূরে। হ্যামলিন ক্লিনিকে।
স্কোয়াড কারের জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে সবই শুনল পুলিশ অফিসার। ডাকল, এস, গাড়িতে ওঠ।
পেছনের সিটে উঠে বসল তিন গোয়েন্দা। দেখতে দেখতে ক্লিনিকের গেটে পৌঁছে গেল গাড়ি। ঝটকা দিয়ে খুলে গেল দুপাশের দরজা। লাফিয়ে নেমে এল আরোহীরা।
রিসেপশন রুমে ঢুকে পড়ল ওরা হুড়মুড় করে। চোখ তুলে তাকাল। রিসেপশনিস্ট। কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেই চুপ হয়ে গেল। তাকে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করল না। পাশ কাটিয়ে ঢুকে পড়ল বারান্দায়।
দুপদাপ সিঁড়ি ডিঙিয়ে দোতলায় উঠে এল ওরা! থমকে দাঁড়াল ডিউটি-নার্স। কাকে চাই? রিসেপশনে আমাকে কিছু বলল না তো!
দরকার নেই, বলল কিশোর। ছুটে গেল বারান্দা দিয়ে। তার পেছনে আর সবাই। হাঁ করে চেয়ে রইল নার্স।
দরজা বন্ধ জ্যাকবসের কেবিনের। ধাক্কা দিয়ে খুলে ভেতরে ঢুকে পড়ল। কিশোর। বিছানায় শুয়ে আছে জ্যাকবস। গলার কাছে টেনে দিয়েছে কম্বলটা। বিছানার উল্টোদিকের দেয়াল ঘেঁষে রাখা টেলিভিশনটা অন করা।
চোখ ফিরিয়ে তাকাল জ্যাকস। কি ব্যাপার?
প্যাকেটা কোথায়, মিস্টার জ্যাকবস? জিজ্ঞেস করল কিশোর। আলমারিতে নাকি কম্বলের তলায় নিয়ে শুয়ে আছেন?
উঠে বসল জ্যাকবস। মুখ লাল হয়ে গেছে, শ্বাস ফেলতে কষ্ট হচ্ছে যেন। গা থেকে খসে পড়ে গেল কম্বল। চেক চেক একটা জ্যাকেট গায়ে, নিচে শার্ট নেই।

টান দিয়ে আলমারির পাল্লা খুলে ফেলল কিশোর। ওপরের তাকেই পাওয়া। গেল প্যাকেটটা। খালা হয়নি এখনও।
গুঙিয়ে উঠল জ্যাকবস।
প্যাকেটটা ধরেছেন, বলল কিশোর। আপনার হাতে মলম লেগে গেছে। শিগগিরই ভরে যাবে কালো কালো দাগে।
চোখের সামনে হাত নিয়ে এল জ্যাকবস।
সামনে বাড়ল সার্জেন্ট হেগান। উকিলকে ডাকবেন নাকি?
আর উকিল ডেকে কি করব! দীর্ঘশ্বাস ফেলল জ্যাকবস।
কিশোরের দিকে ফিরল সার্জেন্ট। অলিভার বললেন, তোমরা খুব চালাক! ঠিকই বলেছেন। সুন্দর অ্যালিবাই! প্রাইভেট হসপিটাল! কে ভাবতে পেরেছিল...
নিজের ফ্ল্যাটে নিজেই আগুন লাগিয়েছেন জ্যাকবস, বলল কিশোর। হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার জন্যে। তিনি জানেন, এ-সময়ে এ-হাসপাতালে রোগীর ভিড় থাকে না। শহরের বেশির ভাগ লোকই বাইরে চলে গেছে বড় দিনের ছুটিতে। ফলে ডিউটি-নার্স আর ডাক্তারের সংখ্যাও কমিয়ে দেয়া হয়। ওদের চোখ এড়িয়ে কয়েক মিনিটের জন্যে বেরিয়ে যাওয়া কিছু না। তাছাড়া হাসপাতালটা বাসার কাছে। হাসপাতালের পেছনে ঝাড়দার ঢোকার পথ দিয়ে সহজেই ঢোকা কিংবা বেরোনও যায়। আসলে কিন্তু খুব বেশি আহত হননি জ্যাকস। যা হয়েছে, তার চেয়ে বেশি করেছেন ভান। গাঁটের পয়সা খরচ করে কেউ যদি প্রাইভেট হাসপাতালে আসতে চায়, ডাক্তারদের কি? তাই তাঁর এখানে আসার ব্যাপারে সেন্ট্রাল হাসপাতালের ডাক্তাররাও আপত্তি করেননি। তাই না, মিস্টার জ্যাকবস?

.

শহরের বাইরে গিয়েছিলেন চিত্রপরিচালক ডেভিস ক্রিস্টোফার। জানুয়ারির মাঝামাঝি ফিরে এলেন।
অফিসে, বিশাল ডেস্কের ওপাশে বসে আছেন চিত্রপরিচালক। এ পাশে বসেছে তিন গোয়েন্দা। গভীর মনোযোগ দিয়ে একটা রিপোর্ট পড়ছেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। দীর্ঘক্ষণ পরে মুখ তুললেন। চমৎকার! রবিন লিখেছেও খুঁটিয়ে। নিজের ছায়াদেহ নিয়ে ঘুরতে বেরোনো! সাংঘাতিক ব্যাপার! বড় বড় ভূতও ওস্তাদ মানবে টমি গিলবার্টকে!
ওর এই বিশেষ ক্ষমতার কথা সে একবারও স্বীকার করেনি, বলল রবিন। বলে, স্বপ্ন দেখে। কিন্তু প্রফেসর লিসা রোজারের কাছে সব শুনে এসেছি। কিভাবে স্বপ্ন দেখে টমি, জানি আমরা।
হ্যাঁ, কিশোরের দিকে ফিরলেন চিত্রপরিচালক। কিশোর, কি করে জানলে, জ্যাকবসই চোর?

কিছু যোগ কিছু বিয়োগ করে, কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করল কিশোর। প্রথমেই সন্দেহ করলাম, চোর মিস্টার অলিভারের ভাড়াটেদের কেউ হবে। সে জানে গির্জার চাবি রেকটরির কোথায় রাখা হয়। মিস ল্যাটনিনা আর মিসেস। ডেনভারের স্বভাবচরিত্র জানাও তাদের কাছাকাছি যারা থাকে, তাদের পক্ষেই সহজ। জানে, ওই দুজনকে সরাতে পারলে পুলটা নিরাপদ। টমিকে সন্দেহ করলাম। পরে বুঝল, সে চোর নয়। চুরিটা যখন হয়, সে ঘুমিয়েছিল তার ঘরে। একই সময় দুজায়গায় থাকার ক্ষমতা অবশ্য তার আছে। তবে বড় জোর দেখতে এবং শুনতে পারে ছায়া শরীরে যখন থাকে। কোন জিনিস নাড়াচাড়া করতে পারে না। তার মানে ছায়া শরীর নিয়ে কারও ঘরে ঢুকে কোন জিনিস চুরি করতে পারে না। সে। বাদ দিলাম তাকে সন্দেহ থেকে। বব বারোজকেও সহজেই বাদ দেয়া গেল। সে ছিলই না চুরির রাতে প্যাসিও প্লেসে। পুরুষ ভাড়াটেদের মাঝে বাকি রইল। ব্রায়ান এনড্রু, আর জ্যাকবস। চুরির সময় ও-বাড়িতে দুজনের কাউকেই দেখা যায়নি। দুজনেই শুনেছে, মিসেস ডেনভারের পুলের পানি পরিষ্কার করার কথা। পরে মনে পড়েছে আমার, কথাটা শুনে একটু যেন চমকে উঠেছিল জ্যাকস। এনড্রুর কোন ভাবান্তরই হয়নি। তাছাড়া সে রাতে গাড়ি নিয়ে কোথাও বেরিয়েছিল। জ্যাকবস।

নিশ্চয় বোমার সরঞ্জাম কিনতে? বলে উঠলেন চিত্রপরিচালক। এসব জিনিস বাড়িতে রাখে না লোকে হরহামেশা।

অতি সাধারণ কয়েকটা কেমিক্যাল কিনে নিয়ে এল জ্যাকবস, আবার বলল কিশোর। সাধারণ একটা বোমা বানিয়ে বসিয়ে রাখল মিসেস ডেনভারের গাড়ির ইঞ্জিনে। মোটেই মারাত্মক ছিল না বোমাটা। প্রচণ্ড শব্দ আর ধোয়া বেরোনর জন্যে তৈরি, ক্ষতি সামান্যই করে। ভয় দেখিয়ে মহিলাকে তাড়াতে চেয়েছে আসলে। জ্যাকবস। যাতে অন্তত দুটো দিন পুলটা পরিষ্কার করাতে না পারে ম্যানেজার। রহস্যটা সমাধান প্রায় করে এনেছিলাম, কিন্তু ঘরে আগুন লাগিয়ে একটা গোলকধাঁধায় ফেলে দিল আমাকে জ্যাকবস। আগুন লাগাটা দুর্ঘটনা নয়, তখনই বুঝেছি। খটকা লাগল। সিগারেটের ব্যাপারে খুবই সতর্ক জ্যাকবস, সঙ্গে অ্যাশট্রে নিয়ে ঘোরে, ছাই থেকে আগুন লেগে যাবার ভয়ে। ধরে নিলাম, এনড্রু চোর। আগুন। লাগিয়ে জ্যাকবসকেও সরাতে চয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন জাগল মনে, কেন সরাতে যাবে? পুলের সঙ্গে জ্যাকবসের কোন সম্পর্ক নেই। কোন যুক্তিই খুঁজে পেলাম না। দ্বিধায় পড়ে গেলাম। সমস্যাটার সমাধান হয়ে গেল, যখন চিঠি নিয়ে এল পিয়ন। খামে উইলশায়ার পোস্ট অফিসের ছাপ। তাছাড়া সময় ঠিক করেছে বিকেল পাঁচটা, বেড়ালকে খাবার খাওয়ার সময় তখন এনড্রুর। কিছুতেই এই সময়ে টাকা আনতে যাবে না সে। শিওর হয়ে গেলাম, জ্যাকবসই চোর।

হাসলেন চিত্রপরিচালক। ঠিক। পাঁচটায় কিছুতেই অনুপস্থিত থাকবে না এনড্রু। মোটেল থেকে এসেও বেড়ালদেরকে খাওয়ায়। একবার গরহাজিরা দিলেই চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় তুলবে বেড়ালের পাল। বেড়াল-মানবের অনুপস্থিতি জানিয়ে দেবে। কিছুতেই এই ঝুঁকি নিত না এনড্রু হলে। ঠিকই ভেবেছ তুমি। ভুরু কোচকালেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। কিন্তু চুরি করতে গেল কেন জ্যাকবস? টাকার এতই টান পড়েছিল?

টান পড়েছিল, পুলিশের কাছে স্বীকার করেছে জ্যাকবস। তার ব্যবসা খুব। মন্দা যাচ্ছিল। অনেক ধার হয়ে গিয়েছিল ব্যাংকে। এমনিতেই টাকা পরিশোধ করতে না পারার দায়ে জেলে যেতে হত তাকে। কাজেই নিয়েছে ঝুঁকি।

সেই পুরানো প্রবাদ! দীর্ঘশ্বাস ফেললেন চিত্রপরিচালক। অভাবে স্বভাব নষ্ট! নইলে জ্যাকবসের মত লোক একাজ করতে যেত না! ভীষণ চাপে পড়েই কাজটা করে ফেলেছে বেচারা!

আয় যখন ভাল ছিল, ভাগ্নের পড়ার খরচের জন্যে, তার নামে ব্যাংকে অনেক টাকা জমা করেছে জ্যাকবস মাসে মাসে, বলল কিশোর। দশ হাজার ডলারের বেশি হবে। ব্যাংকের ঋণ শোধ করে দিয়েছে বব তার টাকা থেকে। কিন্তু ব্যাপারটা এখন আর শুধু তার হাতে নেই। আরও কয়েকটা কেস ঝুলছে জ্যাকবসের মাথায়। পল মিনকে পিটিয়ে বেহুশ করেছে, মিস ল্যাটনিনাকে বিষ খাইয়েছে, মিসেস ডেনভারের গাড়িতে বোমা ফাটিয়েছে। জানালা ভেঙে অন্যের ঘরে ঢুকে জিনিস চুরি করেছে, সেটা আবার ফেরত দেয়ার কথা বলে দশ হাজার ডলার দাবি করেছে। মালিকের কাছে। এগুলো মস্ত অপরাধ।

হু! মাথা ঝোঁকালেন চিত্রপরিচালক। আচ্ছা, কবে, কে মিস্টার। অলিভারের কাছে নিয়ে আসবে, জ্যাকবস জানল কিভাবে?

টমি বলেছে, বলল কিশোর। সেদিন সকালেই মিস্টার অলিভারের ঘরে ঢুকেছিল সে। ফোনে তাকে কথা বলতে শুনেছে মিকো ইলিয়টের সঙ্গে। মিসেস ডেনভার জ্যাকবসকে বলেছিল, কুকুর আনার কথা। সে ব্যাপারেই টমির সঙ্গে কথা বলছিল জ্যাকবস। এক পর্যায়ে টমি বলে বসেছে, ওটা জ্যান্ত কুকুর নয়, ক্রিস্টালের মূর্তি। অনেক দাম। কথায় কথায় তার কাছ থেকে খবর বের করে নিয়েছে স্টকব্রোকার। তারপর মিউজিয়মে চলে গেছে। খোঁজ নিয়ে জেনেছে, মূর্তিটা কে বানিয়েছে, কেমন মূল্যবান। সম্পর্কে সমস্ত তথ্য জেনে এসেছে শো গ্যালারি থেকে। মনে মনে প্ল্যান তৈরি করে ফেলেছে। মিকো ইলিয়টকে অনুসরণ করে এসেছে গ্যালারি থেকেই। জানালা ভেঙে ঘরে ঢুকেছে মিকো ঘরে থাকতেই...

বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল একেবারে! মন্তব্য করলেন মিস্টার ক্রিস্টোফার।

হ্যাঁ। তবে ওর কপাল খারাপ, রাস্তার মোড়েই পুলিশ ছিল। তাড়া খেয়ে নিজের ঘরে এসে ঢুকতে পারত, কিন্তু তাহলে ধরা পড়ে যেত। গির্জাটাই নিরাপদ জায়গা মনে করেছে। ঠিকই মনে করেছিল। পুলিশকে তো ফাঁকি দিয়ে ফেলেছিল।
কিন্তু সে জানত না, সে-সময়ে মিস্টার অলিভারের বাড়িতে হাজির তিন গোয়েন্দা, বুক ফোলাল মুসা। মুখে হাসি।
আসলেই তার কপাল খারাপ, বলল কিশোর। ফাঁকি তো প্রায় দিয়ে ফেলেছিল। কিন্তু সে কি আর জানত, পুলে যখন মূর্তিটা ছাড়ছে, কাছেই ছায়া। শরীরে দাঁড়িয়েছিল টমি গিলবার্ট?
টমি আছে এখনও ও-বাড়িতে? জানতে চাইলেন পরিচালক।
না, বলল মুসা। বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছেন তাঁকে, মিস্টার অলিভার। কাছেপিঠে ওরকম একটা প্রেতসাধককে রেখে শান্তিতে থাকতে পারবেন না, বুঝে ফেলেছেন। পশ্চিম লস অ্যাঞ্জেলেসের কোথায় একটা বাড়িতে গিয়ে উঠেছে এখন সে।
ওখান থেকেও তো আসতে পারে তার ছায়া শরীর?
পনেরো দিন হয়ে গেল, জবাব দিল রবিন। এর মাঝে একবারও আসেনি, জানিয়েছেন মিস্টার অলিভার। মিসেস ডেনভারকেও বিদেয় করে দিয়েছেন। ভাড়াটেদের শান্তি নষ্ট করবে তার ম্যানেজার, এটা কিছুতেই চান না। নতুন ম্যানেজার রেখেছেন। কমবয়েসী একটা মেয়ে। কারও সাতে ও থাকে না পাঁচেও না। কাজ যা করার করে, বাকি সময় ঘরে বসে নিজের কাজ করে, বই পড়ে, কিংবা টিভি দেখে। যেচে পড়ে কারও সঙ্গে কথা বলতেও যায় না।
যাক, সব সমস্যারই সমাধান হল, বললেন পরিচালক। একটা ছাড়া। বৃদ্ধ ফাদারের ভূত...।
ওটা কারও ভূত না, বাধা দিয়ে বলল কিশোর। জ্যাকবসই ফাদারের ছদ্মবেশে গিয়েছিল...
জানি, হাত তুললেন পরিচালক। আমি সেকথা বলছি না। বলছি, গুজব আছে, গির্জায় ফাদারের ভূত দেখা যায়। যা রটে, তা কিছুটা তো বটে! কেন জানি। মনে হচ্ছে, কোথাও কিছু একটা ঘাপলা আছে! কি দেখল, কাকে দেখল তামারা, ব্রাইস? সবই কি তার কল্পনা?
হ্যাঁ, সেটা একটা রহস্য, মাথা ঝোকাল কিশোর। সময় পেলে খোঁজ করে। দেখব ভালমত। হয়ত রহস্যটার সমাধান করে ফেলতে পারব।...তো আজ আসি, স্যার।
এস, বললেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। পারলে শিগগিরই ফাদারের ভূতের সন্ধান করতে যেও। আর, এর মাঝে নতুন কোন রহস্যের খোঁজ পেলে জানাব। নাউ, থ্যাংক ইউ, মাই বয়েজ!

ভলিউম ১ – তিন গোয়েন্দা – তিন গোয়েন্দা – রকিব হাসান – সেবা প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ১৯৮৫

রকি বীচ, লস অ্যাঞ্জেলেস, ক্যালিফোর্নিয়া।

সাইকেলটা স্ট্যান্ডে তুলে রেখে ঘরে এসে ঢুকল রবিন মিলফোর্ড। গোলগাল চেহারা। বাদামী চুল। বেঁটেখাট এক আমেরিকান কিশোর।

রবিন, এলি? শব্দ শুনে রান্নাঘর থেকে ডাকলেন মিসেস মিলফোর্ড।

হ্যাঁ, মা, সাড়া দিল রবিন। উকি দিল রান্নাঘরের দরজায়। কিছু বলবে?

চেহারায় অনেক মিল মা আর ছেলের। চুলের রঙও এক। কেক বানাচ্ছেন মিসেস মিলফোর্ড। চাকরি কেমন লাগছে?

ভালই, বলল রবিন। কাজকর্ম তেমন নেই। বই ফেরত দিয়ে যায় পাঠকরা। নাম্বার দেখে জায়গামত ওগুলো তুলে রাখা, ব্যস। পড়াশোনার প্রচুর সুযোগ আছে।

কিশোর ফোন করেছিল, একটা কাঠের বোর্ডে কেক সাজিয়ে রাখতে রাখতে বললেন মা।

কি, কি বলেছে?

একটা মেসেজ দিতে বলেছে তোকে।

মেসেজ কি মেসেজ?

বুঝলাম না। আমার অ্যাপ্রনের পকেটে আছে।

দাও, হাত বাড়াল রবিন।

একটু দাঁড়া। হাতের কাজটা সেরেই দিচ্ছি, বড় দেখে একটা কেক তুলে নিলেন মা। ছেলের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, নে, খেয়ে নে এটা। নিশ্চয় খিদে পেয়েছে।

কেকটা নিয়েই কামড় বসাল রবিন।

হ্যাঁরে, রবিন, রোলস রয়েস তো পেলি…

শুনেছ। তাহলে। আমি না, কিশোর পেয়েছে, কেক চিবুতে চিবুতে বলল রবিন। চেষ্টা করেছিলাম, হয়নি। একশো আশিটা বেশি বলে ফেলেছিলাম, মুসা দুশো দশটা কম।

ওই হল! কিশোরের পাওয়া মানেই তোদেরও পাওয়া। …রবিন, প্রতিযোগিতাটা কি ছিল রে?

জান না? চিবানো কেকটুকু কোৎ করে গিলে নিয়ে বলল রবিন, সে এক কাণ্ড! বড় এক জারে সীমের বীচি ভরে শোরুমের জানালায় রেখে দিয়েছিল কোম্পানি…

হ্যাঁ। ঘোষণা করলঃ জারে কাটা বীচি আছে যে বলতে পারবে, শোফারসজ একটা রোলস রয়েস দিয়ে দেয়া হবে তাকে তিরিশ দিনের জন্যে। সব খরচ-খরচা

কোম্পানির। জারটা দেখে ঝটপট আনসার সাবমিট করে দিয়ে এলাম। আমি আর মুসা। কিশোর তা করল না। জারটা ভাল করে দেখল, এদিক থেকে ওদিক থেকে। বাড়ি ফিরে এল। শুরু করল হিসেব। কত বড় জার, বীচির সাইজ, প্রতিটা বীচি কতখানি জায়গা দখল করে, ইত্যাদি ইত্যাদি। তিনটে দিন শুধু ওই নিয়েই রইল। ...তার উত্তরও পুরোপুরি সঠিক হয়নি, তিনটে বেশি। তবে এরচেয়ে কাছাকাছি আর কারও হয়নি। কিশোরের জবাবকেই সঠিক করে নিয়েছে কোম্পানি, আবার কেকে কামড় বসাল রবিন।

ছুটি তাহলে খুব আনন্দেই কাটছে তোদের, একটা কাপড়ে হাত মুছছেন মা। কোথায় কোথায় যাচ্ছিস?

সেটা নিয়েই ভাবছি, বাকি কেকটুকু মুখে পুরে দিল রবিন।

তারেকটা নিবি?

মাথা নাড়ল রবিন। হাত বাড়াল, মেসেজটা, মা?

পকেট থেকে কাগজের টুকরোটা বের করলেন মিসেস মিলফোর্ড। ইংরেজিতে বানান করে করে বলেছে কিশোর, লিখে নিয়েছেন তিনি। পড়লেন, স্যাবুজ ফ্যাটাক য়েকা ছাপা খ্যানা চালু মানে কি রে এর?

সবুজ ফটক এক দিয়ে ঢুকতে হবে। ছাপাখানা চালু হয়ে গেছে, বলতে বলতেই ঘুরে দাঁড়াল রবিন। রওনা হয়ে গেল দরজার দিকে।

ও-মা, এই এলি! আর এখুনি... থেমে গেলেন মা। বেরিয়ে গেছে। রবিন। কাঁধ বাঁকালেন তিনি।

এক ছুটে হলরুম পেরোল রবিন। দরজা খুলে প্রায় ছিটকে বেরিয়ে এল। বাইরে। ধাক্কা দিয়ে সন্ট্যান্ড সরিয়েই এক লাফে সাইকেলে চড়ে বসল। পা ভাঙা, ভুলেই গেছে যেন।

ব্যথা আর তেমন পায় না। এখন। সাইকেল চালাতেও বিশেষ অসুবিধে হয় না। পাহাড়ে চড়তে গিয়ে ঘটিয়েছে ঘটনাটা। ভাঙা জায়গায় ব্রেস লাগিয়ে দিয়েছেন ডাক্তার আলমানজু। অভয় দিয়েছেন, শিগগিরই ঠিক হয়ে যাবে পা।

ছোট্ট ছিমছাম শহর রকি বীচ। একপাশে প্রশান্ত মহাসাগর, অন্যপাশে সান্তা মনিকা পর্বতমালা।

পর্বত বললে বাড়িয়ে বলা হয় সান্তা মনিকাকে, পাহাড় বললে কম হয়ে যায়। ওরই একটাতে চড়তে গিয়ে বিপত্তি ঘটিয়েছে রবিন। বেশ খাড়া। সাধারণত কেউ চড়তে যায় না। বাজি ধরে ওটাতেই চড়তে গেল সে। পাঁচশো ফুট উঠেছিল কোনমতে, তারপরই পা পিছলাল।

শহরতলীর প্রান্ত ছাড়িয়ে এল রবিন। ওই যে, দেখা যাচ্ছে জাংক-ইয়ার্ডটা। পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ড।

দুই ভাই জাহেদ পাশা আর রাশেদ পাশা। বাঙালী। গড়ে তুলেছেন ওই জাংক-ইয়ার্ড। আগে নাম ছিলঃ পাশা বাতিল মালের আড়ত। ইংরেজি অক্ষরে সাইনবোর্ড লাগানো হয়েছিল বাংলা নামের। সঠিক উচ্চারণ কেউই করতে পারত না, খালি বিকৃত উচ্চারণ। রেগেমেগে শেষে নামটা বদলাতে বাধ্য হয়েছেন রাশেদ পাশা, কিশোরের চাচা।

এখন রাশেদ পাশা একাই চালান স্যালভিজ ইয়ার্ড। ভাই নেই। ভাবীও নেই, দুজনেই মারা গেছেন এক মোটর-দুর্ঘটনায়। হলিউড থেকে ফিরছিলেন রাতের বেলা। পাহাড়ী পথ। কেন যে ব্যালান্স হারিয়েছিল গাড়িটা, জানা যায়নি। নিচের গভীর খাদে পড়ে চুরমার হয়ে গিয়েছিল। কিশোরের বয়েস তখন এই বছর সাতেক।

অনেক কিছুই পাওয়া যায় পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে, তবে সবই পুরানো। আলপিন থেকে শুরু করে রেলগাড়ির ভাঙা বগি, চাই কি, জাহাজের খোলের টুকরোও আছে। নিলামে কিনে আনেন রাশেদ পাশা। বেশির ভাগই বাতিল জিনিস, তবে মাঝে মাঝে ভাল জিনিসও বেরিয়ে পড়ে। ওগুলো বেশ ভাল দামেই বিক্রি হয়। আর বাতিল জিনিসপত্রের অনেকগুলোই সারিয়ে নেয়া যায়। ওগুলো থেকেও মোটামুটি টাকা আসে। সব মিলিয়ে ভাল লাভ। তবে খাটুনি অনেক।

কিশোরদের জন্যে পরম লোভনীয় জায়গাটা। খুঁজলেই বেরিয়ে পড়ে প্রচুর খেলার জিনিস।

ইয়ার্ডের আরও কাছে চলে এসেছে। রবিন। চোখে পড়ছে রঙচঙে টিনের বেড়ার গায়ে আঁকা বিচিত্র সব ছবি। স্থানীয় শিল্পীদের আঁকা।

বেড়ার গায়ে সামনের দিকে আঁকা রয়েছে গাছপালা, ফুল, হ্রদ। হ্রদের পানিতে সাঁতার কাটছে রাজহাঁস। পাশে পাহাড়ের ওপারে। সাগর। সাগরে পালতোলা জাহাজ, নৌকা। কেমন একটা হাসি হাসি ভাব ছবিগুলোতে, ভারিক্কি কিছু নয়।

লোহার বিরাট সদর দরজা। পুড়ে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল কোন প্যালেস। ওখান থেকেই কিনে আনা হয়েছে পাল্লাজোড়া। রঙ করতেই আবার প্রায় নতুন হয়ে গেছে। ইয়ার্ডের শোভা বাড়াচ্ছে এখন।

দরজার কাছে গেল না। রবিন। পাশ কাটিয়ে চলে এল। বেড়ার ধার ধরে ধরে এগিয়ে গেল শখানেক গজ। এখানে বেড়ার গায়ে আকা নীল সাগর। দুই মাস্তুলের পালতোলা একটা জাহাজ ঝড়ের কবলে পড়েছে। মাথা উচু করে দেখছে একটা বড় মাছ।

সাইকেল থেকে নামল রবিন। হ্যাণ্ডেল ধরে ঠেলে নিয়ে এল বেড়ার কাছে। হাত বাড়িয়ে মাছের চোখ টিপে ধরল।

নিঃশব্দে ডালার মত উঠে গেল বেড়ার গায়ে লেগে থাকা দুটো সবুজ বোর্ড। কয়েকটা গোপন প্রবেশ পথের একটা সবুজ ফটক এক।
সাইকেল নিয়ে ইয়ার্ডে ঢুকে পড়ল। রবিন। আবার নামিয়ে দিল। বোর্ডদুটো। কানে আসছে ঘটাং-ঘট ঘটাং-ঘাট আওয়াজ। কোণের আউটডোর ওয়ার্কশপের দিকে চেয়ে মুচকে হাসল। রবিন। ভাঙা মেশিনটা তো মেরামত হয়েছেই, কাজও শুরু হয়ে গেছে।
মাথার ওপরে টিনের চাল। ছয় ফুট চওড়া। টিনের এক প্রান্ত আটকে দেয়া হয়েছে বেড়ার মাথায়, আরেক প্রান্ত খুঁটির ওপর। ভেতরের দিকে বেড়ার ঘরের প্রায় পুরোটার মাথায়ই টানা রয়েছে এই চাল। ভাল আর দামি জিনিসগুলো এই চালার নিচে রাখেন রাশেদ পাশা। একপাশে খানিকটা জায়গার মালপত্র সরিয়ে তার ওয়ার্কশপ বসিয়েছে কিশোর।
সাইকেল স্ট্যান্ডে তুলে রাখতে রাখতে একবার পেছনে ফিরে চাইল রবিন। দৃষ্টি বাধা পেল পুরানো জিনিসপত্রের স্তুপে। ইয়ার্ডের মূল অফিস আর কিশোরের ওয়ার্কশপের মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওই স্তুপ। অফিসের রঙিন টালির চুড়াটা শুধু চোখে পড়ে এখান থেকে। মেরিচাচীর কাচে ঘেরা। চেম্বারটা দেখা যায় না।
পুরানো জিনিস কেনার কাজে প্রায় সারাক্ষণই বাইরে বাইরে থাকেন রাশেদচাচা, ইয়ার্ড আর অফিসের ভার থাকে তখন মেরিচাচীর ওপর।
ওয়ার্কশপে ঢুকে পড়ল। রবিন। ছোট প্রিন্টিং মেশিনটার কাছে দাঁড়িয়ে আছে লম্বা, বলিষ্ঠ এক কিশোর। কুচকুচে কালো গায়ের রঙ। মাথায় কোঁকড়া কালো চুল। আমেরিকান মুসলমান, মুসা আমান।
মহা ব্যস্ত মুসা। ঘামছে দরদরি করে। সাদা একগাদা কার্ড পড়ে আছে পাশের একটা ছোট টুলে। একটা করে কার্ড তুলে নিয়ে মেশিনে চাপাচ্ছে, ছাপা হয়ে গেলেই আবার বের করে নিচ্ছে দ্রুত হাতে।
পাশে তাকাল রবিন। পুরানো একটা সুইভেল চেয়ারে বসে আছে কিশোর পাশা। হালকা-পাতলা শরীরের তুলনায় মাথাটা বড়। ঝাঁকড়া চুল। চওড়া কপালের তলায় অপূর্ব সুন্দর দুটো চোখে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ঝিলিক। বুড়ো আঙুল আর তর্জনীর সাহায্যে চিমটি কাটছে নিচের ঠোঁটে। ভাবনার ঝড় বইছে মাথায়, বুঝতে পারল রবিন।
কি ছাপাচ্ছ? মেশিনের কাছে এগিয়ে গেল রবিন।
এই যে, এসে গেছে, ফিরে চেয়েই বলে উঠল মুসা।
ভাবনার জগৎ থেকে ফিরে এল কিশোর। রবিনের দিকে চেয়ে বলল, মেসেজ পেয়েছ?
পেয়েই তো এলাম, জবাব দিল রবিন।

গুড, ভারিক্কি চালে বলল কিশোর। মুসা, একটা কার্ড দেখাও ওকে।
মেশিন বন্ধ করে দিল মুসা। একটা কার্ড তুলে বাড়িয়ে ধরল। রবিনের দিকে। নাও।
বড় আকারের একটা ভিজিটিং কার্ড। ইংরেজিতে লেখাঃ
তিন গোয়েন্দা
??
প্রধানঃ কিশোর পাশা
সহকারীঃ মুসা আমান
নথি গবেষকঃ রবিন মিলফোর্ড
বাহ, সুন্দর হয়েছে তো। প্রশংসা করল রবিন। এগিয়ে যাওয়াই ঠিক করলে তাহলে?
হ্যাঁ, ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি খোলার এই-ই সুযোগ, বলল কিশোর। স্কুল ছুটি। তিরিশ দিনের জন্যে একটা গাড়ি হয়ে গেল। খুব কাজে লাগবে, থামল একটু সে। সরাসরি রবিনের দিকে তাকাল। আমরা এখন তিন গোয়েন্দা। এজেন্সির চার্জে থাকছি। আমি। তোমার কোন আপত্তি আছে?
না, মাথা নাড়ল রবিন। ডিটেকশনের কাজ আমার চেয়ে ভাল বোঝ তুমি।
গুড। সহকারী হতে মুসারও আপত্তি নেই, বলল কিশোর। তোমার এখন সময় খারাপ। পা ভাঙা। দৌড়বীপের কাজগুলো খুব একটা করতে পারবে না। বসে বসেই কিছু করা। আপাতত লেখাপড়া আর রেকর্ড রাখার দায়িত্ব রইল তোমার ওপর।
আমি রাজি, বলল রবিন। এবং খুশি হয়েই। লাইব্রেরিতে কাজের ফাঁকে ফাঁকেই পড়াশোনাটা সেরে ফেলতে পারব। রেকর্ড রাখাটাও এমন কিছু কঠিন না।
গুড, মাথা ঝোঁকাল কিশোর। ভেবে বস না, খুব হালকা কাজ পেয়ে গেছ। তদন্তের নিয়মকানুন অনেক বদলে গেছে আজকাল। এ-কাজে এখন প্রচুর পড়াশোনা আর গবেষণা দরকার। ...কি হল, কার্ডের দিকে ওভাবে চেয়ে আছ কেন?
তিনটে প্রশ্নবোধক চিহ্ন কেন?
সূক্ষ্ম একটা হাসির আভাস খেলে গেল কিশোরের মুখে। চট করে একবার চাইল মুসার দিকে।
ঠিকই বলেছ, কিশোর, মুসার চোখে বন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা। ঠিক অনুমান করেছ তুমি!
কি? জানতে চাইল রবিন।
তুমিই বল, কিশোরকে বলল মুসা। গুছিয়ে বলতে পারব না। আমি।
চিহ্নগুলো কার্ডে বসানোর অনেক কারণ আছে, ব্যাখ্যা করতে লাগল কিশোর। একঃ রহস্যের ধ্রুবচিহ্ন ওই প্রশ্নবোধক। আমরা কার্ডে দিয়েছি, কারণ, যে-কোন

রহস্য সমাধানে আগ্রহী আমরা। ছিচকে চুরি থেকে শুরু করে ডাকাতি, রাহাজানি, খুন, এমনকি ভৌতিক রহস্যের তদন্তেও পিছপা নই। দুইঃ চিহ্নগুলো আমাদের ট্রেডমার্ক। দলে তিনজন, তাই তিনটে চিহ্ন, থামল সে।
অপেক্ষা করে রইল রবিন।
তিন, আবার শুরু করল কিশোর। লোকের মনে কৌতুহল জাগাবে ওই চিহ্ন। কেন বসানো হয়েছে, জিজ্ঞেস করবেই। কথা বলার সুযোগ পাব তখন। এতে আমাদের কথা মনে থাকবে তাদের। নাম ছড়াবে অনেক বেশি, রবিনের দিকে চাইল সে। আরও কারণ আছে, পরে ধীরে ধীরে জানতে পারবে সেগুলো।
আর কি কারণ জানার কৌতুহল হল খুব, কিন্তু বলার জন্যে চাপাচাপি করল না। রবিন। বন্ধুর স্বভাব জানে। নিজে থেকে না বললে হাজার চাপাচাপি করেও মুখ খোলানো যাবে না কিশোরের।
মেশিন ঠিক, কার্ড ছাপানো শেষ, গাড়িও পেয়ে গেছি, বলল রবিন। এবার কোন একটা কাজ পেয়ে গেলেই নেমে পড়তে পারতাম।
কাজ একটা পেয়ে গেছি আমরা, মুসা জানাল।
পাইনি এখনও, শুধরে দিল কিশোর। পাবার আশা আছে। সোজা হয়ে বসল সে। তবে সামান্য একটা অসুবিধে আছে।
কেসটা কি? অসুবিধেটাই বা কি? কৌতুহল ঝরল রবিনের গলায়।
একটা ভূতুড়ে বাড়ি খুঁজছেন মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফার, সত্যি সত্যি ভূত থাকতে হবে। তাঁর একটা ছবির শুটিং করবেন। সেখানে, জানাল মুসা। স্টুডিও থেকে শুনে এসেছে বাবা।
হলিউডের বেশ বড়োসড়ো একটা স্টুডিওতে বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ পদে বহাল আছেন মুসার বাবা মিস্টার রাফাত আমান।
ভূতুড়ে বাড়ি ভুরু কুঁচকে গেছে। রবিনের। তা-ও আবার সত্যি সত্যি ভুত থাকতে হবে তা কি করে সম্ভব?
ভুত আছে কি নেই, সেটা পরের কথা। তেমন একটা বাড়ির খোঁজ পেলেই তদন্ত শুরু করে দেব আমরা, জবাব দিল কিশোর। ভুত থাকলে তো কথাই নেই, না থাকলেও ক্ষতি নেই। আমরা খোঁজখবর করতে শুরু করলেই জানাজানি হবে। নাম ছড়াবে তিন গোয়েন্দার।
অসুবিধে কি ভুত নিয়েই?
না।
তবে? মিস্টার ক্রিস্টোফার আমাদেরকে কাজ দিতে রাজি হচ্ছেন না।
হতেই হবে তাঁকে। আমাদের সার্ভিস নিতে বাধ্য করব, কেমন রহস্যময় শোনাল কিশোরের গলা। তিন গোয়েন্দার যাত্রা শুরু হবে মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফারের

কাজ নিয়েই।
শিওর, শিওরা ব্যঙ্গ প্রকাশ পেল রবিনের গলায়। মার্চ করে। সোজা গিয়ে ঢুকে পড়ব পৃথিবী বিখ্যাত এক চিত্র পরিচালকের অফিসে এবং আমরা গিয়ে হাজির হলেই কাজ দিয়ে দেবেন। এতই
সহজা
খুব কঠিনও মনে হচ্ছে না। আমার কাছে, বলল কিশোর। ইতিমধ্যেই মিস্টার ক্রিস্টোফারকে ফোন করেছি। আমি। অ্যাপিয়েন্টমেন্টের জন্যে।
ইয়াল্লা! রবিনের মতই ভুরু কুঁচকে গেছে মুসার। তিনি দেখা করবেন। আমাদের সঙ্গে?
না, সহজ গলায় বলল কিশোর। লাইনই দেয় নি তাঁর সেক্রেটারি।
তা তো দেবেই না, বলল মুসা।
শুধু তাই না, শাসিয়েছে, তাঁর অফিসের কাছাকাছি গেলেই আমাদেরকে হাজতে পাঠানোর ব্যবস্থা করবে, যোগ করল। কিশোর। মেয়েটা কে জান? কেরি ওয়াইল্ডার।
মুরুকী কেরি। একসঙ্গে বলে উঠল মুসা আর রবিন।
মাথা ঝাঁকাল কিশোর। ওদের চেয়ে কয়েক গ্রেড ওপরের ছাত্রী কেরি ওয়াইল্ডার। পড়ালেখায় ভাল। সুনাম আছে ভাল মেয়ে বলে। স্কুলে নিচের গ্রেডের ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাস নেয় মাঝে মাঝে। মুরু কঁৰীয়ানা ফলানোর লোভটা সামলাতে পারে না। ফলে নাম হয়ে গেছে। মুরু কবী কেরি।
এবারের ছুটতে তাহলে সেক্রেটারির কাজ নিয়েছে। মুরুঝবী চিন্তিত দেখাচ্ছে রবিনকে। মিস্টার ক্রিস্টোফারের সঙ্গে দেখা করার আশা ছেড়ে দাও। মুরু কবীর অফিস পেরোনোর চেয়ে প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দেয়া অনেক সহজ।
মূল অসুবিধে এটাই, বলল কিশোর। তবে যে কাজে নামতে যাচ্ছি, বাধা আর বিপদ আসবেই পদে পদে। ওসবের মোকাবিলা করতে না পারলে নামাই উচিত না। আগামীকাল সকালে রোলস রয়েসে চেপে হলিউডে চলে যাব। দেখা করতেই হবে মিস্টার ক্রিস্টোফারের সঙ্গে।
যদি পুলিশে খবর দেয় মুরুব্বী? বলল রবিন। আমার ব্যাপারে অবশ্য ভাবছি না। কাল তোমাদের সঙ্গে যেতে পারব না। আমি। লাইব্রেরিতে কাজ আছে।
তাহলে আমি আর মুসা যাব। কাল সকাল দশটায়। তার আগেই গাড়ি পাঠাতে ফোন করব কোম্পানিকে। হ্যাঁ, তুমি একটা কাজ কর, রবিন, বলে একটা কার্ড তুলে নিল কিশোর। উল্টেপিঠে একটা নাম লিখে বাড়িয়ে ধরল। এটা রাখ। এই নামের একটা দুর্গ আছে। পুরানো ম্যাগাজিন কিংবা পত্র-পত্রিকায় নিশ্চয় উল্লেখ থাকবে। এটার ব্যাপারে যত বেশি পার তথ্য জোগাড় করবে।

টেরর ক্যাসল! পড়ে ফিসফিসিয়ে বলল রবিন। বড় বড় হয়ে গেছে চোখ।
নাম শুনেই ঘাবড়ে গেলো! এত ভয় পেলে গোয়েন্দাগিরি করবে কি করে?
না না, ঘাবড়াইনি…
ঠিক আছে, বাধা দিয়ে বলল কিশোর। কিছু কার্ড সঙ্গে রাখা। তিনজনকেই রাখতে হবে এখন থেকে। এগুলোই আমাদের পরিচয়পত্র। আগামীকাল থেকে পুরোপুরি কাজে নামব আমরা। পালন করব যার যার দায়িত্ব।
পরদিন সকালে, গাড়ি পৌঁছার অনেক আগেই তৈরি হয়ে গেল মুসা। আর কিশোর। লোহার গেটের বাইরে এসে রোলস রয়েসের অপেক্ষায় রইল। ওরা। দুজনেরই পরনে সানডে সুট, শার্ট আর নেকটাই। পরিপটি করে আঁচড়ানো চুল। পরিচ্ছন্ন চেহারা। হাতের নখ অবধি পরিষ্কার করেছে ব্রাশ ঘষে।
অবশেষে হাজির হল বিশাল রোলস রয়েস। গাড়িটার উজ্জ্বলতার কাছে নিজেদেরকে একেবারে স্নান মনে হল দুজনের। পুরানো ধাঁচের ক্লাসিক্যাল চেহারা। প্রকাণ্ড দুটো হেডলাইট। চৌকো, বাক্সের মত দেখতে মূল শরীরটা কুচকুচে কালো। চকচকে পালিশ, মুখ দেখা যায়।
খাইছোঁ কিশোরের মুখে শোনা বাঙালী বুলি ঝাড়ল মুসা। এগিয়ে আসা গাড়িটার দিকে অবাক চোখে চেয়ে আছে। একশো দশ বছর বয়েসী কোটিপতির উপযুক্ত!
পৃথিবীর সবচেয়ে দামি গাড়ির একটা, বলল কিশোর। কোটিপতি এক আরব শেখের অর্ডারে তৈরি হয়েছিল। এই গাড়িও নাকি পছন্দ হয়নি শেখের। ফলে ডেলিভারি নেয়নি। কম দামে পেয়ে কিনে নিয়েছে রেন্ট-আ-রাইড কোম্পানি। নিজেদের বিজ্ঞাপনের কাজে ব্যবহার করছে।
কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল রোলস রয়েস। ঝটিকা দিয়ে খুলে গেল দরজা। ড্রাইভিং সিট থেকে দ্রুত নেমে এল শোফার। ছয় ফুট লম্বা, আট-সাট দেহের গড়ন। লম্বাটে হাসিখুশি চেহারা। একটানে মাথার টুপি খুলে হাতে নিয়ে নিল।
মাস্টার পাশা? সপ্রশ্ন চোখে কিশোরের দিকে চেয়ে বলল লোকটা। আমি হ্যানসন, শোফার।
পরিচিত হয়ে খুশি হলাম, মিস্টার হ্যানসন, বলল কিশোর। আমাকে কিশোর বলে ডাকবেন, আর সবাই যেমন ডাকে।
প্লীজ, স্যার, দুঃখ পেয়েছে যেন শোফার, আমাকে শুধু হ্যানসন বলবেন। আপনাকে নাম ধরে ডাকা উচিত হবে না। কারণ এখন আপনার অধীনে কাজ করছি আমি। বেয়াদবী করতে চাই না।
ঠিক আছে, শুধু হ্যানসন, বলল কিশোর।
থ্যাঙ্ক ইউ, স্যার। আগামী তিরিশ দিনের জন্যে এই গাড়ি আপনার।
চব্বিশ ঘন্টার জন্যে নিশ্চয়? শর্ত তাই ছিল।

নিশ্চয়, স্যার। পেছনের দরজা খুলে ধরল হ্যানসন। প্লীজ।
থ্যাঙ্ক ইউ, বলে গাড়িতে উঠল কিশোর। মুসাও ঢুকল। হ্যানসনের দিকে চেয়ে বলল কিশোর, বেশী ফর্মালিটির দরকার নেই। দরজা আমরাই খুলতে পারব।
কিছু মনে করবেন না, স্যার, বলল। ইংরেজ শোফার, চাকরির পুরো দায়িত্ব পালন করতে দিন আমাকে। ঢিল দিয়ে নিজের স্বভাব নষ্ট করতে চাই না।
পেছনের দরজা বন্ধ করে দিল হ্যানসন। সামনের দরজা খুলে ড্রাইভিং সিটে বসল।
কিন্তু মাঝেমধ্যে তাড়াহুড়ো করে বেরোতে কিংবা ঢুকতে হতে পারে আমাদের, বলল কিশোর। তখন আপনার জন্যে অপেক্ষা করতে পারব না। তবে এক কাজ করা যায়। শুরুতে একবার দায়িত্ব পালন করবেন। আপনি, আরেকবার একেবারে বাড়ি ফিরে। মাঝে যতবার খোলা বা বন্ধ করার দরকার পড়বে, আমরা করব। ঠিক আছে?
ঠিক আছে, স্যার। সুন্দর সমাধান।
রিয়ার ভিউ মিররে চোখ পড়ল কিশোরের। তার দিকে চেয়ে হাসছে। হ্যানসন। তাড়াতাড়ি বলল কিশোর, অনেক সম্ভ্রান্ত লোকের কাজ করেছেন নিশ্চয়? বুঝতেই পারছি, ওরা কেউই আমাদের মত ছিল না। অনেক আজব, উদ্ভট জায়গায় যেতে হতে পারে আমাদের, কাজ করতে... একটা কার্ড নিয়ে হ্যানসনের দিকে বাড়িয়ে ধরল সে। এটা দেখলেই আন্দাজ করতে পারবেন।
গম্ভীর মুখে কার্ডটা ফিরিয়ে দিতে দিতে বলল হ্যানসন, বুঝতে পেরেছি, স্যার। আপনাদের কাজ করতে আমার খুবই ভাল লাগবে। কিশোর অ্যাডভেঞ্চারের কাজ করে একঘেয়েমিও কাটাতে পারব। এতদিন শুধু বুড়োদের চাকরি করেছি, সবাই বাড়ি থেকে অফিস কিংবা অফিস থেকে বাড়ি। মাঝেমধ্যে পার্টিতে যেত, ব্যস। তো এখন কোথায় যাব, স্যার?
হ্যানসনকে খুব পছন্দ হয়ে গেছে দুই গোয়েন্দার। লোকটা সত্যিই ভাল। তাদেরকে মোটেই অবহেলা করছে না।
হলিউডে, প্যাসিফিক স্টুডিওতে, বলল কিশোর। মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফারের সঙ্গে দেখা করব। গতকাল ফোনে... মানে, টেলিফোন করেছিলাম তাঁকে।
যাচ্ছি, স্যার।
মৃদু গুঞ্জন করে উঠল রোলস রয়েসের দামি ইঞ্জিন। এতই মৃদু যে শোনাই যায় না প্রায়। পাহাড়ী পথ ধরে মসৃণ গতিতে হলিউডের দিকে ছুটল রাজকীয় গাড়ি।
সামনে পথের ওপর দৃষ্টি রেখে বলল হ্যানসন, গাড়িতে টেলিফোন আছে। একটা রিফ্রেশমেন্ট কম্পার্টমেন্টও আছে। চাইলে ব্যবহার করতে পারেন।

থ্যাঙ্ক ইউ, গম্ভীর গলায় বলল কিশোর। এত দামি একটা গাড়িতে চড়ে নিজেকে হোমরা-চোমরা গোছের কেউ একজন ভাবতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যেই। সামনের সিটের পেছনে বসানো একটা খোপের ছোট্ট দরজা খুলে ফেলল বোতাম টিপে। বের করে আনল। টেলিফোন রিসিভারটা। এত সুন্দর রিসিভার জীবনে দেখেনি সে। সোনালি রঙ। চকচকে পালিশ। কোন ডায়াল নেই। একটা বোতাম আছে শুধু।

মোবাইল টেলিফোন, জানাল হ্যানসন। বোতামে শুধু একবার চাপ দিলেই যোগাযোগ হয়ে যাবে অপারেটরের সঙ্গে। তাকে নাম্বার জানালে লাইন দিয়ে দেবে। খুব সহজ।

রিসিভারটা আবার আগের জায়গায় রেখে দিল কিশোর। আরাম করে হেলান দিয়ে বসল নরম চামড়া মোড়ানো পুরু গদিতে।

দেখতে দেখতে হলিউডে এসে ঢুকল গাড়ি। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর ধার দিয়ে চলেছে এখন। গন্তব্যস্থান যতই কাছিয়ে আসছে, অস্থির হয়ে উঠছে মুসা। খালি উসখুসি করছে, কিশোর, শেষে বলেই ফেলল। সে। বুঝতে পারছি না। স্টুডিওর গেট পেরোবে কি করে! আমাদেরকে কিছুতেই ঢুকতে দেবে না দারোয়ান। ওই গেটই পেরোতে পারব না আমরা।

উপায় একটা ভেবে রেখেছি, বলল কিশোর। কাজে লাগলেই হয়। এই যে, এসে গেছি।

উঁচু বিশাল এক দেয়ালের ধার দিয়ে এগিয়ে চলেছে গাড়ি। বড় বড় দুটো ব্লক পেরিয়ে এল। সামনের দেয়ালের গায়ে বিরাট লোহার দরজা। গেটের কপালে বড় বড় করে লেখাঃ প্যাসিফিক স্টুডিও।

দরজার সামনে এসে থামল গাড়ি। বন্ধ পাল্লা। হর্নের আওয়াজ শুনে পাল্লার একদিকের ছোট একটা গর্তের সামনে থেকে ঢাকনা সরে গেল। উঁকি দিল একটা গোমড়া মুখ। কোথায় যাবেন?

জানালা দিয়ে ক্রি মুখ বের করে দিল হ্যানসন। মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফার।

পাস আছে?

পাসের দরকার নেই। টেলিফোন করেই এসেছি।

মিছে কথা বলেনি হ্যানসন। ঠিকই টেলিফোন করে ছিল কিশোর। মিসটার ক্রিস্টোফারকে লাইন দেয়া হয়নি, সেটা তার দোষ না।

ও-ও! অনিশ্চিতভাবে মাথা চুলকাচ্ছে দারোয়ান।

ঠিক এই সময় পেছনের একপাশে সাইড উইন্ডো খুলে গেল। বেরিয়ে এল কিশোরের মুখ। এই যে ভাই, কি হয়েছে? দেরি কেন?

দারোয়ানের দিকে চোখ মুসার। কিশোরের কথা কানে যেতেই চমকে উঠল।

কেমন ঘড়ঘড়ে গলা, কথায় খাঁটি ব্রিটিশ টান। ফিরে চাইল। ইয়াল্লা! প্রায় চেঁচিয়ে উঠল সে।
এ কোন কিশোরকে দেখছে! ঝুলে পড়েছে নিচের ঠোঁট। মাড়ি বেরিয়ে পড়ছে। মাথা সামান্য পেছনে হেলানো। নাকের ওপর দিয়ে চেয়ে আছে। বিচ্ছিরি! মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফারের কিশোর সংস্করণ, কোন খুঁত নেই। এক সময় টিভিতে অভিনয় করে প্রচুর নাম কামিয়েছে কিশোর। এ-অঞ্চলে তখন ছিল না মুসা। কিশোরের সেসব অভিনয় দেখেনি। তবে আজ বুঝতে পারল, লোকে কেন কিশোর পাশার নাম রেখেছ নকল পাশা।
হাঁ করে কিশোরের দিকে চেয়ে আছে দারোয়ান। রা নেই মুখে।
ঠিক আছে, নাকের ওপর দিয়ে দারোয়ানের মাথা থেকে পা পর্যন্ত নজর বোলাল একবার কিশোর, মিস্টার ক্রিস্টোফারের অনুকরণে। সন্দেহ থাকলে ফোন করছি আমি চাচাকে।
সোনালি রিসিভারটা বের করে আনল কিশোর। কানে ঠেকাল। বোতাম টিপে দিয়ে নিচু গলায় নাম্বার চাইল। আসলে পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডের নাম্বার। সত্যিই তার চাচার লাইন চেয়েছে কিশোর।
দামি গাড়িটার দিকে আরেকবার চাইল দারোয়ান। সোনালি রিসিভারটা দেখল। কিশোরের টেলিফোন কানে ঠেকিয়ে কথা বলার ভঙ্গিটা দেখল। তারপর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল। ঠিক আছে, আপনার ফোন করার দরকার নেই। আমিই জানিয়ে দিচ্ছি, আপনারা তাঁর অফিসে যাচ্ছেন।
থ্যাঙ্ক ইউ।
খুলে গেল দরজা। হ্যানসন, আগে বাড়ো। গম্ভীর গলায় দারোয়ানকে শুনিয়ে শুনিয়ে আদেশ দিল কিশোর।
সূক্ষ্ম একটা হাসির রেখা দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল হ্যানসনের ঠোঁটে। সাঁ করে গাড়ি ঢুকিয়ে নিল সে ভেতরে।
এগিয়ে চলল। গাড়ি। অনেকখানি এগিয়ে মোড় নিল একদিকে। সরু পথ। দুধারে সবুজ লনের পথঘেষা প্রান্তে পাম গাছের সারি। লনের ওপারে ছবির মত সুন্দর ছিমছাম। ছোট আকারের ডজনখানেক বাংলো। নাক বরাবর সোজা পথের শেষ মাথায় বিশাল অনেকগুলো শেড। স্টুডিও। একটা শেডের সামনে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন অভিনেতা-অভিনেত্রী।
গেটের বাধা ডিঙিয়ে এসেছে, স্টুডিওতে ঢুকে পড়েছে ওরা। এখনও মাথায় ঢুকছে না। মুসার, মিস্টার ক্রিস্টোফারের সঙ্গে কি করে দেখা করবে। কিশোর বেশিক্ষণ ভাবার সময় পেল না সে। একটা বড় বাংলোর সামনে এনে গাড়ি রেখেছে। হ্যানসন। বোঝা গেল, আগেও এসেছে। এখানে। পথঘাট সব চেনা।

বাংলোর দেয়ালে এক জায়গায় বড় বড় করে লেখাঃ ডেভিস ক্রিস্টোফার। আলাদা আলাদা বাংলোতে বিভিন্ন পরিচালকের অফিস। কে কোথায় বসেন, বোঝার জন্যেই এই নাম লেখার ব্যবস্থা।
আপনি বসুন গাড়িতে, পেছনের দরজা ধরে দাঁড়ানো হ্যানসনকে বলল কিশোর। বেরিয়ে এল। কতক্ষণে ফিরব বলা যায় না।
ঠিক আছে, স্যার।
সিঁড়ি ভেঙে বারান্দায় উঠল কিশোর, পেছনে মুসা। সামনের স্ক্রীনডোর ঠেলে ভেতরে পা রাখল। এয়ার কন্ডিশনড রিসিপশন রুম। একটা ডেস্কের ওপাশে বসে আছে সোনালিচুলো একটা মেয়ে। সবে নামিয়ে রাখছে। রিসিভার। অনেকদিন দেখা নেই। হঠাৎ বেড়ে ওঠা কেরি ওয়াইল্ডারকে প্রথমে চিনতেই পারল না মুসা, গলার আওয়াজ শুনে নিশ্চিত হতে হল।
তাহলে, কোমরে দুহাত রেখে উঠে দাঁড়িয়েছে মুরুব্বী, ঢুকেই পড়েছ? মিস্টার ক্রিস্টোফারের ভাতিজা! বেশ, কত তাড়াতাড়ি স্টুডিওতে পুলিশকে আনানো যায়, দেখছি। টেলিফোনের দিকে হাত বাড়াল কেরি। র দিকে হাত বাড়াল কেরি।
একেবারে চুপসে গেল মুসা। বিড়বিড় করে বলল, ইয়াল্লা!
থাম! বলে উঠল কিশোর।
কেন? সামনের দিকে চিবুক বাড়িয়ে দিয়ে আলতো মাথা ঝাঁকাল কেরি। গার্ডকে ফাঁকি দাওনি তুমি? বলনি মিস্টার মিস্টার ক্রিস্টোফারের ভাতিজা…
না, বলেনি, বন্ধুর পক্ষে সাফাই গাইল মুসা। গার্ডই ভুল করেছে।
তোমাকে কথা বলতে কে বলেছে? ধমকে উঠল কেরি। প্রায়ই গোলমাল করে কিশোর পাশা। স্কুকের অন্যের ব্যাপারে না গলানোর অনেক উদাহরণ আছে। এবার কিছুটা শিক্ষা দিয়ে ছাড়ব আমি।
ঘুরে রিসিভারের দিকে ঝুঁকল কেরি। হাত বাড়াল রিসিভারের দিকে।
তাড়াহুড়ো করে কিছু করা উচিত নয়, মিস ওয়াইল্ডার, বলল কিশোর
আবার চমকে উঠল মুসা। আবার পুরোদস্তুর ইংরেজ, কথায় সেই অদ্ভুত টান-মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফার যেভাবে কথা বলেন। চিকিতে আবার কিশোর ক্রিস্টোফার হয়ে গেছে কিশোর।
আমি শিওর, এটা দেখতে চাইবেন মিস্টার ক্রিস্টোফার, বলল কিশোর।
রিসিভার হাতে তুলে নিয়েছে কেরি। কিশোরের কথায় ফিরে চাইল। সঙ্গে সঙ্গে খসে পড়ে গেল রিসিভার। চোখ বড় বড় হয়ে গেছে, ছিটকে বেরিয়ে আসবে যেন কোটির ছেড়ে। কেবল থেকে ঝুলছে রিসিভারটা। টেবিলের পায়ার সঙ্গে বাড়ি খাচ্ছে খটাখট, কানেই ঢুকছে না যেন তার। তুমি… তুমি… ফিসফিস করছে সে,

…তুমি… হঠাৎই ভাষা খুঁজে পেল যেন কেরি। হ্যাঁ, কিশোর পাশা, সত্যিই বলেছ। এটা দেখতে চাইবেন মিস্টার ক্রিস্টোফার!
কি, মিস ওয়াইল্ডার?
দ্রুত তিন জোড়া চোখ ঘুরে গেল দরজার দিকে। দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফার স্বয়ং। শরীরের তুলনায় মাথা বড়। ঝাঁকড়া চুল। এত বেশি ঝুলে পড়েছে নিচের ঠোঁট, মাড়ি দেখা যায়। ভীষণ কুৎসিৎ চেহারা।
কি হয়েছে? কোন গোলমাল? আবার জানতে চাইলেন। মিস্টার ক্রিস্টোফার। সেই কখন থেকে রিঙ করছি আমি।
গোলমাল কিনা। আপনিই ঠিক করুন, মিস্টার ক্রিস্টোফার, ফস করে বলে বসল কেরি। এই ছেলেটা কিছু দেখাতে চায়। আপনাকে। আপনি মুগ্ধ হবেন।
সরি, বললেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। কারও সঙ্গেই দেখা করতে পারব না। আজ। হাতে কাজ অনেক। ওকে যেতে বল।
আমি শিওর, মিস্টার ক্রিস্টোফার, আপনি দেখতে চাইবেন! কেমন এক গলায় কথা বলে উঠল। কেরি।
স্থির চোখে কেরির দিকে তাকালেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। তারপর ফিরলেন দুই কিশোরের দিকে। কাঁধ ঝাঁকালেন। ঠিক আছে। এস।
বিশাল এক টেবিলের ওপাশে সুইভেল চেয়ারে গিয়ে বসলেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। ইচ্ছে করলে টেবিল-টেনিস খেলা যাবে। টেবিলটাতে, এত বড়। তাঁর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল দুই গোয়েন্দা। পেছনে দরজাটা ওপাশ থেকে বন্ধ করে দিল কেরি।
তোমার, ছেলেরা, বললেন, বললেন মিস্টার ক্রিস্টোফার, পাঁচ মিনিট সময় দিচ্ছি তোমাদের, কি দেখাতে চাও?
এটা স্যার, অদ্ভূত ভঙ্গিতে পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে টেবিলের ওপর দিয়ে ঠেলে দিল কিশোর। ভঙ্গিটা লক্ষ্য করলেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। একেবারে তাঁর নিজের ভঙ্গি। হাত বাড়িয়ে তুলে নিলেন। কার্ডটা।
হুমম! তোমরা তাহলে গোয়েন্দা। প্রশ্নবোধক চিহ্নগুলো কেন? নিজেদের ক্ষমতার ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ?
না, স্যার, জবাব দিল কিশোর। ওগুলো আমাদের ট্রেডমার্ক। যে-কোন ধরনের রহস্য ভেদ করতে রাজি আমরা। তাছাড়া ওই চিহ্ন কার্ডে বসানোর কারণ জিজ্ঞেস করবেই লোকে, আমাদেরকে মনে রাখবে।
আচ্ছা! ছোট্ট একটা কাশি দিলেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। নাম প্রচারের ব্যাপারে খুব আগ্রহী মনে হচ্ছে?
নিশ্চয়, স্যার। লোকে আমাদের নামই যদি না জানল, ব্যবসা টেকাব কি করে?

ভাল যুক্তি, স্বীকার করলেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। কিন্তু ব্যবসা তো শুরুই করনি এখনও।
সেজন্যেই তো এসেছি, স্যার। আপনাকে একটা ভূতুড়ে বাড়ি খুঁজে দিতে চাই আমরা।
ভূতুড়ে বাড়ি? ভুরুজোড়া সামান্য উঠে গেল মিস্টার ক্রিস্টোফারের। আমি ভূতুড়ে বাড়ি খুঁজছি, ভাবনাটা কেন এল মাথায়?
শুনেছি, আপনার পরের ছবির জন্যে একটা ভূতুড়ে বাড়ি খুঁজছেন, বলল কিশোর। আপনার খোঁজায় সাহায্য করতে আগ্রহী তিন গোয়েন্দা।
তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটল মিস্টার ক্রিস্টোফারের মুখে। দুটো বাড়ির খোঁজ ইতিমধ্যেই পেয়ে গেছি। আমি, বললেন তিনি। একটা ম্যাসাচুসেটসের সালেমে, আরেকটা দক্ষিণ ক্যারোলিনার চার্লসটনে। দুটো জায়গাতেই নাকি ভূতের উপদ্রব আছে। আগামীকাল আমার দুজন লোক যাবে জায়গাগুলো দেখতে। আমি শিওর, দুটোর একটা জায়গা আমার পছন্দ হবেই।
কিন্তু আমরা যদি এখানে, এই ক্যালিফোর্নিয়াতেই একটা বাড়ি খুঁজে দিতে পারি, অনেক সহজ হয়ে যাবে আপনার কাজ।
আমি দুঃখিত, খোকা। তা হয় না। আর এখন।
টাকা পয়সা কিছু চাই না। আমরা, স্যার, বলল কিশোর। শুধু প্রচার চাই। এজন্যে কাউকে লিখতে হবে আমাদের কথা। যেমন লেখা হয়েছে শার্লক হোমস, এরকুল পোয়ারোর কাহিনী। আমার ধারণা, ওদের কথা লেখা হয়েছে বলেই আজ ওরা এত নামী গোয়েন্দা। না না, স্যার, আপনাকে লিখতেও হবে না। লিখে দেবেন। আমাদের এক সহকারীর বাবা, মিস্টার রোজার মিলফোর্ড। খবরের কাগজে চাকরি করেন তিনি।
আচ্ছা, এবার তাহলে, ঘড়ি দেখলেন মিস্টার ক্রিস্টোফার।
মিস্টার ক্রিস্টোফার, ভেবেছিলাম। আমাদের প্রথম কেসটায় একটু সাহায্য করবেন…
সম্ভব না, যাবার পথে দয়া করে কেরিকে একবার আসতে বলে যেও।
ঠিক আছে, স্যার, হতাশ মনে হল কিশোরকে।
ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে হাঁটতে শুরু করল দুই গোয়েন্দা। দরজার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে, পেছন থেকে ডাক শোনা গেল মিস্টার ক্রিস্টোফারের, একটু দাঁড়াও।
বলুন, স্যার, ঘুরে দাঁড়াল কিশোর। মুসাও ঘুরল।
চোখ কুঁচকে তাদের দিকে চেয়ে আছেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। কেন যেন মনে হচ্ছে, যা দেখাতে এসেছ তা দেখাওনি। কি দেখাবে বলে বলেছিল মিস

ওয়াইল্ডার? নিশ্চয় তোমাদের ভিজিটিং কার্ড নয়?
ঠিকই বলেছেন, স্যার, স্বীকার করল কিশোর। আমি লোকের গলার স্বর, কথা বলার ভঙ্গি, এমনকি অনেকের চেহারাও নকল করতে পারি। মিস ওয়াইল্ডারকে আপনার ছেলেবেলার চেহারা নকল করে দেখিয়েছিলাম।
আমার ছেলেবেলার চেহারা ভারি হয়ে গেল বিখ্যাত পরিচালকের স্বর। চেহারায় মেঘা জমতে শুরু করছে। কি বলতে চাইছ?
ঠিক আছে, দেখাচ্ছি, স্যার।
চোখের পলকে বদলে গেল কিশোরের চেহারা। আমার ধারণা, মিস্টার ক্রিস্টোফার, গলার স্বরও পাল্টে গেছে। হয়ত কোন ছবিতে আপনার ছেলেবেলার চেহারা দেখতে চাইবেন। মানে, ছেলেবেলার কোন ঘটনা কাউকে দিয়ে অভিনয় করাতে চাইবেন…
হেসে ফেললেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। পরীক্ষণেই গম্ভীর হয়ে গেলেন আবার। বিচ্ছিরি থামাও ওসব!
আপন চেহারায় ফিরে এল কিশোর। পছন্দ হল না, স্যার? আপনার ছেলেবেলার চেহারা নিশ্চয় এমন ছিল?
না না, এত বিচ্ছিরি ছিলাম না। আমি কিছু হয়নি তোমার!
তাহলে আরও কিছুদিন প্র্যাকটিস করতে হবে, আপনমনেই বলল কিশোর। টেলিভিশন থেকে খুব চাপাচাপি করছে…
টেলিভিশন সতর্ক হয়ে উঠেছেন পরিচালক। কিসের চাপাচাপি?
মাঝেমধ্যে টেলিভিশনে কমিক দেখাই আমি। আগামী হস্তায় বাচ্চাদের একটা অনুষ্ঠান আছে। ভাবছি, এবারে আপনার চেহারা, কথা বলার ধরন নকল করে…
খবরদার! গর্জে উঠলেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। আমি নিষেধ করছি।
কেন, স্যার? নিরীহ গলা কিশোরের। দোষ কি এতে? বাচ্চারা যদি একটু মজা পায়…
না-আ! কি যেন একটু ভাবলেন পরিচালক। ঠিক আছে, তোমাদের প্রস্তাবে আমি রাজি। তবে কথা দিতে হবে, কক্ষণো, কোথাও আমার চেহারা নকল করে দেখাতে পারবে না।
থ্যাঙ্ক ইউ, মিস্টার ক্রিস্টোফার, হাসিমুখে বলল কিশোর।
তাহলে ভূতুড়ে বাড়ি খোঁজার অনুমতি দিচ্ছেন আমাদেরকে?
হ্যাঁ হ্যাঁ, দিচ্ছি। তেমন বাড়ি পেলেও ওটা ব্যবহার করব, এমন কথা দিতে পারছি না। তবে তোমাদের নাম প্রচারের ব্যবস্থা করব। এখন বেরোও, মেজাজ আরও খিচড়ে যাবার আগেই। হয়ত আবার মত পাল্টে বসতে পারি। ভয়ানক চালাক

ছেলে তুমি, কিশোর পাশা নিজের কাজটা ঠিক উদ্ধার করে নিয়ে গেলো! ভীষণ চালাক!

আর কিছু শোনার দরকার মনে করল না কিশোর আর মুসা। প্রায় ছুটে বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

পড়ন্ত বিকেল। হ্যান্ডেল ধরে সাইকেলটা ঠেলে নিয়ে এসে সবুজ ফটক এক-এর সামনে দাঁড়াল রবিন। গাল-মুখ লাল, হাঁপাচ্ছে। হতচ্ছাড়া টিউব ফুটো হবার আর সময় পেল না! বিড়বিড় করছে সে আপনমনেই।

ইয়ার্ডের ভেতরে এসে ঢুকল রবিন। মেরিচাচীর গলা শোনা যাচ্ছে অফিসের ওদিক থেকে। রাশেদ চাচার দুই সহকারী বোরিস আর রোভারকে কাজের নির্দেশ দিচ্ছেন। ওয়ার্কশপ খালি। কিশোর কিংবা মুসা, কেউই নেই।

এটাই আশা করেছিল রবিন। সাইকেলটা রেখে ছোট ছাপার মেশিনটার ওপোশ ঘুরে একটা জায়গায় এসে দাঁড়াল। একটা ওয়ার্কবেঞ্চের গায়ে হেলান দিয়ে ফেলে রাখা হয়েছে একটা লোহার পাত।

বিশাল এক গ্যালভানাইজটা পাইপের মুখ ঢেকে রাখা হয়েছে পাতটা ফেলে। বসে পড়ে ওটা একটু সরাল রবিন। ফাঁক গলে এসে ঢুকল পাইপের মুখের ভেতরে। পাতটা আবার আগের জায়গায় টেনে বসাল। দ্রুত ক্রল করে এগিয়ে চলল পাইপের ভেতর দিয়ে। এটাও একটা গুপ্ত পথ, নাম রাখা হয়েছে দুই সুড়ঙ্গ।

পাইপের অন্য মাথায় চলে এল রবিন। একটা কাঠের বোর্ড কায়দা করে বসানো আছে। ও-মাথায়। ঠেলা দিতেই সরে গেল বোর্ড।

হেডকোয়ার্টারে এসে ঢুকল সে।

হেডকোয়ার্টার মানে তিরিশ ফুট লম্বা একটা ক্যারাভান, মোবাইল হোম। গত বছর কিনেছিলেন রাশেদ চাচা। অ্যাক্সিডেন্ট করেছিল ক্যারাভানটা। ভেঙে চুরে বেঁকে দুমড়ে একেবারে শেষ।

ইয়ার্ডের এক প্রান্তে ফেলে রাখা হয়েছে। চাচার কাছ থেকে ওটা ব্যবহারের অনুমতি নিয়ে নিয়েছে কিশোর। বোরিস আর রোভারের সাহায্যে মোটামুটি ঠিকঠাক করে নিজের অফিস বানিয়েছে।

পুরো বছর ধরেই মালপত্র এনে ক্যারাভান ট্রেলারটার চারপাশে ফেলেছে কিশোর। একাজেও তাকে সাহায্য করেছে বোরিস আর রোভার, মুসা আর রবিন তো আছেই। ইস্পাতের বার, ভাঙাচোরা ফায়ার-এস্কেপ, কাঠ আর দেখে-চেনার-জো-নেই এমন সব জিনিসপত্রের আড়ালে এখন একেবারে ঢাকা পড়ে গেছে ট্রেলারটা। ওটার কথা ভুলেই গেছেন রাশেদ চাচা। তিনটে কিশোর ছাড়া আর কেউ জানে না, ওই ট্রেলারের ভেতর কত কিছু গড়ে উঠেছে। তিন গোয়েন্দার

অফিস ওটা। ল্যাবরেটরি আছে, ছবি প্রসেসিং-এর ডার্ক-রুম আছে। হেডকোয়ার্টার থেকে বেরোনোর কয়েকটা পথও বানিয়ে নিয়েছে ওরা।
একটা ডেস্কের ওপাশে সুইভেল চেয়ারে বসে আছে কিশোর পাশা। ডেস্কের এক কোণ পোড়া। অন্যপাশে বসে আছে মুসা।
দেরি করে ফেলছ, গম্ভীর গলায় বলল কিশোর। যেন ব্যাপারটা জানে না রবিন।
চাকা পাংচার, এখনও হাঁপাচ্ছে রবিন। লাইব্রেরি থেকে রওনা দেবার পর পরই পেরেক ঢুকেছে।
যে কাজ দিয়েছিলাম কিছু করেছ?
নিশ্চয়। অনেক কিছু জেনেছি টেরর ক্যাসলের ব্যাপারে।
টেরর ক্যাসল? আপনমনেই বিড় বিড় করল মুসা। নামটাই অপছন্দ লাগছে আমার, কেমন যেন গা ছমছম করে!
নাম শুনেই ছমছম, আসল কথা তো শোনইনি। এখনও, বলল রবিন। পাঁচজন লোকের একটা পরিবার রাত কাটাতে গিয়েছিল ওখানে। তারপর...
একেবারে গোড়া থেকে শুরু কর, বলল কিশোর। গালগল্প বাদ দিয়ে সত্যি ঘটনাগুলো শুধু।
ঠিক আছে। সঙ্গে করে নিয়ে আসা বড় একটা বাদামী খাম খুলছে। রবিন। কিন্তু তার আগে শুটিকে টেরির কথাটা জানানো দরকার। সেই সকাল থেকেই আমার পেছনে লেগেছিল ব্যাটা। আমি কি করছি না করছি, জানার চেষ্টা করেছে।
ইয়াল্লা! ব্যাটাকে জানতে দাওনি তো কিছু। প্রায় চেঁচিয়ে উঠল। মুসা। পেছন থেকে কি করে যে সরাই খালি নাক গলাতে আসে। আমাদের কাজে!
না, ওকে কিছু বলিনি। আমি, বলল রবিন। কিন্তু আঠার মত সঙ্গে লেগে ছিল ব্যাটা। লাইব্রেরিতে ঢুকতে যাচ্ছি, আমাকে থামাল শুঁটকো। কিভাবে রোলস-রয়েসটা পেল কিশোর জানতে চাইল। জিজ্ঞেস করল, তিরিশ দিন কোথায় যাচ্ছি আমরা।
তারপর? জানতে চাইল কিশোর।
লাইব্রেরিতে আমার সঙ্গে সঙ্গে ঢুকল ব্যাটা, নাক কোঁচকাল রবিন। আমার দিক থেকে চোখ সরাল না মুহূর্তের জন্যেও। দেখল, পুরানো পত্রিকা আর ম্যাগাজিন ঘাঁটাঘাঁটি করছি আমি। কি পড়ছি, দেখতে দিইনি। ওকে। কিন্তু...
কিন্তু কি?
আমাদের কার্ড। যেটার পেছনে টেরর ক্যাসল লিখেছিলে তুমি...
হারিয়েছে, না? টেবিলে রেখেছিলে, কাজ করে ফিরে এসে আর পাওনি, বলল কিশোর।
তুমি জানলে কি করে? রবিন অবাক।

সহজ। না হারালে ওটার কথা তুলতে না তুমি।
টেবিলে রেখে ক্যাটালগ গোছাচ্ছিলাম, বলল রবিন। মনে পড়তেই তুলে নিতে এলাম। পেলাম না। অনেক খুঁজেছি। শুটকো নিয়েছে, এটাও জোর দিয়ে বলতে পারছি না। তবে বেরিয়ে যাবার সময় ব্যাটাকে খুব খুশি খুশি মনে হয়েছে।
শুঁটকোর কথা যথেষ্ট হয়েছে, বলল কিশোর। একটা জরুরি কাজ হাতে নিয়েছি আমরা। সময় নষ্ট করা চলবে না। টেরর ক্যাসলের ব্যাপারে কি জানলে, বল।
বেশ, শুরু করল রবিন। হলিউড ছাড়িয়ে গেলে একটা সরু গিরিপথ পাওয়া যাবে। নাম ব্ল্যাক ক্যানিয়ন। ওই গিরিপথের এক ধারে পাহাড়ের ঢালে তৈরি হয়েছে টেরর ক্যাসল। এটার নাম ছিল আসলে ফিলবি ক্যাসল। বিখ্যাত অভিনেতা জন ফিলবির বাড়ি সে-ই তৈরি করিয়েছিল। নির্বাক-সিনেমার যুগে লোকের মুখে মুখে ফিরত ফিলবির নাম। থামল রবিন।
বলে যাবার ইঙ্গিত করল। কিশোর।
টেরর ছবিতে অভিনয় করত ফিলবি। এই ভ্যাম্পায়ার কিংবা ওয়্যারউলভূস মার্কা ছবিগুলো আরকি। ওসব ছবিতে সাধারণত পোড়ো বাড়ি দরকার পড়েই। প্ল্যান করে ওই মডেলেরই একটা বাড়ি তৈরি করল। ফিলবি। ঘরে ঘরে ভরল যত্তোসব উদ্ভট জিনিস। মমির কফিন, বহু পুরানো লোহার বর্ম, মানুষের কঙ্কাল, এমনি সব জিনিস। কোনটাই কিনতে হয়নি তাকে। ছবিতে ব্যবহার হয়ে যাবার পর প্রযোজকের কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছে।
ভরসা পাচ্ছি, আস্তে করে বলল কিশোর।
শেষতক শোন আগে, বলল মুসা। তা জন ফিলবির কি হল?
আসছি সে কথায়, বলল রবিন। লক্ষমুখো মানব নামে সারা দুনিয়ায় খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল ফিলবির। এই সময়েই এল সবাক সিনেমা। চমৎকার অভিনয় ফিলবির, কিন্তু কথা বলতে গেলেই গুবলেট হয়ে যায়। চি-চি গলার স্বরা শুধু তাই না, জোরে বলতে গেলে কথা জড়িয়ে যায়। কখনও কোন শব্দের বেলায় তোতলায়ও।
ই-স্-স্ আফসোস করে উঠল মুসা। চি-চি করা ওই তোতলা ভুতকে সিনেমায় যদি দেখতে পেতামা হাসতে হাসতে নিশ্চয় পেট ব্যথা হয়ে যেত লোকের!
তা-ই হত, সায় দিল রবিন। ছবিতে অভিনয় বন্ধ করে দিল ফিলবি। বেহিসেবী, খরুচে ছিল সে। জমানো টাকা পয়সা তেমন ছিল। না। কোজ নেই, টাকাও আসে না। একে একে সবকটা কাজের লোককে বিদেয় করে দিতে বাধ্য হল। সব শেষে বিদেয় করল তার বিজনেস ম্যানেজার হ্যারি প্রাইসকে। লোকের সঙ্গে ফোনে কথা বলা বন্ধ করে দিল। ফোন আসে, ধরে না, চিঠি আসে, জবাব দেয় না। নিজেকে গুটিয়ে নিল ক্যাসলের সীমানায়। ধীরে ধীরে অভিনেতা ফিলবিকে ভুলে

গেল লোকে। থামল রবিন। দম নিয়ে আবার বলতে লাগল, তারপর একদিন, হলিউডের মাইল পচিশোক উত্তরে পড়ে থাকতে দেখা গেল একটা গাড়ি। ভেঙে চুরে দুমড়ে আছে। পাহাড়ী পথ থেকে নিচের পাথুরে সৈকতে পড়ে গিয়ে ওই অবস্থা হয়েছে। ওটার। চুরচুর হয়ে গেছে কাচ। ভেঙে, খুলে দশহাত দূরে ছিটকে পড়েছে একটা দরজা।

ওই গাড়ির সঙ্গে ফিলবির সম্পর্ক কি? রবিনের কথার মাঝেই প্রশ্ন করে বসল মুসা।

লাইসেন্স নাম্বার দেখে পুলিশ জানতে পারল, গাড়িটা ফিলবির, ব্যাখ্যা করল রবিন। অভিনেতার লাশ পাওয়া যায়নি। এতে অবাক হবারও কিছু নেই। নিশ্চয় খোলা দরজা দিয়ে বাইরে ছিটকে পড়েছিল দেহটা। তারপর জোয়ারের সময় ভেসে গেছে সাগরে।

আহু-হা দুঃখ প্রকাশ পেল মুসার গলায়। তোমার কি মনে হয়? ইচ্ছে করেই অ্যাক্সিডেন্ট করেছিল লোকটা?

শিওর না, জবাব দিল রবিন। গাড়িটা সনাক্ত করার পরই ক্যাসলে গিয়ে উঠল পুলিশ। সদর দরজা খোলা। ভেতরে কেউ নেই। পুরো ক্যাসল খুঁজল পুলিশ। কোন লোককেই পাওয়া গেল না। লাইব্রেরিতে একটা টেবিলে পেপারওয়েট চাপা দেয়া একটা নোট পাওয়া গেল, কপি করে আনা নোটটা বাদামী খামের ভেতর থেকে খুলে পড়ল। রবিনঃ লোকে আর কোনদিনই জীবন্ত দেখতে পাবে না। আমাকে। কিন্তু তাই বলে একেবারে হারিয়ে যাব না। আমি। আমার আত্মা ঠিকই বিচরণ করবে তোমাদের মাঝে। আর, মরার পরেও আমার সম্পত্তি হয়ে রইল টেরর ক্যাসল। ওটা এই মুহূর্ত থেকে একটা অভিশপ্ত দুর্গ। — জন ফিলবি।

ইয়াল্লা! প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মুসা। দুর্গটার ব্যাপারে যতই শুনছি, ততই অপছন্দ করছি ওটাকে!

থামলে কেন? রবিনকে বলল কিশোর। বলে যাও।

ক্যাসলের আনাচে-কানাচে কোথাও খোঁজা বাকি রাখল না। পুলিশ। না, ফাঁকি বুকি কিছুই নেই। গাড়িটা ভেঙে ফেলে দিয়ে এসে বাড়িতে লুকিয়ে বসে থাকেনি ফিলবি। পরে জানা গেল, ব্যাংকে পাহাড়-প্রমাণ ঋণ হয়ে আছে তার। বাড়িটা মটগেজ রয়েছে ব্যাংকের কাছে। ফিলবি আত্মহত্যা করেছে, শিওর হয়ে নিয়ে ক্যাসলে লোক পাঠাল ব্যাংক। তার জিনিসপত্র সব তুলে নিতে এল ওরা। কিন্তু অদ্ভুত একটা ব্যাপার ঘটল। কেন জানি থতমত খেয়ে গেল লোকেরা বাড়িতে ঢুকেই। উদ্ভট কিছু শব্দ শুনল ওরা, আজব কিছু চোখে পড়ল। কিন্তু কি শুনেছে, কি দেখেছে, পরিষ্কার করে বলতে পারল না। মালপত্র আর বের করা হল না। নিজেরাই ছুটে বেরিয়ে এল। বাড়িটা বিক্রির সিদ্ধান্ত নিল। এরপর ব্যাংক। লাভ

হল না। লোকে থাকতেই চায় না। ক্যাসলে, কিনতে যাবে কে শুধু শুধু? যে-ই ঢোকে বাড়িটাতে, খানিক পরেই কেমন অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করে। থেমে দুই বন্ধুর দিকে একবার চেয়ে নিল রবিন। কিশোরের কোন রকম ভাব পরিবর্তন নেই। হাঁ করে আছে মুসা। আবার বলল সে, সস্তায় এতবড় একটা বাড়ি কেনার লোভ ছাড়তে পারল না। একজন এস্টেট এজেন্ট। ভূতফুত কিছু নেই, সব বাজে কথা! — প্রমাণ করতে এগিয়ে চলল সে। ঠিক করল, রাত কাটাবে ফিলবি ক্যাসলে। সাঁঝের আগেই ক্যাসলে। ঢুকাল সে। মাঝরাত পেরোনোর আগেই পাগলের মত ছুটে বেরিয়ে এল। ব্ল্যাক ক্যানিয়ন পেরোনোর আগে একবারও আর পেছন ফিরে তাকায়নি।

খুব সন্তুষ্ট মনে হচ্ছে কিশোরকে। কিন্তু চোখ বড় হয়ে গেছে মুসার। রবিন তার দিকে চাইতেই ঢোক গিলল।

বলে যাও, অনুরোধ করল কিশোর। যা আশা করেছিলাম, বাড়িটা তার চেয়ে অনেক বেশি ভূতুড়ে।

এরপর আরও কয়েকজন ক্যাসলে রাত কাটানোর চেষ্টা করেছে জানোল রবিন। একজন উঠতি অভিনেত্রী পাবলিসিটির জন্যে রাত কাটাতে গেল ওখানে। সে বেরিয়ে এল মাঝরাত হবার অনেক আগেই। শীত ছিল না, তবু দাঁতে দাঁত বাড়ি খাচ্ছিল তার। কোটর থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসতে চাইছিল চোখ। স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। আতঙ্কে। তখন কোন কথাই বেরোয়নি মুখ দিয়ে। পরে জানিয়েছে, একটা নীল ভূতের দেখা পেয়েছে। আর কেমন একধরনের কুয়াশা নাকি ঢেকে ফেলছিল তাকে। অভিনেত্রী এর নাম দিয়েছে ফগ। অব ফিয়ার।

নীল ভূত, আবার কুয়াশাতঙ্কও! ইয়াল্লা! শুকনো ঠোঁটে জিভ বুলিয়ে ভেজাবার চেষ্টা করল মুসা। আর কিছু দেখা গেছে? মাথা ছাড়া ঘোড়সওয়ার, শেকলে-বাঁধা-কঙ্কাল...

রবিনকে কথা শেষ করতে দাও, বাধা দিয়ে বলল কিশোর।

আমার আর কিছু শোনার দরকার নেই, মুসার মুখ ফ্যাকাসে। যা শুনেছি, এতেই বুক ধড়ফড় শুরু হয়ে গেছে।

মুসার কথায় কান দিল না কিশোর। রবিনকে জিজ্ঞেস করল, আর কিছু বলবে?

হ্যাঁ, আবার বলতে লাগল। রবিন। একের পর এক ভূতুড়ে কাণ্ড ঘটেই চলল ফিলবি ক্যাসলে। পুবের কোন এক শহর থেকে নতুন এল একটা পরিবার। পাঁচজন সদস্য। থাকার জায়গা খুঁজছে। ব্যাংক ধরল। ওদেরকে। পুরো একবছর ক্যাসলে থাকার অনুমতি দিল। এক পয়সা ভাড়া চায় না। শুধু বাড়িটার বদনাম ঘোচাতে চায় ব্যাংক। খুশি মনেই ক্যাসলে গিয়ে উঠল পরিবারটা। রাত দুপুরে

বেরিয়ে এল হুড়োহুড়ি করে। ক্যাসল তো ক্যাসল, সে-রাতেই শহর ছেড়ে পালাল ওরা। রকি বীচে। আর কোনদিন দেখা যায়নি ওদের।
গোলমালটা শুরু হয় ঠিক কোন সময় থেকে? জানতে চাইল কিশোর।
রাতের শুরুতে সব চুপচাপ। মাঝরাতের কয়েক ঘন্টা আগে থেকে ঘটতে শুরু করে ঘটনা। দূর থেকে ভেসে আসে গোঙানির শব্দ। হঠাৎ করেই হয়ত সিঁড়িতে একটা আবছামূর্তি দেখা যায়। কখনও শোনা যায় দীর্ঘশ্বাস। অনেক সময় ক্যাসলের মেঝের তলা থেকে উঠে আসে চাপা চিৎকার। মিউজিক রুমে একটা অরগান পাইপ আছে, নষ্ট। মাঝরাতে হঠাৎ করে নাকি বেজে ওঠে। ওটা, শুনেছে অনেকে। বাদককেও দেখেছে। কেউ কেউ। অর্গানের সামনে বসে থাকে, আবছা! একটা মূর্তি, শরীর থেকে নীল আলো বিচ্ছুরিত হয়! এর নামও দিয়ে ফেলেছে লোকেঃ নীল অশরীরী।
নিশ্চয় তদন্ত করে দেখা হয়েছে এসব?
হয়েছে, নোট দেখে বলল রবিন। দুজন প্রফেসর গিয়েছিলেন। তাঁরা কিছুই দেখতে পাননি। শোনেনওনি কিছু। তবে অদ্ভুত একটা ব্যাপার ঘটেছে। কেমন অস্বস্তি বোধ করেছেন। সারাক্ষণ। দুজনেই উদ্বিগ্ন, উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। বেরিয়ে এসে জানিয়েছেনঃ অদ্ভুত কিছু একটা রয়েছে ক্যাসলে। কিছুই করতে পারল না ব্যাংক। না পারল বাড়িটা বেচিতে, না পারল ভাড়া দিতে। মালপত্রগুলোও বের করে আনা গেল না। ক্যাসলে যাবার পথ আটকে দিল ব্যাংক। ব্যস। তারপর থেকে ওভাবেই পড়ে আছে ক্যাসলটা। কিশোরের দিকে চেয়ে বলল রবিন, বিশ বছরে একটা পুরো রাত কেউ কাটাতে পারেনি ওরা ভেতর। শেষে কয়েকজন ভবঘুরে মাতাল বাড়িটাতে আস্তানা গাড়ার চেষ্টা করেছিল, তাতেও বাধা দেয়নি ব্যাংক। কিন্তু প্রথম রাতেই পালাল মাস্তানেরা। ভূতে তাড়া করে দুর্গ থেকে বের করে আনল ওদের। সারা শহরে ছড়িয়ে দিল ওরা সে-কাহিনী। ক্যাসলের ত্রিসীমানায় ঘেষা বন্ধ করে দিল লোকে। ফিলবি ক্যাসলের নাম হয়ে গেল টেরর ক্যাসল। এসব অনেক বছর আগের ঘটনা। কিন্তু আজও লোকে মাড়ায় না ওদিকটা।
ঠিকই করে, বলে উঠল মুসা। আমিও যাব না, লাখ টাকা দিলেও না।
আজ রাতেই আমরা যাব ওখানে, ঘোষণা করল কিশোর। সঙ্গে ক্যামেরা আর টেপ-রেকর্ডার নিয়ে যাব। সত্যিই ভূত আছে কিনা ক্যাসলে, দেখতে চাই। পরে আট ঘাট বেঁধে তদন্তে নামব। দুর্গটার ভীষণ বদনাম আছে। জায়গাটাও খারাপ। ভূতুড়ে ছবির শুটিঙের জন্যে এরচে ভাল জায়গা আর পাবেন না মিস্টার ক্রিস্টোফার। হলপি করে। বলতে পারি।
টেরর ক্যাসলের পুরো ইতিহাস লিখে এনেছে। রবিন।

সারাটা বিকেল খুঁটিয়ে সব পড়ল কিশোর। তারপর উঠল, ক্যাসলে যাবার জন্যে তৈরি হল।
সারাক্ষণই যাব না যাব না করল মুসা। কিন্তু শেষে দেখা গেল, সে-ও তৈরি হয়ে এসেছে। পুরানো এক সেট কাপড় পরেছে। সঙ্গে নিয়েছে তার পুরানো টেপরেকর্ডারটা।
পকেটে নোটবুক নিল রবিন। আর নিল চোখ-করে-শিশতোলা পেন্সিল। ফ্ল্যাশগানসহ ক্যামেরা কাঁধে বুলিয়ে নিল কিশোর।
খাওয়া-দাওয়া সেরে এসেছে তিনজনেই। মুসা আর রবিন বাড়িতে বলে এসেছে, রোলস-রয়েসে চড়ে হাওয়া খেতে যাচ্ছে। দুজনের বাবা-মা কেউই আপত্তি করেননি। কিশোরও বেড়াতে যাবার অনুমতি নিয়েছে চাচির কাছ থেকে।
আধার নামল। স্যালভিজ ইয়ার্ডের গেটের বাইরে এসে দাঁড়াল তিন গোয়েন্দা। আগেই টেলিফোন করে দেয়া হয়েছে রেন্ট-আ-রাইড কোম্পানিতে। রোলস রয়েসের বিশাল জ্বলন্ত দুই চোখ দেখা গেল মোড়ের মাথায়। দেখতে দেখতে কাছে এসে দাঁড়াল গাড়ি।
গাড়িতে উঠে বসল তিন কিশোর।
কোথায় যাবে জানতে চাইল হ্যানসন।
কোলের ওপর একটা ম্যাপ বিছিয়ে নিয়েছে কিশোর। একটা জায়গায় আঙুল রেখে হ্যানসনকে দেখিয়ে বলল, ব্ল্যাক ক্যানিয়ন। এই যে, এ পথে যেতে হবে।
ঠিক আছে, মিস্টার পাশা।
অন্ধকারে নিঃশব্দে ছুটে চলল রোলস রয়েস। ধীরে ধীরে ওপরে উঠে যাচ্ছে পাহাড়ী পথ ধরে। এক পাশে নিচে গভীর খাদ। খানিক পর পরই তীক্ষ্ণ মোড় নিয়েছে পথ। কিন্তু দক্ষ ড্রাইভার হ্যানসন। তার হাতে নিজেদের ভার ছেড়ে দিয়ে একেবারে নিশ্চিন্ত তিন কিশোর।
আজ রাতে তদন্ত করার ইচ্ছে নেই, পাশে বসা দুই সঙ্গীকে বলল কিশোর। শুধু দেখে আসব দুর্গটা। উদ্ভট কিছু চোখে পড়লে তার ছবি তোলার চেষ্টা করব। আর তুমি, মুসা, আজব যে-কোন শব্দ রেকর্ড করে নেবে টেপে।
আমাকে রেকর্ড করতে দিলে, থেমে গেল মুসা। আরেকটা তীক্ষ্ণ মোড় নিল গাড়ি। নিচের অন্ধকার খাদের দিকে চেয়ে শিউরে উঠল একবার। তারপর ফিরল আবার কিশোরের দিকে। হ্যাঁ, আমাকে রেকর্ড করতে দিলে শুধু দাঁতে দাঁতে বাড়ি খাবার শব্দ উঠবে, আর কিছু না।
রবিন, মুসার কথায় কান না দিয়ে বলল কিশোর। তুমি গাড়িতে থাকবে। আমাদের ফেরার অপেক্ষা করবে।

এক্কেবারে আমার পছন্দসই কাজ, খুশি হয়ে বলল রবিন জানোলা দিয়ে বাইরে চেয়ে আছে। ইসস, দেখেছ কি অন্ধকারা
অন্ধকার গিরিপথে ঢুকে পড়েছে গাড়ি। দুধারে খাড়া উঠে গেছে পাহাড়। বার বার একেবেঁকে এগিয়ে গেছে। পথটা। কোথাও একবিন্দু আলো দেখা যাচ্ছে না। ঘুটিযুট অন্ধকার। একটা বাড়ি-ঘর চোখে পড়ছে না কোথাও।
ব্ল্যাক ক্যানিয়নের নাম যে-ই রাখুক, ঠিকই রেখেছে, চাপা। গলায় বলল মুসা।
সামনে বাধা দেখতে পাচ্ছি! বলে উঠল কিশোর।
ঠিকই সামনে পথ বন্ধ। পাথর আর মাটির স্তুপ। দুধারে পাহাড়ের গায়ে ঘন হয়ে জন্মে আছে মেলকোয়াইটের ঝোপ, কিন্তু ঘাসের নাম গন্ধও নেই। ফলে রোদ-বৃষ্টি বাতাসে আলগা হয়ে গেছে মাটি, পাথর। গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ে জমা হয়েছে পথের ওপর। স্তুপের ভেতর থেকে উঁকি দিয়ে আছে একটা ক্রসবারের মাথা। কোন এককালে লোক চলাচল ঠেকানোর জন্যে লাগানো হয়েছিল। এখন আর বারের দরকার নেই। তার চেয়ে ভাল ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে মাটি আর পাথর।
স্তুপের কাছে এসে গাড়ি থামিয়ে দিল হ্যানসন। আর যাবে। না, বলল সে। তবে আপনাদের তেমন অসুবিধে হবে বলেও মনে হয় না। ম্যাপে দেখছি, কয়েকশো গজ এগিয়ে একটা মোড় ঘুরলেই পৌঁছে যাবেন ক্যাসলে।
তা ঠিক, সায় দিল কিশোর। আমরা নেমেই যাচ্ছি। মুসা, এস।
নেমে এল দুজনে। গাড়ি ঘুরিয়ে রাখছে হ্যানসন।
এগিয়ে চলল দুই গোয়েন্দা।
খাইছে! শঙ্কিত গলায় বলে উঠল মুসা। দেখেই গা ছমছম করছে। দাঁড়িয়ে পড়েছে সে।
দাঁড়িয়ে পড়ল কিশোরও। অন্ধকারে সামনে তাকাল। গিরিপথের শেষ প্রান্তে একটা পাহাড়ের ঢালে দাঁড়িয়ে আছে অদ্ভুত এক কাঠামো। তারাখচিত আকাশের পটভূমিতে বেশ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে ওটা। বিশাল মোটা পাথরের একটা থাম যেন উঠে গেছে আকাশের দিকে। থামের চুড়ায় একটা রিঙ পরিয়ে দেয়া হয়েছে যেন। টেরার ক্যাসলের টাওয়ার। শুধু টাওয়ারটাই, ক্যাসলের আর বিশেষ কিছুই নজরে পড়ছে না। এখান থেকে।
দিনের বেলা এলেই ভাল হত, বিড় বিড় করে বলল মুসা। মাথা নাড়ল কিশোর। না। দিনে কিছু ঘটে না ক্যাসলে। ভূতপ্রেতগুলো বেরোয় রাতের বেলা।
ভূতের তাড়া খেতে চাই না। আমি। এমনিতেই প্যান্ট নষ্ট করার সময় হয়ে এসেছে।
আমারও, স্বীকার করল। কিশোর। পেটের ভেতর কেমন সুড়সুড়ি লাগছে। কয়েক ডজন প্রজাপতি ঢুকে পড়েছে যেন!

তাহলে চল ফিরে যাই, সুযোগ পেয়ে বলল মুসা। হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে যেন। এক রাতে অনেক দেখা হয়েছে। চল, হেডকোয়ার্টারে ফিরে গিয়ে নতুন কোন প্ল্যান ঠিক করি।

প্ল্যান তো ঠিকই আছে, বলল কিশোর। একটা শেষ না করেই আরেকটা কেন?

পা বাড়াল কিশোর। এগিয়ে চলল ক্যাসলের দিকে। মাঝে মাঝে টর্চ জ্বেলে পথ দেখে নিচ্ছে। প্রায় খাড়া হয়ে উঠে গেছে। পথটা। আলগা পাথরের ছড়াছড়ি। ছোট বড় মাঝারি, সব আকারের। হড়কে যাচ্ছে পা, কখনও হোচট খাচ্ছে। কিন্তু থামল না গোয়েন্দা প্রধান।

কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করল মুসা। তারপর পিছু নিল কিশোরের। তার হাতেও টর্চ। এমন অবস্থায় পড়বা জানলে কিশোরের কাছাকাছি হয়ে ক্ষুন্ন গলায় বলল মুসা। গোয়েন্দা হওয়ার কথা কল্পনাও করতাম না!

কেসটা মিটে গেলেই অন্য রকম মনে হবে, বলল কিশোর। কেউকেটা গোছের কিছু মনে হবে নিজেকে। প্রথম কেসেই কিরকম নাম হবে তিন গোয়েন্দার, ভেবে দেখেছ?

কিন্তু ভূতের সামনে যদি পড়ে যাই? কিংবা নীল অশরীরী তাড়া করে? দুয়েকটা দৈত্য-দানবের বাচ্চা এসে ঘাড় চেপে ধরলেও আশ্চর্য হব না।

ওরা আসুক, তা-ই আমি চাই, বলতে বলতে কাঁধে ঝোলানো ক্যামেরার গায়ে আলতো চাপড় দিল কিশোর। ব্যাটাদের ছবি তুলে নেব। বিখ্যাত হয়ে যাব। রাতারাতি।

বিখ্যাত হবার আগেই যদি ঘাড়টা মটকে দেয়?

শ শ শ! ঠোঁটে আঙুল রেখে হুশিয়ার করে দিল সঙ্গীকে কিশোর। আচমকা দাঁড়িয়ে পড়েছে। নিভিয়ে দিয়েছে টর্চ।

পাথরের মত স্থির হয়ে গেল মুসা। হঠাৎ আলো নিভে যাওয়ায় অন্ধকার যেন আরও বেশি করে চেপে ধরল। চারদিক থেকে।

কেউ, কিংবা কিছু একটা, এদিকেই নেমে আসছে। সোজা ছেলে দুটোর দিকে।

অদ্ভুত পায়ের আওয়াজ। চাপা, মৃদু। সেই সঙ্গে পায়ের আঘাতে ছোট ছোট পাথর গড়িয়ে পড়ার কেমন সুরেলা শব্দ।

ক্যামেরা হাতে তৈরি হয়ে আছে কিশোর। আরও এগিয়ে এল পায়ের শব্দ, আরও। হঠাৎ বিলিক দিয়ে উঠল। ফ্ল্যাশ-গানের তীব্র নীলচে-সাদা আলো। ক্ষণিকের জন্যে বড় বড় দুটো টকটকে লাল চোখ চোখে পড়ল। লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে আসছে চোখের মালিক। আরেক মুহূর্ত পরেই তাদের কাছে এসে গেল ওটা। পরীক্ষণেই আরেক লাফে বেরিয়ে গেল পাশ কেটে। পাথর গড়ানোর আওয়াজ তুলে লাফাতে লাফাতে চলে গেল জীবটা।

খরগোশ! বলল কিশোর। স্বরেই বোঝা গেল, হতাশ হয়েছে। জানোয়ারটাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছি আমরা।
আমরা দিয়েছি! চেঁচিয়ে উঠল মুসা। আমাদেরকে দেয়নি ব্যাটা? আরেকটু হলেই তো ভিরমি খেয়ে পড়েছিলাম!
ও কিছু না। রাতের বেলা রহস্যজনক শব্দ আর নড়াচড়ার ফলে নার্ভাস সিস্টেমের ওপর বিশেষ প্রতিক্রিয়া। ঘটেই থাকে এমন, বন্ধুকে অভয় দিল কিশোর। চল, এগোই। মুসার হাত ধরে টান দিল। সে। আর চুপি চুপি এগিয়ে লাভ নেই। ফ্ল্যাশারের আলোয় নিশ্চয় চমকে গেছে ভূতগুলো, যদি থেকে থাকে।
তাহলে কি গান গাইতে গাইতে এগোব? মোটেই এগোনোর ইচ্ছে নেই মুসার। পেছনে পড়ে গেছে। এতে একটা উপকার হবে। ভূতের গোঙানি, দীর্ঘশ্বাস, কিছুই কানে ঢুকবে না।
কানে ঢুকুক, তা-ই চাই আমি, দৃঢ় শোনাল কিশোরের গলা। সব শুনতে চাই আমি। চেচনি, দীর্ঘশ্বাস, খসখসে, শেকলের ঝনঝনানি, ভূতেরা যতরকম শব্দ ব্যবহার করে, সব।
মুসার মনের ভাব ঠিক উল্টো। কিন্তু বলল না। আর কিছু। জানে লাভ নেই বলে। বন্ধুকে চেনে সে। একবার যখন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, দুর্গে ঢুকবেই কিশোর পাশা। কোন বাধাই এখন ঠেকাতে পারবে না। তাকে। চুপচাপ সঙ্গীর পিছু পিছু এগিয়ে চলল মুসা।
যতই এগোচ্ছে ওরা, আকাশের পটভূমিতে ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে টাওয়ারটা। ক্যাসলের অন্যান্য অংশও চোখে পড়ছে এখন। আবছাভাবে নিজের অজান্তেই শিউরে উঠল একবার মুসা। কি কি ঘটায় ওখানে ভূতেরা, সব বলেছে। রবিন। ওই কথাগুলোই বারবার ঘুরে ফিরে মনে আসছে গোয়েন্দা সহকারীর। ভুলে থাকতে চাইছে, পারছে না।
দুর্গ ঘিরে থাকা উঁচু পাথরের দেয়ালের কাছে এসে দাঁড়াল ওরা। থামল এক মুহূর্ত। তারপর গেট দিয়ে ঢুকে পড়ল দুর্গ প্রাঙ্গনে।
এসে গেলাম, থেমে দাঁড়িয়েছে কিশোর।
বড় টাওয়ারটার পাশেই আরেকটা ছোট টাওয়ার। এটার মাথা চোখা। এমনি ছোট ছোট আরও কয়েকটা টাওয়ার রয়েছে এদিকওদিক। জানালায় জানালায় কাচের শার্সি, তারার আলোয় চিক চিক করছে স্নানভাবে। মুসার মনে হচ্ছে, ওগুলো জানোলা নয়, ভূতের চোখ। তার দিকে চেয়ে মুখ টিপে হাসছে।
কোনরকম জানান না দিয়ে হঠাৎ উড়ে এল ওটা। কালো একটা ছায়া, নিঃশব্দে। আঁতকে উঠে মাথা নুইয়ে ফেলল। মুসা। চেঁচিয়ে উঠল, ইয়াল্লা! বাদুড়া

বাদুড়েরা শুধু পোকামাকড় খায়, মনে করিয়ে দিল কিশোর। অত ভয় পাওয়ার কিছু নেই।
এটা হয়ত রুচি বদলাতে চায়। সুযোগ দিয়ে লাভ কি? ড্রাকুলার প্রেতাত্মাও তো হতে পারে!
সঙ্গীর কথায় কান না দিয়ে আঙুল তুলে সামনে প্রাসাদের গায়ে বসানো বিরাট দরজা দেখাল কিশোর। চল, ঢুকে পড়ি।
আমার পা কথা শুনবে বলে মনে হয় না। কেবলই পেছনে চলতেই চাইছে ও দুটো।
আমার দুটোও, স্বীকার করল। কিশোর। জোর করে কথা শোনাতে হবে। এস।
পা বাড়াল কিশোর।
ভয়াবহ ওই ক্যাসলে বন্ধুকে একা ঢুকতে দেয়া উচিত হবে। না। পেছনে চলল। মুসাও।
মার্বেলের সিড়ি ভেঙে একটা চওড়া বারান্দায় উঠে এল দুজনে। দরজার নবের দিকে হাত বাড়াতেই কিশোরের কজি চেপে ধরল মুসা। থামা শুনতে পোচ্ছ বাজনা বাজাচ্ছে কেউ
কান পাতল দুজনেই। লক্ষ লক্ষ মাইল দূর থেকে আসছে যেন অদ্ভুত কিছু শব্দের আভাস। এক মুহূর্ত। তারপরই হারিয়ে গেল শব্দগুলো। এখন শোনা যাচ্ছে আধার রাতের পরিচিত সব আওয়াজ। পোকামাকড়ের কর্কশ ডাক। হুহু বাতাসে মাঝেমধ্যে পাহাড়ের পাথুরে গা বেয়ে গড়িয়ে পড়া ছোট্ট পাথরের চাপা টুকুর-টাকুর।
শুধুই কল্পনা, গলায় জোর নেই কিশোরের। এমনও হতে পারে, গিরিপথের ওপারে কোন বাড়িতে টেলিভিশন চলছে। বাতাসে। ভেসে এসেছে তার আওয়াজ। খালি বাতাসও হতে পারে। হাজারো রকম শবদ করতে পারে বাতাস।
তা পারে, বিড়বিড় করে বলল মুসা। তবে পাইপ অরগান হলেও অবাক হব না হয়ত বাজানোর নেশায় পেয়েছে এমুহূর্তে নীল ভূতকে!
তাহলে চোখে দেখে শিওর হতে হবে, বলল কিশোর। চল, ঢুকি।
হাত বাড়িয়ে দরজার নব চেপে ধরল। কিশোর। জোরে মোচড় দিয়ে ঠেলা দিতেই তীক্ষ্ণ একটা ক্যাঁ-এঁ-চ-চ আওয়াজ উঠল।
ভয়ানক জোরে বুকের খাঁচায় বাড়ি মারল একবার মুসার হৃৎপিণ্ড। পেছন ফিরে দৌড় মারতে যাচ্ছিল, থেমে গেল শেষ মুহূর্তে। খুলে গেছে বিশাল দরজা। দরজার কব্জার আওয়াজ হয়েছে, বুঝতে পারল।
কিশোরের অবস্থাও বিশেষ সুবিধের নয়। বুকের ভেতর দুরদুর করছে তারও। ফিরে ছুটি লাগাতে ইচ্ছে করছে। মনোবল পুরো ভেঙে পড়ার আগেই বন্ধুর হাত চেপে ধরল। তাকে নিয়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

গাঢ় অন্ধকার গিলে নিল যেন দুই কিশোরকে। টর্চ জ্বালল। ওরা। লম্বা এক হলঘরে এসে দাঁড়িয়েছে। হলের ওপাশে একটা দরজা। সেদিকে এগিয়ে চলল দুজনে।
ভ্যাপসা গন্ধ। বাতাস ভারি। চারদিকে নাচছে যেন ছায়া ছায়া অশরীরীর দল। দরজাটা পেরিয়ে এল ওরা। বিরাট আরেকটা হলে এসে দাঁড়াল। দোতলা সমান উঁচু ছাত।
দাঁড়িয়ে পড়ল। কিশোর। এসে গেছি। এটা মেইন হল। ঘন্টাখানেক থাকব। এখানে। তারপর যাব।
যা-বো চাপা, কাঁপা কাঁপা গলায় কিশোরের কথার প্রতিধ্বনি করে উঠল। কেউ। কানের কাছে ফিসফিস করে উঠল শব্দটা।
শুনলে! থরথর করে কাঁপছে মুসা। ফিসফিস করতেও ভয় পাচ্ছে। ভুতটা আমাদের সঙ্গে যাবে বলছে চল, পালাই।
থাম! সঙ্গীর হাত খামচে ধরল কিশোর।
থা-মো! আবার শোনা গেল। কাঁপা কাঁপা কথা।
হুঁ, বুঝেছি, বলল কিশোর। প্রতিধ্বনি, আর কিছু না। খেয়াল করেছ। কতবড় ঘর? দেয়ালের কোন কোণ নেই, ড্রামের দেয়ালের মত গোল। এতে শব্দ প্রতিধ্বনিত হয় খুব বেশি। ইচ্ছে করেই হয়ত এমন ঘর তৈরি করিয়েছে জন ফিলবি, কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে। নামও রেখেছে। মিলিয়ে, ইকো রুম।
ড়ু-ম! কানের কাছে ফিসফিসিয়ে উঠল আবার কাঁপা প্রতিধ্বনি।
কিশোরের কথা ঠিক, বুঝতে পারল মুসা। ভয় কেটে যাচ্ছে। সাধারণ একটা ব্যাপার তাকে কি রকম ভয় পাইয়ে দিয়েছিল ভেবে লজা পেল মনে মনে। ফিরে গিয়ে রবিনকে নিশ্চয় কথাটা বলবে কিশোর। তাকে নিয়ে হাসাহাসি করবে। তাই বলল, আসলে, আগেই বুঝতে পেরেছি। আমি। ভয় পাওয়ার ভান করছিলাম। শুধু। এবং কথাটা প্রমাণ করার জন্যেই জোরে হা-হা করে হেসে উঠল।
সঙ্গে সঙ্গে উঠল প্রতিধ্বনিঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ আ-আ-আ! ধীরে ধীরে অনেক দূরে কোথাও মিলিয়ে গেল যেন শব্দের রেশ।
ঢোক গিলল মুসা। কাণ্ডটা আমি করলাম জোরে কথা বলতে ভয় পাচ্ছে, ফিসফিসিয়ে বলল।
তো কে করল? নিচু গলায় বলল কিশোর। যা করেছি, করেছি, আর কোরো না।
পগলা ফিসফিস করে বলল মুসা। কথাই বলব না জোরে!
কথা বলবে না কেন? এস, টেনে সঙ্গীকে এক পাশে নিয়ে গেল কিশোর। ঘরের ঠিক মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে কথা বললে প্রতিধ্বনি হবে। এখানে বলতে পার নিশ্চিন্তে।

তাহলে আগে আমাকে বলে নিলেই পারতো ক্ষুন্ন মনে হল মুসাকে।
আমি তো জানি প্রতিধ্বনির নিয়ম-কানুন সব তোমারও জানা আছে বলল কিশোর। পড়নি?
পড়েছি, স্বীকার করল মুসা। কিন্তু ভুলে গিয়েছিলাম। আচ্ছা, পুবের কোন অঞ্চল থেকে এসেছিল একটা পরিবার, একটা রাতও কাটাতে পারেনি। এখানে, ভেগেছে। কেন, বুঝেছ কিছু?
পশ্চিমে সুবিধে করতে পারবে না ভেবে হয়ত আবার পুবেই ফিরে গেছে, নির্লিপ্ত গলা কিশোরের। তবে এটা ঠিক, বিশ বছরে কেউ পুরো একটা রাত কাটাতে পারেনি। এখানে। আমাদের জানতে হবে, কি কারণে এত ভয় পেল ওরা!
কারণ আর কি? ভূতা বলল মুসা। ঘরের চারদিকে টর্চের আলো ফেলছে সে। হলের এক প্রান্ত থেকে একটা সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়! কিন্তু ওই সিড়ি বেয়ে ওপরে যাবার কোন ইচ্ছেই। তার নেই। কোন কোন জায়গার দেয়াল বিচিত্র রঙিন কাপড়ে ঢাকা, নষ্ট হয়ে গেছে কাপড়গুলো। তার নিচে কারুকাজ করা কাঠের বেঞ্চ পাতা। দেয়ালের গায়ে মাঝে মাঝেই ছোট ছোট চৌকোনা তাক। ওগুলোতে দাঁড় করিয়ে রাখা রয়েছে প্রাচীন বর্মপোশাক।
কয়েকটা বড় বড় ছবি বুলিছে দেয়ালে। আলো ফেলে ফেলে। প্রতিটি ছবি দেখছে মুসা। বিভিন্ন পোশাকে বিভিন্ন ভঙ্গিতে সব একজন লোকের ছবি। একটা ছবিতে সম্রান্ত এক ইংরেজের পোশাকে দেখা যাচ্ছে তাকে। পাশেই আরেকটাতে হয়ে গেছে কুজো অদ্ভুত পোশাক পরা একচোখা এক জলদস্যু।
অনুমান করল মুসা, ছবিগুলো দুর্গের মালিক, জন ফিলবির। সেই নির্বাক সিনেমার যুগের নাম করা কিছু ছবি দৃশ্য বড় করে এঁকে দেয়ালে সাজিয়ে রেখেছে। অভিনেতা।
চুপ করে থেকে এতক্ষণ বোঝার চেষ্টা করলাম, হঠাৎ বলল কিশোর। কই, মুহূর্তের জন্যেও তো ভয় টের পেলাম না! তবে একটু কেমন কেমন যে করছে না, তা নয়!
আমারও, জানোল মুসা। তবে ভয় ঠিক পাচ্ছি না। অনেক পুরানো একটা বাড়িতে দাঁড়িয়ে থাকলে যেমন হয়, তেমন অনুভূতি হচ্ছে।
নোট পড়ে জেনেছি, চিন্তিত দেখাচ্ছে কিশোরকে, লোকের ওপর প্রতিক্রিয়া ঘটাতে সময় নেয় টেরর ক্যাসল। শুরুতে হালকা এক ধরনের অস্বস্তিবোধ জন্মে। আস্তে আস্তে বাড়ে। প্রচণ্ড আতঙ্কে রূপ নেয় এক সময়।
কিশোরের শেষ কথাটা পুরোপুরি কানে ঢুকল না। মুসার। দেয়ালে টাঙানো একটা ছবির ওপর আটকে গেছে তার দৃষ্টি। হঠাৎ এক ধরনের অস্বস্তিবোধ চেপে ধরছে তাকে। ক্রমেই বাড়ছে সেটা।

মুসার দিকে চেয়ে আছে একচোখা জলদুস্যা নষ্ট চোখটা গোল করে কাটা কালো কাপড়ে ঢাকা। কিন্তু ভাল চোখটা জ্যান্ত চোখের মতই চেয়ে আছে যেন তার দিকে। জ্বলছে। হালকা লালচে একটা আভা বিকিরণ করছে যেন! কিন্তু ও-কি দ্রুত একবার চোখের পাতা পড়ল না!
কিশোর, গলা দিয়ে কোলা ব্যাঙের ঘড়ঘড়ে আওয়াজ বেরোল মুসার। ছবিটা! ... আমাদের দিকেই চেয়ে আছে।
কোন ছবি!
ওই যে, ওটা। টর্চের আলোর রশ্মি নাচিয়ে ছবিটা নির্দেশ করল। মুসা। আমাদের দিকেই চেয়ে আছে।
দৃষ্টি বিভ্রম, জবাব দিল কিশোর। ইচ্ছে করেই এমনভাবে আকে শিল্পী, মনে হয় দর্শকের দিকেই চেয়ে আছে চোখ। যেদিক থেকেই দেখ না কেন, তোমার দিকেই চেয়ে আছে মনে হবে।
কিন্তু...কিন্তু ওটা রঙে আঁকা চোখ নয়!। প্রতিবাদ করল মুসা। ওটা.ওটা সত্যিকারের চোখ..জ্যান্ত চোখ!
সে তোমার মনে হচ্ছে। ওটা রঙে আঁকা চোখই। চল, কাছ থেকে দেখি।
ছবিটার কাছে এগিয়ে গেল কিশোর। একমুহূর্ত দ্বিধা করে শেষে তাকে অনুসরণ করল মুসা। দুজনেই আলো ফেলল। ছবির ওপর ঠিক, কিশোরের কথাই ঠিক। রঙে আঁকা চোখ ওটা। তবে আঁকা হয়েছে দক্ষ হাতে। একেবারে জ্যান্ত মনে হচ্ছে।
হ্যাঁ রঙে আঁকা। চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা ঝোঁকাল মুসা। কিন্তু মেনে নিতে পারছি না! চোখের পাতা পলক ফেলতে দেখছি..আরে। হঠাৎ যেন কথা আটকে গেল তার। কিছু টের পাচ্ছি।
ঠাণ্ডা, অবাক শোনাল কিশোরের গলা। ঠাণ্ডা একটা অঞ্চলে এসে ঢুকেছি। আমরা। এরকম ঠাণ্ডা আবহাওয়া সব পোড়ো বাড়িতেই কিছু কিছু জায়গায় থাকে।
তাহলে স্বীকার করছি এটা পোড়ো বাড়ি রীতিমত কাঁপছে মুসা। দাঁতে দাঁতে বাড়ি খাওয়া শুরু হয়েছে। ভীষণ শীত করছে। মেরু অঞ্চলে এসে ঢুকলাম নাকিরে বাবা। ভূত, সব ভুত এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে আমার ওপর। কিশোর, ভয় পাচ্ছি আমি।
নিজেকে স্থির রাখার জোর চেষ্টা চালাচ্ছে মুসা। কিন্তু দাঁতে দাঁতে বাড়ি খাওয়া রোধ করতে পারছে না। কোথা থেকে গায়ে এসে লাগছে। তীব্র ঠাণ্ডা হাওয়ার স্রোত। তারপরই চোখে পড়ল, বাতাসে। হালকা ধোঁয়া। সূক্ষ্ম, অতি হালকা ধোঁয়ার ভেতর থেকে ধীরে ধীরে রূপ নিচ্ছে যেন একটা শরীর। মুহূর্তে ভয় প্রচণ্ড আতঙ্কে

পরিণত হল। পাই করে ঘুরল মুসা। কথা শুনল না পা। তাড়িয়ে বের করে নিয়ে এল তাকে ঠাণ্ডা অঞ্চল থেকে। হল পার করে এনে বারান্দায় ফেলল। সেখান থেকে প্রায় উড়িয়ে নামিয়ে আনল সিঁড়ির নিচে, প্রাঙ্গনে, পথে। পেছনে তাড়া করে আসছে পায়ের শব্দ। আরও জোরে ছুটল মুসা।
ক্রমেই কাছে এসে যাচ্ছে পায়ের শব্দ। দেখতে দেখতে পাশে এসে গেল। হাল ছেড়ে দিল মুসা। পাশে চাইল। আরো কিশোর
অবাকই হল মুসা। তিন গোয়েন্দার নেতাকে কোন কারণে এত ভয় পেতে এর আগে কখনও দেখেনি সে।
কি হল? তোমার পা-ও হুকুম মানছে না? ছুটতে ছুটতেই জিজ্ঞেস করল মুসা।
মানছে তো। ওদেরকে ছোটার হুকুম দিয়েছি। আমি, চেঁচিয়ে জবাব দিল কিশোর।
থামল না। ওরা। ছুটেই চলল। হাতে ধরা টর্চে ঝাঁকুনি লাগছে অনবরত, পথের ওপর অদ্ভূত ভঙ্গিতে নাচছে আলোর রশ্মি। টেরর ক্যাসলের কাছ থেকে দ্রুত সরে যাচ্ছে ওরা।
ছুটতে ছুটতে বাঁকের কাছে চলে এল ওরা। গতি কমাল একটু। বাঁক ঘুরল। পেছনে ফিরে চাইল একবার কিশোর। বাঁকের ওপাশে অদৃশ্য হয়ে গেছে টেরর ক্যাসলের গর্বিত টাওয়ার।
সামনে অনেক নিচে উপত্যকায় লস অ্যাঞ্জেলেস শহরের আলো মিটমিট করছে।
থামল না। ওরা। ছুটতে ছুটতে পাথর-মাটির স্তুপের কাছে চলে এল। এখানেও থামল না। চলে এল ওপাশে। একশো গজ নিচে দাঁড়িয়ে আছে কালো রোলস-রয়েস।
গতি একটু কমল দুজনে। ঠিক এই সময়ই শোনা গেল তীক্ষ্ণ প্রলম্বিত একটা চিৎকার। অনেক পেছনে ক্যাসলের দিক থেকে আসছে। থেমে গেল। হঠাৎ করেই। যেন দম আটকে গেছে গলায়। চমকে উঠে আবার ছোটার গতি বাড়িয়ে দিল দুই গোয়েন্দা। এক ছুটে এসে দাঁড়াল গাড়ির কাছে।
তারার আলোয় চিকচিক করছে বিশাল রোলস-রয়েসের সোনালি হাতল। ঝটকা দিয়ে খুলে গেল এক পাশের দরজা। হাত বাড়িয়ে মুসাকে ভেতরে টেনে নিল রবিন। মুসার পরই উঠে বসল। কিশোর। হ্যানসন চেঁচিয়ে উঠল সে, জলদি গাড়ি ছাড়ুন। বাড়ি ফিরে চলুন।
যাচ্ছি, মিস্টার পাশা, শান্ত গলায় বলল হ্যানসন।
মৃদু গুঞ্জন তুলে স্টার্ট হয়ে গেল ইঞ্জিন। প্রায় নিঃশব্দে পাহাড়ী পথ ধরে ছুটল গাড়ি। যতই নামছে, গতি বাড়ছে ততই। আরও বেশি, আরও।

কি হয়েছিল? সিটে এলিয়ে পড়া দুই বন্ধুকে জিজ্ঞেস করল রবিন। ওই চিৎকারটা কিসের?
জানি না, বলল কিশোর।
এবং আমি জানতে চাই না, কিশোরের কথার পিঠে বলল মুসা। যদি কেউ জানেও, আমাকে বলতে মানা করব।
কিন্তু হয়েছিল কি? আবার জিজ্ঞেস করল রবিন। নীল ভূতের দেখা পেয়েছ?
মাথা নাড়ল কিশোর। কিছুই দেখিনি। তবে ভয় পাইয়ে ছেড়েছে আমাদের কিছু একটা।
ভুল হল, শুধরে দিল মুসা। আতঙ্কিত করে ছেড়েছে।
তাহলে গালগল্পগুলো সব সত্যি? হতাশ হয়েছে যেন রবিন। ভূতের উপদ্রব আছে দুর্গে।
আছে মানে! সারা আমেরিকার যত ভূতপ্রেত, জিন, ভ্যাম্পায়ার, ওয়্যারউলফ সবকিছুর আডডা ওটা। হেডকোয়ার্টার শ্বাসপ্রশ্বাস সহজ হয়ে আসছে মুসার। ওই ভূতের খনিতে আর কখনও ঢুকাছি না। আমরা, কি বল?
সমর্থনের আশায় নেতার দিকে চাইল মুসা।
কিশোর শুনল কি-না বোঝা গেল না। হেলান দিয়ে বসে আস্তে আস্তে চিমটি কাটছে নিচের ঠোঁটে। গভীর চিন্তায় মগ্ন।
আর ওই দুর্গে ফিরে যাচ্ছি না। আমরা, তাই না? আবার জিজ্ঞেস করল মুসা।
কিন্তু এবারেও সাড়া নেই কিশোরের। ছুটন্ত গাড়ির জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে আছে। একনাগাড়ে চিমটি কেটে যাচ্ছে নিচের ঠোঁটে।
ইয়ার্ডে এসে পৌঁছুল গাড়ি।
ড্রাইভারকে ধন্যবাদ জানিয়ে নেমে পড়ল তিন গোয়েন্দা।
পরেরবার বেটার লাক আশা করছি, মাস্টার পাশা, জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে বলল হ্যানসন। সত্যি খুব ভাল লাগছে আপনাদের সঙ্গ। বুড়ো ব্যাংকার আর ধনী বিধবাদের কাজ করে বিরক্ত হয়ে পড়েছিলাম। একঘেয়েমী কাটছে।
গাড়ি নিয়ে চলে গেল। ইংরেজ শোফার।
বন্ধুদের নিয়ে জাংক-ইয়ার্ডে এসে ঢুকল কিশোর।
ইয়ার্ডের ভেতরে একধারে একটা ছোট বাংলোমত বাড়ি। তারই একটা ছোট্ট ঘরে ঘুমান চাচা-চাচী। ঘরের জানোলা দিয়ে আলো আসছে। টেলিভিশন দেখছেন দুজনে।
রাত বেশি হয়নি, বলল কিশোর। তাড়াতাড়িই ফিরেছি।
আরও আগে ফেরা উচিত ছিল। তাড়া খাওয়ার আগেই, বলল মুসা। এখনও ফ্যাকাসে হয়ে আছে চেহারা।

কিশোরের চেহারাও ফ্যাকাসে। আমি আশা করেছিলাম। চিৎকারটা রেকর্ড করবে তুমি। তাহলে আবার এখন শোনা যেত। বোঝা যেত কিসের চিৎকার।
তুমি আশা করেছিলো। প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মুসা। প্রাণ নিয়ে পালাতে দিশে পাচ্ছিলাম না, চিৎকার রেকর্ড করব।
আমার নির্দেশ ছিল, যে-কোন রকমের শব্দ রেকর্ড করার দায়িত্ব তোমার, শান্ত গলায় বলল কিশোর। তবে পরিস্থিতি তো নিজের চোখেই দেখেছি, তোমাকে আর কি বলব!
সহজ তিন-এর দিকে বন্ধুদের নিয়ে গেল কিশোর। হেডকোয়ার্টারে ঢোকার এটা সবচেয়ে সহজ গোপন পথ। ফ্রেমে আটকানো বিরাট একটা ওক কাঠের দরজা। গ্র্যানাইট পাথরে তৈরি ধসে পড়া একটা বাড়ি থেকে খুলে এনেছেন রাশেদ চাচা। ওটাকেই একটা দানবীয় স্টীম ইঞ্জিনের পুরানো বয়লারে এক প্রান্তে কায়দা করে বসিয়ে নেয়া হয়েছে।
লোহালক্কড়ের মাঝে একটা খোঁড়িলে হাত ঢুকিয়ে দিল। কিশোর। ভেতরে বসানো আছে একটা ছোট বাক্স, তাতে চাবি রাখা। এমন জায়গায় বাক্স, আর তার ভেতর দরজার চাবি থাকতে পারে, কল্পনাই করবে না কেউ। দরজার তালা খুলল কিশোর। টান দিয়ে খুলল পাল্লা। ঢুকে গেল বিরাট বয়লারে।
পুরো সোজা হয়ে দাঁড়ানো যায় না। মাথা সামান্য নুইয়ে বয়লারের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলল। তিন কিশোর। শেষ মাথায় বড় গোল একটা ফুটো। ওটার ভেতরে মাথা ঢুকিয়ে দিল কিশোর। শরীরটা বের করে নিয়ে এল ট্রেলারের ভেতর। তার পেছনে একে একে ঢুকে পড়ল। মুসা আর রবিন।
সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিল কিশোর। ডেস্কের ওপাশে সুইভেল চেয়ারে গিয়ে বসে পড়ল।
এখন, কথা শুরু করল কিশোর, দুর্গে কি কি ঘটেছে, আলোচনা করব আমরা। মুসা, কিসে ছুটি লাগাতে বাধ্য করল তোমাকে?
কেউ বাধ্য করেনি, সাফ জবাব দিল মুসা। আমার নিজেরই ছুটতে ইচ্ছে করছিল। বুঝতে পারনি। আমার প্রশ্ন। ছুটতে ইচ্ছে হল কেন তোমার? কি হয়েছিল?
শুরুতে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। আস্তে আস্তে বাড়ল অস্বস্তি, ভয় ভয় করতে লাগল। তারপর হঠাৎ করেই চেপে ধরল দারুণ আতঙ্ক। এরপর আর না ছুটে উপায় আছে?
ঠিক, নিচের ঠোঁটে চিমটি কেটে বলল কিশোর, ঠিক একই ব্যাপার ঘটেছে আমার বেলায়ও। শুরুতে অস্বস্তি তারপর ভয় ভয়। শেষে দারুণ আতঙ্ক। কিন্তু আসলে কি ঘটেছিল! প্রথম থেকে ভেবে দেখা উচিত। ইকো হল—প্রতিধ্বনি শুনে প্রথম

ভয় পাওয়া। জলদস্যুর ছবি। কাছে পরখ করতে যাওয়া। তারপর ঠাণ্ডা বাতাসের স্রোত…
হিম শীতল বাতাসের স্রোতা শুধরে দিল মুসা। ছবিটার কথা নতুন করে ভেবেছ কিছু? ওটার চোখ এত জ্যান্ত মনে হল কেন প্রথমে?
হয়ত নিছক কল্পনা, বলল কিশোর। আসলে সত্যি সত্যি এমন কিছু দেখিনি আমরা, কিংবা শুনিনি, যাতে আতঙ্কিত হতে হয়।
নাই বা দেখলাম, টের তো পেয়েছি বলল মুসা। এমনিতেই পুরানো আমলের বাড়িগুলোতে ঢুকতে ভয় ভয় লাগে। আর ক্যাসলটা তো ভূতের আড্ডাখানা। তা-ও যে সে ভূত না, বাঘা বাঘা সব ব্যাটাদের বাস। মানুষ তো মানুষ, ছোটখাট ভূতেরাই ঢুকতে সাহস করবে না। ওখানে জায়গাটা দেখলেই ভয় লাগে।
আসল রহস্যটা হয়ত ওখানেই বলল কিশোর। আবার টেরার ক্যাসলে ঢুকব… বাধা পেয়ে থেমে গেল। বেজে উঠেছে টেলিফোন।
অবাক হয়ে সেটটার দিকে চেয়ে আছে তিন গোয়েন্দা। মাত্র হাপ্ত খানেক আগে এসেছে ওটা। টেলিফোন বুকে নাম ওঠেনি। এখনও কিশোরের। অফিসের দুচারজন, আর তারা তিনজন ছাড়া আর কেউই জানে না নাম্বারটা। তাহলে! কে করল ফোন!
আবার হল রিঙ। আবার।
তুমিই ধর, ফিসফিস করে কিশোরকে বলল মুসা।
হাত বাড়াল কিশোর। আরেকবার রিঙ হতেই ধরল রিসিভার। তুলে কানে ঠেকাল। হ্যালো বলেই নামিয়ে আনল, ধরল। একটা মাইক্রোফোনের সামনে।
পুরানো মাইক্রোফোনটা জাংক-ইয়ার্ড থেকেই জোগাড় করেছে কিশোর। পুরানো একটা রেডিও থেকে খুলে নিয়েছে স্পীকার। মাইক্রোফোন আর স্পীকারের কানেকশন করে দিয়েছে। টেলিফোন এলে, তিনজনে একই সঙ্গে শোনার জন্যে এই ব্যবস্থা। কথা নেই, শুধু অদ্ভুত একটা গুঞ্জন স্পীকারে। আবার রিসিভার কানে ঠেকাল কিশোর। হ্যালো? নামিয়ে এনে ধরল। মাইক্রোফোনের সামনে।
এবারেও শুধু গুঞ্জন। ক্রেডলে রিসিভার রেখে দিল কিশোর। রঙ নাম্বার-টাম্বার কিছু একটা হয়েছে। হ্যাঁ, যা বলেছিলাম। টেরর ক্যাসলে….
আবার বেজে উঠল টেলিফোন।
স্থির চোখে এক মুহূর্ত সেটটার দিকে চেয়ে রইল। কিশোর। ছোঁ। মেরে তুলে নিল রিসিভার।
হা হ্যাল্লো? নামিয়ে আনল মাইক্রোফোনের সামনে।
আবার গুঞ্জন স্পীকারে। না, আগের মত নয়। একটু যেন পরিবর্তন হয়েছে। বহুদূর থেকে আসছে যেন শব্দটা, কাছিয়ে আসছে ধীরে ধীরে। হঠাৎই গুঞ্জনের

ভেতর থেকে ভেসে এল বিদঘুটে একটা অনেক কষ্টে যেন একটা শব্দ উচ্চারিত হল, দূরে... থেমে গোল কথা। শাঁই শাঁই ঝড় বইছে যেন স্পীকারে। আবার উচ্চারিত হলে দুটো শব্দ, দূরে...থাকবে... থেমে গেল কথা। হঠাৎ গলা টিপে ধরে থামিয়ে দেয়া হয়েছে যেন।
ধীরে ধীরে কমে এল শই শই, দূর থেকে দূরে মিলিয়ে গেল গুঞ্জন।
কি থেকে দূরে থাকব? রিসিভারের দিকে চেয়ে ওটাকেই যেন প্রশ্ন করল। কিশোর। তারপর আস্তে করে নামিয়ে রাখল ক্রেডলে।
দীর্ঘ এক মুহূর্ত কেউ কোন কথা বলল না। তারপর হঠাৎ করেই উঠে দাঁড়াল মুসা। বাড়ি যেতে হচ্ছে আমাকে। এই মাত্র মনে পড়ল, জরুরি একটা কাজ ফেলে এসেছি।
আমি যাব, রবিনও উঠল। আমিও যাব তোমার সঙ্গে।
আমারও যাওয়া দরকার। মেরিচাচী হয়ত ভাবছেন, উঠে দাঁড়াল কিশোরও।
হুড়োহুড়ি ঠেলাঠেলি করে বেরুতে গিয়ে একে অন্যের গায়ে ধাক্কা খেল ওরা। কে কার আগে বেরোবে সেই চেষ্টায় ব্যস্ত।
বাক্য পুরো করতে পারেনি। অদ্ভুত গলাটা। কিন্তু বুঝতে একটুও অসুবিধে হল না ছেলেদের, আসলে কি বলতে চেয়েছে। ওটা।
বলতে চেয়েছেঃ টেরর ক্যাসল থেকে দূরে থাকার!
সত্যিই, একটা সমস্যায়ই পড়া গেল বলল কিশোর।
পরদিন বিকেলে হেডকোয়ার্টারে বসে আছে দুই গোয়েন্দা। কিশোর বসে আছে তার সুইভেল চেয়ারে। পোড়া ডেস্কের এপাশে বসেছে মুসা। রবিন গেছে। লাইব্রেরিতে।
সমস্যা আসলে দুটো, আবার বলল গোয়েন্দাপ্রধান।
বলছি, কি করে সমাধান করবে সমস্যার? বলল মুসা। খুব সহজ। রিসিভার তুলে ফোন কর মিস্টার ক্রিস্টোফারকে। বলে দাও, তাঁর জন্যে ভূতুড়ে বাড়ি খুঁজে বের করতে পারব না। আমরা। জানাও, একটার কাছে গিয়েছিলাম কোনমতে প্রাণ বাঁচিয়ে ফিরেছি। আর একবার ওটার কাছে ঘেষতে চাই না।
মুসার পরামর্শের ধার দিয়েও গেল না কিশোর। আমাদের প্রথম সমস্যা, বলল সে, জানা, কে ফোন করেছিল গতরাতে।
কে নয়, শুধরে দিল মুসা। বল কিসে। ভূত, প্রেতাত্মা, ওয়্যারউলফ, ভ্যাম্পায়ার!
ওদের কেউই টেলিফোন ব্যবহার করতে জানে না, মনে করিয়ে দিল কিশোর।
সে-তো পুরানো আমলের কথা। আমরা আধুনিক হয়েছি, ভূতেদেরও আধুনিক হতে দোষ কি? গতরাতে যে-ই ফোন করে। থাকুক, গলাটা মোটেই মানুষের মত মনে হয়নি আমার।

চিন্তিত দেখাল গোয়েন্দাপ্রধানকে। ঠিকই বলছি। আমরা তিনজন আর হ্যানসন ছাড়া কোন মানুষের জানার কথা না, গতরাতে টেরার ক্যাসলে গিয়েছিলাম।
প্রেতাত্মাদের জানতে বাধা কোথায়? প্রশ্ন রাখল মুসা।
তা নেই, অনিচ্ছা সত্ত্বেও সায় দিল কিশোর। তবে, দুর্গটা সত্যিই ভূতুড়ে কিনা দেখে ছাড়ব। জন ফিলবির ব্যাপারে আরও অনেক বেশি জানতে হবে। আমাদের। টেরর ক্যাসলে কারও প্রেতাত্মা থেকে থাকলে, ওরই আছে।
হ্যাঁ, এটা একটা কথার মত কথা বলেছ খুশি হয়ে বলল মুসা। এবার বল দ্বিতীয় সমস্যাটা কি?
এমন কাউকে খুঁজে বের করা, যে জন ফিলবির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশেছে।
কিন্তু সে-তো অনেক বছর আগের কথা! তেমন কাকে পাব আমরা?
অনেক আর কত? আত্মহত্যা না করলে এখনও বেঁচে থাকতে পারত জন ফিলবি। তার সঙ্গী-সাথীদের অনেকেই নিশ্চয় বেঁচে আছে এখনও। হলিউডে খোঁজ করলে তেমন কাউকে না কাউকে পেয়ে যাবই আমরা।
তা হয়ত পেয়ে যাব।
আমার মনে হয়, ফিলবির ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি বলতে পারবে তার ম্যানেজার, মিস্টার ফিসফিস।
মিস্টার ফিসফিসা প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মুসা। এটা আবার কেমন নাম?
ডাক নাম। লোকে ওই নামেই ডাকত। আসল নাম হ্যারি প্রাইস। এই যে, ওর ছবি।
একটা কাগজ সহকারীর দিকে ঠেলে দিল গোয়েন্দাপ্রধান। একটা ছবি, তার নিচে কিছু লেখা। পুরানো একটা খবরের কাগজ থেকে ফটোকপি করে এনেছে। রবিন। ছবিতে দুজন লোক। একজন লম্বা, হালকা-পাতলা, পুরো মাথায় টাক। হাত মেলাচ্ছে তার চেয়ে সামান্য বেঁটে একটা লোকের সঙ্গে। মাথায় ঘন চুল। হাসিখুশি সুন্দর চেহারা। টাকমাথা লোকটার চোখ দেখলেই ভয় লাগে, গলায় একটা গভীর কাটা দাগ।
ইয়াল্লা! বিস্মিত মুসা। এই জন ফিলবির আসল চেহারা! খামোকাই ছদ্মবেশে অভিনয় করেছে। আসল চেহারা দেখালেই ভয় বেশি পেত লোকো এই চোখ আর গলার কাটা কলজে কাঁপিয়ে দেয়।
ভুল করছি। ও নয়, জন ফিলবি হল অন্য লোকটা। চেহারা সুন্দর, হাসিটাও আন্তরিক।
খাইছে আরও বিস্মিত হল মুসা। ওই লোকটা ফিলবি। ভূত-প্রেত। আর দানবের অভিনয় করতা এত সুন্দর মানুষটা।
হ্যাঁ। ব্যক্তিগত জীবনে নাকি খুবই লাজুক লোক ছিল ফিলবি। তাছাড়া তোতলাতো। বন্ধু-বান্ধব ছিল না বললেই চলে। কি করে জানি ফিসফিসের সঙ্গে

ভাব হয়ে গিয়েছিল, শেষে ম্যানেজার নিযুক্ত করে ফেলল। লোকে আগে ঠিকাত ফিলবিকে। ফিসফিস ম্যানেজার হওয়ার পর আর পারেনি।
স্বাভাবিক। মন্তব্য করল মুসা। সামনে না করে কার বাপের সাধ্য। করলেই তো ছুরি বের করবে।
ওকে খুঁজে পেলে কাজ হত। অনেক কিছু জানতে পারতাম ফিলবির ব্যাপারে।
কি করে ওর খোঁজ পাওয়া যাবে, কিছু ভেবেছ?
টেলিফোন গাইড।
গাইডের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল দুই গোয়েন্দা। শেষ অবধি নামটা খুঁজে পেল মুসা।
এই যো চেঁচিয়ে উঠল মুসা। হ্যারি প্রাইস। আটশো বারো উইন্ডিং ভ্যালি রোড। ফোন করবে ওকে?
না, লোক জানাজানি হয়ে যেতে পারে। ওর সঙ্গে দেখা করব। আমরা, টেলিফোনের দিকে হাত বাড়াল কিশোর। গাড়ি দরকার।
গাড়িটা পাওয়ায় খুব উপকার হয়েছে! কিশোরের দিকে চেয়ে বলল মুসা, আচ্ছা, তিরিশ দিন শেষ হয়ে গেলে কি করব, বল তো?
সে তখন দেখা যাবে। বুদ্ধি একটা ভেবে রেখেছি...হ্যালো। ...কিশোর পাশা। ... গাড়িটা চাই, এখুনি। রিসিভার নামিয়ে রাখল কিশোর। চল, উঠি।। চাচীকে বলতে হবে, রাতে দেরি করে খাব।
বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজি করাতে পারল বট কিশোর, কিন্তু সন্দেহ গেল না মেরিচাচীর। গাড়ি এসে গেছে। রাজকীয় রোলস রয়েসের দিকে চেয়ে চিন্তিত ভঙ্গিতে এদিক ওদিক মাথা নাড়লেন। তিনি। এর পর কি করবি কিশোর, তুইই জানিসা এই বয়েসেই রোলস রয়েস. তা-ও আবার আরব শেখের ফরমাশ দেয়া! নষ্ট হয়ে যাবি তো!
আবার যদি মত পাল্টে ফেলে মেরিচাচী, এই ভয়ে কিশোর তাড়াতাড়ি গিয়ে উঠে পড়ল গাড়িতে। মুসা উঠে বসতেই দ্রুত ইয়ার্ড থেকে বেরিয়ে যাবার নির্দেশ দিল হ্যানসনকে।
কোথায় যেতে হবে শোফারকে জানাল কিশোর।
ম্যাপ বের করে দেখে নিল হ্যানসন উইন্ডিং ভ্যালিটি কোথায়। রকি বীচ থেকে বেশ দূরে একটা পর্বতমালার ধারে উপত্যকাটা। নিঃশব্দে ছুটে চলল রোলস রয়েস।
পাহাড়ী পথ ধরে উঠে যাচ্ছে গাড়ি। সেদিকে চেয়ে বলল কিশোর, হ্যানসন, ব্ল্যাক ক্যারিয়নের দিকে যাচ্ছি কেন?

ওদিক দিয়েই যেতে হবে, মাস্টার পাশা। ক্যানিয়নের মাইলখানেক দূর দিয়ে বেরিয়ে যাব।
ভালই হল। আবার একবার ঢুকব ব্ল্যাক ক্যানিয়নে। কয়েকটা ব্যাপারে শিওর হওয়া দরকার।
মিনিট কয়েক পরেই গিরিপথের প্রবেশমুখে পৌঁছে গেল ওরা। ভেতরে ঢুকে পড়ল গাড়ি। পরিচিত পথ, অথচ কেমন অপরিচিত মনে হচ্ছে এখন দিনের আলোয় একেবারে অন্যরকম লাগছে। পথটাকে।
ভেঙে পড়া ক্রসবার আর পাথরের স্তূপের কাছে এনে গাড়ি রাখল হ্যানসন। পথের দিকে চেয়ে বলে উঠল, দেখুন দেখুন, আরেকটা গাড়ির টায়ারের দাগ, গতরাতেই ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছি। কেউ অনুসরণ করেছিল আমাদেরকে।
অনুসরণা কে? একে অন্যের দিকে চাইল মুসা আর কিশোর।
আরেক রহস্য মাথা চাড়া দিচ্ছে, বলল কিশোর। যাকগে। আগের কাজ আগে শেষ করি। টেরর ক্যাসলের বাইরেটা ঘুরে দেখব চল।
চল, বলল দ্বিতীয় গোয়েন্দা। বাইরে দিয়ে ঘুরতে আমার কোন আপত্তি নেই।
দিনের আলোয় অনেক সহজে অনেক কম সময়ে দুর্গের কাছে পৌঁছে গেল ওরা। বিশাল টাওয়ার, আকাশ ছুতে চাইছে যেন।
গতরাতে ওই ভূতের আডডায় ঢুকেছিলাম, ভাবলে এখনও গা ছমছম করে, বলল মুসা।
দুর্গের বাইরের দিকে পুরো একপাক ঘুরে এল কিশোর। তারপর আবার চলল। পেছনে। ওখান থেকে প্রায় খাড়া নিচে নেমে গেছে পাহাড়টা।
বাড়িটাতে মানুষ থাকে। কিনা বুঝতে চাইছি, বলল কিশোর। তাহলে তার কিছু না কিছু চিহ্ন থাকবেই। জুতোর ছাপ...সিগারেটের পোড়া টুকরো...
পাওয়া গেল না তেমন কিছু। পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ল দুজনেই। দুর্গের পাশে বিশ্রাম করতে বসল।
নাহ, মানুষ থাকে না। এখানে, বলল কিশোর। ভূত আছে, তা-ও বিশ্বাস করতে পারছি না...
হঠাৎ তীক্ষ্ণ এক চিৎকারে চমকে উঠল দুজনেই। মানুষ মানুষের গলা লাফিয়ে উঠে। ছুটল ওরা। কয়েক পা এগিয়েই দাঁড়িয়ে পড়ল। দুর্গের সদর দরজা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে দুটো মানুষ। আতঙ্কিত গলায় চোঁচাচ্ছে। হঠাৎ কিসে হোচট লেগে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল একজন। চকচকে কিছু একটা ছিটকে পড়ল। হাত থেকে। কিন্তু ওটা তুলল। না সে। হাঁচড়ে-পাঁচড়ে কোনমতে উঠেই সঙ্গীর পেছনে ছুট লাগাল আবার।

ভুত না! বিস্ময়ের ঘোর কাটতেই বলে উঠল মুসা। তবে ছোটার ধরন দেখে মনে হচ্ছে ভূতের সঙ্গে দেখা হয়েছে।
জলদি বলেই ছুটতে শুরু করল কিশোর। ব্যাটাদের চেহারা দেখা দরকার।
দ্রুত দৌড়াচ্ছে কিশোর। পেছনে মুসা।
প্রায় চোখের আড়ালে চলে গেছে। বাঁকটা ঘুরলেই অদৃশ্য হয়ে যাবে, ধরা যাবে না। ওদেরকে। বুঝে ছোটার গতি কমিয়ে দিল। কিশোর। দাঁড়িয়ে পড়ল এসে, যেখানে আছাড় খেয়েছিল। একজন। কাছেই পড়ে আছে চকচকে জিনিসটা। টর্চ। নিচু হয়ে তুলে নিল কিশোর। খুদে একটা নেমপ্লেট আটকানো টর্চের গায়ে। তাতে দুটো অক্ষর খোদাই করা।
টি ডি! জোরে জোরে পড়ল কিশোর। কে হতে পারে, বল তো, মুসা?
টেরিয়ার ডয়েল প্রায় ফেটে পড়ল। মুসা। শুটিকে টেরিা কিন্তু তা কি করে হয়? ব্যাটা এখানে আসবে কেন?
এসেছে লাইব্রেরিতে রবিনের কাজকর্ম দেখছিল, ভুলে গেছ? আমাদের কার্ড ওই ব্যাটাই চুরি করেছে। গতরাতে ফলো করেছিল। ওই। সব সময়েই তো পেছনে লেগে থাকে শুটিকো। কি করি না করি জানার চেষ্টা করে। এবারেও নিশ্চয় একই ব্যাপার। আমাদের কাজে গোল বাধানোর তালে আছে।
তা হতে পারে, চিন্তিত দেখাচ্ছে সহকারী গোয়েন্দাকে। রাতে আমরা ঢুকেছি, দেখেছে। তখন সাহস করেনি। দিনের বেলা দেখতে এসেছে, কেন গিয়েছিলাম দুর্গের ভেতরে। কেমন মজা! খেলি তো ভূতের তাড়া। হাসি একান-ওকান হয়ে গেল মুসার।
ব্যাপারটাকে এত হালকাভাবে নিতে পারল না কিশোর। টর্চটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখতে রাখতে বলল, এত হাসির কিছু নেই। ভূত আমাদেরকেও ছাড়েনি। তবে আমরা আবার ঢুকব ওদের আডডায়, কিন্তু শুটিকে আর এদিক মাড়াবে না। ভাবছি, এখুনি আবার ঢুকব দুর্গে। দিনের আলোয় ভাল করে দেখতে চাই সব।
প্রতিবাদ করতে গিয়েও থেমে গেল মুসা। ভারি কিছু ধসে। পড়ার শব্দ কানে আসছে। চমকে চোখ তুলে চাইল দুজনেই। ঠিক মাথার ওপরে পাহাড়ের চূড়ার কাছ থেকে গড়িয়ে নেমে আসছে বিশাল এক পাথর।
ছুট লাগাতে যাচ্ছিল মুসা, খপ করে তার হাত ধরে ফেলল। কিশোর। থাম! আমাদের ওপর পড়বে না! কয়েক গজ দূর দিয়ে চলে যাবে।
ঠিকই। ওদের কয়েক গজ দূর দিয়ে তুমুল গতিতে ছুটে গোল পাথরটা, দশ গজ নিচের রাস্তায় আছড়ে পড়ল। পথের সর্বনাশ করে। দিয়ে, চারদিকে কংক্রীটের গুড়ো ছড়িয়ে ফেলে গড়িয়ে নেমে চলে গেল। ঢালু পথ বেয়ে।

ইয়াল্লা! এখনও গা কাঁপছে মুসারী। গায়ে পড়লে টেরর ক্যাসলের ভূতের সংখ্যা আরও দুটো বাড়তা

দেখ দেখা মুসার হাত খামচে ধরে টান দিল কিশোর। ঢালের গায়ে ওই যে ঝোপটা, কে যেন নড়াচড়া করছে। ওর ভেতরো নিশ্চয় ব্যাটা শুটিকো। অন্য ধার দিয়ে ঘুরে আমাদের অলক্ষ্যে গিয়ে চড়েছে ওখানে। পাথর গড়িয়ে দিয়েছে আমাদের দিকে।

এবার আর ব্যাটাকে ছোড়ছি না। আমি, শার্টের হাতা গুটাতে লাগল মুসা। শিক্ষা দিয়ে ছাড়ব।

খাড়াই বেয়ে তাড়াহুড়ো করে উঠতে শুরু করল দুই গোয়েন্দা। আলগা পাথর আর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে জন্মে থাকা কাঁটা ঝোপ বাধা সৃষ্টি করছে। খানিকটা ওঠার পরেই দেখল। ওরা, দ্রুত সরে যাচ্ছে একটা মূর্তি, দেখতে দেখতে হারিয়ে গেল একপাশে।

আরও দ্রুত ওঠার চেষ্টা করল। দুজনে। পাহাড়ের গা থেকে কানিসের মত বেরিয়ে থাকা বিরাট এক চ্যাপ্টা পাথরের কাছে এসে থমকে গেল। ওটা ডিঙানো সম্ভব না। ওখানেই দাঁড়িয়ে জোরে জোরে হাঁপাতে লাগল। দুজনে।

কানিসের মত পাথরটার একপাশে পাহাড়ের গায়ে বড়সড় একটা চৌকোণা গুহামুখ। গুহার নিচ থেকে টেনে সামনে বেরিয়ে আছে বড় আরেকটা চ্যাপ্টা পাথর, অনেকটা ঝোলা বারান্দার মত। আরাম করে বসা যাবে ওখানে। ওটার দিকে এগিয়ে চলল দুই বন্ধু।

প্রায় পৌঁছে গেছে বারান্দার কাছে, এই সময় মাথার ওপরে চাপা গভীর একটা শব্দ হল। তারপরই পাথরে পাথরে ঠোকাঠুকির আওয়াজ। চমকে আবার চোখ তুলে চাইল দুজনেই। এবার আর একটা নয়, অসংখ্য পাথরের ধস নেমে আসছে। বরফের মত জমে গেল যেন মুসা। কি করবে। বুঝে উঠতে পারল না।

কিন্তু বুদ্ধি হারাল না কিশোর। এক মুহূর্ত দ্বিধা করল। পরীক্ষণেই সঙ্গীর হাত ধরে হ্যাঁচকা টান মারল। ঝোলা বারান্দার ওপর প্রায় হুমড়ি খেয়ে এসে পড়ল দুজনে। জোরে এক ধাক্কা দিয়ে মুসাকে গুহার ভেতরে ঠেলে দিল কিশোর। নিজেও গড়িয়ে চলে এল ভেতরে। দ্রুত গড়াতে গড়াতে গর্তের একেবারে শেষ সীমায় চলে এল দুজনে। ঠিক এই সময় প্রথম পাথরটা আঘাত হানল বারান্দায়। দেখতে দেখতে শুরু হয়ে গেল পাথরবৃষ্টি। ছোট, মাঝারি, বড়, সব রকমের, সব আকারের পাথর পড়ছে একনাগাড়ে।

বজ্রের গর্জন তুলে আছড়ে এসে বারান্দায় পড়ছে পাথর, কিছু গড়িয়ে নেমে যাচ্ছে, কিছু যাচ্ছে আটকে, কিছু গড়িয়ে চলে আসছে ভেতরে। একটার পর একটা জমছে পাথর, দেয়াল উঠে যাচ্ছে গর্তের সামনের খোলা অংশে।

গর্তের শেষ মাথায় দেয়ালের গায়ে সেঁটে বসে রইল দুই বন্ধু। আলো অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে তাদের চোখের সামনে থেকে, হারিয়ে যাচ্ছে আকাশ। কয়েক সেকেণ্ডেই পাহাড়ের ঢালে পাথরের কবরে আটকে গেল ওরা। জ্যান্ত কবর। আলো আর আকাশ পুরোপুরি অদৃশ্য হয়ে গেছে চোখের সামনে থেকে। ঘুটঘুটে অন্ধকার।
বাইরে ধীরে ধীরে কমে এল পাথর। ধসের গর্জন। স্তব্ধ হয়ে গেছে দুই বন্ধু। নিকষ। কালো অন্ধকার। গর্তের ভেতরে ছোট্ট পরিসর, বাতাসে। ভাসছে ধূলিকণা। দিম আটকে দিতে চাইছে।
কিশোরা কাশতে কাশতে বলল মুসা। ফাঁদে আটকে গেছি আমরা! আর বেরোতে পারব না! দম বন্ধ হয়ে মরব এবার!
নাকে রুমাল চাপা দাও, জলদি বলল কিশোর। শিগগিরই নেমে যাবে ধূলিকণা। অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে সঙ্গীর কাঁধ চেপে ধরল। সে। ভেব না, দম বন্ধ হয়ে মরব না। ভূমিকম্পের ফলে সৃষ্টি হয়েছে এই গুহা। আমি দেখেছি, এক পাশের দেয়ালে বড় একটা ফাটল আছে। কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে জানি না। তবে ওটা দিয়ে বাতাস চলাচল করে। শুটিকোকে ধন্যবাদ। ওর সৌজন্যেই একটা টর্চ আছে এখন আমার পকেটে।
ঠিকই, শুটকোকে ধন্যবাদ, ব্যঙ্গ করল মুসা। ওর সৌজন্যেই এই কবরে আটকেছি। আমরা ইসস, বগাটাকে যদি হাতের কাছে পেতাম। এখন। সরু ঘাড়টাই মটকে দিতাম!
কিন্তু ও-ই করেছে। কাজটা, কোন প্রমাণ নেই। পাথরের ধস কেন নেমেছে কিছুই জানি না। আমরা এখনও, বলতে বলতেই টর্চের বোতাম টিপে দিল কিশোর। গাঢ় অন্ধকার চিরে দিল তীব্র আলোর রশ্মি।
আলো ফেলে দেখল কিশোর। ফুট ছয়েক উঁচু গুহাটা, পাশ চার ফুট মত। এক পাশের দেয়ালে ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত নয় দশ ইঞ্চি চওড়া একটা ফাটল। বিরবির করে বাতাস আসছে ওপথে। কিন্তু ওদিক দিয়ে বেরোনো যাবে না।
বিরাট এক পাথর আটকে গেছে। গর্তের মুখে। ওটার আশপাশে ওপরে ছোট বড় আরও পাথর ঠেসে আটকেছে, তার ওপর জমেছে বালি আর মাটি।
হুমম। খুব সুন্দর ভাবেই পাথরের দেয়াল উঠেছে, যেন ভাল একটা কাজের কাজ হয়েছে এমনি ভঙ্গিতে বলল কিশোর।
এখনও বড় বড় কথা গেল না তোমারা মুসার গলায় ক্ষোভ। বলে ফেললেই হয় ভালমত আটকে গেছি। আমরা। আর বেরোতে পারব না।
সেটা বলতে যাব কেন? এখনও জানি না বের হতে পারব। কিনা। এস ঠেলা লাগাই। যদি নাড়াতে পারি…

গায়ের জোরে ঠেলা লাগাল দুজনে। এক চুল নড়ল না। পাথর। হাঁপাতে হাঁপাতে বসে পড়ল। ওরা বিশ্রাম নিতে।
হ্যানসন নিশ্চয় আসবে। কেঁদেই ফেলবে যেন মুসা। কিন্তু কিছুতেই খুঁজে পাবে না। আমাদের। শেষে পুলিশে খবর দেবে। পুলিশ আসবে, বয় স্কাউটরা আসবে, খোঁজাখুঁজি হবে প্রচুর। আমরা চোঁচালেও সে আওয়াজ বাইরে যাবে না। তারমানে আর কোন দিনই... চুপ করে গেল সে।
কিশোর শুনছে না কথা। মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে আছে। হাতের টর্চের আলোয় আলোকিত হয়ে আছে গুহার পেছন দিকটা। তীক্ষ্ণ চোখে সেদিকেই চেয়ে আছে সে।
ছাই দেখা যাচ্ছে, বলল কিশোর। কোন কারণে এখানে আশ্রয় নিয়েছিল। কেউ। বলতে বলতেই উঠে গিয়ে ছাইয়ের কাছে বসল সে। এক হাতে টর্চ নিয়ে অন্য হাতে খুঁড়তে শুরু করল। ছাই আর ধূলোর গাদা। আধা ইঞ্চিমত বেরিয়েছিল, খুঁড়ে খুঁড়ে প্রায় ইঞ্চি চারেক বের করে ফেলল ওটার মাথা। একটা শক্ত ডাল। টোনাহেঁচড়া করে। ডালটা বের করে নিয়ে এল সে। ফুট চারেক লম্বা, ইঞ্চি দুয়েক পুরু। এক মাথা পোড়া।
কপাল ভাল আমাদের, বলে উঠল কিশোর। ডালটা পেয়ে গেছি। নিশ্চয় এর মাথায় খাবার গেথে পুড়িয়ে খেয়েছিল লোকটা।
ডালটার দিকে হাবার মত চেয়ে রইল মুসা। পুরানো, আধপোড়া ওই লাঠি তাদের কি কাজে লাগবে বুঝতে পারছে না।
এটা দিয়ে চাড় লাগিয়ে পাথর সরানোর কথা ভাবছ নাকি? জানতে চাইল মুসা। খামোকাই খাটবে তাহলে।
না, চাড় দেব না।
কোন কথা মনে এলে আগেভাগেই সেটা জানিয়ে দেয়ার পক্ষপাতী নয় কিশোর। আগে দেখে নেয়, তার পরিকল্পনায় খুঁত বেরোয় কিনা, তারপর দরকার হলে প্রকাশ করে। এটা জানে মুসা, তাই, ডালটা দিয়ে কি করবে না করবে। সে ব্যাপারে। আর কোন প্রশ্ন করল না সঙ্গীকে।
কোমরের বেল্টে ঝোলানো আটফলার ছোট সুইস ছুরিটা খুলে নিল কিশোর। একটা কাটিয়ং ব্লেড বের করে কাজে লেগে গেল।
ডালের পোড়া মাথাটা চেছে চোখা করে ফেলল। কিশোর। ছুরিটা আবার আগের জায়গায় রেখে দিয়ে ডাল হাতে করে গিয়ে দাঁড়াল পাথরের দেয়ালের সামনে। আলো ফেলে ভালমত পরীক্ষা করে। দেখল দেয়ালটা। বোঝার চেষ্টা করল কোন দিকে পাথরে সংখ্যা কম। তারপর লাঠির চোখা মাথা দিয়ে খোঁচা লাগাল দেয়ালের একপাশে। কয়েক ইঞ্চি ঢুকেই ঠেকে গেল। লাঠির মাথা। জোরাজুরি

করেও আর ঢোকানো গেল না। নিশ্চয় পাথরে আটকে গেছে। টেনে বের করে। এনে আবার খানিকটা ওপরে ঢোকাল সে। আবার কয়েক ইঞ্চি ঢুকে ঠেকে গেল মাথা। আবার বের করে এনে আরেক জায়গায় ঢোকাল। এবার আর ঠেকাল না। ওপাশে বেরিয়ে গেল চোখা মাথাটা। হ্যাঁচকা টানে বের করে আনতেই হড়বড় করে ঝরে পড়ল কিছু বালি মাটি।

আপন মনেই মাথা ঝোঁকাল কিশোর। ছিদ্রটাতে আবার লাঠি ঢোকাল। আস্তে আস্তে চাড় দিতে লাগিল চারদিকে। বালি-মাটি ঝরে। পড়তে লাগল। হাত ঢোকানো যায় এমন একটা গর্ত হয়ে গেল। দেয়ালের গায়ে শিগগিরই। আলো চুইয়ে ঢুকছে গুহার ভেতর।

আবার কাজে লেগে গেল কিশোর। কয়েক মিনিটেই গর্তটার পাশে ওরকম আরেকটা গর্ত করে ফেলল। দুটো গর্তের মাঝামাঝি আবার লাঠি ঢুকিয়ে দিল। খোঁচাতে খোঁচাতে বালি-মাটি ফেলে এক করে ফেলল দুটো গর্ত। বেশ বড় একটা ফোকর হয়ে গেছে এখন। ফোকরের কাছে চোখ নিয়ে গিয়ে বাইরে তাকাল সে। চোখের সামনে ফুটে উঠল। গোল একটা বড় পাথর।

এবার, সন্তুষ্ট গলায় বলল কিশোর, এস, হাত লাগাও। ফোকর দিয়ে লাঠি ঢুকিয়ে দিল আবার। পাথরে ঠেকাল লাঠির মাথা। দুজনে মিলে এপাশ থেকে ঠেলা লাগাল জোরে।

প্রথমে নড়তে চাইল না পাথর শেষ অবধি পরাজিত হতেই হল। চাপা ভোঁতা একটা আওয়াজ তুলে বালি মাটি আর সঙ্গী পাথরের আলিঙ্গন থেকে ছাড়িয়ে নিল নিজেকে, গড়িয়ে পড়তে লাগল। পড়ার সময় কিছু আলগা সঙ্গীকে নিয়ে গেল সাথে করে। ফোকরের বাইরের মুখটা বড় হল আরেকটু।

ফোকরের ওপর দিকে একটা পাথর বেছে নিল কিশোর। কতখানি বড় পাথর, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। লাঠির মাথা পাথরের নিচের দিকে ঠেকিয়ে ঠেলে যেতে লাগল। দুজনে। এক চুল নড়ল না। পাথর। পরিশ্রমে দরদরি করে ঘামছে দুজনে। পিচ্ছিল হয়ে আসছে লাঠি ধরা হাত। কিন্তু বিরত হল না। বেশিক্ষণ আর অনড় থাকতে পারল না পাথর। হড়াৎ করে একটা শব্দ তুলে খুলে এল বালিমাটির আকর্ষণ থেকে। বিশাল পাথর। ধুপ করে আছড়ে পড়ল নিচের সঙ্গী সাথীদের ওপর। অনেকগুলো পাথরকে নড়িয়ে ফেলল। ধাক্কা দিয়ে, সঙ্গে নিয়ে গড়াতে গড়াতে চলে গেল ঢাল বেয়ে।

বেশ প্রশস্ত হয়ে গেছে এখন ফোকরের বাইরের দিকটা। এপাশটাও প্রশস্ত করতে লেগে গেল ওরা। খুব বেশিক্ষণ লাগল না। ক্রল করে বেরিয়ে যাবার উপযোগী একটা সুড়ঙ্গ তৈরি করে ফেলল ওরা।

কিশোর, তুমি একটা জিনিয়াস। প্রশংসা না করে পারল না মুসা।

বেশি বাড়িয়ে বলছি, প্রতিবাদ করল কিশোর। যা করেছি, এর জন্যে প্রতিভার দরকার পড়ে না। বাঁচার তাগিদেই মাথায় এসে গিয়েছিল বুদ্ধিটা।
কিন্তু আমার মাথায় তো আসেনি…
হয়েছে হয়েছে, বেরোও এখন। বেশি নড়াচড়া কোরো না। ওপর থেকে পাথর পড়ে থেতলে। যেতে পারে মাথা।
খুব সাবধানে পাঁকাল মাছের মত দেহটাকে মুচড়ে মুচড়ে গর্তের বাইরে বের করে নিয়ে এল মুসা। সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে মাথা ঢোকাতে বলল বন্ধুকে।
বেশি কষ্ট করতে হল না কিশোরকে। হাত ধরে টেনে ওকে। গুহার বাইরে বের করে নিয়ে এল মুসা।
ঢাল বেয়ে নিরাপদ জায়গায় সরে এল দুজনে। নিজেদের দিকে তাকাবার সময় পেল এতক্ষণে।
সেরেছে? চেঁচিয়ে উঠল মুসা। কেউ দেখলে আমাদেরকেই ভূত ঠাউরাবে এখন।
ও কিছু না, বলল কিশোর। কোন সার্ভিস স্টেশনে থেমে হাত-মুখ ধুয়ে নিলেই হবে। ভাল করে ঝাড়লে কাপড়েও বালি থাকবে না। আর তেমন। এ অবস্থায় দেখা করতে হচ্ছে না মিস্টার ফিসফিসের সঙ্গে!
এত কিছুর পরেও দেখা করতে যাচ্ছি। আমরা অবাক হয়ে বন্ধুর দিকে চাইল মুসা।
কেন নয়? ওটাই তো আসল কাজ, সেজন্যেই তো বেরিয়েছি। চল চল, দেরি হয়ে যাচ্ছে, তাড়া দিল কিশোর।
সারা পথে পাথরের ছড়াছড়ি। হাঁটতেই কষ্ট হচ্ছে। এমনিতে যা লাগার কথা তার দ্বিগুণ সময় লেগে গেল। পথটা পেরোতে।
কাছে এসে ভয়ে ভয়ে দুর্গের সদর দরজার দিকে তাকাল মুসা।
না, আজ আর ঢুকছি না, বন্ধুকে অভয় দিল কিশোর। এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে। মিস্টার ফিসফিসের সঙ্গে দেখা করাটা বেশি জরুরি।
বাঁক পেরিয়ে এল দুজনে। গাড়িটা দেখা যাচ্ছে। অস্থিরভাবে পায়চারি করছে। হ্যানসন। উদ্বিগ্ন।
কিশোর আর মুসাকে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল শোফার। ফিরেছেন তাহলে খুব ভাবনায় পড়ে গিয়েছিলাম। দুজনের সারা গায়ে একবার চোখ বোলাল সে। কোন দুর্ঘটনা?
তেমন কিছু না, জবাব দিল কিশোর। আচ্ছা, মিনিট চল্লিশেক আগে দুটো ছেলেকে এদিক দিয়ে যেতে দেখেছেন?
চল্লিশ মিনিট নয়, তারও বেশি আগে, গাড়িতে উঠে বসতে বসতে বলল হ্যানসন। ক্যাসলের দিক থেকে ছুটে এল দুটো ছেলে। আমাকে দেখেই পাশ কেটে একটা

ঝোপের ওপাশে চলে গেল। খানিক পরেই ইঞ্জিনের শব্দ শুনলাম। ঝোপের ওপাশ থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল একটা নীল স্পোর্টস কার।
একে অন্যের দিকে চাইল মুসা আর কিশোর। মাথা ঝোঁকাল দুজনেই। টেরিয়ারের গাড়িটাও নীল রঙের স্পোর্টস কার।
তারপর, আগের কথার খেই ধরল হ্যানসন, পাথর গড়িয়ে পড়ার আওয়াজ শুনলাম। অপেক্ষায় রইলাম। আপনাদের। দেরি হচ্ছে দেখে ভাবনায়ই পড়ে গিয়েছিলাম। আমার ওপর হুকুম আছে, কিছুতেই যেন গাড়িটাকে চোখের আড়াল না করি। কিন্তু আপনাদের ফিরতে আরেকটু দেরি হলেই হুকুম অমান্য করতাম, না গিয়ে পারতাম না।
ছেলে দুটো চলে যাবার পর পাথর গড়ানোর আওয়াজ শুনেছেন? ঠিক? নিশ্চিত হতে চাইছে কিশোর।
নিশ্চয়, জবাব দিল হ্যানসন। এখন কোথায় যাব, স্যার?
আটশো বারো উইন্ডিং ভ্যালিরোড, যেখানে রওনা হয়েছিলাম, কেমন আনমনা মনে হল কিশোরকে।
বন্ধুর মনে এখন কিসের ভাবনা চলছে, জানে মুসা। নিশ্চয় ভাবছে, পাথর ধসের আগেই যদি চলে গিয়ে থাকে টেরিয়ার, তাহলে পাথর ঠেলে ফেলল কে? পাশে বসা সঙ্গীর দিকে চাইল সে। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর, গভীর চিন্তায় মগ্ন।
শুটিকে নয়, তাহলে কে করল কাজটা? আপনমনেই বিড়বিড় করল। কিশোর। একটা মানুষকে দেখেছি পাহাড়ের ওপরে, সে-তো মিথ্যে নয়!
না, মিথ্যে নয়, বন্ধুর সঙ্গে একমত হল মুসা। এবং ও মানুষই। ভূত-প্রেত কিছু নয়।
ব্যাপারটা একটু অদ্ভুতই। বাস্তবে ফিরে এল যেন কিশোর। জানোলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বলল, হ্যানসন, একটা সার্ভিস স্টেশনে একটু রাখবেন। হাত-মুখ ধুতে হবে।
ঝেড়েঝুড়ে জামাকাপড় যতটা সম্ভব পরিষ্কার করে নিল দুই গোয়েন্দা। হাতমুখ ধুয়ে চুল আঁচড়ে নিল। তারপর আবার এসে উঠল গাড়িতে।
পাহাড়ী পথ ধরে আবার ছুটে চলল রোলস রয়েস। পাহাড়ের ওপাশে নিচের উপত্যকায় নেমে গেছে। পথটা। ডানে মোড় নিয়ে আরও মাইল খানেক এগিয়ে গিয়ে মিশেছে। উইন্ডিং ভ্যালি রোডে।
শুরুতে পথটা বেশ চওড়া, দুধারে সুন্দর সুন্দর বাড়িঘর। ধীরে ধীরে সরু হয়ে গেছে, হঠাৎ করেই ঢুকে পড়েছে একটা গিরিপথে। দুধারে কোথাও কোথাও খাড়া পাহাড়ের দেয়াল, দুদিক থেকে চেপে ধরতে চাইছে যেন। অনেক বেশি ঘুরেফিরে এগিয়ে গেছে পথ। হঠাৎ করেই কোন এক পাশের দেয়াল যেন লাফ দিয়ে সরে

যাচ্ছে, বেরিয়ে পড়ছে খানিকটা খোলা জায়গা। ছোটখাট একঅধটা বাংলোমত বাড়ি উঠেছে। ওখানে। তারপরই যেন আবার লাফিয়ে পথের গা ঘেঁষে এসে দাঁড়াচ্ছে পাহাড়। এত বেশি ঘোরপ্যাঁচ বলেই পথটার নাম হয়েছে। উইন্ডিং ভ্যালি রোড।

একটা জায়গায় এসে আবার ওপরের দিকে উঠে চলল। পথ, আরও সরু হয়ে আসতে লাগল। কয়েলের মত ঘুরে ঘুরে উঠে যাওয়া পথ হঠাৎ করে এসে শেষ হয়ে গেছে এক জায়গায়। তারপরেই গোল একটু সমতল জায়গা পাহাড়ের মাথায়, গাড়ি ঘোরানোর জন্যে। তার উল্টোদিকে খাড়া নেমে গেছে দেয়াল, তলায় গভীর খাদ। নিচে কঠিন পাথর। ঘোরানোর সময় ড্রাইভার একটু অসতর্ক হলেই তলায় গিয়ে আছড়ে পড়বে গাড়ি।

গোলমত জায়গাটায় এনে গাড়ি থামিয়ে দিল হ্যানসন। জায়গা দেখে অবাকই হয়েছে যেন সে, চেহারাই জানান দিচ্ছে।

পথের শেষ মাথায় চলে এসেছি এদিক ওদিক চেয়ে বলল হ্যানসন। কই, কোন বাড়িঘর তো চোখে পড়ছে না।

ওই যে, একটা মেলবর্ব্বক্স হঠাৎ বলে উঠল মুসা। বাক্সের গায়ের লেখাটা পড়ল, প্রাইস আটশো বারো তার মানে কাছে পিঠেই কোথাও আছে বাড়িটা।

গাড়ি থেকে নেমে এল দুই গোয়েন্দা। ক্ষতবিক্ষত একটা ঝোপের পাশে কাত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মেলবর্ব্বক্স। ওটার ধার দিয়ে চলে গেছে একটা এবড়োখেবড়ো পাথুরে পথ। জায়গায় জায়গায় ঝোপঝাড়। ওগুলোর মাঝখান দিয়ে সোজা ওপরের দিকে উঠে গেছে পথটা। উঠে চলল দুজনে। শিগগিরই তাদের অনেক নিচে পড়ে গেল গাড়িটা।

বেশ কয়েকটা ঝোপঝাড় পেরিয়ে এল ওরা। ছোট একটা জংলা মত জায়গা পেরোতেই চোখে পড়ল বাড়িটা। পাহাড়ের ঢালে জোর করে বসিয়ে দেয়া হয়েছে যেন লাল টালির ছাত দেয়া পুরানো টাইপের একটা স্প্যানিশ বাংলো। বাংলোর একপাশে পাহাড়ের গা ঘেঁষে দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়েছে এক বিশাল খাঁচা, ছোটখাট ঘরের সমান। ভেতরে পুরে রাখা হয়েছে অসংখ্য কাকাতুয়া। একনাগাড়ে পরিসরে।

খাঁচার কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল দুজনে। চেয়ে আছে উজ্জ্বল রঙের পাখিগুলোর দিকে। এই সময় পেছনে শোনা গেল পায়ের আওয়াজ।

প্রায় একই সঙ্গে ঘুরে দাঁড়াল দুজনে। যে পথে এসেছে ওরা, সেপথেই আসতে দেখল লোকটাকে। লম্বা, পুরো মাথা জুড়ে টাক, বিরাট সানগ্রাসের আড়ালে ঢাকা পড়েছে চোখ। এক কানের নিচ থেকে শুরু হয়েছে গভীর কাটা একটা দাগ, গলা বেয়ে নেমে গেছে নিচের দিকে, বুকের হাড়ের কাছে গিয়ে ঠেকেছে।

কথা বলে উঠল। লোকটা। গা ছমছম করা কেমন এক ধরনের ফিসফিসে আওয়াজ। খবরদার, যেখানে আছ দাঁড়িয়ে থাকা একচুল নড়বে না কেউ।
স্থির হয়ে গেল দুজনেই।
ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে লাগল লোকটা। বাঁ হাতে বাগিয়ে ধরে আছে একটা মাচেটে। রোদ লেগে ঝিলিক দিয়ে উঠছে বিশাল ছুরির তীক্ষ্ণধার ফলা।
এক পা দুপা করে এগিয়ে আসছে লোকটা।
একটু নড়বে না ফিসফিসিয়ে উঠল আবার সে। প্রাণের ভয় থাকলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা।
মুসার কাছে এই হুশিয়ারি অহেতুক। নড়ছে না। সে এমনিতেই। হঠাৎ বিদ্যুতের চমক দেখা দিল তার আর কিশোরের মাঝামাঝি। দুজনের উরুর কাছ দিয়ে উড়ে চলে গেল মাচেটে। ঘাঁচ করে গিয়ে বিধল মাটিতে।
হতাশ গলায় বলে উঠল। লোকটা, উহহঁ, গেল মিস হয়ে। সানগ্লাস খুলে আনল চোখের ওপর থেকে। নীল আন্তরিক চোখে চেয়ে আছে ছেলেদের দিকে। খানিক আগের মত ভয়াবহ। আর লাগছে না এখন তাকে।
তোমাদের পেছনে ঘাসের ভেতরে ছিল সাপটা, সাফাই গাইল লোকটা। র্যাটলার কিনা বুঝতে পারলাম না। বেশি তাড়াহুড়ো করে। ফেলেছি, সেজন্যেই ফসকে গেল নিশানা।
সাদায়-লালে মেশানো একটা রুমাল বের করে ভুরুর কাছের ঘাম মুছল লোকটা। পাহাড়ের ওপাশে ঝোপঝাড় পরিষ্কার করছিলাম। বাজে জিনিস। দাবানল ছড়ানোর ওস্তাদ। ইসস, ঘেমে নেয়ে গেছি। একেবারে। এক গ্রাস করে লেমোনেড খেলে কেমন হয়, অ্যাঁ?
লোকটার ফিসফিসানিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। ইতিমধ্যে দুই গোয়েন্দা। মুসা আন্দাজ করল, গলার বিচ্ছিরি কাটাটাই ওই স্বর বিকৃতির জন্যে দায়ী।
বাংলোর দিকে হাঁটতে শুরু করল হ্যারি প্রাইস। পিছু পিছু চলল দুই গোয়েন্দা। একটা ঘরে এসে ঢুকল। একপাশে লম্বালম্বি পর্দা ঝোলানো। এপাশে একটা টেবিল ঘিরে কয়েকটা ইজি চেয়ার। টেবিলে বড়সড় একটা জগে বরফ দেয়া লেমোনেড। পর্দার ওপার থেকে ভেসে আসছে কাকাতুয়ার কর্কশ কিচির-মিচির।
পাখি পুষে, পাখি বিক্রি করেই পেট চালাই আমি, জগ থেকে তিনটে গ্লাসে লেমোনেড ঢালতে ঢালতে বলল প্রাইস। দুটো গ্লাস তুলে দিল দুই কিশোরের হাতে। তোমরা খাও। আমি আসছি, এক মিনিট। সানগ্লাসটা টেবিলে নামিয়ে রেখে পাশের ঘরে চলে গেল সে।
ধীরে ধীরে লেমোনেডে চুমুক দিতে লাগল কিশোর। চিন্তিত। মিস্টার প্রাইসকে দেখে কি মনে হয়?

ভালই তো, জবাব দিল মুসা। ফিসফিসানিটাই শুধু খারাপ লাগে। এমনিতে লোকটা মন্দ না।
হ্যাঁ, বেশ মিশুক। কিন্তু মিথ্যে কথা বলল কেন? হাত তো দেখলাম পরিষ্কার। ঝোপঝাড় কাটলে কিছু না কিছু লেগে থাকতই।
কিন্তু মিথ্যে কথা বলবে কেন? এর আগে কখনও দেখেনি। আমাদের। কোন কারণ নেই।
মাথা নাড়ল কিশোর। বুঝতে পারছি না। আরও একটা ব্যাপার। ঝোপ কাটতেই যাক আর যেখানেই যাক, বেশিক্ষণ যায়নি। লেমোনেডে বরফের টুকরো রেখে গিয়েছিল। খুব একটা গলেনি।
তই তো।
কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল কিশোর, প্রাইসকে ঢুকতে দেখে থেমে গেল।
কাপড় বদলে এসেছে প্রাইস। গায়ে স্পোর্টস শার্ট। গলায় জড়িয়ে নিয়েছে একটা স্কার্ফ।
কাটা দাগটা দেখলে অনেকেরই অস্বস্তি লাগে, ফিসফিস করে। বলল লোকটা। কারও সঙ্গে কথা বলার সময় তাই স্কাফ জড়িয়ে নিই। অনেক বছর আগে মালয়ের এক দ্বীপে দুর্ঘটনায় পড়েছিলাম। তখন কেটেছে। সে যাকগে। তা তোমরা এখানে কি মনে করে?
একটা কার্ড বের করে প্রাইসের দিকে বাড়িয়ে ধরল কিশোর।
হাতে নিয়ে দেখল প্রাইস। তিন গোয়েন্দা! বেশ বেশ! তা এখানে কি তদন্ত করতে এসেছ?
কিশোর জানাল, জন ফিলবির ব্যাপারে কিছু আলোচনা করতে চায়।
সানগ্লাসটা তুলে নিয়ে পরল। প্রাইস। দিনের আলো সইতে পারি না। রাতে ভাল দেখি। ...তো ফিলবির ব্যাপারে হঠাৎ এত আগ্রহ কেন তোমাদের?
একটা আজব কথা কানে এসেছে, বলল কিশোর। জন ফিলবি নাকি মরার পরে ভূত হয়ে গেছে। ঠাঁই নিয়েছে ক্যাসলেই। লোককে থাকতে দেয় না। জোর করে কেউ থাকতে চাইলে ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দেয়।
কালো কাচের ওপাশে চোখ দুটো আবছা। দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। দেখছে কিশোরকে।
আমিও শুনেছি, ফিসফিসিয়ে বলল লোকটা। ছবিতে ভূতপ্রেত দৈত্য-দানবের অভিনয় করেছে জন। ভয় পাইয়েছে দর্শককে। কিন্তু আসলে সে ছিল খুবই ভদ্র, লাজুক। খালি ফাঁকি দিত তাকে লোকে। ঠকাতো। বাধ্য হয়ে শেষে আমাকে ম্যানেজার রেখেছিল। এই যে, এই ছবিটা দেখ।
পেছনে টেবিলে রাখা ফ্রেমে বাঁধানো ছবিটা দেখাল। প্রাইস। তুলে বাড়িয়ে ধরল। কিশোরের দিকে।

হাতে নিল কিশোর। মুসাও দেখল, দুজন মানুষ দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে। হাত মেলাচ্ছে। একজন প্রাইস। আরেকজন তার চেয়ে বেঁটে, বিয়েসও কম। এই ছবিটাই পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল, ফটোকপি করেছে। রবিন।
ছবির তলায় লেখাঃ প্রিয় বন্ধু হ্যারিকে।—জন।
ছবি দেখেই আন্দাজ করতে পারছ, কেমন লোক ছিক জন, বলল প্রাইস। লোকের সঙ্গে তর্ক করতে পারত না সে, রাগারগি করতে পারত না, কানের নিচে কাটা জায়গায় একবার আঙুল ছোঁয়াল সে। আমাকে কেন জানি ভয় পায় লোকে। বেশি গোলমাল করে না। জনের অনুরোধে নিলাম তার ম্যানেজারি। অভিনয়ে আরও বেশি মন দিতে পারল সে। কাজটা শুধু তার পেশাই না, নেশাও ছিল। হলে বসে। তার অভিনয় দেখে শিউরে উঠত দর্শক। সবাক চলচ্চিত্রের কদর বাড়ল। দেখা দিল বিপত্তি। ভীষণ চেহারার ভূতের তোতলামিতে লোকে হেসেই খুন। ভেঙে পড়ল জন। তখনকার তার মনের অবস্থা নিশ্চয় বুঝতে পারছ?
হ্যাঁ, স্যার, বলল কিশোর। বুঝতে পারছি। আমাকে নিয়ে কেউ হাসোহাসি করলে, আমারও খুব খারাপ লাগে।
হাপ্তার পর হস্তা পেরিয়ে গেল, ফিসফিসিয়ে বলে চলল লোকটা। ঘর থেকে বেরোয় না জন। একে একে বিদায় করে দিল। চাকর-বাকিরদের। কি আর করব? ওর বাজার-সদাই আমিই করে। দিতে লাগলাম। চারদিক থেকে খবর আসছে তখন। ছবিটার ব্যাপারে। যেখানেই দেখানো হচ্ছে, হাসাহাসি করছে লোকে। অনেক বোঝালাম তাকে। লোকের কথায় কান দিতে মানা করলাম। কিন্তু কোন কাজ হল না, থামল প্রাইস।
অপেক্ষা করে রইল দুই গোয়েন্দা।
তারপর একদিন, আমাকে ডেকে, ছবিটার যে কয়টা প্রিন্ট আছে সব জোগাড় করে নিয়ে আসতে বলল জন। কেউ যেন আর দেখতে না পারে ছবিটা, কেউ যেন আর হাসাহাসি না করতে পারে। বেরোলাম। প্রচুর খরচ-খরচা করে কিনে নিয়ে এলাম সবকটা প্রিন্ট। মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা মারতেই যেন এই সময় এল ব্যাংকের সমন। অনেক টাকা ধার হয়ে গেছে। শোধ না দিতে পারলে ক্যাসলটা দখল করে নেবে ব্যাংক। টাকা-পয়সা জামাত না জন। এক হাতে আয় করত। আরেক হাতে খরচ করত। ভেবেছিল, বয়েস কম, খ্যাতি হয়েছে। অনেক সময় আছে টাকা জমানোর, বলে যাচ্ছে প্রাইস। একদিন, ক্যাসলের মেইন রুমে বসে আছি। দুজনে। আলোচনা হচ্ছে বাড়িটা রাখতে পারবে কিনা সে ব্যাপারে। ও বলল, মরে গিয়ে হলেও বাড়িটা দখলে রাখবে সে। তার দেহ পচেগলে শেষ হয়ে যায় যাবে, কিন্তু প্রেতাত্মা বেরোবে না। ক্যাসল ছেড়ে।

চুপ করল প্রাইস। কালো কাচের ওপাশে আবছা চোখের দৃষ্টিতে নির্লিপ্ততা।
কেঁপে উঠল একবার মুসা, ইয়াল্লা! মরে তাহলে সত্যি সত্যিই ভূত হওয়ার ইচ্ছে ছিল ফিলবির!
তাই তো মনে হচ্ছে, বলল কিশোর। আচ্ছা, মিস্টার প্রাইস, ফিলবি তো খুব ভদ্র ছিল। এমন একজন লোকের প্রেতাত্মাও নিশ্চয় ভদ্রই হবে। লোককে সে ভয় দেখাচ্ছে, তাড়িয়ে দিচ্ছে ক্যাসল থেকে, বিশ্বাস হতে চায় না।
ঠিকই, একমত হল প্রাইস। আমার মনে হয় জন না, লোককে তাড়াচ্ছে অন্য প্রেতাত্মা। ওগুলো অনেক বেশি পাজী।
অন্য...! ঢোক গিলিল মুসা। বেশি পাজী!
হাঁ। বুঝিয়ে বলছি। তোমরা জান, পাহাড়ের তলায় সাগরের ধারে পাওয়া গেছে জন ফিলবির গাড়ি?
মাথা ঝোঁকাল দুই কিশোর।
তাহলে এ-ও জান, একটা নোট রেখে গেছে জন। লিখে গেছে, চিরকালের জন্য অভিশপ্ত করে রেখেছে টেরর ক্যাসলকে?
আবার মাথা ঝোঁকাল দুই গোয়েন্দা। দুজনেই চেয়ে আছে প্রাইসের মুখের দিকে।
পুলিশের ধারণা, বলল প্রাইস। ইচ্ছে করেই পাহাড়ের ওপর থেকে গাড়ি নিয়ে পড়েছে জন। আমিও তাদের সঙ্গে একমত। সেই যে সেদিন কথা হয়েছিল ক্যাসলে, তারপর আর কোনদিন ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। আমাকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছে জন, কোন দিন যেন আর টেরর ক্যাসলে না। ঢুকি। হ্যাঁ, কোন কথা থেকে যেন...
অন্য প্রেতাত্মার কথা বলছিলেন, মনে করিয়ে দিল কিশোর। খুব খারাপ।
হ্যাঁ, খারাপ প্রেতাত্মা, বলল প্রাইস। সারা দুনিয়ার বিখ্যাত সব ভূতুড়ে বাড়ি থেকে মালমশলা জোগাড় করে এনে দুর্গ সাজিয়েছে জন। জাপানের এক ভূতুড়ে মন্দির থেকে এনেছে কাঠ। ভূমিকম্পে ধসে পড়েছিল ওই মন্দির। ভেতরে যে কয়জন লোক ছিল, সব মারা গিয়েছিল ইট কাঠ চাপা পড়ে। ইংল্যান্ডের এক ধ্বংস হয়ে যাওয়া প্রাসাদ থেকে এসেছে কিছু লোহার বরগা। ওই বরগীর একটাতে দড়ি বেঁধে ফাঁসি দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল এক সুন্দরী মেয়ে। ধসে পড়ার আগে নাকি প্রায় রাতেই মেয়েটার প্রেতাত্মা ঘুরে বেড়াতে দেখা যেত প্রাসাদের ছাতে। রাইন নদীর ধারের এক পোড়ো দুর্গের পাথর কিনে এনে লাগানো হয়েছে টেরর ক্যাসলে। ওই দুর্গের ভাঁড়ারে নাকি আটকে রাখা হয়েছিল এক পাগলা বাদককে। আটকে থেকে না খেয়ে মরে গেছে লোকটা। তারপর থেকেই গভীর রাতে দুর্গের ভেতর থেকে ভেসে আসত মিষ্টি হালকা বাজনা।

খাইছে!। চোখ বড় বড় হয়ে গেছে মুসার। দেশ-বিদেশের কুখ্যাত সব ভুতকে এনে টেরর ক্যাসলে তুলেছে জন। ওরা তো লোককে ভয় দেখিয়ে তাড়াবেই। গলা টিপে আজও মারেনি কাউকে, এটাই আশ্চর্য!
কেউ গিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করলে হয়ত মারবে, ফিসফিসিয়ে বলল প্রাইস। তবে আমি যা জানি, কেউ যায় না টেরর ক্যাসলের ধারে কাছে। চোর-ডাকাত ভবঘুরেরা পর্যন্ত এড়িয়ে চলে। মাসে একবার করে। ওদিক থেকে ঘুরে আসি আমি। পুরানো বন্ধুকে মনে রাখি। কোন বারই কাউকে ক্যাসলের কাছেপিঠে দেখিনি।
ওরা ক্যাসলে গিয়েছিল, বলল না কিশোর। আচ্ছা, অনেক কাহিনীই তো শোনা যায় ক্যাসলের ভূত সম্পর্কে। গভীর রাতে নাকি পাইপ অর্গান বাজে, নীল ভূত দেখা যায়। কতখানি সত্যি, বলতে পারেন?
আমিও শুনেছি ওসব কিচ্ছা। বাজনা শুনিনি কখনও, কোন ভূতকে দেখিনি। তবে জন বলত, প্রোজেকশন রুম থেকে গভীর রাতে নাকি ভেসে এসেছে বাজনা। কয়েকবার এই ঘটনা ঘটে যাবার পর একদিন অর্গানের ইলেকট্রিক কানেকশন কেটে রাখল। বন্ধ করে। রাখল প্রোজেকশন রুমের দরজা। কিন্তু লাভ হল না কিছু। সে-রাতেও ঠিক শোনা গেল সেই বাজনা।
ঢোক গিলিল মুসা।
চশমা খুলে নিল প্রাইস। দুই কিশোরের দিকে চেয়ে চোখ মিটমিট করছে। টেরির ক্যাসলে ভূত আছে কি নেই, জানি না। আমি, ফিসফিস করে বলল সে। তবে, আমাকে ঢুকতে বললে ঢুকব না। রাতে ক্যাসলের দরজার ওপাশেই যাব না। লক্ষ-কোটি টাকা দিলেও না।
কিশোর! ডাক শোনা গেল মেরিচাচীর। এদিকে আয়। রডগুলো বেড়ার ধার ঘেঁষে তুলে রাখবি? মুসা.রবিন, তোমরা একটু সাহায্য কর বন্ধুকে।
কড়া রোদ। ইয়ার্ডে ব্যস্ততা। রবিনের পা ভাঙা, ভারি কাজ তার পক্ষে সম্ভব না। উল্টে রাখা পুরানো একটা বাথটাবে আরাম করে। বসে রডের হিসেব রাখছে সে। গত দুদিন ধরেই খুব কাজ হচ্ছে ইয়ার্ডে। কবে। আবার হেডকোয়ার্টারে আলোচনায় বসতে পারে তিনজন কে জানে! মিস্টার ফিসফিসের সঙ্গে দেখা করে আসার পর আর এগোয়নি তদন্ত। আসলে সময়ই পায়নি। ইয়ার্ডে ব্যস্ত থেকেছে। কিশোর। মুসার বাড়িতে কাজ ছিল, সারতে হয়েছে। লাইব্রেরিতে রবিনেরও কাজের চাপ পড়েছিল বেশ।
গত দুদিন খুব কম সময়ই বাড়িতে থাকতে পেরেছেন রাশেদ চাচা। বড়সড় একটা নিলাম হচ্ছে এক জায়গায়। ওখানে মাল কিনতে ব্যস্ত তিনি। ট্রাক বোঝাই হয়ে কেবলই মালের পর মাল এসে জমা হচ্ছে ইয়ার্ডে। কবে যে শেষ হবে, কে জানে!

একটানা কাজ করে গেল ওরা খুশিমনেই। মেরিচাচীর কাজ করে দিতে দ্বিধা নেই তিন গোয়েন্দার। প্রচুর চুইংগাম কিংবা টিফির লোভ আছে। সঙ্গে আছে মেরিচাচীর হাতে তৈরি কেক। বয়ে বয়ে বেড়ার কাছে নিয়ে রড জমা করছে মুসা আর কিশোর। বাথটাবে বসে ওগুলোর হিসেব রাখছে। রবিন। দুপুরের দিকে ফুরসত মিলল কিছুক্ষণের জন্য। বড় ট্রাকটা দেখা গেল। ইয়ার্ডের গেটে। রাশেদ চাচা এসেছেন। ছোটখাট হালকা পাতলা মানুষ, ঈগলের মত বাঁকানো বিরাট নাকের তলায় পেল্লাই গোঁফ। ট্রাক বোঝাই মালপত্রের স্তুপের ওপর একটা পুরানো ধাঁচের চেয়ারে বসে আছেন রাজকীয় ভঙ্গিতে।

পুরানো জিনিস কিনতে গেলে, যা যা চোখে পড়ে কিছুই ফেলে আসেন না রাশেদ চাচা। কাজে লাগবে কি লাগবে না, বিক্রি হবে। কিনা, ওসব নিয়ে মাথা ঘামান না। কিনে নিয়ে আসেন। পরে দেখা যাবে কি করা যায়।

ইয়ার্ডের চত্বরে এসে থামল ট্রাক। মালের দিকে একবার চেয়েই স্বামীর উদ্দেশ্যে বলে উঠলেন মেরিচাচী, তুমি…তুমি পাগল হয়ে গেছ, ওটা এনেছ কেন?

পায়ে পায়ে চাচীর কাছে এসে দাঁড়িয়েছে তিন কিশোর। দাঁতের ফাঁক থেকে পাইপটা নিয়ে ওদের দিকে একবার দোলালেন রাশেদ চাচা। হাসলেন।

অবাক চোখে এক গাদা ধাতব পাইপের দিকে চেয়ে আছে তিন কিশোর। আট ফুট উঁচু একটা পাইপ অর্গান।

অর্গানটা কিনেই ফেললাম, মেরি, গলা খুব ভারি রাশেদ চাচার। বোরিস….রোভার ধর তো। নামিয়ে ফেলি। খুব সাবধানে নামাতে হবে। ভেঙেটেঙে ফেল না আবার।

লাফ দিয়ে মাটিতে নেমে এলেন রাশেদ চাচা। অর্গানটা নামাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল বোরিস আর রোভার।

পাইপ অর্গান… কথা আটকে গেল মেরিচাচীর। যেশাস! পাগল হয়ে গেছে লোকটা! …অর্গান, পাইপ-অর্গান দিয়ে কি হবে!

নাক-মুখ দিয়ে গলগল করে ধোঁয়া ছাড়লেন রাশেদ চাচা। রসিকতা করলেন, বাজানো শিখব। পার্ট টাইম চাকরি করা যাবে। সার্কাসে। হাসলেন তিনি। হাত লাগালেন বোরিস আর রোভারের সঙ্গে।

বোরিস আর রোভার দুই ভাই। বাভারিয়ার লোক। দুজনেই ছয় ফুট চার ইঞ্চি লম্বা, সেই অনুপাতে চওড়া। মাথার চুল সোনালি। গায়ে মোষের জোর। সহজেই ধরে ধরে নামিএয় আনছে ভারি পাইপগুলো।

শোবার ঘরের কাছে বেড়ার ধারে অর্গানটা বসানোর সিদ্ধান্ত নিলেন রাশেদ চাচা। ওখানেই নিয়ে গাদা করে রাখা হল অর্গানের পাইপ আর অন্যান্য যন্ত্রপাতি। পরে জুড়ে দেয়া যাবে।

খুব ভাল জিনিস, তিন কিশোরকে বললেন রাশেদ চাচা। লস আঞ্জেলেসের পুরানো এক থিয়েটার হাউজ থেকে এনেছি।
খুব ভাল করেছ। গোমড়া মুখে বললেন মেরিচাচী। কপাল ভাল, কাছেপিঠে প্রতিবেশী নেই। কাজ করতে চলে গেলেন তিনি।
অনেক বড় অডিটোরিয়ামের জন্যে তৈরি হয়েছিল অর্গানটা, ছেলেদেরকে বললেন রাশেদ চাচা। জোরে বাজালে কানের পর্দা ফেটে যাবে মানুষের। চাইলে খুব নিচুতে নিয়ে আসা যায়। এর শব্দ। এতই নিচু, মানুষের কানেই ঢোকে না সে-আওয়াজ।
না-ই যদি শোনা গেল, ওটা আবার শব্দ হল নাকি? চাচার দিকে চেয়ে বলল কিশোর।
মানুষের কানে ঢেকে না, সার্কাসের হাতির কানে ঢুকবে, মুচকে হাসলেন রাশেদ চাচা। চলে গেলেন সেখান থেকে।
কান তো সবারই এক, বলল মুসা। মানুষের কানে না। ঢুকলে হাতির কানে ঢুকবে নাকি?
চুকতেও পারে, জবাবটা দিল রবিন। কুকুরের হুইসেলের নাম শোনোনি? মানুষের কানে ঢোকে না, কিন্তু কুকুর ঠিকই শুনতে পায় ওই বাঁশির আওয়াজ।
সাবসোনিক, যোগ করল কিশোর। বিলো সাউন্ডও বলে একে। ভাইব্রেশন বেশি না হলে মানুষের কানে ঢেকে না শব্দ। একটা বিশেষ রেঞ্জের কোপন হলে তবেই শুনতে পায় মানুষ।
পাইপ অর্গান আর শব্দ-রহস্য নিয়ে এতই মগ্ন ওরা, গেটের কাছে দাঁড়াল এসে নীল স্পোর্টস কারটা, খেয়ালই করল না। ড্রাইভার—টিং-টিঙে রোগাটে শরীর, লম্বা এক তরুণ। জোরে হর্ন বাজাল।
চমকে ফিরে চাইল তিন কিশোর।
তিন গোয়েন্দাকে চমকে দিতে পেরে খুব মজা পেল যেন গাড়ির আরোহীরা। জোরে হেসে উঠল ড্রাইভার আর তার দুই সঙ্গী।
শুটিকে টেরি লম্বা তরুণকে ড্রাইভিং সিট থেকে নেমে আসতে দেখে বলে উঠল মুসা।
ওর এখানে কি? বিড় বিড় করল রবিন।
বছরের একটা বিশেষ অংশ রকি বীচে কাটাতে আসে ডয়েল পরিবার, সারা বছর থাকে না। কিন্তু ওই কয়েকটা মাসই যথেষ্ট। জ্বলিয়ে মারে কিশোর, মুসা আর রবিনকে। খালি পেছনে লেগে থাকে।
নিজের বুদ্ধির ওপর অগাধ আস্থা টেরিয়ার ডয়েলের, অন্য কেউ সেটা মানল কি মানল না, তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। নিজের গাড়ি নিজেই ড্রাইভ করে। বুক

ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়। কিশোর বয়েসী। ছেলেছোকরাদেরকে অধীনে রাখার চেষ্টা করে। রকি বীচের বেশির ভাগ ছেলেমেয়েই পাত্তা দেয় না। তাকে, এড়িয়ে চলে। তবে বখে যাওয়া কিছু ছেলেকে দলে টানতে পেরেছে। টেরিয়ার। প্রায়ই পার্টি দেয়, ওদেরকে দাওয়াত করে। তার গাড়িতে তুলে ঘোরায় সারা শহর। দরাজ হাতে খরচ করে।
এগিয়ে আসছে টেরিয়ার। হাতে একটা জুতোর বাক্স। গাড়িতে বসা দুই সঙ্গীর চোখ তার ওপর। তিন গোয়েন্দাও দেখছে তাকে। কাছাকাছি এসেই পকেটে হাত ঢোকাল সে। ঝটকা দিয়ে বের করে। আনল আবার। হাতে একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস। রাশেদ চাচা আর দুই বাভারিয়ান ভাইয়ের দিকে তাকাল। পাইপ অর্গানটা নিয়ে ব্যস্ত তারা। এখান থেকে তার কথা শুনতে পাবে না। বিশেষ কায়দায় ভুরু কুঁচকাল সে। গুরুগম্ভীর একটা ভাব ফুটিয়ে তুলল চেহারায়। ম্যাগনিফাইং গ্লাসের ভেতর দিয়ে পুরো ইয়ার্ডে চোখ বোলাল একবার। ভুল জায়গায় এসে পড়লাম না তো!
টেরিয়ারের অভিনয়ে খুব মজা পেল তার দুই সঙ্গী, হেসে উঠল হো হো করে।
কি চাই এখানে, শুটকি?
মুসার কথা যেন শুনতেই পেল না টেরিয়ার। ম্যাগনিফাইং গ্রাসের ভেতর দিয়ে তাকাল কিশোরের দিকে। অনেক কষ্টে যেন চিনতে পারল। গ্লাসটা আবার ভরে রাখল পকেটে। এই যে কিশোর হোমস, পৃথিবী বিখ্যাত গোয়েন্দা। দেখা করতে পেরে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি। একটা কেস নিয়ে এসেছি আপনার কাছে, স্যার। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডও বিমূঢ় হয়ে গেছে, কোন সুরাহা করতে পারেনি। কেসটা। শেষ পর্যন্ত আপনার শরণাপন্ন হতে হল। নির্দয়ভাবে খুন করা হয়েছে বেচারাকে। আশা করি এই জটিল রহস্যের সমাধান করতে পারবেন। বাক্সটা বাড়িয়ে ধরল সে।
টেরিয়ারের বলার ভঙ্গিতে হেসে লুটোপুটি খেতে লাগল তার দুই বন্ধু।
বিচ্ছিরি গন্ধ আসছে বাক্সের ভেতর থেকে। কি আছে, আন্দাজ করতে পারল তিন গোয়েন্দা। হাত বাড়িয়ে বাক্সটা নিল। কিশোর। ডালা খোলার আগে একবার চাইল টেরিয়ারের দিকে।
হাসছে টেরিয়ার। অপেক্ষা করছে।
ডালা খুলল কিশোর। নাকে এসে যেন বাড়ি মোরল পচা গন্ধ। বিরাট এক সাদা ইঁদুর, পচে ফুলে ঢোল হয়ে আছে।
কি মনে হয়, মিস্টার হোমস? সামান্য সামনে বুকে এল টেরিয়ার। ভয়াবহ এই খুনের কিনারা করতে পারবেন? আসামীকে ধরতে পারলে বড় পুরস্কার পাবেন। পঞ্চাশটা স্ট্যাম্প।

হাসির রোল উঠেছে গাড়িতে।
আড়চোখে সেদিকে একবার চাইল কিশোর। চেহারায় কোন পরিবর্তন হল না। গম্ভীর চোখ মুখ, আস্তে করে মাথা ঝোঁকাল। গাড়িতে বসা টেরিয়ারের দুই বন্ধুকে শুনিয়ে জোরে জোরে বলল, আপনার মনের অবস্থা আমরা বুঝতে পারছি, মিস্টার শুটকি। খুবই দুঃখ পেয়েছেন। পাবেনই তো? হাজার হোক, নিহত জীবটা আপনার খুব প্রিয় বন্ধু ছিল।
হঠাৎ থেমে গেল হাসির শব্দ। সতর্ক হয়ে উঠেছে গাড়িতে বসা ছেলে দুটো। চোখ মুখ লাল হয়ে উঠেছে টেরিয়ারের।
বেচারার মৃত্যুর কারণ অনুমান করতে পারছি, আবার বলল কিশোর। বদহজম। খইল খেয়েছিল এক গরু বন্ধুর সঙ্গে, একই গামলায়। গরুটার নামের আদ্যাক্ষর দুটো জানি। টি ডি। ভুরিভোজনের পরই হয়তো টেরর ক্যাসলে গিয়েছিল, ভূতের তাড়া খেয়ে প্যাণ্ট নষ্ট করতে করতে ফিরেছে।
নিজেকে খুব চালাক মনে কর, না? হিসিয়ে উঠল টেরিয়ার।
বিশ্বাস হচ্ছে না? দাঁড়াও, দেখাচ্ছি, বলেই ঘুরল কিশোর। একছুটে গিয়ে ঢুকল ঘরে। কয়েক মুহূর্ত পরেই বেরিয়ে এল।
এই যে, আদ্যাক্ষর খোদাই করা আছে এটাতে, টর্চটা টেরিয়ারের দিকে বাড়িয়ে ধরে বলল কিশোর। আগে একটা এস থাকলেই তোমার পুরো নাম হয়ে যেত। শুটকি টেরিয়ার ডয়েল।
হা হা করে হেসে উঠল মুসা। টিার্চটা শুটকিকে দিয়েই দাও না, কিশোর। একটা এস বসিয়ে নেবে।
থাবা মেরে কিশোরের হাত থেকে টর্চটা নিয়ে নিল টেরিয়ার। ঘুরে দাঁড়াল। গটমট করে হেঁটে চলে গেল গাড়ির কাছে। ড্রাইভিং সিটে উঠে বসে ফিরে চাইল। আহাহা, তিন গোয়েন্দা! শুনলেই হাসি পায়! শহরের ছেলেদের কারই জানতে বাকি নেই ভড়ঙের কথা। কেউ হাসি ঠেকাতে পারছে না।
জবাবে তালে তালে হাততালি দিতে লাগল কিশোর, মুসা আর রবিন।
আরও খেপে গেল টেরিয়ার। রাগে ভাষা হারিয়ে ফেলল। ঝাল। মেটাল গাড়িটার ওপর। বন বন করে ঘুরে উঠল স্টিয়ারিং।। কর্কশ আর্তনাদ উঠল টায়ারের। ঘুরে গেল নীল স্পোর্টস কারের নাক। জোর এক ঝাঁকুনি খেয়েই লাফ দিল সামনে। তীব্র গতিতে ছুটে চলে গেল।
লাইব্রেরিতে আমার কার্ড ও-ব্যাটাই চুরি করেছে, কথা বলল রবিন। আমরা কাজে নেমেছি, জেনে গেছে ব্যাটা।
জানুক, লোককে জানাতেই তো চাই আমরা, বলল কিশোর। তবে, কাজটা আরও জরুরি হয়ে পড়ল আমাদের জন্যে। প্রথম কেসে ফেল করা চলবে না কিছুতেই।

পেছনে ফিরে চাইল একবার কিশোর। পাইপ অর্গান নিয়ে ব্যস্ত এখন রাশেদ চাচা, বোরিস আর রোভার। চাচীকে দেখা যাচ্ছে না। নিশ্চয় টেবিলে খাবার সাজাতে গেছেন।
একটু সময় পাওয়া গেল, বলল কিশোর। চল, লাঞ্চের ডাক পড়ার আগেই মীটিং শেষ করে ফেলি।
দুই সুড়ঙ্গের দিকে এগিয়ে চলল তিন গোয়েন্দা।
তাড়াহুড়ো করে এগোতে গিয়ে অঘটন ঘটাল কিশোর। মাটিতে পড়ে থাকা একটা আলগা পাইপে পা দিয়ে বসল। গড়িয়ে চলে গেল পাইপ। তাল সামলাতে না পেরে বেকায়দা ভঙ্গিতে পড়ে গেল সে।
তাড়াতাড়ি দুদিক থেকে গোয়েন্দা প্রধানকে তুলে বসাল রবিন আর মুসা।
প্রচণ্ড ব্যথায় দাঁতে দাঁত চেপে আছে কিশোর। আমার পা! ...ভেঙেই গেছে বোধহয়। গুঙিয়ে উঠল সে। উফফ, এই যে, এখানে!
দেখা গেল, ইতিমধ্যেই ফুলে উঠতে শুরু করেছে ডান পায়ের গোড়ালির ওপরের গাঁট।
ভীষণ ব্যথা! বিকৃত হয়ে গেছে কিশোরের মুখ। উফফ, বোধহয় ডাক্তারই ডাকতে হবে!
দুই দিন পর।
বিছানায় পড়ে আছে কিশোর। সেদিন, সঙ্গে সঙ্গে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সারাদিন আটকে রাখলেন ডাক্তার। পায়ের এক্সরে করলেন। তারপর কি একটা তরল পদার্থে পা ভিজিয়ে রাখতে দিলেন। বিকেলের দিকে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছে সে।
ডাক্তার অভয় দিয়েছেন, শিগগিরই আবার দৌড়াতে পারবে কিশোর। সারাদিন বিছানায় পড়ে না থেকে একটু একটু হাঁটাচলা করতেও বলেছেন।
ওঠার চেষ্টা করে কিশোর, পারে না। একটু নড়াচড়া করলেই প্রচণ্ড যন্ত্রণা শুরু হয়।
মনে স্বস্তি নেই গোয়েন্দা প্রধানের। দেরি হয়ে যাচ্ছে। নিশ্চয় আর অপেক্ষা করবেন না মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফার। হয়ত ইতিমধ্যেই একটা ভূতুড়ে বাড়ি ঠিক করে ফেলেছেন তিনি।
কাজে নামতে না নামতেই এই অঘটন। এর চেয়ে বড় অস্বস্তিকর কারণ আর কি হতে পারে তিন গোয়েন্দার জন্যে?
কিশোরের বিছানার পাশে মলিন মুখে বসে আছে মুসা আর রবিন।
এখনও ব্যথা করে? জানতে চাইল মুসা।

করে, বলল কিশোর। আক্কেল হয়েছে আমার। এত অসাবধান কেন হলাম? পা-টা যে ভাঙেনি এই যথেষ্ট। যাক গে। এখন আসল কথায় আসছি। ওই টেলিফোন কল, ওটার তো কোন সুরাহা হল না। হ্যানসনের সঙ্গে আলাপ করেছি। ও জানিয়েছে, সে রাতে টেরার ক্যাসল থেকে ফেরার পথেও নাকি কে অনুসরণ করেছিল আমাদেরকে। শুটকি হতে পারে।
সহজেই পারে, সায় দিল রবিন। ওই ব্যাটা জানে, টেরর ক্যাসলের ব্যাপারে আমরা কৌতুহলী।
আমার বিশ্বাস হয় না, এদিক ওদিক মাথা নাড়ল মুসা। গলার স্বর এভাবে বদলে ফেলার ক্ষমতা ওই ব্যাটার নেই। অন্য কেউ করেছে। মানুষ হয়ে থাকলে, মস্তবড় অভিনেতা ওই লোক।
ঠিক, বলল কিশোর। তবে সবই অনুমান। একটু থেমে বলল, নিজের চোখে না দেখলে, ভূতে ফোন করেছে এটা মোটেই বিশ্বাস করব না। আমি।
তা না হয় হল, অনিশ্চিত রবিনের গলা। ধরে নিলাম ভূতে করেনি ফোন। কিন্তু তোমাদের ওপর পাথর ফেলল কে?
ঠিক, রবিনের কথায় জোর পেল মুসা। পাথর ফেলল কে?
আপাতত ওটা নিয়ে ভাবছি না, বলল কিশোর। তবে আমার ধারণা, ভূত নয়। শুটকিও না! এর পেছনে অন্য কেউ রয়েছে।
কে? জানতে চাইল মুসা।
জানলে তো বলতামই। আরও কিছু ঘটনা না ঘটলে জানা যাবে না। হ্যারি প্রাইসের লোকটা যাক। কেন মিছে কথা বলল লোকটা? ঝোপ কাটছিল না, তবু কেন বলল কাটছিল? লেমোনেডের কথাই ধর। সাজিয়েই রেখেছিল। টেবিলে। ফ্রিজ থেকে বরফও বের কয়েক ন জানত, আমরা যাব। অবাক লাগছে না?
কয়েক মুহূর্ত নীরবতা।
মাথা চুলকাল মুসা। বিড়বিড় করল, খালি প্যাঁচ। বাড়ছেই! সুরাহা হবার কোন লক্ষণই দেখছি না!
ঠিক এই সময় ঘরে এসে ঢুকলেন মেরিচাচী দাঁড়ালেন। এখন কেমন লাগছে রে?
ভাল, দায়সারা জবাব দিল কিশোর। তাদের আলোচনায় বাধা পড়েছে। চাইছে মেরিচাচী চলে যাক এখন।
গেলেন না চাচী। বিছানার পাশে বসে কিশোরের আহত জায়গায় হাত রাখলেন। ব্যথা লাগে এখনও?
না।
হেসে ফেললেন চাচী। আমাকে তাড়াতে চাইছিস, না?
না, ইয়ে…মানে… ধরা পড়ে গিয়ে আমতা আমতা করতে লাগল কিশোর।

একটা কথা জানাতে এসেছি, বললে চাচী। আরও আগেই বলতাম। কিন্তু ভুলে গিয়েছিলাম। ইস্‌স্‌, কি ভাবনায়ই না ফেলে দিয়েছিলি! বাবা-মা হারা ছেলেটার জন্যে ভাবনার অন্ত নেই তাঁর।
চাচী, কি বলবে, বলে ফেল না? তাড়া দিল কিশোর।
গতকাল সকালে এক বুড়ি এসেছিল। তুই তখন ঘুমিয়েছিল। সে এক আজব বুড়ি!
আজব বুড়ি, সতর্ক হয়ে উঠল কিশোর।
চাচীর কথায় আগ্রহী হয়ে উঠছে মুসা আর রবিনও।
এক জিপসি বুড়ি।
জিপসি বুড়ি! পিঠ সোজা হয়ে গেছে মুসা আর রবিনের। কিশোরও বালিশে পিঠ রেখে আধশোয়া হল। ব্যথা ভুলে গেছে।
তারপর?
দরজায় টোকা দিল বুড়ি। খুললাম। ভেতরে ডাকব কি ডাকব। না ভাবছি, এই সময়ই তোর নাম বলল সে। পা মাচকানোর কথা বলল। ভবিষ্যদ্বাণী করলঃ সাবধান না হলে আরও বড় বিপদ হবে। তোর। এর আগে কখনও দেখিনি ওকে। তোর নাম জানল কি করে, পা মাচকানোর খবর পেল কোথায়, ঈশ্বরই জানে!
সাবধান হতে বলেছে এক জিপসি বুড়ি। একে অন্যের দিকে চাইছে তিন গোয়েন্দা।
ভেতরে ডাকলাম বুড়িকে, আবার বললেন মেরিচাচী। এল। বসল। ঝোলার ভেতর থেকে কয়েকটা তাস বের করল। বুঝলাম, তাসের ম্যাজিক জানে বুড়িটা। তাস চালাচালি করে লোকের ভবিষ্যৎ জানতে পারে। এসবে কোনদিনই বিশ্বাস নেই। আমার। কিন্তু বুড়িটা যেভাবে বলল, অবিশ্বাসও করতে পারলাম না। তিনবার তাস চালল সে তোর নাম করে। তিন বারে তিনটে কথা বললঃ টি সি থেকে দূরে থাকতে হবে তোকে। পা মাচকানোর পেছনে টি সি রয়েছে। এরপরও যদি টি সি-কে এড়িয়ে না চলিস, আরও বিপদ হবে তোর।
তুমি কিছু বললে না?
কি আর বলব? হেসে উড়িয়ে দিয়েছি বুড়ির কথা। একটু যেন ক্ষুন্ন হল সে। ঝোলার ভেতরে তাসগুলো ভরে উঠে চলে গেল। কিছু একটা দেখেছি। ওর চোখে, খটকা লেগেছে মনে। ...কিশোর, বাপ, একটু সাবধানে থাকিস তুই কি জানি, কিছু ঘটেও যেতে পারে। উঠলেন চাচী। তোরা কথা বল। আমি যাই। কাজ পড়ে আছে ওদিকে।
বেরিয়ে গেলেন মেরি চাচী। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। নিচে নেমে যাচ্ছেন তিনি।

চাচী বেরিয়ে যাবার পরও অনেকক্ষণ কোন কথা বলতে পারল না। তিন গোয়েন্দা। একে অন্যের দিকে চেয়ে রইল।
টি. সি... অবশেষে কথা ফুটল রবিনের মুখে। শুকনো গলা। মানে, টেরর ক্যাসল।
শুটকির কাজও হতে পারে, বলল কিশোর। সামান্য ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে তার চেহারা। সে-ই হয়ত পাঠিয়েছে বুড়িকে। কিন্তু টেরির এত বুদ্ধি, নাহা বিশ্বাস হচ্ছে না! মরা ইদুর এনে ইয়ার্কি মারা পর্যন্তই তার দৌড়।
কেউ... বলল মুসা। মানে, কিছু একটা চায় না, আমরা টেরার ক্যাসলে যাই। প্রথমে ফোনে হুশিয়ার করেছে। তারপর জিপসি বুড়ির ওপর ভর করে তাকে হাঁটিয়ে এনেছে। ইয়ার্ডে। তার মুখ দিয়ে নিজে কথা বলেছে। দুই সঙ্গীর দিকে চাইল সে। কেউ কিছু বলল না। মৌনতা সম্মতির লক্ষণ ধরে নিয়ে বলল, এরপর থেকে টেরর ক্যাসলের ধারে কাছে যাওয়াও আর উচিত না আমাদের। কি বল, রবিন?
ঠিক।
কিশোর?
ঠিক বেঠিক জানি না, তবে আবার যেতে হবে টেরর ক্যাসলে, বলল গোয়েন্দাপ্রধান। লোক হাসাতে চাও? শুটকি কি বলে গেছে, মনে নেই? ভয় পেয়ে এখন পিছিয়ে গেলে থু থু দেবে সে আমাদের মুখে। সারা রকি বীচে। আমাদের গোয়েন্দাগিরির খবর রটিয়ে দিয়েছে। প্রথম কেসেই ফেল করলে মুখ টিপে হাসবে সবাই আমাদের দেখলে। পিছিয়ে আসার আর উপায় নেই। এগিয়ে যেতেই হবে।
চুপ করে রইল দুই সহকারী।
তাছাড়া, আবার বলল কিশোর, জিপসি বুড়ি এসে নতুন আরেক রহস্য যোগ করে দিয়ে গেল। বুঝতে পারছি, ঠিক পথেই এগোচ্ছি। আমরা।
মানে? জানতে চাইল মুসা।
এর আগে অনেকেই ঢুকেছে টেরর ক্যাসলে। এর রহস্য ভেদ করতে চেয়েছে। কাউকেই হুশিয়ার করা হয়নি আমাদের মত। এর একটাই মানে। ঠিক পথেই এগোচ্ছি। আমরা। টেরর ক্যাসলের আজব রহস্য ভেদ করে ফেলি, চায় না কেউ একজন।
বেশ, ধরে নিলাম তোমার কথাই ঠিক, বলল মুসা। তাহলেও আর এগুতে পারছি না। আমরা। তুমি পড়ে আছ বিছানায়। তোমার পা ভাল না হলে কাজে নামতে পারছি না। আর।
ভুল বললে, বলল কিশোর। বিছানায় শুয়ে আছি বটে, ব্রেনটা অকেজো হয়ে যায়নি, বরং ঠাণ্ডা মাথায় ভাবার সুযোগ পেয়েছি বেশি, আমি না হয় না-ই যেতে

পারলাম, তোমরা যাও, আরেকবার ঘুরে এস ক্যাসল থেকে।
আমরা যাবা প্রায় চেঁচিয়ে উঠল রবিন। মোটেই না। টেরর ক্যাসলের ওপর বড়জোর লেখাপড়া চালিয়ে যেতে পারি। আমি। তার বেশি কিছু করতে পারব না।
খুব বেশি কিছু করতে হবেও না তোমাদেরকে, সহজ গলায় বলল কিশোর। একটা ব্যাপারে শুধু শিওর হয়ে আসতে হবে। অস্বস্তি বেড়ে আতঙ্কে রূপ নেয়। কিনা জানতে হবে, আর সে আতঙ্ক কতখানি তীব্র, তাও বুঝে আসতে হবে।
কতখানি তীব্র! চেঁচিয়ে উঠল মুসা। এখনও বোঝার বাকি আছে নাকি? আতঙ্কে হার্টফেল করতে বসেছিলাম গত বার, মনে নেই?
সেজন্যেই রবিনকে যেতে বলছি। এবার সঙ্গে, বলল কিশোর। রিও একই অবস্থা হয়। কিনা, জানা দরকার। আরেকটা ব্যাপার। অবস্থাটা কতক্ষণ স্থায়ী হয়, জেনে আসতে হবে। মানে, ক্যাসলের বাইরে ঠিক কতদূরে এলে পরে এই আতঙ্ক চলে যায়, বুঝতে হবে।
এর আগের বারে ছিল পনেরো মাইল, জবাব দিল মুসা। বাড়িতে গিয়ে নিজের বিছানায় শোয়ার পর তবে গেছে।
এবারে গিয়ে শিওর হয়ে নাও, সত্যিই পনেরো মেইল কিনা, শান্ত গলা কিশোরের। আগের বারের মত পড়িমড়ি করে ছুটবে না। আস্তে আস্তে পিছিয়ে আসবে, ক্যাসলের বাইরে বেরোবে, পথে নামবে। খানিক পরে পরই থেমে বোঝার চেষ্টা করবে, আতঙ্ক চলে গেছে কিনা।
আস্তে আস্তে, শুকনো হাসি হাসল মুসা। আবার থামবও খানিক পর পর।
হয়ত আতঙ্কিতই হবে না, বলল কিশোর। কারণ এবারে যাচ্ছি। দিনের আলো থাকতে থাকতেই পরীক্ষা করবে ক্যাসলের ঘরগুলো। সাহসে কুলালে রাত নামার পরেও অপেক্ষা কোরো একটু। হ্যাঁ, আগামীকাল বিকেলেই যাচ্ছ তোমরা।
কি? রবিনের দিকে চেয়ে বলল মুসা। যাবে তো?
স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রবিন। আগামীকাল হলে আমি পারছি না। লাইব্রেরিতে কাজ আছে। পরশু এবং তার পরদিনও পারব না।
আগামী দুতিন দিন আমারও কাজ আছে, বলল মুসা। বাড়িতে। আমিও যেতে পারছি না।
নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর। হুমম, ভাবনার কথাই। তাহলে তো প্ল্যান বদলাতেই হচ্ছে!
ঠিক, খুশি হয়ে বলল মুসা। প্ল্যান বদলাতেই হচ্ছে।
বেশ, বলল কিশোর। এখনও দিনের আলো থাকবে কয়েক ঘন্টা। তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘন্টাখানেকের মধ্যেই বেরিয়ে পড়। ঘুরে এস ক্যাসল থেকে।

ধুত্তরি। মুখ গোমড়া মুসার। কখনও পারি না-ওর সঙ্গে। কথার প্যাঁচে ফেলে দিয়ে ঠিক কাজ আদায় করে নেয়।
ঠিক, সায় দিল রবিন। আর কিছু বলল না।
গিরিপথে এসে দাঁড়িয়েছে দুজনে। সামনেই পাহাড়ের ঢালে টেরার ক্যাসল আকাশে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে। পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে সূর্য। তেরছাভাবে রোদ এসে পড়েছে বিশাল টাওয়ারের গায়ে। পেঁচিয়ে ওঠা আঙুর-লতার ফাঁকে ফাঁকে শার্শিভাঙা জানালার ফোকর, ভয়াবহ দানবের চোখ যেন।
শিউরে উঠল একবার রবিন। চল, ঢুকে পড়ি। সুরুজ ডুবতে বড়জোর আর দুঘন্টা। তারপর ঝাপাৎ করে নামবে অন্ধকার।
ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল দুজনে। মাঝামাঝি উঠে পেছনে ফিরে চাইল একবার মুসা। বাঁকের ওপারে। পাথরের স্তুপের ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে রোলস রয়েস। অপেক্ষা করছে। হ্যানসন।
কি মনে হয়? উঠতে উঠতে জিজ্ঞেস করল মুসা। এবারেও শুটকি ফলো করছে আমাদের?
না, এদিক ওদিক মাথা নাড়ল রবিন। পা ভাঙা। উঠতে কষ্ট হচ্ছে তার, কিন্তু মুসাকে বুঝতে দিচ্ছে না। আমি খেয়াল রেখেছিলাম। ওর নীল গাড়ির ছায়াও দেখিনি। কিশোরের ধারণা, টেরর ক্যাসলের ধার মাড়াবে না। আর শুটকি।
আমরাও মাড়াতে চাইনি, জোর করে পাঠানো হয়েছে। তবে, শুটকিকে হয়ত জোর করেও পাঠানো যাবে না।
রবিনের কাঁধে বুলছে ক্যামেরা। মুসার হাতে টেপ রেকর্ডার। কোমরের বেল্টে আটকে নিয়েছে টর্চ, দুজনেই। টেরর ক্যাসলের বারান্দায় উঠে এল ওরা। হলে ঢোকার বড় দরজাটা বন্ধ।
তাজ্জব ব্যাপার তো! ভুরু কুঁচকে গেছে মুসার। শুটকি দরজা খোলা রেখেই পালিয়েছিল, দেখেছি।
বাতাসে বন্ধ হয়ে গেছে হয়ত, বলল রবিন।
হাত বাড়িয়ে দরজার নব চেপে ধরল। মুসা। ঘোরাল। ঠেলা দিতেই তীক্ষ্ণ ক্যাঁ-অ্যাঁ-চ্- চ্- চ্ শব্দ করে খুলে গেল ভারি দরজা।
মরচে পড়ে গেছে কবজায়, মন্তব্য করল রবিন। ওই শব্দে ভয় পাবার কিছু নেই, নিজেকেই যেন বোঝাল সে।
কে বলল, ভয় পেয়েছি? স্বীকার করতে রাজি না মুসা।
দরজা খোলা রেখেই হলে ঢুকে পড়ল। ওরা। হলের এক পাশে একটা বড় ঘর। ঢুকাল ওরা। পুরানো আসবাবপত্রে বোঝাই। কাঠের ভারি ভরি চেয়ার টেবিল, বিরাট ফায়ার প্লেস। রহস্যজনক কিছু দেখলেই ছবি তুলে নিতে বলে দিয়েছে

কিশোর। কিন্তু তোলার মত তেমন কিছুই চোখে পড়ল না রবিনের। তবু ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ঘরের গোটা দুয়েক ছবি তুলে নিল সে।
তারপর ইকো রুমে এসে ঢুকাল ওরা। ঘরে আবছা আলো আঁধারির খেলা! গা শিরশিরে একটা অনুভূতি আবহাওয়ায়, অস্বস্তিকর। বিচিত্র আর্মার স্যুট আর বিভিন্ন ভঙ্গিতে তোলা জন ফিলবির ছবিগুলোর দিকে চাইলে আরও বেড়ে যায় অস্বস্তি ভাবটা। একপাশে সিঁড়ি, দোতলায় উঠে গেছে। মাঝামাঝি জায়গায় একপাশের দেয়ালে কয়েকটা জানালা। কাচের শার্শি। ধুলোর পুরু আস্তরণ। ওপথেই আসছে আলো।
মিউজিয়ম মনে হচ্ছে, বলল রবিন। জানই তো, যে-কোন মিউজিয়মে ঢুকলেই কেমন জানি হয়ে যায় মন।
ঠিক, সায় দিল মুসা। ঠিক ধরেছ। সেই অনুভূতি। মিউজিয়মে ঢুকলে এমন হয়। কথা বলতে বলতে এগিয়ে গেল সে। ধুলো-বালি, পুরানো, কেমন যেন মরা মরা...।
মরা-অরা-অরা-অরা-অরা-অর!
ঘরের ঠিক মাঝামাঝি গিয়ে শেষ শব্দটা উচ্চারণ করছে মুসা, বেশ জোরে। এক লাফে পিছিয়ে এল।
ওরে-ব্বাপরে! এত জোরালা বলতে বলতেই ঘরের ঠিক মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল রবিন। প্রতিধ্বনি।
ধ্বনি-অনি-অনি-অনি-অনি-অনি!
হাত চেপে ধরে একটানে রবিনকে সরিয়ে আনল। মুসা। ওখানে দাঁড়িয়ে জোরে কথা বললেই ওই কাণ্ড ঘটে।
প্রতিধ্বনি পছন্দ করে রবিন। জোরে হাল্লো বলার ইচ্ছেটা চাপা দিতে হল। ইকো হলের প্রতিধ্বনি মজার নয়, বরং কেমন অস্বস্তি জাগায়।
চল, ছবিটা দেখি, বলল রবিন। ওই যে, যেটা চোখ টিপেছিল তোমার দিকে চেয়ে।
ওই তো, হাত তুলে দেখাল মুসা। জলদস্যুর সাজে জন ফিলবি।
চল, ভালমত দেখি, বলল রবিন। একটা চেয়ারে দাঁড়িয়ে দেখ তো, নাগাল পাও কিনা।
ভারি, পিঠবাঁকা একটা কাঠের চেয়ার ছবিটার তলায় নিয়ে এল মুসা। উঠল চেয়ারে। পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েও নাগাল পেল না ছবিটার।
ওই যে একটা ব্যালকনি, ছবিটার ওপর দিকে চেয়ে বলল রবিন। ওখান থেকে লম্বা তার দিয়ে বুলিয়ে দেয়া হয়েছে ছবি। চল উঠে যাই। তার ধরে টেনে তুলে নিতে পারব ছবিটা।

সিড়ির দিকে এগোনোর জন্যে ঘুরে দাঁড়াতে গেল। রবিন। আধাপাক ঘুরেছে, এই সময় তার ক্যামেরা-কেসের চামড়ার ফিতে আটকাল কেউ। চমকে ফিরে চাইল রবিন। ঠিক তার পেছনে, আবছা! অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে লম্বা এক মূর্তি। গলা চিরে বিকট চিৎকার বেরিয়ে এল। তার, খিচে দৌড় মারতে চাইল দরজার দিকে। পারল না। ফিতোয় হ্যাঁচকা টান লাগল, আবার পিছিয়ে গেল। রবিন। ভারসাম্য হারাল। কান্ত হয়ে গেল এক পাশে। মুখ ফিরিয়ে চাইল কি আছে পেছনে। আর্মর সুট পরা এক বিরাট মূর্তি, কোপ মারার ভঙ্গিতে মাথার উপর তুলে রেখেছে তলোয়ার।

আবার চিৎকার বেরোলি রবিনের গলা চিরে। পড়ে গেল। মার্বেলের মেঝেতে। সঙ্গে সঙ্গে গড়ান দিয়ে সরে গেল একপাশে।

খটাং করে মেঝেতে পড়ল তলোয়ার, মুহূর্ত আগে ঠিক ওই জায়গাতেই ছিল রবিন। তলোয়ারের পাশেই পড়ল। মূর্তিটা। বদ্ধ ঘরে বিকট আওয়াজ হল। ইস্পাতের খালি ড্রোম পড়ল যেন একটা।

ফিতেয় টান নেই। আর এখন। গড়িয়ে দূরে সরে গেল। রবিন। দেয়ালে এসে ঠেকার আগে থামল না। ফিরে চাইল। খাড়া হয়ে গেছে ঘাড়ের চুল। তার দিকে তেড়ে আসছে না। আর্মর সুট পরা মূর্তি। ধড় থেকে মাথা আলাদা হয়ে গেছে। ওটার। গড়াতে গড়াতে চলে যাচ্ছে মেঝের ওপর দিয়ে। থেমে গোল দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে।

আরও কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে উঠল রবিন। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল পড়ে থাকা ধড়টার দিকে। পাশে গিয়ে বসল ভয়ে ভয়ে। ধড়ের গলার ভেতরে একবার উঁকি দিয়েই হাঁপ ছাড়ল। খালি। আসলে ওটা একটা আর্মর সুট। আস্ত। কায়দা করে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল দেয়ালে ঠেকা দিয়ে। একটা হাত ওপরের দিকে তুলে আটকে দেয়া হয়েছিল কোনভাবে। হাতের মুঠোয় ধরিয়ে দেয়া হয়েছিল তলোয়ার। খুব কাছাকাছি গিয়েছিল রবিন। বেঁধে গিয়েছিল ফিতে। রবিন পাশে ঘোরার সময় টান লেগেছে, পড়ে গেছে মূর্তিটা। চোট সইতে না পেরে গলা থেকে আলগা হয়ে গেছে লোহার শিরস্ত্রাণ।

চোখ বড় বড় করে সুটটার দিকে চেয়ে আছে। রবিন। চমকে উঠল অট্টহাসির শব্দে। হো হো করে ঘর ফাটিয়ে হাসছে মুসা।

হাসিতে যোগ দিল না। রবিন। বেকায়দা ভঙ্গিতে পড়ে থাকা সুটের ধড়ের একটা ছবি তুলল। আরেকটা ছবি তুলল। মুসার।

যাক, বলল রবিন। ক্যাসলের এক ভূতের ছবি তুললাম। চেয়ারে দাঁড়িয়ে হাসছে। দেখে নিশ্চয় মজা পাবে কিশোর।

ক্যামেরাটা আমার হাতে থাকা উচিত ছিল, রবিন, চোখের পানি মুছতে মুছতে বলল মুসা। কত হয়ে পড়ে যাচ্ছ তুমি। পেছনে তলোয়ার উচিয়ে আছে আর্মর সুট পরা এক মূর্তি। আহ, যা দারুণ একখান ছবি হত না আবার হাসতে লাগল সে।
আর্মর সুটটার দিকে একবার তাকাল রবিন। দৃষ্টি দিয়ে ওটাকে ভস্ম করার চেষ্টা চালাল যেন। ব্যর্থ হয়ে ফিরল দেয়ালে ঝোলানো ছবির দিকে। ক্যামেরা চোখের সামনে তুলে এনে শটাশট শাটার টিপে চলল। একের পর এক।
কয়েকটা ছবি তুলে নিয়ে মুসার দিকে ফিরল রবিন। হাসি। থামবে এবার? অনেক কাজ পড়ে আছে। ওই যে দরজাটা, চল ওঘরে ঢুকি। দরজার কপালে বসানো প্লেটের লেখা পড়ল, প্রোজেকশন রুম।
চেয়ার থেকে নেমে এল মুসা। বাবার মুখে শুনেছি, আগে বড় বড় অভিনেতার বাড়িতে নিজস্ব প্রোজেকশন রুম থাকত। ঘরে বসেই নিজের ছবি দেখত, বন্ধুদের দেখাত। চল দেখি ঘরটা।
হাতল ধরে জোরে টান দিল রবিন। ধীরে ধীরে খুলে গেল পাল্লা, যেন ওপাশ থেকে টেনে ধরে রেখেছে। কেউ। এক ঝলক হাওয়া এসে ঝাপটা মারাল গায়ে, নাকে এসে লাগল ভ্যাপসা গন্ধ। দরজার ওপাশে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। নিরেট অন্ধকার।
বেল্টে ঝোলানো টর্চ খুলে নিল মুসা। আলো ফেলল ভেতরে।
অন্ধকারের কালো চাদর ফুড়ে বেরিয়ে গেল আলোক রশ্মি। চোখের সামনে ভেসে উঠল প্রোজেকশন রুম। বেশ বড় একটা হলঘর। কয়েক সারিতে রাখা হয়েছে শখানেক চেয়ার! একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে বিরাট এক পাইপ অর্গান!
মুভি-থিয়েটারের মত সাজানো হয়েছে, বলল মুসা। অর্গানটা দেখেছ? রাশেদ চাচারটার চেয়েও অনেক বড়।
নিজের টর্চ খুলে আনল রবিন। সুইচ টিপল। আলো জ্বলল না। ভাল করে দেখে বুঝল, ভেঙে গেছে। কাচ। সে যখন মেঝেতে পড়ে গিয়েছিল, বাড়ি লেগেছিল তখনই।
একটা টর্চের আলোই যথেষ্ট। প্রোজেকশন রুমের ভেতরে এসে ঢুকল দুজনে। এগোল পাইপ অর্গানটার দিকে।
হাসাহাসি করে হালকা হয়ে গেছে মন।। ভয় কেটে গেছে। দুজনেরই। অর্গানের কাছে এসে দাঁড়াল ওরা।
ছাতের কাছাকাছি উঠে গেছে বিশাল পাইপগুলো। ধুলোবালি আর মাকড়সার জাল লেগে আছে। অর্গানের একটা ছবি তুলল রবিন।
আলো ফেলে ফেলে পুরো ঘরটা দেখল ওরা। যত্নের অভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে চেয়ারগুলো। জায়গায় জায়গায় উঠে গেছে ছাল-চামড়াগদি। ছবি দেখানোর

পর্দার জায়গায় বুলিছে এখন কয়েক ফালি সাদা কাপড়। গুমোট গরম ঘরে।
এখানে কিছু নেই, বলল মুসা। চল, ওপরে যাই।
প্রোজেকশন রুম থেকে বেরিয়ে এল ওরা। ইকো হল পেরিয়ে এক প্রান্তের সিড়ির গোড়ায় চলে এল। উঠতে শুরু করল সিঁড়ি বেয়ে। আধাপাক ঘুরে দোতলায় গিয়ে শেষ হয়েছে সিঁড়ির আরেক মাথা। মাঝামাঝি উঠে থামল ওরা। ধুলোয় ঢাকা জানালার শার্শি দিয়ে বাইরে তাকাল। চোখে পড়ছে গিরিপথ।
আরও ঘন্টা দেড়েক আলো থাকবে, বলল রবিন। এরমধ্যেই দেখে নিতে হবে যা দেখার।
আগে জলদস্যুর ছবিটা ভালমত দেখি, চল, পরামর্শ দিল মুসা।
ব্যালকনিতে এসে থামল ওরা। দুজনেই ধরল। ছবির তার, টান দিল। ভীষণ ভারি ফ্রেম। দুজনে টেনে তুলতেও বেগ পেতে হল।
উঠে এল ছবি। ওটার ওপর টর্চের আলো ফেলল। মুসা। সাধারণ ছবি। তেল রঙে আঁকা, এজন্যেই আলো পড়লে সামান্য চকচক করে। রবিনের ধারণা হল, হয়ত বিশেষ কোন একটা দৃষ্টিকোণ থেকে ছবির চোখের দিকে চেয়েছিল মুসা, চকচক করতে দেখেছিল। জ্যান্ত চোখ বলে মনে হয়েছিল তখন। সেটা তাকে বলল রবিন।
কিন্তু সন্দেহ গেল না মুসার। জ্যান্তই মনে হয়েছিল! কি জানি, ভুলও দেখে থাকতে পারি। যাকগে, আবার নামিয়ে রাখি ছবিটা, এস।
আবার আগের জায়গায় ছবিটা বুলিয়ে রাখল। ওরা। সরে এল ব্যালকনি থেকে। আবার চলে এল সিঁড়িতে।
সিঁড়ি ভেঙে উঠতেই থাকল। ওরা। একটু পরেই মোটা থামের মত একটা টাওয়ারের ভেতরে আবিষ্কার করল নিজেদেরকে। চারদিকে ছোট ছোট জানালা। বাইরে তাকাল। ক্যাসলের চুড়ার কাছে উঠে এসেছে ওরা। অনেক নিচে ব্ল্যাক ক্যানিয়ন। যতদূর চোখ যায়, শুধু পাহাড় আর পাহাড়।
আরো দেখেছা হঠাৎ বলে উঠল মুসা। একটা এরিয়্যালা টেলিভিশনের
চাইল রবিন। ঠিকই। ওদের একেবারে কাছের পাহাড় চুড়োয় দাঁড়িয়ে আছে একটা এরিয়্যাল। হয়ত পাহাড়ের ওপাশেই রয়েছে কোন বাড়ি। ভাল রিসিপশনের জন্যে এরিয়্যালটা লাগিয়েছে বাড়ির লোকো
পাহাড়ের মাঝে মাঝে অনেক গিরিপথ রয়েছে, দেখেছ? আঙুল তুলে একটা দিক দেখিয়ে বলল মুসা। ব্ল্যাক ক্যানিয়নের মত নির্জন নয় ওগুলো।
ডজন ডজন সরু গিরিপথ আছে। এদিকে পাহাড়ের ভেতরে ভেতরে, বলল রবিন। আমি ভাবছি। এরিয়্যালটার কথা। পাহাড়ের ঢাল কি খাড়া দেখেছ? ওতে চড়তে চাইলে… মনে হচ্ছে, ওদিক দিয়ে ঘুরে যেতে হবে।

আমারও তাই ধারণা, বলল মুসা। চল, নামি। এখানে আর কিছু দেখার নেই।
খানিকটা নেমে একটা বড় ঘরে এসে ঢুকাল ওরা। গাদা গাদা বই র‍্যাকে। লাইব্রেরি। এখানকার দেয়ালেও অনেক ছবি ঝোলানো, ইকো হলের ছবিগুলোর চেয়ে আকারে ছোট।
চল, দেখি ছবিগুলো, প্রস্তাব রাখল মুসা।
রবিন রাজি।
জন ফিলবির অভিনীত ছবির দৃশ্য। কোথাও সে জলদস্যু, কোথাও ছিনতাইকারী, ওয়্যারউলফ, জোম্বি, ভ্যাম্পায়ার, আবার কোথাও বা সাগর থেকে উঠে আসা কোন নাম-না জানা ভয়াবহ দানব।
ইস্‌স্‌ ফিল্মগুলো যদি দেখতে পারতাম! বলল মুসা। একই লোকের মত চেহারা!
লোকে এজন্যেই তাকে লক্ষ্যমুখে ডাকত, মনে করিয়ে দিল। রবিন। আরে, দেখ দেখ!
এক জায়গায় দেয়ালের একটা চারকোণা ফোকরে একটা বাক্স, মমিকেস। ডালা বন্ধ। রূপার একটা প্লেট লাগানো বাক্সের গায়ে। এগিয়ে গিয়ে প্লেটে টর্চের আলো ফেলল। মুসা। খোদাই করে। ইংরেজিতে লেখা রয়েছেঃ
জন ফিলবি
তোমার অভিনীত ছবি দেখে অনেক মজা পেয়েছি বেঁচে থাকতে। মৃত্যুর পর আমার দেহের এই বিশেষ অংশগুলো তোমাকেই দান করে গেলাম। তোমার মিউজিয়মে সাজিয়ে রেখা।
— পিটার হেনশ।
সেরেছে, চাপা গলায় বলল মুসা। ভেতরে কি আছে।
আর কি? নিশ্চয় মমি-টমি কিছু।
অন্য কিছুও হতে পারে! এস, দেখি!
ডালা ধরে ওপরের দিকে টান দিল মুসা। বেজায় ভারি। তুলতে কষ্ট হচ্ছে।
ডালাটা অর্ধেক উঠে যেতেই ভেতরে চাইল মুসা। ওরেকবাপারে! বলেই ছেড়ে দিল ডালা। সরে এল এক লাফে।
কি, ক্কি হল? রবিনের গলায় উৎকণ্ঠা।
দাঁত বের করে হাসছে। কঙ্কাল! উরিববাপারে!
বার দুই ঢোক গিলিল রবিন। কঙ্কাল নড়েচড়ে ওঠেনি তো!
বুঝতে পারলাম না!
এস তো, আবার তুলে দেখি!
ভয়ে ভয়ে এসে আবার ডালা ধরল মুসা। রবিনও হাত লাগাল।

ডালা তুলে ভেতরে উঁকি দিল দুজনেই। সাধারণ একটা কঙ্কাল পড়ে আছে চিত হয়ে। না, নড়ছে না। একেবারে স্থির।
খামোকা ভয় পেয়েছ, বলল রবিন। নিশ্চয় ওটা পিটার হেনশর কঙ্কাল। একটা ছবি তুলে নিই। কিশোর খুশি হবে।
ছবি তুলে নিল রবিন। মুসা নেই ওখানে। জানালার ধারে সরে যাচ্ছে।
সর্বনাশ! হঠাৎ চিৎকার শোনা গেল মুসার। রবিন, জলদি কর! অন্ধকার...
তা কি করে হয়? হাতঘড়ির দিকে চাইল রবিন। এখনও এক ঘন্টা আলো থাকার কথা!
কি জানি! দেখে যাও!
জানালার ধারে সরে এল রবিন। ঠিকই, বাইরে গিরিপথে অন্ধকার নামতে শুরু করেছে। উঁচু পাহাড়ের ওপারে হারিয়ে গেছে সূর্য।
ভুলেই গিয়েছিলাম, রবিনের গলায় শঙ্কা, এসব পাহাড়ী অঞ্চলে সূর্য একটু তাড়াতাড়িই ডোবে।
চল, বেরিয়ে পড়ি, তাগাদা দিল মুসা। অন্ধকারে এখানে এক মুহূর্ত থাকতে রাজি নই আমি।
বারান্দায় বেরিয়ে এল ওরা। দুই প্রান্ত থেকেই সিঁড়ি নেমে গেছে। দেখতে ঠিক একই রকম। কাছের সিড়িটার দিকে এগিয়ে গেল ওরা। নামতে শুরু করল।
এক জায়গায় এসে শেষ হল সিড়ি। একটা হল ঘরে এসে ঢুকেছে। ওরা। আবছা অন্ধকার। এক নজর দেখেই বুঝল, এটা ইকো রুম নয়, অন্য ঘর। এক প্রান্ত থেকে সিড়ি নেমে গেছে।
এদিক দিয়ে যাইনি আমরা, বলল রবিন। চল ফিরি। ওপর তলায় উঠে অন্য সিড়ি দিয়ে নামব।
কি দরকার? বাধা দিল মুসা। ওই তো সিঁড়ি নেমে গেছে। নিশ্চয় নিচের তলায়ই নেমেছে।
অপ্রশস্ত সিঁড়ি। গায়ে গায়ে ঠেকে যায়। দ্রুত নেমে চলল। দুজনে। কয়েক ধাপ নেমেই সরু ছোট একটা প্যাসেজে শেষ হয়েছে সিঁড়ি। প্যাসেজের দুপাশে দেয়াল। ও মাথায় দরজা।
তাড়াতাড়ি দরজার কাছে চলে এল ওরা। ঘন হয়ে আসছে অন্ধকার। নব ঘুরিয়ে ঠেলা দিতেই দরজা খুলে গেল! ওপাশ থেকে আবার সিঁড়ি নেমেছে। মুসা চলে গেল ওপাশে। ছেড়ে দিতেই বন্ধ হয়ে যেতে চাইল স্প্রিং লাগানো পাল্লা। খপ করে আবার ধরে ফেলল। সে। রবিনও চলে এল এপাশে। পাল্লা ছেড়ে দিল মুসা।
দরজা বন্ধ হয়ে যেতেই গাঢ় অন্ধকার গ্রাস করল ওদেরকে।

চল ফিরে যাই। আবার বলল রবিন। এই অন্ধকারে অচেনা পথে চলতে মন সায় দিচ্ছে না।
ঠিকই বলেছ। এখন আমারও কেমন কেমন লাগছে! ফিরে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল মুসা। দরজার নব ধরে মোচড় দিল। অন্ধকারে তার শঙ্কিত গলা শোনা গেল। ইয়াল্লা রবিন, নব ঘুরছে না! অটোমেটিক লকা পুশ বাটন ওপাশে। তাড়াহুড়োয় চাপ লেগে গেছে হয়ত!
তাহলে আর কি করা! গলা স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করল রবিন। না চাইলেও সামনেই বাড়তে হবে। আমাদের!
কিছুই দেখা যাচ্ছে না! দেখি, টর্চ জ্বলি ...আরে, টর্চ কোথায় গেল আমার! ... কোথায়! ..নিশ্চয়, মমি-কেসের ডালা তোলার সময় নামিয়ে রেখেছিলাম!
খুব ভাল করেছি! আমার টর্চাটাও নষ্টা এখন? কি উপায়?
কাচ ভেঙেছে, বালব তো ভাঙেনি। দেখি, টর্চটা দাও আমার হাতে, অন্ধকারে রবিনের বাহুতে হাত রাখল মুসা।
সঙ্গীর হাতে টর্চ তুলে দিল রবিন।
টর্চের গায়ে বার দুই থাবা লাগাল মুসা। জোরে জোরে ঝাঁকুনি দিল বার কয়েক। সুইচ টিপল। জ্বলে উঠল বালব। নিভে গেল। আবার ঝাঁকুনি দিতেই আবার জ্বলল, মিটমিট করে। ম্লান আলো।
ঠিকমত ব্যাটারি কানেকশন পাচ্ছে না, মন্তব্য করল মুসা। তবে কাজ চালানো যাবে। এস, নামি।
ঘুরে ঘুরে নেমে গেছে সরু সিঁড়ি। আগে নেমে চলল। মুসা। তাকে অনুসরণ করল রবিন। শেষ হল সিঁড়ি। স্নান আলোয় দেখল, ছোট একটা ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে ওরা। দুদিকে দুটো দরজা। বেরোবে কোন দরজা দিয়ে?
সিদ্ধান্ত নিয়ে একটা দরজার দিকে পা বাড়াল রবিন। সঙ্গে সঙ্গে তার বাহু খামছে ধরল মুসা। শুনিছা শুনতে পাচ্ছ।
কান পাতল রবিন। সে-ও শুনতে পেল।
বাজনা। মৃদু, কাঁপা কাঁপা, বহুদূর থেকে আসছে যেন। প্রোজেকশন রুমের ভাঙা অর্গান পাইপ বাজছো অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। রবিন। হঠাৎ করেই।
ওদিক থেকে আসছে, আঙুল তুলে একটা দরজা দেখিয়ে বলল মুসা।
তাহলে চল ওদিকে যাই। উল্টো দিকের আরেকটা দরজা দেখাল। রবিন।
না, ওটা দিয়েই যাওয়া উচিত, আগের দরজাটা আবার দেখাল মুসা। নিশ্চয় প্রোজেকশন রুমে ঢুকব গিয়ে। ঘরটা চেনা। অচেনা কোন ঘরে ঢুকতে আর রাজি নই। আমি। এখন তো নয়ই।

দরজা খুলল মুসা। অন্ধকার একটা ঘরে ঢুকল দুজনে। স্নান আলোয় পথ দেখে এগিয়ে চলল। বাড়ছে বাজনার শব্দ। এখনও অনেক দূরে মনে হচ্ছে। তীক্ষ্ণ ক্যাঁচক্যাঁচ। আর চাপা চিৎকার কেমন ভূতুড়ে করে তুলেছে। অর্গানের বাজনাকো এগিয়ে চলেছে দুজনে। সামনে মুসা। তার ঠিক পেছনেই রবিন। যতই এগোচ্ছে, বাড়ছে অস্বস্তি-বোধ।

হলের শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়াল ওরা। একটা দরজা। ঠেলে দিল মুসা। খুলে গেল পাল্লা। প্রোজেকশন রুমে ঢুকল দুজনে।

সামনেই পোড়ে আছে সারি সারি চেয়ার। ম্লান আলোয় সামনের কয়েকটা চেয়ার দেখা যাচ্ছে। আবছাভাবে। অর্গান পাইপটা রয়েছে। অন্য প্রান্তে। অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না। যেদিক থেকে বাজনার শব্দ আসছে, সেদিকে তাকাল মুসা। খপ করে চেপে ধরল রবিনের একটা হাত।

রবিনও তাকাল। স্থির হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। মেঝের ফুট চারেক উঁচুতে বাতাসে ঝুলে আছে অদ্ভুত নীল আলো। নির্দিষ্ট কোন আকার নেই। মুহূর্তে মুহূর্তে বিভিন্ন আকৃতি নিচ্ছে আলোটা, কাঁপছে থিরথির করে। ক্রমেই বাড়ছে অর্গান পাইপের বাজনা, সেই সঙ্গে তীক্ষা ক্যাঁচকোঁচ। আর চাপা চিৎকার যেন সঙ্গত করছে।

নীল ভূতা ফিসফিস করে বলল রবিন। অস্বস্তিবোধ উৎকণ্ঠায় রূপ নিয়েছে। ভয়ে বুক কাঁপছে দুরু-দুরু। তীব্র আতঙ্কে রূপ নিতে বেশি দেরি নেই। আর। কোন দরজা দিয়ে গেলে ইকো রুমে যাওয়া যায়, আন্দাজ করে নিল ওরা। ছুটল।

ধাক্কা দিয়ে পাল্লা খুলে ফেলল। মুসা। প্রায় ছিটকে এসে পড়ল ইকো রুমে। হলের দিকে ছুটল।

হল, সদর দরজা পেরিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এল দুজনে তবু থামল না। সিঁড়ি টপকে নেমে চলল। মুসার সঙ্গে পেরে উঠছে না। রবিন, পা ভাঙা। পেছনে পড়ে গেল সে।

খিঁচে দৌড়াচ্ছে মুসা। পা টেনে টেনে যত জোরে সম্ভব, ছুটছে রবিন।

অন্ধকার। ঢাল বেয়ে নামতে নামতে হঠাৎ পা পিছলাল রবিন। হুমড়ি খেয়ে পড়ল। বার দুই ডিগবাজি খেল, তারপর গড়াতে শুরু করল। তার দেহ। কিছুতেই ঠেকাতে পারছে না। কয়েক গড়ান দিয়ে একটা পাথরের ভূপে এসে ধাক্কা খেয়ে থেমে গেল দেহটা। কান্নার মত ফোঁপানি বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে।

ধরেই নিয়েছে। রবিন, পেছনে তাড়া করে আসছে নীল অশরীরী। অপেক্ষা করছে। ওটার জন্যে। বুকের ভেতরে হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে যেন। হাপরের মত ওঠা নামা করছে বুক।

শব্দটা হঠাৎ কানে এল রবিনের। পায়ের আওয়াজ। চাপা। এক কদম... দুই কদম করে এগিয়ে আসছে। নিশ্চয় নীল ভূতা অন্ধকারে খুঁজছে তাকো

থামছে না, এগিয়েই আসছে শব্দটা। কাছে, আরও কাছে। ঠিক পেছনে। থেমে গেল শব্দ।
ফিরে চাইবার সাহস নেই রবিনের। পাথরে মুখ গুজে পড়ে আছে।
দীর্ঘ একটা মুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল মূর্তিটা। তার শ্বাস ফেলার চাপা ফোঁস ফোঁস কানে আসছে। রবিনের। হঠাৎ পিঠে ছোঁয়া লাগল, হাতের তালুর আলতো চাপ। তারপর আলতো ঘষা, ধীরে ধীরে ওপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। নিশ্চয় গলা খুঁজছে, আন্দাজ করল রবিন। নড়ার শক্তি নেই যেন, অবশ আসছে দেহ।
ঘাড়ের কাছে এসে থামল হাতটা। চাপ বাড়ল একটু। চেঁচিয়ে উঠল। রবিন। তীক্ষ্ণ তীব্র চিৎকারে খান খান হয়ে ভেঙে গেল অখণ্ড নীরবতা। প্রতিধ্বনি তুলল পাহাড়ে পাহাড়ে বাড়ি খেয়ে।
তারপর? নীল ভূত তোমার ঘাড়ে হাত রাখল, তারপর কি হল? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
হেডকোয়ার্টারে বসে আছে তিন গোয়েন্দা। তিন দিন পর আবার এক জায়গায় মিলতে পেরেছে তিনজনে। বাবা-মার সঙ্গে স্যান ফ্রান্সিসকোয় আত্মীয়ের বাড়ি গিয়েছিল মুসা। লাইব্রেরিতে কাজের চাপ পড়েছিল রবিনের। এক সহকমী ছুটি নিয়েছিল, ফলে দুজনের কাজ একাই করতে হয়েছে তাকে। কিশোর পড়েছিল বিছানায়, একনাগাড়ে তিনটে দিন। কথা বলার কেউ ছিল না। খালি বই পড়ে কাটিয়েছে।
তারপর কি হল, বললে না? রবিনকে চুপ করে থাকতে দেখে আবার জিজ্ঞেস করল। কিশোর।
মানে.আমি চেঁচিয়ে উঠার পর? ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করতে চাইছে না। রবিন, বোঝা যাচ্ছে।
নিশ্চয়। চেঁচিয়ে উঠলে, তারপর?
মুসাকেই জিজ্ঞেস কর না, এড়িয়ে যেতে চাইছে। রবিন। ও- ও তো ছিল সঙ্গে।
ঠিক আছে। মুসা, কি ঘটেছিল?
ঢোক গিলল একবার মুসা। ইয়ে…আমি পড়লাম…মানে…
পড়ল। তো রবিন, তুমি পড়লে কি করে?
ওর ঘাড়ে হাত রাখতেই চেঁচিয়ে উঠল। জোরে লাথি মেরে বসল আমার পায়ে। পায়ের তলায় পাথর ছিল, সামলাতে পারলাম না। পড়ে গেলাম ওর পিঠে। নিচে পড়ে ছটফট করতে লাগল ও, একেবেঁকে সরে যাবার চেষ্টা করল। গলা ফাটিয়ে চোঁচাতে লাগল। বললঃ আমাকে ছেড়ে দাও, ভূত, প্লাজ! খামোকা ছুচো মেরে হাত গন্ধ করবে কেন…
কক্ষণো বলিনি। আমি একথা! চেঁচিয়ে প্রতিবাদ করল রবিন।

হ্যাঁ, বলেছ। ভুলে গেছ এখন।
না, বলিনি!
বললেই বা কি হয়েছে? রবিনের পক্ষ নিল কিশোর। ওর সাহস আছে, স্বীকার করতেই হবে। ওই অবস্থায় আমি পড়লেও ভয় পেতাম। ও তো প্যান্ট খারাপ করেনি। হ্যাঁ, তারপর?
জোরে জোরে বললাম, অত ভয় পাবার কিছু নেই। আমি মুসা। আমার কথা কানেই ঢুকাল না যেন রবিনের। কানের কাছে মুখ নিয়ে চোঁচাতে তবে থামল। শান্ত হল। ওকে ধরে তুললাম।
ইচ্ছে করেই ভয় পাওয়ানোর চেষ্টা করেছ। আমাকে তুমি! রবিনের গলায় অনুযোগ।
কসম খোদার, রবিন, তোমাকে ভয় পাওয়াব কি, আমারই তো অবস্থা তখন কাহিল। পেছন ফিরে দেখলাম তুমি নেই। ফিরতেই হল। খুব ভয়ে ভয়ে পা ফেলেছি। সারাক্ষণই মনে হয়েছে, এই বুঝি ধরল এসে নীল ভূতের বাচ্চা।
দুজনেই তাকাল কিশোরের দিকে।
ওদের কথা শুনছে না গোয়েন্দাপ্রধান। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে চুপচাপ।
দুজনেই উঠে দাঁড়ালে তোমরা, তারপর? হঠাৎ প্রশ্ন করল কিশোর। আবিষ্কার করলে আতঙ্ক, ভয়, কিছুই নেই। এমনকি অস্বস্তিবোধও চলে গেছে, তাই না?
চাওয়া চাওয়ি করল মুসা আর রবিন। কি করে আন্দাজ করল। কিশোর? এই কথাটা সব শেষে বলে চমকে দেবে প্রধানকে, ভেবে রেখেছে ওরা।
ঠিক, জবাব দিল মুসা। কিন্তু তুমি জানলে কি করে?
মুসার প্রশ্নটা যেন শুনতেই পায়নি। কিশোর। আপনমনে বলল, তারমানে, টেরর ক্যাসলের বাইরে এলেই চলে যায়। ওসব অনুভূতি গুড। একটা কাজের কাজ করে এসেছি।
তাই? রবিনের প্রশ্ন।
তাই। হ্যাঁ, ছবিগুলো নিশ্চয় শুকিয়েছে এতক্ষণে। আন না, দেখি। নাহ, জ্বলিয়ে মারবে চাচা ভেন্টিলেটর বন্ধ করতে উঠে গেল কিশোর।
অর্গান পাইপ বসানোর কাজ শেষ করে ফেলেছেন রাশেদ চাচা। বোরিস আর রাভার তাঁকে সাহায্য করেছে। কিশোরও করেছে, বিছানায় শুয়ে শুয়ে। অর্গান পাইপের ওপর লেখা একটা বই খুঁটিয়ে পড়েছে সে। চাচাকে জানিয়েছে, কোন জোড়াটা কোথায় কিভাবে লাগাতে হবে। কাজ শেষ করেই বাজাতে বসে গেছে। চাচা। ইয়ার্ডের আর সব কাজ বাদ দিয়ে তাঁর সঙ্গে জুটেছে বোরিস আর রোভার।
আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে বাজছে অর্গান। ভয়াবহ। আওয়াজ। আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি-র সুর বাজানোর চেষ্টা করছেন চাচা আনাড়ি

হাতে। ঠিক হচ্ছে না। তবু তালে তালে মাথা দোলাচ্ছে দুই ব্যাভারিয়ান ভাই। তারিফ করছে সুরের। ওদের ধারণা, বাদক হিসেবে জুড়ি নেই রাশেদ পাশার।
শব্দের ধাক্কায় কাঁপছে পুরো ইয়ার্ড। ট্রেলারের ছাতের খোলা ভেন্টিলেটর দিয়ে আসছে আওয়াজ। কান ঝালাপালা করে দিতে চাইছে। সুর চড়া পর্দায় যখন উঠছে, থারথার করে কেঁপে উঠছে। ট্রেলারের দেয়াল।
ভেন্টিলেটর বন্ধ করে দিয়ে ফিরে এল কিশোর।
ডার্করুম থেকে ছবি নিয়ে ফিরল রবিন।
ছবি পরীক্ষা করে দেখতে বসল। কিশোর। ভেজা ভেজা রয়েছে এখনও। একটা করে ছবি টেনে নিয়ে বড় রীডিং গ্লাসের তলায় ফেলছে সে, ভাল করে দেখছে, তারপর ঠেলে দিচ্ছে রবিন আর মুসার দিকে।
অনেক সময় লাগিয়ে পরীক্ষা করল আর্মার সুট আর জন ফিলবির লাইব্রেরির ছবি। মুখ না তুলেই বলল, ভাল ছবি তুলেছ, রবিন। তবে আসল কাজটাই পারনি। নীল ভূতের ছবি তোলা দরকার ছিল।
ভাল বলেছ! অন্ধকারে কয়েক ডজন চেয়ার ডিঙিয়ে অর্গানের কাছে। যাই। ছবি তোলার আগেই তো আমার ঘাড়টা মটকে দিত নীল হারামজাদা!
পালাতে পেরেছি। এই যথেষ্ট, আবার ছবি! যোগ করল মুসা। তীব্র আতঙ্ক চেপে ধরেছে। দিশেহারা হয়ে পড়েছি। তুমিও ছবি তুলতে পারতে না তখন।
ঠিকই, পারতাম না, স্বীকার করল কিশোর। আতঙ্কিত হয়ে পড়লে মাথার ঠিক থাকে না। তবে, তুলে আনা গেলে খুব সুবিধে হত। কিনারা করা যেত রহস্যটার।
চুপ করে রইল মুসা আর রবিন।
অদ্ভুত একটা ব্যাপার ভেবে দেখেছ? বলল কিশোর। টেরর ক্যাসলের ভূত সূর্য ডোবার আগেই দেখা দিয়েছে।
কিন্তু ক্যাসেলের ভেতরে অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল, প্রতিবাদ করল মুসা। বেড়ালেও দেখতে পেত কিনা সন্দেহ!
তবু, বাইরে তখনও সূর্য ডোবেনি। রাত নামার আগে ভূত বেরিয়েছে, এমন শোনা যায়নি। কখনও। যাকগে। ওসব নিয়ে পরে ভাবা যাবে। এখন ছবিগুলো দেখি।
আর্মর সুটের ছবির দিকে আবার চাইল কিশোর। এখনও চকচকে আছে সুন্টটা। মরচে পড়েনি।
ঠিকই, সায় দিল রবি। দুয়েকটা জোড়ায় মরচে দেখেছি শুধু। এছাড়া পুরো সুটটাই চকচকে।
আর এই যে, লাইব্রেরির বইগুলো। ধুলোয় মাখামাখি হয়ে থাকার কথা ছিল। নেই।

হালকা ধুলো ছিল, বলল মুসা। তবে অনেক দিন পড়ে থাকলে যতটা থাকার কথা, ততটা নয়।
হুমম! মমি-কেসে রাখা কঙ্কালের ছবিটা টেনে নিল কিশোর। নিজের কঙ্কাল উপহার দেয়া! সত্যি অদ্ভুত।
ঠিক এই সময় দাড়াম করে শব্দ হল একটা! জঞ্জালের স্তুপ থেকে লোহার ভারি কিছু খসে পড়েছে, আছড়ে পড়েছে ট্রেলারের গায়ে। কারণ-অর্গান পাইপ। আরও জোরে বাজছে এখন।
সর্বনাশ! চেঁচিয়ে উঠল মুসা। ভূমিকম্প শুরু হবে!
কান খারাপ হয়ে গেল নাকি চাচারা ভুরু কোঁচকাল কিশোর। আর সইতে পারছি না! বেরিয়ে যেতে হবে! জিনিসটা দিয়েই বেরিয়ে পড়ব।
অপেক্ষা করে রইল রবিন আর মুসা, উৎসুক দৃষ্টি।
টেবিলের ড্রয়ার থেকে তিনটে লম্বা চক বের করল। কিশোর। সাধারণ চক। একটা নীল, একটা সবুজ, অন্যটা সাদা।
এগুলো কেন? জানতে চাইল মুসা।
আমাদের চিহ্ন রেখে যাবার জন্যে, বলতে বলতেই সাদা চক দিয়ে দেয়ালে বড় একটা প্রশ্নবোধক আকল কিশোর। সাদা প্রশ্নবোধক, আমার চিহ্ন। সবুজ রবিনের, আর নীল তোমার। কোথাও পথ হারিয়ে ফেললে, এই চিহ্ন রেখে যাব আমরা। কে হারিয়েছি, কোন পথ দিয়ে গেছি, খুব সহজেই বুঝতে পারব অন্য দুজন। অনুসরণ করা সহজ হবে।
দারুণ! বিড়বিড় করল মুসা। কিশোর, তোমার তুলনা হয় না!
অনেক সুবিধে এতে, মুসার কথায় কান দিল না কিশোর। দেয়াল, দরজা জানালার পাল্লা, কিংবা অন্য যে কোনখানে চক দিয়ে প্রশ্নবোধক আঁকতে পারব। আমরা। অন্য কারও চোখে পড়লেও তেমন কিছুই বুঝবে না। ভাববে, কোন দুষ্ট ছেলের খেয়াল। অথচ আমাদের কাছে এটা মহামূল্যবান। এখন থেকে যার যার রঙের চক বয়ে বেড়াব আমরা। কখনও কাছছাড়া করব না। ঠিক আছে?
মাথা কাত করে সায় জানাল অন্য দুজন।
আর হ্যাঁ, আসল কথায় এল কিশোর। মিস্টার ক্রিস্টোফারের অফিসে ফোন করেছিলাম, আজ সকালে। কেরি জানিয়েছে, আগামীকাল সকালে স্টাফদের নিয়ে মীটিঙে বসবেন। পরিচালক। সিদ্ধান্ত নেবেন, কোন ভূতুড়ে বাড়িতে ছবির শুটিং করবেন। তারমানে, কাল সকালের আগেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হবে। আমাদের। তার মানে...
না! চেঁচিয়ে উঠল মুসা। আমি পারব না! আমি আর যাব না। টেরর ক্যাসলে। শিওর, ওই বাড়িতে ভূত আছে। কোন প্রমাণের দরকার নেই আমার।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে অনেক ভেবেছি, মুসার কথায় কোনরকম ভাবান্তর হল না কিশোরের। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি, টেরর ক্যাসলে ভূত থাকলে, দেখে ছাড়ব। মিস্টার ক্রিস্টোফার কথা দিয়েছেন, আমাদের নাম প্রচার করবেন। এ-সুযোগ কিছুতেই হাতছাড়া করব না। আমি। তোমাদেরও করা উচিত হবে না। বাড়িতে বলে আসবে, আজ রাতে আর না-ও ফিরে যেতে পার। আবার ঢুকব আমরা টেরর ক্যাসলে। আজই ভেদ করব এর রহস্য।
চাঁদ নেই। গাঢ় অন্ধকারে ডুবে আছে। ব্ল্যাক ক্যানিয়ন। তারার আলোয় আবছা দেখা যাচ্ছে টেরর ক্যাসলের অবয়ব।
আরিকবাপারে, কি অন্ধকারা ফিসফিসিয়ে বলল কিশোর। যা থাকে কপালে, চল ঢুকে পড়ি।
মুসার হাতে নতুন টর্চ। হাত খরচের পয়সা বাঁচিয়ে কিনেছে। আগের টর্চাটা এখনও উদ্ধার করা যায়নি, নিশ্চয় পড়ে আছে মমিকেসের কাছে। টেরর ক্যাসলের লাইব্রেরিতে।
সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠতে শুরু করল দুজনে। এক পায়ে ব্যান্ডেজ বাঁধা, সামান্য খোঁড়াচ্ছে কিশোর। অখণ্ড নীরবতা। তাদের পায়ের চাপা শব্দই অনেক বেশি জোরাল মনে হচ্ছে। হঠাৎ কাছের একটা ছোট ঝোপের ভেতরে শব্দ হল। বেরিয়ে ছুটে পালাল কি যেন! টর্চের আলো ফেলল। মুসা। একটা খরগোশ।
মনে জানান দিয়েছে ব্যাটার, আজ গোলমাল হবে ক্যাসলে, বিড়বিড় করে বলল মুসা। বুদ্ধিমানের মত আগেই পালিয়ে যাচ্ছে।
কোন জবাব দিল না কিশোর। বারান্দা পেরিয়ে দরজার সামনে দাঁড়াল। টান দিল হাতল ধরে। এক চুল নড়ল না পাল্লা।
এস, হাত লাগাও, বলল কিশোর। আটকে গেছে দরজা।
দুজনে চেপে ধরল। পিতলের বড় হাতল। জোরে হ্যাঁচকা টান লাগল। খুলে চলে এল হাতল। টাল সামলাতে না পেরে ছিটকে পেছনে পড়ে গেল দুজনে।
উফফা ওপর থেকে কিশোরকে ঠেলে সরানোর চেষ্টা করে। বলল মুসা, সর সারা পেটের ওপর পড়েছা দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে আমার!
মুসার পেটের ওপর থেকে গড়িয়ে সরে এল কিশোর। উঠে দাঁড়াল।
মুসাও উঠল। টিপেটুপে দেখছে কোথাও ভেঙেছে কিনা বুকের পাঁজরী। নাহ, ঠিকই আছে মনে হচ্ছে।
মুসার কথায় কান নেই কিশোরের। টর্চের আলোয় পরীক্ষা করে দেখছে হাতলটা।
দেখেছ? বলল কিশোর। হাতলের ছিদ্রে আটকে আছে স্ক্রুগুলো। মাথার খাঁজে খোঁচার দাগ।

ঘষা লেগেছে হয়ত কোন কারণে। গত পনেরো দিনে অনেকবার টানা হয়েছে। ওটা ধরে। পুরানো জিনিস। সইতে পারেনি। খুলে এসেছে।
আমি অন্য কথা ভাবছি, বলল কিশোর। খুলে আসতে সাহায্য করা হয়নি তো? মানে, চিল করে রাখা হয়নি তো?
খালি সন্দোহা বলল মুসা। দরজা খুলতে না পারলে ভেতরে ঢুকব কি করে? ফিরেই যেতে হবে।
না। ঢোকার অন্য কোন পথ বের করতে হবে। ওই যে, পাশে আঙুল তুলে দেখোল কিশোর। জানালা। ওদিক দিয়ে চেষ্টা করে। দেখি, চিল।
বারান্দার এক প্রান্তে চলে এল দুজনে। দেয়ালে বড় বড় জানালা, ফ্রেঞ্চ উইন্ডো। আঙিনার দিকে মুখ করে আছে। মোট ছয়টা। ঠেলোঁঠুলে দেখল ওরা। পাঁচটাই ভেতর থেকে আটকানো। একটা পাল্লার ছিটিকিনি ভাঙা। আধইঞ্চি মত ফাঁকা হয়ে আছে। ধরে টান দিল। কিশোর। জোর লাগল না, হা হয়ে খুলে গেল পাল্লা। ভেতরে উঁকি দিল সে। গাঢ় অন্ধকার।
টর্চের আলো ফেলল। কিশোর। লম্বা একটা টেবিল চোখে পড়ল। চারপাশে চেয়ার। টেবিলের শেষ মাথায় কয়েকটা বাসন পড়ে আছে।
ডাইনিং রুম, নিচু গলায় বলল কিশোর। এদিক দিয়ে ঢুকতে পারব।
জানোলা টপকে ভেতরে এসে ঢুকল দুজনে। আলো ফেলে। দেখল কি কি আছে। ঘরের ভেতরে। দেয়ালের একপাশে বসানো কাঠের বড় দেয়াল আলমারি। পাশে কয়েকটা তাক।
দরজা কয়েকটা, বলল কিশোর। কোনটা দিয়ে যাব?
ফিরে গেলেই ভাল…ওরেকবাপারে! চেঁচিয়ে উঠল মুসা। কথা বেরোল না। আর। গলা টিপে ধরেছে যেন কেউ।
কি, ক্কি হল? কাছে সরে এল কিশোর।
ও-ওই যো তোতলাচ্ছে মুসা। ও-ওটা।
মুসার নির্দেশিত দিকে তাকাল কিশোর। স্থির হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। আবছা আলোয় দেখল, লম্বা একটা মেয়ে চেয়ে আছে তাদের দিকে। পরনে তিনশো বছর আগের পোশাক। গলায় দড়ির ফাঁস। দড়ির অন্য মাথা বুকের ওপর দিয়ে ঝুলছে, নেমে এসেছে মাটিতে।
আপলকে চেয়ে আছে মুসা আর কিশোর। মেয়েটাও চেয়ে আছে ওদের দিকে।
মুসা ধরেই নিয়েছে, ওটা প্রেতাত্মা। বাড়ি ছিল ইংল্যান্ডে। ফাঁসি দিয়ে মরেছে, ওই যার কথা বলেছে হ্যারি প্রাইস।
দীর্ঘ কয়েকটা মুহূর্ত। তারপর কিশোর বলল, আমি বললেই সরাসরি ওটার ওপর আলো ফেলবো ফেল!

নড়ে উঠল মেয়েটা। নড়ে উঠল একটা চকচকে কি যেন।
একই সঙ্গে ঘুরে গেল দুটো টর্চ।
কিন্তু কোথায় মেয়ে! একটা বড় আয়নার ওপর আলো পড়েছে। প্রতিফলিত হয়ে এসে লাগছে দুজনের চোখে।
আয়না অবাক গলায় বলল মুসা। তারমানে আমাদের পেছনে রয়েছে মেয়েটা।
পাই করে ঘুরল মুসা। আলো ফেলল। পেছন দিকে। নেই। কোন মেয়ে নেই। শুধু দেয়াল।
চলে গেছে। মুসার গলায় ভয়। আমিও যাচ্ছি। এই ভূতের আড্ডায় আর আমি নেই। পা বাড়ল সে।
দাঁড়াও! সঙ্গীর হাত চেপে ধরল। কিশোর। আয়নার দিকে চেয়েছিলাম আমরা। মেয়েটেয়ে নয়, চোখের ভুলও হতে পারে। বেশি তাড়াহুড়ো করে ফেলেছি। আরও সাবধান হওয়া উচিত ছিল আমাদের।
হলে না কেন? ক্যামেরা তো তোমার কাঁধেই। ছবি তুললে না কেন?
ভুলেই গিয়েছিলাম। ক্যামেরার কথা। নিজের ওপর ওপরই বিরক্ত কিশোর।
মনে থাকলেও লাভ হত না। ছবি ওঠে না ভুতের। ওরা অশরীরী। ভুতের।
ওরা তো অশরীরীর প্রতিবিম্ব হয় না, মনে করিয়ে দিল কিশোর। মানে দাঁড়াচ্ছে, সে অশরীরী নয়। আয়নার ভেতরে ছিল, তাই বা বিশ্বাস করি কি করে। আয়না-ভূতের কথা শুনিনি কখনও! আবার যদি দেখা দিত মেয়েটা।
দেখা না দিলেই ভাল, জোরে বলল মুসা, ভূতকে শোনাল যেন। আর দাঁড়িয়ে থেকে লাভ কি হবে? কি দেখবে? টেরর ক্যাসলে। ভূত আছে, এটা প্রমাণ হয়ে গেল। চল, ফিরে গিয়ে সব জানাই মিস্টার ক্রিস্টোফারকে।
এখুনি ফিরে যাব কি? মাত্র তো এলাম। আরও অনেক কিছু জানার আছে। নীল ভূতকে না দেখে যাব না। ছবি তুলব। ওটার, স্থির শান্ত গলা কিশোরের।
কিশোর ভয় পাচ্ছে না, সে অত ঘাবড়াচ্ছে কেন?—নিজেকে ধমক লাগাল মুসা। কাঁধ ঝাঁকাল। ঠিক আছে। আচ্ছা, এক কাজ করলে তো পারি? এ ঘর থেকেই চকের চিহ্ন রেখে যাই আমরা।
ঠিক বলেছা হল কি আমার! সব খালি ভুলে যাচ্ছি।
খোলা জানালাটার কাছে এগিয়ে গেল কিশোর। এটা দিয়েই ঢুকেছে। ওরা। পাল্লায় বড় করে একটা প্রশ্নবোধক আকল। ডাইনিং টেবিলে আকল একটা। তারপর গিয়ে দাঁড়াল আয়নার সামনে। প্রশ্নবোধক আঁকবে। আমরা এ ঘরে ছিলাম, জানবে হ্যানসন আর রবিন।
আমরা আর ফিরে না গেলে, তখন তো? প্রশ্ন করল মুসা।

জবাব দিল না কিশোর। আয়নায় প্রশ্নবোধক আকার চেষ্টা করল। প্রথমবারে চকের দাগ বসল না ঠিকমত। দ্বিতীয়বার জোরে চাপ দিয়ে আঁকতে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঘটল একটা অদ্ভুত কাণ্ড। নিঃশব্দে পেছনে সরে গেল আয়না, দরজার পাল্লার মত। ওপাশে প্যাসেজ। গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা।
অবাক হয়ে অন্ধকার প্যাসেজের দিকে চেয়ে আছে দুজন।
ইয়াল্লা বলে উঠল মুসা। একটা গোপন পথ!
আয়নার পেছনে লুকানো! ভুরু কুঁচকে গেছে কিশোরের। ভেতরে ঢুকব, দেখব, কি আছে।
মুসা প্রতিবাদ করার আগেই প্যাসেজে পা রাখল কিশোর। টর্চের আলোয় দেখা গেল, সরু লম্বা একটা প্যাসেজ। দুপাশে অমসৃণ পাথরের দেয়াল। প্যাসেজের শেষ মাথায় একটা দরজা।
এস, ফিরে মুসাকে ডাকল কিশোর। কোথায় আমাদেরকে নিয়ে যায় প্যাসেজটা, দেখি।
দ্বিধায় পড়ে গেল মুসা। প্যাসেজে ঢোকাটা মোটেই পছন্দ হচ্ছে না। তার। এদিকে অন্ধকার ঘরে একা থাকতেও চায় না। শেষে ঢুকেই পড়ল।
আলো ফেলে দুপাশের দেয়াল দেখল কিশোর। আয়না বসানো দরজাটা পরীক্ষা করল। সাধারণ দরজা, কাঠের পাল্লা। এক পাশে পাল্লার সমান একটা আয়না বসানো। কোন নব নেই, ছিটিকিনি নেই।
আশ্চর্য! বিড়বিড় করল কিশোর। বন্ধ করে আবার খোলে কি করো নিশ্চয় গোপন কোন ব্যবস্থা আছে।
ঠেলে পাল্লাটা বন্ধ করে দিল কিশোর। মোলায়েম একটা ক্লিক করে আটকে গেল পাল্লা।
সেরেছো? চেঁচিয়ে উঠল মুসা। বন্দি হয়ে গেলাম!
হুমম। আপনমনেই মাথা দোলাল কিশোর। পাল্লার ধারে আঙুল চালিয়ে দেখল, কোন খাঁজ আছে কিনা, ধরে টান দেয়া যায় কিনা। কিছু নেই। দরজার ফ্রেম, পাল্লা মসৃণ করে চাঁছা। ফ্রেমের মধ্যে নিখুঁত ভাবে বসে গেছে পাল্লাটা, ফাঁক নেই।
কোন না কোন উপায় আছেই খোলার, বিড়বিড় করল। কিশোর। ওপাশ থেকে তো খুব সহজেই খুলে গেলা ব্যাপারটা কি?
সেটা তুমি বোঝ, বলল মুসা। আবার সহজে খুলে গেলেই বাঁচি বেরিয়ে যেতে আমি।
বেশি পুরু না। ভাঙার দরকার পড়বে মনে হয় না। প্যাসেজের আরেক দিকে তো পথ রয়েছেই।

কিছু একটা বলতে গিয়েও থেমে গেল মুসা। ঘুরে রওনা হয়ে গেছে গোয়েন্দাপ্রধান।
এক পা দুপা করে এগিয়ে চলেছে। নিরেট, এক সময় বলল সে। হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। শুনতে পাচ্ছি।
দাঁড়িয়ে পড়ল। মুসাও। কান পাতল।
অর্গান বাজছে। বহুদূর থেকে ভেসে আসছে যেন শব্দটা। কাঁপা কাঁপা। সেই সঙ্গে মিশেছে তীক্ষ্ম ক্যাঁচকোচ আর চাপা চিৎকার। এর আগের বার যেমন শুনেছিল মুসা, ঠিক তেমনি। পরিবর্তন নেই।
নীল ভুতা চাপা গলায় বলল গোয়েন্দা সহকারী। অর্গান বাজাচ্ছে!
একদিকের দেয়ালে কান চেপে ধরল। কিশোর। ধরে রইল। দীর্ঘ এক সেকেণ্ড। সরে এল। দেয়াল ভেদ করেই যেন আসছে। আওয়াজ! মানে কি? দেয়ালের ঠিক ওপাশেই আছে। অর্গানটা।
বলতে চাইছ, এই দেয়ালের ওপাশেই আছে ভূতটা আঁতকে উঠল মুসা।
আমার তাই ধারণা, বলল কিশোর। যে করেই হোক, আজ ওর ছবি তুলবই। সম্ভব হলে কথাও বলব।
কথা বলবে? গোঙানি বেরোল মুসার গলা থেকে। ভূতের সঙ্গে কথা বলবে!
যদি ধরতে পারি।
আমরা ধরার আগেই যদি আমাদেরকে ধরে? ঘাড় মটকে দেয়?
সে-ভয় কম, জোর দিয়ে বলল কিশোর। এ-পর্যন্ত কারও কোন ক্ষতি করেনি। ওটা। রেকর্ড নেই। এর ওপর অনেকখানি নির্ভর করছি আমি। বিছানায় শুয়ে শুয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেক ভেবেছি। একটা ধারণা জন্মেছে মনে। পরীক্ষা করে দেখব। আজ। আর খানিক পরেই জানব, ধারণাটা ঠিক কিনা।
যদি ভুল হয়? হঠাৎ যদি আজ ঠিক করে ভূতটা, তার দল বাড়াবে, তাহলে?
তখন মেনে নেব ভুল করেছি, শান্ত গলায় বলল কিশোর। একটা আগাম কথা বলছি। আর কয়েক মুহূর্ত পরেই তীব্র আতঙ্ক এসে চেপে ধরবে। আমাদেরকে।
কয়েক মুহূর্ত পরো প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মুসা। তাহলে এখন কি বোধ করছি?
অস্বস্তি।
চল পালাই। দুজনে ছুটে গিয়ে ধাক্কা দিলে ভেঙে যাবে পাল্লা। লাগবে ছুট?
না, মুসার হাত চেপে ধরল। কিশোর। অস্বস্তি, ভয় কিংবা আতঙ্ক কারও কোন ক্ষতি করে না। ওগুলো এক ধরনের অনুভূতি। আতঙ্কিত হয়ে উল্টোপাল্টা কিছু করে না বসলে, কোন ক্ষতিই হবে না তোমার।
জবাবে কিছু একটা বলতে গিয়েও থেমে গেল মুসা। অদ্ভুত এক পরিবর্তন ঘটছে প্যাসেজে। বাজনার শব্দ আর নিজেদের কথাবার্তায় মগ্ন থাকায় এতক্ষণ খেয়াল

করেনি। ব্যাপারটা। কুয়াশা! আজব এক ধরনের ধোঁয়াটে কুয়াশা উদয় হয়েছে হঠাৎ । মেঝেতে কুয়াশা, দেয়ালের ধার ঘেঁষে কুয়াশা, সিলিঙে কুয়াশা।
ওপরে নিচে আলো ফেলল। মুসা। উজ্জ্বল আলোয় দেখা গেল, পাক খাচ্ছে কুয়াশা, কুণ্ডলী পাকিয়ে ভাসছে বাতাসে। কোথা থেকে আসছে, বোঝা যাচ্ছে না। বাড়ছে ধীরে ধীরে কুয়াশার ভেতর অদ্ভুত কিছু আকৃতি দেখতে পেল যেন সে।
দেখ দেখা কাঁপা গলায় বলল মুসা। বিচ্ছিরি সব মুখ্যা ওই, ওই যে একটা ড্রাগন. একটা বাঘ. ওরেকবাপারে! ভয়ানক এক জলদস্যু…
থাম! বাধা দিয়ে বলল কিশোর। আমিও দেখছি ওসব ছাতে বসে ভেসে যাওয়া মেঘের দিকে চাইলেও দেখতে পাবে ওই কাণ্ড। এই কুয়াশা কোন ক্ষতি করবে বলে মনে হয় না। তবে আতঙ্ক আসছে।
সঙ্গীর হাতে হাতের চাপ বাড়াল কিশোর। কিশোরের হাত চেপে ধরল মুসা। ঠিকই বলেছে গোয়েন্দাপ্রধান। হঠাৎ তীব্র আতঙ্ক এসে ভর করল মনে, ছড়িয়ে পড়তে লাগল যেন সারা শরীরে। পায়ের তালু থেকে মাথার চাঁদি পর্যন্ত সব জায়গায়। অদ্ভুত শিরশিরে এক অনুভূতি চামড়ায়, কুঁচকে যাবে যেন। ছুটে পালাতে চাইছে সে। শক্ত করে তার হাত ধরে রেখেছে কিশোর, যেতে দিচ্ছে না। একই অনুভূতি হচ্ছে কিশোরেরও, কিন্তু পাথরের মত অটল দাঁড়িয়ে আছে সে।
আতঙ্কের একটা স্রোতের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে যেন ওরা। খেয়াল করল, কুয়াশা বাড়ছে, ঘন হচ্ছে। কুণ্ডলী পাকাচ্ছে, ঘুরছে ফিরছে, ভাসছে বাতাসে। সৃষ্টি করছে আজব আজব সব আকৃতি। কুয়াশাতঙ্ক, অল্প অল্প কাঁপছে কিশোরের গলা। কিন্তু মুসার বাহুতে আঙুলের বাঁধন শিথিল হচ্ছে না। সামান্যতম। অনেক বছর আগে এখানে ঢুকে এর কবলে পড়েছিল কে একজন। রেকর্ড আছে। লোক তাড়ানোর শেষ অস্ত্র টেরর ক্যাসলের। চল, ওপাশ দিয়ে বেরিয়ে পড়ি এবার। নীল ভূতকে ধরতে হবে। ও হয়ত ভেবে বসে আছে, এতক্ষণে ভয়ে অবশ হয়ে গেছি আমরা।
আমি যাব না, কোনমতে বলল মুসা। দাঁতে দাঁত ঠোকাঠুকি করছে। আমার শরীর অবশ্য কিছুতেই পা নাড়াতে পারছি না!
কি ভাবল কিশোর। তারপর বলল, শোন, খামোকা ভয় পেয় না। ভাবনা-চিন্তা করে কি বুঝেছি আমি জান? বুঝেছি, টেরর ক্যাসল সত্যিই ভূতুড়ে…
সেকথাই তো তোমাকে বোঝাতে চেয়েছি। এত দিন।
…তবে ভূতুড়ে করে তোলার পেছনে রয়েছে। একজন মানুষ। জীবন্ত মানুষ। জন ফিলবি নিজে। যে আত্মহত্যা করেছে বলে লোকের ধারণা।
বল কি? এতই অবাক হয়েছে মুসা, আতঙ্ক ভুলে গেছে।
ঠিকই বলছি। ভূত সেজে এতগুলো বছর বাস করে আসছে টেরার ক্যাসলে। লোককে ভয় দেখিয়ে তাড়িয়েছে।

কিন্তু তা কি করে হয়? বিশ্বাস করতে পারছে না মুসা। আমরাও তো কয়েকবার ঢুকলাম ক্যাসলে। কখনও তার দেখা পাইনি। তাছাড়া খাবার? লোকের চোখ এড়িয়ে কি করে জোগাড় করে?
জানি না। দেখা হলে জিজ্ঞেস করব। আসলে লোককে ভয় দেখিয়ে তাড়ানো পর্যন্তই, এর বেশি কিছু করে না সে। কারও কোন ক্ষতি করে না। ক্যাসলটা তার দখলে থাকলেই খুশি। আতঙ্ক গেছে?
আরো হ্যাঁ! চলে গেছে! আর ভয় পাচ্ছি না। পা-ও উঠছে। যেদিকে নিয়ে যাব, যাবে।
চল তাহলে। নীল ভূতের সঙ্গে দেখা করি।
পা বাড়াল কিশোর। পেছনে চলল। মুসা। ভয় কেটে গেছে। অবাক হয়ে ভাবছে, এতগুলো বছর একা টেরর ক্যাসলে কি করে বাস করল। জন ফিলবি আরও অনেক প্রশ্ন এসে ভিড় করছে মনে, কিন্তু জবাব খুঁজে পাচ্ছে না ওগুলোর।
প্যাসেজের শেষ মাথায় দরজার কাছে চলে এল ওরা। অবাক কাণ্ড ধাক্কা দিতেই খুলে গেল পাল্লা। ওপাশে গাঢ় অন্ধকার। কি আছে না আছে, আলো না জ্বেলে বোঝার উপায় নেই। হঠাৎ বেড়ে গেল যেন বাজনার শব্দ। দেয়ালে প্রতিহত হচ্ছে। একটা বড় ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে ওরা।
প্রোজেকশনরুম, ফিসফিস করে মুসার কানের কাছে বলল কিশোর। আলো জ্বেল না। চমকে দিতে হবে ওকে।
দেয়ালের ধার ঘেঁষে পাশাপাশি এগিয়ে চলল দুজনে। একটা কোণে এসে ঠেকল। হঠাৎ গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল মুসা। নরম হালকা কিছু একটা তার মুখ-মাথা পেচিয়ে ধরেছে। টেনে সরাতে গিয়েই বুঝল, মখমলের ছেড়া পর্দার কাপড়।
কোণ ঘুরে আবার এগোল ওরা। কয়েক পা এগিয়েই থমকে দাঁড়াল কিশোর। হাত চেপে ধরল মুসা। ভাঙা অর্গানের সামনে নড়াচড়া করছে স্নান নীল আলো। অন্ধকারেই বুঝতে পারল মুসা, ক্যামেরা রেডি করছে তার সঙ্গী।
পা টিপে টিপে এগোবে, ফিসফিস করে বলল কিশোর। ওর ঠিক পেছনে গিয়ে দাঁড়াব। ছবি তুলব।
কাঁপা কাঁপা আলোটার দিকে চেয়ে রইল মুসা। হঠাৎই দুঃখ হল জন ফিলবির জন্যে। বেচারা এতগুলো বছর নিরাপদে কাটিয়ে বুড়ো বয়েসে একটা ধাক্কা খাবে। মুখোশ খুলে যাবে টেরর ক্যাসলের ভূতের।
ওকে ভয় পাইয়ে দিতে হবে, ফিসফিসিয়ে বলল মুসা। নাম ধরে ডাকলেই তো পারি। বোঝাতে পারি, আমরা ওর শত্রু নই, বন্ধু।
ভাল কথা, সায় দিল কিশোর। তবে এখন না। আরও কাছে গিয়ে ডাকব।
নীল আলোর দিকে আবার এগিয়ে চলল ওরা।

মিস্টার ফিলবি! হঠাৎ জোরে ডাক দিল কিশোর। মিস্টার ফিলবি, আমরা আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই। বন্ধু।
কিছুই ঘটল না। বেজেই চলল। অর্গান, কাঁপতে থাকল নীল আলো।
মিসটার ফিলবি আরও কয়েক পা এগিয়ে আবার ডাকল কিশোর। আমি কিশোর পাশা। আমার সঙ্গে মুসা আমান। আপনার সঙ্গে শুধু কথা বলতে চাই।
থেমে গেল বাজনা।
জোরে কেঁপে উঠল একবার আলোটা। তারপর চলতে শুরু করল। ধীরে ধীরে উঠে যাচ্ছে উপরের দিকে। ছাতের কাছে গিয়ে বুলে রইল।
আলোটার দিকে চেয়ে আছে কিশোর আর মুসা। এই সময়ই টের পেল, কেউ এসে দাঁড়িয়েছে তাদের পেছনে। ওরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই ঘটল ঘটনা। ক্যামেরা হাতেই ধরা রইল। কিশোরের। জ্বলে উঠল মুসার হাতের টর্চ। জালে আটকা পড়ে গেল দুজনে। মাথার ওপর থেকে নেমে এসেছে জাল। এতই আচমকা, কিছু করারই সুযোগ পেল না। ওরা। কাছেই দাঁড়িয়ে আছে দুজন আরব।
ছুটতে গেল মুসা। জালের খোপে পা বেধে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। কার্পেটে ঢাকা মেঝেতে। পড়েই গড়ান খেল। পিছলে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করল জালের তলা থেকে। পারল না। আরও পেচিয়ে গেল। জালে আটকা পড়লে মাছের কেমন লাগে, অনুভব করতে পারল সে।
কি-শো-র! চেঁচিয়ে উঠল মুসা। আমাকে ছাড়াও!
সাড়া এল না।
ঘাড় ফেরাল মুসা। টার্চটা হাতেই ধরা আছে। জ্বালল আবার। বুঝল, কেন সাড়া দিল না কিশোর।
আরেকটা জালে তারই মত আটকে পড়েছে কিশোর। ময়দার বস্তার মত তকে তুলে নিয়েছে দুই আরব। একজন ধরেছে পায়ের দিক, আরেক জন কাঁধ। এগিয়ে যাচ্ছে দরজার দিকে।
জালের ভেতর আটকা পড়ে ছটফট করছে মুসা। নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হল। গড়াগড়ি করে ছাড়াতে গিয়ে আরও জড়িয়ে ফেলল। নিজেকে।
চিত হয়ে পড়ে রইল মুসা। ছাতের কাছে এখনও আছে নীল আলো। কাঁপছে। গোয়েন্দা সহকারীর করুণ অবস্থা দেখে নীরব হাসিতে ফেটে পড়ছে যেন।
ম্লান হতে হতে এক সময় মিলিয়ে গেল নীল আলো। গাঢ় অন্ধকার চেপে ধরল যেন মুসাকে। নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করল সে আরেকবার। পারল না। আরও বেশি শক্ত হল জালের জন্ট। টর্চটা খসে গেছে হাত থেকে। খুঁজে বের করার উপায় নেই।

কায়দামত আটকেছি—ভাবল মুসা। বুড়ো এক অভিনেতাকে ধরতে এসে নিজেরাই ধরা পড়ে গেছে। খুব সুবিধের লোক মনে হল না দুই আরবকে। ওরা তাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল অন্ধকারে।
হ্যানসন আর রবিনের কথা ভাবল মুসা। গিরিখাতে বাঁকের ওপাশে অপেক্ষা করছে ওরা। ওদের সঙ্গে কি আর কখনও দেখা হবে? আর কোন দিন কি বাড়ি ফিরে যেতে পারবে সে? মা-বাবার সঙ্গে দেখা হবে?
জীবনে এমন বিপদে আর পড়েনি মুসা। ভাবছে। এইসময় দেখা গেল আলো। এগিয়ে আসছে দুলেন্দুলে। কাছে এসে দাঁড়াল লম্বা এক লোক। হাতে একটা বৈদ্যুতিক লণ্ঠন। সিল্কের আলখেল্লা গায়ে।
বুকল লোকটা। হাতের লণ্ঠন তুলে ভাল করে দেখল মুসাকে। নিষ্ঠুর এক জোড়া চোখ, কেমন ঘোলাটে চাহনি।
হাসল লোকটা। ঝকঝাঁক করে উঠল সোনার দাঁত। বোকা ছেলে! আর সবার মত ভয় পেয়ে চলে গেলেই ভাল করতে। এখন মরবো। জবাই করার ভঙ্গিতে নিজের গলায় আঙুল চালাল লোকটা। বিচ্ছিরি ঘড়ঘড়ে একটা আওয়াজ করল।
ইঙ্গিতটা বুঝল মুসা। দুরুদুরু করে উঠল। বুকের ভেতর। কে আপনি? গলা দিয়ে কোলা ব্যাঙের আওয়াজ বেরোল তার। এখানে কি করছেন?
কি করছি? হাসল লোকটা। পাতালে গেলেই বুঝতে পারবে।
লণ্ঠন নামিয়ে রাখল লোকটা। উবু হয়ে দুহাতে ধরে তুলে নিল মুসাকে। যেন একটা কোলবালিশ, এমনি ভাবে, কাঁধে ফেলল মুসার ভারি দেহটা। লণ্ঠনটা আবার হাতে তুলে নিয়ে এগোল যেদিক থেকে এসেছিল।
কাঁধে ঝুলে থেকে চলেছে, কোথায় চলেছে, বুঝতে পারল না। মুসা। একটা দরজা পেরোল লোকটা, প্যাসেজ পেরোল। একটা সিঁড়ির মাথায় এসে পৌঁছুল। ঘুরে ঘুরে নেমে গেছে সিঁড়ি। নেমে চলল। লোকটা। অনেক ধাপ পেরিয়ে একটা করিডরে এসে পৌঁছুল। বাতাস ঠাণ্ডা, কেমন ভেজা ভেজা। করিডর পেরোল, আরও কয়েকটা দরজা পেরিয়ে এসে ছোট একটা ঘরে ঢুকল। জেলখানার সেলের মত ঘর। নিশ্চয় মাটির তলায় অনুমান করল মুসা। দেয়ালে গাঁথা মরচে পড়া কয়েকটা রিং-বোল্ট।
সাদা বস্তার মত কি একটা পড়ে আছে এক কোণে। কাছে বসে আছে। একজন আরব, বেঁটোটা। বিশাল এক ছুরিতে শান দিচ্ছে।
আবদাল কোথায়? আলখেল্লাধারী লোকটা জিজ্ঞেস করল। ধপাস করে সাদা বস্তাটার পাশে নামিয়ে রাখল মুসাকে।
সিলভিয়াকে ডাকতে গেছে, ভারি গলা আরবটার। ঘড়ঘড়ে আওয়াজ বেরোয় কথা বলার সময়। সিলভিয়া আর জিপসি কাটি লুকিয়ে রেখেছে মুক্তাগুলো।

ছেলেদুটোকে নিয়ে কি করা যায়, সবাই বসে আলোচনা করব।
কিছুই করার দরকার নেই। বলল এশিয়ান। এই ঘরে রেখে বাইরে থেকে দরজায় তালা দিয়ে চলে যাব। কেউ কখনও খুঁজে পাবে না ওদেরকে। মরে ভূত হয়ে যাবে শিগগিরই। টেরর ক্যাসল আগলে রাখবে।
মন্দ হবে না, হাসল আরব। গলায় কফ আটকে আছে যেন। তবে, ছুরিটায় কষ্ট করে শান দিয়েছি। একটু ব্যবহার না করলে কেমন দেখায়?
দেখছে মুসা, বুড়ো আঙ্গুলে ছুরির ধার পরীক্ষা করছে আরবটা। সামান্য নড়ে উঠল সাদা বস্তা। আড়চোখে দেখল মুসা। বুঝল, ওটা বস্তা নয়। জালে আটকানো গোয়েন্দাপ্রধান কিশোর পাশা।
বড় দেরি করেছ, বলল আরবটা। যাই দেখি সিলভিয়া কোথায়, উঠে দাঁড়াল সে। ছুরিটা ঢুকিয়ে রাখল কোমরের খাপে। একবার চাইল মেঝেতে পড়ে থাকা ছেলে দুটোর দিকে। আলখেল্লাধারীকে বলল, এস আমার সঙ্গে। গোপন পথটা পরিষ্কার করতে হবে। আমরা এসেছিলাম, তার কোন প্রমাণ থাকা চলবে না। এদেরকে নিয়ে ভাবনা নেই। বেরোতে পারবে না জাল থেকে।
ঠিক। তাড়াতাড়ি করা দরকার আমাদের, লণ্ঠনটা দেয়ালের বোল্ট রিঙে ঝোলাল আলখেল্লা। আলো পড়ছে এখন ছেলেদুটোর ওপর।
বেরিয়ে গেছে লোকদুটো। মিলিয়ে গেল ওদের পায়ের আওয়াজ। ভারি পাথর ঘষা লাগার আওয়াজ হল। তারপর সব চুপচাপ।
মুসা, ডাকল কিশোর, ঠিকঠাক আছ?
ঠিকঠাক বলতে কি বোঝাতে চাইছ? নিরস গলায় বলল মুসা। হাড়টাড় ভাঙেনি, এটুকু ঠিক আছি।
ভাল, কিশোরের গলায় ক্ষোভ, নিজের প্রতি! বোকার মত তোমাকে এই বিপদে এনে ফেললাম! নিজের বুদ্ধির ওপর খুব বেশি। ভরসা ছিল আমার!
খামোকা ভেবে মন খারাপ কোরো না, বলল মুসা। একদল ডাকাত এসে আস্তানা গেড়েছে টেরর ক্যাসলে, কি করে জানবে? কোন প্রমাণ তো পাওয়া যায়নি আগে।
হাঁ। আমি শিওর ছিলাম, টেরর ক্যাসলের সব কিছুর মূলে শুধু জন ফিলবি। কল্পনাই করিনি, আর কেউ থাকতে পারে। যা হবার হয়ে গেছে, ওসব নিয়ে ভেবে লাভ নেই। তা হাত-পা নাড়াতে পারছ কিছু?
পারছি। শুধু বাঁ হাতের কড়ে আঙুল।
আমি ডান হাত নাড়াতে পারছি, বলল কিশোর। নিজেকে ছাড়াতে পারব মনে হয়। ঠিক জায়গায় পোঁছাচ্ছি কিনা, দেখ।
কাত হয়ে পড়ে আছে কিশোর। মুসা আছে চিত হয়ে। শরীরিটাকে বান মাছের মত বাঁকিয়ে-চুরিয়ে অনেক কষ্টে কাত হল। কিশোরের পিঠ এখন তার দিকে। দেখল,

কোমরের বেল্টে আটকানো সুইস ছুরিটা খুলে ফেলতে পেরেছে কিশোর। বিভিন্ন আকারের ছোটবড় আটটা ব্লেড, ছোট একটা স্ক্রু-ড্রাইভার আর একটা কাঁচিও লাগানো আছে বিশেষ কায়দায়।
কাঁচি দিয়ে জালের কয়েকটা ঘর কেটে ফেলল। কিশোর। কাটা জায়গা দিয়ে বের করতে পারছে ডান হাত।
বাঁ পাশে কাটতে পোর। কিনা দেখ, ফিসফিস করে বলল মুসা। ওই হাতটা বের করতে পারলেই কেল্লা ফতে।
ছোট্ট কাঁচি। নাইলনের শক্ত সুতায় তৈরি জাল। এগোতে চাইছে না। কাজ। থামল না কিশোর। চেষ্টা চালিয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত মুক্ত করে ফেলল দুই হাত। কোমরের কাছে কাটা শুরু করল। নিচের দিকে ফুট খানেক কেটে ফেলেছে, এই সময় শোনা গেল পায়ের আওয়াজ। তাড়াতাড়ি কাটা জায়গাটা টেনে পিঠের দিকে নিয়ে গিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল সে। দুহাত ঢুকিয়ে নিল জালের ভেতর।
কয়েক মুহূর্ত পরেই ঘরে এসে ঢুকল এক বুড়ি। হাতে বৈদ্যুতিক লণ্ঠন। পরনে জিপসি আলখেল্লা। কানে সোনার বড় বড় রিঙ।
বেশ বেশ, হাঁসের মত প্যাঁকপ্যাঁক করে উঠল যেন বুড়িটা। খুব আরামেই আছ দেখছি, বাছারা। জিপসি কাটির হুঁসিয়ারি তো মানলে না, বিপদে পড়বেই। আমার কথা শুনলে আর এ-অবস্থা হত না।
লণ্ঠন তুলে দেখছে বুড়ি। হঠাৎই মনে হল তার, বড় বেশি স্থির হয়ে আছে ছেলেদুটো। কোন কথা বলছে না, নড়ছে না চড়ছে না। সন্দেহ হল। মুসার কাছে এসে দাঁড়াল। সন্দেহজনক কিছু দেখল না। ঘুরে কিশোরের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। তুমি একটু কাত হও তো বাছা, প্যাঁকপ্যাঁক করে উঠল। হাসের গলা। পারছি না? বেশ এই যে, আমি সাহায্য করছি। লণ্ঠনটা নামিয়ে রাখল সে।
জালের কাটা দেখে ফেলল বুড়ি। কিশোরের ডান হাতের কব্জি চেপে ধরল। মোচড় দিয়ে মুঠো থেকে নিয়ে নিল ছুরিটা। বাহ চমৎকারী পালানোর চেষ্টা করছিলে, ছানারাঃ হঠাৎ গলা চড়িয়ে ডাকল সে, সিলভি। দড়ি, দড়ি নিয়ে এস! শক্ত করে বাঁধতে হবে। ছানাদুটোকে, নইলে উড়ে যাবে।
আসছি, সাড়া এল মহিলাকণ্ঠে। কথায় ব্রিটিশ টান।
খানিক পরেই লম্বা একটা মেয়ে এসে দাঁড়াল দরজায়। হাতে দড়ির বাণ্ডিল।
চালাক, ভীষণ চালাক ছানাদুটো, বলল বুড়ি। শক্ত করে। বাঁধতে হবে। এস, সাহায্য করা আমাকে।
অসহায় ভাবে চেয়ে চেয়ে সব দেখল মুসা। কোন সাহায্যই করতে পারল না বন্ধুকে। কিশোরের মাথা, গলা আর পিঠের জাল কাটল ওরা প্রথমে। দুহাত পিঠের কাছে নিয়ে শক্ত করে বাঁধল দড়ি দিয়ে। টেনে হিঁচড়ে জল খুলে নিল।

তারপর বাঁধল পা। কব্জির বাঁধনের ওপর আরেক টুকরো দড়ি বাঁধল। একটা রিং বোল্টের সঙ্গে বেঁধে দিল দড়ির আরেক মাথা।
লম্বা এক টুকরো দড়ি দিয়ে মুসাকে বাঁধা হল এরপর। ওর জাল কাটা নেই কোন জায়গায়। কাজেই জাল ছাড়িয়ে নেবার দরকার মনে করল না বুড়ি। ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে আনল কয়েক প্যাঁচ। বেঁধে দিল দড়ির দুই প্রান্ত।
আর পালাতে পারবে না। ছানারা, বলল হাঁস-গলা। কোন দিনই আর বেরোতে পারবে না। এখান থেকে। ওরা জবাই করে। ফেলতে চাইছে, কিন্তু তার দরকার হবে বলে মনে হয় না। বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে গেলে, এই পাতাল থেকে কখনই আর বেরোতে পারবে না এরা।
আমার দুঃখ হচ্ছে ওদের জন্যে, বলল। ইংরেজ মেয়েটা। চেহারা দেখে ভাল ছেলে বলেই মনে হচ্ছে।
খামোকা দরদ দেখিও না, তীক্ষ্ণা হল হাঁসের গলা। সবাই একমত হয়েছে, ওদেরকে ছেড়ে দেয়া চলবে না। দলের সবার বিরুদ্ধে যেতে পার না তুমি। চল, কেটে পড়ি। সময়ই নেই। চিহ্নটিহ্নগুলো মুছে দিয়ে যেতে হবে। আবার।
দেয়ালে ঝোলানো লণ্ঠনটা নামিয়ে নিল বুড়ি। বেরিয়ে গেল।
মেঝেতে রাখা লণ্ঠনটা তুলে ছেলে দুটোর দিকে আবার তাকাল মেয়েটা। কেন এলে, ছেলেরা? কেন আর সবার মত দূরে থাকলে না? অর্গানের বাজনা একবার শুনেই পালায় লোকে, আর ফেরে না। কিন্তু তোমরা ঠিক ফিরে এলে আবার।
তিন গোয়েন্দা কখনও হাল ছাড়ে না, গম্ভীর গলা কিশোরের।
অনেক সময় হাল ছেড়ে দেয়াই ভাল, বলল মেয়েটা। তো থাক, আমরা যাই। আশা করি, অন্ধকারে ভয় পাবে না। গুডবাই।
যাবার আগে, বলল কিশোর। আশ্চর্য শান্ত গলা। অবাক হল মুসা। একটা প্রশ্নের জবাব দেবে?
কি? জানতে চাইল মেয়েটা।
এখানে কি কুকাজ করছ তোমরা? কিসের দল?
বাহ, সাহস আছে তোমার, ছেলে! হাসল মেয়েটা। কুকাজ, না? হ্যাঁ, কুকাজই। আমরা স্মাগলার। এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে দামি জিনিসপত্র স্মাগল করে আনি, বিশেষ করে মুক্তো। টেরর ক্যাসল আমাদের হেডকোয়ার্টার। লোকে জানে ভূতুড়ে বাড়ি। ধারেকাছে ঘেঁষে না। লুকানোর দারুণ জায়গা। বহু বছর ধরে আছি আমরা এখানে।
কিন্তু ওই বিচিত্র পোশাক পরে আছ কেন? যেন সার্কাসের সং। লোকের নজরে পড়ে যাবে সহজেই।

আমাকে দেখলে তো নজরে পড়ব, বলল মেয়েটা। হয়েছে, আর না। একটার জায়গায় তিনটা প্রশ্নের জবাব দিয়ে ফেলেছি। এবার যেতে হচ্ছে। গুডবাই।
লণ্ঠন হাতে বেরিয়ে গেল মেয়েটা। শব্দ তুলে বন্ধ হয়ে গেল সেলের দরজা। ঘুটঘুটে অন্ধকার চেপে ধরল। দুই গোয়েন্দাকে। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে মুসার। শুকনো ঠোঁটের ওপর একবার বুলিয়ে আনল জিভ।
কিশোরা খসখসে গলা মুসার। চুপ করে আছ কেন? কিছু বল। নইলে পাগল হয়ে যাব যা নীরব।
উ! আনমনা শোনাল কিশোরের গলা। ভাবছিলাম। খাপেখাপে মেলাতে চাইছি। কিছু ব্যাপার।
ভাবছিলে! এই সময়ো!
হ্যাঁ। খেয়াল করেছ, এখান থেকে বেরিয়ে ডানে ঘুরেছে জিপসি কাটি? ওদিকে করিডর ধরে এগিয়েছে?
তাতে কি?
আমরা যেদিক থেকে এসেছি তার উল্টো দিকে গেল। সিড়ি বেয়ে ওপরে উঠেনি। সে। আরও পাতালে নেমেছে। এর মানে কি? মাটির তলা দিয়ে বেরোনোর কোন গোপন পথ আছে। কোন গোপন সুড়ঙ্গ। ওই পথে বেরোলে লোকের চোখে পড়বে না।
কিশোরের মাথা ঠাণ্ডা রাখার ক্ষমতা দেখে অবাক না হয়ে পারল না মুসা। পাতালের এই সেলে, এই বিপদে থেকেও ঠিক খাটিয়ে নিচ্ছে মগজের ধূসর কোষগুলোকে!
অনেক কিছুই তো ভাবছ, বলল মুসা। এখান থেকে কি করে বেরোনো যায়, ভেবেছ কিছু?
না, সোজাসাপ্টা জবাব দিল কিশোর। ভেবে লাভ নেই। পরিষ্কার বুঝতে পারছি, বাইরের সাহায্য ছাড়া এখান থেকে বেরোনোর কোন উপায় নেই। আমাদের। বাস্তবকে স্বীকার করে নেয়াই ভাল। আমাকে ক্ষমা কর, মুসা। আমার ভুলের জন্যেই ঘটল এটা।
চুপ করে রইল মুসা। বলার নেই কিছুই। কি বলবে?
ঘুটঘুটে অন্ধকার। অখণ্ড নীরবতা। কাছেই কোথাও হুটোপুটি করছে একটা ইদুর, শোনা যাচ্ছে। আরেকটা একঘেয়ে শব্দও কানে আসছেঃ টুপ্... টুপ্... টুপ্...!
সময় নিয়ে খুব আস্তে আস্তে পড়ছে পানির ফোঁটা। তারই আওয়াজ।
উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে রবিন আর হ্যানসন। এক ঘন্টা হল গেছে মুসা আর কিশোর, ফেরার নাম নেই। প্রতি পাঁচ মিনিট পরপর রোলস রয়েস থেকে বেরিয়ে আসছে।

রবিন, ব্ল্যাক ক্যানিয়নের দিকে তাকাচ্ছে। বন্ধুরা আসছে কিনা দেখছে। প্রতি দশ মিনিট পর পর বেরোচ্ছে হ্যানসন।
মাস্টার রবিন, আর থাকতে না পেরে বলল হ্যানসন। মনে হয় এবার যাওয়া উচিত।
দিল রবিন। চোখের আড়াল করা নিষেধ।
তা হোক, বলল হ্যানসন। মানুষের জীবনের কাছে রোলস রয়েস কিছু না। আমি ওঁদের খুঁজতে যাব।
গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। হ্যানসন। বুট খুলে বড় একটা বৈদ্যুতিক লণ্ঠন বের করল। পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। রবিন। তার দিকে চেয়ে বলল, আমি যাচ্ছি।
আমিও যাব, বলল রবিন।
ঠিক আছে, আসুন যাই।
বুট বন্ধ করতে গিয়েও থেমে গেল হ্যানসন। বড় একটা হাতুড়ি বের করে নিল, দরকার পড়তে পারে। একটা অস্ত্র তো বটেই।
রওনা হয়ে পড়ল দুজনে। দ্রুত হাঁটছে। হ্যানসন। ভাঙা পা নিয়ে তার সঙ্গে পেরে উঠছে না। রবিন। তবু কাছাকাছি থাকার যথেষ্ট চেষ্টা করছে।
টেরার ক্যাসলের বারান্দায় এসে উঠল দুজনে। দরজা বন্ধ। হাতল বুলে পড়ে আছে। খোলা যাবে না পাল্লা।
এদিক দিয়ে ঢোকেননি, বলল হ্যানসন। তাহলে? কোনদিক দিয়ে গেলেন? এদিক ওদিক তাকাল সে। ওই জানালাগুলো দেখা দরকার!
পাল্লাখোলা জানালাটার সামনে এসে দাঁড়াল দুজনে। আলো ফেলল রবিন। চোখে পড়ল সাদা চকে বড় করে আকা একটা ?। এদিক দিয়েই গেছে ওরা সংক্ষেপে চিহ্নটার মানে বুঝিয়ে বলল রবিন।
জানোলা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল হ্যানসন, রবিনকে ঢুকতে সাহায্য করল। লণ্ঠনের আলোয় বুঝতে পারল ওরা, একটা ডাইনিং রুমে এসে ঢুকেছে।
এরপর? এরপর কোনদিকে গেলেন খুঁজছে। হ্যানসন। কয়েকটা দরজা। কোথাও চিহ্ন নেই।
এই সময় রবিনের চোখ পড়ল আয়নার ওপর। বড় করে। আকা রয়েছে প্রশ্নবোধক চিহ্ন। দেখাল। হ্যানসনকে।
অসম্ভব! বলল হ্যানসন। আয়নার ভেতর দিয়ে কেউ যেতে পারে না! দেখতে হচ্ছে!
আয়নাটার চারপাশে খুঁজে কোন ফোকর দেখতে পেল না ওরা। দরজার চিহ্ন নেই। কি ভেবে আয়নার ফ্রেম ধরে ঠেলা দিল। হ্যানসন। ওদেরকে অবাক করে দিয়ে খুলে গেল পাল্লা। ওপাশে অন্ধকার প্যাসেজ।

গোপন দরজা! বিস্মিত হ্যানসন। নিশ্চয় এদিক দিয়ে গিয়েছেন। চলুন, আমরাও যাই।
গাঢ় অন্ধকার সুড়ঙ্গে ঢুকতে ভয় পাচ্ছে রবিন, আবার একাও থাকতে পারবে না। ডাইনিং রুমে। শেষে যাওয়াই ঠিক করল।
ঢুকে পড়ল হ্যানসন। পেছনে ঢুকল রবিন। দেয়ালে প্রশ্নবোধক। চিহ্ন ধরে ধরে এগিয়ে চলল দুজনে।
ও—প্রান্তের দরজায়ও আঁকা আছে প্রশ্নবোধক। ওপাশে চলে এল দুজনে। প্রোজেকশন রুমে।
উজ্জ্বল আলোয় ঘরের অনেকখানিই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। একসারি ধার দিয়ে পাইপ অর্গানটার দিকে এগোল ওরা। একটা কোণে এসে থামল। নিচে পড়ে আছে পর্দার একটা ছেড়া টুকরো। কোণ ঘুরে এগিয়ে চলল। আবার। কিন্তু কই? কিশোর আর মুসার আর তো কোন চিহ্ন নেই।
এই সময়ই জিনিসটা চোখে পড়ল। রবিনের। একটা সিটের তলায় পড়ে আছে। এগিয়ে গিয়ে তুলে নিল সে। হ্যানসনা মুসার টর্চ নতুন কিনেছে।
নিশ্চয় ইচ্ছে করে ফেলে যাননি। আশপাশের মেঝে পরীক্ষা করল হ্যানসন। দেখুন দেখুন। ধুলোতে অনেক পায়ের ছাপ। আর এই যে এখানে, কেমন আধা খাপচা হয়ে সরে গেছে ধুলো। মনে হচ্ছে, ধস্তাধস্তি হয়েছে। আরে, একটা চকের টুকরো পড়ে আছে।
বেশ কয়েকটা জুতোর ছাপ একদিকে এগিয়ে যেতে দেখল ওরা। পুরু হয়ে জমেছে ধুলো, তাতে ছাপগুলো স্পষ্ট। ছাপ ধরে ধরে এগোল দুজনে।
সামনের সারির সিটিগুলোর সামনে দিয়ে এগিয়ে গেছে ছাপ।
একদিকের শেষ প্রান্তে এসে মোড় নিয়েছে ডানে। পর্দার পাশের একটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেছে ওপাশে। একটা হলে এসে থামল ওরা। এক ধার থেকে নেমে গেছে সিঁড়ি। আরেক দিক থেকে উঠে গেছে। দুদিকেই গেছে জুতোর ছাপ।
এবার কোনদিকে যাবা দ্বিধায় পড়ে গেল হ্যানসন। উঠে যাবার সিড়িটার দিকে চেয়ে আছে। এগিয়ে গেল। কয়েক ধাপ উঠেই থেমে গোল আবার। মাথা নাড়ল। কেন যেন মনে হচ্ছে, এদিক দিয়ে যায়নি। চলুন, আগে নেমে গিয়েই দেখি।
নেমে যাবার সিড়ির কাছে চলে এল ওরা। নিচের দিকে আলো ফেলেই চেঁচিয়ে উঠল রবিন, ওই যে, চকভঙা এদিক দিয়েই গেছে।
মাস্টার কিশোরের ওপর শ্রদ্ধা বেড়ে যাচ্ছে আমার, বলল হ্যানসন।
কি হয়েছে ওদের, আপনার কি মনে হয়? সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বলল রবিন।
ঠিক বুঝতে পারছি না, বলল হ্যানসন। তবে এটা ঠিক, নিজেরা হেঁটে যাননি। তাহলে দেয়ালে প্রশ্ন একে যেতেন। চক ভেঙে ফেলে যেতে হত না। নিশ্চয় বয়ে

নিয়ে যাওয়া হয়েছে।
কিন্তু কে বয়ে নিয়ে যাবো ভূত? আরে, কোথায় নেমে চলেছি। পাতালেই চলে এসেছি মনে হচ্ছে!
হ্যাঁ। ওই যে, দেখতে পাচ্ছেন? একটা ঘরে শেষ হয়েছে সিঁড়ি। ইংল্যান্ডে দেখেছি আমি এ-ধরনের ঘর। একটা দুর্গে। পাতাল কক্ষ। ডানজন বলে!
সিড়ি শেষ। ঘরটা থেকে তিনটে পথ তিন দিকে গেছে। তিনটে সুড়ঙ্গ মুখ দেখা যাচ্ছে। গাঢ় অন্ধকার ওপাশে। চকের চিহ্নও নেই। আর। কোনদিকে যাবে?
এক কাজ করি, বাতি নিভিয়ে দিই, বলল হ্যানসন। সত্যি সত্যি ভূত হলে অন্ধকারে নড়াচড়া করার কথা। দেখি, কি ঘটে।
গাঢ় অন্ধকারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল দুজনে। কানখাড়া। যেকোন রকম শব্দ শোনার জন্যে তৈরি। অখণ্ড নীরবতা। বাতাস কেমন
ভেজা ভেজা, ভ্যাপসা গন্ধ।
কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে বলতে পারবে না। হঠাৎই কানে এল অতি মৃদু একটা শব্দ। পাথরের ওপর আলতো ঘষা লাগল যেন আরেকটা পাথরের। কয়েক মুহূর্ত পরেই দেখা গেল স্নান আলো। মাঝখানের সুড়ঙ্গের ভেতরে। ওদিক থেকেই এসেছে শব্দ।
কোপে কোপে এগিয়ে আসছে আলো। বোকামি করে বসল। হ্যানসন। চেঁচিয়ে ডাকল, মাস্টার কিশোর!
ধমকে থেমে গেল আলোর অগ্রগতি। ঘুরে যাচ্ছে। ক্ষণিকের জন্যে দুজনের চোখে পড়ল মেয়েমানুষের পোশাকের এক অংশ। তারপরই দ্রুত মিলিয়ে গেল। আলো।
ছুটুনা। রবিনের উদ্দেশ্য চেঁচিয়ে উঠল। হ্যানসন। ছুটতে শুরু করেছে। জ্বলে উঠেছে তার হাতের আলো। ঢুকে পড়ছে মাঝখানের সুড়ঙ্গে।
হ্যানসনের পিছু পিছু ছুটল রবিন। বেশিদূর এগোতে পারল না। শোফারের পিঠের ওপর এসে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল।
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে হ্যানসন। সামনে দুপাশে পাথরের দেয়াল। পথ নেই। এখানে এসে শেষ হয়ে গেছে সুড়ঙ্গ।
ওই দেয়ালের ভেতর দিয়ে চলে গেছে! বিশ্বাস করতে পারছে না যেন হ্যানসন। আলো তুলে পরীক্ষা করে দেখল। না, কোন গোপন দরজা আছে বলে তো মনে হয় না! কি ভেবে কোমরে ঝোলানো হাতুড়িটা খুলে নিল। ঠোকা দিল সামনের পাথরের দেয়ালে। আরো ফাঁপা নিশ্চয় গোপন দরজা!
হাতুড়ি দিয়ে জোরে জোরে ঘা মারতে লাগল হ্যানসন। শিগগিরই একটা ফোকর হয়ে গেল। শক্ত তারের জালে সিমেন্টের পুরু আস্তর লাগিয়ে তৈরি হয়েছে। দরজার পাল্লা। ওপাশ থেকে আটকানো। দেখে মনে হয় সাংঘাতিক ভারি,

আসলে পাতলা। জোরে জোরে কয়েক ঘা মেরেই জাল থেকে সিমেন্ট খসিয়ে দিল সে। কাঁধ দিয়ে জোরে জোরে ধাক্কা মারতে লাগল তারের জালে। কয়েক ধাক্কায়ই ফ্রেম থেকে খুলে চলে এল জালের এক প্রান্ত। ওই প্রান্ত ধরে টেনে ফ্রেম সহ খুলে নিয়ে এল সে।

চলুন, দেখি বলেই সামনে পা বাড়াল হ্যানসন। বেটি এদিক দিয়েই গেছে।

হ্যানসনের সঙ্গে পেরে উঠছে না। রবিন। শেষে তার একটা হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল শোফার।

খানিকটা এগোতেই সরু হয়ে এল সুড়ঙ্গ। সোজা হতে পারছে না হ্যানসন। মাথা নুইয়ে হাঁটতে হচ্ছে। যতই সামনে বাড়ছে, আরও সরু হয়ে আসছে সুড়ঙ্গ। মাথা নিচু করে রাখতে হচ্ছে, সামনের দিকে সোজা চাইতে পারছে না। হঠাৎ তার কপালে এসে জোরে লাগল। একটা কি যেন চমকে যাওয়ায় হাত থেকে খসে পড়ে গেল। লণ্ঠন। নিভে গেল।

রবিনের গালেও এসে বাড়ি মারাল কি একটা। ফড়িড়ড়াড় করে। মাথার ওপর দিয়ে উড়ে চলে গেল কি যেন! বাদুড়া চেঁচিয়ে উঠল। সে। হ্যানসন, বাদুড়ে আক্রমণ করেছে।

চুপ করুন, শান্ত হোনা নিচু হয়ে বসে লণ্ঠন খুঁজছে। হ্যানসন। ভয় পাবেন না!

কিন্তু ভয় না পেয়ে উপায় আছে! একের পর এক এসে গায়ে মাথায় মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ছে ওগুলো। একটা এসে বসে পড়ল। মাথায়। চেঁচিয়ে উঠল রবিন। থাবা মেরে ওটাকে ফেলে দিতে দিতে বলল, হ্যানসন ভ্যাম্পায়ার! সব রক্ত খেয়ে নোবে!

ওসব গপ্পো! অভয় দেবার চেষ্টা করল হ্যানসন। ভ্যাম্পায়ার বলে কিছু নেই!

লণ্ঠনটা খুঁজে পেয়েছে হ্যানসন। সুইচে। খামোকাই টেপাটেপি করল। বার দুই ঝাঁকুনি দিল। জ্বলল না। আলো। বিগড়ে গেছে। বিপদেই পড়লাম দেখছি! এখন উপায়!

হঠাৎ কোমরে হাত পড়ল রবিনের, শক্ত কিছু একটার ছোঁয়া লাগল। আছে হ্যানসন, মুসার টর্চটা কোমরে ঝুলিয়ে নিয়েছিলাম।

জ্বলে উঠল টর্চ। উড়ন্ত প্রাণীগুলোকে দেখল। ওরা। একটা দুটো নয়, ডজন ডজন। বড় আকারের কাকাতুয়া। আলো দেখে তীক্ষ্ণ চিৎকার করতে করতে ছুটে এল। ঠোকর মেরে টর্চের কোচই ভেঙে দেবে হয়ত। তাড়াতাড়ি আলো নিভিয়ে ফেলল রবিন।

বাড়ছেই। পাখির সংখ্যা। স্রোতের মত একটানা আসছে সরু দিয়ে। আছড়ে পড়ছে গায়ে মুখে মাথায়। ইতিমধ্যেই কপালে গোটা দুয়েক ঠোকর লেগে গেছে। রবিনের। ফুলে গেছে। ব্যথা করছে। চোখে ঠোকর লাগলে সর্বনাশ!

এগোনো যাবে না, চেঁচিয়ে বলল হ্যানসন। আসুন, পিছিয়ে যাই।

অন্ধকারে রবিনের হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল হ্যানসন। অনেকখানি পিছিয়ে আসার পর কমে এল পাখি। সুড়ঙ্গের শেষ মাথায় হুটোপুটি করছে পাখিগুলো, তীক্ষ্ণ চিৎকার ভেসে আসছে। আলো জ্বললেই হয়ত উড়ে আসবে। তারের দরজাটা তুলে আগের জায়গায় দাঁড় করিয়ে দিল হ্যানসন। সেই ছোট ঘরটায় ফিরে এল আবার দুজনে।

মনে হচ্ছে, ওই সুড়ঙ্গ দিয়ে নেয়া হয়নি ওঁদেরকে, বলল হ্যানসন। দরজা খোলার সময় নামিয়ে রাখতেই হত। সেই সুযোগে কোন চিহ্ন রেখে যেতেন মাস্টার কিশোর।

একমত হল রবিন।

হ্যানসন বলল আবার, এই ঘর পর্যন্ত এসেছেন ওঁরা, কোন সন্দেহ নেই। তারপর কোন একটা সুড়ঙ্গ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মাঝখানেরটা দেখলাম। এবার বাঁয়েরটা দেখি। তারপর ডানেরটা দেখব। ডাকতে ডাকতে এগোব। কাছে পিঠে থেকে থাকলে, সাড়া দেবেন।

মন্দ বলেনি হ্যানসন। তার কথায় সায় জানালি রবিন।

টার্চ জ্বালল রবিন। প্রথমে এগিয়ে গেল বাঁয়ের সুড়ঙ্গের দিকে। সুড়ঙ্গ মুখে দাঁড়িয়ে জোরে চেঁচাল হ্যানসন, মাস্টার কিশোর, আপনারা কোথায়!

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জবাব এল। কার গলা, চিনতে ভুল হল না। হ্যানসনের। রবিনের হাত থেকে টর্চটা নিয়ে এগোল।

কয়েক গজ এগোতেই দেয়ালের গায়ে দরজা দেখতে পেল। ঠেলা দিতেই খুলে গেল ভেজানো পাল্লা। আলো ফেলল। ভেতরে।

***

উফফ! রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। বাঁধনের দাগগুলো জোরে জোরে ডলছে মুসা।

কিশোরও ডিলছে। সংক্ষেপে হ্যানসন আর রবিনকে জানাল, কি করে বন্দি হয়েছিল ওরা।

তাড়াতাড়ি যাওয়া দরকার, বলল হ্যানসন। পুলিশ নিয়ে আসতে হবে। ভয়ানক লোক ওরা! আমরা না এলেই তো গেছিলেন!

ছোট ঘরটায় ফিরে এল ওরা। সিড়ির দিকে পা বাড়াতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল কিশোর। কান পাতল। কিসের শব্দ!

পাখি! বলল রবিন।

পাখি!

কি করে মেয়েমানুষটাকে তাড়া করে গিয়েছিল, জানাল রবিন। সবশেষে জানাল, কি পাখি ওগুলো।

কাকাতুয়া! কিশোরের মুখ দেখে মনে হল বোলতা হুল ফুটিয়েছে। জলদি, এস আমার সঙ্গে। এক থাবায় হ্যানসনের হাত থেকে টর্চটা ছুটল। ঢুকে পড়ল মাঝের সুড়ঙ্গে।
আগে আগে ছুটছে কিশোর, পেছনে অন্যেরা। তারের দরজাটার কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। একটানে ফেলে দিল পাল্লা। আবার ছুটল। ওর সঙ্গে তাল রাখাই কঠিন হয়ে পড়েছে। অন্যদের জন্যে।
ক্রমে সরু হয়ে আসছে সুড়ঙ্গ। আলো দেখে উড়ে এল পাখির ঝাঁক। বুপ করে বসে পড়ল। কিশোর। আলো নিভিয়ে দিল। সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে বলল, হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে হবে।
এগিয়ে চলেছে। ওরা। সবার আগে কিশোর। মাঝে মাঝে টর্চ জ্বেলে দেখে নিচ্ছে পথ। মাথার উপরে উড়ছে পাখিগুলো, হুটোপুটি করছে। বসার জায়গা পাচ্ছে না। অন্ধকারে বেরোনোর পথ পাচ্ছে না। আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। আলো দেখলেই ডাইভ দিয়ে নেমে আসছে। তাড়াতাড়ি আবার নিভিয়ে দিতে হচ্ছে টর্চ।
একেবেঁকে এগিয়ে গেছে। সুড়ঙ্গ। একটা জায়গায় এসে আর বাঁক নেই, সোজা এগিয়েছে। সামনে অন্ধকার ফিকে হয়ে এসেছে। ওটাই সুড়ঙ্গমুখ।
কাঠের পাল্লা দিয়ে দরজা লাগানো হয়েছে সুড়ঙ্গমুখে। হাঁ করে খুলে আছে এখন পাল্লা দুটো। বেরিয়ে এল কিশোর। তারার আলোয় দেখল, বিরাট এক খাঁচায় এসে ঢুকেছে।
একে একে অন্যেরাও বেরিয়ে এল সুড়ঙ্গের বাইরে, খাঁচার ভেতরে।
কাকাতুয়ার খাঁচা এটা, বলল কিশোর। হ্যারি প্রাইসের পাখি।
টেরর ক্যাসল থেকে ওই গোপন সুড়ঙ্গ চলে এসেছে পাহাড়ের তলা দিয়ে। ব্ল্যাক ক্যানিয়ন থেকে পাহাড় ঘুরে গেলে হ্যারি প্রাইসের বাড়ি কয়েক মাইল। অথচ পাহাড়ের তলা দিয়ে মাত্র কয়েক শো ফুট।
এগিয়ে গেল কিশোর। জোরে ঠেলা দিল খাঁচার দরজায়। ঝটিকা দিয়ে খুলে গেল দরজা। বেরিয়ে এল। বাইরে। সামনেই হ্যারি প্রাইসের বাংলো।
ফিসফিসিয়ে সঙ্গীদেরকে বলল কিশোর, চমকে দেব ওদের। চল, যাই।
নিঃশব্দে বাংলোর দরজার কাছে এসে দাঁড়াল ওরা। বেলপুশ টিপে দিল কিশোর। কয়েক মুহূর্ত পরেই খুলে গেল দরজা। দাঁড়িয়ে আছে হ্যারি প্রাইস। চোখে অবাক দৃষ্টি। কুৎসিত দেখাচ্ছে চকচকে টাক আর গলার কাটা দাগ। কি চাই? ফিসফিসিয়ে বলল সে।
কথা বলতে চাই বলল কিশোর।
এত রাতো এখন সময় নেই। ঘুমোতে যাব।

তাহলে হাজতে গিয়ে ঘুমোতে হবে, এখানে নয়, এগিয়ে এল হ্যানসন। পুলিশকে ফোন করব।
সতর্ক হয়ে উঠল। হ্যারি প্রাইস। ভাবল এক মুহূর্ত। সরে জায়গা করে দিল। এস, ফিসফিস করল সে। ভেতরে এস।
ঘরে ঢুকাল ওরা। টেবিলের ওপাশে বসে আছে। একজন লোক। হালকা-পাতলা, লম্বায় পাঁচ ফুটের সামান্য বেশি হবে। হাতে তাস। বোঝা গেল, খেলা ফেলে দরজা খুলতে উঠেছে প্রাইস।
রড মিলার, আমার বন্ধু, পরিচয় করিয়ে দিল মিস্টার ফিসফিস। ব্রড, এরা তিন গোয়েন্দা। টেরর ক্যাসলে ভূত আছে কিনা তদন্ত করছে। তো, ছেলেরা, ভূত-টুত দেখেছ, কিছু ক্যাসলে?
হ্যাঁ, বলল কিশোর। টেরির ক্যাসল রহস্য সমাধান করে ফেলেছি।
কিশোরের আত্মবিশ্বাস দেখে অবাক হল মুসা আর রবিন। সত্যিই কি সমাধান করে ফেলেছে?
তই নাকি? বলল মিস্টার ফিসফিস। তা রহস্যটা কি?
আপনারা দুজন, বলল কিশোর। হ্যাঁ, আপনারা দুজনই টেরার ক্যাসলের ভূত। ভূতুড়ে করে রেখেছেন বাড়িটাকে। কয়েক মিনিট আগে আমাকে আর মুসাকে আপনারাই ধরে বেঁধেছেন। মরার জন্যে ফেলে রেখে এসেছেন। অন্ধকার সেলে।
ভুরু কুঁচকে গেছে প্রাইসের। ভাব দেখে মনে হল ধরে মারবে কিশোরকে। হাতুড়ির হাতলে আঙুল চেপে বসল হ্যানসনের।
খুব সাংঘাতিক অভিযোগ, খোকা, বলল মিস্টার ফিসফিস। কিন্তু প্রমাণ করতে পারবে না।
মুসারও তাই ধারণা, প্রমাণ করতে পারবে না কিশোর। হ্যারি প্রাইস কিংবা মিলার নয়, তাদেরকে বেঁধেছে দুই আরব দাস। সঙ্গে ছিল এক বুড়ি জিপসি আর একটা ইংরেজ মেয়ে।
নিশ্চয় পারব, জোর গলা কিশোরের। পায়ের জুতো দেখুন না। আমাকে বাঁধার সময়ই এঁকে দিয়েছি।
চমকে উঠল। প্রাইস আর মিলার। চোখ চলে গেল জুতোর দিকে। অন্যেরাও তাকাল।
চকচকে কালো চামড়ার জুতো। দুজনেরই ডান পায়ের জুতোর মাথার কাছে সাদা চকে আঁকা ? তিন গোয়েন্দার ট্রেডমার্ক।
হ্যারি প্রাইস আর রড মিলার তো বটেই, মুসা রবিন এমনকি হ্যানসনও অবাক হয়ে গেছে।
কিন্তু... শুরু করেই থেমে গেল মুসা।

বুঝতে পারলে না? মুসার দিকে চেয়ে বলল কিশোর। মেয়েমানুষের পোশাক আর উইগ পরেছিল ওরা। আমাকে বাঁধার সময় ছয়ে দেখেছিলাম। তখনই বুঝেছি, পুরুষের বুট। বুঝলাম, ছদ্মবেশ ধরেছে। পাঁচজনকে একবারও একসঙ্গে দেখিনি। তারমানে, দুজনেই পাঁচজনের অভিনয় করেছে। এক কুমিরের ছানা সাতবার দেখানোর মত, অনেকটা।
তারমানে... দুই আরব, দুই মহিলা আর এক আলখেল্লাঅলা, সব ওই দুজনেরই কাণ্ড! তাজ্জব হয়ে গেছে মুসা।
ঠিকই বলেছে ও, কিশোরের আগেই জবাব দিল হ্যারি প্রাইস। তোমাদের ভয় দেখাতে বার বার চেহারা বদলেছি। তবে, ক্ষতি করার কোন ইচ্ছে ছিল না। আমাদের। বাঁধন খুলে দেবার জন্যেই আবার ফিরে গিয়েছিলাম। কিন্তু তোমাদের বন্ধুরা দেখে ফেলল। তাড়া খেয়ে ফিরে এসেছি।
আমরা খুনী নই, বলল বেঁটে লোকটা, রড মিলার। স্মাগলারও না। ভুতও না। যা করেছি, সব তোমাদেরকে ভয় পাওয়ানোর জন্যে। মুখ টিপে হাসল সে।
তবে আমি খুনী, গম্ভীর দেখাচ্ছে প্রাইসকে। জন ফিলবিকে আমিই খুন করেছি।
হাঁ হ্যাঁ, ঠিক, এমন ভাবে বলল মিলার, যেন ভুলেই গিয়েছিল কথাটা। তবে বিশেষ কিছু এসে যায় না। তাতে।
পুলিশের হয়ত এসে যাবে, বলল হ্যানসন। কিশোরের দিকে চেয়ে বলল, চলুন আমরা যাই। পুলিশকে খবর দেই গিয়ে।
দাঁড়ান দাঁড়ান, হাত তুলে বাধা দিল প্রাইস। একটু সময় দিন আমাকে। জন ফিলবির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। আপনাদের।
জন ফিলবির ভূতের সঙ্গে তো? ভুরু কুঁচকে গেছে মুসার।
ভুতই বলতে পার। ও নিজেই বলবে, তাকে কেন খুন করেছি আমি।
আর কিছু কেউ বলার আগেই ঘুরে হাঁটতে শুরু করল প্রাইস। পাশের ঘরে চলে গেল।
তাড়াতাড়ি পা বাড়াল সেদিকে হ্যানসন।
থামুন থামুন, বাধা দিল মিলার। ভয় নেই, পালাবে না। মিনিট খানেকের ভেতরেই ফিরে আসবে। হ্যাঁ, কিশোর পাশা, এই যে নাও, তোমার ছুরি।
থ্যাংক্যু, বলল কিশোর। আট ফলার ছুরিটা নিয়ে কোমরের বেল্টে আটকাল।
ঠিক এক মিনিট পরেই দরজায় এসে দাঁড়াল লোকটা। না, মিস্টার ফিসফিস নয়। তার চেয়ে বেঁটে, কিছু কম বয়েসী একজন লোক। পরিপটি করে আঁচড়ানো ধূসর চুল। পরনে টুইডের জ্যাকেট। মুখে হাসি।
গুড ইভনিং বলল লোকটা। আমি জন ফিলবি। আমাকে নাকি দেখতে চাও?

মিলার ছাড়া আর সবাই হাঁ করে চেয়ে আছে। একেবারে চুপ।। এমন কি কিশোরও চুপ হয়ে গেছে।
মিটি মিটি হাসছে মিলার। বলল, ও সত্যিই জন ফিলবি।
হঠাৎই ব্যাপারটা বুঝে ফেলল। কিশোর। মুখ দেখে মনে হল, পোকা গিলে ফেলেছে। আপনি জন ফিলবি, আপনিই হ্যারি প্রাইস, মিস্টার ফিসফিস, তাই না?
মিস্টার ফিসফিস চেঁচিয়ে উঠল মুসা। তা কি করে হয়! মিস্টার প্রাইসের চেয়ে বেঁটে, চুল আছে…
কিশোর ঠিকই বলেছে, পকেট থেকে একটা উইগ বের করে। পরে ফেলল ফিলবি। আবার মাথা টাকা হয়ে গেল তার। বুক চিতিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল, লম্বা দেখাল একটু। হঠাৎ ফিসফিসে গলায় চেঁচিয়ে উঠল, একটু নড়বে না! প্রাণের ভয় থাকলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা।
চমকে উঠল তিন গোয়েন্দা, হ্যানসনসহ। পরীক্ষণেই বুঝল ব্যাপারটা। নিজেকে মিস্টার ফিসফিস প্রমাণ করল ফিলবি। অবাক হল তিন গোয়েন্দা, লোকটা কত বড় অভিনেতা, বুঝল এখন।
পকেট থেকে কি যেন একটা বের করল ফিলবি। প্লাস্টিক তৈরি। গলায় লাগিয়ে দিতেই গভীর কাটা দাগ হয়ে গেল। ছেলেরা, বুঝতে পেরেছ তো এবার? জন ফিলবিকে হ্যারি প্রাইস বানিয়ে ফেলা কিছুই না। গলার স্বর বদলে ফেলি। কথা বলি ভয়াবহ ফিসফিসে গলায়। কেউ ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করতে পারে না, আমিই জন ফিলবি।
গলার নকল দাগ আর মাথার উইগটা খুলে আবার পকেটে রেখে দিল ফিলবি। এস, বস সবাই। তারপর বল, কে কি জানতে চাও। তবে, আগে আমিই বলে নিচ্ছি। কিছু, টেবিলে রাখা ছবিটা দেখিয়ে বলল, দেখছ, মিস্টার ফিসফিসের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছি। আমি। কি করে করলাম? খুব সহজে। ফটোগ্রাফির একটা কৌশল। অনেক বছর আগে, ছবিতে যখন অভিনয় করতাম, গলার স্বর খুব খারাপ ছিল। তোতলাতাম। লোকের সঙ্গে কথা বলতেই লজা লাগত। আশ্চর্য লোকের স্বভাবা এটাকেই দুর্বলতা ধরে নিল ওরা। ঠকোত। অনেক ভেবে চিন্তে শেষে নিজেকে মিস্টার ফিসফিস বানিয়ে নিলাম। ভয় পাওয়ানোর মত চেহারা। গলায় কাটা দাগ দেখে ধরেই নিল লোকে, লোকটা ডাকাত-ফাকাত গোছের কিছু। তার ওপর ভয়ঙ্কর ফিসফিসে গলা। বুঝে গেলাম, হ্যারি প্রাইসকে ভয় পায় লোকে। ব্যস, তাকেই ম্যানেজারের পদটা দিয়ে দিলাম। এরপর থেকে টাকা পয়সা আদায় বা কোন কঠিন কাজ করার দরকার পড়লেই ফিসফিস সেজে হাজির হতাম লোকের সামনে। কেউ ধরতে পারেনি। লোকে জেনেছে জন ফিলবি আর হ্যারি প্রাইস আলাদা লোক। একমাত্র রড মিলার ছাড়া আর কেউ জানত না

ব্যাপারটা। ও আমার মেকআপ ম্যান ছিল। ফিসফিস সাজার ফন্দিটা ওর মাথা থেকেই বেরিয়েছে, থামল জন ফিলবি। হাসল। কেমন লাগছে শুনতে?
ভাল, ভাল, বলে উঠল মুসা। বলে যান!
ভালই কাটছিল দিন, বলে চলল ফিলবি। এই সময়ই এল টকিং-পিকচার। ভাবলাম, অভিনয়কেই বেশি গুরুত্ব দেবে লোকে। গলার স্বরে সামান্য খুঁত, সেটা মাপ করে দেবে। কিন্তু না, দিল না। ওটাকেই অস্ত্র বানিয়ে আমার মন গুড়িয়ে দিল। গরম লোহার শিক ঢুকিয়ে যেন ছাঁকা দিয়ে দিল কলজেয়। ছেড়ে দিলাম অভিনয়। ঘরকুণো হয়ে গেলাম। এই সময়ই নোটিশ এল ব্যাংক থেকে, ঋণের দায়ে আমার বাড়ি দখল করে নেবে। ফিলবি ক্যাসল অন্যের হয়ে যাবে, ভাবতেই খারাপ লাগে আমার। বেপরোয়া হয়ে উঠলাম। থামল একটু সে। তারপর বলল, ক্যাসল তৈরির সময়ই সুড়ঙ্গটা আবিষ্কার করেছি। ক্যাসল বানিয়ে শ্রমিকেরা চলে গেল। রিড আর আমি ছাড়া আর কেউ জানত না এটা। সুড়ঙ্গের মাঝামাঝি একটা দরজা বানিয়ে নিলাম, তারের জাল আর সিমেন্ট দিয়ে। এখানে এই বাড়িটা বানালাম। লোকে জানল, এটা হ্যারি প্রাইসের বাড়ি। এক ঝড়ের রাতে পাহাড়ের ওপর থেকে আমার গাড়িটা ফেলে দিলাম নিচে। লোকের কাছে মরে গেল। জন ফিলবি।
ভূত-প্রেতগুলো বানালেন। কখন? জানতে চাইল কিশোর।
শেষ ছবিটাতে অভিনয় করার সময়! ভেবেছিলাম, যেদিন ছবি মুক্তি পাবে, বন্ধুদেরকে দাওয়াত করে এনে মজা দেব। তা আর হল না। ছবি দেখে হাসাহাসি শুরু করল লোকে। মন খারাপ হয়ে গেল, থামল ফিলবি। তারপর বলল, পরে খুব কাজে লেগেছে জিনিসগুলো। এমনিতেই পুরানো ধাঁচের ক্যাসল, ভেতরে অদ্ভুত সব জিনিসে ঠাসা। দেখেই গা ছমছম করে লোকের, ভয় পেতে শুরু করে। তারপর দুয়েকটা ভূত কিংবা প্রেতাত্মা সামনে হাজির হয়ে গেলে, ভিরমি খেতে বাকি থাকে। শুধু, হাসল সে। লোকে জানল ক্যাসলে ভূতের উপদ্রব। আছে। ওরা আর ওদিকে মাড়াল না। পথটাও বন্ধ করে দিলাম পাথর ফেলে ফেলে। ক্যাসল আর বেচিতে পারল না ব্যাংক। হাতে সময় পেলাম। বসে না থেকে দুষ্পপ্রাপ্য কাকাতুয়ার ব্যবসা শুরু করে দিলাম। কিছু টাকা জমেছে এখন আমার হাতে। আর সামান্য কিছু জমলেই ব্যাংকের টাকা পুরো শোধ করে দিতে পারতাম, জোরে নিঃশ্বাস ফেলল। ফিলবি। কিন্তু তোমরা বোধহয় তা হতে দিলে না।
মিস্টার ফিলবি, এতক্ষণ মন দিয়ে অভিনেতার কথা শুনছিল। কিশোর। আপনিই আমাদেরকে ফোন করেছিলেন, না? ভয় দেখাতে চেয়েছিলেন?
মাথা ঝোঁকাল অভিনেতা। ভেবেছিলাম, এরপর আর ক্যাসলের ধারে কাছে আসবে না। কিন্তু সাহস অনেক বেশি তোমাদের।

কি করে জানলেন, সেরাতে আমরা যাব? আমাদের পরিচয় জানলেন কি করে? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
মৃদু হাসল ফিলবি। রড মিলার, স্পাইয়ের কাজটা ওই করেছে। ব্ল্যাক ক্যানিয়নের ধারে, একটা পাহাড়ের ঢালে ছোট একটা বাংলো আছে। ওটা তার বাড়ি। নিচে থেকে সহজে লোকের চোখে পড়ে না বাড়িটা। কাছাকাছি থাকে, ক্যাসলের ওপর নজর রাখতে সুবিধে তারা। তোমাদেরকে দেখেছিল। সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোনে জানিয়েছে আমাকে, থামল সে।
পাহাড়ের মাথায় টেলিভিশন এরিয়্যাল কে বসিয়েছে, বুঝতে আর অসুবিধে হল না তিন গোয়েন্দার।
কিন্তু আমাদের নাম জানলেন কি করে? আবার জিজ্ঞেস করল। কিশোর।
বলছি, হাত তুলল। ফিলবি। কাগজে পড়েছি রোলস রয়েস প্রতিযোগিতার কথা। ব্ল্যাক ক্যানিয়নে গাড়িটাকে দেখল রড। আমাকে জানোল। তাড়াতাড়ি গিয়ে ঢুকলাম ক্যাসলে। ভয় দেখিয়ে তাড়ালাম তোমাদেরকে। সত্যি, ভয় পেতে দেরি করেছ তোমরা। আরও অনেক আগেই ভয় পেয়ে পালিয়েছে অন্যেরা। যাই হোক, তারপর ফিরে এলাম। এখানে। টেলিফোন গাইডে খুঁজলাম তোমার নাম নেই। ধরেই নিলাম, টেলিফোন নেই তোমার। তবু শিওর হবার জন্যে ফোন করলাম ইনফরমেশনে। ওরা জানাল, আছে। আর কি? পেয়ে গেলাম নাম্বার।
অ, মাথা চুলকাচ্ছে কিশোর। শুটকিকেও নিশ্চয় দেখেছিলেন। মিস্টার মিলার?
শুটকি! অবাক চোখে তাকাল ফিলবি।
আমরা ছাড়াও আরও দুটো ছেলে এসেছিল। একজন রোগাপাতলা ঢাঙা।। নীল একটা স্পোর্টস কার নিয়ে এসেছিল....
ও হ্যাঁ হ্যাঁ। শুটকি! ভাল নাম দিয়েছ। হাহ্ হাহ্ করে হাসল ফিলবি।
উসখুস করছে রড মিলার। শেষে বলেই ফেলল, একটা খুব খারাপ কাজ করে ফেলেছিলাম সেদিন। আরেকটু হলেই সর্বনাশ হয়ে গেছিল! ওই যে পাথরের ব্যাপারটা। ক্যাসলের ওপরে পাহাড়ের মাথায় আমিই লুকিয়ে ছিলাম। সেদিন ওখানে বসেই নজর রাখছিলাম তোমাদের ওপর। কতগুলো পাথরের আড়ালে ছিলাম। হঠাৎ পা লেগে হড়কে গেল একটা পাথর। চমকে উঠলাম। নিচে রয়েছ তোমরা। কি হল, দেখার জন্যে উঁকি দিলাম। আমাকে দেখে ফেললে তোমরা। ধরার জন্যে উপরে উঠতে লাগলে। লাফিয়ে সরে এসে ছুটলাম। কয়েকটা পাথর গড়িয়ে গিয়ে ধাক্কা লাগল আলগা পাথরের স্তূপে। ব্যস, নামল পাথর ধস। ওই জায়গাটাই এমন। তোমরা আটকে গেলে গুহায়। তাড়াতাড়ি নেমে গিয়ে গুহার বাইরে দাঁড়ালাম। কি করব না করব, দিশেহারা হয়ে পড়েছিলাম। ধরেই নিয়েছিলাম, চ্যাপ্টা হয়ে গেছ তোমরা। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছিলাম।

ওখানেই। পাথরের ফাঁক গলে লাঠির মাথা বেরোতে দেখে কি যে খুশি লেগেছিল, বলে বোঝাতে পারব না, থামল সে।
গুহাটা না থাকলেই তো খতম করে দিয়েছিলেন। গোমড়া মুখে বলল মুসা।
সত্যি বলছি, বলল মিলার। ইচ্ছে করে ফেলিনি। ওটা নিতান্তই দুর্ঘটনা…
এরপর আর কোন কথা চলে না। চুপ করে গেল মুসা।
নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর। হঠাৎ মুখ তুলে বলল, কিন্তু কয়েকটা ব্যাপার পরিষ্কার হচ্ছে না এখনও!
কি ব্যাপার? জানতে চাইল ফিলবি।
আপনার সঙ্গে যেদিন দেখা করলাম, বলল কিশোর। মিছে কথা বলেছেন। ঝোপ পরিষ্কার করেননি, অথচ বলেছেন করছিলেন। কেন? টেবিলে লেমোনেড রেডি রেখেছিলেন। কি করে জানলেন আমরা যাব?
হাসল অভিনেতা, কি করে জানলাম? গুহ থেকে বেরোলে তোমরা। গাড়ি পর্যন্ত তোমাদেরকে অনুসরণ করে গিয়েছিল মিলার। বেশ জোরেই শোফারকে আমার এ-জায়গাটার নাম বলেছিলে। পাথরের আড়ালে লুকিয়ে শুনেছিল মিলার। খবর দিল আমাকে। লেমোনেড রেডি করলাম। জানালায় দাঁড়িয়ে দেখলাম, রোলস রয়েসটা আসছে। একটা মাচেটে নিয়ে চট করে গিয়ে ঢুকে পড়লাম একটা ঝোপে। হঠাৎ নাটকীয় ভাবে বেরিয়ে এসে, চমকে দিতে চেয়েছিলাম তোমাদেরকে। চাপ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলাম স্নায়ুর ওপর। তারপর শোনালাম টেরর ক্যাসলে ভূত আমদানি করার কাহিনী, হাসল ফিলবি। মুসা কিন্তু সত্যিই ভয় পেয়ে গিয়েছিল।
চট করে আরেক দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল মুসা।
তোমাদেরকে ক্যাসল থেকে দূরে রাখার অনেক চেষ্টা করেছি, আবার বলল ফিলবি। কিন্তু পারলাম না। বড় বেশি একরোখা ছেলে তোমরা। বেশি বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে আজ ধরাই পড়ে গেলাম। এতই তাড়াহুড়ো করেছি, সুড়ঙ্গ মুখের দরজা বন্ধ করতে ভুলে গেছি। পাখিগুলো গিয়ে ঢুকল সুড়ঙ্গে। আরও ফাঁস করে দিল ভূতের পরিচয়।
আবার ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। জিপসি বুড়ি সেজে কে গিয়েছিলেন? নিশ্চয়ই আপনার বন্ধ, মিস্টার মিলার?
হাঁ। ভয় দেখাতে চেয়েছিলাম তোমাদেরকে, বলল ফিলবি।
ভয় পাইনি, বরং কৌতুহল আরও বেড়ে গিয়েছিল। সন্দেহও বাড়ল। বুঝলাম, ভূত নয়, টেরর ক্যাসলে মানুষের বাস আছে। সেটা আরও স্পষ্ট করে দিল রবিনের তুলে আনা ছবি। আর্মর সুটে মরচে নেই, লাইব্রেরির বইয়ে ধুলো নেই। তার মানে, কেউ একজন নিয়মিত পরিষ্কার করে রাখে ওগুলো। কে? কার এত দরদ

জিনিসগুলোর জন্যে? আন্দাজ করলাম, একজনেরই হতে পারে। সে আপনি, মিস্টার ফিলবি। ...তবে, আজ রাতে কিন্তু বোকাই বানিয়ে ফেলেছিলেন। আরব দসুযু সেজে। স্মাগলাররা ক্যাসলটাকে ঘাঁটি বানিয়েছে, প্রায় বিশ্বাসই করে ফেলেছিলাম।
হ্যাঁ, ঠিকই অনুমান করেছিলে। আমিই পরিষ্কার করি। জিনিসপত্রগুলো। আর কিছু জানার আছে?
অনেক! বলে উঠল মুসা। জানতে চাই, জলদস্যুর ছবিটা সত্যিই কি চোখ টিপেছিল?
আমি টিপেছিলাম, বলল ফিলবি। ছবিটার পেছনের দেয়াল আসলে কাঠের তৈরি। সাদা রঙ করা কাঠের একটা বোর্ড। টেনে খুলে আনা যায়। ঠেলে দিলেই আবার বসে যায় খাপে খাপে। বোর্ডটা সরিয়ে ছবির পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। চোখের পেছনে ছোট গোল প্লাস্টিকের চাকতি সরিয়ে, ওই ছেদায় নিজের চোখ রেখেছিলাম। তুমি চাইতেই টিপলাম।
কিন্তু পরে ছবিটা ভালমত পরীক্ষা করে দেখেছি। রবিনও দেখেছে। কোন ছিদ্র ছিল না চোখের জায়গায়।
ওটা আরেকটা ছবি। একই রকম দেখতে। তোমরা ফিরে আসবে সন্দেহ করে সরিয়ে ফেলেছিলাম আগের ছবিটা।
কিন্তু নীল ভূত? ওটা কি দিয়ে বানালেন? একের পর এক প্রশ্ন করে গেল মুসা। অর্গানের কাঁপা ভূতুড়ে বাজনা? আয়নার ভেতরে মেয়ে ভূত? ইকো হলের ঠাণ্ডা বায়ুপ্রবাহ?
বলতে খারাপই লাগছে, বলল অভিনেতা। রহস্যগুলো আর রহস্য থাকবে না। ঠিক আছে, তবু বলছি...
কয়েকটা রহস্য এমনিতেও আর রহস্য নেই, বাধা দিয়ে বলল কিশোর। আমি জানি, কি করে কি করেছেন। বরফের ভেতর দিয়ে কোন ধরনের গ্যাস প্রবাহিত করেছেন। দেয়ালের গোপন কোন ছিদ্র দিয়ে ওই ঠাণ্ড গ্যাস ঢুকিয়ে দিয়েছেন ইকো হলো। হয়ে গেল। ঠাণ্ডা বায়ুপ্রবাহ। বিচিত্র বাজনা, সেই সঙ্গে চেচামেচি, গোলমাল সৃষ্টি করা খুব সহজ। রেকর্ডকে উল্টো ঘোরানোর ব্যবস্থা করেছেন। এই উল্টো বাজনা অ্যামপ্লিফাই করে ছড়িয়ে দিয়েছেন স্পীকারের সাহায্যে। নীল ভূত বানানোও সহজ। নীল লুমিনাস পেইন্ট মাখিয়ে নিয়েছেন পাতলা অয়েল পেপারে। সুতোয় কাগজের এক মাথা বেঁধে বুলিয়ে দিয়েছেন ওপর থেকে। সুতো ধরে টেনে নাচিয়েছেন ওটাকে। তারপর, কুয়াশাতঙ্ক। কোন ধরনের কেমিক্যাল পুড়িয়ে সৃষ্টি করেছেন এমন ধোঁয়া। এমন কোন ধরনের কেমিক্যাল, যেটার

ধোঁয়ায় গন্ধ নেই। দেয়ালের গোপন ছোট ছোট ছিদ্র দিয়ে চালান করে দিয়েছেন। প্যাসেজে। কি, ঠিক বলছি তো?
হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ মাথা ঝোঁকাল ফিলবি। না, মাথায় ঘিলু আছে তোমার, স্বীকার করতেই হবে!
আয়নার ভূত তো আপনি নিজেই, আবার বলল কিশোর। মেয়ে মানুষের পোশাক পরে, প্যাসেজ দিয়ে গেয়ে পাল্লা খুলে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। তারপর সুযোগ বুঝে চট করে আবার ঢুকে গেছেন প্যাসেজে। বন্ধ করে দিয়েছেন পাল্লা। খুব সহজ। কিন্তু একটা জিনিস বুঝতে পারছি না। কোন কৌশলে লোকের স্নায়ুর ওপর চাপ ফেলেছেন আপনি। অস্বস্তি, ভয়, শেষে আতঙ্ক এসে চেপে ধরে। কি করে করলেন?
আরও ভাব আরও ভাব, মাথা খাটিয়ে বের করার চেষ্টা কর। শেষ পর্যন্ত না পারলে, বলে দেব। এখন এস, কিছু জিনিস দেখাচ্ছি তোমাদের।
সবাইকে পাশের ঘরে নিয়ে এল ফিলবি। বিরাট এক ড্রেসিং রুম। নানাধরনের। উইগ, পোশাক আর মেকআপের সরঞ্জাম থরে থরে সাজানো রয়েছে কয়েকটা আলমারিতে। এক পাশে বিরাট এক র‍্যাকে অনেকগুলো গোল ক্যান ।
ওগুলোতে ফিল্ম, ক্যানগুলো দেখিয়ে বলল ফিলবি। আমার অভিনয় করা সমস্ত ছবির একটা করে ফিল্ম। এক সময় কোটি কোটি লোককে অনেক আনন্দ দিয়েছি। অথচ আজ আমাকে ভূত সেজে লুকিয়ে থাকতে হচ্ছে লোকচক্ষুর আড়ালে! কেমন বিষন্ন গলা অভিনেতার, সবারই মন ছুয়ে গেল। তা-ও রেহাই পেলাম না। তোমরা এলে। ছদ্মবেশ খুলে ফেললে আমার। কাল সকাল থেকেই পিলপিল করে লোক আসতে থাকবে। হাসোহাসি করবে, টিটকিরি দেবে।
কেউ কোন কথা বলল না।
তবে, গলার স্বর নিয়ে আর কেউ হাসতে পারবে না। এখন, আবার বলল ফিলবি। ওষুধ খেয়ে আর প্র্যাকটিস করে করে সারিয়ে ফেলেছি আমি।
নিচের ঠোঁটে সমানে চিমটি কেটে চলেছে কিশোর।
কিন্তু এত কষ্ট করে কি পেলাম! অভিনেতার গলায় ক্ষোভ। আবার আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করবে লোকে। ক্যাসলটা আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবে ব্যাংক। এবার হয়ত সত্যিই আত্মহত্যা করতে হবে। আমাকে!
মিস্টার ফিলবি, হঠাৎ বলল কিশোর, ওই ক্যানগুলোতে আপনার অভিনীত সমস্ত ছবি আছে, না?
হ্যাঁ। কোথাও ভূত সেজেছি আমি, কোথাও দানব, কোথাও জলদস্যু...
নির্বাক ছবির যুগ তো অনেক আগেই শেষ। তারমানে অনেকদিন থেকেই পড়ে আছে। আর কোন হলে দেখানো হচ্ছে না এখন।

না, হচ্ছে না। সবাক ছবি ফেলে নির্বাক ছবি কেন দেখবে লোকে? কিন্তু এসব কথা কেন?
মনে হচ্ছে, আপনার ক্যাসল আপনারই থাকবে। একটা বুদ্ধি এসেছে মাথায়। আগামী কাল জনাব আপনাকে। আর হ্যাঁ, এখান থেকে কোথাও যাবেন না। ভয়ের কিছু নেই। আপনিই টেরর ক্যাসলের ভূত, কথাটা এখনই ফাঁস করছি না আমরা। অনেক রাত হল। আচ্ছা চলি। কাল দেখা হবে।
সুড়ঙ্গ পথেই আবার ক্যাসলে ফিরে এল ওরা—তিন গোয়েন্দা আর হ্যানসন। বেরিয়ে এল ক্যাসল থেকে।
আজ আর ভূতের ভয় নেই। ধীরেসুস্থে নেমে এল পথে। রোলস রয়েসে উঠল।
পরদিন সকালে আবার হলিউডে রওনা হল দুই গোয়েন্দা, কিশোর আর মুসা। রবিন আসতে পারেনি। কাজের চাপ বেশি। লাইব্রেরিতে চলে গেছে।
প্যাসিফিক স্টুডিওর ফটকে এসে থামল রোলস রয়েস। আজ আর কোন অসুবিধে হল না। কেরি ওয়াইল্ডার জানে ওরা আসছে, জানিয়ে রেখেছে। গার্ডকে। খুলে গেল দরজা। ভেতরে ঢুকে পড়ল। রোলস রয়েস।
কয়েক মিনিট পরেই মিস্টার ক্রিস্টোফারের অফিসে এসে ঢুকল দুই গোয়েন্দা।
এসে গেছ। বস, ভারি গলা পরিচালকের, তারপর? কি খবর?
ভূতুড়ে বাড়ি খুঁজে পেয়েছি, স্যার, বসতে বসতে বলল কিশোর।
তাই নাকি? ভুরু কোঁচকালেন পরিচালক। কি ধরনের ভূত?
ধরন ঠিক করা কঠিন, বলল কিশোর। আসলে ভূতুড়ে করে। রেখেছিলেন একজন মানুষ। মরা নয়, জ্যান্ত।
তাই মজার ব্যাপার! চেয়ারে হেলান দিলেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। খুলে বল তো, সব।
চুপচাপ সব শুনলেন পরিচালক। তারপর বললেন, জন ফিলবি বেঁচে আছে জেনে ভালই লাগছে। এককালের মস্ত অভিনেতা, কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু একটা ব্যাপার তো বললে না। নার্ভাস করত কি করে লোককে?
গতরাতে মিস্টার ফিলবির ওখান থেকে ফিরে অনেক ভেবেছি, স্যার। শেষে বুঝে ফেলেছি ব্যাপারটা। পাইপ অর্গান।
পাইপ অর্গান!
হ্যাঁ, স্যার। চাচার বুক শেলফে অর্গানের ওপর একটা বই আছে। এক জায়গায় লেখা আছেঃ সাবসোনিক ভাইব্রেশন অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া করে মানুষের স্নায়ুর ওপর। এক ধরনের চাপ সৃষ্টি করে। প্রথমে অস্বস্তি বোধ শুরু হয়। বাড়তে থকে অস্বস্তি, তারপর ভয়, এবং সব শেষে আতঙ্কিত করে তোলে।

বুদ্ধি আছে লোকটার! বললেন পরিচালক, কিন্তু ভূতুড়ে ক্যাসলের ভূতকে লোকের সামনে বের করে আনাটা কি উচিত হবে? একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবে ফিলবি।
এখন একমাত্র আপনিই বাঁচাতে পারেন ওঁকে, বলল কিশোর।
আমি?
হ্যাঁ, স্যার, আপনি। ওঁর সমস্ত নির্বাক ছবিকে সবাক করে তুলতে পারেন। কণ্ঠ উনিই দিতে পারবেন। এখন। গলায় আর কোন দোষ নেই। প্রচুর আয় হবে। ক্যাসলটা আবার কিনে নিতে পারবেন মিস্টার ফিলবি। এতদিন ভূত সেজে মানুষকে কি করে ভয় দেখিয়েছিলেন, প্রকাশিত হবে। খবরের কাগজে। লোকে দেখতে আসবে। টেরর ক্যাসল। ভেতরের অদ্ভুত সব কাণ্ডকারখানা পয়সার বিনিময়ে দেখাতে পারবেন। তিনি। বেশ ভালই আয় হবে ওখান থেকেও। মস্ত বড় একটা প্রতিভাকে প্রায় ধ্বংস করে দিয়েছিল লোকে, না বুঝে। এতগুলো বছরে অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে। তাঁর, তবে আপনি সাহায্য করলে পুষিয়ে নিতে পারবেন কিছুটা।
হুম্‌ম্‌ম্‌! হালকা পাতলা ছেলেটার দিকে চেয়ে আছেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। তোমার অনুরোধ আমি রাখব, কিশোর পাশা, কথা দিলাম।
থ্যাঙ্ক ইউ, স্যার, থ্যাঙ্ক ইউ খুশি হয়ে উঠল। কিশোর। মিস্টার ফিলবির অভিনীত ছবিগুলো এবার দেখতে পাব।
হ্যাঁ, এবার দেখতে পাব, বলল পাশে বসা মুসা।
হ্যাঁ, ভাল কথা, অনেক খোঁজ-খবর করেছি আমি, বললেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। কিন্তু সত্যি সত্যি কোন ভূতুড়ে বাড়ি নেই কোথাও। গুজব থাকে, ভূত আছে ভূত আছে। কিন্তু ভালমত খোঁজখবর করলেই বেরিয়ে পড়ে অন্য কিছু। যাই হোক, ওই প্রোজেক্ট বাদ দিতে হচ্ছে আমার।
তাহলে কি... সামনে ঝুঁকল কিশোর।
হাত তুললেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। আগে শোন সব কথা। কথা দিয়েছিলাম, তোমাদের নাম প্রচার করব। ব্যবস্থাটা আসলে তোমরাই করে দিলে। চমৎকার এক গল্প হবে, সত্যি ঘটনার ওপর ভিত্তি করে। টেলিভিশনের জন্য যদি একটা ফিল্ম তৈরি করি? নাম দিইঃ মিস্টার ফিলবি অভ টেরর ক্যাসল, কেমন হয়?
প্রায় লাফিয়ে উঠল কিশোর আর মুসা। হাততালি দিয়ে উঠল। চেঁচিয়ে উঠল, খুব ভাল হয়, স্যার, খুব ভাল!
হ্যাঁ, আরেকটা ব্যাপার। তোমাদের মাঝে সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি। আমি। গোয়েন্দা হিসেবে ভালই নাম করতে পারবে। চালিয়ে যাও। দরকার হলে আমিও সাহায্য করব তোমাদের।

খুশিতে ধেই ধেই করে লাফানো বাকি রাখল শুধু দুই গোয়েন্দা।
কিশোর বলল, আমরা যাই, স্যার। রবিনকে খবরটা দিতে হবে।
ঘর থেকে প্রায় ছুটে বেরিয়ে এল দুই কিশোর। পেছনে তাকালে, দেখতে পেত, সারাক্ষণ সদা-গম্ভীর চিত্র-পরিচালকের মাঝেও সংক্রমিত হয়েছে তাদের আনন্দ। কুৎসিত ঠোঁটে ফুটেছে নিষ্পাপ। সুন্দর এক চিলতে হাসি।

ভলিউম ১ – মমি – তিন গোয়েন্দা – রকিব হাসান – সেবা প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৬

পাশা স্যালভেজ ইয়ার্ডে ব্যস্ততা।

চাচীকে সাহায্য করছে কিশোর পাশা, আর তার দুই বন্ধু মুসা আমান ও রবিন মিলফোর্ড।

তিন চাকার ছোট্ট গাড়ি নিয়ে ইয়ার্ডের ভেতরে এসে ঢুকল পোস্টম্যান। একগাদা পুরানো লোহা-লক্কড়ের কাছে দাঁড়ানো মারিয়া পাশার দিকে চেয়ে আস্তে করে মাথা ঝোকাল একবার, তারপর এগিয়ে গেল কাঁচে ঘেরা ছোট্ট অফিস ঘরের দিকে। বারান্দার দেয়ালে ঝোলানো চিঠির বাক্সে একগাদা চিঠি ফেলে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল আবার।

হায়, আল্লাহ! বলে উঠলেন মেরিচাচী, ভুলেই গিয়েছিলাম! কিশোর, বাপ, এক দৌড়ে পোস্ট অফিসে যা তো! একটা জরুরি চিঠি রেখে গেছে তোর চাচা, পোস্ট করে দিয়ে আয়।

অ্যাপ্রনের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দোমড়ানো একটা খাম বের করলেন মেরিচাচী। হাত দিয়ে ডলে সমান করে বাড়িয়ে দিলেন কিশোরের দিকে।

রেজিস্ট্রি করে পাঠাস, বললেন মেরিচাচী। আরেক পকেট থেকে টাকা বের করে দিলেন কিশোরকে। সকালের ডাক ধরাতে পারিস কিনা দেখিস।

পারব, কিশোরের কণ্ঠে আত্মবিশ্বাস। মুসা আর রবিনকে খাঁটিয়ে নাও এই সুযোগে। দুই বন্ধুর দিকে চেয়ে মুচকি হাসল গোয়েন্দাপ্রধান। তাড়াতাড়ি সাইকেল বের করে চড়ে বসল।

গেট দিয়ে বেরিয়ে গেল কিশোর। সেদিকে চেয়ে মিষ্টি করে হাসলেন। মেরিচাচী। মুসা আর রবিনকে বললেন, চল, চিঠিপত্রগুলো দেখে ফেলি। আজকাল কিশোরের নামেও অনেক চিঠি থাকে।

খুশি মনেই মেরিচাচীকে অনুসরণ করল দুই গোয়েন্দা।

বাক্স খুলে চিঠিগুলো নিয়ে অফিসে এসে বসলেন মেরিচাচী। একটা চিঠি খুলে দেখলেন। হুমম, একটা বাড়ির মাল নিলাম হবে।—এটা, বিল—একটা স্টীম বয়লার বিক্রি করেছিলাম, তার বিল।—আরেকটা বিল।—ও, এটা এসেছে আমার বোনের কাছ থেকে।—এটা?—একটা বিজ্ঞাপন টেলিভিশনের— একটার পর একটা চিঠি খুলে দেখছেন, আর মন্তব্য করছেন চাচী। রাশেদ চাচার নামে ব্যক্তিগত চিঠিও আছে গোটা দুয়েক। ওগুলো খুললেন না। আরও দুটো চিঠির নাম ঠিকানা দেখে সামান্য ভুরু কোচকালেন। মৃদু একটা হাসির রেখা দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। ঠোঁটে। খুললেন না এ দুটোও, আড়চোখে তাকালেন একবার মুসা আর রবিনের মুখের দিকে। বড়ই হতাশ হয়েছেন যেন, এমনি ভঙ্গিতে মাথা

নাড়লেন। নাহ, কিশোরের জন্যে কিছুই নেই। দুই গোয়েন্দার দিকে সরাসরি তাকালেন। তবে, তিন গোয়েন্দার নামে আছে দুটো, এই যে। নেবে নাকি? না কিশোরের হাতে দেব?
মেরিচাচীর কথা শেষ হওয়ার আগেই ছোঁ মেরে চিঠি দুটো তুলে নিল মুসা। রবিনের দিকে চেয়ে বলল, হেডকোয়ার্টারে যাচ্ছি! ছুটে বেরিয়ে গেল অফিস থেকে।
মুসার পেছনেই বেরোল রবিন। ফিরে চাইলে দেখতে পেত, সস্নেহ হাসি ফুটছে মেরিচাচীর ঠোঁটে।
পেছনে ফিরে তাকাল একবার মুসা, আমাদের অফিশিয়াল কিছু হতে পারে, গোপনীয়। তাই ওখানে খুললাম না। হেডকোয়ার্টারে ঢুকে খুলব।
মাথা কাত করল রবিন।
দুই সুড়ঙ্গের সামনে গিয়ে দাঁড়াল মুসা। লোহার পাতটা সরিয়েই ঢুকে পড়ল পাইপের ভেতরে।
মোবাইল হোমের ভেতরে অন্ধকার। সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিল মুসা। ফিরে তাকাল। রবিনও ঢুকছে।
দুটো চিঠিরই কোণের দিকের ঠিকানা পড়ল মুসা। রবিন! চেঁচিয়ে উঠল। উত্তেজিত গলায়। একটা এসেছে মিস্টার ক্রিস্টোফারের কাছ থেকে। এটাই আগে খুলি।
রবিনও উত্তেজিত। না, এটা পরে। কাজের কিছু থাকলে ওটাতেই আছে। আচ্ছা, কিশোরের ফেরার অপেক্ষা করবে?
এত সৌজন্য না দেখালেও চলবে, ঝাঝাল কণ্ঠ মুসার। একটু আগে কি বলল? আমাকে আর তোমাকে খাঁটিয়ে নিতে। ওসব অপেক্ষা-টপেক্ষার দরকার নেই। খোল। রেকর্ড রাখার আর পড়াশোনার দায়িত্ব তোমার ওপর। তার মানে। চিঠি খোলারও।
মুসার কথায় যুক্তি আছে, আর কিছু বলল না রবিন। একটা চিঠি নিয়ে সাবধানে ছুরি ঢুকিয়ে দিল এক প্রান্তে। কাটল। আচ্ছা, মুসা, চিঠিটা পড়ার আগে চেষ্টা করে দেখি, দেখেই কিছু বোঝা যায় কিনা। কি বল? শার্লক হোমস চিঠি দেখেই অনেক কিছু বলে দিতে পারতেন ওটা সম্পর্কে। কিশোরও তাই বলে, শুধু দেখেই নাকি অনেক কিছু বলে দেয়া যায়। এস, চেষ্টা করে দেখি।
শুধু দেখেই কি আর বলা যাবে? সন্দেহ ফুটেছে মুসার চোখে।
জবাব দিল না রবিন। গভীর মনোযোগে উল্টেপাল্টে পরীক্ষা করছে খামটা। হালকা নীল রঙ। নাকের কাছে তুলে শুকল। লাইলাক ফুলের গন্ধ। ভেতরের

কাগজটা বের করল। গন্ধ আর রঙ খামটার মতই। চিঠির কাগজের এক কোণে। ছোট্ট একটা ছবি ছাপা, দুটো বেড়ালের বাচ্চা খেলছে।
হুম! গম্ভীর হল রবিন। কপালে ডান হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে আস্তে টোকা দিল বার দুই, যেন মগজটাকে খোলাসা করে নিতে চাইছে। হ্যাঁ, আমার কাছেই এসেছে এটা (সিনেমায় দেখা শার্লক হোমসের কথা আর ভঙ্গি নকলের চেষ্টা করছে)। পাঠিয়েছেন এক মহিলা। বয়েস, এই, পঞ্চাশের কাছাকাছি। বেঁটেখাট, মোটা। চুলে রঙ মাখানো। কথা বলেন প্রচুর। বেড়াল বলতে পাগল। মনটা খুব ভাল। মাঝে মাঝে সামান্য খেয়ালী হয়ে পড়েন। এমনিতে তিনি হাসিখুশি, তবে এই চিঠি লেখার সময় খুব দুশ্চিন্তায় ছিলেন।
ঠিকরে বেরিয়ে আসবে যেন মুসার দুই চোখ। খাইছে! শুধু ওই খাম আর চিঠির কাগজ দেখেই এত কিছু জেনে গেলে!
নিশ্চয়, রবিন নির্লিপ্ত। আর হ্যাঁ, মহিলা খুব ধনী। সমাজসেবা করেন।
রবিনের হাত থেকে খাম আর চিঠিটা নিল মুসা। উল্টেপাল্টে দেখল। ভুরু কুঁচকে গেছে। অবশেষে আগের জায়গায় ফিরে গেল আবার ভুরু। বেড়ালের বাচ্চার ছবি দেখেই বোঝা যাচ্ছে, মহিলা বেড়াল ভালবাসেন। স্ট্যাম্পের পাতা থেকে তাড়াহুড়ো করে খুলেছেন স্ট্যাম্প, একটা কোণ ছিঁড়ে গেছে, তারমানে খামখেয়ালী। লেখার স্টাইল দেখে বোঝা যাচ্ছে, হাসিখুশি। নিচের লাইনগুলো আঁকাবাকা, লেখাও কেমন খারাপ, অর্থাৎ কোন একটা ব্যাপার নিয়ে দুশ্চিন্তা করছেন।
মাথা ঝাঁকাল রবিন। ঠিক জায়গায় নজর দিতে পারলে ডিডাকশন খুব সহজ।
হ্যাঁ, স্বীকার করল মুসা। শার্লক হোমস কিংবা কিশোর পাশার শাগরেদ হতে পারলে, এ-বিদ্যা শেখা আরও সহজ। কিন্তু, তুমিও কম না। মহিলার বয়স, আকৃতি, ধনী, চুলে রঙ করেন, বেশি কথা বলেন, এগুলো জানলে কি দেখে?
হাসল রবিন। খামের কোণে মহিলার ঠিকানা রয়েছে। সান্তা মনিকার। জায়গাটা ধনীদের এলাকা, জানই। আর ওখানকার ধনী বয়স্কা মহিলাদের সময় কাটানর জন্যে সমাজসেবা ছাড়া আর তেমন কিছুই করার নেই।
বেশ, বুঝলাম। কিন্তু চুলের রঙ? বয়স? বেশি কথা বলে? আকৃতি? এসব কি করে বুঝলে?
বুঝেছি, সহজ গলায় জবাব দিল রবিন। লাইলাক ফুলের রঙ আর গন্ধ পছন্দ মহিলার, সবুজ কালিতে লেখেন। বয়স্কা মহিলাদেরই এসব রঙ আর গন্ধ। বেশি পছন্দ। আমার খালাও পছন্দ করেন। তার বয়েস পঞ্চাশের কাছাকাছি, মোটাসোটা, বেঁটে, বেশি কথা বলেন, চুলে রঙ লাগান-তবে চিঠি লেখিকার ব্যাপারে এসব সত্যি না-ও হতে পারে। স্রেফ অনুমান করেছি। শিওর বলতে পারব

না। চিঠির নিচে সইটা আরেকবার দেখল রবিন। তবে একেবারে ভুল, তাও বলব না। আমার খালা আর এই মিসেস ভেড়া চ্যানেলের অনেক কিছুতেই মিল দেখতে পাচ্ছি।

হাসল মুসা। আমাকে বোকাই বানিয়ে ফেলেছিলে। তবে, ডিডাকশন ভালই করেছ। শেষগুলো সত্যি হলে একশোতে একশোই দেয়া যায়। আচ্ছা, এবার দেখা যাক, কি লিখেছেন মহিলা।

চিঠিটা মুসাকে শুনিয়ে জোরে জোরে পড়ল রবিন। মিসেস চ্যানেলের একটা আবিসিনিয়ান বেড়াল ছিল, নাম স্ফিঙ্কস। মহিলার খুব আদরের প্রাণী। হপ্তাখানেক আগে নিখোঁজ। পুলিশকে খবর দিয়েও লাভ হয়নি, তারা বেড়ালের ব্যাপারে উদাসীন। খবরের কাগজে ইদানীং তিন গোয়েন্দার খুব নাম দেখে চিঠি পাঠিয়েছেন। যদি তারা তার বেড়ালটা খুঁজে বের করে দেয়, কৃতজ্ঞ হবেন।

বেড়াল নিখোঁজ, চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল মুসা, আমাদের জন্যে কেসটা ভালই। সহজ, বিপদ নেই, কোনরকম ভয়ের কারণ নেই। মহিলাকে রিং করে বলি, কেসটা নিলাম…

দাঁড়াও, মাথা তুলল রবিন। মিস্টার ক্রিস্টোফার কি লিখেছেন, পড়ি আগে।

হ্যাঁ, ঠিক বলেছ, ফোনের দিকে এগোতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়েছে মুসা।

দ্বিতীয় খামটা খুলে ফেলল রবিন। খুব দামি বণ্ড পেপারে লেখা একটা চিঠি। ওপরে একপাশে বিখ্যাত চিত্রপরিচালক ডেভিস ক্রিস্টোফারের নাম-ঠিকানা ছাপা।

মুসাকে শুনিয়ে পড়তে শুরু করল রবিন। প্রথম বাক্যটা পড়েই থমকে গেল। তারপর খুব দ্রুত চোখ বোলাল পরের লাইনগুলোর ওপর। মুখ তুলে দেখল, অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে আছে গোয়েন্দা-সহকারী।

সর্বনাশ! জোরে কথা বলতেও ভয় পাচ্ছে যেন রবিন। চিঠিটা বাড়িয়ে দিল বন্ধুর দিকে। নাও, নিজেই পড়। আমি বললে বিশ্বাস করবে না।

নীরবে চিঠিটা নিল মুসা। রবিনের মতই দ্রুত পড়ে শেষ করল। মুখ তুলে। তাকাল রবিনের দিকে। বিস্ময়ে কোটর থেকে যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে তার চোখ। ইয়াল্লা! ফিসফিস করে বলল। তিন হাজার বছরের পুরানো মমি কথা বলে।

.

রকি বীচ থেকে মাইল বারো দূরে, হলিউডের বাইরে একটা গিরিসঙ্কট। পাহাড়ের মমি ঢালে এখানে কয়েকটা বড়সড় বাংলোমত বাড়ি, প্রচুর পয়সা খরচ করে তৈরি হয়েছে। বাড়িগুলোকে ঘিরে আছে গাছপালা, ঝোঁপঝাড়। পুরানো স্প্যানিশ রীতির। একটা বড় বাড়ি আছে, একটা অংশকে ব্যক্তিগত, জাদুঘর বানিয়ে নিয়েছেন বাড়ির মালিক প্রফেসর বেনজামিন, একজন বিখ্যাত

ইজিপটোলজিস্ট-মিশর-তত্ত্ববিদ। প্রাচীন মিশর ও পিরামিড সম্পর্কে তার অগাধ জ্ঞান।
বাড়িটার জানালাগুলো আবার ফরাসী রীতির, বড় বড় জানালা প্রায় মেঝে ছুঁই ছুঁই করছে। একটা বিশেষ ঘরের জানালা বন্ধ। সেই জানালার পাশে সারি দিয়ে। সাজানো কয়েকটা মূর্তি, প্রাচীন মিশরীয় কবর খুঁড়ে বের করে আনা। একটা মূর্তি ভারি কাঠের তৈরি। শরীর মানুষের, মুখটা শেয়ালের। প্রাচীন দেবতা, আনুবিস। শার্সি ভেদ করে ঢুকছে পড়ন্ত বিকেলের রোদ, মেঝেতে ছায়া পড়েছে আনুবিসের। শেয়ালের মত মুখের ছায়া অনেকটা বেশি লম্বা হয়ে পড়েছে মেঝেতে, দেখলেই গা ছমছম করে।
মিশরের পিরামিড আর প্রাচীন কবর থেকে তুলে আনা আরও সব জিনিসে প্রায় ঠাসা ঘরটা। দেয়ালে ঝুলছে ধাতব মুখোশ, সে মুখোশের বিকৃত ঠোঁটে রহস্যময় হাসি। মাটির তৈরি চাকতি আর ছোট ছোট ফলক, সোনার গয়না, সবুজ পাথর থেকে খোদাই করা পবিত্র গুবরে পোকার প্রতিকৃতি সাজানো রয়েছে কাঁচের বাক্সে। একটা জানালার কাছে রাখা আছে একটা মমির-কফিন, কাঠের তৈরি ডালা আটকানো। অতি সাধারণ কফিন। গায়ে সোনার পাত নেই, নেই রঙে আঁকা কোনরকম নকশা বা ছবি। বিলাসিতা বা আড়ম্বরের কোন ছাপই নেই ওটাতে।
কফিনটা এক রহস্য, এমনকি প্রফেসর বেনজামিনের কাছেও। ওটা তার গর্বের বস্তু।
প্রফেসর বেনজামিন, ছোটখাট একজন মানুষ, শরীরের তুলনায় ভুড়িটা সামান্য বড়, চেহারা আরও সম্ভ্রান্ত করে তুলেছে কাঁচাপাকা দাড়ি। চোখে গোল্ড-রিম চশমা।
তরুণ বয়সটা এবং তারপরেরও অনেকগুলো বছর মিশরেই কাটিয়েছেন। প্রফেসর। প্রত্নতাত্ত্বিক অনেক অভিযানে অংশ নিয়েছেন। আবিষ্কার করেছেন অনেক পুরানো কবর, ঢুকেছেন পিরামিডের তলায়। দেখেছেন হাজার হাজার বছর আগের ফারাও, তাদের রানী আর চাকর-বাকরের মমি-বিচিত্র অলঙ্কার আর জিনিসে জড়ানো। মূর্তি আর অন্যান্য জিনিসপত্র ওখান থেকেই সংগ্রহ করেছেন। কয়েক বছর আগে ফিরে এসেছেন দেশে। প্রাচীন মিশরে তাঁর আবিষ্কার আর অভিযানের ওপর একটা বই লিখেছেন।
ওই কফিন আর ভেতরের মমিটা তার কাছে এসে পৌঁছেছে মাত্র এক হপ্তা হল। এটা তিনি আবিষ্কার করেছিলেন প্রায় পঁচিশ বছর আগে। সে সময় এবং তার পরের অনেকগুলো বছর খুব ব্যস্ত ছিলেন, নজর দিতে পারেননি মমিটার দিকে। ওটা গচ্ছিত রেখেছিলেন কায়রোর এক জাদুঘরে। দেশে ফিরে চিঠি লিখেছেন।

জাদুঘর কর্তৃপক্ষ মমিটা পাঠিয়ে দিয়েছে প্রফেসরের ঠিকানায়, ওটার ওপর প্রচুর। গবেষণা চালানর ইচ্ছে আছে তাঁর।
মি. ক্রিস্টোফার তিন গোয়েন্দাকে চিঠি পাঠানর দুদিন আগে।
জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন প্রফেসর বেনজামিন। গভীর চিন্তায় মগ্ন। মাঝে মাঝে হাতের পেন্সিল দিয়ে আস্তে টোকা দিচ্ছেন কফিনের ডালায়। এত সাধারণ একটা কাঠের কফিনে কেন রাখা হয়েছে এই মমি! বুঝতে পারছেন না প্রফেসর। কেমন অস্বস্তি বোধ করছেন।
প্রফেসরের কাছেই দাঁড়িয়ে আছে তার খানসামা হুপার। লম্বা, রোগাটে একজন। মানুষ। অনেক বছর ধরে কাজ করছে তার এখানে।
স্যার, আবার খুলতে চান এটা? বলল হুপার। গতকাল ওই কাণ্ড ঘটার। পরেও?
আবার ঘটুক, তাই আমি চাই, জোর দিয়ে বললেন প্রফেসর। জানালাগুলো খুলে দাও। কতবার না বলেছি, বন্ধ ঘরে দম আটকে আসে আমার!
এই দিচ্ছি, স্যার, তাড়াতাড়ি কাছের জানালাটা খুলে দিল হুপার। অন্যগুলোও, খুলতে এগোল।
কয়েক বছর আগে একটা কবরে আটকা পড়ে যান প্রফেসর বেনজামিন। দুদিন ওই বন্ধ ঘরে আটকে থাকার পর বের করে আনা হয় তাকে। সেই থেকেই বন্ধ যে-কোন রকম ঘরের ব্যাপারে একটা আতঙ্ক জন্মেছে তার।
সবকটা জানালা খুলে দিয়ে এল হুপার। ডিবার ডালার মত আলগা চারকোনা কফিনের ডালা। তুলে ওটা কফিনের পাশেই দাঁড় করিয়ে রাখল সে। দুজনেই সামান্য ঝুঁকে তাকাল কফিনের ভেতরে।
বাহ্, তোমার সাহস আছে বলতে হবে, হুপার, প্রশংসা করলেন প্রফেসর। অনেকেই মমির দিকে তাকাতে সাহস করে না। অথচ একে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। বিটুমিন আর অন্যান্য আরকে ভিজিয়ে, লিনেন জড়িয়ে রাখা হত হাজার হাজার বছর আগের মিশরীয় রাজ-রাজাদের দেহ। হয়ত ওদের বিশ্বাস ছিল, দেহটা ঠিক থাকলে মৃত্যুর পরের জগতে ঢোকা খুব সহজ হবে। আরেক দুনিয়ায় গিয়ে যাতে কোনরকম অসুবিধা না হয়, সেজন্যে সঙ্গে দেয়া হত সব রকমের দরকারি জিনিসপত্র। চাকর-বাকরদেরও মেরে মমি বানিয়ে রেখে দেয়া হত রাজার পাশের কোন কক্ষে। আরেক জগতে চাকরেরও অভাব হবে না রাজার, এই বিশ্বাসে। কী অদ্ভুত ধর্ম, আর বিশ্বাস! আবার মমিটার দিকে তাকালেন তিনি। ভেতরের দিকে কফিনের গায়ে খোদাই করা আছে, রা-অরকন-এর নাম। মমি জড়িয়ে থাকা লিনেনের একটা অংশ খোলা। ফলে রা-অরকনের চেহারা দেখা যাচ্ছে। গাঢ় রঙের। কাঠ কুঁদে তৈরি যেন মুখ। ঠোঁট সামান্য ফাঁক হয়ে আছে, কথা বলতে চায় বুঝি! চোখ বোজা।

রা-অরকনকে আজ খুব শান্ত মনে হচ্ছে, স্যার, বলল হুপার। আজ হয়ত কথা বলবে না।
না বললেই ভাল। তিন হাজার বছরের পুরানো মমি কথা বলে এটা খুবই অস্বাভাবিক!
হ্যাঁ, স্যার!
অথচ, গতকাল ফিসফিস করে কি যেন বলেছিল! আপনমনেই বললেন। প্রফেসর। গতকাল এঘরে একা ছিলাম, হুপার, তখন কথা বলে উঠছিল মমিটা। অদ্ভুত ভাষা, বুঝিনি! তবে কথার ধরনে মনে হয়েছে আমাকে কিছু একটা করতে বলছে ও!
মমিটার ওপর আবার ঝুঁকলেন প্রফেসর। রা-অরকন, আজও কি আমার সঙ্গে কথা বলতে চান? বলুন। আমি শুনছি।
চুপ করে রইল মমি। এক মিনিট কাটল। দুই। ঘরে এসে ঢুকেছে একটা মাছি, ওটার ভনভন ছাড়া আর কোন আওয়াজ নেই।
আমার কল্পনাও হতে পারে, আপনমনেই কথা বলছেন প্রফেসর। না, কাল কোন কথা বলেনি মমি। ওটা নিছকই আমার কল্পনা। হুপার, ওয়ার্কশপ থেকে ছোট করাতটা নিয়ে এস। কফিন থেকে ছোট এক টুকরো কাঠ কেটে নেব, আজই পাঠাব। ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটিতে। কার্বন টেস্ট করিয়ে মমিটার আসল বয়স জানা দরকার।
ঠিক আছে, স্যার, যাচ্ছি। বেরিয়ে গেল হুপার।
কফিনের ওপর ঝুঁকলেন প্রফেসর। টোকা দিয়ে দিয়ে দেখলেন। কোথা থেকে। কাটলে ভাল হবে? একটা জায়গায় ফাপা মনে হল টোকার শব্দ। চিলতে কাঠ ভরে ফোকরের মুখ বন্ধ করা হয়েছে যেন।
কাজে মগ্ন প্রফেসর। হঠাৎ কানে এল চাপা বিড়বিড় শব্দ, কফিনের ভেতর থেকেই আসছে! ঝট করে সোজা হয়ে গেলেন তিনি। চোখে অবিশ্বাস। আবার ঝুঁকে মমির ঠোঁটের কাছে কান নিয়ে গেলেন।
হ্যাঁ, মমিই! ফিসফিস করে কি যেন বলছে! সামান্য ফাঁক করা ঠোঁটের ভেতর। থেকেই যেন বেরিয়ে আসছে শব্দগুলো। মিশরীয় ভাষা, কোন সন্দেহ নেই। তবে ঠিক কোন ভাষা, বোঝা গেল না। তিন হাজার বছর আগের কোন ভাষা হবে, অনুমান করলেন তিনি। একটা শব্দও বুঝতে পারছেন না প্রফেসর। কেমন খসখসে কণ্ঠস্বর, কথার ফাঁকে ফাঁকে চাপা হিসহিসানি। এতই নিচু কণ্ঠস্বর, কোনমতে শুনতে পাচ্ছেন তিনি। মাঝে মাঝে বেড়ে গিয়ে পরক্ষণেই আবার ঝপ করে খাদে। নেমে যাচ্ছে আওয়াজ। মমিটা তাকে কিছু বোঝনর জোর চেষ্টা চালাচ্ছে যেন।

উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন প্রফেসর। ভাষাটা বোধহয় আরবী, তবে অনেক প্রাচীন। দুয়েকটা শব্দ কেমন পরিচিত লাগছে না!
বলে যান, রা-অরকন! অনুরোধ জানালেন প্রফেসর। বোঝার চেষ্টা করছি। আমি। স্যার?
বোমা ফাটাল যেন ডাকটা! চমকে উঠে পাঁই করে ঘুরলেন প্রফেসর। এতই মগ্ন। ছিলেন, হুপার এসে ঢুকেছে, টেরই পাননি। নীরব হয়ে গেছে রা-অরকন।
করাতটা মালিকের দিকে বাড়িয়ে দিল হুপার।
হুপার! উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠলেন প্রফেসর। আবার কথা বলেছে মমি! তুমি বেরিয়ে যাওয়ার পর পরই শুরু করেছে! যেই ঘরে ঢুকেছ, থেমে গেছে!
হঠাৎ বড় বেশি গম্ভীর হয়ে গেল হুপার। ভ্রুকুটি করল। তার মানে, আপনি একা না হলে ওটা কথা বলে না! কি বলল, বুঝতে পেরেছেন, স্যার?
না! প্রায় গুঙিয়ে উঠলেন প্রফেসর। ইসস, কেন যে ভাষাবিদ হলাম না! প্রাচীন আরবীই বলছে বোধহয়। হিব্রাইট কিংবা শ্যালডিনও হতে পারে!
ভারি ভারি সব শব্দ! উচ্চারণ করতেই কষ্ট হয় হুপারের, মানে বোঝা তো দূরের কথা। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল সে। চোখে পড়ছে গিরিপথের ওপারে প্রায় একশো গজ দূরে ঢালের গায়ে আরেকটা বাড়ি। নতুন তৈরি হয়েছে, আধুনিক ধাচ।
এত ভাবনার কি আছে, স্যার? হাত তুলে বাড়িটা দেখাল হুপার। প্রফেসর উইলসন তো কাছেই থাকেন। তাকে ডেকে নিয়ে আসুন। রা-অরকনের কথা তিনি বুঝতে পারবেন। অবশ্য যদি তাঁর সামনে কথা বলে মমিটা।
ঠিক, ঠিক বলেছ! চেঁচিয়ে উঠলেন প্রফেসর। আরও আগেই ডাকা উচিত ছিল জিমকে। জান না বোধহয়, রা-অরকনকে খোঁজার সময় ওর বাবা ছিল আমার সঙ্গে। আহা, বেচারা! মমিটা খুঁজে পাওয়ার এক হপ্তা পরেই নৃশংসভাবে খুন করা হল তাঁকে! কে, কেন করল, কিছু জানা যায়নি!...যাকগে, তুমি এখনি ফোন কর। জিমকে। বল, আমি ডাকছি। এখুনি যেন চলে আসে।
যাচ্ছি, স্যার।
হুপার বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার কথা বলে উঠল মমি। শুরু হয়ে গেল তার গা ছমছম-করা ফিসফিসানি।
মমির ঠোঁটের কাছে কান নিয়ে গিয়ে কথা বোঝার ব্যর্থ চেষ্টা করলেন আরেকবার প্রফেসর। শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে সোজা হলেন। তাকালেন গিরিপথের। ওপারের বাড়িটার দিকে। গিরিখাতগুলো এখানে অদ্ভুত। পথের অনেক নিচে নেমে গেছে ওপাশে পাহাড়ের ঢাল। ভাষাবিদ জিম উইলসনের বাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে পথের সমতলের বেশ অনেকখানি নিচে।

দেখতে পাচ্ছেন প্রফেসর, বাড়ির একপাশের দরজা দিয়ে বেরোলেন ভাষাবিদ। সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলেন গ্যারেজে। গাড়ি বেরোল। ছোট্ট একটা বিজ পেরিয়ে নামল পেঁচানো সরু গিরিপথে। চোখ যেদিকেই থাক, প্রফেসরের কান রয়েছে মমির দিকে। ফিসফিস থামিয়ে দিয়েছে ওটা, বোধহয় কথা বোঝাতে ব্যর্থ হয়েই হাল। ছেড়ে দিয়েছে।

হঠাৎ অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন প্রফেসর। যদি কথা না বলে মমিটা? প্রফেসর উইলসন এসেও কিছু করতে পারবেন না। কথা না শুনলে মানে বলবেন কি করে? কথা থামাবেন না, রা-অরকন! প্লীজ! অনুরোধ করলেন প্রফেসর বেনজামিন। প্লীজ, আবার বলুন! আমি শুনছি। বোঝার চেষ্টা করছি।

নীরব হল মমি। বাইরে গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ হল। খানিক পরেই খুলে গেল। দরজা। ঘরে এসে ঢুকলেন জিম উইলসন।

এই যে, জিম, এসে পড়েছ, বলে উঠলেন প্রফেসর।

হ্যাঁ, কি হয়েছে? জিজ্ঞেস করলেন উইলসন।

এদিকে এস। অদ্ভুত একটা ভাষা শুনতে পাবে!

পাশে এসে দাঁড়ালেন উইলসন। চেঁচিয়ে বললেন প্রফেসর, রা-অরকন, প্লীজ! কথা বলুন, যা বলছিলেন এতক্ষণ, আবার বলুন!

নীরব রইল মমি, এ-ঘরে আসার আগের তিনশো শতাব্দী যেমন ছিল।

কাকে কি বলছেন বুঝতে পারছি না! উইলসনের কণ্ঠে বিস্ময়। হালকা পাতলা শরীর, মাঝারি উচ্চতা, হাসি-খুশি সুন্দর চেহারা। বয়স, এই পঁয়তাল্লিশ ছেচল্লিশ। ভারি চমৎকার কণ্ঠস্বর। ওই শুকনো লাশকে কথা বলতে বলছেন নাকি!

হ্যাঁ, কণ্ঠস্বর খাদে নামালেন প্রফেসর। ফিসফিস করে কথা বলে। অদ্ভুত ভাষায়। শুধু আমার সঙ্গে। অন্য কাউকে ঘরে ঢুকতে দেখলেই—। ভাষাবিদের চাহনি দেখে থেমে গেলেন তিনি। তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না, না? রা-অরকন আমার সঙ্গে কথা বলে, বিশ্বাস করতে পারছ না?

গাল চুলকালেন উইলসন। বিশ্বাস করা কঠিন। তবে নিজের কানে শুনলে…

চেষ্টা করে দেখি, মমির ওপর কুঁকলেন প্রফেসর। রা-অরকন, কথা বলুন। বোঝার চেষ্টা করব আমরা।

দুজনেই অপেক্ষা করে রইলেন। রা-অরকনের মমি নীরব।

কোন লাভ নেই, শব্দ করে শ্বাস ফেললেন প্রফেসর। তবে, কথা বলেছিল। ও। বিশ্বাস কর। আবার হয়ত আমি একা হলেই বলবে। তোমাকে শোনাতে পারলে ভাল হত। কি বলছে বুঝতে পারতে।

ভাবভঙ্গিতেই বোঝা যাচ্ছে প্রফেসরের কথা বিশ্বাস করতে পারছেন না উইলসন।

হ্যাঁ, তা হয়ত পারতাম।–আপনার হাতে ওটা কি? করাত—মমিটা কেটে ফেলবেন

নাকি?
না, না, মাথা নাড়লেন প্রফেসর। কফিনের কোণ থেকে সামান্য কাঠ নিয়ে কার্বন টেস্টের জন্যে পাঠাব। রা-অরকনকে কবে কবর দেয়া হয়েছিল জানা যাবে।
মূল্যবান জিনিসটা কেটে নষ্ট করবেন! ভুরু কোঁচকালেন উইলসন। তার কি দরকার আছে?
এই মমি আর কফিন সত্যিই মূল্যবান কিনা, এখনও জানি না। জানতে হলে কার্বন টেস্ট করতে হবে। তবে, অদ্ভুত রহস্যটার সমাধান করব আগে। কি বলে, জানব। তার আগে পাঠাচ্ছি না। সত্যি, জিম, খুব অবাক হয়েছি! মমি কথা বলে! তা-ও আবার একা আমার সঙ্গে।
হুমম। বৃদ্ধ প্রফেসরের জন্যে করুণা হচ্ছে উইলসনের। এক কাজ করবেন? কয়েকদিনের জন্যে কফিনসহ মমিটা আমার ওখানে পাঠিয়ে দিন। আমি একা থাকলে হয়ত আমার সঙ্গেও কথা বলতে পারে ওটা। বললে, বুঝতে পারবই। সমাধান হয়ে যাবে হয়ত রহস্যটার।
উইলসনের দিকে তাকালেন প্রফেসর। গম্ভীর হয়ে গেছেন। থ্যাংক ইউ, জিম, কণ্ঠস্বর ভারি। বুঝতে পারছি, আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না তোমার। ভাবছ, সব আমার অলীক কল্পনা। হয়ত তোমার ধারণাই ঠিক। কিন্তু ব্যাপারটা সম্পর্কে শিওর না হয়ে মমি হাতছাড়া করছি না আমি।
সামান্য একটু মাথা ঝাঁকালেন উইলসন। ঠিক আছে, রা-অরকন আবার কথা। বললেই ডেকে পাঠাবেন আমাকে। চলে আসব। এখন যাই। ইউনিভার্সিটিতে সম্মেলন আছে।
প্রফেসরকে গুড বাই জানিয়ে বেরিয়ে গেলেন প্রফেসর উইলসন।
মমির দিকে চেয়ে অপেক্ষা করে রইলেন প্রফেসর বেনজামিন। নীরব রইল রা অরকন।
ডিনার দেব, স্যার? দরজার কাছ থেকে হুপারের কথা শোনা গেল।
হ্যাঁ, মুখ ফিরিয়ে তাকালেন প্রফেসর। শোন, এসব কথা কাউকে কিছু বলবে না।
না, বলব না, স্যার।
উইলসনের ভাবভঙ্গি থেকেই বুঝে গেছি, কথাটা শুনলে আমার বৈজ্ঞানিক বন্ধুরা কি ভাববে। মোটেই বিশ্বাস করবে না ওরা। মুখ টিপে হাসাহাসি করবে। বলবে, বুড়ো বয়সে পাগল হয়ে গেছি। খবরের কাগজে প্রকাশ করে দিলেই গেছি। সারা জীবনে যত সুনাম কামিয়েছি, সব যাবে।
হ্যাঁ, স্যার, মাথা ঝোঁকাল হুপার। হয়ত তাই ঘটবে।
কিন্তু, কারও না কারও কাছে কথাটা বলতেই হবে আমাকে, চিন্তিত ভঙ্গিতে কানের নিচে চুলকালেন প্রফেসর। এমন কেউ, যে বিজ্ঞানী নয়। যে জানে, অনেক

রহস্যময় ঘটনা ঘটে এই দুনিয়ায়, যার কোন ব্যাখ্যা নেই। কিন্তু কাকে বলব? কাকে—
স্যার, মি, ক্রিস্টোফারকে ফোন করে দেখুন না। তিনিও তো আপনার বন্ধু। আর রহস্য নিয়েই তার—
ঠিক, ঠিক বলেছ! চেঁচিয়ে উঠলেন প্রফেসর। আজই যোগাযোগ করব ওর সঙ্গে। সারা আমেরিকায় যদি কেউ বিশ্বাস করে আমার কথা, একমাত্র ডেভিসই করবে।
.
মমি কথা বলে কি করে? আবার একই প্রশ্ন করল মুসা।
জবাবে শুধু মাথা নাড়ল রবিন।
দুজনেই বার বার পড়েছে চিঠিটা। বিশ্বাসই করতে পারছে না। ডেভিস ক্রিস্টোফারের কাছ থেকে না এলে এতক্ষণে ছুঁড়ে ফেলে দিত ময়লা ফেলার ঝুড়িতে। কিন্তু ফালতু কথা বলেন না চিত্রপরিচালক। তিনি যখন বিশ্বাস করেছেন, নিশ্চয় ব্যাপারটা প্রফেসর বেনজামিনের কল্পনাপ্রসূত নয়। প্রফেসরকে সাহায্য করার অনুরোধ জানিয়ে চিঠি লিখেছেন মি, ক্রিস্টোফার।
মমি তো একটা মরা লাশ, আবার বলল মুসা। কি করে কথা বলে কোঁকড়া কালো চুলে আঙুল চালাল সে। এককালে মানুষ ছিল অবশ্য, তবে এখন…
জ্যান্ত নয়, মুসার কথাটা বলে দিল রবিন। ভূত-টুত ভাবছ না তো? অপছন্দ হচ্ছে ব্যাপারটা?
নিশ্চয়! হাত বাড়িয়ে ডেস্কে রাখা চিঠিটা আবার তুলে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখল মুসা। প্রফেসর হার্বার্ট বেনজামিন প্রখ্যাত ইজিপট-অল—ইজিপট-অল—
ইজিপটোলজিস্ট, বলে দিল রবিন।
ইজিপট-অল-ইজিপট-অল–আরে ধুত্তেরি! জাহান্নামে যাক! আঁজিয়ে উঠল মুসা। তারপর নিজেকেই যেন বলল, হলিউডের কাছে হান্টার ক্যানিয়নে থাকেন প্রফেসর। ব্যক্তিগত জাদুঘর আছে। একটা মমি আছে সেখানে, যেটা কথা বলে, এবং ভাষাটা বুঝতে পারেননি প্রফেসর। খুব অস্বস্তি বোধ করছেন। ঠিকই করছেন, তাঁকে দোষ দেয়া যায় না। মমিটা দেখিনি, অথচ শুনেই অস্বস্তি লাগছে আমার। এ পর্যন্ত কয়েকটা রহস্যেরই তো সমাধান করলাম! বিশেষ করে ওই ছায়া শরীর আর হাউণ্ডের ব্যাপারটা এখনও মন থেকে যায়নি। রবিন, তার চেয়ে চল সান্তা মনিকায় বেড়াল রহস্যের সমাধান করি গিয়ে। টেবিল থেকে মিসেস ভেরা চ্যানেলের চিঠিটা তুলে নিল সে।
কিশোর কোন কেসটা নিতে আগ্রহী হবে, জান, গোমড়ামুখে বলল রবিন।
জানি, মুখ বাঁকাল মুসা। ক্রিস্টোফারের চিঠিটা পড়ামাত্র তাঁকে টেলিফোন করবে সে। তারপরই ছুটবে প্রফেসর বেনজামিনের ওখানে। এক কাজ করি। এস, ভোট

নিই। হারিয়ে দেব কিশোরকে। বেড়াল খোঁজার কাজটাই আগে করতে বাধ্য হবে সে।
ভোটাভুটিতে রাজিই হবে না সে, ঠোঁট ওল্টাল রবিন। চেষ্টা করে তো দেখেছি আগেও। টেরোর ক্যাসলের কথা মনে নেই? যাব না বলেছিলাম, তুমি আমি দুজনেই। শুনেছিল আমাদের কথা?
চুপ করে রইল মুসা। গম্ভীর।
কিন্তু ও আসছে না কেন এখনও! সুড়ঙ্গমুখের দিকে তাকাল রবিন। গেল তো অনেকক্ষণ।
দাঁড়াও, দেখি, বলল মুসা। হয়ত এসেছে, কোন কাজে আটকে দিয়েছে মেরিচাচী।
ছোট মোবাইল হোমের এক কোণে চলে এল সে। মাঝারি আকারের মোটা একটা পাইপ, ছাত ফুটো করে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। ওটাকে জায়গামত আটকানর ব্যবস্থা হয়েছে লোহার শিক দিয়ে। নিচের দিকে দুপাশে আরও দুটো লোহার পাইপ-হ্যাণ্ডেল ধরে মূল পাইপটাকে ওঠানো-নামানো কিংবা এদিক-ওদিক ঘোরানর জন্যে। আসলে ওটা একটা পেরিস্কোপ, প্রথম মহাযুদ্ধের একটা সাবমেরিনে ব্যবহার করা হয়েছিল। পুরানো বাতিল অন্যান্য লোহার জিনিসের সঙ্গে ওটাও কিনে এনেছেন রাশেদ চাচা। জিনিসটাকে মেরামত করে হেডকোয়ার্টারের ছাতে লাগিয়ে নিয়েছে তিন গোয়েন্দা। দিব্যি কাজ চলে এখন। কিশোর এক অদ্ভুত নাম দিয়েছে পেরিস্কোপটার, সর্ব দর্শন।
হ্যাঁণ্ডেল ধরে পেরিস্কোপটা ঠেলে ওপরে তুলে দিল মুসা। আয়নায় চোখ রাখল। যন্ত্রটা এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে নজর বোলাল ইয়ার্ডে। নির্দিষ্ট একটা অবস্থানে এনে স্থির করল। একজন খদ্দের দেখতে পাচ্ছি। পাইপ বিক্রি করেছেন মেরিচাচী জঞ্জাল সরাচ্ছে বোরিস... আর, ওই যে, কিশোর, সামান্য ঘোরাল পেরিস্কোপ। ফিরে এসেছে। ঠেলে ঠেলে আনছে সাইকেলটা। খারাপ হয়ে গেছে বোধহঃ কিছু..হ্যাঁ, হ্যাঁ, সামনের টায়ার বসে গেছে। পাঙ্কচার।
পেরেক-টেরেক ঢুকেছে হয়ত, মন্তব্য করল রবিন। দেরি এজন্যেই। কি মনে হচ্ছে চেহারা দেখে? রেগেছে খুব?
নাহ, আশ্চর্য! সঙ্গের রেডিও শুনছে আর হাসছে, বলল মুসা। সত্যিই আশ্চর্য! সাইকেলের টায়ার পাঙ্কচার, ঠেলে ঠেলে আনা! কার না মেজাজ খারাপ হয়? কিশোরের তো আরও বেশি হওয়ার কথা। যেরকম খুঁতখুঁতে। তা না, হাসছে!
ওর মতিগতি বোঝা মুশকিল! বলল রবিন। কখন হাসবে, কখন রাগবে, আর কখন কি করে বসবে, সে-ই জানে! রেডিওতে মজার কোন অনুষ্ঠান হচ্ছে। বোধহয়।

কি জানি! পেরিস্কোপ আরেকটু বায়ে ঘোরাল মুসা। মেরিচাচীর সামনে এসে। দাঁড়িয়েছে। কি যেন দিচ্ছে চাচীকে। কিছু বলছে। এদিকে আঙুল তুলে দেখাচ্ছেন। চাচী। আমাদের কথাই বলছেন বোধহয়।...সাইকেলটা স্ট্যাণ্ডে তুলে রাখল। কিশোর। অফিসে ঢুকছে।...দেরি করছে কেন? কি করছে?...ওই যে, বেরোচ্ছে।...আসছে, এদিকেই আসছে...

ওকে নিয়ে আজ একটু মজা করব, হাসল রবিন। মিস্টার ক্রিস্টোফারের চিঠিটা পকেটে রেখে দিয়েছি। মিসেস চ্যানেলেরটা দেখাব আগে, কেসটা নিতে বলব। রাজি হলে তারপর দেখাব আসল চিঠিটা।

বেড়ালটা পাওয়ার আগে দেখিও না, খবরদার! হাসল মুসা। আরেকটা বুদ্ধি এসেছে মাথায়। আমি যা যা বলব, সায় দেবে। কিংবা চুপ করে থাকবে। অন্তত প্রতিবাদ করবে না।

অপেক্ষা করছে দুই গোয়েন্দা। পেরিস্কোপের কাছ থেকে সরে এসেছে মুসা। বাইরে টিনের পাত সরানর মৃদু শব্দ হল। খানিক পরেই খুলে গেল ট্রেলারের ভেতরে দুই সুড়ঙ্গের ঢাকনা। চট করে এসে নিজের চেয়ারে বসে পড়ল মুসা। সুড়ঙ্গমুখে কিশোরের হাত দেখা গেল, তারপর মাথা। উঠে এল সে ট্রেলারে।

উফফ! যা গরম! ফুহহ করে মুখের ভেতর থেকে বাতাস বের করল কিশোর।

হ্যাঁ, সবজান্তার ভঙ্গিতে মাথা দোলাল মুসা। এই গরমে সাইকেলের চাকা পাঙ্কচার? ঠেলে আনা খুব কষ্টকর।

মুসার দিকে তাকাল কিশোর। কি করে জানলে, সাইকেলের টায়ার পাঙ্কচার?

ডিডাকশন, জবাব দিল মুসা। তুমিই তো ডিডাকশনের ওপর জোর দিতে বল। আমি আর রবিন এতক্ষণ ধরে তাই প্র্যাকটিস করছিলাম। না, রবিন?

মাথা নাড়ল নথি। হ্যাঁ। অনেক পথ হেঁটে আসতে হয়েছে তোমাকে, কিশোর?–

চোখের পাতা কাছাকাছি চলে এসেছে কিশোরের। সতর্ক দৃষ্টিতে একবার তাকাল মুসার দিকে, তারপর রবিনের মুখের দিকে। হ্যাঁ, তা হয়েছে। এখন বল, কি ডিডাকশন করলে? কি দেখে বুঝেছ, আমার সাইকেলের চাকা পাঙ্কচার হয়েছে?

কি দেখে মানে? মুসার কণ্ঠে দ্বিধা। ঘাবড়ে গেছে মনে হচ্ছে।

বল না, বলে দাও, তাড়াতাড়ি পরিস্থিতি আয়ত্তে আনার চেষ্টা করল রবিন। শুরুতেই না সর্বনাশ করে দেয় মুসা!

ইয়ে মানে, ঢোক গিলল মুসা। হ্যাঁ, দেখি তোমার হাত? কিশোরকে বলল।

তালু চিত করে দুই হাত সামনে বাড়িয়ে দিল কিশোর। ময়লা ধুলোবালি লেগে আছে। নিশ্চয় টায়ার ঘাটাঘাটি করেছে। পেরেকটা খুলে ফেলে দিয়েছে। বল, কি করে বুঝলে?

তোমার হাতে, হাঁটুতে ময়লা, সামলে নিয়েছে মুসা। কিছু একটা পরীক্ষা করার জন্যে হাঁটু গেড়ে রাস্তায় বসে পড়েছিলে। ডিডাকশন: হাঁটু গেড়ে বসে পাঙ্কচার হওয়া টায়ার পরীক্ষা করেছ। তোমার জুতোতে প্রচুর ধুলো। ডিডাকশনঃ অনেক পথ হেঁটে এসেছ। তাই না, মাই ডিয়ার কিশোর পাশা?
কিশোরের চেহারা দেখে মনে হল, খুব অবাক হয়েছে। চমৎকার। ভাল। ডিডাকশন করতে শিখেছ। এই বুদ্ধি সাধারণ একটা বেড়াল খোঁজার পেছনে ব্যয় করার কোন মানে হয় না।
কি-ই! চমকে উঠেছে মুসা।
একটা আবিসিনিয়ান বেড়াল হারিয়েছে, ওটাকে খোঁজার কোন মানেই হয় না। তিন গোয়েন্দার জন্যে খুবই সহজ কাজ। ভারিক্কি চালে বলল কিশোর, এটা মোটেই সহ্য হয় না মুসার। আড়চোখে একবার সহকারীর মুখের ভাব লক্ষ্য করে বলল গোয়েন্দাপ্রধান, তোমার মত বুদ্ধিমান গোয়েন্দার উপযুক্ত কাজ, মমির রহস্য ভেদ করা। তিন হাজার বছরের পুরানো মমি, যেটা ফিসফিস করে কথা বলে।
কার কাছে জানলে! প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মুসা।
তোমরা যখন ডিডাকশনে ব্যস্ত, সহজ কণ্ঠে বলল কিশোর। আমি তখন মাইণ্ড রিডিং করেছি। রবিন, তোমার পকেটে রয়েছে একটা চিঠি, ওতে প্রফেসর বেনজামিনের ঠিকানা আছে। পনেরো মিনিটের মধ্যেই বেরিয়ে পড়ব। ট্যাক্সি নেব। হাজার হোক, মিস্টার ক্রিস্টোফারের অনুরোধ আমরা ফেলতে পারব না কিছুতেই।
হাঁ হয়ে গেছে অন্য দুই গোয়েন্দা। বোকার মত চেয়ে আছে কিশোরের মুখের দিকে।

.

০৪.

দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার ভেতর দিয়ে ছুটছে ট্যাক্সি। পেছনের সিটে গা এলিয়ে বসে আছে তিন গোয়েন্দা। পাহাড়ী পথ ধরে ছুটছে গাড়ি। প্রচণ্ড ঝাঁকুনি লাগছে।
ইসস্! সোজা হয়ে বসার চেষ্টা করল রবিন। ঝাঁকুনিতেই মেরে ফেলবে। রোলস রয়েসটা হলে কি মজাই না হত! আবার একটা বাজি যদি লাগাত কোম্পানি!
ভেব না, আশ্বাস দিল কিশোর। শিগগিরই আবার ওটাতে চড়ব আমরা।
কি করে! মুসা অবাক। তিরিশ দিন তো সেই কবেই পেরিয়ে গেছে!
দুইয়ে দুইয়ে চার হলেও, তিরিশ দিনে অনেক সময় তিরিশ হয় না, রহস্যময় কণ্ঠে বলল কিশোর। আমি বলে রাখছি, ওই গাড়িটা আবার ব্যবহার করব আমরা। মাসখানেকের জন্যে ভাড়া নিয়েছেন এক ব্যাংকার। মেয়াদ শেষ হলেই

কোম্পানির অফিসে ফিরে আসবে গাড়িটা। তখন ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করে বললেই…
দিয়ে দেবে! ফস করে বলে উঠল মুসা। এতই সহজ!
একই কথা বলেছিলে মিস্টার ক্রিস্টোফারের সঙ্গে প্রথম দেখা করতে যাওয়ার আগে। যাকগে, কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। আমরা বোধহয় এসে গেছি।
আঁকাবাঁকা গিরিপথে পাহাড়ের ঢাল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়ল গাড়ি। খানিক দূরেই বাড়িটা। পুরানো ধাঁচের পোর্টিকো, বিশাল সব থাম। একটা থামে বসানো পেতলের প্লেটে খোদাই করা রয়েছে প্রফেসর হার্বার্ট বেনজামিনের নাম। গাছপালা ঝোঁপঝাড় ঘিরে রেখেছে লাল টালির ছাত দেয়া স্প্যানিশ ধাচের বাড়িটাকে। একপাশে গোল হয়ে নেমে গেছে পাহাড়, সরু উপত্যকা সৃষ্টি করে ওপাশে আবার উঠে গেছে আরেকটা পাহাড়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে। ওই পাহাড়টার ঢালে বিভিন্ন সমতলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে উঠেছে কয়েকটা বাড়ি। নতুন। বাংলো টাইপ।
চল নামি, বন্ধুদেরকে বলল কিশোর। দরজা খুলে নেমে পড়ল ট্যাক্সি থেকে।
রবিন আর মুসাও নামল। ড্রাইভারকে অপেক্ষা করতে বলল কিশোর।–
কিশোর, আমার ভয় করছে! বলে উঠল মুসা। প্রফেসর বেনজামিন পাগল টাগল নয় তো? বুড়ো ওই বিজ্ঞানীগুলো সাধারণত পাগলাটে হয়! বদমেজাজীও!
নাহ, জোর দিয়ে বলল কিশোর। আসার আগে তো টেলিফোন করলাম। গলা শুনে খুব ভদ্র বলেই মনে হল। চল, আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন। ভদ্রলোক।
পাগলা না হলেই ভাল! বিড়বিড় করল মুসা। এগোল গোয়েন্দাপ্রধানের পিছু পিছু। আর হলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। মমির কথা শুনলে আমিও পাগল হয়ে যাব…

.

প্রফেসর বেনজামিন উত্তেজিত। চত্বরে ইজি চেয়ারে বসে আছেন পিঠ সোজা করে। সামনে টেবিলে কফির কাপ। পাশে দাঁড়িয়ে আছে খানসামা।
হুপার, বললেন প্রফেসর। সত্যি শুনেছ তো?
মনে তো হল, স্যার, জবাব দিল খানসামা। দাঁড়িয়ে ছিলাম ঘরটায়। অন্ধকার। হঠাৎ মৃদু একটা শব্দ-কথা বলার আওয়াজই হবে, শুনলাম!
তারপর?
আমার মনে হয়, ইঁদুর-টিদুর, স্যার, প্রফেসরের প্রশ্ন এড়িয়ে গেল হুপার। শূন্য কাপটা তুলে নিল টেবিল থেকে। ন্যাপকিন এগিয়ে দিল।
ঠোঁট মুছলেন প্রফেসর। কিছু একটা হয়েছে আমার, হুপার! হঠাৎ গতরাতে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। দুরুদুরু করছিল বুকের ভেতর। কেন, কে জানে! হয়ত—হয়ত

রহস্যটা আমার স্নায়ু দুর্বল করে দিয়েছে।
আমারও খুব অস্বস্তি লাগছে, স্যার, বলল হুপার। আপনার কি মনে হয়... থেমে গেল কথা শেষ না করেই।
মনে হয় কি মনে হয়? বল?
ইয়ে—মানে—বলছিলাম কি, ব্র-অরকনকে আবার মিশরে পাঠিয়ে দিলে কেমন হয়? কায়রোর সেই জাদুঘরে? বেচে যেতেন
না! দৃঢ় কণ্ঠে বললেন প্রফেসর। মাঝপথেই হাল ছেড়ে দেয়া আমার স্বভাব নয়। তাছাড়া সাহায্য আসছে।
গোয়েন্দার কথা বলছেন তো, স্যার? ওদেরকে বলা উচিত হবে না। পুলিশের কানে কথাটা যাওয়া কি ঠিক?
পুলিশের কানে যাবে না। আমার বন্ধু, ডেভিস কথা দিয়েছে। দাম আছে তার কথার— কলিং বেলের সুরেলা শব্দে থেমে গেলেন প্রফেসর, ওই যে, এসে গেছে ওরা। হুপার, জলদি যাও। নিয়ে এস ওদেরকে এখানে।
যাচ্ছি, স্যার, তাড়াহুড়ো করে চলে গেল খানসামা। একটু পরেই তিন গোয়েন্দাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এল।
ভুরু কুঁচকে বসে আছেন প্রফেসর। সেটা লক্ষ্য করল কিশোর। বুঝলে তিনটে কিশোরকে আশা করেননি তিনি। ভারিক্কি চালে পকেট থেকে কার্ড বের করে বাড়িয়ে কার্ডটা দিল সে।
যন্ত্রচালিতের মত হাত বাড়িয়ে কার্ডটা নিলেন প্রফেসর। চোখ নামালেন কার্ডের দিকে। ছাপা রয়েছে:
???
তিন গোয়েন্দা।
প্রধান: কিশোর পাশা
সহকারী: মুসা আমান।
নথিরক্ষক ও গবেষক: রবিন মিলফোর্ড
আর সবাই যা করে, সেই একই প্রশ্ন করলেন প্রফেসর বেনজামিনওঃ প্রশ্নবোধকগুলো কেন?
জানাল কিশোর ওগুলো রহস্যের প্রতীকচিহ্ন।
হমম্! কার্ডটা হাতে নিয়ে চিন্তিত ভঙ্গিতে ওল্টাচ্ছেন-পাল্টাচ্ছেন প্রফেসর। ডেভিস পাঠিয়েছে তোমাদেরকে। ওর ওপর আমার অগাধ বিশ্বাস, কাজেই তোমাদের ওপর ভরসা রাখছি আপাতত। পুলিশকে ডেকে পাঠাতে পারতাম, কিন্তু, অসুবিধা আছে। ওরা আমার কথা বিশ্বাস করবে না। জোরজার করি যদি বেশি, একজন

ডিটেকটিভ পাঠাবে। লোকের নজরে পড়বেই ব্যাপারটা।খোঁজখবর শুরু করবে ওরা। আসল খবরটা ঠিক বের করে নেবে। পাগল খেতাব দিয়ে বসবে আমাকে।
উঠলেন প্রফেসর। এস, রা-অরকনকে দেখাব, বলেই হাঁটতে শুরু করলেন বা প্রান্তের দিকে।
প্রফেসরকে অনুসরণ করল কিশোর। রবিন আর মুসাও পা বাড়াতে যাচ্ছিল, একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে তাদেরকে ঠেকাল হুপার। হাতটা কাঁপছে। চেহারা ফ্যাকাসে, উত্তেজিত ভাবভঙ্গি।
অনেকখানি এগিয়ে গেছেন প্রফেসর আর কিশোর। সেদিক থেকে চোখ ফেরাল হুপার। ফিসফিস করে বলল, ছেলেরা, মমিটা নিয়ে কাজ শুরু করার আগে কিছু কথা জানা দরকার তোমাদের।
কি কথা? ভ্রুকুটি করল মুসা।
একটা অভিশাপ রয়েছে, কণ্ঠস্বর আরও খাদে নামাল হুপার। রা-অরকনের কবরে কিছু মাটির ফলক পাওয়া গেছে। তাতে অভিশাপ বাণী লেখা: যে এই কবরের গোপনীয়তা নষ্ট করবে তার ওপর নামবে রা-অরকনের অভিশাপ। অনেক বছর আগে পাওয়া গেছে মমিটা। উদ্ধার অভিযানে যারা ছিল তাদের অনেকেরই অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটেছে। কারও কারও মৃত্য ছিল ভয়ঙ্কর আকস্মিক। প্রফেসর বেনজামিনও জানেন ব্যাপারটা। কিন্তু বিশ্বাস করেন না, বলেন মমিটা না পেলেও ঘটত ওই মৃত্যু। বৈজ্ঞানিক কোন ব্যাখ্যা নেই এর। কুসংস্কার। এতদিন এড়িয়েই ছিলেন, কিন্তু মমিটা ঘরে আনার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল গণ্ডগোল। ফিসফিস করে নাকি কথা বলে ওটা! তারমানে মাথার গোলমাল শুরু হয়ে গেছে প্রফেসরের। কোনদিন আত্মহত্যা করে বসবেন, কে জানে! তোমরা ব্যাপারটা অনুসন্ধান করে দেখতে চাইছ, দেখ, বাধা দেব না। তবে খুব সাবধান!
চোখ বড় বড় হয়ে গেছে দুই গোয়েন্দার। হুপারের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম।
বাড়ির প্রান্তে পৌঁছে গেছে কিশোর, হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে ডাকল, কি হল তোমাদের? এস।
দ্রুত এগিয়ে গেল রবিন আর মুসা। গোয়েন্দাপ্রধানের সঙ্গে সঙ্গে এগোল।
বিশাল জানালা দিয়ে জাদুঘরে ঢুকে পড়ল ওরা। কফিনটার সামনে গিয়ে। দাঁড়ালেন প্রফেসর। ঢাকনা তুলে দাঁড় করিয়ে রাখলেন পাশে। বললেন, এই যে, রা-অরকনের মমি। ও কি বলার চেষ্টা করেছে, আশা করি জানতে পারবে তোমরা। বলতে পারবে আমাকে।
গভীর প্রশান্তিতে যেন কফিনের ভেতর ঘুমিয়ে রয়েছে মেহগনি রঙের মমিটা। চোখের পাতা বোজা, কিন্তু দেখে মনে হয় যে-কোন মুহূর্তে মেলবে।

মমিটার ওপর তীক্ষ্ণ নজর বোলাল কিশোর। চোখেমুখে কৌতূহল।
রবিন আর মুসাও দেখছে, তবে কৌতূহলী বা আগ্রহী মনে হচ্ছে না তাদের। বরং শঙ্কা ফুটেছে চেহারায়। চাওয়া-চাওয়ি করল দুই সহকারী গোয়েন্দা।
ইয়াল্লা! হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল মুসা। একেবারে জ্যান্ত! ড্রাকুলা জাতীয় কোন ভূত! কিশোর, এবার সত্যি সত্যি ভূতের পাল্লায় পড়ব!

.

গভীর মনোযোগে মমিটাকে পর্যবেক্ষণ করছে কিশোর। পাশে দাঁড়িয়ে রুমাল দিয়ে বার বার কপালের ঘাম মুছলেন প্রফেসর।
হুপার, খানসামাকে দেখেই বলে উঠলেন প্রফেসর, সবগুলো জানালা খোল! বলেছি না, আমি বন্ধ ঘর একেবারে সইতে পারি না।
এই যে, স্যার, দিচ্ছি, তাড়াহুড়ো করে একটা জানালার দিকে এগিয়ে গেল। লম্বা লোকটা। খুলে দিল জানালা। এক ঝলক বাতাস এসে ঢুকল ঘরে। দেয়ালে, ঝোলানো মুখোশগুলোকে নাড়িয়ে দিল। অদ্ভুত একটা খসখস আর টুংটাং আওয়াজ উঠল চারপাশ থেকে।
শব্দ শুনে মুখ তুলল কিশোর। প্রফেসর, ওই শব্দ শোনেননি তো? বাতাসে মুখোশ কিংবা আর কিছু নড়ানর শব্দ?
না না, মাথা নাড়লেন প্রফেসর। মানুষের কণ্ঠস্বর চিনতে পারি না ভাবছ? মমিটাই কথা বলেছিল!
তাহলে, বলল কিশোর, ধরে নিচ্ছি, আপনি সত্যিই মমিকে কথা বলতে শুনেছেন, এবং সম্ভবত প্রাচীন আরবীতে, তাই না?
এখানে কি আর কিছু করার আছে, স্যার, আমার? মাঝখান থেকে বলে উঠল হুপার। অনেক কাজ পড়ে আছে। যাব?
সবকটা চোখ ঘুরে গেছে খানসামার দিকে। হঠাৎই তার চোখ বড় বড় হয়ে উঠতে দেখল সবাই। শঙ্কিত। প্রফেসরকে লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিল হুপার। তাঁকে নিয়ে গড়িয়ে পড়ল মেঝেতে। পরমুহূর্তেই দুম করে পড়ল কাঠের ভারি মূর্তিটা। শেয়ালমাথা দেবতা আনুবিস। মুহূর্ত আগে প্রফেসর যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন ঠিক সেখানে। পাশে কাত হয়ে গেল মূর্তি, মুখ প্রফেসরের দিকে। তাঁকে শাসাচ্ছে যেন। নীরবে।
কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালেন প্রফেসর।
হুপারও উঠল। সে আরও বেশি কাঁপছে। আমি...আমি ওটাকে নড়ে উঠতে দেখেছিলাম, স্যার! গলা কাঁপছে। ভর্তা হয়ে যেতেন এতক্ষণে। ঢোক গিলল খানসামা। রা-অরকনের অভিশাপ, আর কিছু না! মমিটার সঙ্গে সঙ্গে এসে হাজির হয়েছে।

আরে দূর! হাত দিয়ে ঝেড়ে হাতের ধুলো পরিষ্কার করছেন প্রফেসর। যত্তোসব কুসংস্কার! আর ওই খবরের কাগজওয়ালারা হয়েছে একেকটা গপ্পোবাজ। কিছু একটা পেলেই হল। রঙ চড়িয়ে সাতখান করে বাড়িয়ে লিখে খালি কাগজ বিক্রির ফন্দি। এমন ঘটনা আরও ঘটেছে তুতানখামেনের মমি আবিষ্কার করার পর। অনেকেই মরল, অথচ কি সুন্দর বেঁচে গেলেন হাওয়ার্ড কার্টার। নাটের গুরু তিনি, অভিশাপে মরলে তারই সবার আগে মরার কথা ছিল। তার তো স্বাভাবিক মৃত্যুই হয়েছে। ওসব আবোল-তাবোল কথা বিশ্বাস করার কোন কারণ নেই। মূর্তিটা পড়েছে অন্য কোন কারণে, অভিশাপের জন্য নয়। হয়ত ঠিকমত দাঁড় করানো হয়নি। বাতাসে পড়ে গেছে।

স্যার, ভুলে যাচ্ছেন, খসখসে শোনল হুপারের কণ্ঠ। তিন হাজার বছর ধরে ঠায় দাঁড়িয়ে ছিল মূর্তিটা, পড়েনি। আজ হঠাৎ করে পড়তে গেল কেন? আপনি ভর্তা হয়ে মরতেন, লর্ড কার্নারভনের—-

লর্ড কার্নারভন অসুখে মরেছিলেন, তপ্তকণ্ঠে বললেন প্রফেসর। মূর্তি পড়ে ভর্তা হননি। যাও, ভাগ এখন।

যাচ্ছি, স্যার, ঘুরে দাঁড়াল হুপার।

ঝুকে মূর্তিটা দেখছিল কিশোর, মাথা তুলল। থামাল খানসামাকে। হুপার, আপনি বললেন মূর্তিটাকে নড়ে উঠতে দেখেছেন। কিভাবে কোনদিকে নড়েছিল?

নাক বরাবর সামনের দিকে পড়তে লাগল, মাস্টার পাশা, টলে উঠেছিল। প্রথমে, জবাব দিল হুপার। আজ দাঁড়ানর ভঙ্গিতেই কেমন গোলমাল ছিল, খেয়াল করেছি! সামান্য নাড়া লাগলেই পড়ে যাবে, এমন ভঙ্গি। যেন আগেভাগেই প্ল্যান। করে রেখেছিল, আজ প্রফেসর সাহেবের ওপর পড়বে!

হুপার! তীক্ষ্ণ শোনাল প্রফেসরের কণ্ঠ।

সত্যিই বলছি, স্যার। টলে উঠল আনুবিস, সামনে ঝুঁকে পড়ে গেল। সময়মত নড়তে পেরেছিলাম, তাই রক্ষে!

হ্যাঁ, খুব ভাল করেছ। তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ, তিক্ত কণ্ঠে বললেন, প্রফেসর। সব বাজে কথা! অভিশাপ-

একটা ধাতব মুখোশ খসে পড়ে তীক্ষ্ণ ঝনঝন শব্দ তুলল। প্রায় লাফিয়ে উঠল ঘরের সবাই। চমকে ফিরে তাকাল ওরা।

দেখলেন!–দেখলেন তো, স্যার! আতঙ্কে ছিটকে বেরিয়ে আসবে যেন হুপারের চোখ।

বাতাস! গলায় আর তেমন জোর নেই প্রফেসরের। বাতাসই ফেলেছে। আনুবিসকে, মুখোশটাও ফেলল।

হাঁটু গেড়ে কাঠের মূর্তিটার পাশে বসে পড়েছে কিশোর। হাত বোলাচ্ছে তলার চারকোনা জায়গাটায়-যার ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়েছিল মূর্তি। যথেষ্ট ভারি মূর্তি, স্যার, মুখ না তুলেই বলল কিশোর। তলাটাও খুব মসৃণ। সহজে নড়ার কথা নয়। এই মূর্তি বাতাসে ফেলতে হলে ঝড়ো বাতাস দরকার।
ইয়ং ম্যান, বিরক্তই শোনাল প্রফেসরের কণ্ঠ, আমি একজন বিজ্ঞানী। ভূতপ্রেত কিংবা অভিশাপে বিশ্বাস করি না। আমাকে সহায়তা করতেই যদি চাও, কথাটা মনে রেখে এগিয়ে।
উঠে দাঁড়াল কিশোর। আমিও ওসব বিশ্বাস করি না, স্যার। কিন্তু পাঁচ মিনিটের মধ্যে দুটো অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল, পাঁচজোড়া চোখের সামনে। এবং কারণটা বোঝা যাচ্ছে না কেন পড়ল ওগুলো।
দৈবক্রমে পড়ে গেছে, বললেন প্রফেসর। এটা নিয়ে এত মাথা ঘামানর কিছু নেই।
ইয়ং ম্যান, তুমি বিশ্বাস করছ মমিটা আমার সঙ্গে কথা বলেছে! কি করে বলব, কোন ব্যাখ্যা দিতে পারবে?
নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে শুরু করেছে কিশোর। হঠাৎ বলল, পারব, স্যার।
বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা? আবোল-তাবোল কিছু নয়?
বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা, দুই সহকারীর দিকে ফিরল কিশোর। মুসা, রবিন, গাড়িতে যে ব্যাগটা রয়েছে, ওটা আনতে হবে। কিছু যন্ত্রপাতি আছে ওতে। ওগুলো দরকার।
নিয়ে আসছি, বলল মুসা। বেরিয়ে যেতে পারছে বলে খুশিই সে। রবিন, এস।
পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব আপনাদেরকে, আসুন, হুপারও বেরিয়ে যাওয়ার ছুঁতো পেল।
বেরিয়ে এল তিনজনে, জাদুঘরে কিশোর আর প্রফেসরকে রেখে।
লম্বা একটা হলঘরের ভেতর দিয়ে চলেছে হুপার। অনুসরণ করছে দুই গোয়েন্দা। অন্য পাশের দরজা খুলল খানসামা। তিনজনে বেরিয়ে এল বাইরে।
গাড়ির বনেট মুছছে ড্রাইভার।
ছেলেরা, ফিসফিস করে বলল হুপার, প্রফেসর বেনজামিন বড় বেশি একরোখা। অভিশাপ রয়েছে, ওটাকে গ্রাহ্যই করতে চাইছেন না। কিন্তু তোমরা তো দেখলে, কি ঘটল! পরের বার হয়ত খুন হবেন তিনি! বেশি বাড়াবাড়ি করলে আমাদের কেউও হয়ে যেতে পারি! প্লীজ, ওঁকে বোঝাও, রা-অরকনকে মিশরে ফেরত পাঠিয়ে দিতে। হলরুমে ঢুকে গেল আবার খানসামা।
রবিন আর মুসা, দুজনেই খুব চিন্তিত।
অভিশাপ-টাপ বিশ্বাস করে না কিশোর, বলল মুসা। আমি করি, তাও বলব না। তবে একটা কথা শিওর হয়ে বলতে পারি; যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে কেটে পড়া উচিত আমাদের।

-কোন জবাব দিতে পারল না রবিন। ওসব অভিশাপ-টাপে তারও বিশ্বাস নেই। কিন্তু দুর্ঘটনাগুলো তো ঘটছে, এর কি ব্যাখ্যা?
পেছনে শব্দ শুনে ফিরে তাকাল ড্রাইভার। হয়েছে আপনাদের? না আরও দেরি আছে?
মাত্র শুরু করেছি, এখনও অনেক দেরি, তিক্তকণ্ঠে বলল মুসা। যে কারবারে জড়িয়েছি!—ব্যাগটা নিতে এলাম।
ঘুরে গাড়ির পেছন দিকে চলে এল ড্রাইভার। ট্রাঙ্ক খুলে বের করে আনল। চামড়ার চ্যাপ্টা ব্যাগটা। বাড়িয়ে দিল মুসার দিকে, এই যে, নিন।
আছে কি এর ভেতরে? ব্যাগটা হাতে নিয়ে বলল মুসা। যা ভারি! রবিন, কিশোর একটা চমক দেবে মনে হচ্ছে!
দেখ কি আবার করে বসে! চিন্তিত দেখাচ্ছে রবিনকে। টায়ার পাঙ্কচারের ডিডাকশন করে তো খুব একহাত নিয়েছ, পাল্টা আঘাত হেনে না একেবারে কাত করে দেয়।
ব্যাগটা নিয়ে আবার জাদুঘরে গিয়ে ঢুকল দুই গোয়েন্দা। আনুবিসকে তুলে আবার জায়গামত দাঁড় করিয়ে দিয়েছে কিশোর আর প্রফেসর। মূর্তিটাকে আরও ইঞ্চিখানেক পেছনে ঠেলে দিল কিশোর। মাথা নাড়ল। না, আপনাআপনি পড়তেই পারে না। জানালা দিয়ে বাতাস যা আসছে এতে তো পড়ার প্রশ্নই ওঠে না। পড়াতে হলে প্রচণ্ড ঝড়ো বাতাস লাগবে।
ঘন ভুরু জোড়া কাছাকাছি চলে এল প্রফেসরের। আধিভৌতিক কোন শক্তি কাজ করছে এর পেছনে, বলতে চাইছ।
জানি না! মূর্তিটা কি করে পড়ল, আপাতত বলতে পারছি না, শান্ত কণ্ঠ কিশোরের। রবিন আর মুসার ওপর চোখ পড়তেই বলল, কিন্তু মমি কি করে কথা বলে, দেখাচ্ছি।
মুসার হাত থেকে ব্যাগ নিয়ে খুলল কিশোর। ভেতর থেকে বের করল বড় আকারের তিনটে ট্রানজিসটর রেডিও। একটা রেডিও তুলে দিল মুসার হাতে। ব্যাগ। থেকে একটা চামড়ার বেল্ট বের করে পরিয়ে দিল মুসার কোমরে। তামার অসংখ্য সরু সরু তার কায়দা করে লম্বালম্বি আটকানো রয়েছে বেল্টে। রেডিও থেকে বের করে রাখা দুটো তারের মাথা প্লাগ দিয়ে আটকে দিল বেল্টের তারের সঙ্গে। জানালা দিয়ে চত্বরে নাম, তারপর বাগানে চলে যাও, সহকারীকে নির্দেশ দিল গোয়েন্দাপ্রধান। কানের কাছে রেডিওটা তুলে ধরে রাখবে, যেন কিছু শোনার চেষ্টা করছ। পাশে, এই যে এই বোতামটা টিপে রাখবে। ঠোঁট যতটা সম্ভব না নেড়ে কথা। বলবে। শোনার দরকার হলে বোতামটা টিপে অন করে দেবে, ব্যস তাহলেই হবে।

কি এটা? জানতে চাইল মুসা।
ওয়াকি-টকি। বেল্টটা অ্যান্টেনা। সিটিজেন ব্যাণ্ডে খবর পাঠানো এবং ধরার রেঞ্জ আধ মাইল। আমাদের নিজেদের মাঝে যোগাযোগ রাখার একটা ব্যবস্থা। গত হপ্তায় আর্মির ফেলে দেয়া বাতিল কিছু জিনিস কিনে এনেছিল চাচা। তার ভেতর ছিল এরকম পাঁচটা জিনিস। তিনটে সারিয়ে নিয়েছি আমি।
আমি বাগানে যাচ্ছি, বলল মুসা। কি কথা বলব?
যা খুশি। জানালা গলে চত্বরে নাম, তারপর বাগান।
ঠিক হ্যায়, পা বাড়াতে গিয়েও থেমে গেল মুসা। ঝট করে চোখ তুলে তাকাল। গোয়েন্দাপ্রধানের দিকে। রক্ত জমেছে মুখে। তাহলে এই তোমার মাইণ্ড রিডিং?
ওসব নিয়ে পরে আলাপ করব, হাসছে কিশোর। এখন প্রফেসরকে ব্যাখ্যা দেয়া দরকার। কথা শুরু কর, বলতে বলতে এগিয়ে গিয়ে বড় একটা জানালার কাছে দাঁড়াল। মুখ বাড়িয়ে উঁকি দিল নিচে। দেয়ালের ধার ধরে চলে যাও। ওই যে, গেটপোস্টের ওপরে বড় পাথরের বলটা বসানো রয়েছে, ওদিকে।
যাচ্ছি! জানালা পেরিয়ে চত্বরে নামল মুসা। কানের কাছে তুলে রেখেছে রেডিও।
প্রফেসর, বলল কিশোর, মমিটা চুলে কোন অসুবিধা হবে?
না, মাথা নাড়লেন প্রফেসর। তবে বেশি নাড়াচড়া কোরো না।
মমির ওপর ঝুঁকল কিশোর। পরমুহূর্তেই সোজা হয়ে দাঁড়াল। হাতে একটা। ওয়াকি-টকি, অন্যটা অদৃশ্য হয়ে গেছে। হাতেরটা মুখের কাছে এনে বলল, হ্যাঁ, এবার কথা শুরু কর, মুসা। প্রফেসর, শুনবেন। রবিন, তুমিও শোন।
সবাই কান খাড়া রাখল। নীরবতা। তারপর একটা মৃদু বিড়বিড় শোনা গেল।
মমির ওপর ঝুঁকে দাঁড়ান, প্রফেসরকে বলল কিশোর। কানের কাছে ধরা রয়েছে তার ওয়াকি-টকি।
ভ্রুকুটি করলেন প্রফেসর। ঝুঁকলেন মমির ওপর। রবিনও ঝুঁকল। ফিসফিসে কথা শোনা যাচ্ছে কফিনের ভেতর থেকে। দুজনের কারোই বুঝতে অসুবিধে হল না, ওটা মুসার কণ্ঠস্বর।
গেট পেরিয়ে এসেছি, বলল মুসা! ঢাল বেয়ে নেমে যাচ্ছি বড় ঝোঁপটার কাছে।
যেতে থাক, বলল কিশোর। ঘরের অন্য দুজনের দিকে ফিরল। দেখলেন তো, প্রফেসর, মমিকে কথা বলানো কত সহজ?
মমির ওপর ঝুঁকল কিশোর। আলগা লিনেনের নিচ থেকে বের করে আনল তৃতীয় ওয়াকি-টকিটা। ওটা থেকেই আসছে মুসার কণ্ঠস্বর। যেন মমিই কথা বলছে।
বৈজ্ঞানিক সমাধান, স্যার, প্রফেসরকে বলল কিশোর। মমির লিনেনে ছোট একটা রেডিও রিসিভার লুকিয়ে রাখা যায় সহজেই। বাইরে থেকে কেউ... থেমে গেল

সে।
আরে! তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে মুসার কণ্ঠ। ঝোঁপের ভেতর কে জানি লুকিয়ে আছে!... একটা ছেলে! ও জানে না, আমি ওকে দেখতে পাচ্ছি। ধরব ওকে।
দাঁড়াও! বলে উঠল কিশোর। আমরা আসছি। একা যেয়ো না।
তোমরা বেরোলেই হয়ত দেখে ফেলবে, শোনা গেল মুসার কণ্ঠ। আমিই যাচ্ছি। ওর পথ আটকে জানাব তোমাদের। সঙ্গে সঙ্গে ছুটবে।
ঠিক আছে, বলল কিশোর। ওকে ধরেই চেঁচিয়ে উঠবে। ছুটে আসব আমরা।
প্রফেসরের দিকে ফিরল সে। ঝোঁপের ভেতর লুকিয়ে বসে আছে একজন। ওকে ধরতে পারলে হয়ত রহস্যটার সমাধান হয়ে যাবে।
নীরবতা।
এতক্ষণ কি করছে ও! অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল রবিন। কিছুই বলছে না মুসা! দেখাও যাচ্ছে না এখান থেকে!
আবার নীরবতা। অপেক্ষা করছে ওরা।

.

পা টিপে টিপে এগোচ্ছে মুসা। কানের কাছেই ধরা রয়েছে রেডিও। ঝোঁপের মধ্যে পেছন ফিরে বসে বাড়ির সামনের দিকে নজর রাখছে লোকটা। ঝোঁপের একেবারে কাছে চলে এল মুসা। এক মুহূর্ত অপেক্ষা করল। তারপর প্রায় ডাইভ দিয়ে ঢুকে গেল ঝোঁপের ভেতরে। ঝোঁপঝাড় ভেঙে ছেলেটাকে নিয়ে পড়ল মাটিতে। উপুড় হয়ে হাত পা ছড়িয়ে পড়েছে ছেলেটা। তার ওপর মুসা। চেঁচিয়ে উঠল, জলদি এস! ওকে ধরেছি!
কথা বলে উঠল ছেলেটা। বিদেশী ভাষা। এক বর্ণ বুঝল না মুসা। ধস্তাধস্তি করছে ছেলেটী। তাকে জোর করে চেপে ধরে রেখেছে। হঠাৎ ছেলেটার হাতের আঘাতে মুসার হাত থেকে ছুটে পড়ে গেল রেডিও। ওটা তোলার চেষ্টা না করে দুহাতে ছেলেটাকে জাপটে ধরল মুসা। ঢাল বেয়ে গড়াতে শুরু করল দুজনে।
প্রায় মুসারই সমবয়েসী হবে ছেলেটা। লম্বা-চওড়ায় কিছুটা কম, তবে গায়ের জোর কম না। কায়দা-কৌশলও জানে মোটামুটি বান মাছের মত পিছলে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে মুসার আলিঙ্গন থেকে। একবার ছুটে বেরিয়ে গেল। কিন্তু খাড়া হওয়ার আগেই আবার তাকে ধরে ফেলল মুসা। ঢাল বেয়ে গড়িয়ে গিয়ে একটা পাথরের দেয়ালে ঠেকে গেল দুজনে। আবার কথা বলে উঠল ছেলেটা। কিছুই বুঝল না মুসা। বোঝার চেষ্টাও করল না। তার একমাত্র চিন্তা, ছেলেটাকে আটকে রাখতে হবে রবিন আর কিশোর না পৌঁছানো পর্যন্ত।

.

ওয়াকি-টকিতে মুসার চিৎকার শুনেই দরজার দিকে দৌড় দিল রবিন। তার পেছনে কিশোর ও প্রফেসর বেনজামিন।
সদর দরজায় বেরিয়েই দেখতে পেল, তাদের আগে ছুটছে আরেকজন লোক। নীল ওভারঅল পরা। ছুটতে ছুটতেই বেলচাটা ফেলে দিয়েছে হাত থেকে।
কে লোকটা? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
প্রফেসর বললেন, মালী।
ঢাল বেয়ে নামতে নামতে দেখল ওরা, ছেলে দুটোর কাছে পৌঁছে গেছে মালী। মুসাকে সরিয়ে দিয়ে অন্য ছেলেটার গলা চেপে ধরল। টেনে তুলে দাঁড় করিয়ে দিল, গলা ছাড়ল না।
উঠে দাঁড়াল মুসা। হাত-পায়ের ধুলো ঝাড়তে লাগল। মালীর দিকে চেয়ে বলল, শক্ত করে ধরুন। ওটা একটা বনবেড়াল!
দুর্বোধ্য ভাষায় আবার কিছু বলে উঠল ছেলেটা। গলায় মালীর হাত, গোঁ গোঁ করে এক ধরনের চাপা শব্দ বেরোল কথার সঙ্গে।
বিদেশী ভাষায় চেঁচিয়ে কিছু বলল মালী, ছেলেটার কথার জবাব দিচ্ছে। বোধহয়। মাঝপথেই আর্তনাদ করে উঠল লোকটা। ঝটকা দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়েই ছুটল ছেলেটা। ঢাল বেয়ে ছুটে গিয়ে ঢুকে পড়ল আরেকটা ঝোপে। আর ধরা যাবে না ওকে। বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়েই রয়েছে মুসা।
ঠিক এই সময় পৌঁছে গেল রবিন, কিশোর আর প্রফেসর।
কি হল? মালীর দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন প্রফেসর। তোমার হাত থেকে ছুটল কি করে ছেলেটা?
প্রফেসরের দিকে ফিরল মালী, হাতে কামড়ে দিয়েছে, স্যার! ডান হাতটা সামনে বাড়িয়ে দিল সে। কব্জির নিচে চামড়ায় দাঁতের দাগ, রক্ত বেরিয়ে এসেছে।
এত বড় দেহটা রেখেছ কেন!...একটা বাচ্চা ছেলেকে—
ও কামড়ে দেবে, বুঝতে পারিনি, স্যার।
হু! যাও, জলদি ওষুধ লাগাও। দাঁতে বিষাক্ত কিছু থাকতে পারে। ইনফেকশন হলে বুঝবে ঠেলা। জলদি যাও।
ঘুরে দাঁড়াল মালী। মাথা নিচু করে হাঁটতে শুরু করল বাড়ির দিকে।
লোকটা রিগো কোম্পানিতে কাজ করে, কিশোরের জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দেখে বললেন প্রফেসর। বাগানের কাজের চুক্তি নেয় কোম্পানিটা। খুব ভাল ভাল মালী আছে ওদের। দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার অনেকেই নিয়মিত ডাকে।
এখনও হাঁফাচ্ছে মুসা। হায়-হায়রে! খামোকাই কষ্ট করলাম! ব্যাটা ছেড়ে দেবে জানলে আমিই ধরে রাখতাম!
কিন্তু ছেলেটা কে? জিজ্ঞেস করল রবিন। কি করছিল এখানে?

ঝোপে বসে প্রফেসরের বাড়ির দিকে চোখ রাখছিল, বলল মুসা। নড়েচড়ে উঠেছিল, তাই দেখে ফেলেছিলাম।
অনেক কিছু জানাতে পারত সে আমাদেরকে! নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর।
ছেলেরা, বললেন প্রফেসর। ব্যাপার-স্যাপার ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে..
তিন জোড়া চোখ ঘুরে গেল তার দিকে।
..তবে, মুসার চিল্কারের পর পরই কয়েকটা শব্দ কানে এসেছে। বোধহয় ছেলেটাই বলেছে।
কিছুই বুঝিনি, বলল মুসা। বিদেশী ভাষা।
আধুনিক, আরবী, বললেন প্রফেসর। কি বলেছে জান? বলেছে: হে মহান রা-অরকন, দয়া করে সাহায্য করুন আমাকে!
কিছু একটা বলার জন্যে মুখ খুলল কিশোর, থেমে গেল মুসার চিঙ্কারে, হুশিয়ার! হাত তুলে নির্দেশ করছে একটা দিক।
নিমেষে সবকটা চোখ ঘুরে গেল সেদিকে।
বড় গেটটার দুপাশে দুটো মোটা থাম, মাথায় বসানো দুটো এ্যানেটের বিশাল বল। কি করে জানি খসে পড়ে গেছে একটা। বিপজ্জনক গতিতে ঢাল বেয়ে গড়িয়ে নেমে আসছে ওদের দিকে। গতি বাড়ছে প্রতি মুহূর্তে।
ছুট লাগানর জন্যে তৈরি হয়েছে রবিন আর মুসা। থেমে গেল প্রফেসরের তীক্ষ্ণ চিৎকারে। খবরদার! এক চুল নড়বে না কেউ।
প্রফেসর বেনজামিনের প্রতি কিশোরের শ্রদ্ধা বাড়ল। বিপদের সময় মাথা ঠাণ্ডা রাখার অদ্ভুত ক্ষমতা তাঁর, কড়া নজর। তার আগেই প্রফেসর অবস্থাটা মনে মনে জরিপ করে নিয়েছেন। বলটা ওদের গায়ে পড়বে না, চলে যাবে পাশ দিয়ে।
লাফিয়ে গড়িয়ে ওদের দশ ফুট দূর দিয়ে চলে গেল বলটা। নিচের কয়েকটা ইউক্যালিপটাস গাছে গিয়ে ধাক্কা খেল প্রচণ্ড শব্দে।
সেরেছিল। কপালের ঘাম মুছল রবিন। ওদিকেই রওনা হয়েছিলাম আমি, ভর্তা হয়ে যেতাম!
আমি হতাম না, বলল মুসা। উল্টো দিকে লক্ষ্য ছিল আমার। ওজন কত হবে? এক টন?
বেশি হবে, বললেন প্রফেসর। গ্র্যানেটের বল, এক ঘন-ফুটে ওজন। হবে... দাঁড়াও, অঙ্ক কষে...
প্রফেসর!
কথা থামিয়ে ফিরলেন প্রফেসর। অন্য তিনজনও তাকাল। হুপার ছুটে আসছে।

কাছে এসে দাঁড়াল হুপার। হাঁপাচ্ছে। রান্নাঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে ছিলাম। দেখেছি! কোন ক্ষতি হয়নি তো আপনাদের?
না, কোন ক্ষতি হয়নি, অস্থির কণ্ঠস্বর। হুপারের দিকে চেয়ে ঘন ভুরুজোড়া কোঁচকালেন প্রফেসর। কি বলবে, জানি। শুনতে চাই না ওসব আর!
মাফ করবেন স্যার, তবু বলল হুপার, এটা রা-অরকনের অভিশাপ ছাড়া আর কিছু না! একের পর এক দুর্ঘটনা-রা-অরকন আপনাকে খুন করবে, স্যার! হয়ত আমাদের সবাইকেই করবে!
রা-অরকনের অভিশাপ! বিড়বিড় করল কিশোর। প্রফেসরের দিকে ফিরল, প্রফেসর, মমিটা যে কবরে পেয়েছেন, ওখানে কি কোন কিছুতে অভিশাপের কথা লেখা ছিল?
না, মানে—ইয়ে—হ্যা..
প্রফেসরের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল হুপার, ছিল! লেখা ছিল: যে এই কবরের পবিত্রতা আর শান্তি বিনষ্ট করবে, তার ওপর নেমে আসবে রা-অরকনের অভিশাপ! কবর খোঁড়ার কাজে যারা সহায়তা করেছিল, তাদের অনেকেই মরেছে। সাতজন..।
হুপার! গর্জে উঠলেন প্রফেসর। খুব বেশি বাড়াবাড়ি করছ!
মাফ করবেন, স্যার, দুঃখিত, চুপ হয়ে গেল খানসামা।
লজ্জিত হলেন প্রফেসর। কিশোরের দিকে চেয়ে বললেন, একেবারে মিথ্যে বলেনি হুপার। রা-অরকনকে ঘিরে সত্যিই কিছু রহস্য গড়ে উঠেছে। একটা পাথরের পাহাড়ের চূড়ার কাছে ছিল ওর কবর। কবরটা লুকানো ছিল ভালমত। রাজকীয় কবর, অথচ মূল্যবান কিছু পাওয়া যায়নি সমাধিকক্ষে। শুধু সাধারণ একটা কফিনে রা-অরকন আর তার আদরের পোষা বেড়ালটার মমি। তবে, ও রা অরকন কিনা, তাতেও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। শুধু কফিনের গায়ে ছাড়া কবরটার আর কোথাও তার নাম লেখা নেই, ফারাওদের কোন চিহ্ন নেই। যদি সে রা-অরকন হয়ে থাকে, তাহলে বিশেষ কোন কারণে ওরকম সাধারণভাবে কবর দেয়া হয়েছিল। তাকে। সমাধিকক্ষটা দেখে যা মনে হয়েছে, প্রাচীন দস্যু-তস্করেরা ঢুকতে পারেনি ওখানে। আর যদি ঢুকে থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই খুব হতাশ হতে হয়েছিল। তাদেরকে। কিছু পায়নি।
অভিশাপের কথা কোথায় লেখা ছিল? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
কয়েকটা মাটির ফলক পাওয়া গিয়েছে, তাতে। মমিটা কবর থেকে বের করে আনার পরের দিনই মোটর দুর্ঘটনায় মারা গেছে আমার প্রধান সহকারী! তার পরের দিন কায়রোর বাজারে খুন হল আমার সেক্রেটারি। একই জায়গায় প্রায় একই সময় খুন হল আরও একজন। সে-ও আমার সহকারী ছিল, বন্ধুও। জিম

উইলসনের বাবা। যে শ্রমিকেরা খুঁড়েছিল, তাদের ওভারশিয়ার। মারা গেল সাপের কামড়ে। সবকটাই দুর্ঘটনা! এর মধ্যে কোন রহস্য নেই। মোটর দুর্ঘটনা, খুনখারাপি, কিংবা সাপের কামড় নতুন কোন ঘটনা নয়।
চাওয়া-চাওয়ি করল মুসা আর রবিন। ব্যাপারটাকে আধিভৌতিক বলেই মনে হচ্ছে ওদের।
ও হ্যাঁ, আরেকটা কথা, অভিশাপের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই, বললেন। প্রফেসর। যেদিন মমিটা আমার বাড়িতে এসে পৌঁছুল সেদিনই একজন লোক। এসেছিল দেখা করতে। অ্যারাবিয়ান। নাম, জলিল—কি যেন! মমিটা দিয়ে দিতে। বলল। বেশ চাপাচাপি করল আমাকে। লিবিয়ার এক ধনী ব্যবসায়ী পাঠিয়েছে তাকে। জলিল ওই লোকটার ম্যানেজার। রা-অরকন নাকি ওই ব্যবসায়ী জামানের পূর্বপুরুষ। সেটা জেনেছে আবার এক জাদুকরের কাছে। যত্তোসব ভোগলামি! প্রথমে ভদ্রভাবে বললাম, গেল না জলিল। শেষে, ব্যবহার খারাপ করতে বাধ্য হয়েছি। যাওয়ার আগে জলিল হুঁশিয়ার করে দিয়ে গেছে, রা-অরকনের প্রেতাত্মা নাকি ছাড়বে না আমাকে। মমিটাকে মিশরে নিয়ে গিয়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় আবার কবর না দিলে অভিশাপ নামবে আরও অনেকের ওপর।
আবার চাওয়া-চাওয়ি করল মুসা আর রবিন। ব্যাপারটাকে আধিভৌতিক বলে মেনে নিতে আর কোন দ্বিধা নেই ওদের।
তবে দুজনের মনে হল, গভীর রহস্যের সন্ধান পাওয়ায় খুশি খুশি লাগছে যেন কিশোরকে।
এখন, বললেন প্রফেসর। ওসব ফালতু চিন্তা বাদ দিয়ে এস দেখি, কেন। খসে পড়ল বলটা। কারণটা জানার চেষ্টা করি।
গেটের দিকে এগোলেন প্রফেসর। পেছনে তিন গোয়েন্দা, সবার পেছনে হুপার।
থামের মাথায় সুড়কি দিয়ে একটা খাজ বানানো হয়েছিল, তার ওপর বসান ছিল বলটা। আটকে দেয়া হয়েছিল সিমেন্ট দিয়ে। দীর্ঘদিন রোদ বাতাস আর বৃষ্টিতে ক্ষয়ে গিয়েছে সিমেন্ট। খাজের একটা দিক ভাঙা, ফলে বলটা পড়ে গেছে।
কোন রহস্য নেই, বললেন প্রফেসর। সিমেন্ট আর সুড়কি ক্ষয় হয়ে গেছে, ওই দেখ রিং ভাঙা। ঢালের দিকে সামান্য কাত হয়ে আছে থাম। হয়ত, অতি মৃদু ভূমিকম্প হয়েছিল, এতই মৃদু আমরা টের পাইনি। এটা নতুন কিছু না এ অঞ্চলে। মাঝেমধ্যেই এরকম ঘটে।
প্রফেসরের যুক্তি মনঃপূত হল না হুপারের। ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে সেখান থেকে চলে গেল সে।

প্রফেসরের সঙ্গে সঙ্গে চত্বরে এসে উঠল আবার তিন গোয়েন্দা। জাদুঘরে ঢুকল। ঘিরে দাঁড়াল রা-অরকনের মমিকে।
বুদ্ধি আছে তোমার, কিশোরের প্রশংসা করলেন প্রফেসর। মরা মমি কি করে কথা বলে, একটা যুক্তি দেখাতে পেরেছ। তবে ভুল যুক্তি। কারণ, কফিনের কোথাও কোন রেডিও লুকানো নেই।
ভালমত দেখেছিলেন তো, স্যার?।
চোখ মিটমিট করলেন প্রফেসর। নিশ্চয়। বেশ, তোমাদের সামনেই আবার দেখছি। মমিটা কফিন থেকে বের করে নিলেন তিনি। কিশোরকে খুঁজে দেখতে বললেন।
না, নেই রেডিও।
এবার সত্যিই বিস্মিত হল কিশোর। নাহ্, নেই! ইলেকট্রনিক কোন কিছুই নেই। প্রফেসর, আমার প্রথম যুক্তি ভুল হল।
প্রথম যুক্তি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ভুল হয়, কিশোরকে উৎসাহ দিলেন প্রফেসর। তবে পরের যুক্তিটা হয়ত ঠিক হবে। ভেবে বের করে ফেল আরেকটা কিছু।
আপাতত পারছি না, স্যার। আচ্ছা, বললেন, শুধু যখন আপনি একা থাকেন। এঘরে, তখনই মমিটা কথা বলে।
হ্যাঁ, মাথা ঝোঁকালেন প্রফেসর। আর বলে বিশেষ একটা সময়ে। শেষ বিকেল কিংবা সন্ধ্যায়।
নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর। এ-বাড়িতে আপনি ছাড়া আর কে কে থাকে?
হুপার। দশ বছর ধরে আমার চাকরি করছে সে। তার আগে থিয়েটারে কাজ করত, অভিনেতা। সে আমার শোফার, বাবুর্চি, খানসামা। হপ্তায় তিন দিন একজন মহিলা আসে ঘরদোর পরিষ্কার করতে, তবে ও থাকে না এখানে।
মালীর ব্যাপারটা কি? নতুন?
তা জানি না, মাথা নাড়লেন প্রফেসর। আট বছর ধরে রিগো কোম্পানির লোক দিয়ে কাজ করাচ্ছি। একেকবার একেকজন লোক আসে। সবার চেহারা মনে রাখা সম্ভব না। তবে বাগান পর্যন্তই ওদের সীমানা। কখনও বাড়ির ভেতরে ঢোকে না।
হুমম! চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা ঝোঁকাল কিশোর। ভুরু কুচকে গেছে। যা-ই হোক, মমিটার কথা-বলা নিজের কানে শুনতে হবে আমাকে।
কিন্তু ও তো শুধু আমার সঙ্গে কথা বলে। হুপার কিংবা জিমের সঙ্গে বলেনি। তোমার সঙ্গে বলবে বলেও মনে হয় না।

হ্যাঁ, প্রফেসরের সঙ্গে একমত হল রবিন। তোমার সঙ্গে কেন কথা বলতে যাবে মমিটা? তুমি তো ওর কাছে অপরিচিত।
এক মিনিট, হাত তুলল মুসা। কথাবার্তা মোটেই সুবিধার মনে হচ্ছে না আমার। এমনভাবে বলা হচ্ছে, যেন মমিটা সব কথা শুনতে পাচ্ছে, সব বুঝতে পারছে। ও যেন আমাদের মতই জ্যান্ত!
ঠিকই বলেছ, সায় দিলেন প্রফেসর। এসব আলোচনার কোন মানে নেই। বৈজ্ঞানিক কোন যুক্তি পাওয়া যাচ্ছে না।
কারও কথায়ই কান দিল না কিশোর। দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করল, আমার বিশ্বাস, মমিটা আমার সঙ্গে কথা বলকে। একবার কথা বললেই আরও কিছু তথ্য জোগাড় করে ফেলতে পারব আমি। প্রফেসর, বিকেলে আবার আসব আমরা। পরীক্ষা চালাব।

.

ইয়াল্লা, কিশোর কোথায়? হেডকোয়ার্টারের দেয়ালে লাগানো ঘড়িটার দিকে চেয়ে আছে মুসা। আমাদেরকে ছটায় আসতে বলে সে নিজেই গায়েব। সোয়া ছটার বেশি বাজে।
মেরিচাচীকে জিজ্ঞেস করে এস, সকালের ঘটনার রিপোর্ট লিখছে রবিন। তিনি হয়ত কিছু বলতে পারবেন।
এসেই জিজ্ঞেস করছি, বলল মুসা। তিনি কিছু জানেন না। বলে যায়নি কিশোর। দেখি এসেছে কিনা ও। উঠে গিয়ে পেরিস্কোপে চোখ রাখল। হাতল ধরে ঘোরাল এদিক-ওদিক। চেঁচিয়ে উঠল হঠাৎ, ওই যে, এসে গেছে। শহরের দিক থেকে আসছে। ট্যাক্সিতে করে। জানালা দিয়ে মুখ বের করে দিয়েছে। হয়ত ওয়াকি-টকিতে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছে।
দ্রুত ডেস্কের কাছে চলে এল মুসা। এক কোণে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে একটা লাউড-স্পীকার, বাক্সে ভরে। টেলিফোন লাইনের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে ওটার। মুসা কিংবা রবিন জানত না, গত হপ্তায় ওটার ওপর আরেক দফা কারিগরী চালিয়েছে কিশোর। বাক্সের মধ্যে একটা রেডিও সেট বসিয়ে যোগ করে দিয়েছে মাইক্রোফোন আর স্পীকারের সঙ্গে। সুইচ অন করা থাকলে হেডকোয়ার্টারের ভেতরের সব আওয়াজ ট্রান্সমিট করে ওটা। প্রফেসর বেনজামিনের ওখান থেকে এসে কথাটা দুই বন্ধুকে জানিয়েছে কিশোর।
বাক্সটার দিকে চেয়ে মুখ বাঁকাল মুসা। এহ, মাইণ্ড রিডিং! সকালে কি ফাঁকিটাই না দিয়েছে আমাদের। আমরা কি বলছি সব শুনেছে! বিড়বিড় করতে করতে বাক্সের সামনে মুখ নিয়ে এল সে। একটা সুইচ অন করল। হেডকোয়ার্টার থেকে বলছি। সেকেণ্ড কলিং ফাস্ট। সেকেণ্ড কলিং ফাস্ট। সুইচটা অফ করে টিপে

আরেকটা সুইচ অন করে দিল। সঙ্গে সঙ্গে গুঞ্জন উঠল স্পীকারে। তারপরই পরিষ্কার ভেসে এল কিশোরের গলা। ফার্স্ট বলছি। শিগগিরই আসছি। সর্ব দর্শন তুলে দিয়েছ কেন? নামাও। দরকারের সময় ছাড়া একদম তুলবে না ওটা। গোপনীয়তা ফাঁস হয়ে যেতে পারে। ওভার অ্যাণ্ড আউট।
শুনেছি, এবং বুঝতে পেরেছি, স্পীকারের সুইচ অফ করে দিল মুসা।
পেরিস্কোপ নামাতে এগিয়ে গেছে রবিন। বাজ পাখির চোখ! কিছু এড়ায় না। নামার আগে একবার চোখ রাখল পেরিস্কোপের আয়নায়। গেটের কাছে থেমেছে ট্যাক্সি। কিশোর বেরিয়ে এসেছে। কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ। হাঁটতে শুরু করেছে। ট্যাক্সিটা অপেক্ষা করছে। পেরিস্কোপ নামিয়ে আগের চেয়ারে এসে বসল রবিন। গিয়েছিল কোথায়!
নীরব রইল মুসা। জবাবটা সে নিজেও জানে না।
এক মিনিট পেরোল-দুই-তিন-চার-পাঁচ।...দশ মিনিট পেরোল...পনেরো...
আসছে না কেন এখনও! বলল রবিন। এতক্ষণে তো এসে পড়ার... ট্রেলারের মেঝেতে ট্র্যাপডোরের শব্দ শুনে থেমে গেল।
খুলে গেল বোর্ডটা। একটা মাথা দেখা দিল সুড়ঙ্গের মুখে। একজন বৃদ্ধ মানুষ। কাঁচাপাকা ঘন ভুরু। চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা। মুখে দাড়ি।
প্রফেসর বেনজামিন! প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মুসা। আপনি এখানে এলেন কি করে? কিশোর কোথায়?
রা-অরকনের অভিশাপ নেমেছে তার ওপর, খুদে অফিস ঘরটায় উঠে এলেন প্রফেসর। রা-অরকন সব উল্টে দিয়েছে। প্রফেসরকে কিশোর আর কিশোরকে প্রফেসর বেনজামিন বানিয়েছে। টেনে মাথার সাদা উইগ খুলে ফেলল কিশোর। চশমা খুলে দরাজ হাসি হাসল দুই বন্ধুর দিকে চেয়ে। তোমাদেরকে যখন বোকা। বানাতে পেরেছি, মমিটাকে নিশ্চয়ই পারব।
হাঁ করে আছে রবিন। চোখ বড় বড়।
খাইছে, কিশোর! মুসার চোখও কোটর থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসবে যেন। দারুণ হয়েছে ছদ্মবেশ। আমরাই গাধা বনে গেছি। মমিটাকে বোকা বানানর কথা। কি যেন বলছিলে?
পরীক্ষা নেব, কাঁধে ঝোলানো ব্যাগে উইগ আর চশমাটা ভরে ফেলল কিশোর। দাড়িটা টেনে খুলে নিয়ে ভরল। কপালে, চোখের পাতায় বিশেষ রঙিন। পেন্সিলে কয়েকটা দাগ টানা হয়েছে। মাত্র কয়েকটা দাগেই অনেক বয়স্ক দেখাচ্ছে। তাকে। মি. ক্রিস্টোফারের কাছে গিয়েছিলাম। একজন মেকআপ ম্যানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন তিনি। ছদ্মবেশের এই উপকরণ সেই মেকআপ ম্যানই দিয়েছে। কি করে ছদ্মবেশ নিতে হবে, শিখিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু কেন? জিজ্ঞেস করল রবিন
মমিটাকে বোকা বানাতে, বলল কিশোর।
সে তো বলেছ! চেঁচিয়ে উঠল মুসা। কেন বানাবে, সেটাই জানতে চাইছি।
আমাকে প্রফেসর বেনজামিন বলে ভুল করলে, কথা বলবে, শান্ত কণ্ঠে বলল কিশোর। তাই ছদ্মবেশ নিতেই হচ্ছে। আর কারও সঙ্গে তো কথা বলে না ওটা।
আল্লাই জানে কি বলছ! এমনভাবে বলছ, যেন মমিটা দেখতে পায়, শুনতে পায়, চিন্তা করতে পারে! কিশোর, ওটা একটা মমি। তিন হাজার বছর আগে মারা যাওয়া একটা মানুষের শুকনো লাশ। ওটা কথা বলে! এবার সত্যিই বুঝি ভূতের পাল্লায় পড়লাম! কিশোর, এখনও সময় আছে। ভাল চাও তো, ভুলে যাও ওটার কথা। চল, বেড়ালটার ব্যাপারে তদন্ত করি আমরা। মমি-রহস্যের সমাধান করতে পারব না। খামোকা বেঘোরে প্রাণটা হারাব।
কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল রবিন। ঢোক গিলল। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর।
তার মানে, মুসার দিকে সরাসরি তাকিয়ে আছে কিশোর, তুমি আমাদের সঙ্গে যেতে চাও না? মমিটার কথা বলা শুনতে চাও না?
দ্বিধা করছে মুসা। উত্তেজিত হয়ে অনেক বেশি কথা বলে ফেলেছে, অনুশোচনা শুরু হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই। সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। আস্তে মাথা নাড়ল সে। তাই বলতে চাইছি। কিশোর, এবার হয়ত জাদুঘরের ছাদটাই ভেঙে পড়বে আমাদের মাথায়! সকালে বড় বেশি নাছোড়বান্দা মনে হয়েছে রা অরকনকে।
বেশ, বলল কিশোর, আমরা মানুষ তিনজন। একই সঙ্গে একটা কাজ করতে হবে, তার কোন মানে নেই। তুমি প্রফেসরের ওখানে যেতে না চাইলে জোর করব না। মিসেস ভেরা চ্যানেলের ওখানেই যাও। বেড়ালটা সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়ে এস। আমি আর রবিন যাচ্ছি প্রফেসরের ওখানে। কি বল, রবিন?
রবিনও ভয় পাচ্ছে যেতে। তবে প্রচণ্ড কৌতূহলের কাছে হার মানল ভয়। মাথা কাত করল সে, যাবে।
বেশ, মুসার দিকে ফিরল কিশোর। আমরা ট্যাক্সি নিয়ে যাচ্ছি। তুমি ইয়ার্ডের পিকআপটায় করে যাও। দেখলাম, বসে আছে বোরিস। তেমন কাজকর্ম নেই। বললে তোমার সঙ্গে যেতে রাজি হয়ে যেতে পারে ও।
দ্বিধা যাচ্ছে না মুসার। অবশেষে মনস্থির করে নিয়ে বলল, ঠিক আছে তাই যাব। সুড়ঙ্গমুখের দিকে এগিয়ে গেল।
দুই সুড়ঙ্গ দিয়ে বেরিয়ে এল মুসা। অফিসে তালা লাগাচ্ছে বোরিস। মুসাকে দেখে হাসল।
এক কথায় রাজি হয়ে গেল বোরিস। মুসাকে নিয়ে যাবে সান্তা মনিকায়।

মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল মুসা, কিশোরকে দেখিয়ে দেবে এবার, গোয়েন্দাগিরিতে সে-ও কম যায় না। বেড়ালটা খুঁজে বের করবেই সে। কিন্তু খচখচও করছে মনের ভেতর, দুই বন্ধুর জন্যে। রা-অরকনের অভিশাপ যদি সত্যিই নেমে আসে কিশোর আর রবিনের ওপর?

.

জাদুঘরে একা ঢুকল কিশোর। মাথার ওপরের আলোটা জ্বেলে দিল। বাইরে এখনও দিন। সূর্য অস্ত যায়নি, তবে খাড়া পাহাড়গুলোর আড়ালে চলে গেছে। ফলে অন্ধকার নেমে এসেছে গিরিখাতে। গাঢ় ছায়া গিলে নিয়েছে যেন বিশাল পুরানো বাড়িটাকে।

বুড়ো মানুষের মত ধীরে সুস্থে নড়াচড়া করছে কিশোর, অবিকল প্রফেসর বেনজামিনের নকল। বড় জানালাগুলো খুলে দিল। তারপর গিয়ে দাঁড়াল কফিনটার সামনে। ঢাকনা তুলে দাঁড় করিয়ে রাখল একপাশে। একনজর দেখল মমিটাকে। ঝুঁকল ওটার ওপর। জোরে জোরে বলল, রা-অরকন, কথা বলুন। আমি শুনছি।

ভাল অভিনেতা কিশোর। গলার স্বরও পুরোপুরি নকল করেছে। প্রফেসরের কোট আর টাই পরেছে। শার্টের তলায় আলগা কাপড় তোয়ালে দিয়ে বেঁধে ভুড়ি তৈরি করেছে। খুব কাছে থেকে কেউ না দেখলে বুঝতেই পারবে না ব্যাপারটা। চোখ বন্ধ রেখে রা-অরকনের মমি নিশ্চয় ধরতে পারবে না এই ফাঁকি, আশা করছে কিশোর।

রবিন আর প্রফেসর বেনজামিন অপেক্ষা করছেন পাশের ঘরে। হুপার রান্নাঘরে। ব্যস্ত। কি ঘটছে না ঘটছে, কিছুই জানে না। নীরব রয়েছে মমি।

মহান রা-অরকন, আবার বলল কিশোর, কথা বলুন। আমি বোঝার চেষ্টা করব।

কি যেন শোনা গেল? মাথা কাত করে মমির ঠোঁটের কাছে কান নিয়ে এল। কিশোর। অদ্ভুত খসখসে কণ্ঠস্বর। হিসহিস আর ফিসফিসানিতে ভরা। আরও কিছু অদ্ভুত শব্দ মিশেছে। শব্দগুলো বোঝাই মুশকিল।

অবাক হয়ে পুরো ঘরে চোখ বোলাল কিশোর। একা রয়েছে সে। দরজা বন্ধ। ফিসফিস করে বলেই চলেছে রা-অরকন। কান পেতে আছে কিশোর। কেমন এক ধরনের আদেশের সুর রয়েছে বলার ভঙ্গিতে। কিন্তু একটা শব্দও বুঝতে পারছে না সে।

কোটের নিচে কোমরের বেল্টের সঙ্গে আটকানো রয়েছে একটা পোর্টেবল টেপ রেকর্ডার। খুলে নিয়ে ওটা মমির ঠোঁটের কাছাকাছি রাখল কিশোর। রেকর্ডিং সুইচ। টিপে দিয়েছে।

রা-অরকন, আপনার কথা বুঝতে পারছি না, জোরে বলল কিশোর। আরেকটু জোরে বলুন।
ক্ষণিকের জন্যে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল কথা, আবার শুরু হল। অনর্গল উচ্চারিত হচ্ছে কিছু দুর্বোধ্য শব্দ, নানারকম আওয়াজের মাঝে বোঝাই কঠিন। টেপ রেকর্ডারের মাইক্রোফোন কথা ধরতে পারবে তো?–সন্দেহ হচ্ছে কিশোরের।
মিনিটখানেক ধরে একটানা কথা বলে যাচ্ছে রা-অরকন। ভাল করে শোনার জন্যে কান মমির ঠোঁটের কাছে নিয়ে গেল কিশোর। ক্ষণিকের জন্যে থামল কথা। সোজা হতে গেল সে। পুরানো কফিনের বেরিয়ে থাকা সুচালো একটা কাঠের ফলায় আটকে গেল দাড়ি। হ্যাঁচকা টানে খুলে গেল গাল থেকে। বেকায়দা ভঙ্গিতে ঝুঁকে থাবা দিয়ে ধরতে গেল দাড়ি। ভারসাম্য হারিয়ে দড়াম করে পড়ল মেঝেতে। নাকের ওপর থেকে খসে পড়ে গেল চশমা, উইগ খুলে চলে এল চোখের ওপর। নিজের অজান্তেই একটা চিৎকার বেরিয়ে এল মুখ থেকে।
অন্ধের মত উঠে দাঁড়াল কিশোর। চুলদাড়ি আবার জায়গামত লাগানর চেষ্টা চালাচ্ছে দ্রুত হাতে।
এই সময় ঝটকা দিয়ে খুলে গেল দরজা। হুড়মুড় করে ঘরে এসে ঢুকল রবিন আর প্রফেসর।
কিশোর, কি হয়েছে? রবিন উদ্বিগ্ন।
তোমার চিৎকার শুনলাম! বলে উঠলেন প্রফেসর। কিছু হয়েছে?
আমার অসাবধানতা, তিক্ত কণ্ঠে বলল কিশোর। বোধহয় সব ভজকট করে দিয়েছি! মমি কথা বলছিল…
বোকা বানিয়েছ তাহলে! চেঁচিয়ে উঠল রবিন।
জানি না কি করেছি! কথা তো বলেছিল! দেখি, আবার বলে কিনা! আবার মমির ওপর ঝুঁকল কিশোর। রা-অরকন, বলুন। রা-অরকন? অপেক্ষা করছে। তিনজনে। মমি নীরব। নিজেদের শ্বাস ফেলার শব্দ শুনতে পাচ্ছে ও নিস্তব্ধ ঘরে।
লাভ নেই, অবশেষে বলল কিশোর। আর এখন কথা বলবে না মমি। দেখি, টেপে রেকর্ড হয়েছে কিনা। _ যন্ত্রটা তুলে নিয়ে দরজার দিকে এগোল গোয়েন্দাপ্রধান। পেছনে এগোল রবিন আর প্রফেসর। পাশের ঘরে চলে এল।
টেপ-রেকর্ডারটা টেবিলে রাখল কিশোর। গা থেকে কোট খুলে ফেলল। খুলল পেটে বাঁধা কাপড়। তারপর টেপ রিউইও করে নিয়ে প্লে লেখা বোতাম টিপে দিল।
কয়েক মুহূর্ত শুধু স্পীকারের মৃদু হিসহিস শব্দ। তারপরেই শোনা গেল কথা। খুবই মৃদু। বোঝাই যায় না প্রায়। ভলিউম বাড়িয়ে দিলে স্পীকারের শব্দও বেড়ে যায়। আরও বোঝা যায় না কথা।

শেষ হল মমির কথা। কিশোরের চিৎকারটা শোনা যেতেই সুইচ অফ করে দিল সে। প্রফেসরের দিকে তাকাল। কিছু বুঝতে পেরেছেন, স্যার?
নীরবে মাথা নাড়লেন প্রফেসর। তারপর বললেন, একআধটা শব্দ পরিচিত মনে হচ্ছে, তবে মানে বুঝতে পারছি না। মধ্যপ্রাচ্যের ভাষা, সন্দেহ নেই, খুবই প্রাচীন। সারা ক্যালিফোর্নিয়ায় একজন লোকই আছে, যে হয়ত এর মানে উদ্ধার করতে পারবে। সে প্রফেসর জিম উইলসন, আমার সহকারীর ছেলে। হাত তুলে জানালা দিয়ে প্রফেসর উইলসনের বাড়িটা দেখালেন। দেখা যাচ্ছে, কাছে। আসলেও তাই। তবে সরাসরি যাওয়ার পথ নেই, পাহাড় ঘুরে যেতে হয়। ট্যাক্সিতে করে গেলে পাঁচ-সাত মিনিটের বেশি লাগবে না। ওকে আগেই বলেছি মমিটার কথা। আমাকে সাহায্য করবে বলে কথাও দিয়েছে। চল, টেপটা নিয়ে এখুনি তার কাছে চলে যাই।
কিশোর রাজি।
হুপারকে ডাকলেন প্রফেসর। সে এলে বললেন, হুপার, আমরা জিমের বাড়িতে যাচ্ছি। তুমি থাক। কড়া নজর রাখবে চারদিকে। তেমন সন্দেহজনক কিছু দেখলে সঙ্গে সঙ্গে ফোন করবে আমাকে।
ঠিক আছে, স্যার।
মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই তৈরি হয়ে প্রফেসর উইলসনের বাড়ির দিকে রওনা হল তিনজনে। বিশাল বাড়িটায় একা হুপার। রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল সে। কয়েকটা প্লেট মাজছিল, শেষ হয়নি মাজা। আবার কাজে মন দিল।
বাইরে অন্ধকার নামছে। প্লেট মাজতে মাজতেই অস্পষ্ট একটা শব্দ শুনতে পেল হুপার। থমকে গেল। কান পাতল।
কিন্তু আর শোনা গেল না শব্দটা। সন্দেহ গেল না হুপারের। হাতের বাসনটা নামিয়ে রেখে পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকল। প্রফেসরের সংগ্রহ থেকে প্রাচীন এক বিশাল তলোয়ার তুলে নিয়ে পা টিপে এগোল জাদুঘরের দিকে।
যেখানে যেটা যেভাবে রাখা ছিল, তেমনি রয়েছে। কোন রকম নড়চড় হয়নি। তেমনি পড়ে আছে কফিনটা, ডালা বন্ধ। জানালা বন্ধ করে গিয়েছিল, বন্ধই আছে।
এগিয়ে গিয়ে একটা জানালা খুলল। ভয়ে ভয়ে পা টিপে টিপে নামল চত্বরে। ঠিক তখনই আবার কানে এল শব্দটা। অদ্ভুত খসখসে ভাষায় কি একটা আদেশ দিল যেন কেউ! কে কাকে আদেশ দিল! তাকেই নয় তো! প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেছে। হুপার। দুরুদুরু করছে বুকের ভেতর। পাগলের মত চারদিকে তাকাচ্ছে।
একপাশে একটা ঝোঁপের ভেতর নড়াচড়া লক্ষ্য করল। তলোয়ারটা তুলে ধরল। আত্মরক্ষার তাগিদে। আবছা অন্ধকারে দেখল, বেরিয়ে আসছে একটা মূর্তি।

দেহটা মানুষের, তবে গলার ওপরের অংশ পুরোপুরি শেয়াল। দুই চোখ জ্বলছে।
আনুবিস! ফিসফিস করে নিজেকেই যেন বলল হুপার। শেয়ালদেবতা!
এক পা সামনে বাড়ল আনুবিস। ধীরে ধীরে তুলল ডান হাত। টান টান সোজা করল সামনের দিকে। তর্জনী নির্দেশ করছে হুপারকে।
ঠিক বুঝতে পারল না হুপার, কি ঘটল। অস্বাভাবিক দুর্বল বোধ করছে। চোখের পলকে যেন অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটে গেছে তার শরীরের যন্ত্রপাতিগুলোতে। হাত থেকে খসে পড়ল তলোয়ার। সেই সঙ্গে লুটিয়ে পড়ল সে-ও।

.

দাঁড়িয়ে পড়ল ট্যাক্সি। ছোট একটা ব্রিজ-গ্যারেজের সঙ্গে রাস্তার যোগাযোগ রেখেছে। নিচে ঢালের গায়ে দাঁড়িয়ে আছে প্রফেসর উইলসনের বাংলো।
সরু রাস্তা, বলল ড্রাইভার। সামনের দিক থেকে কোন গাড়ি এলে মোড় ঘোরার আগে দেখতে পাবে না। লাগিয়ে বসতে পারে আমার ট্যাক্সিতে। আপনারা যান। পাহাড়ের নিচে একটা পার্কিং লট আছে। ওখানে অপেক্ষা করব আমি।
গাড়ি থেকে নামলেন প্রফেসর বেনজামিন, রবিন আর কিশোর। ব্রিজ পেরিয়ে দেখল, গ্যারেজের একপাশ থেকে নেমে গেছে সিঁড়ি।
সিঁড়ি বেয়ে নেমে সদর দরজায় গিয়ে দাঁড়াল ওরা। বেল বাজালেন প্রফেসর।
দরজা খুলে দিল উইলসন। আরে, প্রফেসর! আসুন, আসুন। মধ্যপ্রাচ্যের প্রাচীন ভাষা নিয়ে ডিকশনারি লিখছি, ঠিক সময়েই এসে পড়েছেন। তো, এই অসময়ে কি মনে করে?
জানালেন প্রফেসর বেনজামিন।
খুব উত্তেজিত মনে হল উইলসনকে। অবিশ্বাস্য! এখনই শুনব ক্যাসেটটা! বুড়ো মিয়া কি বলছে বোঝা দরকার।
পথ দেখিয়ে মেহমানদেরকে স্টাডিতে নিয়ে এলেন উইলসন। বইয়ে প্রায় বোঝাই হয়ে গেছে ঘরটা। আর আছে কয়েকটা রেকর্ড প্লেয়ার, টেপ-রেকর্ডার। ক্যাসেটটা নিয়ে একটা মেশিনে ঢুকিয়ে চালু করে দিলেন তিনি।
রা-অরকনের ফিসফিসে গলার আওয়াজ অনেক গুণ পরিবর্ধিত করে সারা ঘরে ছড়িয়ে দিল যেন স্পীকার। শুনতে শুনতে হতাশা ফুটল উইলসনের চেহারায়। উত্তেজনা চলে গেছে। দুঃখিত, প্রফেসর, একটা শব্দও বোঝা যাচ্ছে না। রেকর্ডিং খুব খারাপ, আসল শব্দের চেয়ে মেশিনের শব্দই বেশি ক্যাচ করেছে। আরেকটা মেশিন আছে আমার। ফালতু আওয়াজ কমিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা আছে ওটাতে। দেখি। ওটাতে লাগিয়ে। কাজ হতেও পারে।
বেরিয়ে গেলেন উইলসন। ফিরে এলেন ছোট একটা টেপ-রেকর্ডার সেট নিয়ে। ক্যাসেটটা আগের মেশিন থেকে বের করে নিয়ে নতুনটাতে ভরলেন। টিপে দিলেন

প্লে লেখা বোতাম।

.

কাজ সারতে খুব একটা দেরি হল না মুসার। প্রফেসর বেনজামিনের ওখান থেকে একবার ঘুরে আসার সিদ্ধান্ত নিল। সেকথা বলল বোরিসকে।

প্রফেসর বেনজামিনের বাড়িতে যখন পৌঁছল ট্রাক, অন্ধকার হয়ে গেছে তখন। একটা মাত্র আলো দেখা যাচ্ছে এত বড় বাড়িটাতে।

মনে হচ্ছে বাড়িতে কেউ নেই, বলল বোরিস। যাবে?

কেউ না থাকলেও প্রফেসরের খানসামা থাকবেই, বলল মুসা। নেমে পড়ল। ট্রাক থেকে। ওর কাছেই জানতে পারব কে কোথায় গেছে, যদি গিয়ে থাকে।

হাতঘড়ি দেখল বোরিস। তাড়াতাড়ি এস। রোভারকে নিয়ে সিনেমায় যাব। ও অপেক্ষা করবে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে আসতে পারবে?

আপনি চলে যান তাহলে, বলল মুসা। কত দেরি হবে, ঠিক বলতে পারছি না। পাহাড়ের নিচে ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ড দেখলাম। বাড়ি ফিরতে অসুবিধা হবে না।

ঠিক আছে, ইঞ্জিন স্টার্ট দিল বোরিস। চলে গেল ট্রাক নিয়ে।

বাড়ির সদর দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল মুসা। বেল বাজাল। অপেক্ষা করছে দরজা খোলার। মিসেস ভেরা চ্যানেলের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের কথা ভাবছে।

দ্রুত কথা বললেন মহিলা। অনেক কথাই বলে ফেলেছেন খুব কম সময়ে। হপ্তাখানেক আগে হারিয়ে গেছে তার শখের বেড়ালটা। খুব সুন্দর দেখতে। এ অঞ্চলে দুষ্প্রাপ্য। বেশির ভাগ আবিসিনিয়ান বেড়ালই বুনো স্বভাবের, পোষ মানে, তবে মনিবের সঙ্গেও ব্যবহার খারাপ করে। কিন্তু ওই বিশেষ বেড়ালটা ছিল ঠিক উল্টো। ভদ্র, কোনরকম বাজে স্বভাব ছিল না। মিসেস চ্যানেলের ধারণা, হয় বেড়ালটাকে চুরি করা হয়েছে, কিংবা বাড়ি থেকে দূরে কোথাও চলে গিয়েছিল, পথ। চিনে আর ফিরতে পারেনি।

বেড়ালটা পিঙ্গল রঙের, শুধু সামনের দুই পায়ের নিচের অংশ সাদা। চোখ দুটোতে আশ্চর্য একটা বৈসাদৃশ্য রয়েছে। আবিসিনিয়ায় বেড়ালের চোখ সাধারণত হলুদ কিংবা কমলা রঙের হয়। অথচ স্ফিঙ্কসের একটা চোখ কমলা, আরেকটা নীল। এই বিশেষ ব্যাপারটার জন্যে কয়েকবারই বেড়ালের মেলায় ওটাকে নিয়ে গেছেন। মিসেস চ্যানেল। দেখিয়ে লোককে অবাক করে দেয়ার জন্যে। স্থানীয় অনেক পত্র পত্রিকা আর ম্যাগাজিনে বেরিয়েছেও খবরটা ফিঙ্কসের রঙিন ফটোগ্রাফসহ। জীববিজ্ঞানীদের মতে বেড়ালের চোখের রঙের সেই বৈসাদৃশ্য খুব বিরল একটা ব্যাপার।

কিন্তু এখনও দরজা খুলছে না কেন হুপার? অবাক হল মুসা। আবার বাজাল বেল। সাড়া নেই। চেঁচিয়ে ডাকল সে হুপারের নাম ধরে। তবু জবাব নেই।

চারদিকে তাকাল মুসা। অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়ছে না। গলা আরও চড়িয়ে ডাকল হুপারকে। সাড়া না পেয়ে ঘুরে দাঁড়াল। চলল জাদুঘরের দিকে। জানালা খোলা। আলো জ্বলছে ওঘরেই। ভেতরে ঢুকে পড়ল সে। কফিনটা জায়গামতই রয়েছে। জানালার কাছে তেমনি দাঁড়িয়ে রয়েছে দেবতা আনুবিসের মূর্তি। কোন রকম গোলমাল চোখে পড়ল না তার। কিন্তু তবু অস্বস্তি বোধ করতে লাগল সে। মনে হচ্ছে, দেখা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু কোথাও কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে। কি সেটা? মেরুদণ্ডে অদ্ভুত এক ধরনের শিরশিরে অনুভূতি হচ্ছে এখন।

কফিনের ঢাকনা তুলে দেখার ইচ্ছে হচ্ছে, কিন্তু ভরসা পাচ্ছে না। যদি একা পেয়ে তার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে মমিটা? থাক, বাবা, খুলে কাজ নেই। ইচ্ছেটা বাতিল করে দিল মুসা। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল সেই জানালাটার কাছে, যেটা দিয়ে দেখা যায় প্রফেসর উইলসনের বাড়ি। উঁকি দিল বাইরে। অন্ধকার বাগান। ঘরের আলো পড়েছে খানিকটা জায়গায়, তাতে আশপাশটা আরও বেশি অন্ধকার দেখাচ্ছে। কালো আকাশে অগুনতি তারা। এক বিন্দু বাতাস নেই, গাছের একটা পাতাও নড়ছে না। কালো ঝোঁপগুলোর দিকে চেয়ে মেরুদণ্ডের শিরশিরে অনুভূতিটা ফিরে এল আবার। হঠাৎই ভয় পেতে শুরু করেছে সে। গেল কোথায় সব? কোন অঘটন ঘটল না তো? ঘুরে দাঁড়ানর আগের মুহূর্তে চোখে পড়ল। জিনিসটা। জানালা দিয়ে আলো পড়েছে বাগানে। আলো আর অন্ধকারের সীমারেখার কাছে চকচক করছে কিছু একটা।

ভয় নেই, বলে মনকে বোঝানর চেষ্টা করল মুসা। সাহস সঞ্চয় করে জানালা টপকে নামল বাগানে। কাছে গিয়ে তুলে নিল চকচকে জিনিসটা। একটা তলোয়ার। অনেক পুরানো, ব্রোঞ্জের তৈরি। নিশ্চয় প্রফেসর বেনজামিনের সংগ্রহের জিনিস। ঠিক এই সময় মৃদু একটা শব্দ হল পেছনে। ধক করে উঠল মুসার বুকের ভেতর। পাই করে ঘুরল।

ঝোঁপের ভেতর নড়ছে কিছু একটা। পরমুহূর্তেই বেরিয়ে এল ছোট একটা চারপেয়ে জীব। ধীরে ধীরে কাছ চলে এল। বেড়াল। মুখ তুলে তাকাল মুসার দিকে। পরক্ষণেই তার পায়ে গা ঘষতে শুরু করল। মৃদু ঘড়ঘড় শব্দ করছে। আদর চাইছে বোধহয়।

হেসে ফেলল মুসা। দূর হয়ে গেছে উত্তেজনা, শঙ্কা, ভয়। তলোয়ারটা মাটিতে রেখে বেড়ালটাকে তুলে নিল দুহাতে। সুন্দর একটা বেড়াল। হুলো। বেশ বড়। পিঙ্গল রঙ। মৃদু ঘড়ঘড় করেই চলেছে। দুপা এগিয়ে আলোতে এসে দাঁড়াল মুসা। এই সময় মুখ তুলে তাকাল বেড়ালটা তার দিকে। হাত থেকেই প্রায় ছেড়েই দিচ্ছিল। ওটাকে মুসা। নিজের অজান্তেই চাপা একটা শব্দ করে উঠল, ইয়াল্লা! এটা। ফিস। মিসেস চ্যানেলের বেড়াল!-ভাবছে মুসা। এটা এখানে এল কি করে? যেভাবেই

আসুক, কপালগুণেই খুঁজে পেয়েছে সে এটাকে। কিশোরের দিকে চেয়ে। খুব একখান হাসি দিতে পারবে এবারে। এত তাড়াতাড়ি সমাধান হয়ে গেছে কেস।
জানালার দিকে পা বাড়াল মুসা, ঠিক এই সময় ভারি একটা কিছু এসে পড়ল তার ওপর, পেছন থেকে। চেঁচিয়ে উঠে হাত থেকে বেড়ালটাকে ছেড়ে দিল সে। তাল সামলাতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল ঘাসের ওপর। পিঠের ওপর চেপে এল একটা ভারি কিছু।
এক মুহূর্ত। তারপরই হুশ ফিরে পেল মুসা। এক গড়ান দিয়েই সরে গেল, পিঠের ওপর থেকে ফেলে দিল বোঝাটা। পাশ ফিরে তাকাল। সেই ছেলেটা। সকালে ঝোঁপের ভেতর বসে ছিল যে, যাকে ধরে ফেলেছিল। ছেলেটা উঠে দাঁড়ানর আগেই বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন মুসার শরীরে। চার হাত পায়ে ভর দিয়ে চিতার মত লাফিয়ে পড়ল ছেলেটার ওপর। শক্ত করে জড়িয়ে ধরল কোমর। এবার আর ছাড়বে না কিছুতেই।
অনেক চেষ্টা করল ছেলেটা, কিন্তু ছাড়া পেল না মুসার হাত থেকে।
মুসা আমানের হাতে পড়েছ, খোকাবাবু, বলল গোয়েন্দাসহকারী, সহজে ছাড়া পাচ্ছ না আর। কে তুমি? এদিকে এত ঘোরাফেরা কিসের? আমাকে আক্রমণ করছ কেন?
আবার ছাড়া পাওয়ার চেষ্টা করল ছেলেটা। তারপর হাল ছেড়ে দিল। চেঁচিয়ে উঠল ইংরেজিতে, তোমরা আমার দাদা রা-অরকনকে চুরি করেছ! আমার বেড়ালটাকে ধরে রাখতে চাইছ! কিন্তু আমি জামান বংশের ছেলে জামান, সেটা কিছুতেই হতে দেব না!
দাদা রা-অরকন! চুরি করেছি! মুসা অবাক। আর ওটা তোমার বেড়াল? ভুল করছ, খোকাবাবু। বেড়ালটা তোমার নয়। ওটার মালিক মিসেস ভেরা চ্যানেল। আর আমি ওটাকে ধরে রাখতে চাইনি। ওটাই আমার কাছে এসেছে। খাতির করতে চেয়েছে। ঠেলতে ঠেলতে ছেলেটাকে জানালার কাছে নিয়ে এল মুসা। কোমর ছেড়ে দিয়ে কব্জি চেপে ধরল।
মুসার দিকে চেয়ে আছে ছেলেটা। ছাড়া পাওয়ার চেষ্টা করছে না আর। তামাটে চামড়ার রঙ, কুচকুচে কালো বড় বড় দুটো চোখ। কুটি করল। তুমি দাদা রা-অরকনের ব্যাপারে কিছু জান না! ওকে চুরি করনি?
কি বলছ তাই বুঝতে পারছি না, বলল মুসা। মমিটার কথা বলছ? তাহলে ওটাকে দাদা-দাদা করছ কেন? ওটা তিন হাজার বছরের পুরানো। তোমার দাদা হয়। কি করে? কফিনের ভেতরে রয়েছে এখন। চুরি করিনি। আর করতে যাবই বা কেন?
মাথা নাড়ল ছেলেটা। কফিনের ভেতর নেই এখন ওটা।
নেই!

না, নেই। খানিক আগে দুটো লোক এসে নিয়ে গেছে। এতে তোমার কোন হাত নেই বলতে চাইছ?
রা-অরকনকে নিয়ে গেছে! ছেলেটার প্রশ্ন যেন শুনতে পায়নি মুসা। বিশ্বাস করতে পারছি না!
আমি সত্যি বলছি, দৃঢ়কণ্ঠে বলল ছেলেটা। জামান বংশের জামান কখনও মিছে কথা বলে না।
ছেলেটাকে ধরে রেখেই জানালা দিয়ে কফিনটার দিকে তাকাল মুসা। ঠিক আগের জায়গাতে আগের মতই রয়েছে। বিন্দুমাত্র সরেনি কোনদিকে। কিন্তু ছেলেটা বলছে, সে সত্যি কথা বলছে। তাহলে?
শোন, খোকাবাবু, বলল মুসা। শুনেছি, মমিটা প্রফেসর বেনজামিনের সঙ্গে কথা বলে। ওই রহস্যের সমাধান করতেই এসেছি আমরা। কেন, কি কথা বলে, কি করে বলে, বলতে পারবে কিছু?
বিস্ময় ফুটল ছেলেটার চোখে। দাদা রা-অরকন কথা বলে! আশ্চর্য! না, আমি কিছু বলতে পারব না!
আমরাও কিছু বুঝতে পারিনি এখনও, বলল মুসা। মমিটার ব্যাপারে অনেক কিছু জান মনে হচ্ছে। আমি কিছু কিছু জানি, হয়ত সেটা তুমি জান না। এ-বাড়ির ওপর চোখ রেখেছ কেন? সকালে ঝোঁপের ভেতর কেন লুকিয়েছিলে? কোন অসুবিধে না থাকলে বলে ফেল। হয়ত মমি-রহস্যের সমাধান করে ফেলতে পারব আমরা। মানে, কি করে কথা বলে, কি বলে, জানতে পারব। কি, বলবে?
দ্বিধা করছে ছেলেটা। তারপর মাথা নাড়ল। বেশ, বলব সব। জামান বংশের জামান বিশ্বাস করল তোমাকে। হাত ছাড়, ব্যথা পাচ্ছি।
হাত ছেড়ে দিল মুসা।
কব্জির কাছটায় ডলতে লাগল ছেলেটা। ঝোঁপের দিকে চেয়ে তার নিজের ভাষায় কিছু বলল চেঁচিয়ে।
কি বলছ? জানতে চাইল মুসা।
আমার বেড়ালটাকে ডাকছি। ওর ভেতরে বাস করে রা-অরকনের আত্মা। মমিটা খুঁজে পেতে সাহায্য করবে ওটা আমাদের।
অপেক্ষা করে রইল দুজনে। কিন্তু এল না বেড়ালটা।
বলেছিলাম না? অবশেষে বলল মুসা। ওটা তোমার বেড়াল নয়। মিসেস চ্যানেলের। নাম, ফিঙ্কস। আবিসিনিয়ার বেড়াল, পিঙ্গল শরীর। সামনের দুই পা সাদা। দুই চোখ দুই রঙের। মহিলার বর্ণনার সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে।
না, গভীর আস্থা ছেলেটার কণ্ঠে। পা সাদা নয়, কালো। রা-অরকনের প্রিয় বেড়াল। যেটাকে মেরে মমি করে কফিনে তার সঙ্গে দিয়ে দেয়া হয়েছিল হাজার

হাজার বছর আগে।
দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ল মুসা। বড় বেশি আত্মবিশ্বাস নিয়ে কথা বলছে জামান বংশের জামান। বেড়ালটার পায়ের রং সাদাই দেখেছে কিনা, মনে করতে পারছে না। ভাবনায় পড়ে গেল। ঠিক আছে, এ নিয়ে পরে ভাবব। এস দেখি, তোমার কথা ঠিক কিনা। সত্যিই চুরি গেছে কিনা মমিটা।
জানালা গলে দুজনে ঢুকল জাদুঘরে। ধরাধরি করে তুলে ফেলল কফিনের ঢাকনা। ঠিকই বলেছে জামান বংশের জামান। শূন্য কফিন।
ইয়াল্লা! বিড়বিড় করল মুসা। কে নিল!
তোমাদেরই কেউ নিয়েছে! চুরি করেছে আমার দাদাকে! ঝাঁঝালো কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল ছেলেটা।
না, জামান, চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল মুসা। এই চুরির ব্যাপারে কিছু জানি না আমি। তোমাদের বলতে কাকে বোঝাতে চাইছ? এ-বাড়িতে আমরা তিন বন্ধু এসেছি। অন্য দুজন আমার বয়েসী। মমিটা কথা বলে কেন, সে রহস্য ভেদ করতে এসেছি। সে যাই হোক, মমিটা সম্পর্কে তুমি যা জান বল, আমি যা জানি বলব। হয়ত একটা সমাধান বেরিয়েও যেতে পারে। কে চুরি করল মমিটা, তা-ও জেনে যেতে পারি হয়ত।
কি যেন ভাবল জামান। মাথা কাত করল, বেশ, কি জানতে চাও?
আমার প্রথম প্রশ্ন, রা-অরকনকে দাদা বলছ কেন?
জামান বংশের অনেক প্রাচীন পূর্বপুরুষ রা-অরকন, গর্বিত কণ্ঠ জামানের। তিন হাজার বছর আগে লিবিয়ানরা গিয়ে মিশর শাসন করেছিল। রা-অরকন লিবিয়ান। তিনি ছিলেন এক মহান রাজা। অন্যায়কে প্রশ্রয় দিতেন না বলে, অত্যাচারীকে কঠোর হাতে দমন করতেন বলে, খুন করা হয় তাকে। তার লাশ নষ্ট করে ফেলতে পারে শত্রুরা-জান হয়ত, মমি নষ্ট করে ফেললে সেই লোকের আত্মা আর পরপারে গিয়ে ঠাই পায় না, প্রাচীন মিশরীয়দের বিশ্বাস ছিল, তাই গোপনে গোপন জায়গায় কবর দেয়া হল তাঁকে। বিনা আড়ম্বরে। তাঁর বংশের এক ছেলে। আবার লিবিয়ায় ফিরে গিয়েছিল। সেই ছেলেরই বংশধর আমরা।
জানলে কি করে এত সব? কোন প্রাচীন ডায়েরীটায়েরী...মানে ফলকে। লেখা—
মাথা নাড়ল জামান। না, ওরকম কিছু না। এক জ্যোতিষের কাছে জেনেছেন। এটা বাবা। মহা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ওই জ্যোতিষ। অতীত-ভবিষ্যৎ সব বলে দিতে পারে। সে-ই জানিয়েছে, রা-অরকনকে অনেক দূরের এক দেশে নিয়ে যাওয়া হয়েছে মিশর থেকে, বর্বরদের দেশে। ওখানে মোটেই শান্তি পাচ্ছেন না রা অরকন, তার ঘুমের খুব ব্যাঘাত ঘটছে। আমার বাবা অসুস্থ, তাই মমিটা নিয়ে

যেতে পাঠিয়েছেন জলিলকে। সে আমাদের ম্যানেজার। সঙ্গে দিয়েছেন আমাকে। বংশের কেউ নিতে না এলে যদি কিছু মনে করে রা-অরকন, সেজন্যে।
অন্য সময় হলে বর্বর শব্দটার প্রতিবাদ করত মুসা। কিন্তু এখন অন্য ভাবনা চলেছে মাথায়। সকালে প্রফেসর বেনজামিন বলেছেন, একজন অ্যারাবিয়ান ব্যবসায়ী মমিটা নিতে এসেছিল। তার নাম জলিল। লোকটাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি। ও, এই জন্যেই এ বাড়ির আশপাশে এত ঘোরাফেরা তোমার? বলল মুসা। তুমি আর জলিল মিলে রা-অরকনকে চুরি করার ফন্দি এঁটেছিলে নাকি?
বর্বর প্রফেসর আমার দাদাকে দিল না, বিষণ্ন কণ্ঠে বলল জামান, আর কি করব? কিন্তু চুরি বলছ কেন এটাকে? আমাদের জিনিস জোর করে দখল করেছে সে। আর কোন উপায় নেই আমাদের। তাই ওকে না জানিয়েই নিয়ে যেতে চেয়েছি। দাদার আত্মার শান্তির জন্যে জান দিয়ে দিতেও আপত্তি নেই আমার। বংশের কারও অপমান সহ্য করে না জামান বংশের লোকেরা।
তোমাদের ম্যানেজার জলিল এখন কোথায়?
আছে। তাকে দেখেছ তুমি। সকালে।
দেখেছি!
হ্যাঁ, ওই মালী। যে আমাকে ধরেছিল। ইচ্ছে করেই ওর হাত কামড়ে দেয়ার সুযোগ দিয়েছিল সে আমাকে। আরবীতে চেঁচিয়ে উঠেছিল, মনে আছে? কামড়ে দিতে বলেছিল। খুব চালাক লোক। তোমাদের সবাইকে কেমন বোকা বানিয়ে। ছাড়ল।
হাঁ করে চেয়ে রইল মুসা। চমকটা হজমের চেষ্টা করছে। সেই মালীটা তাহলে। জলিল! চুরি করতে এসেছে রা-অরকনকে জামানের বাবার আদেশে! তার ভাবনা। শেষ হওয়ার আগেই পাই করে ঘুরল জামান জানালার দিকে। কান পেতে শুনছে কি যেন!
কেউ এসেছে! চাপা গলায় বলল জামান। ইঞ্জিনের শব্দ!
জানালার কাছে ছুটে গেল সে। উঁকি দিল বাইরে। পাশে গিয়ে দাঁড়াল মুসা। সে-ও তাকাল।
পুরানো একটা নীল রঙের ট্রাক ঢুকছে গেট দিয়ে। চত্বরে এসে থামল। দুজন। লোক নামল। দুজনেই মোটাসোটা, বেঁটে। সোজা এগিয়ে আসছে জাদুঘরের দিকে।
ওই দুজনই! ফিসফিস করে বলল জামান। ওরাই চুরি করেছে রা অরনকে! কয়েক মিনিট আগে এসেছিল আরেকবার। কম্বলে জড়িয়ে নিয়ে গিয়ে কি তুলল ট্রাকে, এখন বুঝতে পারছি, মমিটাকেই নিয়েছে। ওরা চলে গেল। বাড়িটা খালি মনে হল। ঢুকে পড়লাম জাদুঘরে। ঢাকনা তুলে দেখি কফিনে নেই রা অরকন।

এদিকেই আসছে ব্যাটারা! বিড়বিড় করল মুসা। চেহারা-সুরত বিশেষ সুবিধার ঠেকছে না। আবার কি চায়?
লুকাতে হবে! জলদি! নিশ্চয় আরও কিছু চুরি করতে এসেছে!
কোথায় লুকাব? সারা ঘরে চোখ বোলাল মুসা। কোন জায়গা তো দেখছি না! চল, বাইরে গিয়ে ঝোঁপের ভেতরে...
তাহলে কি চুরি করতে এসেছে দেখব না। ওদের কথাবার্তাও শুনতে পাব না। এখানেই কোথাও লুকাতে হবে, কফিনটার দিকে চেয়ে আছে জামান। জলদি! ওটার ভেতর লুকাব। রা-অরকন নেই, আমাদের জায়গা হয়ে যাবে। জলদি এস।
ঠিক, ঠিক বলেছ, সায় দিল মুসা।
ছুটে গিয়ে কফিনে ঢুকে পড়ল জামান। চাপা গলায় ডাকল, আহ, তাড়াতাড়িন এস!
কফিনে ঢুকল মুসা। দুজনে ধরে ঢাকনাটা নামিয়ে দিল জায়গামত। পকেট থেকে একটা পেন্সিল বের করে ডালার ফাঁকে গুঁজে দিয়েছে মুসা। সামান্য ফাঁক হয়ে আছে, বাতাস চলাচল করতে পারবে। ভেতরে থেকে শ্বাস নিতে অসুবিধা হবে না।
পাশাপাশি শুয়ে পড়েছে দুজনে কফিনের ভেতর। ঠিক এই সময় দরজা। খোলার শব্দ হল। মেঝেতে ভারি পায়ের শব্দ।
দড়িটা খোল, ওয়েব, শোনা গেল একটা কণ্ঠ।
কয়েক মুহূর্ত নীরবতা। খুলেছি, শোনা গেল আরেকটা কণ্ঠ। মেথু, লোকটাকে মোটেই পছন্দ হয়নি আমার। আগে বলল না কেন ব্যাটা, কফিনটা সহ চায়? একবারেই কাজ সারতে পারতাম। আবার এখানে পাঠাল যখন দেব ফিস ডবল করে।
আমিও তাই ভাবছি, বলল মেথু। ডাবল চাইব। নইলে...ঠিক আছে, এস বেঁধে ফেলি।
মুহূর্ত পরেই টের পেল মুসা আর জামান, নড়ছে কফিন। একটা প্রান্ত উঠে যাচ্ছে ওপরে। দড়ি ঢুকিয়ে দেয়া হচ্ছে নিশ্চয়। বুঝতে পারছে ওরা, কফিনের সঙ্গে ডালাটা শক্ত করে পেঁচিয়ে বাঁধা হচ্ছে। ভাগ্যিস পেন্সিলটা ঢুকিয়ে দিয়েছিল! নইলে দম বন্ধ হয়েই মরতে হত!
কফিনটাও চুরি করবে ব্যাটারা। মুসার কানে ফিসফিস করল জামান। গাঢ় অন্ধকার ভেতরে। এখন কি করব আমরা?
চুপ করে শুয়ে থাকতে হবে, ফিসফিস করে জবাব দিল মুসা। এছাড়া আর কিছু করার নেই। কে বা কারা ওদেরকে পাঠিয়েছে, জানার সুযোগ পেয়েছি। কোথায় নিয়ে যায় ওরা কফিনটা জানতে পারব। নিয়ে যাক আগে। তারপর সুযোগ বুঝে

বেরোনর চেষ্টা করব। হয়ত জায়গায় পৌঁছে দড়ির বাধন খুলে ফেলবে। কি, ভয় পাচ্ছ?
জামান বংশের জামান ভয় পায় না!
আমিও না, বলল মুসা। তবে অস্বস্তি বোধ করছি।
দুদিক থেকে তোলা হল কফিনটা, টের পেল ওরা।
আরিব্বাপরে! কি সাংঘাতিক ভারি! শোনা গেল ওয়েবের কণ্ঠ।
সীসা দিয়ে বানিয়েছে নাকি!...ধর, শক্ত করে ধর! ফেলে দিয়ে ভেঙ না। তাহলে একটা কানাকড়িও আদায় করতে পারব না।–
কফিনটা বয়ে নেয়া হচ্ছে, বুঝতে পারল মুসা আর জামান। ট্রাকের পেছনে তোলা হল, শব্দ শুনেই অনুমান করল।
ব্যাটা এসব জিনিস দিয়ে কি করবে? বলল ওয়েব।
কি করবে কে জানে! কতরকম পাগল আছে দুনিয়ায়! মরা লাশও কাজে লাগে।
ওদের! হুহ! জাহান্নামে যাক ব্যাটারা। আমাদের টাকা পেলেই হল। এস, ওঠ। স্টার্ট দাও।
দড়াম করে বন্ধ হল কেবিনের দরজা। গর্জে উঠল ইঞ্জিন। চলতে শুরু করল ট্রাক।
অবাক হয়ে ভাবছে মুসা আর জামান, কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কফিনটা!

.

বিশতম বার ক্যাসেটটা শোনা শেষ করলেন প্রফেসর উইলসন। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছেন প্রফেসর বেনজামিন, রবিন আর কিশোর।
কিছু কিছু বুঝতে পেরেছি, অবশেষে বললেন উইলসন। কয়েকটা শব্দ বোঝা যাচ্ছে। ক্যাসেট প্লেয়ারের সুইচ অফ করে দিলেন। সিগারেটের বাক্স বের করে বাড়িয়ে ধরলেন প্রফেসর বেনজামিনের দিকে। রেকর্ড করলেন কি করে?
একেবারে গোড়া থেকে শুরু করলেন প্রফেসর। তার ওপর কি করে আনুবিস পড়তে যাচ্ছিল, একেবারে সেখান থেকে। মাঝপথে বাধা পড়ল। বাড়ির কোথাও একটা দরজার ঘণ্টা বাজল।
গ্যারেজের কাছে এসেছে কেউ, বললেন উইলসন। আসছি। আপনারা বসুন।
উইলসন বেরিয়ে যেতেই ছেলেদের দিকে তাকালেন প্রফেসর। বলেছিলাম না, কেউ যদি ওই ভাষা বোঝে তো জিমই বুঝবে। বাপের কাছে শিক্ষা পেয়েছে তো। তার বাপও প্রাচীন মিশরীয় ভাষায় বিশেষজ্ঞ ছিল।
মমিটা তুলে আনার এক হপ্তা পর যিনি কায়রোর বাজারে খুন হয়েছিলেন? বলল রবিন।

হ্যাঁ, হাত তুললেন প্রফেসর। না না, আবার ওই অভিশাপের কথা তুল না। ওটা নিছকই দুর্ঘটনা। দস্যুতস্করের অভাব নেই ওখানে। হয়ত টাকা-পয়সা পাওয়ার লোভেই খুন করেছে বেচারাকে।
ফিরে এলেন উইলসন। হাতে ট্রে, চারটে গ্লাসে কমলার রস, আসতে দেরি হয়েছে বোধহয় এজন্যেই। সমাজসেবা, হুহ! চাদার জন্যে এসেছিল কয়েকজন। কি আনন্দ পায় ওসব করে!..যাকগে, নিন, ট্রে-টা বাড়িয়ে ধরল প্রফেসরের দিকে।
একটা করে গ্লাস তুলে নিল সবাই।
গ্লাস হাতেই গিয়ে শেলফ থেকে মোটা একটা বই বের করে আনলেন উইলসন। বিরল একটা ডিকশনারি। বাবা জোগাড় করেছিল কোত্থেকে জানি! এখন কাজে লাগবে। বইটা টেবিলে রেখে আবার ক্যাসেট প্লেয়ার চালু করে দিলেন। তিনি। তিন ঢোকে কমলার রস শেষ করে গ্লাসটা নামিয়ে রাখলেন, টেবিলে। কাগজ কলম নিয়ে বসলেন। মনোযোগ দিয়ে ক্যাসেট শুনছেন, আর কি সব লিখে নিচ্ছেন। কাগজে। মাঝে মাঝে ডিকশনারি খুলে মিলিয়ে নিচ্ছেন।
শেষ হল ক্যাসেট। কলম রেখে উঠে দাঁড়ালেন উইলসন। জানালার কাছে গিয়ে বাইরের তাজা বাতাস টানলেন। ফিরে দাঁড়ালেন তারপর। প্রফেসর, অনেক প্রাচীন আরবী শব্দ রেকর্ড করেছেন। আধুনিক আরবী উচ্চারণের সঙ্গে অনেক তফাৎ। মানে উদ্ধার করতে পেরেছি। কিন্তু কিন্তু…
বলে যাও, ভরসা দিলেন প্রফেসর। আমি শুনব।
প্রফেসর…ইয়ে, মানে, দ্বিধা যাচ্ছে না উইলসনের। অর্থ যা বুঝলাম, নিজেরই বিশ্বাস হচ্ছে না! একটা মেসেজ। বলেছে: দেশ থেকে অনেক দূরে রয়েছে। রা-অরকন। ওর শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে। যারা তার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে, তাদের ওপর অভিশাপ নামুক। যতক্ষণ রা-অরকনের শান্তি না আসছে, তাদের অশান্তি হতেই থাকুক। এরপরও সতর্ক না হলে ভয়ঙ্কর মৃত্যু টেনে নিক তাদের।
মেরুদণ্ড বেয়ে ঠাণ্ডা একটা শিহরণ খেলে গেল রবিনের। এমনকি কিশোরের চেহারা থেকেও রক্ত সরে গেছে।
অস্বস্তি বোধ করছেন প্রফেসর বেনজামিন, চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে। জিম, ওই অভিশাপের ভয় আমি করি না, বিশ্বাস করি না, সামনের দিকে চিবুক বাড়িয়ে দিলেন তিনি। করবও না।
ঠিকই, স্বীকার করলেন উইলসন, ব্যাপারটা অবৈজ্ঞানিক।
পুরোপুরি অবৈজ্ঞানিক, ঘোষণা করলেন যেন বেনজামিন।
তবু ব্যাপারটা পরীক্ষা করে দেখতে চাই, বলল উইলসন। মমিটা কি কদিনের জন্যে আমার এখানে নিয়ে আসবেন? দেখি, আমার সঙ্গে কথা বলে কিনা ওটা। যদি নতুন কিছু বলে…

যা খুশি বলুক গে, কিছু এসে যায় না আমার, থ্যাঙ্ক ইউ। আমি এখনও বিশ্বাস করি না মমিটা কথা বলেছে। নিশ্চয় কোন রহস্য রয়েছে ভেতরে, রবিন আর কিশোরকে দেখিয়ে বললেন প্রফেসর, এদেরকে ডেকে এনেছি আমাকে সাহায্য করার জন্যে। রহস্যটার সমাধান আমরা করবই।
শ্রাগ করলেন উইলসন। মমি তার এখানে নিয়ে আসার জন্যে আর চাপাচাপি করলেন না।
ভাষাবিদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এল তিনজনে।
সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল গ্যারেজের পাশে। ব্রিজ পেরিয়ে এসে নামল রাস্তায়। ঘুরে ঘুরে নেমে গেছে পাহাড়ী পথ। শখানেক গজ নিচেই পার্কিং লট, ওখানেই ট্যাক্সি নিয়ে অপেক্ষা করছে ড্রাইভার।
গাড়িতে উঠে বসল তিনজনে। প্রফেসরের বাড়ির দিকে চলল ট্যাক্সি।
বলেছিলাম না, পেছনের সিটে হেলান দিয়ে বসে বললেন প্রফেসর, কেউ যদি পারে, জিমই পারবে। কিশোর, রা-অরকনের ফিসফিসানির ব্যাপারে আর কোন নতুন থিয়োরী এসেছে মাথায়?
না, স্যার, চিন্তিত কিশোর। ব্যাপারটা সত্যিই বড় বেশি রহস্যময়।
মাথা ঘুরিয়ে দেয়ার মত! বিড়বিড় করল রবিন।
পৌঁছে গেল গাড়ি। নেমে পড়ল তিনজনে।
সদর দরজায় দাঁড়িয়ে বেল বাজালেন প্রফেসর।
সাড়া নেই।
আবার বাজালেন। তবু সাড়া নেই। চেঁচিয়ে ডাকলেন, হুপার! হুপার! কোথায় গেলে!
নীরবতা। সাড়া দিল না হুপার।
আশ্চর্য! আপনমনেই বললেন প্রফেসর। গেল কোথায়!
চলুন, জাদুঘরের জানালা দিয়ে ঢুকে পড়ি, পরামর্শ দিল কিশোর। খুঁজে দেখলেই হবে, কোথায় কি করছে।
জাদুঘরে ঢুকেই চেঁচিয়ে উঠল রবিন। কফিনটা কোথায়, প্রফেসর!
কফিনের জায়গাটা শূন্য। মেঝেতে হালকা ধুলো জমেছে, তাতে কিছু আঁচড় আর ভারি জিনিস টানাহেঁচড়ার দাগ। দলা পাকানো নীল একটা রুমাল পড়ে আছে। এক জায়গায়।
রা-অরকনকে চুরি করেছে কেউ! বলে উঠলেন প্রফেসর। কিন্তু কে করল? জিজ্ঞেস করল? জিনিসটার কোন দামই নেই। মানে, কমার্শিয়াল কোন দাম নেই। বিক্রি করা যাবে না। কুটি করলেন হঠাৎ। বুঝেছি! সেই অ্যারাবিয়ান! যাকে বের। করে দিয়েছিলাম। পুলিশকে ফোন করতে হচ্ছে। কিন্তু, দ্বিধা করছেন প্রফেসর।

কিন্তু ওদেরকে ডেকে আনলে সব খুলে বলতে হবে। মমি কথা বলেছে, এটাও। জানাতে হবে। আগামী কালই বেরিয়ে যাবে খবরের কাগজে খবরটা। এবং আমার ক্যারিয়ার শেষ। নাহ, পুলিশ ডাকা যাচ্ছে না। ঠোঁট কামড়ে ধরলেন। চিন্তিত। অসহায় হয়ে পড়েছেন যেন। কি করি এখন? কি করি?
কোন পরামর্শ দিতে পারল না রবিন।
নীল রুমালটা তুলে নিয়েছে কিশোর। কফিনটা বয়ে নিতে অন্তত দুজন লোক দরকার। যদি, ওই জলিলই করে থাকে কাজটা, তার সঙ্গে আরও একজন রয়েছে। এই যে রুমালটা, কালিঝুলি দেখা যাচ্ছে। শ্রমিকের চিহ্ন। তাড়াহুড়োয় ফেলে গেছে হয়ত।
হাতের তালু দিয়ে কপাল ঘষছেন প্রফেসর। পুরো ব্যাপারটাই কেমন যেন উদ্ভট! মমি কথা বলল, তারপর গেল গায়েব হয়ে... থমকে গেলেন তিনি। আরে হ্যাঁ, হুপারের কথাই তো ভুলে গেছি! ও গেল কোথায়? বদমাশরা তাকে মেরে ফেলল না তো! চল, চল, খুঁজে দেখি!
চোরগুলোর সঙ্গে হাত মেলায়নি তো? অনেক রহস্য কাহিনী পড়েছে রবিন,। যেগুলোতে বাড়ির চাকর-বাকর খানসামারাই চোর-ডাকাতের সহায়ক।
না, না, কি বল! জোরে মাথা নাড়লেন প্রফেসর। দশ বছর ধরে কাজ করছে। সে আমার কাছে। চল, খুঁজে বের করতে হবে ওকে।
বাগানে বেরিয়ে এল ওরা। চোখে পড়ল তলোয়ারটা। নিচু হয়ে তুলে নিলেন। প্রফেসর। আমার সংগ্রহের জিনিস! নিশ্চয় এটা নিয়ে বাধা দিতে গিয়েছিল হুপার! বেচারাকে মেরেই ফেলল কি না কে জানে! আর পুলিশ না ডেকে পারা যাবে না!
ঘুরে দাঁড়াতে গেলেন প্রফেসর, এই সময় মৃদু একটা গোঙানি কানে এল। চত্বরের শেষ প্রান্তে একটা ঝোঁপের ভেতর থেকে এসেছে। কিশোরও শুনেছে। শব্দটা। সে-ই আগে ছুটে গেল ঝোঁপটার কাছে।
ঝোঁপের ভেতর পাওয়া গেল হুপারকে। চিত হয়ে পড়ে আছে ঘাসের ওপর। দুহাত আড়াআড়ি রাখা হয়েছে বুকে।
ধরাধরি করে চত্বরে নিয়ে আসা হল হুপারকে, শুইয়ে দেয়া হল ঘাসের ওপর-জানালা দিয়ে আলো এসে পড়েছে যেখানে।
বেহুশ! খানসামার ওপর ঝুঁকে বসেছে প্রফেসর। জ্ঞান ফিরছে নাকি! হুপার, শুনতে পাচ্ছ? হুপার?
একবার কেঁপে উঠল হুপারের চোখের পাতা, তারপরই আবার স্থির হয়ে গেল।
আরে, দেখুন! ছায়ার দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে উঠল রবিন। একটা বেড়াল। পুষি, এস, এস! হাত চেটে দিল। ওটাকে তুলে নিল রবিন!

দেখ দেখ! বেড়ালটাকে দেখছে রবিন। ওর চোখ দেখ! একটা নীল আরেকটা কমলা! জিন্দেগীতে এমন বিড়াল দেখিনি।
কি বলছ। প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন প্রফেসর। বিশ্বাস করতে পারছেন না যেন। দেখি দেখি, দাও তো আমার হাতে! বিড়বিড় করলেন, চোখের রঙে বৈসাদৃশ্য!.
বেড়ালের চোখ দুটো দেখছেন প্রফেসর। আবিসিনিয়ান বেড়াল, চোখের রঙে বৈসাদৃশ্য! আপনমনেই বিড়বিড় করছেন। কি যে ঘটছে, কিছুই বুঝতে পারছি না! পুরো ব্যাপারটাই অদ্ভুত! রা-অরকনের সঙ্গে কবর দেয়া হয়েছিল তার প্রিয় বেড়ালটাকে। ওটাও ছিল আবিসিনিয়ান, দুই চোখের দুই রঙ। শরীরের রঙ পিঙ্গল, সামনের দুই পায়ের নিচের অংশ কালো। এটারও তাই!
তাজ্জব হয়ে বেড়ালটার কুচকুচে কালো দুই পায়ের দিকে চেয়ে আছে দুই কিশোর।
হুপারের হুশ ফেরানো দরকার, বললেন প্রফেসর। হয়ত ও কিছু বলতে পারবে। খানসামার একটা হাত তুলে নিয়ে তালুতে তালু ঘষতে লাগলেন জোরে জোরে। হুপার? হুপার? শুনতে পাচ্ছ? কথা বল!
খানিকক্ষণ ঘষাঘষি করার পর চোখ মেলল হুপার। চোখ প্রফেসরের মুখের। দিকে। কিন্তু মনিবকে দেখছে বলে মনে হয় না। কেমন যেন শূন্য দৃষ্টি!
হুপার, কি হয়েছিল? জানতে চাইলেন বিজ্ঞানী। রা-অরকনকে কে চুরি করল? সেই অ্যারাবিয়ানটা?
হুপার নীরব! কথা বলার কোন চেষ্টাই নেই।
একই প্রশ্ন আবার করলেন প্রফেসর।
আনুবিস! অনেক কষ্টে যেন উচ্চারণ করল হুপার। আতঙ্কিত। আনুবিস!
আনুবিস? আনুবিস, মানে শেয়াল-দেবতা চুরি করেছে মমিটা?।
আনুবিস! আবার একটা শব্দই উচ্চারণ করল হুপার। তারপর চোখ বুজল।
খানসামার কপালে হাত রাখলেন প্রফেসর। জ্বর। খুব বেশি। ওকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। পুলিশকে ডাকছি না আপাতত। রহস্য আরও জটিল। হয়ে উঠেছে। রা-অরকনের মমি, তার প্রিয় বেড়াল, তারপর আনুবিস! নাহ, বড় বেশি গোলমাল হয়ে যাচ্ছে! আস্তে মাথা নাড়লেন প্রফেসর। কিশোর, তোমাদের ট্যাক্সিটাই নিয়ে যাব। আমার গাড়ি আর বের করছি না। বেড়ালটা তোমাদের কাছেই থাক। হুপার ভাল হোক। ও কিছু বলতে পারলে, নতুনভাবে তদন্ত শুরু করবে। চল।
হুপারকে ছোট একটা প্রাইভেট হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। হাসপাতালের মালিক প্রফেসরের বন্ধু। সঙ্গে সঙ্গে খানসামাকে ভর্তি করে নেয়া হল। কোনরকম অপ্রীতিকর প্রশ্নের সম্মুখীন হলেন না প্রফেসর। _ প্রফেসরের কাছ থেকে বিদায়

নিয়ে ট্যাক্সিতে চড়ল রবিন আর কিশোর। রকি বীচে ফিরে চলল। রবিনের কোলে বেড়ালটা, মৃদু ঘড়ঘড় করছে মাঝে মাঝেই। তবে নড়াচড়া করছে না, আরাম পেয়েছে।
কিশোর, এক সময় বলল রবিন। কি মনে হয় তোমার? রা-অরকন গায়েব। হবার সঙ্গে এই বেড়ালটার কোন সম্পর্ক আছে?
নিশ্চয়। কিন্তু কি সম্পর্ক, জানি না।
হতবুদ্ধি হয়ে গেছে কিশোর। তাকে এরকম হতে কখনও দেখেনি রবিন।
ওদিকে মুসা কি করল, কে জানে! বলল সে।
হেডকোয়ার্টারে গিয়ে না পেলে টেলিফোন করব ওর বাড়িতে, বলল কিশোর। ওখানে না থাকলে করব মিসেস চ্যানেলের বাড়িতে। তবে এতক্ষণ সান্তা মনিকায় থাকবে বলে মনে হয় না।
হেডকোয়ার্টারে ফিরে এল দুই গোয়েন্দা। বিকেলে যেখানে রেখে গিয়েছিল। মুসা তার সাইকেলটা, ওখানেই আছে এখনও। মেরিচাচীকে জিজ্ঞেস করে জানল। কিশোর, মুসা, ফেরেনি। সাইকেলটা রয়েছে, তার মানে বাড়িও ফিরে যায়নি। সান্তা মনিকায় টেলিফোন করল। মিসেস চ্যানেল জানালেন সন্ধ্যার আগেই তার ওখান থেকে বেরিয়ে গেছে মুসা। গেল কোথায়? রাশেদ চাচাকে জিজ্ঞেস করে জানল, সিনেমায় গেছে বোরিস আর রোভার। না, তাদের সঙ্গে মুসাকে দেখেননি তিনি। তাহলে?
কোথায় যেতে পারে? উৎকণ্ঠা ফুটেছে রবিনের চেহারায়।
কি জানি! কিশোরও উদ্বিগ্ন। সান্তা মনিকা থেকে প্রফেসরের বাড়িতে যায়নি তো? বোরিস ফিরলেই জানা যেত। শো ভাঙতে দেরি আছে এখনও, বলল রবিন। চল, ততক্ষণ অপেক্ষা করি।
একটানা ছুটে চলেছে ট্রাক। এবড়ো খেবড়ো অসমতল পথে নেমে এসেছে এখন। প্রচণ্ড ঝাঁকুনি। কফিনের ভেতর গা ঘেঁষাঘেঁষি করে পড়ে আছে মুসা আর জামান, নড়তে চড়তে পারছে না খুব একটা। হাড়গোড় গুঁড়ো হয়ে যাওয়ার অবস্থা।
গুমট হয়ে আসছে কফিনের ভেতরের বাতাস, বাইরে থেকে খুব একটা ঢুকতে পারছে না। বেশিক্ষণ এই অবস্থায় থাকলে অক্সিজেনের অভাবেই মরতে হবে, ভাবল মুসা।
ভয় পেতে শুরু করেছে দুজনেই, কিন্তু কেউই প্রকাশ করছে না সেটা।
কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? একসময় বলল জামান। ফিসফিস করছে, যদিও কোন দরকার নেই। ট্রাকের ইঞ্জিনের প্রচণ্ড আওয়াজ কানে যাবে না ওয়েব কিংবা মেথুর।

কোথায় কে জানে! বলল মুসা। কথাবার্তা শুনে যা বুঝলাম, কোন গোপন জায়গায় নিয়ে লুকিয়ে রাখবে। যে এই কাজের ভার দিয়েছে, তার কাছে ডাবল টাকা চাইবে। টাকা আদায় করার পর তবে দেবে কফিনটা। ভালই। সময় পাব আমরা। সুযোগ বুঝে বেরিয়ে পড়ব কফিন থেকে। বলল বটে, কিন্তু সহজে বেরিয়ে পড়তে পারবে, বিশ্বাস হচ্ছে না তার নিজেরই। যদি দড়ির বাধন না খোলে চোরেরা? এখন যেভাবে আছে, তেমনিভাবে ফেলে রেখে চলে যায়?
প্রফেসরের বাড়িতে দুবার আসতে হয়েছে, বলল ওরা। ফিসফিস করেই বলল জামান। কেউ একজনকে পাগল বলল। কিছু বুঝেছ?
রা-অরকনের মমি চুরি করতে পাঠানো হয়েছে ওদের, বলল মুসা। সোজা কথা, ভাড়া করা হয়েছে। মমিটা নিয়ে গেছে ওরা। কিন্তু সেই লোক চেয়েছে কফিনসুদ্ধ। তাই আবার পাঠিয়েছে ওদেরকে। ওরা গেছে রেগে। কফিনটা নিয়ে গিয়ে অন্য কোথাও রাখবে। ডুবল টাকা না পেলে দেবে না ওটা।
হু, তাই হবে, একমত হল জামান। কিন্তু রা-অরকনের মমি চুরি করবে কে? কেন?
ও আমার দাদা, আর কারও নয়।
এটা আরেক রহস্য, বলল মুসা। নিশ্চয় এতক্ষণে একটা নাম দিয়ে ফেলেছে রবিন, নোট লিখে ফেলছে। মমি-রহস্য নামটাই সবচেয়ে উপযুক্ত।
রবিন? রবিন কে?
তিন গোয়েন্দার একজন।
তিন গোয়েন্দা! সেটা আবার কি? জামানের কণ্ঠে বিস্ময়।
অল্প কথায় জানাল সব মুসা।
গভীর আগ্রহ নিয়ে শুনল জামাল। মুসার কথা শেষ হতেই বলল, তোমরা, আমেরিকান ছেলেরা বড় আরামে আছ। আমার দেশে, লিবিয়ায় অনেক কিছুই অন্য রকম। কার্পেটের ব্যবসা আছে আমাদের। বাবা তো আছেনই, আমাকেও দেখাশোনা করতে হয়। তোমাদের মত এত স্বাধীন না, যা খুশি করতে পারি না। তোমাদের হেডকোয়ার্টার সম্পর্কে আরও বল। টেপ-রেকর্ডার, পেরিস্কোপ, আর? রেডিও, টেলিভিশন, এসব নেই?
রেডিও! প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মুসা। ইসস, আরও আগে মনে হয়নি কেন! বাইরের সাহায্য চাইতে পারতাম আরও আগেই!
পকেটেই আছে ছোট ওয়াকি-টকিটা। কফিনের ভেতরে জায়গা বেশি নেই। ওই স্বল্প পরিসরেই কোনমতে শরীর বাঁকিয়ে হাত ঢুকিয়ে বের করে আনল যন্ত্রটা। কোমর থেকে খুলে নিল অ্যান্টেনা। ডালার ফাঁকে যেখানে পেন্সিল ঢুকিয়েছে ওখান দিয়ে বের করে দিল অ্যান্টেনার এক প্রান্ত। তারপর টিপে দিল সুইচ।

হাল্লো, ফার্স্ট ইনভেস্টিগেটর! মুখের কাছে ওয়াকি-টকি নিয়ে এসেছে মুসা। সেকেণ্ড বলছি। শুনতে পাচ্ছ? জরুরি! ওভার।
জবাবের জন্যে কান পেতে রইল মুসা। এক মুহূর্ত নীরবতা। হঠাৎ ধক করে উঠল তার বুকের ভেতর। কথা শোনা গেল: হ্যালো, টম, শুনতে পাচ্ছ? অন্য কেউ ঢুকে পড়েছে আমাদের চ্যানেলে।
জবাব দিল দ্বিতীয় একটা গলা: হ্যাঁ, জ্যাক। একটা ছেলে। খোকা, যেই হও তুমি, চুপ কর। জরুরি কথা বলছি আমরা। জ্যাক, যা বলছিলাম, পথের মাঝে আটকে গেছি। ট্রাকের টায়ার পাঙ্কচার…
হেল্প! চেঁচিয়ে উঠল মুসা। শুনুন, আমার নাম মুসা আমান। রকি বীচের কিশোর পাশার সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইছি। খুব জরুরি!
টমের গলা শোনা গেল: কার সঙ্গে যোগাযোগ? খোকা, কি বলতে চাইছ তুমি?
রকি বীচের কিশোর পাশাকে ফোন করুন, প্লীজ, অনুরোধ জানাল মুসা। ওকে বলুন মুসা সাহায্য চাইছে। অত্যন্ত জরুরি।
জ্যাক বলল: কি ধরনের জরুরি, খোকা?
একটা মমির বাক্সে আটকে গেছি, বলল মুসা। রা-অরকনের মমি। চুরি করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ট্রাকে করে। কিশোর সব বুঝতে পারবে। প্লীজ, ফোন করুন তাকে।
হেসে উঠল জ্যাক। বলল: টম, শুনলে? এই ছেলেছোকরাগুলোর কথা আর কি বলব? নেশার বড়ি খেয়ে খেয়ে সমাজটাই শেষ হতে বসেছে!
প্লীজ! চেঁচিয়ে উঠল মুসা।নেশা করিনি আমি! কিশোরকে ফোন করুন।
জ্যাক বলল: খোকা, যা করেছ করেছ, আর দুষ্টুমি কোরো না। সিটিজেন ব্যাণ্ডে গোলমাল পাকালে বিপদে পড়বে। পুলিশ শুনলেই কাক করে গিয়ে ধরবে।—টম, অবস্থান জানিয়েছি সাহায্য পাঠাও।
নীরব হয়ে গেল রেডিও।
হল না, বিষণ্ন কণ্ঠে বলল হতাশ মুসা। অন্য কিছু বলা উচিত ছিল ওদের। টাকা হারিয়ে বিপদে পড়েছি, বা এমনি কিছু। সত্য কথা বলেছি, বিশ্বাস করেনি। ওদেরকে দোষ দেয়া যায় না। মমির বাক্সে ঢুকে আছি, এটা বিশ্বাস না করারই কথা।
কি আর করবে? তোমার চেষ্টা তুমি করেছ। আর কিছু করার নেই।
হ্যাঁ। এমন অবস্থায় হাজার বছরে কেউ একবার পড়ে কিনা সন্দেহ! কাতর শোনাল মুসার গলা।
খানিকক্ষণ নীরবতা। ছুটে চলেছে ট্রাক। ভাবছে মুসা। তার অবস্থায় পড়লে কিশোর কি করত, বোঝার চেষ্টা করছে। সময়টা কাজে লাগাতে চাইত কিশোর। কিভাবে? প্রশ্ন করে। জামান যা যা জানে, জানার চেষ্টা করত।

জামান, জিজ্ঞেস করল মুসা। তুমি লিবিয়ার ছেলে। এত ভাল ইংরেজি শিখলে কি করে?
ভাল ইংরেজি বলতে পারি! বলছ? খুশি হলাম, সন্তুষ্ট শোনাল জামানের গলা। অন্ধকারে তার মুখ দেখতে পাচ্ছে না মুসা, তবে খুশি যে হয়েছে, এতে কোন সন্দেহ নেই। আমেরিকান শিক্ষকের কাছে শিখেছি। বড় হলে ব্যবসার কাজে দেশের বাইরে যাওয়ার দরকার পড়বেই। তাই আমাকে ইংরেজি শিখতে হয়েছে। শুধু ইংরেজি না, ফরাসী আর স্প্যানিশও জানি। একটু থেমে আবার বলল, লিবিয়ায় আমাদের বংশের নাম আছে। বহু পুরুষ ধরে কার্পেটের ব্যবসা করছি। আমরা।
তা-তো বুঝলাম, বলল মুসা। কিন্তু এসবের মাঝে রা-অরকন আসছে কি করে? তুমি বলছ, ও তোমাদের পূর্বপুরুষ। কিন্তু প্রফেসর বেনজামিনের মত, রা অরকন সম্পর্কে কেউ কিছু জানে না। ও কে ছিল, কি করত, কেউ কিছু জানে না।
বইয়ে লেখা নেই, তাই জানে না। তবে কিছু কিছু জ্ঞানী লোক আছেন, যাঁরা দুনিয়ার অনেক কিছু সম্পর্কে অনেক কিছু জানেন। বই পড়তে হয় না তাদেরকে।
যেমন?
মাস দুই আগে, বলল জামান। এক জ্যোতিষ এসেছিল আমাদের বাড়িতে। বাবাকে বলল, সে স্বপ্নে দেখেছে, কেউ তাকে আমাদের বাড়িতে আসতে বলছে। তাই সে এসেছে। বাবা তাকে আদর-আপ্যায়ন করে বলেন, খাওয়ালেন। তারপর ধ্যানে বসল জ্যোতিষ। বিড়বিড় করে অদ্ভুত সব কথা বলতে লাগল। একসময় তার। মুখ দিয়ে কথা বলে উঠলেন রা-অরকন। তিনি বললেন, শ্বেতাঙ্গ বর্বরদের দেশে তাঁর খুব কষ্ট হচ্ছে। নিজের দেশে না এলে তার শান্তি নেই। জামান বংশের পূর্বপুরুষ তিনি। কাজেই তাকে ফিরিয়ে আনা জামানদেরই কর্তব্য। বর্বরদের দেশে গেলেই রা-অরকনের কথার প্রমাণ পাবেন বাবা। প্রিয় বেড়ালের রূপ ধরে দেখা দেবেন তিনি বাবাকে। কথা শেষ হতেই ধ্যান ভেঙে গেল জ্যোতিষের। আশ্চর্য! রা অরকন কি কি বলেছেন কিছুই বলতে পারল না সে। বাবা সব খুলে বলতেই গম্ভীর হয়ে গেল।
কোনরকম ফাঁকিবাজি নেই তো?
না না। লোকটাকে দেখলেই শ্রদ্ধা জাগে। চুল, লম্বা লম্বা দাড়ি, সব ধবধবে সাদা। একটা চোখ অন্ধ। বয়েসের ভারে কুঁজো, লাঠিতে ভর করে হাঁটে। সঙ্গে বোঝা ছিল। ওটা থেকে স্ফটিকের একটা বল বের করে কি সব পড়ল বিড়বিড়িয়ে। এক চোখ দিয়ে তাকিয়ে রইল বলটার দিকে। তারপর অতীত আর ভবিষ্যতের অনেক অদ্ভুত কথা বলে দিল গড়গড় করে।
খাইছে! তোমার বাবা কি করলেন তখন?

আমাদের ম্যানেজার জলিলকে কায়রো পাঠালেন। সে গিয়ে জেনে এল, সত্যিই কায়রো মিউজিয়মে রাখা ছিল রা-অরকনের মমি। তখন পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে আমেরিকায়। ক্যালিফোর্নিয়ার এক প্রফেসর হার্বার্ট বেনজামিনের কাছে যাবে। জ্যোতিষ ঠিকই বলেছে। বাবা তখন অসুস্থ। তাই নিজে আসতে পারলেন না। আমাকে আর ম্যানেজারকে পাঠালেন রা-অরকনের খোঁজে। এলাম। খুঁজে খুঁজে বের করলাম প্রফেসরের বাড়ি। তাঁর কাছে গেল ম্যানেজার। মমিটা দিয়ে দিতে বলল। কিন্তু রাজি হল না বর্বর প্রফেসর। উল্টো গালমন্দ করে জলিলকে বের করে দিল বাড়ি থেকে।

শুনেছি, বলল মুসা। প্রফেসর বলেছেন।

তখন চুরি করার ফন্দি আঁটল জলিল। এক কোম্পানিকে ধরে মালীর কাজ নিল। প্রফেসরের বাগানের কাজ করতে এসে নজর রাখতে লাগল বাড়িটার ওপর। আমিও রইলাম তার সঙ্গে। চুরি করার বেশ কয়েকটা সুযোগ পেয়েছি আমরা। কিন্তু অচেনা অজানা দেশ, বিদেশ। কাউকে চিনি না। চুরি করার সাহস হল না।

কিন্তু চুরির ফন্দি করলে কেন? প্রফেসরের কাছে মমিটা কিনে নেয়ার প্রস্তাব দিতে পারতে। ভাল টাকা পেলে হয়ত বিক্রি করে দিতেন।

রা-অরকন আমার দাদা! হিমশীতল কণ্ঠ জামানের। জোর করে কেউ তাঁকে। আটকে রাখবে, আর তার কাছ থেকে কিনে নিতে হবে, কেন? বর্বরদের দেশ কি আর সাধে বলেছি? সে যাই হোক, আমরা পারলাম না শেষ অবধি। অন্য একজন চুরি করে নিল। কিন্তু কে করল কাজটা? কেন?

ভাবনা চলছে মুসার মাথায়। আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে, লোক দিয়ে। জলিলই চুরি করিয়েছে মমিটা? তোমাকে না জানিয়ে হয়ত করেছে একাজ।

না, তা হতে পারে না। আমাকে জানাই। আমার সঙ্গে আলোচনা না করে। এক পা বাড়ায় না সে। বাবা মারা গেলে আমিই মালিক হব, জানা আছে তার।

তাই? জামানের সঙ্গে ঠিক একমত হতে পারছে না মুসা। তো, রা-অরকন যে কথা বলল, এর কি ব্যাখ্যা দেবে?

জানি না! হয়ত রা-অরকন খেপে গিয়েছেন। আমার আর জলিলের ওপরও হয়ত রাগ করেছেন তিনি। নাহ্, এটা সত্যিই এক আজব রহস্য! গাঢ় অন্ধকার, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু উত্তেজিত হয়ে পড়েছে জামান, কণ্ঠস্বরেই বোঝা যাচ্ছে।

খানিকক্ষণ নীরবতা।

থেমে গেল ট্রাক। কফিনের ভেতর থেকে দুজনের কানে এল একটা শব্দ, গ্যারেজ কিংবা ওয়্যারহাউসের দরজা খোলা হচ্ছে। আবার নড়ে উঠল ট্রাক। কয়েক গজ এগিয়ে থামল। বন্ধ হয়ে গেল ইঞ্জিন। দরজা নামানর শব্দ শোনা গেল।

ট্রাকের পেছনের ডালা নামানর শব্দ হল। খানিক পরেই তোলা হল। কফিনটাকে। বয়ে নিয়ে গিয়ে ধপ করে নামানো হল মেঝেতে। প্রচণ্ড ঝাঁকুনি। ভেতরে থেকে ছেলে দুটোর মনে হল, মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে ওদের।
চল যাই, শোনা গেল মেথুর গলা। এটা থাক এখানেই।
থাক, বলল ওয়েব। সকালে ফোন করব মক্কেলকে। বলব, কত চাই আমরা। আজ রাতটা একটু ভাবনা-চিন্তা করেই কাটাক।
কিন্তু কাল সকালেও তো পারা যাবে না, বলল মেথু। লং বীচে একটা কাজ করতে হবে, ভুলে গেছ?
তাই তো। ঠিক আছে, সকালে না পারলে বিকেলে ফোন করব। নত রাতে। দিনটাও দুশ্চিন্তা করেই কাটাক।
কত চাইব, বল তো? দ্বিগুণ নাকি তিন গুণ? জিনিসটা পাওয়ার জন্যে যেরকম উদ্বিগ্ন দেখলাম ওকে, আমার মনে হয় না করতে পারবে না। শেষ অবধি রাজি হয়ে যাবেই।
সে দেখা যাবে। চল, যাই এখন।
আবার দরজা খোলার শব্দ। স্টার্ট হল ইঞ্জিন। পিছিয়ে বেরিয়ে গেল ট্রাকটা।
উত্তেজনায় দুরুদুরু করছে মুসার বুকের ভেতর। ঠেলা দিয়ে দেখল কফিনের ডালায়। নড়াতে পারল না ঢাকনা। বড় বেশি শক্ত দড়ির বাঁধন।

.

১১.

হেডকোয়ার্টার। খটাখট টাইপ করছে রবিন। নোট লিখছে।
আজব বেড়ালটাকে কোলে নিয়ে তার চেয়ারে বসে আছে কিশোর। চিন্তিত। আলতো চাপড় দিচ্ছে বেড়ালের গায়ে। মৃদু ঘড়ঘড় করে আনন্দ প্রকাশ করছে। ওটা।
সেরেছে! টাইপরাইটার থেকে মুখ তুলেছে রবিন। দশটা বাজতে পাঁচ! মুসার কি হল?
হয়ত কোন সূত্র পেয়ে গেছে, বলল কিশোর। তদন্তের কাজে ব্যস্ত।
কিন্তু যেখানেই যাক, দশটার মধ্যে বাড়ি ফেরার কথা তার। আমারও তাই। বেশি দেরি করলে ভাবনা-চিন্তা শুরু হয়ে যাবে বাড়িতে।
ফোন করে বলে দাও, ফিরতে আরও খানিক দেরি হবে। ইতিমধ্যে এসে যাবে মুসা।
ফোন ধরলেন রবিনের মা। আরও আধঘণ্টা থাকার অনুমতি দিলেন ছেলেকে।
বেড়ালটাকে ডেস্কের ওপর নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল কিশোর। গিয়ে চোখ রাখল পেরিস্কোপে। ইয়ার্ডের গেটে আলো। রাস্তায় ল্যাম্পপোস্ট থেকেও আলো এসে

পড়ছে চতুরে। নীরব, নির্জন। মেরিচাচীর ঘরে আলো জ্বলল। টেলিভিশন দেখছেন চাচা-চাচী। বোরিস আর রোভারের কোয়ার্টার অন্ধকার। সিনেমা থেকে এখনও ফেরেনি ওরা।
আবার রাস্তার দিকে পেরিস্কোপ ঘোরাল কিশোর। একটা গাড়ি এগিয়ে আসছে। গেটের কাছে এসে গতি কমাল। একটা নীল স্পোর্টস কার। ড্রাইভারের আসনে বসে আছে লম্বা শুকানো এক কিশোর। মুখ ফিরিয়ে ইয়ার্ডের দিকে তাকাল ছেলেটা। তারপর আবার এ লি। দ্রুত গাড়ি চালিয়ে মোড় নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।
চেয়ারে ফিরে এল কিশোর। মুসার কোন চিহ্ন নেই, গম্ভীর কণ্ঠস্বর। কিন্তু শুটকো টেরি শহরে ফিরে এসেছে। জ্বালাবে।
তাই নাকি! প্রায় চেঁচিয়ে উঠল রবিন। তাহলে গেল আমাদের শান্তি!
গেটের কাছে থেমেছিল। জানা কথা, আমাদেরকে খুঁজছে।
বেশি বাড়াবাড়ি করলে এবার ধরে পেটাব। ব্যাটা জন্মের শয়তান! আবার টাইপে মন দিল রবিন।
সময় যাচ্ছে। মুসার জন্যে ভাবনা বাড়ছে দুজনের।
আর আধঘণ্টা অপেক্ষা করব, অবশেষে বলল কিশোর। তারপর কিছু একটা ব্যবস্থা করতে হবে।
টাইপ থামিয়ে দিয়েছে রবিন। কিশোর, কোন বিপদে পড়েনি তো মুসা? একটা টেলিফোনও তো করতে পারত!...কিশোর, ওয়াকি-টকিতে যোগাযোগের চেষ্টা করছে না তো!।
তাই তো! প্রায় লাফিয়ে উঠল কিশোর। টেবিলে রাখা লাউডস্পীকারের সঙ্গে ওয়াকি-টকির যোগাযোগ করে দিয়ে সুইচ টিপল। হেডকোয়ার্টার ডাকছে। সহকারীকে! সেকেণ্ড, শুনতে পাচ্ছ আমার কথা? সেকেণ্ড!
স্পীকারের মৃদু গুঞ্জন ছাড়া আর কোন শব্দ নেই।
আবার চেষ্টা করল কিশোর। বৃথা। নাহ্, মাথা নাড়ল সে। চেষ্টা করছে না মুসা। কিংবা রেঞ্জের বাইরে রয়েছে। রবিন, রাত অনেক হয়ে গেছে। তুমি বাড়ি চলে যাও। আমি থাকছি এখানেই।
অনিচ্ছুক ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল রবিন। দুই সুড়ঙ্গ দিয়ে বেরিয়ে সাইকেলটা নিয়ে চলে গেল ইয়ার্ড থেকে।
বাড়িতে ঢুকল রবিন। গভীর চিন্তায় মগ্ন। বাবার ডাক শুনতেই পেল না।
রবিন? আবার ডাকলেন মিস্টার মিলফোর্ড। এত কি ভাবছিস রে? স্কুল তো ছুটি। পরীক্ষা-টরীক্ষা নেই।
মুখ তুলে তাকাল রবিন। বাবার দিকে এগোল। বাবা, একটা সমস্যায় পড়েছি! একটা রহস্য।

বলবি নাকি আমাকে?
বাবা, একটা বেড়াল, দুটো চোখ দুই রঙের। একটা সোফায় বসে পড়ল রবিন। নীল আর কমলা।
হুম! আস্তে মাথা নাড়লেন মিস্টার মিলফোর্ড। পাইপে তামাক ঠেসে আগুন ধরালেন।
কিন্তু, বাবা, আসল সমস্যা বেড়ালটা নয়। একটা মমি। তিন হাজার বছরের পুরানো। ওটা কথা বলে!
তাই নাকি? পাইপে টান দিলেন মিস্টার মিলফোর্ড। হাসলেন। এটা একটা সমস্যা হল? মমিকে কথা বলানো সহজ। পুতুল নাচ দেখিসনি? পুতুলকে কি করে কথা বলায় ওরা?
চোখ বড় বড় করে চেয়ে রইল রবিন প্রচণ্ড আগ্রহ নিয়ে।
বুঝলি না? আবার পাইপে টান দিলেন মিস্টার মিলফোর্ড। ভেন্ট্রিলোকুইজম। যুক্তির ভেতরে আয়। মমি হল মরা শুকনো লাশ, ওটার কথা বলার প্রশ্নই ওঠে না। তার মানে, মমিটার হয়ে কোন একজন মানুষ কথা বলে। সুতরাং, রহস্যের সমাধান করতে হলে আশপাশে এমন একজন প্রতিবেশীর খোঁজ কর গিয়ে, যে ভেন্ট্রিলোকুইজম জানে।
তড়াক করে লাফিয়ে উঠল রবিন। ফোনের দিকে ছুটল। কিশোরকে জানাতে হবে। পেছনে চাইলে দেখতে পেত, হাসিতে ভরে গেছে বাবার মুখ। ছেলেবেলায়। তিনিও রবিনের মতই চল ছিলেন। ছেলের মতিগতি তাই খুব ভাল করেই বোঝেন।
দ্রুতহাতে ডায়াল করল রবিন। প্রথম রিঙের সঙ্গে সঙ্গেই ওপাশ থেকে রিসিভার তুলল কিশোর। রবিনের সাড়া পেয়ে হতাশ মনে হল তাকে। আমি ভেবেছিলাম, মুসা! তো, কি খবর, রবিন? মুসার খবর জানতে চাইছ তো?
বুঝতেই পারছি, ওর কোন খবর নেই, বলল রবিন। কিশোর, মমির ব্যাপারটা নিয়ে বাবার সঙ্গে আলোচনা করেছি। বলল, ব্যাপারটা ভেন্ট্রিলো কুইজমের কারসাজি। প্রফেসরের কোন প্রতিবেশীর কাজ।
সেটা আগেই ভেবেছি আমি, খুব একটা উৎসাহ দেখাল না কিশোর। প্রফেসরের বাড়ির কাছাকাছি কোন প্রতিবেশী নেই।
তবু, ভেবে দেখ, ভেবেছিল সাংঘাতিক একটা তথ্য দিয়ে চমকে দেবে। কিশোরকে, হতাশই হল রবিন। হয়ত জাদুঘরের ঠিক বাইরে, কিংবা দরজার আড়ালে লুকিয়ে থাকে লোকটা। ওখান থেকে কফিন লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দেয় কথা।...যাক গে, মুসার কি অবস্থা? প্রফেসরের বাড়িতে একবার ফোন করে দেখ না। আমরা চলে আসার পর গিয়েও থাকতে পারে।

তাই করব এখন, বলল কিশোর। আর হ্যাঁ, ভেন্ট্রিলোকুইজম নিয়ে আরও ভাবব। একেবারে বাতিল করে দেয়া যায় না সম্ভাবনাটা এখনই।—গুড নাইট।
রিসিভার নামিয়ে রাখল রবিন। নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল। কাপড় ছেড়ে বিছানায় গেল। কিন্তু ঘুম আসছে না। হাজারটা ভাবনা এসে ভিড় করছে মনে। সবচেয়ে বেশি ভাবছে মুসার কথা। কোন বিপদে পড়ল না তো? রা-অরকনের। অভিশাপ তারই ওপর নামল না তো প্রথম…

.

অভিশাপ নামেনি, তবে মস্ত বিপদেই আছে মুসা আর জামান। দুজনে প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছে ডালা খোলার! কিন্তু এতই শক্ত বাধন, একটুও ঢিল হচ্ছে না।
বাইরে দাঁড়িয়ে আছে ট্রাকটা তখনও, ইঞ্জিনের শব্দেই বোঝা যাচ্ছে। হঠাৎ থেমে গেল ইঞ্জিনের শব্দ। পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। নিশ্চয় আবার ফিরে আসছে দুই চোর। কেন?
ভাল কথাই মনে করেছ, মেথুর গলা। দিনের বেলা কেউ ঢুকলে এটা চোখে পড়বেই। একটা কফিন পড়ে আছে দেখলে কৌতূহলী হয়ে উঠবে। ক্যানভাস দিয়ে ঢেকে রাখাই ভাল।
সেটাই তো বোঝার চেষ্টা করছি, বলল ওয়েব। ঢাকা দেখলে কেউ ফিরেও তাকাবে না। ভাববে ট্রাকের কোন মাল।
কাম সারছে! ফিসফিস করে বলল মুসা। এতক্ষণ তো বাতাস পেয়েছি, এবার সেটাও বন্ধ হয়ে যাবে! দম বন্ধ হয়েই মরব! তারচেয়ে, চেঁচিয়ে উঠি! কয়েকটা চড়থাপ্পড় দিয়ে ছেড়ে দিতেও পারে!
আমিও সে কথাই ভাবছি! বলল জামান।
চেঁচানর জন্যে মুখ খুলেও থেমে গেল মুসা। একটা বিশেষ কথা কানে ঢুকেছে।

.

ওয়েব, বলছে মেথু। দড়িটা খুলে নাও আগে। কাল দরকার পড়বে।
হ্যাঁ, ঠিক বলেছ, বলল ওয়েব। খুলে নিচ্ছি।
দুরুদুরু বুকে অপেক্ষা করে রইল মুসা আর জামান। দড়ি খোলার শব্দ শুনল। কফিনের ওপর ক্যানভাস টেনে দেয়ার খসখস আওয়াজ আসছে।
আবার দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ হল। খানিক পরেই শোনা গেল ইঞ্জিনের শব্দ। চলে গেল ট্রাক।
আরও কয়েক মিনিট অপেক্ষা করল মুসা। তারপর ঠেলা দিল ডালায়। তার সঙ্গে হাত লাগাল জামান।. ডালা খুলে গেল। তবু অন্ধকার। ক্যানভাসে ঢাকা রয়েছে। দাঁড়িয়ে উঠে ঠেলে ক্যানভাস সরিয়ে ফেলল মুসা, জামান বেরিয়ে গেল আগে। তারপর বেরোল সে।

অন্ধকার। মাথার ওপরে স্কাইলাইট। রাস্তার ল্যাম্পপোস্টের হালকা আলো আসছে। ঘরের জিনিসপত্র আবছা চোখে পড়ল ওদের। একটা স্টোররুম। উঁচু ছাদ, কংক্রীটের দেয়াল, কোন জানালা নেই। বড় একটা লোহার দরজা। ধাক্কা দিল। বাইরে থেকে শক্ত করে আটকানো। ঝন ঝন আওয়াজ হল শুধু। খুলল না।
ঘরে কি কি আছে জানার চেষ্টা করল মুসা আর জামান। বেরিয়ে যাওয়ার উপায় খুঁজছে। আধো অন্ধকার। ভালমত দেখা যাচ্ছে না। কিছু দেখে কিছু হাতের আন্দাজে খোঁজাখুঁজি চালাল ওরা। প্রথমেই চোখে পড়ল একটা পুরানো মোটরগাড়ি। বোঝা গেল, ওটা একটা প্রাচীন পিয়ার্স-অ্যারো সিডান। ঝরঝরে হয়ে গেছে।
পুরানো মোটরগাড়ি! জামানের কণ্ঠে বিস্ময়। এটা এখানে কেন?
কেউ সংগ্রহ করে রেখেছে হয়ত। উনিশশো বিশ সালের জিনিস হবে। গ্রাহকদের কাছে খুব দামি।
এরপর কিছু পুরানো আসবাবপত্র দেখল। ভারি! সূক্ষ্ম কারুকাজ-আঙুল চালিয়ে দেখে বুঝল। জিনিসগুলো রাখা আছে একটা কাঠের মঞ্চের ওপর।
শুকনো রাখার জন্যে, জামানকে বলল মুসা। জমা করে রাখা হয়েছে।—কিন্তু এগুলো কি?—গাদা করে রাখা?
ছুঁয়ে দেখল জামান। রোল পাকিয়ে জিনিসগুলো একটার ওপর আরেকটা রেখে পিরামিড বানিয়ে ফেলা হয়েছে যেন। কার্পেট! মধ্যপ্রাচ্যের জিনিস! খুবই ভাল, অনেক দামি!
কি করে বুঝলে? মুসা অবাক। ভালমত দেখাই যাচ্ছে না।
আট বছর বয়েস থেকেই কার্পেট ঘাটাঘাটি করছি। এগুলো তো আবছামত দেখা যাচ্ছে। না দেখে শুধু ছুঁয়েই বলে দিতে পারি কোনটা কেমন কার্পেট, কি ধরনের সুতো দিয়ে বানানো, বুনট কেমন। আমাদের কোম্পানির জিনিস নয় এগুলো। তবে দামি। একেকটা দুতিন হাজার ডলারের কম হবে না।
ওরেব্বাবা! নিশ্চয় চুরি করে আনা হয়েছে, বলল মুসা। বাজি ধরে বলতে পারি, এই ঘরের সব জিনিসই চোরাই মাল। ওয়েব আর মেথু, দুই ব্যাটাই পেশাদার চোর। এজন্যেই রা-অরকন আর কফিনটা চুরি করার জন্যে ওদেরকে ডাকা হয়েছে।
হ্যাঁ, তাই হবে, একমত হল জামান। কিন্তু এখন এখান থেকে বেরোই কি করে?
এই যে, আরেকটা দরজা! অন্ধকারে প্রায় ঢাকা পড়ে ছিল ছোট দরজাটা। একটা দেয়াল, বোধহয় অন্য ঘরগুলো থেকে আলাদা করে রেখেছে স্টোররুমটাকে।
হাতল ধরে টান দিল মুসা। খুলল না দরজা। আরেকটা দরজা খুঁজে পেল। ওরা। ওটা বাথরুমের।

মনে হয়, মুসা বলল। ঘরটা তৈরিই হয়েছে চোরাই মাল রাখার জন্যে। দরজাগুলোও তৈরি হয়েছে সে কথা চিন্তা করেই। মেথু আর ওয়েব জানে কি করে ঢুকতে হয়, বেরোতে হয়। কিন্তু আমরা বেরোই কি করে? ওপরের দিকে চেয়ে কি ভাবল। ওখান দিয়ে যাওয়া যাবে! বলল আপনমনেই।
যাবে, যদি উড়তে পার।
না উড়েও হয়ত পারব। এস, চেষ্টা করে দেখি। গাড়িটা—স্কাইলাইটের ঠিক নিচে রয়েছে।
ঠিক! উত্তেজিত হয়ে পড়েছে জামান। চল উঠে দেখি। নাগাল পাই কিনা!
ধীরে, বন্ধু, ধীরে, জামানের হাত চেপে ধরেছে মুসা। এত তাড়াহুড়া কোরো না। জুতোর সুখতলার ঘষায় রঙ ছাল তুলে ফেলবে। গাড়িটার অ্যানটিক মূল্যই খতম হয়ে যাবে।
জুতো খুলে নিল দুজনেই। একটার সঙ্গে আরেকটার ফিতে বেঁধে যার যার জুতো গলায় ঝুলিয়ে নিল। বেয়ে উঠে পড়ল গাড়ির ছাদে। কিন্তু দাঁড়িয়ে উঠে দুহাত টান টান করে তুলে দিয়েও নাগাল পেল না মুসা। আরও ফুটখানেক ওপরে থেকে যায় স্কাইলাইট।
লাফিয়ে ধরার চেষ্টা করব, বলল মুসা। যে করে থোক বেরোতেই হবে এখান থেকে।
লাফ দিল মুসা। আঙুলে ঠেকল স্কাইলাইটের ধাতব কিনারা। আঁকড়ে ধরল। ঠেলে খুলে ফেলতে একটা মুহূর্ত ব্যয় করল। দুহাতে ভর দিয়ে টেনে তুলল। শরীরটা। বেরিয়ে এল ধুলোবালিতে ঢাকা ছাদে। বসে পড়ে একটা হাত বাড়িয়ে দিল নিচে। লাফ দাও, জামান! আমার কব্জি চেপে ধর।
এক মুহূর্ত দ্বিধা করল জামান। নিচে কংক্রীটের মেঝের দিকে তাকাল একবার। তারপর আবার মুখ তুলল। লাফ দিল হঠাৎ। তার আঙুল ছুল মুসার হাত। কিন্তু আঁকড়ে ধরে রাখতে পারছে না, পিছলে যাচ্ছে। শেষ মুহূর্তে জামানের কব্জি ধরে ফেলল মুসা। টেনে তুলে আনল ওপরে।
প্রচণ্ড শক্তি তোমার গায়ে, মুসা! দুঃসাহসীও বটে! গোয়েন্দা হওয়ারই উপযুক্ত তুমি।
হয়েছে হয়েছে, প্রশংসা থামাও, হাত তুলল মুসা। ফুলে ফেঁপে শেষে পেট ফেটেই মরব। গলায় ঝোলানো জুতো নামিয়ে এনে ফিতে খুলতে শুরু করল। জলদি খোল! এখানে সারা রাত দাঁড়িয়ে থাকা যাবে না।
বিল্ডিঙের পেছন দিকে ছাতে ওঠার লোহার সিঁড়ি। অন্ধকার একটা সরু গলিতে নেমে এল ওরা। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল কয়েক সেকেও। কেউ আসছে কিনা কিংবা লক্ষ্য করছে কিনা, দেখল। কেউ নেই। নির্জন।

পকেট থেকে নীল চক বের করল মুসা। লোহার বড় দরজাটা খুঁজে বের। করল। ওটার নিচে বাঁ দিকে চক দিয়ে বড় বড় কয়েকটা প্রশ্নবোধক আঁকল। আমাদের বিশেষ চিহ্ন, সঙ্গীকে বলল সে। আগামীকাল ফিরে আসব। চিহ্ন দেখেই বুঝতে পারব, কফিনটা কোথায় রয়েছে। চল, মোড়ের ওদিকে গিয়ে এই রাস্তার নাম দেখি। আরে, কে জানি আসছে! চোর-টোর না তো!

গলি ধরে দ্রুত উল্টো দিকে রওনা হয়ে গেল ওরা। মোড় নিয়ে দুটো দোকানের মাঝের অন্ধকার গলি ধরে বেরিয়ে এল অন্য পাশে। কানা গলিই বলা চলে এটাকে। ল্যাম্পপোস্ট নেই। একটা দোকানের দরজার কপালে জ্বলছে ম্লান আলো, তাতে বিশেষ কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তবে এটুকু বুঝতে পারল মুসা, এই অঞ্চলে আগে কখনও আসেনি। একেবারেই অচেনা।

কোথায় এসেছি, যেভাবেই হোক জানা দরকার, বলল মুসা। জামানের হাত ধরে টানল, এস, ওই মোড়টায় চলে যাই। ফলকে নিশ্চয় রাস্তার নাম লেখা আছে।

ফলকটা পাওয়া গেল ঠিকই, কিন্তু নাম পড়ার উপায় নেই। অনেক দূরে ল্যাম্পপোস্ট, আলো ঠিকমত পৌঁছাচ্ছে না এখানে। তাছাড়া কলাকটার ওপর্ব কাদা লেপে দিয়েছে বোধহয় কোন দুষ্ট ছেলে।

বদমাশ ছেলেগুলোকে ধরে পেটানো উচিত বিড়বিড় করল মুসা আপনমনেই। আরও কিছু একটা বলতে গিয়েই থেমে গেল।

যে গলি থেকে বেরিয়েছে ওরা ওটার শেষ মাথায় কাঁচ ভাঙার ঝনঝন আওয়াজ উঠল। চেঁচিয়ে উঠল কেউ। ছুটে এল দুটো লোক। ল্যাম্পপোস্টের কাছ থেকে খানিক দূরে দাঁড়িয়ে থাকা একটা গাড়িতে গিয়ে ঢুকল। স্টার্ট দিয়ে মুসা আর জামানের পাশ দিয়েই ছুটে বেরিয়ে গেল গাড়িটা।

কিছু বুঝে ওঠার আগেই পেছনে চিৎকার অনলা ওরা। চোর! চোর! বিশালদেহী এক লোক ছুটে আসছে। ছেলেদেরকে দেখেই ঘুসি পাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, হারামজাদা, বদমাশেরা! চোর! আমার জানালা ভেঙেছিস! চুরি করেছিস। দাঁড়া, দেখাচ্ছি মজা!

লোকটার চেঁচামেচিতে কয়েকটা বাড়ির দরজা খুলে গেছে। বেরিয়ে এসেছে। আরও কয়েকজন লোক। সবাই ছুটে আসছে।

খপ করে জামানের হাত চেপে ধরুল মুসা। দৌড় দাও! ধরতে পারলে হাড় গুড়ো করে ফেলবে!

ছুটল ওরা। এ-গলি, ও-গলি, এ-রাস্তা, সে-ব্রাতা, এ-বাড়ির পাঁশ, ও দোকানের কোণ পেরিয়ে এসে পড়ল একটা বড় রাস্তায়। পেছনে তখনও তাড়া করে আসছে লোক। তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে দুটো কুকুর। হাঁপাচ্ছে মুসা আর জামান। আর

বেশিক্ষণ পারবে না। বুকের ভেতর ভীষণ লাফালাফি করছে হৃৎপিণ্ড। তবু থামল না ওরা। ছুটে ঢুকে পড়ল আরেক গলিতে।
অবশেষে তাড়া করে আসা লোকদেরকে হারিয়ে দিল ওরা। ততক্ষণে দম। ফুরিয়ে গেছে একেবারে। ধূপ করে পর্থের ওপরই বসে পড়ল দুজনে। শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে।
খামোকা—দৌড়েছি! হাঁপাতে হাঁপাতে বলল মুসা। আমরা চোর নই, জানালাও ভাঙিনি ওদেরকে সে কথা বুঝিয়ে বললেই হত।
হত না, বলল জামান। চোর বলে কেউ তেড়ে এলে প্রথম কাজ ছুট লাগানো। ঠিকই করেছ। ওরা হয়ত বুঝত শেষ অবধি, কিন্তু ততক্ষণে কিল খেয়ে থেঁতলে যেত আমাদের শরীর। ঠিকই হয়েছে, ছুট লাগিয়েছি।
কিন্তু…কাজটা খারাপ হয়ে গেল, তিক্ত কণ্ঠ মুসার। কোন জায়গা থেকে ছুট লাগিয়েছি, জানি না। কোথায় কোন্‌দিকে ছুটেছি, তা-ও বলতে পারব না। স্টোর হাউসটা কোথায় সামান্যতম ধারণাও নেই।
আমারও না, হতাশ মনে হল জামানকে। পড়লাম আরেক সমস্যায়, তাই না?
তাই, মাথা নাড়ল মুসা। আবার কি করে খুঁজে পাঁব বাড়িটা? বাড়িই বা ফিরব কি করে? রকি বীচ থেকে কম করে হলেও পনেরো মাইল দূরে রয়েছি আমরা। হলিউড থেকে মাইল দশেক। জায়গাটা লস অ্যাঞ্জেলেসের শহরতলী বলেই মনে হচ্ছে।
ট্যাক্সি নিতে পারি, বলল জামান।
তা পারি, বলল মুসা। কিন্তু আমার পকেটে যা আছে তাতে কুলাবে না।
আমার কাছে আছে, আশ্বাস দিল জামান। অনেক টাকা আছে। আমেরিকান ডলার। বেশ পুরু একটা নোটের তাড়া বের করে দেখাল সে।
ভাল, উঠে দাঁড়াল মুসা। আঙুল তুলে একটা দিক দেখাল। আলো। শহর নিশ্চয়। ট্যাক্সি পাওয়া যাবে ওদিকে।
দ্রুত এগিয়ে চলল দুজনে। মোড়ের কাছে একটা ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ড। ভাড়া দিতে পারবে? ছেলেদের দেখে সন্দেহ প্রকাশ করল ড্রাইভার। জামান নোটের তাড়া দেখাতেই নেমে এসে পেছনের দরজা খুলে ধরল।
গাড়িতে চড়ার আগে আশপাশের এলাকা সম্পর্কে একটা ধারণা নিয়ে নিল। অনুমান করল, পনেরো-বিশ ব্লক দূরে রয়েছে স্টোর-হাউসটা। ড্রাইভারকে অপেক্ষা করতে বলে এগিয়ে গেল একটা পাবলিক ফোন-বুথের দিকে।
প্রথমবারই রিঙ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ওপাশ থেকে রিসিভার তুলে নিল কিশোর।
মুসা, বলল গোয়েন্দাসহকারী। ভালই আছি। বাড়ি রওনা হচ্ছি এখনই। অনেক কিছু বলার আছে তোমাকে। বাড়ি থেকে ফোনে জানাব।

ওয়াকি-টকি ব্যবহার কর, বলল কিশোর। আমি আমার ঘরে অপেক্ষা করব। তোমার সাড়া পেয়ে খুব খুশি লাগছে, সেকেণ্ড।
কিশোরের গলা শুনেই বুঝতে পারছে, সত্যিই ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল। গোয়েন্দাপ্রধান। খুশি হয়েছে এখন ঠিকই। তবে খুশি বেশিক্ষণ থাকবে না, ভাবল মুসা। কফিনটা কোথায় আছে, দেখেছে মুসা, অথচ ঠিকানা বলতে পারবে না জানতে পারলে, কিশোরের চেহারা কেমন হবে, মনের চোখে দেখতে পাচ্ছে পরিষ্কার।
গাড়িতে গিয়ে উঠল মুসা। জামান আগেই উঠে বসে আছে।
পথে আর কোনরকম কিছু ঘটল না। নিরাপদেই বাড়ি পৌঁছল মুসা। জামান নামল না ট্যাক্সি থেকে। সে চলে যাবে প্রফেসর বেনজামিনের বাড়ির কাছাকাছি, যে বাড়িটা ভাড়া নিয়েছে জলিল, সেখানে। সেখানেই উঠেছে ওরা এদেশে এসে।
গাড়ি থেকে নামতে যাচ্ছিল মুসা, খপ করে তার হাত চেপে ধরল জামান। মুসা, তোমরা সাহায্য করবে আমাকে? রা-অরকন আর তাঁর কফিনটা খুঁজে বের করতেই হবে। যদি বল, তোমাদের সার্ভিস ভাড়া করতে রাজি আছি আমি।
ভুল করছ তুমি, জামান, বলল মুসা। টাকার বিনিময়ে কারও কাজ করি না আমরা। করি স্রেফ শখে। তাছাড়া কাজটা হাতে নিয়েছি আমরা আগেই, প্রফেসর বেনজামিনের অনুরোধে।
জামানের জন্যেও কাজটা কর, অনুরোধ করল জামান। রা-অরকন আর কফিনটা খুঁজে বের করে প্রফেসরকে ফিরিয়ে দাও। আবার আমি আর জলিল যাব তার কাছে। আবার চাইব তার কাছে মমিটা। অনুরোধে কাজ না হলে অন্য উপায় দেখব।
সেটা করা যেতে পারে, মাথা নাড়ল মুসা। আগামীকাল সকাল দশটায় পাশা স্যালভেজ ইয়ার্ডে হাজির থেক। কিশোরের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে।
সায় জানাল জামান। হাত মেলাল দুজনে। মুসা নামতেই ছেড়ে দিল ট্যাক্সি।
বাড়িতে ঢুকল মুসা। বসার ঘরে টেলিভিশন দেখছেন বাবা-মা।
এত দেরি কেন, মুসা? ছেলেকে দেখেই বলে উঠলেন মিস্টার আমান। ভাবনায় ফেলে দিয়েছিলে। তোমার মা তো অস্থির হয়ে উঠেছে।
বাবা, কৈফিয়ত দিচ্ছে যেন মুসা, একটা কেসে কাজ করছি আমরা। হারানো একটা বেড়াল খুঁজতে গিয়েছিলাম। তারপর…
হয়েছে, আর ওসব শুনতে চাই না, কড়া গলায় বললেন মা। চেহারা আর কাপড়-চোপড়ের যা হাল করেছ! খানা-খন্দে পড়ে গিয়েছিলে নাকি? যাও, জলদি গোসল সেরে ঘুমাতে যাও।

যাচ্ছি, মা, আরও কিছু গালমন্দ শোনার আগেই ছুট লাগাল মুসা। সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল দোতলায়, নিজের ঘরে। জানালা খুলে দিয়ে চেয়ার টেনে বসল। অ্যান্টেনাটা জানালার বাইরে ঝুলিয়ে দিয়ে সুইচ টিপল ওয়াকি-টকির। সেকেণ্ড বলছি-সেকেণ্ড বলছি।...শুনতে পাচ্ছ, ফাস্ট?
প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জবাব এল, ফার্স্ট বলছি। তুমি কেমন আছ, মুসা? কি হয়েছিল?
দ্রুত সংক্ষেপে সব জানাল মুসা। কফিনটা কোথায় আছে, ঠিকানা বলতে পারবে না, তা জানাল সব শেষে।
ওপাশে একটা মুহূর্ত নীরবতা।
খামোকা দোষ দিয়ো না নিজেকে, বলল কিশোর। তোমার আর কিছু করার। ছিল না। কফিনটা খুঁজে বের করবই আমরা। সকালে আলোচনায় বসব। আরও কিছু নতুন তথ্য পাওয়া গেছে। রহস্যের সমাধান তো হয়ইনি, বরং আরও জটিল হয়েছে। তবে, জামান যে বলছে বেড়ালটা রা-অরকনের, তা ঠিক নয়। বেড়ালটা। সত্যিই মিসেস ভেরা চ্যানেলের। আর কোন কথা না বলে চ্যানেল অফ করে দিল ধীরে সুস্থে গোসল সেরে বিছানায় উঠল মুসা। নতুন আরেক সমস্যায় ফেলে দিয়েছে তাকে কিশোর। প্রচণ্ড কৌতূহল কিছুতেই চাপা দিতে পারছে না, অথচ কিছু করারও নেই। এত রাতে আর কিশোরের ওখানে যেতে পারবে না।
মিসেস চ্যানেলের বেড়ালের পা ছিল সাদা, পাওয়া গেছে যেটা, সেটার কালো। তাহলে ওটা ওই মহিলার বেড়াল হয় কি করে?

.

১৩.

হেডকোয়ার্টারে জড় হয়েছে ওরা। কৌতূহলে ফেটে পড়ার জোগাড় মুসা আর রবিনের। কিন্তু কিশোরের নির্লিপ্ত ভাবভঙ্গি দেখে বুঝতে পারছে, এত তাড়াতাড়ি মুখ খুলবে না গোয়েন্দাপ্রধান।
আন্দাজে কিছু বলা পছন্দ নয় আমার, বলল কিশোর। কাজেই এখন কিছু বলতে চাই না। জামান আসুক, তার সঙ্গে কথা বলে নিই আগে। যে কটা ব্যাপারে শিওর হয়েছি, সবার সামনেই বলব তখন।
দশটা বাজল। উঠে গিয়ে পেরিস্কোপে চোখ রাখল মুসা। একটা ট্যাক্সি এসে ইয়ার্ডের গেটে থেমেছে। ওটা থেকে বেরিয়ে এল জামান। তাড়াহুড়ো করে দুই সুড়ঙ্গ দিয়ে বেরিয়ে গেল মুসা। অতিথিকে নিয়ে আবার একই পথে ঢুকল হেডকোয়ার্টারে। জামান মর্কেল, তাকে গোপন জায়গায় আনা যায়, এক নাম্বার কথা। দুনাম্বার, সারাজীবন আমেরিকায় থাকছে না সে, লিবিয়ায় ফিরে যাবে শিগগিরই। কাজেই ফাস করে দেবে আস্তানার খবর, এমন ভয় নেই।

জামান, পরিচয় করিয়ে দিল মুসা, রবিন মিলফোর্ড, রেকর্ড রাখা আর গবেষণার দায়িত্বে আছে। আর এ হল গোয়েন্দাপ্রধান কিশোর পাশা।
তোমাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুব খুশি হলাম, একে একে কিশোর আর রবিনের সঙ্গে হাত মেলাল জামান।
এবার কাজের কথায় আসা যাক, বলল কিশোর। মুসা, গত বিকেলে হেডকোয়ার্টার থেকে বেরোনর পর যা ঘটেছে, সব খুলে বল। কিছুই বাদ দেবে না। রবিন, নোট নাও।
একে একে সব বলে গেল মুসা। শর্টহ্যাণ্ডে নোট নিল রবিন। কিশোর গতরাতেই শুনেছে সব কথা, যদিও সংক্ষেপে। কিন্তু সে এই প্রথম শুনল।
সেরেছে! মুসার কথা শেষ হতেই বলে উঠল রবিন। সত্যিই বলতে পারবে না স্টোর-হাউসটা কোথায়?
কি ছোটা ছুটেছি, বলে বোঝাতে পারব না, গতরাতের কথা মনে করে চোখ বড় বড় হয়ে গেছে মুসার। থেমে রাস্তার নাম দেখার সময় কোথায়! পালিয়েছি কোনমতে! ধরতে পারলে আর আস্ত রাখত না। তবে, ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ড থেকে বিশ ব্লক দূরে হবে জায়গাটা।
বিইশ ব্লক! আঁতকে উঠল রবিন। একেক সারিতে বিশটা করে ধরলেও চারশো ব্লক খুঁজতে হবে! তারমানে চারশো গলি। আর একেক ব্লকে যতটা বাড়ি, ততগুলো উপগলি! নাহ, অসম্ভব মনে হচ্ছে...
ভুলে যাচ্ছ কেন? বাধা দিয়ে বলল মুসা, স্টোর-হাউসের দরজায় চিহ্ন একে দিয়ে এসেছি।
ঠিক, সায় দিল কিশোর। তাতে কাজ অনেক সহজ হবে।
কিন্তু হাতে আমাদের সময় নেই বেশি, প্রতিবাদ করল রবিন। বড়জোর আজ বিকেল পর্যন্ত। এর মধ্যে খুঁজে বের করতে হবে বাড়িটা। কি করে সম্ভব?
একটা প্ল্যান এসেছে আমার মাথায়, বলল কিশোর। সেই মাফিক কাজ শুরু করে দিয়েছি। তবে তাতেও মোটামুটি সময় লাগবে। তার আগে এস, আলোচনা করে দেখি কি করে মমি-রহস্যের সমাধান করা যায়।
সত্যি রা-অরকনের মমি খুঁজে বের করতে পারবে তোমরা? এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না জামান। কোন উপায় জানা আছে? ফিরে পাব আমাদের পূর্বপুরুষকে?
নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে কাটতে ফিরে তাকাল কিশোর। এখনও জানি না। তবে একটু ভুল শুধরে দেয়া দরকার, জামান। রা-অরকন তোমাদের পূর্বপুরুষ নন, অন্তত এখন আমার তাই মনে হচ্ছে।
রেগে উঠল জামান। কিন্তু জ্যোতিষ যে বলল! ও ভাওতা দেয়নি! তাছাড়া, ও নিজে কিছু বলেনি। ধ্যানে বসেছিল। ওর মুখ দিয়ে কথা বলেছেন রা-অরকন।

যথেষ্ট ক্ষমতার অধিকারী ওই জ্যোতিষ। তার প্রমাণ পেয়েছি আমরা।
একটা কথা ঠিক, বলল কিশোর। তিন হাজার বছর আগে মিশর শাসন করেছিল লিবিয়ানরা।
এবং রা-অরকন ছিলেন লিবিয়ান, রাজার ছেলে, জোরাল কণ্ঠে ঘোষণা করল জামান। জ্যোতিষ তাই বলেছে।
তা বলেছে! কিন্তু কতখানি সত্যি, কে জানে! প্রফেসর বেনজামিনের মত অভিজ্ঞ লোকও জানেন না, রা-অরকন সত্যিই কে ছিলেন? ঠিক কত বছর আগে কবর দেয়া হয়েছিল তাঁকে। হতে পারে তিনি লিবিয়ান। কিন্তু তার অর্থ এই নয় তিনি তোমাদের পূর্বপুরুষ ছিলেনই।
কিন্তু জ্যোতিষ যে বলল! জেদ ধরে বসেছে যেন জামান। মস্ত বড় জ্যোতিষ ওই লোক, তার কথা মিথ্যে হতে পারে না।
কে বলল? বেড়ালটার ব্যাপারেই মিথ্যে বলেছে সে। অন্তত ঠিক কথা বলতে পারেনি।
তোমার কথা বুঝতে পারছি না! কটি করল জামান।
বেশ বুঝিয়ে দিচ্ছি, বলল কিশোর। জ্যোতিষ বলেছে, রা-অরকনের আত্মা তাঁর প্রিয় বিড়ালের রূপ ধরে, দেখা দেবে তোমাদেরকে। বেড়ালটা আবিসিনিয়ান, চোখের রঙে বৈসাদৃশ্য, সামনের দুপা কালো। এই তো?
হ্যাঁ, গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে বলল জামান। দেখা দিয়েছে ও। গত হপ্তার এক রাতে বৃহস্যজনকভাবে আমার ঘরে এসে হাজির হল রা-অরকনের আত্মা, বেড়ালের রূপ ধরে।
তাই, না? উঠল কিশোর। একটা জিনিস দেখাচ্ছি তোমাকে। ছোট্ট গবেষণাগারে গিয়ে ঢুকল সে। বেরিয়ে এল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। হাতে সেই বেড়ালটা।
রা-অকনা প্রায় চেঁচিয়ে উঠল জামান। আমার সম্মানিত পূর্বপুরুষ, বহাল তবিয়তেই আছে।
প্রফেসর কেনজামিনের বাড়িতে, একটা ঝোঁপ থেকে বেরিয়েছিল গতরাতে, বলল কিশোর। নিয়ে এসেছি আমরা। এবার দেখ। পকেট থেকে একটা রুমাল বের করল সে। বেড়ালটার সামনে এক পায়ের কালো অংশে জোরে জোরে ডলতে লাগল। সাদা রুমালে কালো দাগ লেগে যাচ্ছে। কালো পা হয়ে যাচ্ছে সাদা। বেড়ালটীর পায়ের ব্লড আসলেই সাদা। এটা মিসেস ভেরা চ্যানেলের স্ফিঙ্কস। কালো রঙ লাগিয়ে দেয়া হয়েছে পায়ে।
এতক্ষণে বুঝল মুসা, গতরাতে কেন এত নিশ্চিত ছিল কিশোর, ওটা মিসেস চ্যানেলের বেড়াল। খাইছে! এ-তো দেখছি ছদ্মবেশ!

কাঁপা কাঁপা হাত বাড়াল জামান। বেড়ালটার একটা পা ধরে দেখল। চোখে অবিশ্বাস। ছদ্মবেশ! তাহলে রা-অরকনের আত্ম নয় ওটা! কিন্তু জ্যোতিষ যে বলল—

মিছে কথা বলেছে, আবার গিয়ে আগের জায়গায় বসল কিশোর। মিসেস চ্যানেলের বেড়াল চুরি করে তার পায়ে রঙ করে তোমার ঘরে চালান দিয়েছিল। বিশ্বাস করাতে চেয়েছিল, রা-অরকনের আত্মার সাক্ষাৎ পেয়েছ।

কিন্তু কেন? চেঁচিয়ে উঠল জামান।

হ্যাঁ, কেন? প্রতিধ্বনি করল যেন মুসা।

জামানের বাবা আর ম্যানেজার জলিলকে বিশ্বাস করানর জন্যে। তাহলে প্রফেসর বেনজামিনের কাছ থেকে মমিটা ফেরত নেয়ার চেষ্টা করবেন তারা, জামানের দিকে তাকাল কিশোর। আমি শিওর, রা-অরকন তোমাদের পূর্বপুরুষ। নন।

রা-অরকন আমাদের পূর্বপুরুষ! কালো চোখের তারা জ্বলে উঠল জামানের। অনেক কষ্টে কান্না ঠেকিয়ে রেখেছে।

প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল কিশোর। ঠিক আছে, আগে মমিটা পেয়ে নিই। তারপর বোঝা যাবে সবই। আগে আমাদের জানা দরকার, কে চুরি করেছে রা-অরকনকে, এবং কেন? জামানের দিকে তাকাল। জামান, গতরাতে মুসাকে যা যা বলেছ, আবার বল। মানে, জ্যোতিষ তোমাদের বাড়িতে যাওয়ার পর যা ঘটেছে। রবিন নোট লিখে রাখুক।

বলতে শুরু করল জামান।

সেরেছে! মালীর কথা আসতেই চেঁচিয়ে উঠল রবিন। সারাক্ষণই জলিল থাকত প্রফেসরের বাড়ির আশপাশে। সেই তোমাকে ধরেছিল! তাই তো বলি, এত সহজে ছাড়া পেলে কি করে!

আমাকে তার হাত কামড়ে দিতে বলেছিল জলিল, দিয়েছি, গর্বিত কণ্ঠে বলল জামান। আমাদের ম্যানেজার খুবই চালাক লোক!

জামান, জিজ্ঞেস করল কিশোর। সমাধিকক্ষে অভিশাপ লেখা ছিল, জান তোমরা?

নিশ্চয়, জবাব দিল লিবিয়ান ছেলেটা। জ্যোতিষ সবই বলেছে। ও বলেছে, দেশে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত শান্তি পাবে না রা-অরকনের আত্মা।

রহস্যজনক কয়েকটা ঘটনা ঘটেছিল প্রফেসরের বাড়িতে, বলল কিশোর। আনুবিসের মূর্তি উপুড় হয়ে পড়েছিল। দেয়াল থেকে খসে পড়েছিল একটা মুখোশ। জলিলের কীর্তি, তাই না?

হ্যাঁ, হাসিতে ঝকঝকে দাঁত বেরিয়ে পড়ল জামানের। জানালার ঠিক বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল সে, হাতে একটা লম্বা শিক নিয়ে। দেয়ালে আর জানালার চৌকাঠের মাঝে আগেই একটা ছিদ্র করে রেখেছিল। সুযোগ বুঝে শিক ঢুকিয়ে ঠেলে ফেলে। দিয়েছে মূর্তিটা। শিক দিয়ে খোঁচা মেরে মুখোশও ফেলেছে। গেটের থামের খাঁজও সেই নষ্ট করেছে। এক সুযোগে জোরে বলটাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলেই সরে গেছে চোখের আড়ালে। প্রফেসরকে আতঙ্কিত করে ফেলতে চেয়েছে সে, তাহলে মমিটা দিয়ে দেবে, এজন্যে।

যা ভেবেছি, বলল কিশোর। তাহলে দেখা যাচ্ছে, প্রাচীন মমির অভিশাপ বাস্তবে কার্যকর করা মোটেই কঠিন কিছু না। ওভারঅল পরা মালী রোজই বাগানে কাজ করে, বিশ্বাসী প্রতিষ্ঠান থেকে এসেছে, তাকে সন্দেহ করবে কে?

সবই বুঝলাম, বলল মুসা। কিন্তু শেষতক মমিটা চুরি করল কে? জামান কসম খাচ্ছে, ওরা চুরি করেনি। তাহলে? মিসেস চ্যানেলের বেড়ালটাই বা চুরি করল কে? কে রেখে দিয়ে এসেছিল ওটাকে জামানের ঘরে? এগুলো খুব রহস্যজনক ব্যাপার। তাই মনে হচ্ছে আমার কাছে।

হ্যাঁ, মুসার কথায় সায় দিল রবিন। আমার কাছেও তাই মনে হচ্ছে। তাছাড়া, মমিটা কথা বলে কি করে? ও সম্পর্কে জামান কিছু জানে না। কোন ব্যাখ্যা দিতে পারবে?

এবারে একটা প্রশ্ন, প্রফেসরি ভঙ্গি কিশোরের জামান, চোর দুটোকে সত্যিই দেখেছিলে? যারা রা-অরকনকে চুরি করেছে?

হ্যাঁ, মাথা নাড়ল জামান। গত সন্ধ্যায় জলিল বলল তার হাত ব্যথা করছে। আমাকে গিয়ে চোখ রাখতে বলল প্রফেসরের বাড়ির ওপর। একটা ঝোপে লুকিয়ে। বসে আছি। বেড়ালটাও সঙ্গে আছে। ইচ্ছে করেই নিয়েছিলাম, তাতে সাহস পাচ্ছিলাম। একটা ট্রাক তখন দাঁড়িয়ে আছে চত্বরে। খানিক পরেই দুটো লোককে জাদুঘর থেকে বেরোতে দেখলাম। চাদরে পেঁচানো কি একটা ধরাধরি করে নিয়ে গিয়ে তুলল ট্রাকে। তখন বুঝতে পারিনি, মমিটা নিয়ে যাচ্ছে ওরা। ওরা চলে যাওয়ার পর জাদুঘরে ঢুকে দেখলাম, কফিনে নেই রা-অরকন।

আমরা প্রফেসর উইলসনের বাড়িতে যাওয়ার পর ঘটেছিল ব্যাপারটা, মন্তব্য করল রবিন।

অপেক্ষা করতে থাকলাম, বলে গেল জামান। ট্রাক নিয়ে চলে গেল চোর দুটো। খানিক পরেই হাজির হল মুসা। বেড়ালটা আমার পাশে নেই, খেয়াল করিনি প্রথমে। তারপর দেখলাম, ওটা মুসার হাতে তাকেও চোরদের একজন বলেই ধরে নিয়েছিলাম। রাগ দমন করতে পারিনি।—দুঃখিত, মুসা। না বুঝেই কাণ্ডটা করে ফেলেছিলাম।

তাতে বরং ভালই হয়েছে, বলল মুসা। তোমার সঙ্গে পরিচয় হল। রহস্যটা সমাধান করা অনেকখানি সহজ হবে।
হুম! নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর। পুরো ব্যাপারটা জটিল, তবে স্পষ্ট।
জটিল তো বটেই, একেবারে অস্পষ্ট ঘোষণা করল মুসা। ওই বৃহস্য শুধু মাথা খারাপ করতে বাকি রেখেছে আমার!
বেশ কিছু তথ্য পেয়ে গেছি, বাস্তবে ফিরে এসেছে যেন কিশোর। এবার ওগুলো খাপে খাপে বসাতে পারলেই ব্যস! রহস্য আর রহস্য থাকবে না।
নোট পড়ায় মন দিল রবিন। তথ্যগুলো খাপে খাপে বসানর চেষ্টা করছে। যতই চেষ্টা করল, আরও বেশি জট পাকিয়ে গেল সবকিছু। সমাধান করতে পারল না। অসহায় ভঙ্গিতে মুখ তুলে তাকাল কিশোরের দিকে।
প্রথমে, বলল কিশোর। কফিনটা খুঁজে বের করতে হবে আমাদের। রহস্য সমাধানের দোরগোড়ায় পৌঁছে যাব তাহলে। স্টোর-হাউসটা খুঁজে বের করে ওটার কাছে পিঠে লুকিয়ে থাকব। সন্ধ্যার পর এক সময় আসবে ওয়েব আর মেথু। কফিনটা ডেলিভারি দিতে নিয়ে যাবে। ওদেরকে অনুসরণ করব আমরা। কার কাছে নিয়ে যায়, দেখব। আসলে অপরাধীকে ধরে ফেলা কঠিন হবে না তখন। সমর্থনের আশায় তিনজনের দিকেই একবার করে তাকাল সে। ওরা নীরব। কিশোব্রের কথা। শেষ হয়নি বুঝে অপেক্ষা করছে। আবার বলল গোয়েন্দাপ্রধান, অপরাধীকে ধরতে পারলে মমি আর কফিনটা তো পেয়ে যাবই, সব রহস্যের সমাধান হয়ে যাবে।
চমৎকার! বন্ধুর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা মুসার কণ্ঠে। এত সহজ ব্যাপারটা মাথায়ই আসেনি।—কিন্তু স্টোর হাউসটা খুঁজে পাওয়া—মানে, খুঁজে পাব, কারণ চিহ্ন রেখে এসেছি কিন্তু তাতে তো সময় লাগবে। দিন পনেরোর আগে হবে না। অথচ হাতে সময় আছে মাত্র আট-নয় ঘণ্টা।
খুঁজতে যাচ্ছি না আমরা সেভাবে, মাথা নাড়ল কিশোর। লাভও হবে না গিয়ে খুঁজে। অন্য প্ল্যান করেছি, বলেছি না। একটা সুন্দর নাম দিয়েছি ব্যবস্থাটার ভূত থেকে ভূতে।
হাঁ হয়ে গেল অন্য তিনজন। কিছুই বুঝতে পারছে না।
খুব সহজ একটা ব্যাপার, হেসে বলল কিশোর। অথচ খুব কার্যকন্দ্র হবে। আমার বিশ্বাস। খবর জোগাড়ের জন্যে শহরের প্রায় সব কজন ছেলেমেয়েকে লাগিয়ে দেয়া যায় এতে। কারোই কোন কষ্ট হবে না, অথচ খবর ঠিকই এসে যাবে। আমাদের হাতে। ছোট একটা পুরস্কারের ব্যবস্থা রেখেছি শুধু।
কিশোরের কথা আরও হেঁয়ালিপূর্ণ মনে হল ওদের কাছে। চোখ বড় বড় করে চেয়ে আছে।

সকালে, বলল কিশোর। আমার পাঁচজন বন্ধুকে ফোন করেছি। বলেছি, লস অ্যাঞ্জেলেসের শহরতলীতে একটা স্টোর-হাউসের দরজায় কিছু নীল প্রশ্নবোধক আঁকা আছে। কথাটা ওদের পাঁচজন বন্ধুকে জানাতে বলেছি। কজন হল? পঁচিশ জন। ওই পঁচিশ জন আবার তাদের পাঁচজন করে বন্ধুকে জানাবে ফোন করে। তার মানে? একশো পঁচিশ। ওই একশো পঁচিশজন আবার তাদের পাঁচজন বন্ধুকে জানাবে। এভাবে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ছড়িয়ে পড়বে খবরটা। হাজারে হাজারে। ছেলেমেয়ে একশো ডলার পুরস্কারের লোভে খুঁজতে থাকবে নীল প্রশ্নবোধক। কাজ কতখানি হালকা হয়ে গেল আমাদের সময় কতখানি বাঁচল? এখন শুধু অপেক্ষার পালা। যে-কোন মুহূর্তে এসে যাবে খুব্বর।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল মুসা। ছুটে গিয়ে চেয়ারসুদ্ধ জড়িয়ে ধরল বন্ধুকে। কসম খোদার, কিশোর পাশা! তুমি–তুমি সত্যিই একটা জিনিয়াস!

ঠিক এই সময় বাজল টেলিফোন। আস্তে করে মুসার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে রিসিভারের দিকে হাত বাড়াল কিশোর। কানে ঠেকাল রিসিভার। হ্যাল্লো বলেই একটা সুইচ টিপে দিল। জ্যান্ত হয়ে উঠল স্পীকার।

কিশোরের এক বন্ধু। জানাল, ভূত থেকে ভূতে ব্যবস্থা চালু হয়ে গেছে। তবে বিকেলের আগে খবর পাওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছে না, বলল ছেলেটা। তারপর কেটে দিল কানেকশন।

খামোকা বসে না থেকে, প্রফেসর বেনজামিনের ওখান থেকে আরেকবার ঘুরে আসা যাক, প্রস্তাব রাখল কিশোর।

কিন্তু মেরিচাচী যেতে দেবেন বলে মনে হয় না, মাথা নাড়ল মুসা। আসার সময় শুনে এলাম বোরিস আর রোভারের সঙ্গে কথা বলছেন। অনেক কাজ ইয়ার্ডে আমরা এখান থেকে বেরোলেই আটকাবেন।

ঠিকই বলেছ, সায় দিল কিশোর। তার চেয়ে বরং ফোন করি প্রফেসরকে জামান, তোমার আর খামোকা বসে থাকার দরকার নেই। রবিন, ওকে এগিয়ে দিয়ে এস, প্লীজ।

যাচ্ছি, উঠে পড়ল রবিন।

জামানও উঠল। জলিলকে তোমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া দরকার, কিশোর পাশা। একটা ভুল ভাঙবে। তার ধারণা, আমেরিকান ছেলেরা সব পাজী। কাজকর্ম কিছু করে না। খালি অকাজের তালে থাকে, আর বাপের পয়সা ধ্বংস করে।

আমি আমেরিকান নই, বলল কিশোর পাশা। বাঙালি। তবে আমেরিকান ছেলেরা সবাই খারাপ নয়। জলিলের সত্যিই এটা ভুল ধারণা। এই যে আমাদের রবিন, ও কি খারাপ?

হ্যাঁ, এটাই বোঝানো দরকার ওকে। আচ্ছা, চলি। রবিনের পেছনে পেছনে দুই সুড়ঙ্গের দিকে এগিয়ে গেল জামান।
জামান, পেছন থেকে ডাকল কিশোর। গতরাতে যা যা ঘটেছে, সব নিশ্চয় বলনি জলিলকে?
রা-অরকনকে খুঁজতে তোমার সাহায্য চেয়েছি, এটাই শুধু বলেছি, ফিরে চেয়ে বলল জামান। বিশেষ কেয়ার করেনি। বলল, বাচ্চা-কাচ্চাদের এর মাঝে টেনে আনা বোকামি।
আর কিছু না বলে ভাল করেছ, বলল কিশোর। কিছু বলবেও না বড়দেরকে বেশি বিশ্বাস কোরো না। নিজেদেরকে সবজান্তা ভাবে, ছোটদের ব্যাপারে সব সময় বাগড়া দেয়। এবং অনেক সময়ই ঠিক কাজ করে না। তাছাড়া গোয়েন্দার কাজে গোপনীয়তা একান্ত দরকার। কাউকে কিছু বলবে না, ঠিক আছে?
মাথা কাত করল জামান। হ্যাঁ, আবার কখন দেখা হচ্ছে আমাদের?
আজ বিকেল ছটায় চলে এস, বলল কিশোর। ততক্ষণে স্টোর-হাউসের হদিস হয়ত পেয়ে যাব আমরা।
ঠিক আছে! ট্যাক্সি নিয়ে আসব। জলিল নাকি আজ খুব ব্যস্ত থাকবে কয়েকজন কার্পেট ব্যবসায়ীর সঙ্গে কথা বলবে। সে আমাকে বাধা দিতে পারবে না।
রবিনের সঙ্গে বেরিয়ে গেল জামান।
খুব ভাল ছেলে, বলল মুসা। কিন্তু তোমার ব্যাপারটা কি বল তো, কিশোর? কি যেন ভাবিয়ে তুলেছে তোমাকে! রা-অরকনকে কে চুরি করেছে, জান নাকি?
সন্দেহ করছি একজনকে, বলল কিশোর। মিসেস চ্যানেলের বেড়ালটার খবর ছবিসহ অনেক ম্যাগাজিন আর পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল, না?
হয়েছিল, বলল মুসা। কয়েকটা ছবি দেখিয়েছেনও আমাকে মিসেস চ্যানেল।
ধর, ওরকম একটা বেড়াল দরকার কারও। স্ফিঙ্কসের কথা সহজেই জানতে পারবে সে। বেড়ালটা খুব ভদ্র, ওটাকে যে কেউ ধরে নিয়ে যেতে পারে। তারপর পায়ে কালো রঙ করে নেয়াটা কিছুই না। এখন কথা হচ্ছে, রা-অরকনকে কার এত দরকার হল? জামানের ঘরে বেড়ালটাকে ঢুকিয়ে দেয়া কার পক্ষে সহজ? সমাধিকক্ষে লেখা অভিশাপের কথা কে বেশি জানে? এবং কে প্রফেসর বেনজামিনের কাছ থেকে মমিটা নিয়ে যেতে চায়?
এক মুহূর্ত ভাবল মুসা। মালী, মানে, জলিল। জামানদের ম্যানেজার।
ঠিক, কিশোর বলল। মমিটাকে রাখার জন্যে কফিনটাও তারই বেশি দরকার। তাই না?
নিশ্চয়ই। প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মুসা। কিন্তু জামান কসম খেয়ে বলেছে, জলিল এ-ব্যাপারে কিছু জানে না।

জামানের তাই ধারণা। কিন্তু বড়রা সব সময় সব কথা ছোটদেরকে বলে না, এটা তো ভাল করেই জান। আরও একটা কারণ হতে পারে, গোপন কোন পরিকল্পনা থাকতে পারে জলিলের। হয়ত মমিটা চুরি করে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে। রেখেছে। পরে জামানের বাবাকে বলবে, অনেক টাকা দিয়ে ছাড়িয়ে এনেছে। টাকাটা সে নিজে মেরে দেবে। মমিটা ফেরত পাওয়ার জন্যে যে-কোন মূল্য দিতে রাজি জামানের বাবা। সুযোগটা ছাড়বে কেন ম্যানেজার?

ইয়াল্লা! চেঁচিয়ে উঠল মুসা। ঠিক ধরেছ! সে তাই করবে! আরবী জানে জলিল। প্রাচীন আরবী জানাও তার পক্ষে সহজ। দরজার বাইরে লুকিয়ে থেকে ভেন্ট্রিলোকুইজম ব্যবহার করেছে, মনে হয়েছে মমিটাই কথা বলেছে!

মাথা নাড়ল কিশোর। কিন্তু, আগে প্রমাণ দরকার। তার আগে জামানকে কিছু বলা যাবে না। রেগে চার্জ করে বসতে পারে জলিলকে। হুশিয়ার হয়ে যাবে ম্যানেজার। তখন তাকে বাগে পাওয়া খুব কঠিন হবে।

ঠিক, একমত হল মুসা। কিশোর, এখন কি করব? সারাটা দিন পড়ে আছে। স্টোর-হাউসের খবর কখন আসবে কে জানে! মেরিচাচীর সামনেও পড়তে চাই না। আজ ইয়ার্ডের কাজ করতে মোটেই ভাল্লাগবে না।

এবং সেজন্যেই এখন বেরনো যাবে না এখান থেকে, টেলিফোনের দিকে হাত বাড়াল কিশোর। প্রফেসরকে পাওয়া যায় কিনা দেখি। হুপারের খোঁজ নেয়া দরকার।

পাওয়া গেল প্রফেসরকে। হাসপাতাল থেকে ফিরে এসেছে হুপার, জানালেন। তিনি। প্রচণ্ড মানসিক আঘাত পেয়েছিল বেচারা। অদ্ভুত এক দৃশ্য নাকি দেখেছে গতরাতে। ঝোঁপ থেকে নাকি বেরিয়ে এসেছিল শেয়াল-দেবতা আনুবিস। দুর্বোধ্য ভাষায় চেঁচিয়ে উঠেছিল। আতঙ্কেই বেহুশ হয়ে গেল হুপার। তার ধারণা, তারপর রা-অরকনকে চুরি করে নিয়ে গেছে আনুবিস।

চাওয়া-চাওয়ি করল কিশোর আর মুসা।

কিন্তু আমরা জানি, ওয়েব আর মেথু চুরি করেছে মমিটা! ফিসফিস করে বলল মুসা।

প্রফেসর, ফোনে বলল কিশোর। আমার মনে হয়, রবারের মুখোশ পরে। এসেছিল কেউ। ভয় দেখিয়েছে হুপারকে। আনুবিসের মুখোশ পাওয়া যায় বাজারে। অবিকল ওরকম না হলেও শেয়ালের মুখ যে-কোন খেলনার দোকানে পাওয়া যায়।

তা ঠিক, স্পীকারে শোনা গেল প্রফেসরের কণ্ঠ। আমারও তাই ধারণা। তো, কি মনে হয়? মমিটা আবার ফিরে পাওয়া যাবে? রহস্যটা কি, কিছু বুঝতে পেরেছ? জলিল ব্যাটাকে সন্দেহ-টন্দেহ হয়?

কিছু কিছু ব্যাপার আন্দাজ করেছি, স্যার, কিন্তু কোন প্রমাণ পাইনি এখনও। আর, আজ বিকেলে কফিনটা উদ্ধার করতে যাব, আশা করছি। তেমন কিছু জানতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে জানাব। রাখি এখন। রিসিভার নামিয়ে রাখল কিশোর। ট্রেলারের ছাতের দিকে চেয়ে গভীর ভাবনায় ডুবে গেল।
অপেক্ষা করছে মুসা। এক সময় উসখুস করতে লাগল। শেষে আর থাকতে না। পেরে জিজ্ঞেস করে ফেলল, কি ভাবছ?
ভাবছি, মুখ নামাল কিলোর। প্রফেসর বেনজামিন বলেছেন অভিনেতা ছিল হুপার। থিয়েটারে অভিনয় করেছে।
তাতে কি?
বেহুশের অভিনয় সহজেই করতে পারে একজন অভিনেতা, বলল কিশোর। রঙ্গ-নাটকে ভেন্ট্রিলোকুইস্টের কাজ করেছে কিনা, তাই বা কে জানে?
যদি করে থাকে?
অনুমান কর।
হুপারকে অপরাধী ভাবছ? ও একা? নাকি জলিলের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে? নাকি অন্য কারও সঙ্গে? আসলে কি ভাবছ তুমি, কিশোর?
সময়েই সব জানা যাবে, কেমন রহস্যময় শোনাল কিশোরের কথা।
এরপর সারাটা দিনে রেগে গুম হয়ে থাকল মুসা। আর একটা কথা বলল না কিশোর। তার কোন কথার জবাবও দিল না। একমনে কি ভাবল সারাক্ষণ।
বিকেল। ইয়ার্ডের পিক-আপটা খারাপ রাস্তা ধরে ঝাঁকুনি খেতে খেতে ছুটে চলেছে লস অ্যাঞ্জেলেসের শহরতলীর দিকে। স্টিয়ারিং ধরেছে রোভার। মেরিচাচীকে অনেক অনুরোধ করে অনুমতি আদায় করেছে কিশোর।
ছটার অনেক আগেই এসে হাজির হয়েছে জামান। এখন বসে আছে রোভার আর কিশোরের পাশে। ট্রাকের পেছনে ভাঁজ করে রাখা ক্যানভাসের ওপর বসেছে। রবিন আর মুসা। সারাক্ষণ তর্ক করছে ওরা, কে অপরাধী তা নিয়ে। একবার বলছে জলিল, একবার হুপার। দুবার এক মত হয়েছে, দুবারই মত পাল্টেছে আবার। এখন আবার শুরু করে দিয়েছে তর্ক। কিছুতেই মনস্থির করতে পারছে না, কাকে অপরাধী বলবে। ম্যানেজার আর খানসামা, দুজনকেই অপরাধী মনে হচ্ছে তাদের কাছে।
শহরতলীর একটা প্রান্তে পৌঁছে থেমে গেল ট্রাক। পাশ দিয়ে বাইরে উঁকি দিল। মুসা আর রবিন। পুরানো একটা থিয়েটার বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এক সময় বড়সড় রঙচঙে সাইনবোর্ড ছিল, এখনও রয়েছে, তবে আগের সেই জৌলুস নেই। থিয়েটার শব্দটা কোনমতে পড়া যায়। সদর দরজায় একটা নোটিশ: বন্ধ। ঢোকার চেষ্টা করবেন না কেউ।

জামান আর কিশোরকে বেরিয়ে আসতে দেখে লাফ দিয়ে নামল মুসা আর রবিন।
বিল্ডিংটা চিনতে পারছ? মুসাকে জিজ্ঞেস করল কিশোর।
সামনেটা দেখিনি গতরাতে, মুসার কণ্ঠে সন্দেহ। তবে উঁচু যেন একটু বেশিই মনে হচ্ছে!
এই বিল্ডিংটা নয়! মাথা নাড়ল জামান।
কিন্তু আমাদের ভূত এই ঠিকানাই তো দিয়েছে, হাতের কাগজের টুকরোটা দেখছে কিশোর। টেলিফোনে ঠিকানা জানিয়েছিল একটা ছেলে, লিখে নিয়েছে। এক আট তিন নয় দুই, ক্যামেট স্ট্রীট।—চল, পেছন দিকটা দেখি। দরজায়। প্রশ্নবোধক থাকলে আর কোন সন্দেহ নেই।
বাড়িটার পেছনে চলে এল ওরা। বড় একটা দরজা, ভেতরে নিশ্চয় স্টোররুম। দরজায় নীল রঙে আঁকা কয়েকটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন।
ওই যে, সেকেণ্ড, তোমার চিহ্ন, আঙুল তুলে দেখাল কিশোর। জায়গা এটাই।
সন্দেহ হচ্ছে! ভুরু কুঁচকে আছে মুসা। ওই চিহ্ন আমি আঁকিনি! জামান, তোমার কি মনে হয়?
আমারও সন্দেহ হচ্ছে, বলল জামান। তবে অন্ধকার ছিল তখন। ভালমত দেখিনি। হয়ত এই বাড়িই।
তাছাড়া উত্তেজিত ছিলে তোমরা, তাড়াহুড়ো ছিল, বলল কিশোর। ভালমত দেখতে পাবার কথাও নয়। এই যে দরজাটা, এটা দিয়ে সহজেই ট্রাক ঢুকতে পারবে। তলায় কয়েক ইঞ্চি ফাঁকও রয়েছে। চল, উঁকি দিয়ে দেখি ভেতরে। কফিনটা চোখে পড়লেই সব সন্দেহের অবসান হয়ে যাবে।
দরজার কাছে এগিয়ে গেল ওরা। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল মুসা। মাথা নুইয়ে উঁকি দিল নিচ দিয়ে। ঠিক এই সময় শব্দ তুলে উঠে গেল দরজা। দেখা গেল তিনটে মুখ। হাসিতে উজ্জ্বল।
এই যে, কিশোর হোমস আর তার চেলাচামুণ্ডারা এসে গেছেন, খুশিতে দাঁত বেরিয়ে পড়েছে টেরিয়ার ডয়েলের।
সূত্র খুঁজছ, শার্লক হোমস? বলল টেরিয়ারের এক সঙ্গী। দাঁত বের করে হাসছে।
প্রশ্নবোধক চিহ্ন খুঁজছ তো? বলল তৃতীয় ছেলেটা। প্রচুর দেখতে পাবে। শহরতলীর যেখানে খুজবে সেখানেই পাবে। প্রচুর চিহ্ন রয়েছে।
আমার মনে হয়, আর অপেক্ষা করে লাভ নেই, সঙ্গীদেরকে বলল টেরিয়ার। আমাদের যাওয়াই উচিত। মিস্টার গর্দর্ভ হোমস আর তার ছাগল-চেলারা দায়িত্ব। নিয়েছে। পরিস্থিতি আয়ত্তে নিয়ে আসতে পারবে শিগগিরই।

মুঠো পাকিয়ে এগোতে গেল মুসা, খপ করে তার হাত চেপে ধরল কিশোর। ছেড়ে দাও। ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করবে নাকি? শুঁটকি আরও শুঁটকি হয়ে ফিরে এসেছে। গন্ধে কাক ভিড় জমাবে। ওয়াক, থুহ!
জ্বলে উঠল টেরিয়ারের চোখ। পা বাড়াতে গিয়েও মুসার পেশীবহুল বাহুর দিকে চেয়ে থেমে গেল। ফিরে তাকাল দুই সঙ্গীর দিকে, ওদের সাহায্য পাবে কিনা বোঝার চেষ্টা করছে। কিন্তু নিরাশ হল। রাস্তার পাশে পার্ক করে রাখা নীল স্পোর্টস কারটার দিকে তাকাচ্ছে ওরা ঘনঘন। ছুটে গিয়ে ওতে উঠে পড়ার তালে আছে। মুসা আমানের সঙ্গে লগতে রাজি নয় কেউই।
তৈরি থেক, শার্লক হোমসেরা, কর্কশ গলায় বলল টেরিয়ার। আবার দেখা করব আমি তোমাদের সঙ্গে। ছুটে বেরিয়ে গেল সে। পেছনে ছুটল তার দুই সঙ্গী।
গাড়ি নিয়ে চলে গেল টেরিয়ার আর তার সঙ্গীরা।
প্রচুর চিহ্ন রয়েছে, টেরিয়ারের সঙ্গীর এই কথাটার মানে প্রথম বুঝতে পারল রবিন। আঙুল তুলে পাশের বাড়ির একটা দরজা দেখিয়ে বলল, দেখ দেখ, নীল প্রশ্নবোধক! তার মানে বন্ধ দরজা এদিকে যে কটা পেয়েছে, সবগুলোতে চিহ্ন এঁকেছে ওরা!
রাগে লাল হয়ে উঠেছে কিশোরের মুখ। শুঁটকি আর তার চেলাদের কাজ! নিশ্চয় কোন একটা ছেলে শুঁটকির কাছেও ফোন করে বলেছিল আমরা কি খুঁজছি। ব্যস, এখানে এসে তৈরি হয়ে বসে ছিল টেরি। তার কোন একটা চেলা ফোনে আমাদেরকে ঠিকানা দিয়েছে এ-বাড়িটার।
খুব একখান গোল দিয়ে গেল আমাদেরকে, হারামজাদারা! গোঁ গোঁ করে উঠল মুসা। খামোকা আটকেছ আমাকে। হাতের ঝাল মিটিয়ে নিতাম! পিটিয়ে তক্তা করে ফেলা উচিত ব্যাটাকে—!
পরিস্থিতি খুব জটিল করে দিয়ে গেছে টেরিয়ার, এতে কোন সন্দেহ নেই। নীল প্রশ্নবোধকের আর কোন মূল্য নেই এ-মুহূর্তে। কোন্ বাড়িটায় যে রয়েছে কফিন, চিহ্ন দেখে বোঝার আর কোন উপায় নেই।
কি করব আমরা এখন? হতাশ কণ্ঠে বলল রবিন। হেডকোয়ার্টারে ফিরে যাব?
নিশ্চয় না! জোর দিয়ে বলল কিশোর। প্রথমে দেখব, কতগুলো দরজায় প্রশ্নবোধক এঁকেছে শুঁটকি আর চেলারা। তারপর কি করা যায়, পরে বিবেচনা করব। তবে, ভূত-থেকে-ভূতে ব্যবস্থার ভাল দিক বেশি হলেও দুর্বলতা কিছু রয়েছে। এটা নিয়ে ভাবতে হবে, পরে।
ছড়িয়ে পড়ে খুঁজতে শুরু করল ওরা। বেশ কয়েকটা ব্লকে পাওয়া গেল প্রশ্নবোধক। হতাশ হয়ে ট্রাকের কাছে ফিরে এল ওরা, এরপর কি করবে তা নিয়ে ভাবতে বসল।

গাড়ি নিয়ে ঘুরব, বলল কিশোর! হয়ত জামান কিংবা মুসার চোখে পরিচিত কিছু পড়েও যেতে পারে। এতখানি এসে হাল ছেড়ে দেব না কিছুতেই। এটাই আমাদের শেষ সুযোগ। ওয়েব আর মেধু কফিনটা একবার এ-এলাকা থেকে বের করে নিয়ে গেলে, মমি-রহস্য সমাধানের উপায়-আর থাকবে না।
ভারি মন নিয়ে ট্রাকে চড়ল ওরা। ক্যামেট স্ট্রীট ধরে খুব ধীরে এগোল। রোভার।
মার খেয়ে গেলাম আমরা, বিষণ্ন মুসা। সেটা স্বীকার করে নিলেই তো পারি?
পাগল হয়েছ? গম্ভীর কিশোর। তাহলে শুঁটকি আমাদেরকে আর টিকতে দেবে না রকি বীচে। যেখানে যাব, পেছন থেকে হাততালি দিয়ে হাসবে—ওই যে, একটা গীর্জা। গতরাতে ওটা চোখে পড়েছিল?
নাহ্! মাথা নাড়ল মুসা। তাছাড়া যেটা দিয়ে চলেছি, রাস্তাও এটা নয়। আরও অনেক সরু ছিল, এক্কেবারে এঁদো গলি!
অন্য জায়গায় চেষ্টা করতে হবে তাহলে। রোভার, ডানে ঘুরুন, প্লীজ।
হোকে (ওকে), বলল বিশালদেহী ব্যাভারিয়ান। শাঁই করে ডানে মোড় ঘোরাল ট্রাক। সরু একটা গলি পথে এসে পড়ল।
বড়জোর তিনটা ব্লক পেরিয়েছে ট্রাক, হঠাৎ কিশোরের আস্তিন খামচে ধরল। মুসা। ওই যে, আইসক্রীমের দোকানটা, মনে হচ্ছে গত রাতে ওটার পাশ দিয়ে। ছুটেছিলাম। আঙুল তুলে দেখাল সে কোন-আইসক্রীম চেহারার ছোট বিল্ডিংটা।
রোভার, থামুন, বলল কিশোর।
থেমে গেল ট্রাক। দ্রুত নেমে পড়ল চার কিশোর। আইসক্রীম স্ট্যাণ্ডটার সামনের চত্বরে এসে দাঁড়াল।
গতরাতে এটা দেখেছিলে? মনে পড়ে? জামানকে জিজ্ঞেস করল মুসা।
হ্যাঁ, ওপরে-নিচে মাথা দোলাল জামান। আমি ভেবেছিলাম, মন্দির। অন্য বাড়িগুলোর চেয়ে চেহারা একেবারে আলাদা।
রবিন হাসল, ক্যালিফোর্নিয়ায় অনেক আজব জিনিসই দেখতে পাবে। কমলা আকৃতির কোন বিল্ডিং দেখলে, বুঝে নেবে ওখানে কমলার রস পাওয়া যায়। এই যে মন্দিরের চেহারা, ওরকম দেখলে বুঝতে হবে আইসক্রীম। আরও অনেক খাবার আছে, যেগুলোর আকৃতির সঙ্গে মিল রেখে তৈরি হয় বিল্ডিংগুলো। বিজ্ঞাপনও হয়, লোকের বুঝতেও সুবিধে হয়, ওটা কিসের দোকান।
আরও কিছু কথা জানার কৌতূহল হচ্ছিল জামানের, কিন্তু সময় নেই এখন।
আইসক্রীমের দোকানটা শুধু চিনল জামান আর মুসা, আশপাশের আর কিছু চিনতে পারল না। অন্ধকারে, উত্তেজনায় খেয়াল করেনি।
দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল কিশোর। রবিন, তুমি আর জামান এখানে থাক। ওয়াকি টকি তৈরি রাখ। দরকার হলেই যাতে মেসেজ আদান-প্রদান করতে পার। মুসা, এই

গলি, আর আশপাশের সবকটা কানা গলি খোঁজ। চিহ্ন দেখতে পেলেই রেডিওতে জানাবে। আমি যাচ্ছি উল্টোদিকে। খুঁজব। পেয়েও যেতে পারি ঠিক বাড়িটা। পুরো শহরতলীতে চিহ্ন আঁকতে পারেনি পুঁটকি, সেটা সম্ভবও নয়।
ঠিক আছে, দেখি চেষ্টা করে, মাথা কাত করল মুসা।
রোভার এখানেই ট্রাক রাখবে। এটাকেই ঘাঁটি ধরে নিতে হবে আমাদের। যে-ই ফিরে আসি, এখানে চলে আসব। সব সময় যোগাযোগ রাখব ওয়াকি-টকির মাধ্যমে। ঠিক আছে?
সায় জানাল সবাই।
সন্ধ্যা হয়ে গেছে। শিগগিরই অন্ধকার নামবে। দুই গলি ধরে দুদিকে রওনা হয়ে গেল মুসা আর কিশোর। ট্রাকের কাছে দাঁড়িয়ে রইল রবিন আর জামান।
কফিনটা যদি খুঁজে না পায় ওরা? বলল জামান। তাহলে মমিটাও পাবে না। চিরদিনের জন্যে হারাব আমরা রা-অরকনকে। কি করে এই দুঃসংবাদ জানাব গিয়ে বাবাকে? না আমি বলতে পারব, না জলিল!
কিশোরের কথা এখনও বিশ্বাস হয়নি জামানের, এখনও বিশ্বাস করছে রা অরকন তাদের পূর্বপুরুষ। ব্যাপারটা নিয়ে চাপাচাপি করল না রবিন। জিজ্ঞেস করল, জলিল কোথায়?
বাসায়ই বোধহয়, জবাব দিল জামান। বলল, ব্যবসার কাজে নাকি ব্যস্ত থাকবে আজ। কয়েকজন কার্পেট-ব্যবসায়ী আসবে। জরুরি আলোচনা আছে তাদের সঙ্গে।
কিসের কার্পেট-ব্যবসায়ী? দুই চোর মেথু আর ওয়েবের সঙ্গে দেখা করবে আসলে জলিল, ধরেই নিল রবিন। এমনিতেই বিষণ্ন হয়ে আছে জামান। কথাটা জানিয়ে তাকে আরও দুঃখ দিতে ইচ্ছে হল না তার।
রবিন আর জামান কথা বলছে, ততক্ষণে কয়েকটা ব্লক দেখা হয়ে গেছে। কিশোর আর মুসার। পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছে ওয়াকি-টকির মাধ্যমে। ব্যর্থতার কথা একটু পর পরই জানাচ্ছে একে অন্যকে। ইতিমধ্যে অন্ধকার হয়ে গেছে। চকের দাগ দেখাই যাবে না আর এখন।
পারলে আরও একটা গলি দেখ, সেকেণ্ড, হতাশ কণ্ঠে বলল কিশোর। তারপর ফিরে এস ট্রাকের কাছে। আলোচনা করে ঠিক করব, এরপর কি করা যায়!
বুঝেছি, খুদে স্পীকারে জবাব এল মুসার। আউট।
পরের গলিটা ধরে এগিয়ে চলল কিশোর। এর আগে যে কয়েকটা গুলি দেখেছে, ওটাও ওগুলোর চেয়ে আলাদা নয়। একই রকম দেখতে। ওই রকমই পুরানো ধাঁচের বাড়ি, দোকানপাট-বেশির ভাগই বন্ধ। ব্যবসা নিশ্চয় এদিকে ভাল জমে না। তাই সন্ধ্যার আগেই দোকান বন্ধ করে দিয়ে বাড়ি চলে গেছে। দোকানদাররা।

গলির প্রায় শেষ মাথায় বড় একটা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল কিশোর। বড় একটা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটা ট্রাক। পুরানো। নীল শরীর, জায়গায় জায়গায় চটে গেছে রঙ। দরজাটা তুলে দিয়েছে একজন লোক। কাজেই ওটাতে প্রশ্নবোধক আঁকা আছে কিনা, জানার উপায় নেই। দাঁড়িয়ে থেকেও লাভ নেই। ঘুরতে যাবে ঠিক এই সময় কানে এল কথা।
মেথু, ট্রাক ঢোকাও ভেতরে, বলল একজন।
ঢোকাচ্ছি। ড্রাইভিং সিটে বসা লোকটার গলা শোনা গেল, দরজার কাছ থেকে সর। এই, ওয়েব-হা, সর, আরও।
থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে আবার কিশোর। মেথু! ওয়েব! ট্রাক। বড় দরজা, বড় বাড়ি। আর কোন সন্দেহ নেই। এ-বাড়িটাই খুঁজছে ওরা।

.

ছুটে ট্রাকের পাশে চলে এল কিশোর। ধীরে ধীরে ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে ট্রাক। হেডলাইট জ্বালেনি। গাঢ় অন্ধকার।
বাঁ পাশে রয়েছে ওয়েব। ট্রাকের ডান থেকে এগোল কিশোর। দরজার ফ্রেম আর ট্রাকের বডির মাঝে মাত্র দুফুট ফাঁক। ওই ফাঁক দিয়েই ভেতরে ঢুকে পড়ল
পুরো শরীরটা ভেতরে ঢুকে গেল ট্রাকের, থেমে দাঁড়াল। কিশোর দাঁড়িয়ে পড়ল ওটার পাশে, অন্ধকারে।
দরজা নামিয়ে দিচ্ছি আমি, শোনা গেল ওয়েবের গলা! তারপর হেডলাইট জ্বালবে। নইলে অন্ধকারে কিছু দেখতে পাব না।
ট্রাকের পাশে উবু হয়ে আছে কিশোর। দ্রুত চিন্তা চলছে মাথায়। কিছু দেখতে পাচ্ছে না। আলো জ্বলে ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষাও করতে পারবে না। তাহলে চোরদের চোখে পড়ে যাবে। এর আগেই লুকিয়ে পড়তে হবে কোথাও। কোথায়?
বেশি ভাবনা-চিন্তার সময় নেই। লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল সে মেঝেতে! গড়িয়ে। চলে এল ট্রাকের তলায়। দরজা নামানর প্রচণ্ড শব্দে ঢাকা পড়ে গেল তার গোনর মৃদু আওয়াজ। মুহূর্ত পরেই জ্বলে উঠল হেডলাইট। আলোকিত হয়ে উঠল ঘরের। অনেকখানি। দৃষ্টি সীমাবদ্ধ হয়ে আছে কিশোরের। তেমন কিছু দেখতে পাচ্ছে না। তবে পুরানো আমলের গাড়িটার চাকা আর কফিনের ওপরের ক্যানভাস ঠিকই চোখে। পড়ল।
ঠিক জায়গাতেই এসে পড়েছে কিশোর। সাহায্য দরকার, সঙ্গে রেডিও আছে, কিন্তু সাহায্য চাইবার উপায় নেই। কথা বললেই শুনে ফেলবে চোরেরা।
চুপচাপ পড়ে আছে কিশোর। হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে যেন বুকের ভেতর। ভয় হচ্ছে, হৃৎপিণ্ডের শব্দ না আবার শুনে ফেলে দুই চোর।

ট্রাক থেকে নেমে এল মেথু। মাত্র ছয় ফুট দূরে দুই জোড়া পা দেখতে পাচ্ছে। কিশোর।
মক্কেল ব্যাটা রাজি হল তাহলে! হাসল মেথু। জানতাম, হবে। কফিনটা, পাওয়ার জন্যে যা ব্যস্ত হয়ে উঠেছে! কিন্তু এই বাক্স দিয়ে কি করবে ব্যাটা?
ওই ব্যাটাই জানে! বলল ওয়েব। জান তো, কোথায় ডেলিভারি দিতে হবে? হলিউডের বাইরে। একটা খালি গ্যারেজ দেখিয়ে দিয়েছে। ওর ভেতরে ঢুকে যেতে হবে ট্রাক নিয়ে।
তাই নাকি?
আরও আছে। ওর ধারণা, আমাদেরকে অনুসরণ করা হবে। ভয় পাচ্ছে। খুব সতর্ক থাকতে বলেছে আমাদেরকে। যদি দেখে অনুসরণ করা হচ্ছে, তাহলে যেন মাল ডেলিভারি না দিই, এ কথাও বলে দিয়েছে।
ব্যাটার মাথা খারাপ! তীক্ষ্ণ শোনাল মেথুর গলা। কে অনুসরণ করতে আসবে আমাদের? কেউ জানেই না কিছু। আমরা ডেলিভারি দেবই। টাকা ভীষণ দরকার।
আমার কথা শেষ হয়নি এখনও। যদি দেখি অনুসরণ করা হচ্ছে না, তাহলে মাঝপথে থেমে ফোন করে তাকে জানাতে হবে। দরকার মনে করলে, ডেলিভারির ঠিকানা বদল করবে সে।
গরু পেয়েছে আমাদেরকে! এত বদলাবদলি করতে পারব না। তাহলে আরও বেশি টাকা লাগবে।
আসল কথাটা তো শোনাইনি এখনও। ডেলিভারি দেয়ার পর আবার মাল দুটো নিয়ে আসতে হবে ওর ওখান থেকে। নিরাপদ কোন জায়গায় নিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে, যাতে কোনরকম চিহ্ন না থাকে। আর সেজন্যে সে আরও এক হাজার ডলার দেবে আমাদেরকে।
আরও এক হা-জা-র! তাহলে জিনিস দুটো চাইছে কেন? পুড়িয়েই যদি ফেলবে?
জানি না। হয়ত কোন কারণে ভয় পেয়ে গেছে। নষ্ট করে ফেলতে চাইছে। এখন। ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ও থাকতে পারে। যা খুশি করুকগে। আমাদের টাকা। পাওয়া নিয়ে কথা। পেলেই হল। এস, তুলে নিই এটা ট্রাকে।
কফিনের কাছে গিয়ে দাঁড়াল দুই জোড়া পা। আলো পড়েছে ওটার ওপর, দেখতে পাচ্ছে কিশোর। টান দিয়ে ক্যানভাস তুলে ফেলল একজন। আরেকজন ঝুঁকল কফিনটার ওপর।
দাঁড়াও, বলে উঠল ওয়েব। খুলে আগে দেখে নিই। ব্যাটা এত পাগল কেন! নিশ্চয় মূল্যবান কিছু আছে এর ভেতর!
ঢাকনা তুলে ফেলল দুজনে মিলে। বাক্সের ভেতরের চারধার আর তলায় হাত চালিয়ে দেখল।

না, বলল ওয়েব। কিছু নেই। ধর, ট্রাকে তুলে ফেলি।
আবার জায়গামত ঢাকনাটা বসাল ওরা। এক প্রান্ত থেকে ঠেলে নিয়ে এল ট্রাকের পেছনে। তুলতে গিয়ে দেখল, দরজা আর ট্রাকের পেছনে খুব একটা ফাঁক নেই। জায়গা হচ্ছে না, তাই তোলা যাচ্ছে না কফিনটা।
আরও সামনে বাড়াতে হবে ট্রাক, বলল ওয়েব। অল্প একটু বাড়ালেই চলবে।
তুমি বাড়াও। আমি পানি খেয়ে আসি, বলে একদিকে চলে গেল মেথু।
ড্রাইভিং সিটে বসল ওয়েব। গর্জে উঠল ইঞ্জিন। কয়েক ফুট সামনে বাড়াল ট্রাক। কিশোরের ওপর থেকে সরে চলে গেছে।
বেকায়দায় পড়ে গেল কিশোর। রেডিওতে বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করার উপায় নেই। হামাগুড়ি দিয়ে গিয়ে কোণের কোন একটা জিনিসের আড়ালে লুকিয়ে। থাকতে পারে। কিন্তু তাহলে চলে যাবে ট্রাকটা। ওটাকে অনুসরণ করার কোন উপায় থাকবে না। ট্রাকের ভেতরে উঠে বসে থাকতে পারে। কিন্তু কফিনটা তোলার। সময়ই তাকে দেখে ফেলবে চোরেরা।
ভাবনার ঝড় বইছে কিশোরের মাথায়। কোন উপায় দেখছে না। লুকিয়ে থেকে ট্রাকটাকে অনুসরণ করতে হবে, বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে, অথচ চোরদের চোখে পড়া চলবে না, একই সঙ্গে সবগুলো করা অসম্ভব মনে হচ্ছে তার। কাছে। অথচ যেভাবেই হোক করতেই হবে।
তারপর, হঠাই বুঝে গেল কিশোর, কি করতে হবে।
এখনও ফেরেনি মেথু। ড্রাইভিং সিটেই বসে আছে ওয়েব। হামাগুড়ি দিয়ে। কফিনটার কাছে এগিয়ে গেল কিশোর। আস্তে করে ঢাকনার একদিক ফাঁক করে। বান মাছের মত পিছলে ঢুকে পড়ল ভেতরে। আবার নামিয়ে দিল ঢাকনা। তবে, আগে ফাঁকের মধ্যে একটা পেন্সিল ঢুকিয়ে নিল, মুসা যা করেছিল। বাতাস চলাচল দরকার।
আর কিছুই করার নেই। এখন শুধু চুপচাপ শুয়ে থাকা। দুরুদুরু বুকে অপেক্ষা করে রইল কিশোর।

.

ট্রাকের কাছে ফিরে এসেছে মুসা। চতুরে দাঁড়িয়ে আছে রবিন আর জামানের সঙ্গে। সবাই উদ্বিগ্ন। কিশোরের কাছ থেকে শেষ নির্দেশ আসার পর অনেকক্ষণ পেরিয়ে গেছে। আর কোন সাড়া নেই। বারবার যোগাযোগের চেষ্টা করছে রবিন আর মুসা। কিন্তু একেবারে নীরব গোয়েন্দাপ্রধান। হল কি? কোন বিপদে পড়ল?
তারপর হঠাৎ করেই কথা বলে উঠল স্পীকার। ফার্স্ট কলিং সেকেণ্ড! ফার্স্ট কলিং সেকেণ্ড! মুসা, শুনতে পাচ্ছ?
সেকেণ্ড বলছি। শুনতে পাচ্ছি, ফাস্ট। কি হয়েছে?

যে ট্রাকটাকে খুঁজছ, ওটা এখন হলিউডের দিকে ছুটছে। ভেসে এল। কিশোরের গলা। নীল, রঙ-চটা, দুই টনী ট্রাক। লাইসেন্স নাম্বার: পি এক্স সাতশো পঁচিশ। এখন সম্ভবত পেইন্টার স্ট্রীট ধরে পশ্চিমে ছুটেছে। শুনতে পেয়েছ?
পেয়েছি! চেঁচিয়ে উঠল মুসা। ওরা এখন পেইন্টার স্ট্রীটেই দাঁড়িয়ে আছে। কিশোরের জোরাল গলা শুনেই বোঝা যাচ্ছে, মাত্র কয়েকটা ব্লক দূরে আছে সে।
এখুনি পিছু নিচ্ছি ওটার, ফাস্ট, বলল মুসা। তুমি কোথায়?
গতরাতে তোমরা যেখানে ছিলে, জবাব এল।
কফিনের ভেতরে? চেঁচিয়ে উঠল মুসা।
এবং ডালাটা দড়ি দিয়ে বাধা, বলল কিশোর। বেরোতে পারব না। তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগের আর কোন উপায় নেই, রেডিও ছাড়া। ট্রাকটাকে চোখের আড়াল করবে না কিছুতেই। তোমাদের সাহায্য দরকার হবে আমার শিগগিরই।
পেছনে লেগে থাকব, বলেই ঘুরল মুসা। দ্রুত নির্দেশ দিল সঙ্গীদেরকে।
তাড়াহুড়ো করে ট্রাকে উঠে পড়ল তিনজনে। কি করতে হবে, রোভারকে বলল। মুসা।
ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়েই বনবন স্টিয়ারিং ঘোরাল বিশালদেহী ব্যাভারিয়ান। উল্টো দিকে নাক ঘুরে গেল ট্রাকের। তীব্র গতিতে পেরিয়ে এল কয়েকটা ব্লক। দেখা পেল নীল ট্রাকের। মিলে গেল লাইসেন্স নাম্বার। সন্দেহ নেই, ওটাতেই আছে কিশোর পাশা। আধ ব্লক মত পেছনে সরে এল রোভার। ওই দূরত্ব রেখেই অনুসরণ করে চলল। এখানে রাস্তায় আলো আছে ভালই, নীল ট্রাকটাকে চোখে চোখে রাখতে অসুবিধা হচ্ছে না।
তোমার আধ ব্লক পেছনে রয়েছি, ফার্স্ট, ওয়াকি-টকিতে জানাল মুসা। ঠিক কোথায় যাচ্ছে ট্রাকটা, জান?
জানি না, জবাব এল কিশোরের। তবে হলিউডের বাইরে কোন একটা গ্যারেজে। কোন ধরনের গ্যারেজ তা-ও বলতে পারব না।
সিনেমা দেখছি যেন! উত্তেজিত হয়ে উঠছে জামান। তবে আরও বেশি রোমাঞ্চকর! কিন্তু কিশোরের কি হবে? যদি হারিয়ে ফেলি আমরা ট্রাকটাকে?
ট্রাকটাকে চোখের আড়াল করা যাবে না কিছুতেই, বিড়বিড় করল রবিন।
বেশ কয়েক মাইল পেরিয়ে এল ওরা। নীল ট্রাকটা এখনও আধ ব্লক দূরে। হঠাৎ গতি বেড়ে গেল ওটার? কোনরকম সন্দেহ হয়েছে? অনুসরণ করা হচ্ছে, বুঝতে পেরেছে?
অনেক দেরিতে বুঝল ওরা কারণটা। সামনে রেল লাইন। ট্রেন আসছে। ব্যারিয়ার পড়তে শুরু করেছে রেলগেটে। শেষ মুহূর্তে বেরিয়ে চলে গেল নীল ট্রাক। আপ্রাণ

চেষ্টা করেও ব্যারিয়ার ওপরে থাকতে থাকতে পৌঁছতে পারল না রোভার। আটকা পড়ে গেল এপাশে।
ফার্স্ট! চেঁচিয়ে উঠল মুসা। আমরা আটকা পড়ে গেছি। মালগাড়ি। মাইলখানেকের কম হবে না লম্বায়! চলেছেও খুব ধীরে ধীরে। তোমাদেরকে বোধহয় হারালাম। শুনতে পাচ্ছ?
পাচ্ছি! শোনা গেল কিশোরের গলা। সেকেণ্ড! উত্তেজিত হয়ে উঠেছে সে। মোড় নিয়েছে ট্রাক! দিক-টিক কিছু বলতে পারব না! কোন রাস্তা দিয়ে যে চলেছি... মৃদু হতে হতে মিলিয়ে গেল কথা।
ফাস্ট। চেঁচিয়ে বলল মুসা। তোমার গলা শুনতে পাচ্ছি না! মনে হয় রেঞ্জ বেড়ে গেছে! কিশোর?
কোন জবাব নেই।
আরেকবার চেষ্টা করল মুসা। জবাব পেল না। দুটো ট্রাকের দূরত্ব অনেক বেড়ে গেছে, বুঝতে পারল। ওয়াকি-টকির রেঞ্জের মধ্যে নেই কিশোর।

.

উৎকণ্ঠিত হয়ে অপেক্ষা করল কিশোর কয়েক মিনিট। স্পীকারে আসছে না মুসার গলা। নিশ্চয় রেঞ্জের বাইরে পড়ে গেছে। কল্পনা করতে পারছে ও, ঝড়ের গতিতে গাড়ি চালিয়ে আসছে রোভার। চারজোড়া চোখ উদ্বিগ্ন হয়ে খুঁজছে নীল ট্রাকটাকে। কিন্তু অন্ধকারে, লস অ্যাঞ্জেলেসের বিশৃঙ্খল পথে এটাকে খুঁজে পাওয়া ওদের জন্যে কঠিন।
আবার মেসেজ পাঠানর চেষ্টা করল কিশোর। ফার্স্ট কলিং সেকেণ্ড! শুনতে পাচ্ছ? আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?
প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এল জবাব। কিন্তু মুসা নয়। একটা অচেনা গলা। অন্য কোন কিশোরের। হ্যাল্লো, কে বলছ? এসব ফার্স্ট সেকেন্দ্রে মানে কি? কোন রকম খেলায় মেতেছ? তাহলে আমাকেও অংশী নাও।
শোন, দ্রুত বলল কিশোর। খেলা নয়, এটা ভয়ানক বিপদ। আমার হয়ে পুলিশকে মেসেজ দিতে পারবে?
পুলিশ? কেন?
দ্রুত ভাবনা চলেছে কিশোরের মাথায়। সত্যি কথা বললে বিশ্বাস করতে পারবে না ছেলেটা। রসিকতা ধরে নিতে পারে। হুশিয়ার হয়ে কথা বলতে হবে। তাই। একটা ট্রাকের পেছনে রয়েছি, আটকে গেছি। চালক আর তার সঙ্গী জানে না। বেরোতে চাই আমি। পুলিশকে ডাক। ওরা ট্রাকটা থামিয়ে আমাকে বের করে নিক। সে বুঝে গেছে, এখন বাইরের সাহায্য অবশ্যই দরকার। একমাত্র পুলিশের কাছ থেকেই পাওয়া যাবে সেটা।

ঠিক আছে, জানাচ্ছি পুলিশকে জবাব দিল ছেলেটা। লুকিয়ে গাড়ি চড়তে গিয়েছিলে, এখন পড়েছ আটকা এই তো?—জলদি কথা বল! নইলে শিগগিরই রেঞ্জের বাইরে চলে যাবে! গাড়িটার কি রঙ? নাম্বার কত?
বলছি, ভাল করে শোন, চেঁচিয়ে বলল কিশোর। নীল ট্রাক, দুই টনী। নাম্বার…
কিছুই শুনতে পাচ্ছি না! শোনা গেল ছেলেটার গলা। আরও জোরে বল!
আমি শুনতে পাচ্ছি, বলল কিশোর। শুনছ? শুনছ?
হ্যাল্লো! হাল্লো! শোনা গেল ছেলেটার গলা। চিৎকার করে কথা বলছে। চুপ হয়ে গেলে কেন! যন্ত্রে গোলমাল!নাকি ট্রান্সমিটিং রেঞ্জের বাইরে চলে গেছ— মৃদু থেকে মৃদুতর হয়ে মিলিয়ে গেল তার গলা।
হতাশ হয়ে পড়ল কিশোর। এবার কি করবে? ওয়াকি-টকিটা শার্টের ভেতরে ঢুকিয়ে রাখল। মুক্তি পাওয়ার কোন একটা উপায় বের করতে হবে। কিন্তু কোন বুদ্ধি এল না মাথায়। দড়ি দিয়ে শক্ত করে কফিনের সঙ্গে ঢাকনাটা বেঁধে রেখেছে মেথু আর ওয়েব।
ফাঁক আছে, বাতাস চলাচল করছে যথেষ্ট, সেদিক থেকে কোন ভয় নেই। ভয় পাচ্ছে ভবিষ্যতের কথা ভেবে। ট্রাক থামলে, মেথু আর ওয়েব কফিনের ঢাকনা খোলার পর কি ঘটবে ভেবে, ঢোঁক গিলল সে। ঘাতে শুরু করল। কল্পনার চোখে দেখতে পাচ্ছে, তিন দুবৃত্ত ঘিরে দাঁড়িয়েছে কফিনটা। অবাক চোখে চেয়ে আছে তার। ॥ দিকে। তার সাক্ষীতে তিনজনই জেলে যাবে। এবং সেখানে কিছুতেই যেতে চাইবে না ওরা। সুতরাং একটাই কাজ করবে ওরা। নিশ্চিহ্ন করে দেবে সাক্ষীকে। এছাড়া আর কোন পথ খোলা নেই তাদের জন্যে।
চিন্তার মোড় ঘোরাল কিশোর। কি করে ওদের হাত থেকে ছাড়া পাওয়া যাবে? যদি ঢাকনা খোলার সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে দৌড় দেয়? অবাক হয়ে যাবে ওরা! কয়েক মুহূর্ত দেরি করে ফেলবে সক্রিয় হয়ে উঠতে। এই সুযোগে কি পালিয়ে যেতে পারবে?
মনে হয় না!–ভাবছে কিশোর। ওরা তিনজন। যেদিকেই ছোটার চেষ্টা করুক সে, কারও না কারও হাতে ধরা পড়বেই।…আচ্ছা, তার চাচা-চাচী কি কাঁদবে তার জন্যে? মন খারাপ করবে? মেরিচাচী নিশ্চয় কাঁদবে, এতে কোন সন্দেহ নেই তার। চাচাও কাঁদবে গোপনে। আর তার বন্ধুরা? মুসা আর রবিন?
ভাবতে ভাবতে গলার কাছে কি যেন দলামত একটা উঠে এল কিশোরের। এই সুন্দর পৃথিবীতে আর বেশিক্ষণ আয়ু নেই তার ঠিক এই সময় ছিন্ন হয়ে গেল। চিন্তাসূত্র। থেমে গেছে ট্রাক। উত্তেজিত হয়ে পড়ল কিশোর। ধক করে উঠেছে বুকের ভেতর। এসে গেছে সময়। যে-কোন মুহূর্তে উঠে এসে কফিন নামিয়ে নেবে মেখু আর ওয়েব।

কিন্তু এল না ওরা। মিনিট পাঁচেক পর আবার চলতে শুরু করল ট্রাক। মনে পড়ে গেল কিশোরের, অর্ধেক পথ এসে মক্কেলের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করার কথা দুই চোরের। নতুন নির্দেশ থাকলে, জেনে নেবে।
আবার নানারকম ভাবনা এসে ভিড় করল কিশোরের মনে। অতীতের অনেক স্মৃতি মনে পড়ে যাচ্ছে, অনেক সুখের মুহূর্ত। অনেক কিছুই ভাবল সে, কিন্তু মুক্তির কোন উপায় বের করতে পারল না। সময়ের হিসেব রাখতে পারেনি কিশোর। আবার কতক্ষণ পর থামল ট্রাক, বলতে পারবে না।
লোহার দরজা উঠে যাওয়ার আওয়াজ শোনা গেল। উত্তেজিত হয়ে উঠেছে আবার কিশোর। টান টান হয়ে গেছে স্নায়ু। চলে গেছে বিষণ্ন ভাবটা। শুয়ে শুয়ে কাপুরুষের মত মরবে না। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়ে যাবে। তবে, প্রথমে দৌড়ে পালানর চেষ্টা করবে।
ট্রাকের দরজা খুলে গেল। ভারি পায়ের শব্দ। উঠে এসেছে মেথু আর ওয়েব। নড়ে উঠল কফিন।
অদ্ভুত একটা কাণ্ড, জান! শোনা গেল ওয়েবের গলা। স্টোররুমে যখন ঠেলেছিলাম, একেবারে হালকা মনে হয়েছিল কফিনটা। যখন তুলতে গেলাম ট্রীকে, বেজায় ভারি। এখনও তাই!
অন্য সময় হলে, খুব একচোট হেসে নিত কিশোর। ওয়েবের বিস্মিত চেহারা সহজেই কল্পনা করতে পারছে। কফিনটার ওজন অন্তত একশো পাউণ্ড বাড়িয়ে দিয়েছে সে। এই ওজন অবাক করবেই ওয়েব কিংবা মেথুকে। সামনে ভয়ানক বিপদ, তাই হাসতে পারল না কিশোর।
ধরাধরি করে নামানো হল কফিনটা।
শোনা গেল তৃতীয় আরেকটা গলা। গ্যারেজের ভেতরে নিয়ে এস, জলদি! চাপী কণ্ঠস্বর, কিন্তু কেমন যেন পরিচিত মনে হল কিশোরের। এর আগে কোথাও শুনেছে! কোথায়?
আবার শূন্যে উঠল কফিন। খানিক পরেই ধপ করে নামানো হল আবার। সিমেন্টের মেঝেতে নামিয়েছে।
গুড, বলল তৃতীয় কণ্ঠ। মুখে রুমাল চেপে আছে নাকি! এমন চাপা কেন? মিনিট দশেকের জন্যে বাইরে যাও তোমরা। তারপর এসে নিয়ে যাবে মমি আর কফিন। আজই নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে ফেলবে।
আগে টাকা, তারপর রেব, গোঁয়ারের মত বলে উঠল ওয়েব। টাকা দাও, নইলে ছুঁতেও দেব না এটা।–
ঠিক আছে, ঠিক আছে, তাড়াতাড়ি বলল তৃতীয় কণ্ঠ। অর্ধেক পাবে এখন। পোড়াতে নিয়ে যাওয়ার আগে দেব বাকিটা।

খসখস আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। নিশ্চয় দড়ি খুলছে ওয়েব কিংবা মেথু। কফিনটাও নড়ে উঠল একবার।
আরে, দড়ি নিচ্ছ কোথায়? বলল মেথু। এখানেই থাক। আবার বেঁধে নিতে হবে না কফিনটা?
চল, টাকা নেবে, বলল তৃতীয় কন্ঠ। আহ্, জলদি এস!
দরজা নামানর শব্দ শুনল কিশোর। তার নীরবতা। ঘরে আর কেউ নেই, বোঝাই যাচ্ছে। আস্তে করে ঢাকনা তুলে উঁকি দিল সে। আবছা অন্ধকার। কাঁচের বদ্ধ শার্সি দিয়ে বাইরের আলো এসে পড়েছে ম্লান হয়ে। একটা গ্যারেজ, প্রাইভেট গ্যারেজ। ঘরে আর কেউ নেই। সাবধানে কোনরকম আওয়াজ না করে বেরিয়ে এল সে। জায়গামত নামিয়ে দিল আবার কফিনের ঢাকনা। ঠিক এই সময় আবার দরজা। উঠতে শুরু করল।
তড়াক করে লাফিয়ে এসে দরজার পাশে দেয়ালের গায়ে সেঁটে দাঁড়াল। কিশোর। অর্ধেক উঠেই থেমে গেল দরজা। ঘরে এসে ঢুকল এক লোক। টেনে আবার নামিয়ে দিল দরজা। উজ্জ্বল আলো থেকে এসেছে, বোধহয় সেজন্যেই আবছা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকা কিশোরকে দেখতে পেল না সে। ঘুরে এগিয়ে গেল। কফিনের দিকে। হাতের তালু ডলছে।
অবশেষে পেলাম! বিড়বিড় করে বলল লোকটা কফিনের পাশে দাঁড়িয়ে। এতগুলো বছর পর! পকেট থেকে একটা টর্চ বের করে আলো ফেলল কফিনটার ওপর। খুব বেশি সতর্ক, তাই গ্যারেজের আলো জ্বালছে না।
উবু হয়ে ঢাকনা তুলে নামিয়ে রাখল কাত করে, কফিনের গায়ে ঠেস দিয়ে। ঝুঁকে হাত বোলাতে শুরু করল কফিনের ভেতরের দেয়ালে। অনুভবে বোঝার চেষ্টা করছে কিছু।
স্প্রিঙের মত লাফিয়ে উঠল যেন কিশোর। দুই লাফে পৌঁছে গেল লোকটার পেছনে। জোরে এক ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল তাকে কফিনের ভেতর। ঠেলে ভেতরে। ঢুকিয়ে দিল পা দুটো। ঢাকনাটা তুলেই বসিয়ে দিল জায়গামত। তারপর চড়ে বসল। ওটার ওপর। মূল অপরাধীকে আটকে ফেলেছে। এরপর কি করবে? কতক্ষণ রাখতে পারবে আটকে?
ভেতর থেকে ধাক্কা দিতে শুরু করেছে লোকটা। চেঁচাচ্ছে। তবে খুব বেশি শোনা যাচ্ছে না চিৎকার। ঢাকনা বন্ধ, বাতাস চলাচল কতে পারছে না। গ্যারেজের দরজা নামানো। কিশোরই শুনতে পাচ্ছে না ভালমত, বাইরে থেকে শুনতে পাবে না মেথু কিংবা ওয়েব।
ঢাকনাসুদ্ধ কিশোরকে ঠেলে ফেলে দেয়ার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে লোকটা। একবার ফাঁক হয়ে যাচ্ছে ঢাকনা, চেপে আবার নামিয়ে দিচ্ছে কিশোর। ঘামছে

দরদর করে। খুব বেশিক্ষণ এভাবে আটকে রাখতে পারবে না, বুঝতে পারছে। ছুটে গিয়ে দরজা তুলতে সময় লেগে যাবে। ততক্ষণে বেরিয়ে এসে তাকে ধরে ফেলবে লোকটা। বাইরে নিশ্চয় পাহারায় রয়েছে দুই চোর। ওরাও মক্কেলের সাহায্যে ছুটে আসবে। সুতরাং ঢাকনায় চেপে বসে থাকা ছাড়া আর কিছুই করার নেই তার। তবে সেটাও নিরাপদ নয়। দশ মিনিট পর এসে কফিনটা নিয়ে যেতে বলা হয়েছে। আসবে মেথু আর ওয়েব। তারমানে, খামোকাই কষ্ট করছে কিশোর। ঠেকাতে পারবে না ওদেরকে শেষ অবধি।

.

হঠাৎ বাইরে শোনা গেল অনেক মানুষের গলা। চিৎকার। হুশিয়ারি। গাড়ির হর্নের শব্দ। আরও চেঁচামেচি। ধুপধাপ শব্দ। মারামারি করছে যেন কারা!

বাইরের দিকে খেয়াল করতে গিয়ে মুহূর্তের জন্যে অসতর্ক হয়ে পড়ল। কিশোর। এই সুযোগে এক জোর ধাক্কায় ঢাকনাসহ কাত করে প্রায় ফেলেই দিয়েছিল তাকে লোকটা। তাড়াতাড়ি সামলে নিল কিশোর। চাপ বাড়াল আবার ঢাকনাটায়। ঠিক এই সময় ঘট-ঘটাং আওয়াজ তুলে উঠে গেল দরজা।

কে ওখানে! অন্ধকারে শোনা, একটা পরিচিত কণ্ঠ। আলোর সুইচ খুঁজে পেল লোকটা। জ্বলে উঠল আলো। দাঁড়িয়ে আছে বিশালদেহী ব্যাভারিয়ান। রোভার।

হঠাৎ করেই কফিনের তলায় ঠেলাঠেলি থামিয়ে দিয়েছে বন্দী। মিটমিট করে দরজার দিকে তাকাচ্ছে কিশোর। রোভারের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে মুসা, রবিন, জামান, প্রফেসর বেনজামিন আর জলিল। অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে সবাই তার দিকে।

অবশেষে কথা ফুটল রোভারের, কিশোর, তুমি হোকে?

হোকে, মাথা নাড়াল কিলোর। তার কথার ধরনে হেসে ফেলল সবাই, এমনকি রোভারও। জিজ্ঞেস করল কিশোর, তোমরা এলে কি করে? চোর দুটো কোথায়?

জবাবটা দিল রবিন। তোমাদের ট্রাকটাকে হারিয়ে ফেললাম... তার কথা শেষ হওয়ার আগেই প্রচণ্ড ঠেলা লাগল কফিনের ঢাকনায়। প্রায় পড়ে যেতে যেতে আবার সামলে নিল কিশোর। বিস্মিত চোখে কফিনের দিকে চেয়ে বলল রবিন, ভেতরে কি!

হ্যাঁ, কি? রবিনের কথার প্রতিধ্বনি করলেন যেন প্রফেসর। গোল্ড-রিম চশমার কাঁচের ওপাশে গোল গোল হয়ে উঠছে তার চোখ।

হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছল কিশোর। নাটের গুরু। দুই মাস আগে যে এই খেল শুরু করেছিল। সেই জ্যোতিষ, যে গিয়েছিল লিবিয়ায় জামানদের বাড়িতে। বিশ্বাস করিয়েছিল, রা-অরকন তাদের পূর্বপুরুষ। মমিসহ কফিনটা চুরির প্রেরণা জুগিয়েছে জামান আর জলিলকে।

জ্যোতিষ! সেই জ্যোতিষ! চেঁচিয়ে উঠল জামান। কি বলছ, কিছুই বুঝতে পারছি না!
অসম্ভব! জলিলও চেঁচিয়ে উঠল। এ হতেই পারে না! ওই জ্যোতিষ রয়ে/ গেছে লিবিয়ায়!
নিজের চোখেই দেখতে পাবেন কোথায় রয়ে গেছে, জলিলের দিকে চেয়ে বলল কিশোর। পালানর চেষ্টা করলে রুখবেন আপনাদের জ্যোতিষকে।
আস্তে করে ঢাকনার ওপর থেকে নেমে এল কিশোর। সঙ্গে সঙ্গে ঝটকা দিয়ে খুলে গেল ডালা, কাত হয়ে পড়ল একপাশে। প্রায় লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল লোকটা। চেহারা ফেকাসে। চোখে শূন্য দৃষ্টি।
জ্যোতিষ! চেঁচিয়ে উঠল জামান। ও জ্যোতিষ নয়। সে লোকটা বুড়ো ছিল! চুলদাড়ি সব সাদা! এক চোখ কানা! কুঁজো! এ তো রীতিমত জোয়ান!
ছদ্মবেশে গিয়েছিল তোমাদের বাড়িতে, শান্ত কণ্ঠে বলল কিশোর।
হাঁ হয়ে গেছেন যেন প্রফেসর, মুসা আর রবিন। বোকার মত চেয়ে আছে কফিনে দাঁড়ানো লোকটার দিকে।
উইলসন! বিড়বিড় করলেন অবশেষে প্রফেসর।
হ্যাঁ, উইলসন, জবাব দিল কিশোর। জামানদের প্রিয় জ্যোতিষ। মিসেস চ্যানেলের বেড়ালচোর। মমিচোর! কফিনচোর।
ও চোর! উইলসন চোর! বিশ্বাস করতে পারছেন না যেন প্রফেসর বেনজামিন। কিন্তু সে কেন চোর হবে? এসব কেন চুরি করতে যাবে?
হ্যাঁ, প্রফেসর, বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা কাত করলেন উইলসন। ছেলেটা ঠিকই বলেছে। আমি চোর। বাবা মারা যাওয়ার পর থেকেই অপেক্ষা করে আছি মমি আর। কফিনটার জন্যে। কিন্তু লাভ কিছুই হল না। হাতে পেয়েও হারালাম দশ লক্ষ ডলার! কে জানে, বিশ কিংবা তিরিশ লক্ষও হতে পারে!
হ্যা! সামনে বাড়ল জলিল। কঠোর চোখে চেয়ে আছে উইলসনের দিকে। ও-ই সেই জ্যোতিষ! গলার স্বর, কথা বলার ধরন! ...এখন চিনতে পারছি! এই লোকই গিয়েছিল আমার মনিবের বাড়িতে। বুঝিয়েছে, রা-অরকন তাদের পূর্বপুরুষ। ঠকিয়েছে ওঁদেরকে। লোকটা একটা ভণ্ড, শয়তান, মিথ্যুক! থুথু ছিটিয়ে দিল সে উইলসনের মুখে।
পকেট থেকে রুমাল বের করে মুছে ফেলল উইলসন। করুণ হয়ে উঠেছে। চেহারা, কেঁদে ফেলবে যেন। এসব আমার পাওনা! কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে মুখ তুললেন। প্রফেসর, শুনতে চান, কেন মমি আর কফিনটার জন্যে চোর হয়েছি আমি?।

নিশ্চয়! প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন প্রফেসর, ইচ্ছে করলেই, যখন খুশি আমার ওখানে গিয়ে মমিটা নিয়ে পরীক্ষা চালাতে পারতে তুমি। চুরি করতে গেলে কেন?
হাত তুলল কিশোর। এক মিনিট। আগে আমার একটা কথার জবাব দিন। মেথু আর ওয়েবকে ধরা হয়েছে?
বাইরে হাত-পা বেঁধে ফেলে রেখেছি ব্যাটাদের, জবাব দিল রোভার।
ছুটতে পারবে না তো?
মাথা নাড়ল রোভার।
উইলসনের দিকে ফিরল কিশোর। আপনার কথা এবার বলুন।
আসলে, মমিটা মোটেই চাইনি আমি, কফিন থেকে নেমে এল উইলসন। আমার দরকার ছিল এই কাঠের বাক্সটা। প্রফেসর, রা-অরকনের মমিটা যেদিন আবিষ্কার করলেন, আমার বাবা ছিল আপনার সঙ্গে।
ছিল, মাথা নাড়লেন প্রফেসর। খুব ভাল মানুষ ছিল। কায়রোর বাজারে খুন। হল বেচারা!
সেদিন আরও একটা জিনিস আবিষ্কার করেছিলেন বাবা, বলল উইলসন। যা আপনি জানেন না। জানানো হয়নি আপনাকে। সমাধি মন্দিরে বসে কফিনটা পরীক্ষা করছিল বাবা। গোপন একটা কুঠুরি পেয়ে গেল কফিনে, হঠাৎ করেই। ছোট একটা কাঠের টুকরো দিয়ে বন্ধ ছিল কুঠুরির মুখ। ওটার ভেতরে আছে... দাঁড়ান, দেখাচ্ছি। যন্ত্রপাতির বাক্স খুলে ছোট একটা করাত বের করে নিয়ে এল ভাষাবিদ। একপাশে কাত করে ফেলল কফিনটা। একটা জায়গায় করাত বসাতে যাবে, হা হা। করে উঠলেন প্রফেসর বেনজামিন।
না না, ওকাজ কোরো না! চেঁচিয়ে বললেন প্রফেসর। কফিনটা খুব মূল্যবান অ্যানটিক, তুমিই বলেছ!
ভেতের যা আছে, তার তুলনায় কিছু না, মলিন হাসি ফুটল উইলসনের। ঠোঁটে। তাছাড়া, এক টুকরো কাঠ আপনার দরকার এটা থেকে, কার্বন টেস্টের জন্যে। কাঠের টুকরোটা শক্ত আঠা দিয়ে আটকে দিয়েছিল বাবা। করাত দিয়ে না কেটে ওটা খোলা যাবে না। সত্যি বলছি, কাটা ছাড়া খোলা গেলে এটা চুরি করার। দরকার হত না। আপনার বাড়িতেই কোন এক ফাঁকে খুলে ভেতরের জিনিসগুলো নিয়ে চলে আসতে পারতাম। কফিনে করাত বসিয়ে চালাতে শুরু করল ভাষাবিদ। কাজ করতে করতেই বলল, আমার বাবা একটা চিঠি লিখেছিল আমার কাছে। তাতে লেখা ছিল সব কথা। তার মৃত্যুর পরে ওই চিঠি এসে হাতে পৌঁছে আমার। আমি তখন কলেজে পড়ছি। তাড়াতাড়ি ছুটে গেলাম মিশরে। কিন্তু তখন কায়রো জাদুঘরে মমিসহ কফিনটা জমা দিয়ে ফেলেছেন আপনি। আমার আর কিছুই করার। থাকল না। অপেক্ষা করে রইলাম, বছরের পর বছর।

তারপর, মাস দুই আগে খবর। পেলাম, কায়রো জাদুঘর থেকে আপনার নামে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে মমিটা। সঙ্গে সঙ্গে উড়ে গেলাম মিশরে। অনেক খুঁজে বের করলাম এক সম্ভ্রান্ত, ধনী লিবিয়ান পরিবারকে, যারা নিজেদেরকে ফারাওয়ের বংশধর বলে দাবি করে। জ্যোতিষের ছদ্মবেশে গিয়ে একদিন হাজির হলাম তাদের বাড়িতে। সহজেই বিশ্বাস করিয়ে ফেললাম, রা-অরকন তাদের পূর্বপুরুষ। বোঝালাম, যে করেই হোক, মমিটা আমেরিকান প্রফেসরের কাছ থেকে তাদের ফিরিয়ে নেয়া উচিত। আমি চেয়েছিলাম, মিস্টার জামান লোক পাঠাক আপনার কাছে মমিটা নেয়ার জন্যে। ওরা এলে আপনি ফিরিয়ে দেবেন, খুব ভাল করেই জানি; তারপর তোক দিয়ে চুরি করাতাম ওটা, আপনি কিংবা পুলিশ ভাবত, লিবিয়ান ওই ব্যবসায়ীই চুরি করিয়েছে মমিটা। সব দোষ তার ঘাড়ে গিয়ে পড়ত। আমি থেকে যেতাম আড়ালে। হয়ত বিশ্বাস করবেন না প্রফেসর, চুরি করতে খুব খারাপ লাগছিল আমার। তাই সেটা না করে যাতে কাজ হাসিল হয়ে যায়, সেজন্যে অনেক ভেবে আরেক উপায় বের করেছিলাম। মমিটাকে কথা বলিয়েছি। ভেবেছি, ভয় পেয়ে আপনি ওটা ফেলে দেবেন, কিংবা কিছু একটা করবেন। আমি কফিনটা থেকে জিনিসগুলো হাতিয়ে নেয়ার সুযোগ পাব। অথবা, প্রাচীন ভাষা বুঝতে না পেরে আমাকে ডাকবেন। ডেকেছেনও। কিন্তু আমি আপনাকে মমিটা আমার বাড়িতে আনতে দিতে রাজি করাতে পারলাম না। তাহলেও চুরির দরকার পড়ত না। জিনিসগুলো খুলে নিয়ে আবার আপনার জিনিস আপনাকে ফেরত দিতাম। কিন্তু সেটাও হল না। আপনি কিছুতেই হাতছাড়া করতে রাজি হলেন না মমি। কি আর করব? বেপরোয়া হয়ে

চুরি করেছ! ধমকে উঠলেন প্রফেসর বেনজামিন। খুব ভাল কাজ করেছ! বাপের নাম রেখেছ! গাধা কোথাকার! তোমার বাপও ছিল একটা গাধা! আমাকে সব কথা খুলে বললেই পারত! তুমি না জানতে পার, কিন্তু তোমার বাপ তো জানত, টাকার কাঙাল আমি কখনও ছিলাম না, এখনও নই।

মুখ নিচু করে করাত চালাচ্ছে উইলসন। খুলে আনল ছোট একটা টুকরো। একটা ফোকরের মুখ বেরিয়ে পড়ল। ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিল সে।

সবকটা চোখ উইলসনের হাতের দিকে। ফোকর থেকে কি বের হয়ে আসে দেখার জন্যে উদগ্রীব।

হাত বের করে আনল উইলসন। একটা কাপড়ের পুটুলি, ছোট। সাবধানে পুটুলিটা খুলল মেঝেতে রেখে। কাপড় সরাল। আলোয় জ্বলে উঠল যেন তরল আগুন। লাল, নীল, কমলা, সবুজ।

রত্ন! কথা আটকে গেছে প্রফেসরের। সামলে নিয়ে বললেন, ফারাওয়ের রত্ন! দশ লক্ষ বলছ! কিছু জান না! ওগুলোর অ্যানটিক মূল্যই ত্রিশ-চল্লিশ লক্ষ ডলার!

তার ওপর রয়েছে পাথরের দাম!
তাহলে বুঝতেই পারছেন, কেন বেপরোয়া হয়ে উঠেছিলাম, দীর্ঘশ্বাস ফেলল উইলসন। প্রফেসর, আমার বাবা এই পাথরের জন্যেই খুন হয়েছিল। তিন-চারটে পাথর বের করে নিয়েছিল। ওগুলোর মূল্য জানার চেষ্টা করেছিল কায়রো বাজারের এক জুয়েলারির দোকানে গিয়ে পড়ে গেল বদ লোকের চোখে। এরকম কিছু একটা ঘটতে পারে আগেই অনুমান করেছিল বাবা। তবু কৌতূহল দমন করতে পারেনি। বাজারে যাবে, এটাও চিঠিতে লিখেছিল।
অথচ গাধাটা আমাকে বলেনি, বলে উঠলেন প্রফেসর। তাহলে টতে দিতাম না কিছুতেই। কপালে লেখা ছিল অপমৃত্যু, কি আর হবে ৩ খলে! থামলেন। চোখ মিটমিট করে তাকালেন উইলসনের দিকে। যা হওয়ার তো হয়েছে। রা-অরকনের মমিটা কি করেছ?
ওখানে, গ্যারেজের পেছন দিকটা দেখিয়ে বলল উইলসন। চট দিয়ে ঢেকে রেখেছি।
যাক! স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন প্রফেসর। আমার গবেষণা– থেমে গেলেন তিনি। উইলসনের দিকে তাকালেন। ওসব কথা এখন থাক। তোমার কথা আগে শুনি। অনেক প্রশ্নের জবাব দিতে হবে তোমাকে। প্রথমেই শুনতে চাই, মমিটাকে কি করে কথা বলিয়েছ?
দুই কাঁধ ঝুলে পড়েছে উইলসনের। জীবনের সব আশা-ভরসাই নিমেষে ধূলিসাৎ হয়ে গেছে যেন তার। রত্নের পুটুলিটা আবার বেঁধে প্রফেসরের হাতে দিয়ে বলল, এখানে গ্যারেজে দাঁড়িয়ে থাকবেন আর কত? চলুন, ঘরে চলুন। বসবেন।

.
মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফারের অফিস। মস্ত ডেস্কের ওপাশে বসে আছেন বিখ্যাত চিত্রপরিচালক। হাতে ক্লিপে আটকানো এক গাদা টাইপ করা কাগজ। পড়ছেন। গভীর মনোযোগে।
পড়া শেষ করে কাগজগুলো ডেস্কে রাখলেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। মুখ। তুললেন, চমৎকার! খুব উত্তেজনা গেছে কয়েকটা দিন তোমাদের!
শুধু উত্তেজনা? মুসার মনে পড়ে গেল কফিনে আটকে থাকা মুহূর্তগুলোর কথা। কিশোরেরও মনে পড়ল। তবে ওসব নিয়ে বেশি ভাবতে চাইল না আর। যা হওয়ার হয়ে গেছে। অবশেষে ভালয় ভালয়ই তো শেষ হয়েছে সব।
হ্যাঁ, স্যার, বলল কিশোর। তাহলে কাহিনীটা নিয়ে ছবি করছেন?
নিশ্চয়, মাথা নাড়লেন চিত্রপরিচালক। এ-তো রীতিমত ভাল কাহিনী। আচ্ছা, কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দাও তো এবার।

কোন কথা কি বাদ গেছে, স্যার? ভুরু কুঁচকে গেছে রবিনের। কারণ লেখার ভার ছিল তার ওপর।
এই দুয়েকটা ব্যাপার, বললেন চিত্রপরিচালক। তবে, সেটাকে ভুল বলা চলে না। তুমি তো গল্প লেখনি, রিপোর্ট লিখেছ। যাই হোক এগুলো জানার জন্যে খুব কৌতূহল হচ্ছে।
বলুন, স্যার, বলল রবিন।
মিশরের আরও দুএকজন রাজাকে অতি সাধারণ মানুষের মত কবর দেয়া হয়েছে, হাতের দশ আঙুলের মাথা একত্র করে একটা পিরামিড বানালেন যেন পরিচালক। তাঁদের সঙ্গে গোপনে দিয়ে দেয়া হয়েছে অনেক মূল্যবান রত্ন। বোধহয় পরকালের পাথেয় হিসেবে। কিন্তু কথা হল, তাদেরকে ওভাবে সাধারণ মানুষের মত কবর দেয়া হল কেন? হয়ত কবর-চোরদের ভয়ে। তবে এসব ব্যাপারে এখনও শিওর নন বিজ্ঞানীরা। রা-অরকনকেও নিশ্চয় তেমনি কোন কারণে সাধারণভাবে কবর দেয়া হয়েছিল।
প্রফেসর বেনজামিনের তাই ধারণা, বলল রবিন।
কিন্তু সেটা আমাদের আলোচ্য নয়, বললেন পরিচালক। ওসব প্রত্নতাত্ত্বিক ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে বিজ্ঞানীরাই মাথা ঘামাক। আমরা আমাদের কথা বলি। মিসেস চ্যানেলের বেড়ালটা কে চুরি করেছিল, এটা এখন পরিষ্কার। উইলসন কাউকে দিয়ে করিয়েছিল। মমি চুরি করেছে মেথু আর ওয়েব। কখন করল?
আমি, কিশোর আর প্রফেসর বেনজামিন টেপটা নিয়ে গিয়েছিলাম উইলসনের বাড়িতে, বলল রবিন। যখন কথা বলছিলাম উইলসনের সঙ্গে, তখন একবার কলিং বেল বেজে উঠেছিল আমরা থাকতেই। মমিটা নিয়ে ফিরে এসেছিল মেথু আর ওয়েব। কফিনটা আনেনি বলে সে সময়ই ধমক-ধামক মেরেছিল ওদেরকে ভাষাবিদ। আবার পাঠিয়েছিল কফিনটা চুরি করতে।
আনুবিস সেজে হুপারকে ভয় দেখিয়েছিল কে? নিশ্চয় মেথু কিংবা ওয়েব?
ওয়েব, স্যার। ভয় দেখিয়েই কাবু করে ফেলেছিল বেচারাকে। ওকে সামনে রেখে কিছুতেই চুরি করতে পারত না ওরা। ওদের বর্ণনা, ট্রাকের বর্ণনা ওরা বাড়ি থেকে বেরোনর সঙ্গে সঙ্গে ফোনে পুলিশকে জানিয়ে দিত খানসামা। ভয় পেয়েও বেহুশ না হলে হয়ত পিটিয়ে বেহুশ করত।
হ্যাঁ, সেটা বুঝেছি। বুঝতে পারছি না, নীল ট্রাকটাকে হারিয়ে ফেলেও এত তাড়াতাড়ি, ঠিক সময়ে গিয়ে কি করে হাজির হল উইলসনের বাড়িতে?
মুসা, তুমি বল, বলল কিশোর।
হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, সোজা হয়ে বসল মুসা। নীল ট্রাকটাকে হারিয়ে ফেললাম। আমরা তখন ধরে নিয়েছি, জলিলই অপরাধী। ওকে ধরতে হলে, আগে প্রফেসর

বেনজামিনের বাড়িতে যেতে হবে। তিনি রিগো অ্যাণ্ড কোম্পানিতে খোঁজ নিয়ে জলিলের বাসার ঠিকানা জানতে পারবেন। তাই করা হল। জলিলের বাড়িতে গিয়ে দেখি, তিনজন কার্পেট ব্যবসায়ীকে সে বিদায় জানাচ্ছে। আমাদের মুখে নীল ট্রাক আর মেথু-ওয়েবের কথা শুনে যেন আকাশ থেকে পড়ল। বুঝলাম, সে কিছু জানে না। অপরাধী সে নয়। তখন এমন অবস্থা, পুলিশকে জানানো ছাড়া আর উপায় নেই। কিন্তু প্রফেসর তখনও পুলিশকে জানাতে দ্বিধা করছেন। অবশেষে ঠিক করলেন, উইলসনের সঙ্গে পরামর্শ করবেন। সময়ে-অসময়ে কোন বিপদ কিংবা। বেকায়দায় পড়লেই পরামর্শ নিতে যেতেন প্রফেসর তার কাছে। আগে যেতেন। ভাষাবিদের বাবার কাছে। যাই হোক, গেলাম...

এবং গিয়েই দেখলে নীল ট্রাকটা, মৃদু হাসলেন পরিচালক। নিশ্চয় খুব চমকে গিয়েছিলে।

মেথু আর ওয়েবকে ধরে খুব পিট্টি দিয়েছে, স্যার, ওরা, হেসে বলল কিশোর। পিটুনি খেয়ে ওরা বলেছে, কফিনটা গ্যারেজে আছে। পুলিশের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে ওদেরকে। আগেও অনেক অপরাধ করেছে, রেকর্ড রয়েছে। পুলিশের খাতায়। প্রমাণের অভাবে ধরতে পারছিল না এতদিন। এখন তো প্রচুর। চোরাই মালসহ ওদের আস্তানাটাই পাওয়া গেছে। থামল সে। তারপর বলল, প্রফেসর উইলসনের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে কোন অভিযোগ করেননি প্রফেসর বেনজামিন। কাজেই বেঁচে গেছেন তিনি। মিডল ঈস্টে চলে গেছেন প্রাচীন ভাষার ওপর গবেষণা করতে।

রত্নগুলো?

কায়রো মিউজিয়মে দান করে দিয়েছেন প্রফেসর বেনজামিন, প্রফেসর উইলসনেরও সায় রয়েছে এতে। তবে তাকে একেবারে খালি হাতে বিদায় করেনি। মিউজিয়ম। গবেষণা আর মিশরে তার থাকার সমস্ত খরচ বহন করবে ওরা। বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি তো রয়েছেই। মোটা বেতন পাচ্ছেন ওখান থেকে, পেতেই থাকবেন। ওরাও এটাকে একটা মিশন হিসেবে ধরে নিয়েছে। মিশনের খরচ বেঁচে যাওয়ায় বরং খুশিই বিশ্ববিদ্যালয়।

গুড, কিশোরের দিকে সরাসরি তাকালেন পরিচালক। আসল রহস্যটাই জানা হল না এখনও। মমিটাকে কি করে কথা বলিয়েছে উইলসন?।

ও, ওটা? হাসি গোপন করল কিশোর। ভেন্ট্রিলোকুইজম, স্যার। রবিনের। বাবা ঠিকই বলেছিলেন।

ভুরুজোড়া কাছাকাছি চলে এল পরিচালকের। ইয়ং ম্যান, সিনেমা ব্যবসায়ে। অনেক বছর ধরে আছি। আমি জানি, ঠিক কতখানি দূর থেকে কথা ছুঁড়ে দিতে পারে ভেন্ট্রিলোকুইস্টরা। মনে হবে পুতুলের মুখ দিয়েই কথা বেরিয়ে আসছে।

কিন্তু সেজন্যে ওটার খুব কাছাকাছি থাকতে হয় তাদের। দূর থেকে মোটেও সম্ভব না।
চাওয়া-চাওয়ি করল মুসা আর রবিন। তারা জানত, অনেক দূর থেকে কথা ছুঁড়ে দিতে পারে ভেন্ট্রিলোকুইস্টরা।
কিন্তু, স্যার, বলল কিশোর। প্রফেসর উইলসন পেরেছেন। তবে ঘটনাস্থল থেকে অনেক দূরে ছিলেন তিনি সব সময়। সেজন্যেই প্রথমে তাকে সন্দেহ করতে পারিনি। তবে করা উচিত ছিল। কারণ, কাছাকাছি তিনিই ছিলেন একমাত্র লোক যিনি মিশরের প্রাচীন ভাষা জানেন। কিন্তু বেড়ালের পায়ে রঙ করা হয়েছে, এটা জানার আগে তার কথা খেয়ালই করিনি। বেড়ালটা ছদ্মবেশী। সন্দেহ হল, জ্যোতিষও ছদ্মবেশী। প্রথমেই মনে এল, প্রফেসর বেনজামিন ছাড়া আর কে। সবচেয়ে বেশি জানে রা-অরকন সম্পর্কে? প্রফেসর উইলসন। প্রাচীন মিশরীয় ভাষা জানেন। ধ্যানে বসার অভিনয় করে অনর্গল বলে যেতে পারা কিছুই না তার জন্যে।
ঠিকই ভেবেছ, বললেন পরিচালক। কিন্তু এসব তো শুনতে চাই না। আমার। প্রশ্ন এটা নয়।
আসছি, স্যার, সে কথায়, মাথা নাড়ল কিশোর। প্রফেসর উইলসন ভাষাবিদ। অনেক ধরনের মাইক্রোফোন, টেপ-প্লেয়ার আর রেকর্ডার ব্যবহার করতে হয়। আপনি নিশ্চয় জানেন, স্যার, আজকাল একধরনের প্যারা-বলিক মাইক্রোফোন বেরিয়েছে, যার সাহায্যে শত শত ফুট দূরের শব্দও রেকর্ড করা যায়।
জানি, উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে পরিচালকের চেহারা। বলে যাও।
এ-ও জানেন, স্যার, একধরনের স্পীকার আছে, ডিরেকশন্যাল স্পীকার, যার সাহায্যে শব্দকে ইয়ে, কি বলব।—জমাট করে ফেলা যায় বলি— হ্যাঁ, জমাট করে ফেলে শত শত ফুট দূরে চালান করে দেয়া যায়। ওই ধরনের মাইক্রোফোন আর স্পীকার আছে প্রফেসর উইলসনের বাড়িতে। প্রফেসর বেনজামিনের বাড়ি থেকে সরাসরি তিনশো ফুট দূরে তাঁর বাড়ি। চুপ করল কিশোর।
বল, বল, বলে যাও, তোমার কথা শেষ কর, তাগাদা দিলেন পরিচালক।
প্রাচীন আরবী ভাষায় কিছু কথা টেপে রেকর্ড করেছিলেন প্রফেসর উইলসন। টেলিস্কোপ আছে তার। প্রফেসর বেনজামিন কাজ করেন জানালা খুলে। সুতরাং কখন তিনি কাজ করছেন, দেখতে অসুবিধা হত না ভাষাবিদের, কথা ছুঁড়ে দিতে পারতেন মেশিনের সাহায্যে। স্পীকার ফোকাস করে লাইন দেয়াই ছিল প্লেয়ারের সঙ্গে। ক্যাসেটটা ভরে শুধু প্লে বাটনটা টিপে দিতেন। বাস শুরু হয়ে যেত মমির কথা বলা। সকালে চলে যেতেন বিশ্ববিদ্যালয়ে, কাজে। ফিরতেন দুপুরের পর। তাই, মমিটা যখনই কথা বলেছে, বলেছে বিকেলে, অর্থাৎ দুপুরের পর যে-কোন

এক সময়। এবং বলেছে শুধু প্রফেসর বেনজামিনের উপস্থিতিতেই। কারণ শুধু তাকেই ভয় পাওয়ার দরকার ছিল উইলসনের। আমার সামনে কথা বলেছে, তারা দূর থেকে আমার ছদ্মবেশ ধরতে পারেননি ভাষাবিদ। কিন্তু যখন কফিনে আটকে গেল আমার, খুলে রয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে কথা থামিয়ে দিল মমি। হাল কিশোর।
হুমম!, ওপরে-নিচে মাথা দোলালেন পরিচালক। আনুবিসের মুখের বিচিত্র ভাষাও তাহলে তারই কাজ!
হ্যাঁ, স্যার, বলল কিশোর। আসলে ওয়েব যখন আনুবিস সেজে হুপারের সামনে আসছে, তার মুখে ভাষা ছুঁড়ে দিয়েছে ভাষাবিদের মেশিন। ব্যাপারটার নাম দিয়েছি আমি, উইলসনস-ভেন্ট্রিলোকুইজম।
প্রতিভা আছে লোকটার! স্বীকার করলেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। তবে আবার কোন কুকর্মে জড়িয়ে না পড়লেই হল!
আর করবে বলে মনে হয় না, স্যার। যা লজ্জা পেয়েছে!
হু। তবে লোভ বড় ভয়ানক জিনিস!...যাই হোক, আমরা আশা করব, এরপর থেকে তার বিজ্ঞান সাধনা নিয়েই ব্যস্ত থাকবে উইলসন।
নীরবতা।
তাহলে। নড়েচড়ে উঠল কিশোর, আমরা তাহলে আজ উঠি, স্যার?
আচ্ছা।...হা, ভাল কথা। জামান আর তার ম্যানেজার তো নিশ্চয় লিবিয়ায় ফিরে গেছে?
হ্যাঁ, স্যার, উঠে দাঁড়িয়েছে কিশোর। তাদের কোম্পানির সবচেয়ে ভাল একটা কার্পেট পাঠাবে বলেছে, তিন গোয়েন্দার হেডকোয়ার্টারের জন্যে।
ভেরি গুড, পরিচালকও উঠে দাঁড়ালেন। রকি, বীচের ওদিকে একটা কাজ আছে আমার। যেতে হবে এখনি। চল, তোমাদেরকে একটা লিফট দিই।
থ্যাঙ্ক ইউ, স্যার, থ্যাঙ্ক ইউ! প্রায় একই সঙ্গে বলে উঠল তিন গোয়েন্দা।

ভলিউম ১ – রত্নদানো – তিন গোয়েন্দা – রকিব হাসান – সেবা প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ: আগস্ট, ১৯৮৬

রামধনু রত্নহার চুরি করা যায় কিনা, ভাবছি! আপনমনেই বলল কিশোর পাশা।

সোলডারিং আয়রনটা মুসার হাত থেকে প্রায় খসে পড়ে যাওয়ার জোগাড় হল। রেডিওর তারা ঝালাই বাদ দিয়ে ফিরে তাকাল সে। তিন গোয়েন্দার। কার্ড শেষ হয়ে এসেছে, আবার ছাপা দরকার, কম্পোজ করছে রবিন, তারও হাত থেমে গেল।

কী! চোখ বড় হয়ে গেছে গোয়েন্দা সহকারীর।

বলছি, রামধনু রত্নহারটা চুরি করা যায় কিনা! আবার বলল গোয়েন্দাপ্রধান। ধর যদি আমরা চোর হতাম?

যা নই সেটা নিয়ে ভাবতে যাব কেন? চুরি করা অন্যায়।

তা ঠিক! হাতের খবরের কাগজে বিশেষ ফিচারটার দিকে আবার তাকাল। কিশোর।

হাতের স্টিকটা নামিয়ে রেখে মুখ তুলল রবিন। কিশোর, রামধনু রত্নহার! কিসের বাংলা করলে?

রেইনবো জুয়েলস।

পিটারসন মিউজিয়মের নেকলেসটা?

হ্যাঁ।

গত রাতেই নেকলেসটার কথা শুনেছে রবিন, তার বাবা বাসায় আলোচনা করছিলেন।

পিটারসন মিউজিয়ম। নেকলেস! কি বলছ তোমরা? কিছুই বুঝতে পারছে না মুসা।

কোন্ দেশে বাস কর? খোঁজখবর রাখ কিছু! বিদ্যে জাহির করার সুযোগ পেয়ে গেছে নথি। মিউজিয়মটা হলিউডে, একটা পাহাড়ের চূড়ায় পুরানো একটা বাড়ি, মালিক ছিলেন এক মস্ত ধনী লোক, হিরাম পিটারসন। মিউজিয়মের জন্যে বাড়িটা দান করে দিয়েছেন তিনি।

বর্তমানে ওখানে একটা প্রদর্শনী হচ্ছে, বলল কিশোর। রত্ন প্রদর্শনী। এর ব্যবস্থা করেছে জাপানের মস্ত বড় এক জুয়েলারি কোম্পানি, সুকিমিচি জুয়েলারস। আমেরিকার সব বড় বড় শহর ঘুরে ঘুরে প্রদর্শনী করবে ওরা। এটা আসলে এক ধরনের বিজ্ঞাপন। এদেশে অলঙ্কারের বড় মার্কেট রয়েছে। ওই কোম্পানির বিশেষত্ব হল মুক্তোর তৈরি অলঙ্কার। অনেক পুরানো দামি জিনিসও আছে ওদের স্টকে। তারই একটা রেইনবো জুয়েলস, সোনার তৈরি সাতনরি হার, হীরা-চুনি

পান্নাখচিত। নাড়া লাগলেই রামধনুর সাতরঙ যেন ছিটকে বেরোয় পাথরগুলে থেকে। দাম অনেক।
আরও একটা দামি জিনিস এনেছে ওরা, কিশোরের কথার পিঠে বলে উঠল রবিন। একটা সোনার বেল্ট। অনেকগুলো পান্না বসানো আছে ওতে। জিনিসটার ওজন পনেরো পাউণ্ড। ওটার মালিক ছিলেন নাকি জাপানের প্রাচীন এক সম্রাট।
তোমার মাথা খারাপ হয়েছে, কিশোর! বিস্ময় কাটেনি এখনও মুসার। এত দামি জিনিস চুরি করার সাধ্য কারও নেই! নিশ্চয়ই কড়া পাহারা দিয়ে রাখা হয়েছে জিনিসগুলো, ব্যাঙ্কের ভল্টের মত...।
তার চেয়েও কড়া পাহারায় রয়েছে। জিনিসগুলো যে-ঘরে রাখা হয়েছে, ওখানে পালা করে সারাক্ষণ পাহারা দেয় পিস্তলধারী প্রহরী। মানুষের চোখকে পুরোপুরি বিশ্বাস নেই, তাই বসানো হয়েছে একটা ক্লোজড-সার্কিট টেলিভিশন ক্যামেরা। রাতে যদি ক্যামেরা ঠিকমত কাজ না করে? সেজন্যে অদৃশ্য আলোকরশ্মির ব্যবস্থা হয়েছে। যে-কোন একটা রশ্মি কোনভাবে বাধা পেলেই চান হয়ে যাবে অ্যালার্ম সিস্টেম। কাঁচের বাক্সে রাখা হয়েছে রেইনবো জুয়েলস আর সোনার বেল্ট। ওই বাক্সেও রয়েছে অ্যালার্ম ব্যবস্থা। বাক্সের ভেতর কেউ হাত দিলেই বেজে উঠবে বেল। কারেন্ট ফেল করলেও অসুবিধে নেই, ব্যাটারি কানেকশন রয়েছে প্রতিটি সিসটেমের সঙ্গে।
ওই তো, যা বলেছিলাম, বলল মুসা। কেউ চুরি করতে পারবেন জিনিসগুলো।
হ্যাঁ, বড় রকমের চ্যালেঞ্জ একটা, মাথা নাড়ল কিশোর।
চ্যালেঞ্জ! ভুরু কুঁচকে গেছে রবিনের। আমরা কি চুরি করতে যাচ্ছি নাকি ওগুলো!
করার মত কোন কাজ এখন আমাদের হাতে নেই, সহজ গলায় বল কিশোর। মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফারও অনেকদিন কোন কাজ দিতে পারছেন না। সময় তো কাটাতে হবে আমাদের। ব্রেনটা চালু রাখতে হবে। জিনিসগুলো চুরি করার একটা উপায় নিশ্চয় আছে, সেটা যদি জানতে পারি, ভবিষ্যতে অনেক কঠিন রত্ন-ডাকাতির কেস সহজেই সমাধান করতে পারব আমরা।
অযথা সময় নষ্ট! ঠোঁট ওল্টাল মুসা। চুরিচামারির কথা ভাবার চেয়ে চলা গিয়ে ডাইভিং প্র্যাকটিস করি, পুরোপুরি রপ্ত হয়নি এখনও আমাদের।
আমিও তাই বলি, মুসার পক্ষ নিল রবিন। বাবা কথা দিয়েছে, ডাইভিংটা ভালমত শিখে নিলে আমাদেরকে মেক্সিকোতে নিয়ে যাবে। উপসাগরে সাঁতার কাটতে পারব, পানির তলায় ওখানে বড় বড় জ্যান্ত চিংড়ি পাওয়া যায়। অক্টোপাসের বাচ্চা
চুপ চুপ, আর বল না, রবিন! জোরে জোরে হাত নাড়ল মুসা। এখুনি ওখানে চলে যেতে ইচ্ছে করছে আমার!

খবরের কাগজে লিখেছে। দুই সহকারীর কথা যেন শুনতেই পায়নি কিশোর, আজকে মিউজিয়মে চিলড্রেনস ডে। আঠারো বছরের নিচের যে-কোন কিশোর হাফ-টিকেটে ঢুকতে পারবে আজ। ইউনিফর্ম পরে যে বয়স্কাউটরা যাবে, তাদের পয়সাই লাগবে না।

আমাদের ইউনিফর্ম নেই, তাড়াতাড়ি বলল মুসা। তারমানে আমরা বাদ।

গত হপ্তায় চাচাকে সাহায্য করেছি আমরা, ইয়ার্ডের কাজ করে বেশ কিছু কামিয়েছি, মনে করিয়ে দিল কিশোর। হাফ কেন, ফুল টিকেট কিনে প্রদর্শনী দেখার ক্ষমতা এখন আমাদের আছে। ভাবছি, আজই কেন চলে যাই না? আর কিছু না হোক, রেইনবো জুয়েলস দেখার সৌভাগ্য তো হবে। আসল মুক্তো আর হীরা চুনি-পান্না দেখতে পারব। ভবিষ্যতে কাজে লাগবে এই অভিজ্ঞতা।

মুসা, গোয়েন্দা সহকারীর দিকে চেয়ে বলল নথি। ওকে ভোটে হারাতে পারব আমরা, কি বল?

নিশ্চয় পারব! প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মুসা। পাথর দেখে কি হবে? জানিই তো ক রঙের হবে পাথরগুলো, কেমন হবে। ওগুলো দেখে কি করব?

মাইক্রোস্কোপের তলায় রেখে দেখলে…

…দেখলে কি হবে? কিশোরকে থামিয়ে দিয়ে জানতে চাইল রবিন। বড় দেখাবে, এই তো?

ক্রিকেট বল, নাহয় ফুটবলের মতই দেখাল, হাতের আঙুল ওপরের দিকে বাঁকা করে নাড়ল মুসা। আমাদের কি? হ্যাঁ, একটাই কাজ করা যেতে পারে ওই পাথর দিয়ে, গুলতিতে লাগিয়ে ছুঁড়ে পাখি মারা যেতে পারে।…আরে হা হা, এই তো আবিষ্কার করে ফেলেছি, কি করে চুরি করা যায়! গুলতির সাহায্যে হারটা জানালা দিয়ে ছুঁড়ে মারলেই হল! বাইরে চোরের সঙ্গী বড় ঝুড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে, লুফে নেবে ঝুড়িতে! তারপর ছুটে পালাবে! বা বা, এই তো একটা উপায় বের করে ফেলেছি! পানির মত সহজ কাজ!

চমৎকার বুদ্ধি! প্রায় চেঁচিয়ে উঠল রবিন।

কয়েক মুহূর্ত চিন্তায় মগ্ন রইল কিশোর। তারপর মাথা নাড়ল ধীরে ধীরে। মোটেই চমস্কার নয়। দুটো ফাঁক রয়েছে। ঝুড়িতে নিল যে, সে হয়ত পালাতে পারবে, কিন্তু যে ছুঁড়ল, সে ঘরেই থেকে যাবে তখনও, ধরা পড়বে গার্ডের হাতে। আরেকটা দুর্বলতা হল, মুসা আর রবিনের দিকে একবার করে তাকাল গোয়েন্দাপ্রধান। পিটারসন মিউজিয়মের যে ঘরে রাখা হয়েছে রেইনবো জুয়েলস, ওই ঘর থেকে জানালা দিয়ে ছোঁড়া যাবে না জিনিসটা। কারণ… নাটকীয়ভাবে চুপ করল সে।

কারণ? সামনে ঝুঁকল মুসা।

হ্যাঁ, কেন ছেঁড়া যাবে না? মুসার পর পরই প্রশ্ন করল রবিন।

কারণ, পিটারসন মিউজিয়মে কোন জানালাই নেই, মুচকে হাসল কিশোর। চল রওনা হয়ে যাই, দেরি না করে।

.

ঘন্টাখানেক পর ছোট পাহাড়টার গোড়ায় এসে পৌঁছল তিন গোয়েন্দা। পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে আছে পিটারসন মিউজিয়ম। গ্রিফিথ পার্ক থেকে বেরিয়ে একটা পথ চলে গেছে উপত্যকা ধরে। এখান দিয়ে প্রায়ই পার্কে পিকনিক করতে যায় লোকে, বিশেষ করে ছেলেমেয়েরাই বেশি যায়। বিরাট বাড়িটার দুদিকে দুটো শাখা যেন ঠেলে বেরিয়েছে, দুটোরই ছাতের জায়গায় রয়েছে বিশাল দুটো গম্বুজ। বাড়ির সামনে-পেছনের ঢাল সবুজ ঘাসে ছাওয়া। ঘুরে ঘুরে একটা পথ উঠে গেছে বাড়ির পেছনে, আরেকটা পথ নেমে এসেছে; একটা ওঠার, আরেকটা নামার জন্যে।

মোটর কার আর স্টেশন ওয়াগনের সারি ধীরে ধীরে উঠে যাচ্ছে মিউজিয়মের দিকে। পথের একপাশ ধরে উঠতে শুরু করল তিন গোয়েন্দা। ঠাসাঠাসি করে গাড়ি রাখা হয়েছে পার্কিং লট-এ, আরও এসে ঢুকছে। ঢোকার সময় তো ঢুকেছে, বেরোনর সময় বুঝবে ঠেলা, ভাবল কিশোর। চারদিকে ভিড়, বেশির ভাগই বাচ্চা ছেলেমেয়ে। নীল ইউনিফর্ম পরা কাব স্কাউটরা বিশৃঙ্খলভাবে ছোটাছুটি করছে এদিক-ওদিক, সামলাতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে তাদের ডেন মাদার (পরিচালিকা)। গার্ল স্কাউটের ছোটাছুটি বিশেষ করছে না, কিন্তু তাদের কলরবে কান ঝালাপালা। কে যে কি বলছে, বোঝার উপায় নেই। বাচ্চা ব্রাউনিদের কাছাকাছিই রয়েছে কয়েকজন লম্বা বয়স্কাউট, বেল্টে গোঁজা ছোট্ট কুঠার, হাতে ক্যানভাসের ব্যাগ।

জায়গাটা ভালমত দেখে নেয়া দরকার, সহকারীদেরকে বলল কিশোর। আগে মিউজিয়মের বাইরেটা দেখব।

বাড়ির পেছনে এক চক্কর দিল তিনজনে। একসময় অনেক জানালা ছিল, কিন্তু এখন বেশির ভাগই বন্ধ করে দেয়া হয়েছে ইট গেঁথে। নিচের তলা আর গম্বুজওয়ালা ঘরগুলোতে একটা জানালাও নেই, সব বুজিয়ে দেয়া হয়েছে। গুলতির সাহায্যে কেন অলঙ্কার চুরি করা যাবে না, বুঝতে পারছে এখন রবিন আর মুসা। জানালাই নেই, ছুঁড়বে কোন পথ দিয়ে? গম্বুজওয়ালা একটা ঘরের দিকে এতই মনোযোগ তার, ডেন মাদারের সঙ্গে কয়েকজন কাব স্কাউটকে দেখতেই পেল না, পড়ল গিয়ে একজনের গায়ে। আউউ!..ইসস, সরি!

ঘাসের ওপর চিত হয়ে পড়েছে একটা ছেলে, রবিনের ধাক্কা খেয়ে। লজ্জিত হাসি হাসল ছেলেটা, ঝিক করে উঠল একটা সোনার দাঁত। হাত ধরে টেনে তাকে।

উঠতে সাহায্য করল রবিন। আরেকবার দুঃখ প্রকাশ করল। ডেন মাদারের সঙ্গে অনেকখানি এগিয়ে গেছে অন্য স্কাউটেরা, তাদেরকে ধরতে ছুটল ছেলেটা।
আরে আরে, দেখ! হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল কিলোর।
কি! ভুরু কুঁচকাল মুসা, ঠোঁট বাঁকাল। কি দেখব! বাড়ির পেছনটা ছাড়া তো আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না!
তারগুলো দেখতে পাচ্ছ না? ওই, ওই যে? পোল থেকে নেমে এসেছে, ইলেকট্রিক তার। সবগুলোকে এক করে পাকিয়ে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে একটা গর্তের ভেতর দিয়ে! ওই তো, বাড়িটার এক কোণে! সহজেই কেটে ফেলা যায়!
তোমার যা কথা! বলল রবিন। কে কাটতে যাবে?
রত্নচোরেরা। তবে ওগুলো কাটলে বড় জোর আলো নেবাতে পারবে, অ্যালার্ম সিস্টেম অকেজো হবে না। সে যা-ই হোক, এটা একটা দুর্বলতা!
বাড়ির সামনে-পেছনে ঘোরা শেষ করল তিন গোয়েন্দা। সামনে দিয়ে ভেতরে ঢোকার গেটের দিকে এগোল। ওরা ইউনিফর্ম পরে আসেনি, কাজেই টিকেট কিনতে হল। পঁচিশ সেন্ট করে হাফ টিকেটের দাম।
গেট পেরিয়ে প্যাসেজে এসে ঢুকল তিনজনে।
তীর চিহ্ন ধরে এগিয়ে যাও, পথের নির্দেশ দিল একজন গার্ড।
ডান শাখার বিশাল এক হলঘরে এসে ঢুকল তিনজনে। গম্বুজওয়ালা এই ঘরটা প্রায় তিন-তলার সমান উঁচু। দেয়ালের মাঝামাঝি উচ্চতায় অর্ধেকটা ঘিরে রয়েছে। ব্যালকনি। বন্ধ নির্দেশিকা ঝুলছে ওখানে।
কারুকাজ করা সুদৃশ্য কাঠের ফ্রেমে বাঁধাই দামি দামি ছবি ঝুলছে দেয়ালে। ওগুলো মিউজিয়মের সম্পত্তি। ছবির প্রতি তেমন আকর্ষণ দেখাল না তিন গোয়েন্দা, তারা এসেছে রত্ন আর অলঙ্কার দেখতে।
ছবিগুলোর পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল কিশোর। ছবিগুলো কিভাবে ঝোলানো হয়েছে, লক্ষ্য করেছ? দেয়ালের ওপরের দিকের খাজ থেকে আটকানর ব্যবস্থা করা হয়েছে। আগে কিন্তু এভাবে ছবি ঝোলানো হত না। সিলিঙে হুক লাগিয়ে লম্বা শেকল দিয়ে ঝোলানো হত। দেখেছ, হুকগুলো এখনও আছে?
একবার ওপরে তাকিয়ে দেখল মুসা, কিন্তু গুরুত্ব দিল না। প্রায় দরজা আকারের বড় বড় জানালাগুলোর দিকে তার মন। জানালা বন্ধ করে দিল কেন ওরা?
দেয়ালে বেশি করে জায়গা করেছে, আরও বেশি ছবি ঝোলানর জন্যে, বলল। কিশোর। এটা একটা কারণ। তবে আসল কারণ বোধহয় ভাল এয়ারকণ্ডিশনিঙের জন্যে। দামি দামি ছবি, তাপমাত্রার পরিবর্তনে ক্ষতি হতে পারে, তাই সব সময় একই রকম উত্তাপ রাখার জন্যে এই ব্যবস্থা হয়েছে।

ধীরে ধীরে পুরো ঘরে চক্কর দিল ওরা, তারপর ভিড়ের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির পেছন। দিকের আরেকটা বড় হলঘরে এসে ঢুকল। তারপর চলে এল বাঁ-শাখার গম্বুজওয়ালা ঘরটায়। এখানেই রত্ন প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছে। ডান শাখার ঘরটার মত এখানেও দেয়ালের মাঝামাঝি ব্যালকনি রয়েছে। ব্যালকনিতে ওঠার সিঁড়ির। মাথা দড়ি আটকে রুদ্ধ করা হয়েছে।

ঘরের ঠিক কেন্দ্রে রয়েছে রেইনবো জুয়েলস। কাঁচের বাক্সটা ঘিরে রয়েছে। খুঁটি, ওগুলোতে বেঁধে রঙিন মখমলের দড়ির ঘের দেয়া হয়েছে। ঘেরের এপাশ থেকে হাত বাড়িয়ে বাক্সটার নাগাল পাওয়া যায় না।

সুন্দর ব্যবস্থা, সারির মধ্যে থেকে চলতে চলতে বলল কিশোর। হঠাৎ গিয়ে। ঘুসি মেরে বাক্স ভেঙে হারটা তুলে নিতে পারবে না চোর।

এক জায়গায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে কিছু দেখার উপায় নেই, এত ভিড়। সারি চলছে ধীরে ধীরে, তারই মাঝে থেকে চলতে চলতে যতখানি দেখে নেয়া যায়। বড় একটা হীরা-নীল আলো ছড়াচ্ছে, মস্ত জোনাকির মত জ্বলে আছে একটা পান্না, জলন্ত কয়লার মত ধক ধক করছে একটা চুনি, আর জ্বলজ্বলে সাদা বিশাল একটা মুক্তা-এই চারটে পাথরই বেশ কায়দা করে বসানো হয়েছে রত্নহারটাতে। ওগুলোকে ঘিরে ঝকমক করছে ছোটবড় আরও অসংখ্য পাথর। ঠিক নামই রাখা। হয়েছে, রামধনু রত্নহার, রামধনুর মতই সাতরঙ বিচ্ছুরিত হচ্ছে পাথরগুলো থেকে।

কাঁচের বাক্সের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে একজন গার্ড। তাকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল হারটার দাম বিশ লক্ষ আমেরিকান ডলার। দাম শুনে হু-ই-ই-ই করে। উঠল এক গার্ল স্কাউট।

এক দিকের দেয়ালের কাছে চলে এল তিন গোয়েন্দা। ব্যালকনির ঠিক নিচেই আরেকটা কাঁচের বাক্সে রাখা হয়েছে ফুট তিনেক লম্বা সোনার বেল্টটা। অনেকগুলো। চারকোনা সোনার টুকরো গেঁথে তৈরি হয়েছে বেল্ট। প্রতিটি টুকরোর মাঝখানে বসানো একটা করে চৌকোনা পান্না, ধারগুলোতে বসানো হয়েছে মুক্তা। দুই মাথার বকলেসে রয়েছে হীরা এবং চুনি। বেল্টের আকার দেখেই বোঝা যায়, এটা যিনি পরতেন, বিশালদেহী মানুষ ছিলেন তিনি।

সম্রাটের সোনার বেল্ট এটার নাম, বেল্টের বাক্সের কাছে দাঁড়ানো এক গার্ড বলল। জিনিসটা প্রায় হাজার বছরের পুরানো। ওজন পনেরো পাউণ্ডের মত। খুবই দামি জিনিস, কিন্তু আসল দাম কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে এর ঐতিহাসিক মূল্য।

আরও কিছুক্ষণ বেল্টটা দেখার ইচ্ছে ছিল তিন গোয়েন্দার, কিন্তু পেছনের চাপে বাধ্য হয়ে সরে আসতে হল। অসংখ্য কাঁচের বাক্সে সাজিয়ে রাখা হয়েছে আরও

অনেক মূল্যবান জিনিস, তার প্রায় সবই সুকিমিচি জুয়েলারস-এর তৈরি। আঠা দিয়ে মুক্তা আর কাঁচ জুড়ে তৈরি হয়েছে হাঁস, ঘুঘুপাখি, মাছ, হরিণ আর অন্যান্য অনেক জীবজন্তুর প্রতিকৃতি। ছেলেরা চুপচাপ মুগ্ধ চোখে দেখছে, কিন্তু মেয়েরা চুপ করে থাকতে পারছে না। চারদিক থেকে কেবল তাদের হুইই-হাইই, ইস-আস্স্ শোনা যাচ্ছে।

প্রায় ভরে গেছে এখন ঘরটা। কথা বলার জন্যে খালি একটু জায়গা দেখে সরে এল তিন গোয়েন্দা।

কত গার্ড দেখেছ? বলল কিশোর। দিনের বেলা এখানে চুরি করা সম্ভব নয়। করলে রাতে করতে হবে। কিন্তু কিভাবে? ঢুকবে কি করে? অ্যালার্ম ফাঁকি দিয়ে বাক্স ভাঙবে কি করে? মাথা নাড়ল সে আপনমনেই। আমার মনে হয় না চুরি করতে পারবে, যদি না—

হুপপ! কিশোরের গায়ে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল লোকটা। হাতঘড়ির দিকে চেয়ে পিছিয়ে এসেছে, আর কোনদিকেই নজর ছিল না।

আরে, মিস্টার মার্চ? বলে উঠল কিশোর।

কে! ভুরু কুঁচকে তাকাল লোকটা।

আরে, আমাকে চিনতে পারছেন না? আমি কিশোর, কিশোর পাশা। টেলিভিশনে কমিকে অভিনয় করতাম, মনে নেই? আমরা বাচ্চারা যত গণ্ডগোল বাধ্যতাম, আপনি তার খেসারত দিতেন, মনে পড়ছে?

কি, কিশোর পাশা! ও ইয়ে..হা হা! চেঁচিয়ে উঠল লোকটা। কিন্তু এখন তো কথা বলার সময় নেই আমার, অভিনয় করতে হবে।

অভিনয়?

দেখ, কি করি, হাসল মিস্টার মার্চ। মজা দেখ। ওই যে, একটা গার্ড। গলা। চড়িয়ে ডাকল, গার্ড! গার্ড!

ঘুরল ইউনিফর্ম পরা গার্ড। থমথমে চেহারা। কি হয়েছে? ভারি কণ্ঠ।

টলে উঠল মার্চ। আমার-আমার মাথা ঘুরছে!...পানি! পানি! পকেট থেকে রুমাল বের করে কাঁপা কাঁপা হাতে কপালের ঘাম মুছল সে। হাত কাঁপছে বলেই বোধহয়, রুমালের ভাঁজ থেকে খুট করে কিছু একটা মেঝেতে পড়ে গেল। লাল একটা পাথর, রুবির মত দেখতে। আহহা! চেহারায় শঙ্কা ফুটল অভিনেতার।

দুই লাফে কাছে চলে এল গার্ড। কোত্থেকে চুরি করেছ এটা! গর্জে উঠল সে। এস, এদিকে এস! মার্চের কলার চেপে ধরে টানল লোকটা।

হ্যাঁচকা টান দিয়ে কলার ছাড়িয়ে নিল মার্চ, জোরে এক ধাক্কা মারল গার্ডের বুকে।

আর দ্বিধা করল না গার্ড। হুইসেল বাজাল। বদ্ধ ঘরের বাতাস যেন চিরে দিল বাঁশির তীক্ষ্ণ শব্দ। জমে গেল যেন ঘরের প্রতিটি লোক। সবকটা চোখ প্রায় একই সঙ্গে ঘুরে গেছে গার্ড আর মার্চের দিকে। দেখতে দেখতে ছুটে এসে মার্চকে ঘিরে। ফেলল গার্ডেরা। অপরাধী একটা ভঙ্গি করে দাঁড়িয়ে আছে অভিনেতা।
এই যে, মিস্টার… শুরু করল হেড গার্ড। কিন্তু তার কথা শেষ হল না, তার আগেই গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে গেল পুরো ঘরটা।
এক সেকেণ্ড নীরবতা। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল একটা উত্তেজিত কণ্ঠ, আলো! আলো জ্বেলে দাও!
হারের বাক্সটার কাছে চলে যাও দুজন! শোনা গেল হেড গার্ডের আদেশ। বিল, ডিক, তোমরা গিয়ে দরজা আটকাও। খবরদার, কেউ যেন বেরোতে না। পারে!
এরপর শুরু হল হট্টগোল। যার যেভাবে খুশি চেঁচাচ্ছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের অনেকে ভয়ে হাউমাউ জুড়ে দিয়েছে, চেঁচিয়ে, বুঝিয়ে তাদেরকে শান্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে মায়েরা।
চীফ! চেঁচিয়ে উঠল এক গার্ড। ছেলেপিলেগুলোর জন্যে এগোতে পারছি না! বাক্সটার কাছে যাওয়া যাচ্ছে না!
যেভাবেই হোক, যাও! আবার বলল হেড গার্ড। ডাকাত! ডাকাত পড়েছে!
ঠিক এই সময় ঝন ঝন করে ভাঙল কাঁচ। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে উঠল যেন অ্যালার্ম বেল। তারই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চেঁচিয়ে চলল দর্শকরা। অন্ধকারের মধ্যে কে কত জোরে চেঁচাতে পারে তারই প্রতিযোগিতা চলেছে যেন।
রত্নহার! কিশোরের কানের কাছে মুখ এনে বলল মুসা। হারটা চুরি করার তালে আছে কেউ!
তাই তো মনে হচ্ছে, কিশোরের কণ্ঠ শুনেই বোঝা গেল, ব্যাপারটা খুব উপভোগ করছে সে। ভেবেচিন্তে প্ল্যান করেই এসেছে ডাকাতেরা।…চল, সামনের দরজার কাছে চলে যাই। ব্যাটারা ওদিক দিয়েই হয়ত বেরোবে। চল চল।
পেছনেও দরজা আছে, বলল রবিন।
তা আছে। কিন্তু একসঙ্গে দুদিকে দেখতে পারব না। চল, সামনের দিকেই যাই।
দুহাতে বাচ্চাদেরকে ঠেলে সরিয়ে দরজার দিকে এগোল কিশোর। তাকে সাহায্য করল মুসা। ভিড়ের মধ্যে কোনমতে পথ করে এগোল তিন গোয়েন্দা।
দরজার কাছে যেতে পারল না ওরা। গার্ডের কাউকে বেরোতে দিচ্ছে না, ফলে দরজার কাছে ঠাসাঠাসি হয়ে আছে লোকজন। এ ওকে ঠেলা মারছে, সে তাকে অঁতো দিচ্ছে। পাগল হয়ে উঠেছে যেন সবাই। বিপজ্জনক পরিস্থিতি। এখন কোনভাবে এক-আধটা বাচ্চা পড়ে গেলে জনতার পায়ের চাপেই চ্যাপ্টা হয়ে যাবে।

অ্যালার্ম আর হট্টগোল ছাপিয়ে শোনা গেল একটা কণ্ঠ, কথায় জাপানী টান। থামিয়ে দেয়া হল বেল। বোধহয় ইমার্জেন্সী সুইচ অফ করে ব্যাটারি কানেকশন কেটে দেয়া হয়েছে। আবার শোনা গেল সেই কণ্ঠে আদেশ, গার্ডস! জলদি বাইরে। চলে যাও! লোককে হল থেকে বেরোতে দাও। কিন্তু সাবধান! এরিয়ার বাইরে যেন যেতে না পারে কেউ! সবাইকে সার্চ করে তবে ছাড়বে!

দরজার কাছ থেকে বোধহয় সরে দাঁড়াল গার্ডেরা। কারণ, অন্ধকারেই বুঝতে পারল কিশোর, ঢেউ খেলে গেল যেন জনতার মাঝে। নড়তে শুরু করেছে সবাই একদিকে, বেরিয়ে যাচ্ছে। মুসা আর রবিনকে নিয়ে তাদের মাঝে ঢুকে গেল সে।

তিন গোয়েন্দাকে যেন ছিটকে বের করে নিয়ে এল জনতার স্রোত। দেয়াল ঘেরা বড় একটা লনে বেরিয়ে এসেছে ওরা। আশপাশে অসংখ্য গার্ড, দর্শকদের কাউকেই লনের বাইরে যেতে দিচ্ছে না। বাচ্চা আর মহিলাদের শান্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে কয়েকজন। পুলিশের সাইরেন শোনা গেল। খানিক পরেই লনের গেট দিয়ে ভেতরে এসে ঢুকল কয়েকটা পুলিশের গাড়ি আর হাফট্রাক। লাফ দিয়ে নেমে এল সশস্ত্র পুলিশ।

শুরু হল তল্লাশি। বয়স্কাউট আর গার্ল গাইডরা পুলিশকে সাহায্য করতে লাগল। দ্রুত চলল তল্লাশি। সারি দিয়ে গেটের দিকে এগোচ্ছে দর্শকরা, যাদেরকে তল্লাশি করা হয়ে যাচ্ছে তারা বেরিয়ে যাচ্ছে। ইচ্ছে করেই রবিন আর মুসাকে নিয়ে। পেছনে রইল কিশোর, যাতে তাদের পালা পরে আসে।

মিস্টার মার্চের পালা এল। বিধ্বস্ত চেহারা তার। একজন গার্ডকে জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে? ডাকাতি…।

…এই যে, মিস্টার, মার্চকে দেখেই বলে উঠল হেড গার্ড। আপনাকে এখন যেতে দেয়া হবে না। হাত ধরে টেনে অভিনেতাকে পুলিশ ইন্সপেক্টরের কাছে নিয়ে চলল সে।

কিছু পাওয়া যাবে না ওর কাছে, নিচু গলায় দুই সঙ্গীকে বলল কিশোর। সহজে ছাড়াও পাবে না। জেরার পর জেরা চলবে। কিন্তু ডাকাত ব্যাটারা পালাল কোন পথে?

তাই তো বুঝতে পারছি না! পুরো লনে চোখ বোলাল মুসা। পুরুষ আর তেমন কেউ নেই, খালি মহিলা, আর বাচ্চা! এদের কাউকেই তো ডাকাত মনে হচ্ছে না!

হু! বিড়বিড় করল কিশোর। ওদের কাছে কিছু পাওয়া যাবে না…

হুড়মুড় করে এই সময় মিউজিয়ম থেকে বেরিয়ে এলেন এক ছোটখাট জাপানী ভদ্রলোক, হাতে টর্চ। চেঁচিয়ে গার্ডদেরকে বললেন, লোকেরা চলে গেছে, না? হায় হায়, গেল বুঝি! রেইনবো জুয়েলস না, রেইনবো জুয়েলস না, বেল্টটা নিয়ে গেছে!

উজ্জ্বল হয়ে উঠল কিশোরের চোখ। অবাক কাণ্ড তো! ব্যাটারা বেল্ট চুরি করতে গেল কেন? হারটা নেয়া অনেক সোজা ছিল! এতবড় জিনিস, লুকাল কোথায়!
ওই যে দুজন বয়স্কাউট, আঙুল তুলে দেখাল রবিন। লম্বু দুটোকে দেখছ, আমার মনে হয় ওদের কাজ। কুঠার দিয়ে বাড়ি মেরে কাঁচের বাক্স ভেঙেছে... বেল্টটা আছে ওদের কাছেই।
আমার মনে হয় না। এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল গোয়েন্দাপ্রধান, ঠোঁট গোল। করে শিস দিল। গোল্ডেন বেল্ট ওদের কাছে পাওয়া যাবে না।
কিশোরের কথা ঠিক হল। স্কাউটদেরকেও তল্লাশি করা হল, কিন্তু পাওয়া গেল সোনার বেল্ট। তাদের ব্যাগে খাবার ছাড়া আর কিছুই নেই, মিউজিয়ম থেকে গ্রিফিথ পার্কে গিয়ে পিকনিকের ইচ্ছে, তাই সঙ্গে খাবার নিয়ে এসেছে। আস্তে আস্তে খালি হয়ে এল লন। তিন গোয়েন্দাকেও তল্লাশি করা হল। এবার বেরিয়ে যেতে পারে ওরা, কিন্তু বেরোল না কিশোর। আরেকবার মিউজিয়মে ঢোকার ইচ্ছে তার।– আর কাউকে তল্লাশি করা বাকি নেই। মিউজিয়মে এখনও আলো জ্বালানর। ব্যবস্থা হয়নি। কয়েকটা টর্চ জোগাড় করে অন্ধকার মিউজিয়মে ঢুকল গিয়ে কয়েকজন গার্ড। মুসা আর রবিনকে নিয়ে কিশোরও ঢুকে পড়ল।
যে কাঁচের বাক্সে বেল্টটা রাখা হয়েছিল, ওটার ওপরের আর একপাশের কাঁচ। ভেঙে চুরমার। অন্য বাক্সগুলো ঠিকই আছে, বেল্টটা বাদে আর কিছু চুরিও হয়নি।
এই সময় পেছনে চেঁচিয়ে উঠল কেউ, আরে, এই যে, ছেলেরা, তোমরা এখানে কি করছ? এখানে কি?
সেই জাপানী ভদ্রলোক।
স্যার। পকেট থেকে কার্ড বের করে বাড়িয়ে ধরল কিশোর, আমরা। গোয়েন্দা। আপনাদেরকে সাহায্য করতে চাই।
টর্চের আলোয় কার্ডটা পড়লেন ভদ্রলোক। তারপর মুখ তুলে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে কিশোরের দিকে তাকালেন।
হেসে বলল গোয়েন্দাপ্রধান। যে-কোন ধরনের রহস্য সমাধান করতে রাজি আমরা। ভৌতিক রহস্য, চুরি, ডাকাতি...
পাগল! আমেরিকান ছেলেগুলো সব বদ্ধ পাগল। যত্তোসব! কার্ডটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন ভদ্রলোক। আমি টোহা মুচামারু, সুকিমিচি জুয়েলারস কোম্পানির সিকিউরিটি ইনচার্জ, আমিই ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছি না গোল্ডেন বেল্ট কি করে চুরি হল! আর তিনটে বাচ্চা খোকা এসেছে এর সমাধান করতে! হুহ!...যাও, খোকারা, বাড়ি যাও। খামোকা গোলমাল কোরো না। বেরোও। প্রায় ধাক্কা দিয়ে তিন গোয়েন্দাকে মিউজিয়ম থেকে বের করে দিলেন মুচামারু।

.
পরদিন খবরের কাগজে বেশ বড়সড় হেডিং দিয়ে ছাপা হল গোল্ডেন বেল্ট চুরির সংবাদ, খুঁটিয়ে পড়ল কিশোর। নতুন কিছু তথ্য জানা গেল। মেকানিক-এর পোশাক পরা একজন লোককে মিউজিয়মের সীমানার ভেতরে ঢুকতে দেখা গেছে, এর কয়েক মিনিট পরেই গাড়িতে করে দ্রুত চলে গেছে লোকটা। যারা দেখেছে, তারা প্রথমে কিছু বুঝতে পারেনি। যে-কোন বাড়িতে যে-কোন সময় বৈদ্যুতিক গোলযোগ ঘটতে পারে, সারানর জন্যে মিস্ত্রি আসতে পারে, এতে অস্বাভাবিক কিছু নেই। নিখুঁত পরিকল্পনা করে চুরি করতে এসেছিল একটা দল, মাপ সময়ে যার যার কাজ করে সরে পড়েছে। কেউ বাইরে থেকে কাজ করেছে, কেউ করেছে ভেতর থেকে। কে ছিল ভেতরে?

পেছনের দরজা দিয়ে কেউ বেরোয়নি। কাগজে লিখেছে, বেরোনর উপায় ছিল না, কারণ পেছনের দরজা এমনভাবে বন্ধ করা ছিল, ওটা খুলে বেরোনো অসম্ভব। তারমানে চোরও বেরিয়েছে সামনের দরজা দিয়েই। মিউজিয়মের ভেতরে দর্শক যারা যারা ঢুকেছিল, তাদের সবাইকে লনে আটকানো হয়েছে, ভালমত তল্লাশি করা হয়েছে। তাহলে কোন্‌দিক দিয়ে গেল চোর?

কাগজে লিখেছে, মিস্টার টোড মার্চকে জেরা করার পর ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

এই মিস্টার মার্চের ব্যাপারটাই বুঝতে পারছি না! নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর। রুমাল থেকে ইচ্ছে করেই একটা লাল পাথর ফেলল! আসল পাথর নয়, নকল, কাঁচ-টাচের তৈরি হবে।

হেডকোয়ার্টারে রয়েছে তিন গোয়েন্দা। কিশোরের কথা শেষ হয়নি, বুঝতে পেরে চুপ করে রইল মুসা আর রবিন।

ক্যারাভানের দেয়ালের দিকে চেয়ে ভ্রুকুটি করল কিশোর। কোন সন্দেহ নেই, পেশাদার দলের কাজ। প্রতিটি সেকেণ্ড পর্যন্ত মেপে নিয়েছে। নাহ, কিচ্ছু বোঝা যাচ্ছে না! কি করে সোনার বেল্টটা বের করল ওরা?

গার্ডদের কেউ হতে পারে! চেঁচিয়ে উঠল রবিন। নিশ্চয় চোরের সঙ্গে যোগসাজশ রয়েছে! কোন গার্ডকে কিন্তু তল্লাশি করা হয়নি!

প্রশংসার দৃষ্টিতে বন্ধুর দিকে তাকাল মুসা। ঠিক, এটা হতে পারে!– কিন্তু...আরও একটা সম্ভাবনা আছে। হয়ত মিউজিয়মেই কোথাও লুকিয়ে ছিল চোর। সবাই চলে যাওয়ার পর কোন এক সুযোগে বেরিয়েছে।

উঁহু! মাথা নাড়ল কিশোর। কাগজে লিখেছে, দর্শকরা সব বেরিয়ে যাওয়ার পর পুরো মিউজিয়ম খুঁজে দেখা হয়েছে। কারও পক্ষে তখন লুকিয়ে থাকা সম্ভব ছিল না।

হয়ত কোন গোপন ঘর আছে, বলল রবিন। ওসব পুরানো বাড়িগুলোতে থাকে।

চুপ করে কয়েক মুহূর্ত ভাবল কিশোর। তারপর মাথা নাড়ল ধীরে ধীরে, আমার মনে হয় না! তেমন ঘর থেকে থাকলে মিউজিয়ম কর্তৃপক্ষ জানবেই। আর গার্ডদের ব্যাপারটা...কি জানি...! একটা ব্যাপার মাথায় ঢুকছে না কিছুতেই, এটা। বুঝলেই অনেকগুলো প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাবহার না নিয়ে বেল্টটা নিল কেন ওরা? হারটার দাম বেশি, লুকানো সহজ, বেচতে পারত সহজে।
চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল গোয়েন্দাপ্রধান। চিমটি কেটে চলল নিচের ঠোঁটে।
দেখি, আবার প্রথম থেকে একটা একটা পয়েন্ট আলোচনা করি, বলল। কিশোর। প্রথমেই লাইট চলে যাওয়ার ব্যাপারটা। এটা সহজ কাজ, বাইরে থেকে সহজেই করা গেছে। দুই, আলো চলে যাওয়ার পর গার্ডরা অসুবিধেয় পড়েছে। কারণ, বাচ্চা আর মহিলারা নরক গুলজার শুরু করে দিয়েছিল মিউজিয়মের ভেতর। গার্ডেরা দর্শক সামলাতেই হিমশিম খেয়ে গেছে, এই সুযোগে কাজ সেরে ফেলেছে। চোর। তারমানে, ইচ্ছে করেই চিলড্রেনস ডে বেছে নিয়েছে চোরেরা। ঠিক কিনা?
ঠিক, মাথা ঝাঁকাল মুসা।
তিন, রেইনবো জুয়েলসের দিকেই লক্ষ্য বেশি ছিল গার্ডদের, ফলে বেল্টটা সহজেই হাতিয়ে নিতে পেরেছে চোর। বাক্সের চারপাশে দড়ির রিঙ, তার বাইরে থেকেই কাজটা করতে পারে একজন লম্বা মানুষ।
গার্ডদের অনেকেই খুব লম্বা, মনে করিয়ে দিল রবিন।
ঠিক, সায় দিল কিশোর। বাক্স ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে অ্যালার্ম বেজে উঠল, দরজার দিকে দৌড় দিল কিছু গার্ড। দর্শকদেরকে বেরোতে দেয়া হল লনে, তাদেরকে তল্লাশি করা হল, তারপর ছেড়ে দেয়া হল।
এগুলো কোন তথ্য নয়, বলল মুসা। এ-থেকে রহস্যের সমাধান করা যাবে না।... আচ্ছা, আমরা যেচে সাহায্য করতে চাইলাম, এমন ব্যবহার করল কেন জাপানী সিকিউরিটি অফিসার?।
ঠোঁট উল্টাল কিশোর। কি জানি! হয়ত আমাদেরকে বেশি ছেলেমানুষ মনে করেছে, তাই। ইস, মিস্টার ক্রিস্টোফার ওই মিউজিয়মের ডিরেক্টর হলে কাজটা পেয়ে যেতাম আমরা!
তিনি নন, বলল মুসা। ওকথা ভেবে আর কি লাভ?
মিস্টার মার্চের ব্যাপারটা বেশ সন্দেহজনক, টেবিলে আস্তে আস্তে টোকা দিল কিশোর।
মানে? প্রায় একই সঙ্গে প্রশ্ন করল রবিন আর মুসা।
মনে আছে কি কি করেছ? টেবিলে দুই কনুই রেখে সামনে ঝুঁকল কিশোর। মিস্টার মার্চ আমাকে বলেছে, এবার অভিনয় শুরু করবে সে। তারপর অভিনয়

শুরু করেছে। পকেট থেকে রুমাল বের করে ঘাম মোছার ছলে ইচ্ছে করেই পাথর ফেলেছে। গার্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, সন্দেহ জাগিয়েছে। তারপর কি ঘটল?
কি ঘটল? একই প্রশ্ন করল রবিন, এবং উত্তর দিল নিজেই, গার্ড চেঁচামেচি শুরু করল, অন্য গার্ডদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল, দর্শকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হল মিস্টার মার্চের দিকে।
ঠিক তাই। খুশি খুশি একটা ভাব ফুটেছে কিশোরের চেহারায়। দর্শক আর গার্ডদের নজর অন্যদিকে সরিয়ে দিল লোকটা। ওই সুযোগে অন্য অপরাধীরা তাদের যার যার কাজ করে গেছে নিরাপদে। এমন কিছু, যেটা আমাদের নজরে পড়েনি।
সেই এমন কিছুটা কি? প্রশ্ন করল মুসা।
সেটাই তো জানি না। তবে ওদের সময়জ্ঞানে আশ্চর্য হতেই হচ্ছে! পাথরটা মেঝেতে ফেলল মিস্টার মার্চ, এক গার্ড বাঁশি বাজাল, অন্য গার্ডরা দৌড়ে এল। তার এক কি দুই সেকেণ্ড পরেই দপ করে নিভে গেল সব বাতি। অন্ধকার হয়ে গেল। ঘর, আর সেই সুযোগে গোল্ডেন বেল্ট চুরি করে পালাল চোরেরা। প্রতিটি কাজ নিখুঁতভাবে সেরেছে।
চিন্তিত দেখাল রবিনকে। কিন্তু কারা ওরা? বেল্টটা বের করে নিয়ে গেল কিভাবে?
কিছু একটা বলার জন্যে মুখ খুলল কিশোর, ঠিক এই সময় তীক্ষ্ণ শব্দে বেজে উঠল টেলিফোন।
তৃতীয়বার রিঙ হতেই ফোনের তারের সঙ্গে যুক্ত লাউড-স্পীকারের সুইচ টিপে অন করে দিল কিশোর। রিসিভার তুলে নিল। হ্যালো।– কিশোর পাশা? মহিলা কণ্ঠ বেজে উঠল স্পীকারে। মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফার চাইছেন তোমাকে।
বিদ্যুৎ ঝিলিক দিয়ে গেল যেন তিন গোয়েন্দার চোখে মুখে। দীর্ঘদিন পর আবার এসেছে ডাক! মিস্টার ক্রিস্টোফার চাইছেন, তারমানে নিশ্চয় জটিল কোন রহস্য।
কিশোর বলছি।
ধরে থাক, প্লীজ।
দুই সেকেণ্ড খুটখাট শব্দ হল স্পীকারে। তারপরই ভেসে এল ভারি গমগমে কণ্ঠস্বর। হ্যালো, কিশোর। কেমন আছ তোমরা?
ভাল, স্যার! উত্তেজনায় কাঁপছে কিশোরের গলা।
হাতে কোন কাজ আছে এখন তোমাদের। মানে কোন কেস?
না, স্যার, কিছু নেই! বসে থেকে থেকে…
তাহলে একটা কাজ দিচ্ছি। আমার এক লেখিকা বান্ধবীকে সাহায্য করতে পারবে?
সাহায্য? কি সাহায্য!

এক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। বোধহয় গুছিয়ে নিচ্ছেন। মনে মনে। কি বলল ঠিক বুঝতে পারছি না। ওর সঙ্গে দেখা হয়নি আমার, ফোনে। কথা হয়েছে। রত্নদানোরা নাকি বিরক্ত করছে ওকে।
র-ত্ন-দা-নো! প্রায় চেঁচিয়ে উঠল কিশোর।
স্তব্ধ হয়ে গেছে যেন রবিন আর মুসা।
তাই তো বলল, বললেন মিস্টার কিস্টোফার। রত্নদানো। ওই যে, খুদে পাতাল-মানব, যারা নাকি চামড়ার পোশাক পরে, পাতালে বাস করে, আর সুড়ঙ্গ কেটে কেটে খালি রত্নের সন্ধানে ফেরে।
রত্নদানো কি, জানি, স্যার। কিন্তু ওরা তো কল্পিত জীব, কেচ্ছা কাহিনীতে আছে। সত্যি সত্যি আছে বলে তো শুনিনি কখনও!
আমিও শুনিনি। কিন্তু আমার বান্ধবী বলছে, সে নিজের চোখে দেখেছে। রাতে চুরি করে তার ঘরে ঢুকে পড়ে দানোরা, সমস্ত ছবি উল্টেপাল্টে রাখে, বই ছড়িয়ে ফেলে দিয়ে যায় যেখানে সেখানে। পুলিশকে বলেছে সে, কিন্তু পুলিশ এমনভাবে তাকিয়েছে যেন মহিলার মাথা খারাপ। ভীষণ অসুবিধেয় পড়ে শেষে আমাকে জানিয়েছে সে।
কয়েক মুহূর্ত নীরবতা।
কিশোর, ওকে সাহায্য করতে পারবে?
পারব কিনা জানি না, তবে চেষ্টা তো নিশ্চয় করব! ঠিকানাটা দেবেন?
কাগজ-কলম টেনে নিয়ে ঠিকানা লিখে নিল রবিন।
ছেলেদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে লাইন কেটে দিলেন চিত্রপরিচালক।
যাক! জোরে একটা শ্বাস ফেলল কিশোর। গোল্ডেন বেল্টের কেন্স পাইনি, কিন্তু তার চেয়েও মজার একটা পেলাম! রত্নদানো! চমৎকার!

.

মিস শ্যানেল ভারনিয়া থাকেন লস অ্যাঞ্জেলেস-এর শহরতলীতে। বাসে যেতে অসুবিধে, একটা গাড়ি হলে ভাল হয়। মেরিচাচীকে ধরল তিন গোয়েন্দা। ইয়ার্ডের ছোট ট্রাকটা দিতে রাজি হলেন চাচী। চালিয়ে নিয়ে যাবে দুই ব্যাভারিয়ান ভাইয়ের একজন, বোরিস।
খালি মুখে বেরোতে রাজি হল না মুসা। অগত্যা কিশোর আর রবিনকেও টেবিলে বসতে হল।
খেয়ে দেয়ে মস্ত ঢেকুর তুলল মুসা। পেটে হাত বুলিয়ে বলল, হ্যাঁ, এইবার দানো শিকারে যাওয়া যায়।
আর কিছু খাবে? মুসাকে জিজ্ঞেস করল কিশোর।
আর? টেবিলের শূন্য প্লেটগুলোর দিকে চেয়ে বলল মুসা। আর তো কিছু নেই!

মুচকি হেসে উঠে গিয়ে ফ্রিজ খুলে একটা জগ বের করল কিশোর। নিয়ে এসে বসল আবার টেবিলে।
কমলার রস। চেঁচিয়ে উঠল মুসা। দাও দাও, জলদি দাও! ইসস, পুডিংটা খাওয়া উচিত হয়নি! তবে তেমন ভাবনা নেই। পানির ভাগ বেশি তো, পেটে বেশিক্ষণ থাকবে না।
দুটো গেলাসে কমলালেবুর রস ঢেলে একটা রবিনকে দিল কিশোর। আরেকটা নিজে রেখে জগটা ঠেলে দিল মুসার দিকে।
প্রায় ছোঁ মেরে জগটা তুলে নিয়ে ঢকঢক করে খেতে শুরু করল মুসা। হঠাৎ কি মনে পড়ে যাওয়ায় মুখের সামনে থেকে জগ সরিয়ে বলল, কিশোর, গোল্ডেন বেল্ট কি করে চুরি হয়েছে, বুঝে গেছি!
অবাক হয়ে মুসার দিকে তাকাল কিশোর আর রবিন। কি করে?
গার্ল স্কাউটের লীডার মেয়েটাকে দেখেছিলে না? ওর মাথায় বড় বড় চুল ছিল। আমার মনে হয় পরচুলা। পরচুলার নিচে করে নিয়ে গেছে বেল্টটা!
মুসার বুদ্ধি দেখে গোঙানি বেরোল কিশোরের।
রবিন বলল, খেয়ে খেয়ে মাথায় আর কিছু নেই ওর! পরচুলার নিচে করে গোল্ডেন বেল্ট? তা-ও যদি বলত চোরা খুপরিওয়ালা কোন লাঠির কথা— কিশোর, পেয়েছি! লাঠি! হ্যাঁ, এক বুড়োকে মোটা লাঠি হাতে দেখেছি সেদিন! নিশ্চয় ওটার চোরা খুপরির ভেতরে ভরে…
তোমাদের দুজনের মাথায়ই গোবর, থামিয়ে দিয়ে বলল কিশোর। পনেরো পাউণ্ড ওজনের তিন ফুট লম্বা একটা বেল্ট! হারটা হলে পরচুলা কিংবা লাঠির ভেতরে করে নিয়ে যেতে পারত। কিন্তু এতবড় বেল্ট…অসম্ভব! অন্য কিছু ভাব।
আর কিছু ভাবতে পারব না আমি, আবার মুখে জগ তুলল মুসা।
আমার মাথায়ও আর কিছু আসছে না! এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল রবিন। চুলোয় যাক গোল্ডেন বেল্ট! হ্যাঁ, এনসাইক্লোপীডিয়ায় দেখলাম, রত্নদানো—
..এখন না, গাড়িতে উঠে বল, চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল কিশোর। দেখি, বোরিস গাড়ি বের করল কিনা।
সামনের সিটে বোরিসের পাশে গাদাগাদি করে বসল তিন গোয়েন্দা। মিস ভারনিয়ার বাড়ির ঠিকানা দিল বোরিসকে কিশোর। ইয়ার্ড থেকে বেরিয়ে পথে উঠে এল হাফট্রাক, ছুটে চলল লস অ্যাঞ্জেলেস-এর শহরতলীর দিকে।
হ্যাঁ, এইবার বল, রবিন, রত্নদানোর ব্যাপারে কি কি জেনেছ? বলল কিশোর।
রত্নদানো হল, লেকচারের ভঙ্গিতে শুরু করল রবিন, এক ধরনের ছোট্ট জীব, মানুষের মতই দেখতে, কিন্তু স্বাভাবিক মানুষের চেয়ে অনেক ছোট, বামনদের সমান কিংবা তার চেয়েও ছোট। ওরা থাকে মাটির তলায়, গুপ্তধন খুঁজে বের

করাই ওদের কাজ। রত্নদানোদের সঙ্গে বাস করে কুৎসিত চেহারার আরেক জাতের জীব, গবলিন। গবলিনরা দক্ষ কামার। শাবল, কোদাল, গাঁইতি বানাতে ওদের জুড়ি নেই। স্বর্ণকার হিসেবেও ওরা ওস্তাদ। সোনা আর নানারকম মূল্যবান পাথর দিয়ে চমৎকার গহনা বানায় রত্নদানোদের রানী আর রাজকুমারীদের জন্যে।

এসব তো কিসসা! ঘঁউক করে এক ঢেকুর তুলল মুসা। আরিব্বাপরে, খাওয়াটা বেশিই হয়ে গেছে! থাকগে, রাতে দেরি করে খেলেই হবে!..হ্যাঁ, যা। বলছিলাম, রত্নদানো, গবলিন, এসব হল গিয়ে কল্পনা। মি:মিউথো...

মিথোলজি, বলে দিল কিশোর।

হ্যাঁ, মিথোলজির ব্যাপার-স্যাপার। বাস্তবে নেই। মিস ভারনিয়ার বাড়িতে আসবে কোত্থেকে? নড়েচড়ে বসল মুসা।

সেটাই তো জানতে যাচ্ছি আমরা।

কিন্তু রত্নদানো তো বাস্তবে নেই, আবার বলল মুসা।

কে বলল নেই? পথের দিকে নজর রেখে বলে উঠল বোরিস। ব্যাভারিয়ার ব্ল্যাক ফরেস্ট জায়গাটা খুব খারাপ!

দেখলে তো? হাসি চাপল কিশোর। রত্নদানো আছে, এটা বোরিস বিশ্বাস করে।

বোরিস করে, সেটা আলাদা কথা, পেটটা সামনের দিকে ঠেলে দিয়ে বিড়বিড় করল মুসা। বোতাম খুলে দেব নাকি প্যান্টের? যাকগে, হজম হয়ে যাবে একটু পরেই।-হ্যাঁ, এটা ব্ল্যাক ফরেস্ট নয়। আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ার-লস অ্যাঞ্জেলেস। এখানে রত্নদানো আসবে কোত্থেকে, কি করে?

হয়ত রত্ন খুঁজতেই এসেছে, মুসার হাঁসফাস অবস্থা দেখে হাসছে রবিন। ক্যালিফোর্নিয়ায় কি রত্ন নেই, সোনার গহনা নেই? ১৮৪৯ সালে সোনার খনিও পাওয়া গেছে ক্যালিফোর্নিয়ায়। খবরটা হয়ত অনেক দেরিতে পেয়েছে ওরা, তাই এতদিন পরে এসেছে। মাটির তলায় খবর যেতে দেরি হলে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

রত্নদানো থাকুক বা না থাকুক, হালকা কথাবার্তা থামিয়ে দিয়ে বলল কিশোর। রহস্যজনক কিছু একটা ঘটছে মিস ভারনিয়ার বাড়িতে, এটা ঠিক। ওখানে গেলেই হয়ত জানতে পারব।

শহরতলীর অতি পুরানো একটা অঞ্চলে এসে ঢুকল ওরা। গাড়ির গতি কমিয়ে রাস্তার নাম্বার খুঁজতে লাগল বোরিস। বিরাট একটা পুরানো বাড়ির কাছে এনে গাড়ি থামাল।

বাড়ি না বলে দুর্গ বলা চলে ওটাকে। অসংখ্য গম্বুজ, মিনার, স্তম্ভ রয়েছে। যেখানে সেখানে নকশা আর ফুল আঁকা হয়েছে সোনালি রঙ দিয়ে, বেশির ভাগ

জায়গায়ই বিবর্ণ হয়ে গেছে কিংবা চটে গেছে রঙ। অস্পষ্ট একটা সাইনবোর্ড পড়ে। বোঝা গেল ওটা একটা থিয়েটার-বাড়ি, মূরেরা তৈরি করেছিল। পুরানো। সাইনবোর্ডটার কাছেই আরেকটা নতুন সাইনবোর্ড-বারোতলা অফিস তৈরি হচ্ছে।
খানিকক্ষণ এদিক-ওদিক চেয়ে আবার গাড়ি ছাড়ল বোরিস। থিয়েটারের পর একটা উঁচু পাতাবাহারের বেড়া পেরিয়ে এল। পলকের জন্যে বেড়ার ওপাশে, অন্ধকার, সরু লম্বা একটা দালান চোখে পড়ল কিশোরের। বেড়ার পরে আরেকটা বাড়ি, একটা ব্যাংক, পুরানো ধাচের বাড়ি, পাথরে তৈরি দেয়াল।
আরেকটা ব্লকের কাছে চলে এল ট্রাক। এখানে একটা সুপারমার্কেট, দোকানগুলো পুরানো। অনেক আগে এটা বাণিজ্যিক এলাকা ছিল, বোঝাই যাচ্ছে।
বাড়িটা পেছনে ফেলে এসেছি, ব্যাংক আর সুপারমার্কেটের মাঝখানে বসানো পাথর ফলকে রাস্তার নাম্বার দেখে বলল কিশোর।
বেড়ার ওপাশের বাড়িটাই হবে, রবিন বলল। একমাত্র ওটাকেই বসতবাড়ির মত দেখতে লাগছে।
পিছিয়ে নিয়ে গিয়ে কোথাও পার্ক করুন, বোরিসকে বলল কিশোর।
খানিকটা পিছিয়ে এনে পাতাবাহারের বেড়ার ধারে গাড়ি পার্ক করল বোরিস। ছয় ফুট উঁচু গাছগুলো অযত্নে বেড়ে উঠেছে, মাথা সবগুলোর সমান নয়, রাস্তার ধুলোবালিতে আসল রঙ হারিয়ে গেছে রঙিন পাতার। বেড়ার ওপাশে পুরানো। বাড়িটার দিকে আবার তাকাল কিশোর, মনে হল, বাইরের ব্যস্ত দুনিয়া থেকে অনেক দূরে সরে আছে ওটা।
বেড়ার ধার ধরে হেঁটে গেল মুসা। খানিকটা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল সাদা রঙ করা ছোট একটা গেটের সামনে। চেঁচিয়ে উঠল, আরে, এই তো! মিস শ্যানেল। ভারনিয়া!
মুসার পাশে এসে দাঁড়াল কিশোর আর রবিন।
এটা একটা জায়গা হল! বলল মুসা। দুনিয়ায় এত জায়গা থাকতে এই ভূতের গলিতে এসে বাসা বাঁধলেন কেন মহিলা!...আরিসব্বোনাশ! কাণ্ড দেখেছ! আঙুল তুলে গেটের এক জায়গায় সাঁটানো কাগজ দেখাল সে। যাতে নষ্ট না হয়, সেজন্যে কাঁচ দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে, কিন্তু তবু রোদে হলদেটে হয়ে গেছে সাদা মোটা কাগজ। বিড়বিড় করে পড়ল মুসা, মানুষ হলে বেল বাজান, প্লীজ। রত্নদানো, বামন কিংবা খাটোভূত হলে শিস দাও। সেরেছে, কিশোর, পাগল! পাগলের পাল্লায় পড়তে যাচ্ছি! চল, ভাগি!
ভুরু কুঁচকে লেখাটার দিকে চেয়ে আছে কিশোর। বোঝা যাচ্ছে, ওই সব কল্পিত জীবগুলোর অস্তিত্ব বিশ্বাস করেন মিস ভারনিয়া। মুসা, এক কাজ কর, শিস

দাও…
ফিক করে হেসে ফেলল রবিন।
কী! চেঁচিয়ে উঠল মুসা! আমি কি রত্নদানো নাকি?
রত্নদানো না হলেও পেটুকদানো, এতে কোন সন্দেহ নেই। যা বলছি, কর। শিস দাও। দেখা যাক, কি ঘটে।
কিশোর ঠাট্টা করছে না বুঝতে পেরে আর প্রতিবাদ করল না মুসা। ঠোঁট গোল করে টানা তীক্ষ্ণ শিস দিয়ে উঠল।
বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। পাতাবাহারের ঝোঁপের ভেতরে কথা বলে। উঠল কেউ, কে?
প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাপারটা বুঝতে পারল কিশোর। ঝোঁপের ভেতরে স্পীকার লুকিয়ে রাখা হয়েছে। বাড়ির ভেতরে বসে স্পীকারের মাধ্যমে কথা বলছে কেউ। বড় বড় এলাকা নিয়ে লস অ্যাঞ্জেলেসে যে সব বাড়ি তৈরি হচ্ছে আজকাল, অনেক বাড়িতেই এই স্পীকারের ব্যবস্থা রয়েছে। এগিয়ে গিয়ে উঁকি দিল ঝোঁপের ভেতরে। কিছু দেখা গেল না। দুহাতে পাতা আর ডাল সরাতেই দেখা গেল জিনিসটা। পাখি। পোষার ছোট বাক্সে বসানো হয়েছে স্পীকার, বৃষ্টি থেকে রক্ষা করার জন্যে। মাইক্রোফোন বসানো রয়েছে স্পীকারের পাশেই।
গুড আফটারনুন, মিস ভারনিয়া, মার্জিত গলায় বলল কিশোর। আমরা তিন গোয়েন্দা। মিস্টার ক্রিস্টোফার পাঠিয়েছেন। আপনার সমস্যা নিয়ে কথা বলতে এসেছি আমরা।
ও, নিশ্চয় নিশ্চয়! তালা খুলে দিচ্ছি, মিষ্টি হালকা গলা।
গেটে মৃদু গুঞ্জন উঠল। বাড়ির ভেতরে বসেই নিশ্চয় সুইচ টেপা হয়েছে, মেকানিজম কাজ করতে শুরু করেছে পাল্লার, খুলে গেল ধীরে ধীরে।
আগে ভেতরে ঢুকল কিশোর। তার পেছনে মুসা আর রবিন।
পেছনে গেটটা আবার বন্ধ হয়ে যেতেই থমকে দাঁড়াল তিন গোয়েন্দা। ওদের মনে হল, বাইরের জগৎ থেকে আলাদা হয়ে গেল যেন। মাথা ছাড়িয়ে উঠে গেছে ছয় ফুট উঁচু বেড়া, রাস্তা দেখা যায় না। একপাশে পরিত্যক্ত থিয়েটার-বাড়ির পুরানো দেয়াল উঠে গেছে কয়েক তলা সমান উঁচুতে। আরেক পাশে ব্যাংকের গ্ল্যানেট পাথরের দেয়াল। দেয়াল বেড়া সবকিছু মিলে সরু পুরানো বাড়িটাকে গিলে ফেলার চেষ্টা চালাচ্ছে যেন। বাড়িটা তিনতলা, কিছু কিছু ঘরের দেয়াল রেডউড কাঠে তৈরি, কড়া রোদ বিবর্ণ করে দিয়েছে কাঠের রঙ। নিচের তলায় সামনের দিকে বারান্দা, কয়েকটা টবে লাগানো ফুল গাছে ফুল ফুটেছে, পুরো এলাকাটায়। তাজা উজ্জ্বল রঙ বলতে শুধু ওই ফুল কটাই।

একই সময়ে প্রায় একই অনুভূতি হচ্ছে তিনজনের। বাড়িটা দেখতে দেখতে ওদের মনে হল, রূপকথার পাতা থেকে উঠে এসেছে যেন কোন ডাইনীর বাড়ি।
কিন্তু মিস শ্যানেল ভারনিয়াকে মোটেই ডাইনীর মত লাগল না। সদর দরজা খুলে দাঁড়িয়েছেন। লম্বা, পাতলা শরীর, চঞ্চল চোখ, সাদা চুল।
এস, পাখির গলার মত মোলায়েম মিষ্টি কণ্ঠস্বর মিস ভারনিয়ার। তোমরা। আসাতে খুব খুশি হয়েছি। এস, ভেতরে এস।
লম্বা হলঘর পেরিয়ে বড়সড় লাইব্রেরিতে ছেলেদেরকে নিয়ে এলেন লেখিকা। দেয়াল ঘেঁষে বড় বড় আলমারি, বুক-শেলফ, বই উপচে পড়ছে। দেয়ালের জায়গায়। জায়গায় ঝোলানো রয়েছে সুন্দর পেইন্টিং আর ফটোগ্রাফ, সবই বাচ্চা ছেলেমেয়ের।
বস, তিনটে চেয়ার দেখিয়ে বললেন লেখিকা। হ্যাঁ, যে জন্যে ডেকেছি। তোমাদেরকে, কোনরকম ভূমিকা না করে শুরু করলেন তিনি। রত্নদানোরা বড় বিরক্ত করছে আমাকে। কয়েকদিন আগে পুলিশকে জানিয়েছিলাম, আমার দিকে যে-রকম করে তাকাল, রত্নদানোর কথা বলতে আর কোনদিন যাব না ওদের কাছে...।
হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল রবিন। আর্মচেয়ারে আরাম করে বসেছিল, এখন সোজা হয়ে গেছে পিঠ, জানালার দিকে চেয়ে আছে। চোখে অবিশ্বাস। জানালার বাইরে একটা ছোট্ট মানুষের মত জীব! মাথায় টোপরের মত টুপি। বিচ্ছিরি দাড়িতে মাটি লেগে আছে, কাঁধে একটা ঝকঝকে গাঁইতি। মুখ ভয়ানক বিকৃত, চোখ লাল।

.

রত্নদানো! চেঁচিয়ে বলল রবিন। আমাদের ওপর নজর রাখছিল!
কই, কোথায়! প্রায় একই সঙ্গে বলে উঠল মুসা আর কিশোর।
ওই যে, ওখানে, জানালার বাইরে ছিল! আঙুল তুলে জানালাটা দেখাল। রবিন। চলে গেছে! হয়ত আঙিনায়ই আছে এখনও!
তড়াক করে লাফিয়ে উঠে ছুটল রবিন ও তার পেছনে কিশোর, সবার পেছনে মুসা। দুটো আলমারির মাঝের ফাঁকে একটু অন্ধকার মত জায়গায় রয়েছে। জানালাটা। চোখ মিটিমিটি করে তাকাল রবিন, হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখল মসৃণ কাঁচ।
আয়না, বলল কিশোর। প্রতিবিম্ব দেখেছ, রবিন।
ফিরে তাকাল অবাক রবিন। মিস ভারনিয়াও উঠে দাঁড়িয়েছেন। আয়নার উল্টো দিকের একটা জানালা দেখালেন তিনি। আয়নার দিকে আঙুল তুলে বললেন, ওদিকটা অন্ধকার হয়ে থাকে, তাই আয়না বসিয়েছি। জানালার আলো প্রতিফলিত করে।

ছুটে খোলা জানালার কাছে চলে এল ছেলেরা। মাথা বাড়িয়ে বাইরে উঁকি দিল। কিশোর, আঙিনাটা দেখল। কেউ নেই!
কিশোরের পাশে দাঁড়িয়ে মুসাও জানালার বাইরে মাথা বের করে দিল। নাহ্, কেউ নেই আঙিনায়! রবিন, তুমি ঠিক দেখেছিলে তো?
জানালার নিচে তাকাল রবিন, শূন্য থিয়েটার-বাড়ির উঁচু দেয়াল দেখল। কোথাও কিছু নেই। দাড়িওয়ালা রত্নদানোর ছায়াও চোখে পড়ছে না।
আমি ওকে দেখেছি! দৃঢ়কণ্ঠে বলল রবিন। নিশ্চয় বাড়ির আশপাশে কোথাও লুকিয়ে পড়েছে। গেট বন্ধ, বাইরে যেতে পারবে না। খুঁজলে এখনও হয়ত পাওয়া যেতে পারে ওকে।
পাবে না, কারণ ওটা রত্নদানো, বলে উঠলেন মিস ভারনিয়া। জাদুবিদ্যায় ওস্তাদ ওরা।
কিন্তু তবু খুঁজে দেখতে চাই, বলল কিশোর। পেছনে কোন গেট-টেট আছে?
মাথা ঝাঁকাল লেখিকা। তিন গোয়েন্দাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এলেন বাড়ির পেছনের আরেকটা ছোট বারান্দায়। ওখান থেকে আঙিনায় নেমে পড়ল ছেলেরা।
মুসা, তুমি বয়ে যাও, নির্দেশ দিল কিশোর। রবিন, তুমি এস আমার সঙ্গে। ডানে যাব।
তেমন বিশেষ কোন জায়গা নেই, যেখানে লুকিয়ে থাকতে পারেরত্নদানো। আঙিনায় ছোট ছোট কয়েকটা ঝোঁপ। বাড়ির পেছনে কাঠের বেড়া, বেড়ার ওপাশে সরু গলি। বেড়ায় কোন ফোকর নেই, যেখান দিয়ে গলে বেরোতে পারে রত্নদানো। পেছনে একটা গেট আছে, তালাবদ্ধ। পুরানো, মরচে ব্রা লোহার গেট, দেখেই বোঝা যায়, অনেক বছর ধরে খোলা হয়নি। ওই গেট পেরোলেই থিয়েটার-বাড়ির সীমানা।
ওদিক দিয়ে যায়নি, মাথা নাড়ল রবিন।
যত ছোটই হোক, তবু সবকটা ঝোঁপ খুঁজল রবিন আর কিশোর, নিচতলায় ভাঁড়ারের জানালাগুলো পরীক্ষা করল বাইরে থেকে। জানালার পাল্লাগুলো অসম্ভব। নোংরা, দীর্ঘদিন খোলাও হয়নি, পরিষ্কারও করা হয়নি। বাড়ির সামনের দিকে বেড়ার ধারে চলে এল দুজনে। পুরো-বেড়াটা পরীক্ষা করল, কোথাও ফোকর নেই, ঠাসাঠাসি করে দাঁড়িয়ে আছে পাতাবাহারের গাছ। বামন-আকৃতির একটা মানুষেরও আঙিনা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কোন পথ নেই, একমাত্র গেট ছাড়া।
তাহলে? যেন বাতাসে মিলিয়ে গেছে রত্নদানো!
মুসাও ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছে।

চল তো, কিশোর বলল। জানালার নিচে পায়ের দাগ আছে কিনা দেখি।
লাইব্রেরি ঘরের যে জানালায় রত্নদানো দেখেছে রবিন, সেটার নিচে চলে এল তিনজনে। শুকনো কঠিন মাটি, পায়ের ছাপ নেই, পড়েনি।
নেই! দেখতে দেখতে বলল কিশোর। আরেকটা রহস্য!
মানে! ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করল রবিন।
উবু হয়ে মাটি থেকে কিছু তুলে নিল কিশোর। এই যে, দেখ, আলগা মাটি। জুতোর তলা থেকে খসে পড়েছে।
মিস ভারনিয়ার টবের মাটিও হতে পারে, বলল রবিন। কোনভাবে পড়েছে এখানে।
সম্ভাবনা কম, ওপর দিকে চেয়ে আছে কিশোর। জানালাটা দেখ। চৌকাঠের নিচটাও আমাদের মাথার ওপরে। রবিন, খুব ছোট একটা মানুষকে দেখেছিলে, না?
মানুষ না, রত্নদানো! জবাব দিল রবিন, ফুট তিনেক লম্বা! মাথায় টোপরের মত টুপি, নোংরা দাড়ি, কাঁধে ধরে রেখেছে গাঁইতি। ওর কোমর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল। এমনভাবে চেয়ে ছিল আমার দিকে, যেন ভীষণ রেগে গেছে।
তা কি করে হয়? নিজেকেই যেন প্রশ্ন করল কিশোর। জানালার চৌকাঠ মাটি থেকে ছয় ফুট উঁচুতে। তিন ফুট লম্বা রত্নদানোর কোমর দেখা যাবে কিভাবে? ওর মাথাই তো দেখা যাওয়ার কথা না!
প্রশ্নটা প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিল রবিন আর মুসাকে।
হয়ত মই, খানিকক্ষণ চুপ করে ভেবে বলল মুসা। হয়ত কেন, নিশ্চয়ই মই!
নিশ্চয়! ব্যঙ্গ প্রকাশ পেল কিশোরের গলায়। ভাঁজ করে এই এত্তোটুকুন করে সেই মই পকেটে ভরে ফেলা যায়! তোমার কি ধারণা? মই পকেটে নিয়ে ফোর্থ ডাইমেনশনের কোন গর্তে ঢুকে পড়েছে দানোটা?
কিশোরের কথার ধরনই অমনি, রাগ করল না মুসা। মাথা চুলকাতে লাগল।
ভ্রুকুটি করল রবিন। ওরা জাদু জানে। জাদুর বলে বাংলাদশে ভানুমতির খেল দেখিয়ে ভ্যানিশ হয়ে গেছে।
আমার মনে হয় আসলে কিছু দেখনি তুমি, রবিন, বলল কিশোর। হয়ত কল্পনা করেছ, মানে, কল্পনার চোখে দেখেছ।
আমি ওটা দেখেছি! জোর দিয়ে বলল রবিন। ওর চোখও দেখেছি! টকটকে লাল, জ্বলন্ত কয়লার মত জ্বলছিল!
লাল চোখওয়ালা রত্নদানো! ইয়াল্লা! গুঙিয়ে উঠল মুসা। রবিন, দোহাই তোমার, বল, ওটা তোমার কল্পনা!

বার বার ছাগলকে কুকুর বলছে ওরা!-নিজের দৃষ্টিশক্তির ওপর সন্দিহান হয়ে উঠল রবিন। তাই তো, বেশিক্ষণ তো দেখিনি ওটাকে। মাত্র এক পলক! কি জানি! গলায় আর আগের জোর নেই তার। মনে তো হল, দেখেছি! কিন্তু-কি জানি, কল্পনাও হতে পারে! তখন অবশ্য এনসাইক্লোপীডিয়ায় দেখা রত্নদানোর ছবির কথা ভাবছিলাম। নাহ্, খুব সম্ভব কল্পনাই করেছি!
কল্পিত জীবকে পাওয়া যাওয়ার কথা না, দ্বিধায় পড়ে গেছে কিশোর। কিন্তু যদি সত্যি দেখে থাক, তাহলে জাদু জানে ব্যাটা! গায়েব হওয়ার মন্ত্র!
এছাড়া বেরোবে কি করে আঙিনা থেকে? যোগ করল মুসা।
চল, ঘরে যাই, বলল কিশোর। মিস ভারনিয়ার কথা শুনিগে। এখানে দাঁড়িয়ে থেকে আর লাভ নেই।
সামনের বারান্দা দিয়ে আবার ঘরে ঢুকল ওরা। হল পেরিয়ে লাইব্রেরিতে এল।
ওকে পাওনি তো? জিজ্ঞেস করলেন লেখিকা।
নাহ, মাথা নাড়ল রবিন। গায়েব!
আমি জানতাম, পাবে না, মাথা দুলিয়ে বললেন মিস ভারনিয়া। রত্নদানোরা ওরকমই, এই আছে এই নেই! তবে আমিও অবাক হয়েছি, দিনের বেলায় আসতে দেখে। দিনের আলোয় সাধারণত বেরোয় না ওরা। যাকগে, এস আগে চা খেয়ে নিই। তারপর বলল, কি কি ঘটেছে।
চীনামাটির কেটলি থেকে কাপে চা ঢালতে ঢালতে বললেন লেখিকা, আশা করি তোমরা আমাকে সাহায্য করতে পারবে। ক্রিস্টোফারের খুব ভাল ধারণা তোমাদের ওপর। কয়েকটা অদ্ভুত রহস্য নাকি ভেদ করেছ।
তা করেছি, সবার আগে কাপ টেনে নিয়ে চায়ে প্রচুর পরিমাণে দুধ আর চিনি। মেশাতে লাগল মুসা। তবে বেশির ভাগ কৃতিত্বই কিশোরের, তাই না, রবিন?
অন্তত আশি পার্সেন্ট, গম্ভীর গলায় বলল নথি। বাকি বিশ পার্সেন্ট আমাদের দুজনের। কিশোর, ঠিক না? এই, কিশোর?।
পাশের একটা কাউচে পড়ে থাকা খবরের কাগজের হেডলাইনে মনোযোগ কিশোরের। রবিনের ডাকে মুখ না ফিরিয়েই বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, মিস ভারনিয়া, রবিন। আর মুসার সাহায্য ছাড়া একটা রহস্য ভেদ করতে পারতাম না।
মিউজিয়মের খবরটা দেখছ মনে হচ্ছে? চা আর বিস্কুট বাড়িয়ে ধরে কিশোরকে বললেন মিস ভারনিয়া। কি যে হয়েছে দিনকাল! চারদিকে খালি গোলমাল আর গোলমাল! রহস্যের ছড়াছড়ি!
একটা বিস্কুট আর কাপটা নিল কিশোর। এক কামড় বিস্কুট ভেঙে চিবিয়ে চা দিয়ে গিলে নিল। গোল্ডেন বেল্টটা যখন চুরি হয়, তখন মিউজিয়মেই ছিলাম।

আমরা, সে এক তাজ্জব কাণ্ড! সাহায্য করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু রাজি হলেন না সিকিউরিটি ইনচার্জ। আমরা নাকি বড় বেশি ছেলেমানুষ।
ভাগিয়ে দিলেন, সেকথা বলছ না কেন? একসঙ্গে দুটো বিস্কুট মুখে পুরেছে মুসা, কথা অস্পষ্ট।
আরে, এ কি! মুসার দিকে চেয়ে বলে উঠল কিশোর। এই না একটু আগে হাঁসফাস করছিলে বেশি খেয়ে ফেলেছিলে বলে?
ও হ্যাঁ, তাই তো! কিশোর মনে করিয়ে দেয়ায় যেন মনে পড়ল মুসার। পেটে হাত রাখল। প্লেট থেকে বড় আকারের আরও গোটা চারেক বিস্কুট একসঙ্গে তুলে নিয়ে বলল, এই কটাই, ব্যস, আর খাব না। আরে, এত উত্তেজনা, পেটের কথা মনে থাকে নাকি?
মুচকি হাসল কিশোর।
আরে থাক, থাক, বললেন মিস ভারনিয়া। ছেলেমানুষ, এই তো তোমাদের খাওয়ার বয়েস।—হ্যাঁ, যা বলছিলাম। ইনচার্জ তোমাদেরকে ভাগিয়ে দিয়ে উচিত। করেনি। তবে আমার জন্যে ভালই হল। তোমরা অন্যখানে ব্যস্ত থাকলে আমার এখানে আসতে পারতে না। খাও, চা-টা আগে শেষ কর, তারপর কথা হবে।
মিস ভারনিয়ার ভরসা পেয়ে পুরো প্লেট খালি করে দিল মুসা। আরেক কাপ চা নিয়ে আবার দুধ আর চিনি মেশাতে শুরু করল।
পুরানো দিনের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে! বললেন লেখিকা। আহা, কি সব দিনই না ছিল। কতদিন পর আবার ছেলেদের সঙ্গে বসে চা খাচ্ছি! পুরো একটা হপ্তাও পেরোত না, টি-পার্টি দিতাম, রত্নদানো, বামন আর খাটোভূতদের নিয়ে।
বিষম খেল মুসা। গলায় চা আটকে যাওয়ায় কাশতে শুরু করল। বিস্কুটে কামড় বসিয়ে মাঝপথেই থেমে গেল রবিন।
শুধু কিশোরের অবস্থা স্বাভাবিক রইল। শান্ত কণ্ঠে বলল, প্রতিবেশী বাচ্চাদের দাওয়াত করতেন, না? ওদের নামই দিয়েছেন রত্নদানো, বামন আর খাটোভূত?
নিশ্চয়। হাসি ফুটল লেখিকার মুখে। খুব চালাক ছেলে তো তুমি! কি করে। বুঝলে?
ডিডাকশন, খালি কাপটা টিপয়ে নামিয়ে রাখল কিশোর। দেয়ালে ঝোলানো ছবিগুলো দেখিয়ে বলল, সব বাচ্চাদের ছবি। পোশাক-আশাক পুরানো ছাঁটের, এখন আর ওসব ডিজাইন কেউ পরে না। কোন কোন ছবির নিচে লেখা দেখলাম: প্রিয় মিস ভারনিয়াকে। আপনি একজন লেখিকা, কল্পিত জীব নিয়ে অনেক বই লিখেছেন, সবই বাচ্চাদের জন্যে। দুটো বই পড়েছি আমি। দারুণ বই। রত্নদানো আর খাটোভূতের চরিত্রগুলো সব মানুষের বাচ্চার মত। ধরেই নিলাম, আদর করে আপনার বাচ্চা বন্ধুদেরকে ওসব নামে ডাকেন। হাঁ হয়ে গেছে রবিন আর

মুসা। ওই দুটো বই ওরাও পড়েছে, দেয়ালে টাঙানো ছবিগুলোও দেখেছে। কিন্তু কিশোরের মত ভেবেও দেখেনি, গুরুত্বও দেয়নি।
ঠিক, ঠিক বলেছ। আনন্দে বাচ্চা মেয়ের মত হাততালি দিয়ে উঠলেন মিস ভারনিয়া। তবে একটা ব্যাপার ভুল বলেছ। বামন কিংবা খাটোভূত কল্পিত হতে পারে, কিন্তু রত্নদানোরা নয়। ওরা বাস্তব। আমি শিওর। একটু থেমে বললেন, আমার বাবার যথেষ্ট টাকা-পয়সা ছিল। আমি যখন বাচ্চা ছিলাম, আমার জন্যে একজন গভর্নেস রেখে দিয়েছিলেন বাবা। কি সব সুন্দর সুন্দর গল্প যে জানত মহিলা! আমাকে শোনাত। ব্ল্যাক ফরেস্টে রত্নদানো আর বামনেরা বাস করে, ওই মহিলাই প্রথম বলেছে আমাকে। বড় হয়ে তার মুখে শোনা অনেক গল্প নিজের মত করে লিখেছি। একটা বই উপহার দিয়েছিল আমাকে মহিলা। বইটা জার্মান ভাষায় লেখা। হয়ত বুঝবে না তোমরা, কিন্তু ছবি বুঝতে কোন অসুবিধে নেই। নিয়ে। আসছি বইটা।
উঠে গিয়ে শেলফ থেকে চামড়ায় বাঁধাই করা মোটা, পুরানো একটা বই নিয়ে এলেন মিস ভারনিয়া। প্রায় দেড়শো বছর আগে জার্মানীতে ছাপা হয়েছিল এ-বই। ছেলেরা ঘিরে বসলে এক এক করে পাতা উল্টাতে শুরু করলেন তিনি। লেখক অনেক দিন বাস করেছেন ব্ল্যাক ফরেস্টে। রত্নদানো, বামন আর খাটোভূতদের নাকি তিনি দেখেছেন। নিজের হাতে ছবি এঁকেছেন ওগুলোর। এই যে, এই ছবিটা দেখ।
পুরো পৃষ্ঠা জুড়ে একটা ড্রইং। কুৎসিত চেহারার একটা মানুষ যেন। মাথায় চূড়া আর বারান্দাওয়ালা চামড়ার টুপি, হাত-পায়ে বড় বড় রোমি। কাঁধে ধরে রেখেছে একটা ছোট গাইতি। লাল চোখ, যেন জ্বলছে। রেগে আছে যেন কোন কারণে।
ঠিক একটা...মানে এই চেহারাই দেখেছি জানালায়! চেঁচিয়ে উঠল রবিন।
লেখক এর নাম দিয়েছেনরত্নদানোর দুষ্ট রাজা! বলে গেলেন মিস ভারনিয়া। কিছু কিছু রত্নদানো আছে, যারা খুবই খারাপ। তবে ভাল রত্নদানোও আছে। যারা খারাপ, লেখকের মতে, তাদের চোখ লাল হয়ে যায়।
খাইছে! বিড়বিড় করল মুসা।
খারাপটাকেই দেখেছি তাহলে! আপনমনেই বলল রবিন। রত্নদানো সত্যিই দেখেছে, এই বিশ্বাস আবার ফিরে আসছে তার।
পাতা উল্টে সাধারণ পোশাক পরা আরও কিছু রত্নদানোর ছবি দেখালেন মিস ভারনিয়া। ঠিক এই ধরনের পোশাক পরা রত্নদানো দেখেছি আমি কয়েকটা, আস্তে বইটা বন্ধ করে রেখে দিলেন তিনি। ছবি তো দেখাই আছে, তাই ব্যাটাদেরকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে চিনেছি। যা যা ঘটেছে, সবই বলব। তবে আগে অন্যান্য কথা কিছু বলে নিই। পুরানো দিনের কথা, যখন খোকা-খুকুদের জন্যে

আমি লিখতাম। দীর্ঘশ্বাস পড়ল লেখিকার, অতীতের সোমালি দিনগুলোর কথা মনে পড়ে যাওয়াতেই বোধহয়। অল্প বয়েস থেকেই লিখতে শুরু করি আমি। বাবা-মা মারা গেলেন, তখন নামডাক ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে আমার। ভাল পয়সা আসতে শুরু করল। এসব অনেক আগের কথা, তোমাদের জন্মও হয়নি তখন। আমার বাড়ি খুঁজে বের করত বাচ্চারা, আমার সঙ্গে আলাপ করতে আসত, আমার সই নিতে আসত। বাচ্চাদেরকে ভালবাসি আমি, তাই আশপাশের বাড়ির যত বাচ্চা ছিল, সবাই ছিল। আমার বন্ধু। ধীরে ধীরে সময় বদলাল, পরিবেশ বদলাল। পুরো অঞ্চলটা বদলে গেল কি করে, কি করে জানি! পুরানো বাড়িঘর সব ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়া হল, ভাল ভাল গাছপালা কেটে সাফ করে ফেলা হল, বসত বাড়ির জায়গায় দিনকে দিন। গজিয়ে উঠতে লাগল দোকানপাট। আমার বাচ্চা বন্ধুরা যেন হুড়মুড় করে বড় হয়ে। গেল, কে যে কোথায় চলে গেল তারপর, জানি না। অনেকেই আমাকে এখান থেকে সরে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে, কিন্তু পারলাম না। কিছুতেই এই পরিচিত বাড়িটা বিক্রি করে যেতে পারলাম না। যাবও না। যতদিন বাঁচব, এখানে, এই বাড়িতেই থাকব। এখানে কেন পড়ে আছি, বোঝাতে পেরেছি তোমাদেরকে?

তিনজনেই মাথা নোয়াল একবার।

বদলেই চলেছে সবকিছু, আবার বললেন মিস ভারনিয়া। বেশ কয়েক বছর আগে বন্ধ হয়ে গেছে থিয়েটারটা। ফলে লোক সমাগমও অনেক কমে গেছে, আগের চেয়ে, প্রায় নির্জনই বলা চলে এখন অঞ্চলটাকে। গেটে কার্ড লাগিয়ে দিয়েছি আমি। পুরানো বন্ধুদের কেউ যদি কখনও আসে, শিস দিয়ে আমাকে ডাকবে। এটাই নিয়ম ছিল, এভাবেই ডাকত আমার রত্নদানো, বামন আর খাটোভূতেরা। লেখিকার চোখের কোণ টলমল করছে। জান, এখনও কালেভদ্রে ওদের কেউ না কেউ আসে, শিস দিয়ে ডাকে আমাকে। ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিই। কিন্তু আগের সেই নিষ্পাপ ফুলগুলোকে আর দেখি না! ওরা আজ অনেক বড়! চুপ করলেন মিস ভারনিয়া। চুপ করে রইল তিন গোয়েন্দা।

যাব না যাব না, বলছি বটে, কিন্তু যাবার দিন হয়ত এসে গেছে আমার, বললেন মিস ভারনিয়া। আমাকে সরে যেতে বাধ্য করবে ওরা। ইতিমধ্যেই কয়েকবার প্রস্তাব নিয়ে এসেছে মিস্টার রবার্ট। আমার জায়গাটা কিনে নিতে পারলে তার সুবিধে হয়। কিন্তু মুখের ওপর মানা করে দিয়েছি। ওরা বুঝতে পারে না, আমি এখানে জন্মেছি, বড় হয়েছি, জীবনের সোনালি দিনগুলো আমার এখানেই কেটেছে, এই জায়গা ছেড়ে আমি কি করে যাই? আমার খাটোভূতদের স্মৃতি যে জড়ানো রয়েছে এর প্রতিটি ইটকাঠে!

মহিলাকে বাড়ি ছাড়া করতে খুব কষ্ট হবে মিস্টার রবার্টের, বুঝতে পারল তিন গোয়েন্দা। আদৌ পারবে কিনা, তাতেও যথেষ্ট সন্দেহ আছে।
আরেক কাপ চা ঢেলে নিলেন মিস ভারনিয়া। আমার অতীত নিয়ে বড় বেশি বকবক করে ফেলেছি, না? হয়ত তোমাদের খারাপ লাগছে। কিন্তু কতদিন পর মন খুলে কথা বলার সুযোগ পেয়েছি! উহ, কতদিন! কাপে চুমুক দিলেন তিনি। থাক। এখন ওসব কথা। কাজের কথায় আসি। মাত্র কয়েক রাত আগে, হ্যাঁ, মাত্র কয়েক রাত। রত্নদানোদের দেখেছি আমি। না না, আমার বাচ্চা বন্ধু নয়, সত্যিকারের দানো!
খুলে বলুন, প্লীজ, অনুরোধ করল কিশোর। রবিন, নোট নাও।
পকেট থেকে নোটবই আর পেন্সিল বের করল রবিন।
বয়েস হয়েছে, বললেন মিস ভারনিয়া। কিন্তু ঘুম ভালই হয় আমার এখনও। কয়েক রাত আগে, অদ্ভুত একটা শব্দ শুনে মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। নরম মাটিতে গাঁইতি চালাচ্ছে যেন কেউ, এমনি শব্দ।
মাঝরাত? গাঁইতি? ভুরু কুঁচকে বলল কিশোর।
হ্যাঁ। প্রথমে ভেবেছি, ভুল শুনেছি। রাতদুপুরে মাটি কাটতে আসবে কে? একমাত্র…
…রত্নদানোরা ছাড়া! বাক্যটা সমাপ্ত করে দিল মুসা।
হ্যাঁ, রত্নদানো ছাড়া! মাথা ঝাঁকালেন মিস ভারনিয়া। উঠে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম! ওমা! আঙিনায় চারটে খুদে মানুষ! একেবারে ছবিতে যে-রকম দেখেছি, তেমনি পোশাক পরা। লাফাচ্ছে ওরা, নাচানাচি করছে, খেলছে আনন্দে! ডাকলাম। সঙ্গে সঙ্গে ভোজবাজির মত গায়েব হয়ে গেল জীবগুলো! ছেলেদের মুখ দেখে বোঝার চেষ্টা করলেন লেখিকা, তার কথা বিশ্বাস করছে কিনা ওরা। আমি স্বপ্ন দেখিনি। পরের দিন পরিচিত এক কনস্টেবলকে রাস্তায় দেখে তাকে ডেকে বললাম সব কথা। কি একখান চাউনি যে দিল আমাকে! আহ, যদি দেখতে! ক্ষণিকের জন্যে ঝিক করে উঠল মহিলার নীল চোখের তারা। আমাকে উপদেশ দিল ব্যাটা! নিজের শরীরের প্রতি খেয়াল রাখতে বলল। শিগগিরই বাইরে কোথাও গিয়ে বেড়িয়ে আসতে বলল। ওকেও আচ্ছামত কথা শুনিয়েছি আমি। ওর সামনেই প্রতিজ্ঞা করেছি, রত্নদানোর কথা আর কক্ষণো বলব না পুলিশকে।
এক মুহূর্ত চুপ থেকে হঠাৎ হেসে উঠলেন মিস ভারনিয়া। আসলে পুলিশেরও দোষ দেয়া উচিত না। রাতদুপুরে রত্নদানো দেখেছি, একথা বললে কে বিশ্বাস করতে চাইবে? যাই হোক, সেদিন জোর করেই মনকে বোঝালাম, রত্নদানো দেখিনি। ওসব আমার কল্পনা। দ্বিতীয় রাত গেল, কিছু ঘটল না। তৃতীয় রাতে আবার

দেখলাম ওদের। একই সময়ে, একই জায়গায়। তাড়াতাড়ি ফোন করে বললাম আমার এক ভাইপোকে। বব, আমার একমাত্র ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। বিয়ে করেনি এখনও, মাইল কয়েক দূরে একটা অ্যাপার্টমেন্ট নিয়ে থাকে সে। ওকে অনুরোধ করলাম আসতে। অবাক হল, কিন্তু আসবে বলে কথা দিল। ভাঁড়ারে দানোদের হুটোপুটির আওয়াজ পেলাম। টর্চটা নিয়ে পা টিপে টিপে নিচে নামলাম, এগোলাম ভাঁড়ারের দিকে। যতই এগোলাম, শব্দ আরও স্পষ্ট হতে থাকল। ঘরে ঢুকেই টর্চের সুইচ টিপে দিলাম। কি দেখলাম জান?

মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনছে তিন ছেলে। একই সঙ্গে বলে উঠল, কী!

তিনজনের দিকেই একবার করে তাকালেন মিস ভারনিয়া। স্বর খাদে নামিয়ে বললেন, কিছু না!

চেপে রাখা শ্বাস শব্দ করে ছাড়ল রবিন। পুরোপুরি হতাশ হয়েছে।

হ্যাঁ, প্রথমে কিছু না! আবার বললেন মিস ভারনিয়া। টর্চ নিভিয়ে দিলাম। আবার ওপরে উঠে যাওয়ার জন্যে ঘুরতেই দেখলাম ওটাকে। ছোট একটা মানুষের। মত জীব, ফুট তিনেক লম্বা। চামড়ার টুপি, চামড়ার কোট-প্যান্ট, চোখা মাথাওয়ালা জুতো। নোংরা দাড়ি, বোধহয় মাটি লেগেছিল। এক হাতে একটা গাঁইতি কাঁধে ধরে রেখেছে, আরেক হাতে মোমবাতি। মোমের আলোয় ওর চোখ দেখতে পেলাম, টকটকে লাল, যেন জ্বলছে!

ঠিক! ওই ব্যাটাকেই খানিক আগে দেখেছি আমি! আবার চেঁচিয়ে উঠল। রবিন।

রত্নদানো। কোন সন্দেহ নেই, সায় দিয়ে বললেন মিস ভারনিয়া।

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর। গভীর চিন্তায় মগ্ন।

তারপর? হঠাৎ প্রশ্ন করল গোয়েন্দাপ্রধান।

কাপে চুমুক দিলেন মিস ভারনিয়া, অল্প অল্প কাঁপছে তাঁর হাত। আমার দিকে চেয়ে ফুঁসে উঠল দানোটা। গাঁইতি বাগিয়ে শাসাল। তারপর এক ফুয়ে বাতি নিভিয়ে দিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দড়াম করে বন্ধ হল দরজার পাল্লা। ছুটে গেলাম দরজার কাছে। বন্ধ! বাইরে থেকে আটকে দেয়া হয়েছে। ভাঁড়ারে আটকা পড়লাম আমি!

কিছু একটা বলার জন্যে মুখ খুলল মুসা, থেমে গেল। ঘরের দূর প্রান্তে ঝনঝন। শব্দ উঠল। আলোচনায় এতই মগ্ন ছিল ওরা, চমকে উঠল ভীষণভাবে।

সর্বনাশ! কণ্ঠস্বরে মনে হল মিস ভারনিয়ার গলা চেপে ধরেছে যেন কেউ। হল কি?...আরে! আমার ছবিটা পড়ে গেছে।

ছুটে গেল তিন গোয়েন্দা। মেঝেতে পড়ে আছে সোনালি ধাতব ফ্রেমে বাঁধাই করা একটা বড়সড় ছবি। ছবিটা চিৎ করল কিশোর। মিস ভারনিয়ার সুন্দর একটা, ছবি, তরুণী ছিলেন তখন তিনি।

আমার বইয়ের ছবি আঁকত যে শিল্পী, বললেন লেখিকা, সে-ই এই ছবিটা এঁকে দিয়েছিল।
ছবিতে ঘাসের ওপর বসে বই পড়ছেন মিস ভারনিয়া, তাকে ঘিরে বসে আছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়ের দল, লেখিকার রত্নদানো, বামন, আর খাটোভূত।
ওপর দিকে তাকাল কিশোর। ছাতের হুক থেকে ঝুলছে একটা সরু শেকল, ওটাতেই ঝোলানো ছিল ছবিটা। কোন কারণে শেকল ছিঁড়ে পড়েছে, ফ্রেমের সঙ্গে লাগানো আছে শেকলের ছেঁড়া একটা অংশ।
ছেঁড়া মাথাটা ভালমত পরীক্ষা করল কিশোর, মুখের ভাব বদলে গেল। মিস ভারনিয়া, শেকলটা ছিঁড়ে পড়েনি। লোহাকাটা করাত দিয়ে কেটে রাখা হয়েছিল। এমনভাবে, যাতে ছবিটা ঝুলে থাকে কিছুক্ষণ, তারপর বাতাসে বা অন্য কোনভাবে নাড়া লাগলেই খসে পড়ে।
বল কি! রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছলেন লেখিকা। রত্নদানো! নিশ্চয় রত্নদানোর কাজ! যে-রাতে—ও, এখনও আসিনি সে-কথায়।
শেকল জোড়া লাগিয়ে আবার ঝুলিয়ে দিচ্ছি ছবিটা। কাজ করতে করতে আপনার কথা শুনব।—ও হ্যাঁ, প্লয়ার্স আছে?
আছে।
কিশোর আর মুসা শেকল জোড়া লাগাতে বসে গেল। মিস ভারনিয়া তাঁর। কাহিনী বলে গেলেন, নোট নিতে থাকল রবিন।
সে-রাতে ভাঁড়ারে আটকা পড়েছিলেন মিস ভারনিয়া। তাঁর ভাইপো এসে দরজার ছিটকিনি খুলে তাকে উদ্ধার করল। ফুফুর কাহিনী মন দিয়ে শুনল বুব, কিন্তু এক বিন্দু বিশ্বাস করল না। অবশেষে আস্তে করে বলল, কোন চোর-টোর ঢুকেছিল বাড়িতে, সেই দরজা আটকে দিয়েছে…
এক মিনিট, মিস ভারনিয়া, হাত তুলল কিশোর। ছবিটা আবার তুলে দিই, তারপর শুনব বাকিটা।
একটা চেয়ারে উঠে দাঁড়াল মুসা। ছবিটা তার হাতে তুলে দিল কিশোর। রবিন দেখল, হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে কিশোরের মুখ। এই উজ্জ্বলতার কারণ জানে নথি। নিশ্চয় কোন বুদ্ধি এসেছে গোয়েন্দাপ্রধানের মাথায়।
কি হল, কিশোর? কাছে গিয়ে মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল রবিন।
শেকল জোড়া লাগিয়ে ছবিটা আবার আগের জায়গায় ঝুলিয়ে দিয়ে চেয়ার থেকে নেমে এল মুসা।
রবিনের দিকে চেয়ে হাসল কিশোর। মনে হয় গোল্ডেন বেল্ট রহস্যের কিনারা করে ফেলেছি, ফিসফিস করে বলল।

তাই। বল, বল! চেঁচিয়ে উঠতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিল রবিন। কি করে কোন্ পথে চুরি করল?
পরে, এখন বলার সময় না। মিস ভারনিয়ার কথা শেষ হয়নি এখনও, সেটা শুনি আগে।
হতাশ হল রবিন। জানে, এখন আর চাপাচাপি করে লাভ নেই। কিশোরের সময় না হলে সে কিছুই বলবে না। মিস ভারনিয়ার ছবিটার দিকে চেয়ে বোঝার চেষ্টা করল কি করে চুরি হয়েছে গোল্ডেন বেল্ট, কিছুই বুঝতে না পেরে হাল ছেড়ে দিল। আবার গিয়ে আগের জায়গায় নোট লিখতে বসল।
ওর অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে আমাকে রাতে থাকতে বলল বব, আবার শুরু করলেন মিস ভারনিয়া। রাজি হলাম না। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল বব, রত্নদানোরা আর এল না। রহস্যজনক শব্দও হল না। শেষে চলে গেল সে। সে রাতে আর কিছুই ঘটল না। পরের রাতে আবার রহস্যময় শব্দ শুনলাম। একবার ভাবলাম, ববকে ফোন করি, কিন্তু আগের রাতে তার হাবভাব যে-রকম দেখেছি, আর ডাকতে ইচ্ছে হল না। পা টিপে টিপে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলাম নিচের তলায়। লাইব্রেরিতে খুটখাট ধুপধাপ শব্দ হচ্ছে। গিয়ে উঁকি দিলাম। আমার সমস্ত বই মেঝেতে ছড়ানো-ছিটানো, কয়েকটা ছবি খুলে নিয়ে ফেলে রাখা হয়েছে বইয়ের তূপের ওপর। যত রকমে সম্ভব, আমাকে বিরক্ত করার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে যেন রত্নদানোরা। মনে হয়, ওই রাতেই শেকলটা করাত দিয়ে কেটেছে ওরা।
খুব দমে গেলাম। ববকে ফোন করলাম পরদিন সকালে। লাইব্রেরির অবস্থা দেখল সে, কিন্তু রত্নদানোরা করেছে, এটা কিছুতেই বিশ্বাস করল না। কায়দা করে বেশ ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দোষটা আমার ওপরই চাপিয়ে দিল। ঘুমের ঘোরে আমি নিজেই নাকি লাইব্রেরিতে ঢুকে এই কাণ্ড করেছি। আমার মাথায় গোলমাল হয়েছে, আকারে-ইঙ্গিতে এ-কথাও বলল। কোন ভাল জায়গায় গিয়ে কদিন ভালমত বিশ্রাম নেয়ার পরামর্শ দিল। বিরক্ত হয়ে শেষে তাকে বকাটকা দিয়ে বের করে দিলাম। আমি জানি আমি কি করেছি, কি দেখেছি। আমি জানি, ঘুমের ঘোরে দুঃস্বপ্ন দেখিনি। কিন্তু এসবের মানে কি, কিছুই বুঝতে পারছি না! এক হাত দিয়ে আরেক হাত মুচড়ে ধরলেন মিস ভারনিয়া। কি মানে? কেন ঘটছে এসব? আমার ওপর রত্নদানোরা খেপে গেল কেন হঠাৎ?
প্রশ্নগুলোর জবাব মুসা আর রবিনও জানে না। অবিশ্বাস্য এক গাঁজাখুরি গল্প, কিন্তু মিস ভারনিয়া যে মিছে কথা বলছেন না, এটাও ঠিক, অন্তত তাদের তাই মনে হচ্ছে।
প্রশ্নগুলোর জবাব কিশোরেরও জানা নেই। অনেকক্ষণ ভেবে নিয়ে বলল, এখন আমাদের প্রথম কাজ, রত্নদানোর অস্তিত্ব সম্পর্কে শিওর হওয়া। কেন আপনাকে

বিরক্ত করছে ওরা, সেটা পরে জানা যাবে।
বেশ, যা ভাল বোঝ কর, হাতের তালু দিয়ে তালু চেপে ধরলেন মিস ভারনিয়া।
ফাঁদ পাততে হবে ব্যাটাদের জন্যে, বলল কিশোর।
ফাঁদ? সামনে ঝুঁকল মুসা। কিসের ফাঁদ?
রত্নদানোদের জন্যে। আজ রাতটা আমরা যে-কেউ একজন এখানে কাটাব, রত্নদানো ধরার চেষ্টা করব।
কে থাকছে?
তুমিই থাক।
দাঁড়াও! হাত তুলল মুসা। আমি টোপ হতে চাই না। রত্নদানো আছে বলে বিশ্বাস করি না, কিন্তু ঝুঁকি নেয়ারও ইচ্ছে নেই আমার।
কিন্তু তুমি থাকলেই ভাল হয়। তোমার গায়ে সিংহের জোর, একবার যদি আঁকড়ে ধরতে পার, রত্নদানোর সাধ্যি নেই ছাড়া পায়। তুমিই থাক, মুসা।
প্রশংসায় গলে গেল মুসা। তবু আমতা আমতা করল, কিন্তু একা...রবিন। থাকলে..
না না, আমি পারব না, তাড়াতাড়ি বলে উঠল রবিন। আজ রাতে আমার খালাম্মা বেড়াতে আসবে। আমাকে থাকতেই হবে বাড়িতে। কাজেই আমি বাদ।
তোমার তো আজ কোন কাজ নেই, কিশোর, বলল মুসা। আগামী কাল রোববার, ইয়ার্ড বন্ধ। কালও কোন কাজ নেই। তুমিই থাক না আমার সঙ্গে?
নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর। মাথা কাত করল। ঠিক আছে, থাকব। একজনের জায়গায় দুজন, বরং ভালই হবে। মিস ভারনিয়া, আমরা থাকলে। আপনার কোন অসুবিধে হবে?
না না, অসুবিধে কি? খুশিতে উজ্জ্বল হল লেখিকার মুখ। বরং ভালই। লাগবে। সিঁড়ির মাথায় একটা ঘর আছে, ওখানে থাকতে পারবে। তোমাদের খারাপ লাগবে কিনা সেটা বল। সাংঘাতিক কোন বিপদে না আবার পড়ে যাও।
রত্নদানোরা বিপদে ফেলবে বলে মনে হয় না, মাথা নাড়ল কিশোর। এ পর্যন্ত আপনার গায়ে হাত তোলেনি ওরা, দূর থেকেই ভয় দেখানর চেষ্টা করেছে শুধু। আমাদেরও ক্ষতি করবে বলে মনে হয় না। আজ রাতে ওদের একটাকে ধরার চেষ্টা করব! রাতের অন্ধকারে ফিরে এসে অপেক্ষা করব আমরা। বেরোব হৈ হট্টগোল করে, ফিরব চুপে চুপে, যাতে কেউ না দেখে।
ভাল বুদ্ধি! সায় দিলেন মিস ভারনিয়া। তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করব আমি। শুধু একবার বেল বাজাবে, গেটের তালা খুলে দেব।
হৈ-চৈ করে মিস ভারনিয়ার বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা। আড়াল থেকে তাদের ওপর কেউ চোখ রেখে থাকলে, সে নিশ্চয় দেখতে পেয়েছে।

গেটের বাইরে এসেই প্রশ্ন করল মুসা, কিশোর, সব কিছুই মহিলার অনুমান নয়ত?
জানি না, চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল গোয়েন্দাপ্রধান। হতেও পারে। কিন্তু মহিলার ব্যবহারে মনে হল না, মাথায় কোন গোলমাল আছে। হয়ত সত্যিই রত্নদানোদের দেখেছেন!
দূরর! রত্নদানো থাকলে তো দেখবে?
থাকতেও পারে। লোকে তো বিশ্বাস করে!
লোকে তো ভূতও বিশ্বাস করে।
জবাব দিল না কিশোর।
রবিন বলল, বিশ্বাস অনেক সময় সত্যিও হয়ে যায়। ১৯৩৮ সালে আফ্রিকার উপকূলে একটা আজব মাছ ধরা পড়েছিল। তার আগে বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল, কোটি কোটি বছর আগে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে ওই মাছ। কোয়েলাকান্থ ওর নাম। একটা দুটো নয়, হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কোয়েলাকান্থ বেঁচে আছে আজও, ঘুরে বেড়াচ্ছে সাগরের তলায়। তাহলে? লেকচার দেয়ার সুযোগ পেয়ে গেছে রবিন। ধর, অনেক অনেক বছর আগে হয়ত বামন মানুষেরা পৃথিবীতে রাজত্ব করত। তারপর একদিন এল লম্বা মানুষেরা, ওদের ভয়ে ছোট মানুষেরা গিয়ে। লুকাল মাটির তলায়। অনেকেই মরে গেল, কিন্তু কেউ কেউ মাটির তলায় বাস করাটা রপ্ত করে নিল। ব্যস, টিকে গেল ওরা। হয়ত কোয়েলাকান্থের মতই আজও টিকে আছে ওরা। তাদের নাম রত্নদানো কিংবা বামন কিংবা খাটোভূত হতে দোষ কি?
চমৎকার থিওরি, হাসল কিশোর। দেখা যাক, আজ রাতে রত্নদানো ধরা পড়ে কিনা। পৃথিবী-বিখ্যাত হয়ে যাব আমরা রাতারাতি।
পথে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে কেবল কিশোর।
অধৈর্য হয়ে উঠল মুসা। কী দাঁড়িয়ে আছ চুপচাপ! চল বাড়ি যাই। খিদে পেয়েছে।
তোমার পেটে রাক্ষস ঢুকেছে! সহকারীকে মৃদু ধমক দিল গোয়েন্দাপ্রধান! এস, আগে পুরো ব্লকটা ঘুরে দেখি। পাতাবাহার আর কাঠের বেড়া শুধু ভেতর থেকে দেখেছি, বাইরে থেকে একবার দেখি।
রত্নদানোরা কোন্ পথে বেরোয়, সেটা দেখতে চাইছ? রবিন বলল।
হা। তখন তাড়াহুড়োয় হয়ত চোখ এড়িয়ে গেছে। ভাল করে দেখলে পথটা পেয়েও যেতে পারি।
থিয়েটার-বাড়ির একপাশ থেকে শুরু করল ওরা। খিদের কথাটা আকারে ইঙ্গিতে আরেকবার জানাল মুসা। হেসে ফেলল কিশোর আর রবিন। শিগগিরই বাড়ি যাবে, কথা দিয়ে, কাজ শুরু করল কিশোর।

থিয়েটারের সদর দরজা তক্তা লাগিয়ে আটকে দেয়া হয়েছে। তার ওপর লাগানো হয়েছে কন্ট্রাকটরের সাইনবোর্ড। মোড় ঘুরে সরু গলিপথটায় এসে ঢুকল তিন গোয়েন্দা, মিস ভারনিয়ার বাড়ির পেছন দিয়ে যেটা গেছে সেটাতে। খানিক দূর এগিয়েই একপাশে একটা লোহার গেট পড়ল, থিয়েটার-বাড়ির পেছনের গেট। পাল্লা কয়েক ইঞ্চি ফাঁক হয়ে আছে, তারমানে খোলা। ভেতর থেকে হঠাৎ ভেসে এল মানুষের গলা।

আশ্চর্য তো! গেটের পাল্লায় লাগানো বোর্ডের দিকে চেয়ে আছে কিশোর। নোটিশ ঝুলিয়েছে বন্ধ, অথচ খোলা!

নিশ্চয় ভূতেরা কথা বলছে, বিড়বিড় করে বলল মুসা। নইলে এখানে মরতে আসবে কে? এই সময়?

সঙ্গীদের নিয়ে গেট ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়ল কিশোর। সিঁড়ি, তারপর আরেকটা দরজা। দরজার কপালে লেখা স্টেজডোর। রঙ চটে গেছে, কিন্তু পড়া যায়।

পাথরের সিঁড়িতে বসে পড়ল কিশোর। ভেতর থেকে আর কথা শোনা যায়। কিনা তার অপেক্ষা করছে। একবার খুলছে আবার বাঁধছে জুতোর ফিতে। দুজন মানুষের চাপা গলায় কথা শোনা গেল আবার।

শুনছ... শুরু করেই থেমে গেল মুসা।

শশশশ! ঠোঁটে আঙুল রাখল কিশোর। ফিসফিস করে বলল, গোল্ডেন বেল্ট শব্দটা বুঝতে পেরেছি!

গোল্ডেন বেল্ট! মানে... বলতে গিয়ে বাধা পেল রবিন।

আস্তে! কান খাড়া করে ঘরের ভেতরের কথা বোঝার চেষ্টা করছে কিশোর। মিউজিয়ম শব্দটাও শুনলাম!

ইয়াল্লা! ফিসফিস করল মুসা, চোখ বড় বড় হয়ে গেছে। কি খুঁজতে এসে কি পেয়ে যাচ্ছি! পুলিশ ডেকে আনব নাকি?

ভালমত বুঝে নিই, তারপর ডাকা যাবে, উঠে গিয়ে দরজায় কান পাতল কিশোর।

রবিন আর মুসাও এসে দাঁড়াল দরজার কাছে। আবার মিউজিয়ম শব্দটা বলা। হল, এবার শুনল তিনজনেই। গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে দরজায় কান পাতল ওরা। পাল্লা ভিড়িয়ে রাখা হয়েছে শুধু, ঠেলা লাগল, খুলে গেল হাঁ হয়ে। বেশি হেলে ছিল কিশোর, হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল সে। পড়ার আগে মুসার কাপড় খামচে ধরে পতন। রোধের চেষ্টা করল, পারল তো না-ই, মুসার ভারসাম্যও নষ্ট করে দিল। গোয়েন্দা সহকারীও পড়ল, এবং পড়ল রবিনকে নিয়ে।

হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে দাঁড়ানর চেষ্টা করল ওরা। ঠিক এই সময় মুসা আর রবিনের কলার চেপে ধরল ভারি থাবা। চোর! গর্জে উঠল লোকটা। মিস্টার রবার্ট, চোর! কয়েকটা ছেলে ঢুকেছে চুরি করতে।

গাঁট্টাগোট্টা একজন লোক। কালো ঘন ভুরু। চোখ মুখ পাকিয়ে রেখেছে। কলার ধরে টেনে তুলল সে রবিন আর মুসাকে। ব্যাটারা! এইবার পেয়েছি! মিস্টার রবার্ট, আরেকটা রয়েছে! জলদি এসে ধরুন!
কিশোর, পালাও! চেঁচিয়ে বলল মুসা। বোরিসকে নিয়ে এস!
পালাল না কিশোর, দাঁড়িয়ে রইল। ভুল করছেন আপনি, নিরীহ গলায় লোকটাকে বলল সে। খালি বাড়িতে কথার আওয়াজ পেয়ে অবাক লাগল, তাই দেখতে এসেছি। আমরাই বরং ভেবেছি, চোর ঢুকেছে।
তাই, না? কড়া চোখে লোকটা তাকাল কিশোরের দিকে। চোর ঢুকেছে ভেবেছ?
যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না, এমনি চেহারা করে দাঁড়িয়ে রইল কিশোর।
আরেকজন এসে দাঁড়াল, রোগা শরীর, পাতলা চুল। আরে, বার্ট, কি করছ? খালি বাড়ি, তাই সন্দেহ হয়েছে ওদের। হতেই পারে।
ওদের ভাবসাব পছন্দ হচ্ছে না আমার, মিস্টার রবার্ট! বার্টের গলায় সন্দেহ।
আচ্ছা দাঁড়াও, আমি কথা বলছি, এগিয়ে এল দ্বিতীয় লোকটা। আমি জন রবার্ট। এই বাড়ির মালিক। ভাঙচুর চলছে, নতুন করে বাড়ি তৈরি করব, তাই মাঝে মাঝে দেখতে আসি। এ হল বার্ট ইঅং, আমার দারোয়ান। তা তোমাদের কেন সন্দেহ হল ভেতরে চোর ঢুকেছে?
গেটে তালা... শুরু করল কিশোর, কিন্তু তার কথার মাঝেই বলে উঠল মুসা, গোল্ডেন বেল্ট শব্দটা কানে এল! সন্দেহ জাগল আমাদের। আরও ভালমত কান পাতলাম, মিউজিয়ম শব্দটাও শুনলাম। ধরেই নিলাম বেল্ট চুরি করে এখানে ঢুকেছে। চোরেরা!
মিস্টার রবার্ট, গম্ভীর গলায় বলল ইঅং। ছেলেগুলোর মাথায় হয় গোলমাল আছে, নইলে চোর। আমি যাই, পুলিশ নিয়ে আসি।
থাম! ধমক দিল রবার্ট। তুমি কি বোঝ?...আচ্ছা, গোল্ডেন বেল্ট...! হঠাৎ কি মনে পড়ে যাওয়ায় হাসল সে। অ-অ, বুঝেছি! মনে পড়েছে। আমি আর বার্ট পরামর্শ করছিলাম থিয়েটারটা ভেঙে ফেলার আগেই গোল্ড অ্যাণ্ড গিল্টগুলো সরিয়ে ফেলব। সোনালি রঙ করা কিংবা গিলটি করা অনেক কারুকাজ, অনেক নকশা রয়েছে এখানে, একেবারে মিউজিয়মের মত মনে হয়। গোল্ড অ্যাণ্ড গিল্টকেই তোমরা গোল্ডেন বেল্ট শুনেছ। বুঝতে পারছি, গোল্ডেন বেল্ট চুরির ব্যাপারটা নিয়ে বেশি মাথা ঘামাচ্ছ তোমরা। হাসল সে।
গোমড়া মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে ইঅং। খুব বেশি কল্পনা করে বিচ্ছুগুলো।

তোমার কি? কড়া গলায় বলল রবার্ট। খাও আর ঘুমাও। কল্পনা করবে কখন? কোন কিছু তোমাকে নাড়া দেয় নাকি? এই যে গত কয়েক রাতে কি সব শব্দ হল, ভয়ে পালাল দুজন নাইট গার্ড, কেন কি হল, একবারও ভেবেছ?
শব্দ? আগ্রহী হয়ে উঠল কিশোর। কেমন শব্দ?
কি জানি! ওরা বলল, ভূতে নাকি দরজায় টোকা দেয়, গোঙায়, বলল রবার্ট। আসলে, বাড়িটা পুরানো, ঢুকলে এমনিতেই গা ছমছম করে। অন্ধকারে নানারকম শব্দ হয়। কেন হয় দেখতে চাও? এস আমার সঙ্গে। গোল্ড অ্যাণ্ড গিল্টও দেখতে পাবে। দেখবে?
তিনজনই বলল, দেখবে।
বার্ট, মেইন লাইনটা দিয়ে দাও তো। এস, তোমরা আমার সঙ্গে এস। আগে। আগে অন্ধকার একটা গলি ধরে এগোল রবার্ট। পেছনে অনুসরণ করল ছেলেরা।
অন্ধকারে কিছু একটা রবিনের গাল ছুঁয়ে গেল, চেঁচিয়ে উঠল সে, বাদুড়!
হ্যাঁ, অন্ধকার থেকে ভেসে এল রবার্টের গলা। অনেক বছর খালি পড়ে আছে বাড়িটা। বাদুড় আর ইঁদুরের আড়া! ওরাই রহস্যময় শব্দ করে। একেকটা ইঁদুর যা বড় না, বেড়াল খেয়ে ফেলতে পারবে!
ঢোক গিলল রবিন, চুপ করে রইল। অসংখ্য বাদুড়ের ডানা ঝাঁপটানর শব্দ কানে আসছে। মাঝে মাঝে তীক্ষ্ণ কিচকিচ আওয়াজ হচ্ছে, শিরশির করে ওঠে গা।
হঠাৎ গ ই-ই-চ করে উঠল কিসে যেন। চমকে উঠল ছেলেরা।
ভয় পাচ্ছ? অন্ধকারেই বলল রবার্ট। ও কিছু না। পর্দা টানার জন্যে, নানারকম সিনসিনারির ছবি ঝোলানর জন্যে পুলি আর মোটা দড়ি ব্যবহার হত, ছিঁড়ে গেছে বেশির ভাগই, পুলিতে মরচে পড়েছে। দড়িগুলোতে বাদুড় ঝুললেই টান পড়ে, বিচিত্র শব্দ হয়।...অহ, এতক্ষণে আলো জ্বলল।
মাথার ওপর বিশাল এক ঝাড়বাতি জ্বলে উঠেছে, সবুজ, লাল, হলুদ আর নীল কাঁচের ফানুসগুলোতে বালি যেন লেপটে রয়েছে। এমনিতেই কম পাওয়ারের বাল্ব। ওগুলোর ভেতরে, তার ওপর বালিতে ঢাকা পড়ায় আলো তেমন ছড়াচ্ছে না। অদ্ভুত এক রঙিন আলো-আঁধারির সৃষ্টি হয়েছে হলের ভেতরে। আবছামত দেখা যাচ্ছে। ঘরের জিনিসপত্র। এক প্রান্তে মস্তবড় মঞ্চ। চারপাশে শুধু সিট আর সিট। বিরাট থিয়েটার ছিল এককালে।
হলের দুপাশের দেয়ালে বড় বড় জানালা, তাতে সোনালি সুতোয় নকশা করা লাল মখমলের ভারি পর্দা ঝুলছে। দেয়ালে দেয়ালে নানা রকমের চিত্র, নাইট আর সারাসেনদের লড়াইয়ের দৃশ্য, যোদ্ধাদের পরনে সোনালি বর্ম। ঠিকই বলেছে রবার্ট, গোল্ড অ্যাণ্ড গিল্ট-এর ছড়াছড়ি। হলের ভেতরের পরিবেশও মিউজিয়মের মত।

উনিশশো বিশ সালে তৈরি হয়েছিল এই থিয়েটার, বলল রবার্ট। মূরেরা তৈরি করেছিল। এ-ধরনের জাকজমক তখন পছন্দ করত লোকে। বাইরে থেকে দেখেছ না, কেমন দুর্গদুর্গ লাগে? এটাও তখনকার দর্শকদের পছন্দ ছিল। আজকাল তো এসব জায়গায় লোকে ঢুকতেই চাইবে না, কেমন যেন দম বন্ধ হয়ে আসে!

ফিরে যাওয়ার জন্যে ঘুরল রবার্ট। হঠাৎ একটা চেয়ারের হাতলে লাফিয়ে উঠল কালচে-ধূসর রোমশ একটা জীব, ছোটখাট একটা বেড়াল বললেই চলে।

আমাদের একজন বাসিন্দা, ইঁদুরটাকে দেখে হেসে বলল রবার্ট। অনেক বছর ধরে বাস করছে, তাড়াতে বহুত কষ্ট হবে।

আগের ঘরটায় ফিরে এল ওরা। তারপর, মূরিশ থিয়েটারের ভেতর তো দেখলে। বাড়িটা ভাঙা হবে যেদিন, সেদিন এস। সে এক দেখার ব্যাপার। কয়েক হপ্তার মধ্যেই ভাঙব। গুডবাই, অ্যা।

ছেলেরা বাইরে বেরোতেই পেছনে বন্ধ করে দেয়া হল দরজা। ছিটকিনি তুলে দেয়ার শব্দ কানে এল ওদের।

বাপরে বাপ! ফোঁস করে শ্বাস ফেলে বলল মুসা। কি একেকখান ইঁদুর! বেড়াল কি, হাতিও খেয়ে ফেলবে! এ-জন্যেই পালিয়েছে নাইট গার্ডরা।

হ্যাঁ, চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল কিশোর। রহস্যময় শব্দের ভালই ব্যাখ্যা। গোল্ডেন বেল্ট আর মিউজিয়মের ব্যাপারটাও বেশ ভালই বোঝানো হয়েছে! জিভ আর টাকরার সাহায্যে বিচিত্র শব্দ করল গোয়েন্দাপ্রধান। কিন্তু যাকগে, ওটা আমাদের কাজ নয়। আমরা এসেছি মিস ভারনিয়াকে সাহায্য করতে। চল, দেখাদেখির কাজটা শেষ করে ফেলি।

গলিটা দেখল ওরা, ইটের দেয়াল আর কাঠের বেড়া পরীক্ষা করল, পাতাবাহারের বেড়ার প্রতিটি ইঞ্চি খুঁটিয়ে দেখল! রত্নদানো বেরোনর কোন পথই নেই।

নাহ, কিছু পাওয়া গেল না! নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে শুরু করেছে কিশোর। বুঝতে পারছি না!

এখন বোঝা যাবেও না! মুখ বাকাল মুসা। খিদেয় পেট জ্বলছে, বাড়ি যাবে নাকি তাই বল?

হ্যাঁ, এখানে এখন আর কিছু করার নেই। চল, যাই।

গভীর মনোযোগে খবরের কাগজ পড়ছে বোরিস। ছেলেরা গাদাগাদি করে। বসল তার পাশে। কাগজটা ভাজ করে রেখে ইঞ্জিন স্টার্ট দিল সে।

বড় রাস্তায় এসে উঠল ট্রাক, ছুটে চলল দ্রুতগতিতে।

একটা প্রশ্ন কেবলই খোঁচাচ্ছে রবিনকে। গোল্ডেন বেল্ট কি করে চুরি হয়েছে? কিশোরকে জিজ্ঞেস করতে গিয়েও থেমে গেল রবিন। গভীর চিন্তায় মগ্ন

গোয়েন্দাপ্রধান। নিচের ঠোঁটে চিমটি কেটে চলেছে ঘনঘন। এখন তাকে প্রশ্ন। করলেও জবাব পাওয়া যাবে না।
অগত্যা কৌতূহল চেপে চুপ করে রইল রবিন।

.

রকি বীচে পৌঁছুল ট্রাক। স্যালভিজ ইয়ার্ডে ঢুকল।
ট্রাক থেকে সবার আগে নামল মুসা। এক্ষুণি বাড়ি যেতে হবে আমাকে। ভুলেই গিয়েছিলাম, আজ বাবার জন্মদিন। স্পেশাল খাবার রাঁধবে মা।
ঠিক আটটায় আসবে, বলল কিশোর। বাড়িতে বলে এস, মিস্টার। ক্রিস্টোফারের এক বান্ধবীর বাড়িতে রাতে থাকবে। আগামীকাল সকাল নাগাদ। ফিরবে।
ঠিক আছে। তাড়াতাড়ি সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে গেল মুসা। ট্রাক থেকে কিশোরকে নামতে দেখে অফিস থেকে বেরিয়ে এলেন মেরিচাচী।
এই যে, কিশোর, এসেছিস, বললেন চাচী। আধঘণ্টা ধরে তোর সঙ্গে দেখা করার জন্যে ছেলেটা বসে আছে।
আমার সঙ্গে দেখা করার জন্যে! কে, চাচী?
নাম বলল মিরো মুচামারু। জাপানী, কিন্তু ভাল ইংরেজি বলে। কত কথা বলল আমাকে। মুক্তার কথা বলল। ট্রেনিং দেয়া ঝিনুক নাকি আছে, মুক্তা ফলানতে। কাজে লাগে ওগুলো। আরও কত কথা! হাসলেন মেরিচাচী।
মনে মনে কিশোর হাসল। ইয়ার্ডের কাজ করার সময় চাচীর এই হাসি কোথায় থাকে, ভেবে অবাক হল সে। কই, চল তো দেখি? রবিন, এস। হাঁটতে হাঁটতে বলল সে, চাচী, আজ রাতে মিস ভারনিয়ার বাড়িতে থাকতে হবে। কি সব শব্দ নাকি রাতে বিরক্ত করে মহিলাকে। আমি আর মুসা আজ রাতে পাহারা দেব। ঠিক করেছি।
তাই নাকি! কিশোরকে অবাক করে দিয়ে এক কথায় রাজি হয়ে গেলেন। চাচী। ঠিক আছে, যাস। বোরিসকে ছেড়ে দিস, সকালে গিয়ে নিয়ে আসবে আবার। কাঁচে ঘেরা অফিসের সামনে এসে ডাক দিলেন তিনি, মিরো, কিশোর এসেছে। এই, রবিন, না খেয়ে যেয়ো না কিন্তু। আধঘণ্টার মধ্যেই হয়ে যাবে। হ্যাঁ রে, কিশোর, মুসাকে দেখছি না?
ওর বাবার জন্মদিন, ভাল রান্নাবান্নার ব্যবস্থা, ও কি আর থাকে? হেসে বলল কিশোর।
পাগল ছেলে! সস্নেহ হাসি ফুটল চাচীর মুখে। ও হ্যাঁ, মিরোকেও ধরে রাখিস। খেয়ে যাবে এখানেই। বাড়ির দিকে রওনা হলেন তিনি।
মেরিচাচীর ডাক শুনে দরজায় বেরিয়ে এল এক কিশোর। লম্বায় রবিনের সমান হবে। পরনে নিখুঁত ছাঁটের নীল সুট, গলায় নীল টাই। চোখে সোনালি ফ্রেমের

চশমা। খাটো করে ছাটা চুল।
এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিল মিরো। তুমি নিশ্চয় কিশোর-স্যান? কথায় জাপানী টান স্পষ্ট। আর তুমি রবিন-স্যান? আমি মিরো, টোহা মুচামারুর ছেলে। আমার বাবা সুকিমিচি জুয়েলারস কোম্পানির সিকিউরিটি ইনচার্জ।
হ্যাল্লো, মিরো, জোরে মিরোর হাত ঝাঁকিয়ে দিল কিশোর। গতকাল পরিচয় হয়েছে তোমার বাবার সঙ্গে।
জানি, লজ্জিত হাসি হাসল মিরো। তোমাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেনি। বাবা, এ-ও জানি। কিছু মনে কোরো না, বাবার তখন মাথা ঠিক ছিল না, কি বলতে কি বলে ফেলেছে। তার হয়ে তোমাদের কাছে মাফ চাইতে এসেছি!
আরে দূর, কি যে বল? তাড়াতাড়ি বলল রবিন। যা অবস্থা ছিল তখন, মাথার ঠিক থাকে নাকি মানুষের? এতবড় দায়িত্ব, এত টাকার ব্যাপার। তাছাড়া আমাদের বয়েস কম, রত্নচোরের পেছনে লাগতে পারব বলে ভাবেননি আর কি। এখন বললেও অবশ্য কেসটা আর নিতে পারব না। অন্য একটা কাজ নিয়ে। ফেলেছি, রত্নদানো ধরার কাজ।
রত্নদানো! বড় বড় হয়ে গেল মিরোর চোখ। ওই যে বামন মানুষেরা, যারা সুড়ঙ্গে বাস করে, আর মাটির তলায় গুপ্তধন খুঁজে বেড়ায়? জাপানেও ওদের কথা জানে লোক। খবরদার, বেশি কাছাকাছি যেয়ো না! ভয়ঙ্কর জীব ওরা। বিপদে ফেলে দেবে।
বিপদে ফেলুক আর যা-ই করুক, আজ রাতে একটাকে ধরার চেষ্টা করব, কিশোর বলল। দাঁড়িয়ে কেন, চল বসি। চা খাবে?
খেয়েছি, আবার অফিসে ঢুকল মিরো কিশোরের পিছু পিছু।
আচ্ছা, আমাদের নাম জানলে কি করে? বসতে বসতে বলল কিশোর। ঠিকানা পেলে কোথায়?
পকেট থেকে একটা কার্ড বের করল মিরো। দলে মুচড়ে গিয়েছিল কার্ডটা, টেনেটুনে আবার ঠিক করা হয়েছে। মিউজিয়মে কুড়িয়ে পেয়েছি এটা। আর ঠিকানা? এ-শহরে তো তোমরা পরিচিত। প্রথম যে ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করলাম, সে-ই বলে দিল।
কপাল ভাল, শুঁটকির পাল্লায় পড়নি, হেসে বলল রবিন।
শুঁটকি? মিরো অবাক।
একটা ছেলে, আমাদের দেখতে পারে না, প্রসঙ্গটা চাপা দিয়ে দিল কিশোর। হ্যাঁ, মিরো, গোল্ডেন বেল্ট খুঁজে পাওয়া গেছে?
না, কিশোর-স্যান, হতাশভাবে মাথা নাড়ল মিরো। এত খুঁজল পুলিশ আর আমাদের গার্ডরা, লাভ হল না। খুব মুষড়ে পড়েছে বাবা। তার নাকের ডগা দিয়ে

বেল্ট চুরি করে নিয়ে গেল চোর, কিছুই করতে পারল না, এই দুঃখেই কাতর হয়ে পড়েছে। বেল্টটা না পাওয়া গেলে তার চাকরি থাকবে না, লজ্জা তো আছেই।
কিছু একটা বলা দরকার, কিন্তু কথা খুঁজে পেল না রবিন।
নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে হঠাৎ বলল, যা যা জেনেছ, সব খুলে বল তো মিরো।
নতুন তেমন কিছুই জানার নেই, খবরের কাগজে প্রায় সবই জেনেছে কিশোর। আবার সে-সবই শুনল মিরোর মুখে। কোন্ পথে বের করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে গোল্ডেন বেল্ট, জানা যায়নি। রেইনবোঁ জুয়েলস না নিয়ে কেন বেল্টটা নিল, এটাও একটা বড় রহস্য। পুরানো কথা সব।
আমার ধারণা, গার্ডদের কেউই চুরি করেছে, বলল রবিন।
মনে হয় না, মাথা নাড়ল মিরো। অনেক বেছে, দেখে শুনে তবে নেয়া হয়েছে গার্ড। প্রত্যেকেই বিশ্বাসী। তবু সবার সঙ্গে আলাদা আলাদাভাবে কথা বলেছে বাবা। কাউকেই সন্দেহ হয়নি তার।
আচ্ছা, মিস্টার মার্চের খবর কি? জিজ্ঞেস করল কিশোর। তার সম্পর্কে কি জেনেছে পুলিশ।
মিরো জানাল, পুলিশের দৃঢ় ধারণা ছিল, বেল্ট চুরির সঙ্গে মার্চও জড়িত। কিন্তু প্রমাণের অভাবে তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে তারা। প্রশ্ন, তাহলে মিউজিয়মে সেই অভিনয় কেন করল মার্চ? স্রেফ টাকার জন্যে। চুরির আগের দিন নাকি ফোনে এক মহিলা যোগাযোগ করেছে তার সঙ্গে (মহিলাকে চেনে না অভিনেতা, দেখেনি), বলেছে ছোট্ট একটা অভিনয়ের জন্যে পঞ্চাশ ডলার দেয়া হবে মার্চকে। লোভ দেখিয়েছে, এতে টাকা তো পাবেই অভিনেতা, তার নামও ছড়িয়ে পড়বে হলিউডে। পত্রিকায় ছবি ছাপা হবে তার নাম ছাপা হবে। এরপর নাকি একটা ছবি করবে। মহিলার স্বামী, ছবির নাম হবে দ্য গ্রেট মিউজিয়ম রবারি। সেই ছবিতে অভিনয়ের। সুযোগ দেয়া হবে মার্চকে। ব্যস, মজে গেল অভিনেতা। রাজি হয়ে গেল মিউজিয়মে। ছোট্ট অভিনয়টুকু করতে। সেদিনই ডাকে তার কাছে এল ছোট্ট একটা প্যাকেট, তাতে একটা নকল পাথর, আর একটা খামে পঞ্চাশ ডলার।
যা ভেবেছি, বলল কিশোর। বেল্ট চুরির সঙ্গে জড়িত নয় টোড মার্চ। কি। করে কোন্ পথে বেল্টটা নিয়ে যাওয়া হয়েছে, এখনও বুঝতে পারছে না পুলিশ, না?
না, পারছে না।
যদি বলি, বেল্টটা এখনও মিউজিয়মেই রয়েছে, বোম ফাটাল যেন কিশোর।
মিউজিয়মে! চেঁচিয়ে উঠল রবিন।
কিন্তু মিউজিয়মের তো কোথাও খোঁজা বাদ নেই! প্রতিবাদ করল মিরো। বেল্ট লুকানর আর জায়গা কোথায়, কিশোর-স্যান?

আজ আরেকটা কেস নিয়ে কাজ করতে করতে হঠাৎ বুঝে গেলাম কোথায় আছে গোল্ডেন বেল্ট। আমার ধারণা— নাটকীয়ভাবে চুপ করল কিশোর।
রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে রবিন আর মিরো।
রবিন, কিশোর বলল। মিস ভারনিয়ার বাড়িতে যে ছবিটা পড়ে গিয়েছিল…
হ্যাঁ। বল।
বড়সড় ভারি ছবি, যেন রবিন দেখেনি, তাকে ছবিটা কেমন বোঝাচ্ছে কিশোর, ধরে তুললাম। প্রায় আড়াই ইঞ্চি মত মোটা ফ্রেম, ছবির পেছনে জায়গা রয়েছে অন্তত দুই ইঞ্চি। ওই রকম ফ্রেম কিংবা তার চেয়েও বড় অনেক ফ্রেমে বাঁধাই ছবি ঝোলানো রয়েছে মিউজিয়মে। তারমানে…
তারমানে, চেঁচিয়ে উঠল রবিন। ছবির পেছনের ওই খালি জায়গায় গোল্ডেন বেল্ট লুকিয়ে রাখা হয়েছে! অন্ধকারে বেল্টটা তুলে নিয়ে ওখানে ঢুকিয়ে দিয়েছে চোর!
চোরেরা হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি, বলল কিশোর। মিস্টার মার্চকে ফোন করেছিল যে মহিলা, চোরের সঙ্গে সে-ও নিশ্চয় জড়িত।
আর শোনার অপেক্ষা করল না মিরো, লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। সারা মিউজিয়ম খুঁজেছে ওরা, কিন্তু ছবির পেছনে খুঁজে দেখার কথা মনে আসেনি কারও! এখুনি গিয়ে বাবাকে বলছি।
উত্তেজনা কমার অপেক্ষায় থাকবে চোর, মিরোর কথা যেন শোনেইনি কিশোর। তল্পিতল্পা গুছিয়ে একদিন সুকিমিচি কোম্পানি চলে যাবে, তখন সময় বুঝে গিয়ে বেল্টটা নিয়ে আসবে। ও হ্যাঁ, তোমার বাবাকে বল, ব্যালকনিতে ঝোলানো ছবিও যাতে বাদ না দেয়।
কিন্তু ব্যালকনিতে ওঠার পথ তো বন্ধু!
তাতে কি? একটা দড়ি হলেই উঠে যাওয়া যায় ওখানে। লুকানর সবচেয়ে ভাল জায়গা সারা মিউজিয়মে।
থ্যাঙ্ক ইউ, কিশোর-স্যান! জ্বলজ্বল করছে মিরোর চোখ। তোমার অনুমান ঠিকই হবে! আমি যাই, বাবাকে গিয়ে বলি।
আরে দাঁড়াও দাঁড়াও, হাত তুলল কিশোর। চাচী খেয়ে যেতে বলেছে।
আজ না, ভাই, আরেকদিন। আমি চলি, আর দাঁড়াল না মিরো। প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেল ইয়ার্ড থেকে।
কিশোরের দিকে চেয়ে হাসল রবিন। গোল্ডেন বেল্ট রহস্য ভেদ হয়ে গেল। আমাদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে তাড়িয়ে দিল তো, এখন লজ্জা পাবেন মিস্টার মুচামারু।
অনিশ্চিত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল কিশোর। আরও একটা ব্যাপার হতে পারে, আপনমনেই বলল সে। কিন্তু—নাহ্, সেটা হওয়ার সম্ভাবনা কম। বেল্টটা বের

করে নিয়ে যাওয়া হয়নি, তারমানে ভেতরেই আছে এখনও। তাহলে ছবির পেছনে ছাড়া লুকিয়ে রাখার আর জায়গা কোথায়?
আছে, ছবির পেছনেই, বলল রবিন।
কাল সকালেই জানা যাবে, নিশ্চিত হতে পারছে না যেন কিশোর। এখন চল, খেয়ে নিই। তুমি খেয়ে বাড়ি চলে যাও, আমাকে কিছু জিনিসপত্র গোছাতে হবে। রত্নদানো ধরতে দরকার হবে। মুসা এলে তাকে নিয়ে মিস ভারনিয়ার। বাড়িতে চলে যাব। কি হল না হল সকালে ফোনে জানাব তোমাকে। ফোনের কাছাকাছি থেক। আমি ফোন করলে পরে বোরিসকে নিয়ে আমাদের আনতে। যেয়ো।
ঠিক আছে, মাথা কাত করল রবিন। আচ্ছা, সত্যিই কি রত্নদানো আছে? নাকি ওসব মহিলার অতিকল্পনা? হয়ত ববের কথাই ঠিক, নিশিডাকে পায় তাকে।
অসম্ভব নয়। ঘুমের ঘোরে অদ্ভুত সব কাণ্ড করে বসে মানুষ। এক ভদ্রলোকের কথা জানি, কয়েকটা মুক্তো নিয়ে খুব দুশ্চিন্তায় থাকত। খালি ভাবত, গেল বুঝি চুরি হয়ে। শেষে, এক রাতে উঠে সেফ থেকে মুক্তোগুলো বের করে লুকিয়ে রাখল আরেক জায়গায়, ঘুমের ঘোরে। সকালে উঠে সেফে ওগুলো না দেখে চেঁচামেচি শুরু করে দিল। রাতে নিজেই যে সরিয়েছে, কিছুতেই মনে করতে পারল না। আরেক রাতে ঘুমের ঘোরেই মুক্তোগুলো বের করে এনে সেফে আগের জায়গায়। রেখে দিল আবার। এক মুহূর্ত চুপ থেকে বলল, মিস ভারনিয়াও তেমন কিছু করে থাকতে পারেন। আজ রাতেই সেটা বুঝব। যদি সত্যিই, রবিনের দিকে চেয়ে হাসল গোয়েন্দাপ্রধান, রত্নদানো আসে, তিন গোয়েন্দার ফাঁদে ধরা পড়তেই হবে তাকে।

.

খুব ব্যস্ত রত্নদানোরা, গাঁইতি দিয়ে সমানে মাটি কুপিয়ে চলেছে, সুড়ঙ্গ খুঁড়ছে। সুড়ঙ্গের শেষ মাথায় রয়েছে খুদে মানুষগুলো, আবছা দেখতে পাচ্ছে রবিন। দ্রুত মনস্থির করে নিয়ে পা টিপে টিপে ওদের দিকে এগোল সে। কেবলই মনে হচ্ছে, ইস, মুসা আর কিশোর যদি থাকত সঙ্গে! সুড়ঙ্গের বেশি গভীরে যেতে সাহস হচ্ছে না তার, কিন্তু এতখানি এসে ফিরেও যেতে চাইছে না।
বুকের ভেতরে জোরে জোরে লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ডটা, রবিনের ভয় হচ্ছে, রত্নদানোদের কানে চলে যাবে ধুকপুক শব্দ। কিন্তু থামল না সে। হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে লাগল। রত্নদানোরা তার দিকে পেছন করে মাটি খোঁড়ায় ব্যস্ত।
শুকনো সুড়ঙ্গ, গাঁইতির ঘায়ে ধুলো উড়ছে, নাকে মুখে ঢুকে যাচ্ছে। হাঁচি পেল রবিনের। চেপেচুপে রাখার চেষ্টা করল, পারল না, হ্যাচচো করে উঠল।
ধীরগতি ছায়াছবির মত যেন ধীরে ধীরে ঘুরল সবকটা রত্নদানো, কোপ মারার। ভঙ্গিতে তুলে ধরেছে গাঁইতি।

ছোটার চেষ্টা করল রবিন। কিন্তু আঠা দিয়ে তার হাত-পা মাটিতে সেঁটে দেয়া হয়েছে যেন, এক চুল নড়াতে পারল না। চেঁচানর চেষ্টা করল, কিন্তু আওয়াজ বেরোল না গলা দিয়ে।
লাল টকটকে চোখ মেলে নীরবে চেয়ে আছে রত্নদানোরা। এই সময়ে রবিনের কানে এল একটা শব্দ। গায়ে মোলায়েম স্পর্শ। আবার ছুটে পালানর চেষ্টা করল। সে, এবারেও ব্যর্থ হল।
কাঁধ চেপে ধরল শক্ত আঙুল, জোরে ঝাঁকুনি দিল। ডাক শোনা গেল, রবিন! এই, রবিন! এমন করছিস কেন?
ভোজবাজির মত অদৃশ্য হয়ে গেল রত্নদানোরা। মিলিয়ে গেল সুড়ঙ্গ। নড়েচড়ে উঠল রবিন, চেঁচাল, ছেড়ে দাও! আমাকে ছেড়ে দাও!
এই, রবিন, ওঠ, চোখ মেল!
আস্তে করে চোখ মেলল রবিন। পাশে দাঁড়িয়ে তার মা।
দুঃস্বপ্ন দেখছিলি? মা বললেন। ঘুমের মধ্যে এমন সব শব্দ করছিলি, যেন গলা টিপে ধরেছে কেউ। ওঠ, বারান্দায় খানিক হেঁটে আয়।
হ্যাঁ, মা, একটা খুব খারাপ স্বপ্ন দেখছিলাম। জাগিয়ে দিয়ে ভাল করেছ। মা, কিশোর ফোন করেছিল?
কিশোর? এত রাতে ও ফোন করতে যাবে কেন? যা, বারান্দা থেকে হেঁটে এসে শুয়ে পড়। রাতদুপুর এখন।
হাঁটতে হবে না।
তাহলে আবার তো দুঃস্বপ্ন দেখবি।
দেখব না, পাশ ফিরে কোলবালিশটা টেনে নিল রবিন।
মুসা আর কিশোরের কথা ভাবল, ওরা এখন কি করছে?
.
লস অ্যাঞ্জেলেসের শহরতলীর দিকে ছুটে চলেছে ট্রাক। বোরিস চালাচ্ছে। পাশে বসেছে কিশোর আর মুসা।
রত্নদানো ধরার জন্যে কি কি যন্ত্রপাতি এনেছে, মুসাকে এক এক করে দেখাচ্ছে কিশোর। এই যে ক্যামেরা, স্পেশাল ক্যামেরা, দশ সেকেণ্ডেই ছবি তৈরি হয়ে যায়। ভাঙা অবস্থায় কিনেছিলাম একটা ছেলের কাছ থেকে, টুকটাক যন্ত্র লাগিয়ে সারিয়ে নিয়েছি। চমৎকার কাজ দেয় এখন। এই যে, ফ্ল্যাশগানও রয়েছে। রত্নদানো এলেই টুক করে ছবি তুলে নেব আগে। ক্যামেরাটা রেখে ব্যাগ থেকে দুজোড়া দস্তানা বের করল। ওগুলোর তালুর কাছে চামড়া লাগানো। দানো ব্যাটাদের আঁকড়ে ধরার জন্যে, পিছলে ছুটে যেতে পারবে না। ব্যাটাদের হাতে

লম্বা চোখা নখ থাকার কথা, খামছি দিলেও এই দস্তানার জন্যে লাগাতে পারবে না।
সেরেছে! চোখ বড় বড় হয়ে গেছে মুসার। রত্নদানো আসবে, ধরেই নিয়েছ মনে হচ্ছে?
আগে থেকেই তৈরি থাকা ভাল। টর্চ এনেছি, আর এই যে দড়ি, নাইলনের, ভীষণ শক্ত। দানো ব্যাটাদের ধরে বাঁধলে ছিঁড়তে পারবে না।
দড়ি আর দস্তানা রেখে একটা ওয়াকি-টকি বের করল কিশোর। রেঞ্জ কম। যন্ত্রটার, কিন্তু দরকারের সময় খুব কাজে লাগে। যোগাযোগ রাখায় খুব সুবিধে।
ওটা রেখে টেপ-রেকর্ডার বের করে দেখাল মুসাকে। রত্নদানোরা কোনরকম শব্দ। করলে, সেটা রেকর্ড করবে।
যন্ত্রপাতির ব্যাগটার দিকে চেয়ে আপনমনেই মাথা নাড়ল কিশোর। সবই এনেছি। আর কিছু বাকি নেই। ও হ্যাঁ, মুসা, চক এনেছ?
পকেট থেকে নীল চক বের করে দেখাল মুসা। কিশোর এনেছে সাদা চক।
না, আর কিছু বাকি নেই, খুশি হয়ে বলল কিশোর। টুথব্রাশ এনেছ?
পাশে রাখা ছোট হ্যাণ্ডব্যাগটা দেখাল মুসা। পাজামাও এনেছি। রাতে থাকব, ওসব তো দরকার।
পাজামা লাগবে না। রাতে তো আর ঘুমাচ্ছি না। কাপড়চোপড় সব পরে বসে থাকব, রত্নদানো এলেই যেন ছুটে গিয়ে খপ করে ধরতে পারি।
আর চুপ থাকতে পারল না বোরিস। দানো ধরার জন্যে তৈরিই হয়ে এসেছ একেবারে! সাবধান, খুব খারাপ জীব ওরা। বিকেলে রোভারের সঙ্গেও আলাপ করেছি, ও আমার সঙ্গে একমত। রত্নদানোরা খারাপ, বিশেষ করে ব্ল্যাক ফরেস্টেরগুলো তো একেকটা সাক্ষাৎ ইবলিস। ওদের চোখের দিকে সরাসরি। তাকিও না, পাথর হয়ে যাবে!
এতই আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কথাগুলো বলল বোরিস, অস্বস্তি বোধ করতে লাগল মুসা। রত্নদানো বাস্তবে নেই, এতক্ষণ যে ধারণাটা ছিল, সেটা বদলে গেল মুহূর্তে। বোরিস বলছে, রত্নদানো আছে, রোভারও বিশ্বাস করে, মিস ভারনিয়া নাকি। দেখেছেন, এমনকি রবিনও দেখেছে। এতগুলো লোক
কিশোরের কথায় মুসার ভাবনায় ছেদ পড়ল। কিন্তু, বোরিস, মিস ভারনিয়াকে সাহায্য করব কথা দিয়ে ফেলেছি আমরা। এখনও জানি না, সত্যি রত্নদানোরাই বিরক্ত করছে তাকে, নাকি অন্য কিছু। তাছাড়া, কি ধরনের রহস্য নিয়ে কাজ করতে পছন্দ করে তিন গোয়েন্দা...
যে কোন ধরনের উদ্ভট রহস্য... বলতে বলতে থেমে গেল মুসা। এই রত্নদানোর ব্যাপারটা উটের চেয়েও উদ্ভট হয়ে যাচ্ছে না তো?

.
মিস ভারনিয়ার আঙিনা অন্ধকার। নির্জন ব্যাংক আর পোড়ড়া থিয়েটার-বাড়িটাকে যেন গিলে ফেলেছে গাঢ় অন্ধকার। সরু বাড়ির একটা ঘরে আলো জ্বলছে, তার মানে অপেক্ষা করছেন লেখিকা, জেগে আছেন গোয়েন্দাদের অপেক্ষায়।
ট্রাক থেকে নেমে এল কিশোর আর মুসা।
জানালার বাইরে মুখ বের করল উদ্বিগ্ন বোরিস। কিশোর, আবার বলছি, রত্নদানো ধরার চেষ্টা কোরো না। ব্ল্যাক ফরেস্টে অনেক পুরানো গুঁড়ি আর পাথর দেখেছি, এক সময় ওরা জ্যান্ত মানুষ ছিল। রত্নদানোরা ওদের ওই অবস্থা করেছে। খবরদার, ওদের চোখে চোখে চেও না কিছুতেই!
গাঢ় বিশ্বাস বোরিসের। মুসার ভাল লাগছে না ব্যাপারটা। অস্বস্তি বোধ বাড়ছে। অবচেতন মন হুঁশিয়ার করে দিল, সামনে রাতটা ভাল যাবে না।
বোরিসকে বিদায় জানাল কিশোর। কথা দিল, হুশিয়ার থাকবে, যাতে তাকে পাথর না বানাতে পারে রত্নদানোরা। বলল, সকালে রবিনের কাছে ফোন করবে, তখন যেন তাকে সহ ট্রাক নিয়ে চলে আসে।
বেড়ার ধার ঘেঁষে গেটের দিকে এগোল দুই গোয়েন্দা। আড়াল থেকে কেউ তাদের ওপর চোখ রাখছে না তো? কি জানি! এত অন্ধকার, প্রায় কিছুই দেখা যায় না।
হাতড়ে হাতড়ে গেটের পাশে লাগানো বেলপুশটা বের করে একবার টিপল কিশোর। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গুঞ্জন উঠল গেটের মেকানিজমে। খুলে গেল পাল্লা, দুই গোয়েন্দা আঙিনায় ঢুকে পড়তেই আবার বন্ধ হয়ে গেল।
থমকে দাঁড়িয়ে কান পাতল কিশোর। অবাক লাগছে মুসার, এত সাবধানতা কেন? বিপদ সত্যি আশা করছে গোয়েন্দাপ্রধান? নাকি অযথাই অতিরিক্ত নাটকীয়। করে তুলছে পরিস্থিতিকে। কিন্তু তেমন স্বভাব তো নয় কিশোরের! ভয় পেল মুসা।
অন্ধকার আঙিনা। নিঃশব্দে কিশোরের পেছনে এগোল মুসা। সিঁড়ি ভেঙে বারান্দায় উঠল। দরজার পাল্লা ভেজানো, ঠেলা দিতেই খুলে গেল, ভেতরে ঢুকে পড়ল দুজন।
শুকনো, ফেকাসে মুখে দুই গোয়েন্দাকে স্বাগত জানালেন মিস ভারনিয়া। হাঁপ ছেড়ে বললেন, তোমরা এসে পড়েছ, ভাল হয়েছে। জীবনে এই প্রথম এত নার্ভাস ফীল করছি। যা ঘটেছে, এর চেয়ে বেশি কিছু ঘটলে আর থাকব না এ-বাড়িতে, এবার ঠিক পালাব। রবার্টের কাছে বাড়ি বেচে দিয়ে দূরে কোথাও চলে যাব।
এত ভেঙে পড়ার কিছু নেই, মিস ভারনিয়া, কোমল গলায় বলল কিশোর। আমরা তো আছি।

কেমন এক ধরনের কাঁপা হাসি ফুটল লেখিকার ঠোঁটে। রাত বেশি হয়নি। মাঝরাতের আগে ওরা আসে না। এতক্ষণ কি করবে? বসে বসে টেলিভিশন দেখ। বরং একটু ঘুমিয়ে নিই, বলল কিশোর। এই সাড়ে এগারোটা নাগাদ উঠে পড়ব। তাজা শরীর নিয়ে খুব আরামে পাহারা দিতে পারব বাকি রাতটা।
আরাম! আশ্চর্য! বিড়বিড় করল মুসা।
সহকারীর কথায় কান না দিয়ে বলল কিশোর, টেবিল ঘড়ি আছে আপনার? অ্যালার্ম ক্লক?
আছে।
সিঁড়ির মাথায় ছোট ঘরটা দুই গোয়েন্দাকে দেখিয়ে দিলেন মিস ভারনিয়া। দুটো বিছানা করে রেখেছেন। টেবিলে ব্যাগ রেখে শুধু জুতো খুলে সটান বিছানায় শুয়ে পড়ল কিশোর।
মুসাও শুলল। খানিকক্ষণ গড়াগড়ি করে এক সময় সে-ও ঘুমিয়ে পড়ল। তার মনে হল, চোখ বোজার সঙ্গে সঙ্গেই বেজে উঠেছে হতচ্ছাড়া ঘড়ির বেল।
কটা বাজল? চোখ না খুলেই বিড়বিড় করল মুসা।
সাড়ে এগারো, চাপা গলায় বলল কিশোর। মিস ভারনিয়া শুয়ে পড়েছেন। বোধহয়। তুমি আরও খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে নিতে পার। আমি পাহারায় থাকছি।
পাহারা! বিড়বিড় করল আবার মুসা, কয়েক সেকেণ্ডেই ঘুমিয়ে পড়ল।
রবিনের মতই দুঃস্বপ্ন দেখতে শুরু করল মুসা। স্বপ্নের মাঝেই কানে এল জানালায় টোকার শব্দ।
ঘুম ভেঙে গেল মুসার, পলকে পুরো সজাগ। টোকার শব্দ হচ্ছে এখনও। তালে তালে একটা বিশেষ ছন্দে এক...তিন—দুই-তিন—এক। কোনরকম সঙ্কেত? নাকি জাদু করছে রত্নদানোরা...
বিছানায় সোজা হয়ে বসল মুসা। চোখ জানালার দিকে। গতি বেড়ে গেছে। হৃদযন্ত্রের, গলার কাছে ঠেলে উঠতে চাইছে কি যেন।
জানালায় উঁকি দিল একটা মুখ! _ খুদে একটা মুখ, লাল চোখ, রোমশ কান, সারকাসের ক্লাউনের মত চোখা লম্বা নাক। ছোট ছোট ঠোঁট সরে গিয়ে বেরিয়ে পড়েছে চোখা দত্ত, ভেঙচি কাটছে যেন।
হঠাৎ ঘরে যেন বিদ্যুৎ চমকে উঠল, লাফিয়ে খাট থেকে নামল মুসা। চোখের পলকে নেই হয়ে গেল মুখটা।
তুলেছি! অন্ধকার কোণ থেকে চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। মুসা, তুলে ফেলেছি!
ওই ব্যাটা রত্নদানো, কোন সন্দেহ নেই! মুসাও চেঁচিয়ে বলল।
ছবি তুলে ফেলেছি। এখন ধরতে হবে ব্যাটাকে!

জানালার কাছে এসে দাঁড়াল দুজনে। চোখ মিটমিট করে তাকাল নিচে আঙিনার দিকে। কৃষ্ণপক্ষের একফালি চাঁদের ঘোলাটে আলোয় দেখা গেল, চারটে খুদে মূর্তি পাগলের মত নাচানাচি করছে। নাচছে কুদছে, এ-ওর ঘাড়ে পড়ছে, ডিগবাজি খাচ্ছে। উল্লাসে ফেটে পড়ছে, যেন সারকাসের কয়েকটা ক্লাউন।

.

ফ্ল্যাশগানের আলো চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিল, ধীরে ধীরে আবার আবছা অন্ধকার সয়ে এল দুই গোয়েন্দার চোখে। মূর্তিগুলোকে আরও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে এখন। দানোদের মুখের সাদা রঙও দেখতে পাচ্ছে। পরনে চামড়ার পোশাক, পায়ে চোখা জুতো।

কিশোর, ফিসফিস করে বলল মুসা। আঙিনায় খেলা জুড়েছে কেন ব্যাটারা?

খুব সহজ কারণ, জুতোর ফিতে বাধছে গোয়েন্দাপ্রধান। আমাদেরকে ভয় দেখিয়ে তাড়াতে চায়।

ভয়? তা দেখাতে পেরেছে, অন্তত আমাকে তো বটেই। কিন্তু কেন? সুড়ঙ্গ খোঁড়া বাদ দিয়ে মানুষের পেছনে লেগেছে কেন?

ওদের ভাড়া করে আনা হয়েছে। কাজটা বোধহয় মিস ভারনিয়ার ভাইপোর।

বব! জুতোর ফিতে বাঁধতে বাঁধতে হাত থেমে গেল মুসার। কেন?

ভয় পেয়ে যাতে বাড়িটা বিক্রি করে দেন মিস ভারনিয়া। পটিয়েপাটিয়ে ফুফুর কাছ থেকে তখন প্রচুর নগদ টাকা আদায় করে নিতে পারবে বব।

ঠিক, ঠিক বলেছ কিশোর। এখন বুঝতে পারছি সব ববের শয়তানি!

এবং সেটা প্রমাণ করা দরকার। অন্তত একটা দানোকে ধরতেই হবে।

ব্যাগ থেকে দড়ির বাণ্ডিল বের করে কোমরে ঝোলাল কিশোর। একজোড়া দস্তানা মুসাকে দিয়ে আরেক জোড়া নিজে পরল। ক্যামেরা ঝুলিয়ে নিল কাঁধে। যার যার কোমরের বেল্টে ঝুলিয়ে টর্চ নিল দুটো, হাত মুক্ত রাখল।

কিন্তু জানালায় উঁকি দিল কি করে রত্নদানো? প্রশ্ন করল মুসা। দোতলার জানালা —

ভালমত ভাব, বুঝে যাবে। এখন চল যাই। মিস ভারনিয়া হয়ত ঘুমিয়ে আছেন, তাঁকে ডাকার দরকার নেই। চেঁচামেচি শুরু করলে দানোরা পালাবে।

নিচতলার বারান্দায় বেরিয়ে এল দুজুনে। ছায়ার মত নিঃশব্দে চলে এল বাড়ির এক কোণে। দেয়ালের সঙ্গে প্রায় লেপটে থেকে মুখ বাড়িয়ে উঁকি দিল।

উঠনে এখনও লাফালাফি করছে চার দানো।

ধর, মুসার হাতে দড়ির এক প্রান্ত খুঁজে দিল কিশোর। আরেক মাথা নিজের কব্জিতে পেঁচিয়ে বাধল। দড়ি টান টান করে ধরে দৌড় দেবে, যার গায়েই দড়ি বাঁধুক পেঁচিয়ে ফেলবে সঙ্গে সঙ্গে। দাও দৌড়!

একসঙ্গে দৌড় দিল দুজনে। একটা ঝোঁপের ধার দিয়ে যাওয়ার সময় ডালে আটকে গেল হঠাৎ কিশোরের কাঁধে ঝোলানো ক্যামেরার বেল্ট, খাপসহ ছিঁড়ে পড়ে গেল ক্যামেরা, কিন্তু থামল না সে।
ছেলেদেরকে আসতে দেখল রত্নদানোরা। তীক্ষ্ণ শিস দিয়ে উঠে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দৌড় দিল দেয়ালের ছায়ার দিকে।
থেম না, মুসা! চেঁচিয়ে বলল কিশোর। একটাকে অন্তত ধরা চাই!
একটা খুদে মূর্তির কাঁধ খামচে ধরল মুসা, কিন্তু ধরে রাখতে পারল না, ঝট করে বসে পড়েছে দানোটা। তাল সামলাতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল সে। কিশোরও ছুটে এসে হোঁচট খেয়ে পড়ল মুসার গায়ের ওপর। তাড়াহুড়ো করে উঠে দাঁড়াল আবার দুজনেই। চকিতের জন্যে দেখল, থিয়েটার-বাড়ির দিকে ছুটে পালাচ্ছে দানাগুলো।
গেট! হাঁপাচ্ছে কিশোর। খোলা!
বাড়িতে ঢুকে পড়েছে! চেঁচিয়ে উঠল মুসা। কিশোর, জলদি এস!
মুসা, দাঁড়াও! ডাকল কিশোর। একটা ব্যাপার... আর কিছু বলার আগেই হাতের কবজিতে হ্যাঁচকা টান পড়ল, বাধ্য হয়েই তাকেও মুসার পিছু নিতে হল।
থিয়েটারে আগুন লাগলে কিংবা অন্য কোনরকম জরুরি অবস্থার সৃষ্টি হলে, বেরোনর জন্যে একটা ইমার্জেন্সী ডোর রাখা হয়েছিল, সেটা এখন খোলা। সেদিক দিয়েই ভেতরে ঢুকেছে দানোরা। মুসাও ঢুকে পড়ল সেই দরজা দিয়ে।
মুসার সঙ্গে তাল রাখতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে কিশোর। গতি কমাতেও পারছে না, তাহলে টানের চোটে হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়তে হবে। মুসার পেছনে বাড়ির ভেতরের গাঢ় অন্ধকারে ঢুকে পড়ল সে-ও। পেছনে দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল। দরজা। আটকা পড়ল দুই গোয়েন্দা। মুহূর্ত পরেই চারপাশ থেকে আক্রান্ত হল ওরা। চোখা তীক্ষ্ণ অনেকগুলো নখ খামচে ধরল ওদেরকে।
বাঁচাও! বাঁচাও! চেঁচাতে লাগল মুসা। দানোরা মেরে ফেলল আমাকে!
আমাকেও ধরেছে! গুঙিয়ে উঠল কিশোর। দুহাতে মেরে গায়ের ওপর থেকে সরানর চেষ্টা করল খুদে মানুষগুলোকে। আমাকে আটকে ফেলেছে!
এখনও দড়ি ধরে রেখেছে মুসা, কি ভেবে হ্যাঁচকা টান মারল কিশোর। চেঁচিয়ে উঠল এক দানো, দড়িটা প্রচণ্ড জোরে বাড়ি মেরেছে তার গলায়।
চমকে গেল দানোরা।
ক্ষণিকের জন্যে গায়ে চাপ কমে গেল, সুযোগটার সদ্ব্যবহার করল কিশোর। ঝাড়া মেরে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে চলে এল মুসার কাছাকাছি। হাতে একটা চামড়ার জ্যাকেট ঠেকতেই খামচে ধরে হ্যাঁচকা টান মারল, একটানে দানোটাকে সরিয়ে

আনল মুসার গায়ের ওপর থেকে, প্রায় ছুঁড়ে ফেলে দিল একপাশে। মেঝেতে পড়ে তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠল দানোটা।
আরেকটা দানোকে ধরে মাথার ওপরে তুলে ছুঁড়ে ফেলল মুসা।
গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়াল দুই গোয়েন্দা, দুজনেই মুক্ত এখন। হাঁপাচ্ছে জোরে জোরে। কব্জি থেকে দড়ি খুলে নিয়ে গুটিয়ে আবার কোমরে ঝোলাল কিশোর।
এখন কি করা, কিশোর? হাঁপাতে হাঁপাতে বলল মুসা।
দরজা খুঁজে বের করতে হবে। আমাদের পেছনেই বোধহয় ওটা, এই যে এদিকে, মুসার হাত ধরে টানল কিশোর।
কয়েক পা এগোতেই দেয়াল ঠেকল হাতে। হাতড়াতে শুরু করল কিশোর। দরজার হাতলে আঙুল ঠেকতেই চেপে ধরে টান দিল। খুলল না দরজা, তালা। আটকানো।
আটকাই পড়লাম, বিষণ্ন শোনাল কিশোরের গলা। ওভাবে এসে ঢুকে পড়াটা উচিত হয়নি, মুসা। উল্টে আমরাই ওদের ফাঁদে ধরা পড়লাম।
হ্যাঁ, কাজটা ঠিক হয়নি! তোমাকেও টেনে আনলাম এর মাঝে!
এটাই চাইছিল ওরা। যা হওয়ার হয়ে গেছে—ওই যে, শুনতে পাচ্ছ?
না শোনার কোন কারণ নেই, তীক্ষ্ণ শিস দিচ্ছে দানোরা। ডানেবায়ে দুদিকে।
আবার আক্রমণের জন্যে তৈরি হচ্ছে! চাপা গলায় বলল মুসা।
জলদি বেরোতে হবে এখান থেকে! আরও পথ থাকতে পারে।
থাকলেও অন্ধকারে খুঁজে বের করব কিভাবে?
আরে তাই তো, টর্চ! ভুলেই গিয়েছিলাম! ভয় এভাবেই আচ্ছন্ন করে মনকে... আছে, কোমরেই আছে।
মুসার টর্চও ঝোলানো আছে কোমরের বেল্টে। খুলে নিয়ে সুইচ টিপতেই অন্ধকার চিরে দিল তীব্র আলোকরশ্মি। আধ সেকেণ্ড পর কিশোরের টর্চ জ্বলে উঠল।
গায়ে আলো পড়তেই ছুটোছুটি করে লুকিয়ে পড়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল খুলে মানুষগুলো। অদ্ভুত ভাষায় চিচি করে কি সব বলছে। অনেক বেশি সতর্ক এখন রত্নদানোরা। বুঝে গেছে, সহজে ছেলেদুটোকে কাবু করা যাবে না।
থিয়েটার মঞ্চের পেছনে রয়েছে দুই গোয়েন্দা। আয়তাকার কাঠের ফ্রেমে আটকানো ক্যানভাসের বড় বড় অসংখ্য ফ্ল্যাট একটার ওপর আরেকটা সাজিয়ে সারি দিয়ে রাখা হয়েছে। নানারকম ছবি, সিনসিনারি আঁকা ওসব ফ্ল্যাটে। নাটক অভিনয়ের সময় দৃশ্যপট পরিবর্তনের কাজে ব্যবহার হত ওগুলো। মই আর অন্যান্য কাজের জিনিস এখন পড়ে আছে অবহেলিত হয়ে পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে অনেক বছর। ধরে।

বাতাসে ডানা ঝাঁপটানর শব্দ, মাথার ওপর দিয়ে শব্দ করে উড়ে গেল একটা বাদুড়।
বাদুড়! চেঁচিয়ে উঠল মুসা।
বাদুড়ে কামড়ায় না। চেঁচিও না অযথা। ওই যে, দেখ, দানোরা আসছে! চ্যালাকাঠকে লাঠির মত বাগিয়ে ধরে পায়ে পায়ে এগোচ্ছে খুদে মানুষেরা, সেদিকে দেখাল কিশোর। এখন যাই কোথায়?
এদিকে! ছোট! বলেই দুই সারি ফ্ল্যাটের মধ্য দিয়ে ছুটল মুসা।
কিশোরও ছুটল মুসার পেছনে। হঠাৎ থেমে মইটাকে এক টান মেরে ফেলে দিয়ে আবার ছুটল। তীক্ষ্ণ স্বরে চেঁচিয়ে উঠল এক দানো, বোধহয় গায়ের ওপর মই পড়েছে, কিংবা হোঁচট খেয়ে মাটিতে পড়ে গেছে ওটা। সেসব দেখার সময় নেই। এখন দুই গোয়েন্দার, ছুটছে প্রাণপণে।
থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল মুসা। সামনেও আছে দুটো! দুদিক থেকে আক্রমণের। তালে আছে!
দ্রুত এপাশ-ওপাশ দেখে নিল কিশোর। সারি দিয়ে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে অনেকগুলো ফ্ল্যাট। আঙুল তুলে দেখাল সে, ওগুলোর ভেতর দিয়ে যাব!
জোরে লাথি মারল কিশোর। ফড়াৎ করে ছিঁড়ে গেল পুরানো ক্যানভাস। মুসাকে নিয়ে ওটার ভেতরে ঢুকে পড়ল সে।
একের পর এক দৃশ্যপট ছিঁড়ে আরও ভেতরে ঢুকে চলল দুই গোয়েন্দা। পেছনে দুলছে ছেঁড়া ক্যানভাস। ওপাশে রয়েছে রত্নদানোরা, ওদেরকে দেখা যাচ্ছে না এখন, তবে চেঁচামেচি কানে আসছে।
কাঠের তৈরি বিশাল মঞ্চের কাছে চলে এল দুজনে। লাফিয়ে উঠে পড়ল। তাতে। সামনে আলো ফেলল। পুরানো, ধুলোমাখা নোংরা সিটের সমুদ্র চোখে পড়ল। ওগুলোর পেছনে নিশ্চয় দরজা রয়েছে। থাকলেও খোলা না বন্ধ কে জানে!।
পেছনে হালকা পায়ের শব্দ ছুটে আসছে। ঘুরে আলো ফেলল মুসা। পৌঁছে গেছে দানোরা।
দৌড়াও! চেঁচিয়ে বলল মুসা। দুই সারির মাঝখানের পথ ধরে ঢুকে পড়ব!
মঞ্চের একপাশের কাঠের সিঁড়ি বেয়ে হলের মেঝেতে নেমে পড়ল ওরা। ঠিক এই সময় জ্বলে উঠল হলের আলো, মেইন সুইচ অন করে দিয়েছে কেউ।
পেছনে তাকাল একবার কিশোর। হাতে চ্যালাকাঠ নিয়ে ছুটে আসছে দুটো খুদে মানুষ। ঝাড়বাতির রঙিন আলোয় অদ্ভুত দেখাচ্ছে দাননাদুটোকে। রত্নদানো
ছুটতে ছুটতে হাত বাড়িয়ে হঠাৎ ছাত থেকে ঝুলন্ত একটা দড়ি ধরে ফেলল এক দানো। জোরে এক দোল দিল দড়াবাজিকরের মত, চোখের পলকে উড়ে এসে

পড়ল কিশোরের ঘাড়ে।
হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল কিশোর, হাত থেকে ছুটে গেল টর্চ। খোঁজার সময় নেই, গায়ে চেপে বসেছে দানো, ওটাকে ছাড়াতেই ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে।
টর্চটা একটা সিটের ওপর রেখে এগিয়ে এল মুসা। দানোর কোমড় আঁকড়ে ধরে হ্যাঁচকা টানে সরিয়ে নিল কিশোরের ওপর থেকে, গুঁজে দিল দুটো সিটের। মাঝখানের ফাঁকে। অসহায় ভঙ্গিতে ঝুলে থেকে হাত-পা ছুঁড়তে শুরু করল দানো, সাহায্যের জন্যে চেঁচাতে লাগল।
সঙ্গীকে সাহায্য করতে ছুটে এল দ্বিতীয় দালোটা। এই সুযোগে ছুটে গিয়ে একটা পথে ঢুকে পড়ল দুই গোয়েন্দা। ছুটল লবির দিকে।
বাইরে বেরোনর দরজার গায়ে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল দুজনে, ধাক্কা দিল। কিন্তু এক চুল নড়ল না বিশাল ভারি দরজা।
বাইরে থেকে তক্তা লাগিয়ে পেরেক মেরে রেখেছে! দমে গেল মুসা। জোরে জোরে হাঁপাচ্ছে। জানালা খুঁজে বের করতে হবে। কিশোর, এস।
টর্চ হাতে একপাশের করিডর ধরে ছুটল মুসা। এক সারি সিঁড়ির গোড়ায় এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। এক মুহূর্ত দ্বিধা করেই পা রাখল সিঁড়িতে।
একেকবারে দুতিনটে করে সিঁড়ি টপকাতে লাগল দুজনে। ঘুরে ঘুরে উঠে গেছে পুরানো ধাচের সিঁড়ি, শেষ নেই যেন এর। কয়টা মোড় ঘুরল ওরা, বলতে। পারবে না।
সিঁড়ি শেষ হল। ব্যালকনিতে উঠে এল ওরা। জিরিয়ে নেয়ার জন্যে থামল। একধারে ঘোরানো রেলিঙ, রঙিন মখমলে ঢাকা। টর্চ নিভিয়ে সেদিকে এগোল মুসা।
রেলিঙের ওপর দিয়ে সাবধানে উঁকি দিল দুই গোয়েন্দা। অনেক নিচে হলের। মেঝেতে চারটে খুদে মূর্তি এক জায়গায় জড়ো হয়ে উত্তেজিতভাবে কথা বলছে। এক সময় আরেকটা মূর্তি এসে যোগ দিল ওদের সঙ্গে। বলিষ্ঠদেহী স্বাভাবিক একজন মানুষ।
বার্ট! আঁতকে উঠল মুসা, চাপা কণ্ঠস্বর। দানোদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে বার্ট!
তাই তো দেখছি! ভীষণ গম্ভীর হয়ে গেছে কিশোর। মস্ত একটা ভুল করেছি আমি, মুসা।...ওই যে, শোন।
দাঁড়িয়ে আছ কেন, চামচিকের দল! নিচে ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছে বার্ট। খোঁজ, খোঁজ! বিছুদুটেন্তকধরতেই হবে! সব দরজা আটকানো, পালাতে পারবে না ওরা।
ছড়িয়ে পড়ল চারটে খুদে মানুষ।
আমরা কোথায়, বুঝতে পারছে না ব্যাটারা, ফিসফিস করে বলল কিশোর। কোথাও লুকিয়ে থাকতে হবে আমাদের এখন। মিস ভারনিয়া জেগে উঠলেই

আমাদের খোঁজ পড়বে—
ইয়াল্লা! ভুলেই গিয়েছিলাম! তাই তো, আমাদের না দেখলে পুলিশকে খবর পাঠাবেন তিনি! এ-বাড়িতে নিশ্চয় খুঁজবে পুলিশ, আশায় দুলে উঠল মুসার বুক।
ঝোঁপের ধারে আমার ক্যামেরাটা খুঁজে পাবে পুলিশ, কিশোর বলল। ফিল বের করে দেখলেই বুঝে যাবে, অদ্ভুত কিছু একটা ঘটছে এই এলাকায়।
চল, কোথাও লুকিয়ে পড়ি, অধৈর্য কণ্ঠে বলল মুসা। শুনতে পাচ্ছ না, সিঁড়িতে শব্দ?

.

পরিচিত একটা শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে গেল মিস ভারনিয়ার: গাঁইতি দিয়ে মাটি কোপাচ্ছে কেউ! চুপচাপ বিছানায় পড়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। হ্যাঁ, সেই শব্দ! তাঁর ঘরের ভিতের নিচে যেন মাটি কাটছে রত্নদানোরা!
ছেলেরা কি শুনতে পাচ্ছে? ওরা থাকায় ভালই হয়েছে, ভাবলেন মিস ভারনিয়া। কিন্তু কোনরকম সাড়াশব্দ নেই কেন ওদের? এখনও ঘুমিয়ে আছে।
কিশোর! মুসা! গলা চড়িয়ে ডাকলেন লেখিকা।
সাড়া এল না। উঠে গিয়ে ডেকে ওদের জাগাতে হবে, ভাবলেন মিস ভারনিয়া। বিছানা থেকে নেমে পায়ে স্লিপার গলালেন। একটা আলোয়ান গায়ে চড়িয়ে। বেরোলেন ঘর থেকে। ছেলেদের ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালেন।
কিশোর! মুসা! আবার ডাকলেন মিস ভারনিয়া।
কোন সাড়া নেই। অবাক কাণ্ড! দরজা খুলে সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিলেন তিনি। বিছানার দিকে চোখ পড়তেই দম আটকে গেল যেন। শূন্য বিছানা!
দুরুদুরু করতে লাগল বুকের ভেতর, সারা ঘরে চোখ বোলালেন মিস ভারনিয়া। চেয়ারের হেলানে রাখা আছে মুসার পায়জামা, ভাজও খোলা হয়নি। টেবিলে পড়ে আছে ছেলেদের ব্যাগ, অথচ ওরা নেই। এর মানে? পালায়নি তো! নিশ্চয় মাটি কাটার শব্দ শুনেছে, দানোদের দেখেছে, ব্যস ভয় পেয়ে পালিয়ে গেছে। মুসা আর কিশোর।
ঈশ্বর! আপনমনেই বিড়বিড় করলেন লেখিকা, এখন আমি কি করি!
আর থাকা যায় না এ-বাড়িতে, ভাবলেন মিস ভারনিয়া। মুসা আর কিশোরের মত ছেলেও যখন ভয় পেয়ে পালিয়েছে, তিনি আর থাকেন কোন ভরসায়? নাহ, আর থাকবেন না, সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন লেখিকা।
আপাতত ববের ওখানে গিয়েই উঠবেন, ভেবে, তাকে টেলিফোন করার জন্যে নিচে নামলেন মিস ভারনিয়া। হাত কাঁপছে, ডায়াল করতে পারছেন না ঠিকমত। সঠিক নাম্বার পাওয়ার জন্যে তিনবার চেষ্টা করতে হল তাঁকে। অবশেষে রিসিভারে ভেসে এল ববের ঘুমজড়িত কণ্ঠ।

বব! ভয়ে ভয়ে এদিক-ওদিক তাকালেন মিস ভারনিয়া। রত্নদানো! আবার এসেছে! স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি মাটি কোপানর শব্দ! বব, আর এক মুহূর্তও এখানে না! তোমার ওখানে চলে আসছি এখুনি। কাল..হ্যাঁ,কালই বাড়ি বিক্রি করে দেব!
বাড়ি বিক্রির কথা পরে হবে, ফুফু, ঘুমের লেশমাত্র নেই আর ববের কণ্ঠে। জলদি তৈরি হয়ে নাও। আমি আসছি, এই বড় জোর দশ মিনিট।
পাঁচ মিনিটেই হয়ে যাবে আমার, রিসিভার নামিয়ে রাখলেন মিস ভারনিয়া।
ববের গাড়িতে উঠে দরজা বন্ধ করার পর শান্ত হলেন মিস ভারনিয়া। নেতিয়ে পড়লেন গাড়ির সিটে।

.

মুসা আর কিশোরের অস্বস্তি বাড়ছে। থিয়েটারের ওপরতলায় এখন রয়েছে ওরা। লুকানর জায়গা খুঁজে পায়নি। নিতান্ত দরকার না পড়লে টর্চ জ্বালছে না। বাতাসে যেন জমাট বেঁধে আছে পুরানো ভাপসা গন্ধ। দানোরা আসছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না, কোনরকম সাড়াশব্দ নেই কোথাও।
সরু করিডর ধরে একটা দরজার কাছে এসে দাঁড়াল দুই গোয়েন্দা, ঠেলা দিতেই খুলে গেল পাল্লা। ভেতরে ঢুকল ওরা। দরজাটা আবার বন্ধ করে দিয়ে টর্চ জ্বালল মুসা।
ঘরের ঠিক মাঝখানে মস্ত বড় দুটো মেশিন বসানো রয়েছে। প্রাচীন আমলের সিনেমা-প্রোজেকটর, ধুলো-ময়লায় একাকার, মরচে পড়ে বাতিল লোহায় পরিণত হতে চলেছে।
আরি, সিনেমাও দেখানো হত নাকি! এহ্, যা-মেশিন! মুখ বাঁকাল মুসা; মিউজিয়মে রাখার উপযুক্ত! কিশোরের দিকে ফিরল। এ-ঘরেই লুকিয়ে থাকা যাক।
বড় বেশি খোলামেলা! কতক্ষণ থাকতে হবে কে জানে! বিপদে পড়ব শেষে।
পড়ব মানে কি? পড়েই তো আছি। বরং বল, বিপদ আরও বাড়বে।
চল, অন্য জায়গা খুঁজি। এখানে লুকানো যাবে না।
প্রোজেকশন রুমের পাশে একটা হলে এসে ঢুকল ওরা। ঘরের এক প্রান্ত থেকে একটা সিঁড়ি উঠে গেছে ছোট একটা প্ল্যাটফরমে, ওটাতে উঠে এল দুজনে। সামনে একটা দরজার গায়ে লেখা।
মিনারেট
প্রবেশ নিষেধ।
মিনারেট! কোনরকম দানব-টানব? মুসা অবাক।
তুমি বোধহয় মাইনোটারের কথা ভাবছ? গ্রীক মিথোলজির ষড়মাথা দানব, কিশোর বলল। এটা মাইনোটার নয়, মিনারেট, টাওয়ারের ওপরের খোলা

জায়গা। চল, ওখানেই উঠে পড়ি। একটা বুদ্ধি এসেছে, দরজায় ঠেলা দিল কিশোর।
লোহার পাল্লা, মরচে পড়ে শক্ত হয়ে আটকে আছে। দুজনে মিলে জোরে ধাক্কা দিতেই শব্দ করে খুলে গেল। খুব সরু একটা লোহার মই উঠে গেছে দরজার ওপাশ থেকে। মই বেয়ে উঠতে শুরু করল ওরা।
মিনিটখানেক পরে টাওয়ারের চারকোনা একটা খোলা জায়গায় এসে উঠল। ওরা। অনেক নিচে রাস্তা, নির্জন, শুধু পথের ধারের লাইটপোস্টগুলো প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে।
মিনারেটে তো উঠলাম, বলল মুসা, এবার? এখান থেকে আর কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। আরও ভালমত আটকা পড়লাম।
আটকা আর পড়লাম কোথায়? পথের দিকে চেয়ে আছে কিশোর। নিচেই রাস্তা, ওখানে কোনমতে নেমে যেতে পারলেই হল। মাত্র পঁচাত্তর ফুট।
মাত্র পঁচাত্তর ফুট! লাফিয়ে নামব নাকি?
কেন, সঙ্গে দড়ি আছে না? দড়ির বাণ্ডিল খুলে নিল কিশোর। পাকিয়ে মোটা করে নিয়েছিলাম। পাক খুললেই অনেক লম্বা হয়ে যাবে। হলেও তোমার ডবল ওজন সইতে পারবে।
আমার? আমার কেন? তোমার নয় কেন?
কারণ, তোমার মত ভাল অ্যাথলেট নই আমি, শান্তকণ্ঠে বলল কিশোর। আমি চেষ্টা করলে বড় জোর পড়ে গিয়ে হাত-পা ভাঙতে পারি, এর বেশি কিছু। করতে পারব না, কিন্তু তুমি নিরাপদে নেমে যেতে পারবে। ওই যে, অনেক শিক বেরিয়ে আছে। ওগুলোর কোনটায় দড়ি বেঁধে দিচ্ছি, নেমে গিয়ে পুলিশ ডেকে নিয়ে। এস। মিস ভারনিয়ার জন্যে অপেক্ষা করলে চলবে না।
দ্রুত দড়ির পাক খুলে ফেলল কিশোর।
টেনেটুনে দড়িটা দেখল মুসা। বেশি সরু, পিচ্ছিল। ধরে রাখাই মুশকিল। হবে। হাতে কেটে বসে যাবে।
যাবে না। দস্তানার তালুতে চামড়া রয়েছে, সহজে কাটবে না। হাতের কব্জিতে এক পাক দিয়ে ঝুলে পড়কে দড়ি ধরে, তারপর আস্তে আস্তে ছাড়লেই সরসর করে। নেমে যেতে পারবে।
হাতে দড়ি পেঁচিয়ে টেনেটুনে দেখল মুসা। মাথা ঝাঁকাল। হ্যাঁ, পারব মনে হচ্ছে। কিন্তু একটা কথার জবাব দেবে?
কি? শিকে দড়ি বাধছে কিশোর।
রত্নদানো আমরা সত্যি দেখলাম তাহলে?

খুদে মানুষ দেখলাম, মুখ তুলল কিশোর। আমি একটা আস্ত গাধা! আমার ধারণা ছিল, মিস ভারনিয়াকে ভয় দেখিয়ে তাড়ানর চেষ্টা করছে ওরা, যাতে উনি বাড়ি বিক্রি করে দেন। বুঝতেই পারিনি সত্যি সত্যি গুপ্তধনের জন্যে মাটি খুঁড়ছে। ওরা। গাধা! অযথা গালমন্দ করছ নিজেকে। তুমি কেন, কেউই বুঝতে পারত না। তখন, মিস ভারনিয়ার বাড়ির তলায় গুপ্তধন খুঁজছে দানোরা।
মিস ভারনিয়ার বাড়ির তলায় নয়, মুসা এখনও বুঝতে পারছে না দেখে বিরক্ত হল কিশোর। এখান থেকে সবচেয়ে কাছের গুপ্তধন কোথায়?
হবে হয়ত, পাহাড়ের তলায় কোথাও!
তোমার মাথা! কেন, ব্যাংকটা চোখে পড়ে না?
ব্যাংক? বোকা হয়ে গেছে যেন মুসা। মানে?
হাল ছেড়ে দিল কিশোর, এত কথা বলার সময় নেই এখন। যাও, নাম। যে কোন সময় ব্যাটারা এসে পড়তে পারে। সাবধান, বেশি তাড়াহুড়ো কোরো না।
কিশোর যেভাবে বলেছে ঠিক সেভাবে নামা সম্ভব হল না, দড়ি ধরে ঝুলে বাঁকা হয়ে দেয়ালে পা ঠেকিয়ে নামতে লাগল মুসা। নিচের দিকে তাকাল না একবারও। অর্ধেকটা মত নেমেছে মুসা, এই সময় ওপরে চিৎকার শুনল। একবার গুঙিয়ে উঠল কিশোর, তারপরেই চুপ হয়ে গেল। ধড়াস করে এক লাফ মারল মুসার হৃৎপিণ্ড। কিশোরকে কি ধরে ফেলেছে:-প্রচণ্ড জোরে দড়িতে নাড়া লাগল, আরেকটু হলে হাতই ছুটে গিয়েছিল মুসার। শক্ত করে দড়ি আঁকড়ে ধরল সে।
এই যে, বিচ্ছু! শোনা গেল বার্টের কর্কশ গলা। নিচে নামছ। হ্যাঁ, তোমাকে বলছি।
ঢোক গিলল মুসা। আবার নাড়া লাগল দড়িতে। প্রাণপণে দড়ি ধরে রইল সে। ব-বল!
উঠে এস।
নিচে নামছি তো! নিজের কানেই বেখাপ্পা শোনাল মুসার কথা।
হঠাৎ নেমে যাবে কিন্তু! ধমকে উঠল বার্ট। দড়ি কেটে দেব।
নিচে তাকাল মুসা। আর বড় জোর তিরিশ ফুট বাকি, ঘাস থাকলে লাফিয়ে পড়তে পারত। কিন্তু কংক্রিটে বাঁধানো কঠিন পথ, দুই পায়ের হাড় কয়েক টুকরো হয়ে যাবে এখান থেকে লাফ দিলে।
কি হল, বিচ্ছু? নড়ছ না কেন? তিন পর্যন্ত গুনব, তারপর দেব দড়ি কেটে!
দাঁড়াও দাঁড়াও, গোনার দরকার নেই! চেঁচিয়ে বলল মুসা। আমি উঠে আসছি। দড়ি পিছলে যেতে চায়, শক্ত করে ধরে নিই।
ঠিক আছে। কিন্তু কোনরকম চালাকি চাই না।
একটা বুদ্ধি এসেছে মুসার মাথায়। তেমন কিছুই নয়, তবে এতে কাজ হলেও হতে পারে। ডান হাতে দড়ি ধরে ঝুলে থেকে দাঁতে কামড়ে ডান হাতের দস্তানা খুলে

ফেলল। পকেট হাতড়ে নীল চক, বের করে ময়লা দেয়ালে বড়সড় একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন আঁকল। নিচে ফেলে দিল বাকি চকটা।
আরে অই, বিচ্ছ! অধৈর্য হয়ে পড়েছে বার্ট। উঠছ না কেন? দেব নাকি দড়ি কেটে?
এই যে আসছি, আসছি!
নামার চেয়ে ওঠা অনেক বেশি কঠিন। অনেক কষ্টে মিনারেটের কাছাকাছি উঠে এল মুসা। তাকে ধরে তুলে নিল দুটো বলিষ্ঠ হাত।
বার্ট ছাড়াও আরও দুজন রয়েছে মিনারেটে, কিশোরকে চেপে ধরে রেখেছে। দুদিক থেকে।
মুসার পিঠে কনুই দিয়ে গুতো মারল বার্ট। আগে বাড়।
অনেক সিঁড়ি, অনেক মোড়, গলিঘুজি আর করিডর পার করে নিচের তলার একটা ঘরে নিয়ে আসা হল দুই গোয়েন্দাকে। কংক্রিটের এবড়োখেবড়ো দেয়াল, একপাশে বড় বড় দুটো মরচে-পড়া বয়লার পড়ে আছে। থিয়েটারের হল রুম গরম রাখার কাজে ব্যবহৃত হত নিশ্চয় ওগুলো, ভাবল মুসা।
একপাশের দেয়ালে কয়েকটা বন্ধ দরজা। প্রথম দরজাটার গায়ে লেখা: কোল বিন নং ১, তারপরে কোল বিন নং ২, এবং কোল বিন নং ৩। রঙ চটে গেছে, কোনমতে পড়া যায় শব্দগুলো। মুসা বুঝল, ওগুলো কয়লা রাখার ঘর।
এক নাম্বার ঘরের দরজা খুলে ছেলেদেরকে ভেতরে ঠেলে দিল বার্ট।
বিস্ময়ে ঘোঁৎ করে উঠল মুসা। এক কোণে বসে তাস খেলছে সেই চার রত্নদানো। একবার চোখ তুলে চেয়েই আবার খেলায় মন দিল ওরা। অনেকগুলো কোদাল, গাঁইতি আর শাবল ফেলে রাখা হয়েছে এক ধারে মেঝেতে কয়েকটা বড় বৈদ্যুতিক লণ্ঠনও আছে। কিন্তু সবচেয়ে বেশি অবাক হল মুসা কংক্রিটের দেয়ালে। একটা কালো ফোকর দেখে। নিশ্চয় মাটির নিচে রয়েছে দেয়ালের ওই অংশ, কারণ ফোকরটার ওপাশে কালো সুড়ঙ্গমত দেখা যাচ্ছে।
দ্রুত চিন্তা চলেছে মুসার মাথায়। তার মনে হল, সুড়ঙ্গটা গেছে মিস ভারনিয়ার। বাড়ির দিকে। নাকি বাড়ির তলা দিয়ে অন্য কোথাও চলে গেছে? চকিতে বুঝে গেল কিশোরের কথার মানে, গুপ্তধনের সন্ধানে সুড়ঙ্গ খুঁড়ছে—ব্যাংক–হ্যাঁ, ব্যাংকে গুপ্ত রইয়েছে এই ধন!
কয়েকজন লোক আর ওই চারটে অদ্ভুত জীব আসলে ডাকাত। ব্যাংক ডাকাতির পরিকল্পনা করেছে ওরা!

.

কংক্রিটের দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে একগাদা বস্তার ওপর বসেছে মুসা আর কিশোর। দুজনেরই হাত-পা বাঁধা। মুখ খোলা, ইচ্ছে করলে কথা বলতে পারে, কিন্তু কথা বলার প্রবৃত্তি হচ্ছে না কিশোরের।

ডাকাতদের কাজকর্ম দেখছে মুসা। বার্টকেই নেতা বলে মনে হচ্ছে, অন্য দুজন, জিম আর রিক তার সহকারী। বেঁটে বলিষ্ঠদেহী লোকটার নাম জিম। রিকের ইয়া বড় গোঁফ, রোগাটে শরীর, কথা বললেই লণ্ঠনের আলোয় ঝিক করে উঠছে ওপরের পাটির একটা সোনায় বাধানো দাঁত।
কিশোর, ফিসফিস করে বলল মুসা। বার্ট ব্যাংক ডাকাত, না? মিস্টার রবার্টের নাইটগার্ডের কাজ নিয়েছে সে ইচ্ছে করেই, ডাকাতি করার জন্যে।
হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছ, নিচু গলায় বলল কিশোর। শুরুতেই ব্যাপারটা বোঝা। উচিত ছিল আমার। দুটো গুরুত্বপূর্ণ সূত্রও ছিল। গাঁইতি দিয়ে মাটি কোপানর শব্দ আর কাছেই একটা ব্যাংক। অথচ কি করলাম? গাধার মত রত্নদানোর দিকে নজর দিয়ে বসলাম।
তোমার কি দোষ? সান্তনা দিল মুসা। স্বয়ং শার্লক হোমসও আগে থেকে ব্যাপারটা বুঝতে পারত না। চমৎকার বুদ্ধি করেছে ব্যাটারা! রহদানোর দিকে নজর ফিরিয়ে রেখেছে আমাদের, বুঝতেই দেয়নি আসল কথা। আচ্ছা, কিশোর, একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না, দানো ব্যাটারা তাস খেলছে, ওদিকে তিন ডাকাত কাজ করতে করতে ঘেমে উঠেছে।
সুড়ঙ্গ খোঁড়ার জন্যে ডাকা হয়নি ওদেরকে, ক্ষোভ প্রকাশ পেল কিশোরের কথায়। ওদেরকে ভাড়া করা হয়েছে মিস ভারনিয়াকে ভয় দেখানর জন্যে, যেন তার কথা লোকে বিশ্বাস না করে সেজন্যে।
অ-অ, বুঝেছি। কিন্তু রত্নদানোদের খোঁজ পেল কি করে বার্ট, আনল কোত্থেকে? ব্ল্যাক ফরেস্ট থেকে?
হায়রে কপাল! হতাশ ভঙ্গিতে এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল কিশোর। ব্ল্যাক ফরেস্ট থেকে আমদানি করতে যাবে কেন? ওদেরকে আনা হয়েছে রূপকথার পাতা থেকে। আঙিনায় ব্যাটাদেরকে নাচতে দেখেই সেটা অনুমান করেছিলাম।
কিশোরের কথা আরও দুর্বোধ্য লাগল মুসার কাছে, কিন্তু বকা শোনার ভয়ে আর প্রশ্ন করল না, চুপ করে ভাবতে লাগল। মিস ভারনিয়ার লেখা বইয়ের পাতা থেকে? কি মানে এর?
ডাকাতদের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। সুড়ঙ্গের শেষ মাথা কাটা চলছে এখন। আলগা মাটি ঝুড়িতে করে ফেলে দিয়ে যাচ্ছে সুড়ঙ্গমুখের বাইরে।
আর মাত্র ফুট দশেক, রিক, জিমকে বলতে শুনল মুসা।
ওই দশ ফুটেই তো জান বের করে ছাড়বে! বলল রিক।
মাটি ফেলতে এসেছিল, ঝুড়ি নিয়ে আবার ভেতরে ঢুকে গেল দুজনে।
আরেকটা প্রশ্ন জাগল মুসার মনে। কিশোর-.. বলতে বলতেই থেমে গেল সে। বস্তার ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েছে গোয়েন্দাপ্রধান। ঘুমিয়ে পড়েছে।

দেখ কাণ্ড কিশোরের!অবাক হয়ে ভাবল মুসা। কোথায় মগজ খাঁটিয়ে এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা করবে, তা না, ঘুমিয়ে পড়েছে। তারপরই মনে হল মুসার, সামনে রাতের অনেকখানি পড়ে আছে। পালানর চেষ্টা করতে হলে শক্তি সঞ্চয় করা দরকার তাদের। যেইমাত্র সুড়ঙ্গ খোঁড়া শেষ হবে, ব্যাংকের ভল্ট থেকে। টাকা নিয়ে পালাবে ডাকাতেরা। ততক্ষণ ঘুমিয়ে নিতে পারলে মন্দ কি? ঠিক কাজই। করেছে কিশোর।

মুসাও শুয়ে পড়ল। মন থেকে দুশ্চিন্তা ঝেড়ে ফেলতেই ঘুম এসে গেল তার চোখেও।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছে, বলতে পারবে না মুসা, কিন্তু এখন বেশ ঝরঝরে লাগছে শরীরটা। তবে হাত-পায়ের যেখানে যেখানে দড়ি বাধা, সেখানে টনটন করছে।

কাছেই কথা বলছে কেউ। উঠে বসে ফিরে চেয়ে দেখল মুসা, কিশোরের হাতে। এক কাপ সুপ। তার পাশে একটা বাক্সের ওপর বসে আছে বার্ট। কিশোরের চেহারায় কেমন একটা খুশি খুশি ভাব।

মাটি কোপানর শব্দ শোনা যাচ্ছে না আর, বোধহয় সুড়ঙ্গ খোঁড়া শেষ হয়ে গেছে। ঘরের কোণে বসে স্যাণ্ডউইচ খাচ্ছে রত্নদানোরা। রিক আর জিমকে দেখা। যাচ্ছে না। সুড়ঙ্গের দিকে তাকাতেই মোটা বৈদ্যুতিক তারটা চোখে পড়ল মুসার, সাপের মত একেবেঁকে ঢুকে গেছে সুড়ঙ্গের ভেতরে। মোটরের আবছা গুঞ্জন কানে। আসছে। ও, বোঝা গেছে, মেশিন দিয়ে ভল্টের কংক্রিটের দেয়ালে ছিদ্র করছে জিম। আর রিক।

গুড মর্নিং, মুসা, হেসে বলল কিশোর। ঘুম ভাল হয়েছে তো?

হা হা, নিশ্চয়, স্বপ্নে এক রাজকুমারীকে বিয়েও করে ফেলেছি। ব্যঙ্গ ঝরল মুসার কথায়। এই বিপদের সময়ে কিশোরের হাসি আসছে কিভাবে বুঝতে পারছে না সে। কিশোরের কাপের দিকে আবার চোখ পড়তেই স্বর নরম করে ফেলল, কিশোর, আর কাপ নেই? মানে, সুপ দেয়া হবে না আমাকে?

মুসার কথার ধনে হো হো করে হেসে উঠল বার্ট। মুসাকেও এক কাপ সুপ দিল। বিচ্ছু ছেলে! তবে এখানে আর ইবলিসগিরি করতে পারবে না, ভালমত আটকেছি।

তোমরাও কম ইবলিস নাকি? যেন ঘরোয়া আলাপ-সালাপ করছে কিশোর, এমনি ভাব। প্রথমে তো পুরো বোকা বানিয়ে দিয়েছিলে আমাদেরকে। আঙিনায় তোমার পাঠানো দানাগুলোকে দেখে প্রথমে ভেবেছিলাম, ওটা ববের কাজ। ফুফুকে ভয় পাইয়ে বাড়ি থেকে তাড়ানর জন্যে ওই ফন্দি করেছে। তারপরে, ওরা যখন থিয়েটারের ভেতরে এসে ঢুকল, তখন বুঝলাম আসল ঘটনাটা।

আরেকটু হলেই দিয়েছিলে আমাদের বারোটা বাজিয়ে, দুআঙুলে চুটকি বাজাল বার্ট। পুলিশ তো প্রায় নিয়েই এসেছিলে, মুসার দিকে ফিরে বলল, চেহারা হাবাগোবার মত করে রাখলে কি হবে, ভীষণ চালাক তোমার বন্ধু। তবে এই অভিনয়টা খুব কাজে লাগবে। লোকে সন্দেহই করতে পারবে না। ওকে আমি ভালমত ট্রেনিং দিয়ে দেব। দশ বছরেই দুনিয়ার সেরা ক্রিমিন্যাল হয়ে উঠবে ও।
ধন্যবাদ, ক্রিমিন্যাল হতে চাই না আমি, মোলায়েম গলায় বলল কিশোর। ক্রিমিন্যালদের পরিণতি খুব খারাপ হয়।
বলে কি ছেলে! আরে, খোকা, তুমি জান, কার সঙ্গে কথা বলছ? দেশের সবচেয়ে ঝানু ক্রিমিনালদের একজনের সঙ্গে। মাথায় ঘিলু থাকলে সারা জীবন। অপরাধ করে বেড়াতে হয় না। প্রচুর পরিশ্রম করে বুদ্ধি খাঁটিয়ে ভালমত একটা দান মেরে দিতে পারলেই বাকি জীবন বসে খাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে যায়। ঠিক আছে, তোমার ইচ্ছে। আমার সঙ্গে থাকতে না চাইলে কি আর করব? খারাপ কাজটাই করতে হবে আমাকে।
বার্টের কথার মানে বুঝতে পারল না মুসা, কিন্তু কেন যেন শিরশির করে উঠল তার মেরুদণ্ডের ভেতরটা।
অনেক কথা জানার আছে মুসার, তাড়াতাড়ি বলে উঠল কিশোর। মিস্টার বার্ট, এই ব্যাংক ডাকাতির পরিকল্পনা কি করে করলেন, খুলেই বলুন না সব ওকে।
নিশ্চয়, নিশ্চয়, সুপের জগ তুলল বার্ট। আরেক কাপ নেবে?
আমার আর লাগবে না। মুসাকে দিন।
মুসার কাপ ভরতি করে সুপ ঢেলে দিল বার্ট। হ্যাঁ, গোড়া থেকেই বলি, জগ নামিয়ে রাখতে রাখতে বলল সে। এই ব্লকের পাশের ব্লকটাতেই আমার বাড়ি। বছর চল্লিশেক আগে মিস ভারনিয়ার এক রত্নদানে ছিলাম আমিও। দাঁত বের করে। হাসল বাট। আমাকে দানো কল্পনা করতে কেমন লাগছে? প্রশ্নের জবাবের। অপেক্ষা না করেই বলল, হপ্তায় একবার করে পাড়ার যত ছেলেমেয়েকে নিয়ে পার্টি দিত মিস ভারনিয়া। আইসক্রীম খাওয়াত, কেক খাওয়াত, তারপর তার বই থেকে গল্প পড়ে শোনাত।
বার্টের কাছে জানা গেল, তার বাবা ছিল রাজমিস্ত্রী, এই মূরিশ থিয়েটার আর পাশের ব্যাংকটা বানাবার সময় এখানে কাজ করেছিল। বাবার কাছেই ব্যাংকের ভল্টের কথা শুনেছে বার্ট। ওটার দরজা ইস্পাতের, কিন্তু দেয়াল তৈরি হয়েছে কংক্রিট দিয়ে। মাটির অনেক গভীরে তৈরি হয়েছে ভল্ট, তাই ইস্পাতের দেয়াল দেয়ার কথা ভাবেনি ব্যাংক কর্তৃপক্ষ। এই সুযোগটাই নিয়েছে বার্ট।
ওরা ভাবেনি, কিন্তু আমি ভেবেছি, বলল বার্ট। ইচ্ছে করলেই ওই ভল্ট থেকে টাকা লুট করা যায়। মিস ভারনিয়ার ভাড়ার থেকে সুড়ঙ্গ খোঁড়া শুরু করলে মাটির

তলা দিয়েই পৌঁছে যাওয়া যায় ভল্টের কাছে। তারপর কংক্রিটের দেয়াল ভেঙে ফেলাটা কোন কাজই না।
তখন এই এলাকায় ভাঙচুর শুরু হয়েছে। বসতবাড়ি বিক্রি করে দিয়ে চলে যাচ্ছে লোকে। আমি ভাবলাম, মিস ভারনিয়াও চলে যাবে, কিন্তু গেল না সে। অপেক্ষা করে করে বিরক্ত হয়ে উঠলাম। এই সময়েই একদিন শুনলাম, থিয়েটার বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। মালিকানা হাত বদল হয়ে গেছে। নতুন আইডিয়া এল মাথায়। থিয়েটার-হাউসের নিচতলার কোন একটা ঘর থেকে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে মিস। ভারনিয়ার বাড়ির নিচ দিয়ে পৌঁছে যাওয়া যায় ব্যাংকের ভল্টে। তখুনি কাজে লেগে যেতাম, কিন্তু একটা অপরাধের জন্যে ধরা পড়লাম পুলিশের হাতে, কয়েক বছর জেল হয়ে গেল।
জেলে বসে একের পর এক প্ল্যান করেছি। জেল থেকে ছাড়া পেয়েই কাজে নেমে পড়লাম। খুঁজে খুঁজে লোক জোগাড় করে একটা দল গড়লাম। থিয়েটার হাউসে তখন দুজন নাইটগার্ড। রাতে বিচিত্র শব্দ করে ভয় দেখিয়ে ওদেরকে তাড়ালাম। নতুন নাইটগার্ড দরকার মিস্টার রবার্টের। তার কাছে গিয়ে চাকরি চাইতেই চাকরি হয়ে গেল।
কি করে রাতের পর রাত দুই সঙ্গীকে নিয়ে সুড়ঙ্গ খুঁড়েছে বার্ট, সব বলল। আলগা মাটি ঝুড়িতে করে বয়ে এনে ফেলেছে কয়লা রাখার ঘরগুলোতে। কয়লার ঘরে কয়লা কিংবা জঞ্জাল ছাড়া আর কিছু থাকতে পারে, ভাবেনি মিস্টার রবার্ট, তাই ওই ঘরগুলোতে ঢোকেনি। ফলে সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়েনি তার।
অ। মিস্টার রবার্ট তাহলে নেই এসবে, বলল কিশোর। আমি ভেবেছিলাম সে-ও জড়িত।
না, সে নেই এতে। একমাত্র সমস্যা হল মিস ভারনিয়াকে নিয়ে। রাতে মাটি কোপানর শব্দ তার কানে যাবেই। পুলিশকে গিয়ে বলে দিতে পারে। তাই কয়েকটা। রত্নদানো আমদানি করতে হল। পুলিশকে বলল মিস ভারনিয়া, রাতে রানোরা মাটি কোপায়। তার কথা হেসেই উড়িয়ে দিল পুলিশ। আর বেশি চাপাচাপি করলে হয়ত মানসিক হাসপাতালেই পাঠাত, হা হা করে হাসল বার্ট। ভাবলাম, এরপর ভয়ে বাড়ি ছেড়ে দেবে মিস ভারনিয়া। ভয় পেল ঠিকই, কিন্তু বাড়ি ছাড়ল না। তোমাদের সাহায্য চেয়ে বসল। আমার সবকিছু প্রায় ভেস্তে দিয়েছিলে তোমরা, অল্পের জন্যে বেঁচে গেছি।
যদি মিস ভারনিয়ার ভাইপো বব বিশ্বাস করে বসত? প্রশ্ন রাখল কিশোর। যদি সে রাতে ফুফুর বাড়িতে থাকত, মাটি কোপানর শব্দ শুনত? দুজনের কথা হেসে উড়িয়ে দিতে পারত না পুলিশ।

মিটিমিটি শয়তানি হাসি হাসল বার্ট। এত কাঁচা কাজ কি আমি করি? ববের সঙ্গে আগেই ভাব করে নিয়েছি।
ভাব বুঝতে পারছে না মুসা।
হ্যাঁ। ওকে বলেছি, মিস্টার রবার্ট মিস ভারনিয়ার বাড়িটা কিনতে চায়, কিন্তু মহিলা বেচতে রাজি নয়। তাই ভয় দেখানর ছোট্ট একটা ব্যবস্থা করেছে মিস্টার। রবার্ট। বব যেন তার ফুফুকে সাহায্য না করে, এমন ভাব দেখায়, যেন ফুফুর মাথায় গোলমাল দেখা দিয়েছে। বুবু তো এক পায়ে খাড়া। ফুফু বাড়ি বেচলে তার লাভ। পটিয়ে মোটা টাকা নিয়ে নিতে পারবে ফুফুর মৃত্যুর আগেই। হাসল বার্ট।
ইয়াল্লা, কিশোর। প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মুসা। বব সত্যিই তাহলে আছে এর। মাঝে!
আগেই সন্দেহ করেছ নাকি তোমরা? ভুরু কোঁচকাল বার্ট। চালু ছেলে। আবার বলছি, আমার দুলে চলে এস। পুলিশের মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিতে পারব আমরা। তাহলে।
কিন্তু... চিন্তিত দেখাচ্ছে কিশোরকে। ভয় পেয়ে গেল মুসা, সুপার ক্রিমিন্যাল হওয়ার লোভ না আবার পেয়ে বসে গোয়েন্দাপ্রধানকে। তার ভয়কে সত্য প্রমাণ। করার জন্যেই যেন কিশোর বলল, ঠিক আছে, আরও ভেবে দেখতে হবে আমাকে। সামান্য সময় দরকার।
আরে নিশ্চয়, নিশ্চয় সময় দেয়া হবে, হেসে বলল বার্ট। যাই দেখি, জিম আর রিক কতদূর কি করল।
যাওয়ার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল বার্ট, ডেকে তাকে ফেরাল মুসা। একটা কথা। ওই রত্নদানো আমদানি করা হল কোত্থেকে? মানুষের কথা শুনতে রাজি হল কি করে। ওরা?
শব্দ করে হাসল বার্ট। সেটা ওদেরকেই জিজ্ঞেস কর। হাত তুলে ডেকে। বলল, এই, বিচ্ছুরা, এদিকে এস। তোমাদের সঙ্গে আলাপ করতে চায় এরা, বলে আর দাঁড়াল না।
উঠে দাঁড়াল একটা দানো। লাল জ্বলজ্বলে চোখ, ময়লা দাড়ি। অদ্ভুত ভঙ্গিতে হেলেদুলে হেঁটে এসে দাঁড়াল সে ছেলেদের সামনে। কি হে, ইবলিসেরা, কি বলবে? এহ, মেলা জালান জ্বালিয়েছ। হাতটা প্রায় ভেঙেই দিয়েছিলে আমার। কিন্তু মাপ করে দিয়েছি, জানি তো কপালে অনেক দুঃখ আছে তোমাদের। লম্বা। সাগরপাড়ি দিতে হবে।
ভাল ইংরেজি বলে দানোটা। ম্লান আলোয় যতখানি সম্ভব ভাল করে ওটাকে দেখল মুসা। লাল চোখ, চোখা রোমশ কান, কুচকুচে কালো রোমশ বড় বড় হাত, পৃথিবীর ওপরে থাকলে এই জীব মানুষের অগোচরে থাকতে পারত না কিছুতেই। মাটির তলায় লুকিয়ে থাকে বলেই লোকের চোখে পড়ে না।
তুমি কি সত্যিই রত্নদানো? জিজ্ঞেস করল মুসা।

হাসল দানোটা। খুব জানতে ইচ্ছে করছে, না? টান দিয়ে রোমশ একটা কান খুলে আনল সে। অবাক হয়ে দেখল মুসা, কানটা নকল, আসল কানের ওপর। বসানো ছিল।

এরপর টান মেরে রোমশ বিশাল একটা হাত খুলে আনল দানো। বেরিয়ে পড়ল ছোট একটা হাত, বাচ্চাছেলের হাতের চেয়েও ছোট। আসল পাটির ওপর থেকে খুলে আনল নকল দাঁত। তারপর চোখে হাত দিল। সাবধানে এক চোখের ওপর থেকে সরাল পাতলা একটা জিনিস। হেসে বলল, দেখলে তো, খোকা, লাল। চোখও নেই, চোখা দাঁতও নেই। লোকটার একটা চোখের মণি এখন স্বাভাবিক নীল। চোখের ওপর থেকে সরানো জিনিসটা দেখিয়ে বলল, টিনটেড কনট্যাক্ট লেন্স। নাকে আঙুল ছোঁয়াল। নকল নাক। দাড়িতে হাত দিল, নকল দাড়ি। রত্নদানোর ছবি দেখে তৈরি করা হয়েছে প্রতিটা জিনিস। আসলে আমি একজন। বামন, খোকা।

অনুমান করেছি, বলল কিশোর! তবে দেরিতে।

হ্যাঁ, বড্ড দেরি করে ফেলেছ। আজ আমাদের কাজ শেষ হয়ে যাবে। আগামীকাল রোববার, সোমবারের আগে কেউ কিছু জানতে পারবে না।

মিস ভারনিয়া আমাদেরকে না দেখলে পুলিশে খবর দেবেন, গলায় জোর পাচ্ছে না কিশোর।

দেবে না, মাথা নাড়ল বামন। এতক্ষণে তার ভাইপোর বাড়িতে পৌঁছে গেছে। কাঁচা কাজ করি না আমরা, খোকা। আগামী চব্বিশ ঘণ্টার আগে কেউ জানতেই পারবে না ব্যাংকটা লুট হয়েছে।

কপালে চিকন ঘাম দেখা দিয়েছে মুসার। কিছু একটা বলতে মুখ খুলল, কিন্তু বলা হল না, ঘরে এসে ঢুকল বার্ট। ভল্টে ঢোকার পথ হয়ে গেছে। বামনদের সর্দারকে বলল, তুমি এখানে থাক। অন্য তিন বামনকে দেখিয়ে বলল, ওদেরকে নিয়ে ভল্টে যাচ্ছি আমি, কাজ আছে।

আমিও সঙ্গে আসব? কিশোর জিজ্ঞেস করল। কি করে কাজ সারেন। আপনারা, দেখতে ইচ্ছে করছে।

হ্যাঁ হ্যাঁ, এস। কাজ দেখার পর ভক্তি এসেও যেতে পারে। হয়ত তখন আমাদের দলে যোগ দিতে আর দ্বিধা থাকবে না।

কিশোরের পায়ের বাধন কেটে দেয়া হল। বার্ট আর তিন বামনের পিছু পিছু সুড়ঙ্গে গিয়ে ঢুকল সে। মুসা বসে রইল আগের জায়গায়।

খুব বোকা বানিয়েছি তোমাদের! হাসল বামনটা। জানালায় টোকা দিলাম, যাতে আমার দিকে ফিরে চাও। জানতাম তাড়া করবে, করলেও, থিয়েটার হাউসে তোমাদেরকে নিয়ে আসতে কোন অসুবিধে হল না।

কিন্তু এখানে আনার কোন দরকার ছিল? জিজ্ঞেস করল মুসা।
ছিল। মাটি খোঁড়ার শব্দ শুনে সন্দেহ জাগতই তোমাদের, পুলিশ ডেকে নিয়ে আসতে হয়ত। অহেতুক কেন ঝুঁকি নিতে যাব? তার চেয়ে তোমাদেরকে আটকে ফেলাটাই কি ভাল হয়নি?
কিন্তু তাতেই কি ঝুঁকি চলে গেল? পুলিশ কি পরেও ধরতে পারবে না তোমাদেরকে? বামনদের সহজেই খুঁজে বের করা যাবে। পুলিশকে গিয়ে সব বলব আমরা, তারা তোমাদেরকে খুঁজে বের করবেই।
যদি গিয়ে বলতে পার তবে তো? রহস্যময় হাসি হাসল বেঁটে মানুষটা। আর পুলিশ এলেই বা কি? ওটা হলিউড, ওখানে ছবি বানানো হয়।
তাতে কি?
তাতে অনেক কিছু। সারা দুনিয়ায় যত বামন আছে, তার অর্ধেক রয়েছে ওই হলিউডে। ওখানকার অনেকেই সিনেমা কিংবা টেলিভিশনে অভিনয় করে, ডিজনিল্যাণ্ডে কাজ করে। বেকারও রয়েছে অনেক। আমিও বেকার, বামনদের একটা বোর্ডিং হাউসে থাকি। ওখানে আরও তিরিশ-বত্রিশ জন থাকে। বেকারদেরও পেট আছে, তাদেরও বাঁচতে ইচ্ছে করে, তাই সব সময়ই নানারকম কাজের ধান্ধায় থাকি আমরা। লোকের বাড়ির স্কাইলাইটের ভেতর দিয়ে কিংবা জানালা খুলে ঢুকে যাই ভেতরে, টুকটাক জিনিস নিয়ে কেটে পড়ি। বড় ধরনের কাজও মিলে যায়। মাঝে মাঝে, এখন যা করছি। আকার ছোট হওয়ায় আমাদের অনেক সুবিধে। এমন অনেক কাজ আমরা অনায়াসেই করতে পারি, স্বাভাবিক মানুষ যা পারে না।
স্বাভাবিক মানুষ আমাদের সম্পর্কে যা খুশি ভাবে ভাবুক, কিন্তু আমরা সুখেই। আছি। এক বোর্ডিং হাউসে অনেকে মিলে এক পরিবারের মত থাকি, কেউ কারও বিরুদ্ধে কিছু করি না। বাইরের কেউ আমাদের কারও সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করতে এলে আমরা কেউ কিছু জানি না, কিছু দেখিনি, শুনিনি, কিছু অনুমান করতে পারি না। নকল কানটা আবার জায়গামত বসিয়ে দিল বামনটা। কাজেই আমাদেরকে খুঁজে বের করতে পারবে না পুলিশ। তোমরাও আমাদের আসল চেহারা দেখনি, চিনিয়ে দিতে পারবে না। উঠে দাঁড়াল সে।যাই, দেখি, ওদিকে কদ্দূর হল। সুড়ঙ্গে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল বামনটা।
কংক্রিটের দেয়ালের বাইরে একটা গুহায় দাঁড়িয়ে আছে কিশোর। দেয়ালে একটা ফোকর করা হয়েছে, ছোট একটা ছেলে ঢুকতে পারবে ওই পথে। দরদর করে ঘামছে শ্রান্ত জিম আর রিক। রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছছে।
ফোকরটা আরও বড় করা যায়, বার্টের দিকে ফিরে বলল জিম। কিন্তু তাতে সময় লাগবে। তাছাড়া দরকার কি? বামনরা তো ঢুকতে পারবে এর ভেতরে।

হ্যাঁ, তা পারবে, এক বামনকে ইশারা করল বার্ট।
একের পর এক বামন ঢুকে গেল ভল্টে। ওদের টর্চের আলোয় চারকোনা একটা ঘর দেখা গেল। দেয়ালের তাকে থরে থরে সাজানো রয়েছে কাগজের নোট, গহনার বাক্স। মেঝেতে ফেলে রাখা হয়েছে মুদ্রার বস্তা।
দশ লাখ ডলারের বেশি! নোটগুলোর দিকে চেয়ে আছে বার্ট, জ্বলছে চোখের তারা। সোমবার অ্যারোপ্লেন কোম্পানির বেতনের দিন। তাই হেড অফিস থেকে এত টাকা তুলে এনে রাখা হয়েছে। কিশোরকে জানাল সে।
গভীর আগ্রহ নিয়ে বামনদের কাজ দেখছে কিশোর। তাক থেকে নোটের তাড়া নামিয়ে ছোট ছোট বস্তায় ভরল ওরা। অলঙ্কারের বাক্সগুলো ভরল আলাদা একটা বস্তায়।
পয়সার বস্তা নিয়ো না, বামনদেরকে বলল জিম। বেশি ভারি।
শুধু দুটো বস্তা নিয়ে এস, হাত নাড়ল বার্ট। দরকার আছে।
নোট আর গহনার বস্তা এপাশে পাচার করে দিল বামনরা। মুদ্রার ভারি বস্তা পার করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হল। ভল্ট থেকে বেরিয়ে এল ওরা।
ঝুড়িতে বস্তাগুলো সব তুলে ধরাধরি করে নিয়ে আসা হল সুড়ঙ্গের বাইরে, কয়লা রাখার ঘরে। একটা বস্তা খুলে নোটের বাণ্ডিল বের করল বার্ট। বামন সর্দারের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, এই নাও, এক লাখ। চারজনে ভাগ করে নিয়ো। সাবধানে খরচ কোরো, নইলে বিপদে পড়বে। যাও এখন। তোমাদের কাজ শেষ। আমরাও এখুনি যাব।
অত তাড়াহুড়ো নেই, বলল রিক। অনেক আগেই কাজ শেষ করে ফেলেছি।
রিকের কথার কোন জবাব না দিয়ে কিশোরের দিকে ঘুরল বার্ট।খোকা, আমাদের কাজ তো দেখলে, কি ঠিক করলে? আমাদের সঙ্গে থাকবে? আমি বলি থাক, কাজ কর, প্রচুর টাকা কামাই করতে পারবে। তোমার যা ব্রেন, খুব বড় গ্যাঙ লীডার হতে পারবে একদিন।
কি জবাব দেবে কিশোর?-ভাবল মুসা। কিশোর কি রাজি হবে?
আরও ভাবতে হবে আমার, বলল গোয়েন্দাপ্রধান। আসলে অর্ধেক কাজ শেষ হয়েছে তোমাদের, কঠিন কাজটাই বাকি রয়ে গেছে এখনও। অপরাধ করা। সহজ, কিন্তু করে পার পাওয়া খুব কঠিন। বেশির ভাগ অপরাধীই সেটা পারে না।
কিশোরের প্রতি শ্রদ্ধা বাড়ল বার্টের, হাসল। সঙ্গীদের দিকে ফিরে বলল, বলেছি না, ছেলেটার বুদ্ধি আছে। কিশোরকে বলল, একটু কষ্ট করতে হবে তোমাদের।
রিক-মাথা নেড়ে ইঙ্গিত করল সে।
বড় বড় দুটো চটের বস্তা নিয়ে এল রিক। কিশোর আর মুসাকে বস্তায় ভরে বস্তার মুখ বেঁধে ফেলা হল।

ট্রাকে তুলে দাও, বলল বাট।
খামোকা ঝামেলা, বলল রিক। ওরা আমাদের কথা শুনবে বলে মনে হয় না।
তাই মনে হচ্ছে, না? পয়সার বস্তা দুটো কেন নিয়েছি তেমন বুঝলে পায়ে বেঁধে পানিতে ফেলে দিলেই হবে, শব্দ করে হাসল বার্ট।
.
রোববার সকাল।
জানালা দিয়ে রোদ এসে পড়েছে ঘরে। ঘুম ভাঙল রবিনের, কিন্তু চুপচাপ বসে রইল অলস কয়েকটা মুহূর্ত। মুসা আর কিশোরের কথা মনে পড়তেই লাফ দিয়ে উঠে বসল। রাতে কতখানি কি করেছে ওরা? কিছু দেখেছে? রত্নদানো ধরতে। পেরেছে? ফোন করেছে?
তাড়াতাড়ি কাপড় পরে নিল রবিন। ওয়াকি-টকিটা পকেটে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে লাফাতে লাফাতে নিচে নামল। রান্নাঘর থেকে গরম কেরে গন্ধ আসছে। ম্যাপল গুড়ের তাজা সুগন্ধ সুড়সুড়ি দিচ্ছে যেন নাকে।
মা, কিশোর ফোন করেছে? রান্নাঘরে ঢুকেই জিজ্ঞেস করল রবিন।
না।
তারমানে, রাতে তেমন কিছু ঘটেনি, ভাবল রবিন। তাড়াহুড়োর কিছু নেই। ধীরেসুস্থে নাস্তা সারল সে। তারপর সাইকেল বের করে নিয়ে রওনা হল স্যালভিজ ইয়ার্ডে।
খোলা সদর দরজা দিয়ে ইয়ার্ডের আঙিনায় ঢুকে পড়ল রবিন।
হাফ-ট্রাকটা ধোয়া-মোছায় ব্যস্ত বোরিস। তার কাছে এসে জিজ্ঞেস করল রবিন, কিশোরের কোন খবর আছে?
না, মুখ না ফিরিয়েই জবাব দিল বোরিস।
ভাজ পড়ল রবিনের কপালে। ইয়ার্ডের অফিসে ঢুকল। মিস ভারনিয়ার বাড়িতে ফোন করল। রিঙ হচ্ছে, কিন্তু কেউ ধরছে না ওপাশ থেকে। কেন? আবার ডায়াল করল সে। এবারেও ধরল না কেউ। কি ব্যাপার? চিন্তিত হয়ে পড়ল সে। অফিস থেকে বেরিয়ে এল। বোরিস, কেউ রিসিভার তুলছে না! মনে হচ্ছে কেউ বাড়িতে নেই।
ফিরে তাকাল বোরিস। রত্নদানোদের শিকার হয়ে গেল না তো?
জলদি চলুন! একটা কিছু ঘটেছে!
চল!
ঠিক এই সময় বেজে উঠল টেলিফোন।
নিশ্চয় কিশোর! চেঁচিয়ে উঠল রবিন। ছুটে এসে আবার ঢুকল অফিসে, প্রায়। ছোঁ মেরে তুলে নিল রিসিভার। হ্যাল্লো! পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ড।

কিশোর-স্যান আছে? মিরোর গলা চিনতে পারল রবিন। বলল, না, বাইরে গেছে। আমি রবিন।
ও, রবিন-স্যান। কিশোরের জন্যে একটা মেসেজ আছে। আবার তন্ন তন্ন করে খোঁজা হয়েছে মিউজিয়মে, ছবিগুলোর পেছনেও দেখা হয়েছে।
গোল্ডেন বেল্ট পাওয়া গেছে? রিসিভার জোরে কানে চেপে ধরল রবিন।
নাহ! বাবা খুব রেগে গেছে আমার ওপর। অযথা হয়রানি করা হয়েছে বলে। আমার কিন্তু এখনও পুরোমাত্রায় বিশ্বাস রয়েছে কিশোর-স্যানের ওপর। গোল্ডেন বেল্ট পাওয়া যায়নি, বল তাকে।
বলব, রিসিভার নামিয়ে রাখল রবিন।
ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে রেখেছে বোরিস, রবিন এসে তার পাশে উঠে বসতেই গাড়ি ছেড়ে দিল।
ছবির পেছনে গোল্ডেন বেল্ট পাওয়া যায়নি! কিশোরের জন্যে একটা বড় দুঃসংবাদ, ভাবল রবিন। এমন তো সাধারণত করে না কিশোর! তাহলে?
একে রোবার, তার ওপর খুব সকাল, রাস্তায় গাড়ির ভিড় কম। সাংঘাতিক স্পীড দিয়েছে বোরিস, থরথর করে কাঁপছে ট্রাক। পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মাথায় মিস ভারনিয়ার গেটে এসে পৌঁছুল ওরা।
ইঞ্জিন থামার আগেই দরজা খুলে লাফিয়ে ট্রাক থেকে নেমে পড়ল রবিন। ছুটে এসে বেলের বোতাম টিপে ধরল। ধরেই রাখল, কিন্তু কোন সাড়া এল না বাড়ির ভেতর থেকে। পুরোপুরি শঙ্কিত হয়ে উঠল সে। বোরিসকে ডাকল।
ট্রাক থেকে নামছে বোরিস, এই সময় রবিন লক্ষ্য করল মিস ভারনিয়ার বাড়ির গেট পুরোপুরি বন্ধ নয়। ঠেলে পাল্লা আরও ফাঁক করে ঢুকে পড়ল আঙিনায়। তার পেছনেই ঢুকল বোরিস। বারান্দায় এসে উঠল দুজনে।
দরজার পাশে আরেকটা বেলের বোতাম, টিপে ধরল রবিন, কিন্তু এবারও সাড়া দিল না কেউ।
নিশ্চয় পাথর বানিয়ে ফেলেছে দানোরা! নিচু গলায় বলল বোরিস।
দরজায় ঠেলা দিল রবিন। হাঁ হয়ে খুলে গেল পাল্লা। বাইরে থেকে চেঁচিয়ে কিশোর আর মুসার নাম ধরে কয়েকবার ডাকল সে, জবাব এল না। ঘরের দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এল তার চিৎকার।
পুরো বাড়ি খুঁজে দেখল রবিন আর বোরিস, ভঁড়ারও বাদ দিল না। কিন্তু কাউকেই পাওয়া গেল না। সিঁড়ির মাথার ঘরে কিশোরের ব্যাগ, মুসার পাজামা আর হাতব্যাগ পড়ে রয়েছে।
নিশ্চয় কিছু দেখেছে মুসা আর কিশোর! দ্রুত চিন্তা চলছে রবিনের মাথায়। হয়ত আরও কাছে থেকে দেখতে গিয়ে ধরা পড়েছে! দুজনের পিছে পিছে গিয়েছেন

মিস ভারনিয়া, তিনিও ধরা পড়েছেন!
রত্নদানোরাই ধরেছে! মুখ শুকিয়ে গেছে বোরিসের।
বাইরে খুঁজে দেখি, চলুন! গলা কাঁপছে রবিনের। তিনজন জলজ্যান্ত মানুষকে দানোরা পাথর বানিয়ে ফেলেছে, এটা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না সে। তার ধারণা, অন্য কিছু ঘটেছে। আঙিনা থেকে শুরু করব।
কিশোরের ক্যামেরাটা খুঁজে পেল রবিন। ঝোঁপের একটা সরু ডালে বেল্ট পেঁচিয়ে আছে। হ্যাঁচকা টান মেরে ডাল থেকে বেল্ট ছাড়িয়ে দিল সে। এখান দিয়ে গেছে কিশোর! নিশ্চয় কোন কিছুর ফটো তুলেছে!
ক্যামেরা থেকে ছবি বের করল রবিন। দেখার জন্যে ঝুঁকে এল বোরিস।
ছবি দেখে থ হয়ে গেল দুজনেই। জানালায় দাঁড়িয়ে আছে ভয়ঙ্কর চেহারার রত্নদানো!
কি...কি বলেছিলাম! তোতলাতে শুরু করল বোরিস। ওদেরকে ধরে নিয়ে গেছে।
পুলিশকে খবর দিতে হবে... বলতে বলতে থেমে গেল রবিন। এই ছবি পুলিশকে দেখালে তাদের কি প্রতিক্রিয়া হবে, ভেবে, দ্বিধা করল। না, আগে সে আর বোরিস খুঁজে দেখবে। না পাওয়া গেলে তখন অন্য কথা। বোরিস, এ-বাড়িতে নেই ওরা। যাওয়ার সময় কোন সূত্র রেখে গেছে হয়ত। আরও ভালমত খুঁজতে হবে। আমাদের। এখানে না পেলে পুরো ব্লকটা খুঁজে দেখব।
আরও একবার খোঁজা হল মিস ভারনিয়ার বাড়ি। কিছু পাওয়া গেল না। বেরিয়ে পড়ল ওরা ও-বাড়ি থেকে।
আগে আগে পথে এসে নামল রবিন, তার পেছনে বোরিস। কাউকে দেখা গেল রাস্তায়; একেবারে নির্জন। গলিপথ ধরে থিয়েটার-বাড়ির পেছনে চলে এল ওরা।
নীল চকটা রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখল রবিন। অর্ধেক ক্ষয় হয়ে গেছে, তারমানে কিছু লিখেছে মুসা। এখানে এল কি করে এটা? মুসা ইচ্ছে করে ফেলে রেখে গেল? নাকি কোনভাবে তার পকেট থেকে পড়ে গেছে।
তীক্ষ্ণ চোখে আশপাশটা পরীক্ষা করে দেখল রবিন। আর কোনরকম চিহ্ন নেই। বাড়ির দেয়াল দেখল, ধীরে ধীরে তার নজর উঠে যাচ্ছে উপর দিকে। হঠাৎ চোখে পড়ল চিহ্নটা। নীল চক দিয়ে মস্ত বড় করে আঁকা হয়েছে একটা প্রশ্নবোধক। কোন সন্দেহ নেই, মুসাই এঁকেছে! কিন্তু খাড়া দেয়াল, ওখানে উঠল কি করে সে? ভেবে কোন কূলকিনারা পেল না রবিন।
বোরিস, হাত তুলে প্রশ্নবোধক চিহ্নটা দেখাল রবিন। ওটা মুসা এঁকেছে! আমার মনে হয় এই বাড়ির ভেতরেই আছে ওরা!
দরজা ভাঙতে হবে! বন্ধ পাল্লার দিকে চেয়ে বলল বোরিস। পা বাড়াল। দরজার দিকে।

খপ করে বোরিসের হাত চেপে ধরল রবিন। না না, ভাঙতে গেলে শব্দ হবে। অনেক দরজা আছে, একটা না একটা খোলা পাওয়া যাবেই।
মিস ভারনিয়ার বাড়ির পেছনের গলিপথটার কাছে বোরিসকে নিয়ে এল রবিন। ফিসফিস করে বলল, সাবধানে এগোতে হবে!
পকেট থেকে ছোট গোল একটা আয়না বের করল রবিন। কিশোরের ধারণা, তিন গোয়েন্দার কাজে লাগবে এই জিনিস, তাই তিনজনেই একটা করে সঙ্গে রাখে।
উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল রবিন। হামাগুড়ি দিয়ে এগোল। গলিপথটার মোড়ে। এসে থামল, পাঁচ আঙুলে আয়নাটা ধরে হাত বাড়িয়ে দিল সামনে। আয়নার ভেতরে। দেখা যাচ্ছে পথটা। ইমার্জেন্সী ডোরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটা সবুজ ভ্যান। আগেরদিন ওখানে ওটা ছিল না।
দরজা খুলে বেরিয়ে এল একজন মানুষ। তাকে দেখেই চমকে উঠল রবিন। বার্ট ইঅং, হাতে একটা বস্তা, ভেতরে ঠাসাঠাসি করে ভরা হয়েছে কিছু। বার বার এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে ইঅং, যেন ভয় করছে, কেউ তাকে দেখে ফেলবে।
রবিন, কিছু দেখেছ মনে হচ্ছে? পেছন থেকে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল। বোরিস।
নাইটগার্ড! নিশ্চয় কিছু চুরি করছে ব্যাটা! আর কোন সন্দেহ নেই, ভেতরেই আছে মুসা আর কিশোর।
তাহলে চল ঢুকে পড়ি! গার্ড ব্যাটা কিছু বললে... শার্টের হাতা গোটাল বোরিস।
না না, এভাবে যাওয়া ঠিক হবে না, বাধা দিল রবিন। নিশ্চয় ভেতরে গার্ডের আরও সাঙ্গোপাঙ্গ রয়েছে।-হা হা, ওই যে আরও দুজন বেরোচ্ছে, হাতে বস্তা! বোরিস, পুলিশ ডাকতে হবে! জলদি যান! আমি আছি এখানে!
বোরিসের ধারণা, তিন চোরকে সে একাই সামলাতে পারবে। বলল, পুলিশ ডাকার কি দরকার? আমিই...
না, ঝুঁকি নেয়া উচিত না! শিগগির যান!
আর দ্বিরুক্তি না করে উঠে চলে গেল বোরিস।
হাত মাটির সঙ্গে প্রায় মিশিয়ে রেখেছে রবিন, তাই তার হাত কিংবা আয়নাটা। চোখে পড়ছে না তিন চোরের। একের পর এক বস্তা এনে গাড়িতে তুলছে ওরা।
সময় যাচ্ছে। অস্থির হয়ে উঠছে রবিন। এখনও আসছে না কেন বোরিস?
গাড়িতে বস্তা তোলা বোধহয় শেষ হয়েছে চোরদের। গাড়ির কাছেই দাঁড়িয়ে কি যেন পরামর্শ করল ওরা। একসঙ্গে তিনজনেই আবার গিয়ে ঢুকল বাড়ির ভেতরে। খানিক পরে বেরিয়ে এল, দুজনের কাঁধে দুটো বড় বস্তা, ভেতরে ভারি কিছু রয়েছে।

হঠাৎ নড়ে উঠল যেন একটা বস্তার ভেতরে কিছু! চোখের ভুল? আরও ভাল করে তাকাল রবিন। না না, ঠিকই নড়ছে। বস্তা ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে যেন ভেতরের কিছুটা! ভ্যানের ভেতরে অন্যান্য বস্তার ওপর নামিয়ে রাখা হল বড় বস্তাদুটো।
বোরিসের দেরি দেখে হতাশ হয়ে পড়ছে রবিন, ঘামছে দরদর করে। বুঝতে পারছে, দুটো বস্তার ভেতরে রয়েছে কিশোর আর মুসা। বোরিস থাকলে দুজনে ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারত লোকগুলোর ওপর, মুক্ত করতে পারত দুই বন্ধুকে। একাই যাবে কিনা ভাবল রবিন, পরক্ষণেই নাকচ করে দিল চিন্তাটা। সে গিয়ে একা কিছুই করতে পারবে না, বরং ধরা পড়বে।
ভ্যানের পেছনের দরজা বন্ধ করে দিল এক চোর। তিনজনেই উঠে বসল। সামনের সিটে। মুহূর্ত পরেই ইঞ্জিন স্টার্ট নিল, চলতে শুরু করল গাড়ি।
রবিনের চোখের সামনে দিয়ে বস্তায় ভরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কিশোর আর মুসাকে, অথচ কিছুই করতে পারছে না সে! রাগে দুঃখে মাথার চুল ছিঁড়তে বাকি রাখল সে।

.

বড় বেকায়দা অবস্থায় রয়েছে মুসা আর কিশোর। হাত-পা বাঁধা, বস্তার পাটের আঁশ সুড়সুড়ি দিচ্ছে নাকে মুখে। টাকা-পয়সার উঁচু নিচু বস্তার ওপর পড়ে আছে, তার ওপর অমসৃণ পথে গাড়ির প্রচণ্ড ঝাঁকুনি, ব্যথা হয়ে গেছে দুজনের পিঠ।
টেনে হাতের বাধন খোলার ব্যর্থ চেষ্টা করল কিশোর।
সঙ্গীকে নড়তে দেখে মুসা বলল, কিশোর, আমাদেরকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। ওরা?
বোধহয় কোন জাহাজে, ফিসফিস করে জবাব দিল কিশোর। সাগর পাড়ি দেয়ার কথা বলছিল, মনে আছে?
শেষে পানিতে ডুবেই মরণ ছিল কপালে! বিষণ্ন শোনাল মুসার কণ্ঠ। বার্ট কি বলল শুনলে না? পয়সার বস্তা পায়ে বেঁধে ছেড়ে দেবে।
শুনেছি, বলল কিশোর। মুসা, হ্যারি হুডিনির নাম শুনেছ? ওই যে সেই বিখ্যাত ম্যাজিশিয়ান, হাত-পা বেঁধে ড্রামে ভরে পানিতে ফেলে দিলেও যিনি বেঁচে ফিরতেন?
তার মত জাদুকর হলে মোটেই ভাবতাম না, গোঁ গোঁ করে বলল মুসা। কিন্তু আমি হুডিনি নই, মুসা আমান। বড় জোর মিনিট খানেক কোনমতে টিকে থাকতে পারব পানির তলায়, তারপরই জারিজুরি খতম।
মুসার কথার ধরনে হেসে উঠল এক বামন। বন্দিদের সঙ্গে ওরা চারজনও চলেছে ভ্যানের পেছনে বসে।

যদি পানিতে না ফেলে? যে বামনটা হেসেছে, সে বলল। যদি কোন আরব শেখের কাছে বেচে দেয়? শুনেছি, আরবের কোন কোন আমির নাকি এখনও গোলাম কিনে রাখে।
ব্যাপারটা ভেবে দেখল মুসা। সিনেমায় দেখেছে, গোলামদের ওপর কি রকম। অকথ্য অত্যাচার করে মনিবেরা। কোটা বেছে নেবে? পানিতে ডুবে মৃত্যু? নাকি শেখের গোলাম হওয়া? দুটোর কোনটাই পছন্দ হল না তার।
ছেলেদের কাছ থেকে জবাব না পেয়ে চুপ করে গেল বামনটা।
ভ্যানের গতি কমতে শুরু করল, ঝাঁকুনিও কমে এল।
বার্টের গলা শোনা গেল, বামনদেরকে বলছে, বাস ধরে চলে যাবে হলিউডে। আবার বলছি, বুঝেশুনে টাকা খরচ কর। লোকের চোখে যাতে না পড়ে।
আর বলতে হবে না, বলল বামন। টাকা এখন খরচই করব না আমরা।
আরেকটা কথা, মুখ বন্ধ রাখবে!
রাখব।
থেমে দাঁড়াল ভ্যান। পেছনের দরজা খুলে নেমে গেল বামনরা। দড়াম করে আবার বন্ধ হয়ে গেল দরজা, আবার ছুটল গাড়ি। কোনরকম ঝাঁকুনি নেই আর এখন, নিশ্চয় মসৃণ হাইওয়েতে উঠে এসেছে। কয়েক মাইল দূরেই রয়েছে সাগর। সেখানে ডাকাতদের অপেক্ষায় রয়েছে কোন একটা জাহাজ, ভাবল কিশোর।
প্রায় গুঙিয়ে উঠল মুসা। কিশোর, এইবার আমাদের খেল খতম! ইসস, কেন। যে এই গোয়েন্দাগিরির ব্যবসা শুরু করেছিলাম!
আমাদের মেধাকে কাজে লাগানর জন্যে, শান্তকণ্ঠে জবাব দিল কিশোর।
মেধা জমে বরফ হয়ে গেছে আমার! ঝাঁঝাল গলায় বলল মুসা। রবিনটাও যদি সময়মত আসত! চিহ্নটা দেখত! প্রায় চেঁচিয়ে উঠল সে, কিশোর, দোহাই তোমার, চুপ করে থেক না! কিছু অন্তত বল! বল, বাঁচার আশা আছে আমাদের!
নেই, সত্যি কথাটাই বলল কিশোর। বার্ট খুব চালাক। কোনরকম ফাঁক রাখেনি।

.

ভ্যানকে অনুসরণ করে চলেছে ট্রাক। রবিন উত্তেজিত, বোরিস গম্ভীর।
বোরিস যখন ফিরেছিল, সবুজ ভ্যানটা তখন মাত্র গলির মোড় পেরিয়ে গেছে। পুলিশ আনতে পারেনি সে, রাস্তায় পুলিশ ছিল না। রবিন একবার ভেবেছে, কোন পুলিশ স্টেশনে ফোন করবে। কিন্তু পরে ভেবেছে, আজ রোববার, দোকানপাট সব বন্ধ, টেলিফোন করবে কোথা থেকে? কাজেই তখন যা করা উচিত, ঠিক তাই করেছে, বোরিসকে নিয়ে ট্রাকে উঠে পড়েছে, পিছু নিয়েছে ভ্যানের।
রোববার সকালে গাড়ির ভিড় কম, পথ প্রায় নির্জন, গতি বাড়াতে কোন অসুবিধে নেই। তীব্র গতিতে ছুটেছে ভ্যান, ওটার সঙ্গে তাল রেখে চলা কঠিন হয়ে পড়েছে

ইয়ার্ডের পুরানো ট্রাকের পক্ষে। বার বার পিছিয়ে পড়ছে।
দেব নাকি বাড়ি লাগিয়ে! আপনমনেই বলল বোরিস। কোনভাবে আটকে দিতে পারলে…
না না, এতবড় ঝুঁকি নেয়া যাবে না! ভ্যান উল্টে যায় যদি? যেভাবে যাচ্ছেন, যেতে থাকুন।
চলতে চলতে এক সময় গতি কমে গেল ভ্যানের, থামল। পেছনের দরজা খুলে টপাটপ লাফিয়ে নামল চারটে ছেলে। তাড়াহুড়ো করে চলে গেল বাস স্টপের দিকে।
ধরব নাকি পিচ্চিগুলোকে! ভুরু কুঁচকে গেছে বোরিসের। গোটা কয়েক চড়থাপ্পড় দিলেই গড়গড় করে বলে দেবে সব।
কি বলবে? হাত তুলল রবিন। না, ভ্যানটা হারাব তাহলে!
পেছনের দরজা বন্ধ হয়ে গেল, আবার চলতে শুরু করল ভ্যান। মোড় নিয়ে পুরানো রাস্তা ছেড়ে হাইওয়েতে উঠে গেল। এগিয়ে চলল নাক বরাবর পশ্চিমে, উপকূলের দিকে।
পেছনে ট্রাক নিয়ে আঠার মত লেগে রইল বোরিস। কিন্তু আর বেশিক্ষণ লেগে থাকা বোধহয় সম্ভব না। ভ্যানটা নতুন, ওটার সঙ্গে পাল্লা দিতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে পুরানো ট্রাক।
নড়েচড়ে বসল রবিন। পকেটে টান পড়তেই গায়ে শক্ত চাপ অনুভব করল সে, মনে পড়ল ওয়াকি-টকিটার কথা। তাই তো? যোগাযোগ করা যায়। তাড়াতাড়ি পকেট থেকে ছোট্ট রেডিওটা বের করল সে। একটা বোতাম টিপে দিয়ে কানের কাছে ধরল যন্ত্রটা। এক মুহূর্ত বিচিত্র গুঞ্জন উঠল স্পীকারে, পরক্ষণেই তাকে অবাক করে দিয়ে ভেসে এল একজন মানুষের গলা। কেমন পরিচিত। জোরাল, স্পষ্ট কথা: হাল্লো, হারবার! হাল্লো, হারবার! অপারেশন থিয়েটার কলিং! শুনতে পাচ্ছ? শুনতে পাচ্ছ?
টানটান হয়ে গেছে রবিনের সমস্ত স্নায়ু, উল্কর্ণ হয়ে আছে সে। জবাব এল অতি মৃদু গলায়: হালো, অপারেশন থিয়েটার। হারবার বলছি। কাজ শেষ? কোন গোলমাল?
হাল্লো, হারবার! আরে, বার্ট ইঅং-এর কণ্ঠ। শেষ। কোন গোলমাল হয়নি। তবে দুজন যাত্রী নিয়ে আসছি সঙ্গে। ডকের কাছাকাছি পৌঁছে আবার কথা বলব। ওভার অ্যান্ড আউট।
চুপ হয়ে গেল স্পীকার।
হঠাৎ বুমম করে কান ফাটানো শব্দ উঠল। নিজের অজান্তেই মাথা নিচু করে ফেলল রবিন। ভ্যান থেকে বোমা ছুঁড়ল না তো!

থরথর করে কেঁপে উঠল ট্রাক, নাক সোজা রাখতে পারছে না যেন কছুতেই। স্টিয়ারিঙে চেপে বসেছে বোরিসের আঙুল, ফুলে উঠেছে হাতের শিরা। অনেক কষ্টে ট্রাকটাকে সাইডরোডে নামিয়ে আনল সে, থামিয়ে দিল।
হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছছে বোরিস। টায়ার ফেটে গেছে!
ঢিল হয়ে গেল রবিনের স্নায়ু। হেলান দিয়ে বসল, দুহাত ছড়িয়ে পড়ল। দুদিকে। শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সবুজ ভ্যানটার দিকে, দ্রুত ছোট হয়ে যাচ্ছে ওটা।
যত তাড়াতাড়ি পারল, টায়ার বদলে নিল বোরিস। কিন্তু তাতেও দশ মিনিটের বেশি লেগে গেল। ইতিমধ্যে নিশ্চয় কয়েক মাইল এগিয়ে গেছে ভাটা।
অদ্ভুত এক শূন্যতা অনুভব করছে রবিন। কেন যেন তার মনে হল, কিশোর আর মুসাকে আর কোনদিন দেখতে পাবে না।
রবিন, এখন কি করা? ড্রাইভিং সিটে রবিনের পাশে উঠে বসেছে আবার বোরিস। পুলিশের কাছে যাব?
কি হবে? ভ্যানের লাইসেন্স নাম্বার নিতে ভুলে গেছি আমি, একেবারে হতাশ হয়ে পড়েছে রবিন। পুলিশকে কি বলব?
কি যেন ভাবল বোরিস। সোজা পথ। ভ্যানটা যেদিকে গেছে সেদিকেই যাই, বলতে বলতেই ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে গিয়ার দিল সে। নির্জন হাইওয়ে ধরে ট্রাক ছোটাল। আবার পশ্চিমে।
গ্রাভ কম্পার্টমেন্ট থেকে লস অ্যাঞ্জেলেসের একটা ম্যাপ বের করল রবিন। তাতে দেখল, কয়েক মাইল সামনে এক জায়গায় পথটা দুভাগ হয়ে গেছে। একটা শাখা চলে গেছে সুন্দর সৈকত শহর লং বীচ-এর দিকে। আরেকটা শাখা গেছে স্যান পেড্রোতে।
রেডিওতে একটা বন্দরের কথা বলা হয়েছে। লং বীচে বন্দর নেই, স্যান পেড্রোতে আছে। তারমানে ওদিকেই গেছে ভ্যানটা।
বোরিস, স্যান পেড্রোর দিকে যেতে হবে, বলল রবিন।
হোকে, একমনে গাড়ি চালাচ্ছে ব্যাভারিয়ান।
পুরানো ইঞ্জিনের শক্তি নিঙড়ে যত জোরে সম্ভব ছুটে চলেছে ট্রাক। মগজে। ভাবনার ছুরি চালাচ্ছে রবিন, কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারছে না রত্নদানো খুঁজতে গিয়ে ডাকাতদের হাতে পড়ল কি করে মুসা আর রবিন! তাদেরকে বস্তায় ভরে নিয়ে যাচ্ছে কেন মূরিশ থিয়েটারের দারোয়ান বার্ট ইঅং! বেশিক্ষণ ভাবনা-চিন্তার সময়। পেল না সে, দুই রাস্তার মোড়ে পৌঁছে গেল ট্রাক।
স্যান পেড্রোর রাস্তায় গাড়ি নামিয়ে আনল বোরিস। গতি সামান্য শিথিল করতে হয়েছিল, আবার বাড়িয়ে দিল।

শিগগিরই স্যান পেড্রোর সীমানা দেখা গেল দূর থেকে। রাস্তার দুপাশে বিস্তীর্ণ মাঠে কালো কালো অসংখ্য বিন্দু দেখা যাচ্ছে। কাছে এলে বোঝা গেল ওগুলো কি। ডেরিক। কুৎসিত দানবের মত দাঁড়িয়ে আছে বিশাল কালো যন্ত্রগুলো, মাটির তলা থেকে তেল ভোলার জন্যে বসানো হয়েছে।
বন্দরে এসে ঢুকল ট্রাক। তেলমেশানো ঘোলা পানিতে গাদাগাদি করে ভাসছে। ছোট-বড়-মাঝারি অগুনতি জলযান। নানারকম জাহাজের মাঝে মাঝে রয়েছে মাছ। ধরার নৌকা আর লঞ্চ
প্রায় প্রতি মুহূর্তে বন্দরে ঢুকছে কিংবা বন্দর ত্যাগ করছে। একের পর এক বোট, জাহাজ, ফ্রেইটার।–
ট্রাক থামলি বোরিস। কোনদিকে যাবে এবার? কোথাও দেখা যাচ্ছে না সবুজ, ভ্যানটা। হাজারো জলযানের যে-কোনটাতে থাকতে পারে মুসা আর কিশোর। কোটাতে নিয়ে গিয়ে তোলা হয়েছে ওদেরকে, কি করে বোঝা যাবে?
রবিন, কিছু ভাবতে পারছি না আমি! তিক্ত কণ্ঠে বলল বোরিস। আর কোন আশা নেই!
কি জানি! কপালে আঙুল ঘষছে রবিন। রেডিওতে বলল-হঠাৎ এমনভাবে লাফিয়ে উঠল সে, যেন বোলতা হুল ফুটিয়েছে। চাঁদিতে কেবিনের ছাতের বাড়ি লাগতেই ধুপ করে বসে পড়ল আবার। চেঁচিয়ে উঠল, রেডিও! হ্যাঁ, রেডিও! বন্দরে ঢুকে আবার কথা বলবে বলেছিল! পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিয়েছে সে।
বেশি তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে কয়েক সেকেণ্ড দেরি করে ফেলল রবিন। পকেটের এখানে-ওখানে বেধে গেল ওয়াকি-টকি, কিন্তু হাতে বেরিয়ে এল অবশেষে।
বোতাম টিপে ওয়াকি-টকি অন করে দিল রবিন, কানের কাছে নিয়ে এল যন্ত্রটা। দুরুদুরু বুকে অপেক্ষা করতে লাগল সে। কথা বলবে তো? নাকি এতক্ষণে বলে ফেলেছে? ন_
রবিনকে চমকে দিয়ে হঠাৎ জ্যান্ত হয়ে উঠল স্পীকার: অপারেশন থিয়েটার! বোট নামিয়ে দিয়েছি। সাঁইত্রিশ নাম্বারে থাক, পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তুলে নেব। মালপত্রসহ যাত্রীদেরকে তৈরি রাখ। সঙ্গে সঙ্গেই যাতে বেটে তুলে নেয়া যায়।
অপারেশন থিয়েটার বলছি, বার্টের গলা শোনা গেল স্পীকারে। বোটটা দেখতে পাচ্ছি। যাত্রী আর মালপত্র ট্রাকে তৈরিই আছে। তুলতে দেরি হবে না।
গুড। আমরা আরও কাছে এলে একটা সাদা রুমাল নাড়বে, তাহলে বুঝব কোন গোলমাল নেই। ওভার অ্যাণ্ড আউট।
চুপ হয়ে গেল স্পীকার। রবিন চেঁচিয়ে উঠল, বোরিস, জলদি, সাঁইত্রিশ নাম্বার জেটি! মাত্র পাঁচ মিনিট সময় আছে হাতে!

কিন্তু সাঁইত্রিশ নাম্বার কোন্টা? স্যান পেড্রোতে আসিনি আগে কখনও, এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে বোরিস।
কাউকে জিজ্ঞেস করতে হবে। জলদি!
ধীরে এগোল ট্রাক। একটা লোকও চোখে পড়ছে না। রোববারের এই সকালে নির্জন হয়ে আছে এলাকাটা, মৃত বন্দর যেন। সামনে একটা বাঁক। মোড় নিয়েই পুলিশের গাড়িটা দেখতে পেল ওরা।
ওই গাড়িটার পাশে, জলদি! আঙুল তুলে দেখাল রবিন।
জোরে ছুটে এসে পুলিশের গাড়ির পাশে ঘঁাচ করে ব্রেক কষল বোরিস।
জানালা দিয়ে মুখ বের করে চেঁচিয়ে বলল রবিন, এই যে, স্যার, সাঁইত্রিশ নাম্বার জেটিটা কোথায়, বলবেন?
সাঁইত্রিশ? বুড়ো আঙুল দিয়ে পেছন দিকে দেখাল অফিসার, রবিনরা যেদিক থেকে এসেছে সেদিকে।-তিনটে ব্লক পেছনে। না না, গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না, এটা ওয়ান ওয়ে। সামনে চার ব্লক যেতে হবে সোজা, ডানে মোড় নিয়ে—
অফিসারের কথা শেষ হওয়ার আগেই এক কাণ্ড করল বোরিস। গ্যাস প্যাড়ালে পায়ের চাপ বাড়িয়ে বনবন করে স্টিয়ারিং ঘোরাল। প্রচণ্ড গর্জন করে উঠল ইঞ্জিন, দুই চাকার ওপর ভর দিয়ে আধ চক্কর ঘুরে গেল গাড়ি, টায়ার ঘষা খাওয়ার তীক্ষ্ণ কর্কশ আওয়াজ উঠল, পরক্ষণেই খেপা ঘোড়ার মত লাফ দিয়ে আগে বাড়ল। ট্রাকটা। তীব্র গতিতে ছুটে চলল যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে।
হেইই! বেআইনী… চেঁচিয়ে উঠল অফিসার, মাত্র দুটো শব্দ রবিনের কানে ঢুকল, বাকিটা ঢাকা পড়ে গেল ইঞ্জিনের শব্দে।
দেখতে দেখতে তিনটে ব্লক পেরিয়ে এল ট্রাক।
মোড় নিন! মোড় নিন! আঙুল তুলে দেখাল রবিন। পথের মোড়ে খাটো একটা সাইনবোর্ড, তাতে ৩৭ নাম্বার লেখা, তলায় তীর চিহ্ন দিয়ে দেখানো হয়েছে। কোনদিকে যেতে হবে।
আবার টায়ারের কর্কশ আর্তনাদ তুলে মোড় নিল ট্রাক। সামনে জেটিতে ঢোকার গেট ভারি লোহার পাতের ফ্রেমে মোটা তারের জাল লাগিয়ে তৈরি হয়েছে। পাল্লা। সবুজ ভ্যানটা পানির প্রায় ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। সামনের বাম্পারের ঠিক পেছনে গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে সাদা রুমাল নাড়ছে একজন লোক। জেটি থেকে মাত্র শখানেক গজ দূরে একটা লঞ্চ, দ্রুত এগিয়ে আসছে এদিকেই।
দরজায় তালা! ট্রাকের গতি কমাল বোরিস।
পেছনে সাইরেনের শব্দ। ট্রাকের পাশ দিয়ে শা করে বেরিয়ে কয়েক গজ সামনে গিয়েই দাঁড়িয়ে পড়ল পুলিশের গাড়িটা।ঝটকা দিয়ে খুলে গেল একপাশের

দরজা। রিভলভার হাতে লাফিয়ে নেমে এল পুলিশ অফিসার। ছুটে এল ট্রাকের দিকে।
ট্রাক থামিয়ে দিয়েছে বোরিস। তার পাশে এসে হাত বাড়াল অফিসার, ইউ আর আণ্ডার অ্যারেস্ট! ওয়ান ওয়েতে ইউ টার্ন নিয়েছ, বেআইনীভাবে গতি বাড়িয়েছ। দেখি, লাইসেন্স দেখি?
সময় নেই, অফিসার, আপনি বুঝতে পারছেন না! চেঁচিয়ে বলল বোরিস। জলদি সাঁইত্রিশ নাম্বারে ঢুকতে হবে…
…লোডিং আজ বন্ধ, বোরিসকে থামিয়ে দিয়ে বলল অফিসার। ধানাই পানাই বাদ দাও। লাইসেন্স দেখি।
বোরিসের কাঁধের ওপর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দিল রবিন। অফিসার, সত্যিই বুঝতে পারছেন না আপনি! ওই ভ্যানে দুটো ছেলেকে কিডন্যাপ করা হয়েছে! প্লীজ, সাহায্য করুন আমাদেরকে!
ওসব কিচ্ছা-কাহিনী বাদ দাও, খোকা, সবুজ ভ্যানটার দিকে একবার চেয়েই মুখ ফিরিয়ে নিল অফিসার। ওসব অনেক শোনা আছে, বোরিসের দিকে চেয়ে। বলে উঠল, কই, লাইসেন্স কই?
প্রতিটি সেকেণ্ড এখন মূল্যবান, দ্রুত এগিয়ে আসছে লঞ্চ, কিন্তু অফিসারকে বোঝানো যাচ্ছে না সেটা। মরিয়া হয়ে চেঁচিয়ে উঠল রবিন, বোরিস, গেট ভেঙে ঢুকে যান! যা হয় হবে!
এমন কিছুই একটা বোধহয় ভাবছিল বোরিস, রবিনের কথা শেষ হওয়ার আগেই সামনে লাফ দিল ট্রাক। পেছনে চেঁচিয়ে উঠল অফিসার, কানেই তুলল না ব্যাভারিয়ান।
ভয়ঙ্কর গতিতে এসে গেটের পাল্লায় সামনের বাম্পার দিয়ে আঘাত হানল। ট্রাক। তীক্ষ্ণ বিচিত্র শব্দ তুলে প্রতিবাদ জানাল যেন পাল্লা, পরক্ষণেই বাঁকাচোরা হয়ে ছিঁড়ে ভেঙে খুলে এল কজা থেকে, ট্রাকের বাম্পারে আটকে থেকে কয়েক গজ এগোল, তারপর খসে পড়ল পথের ওপর। পাল্লা মাড়িয়েই এগোনর চেষ্টা করল। ট্রাক, কিন্তু পারল না। তারের জাল আর বাকাচোরা ইস্পাতের পাত জড়িয়ে ফেলল সামনের দুই চাকা। কান-ফাটা শব্দ করে ফেঁসে গেল একটা টায়ার। এখনও সবুজ ভ্যানটা রয়েছে পঞ্চাশ ফুট দূরে।
রবিন, এস! বলতে বলতেই এক ঝটকায় কেবিনের দরজা খুলে লাফিয়ে পথে নামল বোরিস। ছুটল।
দড়ি ছেঁড়া পাগলা ষাঁড়ের মত এসে বার্টের ঘাড়ে পড়ল বিশালদেহী ব্যাভারিয়ান। চমকে উঠে পকেটে হাত দিতে গেল ডাকাতটা, বোধহয় পিস্তল বের করার জন্যে,

কিন্তু পারল না। তার আগেই দুহাতে ধরে তাকে মাথার ওপর তুলে। পানিতে ছুঁড়ে ফেলে দিল বোরিস।
দ্রুত সামলে নিল বার্ট। গতিক সুবিধের নয় বুঝে গেছে, সোজা লঞ্চের দিকে সাঁতরাতে শুরু করল সে।
ভ্যান থেকে বেরিয়ে এল রিক আর জিম, একজনের হাতে একটা রেঞ্চ, আরেকজনের হাতে টায়ার খোলার লীভার। একই সঙ্গে আক্রমণ চালাল বোরিসের ওপর।
ঝট করে বসে দুজনের আঘাত প্রতিহত করল বোরিস, আবার সোজা হয়ে উঠে খপ করে ধরে ফেলল দুই ডাকাতের অস্ত্র ধরা দুই হাত, প্রায় একই সঙ্গে।
কব্জিতে প্রচণ্ড মোচড় খেয়ে চেঁচিয়ে উঠল রিক আর জিম। হাত থেকে খসে পড়ল অস্ত্র। ঘাড় ধরে জোরে দুজনের মাথা ঠুকে দিল বোরিস। তারপর ঠেলে নিয়ে গিয়ে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল পানিতে।
রবিন বসে নেই। ভ্যানের পেছনের খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকল, মুসাআ! কিশোরও!
রবিন! বস্তার ভেতর থেকে শোনা গেল কিশোরের ভোঁতা কণ্ঠ। জলদি বের কর আমাদেরকে!
রবিন! জলদি, আর পারছি না! ওফ, বাবারে! প্রায় কেঁদে ফেলল মুসা। কিভাবে যেন গড়িয়ে এসে তার পেটের ওপরে পড়েছে কিশোর।
ওদিকে, জিম আর রিকও বার্টের পিছু নিয়েছে। তিনজনকেই তুলে নিয়ে নাক ঘোরাল লঞ্চ। দ্রুত ছুটল কয়েকশো গজ দূরের বড় একটা মাছধরা জাহাজের দিকে।
পুলিশও পৌঁছে গেছে। বোরিসের ক্ষমতা দেখেছে ওরা, কাজেই সাবধানে এগোচ্ছে। হাতে রিভলভার।
বোরিসের হাতের নাগালের বাইরে দাঁড়িয়ে রিভলভার নাচাল অফিসার। ইউ আর আণ্ডার অ্যারেস্ট! খবরদার, নড়বে না! গুলি খাবে!
আরে, আমাকে পরে ধরতে পারবেন! লঞ্চটার দিকে আঙুল তুলে চেঁচিয়ে। বলল বোরিস, ওদেরকে ধরুন! পালাচ্ছে তো!
ইতিমধ্যে কিশোর আর মুসার বস্তার বাঁধন কেটে দিয়েছে রবিন। দ্রুতহাতে বাঁধন কেটে মুক্ত করে দিল কিশোরকে। দুজনে মিলে মুক্ত করল মুসাকে।
ছেলেদেরকে দেখে চোখ বড় বড় হয়ে গেছে অফিসারের। আরে, কি কাণ্ড! তোমরা বস্তার ভেতরে কি করছিলে?
রবিনের হাত থেকে ছুরিটা নিয়ে একটা ছোট বস্তার বাঁধন কেটে ফেলল কিশোর। ভেতরে হাত ঢুকিয়ে বের করল একমুঠো নোট। ছুঁড়ে দিল অফিসারের দিকে। এই

হল কাণ্ড! ব্যাংক ডাকাতি!
কিছুই বুঝতে পারল না যেন অফিসার। হাঁ করে চেয়ে আছে কিশোরের মুখের দিকে।
ভ্যান থেকে নামল কিশোর। অফিসারের সামনে এসে দাঁড়াল। জলদি করুন! নইলে পালিয়ে যাবে ডাকাতেরা! জলদি ধরুন ওদের!
ইয়ে, মানে তোমরা কারা!...মানে... এখনও কিছু বুঝতে পারছে না অফিসার।
বুঝিয়ে বলতেই হল অফিসারকে। মূল্যবান অনেক সময় নষ্ট হল তাতে।
.
পাঁচ দিন পর, শনিবার। হেডকোয়ার্টারে বসে আলাপ আলোচনা করছে তিন। গোয়েন্দা।
ওই অফিসারটা একটা আহাম্মক! ঝাঁঝাল কণ্ঠে বলল মুসা। তাড়াতাড়ি করলে ধরতে পারত ব্যাটাদের, কিন্তু ওকে বোঝাতেই তো সময় গেল।
ইন্টারপোল দায়িত্ব নিয়েছে, বলল কিশোর। ধরেও ফেলতে পারে।
কি জানি! তবে, রিকের সোনার দাঁত ভরসা। ওটাই চিনিয়ে দেবে ওকে। ধরা। পড়লে ওই দাঁতের জন্যেই পড়বে।
আরে না-আ! হাত নাড়ল রবিন। সোনার দাঁত অনেকেই বাধায় ওরকম। এই তো, সেদিন পিটারসন মিউজিয়মেও তো একজনের দেখলাম। একটা ছেলে...
তড়াক করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল কিলোর। অদ্ভুত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে রবিনের মুখের দিকে, যেন তাকে আর কখনও দেখেনি। পিটারসন মিউজিয়মে সোনার দাঁত! উত্তেজনায় রক্ত জমছে তার মুখে। রবিন! আগে বলনি কেন? কেন বলনি আগে?
একটা কাব স্কাউটের মুখে সোনার দাঁত, এতে অবাক হওয়ার কি আছে? কিছুই বুঝতে পারছে না রবিন। বলারই বা কি আছে? ভুলেই গিয়েছিলাম...এখন কথা উঠল...
ইসস, আরও আগে যদি বলতে! এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল কিশোর। আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, এই সময় বাইরে থেকে মেরিচাচীর ডাক শোনা গেল, কিশোর, আছিস ওখানে? মিরো এসেছে।
মুসা গিয়ে মিরোকে নিয়ে এল।
অবাক চোখে হেডকোয়ার্টারের জিনিসপত্র দেখল মিরো। তারপর একটা চেয়ারে বসতে বসতে বলল, কিশোর-স্যান, তোমাদেরকে বিদায় জানাতে এলাম। আগামীকালই জাপানে ফিরে যাচ্ছি আমরা।
এত তাড়াতাড়ি টেবিলে দুই কনুই রেখে সামনে ঝুঁকল কিশোর। প্রদর্শনী শেষ?

না, প্রদর্শনী চলবে, বিষণ্নভাবে মাথা নাড়ল মিরো। শুধু বাবা আর আমি ফিরে যাচ্ছি। বাবাকে বরখাস্ত করেছে কোম্পানি। আর একদিন মাত্র চাকরি আছে তার।
আন্তরিক দুঃখিত হল তিন গোয়েন্দা।
কি যেন ভাবল কিশোর। তারপর বলল, মিরো, পিটারসন মিউজিয়মে আর মাত্র একদিন প্রদর্শনী চলবে, না?
হ্যাঁ। আগামীকাল চলে বন্ধ হয়ে যাবে। অন্য শহরে চলে যাবে।
কাগজে পড়লাম, কালও চিলড্রেনস ডে।
হ্যাঁ। আগেরবার গণ্ডগোলের জন্যে ঠিকমত দেখতে পারেনি ছোটরা, তাই আরেক দিনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
তারমানে সময় বেশি নেই হাতে। মিরো, তোমার বাবা শেষমেশ একবার সাহায্য করবেন আমাকে? বলে দেখবে?
সাহায্য? ভুরু কোঁচকাল মিরো।
আমার কথামত কাজ করবেন?
হয়ত করবে! গোল্ডেন বেল্ট ফিরে পেলে এখনও সম্মান রক্ষা হয়, চাকরি থাকে বাবার। বলে হয়ত রাজি করাতে পারব তাকে।
তাহলে চল যাই, উঠে দাঁড়াল কিশোর। গাড়ি নিয়ে এসেছ?
কোম্পানির গাড়ি।
গুড। রবিন, মুসা, তোমরা থাক। রবিন, রত্নদানোর কেসটা লিখে ফাইল করে ফেল, মিস্টার ক্রিস্টোফারকে দেখাতে হবে। মুসা, ছাপার মেশিনের একটা রোলার ঠিকমত ঘুরছে না, দেখবে ওটা? আমি আসছি। কাল নাগাদ গোল্ডেন বেল্ট রহস্যের কিনারা হয়ে যাবে।
হাঁ হয়ে গেছে মুসা আর রবিন। তাদেরকে ওই অবস্থায় রেখেই মিরোকে নিয়ে দুই সুড়ঙ্গে নেমে পড়ল কিশোর।
সামলে নিতে পুরো এক মিনিট সময় লাগল রবিন আর মুসার।
রবিন, অবশেষে বলল মুসা। কি করে কিনারা হবে?
জানি না! দুই হাত নাড়ল রবিন, মাথা নাড়ল এদিক-ওদিক। কাগজ-কলম টেনে নিল। খানিকক্ষণ গুম হয়ে বসে থেকে শেষে চেয়ার ঠেলে উঠে পড়ল মুসা। অযথা ভেবে লাভ নেই। তারচেয়ে মেশিনটা সারিয়ে ফেললে একটা কাজ হয়ে যায়।
শেষ বিকেলে রহস্য আরও জমাট হল। কিশোরের কাছ থেকে ফোন এল হেডকোয়ার্টারে। দুই সহকারীর জন্যে নির্দেশ: হেডকোয়ার্টারে ঢোকার সবকটা পথ ভাল মত পরীক্ষা করে দেখ। জরুরি এক আর গোপন চার-এ যেন কোন গোলমাল না থাকে। বার বার বেরিয়ে দেখ, কোনরকম অসুবিধে হয় কিনা। সবুজ

ফটক এক, দুই সুড়ঙ্গ, সহজ তিন আর লাল কুকুর চার দিয়েও বেরোও বার বার। দেখ, ছয়টার মধ্যে কোন্ পথটা দিয়ে সবচেয়ে সহজে, সবচেয়ে কম সময়ে ঢোকা যায়।
মুসা কিংবা রবিন কোন প্রশ্ন করার আগেই লাইন কেটে গেল ওপাশ থেকে।
রবিনের নোট লেখা শেষ, মুসারও মেশিন সারানো হয়ে গেছে। কেন গোপন পথগুলো দিয়ে ঢুকতে-বেরোতে বলেছে কিশোর, কিছুই বুঝতে পারল না ওরা। তবু দেরি না করে কাজে লেগে গেল। কিশোর যখন করতে বলেছে, নিশ্চয় কোন না কোন কারণ আছে।
গোপন পথগুলো দিয়ে বার বার ঢুকল-বেরোল দুই সহকারী গোয়েন্দা। দুজনেই একমত হল, সবচেয়ে সহজে সবচেয়ে কম সময়ে ঢাকা কিংবা বেরোনো যায় সহজ তিন দিয়ে।

.

রাতের খাবারের সময় হল, কিশোরের দেখা নেই। আরও এক ঘণ্টা দেরি করে ফিরল সে, উত্তেজিত কিন্তু হাসি হাসি চেহারা। রবিন আর মুসা দেখে অবাক হল, সুকিমিচি কোম্পানির গাড়িতে করে নয়, ট্যাক্সি নিয়ে এসেছে গোয়েন্দাপ্রধান। গাড়ি থেকে মিরোকে চুপিচুপি নামতে দেখে আরও অবাক হল দুই সহকারী গোয়েন্দা।
মিরোকে নিয়ে বাড়ির পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকল কিশোর, কেউ দেখে ফেলবে এই, ভয় যেন করছে।
এই যে, এসেছ! বলে উঠলেন মেরিচাচী। কিশোর, এত দেরি কুলি কেনরে? আমরা এদিকে ভেবে মরি। দেখ, চেহারার কি ছিরি করে এসেছে! আরে, এই, কিশোর, জ্যাকেটের বোতাম লাগাতেও তোর কষ্ট হয় নাকি? কোমরের কাছে। লাগাস না কেন? বিচ্ছিরিভাবে ঝুলে আছে।
মিরোকে একটা চেয়ার দেখিয়ে নিজে আরেকটাতে বসে বলল কিশোর, আস্তে, চাচী, আস্তে। একসঙ্গে এতগুলো প্রশ্ন করলে কোনটার জবাব দেব?
এই যে, বসে পড়লি তো? কোথায় কোথায় ঘুরে এসেছে কে জানে! হাতে মুখে ময়লা-যা, জলদি ধুয়ে আয় ভাল করে।
মিরোকে নিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে এল কিশোর।
খেতে খেতে মুখ তুললেন রাশেদ চাচা। কিশোর, আবার কিসে জড়িয়েছ? তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, আর কখনও ডাকাতদের সঙ্গে মিশবে না। বস্তায় ভরে এবারই তো দিয়েছিল সাগরে ফেলে। ভাগ্যিস রবিন গিয়েছিল...খবরদার, ডাকাতির কেস আর কখনও নেবে না।

গেছিলাম তো রত্নদানো ধরতে, ডাকাতের পাল্লায় পড়ব তা কি আর জানি? বসতে অসুবিধে হচ্ছে যেন কিশোরের। খালি নড়ছে, একবার এভাবে বসছে, একবার, ওভাবে।
হুমম! জবাব খুঁজে পাচ্ছেন না রাশেদ চাচা। ভাজা গরুর মাংসে ছুরি চালালেন, কাঁটা চামচ দিয়ে এক টুকরো মুখে ফেলে চিবাতে চিবাতে বললেন, তা এখন আবার কি ধরে এলে? জিন, না পরী?
মিরোকে সাহায্য করতে গিয়েছিলাম, জাপানী কিশোরের কাঁধে হাত রাখল গোয়েন্দাপ্রধান। বড় বিপদে পড়েছেন ওর বাবা। একটা বেল্ট চুরি হয়েছে, ওটা খুঁজে বের করতে গিয়েছিলাম।
গোল্ডেন বেল্টের কথা বলছ? চিবানো থেমে গেছে রাশেদ চাচার। পারবে বের করতে? আমি অনেক ভেবেছি, কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারিনি কোন দিক দিয়ে কিভাবে ওটা বের করে নিয়ে গেল চোরেরা।
মাথা ঝাঁকাল শুধু কিশোর, কি বোঝাতে চাইল সে-ই জানে।
এরপর আর বেশি কথাবার্তা হল না। খাওয়া শেষ হল।
অনেক প্রশ্ন ভিড় করে আছে রবিনের মনে, কিন্তু কিশোরকে জিজ্ঞেস করার সুযোগই পেল না। কেমন যেন ঝিম মেরে বসে আছে গোয়েন্দাপ্রধান। আরেকটা ব্যাপার, এই গরমের বিকেলে জ্যাকেট পরে আছে কেন সে? মেরিচাচী বলায়। কোমরের কাছের বোতাম লাগিয়েছে, টান টান হয়ে আছে জায়গাটা। হঠাৎ কি করে এত চর্বি জমে গেল তার পেটে!
অন্ধকার নামতে শুরু করতেই উঠে দাঁড়াল কিশোর। রবিন, মুসা, চল। হেডকোয়ার্টারে যাই।
ম্যাগাজিন পড়ছেন রাশেদ চাচা, ডিশ-প্লেট ধুচ্ছেন চাচী। চুপচাপ বেরিয়ে এল ছেলেরা।
হেডকোয়ার্টারে ঢুকেই দুই সহকারীকে জিজ্ঞেস করল কিশোর, যা বলেছিলাম করেছ?
মাথা ঝাঁকাল মুসা আর রবিন।
করা উচিত হয়নি, বলল মুসা। রাস্তার ওপাশে কয়েকটা ছেলে ঘুড়ি ওড়াচ্ছিল, আমাদেরকে দেখেছে। গোপন পথগুলো দেখে ফেলেছে ওরা।
আমাদের ওপর চোখ রাখার জন্যে শুঁটকিই হয়ত পাঠিয়েছে, রবিন বলল। আমারও মনে হয় কাজটা উচিত হয়নি, তুমি বললে বলেই করলাম।
ঠিকই করেছ, সন্তুষ্ট মনে হল কিশোরকে। আমারও সময় খুব ভালই কেটেছে, পরে বলব সব। এস, এখন আমাদের কোন একটা অভিযানের কথা শোনাও মিরোকে। ও শুনতে চায়।

আগ্রহী শ্রোতা পাওয়া গেছে, খুশি হয়েই গল্প শুরু করল রবিন।
বাইরে অন্ধকার গাঢ় থেকে গাঢ়তর হচ্ছে। মাথার ওপরের স্কাইলাইটের ঢাকনা হাঁ করে খুলে দিয়েছে কিশোর, তারাজ্বলা কালো আকাশ চোখে পড়ছে।
ফিসফিস-করে-কথাবলা-মমির গল্প সবে মাঝামাঝি এসেছে, এই সময় নড়েচড়ে উঠল কিশোর। এক এক করে বোতাম খুলল, গা থেকে খুলে ফেলল জ্যাকেট। শার্টের নিচের দিকটা তুলে দেখাল দুই সহকারীকে।
প্রফেসর বলতে যাচ্ছিল রবিন, কিন্তু প্রফে বলেই থেমে গেল। অস্ফুট একটা শব্দ করে উঠল মুসা। দুজনেরই চোখ বড় বড় হয়ে গেছে।
কিশোরের কোমরে সম্রাটের সোনার বেল্ট!
বড় বড় চারকোনা সোনার টুকরো, তাতে উজ্জ্বল পাথর বসানো। না, কোন ভুল নেই, গোল্ডেন বেল্টই পরে আছে গোয়েন্দাপ্রধান।
ভীষণ ভারি! নড়েচড়ে বসল কিশোর। পরে রাখতে খুব কষ্ট হচ্ছে। কোমর থেকে বেল্ট খুলে টেবিলে রাখল সে।
মুখে খই ফুটল দুই সহকারীর। নানা প্রশ্ন। বেল্টটা কোথায় পেয়েছে কিশোর? পরে রয়েছে কেন? কেন কর্তৃপক্ষকে ফেরত দেয়নি? কেন...
হঠাৎ ঝটকা দিয়ে খুলে গেল দুই সুড়ঙ্গের ঢাকনা। খুদে কুৎসিত একটা মানুষের মুখ দেখা দিল। পরক্ষণেই ভেতরে উঠে এল মানুষটা। হাতে ইয়াবড় এক ছুরি। জ্বলন্ত চোখে ছেলেদের দিকে চেয়ে ভয়াবহ ভঙ্গিতে ছুরি চাল সে। ঠিক সেই মুহূর্তে খুলে গেল লাল কুকুর চার-এর-দরজা। ছুরি হাতে ঢুকল আরেকজন খুদে মানুষ। খুলে গেল সহজ তিন, দেখা গেল আরেকটা মুখ, সেটার পেছনে আরেকটা।
বিচ্ছুরা, তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে উঠল এক আগন্তুক, এবার ভালয় ভালয় বেল্টটা দিয়ে দাও তো!
পায়ে পায়ে চারপাশ থেকে এগিয়ে আসতে শুরু করল চার বামন।
বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন কিশোরের দেহে। ছোঁ মেরে বেল্টটা তুলে নিয়েই লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল টেবিলে। স্কাইলাইটের ওপাশে আটকানো দড়ির সিঁড়ি টেনে নামল। চেচিয়ে বলল, মিরো, জলদি!
দড়ির সিঁড়ি বেয়ে ট্রেলারের ছাতে উঠে গেল মিরো। বেল্টটা তার হাতে দিয়ে মুসা আর রবিনের দিকে তাকাল কিশোর। তোমরাও ওঠ!
বিনা প্রতিবাদে ছাতে উঠে গেল দুই সহকারী গোয়েন্দা। তাদের ঠিক পর পরই উঠে পড়ল কিশোরও।
টেবিলে উঠে পড়েছে দুই বামন, একজন ইতিমধ্যেই সিঁড়ি ধরে ফেলেছে।

ট্রেলারের ছাতে আটকা পড়েছে চার কিশোর। কোনদিকে যাওয়ার পথ দেখা। যাচ্ছে না। ওদিকে ছুরি হাতে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করেছে এক বামন।
কোন্ দিক দিয়ে কিভাবে সরে যাবে, আগেই ভেবে রেখেছে যেন কিশোর। ট্রেলারের গায়ে ঠেকিয়ে রাখা হয়েছে পুরানো একটা স্লিপার, বাচ্চাদের কোন পার্ক থেকে কিনে এনেছেন রাশেদ চাচা। লোহার কয়েকটা মোটা মোটা কড়ি আড়াআড়ি পড়ে আছে স্লিপারের ওপর।
একমুহূর্ত সময় নষ্ট করল না কিশোর। নিচের দিকে পা দিয়ে উপুড় হয়ে। স্লিপারে শুয়ে পড়ল। শ করে কড়ির তলা দিয়ে নেমে চলে এল কাঠের গুড়োয় ঢাকা মাটিতে। ডেকে সঙ্গীদেরকেও নামতে বলল। কিশোরের মতই একে একে নেমে এল মিরো, রবিন, মুসা। জঞ্জালের ভেতর দিয়ে পথ করা আছে, তাতে ঢুকে পড়ল চারজনে।
স্লিপারে আড়াআড়ি করে কড়ি রাখা আছে, এটা জানে না বামনেরা। অন্ধকারে ভাল দেখতেও পেল না। তাই শুয়ে না নেমে স্লিপারে বসে পড়ল এক বামন। শা করে খানিকটা নেমেই থ্যা করে বাড়ি খেল কড়িতে, আটকে গেল তার শরীরে, রাতের অন্ধকার চিরে দিল তার তীক্ষ্ণ চিৎকার।
এদিক দিয়ে নয়! চেঁচিয়ে সঙ্গীদেরকে বলল বামনটা। বেরিয়ে যাও! ঘুরে এসে ধর বিচ্ছুগুলোকে! ওরা বেরিয়ে যাচ্ছে!
ছাতে হুড়োহুড়ির শব্দ হল। স্কাইলাইট দিয়ে টপাটপ আবার ট্রেলারের ভেতরে লাফিয়ে নামল বামনগুলো। সবচেয়ে সহজ পথ সহজ তিন দিয়ে বেরোবে।
ওদের ধরতেই হবে! চেঁচিয়ে বলল আবার কড়িতে আটকাপড়া বামনটা। নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আবার স্লিপার বেয়ে ছাতে উঠে যাওয়ার চেষ্টা করছে সে। বেল্টটা নিয়ে গেছে বিচ্ছুগুলো!
অনেকগুলো কাঠের গুঁড়িতে ঘেরা ছোট্ট একটুখানি খোলা অন্ধকার জায়গায় গাদাগাদি করে বসেছে ছেলেরা।
তীক্ষ্ণ হুইসেল বেজে উঠল হঠাৎ। সে-রাতে দ্বিতীয়বার চমকাল রবিন আর মুসা। পুলিশের হুইসেল। মাথা তুলে দেখল, প্রায় আধডজন ছায়ামূর্তি ছুটে আসছে ইয়ার্ডের আঙিনা ধরে।
মিনিটখানেক হুটোপুটির শব্দ হল, পুলিশের উত্তেজিত কণ্ঠ আর বামনদের তীক্ষ্ণ চেঁচামেচি শোনা গেল। ইতিমধ্যে তিন সঙ্গীকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছে। কিশোর।
চার বামনকেই ধরে ফেলেছে পুলিশ। পুলিশের সঙ্গে মিস্টার টোহা মুচামারুও রয়েছেন।
বন্দীদেরকে হাতকড়া পরিয়ে গাড়িতে ভোলা হল।

বাবার কাছে এসে দাঁড়াল মিরো। দেখলে তো, বাবা, কিশোর-স্যানের বুদ্ধি? তুমি তো পাত্তাই দিচ্ছিলে না, অথচ গোল্ডেন বেল্ট খুঁজে বের করল সে, অপরাধীদের ধরিয়ে দিল।
আয়্যাম সরি, কিশোর, লজ্জিত কণ্ঠে বললেন মুচামারু। তোমাদেরকে…
আরে না না, কি যে বলেন, স্যার, তাড়াতাড়ি বলল কিশোর।
যা-ই বল, কিশোর, অসাধ্য সাধন করেছ তোমরা। পুলিশই হাল ছেড়ে দিয়েছিল…মিরোর কথা না শুনলে যে কি ভুল করতাম! এক ভুল তো করেছিলাম তোমাদেরকে মিউজিয়ম থেকে বের করে দিয়ে!
এই যে, বাবা, বেল্টটা নাও, মুচামারুর হাতে গোল্ডেন বেল্ট তুলে দিল, মিরো।
তিন গোয়েন্দাকে বার বার ধন্যবাদ জানিয়ে মিরোকে নিয়ে গাড়িতে গিয়ে উঠলেন মিস্টার মুচামারু।
লস অ্যাঞ্জেলেস পুলিশের চীফ ইয়ান ফ্লেচার আরও কিছুক্ষণ দেরি করলেন, কিছু প্রশ্ন করলেন কিশোরকে। তারপর তিনিও গিয়ে গাড়িতে উঠলেন। চলে গেল পুলিশের গাড়ি।
কিশোর! এইবার ধরল মুসা। কি করে এসব ঘটল কিছুই তো বুঝতে পারছি।! ওই বামনগুলোই তো রত্নদানো সেজেছিল, না?
হ্যাঁ, মাথা ঝাঁকাল কিশোর। ইবলিস একেকটা।
গোল্ডেন বেল্ট কি ওরাই চুরি করেছিল?
তো আর কারা? কাব স্কাউট সেজে ঢুকেছিল মিউজিয়মে। রবিন সোনার দাঁতটার কথা না বললে কিছুই বুঝতে পারতাম না। গোল্ডেন বেল্ট নিয়ে হাওয়া হয়ে যেত ব্যাটারা।

.

অনেকদিন পর আবার মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফারের অফিসে ঢুকেছে তিন গোয়েন্দা। বিশাল টেবিলের ওপাশে বসে আছেন বিখ্যাত চিত্রপরিচালক। আগের মতই রয়েছে ঘরের পরিবেশ, কোন কিছু বদলায়নি এতটুকু।
মোটাসোটা ফাইলটা পরিচালকের দিকে ঠেলে দিল রবিন।
ফাইলে ডুবে গেলেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। অনেকক্ষণ পর মুখ তুলে বললেন, চমৎকার! আবার কৃতিত্ব দেখালে তোমরা।
লজ্জিত হাসি হাসল রবিন আর মুসা। কিশোরের মুখ লালচে হয়ে উঠল।
বামনরাই তাহলে রত্নদানো সেজেছিল, আপনমনেই বললেন পরিচালক। ওদের সঙ্গে ভাব করেছে বব, এটা জানার পর ভারনিয়ার চেহারা কেমন হয়েছিল দেখতে ইচ্ছে করছে।

প্রথমে রেগে গিয়েছিলেন, বলল কিশোর। বব অবশ্য জানত না, তাকেও ফাঁকি দিয়েছে বার্ট। ব্যাংক ডাকাতির ব্যাপারটা জানলে বব রাজি হত না কিছুতেই। খুব লজ্জা পেয়েছে সে, হাতে-পায়ে ধরে মাপ চেয়েছে ফুফুর, কাছে। মাপ করে দিয়েছেন মিস ভারনিয়া। তিনি ঠিক করেছেন, বাড়ি বেচে দিয়ে সাগরের পারে কোথাও একটা ছোট কটেজ কিনবেন। পুরানো বাড়িতে আর থাকবেন না।

ভালই করেছে, মাথা দোলালেন পরিচালক। আচ্ছা, এবার কিছু প্রশ্নের জবাব দাও তো! নোটে লেখনি। গোল্ডেন বেল্ট চুরি করল কিভাবে? কোথায় লুকিয়ে রাখল? বামনরা কি করে জানল তোমার কাছে বেল্টটা আছে?

লম্বা শ্বাস নিল কিশোর। পুরোপুরি অন্ধকারে ছিলাম প্রথমে। রবিন সোনার দাঁতটার কথা বলার পর বুঝলাম সব কিছু। শুধু একটা সোনার দাঁত! ভুরু সামান্য কুঁচকে গেছে মিস্টার ক্রিস্টোফারের। শার্লক হোমসও পারত কিনা সন্দেহ!

সহজ ব্যাপার তো, স্যার, বলল কিশোর। ছোট ছেলেদের দাঁত একবার। পড়লে দ্বিতীয়বার গজায়, বাধানো সোনার দাঁত লাগানর দরকার পড়ে না। তারমানে মিউজিয়মের বাচ্চা ছেলেটা আসলে বয়স্ক মানুষ। আর ওই আকারের বয়স্ক মানুষ একমাত্র বামনই হতে পারে।

ঠিকই অনুমান করেছিলে।

যখনই বুঝে গেলাম, বামনরা গিয়েছিল কাব স্কাউট সেজে, দুইয়ে দুইয়ে চার যোগ করে নিতে অসুবিধে হল না। হলিউডে ওদের বাস, সিনেমা টেলিভিশনে ওরা অভিনয় করে, দড়াবাজিতে ওস্তাদ, চুরিচামারিতেও পিছিয়ে নেই ওদের অনেকেই। পিটারসন মিউজিয়মে অলঙ্কারের প্রদর্শনী শুরু হল, চোরডাকাতের ভিড় জমল শহরে। রত্ন-চুরির ফন্দি করল ইঅং। বামনদেরকে দলে টানল। সুন্দর প্ল্যান করেছে। সে। এক মহিলা অপরাধীকে ডেন মাদার সাজিয়ে বামনদের কাব স্কাউটের পোশাক পরিয়ে পাঠানো হল মিউজিয়মে। টোড মার্চকে ভাড়া করা হল মিউজিয়মের ভেতরে বিশেষ একটা সময়ে সামান্য অভিনয় করার জন্যে। অভিনয় শুরু করল মার্চ, লোকের চোখ তার দিকে আকৃষ্ট হল, এই সুযোগে ব্যালকনির সিঁড়ির গোড়ায় চলে গেল চার বামন। বাইরে থেকে কানেকশন কেটে আলো নিবিয়ে দিল বার্ট, মেকানিক সেজে গিয়েছিল সে-ই। দ্রুত ব্যালকনিতে উঠে গেল চার বামন। ওদিকে অন্ধকার। হলঘরে তখন নরক গুলজার শুরু হয়ে গেছে।

তারপর? কিশোরের দিকে ঝুঁকে এসেছে মুসা।

বামনরা সঙ্গে করে দড়ি নিয়েছিল, বলল কিশোর। তিনজন দড়ি ধরে রইল ওপর থেকে, চতুর্থজন দড়ি ধরে নেমে এল বেল্টের বাক্সের ওপর। বাক্স ভেঙে বেল্টটা

বের করে নিতে বেশিক্ষণ লাগল না। দড়ি ধরে টেনে আবার তাকে ব্যালকনিতে তুলে নিল তার সঙ্গীরা।
হুমম! আস্তে মাথা দোলালেন পরিচালক। ওরা দক্ষ দড়াবাজিকর, আমার ধারণা, কাজটা করতে তিরিশ সেকেণ্ডও লাগেনি। এখন বুঝতে পারছি, কেন। নেকলেস চুরি না করে বেল্ট চুরি করেছে ওরা। নেকলেসের বাক্সের ওপর নামার কোন উপায় ছিল না।
হ্যাঁ, বলল কিশোর। বেল্টটা বাক্স থেকে সরাল বটে, কিন্তু জানে এত ভারি একটা জিনিস তখন হল থেকে বের করে নিয়ে যেতে পারবে না। কাজেই লুকিয়ে। ফেলল।
হলের ভেতরেই লুকিয়েছে? কিন্তু পুরো মিউজিয়ম তো তন্ন তন্ন করে খোঁজা হয়েছে, পাওয়া যায়নি বেল্ট।
আসল জায়গাতেই খোঁজেনি ওরা। খুব মাথা খাঁটিয়ে লুকানর জায়গা ঠিক করেছে বামনরা। বেল্ট লুকিয়ে ফেলল, পরে সুযোগমত একদিন এসে নিয়ে যাবে। বলে। সেদিন রাতে যদি ব্যাটাদের না ধরা যেত, পরের দিনই চিলড্রেনস ডে-তে আবার কাব স্কাউট সেজে গিয়ে বেল্ট বের করে নিয়ে যেত ওরা, কোন একটা সুযোগ সৃষ্টি করে।
হুমম! মাথা দোলালেন পরিচালক।
ব্যাংক ডাকাতি হয়ে গেল, বার্টকে ধরতে পারল না পুলিশ। চার বামনকেও ধরতে পারল না। বোর্ডিং হাউসে খোঁজখবর করতে গিয়েছিল পুলিশ, কিন্তু মুখে তালা এঁটে ছিল বামনের গোষ্ঠী। অনেক ভেবে ঠিক করলাম, ফাঁদ পেতে ওদেরকে ধরতে হবে, এছাড়া আর কোন উপায় নেই।
অ, এই ব্যাপার! মুখ গোমড়া করে ফেলেছে রবিন। আমাকে আর মুসাকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করেছিলে!
রাগ কোরো না, রবিন, এছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। পথগুলো বামনদেরকে দেখানর দরকার ছিল, নইলে ঢুকত কি করে ওরা? পরিচালকের দিকে ফিরল কিশোর। হ্যাঁ, রবিন সোনার দাঁতটার উল্লেখ করতেই সব বুঝে গেলাম। তাড়াতাড়ি ছুটে গেলাম মিউজিয়মে। মিস্টার মুচামারুকে সব খুলে বললাম, তারপর দুজনে মিলে খুঁজে বের করলাম সোনার বেল্টটা…
কোন জায়গা থেকে? কথার মাঝে প্রশ্ন করল মুসা।
আসছি সে-কথায়। বেল্টটা কোমরে পরে চলে গেলাম বামনদের বোর্ডিং হাউসে। রত্নদানো সেজেছিল যে চারজন, তাদের নেতাকে ডেকে আনতে অসুবিধে হল না। গোল্ডেন বেল্ট আমি পেয়ে গেছি, সেকথা বললাম তাকে। জ্যাকেট তুলে এক পলক দেখালামও জিনিসটা। বললাম, চল্লিশ হাজার ডলার নগদ দিলে বেল্টটা

তাকে দিয়ে দিতে পারি। টাকাটা কোথায় হাতবদল করতে হবে, সেকথাও বললাম। ইয়ার্ডের ঠিকানা দিয়ে বেরিয়ে এলাম বোর্ডিং হাউস থেকে।
তারমানে, পরিচালক বললেন। তুমি ধরেই নিয়েছিলে, ওরা তোমার কাছ। থেকে বেল্টটা ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করবেই।
হ্যাঁ। ওরা যদি টাকা নিয়েও আসত, তাহলেও কেস ওদের বিরুদ্ধে চলে যেত। এত টাকা ওরা পেল কোথায়, জানতে চাইত পুলিশ। বেল্ট চুরির কেসে না জড়ালেও তখন ডাকাতির কেসে ফেসে যেত ওরা।
রাস্তার পাশের ছেলেগুলো তাহলে ছেলে নয়! বিড়বিড় করল রবিন। বামনরাই ছেলে সেজে আমার আর মুসার ওপর চোখ রেখেছিল। বিরক্তি ঝরল তার কণ্ঠে। ওদেরকে জানাতে চেয়েছিলে, কোন পথে হেডকোয়ার্টারে ঢোকা সহজ
হ্যাঁ, চেয়ারে সামান্য নড়েচড়ে বসল কিশোর। মিস্টার মুচামারুকে সব বুঝিয়ে বলেছি, কি করে কি করতে হবে। ঠিক সময়ে দলবল নিয়ে এসে ট্রেলারের আশপাশে লুকিয়ে রইলেন চীফ ইয়ান ফ্লেচার। সঙ্গে মিস্টার মুচামারুও এলেন। বামনরা আক্রমণ করল আমাদের, ধরা পড়ল।
একটা কথা বার বার এড়িয়ে যাচ্ছ তুমি, হাসলেন চিত্রপরিচালক। আমাদেরকে টেনশনে রাখার জন্যেই বুঝি? কোথায় লুকানো হয়েছিল গোল্ডেন বেল্ট?
যেখানে কেউ খুঁজবে না, কিশোরও হাসল। মিস ভারনিয়ার বাড়িতে জানালায় উঠে ভয় দেখিয়েছিল রত্নদানো, ওরফে বামনেরা। কি করে? হিউম্যান ল্যাডার, স্যার। একজনের কাঁধে আরেকজন উঠে একটা জ্যান্ত মই বানিয়ে ফেলত ওরা সহজেই…
দাঁড়াও, দাঁড়াও, হাত তুললেন পরিচালক। বোধহয় বুঝতে পারছি, কোথায় লুকানো ছিল গোল্ডেন বেল্ট। ফাইলের পাতা উল্টে গেলেন দ্রুত হাতে। একটা জায়গায় এসে থামলেন, হ্যাঁ, এই যে, পেয়েছি। স্পষ্ট করে লিখেছে সব রবিন। মিউজিয়মের ছাত গম্বুজ আকৃতির, তারমানে দেয়াল গোল। দেয়ালের মাথায় খাজ, গম্বুজটা তার ওপর বসানো, অনেকটা ঢাকনার মত করে। ছবি ঝোলানর জন্যে ওরকম খাজ রাখা হয়েছে। ওই খাঁজেই লুকিয়ে রাখা হয়েছিল গোল্ডেন বেল্ট।
আমিও তাই ভেবেছিলাম, স্যার, হাসছে কিশোর। কিন্তু মই লাগিয়ে উঠে দেখলাম, পিঠ-বাঁকা খাজ, ওখানে বেল্ট রাখার উপায় নেই, পড়ে যাবে।
ভুরু কুঁচকে গেল চিত্রপরিচালকের। সামান্য হাঁ হয়ে গেছে মুখ। শব্দ করে মুখ দিয়ে ফুসফুসের বাতাস বের করে দিলেন। তাহলে কোথায় ছিল বেল্টটা?
খাজে চ্যাপ্টা জায়গা নেই, বলল কিশোর। বোকা বনে গেলাম। কোথায় আছে গোল্ডেন বেল্ট, কিছু বুঝতে পারলাম না। ভাবছি, এই সময় গালে এসে লাগল

ঠাণ্ডা হাওয়ার পরশ। চকিতে বুঝে গেলাম..
এয়ার কণ্ডিশনিং! স্বভাব-বিরুদ্ধ কাজ করে বসলেন পরিচালক, উত্তেজনায়। চেঁচিয়ে উঠলেন।
হ্যাঁ, স্যার, এয়ার কণ্ডিশনিং। বাতাস চলাচলের জন্যে সরু যে চ্যানেল করা হয়েছে, তারই একটার মুখের জালি খুলে নিয়েছে চোর, কালো সুতো দিয়ে জালির সঙ্গে বেল্টটা বেঁধেছে। বেল্ট সুড়ঙ্গের ভেতরে ঝুলিয়ে দিয়ে আবার জায়গামত লাগিয়ে দিয়েছে জালিটা। ওখানে খুঁজতে যায়নি কেউ, কারণ মই ছাড়া ওখানে। পৌঁছানো অসম্ভব। হিউম্যান-ল্যাডার বানিয়ে বামনেরা এই কাজ করেছে, কল্পনাও। করতে পারেনি কেউ।
একসেলেন্ট, মাই বয়েজ! উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে পরিচালকের চেহারা। ভারনিয়ার কাছে আমার মুখ রেখেছ তোমরা। থ্যাঙ্ক ইউ।
আমরা তাহলে আজ আসি, স্যার, উঠে দাঁড়াল কিশোর। রবিন আর মুসাও উঠল।
আরে বস, বস, হাত তুললেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। আইসক্রীমের অর্ডার দিচ্ছি। এত সুন্দর একটা কাহিনী নিয়ে এলে, আর খালি মুখে চলে যাবে?
হাসি একান-ওকান হয়ে গেল মুসার। বন্ধুদের আগেই ধপ করে বসে পড়ল সে চেয়ারে।
রত্নদানোর এই ছবিটায় শিগগিরই হাত দিতে চাই, বললেন পরিচালক। নাম কি রাখা যায়, বলত? ফোর লিটল নোমস হলে কেমন হয়?
চারটে খুদে রত্নদানো, বিড়বিড় করল কিশোর বাংলায়। ইংরেজিতে বলল, লিটল নয়, স্যার, ডেভিল রাখুন। ফোর ডেভিল নোমস।
ঠিক, ঠিক বলেছ, একমত হলেন পরিচালক।

ভলিউম ১ – রূপালী মাকড়সা – তিন গোয়েন্দা – রকিব হাসান – সেবা প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ: নভেম্বর, ১৯৮৫

আরে, আরে! হ্যানসন! চেঁচিয়ে উঠল রবিন মিলফোর্ড।

আরে লাগল…লেগে গেল তো…! প্রায় একই সঙ্গে বলে উঠল মুসা আমান।

বনবন স্টিয়ারিং ঘোরাল হ্যানসন, ব্রেক কষল ঘ্যাচ করে। পেছনের সিটে উল্টে পড়ল তিন গোয়েন্দা। টায়ারের কর্কশ আওয়াজ তুলে চকচকে একটা লিমোসিনের কয়েক ইঞ্চি দূরে দাঁড়িয়ে পড়ল বিশাল রোলস রয়েস।

চোখের পলকে লিমোসিন থেকে বেরিয়ে এল কয়েকজন লোক। ড্রাইভিং সিট থেকে সবে নামছে হ্যানসন। তাকে এসে ঘিরে ফেলল। আঙুল তুলে শাসানর ভঙ্গি করছে, উত্তেজিত। কথা বলছে অদ্ভুত ভাষায়।

লোকগুলোকে পাশ কাটিয়ে গেল হ্যানসন। গাড়িতেই বসে আছে। লিমোসিনের শোফার। লাল পোশাক, কাঁধ আর হাতার কাছে সোনালি কাজ করা।

এই যে, মিস্টার, বলল হ্যানসন, এটা কি করলে? দিয়েছিলে তো মেরে!

আমি ঠিকই চালাচ্ছিলাম! উদ্ধত কণ্ঠ লোকটার। দোষ তোমার! সামনে পড়লে কেন? প্রিন্স দিমিত্রির গাড়ি দেখেছ, সরে যেতে পারনি?

ইতিমধ্যে সামলে নিয়েছে তিন গোয়েন্দা। অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে লোকগুলোর দিকে। উত্তেজিত হয়ে প্রায় আস্ফালন শুরু করেছে হ্যানসনকে ঘিরে। ওদের মাঝে সবচেয়ে লম্বা লোকটা ইংরেজিতে বলে উঠল, বুদ্ধু কোথাকার! দিয়েছিলে তো প্রিন্সকে শেষ করে! সর্বনাশ করে দিয়েছিলে আরেকটু হলেই! তোমার শাস্তি হওয়া দরকার!

আমি ঠিকই মেনেছি, আপনাদের ড্রাইভারই ট্রাফিক আইন মানেনি, দৃঢ় গলায় বলল হ্যানসন। পুরোপুরি ওর দোষ।

কি প্রিন্স প্রিন্স করছে ওরা! রবিনের কানের কাছে বিড়বিড় করল মুসা। দুজনেই হুমড়ি খেয়ে পড়েছে এক জানালার ওপর।

খবরের কাগজ পড় না নাকি? নিচু গলায় বলে উঠল রবিন। ইউরোপের ভ্যারানিয়া থেকে এসেছে। পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট সাতটা দেশের একটা। আমেরিকা দেখতে এসেছে।

খাইছে! কিশোরের মুখে শোনা বাঙালী বুলি ঝাড়ল মুসা। আরেকটু হলেই তো গেছিল!

দোষটা হ্যানসনের নয়! এই প্রথম কথা বলল কিশোর পাশা। চল নামি। সত্যিই কার দোষ, ওদেরকে বুঝিয়ে দেয়া দরকার।

তাড়াহুড়া করে নেমে এল তিন গোয়েন্দা। তাদের পর পরই লিমোসিনের পেছনের সিট থেকে নেমে এল আরেক কিশোর। রবিনের চেয়ে সামান্য লম্বা। কুচকুচে

কালো চুল, লম্বা করে ইউরোপিয়ান ছাদে কাটা। বছর দুয়েকের বড় হবে। চেহারায় আভিজাত্যের ছাপ।
থাম তোমরা! নিজের লোকদের ধমক লাগাল সে। সঙ্গে সঙ্গেই চুপ হয়ে গেল লোকগুলো। হাত নাড়তেই ঝটপট পেছনে সরে গেল ওরা। হ্যানসনের কাছে এগিয়ে এল ছেলেটা। ওদের হয়ে আমি ক্ষমা চাইছি, চমৎকার শুদ্ধ ইংরেজি। আমার শোফারেরই দোষ।
কিন্তু, ইয়োর হাইনেস... বলতে গিয়েও বাধা পেয়ে থেমে গেল। লম্বা লোকটা। হাত নেড়ে থামিয়ে দিয়েছে তাকে প্রিন্স দিমিত্রি। ফিরে চাইল তিন গোয়েন্দার দিকে।
কাজটা খুব খারাপ হয়ে গেছে, বলল প্রিন্স। দুঃখিত। তোমাদের ড্রাইভার খুব ভাল, তাই রক্ষে। নইলে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে যেত!...বাহ্, গাড়িটা তো খুব সুন্দর! রোলস রয়েসটা দেখিয়ে বলল। কিশোরের দিকে তাকাল। মালিক কে? তুমি?
ঠিক মালিক নই, বলল কিশোর। তবে মাঝে মধ্যে মালিকের মতই ব্যবহার করি। রোলস রয়েস কি করে পেয়েছে ওরা, কতদিনের জন্য, সব কিছু ব্যাখ্যা করে বলার সময় এটা নয়।
কঙ্কাল দ্বীপ অভিযানের রিপোর্ট দিতে গিয়েছিল তিন গোয়েন্দা মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফারের অফিসে। ওখান থেকে ফেরার পথেই এই অঘটন।
আমি দিমিত্রি দামিয়ানি, ভ্যারানিয়া থেকে এসেছি, নিজের পরিচয় দিল রাজকুমার। এখনও প্রিন্স পদবী পাইনি। তবে আগামী মাসেই অভিষেক অনুষ্ঠান হবে। আমার লোকেরা জানে, আগে হোক পরে হোক, প্রিন্স আমিই হব, তাই ছোটবেলা থেকেই ওই নামে ডাকে। তোমরা কি পুরোদস্তুর আমেরিকান?
পুরোদস্তুর বলে কি বোঝাতে চাইছে দিমিত্রি, বুঝতে পারল না রবিন আর মুসা। চুপ করে রইল।
জবাব দিল কিশোর। ওরা দুজন আমেরিকান, দুই বন্ধুকে দেখিয়ে বলল সে। এখন আমিও তাই। বাবা এখানকার ন্যাশন্যালিটি পেয়ে গিয়েছিল। তবে, আসলে আমি বাঙালী, বাংলাদেশী।
পরস্পরের দিকে চেয়ে হাসল রবিন আর মুসা। জীবনে কখনও চোখেও দেখেনি, তবু বাংলাদেশকে কতখানি ভালবাসে কিশোর পাশা, জানা আছে তাদের। তাই তার কথায় আহত হল না। আর তাছাড়া তেমন আহত হবার কোন কারণও নেই। ওরাও পুরোপুরি আমেরিকান নয়। একজনের রক্তে রয়েছে আইরিশ রক্তের মিশ্রণ, আরেকজনের দাদার বাবা ছিল খাঁটি আফ্রিকান।
পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে বাড়িয়ে ধরল কিশোর। আমাদের পরিচয়।
কার্ডটা নিল দিমিত্রি।

তিন গোয়েন্দা
???
প্রধান: কিশোর পাশা
সহকারী: মুসা আমান
নথি, গবেষক: রবিন মিলফোর্ড
অপেক্ষা করে রইল তিন গোয়েন্দা কার্ড দেখে নতুন সবাই যা করে, তাই হয়ত করবে দিমিত্রি। প্রথমেই প্রশ্ন করবে, প্রশ্নবোধকগুলোর মানে কি।
ব্রোজাস! বলে উঠল দিমিত্রি। হাসল। সুন্দর করে হাসে রাজকুমার। ঝকঝকে সাদা দাঁত, মুসার মত। তবে মাড়ি বাদামী নয়, টুকটুকে লাল, ঠোঁটও তাই। ও, শব্দটার মানে বোঝনি? ভ্যারানিয়ান ভাষায় এর মানে, চমৎকার। তা, এই প্রশ্নবোধকগুলো নিশ্চয় তোমাদের প্রতীক চিহ্ন?
নতুন চোখে রাজকুমারের দিকে তাকাল তিন গোয়েন্দা। না, যা ভেবেছিল, তা নয়। অনেক বেশি বুদ্ধিমান। দিমিত্রির প্রতি শ্রদ্ধা বাড়ল ওদের।
পকেট থেকে কার্ড বের করল দিমিত্রি। বাড়িয়ে দিল তিন। গোয়েন্দার দিকে। এটা আমার কার্ড।
কার্ডটা নিল কিশোর। দুপাশ থেকে তার গা ঘেঁষে এল রবিন আর মুসা, দেখার জন্যে। ধবধবে সাদা, চকচকে মসৃণ কার্ডটায় কালো কালিতে ছাপা: দিমিত্রি দামিয়ানি। নামের ওপরে একটা ছবি, উজ্জ্বল রঙে ছাপা। সোনালি জালের মাঝখানে বসে আছে একটা রূপালী মাকড়সা, এক পায়ে ধরে রেখেছে তলোয়ার। ছোট্ট ছবিতে এতগুলো ব্যাপার নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তোলা খুব মুশকিল, তবু যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে শিল্পী।
রূপালী মাকড়সা, বলল রাজকুমার। আমার, মানে ভ্যারানিয়ান রাজবংশেরই প্রতীক চিহ্ন এটা। নিশ্চয় অবাক হচ্ছ, একটা মাড়সা কি করে এত সম্মান পায়? সে অনেক লম্বা চওড়া কাহিনী, এখন বলার সময় নেই। একে একে তিন গোয়েন্দার সঙ্গে হাত মেলাল দিমিত্রি। তোমাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুব খুশি হয়েছি।
লিমোসিনের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে একটা কালো গাড়ি, প্রায় নিঃশব্দে। উত্তেজনা আর গোলমালে খেয়ালই করেনি তিন গোয়েন্দা। ওটা থেকে নামল এক তরুণ। হালকা-পাতলা, সুন্দর চেহারা। চোখে সদাসতর্কতা। ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল সে। এতক্ষণে দেখতে পেল তিন। গোয়েন্দা আমেরিকান যুবককে।
মাফ করবেন, ইয়োর হাইনেস, বলল যুবক। দেরি হয়ে যাচ্ছে। আমাদের। এখনও অনেক কিছুই দেখা বাকি।

হোক বাকি, বলল দিমিত্রি। এদের সঙ্গে কথা বলতেই বেশি ভাল লাগছে আমার। এই প্রথম আমেরিকান ছেলেদের সঙ্গে কথা বলার। সুযোগ পেয়েছি।
তিন গোয়েন্দার দিকে ফিরল আবার রাজকুমার। আচ্ছা, শুনেছি, ডিজনিল্যাণ্ড নাকি এক আজব জায়গা! দেখার অনেক কিছু আছে। ওখানে যাবার খুব ইচ্ছে আমার। তোমরা কি বল?
ডিজনিল্যাণ্ড সত্যিই একটা দেখার মত জায়গা, একবাক্যে স্বীকার করল তিন গোয়েন্দা। ওটা না দেখলে মস্ত ভুল করবে দিমিত্রি এটাও জানাল।
বডিগার্ডের সারাক্ষণ ঘিরে আছে, মোটেই ভাল লাগে না আমার, বলল রাজকুমার। খুব বেশি বাড়াবাড়ি করে ডিউক রোজার, আমার গার্জেন, ভ্যারানিয়ার রিজেন্ট এখন। আমাকে চোখে চোখে রাখার নির্দেশ দিয়ে দিয়েছে গার্ডদের। যেন, অন্য কেউ আমার কাছে ঘেষলেই সর্দি লেগে মরে যাব! যত্তসব!...লোকের যেন আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই, খালি আমাকে মারার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে! ভ্যারানিয়ার কোন শত্রু নেই, তারমানে আমারও নেই। কে আমাকে মারতে আসবে? খামোকা ঝামেলা!
ক্ষোভ প্রকাশ করতে গিয়ে অনেক কথা বলে ফেলল দিমিত্রি। চুপ করে গেল হঠাৎ। নীরবে দেখল তিন গোয়েন্দাকে। এক মুহূর্ত ভাবল কি যেন! তারপর বলল, তোমরা ডিজনিল্যাণ্ড যাবে আমার সঙ্গে? তোমাদের তো সব চেনা, দেখাবে আমাকে? খুব খুশি হব। বডিগার্ডের বদলে বন্ধুরা সঙ্গে থাকলে দেখেও মজা পাব অনেক বেশি। চল না!
দিমিত্রির হঠাৎ এই অনুরোধে অবাক হল তিন গোয়েন্দা। দ্রুত আলোচনা করে নিল নিজেদের মাঝে। সারাটা দিন পড়ে আছে সামনে, কিছুই করার নেই তেমন। দিমিত্রির অনুরোধ রক্ষা করা যায় সহজেই। বরং ভালই লাগবে ওদের।
রোলস রয়েসে টেলিফোন রয়েছে। স্যালভেজ ইয়ার্ডে মেরিচাচীকে ফোন করল কিশোর। জানাল, ওর ফিরতে দেরি হবে। সোনালি রিসিভারটা ক্রেডলে রেখে ফিরে চাইল। অবাক চোখে তাকিয়ে আছে। দিমিত্রি।
লিমোসিনে গিয়ে উঠে বসল দিমিত্রি। বন্ধুদের ডাকল।
রাজকুমারের গাড়িতেই যেতে পারবে তিন গোয়েন্দা। হ্যানসনকে রোলস রয়েস নিয়ে চলে যেতে বলল কিশোর। তারপর গিয়ে উঠে বসল। লিমোসিনে। মুসা আর রবিনও উঠল। সামনে শোফারের পাশে বসেছে
লম্বা লোকটা।– কালো গাড়িটায় উঠল অন্যরা। গাদাগাদি ঠাসাঠাসি করে বসতে হল। গাড়িটা আমেরিকান সরকারের। প্রিন্সের গাড়িকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে সঙ্গে দেয়া হয়েছে।

খুব রাগ করবেন ডিউক রোজার, মুখ গোমড়া করে রেখেছে লম্বা লোকটা। ঝুঁকি নিতে নিষেধ করেছেন তিনি।
কোন ঝুঁকি নিইনি, লুথার, কড়া গলায় বলল দিমিত্রি। তাছাড়া ডিউক রোজারের আদেশ মানতে আমি বাধ্য নই। আমার আদেশ মেনে। চলার সময় এসে গেছে তার। আর মাস দুয়েক পরই রাজ্য শাসন করব আমি। আমার কথাই তখন আইন, তার নয়। শোফারকে বলল, রিগো, খুব সাবধানে চালাবে। এটা তোমার ভ্যারানিয়া নয়, যে প্রিন্সের গাড়ি দেখলেই রাস্তা ছেড়ে দেবে লোকে। ট্রাফিক আইন মেনে চলবে পুরোপুরি। আর কোনরকম অঘটন চাই না আমি!
বিদেশী ভাষায় একনাগাড়ে কথা বলে গেল ডিউক লুথার। মুখচোখ কালো। মাথা ঝোঁকাল শোফার। গাড়ি ছেড়ে দিল।
মসৃণ গতিতে এগিয়ে চলেছে লিমোসিন, গতি মাঝারি। কোনরকম গোলমাল করল না আর শোফার। ঠিকঠাক মেনে চলল সব ট্রাফিক আইন। খুব সর্তক।
পঁয়তাল্লিশ মিনিট লাগল ডিজনিল্যাণ্ডে পৌঁছাতে। সারাটা পথ তিন গোয়েন্দাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে এসেছে দিমিত্রি। আমেরিকা, বিশেষ করে ক্যালিফোর্নিয়া সম্পর্কে জেনেছে অনেক কিছু। কখনও বাংলাদেশে আসেনি রাজকুমার। প্রায় কিছুই জানে না দেশটা সম্পর্কে। কিশোরের কাছে জানল অনেক কিছু। মুগ্ধ হয়ে গেল রাজকুমার। বলল, সুযোগ আর সময় পেলেই বাংলাদেশে ঘুরে যাবে সে। দেখবে ধানের খেত, মেঘনার চর, পদ্মার ঢেউ...শুনবে সন্ধ্যায় চৈতী শালিকের কিচির মিচির, বাঁশ বনের ছায়ায় দোয়েলের শিস, চাঁদনী রাতে শেয়ালের হুক্কাহুয়া...
গাড়ি পার্ক করল শোফার। নেমে পড়ল ছেলেরা। কালো গাড়ি থেকে প্রহরীরা নেমে পড়েছে আগেই।
ছেলেদের সঙ্গে সঙ্গে চলল ডিউক আর তার দলবল।
একটা জায়গায় এসে একটু পিছিয়ে পড়ল ডিউক, কিশোরের একেবারে গা ঘেঁষে এল দিমিত্রি। ফিসফিস করে বলল, ওদের ফাঁকি দিতে হবে। গায়ের ওপর থেকে খসাতে হবে!
আস্তে করে মাথা ঝোকাল কিশোর।
পুরো পার্ক চক্কর দিচ্ছে ছোট ট্রেন, বিচিত্র রঙের ইঞ্জিন, কামরা। খুদে স্টেশনে লোকের ভিড়। ওখানে এসে দাঁড়াল চার কিশোর। স্টেশনে এসে থামল একটা ট্রেন। পিলপিল করে নেমে এল যাত্রীরা। বেশির ভাগই বাচ্চা ছেলেমেয়ে। ওদের ভিড়ে মিশে গেল চারজনে। নতুন যাত্রী উঠল ট্রেনে। হুইসেল বাজিয়ে ছেড়ে দেবার আগের মুহূর্তে লাফিয়ে একটা বগিতে উঠে বসল চার কিশোর। ডিউককে

দেখতে পেল ওরা। প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে চোখ বড় বড় করে ছেলেমেয়েদের মাঝে খুঁজছে দিমিত্রিকে। সরে চলে এল ট্রেন।
ট্রেনে বসেই পার্কের অনেক কিছু চোখে পড়ে। দেখল দিমিত্রি। কোটা কি; বুঝিয়ে দিল তিন গোয়েন্দা। বেশ আনন্দেই কাটল সময়টা। পুরো পার্ক একবার চক্কর দিয়ে আবার স্টেশনে এসে থামল গাড়ি। দাঁড়িয়ে আছে ডিউক লুথার। তাকে ঘিরে রয়েছে দেহরক্ষীরা। মুখচোখ কালো। নিশ্চয় প্রচুর বকাঝকা খেতে হয়েছে ডিউকের কাছে।
ট্রেন থামতেই চার কিশোরকে দেখে ফেলল ওরা। ছুটে এসে দাঁড়াল বগির সামনে।
মুখ গোমড়া করে ট্রেন থেকে নামল দিমিত্রি। ঝঝাল কণ্ঠে বলল, আমার সঙ্গে থাকনি তোমরা! ডিউটি ফাঁকি দিয়েছ। রিপোর্ট করব আমি ডিউক রোজারের কাছে।
কিন্তু...আ-আমি... তোতলাতে শুরু করল লুথার।
থাম! ধমকে উঠল দিমিত্রি। তিন গোয়েন্দার দিকে ফিরে বলল, চল, যাই। ইসস, আরও সময় হাতে নিয়ে আসা উচিত ছিল! কত কিছু দেখার আছে আমেরিকায়!
তিন বন্ধুকে নিয়ে গাড়িতে উঠে বসল দিমিত্রি। পেছনের প্রহরী গাড়িতে করে আসার আদেশ দিল ডিউক লুথারকে। শোফার ইংরেজি জানে না। রকি বীচে ফেরার পথে মন খুলে কথা বলতে পারল চারজনে।
অনেক কিছু জানতে চাইল রাজকুমার। খুলে বলল সব তিন গোয়েন্দা। কি করে একসঙ্গে হয়েছে ওরা, কি করে গোয়েন্দা হওয়ার শখ জেগেছে, কি করে দেখা করেছে বিখ্যাত চিত্রপরিচালক মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফারের সঙ্গে, সব জানাল। সংক্ষেপে বলল ভূতুড়ে দুর্গ আর কঙ্কাল দ্বীপ অভিযানের কাহিনী।
ব্রোজাস! শুনতে শুনতে এক সময় চেঁচিয়ে উঠল দিমিত্রি। কি। আনন্দ! একেই বলে জীবন! আহা, আমেরিকান ছেলেরা কত স্বাধীন! ইসস, কেন যে রাজকুমার হয়ে জন্মালাম! আর কদিন পরেই কাঁধে চাপবে মস্ত দায়িত্ব। রাজ্য শাসন... আরিব্বাপরে! ভাবলেই হাত-পা হিম। হয়ে আসে!...স্বাধীন হব, হুহু! বাড়ি থেকেই বেরোতে দেয়া হয় না আমাকে! জীবনে কোনদিন স্কুলের মুখ দেখিনি! বাড়িতে শিক্ষক রেখে পড়াশোনা করিয়েছে! হাতে গোনা কয়েকজন বন্ধু আছে আমার, দেশে।...সত্যি বলছি, জীবনে এই প্রথম কয়েক ঘণ্টা আনন্দে কাটালাম! আজকের দিনটা স্মরণীয় হয়ে থাকবে আমার জীবনে!
খানিকক্ষণ নীরবতা। তোমরা আমার বন্ধু হবে? অযাচিতভাবে হঠাৎ জিজ্ঞেস করল দিমিত্রি। খুব খুশি হব!
আমরাও খুব খুশি হব, বলল মুসা।

থ্যাঙ্ক ইউ! হাসল রাজকুমার। তোমরা জান না, জীবনে আজই প্রথম তর্ক করেছি ডিউক লুথারের সঙ্গে। তোমাদের সঙ্গে মিশেছি, এটা মোটেই ভাল লাগছে না তার। জানি, ফিরে গিয়ে সব লাগাবে রিজেন্টের কাছে। ব্যাপারটা মোটেই ভালভাবে নেবে না রোজার। না নিক। আর মাত্র দুয়েকটা মাস। তারপর ওদের পরোয়া কে করে!

প্রিন্সের কথা নিশ্চয় না মেনে পারবে না ডিউক রোজার, বলল রবিন।

না, পারবে না, বলল দিমিত্রি। সময় আসুক। বেশ কয়েকটা আঘাত অপেক্ষা করছে তার জন্যে! রহস্যময় শোনাল রাজকুমারের গলা।

রকি বীচে পৌঁছে গেল গাড়ি। দিমিত্রিকে বলে গেল কিশোর, কোন্ পথে যেতে হবে। দিমিত্রি তার ভাষায় বলল শোফারকে।

পাশা, স্যালভেজ ইয়ার্ডের বিশাল লোহার গেটের সামনে পৌঁছে গেল গাড়ি।

দিমিত্রিকে নামতে অনুরোধ করল কিশোর। ওদের হেডকোয়ার্টার দেখাবে।

বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল দিমিত্রি। না রে, ভাই, সময় নেই। আজ রাতে এক জায়গায় ডিনারের দাওয়াত আছে। আগামীকাল সকালেই ফিরে যাব ভ্যারানিয়ায়।

রাজধানীতেই থাক নিশ্চয়? জানতে চাইল কিশোর। নাম কি?

হ্যাঁ। ডেনজো। কখনও গেলে দেখবে, কত বড় বাড়িতে থাকি! কয়েকশো বছর আগে তৈরি হয়েছিল বিশাল দুর্গের মত বাড়িটা। তিনশো কামরা। বেশির ভাগই নষ্ট হয়ে গেছে। ছোট রাজ্য। আয় খুবই কম। বাড়ি মেরামত করারও পয়সা নেই আমাদের। অথচ রাজা!...নাহ্, আর দেরি করতে পারছি না। চলি। আবার হয়ত কখনও দেখা হবে, মাই ফ্রেণ্ডস!

বন্ধুদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে গিয়ে লিমোসিনে উঠল দিমিত্রি। রাজকুমারের গা ঘেঁষে বসল লুথার। দেহরক্ষীরা উঠল।

ছেড়ে দিল গাড়ি। প্রতিটি জানালায় শুধু দেহরক্ষীর মুখ। লিমোসিনের পেছনে কালো এসকর্ট কার।

গাড়ি দুটো মোড় ঘুরে অদৃশ্য হয়ে যাবার পরেও অনেকক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে রইল তিন গোয়েন্দা।

একজন রাজকুমার এত ভাল হতে পারে, জানতাম না! কথা বলল, মুসা। কিশোর, কি ভাবছ? নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে শুরু করেছ...।

চোখ মিটমিট করে তাকাল কিশোর। ঠোঁট থেকে সরিয়ে নিল আঙুল। ভাবছি... নাহ্, সত্যি আশ্চর্য।

কি?

সকালের ব্যাপারটা! অ্যাক্সিডেন্ট হয়েই যাচ্ছিল! হ্যানসন ঠিক সময়ে গাড়ি না থামালে…কেন, আশ্চর্য লাগেনি তোমাদের কাছে? কোনরকম খটকা লাগেনি?
আশ্চর্য! খটকা! মুসার মতই বিস্মিত হল রবিন। কপাল ভাল, অ্যাক্সিডেন্ট হয়নি! এতে আশ্চর্যের কি আছে?
আসলে কি বলতে চাইছ, বলে ফেল তো! বলল মুসা।
রিগো, মানে দিমিত্রির শোফার, বলল কিশোর। পাশের রাস্তা থেকে বেরিয়ে এসে সামনে পড়ল। রোলস রয়েসটাকে দেখতে পায়নি, বললে মোটেই বিশ্বাস করব না। নিশ্চয় দেখেছে। ইচ্ছে করলেই গতি বাড়িয়ে আমাদের সামনে দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারত। বরং ব্রেক কষেছে ঘ্যাচ করে। সময় মত হ্যানসন পাশ কাটাতে না পারলে সোজা গিয়ে লিমোসিনের গায়ে বাড়ি মারত রোলস রয়েস। দিমিত্রি যেখানে বসেছিল ঠিক সেখানে। মারাই যেত সে!
দুর্ঘটনার আগে হুঁশজ্ঞান হারিয়ে ফেলে মানুষ, বলল মুসা। রিগোরও সেরকম কিছু হয়েছিল!
বিশ্বাস করতে পারছি না। এদিক ওদিক মাথা নাড়ল কিশোর। কেন যেন মনে হচ্ছে, কোথাও কিছু একটা ঘাপলা রয়েছে।…যাকগে, এস যাই। চাচী হয়ত ভাবছে…

.

দিন কয়েক পর।
হেডকোয়ার্টারে বসে আছে তিন গোয়েন্দা।
পাশা স্যালভেজ ইয়ার্ডের ভেতর আবর্জনার স্তূপের তলায় চাপা পড়ে আছে একটা ট্রেলার-মোবাইল হোম। ভাঙাচোরা। ওটাকে মেরামত করে নিয়ে নিজেদের গোপন আস্তানা বানিয়েছে তিন গোয়েন্দা। কয়েকটা গোপন পথ আছে, ওরা তিনজন ছাড়া আর কেউ জানে না!
কয়েক মিনিট আগে পিয়ন নিয়ে এসেছে সকালের ডাক। ইতিমধ্যেই মোটামুটি নাম ছড়িয়ে পড়েছে তিন গোয়েন্দার, অভিনেতা জন ফিলবি আর তার টেরর ক্যাসলের সৌজন্যে। অনেকেই চিঠি লেখে এখন ওদের কাছে। বেশির ভাগই বাচ্চা ছেলেমেয়ে, কিংবা ধনী বিধবা। কারও হয়ত বল হারিয়ে গেছে, কেউ এক বাক্স চিউইং গাম। খটুজে পাচ্ছে না, কিংবা কোন বিধবার আদরের বিড়ালটা হয়ত কয়েকদিন আগে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে, আর ফেরেনি। খুঁজে বের করে দেবার ডাক আসে। গ্রাহ্য করে না কিশোর। এসব সাধারণ কাজ হাতে নেবার কোন ইচ্ছেই নেই তার-যদিও মুসার খুবই আগ্রহ, চিঠিগুলো সোজা ময়লা ফেলার ঝুড়িতে নিক্ষেপ করে গোয়েন্দাপ্রধান।

হারিয়ে যাওয়া প্রিয় কুকুরটা খুঁজে দেবার অনুরোধ করে চিঠি পাঠিয়েছে এক বিধবা। এটাই পড়ছে রবিন, এই সময় বাজল টেলিফোন।
তিন গোয়েন্দার ব্যক্তিগত টেলিফোন। ইয়ার্ডের কাজে চাচা চাচীকে সাহায্য করে ওরা অবসর সময়ে। পারিশ্রমিক হিসেবে মেরিচাচীর হাতে তৈরি আইসক্রীম-কেক আর হট-চকোলেট ছাড়াও নগদ কিছু টাকা পায় রাশেদ চাচার কাছ থেকে। ওখান থেকেই টেলিফোনের বিল দেয় ওরা। গোয়েন্দাগিরি করে স্রেফ শখে, এর জন্যে টাকাপয়সা নেয় না মক্কেলের কাছ থেকে।
ছোঁ মেরে রিসিভার তুলে নিল কিশোর।
হ্যালো, বলল গোয়েন্দাপ্রধান। তিন গোয়েন্দা। কিশোর পাশা বলছি।
গুড মর্নিং, কিশোর, স্পীকারে গমগম করে উঠল ভারি কণ্ঠস্বর। আগের মত মাইক্রোফোনের সামনে আর রিসিভার ধরতে হয় না, নতুন ব্যবস্থা করে নিয়েছে কিশোর। টেলিফোন লাইনের সঙ্গে কায়দা করে স্পীকারের যোগাযোগ ঘটিয়ে দিয়েছে। ওপাশ থেকে কেউ কথা বললেই বেজে উঠে স্পীকার। হেডকোয়ার্টারে বসা সবাই একসঙ্গে শুনতে পায় কথা। এ রিসিভারে চেপে বসল কিশোরের আঙুল। চোখ বড় বড় হয়ে গেছে মুসা আর রবিনের। কান খাড়া হয়ে গেছে। মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফার!
কিশোর, তোমাকে পেয়ে যাওয়ায় ভালই হল, আবার বললেন চিত্রপরিচালক, শিগগিরই একজন দেখা করতে যাচ্ছে তোমাদের সঙ্গে।
দেখা করতে আসছে? কোন কেস, স্যার?
টেলিফোনে কিছুই বলা যাবে না, জবাব দিলেন চিত্রপরিচালক। খুব গোপন ব্যাপার। তার সঙ্গে দীর্ঘ সময় কথা বলেছি আমি। অনেক কিছু জেনেছি, বুঝেছি। তোমাদের পক্ষেই সুপারিশ করেছি আমি। আশা করি, নিরাশ করবে না। হ্যাঁ, বিস্ময়কর এক প্রস্তাব আসছে তোমাদের কাছে। আগে থেকেই হুঁশিয়ার করে রাখছি। ভেবেচিন্তে কাজ কর।...রাখলাম।
লাইন কেটে গেল ওপাশে। রিসিভারের দিকে এক মুহূর্ত চেয়ে রইল কিশোর। ধীরে ধীরে নামিয়ে রাখল ক্রেডলে। স্তব্ধ নীরবতা ট্রেলারের ভেতর।
কি মনে হয়? আরেকটা কেস? অনেকক্ষণ পর কথা বলল রবিন।
কিশোর কিংবা মুসা কিছু বলার আগেই বাইরে শোনা গেল মেরিচাচীর ডাক। ট্রেলারের স্কাইলাইটের খোলা জায়গা দিয়ে বাতাস ঢোকে, ওখান দিয়েই আসছে।
কিশোর! বেরিয়ে আয় তো! একজন লোক দেখা করতে এসেছে। তোর সঙ্গে।
কয়েক মুহূর্ত পর। দুই সুড়ঙ্গের মত্ত পাইপের ভেতর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চলেছে তিন গোয়েন্দা। একজনের পেছনে আরেকজন। চল্লিশ ফুট লম্বা পাইপ,

হাঁটুতে খুব ব্যথা পেত আগে। তাই পুরানো কাপেট কেটে পেতে দিয়েছে ওরা ভেতরে।
লোহার পাতটা সরাল কিশোর। বেরিয়ে এল তাদের ওয়ার্কশপে। তার পেছনে বেরোল মুসা, তারপর রবিন। পাতটা আবার পাইপের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এল ওরা জঞ্জালের বেড়ার অন্য পাশে।
মেরিচাচীর কাঁচঘেরা অফিসের পাশে একটা ছোট্ট গাড়ি। বনেটে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক তরুণ।
দেখামাত্রই তাকে চিনল তিন গোয়েন্দা। দিমিত্রির সঙ্গে কালো এসকর্ট কারে ছিল ওই যুবক।
হাল্লো! তিন গোয়েন্দাকে দেখেই সোজা হয়ে দাঁড়াল যুবক। হেসে এগিয়ে এল। আবার আমার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে, নিশ্চয় ভাবনি সেদিন তো পরিচয় হয়নি, আজ হয়ে যাক। আমি বব ব্রাউন।—এই যে, আমার আইডেনটিটি।
পরিচয়পত্র দেখাল যুবক। সরকারী সিল-ছাপ্পর মারা।
আমি সরকারী লোক, কার্ডটা আবার পকেটে রাখতে রাখতে বলল যুবক। জরুরি কিছু কথা আছে। নিরাপদে বলা যাবে কোথায়?
আসুন ভাবনা চলছে কিশোরের মাথায়। সরকারী লোক; তিন গোফ্রেন্ধার কাছে এসেছে! জরুরি কথা! মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফারও বার বার হুঁশিয়ার করেছেন। নাহ কিছু বুঝতে পারছে না সে।
তিন গোয়েন্দার ওয়ার্কশপে ববকে নিয়ে এল কিশোর। পুরানো দুটো চেয়ারের একটাতে বসতে দিল অতিথিকে। নিজে বসল আব্রেকটায়। মুসা আর রবিন বসল দুটো বাক্সের ওপর।
হয়ত বুঝতে পারছ, কেন এসেছি? কথা শুরু করল বব। তাকাল। তিন গোয়েন্দার দিকে।
কেউ কোন কথা বলল না।
ব্যাপারটা ভ্যারানিয়ার প্রিন্স দিমিত্রিকে নিয়ে, বলল আবার বব।
প্রিন্স দিমিত্রি! ভুরু কুঁচকে গেছে মুসার। কেমন আছে সে?
ভাল। তোমাদেরকে তার শুভেচ্ছা জানিয়েছে। কিশোরের দিকে তাকাল বব। দুদিন আগে ওর সঙ্গে কথা হয়েছে আমার। আগামী দুহপ্তার মধ্যেই অভিষেক অনুষ্ঠান শুরু হবে। তোমাদেরকে দাওয়াত পাঠিয়েছে সে।
ইয়াল্লা! চেঁচিয়ে উঠল মুসা। ইয়োরোপে যাব! সত্যি বলছেন তো?
সত্যিই বলছি, হাসল বব। তোমরা তার বন্ধু। আমেরিকার আর কোন ছেলেকেই সে চেনে না। দেশেও বন্ধুবান্ধব নেই খুব একটা। তাছাড়া, ভ্যারানিয়ায় কে যে তার বন্ধু, আর কে নয়, বোঝা খুবই মুশকিল। রাজকুমারের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবে

সবাই, তাকে তোয়াজ করে খুশি রাখতে চাইবে, এটাই স্বাভাবিক। এতে আর যাই হোক, বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে না। তাই, সত্যিকারের কয়েকজন বন্ধুকে কাছে রাখতে চায় অভিষেকের সময়।...আসল কথা কি জান, আইডিয়াটা আমিই ঢুকিয়েছি তার মাথায়।

আপনি? রবিন কথা বলল। কেন?

কারণ, আমাদের, মানে আমেরিকানদের কিছু স্বার্থ জড়িত রয়েছে, বলল বব। শান্তির দেশ ভ্যারানিয়া, অন্তত এতদিন তাই ছিল। কোন শত্রু নেই, সুইটজারল্যাণ্ডের মত। ওভাবেই থাকুক, এটাই চায় আমেরিকান সরকার। কোন শত্রুদেশ ওখানে আস্তানা গেড়ে আমাদের অসুবিধে করুক, এটা মোটেই কাম্য নয়।

কিন্তু, এতক্ষণে কথা বলল কিশোর। ভ্যারানিয়ার মত ছোট দরিদ্র একটা দেশ কি এমন দিতে পারে আমেরিকাকে?

পারে, পারে। ছোট বলে ইঁদুরকে উপেক্ষা করা উচিত না সিংহের। ভ্যারানিয়া একটা স্পাই বেস, দুনিয়ার সব দেশের গুপ্তচরদের স্বর্গ। যাকগে, ওসব বলার দরকার নেই এখন। তো, তোমরা যাবে?

চোখ মিটমিট করছে তিন কিশোরই। যাবার জন্যে ওরা এক পায়ে খাড়া। কিন্তু কিছু সমস্যা আছে। যেমন, এতদূরে অজানা অচেনা জায়গায় যেতে মত দেবেন কিনা অভিভাবকেরা, খরচ দেবেন কিনা ইত্যাদি। বব ব্রাউনকে জানাল ওরা সে কথা।

ওসব কোন সমস্যাই না, বলল বব। রবিন আর মুসার বাবাকে ফোন করবেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। তোমাদের সব দায়িত্ব আমার ওপর, সেকথা বলে দেবেন। কিশোরের চাচীর সঙ্গে আমি কথা বলব। মনে হয় না অরাজি হবেন। আর টাকা পয়সার কোন ভাবনা নেই। সব খরচ বহন করবে আমাদের সরকার। দেশের একটা সম্মান আছে, সেটা বজায় রাখতে হবে। যত খুশি খরচ কর ভ্যারানিয়ায়, পুরোদস্তুর। আমেরিকান সেজে থেক, কোন বাধা নেই।

হাসি একান-ওকান হয়ে গেল মুসার। রবিনের চোখও চকচক করছে। কিন্তু কিশোরের চেহারা দেখে বোঝা গেল না খুশি হয়েছে কি না।

কিন্তু, ভ্রূকুটি করল কিশোর, আমেরিকান সরকারের এত গরজ কেন? টাকা পয়সা খরচের ব্যাপারে কোন দেশের কোন সরকারই দরাজহস্ত নয়। আমাদের সরকারও এর বাইরে নন।

মিস্টার ক্রিস্টোফার বলেছেন, তোমরা খুব বুদ্ধিমান, হাসল বব। বুঝতে পারছি, ঠিকই বলেছেন। ঠিক আছে, বলেই ফেলছি। জুনিয়র এজেন্ট হিসেবে তোমাদেরকে ভ্যারানিয়ায় পাঠাতে চাইছেন ইউএস সরকার।

তারমানে...তারমানে প্রিন্স দিমিত্রির ওপর গুপ্তচরগিরি করতে... হতবুদ্ধি হয়ে গেছে যেন মুসা।
জোরে জোরে মাথা নাড়ল বব। মোটেই না। তবে চোখ খোলা রাখবে। সন্দেহজনক যে-কোন ঘটনা চোখে পড়ক, কিংবা কথা কানে আসুক, সঙ্গে সঙ্গে রিপোর্ট করবে। ভেতরে ভেতরে সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটছে ভ্যারানিয়ায়। শিগগিরই হয়ত বিস্ফোরণ ঘটবে। কি হচ্ছে বা হবে, কিছু জানি না আমরা। সেটা জানতে আমাদেরকে সাহায্য করবে তোমরা।
আশ্চর্য! ভুরু কুঁচকে আছে কিশোর। আমি জানতাম, গোপন খবর জানার অনেক উৎস আছে সরকারের...
মানুষ নিয়েই গঠিত হয়েছে সরকার, বাধা দিয়ে বলল বব। তাছাড়া, ভ্যারানিয়ায় কোন গোপন খবর খুবই শক্ত ব্যাপার। ছোট্ট দেশ ওটা, কিন্তু এমন কিছু মানুষের জন্ম দিয়েছে, দেশের জন্যে বিনা দ্বিধায় যারা প্রাণ দিয়ে দিতে পারে। দরিদ্র, তবু লোভী নয় ওদেশের মানুষ। বাইরের কোন সাহায্য ছাড়াই চালিয়ে নিয়েছে এতদিন। ওদের ভাঙা হয়ত সহজ, কিন্তু মচকানো প্রায় অসম্ভব। না খেয়ে থাকতে রাজি, তবু কারও কাছে হাত পাতবে না। যেচে পড়ে কেউ সাহায্য দিতে গেলেও নেবে না। দেশের স্বাধীনতাকে বড় বেশি মর্যাদা দেয় ওরা! থামল সে। তারপর বলল, তবে মক্কায়ও খারাপ লোক আছে। ভ্যারানিয়ার বর্তমান রিজেন্ট, ডিউক রোজার বুরবন তেমনি এক লোক। এটা অবশ্যই আমাদের সন্দেহ। তা না-ও হতে পারে। আমাদের সন্দেহ, দিমিত্রিকে প্রিন্স হতে দেবে না সে কিছুতেই। অভিষেক অনুষ্ঠানই হতে দেবে না। রাজ্য শাসন করছে অনেক দিন থেকে, এই লোভ সে ছাড়তে পারবে বলে মনে হয় না। যদি কোন অঘটন ঘটে ভ্যারানিয়ায়, সে-ই হবে এর হোতা।
নীরব রইল তিন কিশোর। খুশি খুশি ভাবটা চলে গেছে মুসা আর। রবিনের চেহারা থেকেও।
নিরপেক্ষ একটা দেশ, এর ঘরোয়া ব্যাপারে বাইরের কারও নাক গলানো উচিত না, আবার বলল বব। কিন্তু গুজব ছড়িয়ে পড়েছে, শিগগিরই সাংঘাতিক কিছু একটা করতে যাচ্ছে ডিউক রোজার, তখন আর ঘরোয়া থাকবে না ব্যাপারটা। বুঝতেই পারছ, আমাদের অস্বস্তির যথেষ্ট কারণ রয়েছে। আমরা জানতে চাই, কি ঘটাতে যাচ্ছে রোজার। আমরা, বড়রা প্যালেসের ধারেকাছে ঘেষতে পারব না। দিমিত্রিও আমাদের কাছে মুখ খুলবে না কিছুতেই। তবে, তোমরা সহজেই ঢুকতে পারবে প্যালেসে, ওখানেই থাকতে পারবে, তোমাদের কাছে মনের কথা বলেও ফেলতে পারে প্রিন্স। গোলমালটা কি ঘটতে যাচ্ছে, আগেভাগে একমাত্র তোমাদের পক্ষেই জানা সম্ভব। তাছাড়া, ক্ষমতায় যারা রয়েছে, তোমাদেরকে

সন্দেহ করবে না। অসতর্ক হয়ে কিছু একটা করে বসতে পারে তোমাদের সামনেই, যাতে অনেক কিছুই ফাস হয়ে যাবে।
এবারও কেউ কিছু বলল না শ্রোতারা।
তো, আসল কথায় আসা যাক, বলল বব। কাজটা নিচ্ছ। তোমরা?
কিশোরের দিকে চেয়ে অপেক্ষা করে রইল মুসা আর রবিন। সিদ্ধান্তের ভার গোয়েন্দাপ্রধানের ওপরই ছেড়ে দিল ওরা নীরবে।
গভীর চিন্তায় ডুবে আছে কিশোর, নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে একনাগাড়ে।
রাজনীতিতে জড়ানর কোন ইচ্ছেই আমার নেই, হঠাৎ বলে উঠল কিশোর। তাছাড়া ওসব করার বয়েসও হয়নি এখনও, কিছুই বুঝি না। দেশের জন্যে ঘামানর অনেক বড় বড় মাথা রয়েছে। আমাদের কাজ ওসব নয়। তবে হ্যাঁ, আমাদের অভিভাবকদের খুলে বলতে হবে সব কথা। তারা যদি মত দেন, যাব। সে-ও শুধু প্রিন্স দিমিত্রিকে সাহায্য করতেই, আর কোন কারণে নয়।
ব্যস ব্যস, ওতেই চলবে, হাত তুলল বব। বন্ধুকেই সাহায্য কর তোমরা। তবে একটা কথা। নিজে থেকে ঘুণাক্ষরেও বিপদের আভাস দেবে না দিমিত্রিকে। সে যদি বলে, বলুক। তোমরা কি কারণে গেছ, এটাও যেন কেউ না জানে। প্যালেসের সবাই জানবে, তোমরা বেড়াতে গেছ। খবরদার, অপরিচিত কারও কাছে প্রিন্স দিমিত্রি সম্পর্কে কোনরকম আলোচনা করবে না। জানিয়ে রাখছি, আট বছর আগে এক মোটর দুর্ঘটনায় মারা গেছেন তার বাবা। তখন থেকেই কোন কারণে ডিউকের উপর খেপে আছে ভ্যারানিয়ার জনসাধারণ। ওকে দেখতে পারে না তারা। যদি জানে, তোমরা স্পাই, বারুদে জ্বলন্ত ম্যাচের কাঠি পড়বে। কাজেই চোখ খোলা রাখবে, কান সজাগ রাখবে, মুখ বন্ধ রাখবে।
তাহলে এবার অভিভাবকদের… বলতে গিয়ে বাধা পেল রবিন।
বলেছিই তো, সে ভার আমার, বলে উঠল বব। তাহলে উঠি। তোমরা যাবার জন্যে তৈরি হওগে। কালই ফ্লাইট।

.

ভ্যারানিয়া! রাজধানী ডেনজো!
পাথরের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে আছে রবিন। দৃষ্টি সামনে প্রসারিত। দেখছে প্রাচীন শহরটাকে। ভোরের সোনালি রোদ ছড়িয়ে পড়েছে পুরানো বাড়িগুলোর টালির ছাতে, গাছের মাথায়। সরকারী ভবনগুলোর উঁচু টাওয়ারের চূড়াগুলোকে মনে হচ্ছে সোনার পাতে মোড়া। ঝিরঝিরে বাতাসে দুলছে গাছের ডাল, প্যালেসের দিকে মাথা নুইয়ে বার বার। অভিবাদন জানাচ্ছে যেন। প্রায় আধ মাইল দূরে ছোট একটা পাহাড় চূড়ায় দাঁড়িয়ে আছে এক বিশাল গির্জার সোনালি গম্বুজ।

নিচে তাকাল রবিন। রাজপ্রাসাদের পাথর মোড়ানো আঙিনায় কয়েকটা মেয়ে। হাতে ঝাড় আর বালতি। ঘষেমেজে পরিষ্কার করছে। প্রতিটি চৌকোনা পাথর।
পাঁচতলা পাথরের প্রাসাদের পেছনে বইছে ডেনজো নদী। চওড়া, খরস্রোতা। পুরো শহরটাকে পাক দিয়ে ঘিরে রেখেছে যেন রূপকথার বিশাল কোন রাক্ষুসে অজগর। নদীতে ছোট ছোট নৌকা, দাঁড় বেয়ে উজানভাটি করছে ধীরেসুস্থে। অপরূপ দৃশ্য। তিনতলার কোণের দিকে এই ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে সবই চোখে পড়ছে রবিনের।
ক্যালিফোর্নিয়ার সঙ্গে কোন মিল নেই। বিশাল জানালা টপকে এসে ব্যালকনিতে নেমেছে মুসা। রবিনের পাশে এসে দাঁড়াল। অনেক পুরানো শহর! দেখেই বোঝা যায়।
তেরোশো পঁয়তিরিশ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, বলল রবিন। নতুন কোথাও যাবার আগে পড়াশোনা করে জায়গাটা সম্পর্কে আলামত জেনে নেয়া তার স্বভাব। বাড়ি থেকে একটা বই নিয়ে নিয়েছিল সঙ্গে, প্লেনে বসে পড়েছে। বার বার আক্রমণ করেছে হানাদাররা, ধ্বংস করে দিয়েছে প্রতিবারেই আবার নতুন করে গড়া হয়েছে শহর। তবে, সে সবই ষোলোশো পঁচাত্তরের আগে। তারপর ঘটল বিদ্রোহ রাজপরিবারের বিরুদ্ধে। সেই বিদ্রোহ দমন করেন প্রিন্স পল, রাতারাতি জাতীয় লিগ বনে গেলেন তিনি। আমাদের জর্জ ওয়াশিংটনের মত। আবার গড়ি শহর। সে-ই শেষ। এখন যা কিছু দেখছ, বেশির ভাগই তৈরি হয়েছে সেই তিনশো বছর আগে। নতুন শহর একটা গড়ে উঠছে অবশ্য, তবে এখান থেকে সেটা দেখা যায় না।
পুরানোটাই ভাল লাগছে আমার, বলল মুসা। আচ্ছা, দেশটা কত বড়, বলতে পার?
মাত্র পঞ্চাশ বর্গ মাইল, বলল রবিন। খুদে একটা দেশ। ওই যে দূরে পাহাড়গুলো দেখা যাচ্ছে, ওটা ভ্যারানিয়ার সীমান্ত। পা পাশটা পড়েছে এদেশের ভেতরে, ওপাশটা অন্য দেশ। ডেলজো উজান বেয়ে গেলে মাইল সাতে হবে। প্রচু আঙুরের ফলন হয়, এ ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে অনেক মদ চোলাইয়ের কারখানা। মসলিন জাতের মিহি কাপড় তৈরির কারখানা আছে বেশ কিছু। তবে, বেশির ভাগ বিদেশী টাকা আসে টুরিস্টদের কাছ থেকে। দেশটার অপরূপ সুন্দর দৃশ্য দেখার জন্যে আসে তারা, ভিড় করে থাকে সাব্রা বছরই। শুধু এ কারণেই, বেশির ভাগ দোকানদার আজও পুরানো ফ্যাশন জিইয়ে রেখেছে। পুরানো ধাঁচের পোশাক পরে, আচাব্র ব্যবহার, কথাবার্তার ধরনও তিনশো বছরের পুরানো—
বাব্বাহ্! পুরোপুরি ভূগোলের ক্লাস! ব্যালকনিতে নেমে এসেছে কিশোর। পরনে স্পোর্টস শার্ট, বোতাম আঁটছে। সামনের দৃশ্য একবার দেখেই সমঝদারের মত

মাথা নাড়ল। নাহ্, সুন্দর বলতেই হবে! সিনেমার সেটের জন্যে তৈরি করে রাখা হয়েছে যেনা মাস্টার সাব, বলতে পার গির্জাটার নাম কি? ওই যে পাহাড়ের চূড়ায় সেইন্ট ডোমিনিকস, সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিল রবিন। দেশের সবচেয়ে বড় গির্জা, একমাত্র সোনালি গম্বুজ। দুটো বেলটাওয়ার। বায়েরটাতে মোট আটটা ঘন্টা গির্জার কাজে আর জাতীয় ছুটির দিনগুলোতে বাজানো হয়। ডানের টাওয়ারে আছে মাত্র একটা। অনেক পুরানো, বি-শা-ল! নাম, প্রিন্স পলের ঘণ্টা। ইতিহাস আছে ওটার। ষোলোশো পঁচাত্তরে বিদ্রোহের সময় ওই ঘণ্টা বাজিয়ে ভক্তদের সাহায্য চেয়েছিলেন পল। জানিয়েছিলেন, বেঁচে আছেন তিনি। সাহায্য করতে ছুটে এসেছিল ক্রুদ্ধ জনতা, ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছিল বিদ্রোহীদের। এরপর থেকে, রাজপরিবারের কাজেই শুধু ব্যবহার করা হয় ঘণ্টাটা।
যেমন? আগ্রহী হয়ে উঠেছে কিশোর।
যখন কোন প্রিন্সের অভিষেক অনুষ্ঠান হয়, মানে মুকুট পরানো হয়, তখন একশো বার বাজানো হয় ওই ঘণ্টা, ধীরে ধীরে। যখন কোন রাজকুমার জন্ম নেয়, বাজানো হয় পঞ্চাশ বার, রাজকুমারী হলে পঁচিশ। রাজ-পরিবারে কারও বিয়ের সময় বাজে পচাত্তর বার। ঘণ্টাটার শব্দ বেশ গুরুগম্ভীর, তিন মাইল দূর থেকে শোনা যায় আওয়াজ!
মাস্টারি লাইনে গেলেই ভাল করতে, নথি, হাসল মুসা। খামোকা গোয়েন্দাগিরি করতে এসেছ।
চল, তৈরি হয়ে নিই, বলল কিশোর। দিমিত্রির সঙ্গে দেখা করতে যেতে হবে। রয়্যাল চেম্বারলেন (রাজপরিবারের লোকজন আর বাড়িঘর দেখাশোনার ভার থাকে যার ওপর। আগের দিনে আমাদের দেশে জমিদারদের যেমন সরকার থাকত অনেকটা তেমনি।) খবর দিয়ে গেছে, আমাদের সঙ্গে নাস্তা করবে প্রিন্স।
তাই তো! খাবার কথা তো ভুলেই গিয়েছিলাম, বলে উঠল মুসা। পেটের ভেতর ছুঁচোর কেত্তন শুরু হয়ে গেছে।
তাড়াহুড়া করে লাভ হবে না, বলল কিশোর। এ তোমার নিজের বাড়ি নয় যে যা খুশি করতে পারবে। এটা রাজবাড়ি, এখানে কিছু নিয়ম-কানুন আছে। ওগুলো মেনে চলতে হবে। খিদে লাগলেই খেতে বসে যেতে পারবে না। ওদের সময় হলে ডাকবে। মুষড়ে পড়া মুসার দিকে চেয়ে হাসল। এস, বসে না থেকে যন্ত্রপাতিগুলো ঠিকঠাক করে রাখি। দেখতে হবে, সত্যিই কাজ করে কিনা ওগুলো! ভুলে যেয়ো না মস্ত দায়িত্ব নিয়ে এসেছি আমরা। কিশোরের পেছন পেছন ঘরে এসে ঢুকল ওরা আবার। মস্ত একটা স্ত্র। উঁচু ছাত। পাথরের দেয়াল কাঠের তক্তায় ঢাকা। হাত পিছলে যায়, এত মসৃণ। ছয় ফুট চওড়া বিশাল এক পালঙ্ক, একটাতেই তিনজনে

ঘুমিয়েছে ওরা। ওটার মাথার দিকে দেয়ালের গায়ে একটা খোদাই কাজ, রাজপরিবারের প্রতীক চিহ্ন।
একটা টেবিলের ওপর রয়েছে ওদের ব্যাগ। গত রাতে শুধু পাজামা আর টুথব্রাশ বের করেছিল।
অনেক রাতে রাজপ্রাসাদে পৌঁছেছে ওরা গতকাল। নিউ ইয়র্ক থেকে জেট প্লেনে প্যারিস, সেখান থেকে বিরাট এক হেলিকপ্টারে চেপে এসে নেমেছে ডেনজোর খুদে বিমানবন্দরে। বাইরে অপেক্ষা করছিল গাড়ি, ওদেরকে অভ্যর্থনা করে গাড়িতে তুলেছে রয়্যাল চেম্বারলেন। বিশেষ মীটিঙে ছিল তখন দিমিত্রি। বন্ধুদের সঙ্গে রাতে দেখা করতে পারেনি। অসংখ্য থাম আর অনেক গলিঘুজি পেরিয়ে (মুসার মনে হয়েছে কয়েক মাইল পথ) এই বেডরুমে পৌঁছে দিয়ে গেছে ওদেরকে চেম্বারলেন। এতই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল ওরা, কোনমতে পোশক ছেড়ে, পাজামা পরে, দাঁত মেজেছে। তারপরই এসে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েছে বিছানায়।
ব্যাগ খুলে জামাকাপড় বের করল ওরা। গোছগাছ করল। প্রায় পাঁচশো বছরের পুরানো একটা দেয়াল আলমারিতে তুলে রাখল ওগুলো। অন্যান্য জিনিসপত্রও সব তুলে রাখল আলমারির তাকে, তিনটে জিনিস ছাড়া।
তিনটে ক্যামেরা। দেখতে আর সব ক্যামেরার মতই, তবে ছবি ভোলা ছাড়াও আরও কিছু কাজ করে ওগুলো। বেশ বড়সড়, দামি জিনিস। চাঁদিতে বিচিত্র ফ্ল্যাশার। রেডিও হিসেবেও ব্যবহার করা যায় ক্যামেরাগুলোকে। ভেতরে বসানো আছে আধুনিক সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি, শক্তিশালী একটা ওয়্যারলেস সেট। ফ্ল্যাশারটা অ্যান্টেনারও কাজ করে। ছবি তোলার ভঙ্গিতে ওই ক্যামেরা চোখের সামনে তুলে খুব নিচু গলায় কথা বললেও সেটা পৌঁছে যাবে মাইল দশেক দূরের গ্রাহকযন্ত্রে। শুধু পাঠানই না, মেসেজ ধরতেও পারে পরিষ্কার। বদ্ধ ঘরের ভেতর থেকেও এর সীমানা দুই মাইল।
মাত্র দুই ব্যাণ্ডের কমুনিকেশন, নির্দিষ্ট একটা চ্যানেলে যাতায়াত করে এর শব্দ, ঠিক ওই চ্যানেলেই টিউন করা না থাকলে কোন রেডিও বা গ্রাহকযন্ত্রই ধরতে পারবে না মেসেজ। অসাধারণ একটা যন্ত্র। ওদের জানামতে এমন আর একটা মাত্র যন্ত্র আছে সারা ভ্যারানিয়ায়, সেটা আমেরিকান এমব্যাসিতে, বব ব্রাউনের কাছে।
লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে একই প্লেনে তিন গোয়েন্দার সঙ্গে নিউ ইয়র্কে পৌঁছেছে বব। সেখানে একটা বিশেষ অফিসে নিয়ে গেছে তিন কিশোরকে। যন্ত্রপাতিগুলো দিয়েছে, কি করে ব্যবহার করতে হয় শিখিয়েছে। বলেছে, ওদের কাছাকাছিই থাকবে সে সব সময়, তবে এমন ভান করবে, যেন চেনে না। যোগাযোগ করতে

হলে, কোন কিছুর দরকার পড়লে, রেডিওতে জানাতে হবে। এছাড়াও রোজ রাতে নিয়মিত একবার যোগাযোগ করে খবরাখবর জানাতে হবে তাকে।
বিপদ আর পরিস্থিতির গুরুত্ব সম্পর্কে বার বার হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেছে, হয়ত সব কিছুই খুব সহজে হয়ে যাবে। কোনরকম বিপদ ঘটবে না। অভিষেক হয়ে যাবে, মাথায় মুকুট পড়বে নতুন প্রিন্স দিমিত্রি। তবে, সে আশা খুবই কম।..না না, কোন প্রশ্ন নয়। যা বলছি, শুনে যাও চুপচাপ। নিজেদের ব্যাপারে বাইরের কারোর নাক গলানো মোটেই পছন্দ করে না ভ্যারানিয়ানরা। ক্যামেরা সঙ্গে নিয়ে ঘুরবে তোমরা, ছবি তুলবে। সতর্ক থাকবে সব সময়। আমেরিকান এমব্যাসিতে থাকব আমি। যখন খুশি যোগাযোগ করতে পারবে। এখানেই আমার সঙ্গে তোমাদের হয়ত শেষ দেখা। আলাদা প্লেনে প্যারিসে যাব আমি, তোমাদের সঙ্গে নয়। ওখান থেকে আলাদা প্লেনে ভ্যারানিয়া। নতুন কোন কিছু জানার দরকার পড়লে রেডিওতে জানাব, ওখানে পৌঁছে। তোমাদের সাঙ্কেতিক নাম, ফার্স্ট, সেকেণ্ড এবং রেকর্ড, ঠিক আছে? কপালের ঘাম মুছেছে বব।
মাথা ঝোকানর সময় কিশোরও ঘাম মুছেছে। এয়ারকন্ডিশন ঘরেও ঘেমে উঠেছিল ওরা। ববের ভাবসাব দেখে ভয়ই পেয়ে গিয়েছিল তিন গোয়েন্দা। ফিসফিস করে রকি বীচে ফিরে যাবার কথাও কিশোরকে বলেছিল মুসা একবার। স্পাইদের বিপজ্জনক কাজকারবার ছবিতে অনেক দেখেছে। নিজেরাও স্পাইয়ের কাজ করবে একদিন, কল্পনাই করেনি তখন। ভাবছে এসব কথা এখন কিশোর।
তার ক্যামেরা তুলে নিয়ে চামড়ার খাপ খুলল মুসা। খাপের ভেতরে তলায় কায়দা করে বসানো ছোট আরেকটা খাপ। ওতে একটা খুদে টেপ-রেকর্ডার। বেশ শক্তিশালী। হাতে নিয়ে ওটা একবার দেখেই রেখে দিল আবার জায়গামত।
দিমিত্রির সঙ্গে দেখা করার আগে, নীরবতা ভাঙল মুসা, একবার বব ব্রাউনের সঙ্গে কথা বললে কেমন হয়? যন্ত্রপাতিগুলো সত্যি কাজ করছে কিনা, শিওর হওয়া যায়।
ভাল বলেছ, সায় দিল কিশোর। ব্যালকনিতে গিয়ে ঘড়বাড়িগুলোর একটা ছবি তুলে আনি।
ক্যামেরা হাতে ব্যালকনিতে এসে নামল কিলোর। চামড়ার খাপ খুলে বের করল যন্ত্রটা। চোখের সামনে ধরে তাকাল দূরের সেইন্ট ডোমিনিকস গির্জার দিকে। টিপে দিল রেডিওর বোতাম।
ফার্স্ট বলছি, ভিউ ফাইন্ডারের দিকে চেয়ে নিচু গলায় বলল কিশোর। ফার্স্ট রিপোর্টিং, শুনতে পাচ্ছেন?

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জবাব এল। মাত্র তিন হাত দূরে দাঁড়িয়ে আছে যেন কণ্ঠস্বরের মালিক। শুনতে পাচ্ছি, বব ব্রাউনের গলা, ঠিক চেনা যাচ্ছে। কোন কথা আছে?
যন্ত্রটা পরীক্ষা করছি। প্রিন্স দিমিত্রির সঙ্গে দেখা হয়নি এখনও। একসঙ্গে নাস্তা করব।
ভাল। সতর্ক থাকবে। আমাকে সব সময়ই পাবে। ওভার অ্যাণ্ড আউট।
চমৎকার! আপন মনেই বলল কিশোর। আবার এসে ঢুকল ঘরে। ঠিক এই সময় দরজায় টোকার শব্দ হল।
দরজা খুলে দিল মুসা। দাঁড়িয়ে আছে প্রিন্স দিমিত্রি দামিয়ানি। হাসি ছড়িয়ে পড়েছে সারা মুখে।
দুহাত বাড়িয়ে প্রায় ছুটে এসে ঘরে ঢুকল, দিমিত্রি। খাঁটি ইউরোপীয় কায়দায় জড়িয়ে ধরল তিনজনকে। তোমরা এসেছ, কি যে খুশি হয়েছি!
অভ্যর্থনার পালা শেষ হল। জিজ্ঞেস করল দিমিত্রি, ব্যালকনি থেকে কেমন লাগল আমার দেশ?
দারুণ! বলে উঠল মুসা।
এখনও তো কিছুই দেখনি, বলল দিমিত্রি। তবে এসে যখন পড়েছ, সবই দেখতে পাবে একে একে। চল, আগে নাস্তা সেরে নিই। এ দরজা দিয়ে বাইরে উঁকি দিল দিমিত্রি। নিয়ে এস। জানালার ধারে বসাও।
ঘরে এসে ঢুকল আটজন চাকর। টকটকে লাল পোশাকে সোনালি কাজ করা। বয়ে আনল একটা টেবিল, কয়েকটা চেয়ার আর রূপার ঢাকনা দেয়া কিছু প্লেট। জানালার দিকে এগিয়ে গেল।
বন্ধুদের সঙ্গে অনর্গল কথা বলে গেল দিমিত্রি।
তুষার শুভ্র লিনেনের টেবিলক্লথ বিছাল চাকররা। তার ওপর রাখল রূপার ভারি বাসনগুলো। ঢাকনা তুলতেই ঘরের বাতাসে ভুরভুর করে। ছড়িয়ে পড়ল সুগন্ধ। আড়চোখে একবার টেবিলের দিকে না তাকিয়ে পারল না মুসা। ডিম আর মাংস ভাজা, টোস্ট মাখন, ভ্যারানিয়ান কেক! বড় জগে দুধ।
খাইছে! কত খাবার! ঢোক গিলল মুসা। দাদাভাইরা, আমি আর পারছি না। নাড়িভুড়ি সুদ্ধ হজম হয়ে যাচ্ছে খিদেয়!
হ্যাঁ হ্যাঁ, এস, তাড়াতাড়ি বলল দিমিত্রি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খালি বকর বকর করছি! এস, বসে পড়ি।...আরে, রবিন, তুমি কি দেখছ!
বেশ ছড়ানো একটা মাকড়সার জালের দিকে চেয়ে আছে রবিন। তার কাছ থেকে ফুট দুয়েক দূরে, খাটের মাথার কাছে, ঘরের এক। কোণে। দেয়ালে ঝুলছে জালটা। দেয়ালে বসানো তক্তা আর মেঝের মাঝখানের ফাঁকে উঁকি দিয়ে আছে

একটা বড়সড় মাকড়সা। রবিন ভাবছে, দিমিত্রির অনেক চাকর-চাকরাণী আছে, অনেক কাজেই ওরা বিশেষ দক্ষ। তবে ঘর পরিষ্কারের কাজে ওরা ফাঁকি দেয়।
ওই যে, মাকড়সার জাল, বলল রবিন। দাঁড়াও, পরিষ্কার করে ফেলছি! পা বাড়াল সে।
তিন কিশোরকে অবাক করে লাফ দিল দিমিত্রি। প্রায় উড়ে এসে পড়ল রবিনের ওপর। এক ধাক্কায় ফেলে দিল মেঝেতে, জালটা ছিঁড়ে ফেলার আগেই।
স্তব্ধ হয়ে গেছে মুসা আর কিশোর। রবিনকে টেনে তুলল দিমিত্রি। বিড়বিড় করে বলছে কি যেন, ভ্যারানিয়ান ভাষায়!
আগেই তোমাকে সাবধান করা উচিত ছিল, আমারই ভুল হয়ে। গেছে, লজ্জিত কণ্ঠে ইংরেজিতে বলল দিমিত্রি। তাহলে আর এটা ঘটত না! ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তোমাকে সময়মত রুখতে পেরেছি! নইলে সর্বনাশ হয়ে যেত! এখুনি তোমাকে ফেরত পাঠাতে হত আমেরিকায়। রবিনের কাঁধে হাত রাখল সে। হঠাৎ গলার স্বর খাদে নেমে গেল। তবে, শুভলক্ষণ দেখা যাচ্ছে। তোমরা আমাকে সাহায্য করতে, পারবে!
ব্যথা পায়নি রবিন কোথাও। হাঁ করে চেয়ে আছে দিমিত্রির দিকে।
দরজার দিকে ঘুরল রাজকুমার। চেয়ে রইল এক মুহূর্ত। তারপর লম্বা লম্বা পায়ে নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে থামল দরজার সামনে। হাতল। ধরে হ্যাঁচকা টানে খুলে ফেলল। দরজায় দাঁড়িয়ে আছে লাল পোশাক পরা এক চাকর, চাকরদের সর্দার। কুচকুচে কালো চুল, কালো পাকানো গোঁফ।
রুকা, এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন? কড়া গলায় বলল দিমিত্রি।
ইয়ে, মানে…ইয়োর হাইনেসের যদি কিছু দরকার হয়…
কিছু দরকার নেই। যাও। ঠিক আধঘণ্টা পর এসে প্লেটগুলো নিয়ে যাবে, খেঁকিয়ে উঠল দিমিত্রি।
মাথা নুইয়ে কুর্নিশ করল লোকটা, তারপর চলে গেল দ্রুতপায়ে।
দরজা বন্ধ করে দিল দিমিত্রি। ফিরে এল আবার তিন গোয়েন্দার কাছে। গলার স্বর খাদে নামিয়ে বলল, ডিউক রোজারের লোক। দরজায় কান পেতেছিল। কিছু জরুরি কথা আছে তোমাদের সঙ্গে। তোমাদের সাহায্য চাই।
চুপ করে রইল তিন গোয়েন্দা।
অনেক কিছুই বলার আছে, আবার বলল রাজকুমার। আগে খেয়ে নিই, তারপর বলব। শুধু এটুকু জেনে রাখ, চুরি গেছে রূপালী মাকড়সা!

.

প্রায় নীরবে খাওয়া সারল ওরা।
ঠিক আধঘণ্টা পর এল চাকরের দল। টেবিল-চেয়ার, প্লেট নিয়ে চলে গেল।

বাইরে একবার উঁকি দিয়ে নিশ্চিত হয়ে এল দিমিত্রি। না, করিডরে ঘোরাফেরা করছে না আর রুকা। চলে গেছে।
ঘরে চেয়ার আছে। জানালার কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে বসল। চারজনে।
ভ্যারানিয়ার পুরানো ইতিহাস কিছু বলা দরকার আগে, শুরু করল দিমিত্রি। উনিশশো পঁচাত্তর সালে, প্রিন্স পলের অভিষেকের সময় বিদ্রোহ করে বসে কিছু উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী। পালিয়ে যেতে বাধ্য হন প্রিন্স। তাকে ঠাই দেয় এক মিনস্ট্রেল (মধ্যযুগীয় পেশাদার গায়ক। পয়সার বিনিময়ে রাস্তায় রাস্তায় গান গেয়ে লোকের মনোরঞ্জন করত।) পরিবার। প্রাণের তোয়াক্কা না করে প্রিন্সকে লুকিয়ে রাখে নিজেদের বাড়ির চিলেকোঠায়। সারা শহর তন্ন তন্ন করে খুঁজল বিদ্রোহীরা। মিনস্ট্রেলের বাড়িতেও খুঁজল। পেয়ে যেত, যদি না চিলেকোঠার দরজায় জাল বুনত একটা মাকড়সা! আমাদের এখানকার চিলেকোঠা আর দরজা কেমন, বলে নিই। বাড়ির ছাতে ছোট একটা বাক্সের মত তৈরি হয় এই কোঠা, জিনিসপত্র রাখার জন্যে। নিচের দিকে একটা ডালামত থাকে, ওটাই দরজা। যাই হোক, ওই ডালার নিচে বড় করে জাল বুনেছিল মাকড়সাটা! দেখে মনে হয়েছে, অনেকদিন চিলেকোঠার ডালা খোলা হয়নি। ফলে ওখানে আর খুঁজে দেখেনি বিদ্রোহীরা।
তিনটে দিন আর রাত ওই চিলেকোঠায় বন্দি হয়ে রইলেন প্রিন্স। খাওয়া নেই, পানি নেই, কিছু নেই। জাল ছিঁড়ে যাবার ভয়ে ডালা খোলনি মিনস্ট্রেলরা, খাবার দিতে পারেনি। অবশেষে সুযোগ বুঝে চিলেকোঠা থেকে বেরিয়ে এলেন প্রিন্স। কোনমতে গিয়ে পৌঁছুলেন গির্জায়। ঘণ্টা বাজিয়ে ডাকলেন ভক্তদের, জানালেন তিনি বেঁচে আছেন। দমন হয়ে গেল বিদ্রোহ।
সিংহাসনে বসে প্রথমেই স্বর্ণকারকে ডাকালেন প্রিন্স। একটা রূপার মাকড়সা বানিয়ে দিতে বললেন। সোনার চেনে আটকে লকেটের মত ঝুলিয়ে রাখবেন গলায়। ভ্যারানিয়ার রাজপরিবারের সীলমোহরে ব্যবহার হতে লাগল মাকড়সার প্রতীক। জাতীয় প্রাণী হিসেবে মর্যাদা পেল মাকড়সা। ধরে নেয়া হল, ওই বিশেষ জাতের মাকড়সা ভ্যারানিয়ার সৌভাগ্য বহন করছে। ওদের মারা নিষিদ্ধ করে দেয়া হল। শুধু তাই না, যারা একে মারবে, রাজদ্রোহী হিসেবে গণ্য করা হবে। তাদের। এরপর থেকেই বাড়িতে রূপালী মাকড়সার জাল ছেঁড়া বন্ধ করে দিল গৃহবধূরা। যত ময়লাই করে রাখুক, প্রাণীটাকে মারে না তারা।
আমার মা ভ্যারানিয়ায় থাকলে কবে ফাঁসি হয়ে যেত, বলে উঠল মুসা। কোন আইন করেই মাকড়সার জাল ছেঁড়া বন্ধ করানো যেত না তাকে দিয়ে। মার ধারণা, মাকড়সা একটা অতি নোংরা জীব, বিষাক্ত।

অথচ, ওরা ঠিক এর উল্টো, মুসার কথার পিঠে কথা বলল কিশোর! খুবই পরিষ্কার প্রাণী। সব সময় নিজেদেরকে পরিচ্ছন্ন রাখে। সব মাকড়সাই বিষাক্ত নয়। ব্ল্যাক উইডো স্পাইডারের কথা বলতে পার, তবে ওরা শুধু শুধু কামড়ায় না। বেশি বিবক্ত করলে তো তুমিও কামড়াতে আসবে, উইডোর আর কি দোষ? টারান্টুলার এত কুখ্যাতি, কিন্তু আসলে ওরাও তত বিপজ্জনক নয়। মানুষকে এড়িয়ে চলতেই ভালবাসে। ইউরোপের বেশির ভাগ মাকড়সাই কোন ক্ষতি করে না মানুষের। বরং পোকামাকড় খেয়ে উপকারই করে।
ঠিক, একমত হল দিমিত্রি। মানুষের ক্ষতি করে এমন কোন মাকড়সা নেই ভ্যারানিয়ায়। এখানে প্রিন্স পলের মাকড়সাই সবচেয়ে বড়, খুব সুন্দর। কালোর ওপর সোনালি দাগ। বাইরে থাকতেই পছন্দ করে, তবে মাঝেসাঝে এসে ঘরের ভেতর জাল পাতে। যে জালটা তুমি। ছিঁড়ে ফেলতে যাচ্ছিলে, রবিন, ওটা প্রিন্স পলের মাকড়সার। তোমাদের ঘরের ভেতর এসেছে, তারমানে শুভলক্ষণ বয়ে এনেছ তোমরা আমার জন্যে।
আমাকে বাধা দিয়ে ভালই করেছ, বলল রবিন। কিন্তু তোমার অসুবিধেটা কি?
ইতস্তত করল দিমিত্রি। তারপর মাথা নাড়ল। ভ্যারানিয়ায় কোন প্রিন্সের অভিষেকের সময় অবশ্যই ওই রূপালী মাকড়সা গলায় ঝোলাতে হবে তাকে। নইলে মুকুট পরানো হবে না। আর দুহপ্তা পরে অনুষ্ঠান, কিন্তু হবে না। আমি জানি।
কেন? জিজ্ঞেস করল মুসা।
কারণ মাকড়সাটা চুরি গেছে, দিমিত্রির হয়ে বলল কিশোর। ওটা গলায় ঝোলাতে না পারলে অভিষেক হবে না।
হ্যাঁ, মাথা ঝোকাল দিমিত্রি। আসলটা নিয়ে তার জায়গায় একটা নকল মাকড়সা রেখে গেছে চোর। নকল দিয়ে চলবে না। কাজেই, দুহপ্তার আগেই আসলটা খুঁজে পেতে হবে আমাকে। চুরি গেছে, এটা কাউকে জানাতে পারব না। আমাকে অলক্ষুণে ধরে নেবে দেশের লোক। এবং তাহলেই সর্বনাশ। কোনদিনই আর প্রিন্স হতে পারব না। আমি, থামল সে। এক মুহূর্ত কি ভাবল। তারপর বলল, হয়ত ভাবছ, সামান্য একটা রূপার মাকড়সা নিয়ে এত বাড়াবাড়ি কেন? দেশটা আমাদের পুরানো, প্রাচীন রীতিনীতি এখনও মেনে চলি। আমরা। ছাড়তে পারব না কিছুতেই, একে একে তিনজনের দিকেই তাকাল রাজকুমার। তোমরা আমার বন্ধু। মাকড়সাটা খুঁজতে সাহায্য করবে আমাকে?
কেউ কোন জবাব দিল না।
নিচের ঠোঁটে একনাগাড়ে চিমটি কাটছে কিশোর।

দিমিত্রি, অবশেষে কথা বলল গোয়েন্দাপ্রধান। জিনিসটা কি। জ্যান্ত মাকড়সার সমান?
মাখা ঝোকাল দিমিত্রি। হ্যাঁ।
তারমানে খুবই ছোট। লুকিয়ে রাখা সহজ। নষ্টও করে ফেলে থাকতে পারে।
তা মনে হয় না, বলল দিমিত্রি। যে-ই নিয়েছে, বুঝেশুনেই নিয়েছে। ওটা তার দরকার। আমার মনে হয় লুকিয়েই রেখেছে। তবে, মস্ত বড় ঝুঁকি নিয়েছে চোর। ধরা পড়লে এর একমাত্র শাস্তি, মৃত্যুদণ্ড। ডিউক রোজার হলেও মাফ নেই।
চুপ করে রইল তিন গোয়েন্দা।
জোরে একবার শ্বাস নিল দিমিত্রি। আমার সমস্যার কথা বললাম। কি করে সাহায্য করবে, বলতে পারব না। একটা লোক প্রস্তাব দিয়েছিল, অভিষেক অনুষ্ঠানে তোমাদেরকে দাওয়াত দিতে। প্রস্তাবটা লুফে নিয়েছি আমি তোমাদের সাহায্য পাব বলেই। এখানে কেউ জানে না, তোমরা গোয়েন্দা। কাউকে জানানো হবে না। কিশোরের দিকে তাকাল রাজকুমার। তো, করবে সাহায্য?
জানি না! অনিশ্চিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল গোয়েন্দাপ্রধান।ছোট্ট একটা রূপার মাকড়সা, যেখানে খুশি লুকিয়ে রাখা যায়। খুঁজে বের করা প্রায় অসম্ভব। তবে, চেষ্টা করতে পারি আমরা। প্রথমে দেখতে হবে, জিনিসটা কেমন, কোন জায়গা থেকে চুরি হয়েছে। নকলটা দেখে চেহারা বোঝা যাবে আসলটার?
যাবে। নকল করা হয়েছে নিখুঁতভাবে। এস, দেখাব।
ক্যামেরা তুলে নিল তিন গোয়েন্দা। দিমিত্রির পিছু পিছু বেরিয়ে এল করিডরে।
ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে চওড়া আরেকটা করিডরে নেমে এল ওরা। মেঝে, ছাত, দুপাশের দেয়াল, সব পাথরের।
তিনশো বছর আগে তৈরি হয়েছে এই প্যালেস, হাঁটতে হাঁটতে বলল দিমিত্রি। তারও আগে একটা দুর্গ ছিল এখানে। ভেঙে পড়েছিল। ওটাকেই মেরামত করে, সংস্কার করে, তার সঙ্গে আরও কিছু ঘর যোগ করে হয়েছে এই প্যালেস। ডজন ডজন খালি ঘর পড়ে আছে এখনও। বিশেষ করে, ওপরের দুটো তলায় যায়ই না কেউ। এতবড় বাড়ি ঠিকঠাক রাখতে হলে অনেক চাকর-বাকরের দরকার। ওদের পেছনে খরচ করার মত টাকা রাজপরিবারের নেই। তাছাড়া, ওই ঘরগুলো ভীষণ ঠাণ্ডা। আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে গরমের ব্যবস্থা করতে অনেক টাকা দরকার।
আগস্টের এই উত্তপ্ত সকালেও বাড়িটার ভেতরে খুব ঠাণ্ডা। শীতকালে কি ভীষণ অবস্থা হবে, অনুমান করতে অসুবিধে হল না তিন গোয়েন্দার।
দুর্গের ডানজন আর মাটির তলার ঘরগুলো আজও আগের মতই রয়েছে, আরেক সারি সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে বলল দিমিত্রি। অসংখ্য গোপন পথ,

দরজা, সিঁড়ি রয়েছে ওগুলোতে যাবার। আমিই চিনি না সবগুলো। ঢুকলে সহজেই হারিয়ে যাব, বেরিয়ে আসতে পারব না আর। হাসল রাজকুমার। হরর ছবি শূটিঙের চমৎকার জায়গা। গোপন দরজা আর সুড়ঙ্গ দিয়ে ভূত আসবে-যাবে খুব বিশ্বাসযোগ্য মনে হবে। না না, ওরকম চমকে উঠ না, মুসার দিকে চেয়ে বলল সে। ভূত নেই প্যালেসে-ই যে, ডিউক ক্লোজার আসছে।

আরেকটা করিডরে এসে শেষ হয়েছে সিঁড়ি। লম্বা একজন লোককে তাড়াহুড়া করে আসতে দেখা গেল। সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল লোকটা, মাথা সামান্য নুইক্সো অভিবাদন কবুলা দিমিত্রিকে।

গুডমর্নিং, দিমিত্রি বলো ডিউক ক্লোজার। এরাই আপনার। আমেরিকান বন্ধু? শীতল কণ্ঠস্বর। তার সঙ্গে মানিয়ে গেছে তার একহারা দীর্ঘ গড়ন, আর ঈগলের ঠোঁটের মত বাঁকানো নাকের নিচে ঝুলে পড়া কালো একজোড়া গোঁক।

গুড মর্নিং, ভিউক ক্লোজার, বলল দিমিত্রি। ঠিকই ধরেছেন। ওরাই আমার বন্ধু। পরিচয় করিয়ে দিল, কিশোর পাশা, মুসা আমাল, রবিন মিলফোর্ড। সবাই এসেছে ক্যালিফোর্নিফ্লা থেকে।

তিনজনের দিকে চেয়ে প্রতিবারে ইঞ্চিখানেক করে মাথা নোয়ালা রোজার। তীক্ষ্ণ চোখে তাকিন্ত্রে আছে।

ভ্যারানিয়ায় স্বাগতম! বলল ডিউক ক্লোজার। একেবারে মাপজোক করা কথাবার্তা। বন্ধুদেরকে দুর্গ দেখাতে নিয়ে যাচ্ছেন?

মিউজিয়মে নিয়ে যাচ্ছি, বলল দিমিত্রি। আমাদের দেশের ইতিহাস জানতে খুব আগ্রহী ওরা। বন্ধুদের দিকে ফিরে বলল, ডিউক রোজার বুরবন, ভ্যারানিক্সার বর্তমান ব্রিজেন্ট। শিকারে গিয়ে মারা পড়েছিল আমার বাবা। তারপর থেকেই প্রিন্সের প্রতিনিধি হয়ে ব্রাজ্যশাসনা করে আসছে—

প্রিন্স, বলে উঠল ক্লোজার, আমি সঙ্গে আসব মেহমানদের প্রতি একটা সৌজন্যবোধ আছে আমাদের। আপনি একা গেলে, ভাল দেখায় না।

ঠিক আছে, রাজি হল দিমিত্রি। কিন্তু ৰুবাতে অসুবিধে হল না তিন গোয়েন্দার, রোজারকে সঙ্গে নেবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই রাজকুমারের। কিন্তু বেশিক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকার দরকার নেই আপনার। কাজের ক্ষতি হবে। তাছাড়া একটু পরেই কাউন্সিলা মীটিঙে বসতে হবে।

হ্যাঁ, পেছনে পেছনো আসছে রোজার। অভিষেক অনুষ্ঠানে কি কি করতে হবে না হবে, সব ঠিক করতে হবে আজই। তা হলেও, কিছুটা সময় দিতে পারব এখন।

আর কিছু বলল না দিমিত্রি। বন্ধুদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। করিডরের একপাশে একটা দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। তাদেরকে নিয়ে ঢুকে পড়ল বিশাল এক ঘরে।

অনেক উঁচু ছাত, দোতলার সমান। দেয়ালে দেয়ালে ঝুলছে ছবি। কাঁচের বাক্সে বোঝাই হয়ে আছে পুরো ঘরটা। প্রাচীন সব ঐতিহাসিক জিনিস রক্ষিত রয়েছে ওগুলোতে। পতাকা, শীল্ড, মেডাল, বই এবং অন্যান্য আরও অনেক জিনিস। প্রতিটি বাক্সের গায়ে একটা করে সাদা কার্ড সাটা, তাতে ইংরেজিতে টাইপ করে লেখা রয়েছে ভেতরের জিনিসগুলোর নাম এবং সংক্ষিপ্ত বিব্রণ।
একটা বাক্সে একটা ভাঙা তলোয়ার। ওটার ওপর ঝুঁকে দাঁড়াল তিন গোন্দো। কার্ডের লেখা পড়ে জানল, ওটা প্রিন্স পলের তলোয়ার। ১৬৭৫-এ ওটা দিয়েই যুদ্ধ করেছিলেন তিনি।
এই যে, এই ঘরটাতেই রয়েছে আমাদের জাতির পুরো ইতিহাস, পেছন থেকে বলে উঠলা ডিউক রোজার। ছোট্ট দেশ, ক্ষুদ্র একটা জাতি আমরা, ইতিহাস তেমন কিছুই থাকার কথা না। নেইও। বিশাল এক দেশ থেকে এসেছেন, এসব নিশ্চয় ভাল লাগবে না। মনে হবে, অনেক বেশি প্রাচীন।
না না, মোলায়েম গলায় বলল কিশোর। মহান এক জাতি বলেই মালে হচ্ছে ভ্যারানিয়ানরা। বেশ ভাল লাগছে আমার।
আপনার দেশের অনেকের কাছেই আমাদের রীতিনীতি পছন্দ না, বলাল ব্রোজারি। মধ্যযুগীয় বর্বর বলে হাসাহাসি করে। এখন ভাল বলছেন বটে, তবে শিগগিরই বিক্ত হয়ে যাবেন।...ও হ্যাঁ, আমার এখুলি যেতে হবে। মীটিঙের দেরি হয়ে যাবে নইলে।
কারও কিছু বলার অপেক্ষা করল না ডিউক। ঘুরে হাঁটতে শুরু করল।
স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রবিন। শিওর, ও আমাদেরকে পছন্দ করেনি? লিচু গলায় বলল।
কারণ, তোমরা আমার বন্ধু, যোগ করল দিমিত্রি। আমার কোন বন্ধু থাকুক, চায় না সে। ওর ইচ্ছের বিরুদ্ধে চলি, কিংবা কথা বলি, এটাও অপছন্দ। বাদ দাও ওর কথা। এস, প্রি পলের ছবি দেখাচ্ছি।
দেয়ালে ঝোলানো লাইফ-সাইজ একটা ছবির সামনে নিয়ে এল ওদেরকে দিমিত্রি। দক্ষ শিল্পীর হাতে আঁকা। উজ্জ্বল লাল পোর্শকে সোনালি বোতাম, হাতের তলোয়ারের মাথা মেঝের দিকে। সম্ভ্রান্ত। চেহারা, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। অন্য হাতটা সামনের দিকে বাড়ানো। তাতে বসে আছে একটা মাকড়সা। সত্যিই সুন্দর, কালোর ওপর সোনালি ছোপ
আমারি পূর্বপুরুষ, গর্বিত কণ্ঠে বলল দিমিত্রি। অপরাজেয় প্রিন্স পল। হাতে যেটা দেখছ, ওরকম, একটা মাকড়সা প্রাণ বাঁচিয়েছিল তাঁর।
ছবিটা দেখছে তিন গোয়েন্দা। পেছনে কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে।

ঘরে এসে ঢুকেছে দর্শকরা। বিভিন্ন ভাষায় কথা হচ্ছে, তারমাঝে ইংরেজিও আছে। বেশির ভাগই টুরিস্ট। কাঁধে ঝোলানো ক্যামেরা, হাতে গাইড বুক। দরজায় দাঁড়িয়েছে এসে দুজন প্রহরী। হাতে বল্লম। পরনে তিনশো বছর আগের ছাঁটের ইউনিফর্ম। সেই পুরানো কায়দায় ক্রস বানিয়ে ধরে রেখেছে দুটো বল্লম, কেউ ঢুকতে কিংবা বেরোতে গেলেই সালাম ঠুকে সরিয়ে নিচ্ছে। পেছনে ফিরে একবার দেখল মুসা, তারপর আবার তাকাল ছবির দিকে।

চার কিশোরের ঠিক পেছনে এসে দাঁড়াল এক আমেরিকান দম্পতি।

বিচ্ছিরি! কানের কাছে কথা শোনা গেল মহিলার। দেখছ কি জঘন্য একটা মাকড়সা হাতে নিয়েছে!

শশশ! চাপা পুরুষ-কণ্ঠ। আস্তে বল! কেউ শুনে ফেলবে! ওটা ওদের জাতীয় জীব, সৌভাগ্য বয়ে আনে। বাজে মন্তব্য কোরো না!

আমি ওসব কেয়ার করি না, উদ্ধত কণ্ঠ মহিলার। সামনে পড়লে দেব জুতো দিয়ে মাড়িয়ে।

মুচকে হাসল মুসা আর রবিন। চোখ জ্বলে উঠল একবার দিমিত্রির। চারজনেই সরে এল ওখান থেকে।

ঘরের প্রায় প্রতিটি জিনিসই দেখল ওরা একনজর। একটা দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। বল্লম হাতে দাঁড়িয়ে আছে একজন প্রহরী।

ভেতরে ঢুকব, সার্জেন্ট, গম্ভীর হয়ে বলল দিমিত্রি।

জোরে বুট ঠুকে স্যালুট করল প্রহরী। ইয়েস, স্যার! জায়গা ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়াল এক পাশে।

চাবি বের করল দিমিত্রি। ঢুকিয়ে দিল তালায়।

ঠেলা দিতেই খুলে গেল পেতলের ফ্রেমে আটকানো ভারি কাঠের দরজা। ছোট আরেকটা ঘরে এসে দাঁড়াল চারজনে। ওপাশে আরেকটা দরজা। কম্বিনেশন লক। খুলল ওটা দিমিত্রি। আরেকটা ঘর, উল্টো পাশে আরেকটা দরজা, লোহার গ্রিলের। ওটাও খুলল সে।

ছোট, আট বাই আট ফুট একটা ঘরে এসে দাঁড়াল ওরা। ব্যাংকে মাটির তলায় টাকা রাখার একটা গুদাম যেন। ভল্ট।

একপাশে দেয়াল ঘেঁষে রাখা কাঁচের আলমারি। তাতে রাজপরিবারের গহনাপাতি, মুকুট, রাজদণ্ড, বেশ কিছু নেকলেস এবং আঙটি।

রানীর জন্যে, আঙুটি আর নেকলেসগুলো দেখিয়ে বলল দিমিত্রি। আগেই বলেছি, আমরা ধনী নই। খুব সামান্যই গহনা আছে। ওগুলোকেই ভালমত পাহারা দিয়ে রাখার ব্যবস্থা করেছি আমরা। চল, আসল জিনিস দেখাই।

ঘরের ঠিক মাঝখানে রাখা একটা কাঁচের দেরাজ। ভেতরে সুন্দর একটা স্ট্যাণ্ড। তাতে রূপার চেনে ঝুলছে মাকড়সাটা। চোখে বিস্ময় তিন কিশোরের। একেবারে জ্যান্ত মনে হচ্ছে জিনিসটাকে।
রূপার ওপর এনামেল, বলল দিমিত্রি। কালো এনামেলের ওপর সোনালি ছোপ দেয়া হয়েছে। আসলটা এরচেয়ে অনেক সুন্দর।
নকলটা দেখেই অবাক হয়ে গেছে তিন গোয়েন্দা। আসলটা কত সুন্দর? এপাশ থেকে ওপাশ থেকে, ওপর থেকে নিচ থেকে, সব দিক। থেকেই জিনিসটাকে খুঁটিয়ে দেখল ওরা, যাতে দেখামাত্র চিনতে পারে আসলটা, অবশ্য যদি কপাল গুণে পায় ওরা!
গত হপ্তায় চুরি হয়েছে জিনিসটা, তিক্ত কণ্ঠে বলল দিমিত্রি। আমার সন্দেহ ডিউক রোজারকে। একমাত্র ওর পক্ষেই অকাজটা করা সম্ভব। কিন্তু প্রমাণ ছাড়া কিছু বলতে পারব না। ভ্যারানিয়ার রাজনৈতিক অবস্থা এমনিতেই খুব নাজুক। সুপ্রীম কাউন্সিলের সব। মেম্বারই রোজারের লোক। ধরতে গেলে কোন ক্ষমতাই নেই এখন আমার। ওরা চায় না, আমি প্রিন্স হই। সবরকমে বাধা দেবার জন্যে। তৈরি হচ্ছে। তার প্রথম ধাপ, এই চুরি। সরিয়ে ফেলা হল রূপালী মাকড়সা, জোরে একবার শ্বাস টানল সে। আর বেশিক্ষণ থাকতে পারব না। একটা মীটিঙ আছে আমার। বাইরে বেরোতে পারব না। তোমাদের সঙ্গে। শহর দেখতে চাইলে, তোমাদেরকে একা যেতে হবে। রাতে, ডিনারের পর দেখা হবে আবার।
ভল্ট থেকে বেরিয়ে এল ওরা। প্রতিটি দরজায় তালা লাগাল দিমিত্রি। মিউজিয়মে বেরিয়ে এল বন্ধুদের নিয়ে। করিডরে বেরিয়ে হাত মেলাল। কোন্ পথে বেরোতে হবে প্রাসাদ থেকে বলে দিল। বলে দিল, কোথায় গাড়ি অপেক্ষা করবে।
ড্রাইভারের নাম মরিডো, বলল দিমিত্রি। আমার খুব বিশ্বাসী। ওর সঙ্গে যেতে পার তোমরা নিশ্চিন্তে। একটু থেমে বলল, রাজকুমার হয়ে জন্মানো খুবই বিরক্তির ব্যাপার। জীবনের কোন স্বাদ নেই। তবু চিরদিন তাই থাকতে হবে আমাকে। যাকগে, ঘুরে এস। রাতে দেখা হবে।
ঘুরে করিডর ধরে হাঁটতে শুরু করল দিমিত্রি। লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেল দ্রুত।
মাথা চুলকাল রবিন। কিশোর, কি মনে হয়? মাকড়সাটা খুঁজে বের করতে পারব?
ঠোঁট বাঁকাল কিশোর, কাঁধ ঝাঁকাল। জোরে একবার শ্বাস টেনে বলল, জানি না! কোন উপায় দেখছি না আমি!
শহরের ভেতর দিয়ে ছুটে চলেছে গাড়ি।
দুধারের দৃশ্য বেশ লাগছে ছেলেদের কাছে। ক্যালিফোর্নিয়ায়, সব কিছুই নতুন। এখানে ঠিক তার উল্টো। সব কিছুই অবিশ্বাস্য রকমের পুরানো। পাথরের তৈরি

বাড়িঘর, কোথাও কোথাও হলুদ ইটের। বেশির ভাগ ছাত লাল টালির। প্রতিটি ব্লকের পর একটা করে ফোয়ারা। ঝাঁকে ঝাঁকে কবুতর দেখা যাচ্ছে এদিক ওদিক। সেইন্ট ডোমিনিকসের সামনের আঙিনাতেই রয়েছে কয়েকশো।
পুরানো একটা ছাতখোলা বেড়ানর-গাড়ি। ড্রাইভার এক তরুণ, সবে কৈশোর পেরিয়েছে। চমৎকার ইংরেজি বলে। নাম, মরিডো। গাড়িতে ওঠার পর পরই নিচু গলায় জানিয়েছে, তাকে নিশ্চিন্তে বিশ্বাস করতে পারে তিন কিশোর। প্রিন্স দিমিত্রিও তাকে খুবই বিশ্বাস করেন। ফিটফাট পোশাক পরনে।
ডেনজোর বাইরে পাহাড়ের কাছে চলে এল-গাড়ি। পাহাড়ী পথ ধরে উঠে গেল ওপরে। গাড়ি থেকে নেমে চূড়ায় গিয়ে উঠল তিন গোয়েন্দা। ওখান থেকে ডেনজো নদী আর শহরের বেশ কয়েকটা ছবি তুলল। ফিরে এসে গাড়িতে উঠল আবার। চলতে শুরু করল গাড়ি।
আমাদেরকে অনুসরণ করা হচ্ছে, নিচু গলায় বলল মরিডো। প্যালেস থেকে রেরোনর পর পরই পিছু নিয়েছে। পার্কে নিয়ে যাচ্ছি আপনাদের। ঘোরাফেরা করবেন, বিভিন্ন জিনিস দেখবেন। অনেক মজার জিনিস আছে। সাবধান, পেছনে ফিরে তাকাবেন না একবারও। ওদেরকে দেখে ফেলেছি, ঘুণাক্ষরেও বুঝতে দেবেন না।
খুব কঠিন নির্দেশ! অনুসরণ করছে জানা সত্ত্বেও পেছনে ফিরে চাইতে পারবে না। কিন্তু কারা অনুসরণ করছে? কেন?
কি ঘটছে, জানতে পারলে ভাল হত, পথের দিকে চেয়ে আছে। মুসা। কেন আমাদেরকে অনুসরণ করছে? আমরা তো তেমন কিছুই। জানি না!
কেউ একজন হয়ত ভাবছে, জানি, বলল কিশোর।
এবং জানলে সত্যি ভাল হত, যোগ করল রবিন।
গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিল মরিডো। বেশ বড় একটা জায়গায় পৌঁছে গেছে ওরা। প্রচুর গাছপালা। লোকের ভিড়। বাজনার মৃদু শব্দ ভেসে আসছে।
এটা আমাদের প্রধান পার্ক, গাড়ির দরজা খুলতে খুলতে বলল। মরিডো। ধীরে ধীরে হেঁটে মাঝখানে চলে যান। পেরিয়ে যাবেন ব্যাণ্ডস্ট্যাণ্ড। দড়াবাজ আর ভাঁড়দের কাছে গিয়ে দাঁড়াবেন। ছবি তুলবেন। তারপর গিয়ে দাঁড়াবেন বেলুন বিক্রি করছে যে মেয়েটা, তার কাছে। ছবি তোলার প্রস্তাব দেবেন। আমি এখানেই অপেক্ষা করছি। আবার বলছি পেছনে তাকাবেন না। কোনরকম দুশ্চিন্তা করবেন না, অন্তত এখনও না।
এখনও না! মরিডোর কথার প্রতিধ্বনি করল যেন মুসা। গাছপালার ভেতর দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে। জোরাল হচ্ছে। বাজনার শব্দ। পেছনে ফিরে তাকাব না। কত আর সামনে তাকিয়ে থাকা যায়!

দিমিত্রিকে কি করে সাহায্য করতে পারি আমরা? নিচু গলায় বলল রবিন। অন্ধকারে হাতড়ে মরছি! শূন্য, কিছুই ঠেকছে না হাতে!
অপেক্ষা করতে হবে, শান্ত কণ্ঠে বলল কিশোর। আমার ধারণা, কারও সঙ্গে যোগাযোগ করছি কি না, দেখার জন্যেই অনুসরণ করা হচ্ছে।
আরও খানিকটা হেঁটে একটা খোলা জায়গায় এসে দাঁড়াল ওরা। ঘাসের ওপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছে অনেক লোক। খুদে একটা ব্যাণ্ডস্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে আছে আটজন বাদক, হাতে নানারকম বাদ্যযন্ত্র। পরনে বিচিত্র উজ্জ্বল রঙের পোশাক। বাদকদলের নেতা মরিডোর। বয়েসী এক তরুণ। একটা নরম সুর বাজিয়ে থামল ওরা। প্রচুর। হাততালি আর বাহবা পেল। মাথা নুইয়ে শ্রোতাদের অভিবাদন জানিয়ে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আরেকটা সুর ধরল। চড়া, দ্রুত লয়।
ব্যাণ্ডস্ট্যাণ্ডের পাশ কাটিয়ে চলে এল তিন গোয়েন্দা। সামনে পেছনে অনেক, লোক। একবার পেছনে তাকিয়ে ফেলল মুসা। কিন্তু কে অনুসরণ করছে, আদৌ করছে কিনা, বুঝতে পারল না।
শান-বাঁধানো একটা জায়গায় এসে দাঁড়ালা ওরা ॥ ট্রাম্পোনি বসানো হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের বিপজ্জনক উপভোগ্য খেলা দেখাচ্ছে দুজন দড়াবাজ। মাটিতে ডিগবাজি খাচ্ছে, বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি করে লোক হাসাচ্ছে দুজন ভাড়। মাঝে মধ্যেই এগিয়ে এসে একটা ভাঙা পুরানো। ছোট কুড়ি বাড়িয়ে ধরছে সামনে। চেহারাটাকে হাস্যকর করে তুলে পয়সা চাইছে! কেউ মানা করছে না। হেসে দুএকটা মুদ্রা ফেলে দিচ্ছে ঝুড়িতে।
সার্কাসের জায়গার পরেই মেয়েটাকে দেখতে পেল ওরা ॥ সুন্দর দেশীয় পোশাক পরনে। হাতে সুতোয় বাধা এক গুচ্ছ বড় বড় বেলুন। সুললিত গলায় গান ধরেছে ইংরেজিতে কথাগুলো বড় সুন্দর। একটা করে বেলুন কিনে নেবার আমন্ত্রণ। কোন একটা ইচ্ছে মলে নিয়ে সেই বেলুন ছেড়ে দিতে হবে। ইচ্ছেটা আকাশের দূরতম প্রান্তে নিয়ে গিয়ে তারার দেশের কোন মনের মানুষের কাছে পৌঁছে দেবে বেলুন।
অনেকেই কিনছে। ছেড়ে দিচ্ছে সুতো, শাঁ করে শুন্যে উঠে পড়ছে গ্যাস ভরা বেলুন, যার যার ইচ্ছে নিয়ে উড়ে যাচ্ছে নীল আকাশে। ছোট হতে হতে একটা বিন্দুতে পরিণত হচ্ছে। তারপর টুক করে মিলিয়ে যাচ্ছে এক সময়।
ভাঁড়ের ছবি তোলো, মুসা, ফিসফিস করে বলল কিশোর। দড়াবাজদের ছবি তুলছি আমি। রবিন, চারদিকে চোখ রাখী ॥ দেখ, আমাদেরকে লক্ষ্য করছে কিনা সন্দেহজনক কেউ।
ঠিক আছে, বলে ঘুরল মুসা। হাতের তালুতে মাথা রেখে উল্টো হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন দুই ভাড়। সেদিকে এগিয়ে গেল।

রবিনের পাশে দাঁড়িয়ে ক্যামেরার খাপ খুলল কিশোর ॥ পরক্ষণেই বিরক্তিতে ছেয়ে গেল চোখ মুখ। ভাল অভিনেতা সে। দেখলে যে কেউ ধরে নেবে সত্যিই বুঝি ক্যামেরা খারাপ হয়ে গেছে তা বিড়বিড় করে বিরক্তি প্রকাশ করতে লাগল গোয়েন্দাপ্রধান।
রেডিওর বোতাম টিপে দিল কিশোর। নিচু গলায় বলল, কাস্ট বলছি। শুনতে পাচ্ছেন?
স্পষ্ট, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জবাব এল। ভলিউম কমিয়ে রেখেছে কিশোর, কাজেই একেবারে কাছাকাছি না থাকলে কেউই শুনতে পাবে না কথা। কি অবস্থা?
ফেউ লেগেছে পেছনে, বলল কিশোর। প্রিন্স দিমিত্রি সাহায্যের অনুরোধ জানিয়েছে। চুরি গেছে জাতীয় রূপালী মাকড়সা। নকল একটা ফেলে রেখে গেছে চোর।
তাই! অবাক মনে হল বব ব্রাউনের গলা। যা ভেবেছি, পরিস্থিতি তারচেয়ে খারাপ! সাহায্য করবে ওকে?
কি করে?
জানি না, স্বীকার করল বব। চোখ খোলা রাখ। কিছু না কিছু নজরে পড়বেই। ভেবেচিন্তে এগোতে পারবে তখন। আর কিছু
পার্কে রয়েছি। কারা অনুসরণ করছে জানি না।
জানার চেষ্টা কর। পরে জানাবে আমাকে ছেড়ে দাও। বেশিক্ষণ কথা বললে সন্দেহ করে বসতে পারে।
কেটে গেল যোগাযোগ।
ক্যামেরা ঠিক হয়ে গেছে যেন কিশোরের ॥ চোখের সামনে তুলে ধরল। ছবি তুলে গেলা একের পর এক
চারদিকে নজর ফেলল রবিন। অনেকেই চাইছে ওদের দিকে। পরক্ষণেই চোখ সরিয়ে নিচ্ছে। কাউকেই সন্দেহ করতে পারল না সে। একজন ভাড় এসে দাঁড়ালা সামনে। ঝুড়ি বাড়িয়ে দিল। পকেট থেকে একটা মুদ্রা বের করে তাতে ফেলে দিল রবিন।
নতুন একটা আকর্ষণীয় খেলা শুরু করল দুই ভাড়। অন্যদিক থেকে সরে এসে তাদেরকে ঘিরে স্বরণ দর্শকরা। মেয়েটার কাছে একজনও নেই এখন।
এবার ওর ছবি তুলব, বিড়বিড় করে বলল কিশোর। মুসাকে ডাকল ॥ তিনজনে এঙ্গিয়ে গিয়ে দাঁড়াল মেয়েটার সামনে।
ছবি তোলার প্রস্তাব দিল কিশোর। মাথা কাত করল মেয়েটা। ছবি উঠে গেল কিশোরের ক্যামেরায়।

হাসল মেটো। গুচ্ছ থেকে একটা বেলুন বের করে বাড়িয়ে ধরল। একটা বেলুন কিনুন। মনে কোন ইচ্ছে নিয়ে ছেড়ে দিন আকাশে। ঠিক পৌঁছে দেবে মেঘের দেশের কারও কাছে।
পকেট থেকে একটা আমেরিকান ডলার বের করল মুসা। দিল। মেয়েটাকে। তিনজনের হাতেই একটা করে বেলুন ধরিয়ে দিল মেয়েটা। ডলারটা ছোট থলেতে রেখে খুচরো বের করল। বেলুনের দাম রেখে বাকি মুদ্রাগুলো এক এক করে কেলাতে লাগল মুসার হাতে। যেন গুনে গুনে দিচ্ছে, এমনি ভাবভঙ্গি। নিচু গলা বলল, চর লেগেছে। একজন পুরুষ একজন মহিলা। লোক সুবিধের মনে হচ্ছে না। আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে পারে হয়ত। একটা টেবিলে বসে পড়ন আইসক্রীম কিংবা অন্য কিছু খান। কথা বলার সুযোগ দিন ওদের।
পয়সা দিয়ে পিছিয়ে গেল মেটো।
দিমিত্রিকে সাহায্য করতে চাই, তিনজনের মনেই এক ইচ্ছে। সুতো ছেড়ে দিল। শাঁ করে শূন্যে উঠে পড়ল বেলুন। লাল, হলুদ, সবুজ। অনেক ওপরে তিনটি কালো বিন্দুতে পরিণত হল। মিলিয়ে গেল পরক্ষণেই।
খানিক দূরেই ঘাসে ঢাকা একটা খোলা জায়গা! তাতে টেবিল চেয়ার পাতা। মোটা কাপড়ের টেবিলক্লথ, লাল-সাদা চেক। একটা টেবিল বেছে নিয়ে চেয়ার টেনে বসে পড়ল তিন কিশোর। এগিয়ে এল একজন ওয়েটার। মোটা গোঁফ। আইসক্রীম হট-চকোলেট স্যাণ্ডউইচ?
অর্ডার দিল কিশোর। চলে গেল ওয়েটার।
চারপাশে তাকাল তিন গোয়েন্দা। ঠিক পেছনেই ওদেরকে দেখতে পেল রবিন। সেই আমেরিকান দম্পতি। সকালে প্রিন্স পলের ছবি দেখার সময় যারা পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল। হুমম! তাহলে এরাই!
ধীরে সুস্থে এগিয়ে এল দম্পতি। একটা টেবিল পছন্দ করল। তিন গোয়েন্দার ঠিক পাশেরটা। কফির অর্ডার দিয়ে হেলান দিল চেয়ারে। তিন গোয়েন্দার দিকে ফিরে হাসল।
তোমরা আমেরিকান, না হেসে জিজ্ঞেস করল মহিলা। স্বর কেমন খসখসে।
হ্যাঁ, ম্যাডাম্, জবাব দিল কিশোর। আপনারাও আমেরিকান
নিশ্চয়। ক্যালিফোর্নিয়া থেকে এসেছি। তোমাদের মতই।
স্থির হয়ে গেল কিশোর। ওরা ক্যালিফোর্নিয়া থেকে এসেছে, কি করে জানল দম্পতি।
মহিলা ভুল করে বসেছে, বুঝে গেল পুরুষটি ধামাচাপা দেবার জন্যে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, ক্যালিফোর্নিয়া থেকেই তো এসেছ তোমরা, না-কি? ক্যালিফোনিয়ান ছেলেদের মতই কাপড়-চোপড় পরেছ।

হ্যাঁ, বলল কিশোর। ক্যালিফোর্নিয়া থেকেই। গতরাতে এসেছি।
সকালে মিউজিয়মে দেখেছি তোমাদের, বলল মহিলা। আচ্ছা, তোমাদের সঙ্গে ছিল, ও প্রিন্স দিমিত্রি না?
মাথা ঝোঁকাল কিশোর। হ্যাঁ। বন্ধুদের দিকে ফিরল। আইসক্রীম আসতে দেরি আছে। চল, হাত মুখ ধুয়ে আসি। ধুলোবালি লেগেছে। ওই যে, ওপাশে ওয়াশরুম লেখা রয়েছে। চল।
পাশের টেবিলের দম্পতির দিকে তাকাল কিশোর। আমরা হাতমুখ ধুতে যাচ্ছি। ক্যামেরাগুলো রইল টেবিলে। একটু দেখবেন? এই যাব আর আসব আমরা।
নিশ্চয় খোকা, হাসল লোকটা। নিশ্চিন্তে যাও। ক্যামেরা চুরি যাবে না।
থ্যাঙ্ক ইউ, স্যার, উঠে দাঁড়াল কিশোর।
রবিন আর মুসাকে নিয়ে সার্কাসের অন্য পাশে চলে এল গোয়েন্দাপ্রধান। খানিক দূরেই ওয়াশরুম!
কি ব্যাপার? পাশে হাঁটতে হাঁটতে ফিসফিস করে বলল মুসা। ক্যামেরাগুলো ফেলে এলে কেন?
শশশ। হুশিয়ার করল কিশোর। এখন কোন কথা নয়।
আগের জায়গায়ই দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা। কাছাকাছি কেউ নেই। অনেক কমে এসেছে হাতের বেলুনের সংখ্যা। তার পাশ দিয়ে যেতে যেতে নিচু গলায় বলল কিশোর, দম্পতির দিকে চোখ রাখুন। ক্যামেরাগুলো ধরলেই আমাদের জানাবেন। মিনিটখানেক পরেই আসছি।
চুপচাপ রইল মেয়েটা, যেন শোনেইনি কথাগুলো।
কয়েকটা বড় বড় গাছের তলায় একটা পাথরের বাড়ি, ওয়াশরুম। ভেতরে ঢুকে পড়ল তিন গোয়েন্দা।
উদ্দেশ্যটা কি তোমার? ঢুকেই জিজ্ঞেস করল মুসা।
এগিয়ে গিয়ে একটা বেসিনের ওপরের কল খুলে দিল কিশোর। নিচু গলায় বলল, ওরা দুজন কথা বলবেই। বেফাঁস কিছু বলেও ফেলতে পারে।
তাতে আমাদের কি লাভ? ফস করে বলল রবিন। কলের তলায়। হাত পেতে দিয়েছে।
টেপ-রেকর্ডারটা চালু করে দিয়ে এসেছি, বলল কিশোর। ওদের কথাবার্তা টেপ হয়ে যাবে। আর কোন কথা নয় এখন। কাছাকাছি লোক আছে। কে যে কি, বলা যায় না!
নীরবে হাতমুখ ধোয়া সারল ওরা। বেরিয়ে এল বাইরে। ধীর পায়ে এগোল। মেয়েটার পাশ দিয়ে যাবার সময় একবার তাকাল কিশোর। আধ ইঞ্চি মত মাথা নাড়ল মেয়েটা।

যেমন রেখে গিয়েছিল, তেমনি রয়েছে ক্যামেরা তিনটে। ছোঁয়নি কেউ। কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে দম্পতি।
ক্যামেরার ধারেকাছেও আসেনি কেউ, হেসে বলল লোকটা। সৎলোকের দেশ। তোমাদের আইসক্রীম নিয়ে এসেছিল ওয়েটার, পরে আসতে বলে দিয়েছি। ওই যে, আসছে।
ট্রে-তে খাবার নিয়ে এসে দাঁড়াল ওয়েটার। নামিয়ে রাখল স্যাণ্ডউইচ, হট-চকোলেট আর আইসক্রীমের পাত্র।
দুপুর হয়ে এসেছে। একবারে লাঞ্চ সেরে ফেলার সিদ্ধান্ত নিল তিনজনে। আরও কিছু খাবারের অর্ডার দিয়ে খেতে শুরু করল।
আর কয়েক মিনিট পরেই খাওয়া শেষ হয়ে গেল দম্পতির। তিন গোয়েন্দাকে গুড বাই জানিয়ে উঠে চলে গেল।
আমাদের সঙ্গে বিশেষ কিছুই বলল না, বলল মুসা। নিশ্চয় মত বদলেছে।
ওরা নিজেরা নিজেরা কথা বলে থাকলেই আমি খুশি, বলল কিশোর। সবকটা টেবিল খালি। এখনও খাওয়ার জন্যে আসতে শুরু করেনি লোকে। নিজের ক্যামেরাটা টেনে নিল। নিচের দিকের একটা বোতাম টিপে রি-ওয়াইণ্ড করে নিল ক্যাসেটের ফিতে। ভলিউম কমিয়ে। রেখে প্লে বোতামটা টিপে দিল। প্রথমে ফিসফাস শব্দ, তারপরেই স্পষ্ট কথা। আমেরিকান লোকটার গলা।
উত্তেজিত হয়ে পড়ল রবিন। চাপা গলায় বলে উঠল, হয়েছে! কাজ হয়েছে...
শশশ! রবিনকে থামিয়ে দিল কিশোর। শুনি, কি বলে! খাওয়া বন্ধ কোরো না। ক্যামেরার দিকে তাকিও না।
আবার টেপ রি-ওয়াইণ্ড করে নিল কিশোর। প্রথম থেকে চালু করল। আরও কমিয়ে দিল ভলিউম। পাশের টেবিল থেকেও কেউ শুনতে পাবে না এখন।
নিজেদের মধ্যে কথা বলছে দম্পতি:
পুরুষ: খামোকাই পাঠিয়েছে আমাদেরকে, টেরা। ওই ছেলে তিনটে গেয়েন্দা হলে আমার নাম পাল্টে রাখব।
মহিলা: ভুল খুব একটা করে না টেরা। ও বলেছে, ছেলে তিনটে খুবই চালাক-চতুর। তিন গোয়েন্দা বলে নিজেদেরকে।
পুরুষ: ওই বলা পর্যন্তই। গোয়েন্দাগিরির গ-ও জানে না ওরা। বড় মাথা যে ছেলেটার, ওটা তো একটা বুদ্ধ। চেহারা দেখেই বোঝা যায়। হাবাগোবা, একটা গরু!
চাওয়া-চাওয়ি করল মুসা আর রবিন। মুখ টিপে হাসল। গ্রাহ্য করল না কিশোর। কোনরকম ভাবান্তর নেই চেহারায়। ওকে বোকা ভাবুক, এইই চেয়েছিল।

মহিলা: টেরার ধারণা, ওরা কারও সঙ্গে যোগাযোগ করবে। সি.আই. এ.-র হয়ে কাজ করছে ছেলে তিনটে।
পুরুষ: আরে দুত্তোর! সারাক্ষণই তো পেছনে লেগেছিলাম। কারও সঙ্গে যোগাযোগ করতে দেখেছ? কথা বলেছে? বড়লোকের বাচ্চা। স্রেফ টাকা ওড়াতে এসেছে এখানে।
মহিলা: কোন কথাই তো বললে না ওদের সঙ্গে। ডিউক রোজারের কথা তোলা উচিত ছিল, নয় কি?
পুরুষ: মোটেই না। ভুল করেছে টেরা। ওরা গোয়েন্দা হতেই পারে না।
মহিলা: আচ্ছা, ডিউক রোজারের পরিকল্পনা সম্পর্কে কিছু বলেছে নাকি টেরা? আমার সঙ্গে বিশেষ কথা হয়নি। তুমি তো অনেকক্ষণ ছিলে? কিছু বলেছে?
সতর্ক হয়ে উঠল তিন গোয়েন্দা। কান খাড়া করল।
পুরুষ: বলেছে। দিমিত্রিকে সিংহাসনে বসতে দেবে না রোজার। সরিয়ে দেবে কোনভাবে। নিজে স্থায়ী রিজেন্ট হয়ে বসবে। তখন আমাদের আর ব্রায়ানের দলই হবে দেশের হর্তাকর্তা-বিধাতা।
মহিলা: গলা নামাও! কেউ শুনে ফেলবে!
পুরুষ: কাছেপিঠে কেউ নেই, কে শুনবে? রিলটা, কি সাংঘাতিক ব্যাপার হবে ভেবে দেখেছ! এমনি একটা কিছুরই স্বপ্ন দেখছিলাম এতদিন। ডিউক রোজার একবার ক্ষমতায় আসতে পারলেই আর আমাদের পায় কে? ছোট হোক, কিন্তু একটা দেশের মালিক হয়ে যাব, ভাবতে পার!
মহিলা: মন্টি কার্লোর মতই আরেকটা কিছু গড়ে তুলব আমরা!
পুরুষ: তার চেয়ে ভাল ব্যাংকিং সুবিধে দেব লোককে। যত খুশি কালো টাকা এনে জমাক, কোন কৈফিয়ত দিতে হবে না। তাদের দেশের সরকারের কাছ থেকে পুরোপুরি গোপন রাখা হবে কথাটা। বড় বড় অপরাধীরা এসে এখানে লুকিয়ে থাকতে পারবে। ওদেরকে বরং ঠাই দেব আমরা। অবশ্যই অনেক টাকার বিনিময়ে। যে-কোন দেশ থেকে যা খুশি করে আসুক যে-কোন লোক, এখানে এসে পড়তে পারলে সে নিরাপদ। ধনী অপরাধীদের স্বর্গ হয়ে উঠবে ভ্যারানিয়া।
মহিলা: শুনতে তো ভালই লাগছে। কিন্তু যদি ডিউক রোজার রাজি না হয় এসব করতে?
পুরুষ: ধ্বংস করে দেব। ক্ষমতায় থাকতে হলে আমাদের কথা মানতেই হবে। রিটা, রসাল একটা আপেলে পরিণত হবে এই ভ্যারানিয়া। আমরা সবাই খুঁটে খাব।
মহিলা: চুপ! আসছে ওরা...
চুপ হয়ে গেল স্পীকার। বোতাম টিপে সেট অফ করে দিল কিশোর।

খাইছে! বলে উঠল মুসা। বব ব্রাউন যা অনুমান করেছে, তার চেয়েও খারাপ অবস্থা! অপরাধীদের স্বর্গ!
তাকে এখুনি জানানো দরকার! বলে উঠল রবিন।
হ্যাঁ, ধীরে ধীরে মাথা ঝোকাল কিশোর। পুরো টেপটাই শোনানো দরকার তাকে। তবে এখন নয়। তাতে অনেক সময় লাগবে। সন্দেহ করে বসতে পারে কেউ। মূল ব্যাপারটা শুধু জানানো যায় এখন।
ক্যামেরা তুলে নিল কিশোর। ফিল্ম বদলাচ্ছে যেন, এমনি ভাবসাব। টিপে দিল রেডিওর বোতাম।
ফার্স্ট বলছি। শুনতে পাচ্ছেন?
পাচ্ছি, বলল বব ব্রাউন। নতুন কিছু?
টেপে কি কি শুনেছে, সংক্ষেপে জানাল কিশোর।
খুব খারাপ! বলল বব। মহিলা আর লোকটার চেহারা কেমন?
বর্ণনা দিল কিশোর।
মনে হচ্ছে, পিটার জোনস আর তার স্ত্রী। জুয়াড়ী। নেভাডায় বাস। ভয়ানক এক অপরাধী সংস্থার সদস্য। আর যে দুজন লোকের কথা বলল, নিশ্চয় আলবার্ট ট্যাঙ্গোরা, ওরফে টেরা, এবং ব্রায়ান বেরেট। সাংঘাতিক দুই খুনে। ওই সংস্থার সদস্য। যা ভেবেছিলাম তারচেয়ে অনেক অনেক বেশি মারাত্মক ষড়যন্ত্র!
আমাদের এখন কি করণীয়? জানতে চাইল কিশোর।
প্রথম সুযোগেই হুঁশিয়ার করে দেবে প্রিন্স দিমিত্রিকে। সব কথা জানাবে। আগামীকাল সকালে চলে আসবে আমেরিকান এমব্যাসিতে। প্যালেসে থাকা এখন নিরাপদ নয় তোমাদের জন্যে। দিমিত্রিকে সাহায্য করতে একপায়ে খাড়া আছি আমরা, তবে আমাদের সাহায্য চাইতে হবে তাকে। গায়ে পড়ে কিছু করতে যাব না। থামল বব। তারপর বলল, অনেক বেশি খবর জোগাড় করে ফেলেছ তোমরা। এতটা আশা করিনি। তবে, এখন থেকে খুব সাবধান! সব সময় সতর্ক থাকবে! ওভার অ্যাণ্ড আউট!

.

সারাটা বিকেল শহর আর তার আশপাশের মনোরম দৃশ্য দেখে কাটাল তিন, গোয়েন্দা। প্রাচীন কিছু দোকানপাট দেখল, একটা মিউজিয়মে দেখল পাঁচ-ছশো বছর আগের অনেক ঐতিহাসিক জিনিসপত্র। একটা প্রমোদতরীতে করে ডেনজো নদীতে কাটিয়ে এল কিছুক্ষণ। চলে গিয়েছিল নদীর একেবারে উৎসের কাছাকাছি।
গাড়িতে চড়ার খানিক পরেই মরিডো জানিয়েছে, আবার চর লেগেছে পেছনে। তবে এবার আর আমেরিকান দম্পতি নয়। ভ্যারানিয়ান সিক্রেট সার্ভিস, ডিউক

রোজার বুরবনের নিজের পছন্দ করা লোক।
হয়ত মেহমান বলেই নজর রাখছে, বলেছে মুসা।
যথেষ্ট সন্দেহ আছে আমার! মুখ কালো করে বলেছে মরিডো। আপনাদের প্রতি ওদের আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। কেন, জানতে পারলে ভাল হত!
তিন গোয়েন্দাও ভাবছে, জানতে পারলে ভাল হত। সিক্রেট সার্ভিক্স কেন আগ্রহ দেখাবে তাদের প্রতি? এখনও তেমন কিছুই করেনি ওরা। প্রিন্স দিমিত্রিকে সাহায্য করছে, এটা ডিউক রোজারের জানার কথা নয়। তাহলে?
রাস্তার মোড়ে মোড়ে গায়কদের ছোট ছোট দল দেখা গেল। সবার হাতে একটা না একটা বাদ্যযন্ত্র আছেই। বাজিয়ে গান গেয়ে পথচারীদের মনোরঞ্জন করছে।
মিনস্ট্রেলস, মরিডো জানাল। তিনশো বছর আগে যে পরিবারটা প্রিন্স পলকে লুকিয়ে রেখেছিল, তাদেরই বংশধর। আমিও মিনস্ট্রেলদের ছেলে। বাবা ছিল প্রধানমন্ত্রী, তাকে বের করে দিয়েছে ডিউক রোজার। আমাদেরকে, মানে মিনস্ট্রেলদেরকে সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস করেন প্রিন্স দিমিত্রি। সেই প্রিন্স পলের আমল থেকেই আমাদেরকে কোনরকম ট্যাক্স দিতে হয় না। ডিউক রোজার আর তার সাঙ্গোপাঙ্গরা দুচোখে দেখতে পারে না আমাদের। আমরা সব মিনস্ট্রেলরা মিলে একটা গোপন দল করেছি। নাম, মিনস্ট্রেল পার্টি। অনেক ভক্ত জুটেছে আমাদের। দেশের লোক দেখতে পারে না রোজারকে।
মিনস্ট্রেলদের প্রতিটি দলের সামনে গতি কমাচ্ছে মরিডো। তাকাচ্ছে আগ্রহী চোখে। দলের কেউ একজন সামান্য একটু মাথা ঝোকালেই আবার ছুটছে সামনে।
ওদেরকে চোখে চোখে রাখছি আমরা, বলল মরিডো। আপনাদের ওপরও সারাক্ষণ চোখ রয়েছে আমাদের। প্যালেসে আছে। আমাদের লোক, এমনকি রয়্যাল গার্ডেও আছে। অনেক কিছুই জেনে গেছি আমরা। কিন্তু এই একটা ব্যাপার জানতে পারছি না, আপনাদের ওপর রোজারের এত আগ্রহ কেন! সাংঘাতিক কোন প্ল্যান নিশ্চয় করেছে ব্যাটা!
দুপাশে নতুন নতুন দৃশ্য। দেখতে দেখতে কিছুক্ষণের জন্যে সিক্রেট সার্ভিসের কথা ভুলে গেল ছেলেরা।
আরেকটা পার্কে বিশাল এক নাগরদোলায় চেপে কিছুক্ষণ দোল খেল তিন কিশোর। তারপর রাতের খাওয়া সেরে নিল এক রেস্টুরেন্টে। ডেনজো নদীর মাছ, সুস্বাদু। রান্নাও হয়েছে খুব ভাল।
ক্লান্ত হয়ে প্যালেসে ফিরে এল ওরা। তবে মন আনন্দে ভরা। একটা খুব সফল দিন কাটিয়ে এসেছে।

ওদেরকে অভ্যর্থনা করে গাড়ি থেকে নামাল রয়্যাল চেম্বারলেন। এখন আরেকজন। ডিউটি বদলেছে। ছোট্টখাট্ট একজন তোক। টকটকে লাল আলখেল্লা পরনে।
গুড ইভনিং, ইয়ং জেন্টেলম্যান, বলল চেম্বারলেন। আজ রাতে দেখা করতে পারবেন না প্রিন্স দিমিত্রি। দুঃখ প্রকাশ করেছেন তিনি। কাল সকালে নাস্তার সময় দেখা হবে। চলুন, আপনাদের ঘরে পৌঁছে দিই। নইলে পথ চিনে যেতে পারবেন না।
অসংখ্য সিঁড়ি, করিডর, হলঘর পেরিয়ে এল ওরা চেম্বারলেনের পিছু পিছু। প্রতিটি সিঁড়ির গোড়ায় করিডরের প্রান্তে প্রহরী। অবাকই হল ওরা। সকালে, কিংবা গতরাতে এত কড়াকড়ি দেখেনি। তিনতলার ঘরে পৌঁছে দিয়ে তাড়াহুড়া করে চলে গেল চেম্বারলেন। যেন জরুরি কোন কাজ ফেলে এসেছে।
ভারি ওক কাঠের দরজাটা বন্ধ করে দিল কিশোর। ঘরের ভেতরে তাকাল। গোছগাছ সাফসুতরো করা হয়েছে। বিছানায় নতুন চাদর। তবে সুটকেসগুলো যেখানে ফেলে রেখে গিয়েছিল, সেখানেই রয়েছে। মাকড়সার জালটাও রয়েছে আগের মতই। ওটার ধারেকাছেও যায়নি কেউ। সেদিকে এগোল, সে। সুতো বেয়ে নেমে গেল বড় একটা মাকড়সা, কালোর ওপর সোনালি ছোপ। তক্তা আর মেঝের মাঝখানের ফাঁকে গিয়ে ঢুকে পড়ল সুড়ৎ করে। মাথা বের করে দিল পরমুহূর্তেই।
হাসল রবিন। সকালেই যথেষ্ট শিক্ষা হয়ে গেছে। মাকড়সার জাল আর ছিঁড়তে যাবে না ভ্যারানিয়ায় থাকতে।
মনে হচ্ছে, জিনিসপত্র কেউ হাতায়নি, বলল কিশোর। বব ব্রাউনের সঙ্গে যোগাযোগ করা দরকার। নতুন কোন নির্দেশ দিতে– পারে। মুসা, দরজার তালা আটকে দাও।
তালা আটকে দিল মুসা।
খাপ থেকে ক্যামেরা খুলল কিশোর। বোতাম টিপে দিল। ফাস্ট বলছি। শুনতে পাচ্ছেন?
স্পষ্ট, ভেসে এল বব ব্রাউনের গলা। নতুন কিছু
তেমন কিছু না, জানাল কিশোর। সারা বিকেলই গাড়িতে করে ঘুরেছি। শহর দেখেছি। নতুন চর লেগেছিল পেছনে। ডিউক রোজারের লোক, সিক্রেট সার্ভিস।
দিমিত্রির সঙ্গে কথা বলেছ? কণ্ঠ শুনে মনে হল ভাবনায় পড়ে গেছে। খবরটা কিভাবে নিয়েছে সে?
দেখা হয়নি। চেম্বারলেন জানিয়েছে, সকালের আগে দেখা হবে না। প্রিন্স খুব ব্যস্ত।

হুমম! দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছে বব, তার কণ্ঠ শুনেই বোঝা যাচ্ছে। আটকে ফেলেনি তো! ওর সঙ্গে দেখা করা খুবই জরুরি। সকালে যেভাবেই হোক, দেখা কোরো। হ্যাঁ, এক কাজ কর, ক্যামেরা থেকে টেপটা বের করে নিয়ে পকেটে রেখে দাও। আগামীকাল এমব্যাসিতে নিয়ে আসবে। এমন ভাব দেখাবে, যেন শহর দেখতে বেরোচ্ছ। গরম হয়ে উঠছে পরিস্থিতি! বুঝেছ?
বুঝেছি, বলল কিশোর। ওভার অ্যান্ড আউট।
ট্রান্সমিটারের সুইচ অফ করে দিল কিশোর। টেপ-রেকর্ডার থেকে বের করে নিল খুদে ক্যাসেটটা। বাড়িয়ে দিল মুসার দিকে, এটা তোমার কাছে রাখ। কেউ যেন নিয়ে যেতে না পারে।
পারবে না, দৃঢ়কণ্ঠ মুসার। ভেতরের পকেটে রেখে দিল ক্যাসেটটা।
ড্রয়ার হাতাচ্ছে রবিন। রুমাল খুঁজছে। কোন্ ড্রয়ারটীয় রেখেছিল, ঠিক মনে করতে পারছে না। অবশেষে একটা ড্রয়ারে পাওয়া গেল ওটা। টান দিয়ে বের করে আনল রুমাল। ভাঁজের ভেতর থেকে মেঝেতে ছিটকে পড়ল কিছু একটা, মৃদু টুং শব্দ হল। আশ্চর্য! কি ওটা! ঝুঁকে আলমারির তলায় তাকাল। চকচক করছে জিনিসটা। বের করে হাতে নিল।
একবার দেখেই চেঁচিয়ে উঠল রবিন, কিশোর! মুসা! দেখ দেখ!
অবাক হয়ে তাকাল দুজনেই।
মাকড়সা! ঢোক গিলল মুসা। ফেল, ফেল!
কোন ক্ষতি করে না, বলল কিশোর। প্রিন্স পলের মাকড়সা। রবিন, আস্তে নামিয়ে রাখ মেঝেতে।
চিনতে পারছ না! ভুরু কুঁচকে গেছে রবিনের। প্রিন্স পলের মাকড়সাই। রূপালী মাকড়সা!
রূপালী মাকড়সা! রবিনের কথার প্রতিধ্বনি করল যেন মুসা। কি বলছ।
এটা ভ্যারানিয়ার রূপালী মাকড়সা, বলল রবিন। ভল্ট থেকে যেটা চুরি গিয়েছিল। আমি শিওর। এত কাছে থেকেও চিনতে পারনি?
প্রায় লাফ দিয়ে কাছে চলে এল কিশোর আর মুসা।
ছুঁয়ে দেখল কিশোর। ঠিকই বলেছ! এটা একটা মাস্টারপিস। কোথায় পেলে?
রুমালের ভাঁজে! কেউ একজন রেখে দিয়েছে। সকালে ছিল না।
ভুরু কুঁচকে গেল কিশোরের। নিজের অজান্তেই হাত উঠে গেল। নিচের ঠোঁটে। কে রাখল? কেন? বিড়বিড় করতে লাগল। আমাদেরকে চোর বলে চিহ্নিত করতে চায় না-তো। তাহলে…
কি করব আমরা এখন, কিশোর? বলে উঠল মুসা। ওটা চুরির একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড! যদি ধরা পড়ি…

আমার মনে হয়... বলতে গিয়েও থেমে যেতে হল কিশোরকে। বাইরে ভারি জুতোর শব্দ। অনেকগুলো।
মুহূর্ত পরেই দরজায় চাপড়ের শব্দ হল। নবটা ঘোরানর চেষ্টা করল কেউ। ভেতর থেকে তালা দেয়া, খুলল না। শোনা গেল কুদ্ধ গলা, দরজা খোল। রিজেন্টের আদেশ!
স্তব্ধ একটা সেকেণ্ড। তারপরই লাফ দিল মুসা আর কিশোর, একই সঙ্গে। লোহার দুটো ভারি ছিটকিনি তুলে দিল দুজনে।
ঠিকমত ভাবতে পারছে না রবিন, এতই অবাক হয়েছে। হাতে ভ্যারানিয়ার রূপালী মাকড়সা নিয়ে স্থির দাঁড়িয়ে আছে। কি করবে এখন?

.

জোরে জোরে কিল মারার শব্দ হচ্ছে দরজায় বাইরে থেকে।
খোল! রিজেন্টের আদেশ! আমরা আইনের লোক! আবার চেঁচিয়ে উঠল ক্রুদ্ধকণ্ঠ।
দরজায় পিঠ দিয়ে চেপে দাঁড়িয়েছে কিশোর আর মুসা। নিজেদের দেহের ভার দিয়ে দরজা আটকে রাখতে চাইছে যেন।
হাতের অপূর্ব সুন্দর জিনিসটার দিকে চেয়ে আছে রবিন। মাথায় চিন্তার ঝড়। কোথাও লুকিয়ে ফেলা দরকার এটাকে। কিন্তু কোথায়?
হঠাৎ সচল হয়ে উঠল রবিন। ছুটোছুটি শুরু করল সারা ঘরময়। চোখ জায়গা খুঁজছে। কোথায় লুকিয়ে রাখবে মাকড়সাটাকে! কার্পেটের তলায়? না। বিছানার গদি? তাও না। তাহলে, তাহলে কোথায়? কোথায় রাখলে খুঁজে পাবে না অন্য কেউ?
জোরে ধাক্কা দেয়া হচ্ছে দরজায়। ভেঙে ফেলার চেষ্টা চালাচ্ছে। এই সময়ই ঘটল আরেক ঘটনা। ভীষণভাবে দুলে উঠল জানালার পর্দা। লাফিয়ে এসে ঘরের ভেতরে পড়ল দুজন তরুণ! চমকে উঠল কিশোর আর মুসা! ওদিক থেকেও আক্রমণ এল।
না না, চমকাবার কিছু নেই। কাছে এগিয়ে এসেছে এক তরুণ। ফিসফিস করে বলল, আমি। মরিডো। আর, ও আমার ছোট বোন, মেরিনা।
মেরিনা...ও আপনার বোন, ফিসফিস করেই বলল কিশোর।
সেই মেয়েটা। পার্কে বেলুন বিক্রি করছিল যে। পরনে মরিডোর মতই প্যান্ট, জ্যাকেট। দেখে প্রথমে তাই তাকে ছেলে বলে ভুল করেছে ওরা।
মাথা ঝোকাল মরিডো। জলদি আসুন, পালাতে হবে। আপনাদেরকে অ্যারেস্ট করতে এসেছে ওরা! ধরতে পারলে ফাঁসি দিয়ে দেবে!

আওয়াজ পাল্টে গেছে আঘাতের। দরজা ভাঙার জন্যে কুড়াল ব্যবহার করা হচ্ছে। কিন্তু তিন ইঞ্চি পুরু ভারি ওক কাঠের দরজা। এত সহজে ভাঙবে না। কয়েক মিনিট সময় নেবেই।
ঘরে বসে টেলিভিশনে সিনেমা দেখছে যেন ওরা! খুব দ্রুত ঘটে যাচ্ছে ঘটনা। তাল পাচ্ছে না তিন গোয়েন্দা। বেরিয়ে যেতেই হবে এঘর থেকে, এটা ঠিক, কিন্তু কি করে, বুঝতে পারছে না।
জলদি এস, মুসা! হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। কাজ করতে শুরু করেছে আবার তার মগজ। রবিন, এস। মাকড়সাটা পকেটে ঢোকাও।
ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে আছে রবিন। হঠাৎ সোজা হল। দ্বিধা করল এক মুহূর্ত। তারপর ঘুরে ছুটে এল।
জানালার দিকে ছুটল মেরিনা। ফিরে সবাইকে একবার ইশারা করেই টপকে ব্যালকনিতে চলে গেল। ওর পিছু পিছু ব্যালকনিতে এসে নামল কিশোর, মুসা, রবিন।
ঠাণ্ডা অন্ধকারে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়াল ওরা। নিচে জ্বলছে শহরের আলো।
দালানের গা থেকে বেরিয়ে আছে চওড়া কার্নিস। সেটা দেখিয়ে বলল, প্যালেসের পেছনেও আছে। এতখানিই চওড়া। হাঁটা যাবে। আসুন আমি পথ দেখাচ্ছি।
ব্যালকনির রেলিঙে উঠে বসল মেরিনা। নিঃশব্দে লাফিয়ে নামল কার্নিসে।
দ্বিধা করছে কিশোর। আমার ক্যামেরা! হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল সে। ফেলে রেখে এসেছি!
আর আনার সময় নেই! পেছন থেকে বলল মরিডো। দুমিনিট টিকবে আর দরজা, বড় জোর তিন। একটা সেকেণ্ডও নষ্ট করা যাবে না।
খুব খারাপ লাগল ক্যামেরাটার জন্যে। কিন্তু আনার উপায় নেই। মুসা নেমে পড়েছে ততক্ষণে কার্নিসে। তাকে অনুসরণ করল কিশোর। দেয়ালের দিকে মুখ, পা ফাঁক করে পাশে হেঁটে সরছে মেরিনা।
গায়ে গা ঠেকিয়ে মেরিনার মত করেই সরতে লাগল মুসা আর কিশোর। বেড়ালের মত নিঃশব্দে।
ভয় পাবার সময়ই নেই। ঘরের ভেতরে দরজায় আঘাতের শব্দ হচ্ছে একনাগাড়ে। প্রাসাদের এক কোণে পৌঁছে গেল ওরা। ঠাণ্ডা হাওয়া ঝাঁপটা দিয়ে গেল চোখেমুখে।
ক্ষণিকের জন্যে কেঁপে উঠল রবিন, দুলে উঠল দেহ। অনেক নিচে ডেনজো নদী, রাতের মতই অন্ধকার। পাক খেয়ে খেয়ে ঘূর্ণি সৃষ্টি করেছে পানি, শব্দ শোনা যাচ্ছে। কাঁধ খামচে ধরল মরিডোর শক্তিশালী হাত, পতন রোধ করল রবিনের। আবার ভারসাম্য ফিরে পেল সে।

জলদি! রবিনের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলল মরিডো।
চমকে উঠল একজোড়া পায়রা। এ-কি জ্বালাতন! এত রাতে ঘুম নষ্ট করতে এল কে! পাখার ঝটপট শব্দ তুলে দালানের খোপ থেকে বেরিয়ে এল পাখি দুটো, অনধিকার-চর্চাকারীদের মাথার ওপর চক্কর দিয়ে দিয়ে উড়তে লাগল। হঠাৎ বসে পড়তে যাচ্ছিল রবিন, আবার তার কাঁধ খামচে ধরল মরিডো।
মোড় ঘুরে আরেকটা ব্যালকনির কাছে চলে এল ওরা। রেলিঙে উঠে বসল মেরিনা। নামল।
ব্যালকনিতে এসে দাঁড়িয়েছে পাঁচজনে।
এবার ওপরে উঠতে হবে, ফিসফিসিয়ে বলল মেরিনা। এই যে দড়ি। গিঁট দেয়া আছে একটু পর পরই। উঠতে অসুবিধে হবে না!
এটা কেন? রেলিঙে বাঁধা আরেকটা দড়ি নেমে গেছে নিচে, সেটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর।
ওদের বোকা বানাতে, জবাব দিল মেরিনা। ধরে নেবে আমরা নিচে নেমে গেছি।
ওপর থেকে ঝুলছে যে দড়িটা, সেটা ধরে উঠতে শুরু করল মেরিনা। তাকে অনুসরণ করল মুসা। তারপর দড়ি ধরল কিশোর।
ওদেরকে কয়েক ফুট ওঠার সময় দিল রবিন। তারপর দড়ি ধরে ঝুলে পড়ল সে-ও। উঠতে শুরু করল ধীরে ধীরে।
আবার কার্নিসে নেমেছে মরিডো। মারাত্মক ঝুঁকি নিয়ে এগিয়ে গেল কোনায়। উঁকি দিল। দেখতে চাইছে, ওদিকে কতদূর কি করল শত্রুরা।
ফিরে এল মরিডো। ফিসফিস করে বলল, এখনও দরজা নিয়েই আছে। তবে এসে পড়ল বলে!
কি? মরিডোর দিকে তাকাতে গেল রবিন। ঘামে ভেজা হাত, পিছলে গেল হঠাৎ। গিটও আটকাতে পারল না, সড়সড় করে নিচে নেমে চলে এল সে। ঘষা লেগে ছিলে গেল হাতের চামড়া। তার মনে হল, আগুন লাগিয়ে দিয়েছে কেউ। মাত্র একটা মুহূর্ত। পরক্ষণেই এসে পড়ল নিচে দাঁড়ানো মরিডোর ওপর। পড়ল তাকে নিয়েই। জোরে কঠিন কিছুতে ঠুকে গেল মাথা। দপ করে চোখের সামনে জ্বলে উঠল কয়েক হাজার লাল-হলুদ ফুল। তারপরেই অন্ধকার!
রবিন! কানের কাছে ডাক শুনে চোখ মেলল সে।
রবিন! শুনতে পাচ্ছেন! লেগেছে কোথাও! শঙ্কিত গলা মরিডোর।
চোখ মিটমিট করল রবিন। ওপরে তারাজ্বলা আকাশ। মুখের ওপর ঝুঁকে আছে মরিডো। চিত হয়ে পড়ে আছে সে। প্রচণ্ড যন্ত্রণা মাথায়।
রবিন, কোথাও লাগেনি তো! আবার জিজ্ঞেস করল মরিডো। উদ্বিগ্ন।

মাথা ব্যথা করছে, অবশেষে বলল রবিন। কোলা ব্যাঙের আওয়াজ বেরোল গলা থেকে। ভালই আছি। ধীরে ধীরে উঠে বসল সে। চারদিকে তাকাল। একটা ব্যালকনিতে বসে আছে। পাশে, প্যালেসের পাথরের কালো বিশাল দেয়াল উঠে গেছে ওপরে। অনেক নিচে ডেনজো নদীতে মিটমিট করছে নৌকার আলো।
আমি এখানে কেন! বলে উঠল রবিন। জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকলেন আপনারা... তারপরই আমি এখানে!...মাথায় যন্ত্রণা।...কিছুই তো বুঝতে পারছি না!
প্রিন্স পল রক্ষা করুন আমাদের, বিড়বিড় করল মরিডো। কথা বলার সময় নেই! দড়ি ধরে উঠতে পারবেন? এই যে, দড়ি। রবিনের। হাতে দড়িটা গুঁজে দিল সে। উঠতে পারবেন?
অবাক হয়ে দড়িটা ধরে আছে রবিন। এটা কোথা থেকে এল? এর আগে কখনও দেখেছে বলে তো মনে পড়ছে না। ভীষণ দুর্বল লাগছে। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা।
জানি না! ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল রবিন। চেষ্টা করব।
হবে না! আপনমনেই বিড়বিড় করল মরিডো। বুঝেছি, পারবেন না। টেনে তুলতে হবে। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকুন। দড়ি বেঁধে টেনে তুলব।
দড়ির মাথা রবিনের দুই বগলের তলা দিয়ে এনে বুকে শক্ত করে পেঁচাল মরিডো, গিঁট দিল। চুপ করে থাকুন। আমি উঠে যাই। তারপর টেনে তুলব। দেয়ালে অনেক ফাটল আছে। ওগুলোতে পা বাধিয়ে ওপরে ঠেলে দেবার চেষ্টা করবেন নিজেকে। আমাদের সাহায্য হবে। তা যদি না পারেন, চুপচাপ ঝুলে থাকবেন। ভয় নেই, ফেলে দেব না।
দড়িতে টান পড়তেই ওপরের দিকে চেয়ে বলল, আসছে! অঘটন ঘটেছে এখানে!
দড়ি ধরে রেলিঙে উঠে দাঁড়াল মরিড়ো। ঝুলে পড়ল অন্ধকারে।
নিঃশব্দে উঠে যাচ্ছে মরিডো। সেদিকে তাকিয়ে রইল রবিন। হাত চলে গেছে মাথার পেছনে, আহত জায়গা। এখনও বুঝতে পারছে না সে, কি করে এখানে এল! সঙ্গীরা কোথায় কি করছে, বুঝতে পারছে। মনে পড়ছে, ওরা ঘরের ভেতরে দাঁড়িয়ে ছিল। দরজায় কুড়াল দিয়ে কোপানর শব্দ। জানালা দিয়ে ঘরের ভেতর এসে লাফিয়ে নেমেছে। দুই তরুণ...

.

বড় একটা জানালার চৌকাঠে বসল মরিডো। লাফ দিয়ে নামল ভেতরে। ওরা তিনজন দাঁড়িয়ে আছে। সবাই উদ্বিগ্ন।
পড়ে গিয়েছিল রবিন, বলল মরিডো। খুব নাড়া খেয়েছে। চোট লেগেছে মাথায়। টেনে তুলতে হবে, নিজে নিজে উঠতে পারবে না। আসুন, দড়ি ধরতে হবে।
চারজনেই চেপে ধরল দড়ি। টান দিল। ওঠার সময় সাহায্য করেছে গিটগুলো, এখন অসুবিধে সৃষ্টি করল। প্রতিটি গিঁট বেধে যাচ্ছে। চৌকাঠের কিনারে, আটকে

যাচ্ছে। হ্যাঁচকা টান দেয়া যাচ্ছে না। গিটের তলায় হাত ঢুকিয়ে দিয়ে সরিয়ে আনতে হচ্ছে অনেক কষ্টে।

ওজন বেশি না রবিনের। তাছাড়া ওরা চারজন। অসুবিধা সত্ত্বেও শিগগিরই দেখা গেল তার মাথা, কাঁধ। হাত বাড়িয়ে চৌকাঠ চেপে ধরল রবিন। দুহাত ধরে তাকে তুলে আনল মুসা আর মরিডো।

এলাম! কাঁপছে রবিনের গলা। কিছু ভেব না, আমি ঠিকই আছি। মাথা ব্যথা করছে অবশ্য, ওটা এমন কিছু না। হাঁটতে পারব। কিন্তু ব্যালকনিতে কি করে এলাম, সেটাই মনে করতে পারছি না!

পারবেন, মোলায়েম গলায় বলল মেরিনা। ওসব নিয়ে বেশি ভাবার দরকার নেই এখন। আর কোন অসুবিধে নেই তো?

না, বলল রবিন।

আরেকটা শোবার ঘরে এসে ঢুকেছে ওরা। ভাপসা গন্ধ। অনুভবেই বুঝতে পারছে, বালি গিজগিজ করছে। তারার আবছা আলো জানালা দিয়ে ঢুকছে ভেতরে। কোন আসবাবপত্র দেখা গেল না।

পা টিপে টিপে দরজার কাছে এগিয়ে গেল মরিডো আর মেরিনা। নিঃশব্দে দরজা খুলল মরিডো, গলা বাড়িয়ে উঁকি দিল বাইরে। ফিরে এল আবার।

কেউ নেই, বলল মরিডো। লুকানর জন্যে একটা জায়গা বের করতে হবে এবার। মেরিনা, তোমার কি মনে হয়? মাটির তলার কোন একটা ঘরে নিয়ে যাব?

ননাহ, জোরে মাথা নাড়ল মেরিনা। দড়ি দেখে ভাববে, নিচে নেমে গেছেন ওঁরা। নিচের কোন, ঘরেই খোঁজা বাদ রাখবে না ব্যাটারা। দেখ!

জানালায় দাঁড়িয়ে নিচে উঁকি দিল সবাই। নিচে, আঙিনায় আলো, নড়াচড়া করছে। টর্চ হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে প্রহরীরা।

ইতিমধ্যেই পাহারা শুরু হয়ে গেছে আঙিনায়, বলল মেরিনা। ওপরেই যেতে হবে আমাদের। দিনটা কোথাও লুকিয়ে রাখতে হবে। আগামী রাতে দেখব, অন্য কোথাও সরিয়ে নিতে পারি কিনা। কোন একটা ডানজনের ভেতর দিয়ে পানি সরার ড্রেনে নিয়ে যাব। তারপর হয়ত নিয়ে চলে যেতে পারব আমেরিকান এমব্যাসিতে।

ভাল বলেছ, সায় দিয়ে বলল মরিডো। প্যালেসের এদিকটায় লোকজন আসে না। দড়ি নিচে নেমে গেছে, এদিকে ওঠার কথা ভাববে না কেউ।...সঙ্গে রুমাল আছে আপনাদের?

আছে, পকেট থেকে সাদা রুমাল বের করে দিল কিশোর।

নিচে আঙিনায় ফেলে দেব সুযোগমত, বলে রুমালটা পকেটে রাখল মরিডো। জানালার ফ্রেমের মাঝখানের দণ্ডে বাঁধা দড়িটা, ওটা বেয়েই উঠে এসেছে। খুলে

নিয়ে হাতে পেচাল সে। আসুন, যাই। মেরি, পেছনে থাক।
একে একে করিডরে বেরিয়ে এল ওরা। দুপাশে ঘর। ওপরে ছাত। অন্ধকার। মরিডোর হাত ধরেছে কিশোর। তার হাত মুসা, মুসার হাত রবিন। তার হাত মেরিনা। পাঁচজনের একটা শেকল যেন, নিঃশব্দ কিন্তু দ্রুতপায়ে এগিয়ে চলল।
টর্চ জ্বেলে দেখে নিল মরিডো। দেয়ালের গায়ে একটা দরজার সামনে এসে থামল। ধাক্কা দিল খুলল না। আরও জোরে ধাক্কা দিতেই মরচে পড়া কজা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে উঠল। খুলে গেল পাল্লা। চমকে উঠল সবাই।
কান খাড়া করে দুরুদুরু বুকে দাঁড়িয়ে রইল ওরা এক মুহূর্ত। না, কোনরকম শব্দ শোনা গেল না। ভেতরে পা রাখল ওরা। একটা সিঁড়ি ঘর।
অন্ধকারে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল। সামনে আরেকটা। ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলে ফেলল মরিডো।
খোলা ছাতে বেরিয়ে এল ওরা। ছাত ঘিরে রেখেছে উঁচু দেয়াল। দেয়ালের গায়ে মাঝে মাঝে বড় কুলুঙ্গিমত রয়েছে।
ওখান থেকে তীর ছোঁড়া হত, গরম তেল ঢেলে দেয়া হত শত্রুর ওপর, কুলুঙ্গিগুলো দেখিয়ে বলল মরিডো। আজকাল আর ওসবের দরকার হয় না। ছাতে পাহারাই থাকে না অনেক বছর ধরে।
প্রত্যেক কোনায় সেন্ট্রিরুম রয়েছে। এক কোণে পাথরের একটা খুপরিমত ঘরে নিয়ে এল ওদেরকে মরিডো। অনেক আপত্তি প্রকাশ করার পর খুলে গেল কাঠের দরজা। ভেতরে আলো ফেলল সে। চার দেয়াল ঘেঁষে চারটে লম্বা বেঞ্চ, ডিউটির ফাঁকে ফাঁকে ওখানেই শুয়ে ধুমাত সেন্ট্রিরা। ধুলোয় একাকার। ছোট ছোট ফোকর রয়েছে দেয়ালে, কাঁচ নেই।
এককালে সারাক্ষণ পাহারা থাকত এখানে, বলল মরিডো। সে অনেক আগের কথা। এখানে আপাতত নিরাপদ আপনারা। আগামীকাল রাতে আবার আসব। যদি পারি।
ধপ করে একটা কাঠের বেঞ্চে বসে পড়ল কিশোর। কপাল ভাল, এখন গরমকাল। নইলে ঠাণ্ডায় জমেই মরতে হত।...তো, এসব কি? কি ঘটেছিল?
কোন ধরনের ফাঁদ, বলল মেরিনা। রূপালী মাকড়সা চুরির অজুহাতে আপনাদেরকে গ্রেফতার করা হত। তারপর, কোন একটা কায়দা বের করে সিংহাসনে বসতে দিত না প্রিন্স দিমিত্রিকে। এখন পর্যন্ত এইই জানি।
আমরা চুরি করিনি রূপালী মাকড়সা, বলল কিশোর।
জানি।
কিন্তু ওটা এখন আমাদের কাছেই আছে। রবিন, দেখাও ওদের।

জ্যাকেটের এক পকেটে হাত ঢোকাল রবিন। তারপর ঢোকাল। অন্য পকেটে। সতর্ক হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি খুঁজল সবকটা পকেট। ঢোক গিলল। কিশোর... নেই...! নিশ্চয় পড়ে গেছে কোথাও

.

মাকড়সাটা ছিল আপনার কাছে? হারিয়েছেন? আতঙ্কিত গলা মরিডোর।

সর্বনাশ! বলে উঠল মেরিনা। আপনাদের কাছে এল কি করে? হারালই বা কি করে?

ভল্ট থেকে রূপালী মাকড়সা চুরি যাওয়ার কাহিনী খুলে বলল কিশোর, যা যা শুনেছিল প্রিন্স দিমিত্রির কাছে। জানাল, আসলটার জায়গায় নকলটা পড়ে আছে এখন। প্রিন্সের সন্দেহ, চুরি করেছে ডিউক রোজার, দিমিত্রির প্রিন্স হওয়া ঠেকানর জন্যে।

রবিন জানাল, ড্রয়ারে রুমালের আজ থেকে কি করে পেয়েছে সে মাকড়সাটা।

ষড়যন্ত্রটা বুঝতে পারছি এবার, চিন্তিত শোনাল মরিডোর গলা। ডিউক রোজারই মাকড়সাটা আপনাদের ঘরে লুকিয়ে রেখেছিল। তারপর লোক পাঠিয়েছে গ্রেফতার করতে। মাকড়সাটা পাওয়া যেত আপনাদের ঘরে। প্রিন্স দিমিত্রির অসাবধানতার কারণেই ওটা চুরি। করতে পেরেছেন, ঘোষণা করে দিত ডিউক। প্রিন্সের ওপর বিশ্বাস হারাত লোকে। আপনাদেরকে ভ্যারানিয়া থেকে বের করে দিত রোজার, আমেরিকার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করত। রাজ্যশাসন চালিয়ে যেত! তারপর কোন এক সময়ে নিজেকে স্থায়ী রিজেন্ট ঘোষণা করে বসে পড়ত সিংহাসনে।

কিন্তু মাকড়সাটা এখন তার হাতে নেই, বলল মুসা। আর তো এগোতে পারছে না।

পারছে, বলল মরিডো। আপনাদেরকে ধরার চেষ্টা করবে। ধরতে পারলেই ঘোষণা করবে, মাকড়সাটা কোথাও লুকিয়ে ফেলেছেন। আপনারা। আমেরিকান এমব্যাসিতে পালিয়ে যেতে পারলেও বদনাম থেকে রেহাই পাবেন না। তাহলে বলবে, রূপালী মাকড়সা চুরি করে নিয়ে চলে গেছেন আপনারা।

কিন্তু একটা ব্যাপার এখনও বুঝতে পারছি না, বলল মুসা। রূপালী মাকড়সা হারালে কিংবা চুরি গেলে, দিমিত্রির দোষটা কোথায়? আমরা না এলেও তো ওটা চুরি যেতে পারত? আগুন লেগে কিংবা অন্য কোন কারণে নষ্ট হয়ে যেতে পারত। তখন?

তখন সারা দেশ শোক প্রকাশ করত দীর্ঘদিন ধরে। প্রিন্স দিমিত্রির কোন দোষ থাকত না। এখন তো বলবে, আমেরিকান কয়েকটা চোর বন্ধুকে এনে ভল্টে ঢুকিয়েছে, ফলে চুরি গেছে মাকড়সা। আসলে, প্রিন্স পল আমাদের কাছে কতখানি কি, সেটা বলে বোঝানো যাবে না আপনাদের। তারই প্রতীকচিহ্ন ওই

রূপালী মাকড়সা। ওটার ওপরই নির্ভর করছে আমাদের ভাগ্য, স্বাধীনতা, ভবিষ্যৎ।
চুপ করে রইল তিন গোয়েন্দা।
হয়ত বলবেন আমরা কুসংস্কারে বেশি বিশ্বাসী, আবার বলল মরিডো। কিন্তু আজ পর্যন্ত মাকড়সার অবমাননা করে টিকতে পারেনি কেউ, ধ্বংস হয়ে গেছে। বংশ বংশ ধরে প্রিন্স পলকে ভালবেসে এসেছি আমরা। তাঁর আদেশ, তাঁর নির্দেশ এখনও ভ্যারানিয়ানদের কাছে ধ্রুববাক্য। আমরা জানি, যতদিন রূপালী মাকড়সা নিরাপদে থাকবে, ভ্যারানিয়ানরা নিরাপদ। ওটার কোন ক্ষতি হলেই অভিশাপ নেমে আসবে আমাদের ওপর। ওটা রক্ষা করার জন্যে প্রাণ দিতেও আপত্তি নেই আমাদের সরাসরি না হলেও প্রিন্স দিমিত্রি এটা হারানর ব্যাপারে জড়িত, দেশের লোক তাই জানবে। মন থেকে কোনদিনই আর তাকে ভালবাসতে পারবে না। সিংহাসনে বসার অযোগ্য মনে করবে। থামল। একটু। ভাবল। তারপর বলল, তাহলে বুঝতেই পারছেন রূপালী মাকড়সা খুঁজে পেতেই হবে আমাদের। নইলে ডিউক রোজারেরই জিত।
সর্বনাশ করেছি তাহলে! বলে উঠল রবিন। গলা কাঁপছে। ঢোক মিলল। কিশোর, মুসা, আমার পকেট খুঁজে দেখ।
তন্ন তন্ন করে রবিনের সব পকেট খুঁজল মুসা আর কিশোর, টেনে উল্টে বের করে আনল পকেটের কাপড় নেই! জামার হাতার ভাঁজ, প্যান্টের নিচের ভাজ, জুতো-মোজার ভেতর, কোথাও খোঁজা বাদ রাখল না। নেই তো নেই-ই। পাওয়া গেল না রূপালী মাকড়সা।
ভাব, রবিন, অবশেষে বলল কিশোর। ভাল করে ভেবে দেখ, কোথায় রেখেছিলে! তোমার হাতে ছিল ওটা, তারপর কি করলে?
মনে করার চেষ্টা করল রবিন। জানি না! হতাশ কণ্ঠ। রুমালের ভাঁজ থেকে পড়ে গিয়েছিল মেঝেতে। হাতে তুলে নিলাম। দরজায় ধাক্কা দেবার শব্দ হল। জানালা দিয়ে লাফিয়ে এসে পড়ল মরিডো। তারপর আর কিছু মনে নেই!
হুমম! নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর। অ্যামনেশিয়া, আংশিক! মাথায় আঘাত পেলে মাঝেসাঝে ঘটে এটা। বিস্মরণ ঘটে। অতীত জীবনের সমস্ত স্মৃতি হারিয়ে যায় কারও, কেউ হারায় কয়েক হপ্তা, কেউ কয়েক দিন। কয়েক মিনিট হারিয়ে ফেলার ঘটনাও ঘটেছে অনেক। রবিনেরটা কয়েক মিনিট। কারও কারও বেলায় ঠিক হয়ে যায় এটা, আবার ফিরে পায় ওই স্মৃতি। ওর বেলায় কি ঘটবে, জানি না। মাথায় আঘাত লাগার তিন চার মিনিট আগের সমস্ত ঘটনা মুছে গেছে তার মন থেকে।

মনে হয় ঠিকই বলেছ, বলল রবিন। হয়ত তা-ই ঘটেছে। আহত জায়গায় হাত চলে গেল। খুব আবছাভাবে মনে পড়ছে এখন, সারা ঘরে ছুটোছুটি করছিলাম। মাকড়সাটা লুকানর জায়গা খুঁজছিলাম। উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম খুব। কার্পেটের তলায়, গদির তলায়, কিংবা আলমারিতে ঢুকিয়ে রাখার কথা মনে এসেছিল। তবে ওসব জায়গা নিরাপদ বলে মনে হয়নি…
চুপ করল রবিন।
অন্যরাও চুপ করে রইল কয়েক মুহূর্ত। এরপর কি করেছে, মনে করার সুযোগ দিল রবিনকে। কিন্তু আর কিছু মনে করতে পারল না সে।
আমাকে দেখার পর একটা কাজ করাই সবচেয়ে স্বাভাবিক, বলল মরিডো। পকেটে ঢুকিয়ে ফেলা। হয়ত তাই করেছেন। তবে ভালমত রাখতে পারেননি তাড়াহুড়ায়। তারপর, যখন কার্নিসে উঠলেন, কোনভাবে পড়ে গেছে মাকড়সাটা। ব্যালকনিতে যখন আছড়ে পড়েছেন, তখনও পড়ে গিয়ে থাকতে পারে।
কিংবা হয়ত আমার হাতেই ছিল, পকেটে ঢোকাইনি, বলল রবিন। কোন এক সময় হাত থেকে ছুটে পড়ে গেছে। কার্নিস কিংবা ব্যালকনিতে পড়ে থাকার আশা খুবই কম, তবে সম্ভবত নিচে, আঙিনায় পড়েছে।
আঙিনায় পড়ে থাকলে পাওয়া যাবে, বলল মরিডো। ব্যালকনি কিংবা কার্নিসে থাকলেও পেয়ে যাব! কিন্তু, যদি পাওয়া না যায়… চুপ করে গেল সে।
কিংবা ঘরেও ফেলে এসে থাকতে পারেন, এতক্ষণে কথা বলল মেরিনা। হয়ত খোঁজার কথা ভাবেই না গার্ডেরা। ধরেই নেবে, আপনারা সঙ্গে নিয়ে গেছেন। যদি আঙিনায় পাওয়া না যায়, আগামীকাল রাতে আবার সে ঘরে ফিরে যাব আমরা। খুঁজব। কার্নিস আর ব্যালকনিও বাদ দেব না।

০৯.

সারাটা রাত ওই সেন্ট্রিরুমেই কাটিয়ে দিয়েছে তিন গোয়েন্দা।
ছাতে কেউ খুঁজতে আসেনি তাদেরকে। বেশ ভালই বুদ্ধি করেছিল মরিডো। ব্যালকনি থেকে ঝোলানো দড়ি, একটা ডানজনের দরজায়। পড়ে থাকা কিশোরের রুমাল (পরে জেনেছে তিন গোয়েন্দা) অন্যদিকে চোখ সরিয়ে রেখেছে পাহারাদারদের। হাতে খোঁজার কথা ভাবেইনি কেউ।
আরও কিছুক্ষণ কথা বলে চলে গিয়েছিল মরিডো আর মেরিনী। তারপর লম্বা হয়ে কাঠের বেঞ্চেই শুয়ে পড়েছে তিন কিশোর। সারাদিন প্রচণ্ড পরিশ্রম আর উত্তেজনার মাঝে কেটেছে, শক্ত কাঠের ওপর শুয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিল। রূপালী মাকড়সা
পরদিন সূর্য ওঠার পর ভাঙল ঘুম।

চোখ মেলল মুসা। বড় করে হাই তুলল, আড়মোড়া ভাঙল। পাশে চেয়ে দেখল, আগেই উঠে পড়েছে কিশোর। হালকা ব্যায়াম করছে। মাংসপেশীর জড়তা দূর করার জন্যে।
উঠে বসল মুসা। জুতো গলাল পায়ে। দাঁড়াল। এখনও ঘুমিয়ে আছে রবিন।
সকালটা বেশ সুন্দর, দেয়ালের ফোকর দিয়ে বাইরে উঁকি দিয়ে বলল মুসা। দিনটা ভালই যাবে, তবে আমাদের জন্যে না। পেটের ভেতর ছুঁচো নাচানাচি করছে। অথচ কোন খাবার নেই, নাস্তাই নেই, লাঞ্চ আর ডিনার তো স্বপ্ন! কিশোর, খাওয়া-টাওয়া পাব কিছু?
দুত্তোর তোমার খাওয়া! ঝাঁঝালো কণ্ঠ কিশোরের। কি করে বেরোব এই মৃত্যুপুরী থেকে তাই জানি না, খাওয়া! মরিডো কি করছে না করছে, রাতেও আসতে পারবে কিনা, তাই বা কে জানে!
সত্যিই বেরোতে পারব না আমরা এখান থেকে! চুপসে গেছে মুসা। তাহলে আর জীবনেও কিছু খাওয়া হবে না! হতাশ ভঙ্গিতে এদিক ওদিক মাথা নাড়ল সে। আচ্ছা, কিশোর, তোমার কি মনে হয়? জেগে উঠলে মনে করতে পারবে রবিন? রূপালী মাকড়সা কোথায় রেখেছে, বলতে পারবে?
কিশোর কোন জবাব দেবার আগেই চোখ মেলল রবিন। মিটমিট করে বন্ধ করল, তারপর আবার খুলল। আমরা কোথায়? বলতে বলতেই হাত নিয়ে গেল মাথার পেছনে, আহত জায়গায়। ইহ্! ব্যথা...! হ্যাঁ, এই বার মনে পড়েছে...
কি, কি মনে পড়েছে? লাফ দিয়ে দেয়ালের কাছ থেকে সরে এল মুসা। রূপালী মাকড়সা কোথায়, মনে পড়েছে?
মাথা নাড়ল রবিন। এখানে কি করে এলাম, সেটা মনে পড়েছে।
অ-অ! আবার হতাশ হয়ে পড়ল মুসা। আবার চলে গেল ফোকরের কাছে।
ভেব না, রবিন, আশ্বাস দিল কিশোর। সময় যাক। তোমার মাথার যন্ত্রণা যাক। তারপর হয়ত মনে পড়ে যাবে সব কথা...
এই, চুপ! চাপা গলায় হুঁশিয়ার করল মুসা। একটা লোক! এদিকেই আসছে!
দ্রুতপায়ে ফোকরের কাছে এসে দাঁড়াল অন্য দুজন।
ঢোলাঢালা ধূসর রঙের পোশাক পরনে। সামনের দিকে লম্বা। অ্যাপ্রন। হাতে ঝাড়, বালতি আর ন্যাকড়া। কয়েক পা এগিয়েই হাতের জিনিসগুলো নামিয়ে রাখল লোকটা। ভুরু কুঁচকে তাকাল একবার সেন্ট্রিরুমের দিকে। পেছনে সিঁড়ির দিকে তাকাল। তারপর এগিয়ে এল। পায়ে পায়ে।
টোকা পড়ল দরজায়। আস্তে করে।
মুসা, দরজাটা খুলে দাওঁ, ফিসফিস করে বলল কিশোর। গার্ড নয়। ও জানে, আমরা আছি এর ভেতর।

ছিটকিনি খুলে দিয়েই এক লাফে পাশে সরে গেল মুসা। তৈরি। যদি তেমনি বোঝে, লাফিয়ে পড়বে লোকটার ঘাড়ে। তিনজনে মিলে কাবু করে ফেলতে পারবে।
আস্তে ঠেলা দিয়ে দরজা খুলল লোকটা। চট করে ঢুকেই ঠেলে বন্ধ করে দিল আবার পাল্লা। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। তারপর গিয়ে দাঁড়াল একটা ফোকরের কাছে। সিঁড়ির দিকে চেয়ে বলল, কেউ পিছু লেগেছে কিনা, দেখছি! হুঁশিয়ার থাকা ভাল।
দুটো মিনিট চুপচাপ ফোকরের কাছে দাঁড়িয়ে রইল ওরা। দৃষ্টি সিঁড়ি আর ছাতের দিকে।
না, ফেউ লাগেনি পেছনে, অবশেষে বলল লোকটা। আমি ঝাড়দার। এক ফাঁকে উঠে চলে এসেছি। দেখেনি কেউ। মরিডোর মেসেজ আছে। জানতে চেয়েছে: রবিনের মনে পড়েছে কিনা।
না, জবাব দিল কিশোর। মরিডোকে বলবে, মনে পড়েনি।
বলব। অধৈর্য হতে মানা করেছে মরিডো। আঁধার নামলেই আসবে সে। এই যে নিন, খাবার। অ্যাপ্রনের পকেট থেকে একটা অয়েল-পেপারের প্যাকেট বের করে দিল লোকটা। আরেক পকেট থেকে একটা প্লাস্টিকের বোতল বের করল। আর এই যে, পানি।
খাবারের প্যাকেট আর বোতল হাতে নিল মুসা।
আমি যাই, বলল লোকটা। নিচের অবস্থা খুব খারাপ। ধৈর্য হারাবেন না, সাহেবরা। প্রিন্স পল রক্ষা করবেন আপনাদের। তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে চলে গেল ঝাড়দার।
দরজার ছিটকিনি তুলে দিল কিশোর।
ইতিমধ্যে খাবারের প্যাকেট অর্ধেক খুলে ফেলেছে মুসা। স্যাণ্ডউইচ, আর কিছু ফল। হাসি একান ওকান হয়ে গেল তার। আর দেরি করে লাভ কি? এস শুরু করে দিই। একটা স্যাণ্ডউইচ নিয়ে প্যাকেটটা বেঞ্চে নামিয়ে রাখল। কামড় বসাল খাবারে।
রেখে রেখে খেতে হবে, একটা স্যাণ্ডউইচ তুলে রবিনের দিকে বাড়িয়ে ধরল কিশোর। এই খাবার আর পানি দিয়েই চালাতে হবে সারাটা দিন। প্রাসাদে মরিডোর লোক না থাকলেই মরেছিলাম!
হ্যাঁ, স্যাণ্ডউইচ চিবোতে চিবোতে বলল রবিন। আচ্ছা, গতরাতে প্রিন্স দিমিত্রি আর মিনস্ট্রেল পার্টি নিয়ে কি যেন আলাপ করছিলে মরিডোর সঙ্গে। মাথার ব্যথায় ভালমত কান দিতে পারিনি।

কিছু কিছু কথা তো দিনেই শুনেছ, বলল কিশোর। দিমিত্রির বাবার রাজত্বকালে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন মরিডোর বাবা। ডিউক রোজার রিজেন্ট হয়েই তাঁকে চেয়ার ছাড়তে বাধ্য করল। তখন থেকেই রোজারের ওপর সন্দেহ মিনস্ট্রেলদের। ওরা বুঝে ফেলল, দিমিত্রিকে সহজে প্রিন্স হতে দেবে না ডিউক। কাজে নেমে পড়ল ওরা। গোপনে। একটা দল গঠন করল। প্রিন্স পলের নাম করে শপথ নিল, নিজেদের প্রাণের বিনিময়ে হলেও, রোজারের পরিকল্পনা সফল হতে দেবে না। গার্ড, অফিসার এমনকি চাকর-বাকর, ঝাড়দারদের মাঝেও লোক আছে তাদের। গতরাতে, আমাদেরকে গ্রেফতার করার আদেশ দিয়েছিল রোজার। সেটা জেনে ফেলেছিল একজন গার্ড, মিনস্ট্রেল পার্টির লোক। সঙ্গে সঙ্গে মরিডোকে জানিয়েছে সে ব্যাপারটা। এক বিন্দু দেরি করেনি মরিডো আর মেরিনা। ছুটে চলে এসেছে। নইলে তো গিয়েছিলাম ধরা পড়ে… স্যাণ্ডউইচে কামড় বসাল কিশোর। চিবিয়ে গিলে নিয়ে বলল, ছোট বেলায় প্যালেসে প্রায়ই আসত মেরিনা আর মরিডো। কোথাও ঢোকা বারণ ছিল না ওদের। ফলে এই প্রাসাদের গলি ঘুপচি প্রায় সবই ওদের চেনা। গোপন কোন পথ দিয়ে গিয়ে কোন্ সুড়ঙ্গে, ঢোকা যায়, সেখান থেকে নেমে যাওয়া যায় বিশাল নর্দমায়, জানে ওরা। গার্ডদেরও। অনেকেই চেনে না ওই পথ। ওদের চোখ এড়িয়ে তাই সহজেই প্রাসাদে ঢুকে পড়তে পারে দুই ভাইবোন, বেরিয়ে যেতে পারে।

খুব ভাল, বলে উঠল মুসা। তবে আমরা আটকে আছি ছাতে, এটা আবার খুব খারাপ কথা। তোমার কি মনে হয়? গার্ডদের চোখ এড়িয়ে আজ রাতে আসতে পারবে ওরা? বের করে নিয়ে যেতে পারবে আমাদের?

মনে তো হয়, বলল কিশোর। তার আগেই যদি অবশ্য ধরা না পড়ে যাই। এখান থেকে বেরিয়েই সোজা আমেরিকান এমব্যাসিতে চলে যেতে হবে আমাদের। ক্যাসেটটা তুলে দিতে হবে ওদের হাতে। রোজারের বিরুদ্ধে এটা একটা সাংঘাতিক প্রমাণ।

জেমস বৎ হলে নিশ্চিন্ত থাকতে পারতাম এখন, হাতের অবশিষ্ট স্যাণ্ডউইচটুকু মুখে পুরে দিল মুসা। দুই চিবান দিয়েই গিলে ফেলল কোঁৎ করে। জেমস বণ্ডের একটা সুবিধে আছে। যে বিপদেই পড়ুক না কেন, ঠিক বেরিয়ে যায়। তারজন্যে বিপদে পড়া আর না পড়া সমান কথা। কিন্তু আমাদের? নিজেরা কিছুই করতে পারছি না। অন্যের ওপর নির্ভর করে হাঁ হয়ে বসে থাকতে হবে সারাটা দিন!

আমাদের সাধ্যমত আমরা করেছি, করব, দৃঢ়কণ্ঠে বলল কিশোর। এখান থেকে বেরিয়ে যাব, প্রিন্স দিমিত্রিকে সাহায্যও করব। সহজে হাল ছাড়ছি না। তবে, মরিডো আর মেরিনা আসার আগে হাঁ করেই বসে থাকতে হবে আমাদের, এতে কোন সন্দেহ। নেই।…সেকেণ্ড, নাস্তা-লাঞ্চ সব একবারেই সেরে ফেলবে নাকি?

বাড়ানো হাতটা ঝট করে সরিয়ে নিল মুসা। করুণ চোখে তাকাল অবশিষ্ট কয়েকটা স্যাণ্ডউইচের দিকে। মনে করিয়ে দিয়েছ, ধন্যবাদ! ঠিক আছে লাঞ্চের সময়ই না হয় আবার খাব। আসলে, জানই তো, গোটা বিশেক স্যাণ্ডউইচ খাওয়ার পরেও একটা হাঁস খেয়ে ফেলতে পারি…
এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারলে ডবল খেয়ে পুষিয়ে নিয়ো, বলল কিশোর। ভবিষ্যতে বেশি খাওয়ার জন্যেই এখন কম খেয়ে প্রাণটা বাঁচিয়ে রাখতে হবে তোমাকে অনেক বড় একটা দিন পুড়ে আছে সামনে।
সত্যিই, অনেক দীর্ঘ একটা দিন। সারাটা দিন শুয়ে বসেই কাটাতে হল ওদের। কখনও উঠে গিয়ে ফোকরে চোখ রাখে, ছাতে কেউ উঠে আসছে কিনা দেখে।
অবশেষে সেইন্ট ডোমিনিকসের সোনালি গম্বুজের চূড়ার কাছে নেমে গেল সূর্যটা। দুএক মুহূর্ত ঝুলে রইল যেন অনিশ্চিতভাবে, তারপর টুপ করে ডুবে গেল পাহাড়ের ওপাশে। ভেনজো নদীর তীরে ঘন গাছগাছালির ভেতর থেকে ভেসে এল ঘরেফেরা পাখির কলরব। সেটাও থেমে গেল একসময়।
রাত নামল। ঘন হল অন্ধকার। সমস্ত প্রাসাদটা নীরব নিঝুম।
রাত বাড়ল বাড়তেই থাকল। দেখা নেই মরিডোর। অস্থির হয়ে উঠছে তিন গোয়েন্দা। তবে কি সে আসবে না? কোনরকম বিপদে পড়ে গেল?
দরজা খুলল মুসা। অন্ধকার ছাত! আকাশে মেঘ জমছে। দূরে মিটমিট করছে শহরের আলো। বাতিগুলোরও ঘুম পেয়েছে যেন।
হঠাৎ ধড়াস করে উঠল হৃৎপিণ্ডটা। পাঁই করে ঘুরল মুসা। কখন নিঃশব্দে পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে ওরা, টেরই পায়নি।
সেন্ট্রিরুমের দরজা বন্ধ করে দিয়ে টর্চ জ্বাল মরিডো। ফিসফিস করে বলল, এবার বেরোতে হয়। চলুন। আমেরিকান এমব্যাসিতে যেতে হবে। পরিকল্পনা বদল করেছে ডিউক রোজার। খবর পেলাম, প্রিন্স দিমিত্রির অভিষেক অনুষ্ঠান স্থগিত ঘোষণা করবে সে আগামী কালই। নিজেকে অনির্দিষ্টকালের জন্যে রিজেন্ট ঘোষণা করবে।
ঠেকানো যাবে না? জানতে চাইল কিশোর।
সম্ভব না। জনসাধারণকে যদি আসল কথাটা জানানো যেত, ছুটে আসত ওরা। ধ্বংস করে দিত রোজারকে। কিন্তু জানানো যাচ্ছে না। টেলিভিশন আর রেডিও স্টেশন দখল করে বসে আছে ডিউকের লোক। মিলিটারি দিয়ে ঘিরে রেখেছে। ওদেরকে হটানর ক্ষমতা আমাদের নেই, রবিনের দিকে ফিরল। রূপালী মাকড়সা কোথায় রেখেছেন, মনে পড়েছে? আঙিনায় পাওয়া যায়নি ওটা।
ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল রবিন। মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে।

মাকড়সাটা যদি পাওয়া যায়, বলে উঠল কিশোর, কি লাভ হবে? রোজারকে ঠেকানো যাবে এখন?
হয়ত, কথা বলল মেরিনা। মিনস্ট্রেলরা গোপনে একটা সভা ডাকতে পারবে। পাড়ার মাতব্বর গোছের কিছু কিছু লোককে ডেকে আনা হবে। মাকড়সাটা দেখিয়ে বলতে পারবে প্রিন্স দিমিত্রি সাহায্য চান। আমাদের হাতের রূপালী মাকড়সা দেখলে অবিশ্বাস করবে না তারা। খবরটা ছড়িয়ে পড়বে। এতে হয়ত স্রোতের মোড় ঘুরেও যেতে পারে। শুধু ডেনজো শহরের লোক খেপে উঠলেই রোজারের বারোটা বাজবে।
তাহলে, জোর দিয়ে বলল কিশোর। মাকড়সাটা খুঁজে বের করতেই হবে আমাদের। এবং সেটা এই প্রাসাদ ছাড়ার আগেই। ব্যালকনি, কার্নিস সব খুঁজব। শেষে ঢুকব সেই ঘরে। রূপালী মাকড়সানা নিয়ে যাব না।
বুঝতে পারছেন, কি ভয়ানক ঝুঁকি নিতে যাচ্ছেন? হুশিয়ার করল মরিডো।
পারছি, শান্ত কণ্ঠে বলল কিশোর। তবে, বিপদে না-ও পড়তে পারি। ওই ঘরে আবার ফিরে যাব আমরা, ভাববে না কেউ।...অন্তত, সে-সম্ভাবনা কম...

.

সেন্ট্রিরুম ছাড়ার আগে প্রতিটি সম্ভাবনার ব্যাপারে আলোচনা করল ওরা। এখানে ঢুকেছিল, এটা যাতে কেউ বুঝতে না পারে, সে ব্যাপারেও খুব সতর্ক হল। পড়ে থাকা খাবারের প্রতিটি কণা তুলে নিল, ফেলে দিল ফোকর দিয়ে ডেনজো নদীতে। প্যাকেটের কাগজটা দলে মুচড়ে বল বানিয়ে ফেলে দিল। মোট কথা, কোনরকম চিহ্নই রাখল না।
রাত আরও বাড়ার অপেক্ষায় রইল ওরা, পাহারাদারদেরকে ঝিমিয়ে পড়ার সময় দিল।
অনেক অপেক্ষা করেছি, একসময় বলে উঠল মরিডো। দুটো বাড়তি টর্চ এনেছি, এই যে, পকেট থেকে ছোট দুটো টর্চ বের করে মুসা আর কিশোরের হাতে তুলে দিল। নিতান্ত দরকার না হলে জ্বালবেন না। গতরাতের মতই আমি আগে থাকব, মেরি সবার পেছনে। ঠিক আছে?
নীরবে মাথা কাত করে সমর্থন জানাল তিন গোয়েন্দা।
এক সারিতে সেন্ট্রিরুম থেকে বেরিয়ে এল ওরা। একটাও তারা নেই আকাশে, ঢেকে গেছে কালো মেঘে। ওরা বেরোতে না বেরোতেই একটা দুটো করে বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে শুরু করল, বড় বড়।
সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল ওরা। পাঁচতলার করিডরে নেমে থামল। কালি গুলে দিয়েছে যেন কেউ। আধ হাত দূরের জিনিস দেখা যায় না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল

পুরো একটা মিনিট। না, কোন শব্দ কানে আসছে না। মরে গেছে যেন বিশাল প্রাসাদটা।

ঝুঁকি নিতেই হল। টর্চ জ্বালল মরিডো, অন্ধকারে এগোতে পারবে না নইলে। একবার জেলেই নিভিয়ে দিল আবার। পথ দেখে নিয়ে পা বাঁড়াল।

অন্ধকারে এগিয়ে চলেছে ওরা। মাঝে মাঝে টর্চ জ্বেলে পথ দেখে নিচ্ছে মরিডো। পেরিয়ে এল অসংখ্য করিডর, সিঁড়ি। ছেড়ে দিলে বলতেই পারবে না তিন গোয়েন্দা, কোন্ পথে এসেছে। পথ চিনে ফিরে যেতে পারবে কিনা সন্দেহ। মস্ত এক গোলক ধাঁধা যেন!

তবে মরিডো চেনে পথ। একটা ঘরে এসে ঢুকল সবাইকে নিয়ে ছিটকিনি তুলে দিল দরজায়।

একটু জিরিয়ে নিই এখানে, বলল মরিডো। এ-পর্যন্ত তো ভালই এলাম। তবে সবচেয়ে সহজ পথটা পেরিয়েছি। এইবার আসতে পারে বিপদ। আমার মনে হয়, আপনাদেরকে প্যালেসে আর খুঁজছে না ওরা এখন। তাহলে সতর্কতায় ঢিল পড়তে বাধ্য। সুযোগটা নেব আমরা। প্রথমে যাব সেই ঘরে, রূপালী মাকড়সা পাই আর না পাই। তারপর চলে যাব ডানজনে। সেখান থেকে নেমে পড়ব পাতালের ড্রেনে। মাটির তলা দিয়ে চলে যাব আমেরিকান এমব্যাসির কাছে। আপনাদেরকে। নিরাপদে পৌঁছে দিয়েই অন্য কাজে হাত দেন। পোস্টার টানাব, হরতাল করব মিনস্ট্রেলদের নিয়ে। ডিউক রোজারের শয়তানী ফাস করে দেব। জনগণকে চেতিয়ে দেবার চেষ্টা চালাব। তারপর যা থাকে কপালে, হবে। চুপ করল সে। তারপর বলল, চলুন, যাই। জানালা দিয়ে বেরিয়ে গতরাতের মত ব্যালকনিতে নামি। কার্নিস ধরে চলে যাব। সেই ঘরটায়।

দুটো দড়ি নিয়ে এসেছে ওরা। একটা মরিডোর হাতে পেঁচানো। আরেকটা মেরিনার কোমরে।

হাতের দড়িটা খুলে নিয়ে জানালার মাঝখানের দণ্ডের সঙ্গে শক্ত। করে বাঁধল মরিডো। তারপর দড়ি বেয়ে নেমে চলে গেল। কয়েক মুহূর্ত পরেই চাপা শিসের শব্দ এল ব্যালকনি থেকে। তারমানে পৌঁছে গেছে সে। ওদেরকে যাবার জন্যে ইঙ্গিত করেছে।

মুসা নেমে চলে গেল। তাকে অনুসরণ করল কিশোর।

জানালা দিয়ে বাইরে উঁকি দিল মেরিনা আর রবিন। ব্যালকনিতে আবছা আলো নড়াচড়া করছে। টর্চের মুখে হাত চাপা দিয়ে রূপালী মাকড়সা খুঁজছে তিনজনে। খানিক পরেই নিভে গেল আলো। আবার শোনা গেল চাপা শিস।

রবিনকে দুড়ি ধরে ঝুলে পড়তে বলল মেরিনা।

ব্যালকনিতে নেমে এসেছে পাঁচজনে। দড়িটা ঝুলে আছে। থাকবে এভাবেই। রূপালী মাকড়সা খোঁজা শেষ করে আবার এপথেই ফিরে যেতে হবে। করিডর আর গোপন কিছু সিঁড়ি বেয়ে নামবে মাটির তলার ডানজনে।
মাকড়সাটা এখানে পড়েনি, অন্ধকারে ফিসফিস করে জানাল মরিডে। কণ্ঠস্বরেই বোঝা যাচ্ছে, উত্তেজিত। কে জানে, নদীতেই পড়ে গেল কিনা! তবে ঘরটা অরি কার্নিস না দেখে শিওর হওয়া যাবে না।
ব্যালকনির রেলিঙ টপকে কার্নিসে নামল ওরা। দেয়ালের দিকে মুখ করে এক সারিতে এগিয়ে চলল শামুক-গতিতে। তেমনি নিঃশব্দে।
কার্নিসটা যেখানে নব্বই ডিগ্রি কোণ করে মোড় নিয়েছে, সেখানে এসে মুহূর্তের জন্যে থমকে গেল রবিন। নিচে অন্ধকারের দিকে তাকাল! এখানে পড়ে যায়নি তো রূপালী মাকড়সা! তাহলে গেল। আর পাওয়া যাবে না ওটা। এর বেশি ভাবতে চাইল না রবিন। পাশে সরে সরে আবার এল সঙ্গীদের সঙ্গে।
কয়েক পা করে এগিয়েই টর্চ জ্বেলে দেখে নিচ্ছে মরিডো। শেষ। পর্যন্ত পৌঁছুল এসে সেই ঘরটার ব্যালকনিতে। কিন্তু পাওয়া গেল না। রূপালী মাকড়সা। শেষ ভরসা এখন, ওই ঘর। ওখানেও যদি না পাওয়া যায়, রবিনের মতই আর ভাবতে চাইল না সে-ও।
সবাই এসে উঠল ব্যালকনিতে। সাবধানে। পর্দা সরিয়ে ঘরের ভেতরে উঁকি দিল মরিডো। অন্ধকার। কেউ আছে বলে মনে হল না। টর্চের আলো ফেলে নিশ্চিত হল, কেউ নেই।
একে একে ঘরে এসে ঢুকল ওরা সবাই।
এইবার খুঁজতে হবে, বলল কিশোর। কোথাও বাদ দিলে চলবে না। আনাচে-কানাচে, জিনিসপত্রের তলায়, সব জায়গায় দেখতে হবে।
হঠাৎ তীক্ষ্ণ কর্কশ একটা শব্দে চমকে উঠল সবাই। কি করে জানি ঘরে এসে ঢুকেছে একটা ঝিঁঝি পোকা।
ঘরে ঝিঁঝি ঢোকা সৌভাগ্যের লক্ষণ, ফিসফিস করে বলল মুসা। এটা আফ্রিকান প্রবাদ। প্রচুর সৌভাগ্য এখন দরকার আমাদের।
হয়েছে, বলল কিশোর। কথা না বলে এস এখন কাজ করি।
খুঁজতে শুরু করল ওরা। হাঁটু মুড়ে বসে, দরকার পড়লে উপুড় হয়ে শুয়ে, প্রতিটি বর্গ ইঞ্চি জায়গা খুঁজে দেখতে লাগল। কার্পেটের তলা, গদির নিচে দেখল আগে। তারপর দেখল খাট, আলমারি আর অন্যান্য আসবাবপত্রের তলায়। শেষে দেখল আলমারির প্রতিটি ড্রয়ার, মাকড়সাটা লুকিয়ে রাখা যেতে পারে, এমন প্রতিটি জায়গায়।

খাটের তলায় ঢুকে পড়ল রবিন। হাতে লাগল শক্ত মসৃণ কিছু। পেয়েছি! বলে চেঁচিয়ে উঠেই চুপ হয়ে গেল। প্রতিটি টর্চের আলো এসে পড়ল তার হাতের ওপর। ধাতব জিনিস। তবে রূপালী মাকড়সা নয়। অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি। ক্যামেরার ফিল্মের কৌটার ঢাকনা।
দুত্তোর! ক্রল করে এগিয়ে গেল রবিন। উপুড় হয়ে বসে আলো ধরে রেখেছে মুসা।
ক্রিক! ক্রিক! তীক্ষ্ণ শব্দ উঠল।
আলো সরে গেল মুসার টর্চের। সবাই দেখল, ঘরের কোণের দিকে দ্রুত সরে যাচ্ছে কালো একটা পোকা। ঝিঁঝি। আলোয় অস্বস্তি বোধ। করছে। ছুটে অন্ধকারে পালাতে চাইছে।
কপাল খারাপ পোকাটার। তাড়াহুড়ো করে লাফিয়ে সরতে গিয়ে পড়ল প্রিন্স পলের মাকড়সার জালে। ছাড়া পাবার জন্যে ছটফট করতে লাগল।
দুলে উঠল জাল। সুতো বেয়ে খবর পৌঁছে গেল মাকড়সার কাছে। তক্তার প্রান্ত আর মেঝের মাঝখানে সেই ফাঁকটাতেই বসে আছে। মাকড়সা, গায়ে গা ঠেকিয়ে। দুটো। লাল বড় বড় চোখ চকচক করছে আলোয়।
দ্রুত জাল বেয়ে উঠে এল একটা মাকড়সা। তাই করে ওরা। সঙ্গীসাথী যতই থাকুক, শিকার ধরা পড়লে এক জালে একটা মাকড়সাই উঠে আসে। মুখ থেকে আঠালো সুতো বের করে পেঁচিয়ে ফেলে শিকারকে। তারপর ধীরেসুস্থে বসে আরাম করে চুষে খায় রস।
খুব বেশিক্ষণ ছটফট করতে পারল না বেচারা ঝিঁঝি। দ্রুত জড়িয়ে যেতে লাগল আঠালো সুতোয়। নড়ার ক্ষমতাই আর রইল না। সাদাটে কালো একটা গোল পুটুলি হয়ে ঝুলে রইল জালে।
ছুটে গিয়ে ঝিঁঝিকে মুক্তি দেবার প্রচণ্ড ইচ্ছেটা জোর করে রোধ। করল রবিন। পোকাটাকে সরিয়ে আনতে হলে জাল ছিঁড়তে হবে মাকড়সার। হয়ত বা মাকড়সাটাকে আহত করতে হতে পারে। কিন্তু সেটা অসম্ভব। ভ্যারানিয়ার সৌভাগ্যবাহী প্রাণীর গায়ে আঙুল ছোঁয়ালেই মৃত্যুদণ্ড হয়ে যাবে তার।
কই, তোমার আফ্রিকান প্রবাদের কি হল? মুসার দিকে ফিরে বলল রবিন। আমাদের সৌভাগ্য আনতে গিয়ে ওই বেচারাকেই মরতে হল। ভাবছি, আমরাও না আবার রোজারের জালে জড়িয়ে মরি, ওই ঝিঁঝিটার মতই!
চুপ করে রইল মুসা।
খাটের তলায় পাওয়া গেল না, রূপালী মাকড়সা। বেরিয়ে এল রবিন। আলমারির সমস্ত ড্রয়ার খুলে মেঝেতে ফেলেছে মরিডো আর কিশোর। ফোকরে হাত ঢুকিয়ে দেখছে।

মনে হয়, ফিসফিস করে বলল কিশোর, নদীতেই পড়ে গেছে। মাকড়সাটা! গার্ডেরা পায়নি, আপনি শিওর তো? মরিডোকে জিজ্ঞেস করল সে।
শিওর, বলল মরিডো। ভয়ানক খেপে আছে ডিউক রোজার। মাকড়সাটা পেয়ে গেলে অন্যরকম থাকত তার মেজাজ। পেছনে এসে দাঁড়ানো রবিনের দিকে ফিরল সে। আলো ফেলল তার গায়ে।
এদিক ওদিক মাথা নাড়ল রবিন ধীরে ধীরে। সেই আগের মতই অন্ধকারে ঢেকে আছে তার স্মৃতির কয়েকটা মিনিট। কিছুতেই ঢাকনা। সরাতে পারছে না ওখান থেকে।– ঠিক আছে, আবার একবার খুঁজে দেখি সারা ঘর, বলল মরিডো। কিশোরের দিকে ফিরল। আসুন, আমরা সুটকেসগুলো দেখি। মেরি, তুমি দেখ বালিশের খোলের ভেতরে। গদিটাও তুলে দেখ আরেকবার।
জানে ওরা, বৃথা সময় নষ্ট, তবু আরেকবার খুঁজে দেখল।
পাওয়া গেল না রূপালী মাকড়সা।
ঘরের মাঝখানে এসে জড়ো হল সবাই।
নেই এ ঘরে, কাঁপছে মরিডোর গলা। রোজারের লোকেরা পায়নি, আমরা পেলাম না, তারমানে গেল রূপালী মাকড়সা। নদীতেই পড়েছে ওটা! পাওয়ার আশা নেই আর।
তাহলে, কি করব এখন আমরা? বলল কিশোর। স্বেচ্ছায় নেতৃত্ব ছেড়ে দিয়েছে মরিডোর হাতে। এছাড়া গতি নেই এপ্রাসাদে। ওর। সাহায্য ছাড়া এখানে কিছুই করতে পারবে না তিন গোয়েন্দা।
বেরিয়ে যাব, বলল মরিডো। নিরাপদ জায়গায়,.. তার মুখের কথা মুখেই রইল। ঝটকা দিয়ে খুলে গেল দরজা। দপ করে জ্বলে উঠল। তীব্র উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলো। চোখ ধাধিয়ে গেল ওদের।
খবরদার! যেখানে আছ, দাঁড়িয়ে থাক! এল কর্কশ আদেশ। অ্যারেস্ট করা হল তোমাদের!
দীর্ঘ একটা মুহূর্ত। দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগল পাঁচজনে। হঠাৎই নড়ে উঠল মরিডো। লাফ দিল সামনে। একই সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, মেরিনা, ওঁদেরকে নিয়ে পালাও! ব্যাটাদের ঠেকাচ্ছি আমি!
আসুন! চেঁচিয়ে উঠল মেরিনা। জানালার দিকে ছুটেছে। আসুন আমার সঙ্গে!
পাঁই করে ঘুরেই জানালার দিকে দৌড় দিতে গেল রবিন আর কিশোর। শক্ত একটা থাবা পড়ল কিশোরের ঘাড়ে। তার শার্টের কলার চেপে ধরেছে। কিছুতেই ছাড়াতে পারল না সে।
দুপা এগোল রবিন। পরক্ষণেই পিঠের ওপর এসে পড়ল ভারি দেহ। জড়াজড়ি করতে করতে গায়ের ওপর এসে পড়েছে মরিডো আর এক প্রহরী।

ধাক্কা লেগে দড়াম করে হাত পা ছড়িয়ে আছড়ে পড়ল রবিন। জোরে ঠুকে গেল কপাল আর মাথার একটা পাশ। মেঝেতে পুরু কার্পেট না থাকলে খুলিই ফেটে যেত হয়ত। গত চব্বিশ ঘণ্টায় এই নিয়ে দুবার আঘাত পেল মাথায়।
জ্ঞান হারাল রবিন।

.

চোখ বন্ধ করে পড়ে আছে রবিন। কানে আসছে কিশোর আর মরিডোর কথা।
ওই ঝিঁঝিটার মতই জালে আটকা পড়লাম, বলল কিশোর। বাইরে করিডরে লোক থাকবে, কল্পনাও করিনি। উত্তেজনার বশে হয়ত জোরেই কথা বলে ফেলেছিলাম। কানে গিয়েছিল ব্যাটাদের। কিংবা কোন ফাঁক ফোকর দিয়ে আলোও দেখে থাকতে পারে।
আমিও কল্পনা করিনি, বিষণ্ন কণ্ঠ মরিডোর। তাহলে ওই করিডরে আগেই একবার উঁকি দিয়ে যেতাম। যাক, মুসাকে নিয়ে মেরি অন্তত পালাতে পেরেছে।
কিন্তু ওরা দুজনে কি করতে পারবে?
জানি না। হয়ত কিছুই না। বাবা আর মিনস্ট্রেল পার্টির লোকদের জানাতে পারবে বড়জোর, আমরা ধরা পড়েছি। বাবা উদ্ধার করতে পারবে না আমাদের, তবে সময়মত লুকিয়ে পড়তে পারবে। ডিউক রোজারের হাতে পড়ে কষ্ট ভোগ করতে হবে না।
কিন্তু আমরা তিনজন পড়লাম বিপাকে! দিমিত্রিও। তিক্ত কিশোরের গলা। প্রিন্সকে সাহায্য করতে এসেছি। তা-তো করতে পারিইনি, উল্টে রোজারের পথ সাফ করে দিলাম। আমাদের কাম সারা।
কা-ম সারা!
বাংলা শব্দ। মানে, আমরা শেষ।...মনে হয়, রবিনের জ্ঞান ফিরেছে। ইসস, বেচারা নথি। দুই বার লাগল বাড়ি, দুবারই মাথায়।
চোখ মেলল রবিন। কাঠের চৌকিতে শুধু পাতলা চাদরের ওপর শুয়ে আছে চিত হয়ে। ঘরে ম্লান আলো। মোমবাতিটার দিকে চেয়ে চোখ মিটমিট করল সে। পাথরের দেয়াল ঘেঁষে পাতা রয়েছে চৌকি। মাথার ওপরে পাথরের ছাত। লোহার ভারি দরজার ওপর দিকে ছোট গোল একটা ফুটো, বাইরে থেকে ঘরের ভেতরটা দেখার জন্যে।
সঙ্গীকে চোখ মেলতে দেখে কাছে এসে দাঁড়াল কিশোর আর মরিডো।
উঠে বসল রবিন। এর পরে আর কখনও ভ্যারানিয়ায় এলে মাথায় হেলমেট পরে আসব, শুকনো হাসি হাসল সে।
ভালই আছেন, মনে হচ্ছে! বলল মরিডো। একটা দুশ্চিন্তা গেল।
রবিন, মনে করতে পারছ কিছু? জিজ্ঞেস করল কিশোর। ভালমত ভেবে দেখ।

নিশ্চয়। ঝটকা দিয়ে খুলে গেল দরজা। ঘরে ঢুকল গার্ডের। এক ব্যাটাকে আমার ওপর ছুঁড়ে ফেললেন মরিডো। ব্যস, উপুড় হয়ে পড়ে খেলাম মাথার বাড়ি। তারপর আর কিছু মনে নেই।
আমি জানতে চাইছি রূপালী মাকড়সার কথা। মনে পড়ছে কিছু?
না। ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল রবিন।
হুমম! অনেক সময় দ্বিতীয়বার মাথায় চোট লাগলে চলে যায় অ্যামনেশিয়া। ফিরে আসে স্মৃতি।
আসেনি, বিষণ্ন কণ্ঠে বলল রবিন। কয়েকটা মিনিট এখনও ফাঁকা!
এটা বরং ভালই হল, বলে উঠল মরিডো। যতই চাপাচাপি করুক ডিউক রোজার, রূপালী মাকড়সার খোঁজ জানতে পারবে না।
ঠিক এই সময় চাবির গোছর শব্দ হল বাইরে। খুলে গেল ভারি দরজা। দুজন লোক। রয়্যাল গার্ডের ইউনিফর্ম পরা। বুটের গট গট শব্দ তুলে ভেতরে এসে ঢুকল ওরা। হাতে শক্তিশালী বৈদ্যুতিক লণ্ঠন। উজ্জ্বল আলো। দুজনেরই ডান হাতে ঝকঝকে খোলা তলোয়ার।
এস, ভারি মোটা একটা কণ্ঠস্বর। ডিউক রোজার অপেক্ষা করছেন। ওঠ। আমাদের মাঝখানে থাকবে। চালাকির চেষ্টা করলে বুঝবে মজা! তলোয়ার তুলে শাসাল সে।
ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল তিন বন্দি। আগে রইল এক প্রহরী, পেছনে অন্যজন। নিয়ে চলল বন্দিদের।
সরু অন্ধকার একটা করিডরে বেরিয়ে এল ওরা। বাতাসে ভাপসা গন্ধ। পায়ের তলায় পাথরের মেঝে কেমন ভেজা ভেজা, ঘেমে উঠেছে। যেন। সামনে পেছনে দুদিকেই অন্ধকার।
ঢালু হয়ে উঠে গেছে করিডর। একটা জায়গায় এসে থেমেছে সিঁড়ির গোড়ায়। কয়েক ধাপ সিঁড়ির পরেই আবার শুরু হয়েছে করিডর। দুপাশে সারি সারি লোহার দরজা। নিশ্চয় কয়েদখানা। এই করিডরের পরে আবার কয়েক ধাপ সিঁড়ি। ওপরে আরেকটা করিডরের মাথায় দাঁড়িয়ে আছে দুজন প্রহরী।
প্রহরীদের মাঝখান দিয়ে করিডরে উঠে এল ওরা। এখোল। সামনে, একপাশের একটা দরজা খোলা। উজ্জ্বল আলো এসে পড়েছে করিডরে। দরজার সামনে বন্দিদেরকে নিয়ে আসা হল। একবার ভেতরে চেয়েই শিউরে উঠল কিশোর আর রবিন। এই ধরনের ঘর এর আগেও দেখেছে ওরা, ভয়াল ছায়াছবিতে। শত শত বছর আগেকার, মধ্যযুগীয় পীড়ন ঘর। তবে এটা ছায়াছবি নয়, বাস্তব।
পেছন থেকে ধাক্কা দিয়ে ঘরে ঢুকিয়ে দেয়া হল ওদের। লম্বা একটা ঘর। বিচিত্র, কুৎসিত সব জিনিসপত্র। নির্যাতনের যন্ত্র। একপাশে কুৎসিত একটা ব্ল্যাক থেকে

ঝুলছে এক হতভাগ্য। লোহার শেকলে বাঁধা কব্জি। পায়ের সঙ্গে শেকল দিয়ে বেধে ঝুলিয়ে দিয়েছে ভারি পাথর। লম্বা হয়ে গেছে লোকটা। মাঝখান থেকে দুটুকরো হয়ে ছিঁড়ে যাবে আরেকটু টান পড়লেই। পরনে একটা সুতোও নেই। হাড়ের ওপর কটুচকে জড়িয়ে আছে শুকনো চামড়া।
আরেকদিকে বিশাল একটা গোল পাথর, গম ভাঙার যাতার মত দেখতে, তবে অনেক বড়। ওটার গায়ে টান টান করে আটকে দেয়া হয়েছে আরেকটা মানুষকে। এক এক করে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে ভাঙা হয়েছে হাত-পায়ের হাড়।
আরও সব বিচিত্র যন্ত্রপাতি। বেশির ভাগেরই নাম জানা নেই কিশোর কিংবা রবিনের। পাথর, লোহা কিংবা কাঠের তৈরি। ঘরের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে ছয় ফুট লম্বা এক লোহার মেয়েমানুষ। ওই জিনিস আগেও দেখেছে কিশোর, সিনেমায়। আয়রন মেইডেন বা লৌহমানবী নাম। আসলে মেয়েমানুষের আকৃতির একটা লম্বা বাক্স ওটা। একপাশে কজা। টান দিয়ে বাক্সের ডালা খোলার মতই খোলা যায়। ভেতরের দেয়ালে চোখ কাটা বসানো। বন্দিকে ধরে তার ভেতরে ঢুকিয়ে ধীরে ধীরে ডালা বন্ধ করা হয়। শরীরে ঢুকে যেতে থাকে অসংখ্য কাটা। কাটাগুলোর মাধ্যায় আবার এক ধরনের ওষুধ মাখিয়ে রাখা হয়। রক্তের সঙ্গে মিশে গিয়ে যন্ত্রণা শতগুণে বাড়িয়ে তোলে বন্দির।
টর্চার রুম! ফিসফিস করে বলল মরিডো। কাঁপছে গলা। এটা তৈরি হয়েছে সেই ব্ল্যাক প্রিন্স জনের আমলে। ভয়াবহ এক পিশাচ ছিল লোকটা। মধ্যযুগের সবচেয়ে অত্যাচারী সাত আটজন শাসকের একজন। ওর পরে এই ঘর আর কেউ ব্যবহার করেনি বলেই জানতাম। কিন্তু এখন তো দেখছি অন্যরকম! ডিউক রোজার গোপনে ঠিকই ব্যবহার করছে এটা!
পেটের ভেতরে অদ্ভুত একটা শিরশিরে অনুভূতি হল কিশোরের। একসঙ্গে ঢুকে পড়েছে যেন কয়েক ডজন প্রজাপতি, ডানা নাড়ছে! আড়চোখে দেখল, ফ্যাকাসে হয়ে গেছে রবিনের চেহারা। কিছু একটা বলতে গিয়েও থেমে গেল।
চুপ! ধমকে উঠল এক প্রহরী। ডিউক রোজার আসছেন।
স্প্রিঙের মত লাফিয়ে উঠে অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে দরজার দুপাশে দুজন প্রহরী। বুটের খটাশ শব্দ তুলে স্যালুট করল।
গটমট করে হেঁটে এসে ঘরে ঢুকল ডিউক রোজার। পেছনে এল। ডিউক লুথার মরিজ।
বন্দিদের সামনে এসে দাঁড়াল রোজার। কুৎসিত হাসি ফুটল ঠোঁটে। ইঁদুরের বাচ্চারা, ফাঁদে পড়লে শেষে! এইবার খেচানো হবে চোখা শিক দিয়ে। যত খুশি, গলা ফাটিয়ে চেঁচিও। কোন আপত্তি নেই। তারপর গড়গড় করে জবাব দিয়ে যাবে আমার প্রশ্নের। নইলে…

ধুলো ঝেড়ে একটা চেয়ার নিয়ে এসে পেতে দিল এক প্রহরী। বসে পড়ল তাতে রোজার। আরেকটা লম্বা বেঞ্চ এনে পেতে দেয়া হল। তাতে রোজারের মুখোমুখি বসিয়ে দেয়া হল তিন বন্দিকে।
চেয়ারের হাতলে আঙুল দিয়ে ধীরে ধীরে টোকা দিল রোজার। তারপর, মরিডো, তুমিও আছ এর মধ্যে বেশ! টের পাবে তোমার বাবা, পুরো পরিবার। তোমার কথা বাদই দিলাম।
ঠোঁটে ঠোঁট চেপে রেখেছে মরিডো। কোন জবাব দিল না।
তারপর? আমেরিকান বিচ্ছুরা? রোজারের গলায় কেমন খুশির আমেজ। ধরা তো পড়লে। একটা অবশ্য গেল পালিয়ে। তাতে কিছু যায় আসে না। এবার কিছু প্রশ্নের জবাব দেবে আমার? না না, তোমরা কেন এসেছ, জানতে চাই না। সেটা ক্যামেরাগুলোই জানিয়ে দিয়েছে। ভ্যারানিয়ার বিরুদ্ধে গুপ্তচরগিরি করতে এসেছ। মস্ত অপরাধ। তার চেয়ে বড় অপরাধ করেছ রূপালী মাকড়সা চুরি করে। সামনে ঝুকল। হঠাৎ চেহারা থেকে চলে গেল খুশি খুশি ভাবটা। কোথায় ওটা?
আমরা চুরি করিনি, কণ্ঠস্বর শান্ত রাখার চেষ্টা করল কিশোর। কোন্ হারামজাদা চুরি করে আমাদের ঘরে রেখে এসেছিল। আলমারির ড্রয়ারে।
ক্ষণিকের জন্যে ধক করে জ্বলে উঠল রোজারের চোখের তারা। তারপরই স্বাভাবিক হয়ে গেল আবার। বেশ, বেশ! তাহলে স্বীকার করছ, মাকড়সাটা ছিল তোমাদের ঘরে। এটাও এক ধরনের অপরাধ। যাকগে। খুব নরম মনের মানুষ আমি। দুটো কিশোরকে মারধর করতে খুব মায়া হবে। মাকড়সাটা কোথায় আছে, বলে দাও। ছেড়ে দেব তোমাদেরকে।
কিশোরের দিকে তাকাল রবিন। দ্বিধা করছে গোয়েন্দাপ্রধান। শেষে বলে ফেলল, আমরা জানি না। কোথায় আছে, বলতে পারব না।
জেমস বণ্ডের ছবি খুব বেশি দেখেছ, না? ভ্রুকুটি করল রোজার। মারের চোটে হেগেমুতে ফেলবে ব্যাটা, তবু মুখ খুলবে না। রবিনের। দিকে তাকাল। তোমার কি ধারণা, বাচ্চা ইবলিস? রূপালী মাকড়সা কোথায়?
জানি না, মাথা নাড়ল রবিন।
জান না! গর্জে উঠল রোজার। দেখেছ, অথচ কোথায় আছে। জান না! কোথাও লুকিয়ে রেখেছ তোমরা। ফাঁকি দিতে চাইছ এখন। জানি না বললেই হল! কোথায় রেখেছ? কাউকে দিয়েছ?...জবাব দাও!
জানি না, বলল কিশোর। সারারাত চেঁচিয়ে যেতে পারবেন, জানি না-র বেশি কিছু বলতে পারব না আমরা।
বাহ্, চমৎকার! একেবারে জেমস বণ্ডের বাচ্চা! চুপ হয়ে গেল হঠাৎ। ধীরে ধীরে আঙুলের টোকা দিতে লাগল চেয়ারের হাতলে। হঠাৎ বলল, তবে ঘাড় থেকে ভূত

ছাড়িয়ে নিতে পারব। গোয়ার্তুমি রোগ সেরে যাবে একেবারে। তোমরা তো বাচ্চা খোকা। কত বড় বড় শক্তিশালী মানুষ এসে ঢুকেছে এখানে, পাথরের মত কঠিন। শেষে পানি হয়ে গেছে গলে। কোটা দিয়ে শুরু করব? আয়রন মেইডেন?
ঢোক গিলল কিশোর। চুপ করে রইল।
বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে! বলে উঠল মরিডো। ভ্যারানিয়ার ইতিহাস জানা আছে আপনার, ডিউক। সিংহাসন নিয়ে এর আগেও কাড়াকাড়ি খাবলাখাবলি হয়েছে। কেউই টিকতে পারেনি। তাছাড়া, ব্ল্যাক প্রিন্সের কথাও আপনার অজানা নয়। দেশের লোক খেপে গিয়ে টেনে টেনে ছিঁড়েছিল তাকে। ভুলে যাবেন না কথাটা।
বড় বড় কথা, না? দাঁত বের করে হাসল রোজার। ঠিক আছে, তোমার কথাই মেনে নিলাম। আয়রন মেইডেন ব্যবহার করব না। আগেই বলেছি, মনটা খুব নরম আমার। লোকের কষ্ট সইতে পারি না। তবে, কথা আমি আদায় করবই।
প্রহরীর দিকে চেয়ে আঙুলের ইশারা করল রোজার। জিপসি বুড়ো আলবার্তোকে নিয়ে এস।
জাদুকর আলবার্তো! উত্তেজিত হয়ে উঠেছে মরিডো। ও...ওকে...
চুপ! ধমকে উঠল রোজার।
দরজায় পদশব্দ হতেই মুখ ফিরিয়ে তাকাল কিশোর। রবিন আর মরিডোও তাকাল। বৃদ্ধ একজন লোক এসে ঢুকেছে ঘরে। দুদিক থেকে ধরে তাকে নিয়ে আসছে দুই প্রহরী। এককালে খুব লম্বা ছিল, বয়েসের ভারে কুজো হয়ে গেছে এখন। হাতের লাঠিতে ভর দিয়ে ঠুকঠুক করে এগিয়ে আসছে। উজ্জ্বল রঙের আলখেল্লা গায়ে, কানে সোনার আঙটা। এক ছটাক মাংস আছে কিনা মুখে, সন্দেহ। চামড়া কুঁচকে বসে গেছে হাড়ের গায়ে। বড় বড় দুটো নীল চোখ, ধক ধক করে জ্বলছে যেন। সব মিলিয়ে ঘুমের ঘোরে আঁতকে ওঠার মত চেহারা।
লাঠি ঠুকতে ঠুকতে এসে ডিউক রোজারের সামনে দাঁড়াল বুড়ো।
এই যে, এসে গেছে জিপসি বুড়ো, রোজারের কথার ধরনে মনে হল, আলবার্তোর মালিক মনে করে সে নিজেকে। কণ্ঠস্বরে নির্লজ্জ দাম্ভিকতা। তোমার জাদুক্ষমতা কিছু দেখাও তো, আলবার্তো। এই ছেলেগুলো কথা গোপন করতে চাইছে। বের করে আন পেট থেকে।
বুড়ো জিপসির কুৎসিত মুখে কঠিন হাসি ফুটল। আদেশ মানতে অভ্যস্ত নয় জিপসি, আলবার্তো। দুপাশের দুই প্রহরীকে আশ্চর্য ক্ষিপ্রতায় ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। গুডনাইট, ডিউক।
স্পর্ধা বটে বুড়োর! মুখ কালো হয়ে গেল রোজারের। কোনমতে দমন করে নিল রাগ। পকেট থেকে কয়েক টুকরো স্বর্ণ বের করল।

ভুল বুঝ না, জাদুকর, মোলায়েম গলায় বলল রোজার। এই যে নাও, তোমার সম্মানী। সোনার টুকরো।
ধীরে ধীরে ঘুরল আলবার্তো। শীর্ণ, ঈগলের নখের মত বাকানো আঙুলে একটা একটা করে টুকরো তুলে নিয়ে ঢোলা আলখেল্লার পকেটে ভরল।
হ্যাঁ, আলবার্তোর সঙ্গে যারা ভদ্র ব্যবহার করে, বলল জাদুকর। তাদের সাহায্য করে সে। তো, ডিউক, কি জানা দরকার?
এই ইবলিসের বাচ্চাগুলো ভ্যারানিয়ার রূপালী মাকড়সা লুকিয়ে রেখেছে, বলল রোজার। কিছুতেই বলতে চাইছে না। সহজেই জেনে নিতে পারি ওগুলো ব্যবহার করলে, নির্যাতনের যন্ত্রপাতিগুলো দেখাল। কিন্তু মনটা আমার খুবই নরম। ওসব করতে চাই না। তোমার প্রচণ্ড ক্ষমতা প্রয়োগ করলে কোন যন্ত্রণা হবে না, ব্যথা পাবে না, অথচ মনের কথা সুড়সুড় করে বলে দেবে ওরা। সেগুলো শুনতে চাই আমি।
ঠিক আছে, ফোকলা হাসি হাসল আলবার্তো। ঘুরে দাঁড়াল তিন বন্দির দিকে। ঝোলা আলখেল্লার পকেট থেকে বের করল একটা পেতলের কাপ আর চামড়ার একটা ছোট থলে। থলে থেকে কয়েক চিমটি কালো পাউডার তুলে নিয়ে ফেলল কাপে। আরেক পকেট থেকে বের করল দামি একটা সিগারেট লাইটার। আগুন ধরাল পাউডারে। নীল ঘন ধোয়া বেরিয়ে এল কাপের ভেতর থেকে।
নাও, শ্বাস নাও বাছারা! গলাটা বকের মত সামনে বাড়িয়ে দিয়েছে জাদুকর। বিড়বিড় করছে অদ্ভুত কণ্ঠে। এক এক করে কিশোর, রবিন আর মরিডোর নাকের কাছে ধরল কাপ! জোরে শ্বাস নাও! জাদুকর আলবার্তোর আদেশ! শ্বাস নাও! বুক ভরে টেনে নাও সত্যি ভাষণের-ধোয়া!
এদিক ওদিক মুখ ঘুরিয়ে ধোয়া থেকে নাক বাঁচানর চেষ্টা করল ওরা। পারল না। নাকের ভেতর দিয়ে যেন মগজে ঢুকে গেল নীল ধোয়া। জ্বালা ধরিয়ে দিল মস্তিষ্কে, ফুসফুসে। তারপর হঠাৎ করেই আশ্চর্য এক পুলক অনুভব করল। আর জোরাজুরি করতে হল না, নিজেদের ইচ্ছেতেই টেনে নিল ধোয়া। ঢিল পড়ল স্নায়ুতে, ঘুম ঘুম লাগছে।
এবার...তাকাও আমার দিকে! ধীরে ধীরে মোলায়েম গলায় বলল আলবার্তো। আমার চোখের দিকে...
পুরোপুরি ভাবতে পারছে না ওরা, তবু চোখ সরিয়ে রাখার চেষ্টা করল বুড়োর চোখ থেকে। পারল না। প্রচণ্ড এক আকর্ষণ, এড়ানর উপায় নেই। নীল চোখের তারার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে মনে হল গভীর নীল সাগরে ডুবে যাচ্ছে ধীরে ধীরে...চারপাশ থেকে চেপে ধরেছে। যেন পানি...কেমন এক ধরনের উষ্ণ আবেশ....

এইবার বল! আদেশ দিল আলবার্তো। রূপালী মাকড়সা কোথায় ওটা?
জানি না, ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল মরিডো। তার দিকেই চেয়ে আছে এখন বুড়ো। নীল চোখের তারা থেকে আর সরিয়ে নিচ্ছে না চোখ। জানি না...জানি না...
অহ্! বিড়বিড় করল বুড়ো। শ্বাস নাও! আরও জোরে...আরও টেনে...!
একবার করে আবার তিন বন্দির নাকের সামনে কাপ ধরল আলবার্তো, ওদেরকে ধোয়া টেনে নিতে বাধ্য করল। রবিনের মনে হল, আর পানিতে নয়, আকাশে উঠে পড়েছে। সঁতরে চলেছে মেঘের ভেতর দিয়ে।
বাঁকানো আঙুল দিয়ে মরিডোর কপাল টিপে ধরল বুড়ো আলতো করে। ধরে রাখল কয়েক মুহূর্ত, তারপর ছেড়ে দিল। তর্জনীর মাথা ছোঁয়াল কপালের মাঝখানে। মুখ নিয়ে এল মুখের সামনে। স্থির চোখে তাকাল মরিডোর চোখের তারার দিকে।
এবার, ফিসফিস করল বুড়ো। এবার বল!...ভাব! ভাব, কোথায় রেখেছ রূপালী মাকড়সা। কোথায়!...অহ!
দীর্ঘ আরেক মুহূর্ত মরিডোর কপালে আঙুল ছুঁইয়ে রাখল আলবার্তো। তারপর সরিয়ে আনল। কিশোরের ওপরও একই প্রক্রিয়া চালাল। শেষে অহ! বলে সরিয়ে আনল আঙুল কপালের ওপর থেকে।
রবিনের দিকে হাত বাড়াল বুড়ো। ওর কপালে আঙুল ছুঁইয়েই। ঝটকা দিয়ে সরিয়ে আনল, যেন জ্বলন্ত কয়লা ছুঁয়েছে। কুঁচকে গেল ভুরু। তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল রবিনের চোখের দিকে। স্থির চেয়ে রইল দীর্ঘ এক মুহূর্ত।
আলবার্তোর চোখের দিকে চেয়ে বার বার কেবল রূপালী মাকড়সার কথাই মনে আসতে থাকল রবিনের। দুনিয়ার আর সব ভাবনা চিন্তা সরে গেছে বহুদূরে। সে যেন উঠে বসেছে নীল মেঘের চূড়ায়। পায়ের নিচ দিয়ে ভেসে যাচ্ছে মেঘ। অদ্ভুত এক শূন্যতা মাথার ভেতরে। মনে করতে চাইছে, কোথায় আছে রূপালী মাকড়সা। হঠাৎ এক টুকরো কালো মেঘ আচ্ছন্ন করে ফেলল মনকে...
অবাক হল যেন আলবার্তো। আরেকবার তার প্রক্রিয়া চালাল রবিনের ওপর। বিড়বিড় করল নরম গলায়, ভাব! ভাব! অবশেষে শব্দ করে শ্বাস ফেলে ঘুরে দাঁড়াল।
চোখ মিটমিট করতে লাগল রবিন। মনে হল, প্রচণ্ড এক ঘূর্ণিপাক। থেকে মুক্তি দেয়া হয়েছে তাকে।
আপনমনেই ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল বুড়ো। তাকাল রোজারের দিকে।
প্রথম ছেলেটা জানে না, বলল আলবার্তো। ও দেখেনি রূপালী মাকড়সা। মাথাবড় ছেলেটা দেখেছে, তবে হাতে নেয়নি। জানে না কোথায় আছে। আর, ওই বেঁটে ছেলেটা হাতে নিয়েছিল। এবং তারপর...

তারপর? সামনে ঝুঁকে এসেছে রোজার। উত্তেজিত। তারপর কি?
ভাবছিল সে ঠিক মতই। হঠাৎ এক টুকরো কালো মেঘ এসে ঢেকে দিল মনকে। মেঘের ভেতরে হারিয়ে গেল.রূপালী মাকড়সা। এ ধরনের ঘটনার মুখোমুখি হইনি আর কখনও! ও জানত, কোথায় আছে। রূপালী মাকড়সা, তারপর হঠাৎ করেই মুছে গেল, মন থেকে। কিছুতেই মনে করতে পারছে না আর। ও না পারলে, আমারও কিছু করার নেই।
হারামির বাচ্চা! গাল দিয়ে উঠল রোজার। চিন্তিত ভঙ্গিতে টোকা দিতে লাগল চেয়ারের হাতলে। বুড়ো জিপসি... বলতে গিয়েও থেমে গেল সে। তাড়াহুড়ো করে স্বর পাল্টাল। জাদুকর আলবার্তো, তুমি যথেষ্ট করেছ। রূপালী মাকড়সা কোথায় রেখেছে, মনে নেই বিটার। এটা তোমার দোষ নয়। কিন্তু, অনুমানে কিছু বলতে পার না? প্রচণ্ড ক্ষমতা তোমার, জানি। অনুমান করা সম্ভব শুধু তোমার পক্ষেই। কোথায় থাকতে পারে রূপালী মাকড়সা? আগ্রহী চোখে আলবার্তোর দিকে। তাকাল সে। এক মুহূর্ত অপেক্ষা করল। ওটার আসলেই কি কোন দরকার আছে? ওটা ছাড়া আমার ইচ্ছে কি পূরণ হতে পারে না? নেহায়েত একটা দুধের বাচ্চাকে সিংহাসনে না বসালেই কি নয়? আমি বসতে পারি না?
রহস্যময় হাসি ফুটল বৃদ্ধ জাদুকরের ঠোঁটে। ডিউক, রূপালী মাকড়সার সঙ্গে সাধারণ মাকড়সার তফাৎ নেই। তোমার ইচ্ছের কথা বলছ? বিজয়ের ঘণ্টা শুনেছি আমি।...বয়েস তো অনেক হল। পরিশ্রম আর করতে পারি না। ঘুমানো দরকার। এবার তাহলে আসি। গুড নাইট!
রহস্যময় হাসিটা লেগেই রইল আলবার্তোর ঠোঁটে। লাঠি ঠুকতে ঠুকতে এগোল দরজার দিকে।
প্রহরীদের দিকে চেয়ে হাত নাড়ল রোজার। জাদুকরকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এস। তারপর ফিরল সঙ্গী ডিউক লুথারের দিকে। শুনলে তো? জাদুকর কি বলে গেল! রূপালী মাকড়সা শুধুই একটা সাধারণ রূপার টুকরো। ওটার কোন ক্ষমতা নেই। এবং ইচ্ছে করলে ওটা ছাড়াই চলতে পারি আমরা। তাছাড়া, ও বলল, বিজয়ের ঘণ্টা শুনতে পাচ্ছে। আর কোন দ্বিধা নেই আমার। জাদুকর আলবার্তোর ভবিষ্যদ্বাণী কখনও মিথ্যে হয় না। আর অপেক্ষা করে লাভ নেই। আগামীকাল সকালেই কাজে লেগে পড়। অ্যারেস্ট কর দিমিত্রিকে। অনির্দিষ্টকালের জন্যে নিজেকে রিজেন্ট ঘোষণা করব আমি। আমেরিকার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক বাতিল করে দেব, আমাদের ঘরোয়া ব্যাপারে অন্যায়ভাবে নাক গোনর জন্যে। ঘোষণা করব, দুটো আমেরিকান স্পাই এবং চোর ধরা পড়েছে আমাদের হাতে। তৃতীয়টার জন্যে পুরস্কার ঘোষণা করব। ভোর হওয়ার আগেই ধরে নিয়ে এস মরিডোর পরিবারের, সব লোককে। মিনস্ট্রেলদের যাকে যেখানে

পাবে, ধরে নিয়ে এসে ঢোকাও কয়েদখানায়। ওদের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ আন। একসঙ্গে অনেক কথা বলে দম নিল ডিউক। আগামীকাল সকালেই পুরো ভ্যারানিয়া চলে আসবে আমার হাতের মুঠোয়। তারপর সিদ্ধান্ত নেব, চোর দুটোকে নিয়ে কি করা যায়। কানমলা দিয়ে ছেড়ে দেব, বের করে দেব দেশ থেকে, নাকি বিচার হবে প্রকাশ্যে? প্রহরীদের দিকে তাকাল। এগুলোকে নিয়ে ভর কয়েদখানায়।

রবিনের দিকে ঝুঁকল রোজার। ইঁদুরের বাচ্চা, ভাব...ভেবে বের কর, কোথায় রেখেছ রূপালী মাকড়সা। জনতা আমার মত নরম মনের মানুষ নয়। ওদের হাতে তুলে দিলে জ্যান্ত ছাল ছাড়িয়ে নেবে।...মাকড়সাটা অবশ্য দরকার নেই আমার, আলবার্তো বলেছে। তবু, ওটা গলায় পরে সিংহাসনে বসতে বেশ ভালই লাগবে। প্রিন্সের মতই মনে হবে নিজেকে।

কাছে এসে দাঁড়িয়েছে প্রহরীরা।

ওদের দিকে চেয়ে বলল রোজার, নিয়ে যাও।

.

পাহারা দিয়ে নিয়ে চলল ওদেরকে দুজন প্রহরী। আবার সেই ডানজনে, পাতালের কয়েদখানায়।

আগে একজন প্রহরী, পেছনে রবিন, কিশোর, তাদের পেছনে মরিডো। চলতে চলতে মরিডোর গা ঘেঁষে এল পেছনের প্রহরী। কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল, নর্দমায় বন্ধু ইঁদুর আছে। বলেই সরে গেল।

মাথা ঝোকাল মরিডো।

ডানজনের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলল প্রহরী। ঠেলে বন্দিদেরকে ঢুকিয়ে দিল পাথরের ছোট্ট ঘরে। দেয়ালের কাছে জ্বলছে মোমবাতি, আলতো বাতাস লেগে কেঁপে উঠল শিখা। ছায়ার নৃত্য শুরু হল দেয়ালে।

পেছনে শব্দ তুলে বন্ধ হয়ে গেল আবার লোহার দরজা। তালা আটকানর আওয়াজ হল। বাইরে দরজার দুপাশে দাঁড়িয়ে গেল দুই প্রহরী। কড়া পাহারার আদেশ আছে তাদের ওপর।

দীর্ঘ কয়েকটা মুহূর্ত নীরব হয়ে রইল ওরা। নিস্তব্ধ পরিবেশ। কানে আসছে অতি মৃদু চাপা একটা কুলকুল ধ্বনি। পানি বইছে কোথাও। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে মরিডোর দিকে তাকাল দুই গোয়েন্দা।

প্রাসাদের নিচেই আছে ড্রেন, জানাল মরিভে। ডেনজো নদীতে গিয়ে পড়ছে পানি। বাইরে নিশ্চয় তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে। থামল সে। ডেনজোর ওই ড্রেনগুলো শত শত বছরের পুরানো। পাথরের তৈরি পাতাল-খাল বলা চলে ওগুলোকে। তলাটা

চ্যাপ্টা, ছাত ধনুকের মত বাঁকানো। মাটির তলায় মাইলের পর মাইল জুড়ে রয়েছে ওই ড্রেন। শুকনোর সময় হেঁটেই যাওয়া যায় ওর ভেতর দিয়ে। বর্ষায় পানিতে যদি একেবারে ভরে না যায়, নৌকা বাওয়া যায় অনায়াসে।
চুপ করে মরিডোর কথা শুনছে দুই গোয়েন্দা। চোখে মুখে আগ্রহের ছাপ।
ওদের দিকে চেয়ে হাসল মরিডো। আজকাল খুব কম লোকেই ঢোকে এর ভেতর। পথ হারিয়ে মরার ভয় আছে। তাছাড়া রয়েছে ইঁদুর। বেড়ালের সমান বড় একেকটা। কায়ামত পেলে ধরে জ্যান্ত মানুষ খেয়ে ফেলতেও দ্বিধা করে না। তবে আমি আর মেরি ভয় করি না ওসবকে। ভালমতই চিনি ভেতরটা। অনেকবার ঢুকেছি। ওর ভেতরে গিয়ে কোনমতে ঢুকতে পারলে ঠিক চলে যেতে পারব আমেরিকান এমব্যাসির তলায়। ম্যানহোল দিয়ে উঠে যেতে পারব বাইরে।
নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর, মাথা ঝোঁকাল আস্তে করে। বুঝলাম। কিন্তু আমরা বন্দি রয়েছি ডানজনে, দরজায় তালা। বাইরে প্রহরী। নর্দমায় পৌঁছব কি করে?
মিনিটখানেকের জন্যেও যদি সময় পাই, বলল মরিডো। পৌঁছে যেতে পারব। বাইরে যে করিডরুটা আছে, তার শেষ মাথায় রয়েছে ম্যানহোল। ওটা দিয়ে সহজেই ঢুকে পড়া যাবে ড্রেনে।
কিন্তু সেজন্যে বেরোতে হবে আগে, আবার নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে শুরু করল কিশোর।
ওখানে আমাদেরকে সাহায্য করার জন্যে লোক রয়েছে। এক প্রহরী মেসেজ দিয়েছে আমাকে।
তা দিয়েছে, কথা বলল রবিন। কিন্তু ওই যে, কিশোর বলল। ডানজন থেকে বেরোব কি করে আমরা?
হুউ! ধীরে ধীরে মাথা ঝোকাল মরিডো। চুপ করে গেল।
আচ্ছা, বলল রবিন। ওই বুড়ো জাদুকরটা আসলে কে? আমাদের মনের কথা জানল কি করে? থট রীডার গোছের কিছু?
হয়ত, মাথা ঝোঁকাল মরিডো। জানি না ঠিক। ভ্যারানিয়ায় এখনও কিছু জিপসি রয়েছে। তাদের সর্দার ওই বুড়ো। একশোর বেশি বয়েস। আশ্চর্য কিছু ক্ষমতার অধিকারী। কি সে ক্ষমতা, জানে না কেউই। বুঝতে পারে না। আমার তো মনে হয়, বুড়ো ঠিক জানতে পেরেছে, কোথায় আছে রূপালী মাকড়সা। কিন্তু বলেনি রোজারকে। তবে, একটা ব্যাপারে খারাপ হয়ে গেছে মনটা। ও বলেছে, বিজয়ের ঘণ্টা শুনতে পাচ্ছে। কখনও ভুল হয়নি ওর কথা! ফালতু কথা বলে না। তারমানে, সিংহাসন রোজারের দখলেই যাবে! ধরা পড়বে সমস্ত মিনস্ট্রেলরা, মৃত্যুদণ্ড হবে।

আমার বাপকে ধরে আনবে, বন্ধুদের ধরে আনবে। ধরে আনবে মেরিকে...চুপ করে গেল সে।
মরিডোর মনের অবস্থা বুঝতে পারছে রবিন। হাল ছেড়ে দেব না আমরা! দৃঢ় গলায় বলল সে। এক বুড়োর কথায় নিরাশ হয়ে ভেঙে পড়ার কোন মানে হয় না। কোনদিন ভুল করেনি বলেই যে সব সময় সত্যি হবে, এটা মানতে রাজি নই আমি। কিশোর, তোমার মাথায় কোন বুদ্ধি এসেছে?
অ্যাঁ! অন্য জগতে বিচরণ করছিল যেন এতক্ষণ গোয়েন্দাপ্রধান। হ্যাঁ, একটা বুদ্ধি এসেছে। এখান থেকে হয়ত বেরিয়ে যেতে পারব। প্রহরীদের দিয়ে আগে দরজা খোলাতে হবে। তারপর কাবু করে ফেলতে হবে ওদের।
দুটো অস্ত্রধারী লোককে কাবু করব? বলে উঠল মরিডো। কি জোয়ান একেকজন, দেখেছ? হাত দিয়ে চেপে ধরলে নড়তেই পারব। না। নাহ্, পারা যাবে বলে মনে হয় না! এদিক ওদিক মাথা দোলাল সে।
পারতেই হবে, জোর দিয়ে বলল কিশোর। একটা কথা মনে পড়ছে। রহস্য কাহিনীতে পড়েছিলাম। ওটা নিছকই গল্প। তবে বুদ্ধিটা কাজে লাগাতে পারলে, মনে হয় কাবু করে ফেলতে পারব।
কি? আগ্রহে সামনে ঝুঁকল রবিন।
আমাদের মতই বন্দি করে রাখা হয়েছিল একটা ছেলে আর একটা মেয়েকে, বলল কিশোর। বিছানার চাদর ছিঁড়ে দড়ি পাকিয়েছিল ওরা। ফাস তৈরি করে ফেলে রেখেছিল দরজার কাছে। তারপর মেয়েটা মেঝেয় পড়ে চেঁচাতে শুরু করেছিল পেট ব্যথা পেট ব্যথা বলে।
ভুরু কুঁচকে গেছে মরিডোর। আগ্রহী হয়ে উঠেছে সে। ঠিক, ঠিক বলেছেন! কাজ হবে এতে! গলার স্বর খাদে নামাল। কিন্তু ফাস বানাব কি দিয়ে?
কেন, বিছানার চাদর, বলল কিশোর। ওরা যা করেছিল। আমাদের এটা পুরানো। তাতে কিছু যায় আসে না। ছিঁড়ে ভালমত পাকিয়ে নিলে যথেষ্ট শক্ত হবে। হ্যাঁচকা টানে ছিঁড়বে না। ওরা ছিল দুজন, তা-ও আবার একজন মেয়ে। আমরা তিনজনেই ছেলে, গায়ে জোরও আছে। আমাদের তো আরও সহজে পারা উচিত।
ঠিক, বিড়বিড় করল মরিডো। সহজেই পারা উচিত। তাছাড়া, প্রহরীদের একজন আমাদের লোক। কাজেই দরজা খোলানো তেমন কঠিন হবে না।
কাজে লেগে পড়ল ওরা। পুরানো হলেও চাদরটা বেশ শক্ত। জোরে টান দিয়ে ছিঁড়তে গেলে শব্দ হবে। তাই আস্তে আস্তে ছিঁড়তে লাগল। তাড়াহুড়ো করল না মোটেই।
চার ইঞ্চি চওড়া একটা ফালি ছেঁড়া হয়ে গেল। আরেকটা ছিঁড়তে শুরু করল ওরা।

খুব ধীরে এগোচ্ছে কাজ। দাঁত ব্যবহার করতে হচ্ছে কখনও কখনও। একের পর এক ফালি ছিঁড়তে লাগল তিনজনে। বড় চাদর। শেষই হতে চায় না যেন আর। শব্দ হয়ে যাবার ভয়ে টান দিয়ে আধ ইঞ্চির বেশি ছিঁড়তে পারছে না একবারে।
আটটা ফালি ছেঁড়া হয়ে গেলে, থামল ওরা। হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল চিত হয়ে। বিশ্রাম নেবে। উত্তেজিত হয়ে আছে। শুয়ে সঙ্গে সঙ্গেই উঠে বসল আবার। না, কাজ শেষ না করে স্বস্তি পাবে না। কোন কারণে যদি দেখে ফেলে প্রহরীরা, চাদর ছিঁড়ছে ওরা, তাহলেই গেল সুযোগ। আর বেরোতে পারবে না। কাজেই, যত তাড়াতাড়ি শেষ করতে পারবে কাজ, ততই মঙ্গল। _ আবার ছিঁড়তে শুরু করল ওরা। আঙুল ব্যথা হয়ে গেছে। নাইলনের চাদর, কাজটা মোটেই সহজ নয়।
ছেঁড়ার কাজ শেষ হল। একটার সঙ্গে আরেকটা পাকিয়ে কয়েকটা দড়ি বানিয়ে ফেলতে হবে এখন।
এটা সহজ কাজ। বেশিক্ষণ লাগল না। তৈরি হয়ে গেল নাইলনের দড়ি। শক্ত। ফাঁস তৈরি করে ফেলল কিশোর। মরিডোর পায়ে লাগিয়ে টেনে দেখল।
উত্তেজনা চাপা দিতে পারল না মরিডো। ব্রোজাস! ফিসফিস করে বলল সে। কাজ হবেই। চারটে দিয়েই তো হবে। আর কি দরকার?
হ্যাঁ, হবে, মাথা ঝোঁকাল কিশোর।
আরও কয়েকটা বানিয়ে নিই, প্রস্তাব দিল রবিন। সঙ্গে নিয়ে যাব। কাজে লাগতে পারে দড়ি।
একটার সঙ্গে আরেকটা ফালি বেঁধে জোড়া দিয়ে নিল ওরা। বেশ লম্বা শক্ত আরেকটা দড়ি তৈরি হয়ে গেল। কোমরে পেঁচিয়ে নিল ওটা মরিডো।
এইবার আসল কাজ, ফিসফিস করে বলল কিশোর। নথি, চৌকিতে শুয়ে পড় চিত হয়ে। কোঁকাতে শুরু কর। মাঝে মাঝেই গুঙিয়ে উঠবে। এমন ভাব দেখাবে, যেন মাথার যন্ত্রণায় অস্থির। প্রথমে আস্তে, তারপর সুর চড়াতে থাকবে। মরিডো, দরজার কাছে দুটো ফাস বিছিয়ে দিন। ব্যাটারা ঢুকলেই যেন পা পড়ে।
তৈরি হয়ে গেল ফাঁদ। এইবার টোপ ফেলার পালা। গোঙাতে শুরু করল রবিন। সেই সঙ্গে কোঁকানি। বাড়তে থাকল। চড়তে লাগল সুর। চমৎকার অভিনয়। মনে হচ্ছে, সত্যি, মাথার যন্ত্রণায় ভারি কষ্ট পাচ্ছে বেচারা।
মিনিটখানেক পরেই দরজার ফোকরের ঢাকনা সরে গেল। মুখ দেখা গেল একটা। চোখ ঘরের ভেতরে। চুপ! ধমকে উঠল প্রহরী। এত গোলমাল কিসের? ভ্যারানিয়ান ভাষা। বুঝল না দুই গোয়েন্দা।
হাতে মোমবাতি নিয়ে রবিনের মুখের ওপর ঝুঁকে আছে কিশোর। চৌকির কাছেই দাঁড়িয়ে আছে মরিডো। প্রহরীর কথায় ফিরে চাইল। ব্যথা পেয়েছে, ভ্যারানিয়ান

ভাষায় জবাব দিল সে। গতরাতে দড়ি থেকে হাত ফসকে পড়ে গিয়েছিল। বাড়ি লেগেছে মাথায়। সাংঘাতিক, জ্বর উঠেছে এখন। ডাক্তার দরকার।
সব তোমাদের শয়তানী, ইবলিসের দল!
আমি বলছি, ও অসুস্থ! চেঁচিয়ে উঠল মরিডো। পায়ে পায়ে এগোল দরজার দিকে। এসে ওর কপালে হাত দিয়ে দেখ। ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাও।...তাহলে... তাহলে বলব রূপালী মাকড়সা কোথায় আছে। তোদের ওপর খুশি হবে ডিউক রোজার।
দ্বিধা গেল না প্রহরীর।
ভাল করেই জান, আবার বলল মরিডো, আমেরিকান ছেলে দুটোর কোন ক্ষতি হোক, এটা চায় না ডিউক। আমি বলছি ছেলেটা অসুস্থ। ওকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাও। রূপালী মাকড়সা পেয়ে যাবে। আহ, তাড়াতাড়ি কর! ওর অবস্থা খুব খারাপ!
সত্যি বলছে কিনা দেখা দরকার, ফোকরে উঁকি দিয়েছে এসে দ্বিতীয় প্রহরী। মরিডোর কানে কানে মেসেজ দিয়েছিল সে-ই। ডিউকের কুনজরে পড়তে চাই না। আমি দরজায় থাকছি, তুমি ভেতরে। গিয়ে দেখে এস। দুতিনটে বাচ্চা ছেলেকে ভয় করার কিছু নেই।
ঠিক আছে, বলল অন্য প্রহরী। যাচ্ছি। কথা সত্যি না হলে কপালে খারাপি আছে ওদের, বলে দিলাম!
তালায় চাবি ঢোকানর শব্দ হল। শব্দ তুলে, খুলে গেল দরজা। ভেতরে পা রাখল প্রহরী।
পা দিয়েই ফাঁদে আটকাল। দড়ির ফাঁসের মাঝখানে পা পড়ল প্রহরীর। হ্যাঁচকা টান দিয়ে ফাঁসটা আটকে দিল মরিডো। টান সইতে না পেরে দড়াম করে চিত হয়ে পড়ে গেল লোকটা। হাতের লণ্ঠন উড়ে গিয়ে পড়ল মেঝেতে।
লাফ দিয়ে এগিয়ে এসেছে কিশোর। আরেকটা ফাঁস আটকে দিল প্রহরীর গলায়। জোর টান দিলেই দম বন্ধ হয়ে যাবে। দ্রুত তৃতীয়। আরেকটা ফাস তার দুহাতে আটকে দিল মরিডো।
এতই দ্রুত ঘটে গেল ঘটনাগুলো, প্রথমে বিমূঢ় হয়ে গেল প্রহরী। চেঁচিয়ে উঠল হঠাৎ জলদি জলদি এস! বিচ্ছুগুলো আটকে ফেলেছে। আমাকে!
ছুটে এল দ্বিতীয় প্রহরী। দরজার পাশেই অপেক্ষা করছে মরিডো। চোখের পলকে পায়ে আর গলায় একটা করে ফাঁস আটকে গেল দ্বিতীয় লোকটারও। হাতে আটকাল আরেকটা।
দ্বিতীয় প্রহরীর কানে কানে ফিসফিস করে বলল মরিডো। ছাড়া পাবার ভান করতে থাক! চুপ করে থেক না।

হাত-পা ছোঁড়াছুড়ি করতে লাগল লোকটা।
শক্ত করে দুই প্রহরীকেই বেঁধে ফেলা হল। নড়ার উপায় রইল না আর ওদের।
মেঝেতে পড়ে থাকা লোক দুটোর দিকে চেয়ে হাসল মরিডো। মাকড়সার জালে আটকা পড়া পোকার অবস্থা হয়েছে যেন প্রহরীদের। শুভ লক্ষণ! আশা আর উদ্যম আবার ফিরে এল তার।
জলদি করুন! দই গোয়েন্দাকে বলল মরিডো। করিডরের অন্য মাথায় প্রহরী থাকতে পারে। চেঁচামেচি শুনলে ছুটে আসবে ওরা। লণ্ঠন তুলে নিন।
করিডরে বেরিয়ে এল মরিডো। পেছনে কিশোর আর রবিন। সামনে গাঢ় অন্ধকার। সেদিকেই ছুটল ওরা। ছোটার তালে তালে নাচছে বৈদ্যুতিক লণ্ঠনের আলো।
করিডরের প্রান্তে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল ওরা। সিঁড়ি নেমে গেছে। এক মুহূর্ত। সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করল মরিডো। একেক লাফে দুতিনটে করে সিঁড়ি টপকাচ্ছে। তাকে অনুসরণ করল দুই গোয়েন্দা।
সিঁড়ির শেষ ধাপের কাছেই একটা ম্যানহোল। লোহার ভারি ঢাকনা। কোনকালে শেষ খোলা হয়েছিল, কে জানে! মরচে পড়ে বাদামি হয়ে গেছে, তার ওপর পুরু হয়ে জমেছে ধুলো।
ঢাকনার রিঙ ধরে টান দিল মরিডো। নড়াতে পারল না। আবার টান দিল গায়ের জোরে। কোন কাজ হল না। অটল রইল ঢাকনা।
আটকে গেছে! ফাঁসাসে আওয়াজ বেরোল মরিডোর গলা থেকে। মরচে! নড়াতে পারছি না!
জলদি! বলে উঠল কিশোর। জলদি দড়ি ঢোকান রিঙের ভেতর। সবাই ধরে টান দেব!
ঠিক! দ্রুত কোমরে পেঁচানো দড়ি খুলে নিতে লাগল মরিডো।
সবটা খোলার দরকার হল না। একটা প্রান্ত রিঙের ভেতর দিয়ে ঢুকিয়ে দিল। শক্ত করে ধরল তিনজনে। টান লাগাল।
নড়ল না ঢাকনা।
ওরাও নাছোড়বান্দা। টান বাড়াল আরও, আরও...! পেছনে পায়ের শব্দ। দ্রুত এগিয়ে আসছে। আর সময় নেই। হ্যাঁচকা টান লাগাল ওরা। অটল থাকতে পারল না আর ঢাকনা। নড়ে উঠল!
ঠনন আওয়াজ তুলে পাথরের মেঝেতে উল্টে পড়ল ভারি ঢাকনা। গর্তের ভেতরে কালো অন্ধকার। পানি বয়ে যাবার শব্দ আসছে।
আমি আগে যাই, টেনে রিঙের ভেতর থেকে দড়িটা খুলে আনতে আনতে বলল মরিডো। দড়ি ধরে থাকবেন। তাহলে হারানর ভয়। থাকবে না।...নাহ, এসে গেছে

ব্যাটারা! ঢাকনা বন্ধ করে যাবার আর সময় নেই...
গর্তের ভেতরে পা রাখল মরিডো। দড়ির একটা প্রান্ত ধরে রেখে অদৃশ্য হয়ে গেল অন্ধকারে।
দড়ির মাঝামাঝি ধরেছে রবিন। লণ্ঠনের সরু হ্যাঁণ্ডেল ধরে রেখেছে। দাঁতে কামড়ে। গর্তের দিকে চেয়ে কেঁপে উঠল একবার। ওই অন্ধকার মোটেই ভাল লাগছে না তার। নিচ থেকে আসা পানির আওয়াজও কানে সুধা বর্ষণ করছে না। কিন্তু তবু যেতেই হবে। মুহূর্ত দ্বিধা করেই। ভেতরে পা রাখল সে।
হাঁটু অবধি পা ঢুকিয়ে দিল রবিন। কিছুই ঠেকল না। তবে কি সিঁড়ি নেই! না না আছে। লোহার মই। খাড়া। নেমে পড়ল সে। এক ধাপ...দুই ধাপ...পা পিছাল হঠাৎ করেই। হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে রাখতে পারল না ম্যানহোলের কিনারা।
রবিনের মনে হল, পতন আর কোন দিন শেষ হবে না। কিন্তু হল। প্রাচীন পাথুরে নর্দমার তলায় এসে নামল নিরাপদেই। গর্তের মুখ থেকে উচ্চতা বড় জোর সাত-আট ফুট হবে। কোনরকম আঘাত পায়নি, কারণ হাঁটু পানিতে পড়েছে। তাছাড়া, পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে ধরে ফেলেছে মরিডো।
চুপ, কানে কানে বলল মরিডো। ওই যে, কিশোর। সরুন। নামার জায়গা দিন।
কিশোরও পা পিছলাল। তবে রবিনের মত নিরাপদে নামতে পারল না। সড়াৎ করে পিছলে গেল। ধপ করে পড়ে গেল পাথরের মেঝেতে চিত হয়ে। মইয়ের গোড়ায় মাথা বাড়ি লাগার আগেই ধরে ফেলল তাকে মরিডো। টেনে তুলল।
বাপরে বাপ! ঠাণ্ডা!...উফফ, মেরুদণ্ডটা ভেঙেই গেছে! হাঁসফাস করে উঠল গোয়েন্দাপ্রধান।
বৃষ্টির পানি, তাড়াতাড়ি বলল মরিডো। ময়লা নেই। চলুন, কেটে পড়ি। দড়ি ছাড়বেন না কিছুতেই। পথ হারাবেন তাহলে। নদীর দিকে বয়ে যাচ্ছে পানি। ড্রেনের মুখে লোহার মোটা মোটা শিক...
মাথার ওপরে চিৎকার শুনে চুপ হয়ে গেল মরিডো। লণ্ঠন ঝুলছে, আলো।
সরে এল তিনজনে। হাঁটতে শুরু করল।
কয়েক গজ এগিয়েই নিচু হয়ে এল সুড়ঙ্গের ছাত। সোজা হয়ে দাঁড়ানো যাচ্ছে না। মাথা সামান্য নুইয়ে রাখতে হচ্ছে। হাঁটুর নিচে পানির তীব্র স্রোত। পিচ্ছিল মেঝে। অসতর্ক হলেই আছাড় খেতে হবে।
ম্যানহোলের মুখে অনেক লোকের চেঁচামেচি। একটা মোড় ঘুরতেই আলো আর দেখা গেল না।
ধীরে ধীরে দূরে, অনেক দূরে মিলিয়ে গেল যেন চেঁচামেচি। আসলে খুব বেশি এগোয়নি ওরা। ম্যানহোল দিয়ে সুড়ঙ্গের ভেতরে বাইরের শব্দ আসতে পারছে না ঠিকমত।

সুড়ঙ্গের একটা মিলনস্থলে এসে পৌঁছুল ওরা। আরেকটা সুড়ঙ্গের সঙ্গে আড়াআড়ি মিলিত হয়েছে প্রথমটা। যেমন উঁচু তেমনি চওড়া। ওটাতে ঢুকে পড়ল ওরা।

দাঁড়ানো যাচ্ছে এখন সোজা হয়ে। ছাতে মাথা ঠেকছে না। পানি বেশি বড় সুড়ঙ্গটায়, স্রোতও বেশি। শাখা-সুড়ঙ্গগুলো থেকে এসে, এটাতে পড়ছে পানি। কলকল ছলছল আওয়াজ তুলছে পাথরের দেয়ালে বাড়ি দিয়ে। শক্ত করে দড়ি ধরে রেখেছে ওরা। বৈদ্যুতিক লণ্ঠনের আলোতেও কাটতে চাইছে না সামনে পেছনের ঘন কালো অন্ধকার। স্রোতের বিপরীতে এগোতে গিয়ে হিমশিম খেতে হচ্ছে।

চলতে চলতে দুপাশে অসংখ্য ছোটবড় ফাটল দেখতে পেল ওরা। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল রবিন। ঝাড়া দিয়ে মাথা থেকে পানিতে ফেলে দিল কিছু একটা। তীক্ষ্ণ কাঁচকোঁচ আওয়াজ উঠল ফাটলের ভেতর থেকে।

ইদুর, হেসে বলল মরিডো। পানি বইছে, তাই রক্ষে। নইলে এতক্ষণে হয়ত আক্রমণই করে বসত।

খাবি খেতে খেতে এগিয়ে এল একটা বাদামি রোমশ জীব। টকটকে লাল চোখ। কাছে এসে কিশোরের পা বেয়ে ওঠার চেষ্টা করল। ঝাড়া দিয়ে ইঁদুরটাকে আবার পানিতে ফেলে দিল সে। স্রোতের ধাক্কায় ভেসে চলে গেল ওটা।

পেছনে মানুষের গলার আওয়াজ শোনা গেল!

ব্যাটারা আসছে! ফিসফিস করে বলল মরিডো। আসছে শুধু ডিউকের ভয়ে। সুড়ঙ্গগুলো চেনে না ওরা। তবু আসতে হচ্ছে।

গতি বাড়াল ওরা। ধীরে ধীরে পানি বাড়ছে, স্রোতও বাড়ছে। আরও খানিকটা এগিয়ে ঝর্না দেখতে পেল। না না, ঝর্না না। খোলা। ম্যানহোল দিয়ে একনাগাড়ে ঝরে পড়ছে, হয়ত রাস্তার পানি।

এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। ভিজতেই হল। চুপচুপে হয়ে গেল। মাথা-গলা-শরীর। ম্যানহোলটা পেছনে ফেলে এল ওরা।

হঠাই বেরিয়ে এল একটা বড়সড় ড্রামের মত গোল কক্ষে। চারপাশের দেয়ালে ছোট বড় গর্ত। সুড়ঙ্গমুখ।চারদিক থেকে এসে প্রধানটার সঙ্গে মিশেছে শাখা-সুড়ঙ্গগুলো। পানি থই থই করছে এখানে। লোহার ঢালু মই উঠে গেছে ওপরের দিকে।

ইচ্ছে করলে এদিক দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারি, বলল মরিডো। কিন্তু উচিত হবে না। প্রাসাদের কাছাকাছিই রয়ে গেছি এখনও। আসুন, মইটাতে উঠে বসে জিরিয়ে নিই। প্রহরীরা আসতে অনেক দেরি আছে, যদি এতটা আসার সাহস

করে ওরা। পানি ঝরছে যে, ওই ম্যানহোলটার ওপাশ থেকেই ফেরত যেতে পারে হয়ত।
দুই ফুট চওড়া একেকটা ধাপ। তিনটা ধাপে উঠে বসল তিনজনে।
হেলান দিতে গিয়েই ককিয়ে উঠল কিশোর। ছোঁয়াতে পারছে না পিঠের নিচের অংশ। উত্তেজনায় ব্যথা টের পায়নি এতক্ষণ।
কি হল, মুখ তুলে তাকাল রবিন আর মরিডো।
কিছু না। পিঠে চোট পেয়েছি। সামান্য।
শেষ পর্যন্ত তাহলে পালাতে পারলাম! জোরে একটা শ্বাস ফেলে বলল রবিন। এতটা যখন চলে এসেছি, আর ধরতে পারবে না।
কিছু একটা বলতে গিয়েও থেমে গেল মরিডো। উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল, বাতি নিভিয়ে ফেলুন! জলদি!
সঙ্গে সঙ্গে বাতির সুইচ অফ করে দিল দুই গোয়েন্দা।
ড্রামের মৃত গোল দেয়ালের গায়ে বড় বড় দুটো গর্ত, প্রধান সুড়ঙ্গের দুটো মুখ। বাকিগুলো সব ছোট ছোট। ওগুলো দিয়ে ঢোকা যাবে না। বড় দুটো গর্তের একটা দিয়ে বেরিয়ে এসেছে ওরা খানিক আগে। ওটা দিয়েই আসছে প্রহরীরা। দ্বিতীয় মুখ, যেটা দিয়ে এগিয়ে যাবে ভেবেছিল, ওটাতে আলো দেখা যাচ্ছে। ওদিক থেকেও আসছে লোক!
তারমানে, ফাঁদে পড়ে গেছে তিনজনে।
ওপরে উঠুন! চেঁচিয়ে উঠল মরিডো। ঢাকনা খুলে বেরিয়ে যাব!
ভেজা পিচ্ছিল সিঁড়ির ধাপে পা রেখে রবিন আর কিশোরকে ডিঙিয়ে দ্রুত উঠে চলে গেল মরিডো। তার পেছনে উঠল দুই গোয়েন্দা। পাশাপাশি দাঁড়ানর জায়গা নেই। ওরা এক ধাপ নিচে রইল।
অন্ধকার। কিছুই দেখা যায় না। অনুমানে ওপর দিকে হাত বাড়াল মরিডো। হাঁতে লাগল লোহার ঢাকনা। ঠেলা দিল। টান দিয়ে তোলার চেয়ে ঠেলা দিয়ে তোলা সহজ, বেশি জোর করা যায়। কিন্তু তবু প্রথমবারের চেষ্টায় উঠল না ঢাকনা।
আরেক ধাপ উঠে গেল মরিডো। কাঁধের একপাশ ঠেকাল ঢাকনার তলায়। ঠেলা দিল গায়ের জোরে। নড়ে উঠল ঢাকনা। ফাঁক হয়ে গেল। চাপ কমিয়ে দিল সে। হাত দিয়ে ঠেলে আরও খানিকটা ফাঁক করে বাইরে উঁকি দিল। সঙ্গে সঙ্গেই নামিয়ে আনল মাথা। ছেড়ে দিল ঢাকনা। বন্ধ হয়ে গেল ওটা আবার।
দুজন গার্ড! মোড়ের কাছে অপেক্ষা করছে! ফিসফিস করে জানাল মরিডো। বেরোলেই কাঁক করে এসে চেপে ধরবে!
এখানেই যদি চুপ করে বসে থাকি? বলল কিশোর। হয়ত দেখতে পাবে না আমাদের।

এছাড়া করারও কিছু নেই, হতাশ কণ্ঠ মরিডোর। বসে থাকব। চুপ করে। কপাল ভাল হলে বেঁচে যাব!
আলো বাড়ছে সুড়ঙ্গে। এগিয়ে আসছে, বোঝাই যাচ্ছে। পানিতে ঝিলমিল করছে আলো।
হঠাৎ বেরিয়ে এল একটা ছোট ডিঙি। সামনের গলুইয়ের কাছে বসে আছে একজন, মাঝে আরেকজন। নৌকার পাটাতনে রাখা লণ্ঠন। গলুইয়ে বসা লোকটার হাতে একটা লগি।
মরিডো। ডেকে উঠল মাঝে বসা মেয়ে কণ্ঠ। মরিডো, আছ ওখানে? ওপরের দিকে তাকাল সে।
মেরিনা! আনন্দে জোরে চেঁচিয়ে উঠেই আবার স্বর খাদে নামাল মরিডো। মেরি, আমরা এখানে!
থেমে গেল নৌকা। হাত বাড়িয়ে পাশে রাখা টর্চ তুলে আলো ফেলল মেরিনা। চুপচুপে ভেজা ইঁদুরের মত সিঁড়ির ধাপে বসে আছে ওরা তিনজন।
প্রিন্স পলকে ধন্যবাদ! চেঁচিয়ে উঠল মেরিনা। আমরা তো ভেবেছিলাম, বেরোতেই পারবে না!
দেয়ালের ফাটলে লগির মাথা ঢুকিয়ে দিয়ে নৌকাটাকে এক জায়গায় স্থির রাখল যুবক। তাড়াহুড়ো করে নেমে এল কিশোর, রবিন আর মরিডো। সঙ্গে সঙ্গেই লগিটা খুলে আনল যুবক। মেঝেতে লগি ঠেকিয়ে জোরে ঠেলা দিল। শাঁ করে আবার ঢুকে পড়ল নৌকাটা যে সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়েছিল, সেটার ভেতরে।
একজন গার্ড তোমার মেসেজ দিয়েছে আমাকে, মেরিনাকে বলল মরিডো।
কয়েক ঘণ্টা যাবৎ তোমাদেরকে খুঁজে বেড়াচ্ছি, জানাল মেরিনা। জানি, মেসেজ পেলে যে করেই হোক বেরিয়ে পড়বেই তোমরা। এদিকে আরও দুবার খুঁজে গেছি। এবারে না পেলে ধরেই নিতাম, মেসেজ পাওনি।...ওহ, মরিডো, তোমাদের দেখে কি-যে খুশি লাগছে।
আমাদেরও লাগছে! তিনজনের হয়েই বলল মরিডো। যুবককে দেখিয়ে বলল দুই গোয়েন্দাকে, আমার চাচাতো ভাই, রিবাতো।, বোনের দিকে ফিরল আবার। বাইরে কি ঘটছে, মেরি?
জবাব দিতে গিয়েও থেমে গেল মেরিনা। সামনে হঠাৎ অন্ধকার দূর হয়ে গেছে খানিকটা জায়গায়। আলো এসে পড়েছে। কথা বলার শব্দ। ম্যানহোলের ঢাকনা খুলে ফেলা হয়েছে ওখানটায়।
জলদি! জলদি নৌকা থামাও! চেঁচিয়ে উঠল মেরিনা।
কিন্তু দেরি হয়ে গেছে ততক্ষণে। নৌকা ম্যানহোলের প্রায় তলায় চলে এসেছে।
থেম না! চেঁচিয়ে উঠল মরিডো। সোজা এগিয়ে যাও!

লগি দিয়ে সুড়ঙ্গের মেঝেতে জোরে গুতো মারল রিবাতো। তীরের মত ছুটল হালকা ডিঙি।
সিঁড়ি নেই এখানে। একাধিক সুড়ঙ্গের মিলনস্থল নয় এটা। এখান দিয়ে সাধারণত নামে না কেউ। ওপরে কোন কারণে পানি আটকে গেলে, গর্তের ঢাকনা খুলে দেয়া হয়। পানি সরে যায়। রোজারের লোকেরা হয়ত জানে না এটা। তাই খুলেছে। ভেবেছে, এখান দিয়েই ঢুকবে।
ম্যানহোলের নিচ দিয়ে যাবার সময় ওপরের দিকে তাকাল সবাই। উঁকি দিয়ে আছে একটা মুখ। ডিঙিটা দেখেই চেঁচিয়ে উঠল লোকটা। পা ঢুকিয়ে দিল দুহাতে ভর রেখে, ছেড়ে দিল শরীরের ভার। অল্পের জন্যে বেঁচে গেল নৌকাটা। ঝপাং করে পেছনের পানিতে পড়ল লোকটা। নৌকার ওপর পড়ে ওটাকে ঠেকাতে চেয়েছিল, পারেনি।
লগি দিয়ে ওর পেটে এক গুঁতে লাগাল রিবাতো। উ-ক! করে উঠল লোকটা। চেঁচিয়ে উঠল ব্যথায়।
ওপর থেকে আরও একজন প্রহরী পড়ল পানিতে। তার পর পরই আরও একজন। পানি ভেঙে তাড়া করে এল নৌকাটাকে।
আলো নেভাও! চেঁচিয়ে আদেশ দিল মরিডো। অফ করে দাও সুইচ!
ক্ষণেই গভীর অন্ধকার গ্রাস করল ওদেরকে। ম্যানহোল দিয়ে আসা আলো দ্রুত সরে যাচ্ছে পেছনে। স্রোতের টান, তার ওপর লগির। ঠেলায় যেন উড়ে চলল খুদে ডিঙি। সামনের গলুইয়ে বসে দুপাশে হাত ছড়িয়ে দিয়েছে মরিডো। দেয়ালে বাড়ি লাগতে পারে নৌকা, হাত দিয়ে ঠেলে ঠেকাবে।
তাড়া করে আসবেই ওরা, অন্ধকারে বলল মরিডো। তবে পারবে না নৌকার সঙ্গে।
সামনে ম্যানহোলের ঢাকনা খুলে বসে থাকতে পারে, বলল রিবাতো। মেরি, টর্চ জ্বালা তো। সামনেটা দেখে নিই।
জ্বলে উঠল টর্চ। সামনে একটা কক্ষ। আরেকটা সুড়ঙ্গ-সঙ্গম।
পাশের আরেকটা সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়ব, বলল রিবাতো। সামনে অপেক্ষা করে থাকলে ব্যাটাদের নিরাশ হতে হবে।
বেশ বড় একটা কক্ষ। তিন দিক থেকে আরও তিনটে সুড়ঙ্গ এসে মিশেছে। একটা সামনে। ওটা প্রধান সুড়ঙ্গ। দুপাশের দুটো সরু। ও দুটো দিয়ে পানি এসে পড়ছে প্রধান সুড়ঙ্গে। দুটোর সবচেয়ে সরু সুড়ঙ্গটাতে নৌকা ঢুকিয়ে দিল রিবাতো।
আবার লণ্ঠন জ্বালল মেরিনা।
স্রোত ঠেলে যেতে হচ্ছে এখন। এগোতে চাইছে না নৌকা। হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে একা রিবাতো। পাটাতনের নিচে আরেকটা লগি আছে, মরিডো।

ছোট লগিটা বের করে নিল মরিডো। দুজনে মিলে বেয়ে নিয়ে। চলল নৌকাটাকে। নিচু ছাত। কোথাও কোথাও এত নিচু, মাথা নুইয়ে। ফেলতে হচ্ছে। তবে, সামনে পথ রুদ্ধ হয়ে নেই কোথাও।
রিবাতোকে চিনতে পারছেন? দুই গোয়েন্দার দিকে চেয়ে হঠাৎ বলে উঠল মরিডো।
এতক্ষণ উত্তেজনায় খেয়াল করেনি, ভাল করে চাইল এখন রবিন। আরে, তাই তো! চেনা চেনা লাগছে! কোথায় দেখেছে এর আগে! কোথায়,..
ব্যাণ্ড পার্টির সর্দার, বলে উঠল কিশোর। সেদিন পার্কে দেখেছিলাম।
চিনেছেন, বলল মরিডো। আমার আর মেরিনার চেয়ে ভাল চেনে সে এই সুড়ঙ্গ। ওপরে কোথায় কি আছে, তা-ও বলে দিতে পারে শুধু দেয়াল দেখেই।
সামনে আবার নিচু হয়ে আসছে ছাত। ওটা পেরোনর সময় প্রায় শুয়ে পড়তে হল সবাইকে।
পেছনে কারও আসার শব্দ নেই। শুধু দেয়ালে পানি বাড়ি লাগার ছলছলাৎ।
মুসা কোথায়? পেছনে বসে থাকা মেরিনার দিকে চেয়ে বলল কিশোর।
অপেক্ষা করছে আমাদের জন্যে, জানাল মেরিনা। ইচ্ছে করেই রেখে এসেছি। ছোট নৌকা। বোঝা বাড়িয়ে লাভ কি? তাছাড়া, নিরাপদ জায়গায় বসিয়ে রেখে এসেছি। সবাই একসঙ্গে ধরা পড়ার আশঙ্কাও রইল না।
ঠিকই করেছে মেরিনা, আর কিছু বলল না কিশোর।
কোথায় এলাম আমরা, রিবাতো? জানতে চাইল মরিডো। হারিয়ে-টারিয়ে যাচ্ছি না-তো?
কেন, এদিকটায় আসনি? জবাবের অপেক্ষা না করেই বলল। রিবাতো, ঘুরপথে যাচ্ছি। পাঁচ মিনিটেই পৌঁছে যাব আরেকটা কক্ষে।
এগিয়ে চলেছে নৌকা। মিনিট তিন-চার পরেই আলো দেখা গেল সামনে।
আবার আসছে কে জানি! আঙুল তুলে দেখিয়ে বলে উঠল রবিন।
আসছে না, অপেক্ষা করছে, জবাব দিল মেরিনা। মুসা।
আরেকটা বড় কক্ষে এসে ঢুকল নৌকা। উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক লণ্ঠন জ্বলছে। পুরানো মরচে ধরা সিঁড়ির ধাপে আরাম করে বসে আছে। গোয়েন্দা সহকারী। রবিন আর কিশোরের দিকে চেয়ে হাসল। ঝকঝক করে উঠল সাদা দাঁত। আহ্, বাঁচা গেল! এসে পড়েছ! আমি তো ভাবছিলাম, আর আসবেই না!
একাই বসে আছ! বলল রবিন।
না, ঠিক একা নয়, দেয়ালের ফাটলগুলোর দিকে তাকাল একবার মুসা। বেশ কয়েকটা ইঁদুর সঙ্গ দিতে এসেছে বার বার। খাতির বেশি হয়ে গেলে গায়ের ওপর

এসে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। তাই তাড়িয়েছি। বাপরে বাপ! ইঁদুর না-তো! যেন বেড়াল একেকটা!
দেয়ালের একপাশে বিরাট এক গর্ত। ধারগুলো অসমান। মানুষের তৈরি নয়, দেখেই অনুমান করা যায়। দেয়াল তৈরির আগে থেকেই ছিল ওটা ওখানে, তেমনি রেখে দেয়া হয়েছে।
নৌকাটাকে সিঁড়ির সঙ্গে বেঁধে ফেলা হল। কয়েক ধাপ নেমে বসল। মুসা।
নর্দমা তৈরির সময়ই ওটা দেখতে পেয়েছিল মিস্ত্রিরা, গর্তটা দেখিয়ে বলল মরিডো। বন্ধ করেনি, তেমনি রেখে দিয়েছে। ওটাও একটা সুড়ঙ্গমুখ, প্রাকৃতিক। অনেক আগেই এটা আবিষ্কার করেছি। আমরা। বলতে ভুলে গেছি, ছোটবেলায় একটা দল ছিল আমাদের। প্রায়ই নেমে পড়তাম এই সুড়ঙ্গে। একেক দিন একেকটার ভেতর ঢুকে পড়তাম। এমনি করেই চিনেছি সুড়ঙ্গগুলো। কাজটা খুবই বিপজ্জনক ছিল। কিন্তু কেয়ার করতাম না। এমনকি বাবাও ঠেকাতে পারেনি আমাদের। ছেলেবেলার সেই খেলা আজ হয়ত আমাদের প্রাণই বাঁচিয়ে দিল!
দেরি করে লাভ কি? বলল মেরিনা। এদেরকে নিয়ে যাওয়া দরকার। মনে হচ্ছে, আগের প্ল্যানে চলবে না।
কি কি ঘটেছে, সেটা আগে বল আমাকে, বলল মরিডো। রিতো, তুমি এখানে এলে কি করে?
চাচাকে অ্যারেস্ট করার সময় তোমাদের বাড়িতেই ছিলাম, জানাল রিবাতো। গোপন দরজা দিয়ে পালিয়ে এসেছি। চাচাকে ধরার সময় ক্যাপ্টেন ব্যাটা বলল: তোমার বিশ্বাসঘাতক ছেলেকেও শিগগিরই কোর্টে হাজির করা হবে। মেরিনার কথা কিছু বলল না। বুঝলাম তাকে ধরতে পারেনি রোজারের কুত্তারা। বাড়ি থেকে বেরিয়েই দেখা হয়ে গেল মেরিনার সঙ্গে। পেছনের গলি দিয়ে বাড়িতে ঢুকতে যাচ্ছিল। ঠেকালাম। ছুটলাম তাকে নিয়ে। এই সময় শুরু হল তুমুল বৃষ্টি। তোমাদের কথা জানাল মেরিনা। মিনস্ট্রেলদের গোপন আড্ডায় চলে গেলাম। ওখানেই মুসা আমানকে বসিয়ে রেখে গিয়েছিল মেরিনা। তোমাদেরকে বের করে আনা দরকার। মেসেজ দিয়ে পাঠিয়ে দিলাম একজনকে। আমরা তিনজন নৌকা নিয়ে ঢুকে পড়লাম সুড়ঙ্গে। ডেনজো নদী দিয়ে ঢুকেছি। অনেকদিন আগে শিক ভেঙে রেখেছিলাম। যে মুখটার...।
হ্যাঁ, বলে উঠল মেরিনা। কোন অসুবিধে হয়নি ঢুকতে। তখনও পানি বেরোতে শুরু করেনি ততটা। স্রোত খুব বেশি ছিল না। ঢুকে ডানজনের ওদিক থেকে কয়েকবার ঘুরে এসেছি, আগেই তো বলেছি। অনুমান করতে কষ্ট হয়নি, তোমাদেরকে ডানজনেই আটকে রাখবে ওরা। বেরোতে পারলে, ডানজনের বাইরের ম্যানহোল

দিয়েই নামবে তোমরা। ওটা ছাড়া আর কোন পথ নেই ওখান থেকে বেরোবার, জানিই।
রেডিওটা কোথায়? মুসার দিকে চেয়ে বলল রিবাতো।
আছে, পকেট থেকে খুদে একটা রেডিও বের করল মুসা। এই যে! বন্ধ করে রেখেছি। ভাষা তো বুঝি না...
নব ঘুরিয়ে চালু করে দিল রেডিওটা মুসা।
ঝমঝম করে বাজছে যন্ত্রসঙ্গীত। বিশেষ সামরিক সুর। হঠাৎ থেমে গেল। ভেসে এল একটা ভারি গমগমে গলা। খানিকক্ষণ একটানা শব্দ বর্ষণ করে থেমে গেল। আবার বেজে উঠল বাজনা।
একটা বিন্দুও বুঝতে পারল না তিন গোয়েন্দা। ভ্যারানিয়ান ভাষা।
সকাল আটটায় সমস্ত রেড়িও আর টেলিভিশন সেট ভোলা রাখার অনুরোধ জানাচ্ছে, বলল মেরিনা। ভ্যারানিয়ার সকল নাগরিককে সেটের সামনে থাকতে বলছে। জাতির উদ্দেশে এক বিশেষ ভাষণ দেবে ডিউক রোজার।...তারমানে, সকাল আটটায় জানাবে সে: একটা– বিদেশী ষড়যন্ত্র ধরা পড়েছে। অভিযোগ আনবে প্রিন্স দিমিত্রির বিরুদ্ধে। নিজেকে অনির্দিষ্ট কালের জন্যে রিজেন্ট ঘোষণা করবে। লোককে বোঝাতে বিশেষ বেগ পেতে হবে না। আপনাদেরকে স্পাই ঘোষণা করা তেমন কঠিন হবে না তার পক্ষে। ক্যামেরাগুলো প্রমাণ হিসেবে দেখাবে দেশবাসীকে।
তারমানে, হতাশ গলায় বলল রবিন। দিমিত্রির সর্বনাশ করলাম আমরা! উপকার কিছুই করতে পারলাম না। কার মুখ দেখে যে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম!
আপনাদের কোন দোষ নেই, বলল মেরিনা। আপনারা না। এলেও প্রিন্স দিমিত্রিকে সিংহাসনে বসতে দিত না রোজার। কোন না কোন উপায়ে সরিয়ে দিতই। এখন আপনাদেরকে যাতে ধরতে না পারে, সে ব্যবস্থা করতে হবে। পৌঁছে দিতে হবে আমেরিকান। এমব্যাসিতে। রিবাতো, কি বল?
হ্যাঁ, মাথা ঝোঁকাল রিবাতো।
কিন্তু আপনাদের কি হবে? মেরিনার দিকে চেয়ে বলল কিশোর। আপনার বাবা? প্রিন্স দিমিত্রি?
সেটা পরে ভাবব, দীর্ঘশ্বাস ফেলল মেরিনা। অনেক দেরিতে বুঝেছি আমরা রোজারের পরিকল্পনা! আগে জানলে, প্রিন্স দিমিত্রিকে সরিয়ে ফেলতাম। তারপর দেশবাসীকে বোঝানো এমন কিছু কঠিন হত না। কিন্তু, অনেক সময় নিয়ে, চারদিক গুছিয়ে আটঘাট বেঁধে কাজে নেমেছে রোজার। কি করে পারব আমরা তার সঙ্গে? তাছাড়া ক্ষমতায় রয়েছে সে...

হ্যাঁ, মাথা ঝোকাল রিবাতো। মহা ধড়িবাজ! তবে সহজে ছাড়ব না। যতক্ষণ প্রাণ থাকবে, চেষ্টা করে যাব। একটা শয়তান দেশের স্বাধীনতা নষ্ট করবে, এটা কিছুতেই হতে দেয়া যায় না। হয়ত আমরা মরে যাব! কিন্তু দিন আসবেই! কুচক্রী লোক বেশিদিন রাজত্ব করতে পারেনি এখানে, ভ্যারানিয়ার ইতিহাস বলে। ডিউক রোজারের ধ্বংস অনিবার্য। হয়ত সময় লাগবে.....হ্যাঁ, চলুন, আপনাদেরকে পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা করি। ধরা পড়তে দেয়া চলবে না কিছুতেই।
নৌকা নিয়ে যাওয়া যাবে না, বলল মেরিনা। সকাল হয়ে গেছে। ডেনজো নদীতে দেখে ফেলবে আমাদেরকে। ধরা পড়ে যাব।
হ্যাঁ, বলল রিবাতো। এই সুড়ঙ্গ দিয়েই বেরোতে হবে।
পানিতে নেমে পড়ল রিবাতো। তার পর পরই নামল মরিভো। একে একে নেমে পড়ল অন্যেরাও।
কোমরে পেঁচানো দড়ি খুলে নিল মরিডো। একটা লণ্ঠন হাতে ঢুকে পড়ল সুড়ঙ্গে। দড়ি ধরে তার পেছনে ঢুকে পড়ল আর সবাইকে পাশ কাটিয়ে আগে চলে গেল রিবাতো। হাতে আরেকটা লণ্ঠন। হেঁটে চলল আগে আগে।
রির্বাতোকে অনুসরণ করল দলটা নীরবে।

.

বৃষ্টি থেমে গেছে। ঢালু সুড়ঙ্গ বেয়ে নেমে আসা পানি দেখেই বোঝা যায়। পায়ের পাতা ভিজছে এখন শুধু, এতই কম। আস্তে আস্তে আরও কমে যাচ্ছে। লণ্ঠন টর্চ সবই আছে সঙ্গে। একটা জায়গায় এসে ঘোরপ্যাঁচও কমে গেছে। এখন প্রায় সোজা এগিয়ে গেছে সুড়ঙ্গ। দ্রুত হাঁটতে পারছে ওরা।
আচ্ছা, একটা কথা, একসময় বলল রিবাতো। আমেরিকান এমব্যাসির ওদিক দিয়ে যে বেরোব, যদি গার্ড থাকে?
তাই তো! এটা তো ভাবেনি কেউ! অনেকখানি চলে এসেছে ওরা। মনে হচ্ছে, না জানি কত পথ! অথচ নৌকা থেকে নামার পর বড়জোর আট কি দশটা ব্লক পেরিয়ে এসেছে। বেশ চওড়া একটা জায়গায় এসে থেমে গেল রিবাতো। তার সঙ্গে সঙ্গে অন্যেরাও।
প্রাকৃতিক সুড়ঙ্গ। কিন্তু অব্যবহৃত থাকেনি। ওপরে ম্যানহোল তৈরি হয়েছে। সিঁড়ি না বসিয়ে অন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে। খাড়া পাথরের দেয়ালে গেঁথে দেয়া হয়েছে দুই কোনা লোহার আঙটা।
একই সঙ্গে দুভাবে ব্যবহার করা যায় এটা। হাত দিয়ে ধরা যায়, পা রেখে অনেকটা মইয়ের মতই ওঠা-নামাও যায়।
এখানে দাঁড়ালে কেন? জিজ্ঞেস করল মরিডো। আরও দুটো ব্লক পেরোতে হবে।

বিপদের গন্ধ পাচ্ছি, বলল রিবাতো। জায়গাটায় পাহারা থাকবেই। প্রথমে আমরা কোথায় যাব, এটা ঠিকই আঁচ করে নেবে ওরা। তারপর জায়গা মত ওত পেতে বসে থাকবে। যেই বেরোব, ক্যাক করে চেপে ধরবে গর্ত থেকে বেরোনো ইঁদুরের মত। সেইন্ট ডোমিনিকসের পেছনে রয়েছি আমরা এখন। এই একটা জায়গায় পাহারা থাকার সম্ভাবনা কম। এখান দিয়ে বেরিয়ে বাড়িঘরের আড়ালে আড়ালে চলে যেতে পারব এমব্যাসিতে।
হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ, সায় দিল মরিডো। ঠিক আছে। খামোকা সময় নষ্ট করে লাভ নেই। চল, উঠি।
আঙটা বেয়ে তরতর করে উঠে গেল রিবাতো। ম্যানহোলের ঢাকনাই নেই এখানটায়। কোনকালে খুলে গিয়েছিল কে জানে, লাগানো হয়নি আর। বাইরে উঁকি দিয়ে দেখল একবার সে। তারপর চেঁচিয়ে বলল, একজন একজন করে উঠে আসবে। টান দিয়ে তুলে নেব আমি।
বাইরে বেরিয়ে গেল রিবাতো। গর্তের দিকে মুখ কুঁকিয়ে বসল।
প্রথমে উঠে গেল মেরিনা। ওপরে উঠে হাত বাড়িয়ে দিল। তাকে তুলে নিল রিবাতো।
অন্যেরাও উঠে এল একে একে।
আকাশ মেঘে ঢাকা। গোমড়া সকাল। বিষণ্ন এক দিনের শুরু। পানি জমে গেছে রাস্তার দুপাশে। খানাখন্দগুলো ভরা।
সরু একটা গলি পথে এসে উঠল ওরা। বাজারের ভেতর দিয়ে গেছে পথ। দুপাশে সারি সারি দোকানপাট। বেশিরভাগই ফুল আর ফলের দোকান। ভিড় কম। মাত্র সকাল হয়েছে। ক্রেতারা আসতে শুরু করেনি এখনও। হয়ত রেডিও-টেলিভিশনের সামনে বসে আছে!
অবাক চোখে ছয়জনের দলটার দিকে তাকাল লোকে। সারা গা ভেজা, ময়লা, চুল উষ্কখুষ্ক, মুখ শুকনো। ঝড়ো কাকের অবস্থা হয়েছে! কারও দিকেই তাকাল না ওরা। নীরবে এগিয়ে চলল দ্রুত।
আগে আগে চলেছে রিবাতো। পঞ্চাশ গজমত গিয়ে থমকে দাঁড়াল। সামনে, মোড়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছে দুজন প্রহরী, রয়্যাল গার্ড।
পিছাও! চাপা গলায় আদেশ দিল রিবাতো। লুকিয়ে পড় সবাই!
কিন্তু দেরি হয়ে গেছে ততক্ষণে। ফিরে চেয়েছে এক প্রহরী। দেখে ফেলেছে। ভেজা কাপড়-চোপড় আর চেহারা দেখেই অনুমান করে নিয়েছে, কারা ওরা। চেঁচিয়ে উঠেই ছুটে এল।
খবরদার! চেঁচিয়ে বলল প্রহরী। পালানর চেষ্টা কোরো না। রিজেন্টের আদেশে অ্যারেস্ট করা হল তোমাদেরকে!

ধরতে হবে আগে, তারপর তো অ্যারেস্ট, ফস করে বলল রিবাতো। পাঁই করে ঘুরেই দৌড় দিল। গির্জার দিকে…এছাড়া আর জায়গা নেই লুকানর…
ছুটতে শুরু করেছে দলের সবাই। লোকজন কেউ সামনে পড়লে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে। আশপাশে আরও প্রহরী ছিল। চেঁচামেচিতে ওরাও এসে যোগ দিয়েছে প্রথম দুজনের সঙ্গে। মোট ছজন প্রহরী তাড়া করে আসছে এখন।
ছুটতে ছুটতেই ওপরের দিকে তাকাল রবিন। সামনে বাড়িঘর। ছাতের ওপর দিয়ে চোখে পড়ছে ডোমিনিকসের সোনালি গম্বুজ। জোরে জোরে হাঁপাচ্ছে ও। ভাবছে, গির্জার ভেতর লুকিয়ে কি হবে? ধরা পড়তে সামান্য বিলম্ব হবে, এই যা।
পাশে চেয়ে দেখল, কিশোরও চেয়ে আছে গম্বুজের দিকে। ছুটছে, চিমটি কাটছে নিচের ঠোঁটে। জরুরি কিছু একটা ভাবছে নিশ্চয় সে। কিন্তু সেটা জিজ্ঞেস করার সময় এখন নেই।
পেছনে, আছাড় খেল এক প্রহরী। তার গায়ে হোঁচট খেয়ে পড়ল আরেকজন। পড়ল আরও দুজন। হৈ হট্টগোল, চেঁচামেচি। আশপাশ থেকে লোকজন ছুটে এসে তুলছে টেনে।
অনেকখানি এগিয়ে যাবার সুযোগ পেয়ে গেল দলটা। প্রহরীদেরকে পঞ্চাশ গজ পেছনে ফেলে এল ওরা ছয়জন। অবাকই হল রবিন। একই পথ ধরে ছুটে এসেছে ওরা। ওদের কেউ তো আছাড় খেল না! তাহলে ইচ্ছে করেই কি পড়ে গেল সামনের প্রহরীটা! মিনস্ট্রেল পার্টির লোক?
মোড় ঘুরল ছজনে। আর মাত্র একটা ব্লক। তারপরেই সেইন্ট ডোমিনিকস। বিশাল গির্জার ব্লক খানেক দূরে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন। প্রহরী। চেয়ে আছে এদিকেই।
প্রধান ফটক দিয়ে ঢোকা যাবে না কিছুতেই।
কিন্তু সেদিকে এগোলও না রিবাতো। রাস্তা পেরিয়ে ছুটে গেল গির্জার পেছনের ছোট একটা দরজার দিকে। শাঁ করে ঢুকে পড়ল ভেতরে। অন্যেরাও ঢুকে পড়ল তার পেছন পেছন। দরজা বন্ধ করেই। ছিটকিনি তুলে দিল।
পৌঁছে গেল প্রহরীরা। দরজায় ধাক্কা দিতে আরম্ভ করল। সেই সঙ্গে ক্রুদ্ধ চেঁচামেচি।
মুহূর্তের জন্যে চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে আনল রবিন। বিশাল চার দেয়াল, ওপরে ছাত আছে বলে মনে হল না। তবে আকাশও দেখা যাচ্ছে না পুরোপুরি। কিছু একটা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। চোখের সামনে। একপাশের দেয়াল ঘেঁষে ঘুরে ঘুরে উঠে গেছে লোহার সিঁড়ি। ওপর থেকে নেমে এসেছে আটটা লম্বা দড়ি। সিঁড়ির পাশে দেয়ালে গাঁথা লোহার আঙটার সঙ্গে বাঁধা রয়েছে প্রান্তগুলো।
আর কিছু দেখার সময় পেল না রবিন।

ক্যাটাকম্বের দিকে যেতে হবে, কানে এল রিবাতোর কথা। লুকিয়ে থাকতে হবে ওখানেই...
ক্যাটাকম্ব কি, রবিনের জানা আছে। গির্জার ভেতরে মাটির তলায়। ভাঁড়ারের মত বড় বড় ঘর। কফিনে ভরে লাশ নিয়ে রেখে দেয়া হয় ওসব ঘরে। বড় বড় গির্জায় মাটির নিচেও থাকে একাধিক তলা। তাতে অসংখ্য ঘর, অসংখ্য করিডর, সিঁড়ি, অন্ধকার!
কি হবে ওখানে গিয়ে? বলে উঠল কিশোর। ওরা ঠিক বুঝে। যাবে, কোথায় গেছি আমরা। বাতি নিয়ে এসে সহজেই খুঁজে বের করবে।
সবাই চোখ তুলে তাকাল কিশোরের দিকে।
কিছু একটা ভাবছ তুমি, কিশোর! বলল মুসা। কি?
ওই দড়িগুলো, হাত তুলে দেখাল কিশোর। ওগুলো টেনে প্রিন্স পলের ঘণ্টা বাজানো যায়?
প্রিন্স পলের ঘণ্টা! অবাক হয়ে তাকাল মরিডো। কিশোরের কথা বোঝার চেষ্টা করছে। না, ওগুলো সাধারণ ঘণ্টার দড়ি। প্রিন্স পলের ঘণ্টা রয়েছে অন্য টাওয়ারটাতে। ওপাশে। একটাই ঘণ্টা। বিশেষ বিশেষ সময়ে কেবল বাজানো হয়।
শুনেছি, দ্রুত বলল কিশোর। প্রিন্স দিমিত্রির কাছে শুনেছি, শত শত বছর আগে আরেকবার অভ্যুত্থান হয়েছিল ভ্যারানিয়ায়। ওই ঘণ্টা বাজিয়ে দেশবাসীর কাছে সাহায্য চেয়েছিলেন প্রিন্স পল।
হাঁ করে অন্য পাঁচজন চেয়ে আছে কিশোরের মুখের দিকে।
চোয়ালের একপাশ চুলকাল রিবাতো। হ্যাঁ। ভ্যারানিয়ায় বাচ্চা ছেলেরাও জানে একথা। কিন্তু তাতে কি?
উনি বলতে চাইছেন, প্রিন্স পলের মতই গিয়ে আমরাও বাজাব ওই ঘণ্টা! হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল মরিডো। সাহায্য চাইব প্রিন্স দিমিত্রির জন্যে! ইসস, কেউ ভাবিনি আমরা এ কথাটা! খালি খবরের কাগজ, রেডিও আর টেলিভিশনের দিকেই ছিল খেয়াল! অনেক দিন বাজেনি ওই ঘণ্টা! যদি আজ হঠাৎ করে...
..বাজতে শুরু করে, মরিডোর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল মেরিনা, চমকে উঠবে লোকে! দেশবাসী ভালবাসে প্রিন্স দিমিত্রিকে। দলে দলে ছুটে যাবে তারা প্রাসাদের দিকে। জানতে চাইবে, কি হয়েছে!
কিন্তু যদি... শুরু করেই থেমে গেল রিবাতো।
আর দেরি নয়! চেঁচিয়ে উঠল মরিডো। দরজায় আওয়াজ শুনছ! ভেঙে ফেলবে শিগগিরই! যা করার জলদি করতে হবে!
ঠিক আছে! আর দ্বিধা করল না রিবাতো। মরিডো, তুমি এঁদেরকে নিয়ে যাও! আমি আর মেরিনা এখানে অপেক্ষা করছি। প্রহরীদের দেখিয়ে ছুটে যাব

ক্যাটাকম্বের দিকে। লুকিয়ে পড়ব। ওরা আমাদের পেছনে সময় নষ্ট করবে। ঘণ্টা বাজানর সুযোগ পেয়ে যাবে। তোমরা। যাও!
আসুন! তিন গোয়েন্দাকে বলল মরিডো। এপথে!
গির্জার ভেতর দিয়েও পৌঁছে যাওয়া যায় অন্য টাওয়ারটাতে। আগে আগে ছুটছে মরিডো। পেছনে রবিন, মুসা, তার পরে কিশোর।
পেছনে পড়তে শুরু করল রবিন। হঠাৎ ব্যথা আরম্ভ হয়েছে তার। ভাঙা পায়ে। গতরাত থেকে নিয়ে অনেক বেশি দৌড়াদৌড়ি করেছে। সবে জোড়া লেগেছে পায়ের হাড়। এ-পর্যন্ত সয়েছে, এটাই বেশি।
সবার পেছনে পড়ে গেল রবিন। থামল না। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ছুটল। অন্য সময় হলে হেসে মাটিতে গড়াগড়ি করত মুসা। কিন্তু এখন দেখেও দেখল না।
দাঁড়িয়ে পড়েছে আগের তিনজন। বিচিত্র ভঙ্গিতে লাফাতে লাফাতে কাছে এসে দাঁড়াল রবিন। আরেকটা বেল-টাওয়ার। প্রথম যেটায়। ঢুকেছিল, তেমনি। তবে এখানে ওপর থেকে একটা মাত্র দড়ি ঝুলে আছে।
লোহার সিঁড়ির দিকে ছুটে গেল মরিডো। অন্য তিনজন অনুসরণ করল তাকে।
রিঙে বাঁধা দড়ি খুলে দিল মরিডো। ঝুলে পড়ল দড়ির প্রান্ত। দ্রুত সিঁড়ি টপকে ওপরে উঠে চলল সে।
মরিডোর পেছনে উঠে যেতে যেতে পেছনে ফিরে তাকাল একবার কিশোর। না, পড়ে যাবে না রবিন। তার হাত শক্ত করে ধরে রেখেছে। মুসা। উঠে আসছে দ্রুত।

.

উঠেই চলেছে ওরা। সিঁড়ি যেন আর ফুরায় না।
ভীষণ ক্লান্ত ওরা। হাঁপাচ্ছে জোরে জোরে। কষ্ট বেশি হচ্ছে রবিনের।
গতি শ্লথ হয়ে এসেছে চারজনেরই। জিরিয়ে নেবার জন্যে থামল। এই সময় নিচে শোনা গেল চেঁচামেচি।
চমকে নিচে তাকাল ওরা। কয়েকজন প্রহরী এসে দাঁড়িয়েছে। নিচে। চেয়ে আছে ওপরের দিকে। দেখে ফেলল একজন। চেঁচিয়ে উঠল। ছুটে এল সিঁড়ির দিকে।
দুদিক থেকে রবিনের দুই বাহু চেপে ধরল মরিডো আর মুসা। তাকে শূন্যে তুলে নিয়ে আবার টপকাতে শুরু করল সিঁড়ি। খুব পরিশ্রমের কাজ। কিন্তু থামল না ওরা। পেছনে উঠে আসতে লাগল কিশোর।
সামনে একটা বেশ বড়সড় দরজা। পাল্লা বন্ধ।
কিশোর! চেঁচিয়ে উঠল মরিডো। জলদি ধাক্কা দিন দরজায়!
ঠেলা দিতেই খুলে গেল দরজা। রবিনকে নিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল মুসা আর মরিডো। কিশোর ঢুকেই বন্ধ করে দিল ভারি পাল্লাটা। বিশাল এক ছিটকিনি। তুলে দিল।

সামনে এমন আরও দুটো দরজা আছে, আবার সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে জানাল মরিডো। আগে, দেশের ভেতরে কোন, গোলমাল দেখা দিলেই ঘণ্টাঘরে গিয়ে ঠাই নিত পাদ্রী আর গির্জার অন্যান্য লোকেরা। ভীষণ শক্ত দূরজা। ভাঙতে সময় নেবে।
দ্বিতীয় দরজাটা পেরিয়ে এল ওরা। ছিটকিনি তুলে দিল কিশোর। এই সময় কানে এল প্রথম দরজায় ধাক্কার আওয়াজ।
আরও তাড়াতাড়ি করতে হবে। বেলটা বাজানোর আগেই যদি দরজা ভেঙে ঢুকে পড়ে প্রহরীরা, তাহলে এত কষ্ট সব বিফলে যাবে।
সময় খুব বেশি পাব না আমরা! জোরে জোরে হাঁপাচ্ছে কিশোর। এর মাঝেই কাজ সারতে হবে!
তৃতীয় দরজা খুলে ফেলল কিশোর। রবিনকে নিয়ে মরিডো আর মুসা ঢুকে যেতেই সে-ও ঢুকে পড়ল। তুলে দিল ছিটকিনি। হাঁপ ছাড়ল। চমকে উঠে উড়ে গেল এক ঝাঁক পায়রা।
কংক্রীটে তৈরি গোল একটা চত্বরে এসে দাঁড়াল ওরা। খোলা। রেলিঙে ঘেরা। চত্বরের ঠিক মাঝখানে বেশ বড় গোল একটা ফোকর।
ফোকরের কাছে এগিয়ে গেল মরিডো। নিচে তাকাল। অনেক নিচে পুতুলের মত দেখাচ্ছে প্রহরীদেরকে। দড়িটা টান দিয়ে তুলে নিল সে। ঝট করে ওপরে তাকাল প্রহরীরা। কিন্তু দড়িটা চলে এসেছে তাদের নাগালের বাইরে।
প্রথম দরজাটা ভাঙার চেষ্টা করছে ওরা, বলল মরিডো। শিগগিরই শাবল কুড়াল নিয়ে আসবে গিয়ে চিন্তিত ভঙ্গিতে ঘণ্টাটার দিকে তাকাল সে। কিন্তু যা ভারি! বাজাব কি করে! নড়াতেই তো পারব না!
চিন্তিত চোখে ঘণ্টার দিকে চেয়ে আছে কিশোর। কি বিশাল! মোটা দুটো থামের মাথায় লোহার দণ্ডে ঝোলানো। চারদিক থেকে ঘণ্টাকে ঘিরে উঠে গেছে শক্ত কাঠের আরও কয়েকটা থাম। ওগুলোর মাথায় বসানো চোঙের মত টিনের চাল। রোদ-বৃষ্টি থেকে ঘণ্টাকে বাঁচায়। ঘণ্টার চূড়ায় মোটা একটা রিঙ। তাতে বাধা দড়ির আরেক প্রান্ত। দড়ি ধরে টানলেই দুলতে শুরু করে ঘণ্টা, ভেতরে নড়ে ওঠে দোলক। তালে তালে ঘণ্টার গায়ে বাড়ি মারে, একবার এপাশে, একবার ওপাশে। যেমন ঘণ্টা তেমনি তার দোলক। বিশাল, ভারি।
রবিনও দেখছে ঘণ্টাটাকে। ভেতরের দিকে ঘণ্টার নিচে টুপির মত ছড়ানো অংশে নানারকম সূক্ষ্ম কারুকাজ, খোদাই করা। দেখলে শ্রদ্ধা। বেড়ে যায় প্রাচীন শিল্পীর ওপর, যে করেছিল কাজগুলো।
রেলিঙের কাছে এগিয়ে গেল রবিন। নিচে তাকাল। প্রায় পুরো ডেনজো শহরটাই চোখে পড়ছে। এখান থেকে দেখলে মনে হয় একটা লিলিপুটের দেশ। খুদে মানুষ,

খুদে গাড়ি। শহরের পরিবেশ শান্ত। দেখে মনে হয় না, কি সাংঘাতিক এক ষড়যন্ত্র চলছে ভেতরে ভেতরে! মনেই হয় না, প্রাণের ভয়ে ওরা এসে পালিয়েছে এখানে। নিচে প্রাণপণে চেষ্টা চালাচ্ছে ঘাতকরা ওদের ধরার। পাশে তাকাল। নিচে। এখন সেইন্ট ডোমিনিকসের সোনালি গির্জা। এখান থেকে দেখতে অদ্ভুত লাগছে। বিশাল এক বাটি যেন উপুড় করে ফেলে রাখা হয়েছে, পিঠটা চোখা।
হায়, আল্লাহ! খামোকাই এলাম! বলে উঠল মুসা। বাজাব কি করে ওটা!
ফিরে তাকাল রবিন।
নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে কাটতে হঠাৎ ঝটকা দিয়ে হাত সরিয়ে নিল কিশোর। পেয়েছি! সাধারণ নিয়মে ঘন্টাটা বাজাতে পারব না। আমরা। দড়ি ধরে টেনে কাত করে ফেলতে হবে। তারপর দোলকে দড়ি বেঁধে দোলাতে হবে ওটাকে। বাড়ি লাগবে ঘণ্টার গায়ে। এস, কাজে লেগে পড়ি।
চারজনেই দড়ি ধরে টান দিল। নড়ে উঠল ঘণ্টা, খুবই সামান্য।
জোরে! আরও জোরে! চেঁচিয়ে বলল কিশোর।
আরেকটু কাত হল ঘণ্টা।
হ্যাঁ, হবে। ছেড়ে দাও! বলল কিশোর।
কিশোর ছাড়া আর সবাই ছেড়ে দিল। দড়িটা নিয়ে গিয়ে। একপাশের একটা সরু থামের উল্টো পাশ দিয়ে ঘুরিয়ে আনল সে। তারপর আবার সবাইকে ধরে টানার নির্দেশ দিল।
একটু একটু করে কাত হতে শুরু করল ঘণ্টা। দোলকটা সরে যেতে লাগল ঘণ্টার এক কানার দিকে। সামান্য একটু ফাঁক থাকতেই চেঁচিয়ে উঠল কিশোর, এবার দড়ি পেচিয়ে বেঁধে ফেলতে হবে থামের সঙ্গে!
বেঁধে ফেলা হল দড়ি। কাত হয়ে রইল ঘণ্টা।
আবার হাঁপাতে শুরু করল ওরা। ঘামে নেয়ে উঠেছে শরীর। টিনের চালে আবার নেমে এসেছে পায়রাগুলো। বাক-বাকুম বাক-বাকুম শুরু করে দিয়েছে।
নিচে, প্রথম দরজায় ধাক্কার শব্দ থেমে গেছে।
নিশ্চয় কুড়াল আনতে গেছে ব্যাটারা! বিড়বিড় করল মরিডো।
কটা বাজে, মুসা? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
আটটা বাজতে বিশ।
হু। তাড়াতাড়ি করতে হবে। ডিউক রোজার ভাষণ দেবার আগেই শহরবাসীকে হুঁশিয়ার করে দেব।...মরিডো, দড়িটা দিন।
দড়ি!...
কোমরে পেঁচানো...
ও, হ্যাঁ! ভুলেই গিয়েছিলাম! চাদরে তৈরি দড়িটা কোমর থেকে খুলে দিল মরিডো।

দোলকে বেঁধে দিতে হবে। ওটা ধরেই টানব।
এক মুহূর্ত স্থির চোখে কিশোরের দিকে চেয়ে রইল মরিডো। অনেকক্ষণ পর এই প্রথম হাসল। সত্যি, আপনি বুদ্ধিমান…
আহ্, তাড়াতাড়ি করুন…।
কিন্তু ওখানে উঠব কি করে?
কিশোর, বুদ্ধি বাতলে দিল মুসা। আমি আর মরিডো পাশাপাশি দাঁড়াচ্ছি। তুমি আমাদের কাঁধে চড়ে উঠে যাও।
ঠিক আছে।
দোলকটার তলায় গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে পড়ল মুসা আর মরিডো। ওদের কাঁধে উঠে পড়ল কিশোর। দড়ি হাতে নিয়ে দাঁড়াল। দোলকের সঙ্গে পেঁচিয়ে বেঁধে দিল দড়ির এক মাথা। তারপর লাফিয়ে নেমে এল। যাক, অনেক কাজে লাগল দড়িটা!
মনে হচ্ছে ওদের, কত সময় পেরিয়ে গেছে! অথচ ঘণ্টাঘরে ঢোকার পর পেরিয়েছে মাত্র দেড় মিনিট।
আবার শব্দ শোনা গেল দরজায়।
দেরি করে লাভ নেই, বলে উঠল মুসা। এস, শুরু করে দিই।
দড়ি ধরল মুসা আর মরিডো। চারজনের মাঝে ওদের দুজনের গায়েই জোর বেশি। আস্তে করে টেনে কানার কাছ থেকে দোলকটা সরিয়ে আনল ওরা। তারপর হঠাৎ ঢিল দিল দড়িতে। প্রচণ্ড জোরে গিয়ে ঘণ্টার গায়ে আঘাত হানল ভারি দোলক।
গমগমে ভারি একটা শব্দ উঠল। কানে তালা লেগে যাবার জোগাড় হল ছেলেদের! রেলিঙের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে রবিন আর মুসা। নিচে চেয়ে দেখল, রাস্তার সবাই মুখ তুলে তাকিয়েছে এদিকে।
কানের বারোটা বেজে যাবে! বলে উঠল কিশোর। রবিন, তোমার পকেটে রুমাল আছে না?
আছে? এই নাও, বের করে দিল রবিন।
দ্রুত হাতে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করল কিশোর রুমালটা। দুটো টুকরো ঢুকিয়ে দিল, নিজের কানে। দুটো দিল রবিনকে। চারটে করে দিল মুসা আর মরিডোকে। ওরা কানে আঙুল দিতে পারবে না। কাজেই ভালমত বন্ধ করে নিতে হবে কানের ফুটো।
নিচে দরজার কাছ থেকে আসছে জোর আওয়াজ। কুড়াল এসে গেছে। ভেঙে ফেলবে শিগগিরই দরজা।
একনাগাড়ে ঘন্টা বাজিয়ে যেতে ইশারা করল কিশোর।

আবার বেজে উঠল ঘণ্টা। আবার, তারপর আবার। বেজেই চলল। তাল ঠিক নেই! আওয়াজটাও অনেক বেশি চড়া। বেশ দূর থেকে গিয়ে কানায় আঘাত হানছে দোলক, তাই। কান ফাটানো শব্দে ঘোষণা করে চলল যেন ঘণ্টাটা: হুশিয়ার! হুশিয়ার!

কানে আঙুল দিয়ে রেখেছে কিশোর আর রবিন। তবু রেহাই পাচ্ছে না। মাথার মগজসুদ্ধ যেন ঝাঁকিয়ে দিচ্ছে প্রচণ্ড শব্দ। মুসা আর মরিডোর অবস্থা কল্পনা করতে পারল ওরা। নিচে থেকে দরজা ধাক্কানর শব্দ শোনা যাচ্ছে না আর। শোনা যাচ্ছে না কিছুই। সারা পৃথিবী জুড়ে আছে যেন শুধু একটাই শব্দ-প্রচণ্ড ঢ-অ-ও-ও! ঢ-অ–ঙ!

টাওয়ারের নিচে রাস্তায় জমা হতে শুরু করেছে লোক, রেলিঙে দাঁড়িয়ে দেখছে কিশোর আর রবিন। পিল পিল করে লোক বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে অন্যান্য রাস্তায়, সবাই চেয়ে আছে গির্জার দিকে। কেউ কেউ উত্তেজিতভাবে প্রাসাদের দিকে দেখাচ্ছে হাত তুলে। মেসেজটা কি পাবে ওরা? বুঝতে পারবে, প্রিন্স দিমিত্রির বড় বিপদ?

টাওয়ারের নিচে জনতার মাঝে হঠাৎ একটা আলোড়ন উঠল। যাচ্ছে সবাই। হাঁটতে শুরু করল। রওনা হয়ে পথ ধরে, সম্ভবত প্রাসাদেই চলল ওরা।

দেখতে দেখতে জনতার ঢল নামল, যেন শহরের পথে পথে। আর তাকাচ্ছে না ওরা গির্জার দিকে। সোজা এগিয়ে চলেছে। লক্ষ্য, রাজপ্রাসাদ। হাসি ফুটল কিশোর আর রবিনের মুখে।

হাজারে হাজারে লোক জমে গেছে প্রাসাদের সামনে। প্রধান ফটকের সামনে ভিড়। একদল লাল কাপড় পরা পুতুল, চোখে পড়ল কিশোর আর রবিনের। নড়ছে ওগুলো। কিন্তু কয়েকটা সেকেণ্ড। জনতা-পুতুলের ধাক্কায় স্রোতের মুখে কুটোর মত ভেসে গেল যেন লাল ইউনিফর্ম পরা প্রহরীরা। আঙিনায় ঢুকে পড়তে শুরু করল জনতা।

মেসেজ পেয়ে গেছে তাহলে দেশবাসী!

হঠাৎ থেমে গেল ঘণ্টাধ্বনি। দড়ি ছেড়ে দিয়েছে মরিডো আর মুসা, কিশোর আর রবিনের পাশে এসে দাঁড়াল। ওরাও দেখতে চায়, কি ঘটছে। জনতার দিকে চেয়ে ওদের মুখেও হাসি ফুটল।

ঘড়ি দেখল মুসা। পকেট থেকে খুদে রেডিওটা বের করে নব ঘুরিয়ে দিল।

কোন শব্দ ঢুকল না কানে। ভুরু কুঁচকে তাকাল মুসা রেডিওর দিকে। চোখ তুলতেই দেখল, কানের ভেতর থেকে রুমালের টুকরো বের করছে কিশোর।

কানের ফুটো থেকে রুমালের টুকরো বের করে নিল সবাই। শোনা। গেল ভারি একটা কণ্ঠস্বর। ভ্যারানিয়ান ভাষা। ডিউক রোজার! নির্দিষ্ট সময়ের আগেই

ভাষণ শুরু করে দিয়েছে?
চুপচাপ শুনল কিছুক্ষণ মরিডো, তারপর অনুবাদ করে শোনাল তিন গোয়েন্দাকে: ডিউক রোজার! বলল, সাংঘাতিক এক বিদেশী ষড়যন্ত্র ধরা পড়েছে। অভিষেক অনুষ্ঠান অনির্দিষ্ট কালের জন্যে স্থগিত। শাসনভার পুরোপুরি নিজের হাতে তুলে নিয়েছে। শিগগিরই আসামীদের ধরে হাজির করবে দেশবাসীর সামনে। রূপালী মাকড়সা গায়েব। প্রিন্স দিমিত্রিকে নজরবন্দি করা হয়েছে। দেশবাসীর কাছে সাহায্যের আবেদন জানাচ্ছে ডিউক।
কাম সারছে! বলে উঠল মুসা। এমনভাবে বললেন, আমারই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে! আল্লাই জানে, কি হবে!
কিন্তু ডেনজোর অনেকেই শুনছে না তার ভাষণ! বলল মরিডো। ছুটে যাচ্ছে প্রাসাদের দিকে। ঘন্টা কেন বাজল, এটাই হয়ত জানতে চায়...চমকে উঠে থেমে গেল সে। এ দরজা ধাক্কানোর শব্দ। দুটো দরজা ভেঙে ফেলেছে প্রহরীরা। পৌঁছে গেছে তৃতীয় দরজার ওপাশে।
দরজা খোল! চেঁচিয়ে উঠল একটা ভারি কণ্ঠ। রিজেন্টের আদেশে অ্যারেস্ট করা হল তোমাদের
দরজা ভেঙে আস! চেঁচিয়ে জবাব দিল মরিডো। আমরা খুলব না! সঙ্গীদের দিকে ফিরে বলল, আসুন। আবার বাজাই। ওরা ঢোকার চেষ্টা করুক, আমরা বাজিয়ে যাই।
আবার কানে রুমালের টুকরো ঢোকাল ওরা।
আবার বাজতে শুরু করল ঘন্টা। মাত্র কয়েক ফুট দূরে কুড়ালি আর ক্রোবার নিয়ে দরজা আক্রমণ করেছে প্রহরীরা। সে শব্দ চাকা পড়ে গেছে প্রচণ্ড ঘণ্টাধ্বনিতে!
হঠাৎ ভেঙে পড়ল দরজা।
.
আগেপিছে প্রহরী। সিঁড়ি দিয়ে নেমে চলল ছেলেরা। ক্লান্ত।
সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে প্রহরী। গোল একটা বেষ্টনী তৈরি করে দাঁড়াল। তার মাঝে ঠেলে ঢুকিয়ে দেয়া হল ছেলেদেরকে।
গির্জা থেকে বের করে আনা হল চার বন্দিকে। রাস্তায় এখনও লোক আছে, তবে খুবই কম। কৌতূহলী চোখে তাকাল ওরা। কি হচ্ছে না হচ্ছে বুঝতে পারছে না কিছুই। পায়ে পায়ে এগিয়ে এল কয়েকজন। প্রহরীদের ধমক শুনে পিছিয়ে গেল আবার।
চারপাশ থেকে বন্দিদেরকে ঘিরে নিয়ে সার্চ করে এগোল প্রহরীরা। দুটো ব্লক পেরিয়ে এসে থামল একটা পাথরের বাড়ির সামনে। ওটা থানা। ভেতর থেকে

বেরিয়ে এল দুজন নীল পোশাক পরা পুলিশ অফিসার।
দেশের শত্রু! অফিসারদের দিকে চেয়ে বলল প্রহরীদের ক্যাপ্টেন। হাজতে ভরে রাখুন। পরে, ডিউক রোজার যা করার করবেন।
দ্বিধা করতে লাগল দুই অফিসার।
প্রিন্স পলের ঘণ্টা… বলতে গিয়েও থেমে গেল এক অফিসার।
রিজেন্টের আদেশ! খেঁকিয়ে উঠল ক্যাপ্টেন। বোঝা গেল, পুলিশের চেয়ে অনেক বেশি ক্ষমতা দেয়া হয়েছে রয়্যাল গার্ডকে। অনেকটা সেনাবাহিনীর মত। সরুন! পথ ছাড়ন!
সরে দাঁড়াল দুই অফিসার। বন্দিদেরকে নিয়ে একটা হলে এসে ঢুকল প্রহরীরা। অন্য পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল করিডরে। দুটো করে দুপাশে চারটে ছোট ছোট সেল। লোহার শিকের দরজা। একটা ঘরে ঢুকিয়ে দিল মুসা আর মরিডোকে। আরেকটাতে কিশোর আর রবিন। বন্ধ করে দিল দরজা।
তালা আটকান, পেছনে আসা পুলিশ অফিসারের দিকে চেয়ে আদেশ দিল ক্যাপ্টেন। ভালমত পাহারার ব্যবস্থা করুন। এখান থেকে ওরা পালালে, কপালে দুঃখ আছে আপনাদের।…আমরা যাচ্ছি। রিজেন্টকে খবর দিতে হবে।
বেরিয়ে গেল প্রহরীরা।
প্রতিটি সেলে দুটো করে বাংক। এগিয়ে গিয়ে একটাতে বসে পড়ল মরিডো। ধরা শেষতক পড়লামই! তবে, আর কিছু করারও ছিল না আমাদের। প্রাসাদে কি ঘটছে, কে জানে!
কোন জবাব দিল না মুসা। অন্য বাংকটাতে গিয়ে বসে পড়ল, চুপচাপ।
সারারাত জেগেছি, বাংকে বসে বলল কিশোর। ধকলও গেছে সাংঘাতিক! শরীরে আর সইছে না। যা হবার হোকগে পরে, আগে ঘুমিয়ে নিই… শুয়ে পড়ল সে।
রবিনও হাই তুলতে লাগল। চোখ ডলল দুহাতে। আর কিছুই করার নেই। সে-ও শুয়ে পড়ল বাংকে।
শুয়ে শুয়ে বিড়বিড় করতে লাগল কিশোর, শত শত বছর আগে একবার বাজানো হয়েছিল এভাবে, আজ আবার আমরা বাজালাম! রেডিও-টেলিভিশনের চেয়ে অনেক অনেক পুরানো মাধ্যম! আজকাল অনেক জায়গাতেই এটা নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। তবে প্রথম নিষিদ্ধ হয়েছিল ১৪৫৩ সালে, তুর্কীরা কনস্টান্টিনোপল অধিকার করার পর…এই রবিন, শুনছ…
সাড়া দিল না রবিন। ঘুমিয়ে পড়েছে।
চোখ মুদল কিশোর।
.

গাঢ় অন্ধকার। পা পিছলে নর্দমার পানিতে পড়ে গেছে রবিন। ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে তাকে তীব্র স্রোত। হাত-পা নেড়ে ভেসে থাকার চেষ্টা, করছে সে। বার বার বাড়ি খাচ্ছে সুড়ঙ্গের দেয়ালে। একবার এপাশে, একবার ওপাশে। বহুদূর থেকে যেন ভেসে এল কিশোরের ডাক, রবিন! এই, রবিন!
উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করছে রবিন। পারছে না। কাঁধ চেপে ধরল একটা হাত। কানের কাছে চেঁচিয়ে উঠল কিশোর, রবিন! চোখ মেল! ওঠ!
চোখ মেলল রবিন। মিটমিট করে তাকাল। প্রথমে বুঝতে পারল না কোথায় রয়েছে। মুখের ওপর ঝুঁকে আছে কিশোরের মুখ। হাসছে।
রবিন! দেখ কে এসেছে। ওঠ, উঠে বস!
উঠে বসল রবিন। কিশোর সামনে থেকে সরে দাঁড়াল। নজরে পড়ল বব ব্রাউনের হাসি হাসি মুখ।
দারুণ কাজ দেখিয়েছ, রবিন! এগিয়ে এল বব। রবিনের কাঁধে। হাত রাখল। তোমরা সবাই! এতটা আশা করিনি!
চোখ মিটমিট করে ববের দিকে তাকাল রবিন। প্রিন্স দিমিত্রি? সে ভাল আছে?
খুব ভাল। এই এসে পড়ল বলে, বলল বব। ডিউক রোজার, তার প্রধানমন্ত্রী এবং দলের আর সবাইকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। রোজার আর লুথারকে আচ্ছামত ধোলাই দিয়েছে জনতা। প্রিন্স দিমিত্রি ঠিক সময়ে এসে না পড়লে, মেরেই ফেলত। মরিডোর বাবাকে মুক্তি দেয়া হয়েছে। আবার প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছেন তিনি...
উল্টোদিকের সেলের দরজা খোলার শব্দ হল। বেরিয়ে এল মুসা আর মরিডো। এই সেলে এসে ঢুকল। পেছনে এল দুই পুলিশ অফিসারের একজন। হাসি একান-ওকান হয়ে গেছে দুজনেরই।
ঘণ্টা বাজানর পর কি কি হয়েছে, নিশ্চয় জানতে ইচ্ছে করছে। তোমাদের, না? চারজনের দিকেই তাকাল একবার বব।
মাথা ঝোঁকাল তিন গোয়েন্দা।
তোমাদের সঙ্গে হঠাৎ রেডিও যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেল, বলল বব। উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লাম। আজ ভোরে আর থাকতে না পেরে অ্যামব্যাসাডর সাহেবকে নিয়ে বেরিয়েই পড়লাম। প্রাসাদের মেইন গেট বন্ধ। তালা দেয়া। গেটের ওপাশে গার্ড। ভেতরে ঢুকব, বললাম। গেট খুলল না ওরা। ডিউক রোজারের হুকুম, খোলা যাবে না, বলল। এর পরেও দরজা খোলার জন্যে চাপাচাপি করছি, এই সময় বেজে উঠল প্রিন্স পলের ঘণ্টা। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল রাস্তার লোক। তারপর, বেজেই চলল ঘণ্টা। পিলপিল করে ঘর থেকে বেরিয়ে এল মানুষ। বন্যার মত ধেয়ে এল প্রাসাদের দিকে। গেট খুলে দিতে বলল গার্ডদেরকে। প্রিন্স দিমিত্রির কি হয়েছে,

জানতে চাইল। ওদেরকে সন্তুষ্ট করতে পারল না গার্ডেরা। ব্যস, খেপে গেল জনতা। ধাক্কা দিয়ে ভেঙে ফেলল গেট। ঢুকে পড়ল আঙিনায়। হাতে গোনা কয়েকজন গার্ডের সাধ্য হল না সে জনস্রোতকে থামান। দেখতে দেখতে ভরে গেল আঙিনা। বারান্দায় উঠে পড়ল গার্ডেরা। ঠিক এই সময়, দোতলায় রেলিঙের কাছে এসে দাঁড়াল এক প্রহরী। চেঁচিয়ে বলল জনতাকে, প্রিন্স দিমিত্রি সাংঘাতিক বিপদে পড়েছে। তাকে যেন উদ্ধার করে তারা। কয়েদখানায় প্রিন্সকে আটকে রেখেছে শয়তান ডিউক রোজার। ভয়ানক এক ষড়যন্ত্র করেছে। ব্যস, আমিও পেয়ে গেলাম সুযোগ, হাসল বব। উঠে দাঁড়ালাম গাড়ির ছাতে। ভ্যারানিয়ান ভাষা জানি। শুরু করলাম শ্লোগান: প্রিন্স দিমিত্রি! জিন্দাবাদ! ডিউক রোজার! নিপাত যাক। থামল সে। তারপর বলল, এমনিতেই ডিউক রোজারকে দেখতে পারে না। জনসাধারণ। গতরাতে রেডিও-টেলিভিশনে বারবার ঘোষণা করা হয়েছে, সকাল আটটায় জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবে রোজার। প্রাসাদের গেট তালা দিয়ে রাখা হয়েছে। হঠাৎ বেজে উঠেছে প্রিন্স পলের ঘণ্টা। দোতলায় গার্ডের সাহায্যের আবেদন, আবার শ্লোগান...দুইয়ে দুইয়ে। ঠিক চার মিলিয়ে নিল জনতা। বারুদে জ্বলন্ত ম্যাচের কাঠি পড়ল যেন। গার্ডদের আক্রমণ করে বসল ওরা। তারপর যা একখান দৃশ্য! বলে বোঝাতে পারব না! প্রাসাদে ঢুকে পড়ল জনতা। চাপের মুখে প্রিন্স দিমিত্রিকে কোথায় আটকে রেখেছে, দেখিয়ে দিতে বাধ্য হল গার্ডেরা। বের করে আনা হল তাকে। সত্যি, প্রিন্স বটে! ওইটুকু ছেলে! অথচ বেরিয়েই কি সুন্দর থামিয়ে ফেলল সব গোলমাল। রোজার আর লুথারকে অ্যারেস্ট করার আদেশ দিল। বেগতিক দেখে দল বদল করল গার্ডেরা, যারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। এবার বিশ্বাসঘাতকতা করল ওরা দুই ডিউকের সঙ্গে। ওদেরকে ধরে আনতে ছুটল। গিয়ে দেখল ঘরের দরজা ভাঙা। দুজনকে ধরে বেদম পেটাচ্ছে জনতা। কোনমতে উদ্ধার করে আনা হয়েছে ওদেরকে। তারপর আর কি? দোতলায় দাঁড়িয়ে জনতার উদ্দেশে মিনিট দুয়েক ভাষণ দিল প্রিন্স। থেমে গেল। সব গোলমাল।

এখন দু-এক ঘা লাগানো যায় না রোজারকে? শার্টের হাতা গোটাল মুসা। মানে, হাতের ঝাল একটু মিটিয়ে নিতাম।

হেসে ফেলল সবাই।

না, হাসতে হাসতে বলল বব। সুযোগ হারিয়েছে। জেলখানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে বিশ্বাসঘাতকদের সবকটা রুই-কাতলাকে। চুনোপুঁটিগুলো ছাড়াই আছে। ওরা আর কিছু করতে সাহস পাবে না।

ক্যালিফোর্নিয়ায় ইচ্ছে করেই অ্যাক্সিডেন্ট ঘটাতে চেয়েছিল লিমোসিনের ড্রাইভার, বলল কিশোর। এখন এটা পরিষ্কার। ওই ব্যাটাও রোজারেরই লোক।

বিশ্বাসঘাতক। প্রিন্স দিমিত্রিকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল ওরা আমেরিকায় থাকতেই।
হ্যাঁ, মাথা ঝোকাল বব। ওরা… থেমে গেল সে।
সোরগোল উঠেছে বাইরে। শোনা যাচ্ছে শ্লোগান: প্রিন্স! প্রিন্স! লঙ লিভ দ্য প্রিন্স!
সেলের দরজায় এসে দাঁড়াল দিমিত্রি। ছুটে এসে ঢুকল। জড়িয়ে ধরল বন্ধুদেরকে। তোমরা সত্যি আমার বন্ধু! তোমরা না এলে… কথা শেষ করতে পারল না রাজকুমার। ধরে এসেছে গলা।
আলিঙ্গনমুক্ত হল দিমিত্রি। মরিডোর দিকে তাকাল। ঘণ্টা বাজানর বুদ্ধিটা কার?
কিশোরের, বলল মরিডো। আমরা তো খালি-রেডিও টেলিভিশন আর খবরের কাগজের কথাই ভাবছিলাম। ঘন্টার কথা মনেই আসেনি…
ধন্যবাদ…।
…ধন্যবাদটা আসলে তোমার আর রবিনের পাওয়া উচিত, প্রিন্স, মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল কিশোর। ষোলোশো পঁচাত্তরের সেই বিদ্রোহের কথা তোমরাই বলেছিলে। নইলে জানতে পারতাম না। মাথায় ঢুকত না ঘণ্টা বাজিয়ে দেশবাসীর কাছে সাহায্য চাওয়ার কথা…
যত যা-ই বল! তোমরা না এলে গিয়েছিল ভ্যারানিয়া! হাসল দিমিত্রি। প্রিন্স পল এখন বেঁচে থাকলে তোমাদেরকে মাথায় নিয়ে নাচতেন… থেমে গেল রাজকুমার।
হঠাৎ আবার বেজে উঠেছে প্রিন্স পলের ঘন্টা। বেজেই চলল, তালে তালে।
আবার বলল দিমিত্রি, সাঁঝ পর্যন্ত ঘণ্টা বাজাতে বলে এসেছি আমি! আনন্দ প্রকাশের জন্যে, জয়ের আনন্দ, চুপ করল রাজকুমার। বিষণ্ন হয়ে গেল হঠাৎ। তবে, রূপালী মাকড়সা সঙ্গে থাকলে পরিপূর্ণ হত আনন্দ!
দিমিত্রি, বলল কিশোর। আমাকে আরেকবার সেই ঘরে নিয়ে চল। প্রাসাদে, যে-ঘরে আমরা ঘুমিয়েছি। আরেকবার দেখি চেষ্টা করে, রূপালী মাকড়সা বের করা যায় কিনা! একটা ব্যাপারে খচখচ করছে। মনের ভেতর…
তুমি জান কোথায় আছে রূপালী মাকড়সা! চেঁচিয়ে উঠল রবিন। তাহলে আগে বলনি কেন?
যা উত্তেজনা গেছে, ভাবারই সুযোগ পাইনি, বলল কিশোর। তবে, ঘুমিয়ে এখন ঝরঝরে লাগছে শরীরটা। মগজের ধূসর কোষগুলো আবার কাজ করতে শুরু করেছে…চল চল, আর দেরি করে। লাভ নেই…এখুনি বেরিয়ে পড়ি…
.
রাস্তার দুপাশে লোকের ভিড়। মাঝখান দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে। গাড়ি। হাত নাড়ছে জনতা। চেঁচাচ্ছে। সবারই মুখে এক কথা: লঙ লিভ দ্য প্রিন্স!–
ছলছল করছে দিমিত্রির চোখ। হাত নেড়ে তাদের সংবর্ধনার জবাব দিচ্ছে।

অনেক অনেকক্ষণ পর প্রাসাদের আঙিনায় এসে ঢুকল গাড়ি। ঘিরে ধরল সশস্ত্র প্রহরী। ওরা সবাই মিনস্ট্রেল পার্টির লোক। দিমিত্রি নামতেই দুদিক থেকে এগিয়ে এল দুজন দেহরক্ষী।
-একে একে কিশোর, মুসা আর রবিনও নেমে পড়ল। ড্রাইভারের সিট থেকে নেমে এল মরিডো। তিন গোয়েন্দার দুপাশেও এসে দাঁড়িয়ে গেল তলোয়ারধারী দেহরক্ষী। রবিনের দিকে চেয়ে সবার অলক্ষে চোখ টিপল মুসা। ভাবখানাঃ কি ব্যাপার! আমরাও প্রিন্স হয়ে গেলাম নাকি! মুচকে হাসল রবিন।
অনেক অলিগলি করিডর আর সিঁড়ি পেরিয়ে তেতলার সেই ঘরে। এসে ঢুকল ওরা। দিমিত্রি, তিন গোয়েন্দা আর মরিডো। দেহরক্ষীরা সব দাঁড়িয়ে রইল বাইরে।
এ ঘরের কোন জায়গায়ই খোঁজা বাদ দিইনি, বলল কিশোর। শুধু একটা জায়গা ছাড়া। যদি থাকে, ওই একটা জায়গাতে আছে রূপালী মাকড়সা। হয়ত আমার ভুলও হতে পারে, হয়ত পকেটেই রেখেছিল রবিন। নদীতে পড়ে গেছে...
দূর! হাত তুলল মুসা! তোমার বক্তৃতা থামাও তো, কিশোর! কোথায় আছে, বের করে ফেল!
ঠিক আছে দেখি, ঘরের কোণে এগিয়ে গেল কিশোর খাট ঘুরে। হাঁটু আর কনুইয়ে ভর দিয়ে উপুড় হল। জালটা এখনও আগের জায়গায়ই ঝুলছে। হামাগুড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল মাকড়সার জালের দিকে।
তক্তার প্রান্ত আর মেঝের ফাঁকে গায়ে গা ঠেকিয়ে বসে আছে দুটো মাকড়সা। হাত বাড়াল কিশোর। চট করে ভেতরে ঢুকে পড়ল একটা মাকড়সা। আরেকটা রসেই রইল। লাল লাল চোখ।
হাত আরও সামনে বাড়াল কিশোর। আরও, আরও। নড়ল না মাকড়সা। দুআঙুলে চেপে ধরল সোনালি মাথাটা। তবু নড়ল না মাকড়সা। ধীরে ধীরে বের করে নিয়ে এল সে ওটাকে। হাতের তালুতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। হেঁটে এসে দাঁড়াল প্রিন্স দিমিত্রির সামনে।
এই যে, দেখ! তালুতে বসা মাকড়সাটা দেখাল কিশোর।
ভ্যারানিয়ার রূপালী মাকড়সা, বিড়বিড় করে বলল দিমিত্রি। আসলটা!
উত্তেজিত না থাকলে প্রথমবারেই বুঝে যেতাম, বলল কিশোর। দরজায় ধাক্কা দিচ্ছিল গার্ডেরা। লাফিয়ে এসে ঘরে ঢুকেছে মরিডো, অসাধারণ একটা বুদ্ধি খেলে গেল রবিনের মাথায়!
আমি রেখেছি! চোখ বড় বড় হয়ে গেল রবিনের।
হা! মাথায় আঘাত লাগায় ভুলে গিয়েছ। চমৎকার বুদ্ধি এঁটেছিলে! ঠিক বুঝেছিলে, মাত্র ওই একটা জায়গাতেই খুঁজবে না কেউ। খোঁজার সাহসই করবে

না। মাকড়সার মাথা বেরিয়ে আছে, সেই সঙ্গে জাল, জ্যান্ত একটা মাকড়সা ঘোরাফেরা করছে জালের কাছে…নাহ, দারুণ দেখিয়েছ, নথি!
ব্রোজাস! রবিনের মুখে হাত রাখল দিমিত্রি। রবিন, তোমার তুলনা হয় না! বুঝতে পারছি, অলক্ষে থেকে সেদিন প্রিন্স পলই তোমাদের সঙ্গে দেখা করিয়ে দিয়েছিলেন আমার।
মরিডো, বলল কিশোর। মনে আছে, কি বলেছিল জিপসি আলবার্তো? বলেছিল, বিজয়ের ঘণ্টা শুনছি আমি! ঠিকই বলেছে! আরও একটা কথা বলেছে সে: রূপালী মাকড়সার সঙ্গে সাধারণ মাকড়সার তফাৎ নেই! কথাটা তখন রহস্যময় ঠেকেছিল আমার কাছে। কিন্তু ঘণ্টা বাজানর পর যখন প্রিন্স দিমিত্রির বিজয় হল, বুড়ো জাদুকরের কথা মনে পড়ে গেল আমার। তার রহস্যময় কথা আর রহস্য থাকল না। অনুমান করে ফেললাম, কোথায় আছে রূপালী মাকড়সা।
কিন্তু কি করে জানলা সে ভুরু কুঁচকে গেছে মুসার। জিনটিন বশ নেই তো তার মোটেই না, বলল কিশোর। আসলে, মস্তবড় থট রীডার সে। ওই যে নীল ধোয়া, ওটা এক ধরনের কেমিক্যাল। ওটা শুকিয়েছে আমাদেরকে। তারপর সম্মোহন করেছে। তোমার অবচেতন মনে গাঁথা রয়েছে রূপালী মাকড়সার কথা, সেখান থেকে মুছে যায়নি। ঠিক ওখানে পাঠিয়ে দিয়েছিল বুড়ো আলবার্তো তার ব্রেনওয়েভ বা ওই জাতীয় কিছু। বের করে এনেছিল মনের যত কথা। খুব ভাল ভবিষ্যৎ-বক্তাও সে। আশ্চর্য ক্ষমতা,রোজারকে অপছন্দ করে সে, তাই বলেনি কোথায় আছে রূপালী মাকড়সা। দিমিত্রির দিকে চেয়ে হাসল। কাজেই, বুঝতেই পারছ, রূপালী মাকড়সাটার খোঁজ আসলে আলবার্তোই দিয়েছে…
দিয়েছে, কিন্তু আর কেউ তো সে কথার মানে বের করতে পারেনি, কিশোরের হাত থেকে রূপালী মাকড়সাটা নিল দিমিত্রি। রুমালে পেঁচিয়ে সাবধানে ব্রাখিল পকেটে। সে যাই হোক, তোমাদের ঋণ শোধ করতে পারব না আমি। আরেক পকেট থেকে তিনটে রূপালী মাকড়সা বের করল সে। তিনটাতেই রূপার চেন আটকানো। এক এক করে তিন গোয়েন্দার গলায় তিনটে মাকড়সা ঝুলিয়ে দিল সে।
হাত তালি দিয়ে উঠল মরিডো।
ভ্যারানিয়ার সবচেয়ে সম্মানিত পদক, হেসে বলল দিমিত্রি। অর্ডার অভ দ্য সিলভার স্পাইডার। তোমাদেরকে ভ্যারানিয়ার লাগরিকের সম্মান দিয়েছি আমি। এর চেয়ে বেশি সম্মান দেবার ক্ষমতা আমার নেই। তোমাদের কারও কোন ইচ্ছে থাকলে বল, পূরণ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করব আমি।
না না, আর বলতে গিয়ে বাধা পেয়ে থেমে গেল কিশোর।

আছে, কথার মাঝখানেই কথা বলে উঠেছে মুসা। আমার একটা। ইচ্ছে আছে। সামান্য কিছু খাবার হবে? বেশি না, এই ডজনখানেক স্যাণ্ডউইচ, একটা মুরগি, ডিম, কিছু আঙুর আর এক জগ দুধ হলেই চলবে আপাতত।
হো হো করে হেসে উঠল সবাই।

ভলিউম ২ – জলদস্যুর দ্বীপ ১ – রকিব হাসান – তিন গোয়েন্দা – কিশোর থ্রিলার
প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৭
মৃদু ঢেউয়ে দুলছে দুটো জাহাজ-একটা ব্রিটিশ, নাম সাউথ আটলান্টিক, অন্যটা স্প্যানিশ, নাম সান্তা মারিয়া, গায়ে গা ঘষা লেগে আওয়াজ উঠছে কাঁচকোঁচ, শোনা যাচ্ছে শেকলের ঝনঝন। মোটা দড়ি দিয়ে, একটার সঙ্গে আরেকটা বেঁধে রাখা হয়েছে, কখনও টানটান হয়ে যাচ্ছে দড়ি, ছেড়ে ছেড়ে অবস্থা, তার পরেই আবার একেবারে ঢিল হয়ে যাচ্ছে।
মাথার ওপর মস্ত খোলা আকাশ গাঢ় নীল, শুধু অনেক পশ্চিমে হিসপ্যানিওলা পর্বতের ধোয়াটে চুড়ার মাথায় তুলোর মত খানিকটা সাদা মেঘ, ধীরে ধীরে ভেসে আসছে এদিকে। জাহাজদুটোকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে একটা অ্যালট্রেস, তুষারশুভ্র ছড়ানো বিশাল ডানা স্থির, সামান্যতম কাপনও নেই পালকগুলোতে, কি এক অদ্ভুত কৌশলে বাতাসে ভেসে রয়েছে পাখিটা, নিচে কাঁচের মত পরিষ্কার পানিতে তার ছায়া ভেঙে যাচ্ছে ডলফিনের দাপাদাপিতে। কাছাকাছিই রয়েছে ঝাঁকটা, কখনও জাহাজের একেবারে কাছে চলে আসছে, পরক্ষণেই একে অন্যকে তাড়া করে সরে যাচ্ছে আবার দূরে।
জ্যান্ত এই ছবির সঙ্গে মানিয়ে গেছে চমৎকার স্প্যানিশ জাহাজটা-রাজকীয় একটা কাঠের গ্যালিয়ন, লাল আর রূপালী রঙ করা কাউন্টার, পেছনের উঁচু পূপ সোনালি, কিছু পাল মাখনরঙা, কিছু টকটকে লাল।
অন্য জাহাজটা ঠিক তেমনি বেমানান, বড় একটা ক্যানভাস, যেটা দিয়ে কামান ঢেকে রাখা হত, সেটা এখন দলেমুচড়ে পড়ে রয়েছে ভাঙা প্রধান মাস্তুলের গোড়ায়, তাতে অসংখ্য গুলির ফুটো। জাহাজের উজ্জ্বল রঙ জায়গায় জায়গায় মলিন করে দিয়েছে শুকনো রক্তের কালচে দাগ। ডেকে জমাট রক্তের মাঝে বেকায়দা ভঙ্গিতে পড়ে রয়েছে নাবিকদের লাশ, কেউ শূন্য চোখে তাকিয়ে রয়েছে আকাশের দিকে, কেউ মুখ গুঁজে পড়ে আছে ডেকে, কেউবা আবার চেয়ে আছে যেন গ্যালিয়নের পতাকাদণ্ডে উড়তে থাকা ভয়ঙ্কর পতাকাটার দিকে, তাতে আঁকা মানুষের হাড়ের একটা ক্রস, ক্রসের ওপর মড়ার খুলি-জলদস্যুর প্রতীকচিহ্ন। অতি সাধারণ একটা দৃশ্য ছিল এটা শতশত বছর আগে, ইংল্যাণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লসের আমলে।
সাউথ আটলান্টিক আড়াইশো টনী জাহাজ, স্প্যানিশ মেইন থেকে বাড়ি ফিরছিল, ইংল্যাণ্ডে, পথে দেখা হয়ে যায় সান্তা মারিয়ার সঙ্গে। সান্তা মারিয়া তখন ওই অঞ্চলের সাগরের ত্রাস লুই ডেকেইনির দখলে। লোকে বলে, লুই ডেকেইনি মানুষ না, মানুষরূপী খোদ ইবলিস, গায়ে ফরাসী ওলন্দাজের মিশ্র রক্ত, নাবিকেরা তার নাম শুনলেই আঁতকে উঠত তখন। কাউকে রেহাই দিত না

ডেকেইনি, এমনকি শিশু আর বৃদ্ধরাও নিস্তার পেত না তার হাত থেকে, নিষ্ঠুরভাবে খুন হয়ে যেত। সেই ডাকাতের কবলে পড়ল ব্রিটিশ জাহাজটা।

সেদিন ভোরে দিগন্তে দেখা দিল সান্তা মারিয়া, দূর থেকে দেখেই চিনল সাউথ আটলান্টিকের ক্যাপ্টেন রিচার্ড হ্যারিসন। চমকে উঠল। মহাদানব দেখা দিয়েছে, নিস্তার পাওয়া মুশকিল! তাদের ভাগ্য খারাপ, হঠাৎ করেই বাতাস পড়ে গেল এই সময়, গতি কমে গেল জাহাজের। সান্তা মারিয়া জাহাজ বড়, তার পালও বড়, পালে হাওয়া বেশি লাগে, ফলে ব্রিটিশ জাহাজের চেয়ে গতি বেশি এখন তার।

দ্রুত এগিয়ে আসছে জলদস্যুর জাহাজ। বুঝে গেল ক্যাপ্টেন হ্যারিসন, তার দিন শেষ হয়ে এসেছে। ঈশ্বরের কাছে অনুগ্রহ ভিক্ষা চাইল, নাবিকদের ডেকে ছোটখাট একটা বক্তৃতা দিল, তাদেরকে বলল, মরতেই যখন হবে, বিনা লড়াইয়ে মরবে না, বীরের মত লড়ে যাবে শেষ অবধি, যে কটা ডাকাতকে শেষ করে দেয়া যায়, তা-ই লাভ।

বীরের মতই লড়ল হ্যারিসন আর তার দল। কিন্তু টিকল না বেশিক্ষণ। পিলপিল করে জাহাজে উঠে এল ডাকাতের দল, ঘিরে ফেলল। তারপর শুরু হলো পাইকারী গণহত্যা। ক্যাপ্টেনের হাতে খোলা তলোয়ার, মুখে ঈশ্বরের নাম। একে একে মারা গেল ব্রিটিশ জাহাজের সব নাবিক, পেছন থেকে মাথায় আঘাত খেয়ে হুমড়ি খেয়ে ডেকে পড়ে গেল হ্যারিসন...

মরল না ক্যাপ্টেন। তার সঙ্গীসাথীরা কেউ জীবিত নেই। ক্যাপ্টেনের ঠ্যাঙ ধরে হিড়হিড় করে সারা ডেকে টেনে হিঁচড়ে কষ্ট দিতে লাগল কয়েক ডাকাত মিলে, অন্যেরা লুটপাট চালাল জাহাজে। এরপর তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে আনা হলো। ডেকেইনির সামনে। স্প্যানিশ মেইন থেকে সহসা আর কোন জাহাজ ছাড়বে কিনা, ছাড়লে কোনদিকে যাবে, জানতে চাইল ডেকেইনি। কিন্তু মুখে খিল এঁটে রইল ক্যাপ্টেন, কোন জবাবই দিল না। চাবুক দিয়ে তাকে যেভাবে খুশি পেটাল ডাকাতেরা, ক্যাপ্টেন অটল, টু শব্দ করল না। শেষে ডাকাতরাই বিরক্ত হয়ে হাল ছেড়ে দিল। হাত পিছমোড়া করে বেঁধে, জাহাজের গা থেকে বের করে রাখা চওড়া একটা তক্তার ওপর দাঁড় করিয়ে দেয়া হলো তাকে। কিন্তু ক্যাপ্টেনের চেহারায়। মৃত্যুভয় নেই, মেরে ফেলো বা যাই করো, থোড়াই কেয়ার করি! এমনি ভাব ফুটে রয়েছে।

তার চেহারার এই ড্যাম কেয়ার ভাব দেখে চমকে গেছে ডাকাতেরা, থমথমে নীরবতা বিরাজ করতে লাগল। শুধু মাছখেকো পাখির চিৎকার আর ঢেউয়ের মৃদু বিড়বিড় ছাড়া আর কোন শব্দ নেই।

খুনী লুই ডেকেইনি, যার অনেকগুলো ভয়ঙ্কর নাম, সে-ও ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে ক্যাপ্টেনের দিকে। তার নাম শুনলেই লোকে আঁতকে ওঠে, চেহারা দেখে

ভিরমি খায়, স্প্যানিশ মেইনের আতঙ্ক সেই দানব লুইয়ের সামনেও এতখানি অটল থাকছে কি করে লোকটা, এত আত্মবিশ্বাস কিসের! জানে মরবে, তবুও এত শান্ত রয়েছে কি করে ওই ইংরেজ ক্যাপ্টেন? কেমন যেন সন্দেহ জাগতে শুরু করেছে। ডেকেইনির মনে। ব্যাপারটা কি?

কোনমতে ঘাড় ঘুরিয়ে অনেক নিচের সাগরের দিকে চাইল একবার ক্যাপ্টেন, তারপর তাকাল আবার ডাকাতদের মুখের দিকে। তাদের চোখে ঘৃণা নেই, ভয়। নেই, রয়েছে কেমন একটা দ্বিধা, জয়ের আনন্দ ফুটতে পারছে না ঠিকমত। ওদের দৃষ্টি স্থির ক্যাপ্টেনের কপালের দিকে। বন্দির ভুরুর ওপরে একটা রক্তাক্ত কাটা জখমের ওপরের আরেকটা জখম থেকে এক ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে নামছে, ধীরে ধীরে সৃষ্টি হচ্ছে একটা ক্রুশ।

অশুভ সঙ্কেত! গুঞ্জন উঠল ডাকাতদের মাঝে, অদ্ভুত গুঞ্জন, বহুদূরের পাথুরে সৈকতে সাগরের ঢেউ ভাঙল যেন কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ করেই থেমে গেল শব্দ, কথা বলে উঠেছে ক্যাপ্টেন।

নরকের কুত্তার দল! চেঁচিয়ে বলল ক্যাপ্টেন, তোদের সময় ঘনিয়ে এসেছে। আরেক পূর্ণিমা দেখার সুযোগ পাবি না কেউ!

রোদতপ্ত বাতাস চিরে দিল যেন ডাকাতদের মিলিত চিৎকার।

গুলি করো! ভয়ার্ত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল কয়লার মত কালো এক নিগ্রো।

পেররো! ভামো আ ভার! চাপা গলায় গর্জে উঠল আরেক স্প্যানিয়ার্ড।

গোড়ালিতে দড়ি বেঁধে উল্টো করে লটকে দাও! গোঁ গোঁ করল একচোখো এক দানব।

উডল...উডল চালাও, শিক্ষা হয়ে যাবে ব্যাটার! পরামর্শ দিল আরেকজন।

চুপ! দস্যু-সর্দারের তীক্ষ্ণ কণ্ঠ যেন চাবুক মেরে নীরব করে দিল সবাইকে। সে তাকিয়ে রয়েছে ইংরেজ ক্যাপ্টেনের শান্ত হাসিহাসি মুখের দিকে। আশ্চর্য! মৃত্যুকে সামনে দেখেও ভয় পাচ্ছে না কেন লোকটা!

আমার জাহাজ থেকে যেসব মোহর নিয়ে তোমার মোহরের সঙ্গে মিশিয়েছ, ডেকেইনিকে বলল ক্যাপ্টেন, তার মধ্যে বিশেষ একটা ডাবলুন রয়েছে, মন্ত্রপূত অভিশপ্ত মোহর। তোমাদের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেল, ডেকেইনি, মরেছ তোমরা। জোসেপ বউন-এর নাম নিশ্চয়ই শুনেছ, লালচুলো সেই বিখ্যাত দস্যু, ছায়ার মত যার গতিবিধি ছিল, গত হপ্তায় পোর্ট রয়ালে ধরে আনা হয়েছিল তাকে। ওই মোহরটা ছিল তার পকেটে। মৃত্যুর আগে কি করেছে সে জানো? ফাঁসিকাঠে দাঁড়িয়ে মোহরটাতে তিনবার থুথু ছিটিয়ে অভিশাপ দিয়েছে সে-যার হাতেই যাবে ওই মোহর, ধ্বংস হয়ে যাবে সে, খুব দ্রুত।

কেঁপে উঠল কুসংস্কারে আচ্ছন্ন নাবিকেরা, আবার উঠল ভয়ার্ত গুঞ্জন।

সেই মোহরটা এই জাহাজেই আছে, ইংল্যাণ্ডে রাজার কাছে নিয়ে যাচ্ছিলাম, বলে গেল ক্যাপ্টেন, আমার অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছ। সাত দিনের বেশি টিকলাম না, তারমানে বউনের অভিশাপ কাজ করেছে। তোমাদেরও সময় ঘনিয়ে আসছে, রেহাই পাবে না কিছুতেই। তোমার ধনের সঙ্গে মোহর এখন মিশে গেছে। বাঁচতে হলে এখন সব মোহর ঢেলে ফেলে দিতে হবে সাগরে, সেটা করার কলজে তোমার হবে না। কাজেই মরেছ!

জবান বন্ধ হয়ে গেছে ডাকাতদের। থমথমে হয়ে গেছে চেহারা, মনে মনে ঈশ্বরের নাম নিচ্ছে কেউ কেউ, সবার মুখেই স্পষ্ট ভয়।

নীল আকাশের দিকে নীল চোখ তুলল ক্যাপ্টেন হ্যারিসন। ঈশ্বর, আমার ডাক শুনতে পাচ্ছ। বউনের অভিশাপের সঙ্গে মিলিয়ে অভিশাপ দিচ্ছি আমি, মোহরের ধ্বংস-ক্ষমতা জোরালো করো, আরও আরও অনেক বেশি জোরালো, যতক্ষণ না…

গর্জে উঠল ডেকেইনির পিস্তল, আগুনের একটা হলকা ছুটে এসে ঢুকে গেল। ক্যাপ্টেনের বুকে।

কথা থেমে গেছে হ্যারিসনের, আকাশের দিকেই চেয়ে রয়েছে নীল চোখের তারা, ঠোঁট নড়ল সামান্য, তারপর স্থির হয়ে গেল। উল্টে ডিগবাজি খেয়ে দেহটা ঝপাং করে পড়ল পানিতে।

ছুটে এসে দাঁড়াল ডাকাতেরা রেলিঙের ধারে। লাশটা দেখা যাচ্ছে না, ডুবে। গেছে, পানিতে অদ্ভুত একটা গোল ঢেউয়ের চক্র ক্রমেই ছড়িয়ে যাচ্ছে, ঠিক মাঝখান থেকে ফুট ফুট করে উঠছে লালচে বুদবুদ। মাস্তুল আর পালের দড়িতে বাড়ি খেয়ে গোঙানি তুলল এক ঝলক বাতাস।

কি…কি হলো! আঁতকে উঠল ডেকেইনি, মুখ রক্তশূন্য।

বোধহয় অ্যালবেট্রস… মুখ তুলে চেয়েই থেমে গেল কোয়ার্টার মাস্টার ব্ল্যাক জিউস। কই! নেই তো। কখন চলে গেছে! …আরে, দেখো, দেখো!

দেখে স্তব্ধ হয়ে গেল ডাকাতেরা। পশ্চিম দিগন্তে, উত্তর-দক্ষিণ ছেয়ে দিয়েছে যেন গাঢ় বেগুনী একটা চওড়া মেঘলা, আকাশের নীল ঢেকে দিয়েছে, খুব নিচু দিয়ে ধেয়ে আসছে যেন ওদেরকেই গ্রাস করার জন্যে।

জলদি! চেঁচিয়ে আদেশ দিল ডেকেইনি, জলদি জাহাজে গিয়ে ওঠো! সব্বাই! কোলা ব্যাঙের স্বর বেরোল তার কণ্ঠ থেকে, ঠোঁট শুকিয়ে কাঠ।

.

হারিকেনের প্রথম ঝাঁপটাতেই ব্রিটিশ জাহাজের সঙ্গে বাঁধন ছিন্ন হয়ে গেল ডেকেইনির জাহাজের। প্রচণ্ড ঝটকা দিয়ে ফুলে উঠল সামনের পাল, দড়ির টানে যেন উড়ে গিয়ে সাগরে পড়ল দুজন ডাকাত, চোখের পলকে হারিয়ে গেল

ফেনায়িত ঢেউয়ের তলায়। কাকতালীয় ঘটনাই বোধহয়, এই দুজন বেশি কষ্ট দিয়েছিল ইংরেজ ক্যাপ্টেনকে। ব্যাপারটা অন্য নাবিকদের চোখ এড়াল না। ওরা ধরে নিল, এতে ঈশ্বরের হাত রয়েছে। আবার ঝাঁপটা দিল ঝড়ো বাতাস, এত জোরে বাতাস। বইতে আগে কখনও দেখেনি ডাকাতেরা। সান্তা মারিয়ার নাক ঘুরে গেল সাই করে, হালকা একটা শোলা যেন এতবড় জাহাজটা! পাহাড় সমান ঢেউ ফুঁসে উঠল, আছড়ে পড়ল জাহাজের ওপর, প্রধান মাস্তুলের প্রায় অর্ধেকটাই ডুবে গেল সে ঢেউয়ে, অনেক কষ্টে যেন নাকানি-চোবানি খাওয়া ইঁদুরের মত ভেসে উঠল আবার জাহাজ।

সাত দিন সাত রাত ধরে বইল ভয়াবহ ঝড়, নয়জন ডাকাত মরল, বাকি যারা রইল জাহাজের পানি সেচা তো দূরের কথা, তাদের দাঁড়ানোরও ক্ষমতা নেই আর। টলতে টলতে ক্যাপ্টেনের কাছে এসে বলল কোয়ার্টার মাস্টার: সমস্ত মোহর ফেলে দিন, নইলে বাঁচব না একজনও।

রাজি হলো না ডেকেইনি।

চেঁচিয়ে শাসাতে শুরু করল ব্ল্যাক জিউস, পেছনে অন্যেরা এসে দাঁড়াল, তারাও কণ্ঠ মেলাল কোয়ার্টার মাস্টারের সঙ্গে। জিউসকে গুলি করে মারল ডেকেইনি।

আট দিনের দিন বাতাস পড়ে গেল, কাঁচের মত স্থির শান্ত পানিতে চুপচাপ ভেসে রইল জাহাজ। অবস্থা কাহিল। খাবার আর পানির সমস্যা দেখা দিল। পানিতে নোনা পানি মিশে গেছে, মাংস আর রুটি পচে ফুলে উঠেছে, পোকা কিলবিল করছে তাতে, খাওয়ার অযোগ্য। বিড়বিড় করে কার উদ্দেশে গাল দিল ডাকাতেরা, কে জানে।

সন্ধে নাগাদ দুটো দলে ভাগ হয়ে গেল ওরা। একদল চায়, সমস্ত মোহর পানিতে ফেলে দেয়া হোক, তাতে জীবন বাঁচলেও বাঁচতে পারে; আরেক দল অত ভয় পেল না, তারা ডেকেইনিকে সমর্থন করল। তর্ক-বিতর্ক থেকে মারাত্মক লড়াই, তারপর খুনজখম, খতম করে দেয়া হলো বিদ্রোহীদের। জলদস্যুর নিয়ম অনুযায়ী সাগরে ফেলা হলো লাশগুলো। স্থির সাগর আর স্থির রইল না, জাহাজের আশপাশে কিলবিল করতে লাগল শয়ে শয়ে হাঙর।

পরের ছয় দিনে আরও অনেকে দল পাল্টাল, বিদ্রোহী হয়ে উঠল, আগের সঙ্গীদের পরিণতি হলো এদেরও। যারা মরল, তারা বরং বেঁচে গেল। যারা বেঁচে রইল, তাদের খাবার নেই, পানি নেই, তৃষ্ণায় ছাতি ফাটে ফাটে। অগত্যা রামের বোতল খুলে গলায় ঢালল কড়া মদ, কণ্ঠনালী জ্বালিয়ে দিল যেন তরল আগুন, ডেকে গড়াগড়ি খেতে লাগল সবাই। নেশার ঘোরে অন্তত খিদের কষ্ট আর তৃষ্ণা ভুলে রইল। দুর্বল কণ্ঠে বিখ্যাত জলদস্যু মরগানের গান ধরল:

ইফ দেয়ার বি কিউ অ্যামাংস্ট আস।
আওয়ার হার্টস আর ভেরি গ্রেট;
অ্যাণ্ড ইচ উইল হ্যাভ মোর প্লাণ্ডার
অ্যাণ্ড ইচ উইল, হ্যাভ মোর প্লেট।
কিন্তু পরের দিনই আর হার্ট তত বড় থাকল না, নেশা ছুটে গেছে, ক্ষুধাতৃষ্ণা পাগল করে তুলল যেন ওদের। শিস দিয়ে সঙ্গীদের চাঙা করে তোলার ব্যর্থ চেষ্টা করল লুই ডেকেইনি। কাঁচের মতই সমতল রয়েছে এখনও সাগর। শিস দিয়েই বাতাসকেও আমন্ত্রণ জানাল ডেকেইনি, কিন্তু বাতাসও সাড়া দিল না তার ডাকে।
সাগরকে রক্তাক্ত করে দিয়ে যেন মস্ত একটা রক্তলাল সূর্য অস্ত গেল সেদিন, মাথায় লাল একটা বড় রুমাল বেঁধে একজন সহকারীকে ডাকল সর্দার। সারাদিন রাম গিলেছে, গলা শুকিয়ে সিরিশ কাগজের মত খসখসে হয়ে আছে, জানাল। সঙ্গীদেরকে। আরও এক বোতল এনে দেয়ার অনুরোধ করল। বোতল এনে দিল লোকটা। কিন্তু মুখে তুলল না সর্দার, রেলিঙে হাত রেখে শান্ত চোখে তাকিয়ে রয়েছে সাগরের দিকে। হাতটার দিকে ভালভাবে নজর পড়তেই চমকে উঠল লোকটা, চোখ বড় বড় হয়ে গেল, সর্দারের হাতের উল্টো পিঠে সাদা ধুলো লেগে রয়েছে যেন, একটা গোল দাগ!
ডেকেইনির এই সহকারী পোড়খাওয়া নাবিক, অনেক দেখেছে অনেক শুনেছে, জাতে ফরাসী। ছুটে গেল সে সহকারীদের কাছে। মুখ ছাই, চোখ ঠিকরে বেরোবে যেন, বলল, ওকে…প্লেগে ধরেছে! এটুকু বলেই চুপ হয়ে গেল।
ভয়েল, এক-হাত-ওয়ালা এক কামানবাজ লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল, গাল দিয়ে উঠল অস্ফুট স্বরে, অনেক সাগর ঘুরেছে সে, অভিজ্ঞতা আছে অনেক, জানে এখন কি করা দরকার। টান মেরে খাপ থেকে ছুরি বের করল, কিন্তু খপ করে তার হাত চেপে ধরল ফরাসী ডাকাত, কাঁধের ওপর দিয়ে একবার চট করে তাকিয়ে দেখল ডেকেইনি দেখছে কিনা।
সে-রাতে, নেশায় বিভোর হয়ে আছে ডেকেইনি, এই সময় চুপি চুপি নৌকা নামাল তার অবশিষ্ট নাবিকরা–এই একটি মাত্র নৌকাই ঝড়ের কবল থেকে রেহাই পেয়েছে, জ্যোৎস্না-উজ্জ্বল সাগরে ধীরে ধীরে দাঁড় বেয়ে পালাল ওরা, জানে না, কড়া রোদ নৌকার কাঠের সর্বনাশ করে দিয়েছে, প্রতিটি জোড়া প্রায় আলগা। তবে সেটা জানল শিগগিরই। পুরো তিনটি দিন অমানুষিক পরিশ্রম করল ওরা, পালা করে কেউ দাঁড় বাইল, কেউ পানি সিচল, তারপর তাদেরকে তুলে নিল একটা স্প্যানিশ জাহাজ। কয়েকটা প্রশ্ন করেই জেনে নিল ক্যাপ্টেন, ওরা কারা। আর একটি কথা না বলে দস্যুদেরকে নিয়ে গিয়ে ঝুলিয়ে দিল ফাঁসিতে।

জেগে উঠে দেখল ডেকেইনি, সবাই চলে গেছে তাকে ফেলে, একটা রামের বোতলও রেখে যায়নি। সারাটা দিন অদ্ভুত এক তন্দ্রার ঘোরে কেটে গেল তার, রাতে আবার ঝড় এল, তুমুল ঝড়। খানিকক্ষণ একাই জাহাজুটাকে সামলানোর চেষ্টা করল, কিন্তু হাল ছেড়ে দিতে হলো শিগগিরই। প্রচণ্ড ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে শরীর, হাঁপাতে হাঁপাতে কেবিনে এসে ঢুকল সে।

ঘুম ভাঙলে খেয়াল করল ডেকেইনি, ঢেউয়ের দোলা থেমে গেছে, জাহাজ প্রায় স্থির। অবাকই লাগল তার। ডেকে বেরিয়ে হাঁ হয়ে গেল। একটা দ্বীপের ধারে চলে এসেছে জাহাজ, অনেক বড় দ্বীপ, এমাথা-ওমাথা দেখা যায় না। একটা প্রাকৃতিক বন্দরে ঢুকেছে জাহাজ, চারদিকে পাহাড়, কি করে ঢুকল এখানে? ভাল করে দেখল...না না, চারদিকে পাহাড় নয়, একদিকে খোলা আছে, পথটা এত সরু, কোনমতে ঢুকতে পেরেছে জাহাজ।

তিনদিক থেকে ঘিরে রাখা ধূসর পাথুরে পাহাড়ের খাড়া দেয়াল, জাহাজটা যতখানি উঁচু ঠিক ততখানি, হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায় দেয়াল, ইচ্ছে করলে জাহাজ থেকে লাফিয়ে নামা যায় ওখানে, অবশেষে নামলও ডেকেইনি। সরু একটা গিরিপথমত রয়েছে সাগরের দিকে...সাগর দেখতে পাচ্ছে না, তবে ঢেউয়ে শব্দ কানে আসছে, ওই পথেই ঝড়ের সময় ঢুকেছে জাহাজ, এসে পড়েছে পাহা ঘেরা ছোট্ট খাড়িতে। জায়গা ভালই, কিন্তু প্রথমে দেখা দরকার ঘন জঙ্গলে মানুষখেকো আদিবাসীরা লুকিয়ে আছে কিনা। পানির ধার ঘেঁষে থাকা জঙ্গলে ঢুকে পড়ল ডেকেইনি, দেখে শুনে নিশ্চিত হলো, আর কোন মানুষ নেই। পাহাড়ের বেশ ওপরে একটা পাথরে আরাম করে বসে চারপাশটা দেখল সে, খুশি হলো, চমৎকার। জায়গা। মরগানের গানটা মনে পড়তে আসল মনে মনে। এখন সে ছাড়া আর কেউ নেই মোহরের ভাগ নেয়ার, যা আছে সব তার একার। আর হ্যাঁ, জাহাজটা খাড়িতে ঢুকতে যখন পেরেছে, এখান থেকে বেরোতেও পারবে। সে একাই চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবে জাহাজ, তবে তার আগে শরীরের শক্তি ফিরিয়ে আনতে হবে। নিশ্চয়ই খাবার আর পানি আছে দ্বীপে। প্রচুর খাবার নিয়ে তুলতে পারবে জাহাজে, পিপেগুলোতে পানি, তারপর কোন এক সুদিন দেখে পাল তুলে দিয়ে খোলা সাগরে ভেসে পড়লেই হলো। দেখিয়ে ছাড়বে সে তার সঙ্গীদেরকে, যদি কেউ বেঁচে থাকে তখনও, সে একাই একশো, তাদের মত কাপুরুষ নয়।

কোন জায়গায় রয়েছে, ম্যাপ দেখে অনুমান করল ডেকেইনি। খাবার আর পানি পাওয়া গেছে, পেট ঠাণ্ডা, ফলে মাথাও ঠাণ্ডা। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মেরুদণ্ড বেয়ে ঠাণ্ডা ভয়ের একটা স্রোত নেমে গেল তার। আশ্চর্য! এতক্ষণ মনে পড়েনি কেন? সেই অভিশপ্ত মোহর! ওটা রয়েছে মোহরের স্তূপে! ব্যাপারটাকে কুসংস্কার বলে

আর হেসে উড়িয়ে দিতে পারছে না এখন। ওরকম সাংঘাতিক একটা জিনিস নিয়ে আবার সাগরে ভাসতে সাহস হলো না তার। উপায়? সহজ একটা উপায় আছে। সব মোহরগুলো দ্বীপেরই কোথাও লুকিয়ে রেখে যাবে। তারপর ভাল মজবুত আরেকটা জাহাজ আর দুঃসাহসী একদল নাবিক নিয়ে আবার ফিরে আসবে, এবার এমন লোক আনবে, যারা আগের নাবিকদের মত কাপুরুষ নয়।
গর্ত খুঁড়ে তাতে মোহর লুকিয়ে রাখত তখন লোকে, কিন্তু ডেকেইনি অত খাটুনির দরকার মনে করল না। পাহাড়ের গায়ে একটা গর্ত খুঁজে বের করল, গোটা তিনেক পিপে একটার ওপর আরেকটা রাখা যাবে গর্তে। মোহরের স্পর্শ উত্তেজনা জাগায় তার, কিন্তু এখন লাগছে ভয়, অস্বস্তি, প্রায় প্রতি খাবলা মোহর থেকেই একটি মোহর তুলে নিয়ে সাবধানে দেখছে, মনে হচ্ছে এটাই বুঝি সেই অভিশপ্ত মোহর! ক্যানভাসের ওপর মোহর রেখে; চারটে কোনা এক করে বেঁধে পোটলা। বানাল সে। একটা খালি পিপে রেখে এল গর্তে, তারপর পোটলা কাঁধে করে নিয়ে চলল। পোটলার সমস্ত মোহর পিপেয় ঢেলে আরও নিতে এল। নিয়ে গেল আরেক পোটলা। জাহাজে মোহরের তূপ যতই ছোট হয়ে আসছে, মন ভারমুক্ত হয়ে যাচ্ছে তার, হারামী মোহরটা বোধহয় চলে গেল জাহাজ থেকে, আর কোন ক্ষতি করতে পারবে না।
আগুন ঢালছে যেন সূর্য। কাজ করতে করতে ঘেমে নেয়ে গেল ডেকেইনি। কিন্তু অবশেষে শেষ হলো মোহর স্থানান্তর। কাজ শেষ করে, পাহাড়ে উঠে আরেকবার ভালমত দেখল চারপাশটা, দিক চিহ্ন গেঁথে নিচ্ছে মনে। ফিরে এলে সহজেই যাতে গর্তটা খুঁজে পায়।
জাহাজে এসে কেবিনে ঢুকে কাগজ-কলম বের করল। নিখুঁত একটা ম্যাপ একে নেবে, শুধু চোখের আন্দাজের ওপর ভরসা রাখতে চায় না। প্রায়ই ঝড় বয় এদিকে, সে যখন ফিরে আসবে, দ্বীপের এখনকার চেহারা তখন না-ও থাকতে পারে, তাই যেসব জিনিস সহজে নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা নেই, ওগুলোকেই প্রধান চিহ্ন ধরে এঁকে ফেলল ম্যাপ।
হঠাৎই খেয়াল করল যেন সে বড় বেশি নীরব অঞ্চলটা! উত্তাপ নেমে যাচ্ছে দ্রুত, বাইরে প্রখর রোদ অথচ শীত লাগছে তার, গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। আবার অস্বস্তি ফিরে এল মনে। হৃৎপিণ্ডের গতি বাড়ল। জোর করে মন থেকে ভয় তাড়াল সে, খুনী লুই আর যাই হোক, কাপুরুষ, একথা যেন কেউ কখনও বলতে না পারে।
ডেকে বেরিয়ে দেখল, চারদিক নির্জন, সেই আগের মতই। যতদূর চোখ যায়, সন্দেহজনক কিছু দেখা যাচ্ছে না, পাথরে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের মৃদু গুমরানি ছাড়া আর কোন শব্দও নেই। আপন মনেই মাথা ঝাঁকিয়ে আবার কেবিনে ঢুকতে যাবে, চমকে উঠল একটা তীক্ষ্ণ শব্দে।

ঠিক জাহাজের ওপরেই ভেসে রয়েছে মস্ত একটা অ্যালট্রেস! অতি পরিচিত মনে হলো পাখিটাকে। মুখ থেকে রক্ত সরে গেল ডেকেইনির। সত্যি দেখছে তো, নাকি কল্পনা? ওই পাখিটাকেই দেখেছিল না সাউথ আটলান্টিক দখল করার সময়? আরে দূর, যত্তসব কুসংস্কার!-মনকে বোঝাল সে। কোমর থেকে পিস্তল খুলে নিয়ে তুলল পাখিটাকে গুলি করার জন্যে।
ডেকেইনির মনের কথা পরিষ্কার পড়তে পারছে যেন পাখিটা, ছায়ার মত। নিঃশব্দে দ্রুত ভেসে সরে গেল সীমার বাইরে।
পাখিটার আসার অপেক্ষায় রইল ডেকেইনি।
সীমার বাইরে খানিকক্ষণ ভেসে বেড়াল অ্যালট্রেস, ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে লাগল আবার। মাঝে মাঝে বিষণ্ন কণ্ঠে ডেকে উঠছে, মাথা নাড়ছে জ্ঞানী মানুষের ভঙ্গিতে।
জোরে থুথু ফেলল ডেকেইনি, ভয় তাড়াচ্ছে আসলে মন থেকে। জীবনে এই প্রথমবার সত্যি ভয় পেয়েছে সে। দুই লাফে কেবিনে এসে ঢুকল আবার, মোটা একটা মোমের গায়ে পিস্তলটা কক-করা অবস্থায়ই ঠেস দিয়ে রেখে পালকের কলম তুলে নিল, দুতিন টানে একে শেষ করল ম্যাপটা। কালি ঝাড়তে গিয়েই ঘটল ঘটনাটা। তার জামার আস্তিনের একটা খাঁজ থেকে চুন করে টেবিলে পড়ল একটা জিনিস। ধড়াস করে বুকের খাঁচায় বাড়ি মারল ডেকেইনির হৃৎপিণ্ড, দম বন্ধ করে ফেলেছে, ঠিকরে বেরিয়ে আসবে যেন চোখ। একটা সোনার মোহর!
কয়েক মুহূর্ত মোহরটার দিকে চেয়ে রইল ডেকেইনি, বিশ্বাস করতে পারছে না। অস্ফুট একটা শব্দ করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল, মোহরটার দিক থেকে চোখ সরাচ্ছে না। মন্ত্রমুগ্ধ করে ফেলেছে যেন তাকে জিনিসটা। সে জানে, ওটা কি! কোনভাবে এই সাংঘাতিক জিনিসটা তার আস্তিনের খাঁজে আটকে গিয়েছিল, যেন ইচ্ছে করেই, মোহরটা যেন জীবন্ত, জানে-বোঝে সব কিছুই। অনুমান করল। ডেকেইনি, এটাই সেই অভিশপ্ত মোহর, যার গায়ে তিনবার থুথু ছিটিয়েছিল বউন। কিন্তু কেন তার হাতায় আটকাল? কেন পিপেতে পড়ল না?
মোহরটার দিকে কাঁপা কাঁপা হাত বাড়াল ডেকেনি, খেয়ালই করল না, টেবিল ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে সে, তার শরীরের কাঁপুনিতে টেবিল কাঁপছে, মোমের গায়ে ঠেস দিয়ে রাখা পিস্তলটা ধীরে ধীরে নড়ছে, ঘুরে যাচ্ছে নলের মুখ। ভারসাম্য হারিয়ে একসময় খটাশ করে পড়ল পিস্তল, গর্জে উঠল। রক্তলাল একটা আগুনের শিখা ছিটকে বেরোল কালো নলের মুখ থেকে, সোজা ছুটে এল ডেকেইনির বুক লক্ষ্য। করে। পোড়া বারুদের গন্ধ বাতাসে।
পুরো তিন সেকেণ্ড যেন কিছুই টের পেল না ডেকেইনি, বুকের কাছে তীক্ষ্ণ একটা ব্যথা শুরু হলো, বাড়ানো ডান হাতটা বাড়ানোই থেকে গেল, চোখ মোহরের দিকে

স্থির, কোনরকম প্রতিক্রিয়া নেই তার মাঝে। ব্যথা শুরু হতেই বাঁ হাত চেপে ধরল বুকে, ধীরে ধীরে হাতটা তুলে আনল চোখের কাছে। রক্ত! এতক্ষণে যেন বুঝতে পারল সে, গুলি খেয়েছে! রক্ত সরে গেল মুখ থেকে, ঝড়ো-বাতাসে-লতার মত কেঁপে উঠল তার শরীর, ধপ করে বসে পড়ল চেয়ারে। দুই হাত চেপে ধরেছে। ক্ষতস্থানে, দেখতে পাচ্ছে, গল গল করে বেরিয়ে যাচ্ছে তাজা রক্ত, জীবনীশক্তি নিঙড়ে বের করে নিয়ে যাচ্ছে। কোন উপায় নেই...ঠেকানোর কোন উপায় নেই...
ধীরে, অতি ধীরে সামনের দিকে ঝুলে পড়তে শুরু করল তার মাথা, চোখে রাজ্যের ঘুম, দুহাত টেবিলে বিছিয়ে তাতে কাত করে মাথা রেখে নীরবে যেন ঘুমিয়ে পড়ল দস্যু-সর্দার। হাতের রক্ত গালে লেগেছে, তাতে একটা মাছি বসল। নড়ল না ডেকেইনি, তাড়ানোর কোন চেষ্টা নেই। আরামে বসে রক্ত চুষতে থাকল মাছিটা। ওটার দেখাদেখি আরেকটা এসে বসল, আরেকটা, আরও একটা... দেখতে দেখতে মাছির জটলা জমে গেল, তবুও নড়ল না এককালের মহাপরাক্রমশালী দস্যু, খুনী লুই।
কেবিনের খোলা জানালায় চকিতের জন্যে একটা সাদা ছায়া দেখা গেল, জানালার একেবারে ধার ঘেষে উড়ে গেল অ্যালট্রেসটা, তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠল। এসবের কিছুই দেখল না, শুনল না লুই ডেকেইনি। গাঢ় নীল আকাশে ধবধবে সাদা ডানা মেলে দিয়ে উড়ে চলল পাখিটা, দূর হতে দূরে, মিলিয়ে গেল একসময় দিগন্তে।

.

ইংরেজ ক্যাপ্টেন রিচার্ড হ্যারিসনের মৃত্যুর পর ডেকেইনির জাহাজে যত অঘটন ঘটেছে, সেগুলো অভিশপ্ত মোহরের জুন্যে না-ও হতে পারে। অভিশাপের ফলেই ঝড় এসেছে, এটা মনে করারও তেমন কোন কারণ নেই, ঝড়টা হয়তো এমনিতেই আসত, কারণ হঠাৎ করে বাতাস পড়ে গিয়েছিল-ঝড়ের পূর্বাভাস, যার ফলে পালাতে পারেনি ব্রিটিশ জাহাজটা, বারক জাতীয় জাহাজ ওটা, বাতাস ঠিক থাকলে সান্তা মারিয়ার চেয়ে গতিবেগ অনেক বেশি হত, ধরতে পারত না হয়তো ডেকেইনি। এমনও হতে পারে, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ডাকাতদের মনে ভয় ঢুকিয়ে দিয়ে। গেছে ক্যাপ্টেন হ্যারিসন, আর তাতেই একের পর এক অঘটন ঘটিয়েছে তারা। তবে প্রত্যক্ষভাবে যদিও বা না হয়, পরোক্ষভাবে ওসব অঘটনের জন্যে মোহরটা যে। দায়ী তাতে কোন সন্দেহ নেই।
যাই হোক, বছরের পর বছর পেরোল, প্রকৃতিতে নানারকম পরিবর্তন এল, গেল। কত সূর্য উঠল, ডুবল, বৃষ্টি এল, বাতাস বইল, এত কিছু হলো, কিন্তু লুই ডেকেইনির পর আর দীর্ঘ দিন কোন মানুষ এল না সেই দ্বীপে। জাহাজটা আর

দেখা যায় না এখন, তার ওপর লতাগুল্ম জন্মেছে, ডাল পাতা পড়েছে, ঢাকা পড়ে গেছে। গ্যালিয়ন।
রাজা দ্বিতীয় জেমস যখন ইংল্যাণ্ডে রাজত্ব করছেন, তখন একদিন ভীষণ ঝড় বইল, ছোট্ট খাড়ির যে একটা দিক খোলা ছিল, সেটাও বন্ধ হয়ে গেল পাথর ধসে পড়ে, সাগরের পানি ঢোকার আর কোন পথই রইল না। অদ্ভুত একটা কবরে যেন গোর হয়ে গেল জলদস্যুর জাহাজের।
আরও বছর গেল। আরও অনেক জঞ্জালের নিচে চাপা পড়ল ডেকেইনির জাহাজ। রানী অ্যানের যেদিন অভিষেক হলো, তিনি মাথায় মুকুট পরলেন, সেদিন ভেঙে পড়ল জাহাজের সমস্ত মাস্তুল, লতাপাতা ছিঁড়ে একাকার করল, তারপর ওগুলোও আবার ঢাকা পড়তে শুরু করল নতুন লতাপাতায়। রাজা প্রথম জর্জের আমলে একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল জাহাজ, ওটার আর কোন চিহ্নই দেখা যায় না বাইরে থেকে।
রাজা দ্বিতীয় জর্জের আমলে একটা জাহাজ এসে ভিড়ল দ্বীপে, পানি ফুরিয়ে গেছে, পানি দরকার নাবিকদের। পানি নিয়ে চলে গেল তারা, দ্বীপের গোপন রহস্য গোপনই রয়ে গেল।
রাজা তৃতীয় জর্জের আমলে কয়েকটা জাহাজ এসে ভিড়ল একসঙ্গে-ইতিমধ্যে একশো বছর পেরিয়ে গেছে, তারাও জানল না দ্বীপের রহস্য। পানি আর খাবার দরকার, জোগাড় করে নিয়ে চলে গেল।
বছর গেল। রাজা চতুর্থ জর্জের সময় জাহাজডুবি হয়ে এক নাবিক এসে আশ্রয় নিল ডেকেইনির দ্বীপে। পুরো একটা বছর নিঃসঙ্গ জীবন কাটাল সে ওখানে। কিন্তু এতদিনেও দ্বীপের গোপনীয়তা গোপনই রইল তার কাছে। একদিন একটা জাহাজ এল, সেই জাহাজে করে দেশে ফিরে এল নাবিক ভিখিরির মত মরার জন্যে। কোনদিনই জানল না, সাত রাজার ধন হাতের কাছেই ছিল তার একটি বছর।
বছর পেরোল। রাজা চতুর্থ উইলিয়ামের রাজত্ব শেষ হলো, এলেন রানী ভিক্টোরিয়া, রাজা সপ্তম এডওয়ার্ডও গেলেন, পঞ্চম জর্জ গেলেন, ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে বসলেন রাজা অষ্টম এডওয়ার্ড, তখনও দ্বীপ তার গোপনীয়তা ফাঁস করল না। রাজকোষের মোহরের একটা মস্ত স্তূপ লুকিয়েই রেখে দিল খাড়ির কবরে!
একদিন রাজা ষষ্ঠ জর্জ বসলেন ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে। তারও অনেক পরে দ্বীপে নামল কয়েকজন মানুষ।
এ অবশেষে, প্রায় তিনশো বছর পর গোপনীয়তা ফাঁস না করে আর পারল না জলদস্যুর দ্বীপ।

চিলেকোঠার জানালার কাছে নাক ঠেকিয়ে বন্দরের কালো পানির দিকে শূন্য চোখে চেয়ে আছে বব কলিনস। নভেম্বরের সন্ধ্যা নামছে, তার জীবনে আরেকটা বিষণ্ন সন্ধ্যা। বাইরে মন খারাপ-করে-দেয়া-ঝিরঝিরে বৃষ্টি। মাত্র পনেরোটা শীতকাল পেছনে ফেলে এসেছে বব, সামনে আরও কত শীত পড়ে রয়েছে কে জানে! ভাবতেই কালো হয়ে গেল তার অপুষ্ট রক্তশূন্য ফ্যাকাসে মুখ।

সুখ কাকে বলে জানে না বব, সোনালি স্মৃতি হয়ে রয়েছে শুধু হাতে গোনা কয়েকটা ঘণ্টা, সেই যে দূর সাগর থেকে অনেক দিন পর যখন দেখা করতে এসেছিল তার নাবিক বাবা, তখনকার স্মৃতি। বাবার পথ চেয়ে আর কখনও দিন। গোনার প্রয়োজন হবে না, রোজ সকালে খবরের কাগজের পাতা উল্টে সী-ওয়েভ জাহাজটার টাইম-টেবিল দেখারও কোন কারণ নেই আর। পানি জমল চোখের কোণে, ফোঁটা বড় হয়ে গাল বেয়ে নামল, চিবুক থেকে ঝরে পড়ল টপটপ, কিন্তু মুছল না বব, পাথর হয়ে গেছে যেন।

এই চিলেকোঠায়ই ববের জন্ম। তার মা যখন মারা গেল তখন তার বয়েস তেরো, বাবা দূর সাগরে, কোন খোঁজখবর নেই, সেই থেকেই জীবনযুদ্ধে বব একা, খবরের কাগজ বিক্রি করে পেট চালায়। তার ছোট করে ছাঁটা সোনালি চুলে সন্ধ্যার ছায়া, ঘন নীল মায়াময় চোখের তারা নিষ্প্রভ।

খবরের কাগজে জাহাজ দুর্ঘটনার কথা জানল যে-রাতে বব, দুচোখের পাতা এক করতে পারেনি, বিছানায় শুধু এপাশ-ওপাশ করেছে সারা রাত। বাবার মঙ্গল কামনা করে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছে। কয়েক হপ্তা পর এল সুসংবাদ, সী ওয়েভের দুতিনজন ভাগ্যবানের মাঝে তার বাবা একজন, সুস্থ হয়ে উঠছে বোসটনের এক হাসপাতালে। তখুনি ছুটে যেতে ইচ্ছে করেছিল তার, কিন্তু গাড়ি ভাড়া জোগাড় করতে পারেনি।

এটা কয়েক হপ্তা আগের ঘটনা। তারপর, এই ঘণ্টাখানেক আগে এসেছে দুঃসংবাদ, খবর নিয়ে এসেছে এক নাবিক, অনেক খুঁজেপেতে বের করেছে ববের চিলেকোঠা। একটা চিঠি নিয়ে এসেছে ববের বাবার কাছ থেকে, ওই তো, ঘরের কোণে পুরানো নড়বড়ে টেবিলটায় পড়ে আছে খামে ভরা চিঠিটা। মুমূর্ষু এক নাবিকের শেষ অনুরোধ ফেলতে পারেনি আরেক নাবিক, পৌঁছে দিয়েছে চিঠিটা। লোকটা দেরি করেনি, দুচারটা কথা বলেই বিদায় নিয়েছে, তার নামও জিজ্ঞেস করা হয়নি।

নাবিক বলে গেছে, হাসপাতালে মারা যায়নি ববের বাবা, মারা গেছে সাগরতীরের ছোট্ট এক সরাইখানায়। ভাল হয়ে উঠেছে তখন কলিনস, বন্ধুত্ব হয়েছে নাবিকের সঙ্গে, দুজনে মিলে আবার জাহাজে চাকরি খুঁজেছে, পেয়েও গিয়েছিল চাকরি। পরদিনই চলে যেত সরাইখানা ছেড়ে কিন্তু তার আগেই ঘটে গেল ঘটনা। গভীর

রাতে পাশের ঘরে গোঙানি শুনে ঘুম ভেঙে যায় নাবিকের, তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে দেখে বিছানায় পড়ে কাতরাচ্ছে কলিনস, রক্তে মাখামাখি, পিঠে বিধে আছে একটা বড় ছুরি। নাবিককে দেখে কাছে ডাকল, একটা চিঠি হাতে তুলে দিয়ে। অনুরোধ করল, ওটা যাতে তার ছেলের কাছে পৌঁছে দেয়, ববের চিলেকোঠার ঠিকানাও দিল বিড়বিড় করে কোনমতে।

নাবিক কি মিছে কথা বলেছে? কিন্তু কেন বলবে? না, তেমন কোন কারণ খুঁজে পাচ্ছে না বব।

ভয়ে চিঠিটা খুলছে না সে, এখনও ক্ষীণ আশা রয়েছে, তার বাবা মারা যায়নি। কিন্তু চিঠি খুলে পড়লেই হয়তো ওই আশাটুকুও থাকবে না। গত এক ঘণ্টায় বার। বার চিঠিটা হাতে নিয়েছে সে খোলার জন্যে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারেনি, আবার রেখে দিয়েছে। ভারি, বেশ পুরু চিঠি, খামের ওপর পেনসিলে অস্পষ্টভাবে লেখা রয়েছে ববের নাম-ঠিকানা। বাবার হাতের লেখা চেনে বব, খামের ওপরে লেখার সঙ্গে ঠিক যেন মেলে না। না মেলারই কথা। আহত অসুস্থ একজন লোক লিখতে যে পেরেছে, এই যথেষ্ট, হাত কেঁপেছে, গুটি গুটি করে সুন্দর অক্ষরে লিখবে কী করে?

জাহাজের ভেঁপুর তীক্ষ্ণ শব্দে চমক ভাঙল ববের, জানালা থেকে নাক সরাল। দেখল, গভীর সাগরে চলাচলকারী একটা ট্রাম্প স্টীমার ধীরে ধীরে এসে লাগছে বন্দরে, ধূসর অন্ধকারে মস্ত এক জলদানব যেন উঠে এসেছে সাগরের তল থেকে। গায়ে কাটা দিয়ে উঠল ববের, দৃশ্যটা মোটেই সুখকর নয়, এই মুহূর্তে আরও খারাপ লাগছে, বিষণ্নতর করে তুলেছে পরিবেশ। বাইরে বৃষ্টিপাত আরও হিম হয়েছে, ধোয়াটে একটা ভেজা চাদর যেন ঝুলে রয়েছে বাতাসে। রাস্তাঘাটে প্যাঁচপ্যাঁচে কাদা, হুসহুস করে পানি ছিটিয়ে কদাচিৎ চলে যাচ্ছে এক-আধটা গাড়ি। বাড়িঘরে আলো জ্বলে উঠছে, ঘোলাটে হলুদ মিটমিটে আলো।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হলো। বিরক্তিকর দৃশ্য থেকে চোখ ফেরানোর সুযোগ পেয়ে যেন বেঁচে গেল বব, মনে পড়ল, এমনি এক সন্ধ্যায়ই সিঁড়িতে ভারি বুটের শব্দ উঠেছিল মচমচ করে, দরজা খুলে গিয়েছিল, ঘরে ঢুকেছিল তার বাবা। মনে। আশার দোলা, আহা, এখনও যদি তাই হত!

চিলেকোঠার দরজার কাছে এসে থামল পায়ের শব্দ। কে? নাবিক কি আবার ফিরে এসেছে? ভুলে গিয়েছিল কোন কথা, বলার জন্যে এসেছে? কী জানি কেন, প্রথমেই চিঠিটার ওপর চোখ পড়ল ববের, এক লাফে গিয়ে খামটা তুলে নিয়ে ফেলে দিল পুরানো কাগজপত্রের স্কুপে। ঠিক এ সময় ঝটকা দিয়ে খুলে গেল দরজা।

লোকটাকে দেখে পিছিয়ে গেল বব। হিমশীতল চোখে তাকিয়ে রইল আগন্তুক এক মুহূর্ত, তারপর ঘরে ঢুকল। মানুষ না, যেন এক গরিলা। চওড়া কাধ, লম্বা রোমশ হাত হাঁটু ছুঁয়েছে প্রায়, মুঠো খুলছে আর বন্ধ করছে। আধুনিক মানুষের সঙ্গে চেহারার মিল খুবই কম, সভ্য মানুষের পোশাক পরে গুহা থেকে জ্যান্ত হয়ে উঠে। এসেছে যেন এক প্রাগৈতিহাসিক গুহামানব। বাঁ কানের নিচ থেকে কাস্তের মত বাঁকা হয়ে এসে ঠোঁটের কোণে মিশেছে গভীর কাটা দাগ। ঘন ভুরু, চুল আর গায়ের রোমের মতই লালচে। ময়লা নীল জারসি দেখেই অনুমান করা যায়, লোকটা নাবিক।

স্থির দৃষ্টিতে একে অন্যকে দেখল দুজন।

নাম কী? খসখসে গলা লোকটার।

বব...বব কলিনস, দুরুদুরু করছে বুকের ভেতর, গলা কাঁপছে তার।

রিক কলিনসের ছানা? মাথা ঝাঁকাল বব।

সী-ওয়েভে চাকরি করত?

হ্যাঁ।

রলি বার্ট দেখা করতে এসেছিল, না?

কি নাম বললেন?

বার্ট, রলি বার্ট, নাবিক। একটু আগে এসেছিল?

হ্যাঁ, একজন নাবিক এসেছিল।

তোমার বাবার কাছ থেকে কোন চিঠি এনেছে?

হ্যাঁ।

কোথায় ওটা? কণ্ঠস্বর বদলে গেছে লোকটার হঠাৎ, পিস্তলের গুলি ফাটাল যেন।

কে...কেন...

প্রশ্ন কোরো না! ধমকে উঠল লোকটা। কোথায়?

কি করবেন? সাহস করে জিজ্ঞেস করে ফেলল বব।

কোথায়! চেঁচিয়ে উঠল লোকটা।

জ্বলে উঠল ববের নীল চোখ, কঠিন হলো চোয়াল। বলব না।

পকেট থেকে ছুরি বের করল লোকটা, বোতাম টিপতেই ক্লিক করে খুলে গেল লম্বা বাঁকানো ফলা। বলবে না, না?

ঝকঝকে মারাত্মক ফলাটার দিকে যেন মন্ত্রমুগ্ধের মত চেয়ে রয়েছে বব, সরাতে পারছে না দৃষ্টি।

সামনে বাড়তে শুরু করল নাবিক, সামান্য কুঁজো হয়ে গেছে শরীর, হিংস্র জানোয়ারের মত ঠোঁট ছড়িয়ে গেছে দুপাশে, বেরিয়ে পড়েছে দুই সারি ক্ষয়ে যাওয়া হলদেটে দাঁত। এগিয়ে আসছে এক পা এক পা করে।

পিছিয়ে এল বব, হাত ঠেকল পেছনের দেয়ালে। ভয়ঙ্কর একটা মুহূর্ত দিশেহারা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে, পরক্ষণেই ঘরের একমাত্র চেয়ারটা তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারল। চোখের পলকে মাথা নিচু করে ফেলল নাবিক, চেয়ারটা গিয়ে লাগল উল্টোদিকের জানালায়।
ঝনঝন শব্দে কাঁচ ভাঙল, শব্দের রেশ মিলিয়ে যাওয়ার আগেই ছুটে জানালার কাছে এসে বাইরে মুখ বাড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠল বব, বাঁচাও! বাঁচাও! নিচের অন্ধকারে কেউ তার চিৎকার শুনল কিনা বোঝা গেল না।
লাফিয়ে ববের পেছনে এসে দাঁড়াল নাবিক।
শেষ মুহূর্তে পেছনে ফিরে তাকাল বব। ছুরি চালিয়েছে লোকটা। ঝট করে। বসে পড়ল সে, কোনমতে ছুরি খাওয়ার হাত থেকে বাঁচল। ভারসাম্য হারিয়ে কাত হয়ে গেছে নাবিক, সুযোগটা কাজে লাগল বব। নাবিকের বগলের তলা দিয়ে ছুটে গেল দরজার দিকে, তাড়া খাওয়া খরগোশের মত দিগ্বিদিক হুঁশ হারিয়ে লাফিয়ে পড়ল সিঁড়িতে, একেক লাফে দুতিনটে করে সিঁড়ি টপকে নেমে চলল নিচে, অন্ধকারে পা ফসকে পড়লে যে ঘাড় ভেঙে মরবে, সে খেয়াল নেই।
পেছনে ফিরে তাকানোর সাহস বা সময় কোনটাই নেই ববের, সিঁড়ির একেবারে শেষ মাথায় এসে পড়ল। শূন্য হলঘর, ওপাশে দরজা। এক ছুটে হল। পেরোল সে, ধাক্কা দিয়ে খুলে ফেলল ভেজানো দরজা, লাফিয়ে এসে নামল পথে। কোন দিকে তাকানোর ফুরসত নেই, সোজা সামনে ছুটল, মোড়ের লাইট পোস্টের কাছে প্রায় সময় একজন পুলিশকে পাহারায় থাকতে দেখেছে, তাকেই এখন দরকার।
দশ গজও যেতে পারল না বব, তার আগেই হুমড়ি খেয়ে পড়ল কার গায়ে। আবছা অন্ধকারে তার পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে তিনজন মানুষ, একজন বড়, অন্য দুজন তারই মত কিশোর। পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল বব, খপ করে তার হাত চেপে ধরে আটকাল লোকটা। লোহার সাঁড়াশি দিয়ে যেন কেউ কব্জি চেপে ধরেছে ববের।
হোকে! বাজখাই গলা বিশালদেহী দানবটার। কি হয়েছে, খোকা? ভূতে তাড়া করেছে?
গলা শুনেই বুঝল বব, চোরাকাত নয়, ভদ্রলোকের হাতেই পড়েছে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, ওখানে...ওখানে, আমার ঘরে একটা লোক...
লোক? হাসল লোকটা। লোক তো আর ভূত না, ঘাড় মটকে...
আরেকটু হলেই খুন করত আমাকে! তিক্ত কণ্ঠে বলল বব।
খুন!
কিভাবে?

ছুরি মেরে।
কেন?
ওর কথায় রাজি হইনি, তাই।
কি করতে বলেছিল? জিজ্ঞেস করল এক কিশোর।
একটা চিঠি। আমার বাবার চিঠি। প্লীজ, তোমরা আমার সঙ্গে চলো। চিঠিটা নিতে দিও না ওকে! অনুনয় করল বব।
চিঠি! লোকটার দিকে ফিরল কিশোর। বোরিস, চলুন তো দেখি, কি ব্যাপার? আসুন, জলদি! ববের দিকে ফিরে বলল, চলো, তোমার ঘর দেখাও।
দ্বিধা করল বব, তারপর বোরিসের হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল।
অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে চিলেকোঠার দরজায় এসে দাঁড়াল চারজনে। দরজা বন্ধ। নিচের ফাঁক দিয়ে মৃদু আলো আসছে। এই ঘর! বলল বব। কিন্তু আমি যখন বেরিয়েছিলাম, খোলা ছিল দরজা!
দরজা বন্ধ করে দিয়ে নিশ্চয়ই জানালা দিয়ে লাফিয়ে পালিয়েছে! বলল আরেক কিশোর।
না, সম্ভব না! মাথা নাড়ল বব। চল্লিশ ফুট…লাফিয়ে নামতে পারবে না।
ভেতরেই আছে তাহলে। চেঁচিয়ে ডাকল বোরিস, এই যে, ভেতরের মানুষ! দরজা খোলো!
সাড়া নেই।
এটাই তোমার ঘর তো, খোকা? সন্দেহ বোরিসের কণ্ঠে।
নিশ্চয়ই।
ভাড়া দাও?
নইলে থাকতে দেবে কেন?
সত্যি বলছ?
খোদার কসম!
হোকে! এই, তোমরা সরে দাঁড়াও। দুপাশে পিছিয়ে এসে ছুটে গিয়ে দরজার ওপর পড়ল যেন হাতি, মড়মড় করে ভেঙে পড়ল পাল্লা।
টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে আছে গরিলাটা, হাতে একটা চিঠি, মাত্র পেয়েছে, বোধহয়। বোরিসকে দেখে কুঁচকে গেছে ঘন ভুরু। হাত বাড়িয়ে তুলতে গেল টেবিলে পড়ে থাকা ছুরি।
খবরদার! ধমকে উঠল বোরিস। ঘাড় মটকে দেব ধরে! এখানে কি করছ?
সেটা তোমার ব্যাপার না! শুয়োরের মত ঘোঁত ঘোত করে উঠল গরিলা।
এই, হারামজাদা! হঠাৎ করেই রেগে গেল সদাশান্ত বোরিস। আমার ব্যাপার না তো কি তোর? হারামির বাচ্চা হারামি, এখানে ঢুকেছিস কেন? রাখ, চিঠিটা রাখ!

যদি না রাখি! গলায় জোর নেই গরিলার, বুঝতে পারছে, ওই ভালুকের সঙ্গে লাগতে যাওয়া উচিত হবে না।
হাত দুটো ভাঙব আগে, পা খোঁড়া করব, এরপর নিয়ে যাব পুলিশের কাছে। ছুরির দিকে হাত আরেকটু বাড়ল গরিলার।
দুই লাফে কাছে চলে এল বোরিস, চেপে ধরল কব্জি, একটানে সরিয়ে আনল টেবিলের কাছ থেকে। কব্জিতে বেকায়দা এক মোচড় দিতেই চিঠিটা খসে পড়ল নাবিকের হাত থেকে, ব্যথায় উহ্ করে উঠল। লোকটাকে মাথার ওপর তুলে নিল। বোরিস, তারপর আলগোছে ছেড়ে দিল। দড়াম করে মেঝেতে পড়ল গরিলা, কেঁপে উঠল সারা বাড়ি।
কোমরে হাত দিয়ে ককাতে ককাতে কোনমতে বাঁকা হয়ে উঠে দাঁড়াল নাবিক, জানোয়ারের মত দাঁত খিঁচিয়ে বলল, আ-আমি দেখে নেব তোকে…
ধরার জন্যে আবার হাত বাড়াল, বোরিস।
এক লাফে পিছিয়ে গেল নাবিক। একে একে নজর বোলাল তিন কিশোরের ওপর, বোরিসের দিকে তাকাল আবার। ফিরে চাইল টেবিলে রাখা ছুরির দিকে, মেঝেতে পড়া চিঠির দিকে। দ্বিধা করল। তারপর হেঁটে গেল দরজার দিকে, বারান্দায় বেরিয়ে ফিরে তাকাল। শাসাল, আমি ভুলব না! মনে রাখিস, দৈত্য…!
ঘুসি বাগিয়ে এক পা বাড়ল বোরিস।
সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে গিয়ে সিঁড়িতে নামল নাবিক। দুপদাপ শব্দ তুলে নেমে চলে গেল।
কি ব্যাপার? ভুরু নাচাল প্রথম কিশোর ববের দিকে চেয়ে। বাড়িতে কেউ নেই নাকি?
না, মাথা নাড়ল বব। ভালমত দেখল কিশোরকে। এক বোঝা কোঁকড়ানো চুল মাথায়, অপূর্ব সুন্দর দুটো কালো চোখে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ঝিলিক। বেড়াতে গেছে। বাড়ি পাহারায় রেখে গেছে আমাকে।
এই সুযোগে ডাকাতি করতে এসেছিল ডাকাতটা! হাসল অন্য কিশোর-কুচকুচে কালো মুখে নিষ্পাপ হাসি, ম্লান আলোয় ঝকঝক করে উঠল সাদা দাঁত। খাইছে, বোরিস, আপনার সিনেমায় নামা উচিত। যা একখান আছাড় দিয়েছেন না ব্যাটাকে, জনি ওয়াইজমুলার ফেল। সিনেমায় টারজানের অভিনয় দারুণ করতে পারবেন!
মুসার কথায় কান নেই কিশোর পাশার, নিচু হয়ে তুলে নিল চিঠিটা। ববের দিকে ফিরে বলল, তোমার বাবার চিঠি! নিশ্চয়ই মূল্যবান কোন খবর আছে?
মূল্যবান! হ্যাঁ, তা বলতে পারো, বিষণ্ন কণ্ঠে বলল বব। দুনিয়ায় একটি মাত্র লোক যে আমাকে ভালবাসত, তার হাতের ছোঁয়া তো আছে!
মানে?

বাবা মারা গেছে! ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল বব। তার…শেষ চিঠি!
ববের কাঁধে হাত রাখল মুসা আমান। কথা জোগাল না মুখে।
বব একটু শান্ত হলে কিশোর জিজ্ঞেস করল, চিঠিটা এখনও খোলনি কেন? সময় পাওনি?
পেয়েছি, ঘাড় নাড়ল বব।
খুলিনি। খুললেই তো সব আশা শেষ!
ববের মানসিক অবস্থা বুঝতে পারছে কিশোর। গলায় সহানুভূতি ঢেলে বলল, যা ঘটে গেছে, গেছে, তাকে তো মেনে নিতেই হবে। এই দেখো না, আমিও তো তোমারই মত, আমার তো মা-বাবা একসঙ্গে গেছে! গাড়ি অ্যাকসিডেন্টে।
কিশোরের দিকে চেয়ে কি ভাবল বব কে জানে, কিন্তু আর কাঁদল না। চোখ মুছল।
এখন কি করবে? থাকবে এখানেই, জিজ্ঞেস করল কিশোর।
কি জানি! ভয় লাগছে! আবার যদি সে ফিরে আসে?
তোমার কোন আত্মীয়স্বজন নেই? বন্ধু-বান্ধব?
টাকা? হোটেলে থাকার মত?
না।
এক রাতও না?
হুঁ! বিড়বিড় করল কিশোর, শোচনীয়…হ্যাঁ, তো কোথায় থাকবে আজ রাতে?
শুয়ে থাকব গিয়ে বাগানের কোন একটা কুঁড়েতে, যদি খোলা পাই।
কোথায়? ভুরু কুঁচকে গেছে মুসার।
বাগানে! জিরোনোর জন্যে কুঁড়ে থাকে না, ওগুলোরই কোন একটাতে…
ইয়াল্লা! মাথা খারাপ! এই শীতের মধ্যে…
ঠেকায় পড়ে আগেও থেকেছি…
এক কাজ করো না, প্রস্তাব রাখল কিশোর, চলো, কোন হোটেলে গিয়ে খেয়ে নিই আগে। খিদে পেয়েছে আমার। তোমারও নিশ্চয়ই। তারপর ভেবেচিন্তে। ঠিক করা যাবে, কোথায় থাকবে। কি বলো?
কিন্তু আমার কাছে তো পয়সাকড়ি…
সেটা তোমার ভাবতে হবে না, বাধা দিয়ে বলল কিশোর। আমাকে বন্ধু ভাবতে আপত্তি আছে?
চুপ হয়ে গেল বব। ধীরে ধীরে আলো ফুটল নীল চোখের তারায়, হাসল, খুব মিষ্টি হাসিটা। না, কোন আপত্তি নেই। হাত বাড়িয়ে দিল, আমি বব কলিনস।
আমি কিশোর পাশা। ও আমার বন্ধু, মুসা আমান। আর ও বোরিস চেকোমাসকি, ব্যাভারিয়ায় বাড়ি।

হেসে মস্ত এক থাবা বাড়িয়ে দিল বোরিস, ববের হাত ধরে ঝাঁকুনি দিল। বোরিসের ধারণা আলতো ঝাঁকুনি দিয়েছে, কিন্তু ববের মনে হলো কাঁধের কাছ থেকে তার হাতটা খসে চলে আসবে।
আচ্ছা, কিশোর বলল, এদিকে কোন ভাল হোটেল আছে, মানে ভাল খাবার পাওয়া যায়? আমি ভাই মুসলমান, মুসাও। কিছু মনে কোরো না, শুয়োর-টুয়োর খেতে পারব না। আছে?
গাল চুলকাল বব। একটু চিন্তা করে নিয়ে বলল, আছে, বন্দরের ধারে। নানা দেশের নানা জাহাজ আসে, অনেক রকম লোক, একেক জন একেক রকম খায়…কিন্তু, দাম অনেক বেশি।
কুছ পরোয়া নেই, হাত নাড়ল কিশোর। টাকা আছে আমার কাছে। চলো, খিদেয় নাড়ি জ্বলছে।
খুশি মনে নতুন বন্ধুদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল বব, অন্যের পয়সায় ভাল খাওয়া তার ভাগ্যে কমই জুটেছে। কয়েক মিনিট পরেই টেবিল ঘিরে বসল ওরা, পায়ের তলায় নরম কার্পেট, মার্বেল পাথরের তৈরি পুরানো ধাচের টেবিল, হালকা আলোয় চকচক করছে। প্রায় প্রতিটি টেবিলে লোক আছে, বেশির ভাগই নাবিক। কড়া তামাকের নীলচে ধোয়ায় ভারি হয়ে উঠেছে ঘরের বাতাস, খুব ভাল লাগছে। ববের এই কোমল উষ্ণতা। কোণের দিকে মোটামুটি নির্জন একটা জায়গায় বসেছে। ওরা।
ফ্যাকাসে চেহারার ওয়েইটার এগিয়ে এল।
গরুর গোশত ভুনা, ভেড়ার কাবাব, পনির, মাখন, অর্ডার দিল কিশোর, আর, মোটা রুটি। গরম গরম।
লোকটা চলে যেতেই কিশোর বলল, খাবার আসতে সময় লাগবে, এই সুযোগে তোমার বাবার চিঠিটা খুলে ফেলি, কি বলো?
কিন্তু…ওটা তো ঘরে…
হেসে পকেট থেকে মোটা খামটা বের করল কিশোর, এই যে। নিশ্চয়ই মূল্যবান কিছু রয়েছে এতে, নইলে গরিলাটা খুন করতে আসত না তোমাকে। খুলব?
খোলো, মাথা কাত করল বব। কিন্তু কিছু পাবে না। বাবার ধন-দৌলত নেই যে লুকিয়ে রেখে নকশা পাঠাবে।
ববের কথা কিশোরের কানে ঢুকল বলে মনে হলো না, হাতের তালুতে নিয়ে খামের ওজন আন্দাজ করছে সে, আপনমনেই মাথা নাড়ল। বেশ ভারি! কাগজ ছাড়াও ভেতরে… খামের মুখ ছিঁড়তে শুরু করল সে। ছেঁড়া দিকটা কাত করতেই সোনালি ঝিলিক তুলে ঠন করে টেবিলে পড়ল একটা গোল ধাতব জিনিস।

বিদ্যুতের মত ছুটে এল কিশোরের হাত, চাপা দিল জিনিসটা, ঠিক এই সময় এল ওয়েইটার। ধীরে সুস্থে প্লেটগুলো সাজিয়ে রেখে শূন্য ট্রে নিয়ে বিদেয় হলো। সাবধানে এদিক ওদিক চেয়ে আস্তে করে হাত সরাল কিশোর। শিস দিয়ে উঠল। চাপা গলায় বলল, মিস্টার বব, জলদি এটা পকেটে ঢোকাও! গোল জিনিসটা ঠেলে দিল। জলদি! কেউ দেখে ফেলবে!
কী! হাঁ হয়ে গেছে বব, চোখ বড় বড়। কি জিনিস! তোলার কোন চেষ্টা করল না।
সোনা, তালুর নিচে আবার ঢাকল জিনিসটা কিশোর।
সোনা! চেঁচিয়ে উঠল বব।
চুপ! আস্তে! শুনছে!
ঠাট্টা করছ! বিশ্বাস করতে পারছে না বব।
ঠাট্টা নয়, সত্যি।
কি তাহলে? টাকা? ডলারখানেক হবে?
টাকাই, তবে এক ডলার নয়, অনেক। আর নিউমিজম্যাটিসট্রা পেলে তো লুফে নেবে, চাইলে কয়েকশো ডলারও দিয়ে দিতে পারে, যদি তেমন পুরানো হয়।
নিউ…নিউ…
নিউমিজম্যাটিসট।
হ্যাঁ, নিউমিজ…তা, ওরা আবার কারা?
মুদ্রা বেচাকেনা করে যারা, তাদেরকে নিউমিম্যাটি বলে।
কোন্ আমলের জিনিস এটা? এতক্ষণে কথা বলল মুসা। মোহর?
কোন আমলের, ভাল করে না দেখলে বলা যাবে না। মোহরই, সম্ভবত ডাবলুন, পুরানো, স্পেনের স্বর্ণমুদ্রা।
হুম, খেতে খেতে বলল বোরিস, তা-ই হবে। মিউজিয়মে দেখেছি এই জিনিস। তা, খাবে, নাকি খালি গল্প করবে? জুড়িয়ে গেল তো সব।
ঠিক! মোহরটা দেখে এতই অবাক হয়েছে, সামনে খাবার রেখেও ভুলে গেছে। স্বয়ং মুসা আমান। ভুলটা শোধরাতেই যেন তাড়াতাড়ি খাবারের প্লেট টেনে নিয়ে ডবল ডবল করে মুখে পুরতে শুরু করল। আধসের মত গরুর মাংস শেষ করে থামল, ধীরে সুস্থে রুটিতে মাখন মাখাতে মাখাতে বলল, ভাল জিনিস পাওয়া গেছে। জলদস্যরা এসব লুট করে লুকিয়ে রাখত না?
মাথা ঝোকাল কিশোর। সে-সময় স্প্যানিশ ডাবলুনের দাম ছিল প্রচুর, যে কোন বন্দরে ভাঙানো যেত। বব, মোহরটা নিয়ে পকেটে ভরো, হাত বন্ধ, খেতে পারছি না। আর চিঠিটাও লুকাও।
লজ্জিত হলো বব। তাড়াতাড়ি মোহর আর খামসুদ্ধ চিঠিটা নিয়ে পকেটে ভরল।

প্লেট টেনে নিতে নিতে বলল কিশোর, বব, তোমার বাবাকে যতখানি সাধারণ মানুষ ভাবো, নিশ্চয়ই ততটা সাধারণ ছিলেন না তিনি। নইলে এই দুর্লভ জিনিস কি করে তিনি জোগাড় করলেন? চিঠিটা পড়তে দেবে আমাকে?
নাও না, এখুনি পড়া, পকেটে হাত ঢোকাতে গেল বব।
আরে না না, এখন না, ববের হাত চেপে ধরল কিশোর। এত লোকের সামনে না। কার মনে কি আছে কে জানে! একটুকরো মাংস চিবিয়ে গিলে নিল।
আরেক কাজ তো করতে পারি, তুমি আজ রাতে আমার বাড়িতে মেহমান হলে। সেখানেই পড়ব চিঠিটা।
দারুণ প্রস্তাব! আমার জন্যে এর চেয়ে ভাল আর কি হতে পারে, অন্তত আজ রাতে? কিন্তু তোমাদের কোন অসুবিধে হবে না তো?
বিন্দুমাত্র না। বাড়িতে শুধু চাচা আর চাচী, অনেক জায়গা। রবিন আর মুসা তো প্রায়ই থাকে আমার সঙ্গে।
রবিন?
আমাদের আরেক বন্ধু, গেলেই দেখবে, জবাবটা দিল মুসা।
খেতে খেতেই কথা চলল, বব বলল, ইস, যদি এক ব্যাগ ডাবলুন পেয়ে যেতাম!
আমার কি আর সেই কপাল হবে!
হয়েও যেতে পারে, পনিরের বড় একটা টুকরো নিয়ে কামড় বসাল মুসা।
কার কপালে কি আছে, কে জানে!
তোমাদের মুখে ফুলচন্দন পড়ক, হাসল বব।
ফুলচন্দনের দরকার নেই, হাত নাড়ল মুসা। আপাতত বড় সাইজের একখানা চকলেট আইসক্রীম দরকার। এই, মিয়া, এই, এদিকে, ওয়েইটারকে ডাকল সে আইসক্রীমের অর্ডার দেয়ার জন্যে।
এই ঠাণ্ডার মধ্যে আইসক্রীম? বব অবাক।
ঠাণ্ডা কোথায়? দুহাত নাড়ল মুসা। আর হলেই বা কি? গরমের মধ্যে চা কফি খায় না লোকে, ঠাণ্ডার মধ্যে আইসক্রীম খেলে দোষ কি?
অকাট্য যুক্তি, এরপরে আর কথা চলে না।
তুমি নাও, আমার লাগবে না, কিশোর বলল।
আমারও না, বলল বব।
বোরিসের দিকে তাকাল মুসা, নেবেন?
বেশি না, দুটো, নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বলল বোরিস।
হেসে ফেলল মুসা, আমি একটার বেশি পারব না। ওয়েইটারের দিকে ফিরল। এই, মিয়া, তিনটা। বড় দেখে এনো।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম, আগের কথায় ফিরে এল বব, এই মোহরটা কি জলদস্যুদের কাছে পাওয়া গেছে?
তোমার বাবার চিঠি পড়লেই জানা যাবে, কিশোর বলল। বাক্যানিয়ারদেরও হতে পারে।
বাক্যানিয়ার!
ওরাও জলদস্যু, তবে সাধারণ জলদস্যুর সঙ্গে একটু তফাৎ আছে, ন্যাপকিনে হাত মুছল কিশোর। চা খাবে?
তা খেতে পারি।
আইসক্রীম নিয়ে এসেছে ওয়েইটার। তার দিকে চেয়ে বলল কিশোর, দুকাপ চা, দুধ বেশি।
হ্যাঁ, চেয়ারে আরাম করে হেলান দিয়ে বসল কিশোর, বাক্যানিয়াররা আগে জলদস্যু ছিল না। একটা সময় ছিল, যখন জাহাজের চেয়ে নাবিক বেশি হয়ে গিয়েছিল, ফলে জাহাজে চাকরি পাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছিল। কিন্তু বেশি দিন বেকার বসে থাকল না। বেশ কিছু ইংরেজ আর ফরাসী নাবিক, অন্য পেশা নিয়ে মেকসিকো উপকূলে চলে গেল তারা। তার আশপাশে তখন স্প্যানিয়ার্ডদের রাজত্ব। মেকসিকো আর পেরুতে সোনার খনি আবিষ্কার হয়েছিল তারও আগে, ওই সময় হিসপ্যানিওলা-আজকের হাইতি দ্বীপে ছিল স্প্যানিয়ার্ডদের আখড়া। সোনার নাম শুনে লাফিয়ে উঠল তারা। ভাবল, খামোকা বসে থেকে লাভ কি, অনেক দেশের লোক তো যাচ্ছে সোনা খুঁজতে, তারাই বা ভাগ্যটা একটু যাচাই করে দেখে নাকেন? বেরিয়ে পড়ল তারা, তাদের পোষা গরু-ছাগল আর শুয়োরের দল দ্বীপেই ফেলে রেখে যেতে হলো যানবাহনের অভাবে। মানুষ নেই, ধীরে ধীরে বুনো হয়ে উঠল জানোয়ারগুলো, বংশ বিস্তার করে চলল দ্রুত, আর কিছু দিন থাকলে খাওয়ার অভাবে হয়তো নিজেদের মাংসই খেতে শুরু করত ওরা, এত বেশি হয়ে গিয়েছিল, ঠাই নাই ঠাই নাই অবস্থা। এই সময় গিয়ে হাজির হলো বেকার নাবিকেরা। ওসব জানোয়ার মেরে গোশত শুকিয়ে জাহাজীদের কাছে বিক্রি শুরু করল। খাবার আর পানির অভাব হলেই ওপথে চলাচলকারী জাহাজ হিসপ্যানিওলায় নোঙর করে, তাদের কাছে মাংস বিক্রি করে বেশ দুপয়সা কামাই হতে লাগল বেকারদের। শুকনো গরুর মাংসকে ফরাসীরা বলে বুক, বেকারদের নাম রাখা হলো বুকাইয়া, এটা থেকেই এসেছে ইংরেজি বাক্যানিয়ার শব্দটা।
যা-ই হোক, বেশ আরামেই আছে বাক্যানিয়াররা, ওরকমই থাকত, যদি স্প্যানিয়ার্ডরা তাদের না ঘাঁটাত। মাথায় ভূত চেপেছিল ব্যাটাদের, তাই নিরীহ নাবিকগুলোকে খোঁচাতে গিয়েছিল। ওটা তখন স্প্যানিয়ার্ডদের এলাকা, তারা

মনে করল, তাদের রাজত্বে অন্য দেশের লোক থাকবে কেন? উচ্ছেদ করো। হিসপ্যানিওলায় উড়ে এসে জুড়ে বসা বিদেশীগুলোকে। ব্যস, এসে খুনজখম শুরু করে দিল। শুরুতে কিছুদিন সহ্য করল বাক্যানিয়াররা, কিন্তু পরে রুখে দাঁড়াল, সে এক প্রচণ্ড রক্তারক্তি কাণ্ড। স্প্যানিয়ার্ডরাই জিতল, প্রথমে তাই মনে হয়েছিল। অবশ্য। বাক্যানিয়াররা পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিল কাছের আরেকটা দ্বীপে, একটা পাথুরে দ্বীপে, টিলাটকর আর লুকানোর জায়গা আছে প্রচুর। দ্বীপটার নাম টরটুগা। প্রতিশোধের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে তাদের মনে। শুধু ভেবেই ক্ষান্ত রইল না, নৌকা বানানো শুরু করল। শিগগিরই দল বেঁধে চড়াও হতে শুরু করল স্প্যানিয়ার্ডদের সদাগরী জাহাজের ওপর, লুটপাট তো করলই, যে জাহাজকে আক্রমণ করল, তার একটা লোকও জ্যান্ত রাখল না, সুযোগই দিল না কোনরকম, কচুকাটা করল। জাহাজ জোগাড় হতে লাগল, সেই সঙ্গে অস্ত্র, রস, খাবার দাবার। খুব শিগগিরই টরটুগায় দুর্ভেদ্য এক দুর্গ বানিয়ে ফেলল ওরা। তারপর আশপাশের কয়েকটা দ্বীপে দুর্গ বানাল, খুবই জোরদার করে ফেলল প্রতিরোধ ব্যবস্থা।

তারপরে যা ঘটার তা-ই ঘটল, চায়ে চুমুক দিয়ে কাপটা পিরিচে নামিয়ে রাখল কিশোর। দেশে দেশে গুজব ছড়িয়ে পড়ল, বাক্যানিয়াররা স্প্যানিশ জাহাজ লুট করে সোনার পাহাড় জমিয়ে ফেলছে। ব্যস, বাঘা বাঘা সব চোর-ডাকাতের টনক নড়ে গেল, দলে দলে ছুটে আসতে শুরু করল তারা সোনার পাহাড়ের ভাগ নিতে। বাক্যানিয়াররা স্বাগত জানিয়ে দলে টেনে নিল তাদের, দল ভারি করল, শক্তিশালী করল। মাংস বেচে সংসার চালানোর ধারেকাছেও গেল না আর, ডাকাত হওয়ার মজা বুঝে গেছে, ডাকাতই থেকে গেল। প্রায় রাতারাতি গজিয়ে উঠল জলদস্যুদের আরেকটা রাজধানী, জ্যামাইকার পোর্ট রয়ালে। জান খারাপ করে ছাড়ল স্প্যানিয়ার্ডদের-তাদের তখন ছেড়ে-দে-মা-কেঁদে-বাঁচি অবস্থা। কিন্তু বাক্যানিয়াররা ছাড়ল না, দিনকে দিন আরও দুর্দমনীয় হয়ে উঠল। জানে, স্প্যানিশরা ধরতে পারলে পুড়িয়ে মারবে, আর ইংরেজরা ধরলে ফাঁসিতে লটকে দেবে। তাই ধরা পড়ার মত কাজই করল না ওরা। যে জাহাজকেই ধরল, তার। লোকজনকে একেবারে শেষ করে দিল। তাদের সঙ্গে কুলিয়ে উঠতে পারল না স্প্যানিশ সরকার, দমন করা তো দূরের কথা। ইংরেজরাও অতিষ্ঠ হয়ে উঠল, কিন্তু কিছু করতে পারল না। এতই শক্তিশালী হয়ে উঠল বাক্যানিয়াররা, জাহাজ আক্রমণ ছেড়ে শেষে স্প্যানিশ মেইনের উপকূলে গিয়ে আক্রমণ চালাল। তাদের দলপতি কুখ্যাত মরগান, আঠারোশো খুনে ডাকাত নিয়ে একবার পানামাতক ধাওয়া করে এল। থামল কিশোর।

তারপর? আগ্রহে সামনে ঝুঁকে এল বোরিস, গল্প শোনার আগ্রহ যার একদম নেই, সে-ও আইসক্রীম খাওয়া ভুলে গেছে।
শেষে ইংরেজ সরকার এক বুদ্ধি করল, আবার শুরু করল কিশোর, সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে দিল। যারা দস্যুতা ছেড়ে দিয়ে ইংরেজদের দলে যোগ দেবে, তাদেরকে মাপ করে দেবে ইংরেজ সরকার। লোভনীয় প্রস্তাব, অনেকেই সঙ্গে সঙ্গে আত্মসমর্পণ করল ইংরেজদের কাছে, কেউ কেউ গ্রামে বিয়ে-থা করে চাষাবাদ শুরু করল, দুএকজন ব্যবসাও ফাঁদল, তবে বেশিরভাগই যোগ দিল ব্রিটিশ নৌবাহিনীতে। সবচেয়ে বড় খুনেটাকে, মরগানকে নাইট উপাধি দিয়ে জ্যামাইকার গভর্নর বানিয়ে দেয়া হলো। এরপর কি করা উচিত, ভালমতই জানে মরগান, যারা দস্যুতা ছেড়ে তার দলে যোগ দিল না, তাদের সবাইকেই ধরে নির্বিচারে ফাঁসিতে লটকে দিল। হাঁফ ছেড়ে বাচল ওই অঞ্চলে চলাচলকারী জাহাজীরা। কমে এল। জলদস্যুতা। একেবারে বন্ধ হলো স্টীম ইঞ্জিন আসার পর, পালের জাহাজ নিয়ে ওগুলোর সঙ্গে দৌড়ে পারত না ডাকাতেরা, বাধ্য হয়ে ডাকাতি ছাড়তে হলো।
ইস, কি আরামেই না ছিল! ফোঁস করে শ্বাস ফেলল বব। গেল ব্যাটারা ভেড়া বনে!
আরে! হেসে বলল কিশোর, তুমি তো লোক সুবিধের নও। ডাকাতদের জন্যে দুঃখ করছ। সুযোগ পেলে হয়ে যেতে নাকি?
নিশ্চয়ই। খবরের কাগজ ফেরি করার চেয়ে অনেক ভাল।
ববের জন্যে দুঃখ হলো কিশোরের। তা ঠিকই বলেছ, কিন্তু ধরা পড়লে যে ফাঁসিতে ঝোলাত? কিংবা পুড়িয়ে মারত?
না খেয়ে তিলে তিলে মরার চেয়ে একবারে মরে যাওয়া ভাল না?
জবাব দিতে পারল না কিশোর। বিল এল, প্লেটে কয়েকটা নোট রেখে দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। অন্যেরাও উঠল।
বাইরে বেরিয়ে রাস্তা পেরোতে গিয়েই বাধল বিপত্তি। ববের প্রায় গায়ের ওপর এসে পড়ল একটা লরি, হাত ধরে হ্যাঁচকা টানে তাকে সরিয়ে আনল মুসা, আরেকটু হলেই চাকার নিচে চলে যেত বব।
আরে! কি ব্যাপার! উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে কিশোর। এতবড় একটা লরি আসছে, দেখলে না! গেছিলে তো!
কি জানি! বেশ নাড়া খেয়েছে ব্যাপারটায় বব। পথেই তো আমার কাজ, সারাদিন পথে পথে ঘুরি, এমন তো কোনদিন হয়নি! আজ হঠাৎ... কি করে কি। ঘটল, বুঝতে পারছে না যেন সে-ও।
অ্যাকসিডেন্ট রোজ হয় না, হঠাৎ করেই একদিন হয়, সাবধান করল কিশোর। দেখে শুনে পথ চলো এখন থেকে, নইলে মোহর খরচ করার সুযোগ পাবে না।

হাত তুলে একটা খালি ট্যাক্সি ডাকল কিশোর। বোরিস আর মুসাকে নিয়ে এদিকে এসেছিল সে কিছু পুরানো জিনিস দেখতে। ইয়ার্ডের দুটো ট্রাকের একটা খারাপ হয়ে গেছে, আরেকটা নিয়ে বেরিয়েছেন রাশদ চাচা। আসার সময় বাসে এসেছে তিনজনে।

ট্যাক্সিতে উঠল ওরা, বোরিস বসল ড্রাইভারের পাশে, তিন কিশোর পিছনের সীটে।

গাড়ি ছাড়ল ড্রাইভার, বোধহয় অনেক দূর যেতে হবে বলে শুরুতেই গতি অনেক বাড়িয়ে দিল। প্রথম থেকেই ড্রাইভারের আচরণ ভাল লাগেনি কিশোরর, এখন তার এই গতি বাড়ানো আরও অপছন্দ করল। নিচু গলায় সঙ্গীদেরকে বলল, ব্যাটা নিশ্চয়ই মাতাল! এই রাস্তায় এত জোরে গাড়ি চালায় কেউ! দেবে গুঁতো লাগিয়ে কোন গাড়ির সঙ্গে!

খুব খারাপ কথা, ব্যাপারটাকে হালকাভাবে নিল বব। মাত্র টাকা পয়সা আসতে শুরু করেছে, এই সময় যদি মরি...হি-হিহ! অযাচিতভাবে কয়েকজন সত্যিকারের বন্ধুকে পেয়ে সব দুঃখ যেন ভুলেই গেছে সে।

খরচ করার সুযোগ দেবে না তোমাকে ব্যাটা! রেগে উঠছে কিশোর, বোরিস কিছু বলছে না কেন? বোধহয় এই জোরে ছোটা ভালই লাগছে তার। একটা মোড়ে এসে পড়ল গাড়ি, তবুও গতি কমাল না ড্রাইভার, চাকার কর্কশ শব্দ তুলে পিছলে ঘুরে গেল গাড়ির নাক, একে অন্যের ওপর কাত হয়ে পড়ল তিন কিশোর। চেঁচিয়ে উঠল কিশোর, বোরিস! আস্তে চালাতে বলুন! মেরে ফেলবে নাকি!

হেসে উঠল ড্রাইভার, যেন মজার একটা কৌতুক শুনছে, গতি তো কমালই না, বরং আরও বাড়াল।

আশ্চর্য! বোরিস এখনও কিছু বলছে না কেন? কিশোরের মনে হলো, সে নিজেও অযথাই বেশি রেগে যাচ্ছে, কোথায় যেন কি একটা গোলমাল হয়েছে।

অবশেষে দুর্ঘটনা ঘটেই গেল। একটা ট্রাফিক পোস্টের কাছে লাল বাতি অমান্য করল ড্রাইভার, বাঁদিক থেকে আসা একটা প্রাইভেট কারের পেছনে লাগিয়ে দিল গুঁতো। চাকার তীক্ষ্ণ শব্দ, আঁতকে ওঠা মহিলার ভয়ার্ত চিৎকার, দুচারজন পথচারীর গেল! গেল! রব শোনা গেল কয়েক মুহূর্ত। ভাগ্য ভাল, প্রাইভেট কারটা উল্টাল না, তঁতো খেয়ে ওটার পেছন দিক সরে গেল আধ পাক।

রাগে অন্ধ হয়ে গেছে কিশোর। এক ঝটকায় দরজা খুলে বেরিয়ে এল বাইরে, ড্রাইভারের দরজা খুলে তাকে প্রায় চড়ই মেরে বসে, এই অবস্থা। জীবনে যা কখনও করেনি, তাই করে বসল, মুখ খারাপ করে গাল দিয়ে উঠল ড্রাইভারকে।

ট্রাফিক পুলিশ ছুটে এল। প্রথমেই দেখে নিল, দুটো গাড়ির কেউ আঘাত পেয়েছে কিনা। অন্য কারোই তেমন কোন চোট লাগেনি, ট্যাক্সি ড্রাইভারের ছাড়া। তার

কপাল কেটে রক্ত পড়ছে। চেহারা ফ্যাকাসে। মনে হলো, খুব লজ্জা পেয়েছে।
পকেট থেকে নোটবুক বের করতে করতে বলল পুলিশ, কি ব্যাপার? মদ খেয়ে চালাচ্ছিলেন নাকি? দেখি, লাইসেন্স দেখি।
কিশোর বলল, মদই খেয়েছে! কত মানা করলাম, আস্তে চালাও, আস্তে চালাও, শুনল না!
লাইসেন্স বের করে দিয়ে বলল ড্রাইভার, না, স্যার, মদ খাইনি! বিশ্বাস করুন! আজ সারাদিন এক ফোঁটাও না! কি জানি হয়ে গিয়েছিল! জীবনে কখনও এরকম হয়নি! কি যে হয়ে গেল হঠাৎ।
ভুরু কুঁচকে ড্রাইভারের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল এক মুহূর্ত পুলিশ। না, মিছে কথা বলছে বলে তো মনে হচ্ছে না। কি ভাবল, তারপর লাইসেন্সটা ফিরিয়ে দিতে দিতে বলল, যাও, ছেড়ে দিলাম। এখন থেকে সাবধানে গাড়ি চালাবে। অসুখ-টসুখ করেনি তো?
না, স্যার! কপালের রক্ত মুছছে ড্রাইভার। সারাদিন গাড়ি চালিয়েছি, বৃষ্টি তো, খেপও পেয়েছি অনেক। এই একটা খেপেই...আসলে!
যাও, ওনাদেরকে নামিয়ে দিয়ে সোজা বাড়ি ফিরে যাও, পরামর্শ দিল পুলিশ।
বেশি পরিশ্রম করে ফেলেছ, ঘুম পাচ্ছে বোধহয়। যাও, হাত নাড়ল সে।
গাড়ি ছাড়ল আবার ড্রাইভার। গতিবেগ সীমিত রাখল এবার। বলল, স্যার, কিছু মনে করবেন না। সত্যি বলছি, মদ খাইনি। আমার মুখ শুঁকে দেখুন।
কিশোরও বিশ্বাস করল তার কথা, গাল দিয়েছিল বলে লজ্জা পাচ্ছে। চিমটি কাটতে শুরু করেছে নিজের ঠোঁটে, গভীর ভাবনায় ডুবে যাচ্ছে। আনমনেই বলল, না, শোঁকার দরকার নেই। কিন্তু...হোটেল থেকে বেরোনোর পর পরই দুদুটো অঘটন!
ভূতের আসর হয়েছে। অনেকক্ষণ পর এই প্রথম কথা বলল মুসা।ড্রাইভারদের ওপর। লরিটা কি করল, দেখলে না?
লরিটা ঠিকই আসছিল, মনে করিয়ে দিল কিশোর, ববই আনমনা হয়ে গিয়েছিল। হুঁ।
এত কাণ্ড ঘটে গেল, বোরিসু হা-না কিছু বলল না, স্বপ্নের ঘোরে রয়েছে যেন সে। একেবারে চুপ। তার এই ভাবসাব ভাল লাগল না মুসার। সত্যিই কি ভূতের আসর!
তিন গোয়েন্দার হেডকোয়ার্টারে বসে আছে তিন গোয়েন্দা। বাকি পথটা নিরাপদেই ফিরেছে ওরা। ফিরেই রবিনের বাড়িতে টেলিফোন করেছে কিশোর। তাকে পায়নি, বাবা-মায়ে গেছে বব শখের গোয়েন্দর রা সরছে না উল্টো
চার তিন গোয়েন্দার হেডকোয়ার্টারে বসে আছে তিন কিশোর। বাকি পথটা নিরাপদেই ফিরেছে ওরা। ফিরেই রবিনের বাড়িতে টেলিফোন করেছে কিশোর।

তাকে পায়নি, বাবা-মার সঙ্গে খালার বাড়ি গেছে রবিন, পার্টিতে।
থ হয়ে গেছে বব। অল্প কথায় তাকে বলেছে সব মুসা, লেখা-পড়ার ফাঁকে ফাঁকে অবসর সময়ে শখের গোয়েন্দাগিরি করে তারা। দুই সুড়ঙ্গ আর হেডকোয়ার্টার দেখে তাজ্জব হয়ে গেছে বব। রা সরছে না মুখে।
ডেস্কের ওপাশে নিজের চেয়ারে বসেছে কিশোর, উল্টো দিকে বসেছে মুসা আর বব।
আর দেরি করে কি হবে? কিশোর বলল। রবিন কখন আসে, ঠিক নেই। এলেও এত রাতে তার মা তাকে এখানে আসতে দেবেন কিনা, সন্দেহ। আমরা পড়ে ফেলি চিঠিটা। সকালে খবর দেব রবিনকে।
ঠিক আছে, সায় জানাল মুসা আর বব।
বের করো, ববকে বলল কিশোর।
পকেট থেকে খামটা বের করল বব। ভেতর থেকে বেরোল কয়েক পাতা আধময়লা কাগজ, ঠিক মত ভাজ করার সময় পায়নি লেখক, বোঝাই যাচ্ছে। টেবিলে বিছিয়ে হাত দিয়ে ডলে সেগুলোকে সমান করল সে।
পড়ো, বলল কিশোর।
তুমিই পড়ো, কাগজগুলো ঠেলে দিল বব।
আমি...আচ্ছা, কাগজগুলো টেনে নিয়ে আরেক দফা সমান করল কিশোর। জোরে জোরে পড়তে শুরু করল:
ডিয়ার বর
হাসপাতালে বসে লিখছি এ-চিঠি, এখানে আমি মোটামুটি নিরাপদ। মনে হয় না এটা তোমার হাতে পৌঁছাবে, কিন্তু যদি পৌঁছায়ই, পড়ো ভালমত, আমার পরামর্শ মত কাজ করো, হয়তো কোনদিন প্রচুর ধনসম্পদের মালিক হতে পারবে। আবার বলছি, প্রচুর ধনসম্পদ। সাবধান, কাউকে কিছু বলবে না। চিঠিটা তো দেখাবেই না, তাহলে ধনসম্পদ পাওয়া তো দূরের কথা, প্রাণে বাঁচবে কিনা সন্দেহ। স্রেফ খুন হয়ে যাবে।
খুলেই বলি সব। খুব সুন্দর একটা জাহাজ সী-ওয়েভ, ছোট, কিন্তু ভাল। এখন ওটা সাগরের তলায়, সঙ্গে করে নিয়ে গেছে তার বেশিরভাগ নাবিককে। আহা, কি ভাল লোকই না ছিল তারা! সব দোষ ওই শয়তান, মাতাল বিগ হ্যামারের। গরিলার মত শরীর, তেমনি কুৎসিত চেহারা, গালে কাস্তের মত বাঁকা একটা কাটা দাগ আরও বীভৎস, ভয়াবহ করে দিয়েছে মুখটাকে। ভীষণ খারাপ লোক, কতখানি খারাপ, তা তার সংস্পর্শে যারা এসেছে তারা ছাড়া আর কেউ বুঝবে না।

সী-ওয়েভে করে সে-ই আমাদের শেষ যাত্রা। গরিলাটাকে সেদিন জাহাজে উঠতে দেখেই কেন জানি মনে হলো, অঘটন ঘটবে সে যাত্রায়। আমাদের ফার্স্ট মেট অসুস্থ হয়ে পড়ায় তার জায়গায় হ্যামারকে নেয়া হয়েছে। টার্নার খুব ভাল লোক ছিল, নাবিকদের ভালবাসত, অথচ তার জায়গায় এ কাকে নেয়া হলো! দেখেই অপছন্দ করলাম আমরা, সী-ওয়েভের নাবিকেরা। কিন্তু ক্যাপ্টেনের সিদ্ধান্ত, আমরা আর কি বলব।

জাহাজ ছাড়ল। যাত্রার শুরুতেই যখন ন্যাব লাইটের দেখা পেলাম না, বুঝলাম, কপালে খারাপী আছে। যাব রিও-তে। এমনিতেই ওদিককার সাগরের বদনাম আছে, যখন তখন ঝড় ওঠে, সেটা প্রমাণ করার জন্যেই যেন উত্তর-পশ্চিম থেকে ধেয়ে এল পাগলা হাওয়া, বড় বড় ঢেউ উঠল, মোচার খোলার মত দোলাতে শুরু করল জাহাজটাকে। নিচে, নাবিকদের কেবিনে গিয়ে আশ্রয় নিলাম আমরা। গরিলা নামল না, ব্রিজে রয়ে গেল। মাতাল অবস্থায় হাল ধরেছে, ঘষা লাগিয়ে দিল একটা স্টীমারের সঙ্গে। ভাগ্য ভাল, সামনাসামনি তো লাগায়নি, তাহলে ওখানেই হয়তো মরতাম আমরা। ক্যাপ্টেনের শরীর বিশেষ ভাল না, ঘুমের বড়ি খেয়ে নিজের কেবিনে শুয়ে আছেন, তাই বোধহয় ঘষা লাগার শব্দ শুনলেন না। আর ভীষণ ঝড়ের। মাঝে কেবিন থেকে ওই শব্দ শোনাও যায়নি বোধহয়।

হ্যামারকে টার্নারের মত বিশ্বাস করা উচিত হয়নি ক্যাপ্টেনের। এই যে একটা দুর্ঘটনা ঘটাল, তারপরও হুঁশ হলো না হ্যামারের, মদ গিলেই চলল। আপন খেয়ালে যেদিক খুশি ভেসে চলল জাহাজ, গরিলাটার কোন খবরই নেই। সে রাতে সারাটা রাত আতঙ্কে অস্থির হয়ে রইলাম আমরা, যে-কোন মুহূর্তে যা খুশি ঘটে যেতে পারে। আমরা ঠিক করলাম, সকালে ক্যাপ্টেনকে জানাব হ্যামারের গাফিলতির কথা। তার মাতলামির জন্যে জাহাজসুদ্ধ সবাই তো আর মরতে পারি না।

কোনমতে রাতটা কাটল। সকালে একজন নাবিক গিয়ে ক্যাপ্টেনকে জানাল। হ্যামারকে ডেকে খুব একচোট ধমকালেন তিনি, হুঁশিয়ার করে দিলেন, এরপর এ রকম হলে আর সহ্য করবেন না।

মুখ কালো করে ক্যাপ্টেনের কেবিন থেকে বেরোল গরিলা, তারপর শুরু হলো। তার অত্যাচার। সে কী অত্যাচার! পরের পনেরোটা দিন যে কী যন্ত্রণায় কাটল! জাহাজের পরিবেশকে নরক বানিয়ে ছাড়ল শয়তানটা। শঙ্কিত হয়ে পড়লাম, বিনা রক্তপাতে বুঝি আর রিওতে পৌঁছানো সম্ভব হলো না। সে যা শুরু করেছে, যে-কোন, মুহূর্তে যা খুশি ঘটে যেতে পারে। পরিস্থিতি আরও গুরুতর হয়ে উঠল, যখন রহস্যজনকভাবে সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে মাথায় চোট লেগে অজ্ঞান হয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন। ধরাধরি করে তাঁকে কেবিনে নিয়ে শুইয়ে দেয়া হলো।

জাহাজের দায়িত্ব পুরোপুরি এখন গরিলার হাতে। আরও মরলাম আমরা। জাহাজ আর জাহাজ রইল না, দোজখ হয়ে উঠল।

আসল কাহিনী শুরু হলো এরপর। পথ হারাল জাহাজ। জাহাজের গতিপথ ঠিক করার কোন চেষ্টাই করল না হ্যামার, সারাক্ষণ মদ নিয়ে রইল। গত কদিন। থেকেই আবহাওয়া খারাপ। অবশেষে আঘাত হানল হারিকেন। সে কী ঝড়! আমার এত দিনের নাবিক-জীবনে এমন ঝড় আর দেখিনি। দক্ষিণ-পুর্ব থেকে বইল প্রচণ্ড ঝড়, সাগরের ঢেউ তো না, যেন একেকটা হিমালয় পর্বত। ভাল জাহাজ বলেই টিকে রইল সী-ওয়েভ কোনমতে, নইলে পয়লা ধাক্কাতে তলিয়ে যাওয়ার কথা। গল-গল করে পানি ঢুকছে জাহাজে, হাত-পাম্প দিয়ে সেচে কুলিয়ে উঠতে পারছি না। আমরা। পানি ঢুকে বয়লারের আগুন গেল নিভে, ইঞ্জিন বন্ধ। ঢেউয়ের ধাক্কায় প্রধান মাস্তুল ভেঙে ভেসে চলে গেল, সঙ্গে করে নিয়ে গেল অ্যান্টেনা আর কিছু মূল্যবান জিনিস, বিকল হয়ে গেল বেতার যন্ত্র। বিপদ সংকেত যে পাঠাব, সে উপায়ও থাকল না। অসহায়ভাবে ভেসে রইলাম আমরা।

পরের চারটে দিন যেন এক ভয়ানক দুঃস্বপ্ন, কোন জাহাজ চোখে পড়ল না। সী-ওয়েভের খোলের জায়গায় জায়গায় ছিদ্র আর ফাটল দেখা দিয়েছে, পানি ঢুকছে, সেচব আর কত? ধীরে ধীরে ডুবছে জাহাজ, বুঝতে পারছি। কিন্তু ঠেকাব কি করে? আমাদের সবার অবস্থা এত কাহিল, কুটোটি সরানোর শক্তি নেই। চার দিন চার রাত শুধু পানি সেচেছি, ঝড়ের সঙ্গে যুঝেছি, শরীর আর চলছে না, আর পাম্প চালাতে পারছি না, ফলে দ্রুত ডুবছে জাহাজ। আর বেশিক্ষণ ভাসিয়ে রাখতে পারব না ওকে।

যখন বুঝলাম, সী-ওয়েভের আয়ু শেষ, পানি আর না সেচে নৌকা নামালাম। প্রথম নৌকাটায় নামিয়ে দিলাম ক্যাপ্টেনকে। বাতাসের গতিবেগ কমেছে অনেকখানি, কিন্তু ঢেউ বেশ বড় বড়ই রয়েছে। ক্যাপ্টেনের ভাগ্য মন্দ, বিশাল এক ঢেউ এসে নৌকাটাকে তুলে নিয়ে আছাড় মারল জাহাজের গায়ে, এক আছাড়েই চুরমার, চোখের পলকে ফেনা আর ঢেউয়ের তলায় হারিয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন। বিমূঢ়ের মত চেয়ে রইলাম। দড়ি ধরে নৌকায় উঠতে যাচ্ছিল হ্যামার, ঝুলে রইল ওভাবেই, গাল দিতে দিতে ডেকে উঠে এল আবার দড়ি বেয়ে। নৌকায় ক্যাপ্টেনের সঙ্গে যারা উঠেছিল, তাদের একজনকেও দেখা গেল না আর, সবাই তলিয়ে গেছে ঢেউয়ের তলায়।

ডেকে আমার সঙ্গে আর মাত্র চারজন নাবিক বেঁচে আছে। বিগ হ্যামার, পম্পেইয়ের জিম কারনি, বাবুর্চি হ্যারি লুই, আর কিম কারপেনটার, ওই যে, তোমার কিম চাচা, যে আমার সঙ্গে আমাদের বাসায় বেড়াতে এসেছিল, চিনেছ

তো? ছোট্টখাট্টো লোকটা, পাকানো মস্ত গোঁফ ছিল, গিলিংহ্যামে বাড়ি, জানো বোধহয়।
আরেকটা নৌকা আছে জাহাজে, সাবধানে নামালাম ওটা। প্রাণ হাতে করে ভয়ে ভয়ে নামলাম ওতে। আগেরটার অবস্থা দেখেছি, তাই হুঁশিয়ার রইলাম, তাড়াতাড়ি সরিয়ে আনলাম ডুবন্ত জাহাজের কাছ থেকে।
পরের পনেরোটা দিন ছোট্ট সেই ডিঙিতে যে কি করে কাটল পাঁচজন লোকের, কী যে কষ্ট, বোঝাতে পারব না। হাতে ধরে ঈশ্বর বাঁচিয়েছেন, তাই বেঁচে আছি! পনেরো দিনের দিন দূরে ডাঙা চোখে পড়ল। ক্যারিবিয়ান সাগরের একটা দ্বীপ, নাম প্রভিডেন্স, দ্বীপটা আমার চেনা। এর আগেও ওখানে নেমেছি একবার, জাহাজে পানি। নেয়ার জন্যে। জানা গেল, হ্যামারও চেনে। লম্বাটে একটা দ্বীপ, দুই প্রান্তে বিচিত্র চেহারার পাহাড়। গায়ে শক্তি নেই, তবু ডাঙা দেখে শুধু মনের জোরে দাঁড় তুলে। নিয়ে বেয়ে চললাম। কিন্তু তখনও ভাগ্য আমাদের ওপর বিরূপ, তীর ঘেঁষে বয়ে চলা তীব্র স্রোত দ্বীপের গায়ে নৌকা ভিড়তে দিল না, টেনে নিয়ে চলল আবার ভোলা সাগরে। দাঁড় ফেলে দিয়ে একেবারে নেতিয়ে পড়লাম, যেদিকে খুশি যাক ডিঙি, আর কেয়ার করি না। দক্ষিণ-পশ্চিমে এগিয়ে চলেছে নৌকা। ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাহিল আমরা, চোখের সামনে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে দেখছি খাবার আর পানির উৎস, তখন আমাদের মনের অবস্থা যে কী, কি করে বোঝাই! ও হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি, জিম কারনি মারা গেছে আগেই, সে-রাতে শেষ নিঃশ্বাস ফেলল বেচারা হ্যারি। আমরাও মৃত্যুকে মেনে নিয়ে অপেক্ষা করে আছি, এবার কার পালা আসে!
কিন্তু মরলাম না। স্রোত আমাদেরকে এনে ঠেকাল আরেকটা দ্বীপের গায়ে, আধমরা অবস্থায় নামলাম তীরে। বুঝলাম, আপাতত বেঁচে গেছে। দ্বীপে প্রচুর। নারকেল গাছ আছে, গাছের নিচেই পড়ে আছে অনেক নারকেল। তাড়াতাড়ি নারকেল ভেঙে পানি খেলাম, তারপর খেলাম মিষ্টি শাঁস। অচেনা দ্বীপ, নাম জানি না, তবে জানলে ভাল হত; কেন, একটু পরেই বুঝবে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে তীরের নরম বালিতেই হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লাম আমরা।
খুব একটা খারাপ থাকতাম না দ্বীপটাতে, যদি গরিলাটা আমাদের সঙ্গে না থাকত। খাবার আর পানি তো পেয়েই গিয়েছিলাম, চুপচাপ এরপর- শুধু অপেক্ষা। করতাম, ওপথে কোন জাহাজ গেলে কোনভাবে ওটার দৃষ্টি আকর্ষণ করে দেশে ফিরে আসতে পারতাম আবার। কিন্তু আমাদের জান খারাপ করে ছাড়ল বিগ হারামজাদা। নারকেলের পানি পিপাসা মেটাতে পারে, কিন্তু হ্যামারের মদের নেশা আর তো পারে না। মদের জন্যে পাগল হয়ে উঠল সে, এমনিতেই

বদমেজাজী, আরও খারাপ হয়ে গেল। তার মেজাজের জ্বালায় তটস্থ করে রাখল আমাদের সারাক্ষণ।
যা-ই হোক, খাই-দাই, হ্যামারের অত্যাচার সহ্য করি, আর দ্বীপটা ঘুরে ঘুরে দেখি আমি। অদ্ভুত একটা দ্বীপ। মাইল দশেক লম্বা একটা সপ্তমীর বাঁকা চাঁদ যেন, চাঁদের পেটটা বেশিই মোটা, পাঁচ মাইল মত হবে।
এক মাস কাটিয়ে দিয়েছি দ্বীপে। একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই মেজাজ দেখানো শুরু করল হ্যামার, গালাগাল করতে লাগল খাবার পানি এনে রাখিনি বলে। কত আর সওয়া যায়? রেগে গিয়ে বললাম, আমি তার বাপের চাকর নই, দরকার পড়লে নিজে এনে খাকগে। ব্যস, চোখের পলকে ছুরি বের করে তাড়া করল। আমাকে। আমার কাছে কোন অস্ত্র নেই, থাকলেও ওর সঙ্গে পারতাম না, ঝেড়ে দৌড় দিলাম। পেছনে তাড়া করে এল সে। ছুটতে ছুটতে উঠে এলাম ছোট একটা পাহাড়ে। পেছনে ফিরে তাকানোর সাহস নেই। আমার ধারণা, ঠিক পেছনেই রয়েছে সে, ধরে ফেলল বলে। সামনে ঘাস-লতার জঙ্গল। সোজা ছুটে গেলাম, কয়। পা এগিয়েছি বলতে পারব না, হড়াৎ করে পড়ে গেলাম নিচে। হঠাৎ যেন দুফাঁক হয়ে গেল মাটি, গিলে নিয়ে ঠাই দিল আমাকে তার জঠরে। পৌঁছে গেছি বোধহয় পাতাল রাজ্যে!
চোখ মেলে তাকালাম ভয়ে ভয়ে। আবছা আলো। একি! এ কোথায় এসেছি! স্বপ্ন দেখছি না তো? অনেক পুরানো একটা কাঠের জাহাজের স্যালুনে পড়েছি, এই জিনিস তো এখন মিউজিয়মের সামগ্রী। আমি এর ভেতরেই রয়েছি, সত্যি তো? চিমটি কাটলাম হাতে, চুল টেনে দেখলাম। না, জেগেই তো আছি।
বিস্ময়ের ঘোর কাটতেই আবার বাস্তবে ফিরে এলাম। এই জাহাজটা এখানে এল কি করে? তীরের এত ভেতরে? শুকনোয় কখনও জাহাজ চলেছে বলে শুনিনি। তার মানে কি? আবার সব উদ্ভট চিন্তা-ভাবনা আসতে শুরু করল মনে। আমি বোধহয় মরে গেছি। পরলোকে তো যা খুশি ঘটতে পারে, এই যেমন, জাহাজ হয়তো চলে শুকনো দিয়ে। যমদূতের অপেক্ষায় চোখ বন্ধ করে পড়ে রইলাম।
খানিক পরে কিছুই ঘটল না দেখে আবার চোখ মেলোম। দূর, কি সব বাজে কথা ভাবছি!-ধমক লাগালাম নিজেকে। কোথায় এসেছি, ভাল করে দেখিই না। কেন। ওপর দিকে তাকালাম। ছাতে একটা গর্ত। বুঝলাম, ওই গর্ত দিয়েই পড়েছি। সাহস ফিরে এল মনে, কিন্তু পরক্ষণেই একটা জিনিস দেখে আত্মা চমকে গেল আমার।
একজন মানুষ! না না, মানুষের কঙ্কাল। পুরানো আমলের নাবিকের পোশাক পরনে, পচে বিবর্ণ হয়ে গেছে কাপড়ের রঙ। একটা ডেস্কের ওপাশে চেয়ারে বসে

বিকট ভঙ্গিতে দাঁত খিঁচিয়ে রেখেছে যেন মাংস-চামড়া শূন্য মুণ্ডুটা, কালো চক্ষুকোটর দুটো যেন আমার দিকে চেয়েই শাসাচ্ছে।
নিজেকে বোঝালাম, ওটা সাধারণ একটা কঙ্কাল মাত্র, ওটাকে এত ভয়। পাওয়ার কিছু নেই। সাহস সঞ্চয় করে উঠে দাঁড়ালাম, পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম। কাছে। কয়েকটা জিনিস পড়ে আছে টেবিলে, কোনটাই ছুঁলাম না, শুধু...নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছ? দাঁড়াও, খুলেই বলি সব। বিশাল এক মোমবাতি দাঁড়িয়ে আছে রূপোর মোমদানিতে, তিন-চারশো বছর আগের জিনিস বলে মনে হলো। ওটার পাশে পড়ে আছে একটা পিস্তল, পুরানো আমলের। মিউজিয়মে দেখতে পাবে ওই জিনিস। এক টুকরো কাগজ পড়ে আছে, পুরানো হতে হতে হলদে হয়ে গেছে, তার পাশে পালকের কলম। মৃত্যুর আগে বোধহয় ওই কাগজে কিছু লিখছিল লোকটা, কাগজটা দিলাম এই চিঠির সঙ্গে। আরেকটা যে জিনিস দিলাম, সেটাও ছিল টেবিলে। প্রথমে মনে হয়েছিল, একটা মেডাল। হাতে নিয়ে ভাল মত দেখতেই বুঝে গেলাম, সোনার মোহর, স্প্যানিশ ভাবলুন। মিউজিয়মে দেখেছি এর আগে, তাই চিনতে পারলাম। মোহরটা রেখে দিলাম পকেটে। তারপর মন দিয়ে দেখলাম হলদে কাগজের লেখা। একটা নকশা। মাথামুণ্ডু বুঝলাম না কিছু। আরও অনেক সোনার মোহর কোথাও লুকিয়ে রাখেনি তো লোকটা? পরে ভালমত দেখব ভেবে, নকশাটা যত্ন করে রেখে দিলাম পকেটে। তারপর ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম, আর কি কি আছে জাহাজে।
পুরানো, জীর্ণ জাহাজটাতে আরও কি কি ছিল, বলার সময় এখন নেই। শুধু এটুকু বলতে পারি, দেখলে হাঁ হয়ে যাবে, যেমন আমি হয়েছি। কি নেই জাহাজটায়? আলমারি আর সিন্দুক ভর্তি রয়েছে কাপড়ের স্তূপ, সে-কালের নানারকম মূল্যবান কাপড়, সিল্ক, সাটিন ইত্যাদি। এসবও হয়তো লুকিয়ে ফেলত, হয়তো লুকানোর জন্যেই এই দ্বীপে এসেছিল লোকটা, কিন্তু সময় পায়নি, তার আগেই মারা গেছে।
অনেক কিছুই দেখেছি, ভাবলাম, এবার বেরোনো দরকার। কিন্তু বেরোতে গিয়ে দেখলাম, যেখান দিয়ে পড়েছি, সেখান দিয়ে বেরোনো সম্ভব নয় কিছুতেই। আবার ভয় পেয়ে গেলাম। তবে কি এই অদ্ভুত জাহাজে ওই কঙ্কালটার সঙ্গেই জ্যান্ত কবর হয়ে গেল আমার? না না, এভাবে মরতে চাই না আমি। বেরোনোর আপ্রাণ চেষ্টা চালালাম। আর কোন উপায় না দেখে ভাঁড়ার থেকে একটা শাবল এনে খুচিয়ে। ছিদ্র করলাম জাহাজের খোল। হেসো না, হেসো না-জাহাজের কাঠ দীর্ঘদিন স্যাঁতসেতে মাটিতে থাকতে থাকতে পচে গিয়েছে, তাই এত নরম। বড় একটা ফোকর করে, লতার দঙ্গলের ভেতর দিয়ে পথ করে বেরিয়ে এলাম। ভাল

করে তাকিয়ে দেখলাম আশপাশটা, আবার এলে যেন চিনতে পারি। এলে তুমিও চিনতে পারবে, হলুদ কাগজটায় চিহ্ন এঁকে দেখিয়ে দিয়েছি।
আগে কোন সময় নিশ্চয়ই একটা সরু খাল ছিল ওখানে, সাগর থেকে শখানেক গজ ভেতরে একটা খাড়িতে গিয়ে পড়েছিল। ওই খাল বেয়ে জাহাজটা গিয়ে পড়েছিল খাড়িতে, তবে সেটা অনেক আগে, এখন হলে পারত না। এখন একেবারে খটখটে শুকনো। বাইরে থেকে দেখতে পাবে না জাহাজটা পাহাড়ে ঘিরে রেখেছে, তার ওপর ঘন হয়ে জন্মেছে লতাপাতা। এতবড় একটা জাহাজকে যেন বেমালুম গিলে নিয়েছে, কেউ ভাবতেই পারবে না আছে ওটা ভেতরে। ঠিক করলাম, যা-ই পাওয়া যায়, আমি আর কিম ভাগ করে নেব। যেদিক দিয়ে বেরিয়েছি, সে পথটা আবার লতাপাতা আর নারকেলের ডাল দিয়ে বন্ধ করে দিলাম এমনভাবে, যেন। বোঝা না যায় কিছু। অনেক সময় পেরিয়েছে, এতক্ষণে হয়তো শান্ত হয়েছে। হ্যামার, ভেবে ফিরে এলাম ল্যাগুনের ধারে, যেখানে আস্তানা গেড়েছি আমরা। বলতে ভুলে গেছি, একটা ছোট সুন্দর লাগুন আছে দ্বীপের এক ধারে। পাহাড়ের গা থেকে ওখানে উঁচু একটা পাথর ঠেলে বেরিয়ে ছাতের মত হয়ে আছে, তার নিচেই আমাদের বাসা।
চুপচাপ বসে আছে হ্যামার। আমার দিকে কড়া চোখে তাকাল। সাবধান করে দিয়ে বলল, ভবিষ্যতে পানি আনতে ভুল করলে আর ছাড়বে না, খুন করে ফেলবে। বললাম, আর কখনও এমন ভুল হবে না। ঠিক এই সময় একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। আমার পকেটে একটা ফুটো ছিল, সেই ফুটো দিয়ে মাটিতে পড়ে গেল মোহরটা, হ্যামারের একেবারে চোখের সামনে।
বালিতে পড়ে থাকা চকচকে জিনিসটার দিকে চেয়ে রইল হ্যামার দীর্ঘ এক মুহূর্ত, কোটর থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসবে যেন ওর চোখ। কোথায় পেয়েছ। ওটা?
বলব কেন? মুখ ফসকে বলে ফেললাম।
ধক করে জ্বলে উঠল হ্যামারের চোখ, কিন্তু সামলে নিল। একেবারে বদলে গেল তার চেহারা, কণ্ঠস্বর। গলায় মধু ঢেলে বলল, ভাই আমার, দোস্ত আমার, তুমি না আমার প্রাণের বন্ধু! একই জাহাজে চাকরি করেছি আমরা, সমস্ত বিপদ ভাগ করে নিয়েছি, আমার জিনিস তোমার, তোমার জিনিস আমার। তাই না? সকালের কথা ভুলে যাও, মাথার ঠিক ছিল না, কি করতে কি করে ফেলেছি। তা, ভাই, কোথায় পেয়েছ এটা?
না, মিস্টার হ্যামার, মাথা নাড়লাম, মিষ্টি কথায় ভুলছি না। তোমার সঙ্গে আমার দোস্তি নেই, কোনদিন ছিল না। কিছুতেই বলছি না আমি।
বলবি না! চেঁচিয়ে উঠল হ্যামার। হারামজাদা! লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল সে, হাতে ছুরি।

এক লাফে আমাদের মাঝে এসে পড়ল কিম, ঠেকাতে। ততক্ষণে ছুরি চালিয়েছে হ্যামার, সেটা আমার গায়ে না লেগে লাগল কিমের গলায়। আমি আর হ্যামার যখন কথা বলছিলাম, মোহরটা তুলে নিয়ে দেখছিল কিম, সেটা হাতেই রয়েছে। জবাই করা ছাগল যেন, ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল তার গলা থেকে, ঘড়ঘড় আওয়াজ বেরোচ্ছে, শিথিল হাত থেকে খসে পড়ল সোনার মোহর, ওটার পাশেই গড়িয়ে পড়ল বেচারা। রক্তে ভিজে যাচ্ছে সাদা বালি। কয়েক মুহূর্ত হাত-পা নাচিয়ে স্থির হয়ে গেল দেহটা।

বোকা বনে গেলাম। হ্যামারের মুখ থেকে রক্ত সরে গেছে, ফ্যাকাসে হয়ে গেছে চেহারা। ছোঁ মেরে মাটি থেকে মোহরটা তুলে নিয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম, খুন করেছিস ওকে তুই, গরিলার বাচ্চা গরিলা! পার পাবি না। জাহাজে উঠেই ক্যাপ্টেনকে বলে দেব।

ঝট করে মুখ তুলল হ্যামার, ছুরিটা আবার শক্ত হাতে চেপে ধরে ছুটে এল আমার দিকে। গাল দিয়ে উঠল। আমার মরহুম ক্যাপ্টেন বলতেন: গাল দিতে পারে সবাই, কিন্তু ভয় পাওয়াতে পারে কজন? তার জন্যে তেমন বিষাক্ত জিভ থাকা চাই। এই মুহূর্তে আমার সেই কথাটাই মনে পড়ে গেল, হ্যামারের মত বিষাক্ত জিভ কজনের আছে। একটা খুন করেছে, এরপর আর হাত কাপবে না তার, এক সেকেণ্ডও দেরি করলাম না। ঘুরেই দৌড় দিলাম সোজা বনের দিকে। দৌড়ে গিয়ে ঢুকলাম বনে, এরপর যতদিন ওই দ্বীপে ছিলাম বন থেকে বেরোইনি। মাঝে মাঝেই দেখেছি, আমাকে খুঁজছে হ্যামার, সোনার মোহর কোথায় পেয়েছি, সেই জায়গা খুঁজছে। কোনটাই পায়নি। অবশেষে একদিন একটা জাহাজের দেখা পেলাম, আমিই প্রথম দেখেছি, ওটার দৃষ্টিও আকর্ষণ করতে পারলাম। দ্বীপে ভিড়ল জাহাজটা। একটা স্কুনার, নাম আটলান্টিক সিটি। সৈকতে ছুটে গেলাম, হ্যামার এল পরে, দ্বীপের উল্টো প্রান্তে ছিল, হাঁকডাক শুনে ছুটে এসেছে। না, হ্যামারের কুকাণ্ডের কথা বলিনি ক্যাপ্টেনকে। আর বলবই বা কখন? আমরা জাহাজে ওঠার পর থেকেই একটা না একটা অঘটন ঘটেই চলল। প্রথমেই রাডার খারাপ হয়ে গেল, তারপর মাস্তুল ভেঙে পড়ে মারা গেল দুজন লোক। আরও কত কাণ্ড যে ঘটল। যা-ই হোক, অবশেষে যেন ধুঁকতে ধুঁকতে একদিন এসে বোসটনে ভিড়ল। আটলান্টিক সিটি। বন্দর থেকে বেরিয়েই পড়লাম গাড়ির তলায়। জ্ঞান ফিরতেই দেখি শুয়ে আছি হাসপাতালের বেডে। এখানে বসেই এই চিঠি লিখছি। সারাক্ষণ হ্যামারের ভয়ে অস্থির হয়ে আছি। জাহাজে থাকতেই শাসিয়েছে, সোনার সন্ধান না দিলে আমার পিঠে ছুরি বসিয়ে দেবে।

শরীর খারাপ, ভাবছি, ভাল হলেই তোমাকে দেখতে আসব। চাকরিও দরকার। সী-ওয়েভ তো গেছে, আরেকটা ভাল জাহাজ আর ভাল ক্যাপ্টেন খুঁজে নেয়া যে

কী কঠিন। যদি কোন কারণে আমি আসতে না পারি এ-চিঠি আমার একজন নতুন নাবিক-বন্ধুকে দিয়ে দেব, সে পৌঁছে দেবে তোমার কাছে।
যদি আমার কিছু ঘটে যায়, তুমি যেও সেই দ্বীপে, যখন পারো। প্রচুর ধনরত্ন। লুকানো আছে ওখানে, আমার বিশ্বাস। আর যদি মোহর খুঁজে না-ই পাও, জাহাজে যা সম্পদ আছে, সেগুলো এনে বিক্রি করলেও বড়লোক হয়ে যাবে। প্রথমে প্রভিডেন্সে যাবে, সেখান থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে চল্লিশ-পঞ্চাশ মাইল গেলেই পেয়ে যাবে দ্বীপটা। দেখলেই চিনবে, সপ্তমী চাঁদের আকৃতি, পুবধারে পাহাড়। জাহাজটা পাবে উত্তর প্রান্তে, ওদিকে আরেকটা খুদে দ্বীপ প্রায় গা ঘেঁষে রয়েছে মূল দ্বীপের। ম্যাপ এঁকে দেখিয়ে দিলাম।
এ-মুহূর্তে তোমাকে বড্ড দেখতে ইচ্ছে করছে, বব। প্রথম সুযোগেই তোমাকে দেখতে আসব। আবার বলছি, যদি আমার কিছু হয়ে যায়, বড় হয়ে তুমি কিন্তু যেও, সেই দ্বীপে, যেভাবে পারো।
ভাল থেকো, বব, ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনাই জানাই।
ইতি
তোমার বাবা।
চিঠি পড়া শেষ হওয়ার পরও অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা বলতে পারল না। এমনকি মুসা আমান পর্যন্ত চুপ করে আছে। ববের চোখে জল, নীরবে কাঁদছে সে, গাল বেয়ে গড়িয়ে নামছে অশ্রুধারা।
চিঠিটা আবার ভাঁজ করে রাখছে কিশোর, শুধু তার মৃদু খসখস শব্দ, এছাড়া একেবারে নীরব হেডকোয়ার্টার। চিঠি ভাজ করে রেখে খামের ভেতর হাত ঢুকিয়ে আরেকটা ছোট ভাজ করা কাগজ বের করে আনল সে, হলদেটে কাগজ। মেলল।
হ্যাঁ, এই যে সেই নকশা, নীরবতা ভাঙল সে।
বোঝা গেল… চোখ মুছতে মুছতে বলল বব, কেন চিঠিটা নিতে এসেছিল গরিলা হারামজাদা।
হ্যাঁ, মাথা ঝোঁকাল কিশোর।
সোনার মোহরটার জন্যে, বলল মুসা।
মাথা নাড়ল কিশোর।
না। এসেছিল চিঠিটার জন্যে, পড়ে দেখতে চেয়েছিল, কি লেখা আছে। গুপ্তধন কোথায় আছে, লেখা আছে কি না।
গিয়ে তাহলে খুঁজে বের করে নেবে, বলল বব।
পারুক না পারুক, চেষ্টা তো অবশ্যই করবে।

একটু চুপ করে থেকে বব বলল, তো, কি মনে হয় তোমার? বাবা কি সত্যিই গুপ্তধনের খোঁজ পেয়েছিল?
আমার কোন সন্দেহ নেই। তোমার বাবাকে তুমি চেনো, তুমি ভাল বলতে পারবে তিনি কেমন লোক ছিলেন। চিঠি পড়ে আমার যা মনে হলো, মিথ্যে বলার লোক তিনি নন। একটা বর্ণও মিথ্যে লেখেননি।
ঠিকই বলেছ, সায় দিল বব। ফালতু কথা বলত না কখনও বাবা।
আমারও তাই ধারণা। আর সত্যি যে তিনি বলছেন, এই নকশা আর মোহরটাই তার প্রমাণ।
সবই তো জানলাম, মুসা বলল, এখন আমরা কি করব?
কিছু তো একটা করবই, শান্তকণ্ঠে বলল কিশোর।বব, আমার মনে হয়, জলদস্যুর জাহাজ আবিষ্কার করে বসেছেন তোমার বাবা। এক সময় ওসব সাগরে জলদস্যুদের আনাগোনা ছিল খুব বেশি। কাছাকাছি কোন ব্যাংক ছিল না, আর থাকলেও তাতে মোহর রাখতে যেত না ডাকাতেরা। অসৎপথে অর্জিত টাকা রাখতে যাবেই বা কোন সাহসে? নিয়ে গিয়ে তাই লুকিয়ে রাখত কোথাও, নির্জন জায়গায়ই বেশি রাখত। আর কোনদিনই হয়তো গিয়ে ওই ধন তুলে আনার সুযোগ হত না, অনেকের। কিন্তু এটা অন্য কেস। কোনভাবে জাহাজটা ঢুকে গিয়েছিল খাড়িতে, আটকে গিয়েছিল, যে লোকটা ওতে ছিল, বেরোতে পারেনি আর। যেভাবেই হোক, মারা গেছে সে। বছরের পর বছর পড়ে থেকে পচেছে জাহাজটা, শেওলা আর লতাপাতা আগাছায় ছেয়ে ফেলেছে এক সময়। জানোই তো, গ্রীষ্মমণ্ডলীয় আবহাওয়ায় জঙ্গল কি হারে বাড়ে। আর বাইরে থেকে দেখা যায় না কেন, দেখাচ্ছি, উঠে গিয়ে ছোট বুকশেলফ থেকে মোটা একটা এনসাইক্লোপিডিয়া বের করে আনল কিশোর, খুলে একটা ছবি বের করল। ববের দিকে ঠেলে দিয়ে বলল, এই হলো জাহাজের চেহারা, আজকের লোহার জাহাজ তো না। পাহাড়ের ভেতরে লতাপাতায় ঢাকা থাকলে বের করা খুব মুশকিল। এই জন্যেই হ্যামার এত খুঁজেও পায়নি। তোমার বাবা হঠাৎ করেই তার ভেতরে পড়ে গিয়েছিলেন, নইলে তিনিও কোনদিনই দেখতে পেতেন না জাহাজটা। কিন্তু হ্যামার ব্যাটা সহজে ছেড়ে দেবে বলে মনে হয় না।
কি করে এত শিওর হচ্ছ, হ্যামারই গিয়েছিল আমার ঘরে?
খুব সহজ ব্যাপার। তোমার বাবা তো খুব ভালমতই বর্ণনা দিয়েছেন তার চেহারার। বার বার উল্লেখ করেছেন গরিলা বলে, তোমার ঘরে যে এসেছিল, সে দেখতে গরিলার মত নয়? গালে কাস্তের মত বাকা কাটা দাগ ছিল না? চেহারা না হয় দুজন মানুষের প্রায় একরকম হতে পারে, কিন্তু কাটা দাগ?
আবার খানিকক্ষণ নীরবতা।

তোমার কি মনে হয়? বলল বব। হ্যামারই বাবাকে খুন করেছে?
মনে হওয়া খুব সঙ্গত। কথায় কথায় ছুরি বের করে সে, কিমকে খুন করেছে, তোমার বাবাকেও খুন করবে বলে হুমকি দিয়েছে বার বার। আর গুপ্তধনের জন্যে মানুষ খুন, এটা নতুন কিছু নয়।
হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। চিঠি নিয়ে এসেছিল যে নাবিক, সে বলেছে, সরাইখানায় নাকি পিঠে ছুরি বেঁধা অবস্থায় দেখেছে বাবাকে... কথা রুদ্ধ হয়ে এল আবার ববের।
হ্যামার নিশ্চয়ই অনুমান করেছে, হাতের তালু নাড়ল কিশোর, তোমার চিঠিতে নকশা-টকশা কিছু একটা এঁকে পাঠাবেন তোমার বাবা। প্রথমে গিয়েছিল তোমার বাবার ঘরে, সরাইখানায়, কিন্তু তার আগেই ওগুলো হাতবদল করে ফেলেছেন তিনি। রাগের মাথায় তাকে খুন করেছে। তারপর এসেছে তোমার। কাছে, কি মনে হতেই তাড়াতাড়ি আবার চিঠি খুলল কিশোর। দেখে নিয়ে বলল, চিঠিটা কবে নিয়ে এসেছে বলেছিলে তখন?
আজ বিকেলে।
হুঁ। আরও অনেক আগেই আসার কথা ছিল। অনেক দেরি করে এনেছে নাবিক। এই যে তারিখ, দেখাল কিশোর, তিন মাস আগের। এত দেরি করল কেন?
শুনেছি, সঙ্গে সঙ্গেই বলল বব, কেন এত দেরি হয়েছে। তিন মাস আগেই নাকি চিঠি দিয়েছিল তাকে বাবা, কিন্তু আসতে দেরি হয়ে গেছে তার নানা কারণে। চিঠিটা সে হাতে নেয়ার পর থেকে নাকি একের পর এক অঘটন ঘটেছে। নানারকম ঝামেলায় জাহাজে চড়তেই দেরি হয়ে গেছে নাবিকের, তারপর যখন রওনা হলো শুরু হলো দুর্ঘটনা। ঝড়ে পড়ল জাহাজ, প্রপেলারের ব্লেড গেল ভেঙে, এক বন্দর থেকে সেটা সারিয়ে নিয়ে আবার ছাড়ল জাহাজ। কয়েক মাইলও যায়নি, কুয়াশার মধ্যে নাকি একটা ট্রলারের সঙ্গে ধাক্কা লাগাল। ডুবতে ডুবতে কোনমতে বন্দরে ফিরে গেল আবার মেরামত করাতে।
মোলায়েম শিস দিয়ে উঠল কিশোর। পুরো ব্যাপারটাই জানি কেমন গোলমেলে, খালি প্যাঁচ আর প্যাঁচ। মুসার দিকে তাকিয়ে নিল একবার কিশোর, কি জানি হয়েছে আজ গোয়েন্দা সহকারীর, কথা বলাই যেন ভুলে গেছে। বড় বেশি চুপচাপ। ববের দিকে ফিরল আবার গোয়েন্দাপ্রধান। চিঠি তো পেলে, জানলেও সব কিছু। কি করবে, ঠিক করেছ?
পুলিশের কাছে যাওয়াই তো উচিত।
কি বলবে?
বলব, বিগ হ্যামার আমার বাবাকে খুন করেছে।
কি প্রমাণ আছে তোমার হাতে?
অ্যাঁ! ...তাই তো! ...কি করব তাহলে?

কিছুক্ষণ সামনের দেয়ালের দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর, নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল, তারপর ববের দিকে ফিরে বলল, হ্যামারের কাছ থেকে দূরে থাকবে। গুপ্তধনের খোঁজে রয়েছে, কাজেই মরিয়া এখন সে। কয়েকটা প্রশ খোঁচাচ্ছে। আমাকে। ও তোমার কথা জানল কি করে? তোমার বাবার কাছে শুনেহে? কি করে। জানল, তোমাকে চিঠি দিয়েছে তোমার বাবা, তাতে গোপন কথা লেখা আছে? টেবিলে কনুই রেখে দুহাতের আঙুলের মাথা এক করছে, আবার সরিয়ে আনছে। গোয়েন্দাপ্রধান। এবার দেখা যাক, কি কি জেনেছি আমরা। এক, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কোন নির্জন দ্বীপে পুরানো একটা জাহাজ লুকিয়ে আছে, যাতে রয়েছে মূল্যবান বস্তু, ওটার আশপাশেই হয়তো রয়েছে গুপ্তধন। দুই, ব্যাপারটা আমরা যেমন জানি, বিগ হ্যামারও জানে, গুপ্তধন পাওয়ার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে। তিন, তোমার কাছে একটা চিঠি আছে, তাতে গুপ্তধনের ঠিকানা লেখা আছে...কোনভাবে এটা জেনেছে। হ্যামার। সুতরাং, তোমার এখন উচিত কোথাও লুকিয়ে থাকা। ডকের ধারে ওই চিলেকোঠার ছায়া মাড়ানো ঠিক হবে না। মারা পড়বে।

অস্বস্তিতে নড়েচড়ে বসল বব। কি করব তাহলে? আবার একই প্রশ্ন। ফাটা বাঁশে লেজ আটকেছে, করি কি এখন! চিঠিটা পুড়িয়ে ফেলি? হ্যামার ধরলে বলব, পুড়িয়ে ফেলেছি।

বিশ্বাস করবে? ভুরু নাচাল মুসা।

অসহায় ভঙ্গিতে চেয়ারে হেলান দিল বব, টান টান করে দিয়ে এক, পায়ের ওপর আরেক পা রাখল। না, তা করবে না। মিছে কথা বলছি ভেবে পিটিয়ে হাড়গোড় ভাঙবে। কি করব?

গুপ্তধন খুঁজে আনার কথা বলছ না কেন একবারও? কিশোর বলল।

চাঁদ পেড়ে আনব বললেই কি আর পাড়া যায়? ফোঁস করে শ্বাস ফেলল বব। ছেঁড়া কাথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন! পকেটে নাই কানাকড়ি, খরচ পাব কোথায়?

মুসার দিকে ফিরল কিশোর। সেকেণ্ড, তোমার কি মনে হয়? ওকে সাহায্য করতে পারব আমরা?

তালুতে তালু ডলল মুসা, ঠাণ্ডা হাত ডলে গরম করছে যেন। আমরা! ...কিছু একটা ভাবছ তুমি কিশোর, বলে ফেলো না।

গুপ্তধন শিকারে যদি যাই আমরা?

ফ্যাকাসে হয়ে গেল মুসার চেহারা পলকের জন্যে। খাইছে! তোতলাতে শুরু করল, কি-কি-কিভাবে...

হাসল কিশোর। সহজ হবে না যাওয়া। তবে ইচ্ছে করলে যেতে পারি আমরা। তার জন্যে প্রথমেই দরকার, টাকা। অনেক টাকা।

কোথায় পাব এত টাকা?
চেষ্টা করলে পাব, ববের দিকে ফিরল কিশোর। বব, একটা প্রস্তাব রাখছি। ধরো, টাকা আমি জোগাড় করতে পারলাম, যাওয়াও হলো, ডাবলুনগুলো পেলামও আমরা, ভাগাভাগিটা কিভাবে হবে? তোমার অর্ধেক আমাদের অর্ধেক? খরচাপাতি গিয়ে যা থাকবে সেটাই ভাগ হবে। রাজি?
আমাকে নিয়ে তামাশা করছ? বিষণ্ন কণ্ঠে বলল বব, শার্টের একটা ছেঁড়া জায়গা ডলে সমান করার চেষ্টা করল।
ছি, কি বলছ! তামাশা করব কেন? সত্যিই বলছি।
তোমার যা ইচ্ছে করো, সব কিছুতেই আমি রাজি, অনুনয় ঝরল ববের কণ্ঠে। শুধু এই বিপদ থেকে বাঁচাও। হ্যামারের ছুরি খেয়ে মরতে চাই না আমি।
তাহলে অর্ধেক ভাগে তুমি রাজি, আগের কথার খেই ধরল কিশোর। তো কাজ শুরু করে দেয়া যায়। এখন প্রথম কাজ, দ্বীপটার অবস্থান জানা...
চিঠিতেই তো লেখা আছে... বাধা দিয়ে বলল মুসা।
লেখা দিয়ে দ্বীপ খুঁজে পাওয়া যায় না, ম্যাপ দরকার, হাত তুলল কিশোর।
এত খুদে দ্বীপ ম্যাপে থাকবে?
থাকবে না। কিন্তু প্রভিডেন্স দ্বীপটা থাকা উচিত, নামধাম আছে যখন, বোঝা যাচ্ছে, নাবিকেরা চেনে ওটা। আশপাশে নিশ্চয়ই আরও দ্বীপ আছে। এমনিতেই ক্যারিবিয়ানে দ্বীপ বেশি। ছোট, বড়, মাঝারি সব রকমের আছে।
হলদে কাগজটায় ঠিকানা লেখা নেই? পথ নির্দেশ?
না, দেখেছি ভালমত। দ্বীপে নামার পর হয়তো কাজে লাগবে ওটা, বলল কিশোর, অর্থ বের করতে পারি যদি। দেখে তো মনে হচ্ছে, একটা গোলকধাঁধা। মানে না বুঝলে এটা হাতে থাকা না থাকা সমান কথা। আর নকশা ছাড়া গুপ্তধন পাওয়ার আশা প্রায় শূন্য। প্রশান্ত মহাসাগরে কোকোস দ্বীপের নাম শুনেছ? ওখানে গুপ্তধন আছে, ইতিহাস তাই বলে। কথাটা জানাজানি হতেই দলে দলে লোক ছুটল। দ্বীপটা বেশি বড় না, অথচ এত লোকে খুঁজেও একটা মোহর বের করতে পারল না। এক জার্মান থেকেই গেল ওখানে, চষে ফেলল দ্বীপটা। গর্ত যা খুঁড়েছে, মস্ত একটা লড়াইয়ের মাঠেও এত ট্রেঞ্চ খোঁড়া হয় কিনা সন্দেহ। আঠারো বছর থেকেছে। লোকটা, হাতে ফোঁসকা ফেলেছে শুধু, ম্যালেরিয়া বাধিয়েছে, কাজের কাজ কিছু হয়নি। কাজেই বোঝে।
দিচ্ছ তো হতাশ করে! হাত নাড়ল মুসা।
পাবই, এই গ্যারান্টি কে দিল তোমাকে?.
তাহলে যেতে চাইছ কেন?

আশা আছে বলে। ফিফটি ফিফটি চান্স ধরে নেয়াই ভাল। যাকগে, এখন ম্যাপ দেখা দরকার। প্লেন আর পাইলট জোগাড় করতে হবে।
কি বললে? প্লেন! বিস্ময়ে দাঁত বেরিয়ে পড়েছে ববের।
হ্যাঁ। কেন, জাহাজে যাব ভাবছিলে নাকি?
জাহাজেই তো সুবিধা, নাকি?
না, অসুবিধা। নানারকম ঝামেলায় পড়তে হবে। তার চেয়ে প্লেনে যাওয়া নিরাপদ, সময়ও কম লাগবে, খরচ অবশ্য বেড়ে যাবে অনেক। কিন্তু খরচের কথা মোটেই ভাবছি না।
এত টাকা কোথা থেকে জোগাড় করবে কিশোর, বুঝতে পারছে না মুসা, কিন্তু কিছু জিজ্ঞেসও করল না। কিশোর পাশা যখন বলছে পারবে, নিশ্চয়ই পারবে।
টাকা খরচ করলে ভাল প্লেন হয়তো পাওয়া যাবে, ঘাড় চুলকাল কিশোর, কিন্তু ভাল পাইলট পাওয়াই মুশকিল, তাছাড়া বিশ্বস্ত পাইলট। থাক, ওসব নিয়ে পরে ভাবব। আগে ম্যাপে দেখা দরকার, কোথায় যাচ্ছি আমরা।
মেরিচাচী রাজি হবেন? না বলে পারল না মুসা।
সবচেয়ে কঠিন কাজ ওটাই, স্বীকার করল কিশোর, চাচীকে রাজি করানো, উঠে দাঁড়াল সে। ওঠো, আমার ঘরে যাই। ম্যাপ ওখানে।
দুই সুড়ঙ্গ দিয়ে ওয়ার্কশপে বেরিয়ে এল ওরা। বাইরে অঝোর বর্ষণ। এরকম জরুরী অবস্থার জন্যেই ওয়ার্কশপে দুটো ছাতা রেখে দিয়েছে কিশোর, কাজে লাগল এখন।
নিজের ঘরে এসে ম্যাপ বের করল কিশোর, টেবিলে এনে রাখল। মুসা আর ববের উল্টোদিকের আরেকটা চেয়ারে বসল সে। ম্যাপ খুলে গভীর মনোযোগে দেখল কিছুক্ষণ, আঙুল রাখল এক জায়গায়, এই যে, প্রভিডেন্স। পেন্সিল দিয়ে হালকা গোল একটা দাগ দিল দ্বীপটাকে ঘিরে। এখানে নামতে পারেনি ওরা, পেন্সিল এগিয়ে নিয়ে চলল সে দক্ষিণ-পশ্চিমে, আঁকাবাঁকা একটা দাগ পড়ল ম্যাপে, স্রোত ভাসিয়ে নিয়ে গেছে এদিকে, এই যে দ্বীপপুঞ্জগুলোর কোন একটাতে। ছোট ছোট কয়েকটা বিন্দুকে ঘিরে আবার গোল দাগ টানল সে। দেখেছ, কত ছোট? কোন কোনটা হয়তো দ্বীপই নয়, নিছক বালির চর, ঝকঝকে সাদা বালি, গাছ নেই, পানি নেই, সামুদ্রিক পাখি আর কচ্ছপ ডিম পাড়ে এসব জায়গায়, মানুষ বাসের অযোগ্য। এখানে, কোন কোনটা আবার বেশ বড়, বিশ-তিরিশ মাইল লম্বা। এসব দ্বীপের কোনটাতেই ঘাঁটি করতে পারব না আমরা। রসদ, বিশেষ করে প্লেনের তেল এর কোনটাতেই পাওয়া যাবে না, আমার বিশ্বাস। কিংসটন আর জ্যামাইকা এখান থেকে অনেক দূরে, পোর্ট অভ স্পেনও। তাহলে? মূল ভূখণ্ডের

কোন শহর থেকেই গিয়ে ওসব আনতে হবে আমাদের, প্লেনের জন্যে কয়েকশো মাইল অবশ্য কিছু না। কোন্ শহরটা? নিজেকেই প্রশ্ন করল গোয়েন্দাপ্রধান।
ম্যারাবিনা? ম্যাপের এক জায়গায় আঙুল রাখল মুসা।
আমিও তাই ভাবছি, কিশোর মাথা ঝোকাল। এটাই সবচেয়ে কাছে হবে।
কোথায় ওটা? জিজ্ঞেস করল বব। নাম শুনিনি।
সেন্ট্রাল আমেরিকায়। এক বিচিত্র শহর, বলল কিশোর। কোস্টারিকা আর হণ্ডুরাসের মাঝে যেন আটকে রয়েছে, যেন বিশাল স্যাণ্ডউইচের মাঝে মাংসের বড়া, ধপাস করে ম্যাপ-বইটা বন্ধ করল সে। দক্ষিণ আমেরিকায় যাওয়ার সময় প্যান অ্যামেরিকান এয়ার রুটেই পড়ে। আইনকানুনের বালাই নেই, যার যেভাবে খুশি চলছে, ক্ষমতায় আসীন কর্তা ব্যক্তিরা লুটেপুটে খাচ্ছে সব। খাকগে, আমাদের কি? আমাদের পেট্রোল পেলেই হলো। মনে হয়, ওটা মেরিন এয়ারপোর্ট, যদি তাই হয় তাহলে মেরিন এয়ারক্র্যাফট দরকার।
সী-প্লেন? ভুরু নাচাল মুসা।
ফ্লাইং-বোট, উভচর হলে সবচাইতে ভাল হবে, জলে-ডাঙায় যেখানে খুশি নামতে পারব। দামী খুব ভাল কোন প্লেন দরকার নেই, আটলান্টিক পাড়ি দিতে যাচ্ছি না, কাজ চলার মত হলেই হলো। থামল একটু সে, একে একে দুজনের মুখের দিকে তাকাল। তো, আগামীকাল থেকেই কাজ শুরু করে দিতে পারি
আমরা?
কেউ জবাব দেয়ার আগেই দরজা খুলে উঁকি দিলেন মেরিচাচী, তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললেন, এই, কিশোর, কতবার না বলেছি, ম্যাটে জুতো মুছে যাবি? কি করেছিস, দেখ তো? এসবের কোন মানে আছে?
ভুরু কুঁচকে গেল কিশোরের। কি বলছ, চাচী, মুছেই তো ঢুকেছি!
মুছে ঢুকেছিস! বিস্ময় ফুটল মেরিচাচীর কণ্ঠে, জানেন, কিশোর মিথ্যে কথা বলে না। কে করল…চোর-টোর না তো!
চোখের পাতা কাছাকাছি হলো কিশোরের, উঠে দাঁড়াল। দরজায় এসে দেখল, ম্যাটটার ওপাশে বেশ কয়েকটা ছাপ, পানি আর কাদা লেগে আছে, বড় বড় জুতো পায়ে একটু আগে দাঁড়িয়ে ছিল ওখানে কেউ। এখনো বৃষ্টি পড়ছে, না?
পড়ছে মানে? মুষলধারে, বললেন চাচী।
আশ্চর্য! গাল চুলকাল কিশোর। ঠিক আছে, চাচী, তুমি যাও। আমি মুছে ফেলব।
চোর-টোরই হবে!
হুঁ! এদিক-ওদিক তাকালেন মেরিচাচী। কিছু নিয়ে যায়নি তো… ফিরলেন আবার কিশোরের দিকে। খাবি না? রাত তো অনেক হলো।

না। খেয়ে এসেছি, বলল কিশোর। পাশে এসে দাঁড়িয়েছে মুসা, তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কিছু খাবে?
না, লজ্জিত হাসি হাসল মুসা। তখন অনেক বেশি খেয়ে ফেলেছি।
বব, তুমি?
না, মাথা নাড়ল বব।
কিছুই খাবি না? আবার বললেন মেরিচাচী।
নাহ্। আর তেমন খিদে পেলে ফ্রিজ থেকে নিয়ে খেতে পারব, কিশোর বলল।
ঠিক আছে। রাত বেশি করিস না, শুয়ে পড়, বলে চলে গেলেন তিনি।
মেরিচাচী চলে যেতেই কিশোরের দিকে ফিরল মুসা। কি মনে হয়? কার কাজ?
এখানে কেউ দাঁড়িয়ে ছিল! বিড়বিড় করল গোয়েন্দাপ্রধান, বেশ কিছুক্ষণ ধরে। ভেতরে আলোচনা চললে বাইরে আড়ি পেতে কেন দাঁড়িয়ে থাকে লোকে?
কি আলোচনা হচ্ছে শোনার জন্যে, সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল বব।
ঠিক, মাথা ঝোঁকাল কিশোর। কিন্তু অয়েলস্কিন পরে কে আসতে পারে? সাধারণ কেউ হলে উলের ওভারকোট পরে আসত। উল পানি শুষে নেয়, কিন্তু যে হারে পড়ে মেঝে ভিজেছে, ওভারকোট হতে পারে না। অয়েলস্কিন। কারা। অয়েলস্কিন পরে? পুলিশ আর পোস্টম্যান। তাদের কেউই লোকের বাড়িতে উঁকি মারবে না, এভাবে আড়ি পেতে কথা শোনার চেষ্টা করবে না। তাহলে কে?
নাবিক! চেঁচিয়ে উঠল মুসা।
বাহ, বুদ্ধি খুলছে তোমার, মৃদু হাসল কিশোর।
লাফিয়ে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল বব। মানে? হ্যামার অনুসরণ করে এসেছে, এখানেও!
আলমারি খুলে নিচের তাক থেকে ছেঁড়া ন্যাকড়া বের করল কিশোর, মোছার জন্যে দরজার কাছে গিয়ে তাকাল। সেই বোসটন থেকে আসতে পেরেছে, আর এটুকু পথ আসতে বাধা কি?
প্লেনের জানালা দিয়ে পাঁচ হাজার ফুট নিচের তরঙ্গায়িত উজ্জ্বল নীল সাগরের দিকে তাকাল কিশোর। দূরে পাথুরে তীরে ঢেউ ভাঙছে, নীলচে-মাখন ফেনার একটা আঁকাবাঁকা রেখা এগিয়ে গেছে মাইলের পর মাইল, মোড় নিয়ে হারিয়ে গেছে ঘন বেগুনী রঙের আড়ালে। রেখাটার ডানে জঙ্গল, মস্ত এক সবুজ চাদর যেন বিছিয়ে দিয়েছে কেউ।
কিশোরের পাশে পাইলটের সীট, পেছনের দুটো সীটে বব আর মুসা। একঘেয়ে উড়ে চলা আর ভাল লাগছে না ওদের, হাবভাবেই বোঝা যাচ্ছে।
সেই যেদিন প্রথম ববের সঙ্গে দেখা হয়েছে কিশোর আর মুসার, তারপর পুরো একটি মাস কেটে গেছে। অনেক কাজ, সব কিছু গোছগাছ করতে সময়

লেগেছে। দুই গোয়েন্দার। তিন গোয়েন্দার একজন, রবিন মিলফোর্ড, এই অভিযানে ওদের সঙ্গে আসতে পারেনি, তার নানীর শরীর নাকি খুব খারাপ, বাঁচেন কি মরেন ঠিক নেই, তাকে দেখতে চেয়েছেন, বাধ্য হয়েই মা-বাবার সঙ্গে আয়ারল্যাণ্ডে যেতে। হয়েছে রবিনকে।

খরচের টাকা জোগাড় করতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে হয়নি কিশোরের, বি কে বলতেই সে টাকা ধার দিতে রাজি হয়েছে। জিনার এখন অনেক টাকা, পে সোনার বার যা পাওয়া গিয়েছিল, সেগুলো বিক্রি করা টাকা সব তার নামে ব্য. কে জমা করে দিয়েছে তার বাবা। মোহর পাওয়া গেলে, একটা ভাগ জিনাকে নিতে হবে, এই শর্তে তার কাছ থেকে টাকা নিতে রাজি হয়েছে কিশোর। জিনা ভাগ নিতে রাজি হচ্ছিল না প্রথমে, কিশোরও তাহলে টাকা নেবে না, অবশেষে হার মানতেই হয়েছে জিনাকে। সে-ও আসতে চেয়েছিল এই অভিযানে, অনেক কায়দা করে এড়িয়েছে কিশোর।

টাকা জোগাড় হয়ে যেতেই বিখ্যাত চিত্র পরিচালক ডেভিস ক্রিস্টোফারকে গিয়ে ধরেছে কিশোর। অনেক ব্যাপারে তিনি সাহায্য করেছেন। পাইলট তিনিই জোগাড় করে দিয়েছেন, তাঁর খুব পরিচিত লোক, বিশ্বস্ত। পাইলট এক অদ্ভুত লোক, বাড়ি মিশরে, নাম ওমর শরীফ। লম্বা, ছিপছিপে, ক্লিন-শেভড় যুবক, মাথায় ঘন চুল পুরোপুরি কালো নয়, কেমন একটা তামাটে ছোঁয়াচ, গায়ে বেদুইনের রক্ত, তাই বোধহয় বড় বেশি একরোখা। আমেরিকান নেভিতে ছিল, বসেরা তার কাছ থেকে বোধহয় বিশেষ তোয়াজ পায়নি, তাই প্রমোশন দিতে চায়নি। এতে রেগে গিয়ে চাকরি ছেড়ে চলে এসেছে ফ্লাইট-লেফটেন্যান্ট ওমর। এখন সিনেমায়। স্টান্টম্যানের কাজ করে, পরিচালকের নির্দেশে হাজার হাজার ফুট ওপর থেকে প্যারাসুট নিয়ে ঝাঁপ দেয়, বিপজ্জনক গিরিপথে বিমান নিয়ে উড়ে যায় তীব্র গতিতে, এমনি সব কাজ। খুব কঠিন কাজ, সন্দেহ নেই, কিন্তু এসবে আনন্দ পায়, রোমাঞ্চ অনুভব করে বেদুইনের ছেলে ওমর।

দুই গোয়েন্দার সঙ্গে ওমরের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন জনাব ক্রিস্টোফার। অভিযানে যেতে রাজি আছে কিনা জিজ্ঞেস করেছেন পাইলটকে। সব শুনে লাফিয়ে উঠেছে ওমর, এক কথায় রাজি। এমন লোককে সঙ্গী পেয়ে কিশোর আর মুসাও খুব খুশি।

ওমর শরীফই বিমানের ব্যবস্থা করেছে। লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে নিউ ইয়র্কে এসেছে তিন কিশোরকে নিয়ে। ওখানে প্যান-আমেরিকার এয়ারওয়েজে একটা বিমান ভাড়া নিয়েছে ওরা। পুরানো আমলের সিকোরস্কি, কিন্তু ওমরের এটাই পছন্দ। যে-রকম অভিযানে চলেছে ওরা, এই জিনিসই কাজ দেবে। চার সীটের একটা উভচর, টুইন-ইঞ্জিন, বেশ বড় লাগেজ কম্পার্টমেন্ট-অনেক মালপত্র রাখা

গেছে। ঠিকই বলেছে ওমর, নতুন পাইলট-বন্ধুর ওপর ভক্তি বেড়ে যাচ্ছে কিশোরের। এত পুরানো আমলের প্লেন নিচ্ছে দেখে প্রথমে একটু নাকই সিটকেছিল। কিশোর, কিন্তু এখন বুঝতে পারছে ভুল। গত চার দিন ওদেরকে নিয়ে উড়ছে। প্লেনটা, সামান্যতম গোলযোগ করেনি। এয়ারওয়েজ কর্তৃপক্ষকে জিজ্ঞেস করেছিল। কিশোর, যদি কোনরকম গোলমাল করে, কি হবে? তারা বলেছে, বিমান ঘটিত যে কোন রকম অসুবিধে দেখবে তারা, তাদের স্থানীয় অফিসে শুধু জানাতে হবে, ব্যস, এরপর যা করার ওখানকার লোকেরাই করবে। একটা কোলাপসিবল রবারের ভেলাও সরবরাহ করেছে এয়ারওয়েজ, ওমরের অনুরোধে। তার ধারণা, যেখানে যাচ্ছে, জিনিসটা কাজে লাগবে।

চারদিন ধরে উড়ে উড়ে ববও ক্লান্ত, বিরক্ত হয়ে পড়েছে, অথচ প্রথম দিকে তার আনন্দ-উত্তেজনার সীমা ছিল না, জীবনে এই প্রথম প্লেনে চড়ছে, লস অ্যাঞ্জেলেসের বাইরে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছে। জানালা দিয়ে নিচে তাকিয়ে আছে, যখনই কোন দ্বীপের ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে, রূপালী সৈকত দেখে হা-হুঁতাশ করে উঠছে মন, ইস, এই মুহূর্তে যদি ওখানে হাত-পা ছড়িয়ে বসা যেত! নীল সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ে দাপাদাপি করা যেত! ছোট্ট এই কুঠুরিতে গুটিয়ে বসে থাকতে কত আর ভাল লাগে?

মুসাও নির্বাক। এভাবে বসে থাকতে তারও আর ভাল লাগছে না। গন্তব্যস্থল আসে না কেন? এই আদিম উভচর না হয়ে, জেট হলে কত তাড়াতাড়ি পৌঁছে যেতে পারত। কেন যে...তার ভাবনা মাঝপথেই ছিন্ন করে দিয়ে নাক ঝুঁকে গেল বিমানের। বকের মত গলা বাড়িয়ে তাড়াতাড়ি জানালা দিয়ে নিচে তাকিয়ে দেখল মুসা, পৌঁছে গেছে ওরা। সাদা রঙ করা এক ঝাঁক বাড়ি দেখা যাচ্ছে। ববের দিকে তাকাল। চোখে চোখ পড়তেই হাসল মুসা।

এসেছি? জিজ্ঞেস করল বব।

লাগছে তো ম্যারাবিনার মতই। যা শুনেছি, সে-রকমই লাগছে, মাথা ঝাঁকাল মুসা।

এ কেমন জায়গা! নিচের দিকে চেয়ে বলল বব।

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল কিশোর, হেসে বলল, কেমন আর? পথে আরও কয়েক জায়গায় থেমেছি না, ওরকমই হবে। তবে বিষুবরেখার কাছে তো, গরম বেশি লাগবে। সভ্য-ভব্য জায়গা বলে মনে হচ্ছে না, কেমন যেন সেকেলে।

পানি চুল উভচর। চাকার জায়গায় ছোট নৌকার মত দুটো জিনিস নীল পানি চিরে সাদা লম্বা দুটো দাগ সৃষ্টি করে ছুটল বন্দরের দিকে।

বিমান থামাল ওমর। ঠেলে পেছনে সরিয়ে দিল কাঁচের ফোল্ডিং ককপিট। হাত তুলে দেখাল, ওই যে, প্যান-আমেরিকান নোঙর করার জায়গা বোধহয় ওটা। পানির ধারে একটা হ্যাঁঙার, তাতে একটা ফ্লাইং-বোট বেঁধে রাখা হয়েছে। নিউ

ইয়র্কে ওরা বলেছিল, জরুরী অবস্থার জন্যে ডিপোতে বাড়তি বিমান রাখে। ওটার পাশেই রাখব।
বসতে গিয়েও বসল না ওমর, ফুট ফুট আওয়াজ তুলে একটা মোটরবোট এগিয়ে আসছে এদিকেই। সরকারী ইউনিফর্ম পরা এক অফিসার দাঁড়িয়ে আছে গলুইয়ের কাছে, পোশাকটা জমকালোই ছিল এককালে, কিন্তু এখন চাকচিক্য হারিয়ে মলিন হয়ে গেছে।
আমাদেরকেই ইঙ্গিত করছে, না? কিশোরও তাকিয়ে আছে বোটটার দিকে।
তাই তো মনে হয়। ...হ্যাঁ, আমাদের কাছেই আসছে। কাগজপত্র চেক করবে বোধহয়। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি কেন?
উভচরের পাশে থামল মোটরবোট, ঢেউয়ে দুলে উঠল বিমান। নাটকীয় ভঙ্গিতে হাত তুলল সরকারী কর্মচারী, চামড়া ঈষৎ বাদামী, উদ্ধত ভাবভঙ্গি, কথার তুবড়ি ছোটাল উভচরের যাত্রীদের উদ্দেশে।
নো কমপ্রেনডো, ভাঙা ভাঙা স্প্যানিশ বলল ওমর।
কি বলছে ব্যাটা? কিশোর বলল। আমাদেরকে যেতে বলছে না তো?
সে-কথার জবাব না দিয়ে নড়বড়ে জেটি দেখিয়ে, ইঙ্গিতে অফিসারের কাছে। জানতে চাইল ওমর, ওদিকেই যেতে বলছে কিনা।
সি, সি, কর্কশ কণ্ঠে বলল অফিসার।
হ্যাঁ, কিশোরের দিকে তাকাল ওমর, ওর সঙ্গেই যেতে বলছে। আশ্চর্য! কিন্তু বলছে যখন, যেতেই হবে। কথা না শুনলে বিপদে ফেলে দেবে। ..এই-ই হয়। বিড়বিড় করল সে। দেশ যত ছোট হয়, লোকগুলো ততই বড় বড় বুলি আউড়ায়-হেন করেঙ্গা, তেন করেঙ্গা। আরে, ব্যাটা, শ্বেতাঙ্গর মত ভাব দেখালেই কি আর শ্বেতাঙ্গ হয়ে গেলি? যত্তোসব।
শ্বেতাঙ্গ নয় ওরা? নিচু কণ্ঠে বলল মুসা।
চামড়া সাদাই, অফিসারের সঙ্গে যাওয়ার জন্যে তৈরি হলো ওমর, বসে পড়ল পাইলটের সীটে, ইঞ্জিন স্টার্ট দিল আবার। সেন্ট্রাল আমেরিকার শহরগুলোতে কোন আইন-কানুন নেই, জোর যার মুলুক তার। স্প্যানিশরা ঢুকিয়েছে এই বিষ। কলোনি করেছিল এখানে, তারপর একদিন শেষ হলো তাদের দিন। কেউ মরল, কেউ চলে গেল দেশে। যারা রয়ে গেল, মিশে যেতে লাগল তাদের গোলামদের সঙ্গে, বিশেষ করে নিগ্রো গোলাম। তারা আবার মিশতে শুরু করল স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে। ফলে এখন কোন রক্তটা যে আসল, বলা মুশকিল। এমন একটা মিশ্র জাতি দুর্নীতিবাজ হবে না তো, কারা হবে?
হাত তুলল কিশোর, ওই যে ডাকছে। চলুন।

থ্রটল টানতেই আগে বাড়ল উভচর, বোটটাকে অনুসরণ করে চলল ওমর। জেটির লাউঞ্জে জটলা করছে কিছু দর্শক, আধডজন রাইফেলধারী পুলিশের পেছনে দাঁড়িয়ে উৎসুক চোখে তাকিয়ে আছে এদিকে।
অবস্থা সুবিধের না, শুকনো কণ্ঠে বলল ওমর, সুইচ টিপে থামিয়ে দিল ইঞ্জিন। দ্রুত আরেকবার তাকাল সশস্ত্র লোকগুলোর দিকে।
জেটিতে নেমে পড়েছে মুসা আর বব, খুঁটির সঙ্গে উভচরকে বাধছে। সেদিকে তাকিয়ে বলল কিশোর, কেন?
পুলিশের ভাবভঙ্গি ভাল ঠেকছে না। সাবধান হয়ে যাও, বিপদের গন্ধ পাচ্ছি। নাক কুঁচকে শুঁকছে সে, যেন সত্যি সত্যি গন্ধ আছে বাতাসে।
এটা মরুভূমি নয়, জনাব, হাসল কিশোর, যে…
…সেজন্যেই তো আরও খারাপ লাগছে। পানি পছন্দ করি না আমি।
কাগজপত্র ঠিক আছে আমাদের, দুশ্চিন্তার কিছু নেই।
আছে। শয়তান লোক জীবনে অনেক দেখেছি, তাদের দেখলেই চিনতে পারি। ব্যাটারা ডাকাতের বংশধর, অপরাধ-প্রবণতা রক্তে মিশে আছে। ওদেরকে বিশ্বাস নেই…চলো, নামি।
জেটিতে নামল কিশোর আর ওমর।
এখানে একজন থাকলে হত না? মুসা বলল। প্লেনটার পাহারায়। নিয়ে পালায় যদি?
আমারও তাই মনে হচ্ছে, বব বলল।
এতখানি সাহস দেখাবে, মনে হয় না, বলল ওমর। আর চাইলেও থাকা যাচ্ছে না। আমাদের সবাইকে যেতে বলছে। হাত নাড়ছে কীভাবে দেখছ? হারামজাদা! বাপদাদা ছিল চোরের বাচ্চা, ব্যাটা অফিসারি ফলাচ্ছে। দাতে দাঁত, চাপল সে।
উষ্ণমণ্ডল। আগুন ঢালছে সূর্য। দরদর করে ঘামতে ঘামতে পুরানো, জীর্ণ সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল ওরা। অযত্নে নষ্ট হওয়া পথ পেরিয়ে একটা টিলার গোড়ায় চলে এল। টিলার গা বেয়ে উঠে গেছে পাথরের সিঁড়ি, মাথায় পাথরে তৈরি একটা পুরানো বাড়ি, বন্দরের দিকে মুখ করা।
সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল অফিসার, পেছনে তাকিয়ে ইশারা করল অভিযাত্রীদের, ওঠার জন্যে।
কোথায় নিয়ে যাচ্ছে আমাদের? বিড়বিড় করল মুসা। আল্লাহ রে! কি যে আছে কপালে…
জেলখানা না তো? আপনমনেই বলল কিশোর।
মারছে রে! চেঁচিয়ে উঠল মুসা। এই, কিশোর, জেলখানা বলছ কেন?
সে-রকমই মনে হচ্ছে আমার, তাই।

আমারও মনে হচ্ছে, ওমর সায় দিল। অনেক বন্দরেই কাস্টমস অফিসে জেলখানা না হোক, অন্তত হাজতখানা থাকে, আর এটা তো দেশই ডাকাতের।
যেখানেই নিয়ে যাক, না গিয়ে উপায় নেই, তাই অফিসারের পিছু পিছু চলল ওরা নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও। মিনিট কয়েক পরেই স্প্যানিশ আমলে খোদাই করা চমৎকার দরজা পেরিয়ে সুন্দর একটা অফিসঘরে ঢুকল। দামী পুরানো ধাঁচের টেবিলের ওপাশে ভারি চেয়ারে বসে আছে ফ্যাকাসে কালো একটা লোক, একটা জিন্দালাশ যেন, দুপাশে দাঁড়িয়ে আছে দুজন সশস্ত্র পুলিশ।
হাত তুলে সালাম জানাল ওমর, ভাঙা স্প্যানিশে শুভেচ্ছা জানাল, বিয়েনো দিয়াজ, সিনর।
শীতল কণ্ঠে শুভেচ্ছা ফিরিয়ে দিল লোকটা, কঙ্কালসার হাত বাড়িয়ে কাগজপত্র চাইল। সাপের মত ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে একে একে দেখছে অভিযাত্রীদের। ওমর কাগজ দিতেই সেগুলো নিয়ে টেবিলে বিছাল, কোন তাড়াহুড়ো নেই। পাসপোর্টের একটা করে পাতা উল্টে দেখছে, এত ধীর, অসহ্য লাগছে কিশোরের। ওমরের দিকে চেয়ে দেখল, চোখ জ্বলছে তার।
ইংরেজি জানেন? রাগ চেপে খুব ভদ্রভাবে লোকটাকে জিজ্ঞেস করল ওমর। শুনলই না যেন লোকটা।
মেজাজ ঠিক রাখাই কঠিন, সঙ্গীদের দিকে চেয়ে নিচুকণ্ঠে বলল ওমর। এই ব্যাটা জ্বালাবে, বলে রাখলাম, দেখো।
খুব ধীরে গড়িয়ে যাচ্ছে সময়। হাই তুলল মুসা। অস্বস্তি প্রকাশ করছে বব হাত-পা নেড়ে। কিশোর আর ওমুর শান্ত রয়েছে। জানে, অস্থির ভাব দেখালে আরও বেশি দেরি করবে লোকটা, তাদেরকে কষ্ট দেয়ার জন্যে।
অবশেষে মুখ তুলে তাকাল লোকটা, তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল কিছু।
কি বলল? জানতে চাইল মুসা।
পুরোপুরি বুঝিনি, বলল ওমর, কাগজে গোলমাল আছে, এ-রকমই কিছু বলল, ডেস্কের কাছে গিয়ে দাঁড়াল সে।
চলল দীর্ঘ কথা কাটাকাটি। ভাঙা স্প্যানিশে থেমে থেমে কয়েকটা শব্দ উচ্চারণ করে ওমর, আর অমনি মেশিনগান ছোটায় জিন্দালাশ। শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে অসহায় ভঙ্গিতে হাত নাড়ল ওমর। সঙ্গীদের দিকে ফিরে বলল, ব্যাটা বলছে, আরেকটা কি কাগজ না কি...ব্যাটার মাথা ছিল, আনতে ভুলে গেছি আমরা!
কি করতে বলছে? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
জিজ্ঞেস করিনি। করছি, আবার লোকটার দিকে ফিরল ওমর।
ওমরকে কিছু বলে, কড়া গলায় কি যেন আদেশ দিল লোকটা। মার্চ করে দরজার দিকে চলে গেল পুলিশ দুজন।

সঙ্গীদের জানাল ওমর, বলছে সব ঠিক হয়ে যাবে, তবে অপেক্ষা করতে হবে আমাদের। এখন এই দুজনের সঙ্গে যেতে হবে। এসো, যাই। কথা না শুনলে আরও খারাপ হবে।
পুলিশদের পিছু পিছু আরও কিছু সিঁড়ি পেরিয়ে সাদা চুনকাম করা একটা ঘরে এসে ঢুকল, আসবাবপত্র বলতে নেই, গোটা চারেক কাঠের কাঠামো যেন শুধু দেয়াল ঘেষে ফেলে রাখা হয়েছে, ওগুলো তক্তপোষ, না চৌপায়া, না চৌকি, যারা বানিয়েছে তারাই বলতে পারবে। চার অভিযাত্রীকে ঘরে রেখে বেরিয়ে গেল দুই পুলিশ, দরজায় তালা আটকানোর শব্দ শোনা গেল।
ভুরু কুঁচকে ওমরের দিকে তাকাল মুসা। কি ব্যাপার?
বুঝতে পারছি না! আস্তে মাথা নাড়ল ওমর। কাগজপত্রে কোন গোলমাল নেই, আমি শিওর। তাহলে আটকাল কেন? নিশ্চয়ই ঘুষ খাওয়ার জন্যে। চেয়ে। ফেললেই পারে। যত তাড়াতাড়ি চায়, ততই আমাদের জন্যে মঙ্গল।
ঘুষ! হাতের আঙুল মুঠো হয়ে গেছে মুসার।
এটা বাড়তি ইনকাম এখানকার লোকের, কিশোর বলল। কিছু করার নেই, চাইলে দিতে হবে, নইলে ছাড়বে না।
হারামির বাচ্চারা! দাঁত দিয়ে জোরে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরল সহকারী গোয়েন্দা। মড়া হারামিটার নাক ভেঙে দিতে পারতাম।
বিষণ্ন হাসি হাসল ওমর। আইন-কানুন ছাড়া, এসব ছোট ছোট রাজ্যের এই-ই রীতি। দুনিয়ায় এমন জায়গা আরও অনেক আছে। ঘুষ চাইলে দিয়ে দেয়া ভাল, নইলে গোলমাল পাকিয়ে এমন অবস্থা করে ফেলবে, শেষে কয়েক গুণ খরচ করেও পার পাওয়া মুশকিল। ওরা সব পারে। এই যে, হাজতে এনে ভরে রাখল, কি করতে পারলাম?।
চুপ করে গেল মুসা। কিশোর চুপচাপ। বব মনমরা, সব দোষ যেন তারই, এমনি ভাব।
ঘরটা যেন একটা চুলো। একটি মাত্র জানালা, সাগরের দিকে, তাতে লোহার মোটা গরাদে। জানালায় দাঁড়ালে বন্দরের অনেকখানি চোখে পড়ে, উভচরটাকে দেখা যায় পরিষ্কার, এই বড় জোর পোয়াটাক মাইল দূরে হবে।
এ দীর্ঘ সময় যেন আর কাটতে চায় না। এক যুগ পর যেন এক ঘণ্টা পেরোল, আরেক ঘণ্টা, আরও এক ঘণ্টা। বনে ঢাকা পাহাড়ের ওপারে অস্ত যেতে শুরু করল লাল টকটকে সূর্য। নতুন বিপদ দেখা দিল, মশা। বিশাল একেক ঝাক। জানালা দিয়ে ঘরে এসে ঢুকছে যেন মশার মেঘ। বিচিত্র গান গেয়ে ঘুরে ঘুরে উড়তে লাগল। মাথার ওপর। যেন বলছে, কি, মিয়ারা, আছ কেমন? দাঁড়াও,

আলোটা খালি যাক, তারপর শুরু করব। এক ফোঁটা রক্ত রাখব না কারও শরীরে।
শুয়ে ছিল মুসা, হঠাৎ লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। আর না! চেঁচিয়ে উঠল, আর সহ্য করব না! যে কেউ বলবে, আমরা চোরাচড় নই, ভদ্রলোক! এই, এসো তোমরা, চেঁচিয়ে লোক জড়ো করি!।
হ্যাঁ, কিছু একটা করা দরকার, ধীরে সুস্থে উঠে দাঁড়াল ওমর, জানালার দিকে এগোল। বন্দরের দিকে চেয়েই চমকে উঠল। আরে, হচ্ছেটা কি!
ছুটে এসে ওমরের আশপাশে দাঁড়াল সবাই। উভচরটাকে ঘেঁকে ধরেছে যেন পুলিশ। ঢুকছে, বেরোচ্ছে। বড় একটা প্যাকেট নিয়ে বেরোল এক পুলিশ। হাত নেড়ে কি সব বলছে।
কাস্টমসের লোক, বলল ওমর, জিনিসপত্র চেক করছে বোধহয়। আমরা নেই, অথচ আমাদের জিনিস চেক করছে। শয়তানের দল! আর চুপ করে থাকব না।
গটমট করে দরজার দিকে এগোল ওমর, কিন্তু সে হাত দেয়ার আগেই ঝটকা দিয়ে খুলে গেল পাল্লা। সেই দুই সরকারী কর্মচারী-একজন যে তাদেরকে আনতে গিয়েছিল বোট নিয়ে, আরেকজন সেই জিন্দালাশটা। পেছনে রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে ছয়জন পুলিশ।
এসবের মানে কি? কড়া গলায় জানতে চাইল ওমর।
জবাব পাওয়া গেল না। ঘরে ঢুকল দুই অফিসার। মুসা ভয়ানক রেগে গেছে। দেখে, তার বাহুতে হাত রাখল একজন। ঝটকা দিয়ে হাত সরিয়ে নিল মুসা।
ওরকম কোরো না! তাড়াতাড়ি বলল ওমর। লাভ হবে না, আরও খারাপ হবে। শান্ত থাকো।
ওমরের সামনে এসে দাঁড়াল জিন্দালাশ। কথার মেশিনগান ছোটাল কয়েক মুহূর্ত, তারপর যেমন শুরু করেছিল, তেমনি হঠাৎ করে থেমে গেল।
কি বলল হারামজাদা! রাগ দমন করতে পারছে না মুসা।
চোর।
চোর!
একটা আমেরিকান প্লেন নাকি চুরি গেছে। আমাদের গতিবিধি সন্দেহজনক! তাই সার্চ করবে।
দোজখে জ্বলবে! হাতের মুঠো খুলছে আর বন্ধ করছে মুসা। এত বড় মিথ্যা! বললেন না, প্যান-আমেরিকানের অফিসে দেখা করতে?
বলেছি।
কি বলল?

ডিপার্টমেন্টাল বস ছুটিতে, ম্যালেরিয়া হয়েছে, তাই পাহাড়ের ধারে কোথায় নাকি হাওয়া বদলাতে গেছে। অফিসের অন্য কেউ কিছু বলতে পারল না।
ঢোক গিলল মুসা। কথা হারিয়েছে।
হুঁ! আস্তে করে বলল কিশোর, আরেকটা মিথ্যে। ষড়যন্ত্র।
বোঝাই যাচ্ছে, মাথা দোলাল ওমর, কিন্তু করার কিছু দেখছি না। সার্চ করতে চাইছে, মানা করতে পারব না। তাহলে সুযোগ পেয়ে যাবে। ওরা খালি ছুতো খুঁজছে এখন। জেলে নিয়ে গিয়ে একবার ভরে দিলে, কমাস আটকে থাকব কে জানে।
বাহ্, চমৎকার জায়গা খুঁজে বের করেছি, মুখ বাঁকাল মুসা, ঘাঁটি করার জন্যে।
ওসব বলে আর লাভ নেই এখন, বলল কিশোর, ওরা যা করতে চায় করুক। বাধা দিতে গেলে উল্টো ফল হবে। সার্চ করে পাবে না কিছু। লুট করে নেয়ার মত নগদ টাকাও নেই সঙ্গে, লেটার অভ ক্রেডিট আর ট্রাভেলারস চেক নিয়ে ভাঙাতে পারবে না।
সার্চ করতে জানে লোকগুলো। অভিযাত্রীদের পকেটে যা যা ছিল সব বের করে নিল, এমনকি ববের বাবার চিঠি, ম্যাপ আর ডাবলুনটাও। সব একটা ব্যাগে ভরে নিয়ে বেরিয়ে গেল, বাইরে থেকে আবার তালা আটকে দিয়ে গেল।
কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। হঠাৎ বলল মুসা, হারামির বাচ্চাগুলোকে জিজ্ঞেস করলেন না, আমাদের প্লেনে কি করছিল?
লাভ কি? শান্তকণ্ঠে বলল ওমর। বড় বেশি রেগে গেছ তুমি, মুসা, মাথা ঠাণ্ডা করো। এমন অবস্থায় উত্তেজিত হয়ে পড়লে বিপদ আরও বাড়বে। ভেব না, এত সহজেই ছেড়ে দেব ব্যাটাদের। আমি বেদুইনের বাচ্চা, এখনও সময় হয়নি কিছু করার।
কিন্তু মোহর আর ম্যাপটাও তো নিয়ে গেল! উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে বব।
গেছে, গেছে, কি আর করা? হাত নাড়ল ওমর।
বাধা দিলেন না?
কি হত? রেখে যেত? সন্দেহ আরও বাড়ত ওদের।
এমনিতে কি সন্দেহ হবে না?
কোন কারণ দেখি না। মোহরটা একটা সাধারণ সুভনির। আর ম্যাপ থাকতেই পারে বিমানে, পাইলটের দরকার পড়ে। আমার ম্যাপই তোমাদের কাছে ছিল, বলতে অসুবিধে কি?
কিন্তু ম্যাপটা একটু অন্য ধরনের, এটা বোঝার বুদ্ধি নিশ্চয়ই ওদের আছে। মোহর আর ম্যাপ মিলিয়ে যদি গুপ্তধন ভেবে বসে?

জানালায় দাঁড়িয়ে বাইরে তাকিয়ে চুপচাপ ভাবছে কিশোর, হঠাৎ ডাকল, এই, এই, দেখে যাও! জলদি!
কী? দুই লাফে কিশোরের পাশে চলে এল মুসা।
এখন বুঝতে পারছি সব! কেমন যেন খুশি খুশি শোনাল কিশোরের কণ্ঠ। দেখো, সরকারী লোকের সঙ্গে কে যাচ্ছে। ওই গরিলা-মুখটাকে চিনতে পারছ?
খাইছে! হ্যামার!
হাসল কিশোর। বুঝতে পারছ তো এখন, কেন কি ঘটছে? দিনের আলোর মত পরিষ্কার।
ব্যাটা তো একটা আস্ত গরিলা, বলল ওমর। কিন্তু এখানে কি করছে?
এখান পর্যন্ত ধাওয়া করবে, ভাবিনি, প্যান্টের পকেটে দুহাত ঢুকিয়ে ঘুরে দাঁড়াল কিশোর। একবারও যদি মনে পড়ত, অন্য ব্যবস্থা করতাম…
কিন্তু ও জানল কি করে, আমরা এখানে আসছি?
মুসা, বব, বলল কিশোর, মনে পড়ে, রাতে আমরা যখন আলোচনা করছিলাম, ম্যাপ দেখছিলাম, দরজার কাছে পায়ের ছাপ ফেলেছিল কেউ? পানি দিয়ে ভিজিয়ে দিয়েছিল ম্যাট? সন্দেহ করেছিলাম না, হ্যামার? ঠিকই তাই। আস্ত একটা গাধা আমি, আরও সাবধান হওয়া উচিত ছিল। সে-রাতের পর লস অ্যাঞ্জেলেসে আর হ্যামারের চেহারা দেখিনি, কেন সন্দেহ করলাম না কিছু? আসলে, ধরেই নিয়েছিলাম, সে মাথামোটা এক খুনে, বুদ্ধিশুদ্ধি আছে ভাবিনি। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আমাদের আলোচনা শুনে জেনে নিয়েছে আমরা কোথায় আসছি। আগেই এসে বসে আছে এখানে। ভজিয়ে রেখেছে সরকারী দোস্তদের। সে নাবিক, এর আগেও এখানে তার আসাটা বিচিত্র কিছু নয়, হয়তো তখন থেকেই জানাশোনা। নাহ্, সব কিছু ওলট-পালট করে দিল মিস্টার গরিলা।
কিন্তু আমার ম্যাপ আর মোহরের কি হবে? প্রায় চেঁচিয়ে উঠল বব। চিঠিটাও তো নিয়ে গেছে।
মোহরটা আর কডলার? নিয়েছে নিক। চিঠি আর ম্যাপ নিয়ে কচুটাও করতে পারবে না।
মানে?
খামটাই শুধু আসল, ভেতরের চিঠি আমার লেখা, যা মনে এসেছে তাই লিখেছি। আসল চিঠিটা মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফারের কাছে, ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চে পাঠিয়ে দেবেন তিনি। চিঠিটার ওপর হ্যামারের চোখ পড়েছিল, তাই সাবধান হয়েছি।
কিন্তু ম্যাপ?
হ্যাঁ, ওটা দিয়ে অনেক কাজ করতে পারবে হ্যামার, মুচকি হাসল কিশোর।
চুলো থেকে আগুন নিয়ে সিগারেট ধরাতে পারবে…

কি বলছ?
বললাম না, খামটাই শুধু আসল। ভুল ম্যাপ, ম্যাপ না থাকার চেয়েও খারাপ। নতুন করে চিঠি লিখতে পেরেছি, আর একটা ম্যাপ আঁকতে পারব না? নিজেকে খুব চালাক ভেবেছে হ্যামার, খুশিতে নিশ্চয়ই লাফাচ্ছে এখন। লাফাঁক যত খুশি।
হাহ হাহ করে হাসল ওমর। নাহ, তুমি একখান জিনিস, কিশোর পাশা। এখন বুঝতে পারছি, ডেভিস ক্রিস্টোফারের মত লোকও তোমাকে এতটা পাত্তা দেয় কেন!
লজ্জা পেল কিশোর। চুপ করে রইল।
তাহলে? মুসা বলল। এখন কি করছি আমরা? বুঝলামই তো, ঘুষের জন্যে আটকায়নি।
চুপ করে থাকব, বলল কিশোর। দেখি না, কি করে।
কী! এখানে? সারারাত?
ওরা রাখলে থাকতেই হবে, শান্ত কিশোরের কণ্ঠ। প্রায়ই অবাক হয় মুসা, সাংঘাতিক বিপদের সময়েও উত্তেজিত হয় না গোয়েন্দাপ্রধান, এত শান্ত রাখে কি করে নিজেকে? হ্যামারের যা দরকার, পেয়েছে, ওগুলো নিয়ে ও এখান থেকে চলে গেলেই হয়তো আমাদের ছেড়ে দেয়া হবে।
সূর্য অস্ত গেছে। সবুজ জঙ্গলের ওপর আকাশের গাঢ় নীলিমা বেগুনী হতে শুরু করেছে, মাঝে মাঝে লাল ছোপ, শিগগিরই কালো হয়ে যাবে সব রঙ।
রাত নামল, হঠাৎ করেই বড় বেশি নীরব হয়ে গেল চারদিক, উষ্ণমণ্ডলের গভীর নীরবতা। অভিযাত্রীদের ওপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল মশার পাল। খিদেয় পেট জ্বলছে, গরম, তার ওপর এই মশার মাঝে কি করে যে রাতটা কাটবে, কে জানে।
জানালা দিয়ে ঘরে এসে ঢুকল ভোরের নরম আলো। শব্দটা কানে যেতেই তড়াক করে উঠে বসল ওমর। আরে! কি ব্যাপার! তার চিৎকারে অন্যদেরও ঘুম ভেঙে গেল।
স্তব্ধ বাতাসে কাঁপন তুলেছে বিমানের ইঞ্জিন।
প্যান-আমেরিকানের বিমানটা, হাই তুলতে তুলতে বলল মুসা, চলে যাচ্ছে হয়তো।
লাফ দিয়ে উঠে জানালার কাছে ছুটে গেল ওমর। আমাদেরটা! অন্যেরাও ছুটে এল জানালার কাছে। পোতাশ্রয়ের মুখের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে
সিকোররাও ছুটে এলজার কাছে ছুটে গেল ও
কি করছে? বিড়বিড় করল।
প্যান-আমেরিকানের কেউ সরিয়ে নিচ্ছে, বলল মুসা। জাহাজ-টাহাজ ঢুকবে। হয়তো, জায়গা করে দিচ্ছে।

আমার মনে হয় না, মাথা নাড়ল ওমর। জাহাজ ঢোকার অনেক জায়গা আছে। দেখছ না, খোলা সাগরের দিকে যাচ্ছে? ঝাঁপটা দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল সে, এগোল দরজার দিকে।

এই সময় খুলে গেল পাল্লা, একজন পুলিশের হাতে খাবারের ট্রে। তাতে একটা জগ, কয়েকটা কাপ-পিরিচ, একটা পাউরুটি আর কিছু ফল। পেছনে রয়েছে। আরও দুজন।

সামনের লোকটার পাশ কাটিয়ে অন্য দুজনকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে ছুটে গেল ওমর। একেক লাফে দুটো-তিনটে করে সিঁড়ি টপকে নেমে এল পথে, এক ছুটে পথ পেরিয়ে একেবারে পানির ধারে। বিমানটা তখন অনেক দূরে, পোতাশ্রয়ে ঢোকার মুখের বাইরে। থমকে দাঁড়াল সে, বোবা হয়ে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইল সেদিকে, তার পেছনে এসে দাঁড়াল কিশোর, মুসা আর বব।

খানিকক্ষণ গুম হয়ে থেকে ঘুরে তাকাল ওমর প্যান-আমেরিকান হ্যাঁঙারের দিকে, সাদা পোশাক পরা কয়েকজন লোক চেয়ে রয়েছে উভচরটার দিকে। তাদের দিকে দৌড়ে গেল সে।

প্লেনটা কে নিল, জানেন? হাত তুলে উভচরটাকে দেখিয়ে বলল ওমর।

নিশ্চয়ই, বলল হাসিমুখ এক তরুণ, প্যান-আমেরিকানের এক মেকানিক-বুকের কাছে এমব্রয়ডারি করা প্রতীক চিহ্ন আর লেখা দেখেই সেটা বোঝা গেল। আপনারা এনেছিলেন, না?

হ্যাঁ!

ওকে তাই বলছিলাম, পাশের সহকর্মীকে দেখিয়ে বলল তরুণ। গতকাল নামতে দেখেছি আপনাদের, তীরে উঠতে দেখেছি। এখানে তেল না ভরে খাড়ির ধারের ডিপো থেকে নিলেন কেন?

ভুরু কুঁচকে গেল ওমরের। খাঁড়ির ধারে! তেল নিতে! কখন গেলাম?

কাল রাতে। কয়েকজন লোক গিয়ে ওখানকার ডিপো থেকে তেল আনল, ওই বিমানটার কথা বলে।

নিঃশ্বাস ভারি হয়ে এল ওমরের। আমাদের সব কাগজপত্র নিয়ে গেছে পুলিশ, চোর সন্দেহে আটকে রেখেছে সারারাত, তিক্ত কণ্ঠে বলল সে। তার মানে প্লেনটা জালিয়াতি করে নিয়ে গেল আমাদের কাছ থেকে।

অ্যাঁ! আস্তে মাথা কেঁকাল তরুণ মেকানিক। হ্যাঁ, তাই তো মনে হচ্ছে। ফাঁদে ফেলেছিল আপনাদের।

শব্দ করে হাসল তার সহকর্মী, কিন্তু হাসিতে প্রাণ নেই। ওই খট্টাসগুলো! ওরা পারে কি! …চিপিতে ফেলেছে বুঝি?

ভালমতই, বলল ওমর। জিনিসপত্র লুটপাট করবে, এটা ধরেই রেখেছিলাম, কিন্তু বিমান নিয়ে ভাগবে…। কারা নিল?
হ্যামারকে দেখলাম, গরিলাটা…।
কিন্তু সে তো প্লেন চালাতে জানে না…
তার দোস্ত নাকি জানে। গত হপ্তায় এসেছিল হ্যামার, সিডনি নামে একজনকে সঙ্গে নিয়ে। একটা প্লেন চাইছিল।
জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট ভেজাল ওমর। আর কি কি করেছে?
শহরে কি করেছে না করেছে, জানি না। তবে আমার বসকে বলছিল, তাদের একটা প্লেন দরকার, খুব জরুরী। ভাড়া বাকি রাখতে চেয়েছে, বস রাজি হয়নি। …শহরে অবশ্য বার দুই অ্যালেন কিনির সঙ্গে দেখেছি ওকে।
কিনি?
পুলিশের চীফ। এটা সরকারী টাইটেল। আসলে ও এখানকার গ্যাঙ লীডার, ডাকাতদের চীফ।
মড়াটা না তো?
ভাল নাম দিয়েছেন। হ্যাঁ, মড়াটাই। ওর কাছ থেকে দূরে থাকবেন, সাহেব, বিপদে পড়বেন নইলে, বলে দিলাম। খুব খারাপ লোক।
সেটা বুঝেছি, মাথা কাত করল ওমর। আমাদের প্লেনে কজন ঢুকেছে, দেখেছেন?
না, আমি দেখিনি, মাথা নাড়ল তরুণ। সহকর্মীর দিকে চাইল, সে-ও মাথা নাড়ল।
আমি দেখেছি, এগিয়ে এল আরেক মেকানিক। চারজন। হ্যামার, তার মাতাল দোস্ত সিডনি, ইমেট চাব, আর ম্যাবরি।
ইমেট চাব! ঠোঁট ছড়াল ওমর। ম্যাবরি! এ কেমন নাম?
যেমন নামের বাহার, তেমনি লোক। হারামির একশেষ। ইমেট চাব এসেছে। নিউ ইয়র্ক থেকে-পুলিশ খুন করে পুলিশের তাড়া খেয়ে পালিয়ে এসেছে। এখানে এসে শাস্তি তো দূরে থাক, উল্টো পুলিশের সহযোগিতা পাচ্ছে, আছে রাজার হালে। পানির ধারে একটা হোটেল চালায়, যতরকম বেআইনী ব্যবসা করে। সঙ্গে পিস্তল রাখে সব সময়। ওর সামনে দাঁড়াতে চাইলে মেশিনগান নিয়ে যেতে হবে আপনাকে।
আর ম্যাবরি?
ম্যাবরি ভেনাবল। নিগ্রো, ওর মত শয়তান লোক খুব কমই আছে। অ্যালেন কিনির পোষা কসাই, যত রকম কুকাজ আছে, সব করে। দুই পকেটে দুটো ক্ষুর থাকে সব সময়। আমার এক দোস্ত ব্যক্তিগতভাবে চেনে ম্যাবরিকে, সে বলেছে, ক্ষুর দিয়ে মানুষ জবাই করে নাকি দারুণ আনন্দ পায় নিগ্রোটা। এখানে সব্বাই

ভয় করে ম্যাবরিকে। ও আপনার বিমানে উঠেছে, তার মানে এসবের পেছনে অ্যালেন কিনির হাত রয়েছে।
চমৎকার একটা গ্রুপ, কঠিন শোনাল ওমরের কণ্ঠ।
এর চেয়ে চমৎকার আর এদিকে টর্চ নিয়ে খুঁজলেও পাবেন না, নাক কুঁচকাল মেকানিক।
দ্রুত ভাবছে ওমর। চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পাচ্ছে, টিলা বেয়ে নেমে আসছে কয়েকজন সশস্ত্র পুলিশ। আপনার বস্ কোথায়? মেকানিককে জিজ্ঞেস করল সে।
ওই তো, আসছে, ওমরের পেছনে দেখিয়ে বলল মেকানিক। এখানকার অফিস-সুপার, নাম হোস বার্গ। বোঝাতে পারলে তার কাছে সাহায্য পাবেন।
ঘুরে দাঁড়াল ওমর। হাসিখুশি একজন লোক এগিয়ে আসছে, চওড়া কাঁধ, গায়ে ধবধবে সাদা হাওয়াইয়ান শার্ট, পরনে সাদা প্যান্ট, পেশীবহুল শরীর। কাছে এসে দাঁড়াল সুপারিনটেনডেন্ট।
গুড মর্নিং, হাত বাড়িয়ে দিল ওমর। এই মাত্র আমার প্লেন চুরি গেল।
তাই নাকি? হাসল হোস বার্গ। এইমাত্র দেখলাম গেল। আপনাকে এখানে দেখে ভাবছিলাম, ব্যাপার কি। বুঝলাম এখন।
পালিয়ে যাবে কোথায়? …আপনার এখানে ওয়্যারলেস আছে?
আছে।
গুড, এগিয়ে আসা পুলিশদের দিকে চেয়ে দ্রুত বলল ওমর, আসছে! শুনুন, আমার নাম ওমর শরীফ। নিউ ইয়র্কে আপনাদের হেড অফিসে চেক করতে পারেন ইচ্ছে করলে। যে বিমানটা নিয়ে গেল, আপনাদেরই, নিশ্চয়ই জানেন। গত হপ্তায় ভাড়া নিয়েছিলাম। আরেকটা প্লেন এখন দরকার আমাদের। ওই প্লেনটা দেখা যায়? ভাড়া? বিক্রিও করতে পারেন।
ওমরের চোখে চোখে তাকাল.বার্গ। এটা কি করে দিই, ধীরে ধীরে বলল সে। একটাই আছে, রিজার্ভ রেখেছি, জরুরী কাজের জন্যে।
আমার কাজটাও খুব জরুরী। কাছাকাছি আরেকটা বেস কোথায় আপনাদের?
ম্যারাবিনা।
তারমানে খবর পাঠালে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আরেকটা প্লেন আনিয়ে নিতে পারবেন। এটা দিয়ে দিন আমাকে।
নিউ ইয়র্ক যদি বলে।
তাহলে এখুনি যান, প্লীজ, খবর নিন। আমার কাগজপত্র সব কিনির কাছে, আনতে যাচ্ছি। যদি প্লেনটা আমাকে দেন, তো পেট্রোল ট্যাংক ভরে দেবেন। খুব তাড়াতাড়ি।

দেখি, কি করা যায়।
আর, চব্বিশ ঘণ্টা খাইনি, কিছু খাবার যদি…
হাত তুলল সুপারিনটেনডেন্ট, ওসব হবে। যান, এসে পড়েছে। সাবধানে থাকবেন!
থ্যাংকস, বলে ঘুরল ওমর। এসে গেছে পুলিশেরা। তাদের সঙ্গে সেই অফিসার, যে মোটরবোটে করে এসেছিল নিতে।
সঙ্গে যেতে ইশারা করল লোকটা। দ্বিতীয়বার বলার আর দরকার হলো না, পা বাড়াল ওমর, কঠিন হয়ে উঠেছে চোয়াল। তার সঙ্গে তিন কিশোর।
অভিযাত্রীদেরকে আবার নিয়ে আসা হলো অ্যালেন কিনির অফিসে। মুখ তুলে তাকাল লোকটা।
শোনো, কর্কশ কণ্ঠে বলল ওমর, রাগে স্প্যানিশ বলতে ভুলে গেছে, ইংরেজি বলছে, অনেক জ্বালিয়েছ, অনেক সয়েছি, আর না! কি মনে করেছ? এদেশে আমি একা? বন্ধুবান্ধব আমারও আছে এখানে, তারা ইতিমধ্যেই ওয়্যারলেস করে দিয়েছে। নিউ ইয়র্কে, প্যান-আমেরিকান হেড অফিসে। ওখানকার পুলিশের কানেও যাবে কথাটা। সবার সঙ্গেই শয়তানী? জিনিসপত্রগুলো কোথায়, জলদি বের করো।
ইংরেজি বুঝল কিনা কিনি, বোঝা গেল না, হয়তো ওমরের ভাবভঙ্গিতেই অনুমান করে নিয়েছে, হাত তুলে দেখিয়ে দিল টেবিলের এক ধারে জড়ো করে রাখা জিনিস, যা যা বের করে এনেছে চারজনের পকেট থেকে, সব। নাটকীয় ভঙ্গিতে কঙ্কালসার হাত নেড়ে শান্ত কণ্ঠে কিছু বলল স্প্যানিশে।
কি বলল শয়তানের বাচ্চা? জানতে চাইল মুসা।
যা বলবে ভেবেছি-মাফ চাইছে। আমাদের দেরি করিয়ে দেয়ার জন্যে। লজ্জিত। হারামজাদা!
প্লেনটা চুরি করল কেন জিজ্ঞেস করেছেন?
কি লাভ? বললে কি ফেরত আনবে? কি হয়েছে ভালমতই জানে সে, আমরা। জানি এটাও জানে, ওকে বলে কি হবে? চলো, বেরিয়ে যাই। হোস বার্গ বিমানটা দিলে চলে যেতে পারব। ম্যারাবিনাকে আর ঘাঁটি বানানো যাবে না। তাতে কি?
ইংরেজি বুঝল শয়তানী? জিনিসঅফিসে। ওখানখই ওয়্যারলে
দরকার পড়লে বারমুডায় চলে যাব, যত দূরেই হোক।
কথা বলতে বলতেই টেবিল থেকে জিনিসগুলো তুলে নিয়ে যার যার হাতে দিল ওমর। কারও কিছু বাদ পড়েছে?
আমার মোহর, বব বলল। মড়াটা রেখে দিয়েছে।
সোনার টুকরো হাতে পেয়েছে, লোভ সামলাতে পারবে ওর মত লোক? বলল ওমর। ম্যাপ, চিঠি আর মোহর বাদে সবই পেয়েছি। …দাঁড়াও, পকেট থেকে

মানিব্যাগ বের করে দেখল সে, না, নেই। খুচরো টাকা বাদে যা ছিল, সব রেখে দিয়েছে। তোমাদের?
আপনারটা নিয়েছে, আমাদেরগুলো কি আর রাখবে? বলল কিশোর। দেখার দরকার নেই, চলুন, জলদি বেরোই। যা পেয়েছি, এতেই চলবে। ছেড়ে যে দিচ্ছে, এই বেশি।
রওনা হওয়ার জন্যে ঘুরল ওমর, তার বাহু চেপে ধরে ফেরাল বব। ওই যে, মোহরটা! ওই যে, মোহরটা! ওই যে, ম্যাগনিফাইং গ্লাসের তলায়।
দেখতে পেল ওমর। ওরা আসার আগে বোধহয় মোহরটা পরীক্ষা করেছিল কিনি, সাড়া পেয়েই তাড়াতাড়ি লুকিয়ে ফেলেছে গ্লাসের তলায়। মনে করেছে, দেখতে পাবে না কেউ।
ধৈর্য হারাল ওমর, চোরটাকে এত সহজে ছেড়ে দেবে না। কিছুটা শিক্ষা অন্তত দেয়া দরকার। হাত বাড়িয়ে তুলে নিতে গেল মোহর, বাধা দিলেই কষে চড় লাগিয়ে দেবে।
লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল কিনি। সাপের মত ছোবল হানল যেন তার হাত, ওমরের আগেই তুলে নিল মোহরটা।
চোরের বাচ্চা চোর! গাল দিয়ে উঠল ওমর। মুঠো হয়ে গেছে হাত, টেবিলের ওপর দিয়ে পিছলে গিয়ে কিনিকে ধরার ইচ্ছে।
ওমরের উদ্দেশ্য বুঝতে পারল কিশোর, চেঁচিয়ে উঠল, না না! সরে যান!
থমকে গেল ওমর, কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে চেয়ে দেখল, রাইফেল তুলছে। এক পুলিশ।
চোখের পলকে সরে গেল ওমর। বদ্ধ ঘরে রাইফেলের আওয়াজই কামানের শব্দের মত মনে হলো।
করডাইটের গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে বাতাসে, প্রচণ্ড শব্দের রেশ মিলিয়ে যেতেই বড় বেশি নীরব মনে হলো, শুধু দূর থেকে ভেসে আসছে তীরে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের শব্দ। কিন্তু এসব খেয়াল করছে না ঘরের কেউ, বোবা হয়ে চেয়ে আছে। কিনির দিকে।
স্থির হয়ে আছে কিনি, মোহর ধরা মুঠোবদ্ধ হাত দিয়ে বুক চেপে ধরেছে, শার্টের ওখানটায় রক্তে লাল হয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। পুরো দুই সেকেণ্ড একইভাবে দাঁড়িয়ে রইল সে, তারপর ধুড়ম করে পড়ল টেবিলের ওপর, কেঁপে উঠল ঘর। হাত থেকে ছুটে গেছে মোহরটা। সোনালি একটা ধনুক সৃষ্টি করে উড়ে যাচ্ছিল, মাঝ পথেই ধরে ফেলেছে ওমর। পরক্ষণেই দৌড় দিল দরজার দিকে। জলদি এসো! আমাদের দোষ দেবে ওরা।

বেরিয়ে গেল ওমর। তার পেছনে মুসা, তাকে আটকানোর চেষ্টা করল সেই অফিসার। কিন্তু ব্যায়ামবীরের বেমক্কা এক ঘুসি পেটে লাগতেই ভঁক করে বাঁকা হয়ে গেল সামনের দিকে। পাশ থেকে ধাক্কা দিয়ে তাকে একজন পুলিশের গায়ে ফেলেই বেরিয়ে এল মুসা। তার ঠিক পেছনেই কিশোর আর বব।
সিঁড়ি দিয়ে লাফিয়ে নামছে ওমর, চেঁচিয়ে বলল, জলদি নামো, পেছনে তাকাবে না! :
যেন উড়ে নেমে এল চারজনে, পথে নেমেই দৌড় দিল হ্যাঁঙারের দিকে। কড়া রোদ, ভয়ানক গরম। রাস্তায় লোকজন তেমন নেই, এক-আধজন ভবঘুরে আছে, তারা পথরোধ করার চেষ্টা করল, কিন্তু থামাতে কি আর পারে? ওমর আর মুসার, ধাক্কা খেয়ে চিত হয়ে পড়ল পথের ওপর।
পেছনে চেঁচামেচি শোনা যাচ্ছে পুলিশের, কিন্তু দেখার জন্যে একবারও পেছনে ফিরল না অভিযাত্রীরা।
দেখো! সামনের দিকে হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠল ওমর।
দেখল ওরা। রোদে চকচকে একটা চক্র তৈরি করে ঘুরতে শুরু করেছে ফ্লাইং বোটের প্রপেলার, ওদেরকে আসতে দেখেই যেন জ্যান্ত হয়ে উঠেছে। ইঞ্জিন চেক করছে নাকি?
হাঁপাতে হাঁপাতে এসে পৌঁছল ওরা। খুশিতে দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। সুপারিনটেনডেন্টের। কী!
কিনি গুলি খেয়েছে! জোরে জোরে দম নিচ্ছে ওমর।
মরেছে! বড় বেশি বেড়ে গিয়েছিল, আপনি না মারলে আমিই একদিন মেরে বসতাম…
…আমি মারিনি! প্লেন রেডি?
হ্যাঁ! হেড অফিস বলল, হাজার দশেক দিলেই কিনে নিতে পারেন। কিংবা দৈনিক আড়াইশো ডলার, ভাড়া। পাঁচ হাজার ডিপোজিট রাখতে হবে তাহলে।
বার্গের কথা শেষ হওয়ার আগেই চেকবুক আর কলম বের করে ফেলল। কিশোর, দ্রুত লিখে চলল, এত দ্রুত জীবনে আর লেখেনি। ফড়াত করে এক টানে একটা পাতা ছিঁড়ে গুঁজে দিল সুপারের হাতে।
চেকটা এক নজর দেখেই বলল বার্গ, ওকে! যান।
বার্গ কথা শেষ করার আগেই দৌড় দিল ওমর, তার পেছনে মুসা আর বব। সবার পেছনে কিশোর।
একে একে উঠে পড়ল তিন কিশোর।
ককপিট থেকে নামল চীফ মেকানিক। তাকে জিজ্ঞেস করল ওমর, কত মাইল চলবে তেলে?

এক হাজার…
আর শোনার দরকার মনে করল না ওমর, উঠে পড়ল ককপিটে। সে সীটে বসতে না বসতেই গুলির শব্দ হলো, বিমানের গা ভেদ করে তার চুল ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল একটা বুলেট। ঝট করে মাথা নিচু করে ফেলল সে, মুখে ফুটেছে অদ্ভুত হাসি। থ্রটল টানল, গর্জন বেড়ে গেল ইঞ্জিনের। নির্দেশ পেয়ে নাক ঘুরে গেল বিমানের, পানি কেটে দুভাগ করে সাদা ফেনা তুলে ছুটল।
ঝটকা দিয়ে স্টিকটা সামনে ঠেলে দিল ওমর। তীক্ষ্ণ ছ-ট-টা-ক আওয়াজ তুলে পানির আকর্ষণ কাটাল বিমানের নৌকার মত তলা, শূন্যে উঠে পড়ল।
হউফ! করে চেপে রাখা শ্বাসটা ছাড়ল ওমর, হেলান দিল সীটে। বাচলাম!
এখানে আসাটাই ভুল হয়ে গেছে, বলল পাশে বসা কিশোর।
যাকগে, যা হওয়ার হয়েছে। শিক্ষা তো হলো!
নতুন বিমানটা শুধু পানিতে নামতে পারে, আণ্ডারক্যারেজ লাগানো নেই, ডাঙায় নামতে পারবে না উভচরটার মত। ওটার চেয়ে বড়ও, আট সীট। ভাড়াটে যাত্রী বহনের জন্যে তৈরি হয়েছে, ফলে ককপিট আর যাত্রীদের কেবিন আলাদা করে ফেলা হয়েছে মাঝখানে হালকা দেয়াল দিয়ে। ছোট একটা দরজা আছে, পাল্লার ওপর দিকে কাঁচ লাগানো, ওখান দিয়ে ককপিট দেখা যায়, ইচ্ছে করলে দরজা খুলে যাত্রীরা যোগাযোগ করতে পারে পাইলটের সঙ্গে। খুব পুরানো ডিজাইন, এমনিতে এই জিনিস কিছুতেই নিত না ওমর। কিন্তু এখন এটাই যে পেয়েছে, ভাগ্য নেহায়েত ভাল বলতে হবে, নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল।
দ্বীপটা কোথায় হতে পারে, আন্দাজ করে কোর্স ঠিক করল ওমর, প্লেনের নাক ঘোরাল সেদিকে। কিশোরের দিকে ফিরল। হাল ধরতে পারবে?
মাথা কাত করল কিশোর। দেখিয়ে দিলে পারব।
পারবে। সহজ। উভচরটা দেখা যায় কিনা, চোখ রেখো। হ্যামার খুব ভালমতই চেনে দ্বীপটা, উভচরটাকে কোন দ্বীপের কাছে দেখলে বুঝতে হবে…
।..ওই দ্বীপটাই খুঁজছি।
তারপর?
নেমে পড়ব।
ওরা দেখে ফেললে?
যাতে না দেখে সেভাবেই থাকতে হবে। দশ মাইল লম্বা, তারমানে দ্বীপটা খুব ছোট না। ওরা যেদিকে নামবে, তার উল্টোদিকে বা অন্য কোনদিকে অন্য কোথাও নামব আমরা। সঙ্গে রাইফেল বন্দুক কিছু নেই, খালি হাতে চার চারটে খুনে ডাকাতের সঙ্গে লাগতে গেলে মরব। …আগে থেকে ভেবে লাভ নেই, যখন যা হয়, দেখা যাবে।

আকাশে থাকতেই যদি আমাদের দেখে ফেলে? বিড়বিড় করল কিশোর, নিজেকেই প্রশ্ন করল যেন।
দেখলে কি হবে? প্যান-আমেরিকানের ছাপ্পড় মারা ফ্লাইং-বোট অনেক আছে, আমরাই এসেছি জানছে কিভাবে?
তা-ও কথা ঠিক। আমাকে প্লেন চালাতে হবে কেন...আপনি কোথায়। যাচ্ছেন?
আরে! খেতে-টেতে হবে না? নাড়ীভুড়ি সুদ্ধ হজম হয়ে গেল...যাও, তুমি খেয়ে এসো। তারপর আমি যাব।
আপনিই যান, প্লেন চালানোর কথায় উত্তেজিত হয়ে উঠেছে কিশোর। শুকনো কিছু থাকলে পাঠিয়ে দেবেন এখানেই।
কিশোরের দিকে চেয়ে মনে মনে হাসল ওমর। এসো, এখানে এসে বসো, পাইলটের সীট ছেড়ে দিল সে।
কিভাবে হাল ধরতে হবে কিশোরকে দেখিয়ে দিল ওমর। বলল, বলো, তো, গতিবেগ কত? কত ওপর দিয়ে যাচ্ছি?
মিটার দেখে বলল কিশোর, একশো চল্লিশ মাইল।...আট হাজার ফুট।
হ্যাঁ। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই দ্বীপটা চোখে পড়ার কথা। বড় বেশি স্লো, নাক কুঁচকাল ওমর। এসব গরুর গাড়ি চালিয়ে মজা নেই। ...ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি। যেভাবে বললাম, ধরে থাকো, অন্য কিছু নাড়াচাড়া করবে না। অসুবিধে দেখলেই ডাক দেবোম, ধরে থাকো, অন্যলয়ে মজা নেই। ঠিকড় বেশি স্লো, নাক
আচ্ছা, সামনের দিকে চেয়ে বলল কিশোর, পুরোদস্তুর পাইলটের ঢঙে।
মুচকি হেসে, দরজা খুলে কেবিনে এসে ঢুকল ওমর। তাকে দেখে হাসল বব।
ভুরু কুঁচকে গেল মুসার। আপনি! প্লেন...
কিশোর চালাচ্ছে, হাসছে ওমর।
কি-শো... লাফ দিয়ে উঠল মুসা।
কাঁধ চেপে তাকে বসিয়ে দিল ওমর। একবারে খাবার নিয়ে যাও ওর জন্যে।
এত তাড়াহুড়োর মাঝেও অনেক করেছে হোঁস বার্গ, তার প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করল ওমর। বেশ বড়সড় একটা পাউরুটি, আধসেরখানেক পনির, স্লাইস করে ভাজা গরুর মাংস, আর এক কাঁদি কলা রাখা আছে দুই সারি সীটের মাঝখানে। সাংঘাতিক কিছু নয়, কিন্তু তাদের যা অবস্থা, এ-ই রাজার ভোজ এখন।
গোটা দুই কলা, বসতে বসতে বলল ওমর, দিয়ে এসো কিশোরকে। ছোট পকেট-ছুরি বের করে এক টুকরো পনির কেটে নিয়ে কামড় বসাল, সেই সঙ্গে হাত বাড়িয়ে রুটি ছিঁড়ে নিল বড় এক টুকরো। খাও...তুমিও খাও, ববকে বলল।
কিশোর প্লেন চালাচ্ছে, এমন একটা আশ্চর্য খবর শুনে এক মুহূর্ত দেরি করল না মুসা, এক টানে কলা ছিঁড়ে নিয়ে প্রায় ছুটে চলে গেল।

মোহরটা বাঁচাতে পেরেছেন, বলল বব, সেজন্যে ধন্যবাদ।
ওহ, ভুলেই গিয়েছিলাম, পকেটে হাত ঢোকাল ওমর। এই যে, নাও, বলে মোহরটা বের করে বাড়িয়ে ধরল।
নিতে গেল বব। ঠিক এই সময় অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটল। সাঁ করে কোনাকুনি অনেকখানি উঠে গেল বিমান, যেন ঊর্ধ্বমুখী বায়ুস্রোতের টানে, তারপরই পাথরের মত সোজা পড়ল নিচে, প্রায় দুশো ফুট নেমে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেল, এগিয়ে চলল আবার।
সীট থেকে শূন্যে উঠে পড়ল ওমরের শরীর, ধপ করে পড়ল আবার সীটে, হাতের রুটি আলগাভাবে ধরা ছিল, ছুটে উড়ে চলে গেল একদিকে। ববেরও একই অবস্থা। ফিরে আসছিল মুসা, ছিটকে গিয়ে বাড়ি খেল দেয়ালে, মেঝেতে গড়াগড়ি খেল, অবশেষে হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে বসল কোনমতে, হাঁটুভাঙা দ-এর অবস্থা।
খাইছে! …আল্লাহ রে, হলো কি?
পেট চেপে ধরেছে বব। সব্বোনাশ! জোরে জোরে শ্বাস নিল সে। মনে। হলো, নাড়ীভুড়ি বেরিয়ে যাচ্ছে। …ওরকম আরেকবার হলেই গেছি…
উঠে পড়েছে ওমর। ছুটে গেল ককপিটের দরজার কাছে। ভেতরে উঁকি দিয়ে জিজ্ঞেস করল, কি হলো?
বিমূঢ় ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল কিশোর, জানি না।
যন্ত্রপাতি কোনটা নাড়াচাড়া করেছ?
কিচ্ছু না। খালি একটা কলা ছুলতে যাচ্ছিলাম…অমনি…
মেঘের ভেতরে ঢুকেছিল?
মেঘ কোথায়? চিহ্নই নেই। আমি তো ভাবছিলাম, কিছু একটা করেছেন কেবিনে, তাতে কোনভাবে কন্ট্রোল অ্যাফেক্ট করেছে।
না খাচ্ছিলাম, আর ববের মোহরটা দিতে যাচ্ছিলাম…
…কী! ঝট করে ফিরে তাকাল কিশোর।
আরে, ওই ডাবলুনটা। মনে হচ্ছে, সত্যিই জিনের আসর আছে ওটাতে।
জিনের আসর?
এসব তো বিশ্বাস করি না। কিন্তু তোমাদের মুখেই তো মোহরটার গল্প শুনলাম। যখন যার কাছে যাচ্ছে, তারই ক্ষতি করে বসছে।
আমি এখনও বিশ্বাস করি না।
আমিও না। কিন্তু যা যা ঘটেছে, সব খতিয়ে দেখো না। প্রথমে, জলদস্যুর জাহাজটার কথাই ধরো। ববের বাবার চিঠি পড়ে বোঝা যায়, কোন একটা দুর্ঘটনা ঘটেছিল ওটায়। ওটার ক্যাপ্টেন মরেছে রহস্যজনকভাবে। তার সামনে টেবিলে ছিল এই মোহর। কিম এটা হাতে তুলে নিতে না নিতে মরল হ্যামারের ছুরি

খেয়ে। ববের বাবা মরল। তারপর দেখো, যে নাবিককে দিয়ে চিঠি আর মোহর পাঠিয়েছিল, সেই নাবিক যে জাহাজে উঠেছিল, তার কি অবস্থা হলো। বার বার দুর্ঘটনায় পড়ল। হ্যামার ওটা ধরেই আছাড় খেল বোরিসের হাতে। বব ওটা পকেটে নিয়ে হোটেল থেকে বেরোতে না বেরোতেই পড়তে যাচ্ছিল ট্রাকের তলায়। তারপর চড়লে তোমরা ট্যাক্সিতে। ড্রাইভার উল্টোপাল্টা ব্যবহার শুরু করল, গুতো লাগিয়ে দিল আরেক গাড়ির সঙ্গে। অ্যালেন কিনি মরল গুলি খেয়ে। …তারপর, প্লেনটা হঠাৎ এমন করে উঠল। থামল ওমর। চুপ করে রইল এক মুহূর্ত। তারপর বলল, কেমন। রহস্যময় না? দেখো, কুসংস্কার নেই আমার। কিন্তু এতগুলো ঘটনার কি ব্যাখ্যা? একটা ব্যাপার বোধহয় অস্বীকার করবে না, দুর্ভাগ্য বলে একটা কথা আছে, কোন কোন জিনিসে যেন লেপ্টে থাকে সেই দুর্ভাগ্য, মোহরটার ব্যাপারও হয়তো তাই। আবার চুপ করল সে। আচ্ছা, ববকে বলি না, মোহরটা ফেলে দিক। কত আর দাম? এমন একটা অলক্ষুণে জিনিস রেখে কি হবে? অযথা ঝুঁকি…আমি খেয়ে আসি। আবার কেবিনে ফিরে এল ওমর।

টেবিলের ওপর কলার খোসার তূপ বানিয়ে ফেলেছে বব আর মুসা।

কি হয়েছিল? ওমরকে জিজ্ঞেস করল মুসা। উল্টোপাল্টা টিপ মেরেছে, নাকি? …

উহ্, কোমর ভেঙে দিয়েছে আমার! আরেকটা কলা ছিঁড়ে নিল সে।

কিশোর কিছুই করেনি। আগের সীটটায় বসে পড়ল ওমর, আরেক টুকরো রুটি ছিঁড়ে নিল।

কিশোর কিছু করেনি। কলার খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে হাত থেমে গেল মুসার। তাহলে?

বুঝতে পারছি না। বোধহয়…

…ডাঙা! ডাঙা দেখা যাচ্ছে! ককপিট থেকে কিশোরের চিৎকার শোনা গেল।

ওমর ভাই, জলদি আসুন।

দেখে এসো তো, মুসাকে বলল ওমর। খাওয়া ছেড়ে আবার উঠতে রাজি না।

দেখে এল মুসা। চিবাতে চিবাতে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল ওমর।

ডাঙা কিনা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, বলল মুসা। দিগন্তের কাছে কি যেন। ঝড় হতে পারে।

হাতের রুটি আর পনির দ্রুত শেষ করল ওমর, ছোট হয়ে আসা কাঁদি থেকে একটা কলা ছিঁড়ে নিয়ে উঠল। ককপিটে ফিরে জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপার?

উইন্ডশীল্ডের ভেতর দিয়ে দূরে তাকিয়ে আছে কিশোর। গম্ভীর। ওটা কি?

এগিয়ে এল ওমর, তীক্ষ্ণ চোখে দেখল দূরের জিনিসটা, কলাটা পকেটে রেখে দিয়ে বলল, বুঝতে পারছি না। কিন্তু লক্ষণ বিশেষ ভাল মনে হচ্ছে না। ঝড়ের এলাকা…যখন-তখন হারিকেন আঘাত হানে। সে এক ভয়ংকর ব্যাপার…যাও,

ওঠো, জলদি কিছু মুখে দিয়ে নাও। সবাইকে তৈরি থাকতে বলো। ঝড়ই আসছে বোধহয়। কিশোরের খালি করে দেয়া পাইলট সীটে বসে পড়ল সে। দিগন্তে দৃষ্টি স্থির।

মাইল বিশেক দূরে চকচকে ইস্পাত-রঙা সমতল সাগর, সেটা থেকে ধীরে ধীরে গজিয়ে উঠছে যেন সপ্তমীর চাঁদ-আকারের দ্বীপটা, মাঝখান থেকে চোখা হয়ে উঠে গেছে পাহাড়-চূড়া। ওটার আশপাশে আরও কয়েকটা দ্বীপ, রহস্যময় নীল মহাশূন্যে যেন ভেসে রয়েছে। তারও পরে গাঢ় নীল একটা বেগুনী মেঘলা যেন দিগন্ত ঢেকে দিচ্ছে দ্রুত, খুব দ্রুত, যেন একটা অদৃশ্য হাত প্রকাণ্ড এক নীল চাদর নামিয়ে দিচ্ছে মস্ত এক গম্বুজের ওপর থেকে।

ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বসেছে ওমরের। ঝড়ই, সন্দেহ নেই আর। কি করবে এখন? আরও ওপরে উঠে ঝড়ের ওপর দিয়ে বেরিয়ে চলে যাবে, নাকি ঝড় আঘাত হানার আগেই দ্বীপে নামার চেষ্টা করবে? ঝড়টা কত উঁচু, অনুমান করা কঠিন, তার চেয়ে দ্বীপে নেমে নিরাপদ কোন জায়গায় আশ্রয় নেয়ার চেষ্টা করাই ভাল। সিদ্ধান্ত নিয়ে আর দেরি করল না, থ্রটল খুলে দিল পুরোপুরি, জয়স্টিকটা সামনে ঠেলে দিলে যতখানি যায়, ইঞ্জিনের শক্তি নিংড়ে গতিবেগ যা আছে সব বের করে নিতে চায়।

দরজায় দেখা দিল কিশোর। কি হয়েছে?

ভয়ানক বিপদ আসছে, বিড়বিড় করল ওমর। ঝড়কে ছাড়িয়ে যেতে পারব না, পেট্রল যা আছে, কুলোবে বলে মনে হয় না। এসে পড়ার আগেই দ্বীপে নামতে হবে। ঝড় যেদিক থেকে আসছে, দ্বীপে তার উল্টোদিকে কোন একটা খাড়ি-টাড়ি পেয়ে গেলে সুবিধে।

উদ্বিগ্ন দেখাল কিশোরকে। মুখ থমথমে। এগিয়ে আসা ঝড়ের দিকে চেয়ে রয়েছে। এমন দৃশ্য জীবনে দেখিনি। ভয়ংকর।

গতি একশো মাইলের কম না, ওমরের গলা কাঁপছে। পালকের মত উড়িয়ে নিয়ে যাবে প্লেন। মুসা আর ববকে মেঝেয় শুয়ে পড়তে বলো।

দ্বীপে পৌঁছতে পারব?

আশা করছি।

হাজার ফুট ওপর দিয়ে উড়ে চলেছে এখন প্লেন। ইচ্ছে করেই নামিয়ে এনেছে ওমর, সুবিধে হবে ভাবছে। গর্জন শুরু হয়েছে সাগরের, ঘুম ভেঙে জেগে উঠছে যেন বিশাল দৈত্য।

ঢেউ তো নেই, ব্যাপার কি?

উঠবে, বলল ওমর, পাহাড়ের সমান একেকটা। তার আগেই দ্বীপে...

আরে, আরে! গায়ে এসে পড়বে নাকি! হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল কিশোর।

বিমানের নাক সামান্য সরিয়ে দিল ওমর। বড় একটা অ্যালবেট্রস উড়ে আসছে দ্রুত, ছড়ানো ডানা, থিরথির করে কাঁপছে পালক, বাঘের তাড়া খেয়ে ছুটে পালাচ্ছে। যেন হরিণশিশু।

অবাক কাণ্ড তো! ভুরু কুঁচকে গেছে কিশোরের। প্লেনটা দেখতে পাচ্ছে না নাকি?

বিমানের নাক আরেকটু সরাল ওমর। কিন্তু জেদ ধরেছে যেন পাখিটা, ধাক্কা লাগবেই। ওটাও ঘুরে গেল খানিকটা, বাতাসের ধাক্কা সামলাতে না পেরে ঝটকা দিয়ে ওপরে উঠে গেল আরও, সাঁ করে ছুটে এল। চেষ্টা করেও বাঁচাতে পারল না ওমর। দুহাতে মুখ ঢাকল কিশোর। ঝট করে মাথা নুইয়ে ফেলল, যেন তার গায়েই এসে পড়বে পাখিটা।

কড়মড়-মড়াৎ করে বিচিত্র শব্দ হলো। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই থেমে গেল ইঞ্জিনের আওয়াজ।

ফ্যাকাসে মুখ তুলে চাইল কিশোর। হায় হায়! বাঁয়ের প্রপেলারটা গেছে!

জবাব দিল না ওমর, হাত দিয়ে মুখের রক্ত মুছছে।

উঠে দাঁড়িয়ে কাত হয়ে ভালমত দেখল কিশোর, বায়ের প্রপেলারের পাখাগুলো নেই, শুধু দণ্ডটা দেখা যাচ্ছে, নগ্ন। বাঁ পাশের উইণ্ডস্ক্রীন ভেঙে চুরচুর, গর্তটায় ঠেসে আটকে রয়েছে রক্তাক্ত পালকের একটা বোঝ। ইস! শুকনো ঠোঁট জিভ দিয়ে ভেজাল সে।

আবার প্রাণ ফিরে পেল ইঞ্জিন।

এক ইঞ্জিনে চলবে? খসখসে হয়ে গেছে কিশোরের গলা।

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না ওমর। উত্তেজনার মুহূর্তে দুটো ইঞ্জিনই বন্ধ করে দিয়েছিল, একটা চালু হয়েছে। উদ্বিগ্ন চোখে সে তাকিয়ে রয়েছে দ্বীপটার দিকে। কালো একটা চাদর দ্রুত এগিয়ে আসছে, উঠে আসছে মাথার ওপর, তার ওপাশে ঢাকা পড়ে গেছে সূর্য। সাগর যেন চকচকে একটা আয়না। হয়তো।

কাঁপন উঠল হঠাৎ সাগরে, সাদা পানির কণা ছিটিয়ে স্যাৎ করে তীব্র গতিতে ছুটে গেল বাতাস পানি ছুঁয়ে, ভীষণভাবে দুলে উঠল বিমান। এসে গেছে! শক্ত হাতে জয়স্টিক চেপে ধরল ওমর।...দ্বীপের অবস্থা দেখেছ?

সেদিকেই চেয়ে রয়েছে কিশোর, হাঁ হয়ে গেছে মুখ। বাতাসের প্রচণ্ড ঝাঁপটায় একবার এদিক, একবার ওদিকে কাত হচ্ছে দ্বীপের গাছপালা, অজানা এক দানব যেন যন্ত্রণায় দোমড়াচ্ছে-মোচড়াচ্ছে শরীর। নারকেল আর অন্যান্য গাছের ডাল পাতা ছিঁড়ে পাক খেতে খেতে উঠে যাচ্ছে ওপরে।

জয়স্টিকটাকে ঠেলে ধরে রেখেছে ওমর, চোখ অস্থির, নামার জায়গা খুঁজছে। দ্বীপের ধার ঘেঁষে থাকা প্রবালপ্রাচীর ডুবে গেছে এখন রাশি রাশি সাদা ফেনার তলায়।

বিমানের ওপর আঘাত হানল হারিকেন।
আহত মুরগীর মত কেঁপে উঠল ফ্লাইং-বোট, সাই করে ঘুরে গেল আধপাক, আবার ওটার নাক ঘোরাল ওমর অনেক পরিশ্রম করে, পরক্ষণেই ডাইভ দিল বিমান। নিয়ে। প্রায় খাড়া হয়ে নামতে শুরু করল বিমান। কাঁপছে, দুলছে, দোমড়াচ্ছে জীবন্ত প্রাণীর মত, এগিয়ে যাচ্ছে দ্বীপের ছোট্ট ল্যাগুনের দিকে। মিটারের কাঁটা শো করছে একশো-চল্লিশ, অথচ যে হারে এগোচ্ছে, গতিবেগ তিরিশ-চল্লিশের বেশি না, তারমানে বাতাসের গতি একশোর ওপরে। ভয়ংকর গতিবেগ। এর সঙ্গে লড়াই করে একটু একটু করে এগিয়ে যাচ্ছে ফ্লাইং-বোট প্রবালপ্রাচীরের দিকে, প্রাচীর চোখে পড়ছে না, তার জায়গায় ফুঁসছে সাদা পানি, ফেনা ছিটাচ্ছে ফোয়ারার মত।
পারব… বলেই থেমে গেল কিশোর, তার অসমাপ্ত কথার জবাব দিতেই যেন হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে গেল বাকি ইঞ্জিনটাও।
চোয়াল কঠিন হয়ে গেছে ওমরের, দাঁতে দাঁত চেপে দুহাতে জয়স্টিকটা ঠেলে ধরে রেখেছে। ল্যাণ্ড করবে কি করে, ভাবছে। সাগরের যা অবস্থা পাঁচ মিনিটও টিকবে না। ডাঙায় নামবে।
সাঁতরাতে হবে, ঝড়ের শব্দ ছাপিয়ে বলল ওমর। ল্যাণ্ড করাতে পারব না। যেখানেই তো থাক, গুঁড়ো হয়ে যাবে, ভেতরে থাকলে মরব। লাফ দিতে হবে তার আগেই। ওদের রেডি হতে বলোগে।
প্লেনটা বাঁচানো যাচ্ছে না…
…আরে, দূর, প্লেন! জান বাঁচানোর চেষ্টা এখন। যাও, জলদি যাও।
কিশোরকে বলল বটে, কিন্তু সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে ওমর, শেষ মুহূর্তের আগে সে লাফ দেবে না। একটা উঁচু জায়গা এখন লক্ষ্য তার, ওখানটাতে উঠছে না ঢেউ। কিন্তু ওখানে কি পৌঁছতে পারবে? মনে হয় না! একশো ফুট ওপরে রয়েছে। প্লেন, প্রতি এক গজ এগোতে গিয়ে এক গজ করে নামছে, এ-হারে…নাহ্, অসম্ভব! কিন্তু হাল ছাড়ল না সে।
সবাই এসে ঢুকল ককপিটে, গা ঘেঁষাঘেঁষি করে। সাঁতরানোর জন্য তৈরি। চেঁচিয়ে আদেশ দিল ওমর। রেডি!
রেডি। একসঙ্গে জবাব দিল তিন কিশোর।
বব, যাও!
দ্বিধা করছে বব। পানি ছুঁই ছুঁই করছে বিমান। আর কয়েক গজ এগোতে পারলেই পৌঁছে যাবে জায়গা মত।
জলদি! আবার চেঁচিয়ে উঠল ওমর। ডানা ধরে ঝুলে পড়ো! কুইক!।

ওমরের উদ্দেশ্য বুঝতে পারল বব। বা দিকের দরজা খুলে নেমে এল ডানার ওপর, হাত-পা কাঁপছে। ঠিক এই সময় প্রচণ্ড বাতাস এসে ঝাঁপটা মারল বিমানের গায়ে, সাঁই করে ঘুরে গেল বিমানটা, দুলে উঠল ভীষণভাবে। পিছিয়ে এল অনেকখানি। দরজার ধার থেকে হাত ছুটে গেল ববের, ডানা আঁকড়ে ধরে থাকার ব্যর্থ চেষ্টা করল, পারল না, পিছলে চলে এল ডগার কাছে। আবার আঘাত হানল বাতাস, আবার ঝাঁকিয়ে দিল বিমানকে।

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত বাতাসে ঝুলে রইল যেন বব, আবছাভাবে দেখছে, তীব্র গতিতে তার দিকে যেন উঠে আসছে ফেনামেশানো পানির ঘূর্ণিপাক, পরক্ষণেই গাঢ় নীল এক নতুন পৃথিবী গিলে নিল তাকে। অজানা এক ভয়াবহ দানব যেন টেনে নামিয়ে নিয়ে চলল, শ্বাসরুদ্ধ করে মেরে ফেলতে চায়।

গাঢ় নীল রঙ হালকা হতে শুরু করল, তার মাঝে ঝিলমিল করছে সাদা আলোর ফুটকি। বুঝতে পারছে বব, ডুবে মরতে যাচ্ছে সে। বাতাসের জন্যে আকুলি-বিকুলি করছে ফুসফুস, ফেটে যেতে চাইছে। ভেসে উঠুক বা না উঠুক, আর শ্বাস না টেনে পারবে না সে, দম নেয়ার জন্যে হাঁ করল। ঠিক ওই মুহূর্তে নীল রঙ হঠাৎ সরে গিয়ে চোখের সামনে ভেসে উঠল দিনের আলো, বড় বড় টানে বুক ভরে টেনে নিল সে ভেজা বাতাস। কোথায় আছে বোঝার আগে, সাঁতরানোর কথা ভাবার আগেই নিচ থেকে আবার টান মারল তাকে অজানা দানবটা, আবার ডুবে গেল সে গাঢ় নীল জগতে। হাত-পা ছুঁড়তে শুরু করল সে, কিন্তু কোন লাভ হলো না। শক্তি ফুরিয়ে আসছে। লড়াই করার চেয়ে গা ঢেলে দেয়া অনেক সহজ, অনেক আরামদায়ক হবে, মনে হচ্ছে তার কাছে। আবার নিচ থেকে ঠেলতে শুরু করল। দানবটা।

আবার বাতাসে ভেসে উঠল ববের মাথা। দম নিল জোরে জোরে। ঘাড় ফিরিয়ে আশপাশে তাকাল, কঠিন কিছু একটা খুঁজছে, আঁকড়ে ধরার জন্যে। ফেনার মাঝে একটা নারকেলের ডাল চোখে পড়ল। প্রাণপণে হাত-পা ছুঁড়ে এগোতে গেল ওটার দিকে, কিন্তু তিন হাত যেতে না যেতে আবার টান মারল তাকে অদৃশ্য দানবটা। আবার ফিরে এল সেই নীল দুনিয়ায়। বজ্রের গর্জনের মত ভারি একটানা। শব্দ কানে বাজছে। অসহ্য হয়ে উঠছে শব্দটা, আর সইতে পারছে না, ঠিক এই সময় হাতে লাগল কঠিন কিছু, খামচে ধরতে গেল, কিন্তু ধরে রাখতে পারল না। তারপর হঠাৎ করেই দূর হয়ে গেল নীল রঙ, শব্দও চলে গেছে, তীরে উপুড় হয়ে পড়ে আছে সে, ঢেউয়ের টানে হড়হড় করে নেমে যাচ্ছে আলগা বালি আর নুড়ি, সেই সঙ্গে সে-ও নামছে পিছলে। থাবা মেরে একটা পাথর ধরে আটকে থাকতে চাইল। হাপাচ্ছে। পলকের জন্যে ফিরে তাকাল একবার, আঁতকে উঠল। আরেকটা আসছে! মাথায় সাদাটে সবুজ ফেনার মুকুট পরে ভীমবেগে ধেয়ে

আসছে ঢেউয়ের আরেকটা পাহাড়। দুর্বল পায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল, কোনমতে, ইস্, কোনভাবে যদি উঠে যাওয়া যেত আরেকটু ওপরে!
জানে পারবে না, তবুও চেষ্টার ত্রুটি করল না বব। কয়েক হাজার অজগরের মত ফুঁসতে ফুঁসতে আসছে ঢেউটা। এল, চলে গেল তার ওপর দিয়ে। উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে বালি আর পাথর খামচে ধরে আটকে থাকতে চাইল সে। প্রচণ্ড শব্দে কানে তালা লেগে যাওয়ার জোগাড়। এক ঝটকায় তার হাত ছুটিয়ে নিল দানবটা, টেনে নিয়ে চলল।
আবার নীল জগতে প্রবেশ করল সে। দ্রুত গাঢ় হচ্ছে রঙ, বেগুনী হয়ে গেল। দেখতে দেখতে, কালচে, কালো, তার মাঝে নানা রঙের ফুটকি! কানে বাজছে হাজারো ঢাক আর মন্দিরার শব্দ, অসীম অতলে নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাকে অদৃশ্য দানব।
অনেক ওপরের প্লেন থেকে ঝাঁপ দিয়েছে যেন বব, পড়ছে তো পড়ছেই, এই পতনের যেন আর শেষ নেই। অনুভূতিটা খুব খারাপ না, বরং কেমন একটা আরাম! কিন্তু এই নামা শেষ হচ্ছে না কেন? আর পারছে না সে। যা খুশি হয়ে যাক, ঘটে যাক যা ঘটার, আর সে তোয়াক্কা করে না।
নীরবতার জগতে নেমে এল সে, শব্দ নেই এখানে। তলার মাটি রকেট গতিতে উঠে আসছে তার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্যে। প্রচণ্ড ধাক্কা খেল বব। চোখের সামনের জ্বলে উঠল যেন রক্তলাল আগুন, বোম ফাটল বুঝি!
ববকে ফেনার নিচে হারিয়ে যেতে দেখল ওমর, কিন্তু সাহায্যই করতে পারল না। বিমান সামলাতেই হিমশিম খাচ্ছে। ভাবছে, বব তাদের দুএক মিনিট আগে গেল, এই যা, ওদেরও একই পরিণতি ঘটবে। পানিতে ডুবে মরবে ববেরই মত। ছাই হয়ে গেছে ওমরের চেহারা। কিশোরের দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে বলল, লাফ দাও! বলেই সামনের পাথুরে চূড়াটাতে নামার জন্যে ডাইভ দিল বিমান নিয়ে।
পৌঁছতে পারল না অল্পের জন্যে। চূড়ার কয়েক গজ আগে পড়ে গেল বিমান, পানিতে। কিন্তু পানিতে পড়ার ধাক্কা যতটা লাগল, ডাঙায় পড়লেও বোধহয় তার চেয়ে বেশি লাগত না। গোড়া থেকে ছিঁড়ে খসে এল ডানা, নাকটা বাকাচোরা হয়ে গেল এমনভাবে, যেন জুতো দিয়ে মাড়িয়ে দেয়া হয়েছে ডিমের খোসা।
কিশোরের আগে লাফ দিল মুসা। পড়ল একটা পাথরের ওপর, কিন্তু থাকতে পারল না, পিচ্ছিল শেওলায় ঢাকা পাথর, পিছলে নেমে এল সে পানিতে, পরক্ষণেই ঢেউ ধাক্কা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলল তাকে আবার পাথরের ওপর।
কিশোর লাফ দিল মুসার পর পরই, পাথরটার কাছাকাছি পড়ল, ঢেউ তাকেও ছুঁড়ে দিল। কিভাবে জানি মুসার একটা বাড়ানো হাত ধরে ফেলল, সে, বলতে পারবে না। পাথরে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে আঁকড়ে ধরে থাকার চেষ্টা করছে মুসা,

অন্য হাত দিয়ে পেঁচিয়ে ধরল কিশোরের হাত। বড় জোর এক কি দুই সেকেন্ডেই ঘটে গেল এতগুলো ঘটনা।

ককপিট থেকে বেরিয়ে দরজার কাছে পৌঁছতে পারল না ওমর, তার আগে ঢেউ টেনে বিশ গজ দূরে নিয়ে এল বিমানটাকে। ঢেউয়ের পর ঢেউ ভাঙছে, পানির প্রচণ্ড তা-থৈ নাচের মাঝে পড়ে সাংঘাতিকভাবে নাকানি-চোবানি খাচ্ছে বিমান, এখন বেরোলে নির্ঘাত মৃত্যু। কি করবে? বেশি ভাবনা-চিন্তার সময় নেই। একটানে জামাকাপড় খুলে ফেলে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে চৌকাঠের ওপরের অংশ খামচে ধরল। সুযোগ এলেই, মানে, বিমানটা আবার তীরের কাছাকাছি গেলেই দেবে লাফ।

কিন্তু ওমরের দুর্ভাগ্য, গেল না বিমান। যেন তাকে নিয়ে খেলা করার জন্যেই হঠাৎ থেমে গেল ঝড়, ঢেউ যে একবার এগোচ্ছিল একবার পিছাচ্ছিল, সেটা অনেক কমে এল। বাতাসের গতি এখনও অনেক, কিন্তু ঢেউয়ের উথাল-পাথাল অবস্থা কমে যাচ্ছে, পানি নেমে যাচ্ছে দ্রুত, সেই সঙ্গে টেনে নামিয়ে তীর থেকে সরিয়ে নিচ্ছে বিমানটাকে, দূর থেকে দূরে। অসহায় চোখে চেয়ে চেয়ে দেখছে ওমর, কিছুই করার নেই, নেমে যাচ্ছে বিমান হড়হড় করে, গিয়ে পড়বে নেমে আসা পানিকে যেখানে ভীমবেগে আঘাত হানছে ধেয়ে আসা ঢেউ, সেখানে। চোখের পলকে গুঁড়িয়ে যাবে বিমান ওখানে গিয়ে পড়লে।

নিরাপদেই আছে এখন কিশোর আর মুসা, পাথরটার ধারে দাঁড়িয়ে দেখছে ফ্লাইং-বোট আর সেই সঙ্গে ওমরের পরিণতি। ধরেই নিয়েছে ওরা, বাঁচতে পারবে না বিমান, ঢেউ যেভাবে ওটাকে নিয়ে লোফালুফি করছে, আর কয় মিনিট টিকবে কে জানে। ভেতরে নিশ্চয়ই পানি ঢুকেছে, কারণ ডুবতে শুরু করেছে ইতিমধ্যেই। দ্রুত সরে যাচ্ছে দূরে।

পাথরের ওপাশ থেকে বেরিয়ে অনুসরণ করে চলল দুজনে, কিন্তু একটা জায়গায় এসে, আর দেখা গেল না বিমানটাকে। পাহাড়ের ওপাশে চলে গেছে, চোখের আড়ালে এখন। পাশে সরে, পিছিয়ে, অনেকভাবে দেখার চেষ্টা করল ওরা। চকিতের জন্যে আরেকবার দেখা গেল বিমানটা, একটুখানি সরে এসেই ঝটকা দিয়ে চলে গেল আড়ালে, ওইটুকু সময়ের মাঝেই দেখা গেল ওমরকে, অসহায় ভঙ্গিতে দরজার ধার আকড়ে ধরে রয়েছে।

কি-কিছু একটা করা দরকার! চেঁচিয়ে উঠল মুসা। একেবারে খালি গা, কোমরে ইলাস্টিক লাগানো খাটো পাজামা শুধু পরনে। ছোট করে ছাঁটা কোঁকড়া চুল লেপটে রয়েছে মাথার সঙ্গে, যেন খুলিতে আঠা দিয়ে লাগিয়ে দিয়েছে কেউ। কাঁধের কাছে কেটে গেছে, বোধহয় চোখা পাথরে খোঁচা লেগে, পানির সঙ্গে রক্ত মিশে হালকা লাল ধারায় গড়িয়ে নামছে গা বেয়ে।

ডান পা সামান্য বাঁকা করে রেখেছে কিশোর, ব্যথা, কিন্তু মানসিক অবস্থা এমন, কেন ব্যথা করছে দেখার কথাও ভাবছে না। টেনে নিয়ে যাচ্ছে ওকে স্রোত… গলা কাঁপছে তার, চলো তো, দেখি, দেখা যায় কিনা…
কিভাবে… বলল মুসা, কোন পথই নেই।…ববেরও যে কি হলো…
বোধহয় নেই। কিছুই করতে পারলাম না ওর জন্যে। …এসো, দেখি, ওমর। ভাইয়ের কি হলো…
কিন্তু কিভাবে…
ওগুলো পেরোতে হবে, আঙুল তুলে ডানে দেখাল কিশোর।
ওই জঙ্গল? ভুরু কুঁচকে তাকাল মুসা পাহাড়ের গায়ে জঙ্গলের দিকে। প্রায় খাড়া ঢাল, ঘন হয়ে জন্মেছে গাছপালা, মাথা নুইয়ে যেন ঝুলে রয়েছে। ধার দিয়ে ঘুরে যাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না, জঙ্গলের ভেতর দিয়েও যাওয়া যাবে না।
যেতেই হবে, দৃঢ়কণ্ঠে বলল গোয়েন্দাপ্রধান।
কিনার দিয়ে ঘুরে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল ওরা প্রথমে, পারল না। খাড়া পিচ্ছিল পাড়, নিচে পানি। শেষে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যাওয়াই স্থির করল। বৃষ্টিতে ভিজে সাংঘাতিক পিচ্ছিল হয়ে আছে মাটি, তার ওপর খাড়া ঢাল। বারবার আছাড় খেল, বেরিয়ে থাকা শেকড়ের চোখা মাথা, কাঁটালতা আর ধারালো নুড়িতে পা কাটল কয়েক জায়গায়, কিন্তু এতই উত্তেজিত হয়ে রয়েছে, ব্যথা টেরই পেল না। লিয়ানা লতায় বারবার জড়িয়ে যাচ্ছে পা, বার দুই হোঁচট খেয়ে পড়ল কিশোর, হাত ধরে তাকে টেনে তুলল মুসা।
বলেছে বটে পারবে না, কিন্তু কিশোরের আগে মুসাই চূড়ায় উঠল। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে সাগর। রক্তশূন্য হয়ে গেল তার মুখ সহসা, হাত তুলে বলে উঠল, দেখো দেখো! কণ্ঠ খসখসে, হাত কাঁপছে থরথর করে।
কিশোরও দেখল। কিছু বলার নেই। কি বলবে? মর্মান্তিক দৃশ্য! প্রায় মাইলখানেক দূরে ঢেউয়ে এখনও দুলছে ফ্লাইং-বোটের ধ্বংসাবশেষ, পিঠটা একবার ডুবছে, একবার ভাসছে। ওমরকে দেখা যাচ্ছে না কোথাও।
কয়েক মিনিট নীরবে একইভাবে দাঁড়িয়ে রইল ওরা, চেয়ে রয়েছে ভাঙা বিমানের দিকে। দীর্ঘশ্বাস ফেলল কিশোর।
নিচের ঠোঁটে দাঁত বসিয়ে দিল মুসা। বিড়বিড় করল, গেল… ধপ করে ওখানেই বসে পড়ে দুহাতে মাথা চেপে ধরল।
আরও দুতিন মিনিট নীরব রইল দুজনে। আশা ছাড়তে পারছে না কিশোর, চেয়ে রয়েছে ঢেউয়ের দিকে, সাদা ফেনার দিকে, তীক্ষ্ণ চোখে আতিপাতি করে খুঁজছে ঢেউয়ের প্রতিটি ভাঁজ, ভাঙন, খাঁজ। নাহ, দাঁড়িয়ে থেকে আর লাভ নেই, বিষণ্ণ কণ্ঠে বলল সে, চলো, খুঁজে দেখি ববকে পাওয়া যায় কিনা।

কোনদিকে যাব?
চলো, এদিকে, এক দিক দেখিয়ে বলল কিশোর। পেছনে গিয়ে আর লাভ কি? ওদিক থেকে তো এলামই।
জঙ্গলের ভেতর দিয়ে নামতে শুরু করল ওরা। পথ নেই, ঘন জঙ্গল, বেশি অসুবিধে করছে লিয়ানা লতা। খালি জড়িয়ে যায়, গায়ে, পায়ে। ওসব সরিয়ে পথ করে নামতে হচ্ছে, কোনদিকে যাচ্ছে, খেয়াল রাখতে পারছে না, কেয়ারও করছে না। বিশেষ, নির্দিষ্ট কোন লক্ষ্য নেই। একদিকে বেরোলেই হলো। যেদিকেই যাক আগে-পরে সৈকতে বেরোতে পারবেই।
বালিতে ঢাকা সৈকতে বেরোল ওরা। প্রায় একই সঙ্গে চোখে পড়ল দুটো জিনিস। একটা সিঁড়ি, হতভাগ্য ফ্লাইং-বোটের ছোট্ট সিঁড়ি। বালিতে পানির ধার ঘেঁষে পড়ে আছে। আরেকটা জিনিস পানি আর বালির মিলনস্থলে, ঢেউয়ের ধাক্কায় ধীরে ধীরে দুলছে। দ্রুত এগোল ওরা ওই দ্বিতীয় জিনিসটার দিকে।
ববের জ্যাকেট, বলল কিশোর।
বলার দরকার ছিল না, মুসাও চিনতে পেরেছে। পানিতে ভিজে ফুলে রয়েছে পোশাকটা, ঢেউই কোনভাবে এনে ফেলেছে তীরের কাছে। নিচু হয়ে জ্যাকেটটা তুলল মুসা, চেয়ে রইল একদৃষ্টিতে, এটা নিয়ে কি করবে যেন বুঝতে পারছে না। ফেলে দিতে মন চাইছে না। হাতে ঝুলিয়ে উঠে এল কয়েক পা। হঠাৎ ওটার পকেট থেকে টুপ করে কিছু একটা পড়ল সাদা বালিতে। সোনার মোহর, ডাবলুন।
জিনিসটা কুড়িয়ে নিল মুসা, তালুতে নিয়ে চেয়ে রইল বিমূঢ়ের মত। অভিশপ্ত, ভারি গলায় বলল, যেখানে যার হাতে যাচ্ছে, তারই সর্বনাশ করে ছাড়ছে।
চুপ করে রইল কিশোর।
এই অভিশাপ আর সঙ্গে নয়, তীক্ষ্ণ হয়ে গেছে মুসার কণ্ঠ, হাত ঘুরিয়ে সাগরে ছুঁড়ে ফেলতে গিয়েই থমকে গেল। একটা শব্দ, রাইফেলের গুলির মত।
আরে! শব্দটা যেদিক থেকে এসেছে সেদিকে তাকাল কিশোর। সৈকতের শেষ মাথা দেখা যাচ্ছে না, আওয়াজটা ওদিক থেকে এসেছে বলেই মনে হলো।
ওমর ভাই হতে পারে না, আনমনে বিড়বিড় করল কিশোর, রাইফেল নেই তার কাছে। বব তো নয়ই। তাহলে? নিশ্চয়ই জনবসতি আছে দ্বীপে, গ্রাম বা ছোটখাটো শহর আছে...দোকানপাটও নিশ্চয়ই আছে, ঝট করে মুসার দিকে ফিরল সে। ফেলো না, হাত নাড়ল, মোহরটা ফেলো না। কাজে লাগবে। বিক্রি করে খাবার কিনতে পারব। কাপড়ও দরকার। চলো, দেখি।
দ্রুত এগোল ওরা। কিশোরের কষ্ট হচ্ছে, ডান পায়ের গোড়ালি ফুলে উঠেছে, মচকে গেছে বোঝাই যায়। একটা ডাল দিয়ে লাঠির মত বানিয়ে নিয়েছে সে, ওটাতে ভর দিয়ে হাঁটছে খুঁড়িয়ে।

যা ভেবেছিল, তার চেয়ে দূরে সৈকতের শেষ মাথা। দুমাইল তো হবেই, আধ ঘণ্টা লেগে গেল ওখানে পৌঁছুতে। অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে তখন।
খুব ধীরে মোড় নিয়েছে এখানে পাহাড়ের ঢাল, গায়ের পাথরের স্তূপ ঢালু দেয়াল তৈরি করে রেখেছে যেন। পাহাড়ের গায়ে বিছিয়ে রয়েছে শুধু পাথর আর পাথর, কোন এক সময় বুঝি এখানে ঢল নেমেছিল পাথরের, নেমে গেছে একেবারে পানিতে। চূড়ার কাছে পাথরের মাঝে যেন হঠাৎ করে গজিয়েছে একগুচ্ছ নারকেল গাছ।
ওখানে উঠতে পারলে দেখা যাবে কে গুলি করেছে, হাত তুলে নারকেলের কুঞ্জটা দেখিয়ে বলল কিশোর, যদি ও থেকে থাকে এখনও।
আলগা পাথরও রয়েছে অনেক, নাড়া লাগলেই সড়সড় করে গড়িয়ে নামে, সঙ্গে করে নিয়ে যায় আরও কিছু আলগা সঙ্গী-সাথীকে। পা পিছলে ওগুলোর সঙ্গে পড়লে কোমর ভাঙার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে, নিদেন পক্ষে হাত-পা কিছু না কিছু তো ভাঙবেই।
অনেক কষ্টে অবশেষে নিরাপদেই উঠে এল ওরা চূড়ায়। নারকেলের গুচ্ছের ভেতর ঢুকে ফাঁক দিয়ে তাকাল। স্থির হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। যেন অকস্মাৎ শেকড় গজিয়ে গেছে ওদের পায়ে।

ভলিউম ২ – জলদস্যুর দ্বীপ ২ – রকিব হাসান – তিন গোয়েন্দা – কিশোর থ্রিলার
প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৭
ছোট্ট একটা ল্যাগুন, প্রবেশমুখের কাছে আড়াআড়িভাবে বাঁধের মত গড়ে উঠেছে প্রবাল প্রাচীর, ঢেউ আটকাচ্ছে। ল্যাগুনে ভাসছে ছোট একটা বিমান। এক নজর দেখেই বুঝল কিশোর ও মুসা, ওটা ওদের উভচর, ম্যারাবিনা থেকে যেটা ছিনতাই হয়েছে। মস্ত এক জলচর পাখির মত ভাসছে ওটা পানিতে, দোল খাচ্ছে ছোট ছোট ঢেউয়ে। ওটা থেকে তিরিশ কি চল্লিশ গজ দূরে তীরে পড়ে রয়েছে রবারের ডিঙিটা।
দ্রুত একবার ল্যাগুনের পাড়ের জঙ্গলের দিকে চোখ বুলিয়ে নিল কিশোর, লোকগুলোকে দেখা যায় কিনা দেখছে। নেই। আশ্চর্য! গেল কোথায়? মুসার দিকে ফিরে বলল, কি বুঝলে?
বিগ হ্যামার আর তার দল।
হ্যাঁ। কিন্তু সেকথা বলছি না…
তাহলে?
বুঝলে না? নিচু গলায় বলল কিশোর। এটাই সেই দ্বীপ!
ঝট করে কিশোরের দিকে ফিরল মুসা, চেয়ে রইল। কথাটা একবারও মনে হয়নি তার। এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, তো, এখন কি করব আমরা?
কি করব… নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর। ওমর ভাই থাকলে প্লেনটা আবার দখল করা যেত।
নেই যখন, তা আর করতে পারছি না। অন্য কিছু ভাবতে হবে।
সাগরের দিকে চেয়ে আছে কিশোর। ঢেউয়ের মাথায় এখনও সাদা সাদা ফুটকি। মাথা নাড়ল সে আনমনে। আর কি ভাবব? নিজেকেই যেন প্রশ্ন করল।
প্লেনটা এখনও দখল করা যায় হয়তো, কিন্তু কি করে বের করে নিয়ে যাব ল্যাগুন থেকে? আমি অন্তত পারব না। জায়গা নেই, ওড়ার গতি সঞ্চয় করার আগেই বাঁধের কাছে পৌঁছে যাবে প্লেন। সৈকতও খুব ছোট, ডাঙা থেকে যে উড়ব তারও উপায় নেই।
কি বলতে চাও আসলে?
বলতে চাই, নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল কিশোর, প্লেনটা স্টার্ট দিতে পারব, ওমর ভাইয়ের সঙ্গে থেকে সেটুকু শিখেছি, আগে বাড়াতেও পারব, কিন্তু অত্তোটুকুন জায়গায় ওটা নিয়ে উড়াল দেয়া আমার সাধ্যের বাইরে, ওমর ভাইও পারবে কিনা সন্দেহ। তাছাড়া, উড়তে যদিও বা পারি, নামতে পারব না, নামাতে জানি না। অ্যাকসিডেন্ট করে মরব।
হুঁ! কিন্তু এখন করবটা কি?

অন্ধকারও হয়ে আসছে। এখন আর কিছুই করার নেই, লুকিয়ে থেকে সুযোগের অপেক্ষা করা ছাড়া।
কি সুযোগ?
জানি না। তবে কোন না কোন সুযোগ পেয়েও যেতে পারি। চলো, কাটি এখান থেকে। ওরা যে-কোন সময় এসেপড়তে পারে। নিশ্চয়ই ব্যাটারা গুপ্তধন শিকারে বেরিয়েছে।
উল্টোদিকের ঢাল বেয়ে দ্রুত নেমে চলল দুজনে, উদ্দেশ্য, বনে গিয়ে ঢুকবে। কিন্তু ভাগ্য ওদের নেহায়েত খারাপ। খানিক দূর এগোতে এগোতেই পড়ল আরেক বিপদে।
ঘন একটা নারকেল কুঞ্জ থেকে বেরিয়েই লোকটার গায়ে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল কিশোর। ফ্যাকাসে চেহারার হালকা-পাতলা এক লোক, উল্টোদিক থেকে আসছিল। লোকটাকে চেনে না দুই গোয়েন্দা, কিন্তু তার হাবভাব, চেহারা আর হাতের রাইফেল দেখে অনুমান করতে কষ্ট হলো না, সে কে।
আরে, আরে, টেনে টেনে কথা বলে লোকটা, কি অবাক কাণ্ড! তোমরা! এসো, এসো, হ্যামার দেখলে খুব খুশি হবে। বলছিল, তোমরা এসেও পড়তে পারো।
শান্ত চোখে লোকটার দিকে চেয়ে আছে কিশোর। ভয় পাচ্ছে না, ভেতরে ভেতরে জমে উঠছে ঠাণ্ডা রাগ। তুমি ইমেট চাব?
বা-বাহ, নামও তো জানো দেখছি। এসো, অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। আলো থাকতে থাকতেই যাওয়া দরকার, নইলে পাথরে পিছলে পড়ে ঠ্যাং ভাঙবে।
অসহায় বোধ করল দুই গোয়েন্দা, কিছু করার নেই, নীরবে চলল লোকটার সঙ্গে। ল্যাগুনের এক ধারে ছোট্ট একটা খোলা জায়গায় নিয়ে এল তাদেরকে চাব, পাথরের তূপ আড়াল করে রেখেছে, তাই জায়গাটা আগে দেখতে পায়নি মুসা কিংবা কিশোর। তিনজন বসে আছে ওখানে। হ্যামারের পাশে বসেছে লম্বা এক লোক, কোটরে বসা চোখ ঘোলাটে। তাদের উল্টোদিকে বসেছে কুচকুচে কালো বিশাল এক নিগ্রো, বেশভূষা দেখে অন্য সময় হলে হেসে ফেলত মুসা, কিন্তু এখন। হাসি আসছে না। চানাচুর কিংবা সাবানের বিজ্ঞাপন করার জন্যে যেন সং সেজেছে লোকটা, মাথায় চূড়াওয়ালা টুপিটা শুধু নেই।
লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল নিগ্রো, কড়া চোখে তাকিয়ে রয়েছে বন্দিদের দিকে। এমনিতে ঝুলে থাকা ঠোঁট আরও ঝুলে পড়েছে। হাতের মোটা মোটা আঙুল মুঠো পাকাচ্ছে আর খুলছে ধীরে ধীরে। বিস্মিত।
তো, এসে গেছ, কিশোরের দিকে চেয়ে বলল হ্যামার।
তাই তো মনে হয়, নাকি? বাঁকা জবাব দিল কিশোর।

যা জিজ্ঞেস করব, সোজা জবাব দেবে, নইলে… কি করবে মুঠো পাকিয়ে দেখাল হ্যামার। ধমকে উঠল, আরগুলো কোথায়?
কোথায়, আমারও জানতে ইচ্ছে করছে, বলল কিশোর।
জানো না বলতে চাও? মিথ্যে বললে বিপদে পড়বে। কোথায় ওরা?
মিথ্যে বলার দরকার নেই। তা ছাড়া, ভীষণ ক্লান্ত বোধ করছে কিশোর। যা খুশি ঘটে ঘটুক, পরোয়া করে না আর। মিছে কথা বলব কেন? বোধহয় ডুবে মরেছে ওরা, খসখসে কণ্ঠে বলল সে। ঝড়ের আঘাতে ভেঙে পড়েছে প্লেন, সাগরে পড়ে চুরমার হয়েছে। আমরা দুজন বেঁচে গেছি। ব্যস, যা জানি বললাম।
দীর্ঘ এক মুহূর্ত নীরবতা। কিশোরের বলার ধরনে এমন কিছু রয়েছে, তার কথা অবিশ্বাস করতে পারল না শত্রুরা।
বেশি চালাকির ফল, অবশেষে বলল হ্যামার। সঙ্গীদের দিকে ফিরল, ছেলেদুটোকে কী করব?।
দাঁত বের করে হাসল নিগ্রো ম্যাবরি ভেনাবল। চোখের পলকে হাতে বেরিয়ে এসেছে ক্ষুর। ভয়ংকর ভঙ্গিতে হাতের তালুতে ঘষতে শুরু করল ঝকঝকে ক্ষুরের ফলা।
সরাও ওটা, ধমক দিল ঘোলাটে চোখো। অহেতুক খুন-জখমের কোন মানে নেই। ওদেরকে ছেড়ে দিলেই কি? ক্ষতি তো আর করতে পারছে না।
যদি প্লেনটা নিয়ে পালায়? বলল ইমেট চাব। ছেলেগুলো খুব বেশি চালাক। প্লেন চালাতে জানে কিনা কে জানে। এখুনি ছেড়ে দেয়া ঠিক হবে না।
আমারও তাই মনে হচ্ছে, বলল হ্যামার। তা ছাড়া আমরা যা খুঁজছি, ওগুলোর ব্যাপারেও হয়তো জানে।
নিশ্চয়ই, জোরে মাথা ঝাঁকাল চাব। বেঁধে ফেলে রাখি। সকালে শুনব আমরা কি কি জানে। সারা রাত বাঁধা থাকলে সকালে মন বদলাবে। গলা ছেড়ে গান গাইতে শুরু করবে হয়তো। তাড়াহুড়ো করে এখনি কিছু করে ফেলার কি দরকার?
ঠিকই বলেছ, সায় দিল হ্যামার। বাধো, বেঁধে ফেলো। ইচ্ছে করলে যখন। খুশি মেরে ফেলে দিতে পারি, কিংবা ছেড়ে দিতে পারি। সেটা পরে ভাবব। ম্যাবরি, দড়ি আনো।
এক ধারে পড়ে থাকা মালপত্র ঘেঁটে দড়ি বের করল ম্যাবরি। খপ করে মুসার কব্জি চেপে ধরল। চাপের চোটে মুঠো আপনা-আপনি আলগা হয়ে গেল গোয়েন্দা সহকারীর, মোহরটা হাতেই ছিল, আঙুল খুলে যেতেই বালিতে পড়ল।
আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল ম্যাবরি, ছো মেরে তুলে নিল মোহরটা। কোথায় পেয়েছ? জিজ্ঞেস করল মুসাকে, দেখাচ্ছে সঙ্গীদেরকে।
জবাব দিল না মুসা।

কোথায় পেয়েছ? গর্জে উঠল হ্যামার। বলছ না কেন?
এটা সেই ডাবলুনটাই, ঠাণ্ডা গলায় বলল মুসা, লস অ্যাঞ্জেলেসে যেটা পেয়েছি।
মিছে কথা। ওটা অ্যালেন কিনির কাছে, বলল ম্যাবরি। বস, ওরা জানে মোহরের সন্ধান।
বললাম না, এটা সেই মোহরটাই, জোর গলায় প্রতিবাদ করল মুসা। অ্যালেন কিনির কাছ থেকে নিয়ে নিয়েছি। আমাদের দেখে কিছু বুঝতে পারছ না? প্লেন ভেঙে মরার দশা, আর এনারা বলছেন মোহর খুঁজে পেয়েছি। আমাদের চেহারা দেখে সেরকম লাগছে?
দেখি তো মোহরটা, ম্যাবরির দিকে হাত বাড়াল হ্যামার।
দ্বিধা করছে ম্যাবরি।
কিশোরের মনে হলো, ঠিক ওভাবেই দ্বিধা করেছিল ববের বাবা, হয়তো ঠিক ওই জায়গাটাতেই দাঁড়িয়ে। হয়তো ওভাবেই হাত বাড়িয়েছিল হ্যামার সেদিনও। দিতে অস্বীকার করেছিল মিস্টার কলিনস।
আমি এটা রাখি, বস, অনুনয় করল ম্যাবরি।
কী ভাবল হ্যামার।
ঠিক আছে, রাখো। একটা নিয়ে গোলমাল করে লাভ নেই, অনেক পাব শিগগিরই।
খুশিতে বাগবাগ হয়ে মোহরটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখল ম্যাবরি। তারপর দড়ি নিয়ে কাজে লেগে গেল। মুসার দুই কব্জি এক করে বাঁধল, ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিয়ে দুই পা বাঁধল। নরম বালি না হলে খুব ব্যথা পেত মুসা। ঠিক একই ভাবে কিশোরকেও বাধা হলো।
রাত রামল। চাঁদ উঠল। রূপালী আলোর বন্যায় প্লাবিত করে দিল চারপাশে, ছোট্ট ল্যাগুনের পানিকে মনে হচ্ছে এখন তরল রূপা।
বালিতে কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়ল ইমেট চাব। অন্য তিনজনও তাই করল।
কিশোর আর মুসাকে শাসাল হ্যামার। সকালে তোমাদের ব্যবস্থা করব। দাঁড়াও! বলে শুয়ে পড়ল পাশ ফিরে।
পানি থেকে জ্যাকেটটা যখন তুলেছে মুসা, তখন সে কিংবা কিশোর তাদের বায়ে ভালমত তাকালেই দেখতে পেত ববকে। ঝড়ের তোড়ে সাগরের তল থেকে ছিঁড়ে উঠে আসা শেওলা স্তূপ হয়ে আছে একটা জায়গায়। ভেজা, পিচ্ছিল শেওলার স্তূপের তলায় প্রায় অর্ধেকটা ঢাকা পড়ে আছে ববের শরীর। না, মরেনি বব, খুব সৌভাগ্য, বিশাল একটা ঢেউ ছুঁড়ে ফেলেছে তাকে সৈকতে। বেহুঁশ হয়ে আছে।
মুসা আর কিশোর চলে যাওয়ার পরও অনেকক্ষণ নড়ল না বব। লাশ হয়ে পড়ে আছে যেন। সূর্য ডুবল। ভাটা শুরু হলো সাগরে! চাঁদ উঠল, ববের ফ্যাকাসে

চেহারা আরও ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে এখন রূপালী জ্যোৎস্নায়। গর্ত থেকে বেরিয়ে মার্চ করে এগিয়ে এল একটা কাকড়া, দাঁড়া দুটো শূন্যে তুলে রেখেছে অদ্ভুত দুটো অ্যান্টেনার মত, চলার তালে-তালে দুলছে। দাঁড়ার মাথার ধারাল আঁকশি জোড়া মৃদু কিটকিট শব্দ করে একবার খুলছে, একবার বন্ধ করছে।
দুই গজ মত এগিয়ে হঠাৎ থেমে পড়ল কাঁকড়াটা, কোনরকম বিপদ আছে। কিনা আন্দাজ করতে চাইছে হয়তো। আরেক গর্ত থেকে আরেকটা কাঁকড়া এসে যোগ দিল প্রথমটার সাথে। আরেকটা, তারপর আরও একটা, দেখতে-দেখতে যেন। কাঁকড়ার হাট জমে গেল ওখানে। একটা অর্ধচন্দ্র সৃষ্টি করে একসঙ্গে মার্চ করে এগোল দলটা অবশ হয়ে পড়ে থাকা দেহটার দিকে। নীরব রাত ভরে গেল জীবগুলোর দাঁড়ার অদ্ভুত কিটকিট শব্দে। যতই এগোচ্ছে, ধীরে ধীরে গতি কমাচ্ছে কাঁকড়াগুলো, আশ্চর্য শৃঙ্খলা। সব কটার গতি একই রকম থাকছে, এতটুকু এদিক ওদিক নেই।
নড়েচড়ে উঠল ববের শরীর। চোখের পলকে থেমে গেল কাকড়া বাহিনী, একই সঙ্গে, তারপর দ্রুত একটা ঢেউয়ের মত ছড়িয়ে পড়ল তিন দিকে। দেখতে দেখতে গায়েব হয়ে গেল।
চোখ মেলল বব। শূন্য চোখে তাকিয়ে রইল তারাখচিত আকাশের দিকে, হঠাৎ করেই ফিরে এল বোধশক্তি, ডান কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠে বসল তাড়াতাড়ি। তাকাল জ্যোৎস্না-উজ্জ্বল সাগরের দিকে। পুরো এক মিনিট লাগল নিজেকে বোঝাতে যে, সে স্বপ্ন দেখছে না, সমস্ত ব্যাপারটাই কঠোর বাস্তব। উঠে দাঁড়াল সে। পাক দিয়ে উঠল মাথার ভেতর, গল গল করে বমি করে ফেলল। পেট থেকে নোনা পানি বেরিয়ে যাওয়ায় বরং ভালই হলো, হালকা হয়ে গেল শরীর আর মাথার ভেতরটা, টলোমলো পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে এখন। শরীরের জায়গায় জায়গায় ব্যথা অনুভব করছে, আঙুল কাঁপছে।
আরেকবার বমি করল সে, পেট থেকে নোনা পানি সব বেরিয়ে যাওয়ার পর সুস্থির হলো। তাকাল চারপাশে। সঙ্গীদেরকে দেখার আশা করছে না, দেখা গেলও না কাউকে। বিমানটাও নেই। একা সে, ভয়ংকর একাকীত্ববোধ প্রচণ্ড পীড়া দিতে শুরু করল তাকে। অন্য তিনজন পানিতে ডুবে মরেছে, এটা বিশ্বাস করতে পারছে।, বেঁচে আছে ওরা, নিরাপদে আছে, তা-ও বিশ্বাস হচ্ছে না। পানির ধার ঘেঁষে পড়ে থাকা সাদাটে একটা জিনিস চোখে পড়ল তার, কম্পিত পায়ে এগোল সেদিকে। খানিক এগিয়েই বুঝতে পারল কি ওটা, কাছে যাওয়ার দরকার হলো না–বিমানের সিঁড়ি, ওরা যেটাতে করে এসেছিল, সেটার। জোর করে চেপে রাখা পানি আর ঠেকিয়ে রাখতে পারল না, দরদর করে বেরিয়ে এল চোখ থেকে। আর অবিশ্বাস করার কোন কারণ নেই। ধপ করে বালিতে বসে দুহাতে মুখ ঢাকল বব।

কতক্ষণ একই ভাবে বসে থাকল বলতে পারবে না, অবশেষে উঠে দাঁড়াল। আবার, এভাবে ভেঙে পড়ার কোন মানে নেই। পেছনের ঘন জঙ্গলের দিকে চেয়ে। আত্ম কেঁপে গেল, কি ধরনের জানোয়ারের বাসা ওই জঙ্গলে? কি আতঙ্ক আর বিপদ ওঁৎ পেতে আছে কালো গাছগুলোর আড়ালে? জানে না সে, এখান থেকে দেখে কিছু বোঝারও উপায় নেই।

দূর, যত্তোসব আজেবাজে ভাবনা!-ধমক দিয়ে মন থেকে ভয় তাড়ানোর চেষ্টা করল সে। আবার ফিরল সাগরের দিকে। আরে, ওই তো, ওই সেই পাথরটা। যেটাতে নামার চেষ্টা করেছিল সে। বানের পানি চলে যাওয়ায় অনেক উঁচু হয়ে আছে, নিশ্চয়ই শুকনো। ঢেউয়ের দাপাদাপি আর নেই এখন ওটাকে ঘিরে। তার বন্ধুরা কি ওখানেই আছে, টিলার ওপরে বা নিচে কোথাও পড়ে আছে তাদের লাশ? ববের বাবা বলত, খুন করে লাশ গুম করে না সাগর, ফিরিয়ে দিয়ে যায়।

যাবে নাকি? গিয়ে দেখবে? ডানে-বাঁয়ে ভালমত তাকাল আবার, কিন্তু তেমন কিছু চোখে পড়ল না। খাড়া পাহাড়ের ধার ঘেঁষে এগোল, এখান দিয়েই যাওয়ার চেষ্টা করেছিল তখন কিশোর আর মুসা, পানি থাকায় পারেনি, কিন্তু এখন শুকনো, ববের যেতে কোন অসুবিধে হচ্ছে না। পাথরের টিলার কাছে চলে এল, গোড়ায় নেই কেউ, ওপরে চড়ল, না, এখানেও নেই। ফিরে এল আবার সৈকতে, পানি থেকে দূরে একেবারে জঙ্গলের ধারে উঠে এল। ভয়ে ভয়ে তাকাঁচ্ছে কালো বনের দিকে। বসল। এরপর কি করবে, ভাবছে। পানি দরকার আগে, গলা শুকিয়ে কাঠ। কিন্তু পানি খুঁজতে যাওয়ার সাহস নেই, চাঁদের আলোয় অদ্ভুত আলো-আঁধারির খেলা জায়গায় জায়গায়, নির্জন নীরব এই পরিবেশে সেদিকে তাকাতেই গা ছমছম করছে ববের। ভোরের জন্যে অপেক্ষা করবে ঠিক করল সে। ডান হাতের তালুতে চিবুক রেখে ভাবতে লাগল নানা কথা, শূন্য দৃষ্টি স্থির একটা পাথরের স্তূপের দিকে।

বসে আছে তো আছেই। এত দীর্ঘ রাত আর আসেনি তার জীবনে। ভাগ্য ভাল, বাতাস উষ্ণ, নইলে খালি গায়ে যেভাবে বসে আছে খোলা বাতাসে, এভাবে থাকতে পারত না কিছুতেই, খুব অসুবিধেয় পড়ে যেত। নিজের কক্ষপথে নীরবে, এগিয়ে চলেছে চাঁদ, ববের ডানে সৈকত ঘুরে চলেছে যেন, অবশেষে তার বায়ের পাথরগুলোর ছায়া দূর হলো চাঁদের আলো পড়ে, নীলচে উজ্জ্বল একটা আভা ছড়াচ্ছে এখন।

এই দুরবস্থায় থেকেও ঢুলুঢুলু হয়ে এল তার চোখ এক সময়, ঠিক তখনই একটা পাথরকে নড়তে দেখল সে, নাকি কল্পনা? নাহ্, কল্পনাই। যে অবস্থায় রয়েছে সে, তাতে চোখ উল্টোপাল্টা অনেক কিছুই দেখতে পারে, মানে, দেখেছে মনে হতে পারে। কিন্তু পরক্ষণেই পুরো সজাগ হয়ে গেল সে, প্রতিটি স্নায়ু টানটান। পাথরটা

সত্যিই নড়ছে, ধীরে ধীরে রূপ নিচ্ছে একটা মানুষে, চোখ বড় বড় করে ওটার দিকে চেয়ে থেকে ভাবছে বব, সে স্বপ্ন দেখছে। হয় স্বপ্ন দেখছে, না হয় ওই জিনিস, যাকে সবচেয়ে বেশি ভয় তার। ভূত! ভূত মনে করার কারণও আছে। যে মানুষটাকে দেখছে সে, সে আধুনিক মানুষের পোশাক পরা নয়। মাথায় ছিটকাপড়ের রুমাল জড়ানো, একটা কোনা ঝুলছে ঘাড়ের ওপরে। ফতুয়ার মত একটা জামা পরনে, বুকের কাছটায় সুতার পাকানো সরু দড়ির আড়াআড়ি বুনট, ঢোলা রঙিন পাজামার নিচের দিক ঢোকানো বুটের ভেতরে-রূপার বাকলস লাগানো। রয়েছে জুতোতে, চাঁদের আলোয় চকচক করছে। আরও একটা জিনিস চকচক করছে, সেটা তার হাতের মস্ত ভোজালি, চোখা মাথাটা ঠেকিয়ে রেখেছে। কটা পাথরে।

হাঁ হয়ে গেছে বব, নিঃশ্বাস ফেলতে ভয় পাচ্ছে। আস্তে ঘুরল মূর্তিটা, তাকিয়ে রইল প্রবালপ্রাচীরের গায়ে যেখানে ছোট ঢেউ আছড়ে পড়ছে, সেদিকে। তারপর যেমন, নীরবে এসেছিল, তেমনিভাবেই গায়েব হয়ে গেল আবার।

আর কোন সন্দেহ নেই ববের, ভূতই দেখেছে, শত শত বছর আগে অপঘাতে মরা কোন জলদস্যুর ভূত! সারাজীবন যা করেছে, মৃত্যুর পরেও সেই পেশাই বোধহয় বেছে নিয়েছে ভয়ঙ্কর ওই জলদস্যু! কিন্তু আরেকবার ওটাকে দেখার অপেক্ষা করল না বব, লাফিয়ে উঠে ছুটল বালিয়াড়ি ধরে। আরেকটা বড় পাথরের স্তূপ চোখে পড়ার আগে গতি কমাল না। কাঁধের ওপর দিকে ফিরে তাকাল। ভূতটা তাড়া করে আসছে না দেখে থামল, হাঁপাচ্ছে জোরে জোরে। বসে পড়ে জিরিয়ে নিল খানিকক্ষণ, চোখ সারাক্ষণ রয়েছে যেদিক দিয়ে সে এসেছে সেদিকে। ভূতটার ছায়া দেখলেই উঠে দৌড় দেবে আবার।

আর দেখা দিল না ভূত। জিরিয়ে নিয়ে উঠল বব। সামনের পাথরের ফাঁকফোকর দিয়ে গজিয়ে উঠেছে কয়েকটা নারকেল গাছ। যাক, পানি পাওয়া যাবে। একটা নারকেল জোগাড়ের আশায় পা বাড়াল সে নারকেল-কুঞ্জের দিকে।

গাছের গোড়ায় একটা নারকেল দেখে কাছে এসে উবু হতে যাবে, হঠাৎ চোখে পড়ল জিনিসটা, চাঁদের আলোয় চমকাচ্ছে ওটার শরীর। অবিশ্বাস্য। চোখ ডলে নিয়ে আবার তাকাল, না, আছে তো। ল্যাগুনের স্থির আলোয় ভাসছে একটা বিমান, চকচকে ডানায় জ্যোৎস্না প্রতিফলিত হয়ে এসে পড়েছে ববের চোখে। একবারও মনে এল না তার, ওটাতে চড়েই রওনা দিয়েছিল, ওটা তাদেরই সেই উভচর সিকরস্কি। আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ভাবল, প্লেনের লোকগুলো গেল কোথায়? নিশ্চয়ই আশপাশেই কোথাও রয়েছে। সরে এসে এদিক ওদিক তাকিয়ে খুঁজল, কিন্তু ল্যাগুনের ধারে খোলা ছোট্ট সৈকতে কাউকে চোখে পড়ল না।

মনস্থির করে নিয়ে পা বাড়াতে যাবে, এই সময় একটা শব্দ শুনে চমকে উঠল সে, ধড়াস করে উঠল বুকের ভেতর। কাছেই আছে মানুষটা। নাক ডাকাচ্ছে।
জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট ভিজিয়ে নিল বব। কী করবে? ডাকবে মানুষটাকে! প্লেনটার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ একটা ভাবনা ঝিলিক দিয়ে গেল তার মনে। নির্জন এই দ্বীপে এই সময়ে প্লেন আসে কি করে? সিকরস্কিটা না তো? ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হলো, চেনা চেনা মনে হচ্ছে এখন বিমানটাকে। আরও কয়েক মুহূর্ত পর আর সন্দেহ রইল না, ওটা সিকরস্কিই। আনন্দ চলে গেছে মন থেকে, তার জায়গায়। ঠাই নিয়েছে ভয়, সুযোগ দিলে ভয়টা আতঙ্কে রূপ নেবে। মন শক্ত করল সে। কি করবে? প্লেন চালাতে জানে না যে, ওটা নিয়ে পালাবে। তাহলে? হ্যাঁ, প্লেন চালাতে জানে না, কিন্তু নৌকা তো চালাতে পারে। রবারের ডিঙিটা নিয়ে চলে যেতে পারে। কাছের অন্য কোন দ্বীপে, এমন কোনটায়, যেটাতে মানুষের বাস আছে। কিন্তু তার আগে লুকিয়ে দেখে নেবে, হ্যামার আর সঙ্গীরা কি করছে। পুবের আকাশ ফ্যাকাসে হতে শুরু করেছে, মরে যাচ্ছে জ্যোৎস্নার উজ্জ্বলতা, ভোরের দেরি নেই। যা কিছু করার করতে হবে খুব তাড়াতাড়ি, আলো ফোঁটার আগেই।
নিঃশব্দে গাছপালার আড়ালে আড়ালে ঘুরে এসে দাঁড়াল পাথরের স্কুপের পিছনে। আস্তে করে মাথা উঁচিয়ে উঁকি দিল, যেদিক থেকে নাক ডাকার শব্দ আসছে। সেদিকে। ঢিবঢিব করছে বুকের ভেতর। সামনে একটুখানি খোলা জায়গা। পাশাপাশি শুয়ে আছে ছয়জন। কিন্তু চারজন তো থাকার কথা। একজন নড়েচড়ে উঠল। ঝট করে মাথা নামিয়ে ফেলল বব। কয়েক মূহুর্ত অপেক্ষা করে সাবধানে আবার উঁকি দিল।
নড়ে উঠে এদিকে ফিরে শুয়েছে মূর্তিটা। খালি গা। চাঁদের আলো পড়েছে মুখে। দেখেই চিনতে পারল তাকে বব। কিশোর! গলার কাছে চিৎকারটা প্রায় এসে গিয়েছিল ববের, কোনমতে থামাল। বুকের ভেতরে ঢিবঢিব বেড়ে গেছে। কিশোর, তারমানে তার পাশে শোয়া মূর্তিটা মুসা। বোঝা যাচ্ছে, দুজনেরই হাত-পা বেঁধে রাখা হয়েছে, তাদের পড়ে থাকার বেকায়দা ভঙ্গি দেখেই এটা স্পষ্ট।
সাহায্য করা দরকার ওদেরকে, কিন্তু কিভাবে? একটা ছুরির জন্যে এত আফসোস জীবনে আর কখনও করেনি বব। বাঁধনের গিট কি খুলতে পারবে? পারুক আর না পারুক, চেষ্টা করে দেখতেই হবে, সিদ্ধান্ত নিল সে। আকাশের দিকে তাকাল। ইস, এত তাড়াতাড়ি আলো ফুটছে কেন? মনেই পড়ল না, এই খানিক আগেও বার বার বলেছে, কেন আলো ফুটতে এত দেরি হচ্ছে। যা কিছু করার খুব দ্রুত করতে হবে, ডাকাতগুলো জেগে যাওয়ার আগেই।

পাথরের স্কুপের ওপর দিয়ে নিঃশব্দে নেমে এল বব। কিশোরের চোখ মেলা, ববকে দেখছে চুপচাপ। জ্বলজ্বল করছে না? তাই তো মনে হয়, ভাবল বব। হাসল। তার হাসি কিশোরের চোখে পড়ল কিনা বোঝা গেল না।
কিশোরের পাশে এসে বসে পড়ল বব। পায়ের বাঁধনে হাত দিল। একবার চেষ্টা করেই দমে গেল। ভীষণ শক্ত করে বেধেছে। এই বাধন খুলতে অনেক সময় নেবে। উঠে বসার চেষ্টা করছে কিশোর। বব ফিরে তাকাতেই ফিসফিস করে বলল, ক্ষুর! মাথা নেড়ে ইঙ্গিতে দেখাল।
দেখতে পেল বব। খানিক দূরে চিত হয়ে শুয়ে আছে এক বিশালদেহী নিগ্রো, নীল জামা গায়ে, তার ছড়ানো হাতের কাছে পড়ে রয়েছে একটা ক্ষুর।
উঠে এগোল বব। ক্ষুরটা নেয়ার জন্যে হাত বাড়িয়েছে, এই সময় খুলে গেল নিগ্রোর চোখ।
জঘন্য একটা মুহূর্ত একে অন্যের দিকে চেয়ে রইল ওরা। গাল দিয়ে লাফিয়ে উঠে বসল ম্যাবরি।
পালাও, বব, দৌড় দাও! তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল কিশোর।
চমক ভাঙল যেন ববের, স্প্রিঙের মত লাফিয়ে উঠল। কিন্তু তার আগেই ক্ষুর হাতে উঠে পড়েছে নিগ্রো, সই করে হাত চালাল, অল্পের জন্য বাঁচল ববের গলাটা। লাগলে ধড় থেকে আলাদা হয়ে যেত মুণ্ড। আর কি দাঁড়ায় সে সেখানে! আতঙ্কে চেঁচিয়ে দৌড় দিল তাড়া খাওয়া পাহাড়ী ছাগলের মত। সৈকত ধরে ছুটছে, পেছনে তাকানোর সাহস নেই, কোথায় কোন্‌দিকে যাবে জানে না, শুধু বুঝতে পারছে, বাঁচতে চাইলে নিগ্রোর হাতে পড়া চলবে না। ধরে জবাই করে ফেলবে তাকে খুনেটা।
একটা পাহাড়ে উঠে পড়ল বব, উঠে চলল দ্রুত। পেছনে গুলির শব্দ হলো, ববের পায়ের কাছ থেকে উঠে গেল এক খাবলা মাটি। আরেকটা গুলি লাগল প্রথমটার কাছেই, আরেক খাবলা মাটি উড়ল। থামল না বব। বড় একটা খাদের কাছে এসে থমকে দাঁড়াতেই হলো অবশেষে। সামনে যাওয়ার পথ নেই। ফিরে তাকিয়ে দেখল, উঠে আসছে নিগ্রো।
ঘুরে এক পাশে ছুটল আবার বব। ঢুকে পড়ল ঘন জঙ্গলে। কিন্তু কয়েক পা এগিয়েই বুঝল, ভুল জায়গায় ঢুকেছে। ঘন হয়ে জন্মানো লিয়ানা লতা আর কাটাঝোঁপের ভেতরে ছুটে চলা মানুষের সাধ্যের বাইরে। আবার বেরিয়ে এসে বা দিক দিয়ে খাদটা ঘুরে যাওয়ার চেষ্টা করল। জানে না, এটা সেই জায়গা, হ্যামারের তাড়া খেয়ে তার বাবাও একদিন যেদিক দিয়ে ছুটেছিল।
খাদ ঘুরে ছুটল বব, তাড়া করে আসছে নিগ্রো, অনেক কাছে এসে পড়েছে। ছুটতে ছুটতে আবার বাধা পড়ল সামনে। জঙ্গলে ঢাকা একটা শুকনো খাড়িমত

রয়েছে। ওটায় নেমে লুকিয়ে পড়া যায় না? এদিক ওদিক তাকাল সে। ছোট-বড় কয়েকটা গুহা চোখে পড়ল। সময় নেই। একটা গর্তে প্রায় লাফিয়ে নামল সে, ঢুকে বসে পড়ল। হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরল, যাতে হাঁপানোর শব্দ শোনা না যায়।
খাঁড়ির পাড়ে এসে দাঁড়িয়েছে ম্যাবরি, শব্দ শুনে বুঝতে পারল বব। এগিয়ে আসতে শুরু করল পাশের শব্দ, ববের গর্তটার দিকেই এগোচ্ছে। ফাঁদে পড়া ইঁদুরের মত আতঙ্কে থর থর করে কাঁপছে বব। আর রক্ষা নেই, ধরা বুঝি পড়তেই হবে। মাঝে মাঝে থেমে যাচ্ছে পায়ের শব্দ, নিশ্চয়ই কোন গর্তের কিনারে দাঁড়িয়ে উঁকি দিয়ে ভেতরটা দেখে নিচ্ছে ম্যাবরি।
ববের গর্তটা বড় জোর পাঁচ কি ছয় ফুট গভীর, কিনারে এলে তাকে দেখতে পাবে ম্যাবরি। কিন্তু চুপ করে বসে থাকা ছাড়া এখন আর কিছু করারও নেই।
এগিয়ে আসছে পায়ের শব্দ, ম্যাবরির ভারি শ্বাস ফেলার শব্দও কানে আসছে এখন। আসছে...আসছে...তারপর থেমে গেল। ওপরে তাকাতে সাহস হচ্ছে না ববের, তবুও তাকাল। তার দিকেই চেয়ে রয়েছে নিগ্রোটা। দাঁত বের করে নীরবে হাসছে। ভয়ংকর ভঙ্গিতে হাতের তালুতে শান দিচ্ছে ক্ষুর।
গর্তের কিনারে লম্বা হয়ে শুয়ে ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিল নিগ্রো। ববের চুল খামচে ধরে টান দিল। চিৎকার করে উঠল বব, ছটফট করছে, ছুটে যাওয়ার চেষ্টা করছে। চুল ছেড়ে তার ঘাড় চেপে ধরে টেনে তুলে আনছে ম্যাবরি, জবাই করার জন্যে ছাগলের বাচ্চাকে তুলছে যেন।
গর্তের বাইরে ববকে বের করে আনল ম্যাবরি। দাঁড় করিয়ে দিয়ে চুল খামচে ধরল আবার, টান দিয়ে মাথা পেছনে বাঁকা করতেই গলা ঠেলে এল সামনে। ক্ষুর চালানোর সুবিধে হবে। হাসিতে উজ্জ্বল ম্যাবরির মুখ চোখ জ্বলজ্বল করছে। ক্ষুর সোজা করল সে, এগিয়ে আসছে ধীরে ধীরে। গলায় বসিয়ে হঠাৎ হ্যাঁচকা টান মারবে। আতঙ্কে হাত দিয়ে গলা রক্ষা করার কথাও ভুলে গেছে বব, সম্মোহিতের মত চেয়ে রয়েছে নিগ্রোর চোখের দিকে।
ঠা-শ্-শ্ করে একটা শব্দ হলো। বব মনে করল, চাপের চোটে তার ঘাড়ের হাড় ভেঙে গেছে। কিন্তু ব্যথা পাচ্ছে না কেন? ক্ষুরই বা চালাচ্ছে না কেন নিগ্রোটা? আরে, চেহারা দেখি বদলে গেছে ব্যাটার হঠাৎ করে! হাসি মুছে গেছে। কেঁপে উঠল। ম্যাবরির শরীর, হাত থেকে খসে পড়ে গেল ক্ষুর, পাথরে পড়ে শব্দ তুলল, ববের কানে মধুর বাজনার মত শোনাল সে শব্দ। তিন কি চার সেকেণ্ড ওভাবেই দাঁড়িয়ে রইল নিগ্রোটা, তারপর মুখ থুবড়ে পড়ল পাথরের ওপর।
চোখের সামনে থেকে বাধা সরে যেতেই লোকটাকে দেখতে পেল বর, ম্যাবরির ঠিক পেছনেই। ধরেই নিল বব, মরে গেছে সে, মৃতের রাজ্যে ঢুকে পড়েছে, তাই এমন সব আশ্চর্য কাণ্ডকারখানা দেখতে পাচ্ছে। তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সেই

জলদস্যুর ভূত, বাঁ হাতে ভোজালি, ডান হাতে ধরা শত শত বছরের পুরানো পিস্তলের নল দিয়ে ধোয়া বেরোচ্ছে।
বোবা হয়ে চেয়ে আছে বব। তার মগজ কাজ করতে চাইছে না যেন। কিন্তু একে একে দ্বিধার সমস্ত গিট ছাড়াল মগজ, খাপে খাপে বসিয়ে দিল সবকিছু।
চেঁচিয়ে উঠল বব, আপনি!
ডুবতে ডুবতেও ভেসে রইল বিমানটা। দূর থেকে দেখে মুসা কিংবা কিশোর যতখানি খারাপ ভেবেছে, ঠিক ততখানি খারাপ অবস্থায় নেই ওমর। কারণ সহজে ডুববে না বিমান, ভেতরে বাতাস ঢুকে আটকে গেছে, ভেসে রয়েছে ওই বাতাসের জন্যেই। ছোট একটা উপদ্বীপ বা পাথরের অনেক বড় স্তূপ, যা-ই বলা যাক, ওটার দিকে ভেসে চলেছে বিমান, মূল দ্বীপের এক মাথা থেকে বড়জোর শদুয়েক গজ দূরে, তার পরে খোলা সাগর।
উদ্বিগ্ন হয়ে উপদ্বীপটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে ওমর। আশা, যদি কোনভাবে ওটাতে উঠে ঢেউ ছাড়িয়ে ওপরে উঠে যেতে পারে, তো বেঁচে যাবে এযাত্রা। তারপর ঝড় কমলে সাতরে চলে যেতে পারবে মূল দ্বীপে। কিন্তু কাছে যাবে কি বিমানটা?
যেতে পারে, না-ও পারে, ফিফটি ফিফটি চান্স। একবার তো উপদ্বীপের একেবারে কয়েক গজের মধ্যে চলে এল, কিন্তু ওমর ঝাঁপ দিয়ে পড়ার আগেই বিপরীতমুখী স্রোতের টানেই হোক, কিংবা বাতাসের ঝাঁপটায়ই হোক, দ্রুত সরে চলে এল আবার। খানিক পরে আবার এগোল বিমান, আবার পিছিয়ে এল। তারপর আবার এগোতে শুরু করল। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল ওমর, ঝুঁকিটা নেবে, ঝাঁপ দিয়েই পড়বে পানিতে, তারপর সাঁতরে তীরে ওঠার চেষ্টা করবে, এছাড়া উপায় নেই। ও যা ভেবেছে-উপদ্বীপের একেবারে গায়ে বাড়ি খাবে বিমান, তা হবে না। বেশি সুবিধার জন্যে অপেক্ষা করলে শেষে আর কাছে না গিয়ে যদি স্রোতের টানে খোলা সাগরে ভেসে যায়, তাহলে সামান্য যে সুযোগ আছে, সেটাও মিলবে না।
তৃতীয়বার কাছাকাছি হতেই ঝাঁপ দিল ওমর। প্রাণপণে হাত-পা ছুঁড়ে সাঁতরাতে শুরু করল। কোনমতে এসে ধরে ফেলল বেরিয়ে থাকা একটা চোখা পাথর। ঢেউ আসছে, শব্দ শুনেই বুঝতে পারছে। লম্বা শ্বাস টেনে নিয়ে দম বন্ধ করে জোরে প্রায় জড়িয়ে ধরে রইল পাথরটা। এসে গেল ঢেউ, চলে গেল মাথার ওপর দিয়ে। কিন্তু সরার নাম নেই আর। দম ফুরিয়ে আসছে, বাতাসের জন্যে আকুলি-বিকুলি করছে ফুসফুস, আর পারছে না সে। সরল ঢেউ। এত জোরে টান দিল, ওমরের মনে হলো, গোড়া থেকে তার বাহু দুটো ছিঁড়ে শরীরটা নিয়ে চলে যাবে পানি। কিন্তু তার প্রচণ্ড মনোবলের কাছে হার মানল ঢেউ, নিতে পারল না।

ঢেউ সরে যেতেই পাথর ছেড়ে দিল ওমর, বুক সমান পানিতে এখন সে, টান পুরোপুরি কমেনি। আবার হাত-পা ছুঁড়ে অবশেষে উঠে এল উপদ্বীপে। পাথর ধরে ধরে উঠল ওপরে, ঢেউয়ের নাগালের বাইরে এসে ধপাস করে শুয়ে পড়ল। ক্লান্তিতে অবশ হয়ে গেছে শরীর।

কয়েক মিনিট চুপচাপ পড়ে রইল ওমর। জিরিয়ে নিয়ে উঠে বসে তাকাল। উপদ্বীপে সাগরের দিকটায় উঠেছে সে। উঠতে শুরু করল চূড়ায়, ওখান থেকে দেখা যাবে মূল দ্বীপটা, মুসা আর কিশোরকে দেখতে পাওয়ার আশাও করছে।

কিন্তু চূড়ায় পৌঁছার আগেই অবাক হতে হলো তাকে। হঠাৎ আবিষ্কার করল, যে পাথর ধরে ধরে উঠে যাচ্ছে সে, ওগুলোতে মানুষের অস্ত্র লেগেছে। বড় পাথর কেটে ছোট ছোট বিভিন্ন আকারের টুকরো করে সেগুলো দিয়ে একটা বুরুজ মত বানানো হয়েছে। বুরুজের ওপরে ওঠার পথ খুঁজে বের করল সে। উঠে এল। অবাক হয়ে দেখল, পুরানো আমলের একটা দুর্গের ভাঙা চত্বরে উঠে এসেছে। গোটা ছয়েক পুরানো কামানও বসানো রয়েছে, কয়েকটা সাগরের দিকে মুখ করা, কয়েকটা ডাঙার দিকে। কাঠের বড় বারকোশে জমিয়ে রাখা হয়েছে বড় বড় গোলা, কামানের গোলা। দুর্গটা তৈরি হয়েছিল নিশ্চয়ই সেই আমলে, যখন বাক্যানিয়ারদের সঙ্গে স্প্যানিশদের যুদ্ধ চলছিল।

চত্বরের এক ধার থেকে ধাপে ধাপে নেমে গেছে সিঁড়ি, পাহাড়ের ভেতরে ঢুকেছে। ভেতরে কি আছে, দেখার কৌতূহল হচ্ছে বটে, কিন্তু দেখতে যাওয়ার সময় এটা নয়। উঠে এল একেবারে চূড়ায়, এখান থেকে মূল দ্বীপ দেখা যায়। সৈকত দেখা যাচ্ছে, কিন্তু যতদূর চোখ যায় জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই। মুসা আর কিশোরের কি হলো? নিচে তাকাল ওমর। দ্বীপ আর উপদ্বীপের মাঝের সরু প্রণালীতে এখন উথাল-পাতাল ঢেউ, ভীষণ অবস্থা। এখন ওটা সাঁতরে পেরোনোর চেষ্টা আত্মহত্যার সামিল। অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

মন খারাপ হয়ে গেছে ওমরের। ববকে হারিয়েছে, কোন সন্দেহ নেই। মুসা আর কিশোরের কি হয়েছে, বুঝতে পারছে না। দুদুটো বিমান হারিয়ে সে আটকা পড়েছে এক দ্বীপে, সঙ্গে খাবার নেই, পানি নেই, অস্ত্র নেই।

আলো কমছে দ্রুত, শিগগিরই অন্ধকার হয়ে যাবে। ঝড় থেমেছে, কিন্তু সাগরের ফোঁস ফোঁস বন্ধ হয়নি। প্রণালীটা সাঁতরে পেরোনোর সময় হয়নি এখনও, দেরি আছে। দিগন্তে হঠাৎ হঠাৎ করে উদয় হলো সূর্য, কালো মেঘের ফাঁকে। লালচে আলো ছড়িয়ে পড়ল মূল দ্বীপের চন্দ্রাকৃতি মাথায়, রাঙিয়ে লাল করে দিল। অপরূপ দৃশ্য। কিন্তু দেখার মন নেই ওমরের। সে ভাবছে কিশোর আর মুসার কথা। কি হলো ওদের? বেঁচে আছে তো? নাকি ববের মত তাদেরকেও নিয়ে গেছে। উন্মত্ত সাগর?

খামোকা বসে থাকার চেয়ে আশপাশটা ঘুরে দেখা উচিত মনে করল ওমর। যেখানে বসে আছে, ওখান দিয়ে নামতে পারবে না প্রণালীতে, খাড়া পাহাড়। ঢালু জায়গা বের করতে হবে। নেমে চলে এল আরেক দিকে। আরে, সিঁড়ি যে একেবারে তৈরিই করে রেখেছে। মালপত্র নিয়ে জাহাজ আসত, সেসব মালপত্র তোলার জন্যেই তৈরি হয়েছিল এই সিঁড়ি। হঠাৎই মনে পড়ল তার, পানি। নিশ্চয়ই পানি রাখার ব্যবস্থা আছে কোথাও দুর্গে। এসব পাথুরে জায়গায় বৃষ্টির পানি ধরে রাখার জন্যে ট্যাংক খোঁড়া হয় পাথরের তলায়, একটা বা বেশ কয়েকটা নালা কেটে পথ। করে দেয়া হয়, সেই পথ দিয়ে গিয়ে বৃষ্টির পানি জমা হয় ট্যাংকে। পানির কথা মনে হতেই তৃষ্ণা টের পেল সে, এতক্ষণে খেয়াল করল, নোনা পানি শুকিয়ে চড়চড় করছে মুখ। ঠিক আছে, আগে পানির খোঁজই করবে। আবার সেই চত্বরে চলে এল সে, যেখানে কামানগুলো রয়েছে, যেখানে একপ্রান্ত থেকে সিঁড়ি নেমে ঢুকেছে পাহাড়ের গভীরে।

সিঁড়ি বেয়ে একটা অন্ধকার সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়ল সে। যতই নামছে, বাড়ছে অন্ধকার। কিছু দেখা যায় না। খুব সাবধানে এক পা এক পা করে বাড়িয়ে দিয়ে নেমে চলল। যতক্ষণ সিঁড়ি আছে, নামবে, তারপর কিছু না পেলে ফিরে উঠে আসবে। কিন্তু আরও কয়েক ধাপ এগোতেই আলো চোখে পড়ল। খুব কায়দা করে। সুড়ঙ্গ কেটে আলো আনার ব্যবস্থা হয়েছে। আলো আনার জন্যেই, নাকি অন্য কোন ব্যাপার? যা-ই হোক, পরে দেখা যাবে। আপাতত বড় একটা কামরায় এসে ঢুকেছে সে। পাহাড় কেটে তৈরি হয়েছে এই পাতালকক্ষ। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল ওমরের। অদ্ভুত এক অনুভূতি। লাফ দিয়ে কয়েকশো বছর পেরিয়ে অতীতে চলে এসেছে যেন। সে। আবছা আলোয় দেখা যাচ্ছে ঘরের ভেতরটা।

অনুমান করল ওমর, চল্লিশ ফুট চওড়া আর চল্লিশ ফুট প্রশস্ত হবে কামরাটা। ঘরের জিনিসপত্রের অবস্থা দেখে অনুমান করতে কষ্ট হয় না, কোন কারণে খুব তাড়াহুড়ো করে ঘর ছেড়েছিল এর অধিবাসীরা, সোজা কথা, পালিয়েছিল। পুরানো আমলের একগাদা কাপড় তূপ হয়ে পড়ে আছে এক কোণে। লুপহোলে আটকানো একটা তামার সুইভেল-গানের ওপর পড়ে আছে কিছু কাপড়। এক দিকের দেয়াল। ঘেষে কুঁকড়ে পড়ে রয়েছে দুটো কঙ্কাল, পড়ে থাকার ভঙ্গি দেখেই বোঝা যায় খুব কষ্ট পেয়ে মরেছিল। একটা কঙ্কালের হাতের আঙুলের কাছে পড়ে রয়েছে মস্ত এক ভোজালি। মেঝেতে ছড়িয়ে রয়েছে কয়েকটা পিস্তল আর মাসকেট বন্দুক। আর আছে ছটা পিপে। দেখা গেল, চারটে পিপেতে খাবার ছিল-তিনটেতে মাংস, শুকনো হাড়গুলো শুধু অবশিষ্ট রয়েছে, আরেকটাতে ময়দা-নষ্ট হয়ে গেছে। বাকি দুটোতে ছিল বারুদ, কিছু তলানি এখনও আছে। ঘরের আরেক কোণে ধুলোয় ঢাকা পড়ে আছে ছোট গোল মার্বেলের মত কিছুর তূপ। এক মুঠো

হাতে নিয়েই আবার ফেলে দিল ওমর। ওজনেই বোঝা গেছে কি জিনিস। গুলি। মাসকেটের হতে পারে, কিংবা সুইভেল-গানের। কিন্তু পানির ট্যাংকের কোন চিহ্ন চোখে পড়ল না।
আবার কঙ্কাল দুটোর দিকে তাকাল সে বিষণ্ন দৃষ্টিতে। কারা ওরা? বাড়ি কোথায়? কি কারণে এসেছিল, এখানে? কোন দিনই জানবে না হয়তো, জানবে না কেউই। নিজের অজান্তেই একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। ঘুরে এগোল সিঁড়ির দিকে। মাঝপথে থেমে কি ভাবল, তারপর ফিরল কাপড়ের স্তূপের দিকে। প্রায় উলঙ্গ হয়ে রয়েছে সে। কাপড় যখন আছে, কেন পরবে না? বাইরে বেরোলেই হয়তো হেঁকে ধরবে মশার পাল, খালি গায়ে থাকলে অতিষ্ঠ করে ফেলবে।
বেছে বেছে একটা ফতুয়ার মত পোশাক তুলে নিল সে, বুকের কাছে সুতোর দড়ির জালি। লালচে একটা পাজামা নিল, আর একটা ছিট কাপড়ের রুমাল। পুরানো, নোনা গন্ধ, কিন্তু গন্ধটা আপাতত সহ্য করল ওমর। খোলা বাতাস আর রোদ লাগলে চলে যাবে গন্ধ, আঠা আঠা ভাবটাও থাকবে না। আর তেমন বুঝলে ধুয়ে নিতে পারবে যখন-তখন। কাপড় যখন পাওয়া গেছে, খালি গায়ে থাকার কোন মানে হয় না।
কাপড়গুলো পরে নিয়ে খুঁজে খুঁজে পায়ের মাপমত একজোড়া বুট বের করল। একটা টুকরো তারপুলিনও পাওয়া গেল। ওমরের মুখে ফুটেছে অদ্ভুত হাসি। একটা পিস্তল তুলে নিয়ে পরীক্ষা করল, ঠিকই আছে মেকানিজম। কয়েকবার স্লাইড টেনে ট্রিগার টিপে হ্যামারের আঘাত দেখল, নাহ, গুলি ফাটাতে পারবে মনে হচ্ছে। কিছু গুলি নিল। বারুদ রাখার বিশেষ বোতলে ভর্তি করে নিল বারুদ। এক সময় নরম চামড়া দিয়ে তৈরি হয়েছিল বোতলটা, এখন লোহার মত শক্ত হয়ে গেছে, তবে কাজ চলবে। আর কিছু নেয়ার আছে? আছে, তবে তারপুলিনে বাঁধতে হবে না। পিস্তল, গুলি, জুতো আর বারুদের বোতল তারপুলিনে রেখে কোনাগুলো এক করে পোঁটলা বাঁধল। কঙ্কালের হাতের কাছে পড়ে থাকা ভোজালিটা নিয়ে গুজল কোমরে। তারপর পোঁটলাটা হাতে ঝুলিয়ে পা বাড়াল আবার সিঁড়ির দিকে। মুখে হাসি।
বাইরে বেরিয়ে দেখল, অনেক নেমে গেছে পানি। খুব সহজেই পেরোতে পারবে এখন প্রণালী। সুবিধামত একটা দিক খুঁজে বের করল। নিচু একটা দেয়াল ডিঙিয়ে যেতে হবে। পেরিয়ে এল সহজেই। পানিতে নামল।
চিত-সাঁতার দিয়ে এগুলো ওমর, দুহাতে উঁচু করে ধরে রেখেছে পোঁটলাটা, যাতে পানি না লাগে। সহজেই পেরিয়ে এল প্রণালী, পোটলা ভিজল না। তীরে উঠে পরনের কাপড় খুলে চিপে পানি ঝরিয়ে নিয়ে আবার পরল।

চাঁদ উঁকি দিচ্ছে দিগন্তে। চারদিক বড় বেশি নীরব, শান্ত। বনের দিকে তাকাল। কি বিপদ লুকিয়ে রয়েছে ওই গাছের দঙ্গলের মধ্যে? জানে না। সাবধান থাকা দরকার। পোটলা খুলে আগে গুলি আর বারুদ ঠাসল পিস্তলে। বুট পরে পাজামার নিচের দিকটা গুঁজে দিল বুটের ভেতর। তারপুলিন দিয়ে বোতলটা বেঁধে নিল কোমরের সঙ্গে। তারপর পিস্তল আর ভোজালি হাতে চলল শেওলায় ঢাকা পাথরটা খুঁজতে, যেটার ওপর নামতে চেয়েছিল কিশোর আর মুসা।
পাথরটার আশপাশ খুঁজল ওমর। বালিতে পড়ে থাকা ববের জ্যাকেটটা দেখতে পেল। কিন্তু কাউকে চোখে পড়ল না। এগিয়ে চলল আবার এক দিকে। খানিক দূরে এগোনোর পর সামনে দেখতে পেল পাথরের তূপ। কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে দেখল। ভাবল, ওদিকে যেতে পারবে না মুসা কিংবা কিশোর, আবার ফিরল সে। ফিরে এল সৈকতে, যেখানে উঠেছিল প্রথমে। একটু খোঁজাখুঁজি করতেই কয়েকটা নারকেল পেয়ে গেল, ঝড়ে গাছ থেকে খসে পড়েছিল সাগরে, ঢেউ আবার ফিরিয়ে দিয়ে গেছে তীরে। ভোজালি দিয়ে নারকেল কেটে আগে পানি খেল, তারপর ধীরেসুস্থে খেল ভেতরের নরম মিষ্টি শাঁস। পেটে কিছু পড়তেই ক্লান্তি এসে চেপে ধরল। চিত হয়ে ওখানেই শুয়ে পড়ল সে।
কিন্তু এত ক্লান্তি সত্ত্বেও ঘুম এল না চোখে। ভাবছে। কি হলো ছেলে দুটোর? বেঁচে আছে ওরা? নানারকম দুশ্চিন্তা এসে ভিড় করল মনে। ঘুমিয়ে পড়ল এক সময়।
তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার কানে আসতেই ধড়মড়িয়ে উঠে বসল ওমর। চোখ মিটমিট করছে, কোথায় আছে বুঝতে পারছে না। দুয়েক সেকেণ্ড লাগল পূর্ণ সচেতনতা ফিরে আসতে। একটা শব্দ সে শুনেছে নিশ্চয়ই, কিসের শব্দ? এদিক ওদিক তাকাল, দৃষ্টি আটকে গেল পঞ্চাশ গজ দূরে। পাহাড়ের ওপরে উবু হয়ে বসে কি যেন তোলার চেষ্টা করছে বিশালদেহী এক নিগ্রো। কৌতূহল হলো, উঠে পায়ে পায়ে এগোল সেদিকে ওমর।
একটা ছেলেকে তুলে আনল নিগ্রো, নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না ওমর। বব! নিগ্রোর হাতে কি যেন চকচক করছে। চকিতে মনে পড়ে গেল ওমরের, ক্ষুর, ম্যাবরি। ছুটল সে নিঃশব্দে।
দশ গজ দূরে থাকতে থমকে দাঁড়াল ওমর। আর দেরি করা যায় না। পিস্তল তুলে নিশানা ঠিক করে দিল ট্রিগার টিপে। গুলি ফুটবে কিনা, অনিশ্চয়তা ছিল। কিন্তু। ফুটল গুলি।
আবার দৌড় দিল ওমর। ছুটতে ছুটতেই দেখল টলে উঠে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। ম্যাবরি।
ঝুঁকে ববের হাত ধরে তাকে টেনে তুলল ওমর। লেগেছে কোথাও? ...ইস, বড় সময়মত এসে পড়েছিলাম, আরেকটু দেরি করলেই...

মাথা ঝোকাল বব। কথা বলতে পারছে না।
পুব আকাশ লাল হয়ে আসছে।
হাঁটু ভেঙে পড়ে যাচ্ছে বব, তার কাধ চেপে ধরে চেঁচিয়ে উঠল ওমর, আরে, কি করছ? মূর্ছা যাওয়ার সময় হলো এটা? …সোজা, সোজা হও।
মলিন হাসি হাসল বব। সরি। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছল। পা কাঁপছে। বাঁচব ভাবিনি।
হ্যাঁ, মস্ত ফঁড়া গেছে, বলল ওমর। চোখ পড়ল একটা জিনিসের দিকে।
আরে, দেখো! দেখেছ?
দেখল বব। নিগ্রোর ডান হাতের আঙুলের কয়েক ইঞ্চি দূরে পড়ে রয়েছে ছোট্ট গোল সোনালি একটা জিনিস, মোহর। সেই ডাবলুনটা।
বলেছিলাম না, ওমর বলল, মোহরটা অভিশপ্ত। যার হাতেই যায়, তার সর্বনাশ করে ছাড়ে। ববকে মোহরটার দিকে এগোতে দেখে চেঁচিয়ে উঠল, না না, ছুঁয়ো না! ছুঁয়ো না!
এখানে ফেলে যাব?
মাথা নাড়ল ওমর, ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বসেছে। এখানে নয়, চোখের আড়ালে। ওটাকে দেখলেও ক্ষতি হতে পারে, জিনের আসর আছে ওটাতে, মোহরটার কাছে। এসে দাঁড়াল সে। এক লাথি দিয়ে ফেলে দিল একটা গর্তে, এটাতেই লুকিয়েছিল বব। গড়িয়ে গড়িয়ে চোখের আড়াল হয়ে গেল মোহরটা। বিড়বিড় করে বলল ওমর, যাক, গেল আপদ। ববের দিকে ফিরল। তোমাকে আবার দেখব, আশা করিনি, বব। খুব খুশি লাগছে। মুসা আর কিশোরের যে কি হলো?
আমি দেখেছি ওদের! জানাল বব। ওদের বাঁধন খোলার চেষ্টা করছিলাম। ওই সময় এই লোকটা জেগে উঠে তাড়া করল!
বেঁচে আছে ওরা? ইয়াল্লাহ! অন্তরের গভীর থেকে বেরিয়ে এল ডাকটা, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ওমর।
আছে, তবে বন্দি, বলল বব।
বন্দি?
সংক্ষেপে সব কথা জানাল বব।
ববের কথা শেষ হতে আরেকবার লম্বা শ্বাস ফেলল ওমর। মুক্ত করতে হবে ওদের। চলল, এখুনি।
নিগ্রোর দেহটা দেখাল বব। এটার কি হবে?
ওর সকার করার সময় নেই এখন, ঠাণ্ডা ওমরের কণ্ঠ, ওর দোস্তরাই যা করার করবে। কথা বলতে বলতেই আবার গুলি আর বারুদ ঠেসে নিল পিস্তলে। ক্ষুরটা নাও। মুসা আর কিশোরের বাঁধন কাটা যাবে।

ওমর ভাই, এই কাপড় পেলেন কোথায়? আর জিজ্ঞেস না করে পারল না বব। বুঝতে পারছি, গতরাতে আপনাকেই দেখেছিলাম, চাঁদের আলোয় ভূতের ভয়ে ছোটার কথা মনে পড়তেই হেসে ফেলল। জলদস্যুর ভূত ভেবেছিলাম।
ওমরও হাসল। পুরনো একটা দুর্গ আছে, উপদ্বীপে। এসব জিনিস ওখানেই পেয়েছি। কিন্তু এখন সব কথা বলার সময় নেই। কিশোর আর মুসাকে ছাড়িয়ে আনা দরকার। এসো, যাই।
পুরো দলটাকে আক্রমণ করবেন? হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞেস করল বব, সৈকত ধরে চলেছে ওরা ল্যাঙ্গুনের উদ্দেশে।
জানি না। লুকিয়ে থেকে আগে দেখব অবস্থা, পরিস্থিতি বুঝে যা করার করব, বলল ওমর। প্রয়োজন হলে আক্রমণ করতেই হবে। তবে একটা লোককে নিয়ে সমস্যা, ইমেট চাব। রিভলভারে হাত নাকি তার খুবই ভাল। আমার এটা আদিম পিস্তল। এ-জিনিস নিয়ে ওর মুখোমুখি হতে পারব না। এটা হাতে আছে, নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল, এই আর কি। বারো গজ দূর থেকে নিশানা ঠিক রাখা। যাবে না... থমকে গেল সে হঠাৎ। কে জানি আসছে!
সামনে একটা পাথরের স্তূপের ওপাশ থেকে আসছে শব্দ। পটার ওপর উঠে সাবধানে উঁকি দিল ওমর। পরক্ষণেই লাফিয়ে নেমে ববের হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে বলল, জলদি! জঙ্গলে!
ববকে টেনে নিয়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়ল ওমর। কাটার খোঁচায় দুজনেরই চামড়া ছিঁড়ে গেল জায়গায় জায়গায়।
কী? হাঁপাতে হাঁপাতে বলল বব।
ইমেট চাব বোধহয়, হাতে রিভলভার। হ্যাঁ, ও-ই। এদিকে আসছে, নিগ্রোটাকে খুঁজছে, কিংবা হয়তো গুলির শব্দ শুনে সন্দেহ করেছে। চুপ করে থাকো।
ও দলছুট হলে আমাদের জন্যে ভালই, ফিসফিস করে বলল বব।
মাথা নোয়াল ওমর। ঠোঁটে আঙুল রাখল। শশশশ!।
গাছের আড়াল থেকে ইমেট চাবকে দেখতে পাচ্ছে দুজনে। পাথরের পটার চূড়ায় উঠে মুখ ঘুরিয়ে এপাশ ওপাশ দেখল সে। চেঁচিয়ে ডাকল, ম্যাবরি। এই, ম্যাবরি। তারপরই দেখতে পেল পাহাড়ের ওপর পড়ে থাকা নিগ্রোকে। গাল দিয়ে উঠে তূপ থেকে নেমে ছুটল সেদিকে।
এসো, এই আমাদের সুযোগ, উঠে দাঁড়াল ওমর। জঙ্গলের ভেতর দিয়েই কোনমতে পথ করে এগোল। ইচ্ছে, গাছ-পালার আড়ালে আড়ালে পাথরের স্তূপটার পাশ কাটিয়ে চলে যাবে ওপাশে। তাহলে আর তাদেরকে দেখতে পাবে না। ইমেট চাব।

কিন্তু যে পরিমাণ লতা আর কাঁটা, নিঃশব্দে এগোনো অসম্ভব, এর ভেতর দিয়ে এগোনো সাংঘাতিক কঠিন। যতটা সম্ভব কম আওয়াজ করে এগোল ওরা।
স্তূপটার পাশ কাটিয়ে এসে ঝোঁপ সরিয়ে মুখ বের করল ওমর। ববকে জিজ্ঞেস করল, শেষ কোন জায়গায় দেখেছিলে ওদের?
আরেকটা পাথরের স্তূপ দেখাল বব। পাথর আর ভূমিধস নেমেছিল ওখানে কোন্ আদিমকালে, নারকেল গুচ্ছ গজিয়েছে এখন। ওটার ওপাশে।
এসো। ইমেট চাব আসার আগেই কাজ সারতে হবে আমাদের, পাশে তাকিয়ে ইমেট চাব আসছে কিনা দেখল। দৌড় দাও।
নিরাপদেই ভূমিধসটার কাছে চলে এল ওরা। আরেকবার পেছনে তাকিয়ে দেখল ওমর, ইমেট চাবকে দেখা যাচ্ছে না। বব, এবার তোমার পালা। এখুনি মুক্ত করতে না পারলে আর কখনও পারব না। পিস্তল দেখিয়ে আটকে রাখব আমি বারডু আর হ্যামারকে। তুমি কিশোর আর মুসার বাঁধন কাটবে। মাথা নিচু রাখবে, যে কোন সময় গোলাগুলি শুরু হতে পারে। যা-ই ঘটুক, তুমি কোন দিকে তাকাবে না, ওদের বাধন না কাটা পর্যন্ত। ওদেরকে ছাড়াতে পারলেই প্লেনটা আবার দখল করব। বুঝেছ?
বুঝেছি।
গুড। এসো, যাই।
এক হাতে পিস্তল আরেক হাতে ভোজালি নিয়ে পাথরের দ্বিতীয় স্তূপটার চূড়ায় উঠে গেল ওমর। শক্ত করে ক্ষুর চেপে ধরে বব অনুসরণ করল তাকে। বিমানটা দেখা যাচ্ছে, সৈকতে পড়ে থাকা রবারের ডিঙিটাও, কিন্তু মানুষ নেই।
সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ববের দিকে তাকাল ওমর।
আরও কয়েকটা বড় পাথর দেখিয়ে বলল বব, ওগুলোর ওপাশে। ওখানেই ক্যাম্প করেছে ব্যাটারা।
নিঃশব্দে নেমে এল ওরা স্তূপের ওপর থেকে। নরম বালি মাড়িয়ে কুঁজো হয়ে ছুটল। বড় পাথরগুলোর কাছে এসে আস্তে করে উঁকি দিল। বড় জোর ছয় কদম দূরেই রয়েছে ওরা। পায়ের ওপর পা রেখে আরাম করে বসে একটা টিন থেকে কি নিয়ে খাচ্ছে হ্যামার। কিশোর আর মুসা হাত-পা বাঁধা অবস্থায় তেমনি পড়ে রয়েছে। মাটিতে। সিডনি বারডুকে দেখা যাচ্ছে না।
পিস্তল নিশানা করল ওমর। হেঁকে বলল, হাত দুটো তোলো, মিস্টার হ্যামার। শয়তানী করলেই খুলি উড়িয়ে দেব। সন্দেহ থাকলে চেষ্টা করে দেখতে পারো।
ববের দিকে ফিরে নিচু গলায় বলল, যাও।
ফিরে তাকাল হ্যামার, এতোই অবাক হয়েছে, হাস্যকর দেখাচ্ছে তার গরিলার মত মুখটা। কোনরকম শয়তানীর চেষ্টা করল না সে। হাত থেকে টিনটা ছেড়ে দিয়ে

ধীরে ধীরে মাথার উপর তুলল দুই হাত।
শান্ত পায়ে হেঁটে গিয়ে হ্যামারের মাথার পেছনে পিস্তল ঠেকাল ওমর। শান্ত থাকো। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বারডুকে খুঁজল। নেই। তাকাল ববের দিকে, মুসার বাঁধন কাটা সারা, কিশোরের বাঁধন কাটছে দ্রুত হাতে।
মুক্ত হয়েও দাঁড়াতে পারল না কিশোর। গোড়ালি ডলছে, ব্যথায় বিকৃত হয়ে গেছে মুখ।
কঠিন হয়ে গেল ওমরের মুখ। বব। এদিকে এসো।
দৌড়ে এল বব।
পিস্তলটা ধরো, বলল ওমর। ব্যাটা একটু নড়লেই দেবে ট্রিগার টিপে। ববের হাতে পিস্তল ধরিয়ে দিয়ে হ্যামারের পকেট হাতড়াতে শুরু করল সে।
একটা রিভলভার পাওয়া গেল, বাঁ হাতে নিল সেটা। দরকার নেই, তবু কি ভেবে নকল ম্যাপটা বের করে নিজের পকেটে রাখল। তারপর উঠে গেল মুসা আর কিশোরের কাছে। কিশোর তো পারছেই না, মুসাও দাঁড়াতে পারছে না ঠিকমত, কব্জি আর গোড়ালি উলছে। দীর্ঘ সময় রক্ত চলাচল ব্যাহত হওয়ায় সাংঘাতিক ফুলে। উঠেছে জায়গাগুলো। ওদের ঠিক হতে আরও কয়েক মিনিট লাগবে।
ঠিক আছে, বসো, হাত তুলে বলল ওমর। ভালমত ডলো। বেশি দূর না, ডিঙিটার কাছে যদি যেতে পারো, তাহলেই চলবে। জানিও, কখন পারবে।
বিমানটা দখল করবেন আবার, না? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
নিশ্চয়ই, সঙ্গে সঙ্গে বলল ওমর। আমাদের জিনিস... থেমে গেল সে! ঝন্টু করে মাথা ফেরাল বিমানটার দিকে।
স্টার্ট নিয়েছে উভচরের ইঞ্জিন। ধীরে ধীরে চলতে শুরু করল প্রবাল প্রাচীরের দিকে। এক পাশের খোলা মুখ দিয়ে বেরিয়ে চলে যাবে খোলা সাগরে। জানে লাভ নেই, তবু দৌড় দিল ওমর। কিন্তু দশ পা এগোতে এগোতেই গতি বেড়ে গেল বিমানের, পানিতে ঢেউ তুলে ছুটে গেল দ্রুত গতিতে।
বন্ধুদের কাছে ফিরে এল ওমর। তিক্ত কণ্ঠে বলল, বারডু হারামজাদা। একবারও ভাবিনি ও প্লেনে উঠে বসে আছে।
শূন্যে উঠল উভচর। উফুল্ল চোখে সেটার দিকে চেয়ে রইল হ্যামার।
রেগে গেল ওমর আরও। চোখের পাতা কাছাকাছি হলো। দাঁড়াও, শয়তানের বাচ্চা, তোমার নিজের ওষুধই তোমাকে দেব। আশা করি অসুবিধে হবে না, প্রতিহিংসায় জ্বলজ্বল করছে বেদুঈনের চোখ। মুসা, উঠতে পারবে? দড়ি দিয়ে ব্যাটার হাত-পা বাধো কষে।
হাসি মুখে উঠে দাঁড়াল মুসা। ও-কে, বস্।

বব, বলল ওমর, যাও তো, স্তূপের চূড়ায় উঠে দেখো, ইমেট চাব আসছে কিনা। পিস্তলটা কিশোরের হাতে দাও, গরিলার বাচ্চা বাধা দিলেই দেবে গুলি মেরে।
কিশোরের হাতে পিস্তল দিয়ে স্তূপের দিকে দৌড়ে গেল বব। ওপরে উঠে একবার চেয়েই ছুটে ফিরে এল। আসছে! আসছে!
ফিরে চাইল ওমর। কত দূরে?
একশো গজ হবে। খুব আস্তে আস্তে আসছে, ম্যাবরিকে নিয়ে আসতে হচ্ছে তো।
দ্রুত চিন্তা চলেছে ওমরের মাথায়। সবাই তৈরি হয়ে যাও। পালাতে হবে আমাদের।
ভুরু কোঁচকাল মুসা। ইমেটের ভয়ে পালাব?
হ্যাঁ, বলল ওমর, অহেতুক ঝুঁকি নিতে যাব কেন? রিভলভারে হাত খুব ভাল ওর। ওর মুখোমুখি হওয়ার যোগ্যতা নেই আমার, অন্তত রিভলভার নিয়ে। গুলি খেয়ে না মরলেও আহত হতে পারি, আমাদের যে কেউ। এই বিজন অঞ্চলে তখন আরও বিপদে পড়ব, ডাক্তার নেই, ওষুধ নেই। চলো, ভাগি। জলদি করো।
পাথরের স্তূপের দিকে তাকাল কিশোর, পেছনে ঘন বনের দিকে চাইল। ওমরের দিকে ফিরে বলল, যাব কোন দিক দিয়ে?
ওদিক, সাগরের দিকে হাত তুলল ওমর। বব, মুসা, জলদি গিয়ে ডিঙি নামাও পানিতে। কিশোর, এদিকে এসো, আমাদের জিনিস আমরা নিয়ে যাই। প্রথমেই খাবারের টিনগুলো এক জায়গায় জড়ো করতে শুরু করল সে।
ওমর আর কিশোর মিলে খাবারের টিন বয়ে এনে তুলতে লাগল নৌকায়। সব তুলতে পারল না, তবে যত বেশি পারল, তুলল। কিশোর উঠে পড়ল। ডিঙিটা গভীর পানির দিকে ঠেলে দিয়ে আলগোছে লাফিয়ে উঠে বসল ওমর। পানি থেকে বড়জোর ইঞ্চি দুই ওপরে রয়েছে ডিঙির কানা, তবে এখন সাগর শান্ত, আরোহীরা বেশি নড়াচড়া না করলে ডুববে না নৌকা।
ভেবেছ পার পেয়ে যাবে, চেঁচিয়ে বলল হ্যামার। এত সহজ না। দেখাব। মজা।
আমরা অপেক্ষায় থাকব, চেঁচিয়ে জবাব দিল ওমর, বৈঠা তুলে নিয়ে ঝপাং করে ফেলল পানিতে।
ইমেট, এই, ইমেট! চেঁচামেচি শুরু করল হ্যামার। কোথায় তুমি? জলদি এসো। ব্যাটারা পালাল!
পাথরের স্তূপের ওপাশ থেকে সাড়া দিল ইমেট চাব।
শান্ত থাকবে, সঙ্গীদেরকে হুঁশিয়ার করল ওমর, ইমেট চাব গুলি চালালেও নড়বে না কেউ। নড়াচড়ায় ডিঙি ডুবে গেলে আর রক্ষে থাকবে না।
স্তূপের মাথায় দেখা গেল ইমেট চাবকে, প্রায় একশো গজ দূরে চলে এসেছে। ততক্ষণে ডিঙি।

ও দেখে ফেলেছে আমাদের, শান্ত কণ্ঠে বলল কিশোর।
রিভলভার হাতে পানির ধারে দৌড়ে আসছে ইমেট চাব, যতখানি সম্ভব কাছে। থেকে গুলি করতে চায়।
আসুক, অনেক দূরে চলে এসেছি, বলল ওমর। যত ভাল হাতই হোক পঞ্চাশ গজের পরে রিভলভার দিয়ে নিশানা ঠিক রাখা খুব কঠিন।
পানির ধারে চলে এল ইমেট চাব। গর্জে উঠল তার রিভলভার। ডিঙি থেকে কয়েক ফুট দূরে পড়ল বুলেট, পিছলে উড়ে চলে গেল সা করে।
দাঁড় বাইতে বাইতে কিশোরকে বলল ওমর, গুলি করো। জানি লাগবে না, তবু অস্বস্তিতে পড়ক। পাল্টা গুলির মুখে দাঁড়িয়ে হাত স্থির রাখতে পারবে না।
গর্জে উঠল আদিম পিস্তল। পাথরে বাড়ি লেগে বিইঙ করে উড়ে চলে গেল। বল, এত দূর থেকেও সে শব্দ শোনা গেল।
কিন্তু ঘাবড়াল না ইমেট চাব, একের পর এক গুলি করে গেল। একটা গুলিও লাগাতে পারল না। ইতিমধ্যে আরও দূরে সরে এসেছে ডিঙি। শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে ফিরে গেল সে হ্যামারের বাঁধন খুলতে।
ডিঙির নাক বাঁয়ে ঘোরাল ওমর, তীরের সঙ্গে সমান্তরাল রেখে এগিয়ে চলল।
কোথায় যাচ্ছেন? জানতে চাইল কিশোর।
দ্বীপের শেষ মাথায় একটা উপদ্বীপ দেখেছ? এখান থেকে আধমাইল মত। হবে?
হ্যাঁ।
আমাদের জন্যে সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয়। ওখান থেকে চারদিকে লক্ষ রাখতে পারব। লুকিয়ে এসে হঠাৎ আক্রমণ করতে পারবে না হ্যামারের দল। গিয়ে আগে কিছু মুখে দিয়ে নেব, তারপর মিটিঙে বসব। সামনে অনেক কাজ।
তা তো বুঝলাম। কিন্তু, ওমর ভাই, ওই পোশাক কোথায় পেলেন আপনি? জিজ্ঞেস করল মুসা।
কড়া হয়েছে রোদ। হাত দিয়ে কপালের ঘাম মুছল ওমর। গেলেই দেখবে। আচ্ছা, হ্যামারের দল থেকে দূরে থাকতে পারলে না?
হঠাৎ করেই ধরা পড়ে গেলাম, ওমর ভাই, জবাব দিল মুসা। কল্পনাও করিনি ওভাবে ধরা পড়ব।
আর কোন কথা হলো না। চুপচাপ দাঁড় বেয়ে চলল ওমর। ল্যাগুনের ধারে বালিয়াড়িতে দেখা যাচ্ছে হ্যামার আর ইমেট চাবকে, ডিঙির দিকেই ফিরে আছে। ঘুরে উপদ্বীপের অন্য দিকে নৌকা নিয়ে এল ওমর, খোলা সাগরের দিকে। এখান। থেকে দেখা যায় না ল্যাগুনটা। আস্তে আস্তে দাঁড় বেয়ে ডিঙিটাকে নিয়ে এল সিঁড়ির গোড়ায়, যেখানে জাহাজ থেকে মালখালাস করা হত এককালে।
জিনিস নিয়ে উঠে যাও তোমরা, বলল ওমর।

আপনি কোথায় যাচ্ছেন? কিশোর জিজ্ঞেস করল।
খাবার পানি লাগবে না? দ্বীপে যেতেই হচ্ছে। কয়েকটা নারকেল কুড়িয়ে নিয়ে আসি। বেশি দেরি করব না, কয়েক মিনিটের মধ্যেই এসে পড়ব।
বোঝা কমে গিয়ে একেবারে হালকা হয়ে গেছে ডিঙি। নাক ঘুরিয়ে নিয়ে দ্রুত দাঁড় বেয়ে চলল ওমর।
ফিরে এসে ডিঙিটা ঘাটে শক্ত করে বাঁধল ওমর। চত্বরে ঘুরে বেড়াচ্ছে অন্যেরা, অবাক হয়ে দেখছে সবকিছু। হুড়োহুড়ি করছে, চেঁচামেচি করছে উত্তেজনায়, কিন্তু বাধা দিল না ওমর। ছেলেমানুষ ওরা, করবেই। এমন এক জায়গা, তার নিজেরই জানি কেমন লাগছে। বলে বোঝানো যাবে না, এমনি এক ধরনের উত্তেজনা, রোমাঞ্চ।
ওমর ভাই, এ-জায়গার খোঁজ পেলেন কিভাবে? জিজ্ঞেস করল মুসা।
খুঁজে বের করিনি, বলল ওমর। বাঁচার জন্যে উঠেছি। দেখি এই কাণ্ড। প্রথমে ভেবেছিলাম পাথরের স্তূপ, কিংবা উপদ্বীপ। বিমান থেকে লাফিয়ে পড়ে সাঁতরে উঠলাম। বেয়ে বেয়ে উঠে এলাম এই চত্বরে। সিঁড়িটিড়িগুলো পরে আবিষ্কার করেছি।
কিন্তু ওই পোশাক পেলেন কোথায়? জানতে চাইল কিশোর।
নিচে, সিঁড়ির দিকে আঙুল তুলে বলল ওমর। বেশ বড় একটা ঘর আছে।
আরও কাপড় আছে?
এক গাদা।
ওই সিঁড়ি দিয়েই নামা যাবে তো? মাঝে কোন বাধা-টাধা?
কিছু নেই, একেবারে পরিষ্কার। তবে অন্ধকার।
আর শোনার অপেক্ষা করল না কিশোর। মুসা আর ববকে ডাকল, চলো, দেখি।
হৈ-হৈ করে ছুটে গেল ওরা সিঁড়ির দিকে। সেদিকে চেয়ে মুচকি হাসল ওমর, চূড়ায় উঠতে শুরু করল। এটাকে পাহাড়ের চূড়া বলা যায়, নিচের ঘরটার ছাতও বলা চলে। ছাত বললেই বেশি মানানসই হবে, ভাবল সে।
চূড়া কিংবা ছাত যা-ই হোক, চমৎকার জায়গা। চ্যাপ্টা। ওপরে উঠে চারদিকে চোখ রাখতে এর জুড়ি আশপাশে আর একটিও নেই। বাইরের শত্রু যেদিক দিয়েই আসুক, এখানে বসে কেউ চোখ রাখলে, তার চোখ এড়িয়ে আসতে পারবে না। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, ল্যাগুনের ধারে বালিয়াড়ি। মাটিতে পড়ে থাকা কালো একটা কিছুর ওপর কে রয়েছে হ্যামার আর ইমেট চাব, বোধহয় নিগ্রোটা। হঠাৎ নিচ থেকে চেঁচামেচি শোনা গেল। ছেলেগুলোকে থামানো দরকার, তাড়াতাড়ি নিচে নেমে এল ওমর। কি ব্যাপার?

এটাই দেখেননি? জিজ্ঞেস করল কিশোর। হাত তুলে দেখাল আরেক ধাপ সিঁড়ি, মেঝে থেকে নিচে নেমে গেছে। কতগুলো কাপড় আর কম্বল সরাতেই বেরিয়ে পড়ল একটা চ্যাপ্টা পাথর, মাঝখানে লোহার রিঙ লাগানো। সিঁড়ির মুখ ঢাকা ছিল পাথরটা দিয়ে।
না, তখন ভালমত খুঁজে দেখিনি, বলল ওমর। তবে ওরকম কিছুর খোঁজেই নেমেছিলাম। কম্বলে ঢাকা ছিল, না?
হ্যাঁ, মেঝেতে ছড়িয়ে রাখা কয়েকটা কম্বল আর কাপড় দেখাল কিশোর, ওগুলো ছিল ওপরে।
ওরকম কিছুর খোঁজে ছিলেন মানে? প্রশ্ন করল মুসা। জানতেন, আছে ওটা?
না থাকলেই বরং অবাক হতাম।
কি এমন জিনিস…
পানি রাখার ট্যাংক। ছাত থেকে গড়িয়ে পড়ে জমা হয় ওখানে। পাথর ছাড়া কিছু নেই, এখানে যারা থাকত, পানি পেত কোথায়? মূল দ্বীপে হয়তো কোথাও আছে পানি, ঝর্নাও থাকতে পারে। কিন্তু এই দুর্গে যাদের বাস ছিল, তাদেরকে যদি পানির জন্যে বাইরে যেতে হত, নিরাপত্তা থাকত? ছাতে কোথাও না কোথাও একটা গর্ত নিশ্চয়ই আছে, বৃষ্টির পানি ওই গর্ত দিয়ে সুড়ঙ্গপথে এসে জমা হয় ট্যাংকে। তো, পানি আছে ট্যাংকটায়?
দেখিনি এখনও, বলল কিশোর।
একটা গুলি তুলে নিয়ে গর্তের মুখ দিয়ে ভেতরে ছুঁড়ে দিল ওমর।
পানিতে পড়ে টুলুপ শব্দ তুলল ওটা।
হুঁ, আছে, মাথা নাড়ল ওমর। খাওয়ার যোগ্য কিনা দেখি। …ওই যে, একটা বালতি, পুরানো কাপড়-চোপড়ের মাঝে পড়ে থাকা কালো একটা জিনিস দেখাল সে। চামড়ার তৈরি, বারুদ রাখার বোতলের মতই কঠিন হয়ে গেছে এখন।
বালতি তুলে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেল কিশোর। উঠে এল পানি ভরে নিয়ে। চামড়ার বালতির জায়গায় জায়গায় ফুটো, সেগুলো দিয়ে ফোয়ারার মত পানি ছিটকে পড়ছে।
দুহাত এক করে একটা ফোয়ারার সামনে পাতল ওমর, অঞ্জলি ভরে পানি নিয়ে মুখে তুলল। ঠিকই আছে মনে হয়, মাথা দোলাল সে। কিন্তু যতক্ষণ নারকেল আছে, আমি ওই পানি গিলছি না। মুসা, ঢাকনাটা দিয়ে রাখো। পেট জ্বলছে, আমি খাবার আনতে যাচ্ছি।
ট্যাংকের দিক থেকে ফিরল ওমর, এই প্রথম খেয়াল করল যেন ছেলেদের পরনের বিচিত্র পোশাক।

পোকায় কাটা লাল একটা শার্ট গায়ে দিয়েছে কিশোর, পরনে পাজামা, হাঁটুর নিচে নেমেই শেষ, খুব টাইট-ফিটিং। মাথায় বিচিত্র টুপি, চূড়াটা অনেকটা চিমনির মত, ষোলো-সতেরোশো শতকে যেমন পরত নাবিকেরা। নীল-সাদা ডোরাকাটা শার্ট গায়ে দিয়েছে মুসা। শার্টের বুকের কাছে ছোট গোল একটা ছিদ্র, ছিদ্রের চারদিক ঘিরে খয়েরী একটা দাগ, বোঝাই যাচ্ছে কিসের। পরনে সুতি কাপড়ের ময়লা প্যান্ট। মাথায় দিয়েছে তিনকোনা একটা কালো টুপি। কিশোরের গায়ে শার্ট ঠিকমত লাগেনি, বড় হয়েছে, কিন্তু ববের একেবারে ঢলঢল করছে। রঙচটা নীল সিল্কের শার্ট গায়ে দিয়েছে, পুরানো একটা বেল্ট লাগিয়েছে কোমরে, শার্টের ওপরে, ফলে মেয়েদের ফ্রকের মত লাগছে দেখতে। বেল্টের ভেতরে আবার বিরাট পিস্তল গুঁজেছে একটা। মাথায় লাল টুপি, কানের অর্ধেক ঢেকে দিয়েছে, পেছনে লেজ নেমেছে ঘাড়ের ওপর।

হা-হাহ! ববকে দেখতে দেখতে হেসে ফেলল ওমর, চেহারায় ফোঁটাল কৃত্রিম আতঙ্ক। আরে, ইসরায়েল হ্যাণ্ডস দেখছি! এখন একটা জলি রোজার পেলেই হত। চূড়ায় উঁচিয়ে দিয়ে বুক চাপড়ে খাড়া হয়ে যেতাম। ভয়ংকর একদল জলদস্যু, দুর্গ দখল করে বসেছি।

হেসে উঠল সবাই।

স্টিভেনসনের লেখা ট্রেজার আইল্যাণ্ডের ডাকাত না ইসরায়েল হ্যাণ্ডস? বলল বব। পড়েছিলাম।

নামটা ধার নিয়েছে স্টিভেনসন, বলল কিশোর। আসল ইসরায়েল হ্যাণ্ডসও ডাকাত ছিল, খুনে ক্যাপ্টেন এডওয়ার্ড টীচ-এর কোয়ার্টারমাস্টার।

এডওয়ার্ড টীচটা কে? জিজ্ঞেস করল মুসা।

জলদস্যু ব্ল্যাকবীয়ার্ডের নাম শুনেছ?

মাথা ঝোকাল মুসা।

এডওয়ার্ড টীচের ডাক নাম ছিল ব্ল্যাকবীয়ার্ড। এতবড় খুনী লুই ডেকেইনিও ছিল কিনা সন্দেহ।

লুই ডেকেইনির নাম শুনেছি, বলল বব। আচ্ছা, কিভারে মরেছিল ডাকাতটা, বলতে পারো? ফাঁসিতে? ফাঁসি দিয়ে নিশ্চয়ই ফাঁসিকাঠেই ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল লাশটা, শুকিয়ে শুকিয়ে শেষ না হওয়াতক?

না, মাথা নাড়ল কিশোর। ওর মৃত্যুটা একটা রহস্য। কেউ জানে না, কিভাবে মারা গেছে লুই ডেকেইনি। শোনা যায়, মস্ত একটা গ্যালিয়ন দখল করার পর রহস্যময়ভাবে গায়েব হয়ে যায় ডেকেইনি আর তার কিছু নাবিক। হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিল ওয়েস্ট ইনডিয়ান রুটের সদাগরী জাহাজের নাবিকেরা। আমার মনে

হয়, ডুবে মরেছে ডেকেইনি আর তার দল। আমরা যে পোশাক পরে আছি, ডেকেইনির নাবিকদেরই কিনা, কে বলবে!
চুপ, চুপ! আঙুল নাড়ল মুসা। ওসব কথা বলো না, আমার ভয় লাগে! পরনের কাপড়গুলোর দিকে অস্বস্তিভরে তাকাল সে।
একটা কথা কিন্তু ঠিক, বলল কিশোর। রত্নদ্বীপে জলদস্যুর পোশাকে বেমানান নই আমরা।
রত্নদ্বীপ কি করে হলো? ভুরু নাচাল মুসা।
নাহলে এসেছি কেন আমরা? হ্যামারই বা পিছু নিয়ে এসেছে কেন! রত্নের লোভেই তো।
ঠিকই বলেছ, সায় দিল ওমর, রত্নদ্বীপেই এসেছি আমরা। বরং, নামটা একটু বদলে জলদস্যুর দ্বীপ রাখলে আরও মানানসই হয়। বব, যখন বলল, উভচরটা নিয়ে এখানে নেমেছে হ্যামারের দল, তখনই বুঝে নিয়েছি, এই দ্বীপেই আসতে চেয়েছিলাম আমরা।
ওমর ভাই, হাত বাড়াল কিশোর, হ্যামারের পকেট থেকে যে ম্যাপটা নিয়েছেন তাতে কিছু কিছু জায়গা বদলে দিয়েছি বটে, কিন্তু কিছু মিল আছে। আছে পকেটে? দিন তো।
পকেট থেকে ম্যাপটা বের করে দিল ওমর। কেন জানি মনে হচ্ছিল কাজে লাগতেও পারে, ঠিকই লাগল।
ভাঁজ খুলে ম্যাপটা মেঝেতে বিছাল কিশোর। ববের বাবার নির্দেশ মত, বলল সে, এই যে এখান থেকে কোয়ার্টার মাইল দূরে থাকার কথা জাহাজটা। আমি আরও সরিয়ে দিয়েছি। উপদ্বীপ থেকে কোয়ার্টার মাইল দূরে, উপদ্বীপ একটাই আছে, আর সেটাতেই রয়েছি আমরা। মূল ম্যাপে এই যে, এখানটাতে ছিল ক্রস চিহ্ন, ম্যাপের এক জায়গায় আঙুল রাখল কিশোর। খেয়েদেয়ে বেরিয়ে পড়লে কেমন হয়? এসেছি মোহর খুঁজতে, খোঁজা দরকার।
যদি হ্যামার আর ইমেট চাব কাছাকাছি থাকে? মুসার প্রশ্ন।
তাহলে যাওয়া যাবে না।
দূর, যাই আর না যাই, খেয়ে তো নিই। আর থাকতে পারছি না। ওমর ভাই, টিন?
হ্যাঁ, চলো, নিয়ে আসি।
এখানে আনার কি দরকার? চত্বরে বসেই তো খেতে পারি।
না, ওখানে সাংঘাতিক রোদ। তাছাড়া ওখানে থাকলে ডাকাতদের চোখে পড়ে যেতে পারি। আমরা কোথায় আছি, ওদের না জানানোই ভাল।
দুপদাপ করে ওপরে উঠে এল ছেলেরা, পেছনে ওমর। নৌকায় করে আনা সমস্ত মালপত্র হাতে হাতে নামিয়ে আনল ওরা ঘরে, ওমরের আনা নারকেলগুলোও

আনল। কোন আসবাব নেই ঘরে, বসার কিছু নেই, মেঝেতেই বসল ওরা। কোথায় বসবে, কোথায় শোবে এ-নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাল না।
ওই ভদ্রলোকদের সামনে খাই কি করে? কেমন চেয়ে আছে দেখেছেন? কঙ্কালদুটো দেখিয়ে বলল মুসা, কণ্ঠে অস্বস্তি।
তোমারও দেখছি ভূতের ভয় আছে, হেসে বলল ওমর, ববের একার না। ওরা চেয়ে আছে তো কি হয়েছে? কঙ্কাল তো কঙ্কালই, তোমার ভেতরেও তো আছে একটা।
খেতে খেতে আলোচনা চলল। কে কিভাবে দ্বীপে নেমেছে, সেই কাহিনী খুলে বলল। মুসা আর কিশোর ভাগাভাগি করে শোনাল তাদের কাহিনী। বব শোনাল তার কিসসা, কিভাবে ম্যাবরি তার গলা কাটতে যাচ্ছিল, কিভাবে ওমর ভাই। বাঁচিয়েছে, তার বিশদ বর্ণনা। দ্রুত কাটছে সময়। দুপুর হয়ে এসেছে।
নারকেলের মালাগুলো সযত্নে সরিয়ে রাখল ওমর, কাপ হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে। বেশ বেকায়দা অবস্থায়ই পড়েছি, চিন্তিতকণ্ঠে বলল সে। এই দ্বীপ থেকে যেতে পারছি না আমরা, হ্যামারও পারছে না, অন্তত সিডনি বারডু যতক্ষণ না আসছে। কিন্তু প্লেন নিয়ে গেল কোথায় ব্যাটা? ফিরছে না কেন? প্রথমে ভেবেছিলাম, হ্যামারকে আটকে ফেলেছি দেখে প্লেন নিয়ে পালিয়েছে, ফিরে আসবে আমরা সরে গেলেই। কিন্তু সেক্ষেত্রে কি করত? প্লেন নিয়ে কাছাকাছিই ঘোরাঘুরি করত। কিন্তু তা না করে সোজা উড়ে চলে গেল। ম্যারাবিনায়ই গেছে কিনা কে জানে। ভাবনার কথা।
ঠিকই বলেছেন, মাথা কাত করল কিশোর। আমিও সেকথাই ভাবছি।
গেছে হয়তো খাবার-দাবার আনতে, মুসা বলল। ওদের সব কিছু তো নিয়ে এসেছি আমরা।
কি করে জানল খাবার নিয়ে নিচ্ছি আমরা? ওমরের প্রশ্ন।
চুপ করে রইল মুসা, জবাব দিতে পারল না।
আমাদেরগুলো নিয়েছিল তো, বব বলল, হয়তো ভেবেছে, এত অল্প খাবারে চলবে না। তাই আরও আনতে পাঠাচ্ছিল বারডুকে। সে রওনা দেয়ার আগেই আমরা গিয়ে হাজির হয়েছি।
কিংবা হতে পারে, যন্ত্রপাতি আনতে গেছে। শাবল, কোদাল, ঝুড়ি, ইত্যাদি। মাটি খুঁড়ে গুপ্তধন তোলার জন্যে, বলল মুসা।
ওসব কিছুই আনতে যায়নি, হাত নাড়ল কিশোর। ওরা ভালমতই জানে, গুপ্তধন রয়েছে জাহাজে, মাটির নিচে নয়। শাবল-কোদালের দরকার নেই, এটা আমরা যেমন জানি, ওরাও জানে। গেছে অন্য কোন কারণে।
তোমার কি মনে হয়? মুসা প্রশ্ন করল। ভয় পেয়ে পালিয়েছে?

কিসের ভয়? ওমর বলল। ওর মত লোক ভয় পাবে? যখন জানে হাতের কাছেই কোথাও রয়েছে একগাদা মোহর? ওসব না, অন্য কোন সিরিয়াস ব্যাপার। সে যা-ই হোক, ও যদি আর ফিরে না আসে, তো আমাদের অবস্থা কাহিল। ভালমতই আটকা পড়লাম এখানে। টিনের খাবারে আর কদ্দিন চলবে? তারপর থেকে শুধু নারকেল ভরসা। তিনবেলা নারকেল খাওয়া সম্ভব? দ্বীপে যাওয়ারও অনেক বিপদ। ওখানে হ্যামার আছে, ইমেট চাব আছে, দেখামাত্র গুলি করবে। যা খাবার আছে, আমরা ধারণা, আর দুই কি তিন দিন চলবে। তারপর?

হ্যামার কোম্পানিরও তো একই সমস্যা, বলল মুসা।

কিন্তু ওদের চেয়ে আমরা খারাপ অবস্থায় রয়েছি। ঠাণ্ডা মাথায় দেখামাত্র গুলি। করতে পারব না আমরা, কিন্তু ওরা দ্বিধা করবে না।

যাক, অন্তত একটা শয়তান মরেছে, এ-ও কম না, বলল বব।

মরল আর কোথায়? হাত নাড়ল ওমর। ভেবেছিলাম মরেছে, আসলে মরেনি। তবে গুরুতর জখম হয়েছে, নড়াচড়া বিশেষ করতে পারবে বলে মনে হয়। না। চলো, ওপরে যাই, দেখি ব্যাটারা কি করছে। এখন থেকে সব সময় সতর্ক থাকতে হবে আমাদের, পাহারা দিতে হবে, নইলে এখানেই এসে হামলা করবে হঠাৎ এক সময়। আমরা তখন অসতর্ক থাকলেই গেছি।

ভালই লাগছে আমার এসব ডাকাত-ডাকাত খেলা, হেসে বলল বব। ট্রেজার আইল্যাণ্ড পড়ার সময় কল্পনাও করিনি, গুপ্তধন খুঁজতে এসে আটকা পড়ব আমরা। কোন দ্বীপে।

ওমরও হাসল। মজা লাগছে, না? ঠিকই বলেছ, ট্রেজার আইল্যাণ্ডের সঙ্গে অনেক মিল আছে, সত্যিই। হ্যামার হলো লঙ জন সিলভার, তার সঙ্গীরা জলদস্যু, আর আমরা… হাসি বিস্তৃত হলো তার, আমরা…হ্যাঁ, বব হলো জিম হকিনস, কিশোর স্কয়ার ট্রেলনী, মুসা ডক্টর লিভসী, আর আমি…আমি…

ক্যাপ্টেন স্মলেট, চেঁচিয়ে উঠল বব।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল ওমর, নাটকীয় ভঙ্গিতে বাউ করল। তারপর ট্রেজার আইল্যাণ্ড বইয়ের সংলাপ নকল করে বলল, বান্দা আপনাদের খেদমতে হাজির, ভদ্রমহোদয়গণ। আপনাদের সহায়তায় লঙ জন সিলভারকে ফাঁসিতে না ঝোলাতে পারি তো আমার নাম ক্যাপ্টেন স্মলেট নয়। উঠুন, সবাই ডেকে যান, মন শক্ত রাখবেন। চলুন দেখি, শয়তানগুলো কি করছে।

উঠে দাঁড়াল কিশোর। এমনিতেই সে ভাল অভিনেতা। ট্রেজার আইল্যাণ্ড ছবিতে দেখা স্কয়ার ট্রেলনীর ভঙ্গি হুবহু নকল করে বলল, ঠিক বলেছেন, ক্যাপ্টেন, আরেকবার আপনার বিচক্ষণতার প্রশংসা করছি। মোহরগুলো পাওয়ার আশায় রইলাম।

জোরে হেসে উঠল দর্শকরা।
সারি দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল ওরা ওপরে, ছাতে উঠল। ল্যাগুনের ধারে সৈকতে এখনও পড়ে রয়েছে ম্যাবরি। ওর পাশে বসে আছে হ্যামার আর ইমেট চাব।
অতো সোজা হয়ে দাড়িও না, নিচু হও, সাবধান করল ওমর, ওরা দেখে ফেলবে।
তীরে যাব? উত্তেজিত কণ্ঠে বলল বব।
মাথা ঝোঁকাল ওমর। হ্যাঁ, আশা করছি এখন নিরাপদেই যেতে পারব। ওরা নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত। এই সুযোগে ঘুরে দেখে এলে মন্দ হয় না।
যদি ওরা টের পেয়ে যায়? মুসার জিজ্ঞাসা। যদি আক্রমণ করে?
আমরাও প্রতিহত করব। অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তৈরি হয়েই যাব। কিন্তু খুব সাবধানে ব্যবহার করতে হবে আমাদের অস্ত্র, পুরানো জিনিস, ওগুলোর বিশ্বাস নেই। নিজেরাই জখম হয়ে যেতে পারি। বব, তোমার পিস্তলে গুলি আছে?
ঠিক আছে, চলো, নিচে। কি করে গুলি ভরতে হয়, দেখিয়ে দেব। কিশোর, মুসা, তোমরা একটা করে মাসকেট নেবে।
আবার নিচে নেমে এল ওরা। যার যার অস্ত্র পছন্দ করে নিল। সব গাদা বন্দুক, গাদা-পিস্তল, কি করে গুলি ভরে গুলি করতে হয়, শিখিয়ে দিল ওমর। তারপর আবার বেরিয়ে এল চত্বরে। চট করে আরেকবার ছাতে উঠে দেখে নিল ওমর, শত্রুরা কি করছে।
সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে নৌকায় চড়ল সবাই। অল্পক্ষণেই পৌঁছে গেল দ্বীপের চোখা প্রান্তে। নামল। ডিঙিটা টেনে তুলে রাখল পানি থেকে দূরে, বড় একটা পাথরের খাঁজে। হ্যামার বা তার দলের কারও কোন সাড়াশব্দ নেই। নিশ্চিত হয়ে দ্বীপের ভেতরের দিকে রওনা হলো ওরা। একটা টিলার মাথায় উঠে সামনে কি আছে না আছে দেখল ওমর। ঘন জঙ্গল, ঝোঁপঝাড়, লিয়ানা লতা, বড় বড় ক্যাকটাস ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ল না। অন্যেরাও উঠে এল তার পাশে।
মাথা নাড়ল ওমর। না, ওখানে গ্যালিয়নটা আছে বলে মনে হয় না। নাকি। বলো?
ওরকম জায়গায় থাকার কথাও না, কিশোর বলল, ভুল জায়গায় খুঁজছেন। আর যদি সত্যি সত্যি থেকে থাকে, তো ওটা থেকে মোহর বের করে আনা আমাদের কর্ম নয়। দেখেছেন কি ঘন জঙ্গল! আর্মি লাগালেও ওই জঙ্গল পরিষ্কার করতে কয়েক হপ্তা লেগে যাবে।
তবু চলো, খুঁজে দেখি, ওমর বলল। ববের বাবা তো লিখেছেনই এমন জায়গায় রয়েছে জাহাজটা, যেখানে আছে বলে কেউ বিশ্বাস করবে না। ঘন জঙ্গলেই তো ওটা লুকিয়ে থাকা স্বাভাবিক, মাস্তুল দেখা যাবে না, কিছুই দেখা যাবে না। খুঁজে বের করা খুবই কঠিন হবে, মনে হচ্ছে।

দুটো ঘণ্টা পুরোদমে খুঁজল ওরা। জঙ্গলের যেখানেই সামান্যতম ফাঁক ফোকর দেখল, ঘন লতা পাতা গাছগাছালিতে সামান্যতম ফাঁক দেখল, সেখানেই ঢু মারল। ঝোঁপঝাড়ে ঢাকা উঁচু টিলায় উঠল, শুকনো খাড়িতে নামল। কিন্তু জাহাজের চিহ্নও চোখে পড়ল না।
আরও ঘন জঙ্গলে ঢোকার চেষ্টা করল ওরা, বিফল হয়ে বাদ দিল সে চেষ্টা। ঝোঁপঝাড়ে ঢাকা নিচু একটা জায়গা পেরিয়ে উঠল পাহাড়ে, সেই জায়গাটায়, যেখানে ম্যাবরির তাড়া খেয়ে উঠেছিল বব।
পাথরের ওপর বসে পড়ে শার্টের আস্তিন দিয়ে কপালের ঘাম মুছল ওমর।
দূর! কি কষ্ট রে, বাবা! এমন জানলে কে আসে? বিরক্তি প্রকাশ করল মুসা।
কষ্টের কি দেখেছ? বলল ওমর। আমার তো মনে হয়, মাত্র শুরু হয়েছে।
চুলোয় যাক মোহর। চলুন, ওসব খোঁজা বাদ দিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাই।
যাবে কিভাবে? হাসল কিশোর।
সে তুমি জানো! চটে উঠল মুসা। তুমিই তো ভুলিয়েভালিয়ে নিয়ে এসেছ। তোমার জন্যেই তো…
আরে কি ঝগড়া শুরু করে দিলে ছেলেমানুষের মত? মৃদু ধমক দিল ওমর। থামো। আলো আর বেশিক্ষণ নেই, সে খেয়াল আছে? ঘরে নারকেলও আছে আর মাত্র দুতিনটে। চলো, কিছু নারকেল কুড়িয়ে নিয়ে যাই। শুকনো সরু গলা দিয়ে নামাতে সুবিধে হবে।
হ্যাঁ, নারকেল জমিয়ে রাখা উচিত আমাদের, কিশোর বলল।
বব, ওমর নির্দেশ দিল, যাও তো, চট করে ওদিকটা দেখে এসো। হ্যামার আর ইমেট চাব না আবার এদিকে এসে পড়ে। দেখো, সৈকতে কেউ আছে কিনা।
দৌড়ে গেল বব।
মুসা আর কিশোর চলল একটা নারকেল কুঞ্জের দিকে, নারকেল কুড়াতে। খুব বেশি দূরে না কুঞ্জটা, কাছেই, জঙ্গলের ধারে গজিয়ে উঠেছে। কিন্তু বারো কদম যাওয়ার আগেই থেমে গেল ওরা, পড়িমরি করে ছুটে আসছে বব। উত্তেজিত চেহারা।
হুশিয়ার! চাপা গলায় বলল বব। হ্যামার আর চাব এদিকেই আসছে। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল ওমর। কোথায়? কদ্দূর?
ওই যে, পাথরের স্তূপটার ওধারে। এখান থেকে ঢিল মারলে গিয়ে মাথায় পড়বে। ঝোঁপের ধারে ঝুঁকে কি জানি খুঁজছে।
মরুক হারামজাদারা! নিষ্ফল আক্রোশে ফুসল ওমর। এখান দিয়ে আর যেতে পারব না, গেলেই দেখে ফেলবে। দুর্গে ফেরাই তো এক মহাসমস্যা হয়ে গেল। মুসা আর কিশোর ফিরে এসেছে, ওদের দিকে চেয়ে উল্টোদিকে হাত তুলে। বলল,

চলো, দেখি ওদিক দিয়ে যাওয়া যায় কিনা। নৌকার কাছাকাছি গিয়ে লুকিয়ে বসে থাকব। ওরা একটু সরলেই ভাগব।
আগে আগে চলল ওমর, পেছনে সারি দিয়ে অন্যেরা। প্রায় ছুটে ঢুকল জঙ্গলে। একটা জায়গায় কাটাঝোঁপ আর লিয়ানা সামান্য পাতলা। নাকি পথ করা হয়েছিল। কোন এক সময়, আবার লতা আর ঝোঁপ জন্মে ঘন হয়ে আসছে? কে পথ করল? ওরা জানে না, কয়েক মাস আগে হ্যামারের তাড়া খেয়ে এখান দিয়েই ঢুকেছিল। ববের বাবা, লুকিয়েছিল এদিককার জঙ্গলেই, পথটা তৈরি করেছিল তখন।
জঙ্গলের ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় এসে কিসে হোঁচট খেল ওমর। গাছের মত। লম্বা কিছু একটা, শেওলায় ঢাকা, পথ জুড়ে আড়াআড়ি পড়ে রয়েছে।
আরে, কি এটা? আপনমনেই বিড়বিড় করল ওমর। ঝুঁকে পরীক্ষা করল। খানিকটা জায়গার শেওলা সরিয়ে দেখেই সন্দেহ হলো। আরও অনেকখানি জায়গার শেওলা পরিষ্কার করল। ঝড়ে ভেঙে পড়া গাছ বলে তো মনে হচ্ছে না। মানুষের তৈরি না তো?
মানুষের তৈরিই, জাহাজের মাস্তুল, নিশ্চয়ই গ্যালিয়নের প্রধান মাস্তুল। ফিরে চাইল ওমর। তার দিকেই তাকিয়ে রয়েছে কিশোর, চোখাচোখি হতেই মাথা ঝোকাল। সে-ও বুঝতে পেরেছে। এগিয়ে আসতে গিয়ে পায়ে কাঁটা ফুটল। কিশোরের। উহ্ করে নিচু হয়ে কাঁটা খুলতে গিয়ে ভারসাম্য হারাল, থাবা দিয়ে। ওমরের কাধ ধরে ফেলল। তৈরি ছিল না ওমর, সে-ও ভারসাম্য হারাল। পড়ে যেতে শুরু করল সে-ও। একটা লতা ধরল। কিন্তু দুজন মানুষের ভার রাখতে পারল না সে লতা, ছিঁড়ে গেল। পড়ে গেল দুজনেই। তাদেরকে সাহায্য করতে লাফিয়ে এল মুসা আর বব।
অদ্ভুত একটা কাণ্ড ঘটল এই সময়। তীক্ষ্ণ চড়াৎ শব্দে ফেটে যেতে শুরু করল। যেন তলার মাটি।
আরে আরে, মাটি ফাঁক হয়ে যাচ্ছে? চেঁচিয়ে উঠল ওমর। হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি করে উঠে বসার চেষ্টা করল। পারল না। কিছু বলার জন্যে আবার মুখ খুলল, কিন্তু বলা আর হলো না। তার আগেই ভেঙে গেল নিচের তক্তা, গ্যালিয়নের শেওলায়। ঢাকা ডেকের কাঠ। ভাঙা গর্ত দিয়ে নিচে পড়ল ওমর।
বাকি তিনজনের ভারে তক্তা মড়মড় করে ভেঙে গিয়ে গর্ত আরও বড় হলো, পড়ল তারাও, আট-দশ ফুট নিচের কাঠের মেঝেতে। ওমরের ওপর পড়ল কিশোর, তাই ব্যথা বিশেষ পেল না। উহ-আহ করে উঠল অন্যেরা।
মুসা চেঁচিয়ে উঠল, গেছি রে, আল্লাহ, মারা গেছি!

সকলের আগে উঠে দাঁড়াল ওমর। হাঁপাচ্ছে। হলো কি? কাণ্ডটা কি হলো? দ্রুত তাকাল চারপাশে। পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই অনুমান করেছিল, দেখে আরও নিশ্চিত হলো এখন।
গোঁ-গাঁ করে, আরও নানারকম বিচিত্র শব্দ তুলে ককাতে ককাতে উঠে দাঁড়াল। অন্য তিনজন। কোমর ধরে বাঁকা হয়ে আল্লাহকে ডাকছে মুসা, বিড়বিড় করে কি যেন বলছে বব। কিশোর কিছু বলছে না। উঠে ওমরের মতই তাকিয়ে দেখছে। চারপাশে।
কোথায় এলাম রে, বাবা! উফ, কোমরটা বুঝি ভেঙেই গেল! বলি এলাম কোথায়? জবাব নেই কেন? এই, কিশোর… কনুই দিয়ে খোঁচা মারল মুসা গোয়েন্দাপ্রধানের পিঠে।
যা খুঁজছিলাম আমরা, জবাব দিল ওমর। হাত দিয়ে ঝেড়ে কাপড় থেকে শেওলা আর ময়লা পরিষ্কার করছে। জাহাজটার ভেতরেই পড়েছি…শশশ! হঠাৎ থেমে গেল সে, কান পাতল।
কথা শোনা যাচ্ছে, খুব কাছে। হ্যামার। স্পষ্ট শোনা গেল এখন তার কথা। আমি বলছি, শুনেছি শব্দ। এদিকেই কোথাও। মিনিটখানেক আগেও ছিল।
ঠোঁটে আঙুল চেপে ইশারায় সবাইকে চুপ থাকার নির্দেশ দিল ওমর।
নিচু হয়ে আস্তে করে মাসকেট তুলে নিল কিশোর, তার সঙ্গেই পড়েছে। বন্দুকটা। মুসারটাও পড়েছে, কিশোরের দেখাদেখি সে-ও তুলে নিল। তাকাল ওপর দিকে। ডেকের ভাঙা জায়গায় ফোকর হয়ে আছে, তবে পুরোপুরি দেখা যাচ্ছে না। ফাঁকটা, লতাপাতায় ঢেকে দিয়েছে, সবজেটে আলো আসছে ওখান দিয়ে।
হবে শুয়োর-টুয়োর কিংবা অন্য জানোয়ার, জোরাল গলা শোনা গেল ইমেট চাবের।
আমি বলছি কথা শুনেছি! হ্যামার বলল।
তাহলে আমাদের সাড়া পেয়ে পালিয়েছে। আর দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে? চলো, সরে যাই। জঙ্গলের ভেতর লুকিয়ে আমাদের দেখছে কিনা কে জানে? পালের। গোদাটার কাছে পিস্তল আছে। ম্যাবরির মত পিঠে গুলি খাওয়ার ইচ্ছে নেই আমার। চলো। যাবে কোথায় ওরা? কাল সুযোগমত ধরে ফেলব। আরে, চলো না। দেবে তো মেরে।
নিশ্চয়ই দ্বিধা করছে হ্যামার, কারণ পায়ের শব্দ শোনা গেল না তক্ষুণি।
কান পেতে রয়েছে নিচের শ্রোতারা। অবশেষে ফিরল ওপরের দুজন, ধীরে ধীরে চলে গেল, বোঝা গেল শব্দ শুনেই।
আরও কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর সঙ্গীদের দিকে ফিরে ফিসফিস করে বলল ওমর, গেছে। এই সুযোগে জাহাজটায় তল্লাশী চালিয়ে দেখি আমরা। কি

বলো?
ওমর আর তার দল জাহাজের যেখান দিয়ে পড়েছে, ববের বাবা সেখান দিয়ে পড়েনি, সে পড়েছিল স্যালুনের ছাত দিয়ে স্যালুনে। তখনকার দিকে জাহাজের স্যালুন তৈরি হত সাধারণত পূপের ওপর। ওমর আর তার তিন সঙ্গী পড়েছে। জাহাজের মাঝামাঝি জায়গায়।
ভেতরে কি কি আছে দেখায় মন দিল ওরা। এক জায়গায় পড়ে আছে কম্বলের তূপ, দীর্ঘ দিন স্যাঁতসেঁতে জায়গায় থেকে ছাতা পড়ে গেছে-সবুজ ছত্রাক। ওগুলোর কাছেই পড়ে আছে কাপড়ের তূপ, নষ্ট হয়ে গেছে সব ছাতা পড়ে। পচা গন্ধ ছড়াচ্ছে। দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত কিছু নেই। মরচে পড়া কিছু অস্ত্রশস্ত্র পড়ে আছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে, বোধহয় তাড়াহুড়ো করে যাওয়ার সময় ফেলে গিয়েছিল, নাবিকেরা। মূল্যবান কিছুই নেই।
এখানে গুপ্তধন নেই, জোরে কথা বলতে অস্বস্তি বোধ করছে ওমর, বিষণ্ন এই প্রাচীন পরিবেশ ভাল লাগছে না তার। মৃতের জগতে এসে হাজির হয়েছে যেন।
বেরিয়ে এল ওরা। নীরবে এগিয়ে চলল জাহাজের কোমর ধরে। পেরিয়ে এল বহু পুরানো কামান-ধুলো ময়লায় ঢাকা, কামানের গোলা, বারুদের পিপা-কয়েকটা আবার বারুদে বোঝাই, মোটা-শেকল, দড়ি, গাছের গুঁড়ি, খুঁটি, এমনি সব জিনিস। ওপরে জায়গায় জায়গায় চিড় ধরেছে। তক্তা, ফাটল, আবছা আলো আসছে সেসব পথে, সেই আলোয় কেমন যেন বিকট দেখাচ্ছে জিনিসগুলো, গা শিরশির করে।
গুপ্তধন ছাড়াই অনেক মূল্য জাহাজটার, বলল কিশোর, অ্যানটিক মূল্য। যে কোন যাদুঘর পেলে লুফে নেবে। এত পুরানো জাহাজ এত সংরক্ষিত অবস্থায় আর পাওয়া যায়নি। যাদুঘরে রাখলে দলে দলে আসবে দর্শক শুধু এটা দেখার জন্যেই। আমি শুনলে আমিও যেতাম। গুপ্তধন যদি না-ও পাই, বাড়ি ফিরে এই জাহাজের খবর দিলেই রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে যাব।
সাবধানে, খুব ধীরে ধীরে এগোচ্ছে ওরা দেখতে দেখতে, যেন যাদুঘরে। রয়েছে, কোন কিছুতে পা পড়লে কিংবা হাত দিলে যেন এখুনি হাঁ-হাঁ করে ছুটে আসবে প্রহরী।
পাথরের এক বিশাল বয়েম দেখাল ওমর, বোতলের গলাটা খুব সরু, মুখে পাথরের ছিপি আঁটা। গায়ে কালো কালিতে ইংরেজি বড় হাতের অক্ষরে লেখা রয়েছে: বেস্ট ওল্ড জ্যামাইকা। বোতলটার দিকে চেয়ে, ট্রেজার আইল্যাণ্ডে জলদস্যুদের গাওয়া সেই বিখ্যাত চরণটি সুর করে গেয়ে উঠল ওমর, ইয়ো হো হো, অ্যাণ্ড আ বটল অভ রাম। ভারি পরিবেশ হালকা করার চেষ্টা করল সে।

নিশ্চয়ই ভেতরে রয়েছে অনেক পুরানো মদ। বোতলটার দিকে চেয়ে মাথা ঝোঁকাল কিশোর, হ্যাঁ, তা ঠিক। তবে ওটা থেকে নিয়ে খেলে পরের চরণটাও সত্যি হয়ে যাবে: ড্রিংক অ্যাণ্ড ডেভিল হ্যাভ ডান ফর দ্য রেস্ট।
ওপরে ওঠার একটা সিঁড়ির গোড়ায় এসে থামল ওরা। ভালমত পরীক্ষা করে দেখল, ভার সইতে পারবে কিনা, তারপর পা দিল ওতে। বড় একটা ঘরে এসে, ঢুকল। এটা ক্যাপ্টেনের স্যালুন।
ছাতের প্রায় গোল একটা ফোকর দিয়ে আলো আসছে। ঠিক নিচেই জমে রয়েছে শুকনো পাতা, কুটো, ছেঁড়া শুকনো লতা আর শেওলা। আঙুল তুলে ফোকরটা দেখিয়ে বলল কিশোর, ওখান দিয়েই পড়েছিলেন ববের বাবা।
ববের চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠল।
ইয়াল্লা! ফিসফিস করে বলল ওমর, দেখো, দেখো! মাথা নাড়ছে আস্তে আস্তে, বিশ্বাস করতে পারছে না যেন।
অন্যেরা দেখল, নাড়া খেলো ওমরের মতই।
প্রচুর টাকা খরচ করে সাজানো হয়েছিল স্যালুনটা। দেয়ালের জায়গায় জায়গায় লাগানো রয়েছে সোনালি রঙের সুদৃশ্য প্রদীপদানি, তার ফাঁকে ফাঁকে নানারকম ছবি, সবই সাধুদের কিংবা ধর্মীয় কোন পবিত্র দৃশ্যের। অপরূপ কার্পেটে ঢাকা পুরো মেঝে, আর কি তার রঙ। উজ্জ্বল লাল আর নীলের মাঝে সোনালি আলপনা। দেয়ালের সঙ্গে লোহার চ্যাপ্টা দণ্ড দিয়ে আটকানো রয়েছে বড় বড় আলমারি, ঢেউয়ের দোলায় বা ঝড়ের ঝাঁকুনিতে যাতে স্থানচ্যুত না হতে পারে, সে জন্যে। আলমারির আঙটায় ঝুলছে বড় বড় তালা, বেশির ভাগই খোলা। সামনের দিকের দেয়াল ঘেঁষে রয়েছে ওয়ালনাট কাঠের মস্ত এক টেবিল, তাতে চমৎকার খোদাইয়ের কাজ। কিন্তু এসব দেখে নাড়া খায়নি দর্শকরা। তাদের চমকে দিয়েছে। একটা কঙ্কাল। উঁচু পিঠওয়ালা, জায়গায় জায়গায় তামার কাজ করা একটা ভারি চেয়ারে বসে টেবিলে ঝুঁকে পড়ে রয়েছে কঙ্কালটা।
খাইছে! ভয়ে ভয়ে বলল মুসা। জ্যান্ত মনে হচ্ছে! তার ভয়, এখুনি বুঝি, হ্যাল্লো, কেমন আছ, বলে হাত মেলাতে উঠে আসবে পোশাক পরা কঙ্কালটা।
আস্তে আস্তে কঙ্কালটার কাছে এগিয়ে গেল ওমর। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। চেহারা। বিকট ভঙ্গিতে দাঁত খিঁচিয়ে আছে যেন কঙ্কাল, কালো অক্ষিকোটর আরও ভয়ংকর করে তুলেছে চেহারাকে, দীর্ঘ এক মুহূর্ত সেদিকে তাকিয়ে রইল ওমর, পরনের কাপড়-চোপড়গুলো দেখল।
ওমরের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে কিশোর। ভালমত দেখে বলল, জাহাজটা স্প্যানিশ, সন্দেহ নেই, খুব আস্তেই বলেছে সে, কিন্তু অস্বাভাবিক এই নীরবতায় অনেক জোরালো হয়ে কথাটা কানে বাজল যেন, কিন্তু এই লোকটা স্প্যানিয়ার্ড

ছিল না। পোশাক দেখেছেন? জলদস্যুর। নিশ্চয়ই কোন অঘটন ঘটেছিল, ওর দলে বোধহয় ও-ই বেঁচেছিল শেষ অবধি, বলতে বলতেই হাত বাড়িয়ে টেবিলে পড়ে থাকা পিস্তলটা তুলে নিল সে। উল্টে পাল্টে রেখে ওমরের হাতে দিয়ে বলল, দেখুন তো! পিস্তল-বন্দুকের ব্যাপারে আমি আনাড়ি।
ভালমত নাড়াচাড়া করে দেখল পিস্তলটা ওমর, গন্ধ শুকল। গুলি নেই ভেতরে। মনে হয়…মনে হচ্ছে, কাঁপা কাঁপা হাতে কঙ্কালটাকে চেয়ারসুদ্ধ সামান্য সরাল সে, ঘোরাল নিজের দিকে। দেখো, দেখো!
সবাই গা ঘেঁষাঘেঁষি করে এল, ওমর কি দেখেছে দেখার জন্যে। রঙচটা পোশাকের পেটের কাছটায় চেপে রয়েছে কঙ্কালের ডান হাতের আঙুলগুলো। গোল। একটা ছিদ্র শার্টে, ছিদ্রের ধারটা পোড়া।
এদিক ওদিক তাকাচ্ছে ওমর, মেঝেতে চোখ পড়তেই চমকে উঠল। খোদা! জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট ভিজিয়ে নিল সে। এই পিস্তলের গুলিতেই মরেছে। আত্মহত্যা নয়তো? দেখো।
দেখল সবাই। কঙ্কালটার জুতোর চারপাশ ঘিরে কার্পেটে কালচে গাঢ় দাগ, শুকনো রক্ত ছাড়া আর কোন কিছুতেই ওই দাগ হতে পারে না।
মন খারাপ হয়ে যায়, না? অনেকখানি সামলে নিয়েছে ওমর। আবার আগের অবস্থায় সরিয়ে রাখল কঙ্কালটাকে। সরানোর সময় টুপ করে কি যেন পড়ল। মেঝেতে। কুড়িয়ে নিল ওটা, অন্যেরাও কৌতূহলী হয়ে ঝুঁকে এল দেখার জন্যে। গুলি, বলল ওমর। এটাই খুন করেছিল লোকটাকে। শরীরের ভেতরেই কোথাও আটকে ছিল, নড়াচড়ায় খসে পড়েছে। স্যুভনির রাখতে চাও, বব?
নাক-মুখ বাঁকিয়ে পিছিয়ে গেল বব। দুহাত নেড়ে বলল, না, দরকার নেই।
হেসে উঠল অন্যেরা। এতক্ষণের গুরুগম্ভীর পরিবেশ হালকা হয়ে গেল হঠাৎ করে।
পিস্তলটা কোমরের বেল্টে গুঁজে রাখল ওমর। রূপার মোমদানিটা দেখিয়ে বলল, কমপক্ষে দুশো পাউণ্ড হবে এখনকার বাজারে ওটার দাম। ড্রয়ারগুলোতে কি আছে, বলতে বলতেই টান দিয়ে টেবিলের সবচেয়ে ওপরের ড্রয়ারটা খুলে ফেলল। চামড়ায় বাঁধা একটা বই তুলে নিল ড্রয়ার থেকে। আস্তে করে কভার ওল্টাল, যেন ছিঁড়ে যাবে ভয় করছে। প্রথম পৃষ্ঠাটা পড়তে শুরু করল।
চেহারার ভাব বদলে যাচ্ছে ওমরের, দৃষ্টি বদলে যাচ্ছে, বইয়েব দিকে ঝুঁকে যাচ্ছে মাথা। বড় বড় হয়ে গেছে চোখ, হাতের আঙুল কাঁপছে। মুখ তুলে তাকাল। সে। সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে। কি আছে, এতে জানো? খসখসে হয়ে গেছে ওমরের কণ্ঠ। ভয়ঙ্কর এক খুনীর কথা, এই একটু আগে যার কথা

বলেছিলাম। লুই ডেকেইনি, যার অনেকগুলো নাম, লুই লা গ্রানডি, দি এস্টারমিনেটর, নিজেকেই একস্টারমিনেট করেছে, আত্মহত্যাই করেছে বোধহয়। হঠাৎ করেই বড় বেশি নীরব হয়ে গেল ঘরটা। ঠিক এমনি নীরবতা বিরাজ করেছিল তিনশো বছর আগে, ডেকেইনি গুলি খাওয়ার আগের মুহূর্তে।
লম্বা দম নিল ওমর। হাতের বইটা দেখিয়ে বলল, এটা ডেকেইনির লগবুক। দারুণ লাগবে পড়তে। নিশ্চয়ই লেখা আছে, কিভাবে, কখন কোন্ খুনটা করেছিল, কি কি করেছিল। ভাবছি, কত বীরত্বের গাথা লেখা আছে এতে? কত নিরীহ নাবিকের মৃত্যুর কাহিনী? দেখি তো, ডেকেইনি কিভাবে মারা গেছে... দ্রুত পাতা উল্টে চলল সে। লেখা যে পৃষ্ঠায় শেষ, সেটাতে এসে থামল। পড়তে শুরু করল জোরে জোরে:
...রাম শেষ, জাহাজে বিদ্রোহ চলছে, সবাই দ্বিধাগ্রস্ত। বউনের মোহরই এজন্যে দায়ী, নরকে পচে মরুক চোর হারামজাদা। বার বার এসে আমাকে চাপ দিচ্ছে নাবিকেরা, সমস্ত মোহর সাগরে ফেলে দিতে বলছে, কিন্তু আমি কি আর রাজি হই? মোহরটা অভিশপ্ত হলে ওরাও মরবে, মরুক আগে, আমি দেখি, তারপর যা করার করব।
বাতাস বাড়ছে আবার, পাল তোলার কেউ নেই। পাইকারী খুন, বিদ্রোহ, ঝড়, নীরবতা, পানির সমস্যা, তারপর আবার ঝড়ের সঙ্কেত। মনে হচ্ছে, শয়তান নিজে এসে হাত লাগিয়েছে, জাহাজে বাস করছে যেন সে, সবাইকে, সব কিছুকে ধ্বংস না করে ছাড়বে না। হারামজাদা বউন, নিজেও মরেছে, পোর্ট রয়ালের ফাঁসিকাঠে নিশ্চয়ই শেকলবাধা অবস্থায় পচে-গলে শেষ হচ্ছে এখন, আমাদেরকেও মেরে রেখে গেছে। ওর মোহরে ভর করেই যেন এসেছে শয়তান। সবাইকে শেষ করেছে, কেউ পাগল হয়ে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, হাঙরেরা খতম করেছে তাদের, কেউ ছুরি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে, বাকি রয়েছি আমি...
চুপ হয়ে গেল ওমর।
আর কিছু নেই? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
না।
ডেকেইনি এরপর কি করল, খুব জানতে ইচ্ছে করছে।
জানা যাবে না কোনদিনই। একটা ব্যাপার খেয়াল করেছ? বার বার বউনের মোহরের কথা উল্লেখ করেছে। বউনের অভিশপ্ত মোহর। দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। ডেকেইনির নাবিকেরা। বউন কে জানি না, আমেরিকায় ফিরে জ্যামাইকার পুরানো রেকর্ড ঘাটাঘাটি করলে হয়তো জানতে পারব। আমার ধারণা, বউনের মোহরই পড়ে ছিল এই টেবিলে...।
বাবা যেটা তুলে নিয়েছিল, বলে উঠল বব।

হ্যাঁ। কুসংস্কার নেই আমার, আগেই বলেছি। কিন্তু তবু কিছুতেই অবিশ্বাস করতে পারছি না, মোহরটার কিছু অশুভ ক্ষমতা আছে। যেখানে যার হাতেই গেছে, তারই ক্ষতি করেছে। যতক্ষণ আমাদের কাছে ছিল, একটা পর একটা বিপদে পড়েছি। ওটা হাতছাড়া হওয়ার পর থেকেই ভাগ্য ভাল হতে শুরু করেছে। অ্যালেন কিনি নিয়েছিল ওটা, তার অবস্থা দেখেছি আমরা। তারপর আমাদের কি দুরবস্থা। ববের কপাল ভাল, জ্যাকেটটা খুলে ফেলেছিল, নইলে সে-ও মরত। আশ্চর্য, জ্যাকেটটা এত ঝড়েও ভেসে গেল না, তীরে এসে পড়ল। কিশোর আর মুসা, তোমরা পেলে ওটা, মোহরটা নেয়ার একটু পরেই কি বিপদে পড়েছ, মরতে মরতে বেঁচ্ছে। ম্যাবরি নিল ওটা, গুলি খেলো আমার হাতে। আমার বিশ্বাস, ওই মোহরের জন্যেই শেষ হয়ে গেছে ডেকেইনি আর তার দলবল।

আরও অনেক মোহরের উল্লেখ করেছে ডেকেইনি, শান্তকণ্ঠে বলল কিশোর।

বলেছে, বলল ওমর, কিন্তু কেন বলেছে? কেন সব মোহর সাগরে ফেলে দিতে চাপ দিয়েছে নাবিকেরা? কারণ, তারা জানত, ওই মোহরের সঙ্গে বউনের মোহরটাও আছে। জানত না, ঠিক কোটা বউনের অভিশপ্ত মোহর। তাই জাহাজে যত মোহর ছিল, সব ফেলে দিতে চেয়েছে।

শেষ অবধি কি তাহলে সব মোহর ফেলে দিয়েছিল? নিজেকেই যেন প্রশ্ন করল কিশোর। নইলে গেল কোথায় ওগুলো?

আমার মনে হয় ফেলেনি, ওমর বলল। তাহলে বউনের মোহরটা থাকত না ডেকেইনির কাছে, সে নিজেও মরত না। মোহরগুলো আছে হয়তো জাহাজে, কিংবা কাছাকাছি কোথাও।

কিন্তু কোথায় আছে? ভুরু নাচাল মুসা।

সেটা বের করার জন্যেই তো এসেছি আমরা, বলল কিশোর। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে শুরু করেছে সে। আমার মনে হয় মোহর লুকিয়ে রেখে জায়গাটার ম্যাপ তৈরি করে ডেকেইনি, তারপরই কোনভাবে মারা যায়। তার আঁকা আসল ম্যাপটা নেই এখন আমার কাছে, তবে নকলটা আছে, আর কোন কোন জায়গা বদল করেছি, সেটাও মনে আছে আমার। দেখি রহস্য ভেদ করা যায় কিনা। পকেট থেকে নকল ম্যাপটা বের করল সে। একটা কলম দরকার, বলেই চোখ পড়ল। টেবিলের ওপর। এগিয়ে গিয়ে তুলে নিল পালকের কলমটা, যেটা দিয়ে লিখেছিল ডেকেইনি। ছাতের ফোকর দিয়ে বাইরে তাকাল, আলো কমে গেছে। বেরোনো দরকার। আর, পনেরো মিনিটেই অন্ধকার হয়ে যাবে। খুব কাছাকাছি না থাকলে আজ আর খুঁজে বের করা যাবে না মোহর, সময় নেই। তাড়াহুড়ো করে দেখে নিই একবার। কলম আর ম্যাপ টেবিলে রেখে দিয়ে কাজে লেগে গেল সে।

টেব্রিলের বাকি ড্রয়ারগুলো খুলে দেখল কিশোর। বেশ কিছু জিনিস রয়েছে, তার মধ্যে তিনটে জিনিস মনোযোগ আকর্ষণ করল। তার একটা, কালো এক টুকরো কাপড়। সুন্দরভাবে ভাজ করা। মনে হলো টেবিলক্লথ। ড্রয়ারটা লাগিয়ে দিল কিশোর, হঠাৎ কি মনে পড়তেই টেনে আবার খুলল। কাপড়ের এক কোণ ধরে বের করে এনে ঝাঁকি দিয়ে খুলল পুরোটা, দুহাতে ধরে ছড়াল। কালো একটা পতাকা, মাঝখানে মানুষের খুলির তলায় মানুষের হাড়ের ক্রসচিহ্ন-সাদা কাপড় কেটে সেলাই করে লাগানো হয়েছে। একটা হাড়ের নিচে লেখা বড় হাতের এল, আরেকটার নিচে ডি।

ভাগ্যের কি পরিহাস, বিড়বিড় করল ওমর। যে কঙ্কালের চিহ্ন উড়িয়ে হাজার হাজার মানুষকে খুন করেছে সে, সেই কঙ্কাল হয়ে নিজেই বসে আছে এখন। চেয়ারে; তার কঙ্কালখচিত পতাকার কাছেই। মুহূর্তের জন্যেও এখন এই দৃশ্যটা যদি দেখতে পেত ডেকেইনি।

পতাকাটা আবার ভাজ করে ববের দিকে ছুঁড়ে দিল কিশোর। রেখে দাও, চমৎকার ট্রফি। তুমি রাখতে না চাইলে পরে আমাকে দিয়ে দিয়ো।

আরেক ড্রয়ারে পাওয়া গেল খুব সুন্দর একটা চুনি বসানো আঙটি।

দেখি তো, হাত বাড়াল ওমর। আঙটিটা নিয়ে দেখতে লাগল ঘুরিয়ে ফিরিয়ে।

অন্য আরেক ড্রয়ারে পাওয়া গেল শখানেক রূপার মুদ্রা। একটা তুলে নিয়ে দেখে বলল কিশোর, পিসেস অভ এইট। মুসা, একটা ব্যাগ-ট্যাগ পাও নাকি দেখো তো। নিয়েই যাই এগুলো। হ্যামারের হাতে পড়লে আর ফেরত পাওয়া যাবে না। আমরা যেমন দেখেছি, ওরাও দেখে ফেলতে পারে জাহাজটা।

এরপর সবাই মিলে খুঁজল পুরো ঘর। প্রতিটি আলমারি খুঁজে দেখল। মোহর মিলল না কোথাও। রয়েছে গাদা গাদা সিল্ক, সাটিন আর মিহি সুতার কাপড়, পোকায় কেটে নষ্ট করে দিয়েছে। জাহাজের খোলে ঢুকে, খোঁজাখুঁজি করল। মোহর পাওয়া গেল না, তবে কয়েক পিপা ছাতা পড়া চিনি, কফি আর ময়দা পেল।

অনেক জায়গা খোঁজার বাকি রয়ে গেল, থাকারও ইচ্ছে আছে ওদের। কিন্তু থেকে লাভ নেই। অন্ধকার হয়ে গেছে।

আলো ছাড়া হবে না, বলল ওমর।

আলো থাকলেও রাতে থাকছি না আমি এখানে, জোরে মাথা নাড়ল মুসা। লুই ডেকেইনির ভূত ঠিক এসে ঘাড় মটকাবে।

মুসার বলার ধরনে হেসে ফেলল সবাই।

এই, ওমর ভাই, আবার বলল মুসা, খিদে পায়নি আপনার? চলুন না, বেরোই।

হ্যাঁ, চলো যাই। সকালে আবার আসব।

কিন্তু যত সহজে বলে ফেলল, তত সহজে বেরোনো গেল না। উঠবে কিভাবে? ওমরের কাঁধে দাঁড়িয়ে ফোকরের ধার ধরে দোলা দিয়ে ওঠার চেষ্টা করল মুসা, তক্তা ভেঙে ধুড়ম করে পড়ল আবার নিচে, সবার ভয় হলো, স্যালুনের মেঝে ভেঙে না। খোলে পড়ে যায়। ওভাবে বেরোনোর চেষ্টা বাদ দিতে হলো। একা বেরোতে কতখানি কষ্ট হয়েছিল ববের বাবার, উপলব্ধি করল ওরা। মনে পড়ল, জাহাজের খোল কেটে বেরিয়েছিল কলিনস।

খোঁজাখুঁজি করতেই ফোকরটা পাওয়া গেল, জাহাজের সামনের গলুইয়ের নিচে। হাতে হাতে ট্রফিগুলো নিয়ে বেরিয়ে এল ওরা। বিষণ্ন অতীত ছেড়ে বেরিয়ে এল যেন বর্তমান পৃথিবীর উজ্জ্বল তারাখচিত আকাশের নিচে।

যেভাবে রেখে গিয়েছিল, তেমনিই রয়েছে নৌকাটা। পানিতে নামিয়ে তাতে চড়ে বসল সবাই। ফিরে এল উপদ্বীপে।

কাল খুব সকালে বেরোব, যেতে যেতে বলল ওমর। নারকেলের মালায় নারকেলের পানি, শক্ত শুকনো খাবার গলায় আটকে গেলে সেই পানি দিয়ে নামিয়ে নিচ্ছে। মোহর খোঁজার আগে এই দুর্গটাকে দুর্ভেদ্য করে নিতে হবে। প্রতিরোধ যাতে করতে পারি, সেই ব্যবস্থা করতে হবে। বেশিদিন লুকিয়ে থাকতে পারব না। এখানে, এক সময় দেখে ফেলবেই হ্যামার আর ইমেট চাব, জেনে যাবে কোথায়। আছি আমরা। হয়তো বারডুও ফিরে আসবে। কি করবে তখন ব্যাটারা? আমি হলে, দ্বীপের প্রান্তে এসে পাথরের স্তূপের আড়ালে বসে থাকতাম, যাতে উপদ্বীপ থেকে কেউ বেরোতে না পারে। ওরাও যদি তাই করে? আমি হলে অবশ্য দেখামাত্র গুলি করতাম না, কিন্তু ওরা করবে।

কি করব আমরা কাল সকালে, বললেন না? শুকনো মাংস চিবাতে চিবাতে বলল মুসা।

প্রচুর নারকেল এনে জমিয়ে ফেলতে হবে। বারুদ আনতে হবে জাহাজ থেকে, লড়াই লেগে গেলে তখন অনেক বারুদের দরকার পড়বে। আর আজ রাত থেকেই পাহারা দিতে হবে আমাদের।

খাওয়া শেষ হলো। প্রথমে ববকে পাহারায় রাখার সিদ্ধান্ত নিল ওরা। দুঘণ্টা পর এসে মুসাকে তুলে দেবে সে। এমনি করে একজনের পর একজন পাহারা দিয়ে রাতটা পার করে দেবে।

ম্যাপটা ভালমত দেখা দরকার, বলল কিশোর।

এখনই? বলল ওমর। সকালে দেখলে হয় না? খামোকা মোম জ্বালিয়ে লাভ কি?

ভাগ্য ভাল, আমাদের জিনিস আবার ছিনিয়ে আনতে পেরেছি হ্যামারের কাছ থেকে। কিন্তু তা না হলেও কি অন্ধকারে থাকতাম? এত নারকেল থাকতে? হাসল। কিশোর।

আলোর অভাব হবে না। পকেট থেকে ম্যাপটা বের করে আলোর সামনে বিছাল সে। জাহাজ থেকে পালকের কলম, কালির দোয়াত নিয়ে এসেছে। কালি শুকিয়ে গেছে, কিন্তু তাতে সামান্য পানি ঢেলে নিতেই আবার কালি হয়ে গেল। পাতলা কালি, তবে কাজ চলবে।

আরেকটা ম্যাপ এঁকে ফেলি, বলল কিশোর। ডেকেইনির লগবুক থেকে একটা শাদা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে তাতে আরেকটা ম্যাপ আঁকল। ডেকেইনির আঁকা ম্যাপটার মতই হলো অবিকল, নকলটার মত ভুল জায়গায় চিহ্ন দিল না, যতদূর সম্ভব সঠিক জায়গায় দেয়ার চেষ্টা করল। সবই আঁকল ঠিকঠাক, কিন্তু কোনটা কিসের চিহ্ন জানে না। এক দুর্বোধ্য রহস্য মনে হলো। অন্য তিনজনের দিকে চেয়ে বলল, কিছু বোঝা যাচ্ছে?

তুমি বুঝেছ? মুসা প্রশ্ন করল।

না।

কিশোর পাশা যে রহস্যের মীমাংসা করতে পারেনি, আমরা তার কি কচুটা বুঝব? আমি ঘুমাতে যাচ্ছি, তুমি সমাধান করে জানিও, উঠল মুসা, কম্বল বিছাবে।

আরে দাঁড়াও, কাজ আছে, হাত তুলল কিশোর।

কি? ঘুরে তাকাল মুসা।

ওই দুই ভদ্রলোক, ঘরের কোণ দেখাল কিশোর। ওদেরকে ঘরে রেখে ঘুমাতে অস্বস্তি লাগবে। চলো, সাগরে ফেলে দিয়ে আসি।

মাপ চাই, ভাই, আমি পারব না, হাতজোড় করল মুসা।

আরে দূর, এসো, হাত ধরে টানল কিশোর, কঙ্কালই তো, ভয় কি? পাথরের যেমন প্রাণ নেই, ওগুলোরও নেই।

কিন্তু কঙ্কাল দুটো বের করে ফেলার সময় দেখা গেল, মুসার চেয়ে কম ভয় পাচ্ছে না কিশোর, কম অস্বস্তি বোধ করছে না। হেঁইও হেইও করে কঙ্কাল দুটো পানিতে ফেলে দিল ওরা।

বব, তুমি থাকো, বলল ওমর। দুঘণ্টা পর এসে মুসাকে ডেকে দিয়ো।

কিন্তু সময় বুঝব কি করে? প্রশ্ন তুলল বব। ঘড়ি কই?

অনুমান, কিশোর বলল।

ওই যে, ওদিকে নারকেল গাছগুলো দেখেছ? চাঁদ যখন গাছগুলোর মাথায় উঠবে, ধরে নেবে, দুঘণ্টা হয়েছে। ও হ্যাঁ, বন্দুক রেখো সঙ্গে।

আই, আই, মিস্টার ট্রেলনী, স্যার, ট্রেজার আইল্যাণ্ডের জিম হকিনসের সংলাপ ধার নিল বব। পাহারা দিতে চলল।

সময় যেন কাটতেই চাইছে না ববের। অনেকক্ষণ পর্যন্ত নিচ থেকে কথাবার্তা শোনা গেল, কমতে কমতে থেমে গেল এক সময়। নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছে।

গ্রীষ্মমণ্ডলের রাত, কেমন যেন শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ, অসহ্য নীরবতা। সামান্যতম শব্দ নেই কোথাও। পাথরে ঢেউ আছড়ে পড়ার মৃদু ছপছপ শব্দ ছিল, সেটাও থেমে গেছে। নারকেলের পাতা স্থির, তারাগুলো অস্বাভাবিক উজ্জ্বল, এত কাছে মনে হচ্ছে, যেন হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে। আকাশ যেন মস্ত এক গম্বুজ, ওখান থেকে সুতো দিয়ে ঝুলিয়ে দিয়েছে কেউ তারাগুলো। দিগন্তে উঁকি দিল লালচে চাঁদ, ধীরে ধীরে উঠতে শুরু করল ওপরে, রূপালী করে দিল সাগরকে। রহস্যময় হয়ে উঠল দ্বীপটা। সাদা। বালির সৈকত আর মাঝে মাঝে পাথরের স্তূপকে দেখে মনে হচ্ছে, সাগরের পানি থেকে মাথা তুলেছে কোন অজানা দানব।

অবাক হয়ে প্রকৃতির এই রূপ দেখছে আর ভাবছে বব। পাশে রাখা বন্দুকের গায়ে হাত বোলাল। ঠিক এখানটায় এমনিভাবে বন্দুক নিয়ে বসে দূর অতীতে এমনি কোন রাতে নিশ্চয়ই পাহারায় ছিল কোন জলদস্যু। যে দুটো কঙ্কাল ফেলে দিয়ে এসেছে খানিক আগে, তাদেরও কেউ হতে পারে। আচ্ছা, ওদেরই মত ববও তো একদিন কঙ্কালে পরিণত হবে, সেদিনও কি ঠিক এমনি থাকবে প্রকৃতি? এমনি করে চাঁদ উঠবে, জ্যোৎস্না বিলাবে, আকাশে জ্বলবে তারা? এমনিই থাকবে সব, জানে বব, কিন্তু বিশ্বাস করতে মন চায় না। এই সুন্দর পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাবে সে একদিন, মানুষের মন থেকে চিরতরে মুছে যাবে তার স্মৃতি, ভাবতেই যেন কেমন লাগে। কোন দিন মনে হয়নি, কিন্তু এই পরিবেশে আজ হঠাৎ করেই মনে হলো, জীবনের কোন অর্থ নেই। এই জন্মানো, বেঁচে থাকা, তারপর একদিন মরে যাওয়া, এর কোন মানেই নেই।

আচ্ছা, এই দুর্গে কারা ছিল? ডেকেইনির লোক? নাকি দিগ্বিজয়ী মহানাবিক ড্রেক? জানে না বব, হয়তো কেউই জানে না, জানার কোন উপায় নেই। আহা, কি রোমাঞ্চকর দিনই না কাটিয়েছে তারা! মরে গেছে ঠিক, কিন্তু উপভোগ করে গেছে জীবনটা। আফসোস হলো ববের, কেন আরও দুতিনশো বছর আগে জন্মাল না? ড্রেকের নাবিকদলের একজন হতে বড় ইচ্ছে করে। লুই ডেকেইনির দলের কেউ হতেও আপত্তি থাকত না তার। সেই তো জন্মাল, কিন্তু এমন এক যুগে, যখন ভাত কাপড়ের চিন্তা করতেই সময় শেষ। দুত্তোর, জন্মানোর নিকুচি করি, লাথি মারি এই বেঁচে থাকার কপালে!-বিড়বিড় করল সে। ভাগ্যিস কিশোর পাশার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, নইলে এই কদিনের অভিযানের স্বাদটুকুও পাওয়া হত না।

প্রচণ্ড হতাশা গ্রাস করল, তাকে। কপালগুণে মোহর যদি পায়, বড়লোক হয়তো হবে, খাওয়া-পরার ভাবনা হয়তো থাকবে না, কিন্তু লুই ডেকেইনির মত জলদস্যু কি আর হতে পারবে? পাবে সেই রোমাঞ্চের স্বাদ? হতে পারবে ড্রেকের মত দিগ্বিজয়ী নাবিক? পাবে না, কোনদিনই পারবে না, কারণ সেই যুগ আর নেই।

চিরতরে শেষ হয়ে গেছে। কাঠের জাহাজে পাল তুলে অজানার উদ্দেশে বেরোনোর অবকাশ আর নেই। ববের ধারণা, মানুষ নিজেই নিজের সর্বনাশ করেছে ইঞ্জিন আবিষ্কার করে, লোহা আর ইস্পাত দিয়ে জাহাজ তৈরি করতে শিখে। মস্ত চিমনি দিয়ে ভকভক করে বেরোয় কালো ধোয়া, দূর, এ কোন দৃশ্য হলো নাকি? সাদা পাল ঘিরে চক্কর দেয়া উড়ন্ত সী-গাল, সফেদ অ্যালট্রেস, কোথায় সেই ছবি, আর কোথায় কালো...মাঝে মাঝে গেঁউউউউ করে কান ঝালাপালা করে দিয়ে বেজে ওঠা লোহার জাহাজের বিরক্তিকর বাঁশি...বাতাসে থাবা দিয়ে বিরক্তিকর শব্দ সরানোর চেষ্টা করল। যেন বব।

কিন্তু এই মুহূর্তে জীবন খুব একটা একঘেয়ে নয় ববের জন্যে, অনেকের চেয়ে সে ভাগ্যবান। দারুণ রোমাঞ্চকর এক অভিযানে এসেছে। আর সত্যিই যদি গুপ্তধন পেয়ে যায় তাহলে তো এক লাফে বড়লোক। গুপ্তধন, মোহর!-শব্দ দুটো উচ্চারণ করল সে বিড়বিড় করে। কোথায় আছে ওগুলো? ম্যাপটার কথা ভাবল। মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারেনি। আচ্ছা, মোহরটায় কোন সঙ্কেত নেই তো? যেটা গর্তে ফেলে দিয়েছে ওমর ভাই? যেটাকে অভিশপ্ত ভাবা হচ্ছে।

যতই ভাবল বব, মনে হলো, উচিত হয়নি, মোটেই উচিত হয়নি ফেলে দেয়া। ভালমত দেখা দরকার ছিল। হয়তো ওতেই রয়েছে গুপ্তধনের নিশানা, আঁচড় কেটে বা অন্য কোনভাবে চিহ্ন দিয়ে রেখেছে হয়তো ডেকেইনি।

মোহরটা পরীক্ষা করে দেখার ইচ্ছে প্রবল হয়ে উঠল ববের। খুব বেশি দূরে তো নয়। নৌকা নিয়ে যাবে আর আসবে, বড় জোর মিনিট দশেক লাগবে। এটুকু সময়ে কিছু ঘটবে না, নিজেকে বোঝাল বব। পাহারা ছেড়ে যাওয়া মোটেই উচিত হবে, এটাও জানে। কিন্তু সব কিছুই এত বেশি শান্ত, অঘটন ঘটার আশঙ্কা মনে আসতেই চাইছে না।

অবশেষে মনস্থির করে নিল সে, যাবে। পাহারা ছেড়ে যাচ্ছে বলে একটা অন্যায়বোধ পীড়া দিচ্ছে মনকে, জোর করে দমন করল সেটা। দ্রুত ছাত থেকে নেমে ঘরে ঢুকল। সবাই গভীর ঘুমে অচেতন। শান্ত পরিবেশ। পা টিপে টিপে একধারের দেয়ালের কাছে এসে ঠেস দিয়ে রাখল রাইফেলটা, হাতড়ে বের করল তার পিস্তল; কোমরে গুঁজে বেরিয়ে এল চত্বরে। সিঁড়ি বেয়ে নেমে নৌকা খুলে সাগরে ভাসাল। রওনা হলো দ্বীপের দিকে।

বিকেলে যেখান দিয়ে উঠেছিল, সেখান দিয়েই উঠল বব। পাথরের খাঁজে নৌকা রেখে পাহাড়ে উঠতে শুরু করল। ওপরে উঠে নিচে তাকিয়ে দেখল একবার। নির্জন, কোন সাড়াশব্দ নেই। কেন জানি মনে হলো তার, এমনি নীরবতা বিরাজ করছিল তখন গ্যালিয়নের ভেতর, লুই ডেকেইনির কঙ্কালটা দেখার পর। তার প্রেতাত্মা ঘোরাফেরা করছে না তো? দূর, কি যা-তা ভাবছে? নিজেকে ধমক দিল।

সে। কিন্তু ভয় তাড়াতে পারল না মন থেকে। আবার তাকাল এদিক ওদিক। অস্বস্তি বোধ করছে। আবার বোঝাল মনকে, মানুষ মরে গেলে আর কিছু করতে পারে না। ভূত-ফুত সব বাজে কথা। গর্তটার কাছে এসে দাঁড়াল সে, ম্যাবরির ভয়ে যেটাতে লুকিয়েছিল, মোহরটা যেটাতে ফেলেছে ওমর, সেই গর্ত। আবার ফিরে তাকাল। চাঁদের আলোয় রহস্যময় মনে হচ্ছে বনভূমিকে, কিছু কিছু ছায়াকে মানুষের ছায়া বলে ভুল হচ্ছে। হ্যামার আর ইমেট চাব লুকিয়ে থেকে তাকে দেখছে না তো?

ভীষণ দুরুদুরু করছে বুক। গর্তে নেমে পড়ল বব। আশ্চর্য, মাটিতে হাত দিতেই পেয়ে গেল মোহরটা। হাতে নিয়েই মনে পড়ল ওটার অশুভ ক্ষমতার কথা। কাঁপা হাতে মোহরটা নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল সে। গর্তের বাইরে চ্যাপ্টা একটা পাথরে মোহরটা রেখে দুহাতে ভর দিয়ে গর্ত থেকে বেরোতে গেল। কিন্তু গর্তের দেয়ালে বেরিয়ে থাকা একটা পাথরে আটকে গেল পিস্তল, হ্যাঁচকা টানে আবার নেমে আসতে বাধ্য হলো বব। বেল্ট থেকে খুলে গর্তে পড়ে গেল পিস্তল। যতই তাড়াহুড়ো করতে চায় আরও দেরি হয়ে যায়। বসে পড়ে পিস্তলটা হাতড়ে খুঁজতে শুরু করল।

হাতে ঠেকল গোল একটা কিছু, পিস্তল নয়। জিনিসটার আকার আর ওজন চমকে দিল তাকে। কিন্তু ডাবলুনটা তো রেখে দিয়েছে বাইরে, পাথরের ওপর। তাহলে এটা কি আরেকটা? উঠে মুখ বাড়িয়ে দেখল, ডাবলুনটা আগের জায়গায়ই আছে। কিন্তু হাতেও তো আরেকটা। চাঁদের আলোয় চমকাচ্ছে, ভুল হতেই পারে। না। তারমানে দুটো হলো? অসম্ভব...বিশ্বাস করতে পারছে না সে। উত্তেজনায় কাঁপছে, কপাল বেয়ে দরদর করে ঝরছে ঘাম। ভূতের ভয় ফিরে এল আবার মনে। নিশ্চয়ই ডেকেইনির ভূতই এক কাণ্ড করছে, তাকে বোকা বানানোর জন্যে। কেন যে এসেছিল মরতে? কেন এসেছিল অভিশপ্ত মোহরের লোভে...

আরেকটা ভাবনা মাথায় আসতেই চকিতে দূর হয়ে গেল ভূতের ভয়। ঝট করে বসে পড়ে আঙুল দিয়ে খামচে মাটি সরাতে শুরু করল। এক গাদা গোল জিনিস হাতে ঠেকল, গলা শুকিয়ে গেল তার। বেড়ে গেল বুকের দুরুদুরু । দম বন্ধ হয়ে যাবে যেন। গর্তের দেয়ালে হেলান না দিয়ে আর পারল না, এক মুঠো গোল জিনিস তুলে নিয়ে দেখল। শব্দ শুনল। না, কোন ভুল নেই। মোহরই। পেয়েছে। পেয়ে গেছে সে ডেকেইনির গুপ্তধন! মোহর! মোহর! চেঁচিয়ে উঠল সে নিজের অজান্তেই। ভুলে গেল পিস্তলের কথা, ভুলে গেল কোথায় রয়েছে। বসে পড়ে আবার মাটি খুঁড়তে শুরু করল আঙুল দিয়ে। আরও মোহর ঠেকল হাতে। হাতে জোরে কামড় মারল সে। জেগেই আছে, ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে না।

জামা পাজামায় পকেট নেই, মোহর নিয়ে যেতে পারবে না, যেখানে ছিল সেখানেই ওগুলো আবার ফেলে বেরোতে যাবে, এই সময় কানে এল মানুষের কথা। ধড়াস করে এত জোরে লাফ মারল হৃৎপিণ্ড, ববের মনে হলো বুকের খাঁচা ভেঙে বেরিয়ে যাচ্ছে। পরিষ্কার চিনতে পারছে কণ্ঠস্বর। হ্যামার।
এদিকেই কোথাও লুকিয়েছে ব্যাটারা, তখনও বলেছি, এখনও বলছি, তিক্ত শোনাল হ্যামারের কণ্ঠ।
তো হলো কি তাতে? ইমেট চাব বলল। ঘাবড়ানোর কি আছে? কাল বেড় দিয়ে ধরব ব্যাটাদের!
ওরা কি করছে যদি জানতে পারতাম, বলল হ্যামার। পরক্ষণেই স্বর বদলে গেল। আরে, ওটা কি?
দ্রুত এগিয়ে এল দুই জোড়া পায়ের শব্দ, শুনতে পেল বব। গর্তের পারে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। ভয়ে কুঁকড়ে গেল সে।
আরে, মোহর, ইমেট চাবের বিস্মিত কণ্ঠ, এটা এল কোথা থেকে?
নিশ্চয়ই মোহরগুলো খুঁজে পেয়েছে ব্যাটারা। নেয়ার সময় পড়ে গেছে কোনভাবে।
না, ম্যাবরির পকেট থেকে পড়েছে। ওর কাছে একটা মোহর ছিল, মনে আছে? এখানেই পড়েছিল সে, এখান থেকেই তুলে নিয়ে গেছি। ওই যে, রক্ত। মোহরটা রাখতে পারল না বেচারা। আর দেখেই বা কি হবে? যেখানে গেছে, ওখানে মোহর কোন কাজে লাগবে না।
হাত সরাও, ইমেট, আমি আগে দেখেছি, ওটা আমার, কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠল হ্যামার।
কি হলো, বিগ? এটা কি ধরনের ব্যবহার? একটা মোহরই তো, এটার জন্যে …
দাও বলছি ওটা! হ্যামারের গর্জনে গর্তে থেকেও কেঁপে উঠল বব।
নইলে কি করবে? পাল্টা গর্জন করে উঠল ইমেট চাব। ও ছুরি…ছুরির ভয়। দেখাচ্ছ… কথা বন্ধ হয়ে গেল তার আচমকা, বিচ্ছিরি ঘড়ঘড়ানি শোনা গেল। ধড়াস করে মাটিতে আছড়ে পড়ল ভারি কিছু, পাথরে ঘষাঘষির শব্দ হলো কয়েক মুহূর্ত, তারপর চুপ।
জোরে ঠোঁট কামড়ে ধরল বব, অনেক কষ্টে সামলাল নিজেকে, চিৎকার করে উঠেছিল প্রায়। মনের পর্দায় পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ছবি, গর্তের বাইরে কি ঘটেছে।
আমার সঙ্গে ইতরামি…আমার সঙ্গে… ভয়ংকর কণ্ঠে বিড়বিড় করল হ্যামার। হুঁহ্!
পায়ের শব্দ চলে গেল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল বব। কিন্তু আরও মিনিট দশেক বাইরে বেরোনোর সাহস হলো না। কুঁকড়ে বসে থাকতে থাকতে হাতে-পায়ে খিল

ধরার অবস্থা। অবশেষে আস্তে করে সোজা হয়ে উঁকি দিল গর্তের বাইরে। এক নজরই যথেষ্ট, দ্বিতীয় বার আর ইমেট চাবের গলাকাটা লাশটার দিকে চাওয়ার সাহস হলো না।
মোহর নেয়ার জন্যে অপেক্ষা করল না বব, পিস্তলটা খুঁজে বের করার জন্যেও থামল না আর। এক লাফে বেরিয়ে এসে সোজা দৌড় দিল নৌকার দিকে। বার দুই হোঁচট খেয়ে পড়তে পড়তে কোনমতে সামলে নিল, পায়ের চামড়া ছড়ে গেল ধারাল পাথরে লেগে, কেয়ারই করল না। নৌকার ওপর এসে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল। কাঁপা আঙুলে কিভাবে দড়ি খুলল, বলতে পারবে না, নৌকাটা এনে ফেলল পানিতে। লাফিয়ে উঠে বসে দাঁড় বেয়ে তীর বেগে ছুটল। ঘোরের মধ্যে যেন পেরিয়ে এল প্রাণীটা, নৌকা বাঁধল ঘাটে, একেক লাফে দুটো তিনটে করে সিঁড়ি ডিঙিয়ে উঠে এল ওপরে।
থামো! কে? বরফ-শীতল ওমরের কণ্ঠ।
আ-আমি, বব, হাঁপাচ্ছে বব।
উঠে এসো।
চত্বরে উঠে এলো বব। ছায়া থেকে বেরিয়ে এল ওমর। অন্য দুজন তার পেছনে।
কোথায় গিয়েছিলে? কঠিন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল ওমর।
দ্বীপে।...আ-আমি পেয়েছি... হাঁপানোর জন্যে কথা বলতে পারছে না।
ধারাল ছুরির মত কেটে বসল যেন ওমরের কথা, কি পেয়েছ সেটা পরের কথা। পাহারা ছেড়ে গিয়েছ কেন?
কিন্তু...
কোন কৈফিয়ত শুনতে চাই না। গেছ কিনা, বলো আগে।
হ্যাঁ।
অন্যায় করেছ?
হ্যাঁ।
আর কক্ষনো করবে না। ভাগ্য ভাল, কিছু ঘটেনি। কিন্তু ঘটতে পারত। সবাইকে বিপদে ফেলে দিতে পারতে।
সরি! আর এমন হবে না!
ঠিক আছে, কিন্তু এটা করলে কেন?
ডাবলুনটা আনতে গিয়েছিলাম।
কী? ধাক্কা খেয়ে যেন পিছিয়ে এল ওমর। সেই অভিশপ্ত মোহর?
হ্যাঁ। ভাবলাম...
ভাবাভাবি পরের কথা। মোহরটা এনেছ? জলদি ফেলো, ছুঁড়ে ফেলো পানিতে।
আনতে পারিনি। হ্যামার নিয়ে গেছে।

কি করে জানলে?
আমি গর্ত থেকে তুলে একটা পাথরে রেখেছিলাম। একটু পরেই হ্যামার আর ইমেট চাব এল। মোহরটা দেখে এ বলে আমি নেব, ও বলে আমি নেব। কথা কাটাকাটি শেষে ইমেট চাবের গলা ফাঁক করে দিল হ্যামার। মোহরটা নিয়ে চলে গেল।
মুসা আর কিশোরের দিকে তাকাল ওমর। কি বলেছিলাম, মোহরটা অভিশপ্ত? বদলে গেছে তার কণ্ঠস্বর, ফাসফেঁসে হয়ে উঠেছে। বউনের মোহরের জন্যে আরেকজন মরল। হ্যামার নিয়ে গিয়ে কপালে দুর্গতি টেনে আনল আর কি।
ববের দিকে ফিরল আবার সে। এতক্ষণ কি করলে?
গর্তে বসেছিলাম। আরও অনেকগুলো পেয়েছি।
কি পেয়েছ?
মোহর, বোম ফাটাল যেন বব।
চুপ হয়ে গেল সবাই।
আরও মোহর পেয়েছ? বলল অবশেষে কিশোর।
হ্যাঁ।
কতগুলো?
কয়েকশো হতে পারে, কিংবা কয়েক হাজার, হাত উল্টাল বব।
শিওর? ওমর বলল।
শিওর। হাতে নিয়ে দেখেছি।
ঘুমিয়ে পড়োনি তো? ওমরের কণ্ঠে স্পষ্ট সন্দেহ। স্বপ্ন দেখেছ?
এক পা সামনে বাড়ল বব। চেঁচিয়ে উঠল, স্বপ্ন? মোটেই না। বললাম তো, হাতে নিয়ে দেখেছি।
এগিয়ে এল কিশোর। কোথায় পেলে বুব?
ওমর ভাই যে গর্তে ডাবলুনটা ফেলে দিয়েছিল। ম্যাবরির তাড়া খেয়ে ওটাতেই লুকিয়েছিলাম।
নাহ্, বিশ্বাস হচ্ছে না! গাল চুলকাল ওমর, মাথা নাড়ল আনমনে। এত সাধারণ একটা গর্তে মোহর লুকিয়েছিল ডেকেইনি?
হ্যাঁ, তাই, প্রায় চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। এখন বুঝতে পারছি। ম্যাপে পাহাড় বোঝানো আছে, আঁকাবাকা লম্বা দাগ দিয়ে, দাগের এক জায়গায় ছোট একটা গোল চিহ্ন, তারমানে গর্তটা। ওই গর্তে মোহর রেখে মাটি চাপা দিয়ে রেখেছিল ডেকেইনি। বব, হ্যামার আর ইমেট চাব ওখানে কি করতে এসেছিল?।
কথাবার্তা শুনে তো মনে হলো, আমাদের খুঁজতে।
কি কি বলছে, শুনেছ ভালমত?

খুব বেশি কিছু বলেনি। তবে একটা কথা জরুরী মনে হলো, আগামীকাল বেড় দিয়ে নাকি ধরবে আমাদের।
উউহ! মুখ বাঁকাল মুসা। পুকুরে জিয়ানো মাছ পেয়েছে আর কি। হারামির বাচ্চা! কিভাবে ধরবে, বলেছে?
না। তবে কথাটায় বেশ জোর ছিল। এমনভাবে বলল, যেন আগামীকাল বশেষ কিছু ঘটতে যাচ্ছে, তাতে আমাদের ধরা খুব সহজ হয়ে যাবে।
চিন্তিত হয়ে পড়ল ওমর। বুঝতে পারছি না। কিভাবে আমাদের ধরবে? কছুক্ষণ আগে ছিল চারের বিরুদ্ধে দুই, এখন হয়েছে এক ম্যাবরি আহত, তাকে গানার বাইরে রাখা যায়…
মনে হয় মারা গেছে, বলে উঠল বব। ইমেট চাব বলছিল, ম্যাবরি এমন এক জায়গায় গেছে, যেখানে মোহর কোন কাজে লাগবে না তার।
অভিশপ্ত ডাবলুনের আরও শিকার, নরম গলায় বলল ওমর। ইমেটের লাশ কোথায়?
গর্তটার ধারেই পড়ে আছে।
কাল সকালেই ওকে সরিয়ে ফেলতে হবে। লাশ দেখতে ফিরে এসে না আবার মোহর আবিষ্কার করে বসে হ্যামারের বাচ্চা। এখন রাতের বেলা কিছু করতে পারব না, তবে আলো ফোঁটার সঙ্গে সঙ্গে কাজে লাগব। চলো, ঘুমিয়ে নিই। মুসা, তুমি পাহারায় থাকো। ববের মত ঘাড়ে ভূত চাপবে না তো?
হাসল মুসা। মাথা নাড়ল।
ওমর আর কিশোরের পেছন পেছন ঘরে নেমে এল বব। শুয়ে খালি এপাশ ওপাশ করতে লাগল, ঘুম এল না সহজে। ঘুমের মধ্যেও দুঃস্বপ্ন দেখল, হ্যামার আর লুই ডেকেইনি হাতে হাত মিলিয়েছে, মস্ত দুই ছুরি নিয়ে তাড়া করছে তাকে।
ধড়মড়িয়ে উঠে বসল বব। অন্ধকার রয়েছে এখনও, আবছা একটা মূর্তিকে নড়াচড়া করতে দেখল সে। আরও ভালমত দেখার জন্যে সোজা হয়ে বসল।
বাইরের কেউ নয়, ওমর। ববকে নড়াচড়া করতে দেখে বলল, উঠে পড়ো। বেরোনোর সময় হয়েছে।
এখনও ভোর হয়নি, না?
হয়নি, তবে হবে। তারার আলো কমে গেছে, পাঁচ মিনিট পরেই তোর আলো ফুটবে। আরে এই, মুসা, আবার শুয়ে পড়লে যে? ওঠো, ওঠো, নারকেল ভেঙে নাস্তা সেরে নাও। আমি বন্দুকগুলো গুছিয়ে নিই।
হাই তুলতে তুলতে উঠে বসল মুসা। দরকার পড়বে?
শত্রু যখন রয়েছে, পড়তেও পারে।
কিশোর কই?

ছাতে, পাহারা দিচ্ছে, নাস্তাও সেরে নিচ্ছে। জলদি করো, রেডি হয়ে নাও।
লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল মুসা। হায়, আল্লাহ, মোহরের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। ওগুলো আনতে যাচ্ছি আমরা?
হ্যাঁ। ওগুলোও আনতে হবে।
নারকেল ভাঙল মুসা। ঢকঢক করে পানি খেলো। নারকেল সুদ্ধ অর্ধেকটা মালা ববকে দিয়ে বাকি অর্ধেকটা দিতে গেল ওমরকে।
আমি খেয়েছি, বলল ওমর। তোমরা জলদি সেরে নাও।
নৌকায় বসেই খেতে পারব, চলুন যাই, মুসা বলল।
চত্বরে বেরিয়ে কিশোরকে ডাকল ওমর, ছাত থেকে নামতে বলল। ফ্যাকাসে নীল হয়ে গেছে আকাশ, পুব দিগন্তে লালচে আলো। সূর্য উঠবে। কি ভেবে ছাতে উঠে গেল ওমর। ল্যাগুন আর তার আশপাশে যতদূর দেখা যায়, দেখল। হ্যামারকে দেখা যাচ্ছে না, উভচরটাও না। ফেরেনি সিডনি বারভু।
একটা করে মাসকেট নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল ওরা, নৌকায় উঠল।
পাঁচ মিনিটে পেরিয়ে এল প্রণালী, পাথরের খাঁজে তুলে রাখল নৌকাটা।
বব আর কিশোরকে দাঁড়াতে বলল ওমর। মুসা, তুমি আমার সঙ্গে এসো।
কি ব্যাপার? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
কাজ আছে, সেরে ডাকব। তোমরা পাহারা দাও। হ্যামারকে দেখলে জানাবে।
একটা পাথরের ওপর বসে পড়ল কিশোর। কি কাজ সারতে গেছে ওমর ভাই, অনুমান করতে পারছে। কিছুক্ষণ পর উল্টো দিকে পানিতে ঝপাং করে শব্দ হতেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।
ভাল, বিড়বিড় করল সে, ইমেট চাবের লাশ আর দেখতে হলো না আমাকে। সোনার লোভ কত মানুষের যে সর্বনাশ করল।
স্বর্ণ সর্বনাশ করেনি, মানুষ নিজেই নিজের সর্বনাশ করেছে, গম্ভীর হয়ে বলল বব।
ওমরের ডাক শোনা গেল। তাড়াতাড়ি উঠে ছুটল বব আর কিশোর।
বব, ওমর বলল, আগে হাঁটো, পথ দেখাও। মোহর তুমি খুঁজে পেয়েছ, আগে গর্তে নামার সম্মান তোমার প্রাপ্য।
উজ্জ্বল হয়ে উঠল ববের মুখ। পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল সঙ্গীদের। গর্তটার কিনারে এসে হাত তুলে দেখিয়ে বলল, ওটা।
আল্লাহ্! সত্যিই তো, গর্তে উঁকি দিয়ে দেখে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল ওমর।
হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল কিশোর আর মুসার মুখ।
লাফিয়ে গর্তে নেমে এক মুঠো মোহর তুলল ওমর। ঠিক বলেছ তুমি, বব। কয়েক হাজারের কম না।
আরও বেশিও হতে পারে, বলল বব। গুনব নাকি?

এক মিনিট, হাত তুলল কিশোর, মাথা গরম করলে চলবে না। এখানে বসে গোনা রিস্কি হয়ে যাবে, আর গোনার দরকারই বা কি? যা আছে তো আছেই। এগুলো এখান থেকে নিতে হলে ওই দুর্গেই নিতে হবে। তারপর মোহর পাহারা দিয়ে বসে থাকতে হবে ওখানে, কতদিন কে জানে। ঝড় উঠলে, সাগরের অবস্থা খারাপ হলে বেরোতে পারব না, দ্বীপে আসতে পারব না, মোহর সামলাতে গিয়ে শেষে না খেয়ে মরতে হবে। ওদিকে হ্যামার কি করছে সে-ই জানে। চুপ করে বসে থাকার পাত্র সে নয়, নিশ্চয়ই কোন শয়তানী বুদ্ধি আঁটছে। শীঘ্রিই কিছু একটা করবে সে। আমাদের হুঁশিয়ার থাকা দরকার।
ঠিকই বলেছ, গর্ত থেকে বেরিয়ে এলো ওমর। তৈরি থাকতে হবে আমাদের। মুসা, নারকেল কুড়াও গিয়ে। যত বেশি পরো, জমাও। কিশোর, জাহাজটায় যেতে পারবে আবার?
পারব। কেন?
বারুদ আনতে হবে।
আচ্ছা, মাথা কাত করল কিশোর।
বব, বলল ওমর, যাও তো, এক দৌড়ে গিয়ে বালতিটা নিয়ে এসো, ফুটো বালতিটা। মোহরগুলো নিতে হবে। আমি বাইরে তুলে রাখছি।
হ্যামার এলে? মুসা প্রশ্ন করল।
আসুক। চারজনের বিরুদ্ধে যদি লাগার সাহস থাকে, আসুক না। পকেটে অভিশপ্ত ডাবলুন, সে তো এমনিতেই মরা। যাও, তোমরা যার-যার কাজে চলে। যাও।
নারকেল কুড়িয়ে তূপ করে ফেলল মুসা। বালতি নিয়ে এলো বব। কিশোরও বারুদের পিপে নিয়ে হাজির-জাহাজে ঢোকা আর বেরোনোর পথ পেয়ে গেছে, কাজটা আর মোটেই কঠিন নয় এখন। মোহর তুলে গর্তের পাড়ে জমাচ্ছে ওমর।
সূর্য অনেক উপরে উঠেছে। কড়া রোদ। কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বলল। ওমর, মুসা, নারকেল ভাঙবে? খুব খিদে পেয়েছে।
এখুনি আনছি, নারকেল আনতে চলে গেল মুসা।
বারুদ কতখানি আনলে? কিশোরকে জিজ্ঞেস করল ওমর।
আধ পিপার বেশি। এর বেশি আর বইতে পারলাম না।
ওতেই চলবে। দুর্গেও কিছু আছে। ছোটখাট লড়াই ঠেকানো যাবে।
লড়াই হবেই? কিন্তু বুঝতে পারছি না, লড়াইটা কার বিরুদ্ধে করব? হ্যামার, তো একলা, নিজের সঙ্গেই আলোচনা করছে যেন কিশোর। যাকগে, যখন হয় তখন দেখা যাবে। এখন মোহর সরানো দরকার।

হ্যাঁ, ওমর বলল, অনেক মোহর। সরাতে সময় লাগবে। তুলছিই শুধু, শেষ আর হয় না।
নারকেল ভেঙে নিয়ে এল মুসা। গর্তের পাড়ে বসে খেলো চারজনে, জিরিয়ে নিল।
কিশোর, ওমর বলল, তুমি আর মুসা মোহরগুলো দুর্গে নিতে থাকো। আমি আর বব তুলে বালতি ভরে দিচ্ছি।
বার বার নৌকা নিয়ে আসা আর যাওয়া, বেশ পরিশ্রমের কাজ, গর্ত খুঁড়ে মোহর তোলাও কম মেহনত নয়। সময় লাগল অনেক। কিন্তু অবশেষে শেষ হয়ে এল কাজ। শেষবারের মত বালতি ভরা হলো মোহর দিয়ে। আর নেই। ওমরের অনুমান, চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার মোহর নিয়ে যাওয়া হয়েছে।
যাক, বাবা, সারলাম, বাঁচা গেল, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ওমর। কিন্তু হ্যামারের পাত্তা নেই কেন? কি করছে? একটা শব্দ শোনা গেল। ওই যে সাড়া বোধহয় মিলল। বব, এক দৌড়ে গিয়ে দেখে এসো তো।
সৈকতে পা দিয়েই থমকে দাঁড়াল বব। হাঁ করে চেয়ে রইল এক মুহূর্ত, তারপর ঘুরে দৌড় দিল। দূরে থাকতেই চেঁচিয়ে বলল, জলদি আসুন, জলদি! পালাতে হবে! নৌকার দিকে ছুটল সে।
পাথরে বসে বিশ্রাম নিচ্ছিল, লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল তিনজনে। কি হয়েছে? চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল ওমর।
সৈন্য! জবাব দিল বব। ম্যারাবিনা থেকে সৈন্য নিয়ে এসেছে, কণ্ঠে আতঙ্ক, অনেক সৈন্য। এদিকেই আসছে ওরা।
আর দেরি করল না ওমর। ছোঁ মেরে মাসকেট তুলে নিল, হাত বাড়াল। বালতির দিকে। কিন্তু তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে বালতিতে পা লাগিয়ে টান মেরে বসল কিশোর, কাত হয়ে পড়ে গেল বালতি, ছড়িয়ে পড়ল সমস্ত মোহর। কুড়িয়ে তুলতে গেল আবার ওগুলো।
রাখো রাখো, বলে উঠল ওমর। তোলার সময় নেই। জলদি নৌকার দিকে দৌড় দাও।
নৌকা পানিতে নামিয়ে দাঁড় হাতে তৈরি হয়ে আছে বব। কিশোর আর মুসা। উঠল। গভীর পানিতে নৌকা ঠেলে দিয়ে লাফিয়ে উঠে বসল ওমর। এক পাশে কাত হয়ে বেশ খানিকটা পানি উঠল নৌকায়, উল্টে যাচ্ছিল প্রায়।
পাথরের স্তূপের কাছ থেকে শোনা গেল সম্মিলিত চিৎকার। ওদের দেখে ফেলেছে সৈন্যরা। খানিকক্ষণ পর আবার শোনা গেল চিৎকার।
মোহরগুলোও দেখেছে, ববের হাত থেকে দাঁড় নিয়ে জোরে জোরে বাইতে শুরু করল ওমর।

কিশোরের ছড়িয়ে ফেলা মোহরগুলোই প্রাণ বাঁচাল ওদের। রাইফেলের নিশানা করে ফেলেছিল কয়েকজন সৈন্য, ট্রিগার টিপতে যাবে, এই সময় তাদের কানে এল, মোহর! মোহর! চিৎকার। অন্যেরা লুটছে, তারাই বা বাদ পড়ে কেন? ছুটল তারাও। গিয়ে দেখে সত্যি মোহর কুড়াচ্ছে তাদের সঙ্গীসাথীরা, রাইফেল কাঁধে ঝুলিয়ে তারাও কুড়াতে লেগে গেল। হ্যামারের শত চিৎকারেও কান দিল না কেউ। ইমেট চাবের অটোমেটিকটা নিয়ে নিয়েছিল হ্যামার, ওটা নিয়েই ছুটে এল সৈকতে। রাগে, উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছে, হাত ঠিক রাখতে পারল না, এলোপাতাড়ি গুলি ছুঁড়ল, নৌকার ধারেকাছে এল না একটাও।

সব মোহর কুড়িয়ে পকেটে ভরল সৈন্যরা, আর একটাও পড়ে রইল না। রাইফেল তুলে নিয়ে ফিরে এল আবার সৈকতে। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দূরে চলে এসেছে নৌকা। গুলি করল সৈন্যরা, দুএকটা বুলেট নৌকার একেবারে কাছে পানি ছিটাল, কিন্তু লাগল না কারও গায়ে।

গুলি করো, কিশোর, বলল ওমর। কারও গায়ে লাগুক না লাগুক, ভয়। দেখাও।

গর্জে উঠল কিশোরের মাসকেট। প্রচণ্ড ধাক্কা লাগল। এত ধাক্কা দেবে কল্পনাও করেনি সে, বাঁকা হয়ে গেল এক পাশে। পাথরে বাড়ি লেগে বিকট শব্দ তুলে সৈন্যদের মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল বল। চোখের পলকে ডাইভ দিয়ে আড়াল নিল ওরা। ওখান থেকে গুলি ছুঁড়তে থাকল একনাগাড়ে।

নিরাপদেই সিঁড়ির গোড়ায় এসে ভিড়ল নৌকা।

জলদি উঠে যাও, বলল ওমর। একবারে একজন করে।

লাফিয়ে সিঁড়ি ডিঙিয়ে উঠে এল তিন কিশোর। ঘাটের কাছে নৌকাটাকে শক্ত করে বেঁধে ওমরও উঠে এল। হাউফফ, করে মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস ফেলে বসে পড়ল অন্যদের পাশে, একটা নিচু পাথরের দেয়ালের আড়ালে। বড় বাঁচা বেঁচেছি। কিন্তু ব্যাটারা এল কিভাবে?

ছাতে উঠল ওমর, হামাগুড়ি দিয়ে চলে এল কিনারে। সাবধানে উঁকি দিল। যা দেখার দেখে পিছিয়ে এসে বলল, অবস্থা ভাল না।

কি? জানতে চাইল কিশোর।

জাহাজ নিয়ে এসেছে ব্যাটারা, সাইজ দেখে মনে হলো ট্রলার। কোস্ট গার্ডদের বোধহয়। কিন্তু জানল কিভাবে...

বারডু, সিডনি বারডু, বলল কিশোর। ও-ই গিয়ে খবর দিয়েছে ম্যারাবিনায়, সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছিল নিশ্চয়ই হ্যামার। অ্যালেন কিনি মরেছে বটে, কিন্তু তার দোসরগুলো তো আছে। কোটার চেয়ে কোনটা কম শয়তান না।

হ্যাঁ, ঠিক বলেছ, তর্জনী নাড়ল ওমর। ইউনিফর্ম পরা ওই শয়তানটাকেও দেখেছি সৈন্যদের সঙ্গে, ওই যে ওই অফিসারটা, যেটা এসে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল

আমাদেরকে।
কতজন আছে?
ঠিক বোঝা গেল না, তিরিশ-চল্লিশ কিংবা তার বেশিও হতে পারে।
হুঁ। ভাগ্যিস, নারকেলগুলো এনে রেখেছিলাম। আরি... শব্দ শুনে ফিরে তাকাল কিশোর।
বারডু! বারডু আসছে, চেঁচিয়ে বলল মুসা। হাত তুলে দেখাল, দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে উড়ে আসছে বিমানটা।
কপালে হাত রেখে দেখল ওমর, মাথা নাড়ল, হ্যাঁ, আমাদের উভচরটাই সহজে ছাড়বে না, বোঝা যাচ্ছে।
ছাতে উঠে এল চারজনেই, নিচু দেয়ালের ছোট ছোট ফোকর (বন্দুকের নল ঢুকিয়ে শত্রুদের ওপর গুলি চালানোর জন্যে তৈরি হয়েছে ফোকরগুলো) দিয়ে দেখছে। সৈকত থেকে সামান্য দূরে জঙ্গলের ছায়ায় গিয়ে বসেছে সৈন্যরা। হাত নেড়ে তাদেরকে কি যেন বলছে হ্যামার।
ফিরল হ্যামার। এগিয়ে এল সৈকত ধরে। দুর্গের দিকে চোখ।
কি ব্যাপার? বিড়বিড় করল ওমর।
আরি, মিল করতে আসছে মনে হয়! অবাক কণ্ঠে বলল কিশোর।
হ্যামারের হাতে একটা লাঠি, মাথায় সাদা কাপড় বাধা। পানির একেবারে কিনারে এসে উঁচু একটা পাথরে চড়ল, লাঠিটা মাথার ওপর তুলে কাপড় নাড়ল জোরে জোরে। চেঁচিয়ে বলল, এই, শুনছ? এইই, তোমরা?
আমাকে কভার দাও, ছেলেদেরকে বলল ওমর, আমি বললেই গুলি চালাবে।
হ্যামারকে বলল, কী? চেঁচাচ্ছ কেন?
একটা অফার দিতে এসেছি, বলল হ্যামার।
বলো।
মোহরগুলো দিয়ে দাও, বিনিময়ে তোমাদেরকে ম্যারাবিনায় পৌঁছে দেব।
হাসল ওমর। ধন্যবাদ। ম্যারাবিনায় যাব না।
মোহরগুলো দেবে না? রেগে উঠছে হ্যামার।
যা পেয়েছ পেয়েছ, আর একটাও না।
ঠিক আছে, দাঁতে দাঁত চাপল হ্যামার। ধরে এমন ধোলাই দেব, গলার এই জোর থাকবে না। বলতে দিশে পাবে না, কোথায় রেখেছ মোহর।
ধোলাই তো পরের কথা, আগে ধরতে হবে তো আমাদের?
শাআলা! গাল দিয়ে উঠল হ্যামার। দাঁড়া, আগে ধরি, জ্যান্ত ছাল ছাড়িয়ে নেব।
মুখ খিস্তি করে আরও কয়েকটা গাল দিল সে, ঘুসি পাকিয়ে হাত ঝাঁকাল বার

কয়েক। দুপদাপ করে নেমে ছুটে গেল নিজের লোকজনের কাছে। মিনিটখানেক পর তিনজন সৈন্য রাইফেল হাতে ছুটে গেল ট্রলারের দিকে।
কি করতে চায়? নিচু কণ্ঠে বলল কিশোর।
নৌকা নিয়ে আসবে মনে হচ্ছে, বলল ওমর। লড়াই করতেই হচ্ছে। চত্বরে তূপ করে রাখা হয়েছে চকচকে সোনালি মোহরগুলো। তেমন বুঝলে সব মোহর পানিতে ফেলে দেব, তবু ব্যাটাদেরকে দেব না। চলো, রেডি হই। ছাত থেকে নেমে বলল সে, আমাদের কাছে মাসকেট আছে, জানে হ্যামার, কিন্তু ওগুলোর খবর জানে না, হেসে কামানগুলো দেখাল। সুইভেল-গানটার কথাও জানে না। পয়লা চোটেই ওদেরকে ভয় পাইয়ে দিতে হবে।
কাজে লেগে গেল চার অভিযাত্রী। কড়া রোদ মাথার ওপরে। দরদর করে ঘামছে ওরা, কামান-বন্দুকে বারুদ ঠাসছে। পাঁচ পাউণ্ড ওজনের একটা গোলা তুলে নিয়ে বলল মুসা, এটা যদি লাগে হ্যামার মিয়ার মুখে? ডেনটিস্ট দেখানোর আর দরকার পড়বে না! বলেই ঢুকিয়ে দিল একটা কামানে।
তার রসিকতায় হাসল অন্যেরা।
বেজায় ভারি সুইভেল-গানটা। নিচ থেকে এনে প্রণালীর দিকে নিশানা করে বসাতে গিয়ে ঘামে চুপচুপে হয়ে গেল একেকজন। বারুদের পিপা, গুলি, পিস্তল বন্দুক, এমনকি ছুরি-বল্লম যা আছে, সব নিয়ে আসা হলো ওপরে, হাতের কাছে রাখা হলো। এভাবে দেখল ওমর, ওভাবে দেখল, সন্তুষ্ট হয়ে মাথা নাড়ল, হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে।
আচ্ছা, এক কাজ করলে কেমন হয়? প্রস্তাব রাখল কিশোর। লুই। ডেকেইনির নিশানটা উড়িয়ে দিই?
খুব ভাল হয়, আনন্দে হাত তালি দিয়ে উঠল বব। দারুণ হয়।
ভাল বলেছ, হাসিতে ঝকঝকে সাদা দাঁত বেরিয়ে পড়ল মুসার।
মন্দ বলোনি, ওমরও হাসছে।
ববের উৎসাহই বেশি। ছুটে নিচে গিয়ে কালো পতাকাটা নিয়ে এল সে। নৌকার দাঁড়ের মাথায় বেঁধে উড়িয়ে দিল ছাতের ওপরে। সুর করে গেয়ে উঠল ট্রেজার আইল্যাণ্ডের জলদস্যুদের সেই বিখ্যাত গান, ফিফটিন মেন অন দ্য ডেড ম্যানস চেস্ট, ইয়ো হো হো, অ্যাণ্ড আ বটল অভ রাম।
ববের সঙ্গে গলা মিলিয়ে কোরাস গাইল অন্যেরা: ড্রিংক অ্যাণ্ড দ্য ডেভিল হ্যাড ডান ফর দ্য রেস্ট, ইয়ো হো হো, অ্যাণ্ড আ বটল অভ রাম।
ফোকর দিয়ে দেখল কিশোর, এদিকেই চেয়ে আছে সৈন্যরা। মুখের ভাব বোঝা যাচ্ছে না দূর থেকে, কিন্তু তাজ্জব যে হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। ওরা ভাবছে, আমরা পাগল হয়ে গেছি।

ভুল ভাবছে? হাসিতে উজ্জ্বল ওমরের মুখ। হঠাৎ সাগরের দিকে চোখ পড়তেই চেঁচিয়ে বলল, মাথা নামাও! ওরা আসছে।
ল্যাগুনের পাশ দিয়ে বেরিয়ে এগিয়ে আসছে একটা নৌকা, দাঁড় টানছে চারজন লোক। তীর ঘেঁষে চলছে। গাছপালার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল ওটা। হ্যামারকে মাথা নিচু করে সেদিকে ছুটে যেতে দেখা গেল। খানিক পরে আড়াল থেকে আবার বেরিয়ে এল নৌকাটা।
কতজন? বিড়বিড় করল কিশোর।
চোদ্দ-পনেরোজন হবে, আন্দাজ করল ওমর।
দ্বীপের চোখা প্রান্তের কাছে চলে এল নৌকা। লোকের ভারে প্রায় ডোবে। ডোবে। বার বার হাত ঝাঁকি দিয়ে কি যেন বলছে হ্যামার, বোধহয় আরও জোরে দাঁড় টানতে বলছে।
আমি না বললে গুলি করবে না, নিচু গলায় নির্দেশ দিল ওমর।
আরও এগিয়ে এল নৌকা।
হঠাৎ আদেশ দিল ওমর, ফায়ার!
গর্জে উঠল মাসকেট, বার বার তীরের পাহাড়ে পাহাড়ে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হলো বিকট আওয়াজ। নৌকার পাশের পানি ছিটকে উঠল গুলি লেগে। পাটাতনে নুয়ে পড়ে গেল নৌকার একজন। কিন্তু দাঁড় বাওয়া থামাল না ওরা, দ্রুত এগিয়ে এল।
গুলি করো, আদেশ দিল আবার ওমর। থেমো না।
আরও দুজন সৈন্য পড়ে গেল। দুহাত শূন্যে তুলে লাফিয়ে উঠল একজন, বাঁকা হয়ে পানিতে পড়ল ঝপাং করে। একবার কাত হয়ে আবার সোজা হলো নৌকাটা, থামল না, এগিয়ে আসছে আরও দ্রুত।
মাসকেট ফেলে সুইভেল-গানের কাছে চলে এল ওমর। নৌকার দিকে নল ফেরাতে ফেরাতে অদ্ভুত হাসি ফুটল মুখে। টাচ-হোলে কিছু আলগা বারুদ ঢেলে। দিয়ে কম্বল-ছেঁড়া বানানো সলতেয় আগুন ধরিয়ে দাগল কামান। নলের মুখ দিয়ে ঝলকে বেরোল আগুন, আগুনের ফুলঝুরি ছিটিয়ে ছুটে গেল এক ঝাঁক বল। প্রচণ্ড শব্দে কানের পর্দা ফেটে গেছে মনে হলো অভিযাত্রীদের, কামানের নলের সামনে কালো ধোঁয়ার মেঘ।
প্রতিক্রিয়া দেখে বোবা হয়ে গেল যেন ওমর। এত জোরে পিছু-ধাক্কা দেবে সুইভেল-গান, কল্পনাও করেনি সে। প্রায় শখানেক বল ভরে দিয়েছিল, সব ছুটে গেছে ঝাঁক বেঁধে। টগবগ করে ফুটতে শুরু করল যেন কিছুটা জায়গায় পানি, আরেকটু হলেই গিয়েছিল উল্টে নৌকা। সৈন্যদের গোঙানি আর আতঙ্কিত চিৎকার শোনা গেল। চারজনের মাত্র একজনের হাতে দাঁড় রয়েছে, কিন্তু ওই তাণ্ডবের মাঝে সে-ও বাইতে পারছে না, কিংবা বাওয়ার কথা ভুলেই গেছে। সব

শব্দ ছাড়িয়ে শোনা যাচ্ছে হ্যামারের কুৎসিত গালাগাল। ধাক্কার চোটে নৌকার নাক ঘুরে গেছে আবার। যেদিক থেকে এসেছে সেদিকে।
সামলে নিল আবার সৈন্যরা। কারও দাঁড় পানিতে পড়ে গিয়েছিল, কারও বা নৌকার পাটাতনে, তাড়াতাড়ি তুলে নিয়ে দ্বিগুণ বেগে দাঁড় বেয়ে ছুটে গেল তীরের দিকে। পালাচ্ছে।
পাগলের মত হাত চালাল ওমর। ওদের পালাতে দেয়া চলবে না। সুইভেল গানে আবার বল ভরে বারুদ ঠাসছে। চোখ তুলে দেখল, তীরের কাছে চলে গেছে নৌকা। তাড়াতাড়ি সলতে লাগিয়ে আগুন ধরিয়ে গুলি করল আবার।
বু-ম-ম্ করে কানফাটা গর্জন তুলে আবার তপ্ত বল ছিটাল সুইভেল-গান।
এবার আর রেহাই পেল না নৌকা, উল্টে গেল। তীরের কাছে অগভীর পানিতে মৃদু ঢেউয়ে দুলছে। জনাতিনেক সৈন্য হাত-পা ছুঁড়ছে পানিতে, বাকিরা স্থির হয়ে ভাসছে। দুর্বল ভঙ্গিতে আঙুল দিয়ে বালি খামচে খামচে নিজেকে শুকনোয় টেনে তোলার চেষ্টা করছে একজন। হ্যামারসহ আরও তিনজন ছপছপ করে হাঁটু পানি ভেঙে পড়িমরি করে উঠল ডাঙায়, উঠেই দৌড় দিল জঙ্গলের দিকে। দেখতে দেখতে হারিয়ে গেল পাথরের স্তূপের আড়ালে।
গুলি করো, নির্দেশ দিল ওমর। ঝাঁঝরা করে দাও নৌকার তলা, যাতে ওটা নিয়ে আর না আসতে পারে, বলতে বলতেই হাত বাড়িয়ে আবার মাসকেট তুলে। নিয়ে গুলি চালাল। নৌকার উপুড় হয়ে থাকা তলা থেকে কাঠের চিলতে উড়ে গেল। বল ভরে গুলি চালাল আবার। পরের পাঁচ মিনিট একনাগাড়ে গুলি চালিয়ে গেল ওরা। ওমরের প্রায় প্রতিটি গুলিই লক্ষ্যভেদ করল, অন্যদের কোন কোনটা লাগল, তবে বেশির ভাগই মিস হলো। তাদেরই কারও একটা গুলি নৌকায় না লেগে লাগল গিয়ে ক্রল করে ওঠার চেষ্টা করছে যে আহত লোকটা, তার গায়ে। পড়ে গেল সে কাদা পানিতে, স্থির হয়ে রইল।
ভয় পেয়েছে ব্যাটারা, দম নিয়ে বলল ওমর, এত খোলামেলাভাবে আর আসার সাহস করবে না, ধীরে সুস্থে মাসকেটে গুলি ভরছে সে।
দাঁত বের করে হাসল কিশোর, বারুদের ধোঁয়া লেগে কালো হয়ে গেছে মুখ। হ্যাঁ, আর ছেলেমানুষ ভাববে না আমাদেরকে। ওমর ভাই, কি মনে হয়? আবার আসবে?
আসবে তো বটেই। মরার আগে হাল ছাড়বে না হ্যামার। সব রকমে চেষ্টা করে দেখবে। আক্রমণ করে না পারলে, খাবার আর পানি আটকে দেবে। তখন আর কোন উপায় থাকবে না আমাদের, ওর কথা শুনতে বাধ্য হব।
সে তো অনেক পরের কথা, খাবার ফুরোলে তবে তো, এতক্ষণে খাবার কথা মনে পড়ল মুসার। এখুনি সুযোগ, গোটা কয়েক নারকেল ভাঙলে কেমন হয়?

রাইফেল গর্জে উঠল, একটা বুলেট এসে লাগল পাথরে, বিইঙঙ করে পিছলে বেরিয়ে গেল মাথার ওপর দিয়ে। ঝট করে মাথা নুইয়ে ফেলল মুসা।
অসতর্ক হলে কি হবে বুঝলে তো? ভুরু নাচাল ওমর। তখনও বোকামি করেছ দেখেছি, কয়েকবার দাঁড়িয়ে উঠেছ। ওরা ঠিকমত গুলি চালাতে পারলে তোমার নিজের নারকেলই ভেঙে পড়ে থাকত এতক্ষণে। খবরদার, আর কক্ষনো মাথা তুলবে না।
ভ্রূ-কুঞ্চিত হলো ববের। বোকার মত বলল, আমাদেরকে গুলি করছে?
তো কাকে? পাথরে হাত সই করছে? পাথরের আড়ালে লুকিয়ে থেকে আমাদের দেখলেই গুলি ছুঁড়বে। মনে হচ্ছে, এইই করবে ওরা আপাতত। যাও, তাড়াতাড়ি গিয়ে কিছু মুখে দিয়ে এসো। আমি পাহারায় থাকছি। তোমরা এলে আমি যাব।
বিকেল গড়িয়ে গেছে। ছেলেরা যখন ফিরে এল, পশ্চিমে হেলে পড়েছে, তখন সূর্য। শত্রুদের দেখা যাচ্ছে না, তবে মাঝেমধ্যে একআধটা বুলেট ছুটে এসে আঘাত হানছে পাথরের দেয়ালে। কারও কোন ক্ষতি করতে পারছে না। এটা বোঝা যাচ্ছে, দুর্গের দিকে কড়া নজর রেখেছে শত্রুরা।
রাত নামল। চারজন সৈন্য ছুটে এল উল্টোনো নৌকাটার দিকে। তারার আলোয় তাদের আবছা মূর্তি লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল অভিযাত্রীরা। যেমন এসেছিল, তেমনি তাড়াহুড়ো করে আবার ফিরে গেল সৈন্যরা।
রাত গম্ভীর হলো। সৈন্যদের সাড়া নেই আর। কাউকে দেখা গেল না।
কড়া পাহারা দিতে হবে আজ রাতে, ওমর বলল সঙ্গীদেরকে। ঘুমোতে হবে এখানে শুয়েই। বব, আজও দ্বীপে যাবে নাকি?
মাথা খারাপ! জোরে মাথা নাড়ল বব।
ভোর হলো। ববের এখন ডিউটি। সাগরের ওপর হালকা কুয়াশা, ধোয়ার চাদর ঢেকে রেখেছে যেন দ্বীপটাকে। সূর্য উঠল। এক ঝটকায় সরিয়ে নিয়ে গেল ঝুলে থাকা কুয়াশা। চেঁচিয়ে উঠল বব তীক্ষ্ণ কণ্ঠে, এই, তোমরা জলদি এসো! ওমর ভাই! জলদি আসুন।
ছুটে এসে উঠল সবাই ছাতে।
কি ব্যাপার? কি হয়েছে? চোখ ডলতে ডলতে জিজ্ঞেস করল ওমর।
খোলা সাগরের দিকে আঙুল তুলে দেখাল বব। আয়নার মত সমতল সাগর, কাঁচা রোদে চিকচিক করছে। তাতে ঢেউ তুলে আস্তে আস্তে দুর্গের দিকে এগিয়ে আসছে ট্রলারটা, আগের দিন যেটাকে ল্যাগুনের কাছে দেখা গিয়েছিল। গলুইয়ের নিচে পানি ছিটকে পড়ছে দুদিকে, পানির ছোট ছোট কণাগুলোতে রোদ লাগায় মনে হচ্ছে হীরের টুকরো। শিল্পীর তুলিতে আঁকা যেন এক অপরূপ ছবি, কিন্তু ওমরের তা মনে হচ্ছে না। মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে আসছে সুন্দর জাহাজটা।

তাহলে এই ব্যাপার, বিড়বিড় করল ওমর। জাহাজ থেকে আক্রমণ চালাবে।
সারেঙ ছাড়া তো আর কাউকে দেখা যাচ্ছে না, দেখতে দেখতে বলল কিশোর।
নিশ্চয়ই নিচে রয়েছে, যাতে গুলি না করতে পারি আমরা। থাকুক। সুইভেল গানটার কথা জেনে গেছে ওরা, কিন্তু কামানের কথা জানে না এখনও
সই করে দুএকটা গোলা জাহাজে ফেলতে পারলেই কাঁপিয়ে দিতে পারব। শোনো, ভারি হলো ওমরের কণ্ঠ, এ-যাবৎ ডাকাত-ডাকাত খেলা খেলে এসেছি, কিন্তু এটা খেলা নয়। প্রাণপণে লড়তে হবে এবার। হ্যামারের হাতে পড়া চলবে না। তার শয়তানীর সাক্ষী আমরা, তাকে খুন করতে দেখেছি। সাক্ষী বাঁচিয়ে রাখতে চাইবে না সে কিছুতেই। এসো, হাত লাগাও। বক্তৃতা শেষ করল সে। কোমরের পিস্তল খুলে নিয়ে তাতে বারুদ আর গুলি ভরল। চলো, কামানের মুখ ঠিক করে রাখি।
কামানের মুখ ঘোরাতে ঘোরাতে ববের মনে হলো, তিনশো বছর পিছিয়ে গেছে। সে, রক্তে লড়াইয়ের উন্মাদনা। নিজের অজান্তেই নিজেকে জলদস্যু ভাবতে শুরু। করেছে।
আচ্ছা শিক্ষা হয়েছে গতকাল, বলল ওমর, দেখছ, কেমন লুকিয়ে আছে? কারও ছায়াও দেখা যাচ্ছে না।
এসব কামানের রেঞ্জ কত, বলতে পারবেন? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
নাহ্, মাথা নাড়ল ওমর। এত পুরানো জিনিস ছুঁয়েও দেখিনি কোন দিন।
জাহাজ সই করে দিন না তাহলে মেরে। কত দূরে যায়, এক গোলাতেই বুঝে যাব।
ঠিক বলেছ, সায় দিল ওমর। সরো, আমি গোলা ছোঁড়ার সময় কাছে থাকবে না। কি পরিমাণ ঝাঁকি দেবে কে জানে। পাগলা ঘোড়ার মত লাফিয়ে উঠলেও অবাক হব না। একটা কামানের পেছনে বসে পড়ল ওমর। আগের দিনই গোলা ভরে রেখেছে। আগুন, কিশোর, জলদি। কামানের মুখ সামান্য সরিয়ে জাহাজের। দিকে নিশানা করল।
কম্বল ছিঁড়ে সলতে বানানোই আছে। একটাতে আগুন ধরিয়ে এগিয়ে এল কিশোর। ওমর ভাই, দিন না, পয়লাটা আমিই করি। কিভাবে করতে হবে শুধু দেখিয়ে দিন।
কিশোরের দিকে চেয়ে কি ভাবল ওমর, সে-ই জানে। হাসি ফুটল মুখে। বেশ, তবে খুব সাবধান। ওই ভোজালিটা আনো। ওটার মাথায় সলতে রেখে লাগিয়ে দাও বারুদে। দিয়েই সরে যাবে এক পাশে।
তৈরি হলো কিশোর।
ফায়ার! চেঁচিয়ে আদেশ দিল ওমর।
কামানের মুখ দিয়ে ছিটকে বেরোল কমলা আগুন, পেছনে ঘনকালো ধোঁয়ার মেঘ, বাজ পড়ল যেন ঠিক কানের কাছে, এত প্রচণ্ড শব্দ। দ্বীপের পাহাড়ে

প্রতিধ্বনি তুলল সে আওয়াজ। জাহাজটা এখন কোয়ার্টার মাইল দূরে, ওটার পেছনে পানিতে পড়ল গোলা, চারিদিকে ছিটকে উঠল পানি।
গেছিল, কামান ছুঁড়তে পারার আনন্দে ধেই ধেই করে এক পাক নেচে নিল কিশোর। আরেকটু হলেই লেগে গিয়েছিল। ওমর ভাই, কামানের মুখ সামান্য নামিয়ে দিন, পরের বারেই লাগিয়ে দেব।
মুসা আর ববকে খালি কামানে আবার গোলা-বারুদ ভরার নির্দেশ দিয়ে পাশের কামানটার কাছে বসল ওমর। দেখে নিল সব ঠিকঠাক আছে কিনা। কিশোরকে আগুন আনতে বলে সরে গেল।
ফায়ার! আবার আদেশ দিল ওমর।
বুমম!
আবার কমলা আগুন ছুটে গেল জাহাজের দিকে। এবার আর মিস হলো না। ট্রলারের পেছনে কাঠ ভাঙার শব্দ হলো, শূন্যে লাফিয়ে উঠল কাঠের চিলতে।
লাগিয়েছি! লাগিয়েছি। আবার নাচতে শুরু করল কিশোর, সেই সঙ্গে হাততালি।
এতে চলবে না, ওমর সন্তুষ্ট নয়। ইঞ্জিনরুমে ঢোকাতে হবে, কিংবা পাশে এমন জায়গায় ছিদ্র করে দিতে হবে, যাতে পানি ঢোকে। দেখি, এসো। আরেকটা কামানের কাছে এসে বসল সে।
প্রথমটায় গোলা-বারুদ ভরে ফেলেছে বব আর মুসা, দ্বিতীয়টায় ভরতে লেগে গেল। এ-কাজে ওস্তাদ হয়ে গেছে দুজনে।
কামানের নিশানা ঠিক করল ওমর, তিনটেরই। মুসা আর ববকেও কামান। দাগার জন্যে তৈরি হতে বলল।
তিনজনেই তৈরি।
আবার আদেশ দিল ওমর, রেডি। ফায়ার!
কামানের গর্জনে কেঁপে উঠল পাথরের দুর্গ, কানে তালা লেগে যাওয়ার জোগাড়। কালো ধোঁয়া ঢেকে দিল সামনেটা, জাহাজ দেখা যাচ্ছে না। দেখার অপেক্ষা করলও না ওরা, দ্রুতহাতে গোলা-বারুদ ভরতে শুরু করল আবার।
কালো ধোঁয়া সরে গেছে। জাহাজের দিকে চোখ পড়তেই চেঁচিয়ে উঠল তিন। কিশোর, একই সঙ্গে। আনন্দে লাফাচ্ছে।
মাস্তুল গেছে, বলল বব।
ঠিকই বলেছে। মাস্তুল ভেঙে পড়েছে সামনে ডান পাশে। আগের দিনের পালের জাহাজ হলে থেমেই যেত, কিন্তু আধুনিক ট্রলার ইঞ্জিনে চলে। থামল না, কিন্তু লক্ষ্য ঠিক রাখতেও পারল না, জাহাজের নাক সোজা রাখতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে সারেঙ। কেন গোলমাল হচ্ছে, বুঝতে পারছে জাহাজের লোকেরাও, তিনজন কুড়াল হাতে এসে কোপাতে শুরু করল। মাস্তুলের গোড়ার দিকটা

পুরোপুরি ছিন্ন হয়নি, সেটা কেটে পানিতে ফেলে দেবে মাস্তুলটা। আরও ক্ষতি হয়েছে জাহাজের, মূল কাঠামোর এক জায়গায় লেগেছে আরেকটা গোলা, ভেঙে গেছে। মাস্তুলের ভারে এক পাশে বিশ্রীভাবে কাত হয়ে গেছে ট্রলার।
মাসকেট! গর্জে উঠল ওমর। যারা মাস্তুল কাটছে, খতম করে দাও। হাল কাজ করছে না মনে হচ্ছে, মাস্তুলটা সরাতে না পারলে করবেও না।
একনাগাড়ে গুলি চালিয়ে গেল চারজনে। কার গুলি লেগে, বোঝা গেল না, পড়ে গেল তিনজনের একজন। আরেকজন পালাল। তৃতীয়জন বড় বেশি দুঃসাহসী, মারাত্মক গুলি উপেক্ষা করে কুপিয়ে চলল।
মাসকেট ফেলে দিয়ে সুইভেল-গানের মুখ ঘোরাল ওমর। গুলি করল।
ভয়ানক ক্ষতি করল বলের ঝাঁক, কাঠের চিলতের ঝড় উঠল ডেকের একটা অংশে। তৃতীয় লোকটাও পড়ে গেল। কিন্তু দুই-এক গড়ান দিয়েই আবার উঠে পড়ল, মরেনি, আহত হয়েছে। ক্রল করে চলে গেল আড়ালে।
আজ দ্বিতীয় দফা অবাক হলো ওমর সুইভেল-গানের প্রচণ্ড ধ্বংস-ক্ষমতা দেখে। বাপ রে বাপ, শেলের চেয়ে খারাপ! বিড়বিড় করল সে।
ট্রলারের বারোটা বেজেছে, বলল মুসা।
জাহাজের গতিপথ ঠিক নেই, ইঞ্জিন চালু রয়েছে এখনও, কিন্তু নাক ঘুরে গেছে আরেকদিকে। দাঁড়িয়ে থাকার সাহস নেই সারেঙের, বসে পড়েছে, সেই অবস্থায়ই জাহাজ সামলানোর প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছে, পারছে না।
কামান দাগতে থাকো, কিশোর আর মুসাকে আদেশ দিল ওমর। আমার বলার জন্যে বসে থেকো না। গোলা ভরো আর ছাড়ো। বব, মাসকেটগুলো ভরো তুমি।
একের পর এক গোলা ছুটল। সুইভেল-গান থেকে গুলি ছুঁড়ছে ওমর। গোলার আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে জাহাজের গা, চামড়া ক্ষত করে দিচ্ছে সুইভেল-গানের বল। জাহাজের ডেকে আর পানিতে কাঠের চিলতের ছড়াছড়ি। কিন্তু চেষ্টা করেও সারেঙের গায়ে লাগানো যাচ্ছে না, লোকটার ভাগ্য ভাল। নিরস্তও হচ্ছে না সে। এত গোলাগুলির মাঝেও হাল ছাড়ছে না। নড়াচড়ায় মাস্তুলটা আপনা-আপনি গড়িয়ে পড়ে গেছে পানিতে। ফলে জাহাজের নাক সোজা করে ফেলেছে আবার সারেঙ, এগিয়ে আসছে ধীরে ধীরে।
উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে ওমর। আরেকটু এগোলেই কামানের রেঞ্জের এপাশে চলে আসবে জাহাজ। নোয়াতে নোয়াতে একেবারে চত্বরের সঙ্গে লেগে গেছে নলের মুখ, আর নামানো যাবে না। কোনমতে সিঁড়ির কাছাকাছি জাহাজ আনতে পারলে আর ঠেকানো যাবে না সৈন্যদেরকে, দরকার হলে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাতরে চলে আসবে, তারপর উঠে আসবে সিঁড়ি বেয়ে।

তবে, এখনই সবচেয়ে বড় সুযোগ। কামানের আওতায় রয়েছে জাহাজ, খুবই কাছে। কোনমতে একটা গোলা ডেক পার করে যদি ইঞ্জিন রুমে ঢুকিয়ে দেয়া যায়, ব্যস, হয়ে গেল কাজ। ইঞ্জিন তো যাবেই, ডেকে লুকিয়ে থাকা সৈন্যও মরবে বেশ কিছু।
হঠাৎ ডেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করল সৈন্যরা। তাদের মাঝে রয়েছে হ্যামার, চেঁচিয়ে সাহস দিচ্ছে সবাইকে, গুলি করতে বলছে।
গুলি শুরু করল সৈন্যরা।
ঘামে ভিজে সপসপ করছে ওমরের গা। টেনে ছিঁড়ে গা থেকে শার্টটা খুলে ফেলে দিল। মরিয়া হয়ে উঠেছে বেদুইন। কিছুতেই পরাজয় বরণ করবে না, যে। করে হোক ঠেকাবেই দুশমনকে। মাথা নোয়াও, নুইয়ে রাখো! চেঁচিয়ে বলল সে।
ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি এসে লাগছে পেছনের দেয়ালে, কোনটা খসে পড়ছে চত্বরে, কোনটা পিছলে যাচ্ছে তীক্ষ্ণ শব্দ তুলে। মারাত্মক।
সুইভেল-গানটা সরিয়ে আরেকটু সামনে নিয়ে এল ওমর। ডেক সই করে ছাড়ল আরেক ঝক গুলি। সুইভেল-গান ব্যবহার শেষ, আর নাগাল পাবে না জাহাজের। ছিঁড়েখুঁড়ে গেল ডেক, দুজন সৈন্য পড়ে গেল, কিন্তু ইঞ্জিন আগের মতই সচল।
মরিয়া হয়ে উঠেছে তিন কিশোরও। মাসকেট তুলে সারেঙকে লক্ষ্য করে গুলি করল কিশোর। নিশানা ভাল না, সারেঙের মাথার ওপর দিয়ে গেল গুলি। ঝট করে মাথা নুইয়ে ফেলল লোকটা। ববের দিকে বন্দুকটা ছুঁড়ে দিয়ে গুলিভর্তি আরেকটা তুলে নিল কিশোর। আবার গুলি করল সারেঙকে। আর্তনাদ করে উঠে পড়ে গেল লোকটা, আস্তে আস্তে উঠল আবার। এক হাত দিয়ে আরেক হাত চেপে ধরে রেখেছে, বেকায়দা ভঙ্গিতে বাঁকা হয়ে আছে আহত হাতটা। যাক, একটা গুলি অন্তত খেয়েছে।
সুইভেল-গানের গুলি বর্ষণের পর পরই শূন্য হয়ে গেছে ডেক, আবার নিচে গিয়ে লুকিয়েছে সবাই।
থামো, আদেশ দিল ওমর। আন্দাজে গুলি করো না আর। ভালমত দেখে নিশানা করে তবে। ব্যাটারা বেরোক।
কিন্তু আর বেরোল না কেউ।
কাছে চলে আসছে ট্রলার, শিগগিরই ঘাটে লাগবে। এখুনি কিছু একটা করতে না পারলে আর সময় পাওয়া যাবে না।
টেনেহিঁচড়ে একটা কামানকে একেবারে কিনারে নিয়ে এল ওমর, তাকে সাহায্য করল অন্য তিনজন। জাহাজটা এসে চাপ দিয়ে চ্যাপ্টা করে দিল ঘাটে বাঁধা নৌকাকে। চত্বরের এক জায়গায় নিচু দেয়াল, ছাতে যেমন আছে, মাঝে মাঝে

ফোকর। দেয়ালের নিচেই এখন জাহাজটা। ওমরের উদ্দেশ্য বুঝতে পারল না অন্যেরা। কোন ফোকরে ঢুকিয়েই এখন কামান দাগা যাবে না। তাহলে?
কামানের নল কোন ফোকরে ঢোকাল না ওমর, দেয়াল সই করে দিল বারুদে আগুন ধরিয়ে। বিস্ফোরণের গরম ঝাঁপটা যেন ছ্যাকা দিয়ে গেল অভিযাত্রীদের, কালো ধোঁয়া ঢেকে দিল সামনেটা। ধোঁয়া সরে যেতে দেখা গেল, দেয়ালের বড় একটা অংশ ধসে গিয়ে পড়েছে জাহাজের ডেকে। চেঁচামেচি আর গোঙানিতে ভরে গেছে বাতাস, মাঝে মাঝে রাইফেল গর্জে উঠছে, পাথরে বাড়ি খেয়ে শিস কেটে বেরিয়ে যাচ্ছে বুলেট।
লড়াইয়ের উন্মাদনায় পাগল হয়ে উঠেছে বব, তার জীবনে এত উত্তেজনা আর কখনও আসেনি। উল্লাসে চেঁচাচ্ছে সে।
ভাঙা দেয়ালটার দিকে স্থির চোখে চেয়ে আছে কিশোর। হঠাৎ চিৎকার করে উঠল, ওমর ভাই, আসুন!
কিশোরের উদ্দেশ্য বুঝতে পারল ওমর, সে নিজেও একই কথা ভাবছিল। অন্য দুজনকে ডেকে বলল সাহায্য করতে।
হেঁইও, হেঁইও, করে ধাক্কা দিয়ে কামানটাকে ঠেলে দিল ওরা চত্বরের বাইরে।
ক্ষণিকের জন্যে বাতাসে ঝুলে রইল ভারি লোহার তাল, তারপর ডিগবাজি খেয়ে নেমে গেল নিচে। পড়ল গিয়ে জাহাজের ডেকে। ঠেকাতে পারল না ডেক এত ভারি একটা জিনিস, ভোতা শব্দ তুলে ছিঁড়ে গেল, যেন তুলট কাগজ, মস্ত কালো ফোকর সৃষ্টি করে ডেকের নিচে অদৃশ্য হয়ে গেল কামানটা। ভীষণভাবে কেঁপে উঠল। জাহাজ।
যা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জনা ছয়েক লোক নিয়ে ডেকে বেরিয়ে এল হ্যামার। খৈ ফুটছে তার মুখে, বিচ্ছিরি সব গাল দিয়ে চলেছে অনর্গল। সৈন্যদেরকে নিয়ে সিঁড়িতে উঠে পড়ল সে।
মাসকেট! চেঁচিয়ে উঠল ওমর। থাবা দিয়ে তুলে নিল হাতের কাছে পড়ে থাকা একটা বন্দুক। হ্যামারকে সই করে দিল ট্রিগার টিপে। গুলি ফুটল না। বারুদ ভরা হয়নি বোধহয় ঠিকমত।
এই সুযোগে সিঁড়ির আধাআধি উঠে চলে এল হ্যামার, দাঁত বেরিয়ে পড়েছে কুৎসিত ভঙ্গিতে-মুখব্যাদান করে রেখেছে যেন একটা জানোয়ার, হাতে রিভলভার।
বন্দুকটা ছুঁড়ে মারল ওমর। হ্যামারের হাতে বাড়ি লেগে রিভলভারটা উড়ে গিয়ে পড়ল পানিতে।
থামল না হ্যামার। গাল দিয়ে উঠে এক টানে ছুরি বের করল। দুপদাপ করে লাফিয়ে উঠে আসছে।

সাংঘাতিক একটা মুহূর্ত। কি ঘটে কি ঘটে! এদিক ওদিক তাকাল ওমর, একটা পিস্তল দেখে ছোঁ মেরে তুলেই গুলি চালাল। তাড়াহুড়োয় গুলি লাগাতে পারল না হ্যামারের গায়ে, কিন্তু একেবারে মিস হলো না, তার পেছনের লোকটা আর্তনাদ করে উল্টে পড়ে গেল।
এবার? এবার কি হবে?
ওমরের কানের কাছে গর্জে উঠল পিস্তল, পলকের জন্যে বধির হয়ে গেল সে। এবারও হ্যামারের গায়ে লাগল না, তার পেছনের আরেকটা লোক উল্টে পড়ল, তার ধাক্কায় গড়িয়ে পড়ল আরেকজন।
ফিরেও তাকাল না হ্যামার, উঠে এল ওপরে, তার প্রায় গায়ে গা ঘেঁষেই এল। আর দুজন।।
যে-কোন একটা অস্ত্রের জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে ওমর। কামানে আগুন দিয়েছিল যে ভোজালিটা দিয়ে কিশোর, সেটা চোখে পড়তেই তুলে নিতে ছুটল, কিন্তু ধাড়ম করে উপুড় হয়ে পড়ল একটা পাথরে পা বেধে। বনবেড়ালের মত তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল হ্যামার।
একেবেঁকে পিছলে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল ওমর, পারল না, তার বুকের ওপর চেপে বসল হ্যামার। রোদে ঝিক করে উঠল তার হাতের ছুরির তীক্ষ্ণধার ফলা। দাঁত বের করে কুৎসিত হাসি হাসল ডাকাতটা, ওমরের গলার ওপর ধীরে ধীরে নামিয়ে আনছে ছুরি, জবাই করবে।
গর্জে উঠল পিস্তল। স্থির হয়ে গেল হ্যামারের হাত, খসে পড়ল ছুরি, ছোট্ট একটা কাশি দিয়ে এক পাশে টলে পড়তে শুরু করল সে নিজেও। স্লো মোশন ছায়াছবির মত ঘটছে ঘটনা।
ধাক্কা দিয়ে হ্যামারকে গায়ের ওপর থেকে ফেলে উঠে বসল ওমর। ফিরে চেয়ে দেখল, দুহাতে পিস্তল উঁচিয়ে ধরে কাঁপছে কিশোর, নল থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। ছাই হয়ে গেছে মুখ।
থ্যাঙ্কিউ, কিশোর, ফাসফেঁসে কণ্ঠে বলল ওমর। পরক্ষণেই ভোজালিটা তুলে নিয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল।
ঘটনার আকস্মিকতায় বিমূঢ় হয়ে গেছে হ্যামারের সঙ্গীসাথীরা। ওমরকে ভোজালি হাতে উঠে দাঁড়াতে দেখে যেন প্রাণ ফিরে পেল। আক্রমণ আর করল না, নেতার পতন ঘটার পর সাহস আর মনের জোর দুই-ই হারিয়েছে ওরা। অস্ত্র ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ওপর থেকেই ঝপাঝপ লাফিয়ে পড়ল সাগরে। ব্যাপার দেখে ঘাবড়ে গেল জাহাজীরাও, বিধ্বস্ত জাহাজটাকে সরিয়ে নিতে শুরু করল। ধুম ধুম করে গুলি চালাল মুসা আর বব।
ব্যস, হয়েছে, হাত তুলল ওমর। গুলি থামাও।

দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছে কিশোর। চুল উস্কোখুস্কো। হাঁপাচ্ছে আর, ঘামছে। পিস্তলটা পড়ে আছে এক পাশে।
মুসার চোখ লাল, ধপ করে বসে পড়ল। আস্তিন দিয়ে রক্ত মুছল গালের একটা কাটা থেকে।
বব যেন নিষ্প্রাণ একটা পুতুল, শূন্য চোখে চেয়ে আছে ট্রলারটার দিকে।
বেশি কেটেছে? মুসাকে জিজ্ঞেস করল ওমর।
নাহ্, দুর্বল কণ্ঠে বলল মুসা। একটা গুলি পাথরে বাড়ি খেয়ে এসে লেগেছিল।
জাহাজটার দিকে ফিরে চাইল ওমর, পঞ্চাশ গজ দূরে গিয়ে নাক ঘোরাচ্ছে। তীরের দিকে। শিক্ষা হয়েছে ব্যাটাদের। একটা ডাব এনে ভোজালি দিয়ে কেটে, মুসার দিকে বাড়িয়ে ধরল। নাও, খেয়ে নাও, ভাল লাগবে।
এক ডাবে কি হবে, এক বালতি পানি দরকার, ডাবটা হাতে নিয়ে টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল মুসা। এত পিপাসা জীবনে লাগেনি। নৌকাটা কোথায়?
আমাদেরটা? ডুবে গেছে। ধাক্কা দিয়ে চ্যাপ্টা করে ডুবিয়ে দেয়া হয়েছে। জাহাজটা তীরের দিকে যাচ্ছে, পানি উঠছে হয়তো। উঠুক আর না উঠুক, আজ আর আসছে না। ...মাথা অত উঁচিও না, নোয়াও, গুলি করে বসতে পারে। ...আচ্ছা, সিডনি বারভুকে দেখলাম না তো। তোমরা দেখেছ?
না, মাথা নাড়ল কিশোর।
বব আর মুসা জানাল, ওরাও দেখেনি।
প্লেনটা দখল করতে না পারলে লাভ হবে না কিছু, চিন্তিত হয়ে পড়ল ওমর। ছাতে উঠল গিয়ে। ল্যাগুনে বিমানটা আছে কিনা দেখবে। সাগরের দিকে একটা নড়াচড়া দৃষ্টিগোচর হতেই ঝট করে ঘুরল ভালমত দেখার জন্যে। হায়, আল্লাহ! চেঁচিয়ে উঠল সে।
আরও বিপদ আসছে মনে করে ছাতে উঠে এল অন্যেরা। বড় জোর মাইল খানেক দূরে, দ্বীপের দিকে মুখ করে ছুটে আসছে লম্বা একটা বড় জাহাজ।
সর্বনাশ! বিড়বিড় করল বব। ডেস্ট্রয়ার। ওটা হামলা চালালে আর ঠেকাতে পারব না।
তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে হঠাৎ হাসি ফুটল কিশোরের মুখে। না, না, আক্রমণ করবে না। আমেরিকান। নেভির শিপ, বুঝতে পারছ না? ...কিন্তু এখানে এল কেন? জলদস্যুতা শেষ হয়ে গেছে অনেক বছর আগে, টহল দিচ্ছে না জাহাজটা। দেখি, কি করে।
ইস্ যদি আমাদের তুলে নিত, বলল মুসা। এক প্লেট ডিম ভাজা আর রুটি যদি খেতে দিত, আর কিছু পনির, একটা মুরগী, কলা...
বোলো না আর, দুহাত নাড়ল বব, বোলো না।

ববের কথার ধরনে হেসে ফেলল সবাই। জানে, বিপদ পুরোপুরি কাটেনি এখনও, দোদুল্যমান অবস্থা, কিন্তু জাহাজটা দেখে হালকা হয়ে গেছে সবার মন। কেন যেন মনে হচ্ছে, ওটা শত্রুপক্ষের নয়।
কোনভাবে জানাতে পারি না, আমরা এখানে আছি? প্রস্তাব দিল মুসা।
হ্যাঁ, ঠিক, সায় দিল ওমর। এসো, চেঁচাই সবাই মিলে…
একসঙ্গে জোরে চিৎকার করে ডাকল ওরা, কিন্তু কোন সাড়া এল না।
কালা নাকি সব? গোঁ গোঁ করল মুসা। ডিম ভাজার চিন্তায় বিমর্ষ। আবার ডাকি?
চিৎকার করে আবার ডাকল ওরা। সাড়া মিলল না এবারেও। তবে থামতে শুরু করল ডেস্ট্রয়ার। বোট নামল। ঝিলিক দিয়ে উঠল ছয় জোড়া ভেজা দাঁড়, দ্রুত গতিতে ছুটে এল নৌকাটা উপদ্বীপের দিকে। গলুইয়ের কাছে বসে আছে সাদা পোশাক পরা একজন অফিসার।
ছাদ থেকে চত্বরে নেমে এল অভিযাত্রীরা। ছুটে এসে দাঁড়াল ভাঙা নিচু দেয়ালের ধারে। নৌকা কাছে আসতেই ডেকে বলল ওমর, ওদিক দিয়ে ঘুরে আসুন। সিঁড়ি আছে।
স্পষ্ট আদেশ শোনা গেল। উপদ্বীপের এক পাশ ঘুরে সিঁড়ির কাছে এসে থামল নৌকা। পানিতে ভাসছে খানিক আগের খণ্ডযুদ্ধের আলামত। অবাক হয়ে দেখছে।
অফিসার। অভিযাত্রীদের দিকে চেয়ে হাসল কয়েকজন নাবিক।
হালকা পায়ে সিঁড়ি বেয়ে চত্বরে উঠে এল অফিসার। আদিম কামান বন্দুকগুলোর দিকে চেয়ে থমকে গেল। একে একে তাকাল চারটে বারুদে-মাখামাখি
শরীরের দিকে। কি ব্যাপার? ডাকাত পড়েছিল নাকি?
হ্যাঁ, জবাব দিল ওমর। আরেকটু হলেই দিয়েছিল শেষ করে। অনেক কষ্টে বেঁচেছি। লড়াই করে।
এগুলো দিয়ে?
খেলনা ভাবছেন নাকি? একেকটা গোলা যে কাণ্ড করেছে, যদি দেখতেন… সুইভেল-গানটার কথা বাদই দিলাম।
কালো পতাকাটার দিকে চোখ পড়তে ভুরু কোঁচকালো লেফটেন্যান্ট। জলদস্যু?
আধুনিক জলদস্যু।
আপনারা?
আমরা ট্রেজার আইল্যাণ্ডের গুপ্তধন-সন্ধানী, পরিবেশ হালকা করার জন্যে নাটকীয় ভঙ্গিতে বাউ করল ওমর। ধরে নিন, আমি ক্যাপ্টেন স্মলেট। আর এই যে ইনি স্কয়ার ট্রেলনী, ইনি ডক্টর লিভসী, আর ও জিম হকিনস। আর এই যে, বাঁকা হয়ে পড়ে থাকা হ্যামারের লাশটা দেখাল, এ হলো লঙ জন সিলভার।

মারা গেছে?
উপায় ছিল না। না মারলে আমরা মরতাম।
আদিম কামান-বন্দুক, জলদস্যুর কালো পতাকা, অভিযাত্রীদের পোশাক আশাক আর অবস্থা দেখে বোকা হয়ে গেছে যেন অফিসার, ব্যাপারটাকে কি ভাবে নেবে বুঝতে পারছে না। তবে তার হাবভাবে মনে হলো, অভিযাত্রীদের পাগল ভাবছে সে। তা গুপ্তধন মিলল?
নিশ্চয়ই। নইলে এত খুনখারাপী কেন? মোহরের স্তূপ দেখাল ওমর। ওই যে। চাইলে দুএকটা নিতেও পারেন, স্যুভনির রাখবেন।
হাঁ হয়ে গেল অফিসার। এগোবে কিনা ভাবতে ভাবতেই চোখ পড়ল হ্যামারের পাশে পড়ে থাকা একটা মোহরের দিকে। নিচু হয়ে সেটা তুলতে গেল।
হাঁ-হাঁ করে উঠল ওমর। ওটা না, ওটা না। নিলে মরবেন। লাফিয়ে এসে ছো মেরে তুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলল। চকিতের জন্যে সোনালি একটা ধনুক সৃষ্টি করে উড়ে গেল ডাবলুনটা, পড়ল পানিতে। হারিয়ে গেল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সে।
অভিশপ্ত। অনেক মানুষের প্রাণ নিয়েছে।
কিছু না বুঝেই মাথা নাড়ল লেফটেন্যান্ট। চলুন, জাহাজে চলুন। ক্যাপ্টেনকে সব খুলে বলবেন।
খুব ভাল কথা, চলুন, খুশি হলো ওমর।
অফিসারের পিছু পিছু নেমে এল ওরা বোটে।
ভাগ্য ভাল আমাদের, আপনারা এসেছেন, লেফটেন্যান্টের সঙ্গে আলাপ জমানোর চেষ্টা করল ওমর। কেন এসেছিলেন?
হাসল অফিসার। কেন? যে কাণ্ড করেছেন আপনারা, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অর্ধেকটা কাঁপিয়ে দিয়েছেন। বিশ মাইল দূর থেকে গোলার আওয়াজ শুনেছি, কালো ধোয়া দেখেছি। আমরা তো ভাবছিলাম, দ্বীপপুঞ্জগুলো যুদ্ধ ঘোষণা করে বসেছে। এরপরেও দেখতে আসব না?
অ। হাসল ওমর। জাহাজের কাছে চলে এসেছে বোট। রেলিঙে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কৌতূহলী দর্শক, তাদের দিকে তাকাল সে।
অস্ফুট শব্দ করে উঠল বব। ফিরে চেয়ে দেখল ওমর, চোখ বড় বড় হয়ে গেছে। ববের। ফ্যাকাসে চেহারা।
কি হয়েছে? উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করল ওমর। ব্যথা লেগেছে কোথাও?
না, কিছু না, মাথা নাড়ল বব।
কিছু তো বটেই। কি?
মনে হলো…মনে হলো, বাবাকে দেখলাম! ডেকে, নিচু গলায় বলল সে।

ঝট করে মুখ ফিরিয়ে রেলিঙের কাছে দর্শকদের দেখল আরেকবার ওমর। কই, কোথায়?
ববের কথা অফিসারের কানেও গেছে। তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে ববের দিকে। তুমি কলিনস না তো?
হ্যাঁ, কলিনস, বব কলিনস, অবাক হলো বব, তার নাম জানল কি করে। লোকটা?
তাহলে ঠিকই দেখেছ, মাথা কাত করল লেফটেন্যান্ট। তোমার বাবাই। এক বন্দরে আমাদের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। ক্যাপ্টেন তাকে আগে থেকেই চিনতেন। অদ্ভুত এক গল্প শোনাল কলিনস, গুপ্তধনের গল্প। সাহায্য করার জন্য অনুরোধ করল ক্যাপ্টেনকে। এমনভাবে বলল, যাচাই করে দেখতে রাজি হয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন, তাছাড়া এদিক দিয়েই যাওয়ার কথা আমাদের। কলিনসকে জাহাজে তুলে নিলেন তিনি।
কিন্তু ববের কানে অফিসারের কথা ঢুকল কিনা বোঝা গেল না। রেলিঙের দিকে চেয়ে রয়েছে সে। আরেকজন মধ্যবয়েসী দর্শক এসে দাঁড়িয়েছে, ববের মতই চুলের রঙ, একজন সিভিলিয়ান।
জাহাজের গা ছুঁল বোট। সিঁড়ি নামানো হলো। কারও অনুমতির অপেক্ষা না করে সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত উঠে গেল বব। সোজা গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল সিভিলিয়ান লোকটার বাড়ানো দুই হাতের মাঝে।
উঠে গেল ওমর, কিশোর আর মুসা। বব আর তার বাবার তখন মুখে হাসি, চোখে পানি। দর্শকরা ঘিরে ধরল অভিযাত্রীদেরকে।
সাড়া ফেলে দিয়েছি মনে হচ্ছে, কিশোরের কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল ওমর।
মাথা ঝোঁকাল শুধু কিশোর।
জাহাজের পেছন দিকে ডেকে একটা কাঠের সামিয়ানার তলায় অপেক্ষা করছেন ক্যাপ্টেন। অভিযাত্রীদের তাঁর কাছে নিয়ে এল লেফটেন্যান্ট, পেছন পেছন এল কৌতূহলী দর্শকের দল।
ক্যাপ্টেনের বয়েস অল্প, তরুণ। বিচিত্র পোশাক পরা অভিযাত্রীদের দেখে একই সঙ্গে কৌতূহল, সন্দেহ আর বিস্ময় ফুটল তার চোখে। ইঙ্গিতে চেয়ার দেখিয়ে বসতে বললেন তাদেরকে। জিজ্ঞেস করলেন, দলপতি কে?
ইনি, ওমরকে দেখিয়ে দিল কিশোর।
কি হয়েছিল? আবার প্রশ্ন করলেন ক্যাপ্টেন।
সবই বলব, ওমর বলল, কিন্তু তার আগে পানি খাওয়ান আমাদের। গোসলও করতে হবে। হাতমুখের যা অবস্থা। হাসল সে।
পানি আনতে বললেন ক্যাপ্টেন। আর?

দ্বীপের ধারে একটা ল্যাগুনে আমাদের প্লেন আছে, শত্রুরা দখল করে নিয়েছে, ওটা ফিরিয়ে আনতে লোক পাঠান, প্লীজ। আর আপনার লেফটেন্যান্ট সাহেব আমাদেরকে যেখান থেকে নিয়ে এসেছেন, অনেক মোহর আছে ওখানে, ওগুলোও আনা দরকার। তাড়াতাড়ি না করলে লুট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। কিছু ডাকাত দ্বীপে আশ্রয় নিয়েছে। মোহর নিয়ে প্লেনে করে পালাতে পারে।
স্থির দৃষ্টিতে ওমরের মুখের দিকে চেয়ে আছেন ক্যাপ্টেন। তার মানে, বলতে চাইছেন সত্যিই গুপ্তধন খুঁজে পেয়েছেন আপনারা?
একটা দুটো নয়, হাজার হাজার।
তাই?
বলেছিলাম না, স্যার, মোহর আছে, অনেক মোহর, বলে উঠল ববের বাবা।
শুধু মোহর না, ওমর বলল, আরও অনেক মূল্যবান জিনিস আছে দ্বীপে।
নিশ্চয়ই গ্যালিয়নটা খুঁজে পেয়েছেন আপনারা? কলিনস যেটার কথা বলছিল?
হ্যাঁ। আমার সঙ্গে গেলে দেখাতেও পারি। কিন্তু আগে আমাদের পানি আর খাওয়া...
উঠে দাঁড়ালেন ক্যাপ্টেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আগে ঠাণ্ডা হয়ে নিন, তারপর বলবেন সব কিছু। আমি তোক পাঠিয়ে দিচ্ছি দ্বীপে।
গায়ে সাবান মাখতে মাখতে বাবার সঙ্গে কথা বলছে বব। জানা গেল, হ্যামারের ছুরি খেয়ে সেদিন মরেনি কলিনস, দমটা ছিল কোনমতে। যমে-মানুষে টানাহেঁচড়া করে শেষে ডাক্তাররা বাঁচিয়েছে তাকে। অনেক সময় লেগেছে সুস্থ হতে। ভাল হয়েই আরেকটা চিঠি লিখেছে ববের কাছে, কিন্তু পায়নি বব, সে তখন বেরিয়ে পড়েছে গুপ্তধনের সন্ধানে। জ্যামাইকার কিংসটন বন্দরে চলে গেছে এরপর কলিনস, ওখানেই দেখা ডেস্ট্রয়ারের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে। প্রাচীন গ্যালিয়ন আর মোহরের কথা কৌতূহলী করে তুলেছে তরুণ ক্যাপ্টেনকে। বিশ্বাস করার আরও কারণ ছিল, কলিনস যে এলাকার কথা বলেছে, ওখানে আগেও কয়েকটা জাহাজের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে, তাছাড়া ওই এলাকাটা, এককালে ছিল জলদস্যুদের স্বর্গরাজ্য। ভেবেচিন্তে শেষে কলিনসকে জাহাজে তুলে নিলেন ক্যাপ্টেন।
জানা গেল, মাত্র আগের দিন বিকেলে বেতারে একটা মেসেজ পেয়েছেন। ক্যাপ্টেন, ম্যারাবিনার প্যান-আমেরিকান রেডিও স্টেশন মেসেজটা পাঠিয়েছে, চারজন আমেরিকানকে নিয়ে একটা বিমান নিখোঁজ হয়েছে দক্ষিণ সাগরের কোথাও। গুপ্তধন নয়, বিমানটাকেই খুঁজছিল ডেস্ট্রয়ার। কামানের গোলার শব্দ কানে আসতেই দ্রুত গতিতে ছুটে এসেছে খোঁজ নিতে। সবচেয়ে বেশি অবাক হয়েছে বব আর ববের বাবা, দুজনের কেউ কাউকে আশা করেনি এখানে।

এক ঘণ্টা পর। বেশ ভাল একটা ভূরিভোজন শেষে চার অভিযাত্রীকে আবার নিয়ে আসা হলো সামিয়ানার নিচে। সিকরস্কিটাকে উদ্ধার করে এনে ডেস্ট্রয়ারের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে। মৃদু ঢেউয়ে দুলছে ওটা স্বচ্ছ নীল পানিতে। ক্যাপ্টেনের চেয়ারের পাশে তূপ করে রাখা হয়েছে মোহর।

চেয়ারে বসল অভিযাত্রীরা।

ওমরকে বললেন ক্যাপ্টেন, এবার শুরু করুন আপনার কাহিনী। তাড়াহুড়োর দরকার নেই, খুলেই বলুন সব।

কফির কাপ টেনে নিল ওমর। তারপর শুরু করল গল্প। একেবারে গোড়া থেকে, কিছুই গোপন করল না, মাঝে মাঝে কথা যোগ করল তিন কিশোর। রুদ্ধশ্বাসে শুনলেন ক্যাপ্টেন আর তার অফিসারেরা।

অবিশ্বাস্য, ওমরের কথা শেষ হলে বললেন ক্যাপ্টেন। চোখের সামনে প্রমাণ রয়েছে, তা-ও বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে। ...তো, আপনাদের এখন কোথায় যাওয়ার ইচ্ছে?

দেশে।

হ্যাঁ, তাই যেতে হবে। আপনাদেরকে ছাড়তে পারছি না এখন, সরি, যেতে হবে আমাদের সঙ্গেই। একটা কোর্ট অভ ইনকয়্যারী হবে, তারপর আদালত থেকে। যা রায় হয়, হবে। হাজার হোক, মানুষ খুন করেছেন আপনারা।

কিন্তু প্রাণ বাঁচাতে করেছি। আর কোন উপায় ছিল না।

বুঝতে পারছি। মাননীয় আদালতও নিশ্চয়ই বুঝবেন। কিছু হবে না আপনাদের। এই একটা রুটিন শুনানী, তারপর খালাস দিয়ে দেয়া হবে। তবে মোহর সব পাবেন না আপনারা, আইন অনুযায়ী অর্ধেক নিয়ে নেবে স্টেট।

নিক। তার পরেও যা থাকবে, অনেক টাকার জিনিস, হাসল ওমর। আর মোহর! প্রাণে যে বেঁচেছি এই-ই যথেষ্ট। আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ।

ও হ্যাঁ, বললেন ক্যাপ্টেন, ট্রলারে একজন সিভিলিয়ান ছিল। লাশের পকেটের কাগজপত্র ঘেঁটে তার নাম জানা গেছে, সিডনি...

...বারডু, বলে উঠল ওমর। ও-ই পাইলট, আমাদের বিমান চোরদের একজন। ম্যারাবিনা থেকে চুরি করেছিল। হ্যামারের সঙ্গে ওর থাকার কথা, তাই ভাবছিলাম, বারডু গেল কোথায়? বোধহয় ডেকের নিচে থাকতেই আমাদের গুলি লেগে মরেছে।

গোলা লেগে, শুধরে দিলেন ক্যাপ্টেন। শরীরের অর্ধেকটা উড়ে গেছে, যেন। শেলের আঘাতে...।

গোলাও নয়, হাসল ওমর। আদিম সুইভেল-গানের কাণ্ড।

হু। আচ্ছা, চলুন এখন দ্বীপে যাই। গ্যালিয়নটা দেখান আমাদের। দুর্গও। এসব প্রাচীন জিনিসের প্রতি আমার ভারি কৌতূহল। যাবেন?
সানন্দে। আসলে, আমরাও ভালমত দেখতে চাই জাহাজটা। সেদিন তাড়াহুড়ো ছিল, তাছাড়া অন্ধকার, দেখতে পারিনি সব।
বাকি দিনটা দ্বীপে কাটাল অভিযাত্রীরা, কখনও একা, কখনও দলবল নিয়ে। রাজকীয়-গ্যালিয়নের ভেতরে বাইরে যতখানি দেখা সম্ভব, দেখল। দ্বীপটা ঘুরে দেখল। সারাক্ষণ তাদের সঙ্গে সঙ্গে রইল নৌ-বাহিনীর একজন গার্ড। যখন অন্ধকার হলো, আর কিছু দেখা গেল না, তখন ফিরে এল ওরা জাহাজে। দুর্গ থেকে লুই ডেকেইনির কালো পতাকাটা খুলে নিয়ে এসেছে বব, বন্ধুদের অনুমতি নিয়ে রেখে দিয়েছে ওটা তার কাছে, ট্রফি।
পরদিন সকালে সূর্য ওঠার পর ছাড়ল ডেস্ট্রয়ার। রাতের বেলায়ই বেতারে কিংস্টনে আমেরিকান নৌ-ঘাঁটির সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন ক্যাপ্টেন, তার ওপরওয়ালার সঙ্গে কথা বলেছেন। সোজা ওখানে গিয়ে রিপোর্ট করার আদেশ পেয়েছেন ক্যাপ্টেন।
ক্রেন দিয়ে টেনে তুলে ডেকে বহাল তবিয়তে ক্যানভাসের চাদর দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে সিকরস্কিটাকে। ডেক চেয়ারে বসে কফি খেতে খেতে কথা বলছে ওমর আর ববের বাবা।
বব, কিশোর আর মুসা দাঁড়িয়ে আছে রেলিঙের ধারে। নোঙর তোলা দেখছে। রাতের বেলায়ই কয়েকটা ডলফিন এসে জমা হয়েছে জাহাজের ধারে, ফেলে দেয়া খাবারের টুকরো-টাকরার লোভে। স্বচ্ছ পানিতে খেলা জুড়েছে ওগুলো। কখনও তাড়া করে যাচ্ছে একে অন্যকে, বোতলের মুখের মত নাক দিয়ে গুতো মারছে। পেটে, কখনও লাফিয়ে শূন্যে উঠে ডাইভ দিয়ে পড়ছে। সূর্যের সোনালি আলোয় অপরূপ সুন্দর লাগছে জীবগুলোকে।
জাহাজ ছাড়ল। ডলফিনের দলও চলল সঙ্গে সঙ্গে। কোথা থেকে এসে হাজির হলো একটা সাদা অ্যালট্রেস, উড়ে চলল জাহাজকে অনুসরণ করে।
অভিশপ্তটা মারা গেছে, প্লেনে বাড়ি খেয়ে, পাখিটাকে দেখতে দেখতে বলল মুসা।
কে বলল তোমাকে? ঘুরল কিশোর।
কেন, মরেনি? তাহলে অ্যাকসিডেন্টটা করল কে?
অ্যালট্রেসই, এটার মতই সাধারণ আরেকটা পাখি। অভিশাপ-টভিশাপ কিছু, ঝড়ের তাড়া খেয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছিল, ধাক্কা লাগিয়েছিল প্লেনের সঙ্গে।
মোহরের অভিশাপ তাহলে বিশ্বাস করো না তুমি? বলল বব।
অভিশাপ না কচু। সব মনের ভয়।

তাহলে এই যে, এতগুলো অঘটন ঘটল? মোহরটা যে-ই ছুঁলো, মরল! প্রতিবাদ করল মুসা।
তুমি মরেছ? আমি, বব, কিংবা ওমর ভাই মরেছে? ববের বাবা মরেছেন? আসলে যা ঘটার এমনিতেই ঘটত। হ্যামার আর অন্যরা যারা মরেছে, মোহরের লোভে মরেছে, অভিশাপে নয়। ঠাণ্ডা মাথায় ভালমত বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখো, কোন দ্বিধা থাকবে না আর।
তুমি বলতে চাইছ, ওমর ভাই খামোকাই অভিশপ্ত মোহরটা ফেলেছে? না ফেললেও চলত? বব আফসোস করল। আহ্হা, তাহলে তো ভুল হয়ে গেছে। স্যুভনির রাখতে পারতাম।
ওটাই যে সেই মোহরটা, কি করে জানলে? ভুরু নাচাল কিশোর। গর্তে পেয়েছ, আরও তো মোহর ছিল। সবই একরকম। কোটা তুলতে কোটা তুলে পাথরে রেখেছ, শিওর হচ্ছ কি করে?
তাই তো!
যাক ওসব কথা। দেশে ফিরে এত টাকা দিয়ে কি করবে বলো দেখি?
আমি আর কি করব? ভাল হোস্টেলে থেকে ভাল ইস্কুলে পড়ালেখা করব, ব্যস। তবে বাবা বোধহয় ভাল দেখে একটা জাহাজ কিনবে, হঠাৎ কিশোরের হাত চেপে ধরল বব। কিশোর, আমার একটা কথা রাখবে? তিন গোয়েন্দায় শরিক করে। নাও না আমাকে, চার গোয়েন্দা করে ফেলো। প্লীজ।
হাসল কিশোর। কৌশলে এড়িয়ে গেল অনুরোধটা, বলল, কেন, গোয়েন্দা হতে চাও কেন? ভাল একটা পালের জাহাজ বানিয়ে জলদস্যু হয়ে যাও না? টাকা। তো আছেই।
আহা, তা যদি হতে পারতাম, দীর্ঘশ্বাস ফেলল বব। নীল পানিতে ডলফিনের খেলা দেখতে দেখতে স্বপ্নের জগতে হারিয়ে গেল সে, বোধহয় লুই ডেকেইনির কথাই ভাবছে। এক সময় মুখ তুলে বলল, জলদস্যু হই আর না হই, নাবিক হবই। জাহাজ নিয়ে বেরিয়ে পড়ব খোলা সাগরে। এতদিন মনে মনে দোষ দিয়েছি। বাবাকে, কিন্তু আজ বুঝতে পারছি, কিসের নেশায় ঘর ছেড়েছে বাবা। এই খোলা, আকাশ, খোলা বাতাস, নীল সাগর…আহা! আবার স্বপ্ন দেখতে শুরু করল সে।

ভলিউম ০০২ – প্রেতসাধনা – রকিব হাসান – তিন গোয়েন্দা – কিশোর থ্রিলার

প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি, ১৯৮৭

ওই দেখো! কিশোরকে দেখেই বলে। উঠলেন মেরি চাচী। সাঁতারের পোশাক পরেই চলে এসেছে! তোকে না কতবার বলেছি এসব পরে নাস্তা খেতে আসবি না কখনও।

স্পোর্টস শার্টের হাতা কনুইয়ের কাছে গুটিয়ে তুলে দিয়ে কমলার রসের দিকে, হাত বাড়াল কিশোর পাশা। সাঁতার কাটতে যাচ্ছি, শান্ত কণ্ঠে বলল সে। মুসা আর রবিন এই এল বলে।

তাই বলে এসব পরে? খেয়ে গিয়ে পরলে চলত না?

কালো মস্ত গোঁফে লেগে থাকা রুটির কণা মুছলেন টেবিলের ওপাশে বসা রাশেদ চাচা। হালকা কিছু খা। ভরাপেটে সাঁতরাতে অসুবিধে হয়।

আরে, না না, সবই খাক, তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন মেরি চাচী। না খেলে পরিশ্রম করবে কী করে? কফির কাপ, সেই সঙ্গে টেবিলে পড়ে থাকা দৈনিকটা টেনে নিলেন।

পাউরুটির টুকরোতে পুরু করে মাখন মাখতে শুরু করল কিশোর।

আরে! বিস্মিত কণ্ঠ মেরি চাচীর।

কৌতূহলী চোখে তাকাল কিশোর। সহজে কোন ব্যাপারে তো অবাক হয় না চাচী!

অনেক আগে অডিয়নে দেখেছিলাম ছবিটা! আপন মনেই বললেন। চাচী। এই ষোলোসতেরো বছর বয়েস তখন আমার।

শূন্য দৃষ্টিতে তাকালেন রাশেদ চাচা।

দেখার পর পুরো এক হপ্তা ঘুমোতে পারিনি, বলতে বলতে কাগজটা স্বামীর দিকে ঠেলে দিলেন চাচী।

ঘুরে এসে চাচার কাঁধের ওপর দিয়ে কাগজটার দিকে তাকাল। কিশোর। হালকা-পাতলা একজন মানুষের ছবি, ঠেলে বেরিয়ে আছে। চোয়াল, তোতাপাখির ঠোঁটের মত বাঁকানো নাক, কালো চোখের তারা। উজ্জ্বল একটা কাঁচের গোলকের ওপর দৃষ্টি স্থির।

র‍্যামন ক্যাসটিলো, বিড়বিড় করল কিশোর। দ্য ভ্যাম্পায়ারস লেয়ার ছবিতে। অভিনয় তো বটেই, মেকাপেও মাস্টার ছিল লোকটা।

গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল মেরি চাচীর। উফফ! ক্রাই অভ দ্য ওয়্যারউলফ ছবিতে যদি দেখতি ওকে!

দেখেছি, বলল কিশোর। গত মাসে টেলিভিশনে দেখিয়েছে।

লেখাটা পড়া শেষ করে মৃত অভিনেতার ছবির দিকে চেয়ে রইলেন রাশেদ চাচা কয়েক মুহূর্ত। মুখ তুললেন। ক্যাসটিলোর প্রাসাদে নিলাম। হবে, একুশ তারিখ।

যাওয়া দরকার।
ভ্রূকুটি করলেন মেরি চাচী। জানেন, বাধা দিয়ে লাভ হবে না, যাবেনই রাশেদ পাশা। আশপাশে যেখানে যখন পুরানো জিনিসপত্র নিলাম হয়, তার যাওয়া চাই-ই। যা পান, কিনে এনে স্তূপ দেন পাশা স্যালভেজ ইয়ার্ডে। দেখে মনে হয়, অদরকারী জিনিস, কিন্তু এসব জিনিসেরও দরকার পড়ে লোকের, কিনতে আসে তারা। বেশ ভালই লাভ পুরানো জিনিসে। তবে এমন সব জিনিসও নিয়ে আসেন রাশেদ চাচা, যেগুলো একেবারেই বাতিল। হয়তো কোনদিনই বিক্রি হবে না, সেসব নিয়েই মেরি চাচীর আপত্তি। কিন্তু চাচীর কথায় থোড়াই কেয়ার করেন। চাচা।
ক্যাসটিলোর জিনিসপত্র সব বেচে দেবে ওরা, আবার বললেন চাচা। এমনকী এই ক্রিস্টাল বলটাও, ছবিতে আঙুল রাখলেন। দ্য ভ্যাম্পায়ারস লেয়ারে ব্যবহার করা হয়েছিল এটা।
ওসব অ্যানটিক জিনিস কেনার মানুষ আলাদা, তাদের আলাদা। ব্যবসা, প্রতিবাদ করলেন চাচী। তা ছাড়া দামও নিশ্চয় অনেক উঠবে।
তা উঠবে, কাগজটা এক পাশে সরিয়ে রাখলেন চাচা। অ্যানটিক যারা জোগাড় করে, তারা তো পাগল হয়ে ছুটে আসবে।
তা হলে আর গিয়ে কী করবে? উঠে টেবিল পরিষ্কার করতে শুরু করলেন চাচী। কাপ-প্লেটগুলো নিয়ে গিয়ে সিঙ্কে চুবিয়ে রাখলেন। একটা একটা করে তুলে ধুয়ে মুছে সাজিয়ে রাখতে লাগলেন তাকে। পথে ঘোড়ার খুরের শব্দ হতেই কান পাতলেন। ওই যে, পারকারদের মেয়েটা যাচ্ছে।
জানালার কাছে এসে দাঁড়াল কিশোর। হ্যাঁ, পারকারদের মেয়েটাই। অন্য দিনের মতই ঘোড়ায় চেপে চলেছে। চমৎকার একটা মাদী আপালুসা, বাদামী লোম থেকে যেন তেল চুঁইয়ে পড়ছে। লেজের কাছে খানিকটা সাদা ছোপ আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে ঘোড়াটাকে। খুব সুন্দর! আপন মনেই বলল কিশোর। আপালুসা আরও দেখেছি, কিন্তু এমনটি দেখিনি!
ঘোড়ার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল কিশোর, কিন্তু আরোহিণীর ব্যাপারে কোন মন্তব্যই করল না। মাথা উঁচু করে বসে আছে মেয়েটা, নজর সামনে, ডানে-বায়ে কোন দিকেই ফিরছে না।
সৈকতে যাচ্ছে বোধহয়, কাজ করতে করতেই বললেন মেরি চাচী। দৌড় করাতে। মেয়েটা বড় বেশি একা। রুজের কাছে শুনলাম, বাবা-মা ইউরোপে থাকে।
জানি, বলল কিশোর। সে আরও জানে, পারকারদের বাড়ি দেখাশোনা করে রুজ, মেয়েটাকেও। বিকেলে প্রায়ই ইয়ার্ডে আসে রুজ, মেরি চাচীর সঙ্গে চা খেতে খেতে গল্প করে। আশপাশে ঘুরঘুর করে তখন কিশোর, কথা শোনে।

মাস কয়েক আগে মোড়ের কাছের পুরানা প্রাসাদটা কিনেছেন। মিস্টার পারকার। আগে যা ছিল তা-ই রয়েছে বাড়িটা, সারানো দরকার মনে করেননি তিনি। কিশোর জানে, বাড়িটার খাবার ঘরে পুরানো আমলের মস্ত এক ঝাড়বাতি ঝোলানো আছে। বাতিটা আগে ছিল। ভিয়েনার এক জমিদারের প্রাসাদে। জানে, মিসেস পারকারের একটা হীরের হার আছে, ওটার আগের মালিক ছিল ইউজেনি-র এক সম্রাজ্ঞী। পারকারদের মেয়েটার নাম জিনা, ঘোড়াটা তার খুব প্রিয়। কিশোর। এটাও জানে, বর্তমানে জিনার এক খালা আছে তাদের বাড়িতে। লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে দিন কয়েক আগে এসেছে মহিলা। রুজের মন্তব্য: বুড়িটার কাণ্ডকারখানা ভারি অদ্ভুত!

মোড়ের ওপাশে অদৃশ্য হয়ে গেল আলুসা।

কিশোর, মেরি চাচী বললেন। মেয়েটার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করিস না। তোর তো যতসব উদ্ভট কাণ্ড! রাস্তার ওপারে বাড়ি, হাজার হোক আমাদের প্রতিবেশী।

কিন্তু প্রতিবেশীসুলভ ব্যবহার তো করে না, সাফ জবাব দিল। কিশোর। ঘোড়াটা ছাড়া আর কারও সঙ্গে কথা বলে বলেও মনে হয় না।

বেশি লাজুক আরকী।

জবাব দিল না কিশোর, পথের মাথায় মুসা আর রবিনকে দেখা যাচ্ছে। সাইকেল চালানোর প্রতিযোগিতা লাগিয়েছে যেন দুজনে। ওরাও তার মতই স্পোর্টস শার্ট গায়ে চড়িয়েছে, নিচে সাতারের। পোশাক, পায়ে স্নিকার।

আমি যাই, চাচীকে বলেই আর দাঁড়াল না কিশোর, বেরিয়ে এল। ঘর থেকে।

সাইকেল নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে যোগ দিল কিশোর। এবারে সত্যিই প্রতিযোগিতা শুরু হলো। সাই সাই প্যাডাল ঘুরিয়ে অন্য দুজনের আগে চলে এল সে। এমনিতে মুসার সঙ্গে পারার কথা নয় কিশোরের, কিন্তু মুসা আর রবিন অনেক পথ পেরিয়ে এসেছে, আর সে সবে শুরু করেছে। চালানো।

দেখতে দেখতে পথের মোড়ে পৌঁছে গেল ওরা। ছোট্ট পাহাড়ের জন্যে ওপাশের কিছু দেখা যায় না, সৈকতের দিকে চলে গেছে যে সড়কটা, ওটাও চোখে পড়ে না।

হঠাৎ, হেইই, কিশোর! বলে চেঁচিয়ে উঠল মুসা।

কিশোরও দেখেছে, কিন্তু সামলে নেয়ার সময় পেল না। সামনে আচমকা বিশাল মূর্তিটা উদয় হতেই সাইকেলের কথা ভুলে গিয়ে আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে দুহাত মাথার ওপর তুলে ফেলল সে, ভারসাম্য হারিয়ে হুড়াম করে কাত হয়ে পড়ে গেল এক পাশে। উরুর ফাঁক থেকে ঝনঝন শব্দ তুলে পিছলে সরে গেল সাইকেল।

উঁচু পর্দায় চিৎকার শোনা গেল, ঘোড়ার ডাক নয়, মেয়ে কণ্ঠ।

মুহূর্ত পরেই আলকাতরা মেশানো পথের নুড়িতে নাল লাগানো ঘোড়ার খুরের বিচিত্র শব্দ উঠল, ব্রেক কষে নিজেকে থামানোর প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছে জানোয়ারটা। ঠিক চোখের সামনে খুর দুটো দেখতে পেল কিশোর। দ্রুত এক গড়ান দিয়ে পাশে সরে গেল সে, তারপর উঠে বসল।
পেছনের পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে গেছে আপালুসা, নামিয়ে আনছে সামনের পা। দুকান লেপ্টে আছে মাথার সঙ্গে। পথের ওপর চিৎপাত হয়ে আছে পারকারদের মেয়ে।
মাটিতে সাইকেল শুইয়ে রেখে সাহায্য করতে ছুটে গেল মুসা আর রবিন। হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে কিশোরও ছুটল।
নিচু হয়ে জিনার কাঁধে হাত রাখল মুসা।
হাঁপাচ্ছে মেয়েটা, হাঁ করে শ্বাস নিচ্ছে। চেঁচিয়ে উঠল, হা-হাত সরাও!
ইলেকট্রিক শক খেল যেন মুসা, হাত সরিয়ে আনল।
খুব বেশি লেগেছে? মেয়েটার দিকে ঝুঁকে মোলায়েম গলায় প্রশ্ন করল রবিন।
কোনমতে উঠে বসল জিনা। হাঁটু চেপে ধরে রেখেছে। আঙুলের ফাঁক দিয়ে চুঁইয়ে বেরিয়ে আসছে রক্ত, জিনসের প্যান্টের এক হাঁটুর কাছে ছেঁড়া, জায়গাটার চারপাশ ভিজে গেছে রক্তে। কান্নার মত ফোপানি বেরোচ্ছে তার গলা থেকে, কিন্তু চোখ শুকনো, কাঁদছে না। হাপাচ্ছে। এখনও।
নাহ, সত্যিই খুব চোট পেয়েছ! গলায় সহানুভূতি ঢালল মুসা।
মুসার কথায় কানই দিল না জিনা, কড়া চোখে তাকাল কিশোরের দিকে। হঠাৎ সামনে কিছু দেখলে চমকে ওঠে ঘোড়া, জানো না!
সরি! বলল কিশোর। আমি দেখিনি।
আস্তে করে উঠে দাঁড়াল জিনা। ঘোড়াটাকে এক নজর দেখে আবার কিশোরের দিকে ফিরল। মেয়েটার চুলের রঙের মতই চোখের মণিও তামাটে, জ্বলছে। যদি আমার ঘোড়ার কোন কিছু হয়... দাঁতে দাঁত চাপল মেয়েটা।
মনে হচ্ছে হয়নি, ভোতা গলায় বলল কিশোর।
খোঁড়াতে খোঁড়াতে আপালুসার পাশে গিয়ে দাঁড়াল জিনা। গায়ে হাত রাখল। লক্ষ্মী মেয়ে! শান্ত হও!
বিশাল থুতনি জিনার কাঁধে রাখল আপালুসা।
খুব ভয় পাইয়ে দিয়েছে তোমাকে, না? আস্তে করে ঘোড়ার মাথায় চাপড় দিল জিনা।
পথের মাথায় মেরি চাচীকে দেখা গেল, চেঁচামেচি শুনে ছুটে এসেছেন। এই, কিশোর! কী হয়েছে রে?

রাশ ধরে ঘোড়ার পাশে চলে এল জিনা, পিঠে চড়ার ইচ্ছে। কিন্তু আরোহী নিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করল ঘোড়া, পিছিয়ে গেল এক পা।
মুসা, কিশোর বলল। রাশটা সামনের দিকে টেনে ধরো তো। আমি ওকে তুলে দিচ্ছি।
হয়েছে হয়েছে, কারও সাহায্য লাগবে না আমার! খেঁকিয়ে উঠল জিনা।
কাছে এসে দাঁড়ালেন মেরি চাচী। জিনার উস্কোখুস্কো চুল, ধূলি ধূসরিত মুখ, ছেঁড়া প্যান্ট, রক্তাক্ত হাঁটু দেখলেন। কী হয়েছে?
ও আমার ঘোড়াকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে, কিশোরকে দেখিয়ে। গোমড়া মুখে বলল জিনা।
জিনা পড়ে গিয়েছিল, যোগ করল মুসা।
ইচ্ছে করে করিনি, বলল কিশোর। এত বড় একটা জানোয়ার যে এমন ভীতুর ডিম, তাই বা কে জানত!
এই, চুপ কর! কিশোরকে ধমক দিলেন মেরি চাচী। যা, দি গিয়ে তোর চাচাকে বল পিকআপটা নিয়ে আসতে
মেয়েটার হাঁটুর যা
অবস্থা, ঘোড়ায় উঠতে পারবে না।
না, না, পারব, প্রতিবাদ করল জিনা।
কানেই তুললেন না চাচী। কিশোরকে বললেন, দাঁড়িয়ে আছিস কেন? মুসার দিকে ফিরলেন। তুমি লাগামটা ধরো তো শক্ত করে। জিনার দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে, দেখছ না।
ভয়ে ভয়ে ঘোড়াটার দিকে তাকাল মুসা। যদি কামড়ায়?
আরে, নাহ, কামড়াবে না! ঘোড়ার ব্যাপারে তার জ্ঞান কতখানি, ভুলে প্রকাশ করে দিলেন মেরি চাচী। ঘোড়া কামড়ায় না। তবে লাথি মারে।
খাইছে! গুঙিয়ে উঠল মুসা।
ঘোড়াটাকে পারকার হাউসে নিয়ে এল তিন গোয়েন্দা। গাড়ি-বারান্দায় স্যালভেজ ইয়ার্ডের পিকআপটা দাঁড়িয়ে আছে, মেরি চাচী কিংবা জিনাকে দেখা যাচ্ছে না কোথাও।
বারান্দার ছাতকে ঠেকিয়ে রেখেছে যেন বড় বড় থাম, সেদিকে চেয়ে বলল মুসা, মেরি চাচী তার দাদীর স্কার্টটা পরে এলে মানাত এখানে।
হাসল কিশোর। কোন্ আমলের বাড়ি এটা!
মধ্যযুগের হলেও অবাক হব না! রবিন বলল। কিন্তু ঘোড়াশালটা কোথায়?
বাড়ির পেছনের সীমানা দেখাল মুসা। ওই যে একটা মাঠ, কাঁটাতারে ঘেরা।
চলো, ওখানেই নিয়ে যাই, প্রস্তাব দিল কিশোর।

প্রাসাদের এক পাশে পাথরে বাঁধানো চত্বর প্রায় ঢেকে গেছে। ওইসটেরিয়া লতাঝাড়ে। তার এক পাশে কংক্রিটের সরু পথ ধরে পেছনের মাঠে ঘোড়াটাকে নিয়ে চলল তিন গোয়েন্দা।

বাড়ির পেছনে বিশাল আঙিনা। তার পরে তারে ঘেরা মাঠ, মাঠের পরে পাশাপাশি তিনটে গ্যারাজ। একটা গ্যারাজের মস্ত দরজা হাঁ হয়ে খোলা, ভেতরে ঘোড়া বাঁধার জায়গা দেখা যাচ্ছে। দেয়ালে গাঁথা বড় বড় পেরেকে ঝুলছে দড়ি।

বাড়ির পেছনের দরজা খুলে উঁকি দিল রুজ। এই যে, ছেলেরা, কমেটকে নিয়ে এসেছ? মাঠে ছেড়ে দিয়ে ভেতরে এসো। মিস মারভেল তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে চান।

আবার দরজা বন্ধ করে দিল রুজ।

ঘোড়াটার দিকে চেয়ে আপন মনেই বলল মুসা, কমেট!

হ্যাঁ, বাংলায় বলে ধূমকেতু, বলল কিশোর। চাচীকে রুজ বলেছে, ঘোড়াটাকে নাকি শুধু মেট বলে ডাকে জিনা।

তার মানে বাংলায় কেতু?

আরে, না, হেসে উঠল কিশোর। মেটের বাংলা, বন্ধু।

এই মিস মারভেলটা কে, জানো? জিজ্ঞেস করল রবিন।

জিনার খালা। এখানেই থাকবে, কিশোর জানাল। রুজ বলে, এই খালাটা নাকি অদ্ভুত!

অদ্ভুত?

জানি না কেন বলে, মহিলার আচার-আচরণ নাকি ভাল লাগে না রুজের। আমরা তো যাচ্ছিই, দেখব, কেন ভাল লাগেনি।

ঘোড়ার জিন আর লাগাম খুলে নিল কিশোর। রবিন গেট খুলে দিতেই মাঠে ঢুকে পড়ল কমেট।

গ্যারাজে জিন রাখার জায়গায় জিন রাখল কিশোর, লাগাম ঝুলিয়ে রাখল একটা পেরেকে। তারপর প্রাসাদের পেছনের একটা দরজা খুলে দুই সঙ্গীকে নিয়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে। রান্নাঘর। জানালা দিয়ে এসে পড়া রোদের আলোয় ঝলমল করছে মস্ত ঘরটা।

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল ওরা চওড়া বিরাট এক হলঘরে। বায়ে খাবার ঘর। হলের ছাতে ঝুলছে, সেই বহুল আলোচিত ঝাড়বাতি। ওপাশের জানালা দিয়ে চোখে পড়ে ওইসটেরিয়া ঝাড়ে ঢাকা চত্বর। ডানে একটা শোবার ঘর, খোলা দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে হালকা সবুজ দেয়াল, ওপরের দিকে সোনালি রঙের কারুকাজ। শোবার ঘরের পাশে আরেকটা দরজা, ওই দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে আরেকটা ঘর, দেয়াল আলমারির তাকে তাকে ঠাসাঠাসি করে রাখা বই।

হলঘরের সোফায় আধশোয়া হয়ে আছে জিনা, আহত হাঁটুর নিচে একটা তোয়ালে। ওর পাশে বসে আছে এক বয়স্কা মহিলা। পরনে নীলচে-লাল মখমলের গলাবন্ধ লম্বা গাউন, গলায় রূপার একটা চেপ্টা আঙটা। লালচে-ধূসর চুল। বাতাসে ল্যাবিণ্ডারের গন্ধ, পুরানো গির্জার শব-রাখা ঘরের কথা মনে করিয়ে দেয়।

খালা, সোফায় রক্ত লাগালে মা মেরে ফেলবে আমাকে, জিনা বলল। আমি ওপরতলায়...।

চুপ করে বসো এখানে, শান্ত কণ্ঠে বলল মিস মারভেল। এতবড় একটা আঘাত। ছেলেদের দিকে একবারও তাকাল না মহিলা। কাঁচি দিয়ে জিনার প্যান্ট হাঁটুর কাছ থেকে কেটে নামিয়ে দিল। ইসস, অনেকখানি কেটেছে!

ও কিছু না, অভয় দিলেন মেরি চাচী। ফায়ারপ্লেসের কাছে একটা চেয়ারে বসেছেন। ওষুধ লাগালেই সেরে যাবে।

মাকড়সার জাল দরকার, আনমনে বলল মিস মারভেল।

মাকড়সার জাল! মেরি চাচীর ভুরু কুঁচকে গেছে।

মাকড়সার জাল! চমকে উঠল জিনার কাছে দাঁড়ানো রুজ, হাতের গরম পানির পাত্র থেকে ছলকে পড়ল পানি।

নড়েচড়ে উঠল সহকারী, দুই গোয়েন্দা, অস্বস্তি বোধ করছে। গোয়েন্দাপ্রধানের দিকে তাকাল মুসা, চোখে জিজ্ঞাসা।

হেসে রুজকে বলল কিশোর, খুব অবাক হয়েছেন মনে হচ্ছে? মাকড়সার জাল নেই নাকি এ-বাড়িতে?

রেগে উঠল রুজ। জাল কী করে থাকবে? এক কণা ধুলো রাখি না আমি, ঝেটিয়ে দূর করি, আর জাল থাকবে! লাল হয়ে গেছে তার মুখ।

হায় রে কপাল! আক্ষেপ করল মিস মারভেল। সাধারণ মাকড়সার জাল, তা-ও মেলে না এখানে! কী আর করা। যাও, আমার ওষুধের বাক্স থেকে সোনার ছোট বয়মটা নিয়ে এসো।

রুজ চলে গেল। ছেলেদের দিকে মুখ তুলে তাকাল মিস মারভেল, জিনাকে সাহায্য করার জন্যে ধন্যবাদ দিল। তারপর বলল, আমার কথা

তো শোনে না। কতবার বলেছি, আর কিছু না হোক, গলায় অন্তত লাল একটা রুমাল বেঁধে নাও, সব রকম অঘটন থেকে রেহাই পাবে। লাল রঙ দুর্ঘটনা ঠেকায়, জানো তো?

নিশ্চয়ই, জবাব দিল কিশোর।

ছোট একটা সোনার বয়ম এনে মিস মারভেলের হাতে তুলে দিল রুজ।

এতেও চলবে, বলল জিনার খালা। মাকড়সার জালের মত তত কাজের নয়, তবে ভাল। আমি নিজে বানিয়েছি। ছিপি খুলে মলম বের করে বোনঝির আহত জায়গায় ডলে লাগিয়ে দিল।
মেডিক্যাল অ্যাসোশিয়েশনের অনুমোদন আছে? জানতে চাইল জিনা।
কী যে বলো না তুমি, মেয়ে, অনুমোদন দিয়ে কী হবে? কাজ হলেই হলো, বলল মিস মারভেল। অমাবস্যার রাতে নিজে শেকড়-পাতা জোগাড় করেছি আমি। ওই দেখো, লাগানোর সঙ্গে সঙ্গে রক্ত বন্ধ হয়ে। গেছে।
অনেক আগেই রক্ত বন্ধ হয়েছে আমার, ওই আজেবাজে জিনিস না লাগালেও চলত, খালা। এবার কী? হুইলচেয়ার আনতে বলবে?
একটা ব্যাণ্ডেজ হলে, তাতে মাছির ডিম ভেঙে মাখিয়ে... খালার কথা শেষ হওয়ার আগেই উঠে দাঁড়াল জিনা। লাগিয়ে পচে মরি। ওসব কিছু লাগবে না আমার! সিঁড়ির দিকে রওনা হলো সে। ছেলেদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় থামল, থ্যাঙ্কস! শুনলাম, মেটকে জায়গামতই এনে রেখেছ।
না না, এর জন্যে ধন্যবাদ আবার কেন? এ তো আমাদের কর্তব্য ছিল, হাসিতে ঝকঝকে সাদা দাঁত বেরিয়ে পড়েছে মুসার। আড়চোখে একবার তাকাল বন্ধুদের দিকে
ঘোড়া আনার কাজে সে কোন সহায়তাই করেনি, ভয়ে দূরে দূরে ছিল, সেটা না আবার বলে দেয় ওরা।
ওপরতলায় উঠে গেল জিনা।
শিগগিরই মত বদলাবে ও, বলল মিস মারভেল। যখন ব্যথা কমে যাবে, কালকের মধ্যেই ক্ষত শুকিয়ে যাবে, তখন বুঝবে মলমের গুণ আছে কিনা। বাচ্চা মেয়ে তো, এতবড় একটা ব্যথা পেয়েছে...ও, হ্যাঁ, মেরি চাচীর দিকে চেয়ে বলল মহিলা। আপনারা কে, তাই তো জানা। হয়নি।
মেরি চাচী উঠে দাঁড়ালেন। আমি মিসেস রাশেদ পাশ, ও আমার ছেলে কিশোর। বাইরের লোকের কাছে কিশোরকে নিজের ছেলে বলেই পরিচয় দেন তিনি। ও হলো মুসা আমান, আর ও রবিন মিলফোর্ড।
কিশোরকে দেখতে দেখতে হঠাৎ স্থির হয়ে গেল মিস মারভেলের। দৃষ্টি, বেগুনী চোখের তারায় বিস্ময়। আরে, কিশোর পাশা! মানে, কমিক পাশা?
ঠিকই চিনেছেন, বন্ধুগর্বে আধহাত ফুলে গেল মুসার বুক। ও কমিক পাশা। টেলিভিশনে কমিক দেখিয়ে এই বয়সে এত সুনাম আর কেউ কামাতে পারেনি।
তা, খোকা, সিনেমায় ঢুকছ না কেন? বাচ্চাদের ছবি বানান হলিউডের বিখ্যাত ফিল্ম ডিরেকটর মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফার, তাকে গিয়ে ধরো... জানালার

বাইরে চোখ পড়তেই থেমে গেল মিস মারভেল। চেঁচিয়ে উঠল, আরে, মিস্টার ভ্যারাড।
ফিরে তাকাল ঘরের আর সবাই। আগাগোড়া কালো পোশাক পরা একজন মানুষ নামছে ট্যাক্সি থেকে। অবাক হলো কিশোর। মানুষের মুখ এত ফেকাসে! সারাজীবন অন্ধকার গুহায় কাটিয়ে মাত্র যেন বেরোল!
হাতে একটা সুটকেস নিয়ে সরু পথ ধরে সদর দরজার দিকে এগোল। লোকটা।
শেষ পর্যন্ত তা হলে এলেন উনি! খুশিতে আত্মহারা হয়ে উঠেছে মিস মারভেল। আশা পুরো হলো আমার।। আমরা তা হলে আসি, ছেলেদের ঠেলে নিয়ে দরজার দিকে রওনা হলেন মেরি চাচী। চওড়া বারান্দা পেরিয়ে এল ওরা। সরু পথে পাশ। কাটাল আগন্তুককে।
পিকআপে ওঠার আগে থমকে দাঁড়ালেন মেরি চাচী। তোরা তো সাঁতার কাটতে যাবি। এগিয়ে দিয়ে আসব?
না না, লাগবে না, হাত তুলল কিশোর। হেঁটেই যেতে পারব।
যা, এখানে আর থাকিস না! মাথা নাড়লেন তিনি। কাণ্ড! কাটা ক্ষতে মাকড়সার জাল, মাছির ডিম! মেরে ফেলার জোগাড়! গাড়িতে চড়ে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিলেন।
মাছির ডিমের কথা শুনিনি, তবে মাকড়সার জালের কথা শুনেছি, বলল কিশোর। বইপত্র প্রচুর ঘাটাঘাটি করে সে, উদ্ভট লেখা দেখলেই তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। রক্ত বন্ধ করতে নাকি খুব কাজ দেয়। পুরানো আমলে লোকে ব্যবহার করত।
পুরানো আমলে তো ছাইপাঁশ কত কী-ই ব্যবহার করত লোকে, মরতও! যত্তসব! গজগজ করতে করতেই ইঞ্জিন স্টার্ট দিলেন মেরি চাচী। গাড়ি পিছিয়ে নিয়ে চললেন গেটের দিকে।
অদ্ভুত! বলল মুসা। রুজ ঠিকই বলেছে। জিনার খালা জানি কেমন!
কুসংস্কার ছাড়তে পারেনি, কিশোর বলল।
সেরাতে ঘুমানোর আগে অনেক ভাবল কিশোর। জিনার খালার বানানো মলমের কথা মনে করে হাসি পেল। অমাবস্যার রাতে শেকড় বাকড় জোগাড় করে...হাহ! হেসে কম্বলটা গলার কাছে টেনে নিল সে। চোখ লেগে এসেছে, এই সময় দরজায় দমাদম কিল পড়তেই তন্দ্রা টুটে গেল।
মিসেস প্যাশাআ! মিসেস প্যাশাআ! দরজা খুলুন!
লাফিয়ে বিছানা থেকে নামল কিশোর, এক টানে ড্রেসিং গাউনটা নিয়ে গায়ে চড়িয়েই দরজা খুলে সিঁড়ির দিকে ছুটল। মাঝামাঝি নেমে গেছেন মেরি চাচী,

তার পিছনে রাশেদ চাচা। একেক লাফে দুতিনটে করে সিঁড়ি টপকে চাচা-চাচীর পেছনে চলে এল সে।
দরজা খুলে দিলেন চাচী।
প্রায় হুমড়ি খেয়ে এসে ঘরের ভেতরে পড়ল ক্লজ। আউহহ...মিসেস, প্যাশা! হাঁপাচ্ছে। পরনে শুধু ড্রেসিং গাউন, পায়ে চপ্পল।
কী হয়েছে, রজ? মেরি চাচী অবাক।
আজ রাতটা থাকতে দেবেন? ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল রুজ। মেরি চাচী না বললেই কেঁদে ফেলবে যেন।
রুজ, হয়েছে কী?
গান!
কী?
গান! কেঁপে উঠল রুজ। কিছু একটা এসে ঢুকেছে ও-বাড়িতে, গান জুড়েছে! মেরি চাচীর হাত আঁকড়ে ধরল সে। ভয়ঙ্কর! জিন্দেগীতে ওরকম গান শুনিনি! আমি আর ওখানে ফিরে যাব না!
আস্তে করে রুজের হাত সরিয়ে দিলেন মেরি চাচী। ঠিক আছে, ফোন করছি আমি।
নাক কোঁচকাল রুজ। তা করুন। কিন্তু আমি আর ওখানে ফিরে যাচ্ছি না।
পারকারদের বাড়ির নাম্বারে রিং করলেন মেরি চাচী। ফোন ধরল মিস মারভেল। সংক্ষিপ্ত কথাবার্তার পর রিসিভার নামিয়ে রাখলেন চাচী। মিস মারভেল নাকি তেমন কিছু শোনেনি।
ওই বুড়ি তো বলবেই! চেঁচিয়ে উঠল রুজ।
কেন? বলবে কেন?
মানে...ইয়ে...ও, ও নিজেই তো অদ্ভুত! যেসব কাণ্ড ঘটছে ও বাড়িতে, লাখ টাকা দিলেও আর ফিরে যাচ্ছি না।
ব্যাপারটা নিয়ে আর কিছু বলতে চাইল না রুজ, পারকারদের বাড়িতে আর ফিরেও গেল না। রাতটা কিশোরদের বাড়িতে শোবার ঘরে। কাটাল। সকালে গিয়ে রুজের জিনিসপত্র নিয়ে এলেন রাশেদ চাচা, সুটকেস গুছিয়ে দিয়েছে জিনা। তারপর লস অ্যাঞ্জেলেসে রুজের মায়ের। কাছে তাকে পৌঁছে দিতে চললেন।
কী এমন শুনল! রুজ ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই বলল কিশোর।
কী জানি! হাত নাড়লেন চাচী। নিজের কাজে চলে গেলেন।
পরের কদিন ব্যাপারটা নিয়ে অনেক ভাবল কিশোর। সেদিন সকালেও একই কথা ভাবতে ভাবতে ঘর থেকে বেরোল, স্যালভেজ ইয়ার্ডের ভেতরের খোয়া বিছানো পথ ধরে এগোল তার নিজস্ব ওয়ার্কশপের দিকে। কাজে ব্যস্ত দুই

ব্যাভারিয়ান ভাই, বোরিস আর রোভার, মারবেলের তৈরি একটা চুলা ঘষেমেজে পরিষ্কার করছে। হলিউড পাহাড়ের ধারে এক পুড়ে যাওয়া বাড়ির নষ্ট জিনিসপত্র কিনে এনেছেন রাশেদ চাচা, চুলাটা ওসবের ভেতর থেকেই বেরিয়েছে।
মুসা এসেছে, মুখ তুলে বলল বোরিস। ওয়ার্কশপে।
ছাপার মেশিন চালু করেছে, রোভার যোগ করল।
মাথা ঝোকাল কিশোর। মেশিন যে চালু হয়েছে, এটা না বললেও চলত। মেরামত করা পুরানো মেশিনের ঘটাং-ঘট ঘটরাং-ঘট এখান থেকেই কানে আসছে। ইসস, ভাঙা একটা আধুনিক মেশিন যদি কোন জায়গা থেকে জোগাড় করতে পারত চাচা!-ভাবল কিশোর, এই বিশ্রী। আওয়াজ থেকে রেহাই পাওয়া যেত।
এক জায়গায় তূপ করা আছে বড় বড় গাছের কাণ্ড; ইস্পাতের কড়িবরগা আর কিছু লোহার জাল। ওগুলো ঘুরে অন্য পাশে চলে এল। কিশোর, স্যালভেজ ইয়ার্ডের মূল আঙিনা দেখা যায় না এখান থেকে, মেরি চাচীর কাঁচে ঘেরা ছোট্ট সুন্দর ছিমছাম অফিসটাও চোখে পড়ে না। উঁচু কাঠের তক্তার বেড়া দিয়ে ঘেরা পুরো ইয়ার্ড, একদিকের বেড়ার ওপাশেই রাস্তা। কিছুটা জায়গায় বেড়ার মাথায় ছয় ফুট চওড়া চাল, চালের ভার রেখেছে লোহার খুটি। রোদবৃষ্টিতে পুড়ে-ভিজে নষ্ট হয়ে যায়। যেসব জিনিস, ওগুলো রাখা হয়েছে এই চালার নিচে।
ওয়ার্কশপে ঢুকল কিশোর। ছাপার মেশিনের ওপর ঝুঁকে আছে মুসা, কার্ড ছাপছে। কিছু দিন পর পরই কার্ডের ডিজাইন পাল্টায় কিশোর। কারণ আছে। তিন গোয়েন্দার দেখাদেখি অনেক ছেলেই গোয়েন্দা সাজতে শুরু করেছে; দুই গোয়েন্দা, চার, পাঁচ, ছয়, সাত গোয়েন্দাও গজিয়ে উঠেছে; আগের ছুটিতে টেরিয়ার ডয়েল তো এগারো গোয়েন্দা বানিয়ে বসেছিল। যদিও কাজের কাজ কিছুই করতে পারেনি। একবার তো গোয়েন্দাগিরি করতে গিয়ে ডাকাতের ধোলাই খেয়ে এসে পুরো পনেরো দিন বিছানায় পড়েছিল শুঁটকি টেরি আর তার সাঙ্গপাঙ্গরা।
ছাপানো কার্ডের তূপ থেকে একটা কার্ড তুলে নিল কিশোর।
মেশিন থামিয়ে ফিরে তাকাল মুসা। কেমন হয়েছে?
খুব ভাল, প্রশংসা করল কিশোর। ভাবতেই পারিনি, এত উন্নতি। করব আমরা, আমাদেরকে নকল করবে লোকে!
চুপ করে রইল মুসা। তিন গোয়েন্দা-র গোড়াপত্তনের সময় ভাবতে পারেনি সে-ও, সংস্থাটা এভাবে টিকে যাবে, কিশোর যখন প্রস্তাব দিয়েছিল, বিদ্রূপ করতেও ছাড়েনি তাকে মুসা। আরও একটা ব্যাপারে ক্ষীণ আপত্তি ছিল তার, কিশোর কেন গোয়েন্দাপ্রধান হবে, মুসা কেন। নয়? তার গায়ে কিশোরের চেয়ে জোর অনেক বেশি, তার বয়েসী যে কোন ছেলেকে পিটিয়ে তক্তা করে দিতে পারে অনায়াসে।

কিন্তু কিশোর প্রমাণ করে দিয়েছে, গোয়েন্দা হতে হলে গায়ের জোরের চেয়ে মগজের জোর অনেক বেশি দরকার। রবিনও প্রমাণ করে দিয়েছে, সে একটা চলন্ত বিশ্বকোষ।

তিরিশ ফুট লম্বা একটা মোবাইল হোমের ভেতর তিন গোয়েন্দার হেডকোয়ার্টার। জঞ্জালের তূপের ভেতরে পুরোপুরি ঢাকা পড়ে গেছে। ট্রেলারটা, বাইরে থেকে এর কিছুই দেখা যায় না। ওটা এত বেশি পুরানো আর নষ্ট হয়ে গেছে, মেরামত করেও বিক্রি করা যাবে না, তাই ছেলেদেরকে দান করে দিয়েছেন রাশেদ চাচা। অনেক সময় লাগিয়ে অনেক পরিশ্রম করে ট্রেলারটাকে ব্যবহারের উপযোগী করে তুলেছে তিন গোয়েন্দা।

ট্রেলারের ভেতর সুন্দর একটা ল্যাবরেটরি করেছে ছেলেরা। ছবি প্রসেস করার জন্যে ছোট্ট একটা ডার্করুমও আছে। টেলিফোন আছে-তার খরচা ছেলেরাই জোগাড় করে অবসর সময়ে স্যালভেজ ইয়ার্ডে কাজ করে; চাচা-চাচীর কাছে কিশোর চাইলেই টাকা পায়, কিন্তু হাত পাততে রাজি নয় সে। ছোট্ট র‍্যাকে চমৎকার করে সাজানো রয়েছে। কিছু প্রয়োজনীয় বই, তার সঙ্গে যোগ হয়েছে কয়েকটা ফাইল-রবিনের দপ্তর। এ-যাবৎ যতগুলো রহস্যের সমাধান করেছে তিন গোয়েন্দা, সবগুলোর বিস্তারিত রিপোর্ট লেখা রয়েছে ওসব ফাইলে।

আগের কার্ডটার চেয়ে ভাল হয়েছে, কী বলো? মুসা বলল।

হ্যাঁ, হাতের কার্ডটা দেখছে কিশোর। প্রশ্নবোধকগুলো উড়িয়ে। দেয়া হয়েছে, কার্ডের কোণে এখন বড়সড় একটা আশ্চর্যবোধক। এই চিহ্নটাই বরং ভাল। রহস্যময়, অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য বোঝাতে এটাই ব্যবহার হয়, প্রশ্নবোধক দেয়াটা ভুলই হয়েছিল।

হু। একটু চুপ থেকে জিজ্ঞেস করল মুসা, আচ্ছা, জিনাদের বাড়ির কোন খবর আছে?

না, মাথা দোলাল কিশোর। রুজ যাওয়ার পর আর কোন খবর পাইনি। কী শুনে যে এত ভয় পেল সে! সত্যিই শুনেছে, না কল্পনা তাই বা কে জানে! প্রায় বলত, মিস মারভেল অদ্ভুত, কিন্তু কেন এটা মনে হয়েছে তার, বলেনি কখনও।

বলবে আবার কী? সে তো আমরা নিজেরাই দেখেছি। অদ্ভুত না হলে কাটা ক্ষতে মাকড়সার জাল দিতে চায়...

শশশশ! হঠাৎ ঠোঁটে আঙুল রাখল কিশোর। জঞ্জালের ওপাশে মৃদু একটা শব্দ শুনেছে।

ঝট করে সোজা হলো মুসা। লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে গেল জঞ্জালের ওপাশে। পরক্ষণেই তার উত্তেজিত চিৎকার কিশোরের কানে এল: তাই তো বলি! ঘোড়ার গন্ধ আসে কোত্থেকে! অনেকক্ষণ থেকেই পাচ্ছিলাম।

গটমট করে এসে ওয়ার্কশপে ঢুকল জিনা, পেছনে এল মুসা। চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, বাহ, বেশ জমিয়ে নিয়েছ!
কতক্ষণ আড়ি পাতা হয়েছে? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
অনেকক্ষণ, কারও বলার অপেক্ষায় থাকল না জিনা, একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ল, মেশিনটার কাছাকাছি।
কেন? গম্ভীর হয়ে আছে কিশোর।
কার্ডের তূপ থেকে একটা কার্ড তুলে দেখছে জিনা। হুম! হাতখরচ যা পাই, তা দিয়ে প্রফেশনাল ডিটেকটিভ ভাড়া করতে পারব না, মুখ তুলল। তোমার রেট কত?
তিন গোয়েন্দাকে ভাড়া করতে চাও?
যদি সম্ভব হয়।
তা কাজটা কী? না শুনে কিছু বলতে পারছি না। আমরা আগ্রহী না-ও হতে পারি।
হবে না মানে? হয়ে বসে আছ, বলল জিনা। তোমাদের আলাপ আলোচনা সব শুনেছি। আমাদের বাড়িতে কী হচ্ছে না হচ্ছে জানার জন্যে মাথা কুটে মরছ তোমরা। তা ছাড়া, রাজি না হয়ে উপায়ও নেই তোমাদের।
মানে? ভুরু কুঁচকে গেছে মুসার।
মানে, তেমন সাবধান নও তোমরা। পেছনের বেড়ার এক জায়গায় একটা ছবি আঁকা আছে না, অগ্নিকাণ্ডের দৃশ্য, ওই যে উনিশশো পাঁচ সালে যে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটেছিল স্যান ফ্রানসিসকোতে?
উনিশশো ছয় সালে, শুধরে দিল কিশোর।
উনিশশো বত্রিশ হলেই বা কী এসে যায়? আসল কথা হলো, দৃশ্যটাতে ছোট্ট একটা কুকুরের ছবি আছে। ওটার চোখ টিপলেই বেড়ার এক জায়গায় একটা ছোট দরজা খুলে যায়, খুলতে দেখেছি তোমাদেরকে। হেডকোয়ার্টারে ঢোকার গোপন পথ নিশ্চয়? টেরিয়ার ডয়েল জানে?
ব্ল্যাকমেইল! চেঁচিয়ে উঠল মুসা।
যা খুশি মনে করতে পারো, জিনা বলল। টাকা দেব না বলে। করছি, ভেব না। টাকা দেব ঠিকই। আসলে, সাহায্য চাই আমি। তিন গোয়েন্দার খুব নাম শুনলাম, তাই তোমাদের কাছেই এসেছি।
খুব ভাল করেছ, হাসল মুসা।
বেশ। এখন বলল, আমাকে সাহায্য করবে, না শুঁটকির কাছে যাব!
ও এখন শহরে নেই, হাসি মুছে গেল মুসার মুখ থেকে।
ওর চেলারা আছে। এগারো গোয়েন্দা বানিয়েছে ওরা। শুনলাম, তোমাদের সঙ্গে ওদের আদায়-কাঁচকলায় বন্ধুত্ব। যাব?

একটা খালি বাক্সের ওপর বসে পড়ল কিশোর। সাহায্য? কী সাহায্য চাও?
ওই ভ্যারাডের বাচ্চাকে বাড়ি থেকে তাড়াতে চাই, সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল জিনা।
ভ্যারাড? কালো পোশাক পরে যে লোকটা এসেছে, ফেকাসে মুখো?
হ্যাঁ। ফেকাসে হবে না তো কী হবে, সারাদিন থাকে ঘরে বসে! রাতে বেরোয়। শিওর, ওর বাপ একটা ছুঁচো ছিল।
ও যেদিন এল, তুমি ঘোড়া থেকে পড়ে পা কাটলে। সেরাতেই রুজ পালাল, নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে শুরু করেছে কিশোর, তার মানে জোর ভাবনা চলেছে মাথায়। অদ্ভুত কিছু একটা শুনেছে। না, কল্পনা করেনি, ঠিকই শুনেছে।
হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছে, কিন্তু গলায় জোর নেই জিনার। অস্বস্তি বোধ করছে। হাতের কার্ডটা একবার ভাজ করছে, আবার খুলছে। এর জন্যে ভ্যারাডই দায়ী, ধীরে ধীরে বলল সে। কোন উপায়ে সে-ই সৃষ্টি করেছে শব্দটা। ও আসার আগে আর ওরকম শব্দ শোনা যায়নি।
ও কি এখনও তোমাদের বাড়িতেই থাকছে? মুসা জিজ্ঞেস করল।
না হলে তাড়াতে চাইছি কেন? খালার ধারণা, হিউগ ভ্যারাডের মত মহাপুরুষ আর হয় না। খালার মাথায় আগে থেকেই গণ্ডগোল ছিল। রোজ রাতে বিছানায় ছুরির ডগা দিয়ে অদৃশ্য চক্র আঁকত, ভূত-প্রেত যাতে তার কোন ক্ষতি করতে না পারে। ভ্যারাড আসার পর আরেকটা নতুন কাণ্ড যোগ হয়েছে। মোমবাতি। ডজনে ডজনে জেলে রাখে সারারাত। যে-সে মোম হলে চলবে না, হলিউডের এক বিশেষ দোকান থেকে বিশেষ মোম আনায়। বিভিন্ন রঙের। নীলচে-লাল মোম নাকি বিপদ ঠেকায়, শুধু নীল দিয়ে আরেকটা কী উপকার হয়, কমলা রঙ শুভ, এমনি একেক রঙের একেক গুণ। রোজ রাতে লাইব্রেরিতে গিয়ে ঢেকে খালা আর ভ্যারাড, মোম জ্বালে, দরজায় তালা লাগিয়ে দেয়।
কী করে? আগ্রহে সামনে ঝুঁকল কিশোর।
কী করে, কে জানে! মাঝে মাঝে বিচিত্র শব্দ শোনা যায়, নিজের অজান্তেই কেঁপে উঠল জিনা। দোতলা থেকেও শুনেছি। তবে হলরুম থেকে স্পষ্ট শোনা যায়। লাইব্রেরি থেকে আসে।
রুজ বলেছে, গান নাকি গায়?
গান? নিজের হাতের দিকে তাকাল জিনা। তা…হ্যাঁ, গান বলতে পারো! … তবে এমন গান জন্মেও শুনিনি! শুনলেই গায়ের রোম খাড়া হয়ে যায়।
দুই ভুরু সামান্য কাছাকাছি হয়ে গেছে কিশোরের রুজ বলেছে, কিছু একটা গান গায়। মানুষের কথা বলেনি।
সোজা হয়ে বসল জিনা, সরাসরি তাকাল কিশোরের দিকে। কে কী বলেছে না বলেছে, ওসব শোনার দরকার নেই। আমি বলছি, কাজটা ভ্যারাডের। আমি চাই,

ওর শয়তানী বন্ধ হোক।
এতই খারাপ শব্দ?
তা হলে আর বলছি কী? কাজের লোক থাকছে না। এজেন্সিতে ফোন করে দু-দুজন লোক আনিয়েছি, রুজের মতই ওরাও পালিয়েছে এক রাত থেকেই। এতবড় বাড়ি, কে পরিষ্কার করে, কে কী করে? হাঁটু সমান ধুলো জমেছে, না খেয়ে মরার জোগাড় হয়েছে আমার। রাধে কে? আমি পারি না, খালা তো আমার চেয়ে আনাড়ি। দিনের বেলা টু শব্দটি করতে পারি না আমি আমার নিজের বাড়িতে। কেন? না, ভ্যারাড ছুঁচোটা সারারাত কেঁচো ধরে খাওয়ার জন্যে সজাগ থেকেছে, দিনে তো ঘুমোতে হবে তাকে! শয়তান কোথাকার! ওকে বড় মেরে বিদেয় করতে চাই আমি।
কিন্তু, অবাঞ্ছিত মেহমান তাড়ানোর কাজ তো আমাদের নয়, চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। তোমার খালাকে সব খুলে বলে দেখো…
বলে বলে মুখ ব্যথা করে ফেলেছি, নিমের তেতো ঝরল যেন জিনার কণ্ঠে। খালি হাসে। বেশি বললে অন্য কথায় চলে যায়। ফিল্মের রদ্দিপচা যেসব জিনিসপত্র জোগাড় করে এনেছে, ওগুলোর কথা তোলে।
ফিল্মের জিনিসপত্র? মুসার প্রশ্ন।
আরে, বুড়িটার কি এক দোষ? কোথায় কোথায় গিয়ে রাজ্যের সব পচা মাল কিনে আনে! স্প্রিং ফিভার ছবিতে ডেলা লাফনতি যে আলগা। চোখের পাতা ব্যবহার করেছে, সেগুলো এনেছে। মারকোস রিভেঞ্জ-এ জন মেঝাঙ্ক-এর ব্যবহার করা তলোয়ারটা জোগাড় করেছে চড়া দাম দিয়ে। ফিল্ম স্টারদের ফেলে দেয়া বাতিল জিনিসের নিলাম হবে শুনলেই ছোটে খালা। ওসবের পেছনেই যায় তার টাকা।
এতে দোষের কিছু দেখছি না, বলল কিশোর।
আমিও দেখতাম না, যদি ওসব চক্র আঁকা আর মোমবাতি জ্বালা বাদ দিত। তা-ও না হয় সওয়া গেল, কিন্তু ওই ভ্যারাড ব্যাটাকে আমি একদম সইতে পারছি না। ও আর ওর বিচ্ছিরি গান!
ছাপার মেশিনের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল মুসা। কিশোর, আমার মনে হয়, ব্যাটাকে তাড়ানো কঠিন কিছু না। ওর বিছানায় শুয়োপোকা ছেড়ে দিতে পারি আমরা, বাথটাবে ব্যাঙ ছেড়ে দিতে পারি, জুতোর ভেতরে সাপ ভরে রাখতে পারি…
না না, ওসবে কাজ হবে না! বাধা দিয়ে বলল জিনা। বরং খুশিই হবে। সাপ ভীষণ পছন্দ ওর! ছুঁচোটার দুর্বলতা কোথায় জানা দরকার।
ওকেও ব্ল্যাকমেইল? শান্ত কণ্ঠে বলল কিশোর।

অনুচিত কিছু হবে না। আমার বাড়িতে ঢুকে বসে অত্যাচার করছে। সে। এমনই চশমখোর, আমার সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলে না; পাত্তাই দিতে চায় না। যেন বাড়িটা তার বাপের, আমিই অন্যায়ভাবে ঢুকে পড়েছি। ওর ব্যাপারে জানা খুব কঠিন হবে, খালাও মুখ খুলতে চায় না।
হয়তো তোমার খালাও জানেন না, মুসা বলল।
হতে পারে, মাথা ঝোকাল জিনা। নিশ্চয় ভাল জানে। খারাপ কিছু জানলে ব্যাটাকে বাড়িতে ঢুকতে দিত না। খালাটা ভীষণ বোকা, তবে মানুষ খারাপ না। ওসব কথা থাক। আসলে, ভ্যারাডের ব্যাপারে ইনফরমেশন চাই আমি। ও কে, কোথা থেকে এসেছে, কী করে, জানতে চাই। সেজন্যে তোমাদের সাহায্য দরকার।
একটু চুপ থেকে বলল, শোনো, আজ রাতে পার্টি দিচ্ছে খালা। টেলিফোনে দাওয়াত করছে, শুনে এসেছি। অতিথিদের খাওয়ানোর জন্যে কী জানি রাধছে ভ্যারাড ব্যাটা। বেশি লোক মানেই বেশি কথা। কিছু না কিছু জেনে যাবই আমরা।
পার্টিতে তোমাদেরও দাওয়াত, আমার তরফ থেকে।
ভ্যারাডের রান্না খাওয়ার জন্যে? খুশিতে দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। মুসার।
না, দূর থেকে দেখার জন্যে। ইচ্ছে হলে গন্ধ শুঁকতে পারো যত, খুশি। পার্টি শেষে অতিথিদের অনুসরণ করবে তোমরা; দেখবে, কে কোন্ গুহায় গিয়ে ঢুকছে। তারপর ভাব, কী করা যায়। হ্যাঁ, গ্যারাজের কাছে হাজির থেকে রাত আটটায়। পেছন দিয়ে ঢুকো, তা হলে কারও চোখে পড়বে না। উঠে দাঁড়াল জিনা। ঠিক আটটা, মনে থাকে যেন। নইলে শুঁটকির সঙ্গে দেখা করব গিয়ে, হ্যাঁ।
স্যালভেজ ইয়ার্ডের আঙিনার দিকে চলে গেল ঘোড়ার খুরের শব্দ।
নতুন মক্কেল পাওয়া গেল, কিশোর বলল।
কিন্তু ও যে ব্ল্যাকমেইল…
আরে, দূর, ব্ল্যাকমেইল, বাধা দিয়ে বলল কিশোর। এভাবে এমন একটা সুযোগ এসে যাবে ভাবতেই পারিনি। রুজ পালিয়ে আসার পর থেকেই ভাবছি, কী করে ঢোকা যায় ও-বাড়িতে। তা ছাপার মেশিনের পেছনে একটা শয়গায় হেলান দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে একটা লোহার পাত, উঠে গিয়ে ওটা এক পাশে সরিয়ে রাখল কিশোর। বেরিয়ে পড়ল ইয়া মোটা এক পাইপের মুখ। ভিতরে, নিচের দিকে পুরানো কার্পেট ফালি করে কেটে বিছানো; হামাগুড়ি দিয়ে যাওয়ার সময় হাতে-হাটুতে ঘা লেগে চামড়া যাতে ছিলে না যায় সে জন্যে। এটা হেডকোয়ার্টারে ঢোকার আরেকটা গোপন প্রবেশপথ, দুই সুড়ঙ্গ। জঞ্জালের তূপের নিচ দিয়ে চলে গেছে পাইপটা, আরেক মাথা শেষ হয়েছে গিয়ে একেবারে ট্রেলারের মেঝের তলায়। মেঝেতে গোল গর্ত কেটে তার মুখে গোল দরজা বসিয়ে দেয়া হয়েছে, ঠেলা দিলেই খুলে যাবে।

ভিতরে যাচ্ছ? জানতে চাইল মুসা।
হ্যাঁ। রবিনের বোধহয় আজ সকালে কাজ নেই লাইব্রেরিতে। ওকে খবরটা দিতে হবে। বলব, আজ রাতে এক পার্টিতে দাওয়াত পেয়েছি আমরা।
আমিও আসি, বলল মুসা। পেরেক আর হাতুড়ি নেব। লাল কুকুর চার বন্ধই করে দিতে হচ্ছে। জিনাকে বিশ্বাস নেই। পান থেকে চুন খসলেই হয়তো গিয়ে বলে দেবে শুঁটকির দলকে, হেডকোয়ার্টারে ঢুকে সব তছনছ করে দিয়ে যাবে ওরা। তার চেয়ে পথ বন্ধই করে দিই আপাতত।
সাঁঝের বেলা পারকার হাউসকে পাশ কাটিয়ে এল তিন গোয়েন্দা।
পার্টি খুব বড় না, বলল কিশোর। গাড়ি-বারান্দায় মাত্র তিনটে গাড়ি দেখেছে। একটা কমলা স্পোর্টস কার, একটা সবুজ সরকারি গাড়ি, আরেকটা ধূলি-ধূসরিত ছাই রঙের স্যালুন।
বাড়ির পিছনের খানিকটা খোলা জায়গা পেরিয়ে গ্যারাজের পিছনে এসে দাঁড়াল ওরা। ওদের অপেক্ষায় রয়েছে জিনা। নিচু গলায় বলল, সবাই এসে গেছে। ডাইনিং রুমে। চত্বরের দিকের দরজা খুলে রেখেছি, এসো। আস্তে, শব্দ কোরো না।
পা টিপে টিপে এসে দাঁড়াল ওরা চত্বরের ধারে, ওইসটেরিয়া ঝাড়ের ছায়ায়। চোখের সামনে একটা লতা সরিয়ে জিনার কাঁধের ওপর দিয়ে ডাইনিং রুমে উঁকি দিল কিশোর। এমন পার্টি জীবনে দেখেনি সে। পাঁচজন লোক, একটা গোল টেবিল ঘিরে দাঁড়িয়েছে নীরবে। লালচে-লাল নতুন একটা পোশাক পরেছে মিস মারভেল, আস্তিনের প্রান্ত অস্বাভাবিক ছড়ানো, গলা পুরোপুরি ঢেকে দিয়েছে উঁচু কলার। তার উল্টো দিকের লোকটা হিউগ ভ্যারাড, আগাগোড়া কালো পোশাক পরনে, রূপার ভারি মোমদানিতে জ্বলছে দুটো লাল মোমবাতি, ম্লান আলোয় চকচক করছে লোকটার ফেকাসে চেহারা। ছোট করে ছাটা কালো চুল আঁচড়ে কপালের ওপর এনে ছড়িয়ে ফেলেছে, ঘন ভুরু ছুঁই ছুঁই করছে চুলের ডগা।
ভ্যারাডের বাঁ পাশে ছিপছিপে এক মহিলা, পরনে কমলা রঙের গাউন। মিস মারভেলের মতই চুলে কলপ লাগিয়েছে সে, কিন্তু রঙ পছন্দ ঠিক হয়নি তার। কমলা পোশাকের সঙ্গে হালকা লাল হাস্যকর রকম বেমানান লাগছে।
লাল-চুলো মহিলার পাশে সোনালি-চুলো আরেক মহিলা। আঁটসাট হালকা সবুজ পোশাক ছিঁড়ে-ফেটে বেরিয়ে যাবে যেন থলথলে মাংসল শরীর। তার পাশেই দাঁড়িয়েছে পঞ্চম লোকটা, পার্টিতে বেমানান। অন্য সবাই দাঁড়িয়েছে সোজা হয়ে, সে দাঁড়িয়েছে সামান্য কুঁজো হয়ে, সুযোগ পেলেই বসে পড়তে ইচ্ছুক যেন। অন্যেরা পার্টির জন্যে বিশেষ পোশাক পরে এসেছে খুব সাবধানে বাছাই করে, কিন্তু ওই লোকটা অতসবের ধার ধারেনি, হাতের কাছে যা পেয়েছে, তা-ই

তাড়াহুড়ো করে পরে চলে এসেছে বোধহয়। পুরানো মলিন জ্যাকেটের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে ময়লা স্পোর্টস শার্ট, তার নিচ থেকে বিচ্ছিরিভাবে বেরিয়ে আছে টি শার্টের খানিকটা। উস্কোখুস্কো ধূসর চুলে কতদিন চিরুনি আর নাপিতের কাচি পড়েনি, কে জানে!

এখান থেকে কথা শোনা যাবে না, আরও সামনে এগোনোর ইশারা করল জিনা। ফিসফিস করে বলল, সব কটার মাথায় ছিট আছে!

ওরা ওভাবেই দাঁড়িয়ে থাকবে নাকি? জিজ্ঞেস করল মুসা।

জানি না, মাথা নাড়ল জিনা। মেহমানদের কাছাকাছি ঘোরাফেরা করছিলাম, ভ্যারাডের বাচ্চা এমন একখান চাউনি দিল না আমাকে! মরা মাছের চোখের মত ঠাণ্ডা ব্যাটার চোখ, গা শিরশির করে তাকালে! ময়লা জ্যাকেট পরে আছে যে লোকটা ওর নাম রাসলার, খাবারের দোকানের মালিক। কমলা গাউন পরা কঙ্কালটার নাম জেরি গ্যানারিল, নাপতিনী, খালার চুল ও-ই ড্রেসিং করে। কমলা রঙের কাপড় পরলে নাকি সে জ্যান্ত হয়ে ওঠে। সেজন্যেই বোধহয় খালি ঝাঁকি খেতে থাকে তার শরীর। আর ওই যে সোনালি-চুলোটা, ওর একটা বড়সড় দোকান আছে, স্বামী হেলথ ডিপার্টমেন্টের বড় অফিসার।

মৃদু একটা শব্দ হলো, কোন দিকে ঠিক বোঝা গেল না। কিশোরের মনে হলো, গ্যারাজে। কী জানি, ঘোড়াটার খুর ঠোকার শব্দ হবে হয়তো!

কিছু একটা ঘটবে, ফিসফিস করে বলল জিনা। চলো, এগিয়ে দেখি।

আরও এগিয়ে আরেকটা ওইসটেরিয়া ঝাড়ের আড়ালে দাঁড়াল ওরা।

একটা কাঁচের বাটিতে পানির মত কী একটা তরল পদার্থ ঢেলে ভ্যারাড়ের দিকে এগিয়ে দিল মিস মারভেল। দুহাতে ধরে বাটিটা তুলল। ভ্যারাড, মোমের শিখার দিকে দৃষ্টি স্থির, কোনরকম ভাবান্তর নেই রক্তশূন্য চেহারায়। সাপের চোখের মত ঠাণ্ডা চোখের তারা চকচক করছে। মোমের আলোয়।

শুরু করা যায়, বলল ভ্যারাড।

টেবিলে আরও কাছাকাছি হলো অতিথিরা। একটা দীর্ঘশ্বাস শুনল বলে মনে হলো কিশোরের।

সবাই আসেনি আজ, গম্ভীর গলায় বলল ভ্যারাড। ডাক্তার শয়তান আজ দেখা না-ও দিতে পারেন। যোজন যোজন দূরে রয়েছেন মহাসর্প, তিনি কথা বলবেন কিনা, তাই বা কে জানে! তবু চেষ্টা করে দেখা যাক।

বাটিটা একবার ঠোঁটে চুঁইয়েই কমলা পোশাক পরা মহিলার হাতে তুলে দিল ভ্যারাড।

আমাদের বৈঠক সার্থক হোক! কোলা ব্যাঙের স্বর বেরোল জেরি গ্যানারিলের গলা থেকে। বাটিতে চুমুক দিল। হবে, হবে! কেন, সেই যে, বাড়িওলীর সঙ্গে যখন

আমার লাগল…
চুপ! ধমক দিল, ভ্যারাড। আবেশই নষ্ট করে দেবেন!
কুঁকড়ে গেল গ্যানারিল, বাটিটা তুলে দিল মিস মারভেলের হাতে। চুমুক দিয়ে খানিকটা তরল খেয়ে সে আবার তুলে দিল রাসলারের হাতে। সে খেয়ে দিল সবুজ পোশাক পরা মহিলার হাতে। তার হাত থেকে আবার বাটি ফিরে এল ভ্যারাডের কাছে।
এবার বসতে পারি আমরা, ভ্যারাড বলল।
যার যার চেয়ার টেনে বসে পড়ল বৈঠকের সদস্যরা।
মিস মারভেল, আপনার ইচ্ছে কী, বলুন, আদেশের সুর ভ্যারাডের গলায়।
মাথা নুইয়ে-অদৃশ্য কারও উদ্দেশে সালাম জানাল মিস মারভেল। আমি ক্রিস্টাল বলটা চাই। অ্যানি পলকে সরিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা হোক, কিছুতেই যেন সে ওটা কিনতে না পারে।
বিলিয়ালকে অনুরোধ করব?
করুন। মোট কথা আমি বলটা চাই।
অন্য সদস্যদের দিকে তাকাল ভ্যারাড। আপনাদের কী মত?
আমার নিজের সমস্যা নিয়েই বাঁচি না! ঘোঁত ঘোত করে উঠল রাসলার।
এখানে এক ভাইয়ের সমস্যা সবারই সমস্যা, মনে করিয়ে দিল ভ্যারাড।
অ্যানিকে দূরে কোথাও বেড়াতে পাঠিয়ে দিলে কেমন হয়? শরীর ঝাঁকি খেল গ্যানারিলের। এই…দিন পনেরোর জন্যে…কবে পাঠালে সুবিধে, আপা?
একুশ তারিখের আগে, বলল মিস মারভেল।
মিস মারভেলের ওপর থেকে সবুজ পোশাক, তারপর রাসলারের ওপর এসে থামল ভ্যারাডের কালো চোখ। তা হলে আমরা সবাই একমত, চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করল সে।
থিরথির করে কাঁপছে মোমের শিখা। কয়েক মিনিট কিছুই ঘটল না। পাথরের মূর্তির মত নিথর হয়ে আছে ঘরের সব কজন লোক।
শোনা গেল শব্দটা, ঘন কালো রাতের অন্ধকারে ভর করে যেন ভেসে এল। প্রথমে অস্পষ্ট, মোলায়েম একটা কাঁপা কাঁপা আওয়াজ, স্থির বাতাসকে ঘুটছে যেন ধীরে ধীরে। গানের মত, কিন্তু গান বলা চলবে না কিছুতেই, শরীর হিম-করা বেসুরো সুর আছে, কথা নেই; তাল লয় ছন্দ, কিছু নেই। একবার চড়া পর্দায় উঠছে সুর, পরক্ষণেই নেমে যাচ্ছে; একবার তীক্ষ্ণ, একবার মোলায়েম। কমছে, বাড়ছে, থামছে, গোঙাচ্ছে, বিড়বিড় করছে, ফোপাচ্ছে; তারপর হঠাৎ করেই হাঁসফাঁস করে উঠছে, যেন গায়কের গলা টিপে ধরেছে কেউ!

আতঙ্কে রোম খাড়া হয়ে যাচ্ছে তিন গোয়েন্দার। এমন বিচ্ছিরি গান জীবনে শোনেনি ওরা। ভয়ঙ্কর এক কালো জগৎ থেকে উঠে আসছে যেন দুরন্ত শয়তান, মানুষকে টেনে নিয়ে যাবে শব-গন্ধে ভরা নরকে! ঢোক গিলল রবিন, কাঁপা কাঁপা শ্বাস পড়ছে মুসার।
শান্ত রয়েছে কিশোর, গভীর মনোযোগে দেখছে অতিথিদের কাণ্ড! নতুন কেউ ঢোকেনি ঘরে। ছাতের দিকে চেয়ে আছে ভ্যারাড, স্থির।
অবশেষে পিছিয়ে যেতে শুরু করল জিনা। ছেলেরা অনুসরণ করল। তাকে। নিঃশব্দে চলে এল খোয়া বিছানো পথে। গান চলছেই, জ্যান্ত অশরীরী কিছু একটার মত তাদের সঙ্গে চলেছে যেন কুৎসিত শব্দ।
পেছনের চত্বরে চলে এল চারজনে। প্রাসাদের দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াল জিনা। আস্তে আস্তে ভয় কেটে যাচ্ছে রবিন আর মুসার।
এই গান শুনেই পালিয়েছিল রুজ? ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল কিশোর।
মাথা ঝাঁকাল শুধু জিনা, মুখে কিছু বলল না।
আমিও পালাতে চাই, চুলে আঙুল চালাচ্ছে মুসা।
গভীর শ্বাস টানল জিনা। আমি চাই না, কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তা। এটা আমার বাড়ি। খালা থাকতে চাইলে থাকবে, কিন্তু ভ্যারাডকে যেতে হবে। এখান থেকে!
কিন্তু অকাজটা ভ্যারাডের নয়, তাড়াতাড়ি বলল কিশোর। ওর মুখের একটা পেশীও নড়েনি, দেখেছি। ও শব্দ করেনি।
ও করেনি, কিন্তু এতে ওর হাত আছেই, ভোতা গলায় বলল জিনা।
গ্যারাজে অস্থিরভাবে পা ঠকল কমেট, মৃদু চিহিহি করে উঠল।
মে-ট! চেঁচিয়ে উঠল জিনা। গ্যারাজে ঢুকেছে কেউ!
প্রায় লাফিয়ে উঠে ছুটল কিশোর। গিয়ে এক টান মেরে খুলে ফেলল গ্যারাজের দরজা, পরক্ষণেই জোরে এক ধাক্কা খেয়ে চিৎপাত হয়ে পড়ে গেল মাটিতে। দুপদাপ পা ফেলে খোলা জায়গাটার দিকে ছুটে গেল কালো একটা মূর্তি।
কিশোর! চেঁচিয়ে উঠে গোয়েন্দাপ্রধানের পাশে হাঁটু গেড়ে বসল মুসা।
আমি ঠিকই আছি, ধীরে ধীরে বলল কিশোর। লোকটা কে, দেখেছ?
মোটকা! জবাবটা দিল রবিন। বেশি লম্বা না। গোঁফ আছে মনে হলো, আঁটার মত গোঁফ।
নজর তো খুব কড়া! জিনার কণ্ঠে শ্রদ্ধা। অন্ধকারে দেখলে কী করে এত কিছু?
অন্ধকার কোথায় দেখছ? কিশোর বলল। তারার আবছা আলো আছে না? নজর কড়া না হলে গোয়েন্দা হবে কী করে? গান যে থেমে গেছে খেয়াল করেছ?
রান্নাঘরে আলো জ্বলল, গ্যারাজের ছায়ায় লুকিয়ে পড়ল ছেলেরা।
দরজা খুলে গেল রান্নাঘরের। কে? মিস মারভেলের গলা।

আমি, খালা, জবাব দিল জিনা।মেটকে দেখতে এসেছি।
বড় বেশি বেশি করো তুমি ঘোড়াটাকে নিয়ে! বিরক্তি ঝরল মিস মারভেলের কণ্ঠে। এসো, জলদি এসো। বন্ধ হয়ে গেল দরজা।
গাড়ি-বারান্দায় ইঞ্জিন স্টার্ট নেয়ার শব্দ হলো।
পার্টি বোধহয় ভাঙল, চাপা গলায় বলল রবিন।
সকালে এসো আবার, জিনা অনুরোধ করল।
আসব, বলল কিশোর।
খোয়া বিছানো পথে জিনার হালকা পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল ধীরে ধীরে।
চলো, আমরাও কেটে পড়ি, এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে মুসা। আবার। কখন শুরু হয়ে যায় গান, কে জানে!
পরদিন সকালে, বেড়ায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তিন গোয়েন্দা। তারের বেড়া দেয়া মাঠে ঘাস খাচ্ছে আপালুসাটা, তা-ই দেখছে।
চমৎকার স্বাস্থ্য! মুসা বলল এক সময়। অনেক মানুষেরই থাকে না।
এবং কোন মানুষই ঘাস খায় না, পিছন থেকে শোনা গেল জিনার গলা। তোমার যে কথা! ঘোড়া আর মানুষ এক হলো নাকি?
ঘুরে তাকাল ছেলেরা। জিনার পরনে জিনসের প্যান্ট, কড়া ইস্ত্রী করা শার্ট। তারপর? কিছু ভেবেছ! কীসে গান গায়, বুঝেছ কিছু?
গতরাতে আর কিছু ঘটেছে? পাল্টা প্রশ্ন করল কিশোর, পারকার, হাউসের দিকে দৃষ্টি ফেরাল।
না, গলা সমান উঁচু বেড়া ডিঙিয়ে এপাশে চলে এল জিনা। আচ্ছা, লোকটা গ্যারাজে লুকিয়ে ছিল কেন, বলো তো?
জানি না, হেসে মাথা নাড়ল রবিন। ওর সঙ্গে তো আর আমাদের। কথা হয়নি। তবে অনুমান করতে পারি। হয়তো চোর, বাড়িতে ঢোকার পথ খুঁজছিল। কিংবা ভবঘুরে, রাত কাটানোর জন্যে ঢুকেছিল গ্যারাজে।
ওই বিচ্ছিরি গান গাওয়ার জন্যেও ঢুকে থাকতে পারে, কিশোর। বলল। মনে আছে, ভ্যারাড বলেছিল, অনেক দূর থেকে আসতে পারে মহাসর্পের গান?
কিন্তু সাপ তো গান গায় না, প্রতিবাদ করল জিনা। সেটা মহাই হোক, আর সাধারণ সাপই হোক। কেবল হিসহিস করতে পারে।
একটা কথা ভুলে যাচ্ছ, যুক্তি দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করল কিশোর। হিউগ ভ্যারাড আসার আগে ওই গান কখনও শোনোনি। তার মানে ওসবের সঙ্গে কোন না কোনভাবে জড়িত লোকটা। তবে এ-ও ঠিক, গতরাতে গান যখন চলছিল, ডাইনিং রুমে চেয়ারে চুপচাপ বসেছিল সে, স্পষ্ট দেখেছি, যেন ঘোরের মধ্যে ছিল।

টেপরেকর্ডার ব্যবহার করে না তো? মুসা প্রশ্ন রাখল। হয়তো গোঁফওয়ালা লোকটার সঙ্গে আগেই পরামর্শ করে নিয়েছিল ভ্যারাড। ঠিক সময় এসে ডাইনিং রুমের কাছাকাছি কোথাও যন্ত্রটা বসিয়ে চালু করে। দিয়ে, গ্যারাজে গিয়ে লুকিয়ে বসেছিল লোকটা। অনুষ্ঠান শেষ না হওয়াতক অপেক্ষা করত ওখানে, কমেটের জন্যে পারেনি।
তা হতে পারে, সায় দিল কিশোর। কিন্তু চট করে কোন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলা ঠিক হবে না। এমনও হতে পারে, গোঁফের সঙ্গে ভ্যারাডের কোন সম্পর্কই নেই।
ঠোঁট বাকাল জিনা। তার মানে, যেখান থেকে শুরু করেছিলাম, সেখানেই রয়ে গেছি! ভ্যারাড ব্যাটাও যাচ্ছে না আমার বাড়ি থেকে, ওই নাট-ঢিলা লোকগুলোও আসতেই থাকবে!
গতরাতের অতিথিরা তো? কিশোর বলল। ঠিকই বলেছ, সত্যিই নাট-ঢিলা! ওই রাসলারটা তো একটা খাটাস, স্বভাব-চরিত্রও বিশেষ সুবিধের মনে হলো না।
ব্যাটা খাবারের দোকান চালায় কী করে! স্বাস্থ্য দপ্তর যে ওর লাইসেন্স এখনও ক্যানসেল করেনি, সেটাই আশ্চর্য!
একটা ব্যাপার পরিষ্কার, কিশোর বলল। ওরা কোন একটা সাধনার জন্যে জমায়েত হয়। শয়তানকে ডাকে তো, সম্ভবত প্রেতসাধনা। করে। গতরাতে তোমার খালার সমস্যা সমাধানের জন্যে এসেছিল। শুনবে না, কোন এক অ্যানি পলকে শহর থেকে তাড়াতে চাইছে ওরা।
পাগলামি! চেঁচিয়ে উঠল জিনা। স্রেফ পাগলামি!
বিজ্ঞের ভঙ্গিতে হাসল কিশোর। কোন্ বলের কথা বলেছে ওরা, আমি জানি।
জানো?
একুশ তারিখে একটা নিলাম হবে, বিখ্যাত অভিনেতা মরহুম র‍্যামন ক্যাসটিলোর বাড়িতে। অন্যান্য অনেক জিনিসের মাঝে কাঁচের বলটাও রয়েছে, এটা তিনি ব্যবহার করেছিলেন দ্য ভ্যাম্পায়ারস লেয়ার ছবিতে। সেদিন খবরের কাগজ পড়ে আলোচনা করছিল চাচা চাচী ব্যাপারটা নিয়ে। অভিনেতাদের ব্যবহার করা জিনিসপত্র কেনার জন্যে পাগল তোমার খালা, কাঁচের বলটা কিনতে আগ্রহী তো হবেনই।
এখন বুঝতে পারছি, ভ্যারাডকে কেন এত খাতিরযত্ন করছে খালা।
শয়তান-সাধকের ক্ষমতা ব্যবহার করে অ্যানি পলকে তাড়াতে চান শহর থেকে, নিলামের সময়।
খালার সঙ্গে অ্যানি পলের সাপে-নেউলে সম্পর্ক, আমি জানি।
ওই মহিলাও তোমার খালার মত জিনিস কালেকশন করেন নাকি?

করে। খালার চেয়ে বড় পাগল। বিধবা, মস্ত ধনী। ওই মহিলা নিলামে হাজির থাকলে কাঁচের বল আর খালার ভাগ্যে জুটছে না। অত টাকা নেই খালার।
সেজন্যেই শয়তানের বৈঠক বসিয়েছেন ভ্যারাডকে দিয়ে, যাতে মহিলা নিলামেই হাজির হতে না পারে।
তাই তো মনে হচ্ছে, বলল জিনা। কিন্তু ভ্যারাডের এতে কী লাভ? টাকার জন্যে করছে না। নগদ টাকা প্রায় নেই খালার। সামান্য যা আছে, খাঁটিয়ে রেখেছে শেয়ারের ব্যবসায়; লাভ যা আসে, খাওয়া-পরা আর বাতিল জিনিস কিনতেই শেষ। তার মানে টাকার লোভে কাজটা করছে না ভ্যারাড!
হুম! মাথা দোলাল রবিন। উদ্দেশ্য জানা যাচ্ছে না তা হলে!
তবে, কিশোর বলল, খুঁজলে বাড়িতেই যন্ত্রটা পেয়ে যেতে পারি। জিনা, তোমার খালাকে বললে কি তখন বিশ্বাস হারাবেন ভ্যারাডের ওপর।
থেকে?ল জিনা। কানসেছিল ভ্যারাতে
হাসল জিনা। কানটা ধরে বের করে দেবে সোজা। আজই খুঁজতে পারবে। সকালে ফোন এসেছিল ভ্যারাডের কাছে।
নতুন কোন ব্যাপার? ভুরু কোঁচকাল কিশোর।
হ্যাঁ। এখানে এই প্রথম ফোন এসেছে তার কাছে। আমিই ফোন ধরেছিলাম। একটা লোক ভ্যারাডকে চাইল। ঘুমিয়ে ছিল ছুঁচোটা, দরজা ধাক্কাধাক্কি করে ঘুম ভাঙাতে হলো।
এক্সটেনশন আছে নিশ্চয়, মুসা বলল। শুনেছ?
এ সময় পাইনি, জিনা বলল।ফোন ধরল আর ছাড়ল। শুধু শুনলাম, ভেরি গুড, তারপরেই লাইন কেটে দিল। খালাকে ডেকে বলল, আজ রাতে আবার বৈঠক বসবে, সব ভাইয়েরাই আসবে।
ওই বৈঠকের ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করোনি তোমার খালাকে? জানতে চাইল রবিন।
করেছি। খালা ভারি খুশি, তার কাজের ব্যাপারে আমার আগ্রহ দেখে। অবশ্য কায়দা করে বলে তাকে ফুলিয়ে দিয়েছিলাম, নইলে কি আর মুখ খুলত? আজ রাতে ভ্যারাডের সঙ্গে যাচ্ছে খালা, বৈঠকে। বাড়িতে কেউ থাকবে না, আজই আমাদের সুযোগ। যন্ত্র লুকানো থাকলে, আজই খুঁজে বের করতে হবে।
নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর, গভীর চিন্তায় মগ্ন। যন্ত্রটা যদি সঙ্গে করে নিয়ে যায়?
তাই বলে চেষ্টা করেও দেখবে না একবার? জিনা বলল। ঘরের কোণে, কার্পেটের তলায়, কিংবা পর্দার আড়ালে…
তা থাকতে পারে, মাথা দোলাল কিশোর কী করে খুঁজতে হয়, জানো?

এসব কাজ করিনি তো কখনও, সত্যি কথাটাই বলল জিনা। তবে চেষ্টা করে দেখতে পারি।
ফাইন। তা হলে আজ রাতে তুমিই খোঁজ। গ্যারাজেও বাদ দেবে না।
বাহ, কী চমৎকার! মুখ বাঁকাল জিনা। আমিই যদি এসব কাজ করব, তোমাদেরকে ডেকেছি কেন?
কোন জায়গা বাদ দেবে না, বুঝেছ? জিনার কথা কানেই নিল না। কিশোর। টেবিলের নিচে, সাইনবোর্ডের আড়ালে…
…কিংবা ওইসটেরিয়া ঝাড়ের আড়ালে, মনে করিয়ে দিল জিনা।
তা-ও দেখতে পারো। তবে সাবধানে জাফরিতে উঠবে। পড়ে গিয়ে হাত-পা ভেঙো না আবার।
ভাঙব না। তা আমি যখন হাত-পা ভাঙার ঝুঁকি নেব তোমরা তখন কী করবে?
তোমার খালা আর ভ্যারাডকে অনুসরণ করব। দেখব, আজ রাতে কোথায় বৈঠক বসায়।
সানসেট বুলভারের দিকে যাচ্ছে, বোরিস বলল।
জোরে। চেঁচিয়ে উঠল পাশে বসা কিশোর। আরও জোরে! ট্রাফিক লাইটে আটকা পড়বেন না!
পড়ব না, গ্যাস প্যাড়ালে পায়ের চাপ হঠাৎ বাড়িয়ে দিল বোরিস। প্রচণ্ড গোঁ গোঁ করে প্রতিবাদ জানাল পুরানো ইঞ্জিন, কিন্তু নিমেষে গতি বেড়ে গেল গাড়ির, সিগন্যাল পোস্ট পেরিয়ে এল চোখের পলকে, আর এক মুহূর্ত দেরি হলেই লাল আলোয় আটকা পড়ে যেত।
বেগুনি-লাল ছোট্ট করভেটকে অনুসরণ করে চলেছে ইয়ার্ডের হাফট্রাক। সাগর পেছনে ফেলে আঁকাবাঁকা পাহাড়ি পথ ধরে উঠে যাচ্ছে। দুটো গাড়ি। পথের দুধারে বেশ দূরে দূরে ছিমছাম বাড়িঘর, সুন্দর বাগানে উজ্জ্বল রঙের জিরেনিয়াম ফুটে আছে। মাঝে মাঝে বাকের। ওপাশে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে করভেট, কিন্তু ট্রাকটা মোড় পেরিয়ে এলেই। আবার দেখা যাচ্ছে। অবশেষে গতি কমাল গাড়ি।
টরেনটি ক্যানিয়ন, বিড়বিড় করল বোরিস। সামনে পথ শেষ, করভেটকে হারানোর ভয় নেই আর।
হাফট্রাককে পাশ কাটিয়ে ছুটে গেল আরেকটা কমলা রঙের গাড়ি।
জিনার খালার হেয়ারড্রেসার, কিশোর বলল। মিস গ্যানারিল।
নাপতিনী, হাসল মুসা। বোরিস, আর কোন অসুবিধে হবে না। আপনার। অন্ধকারেও দেখা যাবে ওই লাল চুল, অনুসরণ করতে পারবেন সহজেই।

বোরিসও হাসল। কমলা গাড়িটাকে অনুসরণ করল। করভেটটাকে দেখা যাচ্ছে না, গিরিপথে মোড়ের ওপাশে হারিয়ে গেছে আবার। মোড় পেরোতেই ইটের উঁচু একটা দেয়াল চোখে পড়ল, পথের ওপর সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অনেকগুলো গাড়ি। ওগুলোর পাশে থেমেছে করভেট, মিস মারভেল আর হিউগ ভ্যারাড় নামছে গাড়ি থেকে।
ঘাসে ঢাকা ঢালের গা ঘেঁষে গাড়িগুলোর দিকে পেছন করে ট্রাক রাখল বোরিস। জিনার খালা কিংবা ভ্যারাডের চোখে পড়ে যাওয়ার ভয়ে মাথা নিচু করে রেখেছিল তিন গোয়েন্দা, আবার সোজা হয়ে বসল।
রিয়ার ভিউ মিররের দিকে তাকিয়ে আছে বোরিস। মিস মারভেলের দিকে হাত নাড়ছে গ্যানারিল।
ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকাল রবিন আর মুসা।
আরে! ছাই রঙের স্যালুন! উত্তেজিত কণ্ঠে বলল রবিন। জিনাদের বাড়িতে যেটাকে দেখেছিলাম!
নিশ্চয় ওই নোংরা রাসলার, অনুমান করল মুসা। মেলা লোক। এসেছে তো আজ রাতে! গাড়িগুলোর দিকে চেয়ে আছে সে।
এগোরাটা, গুনে বলল বোরিস।
জেরি গ্যানারিল আর মিস মারভেলকে নিয়ে বিরাট লোহার গেটের সামনে গিয়ে দাঁড়াল ভ্যারাড। গেটের মাথায় লোহার চোখা শিক বসানো। দুই মহিলাকে কিছু বলে গেটের পাশের দেয়ালের কাছে সরে গেল ভ্যারাড। একটা খোপের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে কী যেন বের করে আনল।
টেলিফোন? আপন মনেই বাল রবিন।
টেলিফোনই। রিসিভার কানে ঠেকাল ভ্যারাড়, বোধহয় কিছু বলল, তারপর আবার রেখে দিল আগের জায়গায়। খানিক পরেই ঝনঝন করে খুলে গেল গেট। মহিলাদেরকে নিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল ভ্যারাড, বন্ধ হয়ে গেল পাল্লা।
নীরবে অপেক্ষা করছে গোয়েন্দারা। আর কোন গাড়ি এল না। মিনিট পনেরো পর কেবিনের দরজা খুলল কিশোর। অতিথিরা সব এসে গেছে, আর কেউ আসবে না। কীসের বৈঠক, দেখা দরকার।
নেমে পড়ল তিন গোয়েন্দা। কিশোরকে অনুসরণ করে এগোল অন্য দুজন।
কারুকাজ করা পাল্লার একটা সর্পিল তামার পাতে হাত বুলিয়ে বলল রবিন, ইস, রাশেদ চাচা এ-জিনিস পেলে পয়সার দিকে চাইত না।
চকচকে পালিশ করা পিতলের হাতল ধরে জোরে টান দিল কিশোর, নড়ল না পাল্লা। তালা লাগানো। এটাই আশা করেছিলাম।

দেয়ালের খোপটা দেখছে মুসা। করে দেখব নাকি? ডায়াল নেই। বাড়ির ভিতরে সরাসরি কানেকশন।
পায়ে পায়ে পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে বোরিস। দেখো না করে।
হুকে ঝোলানো রিসিভারটা বের করে আনল মুসা। কানে ঠেকাতেই ক্লিক করে একটা শব্দ শুনল, তারপরই ভেসে এল ভারি কণ্ঠ, অন্ধকার রাত।
অ্যাঁ! থতমত খেয়ে গেল সহকারী গোয়েন্দা। রাত হয়নি এখনও, শিগগিরই হবে! ইয়ে, স্যর, একটা বিস্কুট কোম্পানি থেকে এসেছি…
আবার ক্লিক শব্দ করে নীরব হয়ে গেল ফোন, কানেকশন কেটে দিয়েছে।
বিস্কুট পছন্দ না ওদের, হাসল কিশোর, মুসার মুখ দেখেই বুঝেছে। কী ঘটেছে।
তাই তো মনে হচ্ছে, রিসিভার আগের জায়গায় রেখে দিল মুসা। তুলেই কী বলেছে জানো? অন্ধকার রাত!
কোন ধরনের কোড় ওয়ার্ড সদস্যরা জানে জবাবটা কী হবে।
পাল্লার ফাঁক দিয়ে ভিতরে উঁকি দিল রবিন। একটা আলোও নেই, এ কী-রকম বাড়ি!
এগারোটা গাড়ি, বিড়বিড় করল, কিশোর!
মিস মারভেলের গাড়িতে এসেছে দুজন, তার মানে অন্তত বারোজন অতিথি এসেছে আজ রাতে।
করছে কী ব্যাটারা? বোরিসের কণ্ঠে বিস্ময়। কিছু আলো তো অন্তত থাকবে!
মোটা পর্দা লাগিয়েছে হয়তো, কিশোর বলল।
তা ছাড়া মোম, জ্বালে ওরা, রবিন যোগ করল। ওদের কাছে মোম খুব প্রিয়। এত কম আলো পর্দা ভেদ করে আসতে পারছে না।
আবছা অন্ধকার পথে দাঁড়িয়ে আগের রাতের কথা ভাবছে তিন গোয়েন্দা, পারকার হাউসের ডাইনিং রুমের দৃশ্য ভেসে উঠেছে মনের পর্দায়: কাঁচের বাটিতে তরল পদার্থ, মেহমানদের হাতে হাতে ঘুরছে, মোমের আলোয় ঘরের দেয়ালে ছায়ার নাচন…তারপর, তারপর সেই অপার্থিব রক্ত হিম-করা বেসুরো গান..
আজ রাতেও শোনা যাবে না তো! হঠাৎ নিজেকেই যেন প্রশ্ন করল মুসা।
কী শোনা যাবে? বুঝতে পারছে না বোরিস।
জানি না, মাথা নাড়ল কিশোর। ভ্যারাড় বলেছে মহাসর্পের কণ্ঠস্বর। কিন্তু এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে কিছুই জানতে পারব না।
আরও গেট থাকতে পারে, সম্ভাবনার কথা বলল রবিন।
তা পারে, সায় দিল কিশোর। হয়তো ওটাতে তালাও নেই। অনেকেই সামনের গেটে তালা লাগায়, পিছনের গেট এক্কেবারে খোলা থাকে। কতরকম মানুষ যে আছে! খামখেয়ালীপনা করে পুলিশের কাজ বাড়ায়।

চলো, দেখি, মুসা বলল।
বোরিস, গাড়িতে গিয়ে ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে বসে থাকুন। আর হ্যাঁ, গাড়িটা গেটের আরও কাছে নিয়ে এলেই বোধহয় ভাল হয়। কীসের বৈঠক বসিয়েছে ব্যাটারা, কে জানে! ছুটে পালানোর দরকার পড়তে পারে আমাদের।
দ্বিধা করল বোরিস। কী ভাবল, তারপর বলল, ঠিক আছে।ট্রাকের দিকে রওনা হলো সে।
ইঞ্জিন স্টার্ট হলো, জ্বলে উঠল হেডলাইট। ট্রাকটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে এল বোরিস, গেটের সামনে দিয়ে গিয়ে ফুট পঞ্চাশেক দূরে পথের পাশে দাঁড় করাল। নিভে গেল আলো। উজ্জ্বল আলো হঠাৎ নিভে যাওয়ায় অন্ধকার অনেক বেশি মনে হচ্ছে এখন।
টর্চ আনা উচিত ছিল, আফসোস করল মুসা।
আনিনি যখন, বলে আর কী হবে? বলল কিশোর। তবে আনলেও জ্বালতাম না, ওদের চোখে পড়ত। চলো।
সাবধানে দেয়ালের পাশ দিয়ে হেঁটে চলল তিন গোয়েন্দা, মাঝে মাঝেই থেমে কান পাতছে। কোনরকম আওয়াজ আসছে না দেয়ালের ওপার থেকে। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল রবিন, লাফিয়ে সরে গেল এক পাশে, পায়ের ওপর এসে পড়েছে একটা ছোট্ট জানোয়ার, ভয় পেয়ে ঝোঁপঝাড়ের ভিতরে ছুটে পালাল ওটা।
শেয়াল, বলে উঠল মুসা।
দেখেছ? জানতে চাইল রবিন।
না। কিন্তু শেয়ালই তো হওয়া উচিত!
চুপ! চাপা গলায় হুশিয়ার করল কিশোর।
দেয়ালের ধার ধরে বাড়ির পুরো সীমানায় চক্কর দিয়ে এল ওরা, কিন্তু আর কোন গেট পাওয়া গেল না। যেখান থেকে শুরু করেছিল, আবার সেখানে এসে দাঁড়াল। বাড়ির ভিতর ঢোকার কোন পথ খুঁজে পেল না গোয়েন্দারা; শুধু জানল, বিরাট সীমানা, আশপাশ নির্জন, কাছেপিঠে আর কোন বাড়ি-ঘর নেই। অন্ধকার ঘন হয়েছে আরও, আলোর কোন চিহ্ন নেই এখন ও-বাড়িটাতে।
দেয়াল ডিঙাতে হবে, মুসা, সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে কিশোর। আমার আর রবিনের কাঁধে চড়ে উঠে যাও।
ইয়াল্লা! বলে কী! প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মুসা। মাথা খারাপ!
আর কোন উপায় নেই, মুসার কথা কানেই নিল না কিশোর। তুমি উঠলে আমি চেষ্টা করব। কিন্তু, কাজটা তোমারই করা উচিত। তুমি উঠলে আমাকে আর রবিনকে টেনে তুলতে পারবে। আমি বা রবিন, কেউই তোমাকে তুলতে পারব না। বাড়িটাতে ঢোকার এই একটাই উপায়।

অনেক বারের মত আরেকবার নিজেকে মনে মনে গাল দিল মুসা: কেন মরতে তিন গোয়েন্দায় যোগ দিয়েছিল! কিন্তু সত্যিই কি ঢুকতে চাই আমরা? বলেই বুঝল, অহেতুক মুখ নষ্ট। রবিনকে টেনে নিয়ে দেয়ালের ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে কিশোর, দুজনের কাঁধে দুজনে হাত রেখে চমৎকার একটা মাচা তৈরি করে ফেলেছে।

কী আর করবে? বিড়বিড় করে নিজের ভাগ্যকেই বোধহয় একটা গাল দিয়ে এসে মাচায় উঠল মুসা। দেয়ালের মাথা দুহাতে ধরে মুখ বাড়িয়ে দিল সামনে। অন্ধকার বাড়িটার দিকে চোখ রেখে দুহাতে ভর দিয়ে এক ঝাঁকুনিতে উঠে বসল দেয়ালের ওপরে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘটল ঘটনা। কান ফাটানো তীক্ষ্ণ আওয়াজে বেজে উঠল অ্যালার্ম বেল।

জলদি নামো! মুসার দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে উঠল কিশোর।

জ্বলে উঠল ফ্লাডলাইট, একসঙ্গে, আটটা, দেয়ালের একেক কোণে দুটো করে। দেয়ালের মাথা আঁকড়ে ধরে বসে আছে মুসা, তীব্র নীলচে সাদা আলো ধাঁধিয়ে দিচ্ছে চোখ, পাতা মেলে রাখতে পারছে না।

লাফ মারো! আবার চেঁচিয়ে উঠল কিশোর।

তাড়াহুড়ো করে ঘুরে বসতে গিয়ে হাত পিছলাল মুসার, সামলানোর চেষ্টা করল, পারল না, পড়ে গেল ধুপপ করে। এপাশে নয়, দেয়ালের ওপাশে!

নরম ঘাসের ওপর চিত হয়ে পড়েছে মুসা, তাই ব্যথা পেল না। পড়েই এক গড়ান দিয়ে হাঁটুতে ভর করে উঠে বসল। থেমে গেছে বেল। চোখ পিটপিট করল সে, আশপাশে কী আছে দেখার চেষ্টা করল।

গাঁট্টাগোট্টা একজন লোক এসে দাঁড়িয়েছে।

চোর কোথাকার! চেঁচিয়ে উঠল গার্ড, কণ্ঠস্বরে কিছু একটা রয়েছে, শিরশির করে উঠল মুসার মেরুদণ্ডের ভিতর। মতলব কী?

কিছু বলার জন্যে মুখ খুলল, কিন্তু শব্দ বেরোল না, গলার ভিতরটা খসখসে শুকনো-সিরিশ কাগজ দিয়ে ঘষে দিয়েছে যেন কেউ। উঠে দাঁড়াতে গেল, কিন্তু এক হাঁটুতে ভর রেখে থেমে গেল মাঝপথেই, শাসানোর ভঙ্গিতে এক পা সামনে বেড়েছে লোকটা।

মুসাআ? ওপার থেকে শোনা গেল কিশোরের ডাক। পেয়েছ ওকে?

ভুরু কুঁচকে তাকাল গার্ড। কে? দ্রুত গেটের দিকে এগোল।

গেটের সামনে দেখা গেল কিশোরকে। এই যে, মিস্টার, ওকে দেখেছেন?

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল যেন মুসার। অভিনয় শুরু করেছে শক্তিমান অভিনেতা।

কাকে? কিছুই বুঝতে পারছে না গার্ড।

হুগো।
মুসার দিকে তাকাল গার্ড।
আরে, না না, ও না, হাত নাড়ল কিশোর। বেড়াল। একটা হুলো, সিয়ামিজ ক্যাট। আমার মা এখনও জানে না ওটা হারিয়েছে। আপনাদের দেয়ালের ওপাশে যেতে দেখেছি।
ভাল গপ্পো! লোকটা ভয়ানক গম্ভীর।
সত্যি বলছি, গার্ডকে বিশ্বাস করানোর চেষ্টা করছে কিশোর। হয়তো কোন গাছে উঠে বসে আছে।
এমনভাবে বলছে কিশোর, মুসারই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে। ঘাড়ে নেমে আসা ধূসর চুলের বোঝায় আঙুল চালাল লোকটা, মুসার দিকে ফিরল।ওঠো! হাতের নির্দেশে গেট দেখাল। বেরোও!
উঠে দাঁড়াল মুসা।
প্লিজ! অনুনয় ঝরল কিশোরের কণ্ঠে। একটু সাহায্য করুন। বেড়ালটাকে একবার খুঁজেই বেরিয়ে আসবে আমার বন্ধু।
বেড়াল নেই! মুসার কনুই ধরে টেনে গেটের কাছে নিয়ে এল গার্ড।
মা আমাকে মেরে ফেলবে, কেঁদেই ফেলবে যেন কিশোর।
আমাকে মারারও লোক আছে, বলল গার্ড। ধমকে উঠল, জলদি যাও এখান থেকে! নইলে পুলিশ ডাকব!
নিরাশ ভঙ্গিতে এক পা পিছিয়ে এল কিশোর। কড়া নজর লোকটার দিকে।
গেটের পাশে দেয়ালের ভিতরের দিকে আইভি লতার ঝাড়, তার ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দিল গার্ড। কিছু একটা করল, মৃদু ক্লিক শব্দ হলো। খুলে যেতে শুরু করল পাল।।
এক ধাক্কায় মুসাকে বাইরে বের করে দিল গার্ড। আর যেন ভিতরে দেখি! তা হলে কপালে ভীষণ দুঃখ আছে বলে দিলাম। আবার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে গেট।
যদি বেড়ালটা দেখেন… শুরু করেই থেমে যেতে হলো কিশোরকে।
ভাগো! চেঁচিয়ে উঠল গার্ড।
ঘুরে হাঁটতে শুরু করল মুসা আর কিশোর। চলে এল রবিনের কাছে, তাকে দেখেনি গার্ড। ফ্লাডলাইট নিভে গেল, কালিগোলা অন্ধকার যেন গ্রাস করে নিল তিন কিশোরকে।
উফফ! ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল মুসা। আল্লাহ বাঁচিয়েছে।
ফিক করে হাসল রবিন। কান মলেনি তো!
এই, ভাল হবে না বলে দিচ্ছি! হাত তুলল মুসা।
আহ্, থামো তো! চাপা গলায় ধমক দিল কিশোর। কান পেতে শুনছে।

খোয়া বিছানো পথে গার্ডের বুটের শব্দ হচ্ছে। কয়েক কদম চলেই থেমে গেল।
আমরা গেছি কিনা, বোঝার চেষ্টা করছে, কণ্ঠস্বর আরও খাদে নামাল কিশোর। চলো, হাঁটি। এমনিতেই সন্দেহ করেছে গার্ড। গাড়িতে করে এসেছি দেখলে শিওর হয়ে যাবে, বেড়াল খুঁজতে আসিনি আমরা।
চলো তা হলে, তাড়াতাড়ি পালাতে পারলে বাঁচে মুসা, গার্ডের হাতে পড়তে চায় না আর।
জোরে কথা বলতে বলতে চলল ওরা পথ ধরে, খালি বেড়ালটার আলোচনা করছে। সিয়ামিজ ক্যাটের দাম কত, ওটা না পেলে মা কী পরিমাণ বকবে কিংবা পেটাবে, আরেকটা বেড়াল জোগাড় করা যায় কিনা, এসব। হাফট্রাকের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় নিচু গলায় বলল। কিশোর, বোরিস, কয়েক মিনিট পর আমাদের পিছনে আসবেন।
হাঁটতে হাঁটতে একটা মোড় পেরিয়ে এল ছেলেরা; পিছনে চেয়ে দেখল, গেট দেখা যায় না; তার মানে গার্ডের চোখের আড়ালে চলে এসেছে। থামল ওরা।
অদ্ভুত ব্যাপার-স্যাপার! কিশোর বলল। পার্টি চলছে, কিন্তু একটা আলোও জ্বালেনি। ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি বসিয়েছে, তার ওপর গার্ড। এত কড়া পাহারা কেন? চুরি করে ঢোকার উপায় নেই, অ্যালার্ম বেল বেজে ওঠে, সার্চলাইট জ্বলে ওঠে! সাঙ্কেতিক কথার জবাব যে জানে না, তাকে ঢুকতে দেয়া হয় না। কী কাণ্ড চলছে ভিতরে?
পিছন থেকে ট্রাকটা এসে দাঁড়াল পাশে, উঠে বসল ছেলেরা। রবিন দরজা বন্ধ করে দিল।
পাক্কা হারামি লোক! পিছন দিকে হাত নাড়ল বোরিস। সব কথা শুনেছেন? মুসা জিজ্ঞেস করল।
শুনেছি। একবার ভাবলাম, যাই! আরেকটু বাড়াবাড়ি করলেই যেতাম। মুসা, ব্যথা পেয়েছ?
দীর্ঘশ্বাস ফেলে সিটে হেলান দিল মুসা আমান। এখন আর পাচ্ছি! তবে পড়ার পরে মনে হয়েছিল, মেরুদণ্ড দুটুকরো!
একটা দুই রাস্তার মোড়ে এসে গতি কমাল বোরিস। বাঁ দিকে টরেনটি ক্যানিয়ন রোড ধরে তীব্র বেগে ছুটে আসছে আরেকটা ট্রাক, ওটাকে পথ ছেড়ে দেয়ার জন্যে থেমেই দাঁড়াতে হলো। পিছন থেকে এসে ঘ্যাচ করে হাফট্রাকের পাশে থামল একটা কমলা রঙের স্পোর্টস কার।
আরে! চাপা গলায় বলল রবিন। মিস গ্যানারিল, হেয়ারড্রেসার!
বাড়ি ফিরছে! উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল কিশোর। জলদি জিনার কাছে। ফোন করতে হবে! নিশ্চয় খোঁজাখুঁজি করছে। ভ্যারাড় কিংবা মিস মারভেল দেখে ফেললে কী

ভাববে, কে জানে!
সামনে আধ মাইল দূরে একটা পেট্রল স্টেশন আছে, বোরিস জানাল।
তাড়াতাড়ি চলুন, বার বার পিছন ফিরে তাকাচ্ছে কিশোর, মিস মারভেলের গাড়ি আসছে কিনা দেখছে।
পেট্রল স্টেশন থেকে পারকার হাউসে ফোন করল কিশোর। দ্বিতীয় বার রিং হওয়ার আগেই ওপাশে রিসিভার তুলল জিনা।
বৈঠক শেষ, কোনরকম ভূমিকা করল না কিশোর। আমরা কিছুই করতে পারিনি। তোমার কদ্দূর? পেয়েছ?
না।
সব জায়গায় দেখেছ?
কিচ্ছু বাদ দিইনি। চুম্বকও ব্যবহার করেছি। খালি ধুলো, রুজ যাওয়ার পর আর ঝাড়া হয়নি।
তার মানে, যন্ত্রটা সঙ্গে নিয়ে গেছে ভ্যারাড। কিংবা তার সহকারীর। কাছে রয়েছে ওটা।
সহকারী? তাই হবে। নতুন একজন লোক আসছে বাড়িতে।
কে?
রুজের জায়গায়। খানিক আগে এসে বলল, কত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চায়।
তারপর?
জানালাম, মা বাড়িতে নেই। যা বলার আমাকে বলতে পারে…
অপরিচিত একজনের সঙ্গে এভাবে কথা বলা উচিত হয়নি তোমার, জিনা!
শুধু তাই না, জিনার হাসি শোনা গেল। চাকরিটাও দিয়ে ফেলেছি তাকে।
চুপ করে রইল কিশোর। বুঝতে পারছে, আরও কথা বলার আছে। জিনার।
এভাবে হুট করে কেন রাজি হয়ে গেছি, জিজ্ঞেস করলে না?
কেন?
কারণ, চোখা গোঁফ আছে লোকটার। গতরাতে গ্যারাজে লুকিয়েছিল যে লোকটা, তারও গোঁফ ছিল। একই লোক কিনা, জানি না, কিন্তু যদি হয়, কোন বিশেষ কারণ আছে এভাবে যেচে এসে চাকরি চাওয়ার। হয়তো ও-ই ভ্যারাড় ইবলিশের সহকারী। তা হলে কী বলো, ওকে আসতে বলে ভালই করেছি, না? চোখে চোখে রাখা যাবে। কাল সকাল আটটায় কাজে যোগ দেবে সে। এসেই ভ্যারাডের কফিতে মাকড়সার ডিম মেশাতে শুরু করবে কিনা, কে জানে।
তোমার খালা জিজ্ঞেস করলে কী বলবে?
গল্প একখানা বানিয়ে রেখেছি মনে মনে। হ্যাঁ, কাল সকালে দেখা কোরো আমাদের বাড়িতে।

লাইন কেটে দিল জিনা। ট্রাকে ফিরে এল কিশোর।
কী ব্যাপার? কিশোরের চিন্তিত ভঙ্গি লক্ষ করল মুসা।
ঠিক বুঝতে পারছি না! হয় মেয়েটা অতি চালাক, নইলে এক্কেবারে বোকা, কিংবা দুটোই!
কী বলছ? একই সঙ্গে চালাক আর বোকা হয় কী করে একজন!
তা-ও জানি না! তবে জিনার ক্ষেত্রে হয়তো তা-ই ঘটেছে!
পরদিন সকালে পারকার হাউসে এল তিন গোয়েন্দা। বারান্দায় সিঁড়িতে বসে আছে জিনা, হাসিতে উজ্জ্বল মুখ-চোখ।
শুনছ? বলল জিনা।
শুনছে তিন গোয়েন্দা। বাড়ির ভিতর থেকে আসছে ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের গুঞ্জন।
কিছুই বলে দিতে হয়নি ওকে, জিনা বলল। সুটকেসটা রুজের ঘরে রেখে এসেই কাজে লেগে গেছে। ঝাড়টা নিয়ে আগে কুলি-ময়লা পরিষ্কার করেছে। খালার মাকড়সার জালের আশা একেবারেই খতম। হি
তার মানে রাতেও এখানে থাকছে সে? রবিন জানতে চাইল।
সেটাই ভাল হবে, না? পাল্টা প্রশ্ন করল জিনা। দিনে-রাতে সব। সময় নজর রাখতে পারব ওর ওপর।
লোক ভাল হলে হয়, কিশোরের কণ্ঠে সন্দেহ। তোমার খালা কী বলেন? তাঁকে বলেছ?
বলেছি। খুব ভাল বলে সোজা গিয়ে বিছানায় উঠেছে।
এর আগে কোথায় কাজ করত লোকটা?
বলেনি, আমিও চাপাচাপি করিনি।
খুব ভাল করেছ! নইলে হয়তো… বলতে গিয়ে বাধা পেল মুসা।
ওর সঙ্গে দেখা করতে চাও? জিনা বলল। দেখলে চিনতে পারবে?
সন্দেহ আছে, চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। রবিন চিনলে চিনতে পারে।
মাথা ঝোকাল রবিন।
চিনতে পারলেও এমন ভাব দেখাবে, যেন নতুন দেখছ, রবিনকে সাবধান করে দিল কিশোর।
তিন গোয়েন্দাকে নিয়ে চলল জিনা।
বসার ঘরে কাজে ব্যস্ত লোকটা। সবুজ-সোনালি কার্পেট থেকে ধুলো ঝাড়ছে। সারা পেয়ে মুখ ঘুরিয়ে তাকাল ছেলেদের দিকে। এগিয়ে গিয়ে ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের সুইচ অফ করে দিল জিনা।
কিছু লাগবে, মিস পারকার? জিজ্ঞেস করল লোকটা।
না, মাথা নাড়ল জিনা। আমিই নিতে পারব। লেমোনেড়।

নিন, যন্ত্রের সুইচ অন করে দিয়ে আবার কাজে লেগে গেল লোকটা।
বন্ধুদেরকে রান্নাঘরে নিয়ে এল জিনা। ফ্রিজ খুলে চারটে লেমোনেডের বোতল বের করল। চাপা গলায় বলল, ওই লোকই?।
শিওর না, অনিশ্চিত রবিন। আকার-আয়তন এক রকম, গোঁফেরও মিল রয়েছে, তবে ও কিনা, কে জানে! মাত্র এক পলক দেখেছিলাম তো।
দেখে তো খারাপ লোক মনে হলো না, মন্তব্য করল মুসা। ওই লোক কাউকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে পালাবে…নাহ, বিশ্বাস হচ্ছে না।
বর্ণচোরা! জোর গলায় বলল জিনা। আস্ত এক বর্ণচোরা। লম্বাও, খাটোও না, পাতলাও না, মোটাও না। ধূসর চুল, আর দশজনের মতই স্বাভাবিক। রাস্তায় বেরোলে ওরকম লোক অনেক দেখা যায়। মস্ত গোফ বাদ দিলে লোকের ভিড়ে অতি সহজেই মিশে যেতে পারে, আলাদা করে চেনা মুশকিল, একটা বটল ওপেনার নিয়ে বোতলের ছিপি খুলতে লাগল সে। তা গতরাতে কী কী ঘটেছে বললে না তো।
সংক্ষেপে সব জানাল কিশোর।
এখনও তোমাদের চেয়ে এগিয়ে আছি আমি, হাসল জিনা। তোমরা শুধু দেয়াল থেকে পড়ার কেরামতি দেখিয়েছ, আর আমি? হার্ডে পার্সেন্ট রহস্যময় একটা লোককে আবিষ্কার করে তাকে কাজে লাগিয়েছি।
রহস্যময় আরেকটা লোককে তাড়ানোর জন্যেই আমাদের সাহায্য চেয়েছিলে, মনে আছে? মনে করিয়ে দিল মুসা। কিন্তু, ব্যাপারটা কী? ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের আওয়াজেও ঘুমের ব্যাঘাত ঘটছে না কেন নিশাচরদের?
ভ্যারাড বাইরে, লেমোনেডের বোতলে চুমুক দিল জিনা।
দিনের বেলা কক্ষনো গুহা থেকে বেরোয় না বলেই তো জানতাম!
আজ সকালে বেরিয়েছে। কোন গোরস্থানে মড়ার হাড্ডি চুষতে গেছে, কে জানে! খালার গাড়িটা নিয়ে গেছে।
দরজায় দেখা দিল মিস মারভেল। জিনা, লোকটা কে রে? সারা। বাড়ি মাথায় তুলেছে! খালার পরনে ফিকে নীল হাউসকোট, বেগুনি-নীল বেল্ট এটেছে কোমরে। পরিপাটি করে আঁচড়ানো চুলে নতুন করে রঙ লাগিয়েছে।
নতুন কাজের লোক, খালা, জিনা বলল। তোমাকে না বললাম। গতরাতে?
ও, হা হা! খুব ভাল। কী নাম যেন বলেছিলে?
নাম বলিনি। ওর নাম ফোর্ড।
ফোর্ড! ফোর্ড! ভেরি গুড, গাড়ির নামে নাম। মনে রাখতে পারব। ছেলেদের দিকে চেয়ে আনমনে হাসল খালা। ছেলেরা গুড মর্নিং জানাল, মহিলা খেয়াল করল কিনা বোঝা গেল না। রাঁধতে পারে তো? জিনাকে জিজ্ঞেস করল।

বলল তো পারে।
তা হলে যাই, ডিনারের জন্যে কী কী রাঁধতে হবে, বলি গিয়ে। চলে গেল মিস মারভেল।
সিঙ্কে হেলান দিয়ে দাঁড়াল জিনা। বহুদিন পরে খাওয়া জুটবে মনে হচ্ছে। জানালার দিকে চোখ পড়তেই স্থির হয়ে গেল। জনাব এসে গেছেন! দেখ দেখ, গর্ত থেকে বেরোনোর চেষ্টা করছে যেন ছুচোটা!।
হেসে ফেলল ছেলেরা। ছোট্ট করভেট থেকে বেরোতে গিয়ে প্রাণান্তকর অবস্থা ভ্যারাডের। দুমড়ে মুচড়ে বাঁকা হয়ে স্টিয়ারিঙের তলা থেকে বেরোনোর চেষ্টায় অস্থির, আটকে গেছে লম্বা লম্বা পা! কাত হয়ে অনেক কষ্টে শরীরটাকে বাঁকিয়ে চুরিয়ে বেরিয়ে এল অবশেষে, প্যান্টের ভিতর থেকে খুলে এসেছে শার্টের নিচের দিক টানের চোটে, প্রায় বুকের কাছাকাছি উঠে গেছে, বেরিয়ে পড়েছে রোমশ পেট।
ব্যাটা কোথায় গিয়েছিল জানতে পারলে হত, জিনা বলল।
পিছনের দরজা খুলে ঘরে এসে ঢুকল ভ্যারাড। ছেলেমেয়েদেরকে দেখে থমকে গেল, দৃষ্টি এক মুহূর্ত স্থির রইল জিনার ওপর, তারপর তাকে পাশ কাটিয়ে এগোতে গেল। নীরবে।
পথরোধ করে দাঁড়াল জিনা। মিস্টার ভ্যারাড, আমার বন্ধুদের সঙ্গে পরিচয় করবেন না?
নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও পরিচয় করার জন্যে দাঁড়াল ভ্যারাড। খুশি খুশি ভাব করে হাত বাড়িয়ে দিল রবিন, নিষ্প্রাণ একটা রবারের হাত ধরে যেন ঝুঁকি দিল বার কয়েক।
নীরবে সব অত্যাচার সহ্য করল ভ্যারাড। পরিচয়ের পালা শেষ। হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পা বাড়াল; জিনা যেন একটা খুঁটি, এমনভাবে তাকে পাশ কাটিয়ে এগোল। বেরিয়ে গিয়েই দড়াম করে বন্ধ করে দিল দরজার পাল্লা।
কেমন বুঝলে? হাসিতে উদ্ভাসিত জিনার মুখ। সুযোগ পেলেই খোঁচাই লোকটাকে। ও ভাব করে, যেন আমি জ্যান্ত কিছু নই। তাই আমিও ছাড়ি না। কবে যে যাবে ইতরটা!
মিস্টার ভ্যারাড? মিস মারভেলের উঁচু কণ্ঠ শোনা গেল রান্নাঘর থেকেও। কাজ হয়েছে?
দুই লাফে দরজার কাছে চলে গেল জিনা, ফাঁকে কান পেতে দাঁড়াল।
কোন ভাবনা নেই, হলঘর থেকে জবাব এল ভ্যারাডের। আপনার ইচ্ছে পেশ করা হয়েছে। পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে মহাসর্পকে। বিলিয়াল দায়িত্ব নিয়েছেন। চুপচাপ বসে বসে শুধু দেখুন এখন কী ঘটে।

কিন্তু একুশের আর দেরি নেই, নিশ্চিন্ত হতে পারছে না মিস মারভেল। এর মধ্যে হবে তো? তেমন কিছুই না, তবু, জিনিসটা আমার চাই। আগেই যদি অ্যানি পল…
ঈমান নষ্ট করছেন! গম্ভীর কণ্ঠ ভ্যারাডের।
না না! আঁতকে উঠল যেন খালা। আমি সে-কথা বলিনি! ঈমান ঠিকই আছে…
তা হলে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকুন গে। আমি যাই, রেস্ট নেয়া দরকার। বড় কঠিন কাজ করতে হয়, মাঝে মাঝে একেবারে কাহিল হয়ে
হ্যাঁ হ্যাঁ, যান!
সিঁড়িতে ভ্যারাডের জুতোর শব্দ মিলিয়ে গেল।
ব্যস, গিয়ে ঢুকল আবার গর্তে, সরে আসতে আসতে বলল জিনা। ছুঁচোও লজ্জা পাবে!
মহাসর্পকে পাঠানো হয়েছে! নিজেকেই প্রশ্ন করল যেন কিশোর, মানেটা কী?
ডাকে সাপ-টাপ পাঠায়নি তো খালার কাছে? মুসা বলল।
মাথা নাড়ল জিনা। না। সাপ দেখলেই মূর্ছা যায় খালা। ভ্যারাড আর তার ভক্তরা ওভাবেই কথা বলে। ওদের কথার মানে ওরাই শুধু বোঝে! মনে আছে, সেদিন রাতে বলেছিল, যোজন যোজন দূরে রয়েছেন। মহাসর্প, তিনি কথা বলবেন কিনা, তাই বা কে জানে!
কথা অবশ্য বলেছিলেন মহাসর্প! চিন্তিত দেখাচ্ছে কিশোরকে। এমন বেসুরো সুরে, শুনলে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যেতে চায়! কী যে করছে। ওরা, ওরাই জানে! বৈঠক বসাচ্ছে, একবার এখানে, একবার ওখানে! …তোমাদের নতুন কাজের লোকটাও এসবে জড়িত কিনা, কে বলবে! যাই হোক, এখন আর এখানে কিছু করার নেই আমাদের। আবার কিছু ঘটলে খবর দিয়ো। যাই, চাচী বলেছিল কী নাকি জরুরি কাজ আছে।
আমারও লাইব্রেরিতে যেতে হবে, রবিন বলল। ডিউটির সময় হয়েছে।
আমিই বা আর থাকি কেন? বলল মুসা। কদিন ধরেই মা তাগাদা দিচ্ছে লনটা পরিষ্কার করার জন্যে।
দারুণ ছেলে তো হে তোমরা! প্রশংসায় উজ্জ্বল হলো জিনার মুখ। গোয়েন্দাগিরি, লেখাপড়া, তার ওপর আবার বাড়তি কাজ! নাহ, তোমাদের ওপর ভক্তি আমার বাড়ছে! তা যাও, নতুন কিছু ঘটলে ফোন করব। মুসার দিকে ফিরে বলল, তোমার বোতল তো খালি। দেব আরেকটা?
তা দিতে পারো, হাসল সে।
বাড়তি আরেকটা অবশ্য ওর প্রাপ্য, টিপ্পনী কাটল রবিন। বেচারা গতরাতে যেভাবে দেয়াল থেকে পড়ল। যদি দেখতে! হাহ হা!

কিছু একটা বলতে গিয়েও থেমে গেল মুসা, আরেকটা বোতল তার হাতে ধরিয়ে দিচ্ছে জিনা।
লেমোনেড শেষ করে জিনার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যে-যার পথে চলে গেল তিন গোয়েন্দা।
ইয়ার্ডে ফিরে দেখল কিশোর, সাংঘাতিক ব্যস্ত বোরিস আর রোভার; দুটো ট্রাকে উঁচু হয়ে আছে মালপত্র, ওগুলো নামাচ্ছে।
এত দেরি করলি? মেরি চাচী বলে উঠলেন কিশোরকে দেখে।
হ্যাঁ, চাচী, একটু দেরিই হয়ে গেল।
তোর চাচার কাণ্ড দেখেছিস? দেখ, কী-সব নিয়ে এসেছে!
দেখল কিশোর। ঢালাই লোহার তৈরি পুরানো আমলের এক গাদা চুলো।
লাকড়ির চুলো! চাচীর গলায় প্রচণ্ড ক্ষোভ। বল, এসব জিনিস আর আজকাল রাখে কেউ? ব্যবহার করে? শহরের পুবে কোন এক পুরানো গুদামে পড়ে ছিল অনেক বছর। নতুন শহর হচ্ছে ওদিকে, গুদাম ভেঙে ফেলা হচ্ছে, তাই বাতিল মাল সব নিলামে বেচে দিচ্ছে। কী জানি, মরতে কেন ওদিকে গিয়েছিল তার চাচা! চোখে পড়েছে, আর কী রেখে আসে! আরও পেয়েছে কমদামে! কিশোরের দিকে তাকালেন। তোর কী মনে হয়? বিক্রি হবে এগুলো?
হবে, হবে, নির্দ্বিধায় জবাব দিল কিশোর। আজকাল অনেকেরই তো পুরানো আমলের জিনিস ব্যবহারের শখ চাপে। দেখো, একটাও থাকবে না, সব বিক্রি হয়ে যাবে।
কী জানি, বাপু! আমার তো মনে হয়, শখানেক বছরেও ওগুলো পার করা যাবে না, বোরিস আর রোভারের দিকে ফিরলেন। ওই ওদিকে জঞ্জালের ধারে কোথাও নিয়ে গিয়ে ফেলে রাখো। আমার চোখে যেন না পড়ে!
রাগে গটমট করে অফিসে চলে গেলেন মেরি চাচী।
চুলো নামাতে বোরিস আর রোভারকে সাহায্য করল কিশোর। ইয়ার্ডের এক ধারে নিয়ে গিয়ে তূপ করে ফেলতে লাগল। ভীষণ ভারি জিনিস, তার ওপর লাকড়ি ঢোকানোর ফোকরের দরজা আলগা, বয়ে নেয়ার সময় যখন-তখন খুলে পড়ে, সে আরেক ঝামেলা। ফলে কাজে দেরি হতে লাগল।
লাঞ্চের সময় হয়ে গেল, একটা ট্রাক খালি হয়েছে, আরেকটা তখনও পুরো বোঝাই।
খেয়েদেয়ে এসে আবার কাজে লাগল তিনজনে।
তিনটের দিকে বোরিস আর রোভারের ওপর বাকি কাজের ভার ছেড়ে দিয়ে গোসল করতে চলল কিশোর। হলঘরে ঢুকে দেখল, চাচা বসে বসে টেলিভিশন দেখছেন।

কিশোরকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠলেন রাশেদ পাশা, ভয়ানক!
কী ভয়ানক? দাঁড়িয়ে পড়ল কিশোর।
আরে, লোকের কাণ্ডজ্ঞান নেই! এত অসাবধানে গাড়ি চালায়! হাইওয়েতে উঠলে যেন আর দুনিয়ার খেয়াল থাকে না! দেখ! টেলিভিশনের দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি।
কিশোর তাকাল। পরিচিত দৃশ্য। প্রায়ই দেখে টেলিভিশনে, খবরের কাগজে। হলিউড ফ্রিওয়ে-তে একটা পুলের রেলিঙে বাড়ি খেয়ে বেঁকেচুরে পড়ে আছে একটা স্যালুন গাড়ি। পথ প্রায় বন্ধ। ট্রাফিক জ্যাম ছাড়াতে হিমশিম খাচ্ছে পুলিশ।
স্পিকারে ভেসে আসছে ঘোষকের কণ্ঠ: মিস অ্যানি পল নিজেই গাড়ি চালাচ্ছিলেন। তাঁকে অ্যাঞ্জেল অভ মারসি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ডাক্তাররা বলছেন, তার অবস্থা তেমন আশঙ্কাজনক নয়...
মিস অ্যানি পল! প্রায় চেঁচিয়ে উঠল কিশোর।
চিনিস নাকি? ভুরু কোঁচকালেন চাচা।
নামটা পরিচিত, বলেই আর দাঁড়াল না কিশোর, টেলিফোনের দিকে ছুটল।
কাজ আছে, ফিরতে দেরি হবে, সে-সন্ধ্যায় চাচীকে বলে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল কিশোর। ওয়ার্কশপে পৌঁছে দেখল সাইকেল নিয়ে অপেক্ষা করছে রবিন আর মুসা।
সোয়ানসন কোভ-এ যাব, কিশোর বলল। ওখানে থাকবে জিনা।
সবুজ ফটক এক দিয়ে বেরোব? জানতে চাইল রবিন।
মাথা ঝোকাল কিশোর। ও-পথেই সুবিধে। চাচীর ঘর থেকে দেখা যাবে না।
বেড়ার কাছে গিয়ে ছোট্ট একটা ফোকরে দুই আঙুল ঢুকিয়ে গোপন সুইচে চাপ দিল মুসা। নিঃশব্দে খুলে গেল দুটো পাল্লা। মাথা বের করে উঁকি দিল সে, রাস্তার এ-মাথা ও-মাথা দেখল, নির্জন। জানাল বন্ধুদেরকে। ছাপার মেশিনের গায়ে হেলান দিয়ে রাখা সাইকেলটা নিয়ে আগে বেরোল কিশোর, তার পিছনে অন্য দুজন।
পাল্লা দুটো আবার বন্ধ হয়ে গেল। চিন্তিত দৃষ্টিতে বেড়ার দিকে। তাকিয়ে আছে রবিন। বেশ বড়সড় একটা ছবিতে সাগর আকা রয়েছে, ঝড় উঠেছে, ডুবতে বসেছে একটা জাহাজ, মুখ তুলে তা দেখছে একটা বড় মাছ। ওই মাছের চোখ টিপে ধরলেই খুলে যাবে আবার সবুজ পাল্লা দুটো। তিন গোয়েন্দার হেডকোয়ার্টার থেকে বেরোনোর অনেকগুলো গোপন পথের একটা এটা।
লাল কুকুর চার গেল! বিষণ্ন কণ্ঠে বলল রবিন। বড় বেশি ছেক ছোঁক করে মেয়েটা! কী করে যে দেখে ফেলল! কবে আবার সবুজ ফটকটাও দেখে ফেলে,

কে জানে!
দেখলে দেখবে, কিশোর বলল। আরেকটা পথ বানিয়ে নেব। ওসব নিয়ে দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই। চলো, দেরি হয়ে যাচ্ছে।
হ্যাঁ হ্যাঁ, মুসা বলল। চলো।
সাইকেলে চাপল তিন গোয়েন্দা। পাশা স্যালভেজ ইয়ার্ড থেকে কোস্ট হাইওয়ে ধরে সোয়ানসন কোভ মাত্র পাঁচ মিনিটের পথ।
বড় একটা পাথরে হেলান দিয়ে আছে জিনা, কাছেই চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে আপালুসাটা, লাগামের মাথা ঝুলছে সামনের হাটুর কাছে।
বেশ ভালই ব্যথা পেয়েছে মিস অ্যানি পল, পাথরের ওপর বসে পড়ল জিনা।
জিনার মুখোমুখি আরেকটা পাথরে বসল কিশোর।তোমার খালা কী বলেন? আমি ফোন করার পর কিছু ঘটেছে?
খালার মন খুব খারাপ হয়ে গেছে। কাঁদছে। খবরটা শোনার পর থেকেই খালি কাঁদছে।
পাথরের গায়ে হেলান দিল রবিন। ঘটনা ঘটতে শুরু করেছে!
এবং খুব তাড়াতাড়ি, যোগ করল কিশোর। মাত্র আজ সকালে ভ্যারাড় বলল, মহাসকে পাঠানো হয়েছে, ব্যস, দুপুর পেরোতে না। পেরোতেই কর্ম সারা! মিস মারভেলের ইচ্ছে পূরণ হয়ে গেল। ক্যাসটিলোর বাড়িতে নিলামে আর যেতে পারছে না মিস পল। ক্রিস্টাল বল গেল তার হাতছাড়া হয়ে।
কিন্তু এরকম কিছু ঘটুক এটা চায়নি খালা, একটু যেন লজ্জিতই মনে হলো জিনাকে। খবরটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠেছে: হায় হায়, এ-কী করলাম! মহিলা মারা যেতে পারত! সব দোষ আমার, সব আমার দোষ! তাকে ঘর থেকে ধরে ধরে নিয়ে যেতে হয়েছে ভ্যারাডকে।
স্বাভাবিক, মন্তব্য করল মুসা।
তার কথায় কান দিল না জিনা। খালার ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল ভ্যারাড। হল-এ থেকে ওদের কথাবার্তা শুনেছি। সব শুনিনি, তবে এটুকু বুঝেছি, কোন একটা ব্যাপারে খালাকে চাপাচাপি করছে ভ্যারাড। বলল, অপেক্ষা করতে রাজি আছে সে, তবে বেশি দিন নয়। খালাকে কান্নাকাটি করতে বারণ করে নিচে চলে গেল সে। খালার ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। আমাকে দেখেই ধমকে উঠল খালা। বেরিয়ে এলাম, তবে রইলাম কাছাকাছিই, লুকিয়ে।
নিশ্চয় হল-এ? মুসা বলল।
হ্যাঁ। ফোন করল খালা, মিস্টার ফন হেনরিখকে চাইল।
বাড়তি রিসিভারটা তুলতে কত দেরি করেছ? জিজ্ঞেস করল কিশোর।

অনেক, জিনার কণ্ঠে বিরক্তি। নিচে নেমে রিসিভার তুলে শুনলাম, খালা বলছে: …একটা চিঠি সঙ্গে দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি তা হলে। জবাব এল: হ্যাঁ, দিন। তারপরই কেটে গেল লাইন।
তারপর? প্রশ্ন করল রবিন।
ওপরতলায় খালার পায়ের আওয়াজ শুনলাম। ফোর্ডকে ডাকল। একটা ছোট্ট বাদামী কাগজের মোড়ক হাতে নিয়ে নেমে এল ফোর্ড, খালার গাড়ি নিয়ে চলে গেল।
ভ্যারাডের আগ্রহ কেমন দেখলে? কিশোরের প্রশ্ন।
কামানের গোলার মত ছুটে গেল সে ওপরতলায়। খালা তৈরিই হয়ে ছিল। চেঁচাতে শুরু করল ভ্যারাড়, পাল্টা জবাব পেল। খালা বলল, ফোর্ডকে বেভারলি হিল-এ পাঠিয়েছে একটা ফেসক্রিম কিনে আনতে।
বিশ্বাস করেছ?
না। ভ্যারাডও করেনি। এক কৌটা ক্রিম নিয়ে ফিরতে দেখল ফোর্ডকে, তাই আর কিছু বলারও থাকল না ওর। কিন্তু আমি জানি, মিথ্যে কথা। গোলাপের পাপড়ি, গ্লিসারিন আর আরও কী কী দিয়ে নিজের ক্রীম নিজেই বানিয়ে নেয় খালা, বাজারের জিনিস কক্ষনো কেনে না।
খালাকে জিজ্ঞেস করেছ কিছু? নাকি ফোর্ডকে?
কাউকেই করিনি। আমি জানতাম, কোথায় গেছে ফোর্ড। মিস্টার। ফন হেনরিখ বেভারলি হিলের অনেক বড় একটা জুয়েলারি শপের মালিক। আমাদের বাড়ির সেফের কম্বিনেশনও আমার জানা। মা-র ঘরে গিয়ে সোজা সেটা খুললাম। নেকলেসটা গায়েব।।
স্তব্ধ হয়ে গেল ছেলেরা। খবরটা হজম করতে সময় নিল। (অবশেষে বলল কিশোর, কোন নেকলেস? ইউজেনির সম্রাজ্ঞীরটা? এত দামী জিনিস প্রায় অপরিচিত একটা লোকের হাতে পাঠাতে সাহস করলেন তোমার খালা?
খালার বুদ্ধিশুদ্ধি এমনিতেই কম, জিনা বলল। মা-ই কম্বিনেশনটা বলেছে খালাকে। কত রকমের অঘটনই তো আছে, বাড়িতে আগুন লাগতে পারে, ভূমিকম্পে ধসে যেতে পারে, তা-ই বলে রখেছে, যাতে দরকার পড়লে নেকলেসটা সরিয়ে ফেলতে পারে খালা।
নেকলেস নেই, এটা যে জানো, জানেন তোমার খালা?
জানে। নেই দেখেই তো গিয়ে ধরেছি। বলল, মা নাকি বলেছে, নেকলেসটা পরিষ্কার করার জন্যে পাঠিয়ে দিতে।
নিশ্চয় বানানো গল্প?

তা তো বটেই, মুখ বিকৃত করল জিনা। মা বাড়িতে নেই, তবু নেকলেসটা পরিষ্কার করাতেই হবে, এতই তাড়াহুড়ো! আর যদি করাতেই হয়, দোকানে পাঠাতে হবে কেন? ফন হেনরিখকে ফোন করলেই সঙ্গে সঙ্গে লোক পাঠিয়ে দিত, বাড়িতে বসে কাজ সেরে দিয়ে যেত।
তার মানে কোন ধরনের গোলমালে জড়িয়েছেন তোমার খালা, কিশোর বলল। কয়েকটা ব্যাপারে উপসংহার টানতে পারি আমরা।
যেমন?
এক, অ্যানি পলের দুর্ঘটনার জন্যে নিজেকে দায়ী করছেন মিস মারভেল। ভাবছেন, শয়তানের সাহায্য নিয়ে কাজটা ভাল করেননি তিনি। পস্তাচ্ছেন এখন।
দুই, তার ওপর কোন ধরনের চাপ সৃষ্টি করেছে ভ্যারাড। সম্মানিত অতিথির অভিনয় বাদ দিয়ে, খোলস ছেড়ে আসল রূপ ধরেছে। ফোর্ডকে প্যাকেট হাতে দেখেছে ভ্যারাড?
না। গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যেতে দেখেছে শুধু।
ও জানে, নেকলেসটা সেফে রাখা ছিল?
কী জানি! মনে হয় না। সেফের কাছে যেতে দেখিনি তাকে কখনও। ও শুধু জানতে চেয়েছে, কেন ফোর্ডকে তাড়াহুড়ো করে বাইরে পাঠাল খালা।
সেই রহস্যময় ফোর্ড! আবার সেই সব প্রশ্ন: সে-রাতে গ্যারাজে সে-ই কি লুকিয়েছিল? নাকি তোমাদের কাজের লোক দরকার শুনে কাজ করতেই এসেছে? সে-রাতের সেই রহস্যময় লোকটা যদি সে হয়, তা হলে এ-বাড়িতে কী করছে? একটা ব্যাপার অবশ্য শিওর হয়ে গেলাম, ভ্যারাডের সহকারী সে নয়, চুপ করে গেল গোয়েন্দাপ্রধান। নিচের ঠোঁটে ঘন ঘন চিমটি কাটছে। কয়েকটা ব্যাপার খুব তাড়াতাড়ি জানা দরকার। প্রথমেই জানতে হবে, নেকলেসটা জুয়েলারের দোকানে সত্যিই দিয়ে আসা হয়েছে কিনা।
তাই তো! জিনা বিস্মিত। আগে ভাবিনি কেন? যাচ্ছি, এখুনি। ফোন করব।
সকালে, বাধা দিল কিশোর। আমাদের অফিস থেকে ফোন করবে, তা হলে তোমাদের বাড়ির কেউ জানবে না। সকালে জানার চেষ্টা করব, মিস পলের অ্যাকসিডেন্টের সঙ্গে শয়তান-সাধকদের কোন যোগাযোগ আছে কিনা।
আনমনে বলল, কিন্তু, ভ্যারাড কি সত্যিই সাপ পাঠিয়েছিল?
মনে হয় না, মাথা নাড়ল জিনা। সাপ পাঠানো হয়েছে বলছে। বটে, কিন্তু তার অর্থ অন্য কিছু।
সেই অন্য কিছুটা কী? কী পাঠানো হয়েছে?
কী জানি। হাত নাড়ল জিনা।
তা হলে এত নিশ্চিত হয়ে বলছ কী করে?

আগেই বলেছি, ওরা ঘুরিয়ে কথা বলে। তা ছাড়া বাক্সে বা অন্য কিছুতে ভরে জ্যান্ত সাপ পাঠাবে? মোটেই রাজি হবে না খালা। তার সবচেয়ে বড় শত্রুকেও ওভাবে চমকে দিতে চাইবে না, কামড়াতে পাঠানো তো দূরের কথা!
রবিন বলল, আরেকটা ব্যাপার আছে এখানে। বিলিয়াল শব্দটা। বলেছিল ভ্যারাড। লাইব্রেরিতে বইপত্র ঘেঁটে জেনেছি, বিলিয়াল শয়তানের আরেক নাম
আর শয়তানকেই শ্রদ্ধাভরে ডক্টর কিংবা ডাক্তার শয়তান বলে ডাকে তার পূজারিরা।
গায়ে কাটা দিয়ে উঠল মুসার। খাইছে রে! শয়তানের সঙ্গে সাপের সম্পর্ক! আল্লাই জানে, কী ঘটবে!
এক মুঠো বালি তুলে নিয়ে আঙুলের ফাঁক দিয়ে ধীরে ধীরে ছাড়ল। জিনা। কার সঙ্গে যে ভাব জমাল খালা!
সেটা আমিও ভাবছি, রহস্যময় শোনাল কিশোরের কথা। আসল। ইবলিশ না হলেও মানুষ-শয়তান তো বটেই।
বিধ্বস্ত চেহারা নিয়ে পরদিন সকালে পাশা স্যালভেজ ইয়ার্ডে হাজির হলো জিনা, দেখেই বোঝা যায় সারারাত ঘুমোতে পারেনি। অফিসের কাছে তার অপেক্ষা করছে তিন গোয়েন্দা।
খালা কাঁদছে, জানাল জিনা। ভ্যারাড ঘুমোচ্ছে। আর ফোর্ড দেখে। এলাম জানালা পরিষ্কার করছে।
মেরি চাচী বাসন-পেয়ালা ধুচ্ছে, কিশোর বলল। এই সুযোগে ফোনটা সেরে ফেলো।
এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে অফিসে ঢুকে রিসিভার তুলে ডায়াল করল জিনা। হারটার কথা জিজ্ঞেস করে জবাব শুনল চুপচাপ, তারপর থ্যাঙ্কিউ বলে নামিয়ে রাখল রিসিভার।
ওরা হার পেয়েছে, উকণ্ঠা দূর হয়েছে জিনার। দিন কয়েক রাখবে হারটা, কাজ হয়ে গেলেই পাঠিয়ে দেবে। যাক, বাঁচা গেল! স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সে।
তা হলে নিরাপদেই আছে, কিশোর বলল। আর যাই হোক, তোমাদের নতুন লোকটা রত্নচোর নয়। এখন সাপের ব্যাপারটা কী, জানা দরকার। অ্যাকসিডেন্টটা কী করে ঘটল জানতে হবে।
তোমার কী ধারণা? কিশোরের দিকে তাকাল মুসা। মিস পলের গাড়িতে সাপ ফেলে রাখা হয়েছিল?
কেঁপে উঠল জিনা।
খুব সম্ভব, জবাব দিল কিশোর। গাড়ির ভেতর হঠাৎ জ্যান্ত সাপ দেখলে চমকে উঠবে না এমন মানুষ কমই আছে।

এখন কী করবে? জিনা জিজ্ঞেস করল।
আমি লাইব্রেরিতে যাব, রবিন বলল। সাপ, শয়তান আর প্রেতসাধকদের ব্যাপারে পড়াশোনা করব। দেখি, আর কী কী জানা যায়।
আমি আর মুসা যাব হাসপাতালে, কিশোর বলল। মিস অ্যানি পলকে দেখতে। লস অ্যাঞ্জেলেসে যাবে বোরিস, আমাদেরকে নামিয়ে দিতে পারবে।
আমি বাড়ি যাচ্ছি, দরজার দিকে রওনা হলো জিনা। সব কটার ওপর নজর রাখতে হবে।
তেমন কিছু যদি জানতে পারি, ফোন করব তোমাকে, কথা দিল কিশোর।
জিনা বেরিয়ে গেল।
দরজায় দেখা দিল বোরিস। রেডি?
হ্যাঁ, বলল কিশোর। মুসাকে নিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে এসে ট্রাকে চড়ল।
লস অ্যাঞ্জেলেসের দিকে ছুটে চলেছে ট্রাক। গভীর ভাবনায় ডুবে আছে কিশোর, মুসা চুপচাপ।
ভারমন্ট বুলভারে ঢুকল গাড়ি, ছোট্ট একটা ফুলের দোকান চোখে পড়তেই বোরিসের বাহুতে হাত রাখল কিশোর। আফ্রিকান ভায়োলেটের একটা তোড়া কিনল সে, উপহারের কার্ডে গুটি গুটি করে কিছু লিখল। তারপর আবার এসে উঠল ট্রাকে।
অ্যাঞ্জেল অভ মারসি হাসপাতালের গেটে গাড়ি রাখল বোরিস। আমি থাকব?
থাকবেন? ...আচ্ছা, থাকুন, আমরা আসছি, কেবিনের দরজা খুলল কিশোর।
এবার কীসের খোঁজে?
এক মহিলার সঙ্গে দেখা করব। সাপ!
সাপ! চমকে উঠল বোরিস! এমনভাবে বলেছে কিশোর, যেন গাড়ির ভেতরেই কোথাও রয়েছে সরীসৃপটা।
তা-ও আবার যে-সে সাপ নয়, গান-গাওয়া সাপ! বোরিসকে আরও তাজ্জব করে দিল মুসা।
নামল কিশোর। মুসাকে নামতে মানা করল। বলল, আমি একাই যাই। লোকের চোখে যত কম পড়া যায়, সেই চেষ্টা করতে হবে।
ঠিক আছে, যেতে হলো না বলে খুশিই মুসা। আমি বসছি।
হাসপাতালে এসে ঢুকল কিশোর। রিসেপশন ডেস্কের ওপাশে বসা মহিলাকে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, মিস অ্যানি পলের সঙ্গে দেখা করা। যাবে?
একটা বাক্সে সাজানো কার্ডে আঙুল চালাল মহিলা নীরবে। নির্দিষ্ট কার্ডটা তুলে পড়ল: রুম নাম্বার দুশো তিন, ইস্ট উইং। মুখ তুলে কিশোরকে বলল, করিডর ধরে

চলে যাও, লিফট পেয়ে যাবে। দোতলায় গিয়ে কোন নার্সকে জিজ্ঞেস করলেই দেখিয়ে দেবে ঘর।
রিসেপশনিস্টকে ধন্যবাদ জানিয়ে করিডর ধরে রওনা হলো। কিশোর। লিফটে করে উঠে এল দোতলায়। সামনেই একটা অফিস, লোকজন খুব ব্যস্ত। ফোনে উত্তেজিতভাবে কথা বলছেন একজন ডাক্তার, ওষুধ আর যন্ত্রপাতির ট্রে নিয়ে কাছেই দাঁড়িয়ে আছে এক নার্স, আরও কিছু ওষুধ নিয়ে ছুটে এল আরেকজন নার্স। তাদের কাছে এসে দাঁড়াল কিশোর, কিন্তু দেখতেই পেল না যেন তাকে কেউ।
রিসিভার নামিয়ে রেখে এক নার্সকে নিয়ে ব্যস্তভাবে বেরিয়ে গেলেন। ডাক্তার। দ্বিতীয় নার্স রইল ফোনের কাছাকাছি, চোখ একটা চাটে।
কেশে গলা পরিষ্কার করে নিল কিশোর। মিস অ্যানি পলের সঙ্গে দেখা করব, প্লিজ। দুশো তিন নাম্বার।
চার্ট থেকে চোখ ফেরাল নার্স। হবে না। ঘুমের বড়ি খাইয়ে এসেছি।
প্লিজ, সিসটার…
বললাম তো, এখন দেখা করতে পারবে না। নিজের কাজে মন দিল নার্স।
অ! চোখের পলকে চেহারা কাঁদো কাঁদো হয়ে গেল কিশোরের। আমার…আমার চাচী! …চাচী ছাড়া আর কেউ নেই দুনিয়ায়! ফোঁপাতে শুরু করল সে। বাবা-মা অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছে! এখন চাচীও যদি যায়… আর বলতে পারল না সে, ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠল।
বিস্ময় ফুটল প্রথমে নার্সের চোখে, সেটা করুণায় রূপ নিল। হাত তুলল, দাঁড়াও, খোঁজ নিয়ে দেখি, ঘুমিয়ে পড়ছে কিনা।
দুহাতে চোখ ডলতে শুরু করল কিশোর।
ইউনিফর্মে খসখস আওয়াজ তুলে বেরিয়ে গেল নার্স, ফিরে এল। আধ মিনিট পরেই। এখনও জেগেই আছে, যাও। কিন্তু দেরি করবে না, ঠিক? হাত তুলে একটা দিক দেখিয়ে দিল।
থ্যা-থ্যাঙ্কিউ, সিসটার! হাসি ফুটল কিশোরের মুখে, বড় বড় অপূর্ব সুন্দর দুটো চোখ কান্নাভেজা।
দরজার গায়ে নম্বর দেখে পাল্লা ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়ল কিশোর। বিছানায় শুয়ে আছেন এক গোলগাল চেহারার মহিলা, ধবধবে সাদা চুল, ঢুলুঢুলু চোখ। কোমর পর্যন্ত কম্বল টানা।
কাছে এসে দাঁড়াল কিশোর। মিস পল? তোড়াটা বাড়িয়ে দিল।
মহিলার ঘুমজড়ানো ধূসর চোখের তারা উজ্জ্বল হলো। বাহ্, কী সুন্দর!
স্পেশাল ভায়োলেট, হাসল কিশোর। একটা লোক আপনাকে দিতে দিল।

বালিশের পাশ থেকে আস্তে করে চশমাটা নিয়ে পরলেন মিস পল। কার্ডটা দেখি?
বিছানার পাশের টেবিলে ফুলদানিতে তোড়াটা গুঁজে রাখল কিশোর, কার্ডটা খুলে নিয়ে দিল মহিলার বাড়ানো হাতে।
কার্ড চোখের সামনে এনে বিড়বিড় করে পড়লেন মিস পল: শুভেচ্ছা-তাড়াতাড়ি সেরে উঠুন। উল্টেপাল্টে দেখলেন। অবাক। আরে! নাম-টাম কিচ্ছু নেই!
চুপ করে রইল কিশোর।
কালও একই কাণ্ড ঘটেছিল, আবার বললেন মহিলা। একটা প্যাকেট, সঙ্গে কার্ড.. নামঠিকানা কিছু নেই! এত ভুলো মন লোকটার!
আমারও তাই মনে হলো, কিশোর বলল। লম্বা ছিপছিপে মানুষ, কালো চুল, ফেকাসে চেহারা।
হুমম! চোখ মুদলেন মিস পল।
ঘুমিয়ে পড়ছেন না তো! অধীর হয়ে উঠেছে কিশোর, এই সময় ঘুমিয়ে পড়লে...
হঠাৎ চোখ মেললেন মহিলা। মনে পড়েছে! গতকাল ওই লোকটাই সাপ দিয়েছিল। আজ দিল ফুল।...আশ্চর্য!
সাপ!
হ্যা! ...ছোট্ট... চোখ মুদলেন আবার মিস পল, ঘুমিয়ে পড়ছেন।
সাপ? তাড়াতাড়ি বলল কিশোর। সাপ সংগ্রহ করেন নাকি আপনি?
আবার মেললেন ধূসর চোখ জোড়া। না না! ওটা আসল সাপ না! ব্রেসলেট। পছন্দ হলো না... চোখের পাতা কাছাকাছি হতে শুরু করল। মহিলার।
তার মানে সাপের মত? মরিয়া হয়ে প্রশ্ন করল কিশোর।
হ্যাঁ। ...ঠিকানা জানি না তো, নইলে ফেরত পাঠাতাম। দেখাচ্ছি, ড্রয়ারের দিকে হাত বাড়ালেন মিস পল। আমার হ্যান্ডব্যাগে।
তাড়াতাড়ি ড্রয়ার খুলে হাতব্যাগটা বের করে দিল কিশোর।
ব্যাগ খুলে ভেতরে হাতড়ালেন মহিলা। এই...এই যে...বিচ্ছিরি না?
হুঁ! ভুরু কুঁচকে গেছে কিশোরের। বেসলেটটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। খুদে একটা ধাতব সাপ, কারিগরের বাহাদুরি আছে, স্বীকার করতেই হবে। ফণা তুলে আছে অ্যালুমিনিয়ামে তৈরি একটা সোনালি রং করা গোখরো, গাঢ় লাল পাথরে তৈরি দুটো চোখ, জীবন্ত মনে হয়।
সাপের মসৃণ পেটে আঙুল চালিয়ে দেখল কিশোর, যতভাবে সম্ভব পরীক্ষা করল। গতকাল গাড়িতে এটা ছিল আপনার সঙ্গে?
ছিল, পরেছিলাম। গতকালই তো? হ্যাঁ, অথচ মনে হচ্ছে অনেক দিন আগের কথা, চোখ মুদলেন। কী করে যে খুলে এল চাকাটা!
চাকা খুলে এল? গাড়ির ভেতরে তা হলে গোলমাল ছিল না?

আবার চোখ খুললেন মিস পল। না...চাকাটা খুলে গেল, সামনের...। গড়াতে গড়াতে ছুটল, পরিষ্কার দেখলাম! সামনে পুল...তারপর আর কিছু মনে নেই...
দরজা খোলার শব্দে ফিরে তাকাল কিশোর। নার্স। কড়া দৃষ্টি।
যাচ্ছি, অনুনয়ের সুরে নার্সকে বলল কিশোর। ব্রেসলেটটা মিস পলের হাতে গুঁজে দিয়ে রওনা হলো দরজার দিকে।
এতক্ষণ জ্বালাবে জানলে ঢুকতে দিতাম না, কঠোর গলায় বলল নার্স।
সরি, করুণ হাসি হাসল কিশোর। যেতে মন চাইছে না...
বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিল নার্স। ঠিক আছে, ঠিক আছে, অন্য সময় এসে কথা বোলো আবার, তাড়াতাড়ি বলল সে, আশঙ্কা, ছেলেটা আবার না কেঁদে ফেলে!
চেহারা বিষণ্ন করে নার্সকে দেখিয়ে দেখিয়ে লিফটে উঠল কিশোর, দরজা বন্ধ হয়ে যেতেই আয়নার দিকে চেয়ে দরাজ হাসি হাসল নীরবে।
কিছু জানলে? কিশোর কাছে আসতেই জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে। দিল মুসা।
অনেক কিছু, গাড়িতে উঠল কিশোর। সাপটা মহিলার ব্যাগেই রয়েছে।
সা-প! চেঁচিয়ে উঠল বোরিস। হাসপাতালে সাপ সঙ্গে রেখেছে?
ধাতুর সাপ। একটা ব্রেসলেট, গোখরোর হুবহু নকল।
বুঝেছি, আস্তে মাথা দোলাল মুসা। যত গোলমাল এই ব্রেসলেটেই! কোন মাদক ছিল, গাড়ি চালানোর সময় ঢুকে গেছে মিস পলের শরীরে। বরজিয়া আঙটির কথা শোনোনি? গোপন কুঠুরি ছিল আঙটির ভেতরে, তার ভেতরে রাখা হত মারাত্মক বিষ। গোপন অতি সূক্ষ্ম একটা সূচ লাগানো ছিল, ওটা বিষ ইনজেক্ট করে দিত যে পরত তার শরীরে...।
জানি, বাধা দিয়ে বলল কিশোর। সেজন্যেই ভালমত পরীক্ষা করে দেখেছি ব্রেসলেটটা। বরজিয়া আঙটির মত ভেতরে কোন কৌশল। নেই। চেহারা বাদ দিলে অতি সাধারণ একটা অলঙ্কার, ভ্যারাড নিজে দিয়েছে মিস পলের হাতে। কোন জ্যান্ত সাপ ছিল না মহিলার গাড়িতে, সামনের একটার চাকা হঠাৎ খুলে গিয়েছিল। মুসার দিকে ফিরল সে। কী মনে হয়? ব্রেসলেটে খুলেছে চাকাটা? যদি প্রমাণ করতে পারো, রাশেদ চাচার সব কটা লোহার চুলো চিবিয়ে খাব আমি, কসম।
ইয়ার্ডে ফিরে সোজা হেডকোয়ার্টারে রওনা হলো মুসা আর কিশোর। ওয়ার্কশপে ঢুকতেই চোখে পড়ল ছাপার মেশিনের ওপরে চালায় লাগানো লাইটটা জ্বলছে-নিভছে। তার মানে হেডকোয়ার্টারে টেলিফোন বাজছে।
জিনা হবে, কিশোর বলল। তাকে আমাদের নাম্বারটা দিয়েছি।

দুই সুড়ঙ্গের মুখে রাখা ধাতব পাতটা সরিয়ে পাইপে ঢুকে পড়ল মুসা। হামাগুড়ি দিয়ে এসে পড়ল শেষ মাথায়, ঢাকনা তুলে উঠে এল ট্রেলারের ভেতরে।
কিশোর ঢাকনা তুলেই শুনল মুসার গলা: ...সাপ সত্যিই পাঠানো হয়েছে, তবে নকল সাপ। একটা ব্রেসলেট। ...না না, সাপে কিছু করেনি। সামনের চাকা খুলে গিয়েছিল। স্রেফ দুর্ঘটনা...কিন্তু মাত্র পৌঁছেছি আমরা, এখুনি...ঠিক আছে, ডিনারের পর যাব।
রিসিভার নামিয়ে রেখে কিশোরের দিকে ফিরল মুসা। জিনা। মিস। মারভেল আর ভ্যারাড লাইব্রেরিতে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিয়েছে। ফোর্ড গেছে বাজারে। আগে কোথায় চাকরি করেছে, তাকে জিজ্ঞেস করেছিল জিনা। দুজায়গার কথা বলেছে। মিসেস জেরিনাল নামে এক মহিলার বাড়িতে, আর জনৈক প্রফেসর হ্যারিডানের বাড়িতে। মিস্টার জেরিনাল সরকারি চাকুরে, কানসাস সিটিতে বদলী হয়ে গেছেন। ওখানে ফোন করার চেষ্টা করেছে জিনা, পারেনি, ফোন গাইডে নামই নেই। প্রফেসর হ্যারিডানকেও পায়নি, লাইন বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়েছে।
সুবিধের মনে হচ্ছে না, কিশোর বলল। লোকটাকে কাজ দেয়ার আগে ভালমত খোঁজখবর নেয়া উচিত ছিল।
নেয়নি, এখন সেটা নিতে বলছে আমাদেরকে। কায়দা করে–ফোর্ডের বাসার ঠিকানা জেনে নিয়েছে জিনা, সান্তা মনিকার নর্থ টেনিসনে। এখুনি যেতে বলেছিল, মানা করে দিয়েছি।
ডিনারের পর যাবে বলেছ।
হ্যাঁ। এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে। এখুনি বাড়ি না গেলে মা আর ঢুকতেই দেবে না।
ডিনারের পরই ভাল। আমারও তখন কোন কাজ থাকবে না।
কিন্তু, গলা চুলকাঁচ্ছে মুসা। জিনার কথায় বড় বেশি নাচছি না আমরা! ও বলল চিলে কান নিল, আর অমনি চিলের পেছনে ছুটলাম!
ও আমাদের মক্কেল, কিশোর যুক্তি দেখাল। ওভাবে ফোর্ডকে ঘরে জায়গা দিয়ে ভুল করেছে, কিন্তু ভুল তো করেই মানুষ। যাই হোক, এখন ওকে সাহায্য করতে হবে আমাদের। হ্যাঁ, রবিনকে ফোন করে জানিয়ে দিচ্ছি, ঠিক সাতটায় যেন সুপারমার্কেটের সামনের রাস্তায় থাকে। তুমিও ওখানেই এসো। নাকি?
আচ্ছা।
ঠিক সাতটা, দেরি কোরো না।
সন্ধে সাতটা পাঁচ মিনিটে কোস্ট হাইওয়ে ধরে সান্তা মনিকার দিকে সাইকেল চালাল তিন গোয়েন্দা। সঙ্গে আনা ম্যাপ দেখে নর্থ টেনিসন প্লেস খুঁজে বের করল

কিশোর। মূল সড়ক থেকে বেরিয়ে গেছে একটা সরু গলি, তার মাথায় একটা বড় পুরানো বাড়ি, লাল টালির ছাত। জিনার দেয়া নাম্বার মিলিয়ে দেখে নিল মুসা।
গ্যারাজ অ্যাপার্টমেন্ট, বাড়িটার দিকে চেয়ে আছে কিশোর। তোমরা এখানে দাঁড়াও, আমি আসছি। সরু গাড়িপথ ধরে এগিয়ে। গেল সে, ফিরে এল খানিক পরে। একটা ডবল গ্যারাজের ওপর। আরেকটা অ্যাপার্টমেন্ট আছে। একই নম্বর।
কিন্তু কোনটাতে থাকে ফোর্ড, কী করে জানব? মুসা বলল।
বড় বাড়িটায় কাউকে জিজ্ঞেস করব। বলব, আমরা ফোর্ডের ভাইপোর বন্ধু, ওয়েস্টউড় যাচ্ছিলাম; ভাবলাম, ফোর্ড চাচার সঙ্গে দেখা করে যাই, হাসল কিশোর।
ফোর্ডের ভাতিজা। হা হা! সাইকেল থেকে নেমে দাঁড়াল রবিন।
সাইকেলটা পথের ওপর শুইয়ে রেখে হেঁটে গিয়ে সদর দরজায় দাঁড়াল কিশোর, বোতাম টিপল। পুরো এক মিনিট অপেক্ষা করল, কেউ এল না, আবার বেল বাজাল। দরজা খুলল না কেউ। ফিরে এল সে।
বুদ্ধি খাটল না, মুসা বলল। এবার কী?
আগে ওই ছোট গ্যারাজটাতেই দেখব, সাইকেল তুলছে কিশোর। আমার মনে হয় ওখানেই থাকে সে। অনেক সময় মানুষকে দেখেই অনুমান করা যায় সে কেমন জায়গায় বাস করে।
চুরি করে ঢুকব? মুসার প্রশ্ন।
জানালা দিয়ে দেখব।
খুব সহজেই দেখা সম্ভব হলো। গ্যারাজের পাশ দিয়ে সিঁড়ি উঠে গেছে, সিঁড়ির মাথায় খুদে একটা চতুরমত, সামনে দরজা, পাশে জানালা, জানালার খড়খড়ি ওঠানো।
কপাল ভাল আমাদের, জানালার কাছে নাক চেপে ধরল কিশোর।
তার গা ঘেঁষে এল মুসা। জুতোর ডগায় ভর রেখে মুসার কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি দিল রবিন।
ডুবন্ত সূর্যের সোনালি আলো জানালা দিয়ে এসে ঘরে ঢুকেছে, ফলে বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ভেতরটা। এক দিকের দেয়াল ঘেঁষে কয়েকটা তাক, বইয়ে ঠাসা। একটা কাজের টেবিল, তাতে নানারকম ফাইল-ফোল্ডার আর বইয়ের স্তূপ। ছোট আরেকটা টেবিলে একটা টাইপরাইটার, পাশে একটা ফ্লোর ল্যাম্প, একটা সুইভেল চেয়ার...বসে টাইপ করার জন্যে। বড় একটা কাউচ আছে, চামড়ায় মোড়া গদি।
বাড়ি না অফিস? মুসা বলল।

জানালার কাছ থেকে সরে এল কিশোর। লোকটা বইয়ের পোকা। লেখালেখির দিকেও ঝোঁক আছে মনে হচ্ছে।
শিস দিয়ে উঠল রবিন। বইয়ের নাম দেখেছ? উইচক্র্যাফট, ফোক মেডিসিন অ্যাণ্ড ম্যাজিক, আনকোরা নতুন বই। লাইব্রেরিতে এসেছে গত হপ্তায়, অনেক দাম। আরেকটা বই দেখলাম টেরিলে, ভুড়-রিচুয়াল অ্যাণ্ড রিআলিটি।
সাপ সংক্রান্ত কোন বই? মুসা জিজ্ঞেস করল।
থাকতে পারে, অনেক বই-ই তো আছে। সব টাইটেল পড়তে পারছি না এখান থেকে।
দরজার নব ঘোরানোর চেষ্টা করল কিশোর, তালা আটকানো। ফিরে এসে জানালার শার্সি টান দিল, খুলে গেল। ঢাকা যাবে! দুই বন্ধুর দিকে তাকাল সে।
গ্যারাজের নিচের চত্বরের দিকে তাকাল মুসা, শূন্য, নির্জন। বড় বাড়িটার কাছেও লোকজন দেখা যাচ্ছে না।
ধরা পড়লে বিপদ হবে, ফিসফিস করে বলল মুসা।
পড়ব না, জানালার চৌকাঠে উঠে ভেতরে লাফিয়ে নামল কিশোর।
মুসা আর রবিনও ঢুকল ঘরে। পায়ে পায়ে তিনজনেই এগিয়ে গেল কাজের টেবিলটার দিকে। তাকের বইগুলোর দিকে তাকাল রবিন। আদিম মানুষের আচার-ব্যবহার, উপকথা, লোককথা, ব্ল্যাক ম্যাজিকের ওপর লেখা নানারকম বই।
কয়েকটা বইয়ের নাম পড়েই মুসা বলে উঠল, ভ্যারাড আর মিস মারভেলের সঙ্গে ব্যাটার মিল হবে ভাল!
লোকটার ওপর ভক্তি এসে যাচ্ছে আমার, রবিন বলল। কঠিন কঠিন সব বিষয়, আজ দুপুরে পড়ার চেষ্টা করেছিলাম, মাথায়ই ঢুকল না। বেশির ভাগ।
অকাল্ট-বিশেষজ্ঞ দেখা যাচ্ছে! বিড়বিড় করল কিশোর। সত্যিই এটা ফোর্ডের ঘর তো? এমন একজন মানুষ লোকের বাড়িতে চাকর থাকতে গেছে! টেবিলের ওপর ঝুঁকে ফাইলে লাগানো ট্যাগে নাম পড়তে শুরু করল সে, আউরোস ক্লায়েন্ট, দ্য গ্রিন ট্রায়াঙ্গল, দ্য ফেলোশিপ অভ দ্য লোয়ার সার্কেল...আরিব্বাপরে। কী সব নাম! আপন মনেই বাংলা করল ওগুলোর, আউরোর মক্কেল, সবুজ ত্রিভুজ, নির্মচক্রের সঙ্... বলতে বলতেই মোটা ফাইলটা টেনে নিল। আমাদের ভ্যারাড মিয়ার সঙ্ কিনা, এখনি বোঝা যাবে, ফিতের বাঁধন খুলে ফেলল সে।
কী? তাকের দিক থেকে ফিরল রবিন।
ঘেটে ঘেঁটে দুই শিট কাগজ বের করল কিশোর ফাইল থেকে। এই যে, মিস মারভেলের নাম! হু, ফোর্ডের চোখ তার ওপর পড়েছে। নামধাম, নাড়ি-নক্ষত্র সব লেখা: গোটা পাঁচেক অস্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান। কিংবা সঙ্ঘের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল

মিস মারভেল, অতীতে দুটো অ্যাস্ট্রলজি ম্যাগাজিনে ছবি ছাপা হয়েছে তার, সাধুদের সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে ভারতেও গিয়েছিল একবার। বেশিদিন থাকেনি ওখানে, সন্ন্যাসগিরি বিশেষ ভাল লাগেনি বোধহয়। রকি বিচে পারকার হাউসে কবে উঠেছে মিস মারভেল, তা-ও পরিষ্কার করে লেখা আছে, এমনকী হিউগ ভ্যারাড কবে ঢুকেছে তা-ও।
আর কিছু? মুসা জানতে চাইল।
আরেক শিট কাগজ বের করল কিশোর। মিস মারভেলের সয় সম্পত্তি কী আছে না আছে, তার লিস্ট। নাহ্, বড়লোক নয় মহিলা।
টাকা চায় নাকি ফোর্ড?
ফাইলের কাগজ উল্টেপাল্টে দেখল কিশোর। তাই তো মনে হচ্ছে। রাসলারের নামধামও লিখেছে, ওই যে, খাবারের দোকানের নোংরা মালিক। ইস্ট লস অ্যাঞ্জেলেসে সম্পত্তি আছে তার। চেহারা দেখলে তো ভিখিরি মনে হয়; আসলে টাকাপয়সা আছে, দেখা যাচ্ছে।
কমলা লেডি?
জেরি গ্যানারিল, হেয়ারড্রেসার? ফাইলের পাতা উল্টে চলল কিশোর, এক জায়গায় এসে থামল। এই যে, বেশ কয়েকটা অস্বাভাবিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত। নিজের ব্যবসা আছে, যথেষ্ট ভাল আয়। হেয়ারড্রেসিঙের দোকান ছাড়া আরও ব্যবসা আছে। স্টক। স্যান। ফারনানদো ভ্যালিতে অফিস, নিজের অ্যাকাউনটেন্ট আছে।
আর কারও নাম? রবিন জানতে চাইল।
আছে। এই যে, আরেকটা মনে হয় সেই মোটা মহিলা, সবুজ পোশাক পরেছিল যে। লোনের জন্যে ব্যাঙ্কে দরখাস্ত করেছে, আরেকটা দোকান করবে। আরও অনেকের নাম লেখা আছে, তাদেরকে চিনি না আমরা।
ম্যাজিক অ্যাণ্ড উইচক্র্যাফট, টেবিলে রাখা বইটায় আঙুল রাখল রবিন। সেই সঙ্গে টাকা!
টাকার সঙ্গে প্রেততত্ত্বের সম্পর্ক আছে বোধহয়, কিশোর বলল।
টান দিয়ে একটা ড্রয়ার খুলল মুসা। কয়েকটা পেপার ক্লিপ আর। একটা ছোট টেপরেকর্ডার, ব্যস, আর কিছু নেই। রেকর্ডারে টেপের ছোট একটা স্কুল লাগানো রয়েছে! দারুণ জিনিস। মেরে দিলে কেমন হয়?
যন্ত্রটা তুলে নিল রবিন। সত্যিই ভাল! ব্যাটারিতে চলে। ছোট একটা বোতাম টিপতেই এক প্রান্তের একটা খোপের দরজা খুলে গেল। ভেতরে খুদে মাইক্রোফোন। বাহ! চমৎকার! পকেটে ঢুকিয়ে নিয়ে যাওয়ার জিনিস। জেমস বণ্ড এটা পেলে বর্তে যেত।

কিন্তু কী টেপ করা হয়েছে? যন্ত্রটার দিকে চিন্তিত চোখে চেয়ে। আছে কিশোর। দেখো তো, প্লে করা যায় কিনা।
বোতামের কাছে নির্দেশ চিহ্ন রয়েছে, একটা বোতাম টিপল রবিন। মৃদু হিররর শব্দে ঘুরতে শুরু করল ফিতে, পুরোটা রিভার্স করে নিয়ে প্লে লেখা বোতামটা টিপল সে। কয়েক সেকেণ্ড খুটখাট করার পর ভেসে এল। একটা পুরুষ কণ্ঠ: শুরু করা যায়!
ভ্যারাড! চেঁচিয়ে উঠল রবিন।
সবাই আসেনি আজ রাতে। ডাক্তার শয়তান আজ দেখা না-ও দিতে পারেন। যোজন যোজন দূরে রয়েছেন মহাসর্প, তিনি কথা বলবেন কিনা, তাই বা কে জানে! তবু চেষ্টা করে দেখা যাক!
টেপরেকর্ডারটা পারকারদের বাড়িতে কোথাও লুকিয়ে রাখা। হয়েছিল! মুসা বলল।
ডাইনিং রুমের কাছাকাছি কোথাও হবে, ভেবে বলল রবিন।
স্পিকারে জেরি গ্যানারিলের কোলা ব্যাঙের মত কণ্ঠস্বর শোনা গেল, রাসলারের ঘোঁত ঘোত আর অন্যান্য কথাবার্তা সবই শোনা গেল স্পষ্ট। তারপর ভেসে এল সেই গা-শিউরানো গান, ভরে দিল যেন ঘর!
মহাসর্প! ফিসফিস করল কিশোর।
শিউরে উঠে আস্তে করে যন্ত্রটা টেবিলে নামিয়ে রাখল রবিন। বিচ্ছিরি গান গেয়েই চলেছে মহাসর্প।
ধীরে ধীরে শেষ মাথায় পৌঁছে গেল ফিতে, গুঙিয়ে উঠে আরেকবার ফুঁপিয়েই শেষ হয়ে গেল গান। স্পিকারের স্বাভাবিক অতি মৃদু সসস ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল কিশোরের, শীতেই বোধহয়। হঠাৎই খেয়াল করল, ঘরে আলো নেই, কখন ডুবে গেছে সূর্য। আবছা অন্ধকার।
দরজায় শব্দ হতেই একসঙ্গে ঘুরল তিন গোয়েন্দা। ফোর্ড!
ইয়াল্লা! চেঁচিয়ে উঠল মুসা।
লাফ দিয়ে গিয়ে টেপরেকর্ডারের সুইচ অফ করে দিল রবিন।
স্থির দাঁড়িয়ে আছে কিশোর; ফোর্ডকে কী বলবে, ভাবছে। আমতা আমতা করে বলল, আমরা চলে যাচ্ছিলাম।
দরজায় একইভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে গোঁফওয়ালা লোকটা। যে পথে ঢুকেছ সে-পথে? জানালা দিয়ে ঢুকেছ, না? ঝাঝাল কণ্ঠস্বর, খোলস। পাল্টে ফেলেছে, বাড়ির নম্র কাজের লোক আর নয় এখন না। দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে ফোর্ড; কিশোরের মনে হলো, ডিনামাইট ছাড়া তাকে ওখান থেকে নড়ানো যাবে না। পালানোর উপায় খুঁজল। রবিন, হাত বাড়াল সে। টেপটা।

রেকর্ডার থেকে খুলে টেপের শুলটা কিশোরের হাতে দিল রবিন।
ওটা আমার। কপাল কুচকে গেছে ফোর্ডের।
স্পুলটা বাড়িয়ে ধরল কিশোর। রেকর্ড করলেন কী করে? ডাইনিং রুমে কোথাও লুকিয়ে রেখেছিলেন?
প্রায় অন্ধকার ঘরের ভেতরে লাফিয়ে এসে পড়ল ফোর্ড। খপ করে চেপে ধরল কিশোরের হাত।
দৌড় দাও! বন্ধুদেরকে চেঁচিয়ে বলল কিশোর।
খোলা দরজার দিকে দৌড় দিল দুই সহকারী গোয়েন্দা। হাত থেকে শুলটা ছেড়ে দিল কিশোর। ফোর্ডের বা হাটুর পেছনে ডান পা বাধিয়ে হ্যাঁচকা টান মারল।
পেছনে বাঁকা হয়ে গেল ফোর্ডের শরীর, গাল দিয়ে উঠল সে। স্কুলের ফিতের এক প্রান্ত ধরে রেখেছিল কিশোর, মেঝেতে ছড়িয়ে পড়েছে ফিতে, প্রান্তটা ছেড়ে দিয়ে আচমকা এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়েই দৌড় দিল।
কিশোর দরজার কাছে প্রায় পৌঁছে গেছে, এই সময় পেছন থেকে তার শার্ট চেপে ধরল ফোর্ড। কিন্তু গতি সামান্যতম শিথিল করল না। কিশোর। শার্টের পিঠের খানিকটা ছিঁড়ে ফোর্ডের হাতে রয়ে গেল, কেয়ারই করল না গোয়েন্দাপ্রধান, একেক লাফে দুতিনটে করে সিঁড়ি টপকে নিচে নেমে চলল।
অনুসরণ করল না ফোর্ড। হাতে ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো নিয়ে হাঁ। করে চেয়ে আছে। সাঁই সাঁই প্যাড়াল করে সাইকেল নিয়ে চলে যাচ্ছে তিন কিশোর।

.

গোলমাল রাধাবে না তো ফোর্ড? পাশাপাশি সাইকেল চালাতে চালাতে এক সময় বলল মুসা। হয়তো পুলিশে ফোন করবে। করলে আমরা বলে। দেব টেপ আর ফাইলের কথা।
ও-দুটো জিনিস সহজেই নষ্ট করে, কিংবা লুকিয়ে ফেলা যায়, কিশোর বলল। আমরা রীতিমত অপরাধ করেছি। চুরি করে ঘরে ঢুকে জিনিসপত্র তছনছ করেছি, অভিযোগ করতে পারবে সে। জিনাদের বাড়িতে দেখেছে আমাদের; কোথায় থাকি, সহজেই বের করে ফেলতে পারবে।
তো, আমরা এখন কী করব? রবিনের প্রশ্ন।
ইয়ার্ডে ফিরে আগে জিনাকে ফোন করব। হয়তো কিছুই করবে না। ফোর্ড। ও যে রাতে চুরি করে পারকারদের গ্যারাজে ঢুকেছে, এটা তো মিথ্যে নয়। তা ছাড়া লোকের ব্যক্তিগত ব্যাপারে খোঁজখবর করে। তাদের সম্পর্কে রিপোর্ট তৈরি করেছে। অপরাধবোধ আছে তার মনে। পুলিশকে ফোন করার আগে অন্তত দশবার ভাববে।
আচ্ছা, উদ্দেশ্য কী ছিল ওর? মুসা বলল। ব্ল্যাকমেইল?

হতে পারে।
জিনা আমাদেরকে বললে পারত, তিক্ত শোনাল মুসার কণ্ঠ। আজ রাতে ফোর্ড বাসায় যাবে!
জানে না হয়তো।
হেডকোয়ার্টারে এসে ঢুকল তিন গোয়েন্দা। টেলিফোন বাজছে।
লাইনের সঙ্গে স্পিকারের কানেকশন রয়েছে, সুইচ অন করে দিয়ে রিসিভার তুলল কিশোর। জিনার কণ্ঠ শোনা গেল। কিশোর?
হ্যাঁ, কিশোরের চাঁছাছোলা জবাব। ফোর্ড ধরে ফেলেছিল আমাদেরকে।
সরি, আন্তরিক দুঃখিত মনে হলো জিনাকে। জানার পর তোমাদেরকে জানানোর অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু বেরিয়ে গেছ তোমরা তখন। ও বলল, বাসায় কী জরুরি কাজ আছে। কী করে আটকাই, বলো? চাপাচাপি করতে পারতাম, তাতে লাভ হত কী?
করে দেখতে পারতে, ক্ষোভ যাচ্ছে না কিশোরের। আমার শার্ট ছিঁড়ল; ও জেনে গেল, ওর ওপর আমরা গোয়েন্দাগিরি করছি; তোমারও আরেকজন কাজের লোক গেল।
আর ফিরে আসবে না বলছ?
দ্বিধা করল কিশোর। গরু হলে আসবে! ওর ঘরে ঢুকে এমন সব জিনিসপত্র পেয়েছি, প্রমাণ করতে পারলে কয়েক বছর জেল হয়ে যাবে। ওর। তোমার খালাকে বোধহয় ব্ল্যাকমেইল করার তালে ছিল ফোর্ড। সেরাতে গ্যারাজে লুকিয়ে ছিল ও-ই, বৈঠকের কথাবার্তা আর গান রেকর্ড করেছে।
ঠিক বোঝা যাচ্ছে না ব্যাপারটা! খালাকে ব্ল্যাকমেইল করবে কী কারণে? কী অপরাধ করেছে খালা?
মিস অ্যানি পলের অ্যাকসিডেণ্টের জন্যে কে দায়ী?
চুপ করে রইল জিনা।
তোমার খালা কোথায়? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
ওপরে। মন খারাপ।
ভ্যারাড?
লাইব্রেরিতে। কিছু একটা করছে।
ওই গান আর শুনেছ?
না। বাড়িটা কবরের মত নীরব।
ঠিক আছে, চোখ খোলা রাখো। সন্দেহজনক কিছু দেখলে সঙ্গে সঙ্গে জানাবে। ফোর্ড ফিরলে তা-ও জানাবে।

কিন্তু ফোর্ড ফিরল না। পরদিন সকালে ইয়ার্ডে ফোন করে। কিশোরকে জানাল জিনা। দুপুরের আগে রবিনকে নিয়ে আবার সান্তা মনিকায় গেল কিশোর। আগের দিনের মতই বড় বাড়িটার সদর দরজায়। গিয়ে বেল বাজাল। আজ জবাব পেল, দরজা খুলে দিল এক শীর্ণকায় বৃদ্ধা। জানাল, সকাল বেলায়ই ঘর খালি করে মালপত্র নিয়ে চলে গেছে। ফোর্ড।
কোথায় গেছে বলতে পারেন? জিজ্ঞেস করল কিশোর। দোকানে বিল বাকি ফেলে গেছে।
জানি না, মাথা নাড়ল বৃদ্ধা। কোত্থেকে একটা গাড়ি আর ট্রেলার এনে মালপত্র তুলে নিয়ে চলে গেল।
খুব অসুবিধে হচ্ছে, কিশোরকে বলল জিনা। ফোর্ড গেছে তিন দিন হয়েছে। অন্তত খাওয়া-দাওয়াটা তো ঠিকমত করতে পারতাম। সারাদিন গুম হয়ে বসে থাকে খালা। ভ্যারাড় আছে আগের মতই, সারাক্ষণ চোখে চোখে রাখে খালাকে।
এখন কোথায়? নিশ্চয় ঘুমোচ্ছে? বেড়ার বাইরে রয়েছে কিশোর।
না, চুল কাটাতে গেছে।
এই সক্কাল বেলা!
আজকাল ভোরে ভোরেই উঠে পড়ে, ছুঁচোবাজি কমিয়ে দিয়েছে কেন জানি!
কী কী আলোচনা করে দুজনে? তারের বেড়ার ভিতরে ঘাস খাচ্ছে। আপালুসাটা, দেখছে কিশোর।
কোন আলোচনাই নয়।
উদ্ভট কিছুতে জড়িয়ে পড়েছেন তোমার খালা। প্রেততত্ত্ব নিয়ে পড়াশোনা করছে রবিন কদিন ধরে; ও বলছে, তোমার খালা প্রেতসাধকের পালায় পড়েছেন, প্রেতসাধনা চালাচ্ছেন। ছুরির ডগা দিয়ে। বিছানায় চক্র একে তাতে বসে থাকা, মোম জ্বেলে মন্ত্র পড়া, কিংবা রঙের ওপর বিশেষ জোর দেয়া, এসব প্রেত পূজারিরাই সাধারণত করে থাকে।
কদিন ধরে মোম জ্বালছে না খালা।
আগামী হপ্তায়ই তো র‍্যামন ক্যাসটিলোর বাড়িতে নিলাম, কথার মোড় ঘোরাল কিশোর। তোমার খালা যাচ্ছেন? ক্রিস্টাল বল কেনার জন্যে বোধহয় যেতে পারবেন না মিস পল।
আগামী এক মাসও কোথাও যেতে পারবে না। পায়ের হাড় দু জায়গায় ভেঙেছে। খালা খালি নিজেকে দোষ দিচ্ছে। রোজ সকাল বিকাল ফোন করে হাসপাতালে, নার্সের কাছে খবর নেয় মিস পল কেমন আছে।
ইঞ্জিনের মৃদু গুঞ্জন শুনে দুজনেই তাকাল বাড়ির সামনের দিকে। চকচকে কালো একটা লিমাজিন ঢুকছে। গাড়ি-বারান্দায় এসে থামল গাড়িটা, শোফার নেমে

পেছনের দরজা খুলে ধরল। খুব দামী পোশাক আর, দস্তানা পরা একজন বেঁটেখাটো লোক বেরিয়ে এল।
ভুরু কোঁচকাল জিনা। মিস্টার ফন হেনরিখ!
কিশোরও দেখছে লোকটাকে।
সাধারণ জিনিস হলে কর্মচারী দিয়ে পাঠিয়ে দেয়, আবার বলল জিনা। বোধহয় নেকলেসটা নিয়ে এসেছে। চলো তো, দেখি।
বেড়া ডিঙিয়ে এপারে চলে এল কিশোর। জিনার সঙ্গে রান্নাঘর দিয়ে। হল-এ ঢুকল। ফন হেনরিখের হাত থেকে একটা প্যাকেট নিচ্ছে মিস। মারভেল। কিশোর লক্ষ করল; সেই নীলচে-লাল গাউনটাই পরে আছে মহিলা, তবে আগের মত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন নয়, জায়গায় জায়গায় কুঁচকে গেছে, ময়লা; ধোয়া হয় না কতদিন, কে জানে। এক কাপড় অনেক দিন পরছে মনে হচ্ছে।
মাল ডেলিভারি দিয়ে রিসিপ্ট এবং ধন্যবাদ নিয়ে চলে গেল ফন হেনরিখ।
জিনা... বলতে বলতেই কিশোরের দিকে চোখ পড়ল মিস মারভেলের। ভুরু কোঁচকাল। আরে, কিশোর। গুড মর্নিং! কখন এলে?
এই তো, এক পা এগোল কিশোর! কেমন আছেন, খালা?
ভাল না। জিনার দিকে প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিল খালা। নে, নেকলেস। খুলে দেখ তো, কেমন পরিষ্কার করেছে?
সাদা কাগজের আবরণ ছিঁড়ে গাঢ় সবুজ রঙ করা চামড়ার একটা বাক্স বের করল জিনা। বাক্সের ডালা তুলতেই ঝিলিক দিয়ে উঠল একশোরও বেশি পাথর, ঠাণ্ডা, সাদা আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে।
দারুণ, না? কিশোরকে দেখিয়ে বলল জিনা। দারুণ হবে না?
সীসের মত ভারি! জিনা বলল। ভারি বলেই পরে না মা। আরেকটা হালকা হার আছে, ওটা পরে সব সময়। হীরা আমারও পছন্দ, তার চেয়ে মুক্তো ভাল। হালকা। তবে কিনেছে যখন, এই হারটাই পরে থাকা উচিত ছিল মা-র। যে-কোন আয়রন, সেফের চেয়ে গলায় থাকা অনেক নিরাপদ।
অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে ফেলল মিস মারভেল। জানালা দিয়ে বাইরে চোখ পড়তেই বলল, ওই যে, এসেছে!
রকি বিচের আপদ! মুখ কালো করে ফেলল জিনা। নাপিত ওর গলাটা কেটে দিল না কেন!
জিনা, জলদি সেফে রেখে দে নেকলেসটা!
দড়াম করে গাড়ির দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ হলো। গাউনের পকেটে হাত ঢোকাল মিস মারভেল, হাতটা যেন দেখাতে চায় না, তাই লুকিয়ে ফেলল। যা, দেরি করছিস কেন!

বাক্সসহ হারটা নিয়ে চলে গেল জিনা। ঝটকা দিয়ে দরজা খুলে ঘরে এসে ঢুকল ভ্যারাড, আর এক মুহূর্ত আগে ঢুকলেই জিনার হাতে বাক্সটা দেখতে পেত। হেয়ার টনিকের মিষ্টি ঝাঁঝাল গন্ধ এসে লাগল কিশোরের নাকে।
খানিক পরেই সিঁড়ির মাথায় দেখা দিল আবার জিনা। কিশোর, পরে কথা বলব।
আচ্ছা, আমি যাই, দরজার দিকে পা বাড়াল কিশোর।
সারাদিন ইয়ার্ডে কাজ করল কিশোর, কান টেলিফোনের দিকে। বিকেল পাঁচটায় জিনার ফোন এল।
আজ সকালে খালার ব্যবহারে অবাক হওনি? জিনা বলল।
হয়েছি, জবাব দিল কিশোর। একটা ব্যাপার পরিষ্কার, নেকলেসটা আবার বাড়িতে ফিরে এসেছে, এটা কিছুতেই ভ্যারাডকে জানতে দিতে চান না।
হ্যাঁ। ভ্যারাড নাপিতের দোকানে যাওয়ার পর নিশ্চয় ফোন। করেছিল খালা, তাড়াতাড়ি হারটা ডেলিভারি দিয়ে যেতে বলেছিল ফন হেনরিখকে। কিন্তু এতসবের কী দরকার ছিল? হারটা থাকত পড়ে হেনরিখের দোকানে, মা এসে আনিয়ে নিতে পারত।
তার মানে হারটা তোমার খালার দরকার।
কী দরকার! চেঁচিয়ে উঠল জিনা। ওটা আমার মায়ের জিনিস! খালার না!
সে তো ঠিকই। এক কাজ করতে পারবে? জিনিসটা একবার নিয়ে আসতে পারবে আমাদের এখানে? কাজ আছে।
নিশ্চয়ই, সামান্যতম দ্বিধা নেই জিনার গলায়। জ্যাকেটের পকেটে করেই নিয়ে আসতে পারব। কেউ দেখবে না।
ভেরি গুড। নিয়ে এসো। আমি ওয়ার্কশপে আছি।
ছটা নাগাদ জিনা এল। বাক্সসহ হারটা কিশোরের হাতে দিয়ে। খানিকক্ষণ আলাপ-আলোচনা করে চলে গেল।
পরদিন ওয়ার্কশপে মিলিত হলো তিন গোয়েন্দা আর জিনা। বোরিসকে এক জায়গায় পাঠিয়েছে কিশোর, তার ফেরার অপেক্ষা করছে। ওরা!
দুপুর দুটোয় ফিরল বোরিস। একটা বাক্সে বসে পকেট থেকে সবুজ বাক্সটা বের করে ডালা খুলল। খুবই সুন্দর জিনিস, মিস পারকার, জিনার দিকে চেয়ে হাসল সে। কিন্তু কোন দাগ নেই।
দাম নেই! লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল জিনা। জানেন, ওটা ইউজেনির সম্রাজ্ঞীর জিনিস! অনেক দামী, ঐতিহাসিক মূল্য ধরলে তো কথাই নেই!
একটু যেন থমকে গেল বোরিস। সরি, মিস পারকার, কিন্তু আমি ঠিকই বলছি। সম্রাজ্ঞীর জিনিস নয় এটা, মেকি। তিনটে বড় বড় দোকানে দেখিয়েছি, একই কথা বলল। একজন তো হেসে রসিকতাও করল, ইনশিওরেন্স করাতে বলল।

মেকি! দম বন্ধ হয়ে আসছে যেন জিনার। দিন!
বাক্সটা জিনার হাতে দিয়ে উঠল বোরিস। আমি যাচ্ছি। কিশোর, মিসেস পাশা কিছু বলেছেন? খুঁজেছেন আমাকে?
খুঁজেছিল, আমি বলেছি।
আচ্ছা, বেরিয়ে গেল বোরিস।
ওকে পাঠালে কেন? জিনা বলে উঠল। তুমি গেলেই পারতে?
না, পারতাম না, মাথা নাড়ল কিশোর। আমার বয়েসী কারও হাতে ওই জিনিস দেখলে লোকে সন্দেহ করত। বোরিস বড় মানুষ...তখন অবশ্য জানতাম না ওটা নকল!
আমি যাচ্ছি!
তোমার খালাকে জিজ্ঞেস করবে নিশ্চয়?
করব মানে! কঠিন গলা জিনার। আজ একটা হেস্তনেস্ত করেই ছাড়ব! পেয়েছে কী? আসলটা কী করেছে না জেনে ছাড়ব মনে করেছ?
কী করেছেন, অনুমান করতে পারি, শান্ত কণ্ঠে বলল কিশোর। নকল একটা বানিয়ে এনেছেন তোমাদের সেফে রাখার জন্যে। আসলটা রয়ে গেছে ফন হেনরিখের কাছে। ইচ্ছে করেই আাননি তোমার খালা।
ধীরে ধীরে আবার বাক্সের ওপর বসে পড়ল জিনা। তাই তো! এটা তো ভাবিনি! আগাথা ক্রিস্টির পোয়ারোকে হার মানাচ্ছ তুমি, কিশোর পাশা, নাহ, স্বীকার করতেই হচ্ছে। তার মানে আসল হারটা নিরাপদে রাখার ব্যবস্থা নিয়েছে খালা!
কিন্তু নকল হার বানানোর দরকার কী ছিল? মুসা ঠিক বুঝতে পারছে না। কী করবে এটা দিয়ে?
ভ্রূকুটি করল জিনা। ওই ছুচো ভ্যারাডটা বোধহয় কোনভাবে ভয় ঢুকিয়েছে খালার মনে! আসল হারটা তাই ব্যাটাকে দেখতে দিতেই রাজি নয় খালা।
ভ্যারাড হারটা চুরি করবে, এই ভয়? রবিন বলল।
তা হলে তো ভালই, বলে উঠল মুসা। পালাক না! নকল হার নিয়ে ভাগুক ছুঁচোটা, জিনাও বাঁচুক।
এত সহজ চুরির কেস বলে মনে হচ্ছে না আমার, কিশোর বলল। সাংঘাতিক কোন ঘাপলা রয়েছে! মিস অ্যানি পলের অ্যাকসিডেন্ট, প্রেতবৈঠক, মহাসর্পের গান, সব কিছু মিলিয়ে কোথায় জানি একটা মস্ত প্যাঁচ রয়েছে। তারই মাঝে কোনভাবে জড়িয়েছে এই হারের ব্যাপারটা।
এখনও কি গান শোনা যায়? জিনাকে প্রশ্ন করল রবিন।
না। আর একদিনও শুনিনি।
ভয় করে বাড়িতে থাকতে? মুসা জিজ্ঞেস করল।

একটু যে করে না, তা বলব না!
এক্ষুণি তোমার কোন বিপদ নেই, কিশোর অভয় দিল, এটুকু বলতে পারি। তোমাকে ভ্যারাড যতক্ষণ না সন্দেহ করছে, তুমি নিরাপদ। ব্যাপারটাতে ফোর্ড জড়িত, আবার ফিরে আসবে সে কোনভাবে, তবে তাকে বিপজ্জনক লোক মনে হলো না। আর যা-ই করুক, মানুষের রক্তে হাত রাঙাবে না।
নিজের চেয়ে খালার জন্যে বেশি ভাবছি আমি, জিনা বলল। আমাকে কচি খুকী ভাবে ওরা, ভাবুক, ভালই। কিন্তু খালা যে বিপদে পড়তে যাচ্ছে। আজ রাতে আবার প্রেতবৈঠক বসবে টরেনটি ক্যানিয়নের সেই বাড়িতে। ডক্টর শয়তান আজ দেখা দিতে পারে, বলল ভ্যারাড। খালা প্রথমে যেতে রাজি হয়নি, কিন্তু পরে শুনলাম যাবে।
চমৎকার! চেঁচিয়ে উঠল কিশোর।
মোটেই চমৎকার নয়! পাল্টা চেঁচিয়ে প্রতিবাদ করল জিনা। ভয়ঙ্কর এক প্রেতবৈঠকে খালাকে দেখতে চাই না আমি!
প্রেতসাধনা করছে, না কী করছে, শিওর না হয়ে কিছুই বলা যাচ্ছে। না। তোমার খালাকেও ভ্যারাডের খপ্পর থেকে ছাড়িয়ে আনার কোন উপায় দেখছি না। … আজ রাতেও আমরা যাব…
আমিও যাব, ধরে বসল জিনা।
জিনা, প্লিজ! অনুরোধ করল মুসা।
না, আমি যাবই, গোঁ ধরল জিনা। তোমাদের চেয়ে আমার দায়িত্ব বেশি, কারণ, আমার খালা! ভ্যারাড় আমার বাড়িতে থাকছে, আমাকে জ্বালাচ্ছে। তা কখন রওনা হচ্ছ?
সন্ধ্যায়, কিশোর বলল। এই সাড়ে সাতটার দিকে।
কোথায় দেখা হবে তোমাদের সঙ্গে?
এখানেই চলে এসো। দেখি, চাচীকে গিয়ে ধরতে হবে। পিকআপটা নিতে পারলে ভাল।
আমি যাই, বাক্সটা জ্যাকেটের পকেটে নিয়ে বেরিয়ে গেল জিনা।
রাজি হলে কেন? মুসা আপত্তি করল। গিয়ে বিপদে পড়লে?
ওকে দেয়ালের ওপরে উঠতে না দিলেই হলো, মুচকি হাসল। রবিন।
দেখো, এক কথা বার বার ভাল্লাগে না! রেগে গেল মুসা।
আরে, দূর, ঝগড়াঝাটি রাখো তো, হাত তুলল কিশোর। এক কাজ করো, তোমরা আজ আমাদের এখানেই খাও। সকালে দেখলাম, অনেকগুলো আনারস আনিয়েছে চাচী, মোরব্বা বানাবে, মুসার দিকে চেয়ে হাসল সে।

ঝকঝকে সাদা দাঁত বেরিয়ে পড়ল মুসার, রাগ পানি। রবিনের দিকে চেয়ে বলল, যাও, মাফ করে দিলাম।
আমিও ঢুকব, জেদ ধরল জিনা।
ঢুকবে! বিরাট গেটের দিকে চেয়ে আছে কিশোর, চিন্তিত। দেখা যাক!
করবীর ঝোপে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে আছে চারটি ছেলেমেয়ে। নজর বাড়ির গেটের দিকে, মেহমানরা কখন আসে, সেই অপেক্ষায় আছে। পথের মোড়ে পাহাড়ের গা ঘেষে পিকআপ থামিয়ে তাতে বসে আছে বোরিস।
আমি ওটাতে চলে যাই, গেটের আরও কাছে আরেকটা করবীর ঝোঁপ দেখিয়ে বলল রবিন। কে কী বলে, শুনতে পাব।
মাথা কাত করল কিশোর।
ঝোঁপ থেকে বেরিয়ে এদিক-ওদিক চেয়ে এক ছুটে গিয়ে অন্য ঝোঁপটায় ঢুকে পড়ল রবিন।
প্রথম গাড়িটা এল। জেরি গ্যানারিল নেমে রাস্তা পেরিয়ে গেটের কাছে গিয়ে দাঁড়াল, খোপ থেকে রিসিভার নিয়ে কানে ঠেকাল। এই সময় এল নীলচে-লাল করভেট, ড্রাইভিং সিটে হিউগ ভ্যারাড। আবছা ধূসর আলোয় পেছনের সিটে বসা মিস মারভেলের মূর্তিটা অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মাথা ঝুলে পড়েছে বুকের কাছে, বার বার চোখের কাছে হাত নিয়ে। যাচ্ছে, নিশ্চয় রুমাল দিয়ে চোখ মুছছে। ধরে ধরে তাকে নামাল ভ্যারাড। গুঞ্জন উঠল গেটের পাল্লায়, খুলে গেল, ভেতরে ঢুকল তিনজনে।
মিনিট কয়েক পরে ফেকাসে-নীল একটা ক্যাডিলাক এসে থামল। হালকা-পাতলা একজন লোক নামল গাড়ি থেকে, বাদামী চুল। গেটের
কাছে গিয়ে রিসিভার বের করে কানে ঠেকাল।
একটা ব্যাপার খেয়াল করেছে রবিন; যে ঝোপে রয়েছে, সেখান থেকেও কথা স্পষ্ট শোনা যায় না। ঝুঁকি নিল। নিঃশব্দে বেরোল ঝোঁপ থেকে, পা টিপে টিপে এসে থামল লোকটার পেছনে।
লোয়ার সার্কেলে নেমে যাব আমি, বলেই রিসিভার রেখে দিল। লোকটা।
গুড ইভনিং, বলল রবিন।
ঝট করে মুখ ফেরাল লোকটা।
এটা কি আঠারোশো বত্রিশ টরেনটি সার্কেল?
না। এটা টরেনটি ক্যানিয়ন ড্রাইভ। রাস্তা ভুল করেছ।
গুঞ্জন তুলে খুলে গেল পাল্লা। লোকটা ভেতরে ঢুকে যেতেই আবার বন্ধ হয়ে গেল।
প্রথম ঝোঁপটায় ফিরে এল রবিন। লোয়ার সার্কেলে নেমে যাব আমি।
হাঁ করে চেয়ে রইল অন্য তিনজন।

বুঝলে না? হাসল রবিন। এটা ওদের কোড। দারোয়ান বলে: অন্ধকার রাত। তার জবাবে বলতে হবে: লোয়ার সার্কেলে নেমে যাব আমি।
তা হলে আর দেরি কেন? জিনা বলল। চলো নেমে যাই।
গেটের কাছে এসে দাঁড়াল চারজনে। রিসিভার কানে ঠেকাল কিশোর। ভেসে এল একটা খসখসে গলা: অন্ধকার রাত! কণ্ঠস্বর যতখানি সম্ভব ভারি করে তার জবাব দিল কিশোর।
ক্লিক করে কেটে গেল কানেকশন। রিসিভার রেখে দিল কিশোর। মুহূর্ত পরেই গুঞ্জন তুলে খুলতে শুরু করল পাল্লা।
জিনাকে নিয়ে ঢুকে পড়ল তিন গোয়েন্দা। পেছনে বন্ধ হয়ে গেল। পাল্লা। হ্যাঁণ্ডেল টেনেটুনে দেখল রবিন, নড়ল না দরজা।
ওভাবে টানাটানি করে লাভ নেই, খুলবে না, মুসা বলল। গেটের এক পাশে আইভি লতার ঝাড় দেখাল। ওর ভেতরে দেয়ালে একটা খোপ আছে, তাতে সুইচ-টুইচ কিছু একটা আছে। সেদিন রাতে দারোয়ান ব্যাটাকে খুলতে দেখছিলাম।
ভুরু কুঁচকে আইভি-ঝাড়ের দিকে তাকাল রবিন। তাই! তার মানে কোন ধরনের সারকিট ব্রেকার!
আহাহা, হাত দিয়ো না! বাধা দিল কিশোর। অ্যালার্ম কানেকশন থাকতে পারে, বেজে উঠবে! কোথায় আছে জানলাম তো, জরুরি দরকার পড়লে খুলে বেরিয়ে যেতে পারব।
চলো, ব্যাটারা কী করছে দেখি! তাড়া দিল জিনা।
না, এখুনি বাড়ির ভেতরে ঢুকব না, কিশোর বলল। মেহমানরা সবাই আসেনি। আসুক, তারপর।
বাড়ির এক কোণে একটা অন্ধকার জায়গায় লুকিয়ে রইল, ওরা। চোখ গেটের দিকে। খানিক পর পরই খুলতে লাগল গেট, মেহমানরা ঢুকল। পনেরো মিনিটে আরও আটজন লোক এল, লম্বা গাড়িপথ ধরে চলে গেল বাড়ির ভেতরে।
আটজন, প্লাস, জেরি গ্যানারিল, মিস মারভেল আর ভ্যারাড, বলল কিশোর, এগারোজন। বাড়ির ভেতরে আছে আরেকজন, নিশ্চয় বাড়ির মালিক, মোট বারোজন। সেরাতেও বারোজনই ছিল। তার মানে মোট। সদস্য এই-ই!
চুপ করে রইল অন্য তিনজন।
আরও মিনিট দশেক গেল, কেউ এল না। নিশ্চিত হলো কিশোর, বারোজনই। ওঠার সিদ্ধান্ত নিল সে।
হুশিয়ার! সতর্ক করল মুসা। সেই দারোয়ান ব্যাটার হাতে পড়া চলবে না!
নিঃশব্দে, ধীরে ধীরে ঘাসে ঢাকা আঙিনা ধরে এগোল ওরা। লম্বা একটা জানালায় অতি ম্লান আলো দেখা যাচ্ছে, ভারি পর্দা ভেদ করে আলো বেরোতে

পারছে না ভালমত। জানালার কাছ থেকে দূরে রইল, ওরা, ঘুরে চলে এল বাড়ির পেছন দিকে।
দরজা, ফিসফিস করে বলল কিশোর। সামান্য ঝুঁকে অন্ধকারে এগোল সাবধানে, যাতে কোন কিছুতে হোঁচট খেয়ে না পড়ে। দরজার নব ধরে মোচড় দিল, নড়ল না নব; তালা লাগানো।
কিশোরের কাঁধে হাত রাখল জিনা। ওই যে, কানের কাছে বলল, সে। একটা জানালা। খোলা আছে মনে হয়। এত ওপরে, ছিটকিনি লাগানোর কথা ভাববে না ওরা।
ভাঁড়ার বোধহয়, জানালাটার দিকে চেয়ে আছে কিশোর। খুব বেশি ছোট।
আমি ঢুকতে পারব, বলে উঠল জিনা।
না, তুমি পারবে না, রবিন মাথা নাড়ল। আরও সরু শরীর হতে হবে।
ঠিকই বলেছ, কিশোর বলল। তার মানে তোমাকেই যেতে হচ্ছে। আমিও ঢুকতে পারব না। পারবে?
খুব পারব।
সাবধান!
জানালার নিচে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল মুসা। তার কাঁধে উঠে দাঁড়াল রবিন।
খোলা? নিচ থেকে জিজ্ঞেস করল জিনা।
শশশ! আস্তে! কান পেতে শুনছে কিশোর, কাঠে কাঠ ঘষার শব্দ।
গুঙিয়ে উঠল রবিন, হাতে ভর দিয়ে টেনে তুলল শরীরটা, জানালা দিয়ে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল। কেটে গেল দীর্ঘ এক মিনিট। ক্লিক করে মৃদু একটা শব্দ হলো, আস্তে করে খুলে গেল পেছনের দরজা, একটু আগে যেটা খোলার চেষ্টা করেছিল কিশোর।
এসো, চাপা গলায় ডাকল রবিন। ওরা সামনের কোন একটা ঘরে রয়েছে।
আরেকটা ঘরে এসে ঢুকল ওরা, রান্নাঘর। সামনের দিকে ম্লান। আলো দেখা যাচ্ছে। ঘরের অন্য পাশের দরজার কাছে এসে ওপাশে উঁকি দিল কিশোর, একটা হলঘর। বাঁয়ে চওড়া সিঁড়ি, ডানে সিঁড়ির ঠিক উল্টো দিকে একটা দরজা, ওপর দিক ধনুকের মত বাঁকানো। ওই দরজা দিয়েই আসছে আলো।
আবার আগের জায়গায় ফিরে এল কিশোর। জানালায় পর্দা নেই, বাইরে গাছের মাথায় ঘোলাটে জ্যোৎস্না, আবছা আলো এসে পড়েছে। ঘরে। একটা স্টোভের আদল চোখে পড়ছে। কাছেই কোথায় জানি একটা কলের চাবি ঠিকমত লাগানো হয়নি, পানি পড়ার টুপটাপ শব্দ। কানে আসছে। বায়ে দেয়ালের গায়ে মস্ত এক কালো ফোকর, না না, আরেকটা দরজা, পাল্লা খোলা।

রবিনের কাঁধে হাত রাখল কিশোর, মাথা কেঁকাল রবিন। জিনার হাত ধরে তাকে নিয়ে তৃতীয় দরজাটার আরেক পাশে চলে এল কিশোর, তাদেরকে অনুসরণ করল অন্য দুজন।

গাঢ় অন্ধকার। দৃষ্টি পুরোপুরি অচল। অনুমানে ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগোল ওরা। নানারকম জিনিস হাতে ঠেকছে, পায়ে ঠেকছে। নরম একটা কিছু হাতে ঠেকল মুসার, চাপ দিয়ে বুঝল সোফা।

অবশেষে অন্ধকারে চিড় ধরল, আলোর সূক্ষ্ম একটা চুল দেখা গেল, দরজার ফাঁক দিয়ে আসছে। জিনার হাত ছেড়ে দিয়ে দরজার কাছে এসে দাঁড়াল কিশোর, মসৃণ পাল্লায় হাত বোলাল। হাতে নব ঠেকতেই মোচড় দিল আস্তে করে। নিঃশব্দে ঘুরে গেল নব। টেনে পাল্লাটা কয়েক ইঞ্চি ফাঁক করল সে।

চোখে পড়ল খিলানে ঢাকা আলোকিত পথ, তার ওপারে বিরাট এক হলঘর।

বৈঠক শুরু করা যায়, কানে এল ভ্যারাডের পরিচিত খসখসে কণ্ঠ।

দরজা আরও কয়েক ইঞ্চি ফাঁক করল কিশোর। অন্য তিনজনও এসে দাঁড়িয়েছে তার পাশে। সবারই নজর হলঘরে। রূপার মোমদানীতে জ্বলছে লম্বা কালো কালো মোম। ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা গোল টেবিল, কালো কাপড়ে ঢাকা। টেবিল ঘিরে বারোটা চেয়ার, প্রতিটি চেয়ারের পেছনে দাঁড়িয়েছে একজন করে। ভ্যারাডের সামনের চেয়ারটাকে ছোটখাট একটা সিংহাসন বলা চলে, হাতল দুটো কাঠের তৈরি দুটো কালো গোখরো, ফণা উঁচিয়ে রেখেছে। তার পাশে জিনার। খালা। বিষণ্ন, নিষ্প্রাণ চাহনি।

সদস্যরা সব নীরব, নিথর, অথচ ঘরের সর্বত্র যেন নড়াচড়ার আভাস! কিশোরের মনে হলো, মানুষগুলোকে ঘিরে নাচছে অন্ধকারের কালো চাদর, হাসছে বিকট হাসি, নীরবে। চারদিকে শুধু কালো আর কালো। দেয়াল ঢাকা কালো কাপড়ে, দরজা-জানালায় কালো পর্দা। এ যেন কালোর রাজত্ব!

নড়েচড়ে দাঁড়াল ভ্যারাড, এক পা থেকে আরেক পায়ে শরীরের ভর বদল করছে। বৈঠক শুরু করা যায়, সেই একই কথা, একই কণ্ঠ।

খিলানে ঢাকা পথের এক পাশ থেকে সিঁড়ি উঠে গেছে, তাতে পায়ের শব্দ হলো। লম্বা আলখেল্লা পরা একটা কালো মূর্তি নেমে এল, হালকা পায়ে গিয়ে দাঁড়াল টেবিলের ধারে। সাপ-সিংহাসনে বসল সে এদিকে ফিরে।

ইয়াল্লা! বিড়বিড় করল মুসা, ভীষণ চমকে গেছে।

চমকে দেয়ার মতই চেহারা আগন্তুকের। ভ্যারাডের চেহারা আর কী এমন ফেকাসে! এই লোকটাকে দেখে মনে হলো, গায়ে এক বিন্দু রক্ত নেই। কবর থেকে উঠে এসেছে যেন একটা লাশ। সারা গা কালো কাপড়ে ঢাকা, এমনকী মাথার

চুলও কালো টুপি দিয়ে ঢেকে রেখেছে, সার্জনদের টুপির মত আঁটসাট টুপি। মোমের চেহারা যেন, তাতে টকটকে লাল দুটো চোখ।
মোম-সাদা হাত দিয়ে টুপিটা আধ ইঞ্চিমত পেছনে সরাল লোকটা, মাথা একটুখানি নুইয়ে সালাম জানাল।
একে একে যার যার চেয়ারে বসে পড়ল সদস্যরা।
দুবার হাততালি দিল আগন্তুক।
টেবিলের কাছ থেকে নিঃশব্দে যেন উড়ে চলে গেল ভ্যারাড, ফিরে এল হাতে ট্রে নিয়ে। তাতে একটা রূপার বড় কাপ, ট্রেসহ কাপটা বাড়িয়ে দিল সে সিংহাসনে বসা লোকটার দিকে।
বিলিয়াল আমাদের সহায় হোন! বলে কাপ তুলে ঠোঁটে ছোঁয়াল লোকটা।
মোলক শুনছেন সব! জবাবে সুর করে জারিগান গেয়ে উঠল যেন বারোটা কণ্ঠ।
কাপটা মিস মারভেলের হাতে তুলে দিল কালো আলখেল্লা। বিলিয়াল সবার মঙ্গল করুন! গলা কাঁপছে মিস মারভেলের, চেহারা দেখে মনে হচ্ছে কেঁদে ফেলবে। কাপে চুমুক দিয়ে সেটা তুলে দিল পাশের লোকের হাতে।
হাতে হাতে ঘুরতে থাকল কাপ, বিলিয়ালের জয়ধ্বনিতে ভরে উঠল। ঘর। বার বার সুর করে জারিগান গেয়ে, মোলক যে সব শুনছেন সেটা ঘোষণা করল সদস্যরা। কাপটা আবার ফিরে এল কালো আলখেল্লার হাতে, সে রেখে দিল ভ্যারাডের ট্রেতে।
এ কয়লা রাখার চার পা-ওয়ালা ছোট একটা তাওয়া নিয়ে এল ভ্যারাড, টেবিলে রাখল কালো টুপির সামনে। তাওয়ায় জ্বলন্ত কয়লা। উঠে দাঁড়িয়ে কয়লার ওপরে হাত ছড়াল লোকটা, চেঁচিয়ে বলল, অ্যাসমোডিউস, অ্যাবাড়ন, ইবলিশ, দয়া করে আমাদের দিকে তাকান!
রূপার একটা ডিশ এনে দিল ভ্যারাড। ওটা থেকে কী যেন খানিকটা নিয়ে জ্বলন্ত কয়লায় ছিটাল কালো পোশাক পরা লোকটা, প্রায় লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল ঘন ধোয়া, বাতাসে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ল মিষ্টি একটা গন্ধ।
বিলিয়াল, শুনছেন! মিনতিভরা কণ্ঠ লোকটার, মহাসর্পের শক্তিকে পাঠান আমাদেরকে পাহারা দিতে! দেখা দিন দয়া করে! শোনান আপনার মিষ্টি গলা!
চুপ হয়ে গেল লোকটা। চুপ হয়ে গেল অন্যরাও। স্থির হয়ে অপেক্ষা করছে।
আস্তে আস্তে কানে এল শব্দটা, সেই বিচ্ছিরি গানের শুরু।
এক ঝটকায় ঘুরে দাঁড়াল জিনা, পালাবে, খপ করে তার হাত ধরে ফেলল কিশোর। ফেরাল।
বাড়ছে শব্দ। বাড়ছে, আরও বাড়ছে, মাংস চিরে ঢুকে যাচ্ছে যেন শব্দের ফলা, হাড় ভেদ করে মজ্জায় ঢুকতে চাইছে!

আবার রূপার ডিশ থেকে খানিকটা জিনিস তুলে নিয়ে কয়লায় ছিটাল লোকটা। ভক্ করে লাফিয়ে উঠল আবার ঘন ধোঁয়ার স্তম্ভ। স্তম্ভের মাথায় কী যেন নড়ছে!!
অস্ফুট একটা শব্দ বেরোল রবিনের গলা থেকে, তার টুটি টিপে ধরেছে যেন কেউ।
বিলিয়াল দয়া করেছেন আমাদের! কালো টুপির গলায় আনন্দ। অমর মহাসর্প দেখা দিয়েছেন!
মানুষগুলো যেন সব পাথর হয়ে গেছে, দৃষ্টি ধোয়ার স্তম্ভের মাথায় স্থির। মস্ত এক গোখরো সাপ দেখা যাচ্ছে, নীলচে-সবুজ রঙ, ছড়ানো ফণা, টকটকে লাল চোখ জ্বলছে!
বেড়েই চলেছে শব্দ। কানের পর্দা ফুড়ে মগজে ঢুকে যাবে যেন। আর সইতে না পেরে কানে আঙুল দিল কিশোর। হঠাৎ করেই কমতে শুরু করল তীক্ষ্ণ আওয়াজ, পাতলা হয়ে এসেছে ধোঁয়ার স্তম্ভ, মিলিয়ে যাচ্ছে সাপটা। থেমে গেল গান। মহাসর্প-ও গায়েব।
এ ধপ করে সিংহাসনে বসে পড়ল কালো পোশাক পরা লোকটা। মঙ্গল হোক আমাদের। আসুন, হাত মেলাই।
হাত বাড়িয়ে দিল মিস মারভেল, বোধহয় লোকটার হাতেই রাখতে চাইল, কিন্তু ভুলে পড়ল টেবিলে। হাতটা তুলে নিল লোকটা।
মুসার গায়ে কনুইয়ের খোঁচা লাগাল কিশোর। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ, পরক্ষণেই নেমে এল একটা মূর্তি, ছেলেদের দৃষ্টিপথে বাধা হয়ে দাঁড়াল। পেশীবহুল লোকটাকে দেখেই চিনল মুসা, সেদিন দেয়াল থেকে সে পড়ে যাওয়ার পর ওই লোকটাই এসে ধরেছিল তাকে। গার্ড। চুপ করে দাঁড়িয়ে হলের দৃশ্য দেখল, এক মুহূর্ত দ্বিধা করে পায়ে পায়ে এগোল টেবিলের দিকে। সিংহাসনে বসা লোকটার কানে কানে কী বলল।
অসম্ভব! বলে উঠল লোকটা। আরা সবাই হাজির এখানে?
তেরোজন হওয়ার কথা, গার্ড বলল। মিস গ্যানারিল, মিস মারভেল আর মিস্টার ভ্যারাড় একসঙ্গে ঢুকেছেন। এগারোবার গেট খুলেছি আমি, তার মানে অন্তত আরও একজন এখানে থাকার কথা।
উঠে দাঁড়াল কালো টুপি। তার মানে ফাঁকি দিয়ে ঢুকেছে কেউ! বৈঠক বাতিল! সময় করে আবার ডাকব আপনাদের, এখন যার যার বাড়ি যান।
আস্তে দরজা বন্ধ করে দিল কিশোর।
ব্যাটারা টের পেয়ে গেছে! ফিসফিসিয়ে বলল মুসা।
হলরুমে চেয়ার টানাহেঁচড়ার শব্দ, কথা বলছে সবাই।
ব্যাটা সাংঘাতিক হুশিয়ার! কিশোর বলল। ঠিক সন্দেহ করে বসেছে!

চলো, পালাই! তাড়া দিল রবিন। খোঁজা শুরু করবে এখুনি?
তোমরা যাও, কিশোর বলল।
এটা মজা করার সময়?
মজা করছি না, গলা আরও খাদে নামাল কিশোর। যেদিক দিয়ে ঢুকেছ, ওদিক দিয়ে বেরোবে। বেরোনোর সময় ইচ্ছে করেই শব্দ করবে। তারপর দেয়ালে চড়ে বসে দেবে অ্যালার্ম বাজিয়ে। ওদের বোঝাবে, ফাঁকি দিয়ে যে ঢুকেছিল, সে পালিয়েছে। ট্রাক নিয়ে চলে যাবে। সানসেট অ্যাণ্ড টরেনটিতে তোমাদের সঙ্গে দেখা করব। ঠিক আছে?
কিশোরকে সাবধানে থাকতে অনুরোধ করে অন্য দুজনের সঙ্গে চলে গেল রবিন।
রান্নাঘরের দরজা দড়াম করে বন্ধ হলো, বাইরে গার্ডরা হৈ-চৈ করে উঠল। জিনার চিৎকার শোনা গেল হঠাৎ, তারপরই বেজে উঠল ঘণ্টা।
চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে কিশোর। ধীরে ধীরে থেমে এল গোলমাল, হৈ-চৈ। বাইরে নীরবতা, ঘরও নীরব। আস্তে করে আবার দরজাটা খুলে হল-এ উঁকি দিল সে। নির্জন। এক ছুটে খিলানে ঢাকা পথ পেরিয়ে হল-এ ঢুকল এসে, দেয়াল-ঢাকা একটা কালো কাপড়ের তলায় লুকিয়ে
পড়ল। বাইরে পায়ের আওয়াজ, ঘরে ঢুকল, দরজা বন্ধ হলো জোরে।
কটা ছেলে, বলল একটা কণ্ঠ, কৌতূহলী হয়ে উঠেছে।
ওদের কৌতূহল মিটিয়ে দেয়া উচিত ছিল তোমার, রড, কালো আলখেল্লা পরা লোকটার গলা। যাতে কোন সন্দেহ না থাকে ওদের মনে। সব কটা বেরিয়ে গেছে তো?
হ্যাঁ।
কাপড়ের আড়ালে থেকে হাসি পেল কিশোরের। গেছে, তবে সবাই নয়, মিয়া, শয়তানের চেলা-মনে মনে বলল সে, একজন রয়ে গেছে। সে এখন খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে, কী নিয়ে কী কারণে শয়তানী শুরু করেছ তোমরা!
ছোট্ট একটা ফুটো দেখতে পেল কিশোর কালো কাপড়ে, ওটাতে আঙুল ঢুকিয়ে অতি সাবধানে ছিঁড়ে বড় করতে শুরু করল। ফুটোটা বড় হতেই তাতে চোখ রেখে দেখল, দরজার কাছে একটা সুইচে আঙুল রাখছে। গার্ড। রড়। ক্লিক করে একটা শব্দ হলো, মাথার ওপরে জ্বলে উঠল উজ্জ্বল আলো।
শঙ্কিত হলো কিশোর। মোমের আলোয় কাটেনি ঘরের অন্ধকার, যেখানে যেখানে আলো পড়েছিল, সেখানেও ছিল ছায়ার নাচন, ফলে তার লুকিয়ে থাকা চোখে পড়েনি কারও। কিন্তু এখন? উজ্জ্বল আলোয় চোখে। পড়ে যাবে না ওদের? গোল টেবিলে ধুলো দেখতে পাচ্ছে এখন সে পরিষ্কার দেয়াল ঢাকা দেয়ার কাপড়

পুরানো, মলিন, একেবারেই বাজে, কমদামী জিনিস। রূপার মোমদানীগুলো আরও পুরানো, ঘষেমেজে চকচকে করা হয়েছে।
ঘর আর আসবাবপত্রের চেয়ে শোচনীয় লোক দুটোর অবস্থা। ধূসর চুলওয়ালা গার্ড ফুঁ দিয়ে দিয়ে নেভাচ্ছে মোমগুলো। মুখের চামড়ায় গভীর ভজ, চোখের কোণ থেকে শুরু করে ঠোঁটের কোণে এসে শেষ হয়েছে। মেদ জমেছে শরীরে, চলাফেরা ভারি, থুতনির নিচটা ঝুলে পড়েছে।
সিংহাসনে বসে আস্তে আস্তে সাপের মাথায় টোকা দিচ্ছে কালো আলখেল্লাধারী, চিন্তিত। চেয়ার পেছনে ঠেলে পা তুলে দিল টেবিলে। উজ্জ্বল আলোয় তার চেহারা আর তেমন রক্তশূন্য লাগছে না। আলগা রঙ, বুঝল কিশোর। সাদাটে-সবুজ কোন পাউডার মেখেছে মুখের ভাজ আর নাকের দুপাশে।
টেলিফোন সিসটেম একেবারে ফেল মারল!হঠাৎ বলল লোকটা।
শেষ মোমটা নিভিয়ে, গিয়ে একটা চেয়ারে বসল রড। দেখো, আমি গিয়ে গেটের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে পারতাম, কে আসছে কে যাচ্ছে, ভাল মত খেয়াল রাখতে পারতাম। কিন্তু তাতেও কিছু হত না। বাচ্চাদেরকে ঠেকানো শয়তানের অসাধ্য, আর আমি তো মানুষ। কোন না কোনভাবে ঢুকে পড়তই ওরা। মনে হচ্ছে, তল্পি গোটানোর সময় এসে গেছে। চলো, কেটে পড়ি। স্যান ফ্রানসিসকো কিংবা স্যান ডিয়েগো কিংবা শিকাগোতে গিয়ে আবার নতুন খেল শুরু করা যাবে। অবস্থা আরও খারাপ হওয়ার আগেই চলো কাটি। এখানে তোমার ডক্টর। জিহাভোগিরি আর বেশিদিন চলবে না।
কিন্তু, রড, এখনও অনেক আসা বাকি, এক টানে মাথার কালো টুপিটা খুলে ছুঁড়ে ফেলল ডক্টর জিহাভো। মাথায় আগুন-লাল চুল। পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখে ঘষতে শুরু করল লোকটা। মুখের সবজে পাউডার ঝরে যেতেই বেরিয়ে পড়ল লাল চামড়া।
কষ্টে হাসি চাপল কিশোর।
এখানে না ফেললে চলত না? বিরক্ত মুখে বলল রড। ঝাড়বে কে ওগুলো?
ভাবছি, রুমালটা মুঠোয় দলা পাকাচ্ছে জিহাভো, আরও কিছু দিন দেখা দরকার। পুরো সেটআপটা ঠিক করতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। গরুগুলোকে খুঁজে বের করতে কম কষ্ট করেছি? ওই নাপতিনীটা, গ্যানারিল, ওর কাছ থেকে বেশ কিছু পাওয়া গেছে, তাকে এখন বাদ দিলেও চলে। আর ওই কন্ট্রাকটার ব্যাটার কাছ থেকেও প্রচুর পাওয়া গেছে। মিস মারভেল এখনও কিছু দেয়নি, তবে দেবে শিগগিরই। এত ভাল ব্যবসা কয়েকটা বাচ্চার ভয়ে হঠাৎ ছেড়ে দিয়ে পালাব?
ভাল ব্যবসাটা কতদিন ভাল থাকবে, ভাবছি!

ঠিকমত চালানো গেলে থাকবে আরও আনেক দিন, হাসল জিহাভো। শুধু জানতে হবে কীভাবে কী করা দরকার। ওই রলির কথাই ধরো। চমৎকার দেখিয়েছে। অচল করে দিল অ্যানি পলকে, কেউ কিছু সন্দেহ করতে পারল না। মিস মারভেলের ভাবগতিক দেখেছ আজকে?
ভয় পেয়েছে।
মূর্ছা যেতে বাকি রেখেছে। দাবি পূরণ না করলে সেটাও যাওয়াব। তবে, রাসলারকে ভয় পাওয়ানো কঠিনই হবে। ওর ব্যাপারে কিছু একটা করতেই হচ্ছে।
নাক দিয়ে ছোঁক ছোঁক শব্দ করল রড। ও-ব্যাটার কাজটা করে দিলেই তো হয়ে যায়। রাস্তার ওপারের রেস্তোরাঁর মালিককে কোনভাবে ভয় দেখিয়ে ভাগিয়ে দিলে সব কাস্টোমার আসবে রাসলারের ওখানে।
ভুল করছ। শুধু টাকাই চায় না রাসলার, ক্ষমতাও চায়। সেটা কী করে দেব তাকে?
আমি কী জানি! হাত ওল্টাল রড।
তোমাকে জানতে বলছিও না, বার বার হাতের আঙুলের মাথা এক করছে, আর সরিয়ে আনছে জিহাভো। কিছু একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। দরকার পড়লে...
হাই তুলল। যাক গে, যখনকারটা তখন ভাবা যাবে। ঘুম পেয়েছে। উঠে দরজার দিকে রওনা দিল সে।
টুপি ফেলে যাচ্ছ, মনে করিয়ে দিল রড।
থাক গে, সকালে তুলে নেব, বেরিয়ে গেল জিহাভো। সিঁড়িতে মিলিয়ে গেল পায়ের শব্দ।
বিড়বিড় করে গাল দিল রড, কাকে বোঝা গেল না। চেয়ার ঠেলে উঠে দ্রজার দিকে রওনা দিল। সুইচ টিপে আলো নেভাল।
সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ শুনল কিশোর, বোধহয় জিহাভোকে অনুসরণ করেছে রড। দড়াম করে দরজা বন্ধ হলো! পানির পাইপ থেকে পানি পড়তে শুরু করল বাড়ির পেছনে কোথাও
কাপড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে অনুমানে পা টিপে টিপে দরজার দিকে এগোল কিশোর; যে পথে ঢুকেছিল, সে-পথ ধরে আবার ফিরে এল প্রথম হলঘরটায়। রান্নাঘরের দরজা খোলাই রয়েছে। নিঃশব্দে বেরিয়ে গেটের দিকে চলল সে। ফিরে তাকাল একবার, ওপরতলায় কয়েকটা জানালায় আলো। একটা পর্দায় মানুষের ছায়া পড়েছে। হাসল কিশোর। ডক্টর জিহাভো মুখ ওপর দিকে তুলে ধরেছে, কুলকুচা করছে বোধহয়। ইস, এই মুহূর্তে যদি ওর একটা ছবি তোলা যেত!

গেটের কাছে এসে দাঁড়াল কিশোর। চাঁদের আলো বিচিত্র আলো আঁধারি সৃষ্টি করেছে আইভি লতার ঝাড়ে, এরই কোন একটা ফাঁকে রয়েছে খোপ, তাতে সুইচ। অনুমানে একটা ফাঁকে হাত ঢুকিয়ে দিল সে, পয়লা বারেই হাত লাগাল সুইচে। সুইচ মানে প্রাস্টিকের একটা লিভার। চাপ দিতে গিয়েও থেমে গেল। ঘণ্টা বেজে উঠবে না তো? কিন্তু উঠলেও কিছু করার নেই। কাঁপা হাতে চাপ দিল। ঘণ্টা বাজল না, আলো জ্বলল না। গুঞ্জন তুলে খুলতে শুরু করল পাল্লা। ঠিক এই সময় দপ করে জ্বলে উঠল ফ্লাডলাইট।
এই! এই, ছেলে! দাঁড়াও! চিৎকার শোনা গেল দোতলা থেকে।
ফিরেও তাকাল না, কিশোর, গলা শুনেই বুঝতে পেরেছে, রড। গেটের দিকে লাফ দিল সে।
দাঁড়াও! আবার ধমকে উঠল রড।
দাঁড়াল না কিশোর, এক লাফে গেট পেরিয়ে এল। গায়ের ওপর এসে পড়ল ভারি একটা শরীর, তাকে নিয়ে গড়িয়ে পড়ল রাস্তায়। ভ্রামম। করে বিকট শব্দ হলো, মাথার ওপর দিয়ে শা করে উড়ে গেল কিছু।
ওঠার চেষ্টা করল কিশোর।
কানের কাছে ধমক দিল কেউ, চুপ! নোড়ো না!
আবার গর্জে উঠল শটগান, শাঁ শাঁ করে উঠে গেল ছররা, প্রায় কান ঘেঁষে।
কিশোরকে চেপে ধরে রেখেছে লোকটা। দ্বিতীয় গুলি হওয়ার পরই ছেড়ে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, দৌড় দাও!
লাফিয়ে উঠে মাথা নিচু করে করবীর ঝোঁপের দিকে ছুটল লোকটা। কিশোরও দৌড় দিল তার পেছনে। ঝোঁপ পেরিয়ে ঘুরে এসে রাস্তায় পড়ল দুজনে।
থেমো না! কিশোরকে হুশিয়ার করেই মোড় নিয়ে আরেক দিকে ছুটল লোকটা।
থামল না কিশোয়। পা কাঁপছে, বুকের ভিতর যে হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে।
সানসেট অ্যাণ্ড টরেনটি রোডের মোড়ে অপেক্ষা করছে পিকআপ। কিশোরকে দেখেই জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে দিল বোরিস। হোকে (ওকে)?
কোন মতে মাথা ঝোকাল কিশোর। পিকআপের পিছনে তাকে টেনে তুলল মুসা আর রবিন। গাড়ি ছেড়ে দিল বোরিস।
কী হয়েছে? জিনা জিজ্ঞেস করল।
চুপ করে বসে জিরিয়ে নিল কিশোর। গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল গোঁফওয়ালা।
ফোর্ড?
হ্যাঁ। ওকে ধন্যবাদ জানানোরও সময় পাইনি।
কেন?

ফোর্ড না থাকলে ঝাঁজরা হয়ে পড়ে থাকতাম এখন। মাথা ঠিক রাখতে পারেনি রড। ব্যাটার একটা ডবল ব্যারেল শটগান আছে, গুলি করে বসেছিল।
ডাইনীবিদ্যা, ঘোষণা করল রবিন।
হেডকোয়ার্টারে আলোচনায় বসেছে তিন গোয়েন্দা। লাইব্রেরি থেকে কয়েকটা মোটা বই নিয়ে এসেছে রবিন। তার একটা: উইচক্র্যাফট, ফোক মেডিসিন অ্যাণ্ড ম্যাজিক। বইটাতে টোকা দিল সে। হয়তো এটা থেকেই তথ্য জোগাড় করেছে ওরা, অন্য কোন বইও হতে পারে অবশ্য। সেটা কথা না; কথা হলো, ওরা ডাইনীবিদ্যা নিয়ে চর্চা করছে। একেক দেশে এর একেক নাম। ইংরেজরা বলে ব্ল্যাক ম্যাজিক, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের লোকেরা বলে ভুডু, ইণ্ডিয়ানরা বলে প্রেতসাধনা কিংবা কালিসাধনা। যে যা-ই বলুক, সোজা কথা, শয়তানের পুজো করে ওরা, কালো পথে ক্ষমতার অধিকারী হতে চায়। আমাদের টরেনটি ক্যানিয়নের জনাবরাও এই কাজই করছে, কিন্তু বিশেষ সুবিধে করতে পারছে বলে মনে হয় না।
বলির পাঁঠারা বিশ্বাস করছে না বলে? কিশোর বলল।
হ্যাঁ, বিশ্বাস করছে না বলে, সায় দিল রবিন।
তোমাদের কথা কিছু বুঝছি না আমি, অনুযোগ করল মুসা। দয়া করে খুলে বলবে?
খুব সহজ, উইচক্র্যাফটের ওপর লেখা বইটা তুলে দেখাল রবিন। এতে সব লেখা আছে। রুকসটন বিশ্ববিদ্যালয়ের নরবিজ্ঞানের প্রফেসর ডক্টর জন এ, স্মিথের লেখা। ব্ল্যাক ম্যাজিক নিয়ে গবেষণা করার জন্যে অনেক দেশে ঘুরেছেন তিনি; আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, মেকসিকো, অস্ট্রেলিয়া, কোথাও বাদ রাখেননি। ওঝাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছেন। তিনি দেখেছেন, যারা ভুডুর চর্চা করে, তারা কাউকে মারতে চাইলে ওই লোকের নাম করে একটা পুতুলের গায়ে পিন বিধিয়ে দেয়। তারা বলে, পুতুলের যেখানে পিন বেঁধানো হলো, মানুষটাও ঠিক ওখানেই ব্যথা পাবে। পুতুলের বুকে পিন বেঁধাল, মানুষটারও বুকে বিধবে, ফলে মারা যাবে সে। মেকসিকোতে প্রেতপূজারিরা গিয়ে ঢোকে কোন অন্ধকার গুহায়, মোম জ্বেলে মন্ত্র পড়ে। তারপর একটা বিশেষ সুতো কেটে দুটুকরো করে ফেলে। তার মানে, কোন একজন মানুষের আয়ু কমিয়ে দিল। লোকটা যখন জানতে পারে, তার নাম করে সুতো কেটেছে ওঝা, সে অসুস্থ হয়ে পড়ে, তারপর মরে যায়।
বুঝলাম না, মুসা বলল।
মানে, মানুষটা ওঝার কথায় বিশ্বাস করে, বুঝিয়ে দিল কিশোর, ভয় পেয়ে যায়। ফলে অসুস্থ হয়ে মারা পড়ে সে।
শুধু বিশ্বাসে এত মারাত্মক কাণ্ড ঘটে? ফেকাসে হয়ে গেছে মুসার চেহারা।

আন্তরিকভাবে যদি কোন কথা বিশ্বাস করো, সেটা ঘটতে বাধ্য, আবার বইটাতে টোকা দিল রবিন। প্রফেসর ব্যারিস্টার তাই বলেছেন। তিনি দেখেছেন, ওঝা ঘোষণা করার পরেই অসুস্থ হয়ে পড়েছে মানুষটা, মারা গেছে কয়েক দিন পর। প্রফেসরের ধারণা: মন্ত্র-ফন্ত্র সব বাজে কথা! তীব্র আতঙ্কই কাহিল করে করে মেরে ফেলেছে লোকটাকে।
হুমম! বুঝলাম! মাথা দোলাল মুসা। ভ্যারাড আর জিহাভোও একই কাণ্ড করছে! ব্যাটারা পুতুল কিংবা সুতো বাদ দিয়ে সাপ ব্যবহার করছে। যার ক্ষতি করতে চায়, তার কাছে জাদুর সাপ পাঠাচ্ছে!
হ্যাঁ, কিশোর বলল। কিন্তু জাদুর জ-ও জানে না ব্যাটারা। তা ছাড়া যাদের কাছে পাঠাচ্ছে, তারাও বিশ্বাস করছে না, ভয়ও পাচ্ছে না। মিস অ্যানি পল বিশ্বাস করেনি। তার কাছে ওটা স্রেফ একটা সস্তা অদ্ভুত ব্রেসলেট। জিনার খালাই শুধু বিশ্বাস করে কেঁদেকেটে মরছে, তার ধারণা, সাপই বুঝি অ্যাকসিডেন্টটা ঘটাল। ফলে নিজেকে দোষ দিচ্ছে। খুব স্বাভাবিক। তার মত মহিলা এই-ই তো করবে।
কিন্তু আমরা জানি, সাপের জন্যে হয়নি অ্যাকসিডেন্ট। জিহাভো কাউকে দিয়ে চাকার নাট ঢিল করিয়ে রেখেছে, ফলে খুলে এসেছে। চাকাটা। অ্যাকসিডেন্ট করেছে মিস পুল।
এখন রাসলারের সুবিধের জন্যে অন্য কারও ক্ষতি করার প্ল্যান করছে জিহাভো! রবিনের কণ্ঠে অস্বস্তি।
কপাল ডলল কিশোর। ওই রকমই কিছু করবে মনে হলো ওদের কথা শুনে।
পাগলামি! স্রেফ পাগলামি! বলে উঠল মুসা।
আমাদের কাছে, কিশোর বলল। কিন্তু মিস মারভেল? সে তো বিশ্বাস করে বসে আছে, মহাসর্প তাকে র‍্যামন ক্যাসটিলোর ক্রিস্টাল বল পাইয়ে দেবে। মিস গ্যানারিলের বাড়িওলীর সঙ্গে গোলমাল চলছিল, সেটাও নাকি মিটমাট করে দিয়েছে মহাসর্প।
রাসলার চাইছে ক্ষমতা। যে যা চাইছে, টাকার বিনিময়ে তাকে তা দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে জিহাভো। কিছু কেরামতি দেখিয়েছে সে।
কিন্তু ফোর্ডের ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না! সে কী চায়!
ওরও হয়তো টাকা চাই, রবিন অনুমান করল। তবে ব্ল্যাকমেইলার হোক, আর যা-ই হোক ওর কাছে তোমার কৃতজ্ঞ থাকতেই হবে। তোমাকে বাঁচিয়েছে।
তা রয়েছি। কিন্তু লোকটা কি সত্যি সত্যিই টাকা চায়?
বড় একটা রহস্য! গলা চুলকাল রবিন। তবে তথাকথিত শয়তান। উপাসকদের উদ্দেশ্য জানা গেছে। ওরা একদল ঠকবাজ, বোকাদেরকে ঠকিয়ে দুপয়সা কামিয়ে নিচ্ছে। তো, এখন কী করব আমরা?

পুলিশকে জানাব, পরামর্শ দিল মুসা।
বিশ্বাস করবে পুলিশ? কিশোর বলল।
কেন করবে না? মিস পলের অ্যাকসিডেন্ট তো মিথ্যে নয়।
অ্যাকসিডেন্ট? গাড়ির চাকা খুলে গেছে, অমন তো খুলতেই পারে। টরেনটি ক্যানিয়নে পুলিশকে নিয়ে যেতে পারি হয়তো। কিন্তু গিয়ে কী পাবে? দুজন মানুষ, আর কিছু কালো, মোমবাতি! না, এখনও পুলিশকে বলার সময় আসেনি। প্রমাণ দরকার।
ভ্যারাড প্রমাণ নয়? রবিন বলল। মিস মারভেলকে কিছু একটার জন্যে চাপাচাপি করছে না সে?
ভ্যারাড কি স্বীকার করবে সে-কথা? না মিস মারভেল তার বিপক্ষে বলবে? ঠোঁটে তালা এঁটে থাকবে সে।
কিন্তু ব্যাটারা কী চাইছে তার কাছে? মুসার প্রশ্ন।
টাকা নয়, অন্য কিছু। বোধহয় নেকলেসটার ওপর চোখ পড়েছে ব্যাটাদের।
কিন্তু ওটা পাচ্ছে না ওরা। ফন হেনরিখের ভল্টে… কথা শেষ
করতে পারল না রবিন, বাইরে থেকে ডাক শোনা গেল।
কিশোর! কিশোর পাশা! ট্রেলারের ছাতের ভেন্টিলেটার দিয়ে ভেসে এল তীক্ষ্ণ কণ্ঠ।
জিনা! লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর।
এক টানে দুই সুড়ঙ্গের ঢাকনা তুলে ফেলল মুসা। নিশ্চয় কোন বিপদ!
পাইপের ভেতর দিয়ে যত তাড়াতাড়ি পারল, ওয়ার্কশপে বেরিয়ে এল ছেলেরা। ছুটল।
ছোট অফিসটার কাছে দাঁড়িয়ে আছে জিনা। কাঁদো কাঁদো ভাব। এক গালে লাল একটা দাগ। বলল, ডক্টর জিহাভো! আমাদের বাড়িতে!
শিস দিয়ে উঠল মুসা। ও-ই মেরেছে?
কী! মুসার দিকে ফিরল জিনা।
গালে লাল দাগ। চড় মেরেছে বুঝি?
পেছনে চুল সরাল জিনা। না, খালা।
দূর, কী বলছ! তোমার খালা মেরেছেন?
মারতে চায়নি! খুব ভয় পেয়ে গেছে, তাই। জানালা দিয়ে দেখল, কালো একটা গাড়ি ঢুকছে। গাড়ি-বারান্দায় থামল গাড়িটা, কালো আলখেল্লা আর টুপি পরা জিহাভো নামল। গার্ড ছুঁচোটা শোফার সেজেছে। আমাকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বলল খালা। মানা করে দিলাম। রেগে গিয়ে চড় মারল আমাকে খালা,

ঠেলে পেছনের দরজা দিয়ে বের করে দরজা লাগিয়ে দিল। এই সময় সামনের দরজায় বেল বাজল, বিষণ্ন হাসি হাসল জিনা।
এখন তো পুলিশের কাছে যাওয়া যায়? কিশোরের দিকে ফিরল মুসা।
না, যায় না, জবাবটা দিল জিনা। সময় নেই। বুঝতে পারছ না, তিনটে শয়তানের সঙ্গে বাড়িতে একা খালা। ওরা যা খুশি করতে পারে।
চলো, তোমাদের বাড়িতেই যাই! ব্যস্ত হয়ে বলল কিশোর। জলদি!
চারজন দৌড় দিল একই সঙ্গে। কিন্তু তবুও দেরি হয়ে গেল। দেখল, গেট দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে কালো গাড়িটা। গাড়ি চালাচ্ছে রড, তার পাশে ভ্যারাড। জিহাভো পিছনের সিটে।
সদর দরজার তালা খোলা। এত জোরে ধাক্কা মারল জিনা, ভ্রামম করে দেয়ালের সঙ্গে বাড়ি খেল পাল্লা। খালা! খালাআ! চেঁচিয়ে ডাকল সে।
সোনালি-সবুজ বসার ঘরে গুম হয়ে বসে আছে মিস, মারভেল। দেখেই বলে উঠল, জিনা, জিনা, কিছু মনে করিস না, মা! আমার মাথার ঠিক ছিল না!
ছুটে গেল জিনা। তোমার কিছু হয়নি তো, খালা!
না, আমি ঠিক আছি, থিরথির করে গলা কাঁপছে মিস মারভেলের। চিবুকে চোখের পানি শুকিয়ে দাগ লেগে আছে। মিস্টার ভ্যারাড, আর. আর…
ডক্টর জিহাভো? বলল কিশোর।
অন্ধের মত দুহাত বাড়িয়ে এগোল মিস মারভেল, একটা চেয়ার হাতে ঠেকতেই তাতে বসে পড়ল।
নেকলেসটা চায় ওরা? আবার প্রশ্ন করল কিশোর। নকলটা দিয়ে দিয়েছেন তো?
স্থির দৃষ্টিতে এক মুহূর্ত কিশোরের দিকে চেয়ে রইল মিস মারভেল, একে একে নজর দিল অন্য তিনজনের দিকে। তোমরা জানো?
জানি, কিশোর জবাব দিল। আপনাকে শাসিয়েছে ওরা, খালা?
আবার কেঁদে ফেলল মিস মারভেল। আরিব্বাপ রে! কী সাংঘাতিক! সাংঘাতিক! বলল, বিনিময়ে কিছু দিতেই হবে! গাউনের পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখ মুছল। নাকের পানি মুছল। কিন্তু ফাঁকি দিতে পেরেছি ওদের। বুদ্ধিটা ঠিকই হয়েছে, না? নকলটা নিয়ে চলে গেছে ওরা, আসলটা নিরাপদ।
ফন হেনরিখের কাছে? জানতে চাইল কিশোর।
না, তা হবে কেন? ও দুটোই দিয়ে গেছে। আসলটা এনেছিল সাধারণ কাগজে পোটলা করে। চট করে গাউনের পকেটে রেখে দিয়েছিলাম ওটা, তারপর সুযোগ বুঝে লুকিয়ে ফেলেছি।
জোরে নিঃশ্বাস ফেলল জিনা। তার মানে এই বাড়িতেই!

নিশ্চয়! আর কোথায় রাখব? তবে নিরাপদেই আছে। আমি বের করে না দিলে কেউ খুঁজে পাবে না। আর কাউকে বলিওনি।
খালার পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসল জিনা। খুব ভাল করেছ, খালা। আমাদেরকেও বলার দরকার নেই। পুলিশকে জানব? খুব নরম গলায় বলল সে।
এখন প্রমাণ রয়েছে আমাদের হাতে, কিশোর বলল। পুলিশকে বলতে পারবেন, নেকলেসের জন্যে ওরা আপনাকে চাপ দিয়েছে, না দিলে ক্ষতি করবে বলে হুমকি দিয়েছে।
না!
খালা, ওরা ভয়ানক লোক। লস অ্যাঞ্জেলেসেই ওদের শয়তানী শেষ নয়, অন্য জায়গায় গিয়েও করবে। তার আগেই পুলিশকে বলা দরকার। নইলে আরও অনেকের সর্বনাশ করবে।
কিন্তু কী করে বলি! আমার দোষে এক বেচারী পা ভেঙে শুয়ে আছে! না না, আমি বলতে পারব না! তোমরা জানো না, বললে কী হবে!
বেশ, অন্যভাবে ভেবে দেখুন, কিশোর বলল। নেকলেসটা নকল। বুঝতে কতদিন লাগবে জিহাভোর? তারপর কী ঘটবে? কী করবে সে আপনাকে?
চুপ করে রইল মিস মারভেল।
ভাবুন, খালা। নকল নেকলেস গছিয়ে ফাঁকি দিয়েছেন, বুঝতে বেশি সময় লাগবে না ওদের! তখন কী করবে?
ঘোরের মধ্যে রয়েছে যেন মিস মারভেল। তাকে এখন আর কোন কথা বলে লাভ হবে না, বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা।
মাথামোটা মেয়েমানুষ! রাগে জ্বলছে মুসা।
আহ, ভদ্রভাবে কথা বলো, মুসা, বিরক্তি ঝরল, রবিনের গলায়। কেউ নিজের ভাল না বুঝলে, তাকে বোঝাতে যাবে কে?
এক কাজ করতে পারি আমরা, কিশোর বলল। জিহাভোর প্ল্যান আমরা জানি, ও রাসলারের শত্রুকে ধ্বংস করতে যাচ্ছে। খাবারের দোকানটা খুঁজে বের করে ওটার মালিককে সাবধান করে দিতে পারি।
বিশ্বাস করবে? রবিন প্রশ্ন রাখল।
হয়তো করবে না। কিন্তু একটা কার্ড দিয়ে বলতে পারি, দরকার মনে করলে যেন আমাদের ফোন করে। সাপটা এলেই কৌতূহল জাগবে তার। আমার ধারণা, তখন আমাদের ডাকবে সে।
ইয়ার্ডে পৌঁছে সোজা অফিসে ঢুকল তিন গোয়েন্দা। টেলিফোন ডিরেকটরি ঘেঁটে রাসলারের দোকানের নাম-ঠিকানা বের করল কিশোর। বলল, রাসলারস ফুড। বেভারলি অ্যাও থার্ড স্ট্রিট।

যাব কী করে? ভুরু নাচাল রবিন। বোরিসকে বলবে?
নাহ, বার বার ওকে বলা বোধহয় উচিত হবে না। তার চেয়ে। বাসেই যাওয়া ভাল। রাসলারের শত্রুর দোকানটা সহজেই খুঁজে পাওয়া যাবে। ওই রাস্তায় শুধু দুটো খাবারের দোকান। কিন্তু তিনজনেরই যাওয়ার দরকার আছে কি? যদি জিনাদের বাড়িতে জিহাভো আসে আবার? আমি বরং এখানেই থাকি, কী বলো?
ইচ্ছে করলে তুমিও থাকতে পারো, মুসা তাকাল রবিনের দিকে। কাজটা এমন কিছু না, আমি একাই গিয়ে সেরে আসতে পারব।
সান্তা মনিকার বাস ধরল মুসা। সেখান থেকে গাড়ি বদল করে লস অ্যাঞ্জেলেসের বাসে চাপল। দুপুর নাগাদ এসে ঢুকল বেভারলি অ্যাণ্ড থার্ড স্ট্রিটে।
ঢুকেই রাসলারের দোকানটা চোখে পড়ল মুসার। বাস স্টপেজের উল্টো দিকে। দোকানের সঙ্গে দোকানের মালিকের হুবহু মিল রয়েছে। রাসলারের শার্টের মতই অপরিষ্কার তার দোকানের জানালা। গাড়ি রাখার জায়গাটায় ছেঁড়া খবরের কাগজের স্তূপ, মুসার সামনেই এক লোক একটা লেমোনেডের খালি বোতল সেখানে ছুঁড়ে ফেলল। ভাঙা কাঁচের টুকরো, খাবারের খালি টিন, এটা-ওটা নানারকম আবর্জনায় বোঝাই, যেন ডাস্টবিনের বদলে ব্যবহার হচ্ছে জায়গাটা।
পাশে তাকাল মুসা। একটা টেলিভিশন মেরামতের দোকান, তারপরে আরেকটা খাবারের দোকান। রঙ করা পরিষ্কার দেয়ালে পিতলের তৈরি ঝকঝকে হরফে বসানো: ডলফ টারনারস ফুড। কাঁচের দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে, ভেতরে বিশালদেহী এক লোক, কালো চুল, বাক্সে খাবার ভরছে। তার কাছেই এক মহিলা, ইয়া বড় ভুড়ি, লিস্ট মিলিয়ে নিচ্ছে। সাদা ফরমাইকার কাউন্টারে একটা দাগ নেই; কাছে গেলে হয়তো দেখা যাবে, ধুলোও নেই এক কণা। আশপাশে আর কোন খাবারের দোকান চোখে পড়ল না।
রাসলারের শত্রুকে পাওয়া গেছে, বুঝল মুসা। মোটা মহিলা বেরিয়ে যাওয়ার পর সে গিয়ে ঢুকল। মিস্টার টারনার?
হ্যাঁ? তাকাল কাউন্টারের ওপাশের বিশালদেহী লোকটা।
আপনি মিস্টার টারনার? মানে, এই দোকানটা আপনার?
মুসার দিকে চেয়ে রইল লোকটা এক মুহূর্ত। মুসাও তাকে দেখল ভাল করে। মস্ত শরীর, কিন্তু এক বিন্দু বাড়তি মেদ নেই। বাইরে থেকে যা মনে হচ্ছিল, চুল একেবারে কালো নয়, ধূসর একটা ছোঁয়া রয়েছে: বাদামী চোখের তারা স্থির, উজ্জ্বল, পরিষ্কার। দেখেই বোঝা যায়, শরীরের যত্ন নেয় টারনার। কাজ চাইছ, খোকা? অবশেষে বলল সে। গত সপ্তায় একটু ছেলে নিয়ে ফেলেছি, তবু যদি চাও…

না না, চাকরির জন্যে আসিনি, হাত তুলল মুসা। আমি শিওর হতে চাইছি, এটা আপনারই দোকান কিনা।
হুঁ! টমাটোর আচার খারাপ পড়েছে? অসম্ভব…
…আমি ওসব কিছুই বলতে আসিনি! আপনিই মিস্টার টারনার তো?
হ্যাঁ, আমিই ডলফ টারনার, এ-দোকানের মালিক। কী চাও?
আপনাকে সাবধান করতে এসেছি, মিস্টার টারনার। কথাটা অবিশ্বাস্য শোনাবে হয়তো, কিন্তু অবিশ্বাস্য কাণ্ডই ঘটতে যাচ্ছে। ঠিক কী ঘটবে, এখনও জানি না; তবে খারাপ কিছু, সন্দেহ নেই। তিন গোয়েন্দার কার্ড বের করে কাউন্টারে রাখল মুসা, হেডকোয়ার্টারের টেলিফোন নম্বর লিখল। কী ভেবে তার তলায় ইয়ার্ডের নম্বরটাও লিখল। যদি সাপ দেখেন…
…তো চিড়িয়াখানায় ফোন করব, কথা শেষ করে দিল টারনার।
আরে, না না, ওই সাপের কথা বলছি না, জ্যান্ত সাপ নয়। হয়তো পাথরের, রবারের, কিংবা ধাতুর। হয়তো সাপের চেহারার টাই-পিনও পাঠাতে পারে। তবে সাপটা হবে, গোখরো। যা-ই আসুক না কেন, সাপের চেহারা হলেই ফোন করবেন, সঙ্গে সঙ্গে, এই ওপরেরটায় প্রথমে করবেন, কেউ না ধরলে নিচেরটায়।
কার্ডটা চুল, না টারনার। থমথমে হয়ে গেছে চেহারা।
দোকানের মালিকের চেহারা দেখে অস্বস্তি বোধ করছে মুসা, তাড়াতাড়ি বলল, আশা করি, আপনাকে সাহায্য করতে পারব। খুব। সাংঘাতিক ব্যাপার! কেউ একজন আপনার ক্ষতি করতে চায়। সাপ দেখলেই বুঝবেন, খারাপ কিছু ঘটতে যাচ্ছে। আমাদেরকে ডাকবেন…
ভাগো! হাত নাড়ল টারনার।
বুঝতে পারছেন না, মিস্টার টারনার…
ভাগো বলছি! বাদামী চোখ দুটো কঠিন।
সাপটা দেখলে হয়তো মত বদলাবেন… টারনারকে কাউন্টার ঘুরে আসতে দেখে থেমে গেল মুসা, পিছিয়ে গেল এক পা এক পা করে। যে-কোন সময় ফোন করবেন, কোন…
এখনও দাঁড়িয়ে… টারনারের কথা শেষ হওয়ার আগেই এক টানে। দরজা খুলে বেরিয়ে এল মুসা, রাস্তা পেরিয়ে একেবারে বাস স্টপেজে। বাস দাঁড়িয়েই আছে।
ভাবছে মুসা, সুবিধে করতে পারেনি সে। কিশোর হলে হয়তো অন্য রকম ঘটত। মানুষকে বোঝানোর ব্যাপারে ওস্তাদ কিশোর; অভিনয় করে, এভাবে-সেভাবে কথা বলে কী করে জানি আজগুবি কথাও বিশ্বাস করিয়ে ফেলে মানুষকে! টারনারের ব্যাপারে মুসা যা পারেনি, কিশোর হয়তো পারত।

বিকেলের দিকে ইয়ার্ডে ফিরে এল মুসা। রবিন আর কিশোর আছে। কোথা থেকে জানি পুরানো একটা সূর্যঘড়ি কিনে এনেছেন রাশেদ চাচা, ময়লা আর মাটিতে একাকার, হোস পাইপ দিয়ে পানি ছুঁড়ে সেটা ধুচ্ছে কিশোর।
কাছে এসে দাঁড়াল মুসা। রাসলারের শত্রুর নাম ডলফ টারনার। কঠিন ঠাই!
হুঁশিয়ার করেছ? জানতে চাইল রবিন।
করতে চেয়েছি। কাউন্টারে কার্ডও ফেলে এসোছ, দরকার মনে করলে আমাদের ফোন করবে। দোকান থেকে বের করে দিল সে আমাকে, আরেকটু দাঁড়িয়ে থাকলে মেরেই বসত।
বিশ্বাস করেনি, হোসের চাবি বন্ধ করে দিল কিশোর। জানতাম। কিন্তু সাপটা পেলেই অন্য রকম ভাববে। মানে, ভাবতে পারে।
ওর ফোনের অপেক্ষা না করাই ভাল, রবিন বলল। চলো, পুলিশের কাছেই যাই। কেউ তার নিজের ভাল না বুঝতে চাইলে, আমরা কী করতে পারি?
গেটে গাড়ির শব্দ হলো। তিনজনেই ফিরে তাকাল সেদিকে। পুলিশের গাড়ি ঢুকছে, একটা পেট্রোল কার। ড্রাইভিং সিটে লস অ্যাঞ্জেলেস পুলিশের প্রধান, ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্লেচার।
আমাদেরকে আর পর্বতের কাছে যেতে হলো না, কিশোর বলল। পর্বতই চলে এসেছে!
গাড়ি থেকে নামলেন ক্যাপ্টেন। এই যে, ছেলেরা, এবার কী নিয়ে মেতেছ?
আমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আছে, স্যর? পাল্টা প্রশ্ন করল কিশোর।
জুভেনাইল ডিভিশন ফোন করল। তোমাদেরকে চিনি কিনা, জিজ্ঞেস করল। বলে দিয়েছি, চিনি, মুসার দিকে আঙুল তুললেন ফ্লেচার। টারনারের খাবারের দোকানে গিয়েছিলে।
ঢোক গিলল গোয়েন্দা সহকারী।
কার্ড আর ফোন নম্বর রেখে এসেছ, আবার বললেন ক্যাপ্টেন। ওরা ভাবছে, তুমি টারনারকে হুমকি দিতে গিয়েছিলে।
হুমকি! চমকে গেছে মুসা। হুমকি, কে বলল! হুশিয়ার করতে গিয়েছিলাম।
টারনারের সেটা মনে হয়নি। ও ধরে নিয়েছে, হুমকি। খুলে বলবে?
ও আনন্দের সঙ্গে, গম্ভীর হয়ে গেছে কিশোর, ভারি শব্দ ব্যবহার শুরু হলো তার।
ফাইন, বললেন ফ্লেচার। বলো।
জিনা আর মিস মারভেলের কথা বাদ দিয়ে, এ-যাবৎ আর যা যা ঘটেছে, সব খুলে বলল কিশোর। শেষে বলল, আমাদের অনুমান, মিস্টার টারনার বিপদে পড়তে যাচ্ছেন। গান-গাওয়া সাপের, ক্ষমতা...

ব্যস ব্যস, হাত তুললেন ফ্লেচার, হয়েছে। ওসব কথা বাদ। এটা লস অ্যাঞ্জেলেস, খুঁজলে অনেক পাগল পাবে। প্রায়ই অঘটন ঘটিয়ে বসে ওরা। এক এক করে যদি ধরতে শুরু করি, জেলে জায়গা দিতে পারব না। যাক গে, গিয়ে এখন তোমাদের জন্যে সাফাই গাইতে হবে আরকী। জুভেনাইল পুলিশের কাছে। আমার একটা কথা শুনবে? ওভাবে আর কক্ষনো লোকের বাড়িতে চুরি করে ঢুকো না। নইলে সত্যি সত্যি একদিন গুলি খাধে।
চলে গেলেন ক্যাপ্টেন।
মুসা বলল, মিস মারভেল আর নেকলেসটার কথা বললে না কেন?
কী করে বলি? হাত নাড়ল কিশোর। হাজার হোক, জিনা আমাদের মক্কেল, তার খালার বদনাম ঢেকে রাখতে হবে আমাদের।
অফিসে ফোন বাজল। কেউ নেই, কিশোরই এসে রিসিভার তুলল। কয়েক সেকেণ্ড পরই হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এল। জিনা! তার খালাকে সাপ পাঠানো হয়েছে! এইমাত্র!
দরজায় দাঁড়িয়ে তিন গোয়েন্দার অপেক্ষা করছে জিনা, উত্তেজিত, হাতে একটা গোখরো। চমৎকার একটা শিল্পকর্ম, ধাতুর তৈরি, একেবারে জ্যান্ত মনে হয়। কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে, তবে ভেতর থেকে উঁচু করে রেখেছে ফণা, ছোবল মারতে প্রস্তুত। জিনা মূর্তিটা উঁচু করতেই চকমক করে উঠল সাপের দুটো লাল পাথরের চোখ।
কে নিয়ে এসেছে? কিশোর জিজ্ঞেস করল।
ছেলেদের আগে আগে বসার ঘরে এসে ঢুকল জিনা। মূর্তিটা কফির টেবিলে নামিয়ে রাখতে রাখতে বলল, জানি না। বেল বাজতেই গিয়ে দরজা খুললাম। দেখি, একটা বাক্স পড়ে আছে।
হবে না কিছু, মুসা বলল।
আমারও মনে হয়, হবে না। তবে খালাকে নিয়ে ভাবনা। পিছন থেকে এসে আমার আগেই বাক্সটা তুলল খালা, ডালা খুলেই কাঁপতে শুরু করল।
তারপর? রবিন জানতে চাইল।
সাপটা দেখল। ওটার গলায় ঝোলানো কার্ড পড়ল, টেবিল থেকে তুলে বাড়িয়ে ধরল জিনা। এই যে, এটা।
সাদা কার্ডটা দেখাল কিশোর। জোরে জোরে পড়ল: বিলিয়াল তার পাওনা চায়। হীরার চেয়ে মানুষের জীবন অনেক বেশি আকর্ষণীয় তার কাছে।
দেখেছ, জিনা বলল, বড় বড় হরফে পরিষ্কার করে লিখেছে! পাঠকের মনে ছাপ ফেলবার জন্যে!
সফল হয়েছে নিশ্চয়? জিনার দিকে তাকাল রবিন।

হয়েছে। টলে উঠেই পড়ে গেল খালা। আগে কাউকে বেহুশ হতে দেখিনি! ভয়ই পেয়ে গেলাম। খানিক পরেই গোঙাতে শুরু করল খালা, চোখ মেলল। ধরে ধরে অনেক কষ্টে তাকে ওপরে নিয়ে গেছি।
পুলিশকে বলতে রাজি হয়েছে?
না। অনেক বার বলেছি, বুঝিয়েছি, শুনতেই রাজি না। বলেছি, সাপটা আছে, কার্ডটা আছে, পুলিশকে প্রমাণ দেখাতে অসুবিধে হবে না। কিন্তু শুনলই না আমার কথা। খালি বলে, জিহাভোকে নেকলেস দেয়া ছাড়া নাকি আর কোন উপায় নেই।
তার মানে নেকলেসটা দিতে যাচ্ছেন? কিশোর বলল।
না। ওটা পেয়ে গেছি, আমার কাছে।
চুপ করে রইল তিন গোয়েন্দা।
কয়েকদিন আগে টেলিভিশনে একটা সিনেমা দেখেছিলাম, খুলে বলল জিনা। স্পাই ছবি। মেয়েদের বাথরুমে টুরানো সাবানের বাক্সে একটা মাইক্রোফিল্ম লুকিয়ে রাখল গুপ্তচর। খালাও দেখেছে ছবিটা। নিজের বুদ্ধিতে কিছুই করতে পারে না খালা, ভাবতেই বুঝে গেলাম। নেকলেস কোথায় লুকিয়েছে। তোমরা যাওয়ার পর গিয়ে খুঁজলাম। হ্যাঁ, যা ভেবেছি তাই।
তুমি নিশ্চয় আরও ভাল জায়গায় লুকিয়েছ, মুসা বলল।
তোমাদেরকে জানিয়ে রাখি, রসিকতার সুরে বলল জিনা, যদি আমার কিছু হয়ে যায়, তো গ্যারাজে খুঁজো। ঘোড়ার ওট বিনের টিনে।
মন্দ না, মাথা নাড়ল মুসা।
হ্যাঁ, যা বলছিলাম, খালার অবস্থা ভাল না। বিছানায় পড়ে আছে, দেয়ালের দিকে চোখ। মনে হলো, অসুখ করবে।
অসুখ খুব খারাপ হতে পারে, সাবধান করল কিশোর। এমনিতেই দুর্বল, না?
আগে ভালই ছিল। মিস পলের অ্যাকসিডেন্টের পর থেকেই কাহিল হয়ে পড়েছে। তাকে এখন একা থাকতে দেয়া ঠিক নয়। দাঁড়াও, চাচীকে আসতে ফোন করছি।
জিনার মুখ উজ্জ্বল হলো। খুব ভাল হবে। তোমার চাচী খুব শক্ত মনের মহিলা! তাকে সব কথা বলব। হয়তো খালাকে পুলিশের কাছে মুখ খুলতে রাজি করাতে পারবেন।
শুধু শক্ত বললে ভুল হবে, কিশোর শুধরে দিল। চাচীর স্নায়ু ইস্পাতে তৈরি। কিন্তু, এই অবস্থায় চাচীও কিছু করতে পারবে বলে মনে হয় না। তোমার খালা ভ্যারাড আর বিলিয়ালের ভয়ে কাতর, এখন অন্য কিছু ভাবতেই চাইবেন না। চাচীকে শুধু বলব, তোমার খালার অবস্থা খারাপ, তুমি একা সামলাতে পারছ না।
তা-ও ঠিক।

উঠে গিয়ে বাড়িতে ফোন করল কিশোর।
ঠিক পনেরো মিনিটের মাথায় হাজির হয়ে গেলেন মেরি চাচী। মিস মারভেলের ঘরে ঢুকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখলেন ঘরের আর মহিলার অবস্থা। গভীর ভ্রূকুটি করলেন জিনা আর ছেলেদের দিকে তাকিয়ে। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন, এক্ষুণি ঘুমাতে যাওয়া উচিত জিনার, ছেলেদের বাড়ি ফেরা উচিত।
কিশোরের দিকে তাকালেন মেরি চাচী। তুই আর তোর চাচা বাইরে খেয়ে নিস রাতে, আমি থাকছি। সকালে ফোন করব। বলেই রান্নাঘরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন তিনি। খুটখাট আওয়াজ শুনেই বোঝা গেল, রেফ্রিজারেটর আর তাকগুলো খোঁজাখুঁজি করছেন।
জিনা, আজ রাতে পেট ভরে খেতে পারবে, হেসে বলল কিশোর। খবরদার, একবারও বলবে না, ওটা আরেকটু দিন। চাচী যদি মনে করে তোমার পেট ভরেনি, বুঝবে ঠেলা।
আমার যেতে ইচ্ছে করছে না, বার বার রান্নাঘরের দিকে তাকাচ্ছে মুসা। আজ রাতে আমরাও এখানেই থেকে যাই না কেন? কত কী। লাগতে পারে রাতে, তখন কাকে ডাকবেন চাচী?
পারলে চাচীকে গিয়ে বলো সে-কথা, হাসল কিশোর, জিনার দিকে ফিরল। আসলে আর থাকার দরকারই নেই আমাদের। ওসব গান গাওয়া সাপ-টাপের পরোয়া-মেরি চাচী করবে না; আর হ্যাঁ, তোমার খালা সাহস পাচ্ছেন না, কিন্তু তুমি তো জানাতে পারো পুলিশকে? বলবে, ভয় দেখিয়ে মেরে ফেলা হচ্ছে তোমার খালাকে।
না না, বাপু, আমি পারব না, জোরে জোরে মাথা নাড়ল জিনা। খালাকে ভূতে ধরেছে, একথা গিয়ে পুলিশকে বলতে পারব না। খালাও পরে শুনলে খুব দুঃখ পাবে।
ঝটকা দিয়ে রান্নাঘরের দরজা খুলে গেল। কিশোর! মেরি চাচীর তীক্ষ্ণ কণ্ঠ, এখনও দাঁড়িয়ে বকবক করছিস কেন তোরা? মেয়েটাকে ঘুমোতে দিবি না নাকি?
তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে এল ছেলেরা।
সন্ধ্যার পরে ফোন করল কিশোর। ধরলেন মেরি চাচী। কড়া গলায় জানালেন, জিনা ঘুমোচ্ছে, মিস মারভেল ঘুমায়নি, তবে শান্তই রয়েছে। বিছানায় না গিয়ে এত রাত অবধি কী করছে কিশোর, কৈফিয়ত চাইলেন। শেষে ধমক দিয়ে বললেন, সকালের আগে যেন আর কোন ফোন না করে।
চিত হয়ে শুয়ে ছাতের দিকে চেয়ে রইল কিশোর, ভাবছে। ঘুমিয়ে পড়ল এক সময়, দুঃস্বপ্ন দেখল: অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে পোড়ো বাড়িতে কালো মোম জ্বলছে। বীভৎস সব ছায়ারা নেচে বেড়াচ্ছে আলোর আশপাশে। কাক-ভোরের আগে

নীরব এক মুহূর্তে ঘুম ভাঙল তার, ঘামছে দরদর করে। মনে পড়ল সাপের মূর্তিটার কথা, আতঙ্কে তিল তিল করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়া মিস মারভেলের কথা।
মনের পর্দায় ভেসে উঠল ডক্টর জিহাভোর কালো পোশাক পরা মূর্তি, ভীষণ ফেকাসে চেহারা। দুদিন আগেও এত তাড়াহুড়ো ছিল না লোকটার। এখন এতই অস্থির হয়ে উঠেছে, পারকারদের বাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া করছে মিস মারভেলকে হুমকি দিতে। কেন?
ইস, যদি জানা যেত জবাবটা! ফ্লাডলাইটের আলোয় কিশোরকে দেখেছে নিশ্চয় জিহাভো, আর তাকে দেখে থাকলে ফোর্ডকেও অবশ্যই দেখেছে। তাতে ভয় পেয়ে গেছে ঠকবাজটা?
নড়েচড়ে শুল কিশোর। এখন ফোর্ডকে খুঁজে পেলেই অনেক প্রশ্নের জবাব পেয়ে যেত। কিন্তু পাবে কোথায়? পুরো ব্যাপারটার চাবিকাঠিই বোধহয় ওই রহস্যময় লোকটা! ওদিকে মস্ত বিপদ, ধীরে ধীরে অসুস্থতা বাড়ছে মিস মারভেলের, এগিয়ে যাচ্ছে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে। আর টারনার? তার কী হবে? সাপ কি পাঠানো হয়েছে তার কাছে?
ডাইনীবিদ্যার ওপর লেখা বইটার কথা মনে পড়ল কিশোরের, রবিন যেটা লাইব্রেরি থেকে এনেছিল; ফোর্ডের বাসায় যেটা দেখেছিল, সেই বই। লেখক রুকসটন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর, রকি বিচ থেকে রুকস্টন মাত্র দশ মাইল। হাসি ফুটল কিশোরের ঠোঁটে। পেয়েছে, সমাধান। পেয়েছে! ফোর্ডকে ছাড়াও চলবে, মিস মারভেলের জন্যে কিছু করতে পারবে এখন। ডক্টর জিহাভোর তাড়া রয়েছে, এটা খারাপ না হয়ে ভালই হতে যাচ্ছে জিনার খালার জন্যে।
উপায় একটা পেয়ে গেছে গোয়েন্দাপ্রধান, দুশ্চিন্তা দূর হয়ে গেল। আবার ঘুমিয়ে পড়ল সে।
সকাল সকালই পারকারদের বাড়িতে এল তিন গোয়েন্দা। হাতে খাবারের
ট্রে নিয়ে ওপরতলায় যাচ্ছেন মেরি চাচী। রান্নাঘরে ঢকঢক করে কমলার রস গিলছে জিনা।
নেকলেসটা নিয়ে কী করব ঠিক করে ফেলেছি, ছেলেদের দেখেই বলে উঠল সে। ফন হেনরিখের কাছে দিয়ে আসব। ও-ই সামলাক।
ভাল! সমর্থন করল রবিন।
তা তোমরা কী করেছ? মানে করবে?
লস অ্যাঞ্জেলেসে এক লোক আছে, তার নাম উলফ টারনার, একটা খাবারের দোকানের মালিক, গল্প বলছে যেন কিশোর। আশা করছি, এতক্ষণে তার কাছে সাপ পৌঁছে গেছে। জিহাভোর তাড়া আছে, কাজেই দেরি করবে না সে।

রাসলারের প্রতিদ্বন্দী টারনার, বিলিয়ালেরও শত্রু, বলার ঢং পাল্টাল গোয়েন্দাপ্রধান। আমরা লস অ্যাঞ্জেলেসে যাচ্ছি।
খালার কী হবে? তার অবস্থা খুব খারাপ।
চাচী আছে, মনে করিয়ে দিল কিশোর। খালাকে দেখবে। তুমিও আছ। ফন হেনরিখকে ফোন করে বাসাতেই থাকতে হচ্ছে তোমাকে। কখন ওদের লোক আসে, কে জানে।
তা ঠিক। কিন্তু জিহাভো যদি আসে?
আসবে না। দেখে, জিনা, তোমার খালা সাপের ক্ষমতায় বিশ্বাসী। এতেই অসুখ বাড়ছে তার। জিহাভো জানে এটা। জানে বলেই আসবে না, কখন তার চাহিদামত জিনিস যাবে সে-অপেক্ষায় থাকবে।
জিনিস যাবে না। খালা উঠতেই পারে না, পাঠাবে কে? একেবারে অচল হয়ে গেছে।
তোমার খালাকে বাঁচানোর একটা উপায় আছে, জিনা, কিন্তু টারনারের কথা আগে ভাবতে হবে আমাদের। তোমার খালার হাতে সময় আছে, কিন্তু টারনারের একেবারেই নেই।
কী করতে যাচ্ছ? ভুরু কোঁচকাল জিনা।
টারনারের দোকান বাঁচাতে যাচ্ছি, রবিন আর চেপে রাখতে পারল না।
তা হলে আমিও যাব, ঘোষণা করল জিনা।
না, তুমি যাচ্ছ না, সাফ বলে দিল মুসা। টারনার দুর্বল লোক না, তাকে নোয়াতে কষ্ট হবে জিহাভোর। গোলমাল হতে পারে।
হোক, আমি যাবই! জেদ ধরল জিনা। মেরি চাচী থাকছেন, জিহাভো আসছে না। নেকলেসটাও এখনও যেখানে আছে, নিরাপদেই আছে। আমার যেতে বাধা কী? তোমরা ওদিকে মজা লুটবে, আর আমি বসে বসে আঙুল চুষব? তা হবে না। আমি যাব।
ট্রে হাতে এসে ঢুকলেন মেরি চাচী। কোথায়?
লস অ্যাঞ্জেলেসে যাব, চাচী, বলতে একটুও দেরি করল না জিনা। খালার ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলতে হবে। কিশোরকে আমার সঙ্গে যেতে বলুন না!
অবাক হলেন মেরি চাচী। অবস্থা খুব খারাপ, একটা দানাও মুখে দেননি সকালে, ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলা দরকারই, কিন্তু যাওয়া লাগবে কেন? লস অ্যাঞ্জেলেস কি কম দূর? ফোন করলেই পারো।
ডাক্তারের নাম ভুলে গেছি, ফোন নম্বরও জানি না। তবে তার চেম্বার চিনি, উইলশায়ারে, গির্জার পাশে একটা বাড়ি।

এত কষ্ট করবে? তার চেয়ে তোমার খালাকে জিজ্ঞেস করে দেখো না। নাম, নাম্বার, দুটোই হয়তো পেয়ে যাবে। আ খালা বলবে না। জিজ্ঞেস করিনি ভাবছেন? করেছি। আরেক দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকে। ভূতে ধরেছে, ডাক্তারের কথা শুনতে চাইবে কেন!
নীরবে জিনার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন মেরি চাচী। দুহাত নাড়লেন। ঠিক আছে! কিশোর, দৌড়ে যা তো, বোরিসকে বল গে পিকআপটা নিয়ে আসতে। বাসে গেলে সারাদিন লেগে যাবে।
আনন্দে মেরি চাচীকে জড়িয়ে ধরল জিনা। ও, মাই সুইট আন্টি!
ছেলেরা মুখ গোমড়া করে থাকল। কিশোরের পেছনে বেরোল জিনা, তাদেরকে অনুসরণ করল অন্য দুজন। রাগে ফুলছে। টারনারকে সাহায্য করতে যাচ্ছে, কিছুতেই বলা যাবে না চাচীকে। বিপদ আছে শুনলে যেতেই দেবেন না চাচী।
ইয়ার্ডে প্রচুর কাজ, তা থেকে মুক্তি পেয়ে খুশিই হলো বোরিস। চুপচাপ পিকআপের পেছনে উঠে বসল ছেলেরা, জিনা বসল ড্রাইভারের পাশে।
বেভারলি অ্যাণ্ড থার্ড স্ট্রিটের মোড়ে গাড়ি পার্ক করল বোরিস। দরজা খুলে গলা বাড়াল। আমি আসব?
না, বলল কিশোর। এখানেই থাকুন। বসে বসে জিরোন। আমাদের দেরি হতে পারে।
হোক! একটা খবরের কাগজ খুলে আরাম করে বসে তাতে মন দিল বোরিস।
জিনাকে হা-না কিছুই বলল না ছেলেরা। অনেকটা বেহায়ার মতই তাদের সঙ্গে সঙ্গে এল সে।
ওই যে, রাসলারের দোকান, হাত তুলে দেখাল মুসা।
নাক বকাল জিনা, থুথু ফেলল মাটিতে, নোংরামি দেখে।
টারনারের দোকানের দরজা খুলে একটা ছেলে বেরোল। তার পিছনেই মালিকের মুখ দেখা গেল। আজ আর এসো না।
বড় বড় কদমে কাছে চলে এল কিশোর, দরজায় তালা লাগাচ্ছে টারনার।
সরি, ফিরে চেয়ে বলল লোকটা, বন্ধ করে দিয়েছি।
সাপটা পেয়েছেন? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
ঝট করে সোজা হলো টারনার, মুসাকে চোখে পড়ল। তুমিও আবার এসেছ।
আমরা আপনাকে সাহায্য করতে চাই, মিস্টার টারনার, নরম গলায় বলল মুসা।
তাই, না? পুলিশ সব কথা বলেছে আমাকে। তোমরা কিশোর গোয়েন্দা, প্রেতসাধকদের পেছনে লেগেছ। কী বলব? ছেলেমানুষী, না পাগলামি? যা খুশি করো গে। আমি যাচ্ছি। দোকান বন্ধ।
সাপটা পেয়েছেন? একইভাবে জিজ্ঞেস করল আবার কিশোর।

কিশোরের শার্ট খামচে ধরল টারনার। তুমি রেখে গিয়েছিলে? ঘাড় মটকে দেব!
শার্ট ছাড়ানোর বিন্দুমাত্র চেষ্টা করল না কিশোর। আমরা কেউ রাখিনি। তবে জানি, ওটা একটা গোখরোর মূর্তি, কুণ্ডলী পাকানো, চোখ দুটো লাল পাথরের।
স্থির দৃষ্টিতে কিশোরের মুখের দিকে চেয়ে থাকল কিছুক্ষণ টারনার, তারপর আস্তে করে ছেড়ে দিল শার্ট। আবার দরজা খুলে কাউন্টারের দিকে ইঙ্গিত করল। সাদা ফরমাইকার ওপর বসে আছে মূর্তিটা; মিস মারভেলকে যেটা পাঠানো হয়েছে, তার অবিকল নকল।
মিনিট দুয়েকের জন্যে দোকানের পিছনে গিয়েছিলাম, টারনার বলল। ফিরে এসে দেখি ওটা।
হুঁ! কিশোর গম্ভীর।
আমি যাচ্ছি, তোমরাও কেটে পড়ো। কিছু যদি ঘটেই, নির্জন জায়গায় ঘটুক। পুলিশকে ফোন করে জানিয়েছি। যাও যাও, সরে যাও।
রাস্তা পেরিয়ে একটা মেয়ে এসে দাঁড়াল। কাঁধ ধরে এক ঝটকায় তাকে আবার রাস্তার দিকে ঘুরিয়ে দিল টারনার। বাড়ি যাও! তোমার মাকে বলবে, সে-ও যেন আজ আর না বেরোয়! যাও!
হাঁ করে টারনারের দিকে চেয়ে রইল মেয়েটা।
দেখছ কী! ধমকে উঠল দোকানদার।
কিছুই না বুঝে প্রায় ছুটে পালাল মেয়েটা।
খদ্দেরের জ্বালায় আর পারি না! আক্ষেপ করল, টারনার। একেবারে উইপোকা! ঝাঁকে ঝাকে আসে, ছাড়াতে পারি না!
দালানের কোণের দিক থেকে একটা লোক এসে দাঁড়াল। নীল প্যান্ট আর কালো কোটের বয়েস কত সে নিজেও বলতে পারবে না হয়তো। ময়লা, ছেঁড়া, কোঁচকানো কাপড়-চোপড়। অনুনয় করল, কফি হবে?
আগ্রহের সঙ্গে লোকটাকে দেখছে জিনা। জীবনে ভিখিরি খুব কমই দেখেছে সে, এই লোকটা তাদের সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে। গায়ে শুধু কোট, শার্টও নেই। লালচে ঘাড় বেরিয়ে আছে। কতদিন চুল কাটেনি, কে জানে! ধুলোয় ধূসর, শিগগিরই পরিষ্কার না করলে জটা পড়বে। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে গা থেকে।
হবে, ভাই? আবার অনুনয় করল লোকটা। এক-আধটা স্যাণ্ডউইচও যদি পেতাম! দুদিন খাইনি!
পকেট থেকে নোটের তাড়া বের করে একটা খুলে নিল টারনার। লোকটার দিকে না তাকিয়ে বাড়িয়ে ধরল, নোটটা। আমার দোকান বন্ধ। ওই যে, ওই দোকান থেকে কিনে খাও গে, রাসলারের দোকান দেখিয়ে দিল।

ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন! টাকাটা নিয়ে কপালে ছোঁয়াল ভিখিরি। ঘুরে দাঁড়াতে গিয়েই খবরের কাগজ রাখার স্ট্যাণ্ডে হোঁচট খেল, সামলানোর চেষ্টা করল, পারল না, স্ট্যাণ্ড আর কাগজগুলো নিয়ে পড়ল হুড়াম করে।
আরে, দূর! চেঁচিয়ে উঠল টারনার। জ্বালা!
হাঁচড়ে-চড়ে কোনমতে উঠল ভিখিরি। সোকে! (ইটস ওকে) টলতে টলতে পা বাড়াল।
এই, মিয়া! জিনা ডাকল। দাঁড়াও! এগিয়ে গিয়ে উবু হয়ে ছোট একটা কালো বাক্স তুলে নিল। তোমার রেডিও ফেলে যাচ্ছ!
দৌড় দিল লোকটা।
জিনা! হাত বাড়াল কিশোর। জলদি দাও আমার হাতে!
গুড লর্ড! চেঁচিয়ে উঠল টারনার। ছোঁ মেরে জিনার হাত থেকে বাক্সটা নিয়েই ছুঁড়ে ফেলল অন্ধের মত। উড়ে গিয়ে রাসলারের দোকানের দেয়ালে বাড়ি খেল ওটা, ভ্রামমম্ করে বিকট আওয়াজ তুলে ফাটল। চোখ ধাঁধানো আলো। কালো ধোঁয়া সরে যেতেই দেখা গেল, রাসলারের দোকানের জানালা-দরজার একটা কাঁচও নেই, সব গুড়ো। রাসলারের নোংরা ফেকাসে মুখটা চকিতের জন্য দেখল কিশোর।
ক্ষণিকের জন্য থ হয়ে গিয়েছিল টারনার, সংবিৎ ফিরে পেয়েই ঘুরে তাকাল। পথের মোড়ের কাছে চলে গেছে ভিখিরির পোশাক পরা লোকটা। লাফিয়ে উঠে দৌড় দিল টারনার সেদিকে।
বোমা! থরথর করে কাঁপছে এখনও জিনা। জীবনে দেখিনি! আমি ভেবেছি রেডিও!
মাই ডিয়ার লেডি, হাসিমুখে বলল মুসা, আমাদের সঙ্গে থাকলে আরও অনেক কিছুই দেখবে। সারাজীবন ঘরের ভেতরেই কাটিয়েছ
জিনার ওপর থেকে রাগ দূর হয়ে গেছে ছেলেদের।
ফেরার পথে পিকআপের পিছনে বসল জিনা। এক সময় বলল, আর ঠেকিয়ে রাখা গেল না। এবার নিশ্চয় খালার সঙ্গে কথা বলবে পুলিশ।
ভদ্রভাবেই বলবে, জিনার আশঙ্কা দূর করতে চাইল কিশোর। তিনি তো আর অপরাধী নন।
পুলিশের ঝামেলা থেকে যদি দূরে সরিয়ে রাখা যেত!
সম্ভব না, মাথা নাড়ল রবিন। তা ছাড়া পুলিশের কাছে চেপে রাখাও আর উচিত হবে না আমাদের। ভয়ানক লোক জিহাভো, মানুষ খুন করতেও বাধে না তার। আজ আরেকটু হলেই তো দিয়েছিল টারনারকে শেষ করে!

জিনা, আজ একটা কাজের কাজ করেছ, মুসা বলল। বোমাটা আমাদের চোখে পড়েনি, তুমি না দেখলে… হাসল সে। এত তাড়াতাড়ি চলে আসা উচিত হয়নি। লোকটাকে ধরতে পারলে ধোলাই যা একখান দেবে না টারনার! আহ, থাকলে পারতাম!
রাসলারের চেহারা দেখেছ! হাহ্ হাহ! হাসি ঠেকাতে পারছে না। কিশোর। ওর জানালা ধসে পড়বে, এটা কল্পনাও করেনি সে।
পারকারদের বাড়িতে ঢুকল পিকআপ। মেরি চাচী বোধহয় ওদের অপেক্ষায়ই ছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে সদর দরজা খুলে উঁকি দিলেন। এতক্ষণ! মিস মারভেলের অবস্থা আরও খারাপ। এখানকার ডাক্তারকেই ডেকেছি, কী করব! জিনা, ডাক্তারকে পেয়েছ?
না, লাফ দিয়ে নামল কিশোর। মেরি চাচীকে পাশ কাটিয়ে দ্রুত ঢুকে পড়ল।
জিনা ছুটল পেছনে।
হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার, ডাক্তার বললেন। কিন্তু রাজি হচ্ছেন না উনি।
একেক লাফে দুটো করে সিঁড়ি টপকে উঠতে লাগল জিনা, কিশোর তার পেছনে পড়ে গেছে।
চুপসে যাওয়া মস্ত একটা পুতুলের মত বিছানায় নেতিয়ে পড়েছে। মিস মারভেল। জিনার গলা শুনে ফিরে তাকাল।
খালা, আর চিন্তা নেই, জিনা বলল। জিহাভোর শয়তানী ফাঁস হয়ে গেছে। একটা ঠকবাজ, খুনী। পুলিশ খুঁজছে এখন তাকে।
নড়ল না মিস মারভেল।
হাত ধরে ঝাঁকুনি দিল জিনা। ভাবনাচিন্তা এক্কেবারে বাদ দাও। তোমাকে হাসপাতালে যেতে হবে।
জিনার হাতে হাত রাখল মহিলা। ফিসফিস করে বলল, জিনা, নেকলেসটা…
এক ঝটকায় সরে এল জিনা। না! দেব না! কী বলছি, শুনছ না? জিহাভো একটা ঠকবাজ খুনী। ধরে নিয়ে গিয়ে তাকে জেলে ভরবে।
পুলিশ। কারও আর কিছু করতে পারবে না সে।
ওর বিরুদ্ধে কিছু করেছিস! তাজা আতঙ্ক ফুটল মিস মারভেলের চেহারায়। জিনা, ও আমাকে দুষবে!
যত্তসব! খালার কব্জি ধরে টানল জিনা। হয়েছে, ওঠো।
জিনার বাহুতে হাত রাখল কিশোর। ছেড়ে দাও। তাকে নিয়ে। হল-এ এল সে। এভাবে খালাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে লাভ হবে না, বোঝাল কিশোর। দেখছ না, জিহাভো জেলে যাবে শুনে আরও ভয়। পেয়ে গেছেন? একটাই উপায় আছে। কাটা দিয়ে কাটা তুলতে হবে।

কীভাবে?
ভূত ছাড়াতে হবে।
জনাব কিশোর পাশা, মাথামুথা ঠিক আছে তো তোমার?
ওঁর ভূত ছাড়াতে হবে, জিনার কথা শুনতেই পায়নি যেন কিশোর। অভিশাপ তুলে নেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। ওঝা ডাকব। এক ওঝা কাউকে বাণ মারলে সেটা ছাড়ানোর জন্যে আরেক ওঝা দরকার। বাংলাদেশে অহরহ ঘটছে এসব। চাচা বলতে বলতে একেক সময় খেপে ওঠে।
হতাশ ভঙ্গিতে দেয়ালে হেলান দিল জিনা। বাংলাদেশ এখান থেকে অনেক দূর! ওঝা কোথায় পাব?
পাব, পাব, হাত তুলল কিশোর। বোকা মানুষ দুনিয়ার সব দেশেই আছে। আমার তো ধারণা, লস অ্যাঞ্জেলেসে আরও বেশি আছে। পাগলও বেশি এখানে। বোকা মানুষ বেশি যেখানে, সেখানে ঠকবাজও বেশি। আমি জানি, কোথায় ওঝা পাওয়া যাবে।
নিচে নামল কিশোর। উদ্বিগ্ন মেরি চাচীকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে রবিন আর মুসা। গম্ভীর মুখে পায়চারি করছেন ডাক্তার।
রবিন, কিশোর বলল, রুকসটন বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই প্রফেসর, পুরো নাম কী যেন?
জন এ. স্মিথ।
হ্যাঁ, জন স্মিথ, রান্নাঘরে এসে ঢুকল কিশোর। জানালা দিয়ে তাকাল পাহাড়ি উপত্যকার দিকে। রবিন আর মুসাও ঘরে ঢুকল।
প্রফেসরকে দরকার? জানতে চাইল রবিন।
হ্যাঁ। ওঝা দরকার একজন। কীভাবে কী করতে হবে, প্রফেসর স্মিথ ভাল বলতে পারবেন।
অনুসন্ধান-এ ফোন করল কিশোর। প্রফেসর জন এ, স্মিথের নাম্বারটা বলবেন, প্লিজ? ...হা হা, রুকসটন ইউনিভার্সিটি।
কাগজ-কলম নিয়ে রবিন তৈরি। জোরে জোরে নম্বরগুলো বলল কিশোর, রবিন লিখে নিল। থ্যাঙ্ক ইউ, বলে লাইন কেটে দিল কিশোর। এখন তাকে পেলে হয়। আবার ডায়াল ঘোরাল সে। ডক্টর স্মিথ আছেন?
খানিকক্ষণ নীরবতা। রিসিভার কানে ঠেকিয়ে অপেক্ষা করছে। কিশোর। ওপাশ থেকে সাড়া আসতেই বলল, প্রফেসর? স্যর, আমি কিশোর পাশা, রকি বিচ থেকে বলছি। একটা সাহায্য করতে পারেন? টেলিফোনে ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না। একজন মহিলাকে, মানে তাকে অভিশাপ দেয়া হয়েছে। আমরা...
চুপ করে শুনল কিশোর। তারপর বলল, হ্যাঁ, স্যর, খুব অসুস্থ।

আবার চুপ। শুনে বলল, গতকাল, স্যর। প্যাকেটে করে একটা সাপের মূর্তি পাঠানো হয়েছে। আবার কিছুক্ষণ চুপ থেকে ওপাশের কথা শুনে বলল, পারকার হাউস। মহিলার নাম মিস মারভেল। আবার। চুপচাপ। থ্যাঙ্ক ইউ, স্যর, থ্যাঙ্ক ইউ, বলে প্রফেসরকে পারকার হাউসের ঠিকানা দিয়ে রিসিভার রেখে দিল।
আসছেন, রবিন আর মুসার কৌতূহল নিরসন করল কিশোর। সঙ্গে করে ওঝা নিয়ে আসবেন, অভিশাপ দূর করার জন্যে।
খাইছে রে, বিড়বিড় করল মুসা। আল্লাই জানে কী হবে! ভুডুর ওস্তাদ নিশ্চয়?
এলেই জানা যাবে।
দরজা খুলে উঁকি দিলেন মেরি চাচী। কিশোর, কী করছিস?
ডাক্তারকে পেয়েছি, চাচী।
অউ, গুড! যাক, বাঁচা গেল। চেনা ডাক্তারের কথা হয়তো শুনবে। মহিলা।
দেখা যাক, কী হয়। তিনি আসছেন।
গুড। আমি গিয়ে বসি জিনার খালার কাছে। আর এই, শোনো তো, একজন গিয়ে ওই ঘোড়াটাকে বাঁধো! জানালা দিয়ে দেখলেন মেরি চাচী। ঝাড়-টাড় সব নষ্ট করে ফেলবে!
চাচীর পেছনেই এসে দাঁড়িয়েছে জিনা। বলল, আমিই যাচ্ছি।
জিনা, কিশোর ডেকে বলল, ডাক্তার আসছেন।
পেয়েছ তা হলে! খুব ভাল!
জিনা চলে গেল। মেরি চাচী গেলেন মিস মারভেলের ঘরে। বারান্দার সিঁড়িতে পা রেখে বসল ছেলেরা। খানিক পরেই ফিরে এল জিনা। কতক্ষণ লাগবে?
বেশি দেরি হবে না, কিশোর বলল।
সত্যিই দেরি হলো না, গেট দিয়ে একটা গাড়ি ঢুকল। এসে থামল গাড়ি-বারান্দায়। ইঞ্জিন বন্ধ হতেই ড্রাইভারের পাশের দরজা খুলে। লাফিয়ে নামল একজন লোক।
কিশোর প্যাশাআ!
অবাক হয়ে লোকটার দিকে চেয়ে আছে চার ছেলেমেয়ে।
জিনা, লোকটা বলল, আমি সত্যিই দুঃখিত! জানতাম না, এতখানি গড়াবে!
আস্তে করে উঠে দাঁড়াল কিশোর। আপনি!
আমি ডক্টর জন স্মিথ।
হাঁ হয়ে গেছে জিনা। আপনি…আপনি গোঁফ কামিয়ে ফেলেছেন, মিস্টার ফোর্ড!
ওপরের ঠোঁটে আঙুল বোলালেন প্রফেসর। হাসলেন। ওটা নকল গোঁফ ছিল। ফোর্ড নামটাও বানানো। আমি আসলে ডক্টর জন এ. স্মিথ, রুকসটন ইউনিভার্সিটির অ্যানথ্রোপলজির প্রফেসর।

হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মূর্তিটা দেখলেন প্রফেসর। চমৎকার কাজ। এ জিনিসে ভয় না পেলে আর কীসে পাবে?
সত্যিই কি কাজ হয়? মুসা জানতে চাইল।
সাপটা টেবিলে নামিয়ে রাখলেন প্রফেসর। যার বিরুদ্ধে করা হলো, সে না জানলে কিছুই হবে না। ভয় পেল কি, মরল!
আপনি খালাকে ভাল করতে পারবেন? জিনা বলল। বোঝাতে পারবেন, তার ওপর থেকে অভিশাপ দূর হয়েছে?
না, আমি পারব না। আমাকে কি ওঝার মত দেখাচ্ছে?
দেখাচ্ছে না, স্বীকার করল জিনা। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, নিখুঁত পোশাক। তোমার খালা আমাকে বাড়ির কাজের লোক হিসেবে দেখেছেন, ভ্যাকুয়াম ক্লিনার দিয়ে বালি পরিষ্কার করতে দেখেছেন, আমি বললে কি বিশ্বাস করবেন? না। এজন্যেই আউরোকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি। গাড়িতে বসে আছে। কী কী করতে হবে, বুঝিয়ে দিয়েছি তাকে, করতে পারবে।
তিনি কি ওঝা? জানতে চাইল কিশোর।
জিপসি, প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলেন প্রফেসর। ভূতে পাওয়া এরকম আরও অনেককেই ভাল করেছে। আঁচিল সারাতে পারে, ভবিষ্যৎ বলতে পারে, শত্রুর পিঠে মাথা গজিয়ে দিতে পারে…)
দূর! তাই কি হয়? বিশ্বাস করতে পারছে না মুসা।
নিজের চোখেই দেখবে, হাসলেন প্রফেসর। যাই, ওকে নিয়ে আসি।
মহিলাকে নিয়ে এলেন প্রফেসর। বৃদ্ধা, গালের চামড়া কোঁচকানো। মাথায় কয়েকটা রঙিন রুমাল বেঁধেছে, তাতেও পুরোপুরি ঢাকতে পারেনি লম্বা জটা। ব্লাউজ ফেকাসে নীল, সবুজ গাউন পায়ের পাতা ঢেকে দিয়েছে। কাপড়-চোপড়ে কেমন একটা পুরানো পুরানো গন্ধ, বালি নেই, তবু মনে হয় বালিতে ঢাকা। ঘন কাঁচাপাকা ভুরুর নিচে গভীর কালো উজ্জ্বল দুটো চোখ।
মূর্তিটা তুলে নিল মহিলা। এটাই?
হ্যাঁ, বললেন প্রফেসর।
হাহ! অবজ্ঞা দেখাল আউবো। এই, মেয়ে, এই, তোমরাও, ছেলেদের দিকে হাত তুলল সে। এসো আমার সঙ্গে। যা যা বলব, করবে। টু শব্দ করবে না। বুঝেছ।
বুঝেছি, কিশোর বল।
মেয়েমানুষটা কোথায়?
ওপরে, দোতলা দেখাল জিনা।
চলো, মূর্তিটা হাতে নিয়েই সিঁড়ির দিকে এগোল আউরো।

সিঁড়ির মাথায় দেখা হয়ে গেল মেরি চাচীর সঙ্গে। আরে, এ-কী! এই পাগল ধরে এনেছে কেন! আরে, এই, কিশোর…
ঠিকই আছে, চাচী, দুহাত তুলল কিশোর। ডক্টর স্মিথই নিয়ে এসেছেন ওকে।
ডক্টর স্মিথ? কখন এলেন? কই, আমাকে ডাকলি না কেন? এসব হচ্ছে কী?
পরে বলব, প্রফেসরের দিকে ফিরে বলল কিশোর। আমার চাচী।
সালাম জানালেন প্রফেসর।
মাথাটা সামান্য একটু নুইয়ে আবার কিশোরের দিকে ফিরলেন মেরি চাচী। পরে-টরে না, আমি এক্ষুণি জানতে চাই কী হচ্ছে এসব!
এই, বেটি, সরো! ধমক লাগাল আউরো।
কী! চেঁচিয়ে উঠলেন মেরি চাচী।
প্রমাদ গণল তিন গোয়েন্দা। বড় কেশ বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। ওঝা!
বলছি, সরো, আউরোও গলা চড়াল। আমার জরুরি কাজ আছে! শিগগির সরো, নইলে পরে পস্তাবে বলে দিচ্ছি!
দীর্ঘ এক মুহূর্ত দুজনের চোখে চোখ আটকে থাকল। তারপর তিন গোয়েন্দাকে অবাক করে দিয়ে এক পাশে সরে দাঁড়ালেন মেরি চাচী।
জিনার সঙ্গে মিস মারভেলের ঘরে ঢুকল আউরো, পেছনে তিন গোয়েন্দা। ওঝার ওপর ভক্তি বেড়েছে। দুর্ব্যবহার করে মেরি চাচীকে কুপোকাৎ করে দেয়া… আরিব্বাপ রে!
চোখ বন্ধ করে চুপচাপ পড়ে আছে মিস মারভেল। তার পায়ের কাছে এসে ডাকল আউরো। অই, ভূতের বাসা! শুনছ? চাও!
চোখ পিটপিট করে তাকাল মিস মারভেল, শিউরে উঠে গায়ের চাদরটা গলা পর্যন্ত টেনে দিল।
বেটির মাথার তলায় বালিশ দাও, জিনাকে আদেশ দিল আউরো। ওরও দেখা দরকার।
এই যে, দেখো! মূর্তিটা উঁচু করে ধরল আউরো। শয়তানের বাহন।
আবার কেঁপে উঠল মিস মারভেল। বিলিয়াল, বিড়বিড় করল। বিলিয়ালের দূত!
হাহ! অবজ্ঞায় মুখ বাকাল আউরো। অমন কত দূত আছে আমার। যে-কোন একটা পাঠালেই বিলিয়ালের অস্তিত্ব বিনাশ করে দিয়ে আসবে! ঘুরে এসে মূর্তিটা বাড়িয়ে ধরল ওঝা। ধরো! এটা হাতে নাও!
না, না, আমি পারব না। দুহাত নাড়তে লাগল মিস মারভেল।
একশোবার পারবে, কড়া গলায় ধমক দিল আউরো। খপ করে মিস মারভেলের একটা হাত তুলে নিয়ে কাঁপা কাঁপা আঙুলে গুঁজে দিল মূর্তিটা। বাঁচতে চাও? ধরো শক্ত করে!

এই প্রথমবার মিস মারভেলের চোখে আলো ঝিলিক দিয়ে গেল, আশার আলো। মূর্তিটা ধরল শক্ত করে।
ঢোলা গাউনের অসংখ্য পকেটের একটা থেকে সবুজ কাপড়ের থলে বের করল আউরো। ভারি গলায় একটা একটা করে শব্দ উচ্চারণ করল, সবুজ বসন্তের প্রতীক! জীবনের রঙ! থলেটা মিস মারভেলের দিকে বাড়িয়ে ধরে বলল, দাও, সাপটা ঢুকিয়ে দাও এর মধ্যে।
আউরোর চোখ থেকে চোখ না সরিয়ে থলের ভেতরে মূর্তিটা রেখে। দিল মিস মারভেল।
ব্যস, তাড়াতাড়ি থলের মুখ শক্ত, মোটা সুতো দিয়ে বেঁধে ফেলল আউরো। জিনাকে বলল, দরজা বন্ধ করো। মোম জ্বালো! এই, মেয়ে, নড়তে-চড়তে পারো না!
মোমের অভাব নেই ঘরে। সবুজ, নীলচে-লাল, লাল, সাদা, কালো; যত রঙের পাওয়া যায়, সব আছে।
লাল মোম জ্বালো, বলল আউরো। লাল মানে শক্তি।
মোম জ্বলল।
খবরদার! কেউ কথা বলবে না! হুঁশিয়ার করে দিল আউরো।
কেউ বলল না, আউরো ছাড়া। ভাবি কেমন এক গলায় মন্ত্র পাঠ শুরু করল সে, ভাষাটা বিচিত্র, এক বর্ণও বুঝতে পারল না আর কেউ। সবুজ থলেটা মোমের আলোর দিকে উঁচু করে ধরল; একবার জোরে, একবার আস্তে, একবার ফিসফিস করে, তারপরই নাকি সুরে, কী সব। বকবক করল, সে-ই জানে!
মাথা সামনে-পেছনে তালে তালে দোলাচ্ছে ওঝা, বিড়বিড় করতে করতেই ঝট করে সোজা হয়ে গেল হঠাৎ। গুঙিয়ে উঠে বন্ধ করে ফেলল। চোখের পাতা, গড়িয়ে পড়ল মেঝেতে হাতের থলে ছাড়েন।
চোখ বড় বড় করে চেয়ে আছে মিস মারভেল। আউরোর মুখ ফাঁক, গলার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে নানারকম বিচিত্র শব্দ। তারপর সবাইকে অবাক করে দিয়ে শুরু হলো গান, সেই মহাসর্পের গান! ভাল। করে দেখল কিশোর। উঁহু! আউরোর মুখ থেকে আসছে না আওয়াজ! সারা ঘরের বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে বেসুরো সুর, দুর্বোধ্য শব্দ। জবাই করা ছাগলের মত ঝাঁকুনি খাচ্ছে আউরোর দেহ। হঠাৎ গড়াতে শুরু করল। সে সারা ঘরে। একের পর এক রুমাল খুলে পড়ছে মাথা থেকে, হুঁশই নেই যেন। লম্বা জটাগুলোকে মনে হচ্ছে খুলি আকড়ে থাকা এক ঝাক বিষাক্ত সাপ!
গান বাড়ছে, জোরাল হচ্ছে, আরও জোরাল। তীক্ষ্ণ, বাতাস চিরে কান ফুড়ে যেন ঢুকে যাচ্ছে মগজে।

বিছানায় সোজা হয়ে বসেছে মিস মারভেল। বালিশের দরকার পড়ছে না আর। প্রচণ্ড এক ঝাঁকুনি খেয়ে স্থির হয়ে গেল আউরোর শরীর। মেঝের ঠিক মাঝখানে এসে চিত হয়ে পড়েছে। চোখ খোলা, ছাতের দিকে চেয়ে আছে, প্রাণ নেই যেন।
কিশোর! দরজায় করাঘাত হলো। এই, কিশোর, দরজা খোল! হচ্ছে কী ভেতরে! খোল!
গুঙিয়ে উঠল আউরো। উঠে বসল। থলেটা এখনও হাতে ধরা, এত কিছুতেও ছাড়েনি। সেটার দিকে চেয়ে বলল, দেখেছি ওকে। কালো আলখেল্লা পরা এক লোক, ফেকাসে চেহারা, খুব বিপদে পড়েছে। সাপের। পাকে আটকা পড়েছে সে।
কিশোর, খুললি না এখনও! চেঁচিয়ে চলেছেন মেরি চাচী।
উঠে দাঁড়াল আউরো। মিস মারভেলের কাছে গিয়ে থলেটা বাড়িয়ে ধরল, খুলে দেখো।
কাঁপা হাতে বাধন খুলে থলের ভেতরে হাত ঢোকাল মিস মারভেল। বিস্ময় ফুটল চোখে। মূর্তিটা নেই।
বলেছি না, বিলিয়ালের চেয়ে আমার প্রেত ক্ষমতাশালী? এই প্রথম হাসল আউরো। যে পাঠিয়েছে, তাকেই কামড়াতে গেছে মহাসর্প। বিলিয়ালকে ঘুরিয়ে দিয়েছি, জিহাভোকেই আক্রমণ করেছে এখন সে। তোমার আর কোন ভয় নেই।
গিয়ে দরজা খুলে দিল আউরো। কোমল গলায় ডাকল মেরি চাচীকে, এসো, মেয়ে, এসো। আর ভয় নেই। ভূত ভেগেছে।
আশ্চর্য! জিনা বলল। গতরাতে পুরো এক বাটি সুপ খেয়েছে খালা। ঘুমানোর আগে দুধ আর বিস্কুট খেয়েছে। আজ সকালে উঠেই ডিম খেয়েছে দুটো। এই তো, এক ঘণ্টাও হয়নি, খিদে পেয়েছে বলে চিল্লাচিল্লি লাগিয়েছে আবার!
টোস্টার থেকে দুই টুকরো টোস্ট তুলে নিল জিনা। তাতে মাখন মাখাতে মাখাতে বলল, মেরি চাচী না থাকলে কী যে করতাম! জান বেচেছে আমার!
হাসল কিশোর।
আরও দুএকদিন যদি থাকতেন, ট্রেতে টোস্টের প্লেট রাখল জিনা, আর এক গ্লাস দুধ।
দরকার পড়লেই আবার চলে আসবে, কিশোর বলল। ইয়ার্ডে মেলা কাজ পড়ে আছে। চাচীর ধারণা, নিজে হাজির না থাকলে, খালি ফাঁকি দেবে বোরিস আর রোভার। একটু চুপ থেকে বলল, ও, হ্যাঁ, সকালে ক্যাপ্টেন ফ্লেচার এসেছিলেন, লস অ্যাঞ্জেলেসের পুলিশ চিফ।
কোন খবর? কিশোরের দিকে ফিরল জিনা।
বোমা এনেছিল যে, লোকটা এখন জেলে, রবিন জানাল।
ওর মত লোকের উপযুক্ত জায়গা!

ক্যাপ্টেন বললেন, মুসা জানাল, দুএক ঘা খেতেই মুখ খুলে গেছে। লোকটার। হড়হড় করে বলে দিয়েছে সব। ভ্যারাড আর রড ধরা পড়েছে। রাসলারকে কিছু বলেনি পুলিশ; সে সত্যিই জানত না, বোমা মেরে টারনারের দোকান উড়িয়ে দেয়ার তাল করেছে ডাক্তার জিহাভো।
জিহাভো কই? ধরা পড়েনি?
না, ওই একটাই বাকি, কিশোর বলল।
একটা চেয়ারে বসে পড়ল জিনা। জিহাভো ধরা পড়েনি!
টরেনটি ক্যানিয়নের বাড়িতে পায়নি তাকে পুলিশ। সব কিছু ফেলে পালিয়েছে, এমনকী গাড়িটাও ফেলে গেছে। ক্যাপ্টেনের ধারণা, এতক্ষণে সে পগার পার, এক্কেবারে ক্যানাড়ায়।
চেয়ারের পায়ায় গোড়ালি ঠুকতে শুরু করল জিনা। তোমার কী ধারণা?
এখনও তুমি আমাদের মক্কেল। জিহাভো এভাবে পালিয়ে যাবে, আমার বিশ্বাস হয় না।
ঠিক বলেছ, দরজার কাছ থেকে বলে উঠল একটা কণ্ঠ।
চেয়ারেই পাঁই করে ঘুরে গেল জিনা। যার যার জায়গায় পাথর হয়ে গেল যেন ছেলেরা।
হলের দিকে পিছন করে দাঁড়িয়েছে ডক্টর জিহাভো। সেরাতে যেমন দেখেছিল, তেমনি দেখাচ্ছে লোকটাকে, সেই একই পোশাক। তবে কাপড়গুলো এখন ময়লা, কোঁচকানো, ধুলো লেগে আছে। হাতে একটা পিস্তল।
আমি একটা গাধা! বিড়বিড় করে নিজেকে গাল দিল জিনা। দরজা খুলে রেখেছি! যে খুশি ঢুকে পড়তে পারে।
কদিন ধরে তো এ-বাড়ির দরজা খোলা দেখছি, একা তোমার দোষ না, লোকটা বলল। বেশি দোষ তোমার ওই মাথামোটা খালাটার।
বাহ, খবর-টুবর ভালই রাখেন, কিশোর বলল। দেখলেন কোত্থেকে? ওই পাহাড়ের মাথায় লুকিয়ে বসে ছিলেন?
তোমার বুদ্ধি আছে, খোকা, কিশোরের দিকে চেয়ে মাথা সামান্য নোয়াল জিহাভো। ঠিকই ধরেছ। একটা গুহা আছে, ওখানেই লুকিয়ে থেকেছি। বাজে জায়গা!
একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না। আচ্ছা, টরেনটি ক্যানিয়ন থেকে পালালেন কী করে? মুসা জিজ্ঞেস করল। ভ্যারাড় আর রডকে তো পুলিশ ধরে ফেলল।
বাগানের পেছনে ছিলাম। পুলিশের গাড়ি দেখলাম।
ব্যস, অমনি দেয়াল ডিঙিয়ে ঢুকে পড়লেন ঝোপে, না? রবিন বলল। বন্ধুদেরকে বিপদে রেখে।

কথায় আছে না, চাচা আপন প্রাণ বাঁচা! হাসি হাসি ভাবটা হঠাৎ দূর হয়ে গেল জিহাভোর চেহারা থেকে। ওই মাথামোটা মেয়েমানুষটা কোথায়? নিশ্চয় দোতলায়। সিঁড়ির দিকে পিস্তলের ইঙ্গিত করে বলল, চারজনই ওঠো। আমি পেছনে থাকছি।
যাব না, গ্যাঁট হয়ে বসে রইল জিনা।
বোকামি কোরো না, মুসা বলল। ওর হাতে পিস্তল!
আমি কেয়ার করি না। খালার সঙ্গে আর দেখা করতে দিচ্ছি না আমি ওকে, যথেষ্ট করেছে। আস্তে করে উঠে দাঁড়াল জিনা। কোমরে দুহাত রেখে মুখোমুখি হলো জিহাভোর। আমি জানি, তুমি কী চাও। ওই নেকলেসটা। ওটা নেই এখানে, কাজেই, যেতে পারো এবার।
তা হলে কোন ব্যাঙ্কে কিংবা জুয়েলারের দোকানে আছে, শান্ত কণ্ঠে বলল জিহাভো। মিস মারভেল ফোন করে ওটা আনাতে পারবে।
না, ওটা…
জিনা! চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। বোলো না!
জিনার ওপর থেকে চোখ সরে গেল জিহাভোর, নীরবে এক মুহূর্ত দেখল কিশোরকে, তারপর আবার জিনার দিকে ফিরল।
ব্যাঙ্কে নেই, না? জিহাভো বলল। জুয়েলারের দোকানেও না? তা হলে কোথায়? এত দামী একটা জিনিস কোথায় থাকতে পারে? হাত নেড়ে সরে যাওয়ার ইঙ্গিত করল ছেলেদেরকে। তারপর এসে দাঁড়াল জিনার একেবারে সামনে। তুমি জানো।
কোথায়?
পিছিয়ে গেল জিনা। জানি না।
নিশ্চয় জানো, হঠাৎ বাঁ হাতে জিনার কাধ খামচে ধরল জিহাভো। কোথায়?
হাত সরান! চেঁচিয়ে উঠল মুসা। ছাড়ন! ছাড়ন ওকে।
আমি বলব না! জিনাও চেঁচাল। বলব না!
বলবে, কাধ ধরে জিনাকে ঝাঁকাতে শুরু করল লোকটা।
ছাড়ুন বলছি! নইলে ভাল হবে না! রবিনও চেঁচিয়ে উঠল। পিস্তলের জন্যে সামনে বাড়তে সাহস করছে না।
গ্যারাজ থেকে ঘোড়ার উত্তেজিত চিহিহিহি শোনা গেল। জিনা। বিপদে পড়েছে, কল করে জানি টের পেয়ে গেছে কমেট।
আরে! কী ব্যাপার! ভুরু কোঁচকাল জিহাভো।
ঘোড়ার ডাক চেনেন না? খেঁকিয়ে উঠল জিনা।
চিনি, নিশ্চয় চিনি! আনমনে মাথা দোলাল জিহাভো। সারাদিন ঘোড়া নিয়েই থাকো, দিনের মধ্যে অসংখ্য বার গ্যারাজে ঢুকতে দেখেছি। তোমাকে…ওখানেই

বেধে রাখো, না?
চুপ করে রইল সবাই।
গ্যারাজ! বলে উঠল জিহাভো। হ্যাঁ, গ্যারাজেই আছে! ঘোড়াটার অগোচরে কেউ সরাতে পারবে না ওটা। ভাল বুদ্ধি করেছ!
ঝটকা দিয়ে কাধ ছাড়িয়ে নিল জিনা।
বেরোও। আদেশ দিল জিহাভো। সবাই!
আবার ডেকে উঠল ঘোড়া।
বেরোও! ধমকে উঠল জিহাভো। কোথায় রেখেছ হারটা, দেখাও!
না! চোখে পানি এসে গেছে জিনার।
যা বলছে করো, জিনা, কিশোর বলল। তোমার শরীর বুলেটপ্রুফ।
হ্যাঁ, দেখাও, রবিনও বলল। নিয়ে বেশিদূর যেতে পারবে না ও।
সেটা দেখা যাবে, পিস্তল নাচাল জিহাভো।
পেছনের আঙিনায় বেরিয়ে এল ওরা। গ্যারাজের দরজা ফাঁক হয়ে আছে। গিয়ে টেনে পুরো খুলে দিল কিশোর।
কোথায় ওটা? ভুরু নাচাল জিহাভো।
জবাব দিল যেন কমেট, বিরাট মাথাটা ঝাঁকিয়ে জিনার দিকে চেয়ে ডেকে উঠল।
গ্যারাজের ভেতরে চেয়ে আছে জিহাভো। কোথায় আছে! গামলায় নয়, ঘাসের মধ্যে নয়, তা হলে খেয়ে ফেলতে পারে ঘোড়া। তা হলে? ওট বিন...হা হা, ওট বিনের টিনে!
স্থির হয়ে গেল জিনা।
তা হলে ওট বিনেই আছে! জিনার পরিবর্তন লক্ষ করেছে জিহাভো। টিনে।
চারজনকেই গ্যারাজে ঢোকার হুকুম দিল জিহাভো। পেছনে ঢুকল সে। এবার বের করো, জিনাকে বলল, শীতল কণ্ঠস্বর! চালাকির চেষ্টা করলে ঘাড় ভেঙে দেব।
আস্তে করে হাত বাড়াল মুসা, তার দিকে পেছন ফিরে রয়েছে। জিহাভো। ঘোড়ার বাধন খুলতে শুরু করল সাবধানে।
বের করো! ধমকে উঠল জিহাভো। জিনার এক হাত ধরে মুচড়ে নিয়ে এল পিঠের ওপর।
উহ্ উহ্, ব্যথা পাচ্ছি! ছাড়ুন! ককিয়ে উঠল জিনা।
গিঁট খুলে দিয়ে সরে গেল মুসা। ধীরে ধীরে মাথার সঙ্গে কান লেপ্টে ফেলছে আপালুসা।
কমেট, ধরো! আচমকা চেঁচিয়ে উঠল মুসা।

লাফিয়ে পেছনের দুপায়ের ওপর খাড়া হয়ে গেল কমেট। চেঁচিয়ে। উঠল প্রচণ্ড রাগে।
জিনার হাত ছেড়ে দিয়ে এক লাফে সরে দাঁড়াল জিহাভো। খবরদার! পিস্তল তুলল সে ঘোড়ার দিকে।
না, না! বলতে বলতেই জিহাভোর হাতে থাবা মারল জিনা।
বদ্ধ জায়গায় গুলি ফোঁটার বিকট আওয়াজ হলো। মনে হলো, ধসে পড়বে গ্যারাজটা। কারও কোন ক্ষতি করল না বুলেট, মেঝেতে বাড়ি খেয়ে পিছলে গিয়ে বিধল দেয়ালে, আস্তরণ খসিয়ে দিল খানিকটা জায়গার।
কমেটের সামনের পা খটাস করে আবার মেঝেতে পড়েছে। মাথা দোলাল সামনে। মুগুর দিয়ে বাড়ি মারল যেন কেউ জিহাভোকে। উড়ে গিয়ে বাড়ি খেল দেয়ালের সঙ্গে। কিন্তু পিস্তল ছাড়ল না হাত থেকে। আবার তুলতে শুরু করল গুলি করার জন্যে।
এক লাফে কাছে গিয়ে দাঁড়াল কমেট। বড় বড় দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল পিস্তল ধরা হাত। চেঁচিয়ে উঠে হাত থেকে অস্ত্রটা ছেড়ে দিল জিহাভো। খটাস করে মেঝেতে পড়ল পিস্তল। কমেটের পায়ের ফাঁক দিয়ে ঢুকে চট করে ওটা তুলে নিয়ে এল কিশোর।
জিনা! চেঁচিয়ে বলল গোয়েন্দাপ্রধান। ঘোড়াটাকে সরাও!
ছুটে গিয়ে ঘোড়ার গলা পেঁচিয়ে ধরল জিনা। হয়েছে, মেয়ে, এবার ছাড়ো। শান্ত হও।
কামড় ছাড়ল ঘোড়া।
ধপ করে গ্যারাজের কোণে বসে পড়ল মহাগুরু, ক্লান্ত, আহত, বিধ্বস্ত। কাটা জায়গা চেপে ধরল আরেক হাতে। হাঁপাচ্ছে। কোলা ব্যাঙের স্বর বেরোচ্ছে গলা দিয়ে।
চুপচাপ বসে থাকুন, পিস্তল তুলে ধরেছে কিশোর। নিশানা মোটেই ভাল না আমার, তবে এত কাছে থেকে মিস করব না। বাই চান্স বুকে কিংবা কপালে লেগে যেতে পারে।
নীরবে আহত হাত চেপে ধরে বসে রইল জিহাভো।
আমি যাই, দরজার কাছে চলে গেছে রবিন। ক্যাপ্টেনকে ফোন করতে হবে। পাঁচ মিনিটেই পৌঁছে যাবেন।
অত তাড়াহুড়ো না করলেও চলবে, বোলো, খুশি খুশি গলায় বলল কিশোর। কমেটের সামনে দিয়ে পালাতে পারবে না।
জিনা হাসল। বিচিত্র শব্দ করল কমেট।

হাসল না তো! জিনার দিকে তাকাল মুসা। সেদিনই মনে হয়েছিল আমার, ঘোড়া কামড়ায়। মেরি চাচী বললেন, না! ভাগ্যিস কাছে যাইনি! ভয়ে ভয়ে ঘোড়াটার দিকে তাকাল মুসা, নিজের অজান্তেই পিছিয়ে গেল এক পা।

এসো, এসো, তিন গোয়েন্দাকে দেখেই ডাকলেন হলিউডের বিখ্যাত চিত্রপরিচালক ডেভিস ক্রিস্টোফার। তোমাদের জন্যেই বসে আছি। বসো।

বিশাল টেবিলে পড়ে আছে এক গাদা খবরের কাগজ, তার ওপাশে পরিচালকের গলার ওপরের অংশ শুধু দেখা যাচ্ছে। লস অ্যাঞ্জেলেসে বোমা বিস্ফোরণের খবর পড়েছি। জানলাম, রকি বিচের তিনজন কিশোর ছিল তখন ওখানে, আর একটা মেয়ে। সন্দেহ হলো, তোমরা ছাড়া কেউ না। তাই সেক্রেটারিকে বলেছি তোমাদের ডাকতে।

মোটা একটা ফাইল বাড়িয়ে দিল রবিন। ঠিকই অনুমান করেছেন, স্যর, আমরাই ছিলাম।

কোন কেস? ফাইল খুলতে শুরু করলেন চিত্রপরিচালক।

নীরব ঘর, মাঝে মাঝে শুধু ফাইলের পাতা ওল্টানোর শব্দ, গভীর মনোযোগে পড়ছেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। অবশেষে মুখ তুললেন, সব নেই এখানে।

বাকিটুকু বলেনি কিশোর পাশা, রবিন জানাল।

কী মানুষ ওরা! নাক কোচকালেন চিত্রপরিচালক। কিশোর, ধোয়ার ওপরে সাপের ছবি কী করে তৈরি করল, বুঝেছ?

হ্যাঁ, স্যর, মাথা নোয়াল কিশোর। সিনেমা প্রোজেক্টর। রঙিন একটা খেলনা সাপের ফিল্ম তৈরি করেছে। আগুনে কেমিকেল পুড়িয়ে ধোয়া সৃষ্টি করে তাতে ফেলেছে সাপের ছবি। এর জন্যে স্পেশাল গ্লাস ব্যবহার করেছে ওরা। ধোয়ার পর্দার মধ্যে দর্শকদের মনে হয়েছে, জ্যান্ত সাপ দেখেছে। একটু থেমে বলল, তোমাদেরকেও বোকা বানিয়ে ফেলেছিল। পরে ভালমত চিন্তাভাবনা করতেই বুঝে গেছি আসল ব্যাপারটা।

আর গান?

ওটা ভ্যারাডের কাজ। প্রথমে ভেবেছি, টেপরেকার ব্যবহার করেছে। কিন্তু পরে বুঝলাম, যন্ত্র নয়, নিজেই শব্দটা করেছে। ভেনট্রিলোকুইজম। শব্দ আর সুর ব্যবহারের বাহাদুরি আছে তার, স্বীকার করতেই হবে। বিকট গান প্রোজেক্টরের ঝিরঝিরও ঢেকে দিয়েছে। আউরোও এই ব্যাপারে ওস্তাদ।

সে-ও ভেনট্রিলোকুইস্ট?

হ্যাঁ, স্যর। ডক্টর স্মিথের কাছে টেপ করা আছে ভ্যারাডের বিকট গান, সেটা শুনে শুনে প্র্যাকটিস করে নিয়েছে আউরো। মিস মারভেলের। চিকিৎসা করার সময় ব্যবহার করেছে।

আউরো খুব চালাক। মিস মারভেলকে কীভাবে যে বিশ্বাস করিয়ে ছাড়ল! আমি শিওর, তার গাউনের অন্য পকেটে আরেকটা সবুজ থলে ছিল। গড়াগড়ি করার সময় হাত সাফাই করে কোন এক ফাঁকে সাপভরা। থলেটা পকেটে চালান করে দিয়ে, খালি থলেটা বের করে নিয়েছে।
ওঝাদের পুরানো কৌশল, বললেন চিত্রপরিচালক। তা, ডক্টর স্মিথের এত আগ্রহ কেন মিস মারভেল আর প্রেতসাধকের ব্যাপারে, জিজ্ঞেস করেছ?
কুসংস্কারে বিশ্বাসী মানসিক রোগীদের ওপর একটা বই লিখতে যাচ্ছেন তিনি, বলল কিশোর। লস অ্যাঞ্জেলেসে নাকি আজকাল বড় বেশি ছড়িয়ে পড়েছে এসব, লোককে হুঁশিয়ার করে দিতে চান। তাই, ব্ল্যাক ম্যাজিকের গন্ধ পেলেই ছুটে যান তিনি সেখানে, ঝুঁকিও নিতে হয়। অনেক সময়। সাধকরা বাইরের লোককে বৈঠকে ঢুকতে দেয় না, ফলে। লুকিয়ে-চুরিয়ে কাজ সারতে হয় ডক্টরকে। ওরা কী করে না করে, দেখেন; দরকার মনে করলে তাদের কথাবার্তা, মন্ত্র, গান টেপ করে নেন, পরে গবেষণার জন্যে।
ওই কারণেই মিস মারভেলের প্রতি তার আগ্রহ? হ্যাঁ। এতবড় বাড়ি পারকারদের, কাজের লোকও নেই, সুযোগ পেয়ে গেলেন ডক্টর। তাই কাজের লোকের ছদ্মবেশে কাছে কাছে থাকতে চেয়েছেন তিনি। আমরা মাঝখান থেকে গিয়ে পড়ে ভণ্ডুল করে দিয়েছি। সব।
ও না থাকলে বিপদে পড়তে, বললেন চিত্রপরিচালক। গুলি
হ্যাঁ, স্যর, রবিন বলল। তবে মুসা যেদিন দেয়াল থেকে পড়ল, সেদিন বোধহয় ছিলেন না উনি।
হাসলেন পরিচালক। ঠিক। তবে মুসা না থাকলে তোমরাও জিহাভোর হাত থেকে মুক্তি পেতে না। অন্তত নেকলেসটা তো যেতই। ও-ই বুদ্ধি করে কমেটের বাধন খুলে দিয়েছিল।
হাসি ফুটল মুসার মুখে।
হ্যাঁ, একটা ব্যাপার, হাত তুললেন পরিচালক। ওই গ্যারাজের ওপরে বাসা ভাড়া নিতে গেল কেন ডক্টর? তার তো ইউনিভার্সিটির কোয়ার্টারই আছে।
রকি বিচ থেকে বাসাটা কাছে, তাই, বলল কিশোর। জিজ্ঞেস করেছিলাম; তিনি বললেন, ওখান থেকে যখন খুশি চলে আসতে পেরেছেন পারকার হাউসে।
আউরোকে জোগাড় করল কোত্থেকে?
আউরো তার স্ত্রী। জিপসি, ওঝাদের কাজকারবার দেখে দেখে অভ্যস্ত মহিলা। তাই ছদ্মবেশ নিতে আর অভিনয় করতে কোন অসুবিধে হয়নি।
হুম! আচ্ছা, ডক্টর জিহাভোর আসল পরিচয় জানা গেছে?

গেছে, স্যর, জবাব দিল মুসা। নাম্বার ওয়ান ক্রিমিনাল, আসল নাম হগ রিমার। চুরি, জালিয়াতি, বাটপাড়ি, পকেট মারা, সব ব্যাপারে ওস্তাদ। ভ্যারাড আর রড তার সহকারী, অনেক দিন থেকেই। সব কজনের নাম আছে পুলিশের খাতায়। মেকসিকো আর নিউ ইয়র্কের পুলিশ অনেক দিন থেকে খুঁজছে ওদের। টাকার জন্যে সব করতে পারে ব্যাটারা, এমনকী খুনও।
হুঁ। জিনার খালার খবর কী?
ভাল অনেকটা। শিগগিরই নাকি আউরোর সঙ্গে আবার দেখা করতে যাবেন। চিকিৎসা করাতে, রবিন জানাল।
এসব মানুষ নিয়ে ভয়। লোককে অযথা বিপদে ফেলে দেয়।
হ্যাঁ, মিস পলের পা ভাঙার জন্যে তিনি কিছু হলেও দায়ী। তবে প্রায়শ্চিত্ত হয়ে গেছে, যে মানসিক যন্ত্রণায় ভুগছেন! জিনাকে পাঠিয়ে র‍্যামন ক্যাসটিলোর ক্রিস্টাল বলটা কিনিয়েছেন, ওটা উপহার পাঠিয়েছেন মিস পলকে।
ভাল। জিনার কী খবর?
হোস্টেলে চলে যাবে, শিগগিরই। গেলে বাঁচি। ওর তো মুখের ঠিক-ঠিকানা নেই, আর এত মিছে কথা বলতে পারে! ওদিকে শুঁটকি টেরিরও আসার সময় হলো, কোন দিন রেগেমেণে গিয়ে তাকে আমাদের গোপন পথগুলোর খবর জানিয়ে দেবে, কে জানে!
খুব জেদি মেয়ে। এরা কিন্তু একদিক থেকে ভাল হয়। দলে টানতে পারো যদি, দেখো, বিপদের সময় তোমাদের জন্যে দরকার পড়লে প্রাণ দিয়ে দেবে। নিয়ে এলে না কেন ওকেও?
আসার সময় দেখলাম, ঘোড়া নিয়ে সৈকতে চলেছে, তাই আর ডাকলাম না, কিশোর বলল।
এই সুযোগে ঘোড়ায় চড়াটা শিখে নাও না তার কাছে? কাজে লাগবে, দেখো, পরে।
আমি বাদ, স্যর, দুহাত দুদিকে নাড়ল মুসা। আরিব্বাপ রে, যে কামড় মারে! আর লাথি!
মুসার কথার ধরনে হেসে ফেললেন স্বভাবগম্ভীর মানুষটাও।
আজ তা হলে উঠি, স্যর? কিশোর উঠে দাঁড়াল।
মুসা, মিটিমিটি হাসছেন পরিচালক। আইসক্রিম?
উঠে দাঁড়িয়েছিল, বসে পড়ল আবার মুসা। খুশিতে দাঁত বেরিয়ে। পড়েছে। তা, স্যর, আনাতে পারেন!
নিষ্পাপ সুন্দর হাসিতে ভরে গেছে মিস্টার ক্রিস্টোফারের কুৎসিত মুখটা। ইন্টারকমের বোতাম টিপলেন।

ভলিউম ০০২ – রক্তচক্ষু – রকিব হাসান – তিন গোয়েন্দা – কিশোর থ্রিলার

প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৭

পাশা স্যালভেজ ইয়ার্ডে আরেকটি ব্যস্ত দিন। ট্রাক থেকে মাল নামাচ্ছে তিন গোয়েন্দা। ছোট অফিসের বাইরে একটা লোহার চেয়ারে বসে তাদের কাজ দেখছেন মেরি চাচী।

কিশোর, ডেকে বললেন তিনি, মূর্তিগুলো ওই টেবিলটায় রাখিস। দেখিস, ভাঙে না যেন। ভালই কাটতি হবে ওগুলোর, মনে হচ্ছে।

একসঙ্গে অনেক পুরানো মাল নিলামে কিনেছেন রাশেদ পাশা, এক ট্রাক রেখে গেছেন, আরও আনতে গেছেন বোরিস আর রোভারকে নিয়ে।

পুরু করে ক্যানভাস বিছিয়ে তার ওপর যত্ন করে সারি দিয়ে রাখা হয়েছে মূর্তিগুলো। আবক্ষ মূর্তি, শুধু বুক থেকে ওপরের অংশটুকু।

ট্রাকে উঠে মূর্তিগুলো দেখছে তিন গোয়েন্দা। অবাক হয়ে ভাবছে, এগুলো কার দরকার? কে কিনতে আসবে? নিয়ে গিয়ে করবেটা কী? মোটা তেরোটা মূর্তি, বহুদিন অযত্ন-অবহেলায় পড়ে থেকে রঙ চটে গেছে, ধুলো জমেছে পুরু হয়ে।

চারকোনা বনিয়াদের ওপর দাঁড়িয়ে আছে মূর্তিগুলো, প্রতিটির আলাদা আলাদা নাম খোদাই করা রয়েছে: জুলিয়াস সিজার, অকটেভিয়ান, দান্তে, হোমার, ফ্রানসিস বেকন, শেকসপিয়ার, জোরে জোরে পড়ল কিশোর। সব দেখছি বিখ্যাত লোক।

অগাস্টাস অভ পোল্যাণ্ড, রবিন পড়ল। অচেনা। কখনও শুনিনি।

লুথার, বিসমার্ক, আঙুল তুলে দুটো মূর্তি দেখাল মুসা। এসব। নামও শুনিনি।

কিন্তু থিওডর রুজভেল্ট-এর নাম তো শুনেছ, কিশোর বলল। কিংবা ওয়াশিংটন, ফ্র্যাঙ্কলিন আর লিঙ্কন?

নিশ্চয়, মুসা বলল। এসো, ওয়াশিংটনকে দিয়েই শুরু করি। নিচু হয়ে জর্জ ওয়াশিংটনকে তুলে নিল। আউফ! কী ভারি।

মুসা, সাবধান! ডেকে বললেন মেরি চাচী। পায়ের ওপর ফেলো না, দেখো!

আমি নিচে নামছি, তারপর দিও, লাফিয়ে ট্রাক থেকে নামল কিশোর।

দুহাতে মূর্তিটা জাপটে ধরে হাঁটু গেড়ে বসল মুসা। সাবধানে নামিয়ে দিল কিশোরের ছড়ানো বাহুতে। টলে উঠল কিশোর, বাঁকা হয়ে গেল পেছন দিকে। কোনমতে বয়ে এনে টেবিলে ফেলল আমেরিকার প্রথম প্রেসিডেন্টকে। কপালের ঘাম মুছল।

চাচী, হাঁপাতে হাঁপাতে বলল কিশোর, আমরা পারব না। একটা ফেলে দিলে যাবে পঞ্চাশ ডলার। তার চেয়ে বোরিস আর রোভার আসুক।

ঠিক, মাথা ঝোঁকালেন মেরি চাচী। থাক। আসুক ওরা। তোরা জিরিয়ে নে গে, যা।

বেশিক্ষণ জিরাতে পারল না তিন গোয়েন্দা, গেট দিয়ে আরেকটা বড় ট্রাক ঢুকল। গাড়ি চালাচ্ছে রোভার, পাশে বসে আছেন রাশেদ পাশা। ছোটখাট মানুষ, প্রথমেই চোখে পড়ে তার ইয়া বড় গোফ। ট্রাকের পেছনে মালের বোঝার ওপর আরাম করে বসে আছে বোরিস।
প্রথম ট্রাকটার কাছে এনে দ্বিতীয়টাকে রাখল রোভার। তাড়াহুড়ো করে অফিস থেকে বেরিয়ে এলেন মেরি চাচী। ট্রাকে অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে রয়েছে অনেকগুলো পুতুল; দরজিরা পোশাক তৈরি করতে যে ডামি ব্যবহার করে, ওই জিনিস। স্বাভাবিক উচ্চতার মেয়েমানুষের সমান ডামিগুলো ধাতু দিয়ে তৈরি, গলার ওপরে আর কিছু নেই, এক কোপে মুণ্ডু ফেলে দেয়া হয়েছে যেন, পা-ও নেই, দাঁড়িয়ে আছে একটা ধাতব দণ্ডের ওপর। পুরানো আমলের জিনিস, এগুলো আজকাল আর বিশেষ ব্যবহার হয় না।
বোকা হয়ে মূর্তিগুলোর দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইলেন মেরি চাচী। চেঁচিয়ে উঠলেন হঠাৎ, আরে! এগুলো কী এনেছ! মাথা খারাপ হয়েছে তোমার? এক ট্রাক পুরানো ডামি! হায় হায় হায় হায়! সব পয়সা। পানিতে ফেলে এসেছে!
তোমার তাই মনে হচ্ছে? শান্ত কণ্ঠে বললেন রাশেদ পাশা। কম পয়সায় পেলে যে-কোন বাতিল মাল কিনতে তিনি আগ্রহী। জানেন, কোনটাই পড়ে থাকে না ইয়ার্ডে। বিক্রি হয়ে যায়ই। কিশোরের দিকে ফিরলেন। তোর কী মনে হয়?
আমার তো ধারণা বিক্রি হয়ে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল কিশোর। আরচারি ক্লাবের ওরাই এসে কিনে নিয়ে যাবে, তীর ছোঁড়া প্র্যাকটিস করার জন্যে।
হুমম! ধীরে ধীরে মাথা দোলালেন রাশেদ চাচা। নিতে পারে। ভাব, আরও ভেবে দেখ। কাদের কাছে বিক্রি করা যাবে, ভেবে বের কর। তোর কথা ঠিক হলে ফাইভ পারসেন্ট কমিশন তোর। ...তা, হ্যাঁ রে, মূর্তিগুলোর ব্যাপারে কী মনে হয়? খুব ভাল জিনিস কিনেছি, না?
প্রথমে বুঝিনি ওগুলো দিয়ে কী হবে, জবাবটা দিলেন মেরি চাচী। অনেক ভেবে একটা বুদ্ধি বের করেছি। বিজ্ঞাপন দের। বাগানে সাজাতে পারবে লোকে। ফুলের ঝাড়ের ফাঁকে ফাঁকে মন্দ লাগবে না।
খামোকাই তো রেগে যাও, সুযোগ পেয়ে গলার জোর বাড়ল রাশেদ চাচার। আসলে, সব জিনিসই কাজে লাগে।
তাই বলে ওই ডামিগুলো কোন কাজে লাগবে না!
লাগবে, লাগবে। কিশোর ঠিক একটা উপায় বের করে ফেলব, দেখো। এই, রোভার, বোরিস, মূর্তিগুলো নামিয়ে ফেললো। দেখো, ভাঙে টাঙে না যেন। চলটা উঠলেও আর কেউ কিনতে চাইবে না। সাবধানে নামাও।

ছায়ায় গিয়ে বসলেন রাশেদ পাশা, পাইপ বের করে ধরালেন। দুই ব্যাভারিয়ান ভাইয়ের ওপর চোখ। দুজনেই বিশালদেহী, গায়ে ভীষণ। জোর। ভারি মূর্তিগুলোকে এমনভাবে নামাচ্ছে, যেন ওগুলো তুলার পুতুল।
পাহাড়ের মাথায় বিরাট এক পুরানো বাড়িতে ছিল মূর্তিগুলো, বললেন রাশেদ চাচা। বাড়ি না ওটা, আস্ত এক দুর্গ! মালিক নেই, মারা গেছে। পুরানো জিনিসপত্র সব বেচে দিয়েছে, আমি যাওয়ার আগেই সব। সাফ। মূর্তিগুলো, অকাজের ভেবে কেউ নেয়নি। আর কিছু বই। একটা পুরানো সূর্যঘড়ি আর গোটা কয়েক চেয়ার পেয়েছি, বাগানে বসার চেয়ার। কিনে ফেললাম।
মেরি চাচীর সঙ্গে কথা বলছেন চাচা। এই-ই সুযোগ, চুপচাপ ওখান থেকে সরে চলে এল তিন গোয়েন্দা, নিজেদের ওয়ার্কশপে এসে ঢুকল।
সামনে লম্বা ছুটি, কী করে কাটাবে, সেই আলোচনায় বসল ওরা।
কী করি? মুসা বলল। চলো, মরুভূমিতে চলে যাই একদিন। পুরানো পোড়ো শহর দেখব।
তার চেয়ে সাবান কোম্পানির প্রতিযোগিতার ব্যাপারটা নিয়ে ভাবা। যাক, প্রস্তাব রাখল রবিন। জিততে পারলে হাওয়াই থেকে বেরিয়ে আসতে পারব।
আমি ভাবছি... কথা শেষ করতে পারল না কিশোর, তার আগেই মাথার ওপরের লাল আলোটা জলতে-নিভতে শুরু করল।
ফোন এসেছে! চেঁচিয়ে উঠল রবিন।
নিশ্চয় কেউ কোন সমস্যায় পড়েছে, উজ্জ্বল হয়ে উঠল কিশোরের চেহারা।
দুই সুড়ঙ্গের পাইপের মুখের ঢাকনা সরিয়ে ফেলেছে মুসা ইতিমধ্যে। হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে পড়ল তার ভেতর। মোটা একটা গ্যালভানাইজড পাইপকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে জঞ্জালে ঢাকা একটা মোবাইল ট্রেলারের তলায়। ট্রেলারের ভেতরে তিন গোয়েন্দার হেডকোয়ার্টার।
পাইপের শেষ মাথায় আরেকটা ঢাকনা সরিয়ে ট্রেলারের ভেতর ঢুকল মুসা। তার পেছনে অন্য দুজন।
থাবা দিয়ে রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল কিশোর। হালো! কিশোর পাশা। টেলিফোন লাইনের সঙ্গে যুক্ত স্পিকারের সুইচ অন করে দিল।
ধরে থাকো, প্লিজ, ভেসে এল একটা নারীকণ্ঠ। মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফার কথা বলবেন।
মিস্টার ক্রিস্টোফার! তার মানে আরেকটা রহস্যময় কেস!
কিশোর, গমগম করে উঠল চিত্রপরিচালকের ভারি কণ্ঠ, ব্যস্ত? আমার সামনে একজন বসে আছে। তোমাদের সাহায্য চায়। করতে পারবে?
নিশ্চয়, স্যর। সানন্দে। কী সাহায্য চায়?

কেউ একজন মূল্যবান কিছু রেখে গেছে তার জন্যে। কী জিনিস, কোথায় আছে, কিছুই জানে না সে। যদি কাল দশটায় আমার অফিসে আসো, ও থাকবে ওখানে।
দারুণ! চেঁচিয়ে উঠল মুসা। নতুন কেস! সময় কাটবে এবার!
মূল্যবান জিনিস রেখে গেছে! কুটি করল রবিন। কী জিনিস জানে না! কোথায় আছে, তা-ও না! জটিল ব্যাপারই মনে হচ্ছে!
জটিল হলেই তো ভাল, কিশোর বলল। কাজ করে মজা পাওয়া যাবে।
একটা গাড়ি পেলে ভাল হত, আফসোস করল মুসা। এত বড় স্টুডিওতে ওই পুরানো পিকআপ নিয়ে যেতে খারাপ লাগে, ফকির ফকির মনে হয়।
ঠিক আছে, কিশোর বলল, রেন্ট-আ-রাইড অটো রেন্টাল কোম্পানিতে ফোন করছি। রোলস রয়েসটা নিয়ে কাল সকালে হাজির হয়ে যাবে হ্যাঁনসন। ডায়াল শুরু করল সে।
এক সময় বিজ্ঞাপনের বাজি জিতে শোফারসহ একটা গাড়ি তিরিশ দিন ব্যবহারের জন্যে পেয়েছিল কিশোর। বিশাল এক রোলস রয়েস, পুরানো ধাঁচের রাজকীয় গাড়ি, ক্লাসিক্যাল চেহারা। চৌকো, বাক্সের মত দেখতে মূল শরীরটা কুচকুচে কালো। চকচকে পালিশ, মুখ দেখা যায়। মাঝে মাঝে সোনালি রঙের কাজ। প্রকাণ্ড দুটো হেডলাইট।
হালো! বলল কিশোর। ম্যানেজার সাহেব আছেন? প্লিজ, দিন। ...ম্যানেজার সাহেব? আমি কিশোর পাশা। আগামীকাল সকাল সাড়ে নটায় রোলস রয়েসটা দরকার, হ্যাঁ হ্যাঁ, শোফারসহ।
অসম্ভব! কণ্ঠ শুনেই বোঝা গেল বিস্মিত হয়েছে ম্যানেজার। তোমার তিরিশ দিন সেই কবেই শেষ হয়ে গেছে।
ঠিক বলেছে, মুসা বলল। আরও কত তিরিশ দিন পেরিয়ে গেছে। দেবে কেন?
মুসার কথায় কানই দিল না কিশোর। ম্যানেজার সাহেব, আপনি বোধহয় ভুল করছেন। আমার হিসেজে তিরিশ দিন পেরোতে এখনও অনেক দেরি।
কী বলছ! মুসা অবাক। ভুল তো তুমিই করেছ!
মুসার দিকে চেয়ে হাত নাড়ল কিশোর, চুপ করার নির্দেশ।
তুমি ভুল করছ, খোকা, দৃঢ় কণ্ঠে বলল ম্যানেজার।
ম্যানেজার সাহেব, কণ্ঠস্বরে ব্যক্তিত্ব ফোঁটাল কিশোর, শিগগিরই অন্য কথা বলবেন। আমি বিশ মিনিটের মধ্যে আসছি, সামনা-সামনি আলোচনা হবে।
আলোচনার কিছু নেই! রুক্ষ হয়ে উঠল ম্যানেজারের কণ্ঠ। আসতে চাইলে এসো, কিন্তু কোন লাভ হবে না।
থ্যাঙ্ক্যু, বলে রিসিভার নামিয়ে রেখে সঙ্গীদের দিকে ফিরল কিশোর। চলো। শহরতলীতে যাব।

কিন্তু ম্যানেজার ঠিকই বলেছে! প্রতিবাদ করল মুসা। তিরিশ দিন সেই কবে শেষ…
সব সময় তিরিশ দিন পেরোলেই তিরিশ দিন হয় না, রহস্যময় শোনাল কিশোরের কণ্ঠ দুই সুড়ঙ্গের ঢাকনার দিকে এগোল সে।
কিন্তু…
খামোকা তর্ক করছ, মুসা, রবিন বাধা দিল। ও যা ভাল বুঝছে, করুক না। যদি গাড়িটা আবার পাই আমরা, ক্ষতি কী?
সাইকেল নিয়ে ইয়াড থেকে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা। সৈকতের ধার ঘেষে চলে গেছে পথ, ঢুকেছে গিয়ে রকি বিচের একেবারে। অভ্যন্তরে। বায়ে উজ্জ্বল রোদে ঝলমল করছে গাঢ় নীল প্রশান্ত মহাসাগর। দিগন্তের কাছে অনেকগুলো বিন্দু, সব মাছধরা নৌকা। ডানে আকাশ ফুড়ে উঠে যাওয়ার তাল করছে যেন সান্তা মনিকা পর্বতমালা, রুক্ষ, বাদামী।
প্রধান সড়কের এক মোড়ে রেন্ট-আ-রাইড অটো রেন্টাল কোম্পানির বিশাল অফিস। সাইকেল স্ট্যাণ্ডে তুলে রেখে ভিতরে ঢুকল তিন গোয়েন্দা, আগে আগে হাঁটছে কিশোর, দ্বিধাজড়িত পায়ে তাকে অনুসরণ করছে মুসা আর রবিন। ওরা ঠিক জানে, বিফল হয়ে ফিরতে হবে।
অফিসেই রয়েছে ম্যানেজার। লাল চেহারা, কড়া মানুষ, সেটা চেহারাতেই স্পষ্ট। তিন গোয়েন্দাকে দেখে ভারি ভুরু কোঁচকাল। গম্ভীর।
তিরিশ দিন গাড়ির ব্যবহারের কথা ছিল, কোনরকম ভূমিকা করল না ম্যানেজার, করেছ। আবার কী চাই? গুনতে জানো না?
জানি, স্যর, নরম হয়ে বলল কিশোর। আর খুব নিখুঁতভাবে গোনার চেষ্টা করি।
পকেট থেকে নোটবুক বের করে তার ভেতর থেকে বের করল একটা খাম। খাম থেকে ছোট একটা ভাঁজ করা খবরের কাগজের টুকরো বের করে মেলল। জোরে জোরে পড়ল, রাজকীয় রোলস রয়েস ব্যবহারের সুবর্ণ সুযোগ! শোফারসহ অন্যান্য সব খরচ-খরচা কোম্পানির। তিরিশ দিন চব্বিশ ঘণ্টা করে ব্যবহার করা যাবে গাড়িটা, যদি ছোট্ট একটা কাজ করতে পারেন। জারে কটা শিমের বীচি আছে আন্দাজ করে বলতে হবে। রেন্ট-আ-রাইড অটো রেন্টাল কোম্পানি।
ভুরু নাচাল ম্যানেজার। ঠিকই তো আছে। কথার বরখেলাপ করেছি আমরা? তিরিশ দিনের জন্যে গাড়িটা দেয়া হয়েছে তোমাকে; যখন ডেকেছ, পেয়েছ। দিনে-রাতে যখন খুশি।
লেখাটা আরেকবার ভাল করে দেখলে ভাল হত না, স্যর? অনুরোধ করল কিশোর। লেখা হয়েছে, তিরিশ দিন চব্বিশ ঘণ্টা করে ব্যবহার করা যাবে।

গোলমালটা কোথায় দেখলে? রেগে যাচ্ছে ম্যানেজার। চব্বিশ ঘণ্টায় দিন, এটা তো সবাই জানে।
ঠিক বলেছেন, সঙ্গে সঙ্গে কথা ধরল কিশোর। যেটা সবাই জানে, সেটা ঢাকঢোল পিটিয়ে বলার দরকার কী? উল্লেখ করার কোন দরকার ছিল? বললেই চলত, তিরিশ দিনের জন্যে গাড়িটা পাওয়া যাবে।
ইয়ে...মানে... তোতলাতে শুরু করল ম্যানেজার, একটু যেন। ঘাবড়ে গেছে। মানে, আমি পরিষ্কার করে সব বলতে চেয়েছিলাম।
তা চেয়েছেন, মাথা ঝাঁকাল কিশোর। কিন্তু আমার কাছে। অন্যরকম লাগছে। আমি ধরে নিচ্ছি চব্বিশ ঘণ্টা করে তিরিশ দিন, তার মানে তিরিশ গুণন চব্বিশ। এখন আমার হিসেবে, আবার নোটবই খুলল। সে, আমি গাড়িটা ব্যবহার করেছি মোট সাতাত্তর ঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট, মানে তিন দিনের কিছু বেশি। তা হলে, আরও প্রায় সাতাশ দিন থেকে যাচ্ছে।
হাঁ হয়ে গেছে মুসা আর রবিন। কিশোরের কথা উড়িয়ে দেয়ার উপায় নেই। অযৌক্তিক কিছু বলছে না সে।
কথা হারিয়ে ফেলেছে ম্যানেজার। রাগে লাল চেহারা আরও লাল হয়ে উঠেছে।
অসম্ভব! হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল সে। ওরকম কিছু বলিনি আমি! ওটা একটা কথা হলো নাকি?
সেজন্যেই তো, স্যর, শান্ত রয়েছে কিশোর, যা বোঝানো দরকার ঠিক তা-ই বলা উচিত। কথা বড় খারাপ জিনিস, একটু এদিক-ওদিক হলেই...। এই যে, দেখুন না, এখানে আপনি বোঝাতে চেয়েছেন...
না, আমি চাইনি! গর্জে উঠল ম্যানেজার। আমার সবচেয়ে ভাল গাড়িটা তোমাকে সারাজীবনের জন্যে দিয়ে দেব ভাবছ! বিজ্ঞাপনে কী লেখা আছে না আছে, কেয়ার করি না আমি। তিরিশ দিন বলেছি, তিরিশ দিনের জন্যে দিয়েছি। সময়সীমা শেষ। যাও।
কিন্তু আমরা তো ছিলামই না রকি বিচে, প্রতিবাদ করল এবার রবিন। তিরিশ দিন কী করে ব্যবহার করলাম? কোনরকম ফাঁক না দিয়ে তিরিশ দিন ব্যবহার করতে হবে, এটাও তো লেখেননি। এ-ও তো ধরে নিতে পারি, বছরে একদিন করে আগামী তিরিশ বছর পাব আমরা গাড়িটা। নাকি?
এই নতুন আঘাতে থতমত খেয়ে গেল ম্যানেজার। না...তা...! মাথা কাত করল সে। আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি একটা প্রস্তাব দিচ্ছি। আর দুবার গাড়িটা পাবে তোমরা। তবে কথা দিতে হবে, এরপর আর কখনও জ্বালাতে আসবে না। দুবার, ঠিক আছে?

জোরে নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। খুব নিরাশ হয়েছে যেন। ঠিক আছে, কী আর করা! আপনাদের গাড়ি, জোর করে তো আর নিতে পারব না। রাজি, দুবারেই রাজি। রবিন, চলো, যাই। ম্যানেজারের দিকে ফিরল। আবার সে। কাল সকাল সাড়ে নটায় চাই একবার। পাওয়া যাবে?
যাবে। যাও।
চুপচাপ বেরিয়ে ফোঁসস করে শ্বাস ফেলল মুসা। রাজি হলে কেন? ব্যাটা আটকে গিয়েছিল, চাপ দিলেই কাজ হয়ে যেত।
না-ও হতে পারত, কিশোর বলল। হয়তো কোর্টে নালিশ করতে বলত আমাদেরকে। বিচারে ঠকে যেতাম আমরা। তিরিশ দিন চব্বিশ ঘণ্টা করে ওই তিরিশ দিনকেই বোঝায়।
কিন্তু মাত্র দুবার ব্যবহার করলেই বা কী, আর না করলেই বা কী?
তাই বা কম কীসে? গাড়িটা তো আর আমাদের সম্পত্তি না। সুর করে বলে উঠল কিশোর, সামনে যা পাও হাত পেতে নাও, বাকির খাতা শূন্য থাক। চরণ দুটো ইংরেজিতে আবার অনুবাদ করে বলল সে।
তার মানে যা পেলাম, তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে বলছ? মুসা বলল। হ্যাঁ। কে জানে, নতুন কোন উপায় বেরিয়েও যেতে পারে। হয়তো আরও অনেক দিন অনেক বার গাড়িটা ব্যবহারের সুযোগ পেয়েও যেতে পারি আমরা। আগামীকাল মিস্টার ক্রিস্টোফারের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি, প্যাসিফিক স্টুডিওতে পুরানো পিকআপ নিয়ে যেতে হচ্ছে না, এতেই খুশি আমি। ভাবছি, কী রহস্য ওখানে অপেক্ষা করছে আমাদের জন্যে!
এসো, এসো, তিন গোয়েন্দাকে দেখেই ডাকলেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। পরিচয় করিয়ে দিই। বিশাল টেবিলের ধারে চেয়ারে বসা এক কিশোরকে দেখালেন তিনি। ও অগাস্ট অগাস্ট, ব্রিটিশ। অগাস্ট, এই আমাদের তিন গোয়েন্দা। ও কিশোর পাশা, বাড়ি বাংলাদেশ। ও মুসা আমান, আদিবাস ছিল আফ্রিকায়, এখন আমেরিকার নাগরিক। আর এ হলো রবিন মিলফোর্ড, এ-ও খাঁটি আমেরিকান নয়, আইরিশ রক্ত রয়েছে, তার মানে তোমার আর আমার বাড়ির কাছের লোক।
এক এক করে চেয়ার টেনে বসল তিন গোয়েন্দা। উঠে এসে হাত বাড়িয়ে দিল ইংরেজ কিশোর। লম্বা তাল পাতার সেপাই, পাতলা চুল খুব লম্বা করে রেখেছে। চোখা উঁচু নাকের ঠিক মাঝখানে বসে আছে। হরিমড গ্লাসের চশমা। তোমাদেরকে পেয়ে খুব খুশি হয়েছি। একে একে হাত মেলাল তার সমবয়েসী তিন কিশোরের সঙ্গে। বন্ধুরা আমাকে গাস বলে ডাকে, অগাস্টের সংক্ষেপ আরকী, তোমরাও তাই ডাকবে।

আবার তার চেয়ারে গিয়ে বসল অগাস্ট। আশা করছি, তোমরা আমাকে সাহায্য করতে পারবে। আমার দাদার ভাই, মানে আমার আরেক দাদা, হোরাশিও অগাস্ট, এই কিছুদিন আগে মারা গেছে। তার উকিল আমাকে একটা চিঠি পাঠিয়েছে, চিঠিটার মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারছি না।
আমিও না, মাথা নাড়লেন চিত্রপরিচালক। অথচ হোরাশিও অগাস্টের ধারণা, তার নাতি সেটা বুঝতে পারবে। অগাস্ট, ওদেরকে দেখাও চিঠিটা।
পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে সেটা থেকে একটা কাগজ নিয়ে সাবধানে ভাজ খুলল অগাস্ট। কাঁপা হাতের লেখা রয়েছে তাতে। নাও, কিশোরের দিকে বাড়িয়ে ধরল সে চিঠিটা। দেখো, কিছু বুঝতে পারো কিনা।
দুপাশ থেকে রবিন আর মুসাও ঝুঁকে এল চিঠিটার ওপর।
লেখা রয়েছে:
আমার নাতি, অগাস্ট অগাস্ট
অগাস্ট তোমার নাম, অগাস্ট তোমার খ্যাতি, অগাস্ট তোমার সৌভাগ্য। পাহাড়-প্রমাণ বাধাকেও বাধা মনে করবে না; তোমার জন্মতারিখের ছায়াতেই ওর অস্তিত্ব।
গভীরে খোঁড়ো; আমার কথার অর্থ শুধু তোমার জন্যেই। স্পষ্ট করে বলতে পারছি না, তা হলে অন্যরা বুঝে ফেলবে। ওটা আমার, ওটার জন্যে মূল্য দিয়েছি, ওটার মালিক হয়েছি, অথচ ওটার ভয়ে অস্থির আমি।
তবে পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে গেছে, অর্ধশতাব্দী পর নিশ্চয় ওটার পঙ্কিল ক্ষমতা দূর হয়েছে কিন্তু তবু ওটাকে জোর করে কিংবা ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে দখল করার উপায় নেই; ওটা হয় কিনতে হবে, কিংবা কারও কাছ থেকে উপহার পেতে হবে, কিংবা খুঁজে বের করতে হবে।
সাবধান থেকো। সময় খুব মূল্যবান। ওটা আর আমার সব ভালবাসা তোমাকে দিয়ে গেলাম।-হোরাশিও অগাস্ট।
বাবা রে বাবা! ঠোঁট ওল্টাল রবিন। চিঠি বটে!
ইংরেজি না তো, গ্রিক! বিড়বিড় করল মুসা। পঙ্কিল ক্ষমতা মানে কী?
হতে পারে, খারাপ কোন ক্ষমতা, রবিন বলল। হয়তো ক্ষতি। করার ক্ষমতা বা ওই জাতীয় কিছু বোঝানো হয়েছে।
চুপচাপ চিঠিটা হাতে নিয়ে বসে আছে কিশোর, নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে, তার মানে গভীর ভাবনা চলছে তার মাথায়। আস্তে করে কাগজটা আলোর দিকে তুলে ধরল, লুকানো সাঙ্কেতিক লেখা আছে কিনা খুজছে।
নেই, কিশোর, বললেন পরিচালক। প্রথমেই ওকথা ভেবেছি। স্টুডিওর টেকনিক্যাল এক্সপার্ট দিয়ে পরীক্ষা করিয়েছি। অদৃশ্য কালি দিয়ে গোপন কিছু

লেখা হয়নি। চিঠিটাই লেখা হয়েছে সাঙ্কেতিক ভাষায়। যে উকিল এটা অগাস্টের কাছে পাঠিয়েছে, সে জানিয়েছে, মৃত্যুর কয়েক দিন আগে নাকি চিঠিটা লিখেছিলেন হোরাশিও অগাস্ট। উকিলের হাতে চিঠি দিয়ে তাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, সময় এলে যাতে এটা তার নাতির কাছে পাঠানো হয়! তার মানে, যা কিছু বলার এই চিঠিতেই বলেছেন হোরাশিও। তো, কিছু বুঝলে?

ইয়ে, সাবধানে বলল কিশোর, একদিক থেকে, বলতে গেলে চিঠির মানে খুব পরিষ্কার।

পরিষ্কার! কোথায় রয়েছে ভুলে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠল মুসা। তুমি বলছ পরিষ্কার! আমার কাছে ওটা অমাবস্যার অন্ধকার!

শুনলই না যেন কিশোর। ধ্যানমগ্ন হয়ে তাকিয়ে আছে চিঠিটার দিকে। হঠাৎ মুখ তুলল। একটা ব্যাপার একেবারেই স্পষ্ট, মিস্টার হোরাশিও অগাস্ট এই চিঠির মানে তার নাতি ছাড়া আর কাউকে বুঝতে দিতে চাননি। কিছু একটা লুকিয়ে রেখেছেন তিনি, গত পঞ্চাশ বছর ধরে। মহামূল্যবান কিছু একটা। আর কেউ জানলে চুরি করে নিয়ে যেতে পারে, সেই ভয়ে নিজের নাতিকেও খুলে বলতে পারেননি, কোথায়। রেখেছেন জিনিসটা। এটুকু পরিষ্কার।

হ্যাঁ, তা বটে, মাথা দোলাল মুসা। কিন্তু বাকিটা কাদা-পানির মতই ঘোলা।

হয়তো, আগের কথার খেই ধরল কিশোর, কিছু কথার গভীর মানে আছে। বাকি কথাগুলো একেবারেই ফালতু, লোককে বিপথে সরানোর জন্যে। গোড়া থেকেই শুরু করি: অগাস্ট তোমার নাম।

হ্যাঁ, সায় দিল অগাস্ট। আর অগাস্ট আমার খ্যাতি, সেটাও এক অর্থে ঠিক। অদ্ভুত নামের জন্যে স্কুলে প্রায়ই টিটকারি শুনতে হয় আমাকে, স্কুলের সবাই একডাকে চেনে।

বুঝলাম, রবিন বলল। কিন্তু অগাস্ট তোমার সৌভাগ্য, এর মানে কী?

আমিও তাই ভাবছি, কিশোর বলল। এক হতে পারে, অগাস্ট মাসের মধ্যে অগাস্ট তার জিনিসটা খুঁজে পাবে, এটাই বোঝাতে চেয়েছেন, কিন্তু অগাস্ট না বলে অগাস্টে তোমার সৌভাগ্য বললেই ঠিক হত না?

হুমম! ভাল কথা ধরেছ, বললেন চিত্রপরিচালক। এমনও হতে পারে, তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে যা এসেছে কলমের মাথায়, লিখে ফেলেছেন।

মাথা নাড়ল গোয়েন্দাপ্রধান। উঁহু! তা হতেই পারে না। ভেবেচিন্তে খুব সাবধানে লেখা হয়েছে। এখনও ঠিকমত মানে বুঝতে পারছি না। আমরা, তাই উল্টোপাল্টা মনে হচ্ছে।

আর দুদিন পরেই আমার জন্মদিন, অগাস্ট বলল, ছতারিখে। অগাস্টের গোড়াতে জন্মেছি বলেই আমার নাম অগাস্ট রেখেছে আমার বাবা। বলে: অগাস্টে জন্মে

যে, তার নামও হবে অগাস্ট। দাদার লেখা কিংবা বাবার কথার সঙ্গে আমার জন্মদিনের কোন সম্পর্ক নেই তো?
কথাটা ভেবে দেখল কিশোর।
জানি না, বলল সে। হতে পারে, তোমার জন্মদিন খুব কাছে বলেই চিঠিতে লেখা হয়েছে, সময় খুব মূল্যবান।
খাইছে! আঁতকে উঠল যেন মুসা। এই ঘোর রহস্যের কিনারা মাত্র দুদিনে! তা হলেই হয়েছে!
তুমি থামো তো, বিরক্ত হয়ে বলল রবিন। ওকে বলতে দাও।
চিঠির দিকে চেয়ে আছে কিশোর। দ্বিতীয় বাক্যটা: পাহাড়-প্রমাণ বাধাকেও বাধা মনে করবে না; তোমার জন্মতারিখের ছায়াতেই ওর অস্তিত্ব। প্রথম অর্ধেকটা বলছে, কিছুতেই পিছিয়ে আসবে না, কিন্তু শেষ অর্ধেকটা? নাহ, বোঝা যাচ্ছে না।
আসলে, আমার জন্মের একটা ছায়া আছে, অগাস্ট বলল। কালো ছায়া বলতে পারো। আমাকে জন্ম দিয়েই মারা যায় আমার মা। এটাই হয়তো বোঝাতে চেয়েছে দাদা।
হয়তো, কিশোরের কণ্ঠে সন্দেহ। তবে খাপে খাপে মিলছে না। পরের বাক্যটা: গভীরে খোঁড়ো; আমার কথার অর্থ শুধু তোমার জন্যেই। তার মানে, এই মেসেজ শুধু তোমার জন্যেই, ভালমত ভেবেচিন্তে এর মানে বের করো। কিন্তু গভীরে খোঁড়ার মানে কী? তারপরের বাক্য: স্পষ্ট করে বলতে পারছি না, তা হলে অন্যরা বুঝে ফেলবে। এটা খুব পরিষ্কার কথা।
হ্যাঁ, সায় দিলেন পরিচালক। কিন্তু তারপরের বাক্যটা? ওটা আমার, ওটার জন্যে মূল্য দিয়েছি, ওটার মালিক হয়েছি, অথচ ওটার ভয়ে অস্থির আমি। এর কী মানে?
মিস্টার হোরাশিও বলেছেন, কিশোর বলল, জিনিসটা তাঁর সম্পত্তি, ওটা নাতিকে দেয়ার ক্ষমতা তার আছে। কিন্তু কোন কারণে জিনিসটার ব্যাপারে তার একটা ভয়ও আছে, দারুণ ভয়!
জোরে জোরে পড়ল কিশোর, তবে পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে গেছে, অর্ধশতাব্দী পর নিশ্চয় ওটার পঙ্কিল ক্ষমতা দূর হয়েছে। কিন্তু তবু ওটাকে জোর করে কিংবা ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে দখল করার উপায় নেই; ওটা হয় কিনতে হবে, কিংবা কারও কাছ থেকে উপহার পেতে হবে, কিংবা খুঁজে বের করতে হবে। মুসা আর রবিনের দিকে তাকাল সে। কিছু বুঝেছ?
মুসা বলল, মিস্টার হোরাশিও বলছেন, জিনিসটা পঞ্চাশ বছর ধরে আছে তার কাছে। এতদিনে ওটা বিশুদ্ধ হয়ে গেছে, লোকের ক্ষতি করার ক্ষমতা হারিয়েছে।

তা হলে ওটাকে বিপজ্জনক কেন মনে করেছেন মিস্টার হোরাশিও? রবিন প্রশ্ন রাখল। কেন বলছেন: ওটাকে জোর করে কিংবা ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে দখল করা যাবে না? কেন সাবধানে থাকার জন্যে হুশিয়ার করছেন গাসকে? আরও একটা ব্যাপার, সময়ের ওপর জোর দিয়েছেন তিনি। কেন? সাবধানেও থাকতে বলছেন, একই সঙ্গে তাড়াহুড়োও করতে বলছেন।
শেষ লাইন, কিশোর পড়ল, ওটা আর আমার সব ভালবাসা তোমাকে দিয়ে গেলাম। মুখ তুলল সে। মেসেজ শেষ। কিছু কিছু বোঝা গেল, কিন্তু শুরুতে যে অন্ধকারে ছিলাম, সে-অন্ধকারেই রয়েছি।
অমাবস্যার অন্ধকার, আগেই বলেছি, মুসা বিড়বিড় করল।
মিস্টার হোরাশিও অগাস্টের সম্পর্কে ভালমত জানা দরকার, অগাস্টের দিকে ফিরল কিশোর। গাস, তোমার দাদা কেমন মানুষ ছিলেন?
জানি না, মাথা নাড়ল ইংরেজ কিশোর। কখনও দেখিনি। পরিবারের রহস্যময় লোক সে। ছেলেবেলায় বাড়ি থেকে পালিয়েছিল, এক সওদাগরী জাহাজে চেপে পাড়ি জমিয়েছিল দক্ষিণ সাগরে। কিছুদিন পর একটা চিঠি এল তার, তারপর নিয়মিত কয়েকটা। শেষে হঠাৎ করেই একদিন চিঠি আসা বন্ধ হয়ে গেল। পরিবারের সবাই ধরে নিল, জাহাজ ডুবে কিংবা অন্য কোন দুর্ঘটনায় মারা গেছে হোরাশিও। অনেক দিন পর আবার তার খবর পেয়ে চমকে উঠল আমার বাবা। হলিউডের এক উকিলের কাছ থেকে চিঠি এল: জনাব হোরাশিও অগাস্ট এই কদিন আগে মারা গেছেন। তাঁর নাতি অগাস্ট অগাস্টের জন্যে কিছু তথ্য আর সম্পদ রেখে গেছেন। উকিলের চিঠির সঙ্গেই এই সাঙ্কেতিক চিঠিটা ছিল।
চিঠি পেয়েই ইংল্যাণ্ড থেকে চলে এসেছ? কিশোর জিজ্ঞেস করল।
যত তাড়াতাড়ি পেরেছি, অগাস্ট জানাল। প্লেনে এলে আরও অনেক আগে আসতে পারতাম। কিন্তু টাকা নেই বাবার। অনেক চেষ্টা করে শুধু একজনের জাহাজ ভাড়া জোগাড় করেছে, তাই আমি একা এসেছি। কয়েক হপ্তা লেগেছে আসতে। চিঠিটা পেয়েছি প্রায় দুমাস
এসেই নিশ্চয় উকিলের সঙ্গে দেখা করেছ?
মাথা নাড়ল অগাস্ট। এসে ফোন করেছি, কিন্তু উকিল তখন শহরের বাইরে, তাই দেখা করতে পারিনি। আজ করার কথা। আমেরিকায় কাউকে চিনি না আমি আঙ্কলকে ছাড়া, মিস্টার ক্রিস্টোফারকে দেখাল অগাস্ট। বাবাও বিশেষ কাউকে চেনে না। সব শুনে আঙ্কলই তোমাদের কথা বললেন, তোমাদের সাহায্য চাইতে বললেন।
মনে হচ্ছে, কিশোর বলল, তোমার সঙ্গে আমাদেরও উকিলের কাছে যাওয়া দরকার। তোমার দাদার ব্যাপারে জানা খুব জরুরি। কোন না কোন শত্রু পেয়ে

যেতে পারি।
ঠিকই বলেছ, মাথা কাত করলেন পরিচালক। গাস, ওরা তোমাকে সাহায্য করবে। আর আমি তো আছিই। তো, এখন যাও, তোমাদের কাজ শুরু করো গিয়ে। আমারও জরুরি কয়েকটা কাজ আছে, একটা ফাইল টেনে নিলেন তিনি।
ছেলেদেরকে দেখেই রাজকীয় রোলস রয়েস থেকে বেরিয়ে এল। দীর্ঘদেহী ইংরেজ শাফার, হ্যাঁনসন। দরজা খুলে ধরল।
পকেট থেকে আরেকটা চিঠি বের করল অগাস্ট। তাতে হলিউডের সেই উকিলের নাম আর ঠিকানা রয়েছে। শহরতলীর একটা, ঠিকানা, উকিলের নাম রয় হ্যামার।
কোথায় যেতে হবে হ্যাঁনসনকে বলল কিশোর। নিঃশব্দে ছুটে চলল বিশাল রোলস রয়েস।
নানারকম আলোচনা চলল চার কিশোরের মাঝে। বেশিরভাগ প্রশ্ন করছে অগাস্ট; আমেরিকা, বিশেষ করে হলিউডের ব্যাপারে জানতে চাইছে সে, জবাব দিচ্ছে তিন গোয়েন্দা।
চওড়া রাস্তা ছেড়ে সরু একটা গলিপথে গাড়ি নামিয়ে আনল হ্যাঁনসন। পুরানো ধাঁচের ছোট একটা পুরানো বাড়ির সামনে এসে থামল।
হুমম! বাড়িটার দিকে চেয়ে গম্ভীর হয়ে গেছে কিশোর। চিন্তিত ভঙ্গিতে নামল গাড়ি থেকে। বেশি পুরানো। উকিল সাহেব বাড়িতেই অফিস করে, মনে হচ্ছে।
দরজার পাশে বেলের সুইচের গা ঘেঁষে বসানো হয়েছে একটা নেমপ্লেট। তাতে লেখা:
রয় হ্যামার
অ্যাটর্নি-অ্যাট-ল।
বেল বাজিয়ে ঢুকে পড়ন। বোতাম টিপল কিশোর। বেলের শব্দ শোনা গেল। নির্দেশ দেয়া আছে, কাজেই দরজা খুলে ঢুকে পড়ল সে, তার পেছনে অন্য তিনজন।
বসার ঘরটাকে অফিস বানিয়েছে হ্যামার। বড় একটা টেবিল, অনেকগুলো বুকশেলফে মোটা মোটা আইনের বই, আর কয়েকটা ফাইল কেবিনেট, তাতে ফাইল। একটা কেবিনেট খোলা, টেবিলে অগোছালোভাবে পড়ে রয়েছে একটা ফাইল, কাগজপত্র এলোমেলো। টেবিলের পাশে উল্টে পড়ে আছে একটা চেয়ার। উকিল নেই ঘরে।
কিছু একটা ঘটেছে, চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। গোলমাল! গলা। চড়িয়ে ডাকল, মিস্টার হ্যামার! মিস্টার হ্যামার! কোথায় আপনি?
সাড়া নেই। রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে ছেলেরা।
আবার ডাকল কিশোর।

এইবার সাড়া মিলল। অনেক দূর থেকে যেন ভেসে এল চাপা জবাব, ভাল করে কান না পাতলে শোনাই যেত না।
বাঁচাও! বাঁচাও! আমার দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে!
আমাকে বাঁচাও! আবার শোনা গেল চাপা কণ্ঠ। আমি মরে যাচ্ছি!
ওই যে! উল্টো দিকের একটা দেয়াল আলমারির দরজা খোল মুসা, দুটো বুকশেলফের মাঝখানে দরজাটা। স্প্রিঙ লক লাগানো, পাল্লা ভেজিয়ে দিলে আপনাআপনি লেগে যায় এই তালা, ভেতর থেকে খোলা যায় না। নব ধরে মোচড় দিল মুসা, টান দিতেই হা হয়ে খুলে গেল পাল্লা।
আলমারির মেঝেতে বসে রয়েছে ছোট্ট একজন মানুষ, হাঁ করে জোরে জোরে দম নিচ্ছে। সোনালি ফ্রেমের চশমায় সুতো বাধা, এক কান থেকে ঝুলছে চশমাটা। টাইয়ের নট ঢিলে, ঘাড়ের ওপর উঠে গেছে, বাঁকা হয়ে আছে টাই। সাদা চুল এলোমেলো।
আহ, বাঁচালে আমাকে! ফিসফিস করে বলল লোকটা। ধন্যবাদ! ধরো, তোলো আমাকে, প্লিজ!
আলমারির অপরিসর জায়গা থেকে লোকটাকে বের করে আনল। মুসা আর রবিন, দাঁড়াতে সাহায্য করল।
উল্টে থাকা সুইভেল চেয়ারটা তুলে জায়গামত রাখল কিশোর। চেয়ারটা সোজা করেই ক্ষণিকের জন্যে স্থির হয়ে গেল, বিস্ময় ফুটল চেহারায়।
আশ্চর্য! আপনমনেই বিড়বিড় করল সে।
ধরে ধরে এনে লোকটাকে চেয়ারে বসিয়ে দিল ছেলেরা। গভীরভাবে কয়েকবার শ্বাস টানল সে। কাঁপা হাতে টাই ঠিক করল, চশমা বসাল নাকে।
ঠিক সময়ে এসে পড়েছ! গলা কাঁপছে এখনও তার। আরেকটু দেরি করলেই...! শিউরে উঠল সে।
আপনি নিশ্চয় মিস্টার রয় হ্যামার, বলল রবিন। এক এক করে চার কিশোরের ওপরই নজর বোলাল লোকটা। মাথা কেঁকাল। হ্যাঁ। চোখ পিটপিট করল। কিন্তু তোমরা?
আমি অগাস্ট অগাস্ট, স্যর, এগিয়ে এসে পরিচয় দিল ইংরেজ কিশোর। আজ আপনার সঙ্গে দেখা করার ডেট দিয়েছেন।
ও, হ্যাঁ, আবার মাথা ঝোকাল উকিল। এরা তোমার বন্ধু, না?
এতে আমাদের পরিচয় পাবেন, স্যর, তিন গোয়েন্দার একটা কার্ড বাড়িয়ে ধরল কিশোর।
গোয়েন্দা! কার্ডটা পড়ে অবাক হয়েছে হ্যামার।
আমাকে সাহায্য করতে রাজি হয়েছে ওরা, অগাস্ট বলল।

তাই? আবার চোখ পিটপিট করল উকিল। আরেকবার তাকাল কার্ডটার দিকে। সুন্দর! খুব সুন্দর!
চুপ করে রইল গোয়েন্দারা। অগাস্টও।
তা হলে তোমরা গোয়েন্দা! বিড়বিড় করল উকিল। খুব ভাল, খুব ভাল। যার যা হওয়ার ইচ্ছে, ছোটবেলা থেকে সে-পথে যাওয়াই ভাল। ...হায় হায়! হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল সে। আসল কথাই ভুলে গেছি! ব্যাটারা, ব্যাটারা আমাকে আটকে রেখেছিল!
লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল উকিল। চারপাশে চোখ বোলাতে গিয়ে খোলা কেবিনেটটার ওপর দৃষ্টি আটকাল। হায় হায়! আমার ফাইল, গোপন কাগজপত্র! হারামজাদা আমার ফাইল ঘেঁটেছে। কী জানি নিল! আর এটা এখানে কেন! টেবিলের ফাইলটার দিকে আঙুল তুলল সে। আমি তো রাখিনি!
ফাইলের ওপর এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল উকিল, দ্রুত পাতা উল্টে চলল; দেখছে, কোন্ কাগজটা নেই।
তোমার দাদার ফাইল এটা, অগাস্টকে বলল হ্যামার। বিশ বছর ধরে ওঁর উকিল ছিলাম। ওঁর সম্পর্কে যত কাগজপত্র, সব এই ফাইলে রেখেছি। এটার প্রতি আগ্রহ হবে কেন! ...মেসেজ, চেঁচিয়ে উঠল উকিল, মেসেজটা নিয়ে গেছে!
অগাস্টের দিকে তাকাল হ্যামার। তোমাকে যে চিঠিটা পাঠিয়েছি, তার নকল! নিয়ে গেছে! ...লেখাটা আগাগোড়াই অবশ্য অর্থহীন মনে হয়েছে আমার কাছে। তবু একটা কপি করে রেখেছিলাম। কেবিনেটে রেখেছি ফাইল, এর চেয়ে সাবধান আর হয় মী করে লোকে! কিন্তু দেখলে তো, গেল চুরি হয়ে!
কী হয়েছিল, স্যর, খুলে, বলবেন? এতক্ষণে আবার কথা বলল কিশোর। ব্যাপারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে!
কাগজগুলো গুছিয়ে ঠিকঠাক করে ফাইলটা আবার কেবিনেটে রাখল উকিল। ড্রয়ার ঠেলে লাগিয়ে তালা আটকে দিল। তারপর বসল আবার চেয়ারে।
রয় হ্যামারের বক্তব্য: ডেস্কে বসে কাজ করছিল সে, এই সময় কোনরকম সাড়া না দিয়ে দরজা খুলে একটা লোক এসে ঘরে ঢুকল। মাঝারি উচ্চতা, কালো পুরু গোঁফ, চোখে ভারি পাওয়ারের চশমা। উকিল মুখ খোলার আগেই দুই লাফে কাছে চলে এল আগন্তুক, থাবা দিয়ে হ্যামারের নাকের ওপর থেকে চশমা ফেলে দিল, ধাক্কা দিয়ে তাকে চেয়ারসহ উল্টে ফেলল মেঝেতে, তারপর টেনে নিয়ে গিয়ে ভরল আলমারিতে। বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিল, আপনাআপনি লেগে গেল অটোমেটিক তালা।
প্রথমে, দরজায় ধাক্কাধাক্কি করে হ্যামার, চেঁচামেচি করে, সাহায্য চায়। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরেই বুঝতে পারল, শক্তি আর আলমারির ভেতরের অক্সিজেন

ক্ষয় করছে বৃথাই। বাড়িতে কোন চাকর-বাকর কিংবা আর কেউ নেই যে তার চিৎকার শুনবে। তাই চুপ করে গেল।
কয়েক মিনিট পর বাইরে বেরোনোর দরজা খোলা এবং বন্ধ হওয়ার আওয়াজ শুনল উকিল, বুঝল, তার আক্রমণকারী বেরিয়ে যাচ্ছে। আবার আলমারির দরজায় ধাক্কাধাক্কি শুরু করল সে, খোলার চেষ্টা করল। শেষে হাল ছেড়ে দিল।
কী আর করব, মেঝেতেই বসে পড়লাম! বলল হ্যামার। জানি, আলমারির ভেতর যে বাতাস রয়েছে, তাতে আরও কয়েক ঘণ্টা টিকব। কপাল ভাল হলে কেউ না কেউ এসে পড়তে পারে। ঈশ্বরের দয়া, তোমরা এলে।
কটার সময় এটা ঘটেছিল! কিশোর জিজ্ঞেস করল।
শিওর না, জবাব দিল উকিল। এই ধরো, হাতঘড়ির দিকে তাকাল সে। নয়টা সতেরো বেজে বন্ধ হয়ে আছে কাটা, তার মানে দেড় ঘণ্টার ওপরে।
আমার ঘড়ি! চেঁচিয়ে উঠল সে। ব্যাটা যখন ধাক্কা দিয়ে ফেলল আমাকে, নিশ্চয় চোট লেগেছে! গেছে নষ্ট হয়ে।
তার মানে, শান্ত কণ্ঠে বলল কিশোর, যে-ই এই কাজ করেছে, দুঘণ্টা সময় পেয়েছে হাতে পালানোর। কোথায় আছে এখন, কে জানে! কিছু লক্ষ করেছেন? এমন কিছু, যা লোকটাকে ধরিয়ে দিতে পারে!
না। এতই চমকে গিয়েছিলাম, কিছুই খেয়াল করতে পারিনি। তা ছাড়া সময়ও দেয়নি সে আমাকে। পুরু গোঁফ, আর ভারি চশমা! ও, হ্যাঁ, চশমার কাঁচের ওপাশে তার চোখ যেন জ্বলছিল!
না, এতে চলবে না, মুসার কণ্ঠে নিরাশা।
না, চলবে না, কিশোরও একমত হলো। আচ্ছা, এ ঘরে এমন কিছু দেখছেন, যেটা অস্বাভাবিক ঠেকছে?
পুরো অফিস-ঘরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বোলাল উকিল। না, তেমন কিছুই তো না। মনে হচ্ছে, আমাকে আলমারিতে ভরেই সোজা ফাইল কেবিনেটের দিকে গেছে, কেবিনেট খুলে ফাইল বের করেছে, যা দরকার নিয়ে চলে গেছে। ব্যস।
হুমম! বিড়বিড় করল কিশোর, আপনমনেই বলল, তার মানে, কী খুঁজছে, জানা ছিল তার। জানা ছিল, ঠিক কোথায় ওটা পাওয়া যাবে! কয়েকটা কেবিনেটের এতগুলো ড্রয়ারের মধ্যে ঠিক ড্রয়ারটাই খুলল, ঠিক ফাইলটা বের করে আনল! অসংখ্য ফাইল, এত সহজে কী করে তা সম্ভব। তা ছাড়া মেসেজটা ফাইলে আছে, তা-ই বা জানল কী করে সে?
চোখ পিটপিট করল আবার উকিল। ইয়ে…মানে…কী জানি!
মিস্টার হোরাশিও মেসেজটা লেখার সময় আর কেউ কাছে ছিল? জানতে চাইল কিশোর।

হ্যাঁ, মাথা নোয়াল হ্যামার, ওঁর দুজন চাকর-চাকরানী। ওরা স্বামী-স্ত্রী। বুড়ো-বুড়ি। মিস্টার অগাস্টের চাকরি করেছে অনেক বছর। বাড়িঘর দেখাশোনা, বাগান পরিষ্কার, বাজার, রান্নাবাড়ী, প্রায় সব কাজই করেছে। বুড়োটার নাম হ্যারি, হ্যারিসন। মনিবের মৃত্যুর পর স্যান ফ্রানসিসকোতে চলে গেছে ওরা। মেসেজটার কথা হয়তো শুনেছে ওরা, তারপর যেই মনিব মরেছে, তার নাতিকে ফাঁকি দিতে উঠেপড়ে লেগেছে।

কিংবা কথায় কথায় অন্য কাউকে বলেছে ওরা, মুসা সন্দেহ। করল। হয়তো সেই তৃতীয়জন অনুমান করেছে, মিস্টার হ্যামারের কাছে। মেসেজের কপি আছে! নিতে এসেছে।

তা-ও হতে পারে, উকিল বলল। ওরা হয়তো ভেবেছে, মিস্টার হোরাশিও গুপ্তধন লুকিয়ে রেখেছেন। সাঙ্কেতিক চিঠিতে মূল্যবান কিছুর কথা লেখা থাকলেই লোকে ধরে নেয়, গুপ্তধন, কিংবা চোরাই টাকা। সেগুলো খুঁজে পাওয়ার জন্যে পাগল হয়ে ওঠে। সত্যি কথা কী, মিস্টার হোরাশিও খুব গরীব অবস্থায় মারা গেছেন। তার বাড়িটা পর্যন্ত বাধা ছিল। অন্যের কাছে, সেই লোকটা এখন বাড়ি দখল করে নিয়েছে। বাড়ির। জিনিসপত্র বিক্রি করে দোকানের বকেয়া বিল দিয়েছি, অনেক টাকা বাকি ফেলে গিয়েছিলেন হোরাশিও।

কিন্তু মেসেজ বলছে, মূল্যবান কিছু আমার জন্যে রেখে গেছে। দাদা, অগাস্ট প্রতিবাদ করল। এমন কিছু, কোন কারণে সেটাকে ভয় পেত সে।

হ্যাঁ, তা ঠিক, চশমা খুলে কাঁচ পরিষ্কার শুরু করল উকিল। কী। জিনিস, আমিও জানি না, আমাকেও বলেনি। কথায় কথায় অনেক বার। বলেছেন: রয়, আমার ব্যাপারে অনেক কিছুই জানো না তুমি, জানার চেষ্টাও কোরো না, আমি গোপনই রাখতে চাই। আমার নামেও গোলমাল আছে। আর হ্যাঁ, বাদামী চামড়া, কপালে উলকি দিয়ে তিনটে বিন্দু আঁকা রয়েছে, এমন কোন মানুষকে যদি কাছাকাছি ঘুরঘুর করতে দেখো, বুঝবে। তুমুল ঝড় আসছে!

আজব লোক ছিলেন মিস্টার ওয়েসটন...ইয়ে, মিস্টার হোরাশিও। অদ্ভুত, কিন্তু ভাল মানুষ। তার গোপন ব্যাপার নিয়ে আমি কখনও মাথা ঘামাইনি, বলার জন্যে তাকে চাপাচাপি করিনি।

মিস্টার হোরাশিওর আরেক নাম ওয়েসটন ছিল? কিশোর প্রশ্ন করল।

হ্যাঁ, হেনরি ওয়েসটন নামেই হলিউডে পরিচিত ছিলেন। আমিও ওই নামই জানতাম। মৃত্যুর আগে আমাকে ডেকে আসল নাম বললেন, নাতির নাম-ঠিকানা জানালেন, নইলে চিঠি পাঠাতে পারতাম না।

কেবিনের দিকে নজর ঘুরে গেল কিশোরের, সেই ড্রয়ারটার দিকে তাকাল, যেটাতে মিস্টার হোরাশিও অগাস্টের ফাইল রেখেছে উকিল।

মিস্টার হ্যামার, ড্রয়ারটার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল কিশোর, ভুল ড্রয়ারে রাখেননি তো ফাইলটা? অগাস্টের আদ্যক্ষর এ, কিন্তু ওয়েসটনের বেলায়? নাকি ফাইলে নাম বদলে অগাস্টই লিখেছেন?
হ্যাঁ, নিশ্চয়। এসব ব্যাপারে সাবধান থাকি আমি, কাগজপত্র নিখুঁত রাখার চেষ্টা করি।
কিন্তু ওই লোকটা জানল কী করে? কেন সে ওয়েসটন খুঁজতে ডব্লিউ লেখা ড্রয়ার খুলল না?
কী জানি, ছাতের দিকে তাকাল উকিল। হয়তো, হয়তো হ্যারিসনরা কোনভাবে আসল নাম জেনে ফেলেছিল…ও, হ্যাঁ। একটা জিনিস দেখাচ্ছি তোমাদের।
উঠে গিয়ে এ লেখা ড্রয়ারটা খুলে এক টুকরো কাগজ বের করল হ্যামার। একটা পেপার কাটিং। দৈনিক লস অ্যাঞ্জেলেস। এক খুঁতখুঁতে রিপোর্টার সন্দেহ করে বসেছিল, মিস্টার ওয়েসটনকে রহস্যময় লোক মনে হয়েছিল তার। খোঁজখবর শুরু করল। একদিন আমার কাছে এসে হাজির, তখন হোরাশিও মারা গেছেন, তার আসল নাম গোপন করার আর কোন মানে দেখলাম না। বলে দিয়েছি রিপোর্টারকে। হোরাশিওর অতীত জীবন সম্পর্কে সামান্য যা জানি, তা-ও বলেছি। কাগজে বেরিয়েছে, যে কেউ জেনে যেতে পারে তার আসল নাম।
কাগজের টুকরোটা কিশোরের হাতে দিল উকিল।
অন্য তিনজন ঘিরে এল কিশোরকে, কাগজের লেখা দেখতে।
ছোট অক্ষরে আকর্ষণীয় হেডলাইন: ডায়াল ক্যানিয়নের নির্জন বাড়িতে রহস্যময় লোকটির মৃত্যু!
দ্রুত লেখাটা পড়ে ফেলল কিশোর। জানা গেল, বিশ বছর আগে হেনরি ওয়েসটন ছদ্মনাম নিয়ে হলিউডে এসেছিলেন হোরাশিও অগাস্ট। তার আগে অনেক বছর কাটিয়েছেন পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জগুলোতে। ওখানে থাকতেই প্রচুর টাকা কামিয়েছেন। তরুণ বয়েস তখন, দক্ষিণ সাগর থেকে শুরু করে মধ্য প্রাচ্যের বিভিন্ন জায়গায় পাড়ি জমিয়েছেন, বোধহয় ব্যবসার খাতিরেই।
হলিউডের উত্তরে নির্জন পাহাড়ি এলাকায় জায়গা কিনে মস্ত বাড়ি বানিয়েছিলেন হোরাশিও অগাস্ট। লোকালয় থেকে দূরে থেকেছেন যেন ইচ্ছে করেই। এত বড় বাড়ি দেখাশোনার জন্যে তোক রেখেছিলেন মাত্র দুজন। কোন বন্ধুবান্ধব ছিল না তার। পুরানো ঘড়ি আর বই সংগ্রহের বিচিত্র নেশা ছিল তার, বিশেষ করে ল্যাটিন ভাষায় লেখা বই। স্যর। আর্থার কোনান ডয়েলের ওপর ছিল তার অগাধ ভক্তিশ্রদ্ধা, ডয়েলের লেখা সমস্ত বইয়ের যতগুলো সংস্করণ পেয়েছেন, সবগুলোর কপি জোগাড় করেছেন তিনি। ছেলেবেলায় ইংল্যাণ্ডে থাকতে একবার বিখ্যাত ওই লেখকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল হোরাশিওর, তারপর থেকেই তার

অন্ধভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন, ভক্ত হয়েছিলেন কোনান ডয়েলের অসামান্য সৃষ্টি গোয়েন্দা শার্লক হোমসের। |
যতদূর জানা যায়, শান্তিতেই ডায়াল ক্যানিয়নের বাড়িতে বিশ বছর কাটিয়েছেন হোরাশিও অগাস্ট নামের রহস্যময় লোকটি! অসুস্থ হয়ে মারা গেছেন, কিন্তু কিছুতেই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া যায়নি তাকে। নিজের বাড়িতে নিজের বিছানায় শুয়ে মরার প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল তার, সেজন্যেই হাসপাতালে যেতে চাননি। যা-ই হোক, শেষ ইচ্ছে পূরণ হয়েছে। মানুষটির।
লম্বা, সুদর্শন এক সুপুরুষ ছিলেন হোরাশিও অগাস্ট, মাথায় ঝাঁকড়া চুল। একটাও ছবি নেই তাঁর। বাড়ি থেকে যেমন বেরোতে চাইতেন না, ছবি তোলার ব্যাপারেও ছিল তার প্রবল বিতৃষ্ণা। তার একমাত্র আত্মীয় থাকে ইংল্যাণ্ডে। ডাক্তার ডেথ সার্টিফিকেটে লিখেছেন: হোরাশিও অগাস্টের শরীরে অজস্র কাটা দাগ। তরুণ বয়েসের অনেক দুঃসাহসিক অভিযানের চিহ্ন বোধহয় ওই ছুরিতে কাটা দাগগুলো।
হোরাশিও অগাস্টের রহস্যময় অতীত রহস্যেই ঢাকা পড়ে আছে, বিশেষ কিছুই জানা যায়নি।
আরিব্বাপ! ফোসস্ করে শ্বাস ফেলল মুসা। সত্যিই রহস্যময় লোক!
ছুরির দাগ! বিড়বিড় করল অগাস্ট। অভিযানপ্রিয়! চোরাচালানী ছিলেন না তো?
কারও ভয়ে যে লুকিয়ে ছিলেন, রবিন বলল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। প্রথমে ওয়েস্ট ইনডিজে গিয়ে লুকিয়েছিলেন, ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে সেখান থেকে পালিয়ে এসে লুকিয়েছেন ডায়াল ক্যানিয়নে। লস অ্যাঞ্জেলেস আর হলিউডের হাজার রকম লোকের ভিড়ে সহজেই গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারবেন, আশা করেছিলেন হয়তো।
বোধহয় পেরেছেনও, রবিনের কথার পিঠে বলল কিশোর, নিজের বিছানায় শান্তিতেই চোখ বুজতে পেরেছেন। কিন্তু কেন এই ঘরকুনো মন? কার ভয়ে? বাদামী চামড়া, কপালে তিন ফোটাওয়ালা লোকটাই বা
কে?
দাঁড়াও, দাঁড়াও! হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল অগাস্ট। মনে পড়েছে! দশ বছর আগে, সেই ধোয়াটে শৈশবে... নাকমুখ কুঁচকে মনে করার চেষ্টা চালাল সে। এক রাতে, সবে বিছানায় গিয়ে শুয়েছি। হঠাৎ নিচে কথা শুনলাম, কার সঙ্গে জানি উত্তেজিত হয়ে কথা বলছে বাবা। বলল, কতবার বলব, চাচা কোথায় আছে জানি না! অনেক আগেই শুনেছি মারা গেছে! কোটি টাকা দিলেও সে কোথায় আছে বলতে পারব না!

বিছানা থেকে নেমে পা টিপে টিপে সিঁড়ির মাথায় গিয়ে দাঁড়ালাম। বসার ঘরের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে বাবা, আর
অচেনা একটা লোক। নিচু গলায় কিছু বলল লোকটা, শুনতে পেলাম না। জবাবে জোরে জোরে বলল বাবাঃ তোমার কাছে কোন্টা কত জরুরি ওসব জানার দরকার নেই আমার! রক্তচক্ষুর নাম জীবনেও শুনিনি! চাচাও কখনও লেখেনি ওটার কথা। এখন বেরোও, আমি ঘুমাব।
মাথা নুইয়ে বাবাকে বাউ করল লম্বা লোকটা, তারপর হ্যাট তুলে নেয়ার জন্যে ঘুরল। এই সময় ওপরে তাকাতেই আমার দিকে চোখ পড়ল তার, কিন্তু আমাকে দেখেও যেন দেখল না। হ্যাটটা তুলে নিয়ে আরেকবার বাবাকে বাউ করে বেরিয়ে গেল। বাবা কখনও ওর কথা আমাকে বলেনি। আমিও জিজ্ঞেস করিনি, লুকিয়ে লুকিয়ে অন্যের কথা শোনা বাবা একদম পছন্দ করে না।
জানো, কণ্ঠস্বর খাদে নামাল অগাস্ট, ওই লোকটার রঙ ছিল বাদামী, কপালে তিনটে ফোঁটা। তখন বুঝিনি, কিন্তু এখন বুঝতে পারছি উলকি দিয়ে আঁকা হয়েছিল।
অউ! বিচিত্র শব্দ করে উঠল রবিন। তোমার বাবার কাছে তোমার দাদার খোঁজ চেয়েছিল তিন-ফোঁটা!
বাবা মিথ্যে বলেনি। সত্যিই জানত না তখন দাদা কোথায় আছে।
রক্তচক্ষু! আনমনে বলল কিশোর। মিস্টার হ্যামার, ওরকম কিছুর কথা কখনও বলেছিলেন মিস্টার হোরাশিও?
না, মাথা দোলাল উকিল। বিশ বছর ধরে তাকে চিনতাম। কখনও ওই শব্দ উচ্চারণ করেননি। ইসস, রিপোর্টার ব্যাটার কাছে মুখ খুলে ভুলই করেছি! তখন কি আর জানতাম…ভেবেছি, মৃত লোকের আর কী এমন ক্ষতি করবে সে? একটা কথা অবশ্য বলিনি ওকে, শেষ দিকে কেমন জানি সারাক্ষণ অস্থির হয়ে থাকতেন হোরাশিও। শত্রুরা যেন ঘিরে রেখেছে তাকে, তার ওপর চোখ রাখছে। আমাকেও অবিশ্বাস করতেন তখন। কল্পিত শত্রুদের কাছ থেকে কী জানি লুকিয়ে রাখতে চেয়েছেন। অগাস্টের দিকে তাকাল হ্যামার। তারপরই তোমার কাছে সাঙ্কেতিক চিঠি পাঠালেন তিনি।
হুঁ! বলল কিশোর, মিস্টার হেরাশিওর কথা আপনার কাছে জানতে এসেছিলাম, জেনেছি। একবার ডায়াল ক্যানিয়নে যেতে চাই। কী বলেন? ওখানে নতুন কিছু জানতে পারব?
আমার মনে হয় না, উকিল বলল। একেবারে খালি বাড়ি। বললামই তো, ধার শোধ করার জন্যে তাঁর সমস্ত জিনিসপত্র বেচে দিয়েছি। বই, আসবাবপত্র, সব।

যে লোকের কাছে বাড়ি বাধা ছিল, তিনি তিন-চার দিনের মধ্যেই বাড়ি ভাঙার কাজ শুরু করবেন। নতুন বাংলো তুলবেন ওখানে।
তবে, তোমরা যেতে চাইলে, যাও। কিছু পাবে কিনা জানি না। গতকাল পর্যন্ত কয়েকটা বই ছিল, আর কয়েকটা মূর্তি, আবক্ষ মূর্তি। বিখ্যাত লোকদের মূর্তি। গতকাল ওগুলো এক স্যালভেজ ইয়ার্ডের মালিকের কাছে নিলামে বেচে দিয়েছি…
আবক্ষ মূর্তি! বোলতা হুল ফোঁটাল যেন কিশোরের গায়ে। মিস্টার হ্যামার, আমরা যাই। যা জানার জেনেছি। থ্যাঙ্ক ইউ।
দরজার দিকে রওনা দিল কিশোর। অবাক হয়ে তাকে অনুসরণ করল মুসা, রবিন আর অগাস্ট।
ঘষে ঘষে রোলস রয়েসের কালো উজ্জ্বল শরীরকে আরও চকচকে করে তুলছে হ্যাঁনসন, গাড়িটাকে ভালবাসে সে।
হ্যানসন, জলদি বাড়ি চলুন! তাড়া দিল কিশোর। যত তাড়াতাড়ি পারেন!
নিঃশব্দে রকি বিচের দিকে ছুটল গাড়ি। গতিবেগ ইচ্ছেমত বাড়ানোর। উপায় নেই, ট্রাফিক আইনে গতিবেগ বেঁধে দেয়া আছে।
হঠাৎ এত তাড়া কেন, কিশোর? আর থাকতে না পেরে জিজ্ঞেসই করে ফেলল মুসা।
রক্তচক্ষু! মুচকি হাসল গোয়েন্দাপ্রধান।
কী! ভুরু কুঁচকে গেল মুসার।
মিটিমিটি হাসছে কিশোর। রহস্যভেদ।
হাঁ হয়ে গেছে অগাস্ট। সত্যি বলছ!
মনে তো হয়, কিশোর জবাব দিল। তোমার দাদার শার্লক হোমসপ্রীতি আর আবক্ষ মূর্তিতেই রয়েছে রহস্যের সমাধান।
তুমিই জানো কী বলছ, গোঁ গোঁ করে করে উঠল মুসা। শার্লক হোমস…আবক্ষ মূর্তি…সাঙ্কেতিক চিঠির সঙ্গে কী সম্পর্ক?
পরে খুলে বলব, কিশোর বলল। আপাতত একটা লাইন নিয়েই আলোচনা করা যাক। অগাস্ট তোমার সৌভাগ্য।
কী সৌভাগ্য? শূন্য দৃষ্টিতে তাকাল মুসা।
অগাস্টও কিছুই বুঝতে পারছে না।
কিন্তু রবিন বুঝে ফেলল। আবক্ষ মূর্তি…রাশেদ চাচা যেগুলো কিনে এনেছেন!.ওয়াশিংটন…লিঙ্কন…আর, আর অগাস্টাস অভ পোল্যাণ্ড…
অগাস্ট তোমার সৌভাগ্য! উত্তেজিত হয়ে পড়ল অগাস্ট।
অগাস্ট…অগাস্টাস! তার মানে অগাস্টাসের মূর্তির ভিতরে কিছু লুকানো রয়েছে!

আমি শিওর, কিশোর বাল। খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে। শার্লক হোমস পড়তে ভালবাসতেন তোমার দাদা। কোনান ডয়েলের একটা গল্পের নাম: দ্য অ্যাডভেঞ্চার অভ দ্য সিক্স নেপোলিয়নস, তাতে নেপোলিয়নের মূর্তির ভেতরে একটা মূল্যবান জিনিস লুকানো থাকে। ওটা পড়েই বুদ্ধি এসেছে মিস্টার হোয়াশিও অগাস্টের মাথায়। সাধারণ একটা মূর্তির ভিতরে রক্তচক্ষু লুকানো আছে এটা কেউ ভাববে না। অগাস্টাসকে বেছে নিয়েছেন, কারণ, এর সঙ্গে অগাস্ট নামের মিল রয়েছে।
ক্ষণিকের জন্যে চুপ হয়ে গেল অন্য তিন কিশোর, তারপরই ফেটে পড়ল উল্লাসে।
পাশা স্যালভেজ ইয়ার্ডের গেট দেখা গেল। গেটের সামনে এসে গাড়ি থামাল হ্যাঁনসন। সে নেমে দরজা খুলবে কখন? তার আগেই ঝটকা। দিয়ে দুদিকের দরজা খুলে গেল, হুড়মুড় করে নেমে পড়ল চার কিশোর।
অফিসের কাছে টেবিলে সাজিয়ে রাখা হয়েছে মূর্তিগুলো। সেদিকে চেয়েই দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে যেন থেমে গেল কিশোর। গায়ের ওপর এসে পড়ল অন্য তিনজন, আরেকটু হলে ধাক্কা দিয়ে মাটিতেই ফেলে দিয়েছিল তাকে। ওরাও দেখল, বুঝল, কেন ওভাবে দাঁড়িয়ে পড়েছে কিশোর।
সকাল বেলাও যে টেবিলটাতে তেরোটা মূর্তি সাজানো ছিল, এখন সেখানে রয়েছে মাত্র পাঁচটা: ওয়াশিংটন, ফ্র্যাঙ্কলিন, লুথার এবং থিওডর রুজভেল্ট।
অগাস্টাস অভ পোল্যাণ্ডের মূর্তিটা নেই।
পায়ে পায়ে এগোল চার কিশোর। টেবিলের ওপাশে অফিসের দেয়ালে বড় করে লেখা একটা নোটিশ টাঙানো: মূর্তি দিয়ে বাগান সাজাতে চান? মাত্র পঞ্চাশ (৫০.০০) ডলার, প্রতিটি।
হতাশায় কালো হয়ে গেছে ছেলেদের মুখ।
কাঁচেঘেরা ছোট্ট অফিস ডেস্কে বসে কী যেন পড়ছেন মেরি চাচী।
ঢোক গিলল কিশোর, গলা চড়িয়ে ডাকল, চাচী! আর মূর্তি কই?
বল তো কোথায়? দরজায় বেরিয়ে এলেন চাচী, হাসি হাসি মুখ।
বিক্রি হয়ে গেছে?
নিশ্চয়। আজ শনিবার, মনে নেই? শনিবারে সবচেয়ে বেশি কাস্টোমার আসে জানিসই তো। অনেকেই এসেছিল, চোখে পড়ল, পছন্দ হলো, আর কী রাখে? দামও কম। নিয়ে গেল।
নিজের অজান্তেই মুখ বিকৃত করল কিশোর। লস অ্যাঞ্জেলেসের লোকগুলো পাগল! আর শনিবার-রোববারে যেন বদ্ধ পাগল হয়ে যায়! কী করে, না করে তার ঠিক নেই! কিছু একটা যেন কিনতেই হবে, এমনকী পুরানো বাতিল মালের

চত্বরেও ভিড় জমে যায়। দূরর! বিরক্তি চাপতে পারল না সে। চাচী, যারা নিল, তাদের নাম-ঠিকানা রেখেছ? বলেই বুঝল, বোকার মত প্রশ্ন করে ফেলেছে।
এই দেখো, দিন দিন জ্ঞান বাড়ছে! ওদের নাম-ঠিকানা রাখতে যাব। কেন আমি? টাকা দিল, জিনিস নিয়ে চলে গেল। ওদেরকে আর কী দরকার আমার?
যারা নিয়েছে, তাদের চেহারা কেমন মনে আছে? অগাস্টাস অভ পোল্যাণ্ডটা যে নিল?
কী ব্যাপার, বল তো, কিশোর? ভুরু কুঁচকে গেছে মেরি চাচীর। হঠাৎ ওই মূর্তিগুলোর ব্যাপারে এত আগ্রহ কেন?
চুপ করে রইল কিশোর।
কী বুঝলেন চাচী, কে জানে; বললেন, কালো স্টেশন ওয়াগন নিয়ে এসেছিল এক লোক, সে কিনেছে দুটো মূর্তি। মনে হলো, উত্তর হলিউডে থাকে সে। এক মহিলা নিয়েছে দুটো, ম্যালিবুতে থাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। লাল একটা সিড্যানে করে এসেছিল। বাকি চারটে কারা যে নিল, মনে করতে পারছি না। খুব ব্যস্ত ছিলাম।
বড় করে নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। সঙ্গীদের দিকে ফিরে বলল, চলো, হে, ভেবে দেখি, এরপর কী করা যায়।
ওয়ার্কশপে এসে ঢুকল ওরা। পাইপের মুখ থেকে লোহার পাত সরাতে দেখে চোখ বড় বড় হয়ে গেল অগাস্টের। দুই সুড়ঙ্গ দিয়ে তাকে হেডকোয়ার্টারে নিয়ে এল তিন গোয়েন্দা।
খুদে ল্যাবরেটরিটা দেখানো হলো মেহমানকে। ডার্করুম দেখল অগাস্ট। সর্বদর্শন পেরিস্কোপের ভেতর দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখল, সাজানো-গোছানো ছোট্ট অফিস আর সরঞ্জাম দেখে তাজ্জব হয়ে গেল।
চেয়ারে বসল সবাই।
এবার? মুসা শুরু করল। এবার কী? অগাস্টাসের মূর্তি গেল, সে সঙ্গে অগাস্টের জিনিসও। কোথায় কার বাগানে এখন শোভা বাড়াচ্ছে মূর্তিটা, কে জানে! লস অ্যাঞ্জেলেস আর তার আশপাশে কম করে হলেও হাজারখানেক বাগান আছে, ওগুলোর মধ্য থেকে খুঁজে বের করা! এ-জীবনে হবে না! হাত নাড়ল সে।
তবু চেষ্টা করে দেখতে হবে, নিরাশা গোপনের চেষ্টা করল অগাস্ট। ইসস, গতকালই যদি তোমাদের সঙ্গে দেখা করতাম! আজ সকালে একেবারে...যাক গে। যা গেছে, সেটা নিয়ে ভেবে কিছু হবে না। এখন কী করা যায়? দাদা সময়ের ওপর জোর দিয়েছে, তার মানে বেশি সময়ও নেই আমাদের হাতে। তার দুর্ভাবনা ছিল, তাড়াতাড়ি কিছু করতে না পারলে জিনিসটা আমার হাতছাড়া হয়ে যাবে। গেলও তাই।

হয়তো চিরতরেই গেল, অবশেষে মুখ খুলল কিশোর। কিন্তু এত সহজেপরাজয় মেনে নিতে পারব না। খুঁজে বের করবই।
কীভাবে? রবিনের জিজ্ঞাসা।
জানি না। ভাবতে হবে।
আচ্ছা! চেঁচিয়ে উঠল রবিন। এক কাজ করলেই তো পারি! ভূত থেকে-ভূতে!
ভূত-থেকে-ভূতে! চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসবে যেন অগাস্টের। প্রেতজগতের সঙ্গে যোগাযোগ আছে নাকি তোমাদের!
না, হাসল রবিন। তবে কিশোর জগতের সঙ্গে আছে। এটা খুব ভাল আবিষ্কার, অবশ্যই কিশোরের। আচ্ছা, বলো দেখি, আশপাশে কী আছে না আছে কারা বেশি খেয়াল করে? এই, নানারকম অদ্ভুত জিনিসপত্র?
কেন... বলতে গিয়েও চুপ হয়ে গেল অগাস্ট। জানি না!
অবশ্যই বাচ্চারা, মুসা বলল। বাচ্চাদেরকে বড়রা দেখেও দেখে না, ফলে বাচ্চারা এমন সব জায়গায় সহজেই ঢুকে যেতে পারে, যেখানে ঢোকা বড়দের জন্যে কঠিন। তা ছাড়া, নানারকম জিনিসের দিকে বাচ্চাদের আকর্ষণ, এই যেমন, কুকুর, বেড়াল, কোন্ পাড়ায় নতুন কোন্ ছেলে বা মেয়ে এল, কোথায় কার বাগানে ফল পাকল, কোন বাগানে প্রজাপতি বেশি, এমনি সব ব্যাপার। বড়রা এসব খেয়ালই করে না।
বাচ্চারা একে অন্যকে সাহায্য করতে চায়, খুব খুশি হয়ে, নিঃস্বার্থভাবে, মুসার কথার পিঠে বলল রবিন। আর রহস্যের গন্ধ পেলে তো কথাই নেই।
কিন্তু কজন বাচ্চাকে চেনো তোমরা? অগাস্টের প্রশ্ন। এত বড় শহর। সবগুলো বাগান খুঁজতে হলে শহরের বেশিরভাগ ছেলেমেয়েকেই কাজে লাগাতে হবে। কী করে সম্ভব?
ভূত-থেকে-ভূতের সাহায্যে, হাসল মুসা। খুব সহজ। আমাদের সবারই অন্তত কয়েকজন করে বন্ধু আছে, সব ছেলেমেয়েরই থাকে। কিছু জানার দরকার হলে, আমরা আমাদের বন্ধুদেরকে ফোন করব। তারা আবার তাদের বন্ধুদেরকে জিজ্ঞেস করবে। সেই তারা আবার তাদের বন্ধুদেরকে। এভাবে ছড়াতে থাকলে, অবস্থাটা কী দাঁড়ায়, ভেবে দেখো। কোন বাগানে নতুন মূর্তি বসানো হয়েছে, জানাটা আর তত কঠিন মনে। হচ্ছে?
হাঁ করে আছে অগাস্ট।
এখনও বুঝলে না? আবার বলল মুসা। আচ্ছা, ধরো, আমাদের তিনজনের, রবিন আর কিশোরকে দেখাল মুসা, পাঁচজন করে বন্ধু
আছে। তাদেরকে ফোন করে মূর্তির কথা জিজ্ঞেস করলাম আমরা। তারা। হয়তো কিছু বলতে পারল না, কিন্তু তাদের পাঁচজন করে বন্ধুকে জিজ্ঞেস করতে পারবে।

ওরা আবার তাদের পাঁচজন করে বন্ধুকে। কী ঘটবে? দাবানলের মত খবরটা ছড়িয়ে পড়বে পুরো লস অ্যাঞ্জেলেসে। কতগুলো ছেলেমেয়ে আছে এই শহরে? সবাই না হোক, তাদের অর্ধেকেও যদি একটা মূর্তি খুঁজতে শুরু করে…
হয়েছে, হয়েছে! আর বোলো না! হাত নাড়তে শুরু করল অগাস্ট। বুঝতে পেরেছি! আরিব্বাপ রে! হিসেব শুরু করল সে। তোমরা তিনজনে পাঁচজন করে বললে হবে পনেরোজন, তারা বলবে পঁচাত্তরজনকে, সেই তারা আবার, তিনশো পচাত্তর…পরের বারেই হাজার পেরোবে! সাংঘাতিক কাণ্ড! শিস দিয়ে উঠল সে।
এই পদ্ধতির নাম রেখেছি আমরা ভূত-থেকে-ভূতে, গর্বের সঙ্গে বলল রবিন। সাংঘাতিক নাম। বড়দের সামনে বললেও ক্ষতি নেই, কিছুই বুঝবে না। বড়জোর হাসবে, বলবে, বাচ্চাদের খেয়াল!
তোমরা জিনিয়াস! প্রশংসা না করে পারল না অগাস্ট। কিশোরের দিকে ফিরল। এখুনি ফোন করবে?
আজ শনিবার, মনে করিয়ে দিল কিশোর। বিকেলও হয়ে এসেছে। বেশিরভাগ ছেলেমেয়েই এখন বাইরে। ডিনারের আগে ফোন করে লাভ নেই। কয়েকটা ঘণ্টা অপেক্ষা করতেই হচ্ছে…
কিশোর! মেরি চাচীর ডাকে বাধা পড়ল কথায়। ট্রেলারের ছাতে স্কাইলাইটের ফাঁক দিয়ে আসছে শব্দ। এই, কি-শো-র! কোথায় তোরা?
ডেস্ক থেকে মাইক্রোফোন তুলে নিল কিশোর। ছাতে বসানো রয়েছে। ছোট একটা শক্তিশালী স্পিকার, ভেতর থেকে বাইরের কারও সঙ্গে কথা বলতে চাইলে এটা ব্যবহার করে সে। আরও বিভিন্ন কাজে ব্যবহার হয়। আমি এখানে, চাচী, জবাব দিল সে। দরকার?
ওই দেখো, এবার স্পিকার লাগিয়েছে! জঞ্জালের ভেতর বসে যে কী করে ছেলেগুলো! পাগল হতে আর দেরি নেই! আরে, অই, কিশোর, কটা বেজেছে খেয়াল আছে? পেটের খবর আছে, না নেই? খাবি-টাবি না?
লাঞ্চ! প্রায় লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল মুসা। তাই তো! একেবারে ভুলেই গিয়েছিল। অন্য ছেলেদেরও মনে পড়ল খাওয়ার কথা।
আসছি, চাচী, জবাব দিল কিশোর। সঙ্গে মেহমান আছে।
তখনই তো দেখেছি, মেরি চাচী বললেন। ওকেও নিয়ে আয়। মাংসের বড়া ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।
কালো পুরু ঠোঁটের ফাঁকে ঝকঝকে সাদা দাঁত বেরিয়ে পড়ল মুসার। আঙুল দিয়ে নিজের পেটেই চাটি দিল, তবলা বাজাল যেন। কিশোরের হাতে ধরা মাইক্রোফোনের ওপর ঝুঁকে বলল, বেড়ে ফেলুন। গিয়ে, চাচী! আমরা এই এলাম বলে!

পাগল! মেরি চাচীর সস্নেহ হাসি শোনা গেল।
সবার আগে ঢাকনা তুলে দুই সুড়ঙ্গে নেমে পড়ল মুসা।
রাশেদ চাচা নেই, কী কাজে বাইরে গেছেন। হাতমুখ ধুয়ে এসে টেবিল ঘিরে বসে পড়ল ছেলেরা। মাংসের বড়া, রুটি, ডিমসেদ্ধ, আর কমলার রস দিয়ে লাঞ্চ সারা হলো।
কিশোর, এটো প্লেটগুলো সিঙ্কে ফেলতে ফেলতে বললেন মেরি চাচী, আমি বাইরে বেরোব। রোভার গেছে তোর চাচার সঙ্গে, আমি বোরিসকে নিয়ে যাচ্ছি। ইয়ার্ডেই থাকিস, আমরা না ফিরলে যাসনে। কোথাও।
আচ্ছা, মাথা কাত করল কিশোর।
বেরিয়ে গেলেন মেরি চাচী।
আরেক গেলাস করে কমলার রস ঢেলে নিল ওরা।
কিশোর, গেলাসে চুমুক দিয়ে আবার নামিয়ে রাখল মুসা। মূর্তিটার ভেতরে কী জিনিস আছে?
রক্তচক্ষু।
কিন্তু ওই রক্তচক্ষুটা কী? প্রশ্ন করল রবিন।
ছোট কোন কিছু, তার সামনের গেলাসটা আগে-পিছে করছে কিশোর। নইলে মূর্তির ভেতরে রাখা যেত না। আর এত যত্ন করে যেহেতু লুকানো হয়েছে, নিশ্চয়ই মূল্যবান কিছু। নইলে এত কষ্ট করার কী দরকার ছিল? এখন প্রশ্ন, ওই মূল্যবান জিনিসটা কী? কোন ধরনের রত্ন? যার ঐতিহাসিক মূল্য আছে? তাই হওয়া উচিত। রত্নের নাম রাখার একটা ফ্যাশান ছিল আগে, এই যেমন গ্র্যাণ্ড মোঘল, স্টার অভ ইনডিয়া, পাশা অভ ইজিপ্ট, রক্তচক্ষুও সেরকম কিছু। দূর প্রাচ্যের কোন দেশ থেকে হয়তো ওটা কিনেছিলেন মিস্টার হোরাশিও অগাস্ট, তারপর কোন কারণে লুকিয়ে রেখেছিলেন।
হুম! বড় করে শ্বাস ফেলল মুসা। তোমার কথা ঠিক হলে...
চুপ! বাধা দিল রবিন। লোক আসছে!
চকচকে একটা সিড্যান গাড়ি, অফিসের বাইরে থামল। ড্রাইভিং সিটে ইউনিফর্ম পরা শোফার। পেছনের দরজা খুলে নামল লম্বা, পাতলা একটা লোক। টেবিলে রাখা অবশিষ্ট পাঁচটা মূর্তির দিকে তাকাল এক পলক।
লোকটার বা হাতে পালিশ করা একটা কালো ছড়ি, অনেক বেতো রোগীর হাতে যেমন থাকে, ভর দিয়ে হাঁটার জন্যে। ছড়ির ডগা দিয়ে আলতো খোঁচা দিল একটা মূর্তিকে, হাত বোলাল ওটার মসৃণ মাথায়। সন্তুষ্ট হতে পারছে না, চেহারাই প্রকাশ করে দিল। আঙুলের ডগায় লেগে যাওয়া ধুলো মুছল রুমালে, তারপর ঘুরল অফিসের দরজার দিকে।

উঠে দাঁড়িয়েছে কিশোর। অন্যেরা যে যার জায়গায় বসে আছে। দরজার দিকে পা বাড়াল সে।
ধোপদুরস্ত পোশাক পরা ঢেঙা লোকটার চামড়া বাদামী, কুচকুচে কালো চুল ছিল এক সময়, এখন ধূসর। আর কপালে তিনটে কালো ফোঁটা।
এই যে, ছেলেরা, চমৎকার ইংরেজি বলে। তিন-ফোঁটা। মূর্তিগুলো, ছড়ি তুলে দেখাল সে, চুপ করে গেল কিশোরকে তার কপালের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে।
মাত্র এক মুহূর্ত, তারপরই বদলে গেল কিশোরের চেহারা। ঝুলে। পড়ল নিচের ঠোঁট, গাল ফুলে গেল, সামান্য কুঁজো হয়ে গেল পিঠ। হ্যাঁ, স্যর, বলুন? বকের মত সামনে বাড়িয়ে দিয়েছে গলা, আমূল বদলে গেছে কণ্ঠস্বর। বোকা বোকা একটা ভাব।
এগুলো ছাড়া আর আছে? কেমন যেন শীতল কণ্ঠ লোকটার, মনে। হয় দূর থেকে আসছে।
আরও? বুঝতে পারছে না যেন কিশোর।
হ্যাঁ, আরও মূর্তি? থাকলে দেখাও। জর্জ ওয়াশিংটন আর বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিনকে দিয়ে চলবে না আমার। অন্য কাউকে দরকার।
এই-ই আছে, কিশোর বলল। বাকিগুলো বিক্রি হয়ে গেছে।
আরও ছিল তা হলে? কালো চোখের তারা ক্ষণিকের জন্যে ঝিলিক দিয়ে উঠল লোকটার। নাম বলতে পারবে?
নাম...নাম! মনে করার জন্যে চোখ বুজল কিশোর, আস্তে আস্তে মাথা নাড়ছে। চোখ মেলল। অদ্ভুত সব নাম! হোম...হোম...হোমার কী যেন! আগাস, হ্যাঁ হ্যাঁ, আগাসটুস জানি কোন জায়গার!
ও অমন করছে কেন? রবিনের কানে কানে বলল মুসা।
নিশ্চয় কারণ আছে, ফিসফিস করে জবাব দিল রবিন। শোনো।
অগাস্টাস! চোখের পলকে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তিন-ফোঁটার গোমড়া। মুখ। অগাস্টাসের একটা মূর্তি আমার দরকার! বাগানের জন্যে। ওটাও বিক্রি হয়ে গেছে?
গেছে, মাথা কাত করল কিশোর।
লোকটার নাম-ঠিকানা? আদেশের সুরে বলল ফোঁটা। ওর কাছ থেকে কিনে নেব।
নাম-ঠিকানা তো লিখে রাখি না! হাত কচলে বলল কিশোর, যেন মস্ত অন্যায় করে ফেলেছে। কে যে নিল...
লিখে রাখো না! কঠিন শোনাল লোকটার গলা। এখন থেকে রাখবে। দরকার পড়ে অনেক সময়।

কিশোরও মনে মনে স্বীকার করল কথাটা।
দেখো, নাম-ঠিকানা জোগাড় করতে পারো কিনা, বলল লোকটা। একশো ডলার বকশিশ দেব।
নাম-ঠিকানা লিখে রাখি না, স্যর, আবার একই কথা বলল। কিশোর। তবে, মাঝেসাঝে বাড়ি নেয়ার পর আর জিনিস পছন্দ হয় না। কারও কারও, ফেরত নিয়ে আসে। আপনার কপাল ভাল হলে আসতেও পারে আগুসটাস। আপনার ঠিকানা রেখে যান।
ভাল বলেছ, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিশোরের চেহারায় কী খুঁজল লোকটা। তা রাখতে পারো।
ছড়ির এক মাথায় লাগানো ফিতের ফাসে বা হাত ঢুকিয়ে দিল তিন ফোঁটা, কনুইয়ের কাছে এনে ঝুলিয়ে রাখল। পকেট থেকে কার্ড আর কলম বের করে কিছু লিখে কার্ডটা বাড়িয়ে দিল কিশোরকে। নাও। এলেই ফোন কোরো। তুমি পাবে একশো ডলার, মূর্তিটার দাম আলাদা। হ্যাঁ, শুধু অগাস্টাসের মূর্তি হলেই ফোন কোরো, আর কোনটা দরকার নেই।
আচ্ছা, স্যর, ভোতা গলায় বলল কিশোর।
ভুলে যাবে না তো?
মনে রাখার চেষ্টা করব, স্যর।
রাখলেই ভাল করবে! ছড়ির ডগা নিয়ে মাটিতে হঠাৎ খোঁচা মারল তিন-ফোঁটা। কাগজের টুকরো পড়ে নোংরা হয়ে আছে।
ছড়ির ডগা কিশোরের দিকে ঠেলে দিল লোকটা।
চেঁচিয়ে উঠল অন্য তিন কিশোর।
ছড়ির আগ থেকে একটা ছুরি বেরিয়ে এসেছে, তাতে গেঁথে রয়েছে কাগজের টুকরোটা। তীক্ষ্ণ ধার, পাতলা ঝকঝকে ছুরির ফলা ফুটখানেক লম্বা, চোখা মাথাটা কিশোয়ের বুক ছুঁই ছুঁই করছে।
নোংরামি একদম দেখতে পারি না আমি, বলল লোকটা, ইঙ্গিতে কাগজের টুকরোটা দেখাল। খুলে নিয়ে ঝড়িতে ফেলো।
আস্তে হাত বাড়িয়ে ছুরি থেকে কাগজটা খুলে নিল কিশোর।
ছড়ির হাতলের কাছে বোতাম রয়েছে, তাতে চাপ দিল লোকটা, ওর আঙুলের নড়া দেখেই বোঝা গেল। ঝট করে আবার ছড়ির খোড়লে ফিরে গেল ফলাটা। নিশ্চয় স্প্রিং-সিসটেমে কাজ করে। আবার সেই নিরীহ চেহারার ছড়ি হয়ে গেল মারাত্মক অস্ত্রটা।
তা হলে বুঝতেই পারছ, তীক্ষ্ণ হলো লোকটার গলা, ভুললে কী অবস্থা হবে? আমি আবার আসব। অগাস্টাসের মূর্তি ফের তি এলেই ফোন। করবে আমাকে।

ঘুরে দাঁড়াল লোকটা। টেবিলে রাখা পাঁচটা মূর্তির দিকে আরেকবার ফিরে চাইল, তারপর গটমট করে উঠল গাড়িতে।
চলে গেল চকচকে সিড্যান।
গেট দিয়ে গাড়িটা বেরিয়ে যাওয়ার পর ঘুরল কিশোর। চেহারা ফেকাসে। হাতের কাগজটাকে দলা পাকিয়ে মুঠো করে রেখেছে।
ওই লোকের সঙ্গে চালাকি চলবে না! বলে উঠল মুসা। বেশি বাড়াবাড়ি করলে ছুরি ঢুকিয়ে দেবে পেটে!
আমাকে হুমকি দিয়ে গেল! ঢোক গিলল কিশোর। দরজা দিয়ে কাগজটা ছুঁড়ে ফেলে দিল বাইরে। সত্যিই বলেছ, ওর সঙ্গে চালাকি চলবে না। বুঝিয়ে দিয়ে গেল।
মনে হচ্ছে, এই লোকই দশ বছর আগে আমাদের বাড়িতে এসেছিল, অগাস্ট বলল। শিওর না, তবে ওই লোকটার মতই লাগল একে।
তোমাদের বাড়িতে যে এসেছিল, তার কপালেও তিনটে ফোঁটা ছিল, রবিন বলল। এই লোকটাকেও দূর প্রাচ্যের লোক মনে হলো। হয়তো ভারতের কোন অঞ্চল থেকে এসেছে, কপালের ফোঁটা তিনটে হয়তো কোন গোত্র বা ধর্মের প্রতীক চিহ্ন।
কেন ওকে বললে অগাস্টাসের মূর্তিটার কথা? কিশোরের দিকে চেয়ে অনুযোগ করল মুসা। কাজটা বোধহয় ভাল হলো না!
না বললে বিপদে পড়তাম, কিশোর চিন্তিত। গেলাস তুলে ঢকঢক করে গিলল কমলার রস, ভিজিয়ে নিল শুকনো গলা। ও জেনেশুনেই এসেছে। সেটাই শিওর হয়ে নিলাম বলে দিয়ে। উকিল রয় হ্যামারের ফাইল থেকে চিঠির কপিও হয়তো ও-ই সরিয়েছে।
কিন্তু ওর চশমাও নেই, কালো গোঁফও নেই, মনে করিয়ে দিল অগাস্ট।
কাগজ চুরি করার জন্যে তোক ভাড়া করতে পারে, রবিন বলল। যেভাবে যা-ই করুক, অগাস্টাস ওর কাছে মূল্যবান। তার মানে, জানে।
এখানে তথ্যের জন্যে এসেছিল, কিশোর বলল। আমারও তথ্য। দরকার। ও তেমন কিছু জেনে যেতে পারেনি, কিন্তু আমি জেনে নিয়েছি। লোকটার নাম-ঠিকানা রেখে দিয়েছি!।
তিন-ফোঁটার দেয়া কার্ডটা রাখল গোয়েন্দাপ্রধান। সবাই ঝুঁকে এল, কী লেখা আছে দেখতে। ছাপানো রয়েছে:
কালিচরণ রামানাথ
কাটিরঙ্গা, ভারত।
অদ্ভুত ঠিকানা! কাটিরঙ্গার কোথায় থাকে, কী করে, কিছুই লেখা নেই। তার নিচে কলম দিয়ে লিখেছে হলিউডের একটা হোটেলের নাম আর ফোন নম্বর।

ভারত! প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মুসা। রবিন ঠিকই বলেছে! কোন খুনে গোত্রের লোক নয় তো তিন-ফোঁটা! তা, হলে রক্তচক্ষু খোঁজায় ইস্তফা! শুনেছি, আফ্রিকার চেয়েও খারাপ জায়গা ভারত। ওখানে নানারকম হিংস্র উপজাতির বাস, ধর্মের জন্যে মানুষ বলি দেয় যখন-তখন! দৃষ্টি দিয়েই তোমাকে ভস্ম করে দিতে পারে পুরোহিতরা, গলা কেটে মুণ্ডু আলাদা করে...
আরে, দূর, কী যা-তা বলছ! বাধা দিল কিশোর। ওসব বাজে কথা, লোকের বানানো গপ্পো। রবিনকে বলল, তোমার কিছু কাজ বাড়ল, নথি।
তাই তো চাই, রবিন বলল। কী কাজ?
রক্তচক্ষুর ব্যাপারে খোঁজ নেবে। লাইব্রেরিতে কোন বইয়ে দেখো। তো, ওটার উল্লেখ আছে কিনা। আমার মনে হয় রত্ন কিংবা মূল্যবান। পাথরের ওপর লেখা রেফারেন্স বইয়ে পেয়ে যাবে।
ঠিক আছে, মাথা নাড়ল রবিন। তো এখন যাই। লাইব্রেরিতে যাব। আগে। ওখানে কাজ সেরে বাড়ি ফিরব।
যাও। ভূত-থেকে-ভূতে চালু করে দিয়ে ডিনারের আগেই।
সাইকেল নিয়ে চলে গেল রবিন।
বরং বাদই দাও! হঠাৎ বলল অগাস্ট। তোমাদেরকে কতখানি। বিপদে ফেলছি, আমিও জানি না! অবস্থা বিশেষ ভাল ঠেকছে না! রয় হ্যামারের বাড়িতে ডাকাত পড়ল, তিন-ফোঁটা এসে তোমাকে হুমকি দিয়ে গেল। কিশোর, সামনে মহাবিপদ! তোমাদেরকে বিপদে ফেলার কোন যুক্তিই নেই, রক্তচক্ষুর কথা ভুলে বরং বাড়ি ফিরে যাই আমি। অগাস্টাসকে খোঁজার দরকার নেই তোমাদের। পারলে তিন-ফোঁটা কিংবা কালো-গোঁফই খুঁজে নিক, ওটা নিয়ে মারামারি করুক গে ওরা।
খুব ভাল কথা বলেছ, সঙ্গে সঙ্গে সায় দিল মুসা। কী বলো, কিশোর?
কিন্তু গোয়েন্দাপ্রধানের চেহারা দেখেই জবাব পেয়ে গেল সে। জটিল রহস্য সমাধান করতে দেয়া হয়েছে কিশোর পাশাকে, রক্তের গন্ধ পেয়েছে ব্লাডহাউণ্ড, আর তাকে বিরত করা যাবে না।
মাত্র তো শুরু করলাম, সেকেণ্ডু, কিশোর বলল, এখনি কী! রহস্যই তো চাই আমরা, পেয়েছিও, এখন সেটার কিনারা না করেই পিছিয়ে যাব? কাজের কথায় আসি। কয়েকটা ব্যাপার অদ্ভুত ঠেকছে!
যেমন?
আলমারিতে নিজেই নিজেকে আটকে রেখেছিল রয় হ্যামার, বোমা ফাটাল কিশোর।
বিস্ময়ে কয়েক মুহূর্ত কথা বলতে পারল না অগাস্ট। আটকে রেখেছিল! কেন?
সেটাই বুঝতে পারছি না।

আগ্রহে সামনে ঝুঁকে এসেছে মুসা। আলমারিতে কী করে আটকা পড়ল নিজে নিজে? চেহারা দেখে মনে হয়েছে, ঝড়ে পড়েছিল, ওই অবস্থাই বা করল কী করে নিজের?
দেখে যা মনে হয়, তাই হতে হবে এমন কোন কথা নেই, এক আঙুল দিয়ে গাল চুলকাল কিশোর। ভাবো। নিজের মগজকে কাজে লাগাও। ...উকিল বলেছে, দেড় ঘণ্টা ধরে আলমারিতে আটকে আছে, বলেনি?
অ্যাঁ! ...হ্যাঁ।
বেশ। তা হলে তার কথামত, সে ওই দেড়টি ঘণ্টা খানিক পর পরই চেঁচিয়েছে, দরজায় ধাক্কা দিয়েছে সাহায্যের আশায়। কিন্তু ওইরকম পরিস্থিতিতে একজন মানুষ সাধারণত কী করবে প্রথমে?
প্রথমেই চশমা ঠিক করবে! চেঁচিয়ে উঠল অগাস্ট। হয় নাকে, বসাবে, কিংবা খুলে পকেটে রেখে দেবে। অন্ধকারে পকেটেই রাখে। বেশিরভাগ লোকে। সুতো বেঁধে কান থেকে দেড় ঘণ্টা ঝুলিয়ে রাখা...উঁহু! অসম্ভব!
ঠিকই বলেছ, মাথা চুলকাল মুসা। আরও একটা ব্যাপার, চশমা ঠিক করার পরেই টাই ঠিক করত। টেনেটুনে নট ঢিলা করত, সোজা করত টাইটা, যেভাবে বাকা হয়েছিল খুব অস্বস্তি লাগার কথা। কিশোর, ঠিকই আন্দাজ করেছ। ওই ব্যাটা চশমা আর টাই উল্টোপাল্টা করে রেখেছিল ইচ্ছে করেই, আমাদের বোকা বানানোর জন্যে।
রহস্যের সমাধান করতে হলে সমস্ত ব্যাপার খতিয়ে দেখতে হবে, খুঁটিনাটি কিছু বাদ দেয়া চলবে না, কিশোর বলল। তোমাদের মতই আমিও প্রথমে বোকা বনেছিলাম। ...এসো, এখানে এসো। দুজনেই। চেয়ার থেকে উঠে সরে দাঁড়াল সে। চেয়ারের গদিতে হাত দিয়ে দেখো। টেবিলেও হাত রাখো।
কিশোর যে চেয়ারটায় বসেছিল, তার গদিতে হাত রেখে দেখল মুসা আর অগাস্ট। চেয়ারের সামনে টেবিলেরও খানিকটা জায়গায় হাত বোলাল।
কী বুঝলে? ভুরু নাচাল গোয়েন্দাপ্রধান।
চেয়ারের গদি গরম, বলল অগাস্ট। টেবিলও।
মাথা ঝোকাল কিশোর। হ্যাঁ। রয় হ্যামারের চেয়ার তুলতে গিয়েও এই একই ব্যাপার দেখেছি। চেয়ারের গদি গরম, বড়জোর মিনিটখানেক আগে ওতে বসেছিল কেউ। এরপর যখন ওর চশমা আর টাইয়ের কথা ভাবলাম, আর কোন সন্দেহ রইল না। বুঝে গেলাম কী ঘটেছে।
আমাদেরকে আসতে দেখেছে সে, গাড়ি থেকে বেরোতে দেখেছে। তাড়াতাড়ি চেয়ারটা উল্টে রেখে গিয়ে আলমারিতে ঢুকেছে, চশমা আর টাই উল্টোপাল্টা

করেছে। আমরা তার ঘরে ঢুকেছি, সাড়া পেয়েই শুরু করেছে চেঁচামেচি। দুতিন মিনিটের বেশি আলমারিতে ছিল না সে।
ইয়াল্লা! চেঁচিয়ে উঠল মুসা। ওকাজ করতে গেল কেন?
আমাদেরকে বিপথে নেয়ার জন্যে, কিশোর বলল। বোঝানোর জন্যে, চিঠির কপি সত্যিই চুরি গেছে। আসলে মিছে কথা বলেছে।
তার মানে, চশমাধারী, কালো গোঁফওয়ালা, মাঝারি উচ্চতার কোন লোক নেই? অগাস্টের প্রশ্ন।
আমার তো তাই মনে হয়। সব হ্যামারের বানানো কথা। যা মনে হচ্ছে, তিন-ফোঁটা কালিচরণ রামানাথের টাকা খেয়েছে সে, কপিটা দিয়ে দিয়েছে তাকে। আমাদেরকে কী করে বোকা বানাবে, সেটাও হাতুড়ি মিয়ারই পরিকল্পিত।
হাতুড়ি মিয়া! বুঝতে পারছে না অগাস্ট।
হ্যামারের বাংলা হাতুড়ি, কাউকে সম্বোধন করতে মিয়া বলে আমাদের দেশে, অনেক ক্ষেত্রে টিটকারির ছলে
অ। তা হলে দেখা যাচ্ছে, ওই হাতুড়ি মিয়ারই যত শয়তানী। হু, এখন বোঝা যাচ্ছে, তিন. ফোঁটা কার কাছে খবর পেল এখানে মূর্তিগুলো। আছে। চিঠি পড়েই বুঝেছে সে, অগাস্টাসের মূর্তির ভেতর রয়েছে জিনিসটা।
ব্যাটা আবার আসবে বলে গেছে! মুসা বলল। সঙ্গে করে না আরও কয়েকটা কয়েক-ফোঁটাকে নিয়ে আসে! যদি বিশ্বাস না করে আমাদের কথা? যদি ভাবে, অগাস্টাসের মূর্তি কোথায় আছে আমরা জানি, তাকে মিছে কথা বলছি? শুনেছি, ভারতের লোকেরা নাকি কথা আদায়ের জন্যে খুব অত্যাচার করে মানুষের ওপর!
দেখো, অত্যাচার সব দেশেই আছে। আমেরিকানরা কম অত্যাচার করেছিল চীনাদের ওপর? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মান নাৎসি আর। জাপানীরা কী করেছে? আজও ইহুদীরা যে অত্যাচার চালাচ্ছে। প্যালেসটাইনীদের ওপর, ভাবতেই গা শিউরে ওঠে! আর ইংরেজরা কী করেছিল? অগাস্টের ওপর চোখ পড়তেই থেমে গেল কিশোর। গাস, কিছু মনে কোরো না, আমি ইতিহাসের কথা বলছি। ভারত দখল করেছিল ওরা জোর করে; দুশো বছর ধরে একটানা অকথ্য অত্যাচার, অনাচার চালিয়েছে, বিভীষিকার রাজত্ব কায়েম করেছিল লর্ড ক্লাইভ আর তার চেলারা, ওদের তুলনায় ভারতের মানুষ ফেরেশতা…
হয়েছে, হয়েছে, কিশোর, থামো! দুহাত তুলল মুসা। আমি মাপ চাইছি!
সরি! লজ্জিত হলো কিশোর। উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম। ইনডিয়াকে কেউ খারাপ বললে সইতে পারি না। ওটা আমার দেশ…
বাংলাদেশ না? অগাস্ট প্রশ্ন করল।

বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান আগে একটাই দেশ ছিল, ক্লাইভের চেলাদের কাছে ব্লাডি ইনডিয়া, ওরাই ভাঙনের বীজ বুনে এসেছে, ভাগাভাগি করে দিয়ে এসেছে একটা অখণ্ড সোনার দেশকে।...যাক গে, ওসব পুরানো কাসুন্দি ঘেঁটে লাভ নেই। সব দেশেই ভালমন্দ আছে। হ্যাঁ, যা বলছিলাম... ফোন বেজে উঠল, বাধা পড়ল তার কথায়।

উঠে গিয়ে রিসিভার তুলে নিল কিশোর। হ্যালো। পাশা স্যালভেজ ইয়ার্ড।

মিসেস প্যাশা আছেন? মহিলাকণ্ঠ ভেসে এল। আমি ম্যালিবু বিচ থেকে বলছি। মিসেস হ্যামলিন।

তিনি তো নেই, বাইরে গেছেন। জরুরি কিছু? আমাকে বলবেন? চাচী এলেই বলব।

ও, তোমার চাচী? গুড। কী নাম তোমার, খোকা?

কিশোর পাশা। কিশোর।

হ্যাঁ, কিশোর, গতকাল দুটো মূর্তি কিনেছিলাম তোমাদের ওখান। থেকে। বাগানে সাজাব বলে।

সাজিয়েছেন? সতর্ক হয়ে উঠল কিশোর।

না, পারলাম আর কই? ধুলোময়লা খুব বেশি ছিল, বাগানে ফেলে পাইপের পানি দিয়ে ধুতে চেয়েছিলাম। কিন্তু একেবারে নরম কাদা দিয়ে তৈরি। পয়লা চোটেই কান খসে গেল, তারপর চলটা উঠতে শুরু করল, ওগুলো ঘরে রাখার জিনিস, বাগানে বৃষ্টিতে চব্বিশ ঘণ্টাও টিকবে না। ভাবছি, ফেরত নেবে কিনা! বাগানে তো সাজাতে পারলাম না, তোমার চাচী অবশ্য তাই বলেছিল...

সরি, মিসেস হ্যামলিন, আমরা জানতাম না ওগুলো মাটির। পুরানো জিনিস কিনি তো, কোনটা যে খারাপ পড়বে, ঠিক বোঝা যায় না। আপনি মূর্তি পাঠিয়ে দিন, পয়সা ফেরত নিয়ে যাবেন। আচ্ছা, কার মূর্তি নিয়েছিলেন?

কার মূর্তি মানে?

মূর্তিগুলো তো সব বিখ্যাত লোকের, নামটা জানতে চাইছি।

অ। তা ঠিক বলতে পারব না। তবে পোল্যাণ্ড নামটা মনে আছে, পোল্যাণ্ডের কী যেন?

অগাস্টাস?

হ্যাঁ হ্যাঁ, অগাস্টাস অভ পোল্যাণ্ড। আজব নাম! তা মূর্তিগুলো পাঠিয়ে দিতে বলছ?

হ্যাঁ।

ঠিক আছে। কাল আমিই নিয়ে আসব।

আপনি আর কেন কষ্ট করবেন? তাড়াতাড়ি বলল কিশোর। আমরাই বরং আসি, দোষটা তো আমাদেরই, টাকা ফেরত দিয়ে মূর্তি নিয়ে আসব। আজ বিকেলেই আসি?
তা হলে তো খুবই ভাল হয়।
ঠিকানাটা দিন।
ঠিকানা লিখে নিয়ে মিসেস হ্যামলিনকে ধন্যবাদ জানিয়ে রিসিভার রেখে দিল কিশোর। ফিরে তাকাল।
কৌতূহলে ফেটে পড়ছে মুসা আর অগাস্ট। বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে আছে তার দিকে।
অগাস্টাস অভ পোল্যাণ্ডকে পাওয়া গেছে, হাসল কিশোর। বোরিস ফিরে এলেই যাব। নিয়ে আসব মূর্তিটা!
খাইছে! চেঁচিয়ে উঠল মুসা। তিন-ফোঁটার কাছ থেকে খবরটা গোপন রেখো, আল্লাহ!
মুসার কথার ধরনে হেসে ফেলল কিশোর আর অগাস্ট।
রকি বিচ পাবলিক লাইব্রেরিতে পার্ট-টাইম চাকরি করে রবিন, হাতখরচের টাকাটা এসে যায়, মা-বাবার কাছে চাইতে হয় না; তা ছাড়া, পছন্দসই জিনিস কেনার ব্যাপারও আছে। তবে সবচেয়ে বড় সুবিধে, ইচ্ছেমত যখন-তখন এসে বইপত্র ঘাটাঘাটি করা যায়, লাইব্রেরিয়ানের অনুমতি নিয়ে বাড়ি নিয়ে যাওয়া যায়, এখানে চাকরি না করলে এই সুবিধেটা পেত না।
অসময়ে রবিনকে লাইব্রেরিতে ঢুকতে দেখে অবাক হলেন না প্রৌঢ়া। লাইব্রেরিয়ান মিস হকিনস। তবু জিজ্ঞেস করলেন, আরে, রবিন! আজ তো তোমার ডিউটি নেই।
একটা তথ্য দরকার, আপা, রবিন বলল। কয়েকটা বই দেখব।
অ, তাই বলি, অসময়ে আমাদের ছোট গোয়েন্দা এখানে কেন? মিষ্টি করে হাসলেন মিস হকিনস। এসে ভালই করেছ, রবিন। আজ যা কাজ না! একটু সাহায্য করবে? না না, বেশি কিছু না, এই কয়েকটা বই একটু র‍্যাকে তুলে দেবে। পারবে?
নিশ্চয়, দিন, এগিয়ে এল রবিন।
বইগুলোর অবস্থা দেখে পাঠকদের ওপর মেজাজ খারাপ হয়ে গেল রবিনের, এত অযত্ন করে! কোনটার মলাট ছিঁড়ে ফেলেছে, কোনটা সেলাই ছিঁড়ে যাওয়ায় ভেতরের পাতা বেরিয়ে পড়েছে। এই অবস্থায় এগুলো র‍্যাকে তোলা উচিত হবে না, এরপর টানাটানিতে একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে। বেশি ছেঁড়া বইগুলো তুলে নিয়ে হলের পেছনের ছোট একটা ঘরে চলে এল। সুচ-সুতো-ছুরি-কাঁচি-আঠা, সবই

আছে এখানে। কাজে লেগে গেল সে। সেলাই করে, আঠা লাগিয়ে, মলাট জুড়ে দিয়ে আবার প্রায় নতুন করে ফেলল সে বইগুলোকে, গভীর মমতায় একবার হাত বোলাল ওগুলোর ওপর, তারপর এনে সাজিয়ে রাখতে লাগল র‍্যাকে।
বাকি বইগুলো নিয়ে এল রবিন। তূপের ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়ল একটা মোটা বই, নতুনই রয়েছে মলাট। নামটা দেখে চমকে উঠল। সে, ফেমাস জেমস অ্যাণ্ড দেয়ার স্টোরিজ। ঠিক এই ধরনের একটা বই-ই মনে মনে খুঁজছিল সে।
রবিনের চমকে ওঠা লক্ষ করলেন মিস হকিনস। কী ব্যাপার, রবিন?
আনমনেই মাথা নাড়ল রবিন। বইটা তুলে নিয়ে এল মহিলার কাছে। এটার জন্যেই এসেছিলাম। টেবিলে পড়ে আছে!
আরে! মিস হকিনসও চোখ কপালে তুললেন। আশ্চর্য! কয়েক বছর ধরে র‍্যাকে পড়ে আছে ওটা, ছুঁয়েও দেখে না কেউ! আজ একই দিনে দুজনের দরকার পড়ল!
কে পড়ছিল, মনে আছে?
না। আজ এমনিতেই ভিড় বেশি, তা ছাড়া কোন্ টেবিলে কে কী পড়ছে, এখানে বসে কী করে জানব!
বোকার মত প্রশ্ন করে বসেছে সে-ভাবল রবিন। কে হতে পারে?
আচ্ছা, লোকটার কি কালো গোঁফ ছিল? আবার জিজ্ঞেস করল সে। চোখে হর্নরিমড় চশমা? এই মাঝারি উচ্চতা…
হ্যাঁ হ্যাঁ, ওরকম একটা লোক এসেছিল বটে, মাথা ঝাঁকালেন মিস। হকিনস। তবে ও-ই এই বই পড়েছে কিনা…না না, ঠিক, ও-ই পড়েছে! আমাকে এ-ধরনের বইয়ের কথা জিজ্ঞেস করেছিল। ফাসফেঁসে গলা, সেজন্যেই মনে করতে পেরেছি। চেনো নাকি ওকে?
না, শুনেছি। বাকি বইগুলো র‍্যাকে তুলতে চলল সে। মনে ভাবনার ঝড়। কালো-গুফো এই বই পড়ছিল কেন? কী জানতে চেয়েছিল? লোকটা কে?
তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে বইটা নিয়ে এসে কোণের দিকে প্রায় নির্জন একটা টেবিলে বসল রবিন।
গভীর আগ্রহে বইয়ের বিশেষ বিশেষ জায়গা পড়ে চলল সে। পৃথিবীর বিখ্যাত সব রত্ন আবিষ্কারের রোমাঞ্চকর ইতিহাস, বিভিন্ন তথ্য। যেটাই ধরছে, ছাড়তে পারছে না। জোর করে শেষে হোপ হীরার অধ্যায় থেকে চোখ সরাল, পাতা উল্টে চলল। হঠাৎ করেই পেয়ে গেল রক্তচক্ষু, পুরো একটা অধ্যায় লেখা রয়েছে ওটার ওপর।
পায়রার ডিমের সমান একটা পদ্মরাগমণি। কখন, কোথায়, কীভাবে আবিষ্কার হয়েছে ওটা, কেউ জানে না। কিন্তু কয়েক শতাব্দী ধরে পাথরটার নাম জানে চীন,

ভারত আর তিব্বতের মানুষ। রাজা-মহারাজা, সম্রাট, রানী, রাজকুমারী, বড় বড় সওদাগর, অনেকেই এর মালিক হয়েছে, কিন্তু কেউ ধরে রাখতে পারেনি বেশিদিন। কারও কাছ থেকে চুরি হয়েছে, কারও কাছ থেকে ছিনতাই, বেশ কয়েকজন খুনও হয়েছে ওটার জন্যে। শুধু তাই নয়, রাজায় রাজায় লড়াই বাধিয়েছে ওই চুনি, সিংহাসন-ছাড়া করেছে রাজাকে, কাঙাল বানিয়ে বনবাসে পাঠিয়েছে। অন্তত পনেরোজনের রহস্যময় মৃত্যু ঘটেছে ওই পাথরের জন্যে।

মহামূল্যবান রক্তচক্ষু; অদ্ভুত নামকরণের কারণ, দেখতে ওটা মানুষের চোখের মত, রঙ রক্তলাল। মহামূল্যবান কেন হলো ওটা, জানা যায়নি, বরং উল্টোটাই হওয়ার কথা। রক্তচক্ষু নিরেট নয়, মস্ত খুত আছে, ভেতরটা ফাপা। তবু এর জন্যে পাগল মানুষ! কেন!

পড়তে পড়তে অধ্যায়ের শেষে চলে এল রবিন লেখা রয়েছে:

মূল্যবান অনেক পাথরই আছে, যেগুলো অভিশপ্ত, দুর্ভাগ্য বয়ে আনে মালিকের। বার বার হাত বদল হয়েছে ওগুলো, কেউ মরেছে, কেউ সাংঘাতিক অসুখে ভুগেছে ওগুলোর জন্যে, কারও বা অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। ওগুলোর মারাত্মক ক্ষতিকারক প্রভাব থেকে কেউই নিরাপদ ছিল না। হোপ হীরা ওসব পাথরের একটা, মানুষের ক্ষতি করেই চলছিল, শেষে ভয়ে ওটাকে ওয়াশিংটনের স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউটকে দান করে। দিয়ে বাচল ওটার শেষ মালিক। রক্তচক্ষু ওরকম আরেকটা অভিশপ্ত পাথর। ওটার মালিক হয়ে দুর্ভাগ্যের কবল থেকে বেঁচেছে খুব কম লোকেই। শেষে ওটাকে ভারতের এক মহারাজ দান করে দিলেন ছোট্ট পাহাড়ি গ্রাম কাটিরঙ্গার ন্যায়-বিচারের মন্দির-এ (গ্রাম এবং মন্দিরের নামের ব্যাপারে মতান্তর আছে)।

মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে নিয়োজিত রয়েছে একদল দুর্ধর্ষ পাহাড়ি উপজাতির লোক, ভয়ানক যোদ্ধা ওরা। দেব-মূর্তির কপালে খোচিত ছিল রক্তচক্ষু। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস, পাপীকে ধরিয়ে দেয়ার ক্ষমতা আছে পাথরটার। কাউকে দোষী সন্দেহ হলে, তাকে নিয়ে আসা হত রক্তচক্ষুর সামনে। যাকে আনা হলো, সে পাপী হলে, জ্বলে উঠবে পাথরটা।

অনেক বছর আগে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যায় রক্তচক্ষু। এখন কোথায় আছে, কেউ জানে না, অথচ আজও এর আশা ছাড়েনি। মন্দিরের লোক, দুনিয়াময় খুঁজে বেড়াচ্ছে পাথরটা। গুজব রয়েছে, মন্দিরেরই কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করে পাথরটা বিক্রি করে দিয়েছে বিদেশী কারও কাছে। কেউ বলে পাথরটা এখন অপঘাতে মরা চোরের কবরে পড়ে রয়েছে, তার শুকনো হাড়গোড়ের মাঝে। কেউ বলে, না, কবরে নেই, অন্য জায়গায়, আবার একদিন উদয় হবে। পুরানো কিংবদন্তী বলে: পঞ্চাশ বছর মানুষের ছোঁয়া না পেলে

রক্তচক্ষুর ক্ষতি করার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যাবে, অভিশাপমুক্ত হয়ে যাবে, তখন কেউ ওটা খুঁজে বের করতে পারলে, উপহার পেলে, কিংবা ন্যায্য দামে কিনে নিলে তার আর ক্ষতি হবে না। তবে, চুরি কিংবা ছিনতাই করে নিয়ে যাওয়া চলবে না, তা হলে যে নেবে তার ক্ষতি হবেই।

কিছু রত্ন-সংগ্রাহক গোপনে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে পাথরটা। অভিশপ্ত হোক বা না হোক, পাথরটা তাদের চাই-ই। তবে ক্ষীণ একটা আশাও রয়েছে ওদের, হয়তো পঞ্চাশ বছরে শুদ্ধ হয়ে গেছে রক্তচক্ষু।

বাপ রে! জোরে নিঃশ্বাস ফেলল রবিন। ওই পাথরের কাছ থেকে দূরে থাকাই উচিত!-মনে মনে বলল। কী ভেবে পাতা উল্টে বইটা কবে লেখা হয়েছে, দেখে নিল। বেশ কয়েক বছর আগের ছাপা। কয়েকটা প্রশ্ন। ভিড় জমাল মনে। কতদিন আগে চুরি হয়েছে রক্তচক্ষু? সত্যিই ক্ষতি করার ক্ষমতা আছে পাথরের? তা যদি হয়, পঞ্চাশ বছর পর কি আসলেই শুদ্ধ হয়ে যাবে রক্তচক্ষু।

চিন্তিতভাবে বইটা নিয়ে র‍্যাকে রেখে দিল রবিন। একটা এনসাইক্লোপিডিয়া খুলে খোঁজাখুঁজি করতেই পেয়ে গেল কাটিরঙ্গা, কয়েক লাইন লেখা রয়েছে জায়গাটার ওপর। পাহাড়ঘেরা খুব দুর্গম অঞ্চল, অধিবাসীরা ভয়ঙ্কর প্রতিহিংসাপরায়ণ।

ঢোক গিলল রবিন নিজের অজান্তেই, গলা, শুকনো। রক্তচক্ষু আর কাটিরঙ্গার ব্যাপারে যা যা জেনেছে, নোট লিখে নিল। ভাবছে। কিশোরকে ফোন করে জানাবে? না, তত তাড়াহুড়ো নেই। পরে জানালেও চলবে। তা ছাড়া ডিনারের সময় হয়ে এসেছে। বাড়িতে বলে আসেনি, দেরি করলে মা বকবেন!

মিস হকিনসকে গুডবাই জানিয়ে বেরিয়ে এল রবিন। বাড়িতে পৌঁছে দেখল, ডিনার তৈরি করছেন মা, বাবা বসে বই পড়ছেন, মুখে পাইপ।

ছেলের সাড়া পেয়েই মুখ তুললেন মিস্টার মিলফোর্ড। এই যে, এসেছ। ভাবছ কী? মনে হচ্ছে, মস্ত কোন সমস্যায় পড়ে গেছ?

বাবা, এগিয়ে এল রবিন, অগাস্টাস অভ পোল্যাণ্ডের নাম শুনেছ? কে ছিলেন, জানো?

না, মাথা নাড়লেন মিস্টার = মিলফোর্ড। অগাস্টাস...অগাস্টাস...অগাস্ট, হ্যাঁ, অগাস্ট নামটা জানি। কী করে। হয়েছে, তা-ও জানি। তুমি জানো?

রবিন জানে না। খুলে বললেন তাকে মিস্টার মিলফোর্ড। গায়ে পিন, ফোঁটাল যেন কেউ, এমনিভাবে লাফিয়ে উঠল রবিন। প্রায় উড়ে গিয়ে। পড়ল ফোনের কাছে।

কিন্তু কিশোরকে পাওয়া গেল না। জানালেন মেরি চাচী, আধ ঘণ্টা আগে বোরিস আর মুসাকে নিয়ে ম্যালিবু বিচে গেছে। কখন ফিরবে ঠিক নেই।

আমি আসছি, রবিন বলল। এলে ওকে বলবেন। থ্যাঙ্ক ইউ, ফোন রেখে দিল সে।

দরজার দিকে আবার রওনা দিতে যাবে, এই সময় মায়ের ডাক কানে এল। এই, তোমরা খেতে এসো, আমার হয়ে গেছে।
বাধ্য হয়েই আবার ফিরতে হলো রবিনকে। বাবার কাছ থেকে যা জেনেছে, কিশোরকে জানানোর জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে সে। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে গলায় বার বার খাবার আটকে যেতে লাগল তার।

.
মিসেস হ্যামলিনের বাড়ি খুঁজছে তখন কিশোর, মুসা আর অগাস্ট।
অবশেষে খুঁজে পাওয়া গেল। বড় বাংলো টাইপের বাড়ি, চারপাশ ঘিরে রেখেছে বাগান।
গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল তিন কিশোর। লাল ইটের পথ চলে গেছে সবুজ ঘাসে ঢাকা বাগানের মাঝখান দিয়ে। বাড়ির দরজায় এসে বেল বাজাল কিশোর।
সুন্দর চেহারার একজন মাঝবয়েসী মহিলা দরজা খুলে দিলেন, পরনে হালকা পোশাক।
আমি কিশোর পাশা, স্যালভেজ ইয়ার্ড থেকে এসেছি, পরিচয় দিল কিশোর। মূর্তিগুলো কোথায়?
ও, এসো এসো, ওই যে ওখানে।
গলা শুনেই বুঝল কিশোর, মিসেস হ্যামলিন।
পথ দেখিয়ে বাগানের কোণে এক জায়গায় ওদেরকে নিয়ে এলেন মহিলা। ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে যেন পড়ে আছে অগাস্টাস অভ পোল্যাণ্ড, করুণ অবস্থা। নাক নেই, একটা কান খসে গেছে, শরীরের জায়গায়। জায়গায় খাবলা দিয়ে ছাল-চামড়া-মাংস তুলে নেয়া হয়েছে যেন। কিন্তু ফ্রানসিস বেকন বহাল তবিয়তেই রয়েছে, বোঝা যাচ্ছে, ওটাকে ধোয়া হয়নি, ধুলো জমে রয়েছে গায়ে আগের মতই।
ফিরিয়ে দিতে খারাপই লাগছে, মহিলা আন্তরিক দুঃখিত। খুব শখ করে এনেছিলাম। আসলে, বাগানে বসানোর জিনিস নয় এগুলো, ঘরে রাখার জন্যে বানিয়েছে। পানি লাগলেই শেষ।
ঠিক আছে, ঠিক আছে, ভাববেন না, আশ্বাস দিল কিশোর। ইয়ার্ডে প্রায়ই পুরানো মাল আসে। আপনার কথা মনে রাখব। বাগানে সাজানোর উপযুক্ত, পাথরের তেমন মূর্তি এলেই দিয়ে যাব আপনাকে, অগাস্টাসকে ফিরে পেয়ে খুব খুশি সে। এই যে নিন, আপনার টাকা। নিয়ে যাই তা হলে মূর্তি দুটো?
টাকাটা নিলেন মিস হ্যামলিন, গুনে দেখার প্রয়োজন বোধ করলেন না, সায় জানিয়ে মাথা কাত করলেন।

দুহাতে মূর্তিটাকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে এগোল কিশোর, ভারের জন্যে তার শরীর বাঁকা হয়ে গেছে পেছন দিকে। মুসা তুলে নিল বেকনকে।
সাবধানে গাড়িতে মূর্তি দুটো নামিয়ে রাখল মুসা আর কিশোর। হাঁপাচ্ছে।
আরিব্বাপ রে! ফোঁস করে মুখ দিয়ে বাতাস ছাড়ল মুসা। কী ভারির ভারি!
অগাস্ট বসল পিকআপের কেবিনে, তার আর বোরিসের মাঝখানে সিটে রয়েছে মূর্তি দুটো। মুসা আর কিশোর উঠল পেছনে। গাড়ি ছেড়ে দিল বোরিস।
তা হলে রক্তচক্ষুকে পেলাম? বলল মুসা। তুমি এখনও শিওর, অগাস্টাসের ভেতরেই পাওয়া যাবে?
নিশ্চয়ই।
ইয়ার্ডে ফিরেই আগে ভাঙতে হবে মূর্তিটা, না কী বলো?
রবিনের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। নইলে মন খারাপ হবে ওর।
ইয়ার্ডের অফিসে মেরি চাচীর সঙ্গে বসে কিশোরদের অপেক্ষা করছে রবিন। সময় যেন দাঁড়িয়ে গেছে মনে হচ্ছে তার। ইতিমধ্যে দুজন খরিদ্দার এসেছে, ছোটখাট জিনিস কিনেই সঙ্গে সঙ্গে চলে গেছে আবার।
গেটে গাড়ির শব্দ হতেই ঝট করে ফিল রবিন। নিরাশ হলো। না, পিকআপ নয়, কালো একটা সিড্যান ঢুকছে। আরে, সিড্যানের জোয়ার এল নাকি! আর কোন গাড়ি আসতে পারে না? অফিসের সামনে এসে থামল গাড়িটা। একজন লোক নামল। দেখেই চমকে উঠল রবিন। মাঝারি উচ্চতা, কালো চুল, হর্নরিমড় চশমা, আর অবশ্যই কালো গোঁফ!
কালো-গুঁফো! এখানে!
গুড ইভনিং, অফিসের দরজা থেকেই বলল লোকটা, মেরি চাচীর। দিকে তাকিয়ে, ফ্যাসফেসে গলা। অফিসের বাইরে টেবিলে রাখা পাঁচটা মূর্তির দিকে আঙুল তুলল। খুব ভাল জিনিস। বিখ্যাত সব লোক! আর আছে, না এই কটাই?
এই কটাই, মেরি চাচী বললেন। একটা কথা আগেই বলে দিচ্ছি, বাগানে বসানোর জন্যে নেবেন না। পানি লাগলেই নষ্ট হয়ে যায়, এই একটু আগে একজন অভিযোগ করেছে। ওগুলো ফেরত আনতে পাঠিয়েছি। মনে হয়, বাকিগুলোর ব্যাপারেও অভিযোগ আসবে শিগগিরই।
মেরি চাচীর কণ্ঠ আর চেহারা দেখেই বুঝল রবিন, বেচারীর মন খারাপ। জিনিস বিক্রি করে আবার ফেরত নেয়া যে-কোন ব্যবসায়ীর জন্যে কষ্টকর। তা ছাড়া পুরানো জিনিস, খারাপ বলে ফেরত দিচ্ছে লোকে, এরপর বিক্রি হবে কিনা, তার ঠিক নেই। অনেকগুলো টাকা পানিতে যাবে, মেরি চাচীর খারাপ লাগারই কথা।
তাই? আগ্রহী মনে হলো কালো-ফোকে। দুটো আসছে, বাকিগুলোও আসতে পারে বলছেন? তা হলে তো খুব ভাল। এসব জিনিস সংগ্রহ করা আমার নেশা,

এই পাঁচটা নিচ্ছি, বাকিগুলোও নেব, যদি আসে। আর কাউকে দেবেন না, প্লিজ!
দাম জানেন? মেরি চাচী বললেন।
কত?
পঞ্চাশ ডলার করে একেকটা।
রাজি।
যেগুলো ফেরত আসবে, ওগুলোর অবস্থা কেমন থাকবে জানি না। ভেঙেচুরে নষ্ট হয়ে আসতে পারে।
কুছ পরোয়া নেই। আমি নেব, বলতে বলতেই পকেট থেকে নোটের তাড়া বের করল। সাড়ে তিনশো ডলার গুনে নিয়ে বাড়িয়ে ধরল। সাতটার দাম। এখানে পাঁচটা, আর যে দুটো আসছে তার জন্যে।
অবাক হয়েছেন মেরি চাচী। বোকা নাকি লোকটা! টাকাগুলো নিতে দ্বিধা করছেন। শেষে বললেন, আগেই বলে দিচ্ছি, খারাপ জিনিস। পরে আমাকে দুষবেন না, ফেরত নিয়ে আসতে পারবেন না।
আনব না, নিন, টাকা নিন। যেগুলো ফেরত আসবে, সব নেব। আর কাউকে দেবেন না।
টাকাগুলো নিয়ে ড্রয়ারে রাখতে রাখতে বললেন চাচী, দেব না। বসুন, অন্য দুটো এসে পড়ল বলে। আমার ছেলে গেছে আনতে। বাইরের লোকের কাছে কিশোরকে নিজের ছেলে বলে পরিচয় দেন মেরি চাচী।
গুড! একটা চেয়ার টেনে বসল লোকটা। খুব ভাল মূর্তি, জানেন। আমার খুব পছন্দ হয়েছে। সত্যি বলতে কী, ম্যাডাম, দাম আপনি খুব কমই নিয়েছেন। আরে, হ্যাঁ, বসে থাকি কেন? আবার উঠে দাঁড়াল। লোকটা। মূর্তিগুলো এই সুযোগে গাড়িতে তুলে ফেললেই তো পারি। বেরিয়ে গেল সে।
উত্তেজনায় লাল হয়ে গেছে রবিনের চেহারা। বেচাকেনা শেষ, টাকাও নিয়ে ফেলেছেন মেরি চাচী। কথা দিয়ে ফেলেছেন, সবগুলো মূর্তি দেবেন লোকটাকে। এখন কী করা? কিশোর যে দুটো আনতে গেছে, ওগুলোর মধ্যে অগাস্টাসও থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে? আইনত এখন ওটাও কালো-ফোর জিনিস। অস্থির হয়ে উঠল সে।
ব্যাপারটা মেরি চাচীর চোখ এড়াল না। আরে, রবিন! এমন করছ কেন? শরীর খারাপ লাগছে?
আগেই আপনাকে বলা উচিত ছিল, চাচী, অনেক চেষ্টায় যেন কথা বেরোল রবিনের মুখ দিয়ে। অগাস্টের খুব ইচ্ছে ছিল, একটা মূর্তি কিনে বাড়ি নিয়ে যাবে। হাজার হোক, তার দাদার জিনিস…

আগেই বলা উচিত ছিল, মেরি চাচীর মুখ কালো হয়ে গেল। এখন তো আর সম্ভব নয়। কথা দিয়ে ফেলেছি ভদ্রলোককে…। ওই যে, কিশোর এসেছে…
শেষ মূর্তিটা সবে গাড়িতে তুলেছে কালো-ফো, এই সময় অফিসের কাছে এসে থামল পিকআপ। ঘোউউউ করে উঠে বন্ধ হয়ে গেল ইঞ্জিন।
গাড়ির পিছন থেকে লাফিয়ে নামল কিশোর আর মুসা। তাড়াহুড়ো করে এসে দাঁড়াল কেবিনের দরজার কাছে। দরজা খুলে গেল। বোরিস নামল, এক এক করে বের করল মূর্তি দুটো। বেকনকে নিল মুসা, কিশোর অগাস্টাসকে। চেপে ধরে রেখেছে বুকের সঙ্গে, নইলে পড়ে যাবে।
দুজনের কেউই প্রথমে দেখতে পেল না কালো-গুফোকে।
লোকটা এসে দাঁড়াল ছেলেদের সামনে। দাও, আর তোমাদের কষ্ট করার দরকার নেই। আমিই তুলতে পারব। অগাস্টাসের দিকে হাত বাড়াল। এগুলো কিনে নিয়েছি। মূর্তিটাকে দুহাতে চেপে ধরে টান মারল সে।
মূর্তি ছাড়ল না কিশোর। লোকটাও টানছে। চেঁচিয়ে উঠল রাগে, এই, ছেলে, ছাড়ছ না কেন? বললাম না, কিনে নিয়েছি?
দিয়ে দে, কিশোর, ডেকে বললেন মেরি চাচী।
চাচী! মূর্তিটাকে আরও শক্ত করে ধরে প্রতিবাদ করল কিশোর। অগাস্টকে এটা দেব কথা দিয়েছি আমি!
দিয়ে দে, বাবা, আমি জানতাম না! ভদ্রলোকের কাছ থেকে টাকা নিয়ে ফেলেছি!
কিন্তু ওনার চেয়েও অগাস্টের এটা বেশি দরকার! ভারি মূর্তি, তার ওপর টানাটানি, আর ধরে রাখতে পারছে না কিশোর। ওর কাছে এটা বাঁচা-মরার সামিল!
কী বলছিস! একটা মাটির মূর্তি বাঁচা-মরার সামিল!রাগ করলেন। মেরি চাচী। তোদের মাথা খারাপ হয়েছে! দিয়ে দে ওটা। নইলে বদনাম হয়ে যাবে। লোকে বলবে, কথা দিয়ে কথা রাখে না পাশারা!
দাও! গর্জে উঠল কালো-গুফো। হঠাৎ হ্যাঁচকা টান মারল।
চাচীর কথায় এমনিতেই ঢিল দিয়ে ফেলেছিল কিশোর, আচমকা টানে খসে গেল হাত থেকে, সামলাতে পারল না লোকটা, মূর্তি নিয়ে উল্টে পড়ল। সে-ও ধরে রাখতে পারল না ভারি জিনিসটা, পড়ে গেল। হাত থেকে, ভেঙে খান খান হয়ে গেল।
ভাঙা টুকরোগুলোর দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল ছেলেরা।
মেরি চাচী দূরে রয়েছেন, তাই দেখতে পাচ্ছেন না, কিন্তু চার। কিশোর পরিষ্কার দেখছে। লাল উজ্জ্বল একটা পাথর, পায়রার ডিমের সমান বড়, অগাস্টাসের ভাঙা মাথার ভেতর থেকে বেরিয়ে আছে।

নিশ্চল হয়ে গেছে যেন ছেলেরা।
হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে কালো-গুফো। দেখতে পেল পাথরটা, সঙ্গে সঙ্গে উবু হয়ে তুলে নিয়েই পকেটে ভরল।
অফিসের দরজায় বেরিয়ে এসেছেন মেরি চাচী, সেদিকে ফিরল সে। বলল, আমার দোষেই পড়েছে। আর হ্যাঁ, আর কোন মূর্তির দরকার নেই আমার। চলি।
গাড়িতে উঠে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল সে। ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে দ্রুত চলে গেল।
ইয়ার্ডের গেট দিয়ে সিড্যানটাকে বেরিয়ে যেতে দেখল ছেলেরা হতাশ দৃষ্টিতে।
গেল! প্রায় গুঙিয়ে উঠল মুসা। নিয়ে গেল রক্তচক্ষু! কিন্তু তখন না আলোচনা হলো, কালো-ফো বলতে কেউ নেই? রয় হ্যামারের কল্পনা? তা হলে ও কে?।
ভুল একটা কিছু হয়েছে, সামান্য কুঁজো হয়ে গেছে কিশোরের পিঠ, চোখে-মুখে রাজ্যের হতাশা।
আজ লাইব্রেরিতে গিয়েছিল কালো-ফো, রবিন বলল। আমি যাওয়ার আগে। রক্তচক্ষুর ব্যাপারে তথ্য খুঁজেছে সে।
এমন কাণ্ড ঘটবে ভাবিইনি! ধীরে ধীরে বলল কিশোর। জিনিসটা পেয়েও রাখতে পারলাম না, ছুঁতেই পারলাম না। সরি, গাস।
তোমার কী দোষ? সান্ত্বনা দিল অগাস্ট। খামোকা মন খারাপ কোরো না।
আমি এতই শিওর ছিলাম যে কালো-ফো নেই… বাধা পেয়ে থেমে গেল কিশোর।
মেরি চাচী বললেন, ঠিকই, তোর কোন দোষ নেই। তুই তো ছেড়েই দিয়েছিলি, ও ধরে রাখতে পারেনি। ওর দোষ। টুকরোগুলো ফেলে দিয়ে আয়। কিন্তু বাকি টাকাটা ফেরত নিল না…
হ্যাঁ, যাচ্ছি।
ফিরে দেয়াল-ঘড়ির দিকে তাকালেন মেরি চাচী। আরিব্বাবা, অনেক বেজেছে! তোরা বসবি নাকি, না বন্ধ করে দেব?
বসব, কিশোর বলল। তবে বেশিক্ষণ না।
গেট খোলাই থাক তা হলে। আরও এক-আধজন কাস্টোমার এসেও পড়তে পারে।
মাথা কাত করে সায় জানাল কিশোর।
অফিস থেকে বেরিয়ে ছিমছাম ছোট্ট সুন্দর দোতলা বসতবাড়ির দিকে রওনা দিলেন মেরি চাচী!
নীরবে ভাঙা টুকরোগুলো তুলে নিয়ে এল চার কিশোর, গোয়েন্দাপ্রধানের নির্দেশে একটা টেবিলে রাখল। টুকরোগুলো পরীক্ষা। করে দেখল কিশোর।

দেখো, দেখো, মাথার ভাঙা টুকরোয় একটা ডিম আকারের গর্ত, এর মধ্যেই ছিল রক্তচক্ষু।
ছিল, এখন আর নেই, নিরাশ হয়ে পড়েছে রবিন। ফোর হাত থেকে ওটা আর কোনদিন আনা যাবেও না।
এখন তা-ই মনে হচ্ছে বটে, পরাজয় মেনে নিতে পারছে না কিশোর পাশা। ভালমত ভাবলে উপায় বেরিয়েও যেতে পারে। চলো, ওয়ার্কশপে গিয়ে বসি। অযথা অফিস খোলা রেখে লাভ নেই। আজ আর কেউ আসবে না। ওখানে গিয়ে আলোচনা করব।
ওয়ার্কশপে এসে বসল ছেলেরা।
রবিন, কিশোর বলল, রক্তচক্ষুর ব্যাপারে কী কী জেনেছ?
নোট বের করে পাথরটার রক্তাক্ত ইতিহাস পড়ল রবিন। জানাল। কাটিরঙ্গার প্রতিশোধপরায়ণ ভীষণ উপজাতির কথা।
মারছে রে! খাইছে আর সেরেছে-র মত এই শব্দটাও কিশোরের কাছ থেকেই শিখেছে মুসা। শুনেই লোম খাড়া হয়ে যাচ্ছে! পাথরটা গেছে, ভালই হয়েছে। মরুক গে এখন কালো-গুফো।
কিন্তু, লোকে এটাও বলে: পঞ্চাশ বছর কেউ না ছলে শুদ্ধ হয়ে। যাবে পাথরটা, মনে করিয়ে দিল রবিন। যদি পঞ্চাশ বছর হয়ে গিয়ে থাকে? কিছুই হবে না গুফোর।
তা ঠিক, স্বীকার করল মুসা। কিন্তু ব্যাপারটা সত্যি না-ও হতে পারে।
হুমম! ধীরে ধীরে মাথা দোলাল অগাস্ট। জ্বলজ্বল করছে চোখ। বুঝতে পারছি, কেন দাদা ওটাকে ভয় পেত। কেন লুকিয়ে রেখেছিল মূর্তির মধ্যে। পঞ্চাশ বছর যাতে ওটাকে কেউ ছুতে না পারে! সময় গেলে ওটা অভিশাপমুক্ত হয়ে যাওয়ার পর বের করে বিক্রি করে দিত। কিন্তু সময় পায়নি দাদা, তাই আমার জন্যে রেখে গেছে। আমি শিওর, রক্তচক্ষু শাপমুক্ত হয়ে গেছে।
হতে পারে, কিশোর বলল। কিন্তু লাভ নেই। ফোর হাত থেকে কী করে বের করে আনব ওটা, জানি না।
ভূত-থেকে-ভূতে! আচমকা চেঁচিয়ে উঠল রবিন। কালো-ফোর। সন্ধানে লাগিয়ে দিই। ওর খোঁজ পাওয়া গেলেই...ইয়ে, গেলেই... গেলে কী করবে, সেটা আর বলতে পারল না সে।
গেলেই, বাক্যটা শেষ করে দিল কিশোর, ওর কাছ থেকে ছিনিয়ে। আনা যেত পাথরটা। কিন্তু, নথি, জানো, এই শহরে কালো গোঁফওয়ালা লোক কত আছে? শয়ে শয়ে। তা ছাড়া ওটা যে লোকটার সত্যিকারের। গোফ, তা-ই বা জানছি কী করে? নকলও হতে পারে।

হুঁ! চুপসে গেল রবিন।
দীর্ঘ নীরবতার পর মুখ খুলল অগাস্ট, আর কোন ভরসাই নেই!
আবার নীরবতা। এমনকী কিশোর পাশাও কোন উপায় বের করতে পারছে না।
হঠাৎ তীক্ষ্ণ ঝনঝন শব্দে বেজে উঠল ঘণ্টা।
বেল! লাফিয়ে উঠল রবিন। কাস্টোমার!
যাই, আমি দেখি, ধীরেসুস্থে উঠে দাঁড়াল কিশোর, অফিসের দিকে চলল। তাকে অনুসরণ করল অন্য তিনজন।
খোলা জায়গায় বেরিয়েই খরিদ্দারকে দেখতে পেল ওরা। কালো। চকচকে গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, হাতে কালো ছড়ি।
খাইছে! ফিসফিস করল মুসা। তিন-ফোঁটা!
এই যে, ছেলেরা, মিষ্টি করে হাসল লোকটা। ওগুলো দেখলাম পরীক্ষা করে, ছড়ি তুলে ভাঙা টুকরোগুলো দেখাল সে। নিশ্চয়ই অগাস্টাস অভ পোল্যাণ্ডের। ওটা এলেই আমাকে টেলিফোন করার কথা বলেছিলাম, ভুলে গেছ?
করতাম, স্যর, কিশোর বলল। কিন্তু তার আগেই ভেঙে গেল।
কীভাবে? আবার হাসল তিন-ফোঁটা, ভয়ঙ্কর হাসি, নাদুস-নুদুস হরিণশিশু দেখেছে যেন ক্ষুধার্ত বাঘ। ভাঙা মাথায় একটা গর্তও দেখেছি, ডিমের আকার। ওখানে কিছু লুকানো ছিল মনে হচ্ছে।
হ্যাঁ, স্যর, ছিল, আবার বোকার অভিনয় শুরু করেছে কিশোর, কণ্ঠস্বর ভোতা। এক কাস্টোমার টানাহেঁচড়া শুরু করেছিল, আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়ার জন্যে। ফেলে দিয়ে ভেঙেছে। তারপর কী জানি একটা তুলে নিয়ে পকেটে ভরল। ভাল করে দেখতে পারিনি।
চুপ করে এক মুহূর্ত ভাবল তিন-ফোঁটা। লোকটার কালো গোঁফ ছিল? আর ভারি চশমা?
হ্যাঁ হ্যাঁ, স্যর, হ্যাঁ! জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাল কিশোর।
নীরবে অবাক দৃষ্টি বিনিময় করল অন্য তিন কিশোর।
আর, আবার বলল লোকটা, ও যা নিয়ে গেল সেটা কি এরকম? পকেট থেকে একটা জিনিস বের করে টেবিলে ছুঁড়ে দিল সে।
লাল একটা পাথর!
রক্তচক্ষু! রক্তচক্ষু!
চমকটা সামলে নিতে কিশোরেরও সময় লাগল। ঢোঁক গিলে বলল, হ্যাঁ, স্যর, ওরকমই।
আঁমম! ছড়িতে ভর রেখে দাঁড়াল তিন-ফোঁটা। রক্তচক্ষুর নাম শুনেছ? শুনেছ, ওটা নিলে কী সাংঘাতিক অভিশাপ নেমে আসে? এমনকী যে ছোঁয়, সে-ও রেহাই

পায় না?
জবাব দিলে কী হবে, বুঝতে পারছে না কেউ, তাই চুপ করে রইল। অবাক হয়ে ভাবছে পাথরটা তিন-ফোঁটার দখলে এল কীভাবে! বড় জোর ঘণ্টাখানেক আগে এটা নিয়ে পালিয়েছিল কালো-গুফো।
একটা জিনিস দেখাচ্ছি, ছড়ি তুলে বোতাম টিপে দিল তিন ফোঁটা। সড়াৎ করে বেরিয়ে এল বারো ইঞ্চি লম্বা ছুরি। ফলাটার দিকে চেয়ে মুখ বাকাল। নোংরা! পকেট থেকে রুমাল বের করে ছুরি মুছল সে। লাল আঠালো পদার্থ লেগে গেল তাতে।
রক্ত লেগে থাকলে ইস্পাত নষ্ট হয়ে যায়, তিন-ফোঁটার হাসি হাসি মুখ, ভাবভঙ্গি আর বলার ধরন ভয়ঙ্কর। সে যাক গে... ছুরির ফলায় ঠেকিয়ে পাথরটা টেবিলের মাঝখান থেকে টেনে আনল সে। তুলে নিয়ে বাড়িয়ে ধরল কিশোরের দিকে। দেখো! ভাল করে দেখো।
হাতে নিয়ে পাথরটা চোখের সামনে ধরল কিশোর। অন্য তিনজন। ঘিরে এল তাকে, ওরাও দেখতে চায়। বিশেষ কিছু চোখে পড়ল না ওদের।
কই, কিছুই তো দেখছি না! কিশোর বলল।
দাও, পাথরটা নিয়ে ছুরি দিয়ে পোঁচ মারল তিন-ফোঁটা। আবার ওটা কিশোরের হাতে তুলে দিতে দিতে বলল, এবার দেখো।
হালকা একটা দাগ পড়েছে পাথরের গায়ে।
আচড়! কিশোর বলল। আঁচড় লেগেছে! কিন্তু চুনি তো ইস্পাতের চেয়ে শক্ত বলেই জানতাম! দাগ কাটল কীভাবে!
ঠিকই জানো, খুশি হয়েছে তিন-ফোঁটা। তার মানে চেহারা দেখে যা মনে হচ্ছে, তা তুমি নও। ভীষণ চালাক ছেলে তুমি, কিশোর পাশা, বোকার অভিনয় ছাড়ো। বিকেলে বুঝিনি। একটু আগে তোমার স্বাভাবিক চেহারা দেখলাম, তারপর হঠাৎ করেই অভিনয় শুরু করলে। যাক গে, এবার বলো তো, এই আঁচড় লাগার মানে কী?
আড়চোখে মুসার দিকে তাকাল কিশোর, হাসি ছড়িয়ে পড়েছে সহকারী গোয়েন্দার মুখে। ধরা পড়ে গিয়েছে, আর অভিনয় করে লাভ নেই। পাথরটার দিকে চেয়ে রইল এক মুহূর্ত, নীরবে। হঠাৎ মুখ তুলল। এটা আসল পাথর নয়। নকল, ছাঁচে ফেলে বানানো হয়েছে প্লাস্টিক দিয়ে।
চমৎকার! প্রশংসা করল তিন-ফোঁটা। ঠিক বলেছ। আর হ্যাঁ, যা ভাবছ, তা-ই, কালো-ফোর কাছ থেকেই নিয়েছি এটা। আসল রক্তচক্ষু এখনও লুকানোই রয়েছে। আমার ধারণা, অগাস্টাসের আরেকটা মূর্তি কোথাও আছে। তোমরা

যেগুলো বিক্রি করেছ, তার মধ্যেও থাকতে পারে। আমি চাই, আমার হয়ে খুঁজে বের করো ওটা।
এক এক করে চার কিশোরের মুখেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বোলাল তিন ফোঁটা।
আমি বলছি, অগাস্টাসের মূর্তি খুঁজে বের করবে! গর্জে উঠল সে হঠাৎ, হাসি হাসি ভাব চলে গেছে। নইলে... বোতাম টিপে ছুরির ফলা আবার খোলসের ভিতর ঢুকিয়ে নিল সে। থাক, তোমরা বুদ্ধিমান ছেলে, বলার আর দরকার নেই। বুঝতেই পারছ। মূর্তিটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফোন করবে আমাকে।
শান্ত পায়ে হেঁটে গিয়ে গাড়িতে উঠল সে। চলে গেল। হাঁ করে সেদিকে তাকিয়ে রইল ছেলেরা।
ব্যাটা...ব্যাটা, নিশ্চয় কালো-ফোকে খুন করেছে! নীরবতা ভাঙল মুসা। হায়, আল্লাহ, এত তাড়াতাড়ি কী করে জানল সে, ফো পাথর নিয়ে পালিয়েছে?
রহস্য জমাট বাধছে, সূক্ষ্ম খুশির আমেজ কিশোরের কণ্ঠে। মিস্টার হোরাশিও অগাস্ট নকল পাথর কেন রাখলেন অগাস্টাসের ভেতরে? আসল ভেবে নকলটাকে লুকিয়ে রাখেননি তো? নাকি ইচ্ছে করে, জেনেশুনেই আরেকটা পাথর লুকিয়েছেন, ফাঁকি দেয়ার জন্যে? আসলটা তা হলে কোথায়? অন্য কোন মূর্তির ভেতরে? তেরোটার মধ্যে আর কোন অগাস্টাস নেই, তা হলে...
আছে! বিস্ফোরিত হলো যেন রবিনের কণ্ঠ। আছে!
ভুরু কুঁচকে তাকাল কিশোর। অন্য দুজনও অবাক।
ভুলেই গিয়েছিলাম, বলল রবিন। এসেছি সেটা বলার জন্যেই, কিন্তু এমন সব কাণ্ড ঘটতে শুরু করল! বাবা বলল কথাটা। অকটেভিয়ান! রোমের সম্রাট ছিলেন, তাঁর আরেক নাম অগাস্টাস। নিশ্চয় অকটেভিয়ানের মূর্তির কথাই বোঝাতে চেয়েছেন গাসের দাদা। অগাস্ট নামকরণ হয়েছে অকটেভিয়ানের কারণেই। ওই মূর্তিটাই এখন খোঁজা। দরকার।
রক্তচক্ষুর কথা ভুলে যাওয়াই ভাল! বিড়বিড় করল মুসা। পনেরোজন। মরেছে, সঙ্গে আরও চারটে ছেলে যোগ হতে বাধা কী?
মুসা ঠিকই বলেছে, অগাস্ট একমত হলো। রক্তচক্ষু পেলেও ও। এখন নেবে কিনা জানি না। ভয় করছে!
কালো-গুফোর পরিণতি দেখো, সায় পেয়ে গলার জোর বাড়ল গোয়েন্দা সহকারীর। নকলটা নিয়ে গেল, তাতেই এক ঘণ্টার বেশি টিকল না! আল্লাই জানে, আমাদের কী হবে!
রবিন নীরব, কিশোরের থমথমে মুখের দিকে চেয়ে আছে।
পাথরটা খুঁজে পাইনি এখনও, অবশেষে মুখ খুলল কিশোর। বিপদ আসে কোথা থেকে? আগে তো খুঁজে বের করি, তারপর দেখা যাবে।

খুঁজব কিনা, সেটাও ঠিক করা দরকার, মুসা বলল। এসো, ভোট নিই। যে খোঁজার বিপক্ষে, হাত তোলো।
দেখা গেল, মসা একাই হাত তুলেছে। অগাস্ট সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না, আর রবিনের বিশ্বাস রয়েছে গোয়েন্দাপ্রধানের ওপর, তাই হাত তুলছে না। তা ছাড়া, ওরা ভোটে জিতলেই কি কিশোরকে ঠেকানো যাবে? এর আগে কখনও পেরেছে? কিশোরের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত, তাকে বিরত করা মুসা আর রবিনের কর্ম নয়।
বোকা হয়ে গেল যেন মুসা, সে ভেবেছিল, অগাস্ট আর রবিন তার সঙ্গে যোগ দেবে। হেরে গিয়ে ধীরে ধীরে হাত নামিয়ে নিল আবার। বিড়বিড় করে কী বলল, বোঝা গেল না। কিশোরের দিকে ফিরল। তুমিও মরবে, আমাদেরও মারবে। কোন আক্কেলে যে যোগ দিয়েছিলাম তিন গোয়েন্দায়! ...তো, এখন কী করা? পুলিশকে ফোন করব? কালোগুফো খুন হয়েছে যে জানাব?
প্রমাণ আছে? পাল্টা প্রশ্ন করল কিশোর। প্রমাণ ছাড়া বিশ্বাস করবে না পুলিশ। তবে, লাশটা পাওয়া গেলে যা জানি গিয়ে বলতে পারব। একটু থেমে বলল, একটাই উপায় দেখা যাচ্ছে, অকটেভিয়ানের মূর্তি খুঁজে বের করতে হবে এখন। তার জন্যে ভূত-থেকে-ভূতের দরকার। ঘড়ি দেখল। সাতটা বাজে, ছেলেমেয়েরা নিশ্চয় বাড়ি ফিরেছে। এতক্ষণে। চালু করে দেয়া যায় ভূতদের।
দেরি করল না আর কিশোর। এক এক করে তার পাঁচজন বন্ধুকে ফোন করল। পরদিন সকাল দশটার মধ্যে খবর জানাতে অনুরোধ করল। তারপর রবিন ফোন করল পাঁচজনকে, সব শেষে মুসা।
আপাতত আর কিছু করার নেই। রাতটা তার সঙ্গেই অগাস্টকে। থাকার আমন্ত্রণ জানাল কিশোর।
অগাস্ট রাজি।
সাইকেল নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হলো মুসা আর রবিন।
কী মনে হয়? পাশাপাশি চলতে চলতে বলল মুসা। অকটেভিয়ানটা পাওয়া যাবে?
না পেলে গেল রক্তচক্ষু, বলল রবিন। পানি লেগে হয়তো কোন এক সময় গলে যাবে মূর্তিটা, বেরিয়ে পড়বে পাথর। বাগানে পড়ে থাকবে। যার চোখে পড়বে, সে না-ও চিনতে পারে, দাম না-ও বুঝতে পারে। হয়তো তুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেবে, কিংবা ডাস্টবিনে নিয়ে ফেলবে। আর চিনে ফেললে তো মজাই মেরে দিল।
একটা জায়গায় এসে আলাদা হয়ে গেল দুজনে।
বাড়ি পৌঁছল রবিন। ঘরে ঢুকে দেখল, রিসিভার কানে ঠেকিয়ে ডায়াল করে যাচ্ছেন তার বাবা। বিরক্ত হয়ে খটাস করে নামিয়ে রাখলেন রিসিভার। রবিনকে দেখেই বলে উঠলেন, কাণ্ড! সারা রকি বিচই যেন পাগল হয়ে উঠেছে। একটা

লাইন খালি নেই, সব এনগেজড! আধ ঘণ্টা ধরে চেষ্টা করছি, লাইন পাচ্ছি না! আশ্চর্য!
কারণটা জানে রবিন, কিন্তু চুপ করে রইল। ভীমরুলের চাকে ঢিল পড়েছে, সবাই এখন টেলিফোন নিয়ে ব্যস্ত।
কাপড় ছেড়ে সোজা গিয়ে বিছানায় উঠল রবিন। কিন্তু ঘুম আসছে না, খালি এটা ভাবে, ওটা ভাবে।
ঘুমের ঘোরে দুঃস্বপ্ন দেখল রবিন: ঘোড়ায় চড়ে একদল খুনে ডাকাত তাড়া করেছে তাকে, সবার হাতে ছুরি লাগানো কালো ছড়ি।
চোখ মেলল এক সময়। পুব আকাশে অনেকখানি উঠে এসেছে। সূর্য। বাতাসে বেকন ভাজার সুবাস, প্রথমেই মুসার কথা মনে এল রবিনের। মুচকে হাসল।
কাপড় পরে তৈরি হয়ে নিচে নামল রবিন। রান্নাঘরে বেকন ভাজায় ব্যস্ত মা।
মা? কিশোর ফোন করেছে?
দাঁড়া, ভেবে দেখি… রবিনের দিকে না তাকিয়েই হাসলেন মা, কড়াইটা চুলা থেকে নামিয়ে ফিরলেন। আঙুল থুতনিতে ঠেকিয়ে গভীর চিন্তার ভান করলেন। করেছিল।
কী বলেছে?
আকাশেতে উড়িতেছে একপাল হাতি, পূর্ণিমা চাঁদ যেন অমাবস্যার রাতি।
ভ্রূকুটি করল রবিন। এটা কোন মেসেজ হতে পারে না। যাহ্, ঠাট্টা করছ! সত্যি, বলো না, কী বলেছে?
হাসলেন মা। তা হলে আরেকবার ভাবি। হ্যাঁ, মনে পড়েছে। এটা আর সেটা, শুধু আমরাই জানি, কাউকে সামলাতে হবে টেলিফোনের কানি! কী মানে রে এর?
তোমার আগের কথাটার কী মানে ছিল?
ওটা তো এমনি বানিয়ে বলেছে, মজা করার জন্যে।
এটাও কিশোর বানিয়ে বলেছে।
তা বলেছে, কিন্তু এর কোন মানে নিশ্চয় আছে। তোদের কাজ কারবার জানতে তো আর আমার বাকি নেই। হ্যাঁ রে, রবিন, আবার কোন একটা আজব কেসে জড়িয়েছিস বুঝি?
হ্যাঁ, মা, তাড়া দিল রবিন, দাও, জলদি নাশতা দাও।
এবার কী? ডানাওয়ালা হাতি খুঁজছিস? প্লেটে ডিম আর বেকন বাড়তে শুরু করলেন মা। টোস্টার থেকে টোস্ট নিয়ে রাখলেন আরেকটা প্লেটে।
রান্নাঘরের ছোট টেবিলেই খেতে বসে গেল রবিন। রোমের সম্রাট অকটেভিয়ানকে খুঁজছি। ওর মালিক এক ইংরেজ কিশোর, অগাস্ট অগাস্ট, পেলে তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে।

কফি ছলকে পড়ল মায়ের হাতের কেটলি থেকে। চমকে উঠেছেন। হাঁ হয়ে গেছে মুখ।
হাসল রবিন। খানিক আগে মা তাকে বোকা বানিয়েছিলেন, এখন। সে শোধ নিচ্ছে। হ্যাঁ, মা, ঠিকই বলেছি। পরে সব বুঝিয়ে বলব, এখন সময় নেই।
নীরবে ঠোঁট বাঁকালেন মা, কফি ঢালায় মন দিলেন। আবার রবিনের দিকে চোখ পড়তেই বললেন, ও-কী, সবই যে রইল! এই, ভাল হবে না, যা দিয়েছি সব খাবি। নইলে বেরোতেই দেব না।
অগত্যা আবার বসে পড়তে হলো রবিনকে।
যত তাড়াতাড়ি পারল, সাইকেল চালিয়ে ইয়ার্ডে এসে ঢুকল রবিন। অফিসে মেরি চাচী একা। বাইরে কাজে ব্যস্ত বোরিস আর রোভার।
রবিন অফিসে ঢুকতেই মুখ তুললেন চাচী। এই যে, এসে গেছ, বসো। মুসা আর গাসকে নিয়ে বেরিয়েছে কিশোর, এই আধ ঘণ্টামত হবে। তোমাকে ওয়ার্কশপে বসতে বলে গেছে।
মেরি চাচীকে ধন্যবাদ জানিয়ে হেডকোয়ার্টারে এসে ঢুকল রবিন। কিশোরের মেসেজের মানে: হেডকোয়ার্টারে টেলিফোনের পাশে অপেক্ষা করতে হবে রবিনকে। কেন অপেক্ষা করতে বলেছে, তা-ও জানে রবিন। দশটার পর যে-কোন মুহূর্তে ভূতের ফোন আসতে পারে। খবর জানাতে পারে।
রবিন চেয়ারে বসতে না বসতেই ফোন বেজে উঠল। ঘড়ি দেখল, দশটা বেজে পাঁচ। ছো মেরে রিসিভার তুলে নিয়ে কানে ঠেকাল। হালো, তিন গোয়েন্দা। রবিন বলছি।
হ্যালো, কিশোরকণ্ঠে জবাব এল, আমি জিম। আমার বোন পাশা স্যালভেজ ইয়ার্ড থেকে একটা মূর্তি কিনেছে।
ধক করে উঠল রবিনের বুক। নাম কী? অকটেভিয়ান?
নাম? দেখতে হচ্ছে। ধরে রাখো, আমি দেখে আসি।
বুকের ভেতর হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে রবিনের। একেকটা সেকেণ্ড একেক যুগ বলে মনে হচ্ছে। এত তাড়াতাড়িই কাজ হয়ে গেল! বিশ্বাস করতে পারছে না সে।
সাড়া এল পুরো এক মিনিট পর। হ্যালো?
হ্যাঁ হ্যাঁ, বলো! কানের ওপর জোরে রিসিভার চেপে ধরেছে রবিন, ব্যথা পাচ্ছে সে খেয়ালও নেই।
বিসমার্ক, জবাব এল। অকটেভিয়ান না। চলবে?
না, থ্যাঙ্ক ইউ, হতাশা ঢাকতে পারল না রবিন। থ্যাঙ্ক ইউ। অকেটেভিয়ানকে দরকার আমাদের। তৃতীয়বার ধন্যবাদ জানিয়ে রিসিভার রেখে দিল সে।

আরও এক মিনিট চুপচাপ বসে রইল রবিন। শেষে টাইপরাইটার টেনে নিল। এ-যাবৎ যা যা ঘটেছে, বিস্তারিত লিখে ফেলবে।
লেখা শেষ করতে করতে দুপুর হয়ে গেল, ইতিমধ্যে আর ফোন এল।। আশাই ছেড়ে দিল রবিন, এবার কায়দাটা বোধহয় বিফলেই গেল।
রবিন! এই, রবিন! মেরি চাচীর ডাক শোনা গেল স্কাইলাইটের ভেতর দিয়ে। খেতে এসো।
আসছি, মাইক্রোফোনে জবাব দিল রবিন।
কাগজপত্র গুছিয়ে রেখে উঠল সে। দুই সুড়ঙ্গের ঢাকনা সবে তুলেছে, এই সময় বেজে উঠল ফোন। থমকে গেল সে। হাত থেকে ঢাকনাটা ছেড়ে দিয়ে দুই লাফে গিয়ে পৌঁছল ফোনের কাছে। হালো! তিন গোয়েন্দা! রবিন বলছি।
অকটেভিয়ানের খবর চেয়েছিলে? একটা মেয়ে। আমার মা কিনে এনেছে। বাগান সাজাতে চেয়েছিল, কিন্তু বসানোর পর আর পছন্দ হয়নি। পাশের বাড়ির মহিলাকে দিয়ে দেবে ভাবছে।
কোন দরকার নেই, প্লিজ! চেঁচিয়ে উঠল রবিন। জিনিস পছন্দ না হলে রাখার কোন দরকার নেই। আমরা আসছি এখুনি, টাকা ফেরত দিয়ে মূর্তিটা নিয়ে আসব।
নাম-ঠিকানা লিখে নিয়ে রিসিভার রেখে দিল রবিন। হলিউডের ঠিকানা, রকি বিচ থেকে অনেক দূরে। কিন্তু অসুবিধে নেই। গাড়ি নিয়ে গেলে খুব বেশিক্ষণ লাগবে না। চট করে ঘড়ি দেখে নিল।
ইসস, কিশোরটা করছে কী। অকটেভিয়ানের খোঁজ পাওয়া গেছে, ও থাকলে খেয়ে নিয়ে এখুনি বেরিয়ে পড়া যেত। দেরি করে ফেললে পেয়েও না আবার হারাতে হয় মূর্তিটা!
গাল ফুলিয়ে রেখেছে মুসা, মুখ দিয়ে বাতাস ছাড়ছে। সাইকেল নিয়ে খাড়াইয়ে উঠছে, ছোট একটা টিলা পেরিয়ে বেরিয়ে এল ডায়াল ক্যানিয়নে। তার পেছনে কিশোর আর অগাস্ট।
হলিউডের উত্তর-পশ্চিমে পাহাড়ের বেশ ওপর দিকে এই গিরিপথটা। সরু একটা পথ চলে গেছে, পাহাড়ের ওপরে সমতল একটা জায়গায় গিয়ে শেষ। এইখানেই হোরাশিও অগাস্টের বাড়ি, ঘন সবুজ ঘাসে ঢাকা বিরাট এলাকা জুড়ে।
বাড়িটায় ঘুরে যাওয়ার বুদ্ধি কিশোরের। জানে না, কী খুঁজতে এসেছে। অগাস্টের দাদা কোন বাড়িতে থাকতেন, কেমন জায়গা, না দেখলে মানুষটা সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাওয়া কঠিন, আসার এটাই প্রধান। কারণ।
যত সহজ মনে হয়েছিল, সাইকেল নিয়ে এই পাহাড়ে চড়ার কাজটা তত সহজ হলো না। দুপুর হয়ে এসেছে, মাথার ওপর গনগনে সূর্য, দরদর করে ঘামছে ওরা,

হাঁপাচ্ছে পরিশ্রমে। থেমে মুখের ঘাম মুছে নিল। তিনজনেই, হোরাশিও অগাস্টের খালি বাড়িটার দিকে তাকাল।
তিনতলা বাড়ি, কোন অংশ পাকা, কোন অংশ কাঠের, চমৎকার একটা স্টাইল। চারদিকে খোলামেলা, আলো আর হু-হুঁ বাতাসের অন্ত নেই! কিন্তু একেবারে নির্জন। সাইকেল ঠেলে নিয়ে এল ওরা সদর দরজার কাছে, ঘাসের ওপর শুইয়ে রাখল।
চাবি ছাড়া ঢুকবে কীভাবে? দেখেশুনে বলল মুসা। তখনই বলেছিলাম, চাবিটা নিয়ে নিই রয় হ্যামারের কাছ থেকে।
চলো, জানালা ভেঙে ঢুকে পড়ি, পরামর্শ দিল অগাস্ট।
দরকার পড়লে তা-ই করতে হবে, কিশোর বলল। বাড়ির মালিক হয়তো কিছুই মনে করবে না, দুচারদিনের মধ্যে পুরো বাড়িই তো ভেঙে ফেলবে। পকেট থেকে এক গোছা চাবি বের করল সে। তবে আশা করছি জানালা ভাঙার দরকার পড়বে না, এগুলোর কোনটা না কোনটা লেগে যাবেই। আমেরিকার নাম করা সব কোম্পানির সব রকমের তালার চাবি আছে এখানে।
এক তালার চাবি আরেক তালায় লাগবে? অগাস্টের সন্দেহ রয়েছে।
না লাগারই কথা, তবে লেগেও যেতে পারে।
তিন ধাপ সিঁড়ি ডিঙিয়ে দরজার কাছে চলে এল ওরা, নব ধরে মোচড় দিল মুসা। তাকে অবাক করে দিয়ে পুরো ঘুরে গেল নব, ঠেলা দিতেই নিঃশব্দে খুলে গেল পাল্লা। খোলা! খিল-টিল কিছু লাগানো
অস্বাভাবিক! আপন মনে বিড়বিড় করল কিশোর।
খোলাই ফেলে গিয়েছে হয়তো রয় হ্যামার, মুসা বলল। কিংবা, অন্য কেউ কোন কারণে খুলেছিল, আর লাগায়নি। খালি বাড়ি তো, মালপত্র নেই, লাগানোর দরকার মনে করেনি।
অন্ধকার একটা হলঘরে এসে ঢুকল ওরা। ঘরটার দুপাশে আরও দুটো বড় ঘর, খালি, ধুলোয় ঢাকা, মেঝেতে কাগজের টুকরো ছড়ানো।
একটা ঘরে ঢুকল কিশোর; অনুমান করল, এটা শোবার ঘর। চারপাশে তাকাল, কিন্তু দেখার তেমন কিছু নেই। কোন আসবাব নেই। পাতলা ওয়ালনাট কাঠ দিয়ে দেয়াল পুরো ঢেকে দেয়া হয়েছে, গাঢ় চকলেট রঙের ওপর ধুলোর আস্তরণ।
না, কিছুই দেখার নেই এখানে, ঘুরল কিশোর। হলঘরে এসে ঢুকল আবার, উল্টোদিকের ঘরটায় চলে এল। লাইব্রেরি ছিল, দেয়ালে গাঁথা সারি সারি তাক দেখেই বোঝা যায়, তিন দিকের সব কটা তাক এখন নিঃস্ব, তাতে ধুলোর রাজত্ব। ঘরের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে একে একে সবগুলো তাকের ওপর নজর বোলাল কিশোর, অস্ফুট একটা শব্দ বেরোল মুখ থেকে, আ!

আ! কীসের আ! মুসা জিজ্ঞেস করল। কী দেখলে?
দেখার চোখ থাকলে তুমিও দেখতে পেতে। নাক বরাবর সামনে হাত তুলল কিশোর। ওই তাকটা, দেখো।
তাকাল মুসা। কই, ধুলো ছাড়া আর কিছু দেখছি না!
শেষ মাথায়, অন্যগুলোর চেয়ে কোয়ার্টার ইঞ্চি বেশি লম্বা। নিশ্চয় কোন ব্যাপার আছে।
এগিয়ে এসে তাকের শেষ মাথায় হাত রাখল কিশোর। টানাটানি করল। শেষে জোরে চাপ দিতেই নিঃশব্দে খুলে গেল একটা ছোট গোপন দরজা, পাল্লাসুদ্ধ তাক ভেতরে সরে গেল, বেরিয়ে পড়ল একটা কালো ফোকর।
হুঁ! মাথা দোলাল কিশোর। বললাম না! কিছু একটা আছে।
ঠিকই তো! কালো ফোকটার দিকে চেয়ে আছে মুসা। পেলাম তা হলে কিছু!
টর্চ আনা উচিত ছিল। ভুলই করেছি। মুসা, চট করে গিয়ে সাইকেল থেকে একটা লাইট খুলে নিয়ে এসো।
ছুটে বেরিয়ে গেল মুসা। লাইট নিয়ে ফিরে এল। কিশোরের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, তুমি আগে ঢুকবে?
কেন, তুমি আগে যেতে ভয় পাচ্ছ নাকি? কিশোর হাসল। ভয়ের কিছু আছে বলে মনে হয় না।
কিন্তু মুসা কথাটা মানতে পারল না। খালি বাড়ির অনেক গোপন ঘর দেখেছে সে এর আগে, কোনটাই পুরোপুরি নিরাপদ ছিল না।
আলো জ্বেলে সরু দরজা দিয়ে ঢুকে গেল কিশোর, তাকে অনুসরণ করল মুসা আর অগাস্ট।
তিন কদম এগিয়েই থেমে গেল।
না, মানুষের কঙ্কাল নেই, ভয় পাওয়ার মত কিছুই চোখে পড়ছে না। একেবারে খালি। দেয়ালে তাক, এখানেও বই ছিল, লাইব্রেরিরই একটা অংশ।
কিছু নেই। কঙ্কাল কিংবা মানুষের খুলি নেই দেখে হতাশই হলো। যেন মুসা।
কিছুই না? প্রশ্ন করল কিশোর।
ভাল করে পুরো ঘরে আবার চোখ বোলাল মুসা। না, আমি কিছুই দেখছি না।
ভুল জায়গার দিকে ভুলভাবে তাকিয়ে আছ। জিনিসটা এতই সাধারণ, তোমার মগজ ওটাকে গুরুত্বই দিতে চাইছে না, তাই দেখতে পাচ্ছ না।
চোখ পিটপিট করল মুসা; আরেকবার দেখার চেষ্টা করল, কিশোর দেখতে পেয়েছে। না, বাবা, আমি দেখছি না! কী দেখেছ?
দরজা! বলে উঠল অগাস্ট।

এইবার দেখতে পেল মুসা। বাদামী রঙের অতি সাধারণ একটা নব এমনভাবে বসানো, পাল্লার সঙ্গে প্রায় মিশে গেছে।
এগিয়ে গিয়ে নব ধরে মোচড় দিল কিশোর। সরু ছোট দরজা খুলে গেল সহজেই। ভেতরে আলো ফেলল সে। ধাপে ধাপে কাঠের সিঁড়ি নেমে গেছে।
ভাঁড়ার বোধহয়, কিশোর বলল। চলো, দেখি কী আছে।
সবগুলো দরজা খোলা থাক, মুসার কণ্ঠে অস্বস্তি। দরজা লাগিয়ে অচেনা ঘরে ঢুকতে ভয় লাগে আমার।
সিঁড়িতে পা রাখল কিশোর, নামতে শুরু করল। পেছনে অন্য দুজন। দুপাশে দেয়াল এত চাপা, ওরা একটু এদিক-ওদিক হলেই কাঁধ ঠেকে যাচ্ছে।
সিঁড়ি শেষ হলো। সামনে আরেকটা দরজা। নব ধরে ধরে টানতেই খুলে গেল। ছোট একটা ঘরে এসে ঢুকল ওরা, ঠাণ্ডা ভেজা, বাতাস, পাথরের দেয়াল।
ভাঁড়ার, আলো তুলে দেখছে কিশোর।
বিচিত্র আকারের সব তাক কেন ওরকম করে বানানো হয়েছে মাথায় ঢুকল না কিশোর কিংবা মুসার। খালি।
কিন্তু অগাস্ট চিনতে পারল। মদ রাখার ভাঁড়ার। বোতলের আকার আর মাপমত বানানো হয়েছে। ওই যে, একটা ভাঙা বোতল পড়ে আছে।
হঠাৎ বরফের মত জমে গেল যেন কিশোর, সঙ্গে সঙ্গে আলো নিভিয়ে দিল। গাঢ় অন্ধকার গিলে নিল ওদেরকে।
কী হলো! ফিসফিস করে উঠল আতঙ্কিত কণ্ঠ।
শশশ! কে জানি আসছে! দেখো!
আবছা আলো দরজার ওপাশে, বোধহয় সিঁড়ির মাথায় রয়েছে এখনও লোকটা। চাপা গলায় কথা শোনা গেল।
চলো, ভাগি! দরজার নব ধরে টান মারল মুসা, কোন কিছু না ভেবেই। পাল্লা বন্ধ হয়ে গেল, অনেক পুরানো নব, তার ওপর ভেজা বাতাসে ক্ষয় হয়ে নষ্ট হয়ে গেছে ধাতু, হ্যাঁচকা টানে ছিঁড়ে ছুটে চলে এল তার হাতে।
এগিয়ে আসছে আলো আর কণ্ঠস্বর।
ভাঁড়ারে আটকা পড়ল ছেলেরা।
কাছে আসছে কণ্ঠস্বর।
দরজার বাইরে এসে থামল পদশব্দ। পাল্লার নিচ দিয়ে টর্চের আবছা আলো আসছে।
এখানে তো আগেই খুঁজেছি, ভারি গলায় বলল একজন। গিয়ে আর কী হবে?
পুরো বাড়িই খোঁজা হয়েছে, আরেকটা কণ্ঠ, খসখসে, বিক্তি মেশানো। আর এই ভাঁড়ারে তো আধা ঘণ্টা নষ্ট করেছি। হ্যারি, আমাদের ফাঁকি দেয়ার চেষ্টা

করলে…।
না না, ফাঁকি দিচ্ছি না, ফাঁকি দিচ্ছি না! কসম! তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল তৃতীয় আরেকজন, বুড়ো মানুষের গলা। এ-বাড়িতে থেকে থাকলে। খুঁজে পেতামই। বলেছি না, এখানে লুকানোর মত আর কোন জায়গা নেই। বিশ বছর ধরে কাজ করেছি এ-বাড়িতে… থেমে গেল সে
হ্যারি, হ্যারিসন! মুসা অনুভব করল হঠাৎ শক্ত হয়ে গেছে কিশোর। রয় হ্যামার তা হলে ঠিকই বলেছে, হোরাশিও অগাস্টের চাকর হ্যারিসনও হাত মিলিয়েছে ষড়যন্ত্রে!
মিছে কথা বললে ভাল হবে না, হ্যারি, বলল প্রথমজন। ছেলেখেলা নয় এটা। অনেক টাকার ব্যাপার, তুমিও একটা ভাগ পাবে।
যা জানি, সবই তো বলেছি! হ্যারির কণ্ঠে অনুনয়। আমি আর অ্যানি যখন বাইরে যেতাম, নিশ্চয় তখন কোন ফাঁকে লুকিয়েছে জিনিসটা। শেষ দিকে কাউকে বিশ্বাস করত না, আমাদেরও না। থেকে থেকেই চমকে উঠত, এদিক-ওদিক দেখত, বোধহয় সন্দেহ করত কেউ তার ওপর চোখ রাখছে।
ভীষণ চালাক ছিল ব্যাটা! খসখসে কণ্ঠ। মাথায়ই ঢুকছে না, অগাস্টাসের মূর্তির ভেতরে নকল পাথরটা কেন রেখেছিল!
কান খাড়া করে শুনছে ছেলেরা, বিপদে যে রয়েছে ভুলেই গেছে। নকল পাথরটার কথা জানে লোকগুলো, তার মানে ওরা কালো-গুঁফো অথবা তিন-ফোঁটার দলের লোক। পরের কথায়ই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল।
অথচ নকলটার জন্যেই জিকোর অবস্থা কাহিল! আহা, বেচারা! হাসল খসখসে গলা।
হাসি শুনে কেঁপে উঠল মুসা, ভয়ঙ্কর হাসি। ছুরির ফলা থেকে তিন ফোঁটার রক্ত মুছে ফেলার কথা মনে পড়ল।
হাসিঠাট্টার সময় না এটা, ভারি কণ্ঠ আরও ভারি শোনাল। যা বলছিলাম, অগাস্টাসের ভেতরে নকল পাথর কেন? নিশ্চয় বিপথে সরানোর জন্যে। আমি বলছি, আসল চুনিটা এই বাড়িতেই আছে কোথাও।
তা হলে আমার আর কিছু বলার নেই, হ্যারিসনের গলা। পুরো বাড়িটা ভেঙে দেখতে পারেন এবার। কসম খেয়ে বলছি, আর কোন জায়গা জানি না তামি। দোহাই আপনাদের, আমাকে ছেড়ে দিন। স্যান ফ্রানসিসকোয় ফিরে যাব, এতক্ষণে হয়তো কান্নাকাটি শুরু করেছে। অ্যানি। আমার সাধ্যমত আমি করেছি, আর কিছু করার নেই।
ভেবে দেখতে হবে, বলল খসখসে গলা, আদৌ ছাড়ব কিনা…ইয়ার্ডের ওই ছেলেটাকে ধরা দরকার। আশপাশের অনেকের সঙ্গে আলাপ করেছি, সবাই

একবাক্যে বলেছে, খুব চালু ছোকরা। কম্পিউটারের মত কাজ করে নাকি ওর ব্রেন। বোকার ভান করে থাকে, ওটাও একটা চালাকি। পাথরটা কোথায় নিশ্চয়ই ও জানে।
কিন্তু ওকে ধরি কী করে? ভারি কণ্ঠ। দেখি, একটা উপায় বের করতে হবে। চলো, ওপরে চলো, আলোচনা করি গে।
এই গোপন সিঁড়ি আর ভাঁড়ারটা কেন? যেতে চাইছে না খসখসে গলা। এখানে আরেকবার খুঁজলে হত না? নিশ্চয় কোন উদ্দেশ্য নিয়ে বানিয়েছে!
আরে, দূর! ওই বুড়োর কাণ্ড! বলল ভারি কণ্ঠ। সিঁড়িটাও সাধারণ, ভাঁড়ারটাও। মদ রাখত, নিরাপদে সংরক্ষণের জন্যেই বোধহয়। বানিয়েছে ভাঁড়ার। তাই না, হ্যারি?
হ্যাঁ, সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল হ্যারিসন। মিস্টার অগাস্টের এটা এক খেয়াল। রাতেই শুধু এখানে আসতেন তিনি। প্রায়ই বলতেন, ছেলেবেলা থেকেই বিরাট বাড়িতে বাস করার শখ, যাতে থাকবে গোপন ভাঁড়ার, গোপন অন্ধকার সিঁড়ি।
আজব বুড়ো! বলল ভারি গলা। চলো চলো; এই অন্ধকার, বদ্ধ। বাতাস, দম আটকে আসে!
আলো হারিয়ে গেল ধীরে ধীরে। কাঠের সিঁড়িতে পায়ের শব্দ, দড়াম করে দরজা বন্ধ হলো। ভাঁড়ারে একা হয়ে গেল ছেলেরা।
আউফফ! চেপে রাখা শ্বাস ছাড়ল মুসা। আরেকটু হলেই গেছিলাম! যা সব লোক!
শয়তানের চেলা একেকটা! অগাস্ট বলল। হাসি কী! অথচ ওদের দলেরই একজনকে মেরে ফেলল তিন-ফোঁটা।
কী মনে হয়, কিশোর, ওরা কারা? মুসা বলল। এই, কিশোর, ঘুমিয়ে পড়লে নাকি!
স্বপ্ন থেকে যেন বাস্তবে ফিরে এল কিশোর। অ্যাঁ! ...ও, ভাবছিলাম। হ্যারিসনও ওদের দলে! তিন-ফোঁটার বিপক্ষে।
ওসব ভাবাভাবি পরে করলেও চলবে। বেরোনোর উপায় খোজো। আটকা পড়েছি, খেয়াল আছে?
এখানে অপেক্ষা করাই নিরাপদ। এখনও যায়নি ওরা। এসো, ভাঁড়ারটা ঘুরে দেখি।
হয় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে এখানে, কিংবা কিশোরের সঙ্গে যেতে হবে। দুটোতেই মুসার অনিচ্ছা। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকাটাই বেশি খারাপ মনে হলো, অগত্যা চলল কিশোরের পিছু পিছু।
উল্টো দিকে আরেকটা দরজা, ঠেলা দিতেই খুলে গেল। বড় চারকোনা আরেকটা ভাঁড়ার, নিচু ছাত, জানালা নেই। দেয়ালের গা ঘেঁষে এক জায়গায় বড় একটা

তেলের ট্যাঙ্ক, পাশেই মস্ত একটা তেলের চুলা। ব্যস, আর কিছু নেই।
উল্টো দিকে আরেকটা দরজা, তার ওপাশে সিঁড়ি। নিঃশব্দে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল কিশোর, সিঁড়ির মাথায় দরজা, নব ধরে মোচড় দিল সে। খুলল না। আস্তে করে ধাক্কা দিয়ে দেখল, অনড় রইল পাল্লা। কী ভেবে আর খোলার চেষ্টা করল না, নেমে চলে এল।
ওপাশ থেকে ছিটকিনি লাগানো, সঙ্গীদের জানাল কিশোর।
ব্যাপারটার মানে জানা আছে ওদের। দরজা খুলতে না পারলে, এখানেই আটকা থাকতে হবে। বাইরের কেউ জানবে না ওরা কোথায় আছে।
চুপ করে ভাবছে কিশোর। হঠাৎ বলল, যেখান দিয়ে ঢুকেছি ওখান দিয়েই বেরোতে হবে।
কীভাবে? প্রতিবাদ করল অগাস্ট। নবের অর্ধেকটা :লেছে, তালা আটকে গেছে। ওপাশ থেকে ছাড়া খোলা যাবে না। চাবিও নেই আমাদের কাছে।
আমারই দোষ! বিষণ্ন শোনাল মুসার কণ্ঠ।
এসো, চেষ্টা করে দেখি, খোলে কিনা, কিশোর বলল।
আবার আগের ভাঁড়ারটায় এসে ঢুকল ওরা। দরজার ভাঙা নবের কাছে আলো তুলে ধরল মুসা। কোমরে ঝোলানো সুইস ছুরিটা খুলে নিল। কিশোর, অনেকগুলো ফলা, বিভিন্ন কাজে লাগে, তার খুবই প্রিয়! একটা ফলা খুলল, ছোট একটা স্ক্র-ড্রাইভার এটা।
সাধারণ তালা, ভালমত দেখে বলল কিশোর। খুলতেও পারে। ছোট চারকোনা গর্তে স্ক্র-ড্রাইভার ঢুকিয়ে মোচড় দিল সে। ঘুরল না। যন্ত্রটা আরেকটু ঠেলে দিয়ে আবার মোচড় দিল। ক্লিক করে ঘুরে গেল। তালার জিভ, খুলে গেল।
এত সহজে তালা খুলে গেছে, বিশ্বাসই হচ্ছে না মুসা আর। অগাস্টের।
পাল্লা খুলে উঁকি দিল কিশোর, সিঁড়ির অর্ধেকটা পর্যন্ত আবছা দেখা, যাচ্ছে, তারপরে অন্ধকার। কেউ আছে বলে মনে হলো না।
সিঁড়ির গোড়ায় চলে এল সে। অন্য দুজনকে ডাকল।
হঠাৎ জ্বলে উঠল আলো।
চোখ ধাঁধিয়ে দিল টর্চের আলো, চোখ পিটপিট করছে কিশোর, কিছুই দেখতে পাচ্ছে না।
বাহ, এই তো আছে! গমগম করে উঠল ভারি গলা। তাই তো বলি, সাইকেল রেখে গেল কোথায়! এসো, লক্ষ্মী ছেলের মত চুপচাপ উঠে এসো। নইলে…
কিশোরের ব্যবহারে লক্ষ্মী ছেলের কোন লক্ষণই দেখা গেল না। এক ঝটকায় ঘুরে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল দরজার ওপর, হাত বাড়িয়ে নবটা ধরার চেষ্টা করল। পারল না। ধাক্কা লেগে দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল। পাল্লা।

সিঁড়ি বেয়ে দুপদাপ করে নেমে আসছে লোক দুজন।
ধরো, ধরো ওকে, জ্যাকি! চেঁচিয়ে উঠল ভারি কণ্ঠ। ওর কথাই বলেছি।
শক্তিশালী একটা থাবা কিশোরের হাত চেপে ধরল, মুচড়ে নিয়ে এল পিঠের ওপর। আরেক হাতে শার্টের কলার চেপে ধরে সিঁড়ি দিয়ে প্রায় টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে চলল ওপরে।
ভাঁড়ার থেকে শব্দ শুনেই বুঝল মুসা আর অগাস্ট, কিশোরকে ধরে। নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।
ধরে ফেলল! ঢোক গিলল মুসা, গলা শুকিয়ে কাঠ।
নিয়ে যেতে বারোটা বাজছে ওদের, অগাস্ট বলল। শুনছ, কী রকম শব্দ হচ্ছে? জোরাজুরি করছে ভীষণ।
ব্যথায় আহহ! করে চেঁচিয়ে উঠল একজন।
হাতে কামড় দিয়েছে বোধহয়। হাসল অগাস্ট।
চটাস করে চড় পড়ার শব্দ হলো, থেমে গেল জোরাজুরির শব্দ।
দুজন মিলে একজনকে ধরেছ, লজ্জা করে না! আবার মারছ! চেঁচিয়ে উঠল কিশোর।
বেশ, তা হলে চুপ হয়ে যাও, খসখসে কণ্ঠ বলল।
হ্যাঁ, শান্তভাবে উঠে এসো, মারব না, বলল ভারি কণ্ঠ। নইলে কপালে আরও দুঃখ আছে।
আরও দুটো তো রয়ে গেল, খসখসে গলা।
থাক, ভারি কণ্ঠ। একেই আমাদের দরকার।
দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ শোনা গেল, ছিটকিনি লাগাল, আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল পদশব্দ।
কিশোর চুপ হয়ে গেছে, শব্দ করে শ্বাস ফেলল অগাস্ট।
তো আর কী করবে? দুজনের সঙ্গে পারবে না, খামোকা মার খাবে আরও।
ও পড়ল ডাকাতের হাতে, আমরা আটকা পড়লাম এখানে। আগে ছিল একটা, এখন দুটো দরজাই বন্ধ। বেরোনোর আশা শেষ।
কিশোর যখন বাইরে রয়েছে, আশা পুরোপুরিই আছে। কোন একটা উপায় ও ঠিক করে ফেলবে, বের করে নিয়ে যাবে আমাদের, গভীর আস্থা মুসার কণ্ঠে।
তবে, মুসা বন্ধুর অবস্থাটা জানে না। কিশোর নিজেই ছুটতে পারবে কিনা সন্দেহ আছে, থাক তো অন্য দুজনকে মুক্ত করা। হাত পিঠের ওপর মুচড়ে ধরে তাকে ঠেলে নিয়ে চলেছে ভারিকণ্ঠ। রান্নাঘরে নিয়ে এল। একটা আসবাব আছে এখনও, একটা চেয়ার, এতই পুরানো, নড়বড়ে, ভাঙা; বাতিল মালের ক্রেতারাও নেয়নি, ফেলে গেছে।

ভারি কণ্ঠ বেঁটে, মোটা। খসখসে গলা বিশালদেহী। দুজনেরই কালো গোঁফ, ভারি হর্নরিমড চশমা। ইয়ার্ডে যে কালো-গুফো গিয়েছিল, তারও একই রকম গোঁফ আর চশমা ছিল, তবে এদের কেউ নয়।
হাত ছেড়ে দিয়ে কিশোরের কাধ চেপে ধরল ভারি কণ্ঠ, ঠেলে নিয়ে গিয়ে চাপ দিয়ে বসিয়ে দিল চেয়ারে।
বাড়ির পেছনে কাপড় শুকানোর দড়ি আছে, দেখেছি, খসখসে গলাকে বলল সে। যাও তো, চট করে নিয়ে এসো।
বেরিয়ে গেল লোকটা।
কিশোরের দেহ তল্লাশি করল ভারি কণ্ঠ দক্ষ হাতে, ছুরিটা বের করে নিল। দারুণ জিনিস তো! বেশ ধার। নাক আর কান অতি সহজেই কেটে নেয়া যাবে, কিশোরের দিকে চেয়ে হাসল সে।। চুপ করে ভাবছে গোয়েন্দাপ্রধান। ভারি কণ্ঠকে শিক্ষিতই মনে হচ্ছে, সাধারণ চোর-ডাকাতের মত লাগছে না। খসখসে গলা অবশ্য সাধারণ গুণ্ডাই, তবে, ভরসা এই যে, আদেশের মালিক ভারি কণ্ঠ।
ছোটখাট একজন মানুষ দেখা দিল দরজায়, ধূসর চুল, চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। বোধহয় ও-ই হ্যারিসন। উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, আরে, মারছেন নাকি? আমাকে কথা দিয়েছিলেন, খুনখারাপীতে যাবেন না, মনে আছে?
যাও এখান থেকে! ধমকে উঠল ভারি কণ্ঠ। খুন করব কি করব না, ওর ওপর নির্ভর করছে। কথামত চললে কিছুই করব না, নইলে…তুমি যাও এখান থেকে।
দ্বিধাজড়িত পায়ে আস্তে করে পিছিয়ে গেল হ্যারিসন।
দড়ি নিয়ে এল খসখসে গলা। দুজনে মিলে চেয়ারের সঙ্গে বাঁধল। কিশোরকে। দুই হাত চেয়ারের হাতার সঙ্গে, পা চেয়ারের পায়ার সঙ্গে, কোমর পেচিয়ে পেচিয়ে বাধল চেয়ারের পেছনের সঙ্গে। মাথা ছাড়া শরীরের আর কোন অঙ্গই নড়ানোর উপায় থাকল না কিশোরের।
তারপর, খোকা, আলাপী ভঙ্গিতে বলল ভারি কণ্ঠ, চুনিটা কোথায়?
জানি না, আমরাও খুঁজছি।
সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না, রাইস। তুমি সরা, আমি দেখছি, জানালার চৌকাঠে রাখা আছে কিশোরের ছুরিটা, তুলে নিল খসখসে গলা। বেছে বেছে পাতলা একটা ফলা খুলল, ক্ষুরের মত ধার, ঝকঝক করছে। কোন গালে আগে পোচ লাগাব, খোকাবাবু? নিজের রসিকতায় নিজেই খিকখিক করে বিচ্ছিরি হাসি হাসল।
তুমি থামো! ধমক দিল রাইস। আমি কথা বলছি ওর সঙ্গে। সত্যিই বোধহয় জানে না। তবে, অনুমান করতে পারবে। কিশোরের দিকে তাকাল। অগাস্টাসের মাথায় নকল পাথরটা ঢোকাল কেন, বলতে পারবে?

মনে হয় লোককে বিপথগামী করার জন্যে।
আসলটা তা হলে কোথায়?
হয়তো আরেকটা মূর্তির ভেতরে, যেটাকে লোকে ভাবনার বাইরে রাখবে। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে কিশোর, সত্যি কথাই বলবে। অকটেভিয়ান কোথায় আছে জানে না, তোক দুটোও নিশ্চয় জানে না, কাজেই সত্যি কথা বলেও ক্ষতি নেই। বরং লাভ। তাকে মুক্তি দিয়ে দেবে হয়তো। আমার ধারণা, অকটেভিয়ান।
অকটে...ঠিক, ঠিক বলেছ! নিজের হাতেই চাপড় মারল লোকটা। রোমের সম্রাট ছিল অকটেভিয়ান, আরেক নাম অগাস্টাস। অগাস্টাস থেকে অগাস্ট। ঠিক। সঙ্গীর দিকে ফিরল সে। কী বুঝলে, জ্যাকি?
অ্যাঁ, হ্যাঁ! ঘাড় চুলকাচ্ছে জ্যাকি। ঠিকই তো মনে হচ্ছে। তা হলে, খোকা, এবার ফাস করো তো, কোথায় আছে অকটেভিয়ান?
জানি না, মাথা নাড়ল কিশোর। কার কাছে জানি বিক্রি করে দিয়েছে চাচী। কে কী কিনল, নামধাম তো আর লিখে রাখা হয় না, জানাও সম্ভব না। তবে, লস অ্যাঞ্জেলেসের কেউই হবে।
কিশোরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে রাইস, আনমনে গোঁফের মাথা ধরে টান মারল। খানিকটা সরে গেল গোফ। নকল! হুঁ! আরেকটা কথা বলো তো, অকটেভিয়ানের ভেতরেই যদি থাকবে, তুমি মূর্তিটা খুঁজছ না কেন? এ-বাড়িতে কী খুঁজতে এসেছ?
জবাব দেয়া কঠিন। কিশোরের ভাব ছিল, যে জিনিস নিয়ে এত গোলমাল, ওই লোক কোন বাড়িতে বাস করত, দেখা দরকার। কী জিনিস, বা কী ধরনের সূত্র খুঁজতে এসেছে, সে নিজেও জানে না।
অকটেভিয়ান কোথায় আছে জানি না, বলল কিশোর। তাই ভাবলাম, এখানেই খোঁজখবর করে যাই। নতুন কিছু মিলেও যেতে পারে।
নতুন কী?
নতুন ঠিক না, ভাবলাম, মানে আমার ভুলও হতে পারে, হয়তো অকটেভিয়ানের ভেতরেও লুকানো নেই পাথরটা। এ-বাড়িতেই কোথাও লুকিয়েছেন মিস্টার হোরাশিও অগাস্ট।
না, এখানে নেই, বিড়বিড় করল রাইস। তা হলে মেসেজে লেখা থাকত। নকলটা অগাস্টাসের ভেতরে ছিল, তার মানে আসলটা অকটেভিয়ানেই আছে। এখন তা হলে ওই মূর্তিটাই তাড়াতাড়ি খোঁজা দরকার, আর কেউ জেনে যাওয়ার আগেই।
কোথায় খুঁজব? প্রশ্ন করল জ্যাকি। এক এক করে বাড়ি খুঁজতে শুরু করলে, সারাজীবন খুঁজেও লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে ওটা বের করতে পারব না।
হ্যাঁ, একটা সমস্যা বটে, মাথা দোলাল রাইস। কিশোরের চোখে চোখে তাকাল। সেটা কি আমাদের সমস্যা? মোটেও না। মুক্তি পেতে চাইলে উপায়টা তোমাকেই

বাতলাতে হবে। ভাবো।
চুপ করে রইল কিশোর। ভূত-থেকে-ভূতের কথা বলে দিতে পারে, কিন্তু ওটা তাসের শেষ ট্রাম্প। এখনই হাতছাড়া করা ঠিক হবে না।
অকটেভিয়ান কোথায় জানি না, বলল কিশোর। তবে আমাকে ছেড়ে দিলে চেষ্টা করে দেখতে পারি, খুঁজে বের করা যায় কিনা।
কীভাবে করবে, উপায়টা বলো, কুৎসিত হাসি হাসল জ্যাকি। এখনও না জানলে, ভেবে বের করো, এখানে বসেই। সারাদিন বসে থাকতেও রাজি আছি আমরা। দরকার হলে সারারাত। তোমার বন্ধুরা ভাঁড়ারে আটকে আছে, ভুলে গেছ?
জবাব নেই কিশোরের। কী বলবে? ভাবনার তুফান চলছে মগজে। ওরা এখানে বন্দি হয়েছে এটা কি অনুমান করতে পারছে রবিন? রাতে যদি বাড়ি না ফেরে ওরা তিনজন, বোরিসকে নিয়ে কি আসবে? রবিনকে ফোনের পাশে থাকতে বলে এসেছে সে, তাই তাড়াহুড়ো করবে না রবিন। কিন্তু বেশি দেরি হয়ে গেলে? চাচা-চাচীও যখন চিন্তিত হয়ে পড়বেন?
ভূত-থেকে-ভূতের কথা বলল না কিশোর। অপেক্ষা করবে, সিদ্ধান্ত নিল। হয়তো রবিন...।
এই সময় দরজায় দেখা দিল আবার হ্যারিসন। রেডিও, জ্যাকি আর রাইসকে বলল সে। আপনাদের বন্ধুরাই বোধহয়, রেডিওতে যোগাযোগের চেষ্টা করছে। জ্যাকি নামটা শুনলাম...
পাই করে ঘুরল রাইস। রেডিও। চেঁচিয়ে উঠল সে। ভুলেই গিয়েছিলাম। জ্যাকি, যাও তো, নিশ্চয় জিকো। ওদিকে খবর-টবর আছে বোধহয়।
ছুটে বেরিয়ে গেল জ্যাকি।
কিশোর অবাক! মৃত লোক রেডিওতে কথা বলে কী করে? তিন ফোঁটা না ছুরি মেরে মেরে ফেলেছে তাকে?
বড় আকারের একটা ওয়াকি-টকি নিয়ে ফিরে এল জ্যাকি। একদিকে কাত হয়ে পড়েছে সে; বোঝাই যাচ্ছে, বেজায় ভারি। ছোট যে জিনিস ব্যবহার করে তিন গোয়েন্দা, তার চেয়ে অনেক ভাল আর দামী এটা, অনেক বেশি শক্তিশালী। লাইসেন্স লাগে। আছে কিনা, কে জানে? সেটা নিয়ে জ্যাকি আর রাইসের মত লোক বিশেষ মাথা ঘামাবে বলে মনে হয় না।
জিকোই, ঘোষণা করল জ্যাকি। রেডিওটা মেঝেতে রেখে একটা বোতাম টিপে ধরল। মুখ নামিয়ে বলল, জিকো, জ্যাকি বলছি। শুনতে পাচ্ছ? ছেড়ে দিল বোতামটা।
গুঞ্জন উঠল রেডিওর স্পিকারে। কথা বলে উঠল একটা কণ্ঠ, কেমন। যেন যান্ত্রিক, একবার আওয়াজ কমছে, একবার বাড়ছে, দূর থেকে আসছে বলেই।

জ্যাকি, কোথায় তোমরা? দশ মিনিট ধরে চেষ্টা করছি।
আমরা ব্যস্ত। কী খবর?
এদিকে উত্তেজনা। সোনালিচুলো ছেলেটা এইমাত্র পিকআপ নিয়ে বেরোল, সঙ্গে ড্রাইভার। ইয়ার্ডেরই একজন। হলিউডের দিকে চলেছে, আমরা পিছু নিয়েছি।
ধড়াস করে এক লাফ মারল কিশোরের হৃৎপিণ্ড। তাদেরকে খুঁজতে আসছে রবিন। বোরিসকে নিয়ে আসছে? জ্যাকি আর রাইসকে সামলাতে বোরিস একাই যথেষ্ট…
কিন্তু তার পরের কথা শুনেই আশা দপ করে নিভে গেল তার।
এদিকে আসছে? জ্যাকি বলল।
না, শহরের দিকে যাচ্ছে। আমরা পিছু নিয়েছি, জানে না।
দেখো, কোথায় যায়, নির্দেশ দিল জ্যাকি। রাইসের দিকে তাকাল। তুমি কিছু বলবে?
হ্যাঁ। অকটেভিয়ানের খোঁজ পেয়েছে ছেলেটা, আমি শিওর। জিকোকে বলো, যদি কোন মূর্তি পিকআপে তোলা হয়, ওটা ছিনিয়ে নেয় যেন।
নির্দেশ জানাল জ্যাকি রেডিওতে। তারপর সুইচ অফ করে হাসল রাইসের দিকে চেয়ে। রেডিওটা কিনে খুব ভাল করেছ। টাকা উসুল। বকের মত গলা বাড়িয়ে কিশোরের মুখের কাছে মুখ নিয়ে এল সে। দাঁত বেরিয়ে পড়েছে খুশিতে। এবার বসে বসে শুধু দেখার পালা, কী বলো, খোকাবাবু?
বিকেল হয়ে এসেছে, তবু কিশোর আর মুসার দেখা নেই। আর অপেক্ষা করতে পারছে না রবিন। হয়তো জরুরি কোন ব্যাপারে আটকে গেছে। ওরা, ওদের জন্যে বসে থাকলে অকটেভিয়ানকে হারাতে হতে পারে। মনস্থির করে ফেলল রবিন, ওদেরকে ছাড়াই যাবে।
মেরীচাচীকে জিজ্ঞেস করল সে, পিকআপটার কোন দরকার আছে। কিনা। নেই। বোরিসের হাতেও টুকটাক কাজ, পরে করলেও চলবে। একবার দ্বিধা করেই রাজি হয়ে গেলেন মেরি চাচী।
চাচীর কাছ থেকে পঞ্চাশ ডলার ধার নিল রবিন, যদি আর কোন মূর্তি নিতে রাজি না হন মহিলা, যিনি অকটেভিয়ান কিনেছেন, তাকে দিতে হবে। তবুও ফ্রানসিস বেকনকে সঙ্গে নিল।
পিকআপের পিছনে পুরু করে ক্যানভাস বিছিয়ে তাতে মূর্তিটা ভালমত বসাল বোরিস, যাতে গাড়ির ঝাঁকুনিতে পড়ে গিয়ে নষ্ট না হয়ে যায়। চারদিক ঘিরে পুরানো খবরের কাগজের গাদা আর কার্ডবোর্ডের বাক্স খুঁজে দিল এমনভাবে, হাজার ঝাঁকুনিতেও পড়া তো দূরের কথা, নড়বেও না মূর্তি।

ইয়ার্ড থেকে কম করে হলেও পঁয়তাল্লিশ মিনিটের পথ। আবাসিক এলাকার মধ্য দিয়ে চলে গেছে সুন্দর পথ, মসৃণ গতিতে ছুটে চলল। পিকআপ। পথ ভাল, ঘন লোকালয়ের ভিতর দিয়ে গেছে, ফলে গাড়ির ভিড়ও বেশি। ওদেরকে অনুসরণ করে আসছে একটা গাঢ় নীল সিড্যান, এটা লক্ষই করল না রবিন কিংবা বোরিস। গাড়িটাতে দুজন লোক, দুজনেরই কালো গোঁফ, হরিমড় ভারি চশমা।
যে অঞ্চলের ঠিকানা দিয়েছে মেয়েটা, সেখানে পৌঁছে গেল পিকআপ। গলির নাম্বার দেখতে শুরু করল রবিন। গলি পাওয়া গেল। মোড় নিয়ে গাড়ি ঢোকাল বোরিস।
এই যে, এই বাড়িই! চেঁচিয়ে বলল রবিন। রাখুন, রাখুন।
হো-কে, রিয়ারভিউ মিররের দিকে তাকিয়ে ব্রেক কষল বোরিস। গাড়ি থামাল। ওদের আধ ব্লক পেছনে থেমে গেল নীল সিড্যান। গাড়িতেই বসে রইল লোক দুজন, এদিকে দৃষ্টি।
এক পাশের দরজা খুলে নেমে পড়ল রবিন, অন্য পাশ দিয়ে বোরিস। ট্রাকের পেছন থেকে মূর্তিটা তুলে নিয়ে এগোল রবিনের পিছু পিছু।
বেল বাজাল রবিন।
দরজার ওপাশেই যেন অপেক্ষা করছিল মেয়েটা, সঙ্গে সঙ্গে খুলে দিল, বয়েসে রবিনের চেয়ে ছোট হবে।
তিন গোয়েন্দা! চেঁচিয়ে উঠল মেয়েটা, জীবন্ত শার্লক হোমসকে দেখছে যেন সামনে।
তিন গোয়েন্দায় যোগ দিয়েছে বলে গর্ব হলো রবিনের। গম্ভীর ভঙ্গিতে মাথা নোয়াল সামান্য।
অকটেভিয়ানকে নিতে এসেছ? কথার তুবড়ি ছুটল মেয়েটার মুখ দিয়ে। মা যেটা কিনে এসেছে? রহস্যময় কোন গোপন কারণ আছে নিশ্চয়? এসো। ইস, মাকে রুখতে জান বেরিয়ে যাচ্ছিল আমার! প্রায় দিয়েই দিয়েছিল পড়শীকে। শেষে বললাম, ভুল করে রেডিও অ্যাকটিভ পদার্থ দিয়ে প্রলেপ লাগানো হয়েছে মূর্তিটায়, মারাত্মক পদার্থ, সিকিউরিটির লোক নিতে আসছে, তবে গিয়ে থামল। নইলে দিয়ে ফেলেছিল।
এত দ্রুত কথা বলে মেয়েটা, শুনে তাল রাখাই মুশকিল হয়ে গেল রবিনের পক্ষে। চোখ পিটপিট করছে বোরিস।
আরে, এসো, এসো, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বলেই ঘুরল মেয়েটা।
তাকে অনুসরণ করল রবিন আর বোরিস।
বাড়ির পেছনে সুন্দর একটা বাগানে ওদেরকে নিয়ে এল মেয়েটা। মাঝখানে একটা ফোয়ারার ধারে রয়েছে অকটেভিয়ান, দেখেই এক লাফ মারল রবিনের

হৃৎপিণ্ড। অকটেভিয়ানের গায়ে ছায়া ফেলেছে উঁচু গোলাপঝাড়, সবুজ পাতার মাঝে মাঝে ফুটে রয়েছে লাল গোলাপ; ধুলোয় মলিন সাদা মূর্তিটাকে এই পরিচ্ছন্নতার মাঝে বড় বেমানান, বড় নোংরা দেখাচ্ছে।
খানিক দূরে মরা পাতা ছাঁটছেন একজন হালকা-পাতলা মহিলা, সাড়া শুনে ঘুরলেন।
এই যে, মা, ওরা এসে পড়েছে, আবার কথা শুরু করে দিল মেয়েটা। তিন গোয়েন্দার লোক। বলেছিলাম না? ও ওদেরই একজন, রবিনকে দেখাল সে। অকটেভিয়ানকে নিতে এসেছে। আর কোন ভয় নেই তোমার। এখনও ছুঁয়ে ফেলোনি তো? বেশ বেশ, তা হলে আর ভয়, নেই। আরিব্বাপ রে, রেডিও অ্যাকটিভ! স্কুলের আপা বলেছে, সাংঘাতিক ক্ষতি করে শরীরের…
না, দুইনি, রুসা! মেয়েকে থামিয়ে দিলেন মহিলা। রবিনের দিকে চেয়ে মিষ্টি করে হাসলেন। যত সব উদ্ভট কল্পনা মেয়েটার, ফ্যানটাসির জগতে বাস। ওর চোখে দুনিয়ার সবই রহস্য, রাস্তার অচেনা সমস্ত লোক চোর-ডাকাত কিংবা স্পাই। নিশ্চয় বলেছে, রেডিও অ্যাকটিভিটির কথা বলে আমাকে ঠেকিয়েছে?
হ্যাঁ, মাথা নোয়াল রবিন। মূর্তিটা নিতে এসেছি, ম্যাডাম। ওটার বদলে যদি আরেকটা চান…এই যে, ফ্রানসিস বেকন…
না, আর মূর্তির দরকার নেই। ভেবেছিলাম, বাগানে রাখলে ভাল। লাগবে। কিন্তু লাগে না। নিজেই তো দেখছ।
হুঁ! পকেট থেকে টাকা বের করে বাড়িয়ে ধরল রবিন, এই নিন, পঞ্চাশই আছে।
খুব ভাল, খুব ভাল, খুশি হলেন মহিলা। প্যাশা স্যালভেজ ইয়ার্ডের সুনাম শুনেছিলাম, দেখছি ঠিকই শুনেছি।
বোরিস, রবিন বলল, দুটো মূর্তি একসঙ্গে নিতে পারবেন?
পারব, একটা মূর্তি বগলে চেপে ধরে রেখেছে বিশালদেহী ব্যাভারিয়ান। কিশোর বলে, ওর গায়ে মোষের জোর, ঠিকই বলে। অকটেভিয়ানকে আরেক বগলের তলায় তুলে নিল বোরিস অতি সহজে, যেন তুলোর পুতুল। রবিনের দিকে ফিরল। যাব?
হ্যাঁ, চলুন, ঘুরে দাঁড়াতে গেল রবিন।
দুই লাফে কাছে চলে এল রুসা। এখুনি চলে যাবে? এই প্রথম সত্যিকারের একজন গোয়েন্দার সঙ্গে দেখা হলো, কয়েক কোটি প্রশ্ন জমে আছে মনে, জিজ্ঞেস করব ভাবছিলাম…
কী… দ্বিধা করছে রবিন। রুসার কথা শুনতে মন্দ লাগছে না। তা ছাড়া, গোয়েন্দাদের ওপর অগাধ ভক্তি-শ্রদ্ধা যখন মেয়েটার…বোরিসের দিকে তাকাল

সে। আপনি যান আমি আসছি। হ্যাঁ, অকটেভিয়ানকে একটা বাক্সে ভরে রাখবেন।
ঠিক আছে, তুমি তাড়াতাড়ি এসো, বলে হাঁটতে শুরু করল। বোরিস।
কথার মেশিনগান ছোটাল রুসা, একের পর এক প্রশ্ন করে যাচ্ছে, কোনটারই জবাবের অপেক্ষা করছে না। কিছুই বলতে হচ্ছে না রবিনকে, শুধু শুনছে।
বোরিস এসে উঠল পিকআপের পেছনে। চ্যাপ্টা হয়ে থাকা কার্ডবোর্ডের বড় একটা বাক্স ঠিকঠাক করে তার মধ্যে একটা মূর্তি ঢুকিয়ে ভালমত বাঁধল। তার প্রতিটি কাজের ওপর চোখ রেখেছে নীল সিড্যানে বসা দুই কালো-গুফো। রেডিওতে অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে। জিকো, জ্যাকি আর রাইসের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছে।
মূর্তি বাক্সে ঢুকিয়ে বেঁধেছে ভালুকটা, মাইক্রোফোনে মুখ প্রায় ঠেকিয়ে কথা বলছে জিকো। ছেলেটা এখনও বাড়ির ভেতরে…
ভাঙা চেয়ারে বসে সব শুনছে কিশোর।
কথা শেষ হলো জিকোর। নির্দেশ দিল রাইস, বাক্সটা নামাও! শোনো, এক কাজ করো। একটা নকল দুর্ঘটনা ঘটাও
পিকআপটা স্টার্ট নিলেই গিয়ে ওটার সামনে দাঁড়িয়ে যাও, চলতে শুরু করলেই পড়ে যাওয়ার ভান করবে, ধাক্কা খেয়ে যেন পড়ে গেছ। চেঁচাতে শুরু করবে। লোকজন জমে যাবে। ছেলেটা আর ড্রাইভার নেমে পড়বে কতখানি চোট লেগেছে দেখার জন্যে। এই সুযোগে…
দাঁড়াও, দাঁড়াও, দরকার নেই! চেঁচিয়ে বাধা দিল জিকো। ভালুকটা আবার বাড়ির ভেতরে যাচ্ছে। ট্রাকে কেউ নেই। নামিয়ে আনতে পারব।
নীরব হয়ে গেল রেডিও। পারছে না, তাই, নইলে দড়ি ছিঁড়ে উড়ে চলে যেত এখন কিশোর। যা-ও বা অকটেভিয়ানের মূর্তিটা খুঁজে পাওয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গেই হারাতে হচ্ছে আবার।
বাগানে এসে ঢুকল আবার বোরিস।
একনাগাড়ে বকে চলেছে মেয়েটা, চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে রবিন।
আচ্ছা, মেয়ে গোয়েন্দার দরকার নেই তোমাদের? আগ্রহে সামনে। মাথা বাড়িয়ে দিয়েছে রুসা। আমার তো মনে হয়, দলে একটা মেয়ে থাকা উচিত। অনেক সময় অনেক রকম সাহায্য হবে, যা ব্যাটাছেলেকে দিয়ে হয় না। আমাকে নিতে পারো। খুব ভাল অভিনয় করতে পারি, বিশ্বাস না হলে মাকে জিজ্ঞেস করে দেখো, যে-কোন মানুষের গলা নকল করতে পারি, আর…।
এই, রবিন, ডাকল বোরিস। আর কতক্ষণ! মিসেস পাশা জলদি করতে বলে দিয়েছে। চলো।

হ্যাঁ, এই যে, আসছি, রবিন বলল। সরি, রুসা, আমাকে যেতে হচ্ছে। হয়তো মেয়ে একজন দরকার হতে পারে আমাদের। যদি হয়, তোমাকেই আগে খবর দেব।
এক সেকেণ্ড, প্লিজ! আমি আসছি, রবিনকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই ছুটে বাড়ির ভিতরে চলে গেল রুসা। ফিরে এল যেন চোখের পলকে। হাতে একটা চারকোনা সাদা কার্ড, আর পেনসিল। এই যে, নাও, ফোন নম্বর আর আমার নাম লিখে দিয়েছি। প্লিজ, রবিন, ভুলো না! আমাকে খবর দিয়ো! সত্যিকার গোয়েন্দাদের সঙ্গে কাজ করতে পারলে ধন্য হয়ে যাব। প্লিজ!
কার্ডটা হাতে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল রবিন, তার পাশে বকবক করতে করতে চলল মেয়েটা।
ট্রাকে এসে উঠল রবিন আর বোরিস। ঘুরে গলি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে তখন নীল সিড্যান, দেখল দুজনেই, কিন্তু ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ হলো না, বাক্সে বাধা মূর্তি চলে যাচ্ছে।
হাত নেড়ে গুডবাই জানাল রুসা। কিশোর আর মুসাকে নিয়ে আরেকদিন এসে চা খেয়ে যাওয়ার অনুরোধ করল চেঁচিয়ে।
গাড়ি ছেড়ে দিল বোরিস।
মোড় নিয়ে বড় রাস্তায় পড়ার আগে জানালা দিয়ে মুখ বের করে পেছনে তাকাল রবিন, এখনও রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে রুসা, রবিনকে দেখে আরেকবার হাত নাড়াল।
চুপ হয়ে গিয়েছিল, আবার জ্যান্ত হয়ে উঠল রেডিও। কানে এল জিকোর গলা।
পেয়েছি! জিকো বলছে। ওরা কল্পনাও করতে পারেনি, মূর্তিটা আমরা নিয়ে এসেছি।
গুড! বলল রাইস। গোপন আড়োয় নিয়ে যাও। খবরদার, আমরা। আসার আগে খুলো না। ওভার অ্যাণ্ড আউট।
ওভার অ্যাণ্ড আউট! বলে নীরব হয়ে গেল রেডিও। কিশোরের দিকে তাকিয়ে হাসল রাইস, বিচ্ছিরি হাসি, ঠোঁটের এক কোণ ঝুলে পড়ছে। খোকা, বেঁচে গেলে। আমাদের জিনিস আমরা পেয়েছি। এখুনি অবশ্য তোমাদেরকে ছাড়তে পারছি না, তোমার বাড়িতে ফোন করে খবর দেব কোথায় আছ। তবে দেরি হবে, রাতের আগে। বোধহয় পারব না। ততক্ষণ বসে থাকো এখানে।
হ্যারিসনকে ডাকল রাইস।
তারপর তিনজনে বেরিয়ে গেল। যাওয়ার আগে একবার ফিরে তাকাল হ্যারিসন, কিশোরের জন্যে কিছু করতে পারেনি বলে দুঃখিত মনে হচ্ছে ওকে। বুড়ো মানুষ, দুই ডাকাতের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারছে না। বোঝাই যাচ্ছে।

ওরা বেরিয়ে যাওয়ার পর মিনিটখানেক অপেক্ষা করল কিশোর। তারপর চেঁচিয়ে ডাকল, মুসাআ! গাআস! শুনছও!
কিশোওর! মুসার চাপা কণ্ঠ ভেসে এল, দুটো বন্ধ দরজার জন্যে আওয়াজ অস্পষ্ট। কী হচ্ছে? আমাদের বের করতে পারবে? লাইটের। ব্যাটারি শেষ!
সরি, সেকেণ্ড! জবাব দিল কিশোর। আমি নিজেই আটকে আছি। দড়ি পেঁচিয়ে মমি বানিয়ে রেখেছে আমাকে। অকটেভিয়ানকেও পেয়ে গেছে ওরা!
ভাবছে কিশোর, কী করে মুক্তি পাওয়া যায়! জানালার চৌকাঠে ফেলে গেছে ওরা তার ছুরিটা। ওখানে যাওয়া সম্ভব না, আর কোন অলৌকিক উপায়ে যেতে পারলেও দড়ি কাটা তো দূরের কথা, ওটা হাতে নিতে। পারবে না।
কিন্তু মুক্তি তো পেতেই হবে! ওরা বলে গেছে বটে। কিন্তু কখন। ফোন করবে না রবে ঠিক আছে?
নিচে জোর ধাক্কার শব্দ শোনা গেল। বন্ধ দরজায় গায়ের জোরে ধাক্কা মারছে মুসা আর অগাস্ট, তারই আওয়াজ। ভেঙে ফেলতে চাইছে পাল্লা।
ধাক্কা দেয়া থামল। চিৎকার শোনা গেল মুসার, কিশোর, এই, কিশোর! শুনছ?
শুনছি! জবাব দিল কিশোর। কী খবর!
নড়ছেও না। কাঁধ ব্যথা করে ফেলছি আমরা! ভীষণ অন্ধকার!
ধৈর্য ধরো। উপায় ভাবছি আমি।
জলদি করো, কিশোর! হুটোপুটি শুনছি, ইঁদুর আছে মনে হয়!
চিমটি কাটতে পারছে না, নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরেই গভীর ভাবনায় ডুবে গেল কিশোর। একটা কোন উপায়! একটা! চেয়ারে নড়েচড়ে উঠল সে, তার চেয়ে বেশি নড়ল চেয়ারটা, বিচিত্র শব্দ করে প্রতিবাদ জানাল যেন।
রান্নাঘরের জানালা দিয়ে দেখতে পাচ্ছে কিশোর, বাইরে সময় যেন ছুট লাগিয়েছে। একটা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আছে মনে হচ্ছে। পশ্চিমের উঁচু চূড়ার ছায়া এসে পড়েছে লনে, সূর্য যতই দিগন্তে নামছে, ততই বাড়ছে ছায়াটা।
টেনেটুনে আরেকবার হাতের বাঁধন পরীক্ষা করল কিশোর। কচমচ, মড়মড় করে উঠল আবার চেয়ার। বিদ্যুৎ ঝিলিক হানল যেন তার মগজে। মনে পড়ল, কিছুদিন আগে পুরানো নড়বড়ে একটা চেয়ারে বসে। পড়েছিল সে, মড়াৎ করে ভেঙে প্রায় বসে গিয়েছিল চেয়ারটা।
শরীরটা সামনে-পেছনে করতে শুরু করল, কিশোর, চেয়ারও নড়ছে। তার সঙ্গে। জোড়াগুলো খুলবে খুলবে করছে, কিন্তু খুলছে না। ঝটকা। মেরে, এক পাশে কাত হয়ে গেল কিশোর, চেয়ার নিয়ে পড়ল ভ্রাম করে। চেয়ারের একটা পায়া ছুটে গেল। কয়েকবার জোরে জোরে পা ছুঁড়তেই খুলে উড়ে চলে গেল পায়াটা,

কিশোরের পায়ে দড়ির প্যাঁচগুলো ঢলঢলে হয়ে গেল। যাক, ডান পা-টা মুক্তি পেল!
অন্য পা মুক্ত করার চেষ্টায় লাগল কিশোর। টানাহেঁচড়া করে লাভ হলো না। শেষে ডান পায়ে ভর দিয়ে উঠে তিন পায়ার ওপর বসাল। চেয়ারটাকে ধাক্কা দিয়ে কাত হয়ে চেয়ার নিয়ে পড়ল আরেক পাশে। মড়াৎ করে বাঁ হাতটা ভাঙল চেয়ারের। নিজেও ব্যথা পেয়েছে কিশোর, গুঙিয়ে উঠল। কিন্তু চুপ করল না। হ্যাঁচকা টান মারল বা হাতে, জোড়া থেকে খুলে এল চেয়ারের বা হাতা। হাতটা বার বার ঝাঁকি দিয়ে হাতা খুলে ফেলার চেষ্টা করল।
কিশোর! মুসার উদ্বিগ্ন ডাক শোনা গেল। কী হয়েছে? মারপিট করছ?
হ্যাঁ, চেয়ারের সঙ্গে, জবাব দিল, কিশোর। আমি জিতছি। আর মিনিট দুই অপেক্ষা করো।
উঠে আবার চেয়ার নিয়ে কাত হয়ে পড়ল কিশোর, মড়মড় করে উঠল চেয়ার, বেঁকাতেড়া হয়ে গেল, কিন্তু আর কোন জোড়া খুলল না। অনেক কায়দা-কসরৎ করেও বাঁ হাত থেকে চেয়ারের হাতা খসাতে পারল না সে। চেষ্টা করে দেখল, হামাগুড়ি দেয়া যায়, শেষে হামাগুড়ি দিয়েই এগোল জানালার দিকে ছুরিটার জন্যে।
দুই হাতেরই কব্জি অবধি বাধা, আঙুলগুলো নড়ানো যায়। জানালার চৌকাঠ থেকে বাঁ হাতে ছুরিটা তুলে নিতে পারল কিশোর। ব্যস, হয়ে গেছে কাজ! বাঁধন কেটে মুক্ত হতে আর মাত্র এক মিনিট লাগল।
প্রচণ্ড পরিশ্রম গেছে, মেঝেতেই চিত হয়ে শুয়ে জিরিয়ে নিল কিশোর। ডেকে বলল, মুসা, আমি আসছি।
আল্লাহ! অনেকক্ষণ অন্ধকারে থেকে আলোয় এসে চোখ মেলতে পারছে না মুসা। দড়ি খুললে কী করে?
মগজের ধূসর কোষগুলোকে ব্যবহার করে, মাথায় টোকা দিল কিশোর। চলো, জলদি কাটি এখান থেকে। কোন কারণে কালো গুফোদের কেউ আবার এসে পড়লেই গেছি। রবিনের খবর শোনো, অকটেভিয়ানকে খুঁজে পেয়েছে...
তাই নাকি? চেঁচিয়ে উঠল মুসা।
ভাল খবর! যোগ করল অগাস্ট।
কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই হারিয়েছে আবার, আগের বাক্যটা শেষ করল কিশোর। কালো-ফোরা নিয়ে গেছে। চলো, যেতে যেতে বলব।
সাইকেলগুলো তেমনি পড়ে আছে। তুলে নিয়ে চড়ে বসল তিনজনে, দ্রুত ফিরে চলল রকি বিচে। যাওয়ার পথে সব খুলে বলল কিশোর।

ইশশ, বার বার এসেও আবার চলে যাচ্ছে আমাদের নাকের ডগা দিয়ে! বিলাপ করে উঠল যেন মুসা। মূর্তিটায় জিনের আসর হয়েছে।
বোধহয় অভিশাপই কাটেনি এখনও, মন্তব্য করল অগাস্ট।
না কাটলে আমাদের কী? কালো-গুফোরা মরবে, কিশোর বলল। আমি অবাক হচ্ছি জিকোর কথা ভেবে। তিন-ফোঁটা বলল ওকে মেরে ফেলেছে, তা হলে আবার এল কোত্থেকে?
হুঁ, রহস্যই! মুসা ঘাড় দোলাল। কিন্তু ওসব ভাবনা তো পরে, আবার অকটেভিয়ানকে পাচ্ছি কী করে? গাস, তোমার সম্পত্তি বোধহয় গেল।
তিনজনেই চিন্তিত। কথা জমল না। চুপচাপ সাইকেল চালিয়ে রকি বিচে এসে পৌঁছল। সূর্য অস্ত যাচ্ছে, ইয়ার্ডের গেটে ঢুকে মনে পড়ল ওদের, সারাদিন কিছু খায়নি, মনে পড়তেই মোচড় দিয়ে উঠল পেটের ভেতর।
রবিন, বোরিস আর রোভার, তিনজনেই কাজে ব্যস্ত। চাচা-চাচীকে দেখা যাচ্ছে না। ইয়ার্ডের শেষ মাথায় বড় বড় গাছের গুঁড়ি একটার ওপর আরেকটা তুলে রাখছে দুই ব্যাভারিয়ান। পিকআপটা দাঁড়িয়ে আছে। অফিসের কাছে। কয়েকটা লোহার চেয়ারে রঙ করছে রবিন।
মন খারাপ নরি, বলল মুসা। দেখেছ, ব্যাজার হয়ে আছে?
আমাদেরও তো তাই, কিশোর বলল।
সাইকেলের শব্দ শুনে মুখ তুলল রবিন। জোর করে হাসার চেষ্টা করল। এই যে, এসেছ। ভেবেই মরছিলাম, কোথায় গেছ!
গাসের দাদার বাড়িতে, সাইকেলটা স্ট্যাণ্ডে তুলতে তুলতে বলল। কিশোর। তোমার কী খবর?
ইয়ে... বলতে গিয়েও থেমে গেল রবিন, এতবড় একটা দুঃসংবাদ শোনাতে বাধছে।
ঠিক আছে, বলতে হবে না, কণ্ঠে রহস্য ঢালল কিশোর। এদিকে এসো।...আমার চোখে চোখে তাকাও। হ্যাঁ, না না, পাতা বন্ধ কোরো না। তোমার চোখ দেখেই বলে দিতে পারব মনে কী আছে।
মিটিমিটি হাসছে মুসা আর অগাস্ট।
রবিনের চোখে কিশোরের দৃষ্টি স্থির, আস্তে আস্তে টোকা দিচ্ছে নিজের কপালে। হ্যাঁ, আসছে...পড়তে পারছি-ফোন এসেছিল, এক ভূত ফোন করেছিল। অকটেভিয়ানের খোঁজ মিলেছে। পিকআপ আর বোরিসকে নিয়ে ছুটলে। তারপর...তারপর, মূর্তিটা পেলে, গাড়িতে তুললে! হলিউডের এক বাড়িতে পেয়েছ, ঠিক হচ্ছে না?
হাঁ হয়ে গেছে রবিন। তাই হয়েছে! কিন্তু...

চুপ! আঙুল তুলল কিশোর। বাকিটাও পড়ছি...
রবিন আরও অবাক; দেখে, অগাস্টও হাসছে। কিশোরও। কিছুই বুঝতে না পেরে সে-ও হাসল। গোমড়া ভাবটা কেটে গেল, হালকা হয়ে গেল আবার পরিস্থিতি।
রবিন? বোরিসের ডাক শুনে ঘুরল চার কিশোর, পিকআপের কাছে দাঁড়িয়ে আছে ব্যাভারিয়ান। মূর্তিটা কী করব? পিকআপ গ্যারাজে তুলতে হবে।
ওই বেঞ্চে রেখে দিন, রবিন বলল। সঙ্গীদের দিকে ফিরে বলল, ফ্রানসিস বেকন। নিয়ে গিয়েছিলাম যদি মহিলা বদলে নেন! নিলেন না, টাকাই ফেরত নিলেন। পঞ্চাশ ডলার ধার নিয়েছিলাম মেরি চাচীর কাছ থেকে, অকটেভিয়ানকে ফেরত আনতে পারলে টাকাটা আর দিতে হত না।
ও নিয়ে ভেবো না, হাত নাড়ল কিশোর। টাকার ব্যবস্থা আমি করব।
মূর্তিটা নামিয়ে বেঞ্চে রাখল বোরিস।
কোন কিছু না ভেবেই এগিয়ে গেল মুসা। কাছে গিয়ে দেখেই চেঁচিয়ে উঠল, আরে! ঠিক দেখছি তো! এই, কিশোর, জলদি এসো!
ছুটে এল তিন কিশোর।
আঙুল তুলে মূর্তির পিছনের লেখা দেখাল মুসা: অকটেভিয়ান!
অকটেভিয়ান! চেঁচিয়ে উঠল অগাস্ট। কালো-ফোর দল নিতে পারেনি!
বুঝেছি! ঘোরের মধ্যেই যেন মাথা দোলাল রবিন। দুটো মূর্তি বগলে চেপে নিয়ে গিয়েছিল বোরিস, অকটেভিয়ানকে বাক্সে না ভরে, ভুলে বেকনকে ভরেছে। যাক, বাঁচলাম! ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল সে।
চট করে সবাই একবার দেখে নিল গেটের দিকে তাদের ভয়, তিন ফোঁটা না এসে হাজির হয় আবার। অমূলক ভয়, একেবারে নির্জন গেট আর রাস্তা।
কমবেশি সবাই চমকে গিয়েছে, আগে সামলে নিল কিশোর। চলো, চলো, দেরি করা উচিত না। ওয়ার্কশপে নিয়ে গিয়ে ভেঙে ফেলি মূর্তিটা।
জোশ এসে গেছে মুসার শরীরে, একাই মূর্তিটা বয়ে নিয়ে এল ওয়ার্কশপে।
একটা বাটালি আর হাতুড়ি বের করে আনল কিশোর। দেখো, অকটেভিয়ানের ঘাড়ের নিচে হাত বোলাচ্ছে সে। এখানে গর্ত করা হয়েছিল, তারপর আবার কাদা লেপে ঢেকে দেয়া হয়েছে। আঙুলে লাগছে। যাক, অবশেষে রক্তচক্ষু মিলল!
দূর, কথা থামাও! অধৈর্য হয়ে বাতাসে থাবা মারল মুসা। ভাঙো, ভাঙো! নইলে আমার কাছে দাও!
হেসে মূর্তির গায়ে বাটালি লাগাল কিশোর, হাতুড়ি দিয়ে জোরে বাড়ি মারল বাটালির পেছনে। আরেকবার বাড়ি মারতেই চলটা উঠে গেল, পরের বাড়িতে অকটেভিয়ান দুটুকরো। ছোট গোল একটা কাঠের বাক্স গড়িয়ে পড়ল মাটিতে।

ছোঁ মেরে ওটা তুলে নিল মুসা। কিশোরের দিকে বাড়িয়ে ধরল। খোলো! তুমিই খোলো! দেখি, পঞ্চাশ বছর ধরে কী জিনিস লুকিয়ে রেখেছে! উত্তেজনায় কাঁপছে তার গলা। আরে, দেরি করছ কেন? অভিশাপের ভয় করছ নাকি?
না, কেমন বদলে গেছে গোয়েন্দাপ্রধানের কণ্ঠ!
হালকা! এত হালকা হওয়ার তো কথা না! বাক্সটা হাতের তালুতে রেখে ওজন। আন্দাজ করছে সে।
মোচড় দিয়ে বাক্সের ঢাকনা খুলে ফেলল কিশোর। সবাই ঝুঁকে এল ভেতরে কী আছে দেখার জন্যে। না, জ্বলজ্বলে লাল কোন পাথর তো। নেই! শুধু রয়েছে ভাঁজ করা এক টুকরো কাগজ। ধীরে, অতি ধীরে। দুআঙুলে চেপে কাগজটা বের করে আনল গোয়েন্দাপ্রধান। খুলে পড়ল: গভীরে খোঁড়ো! সময় খুব মূল্যবান!
সেরাতে সহজে ঘুম এল না রবিনের চোখে। ভয়ানক উত্তেজনা গেছে। সারাদিন। অবশেষে কী মিলল! এক টুকরো কাগজ! নাহ, অতিরিক্ত হয়ে গেছে! বাক্সটা খোলার পর কী কী ঘটেছে, বার বার চোখের সামনে। ভাসছে তার।
হতাশ দৃষ্টিতে কাগজের টুকরোটার দিকে তাকিয়ে ছিল কিশোর। ও নিশ্চিত ছিল, বাক্সে পাথরটাই মিলবে। তার ধারণা ভুল। এবং ভুল হলে নিজের ওপর সাংঘাতিক রেগে যায় গোয়েন্দাপ্রধান।
আরেকটা মেসেজ! সবচেয়ে কম হতাশ হয়েছে মুসা।
গভীরে খোঁড়ো! আপনমনেই বলল কিশোর। মানে কী? রহস্যের গভীরে খোঁড়ো। লোককে বিপথে চালিত করার জন্যেই মূর্তির বুদ্ধি করেছেন হোরাশিও অগাস্ট। কিন্তু ধরে নিয়েছেন, কোন না কোনভাবে বুঝে যাবে তার নাতি। নিশ্চয় বোঝার জন্যে কোন ইঙ্গিতও রেখেছেন। সেটা কী?
জানি না, জবাব দিল অগাস্ট। ভাজ পড়েছে দুই ভুরুর মাঝে। দাদা খুব চালাক ছিল, নিজের বুদ্ধির মাপকাঠিতেই আর সবাইকে বিচার করেছে, ফলে থই পাচ্ছি না আমরা।
দেখি, মেসেজটা বের করো তো, হাত বাড়াল কিশোর। আছে সঙ্গে?
বের করে দিল অগাস্ট।
ছোট টেবিলে ছড়িয়ে বিছিয়ে আবার মেসেজটা পড়ল কিশোর, জোরে জোরে।
এখনও আমার কাছে আগের মতই দুর্বোধ্য! কুটি করল মুসা।
আমার কাছেও, অগাস্ট বলল। অগাস্ট আমার সৌভাগ্য, মানে কী? অগাস্টাসের কোন একটা মূর্তির ভেতরে, এ ছাড়া আর কী? কিংবা হতে পারে, অগাস্ট মাসের কথা বলেছে। আগামীকাল আমার জন্মদিন। অগাস্টের ছয় তারিখে বেলা আড়াইটায় জন্মেছি আমি। কিন্তু মাসের মধ্যে পাথর থাকে কী করে? কোন ক্যালেণ্ডারের কথা বলেনি তো?

মনে হয় না, নিজের ঠোঁটে চিমটি কাটতে শুরু করল কিশোর। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে মুখ তুলল। সব ভাবনাচিন্তা এখন বাদ। শুতে যাব। আচ্ছা, দাঁড়াও, দেখে নিই, অকটেভিয়ানের মূর্তির ভাঙা ধারগুলো পরীক্ষা করে দেখল সে। বাক্সটা যেখানে ছিল, খাজ হয়ে আছে, আঙুল বুলিয়ে দেখল। মূর্তির ভেতরে পাথর রাখা নিরাপদ মনে করেননি মিস্টার অগাস্ট।
চুপ করে রইল অন্য তিনজন। বলার আছেই বা কী?
চলো, যাই, বলল গোয়েন্দাপ্রধান। পেটের ভেতর ছুচো নাচছে। খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ব। ঘুম দিয়ে উঠলে মাথাটা পরিষ্কার হবে, কোন একটা বুদ্ধি বেরিয়ে যাবে হয়তো তখন।
সাইকেল নিয়ে বাড়ি চলে এল রবিন। খাওয়ার পর খাওয়ার টেবিলে বসেই নোট লিখতে শুরু করল, সারাদিন যা যা ঘটেছে, বিস্তারিত। পরে খুঁটিনাটি সব মনে না-ও থাকতে পারে। লিখতে লিখতেই হাত থেমে গেল। এই সময় হঠাৎ: ডায়াল ক্যানিয়ন! তাই তো, ডায়াল ক্যানিয়ন কেন? অদ্ভুত নাম! খানিক দূরে বসে খবরের কাগজ পড়ছেন মিস্টার মিলফোর্ড। ডেকে জিজ্ঞেস করল রবিন, বাবা, হলিউডের উত্তরে ডায়াল ক্যানিয়নের নাম শুনেছ?
কাগজ নামিয়ে রাখলেন মিস্টার মিলফোর্ড। ডায়াল ক্যানিয়ন? বোধহয় শুনেছি। কেন?
নামটা অদ্ভুত লাগছে আমার কাছে!
তাই, না? দাঁড়া দেখছি। উঠে গিয়ে বুকশেলফ থেকে মোটা একটা বই নিয়ে এলেন মিস্টার মিলফোর্ড, আর একটা বড় ম্যাপ।
ম্যাপে পাওয়া গেল জায়গাটা। আঙুল রেখে বললেন, এই তো। বইটা খুললেন। ডায়াল ক্যানিয়ন...ডায়াল ক্যানিয়ন...এই যে, নিঃসঙ্গ ছোট্ট একটা গিরিসঙ্কট, হলিউডের উত্তরে। আগে নাম ছিল সানডায়াল ক্যানিয়ন, পরে সংক্ষেপ করে নেয়া হয়েছে। এই নামকরণের কারণ, সূর্যঘড়ির কাঁটার সঙ্গে চূড়াটার মিল আছে।
রবিনের দিকে তাকালেন। সূর্যঘড়ির কাটা কেমন জিনিস? পিরামিডের মত। ওটার ছায়া পড়ে ডায়ালের ওপর, তা দেখেই আগে সময় অনুমান করত লোকে।
থ্যাঙ্কস, বলেই আবার লেখায় মন দিল রবিন।
লিখতে লিখতেই তার মনে হলো, তথ্যটা কিশোরকে জানালে কেমন হয়? হয়তো তেমন কিছুই না, কিন্তু কোন কথা থেকে যে কখন কী আবিষ্কার করে বসবে কিশোর পাশা, আগে থেকে বলা যায় না।
উঠে এসে ফোন করল রবিন।
ফোন ধরল কিশোর। রবিনের কথা শুনতে শুনতে হঠাৎ ঢোক গিলল, শব্দটা এপাশ থেকেও শুনতে পেল রবিন। পরক্ষণেই চেঁচিয়ে উঠল কিশোর, রবিন!

পেয়েছি!
কী!
পেয়েছি! কাল সকালে লাইব্রেরিতে যাচ্ছ তো? দুপুরের আগেই ইয়ার্ডে চলে আসবে। ঠিক একটায়, দেরি কোরো না। সব কিছু তৈরি রাখব আমি।
কীসের তৈরি! কিছুই বুঝতে পারছে না রবিন।
কিন্তু লাইন কেটে দিল কিশোর।
স্তব্ধ হয়ে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল রবিন, আস্তে করে নামিয়ে রাখল রিসিভার। নোট লেখা শেষ আর হলো না, কাপড় ছেড়ে বিছানায় উঠল সে।
রাতে ঘুম ভাল হলো না। সকালে লাইব্রেরিতে গিয়েও কাজে মন বসাতে পারল না রবিন। থেকে থেকেই আনমনা হয়ে যাচ্ছে।
একটার আগেই ইয়ার্ডে পৌঁছে গেল রবিন। কিশোর, অগাস্ট আর মুসা তার জন্যে অপেক্ষা করছে। পিকআপটাও তৈরি, ড্রাইভিং সিটে বোরিস, পাশে রোভার। দুজনেই যাবে সঙ্গে। কিন্তু কোথায়? ট্রাকের পেছনে পুরু করে ক্যানভাস বিছানো, ছেলেদের বসার জন্যে। গোটা দুই বেলচাও আছে। কিশোরের কাঁধে ঝুলছে ক্যামেরা।
কিন্তু যাচ্ছিটা কোথায়? এই নিয়ে অন্তত দশবার প্রশ্ন করল রবিন। উত্তেজিত।
ছুটে চলেছে পিকআপ।
রাস্তার দিক থেকে মুখ ফেরাল মুসা। আমারও সেই প্রশ্ন! কিশোর, মাঝেমধ্যে তুমি এত বেশি বেশি করো না। আমাদেরকে ভাবনায় রেখে কী লাভ তোমার? আমরা তো তোমারই সহকারী, নাকি?
হহারাশিও অগাস্টের মেসেজের লেখা সত্যি কিনা, যাচাই করতে যাচ্ছি, অবশেষে মুখ খুলল গোয়েন্দাপ্রধান। বোরিস আর রোভারকে নিয়ে যাচ্ছি নিরাপত্তার জন্যে। ডাকাত ব্যাটারা যদি হামলা করে বসে, এই দুজনই যথেষ্ট। দশটা কালো-ফোরও সাধ্য হবে না দুভাইয়ের মোকাবেলা করে।
আরে, দূর, ওসব কথা শুনতে চেয়েছে কে? গোঁ গোঁ করে উঠল মুসা। পারবে না, সে তো আমরাও জানি। যা জানি না, সেটা বলো।
ঠিক আছে, বাবা, বলছি, হাত তুলল কিশোর। সূত্রটা রবিনই দিয়েছে, কাল রাতে। ডায়াল ক্যানিয়নের আগের নাম ছিল সানডায়াল ক্যানিয়ন। এটা শুনেই বুঝে গেছি। ইস, আরও আগেই বোঝা উচিত ছিল! কাল ওরা আমাকে বেঁধে রেখেছিল, রান্নাঘরের জানালা দিয়ে দেখেছি, লনে পাহাড়ের চূড়ার ছায়া! যেন একটা বিশাল সূর্যঘড়ি। গাস, বুঝেছ কিছু?
না, সোজাসাপ্টা জবাব।

দাঁড়াও, দাঁড়াও! হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল রবিন। বুঝেছি! সূর্যঘড়ি...তার মানে কাটার ছায়ার মাথা যেখানে পড়বে, সেখানেই রয়েছে। রক্তচক্ষু! মাটির নিচে। তাই না?
হ্যাঁ, কিশোর বলল।
কিন্তু মস্ত বড় লন, মুসা তত উৎসাহ পাচ্ছে না। একেক সময় কাটার ছায়া একেক জায়গায় পড়বে, কয় জায়গা খুঁড়ব? পুরো লন তো খোঁড়া সম্ভব না।
পুরো লন খুড়তে হবে কেন? পকেট থেকে মেসেজটা বের করে ক্যানভাসের ওপর বিছাল কিশোর। আবার গোড়া থেকে আলোচনা করছি, অগাস্ট তোমার নাম, অগাস্ট তোমার খ্যাতি, অগাস্ট তোমার সৌভাগ্য-এসব কথা গাসের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যেই লেখা হয়েছে। তারপর, পাহাড়প্রমাণ বাধাকেও বাধা মনে করবে না, তোমার জন্ম তারিখের ছায়াতেই ওর অস্তিত্ব; এটাই হলো গিয়ে আসল কথা। বলতে চেয়েছেন, গাসের জন্মদিনে পাহাড়ের ছায়া যেখানে পড়বে, সেখানেই পাওয়া যাবে পাথরটা। ওর জন্ম কবে? অগাস্টের ছয় তারিখে। কটার সময়?
আড়াইটা! বলল অগাস্ট।
হ্যাঁ, আড়াইটার সময় যেখানে ছায়া পড়বে, খুঁড়তে হবে সেখানেই। গভীর করে খুঁড়তে হবে। মেসেজ এখানেই শেষ, বাকিটা লিখেছেন ভাবনা গুলিয়ে দেয়ার জন্যে। হ্যাঁ, আরেকটা বাক্য: সময় খুব মূল্যবান। তার মানে, বেলা আড়াইটাকে প্রাধান্য দিয়েছেন, দিনের অন্য কোন সময়ের ছায়া হলে চলবে না।
আর এক ঘণ্টাও তো নেই! ঘড়ি দেখে বলে উঠল মুসা।
দূরও আর বেশি নেই, কিশোর বলল। এসে গেছি প্রায়।
কী ভেবে পেছনে তাকাল মুসা। রাস্তা শূন্য। একটা গাড়িও দেখা যাচ্ছে না, অনুসরণ করছে না কেউ।
আগেই দেখেছি, কেউ পিছু নেয়নি আমাদের। আর নিলে নিল। বোরিস আর রোভারের হাতের কিছু কিলঘুসি প্রাপ্যই হয়েছে ওদের।
হঠাৎ মোড় নিয়ে পাশের সরু পথে নেমে এল পিকআপ। দুপাশে পাহাড়। কতদিন আগে পথ বাঁধানো হয়েছিল, কে জানে, তারপর আর মেরামত করা হয়নি, নষ্ট হয়ে গেছে জায়গায় জায়গায়, ছালচামড়া আর মাংস উঠে গেছে পথের, ছোট ছোট গর্তে পড়ে বিষম ঝাঁকুনি খাচ্ছে গাড়ি, ঝনঝন আর্তনাদ তুলছে পুরানো বডি।
কিশোর, পেছনে নেই, ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে মুসা। কিন্তু সামনে আছে!
দুপাশে দুজন করে এসে ঝুঁকে দাঁড়াল, দৃষ্টি সামনে। পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে গোটা কয়েক বিশাল ট্রাক, বুলডোজার, আর ইঞ্জিনে চলে এমন একটা দানবীয় বেলচা।

মিস্টার হোরাশিওর বাড়ির খানিকটা মস্ত চোয়ালে চেপে ধরে ছিঁড়ে নিয়ে এসেছে বেলচাটা, একটা ট্রাকে নামিয়ে দিয়ে চোয়াল ফাঁক করে
আবার এগিয়ে যাচ্ছে আরেক লোকমা তুলে আনার জন্যে। বাড়ির ছাত। আর একটা ধার ইতিমধ্যেই ধ্বংস করে দিয়েছে যন্ত্রটা, বাকিটুকুও খতম করে দেবে দেখতে দেখতে। যেন একটা মহারাক্ষস।
বাড়ির পেছনের গাছপালা টিলাটব্বর যা আছে, সমান করে দিচ্ছে বুলডোজার। দ্রুত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে হোরাশিওর অতি শখের বাগান।
দানবের দল! চিকচিক করছে অগাস্টের দুচোখের কোণ। ইস, কী করছে! দাদা এখন থাকলে… গলা ধরে এল তার।
সমান করে ফেলছে সব! গুঙিয়ে উঠল রবিন। রক্তচক্ষু আর আগের জায়গায় আছে কিনা, কে জানে!
মনে হয় আছে, ভুরু কুঁচকে লনের দিকে তাকিয়ে আছে অগাস্ট। দেখছ, ওই যে পাহাড়ের ছায়া, ওদিকে কেউ নেই।
রাবিশ, নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল একটা ট্রাক। মুখ বের করে ড্রাইভার হাকল, এই, সরো, পথ ছাড়া। আমাদের তাড়া আছে।
পিকআপকে রাস্তার এক পাশে সরিয়ে রাখল বোরিস, পাশ কেটে চলে গেল ট্রাকটা। আরও ট্রাক এসে পড়েছে রাবিশের বোঝা নিয়ে। ওটাও চলে গেল।
খোলা জায়গায় নিয়ে যান, লনের দিকে দেখিয়ে বোরিসকে বলল কিশোর। কেউ কিছু বললে আমি জবাব দেব।
হোকে, বলে আবার পিকআপ রাস্তায় তুলল বোরিস, শদুই গজ এগিয়ে লনের কাছে এসে থামল।
লাফিয়ে গাড়ি থেকে নামল ছেলেরা।
ওদেরকে দেখে ভাঙা বাড়ির দিক থেকে এগিয়ে এল একজন বেঁটে খাটো লোক, মাথায় ধাতব হেলমেট, সুপারভাইজার বোধহয়।
এখানে কী করছ? কড়া গলায় জিজ্ঞেস করল লোকটা। বাইরের লোক আসা নিষেধ।
ভাবভঙ্গি দেখেই ভড়কে গেল মুসা আর রবিন। কী জবাব দেবে। কিশোর?।
কিন্তু জবাব তৈরিই রয়েছে গোয়েন্দাপ্রধানের মুখে। আমার চাচা পুরানো জিনিসপত্র কিনেছিল এখান থেকে। কিছু ফেলে গেল কিনা দেখতে পাঠিয়েছে।
কিছু নেই। সামান্যতম নরম হলো না লোকটা। একটা সুচও না। যাও।
আচ্ছা, কয়েক মিনিট দাঁড়াতে পারি আমরা? সুর পাল্টাল কিশোর। এই যে, আমার বন্ধু, অগাস্টকে দেখাল সে। ইংল্যাণ্ড থেকে এসেছে। আমেরিকায় কী করে বাড়িঘর ভাঙা হয়, দেখেনি কখনও। ওর নাকি খুব দেখতে ইচ্ছে করছে।

শুনেছ, কী বলেছি তোমাকে? ধমকে উঠল লোকটা। এখানে সারকাস চলছে না, দেখার কিছু নেই। গায়ে এসে যখন কিছু পড়বে
তখন বুঝবে ঠেলা। ব্যথা পাবে, ঝামেলা বাধাবে খামোকা।
এই... চট করে ঘড়ির দিকে তাকাল কিশোর। সওয়া দুটো বাজে, এই, পনেরো মিনিট? অনুরোধ করল সে। পনেরো মিনিট পরেই চলে যাব।
পনেরো সেকেণ্ডও না! ভীষণ একরোখা লোক। যাও, ভাগো!
লনে এসে পড়া ছায়ার দিকে তাকাল ছেলেরা। পনেরো মিনিট পরেই পাহাড়ের চূড়ার ছায়া পড়বে রক্তচক্ষু যেখানে আছে, সেখানে।
ঠিক আছে, স্যর, যাচ্ছি, কিশোরও নাছোড়বান্দা। কিন্তু, স্যর, দুএকটা ছবি তুলতে তো কোন আপত্তি নেই?
জবাবের অপেক্ষা করল না কিশোর। কাঁধে ঝোলানো ক্যামেরা নামিয়ে নিয়ে পা বাড়াল ছায়ার দিকে। চিৎকার করার জন্যে মুখ খুলেই থেমে গেল সুপারভাইজার, বোধহয় ভাবল ওদিকে গেলে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা নেই।
ছায়ার মাথা থেকে গজখানেক দূরে এসে দাঁড়িয়ে গেল কিশোর, ফিরে ভাঙা বাড়িটার ছবি তুলল একটা। ক্যামেরা আবার কাঁধে ঝুলিয়ে নিচু হয়ে জুতোর ফিতে বাধল সময় নিয়ে। ফিরে এল।
থ্যাঙ্ক ইউ, স্যর, বলল কিশোর। যাচ্ছি।
আর যেন না দেখি এখানে! বেশি খারাপ ব্যবহার করে ফেলেছে ভাবল হয়তো লোকটা, তাই বলল, তবে, মাস তিনেক পরে এলে আর কিছু বলব না। ছটা বাড়ি আর বড় সুইমিং পুল বানিয়ে ফেলব ততদিনে, চাইলে একটা বাড়িও কিনতে পারো। ছোট্ট একটা হাসি দিল সে।
পিকআপে এসে উঠল কিশোর। তার পিছনে এল বিষণ্ন তিন কিশোর।
স্টার্ট নিয়ে গাড়ি চলতে শুরু করতেই ক্ষোভ ঝাড়ল মুসা, এক্কেবারে ছোটলোক, ব্যাটা! পনেরোটা মিনিটও থাকতে দিল না। লাঠি দিয়ে কুত্তা, খেদাল যেন! গেল গাসের রক্তচক্ষু! কাল এসে লনের চিহ্নও দেখব না!
কাল আসতে যাচ্ছে কে? ভুরু নাচাল কিশোর। আজ রাতেই আসব।
অন্ধকারে? হাঁ হয়ে গেছে রবিন। অন্ধকারে কী দেখব? ছায়া-টায়া। কিছু থাকবে না তখন!
ঈগল পাখিকে বলব জায়গাটা খুঁজে দিতে, মুচকি হাসল কিশোর। ব্যস, এই পর্যন্তই, আর একটাও কথা বের করা গেল না তার মুখ থেকে।
ক্লান্ত শামুকের মত যেন গড়িয়ে চলল সময়। এক বিকেল পার করতেই ছেলেদের মনে হলো কয়েকশো যুগ পার হচ্ছে। সময় কাটানোর জন্যে কত কী-ই যে করল ওরা: বোরিস আর রোভারকে কাজে সাহায্য করল, মেরি চাচী দশবার বলেও যে

কাজে হাত দেয়াতে পারেননি ছেলেদেরকে, আর কিছু না পেয়ে শেষে তেমন কাজও করল ওরা। চাই কী, অনেক পুরানো কয়েকটা লোহার চেয়ারের মরচে তুলল মুসা সিরিশ দিয়ে ঘষে, তারপর ব্রাশ নিয়ে রঙ করায় মন দিল। কিশোর এসবের মধ্যে নেই।

ডায়াল ক্যানিয়ন থেকে ফিরেই কিশোর সেই যে তার ওয়ার্কশপে ঢুকেছে, আর বেরোনোর নাম নেই। অন্য তিনজনের একজনকেও ঢুকতে দিল না। রক্তচক্ষু খোঁজার জন্যে কোন যন্ত্র বানাচ্ছে নাকি?

অবশেষে শেষ হলো দীর্ঘ বিকেল। তাড়াতাড়ি ডিনার সেরে ফেলল। ছেলেরা, বোরিসকেও খেয়ে নিতে বলল কিশোর।

খেয়েদেয়ে পিকআপ বের করল বোরিস, ইয়ার্ড থেকে কয়েক ব্লক দূরে সহজে চোখে পড়ে না এমন একটা জায়গায় এনে গাড়ি থামিয়ে তাতে বসে রইল চুপচাপ।

ব্যাটাদের ধোকা দেয়ার জন্যে কিছু করতে হবে এবার, কিশোর বলল। হ্যানসনকে আসতে ফোন করে দিয়েছি, অন্ধকার নামলেই চলে। আসবে। আমাদের তৈরি থাকা দরকার।

এই শেষবার রোলস রয়েসে চড়া! আফসোস করল মুসা, তারপর থেকে পা সম্বল!

কেন, সাইকেল আছে না আমাদের? রবিন মনে করিয়ে দিল।

ওই তো, পা-ই তো সম্বল, মুসা বলল। ইঞ্জিন তো আর নেই, আরামও নেই। হাঁটার চেয়ে কম কষ্ট নাকি সাইকেল চালানো? পাহাড়ি পথে ওঠার সময় না বোঝা যায় ঠেলা! তিন গোয়েন্দার জারিজুরি শেষ।

এতদিন যে গাড়ি ছিল না, আমরা বসে থেকেছি নাকি? কিশোর বলল।কোন না কোনভাবে কাজ উদ্ধার হয়েই গেছে।

রোলস রয়েসের ব্যাপারে আগ্রহী মনে হলো অগাস্টকে, কী করে পাওয়া গেল ওটা, জানতে চাইল।

সংক্ষেপে জানাল মুসা। আক্ষেপ করল, এ-ই শেষবার, বুঝলে? আর পাব না। মানা করে দিয়েছে রেন্ট-আ-রাইড কোম্পানির ম্যানেজার। আরেকবার চাইতে গেলে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দেবে।

আরে, দূর, কী বকবক শুরু করেছ! ধমক লাগাল কিশোর। যখন ঠেকায় পড়ব তখন দেখা যাবে। চলো, তৈরি হয়ে নিই।

নিজের বেডরুমে তিনজনকে নিয়ে চলল গোয়েন্দাপ্রধান।

যেতে যেতে মুসাকে বলল অগাস্ট, একটা কথা কিন্তু ঠিক। ক্যালিফোর্নিয়া অনেক বড়, গাড়ি ছাড়া অসুবিধেই হবে তোমাদের।

ইয়ার্ডের পিকআপ আছে, বলল রবিন। ওটা ব্যবহার করতে পারছি।
পারছ, কিন্তু দেখছি তো, যতবারই দরকার পড়ছে, গিয়ে চাইতে হচ্ছে মেরি চাচীর কাছে। তখন বোরিসের হাতে কাজ আছে কিনা, সেটাও দেখতে হচ্ছে। অনেক ফ্যাকড়া না?
আলমারি খুলে চারটে জ্যাকেট বের করল কিশোর। সব কটাই তার, বিভিন্ন ধরনের, বিভিন্ন রঙের। একেকজনকে একেকটা দিয়ে পরতে বলল। অগাস্টের গায়ে মোটামুটি ঠিকই লাগল, রবিনের গায়ে সামান্য ঢলঢলে হলো, কিন্তু মুসার গায়ে লাগতেই চাইল না; জোরজার করে পরতে হলো, অন্যেরা সাহায্য না করলে পিঠের ওপর থেকেই নামাতে পারত না; চেন লাগাতে পারল না, সামনের দিক খোলা রইল জ্যাকেটের।
বেরিয়ে এল ওরা।
মেরি চাচী ওদেরকে দেখেই চোখ কপালে তুললেন। আরে, কী কাণ্ড! এই, কিশোর, এতই শীত লাগছে তোদের? একজনের জ্যাকেট আরেকজনে না পরলে চলছে না? কী জানি, বাপু, আজকালকার ছেলেছোকরাদের মতিগতি বুঝি না।
চাচাও হাঁটাহাঁটি করছেন বাইরে। ফিরে তাকালেন।
কয়েকটা লোককে ফাঁকি দিতে হবে, চাচী, সত্যি কথাটাই বলল কিশোর।
বাচ্চাদের খেলা! দাতে পাইপ, ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে ফকফক করে ধোয়া ছাড়ছেন রাশেদ পাশা। ছেলেবেলায় আমরাও ওরকম খেলেছি, কত। আহা, কী ছিল সেসব দিন! মামা-বাড়িতে যেতাম, শীতের সন্ধ্যায় কিষাণ বাড়িতে খড় পোড়াত, ধোঁয়া উঠত, গন্ধ এখনও যেন নাকে লেগে রয়েছে! চাঁদনী রাতে খেজুরের রস চুরি করতে যেতাম মামাতো ভাইদের সঙ্গে…যদি চিনে ফেলে কেউ? তাই মামার শার্ট-পাঞ্জাবি গায়ে চড়িয়ে ছদ্মবেশ নিতাম…ঢলঢল করত…আহ, বাচ্চা থাকাই ভাল। সোনালি দিনগুলো উড়ে চলে যায়…যেতে দাও, মেরি, ওদের আনন্দ মাটি কোরো না।
কিশোরের ওয়ার্কশপে চলে এল ছেলেরা। ছোট টেবিলে একটা জিনিস পড়ে আছে। একটা যন্ত্র, ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের মত দেখতে, সরু দুটো তার বেরিয়ে এসেছে মূল অংশ থেকে, তারের মাথায় হেডফোন লাগানো। বোঝা গেল, সারা বিকেল এটা নিয়েই খেটেছে কিশোর।
এক কোণে চারটে বড় পুতুল, ওই যে, দরজিদের পোশাক তৈরি করার ডামি, যেগুলো কিনে এনেছিলেন রাশেদ চাচা, মুশূন্য চারটে ধড়। নিচের স্ট্যাণ্ড কেটে ফেলে দিয়েছে কিশোর।
এসো, হাত লাগাও, ডাকল সে। এগুলোকে পোশাক পরাতে হবে। কেন জ্যাকেটগুলো পরে এসেছি, বুঝেছ তো? দূরবীন নিয়ে কেউ ইয়ার্ডের ওপর চোখ

রেখেছে কিনা জানি না। রাখতে পারে। হাতে করে আলাদা কাপড় আনলে ওরা সন্দেহ করে বসত। জ্যাকেট খোলো, পুতুলগুলোকে পরাও।
জ্যাকেট পরে হাস্যকর রূপ নিল দরজির ডামি। হাত নেই, দুপাশে ঝুলছে জ্যাকেটের হাতা।
ভূত মনে হচ্ছে, মুসা মন্তব্য করল। এই জিনিস দেখিয়ে ফাঁকি। দিতে চাও?
মাথা লাগালেই অনেক জ্যান্ত মনে হবে, কিশোর আশ্বাস দিল।
টেবিলের ড্রয়ার থেকে চারটে বেলুন বের করল সে। ফুঁ দিয়ে ফোলাল। তারপর সুতো দিয়ে বাধল কাটা গলার সঙ্গে। এদিক দুলছে, ওদিক দুলছে বেলুন; মনে হচ্ছে যেন মাথা নাড়ছে পুতুল।
হা হা করে হেসে উঠল মুসা। রবিন আর অগাস্টও হাসল।
অন্ধকারে জ্যান্তই মনে হবে, এপাশ থেকে, ওপাশ থেকে দেখে আবার বলল কিশোর।
অপেক্ষা করছে ওরা। ধীরে ধীরে নামল অন্ধকার। পুতুলগুলোকে এখন আর হাস্যকর লাগছে না, হঠাৎ কেউ দেখলে বরং ভয়ই পেয়ে যাবে।
ইয়ার্ডের চত্বরে গাড়ির বাঁশি শোনা গেল।
হ্যানসন, কিশোর বলল।
খানিক পরেই ইঞ্জিনের মৃদু শব্দ এসে থামল ওয়ার্কশপের বেড়ার বাইরে।
ফোনেই বলেছি ওকে এখানে গাড়ি নিয়ে আসতে, জানাল কিশোর। এসো, একটা করে পুতুল তুলে নাও সবাই। চট করে নিয়ে গিয়ে গাড়িতে তুলে ফেলো।
অন্ধকারে গা ঢেকে রয়েছে কালো রোলস রয়েস, কিন্তু তারার আলোর জন্যে পুরোপুরি লুকাতে পারছে না চকচকে শরীর।
মাস্টার কিশোর? ফিসফিস করে বলল হ্যাঁনসন, গাড়ি থেকে নেমে পড়ছে। দরজা খুলে দিয়েছি। পেছনের সিটে পুতুলগুলোকে তুলে দেয়া হলো; এমনভাবে, দেখলে মনে হবে চার কিশোর বসে আছে।
হ্যানসন, কিশোর নির্দেশ দিল, কোস্ট রোড ধরে দ্রুত চলে যাবেন। মোড় নিয়ে পাহাড়ের পথ ধরে এগিয়ে যাবেন একটানা দুঘণ্টা, তারপর আরেক দিক দিয়ে ঘুরে এসে এখানে ফেলে যাবেন ডামিগুলো। ঠিক আছে?
ঠিক আছে।
যান। গুডবাই। আপনার সঙ্গে হয়তো আর দেখা হবে না আমাদের। অনেক খারাপ ব্যবহার করেছি হয়তো, কিছু মনে রাখবেন। না।
আরে, না না, কী যে বলেন, হাঁ হাঁ করে উঠল ইংরেজ শশাফার। খারাপই লাগছে আমার। আপনাদের সঙ্গে কাজ করে অনেক মজা পেয়েছি। যাই, সুযোগ পেলেই দেখা করব।

যান। ও, হ্যাঁ, হেডলাইট জ্বালবেন না।
পুলিশ থাকলে? অগাস্ট প্রশ্ন করল।
ওপথে রাতে পুলিশ থাকে না, বিশেষ কোন ব্যাপার না ঘটলে।
চলে গেল রোলস রয়েস, প্রায় নিঃশব্দে, চুপিচুপি গা ঢাকা দিয়ে। পালাল যেন।
বাহ, চমৎকার! এতক্ষণে কথা বলল রবিন। কেউ চোখ রেখে থাকলে মনে করবে, আমরাই যাচ্ছি।
ভেবে চুপ করে বসে থাকবে না, কিশোর বলল। রোলস রয়েসের পিছু নেবে। চলো, এবার আমরাও যাই। লাল কুকুর চার দিয়ে বেরোতে হবে, বোরিস ওদিকেই পিকআপ নিয়ে বসে আছে।
ওয়ার্কশপে ঢুকে যন্ত্রটা নিয়ে এল কিশোর। লাল কুকুর চার দিয়ে বেরিয়ে এল অন্ধকার নির্জন পথে। পাহাড়ের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। পিকআপ, প্রায় দেখাই যায় না, আগে থেকে না জানলে গাড়িটার গায়েই হুমড়ি খেয়ে পড়ত ওরা।
ছেলেরা চড়ে বসতেই গাড়ি ছেড়ে দিল বোরিস। পেছনে তাকিয়ে দেখল একবার কিশোর। না, কেউ অনুসরণ করছে বলে মনে হচ্ছে না।
নিরাপদেই পৌঁছল পিকআপ ডায়াল ক্যানিয়নে। হোরাশিও অগাস্টের ভাঙা বাড়ির কাছে এনে গাড়ি রাখল বোরিস। নীরব, নির্জন, কোথাও কোনরকম নড়াচড়ার আভাস নেই। লনে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটা বড় ট্রাক আর বুলডোজার, যেন ভূত! প্রহরী নেই, রাখার কথা মনেই হয়নি বোধহয় কড়া সুপারভাইজারের।
বোরিস, চাপা কণ্ঠে নির্দেশ দিল কিশোর, ট্রাক ঘুরিয়ে রাস্তায় নিয়ে রাখুন। কড়া নজরে রাখবেন। কিছু দেখলেই দুবার হর্ন টিপবেন।
ঠিক আছে, বলল বোরিস।
যন্ত্রটা নামিয়ে নিল মুসা, তার হাত থেকে নিয়ে কাঁধে ফেলল কিশোর। এইবার দেখা যাক আমার ডিটেকটর ঈগলের সন্ধান পায়। কিনা।
কী বলছ, সহজ করেই বলো না, বাবা! দুহাত তুলল মুসা।
হাতে বেলচা নিয়ে পিকআপ থেকে লাফিয়ে নামল রবিন আর অগাস্ট।
এটা মেটাল ডিটেকটর, যন্ত্রটার লম্বা হাতলে চাপড় দিল কিশোর। ধাতব জিনিস মাটির কয়েক ফুট নিচে থাকলেও ঠিক ধরে ফেলবে, লনের দিকে হাঁটতে শুরু করল সে।
কিন্তু রক্তচক্ষু ধাতু নয়, রবিন প্রতিবাদ করল। পাথর।
সেটা আমিও জানি, চলতে চলতেই বলল কিশোর। দুপুরে জুতোর ফিতে বেধেছিলাম, মনে আছে? সেই সুযোগে রূপার একটা আধডলার গুঁজে দিয়েছিলাম মাটিতে। মুদ্রাটার এক পিঠে ঈগলের ছবি আছে না? ওই পাখিকেই এখন জিজ্ঞেস করব, পাথর আছে কোথায়।

কিন্তু, দুটো পনেরো মিনিটে মুদ্রা গুঁজেছ, সামনের অন্ধকারের দিকে চোখ মেলে বলল অগাস্ট। চিহ্ন কি ঠিক হবে?
সেজন্যেই একটু এগিয়ে গুঁজেছি, আড়াইটায় কোথায় ছায়া পড়বে। অনুমান করে নিয়ে। এই যে, এখানেই কোথাও হবে, কাধ থেকে যন্ত্র নামাল সে।
ডিটেকটরের চ্যাপ্টা গোল দিকটা মাটিতে রেখে হেডফোন পরে নিল কিশোর। তারপর হাতলের কাছের একটা সুইচ টিপে দিয়ে ধীরে ধীরে সামনে-পেছনে-আশপাশে সরাতে থাকল যন্ত্রটা। ধাতুর সন্ধান পেলেই গুঞ্জন উঠবে হেডফোনে, বলল সে।
কিন্তু অনেকক্ষণ চেষ্টা করেও হলো না। ভারি যন্ত্র নাড়াচাড়া করে ক্লান্ত হয়ে গেল কিশোর। মুসার হাতে তুলে দিল।
মুসাও চেষ্টা করল বেশ কিছুক্ষণ। কিন্তু গুঞ্জন তুলতে যেন নারাজ হয়ে আছে হেডফোন। ঈগল পাখি উড়ে চলে গেছে! বলল সে একসময়। হতাশ। সারারাত খুঁজলেও পাব না!
কিন্তু এখানেই কোথাও থাকার কথা! ফিরে বাড়ির অন্ধকার ছায়াটার দিকে তাকাল কিশোর, অনুমান করে নিল আবার। এখানেই আছে। আরেকটা চক্কর দাও।
চক্কর পুরো করার দরকার হলো না, মৌমাছির গুঞ্জন উঠল হেডফোনে। লাফিয়ে উঠল মুসা, পেয়েছি! পেয়েছি!
চুপ! আস্তে! মুসার কান থেকে হেডফোন খুলে নিয়ে পরল কিশোর। হ্যাঁ, ঠিকই। আর সামান্য একটু পিছাও তো...আরেকটু পাশে...হ্যাঁ, হ্যাঁ, হয়েছে, হয়েছে, থামো!
হেডফোন খুলে কোমরের বেল্টে ঝোলানো টর্চ খুলল কিশোর। হাঁটু গেড়ে বসে আলো ফেলল মাটিতে, আঙুল দিয়ে খুঁচিয়ে বের করে তুলে নিল মুদ্রাটা। রবিন, গাস, খোঁড়ো এখানেই।
বেশ কিছুক্ষণ বেলচা চালিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ল রবিন আর অগাস্ট। মুসা আর কিশোরের হাতে তুলে দিল বেলচা। পালা করে মাটি খুঁড়ে চলল চার কিশোর। কিন্তু রক্তচক্ষুর দেখা নেই।
নীরব নিথর চারদিক, বেলচার থ্যাপ থ্যাপ ছাড়া কোন শব্দ নেই, এমনকী একটা ঝিঁঝিও ডাকছে না।
এক সময়ে থেমে গেল মুসা। বেলচায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে কপালের ঘাম মুছল। উফফ, আর পারছি না! হাঁপাচ্ছে পরিশ্রমে। কিশোর, ভুল করেছ, জায়গা এটা না।
চুপ করে ভাবছে কিশোর। বাড়ির দিকে তাকাল আরেকবার, তারপর ফিরল কালো পাহাড়ের চূড়াটার দিকে। দূরত্ব আন্দাজ করল। তারার আলোয়। বাড়িটার

দিকে এক কদম এগোল। এখানে এসো। দেখা যাক খুড়ে।
নীরবে বেলচা চলল আবার কিছুক্ষণ। হঠাৎ ঠং করে কীসে যেন বাড়ি খেল বেলচা, পাথুরে কিছুতে।
কিশোর! কোথায় কী করছে ভুলে গিয়ে আবার চেঁচিয়ে উঠল মুসা।
চুপ! দ্রুত একবার এদিক-ওদিক চেয়ে নিল কিশোর। নেমে পড়ল দ্বিতীয় গর্তটায়। টর্চের আলোয় দেখা গেল ছোট একটা বাক্সের কোণ বেরিয়ে আছে। ঝুঁকে আঙুল দিয়ে খুঁচিয়ে মাটি সরাল, শক্ত করে চেপে ধরে টান দিতেই উঠে এল বাক্সটা। এটাই হবে, ফিসফিস করল সে। সাজিমাটি দিয়ে তৈরি। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখছে। রবিন, টর্চটা ধরো।
ছোট্ট একটা সোনার তালা লাগানো বাক্সে। মুঠো করে ধরে চাপ দিল কিশোর, খুলল না তালা। ছোট হলেও বেশ শক্ত। শেষে একটা পাথর কুড়িয়ে নিয়ে জোরে জোরে কয়েক ঘা লাগাতেই কটাং করে ভেঙে গেল আংটা। তালাটা খুলে ছিটকে পড়ল।
আস্তে করে ডালা তুলল কিশোর।
টর্চের আলোয় ঝিকিয়ে উঠল একটা লাল পাথর, তুলোর শয্যায় শুয়ে আছে।
ইয়াল্লা! আবার চেঁচাল মুসা। কিশোর, দিয়েছ সেরে কাজ!
বাহ, ভারি সুন্দর! অগাস্টও চেঁচিয়ে উঠল।
কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল কিশোর। পাথরের মত স্থির হয়ে গেল অন্য তিনজন।
ঝাড়া মেরে অন্ধকারকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে যেন তীব্র উজ্জ্বল আলো। শক্তিশালী কয়েকটা টর্চের আলো পড়েছে গায়ে। চোখ মেলতে। পারছে না ছেলেরা। পায়ের শব্দ কানে আসছে।
নড়বে না, গর্জে উঠল একটা পরিচিত ভারি কণ্ঠ। দাও, পাথরটা।
চোখ পিটপিট করছে ছেলেরা, আবছামত দেখতে পাচ্ছে চারটে টর্চের ওপাশে চার জোড়া গোঁফ, এগিয়ে আসছে চারজন মানুষ। একজনের হাতে পিস্তল। ভয়ঙ্কর নলের কালো মুখ ছেলেদের দিকে।
কালো-ফোর দল! চাপা কণ্ঠে বলল রবিন। ব্যাটারা ঘাপটি মেরে বসে ছিল, ট্রাকগুলোর আড়ালে।
দুপুরে এসেছিলে, শুনেছি, বলল রাইস। ভাগিয়ে নাকি দিয়েছিল। শুনেই বুঝেছি, আবার আসবে তোমরা।
আলাপ বাদ দাও তো, জ্যাকির খসখসে গলা। অধৈর্য হয়ে উঠেছে সে। পাথরটা নিয়ে সরে পড়া দরকার। এই, ছেলে, দাও ওটা। এগিয়ে এল সে।

ভীষণ ভয় পেয়েছে কিশোর, এতখানি ভয় পেতে আর তাকে দেখেনি কখনও রবিন আর মুসা। চোখ উল্টে পড়ে যাবে যেন যে-কোন সময়! কাঁপছে থরথর করে। তার কাঁপা হাত থেকে বাক্সটা উল্টে পড়ে গেল গর্তে! এই...গুলি কোরো না! ..আ-আমি তুলছি!
ঝুঁকে বসে কাঁপা কাঁপা আঙুলে ঝুরঝুরে মাটি ঘটল সে, পাথরটা দেখা গেল হাতে। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, এই যে, নাও! তবু আমাদেরকে মেরো না!
কিন্তু কেউ এসে পাথর নেয়ার সময় পেল না। আচমকা হাত ঘুরিয়ে পাথরটা ছুঁড়ে মারল সে, উজ্জ্বল আলোয় চকিতের জন্যে একটা রঙিন ধনুক সৃষ্টি করে জ্যাকির মাথার ওপর দিয়ে উড়ে চলে গেল পাথরটা, হারিয়ে গেল পিছনের অন্ধকারে।
গাল দিয়ে উঠল জ্যাকি, এক ঝটকায় ঘুরে দাঁড়াল। খোজো! চেঁচিয়ে উঠল সে। আলো ঘোরাও, জলদি!
ছেলেদের দিক থেকে একসঙ্গে ঘুরে গেল সব কটা টর্চ।
দৌড় দাও! চেঁচিয়ে নিজের সঙ্গীদেরকে বলল কিশোর। জলদি! ওরা গুলি করবে না।
চারটে তাড়া খাওয়া খরগোশের মত ছুটল ছেলেরা রাস্তার দিকে, অন্ধকার লন উড়ে পেরিয়ে এল যেন। জায়গামতই বসে আছে বোরিস, ছেলেদেরকে ছুটে আসতে দেখেই যা বোঝার বুঝে নিল। স্টার্ট দিল ইঞ্জিন।
বোরিস! জলদি! পিকআপে উঠেই চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। জলদি ছাড়ুন!
কোন প্রশ্ন করল না বোরিস।
প্রচণ্ড এক ঝাঁকুনি দিয়েই ছুটতে শুরু করল পিকআপ। পেছনে তাকিয়ে দেখল ছেলেরা, গুফোর দলকে দেখা যাচ্ছে না। পাথরটা এখনও পায়নি নিশ্চয়, ওটা খোঁজা নিয়েই ব্যস্ত।
থরথর করে কাঁপছে পিকআপের পুরানো বডি, নীরব রাতে ইঞ্জিনের গোঁ গোঁ শুনে মনে হচ্ছে যেন কোন দৈত্যের গর্জন, দুপাশের পাহাড়ে বাড়ি খেয়ে অনেক বেশি বিকট হয়ে উঠছে শব্দ। প্রচণ্ড ঝাঁকুনি, স্থির হয়ে বসে থাকাই মুশকিল। একে অন্যের গায়ে গা ঠেকিয়ে চাপাচাপি করে বসে আছে ছেলেরা।
সরু গিরিপথ পেরিয়ে বড় রাস্তায় উঠল পিকআপ, এইবার শান্তি।
তবুও চুপ করে রইল ছেলেরা। ইয়ার্ডে পৌঁছার আগে একটা কথাও বলল না কেউ।
ইয়ার্ডের অন্ধকার চত্বরে এনে গাড়ি রাখল বোরিস।
চুপচাপ ট্রাক থেকে নামল ছেলেরা। বেলচা, মেটাল ডিটেকটর ফেলে এসেছে; আনতে পারেনি। আর অবশ্যই, লাল পাথরটাও।

অফিসের ধারে এসে গোল হয়ে দাঁড়াল চার কিশোর।
সব শেষ! দীর্ঘশ্বাস ফেলল মুসা।
তীরে এসে তরী ডুবল! রবিনও বিষণ্ন।
তাই মনে হচ্ছে? সামান্যতম মন খারাপ হয়নি কিশোরের।
মনে হচ্ছে মানে? অগাস্টের কণ্ঠে বিস্ময়।
ভেবেছিলাম, কিশোর বলল, রোলস রয়েসের দিকে নজর দেবে ওরা। ফাঁকি দিতে পারব। উল্টে আমাদেরকেই ফাঁকি দিয়ে দিল। ভাগ্যিস বুদ্ধিটা মাথায় এসেছিল।
হ্যাঁ, বেঁচে ফিরেছি বটে, কিন্তু পাথরটা গেল! মুসার গলায় তীব্র ক্ষোভ।
রবিন, কিশোর বলল, টর্চটা জ্বালো তো।
টর্চ জ্বালল রবিন, কিশোরের হাতে আলো ফেলেই স্থির হয়ে গেল।
গোয়েন্দাপ্রধানের ছড়ানো হাতের তালুতে জ্বলছে উজ্জ্বল লাল চুনি!
আসল রক্তচক্ষু, হাসল কিশোর। ছুঁড়ে ফেলেছি নকলটা, তিন ফোঁটা যেটা ফেলে গিয়েছিল, মনে আছে? কেন জানি মনে হলো তখন, নিয়ে নিলাম সঙ্গে। এখন তো দেখছ, কাজেই লেগেছে। গর্তে আসলটাই ফেলেছিলাম। এক ফাঁকে ওটা তুলে পকেটে ঢুকিয়ে নকলটা বের করেছি। হাহ হাহ! কলা দেখিয়ে এসেছি ব্যাটাদের!
কিশোর, সত্যিই তুমি একটা জিনিয়াস! উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল রবিন।
আর অভিনয়টা কী করল দেখলে! অগাস্ট বলল। আমি তো ভেবেছিলাম, হার্টফেল করছে! ডাকাতগুলোকে পর্যন্ত বোকা বানিয়ে দিল!
নাহ্, আমিও মেনে নিচ্ছি, হাত তুলল মুসা, ঝকঝকে সাদা দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। আমাদের কিশোর পাশার কাছে শার্লক হোমস কিংবা এরকুল পোয়ারো কিছু না!
আমিও তাই বলি, অন্ধকার থেকে ভেসে এল শীতল, শান্ত একটা কণ্ঠ। কিন্তু আর কোন চালাকি নয়, খোকা।
ছেলেদের হতভম্ব ভাব কাটার আগেই দপ করে জ্বলে উঠল অফিসের বাইরে লাগানো আলো। লম্বা, পাতলা লোকটা নেমে এল দরজার কাছ থেকে। ডান হাত বাড়ানো, পাথরটা নেয়ার জন্যে। অন্য হাতে মারাত্মক ছড়িটা। তিন-ফোঁটা!
বোকা হয়ে গেছে ছেলেরা। কথা ফুটল না মুখে।
পালানোর চেষ্টা কোরো না, কড়া গলায় বলল তিন-ফোঁটা। হাতের ছড়িটা ঠেলে দিল ছেলেদের দিকে, ঝট করে বেরিয়ে এল তীক্ষ্ণধার ছুরির ফলা। ঝকঝক করছে।
সেই কখন থেকে বসে আছি, বলল সে। চমৎকার বুদ্ধি করেছিলে, রোলস রয়েসে করে ডামি পাঠানো! কিন্তু কাজ হলো না। কিছুই। তোমাদের চালাকি ওরাও ধরে ফেলেছে, আমিও। কেন যেন মনে হচ্ছিল, গোঁফওয়ালা রামছাগলগুলোকে ধোকা দেবেই তোমরা। তাই এখানে বসে আছি। ঠিকই করেছি। দাও।

আর কিছু করার নেই, ভাবল রবিন, রক্তচক্ষু হাতছাড়া করতেই হচ্ছে।
এখনও দ্বিধা করছে কিশোর। হাতের তালুতে যেন ওজন পরীক্ষা করল পাথরটা, ঢোক গিলল। মুখ তুলে তাকাল লোকটার দিকে। মিস্টার রামানাথ, আপনি কি কাটিরঙ্গা মন্দিরের কেউ? ন্যায়-বিচারের মন্দিরের?
নিশ্চয়ই, সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল রামানাথ। নইলে পৃথিবীর এ মাথায় আসি? আমি মন্দিরের পুরোহিত। পঞ্চাশ বছর হলো, মন্দির থেকে চুরি গেছে রক্তচুক্ষু, মন্দিরের একজন টাকা খেয়ে হোরাশিও অগাস্টকে দিয়ে দিয়েছিল ওটা। তখন থেকেই খোঁজা হচ্ছে ওই পুণ্য-পাথর। চুনিটার উদ্দেশে মাথা নোয়াল সে। আমার অনেক ভাগ্য, অনেক পুণ্যের ফলেই আজ খুঁজে পেয়েছি এটা। ভগবান দয়া করেছেন। এক কদম বাড়াল। দাও।
কিশোরের পেট ছুঁই ছুঁই করছে ছুরির ফলা, কিন্তু সে অবিচল। বলল, পাথরটার ক্ষতি করার ক্ষমতা দূর হয়েছে পঞ্চাশ বছরে; ঠিক, কিন্তু পুরোপুরি কি হয়েছে? আপনি চুরি করে কিংবা ছিনিয়ে নিলে ক্ষতি হবে না?
বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন রামানাথের শরীরে। এক লাফে পিছিয়ে গেল। সে। সট করে ছুরির ফলা ঢুকে গেল ছড়ির খাপে।
গাস, এই নাও, পাথরটা বাড়িয়ে ধরল কিশোর। আমি এটা খুঁজে পেয়েছি, তোমাকে উপহার দিলাম। তোমার কিছু হবে না। কিন্তু যদি কেউ তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়, পাথরের ভয়ানক অভিশাপ নামবে তার ওপর।
থরথর করে কেঁপে উঠল রামানাথ। দুচোখে আতঙ্ক। সামলে নিতে সময় লাগল। ভয়ে ভয়ে বলল, আ-আমাকে ক্ষমা করো, খোকা! আমি ভুলেই গিয়েছিলাম! ছড়ি ফেলে দিয়ে দুহাত জড়ো করে প্রণাম করল রক্তচক্ষুকে। ঘাট হয়েছে, ভগবান, অধমকে ক্ষমা করো!
মুখ তুলে কিশোরের দিকে তাকাল রামানাথ। কিশোর, চলো না, অফিসে বসি? কথা আছে।
চলুন।
অফিসে এসে ঢুকল পাঁচজনেই। চেয়ার টেনে বসল। পকেট থেকে চেকবই আর কলম বের করে খসখস করে লিখল রামানাথ। ছিঁড়ে নিয়ে চেকটা ঠেলে দিল অগাস্টের দিকে। দেখো, এতে চলবে কিনা। রক্তচক্ষু তোমাদের কাছে একটা দামী পাথর, আর কিছু না, কিন্তু আমার কাছে দেবতা। যদি ওতে না হয়, আরও টাকা দেব। কিন্তু দেবতাকে নিয়ে দেশে ফিরব না।
চেকের অঙ্ক দেখে চোখ কপালে উঠল চার কিশোরের।
উঠে এসে আস্তে করে পাথরটা টেবিলে রাখল অগাস্ট, চেকটাও, রামানাথের সামনে। আপনার দেবতাকে আটকাব না আমি, মিস্টার রামানাথ, নিয়ে যান।

টাকাও লাগবে না। যান, রক্তচক্ষু উপহার দিলাম আমি আপনাকে।
আরেকবার পাথরটাকে প্রণাম করে সযত্নে বুকপকেটে ঢুকিয়ে রাখল রামানাথ। দুগালে অশ্রুধারা। চেকটা আবার ঠেলে দিয়ে বলল, তোমার মত নির্লোভ ছেলে আমি দেখিনি, গাস, মাই বয়! আমাকে অপমান কোরো না, এই টাকাটা তোমাদেরকে আমি উপহার দিলাম। ভগবান আমাকে অনেক দিয়েছেন। যা দিলাম, এটা আমার কাছে কিছুই না। নাও। আমি আশীর্বাদ করছি, তোমরা অনেক বড় হবে, অনেক অনেক বড়।
চেকটা নিয়ে পকেটে রেখে দিল অগাস্ট।
আচ্ছা, মিস্টার রামানাথ, কিশোর বলল, কয়েকটা কথার জবাব দেবেন?
বলো?
কী করে জানালেন, রক্তচক্ষু আমেরিকায় আছে?
আমরা জানতাম, হোরাশিও অগাস্টই রক্তচক্ষু নিয়ে পালিয়েছে। পালাল তো পালাল, একেবারে গায়েব। কত খোঁজাখুঁজি করেছি, পাইনি। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর পর তার নাম ছাপা হলো পত্রিকায়, তার সম্পর্কে লেখা হলো। ছুটে এলাম আমেরিকায়।
তো, কালো-ফোদের ব্যাপারটা কী? ওরা কী করে জানল রক্তচক্ষুর কথা?
আমি বলেছি। অনেক টাকা দেব চুক্তি করে আমিই ওদের কাজে লাগিয়েছি।
অ। আর উকিল রয় হ্যামার? তার কী লাভ ছিল?
চিঠির কপিটা কিনেছি তার কাছ থেকে, ব্যস, এ-ই।
হ্যারিসন?
ওকে স্রেফ ভয় দেখিয়ে খবর জোগাড় করতে চেয়েছিল রাইস, আর কিছু না। আমি কিছু টাকা দিয়ে দেব ভাবছি ওকে।
আচ্ছা, মিস্টার রামানাথ, জিজ্ঞেস করার জন্যে অনেকক্ষণ থেকেই উসখুস করছে মুসা, সেদিন বললেন জিকোকে মেরে ফেলেছেন, ও আবার জ্যান্ত হলো কী করে?
হাসল রামানাথ। মারিনি। তোমাদেরকে ভয় দেখানোর জন্যে ছুরিতে রঙ মাখিয়ে এনেছিলাম।
উফফ, সত্যি যা ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন না! রবিনও হাসল।
একটা কথা, হাত তুলল কিশোর। ওরা তো আর টাকা পেল না, রাইসের দলের কথা বলছি। যদি এখন পাথরটা ছিনিয়ে নিতে চায়। আপনার কাছ থেকে?
শীতল হাসি ফুটল রামানাথের ঠোঁটে, বুকের ভেতর কাঁপন তোলে সে ভয়ানক হাসি। খোকা, ভুলে যাচ্ছ কেন আমি ন্যায়-বিচারের মন্দিরের পুরোহিত? পাহাড়ি যোদ্ধার রক্ত বইছে আমার শরীরে। বড়াই করছি না, জানেনা, মানুষখেকো বাঘ

পথ ছেড়ে দেয় আমাদের দেখলে? আমার কাছ থেকে রক্তচক্ষু ছিনিয়ে নেবে কয়েকটা ছিঁচকে চোর, এতই সহজ? মেঝেতে ছড়ি ঠুকল সে। তারপর উঠে দাঁড়াল। আচ্ছা, আজ তা হলে আসি। কিশোর, এসো না একবার কাটিরঙ্গায়, তোমরা সবাই? অনেক কিছু দেখার আছে।
যাব, নিশ্চয়ই যাব! হাসি ছড়িয়ে পড়েছে মুসার মুখে। ইনডিয়া দেখার শখ আমার অনেক দিনের।
সুযোগ করতে পারলে আমিও যাব, কিশোর বলল। স্বপ্নিল হয়ে উঠেছে তার চোখ। আমার নিজের দেশকে দেখব না! এই বিদেশ বিভুইয়ে পড়ে আছি বটে, কিন্তু দেশ তো আমার ওই উপমহাদেশেই-বাংলাদেশে!
যেয়ো। হ্যাঁ, ঠিকানা তো তোমার কাছে আছেই। শুধু একটা চিঠি লিখে দিয়ে আমার কাছে। ব্যস, আর কোন চিন্তা করতে হবে না, তোমাদেরকে। তোমাদের জন্যেই, দেবতাকে আবার ফিরে পেয়েছি। অনেক, অনেক ধন্যবাদ। চলি।
অরে, আরে, যাচ্ছেন কোথায়? বসুন, লাফিয়ে উঠল কিশোর। একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম! আমাদের বাড়িতে এসে খালিমুখে ফিরে যাবেন? সকালে চাচী শুনলে আমাকে আস্ত রাখবে? অন্তত এক কাপ চা তো খেয়ে যান।
হেসে আবার বসে পড়ল পুরোহিত। দাও। বুড়ো মানুষ তো, চা-ই বেশি খাই।

ভলিউম ০০২ – সবুজ ভূত – রকিব হাসান – তিন গোয়েন্দা – কিশোর থ্রিলার
প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৭

তীক্ষ্ণ চিৎকার শুনে চমকে উঠল রবিন মিলফোর্ড আর মুসা আমান।

পুরানো ড্রাইভওয়েতে দাঁড়িয়ে আছে ওরা, চারপাশে আগাছার জঙ্গল। চোখ মস্ত এক পোড়ো বাড়ির দিকে। এক পাশ থেকে ভেঙে ফেলা শুরু হয়েছে, নতুন বাড়ি করা হবে। চাঁদের আলোয় কেমন যেন অবাস্তব, রহস্যময় মনে হচ্ছে ভাঙা বাড়িটাকে।

রবিনের কাঁধে ঝোলানো একটা পোর্টেবল টেপ রেকর্ডার, চালু করে দিয়ে পরিবেশ আর দৃশ্যাবলীর বিস্তারিত ব্যাখ্যা করছে জোরে জোরে, টেপ করে নিচ্ছে। চিৎকার শুনে চুপ হয়ে গেল ক্ষণিকের জন্যে। মুসার দিকে ফিরে বলল, লোকে বলে, ভূতুড়ে বাড়ি। ভূতের চিৎকার না তো?

যেন তার কথার জবাব দিতেই আবার শোনা গেল টানা চিৎকার: ইইইইইইই আআআআহহ! মানুষ না, যেন কোন জানোয়ারের কণ্ঠ। ঘাড়ের রোম খাড়া হয়ে গেল ছেলেদুটোর।

ভূতই! ঢোক গিলল মুসা। চাপা কণ্ঠে বলল, চলো, পালাই।

দাঁড়াও, ঘুরে দৌড় দেয়ার ইচ্ছেটা রোধ করল রবিন। দ্বিধা করছে মুসা, তার দিকে চেয়ে বলল, দেখি আর কোন শব্দ হয় কিনা। রেকর্ড করে নেব। কিশোর হলে তা-ই করত।

গোয়েন্দাপ্রধান কিশোর পাশা আসেনি ওদের সঙ্গে।

কিন্তু… থেমে গেল মুসা। ভলিউম কন্ট্রোল ঠিক করে মাইক্রোফোন বাড়ির দিকে বাড়িয়ে ধরেছে রবিন, যদি আর কোন আওয়াজ হয়।

হলো। আবার সেই আগের মতই টানা চিত্তার: ইইইইইইই-আআআআহহ।

আর না, চলো ভাগি! ঘুরে ছুটতে শুরু করল মুসা।

একা দাঁড়িয়ে থাকার সাহস হলো না রবিনের, মুসার পিছু নিল সে-ও, পার্ক করে রাখা সাইকেলের দিকে।

হঠাৎ জোর করে ধরে তাদের থামিয়ে দিল কেউ।

আউউ! লম্বা এক লোকের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে মুসা। রবিনকে ধরেছে। বেঁটে আরেকজন।

বেশ কয়েকজন লোক যেন মাটি খুঁড়ে উদয় হয়েছে, গায়ে পড়ার আগে খেয়ালই করেনি দুই গোয়েন্দা। চিৎকার শুনে বোধহয় দেখতে এসেছে লোকগুলো, কি হচ্ছে বাড়িতে।

তুমি তো মিয়া ফেলেই দিয়েছিলে আমাকে, মুসাকে বলল লম্বা লোকটা।

কিসের চিৎকার? জিজ্ঞেস করল বেঁটে লোকটা রবিনকে। দেখলাম দাঁড়িয়ে ছিলে, তারপরই দৌড় দিলে।
জানি না, বলল মুসা, ভূত ছাড়া আর কি?
ভূত? বোকা কোথাকার। মানুষের চিৎকার। কেউ বিপদে পড়েছে।
একই সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল পাঁচ-ছয়জন লোক, মুসা আর রবিনের উপস্থিতি ভুলেই গেল। নানারকম মন্তব্য করছে ওরা। সব কজনই ভদ্রলোক, অন্তত পোশাকে আশাকে তা-ই মনে হচ্ছে। বোধহয় প্রতিবেশী, রাতের বেলা পোড়ো বাড়িতে চিৎকার শুনে তদন্ত করে দেখতে এসেছে।
চলুন, ঢুকে দেখি, প্রস্তাব দিল একজন। অস্বাভাবিক ভারি কণ্ঠ, জোরে জোরে কথা বলে। চাঁদের দিকে পেছন করে রয়েছে, লোকটার চেহারা স্পষ্ট দেখতে পেল না রবিন, তবে গোঁফ আছে দেখা যাচ্ছে। বাড়ি ভাঙা হচ্ছে শুনে দেখতে এসেছিলাম। পুরানো বাড়ি, যদি কিছু বেরোয়-টেরোয়? ....চিৎকার শুনেছি, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ইট খসে পড়েছে কারও মাথায়।
পুলিশকে খবর দেয়া দরকার, বলল আরেকজন। কণ্ঠে দ্বিধা। পরনে চেককাটা স্পোর্টস জ্যাকেট। ওরা ঢুকে দেখুক কার কি হয়েছে।
নিশ্চয়ই কেউ ব্যথা পেয়েছে, বলল ভারি কণ্ঠ। চলুন, দেখি সাহায্য করতে পারি কিনা। পুলিশের জন্যে দেরি করলে মরেও যেতে পারে।
ঠিকই বলেছেন, সায় দিল ভারি লেন্সের চশমা পরা একজন। চলুন, আগে আমরাই গিয়ে দেখি।
আপনারা যান, আমি পুলিশ ডেকে আনছি, বলল চেক-জ্যাকেট।
একজনের সঙ্গে ছোট এক কুকুর, কুকুরের গলার চেন ধরে দাঁড়িয়ে চুপচাপ দেখছিল এতক্ষণ বাড়িটাকে। চেক-জ্যাকেটকে ডেকে বলল, আরে কই যাচ্ছেন, সাহেব? পেঁচার ডাকও হতে পারে। শেষে লোক হাসাবেন তো। থামুন।
থেমে গেল চেক-জ্যাকেট, দ্বিধা করল, ঘুরল। ঠিক আছে...
নেতৃত্ব দিল বিশালদেহী একজন লোক, কৌতূহলী জনতার সব কজনের মাথাকে ছাড়িয়ে গেছে তার মাথা, সেই অনুপাতে শরীর। বলল, আসুন, সবাই। ছসাতজন আমরা, টর্চও আছে। ঢুকে দেখি, তেমন কিছু দেখলে পুলিশ ডাকা যাবে। এই যে, ছেলেরা, বাড়ি যাও, তোমাদের আসতে হবে না।
পাথরে তৈরি পথ ধরে গটগট করে হেঁটে চলল সে। এক মুহূর্ত দ্বিধা করে অনুসরণ করল অন্যেরা। কুকুরের মালিক আর চেক-জ্যাকেট রয়েছে সবার পেছনে, নির্ভয় হতে পারছে না।
এসো, রবিনের হাত ধরে টানল মুসা, বাড়ি চলে যাই।

কিসের শব্দ না জেনেই? রবিন যেতে চাইছে না। কিশোর কি ভাববে? তার পিন-মারা সইতে পারবে? আমরা গোয়েন্দা, এভাবে চলে যাওয়া উচিত না। তাছাড়া এখন আর ভয় কি? অনেক লোক।
লোকগুলোর পেছনে রওনা হলো রবিন। মাথা নেড়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুসা তার পিছু নিল।
বাড়ির মস্ত সদর দরজায় এসে দাঁড়াল লোকগুলো। এখনও দ্বিধাগ্রস্ত। অবশেষে দরজায় ঠেলা দিল বিশালদেহী লোকটা। খুলে গেল পাল্লা। ওপাশে গাঢ় অন্ধকার।
টর্চ জ্বালান, বলল নেতা। দেখি কি আছে।
নিজের হাতের টর্চ জেলে ভেতরে ঢুকে পড়ল সে। অন্ধকার চিরে দিল আরও তিনটে উজ্জ্বল আলোক রশ্মি। লোকগুলো সব ঢোকার পর ওদের অলক্ষে নিঃশব্দে ভেতরে পা রাখল দুই গোয়েন্দা।
বিরাট এক হলরুম। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আলো ফেলে দেখতে লাগল লোকেরা। বিবর্ণ সিল্কের কাপড়ে দেয়াল ঢাকা, কাপড়ে আঁকা প্রাচ্যের নানারকম দৃশ্যের রঙও চটে গেছে জায়গায় জায়গায়।
হলের এক জায়গা থেকে উঠে গেছে সুদৃশ্য সিঁড়ি, তাতে আলো ফেলল। একজন। ওটা থেকে পড়েই বোধহয় পঞ্চাশ বছর আগে ঘাড় ভেঙেছিল চীনা বুড়ো ফারকোপার কৌন, বলল যে লোকটা সিঁড়িতে আলো ফেলেছে সে।
উহ্, গন্ধ! পঞ্চাশ বছরে ঘর খোলেনি নাকি কেউ?
কে খুলতে যাবে ভূতের বাড়ি? বলল আরেকজন। এমন জায়গা, ভূত থাকা। বিচিত্র নয়। এসে এখন দেখা না দিলেই বাঁচি।
যত্তোসব বাজে বকবকানি, বিড়বিড় করল নেতা। আসুন, নিচতলা থেকেই খুঁজতে শুরু করি।
বড় বড় একেকটা ঘর। তন্ন তন্ন করে খোঁজা হতে লাগল। আসবাবপত্র নেই, মেঝেতে পুরু ধুলো। এক প্রান্তে ঘরে পেছনের দেয়াল অনেকখানি নেই, ওখান থেকেই ভাঙা শুরু করেছে শ্রমিকেরা।
কোন ঘরেই কিছু পাওয়া গেল না। শূন্য বাড়ি। কথা বললেই প্রতিধ্বনি উঠছে, ফলে জোরে কথা বলতে অস্বস্তি বোধ করছে সবাই, ফিসফিস করে বলছে। এ প্রান্তে কিছু নেই, বাড়ির অন্য প্রান্তের দিকে চলল ওরা। বড়সড় একটা পারলারে চলে এল। এক প্রান্তে বড় ফায়ারপ্লেস, আরেক প্রান্তে উঁচু জানালা। গুটি গুটি পায়ে ফায়ারপ্লেসের সামনে এসে দাঁড়াল লোকেরা, অস্বস্তি বাড়ছে।
আমাদের দিয়ে হবে না, নিচু কণ্ঠে বলল, একজন। পুলিশ...
শ্‌শ্‌শ্! হুঁশিয়ার করল আরেকজন, বরফের মত জমে গেল যেন সবাই। শব্দ

ইঁদুর-টিদুর, ফিসফিস করে বলল তৃতীয় আরেকজন। আলো নেভান। অন্ধকারে নড়ে কিনা দেখি।
নিভে গেল সব কটা টর্চ। ঘন কালো অন্ধকার গিলে নিল যেন মানুষগুলোকে। ধুলোয় ঢাকা ময়লা কাঁচের শার্সি দিয়ে চাঁদের আলো আসছে এত স্নানভাবে, অন্ধকার একটুও কাটছে না।
দেখুন! বলে উঠল একজন, গলা টিপে ধরা হয়েছে যেন তার। দরজার কাছে!
একসঙ্গে ঘুরল সবাই। দেখল।
যে দরজা দিয়ে ওরা ঢুকেছে, ওটার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে এক সবুজ মূর্তি। শরীর থেকে আবছা দ্যুতি বেরোচ্ছে, কেঁপে উঠছে মাঝে মাঝে। রবিনের মনে হলো দুঃস্বপ্ন দেখছে সে। ওটা কি? লম্বা একজন মানুষই তো, নাকি? গায়ে সবুজ ঢোলা আলখেল্লা?
ভূত! শোনা গেল দুর্বল কণ্ঠে চিৎকার। বুড়ো ফারকোপার কৌন!
আলো! চেঁচিয়ে আদেশ দিল বিশালদেহী লোকটা। টর্চ জ্বালুন।
আলো জ্বালার আগেই নড়তে শুরু করল সবুজ মূর্তিটা। দেয়ালের ধার ধরে যেন বাতাসে ভেসে চলল, বেরিয়ে গেল খোলা দরজা দিয়ে। তিনটে আলোর রশ্মি ছুটে গেল মূর্তিটার দিকে, চোখের পলকে নেই হয়ে গেল ওটা।
আমি মরে গেছি, দোজখে আছি এখন! রবিনের কানে কানে বলল মুসা। ওটা দোজখের দারোয়ান।
গাড়ির আলো হতে পারে, নিস্তেজ কণ্ঠে বলল একজন। জানালা দিয়ে এসেছে। চলুন তো, ওপাশের ঘরে গিয়ে দেখি।
দল বেঁধে এসে ঢুকল সবাই পাশের বড় ঘরে, আরেকটা হলরুম। আলো ঘুরিয়ে দেখল। কিছু নেই। আলো নেভানোর পরামর্শ দিল একজন, তাহলে ভূতটা আবার আসতে পারে।
অন্ধকারে অপেক্ষা করে আছে ওরা। চাপা গোঁ গোঁ করছে ছোট্ট কুকুরটা।
এইবার মুসা দেখল সবার আগে। এদিক ওদিক তাকাচ্ছে সবাই। মুসাও তাকাচ্ছে, হঠাৎ চোখ পড়ল সিঁড়ির দিকে।
ওই যে! আল্লাহ রে, খাইছে! চেঁচিয়ে উঠল সে। সিঁড়িতে!
সবাই দেখল। সিঁড়ির ধাপগুলোর ওপর দিয়ে যেন বাতাসে ভেসে উঠে গেল মূর্তিটা দোতলায়।
ধরো! বলে উঠল বিশালদেহী লোকটা। বোকা বানাচ্ছে আমাদের। ধরো ব্যাটাকে।
দুপদাপ করে উঠতে শুরু করল সবাই। দোতলায় কেউ নেই। সবুজ মূর্তি গায়েব।
হুমম, একটা বুদ্ধি এসেছে মাথায়, কিশোরের ভঙ্গি নকল করে বলল রবিন। ঘুরে একজন আলো ফেলল তার মুখে। সবাই ফিরে তাকাল। এক কাজ করতে পারি।

যে রকম ধুলো, নিশ্চয়ই পায়ের ছাপ ফেলেছে। ওই ছাপ অনুসরণ করে ধরে ফেলতে পারব ব্যাটাকে। আমরা এখনও ওদিকে যাইনি, ছাপ পড়লে শুধু ওটারই পড়বে।
ঠিক বলেছে, ছেলেটা, সায় দিল কুকুরের মালিক। আলো ফেলুন। আলো ফেলে দেখুন।
প্রচুর ধুলো আছে, কিন্তু তাতে পায়ের ছাপ নেই, অথচ ওদিকেই গেছে মূর্তিটা, স্পষ্ট দেখেছে সবাই।
নেই! বলল কুকুরের মালিক। অদ্ভুত কাণ্ড! কি দেখলাম তাহলে? কেউ জবাব দিল না। সবাই ভাবছে। প্রত্যেকে যেন পড়তে পারছে প্রত্যেকের মনের কথা।
আবার আলো নিভিয়ে দেখা যাক তো, বলল আগের বার যে পরামর্শ দিয়েছিল সে।
চলুন কাটি এখান থেকে, বলল আরেকজন, কিন্তু তার কথা ঢাকা পড়ে গেল অন্যদের সমর্থনে। হা হা, আলো নিভিয়ে দেখা যাক।
ভয় পাচ্ছে ঠিক, কিন্তু সেটা দেখাতে চাইছে না অনেকেই।
আলো নিভে গেল। সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে সবাই। নিচে হলের দিকে চেয়ে আছে রবিন আর মুসা, এই সময় বলে উঠল কেউ, ওই, ওই যে। বাঁয়ে।
একটা দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। মানুষেরই আকার, সবুজ, স্পষ্ট হয়েছে। আরও। মনে হচ্ছে যেন বুড়ো ফারকোপারই সবুজ আলখেল্লা পরে দাঁড়িয়ে আছে।
ভয় পাবেন না, ফিসফিস করে বলল কেউ। দেখি কি করে।
নীরবে অপেক্ষা করে রইল দর্শকরা।
নড়তে শুরু করল মূর্তিটা। হলের দেয়ালের ধার ঘেঁষে আস্তে আস্তে ভেসে গেল। এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে। কোণের কাছে গিয়ে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল।
চলুন, দেখি কোথায় গেল? বিড়বিড় করল এক দর্শক। পালানোর তো চেষ্টা করে না।
এবার ছাপ দেখা যাক, বলে উঠল রবিন। ওই দেয়ালের কাছে কেউ যায়নি। দেখি, পায়ের ছাপ আছে কিনা।
সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠল দুটো টর্চ। দেয়ালের নিচের মেঝেতে ফেলল আলো।
নেই! ভারি কণ্ঠ বলল। কিছু নেই ধুলোতে, কোন দাগই নেই। ওটা যা-ই হোক, বাতাসে ভেসে চলে, মাটিতে পা রাখে না!
শেষ না দেখে ফিরছি না, দৃঢ় কণ্ঠে বলল বিশালদেহী নেতা। আসুন আমার সঙ্গে।

এ হলের কোণে চলে এল সবাই, এখান থেকে অদৃশ্য হয়েছে মূর্তিটা। এক পাশে দরজার পরে করিডর, শেষ মাথা গিয়ে মিশেছে আরেক ঘরের আরেকটা দরজার সঙ্গে। দুটো দরজাই খোলা। আলো ফেলে সন্দেহজনক কিছু দেখা গেল না।
আলো নিভিয়ে দিয়ে আবার অপেক্ষায় রইল ওরা। খানিক পরেই একটা দরজায় দেখা দিল মূর্তি। দেয়াল ঘেঁষে এগিয়ে গেল হলের আরেক প্রান্তের দিকে। শেষ মাথায় গিয়ে থামল। তারপর ধীরে, অতি ধীরে আবছা হতে হতে মিলিয়ে গেল। রবিনের মনে হলো দেয়ালে মিশে গেল ওটা।
এবারেও পায়ের ছাপ বা বালিতে কোনরকম দাগ পাওয়া গেল না।
পুলিশ ডাকতেই হলো। দলবল নিয়ে নিজেই এসে হাজির হলেন লস অ্যাঞ্জেলেসের পুলিশ-প্রধান ইয়ান ফ্লেচার। কিছুই পেল না পুলিশও। আহত কোন মানুষ কিংবা জানোয়ার, কিছু না।
পোড়-খাওয়া পুলিশ অফিসার ইয়ান ফ্লেচার কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারলেন, ভূত দেখেছে লোকে, কিন্তু আটজন সুস্থ মস্তিষ্ক লোকের কথা উড়িয়েই দেন। চেঁচানোর ক্ষমতা ছিল না আর।
ঠিক বলেছ! চেঁচিয়ে উঠল রবিন। তা-ই ঘটেছিল পঞ্চাশ বছর আগে। সিঁড়ি থেকে পড়ে ঘাড় ভেঙে মরেছিল ফারকোপার বুড়ো। পড়ার সময় নিশ্চয়ই ওরকমভাবে চেঁচিয়েছে।
এক মিনিট, আঙুল তুলল মুসা। সে তো পঞ্চাশ বছর আগের কথা। এতদিন পর কেন শোনা গেল?
হয়তো, হালকা গলায় বলল কিশোর, পঞ্চাশ বছর আগের চিৎকারটা জমে ছিল বাতাসে, এতদিন পর শব্দ হয়ে বেরিয়েছে।
দূর, ঠাট্টা কোরো না। পঞ্চাশ বছর আগের শব্দ কি করে শোনা গেল?
জানি না। রবিন, খোঁজখবর নিশ্চয়ই করেছ। শোনাও তো কৌন প্রাসাদের ইতিহাস, প্রাসাদ শব্দটা বাংলায় বলল কিশোর।
প্রাসাদ? বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করল রবিন।
বাংলা। বড় বড় বাড়িকে বলে। হ্যাঁ, বলো, কৌন ম্যানশন সম্পর্কে কি কি জানলে?
লম্বা দম নিল রবিন, তারপর শুরু করল, বাড়িটা ভেঙে ফেলা হচ্ছে শুনে গতকাল মুসাকে নিয়ে দেখতে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, পুরানো বাড়ির ওপর ভাল একটা ফিচার করে স্কুল ম্যাগাজিনে ছাপতে দেব। সেজন্যেই টেপরেকর্ডার নিয়ে। গিয়েছিলাম সঙ্গে, যা যা দেখব, খুঁটিনাটি সব রেকর্ড করে রাখব, পরে লেখার সুবিধে হবে ভেবে।
চাঁদের আলোয় কেমন যেন ভূতুড়ে দেখাচ্ছিল বাড়িটা। ঢোকার পর বড় জোর পাঁচ মিনিট কাটল, তারপরই শোনা গেল প্রথম চিৎকার। মাইক্রোফোনের ভলিউম

বাড়িয়ে দিলাম। তুমি আগ্রহ দেখাবে জানতাম।
খুব ভাল করেছ, বলল কিশোর। এতদিনে সত্যিকার গোয়েন্দার মত ভাবনা চিন্তা আরম্ভ করেছ। টেপে শুনেই বাড়িটা কত বড়, আশপাশে আগাছার জঙ্গল কেমন, বুঝে গেছি। লোকের কথাবার্তাও শুনেছি। ওসব আর বলার দরকার নেই, বাড়ির ভেতরে ঢোকার পর কি কি ঘটল, বলো।
বিস্তারিত জানাল সব রবিন, কিভাবে বাড়িতে ঢুকে ঘরের পর ঘর খুঁজেছে, কোথায় কিভাবে উদয় হয়েছে সবুজ ভূত, গায়েব হয়ে গেছে, সব।
এবং ভূতের পায়ের ছাপ পাওয়া যায়নি, যোগ করল মুসা। রবিনের মনেই প্রথম প্রশ্নটা জেগেছিল। বলতেই টর্চ নিয়ে খোঁজা শুরু করল সবাই।
ভাল, বলল কিশোর। তা কতজন লোক সবুজ জিনিসটাকে দেখেছে, মানে, তোমাদের সঙ্গে কজন ছিল?
ছজন, জানাল মুসা।
না, সাত, হাত নাড়ল রবিন।
চোখে চোখে তাকাল দুজন।
ছয়, আবার বলল মুসা, আমি শিওর। বিশালদেহী নেতা, ভারিকণ্ঠ, কুকুরের মালিক, মোটা লেন্সের চশমা পরা লোকটা, আর, আর দুজন, তাদের দিকে ভালমত কিভাবে? যা-ই হোক, একজন পুলিশকে পাহারায় রেখে দলবল নিয়ে ফিরে গেলেন। তিনি।
গভীর রাতে তাকে ফোন করল এক গুদামের দারোয়ান, সবুজ একটা জ্বলন্ত। মূর্তিকে দেখতে পেয়েছে সে। গুদামের দরজার কাছে নড়াচড়া করছিল, সে এগোতেই ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেছে।
সে-রাতেই থানায় ফোন করল এক মহিলা। গভীর রাতে গোঙানির শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে যায় তার। একটা রহস্যময় সবুজ জ্বলজ্বলে মূর্তিকে দেখেছে সে তার বাড়ির বারান্দায়। যেই আলো জ্বেলেছে মহিলা, সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে গেছে মূর্তিটা। দুজন ট্রাক-ড্রাইভার রিপোর্ট করল, তাদের গাড়ির কাছে সবুজ জ্বলন্ত মূর্তি দেখেছে।
শেষ রিপোর্ট এল পুলিশের একটা পেট্রল-কার থেকে। রেডিওতে খবর পাঠাল দুই অফিসার, রকি বীচে গ্রীন হিল গোরস্থানে একটা সবুজ মূর্তি দেখেছে ওরা। দ্রুত সেখানে এসে পৌঁছুলেন ফ্লেচার। বিরাট লোহার গেট ঠেলে ঢুকলেন গোরস্থানে। সাদা, লম্বা, একটা স্তম্ভে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন একটা সবুজ মূর্তিকে। তাকে এগোতে দেখেই যেন ধীরে ধীরে মাটিতে মিশে গেল মূর্তিটা।
টর্চ জ্বেলে দেখলেন ফ্লেচার। কিন্তু আর কিছুই চোখে পড়ল না। দ্রুত এসে দাঁড়ালেন স্তম্ভের কাছে। স্মৃতিস্তম্ভ। মৃতের নাম, জন্ম-মৃত্যুর তারিখ আর কিভাবে

মারা গেছে, লেখা রয়েছে। কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছেন না অভিজ্ঞ পুলিস প্রধান। কবরটা বুড়ো ফারকোপার কৌনের। পঞ্চাশ বছর আগে সিঁড়ি থেকে পড়ে ঘাড় ভেঙে যে মরেছিল।

ইইইইইইই-আআআআহহ! শোনা গেল, ভূতুড়ে চিৎকার, কিন্তু আঁতকে উঠল না মুসা আর রবিন, কারণ শব্দটা আসছে টেপ রেকর্ডারের স্পীকার থেকে।

লোহালক্কড় আর বাতিল মালের জঞ্জালের তলায় লুকানো মোবাইল হোমের হেডকোয়ার্টারে বসে আছে তিন গোয়েন্দা। আগের রাতে রবিনের রেকর্ড করে আনা টেপট গভীর আগ্রহে শুনছে কিশোর পাশা।

এই শেষবার, আর চিৎকার করেনি, বলল রবিন। এরপর সামান্য কিছু কথাবার্তা, লোকের। বাড়ির ভেতরে ঢোকার আগে সুইচ অফ করে দিয়েছিলাম, আর কিছু রেকর্ড হয়নি।

কথাবার্তা যা যা রেকর্ড হয়েছে, গভীর মনোযোগে শুনল কিশোর। রেকর্ডিংয়ের সময় মাইক্রোফোনের ভলিউম বাড়িয়ে দিয়েছিল রবিন, ফলে স্পষ্ট আওয়াজ, পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে সব। টেপ শেষ হতেই সুইচ টিপে মেশিন থামিয়ে দিল কিশোর, নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটা শুরু হয়েছে।

মানুষের গলার মতই লাগল, আনমনে বলল কিশোর। যেন সিঁড়ি থেকে গড়াতে গড়াতে পড়ছে লোকটা, শেষ মাথায় পড়ে হঠাৎ থেমে গেছে। বোধহয় খেয়াল দিইনি।

কি জানি, নিশ্চিত হতে পারছে না রবিন। তিনবার গুনেছি আমি। একবার গুনেছি ছয়জন, আর দুবার সাতজন।

কতজন, সেটা বড় কথা না, নিজের নীতিবাক্য নিজেই ভুলে গেল কিশোর-রহস্যভেদের কাছে কোন ব্যাপারকেই ছোট করে দেখা উচিত নয়, সে যত তুচ্ছই হোক। যাক, বাড়ির ইতিহাস বলো এখন।

বলছি, শার্টের গলার কাছের একটা বোতাম খুলে দিল রবিন। আজকের কাগজে বাড়িটার সম্পর্কে অনেক কথা ছাপা হয়েছে। লাইব্রেরিতে কোন বইয়ে কিছু পাইনি। কৌন ম্যানশন অনেক আগে তৈরি হয়েছে। রকি বীচে শহর গড়ে ওঠারও অনেক আগে। এ খবরের কাগজে লিখেছে, আশি-নব্বই বছর আগে বুড়ো ফারকোপার তৈরি করেছিল বাড়িটা। চীনে ব্যবসা-বাণিজ্য করেছে, নিশ্চয়ই খুব ঘড়েল লোক ছিল। ওর সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায়নি, তবে যতটা জানা গেছে, চীনে নাকি কি এক গোলমাল পাকিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে এসেছিল। বিয়ে করে নিয়ে এসেছিল এক অপরূপ সুন্দরী চীনা রাজকুমারীকে। শোনা যায়, প্রথমে এসে উঠেছিল স্যান ফ্রানসিসকোয়, ভাইয়ের বাড়িতে। ভাইয়ের স্ত্রীর সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় রাগ করে চলে এসেছিল এই রকি বীচে।

কেউ কেউ বলে, আসলে চীন-রাজবংশের উচ্চপদস্থ কারও সঙ্গে লেগেছিল ফারকোপার কৌনের, হয়তো স্ত্রীর ভাই বা বাপ, বা ঘনিষ্ঠ কারও সঙ্গে, সেই লোক নাকি প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছিল। তাই রকি বীচে এসে বাড়ি করে লুকিয়েছিল বুড়ো। জানো তো এদিকটায় তখন বসতি গড়ে ওঠেনি, বুনোই ছিল।

কৌন ম্যানশনে বেশ রাজকীয় হালে বাস করেছে ফারকোপার। এক গাদা চাকর-বাকর ছিল। চীনের মানচু রাজবংশের লোকের মত আলখেল্লা পরতে পছন্দ করত সে, তার প্রিয় রঙ ছিল সবুজ। খাবার আর নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে আনিয়ে নিত ওয়াগনে করে, হপ্তায় একবার। একদিন এসে বাড়িটা খালি পেল ওয়াগনের ড্রাইভার। শুধু হলের সিঁড়ির গোড়ায় পড়ে ছিল বুড়ো ফারকোপারের লাশ। ঘাড় ভাঙা।

পুলিশ এল। তাদের সন্দেহ, অতিরিক্ত মদ খেয়ে সামলাতে না পেরে সিঁড়ি থেকে পড়ে মরেছে বুড়ো। ভয়ে পালিয়েছে- চাকর-বাকরেরা। এমনকি বুড়োর বৌ-ও।

অনেক খোঁজ-খবর করল পুলিশ, কিন্তু এমন কাউকে পেল না যে কিছু জানাতে পারে। এমনিতেই চীনারা বাইরের লোকের কাছে গোপন কথা ফাঁস করে না, তখনকার দিনে আরও বেশি মুখ বুজে থাকত। কাছেপিঠে যে কয়েকজন চীনা ছিল, তাদের মুখ থেকে একটা শব্দও বের করতে পারেনি পুলিশ। বুড়োর চাকরদের কাউকে পায়নি। হয় চীনে পালিয়ে গিয়েছিল, নয়তো লস অ্যাঞ্জেলেসের চায়না টাউনে গিয়ে দেশোয়ালী ভাইদের মাঝে লুকিয়েছিল।

যা-ই হোক, পুরো ব্যাপারটা একটা রহস্য। জানামতে বুড়োর একমাত্র আত্মীয় তার মৃত ভাইয়ের বিধবা স্ত্রী, আইনত তিনিই পেলেন বাড়িটা। ভারড্যান্ট ভ্যালিতে আঙুরের খেত ছিল তাঁর। কৌন ম্যানশন বিক্রির প্রস্তাব পেয়েছেন মহিলা অনেকবার, কিন্তু বিক্রি করতে রাজি হননি। বাড়িটায় এসে থাকেনওনি কোনদিন। তিনি মারা যাওয়ার পরেও ঠিক একই রকমভাবে পড়ে থাকল বাড়িটা, পড়ে পড়ে নষ্ট হলো। তারপর, এই এ-বছর মহিলার মেয়ে, মিস দিনারা কৌন বিল্ডিং ডেভেলপমেন্ট কোম্পানীর কাছে বাড়িটা বিক্রি করতে রাজি হয়েছেন। তারাই গতকাল থেকে বাড়ি ভাঙা শুরু করেছে, নতুন বাড়ি তুলবে। ব্যস, এই জানি।

হুঁ, সোজা হয়ে বসল কিশোর। কাগজগুলো দেখা যাক এবার।

কয়েকটা খবরের কাগজ টেনে নিয়ে এক এক করে টেবিলে বিছাল গোয়েন্দাপ্রধান। লস অ্যাঞ্জেলেসের একটা আর স্যান ফ্রানসিসকোর একটা কাগজেও খবরটা ছাপা হয়েছে, স্থানীয়গুলোতে তো হয়েছেই-বড় বড় হেডলাইন দিয়ে। লিখেছেও অনেক জায়গা নিয়ে। কেউ হেডিং দিয়েছে: চেঁচানো ভূতের

ভাঙা বাড়ি পরিত্যাগ, রকি বীচে আতঙ্ক; কেউ পোড়ো বাড়ি ভাঙা শুরু, রকি বীচে সবুজ ভূতের উৎপাত; কেউ বা আবার লিখেছে, পুরানো আস্তানা ধ্বংসপ্রাপ্ত, নতুন আস্তানার খোঁজে বেরিয়েছে সবুজ ভূত।
যার যা কলমের মাথায় এসেছে লিখেছে, বানানো, রঙ চড়ানো, নানাজনের নানা মন্তব্য খুব রস দিয়ে সাজিয়েছে। তবে, আসল তথ্য সব কাগজেই প্রায় এক, রবিন একটু আগে যা বলেছে। যারা যারা ভূত দেখেছে, তাদের কথাও লেখা হয়েছে, বাদ পড়েছে শুধু পুলিশ-প্রধান ইয়ান ফ্লেচার আর তার দুই সহকারী, অফিসারের কথা। ইচ্ছে করেই খবরের কাগজওয়ালাদের কাছে নিজেদের কথা চেপে গেছে তারা, হাসির পাত্র হতে চায়নি।
রকি বীচ নিউজ কাগজটায় হাত রেখে বলল কিশোর, এতে লিখেছে, একটা গুদামের বাইরেও দেখা গেছে ভূতটাকে, তারপর এক মহিলার বাড়ির বারান্দায়, এরপর দেখেছে দুজন ট্রাক-ড্রাইভার। পুরানো একটা হোটেলে তখন খাচ্ছিল। ড্রাইভাররা, এই সময়ই বাইরে ট্রাকের কাছে ভূতটাকে ঘোরাফেরা করতে দেখেছে। তারা। তারমানে, বোঝাতে চাইছে, পুরানো আস্তানা ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে ভূতটা, নতুন আস্তানার খোঁজে আছে।
হ্যাঁ, খুব জোর দিয়ে বলল মুসা, এমনও হতে পারে, রকি বীচ থেকে চলে যাওয়ার তালে আছে সে, ট্রাকে চড়ে, তাই ট্রাকের কাছে ঘোরাঘুরি করছিল।
ভূত তো এমনিতেই যেখানে খুশি যেতে পারে, চোখের পলকে, তার যানবাহনের দরকার হবে কেন?
আমি কি জানি? দুহাত উল্টাল মুসা।
হাসল কিশোর। যা-ই হোক, খুব রহস্যময় কাণ্ড। আরও তথ্য না পেলে, কিংবা নতুন কিছু না ঘটলে… বাধা পেয়ে থেমে গেল সে।
বাইরে থেকে ডাকছেন মেরিচাচী। রবিন, এই, রবিন, জলদি এসো।
রবিনের বাবা হঠাৎ করে পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে?
তাড়াহুড়ো করে দুই সুড়ঙ্গ দিয়ে বেরোতে শুরু করল তিন গোয়েন্দা।
দুই সুড়ঙ্গ মানে, একটা লম্বা লোহার মোটা পাইপ। এক মুখ কায়দা করে যোগ করে দেয়া হয়েছে মোবাইল হোমের মেঝের একটা গর্তের সঙ্গে। আরেক মুখ জঞ্জালের বাইরে, একটা লোহার পাত ফেলে সেটা ঢেকে রাখা হয় সারাক্ষণ। হামাগুড়ি দিয়ে চলাচল করতে যাতে অসুবিধে না হয়, সেজন্যে পুরু কার্পেট পেতে দেয়া হয়েছে পাইপের করতে যাতে অসুবিলে সেটা ঢেকে রাখা, আরেক মুখ
বাইরে বেরোল তিন গোয়েন্দা। জঞ্জালের বেড়ার পাশ দিয়ে ঘুরে বেরিয়ে এল স্যালভিজ ইয়ার্ডের কাঁচে-ঢাকা ছোট্ট অফিসঘরের সামনের আঙিনায়।

অফিসের বাইরে দাঁড়িয়ে লম্বা এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছেন মেরিচাচী। বাদামী গোঁফে আঙুল বুলিয়ে উজ্জ্বল চোখের তারা নাচিয়ে বললেন ভদ্রলোক, এই যে, এসে গেছে আপনার তিন আসামী। রবিন, তোমার সঙ্গে ফ্লেচার কথা বলতে চায়। মুসা, তোমার সঙ্গেও।
ঢোক গিলল মুসা। পুলিশ-প্রধান তার সঙ্গে কথা বলতে চান? আগের রাতে যা যা দেখেছে-শুনেছে, দ্রুত গুছিয়ে নিতে শুরু করল মনে।
ঝাঁকড়া চুলে আঙুল বোলাল কিশোর। আংকেল, আমি আসব?
এসো, হাসলেন মিস্টার মিলফোর্ড। এসো, বাইরে গাড়িতে বসে আছে চীফ।
গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে একটা কালো সিডান। স্টিয়ারিং হুইলে এক হাত রেখে বসে আছেন ইয়ান ফ্লেচার। মোটাসোটা মানুষ, মাথার সামনের দিকটায় টাক, হাসিখুশি। ববের বাবার দিকে চেয়ে হাসলেন। বাড়িতেই পেয়েছ তাহলে। এসো, গাড়িতে ওঠো। দেখো, রজার, আগে থেকেই বলে দিচ্ছি, আমাকে বাঁচাবে জোকগুলোর হাত থেকে। আরিব্বাপ রে বাপ! রিপোর্টার তো না একেকটা... এসো, গাড়িতে ওঠো।
আমিও তো খবরের কাগজের লোক, গাড়িতে উঠে বললেন মিস্টার মিলফোর্ড।
সেজন্যেই তো বলছি। তুমি আমার প্রতিবেশী, সহায়তা করবে আর কি একটু। যেভাবে প্রশ্ন শুরু করে ওরা, মুখ ফসকে কি বলতে কি বলে ফেলি, দেবে ছেপে। যাবে আমার এত বছরের ক্যারিয়ার।
ঠিক আছে, ঠিক আছে, ভেব না, হাত তুললেন মিস্টার মিলফোর্ড। এক কাজ করি। কৌন ম্যানশনে যেতে যেতেই শুনি ওরা কি কি দেখেছে।
আরও কয়েকজনের মুখে শুনেছি অবশ্য, ইঞ্জিন স্টার্ট দিতে-দিতে বললেন। ফ্লেচার, তবু আরেকবার শোনা যাক। বলো তোমরা।
সংক্ষেপে সব বলল রবিন, মাঝে মাঝে কথা যোগ করল মুসা। চুপচাপ গাড়ি চালাতে চালাতে শুনলেন পুলিশ-প্রধান। তারপর বললেন, অন্যেরাও এই একই কথা বলেছে। অনেকেই দেখেছে। তবু বিশ্বাস করতাম না, যদি... থেমে গেলেন ফ্লেচার, আরেকটু হলেই দিয়েছিলেন ফাঁস করে।
যদি? সঙ্গে সঙ্গে কথা ধরলেন মিস্টার মিলফোর্ড।
না, কিছু না।
কিছু তো বটেই। ইয়ান, কিছু লুকোচ্ছ তুমি। ভূতটাকে তুমিও দেখেছ, না? এ-কারণেই অসম্ভব বলে উড়িয়ে দিচ্ছ না।
হ্যাঁ, পথের দিকে তাকিয়ে আছেন ফ্লেচার, আমি দেখেছি। গোরস্থানে। ফারকোপার কৌনের কবরের কাছে, মারবেলের একটা খুঁটিতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। আমি এগোতেই মিশে গেল মাটিতে, যেন কবরে ঢুকে পড়ল।

পিঠ খাড়া হয়ে গেছে তিন কিশোরের।
আড়চোখে ফ্লেচারের দিকে তাকালেন মিস্টার মিলফোর্ড, মুচকে হাসলেন, নোট করে নেব?
না না, আঁতকে উঠলেন ফ্লেচার, ছেলেদের দিকে ফিরলেন। এই, কাউকে কিছু বলবে না। তোমরা আছ ভুলেই গিয়েছিলাম। বলবে না তো?
না, স্যার, বলব না, কিশোর মাথা নাড়ল।
আমি একা নই, চীফ নিশ্চিন্ত হলেন কিনা বোঝা গেল না, আরও অনেকেই দেখেছে, নিশ্চয়ই কাগজ পড়েছ। দুজন ট্রাক-ড্রাইভার দেখেছে। এক মহিলা দেখেছে। এক গুদামের দারোয়ান দেখেছে। আমি দেখেছি, আমার দুজন অফিসার দেখেছে, রবিন আর মুসা দেখেছে।
মোট নজন, হিসাব করলেন মিস্টার মিলফোর্ড।
না, পনেরো, শুধরে দিলেন ফ্লেচার। আরও ছজন ছিল রবিন আর মুসার সঙ্গে। মোট পনেরো জন দেখেছে ভূতুড়ে মূর্তিটাকে।
ছজনই ছিল, ঠিক জানেন? প্রশ্ন করল কিশোর। নাকি সাতজন? মুসা আর রবিন একমত হতে পারছেন না।
আমি শিওর না। চারজনের রিপোর্ট শুনেছি আমরা। তিনজন বলেছে, তোমরা ছাড়া আরও ছজন ছিল। একজন বলেছে সাতজন। অন্য দুই বা তিন, যে-কজনই হোক, ওদের রিপোর্ট নেয়া হয়নি। ওরাও আসেনি। বোধহয় পাবলিসিটি চায় না। পনেরো হোক আর ষোলোই হোক, এতগুলো লোক দেখেছে, চোখের ভুল বলে। উড়িয়ে দেয়া যায় না। নিজের চোখে দেখলাম, মাটিতে মিলিয়ে গেল, অবিশ্বাস করি কি করে?
অযত্নে গজিয়ে ওঠা ঘাসে-ঢাকা ড্রাইভওয়েতে ঢুকল গাড়ি। দিনের আলোয় চমৎকার লাগছে বাড়িটাকে, একটা অংশ ভাঙা অবস্থাতেও। সদর দরজায় পাহারা দিচ্ছে দুজন পুলিশ। বাদামী স্যুট পরা এক লোক অস্থিরভাবে পায়চারি করছে ওদের সামনে। গাড়িটাকে দেখেই দাঁড়িয়ে গেল।
কে? বিড়বিড় করল ফ্লেচার। আরেকটা সেঁক বোধহয়।
এগিয়ে এল লোকটা। চীফ ফ্লেচার? খুব মিষ্টি কণ্ঠ। আপনি পুলিশ চীফ তো? আপনার অপেক্ষায়ই আছি। আমার মক্কেলের বাড়িতে আমাকে ঢুকতে দিচ্ছে না কেন আপনার লোক?
আপনার মক্কেল? ভুরু কুঁচকে গেল পুলিশ-প্রধানের। কে আপনি?
আমি ডলফ টার্নার, পরিচয় দিল লোকটা। এ-বাড়ি মিস দিনারা কৌনের, আমি তার উকিল, দূর সম্পর্কের ভাইয়ের ছেলে। তার ভালমন্দ দেখাশোনার ভার আমার ওপর। সকালে খবরের কাগজ পড়েই ছুটেছি, স্যান ফ্রানসিসকো থেকে

উড়ে এসেছি। আমি ভালমত তদন্ত করতে চাই। পুরো ব্যাপারটাই অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে আমার কাছে, পাগলের প্রলাপ।
অবিশ্বাস্য, ঠিক, মাথা দোলালেন ফ্লেচার, তবে পাগলের প্রলাপ নয়। যাক, আপনি এসেছেন, খুশি হলাম, মিস্টার টার্নার। নইলে আসার জন্যে খবর পাঠাতে হত হয়তো। ও হ্যাঁ, পাহারা রেখেছি, কারণ, যখন-তখন যে কেউ ঢুকে পড়তে পারে। আমার নির্দেশ আছে, কাউকে যেন ঢুকতে না দেয়া হয়। তাই আপনাকে ঢুকতে দেয়নি। চলুন, এখন ঢুকি। এই যে, এই ছেলেরাও গতরাতে এসেছিল এখানে, সবুজ মূর্তিটাকে দেখেছে। এজন্যেই এখন নিয়ে এসেছি। কোথায় কোথায়। দেখা গেছে, দেখাবে আমাদের।
তিন কিশোর আর মিস্টার মিলফোর্ডের সঙ্গে টার্নারের পরিচয় করিয়ে দিলেন। ফ্লেচার। তারপর সদর দরজার দিকে রওনা হলেন। পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াল প্রহরীরা। বিরাট হলে ঢুকলেন তিনি, সঙ্গে অন্য পাঁচজন। আবছা আলো হলে, গা ছমছমে পরিবেশ। রবিন আর মুসা দেখাল, ঠিক কোথায় প্রথম উদয় হয়েছিল মূর্তিটা।
মুসা ওদেরকে সিঁড়ির কাছে নিয়ে এল। এই সিঁড়ির ওপর দিয়ে ভেসে হলে নেমেছিল মূর্তিটা, জানাল সে।
ভেসে বলছ কেন? প্রশ্ন করলেন পুলিশ-প্রধান।
মাটিতে পায়ের ছাপ দেখা যায়নি, সবাই খুঁজেছি। উড়ে না নামলে কি করে নামল? ছাপ খোঁজার কথা রবিনের মনে হয়েছিল। সবাই খুঁজেছি, কিন্তু ছাপ-টাপ দেখিনি।
তারপর? জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার মিলফোর্ড।
উড়ে হলের ওই যে, ওখানটায় চলে গেল, হাত তুলে দেখাল মুসা, দেয়ালের কাছে। এক সময় দেয়ালের ভেতর দিয়ে ঢুকে মিলিয়ে গেল।
আঁম্‌ম্‌ন্‌, ভ্রূকুটি করলেন ফ্লেচার, দেয়ালের দিকে তাকিয়ে আছেন।
অনিশ্চিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাচ্ছে উকিল। বুঝতে পারছি না কিছু? ভূতুড়ে বাড়ির কিস্সা অনেক শুনেছি। আমার বিশ্বাস হয় না ওসব।
কি বিশ্বাস হয়? ভুরু নাচালেন ফ্লেচার। কি ছিল বলে আপনার ধারণা?
চোখ মিটমিট করল উকিল। আমি কি করে জানব?
সেটা জানার জন্যেই এসেছি আমরা। আপনি আসাতে কেন খুশি হয়েছি, জানেন?
কেন?
আজ সকালে মইয়ে দাঁড়িয়ে বাড়ির এক জায়গায় প্লাস্টার ভাঙছিল এক শ্রমিক। এই যে, আমরা যেখানে রয়েছি, তার নিচের তলারই একটা সাইড। কিছু একটা

দেখে কাজ থামিয়ে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল সে।
কী? সামনে ঝুঁকে এল টার্নার। কি দেখল?
ও শিওর না। তবে ওই যে দেয়ালটা, যেটা গলে ভূত অদৃশ্য হয়েছে বলেছে মুসা, সেদিকে দেখিয়ে বললেন ফ্লেচার, লোকটার ধারণা, ওটার ওপাশে একটা গোপন কুঠুরিমত আছে। আপনার অনুমতি পেলে ভেঙে ঢুকতে পারি আমরা।
কপাল ডলল টার্নার। মিস্টার মিলফোর্ডের দিকে তাকাল, তিনি তখন নোটবইয়ে নোট লিখতে ব্যস্ত। গোপন কুঠুরি? রীতিমত অবাক হয়েছে উকিল।
কই, এ বাড়িতে তেমন কোন কুঠুরি আছে বলে তো শুনিনি।
প্রচণ্ড উত্তেজনা কোনমতে দমিয়ে রেখেছে তিন কিশোর।
উকিলের অনুমতি পেয়ে কুড়াল আর শাবল নিয়ে এল দুই পুলিশ।
দেয়ালের একটা জায়গা দেখিয়ে বললেন ফ্লেচার, ভাঙো।
প্রচণ্ড বিক্রমে দেয়ালের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল পুলিশ দুজন। একটা ফোকর করে ফেলল। বোঝা গেল, ওপাশে ফাঁপা জায়গা রয়েছে, অন্ধকার, দেখা যায় না কি আছে। আরও বড় করা হলো ফোকর, মানুষ ঢুকতে পারবে। হাত ঢুকিয়ে দিয়ে ভেতরে টর্চের আলো ফেললেন ফ্লেচার।
অস্ফুট স্বরে কিছু বললেন, তারপর ফোকর গলে ঢুকে পড়লেন ভেতরে। ঢুকবে। কিনা দ্বিধা করছে উকিল, কিন্তু ফ্লেচারের পেছনে মিস্টার মিলফোর্ডকে যেতে দেখে সে-ও ঢুকল। বাইরে দাঁড়িয়ে তাদের উত্তেজিত কথা শুনতে পেল তিন গোয়েন্দা।
ফোকর দিয়ে উঁকি দিল কিশোর, তারপর দুই সহকারীর দিকে একবার চেয়ে সে-ও ঢুকে পড়ল। মুসা আর রবিনও ঢুকল।
ছোট একটা কক্ষ, ছয় বাই আট ফুট। দেয়ালের একটা ফাটল দিয়ে আলো আসছে, আস্তর খসানোর সময়ই নিশ্চয় ফেটেছে।
ঘরে আর কিছু নেই, শুধু একটা কফিন।
চকচকে পালিশ করা নিচু কাঠের টেবিলে রাখা আছে কফিনটা, জায়গায় জায়গায় চমৎকার খোদাইয়ের কাজ। ডালা তোলা। ভেতরের কিছু দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে ফ্লেচার আর অন্য দুজনের।
পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে ছেলেরাও উঁকি দিল কফিনের ভেতরে। চমকে উঠল।
একটা কঙ্কাল। পুরোটা দেখা যাচ্ছে না। দামী আলখেল্লায় ঢেকে আছে। এক সময় খুব সুন্দর ছিল কাপড়টা, এখন অনেক জায়গায় নষ্ট হয়েছে দীর্ঘদিন। অবহেলায় পড়ে থেকে।
সবাই নীরব। অবশেষে কথা বললেন মিস্টার মিলফোর্ড, দেখো, প্লেটটা দেখো! কফিনের গায়ে আটকানো রূপার একটা পাত দেখালেন। তাতে ইংরেজিতে লেখা:

ফারকোপার কৌনের প্রিয় স্ত্রী শান্তিতে ঘুমোচ্ছেন এখানে।
ফারকোপারের চীনা স্ত্রী। খসখসে শোনাল চীফের কণ্ঠ।
অথচ লোকে ভেবেছে, বুড়ো মারা যাওয়ার পর চীনে পালিয়েছে মহিলা, বিড়বিড় করলেন মিস্টার মিলফোর্ড।
লোকের কথা। দেখুন দেখুন, কফিনের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিল উকিল।
জিনিসটা বের করে আনল টার্নার। একটা মালা। গোল গোল পাথরের মত কিছু দিয়ে তৈরি হয়েছে। টর্চের আলোয় ভোতা ধূসর আভা বিকিরণ করছে।
এটাই বোধহয় সেই বিখ্যাত গোস্ট পার্লস, বলল উকিল। আমাদের পারিবারিক অলংকার, চীন থেকে নিয়ে এসেছিল মিস্টার ফারকোপার কৌন। অনেক দামী জিনিস। মিস্টার কৌন ঘাড় ভেঙে মরল, তার স্ত্রী নিখোঁজ হয়ে গেল। আমরা ভেবেছিলাম, হারটা নিয়ে আবার দেশে ফিরে যাওয়ার পথে কোনভাবে লাপাত্তা হয়ে গেছে মহিলা। অথচ এখানে, এই বাড়িতেই ছিল এতগুলো বছর!
হেডকোয়ার্টারে কাজে ব্যস্ত মুসা আর রবিন। সবুজ ভূত সম্পর্কে খবরের কাগজে যা যা লেখা বেরিয়েছে, সবগুলোর কাটিং কেটে দিচ্ছে মুসা, আঠা দিয়ে বড় একটা খাতায় সেগুলো সেঁটে রাখছে রবিন।
সবুজ ভূত সম্পর্কে লোকের আগ্রহ কমে আসছিল, কিন্তু হঠাৎ করে পোড়ো বাড়িতে গোপন কুঠুরি, কফিনের ভেতরে বুড়ো ফারকোপারের চীনা স্ত্রীর মৃতদেহ আর মুক্তোর মালা আবার নতুন করে সাড়া জাগাল রকি বীচের লোকের মনে। প্রথম পাতায় বড় বড় হেডিং দিয়ে ছাপা হলো সেই খবর।
ফারকোপার কৌনের অতীত ইতিহাস আরও গভীরে খুঁড়ে বের করার জন্যে একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ল রিপোর্টারেরা। জানা গেল, চীনা জাহাজে ক্যাপ্টেনের চাকরি করেছে কিছুদিন ফারকোপার। দুর্ধর্ষ নাবিক নাকি ছিল সে, ভয়াবহ ঝড়কেও পরোয়া করত না, জাহাজ নিয়ে ঢুকে পড়ত ঝড়ের মাঝে। বেশ কয়েকজন মানচু রাজবংশীয় ব্যক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল তার, প্রায়ই নানারকম মূল্যবান জিনিস তাকে উপহার দিত তারা। তবে গোস্ট পার্ল তাকে উপহার দেয়া হয়নি, ওটা সে চুরি করেছে, তারপর তাড়াহুড়ো করে স্ত্রীকে নিয়ে পালিয়েছে, আর কোনদিন চীনে। যাওয়ার আশা ত্যাগ করে। তারপর, বাকি জীবনটা কৌন ম্যানশনে লুকিয়ে কাটিয়েছে।
ভাবো একবার, হাত থামিয়ে বলে উঠল হঠাৎ রবিন, এমন একটা লোক এই রকি বীচেই ছিল এতদিন, আর কি কাণ্ডটাই না ঘটাল। বাবা আর চীফ কি ভাবছে জানো?
ধাতব শব্দ হতেই থেমে গেল রবিন। দুই সুড়ঙ্গের মুখের লোহার পাত সরানোর আওয়াজ। চাপা খসখস শব্দ হলো কিছুক্ষণ, তারপর ট্রেলারের মেঝেতে

লাগানো ট্র্যাপডোরে টোকা পড়ল।
দরজার হুড়কো সরিয়ে দিল মুসা।
গর্তের মুখে বেরিয়ে এল কিশোরের মাথা। হুফফ! মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস ফেলল সে, উঠে এল। যা গরম পড়েছে।...ভাবছি।
সাবধান, কিশোর, হেসে বলল মুসা, ভাবাভাবিটা এখন একটু কমাও। নইলে মগজের বেয়ারিং জ্বলে গিয়ে শেষে আমাদের মতই ভোতামাথাদের একজন। হয়ে যাবে।
শব্দ করে হাসল রবিন।
কিশোরের মগজ সম্পর্কে খুব উঁচু ধারণা মুসার, কিন্তু সুযোগ পেলেই সেটা নিয়ে বন্ধুকে খোঁচা মারতেও ছাড়ে না সে। কিন্তু সাবধানী ছেলে কিশোর, এড়িয়ে যায়। মেজাজ শান্ত রাখার ক্ষমতা তার অপরিসীম।
মুসার কথা যেন শুনতেই পায়নি কিশোর, এমনি ভঙ্গিতে গিয়ে ধপ করে বসে পড়ল তার সুইভেল চেয়ারে। ভাবছি, আবার বলল সে। ভাবায় লাভও হচ্ছে। অবশ্য। অনেক বছর আগে কৌন ম্যানশনে কি ঘটেছিল, অনুমান করতে পারছি।
তোমার কষ্ট না করলেও চলত, কিশোর, রবিন বলল। বাবা আর চীফও এ নিয়ে অনেক ভেবেছেন...
আমার ধারণা, রবিনের কথা কানে তুলল না কিশোর।
বাবা আর চীফের ধারণা, কিশোরকে কথা শেষ করতে দিল না রবিন। সে যা যা জানে, সেটা তার আগেই কিশোর বলে ফেলুক, এটা হতে দিল না। রোগে ভুগে মারা গেছে ফারকোপারের স্ত্রী। সুন্দর একটা কফিনে ভরে তাকে তখন বাড়িরই ছোট্ট একটা ঘরে রেখে দিল বুড়ো নাবিক, প্রিয়তম স্ত্রীকে দূরে সরিয়ে দিতে মন সায় দেয়নি হয়তো, মৃত্যুর পরও তাই কাছে কাছে রেখেছে। সম্ভবত করিডর দিয়ে কফিনটা সেই ঘরে ঢুকিয়েছে বুড়ো, তার জানালা দরজা ভেঙে হঁট গেঁথে বন্ধ করে দিয়েছে ফোকর। তার ওপর প্লাস্টার করে দিয়েছে। বাইরে থেকে দেখে আর বোঝার উপায় ছিল না, একটা গোপন কুঠুরি আছে ওখানে।
তারপর কতদিন বেঁচে ছিল ফারকোপার, জানা যায়নি। এক রাতে সিঁড়িতে আছাড় খেয়ে পড়ে মরল সে।
চাকরেরা বুড়োর লাশ দেখে ভয়ে রাতেই পালাল। স্যান ফ্রানসিসকোর চীনা পল্লীতে ঠাই নিয়েছিল, না দেশে পালিয়েছিল, জানা যায়নি। কারণ, স্বদেশীদের ব্যাপারে আমেরিকান পুলিশের কাছে মুখ খোলেনি চীনা-পল্লীর চীনারা।
যতদূর জানা যায়, আত্মীয় বলতে একজনই ছিল ফারকোপারের, তার ভাইয়ের স্ত্রী। স্যান ফ্রানসিসকোর ভারড্যান্ট ভ্যালিতে আঙুরখেত...
এসব পুরানো কথা, হাত তুলল কিশোর, জানি।

শেষ পর্যন্ত শোনোই না, বলে চলল রবিন। এত কাছেই থাকে, অথচ মহিলা কোন দিন ফারকোপারের বাড়িতে আসেনি। তার মেয়ে দিনারা কৌনও না। মায়ের মৃত্যুর পর আঙুরের খেত আর কৌন ম্যানশনের মালিক হয়েছে মেয়ে।
পুরানো বাড়িটাকে এতদিন কেন বিক্রি করেনি ওরা, সেটা এক রহস্য। কেন এভাবে ফেলে রেখেছিল, সেটাও। এই এতদিন পরে বাড়ি বিক্রি করতে রাজি হয়েছে মিস দিনারা কৌন।
তারপর, মুসা যোগ করল, বাড়ি ভাঙা শুরু হতেই বিরক্ত হয়ে উঠল সবুজ ভূত। গোপন কুঠুরি থেকে বেরিয়ে চেঁচিয়ে সাবধান করল। ভূত অবশ্যই বুঝতে পেরেছে, যত যা-ই করুক, ওই বাড়িতে আর থাকতে পারবে না সে, তাই নতুন আস্তানার খোঁজে বেরিয়েছে।
তোমার তাই ধারণা, কিশোর বলল। ওটা. ফারকোপার বুড়োর ভূত, এতেও নিশ্চয়ই কোন সন্দেহ নেই।
তোমার আছে? ওটা যদি ভূত না হয়, আমার নাম বদলে রাখব।
নামটা শেষে সত্যিই না বদলাতে হয়…
কিশোরের কথায় বাধা দিল রবিন। তোমার কি মনে হয়, ভূত না ওটা? অন্য কিছু ভেবে থাকলে গিয়ে বলো চীফকে, হয়তো পুরস্কার দিয়ে দেবেন।
মানে? চোখ মিটমিট করল কিশোর।
কেন, কাল শোনোনি? সবার সামনেই তো চীফ বলেছেন, ভূতটাকে তিনিও দেখেছেন। পরে বাবাকে বলেছেন, ভূতে বিশ্বাস করেন না তিনি, কিন্তু এই ব্যাপারটাকে অবিশ্বাসও করতে পারছেন না। তাই জোর গলায় হুকুম দিতে পারছেন না সহকারীদের যে, সবুজ জিনিসটাকে ধরে এনে দাও। এখন যদি কেউ প্রমাণ করতে পারে ওটা ভূত নয়, তাকে পুরস্কার দেবেন না?
হুমম, মাথা দোলাল কিশোর, খুশি মনে হচ্ছে তাকে। তাহলে সবুজ ভূতের কেসটা নিতে পারি আমরা, অন্তত পুলিশ ডিপার্টমেন্টকে সাহায্য করার জন্যে হলেও। যত সহজ ভাবছ, ব্যাপারটা তত সহজ না-ও হতে পারে। এর পেছনে। অনেক গভীর রহস্য লুকিয়ে আছে, আমি শিওর।
এক মিনিট, হাত তুলল মুসা। পুলিশ আমাদের সাহায্য চায়নি, এক নম্বর। দুই নম্বর, ওই ভূতপ্রেতের ব্যাপারে নাক গলাতে ব্যক্তিগতভাবে আপত্তি আছে আমার।
রবিন আপত্তি করল না, চুপ করে রইল।
কেন, আপত্তি কেন? ভুরু নাচাল কিশোর। তিন গোয়েন্দার নীতিই তো। হলো, যে-কোন জটিল রহস্য সমাধানের চেষ্টা করা। ভূতরহস্য কি রহস্য নয়? ভূত বিশ্বাস করি না মোটেও, কিন্তু যদি সত্যিই থেকে থাকে, আর একটাকে পাকড়াও করতে

পারি, কি রকম সাড়া পড়বে, ভেবেছ? রবিন আর মুসার দিকে তাকিয়ে নিল। একবার করে। হ্যাঁ, গোড়া থেকে শুরু করি। গতরাতে আবার দেখা গিয়েছিল। ভূত?
কাগজে তো কিছু লেখেনি, বলল রবিন। চীফকে জিজ্ঞেস করেছিল বাবা। চীফ জানিয়েছেন, নতুন কোন রিপোর্ট আসেনি থানায়।
সে-রাতে কৌন ম্যানশনে যে কজন ভূতটাকে দেখেছে, সবার সঙ্গে কথা বলেছেন তোমার বাবা?
নাহ্। চারজনের সঙ্গে বলেছে। বিশালদেহী লোকটা, কুকুরের মালিক, আর কৌনের দুই প্রতিবেশী।
বাকি দুজন?
কারা ছিল, সেটাই জানা যায়নি। বাবার ধারণা, ওরা পাবলিসিটি চায় না, বন্ধুদের হাসির খোরাক হতে নারাজ। আমি শিওর, দুজন নয়, তিনজনই।
ঠিক আছে, ধরে নিলাম সাতজনই। কৌন ম্যানশনে আসার সাধ জেগেছিল কেন হঠাৎ?
জ্যোৎস্নায় হাঁটাহাঁটি করছিল ফারকোপারের প্রতিবেশীরা, এই সময় দুজন লোক এসে তাদেরকে প্রস্তাব দিন, চাঁদের আলোয় ভাঙা পোড়ো বাড়ি কেমন লাগে, দেখতে যাওয়ার। লোকগুলোকে চেনে না প্রতিবেশীরা। তবে প্রস্তাবটা তাদের মনে ধরল। ড্রাইভওয়েতে ঢুকেই চিৎকার শুনতে পেল ওরা। তারপর কি হয়েছে, সব জানো।
বাড়ি ভাঙা বন্ধ হয়েছে?
আপাতত। গোপন আরও কুঠুরি আছে কিনা, খুঁজেছে পুলিশ। পাওয়া যায়নি। এখনও বাড়িটাকে কড়া পুলিশ পাহারায় রাখা হয়েছে। বাবা বলছে, ওখানে নতুন বাড়ি করলেও আর বিশেষ সুবিধে হবে না, ভাড়াটে পাওয়া মুশকিল হবে। ভূতের ভয়ে আসতে চাইবে না লোকে।
চুপ হয়ে গেল কিশোর, ধ্যানমগ্ন হয়ে রইল যেন কয়েক মিনিট, দৃষ্টি ছাতের দিকে। অবশেষে মুখ নামিয়ে রবিনকে বলল, টেপরেকর্ডারটা নাও, শুনি আবার ক্যাসেটটা।
রেকর্ডারের সুইচ টিপে দিল রবিন। কানে আঘাত হানল তীক্ষ্ণ বিকট চিৎকার। তারপর লোকের কথাবার্তা। শুনতে শুনতে ভ্রুকুটি করল কিশোর। কিছু একটা রয়েছে টেপে, ঠিক বুঝতে পারছি না, বের করে আনতে পারছি না। আচ্ছা, কুকুরের আওয়াজ যে শুনলাম, কি জাতের কুকুর?
কুকুরের জাত দিয়ে কি হবে? হাত নেড়ে বলল মুসা।
হতেও পারে। কোন কিছুকেই ছোট করে দেখা উচিত হবে না।

ফক্স্ টেরিয়ার, বলল রবিন, রোমশ। ছোট্ট কুকুর। কিছু বুঝলে?
বোঝেনি, বলতে বাধ্য হলো কিশোর। আবার বাজিয়ে শুনল টেপটা, আবার। কি যেন একটা ইঙ্গিত রয়েছে, কিন্তু ধরতে পারছে না সে। টেপরেকর্ডার বন্ধ করে খবরের কাগজের কাটিং পড়ায় মন দিল।
শহরের বাইরে চলে গেছে সবুজ ভূত, বলল মুসা, এতে কোন সন্দেহ নেই। বাড়ি ভাঙা শুরু হতেই সটকে পড়েছে।
জবাব দিতে গিয়েও থেমে গেল কিশোর। ফোন বেজে উঠেছে। রিসিভার তুলে নিয়ে কানে ঠেকাল।
হ্যালো?
ফোনের সঙ্গে কায়দা করে আটকানো লাউড-স্পীকার জ্যান্ত হয়ে উঠল। সবাই শুনতে পেল কথা। লঙ ডিসট্যান্স কল, বলল মহিলাকণ্ঠ। রবিন মিলফোর্ডকে চাই।
একে অন্যের দিকে তাকাল ছেলেরা।
রবিন, তোমার, বলে রিসিভার বাড়িয়ে ধরল কিশোর।
হ্যাল্লো, রবিন মিলফোর্ড বলছি, উত্তেজনায় গলা মৃদু কাঁপছে তার।
হ্যাল্লো, রবিন, বলল এক মহিলাকণ্ঠ, বৃদ্ধা, আওয়াজেই বোঝা গেল। আমি দিনারা কৌন। ভারড্যান্ট ভ্যালি থেকে বলছি।
দিনারা কৌন! ফারকোপার কৌনের ভাইঝি।
হ্যাঁ, বলুন?
আমার একটা উপকার করবে? অনুনয় করলেন মহিলা। তুমি আর তোমার বন্ধু, মুসা আমান, দয়া করে আসবে একবার ভারড্যান্ট ভ্যালিতে?
ভারড্যান্ট ভ্যালিতে! কেন?
তোমার সঙ্গে কথা বলা খুব জরুরী। আমার চাচাকে দেখেছ তোমরা…ইয়ে, মানে, তার ভূত দেখেছ। দুজন প্রত্যক্ষদর্শীর মুখ থেকে সব শুনতে চাই। ভূতটা কেমন, কি করেছে, সব… চুপ হয়ে গেলেন দিনারা, বোঝা যাচ্ছে, দ্বিধা করছেন। শেষে বলেই ফেললেন, জানো, আমি…আমিও গতরাতে দেখেছি, এই ভারড্যান্ট ভ্যালিতে। আমার ঘরে।
কিশোরের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল রবিন।
হ্যাঁ, বলে দেয়ার জন্যে মাথা ঝুঁকিয়ে ইঙ্গিত করল কিশোর।
হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আসব, মিস কৌন, টেলিফোনে বলল রবিন। মুসাও আসবে হয়তো! অবশ্য যদি আমাদের বাবা-মার কোন আপত্তি না থাকে।
তা তো বটেই, তা তো বটেই, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন মহিলা। সেজন্যেই আগে তোমাদের বাড়িতে ফোন করেছি। তোমার মার আপত্তি নেই, মুসার মা-ও রাজি

হয়েছেন। ডারড্যান্ট ভ্যালি খুবই সুন্দর জায়গা, বুঝেছ? আর তোমাদের বয়েসী এক নাতি আছে আমার, রিচার্ড মিঙ কৌন, তোমাদের সঙ্গ দিতে পারবে। প্রায় সারাজীবনই চীনে কাটিয়েছে।
কিভাবে কখন যেতে হবে, বিস্তারিত জানালেন মিস কৌন। ছটার প্লেন ধরতে হবে রবিন আর মুসাকে, স্যান ফ্রানসিসকোয় যাবে। এয়ারপোর্টে তাদের সঙ্গে দেখা করবেন তিনি, গাড়িতে করে নিয়ে যাবেন ডারড্যান্ট ভ্যালির বাড়িতে। আরেকবার ধন্যবাদ জানিয়ে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন তিনি।
দারুণ হলো! আনন্দে জ্বলজ্বল করছে রবিন। ভাল একখান জার্নি করে আসা যাবে। হঠাৎ মনে পড়ল তার, কিন্তু তোমাকে তো যেতে বলেনি, কিশোর?
আহত হয়েছে কিশোর অবশ্যই, কিন্তু সেটা প্রকাশ করল না। আমি ভূত দেখিনি, তোমরা দুজন দেখেছ, তোমাদেরকেই তো বলবে। বললেও অবশ্য আমি এখন যেতে পারতাম না, জরুরী কাজ আছে। বড় ট্রাকটা নিয়ে কাল চাচা-চাচীর সঙ্গে স্যান ডিয়েগো যেতে হবে। নেভির বাতিল মালের একটা লট আছে, দেখেশুনে আনা দরকার।
যা-ই বলো, তোমাকে ছাড়া যেতে ভাল লাগছে না, মুসা আন্তরিক দুঃখিত। আর ধারেকাছে যদি ভূত থাকে তাহলে তো কথাই নেই। তুমি ছাড়া গতি নেই আমাদের।
মুসার কথায় মনে মনে খুশি হলো কিশোর। বলল, হয়তো এটা ভালই হলো। ভারড্যান্ট ভ্যালিতে ভূত দেখা গেল, তোমরা তদন্ত চালাতে পারবে। এদিকে, খোঁজখবর করে রহস্য সমাধানের চেষ্টা করব আমি। টীম ওয়ার্ক করছি আমরা, ঠিক, কিন্তু তিনজনকে একই সঙ্গে একই জায়গায় থেকে কাজ করতে হবে, এটা কোন যুক্তি নয়। একই কাজের জন্যে দরকার পড়লে তিনজনকে তিন জায়গায় যেতে হবে না?
অকাট্য যুক্তি, কিন্তু মুসা আর রবিনের মত খুঁতখুঁত করতেই থাকল। জোর করে ওদেরকে তুলে বাড়ি পাঠাল কিশোর, তৈরি হওয়ার জন্যে।
মুসা আর রবিনের মা সুটকেস গুছিয়ে রেখেছেন। ছেলেরা বাড়তি কিছু জিনিস নিল, একটা করে টর্চ, কিছু চক-রবিন সবুজ রঙের, মুসা নীল-দরকারের সময় দেয়ালে বা অন্য কোন জায়গায় তিন গোয়েন্দার আশ্চর্যবোধক চিহ্ন এঁকে সঙ্কেত রাখার জন্যে।
লস অ্যাঞ্জেলেস এয়ারপোর্টে তাদেরকে তুলে দিতে গেলেন রবিনের মা গাড়ি নিয়ে, সঙ্গে গেল কিশোর।
ফোনে যোগাযোগ রাখবে আমার সঙ্গে, বলল গোয়েন্দাপ্রধান। কিছু ঘটলে জানাবে। ভূতটা যদি ওখানে আবার দেখা যায়, তেমন বুঝলে আমিও চলে আসব। পরে।

বার বার ছেলেকে হুঁশিয়ার করে দিলেন রবিনের মা, সাবধানে থাকবে। আর দেখো, মহিলার সঙ্গে কোন খারাপ ব্যবহার কোরো না।
ও তো কারও সঙ্গেই খারাপ ব্যবহার করে না, আন্টি, প্রতিবাদ করল কিশোর।
জানি, হাসলেন মিসেস মিলফোর্ড, তবু বলছি।
প্লেন ছাড়ল। আকাশে উঠল বিশাল জেট, উড়ে চলল উত্তরমুখো। বেশি না, মাত্র এক ঘণ্টার ভ্রমণ, এরই মাঝে ডিনার আছে, তাই সময়টা আরও কম মনে হয়।
দেখতে দেখতে স্যান ফ্রানসিসকোয় পৌঁছে গেল বিমান, ল্যাণ্ড করল।
লাউঞ্জে মুসার বয়েসী, প্রায় তার সমান লম্বা, চওড়া কাধ, এক কিশোরের সঙ্গে পরিচয় হলো তাদের। এগিয়ে এসে স্বাগত জানাল, চলন-বলন-চেহারায় পাক্কা আমেরিকান ছাপ, চোখ দুটো শুধু চীনা, তা-ও পুরোপুরি না।
পরিচিত হলো রিচার্ড কৌন, মিঙ নামটাই তার পছন্দ, তাই ওটা ধরে ডাকতেই অনুরোধ জানাল নব পরিচিত বন্ধুদের। স্বল্প সময়েই জানিয়ে দিল, তার রক্তের চার ভাগের এক ভাগ চীনা, তবে বয়েসের চার ভাগের তিন ভাগ কাটিয়েছে চীনে, হংকং-এ। মালপত্র বইতে মুসা আর রবিনকে সাহায্য করল সে, পথ দেখিয়ে বের করে নিয়ে এল বিমানবন্দর থেকে। ব্যস্ত রাস্তা পার হয়ে এসে দাঁড়াল বিরাট পার্কিং লটে।
একটা স্টেশন ওয়াগন অপেক্ষা করছে ওদের জন্যে, ছোটখাট একটা বাস বললেই চলে। ড্রাইভিং সীটে বসা এক তরুণ মেকসিকান।
হুগো, লোকটাকে বলল মিঙ, এরাই আমাদের মেহমান। ও রবিন মিলফোর্ড, আর ও মুসা আমান। চলো, সোজা বাড়ি চলো। প্লেনে কি খেয়েছে না খেয়েছে, নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে।
সি, সিনর মিঙ, দরজা খুলে লাফিয়ে নামল হুগো। দুহাতে দুটো ব্যাগ তুলে নিয়ে গিয়ে গাড়ির পেছনের সীটে রাখল। ফিরে এসে বসল আবার ড্রাইভিং সীটে। তার ঠিক পেছনেই উঠে বসল ছেলেরা, তিনজন একই সীটে পাশাপাশি। গাড়ি ছাড়ল হুগো।
স্যান ফ্রানসিসকো শহরটা ভালমত দেখার ইচ্ছে ছিল মুসা আর রবিনের, কিন্তু হতাশ হতে হলো। শহরের ভেতরে গেল না গাড়ি, মোড় নিয়ে বেরিয়ে এল এক প্রান্ত দিয়ে। উঠে পড়ল হাইওয়েতে। পথের দুধারে কোথাও পাহাড়, কোথাও খোলা জায়গা।
অনেক বড় আঙুরের খেত তোমার দাদীর, না? এক সময় জিজ্ঞেস করল মুসা।
অনেক বড়, বলল মিঙ। গেলেই দেখবে। মদ চোলাইয়ের কারখানাও আছে। দাদীমা বলে, সব আমাকে দিয়ে যাবে। কিন্তু আমার কেন জানি নিতে ইচ্ছে করে না।

আগ্রহ প্রকাশ করল রবিন আর মুসা। অনেক কথাই জানাল মিঙ যেতে যেতে।
জানা গেল, ফারকোপার কৌনের প্রপৌত্র মিঙ কৌন। চীনা রাজকুমারী ছিল। ফারকোপারের দ্বিতীয় স্ত্রী, প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর বিয়ে করেছিল।
যেখানেই যেত, প্রথম স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যেত ফারকোপার, জাহাজে যখন সে দূর সাগরে পাড়ি জমাত, তখনও কাছছাড়া করত না। এমনি এক ভ্রমণের সময়েই সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে মারা গেল মহিলা। সদ্যপ্রসূত ছেলেকে নিয়ে মুশকিলে পড়ল ফারকোপার, হংকং থেকে রওনা হয়েছিল, তাড়াতাড়ি ফিরে গেল আবার ওখানেই।
শিশুর দেখাশোনা কে করবে? ফারকোপারের পক্ষে সম্ভব নয়। হংকঙের এক আমেরিকান মিশনারিতে ছেলেকে রাখার ব্যবস্থা করল। এর কিছুদিন পরেই রাজবংশের লোকের সঙ্গে গোলমাল বাধল তার, সুন্দরী রাজকুমারীকে বিয়ে করা নিয়ে। আর থাকা যাবে না চীনে, বুঝে ফেলল। শেষে গোস্ট পার্ল চুরি করে বৌকে নিয়ে পালিয়ে এল আমেরিকায়। তার ছেলে রয়ে গেল হংকঙেই।
সেই ছেলে, রবার্ট কৌন বড় হলো, লেখাপড়া শিখল, কিন্তু আমেরিকায় আর ফিরল না। মিশনারির ডাক্তার হিসেবে থেকে গেল হংকঙেই, বিয়ে করল এক চীনা তরুণীকে। এক ছেলে হলো তাদের, জেমস। কয়েক বছর পরেই পীত জ্বরে প্রায়। একই সঙ্গে মারা গেল জেমসের বাবা-মা, এতিম ছেলেটাকে নিয়ে এল মিশনারি। বড় হতে লাগল ছেলে, বড় হয়ে বাবার মতই ডাক্তার হলো সে-ও। হংকঙেই থেকে গেল। বিয়ে করল এক ইংরেজ মিশনারির মেয়েকে। তাদেরই ছেলে মিঙ। মিঙের যখন কয়েক বছর বয়েস, পীত নদীতে নৌকাডুবিতে মারা গেল তার বাবা-মা। এতিম শিশুর দায়িত্ব নিতে হলো আবার মিশনারিকে।
এ-পর্যন্ত বলে থামল মিঙ। দীর্ঘশ্বাস চাপল।
চুপ করে রইল রবিন আর মুসা।
সামলে নিয়ে আবার কথা শুরু করল মিঙ, নৌকায় আমিও ছিলাম। কিন্তু বেঁচে গেলাম, বাঁচাল জেলেরা। ওরাই পৌঁছে দিয়েছে মিশনারিতে। আমার দাদা আর বাবা যেখানে বড় হয়েছে, সেখানে নয়, অন্য এক মিশনারিতে কয়েক বছর গেল। আমি কে, বাড়ি কোথায় কিছুই জানি না তখন। জানার জন্যে পাগল হয়ে উঠলাম। শেষে মিশনারি স্কুলের একজন শিক্ষককে বললাম। আমার বাবা আর মায়ের ডাকনাম শুধু জানি, আর জানি আমার বাবা ডাক্তার ছিল। আর দুজনেই যে। মিশনারির লোক ছিল, একথা জেলেরাই জানিয়ে গেছে, আমাকে দিয়ে যাওয়ার সময়। পুরানো রেকর্ড ঘেঁটে অনেক কষ্টে আমার পরিচয় বের করলেন স্যার। কিভাবে কিভাবে খোঁজ করে দাদীমার নাম-ঠিকানা জোগাড় করলেন তিনি, চিঠি পাঠালেন তাঁর কাছে।

দাদীমাই আমাকে আমেরিকায় নিয়ে এসেছে। তারপর তার সঙ্গেই আছি। আমাকে খুব ভালবাসে। এতদিন ভালই ছিলাম আমরা, হঠাৎ করে আমার দাদার বাবার ভূত এসে গোলমাল করে দিয়েছে সব। খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েছে দাদীমা। ডলফ আংকেল অবশ্য তাকে শান্ত করার যথেষ্ট চেষ্টা করছে। আমিও দাদীমাকে সাহায্য করতে চাই, তার ভাল চাই।
ভূতের ব্যাপারে তোমার কি মনে হয়?
বুঝতে পারছি না।
এরপর আর বিশেষ কোন কথা হলো না। উত্তেজনায় ভরা দিন গেছে। ঢুলুঢুলু। হয়ে এসেছে মুসার চোখ, রবিনও হাই তুলছে। নরম গদিতে আরামে হেলান দিয়ে দুজনেই ঘুমিয়ে পড়ল এক সময়।
গাড়ি থামার সঙ্গে সঙ্গে চোখ মেলল রবিন। উঁচু পাহাড়ের ওপাশে অস্ত যাচ্ছে সূর্য। পাথর আর কাঠে তৈরি বিশাল এক বাড়ির সামনে দাঁড়িয়েছে গাড়ি। দুপাশে। পাহাড়। ছোট্ট একটা উপত্যকায় বাড়িটা। আশপাশে তাকিয়ে দেখল সে। ইতিমধ্যেই পাহাড়ের গোড়ায় অন্ধকার নামতে শুরু করেছে। অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, মাইলের পর মাইল বিছিয়ে থাকা খেত, কালো ছোট ছোট ঝোঁপ, নিশ্চয়ই আঙুর লতার ঝড়।
মুসা, ওঠো, ধাক্কা দিল রবিন।
চোখ মেলল মুসা। মুখের কাছে হাত নিয়ে এসে হাই তুলল বড় করে। তারপর উঠে দাঁড়াল।
মেহমানদের পথ দেখাল মিঙ। চওড়া কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল বাড়ির এক পাশের ছোট্ট আঙিনায়।
এটাই দাদীমার বাড়ি, বলল মিঙ। চলো, আগে তার সঙ্গে দেখা করি।
রেডউডের প্যানেল করা বিরাট এক হলরুমে এসে ঢুকল ওরা। লম্বা, সম্ভ্রান্ত চেহারার এক মহিলা এগিয়ে এলেন হাসিমুখে, স্বাগত জানালেন ছেলেদের।
কোন অসুবিধে হয়নি তো? জিজ্ঞেস করলেন মহিলা। তোমরা এসেছ, খুব। খুশি হয়েছি।
কোন রকম অসুবিধে হয়নি, জানাল রবিন আর মুসা।
তাদেরকে ডাইনিং রুমে নিয়ে চললেন মহিলা।
জানি, খিদে পেয়েছে তোমাদের, বললেন দিনারা কৌন, বসো, চেয়ারে বসো। আজ আমার শরীরটা ভাল নেই। তাছাড়া সারাদিন খুব কাজের চাপ গেছে। কাল তোমাদের সঙ্গে কথা বলব, হ্যাঁ? ব্রোঞ্জের ছোট একটা ঘণ্টা বাজালেন তিনি। মাঝবয়েসী এক চীনা পরিচারিকা এসে ঢুকল।

ছেলেদের খাবার দাও, সুই, নির্দেশ দিলেন মিস কৌন। মিঙ, তোরও নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে?
মিঙ জবাব দেয়ার আগেই বলে উঠল সুই, জিজ্ঞেস করার দরকার কি? এই বয়েসে ছেলেদের খিদে পাবেই। এটাই তো খাওয়ার বয়েস। তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে গেল পরিচারিকা।
উল্টো দিকের একটা দরজা দিয়ে একজন লোক ঢুকল ঘরে। দেখামাত্র চিনল দুই গোয়েন্দা। ডলফ টার্নার। উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে তাকে।
এই যে, ছেলেরা, এসে গেছ, হালকা, মিষ্টি গলায় বলল টার্নার। কাল কল্পনাও করিনি, আজই তোমাদের সঙ্গে আবার দেখা হয়ে যাবে। তো আছ কেমন? ভাল? জবাবের অপেক্ষা না করেই বলল, কি যে কাণ্ড শুরু হয়েছে। কিছু বুঝতে পারছি না। কেউই পারছে না।
তোমরা বসো, রবিন আর মুসাকে বলল মিস কৌন। আমি গিয়ে শুয়ে পড়িগে। তোমাদের কোন অসুবিধে হবে না। মিঙ আছে, সব দেখবে। ডলফ, খুব খারাপ লাগছে। সিঁড়ি বেয়ে যেন উঠতে পারব না, একটু ধরবে আমাকে?
নিশ্চয়ই, দ্রুত এসে মিস কৌনের বাহু ধরল টার্নার। সিঁড়ির দিকে নিয়ে চলল মহিলাকে।
হঠাৎ করেই অন্ধকার হয়ে গেল ঘর। সুইচ টিপে আলো জ্বালল মিঙ। পাহাড়ী এলাকা, হঠাৎ করেই রাত নামে।
টেবিলে খাবার সাজাল সুই।
শুরু করো, বলল মিঙ।
হ্যাঁ, শুরু করো, সুই বলল। খাওয়ার সময় কথা বেশি বলবে না। পেট পুরে খাও। কোন রকম লজ্জা কোরো না।
খাওয়ার ব্যাপারে আমার কোন লজ্জা নেই, হাত নাড়ল মুসা। প্লেনে কি খেয়ে ছে না খেয়েছে কখন হজম হয়ে গেছে তার। হাবভাবে মনে হচ্ছে, গত তিন দিন কছু খায়নি।
জহুরী জহর চেনে। ভোজন রসিককে চিনে নিল অভিজ্ঞ পরিচারিকা। খাবার সরবরাহ করতে লাগল সেভাবেই।
গরুর মাংসের ঠাণ্ডা রোস্ট, গরম রুটি, নানারকম আচার, আলুর সালাদ, আর আরও কয়েক রকম ঠাণ্ডা খাবার, চেহারা আর গন্ধে রবিনের খিদেও বেড়ে গেল।
খাওয়া শুরু করতে যাচ্ছে, এই সময় বাধা পড়ল।
দোতলা থেকে শোনা গেল তীক্ষ্ণ চিৎকার।
দাদীমা! লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল মিঙ। নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে।

পড়িমরি করে সিঁড়ির দিকে দৌড় দিল সে। তাকে অনুসরণ করল দুই গোয়েন্দা। তাদের পেছনে সুই, আর আরও কয়েকজন চাকর-চোখের পলকে কোথা, থেকে জানি উদয় হয়েছে ওরা।
ওপরে সিঁড়ির পাশে আরেকটা হল, শেষ মাথায় একটা দরজা খোলা। সেদিকেই দৌড় দিল মিঙ।
বিছানায় চিত হয়ে পড়ে আছেন মিস কৌন। তার ওপর ঝুঁকে আছে টার্নার। হাতের তালু ডলছে, আর উত্তেজিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করছে কিছু। সুইকে দেখে চেঁচিয়ে বলল, স্মেলিং সল্ট! জলদি।
ছুটে গিয়ে বেডরুম সংলগ্ন বাথরুমে ঢুকল সুই, বেরিয়ে এল একটা শিশি হাতে। মুখ খুলে ধরল মিস কৌনের নাকের কাছে।
একটু পরেই নড়েচড়ে উঠলেন মিস কৌন, আস্তে করে চোখ মেললেন। ভিড় দেখে লজ্জিত কণ্ঠে বললেন, ছেলেমানুষী করে ফেলেছি, না? জীবনে এই প্রথমবার বেহুশ হলাম।
কি হয়েছিল, দাদীমা? ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে মিঙ। চিৎকার করলে কেন?
ভূতটাকে আবার দেখেছি, গলার স্বর স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করছেন মহিলা।
ডলফকে গুড নাইট জানিয়ে বেডরুমে ঢুকলাম। আলো জ্বালতে যাব, এই সময় দেখলাম ওটাকে।
কোথায়?
ওই জানালাটার ধারে। স্পষ্ট। কড়া চোখে তাকিয়ে ছিল আমার দিকে। পরনে সবুজ আলখেল্লা, ঠিক যেমনটি পরত ফারকোপার চাচা। চেহারাটা স্পষ্ট নয়, তবে চোখগুলো পরিষ্কার, লাল টকটকে। গলার স্বর খাদে নামিয়ে ফিসফিস করে বললেন, আমার উপর রেগে আছে। থাকবে, জানতাম। মা তার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিল তার মৃত্যুর পর বন্ধ রাখবে কৌন ম্যানশন, কখনও খুলবে না। কখনও ওখানকার শান্তি নষ্ট করবে না। অথচ আমি কি করেছি? মায়ের প্রতিজ্ঞা নষ্ট করেছি, বাড়ি বিক্রি করতে রাজি হয়েছি। তার স্ত্রীর শান্তি নষ্ট করেছি, ফারকোপার চাচা রাগ তো করবেই আমার ওপর।
দিনারা কৌনকে শান্ত করে আবার এসে খাবার টেবিলে বসল রবিন, মুসা আর মিঙ। খাওয়া চলল উত্তেজিত কথাবার্তার মধ্য দিয়ে।
কমলার রস খাইয়ে মিস কৌনকে বিছানায় শুইয়ে দিয়েছে সুই। মনিবানীর কাছেই রয়েছে। যে হারে ধমক-ধামক মেরেছে চাকর-বাকরকে, তাতে স্পষ্ট বুঝে গেছে দুই গোয়েন্দা, এ-বাড়িতে যথেষ্ট প্রতিপত্তি ওই চীনা মহিলার।
ওপরতলা থেকে নেমে এল টার্নার, গম্ভীর।

ভূতটা আপনি দেখেছেন? জিজ্ঞেস করল মুসা। মাথা নাড়ল টার্নার, আন্টিকে ঘরের দরজায় পৌঁছে দিয়ে ফিরেছি। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন। লাফ দিয়ে গিয়ে ঢুকলাম। সুইচে হাত রেখে টিপছেন, এই সময় দেখেছেন ভূতটাকে। আমি ঢুকতেই আলো জ্বলে উঠল, ঢলে পড়তে শুরু করলেন তিনি। ধরলাম তাকে, বিছানায় শোয়ালাম। এত তাড়াহুড়োর মাঝে ভূত দেখার সময় কোথায়? হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কপাল ডলল সে।

চাকর-বাকরের মুখ বন্ধ রাখা যাবে না, চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল আবার টার্নার।

ঠেকানো যাবে না কিছুতেই। কাল সকাল হতে না হতেই সারা এলাকায় ছড়িয়ে পড়বে গুজব।

খবরের কাগজকে নিয়ে ভাবনা? জিজ্ঞেস করল রবিন।

খবরের কাগজওয়ালারা যা ক্ষতি করার করে ফেলেছে। আমি আমাদের শ্রমিকদের কথা ভাবছি। গতরাতেও যে আন্টি ভূত দেখেছেন, ফোনে বলেছেন তোমাদেরকে?

মাথা কেঁকাল মুসা আর রবিন।

এ-বাড়ির দুজন চাকরানীও দেখেছে, বলল টার্নার। ভয়ে আধমরা হয়ে গিয়েছিল। অনেক বলেকয়ে বুঝিয়েছি ওদের, খবরটা গোপন রাখতে। বিশেষ কাজ হয়েছে বলে মনে হয় না। সারাদিনে ছড়িয়ে পড়েছে গুজব, রকি বীচের ভূত এসে। ঠাই নিয়েছে ভারড্যান্ট ভ্যালিতে। ব্যাপারটা নিয়ে কানাঘুষো করছে শ্রমিকরা।

শ্রমিকরা ভয় পাবে ভাবছেন? বলল মিঙ।

পাবে মানে? সর্বনাশ হয়ে যাবে! উত্তেজনা দমন করল টার্নার। প্রসঙ্গ বদলে বলল, যাকগে, মেহমানদের অস্থির করে দেয়াটা উচিত হচ্ছে না। রবিন আর মুসাকে বলল, তোমরা এসব নিয়ে কিছু ভেব না। তো, গোস্ট পার্লের ব্যাপারে আগ্রহ আছে? গতকাল তো ভালমত দেখোনি, আজ দেখতে চাও?

একই সঙ্গে মাথা কাত করল মুসা আর রবিন।

খাওয়ার পর দুই গোয়েন্দাকে নিয়ে চলল টার্নার। ডাইনিং রুমের লাগোয়া মাঝারি একটা হল পেরিয়ে ছোট একটা অফিসঘরে ওদেরকে নিয়ে এল সে। চকচকে পালিশ করা বড় একটা টেবিল, টেলিফোন, কয়েকটা ফাইলিং কেবিনেট, আর ঘরের কোণে পুরানো একটা আয়রন সেফ রয়েছে।

ঝুঁকে বসে সেফের ডায়াল ঘোরাতে শুরু করল টার্নার। ক্লিক শব্দ করে খুলে গেল তালা। কার্ডবোর্ডের ছোট একটা বাক্স হাতে ফিরে এল আবার ছেলেদের কাছে। টেবিলে বাক্সটা রেখে ডালা খুলল। নেকলেসটা বের করে রাখল একটা সবুজ ব্লটিং পেপারের ওপর।

ঝুঁকে এল মুসা আর রবিন, তাদের পাশে মিঙ। বড় বড় মুক্তো, একেকটার আকার একেক রকম, ধূসর রঙ। কেমন জানি মুক্তোগুলো। রবিনের মায়ের একটা মুক্তোর হার আছে, মুক্তোগুলোর কিছু লাল, কিছু শাদা, চকচকে, মসৃণ, কিন্তু এই মুক্তোগুলো ওরকম নয়। আঙুল বুলিয়ে দেখল, কেমন খসখসে।
এমন মুক্তো আর দেখিনি, বলল মুসা।
এজন্যেই এগুলোর নাম রাখা হয়েছে গোস্ট পার্ল, বলল টার্নার। এগুলো তোলা হয়েছিল ভারত মহাসাগরের একটা ছোট উপসাগর থেকে। প্রাচ্যের ধনীরা এগুলোর খুব দাম দেয়, কিন্তু আমি বুঝি না কেন। যেমন বাজে চেহারা, তেমনি রঙ। এখনও নেকলেসটার দাম দশ-পনেরো লাখ ডলারের কম না।
আরিব্বাবা, তাই নাকি? ভুরু কুঁচকে গেল মিঙের। তাহলে তো সমস্যা মিটে গেল। এটা বিক্রি করেই সমস্ত ঋণ শোধ করতে পারবে দাদীমা, বেঁচে যাবে আঙুরের খেত। নেকলেসটা নিশ্চয়ই দাদীমা পাবে?
কিছু অসুবিধে আছে, মাথা নেড়ে বলল টার্নার। ফারকোপার কৌন নেকলেসটা তার চীনা স্ত্রীকে দান করে দিয়েছিলেন। আইনত এখন ওটা মহিলার কোন নিকট আত্মীয়ের পাওনা।
কিন্তু তার পরিবার তাঁকে ত্যাগ করেছে, অবাক হয়ে বলল মিঙ। তাছাড়া চীনের বিপ্লব আর যুদ্ধের সময় তাঁর পরিবার নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, কেউ বেঁচে আছে। কিনা সন্দেহ।
আছে, ভুরুর ওপরে জমে ওঠা বিন্দু বিন্দু ঘাম মুছল টার্নার। স্যান ফ্রানসিসকোতে এক চীনা উকিল আছে, সে চিঠি দিয়েছে আমাকে। চীনা মহিলার বোনের এক বংশধর নাকি বেঁচে আছে। নেকলেসটা সাবধানে রাখতে বলেছে, যে কোন সময় ওটা নিতে আসতে পারে। তবে এত সহজে দিচ্ছি না। কেস করবে, করুক। কে পাবে ওটা, সাক্ষী-প্রমাণ নিয়ে রায় দিতে দিতে কয়েক বছর লেগে যাবে, আদালতের।
কপাল কুঁচকে গেল মিঙের। মুখ খুলতে গিয়েও পায়ের শব্দ শুনে থেমে গেল। তাড়াহুড়ো করে কে জানি আসছে। দরজায় জোরে ধাক্কা দিল কেউ।
কে? এসো, ডাকল টার্নার।
দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল লম্বা চওড়া, মাঝবয়েসী, কালো এক লোক। চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। ছেলেদের যেন দেখতেই পেল না, হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, মিস্টার টার্নার, এক নম্বর প্রেসিং হাউসের কাছে ভূত দেখা গেছে। তিনজন মেকসিকান শ্রমিক দেখেছে, আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে ওরা। আপনার যাওয়া দরকার।
সর্বনাশ! গুঙিয়ে উঠল টার্নার। এখুনি যাচ্ছি, চলো। তাড়াতাড়ি নেকলেসটা সেফে ভরে দরজা লাগিয়ে দিল। তারপর তিন কিশোরকে নিয়ে কালো লোকটার পেছনে

পেছনে ছুটে বেরিয়ে এল বাইরে। জীপ অপেক্ষা করছে। চড়ে বসল তাতে। গর্জে উঠল ইঞ্জিন। দুপাশের পাহাড়ে প্রতিধ্বনি তুলে অন্ধকার উপত্যকা ধরে ছুটে চলল গাড়ি।
পথ খুব খারাপ, উঁচুনিচু, এবড়োখেবড়ো, প্রচণ্ড ঝাঁকুনি। কিন্তু মাত্র পাঁচ মিনিটের পথ, তাই রক্ষা। নিচু একটা পাকা বাড়ির সামনে এসে থেমে গেল জীপ। কংক্রিট আর ইটের তৈরি মজবুত দেয়াল, হেডলাইটের আলোয় দেখল দুই গোয়েন্দা। বাড়িটা নতুন।
লাফিয়ে জীপ থেকে নামল সবাই। আঙুরের রসের তীব্র সুবাসে বাতাস ভারি, সদ্য পিষে বের করা হয়েছে রস।
ও মিস্টার মরিসন, কালো লোকটার পরিচয় দিল মিঙ, ফোরম্যান। খেত লাগানো আর আঙুর তোলার দায়িত্ব তার।
বাড়ির অন্ধকার ছায়া থেকে বেরিয়ে এল এক তরুণ, পরনের কাপড়ে বালি আর ময়লা।
হেডলাইট নিভিয়ে দিল মরিসন। গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, জ্যাক, আমি যাওয়ার পর আর কিছু দেখা গেছে?
না, স্যার, আর কিছু দেখা যায়নি, জবাব দিল জ্যাক।
ওই তিন ব্যাটা কোথায়?
কি জানি। আপনি যাওয়ার পরই ভেগেছে। দৌড়ে, হেসে উঠল জ্যাক, সে কি দৌড়। বোধহয় কাফেতে গিয়ে ঢুকেছে, হাত তুলে উপত্যকার শেষ প্রান্তে এক গুচ্ছ আলো দেখাল সে। ভূত দেখার গল্প বলছে সবাইকে।
মেরেছে! মরিসনের কণ্ঠে শঙ্কা। যেতে দিলে কেন?
ঠেকানোর চেষ্টা করেছি। রাখতে পারিনি। এমনই ভয় পেয়েছে।
হুঁ, আগুনে কেরোসিন পড়ল! তিক্ত হয়ে উঠেছে মরিসনের কণ্ঠস্বর। ব্যাটারা এখানে অন্ধকারে কি করছিল?
আমিই আসতে বলেছিলাম, এখানে দেখা করতে বলেছিলাম আমার সঙ্গে। ভূতের কিচ্ছা ওরাই ছড়াচ্ছিল, তাই ধমকে দিতে চেয়েছিলাম, বেশি শয়তানী করলে চাকরি থেকে তাড়িয়ে দেব। আমার আসতে দেরি হয়ে গেল, ওরা অপেক্ষা করেছিল। এখনে অন্ধকারে। তখনই নাকি কি একটা দেখেছে, আমার বিশ্বাস হয় না।
আমারও না। কল্পনা, স্রেফ কল্পনা। ভূত নিয়ে এত বেশি আলাপ আলোচনা করেছে, ছায়া দেখলেই ভূত ভাবে এখন।
কল্পনাই হোক আর যাই হোক, ক্ষতি যা করার করে ফেলেছে, এতক্ষণ। চুপচাপ কথা শুনছিল টার্নার। যাও, গাঁয়ে গিয়ে দেখো, বুঝিয়ে-শুনিয়ে শান্ত করতে পার

কিনা শ্রমিকদের। মনে হয় না খুব একটা লাভ হবে।
হবে না। বাড়ি দিয়ে আসব আপনাকে? বলল মরিসন।
হ্যাঁ...হায় হায়, হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে কপালে চাপড় মারল টার্নার। মিঙ! নেকলেস রেখে সেফে তালা লাগিয়েছিলাম? মনে আছে?
কি জানি, খেয়াল করিনি, বলল মিঙ।
আমার মনে হয়, স্মৃতির আনাচে-কানাচে হাতড়ে বেড়াল মুসা, আমার মনে হয়...
হ্যাঁ, নেকলেসটা রেখে জোরে দরজা বন্ধ করেছিলেন, হ্যাণ্ডেল ঘুরিয়েছিলেন।
হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে। কিন্তু ডায়াল ঘুরিয়েছিলাম?
ভাবল মুসা। মনে করতে পারছে না। না বোধহয়। দরজা লাগিয়েই তো ছুটলেন...
আমারও তাই মনে হচ্ছে, অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে গেছে টার্নারের কণ্ঠ। শ্রমিকেরা ভূত দেখেছে শুনে এতই ঘাবড়ে গিয়েছিলাম, তালা লাগানোর কথাও মনে হয়নি। মরিসন, জলদি, জলদি বাড়ি নিয়ে চলো আমাকে। ছেলেরা থাক এখানেই। ফিরে এসে নিয়ে যেয়ো।
ঠিক আছে। মিঙ, এই যে, আর টর্চটা রাখো, শক্তিশালী একটা টর্চ মিঙের হাতে গুঁজে দিয়ে জীপে গিয়ে উঠল মরিসন। টার্নার আগেই উঠে বসেছে। স্টার্ট নিয়ে চলে গেল জীপ। জ্যাক চলে গেল গ্রামের দিকে।
কি কাণ্ড! ইঞ্জিনের আওয়াজ মিলিয়ে যেতে বলল রবিন। প্রথমে বাড়িতে ভূত, তারপর এখানে। কিন্তু, মিঙ, ভূত দেখা নিয়ে সবাই এত উতলা হয়ে উঠেছে। কেন?
নীরব অন্ধকারে নিজেদের অজান্তেই গা ঘেঁষাঘেঁষি করে এসেছে তিন কিশোর। পরিবেশ আরও ভয়াবহ করে তুলেছে পোকামাকড়ের একটানা কর্কশ চিৎকার।
এখন আঙুর তোলার পুরো মৌসুম, মিঙ বলল। রোজই আঙুর পাকছে, তুলে এনে প্রেসিং মেশিনে ফেলছে শ্রমিকরা। রস বের করে রাখা হচ্ছে। ঠিক সময়ে তোলা না হলে বেশি পেকে যাবে, কিংবা পচে যাবে, ভাল মদ আর তৈরি হবে না ওগুলো দিয়ে। থেমে অন্ধকারেই এদিক ওদিক তাকাল। আঙুর তুলতে অনেক লোকের দরকার, কিন্তু সারা বছর এই কাজ হয় না। তাই মৌসুমের সময়ই শুধু আসে শ্রমিকেরা, তারপর চলে যায় অন্য কোথাও। অনেক দেশের লোক আছে। মেকসিকান আর এশিয়ানই বেশি, আমেরিকানও আছে কিছু। দরিদ্র লোক ওরা, কর্মঠ, কুসংস্কারে বোঝাই ওদের মন, বলে গেল মিঙ। রকি বীচে ভূত দেখা যাওয়ার খবর শুনেই শ্রমিকেরা বিচলিত হয়ে উঠেছিল। এখানেও দেখা গেছে শুনলে আর থাকবে না, কোন কিছুর বিনিময়েই ঠেকিয়ে রাখা যাবে না, পালাবে। খেতে আঙুর পচে নষ্ট হবে, তুলে না আনা গেলে রসও হবে না, যাবে এ বছরের ফসল। অনেক টাকা গচ্চা দিতে হবে দাদীমাকে। এমনিতেই সময় এখন ভাল

যাচ্ছে না তার, অনেক টাকা ঋণ, তার ওপর ফসল নষ্ট হলে...সে-জন্যেই এত ভেঙে পড়েছে। দাদীমা।
হুঁ, মুশকিল, সহানুভূতির স্বরে বলল মুসা। সব দোষ তোমার দাদার বাবার। ওর ভূত বাইরে বেরোনোতেই তো যত গণ্ডগোল।
না, জোর দিয়ে বলল মিঙ, আমি বিশ্বাস করি না। দাদার বাবা আমাদের ক্ষতি করতে পারে না, হাজার হোক তার রক্ত আমরা। ওটা অন্য কোন শয়তান লোকের ভূত।
এত প্রত্যয়ের সঙ্গে কথাটা বলল মিঙ, রবিনের ইচ্ছে হলো বিশ্বাস করে ফেলে। কিন্তু কৌন ম্যানশনে ভূতটাকে দেখেছে সে, দেখেছে ঢোলা সবুজ আলখেল্লা। যদি ওটা ভূত হয়, বুড়ো ফারকোপার ছাড়া আর কারও না।
এক মুহূর্ত নীরব রইল তিনজনেই। কি বলবে ভাবছে। অবশেষে বলল রবিন, দেখতে পারলে শিওর হতাম রকি বীচ আর এখানকারটা একই ভূত কিনা।
শিওর হলে কি হবে? ভূত ভূতই, তা যার ভূতই হোক, মুসার কণ্ঠে অস্বস্তি। ইস, কিশোরটা যদি থাকত এখন।
এই ভূতটা এখনও কারও কোন ক্ষতি করেনি, বলল মিঙ। শুধু দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায়। ভয়ের কিছু নেই। আর যদি দাদার বাবার ভূত হয়ই, তাহলে তো আরও ভয় নেই, আমাদের ক্ষতি করতেই পারে না। রবিন, চলো না এক নম্বর প্রেসিং হাউসে দেখি, এখনও আছে কিনা।
রবিন আর মুসাকে নিয়ে বিল্ডিংটার চারপাশে একবার চক্কর দিল মিঙ। জায়গাটা তার ভালমত চেনা, টর্চ জ্বালার প্রয়োজনই বোধ করল না। আলো জ্বালল না আরও একটা কারণে, অন্ধকারে ছাড়া দেখা দেয় না ভূতটা।
চেয়ে চেয়ে চোখ ব্যথা করে ফেলল ওরা, কিন্তু ভূতের দেখা নেই, শুধু। অন্ধকারে বাড়িটার কালো ছায়া, বিরাট আরেকটা ভূতই যেন। হাঁটতে হাঁটতেই মিঙ জানাল, আঙুর এনে এখানে বড় বড় ট্যাংকে রাখা হয়। মেশিনের সাহায্যে চিপে রস বের করা হয়, সেই রস গড়িয়ে গিয়ে জমা হয় অন্য ট্যাংকে। সেখান থেকে পাম্পের সাহায্যে নিয়ে যাওয়া হয় মদ চোলাইয়ের কারখানায়। সে এক এলাহি কাণ্ড। পাহাড়ের বিরাট গুহার ভেতরে ছোট পুকুর কাটা হয়েছে, তাতে জমা হয় আঙুরের রস, বিশেষ পদ্ধতিতে মদ তৈরি হতে থাকে। সারা বছরই উত্তাপ আর আর্দ্রতা এক রকম থাকে গুহার ভেতরে, মদ বানানোর জন্যে এটা খুব দরকার।
মিঙের কথায় বিশেষ মন নেই রবিনের। সে ভূতটাকে খুঁজছে।
চলো, ভেতরে যাই, বলল মিঙ। মেশিন আর ট্যাংকগুলো দেখাব। একেবারে নতুন, মাত্র গত বছর কেনা হয়েছে। কিনে এনেছে উলফ আংকেল। বাকিতে।

অনেক টাকা। কি করে শোধ করবে ভাবছে দাদীমা। তার ধারণা, এত টাকা। কোনদিনই শোধ করতে পারবে না।
হেডলাইটের আলো দেখা গেল। খানিক পরেই ছেলেদের পাশে এসে থামল জীপ।
এসো, ওঠো, ডাকল মরিসন, বাড়িতে দিয়ে আসি। কাজ আছে আমার। গাঁয়ে গিয়ে খুঁজে বের করতে হবে তিন হারামজাদাকে। শ্রমিকদেরও বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শান্ত করা দরকার।
হ্যাঁ, খুব জরুরী কাজ, বলল মিঙ। আপনি চলে যান না। মাত্র তো মাইলখানেক, আমরা হেঁটেই চলে যেতে পারব। এই যে, আপনার টর্চ। চাঁদ উঠছে, অসুবিধে হবে না আমাদের।
ঠিক আছে, মাথা কাত করল মরিসন। এতক্ষণে ভয় দেখিয়ে শ্রমিকদের ভাগিয়ে দিয়েছে কিনা হারামজাদারা, কে জানে।
ইঞ্জিনের গর্জন তুলে পাহাড়ী পথ ধরে উপত্যকার শেষ প্রান্তের আলোকগুচ্ছের দিকে চলে গেল ট্রাক।
ইসি, চলে যেতে যে বললাম, বলল মিঙ, তোমাদের কোন অসুবিধা হবে না তো?
না না, অসুবিধে কিসের, তাড়াতাড়ি বলল রবিন, হাঁটতে বরং ভালই লাগবে। দেখতে দেখতে যাব।
ধুলো আর পাথরের কুচিতে ভরা আঁকাবাঁকা পথ. জ্যোৎস্নার আলোয় ধূসর। বাতাসে পাকা আঙুরের গন্ধ।
চলতে চলতে বলল মিঙ, ব্যবসায় লাল বাতি জ্বালিয়ে ছাড়বে ওই ভূত। শ্রমিকদের ঠেকানো যাবে না, চলে যাবেই। অনেক টাকা গচ্চা দিতে হবে। দাদীমাকে, মেশিনের টাকা শোধ করতে পারবে না। ক্ষেত খামার সব তার কাছ থেকে নিলাম করে নেবে ব্যাংক। একটু চুপ থেকে বলল, একটাই উপায় আছে এখন। মুক্তোর মালাটা। ওটা যদি পাওয়া যেত, বিক্রির করে ঋণ শোধ করে দেয়া যেত।
কেউ কোন জবাব দিল না। কি বলবে? নেকলেস কে পাবে, সেটা কৌন পরিবারের ব্যক্তিগত সমস্যা, আদালত নিষ্পত্তি করবে, এ-ব্যাপারে রবিন আর মুসা কি সাহায্য করতে পারবে?
এরপর আর কোন কথা হলো না। তিনজনেই চিন্তিত, চুপচাপ হাঁটতে থাকল। বাড়িটা দেখা যাচ্ছে, বেশির ভাগ আলোই নিভানো, কয়েকটা, শুধু জ্বলছে। আশপাশটা বড় বেশি শান্ত।
সিঁড়ি বেয়ে আঙিনায় উঠল ওরা। কারও সাড়া না পেয়ে অবাক হলো মিঙ। বিড়বিড় করল, গেল কোথায় সব? চাকরবাকরেরা না হয় ঘুমাতে গেছে, কিন্তু ডলফ আংকেল? তার তো এ-সময়ে হলে থাকার কথা। অফিসে?

অফিসরুমে রওনা হলো মিঙ, পেছনে দুই গোয়েন্দা। দরজা ভেজানো। টোকা দিল মিঙ। জবাবে গোঙানি শোনা গেল, আর ঘষার আওয়াজ।
সতর্ক হয়ে উঠল মিঙ, ধাক্কা দিয়ে খুলে ফেলল পাল্লা। মেঝেতে পড়ে আছে। টার্নার, হাত-পা বাঁধা। বাদামী একটা কাগজের ঠোঙা মাথার উপর দিয়ে টেনে এনে মুখ ঢেকে দেয়া হয়েছে।
আংকেল! চেঁচিয়ে উঠে ছুটে গেল মিঙ।
মাথার ঢাকনাটা খুলতে শুরু করল আগে সে, রবিন আর মুসা তাকে সাহায্য করল। চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসবে যেন টার্নারের। কথা বলতে পারছে না, মুখে কাপড় বাধা।
দাঁড়ান, আগে বাঁধন কেটে নিই, হাত তুলল মিঙ, তারপর সব শুনব।
পকেট নাইফ বের করে আগে মুখের কাপড় কাটল সে, তারপর হাত পায়ের বাঁধন খুলতে শুরু করল। জোরে জোরে দম নিচ্ছে টার্নার। বাঁধন কাটা হতেই কব্জি আর গোড়ালি ডলতে শুরু করল।
কি হয়েছিল? জানতে চাইল মুসা।
বাড়িতে ফিরে অফিসে ঢুকলাম। দরজার আড়ালে লুকিয়ে ছিল ব্যাটা। পেছন থেকে জড়িয়ে ধরল, কোথা থেকে আরেকটা এসে হাজির হলো। দুজনে মিলে আমাকে মেঝেতে ফেলে বেঁধে ফেলল। তারপর ঠোঙাটা টেনে দিল মাথায়। সেফের দরজা খোলার শব্দ...সেফ! লাফ দিয়ে আয়রন সেটার দিকে ছুটে গেল সে।
ইঞ্চিখানেক ফাঁক হয়ে আছে পাল্লা। ঝটকা দিয়ে একটানে খুলে ফেলল পুরোটা। খোঁজাখুঁজি করল। ঘুরল ধীরে ধীরে। মুখ ফ্যাকাসে।
নেকলেসটা, ফিসফিস করে বলল সে, নেই!
বসার ঘরে চুপচাপ বসে আছে কিশোর, একা। চাচা-চাচী বাড়ি নেই। গভীর ভাবনায় ডুবে আছে সে, চিমটি কাটছে নিচের ঠোঁটে। হঠাৎ সোজা হলো, ঠোঁটের কাছ থেকে সরে এল হাত। গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, যত জোরে পারে। অপেক্ষা করতে লাগল।
বারান্দায় পায়ের আওয়াজ হলো। খানিক পরেই দরজায় উঁকি দিল বোরিস, বিশালদেহী দুই ব্যাভারিয়ান ভাইয়ের একজন, ইয়ার্ডের কর্মচারী! তার ভাই রোভার গেছে মেরিচাচী আর রাশেদ চাচার সঙ্গে, স্যান ডিয়েগোতে।
কি হয়েছে, কিশোর? বোরিস উদ্বিগ্ন।
শোনা গেছে তাহলে, শান্ত কণ্ঠে বলল কিশোর।
যাবে না? বাড়ি ফাটিয়ে ফেলেছ। তোমার জানালা খোলা, আমার জানালা খোলা। কি ব্যাপার, বাড়িটাড়ি মেরেছে? কিশোরের মাথা আর কাঁধে চোখ বোলাচ্ছে।

বোরিস।
ফিরে তার ঘরের জানালার দিকে তাকাল কিশোর, খোলা। চোখে ক্ষোভ জমল।
কি ব্যাপার? আবার জানতে চাইল বোরিস। কিছু হয়েছে বলে তো মনে হয় না।
হয়নি, শুধু জানালাটা বন্ধ করতে ভুলে গেছি।
তাহলে চেঁচালে কেন?
চিৎকার প্র্যাকটিস করছিলাম।
কিশোর, তুমি ঠিক আছ? ভুরু কোঁচকাল বোরিস। অসুস্থ নও তো? হোকে (ওকে)?
ইয়েস, হোকে, হাসল কিশোর! আপনি যান, ঘুমোনগে। আজ রাতে আর চেঁচাব না।
ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে, সন্দেহ যাচ্ছে না বোরিসের। কিন্তু আর কিছু বললও না, দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে চলে গেল তার ঘরে। দুভাই একই ঘরে থাকে, মূল বাড়ি থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে ছোট্ট একটা কটেজে।
যেখানে ছিল সেখানেই বসে রইল কিশোর। মগজে চিন্তার ঘূর্ণিপাক। কি যেন একটা আসি আসি করছে মনে, কিন্তু আসছে না, সবুজ ভূতের ব্যাপারে। ক্ষান্ত দিয়ে শেষে উঠে পড়ল। শোয়ার সময় পেরিয়ে যাচ্ছে।
দোতলায় যাওয়ার জন্যে উঠল। আচ্ছা, রবিন আর মুসা কি করছে?-ভাবল সে।
যেন তার প্রশ্নের জবাব দিয়েই বেজে উঠল টেলিফোন। দুই লাফে গিয়ে রিসিভার তুলে নিল সে। কি ব্যাপার, রবিন? ভূতটা আবার দেখেছ?
না, মিস কৌন দেখেছেন, উত্তেজিত শোনাল রবিনের কণ্ঠ। তারপর যা সব। কাণ্ড ঘটল না…
বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়েছ, বাধা দিল কিশোর। শান্ত হয়ে বলো সব। কিছু বাদ দেবে না। যখন যেভাবে ঘটেছে, বিস্তারিত বলো।
এ-মুহূর্তে কাজটা রবিনের জন্যে বেশ কঠিন। নেকলেস চুরির কথা বলার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে সে। কিন্তু ওভাবে শুনতে চায় না কিশোর, জোর করে নিজেকে শান্ত করল রবিন। এক এক করে বলে গেল, সে আর মুসা ভারড্যান্ট ভ্যালিতে যাওয়ার পর কি কি ঘটেছে। সব শেষে নেকলেস চুরির ঘটনা বলে হাঁপ ছাড়ল।
হুমম, বলল কিশোর। জোরে জোরে দম নিচ্ছে রবিন, শুনতে পাচ্ছে। টেলিফোনেই। এটা আশা করিনি। তো, এখন কি হচ্ছে? তদন্তের আয়োজন চলছে?
স্থানীয় শেরিফকে ডেকে এনেছে টার্নার, শেরিফ হামফ্রে। তিন কাল শেষ, এক কালে ঠেকেছে বয়েস, কাজকর্ম কিছু বোঝেটোঝে মনে হয় না। শহর থেকে

অনেক দূরে ভারড্যান্ট ভ্যালি, কাছাকাছি থানা নেই, পুলিশ নেই, শেরিফ আর তার সহকারীই ভরসা। সহকারীটাও বসেরই মত, গাল দেয়া ছাড়া আর কিছু জানে না।
শেরিফের ধারণা, কাগজে নেকলেসটার খবর পড়ে শহর থেকে চোর এসে চুরি করে নিয়ে গেছে। ওরা যখন সেফ খুলছিল, টার্নার তখন ঘরে ঢুকেছে। তাকে বেঁধে হারটা নিয়ে পালিয়েছে চোর আর তার সহকারী। শেরিফ বলছে, ইতিমধ্যে অর্ধেক পথ চলে গেছে চোরেরা। স্যান ফ্রানসিসকোর পুলিশকে ফোন করবে, কিন্তু ভাবছে কোন লাভ হবে না।
নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। একেবারে অযৌক্তিক কথা বলেনি শেরিফ। কিন্তু কিশোর বিশ্বাস করতে পারছে না। সবুজ ভূতের সঙ্গে এই হার চুরির কোন সম্পর্ক নেই তো?
তুমি আর মুসা চোখ খোলা রেখো, পরামর্শ দিল কিশোর। আমি ওখানে থাকতে পারলে ভাল হত। কিন্তু যেতে পারছি না। চাচা-চাচী বাড়ি নেই, আরও একদিন থাকবে স্যান ডিয়েগোতে, রোভারও নেই, বোরিস একা সামলাতে পারবে না। যোগাযোগ রেখো। যখন যা ঘটে, ফোনে জানিও। রিসিভার নামিয়ে রাখল সে।
নতুন করে আবার ব্যাপারটা নিয়ে ভাবার লোভ জাগছে, কিন্তু জোর করে দমন করল ইচ্ছেটা। ঘুমাতে চলল।
নানারকম স্বপ্ন দেখল, ঘুমের মধ্যেই একটা কণ্ঠ শুনল চেনা চেনা, কিন্তু চিনতে পারল না।
পরদিন সকালে মনে রইল না, রাতে কি স্বপ্ন দেখেছে।
সকালে ঘুম থেকে উঠে মনেপ্রাণে আশা করল কিশোর, যাতে কাজ বেশি না থাকে ইয়ার্ডে, ক্রেতা না আসে, তাহলে হার চুরির ব্যাপারটা নিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে পারবে।
কিন্তু ঘটল উল্টো। একের পর এক খরিদ্দার আসতেই থাকল, দরকষাকষি করতে লাগল, তর্ক করল, দুএকজন তো জিনিস আর দর নিয়ে আরেকটু হলে ঝগড়াই বাধিয়ে দিত। হিমশিম খেয়ে গেল কিশোর আর বোরিস, ঘেমে সারা। একটা মিনিট চুপ করে বসতে পারল না কিশোর, ভাববে কখন? পাঁচটার সময় অফিস বন্ধ করে দিল সে। বিক্রি বন্ধ। দম ফেলার অবকাশ পেল এতক্ষণে।
সুযোগ মিলতেই ভাবতে বসে গেল কিশোর। ধীরে ধীরে একটা ধারণা রূপ নিতে শুরু করল মনে।
বোরিস, চেঁচিয়ে ডাকল কিশোর, আপনি থাকুন। আমি চললাম।
কিশোরের স্বভার বোরিসের জানা। পাল্টা কোন প্রশ্ন করল না। বলল, ঠিক আছে, যাও। আমি আছি। কোথায় যাচ্ছ?

তদন্ত করতে, বোরিসকে আর কোন প্রশ্ন করার সুযোগ না দিয়ে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল কিশোর। দ্রুত চালিয়ে শহরের প্রান্তে ছোট একটা জলাশয়ের ধারে জংলা জায়গায় চলে এল, এখানেই কৌন ম্যানশন। ড্রাইভওয়েতে ঢুকে দেখল, বাড়ির সামনে পুলিশের একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। কিশোরকে দেখে গাড়ির জানালা দিয়ে মুখ বের করল একজন পুলিশ। আগের দিন সকালে চীফের সঙ্গে যখন এসেছিল তখন এই লোকটাকে এখানে দেখেছিল কিশোর।

সাইকেল ঘোরাও, খোকা, বলল লোকটা। কৌতূহলী দর্শকদের তাড়ানোর জন্যেই পাহারায় আছি এখানে। উফফ, সারাটা দিন...আর ভাল্লাগছে না এখন।

স্ট্যাণ্ডে সাইকেল তুলে পকেটে হাত ঢোকাল কিশোর। আরও অনেকে এসেছিল?

এসেছে মানে? মুখ বাঁকাল লোকটা। পাগল করে দিয়েছে আমাকে। স্যুভনির শিকারিদের জ্বালায়...উফফ, বদ্ধ পাগলের দেশ এটা। বেশি কথা বলতে পারব না, খোকা, চলে যাও।

আমি স্যুভনিরের জন্যে আসিনি, এগিয়ে এল কিশোর। গতকাল দেখেছেন। আমাকে, মনে নেই? আপনাদের চীফের সঙ্গে এসেছিলাম।

ভাল করে তাকাল পুলিশম্যান। ও হা হা...সেজন্যেই চেনা চেনা লাগছিল। তা কি ব্যাপার?

তিন গোয়েন্দার একটা কার্ড বাড়িয়ে ধরল কিশোর, আমি কিশোর পাশা।

কার্ড পড়ে হাসতে গিয়েও থেমে গেল পুলিশম্যান, কি জানি, চীফের সঙ্গে এসেছিল যখন, ফেলনা না-ও হতে পারে। গোয়েন্দা, না? চীফের হয়ে কাজ করছ?

তার হয়ে করছি না, তবে আমি যা করব, সফল হতে পারলে খুব খুশি হবেন। চীফ। আগেও অনেক কাজ করেছি। এখন কি করতে চায়, জানাল কিশোর।

মাথা ঝোকাল পুলিশম্যান। ঠিক আছে। যাও।

পাথরের সিঁড়ি বেয়ে বাড়ির বারান্দায় উঠল কিশোর, ভেতরে ঢুকল। তীক্ষ্ণ চোখে দেখছে সব। যেদিক থেকে ভাঙা শুরু হয়েছে, সেখানে এসে দাঁড়াল। পরীক্ষা করে দেখল, দেয়াল খুব পুরু।

আর কোন গোপন কুঠরি খোঁজার চেষ্টা করল না কিশোর, পুলিশই ভালমত খুঁজেছে, অহেতুক সময় নষ্ট করা হবে। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠল। সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠল গলা ফাটিয়ে। এক মিনিট অপেক্ষা করে নিচে নেমে বড় হলরুমটায় ঢুকে আবার চিৎকার করল। তারপর বেরিয়ে এল বাইরে। পুলিশম্যানের কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, কিছু শুনেছেন?

চিৎকার শুনেছি। একবার একেবারে ক্ষীণ, আরেকবার একটু জোরে। দরজা বন্ধ ছিল তো।

ভূত যে-রাতে চেঁচিয়েছে, তখনও দরজা বন্ধ ছিল, বলল কিশোর। এদিক ওদিক তাকাল। বাড়ির এক কোণে একটা বড় সাজানো ঝোঁপ দেখে তার ভেতরে এসে ঢুকল। চেঁচিয়ে উঠল জোরে। বেরিয়ে আবার পুলিশম্যানের কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, এবার?
অনেক জোরে, জবাব দিল লোকটা, স্পষ্ট। কিন্তু কি প্রমাণের চেষ্টা করছ?
কোথা থেকে চেঁচিয়েছিল ভূতটা। নিশ্চয়ই বাইরে ছিল। বাড়ির ভেতর থেকে চেঁচিয়ে থাকলে স্বীকার করতেই হবে, ব্যাটার ফুসফুসের জোর অসাধারণ।
ভূতের ফুসফুস আছে কিনা তাই বা কে জানে, হাসল পুলিশম্যান।
কিন্তু কিশোর হাসল না। এটাই পয়েন্ট।
বুঝতে না পেরে মাথা চুলকাল লোকটা। বোঝাল না তাকে কিশোর, সাইকেলের দিকে হাঁটতে শুরু করল।
খোকা, ডাকল পুলিশম্যান, কার্ডে এই আশ্চর্যবোধক চিহ্নগুলো কেন?
হেসে ঘুরে চাইল কিশোর। লোকের কৌতূহল জাগানোর জন্যে। তাছাড়া সব রকম আশ্চর্য, উদ্ভট রহস্যের সমাধান করতে চাই আমরা, চিহ্নগুলো দেয়ার সেটা অনেক কারণ।
সাইকেলে উঠে আরেকবার ফিরে তাকাল কিশোর, তখনও মাথা চুলকাচ্ছে পুলিশম্যান। মুচকি হেসে বেরিয়ে এল ড্রাইভওয়ে ধরে।
কিন্তু বেশি দূরে গেল না কিশোর। কৌন ম্যানশন থেকে কয়েক ব্লক দূরে এসে থামল। আধুনিক মডেলের কয়েকটা বাড়ি এখানে, ফারকোপারের মধ্যযুগীয় বাড়িটার সঙ্গে বেমানান। সঙ্গে করে স্থানীয় পত্রিকার কিছু পেপার কাটিং নিয়ে। এসেছে সে। যে চারজন লোক ভূত দেখার কথা রিপোর্ট করেছে থানায়, তাদের নামধাম লেখা আছে। ঠিকানা খুঁজে একটা বাড়ি বের করল সে। ড্রাইভওয়েতে ঢুকল। এই সময় একটা গাড়ি ঢুকল, কিশোরের পাশে থেমে গেল। ড্রাইভারের পাশের দরজা খুলে নামল একজন লোক। জিজ্ঞেস করল, কি চায়। জানাল কিশোর।
লোকটা চারজনের একজন, নাম হ্যারি পিটারসন। সানন্দে কিশোরের প্রশ্নের জবাব দিল।
জানা গেল, পিটারসন আর তার এক প্রতিবেশী হাঁটতে হাঁটতে গল্প করছিল সে-রাতে, সিগারেট ফুকছিল আর বেসবল নিয়ে আলোচনা করছিল, এই সময় দুজন। লোক ডাকে তাদেরকে পেছন থেকে। অচেনা লোক, হ্যারি আর তার প্রতিবেশী মনে করেছে, আগন্তুক দুজনও তাদের প্রতিবেশী হবে, হয়তো নতুন এসেছে এ এলাকায়। নইলে এভাবে যেচে এসে কথা বলবে কেন? জ্যোৎস্না ছিল। চাঁদের আলোয় পোড়ো বাড়িটা কেমন দেখা যায়, দেখতে যাওয়ার কথা তুলল দুই

আগন্তুক। ভালই লাগল প্রস্তাব। রাজি হয়ে গেল পিটারসন আর তার প্রতিবেশী বন্ধু। আগন্তুকদের একজনের ভারি কণ্ঠস্বর।
গ্যারেজ থেকে দুটো টর্চ নিয়ে এল পিটারসন, একটা দিল তার বন্ধুকে।
চারজনে চলল কৌন ম্যানশনের দিকে। পথে আরও দুই প্রতিবেশীর সঙ্গে দেখা, তাদেরকেও সঙ্গে যেতে রাজি করিয়ে ফেলল ভারিকণ্ঠ। খুব মজা পাচ্ছিল যেন সে, ভূত নিয়ে হাসি ঠাট্টা করেছিল, তার ধারণা পোড়ো বাড়িতে ভূতের দেখা মিলে যেতে পারে।
ভূত দেখা যাবেই, জোর দিয়েছিল একথায়? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
মাথা কেঁকাল পিটারসন। তা দিয়েছিল। তার কথা ফলেছে। একেবারে জলজ্যান্ত ভূত, আশ্চর্য!
লোক দুজনকে চেনেন না বলছেন?
নাহ্। তবে একজনকে আগে কোথাও দেখেছি মনে হয়েছিল। অন্যজন একেবারে অচেনা। আশপাশেই কোথাও থাকে ভেবেছিলাম। অনেক প্রতিবেশী আমাদের, সবাইকে চিনি না, চেনা সম্ভবও নয়। গত এক বছরে অনেক নতুন লোক এসেছে।
মোট কজন গিয়েছিলেন আপনারা?
ছয়, ভেবে বলল পিটারসন। কারও-কারও ধারণা, সাতজন, কিন্তু ড্রাইভওয়েতে যখন ঢুকি তখন ছজনই ছিল। হতে পারে, পেছন পেছন আরও একজন এসেছিল, তবে আমি দেখিনি। তারপরে যা কাণ্ড শুরু হলো, লোক গোনার কথা মনে থাকে নাকি কারও? তাছাড়া গাঢ় অন্ধকার ছিল। কৌন ম্যানশন থেকে বেরিয়ে অচেনা দুজন চলে গেল। আমি আর আমার তিন প্রতিবেশী ঠিক করলাম, পুলিশে খবর দিতে হবে। ওই দুজনের আর কোন খোঁজ পাইনি।
বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একটা ছোট রোমশ কুকুর, আদুরে গলায় কুঁইকুঁই করে পিটারসনের পায়ে গা ঘষতে লাগল।
লক্ষ্মী ছেলে, নিচু হয়ে কুকুরটার গায়ে হাত বুলোল পিটারসন।
এই কুকুরটাকেই নিয়ে গিয়েছিলেন সঙ্গে? জানতে চাইল কিশোর।
হ্যাঁ, হাঁটতে বেরোলেই জিমিকে সঙ্গে নিই, বিশেষ করে বিকেলে। সেরাতেও নিয়েছিলাম।
কুকুরটার দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। জানোয়ারটাও তাকাল তার চোখে চোখে। মুখ হাঁ, জিভ বের করে হাপাচ্ছে, যেন হাসছে তার দিকে চেয়ে! ভুরু কোঁচকাল কিশোর। আবার কিছু একটা মনে আসি আসি করেও আসছে না।
আরও কয়েকটা প্রশ্ন করল কিশোর, কিন্তু নতুন কিছুই জানাতে পারল না পিটারসন, তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে সাইকেলে চড়ে বেরিয়ে এল সে।

ধীরে ধীরে প্যাড়াল করে চলেছে কিশোর, গভীর চিন্তায় মগ্ন। ইয়ার্ডে পৌঁছে দেখল, বিশাল সদর দরজা বন্ধ। সূর্য অস্ত যাচ্ছে, এতক্ষণে খেয়াল হলো, তদন্ত করতে গিয়ে বেশ দেরি করে ফেলেছে।
নিজের ঘরে বসে আরামে পাইপ টানছে বোরিস। কিশোর উঁকি দিতেই ডাকল, এসেছ। এসো এসো। খুব ভাবছ মনে হচ্ছে?
বোরিস, ঘরে ঢুকল কিশোর, গতরাতে আমার চিৎকার শুনেছেন। কি রকম মনে হয়েছিল?
মনে হয়েছিল বাড়ি মেরে কোন শুয়োরের ঠ্যাঙ ভেঙে দেয়া হয়েছে।
কিন্তু আমার জানালা যদি বন্ধ থাকত, শুনতে পেতেন?
বোধহয় না। কি বোঝাতে চাইছ?
উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠল কিশোরের মুখ। চিৎকারটা সবাই শুনেছে, পিটারসনের ছোট কুকুরটাও। হয়তো কোন সূত্র দিতে পারবে ওটা। শার্লক হোমসকে অনেক সময় অনেকভাবে সাহায্য করেছে কুকুর।
তাড়াহুড়ো করে নিজের ঘরে চলে এল কিশোর। খুলতে শুরু করেছে কয়েকটা প্যাঁচ।
কৌন ম্যানশনে দরজা বন্ধ ঘরে চিৎকার করেছিল সে, তার চিৎকার স্পষ্ট শুনতে পায়নি পুলিশম্যান। কিন্তু বাইরে এসে ঝোঁপের ভেতর থেকে যখন চিৎকার করল, স্পষ্ট শুনতে পেল। এটা একটা জোরাল পয়েন্ট।
টেপরেকর্ডার বের করে রবিনের রেকর্ড করে আনা ক্যাসেটটা চালু করে দিল। মন দিয়ে শুনল চিৎকার, কথাবার্তা আর যতরকম আওয়াজ শোনা গেল সব। তারপর চুপচাপ ভাবল কয়েক মিনিট। সেদিন রবিন যা যা বলেছে, আবার পর্যালোচনা করে দেখল মনে মনে। যাচ্ছে, খাপে খাপে বসে যাচ্ছে! কিন্তু অনেকগুলো ব্যাপার এখনও অস্পষ্ট, কিংবা দুর্বোধ্য।
ঘর অন্ধকার। আলো জ্বালার দরকার মনে করল না কিশোর, হঠাৎ উঠে গিয়ে ফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল শুরু করল। অনেকক্ষণ পর ওপাশে ফোন তুলল। কেউ।
হ্যালো, রবিনকে দেয়া যাবে? অনুরোধ করল কিশোর।
কে, কিশোর পাশা? মিস দিনারা কৌনের কণ্ঠ, কাঁপছে।
হ্যাঁ। রবিনকে দরকার, মিস কৌন। কয়েকটা জরুরী কথা…
..রবিন তো নেই।
নেই?
নেই, অস্থির কণ্ঠস্বর। মুসাও নেই। আমার নাতি মিঙও গায়েব।

নেকলেস চুরির খবর যে রাতে ফোনে কিশোরকে জানিয়েছে রবিন, তার পরদিন সকালে উঠে নাস্তা সেরে মিঙের সঙ্গে বেরোল সে আর মুসা, ভারড্যান্ট ভ্যালি দেখতে। সেই গুহা দেখতে যাবে, আঙুরের রস গাঁজিয়ে যেখানে মদ তৈরি হয়! মিঙ জানাল, পুকুরটা নতুন কাটা হয়েছে, কিন্তু ওই গুহা আর আশপাশের সুড়ঙ্গ কাটা হয়েছে অনেক আগে, খনি ছিল ওটা এক সময়।

সারাদিন বাড়ি ফেরার ইচ্ছে নেই ছেলেদের, ঘুরবে, দেখবে কি আছে না আছে। বাড়ি গিয়ে কি হবে? নেকলেস চুরির রহস্য ভেদ করতে পারবে না তারা। শেরিফ হামফ্রের ধারণা ঠিক হলে, চোর এতক্ষণে নিশ্চয়ই স্যান ফ্রানসিসকোতে পৌঁছে গেছে, ওকে ধরা এখন পুলিশের পক্ষেও কঠিন। আরও একটা কারণে রাতের আগে ফেরার ইচ্ছে নেই। রিপোর্টার।

সকাল থেকেই খবরের কাগজের লোকজন আসতে শুরু করেছে, তিন কিশোরের অনুমান, নিশ্চয়ই এখন বাড়িতে গিজগিজ করছে লোকে। ছেকে ধরেছে মিস কৌনকে। জবাব দিতে দিতে জান খারাপ হয়ে যাচ্ছে হয়তো মহিলার। ফিরে গেলে তিন কিশোরকেও ওদের মুখোমুখি হতে হবে, ওই ঝামেলার মধ্যে থাকতে রাজি না ওরা।

আস্তাবল থেকে ঘোড়া নিয়ে এসেছে ওরা। ঘোড়ায় চড়তে ওস্তাদ মিঙ, মুসা আর রবিনও পারে-জিনার কাছে শিখেছে, তবে মিঙের মত নয়। জিনা আর মিঙ প্রতিযোগিতায় নামলে বোঝা যেত, দুজনের মাঝে কে বেশি দক্ষ।

বিষণ্ন দেখাচ্ছে মিঙকে। শখানেক শ্রমিক থাকার কথা ছিল এখন, বলল সে, বেশ কয়েকটা ট্রাক থাকার কথা, আঙুর বোঝাই করে প্রেসিং হাউসে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। অথচ দেখো, মোটে বারো-তেরোজন লোক আছে। মাত্র একটা ট্রাক। ভূতের ভয়ে পালিয়েছে সব। দাদীমার সর্বনাশ হয়েই গেল। কিছুতেই ঠেকাতে পারবে না!

কোন জবাব জোগাল না রবিনের মুখে।

মিঙকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে মুসা বলল, এত ভেঙে পড়ছ কেন? আমাদের কিশোর তো আছে। রকি বীচে ভূতের রহস্য সমাধানে ব্যস্ত এখন সে। অসাধারণ বুদ্ধিমান, দেখো সমাধান করে ফেলবে। ভূতের ভয় না থাকলে আবার ফিরে আসবে শ্রমিকেরা।

খুব তাড়াতাড়ি কিছু করতে পারলে হত, বলল মিঙ, নইলে, অন্য জায়গায় কাজ নিয়ে নেবে শ্রমিকেরা। আজ সকালে সুই কি বলল জানো? আমিই নাকি সকল অনর্থের মূল, আমি অলক্ষুণে। আমি আসার পর থেকেই নাকি যত গোলমাল শুরু হয়েছে ভারড্যান্ট ভ্যালিতে।

বাজে কথা, জোর গলায় বলল রবিন, কুসংস্কার। অলক্ষুণে আবার হয় নাকি মানুষ?
মাথা নাড়ল মিঙ। জানি না। তবে এটা ঠিক, আমি আসার পর থেকেই একটার পর একটা গোলমাল হয়ে চলেছে। একসঙ্গে অনেক পিপা মদ একবার নষ্ট হয়ে গেল, পিপায় ফুটো হয়ে মদ পড়ে গেল, মেশিনের পার্টস ভাঙল। আরও নানারকম গণ্ডগোল। কিছুই যেন ঠিকমত চলতে চাইছে না।
তাতে তোমার কি দোষ? মুসা বলল।
কিছু কিছু অলক্ষুণে মানুষ থাকে না। বলল মিঙ, আমিও তেমনি একজন হতভাগ্য হয়তো। আমি হঙকঙে ফিরে গেলে হয়তো আবার সব ঠিক হয়ে যাবে, ভূত চলে যাবে, আবার হেসে উঠবে ভারড্যান্ট ভ্যালি। যদি শিওর হতে পারতাম, কালই চলে যেতাম। দাদীমার কষ্ট আমি সইতে পারি না।
এই বিষণ্নতা কাটানো দরকার, নইলে দিনটাই মাটি হবে, ভাবল রবিন। প্রসঙ্গ পরিবর্তন করার জন্যে বলল, এই ভারড্যান্ট ভ্যালি তোমারই হবে, না? আর কোন ভাগবাটোয়ারা নেই? দুপাশে পাহাড়ের দেয়াল, মাঝে যতদূর চোখ যায় শুধু আঙুরের ঝোঁপ, সেদিকে তাকিয়ে আছে সে।
দাদীমা তার সমস্ত সম্পত্তি আমাকেই উইল করে দিতে চায়। কিন্তু আমি ভাবছি, অর্ধেক ডলফ আংকেলকে দিয়ে দেব। এখানকার উন্নতির জন্যে অনেক করেছে সে। খেতখামার বাড়িয়েছে, নতুন মেশিন আনিয়েছে, আবার বিষণ্ন হয়ে পড়ল মিঙ, অনেক লাভ হত। এক বছরেই শোধ করে দেয়া যেত ব্যাংকের ঋণ, কিন্তু সব শেষ করে দিল ওই হারামী ভূত।
সরু পথ ধরে ঝাঁকি খেতে খেতে ছুটে এল একটা জীপ, ওটাকে সাইড দেয়ার জন্যে পথের একেবারে কিনারে চলে এল তিন ঘোড়সওয়ার। খুব তেজি একটা কালো কোল্ট ঘোড়ায় চড়েছে মিঙ, মুসারটা কম বয়েসী ঘোটকী, চঞ্চল, সামলাতে অসুবিধেই হচ্ছে গোয়েন্দাসহকারীর, একটু এদিক ওদিক হলেই উল্টোপাল্টা কিছু করে বসবে ঘোড়াটা। রবিনেরটাও মাদী ঘোড়া, বয়স্ক, একেবারে শান্ত, যেভাবেই চালানো হচ্ছে, সেভাবেই চলছে।
পাশে এসে থেমে গেল জীপ। মুখ বাড়াল ফোরম্যান মরিসন। হেই, মিঙ, অবস্থা তো খুব খারাপ। শ্রমিক নেই, দেখেছ?
মাথা কেঁকাল মিঙ।
ওই তিন শয়তানের কাণ্ড, বলল মরিসন, ধসিয়ে দিয়েই ছাড়ল শেষকালে। লোক জোগাড়ের অনেক চেষ্টা করছি, হচ্ছে না। কেউ আসতে রাজি না।
চুপ করে রইল মিঙ।
মিস কৌনকে জানাতে যাচ্ছি। গতিক সুবিধের না।

জোর করে নিজের বিষণ্নতা ঝেড়ে ফেলল মিঙ। যাকগে, যা হওয়ার হবে। ভাগ্যের ওপর তো কারও হাত নেই। চলো, আমাদের কাজ আমরা করি।
পুরো উপত্যকায় ঘুরে বেড়াল ওরা। মাঝেমধ্যে থেমে এটা-ওটা দেখল। প্রেসিং হাউসগুলো সব দেখাল মিঙ। দুপুরের দিকে ক্লান্ত হয়ে পড়ল ওরা, খিদেও লেগেছে খুব। সঙ্গে স্যাণ্ডউইচ আর ক্যান্টিনে পানি নিয়ে এসেছে, ব্যাগে করে এনেছে ঘোড়ার খাবার।
ঠাণ্ডা একটা জায়গা আছে, জানাল মিঙ, আরামে বসে খাওয়া যাবে। পুরানো একটা বিল্ডিঙের ধার দিয়ে নিয়ে চলল সে দুই গোয়েন্দাকে, পুরানো প্রেসিং হাউস, পরিত্যক্তই বলা চলে, খুব বেশি চাপ না থাকলে এখানে কাজ চলে না আজকাল।
আরও একশো গজ এগিয়ে, পশ্চিমের পাহাড়শ্রেণীর গোড়ায় ছায়া পাওয়া গেল। ঘোড়াগুলোকে ছায়ায় বেঁধে খেতে দেয়া হলো।
পর্বতের গা থেকে ছোট্ট একটা শাখা বেরিয়েছে ওখানে, শাখার গায়ে ঢাল কেটে ভারি একটা দরজা বসানো হয়েছে। দুই গোয়েন্দাকে দরজার সামনে নিয়ে। এল মিঙ। এটাই সেই গুহা, যেটার কথা বলেছিলাম। জোরে টান দিয়ে দরজাটা খুলল সে। ভেতরে অন্ধকার। আগে খেয়ে নিই, তারপর দেখাব সব কিছু।
দরজার পাশে বসানো সুইচ বোর্ড, সুইচ টিপে দিল মিঙ। ক্লিক করে শব্দ হলো কিন্তু আলো জ্বলল না। ওহহো, ভুলেই গিয়েছিলাম, ডায়নামো বন্ধ। কাজ না চললে বন্ধই রাখা হয়। টর্চ জ্বালতে হবে।
কোমরে ঝোলানো টর্চ খুলে নিয়ে জ্বালল মিঙ। লম্বা একটা করিডর দেখা গেল, দুধারে পাথরের দেয়াল, ছাত যাতে ভেঙে না পড়ে সেজন্যে কাঠের মোটা মোটা কড়িবর্গা লাগানো হয়েছে, দুই দিকেরই দেয়াল ঘেঁষে সারি দিয়ে রাখা হয়েছে রাশি রাশি জালা। করিডরের ঠিক মাঝখান দিয়ে চলে গেছে সরু লাইন, খানিক দূরে লাইনের ওপর দাঁড়িয়ে আছে একটা ফ্ল্যাটকার।
মদের জালা ফ্ল্যাটকারে তুলে ঠেলে নিয়ে যাওয়া হয় দরজার কাছে, বুঝিয়ে বলল মিঙ। লাইনের শেষ মাথায় ট্রাক দাঁড়ায়, তাতে বোঝাই করা হয় জালা। লাইনের ওপর দিয়ে ফ্ল্যাটকার ঠেলে আনা খুবই সহজ, পরিশ্রম খুবই কম হয়, যত ভারি বোঝাই থাকুক না কেন।
বুঝলাম, হাত তুলল মুসা। কথা আর না বাড়িয়ে আগে পেট ঠাণ্ডা করে নিলে কেমন হয়?
পাথরের দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসল মুসা আর রবিন, মিঙ বসল তাদের মুখোমুখি। লাঞ্চ প্যাকেট খুলল। মাত্র কয়েক ফুট দূরে, দরজার বাইরে অপরাষ্ট্রের

কড়া রোদ, তীব্র; গরম, অথচ গুহার ভেতরে এখানে বেশ ঠাণ্ডা, যেন এয়ারকুলার লাগানো রয়েছে।
খেতে খেতেই মাঝে মাঝে চোখ তুলে তাকাচ্ছে ওরা, পুরানো প্রেসিং হাউসটা দেখা যাচ্ছে এখান থেকে, কিন্তু ওখান থেকে কেউ দেখতে পাবে না ওদেরকে।
খাওয়া শেষ। হাত-পা ছড়িয়ে আরামে বসে বিশ্রাম নিচ্ছে ওরা। নিজের জীবনের কথা বলছে মিঙ। কয়েকটা পুরানো গাড়ি এসে থামল পুরানো প্রেসিং হাউসের কয়েকশো গজ দূরে, নতুন প্রেসিং হাউসের সামনে।
জনা ছয়েক লোক নামল গাড়ি থেকে, সব কজনের বিশাল শরীর, শক্তিশালী। এক জায়গায় জমা হলো ওরা। কোন কিছুর অপেক্ষা করছে মনে হচ্ছে।
চুপ হয়ে গেছে মিঙ। ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। দাঁড়িয়ে রয়েছে। কেন? এমনিতেই লোক কম, আঙুর তোলা শুরু করছে না কেন?
মরিসনের জীপ এসে থামল লোকগুলোর পাশে, লাফ দিয়ে নামল বিশালদেহী ফোরম্যান। প্রেসিং হাউসের দিকে চলল, তাকে অনুসরণ করল ছয়জন। সবাই ঢোকার পর দরজা বন্ধ করে দিল।
মেশিন চালাবে বোধহয়, বিড়বিড় করল মিঙ। তার ব্যাপার, যা খুশি কর.গে। লোকটাকে পছন্দ করি না, কিন্তু কাজ বোঝে। শ্রমিক সামলাতে তার জুড়ি কম। দুর্ব্যবহারও করে। কনুইয়ে ভর দিয়ে কাত হয়ে আছে সে, রবিন আর মুসার দিকে তাকাল। খনির সুড়ঙ-টুড়ঙ দেখার ইচ্ছে আছে?
আছে, জানাল দুই গোয়েন্দা। কোমরের বেল্টে ঝোলানো টর্চ খুলে নিল। তাড়াহুড়ো করে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে আলগা পাথরে পা পিছলাল মুসা, পতন ঠেকাতে গিয়ে হাত থেকে ছুটে গেল টর্চ, পাথুরে মেঝেতে পড়ে ঝনঝন শব্দ তুলল।
টর্চটা কুড়িয়ে নিয়ে রবিনের টর্চের আলোয় দেখল, কাঁচ আর বা ভেঙে গেছে! ইয়াল্লা। গেছে আমার টর্চ।
দুটোতেই চলবে, বলল মিঙ, তবে... প্রেসিং হাউসের কাছে দাঁড়ানো জীপটার দিকে তাকাল, তবে, ইচ্ছে করলে মরিসনের টর্চটা নিতে পারি। গতরাতে যেটা ধার দিয়েছিল আমাকে। তার টুলবক্সে অন্যান্য যন্ত্রপাতির সঙ্গে রাখে। রাতের আগে ফেরত দিলেই চলবে। তোমরা থাকো, আমি গিয়ে নিয়ে আসি।
বাধা দিয়ে মুসা বলল, তুমি থাকো, আমিই যাই। আমি ভেঙেছি, আনার দায়িত্ব আমার।
কি ভাবল মিঙ, মাথা কাত করল, ঠিক আছে। নোটবুক বের করে পাতা ছিঁড়ে তাতে নোট লিখল মরিসনকে, টর্চটা ধার নিচ্ছি। রাতের আগে ফেরত দেব।-মিঙ। কাগজটা মুসার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল। কাজের সময় বিরক্ত করা পছন্দ করে

না সে। এই নোটটা টুলবক্সে রেখে এসো। যন্ত্রপাতি সব কোম্পানির, আমি লিখে দিয়েছি, কিছু মনে করার নেই তার।
ঘোড়ায় চড়ে চষা খেতের ওপর দিয়ে চলল মুসা। দুই মিনিটেই পৌঁছে গেল জীপের কাছে। খেয়েদেয়ে আর বিশ্রাম নিয়ে আবার তাজা হয়ে উঠেছে ঘোটকী, চঞ্চলতা বেড়েছে, সামলাতে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে মুসার। নেমে রাশ ধরে রাখল শক্ত হাতে। আরেক হাতে খুলল জীপে রাখা টুলবক্সের ডালা। টর্চটা দেখা যাচ্ছে না। কয়েকটা যন্ত্রপাতি সরাতেই পাওয়া গেল ওটা, বাক্সের এক কোণে লুকিয়ে ছিল। তুলে নিল। পুরানো ধাচের বড় ভারি জিনিস, কালো প্লাস্টিকের খোল, পেছনে। রিঙ বা লুপ জাতীয় কিছু নেই কোমরে ঝোলানোর জন্যে, অগত্যা কোমরের বেল্টের ভেতর গুঁজে রাখল সেটা।
নোটটা বাক্সে রাখল, ডালা তোলাই রইল, যাতে এসে প্রথমেই কাগজটা চোখে পড়ে মরিসনের। অনেক কায়দা-কসরত করতে হলো ঘোড়ায় চড়তে, কিছুতেই পিঠে নিতে চাইছে না ঘোটকী।
বড় জোর একশো গজ এসেছে, এই সময় পেছনে চিৎকার শুনতে পেল মুসা। ফিরে তাকাল। জীপের কাছে দাঁড়িয়ে জোরে জোরে হাত নাড়ছে মরিসন, চেঁচামেচি করছে। টর্চটা দেখাল মুসা, ইঙ্গিত বোঝাতে চাইল নোট রয়েছে টুলবক্সে, ঘোড়া থামাল না।
লাফিয়ে জীপে উঠল মরিসন। চিৎকার শুনে প্রেসিং হাউস থেকে অন্য লোকগুলো বেরিয়ে এসেছে, দেখছে। আঙুরের ঝোঁপ দলে খেত মাড়িয়েই ছুটে আসতে লাগল জীপ। দরজা দিয়ে মুখ বের করে চিৎকার করছে ফোরম্যান, হাত নেড়ে থামার ইঙ্গিত করছে মুসাকে।
থামতে চাইছে মুসা, কিন্তু ঘোটকী কথা শুনছে না। চেঁচামেচিতে অস্বস্তি বোধ করছে বোধহয়। আরে থাম থাম! রাশ টেনে ধরল সে।
কাছে এসে থামল জীপ। খানিকটা পাশে সরে গেল ঘোটকী। বন্দুকের নল থেকে গুলির মত ছিটকে বেরিয়ে দৌড়ে এল মরিসন। চোর! চোর কোথাকার! ছাল ছাড়াব... রাগে বাক্য শেষ করতে পারল না, মুখে আটকে গেল।
ঘোটকী বোধহয় ভাবল, তাকেই গাল দিচ্ছে লোকটা, মারতে আসছে, আকাশমুখী বিরাট এক লাফ মারল। আরেকটু হলেই পড়ে গিয়েছিল মুসা, খপ করে চেপে ধরল জিনের সামনের উঁচু শক্ত মাথাটা।
আবার চেঁচিয়ে উঠল মরিসন।
ঘাবড়ে গিয়ে ছুট লাগাল ঘোটকী, আঙুরের ঝোঁপ দলে দৌড় দিল পাহাড়ের ঢালের দিকে, অনেক চেষ্টা করেও থামাতে পারল না মুসা। কি আর করবে? দুহাঁটু

ঘোড়ার পেটের সঙ্গে চেপে রেখে, জিন আর রাশ একই সঙ্গে আঁকড়ে ধরে কোনমতে জানোয়ারটার পিঠে উপুড় হয়ে রইল সে।
দূর থেকেই দেখতে পেল মুসা, পাহাড়ের ঢালে সরু একটা পথ উঠে গেছে, বেশ খাড়া। সোজা সেই পথে এসে উঠল ঘোটকী। গতি সামান্য কমল, এই সুযোগে আরেকটু শক্ত হয়ে বসল মুসা। পড়ে যাওয়ার যথেষ্ট ঝুঁকি নিয়ে ফিরে তাকাল একবার। জীপ নিয়ে তাড়া করে আসছে মরিসন। উঁচুনিচু খেতের ওপর দিয়ে সাংঘাতিক ঝাঁকি খেতে খেতে আসছে গাড়ি।
পাহাড়ী পথের গোড়ায় এসে থেমে গেল জীপ। লাফিয়ে নামল মরিসন, ঘুসি পাকিয়ে হাত কঁকাতে লাগল মুসার দিকে।
রবিন আর মিঙকে বেরোতে দেখল মুসা। ঘোড়ায় চড়ল ওরা তাড়াহুড়ো করে, মুসার দিকে ছুটে আসতে শুরু করল। মরিসন আর তার জীপের পাশ কাটিয়ে ছুটে এল দ্রুত গতিতে, মিঙ আগে, রবিন পেছনে। সাংঘাতিক জোরে ছুটছে মিঙের কালো কোল্ট, মুসার ঘোটকীর সঙ্গে দূরত্ব কমছে।
একটা পাথরের পাশ কাটাতে গিয়ে জোরে মোচড় খেলো ঘোটকীর শরীর, কোনমতে দ্বিতীয়বার পতন রোধ করল মুসা। একটা মোটামুটি সমতল জায়গায় এসে আবার গতি বাড়াল ঘোড়া। পেছনে খুরের শব্দ শোনা যাচ্ছে। খানিক পরেই মুসার পাশাপাশি হলো মিঙ। ঘোটকীর রাশ ছেড়ে দিয়েছে মুসা, বাতাসে উড়ছে ওটা, হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলল মিঙ। কোল্টের গতি কমাল ধীরে ধীরে, টানের চোটে ঘোটকীও গতি কমাতে বাধ্য হলো। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে পড়ল দুটো ঘোড়া, নাক প্রসারিত, জোরে জোরে শ্বাস টানছে, চামড়া ঘামে ভেজা।
ধন্যবাদ, মিঙ, হাঁপাতে হাঁপাতে বলল মুসা। আমি তো ভয় পাচ্ছিলাম, পাহাড়ের চূড়া থেকে নিচে ঝাঁপিয়ে পড়বে বুঝি ঘোটকীর বাচ্চা।
অদ্ভুত দৃষ্টিতে মুসার দিকে চেয়ে আছে মিঙ।
কি ব্যাপার? অমন করে দেখছ কেন?
ভাবছি, মিঙ বলল, তোমার ঘোড়াকে তাড়া করল কেন মরিসন?
কি জানি! চেঁচামেচি শুরু করে দিল। চোর বলে গাল দিল। ভীষণ রেগেছে।
আসার সময় দেখলাম, ইবলিসের চেহারা হয়ে গেছে। রাগে হাত-পা ছুঁড়ছে। পকেটে রিভলভার আছে, র‍্যাটল সাপ মারার জন্যে দিয়েছে দাদীমা, ওটা প্রায় বের করে ফেলেছিল।
বুঝতে পারছি না, মাথা চুলকাল মুসা। পুরানো একটা টর্চের জন্যে এই কাণ্ড কেন করল? বেল্টে গোঁজা কালো জিনিসটা টেনে খুলে দেখল।
টর্চটার দিকে তাকিয়ে রইল মিঙ। ওটা...ওটা মরিসনের টর্চ নয়, চেঁচিয়ে উঠল সে। মানে, টুলবক্সে কখনও দেখিনি এটা। গতরাতে আরেকটা দিয়েছিল।

আমি এটাই পেয়েছি। আর কোন টর্চ দেখিনি। তুমি বললে বলেই নিলাম...ও এমন আচরণ করবে জানলে...
ভুলই করেছি, বাধা দিয়ে বলল মিঙ। দেখি? হাত বাড়াল সে।
টর্চটা দিল মুসা। হাতে নিয়ে দেখল মিঙ, ওজন আন্দাজ করল। হালকা। ভেতরে বোধহয় ব্যাটারি নেই।
তাহলে তো কোন কাজে আসছে না, দারুণ বিরক্ত শোনাল মুসার কণ্ঠ। এমন একটা জিনিসের জন্যে এই কাণ্ড করল মরিসন? কেন?
হয়তো... রবিনকে দেখে থেমে গেল মিঙ।
টলোমলো পায়ে কাছে এসে দাঁড়াল রবিনের নড়বড়ে বুড়ো ঘোড়া। ফেস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়ছে, ঘোড়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়েই যেন হাঁপাচ্ছে রবিন। উফ বেঁচেছি। আরেকটু হলেই গেছিলাম। একবার তো মনে হলো, হাঁটু ভেঙে আমাকে নিয়েই গড়িয়ে পড়বে ঘোড়া।...কি ব্যাপার? কিছু হয়েছে?
এত রাগল কেন মরিসন, তাই ভাবছি, বলতে বলতে পঁাচ ঘুরিয়ে টর্চের পেছনের ক্যাপ খুলে ফেলল মিঙ। ভেতরে আঙুল ঢুকিয়ে বের করে আনল তুলট কাগজের ছোট একটা প্যাকেট। হাতের তালুতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। খুলল সাবধানে।
গোস্ট পার্লস! ভেতরের জিনিসটা দেখে চেঁচিয়ে উঠল মুসা।
মরিসন চুরি করেছিল! রবিনও চেঁচাল।
ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বসল মিঙের। তাই তো মনে হচ্ছে। টর্চের ভেতর। বাহ, চমৎকার বুদ্ধি। পুরানো যন্ত্রপাতির বাক্সে বাতিল টর্চ, কেউ সন্দেহ করবে না। জীপের ভেতর নিয়েই ঘুরে বেড়াচ্ছিল, কাছছাড়া করার ঝুঁকি নেয়নি।
হুঁ, ভাল জায়গায়ই লুকিয়েছিল, বলল রবিন। আমাদের হঠাৎ টর্চের দরকার হবে, কল্পনাও করেনি।
ভাবছি, প্রেসিং হাউসে লোকগুলোকে নিয়ে কি করছিল? মিঙের কণ্ঠে অস্বস্তি।
এখন তো অনেক কিছুই সন্দেহ হচ্ছে। এই যে একের পর এক দুর্ঘটনা, পিপা ফুটো হওয়া, মেশিন ভেঙে যাওয়া, এসবে তার কোন হাত নেই তো?
থাকতেও পারে। চলো, তোমার দাদীমাকে গিয়ে সব খুলে বলি। শেরিফকে ডেকে এনে মরিসনকে ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবেন।
যত সহজ ভাবছ তত সহজ হবে না, ধীরে ধীরে বলল মিঙ। মরিসন ডেনজারাস লোক। মরিয়া হয়ে উঠলে কি করবে বলা যায় না। আমাদের এখন বাড়ি ফিরতে দিলে হয়।
কি করবে? উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল রবিন।

সরাসরি না বলে ঘুরিয়ে বলল মিঙ, দেখা যাক কি করে? রবিন, তুমি ঘোড়াগুলো রাখো। আমি আর মুসা গিয়ে উঁকি মেরে দেখে আসি, নিচে কি হচ্ছে।
তিনটে রাশ হাতে নিয়ে ঘোড়ার পিঠে বসে রইল রবিন।
মিঙ আর মুসা ফিরে চলল, যেদিক থেকে এসেছে, সেদিকে।
সমতল জায়গাটার কিনারে এসে ঝুঁকে নিচে তাকাল। পথের গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে দুজন লোক, পাহারায় রয়েছে যেন। আঁকি খেতে খেতে গায়ের দিকে ছুটে যাচ্ছে জীপটা। প্রেসিং হাউসের কাছে দাঁড়ানো দুটো পুরানো গাড়ি স্টার্ট নিয়ে এগিয়ে এল খেতের ওপর দিয়ে, পাহাড়ী পথটাই বোধহয় লক্ষ্য।
সরু পাহাড়ী পথের কয়েকগজ ওপরে এসে থেমে দাঁড়াল আগের গাড়িটা, পেছনেরটা আড়াআড়িভাবে থামল পথের ঠিক গোড়ায়। উদ্দেশ্য বোঝা গেল, পথ রোধ করেছে। ঘোড়া নিয়ে গাড়ি দুটোকে এড়িয়ে যাওয়া যাবে না, যেতে হলে। ডিঙিয়ে যেতে হবে, এবং সেটা সম্ভব নয়-আর কোন উপায় নেই!
দম আটকে আসছে যেন মিঙের। নিচু গলায় বলল, ঘোড়ার জন্যে গেছে। মরিসন। আমরা যাতে পালাতে না পারি, সেজন্যে লোকগুলোকে রেখে গেছে।
তারমানে ফাঁদে ফেলেছে?
তাছাড়া আর কি? ওপথে ফিরে যেতে পারব না আমরা, এগিয়ে গিয়ে উল্টো পাশে হয়তো নামতে পারব, কিন্তু সহজ হবে না। নিচে হ্যাঁশনাইফ ক্যানিয়ন, গভীর একটা গিরিসঙ্কট, তা-ও বক্স ক্যানিয়ন। এক দিক রুদ্ধ, আরেক দিক খোলা। খোলা, দিক দিয়ে বেরোলে সরু একটা পথ পাওয়া যাবে, খুব খারাপ পথ, উঁচুনিচু, স্যান ফ্রানসিসকো যাওয়ার মেইন রোডের সঙ্গে গিয়ে মিশেছে।
কিন্তু ওপথ ধরে গেলেও বাঁচতে পারব না। সহজেই ধরে ফেলবে আমাদেরকে মরিসন। ইতিমধ্যেও ওই পথের শেষ মাথায় পাহারা পাঠিয়ে দিয়েছে কিনা কে জানে। নেকলেসটা ছিনিয়ে নেয়ার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠবে সে, জানা কথা।
কিন্তু এসব করে পার পাবে না, চেপে রাখা দম ফেলল মুসা। নেকলেসটা। নিয়ে নেবে, কিন্তু আমরা তো বলে দেব।
ওকথা ভাববে না মনে করেছ? মিঙের অস্বাভাবিক শান্ত কণ্ঠ ভয়ের ঠাণ্ডা স্রোত বইয়ে দিল মুসার শিরদাঁড়ায়। আমাদের মুখ বন্ধ করার ব্যবস্থা করবে। যারা যারা এখানে দেখেছে আমাদের, সব মরিসনের লোক, কেউ মুখ খুলবে না।
চুপ হয়ে গেল মুসা। গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। ঢোক গিলল।
এসো, মুসার হাত ধরে টানল মিঙ। হঠাৎ হাসি ফুটল মুখে, কালো চোখের তারা উজ্জ্বল। একটা ফন্দি এসেছে মাথায়। গাঁয়ে গিয়ে ঘোড়া নিয়ে ফিরতে মরিসনের সময় লাগবে। ওকে ফাঁকি দেব আমরা। জলদি করতে হবে। চলো।

দৌড়ে ফিরে এল ওরা। অধৈর্য হয়ে উঠেছে রবিন। ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে বলল, কি ব্যাপার?
ফাঁদে আটকেছে আমাদের, জানাল মুসা। নেকলেসটা ফেরত চায় মরিসন, সেইসাথে আমাদের মুখ বন্ধ করে দিতে চায়। লোকগুলো ওর সহকারী।
কিন্তু ওকে বোকা বানাব আমরা, আশ্বাস দিল মিঙ। পাহাড়ের চূড়া লম্বালম্বি এগিয়ে গেছে, চূড়ার ওপর দিয়েই বক্স ক্যানিয়নের পাশ কেটে চলে যাব, তারপর নামব। আরেকটা গিরিপথ আছে।
ঘোড়ায় চাপল আবার তিনজনে। আস্তে আস্তে চলল মিঙ, ঘোড়াগুলোকে ক্লান্ত করতে চায় না। তার পেছনে রইল রবিন, সবার পেছনে মুসা। তরুণ কোল্টের কোনরকম আড়ষ্টতা নেই, স্বচ্ছন্দে এগিয়ে চলেছে, কিন্তু নড়বড়ে বুড়িটার নড়ার ইচ্ছে নেই, খালি, দাঁড়িয়ে পড়তে চাইছে! মুসার তরুণীর মেজাজ মর্জিও বিশেষ সুবিধের নয়। যে-কোন মুহূর্তে অঘটন ঘটিয়ে ফেলতে পারে। তবু বাধ্য হয়ে ওগুলোতে চড়েই এগোতে হলো ওদের, যা পথ, পায়ে হাঁটা সম্ভব না।
যা-ই হোক, নিরাপদেই আধ ঘণ্টা পর পাথুরে গিরিপথে এসে নামল ওরা।
হ্যাশনাইফ ক্যানিয়ন থেকে বেরিয়ে ওদিকে গেছে পথটা, হাত তুলে দেখাল। মিঙ। মরিসনের ধারণা ওই পথ ধরে গিয়ে হাইওয়েতে উঠব আমরা। আসলে করব উল্টোটা। ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিল সে, চলতে শুরু করল সঙ্কীর্ণ গিরিপথ ধরে। দুপাশে পাহাড়ের খাড়া দেয়াল। মাথার ওপরে আকাশের একটা অংশ শুধু দেখা যায়।
দুটো হলুদ পাথরের দেখা পেলে এখন হয়, বলল মিঙ, চিহ্ন। গিরিপথ থেকে বিশ ফুট ওপরে একটা, আরেকটা তার ওপরে।
মিনিট দশেক একটানা চলল ওরা। তিনজনের মাঝে দৃষ্টিশক্তি বেশি তীক্ষ্ণ মুসার, সে-ই আগে দেখল পাথর দুটো। হাত তুলে বলল, ওই দুটো?
মাথা ঝাঁকাল মিঙ। পাথর দুটোর নিচে এসে ঘোড়া থেকে নামল। নামমা।
দুই গোয়েন্দাও নামল। তাদেরকে অবাক করে দিয়ে ঘোড়াগুলোর গায়ে চাপড় মেরে বসল মিঙ। চমকে উঠে পেছন ফিরে দৌড়াতে শুরু করল কোল্ট, অন্য দুটো অনুসরণ করল তাকে।
হাঁটতে হবে এখন, বলল মিঙ। দরকার পড়লে ক্রলও করতে হতে পারে। গিরিপথ ওদিকে বন্ধ, পেছনে দেখাল সে। এক জায়গায় ছোট একটা ডোবা আছে। পানির গন্ধ শুঁকে এগিয়ে যাবে ঘোড়াগুলো, পানি খেয়ে বিশ্রাম করবে ওটার পাড়েই। মরিসন যখন বুঝতে পারবে আমরা তাকে ফাঁকি দিয়েছি, খুঁজতে আসবে, ঘোড়াগুলো দেখবে, আমরা তখন কয়েক ঘণ্টার পথ দূরে। ওপর দিকে তাকাল। সে। ওখান দিয়ে একটা পথ গেছে জানি, অনেকটাই মুছে দিয়েছে পাথরের ধস।

আমাদের জন্যে সুবিধেই। আশা করি উঠতে পারব ওখানে, প্রথম হলুদ পাথরটা দেখল সে।
এ পাথরের খাঁজে খাঁজে হাত-পায়ের আঙুল বাধিয়ে উঠতে শুরু করল মিঙ। তাকে অনুসরণ করল রবিন। তার নিচে মুসা। এসব ব্যাপারে সে ওস্তাদ। নিজে তো উঠছেই, মাঝেমধ্যে নিচ থেকে ঠেলে উঠতে সাহায্য করছে রবিনকেও। দুই মিনিটেই উঠে এল ওরা হলুদ পাথরের কাছে। তাজ্জব হয়ে দেখল দুই গোয়েন্দা, দুটো পাথরের মাঝে একটা বড় ফোকর। দ্বিতীয় পাথরটা আসলে ছাত সৃষ্টি করে রেখেছে গর্তের মুখে, বেশির ভাগটাই পাহাড়ের গা থেকে বেরিয়ে প্রায় ঝুলে রয়েছে শূন্যে।
গুহা, বলল মিঙ। অনেক বছর আগে এক খনি-শ্রমিক স্বর্ণের লোভে খুঁজতে শুরু করে একাই। সুড়ঙ্গ কেটে ঢুকে যায় ভেতরে। ওখানেই ঢুকব আমরা।
সুড়ঙ্গে নেমে গেল মিঙ। পেছনে নামল রবিন আর মুসা। গাঢ় অন্ধকারে এগিয়ে চলল অন্ধের মত। কিছুই জানে না কোথায় যাচ্ছে, কি আছে সামনে।
গুহার শেষ প্রান্তে নিয়ে এল দুজনকে মিঙ। টর্চের আলোয় দেখা গেল বেশ বড় গুহা। এক জায়গায় একটা সুড়ঙ্গমুখ, আসলে পুরানো খনির গ্যালারি, বহু বছর আগে খোঁড়া হয়েছিল। জায়গায় জায়গায় এখনও ছাত ঠেকা দিয়ে রেখেছে পুরানো। কাঠের থাম, তবুও বেশ কিছু পাথর খসে পড়েছে ছাত থেকে।
আমার প্ল্যান শোনো, বলল মিঙ। আরও অনেক গ্যালারি আছে এই পাহাড়ের নিচে। প্রথম যখন এসেছিলাম, দেখে তাজ্জব হয়ে গিয়েছিলাম। এক বুড়ো আছে, ন্যাট বারুচ, এখানকার প্রতিটি ইঞ্চি চেনা তার। সারাটা জীবন এসব খনিতেই কাটিয়েছে, সোনা খুঁজেছে, মাঝে মাঝেই পেয়েছে ছোটখাটো টুকরো।
বুড়ো এখন হাসপাতালে। বারুচই চিনিয়েছে আমাকে খনিগুলো। এই গুহা থেকে একটা সুড়ঙ্গ চলে গেছে একেবারে সেই গুহাটায়, যেখানে মদ চোলাই করা হয়। যেটাতে বসে খেয়েছি আমরা খানিক আগে।
সেরেছে! তাই নাকি? চেঁচিয়ে উঠল মুসা। গুহার দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়ে বেশি করে কানে বাজল সে আওয়াজ। কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে ফেলল সে। তারমানে পাহাড়ের ভেতর দিয়ে যাচ্ছি আমরা? বাহ, কি মজা। ওপরে আমাদেরকে খুঁজছে মরিসন, ঘুণাক্ষরেও ভাবছে না আমরা তার নিচেই রয়েছি।
ঠিক তাই, সায় দিল মিঙ। এভাবেই বাড়ির মাইলখানেকের মধ্যে পৌঁছে যাব আমরা, ওদের অলক্ষ্যে। গুহামুখে পাহারা রাখার কথা ভাববে না ওরা, সুযোগটা নেব আমরা। ওখান দিয়ে বেরিয়ে এক দৌড়ে বাড়ি চলে যাব। তারপর আর ঠেকায় কে? দেব মরিসনের কীর্তি ফাঁস করে।

মুক্তির কথা ভেবে আনন্দিত হলো রবিন, কিন্তু অন্ধকার সুড়ঙ্গ ধরে এতখানি যেতে হবে ভাবতেই কেমন জানি লাগছে। যদি আটকে যায়? যদি পাথর পড়ে সামনের পথ বন্ধ হয়ে গিয়ে থাকে? কিংবা যদি পথ হারায় মিঙ? তাহলে হয়তো আর কোন দিনই বেরোতে পারবে না মাটির তলার এই গোলকধাঁধা থেকে। পকেটে হাত ঢুকিয়ে সবুজ চকের অস্তিত্ব অনুভব করল সে।

চিহ্ন রেখে যাব নাকি? বলল রবিন। তাহলে পথ হারালেও চিহ্ন দেখে আবার ফিরে আসতে পারব।

হারাব না, দৃঢ়কণ্ঠে বলল, মিঙ। যদি মরিসন এসে ঢোকে এখানে? চিহ্ন দেখে সব বুঝে গিয়ে আমাদের পিছু নেয়? না, ওসবের দরকার নেই।

নিজের ওপর প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস মিঙের। কিন্তু রবিন জানে, মানুষ যা আশা করে না, তাই ঘটে যায় অনেক সময়।

মুসা রবিনের সঙ্গে একমত। বলল, আমরা এমন চিহ্ন রেখে যাব খেয়ালই করবে না মরিসন। দেয়ালে চক দিয়ে আশ্চর্যবোধক একে দেব, মাঝে মাঝে তীরচিহ্ন আঁকব, একেকবার একেক দিকে মুখ করে, কেউ বুঝবেই না আমরা কোন দিকে গেছি। আশ্চর্যবোধকগুলোকে গুরুত্ব দেবে না, তীরচিহ্ন ধরে একবার এদিক যাবে, একবার ওদিক, ঘুরে মরবে শুধু শুধু।

তা করা যেতে পারে, মাথা দোলাল মিঙ। তবে এত ভাবনার কিছু নেই। এদিককার খনিগুলো চেনে না মরিসন, জানে না মদ চোলাইয়ের গুহাটার সঙ্গে যে এই গুহার যোগাযোগ আছে। হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ, হুঁশিয়ার থাকা ভাল। বলা তো যায়, যদি হারিয়ে যাই? তবে এই সুড়ঙ্গের মুখে চিহ্ন দেয়া চলবে না, তাহলে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হবে কোন্টাতে ঢুকেছি আমরা। ভেতরে ঢুকে তারপর চিহ্ন দেয়া শুরু করব।

সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়ল ওরা। সরু পথ, মাঝে মাঝে ছাত এত নেমে এসেছে, মাথা ঠেকে যায়, নিচু হয়ে চলতে হয়। কোথাও কোথাও সুড়ঙ্গটাকে ভেদ করে আড়াআড়িভাবে চলে গেছে আরও সুড়ঙ্গ, কিংবা মূল সুড়ঙ্গ থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে শাখা-সুড়ঙ্গ। ওই সব সুড়ঙ্গমুখে উল্টো পাল্টা তীর চিহ্ন এঁকে দিচ্ছে। রবিন, যেটা ধরে যাচ্ছে, সেটার মাঝে মাঝে দেয়ালে আশ্চর্যবোধক আঁকছে, একবার। এপাশের দেয়ালে, একবার ওপাশের। এমনভাবে আকছে, দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে যাবে যে কেউ, ওরা নিজেরা বাদে।

একটা জায়গায় খুব সঙ্কীর্ণ হয়ে এল সুড়ঙ্গ, তার ওপর পাথর ধসে পথ প্রায় রুদ্ধ। থামতে বলল মিঙ। ক্রল করে যেতে হবে। আমি আগে যাই। কোমরের বেল্টে গোঁজা কালো টর্চটা, যেটাতে নেকলেস ভরা আছে, সেটা টেনে খুলে মুসার হাতে

গুঁজে দিল সে। এটা তোমার কাছে রাখো। পাথর আর মাটি সরিয়ে পথ করে নিতে হতে পারে। হারানোর ভয় আছে। যত্ন করে রাখো।
মুসাও কোমরের বেল্টের ভেতর গুঁজে রাখল টর্চটা, বাকলস আরও টাইট করে দিল, যাতে পড়ে না যেতে পারে মহামূল্যবান জিনিসটা। আমার হাতে আরেকটা টর্চ থাকলে ভাল হত।
তা হত, স্বীকার করল মিঙ। দুটো আছে, এই অন্ধকারে আরেকটা থাকলে কাজে লাগত। রবিন, এক কাজ করো না, তোমারটা দিয়ে দাও মুসাকে। তুমি আমার পেছনে থাকো, তাহলে তোমার আর টর্চের দরকার পড়বে না। কি বলো?
মাথা কাত করল বটে রবিন, কিন্তু মনে মনে মেনে নিতে পারছে না ব্যাপারটা। এই অন্ধকারে সবচেয়ে যেটা বেশি দরকার, সেটা আলো। কিন্তু অযৌক্তিক কথা বলেনি মিঙ, মুসার হাতে টর্চটা দিল রবিন। তারপর মিঙের পেছনে ক্রল করতে গিয়ে বুঝল, ঠিক কাজই করেছে। হাতে কিছু না থাকায় কাজটা সহজ হয়ে গেছে তার জন্যে।
সুড়ঙ্গের সরু অংশটা বড় জোর শখানেক গজ লম্বা, অথচ এটুকু পেরোতেই ওদের মনে হলো অসীম পথ, শেষ আর হতে চায় না। ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগিয়ে চলেছে ওরা। রবিন আর মুসার অবস্থা যেমন তেমন, মিঙের অবস্থা কাহিল। সামনের পাথর দুহাতে সরিয়ে পথ করে নিতে হচ্ছে তাকে। ধারাল পাথরে লেগে চামড়া কেটে রক্তাক্ত হয়ে গেছে হাত।
দাঁড়িয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে রবিনের। কিন্তু সোজা হয়ে বসারই উপায় নেই, দাঁড়াবে কিভাবে? একবার সেটা করতে গিয়ে অল্পের জন্যে বেঁচেছে। চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে উঠতে চেয়েছিল, তাতেই বিপত্তি, কাঁধের ধাক্কায় ধসে পড়ল ছাতের আলগা পাথর, ঝরঝর করে পড়ে প্রায় ঢেকে দিল রবিনকে। আটকে গেল সে, নড়তে পারল না, পেছন থেকে এসে অনেক কষ্টে পাথর সরিয়ে তাকে মুক্ত করল মুসা।
ধন্যবাদ, হাঁপাতে হাঁপাতে বলল আতঙ্কিত রবিন। আর দাঁড়ানোর চেষ্টা নয়।
অবশেষে চওড়া হতে শুরু করল সুড়ঙ্গ। দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসে হাপাতে লাগল ওরা। টর্চের আলোয় দেখা গেল, ছাতের কাঠের কড়িবর্গা পাথরের চাপে বাঁকা হয়ে গেছে, একটুখানি ঠেলা বা ধাক্কা লাগলেই ধসে পড়তে পারে। তাহলে পাথরের তলায় জ্যান্ত কবর হয়ে যাবে ওদের।।
খানিকক্ষণ একইভাবে বসে জিরিয়ে নেয়ার পর বলল মিঙ, সবচেয়ে খারাপ জায়গাটা পেরিয়ে এসেছি। সামনে আরেকটা আছে, তবে পেছনের মত এত খারাপ নয়। ওটা পেরোতে পারলেই... হাসল সে। একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে

গেলাম। ওই পথে আমাদের পিছু নিতে পারবে না মরিসন, ওই সুড়ঙ্গে জায়গাই হবে না তার, গলে বেরিয়ে আসতে পারবে না, আটকে যাবে।
বিশ্রাম নিতে নিতে খনির ইতিহাস বলল মিঙ। আঠারোশো ঊনপঞ্চাশ সালে ক্যালিফোর্নিয়ায় যখন স্বর্ণ আবিষ্কার হয়, তখন খোঁড়া শুরু হয় এই খনি। শুরুর দিকে সহজেই সোনা মিলতে লাগল, ফুরিয়ে আসার পর বেশির ভাগ শ্রমিকই চলে গেল অন্যত্র, কিন্তু কেউ কেউ রয়ে গেল, ওরা বেশি পরিশ্রমী। পাহাড়ের তলায় খুঁড়ে খুঁড়ে সুড়ঙ্গের জাল বানিয়ে ফেলল।
ভারড্যান্ট ভ্যালিতে তার আগে থেকেই আঙুরের চাষ হত। তারও অনেক পরে ওখানে আঙুরের খেত কিনলেন মিস দিনারা কৌনের মা।
তিরিশের দশকের পরেও টিকে ছিল কিছু কিছু খনিশ্রমিক, তারপর উনিশশো চল্লিশে আর সোনা পাওয়া গেল না, একে একে চলে গেল যারা তখনও ছিল। কেউ কেউ খনি খোঁড়া বাদ দিয়ে আঙুরের ফার্মে কাজ নিল।
এখন আর সোনা আছে? জিজ্ঞেস করল রবিন।
আছে, খুব অল্প। তবে সেটা তুলতে খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি বলে কেউ আর এগিয়ে আসছে না, বলল মিঙ। জিরানো হয়েছে। চলো যাই।
আবার এগোনোর পালা। দেয়ালে আশ্চর্যবোধক আর তীর চিহ্ন এঁকে চলল রবিন।
একটা জায়গায় এসে থমকে গেল মিঙ। কয়েকটা সুড়ঙ্গ এক জায়গায় মিলিত হয়েছে মূল সুড়ঙ্গের সঙ্গে। কোষ্টা দিয়ে যেতে হবে, ভুলে গেছে সে। অবশেষে ভানের, একটা সুড়ঙ্গ বেছে নিয়ে তাতে ঢুকে পড়ল। কিন্তু ভুল করেছে। তিনশো গজ গিয়ে সরু হতে হতে মিলিয়ে গেছে সুড়ঙ্গ।
ভুল পথে এসেছি, টর্চের আলো জ্বেলে দেখছে মিঙ। সুড়ঙ্গের মেঝেতে এক জায়গায় আলো ফেলে চেঁচিয়ে উঠল, দেখো দেখো।
দেখল রবিন আর মুসা। আলোয় মৃদু চকচক করছে শাদা হাড়। প্রথমে মনে। হলো, মানুষের হাড়। কিন্তু ভাল মত দেখে বুঝল, কোন জানোয়ারের, বোধহয় আটকা পড়ে গিয়েছিল এখানে, ঢুকে কোন কারণে আর বেরোতে পারেনি, ক্ষুধাতৃষ্ণায় মরেছে।
গাধার হাড়, মিঙ বলল। মাল বওয়ার জন্যে নিয়ে আসা হত। হয়তো ধস নেমে পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, বেরোতে আর পারেনি অসহায় জানোয়ারটা। লোকটার কি হয়েছিল কে জানে।
গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল রবিনের। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে প্রবল হয়ে উঠল।

আবার আগের জায়গায় ফিরে এল ওরা। এবার সঠিক পথ বেছে নিল মিঙ। এগিয়ে চলল। আরও অনেক সুড়ঙ্গ উপসুড়ঙ্গ পেরিয়ে একটা জায়গায় এসে থামল মিঙ। তার গায়ে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল রবিন। কি হলো?
গলা, জানাল মিঙ।
গলা? মুসা অবাক। কিসের গলা?
পাথরের মাঝের চিড়, খুব সরু আর রুক্ষ। প্রাকৃতিক। খনি আর গুহার সঙ্গে যোগাযোগ করে দিয়েছে।
ফাটলের মুখে আলো ফেলল মিঙ। ঠিকই বলেছে, খুবই সরু। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে ওর মধ্যে কোনমতে, কিন্তু সামনা-সামনি ঢুকতে পারবে না, পাশ থেকে ঢুকতে হবে। এটাই।
এর ভেতর দিয়ে যাওয়া যাবে? বিশ্বাস করতে পারছে না রবিন। শিওর? ওই সরু ফাটলে ঢোকার বিন্দুমাত্রও ইচ্ছে নেই তার।
শিওর, বলল মিঙ। আগেও গিয়েছি। মুখের কাছে এসে দেখো। বাতাস লাগছে না? বাইরে থেকে আসছে।
পরীক্ষা করে দেখল মুসা আর রবিন। ঠিকই। গালে ঝিরঝিরে বাতাসের স্পর্শ অনুভব করছে।
ওর মধ্য দিয়েই যেতে হবে আমাদের, আবার বলল মিঙ। আর কোন পথ নেই। আমরা এখনও গায়ে গতরে ছোট, তাই পারব। বড় কারও পক্ষে সম্ভব নয়। আমি আগে যাচ্ছি। তোমরা দাঁড়াও। ওপাশে গিয়ে তিনবার টর্চ জ্বেলে সঙ্কেত দেব, তারপর তোমরা আসবে। রবিন আসবে আগে। তারপর আবার তিনবার টর্চ জ্বাললে। মুসা আসবে। ঠিক আছে?
মাথা কাত করল দুই গোয়েন্দা।
ঢুকে গেল মিঙ। ডান হাতে টর্চ। খুব সাবধানে এক পা এক পা করে পাশে হেঁটে চলল। সামান্যতম বাড়তি নড়াচড়া করল না, কোনভাবে যদি কোন জায়গা থেকে এখন পাথর ধসে পড়ে, আর বেরোতে হবে না কোনদিন। ভয়ংকর পরিস্থিতি।
রবিনের মুখ কালো। মুসার বুক দুরদুর করছে। বার বার আলো ফেলে দেখছে। নিজের শরীর, তাকাচ্ছে সরু ফাটলটার দিকে, অনুমান করতে চাইছে, ফাটলে তার শরীর ঢুকবে কিনা। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে ফেলল, আর কখনও বেশি খাবে না, কোনমতে এখন এখান থেকে বেরোতে পারলে হয়, খাওয়া একেবারে কমিয়ে দেবে, যত লোভনীয় খাবারই সামনে থাকুক, প্রয়োজনের অতিরিক্ত ছোঁবেও না। আল্লাহ্ আল্লাহ্ করতে লাগল সে।
কতক্ষণ অপেক্ষা করে আছে ছেলেরা, বলতে পারবে না, মনে হলো অনন্তকাল ধরে ফাটলটার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। অবশেষে শেষ হলো প্রতীক্ষা, আলো

জ্বলল তিনবার। ওপাশে পৌঁছে গেছে মিঙ।
রবিন, যাও, দীর্ঘশ্বাস ফেলল মুসা। মিঙ যখন পেরেছে, তুমিও সহজেই পারবে। ওর চেয়ে তোমার শরীর অনেক ছোট, অনেক পাতলা। মুশকিল তো হবে। আমার।
অত ভেব না, সান্ত্বনা দিল রবিন। মিঙ যখন পেরেছে, তুমিও পারবে। ওর চেয়ে তুমি মোটা নও, একই রকম। বন্ধুকে বলছে বটে, কিন্তু তার নিজের গলাই শুকিয়ে কাঠ। ঢোক গিলল। আলো দেখাও।
পাশ ফিরে গলায় ঢুকে পড়ল রবিন। একেবারে মুখের কাছে দাঁড়িয়ে ভেতরে আলো ফেলল মুসা। অন্য পাশ থেকেও আলো আসছে, টর্চ জ্বেলে রেখেছে মিঙ, রবিনের শরীরের ফাঁক দিয়ে দেখতে পাচ্ছে মুসা সেই আলো।
এগিয়ে যাচ্ছে রবিন। একটা সময় ওপাশের আলো আর দেখতে পেল না মুসা, রবিনের শরীর একেবারে ঢেকে দিয়েছে আলো। আরও কয়েক মুহূর্ত আলো জ্বেলে রাখল মুসা, তারপর যখন বুঝল মিঙের কাছাকছি চলে গেছে রবিন, টর্চ নিভিয়ে দিল। অহেতুক ব্যাটারি খরচ করা উচিত নয় এখন।
আলোর সঙ্কেতের অপেক্ষায় রইল মুসা। কিন্তু কেন জানি দেরি হচ্ছে সঙ্কেত আসতে।
হঠাৎ শোনা গেল উত্তেজিত চিৎকার, মুসা-আ। খবরদার, এসো না…
মিঙের কণ্ঠ, থেমে গেল আচমকা, যেন মুখ চেপে ধরা হয়েছে তার।
কিন্তু কি বলতে চেয়েছে মিঙ, বুঝতে পেরেছে মুসা, তাকে না যেতে বলেছে। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সে। কিছুক্ষণ পর আলোর সঙ্কেত এল তিনবার, খানিক পরে আবার তিনবার। আলো দেখেই বোঝা গেছে, টর্চ ধরা হাতটা অস্থির। তাছাড়া রবিনকে ডাকার সময় প্রতিবারে যতক্ষণ করে আলো জ্বেলে রেখেছিল মিঙ, এখন তার চেয়ে কম সময় রেখেছে। এর মানে কি?
মিঙ বা রবিন আলোর সঙ্কেত দেয়নি, অন্য কেউ দিয়েছে।
তার মানে শত্রুর হাতে ধরা পড়েছে ওরা।
এই সময় মিস কৌনের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলছে কিশোর।
ওদের কোন খবর নেই, বাতাসে মিলিয়ে গেছে যেন। বললেন মিস কৌন। ঘোড়া নিয়ে গেছে। বলে গেছে, উপত্যকা ঘুরেফিরে দেখবে। সারাদিন আর পাত্তা নেই। এদিকে আমি পড়েছি এক মহা ঝামেলায়। রিপোর্টার, শেরিফ, ওদেরকে নিয়েই এত বেশি ব্যস্ত…। লোক পাঠিয়েছিলাম, অনেক খুঁজেছে। কিন্তু পাওয়া যায়নি ওদেরকে, এমনকি ঘোড়াগুলোও না।
কিন্তু গেল কোথায় ওরা? নিজেকেই প্রশ্ন করল কিশোর।

আমার মনে হয় খনিতে ঢুকেছে। পাহাড়ের তলায় অনেক সুড়ঙ্গ আছে, ঢুকে হয়তো আর বেরোতে পারছে না। ওখানে খুঁজতে লোক পাঠাচ্ছি।
নিচের ঠোঁটে একনাগাড়ে চিমটি কেটে চলেছে কিশোর। গোস্ট পার্ল চুরি গেছে, এখন তার বন্ধুরা নিখোঁজ। নিশ্চয়ই কোথাও একটা যোগসূত্র রয়েছে। বলল, অনেক লোক পাঠাচ্ছেন তো?
নিশ্চয়ই। শ্রমিক, যারা এখনও আছে, ভূতের ভয়ে পালায়নি, সব্বাইকে। এমনকি বাড়ির চাকর-বাকরও কয়েকজনকে পাঠাচ্ছি। ভারড্যান্ট ভ্যালির পরে যে মরুভূমি, সেখানেও পাঠিয়েছি কয়েকজনকে। তারা এখনও ফেরেনি।
যারা যাচ্ছে, তাদেরকে বলে দিন আশ্চর্যবোধক চিহ্ন খুঁজতে।
কি খুঁজতে?
আশ্চর্যবোধক চিহ্ন। খনির দেয়ালে আঁকা থাকতে পারে। পেলেই যেন আপনাকে জানায়।
কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না…
ফোনে ব্যাখ্যা করতে পারব না, বাধা দিয়ে বলল কিশোর। আমি আসছি। এয়ারপোর্টে গাড়ি পাঠাবেন, প্লীজ? সঙ্গে রবিনের বাবাকে নিয়ে আসার চেষ্টা করব।
হ্যাঁ হ্যাঁ, পাঠাব। ছেলেগুলোকে এখন ভালয় ভালয় ফিরে পেলে বাঁচি।
ধন্যবাদ জানিয়ে লাইন কেটে দিল কিশোর। তারপর রবিনের বাবাকে ফোন করল। বাড়িতেই পাওয়া গেল তাঁকে। সব শুনে কিশোরের সঙ্গে যেতে রাজি হয়ে গেলেন তিনি। বললেন, পত্রিকার একটা জরুরী কাজে বেরোচ্ছেন, এয়ারপোর্টে দেখা করবেন।
দ্রুত তৈরি হয়ে নিল কিশোর। বোরিসকে এসে জানাল মুসা আর রবিনের নিখোঁজ হওয়ার খবর। স্যালভিজ ইয়ার্ডের ভার তার ওপর দিয়ে রওনা হলো বিমানবন্দরে। বোরিসই ছোট ট্রাকটা নিয়ে তাকে প্লেনে তুলে দিয়ে আসতে চলল।
গাড়িতে বসে ভাবছে কিশোর। মিস দিনারা কৌন যত সহজ ভাবছেন, তত সহজে রবিন, মুসা আর মিঙকে পাওয়া যাবে বলে মনে হলো না তার।
কিশোরের অনুমান মিথ্যে নয়।
মদের বড় বড় দুটো জালায় ভরা হলো রবিন আর মিঙকে। ট্রাকে তুলে নিয়ে চলল মরিসন আর দলের লোকেরা। কোথায়, জানে না দুজনে।
গলার এপাশে অন্ধকার গুহায় থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ মুসা। বুঝতে পারছে, রবিন আর মিঙকে যারাই বন্দি করে থাকুক, তারা বড় মানুষ, ফাটলে ঢুকতে পারবে না, নইলে এতক্ষণে ঢুকে পড়ত। সে এখন কি করবে?

এখানে থেকে লাভ নেই। আবার হ্যাঁশনাইফ ক্যানিয়নে ফিরে গিয়ে কোথাও লুকিয়ে থাকতে হবে সকাল পর্যন্ত। তাদের খুঁজতে লোক নিশ্চয়ই পাঠাবেন মিস কৌন। তখন রবিন আর মিঙকে মুক্ত করার চেষ্টা করবে।
নেকলেস ভরা টর্চটা কোমরের বেল্টেই গোঁজা রয়েছে। তাতে হাত বোলাল মুসা। মনে মনে আল্লাহকে ডাকল: যেন হাতের টর্চটার ব্যাটারি না ফুরোয়, অন্তত সে না বেরোনোর আগে।
রবিনের কথা এইবার ফলল, কাজে লাগল চিহ্ন। সবুজ চকে আঁকা চিহ্ন ধরে ধরে ফিরে চলল সে। সত্যিই তীর আর আশ্চর্যবোধকের গোলকধাঁধা সৃষ্টি করে রেখেছে রবিন, মুসাও একবার ভুল করে বসল। ভুল সুড়ঙ্গ ধরে চলে এল সেই গুহায়, যেটাতে গাধা মরেছে।
শাদা হাড়গুলোর ওপর একবার আলো ফেলেই ফিরল মুসা। পা বাড়াতে গিয়েই থমকে দাঁড়াল। আচ্ছা, নেকলেসটা সঙ্গে নিয়ে ঘুরছে কেন? যদি ধরা পড়ে যায়? তার চেয়ে লুকিয়ে রাখা কি ভাল নয়? ধরে ফেললেও হারটার লোভে ওদেরকে। বাঁচিয়ে রাখতে বাধ্য হবে মরিসন।
হ্যাঁ, ভাল কথা মনে হয়েছে, তাই করবে সে। কিন্তু লুকাবে কোথায়? কোন পাথরের তলায়? না, সেটা বোধহয় ঠিক হবে না। সবগুলো পাথরই দেখতে প্রায় এক রকম। নিশানা ভুল করে ফেললে শেষে আর নিজেই খুঁজে বের করতে পারব না। এমন কোথাও রাখা দরকার, যেখানে রাখলে ভুল করবে না, আবার, শত্রুরাও খুঁজে পাবে না সহজে।
কোথায় তেমন জায়গা? গাধার হাড়গুলোর ওপর আলো ফেলল সে আবার। ঘুরিয়ে এনে স্থির করল খুলিটার ওপর। হ্যাঁ, এটাই ঠিক জায়গা। খুঁজে পেতে তার কোন অসুবিধে হবে না, অথচ শত্রুরা ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করবে না। is টর্চ থেকে খুলে হারটা কাগজের মোড়কমুক্ত করতে সময় লাগল না। খুলিটা উল্টে একটা খোড়লে নেকলেস ভরে আবার আগের মত করে ফেলে রাখল।
সঠিক সুড়ঙ্গটা খুঁজে বের করায় মন দিল সে। এই সময় আরেকটা ভাবনা খেলে গেল মনে। খালি টর্চটা সঙ্গে বয়ে বেড়ানোর কোন কারণ নেই। তার চেয়ে... কথাটা কেন তার মনে এল, নিজেই বলতে পারবে না। কয়েকটা পাথর ভরে কোথাও লুকিয়ে রাখবে টর্চটা, সময়ে কাজে লেগেও যেতে পারে।
পকেট থেকে রুমাল বের করে কয়েকটা পাথর রেখে পোঁটলা করে ঠেসে ভরল টর্চের ভেতর। পেছনের ক্যাপটা আবার লাগিয়ে একটা পাথরের আড়ালে রেখে দিল টর্চটা। পাথরটার কয়েক ফুট দূরে ছোট ছোট পাথর দিয়ে একটা স্তূপ তৈরি করল, নিশানা। দরকার লাগলে এসে খুঁজে বের করে নিতে পারবে আবার টর্চটা।

সুড়ঙ্গ ধরে আবার চলতে শুরু করল মুসা। এসে পড়ল সেই সঙ্কীর্ণ জায়গাটায়। হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চলল। একটা জায়গায় এসে শুয়ে পড়ে ক্রল করে এগোতে হলো।

বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে রয়েছে পাহাড়ের তলায়। খালি হয়ে আসছে সেটা জানান দিতে শুরু করেছে পাকস্থলী। এই অন্ধকারও অসুহ্য হয়ে উঠেছে। আরেকবার প্রার্থনা করল সে, যেন টর্চের ব্যাটারি ফুরিয়ে না যায়। তাড়াতাড়িও করতে পারছে না। জানে, যে অবস্থায় রয়েছে, তাড়াহুড়ো করলে, কিংবা মাথা গরম করলে, আরও বেশি বিপদে পড়ে যেতে পারে। মাথা ঠাণ্ডা রেখে ধীরেসুস্থে কাজ করাই এখন বাঁচার একমাত্র উপায়।

টর্চ হাতে ক্রল করতে অসুবিধে হচ্ছে। বেল্টের পাশে জ্বলন্ত অবস্থায় ওটা খুঁজে রাখল সে। ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগিয়ে চলল।

হঠাৎ খটাস করে তার মাথার সামনে পড়ল একটা পাথর, ছোট। চমকে উঠল সে। ভয়ে ভয়ে তাকাল মাথার ওপর নেমে আসা ছাতের দিকে। ধসে পড়ছে না তো? এখানে ছাত ধসে পড়ার মানে জ্যান্ত কবর হয়ে যাওয়া। পেটের তলায়। মাটিতে কম্পন অনুভূত হলো। দম বন্ধ করে পড়ে রইল সে, বুকের ভেতর হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে।

যেমন সহসা শুরু হয়েছিল, তেমনি হঠাৎ করেই থেমে গেল কম্পনটা। আস্তে করে হাত বাড়িয়ে মাথার কাছ থেকে পাথরটা এক পাশে সরিয়ে দিল মুসা।

মিনিট খানেক চুপচাপ অপেক্ষা করল সে, তারপর আবার চলতে শুরু করল। কাঁপুনিটা কেন শুরু হয়েছিল, বুঝতে পেরেছে। কোথাও ছোটখাট ভূমিকম্প হয়ে গেছে, তারই রেশ এসে পৌঁছেছে এখানে।

ক্যালিফোর্নিয়ার প্রায় সবাই জানে, মুসাও জানে, বিখ্যাত স্যান অ্যানড্রিয়াস ফল্ট-পাথুরে ভূত্বকের এক মস্ত চিড়-চলে গেছে পশ্চিম ক্যালিফোর্নিয়ার নিচ দিয়ে। উনিশশো ছয় সালে ওই ফল্টের কারণেই ভয়ংকর ভূমিকম্প হয়েছিল স্যান ফ্রানসিসকোয়। উনিশশো চৌষট্টি সালে আলাসকায় মহাভূমিকম্প ঘটিয়েছিল ওটাই। সেসময় ওখানকার ভূপৃষ্ঠ কোথাও কোথাও তিনশো ফুট ঠেলে উঠেছিল, কোথাও বসে গিয়েছিল তার চেয়ে বেশি। প্রতি বছরই কমবেশি ভূমিকম্প হয় ওই ফল্টের কারণে, বছরে অসংখ্যবার, তবে তেমন মারাত্মক নয়।

জোরে জোরে দম নিচ্ছে মুসা। পেরিয়ে এল সঙ্কীর্ণ সুড়ঙ্গ। চিহ্ন ধরে ধরে চলে এল সেই গুহাটায়, যেটা থেকে যাত্রা শুরু করেছিল।

গুহাটা খালি। নীরব। বাইরে অন্ধকারের কালো চাদর, রাত নেমেছে।

সাবধানে, নিঃশব্দে গুহামুখের দিকে এগোল সে। টর্চ নিভিয়ে দিয়েছে। কয়েক কদম এগিয়েই থেমে কান পেতে শুনছে সন্দেহজনক শব্দ পাওয়া যায় কিনা।

আশা করছে, এখনও গুহামুখটা খুঁজে পায়নি শত্রুরা।
গুহামুখের বাইরে বেরোল মুসা। তাকাল তারাজ্বলা আকাশের দিকে।
এই সময় পাথরের আড়াল থেকে কেউ ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। শক্তিশালী বাহু জড়িয়ে ধরল তাকে, মুখ চেপে ধরল একটা কঠিন থাবা।
একটা ঘরে আটকে রাখা হয়েছে মিঙ আর রবিনকে। জানালা নেই, শুধু একটা। দরজা, তা-ও তালা দেয়া, চেষ্টা করে দেখেছে দুজনে, খুলতে পারেনি।
এ দুজনেরই কাপড়ে বালি, ময়লা, সুড়ঙ্গে হামাগুড়ি দেয়ার সময় লেগেছে। ঝেড়েমুছেও বিশেষ সুবিধে হয়নি, সাফ হয়নি ময়লা। দুজনেই গোসল করে নিয়েছে। শুধু তাই না, ভরপেট খেয়েছেও। চমৎকার রান্না করা চীনা খাবার।
খিদের জন্যে কথা বলার ইচ্ছেই হয়নি এতক্ষণ, পেট ঠাণ্ডা হতে আরাম করে বসে আলোচনা শুরু করল।
আছি কোথায় কে জানে? বলল রবিন, গত কয়েক ঘণ্টার উত্তেজনা অনেকখানি দূর হয়ে গেছে।
বড় কোন শহরের তলায়, বলল মিঙ। স্যান ফ্রানসিসকো হতে পারে।
কি করে বুঝলে? চোখ বেঁধে এনেছে, আমি তো কিছুই দেখিনি, তুমি দেখেছিলে?
না। অনুমান। মাঝে মাঝেই ছাত কেঁপে উঠছে, খেয়াল করছ না? ট্রাক যাচ্ছে। ওপর দিয়ে। আর ট্রাক মানেই বড় শহর। চীনা চাকরেরা এই ঘরে নিয়ে এসেছে। আমাদের, চীনা খাবার খাইয়েছে। সারা আমেরিকায় স্যান ফ্রানসিসকোতেই রয়েছে। সবচেয়ে বড় চায়না টাউন। কোন মস্ত বড় লোকের বাড়িতে বন্দি হয়েছি আমরা।
কি করে জানলে?
খাবার। রান্না দেখোনি কি চমৎকার? এত ভাল রাঁধতে হলে খুব ভাল বাবুর্চি দরকার, আর সে-রকম বাবুর্চি রাখতে অনেক টাকা লাগে।
কিশোরের সহকারী তোমারই হওয়া উচিত ছিল, আন্তরিক প্রশংসা করল রবিন। রকি বীচে থাকলে তোমাকে দলে নিয়ে নিত সে।
আমিও খুশি হয়ে যোগ দিতাম। ভারড্যান্ট ভ্যালিতে বড় একা একা লাগে, আমার বয়েসী কেউ নেই তো। হঙকঙে খুব আরামে ছিলাম, বন্ধুরা ছিল, কত খেলেছি। কিন্তু দাদীমার ওখানে...আর খেলার কথা ভেবে কি হবে, এখন হঙকঙও যা, ভারড্যান্ট ভ্যালিও তা।
মিঙের কথা বুঝতে পারছে রবিন। এখান থেকে বেরোতেই যদি না পারে, কোন্ জায়গা ভাল আর কোন্ জায়গা খারাপ, তা দিয়ে কি হবে?
দরজা খোলার শব্দে ভাবনায় বাধা পড়ল। এক বুড়ো চীনা, পরনে প্রাচীন চীনের পোশাক, দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে।

এসো, ডাকল লোকটা।
কোথায়? গম্ভীর হয়ে বলল মিঙ।
বন্দির কোন প্রশ্ন করা উচিত নয়। এসো। দৃঢ়, বলিষ্ঠ পায়ে এগিয়ে গেল মিঙ, তাকে অনুসরণ করল রবিন।
বুড়ো চীনার পেছনে পেছনে লম্বা করিডর পেরিয়ে খুদে একটা লিফটে উঠল ওরা। অনেক উপরে উঠে একটা লাল দরজার সামনে থামল লিফট। দরজা খুলে পাশে সরে দাঁড়াল বুড়ো, হাত নেড়ে বলল, যাও। যা যা জিজ্ঞেস করা হবে, ঠিক ঠিক জবাব দেবে, যদি ভাল চাও।
বিশাল এক গোল হলরুমে ঢুকল ওরা। দেয়াল ঢাকা মূল্যবান, কাপড়ে, সোনালি সুতো দিয়ে সুচের নানা রকম কাজ: ড্রাগন, চীনা মন্দির, উইলো গাছ, আর আরও নানারকম সুদৃশ্য ছবি। এক জায়গায় কিছু উইলো গাছ ঝড়ে দুলছে, একেবারে জ্যান্ত মনে হয়।
খুব পছন্দ হয়েছে, না? হালকা, বয়স্ক কিন্তু স্পষ্ট কণ্ঠস্বর। পাঁচশো বছর আগের তৈরি।
ফিরে চেয়ে দেখল, ওরা একা নয়। কারুকাজ করা বিরাট এক কাঠের চেয়ারে বসে আছেন এক বৃদ্ধ। কালো রঙ করা চেয়ার, কোমল পুরু গদি।
বৃদ্ধের পরনে ঢোলা আলখেল্লা, প্রাচীন চীনা সম্রাটরা যেমন পরতেন। ছোট্ট, হলদেটে মুখ, চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা।
এগোও, শান্ত কণ্ঠে বললেন তিনি, খুদে বিচ্ছুর দল। অনেক ঝামেলা করেছ। বসো।
গালিচার ওপর দিয়ে হেঁটে এল ছেলেরা, এত পুরু যে গোড়ালি ডুবে যায়। ছোট দুটো টুল আছে, ওদের জন্যেই এনে রাখা হয়েছে বোধহয়। বসল। অবাক হয়ে তাকাল বৃদ্ধের দিকে।
আমি হুয়াঙ। বয়েস একশো সাত।
বিশ্বাস করল রবিন। এত বয়স্ক লোক আর দেখেনি। বয়েসের তুলনায় বেশ তাজা এখনও মিস্টার হুয়াঙ।
খুদে ঝিঁঝি পোকা, মিঙের দিকে চেয়ে বলল বৃদ্ধ, আমার দেশী রক্ত বইছে। তোমার শরীরে। পুরানো চীনের কথা বলছি, আধুনিক চীন নয়। তোমার পূর্বপুরুষ মিশেছিল তাদের সঙ্গে। তোমার দাদার বাবা আমাদের রাজকুমারীকে নিয়ে এসেছিল। আসুক। মেয়েমানুষের ব্যাপারে আমার কোন মাথাব্যথা নেই, যাকে পছন্দ হয়েছে তার সঙ্গে এসেছে। কিন্তু তোমার দাদার বাবা জিনিস চুরি করেছিল। গোস্ট পার্ল।
এই প্রথম উত্তেজনার চিহ্ন দেখা গেল তার চেহারায়।

মহামূল্যবান মুক্তোর একটা মালা, আবার বললেন মিস্টার হুয়াঙ। প্রায় সত্তর-পঁচাত্তর বছর লুকানো ছিল জিনিসটা, আবার বেরিয়েছে। ওটা এখন আমার চাই-ই। সামান্য সামনে ঝুঁকলেন। জোরাল হলো কণ্ঠ, শুনছ, খুদে ইঁদুরের ছানা? মালাটা আমার চাই।

ভীষণ নার্ভাস হয়ে পড়েছে রবিন, কারণ, নেকলেসটা তাদের কাছে নেই। চাইলেই মিস্টার হুয়াঙকে দিয়ে দিতে পারছে না।

মিঙ বলল, জনাব, জিনিসটা আমাদের কাছে নেই। আরেকজনের কাছে। হরিণের গতি তার, সিংহের হৃদয়, নেকলেসটা নিয়ে এতক্ষণে নিশ্চয়ই চলে গেছে আমার দাদীমার কাছে। আমাদের বাড়ি যেতে দিন, দাদীমাকে বলব ওটা আপনার কাছে বিক্রি করে দিতে। তবে, আমার চীনা বড় মায়ের কোন আত্মীয় এসে যদি দাবি করে…

করবে না, তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল মিস্টার হুয়াঙের কণ্ঠ, কারণ তেমন কেউ নেই। অন্য লোকের কারসাজি রয়েছে এতে, ব্যাপারটা ঘোরাল করে নেকলেস দখল করতে চায়। খুব ধনী এক লোক, আমার চেয়ে অনেক ধনী। একবার ওর হাতে চলে গেলে আর আমি পাব না।

বাউ করল মিঙ। মিস্টার হুয়াঙের সম্বোধন নকল করে নিরীহ কণ্ঠে বলল, আমরা খুদে ইঁদুরের ছানা, অসহায় বটে, কিন্তু আমাদের বন্ধু বাঘের বাচ্চা। ওর কাছে আছে নেকলেস। পালিয়ে যাবেই। ধনী লোকটার হাতে মালা পড়ে যাওয়া বিচিত্র নয়।

মরবে! চেয়ারের হাতলে টাটু বাজাল মিস্টার হুয়াঙের আঙুল। ওকে যারা পালাতে দেবে, তারা মরবে।

আমাদের প্ল্যান বুঝে ফেলেছিল আপনার লোক, বলল মিঙ। ফাটলের কাছাকাছিই ছিল। তবে আমার মুখ চেপে ধরার আগে চেঁচিয়ে সাবধান করে দিতে। পেরেছি আমার বন্ধুকে। তাকে আর ধরতে পারবে না। মরিসন আর তার। সাঙ্গোপাঙ্গরা এত মোটা, ফাটলে ঢুকতেই পারবে না।

ঢুকতে তাদের হবেই, বললেন মিস্টার হুয়াঙ। কাল রাতে নেকলেসটা হাতিয়ে নেয়ার পর টেলিফোন করল আমাকে মরিসন, জিনিস পাওয়া গেছে। তখনই হুঁশিয়ার করেছি, গোস্ট পার্ল হাতছাড়া করা চলবে না…

থেমে গেলেন তিনি। কোথাও বেল বেজে উঠেছে। রবিনকে অবাক করে দিয়ে চেয়ারের গদির তলা থেকে ফোনের রিসিভার বের করে এনে কানে ঠেকালেন। চুপচাপ শুনে আবার রেখে দিলেন আগের জায়গায়।

অবস্থার উন্নতি হয়েছে।

নীরবে অপেক্ষা করতে লাগলেন মিস্টার হুয়াঙ।

কি ব্যাপার? কৌতূহলে ভেতরে ভেতরে ফেটে পড়ছে রবিন। কি ঘটেছে? হঠাৎ চুপ হয়ে গেলেন কেন মিস্টার হুয়াঙ। তাঁর হাবভাবেই বোঝা যাচ্ছে, কিছু একটা দেখিয়ে চমকে দিতে চাইছেন রবিন আর মিঙকে।
সম্ভব-অসম্ভব অনেক কথাই ভাবল রবিন, একটা কথা বাদে।
খুলে গেল লাল দরজা।
সারা গায়ে ধুলো-ময়লা, ফ্যাকাসে চেহারা, টলোমলো পায়ে ঘরে এসে ঢুকল মুসা আমান।
মুসাআ! লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল রবিন আর মিঙ। তুমি ঠিক আছো?
খুব খিদে লেগেছে, করুণ হয়ে উঠল মুসার চেহারা। হাতটা ব্যথা করছে। মরি ননের বাচ্চা মুচড়ে ধরেছিল, নেকলেসটা কোথায় রেখেছি বলিনি, সেজন্যে।
হারটা তাহলে লুকিয়ে ফেলেছ? উত্তেজিত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল রবিন।
কাউকে বলোনি তো? যোগ করল মিঙ।
নাআ, বলিনি, হাসি ফুটল মুসার চোখে। গুহায় লু...
চুপ! চেঁচিয়ে উঠল মিঙ। বোলো না। শুনছে। নীরব হয়ে গেল মুসা। এই প্রথম চোখ পড়ল মিস্টার হুয়াঙের ওপর।
তুমি খুদে ইঁদুর নও, মিঙের দিকে চোখ ফেরালেন মিস্টার হুয়াঙ, ভুল বলেছি। তুমি একটা ড্রাগনের বাচ্চা, ঠিক তোমার দাদার বাপের মত, হাড়ে হাড়ে শয়তান।
এক মুহূর্ত চুপ থেকে কি ভাবলেন, তারপর তিন কিশোরকে অবাক করেদিয়ে যেন বোম ফাটালেন, তুমি আমার ছেলে হবে? পালকপুত্র? আমি ধনী, অনেক টাকার মালিক, কিন্তু আমার ছেলেপুলে নেই। তোমার মত একটা ছেলে পেলে...হবে? আমার সব সম্পদ দান করে দিয়ে যাব। আরামে কাটাতে পারবে বাকি জীবন।
হতে পারলে খুব খুশিই হতাম, শান্ত কণ্ঠে বলল মিঙ। কিন্তু দুটো খারাপ কাজ করতে হবে আমাকে।
কি কি?
এক: আমার বন্ধুদের সঙ্গে বেঈমানী করে গোস্ট পার্ল আপনার হাতে তুলে দিতে হবে।
মাথা ঝোঁকালেন মিস্টার হুয়াঙ। আমার ছেলে হলে সেটা তোমার কর্তব্য।
দুই নম্বর: নেকলেসটা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে কথা আপনি ভুলে যাবেন, আমাকে পালকপুত্র করার ধারেকাছেও যাবেন না।
দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মিস্টার হুয়াঙ। আমি বলামাত্র যদি রাজি হয়ে যেতে, হয়তো ভুলে যেতাম। কিন্তু এখন? এখন সত্যিই তোমাকে ছেলে হিসেবে পেতে চাই।
না, মিস্টার হুয়াঙ, মাপ করবেন। দুনিয়ার তাবৎ ধনের বিনিময়েও বন্ধুদের সঙ্গে বেঈমানী করতে পারব না আমি।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন মিস্টার হুয়াঙ, রাজি হলে ভাল করতে। যাকগে। মনের ওপর তো আর জোর চলে না। তবে দরকার হলে নেকলেস আমি জোর করেই আদায় করব। গদির তলায় হাত দিয়ে চেয়ারে লাগানো গোপন কুঠুরি থেকে একটা ছোট বোতল, কাঁচের গেলাস আর গোল একটা জিনিস বের করে আনলেন। কাছে এসো, দেখে যাও।

কাছে এসে দাঁড়াল তিন কিশোর।

মিস্টার হুয়াঙের বৃদ্ধ, শীর্ণ হাতের তালুতে ধূসর রঙের একটা গোল জিনিস, অনেকটা মার্বেলের মত, তবে অত মসৃণ নয়।

জিনিসটা চিনল মিঙ। একটা গোস্ট পার্ল।

ভুল নাম দেয়া হয়েছে জিনিসটার, বলে বোতলের ছিপি খুলে তার। তর মুক্তোটা ফেলে দিয়ে ঝাঁকাতে লাগলেন মিস্টার হুয়াঙ। বুদবুদ উঠল কয়েক সে ণ্ড, তারপর গলে বোতলের তরল পদার্থের সঙ্গে মিশে গেল।

এর নাম রাখা উচিত ছিল, বোতলের তরল জিনিসটা গেলাসে ঢালতে ঢালতে বললেন মিস্টার হুয়াঙ, লাইফ পার্ল।

গেলাসের তরল পদার্থটুকু এক চুমুকে খেয়ে ফেললেন তিনি, যেন ওষুধ খেলেন, একটা ফোঁটাও রাখলেন না। গেলাসটা আবার রেখে দিলেন গদির নিচে গোপন কুঠুরিতে। একটা কথা অনেকেই জানে না, বললেন তিনি, হাতে গোনা কয়েকজনে শুধু জানে, তারা সবাই ধনী, জ্ঞানী। দুনিয়ার লোক জানে গোস্ট পার্ল খুব দামী। কিন্তু কেন দামী, জানে? জানে না। সাধারণ মুক্তোর মত সুন্দর নয় এই পার্ল, বরং কুৎসিতই বলা যায়। মনে হয় যেন মৃত কিছু। এজন্যেই এর নাম হয়েছে গোস্ট পার্ল।

মিস্টার হুয়াঙ কি বলতে চাইছেন, কিছুই বুঝতে পারছে না তিন কিশোর, চুপ করে রইল ওরা।

কয়েকশো বছরে, বলে গেলেন বৃদ্ধ, মাত্র কয়েকটা গোস্ট পার্ল পাওয়া গেছে, ভারত মহাসাগরের একটা বিশেষ জায়গায়। সেটাও অনেক দিন আগের কথা, তারপর আর একটাও ওরকম মুক্তো পাওয়া যায়নি। বর্তমানে সারা পৃথিবীতে মাত্র ছটা গোস্ট পার্ল আছে, আর পাঁচটাই প্রাচ্যের লোকের কাছে, খুব কড়া পাহারায়। ওদের একেকজনের কত টাকা আছে, নিজেরাই জানে না। কিন্তু ওই কুৎসিত জিনিসগুলোর এত কদর কেন? কারণ, নাটকীয়ভাবে থামলেন তিনি। ওই মুক্তো খেলে আয়ু বাড়ে।

চোখ বড় বড় হয়ে গেল তিন কিশোরের। যা বলছেন, মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন বলেই বলছেন মিস্টার হুয়াঙ।

লম্বা দম নিয়ে আবার বললেন তিনি, শত শত বছর আগেই ব্যাপারটা আবিস্কৃত হয়েছে চীনে। প্রথমে জানত শুধু রাজ-রাজড়ারা, তারপর জানল বড় বড় জমিদারেরা, তারপর কিছু বড় ব্যবসায়ী-আমার মত লোকেরা। আমার বয়েস একশো সাত, এত দিন কিভাবে বেঁচেছি জানো? মুক্তো খেয়ে, গোস্ট পার্ল, একশোটার মত খেয়েছি। তার কালো কুতকুতে চোখের তারা মিঙের ওপর নিবদ্ধ হলো। বুঝতে পারছ, খুদে ড্রাগন, কেন নেকলেসটা আমার চাই? একেকটা মুক্তো। তিন মাস করে আয়ু বাড়ায়, নেকলেসটাতে আছে আটচল্লিশটা মুক্তো, তার মানে। আরও বারো বছর বাড়তি জীবন! কণ্ঠস্বর চড়ছে তাঁর। মুক্তোগুলো আমার চাই, যে করেই হোক, কিছুই আমাকে ঠেকাতে পারবে না। আমার পথে বাধা হলে ধুলোর মতই ঝেড়ে ফেলে দেব তোমাদেরকে। আরও বারো বছর জীবন... বুঝতেই পারছ। কত মূল্যবান আমার জন্যে।

ঠোঁট কামড়ে ধরল মিঙ। মুসা আর রবিনের কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, ফালতু হুমকি দিচ্ছে না। যা বলছে, করবে। দেখি দর কষাকষি করে।

দর কষাকষি করবে? শ্রবণশক্তি অত্যন্ত প্রখর মিস্টার হুয়াঙের, মিঙের কথা সব শুনেছেন। ঠিক প্রাচ্যের লোকের মত কথা বলেছ। ন্যায্য দর কষাকষিতে উভয় দিকই রক্ষা হয়। বলে ফেলো।

নেকলেসটা কোথায় আছে, মুসা যদি বলে, কিনে নেবেন? না না, আমার জন্যে বলছি না, টাকাটা দাদীমাকে দেবেন?

মাথা নাড়লেন মিস্টার হুয়াঙ। টাকা দিয়ে দিয়েছি মরিসনকে, তাকে দেব বলেছিলাম, দিয়েছি। তবে, মিঙের মুখের ভাব লক্ষ করতে করতে বললেন, একটা কাজ করতে পারি। তোমার দাদীমা আঙুর খেত আর মদের কারখানা আমার কাছে। বন্ধক রেখেছে। আমি তোমার দাদীমাকে সময় বাড়িয়ে দিতে পারি টাকা শোধ করার জন্যে, ছোট ছোট কিস্তিতে দেয়ার পরামর্শ দিতে পারি। কথা দিতে পারি, ভূতটা আর দেখা দেবে না। শ্রমিকেরা ফিরে এসে কাজে লাগবে, তোমার দাদীমা ভরাডুবির হাত থেকে রেহাই পাবে।

চোখ মিটমিট করল তিন কিশোর।

কার ভূত জানেন তাহলে? চেঁচিয়ে উঠল মিঙ। কি করে জানলেন?

মৃদু হাসলেন মিস্টার হুয়াঙ। ছোট ছোট অনেক বিদ্যেই জানা আছে আমার। নেকলেসটা কোথায় আছে মরিসনকে দেখিয়ে দাওগে, তোমার দাদীমার সব দুঃখ শেষ।

শুনতে ভালই লাগছে, মাথা ঝোকাল মিঙ। কিন্তু বিশ্বাস কি?

অবচেতনভাবে রবিন আর মুসাও মাথা ঝোঁকাল, এই প্রশ্ন তাদের মনেও।

আমি মিস্টার হুয়াঙ, তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল কণ্ঠস্বর, আমার দেয়া কথা ইস্পাতের চেয়েও শক্ত।
ওনাকে জিজ্ঞেস করো, মিঙ, বলল রবিন, মরিসনকে বিশ্বাস কি?
ঠিক, সায় দিল মুসা। মরিসন যা বলে, করে ঠিক তার উল্টো। কেউটে সাপকে বরং বিশ্বাস করা যায়, কিন্তু ওকে নয়।
দরজার দিকে চেয়ে ডাকলেন মিস্টার হুয়াঙ, মরিসনকে আসতে বলো।
দীর্ঘ দুই মিনিট অপেক্ষা করে রইল ছেলেরা। খুলে গেল লাল দরজা। লিফট থেকে নামল মরিসন। ধীরে ধীরে এগিয়ে এল, হাবভাবে অস্বস্তি প্রকাশ পাচ্ছে।
মুখ খুলেছে? ছেলেদের দিকে বুড়ো আঙুলের ইঙ্গিত করে মিস্টার হুয়াকে জিজ্ঞেস করল মরিসন।
ভদ্রভাবে কথা বলো। গর্জে উঠলেন মিস্টার হুয়াঙ। ওদেরকে অবহেলা। করবে না। তোমার মত নর্দমার কীট নয় ওরা। ড্রাগনের বাচ্চার সঙ্গে ক্রিমির যেরকম ব্যবহার করা উচিত, তেমন ব্যবহার করো।
রাগে লাল হয়ে গেল মরিসনের মুখচোখ, কিন্তু মিস্টার হুয়াঙের কালো চোখের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে ফ্যাকাসে হয়ে গেল চেহারা, মড়ার মুখের মত ফ্যাকাসে। সরি, মিস্টার হুয়াঙ, আমি জানতে চাইছিলাম।
তোমার চাওয়া না চাওয়ায় কিছুই এসে যায় না, ধমকে উঠলেন মিস্টার হুয়াঙ। যা হুকুম করব, পালন করবে। শোনো, আজ রাতে ওরা যদি নেকলেসটা তোমার হাতে তুলে দেয়, কোন ক্ষতি করবে না ওদের। বেঁধে রাখতে পারো, তবে খুব শক্ত করে নয়। এমনভাবে বাধবে, যাতে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে নিজেরাই বাঁধনমুক্ত হতে পারে। ভালমত শুনে রাখো, ওরা একটা আঘাত পেলে, তোমাকে একশোটা আঘাত করা হবে। আমার আদেশ অমান্য করলে ছুরি দিয়ে খুঁচিয়ে মারা হবে তোমাকে।
কয়েকবার ঢোক গিলল মরিসন, তারপর বলল, ভারড্যান্ট ভ্যালিতে লোক গিজগিজ করছে, গরুখোঁজা খুঁজছে। অনেক কষ্টে ওদের নজর হ্যাঁশনাইফ ক্যানিয়ন থেকে অন্য দিকে সরাতে পেরেছি। ছেলেগুলোকে আবার ওখানে নিয়ে গেলে...
ওখানে ওদের কে নিতে বলেছে তোমাকে? নেকলেসটা কোথায় আছে জেনে নিলেই তো হয়। তারপর তোমার সুবিধেমত জায়গায় নিয়ে গিয়ে বেঁধে রাখো। এমন কোথাও যেখান থেকে ওদের বাড়ি ফেরা সহজ হয়।
উঠলেন মিস্টার হুয়াঙ। ঢোলা আলখেল্লার নিচটা গাউনের মত ছড়িয়ে রইল। বসা অবস্থায় বোঝা যাচ্ছিল না, কিন্তু এখন দেখা গেল, লম্বা নন তিনি, বেঁটেই বলা চলে, পাঁচ ফুটের সামান্য বেশি।

এসো, মরিসনকে ডাকলেন তিনি। ওরা এখানেই থাকুক। নিজেদের মাঝে আলোচনা করে ঠিক করুক কি করবে। বুদ্ধি আছে ওদের, আমার ধারণা ঠিক সিদ্ধান্তই নেবে।
মিস্টার হুয়াঙের পেছনে বেরিয়ে গেল মরিসন।
আস্তে কথা বলবে, ফিসফিস করে বলল মিঙ। মুসা, নেকলেসটা কোথায়, উচ্চারণও করবে না। লুকানো মাইক্রোফোন নিশ্চয়ই আছে। অন্য কথা বলো, সময় নষ্ট করো।
নেকলেসটা লুকিয়ে কাজের কাজ করেছি, বিষণ্ন কণ্ঠে বলল মুসা, অন্তত সময় তো পাওয়া গেল। নইলে তো গেছিলাম।...তোমরা ধরা পড়লে কিভাবে?
লুকিয়ে ছিল ব্যাটারা, বলল মিঙ। আমাকে বেরোতে দেখেছে। আমি রবিনকে টর্চ জ্বেলে সঙ্কেত দিয়েছি, তা-ও দেখেছে। রবিন বেরোতেই এসে আমাকে আর রবিনকে জাপটে ধরেছে।
এবং গাধামী করেছে, রবিন বলল। অপেক্ষা করা উচিত ছিল ওদের। মুসা বেরোলে তারপর ধরা উচিত ছিল।
হুঁ, মাথা দোলাল মুসা। মিঙ চেঁচিয়ে হুঁশিয়ার করল। বুঝলাম, কিছু হয়েছে। তারপর টর্চ জ্বালল তিনবার, ওতেও গোলমাল লক্ষ করলাম। আর কি বেরোই! হাসল সে। কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছি না, আমরা কোথায় আছি, সেটা জানল কি করে?
ঘোড়া নিয়ে এসে পাহাড়ে চড়েছিল মরিসন, বলল মিঙ। আমাদেরকে হ্যাঁশনাইফ ক্যানিয়ন পেরিয়ে যেতে দেখেছে। অনুমান করে নিয়েছে আমরা কি করতে যাচ্ছি। ওর জানা আছে গলাটার কথা। বিরক্ত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল সে।
আমি ভেবেছি আমি খুব চালাক। অথচ সোজা এসে মরিসনের খপ্পরে পড়লাম।
আমাদেরকে ক্যানিয়ন পেরিয়ে যেতে না দেখলে ধরতে পারত না, মুসা বলল, সেটা আমাদের দুর্ভাগ্য। তোমার আর কি করার ছিল? যাকগে, যা হবার হয়েছে। একটা ব্যাপারে তো শিওর হলে, মরিসন বেঈমান। মেশিনপত্র সে-ই ভেঙেছে, ইচ্ছে করে, মদের পিপা ফুটো করে দিয়েছে। সব তার শয়তানী।
হ্যাঁ, বলল মিঙ। ও আর ওর সাঙ্গোপাঙ্গরাই করেছে। কিন্তু কেন? এসব তো শুরু করেছে বছর খানেক আগে থেকে, ভূত দেখা যায়নি তখনও। ভারড্যান্ট ভ্যালিতে গোস্ট পার্লের কথা ওখানকার কেউ জানত না তখন।
নিশ্চয়ই আছে কোন কারণ, বলল রবিন। আমাদেরকে কিভাবে এনেছে, শোনো। পিপায় ভরে ট্রাকে করে এনেছে। একটা জায়গায় এসে থামল ট্রাক, মরিসনের সঙ্গে কথা বলল কয়েকজন লোক। কথাবার্তায়ই বুঝলাম, তাদেরকে পাঠিয়েছেন

মিঙের দাদীমা, আমাদের খুঁজতে। ওরা নিশ্চয়ই কল্পনাও করেনি, ওদের কয়েক হাতের মধ্যেই রয়েছি আমরা।
চেঁচালে না কেন? বলল মুসা।
মুখ বেঁধে রেখেছিল, বলল মিঙ। চালাক আছে মরিসন। মদের পিপায় মানুষ রয়েছে কে ভাববে? তাছাড়া তাকে সন্দেহও করে না কেউ। সে বলল, স্যান। ফ্রানসিসকোর দিকে যাচ্ছে, আমাদের খুঁজতে। আমাদের না নিয়ে ফিরবে না। কাজেই তার অনুপস্থিতিতে সন্দেহ করবে না কেউ।
হুঁ, ব্যাটা চালাকই, স্বীকার করল মুসা।
স্যান ফ্রানসিসকোর পথে কয়েক মাইল চলল ট্রাক, আবার বলল মিঙ, তারপর থামল। মদের পিপা থেকে বের করে একটা স্টেশন ওয়াগনে তোলা হলো আমাদের। পেছনে শুইয়ে দিয়ে চাদর দিয়ে ঢেকে দেয়া হলো। আমার ধারণা, হ্যাঁশনাইফ ক্যানিয়নের দিকে যে আমরা গেছি তার সব চিহ্ন মুছে দিয়েছে মরিসন। ঘোড়াগুলোও নিশ্চয়ই সরিয়ে ফেলেছে ভেবেছিলাম, তোমাকে ধরতে পারবে না, কিন্তু ধরে ফেলল। নেকলেসটা ছিনিয়ে নেবে এখন!
তা পারছে না। নেকলেস আমি দেব না, দৃঢ় কণ্ঠে বলল মুসা।
না দিয়ে পারবে না।
সেটা দেখা যাবে, নিজের দুই হাতের দিকে তাকাল মুসা। আপাতত হাতমুখ ধোয়ার পানি যদি পেতাম, আর কিছু খাবার। পেট জ্বলছে। গুহায় বসে কি খেয়েছি না খেয়েছি, কখন হজম হয়ে গেছে। আর যা কষ্ট করেছি বেরোতে! ভাগ্যিস রবিন চিহ্ন দিয়ে রেখেছিল, নইলে বেরোতেই পারতাম না।
ফিসফিস করে বলল রবিন, যে দুটো পিপায় ভরা হয়েছিল আমাদেরকে, এক সুযোগে সে দুটোতেও চিহ্ন এঁকে দিয়েছি।
তাতে কি? নিচু গলায় বলল মুসা। কিছু বুঝবে না কেউ। কিশোরও বুঝবে কিনা সন্দেহ।
ফিসফিসানি বাদ দাও, বলল মিঙ। স্বাভাবিক গলায় কথা বলো, নইলে সন্দেহ করবে আমরা ফন্দি আঁটছি।
ফন্দি আর কি করব? হতাশ ভঙ্গিতে দুহাত নাড়ল মুসা। মিস্টার হুয়াঙের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া মুশকিল।
আমারও তাই ধারণা, মাথা দোলাল মিঙ। বোঝাই যাচ্ছে, অনেক বড়লোক তিনি, প্রচণ্ড ক্ষমতা। একটাই উপায় আছে আমাদের, নেকলেসটা তাঁকে দিয়ে দেয়া।
এত সহজেই দিয়ে দিতে বলছ? ভুরু কুঁচকাল মুসা। ভাবছে, কি কষ্ট করেই না লুকিয়েছে নেকলেসটা। এত কিছুর পর, মিস্টার হুয়াঙকে দিয়ে দিতে হবে?
মুফতে তো দিচ্ছি না, মুসার হতাশা দূর করার চেষ্টা করল মিঙ।

মিস্টার হুয়াঙ কথা দিয়েছেন, আমাদেরকে মুক্তি দেবেন। তার কথা বিশ্বাস করি। তাছাড়া দাদীমার কষ্টও কমবে, ধীরেসুস্থে ঋণ শোধ করতে পারবে! এর বেশি আর কি চাই আমরা?
তা-ও বটে। আচ্ছা, সত্যি কি বিশ্বাস হয়, মুক্তো আয়ু বাড়াতে পারে? আমার কাছে পাগলামি মনে হচ্ছে।
আমি অবিশ্বাস করছি না। অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে, কিন্তু সত্যি হতে পারে। চীনের ওষুধ-বিদ্যা অনেক পুরানো। ইদানীং পশ্চিমা বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন, বিশেষ এক ধরনের ব্যাঙের চামড়ায় মূল্যবান ওষুধ হয়, অথচ শত শত বছর আগেই এটা জানা ছিল চীনের কবিরাজদের। বাঘের গোঁফ আর দানবের হাড়ের গুঁড়ো অনেক জটিল রোগের মহৌষধ, এটা অনেক আগে থেকেই বিশ্বাস করে চীনারা।
আমিও পড়েছি এ-ব্যাপারে, বলল রবিন। ওই দানবরা হলো প্রাগৈতিহাসিক ম্যামথ, সাইবেরিয়ার দাঁতাল বাঘ আর কিছু প্রকাণ্ড প্রাগৈতিহাসিক জন্তু-জানোয়ার।
এখন কথা হলো, ওসবে যদি রোগ সারে, ভূতুড়ে মুক্তোই বা কেন আয়ু বাড়াবে না? প্রশ্ন রাখল মিঙ।
মিস্টার হুয়াঙ মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন এটা, আর শুধু বিশ্বাসই অনেক সময় জটিল রোগ সারিয়ে দেয়, এটা তো এখন বৈজ্ঞানিক সত্য।
আচ্ছা, সবুজ ভূতের ব্যাপারে সত্যি সব জানেন মিস্টার হুয়াঙ? বলল রবিন। একটা ব্যাপার আশ্চর্য লাগছে। প্রায় একই সময়ে একই জায়গায় উদয় হলো সবুজ ভূত আর ভূতুড়ে নেকলেস!
ওসব ভেবে লাভ নেই, বলল মিঙ। নেকলেসটা দিয়ে দিচ্ছি এ ব্যাপারে তাহলে একমত আমরা?
মাথা কাত করল মুসা আর রবিন।
গলা চড়িয়ে ডাকল মিঙ, মিস্টার হুয়াঙ, সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা।
এক জায়গায় কাপড় সরিয়ে বেরিয়ে এলেন মিস্টার হুয়াঙ, সঙ্গে তিনজন। চাকর। কাপড়ের পেছনে ওখানে চার-চারজন মানুষের লুকানোর জায়গা থাকতে পারে, বাইরে থেকে দেখে বোঝা যায় না।
কি সিদ্ধান্ত নিলে, খুদে ড্রাগন? জানতে চাইলেন মিস্টার হুয়াঙ, হয়তো আড়ালে থেকে সবই শুনেছেন, কিন্তু সেটা প্রকাশ করলেন না।
নেকলেসটা দেব।
কোথায় আছে ওটা?
খনিতে, জবাব দিল মুসা।

মরিসনকে ডেকে আনালেন মিস্টার হুয়াঙ। ও গিয়ে নিয়ে আসতে পারবে। ততক্ষণে তোমরা এখানে আমার মেহমান। নেকলেসটা পেলে তোমাদের ছেড়ে দেব। বাধার আর দরকার হবে না। ফিরে গিয়ে পুলিশকে হয়তো বলবে আমার কথা, কিন্তু লাভ হবে না। আমাকে খুঁজে পাবে না ওরা, হাওয়ায় মিলিয়ে যাব। আমেরিকার এই বিশাল চায়না টাউনেও আমি একটা বিরাট রহস্য, এখানকার যে কোন চীনাকে জিজ্ঞেস করলেই বুঝবে।
মরিসন আনতে পারবে না খনি থেকে, বলল মুসা। ও খুব বেশি মোটা। সুড়ঙ্গ দিয়ে ঢুকবেই না তার শরীর, বোতলের গলায় ছিপির মত আটকে যাবে, ফোরম্যানের দিকে চেয়ে মুচকি হাসার লোভ সংবরণ করতে পারল না সে।
রোগাটে লোক জোগাড় করতে পারব... বাধা পেয়ে থেমে গেল মরিসন। হাত তালি দিয়ে তাকে থামিয়ে দিলেন মিস্টার হুয়াঙ।
নাআ! তোমাকে আনতে হবে। আর কাউকে বিশ্বাস করি না। যেভাবে পারো ঢুকবে।
খুদে ব্যাঘশাবক, মুসার দিকে ফিরে বললেন তিনি, সুড়ঙ্গটা কতখানি সরু? সত্যিই ঢুকতে পারবে না হোঁতকাটা?
না, স্যার, সত্যি পারবে না, বলল মুসা।
নেকলেসটা টর্চের মধ্যে?
হ্যাঁ, ঢোক গিলল মুসা।
টর্চটা কোথায়?
পাথরের আড়ালে।
কোন্ জায়গায়?
কোথায় বলতে পারব না, তবে খুঁজে বের করতে পারব। ম্যাপটাপ কিছু এঁকে রাখিনি।
হুঁ, ভাবলেন মিস্টার হুয়াঙ। মরিসনের দিকে ফিরে বললেন, সহজ হয়ে গেল। ওদেরকে নিয়ে যাও। মুসা টর্চটা বের করে দেবে।
কিন্তু তাতে বিপদ আছে, বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে মরিসনের কপালে। ওদের খোঁজা হচ্ছে, যদি দেখে ফেলে...
ঝুঁকি নিতেই হবে। আগে সাবধান থাকোনি, তাই বিপদে পড়েছ। কিভাবে সামলাবে সেটা তোমার ব্যাপার। একটা কথা, ছেলেদের কোন ক্ষতি করা চলবে না।
কিন্তু ফিরে গিয়ে সব জানিয়ে দেবে ওরা।
জানাক। আমি তোমাকে লক্ষ করব। নিরাপদে বের করে দেব দেশের বাইরে। তোমার সহকর্মীরাও গায়েব হয়ে যাবে, পুলিশ খুঁজে পাবে না। আমাকে তো

পাবেই না। কাজেই ওরা বললেও কিছু এসে যায় না। বুঝেছ?
জোরে জোরে শ্বাস ফেলছে মরিসন। হ্যাঁ, স্যার, গলা কাঁপছে। আপনার কথামতই কাজ হবে। কিন্তু ছেলেরা যদি আমার সঙ্গে বেঈমানী করে?
হাসলেন মিস্টার হুয়াঙ। সেক্ষেত্রে আমার আর কোন দায়িত্ব থাকবে না। ওদেরকে যা খুশি করতে পারো। তোমার নিরাপত্তার পথ তুমি বেছে নেবে। তবে আমার মনে হয় না ওরা কোন চালাকি করবে। প্রাণের মায়া কার না আছে? এই বুড়ো বয়েসেও আমার বেঁচে থাকার সাধ, আর ওরা তো শিশু।
মিস্টার হুয়াঙের কণ্ঠে কিছু একটা রয়েছে, শিউরে উঠল রবিন। মনে মনে সে। আশা করল, সত্যি কথাই বলেছে মুসা, নেকলেসটা খুঁজে বের করতে পারবে।
মুসা ভাবছে, মিস্টার হুয়াঙকে মিথ্যে কথা বলেছে সে, এর পরিণতি কি হবে?
জলদি করো, মরিসনকে তাড়া দিলেন মিস্টার হুয়াঙ, দেরি হয়ে যাচ্ছে।
ওদের বেঁধে নিই... বাধা পেয়ে আবার থেমে গেল মরিসন।
ধমকে উঠলেন মিস্টার হুয়াঙ, নাআ! তার দরকার হবে না। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যাবে ওরা। আরামে যাবে। মিঙের দিকে ফিরলেন। খুদে ড্রাগন, তাকাও তো আমার দিকে।
মিস্টার হুয়াঙের চোখের দিকে তাকাল মিঙ, আটকে গেল দৃষ্টি, চেষ্টা করেও আর সরাতে পারল না।
একঘেয়ে কণ্ঠে বলে চললেন মিস্টার হুয়াঙ, খুদে ড্রাগন, তুমি ক্লান্ত, খুর ক্লান্ত। ঘুম পেয়েছে তোমার, অনেক ঘুম। কোমল হাতে তোমার চোখে পরশ। বুলাচ্ছে ঘুম, ঘুমের রাজ্যে যাওয়ার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছ তুমি, তোমার চোখ বন্ধ হয়ে আসছে।
অবাক হয়ে দেখল দুই গোয়েন্দা, সত্যিই চোখ বন্ধ হয়ে আসছে মিঙের।
ভীষণ অস্বস্তি বোধ করছে মিঙ। জোর করে টেনে খুলল চোখের পাতা।
আবার শুরু হলো একঘেয়ে কণ্ঠ, চোখ বন্ধ হয়ে আসছে! বাধা দিতে পারছ না। তুমি, আমার ইচ্ছেই তোমার ইচ্ছে, চোখের পাতা ভারি আসছে তোমার, বন্ধ করো, বন্ধ...বন্ধ...বন্ধ...
পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেল মিঙের চোখের পাতা। খুলতে পারছে না।
মোলায়েম একঘেয়ে কণ্ঠ থামল না মিস্টার হুয়াঙের, ঘুম আসছে তোমার চোখ জুড়ে। গভীর ঘুম। অন্ধকারের চাদর গ্রাস করছে তোমাকে। ঘুমের দরিয়ায় তলিয়ে যাচ্ছ তুমি। তোমার ইচ্ছাশক্তিকে দাবিয়ে দিয়েছে ঘুম। ঘুমিয়ে পড়ছ তুমি। ঘুমিয়ে থাকবে, আমি না বললে জাগবে না। খুদে ড্রাগন, শান্তিতে ঘুমাও এখন, ঘুমাও...ঘুমাও...ঘুমাও...ঘুমাও...

হঠাৎ টলে পড়ে যেতে শুরু করল মিঙের শরীর। লাফিয়ে এসে ধরে ফেলল। তিন চাকর। একটা সোফায় শুইয়ে দিল।
খুদে ব্যাঘ্রশাবক, এবার তুমি তাকাও আমার দিকে, বললেন মিস্টার হুয়াঙ।
দুরুদুরু করছে মুসার বুক। না তাকিয়ে পারল না। একবার চেয়ে আর দৃষ্টিও সরাতে পারল না কোনদিকে। জোর করে ঘুম ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করল না মুসা, কেমন একটু যেন মজা পাচ্ছে, দেখি না কি হয় ভাব। অবশ করে ফেলছে যেন তাকে মিস্টার হুয়াঙের একঘেয়ে মোলায়েম কণ্ঠ। এক সময় সে-ও টলে পড়ে যেতে শুরু করল, তাকেও ধরে শুইয়ে দিল চাকরেরা।
রবিন বুঝতে পারছে, মিঙ আর মুসাকে সম্মোহন করেছেন মিস্টার হুয়াঙ। সে বইয়ে পড়েছে, রোগীকে সম্মোহন করে ঘুম পাড়িয়ে অপারেশন করা সম্ভব, কোন ব্যথা নাকি অনুভব করে না রোগী। মুসার মত ভয় পেল না সে। তার পালা এল।
শক্তহৃদয়, তাকাও আমার দিকে, বললেন মিস্টার হুয়াঙ। তোমার ঘুম পেয়েছে, তোমার বন্ধুদের মতই। ক্লান্ত তুমি, ভীষণ ক্লান্ত। চোখ বন্ধ করো…
চোখ বন্ধ করে ফেলল রবিন।
মিস্টার হুয়াঙের একঘেয়ে কণ্ঠ চলল থেমে থেমে।
পড়ে যেতে শুরু করল রবিন, তাকে ধরে ফেলল চাকরেরা।
মরিসনকে বললেন মিস্টার হুয়াঙ, কোন রকম গোলমাল করতে পারবে না। ওরা। জায়গামত পৌঁছে ডাক দিও, জেগে উঠবে। নেকলেসটা নিয়ে ছেড়ে দেবে। আর যদি…
অপেক্ষা করে রইল মরিসন।
আর যদি, বললেন মিস্টার হুয়াঙ, গোলমাল কিংবা চালাকি করে, গলা কেটে ফেলে দিও কোথাও।
আশ্চর্যবোধক চিহ্ন কেউ খুঁজে পায়নি? বিস্মিতই মনে হচ্ছে কিশোরকে। এই খানিক আগে ভারড্যান্ট ভ্যালিতে পৌঁছেছে সে আর রবিনের বাবা।
জোরে জোরে মাথা নাড়লেন মিসেস দিনারা কৌন। না। পুরো উপত্যকায় খোঁজ করিয়েছি আমি। গাঁয়ে যত লোক আছে, সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে, বাচ্চারাও বাদ যায়নি।
আশ্চর্যবোধক নিয়ে এত তোড়জোড় কেন? ভুরু নাচাল ডলফ টার্নার। মিসেস কৌনের মতই তাকেও খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে।
ব্যাখ্যা করে বলল কিশোর।
মরুভূমিতে চিহ্ন দেবে কোথায়? বলল টার্নার। আমি শিওর, ওদিকেই গেছে ওরা। কাল ভোরেই প্লেন নিয়ে খুঁজতে পাঠাব। মরুভূমিতেই কোথাও পথ হারিয়েছে

ওরা। খানিতে আটকা পড়লে বাইরে ওদের ঘোড়াগুলো অন্তত খুঁজে পাওয়া যেত।
তা ঠিক, সায় দিলেন মিস্টার মিলফোর্ড, বিষণ্ন কণ্ঠস্বর। হ্যাঁ, মিস কৌন, কিশোর আপনাকে কিছু বলতে চায়।
অপেক্ষা করে রইলেন মিস কৌন আর টার্নার। মস্ত হলঘরে বসেছে ওরা, চারজনই শুধু, অন্য কেউ নেই।
মিস কৌন, নাটকীয় ভঙ্গিতে শুরু করল কিশোর, কথার গুরুত্ব বোঝানোর জন্যে বড়দের মত গম্ভীর করে তুলল চেহারাকে, সবুজ ভূতের ব্যাপার নিয়ে অনেক ভাবনাচিন্তা করেছি আমি। আমার দুই বন্ধু ওটাকে দেখেছে, চিৎকার শুনেছে। তদন্ত করে আমি জেনেছি, চিৎকারটা বাড়ির ভেতর থেকে আসেনি। খুব মজবুত বাড়ি, নিখুঁত করে তেরি হয়েছিল, প্রায় সাউন্ডপ্রুফ, ভেতরের শব্দ বাইরে আসতে পারে না ভাল মত।
একটা কথা আমাকে বলুন, ভূত যদি থেকেই থাকে, আর থাকে বাড়ির ভেতরে, শুধু চিৎকার করার জন্যে বাইরে আসবে কেন? আসেওনি। চিৎকারটা করেছিল আসলে মানুষে, আমাদেরই মত জলজ্যান্ত মানুষ। আরেকটা ব্যাপার, সে রাতে যে কজন দেখতে গিয়েছিল, তারা কেউই শিওর নয়, দলে কতজন ছিল। কেউ বলছে ছয়, কেউ বলছে সাতজন। সবার কথাই ঠিক।
চিৎকারটা ড্রাইভওয়ে থেকে শুনেছে ছয়জন, আর ঝোঁপের ভেতরে লুকিয়ে থেকে শুনেছে একজন, সে-ই চিৎকার করেছিল। তারপর কোন এক ফাঁকে বেরিয়ে এসে যোগ দিয়েছে দলের সঙ্গে।
কিশোর ঠিকই বলেছে, একমত হলেন মিস্টার মিলফোর্ড। আশ্চর্য! এই সহজ কথাটা আমার আর পুলিশ চীফের মাথায় এল না।
মিস কৌন ভ্রূকুটি করলেন।
কথায় যুক্তি আছে, ভুরু কুঁচকে গেছে টার্নারের, কিন্তু এই কাণ্ড কেন করতে যাবে লোকে?
দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে, জবাব দিল কিশোর। পুরানো বাড়িতে ওরকম চিৎকার শুনলে অবাক হবেই লোকে। তাছাড়া ওরকম কিছু একটা ঘটবে, আশাও করছিল ছয়জন মানুষ। বলতে গেলে, একরকম জোরজার করেই নিয়ে আসা হয়েছিল ওদের পাঁচজনকে।
হুঁ। সাজানো ব্যাপার, বললেন মিস্টার মিলফোর্ড।
এক্কেবারে, বলল কিশোর। একজন লোক ডেকে এনেছিল পাঁচজনকে, চাঁদের আলোয় পোড়ড়া বাড়ি দেখতে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। চাঁদের আলোয় অ্যাডভেঞ্চারের লোভেই রাজি হয়ে গিয়েছিল পাঁচজন, ছয় নম্বর লোকটাকে

সন্দেহ করেনি ওরা, ধরে নিয়েছে নতুন কোন প্রতিবেশী। তার সঙ্গী তখন লুকিয়েছিল। ঝোঁপের ভেতরে। ড্রাইভওয়েতে দলটাকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠছে।
চোখ মিটমিট করছে টার্নার, কিশোরের কথা বোঝার চেষ্টা করছে যেন।
মিস দিনারা কৌনের চোখে বিস্ময়। কিন্তু…কিন্তু কেন? দুজন লোক কেন ওরকম করবে?
দলটাকে বাড়িতে ঢোকানোর জন্যে, বললেন মিস্টার মিলফোর্ড। যাতে ভূত দেখে গিয়ে খবরটা ছড়াতে পারে। ভাল ফন্দি এঁটেছিল।
আমার মনে হয় না, প্রতিবাদ করল টার্নার। এসব অতিকল্পনা।
তাই? কিশোর, টেপটা চালিয়ে শোনাও ওঁকে।
রেকর্ডার রেডিই করে রেখেছে কিশোর। চালিয়ে দিল। কুৎসিত চিৎকারে ভরে গেল ঘর। লাফিয়ে উঠলেন মিস কৌন, চমকে গেল টার্নার।
এটা শুরু, মোলায়েম গলায় বললেন মিস্টার মিলফোর্ড। আরও কিছু আছে। সে-রাতে যারা যারা কথা বলেছিল, সবার কণ্ঠস্বর ধরা পড়েছে টেপে। চিনতে পারলে জানাবেন।
ভারি-কণ্ঠের কথা শুনে হঠাৎ সোজা হয়ে বসলেন মিস কৌন। চোখ বড় বড় হয়ে গেছে। হাত তুলে বাধা দিয়ে বললেন, হয়েছে, হয়েছে, আর শোনার দরকার নেই, বন্ধ করো। এই, ডলফ, এ তো তোমার গলা! ভারি করেছ ইচ্ছে করেই। সেই যে, কলেজে যখন পড়তে, নাটকে ভিলেনের অভিনয় করার সময় ওরকম করে কথা বলতে, আমি ভুলিনি।
হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন, মাথা কেঁকাল কিশোর, মিস্টার টার্নারের গলা। প্রথমে ধরতে পারিনি, তবে চেনা চেনা লাগছিল। কৌন ম্যানশনে ওঁর কথা শুনেছি তো। বদলে ফেলেছিলেন, তবে পুরোপুরি পারেননি। সে-রাতে নকল গোঁফ পরেছিলেন। তিনি। অন্ধকারে ওইটুকুই যথেষ্ট ছিল। সহজেই বোকা বানিয়ে দিয়েছেন। পাঁচজনকে।
মুখ নিচু করে সোফায় বসে আছে টার্নার, পুরানো কাপড়ের একটা দোমড়ানো বাণ্ডিল যেন।
চুপ করে আছ কেন, ডলফ? বরফের মত শীতল মিস কৌনের কণ্ঠ। কিছু বলার থাকলে বলো।
বার কয়েক ঢোক গিলল টার্নার, অযথাই নিজের হাতের তালুর দিকে চেয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত, তারপর শুরু করল, গোলমালটা শুরু হয়েছে বছর দেড়েক। আগে, যখন ঘোষণা করলেন, আপনার সব সম্পত্তি মিঙকে দিয়ে যাবেন। অথচ ও আসার আগে জানতাম, সব আমি পাব, গুঙিয়ে উঠল সে। কারণ মিঙ না থাকলে আপনার সব সম্পত্তির মালিক আইনত আমিই হতাম। নিজের জিনিস মনে করে ওই আঙুর খেতে আর মদের কারখানার উন্নতির জন্যে গাধার মত খেটেছি।

অথচ শেষে কি হলো? মনে হলো, আমার জিনিস আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হচ্ছে, থামল সে।
বলে যাও, কঠিন কণ্ঠে বললেন মিস কৌন।
হাত দিয়ে কপাল মুছল টার্নার। সহ্য করতে পারলাম না। একটা ফন্দি আঁটলাম। বন্ধুবান্ধব আর ব্যাংকের কাছ থেকে টাকা ধার করলাম খেত বন্ধক রেখে, নতুন মেশিনারি কিনলাম। মরিসন আর তার কয়েক দোস্তকে টাকা খাইয়ে বশ করলাম, আমার হয়ে গোলমাল পাকাতে লাগল ওরা, যন্ত্রপাতি ভাঙতে লাগল, পিপায় ফুটো করে মদ ফেলে দিল। ক্ষতি করে করে এমন অবস্থায় নিয়ে আসতে চাইলাম, যাতে ভারড্যান্ট, ভ্যালির সবকিছু বিক্রি করে আপনি কৌন ম্যানশনে চলে যেতে বাধ্য হন।
হুঁ, তুমিই আমাকে কৌন ম্যানশন বিক্রি করতে বাধ্য করেছ, এখন বুঝতে পারছি। বলে যাও।
গভীর আগ্রহে শুনছে কিশোর। চিৎকারটা কার, বুঝেছিল সে, অনুমান করেছিল, টার্নার কোন না কোনভাবে জড়িত, কিন্তু কিভাবে, সেটা জানত না।
বাড়ির অনেক দাম উঠল, আবার বলল টার্নার, এত উঠবে কল্পনাও করিনি। বুঝলাম, ওই টাকা দিয়ে ঋণের বেশির ভাগই শোধ করে ফেলতে পারবেন। কি করব ভেবে ভেবে দিশেহারা হয়ে পড়েছি, এই সময় একটা মেসেজ এল।
মেসেজ? বলে উঠলেন মিস্টার মিলফোর্ড। কি মেসেজ?
স্যান ফ্রানসিসকোয় যেতে হবে একজনের সঙ্গে দেখা করার জন্যে। গেলাম। বৃদ্ধ এক চীনা, তার নাম মিস্টার হুয়াঙ। চোখ বেঁধে নিয়ে যাওয়া হয়েছে আমাকে, তাই কোন্ পথে গেছি বলতে পারব না। তিনি আমাকে জানালেন, ব্যাংকের কাছে রাখা ভারড্যান্ট ভ্যালির মর্টগেজ তিনি কিনে নিয়েছেন। বন্ধুবান্ধব যাদের কাছ থেকে টাকা ধার করেছিলাম, তাদের সব টাকা পরিশোধ করে দিয়েছে। শুধু তাই না, মুখ বন্ধ রাখার জন্যে বাড়তি টাকাও দিয়েছেন তাদেরকে।
কেন? তার কি লাভ? জিজ্ঞেস করলেন মিস কৌন।
আসছি সে কথায়, জোরে নিঃশ্বাস ফেলল টার্নার। তাঁর বাড়িতে বুড়ো এক চীনা চাকরানী আছে, মিস্টার ফারকোপারের বাড়িতে চাকরানী ছিল। গোস্ট পার্লের কথা সে জানে। জানে, মিস্টার ফারকোপারের স্ত্রীর লাশের সঙ্গে ওটাকে কবর দেয়া হয়েছে। মুখের ঘাম মুছল সে। মিস্টার হুয়াঙ যেন সবজান্তা। আপনার কথা, মিস্টার ফারকোপারের কথা, ভারড্যান্ট ভ্যালির কথা, সবই তার জানা। আমার সামনে টোপ ফেললেন তিনি। বুদ্ধিও বাতলালেন।
বাড়িটাকে ভূতের বাড়ি হিসেবে বদনাম রটানোর পরামর্শ দিলেন তিনি আমাকে, কিভাবে কি করতে হবে তা-ও বুঝিয়ে দিলেন। এতে বাড়ির খরিদ্দার যাবে কমে,

বাড়ি বিক্রি করতে দেরি হবে। গুপ্ত ঘরটা খোঁজার সুযোগ পাব, নেকলেসটা বের করে দিতে পারব। আমার কাছ থেকে দশ লাখ ডলারে কিনে নেবেন ওটা তিনি।
আরও কিছু চালাকি করতে বললেন তিনি। ভূতটা প্রথম দেখা যাবে পোড়া বাড়িতে, তারপর রকি বীচের এখানে-সেখানে, সব শেষে ভারড্যান্ট ভ্যালিতে গুজব ছড়াতে হবে, যাতে ভয় পেয়ে কাজ ফেলে পালায় শ্রমিকেরা। ঋণের দায়ে শেষে। নিলামে উঠবে আঙুরের খেত আর মদের কারখানা। তখন নেকলেস বিক্রির টাকা দিয়ে সব কিনে নিতে পারব আমি।
পুরো ব্যাপারটাই খুব সহজ মনে হয়েছিল আমার কাছে। মরিসনকে নিয়ে কাজে লেগে গেলাম। প্ল্যান করলাম, কবে থেকে কিভাবে ভূত দেখানো শুরু করব। কিন্তু গোলমাল করে দিল কন্ট্রাক্টর, এক সপ্তাহ আগেই এসে বাড়ি ভাঙতে শুরু করল। সমস্ত প্ল্যান বদলে তাড়াহুড়ো করে কাজ করতে হলো আমার। ছোটখাট ভুলচুক হয়ে গেল এ-কারণেই।
বাড়ি ভাঙার খবর শুনে মরিসনকে নিয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেলাম রকি বীচে। কয়েকজন লোককে ডেকে নিয়ে গিয়ে ভূত দেখালাম। তারপর গায়েব হয়ে গেলাম দুজনে। সে-রাতেই চলে এসেছি ভারড্যান্ট ভ্যারিতে। পরদিন আবার গেলাম, আমি একা। আমার দুর্ভাগ্য, পুলিশ ঢুকতে দিল না বাড়িতে, তাহলে তোমাদের সঙ্গে দেখা হত না, আমার কণ্ঠস্বরও শুনতে না, ধরতেও পারতে না।
পারতাম, বলল কিশোর। সেদিন আপনার কথা শুনতে পেতাম না বটে, কিন্তু আজ তো পেতাম। রহস্যের সমাধান করতে আরেকটু সময় লাগত, এই আর কি। আচ্ছা, সেফ থেকে নেকলেসটা তো আপনিই সরিয়েছেন, নাকি?
প্ল্যানটা আমারই, বিষণ্ন কণ্ঠে বলল টার্নার। প্রেসিং হাউসে ভূত দেখানোর বন্দোবস্ত করলাম। গুজব বেশি করে ছড়ানোর জন্যে। নেকলেসটা রবিন, মুসা আর মিকে দেখালাম, সাক্ষী রাখলাম যে সেফেই ওটা রেখেছি। এই সময় খবর এল প্রেসিং হাউসে ভূত দেখা গেছে, উত্তেজনায় ভুলে যাওয়ার ভান করে সেফ খোলা রেখেই বেরিয়ে পড়লাম। তারপর হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়ার ভান করে আবার তাড়াহুড়ো করে ফিরে এলাম। মরিসনকে দিলাম নেকলেসটা। সে আমাকে সন্দেহমুক্ত রাখার জন্যে আমার হাত পা বেঁধে রেখে গেল।
তুমি এত বড় শয়তান জানলে...ছিহ। ঘৃণায় মুখ বাঁকালেন মিস কৌন। আর দশটা চোরাচড়ের সঙ্গে কোন পার্থক্য দেখছি না তোমার। নেকলেস জাহান্নামে। যাক, ছেলেগুলোর কি হলো? ওদেরকে ফেরত পেলেই আমি খুশি। কোথায় ওরা?
মাথা নাড়ল টার্নার। জানি না। সত্যি বলছি।
তোমার সত্যি আর কে বিশ্বাস করতে যাচ্ছে, তীব্র কণ্ঠে বললেন মিস কৌন।

কিশোরের মনে হলো, সত্যি কথাই বলছে টার্নার। বলল, আমার মনে হয়, ওরা মরিসনকে সন্দেহ করেছে। হয়তো অনুসরণও করেছে। তাই কোথাও আটকে রেখেছে মরিসন।
মাথা দোলালেন মিস্টার মিলফোর্ড। হতে পারে। আজ সারাদিনে মরিসনেরও পাত্তা নেই। কোথায় সে?
ছেলেগুলোকে না হয় লুকিয়ে রাখল, প্রতিবাদ করল টার্নার, কিন্তু ঘোড়া? তিন-তিনটে ঘোড়া লুকাবে কোথায়? উপত্যকা চষে ফেলেছে লোকেরা, তাদের চোখে পড়তই।
কোথায় লুকিয়েছে সেটা আমরা কি জানি? ঝাঁঝাল কণ্ঠে বললেন মিস কৌন। চোরে চোরে খালাত ভাই, সেটা তোমার জানার কথা।
কেউ যদি খালি আশ্চর্যবোধক চিহ্ন খুঁজে পেত, আফসোস করল কিশোর, তাহলেই খুঁজে বের করে ফেলতাম ওদের। কিন্তু চিহ্ন রেখে যেতে পেরেছে কিনা, কে জানে। থাকলে চোখে পড়বে না কেন?
ঘরে এসে ঢুকল সুই। শেরিফ এসেছেন, ম্যাডাম। বললেন খবর আছে।
জলদি নিয়ে এসো, বললেন মিস কৌন।
ঘরে ঢুকলেন শেরিফ। সঙ্গে একটা ছেলে।
কি খবর, শেরিফ? তর সইছে না আর মিস কৌনের। ওদের খোঁজ পাওয়া গেল?
না, ম্যাডাম, মাথা নাড়ল শেরিফ। তবে আশ্চর্যবোধক চিহ্ন দেখা গেছে। এই ছেলেটা দেখেছে।
ময়লা পোশাক পরা ছেলেটা এগিয়ে এল। হ্যাঁ, ম্যাডাম। পাখির ডিম খুঁজতে বেরিয়েছিলাম, পিপাসা পেল খুব। কয়েকটা পিপা দেখে পানি আছে কিনা উঁকি দিলাম, দেখি চিহ্ন।
কোথায়? আগ্রহে সামনে ঝুঁকে এসেছে কিশোর।
মরুভূমির ধারে, পথে।
মরুভূমিতে, পিপার ভেতরে, বিড়বিড় করলেন মিস্টার মিলফোর্ড। নাহ, বিশেষ সুবিধে হবে না।
হতেও পারে, উঠে দাঁড়াল কিশোর। চলুন দেখে আসি।
মিস কৌনও উঠলেন। আমিও যাব।
আমিও আসি, বলল টার্নার।
না, ধমকে উঠলেন মিস কৌন, তোমার যেতে হবে না।
তাড়াতাড়ি এসে শেরিফের পুরানো সিডানে উঠে গাদাগাদি হয়ে বসল ওরা।
বাড়ি থেকে কয়েক মাইল দূরে একটা নির্জন জায়গায় দুটো পিপা পড়ে থাকতে দেখা গেল হেডলাইটের আলোয়।

ওই যে, ওই দুটোই, হাত তুলে দেখিয়ে বলল ছেলেটা।
কাছে এসে থামল গাড়ি।
পিপাগুলো ভালমত দেখে বললেন মিস কৌন, পুরানো বাতিল জিনিস। এর মধ্যে আঙুর বা রস কোনটাই রাখা যাবে না। কিন্তু এখানে এনে ফেলল কে?
পিপার ভেতরে ঝুঁকে টর্চের আলো ফেলল কিশোর। একটা পিপার তলায় সবুজ চক দিয়ে আঁকা রয়েছে বড় একটা আশ্চর্যবোধক। হুম, রবিন ছিল এর ভেতরে।
বুঝেছি! চেঁচিয়ে উঠলেন হঠাৎ মিস কৌন। এখানে পুরানো পিপা এতই সাধারণ জিনিস, কেউই সন্দেহ করেনি। কল্পনাও করেনি কেউ ওগুলোর ভেতরে ভরে মানুষ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এগুলোতে করেই ছেলেগুলোকে পাচার করেছে। মরিসন। কিন্তু আছে তো দুটো। আরেকজনকে কি করে নিল?
কি শয়তানী বুদ্ধি! বিড়বিড় করলেন শেরিফ। কিন্তু এখানে ফেলে গেল পিপাগুলো?
হয়তো গাড়ি বদল করেছে এখানে, বললেন মিস্টার মিলফোর্ড। মরিসনের লোক আগে থেকেই গাড়ি নিয়ে বসে ছিল, নির্জন জায়গায় এসে পিপা থেকে ছেলেদেরকে বের করে অন্য গাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে স্যান ফ্রানসিসকোয়। চলুন, জলদি বাড়ি চলুন। পুলিশকে টেলিফোন করতে হবে।
ফিরে চলল গাড়ি। হেডলাইটের আলোয় পথের ধারে একটা কাগজের টুকরো পড়ে থাকতে দেখল কিশোর। খানিক দূরে একটা, তারপর আরেকটা। চিন্তিত দেখাচ্ছে তাকে। কই, আসার সময় তো দেখেনি? নাকি বেশি উত্তেজিত ছিল বলে খেয়াল করেনি? তাই হবে।
খানিক দূরে আরেকটা একই রকম কাগজের টুকরো চোখে পড়তেই গাড়ি থামাতে বলল কিশোর। গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে তুলে নিল টুকরোটা। টর্চের আলোয় দেখল, তাতে লেখা রয়েছে কিছু। আরে, রবিনের হাতের লেখা না! দ্রুত চলে এল গাড়ির কাছে। মিস্টার মিলফোর্ডকে ডাকল, আংকেল, দেখুন, রবিনের। লেখা!
ছেলের হাতের লেখা চিনতে পারলেন বাবাও।
লেখা রয়েছে: ৪৭ খনি সাহায্য চাই!!!
কি মানে এর! আপনমনেই বললেন মিস্টার মিলফোর্ড। কিশোর, কিছু বুঝতে পারছ?
না, মাথা নাড়ল কিশোর। কিছুই বুঝছি না। হতে পারে সাতচল্লিশ মাইল দূরের কোন খনির কথা বলছে।
সাতচল্লিশ মাইল দূরে কোন খনি নেই, বললেন মিস কৌন, যা আছে, মাইল দশেকের মধ্যেই রয়েছে। এখানকার কোন খনিই খোঁজা বাদ রাখেনি।

স্থির দৃষ্টিতে কাগজটার দিকে চেয়ে আছে কিশোর, চিমটি কাটছে নিচের ঠোঁটে। দশ মাইলের মধ্যেই কোন খনিতে রয়েছে ওরা খনির উল্লেখ তাই বোঝাচ্ছে। কিন্তু সাতচল্লিশ মানে কি তাহলে?
গুহার দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে পাশাপাশি বসে আছে রবিন আর মিঙ। পা বাঁধা। বাড়তি সতর্কতা হিসেবে ওদের দুপাশে বসে আছে দুজন লোক, পাহারায়।
গাঢ় অন্ধকার। কিছুই দেখা যায় না।
স্টেশন ওয়াগনের পেছনে তুলে চাদর দিয়ে ঢেকে নিয়ে আসা হয়েছে ওদেরকে হ্যাঁশনাইফ ক্যানিয়নে। গাড়ি যতদূর আসতে পারে এসেছে, তারপর ঘুম থেকে তুলে হাঁটিয়ে এসেছে বাকি পথ।
মুসাকে নিয়ে নেকলেস আনতে গেছে মরিসন।
সুড়ঙ্গের সঙ্কীর্ণ অংশটার কাছে এসে দাঁড়াল দুজনে। এরপর আর মরিসন যেতে পারবে না। মুসার হাতে একটা টর্চ ধরিয়ে দিয়ে শাসিয়ে বলল, যাও। কোনরকম চালাকি করবে না। তুমি ফিরে না এলে তোমার দুই বন্ধুর গলা কেটে ফেলে দেব। মনে থাকে যেন।
না ফেরার কোন ইচ্ছে নেই মুসার। সেকথা মরিসনকে জানিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে পড়ল সুড়ঙ্গে।
দুইবার গেছে-এসেছে এই পথে, তৃতীয়বার যেতে বিশেষ অসুবিধে হলো না। পেরিয়ে এল সঙ্কীর্ণ অংশটা তারপর চিহ্ন ধরে ধরে এসে ঢুকল সেই গুহায়, যেখানে লুকিয়েছে নেকলেস। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, নেকলেসটা দিয়ে দেবে মিস্টার হুয়াঙকে, কোনরকম চালাকি করবে না। অহেতুক ঝুঁকি নেয়ার কোন অর্থ নেই।
কিন্তু কঙ্কালটা যেখানে থাকার কথা সেখানে আলো ফেলেই স্থির হয়ে গেল। ভয়ের ঠাণ্ডা স্রোত শিরশির করে নেমে গেল মেরুদণ্ড বেয়ে। কঙ্কালের চিহ্নও নেই, গাধার খুলিটাও গায়েব। সে জায়গায় মস্ত এক কালো গর্ত, বড় পাথর ধসে পড়ে রয়েছে। নিশ্চয়ই গুঁড়িয়ে দিয়েছে হাড়, সেই সঙ্গে ভঙ্গুর মুক্তোগুলোও।
প্রমাদ গুনল মুসা। এখন কি করবে? মরিসনকে বিশ্বাস করানো যাবে না। কি করবে? ভাবতে ভাবতেই ফিরল সে। পাথরের আড়াল থেকে বের করে নিল কালো টর্চটা। মরিসন কি খুলে দেখবে? নাকি না দেখেই ছেড়ে দেবে তাদেরকে?
ঘটল কি করে এই কাণ্ড? মনে পড়ল মুসার, দ্বিতীয়বার সঙ্কীর্ণ সুড়ঙ্গ দিয়ে ফেরার পথে ভূমিকম্প হয়েছিল। সে-কারণেই হয়তো ধসে পড়েছে পাথর। একেই বলে দুর্ভাগ্য। পড়ার আর জায়গা পেল না, পড়ল একেবারে কঙ্কালটার ওপর।
ভগ্নহৃদয়ে কালো টর্চটা নিয়ে ফিরে চলল মুসা। জানে, না দেখে নিশ্চিন্ত হবে না মরিসন, তবু ক্ষীণ একটা আশা দুলছে মনে। যদি না দেখেই ছেড়ে দেয়?

সঙ্কীর্ণ সুড়ঙ্গ পেরিয়ে এল মুসা।
দেখেই ধমকে উঠল মরিসন, এত দেরি কেন? কই, এনেছ?
নীরবে কালো টর্চটা মরিসনের হাতে তুলে দিল মুসা।
হাতে নিয়ে একবার ওজন পরীক্ষা করেই মাথা নাড়ল মরিসন। হু। চলো, এগোও।
কিন্তু দশ পা এগিয়েই থেমে গেল মরিসন। আছে কিনা দেখি তো? বিচ্ছটাকে বিশ্বাস নেই। টর্চের পেছনের ক্যাপ ঘুরিয়ে খুলতে শুরু করল।
দৌড় দিল মুসা। দুই লাফে এসে তার কলার চেপে ধরল মরিসন, ল্যাঙ মেরে ফেলে দিল মাটিতে। দ্রুত হাতে ক্যাপ খুলে টর্চের ভেতর থেকে বের করে আনল রুমালে বাধা পাথরের পুঁটলি।
গর্জে উঠে একটানে ছুরি বের করল মরিসন। উঠে দাঁড়িয়েছে মুসা। ছুরির চোখা ফলা তার পিঠে ঠেসে ধরে বলল ফোরম্যান, গোলমাল করলে কি করতে হবে বলে দিয়েছেন মিস্টার হুয়াঙ। জবাই করব আমি তোমাদের। নেকলেসটা কোথায়?
নেই। পাথর পড়ে ভেঙে গেছে, মিনমিন করে বলল মুসা।
চুপ! চালাকির আর জায়গা পাওনি! দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা। তোমাকে কিছু বলব না, তোমার বন্ধুদের আঙুল কাটব এক এক করে। চলো হাঁটো। সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না। হাঁটো, ছুরির মাথা দিয়ে মুসার পিঠে খোঁচা লাগাল মরিসন।
গুহাটায় ফিরে এল দুজনে। টর্চের আলোয় দেখা গেল তেমনি বসে আছে রবিন আর মিঙ। তার পাশে মুখ গুঁজে বসে আছে দুজন লোক।
এই... বলেই থেমে গেল মরিসন। হঠাৎ লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল দুজন, হাতে রিভলভার। তার রেখে যাওয়া প্রহরীরা নয়, অন্য লোক।
প্রায় একই সঙ্গে গুহার চারপাশ থেকে জ্বলে উঠল ছয়টা টর্চ। শেরিফের ধমক শোনা গেল, খবরদার, নড়বে না, খুলি উড়িয়ে দেব!
কিন্তু নড়ল মরিসন। চোখের পলকে মুসার কলার চেপে ধরে একটানে তাকে নিয়ে ঢুকে গেল আবার সুড়ঙ্গে। কেউ গুলি করার সাহস পেল না, মুসার গায়ে লাগতে পারে। এতই তাড়াতাড়ি ঘটে গেল ঘটনাটা, কেউই কিছু করতে পারল না। তবে দাঁড়িয়েও থাকল না। টর্চ আর রিভলভার হাতে ছুটে এসে ঢুকল সুড়ঙ্গে।
ঝাড়া দিয়ে মরিসনের হাত থেকে কলার ছুটিয়ে নিয়ে দৌড় দিল মুসা। এসে পড়ল একেবারে শেরিফের গায়ে।
কোথায় গেল? জিজ্ঞেস করল শেরিফ।
আঙুল তুলে একটা সুড়ঙ্গ মুখ দেখিয়ে দিল মুসা, কথা বলতে পারছে না, হাঁপাচ্ছে।

যাক, বলল শেরিফ। আজ আর খুঁজব না। খনির মুখে পাহারা রেখে যাব। কাল সকালে এসে ধরব ব্যাটাকে।
ফেরার পথে গাড়িতে রবিন জানতে চাইল, ওরা কোথায় আছে তা জানা গেল। কি করে।
কিশোরের কৃতিত্ব, বললেন মিস্টার মিলফোর্ড। পথের ধারে তোমার লেখা কাগজ তার চোখেই পড়েছে। বোঝা গেল, খনিতে রয়েছ তোমরা। কিন্তু কোন্টায়? যত খনি আছে, জানামতে সব খুঁজেছে মিস কৌনের লোকেরা। শেষে তারই মনে পড়ল একটা কথা, প্রায়ই নাকি মিঙ কোন এক খনিতে যেত, একজন লোকের সঙ্গে। লোকটার নাম ন্যাট বারুচ, স্যান ফ্রানসিসকোর এক হাসপাতালে রয়েছে এখন। অসুস্থ। তাকে ফোন করলেন মিস কৌন। জানা গেল, আরেকটা খনিমুখ আছে, যেটা খোঁজা হয়নি। দুটো হলদে পাথর আছে খনির মুখে। তখনই তোক জোগাড় করে ওটাতে এসে ঢুকলাম। তারপর আর কি? ঢুকেই দেখি তুমি আর মিঙ... থামলেন তিনি। আচ্ছা, সাতচল্লিশ লিখেছিলে কেন? মানে কি?
হাসল রবিন। কিশোর এর মানে বের করতে পারেনি?
না, বলল কিশোর।
তুমি বোঝে না, এমন জটিল সমস্যাও তাহলে আছে, বলল রবিন। স্টেশন। ওয়াগনের পেছনে তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল আমাদেরকে। নোট বই থেকে পাতা ছিঁড়ে তাতে সঙ্কেত লিখে একটা ফাঁক দিয়ে ফেলেছি। একটা মাত্র পাতা ফেললে লোকের চোখে পড়ার সম্ভাবনা খুবই কম। তাই একটার পর একটা পাতা ছিঁড়ে একই কথা বারবার লিখে ফেলেছি। সিরিয়াল নম্বর দিয়ে দিয়েছি এক দুই করে। ধরে নিয়েছি, বেশি পাতা ফেললে একটা অন্তত কারও না কারও চোখে পড়বেই। তোমরা যেটা পেয়েছ, সেটা সাতচল্লিশ নম্বর।
নম্বর দিয়েছ কেন? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
এমনি মনে হলো, তাই দিলাম।
খনির নাম-ঠিকানা লিখলে না কেন?
নাম জানি না। তাছাড়া বেশি লেখার সুযোগ কোথায়? চাদরের নিচে অন্ধকারে বসে লিখেছি, চলন্ত গাড়িতে। ওটুকু যে লিখতে পেরেছি তা-ই বেশি।
পরদিন ধরা পড়ল না মরিসন। ধরা গেল না কোনদিনই। তার আর কোন খোঁজই কেউ কোনদিন পেল না। হয়তো এমন কোন সুড়ঙ্গ দিয়ে বেরিয়ে পালিয়েছে সে, যেটা সম্পর্কে আর কেউই জানে না। কিংবা হতে পারে, কোন সুড়ঙ্গ বা গুহায় বেকায়দা অবস্থায় আটকা পড়ে গাধাটার মতই মর্মান্তিক মৃত্যু বরণ করছে।
মিস্টার মিলফোর্ড ফিরে গেলেন রকি বীচে।

মিঙের দাদীমার মেহমান হয়ে আরও কয়েক দিন ভারড্যান্ট ভ্যালিতে থাকল। তিন গোয়েন্দা।
যেসব জায়গা দেখা হয়নি, ঘুরে ঘুরে সব দেখাল তাদেরকে মিঙ। চাকার কেটে গেল কয়েকটা দিন।
ভূতের ব্যাপারটা ভুয়া, সব টার্নারের শয়তানী, এটা প্রকাশ পেতেই আবার ফিরে এল শ্রমিকের দল, শেষ মুহূর্তে রক্ষা পেল পাকা আঙুর, তাড়াতাড়ি তুলে পাঠানো হলো ওগুলোকে প্রেসিং হাউসে, রাতদিন পরিশ্রম করে ক্ষতি পুষিয়ে নেয়া হলো।
টার্নারকে পুলিশে দেননি মিস কৌন, আত্মীয় বলে মাফ করে দিয়েছেন। তবে তাড়িয়ে দিয়েছেন ভারড্যান্ট ভ্যালি থেকে। সাবধান করে দিয়েছেন, ওখানে আর কোন দিন তাকে দেখা গেলে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশে দেবেন।
অবশেষে একদিন রকি বীচে ফিরে এল তিন গোয়েন্দা। খবর পেয়ে সেদিনই এসে তাদের সঙ্গে দেখা করলেন পুলিশ-প্রধান ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্লেচার। বার বার ধন্যবাদ দিয়ে বললেন, উফ, কি মানসিক অশান্তি থেকেই না মুক্ত করেছ তোমরা আমাকে। নিজের চোখে ভূত দেখলাম অথচ ভূত বিশ্বাস করি না, রহস্যটা রাতের ঘুম হারাম করে দিয়েছিল আমার।
পকেট থেকে তিনটে সবুজ কার্ড বের করলেন ক্যাপ্টেন, একেকজনকে একটা করে দিলেন।
লেখা রয়েছে:
এই কার্ডের বাহক ভলানটিয়ার জুনিয়র, রকি বীচ পুলিশকে সহায়তা করছে। এদেরকে সাহায্য করা মানে, পক্ষান্তরে পুলিশকেই সাহায্য করা।
সার্টিফিকেটের নিচে ক্যাপ্টেন ফ্লেচারের সই আর সীল।
আনন্দে লাল হয়ে গেল কিশোরের মুখ। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, ক্যাপ্টেন। গোয়েন্দাগিরি করা এখন অনেক সহজ হয়ে গেল আমাদের জন্যে।
চেঁচিয়ে উঠল মুসা, থ্রী চিয়ার্স ফর...
ক্যাপ্টেন ফ্লেচার! সমস্বরে শ্লোগান দিল কিশোর আর রবিন।
হাসলেন ক্যাপ্টেন। এখন থেকে কোনরকম অসুবিধে হলেই আমাকে জানাবে। যতভাবে পারি, সাহায্য করব।
বাইরে বোরিস আর রোভারকে খাটাচ্ছেন মেরিচাচী, চেঁচামেচি শুনে উঁকি দিলেন অফিসে। হাসিমুখে বেরিয়ে আসছেন ক্যাপ্টেন ফ্লেচার, ব্যাপারটা অবাকই লাগল তার কাছে। কি ব্যাপার, চীফ? আপনার মুখে হাসি, অবাক কাণ্ড!
হাসব না বলছেন কি? হাসতে হাসতেই বললেন ক্যাপ্টেন। ভূতে ধরেছিল আমাকে, আপনার ছেলেরা ছাড়িয়েছে।

সর্বনাশ! আঁতকে উঠলেন মেরিচাচী। ছেলেগুলো আপনার মাথাও খেয়েছে। তাহলে? …যাচ্ছেন যে? চা খেয়েছেন?
না, খাইনি। বসব?
বসুন বসুন, আমি এখুনি নিয়ে আসছি। তারপর ভূতের গল্প শুনব।
বড়দের কথায় আর থাকল না তিন গোয়েন্দা, বেরিয়ে এল। রওনা হলো হেডকোয়ার্টারে।

.

তার পরদিন বিখ্যাত চিত্রপরিচালক মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফারের অফিসে এল তিন গোয়েন্দা। তাদেরকে দেখেই বলে উঠলেন তিনি, এই যে, এসে পড়েছ, বসো। খবরের কাগজে পড়েছি সব। দুমিনিট বসো, হাতের কাজটা সেরে নিই, তারপর শুনব।
কাজ শেষ করে কাগজপত্র এক পাশে ঠেলে সরিয়ে রাখলেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। হাত বাড়ালেন। ফাইলটা বাড়িয়ে দিল রবিন।
মন দিয়ে রবিনের লেখা রিপোর্ট পড়লেন তিনি। মুখ তুললেন। মিস্টার হুয়াঙের খবর কি? তার কথা তো আর কিছু লেখোনি।
রবিন বলল, আমার ওখানে থাকতেই একদিন মিঙের দাদীমার বাড়িতে এল দুজন চীনা। তারা বলল, নেকলেসটা কোথায় রেখেছিল মুসা দেখিয়ে দিলে মিস্টার হুয়াঙ কিস্তিতে ঋণের টাকা নিতে রাজি আছেন। দেখিয়ে দিল মুসা। নেকলেস পাওয়া যায়নি, তবে ওখানকার সমস্ত ধুলো পোটলা করে নিয়ে গেছে লোকগুলো।
মুক্তোর গুঁড়ো মেশানো ধুলো খেয়েই বেঁচে থাকার ইচ্ছে। হুহ, কতরকম লোক যে আছে দুনিয়ায়। সব কুসংস্কার। কিশোরের দিকে ফিরলেন, কিশোর, কুকুরের উল্লেখ আছে রিপোর্টে, কিন্তু ব্যাখ্যা করা হয়নি। খুলে বলো তো।
কুকুরটার কথা ভাবতে শার্লক হোমসের একটা গল্প মনে পড়ে গেল, বলল কিশোর। আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে, স্যার, ডক্টর ওয়াটসনকে শার্লক হোমস কি বলেছে, রাতে কুকুরের আচরণ সম্পর্কে?
নিশ্চয়ই! বুঝে ফেললেন চিত্রপরিচালক, চেহারার ভাবেই প্রকাশ পেল সেটা। ডক্টর ওয়াটসন বলছে, রাতে অদ্ভুত কিছুই করে না কুকুরটা। শার্লক হোমসের জবাব, করে না যে সেটাই তো অদ্ভুত।
বুঝেছেন, স্যার।
রিপোর্টের পাতা উল্টে একটা জায়গায় এসে থামলেন চিত্রপরিচালক। এই যে, এখানে লেখা রয়েছে, ছোট্ট কুকুরটা শান্ত ছিল লোকটার কোলে, চেঁচামেচি

করেনি। কিশোর, না বলে পারছি না, তোমার ব্রেনটা অসাধারণ। এই অতি সামান্য একটা ব্যাপার থেকে রহস্যের সমাধান করে ফেললে?
মুসা আর রবিনের চোখ বড় বড় হয়ে গেছে। কিছুই বুঝতে পারছে না। হেঁয়ালি মনে হলো তাদের কাছে কিশোর আর চিত্রপরিচালকের কথাবার্তা।
কুকুরটা শান্ত ছিল, তাতে কি? আর থাকতে না পেরে জিজ্ঞেস করল মুসা।
কুকুর আর বিড়ালের স্বভাব জানো? বললেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। রাতের বেলায় ভয় পেলে কিংবা অদ্ভুত কিছু দেখলে কি রকম উত্তেজিত হয়ে ওঠে? রোম খাড়া হয়ে যায়, চিৎকার করে। ছোট্ট কুকুরটা সেরাতে কিছুই করেনি, তার মানে কি?
ও, বুঝেছি! চেঁচিয়ে উঠল মুসা। যেহেতু ভূত ছিল না সেটা, সেজন্যেই চেঁচামেচি করেনি কুকুরটা। আমাদের কাছে অস্বাভাবিক, কিন্তু তার কাছে ব্যাপারটা সাধারণ ছিল। ইস, আমরা কি! এই সহজ কথাটা…
তোমরা? আর দশটা ছেলের চেয়ে বুদ্ধিমান, সাহসী, রীতিমত দুঃসাহসী, বললেন চিত্রপরিচালক, নেকলেসটা যেভাবে লুকিয়েছ, মরিসনকে ধোঁকা দিতে চেয়েছ, সেটা বুদ্ধি আর সাহসের পরিচয় নয়? রবিন যে ঘুমের ভান করে থাকল সেটা বুদ্ধির পরিচয় নয়?…
হ্যাঁ, ঠিক, হাসল মুসা। মিস্টার হুয়াঙকেও বোকা বানিয়ে ছাড়ল। সম্মোহিত হওয়ার ভান করে চোখ বুজে রইল। তারপর সুযোগমত সাহায্যের আবেদন ছড়িয়ে দিল পথে পথে। এটা শুনলে মিস্টার হুয়াঙের চেহারা কেমন হয় দেখতে ইচ্ছে করছে। হা-হাহ্।
আজ তাহলে উঠি, স্যার? ওঠার উপক্রম করল কিশোর।
আরে বসো, হাত নাড়লেন চিত্রপরিচালক। আসল কথাটাই তো জানা হয়নি এখনও ভূতের ব্যাপারটা ফাঁকিবাজি, কিন্তু একটা কিছু তো দেখা গেছে। কি ওটা?
কুকুরের ব্যাপারে ভাবতে গিয়েই ওটা বুঝতে পেরেছি। কুকুরটা তেমন বিশেষ কোন গন্ধ পেল না, বিশেষ কিছু দেখল না, তার আচরণ থেকেই এটা স্পষ্ট। … ঘরটা অন্ধকার করে দিই, স্যার?
হ্যাঁ হ্যাঁ, দাও।
জানালার সবগুলো পর্দা টেনে দিল কিশোর। আলো নিভিয়ে ঘর অন্ধকার করে দিল। ডানে, দেয়ালের দিকে তাকান।
রবিন আর মুসাও তাকাল। সবুজ আলো ফুটছে সাদা দেয়ালে। আস্তে আস্তে উজ্জ্বল হলো আলো। যেন একটা মানুষের রঙিন ছায়া, নড়ছে। দেয়ালের এক

প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ভেসে চলে গেল যেন ওটা। ম্লান হতে হতে মিলিয়ে গেল।
আলো জ্বেলে দিল আবার কিশোর।
তাজ্জব ব্যাপার। বিশ্বাস করতে পারছে না মুসা।
বুঝেছি, মাথা ঝোকালেন চিত্রপরিচালক। আরও আগেই আমার বোঝা উচিত ছিল। এতদিন সিনেমা লাইনে আছি…
কী, স্যার? কৌতূহল দমিয়ে রাখতে পারছে না মুসা।
প্রোজেক্টর। মিনি প্রোজেক্টর। লাইটিং খুব কমিয়ে দিয়ে অন্ধকারে দেয়ালে ছবি ফেলা হয়েছে, আর কিছু না। রঙিন ছবি।
কিশোরের হাতের ওই টর্চটা? ভুরু কুঁচকে গেছে মুসার।
হ্যাঁ, বলল কিশোর। এটা টার্নারের অফিসে খুঁজে পেয়েছি। জাপানের তৈরি। দেয়ালে ছবি ফেলে টর্চটা যেদিকে ঘোরাবে সেদিকেই যাবে ছবি। ওপরে নিচে কিংবা পাশে দ্রুত নাড়ালে মনে হবে ছবিটা, নাচছে। একটা সুইচ আছে, এই যে এটা, এটা দিয়ে লাইট কন্ট্রোল করা যায়, আলো কমানো বাড়ানো যায়। মিস্টার হুয়াঙ দিয়েছেন এটা টার্নারকে।
কি করে জানলে? রবিন জিজ্ঞেস করল।
টার্নারই বলেছে।
টার্নারই তাহলে ভূত দেখিয়েছে? মুসা বলল।
সে-ও দেখিয়েছে, মরিসনও দেখিয়েছে। টর্চের মত দেখতে, হাতে নিয়ে ঘুরলে কেউ সন্দেহ করে না। পকেটেও জায়গা হয়, পকেটে ঢুকিয়ে রাখল কিশোর। তিন গোয়েন্দার হেডকোয়ার্টারে স্যুভনির রাখব এটা। চিত্রপরিচালকের দিকে ফিরে বলল, তাহলে এখন যাই, স্যার।
কিছু খাবে না? আইসক্রীম?
মুসার মুখটা হাসি হাসি হয়ে গেল, কিন্তু সেদিকে খেয়াল না দিয়ে উঠে পড়ল কিশোর।
না, স্যার, বাড়ি গিয়ে একবারে খাব। চলি।
একে একে বেরিয়ে গেল ওরা অফিস থেকে।
পেছনে তাকিয়ে রইলেন চিত্রপরিচালক। আপনমনেই বিড়বিড় করলেন, আশ্চর্য এক ছেলে! শার্লক হোমসের কিশোর সংস্করণ। শুধু একটা কুকুরের আচরণ থেকেই… হাত বাড়িয়ে বেলপুশ টিপে বেয়ারাকে ডাকলেন। লাঞ্চের সময় পেরিয়ে যাচ্ছে।

ভলিউম ০০২ – সাগরসৈকত – রকিব হাসান – তিন গোয়েন্দা – কিশোর থ্রিলার

প্রথম প্রকাশ: মার্চ, ১৯৮৭

চিঠিটা অদ্ভুত। হাতে নিয়ে চিন্তিত চোখে ওটার দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ কিশোর পাশা, তৃতীয়বার পড়ল:

তিন গোয়েন্দা

স্কুল তো ছুটি, চলে এসো না তিনজনেই আমাদের বাড়িতে। চমৎকার জায়গা, বুঝেছ, খুবই সুন্দর। সাগর, পাহাড়, পাখি, কি যে দারুণ, না দেখলে বুঝবে না! হ্যাঁ, আরেকটা কথা, রহস্যের পূজারি তোমরা, কথা দিচ্ছি-এখানে এলে কোন না কোন রহস্য পেয়ে যাবেই যাবে। তোমাদের সঙ্গে আমারও ছুটিটা কাটবে ভাল। এসো, পছন্দ না হলে পরের দিনই চলে যেয়ো আবার, খরচ-খরচা সব আমার।

আসবে তো? তোমাদের অপেক্ষায় রইলাম।

-জর্জ গোবেল।

হেডকোয়ার্টারে বসে আছে তিন গোয়েন্দা। কিশোরের ডেস্কের। উল্টোদিকে বসেছে মুসা আর রবিন।

খামটা উল্টেপাল্টে দেখছে রবিন। খামের এক কোণে প্রেরকের ঠিকানা রয়েছে: জর্জ গোবেল, গোবেল ভিলা, গোবেল বিচ।

ঠিকানাটাও অদ্ভুত! বিড়বিড় করল রবিন।

জায়গাটা কোথায়? মুসার প্রশ্ন।

ড্রয়ার খুলে একটা ম্যাপ বের করে বিছাল কিশোর। তিনজনেই হুমড়ি খেয়ে পড়ল তার ওপর। একটা জায়গায় আঙুল রাখল রবিন। এই যে, এই তো...লস অ্যাঞ্জেলেসেই। যা মনে হচ্ছে...শহরের বাইরে, গ্রামট্রাম থাকবে হয়তো আশপাশে। সাগরের তীরে, এই যে। নাহ, জায়গাটা সুন্দরই হবে।

কিন্তু এই জর্জ গোবেলটা কে? কিশোরের দিকে তাকাল মুসা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে। আমাদের পরিচিত না!

কী জানি! নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কয়েকবার গোয়েন্দাপ্রধান, চিন্তিত। কিন্তু চিঠি পড়ে মনে হচ্ছে, আমাদের নাড়িনক্ষত্র সব তার জানা।

দূর! ঠোঁট ওল্টাল মুসা। আমার মনে হয়, কারও শয়তানী। শুঁটকি টেরিও হতে পারে। আমাদের বোকা বানানোর জন্যে করেছে। গেলেই ব্যাটার হাসির খোরাক হব হয়তো।

তা-ও হতে পারে! রবিন বলল।

চিঠিটার দিকে আরেকবার তাকাল কিশোর পাশা, নীরবে কিছুক্ষণ ভাবল। মুখ তুলল হঠাৎ। এই ছুটিতে তোমাদের কোথাও যাওয়ার কথা আছে?

মা আয়ারল্যাণ্ডে যাবে, রবিন বলল। অনেক দিন আমার নানা নানীকে দেখে না, এবার নাকি দেখতে যাবে। বাবা সঙ্গে যেতেও পারে, না-ও যেতে পারে। আমাকে যেতে বলেছিল, আমি মানা করে দিয়েছি। যা শীত এখন, কে যায় মরতে! সারাক্ষণ বাড়িতে বসে থাকা কাথামুড়ি হয়ে, বরফের জ্বালায় বাইরে বেরোনোর জো নেই। তার চেয়ে আমাদের রকি বিচই অনেক ভাল। আমি যাচ্ছি না।
আমার আম্মা-আব্বা যাবে নিউ ইয়র্কে, মুসা বলল। মার বোনের সঙ্গে দেখা করতে। আমি যাব..যদি না…
যদি না? কিশোর ভুরু কেঁচিকাল।
যদি না গোবেল বিচে যাওয়া হয়। নিউ ইয়র্কের লোকের ভিড়ের চেয়ে সাগর অনেক ভাল। তা ছাড়া বলছে, পাহাড়, পাখি…
আরে, আরে! তুমি আবার কবি হলে কবে থেকে! টিপ্পনী কাটল রবিন। ফুলের কথা কিন্তু বলেনি।
কড়া একটা জবাব দেয়ার জন্যে ঘুরে চাইল মুসা। সঙ্গে সঙ্গে হাত তুলল কিশোর, রাখো, রাখো, ঝগড়া বাধিয়ো না, জরুরি আলাপ এটা। হ্যাঁ, তা হলে দেখা যাচ্ছে, তোমরা দুজন কোথাও যাচ্ছ না। আমিও না। তা হলে গোবেল বিচে যেতে বাধা কোথায়?
যাবে ঠিক করে ফেলেছ? মুসার কণ্ঠে বিস্ময়। যদি শুঁটকির কাজ হয়? ও ব্যাটা রকি বিচে আসেনি এবার ছুটিতে, ওখানে গিয়ে বসে আছে। কিনা, কে জানে?
গেলে গেল। ওর চিঠি পেয়ে আমরা গেছি, কী করে জানছে? আমরা কি বলতে যাচ্ছি? তোমার এয়ারগানটা সঙ্গে নেবে, রবিন আর আমি ছিপ নেব। চুটিয়ে পাখি শিকার করব, খরগোশ মারব, মাছ ধরব।
থাকব কোথায়? রবিনের জিজ্ঞাসা।
গোবেল ভিলায়। আর ওরকম কোন ভিলা না থাকলে শহরে এসে তাঁবু-টাবু কিনে নিয়ে যেতে পারব। অসুবিধে কী?
না, কোন অসুবিধে নেই। আরও খানিকক্ষণ আলাপ-আলোচনা করে একমত হয়ে গেল তিন কিশোর, গোবেল বিচেই যাবে। আসছে বুধবার, মাঝখানে শুধু একটা দিন বাকি।

.

মাত্র একটা দিনই যেন আর ফুরোতে চায় না। অবশেষে বুধবার এল। ভোরে উঠে তাড়াহুড়ো করে তৈরি হয়ে নিল রবিন আর মুসা, নাশতা সেরেই পাশা স্যালভেজ ইয়ার্ডে চলে এল। কিশোরও তৈরি হয়ে ওদের অপেক্ষা করছে, দুই বন্ধু আসতেই ওদেরকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল, তিনজনের কাঁধেই ব্যাগ। মুসার হাতে এয়ারগান, রবিন আর কিশোরের হাতে ছিপ।

ছুটির সময়। বাস স্টেশনে বেশ ভিড়। স্কুল ছুটি, বড়দের চেয়ে বাচ্চা ছেলেমেয়েদের ভিড়ই বেশি। কোলাহল, কলরব, উত্তেজনা, সবাই আনন্দমুখর। কোথাও না কোথাও ছুটি কাটাতে যাচ্ছে সবাই।
প্রথম বাসটায় জায়গা পেল না তিন গোয়েন্দা, পরের বাসের টিকিট কাটতে হলো।
বাস ছাড়ল। রাস্তায় গাড়ির ভিড়।
শহর ছাড়িয়ে এল এক সময় বাস। ধীরে ধীরে কমছে যানবাহনের ভিড়। পথের দুপাশে বাড়িঘর আর তেমন নেই এখন, পাহাড় আর টিলাটব্ধরও কমে আসছে। খোলা প্রান্তর।
তীব্র গতিতে ছুটে চলেছে গাড়ি। জানালার কাছে বসেছে কিশোর, তার দুপাশে অন্য দুই গোয়েন্দা। হু হু বাতাসে চুল উড়ছে ওদের। মনে দারুণ সুখ। আর থাকতে না পেরে এক সময় গান গেয়ে উঠল মুসা। তার সঙ্গে যোগ দিল রবিন, দেখতে দেখতে গান শুরু হয়ে গেল সারা বাস জুড়ে। হাতে তালি দিয়ে তাল দিচ্ছে কয়েকটা ছেলে। বাসের কণ্ডাকটরও যোগ দিল তাদের সঙ্গে। তালে তালে আস্তে আস্তে মাথা দোলাচ্ছে ড্রাইভার। নাহ, ছুটি বটে!
গান থামল এক সময়।
কিশোর, মুসা বলল, খাচ্ছি কখন? পেট জ্বলছে খিদেয়।
এখনি? জানালার দিক থেকে মুখ ফেরাল কিশোর। মাত্র তো এগারোটা। আরও ঘণ্টা দেড়েক যাক।
খাইছে, এতক্ষণ! আঁতকে উঠল মুসা। টিকব না! সেই ভোরে কখন কী খেয়েছি ভুলেই গেছি!
হেসে ফেলল কিশোর। ব্যাগ খুলে বড় তিনটে চকলেট বের করে একটা করে তুলে দিল রবিন, আর মুসার হাতে। নিজেরটারও মোড়ক ছাড়িয়ে কামড় বসাল। আবার চোখ ফেরাল বাইরে। দুপাশে তৃণভূমি, তার ওপারে পাহাড়ের ঢালে জঙ্গল। পথের ধারে বড় বড় গাছ, স্যাৎ স্যাৎ করে সরে যাচ্ছে।
বারোটা নাগাদ একটা স্টেশনে থামল বাস। এখানে গাড়ি বদল করতে হবে, বাস থেকে নামল তিন গোয়েন্দা।
পাহাড়ের ধার ঘেঁষে এখানে চলে গেছে পথ। নিচে ছড়ানো উপত্যকা রোদে ঝলমল করছে। গরু-ভেড়া চরছে। খেয়ে নিয়ে তারপর বাসে উঠবে ঠিক করল তিন গোয়েন্দা। ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল ওরা, একটা বড় গাছ দেখেছে, তার ছায়ায় বসে খাবে।
পেছনে আচমকা ম-অঁ-অ্যাঁ! শুনে ইয়াল্লা! বলে চেঁচিয়ে এক লাফ মারল মুসা। ফিরে চেয়ে দেখল, বাদামী রঙের একটা গরু বড় বড় অবাক চোখ মেলে তাকে

দেখছে। হো হো করে হেসে উঠল কিশোর আর রবিন।
সঙ্গে আনা স্যাণ্ডউইচ দিয়ে খাওয়া সারল ওরা।
কটার সময় পৌঁছুব? আঙুল চাটছে মুসা। খাওয়াটা জুতসই হলো না। শিগগিরই খিদে লেগে যাবে।
এই, সাতটা-আটটা তো বাজবেই, কিশোর জবাব দিল। হাত-পা ছড়িয়ে ঘাসের ওপর চিত হয়ে শুয়ে পড়ল সে। আরেকটা লম্বা যাত্রা।
আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না? প্রস্তাব দিল রবিন। একটা ট্যাক্সি ভাড়া করে নিলেই তো পারি? ভিড়ও হবে না, যেতেও পারব তাড়াতাড়ি।
হুঁ, কথাটা মন্দ না, এক কনুইয়ে ভর রেখে কাত হয়ে শরীরটাকে সামান্য তলল কিশোর। তাই করব। মুসা, দেখো না একটা ট্যাক্সি।
আবার যাত্রা শুরু হলো। চোখের পলকে যেন এগিয়ে আসছে মাইল। পোস্টগুলো, পেছনে পড়ে যাচ্ছে। বিকেলের দিকে একটা বড় পাহাড়ে উঠতে শুরু করল গাড়ি, পথটা পাহাড় পেরিয়ে গেছে। হঠাৎ করেই যেন চূড়ায় পৌঁছে গেল গাড়ি, সাগর চোখে পড়ল। বিকেলের সোনালী আলোয় সূরের সাগরটাকে দেখাচ্ছে মস্ত এক আয়নার মত।
ওই যে! এসে পড়েছি! হাত তুলল কিশোর।
দারুণ! চোখ বড় বড় করে চেয়ে আছে রবিন।
ইস, এখুনি গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে! মুসা বলল।
আর বড় জোর মিনিট বিশেক লাগবে, কিশোর বলল। খুব তাড়াতাড়িই এসেছি। বাসে এলে অর্ধেক পথ আসতাম এতক্ষণে।
সৈকতের ধার দিয়ে ছুটছে ট্যাক্সি।
খুবই সুন্দর! কিশোর বলল। কী ঘন নীল!
আর দ্বীপগুলো দেখেছ? রবিন অভিভূত। যেন ছবি! নাহ, এসে ভুল করিনি, কিশোর!
গোবেল ভিলাটা এখন খুঁজে পেলেই হয়! মুসার কণ্ঠে সন্দেহ।
কিন্তু পাওয়া গেল গোবেল ভিলা, সহজেই। একজন পথচারীকে জিজ্ঞেস করতেই হাত তুলে দেখিয়ে দিল। ছোট একটা পাহাড়ের মাথায় বিশাল এক বাড়ি, সাগরের দিকে মুখ করা। শ্বেতপাথরে তৈরি, নিশ্চয় অনেক পুরানো আমলের। সামনে ছড়ানো বাগান, ফুলে ফুলে ছেয়ে আছে, গোলাপই বেশি।
বাড়ির সিংহ-দরজার মস্ত খুঁটিও শ্বেতপাথরে তৈরি, ধনুকের মত বাকানো গেটের কপালে বড় বড় অক্ষরে ইংরেজিতে লেখা রয়েছে: গোবেল ভিলা। ধবধবে সাদা পাথরে যেন ফুটে রয়েছে কালো অক্ষরগুলো।
ব্যস, পৌঁছে গেলাম! চেপে রাখা শ্বাসটা শব্দ করে ছাড়ল গোয়েন্দাপ্রধান।

খোয়া বিছানো পথ ধরে গাড়ি-বারান্দায় এসে থামল ট্যাক্সি, শব্দ শুনেই দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন এক মহিলা। সিঁড়ি বেয়ে তাড়াতাড়ি নেমে এসে দাঁড়ালেন গাড়ির পাশে। মেরি চাচীর বয়েসী, বেশ সুন্দরী, হাসিতে উজ্জ্বল মুখ। মহিলাকে ভাল লাগল ছেলেদের।

এসে পড়েছ! হেসে বললেন মহিলা। তোমাদের অপেক্ষায়ই ছিলাম। তাড়াতাড়িই এসেছ।

ট্যাক্সিতে এসেছি, তাই, জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলল কিশোর। দরজা খুলে নামল। রবিন আর মুসাও নামল। গালে চুমু খেয়ে ছেলেদেরকে স্বাগত জানালেন মহিলা। ট্যাক্সি। বিদায় করে দেয়া হলো। পথ দেখিয়ে তিন গোয়েন্দাকে নিয়ে এলেন ড্রইংরুমে। বিরাট হলরুম, আসবাবপত্র সব পুরানো আমলের, কিন্তু খুব। সুন্দর।

চারপাশে তাকিয়ে কিশোর বলল, কই, জর্জকে দেখছি না?

ওর কথা আর বোলো না, হাসলেন মহিলা। ও কি বাড়ি থাকে? তোমরা আসবে, আমাকে বলে সেই সকালে বেরিয়েছে, আর দেখা নেই। হয়তো মাছ ধরছে জেলে ছেলেদের সঙ্গে, কিংবা পাহাড়ে উঠে পাখির ডিম পাড়ছে। বড় বেশি দুষ্ট হয়েছে, কথাবার্তা এক্কেবারে শোনে না…

এক পাশে দরজা খুলে গেল। লম্বা একজন লোক ঘরে ঢুকলেন, ফেকাসে চামড়া রোদের মুখ দেখে বলে মনে হলো না, বাদামী মস্ত গোঁফ, চওড়া কপাল বিরক্তিতে কোঁচকানো, চোখ দুটো চেহারার সঙ্গে বেমানান-বড় বড়, তাতে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ছাপ।

এই, শোনো, ভদ্রলোককে ডাকলেন মহিলা। ওরা রকি বিচ থেকে এসেছে, জর্জের বন্ধু। ছেলেদেরকে বললেন, ও জর্জের বাবা।

উঠে এগিয়ে এসে হাত বাড়াল কিশোর। আমি কিশোর পাশা:..ও মুসা আমান। আর ও হলো রবিন মিলফোর্ড।

হুঁ, তোমরা বসো, বিরক্তিতে আরও কুঁচকে গেল জর্জের বাবার চেহারা। হট্টগোল একদম পছন্দ করি না আমি, বুঝেছ? চুপচাপ, থাকবে। বেরিয়ে গেলেন তিনি।

ওর কথায় কিছু মনে কোরো না, তাড়াতাড়ি বললেন মহিলা। ও এরকমই। তবে মনটা খুব ভাল। সারাদিন কী সব গবেষণা নিয়ে থাকে, এখন একটা বই লিখছে, বিজ্ঞানের কী একটা জটিল বিষয়ের ওপর। তাই অমন খিটখিটে মেজাজ।

না না, ঠিক আছে, আমরা কিছু মনে করিনি, মহিলার অপ্রতিভ। ভাব দেখে বলে উঠল রবিন। বিজ্ঞানীরা ওরকমই হয়, দুনিয়ার আর কোন খোঁজখবর থাকে না তো।

কথা পরে হবে, বললেন মহিলা। অনেক দূর থেকে এসেছ, সারাদিন কী খেয়েছ না খেয়েছ, কে জানে। নিশ্চয় খিদে পেয়েছে। যাও, হাত-মুখ ধুয়ে এসো। ওই যে,

ওদিকে বাথরুম। আমি খাবার বাড়ছি।
খাওয়া সারা হলো, তবু জর্জের দেখা নেই।
ছেলেদেরকে থাকার ঘর দেখিয়ে দিলেন জর্জের মা। পাশাপাশি দুটো ঘর, একেক ঘরে দুটো করে বিছানা। লাল টালির ছাত, অনেক উঁচুতে। এক পাশের বড় বড় জানালা দিয়ে তৃণভূমি আর তার ওপারের জলাভূমি চোখে পড়ে। অন্য পাশের একটা জানালা দিয়ে সাগর দেখা যায়। বাতাসে জানালার কাঁচের শার্শিতে মাথা ঠুকছে রক্তগোলাপ। এত ফুল, খুবই ভাল লাগছে রবিনের।
জর্জ এখনও আসছে না! রবিন বলল।
ওর আসার ঠিকঠিকানা নেই, ঠোঁট বাঁকালেন মহিলা। হয়তো জেলেদের বাড়িতেই খেয়ে রাতদুপুরে আসবে। ওর বাপ জানলে তো দেবে পিট্টি, পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়বে। অনেক বুঝিয়েছি, রাগ করেছি, শাসন করেছি, শোনে না। ছেড়ে দিয়েছি এখন, যা খুশি করুক গে! বড় হলে যদি ভাল হয় তো হবে!
বড় করে হাই তুলল মুসা। শঙ্কিত হয়ে উঠল কিশোর আর রবিন, এরপর কী হবে বুঝতে পারছে। ওদের আশঙ্কাই ঠিক হলো। হা হা করে উঠলেন মহিলা, এই যে, ঘুম পেয়েছে! সারাদিন গাড়িতে, কম পরিশ্রম? শুয়ে পড়ো, শুয়ে পড়ো! কিশোর আর মুসাকে বললেন, তোমরা দুজন। এঘরে শোও। রবিন, তুমি ওঘরে চলে যাও..হ্যাঁ, রাতে কোন কিছুর দরকার হলে ডেকো আমাকে। একটুও লজ্জা কোরো না। আমি যাই।
গাধা কোথাকার! জর্জের মা চলে যেতেই মুসার দিকে চেয়ে ধমকে উঠল কিশোর। আর খানিকক্ষণ চেপে রাখতে পারলে না? ভেবেছি, খাওয়ার পর সৈকতে একটু হাঁটাহাঁটি করে আসব। দিলে সব মাটি করে! কী করে মানা করি মহিলার মুখের ওপর? ভাববে বেয়াদব।
আমি…আমি বুঝিইনি! বিষণ্ন কণ্ঠে বলল মুসা। মহিলার রান্না খুব ভাল, বেশি খেয়ে ফেলেছি..তাই…
…তাই, আর কী? নাক ডাকিয়ে ঘুমাও এখন!
কিন্তু জর্জের ব্যাপারটা কী, বলো তো? রবিন কথার মোড় ঘোরাল। আমাদেরকে এভাবে দাওয়াত করে এনে…
আসবে সময় হলে, মুসা বলল। শুঁটকির ফাঁকিতে পড়িনি, এতেই আমি খুশি! ভেবে অবাক হচ্ছি, ছেলেটা কে!
এত দেরিতে হচ্ছ? রবিন পাল্টা প্রশ্ন করল। আমি তো চিঠি। পাওয়ার পর থেকেই ভাবছি, সে কে। কী করে আমাদের নাম জানল?
রহস্যজনক! গম্ভীর মুখে বলল কিশোর। নিশ্চয় আমাদের পরিচিত কেউ, কোন একটা মতলব আছে তার, হয়তো আমাদের সাহায্য দরকার।

হাঁ করে তাকিয়ে রইল রবিন আর মুসা, বুঝতে পারছে না।
এখন শুয়ে পড়ো, কাপড় ছাড়তে শুরু করল কিশোর। পরে জানা যাবে কী ব্যাপার। জর্জ আগে আসুক তো।
রাতে জর্জ কখন এল, কাপড় ছাড়ল, শুল, কিছুই টের পেল না। রবিন। ঘুম ভাঙল পরদিন সকালে, সূর্য উঠেছে তখন।
চোখ মেলতেই লাল টালির ছাত চোখে পড়ল রবিনের। প্রথমে বুঝতেই পারল না কোথায় আছে। মাথা কাত করে জানালার দিকে তাকাল, ভোরের বাতাসে দুলছে গোলাপের ডাল, আলতো বাড়ি মারছে। শার্শিতে। হঠাৎ করেই মনে পড়ে গেল তার, কোথায় রয়েছে। মুখ ফিরিয়ে আরেক পাশে তাকাতেই দেখল, অন্য বিছানাটাও এখন আর খালি নয়। কুকুরকুণ্ডলী হয়ে শুয়ে আছে একটা ছেলে, গলা পর্যন্ত চাদর টানা।
নড়েচড়ে উঠল ছেলেটা, চোখ মেলল, রবিনের দিকে তাকাল।
জর্জ? রবিন বল।
বিছানায় উঠে বসল ছেলেটা, আস্তে করে মাথা নোয়াল। মুসার চেয়েও ছোট করে ছাটা কালো চুল, মোটা নাক, রোদে-পোড়া চেহারা। কিন্তু চোখ দুটো বড় বড়, ধূসর, বাপের চোখের মতই তাতে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ছাপ। চেহারাটা কেমন যেন পরিচিত মনে হলো রবিনের, আগে কোথাও দেখেছে, কিন্তু কোথায়, মনে করতে পারল না।
একটাও কথা না বলে উঠে গিয়ে বাথরুমে ঢুকল জর্জ। ভীষণ পেচ্ছাপ চেপেছে রবিনের, অপেক্ষা করতে করতে অস্থির হয়ে উঠল সে, কিন্তু জর্জের বেরোনোর নাম নেই। শেষে আর থাকতে না পেরে, পাশের ঘরে চলে এল। এখানেও বাথরুম খালি নেই, মুসা ঢুকেছে। কিশোরের বাথরুমের কাজ শেষ, চুল আঁচড়াচ্ছে।
আর পারছে না রবিন। জানালা দিয়েই কল ছেড়ে দেবে কিনা ভাবছে, এই সময় দরজা খুলল মুসা।
বারান্দায় বেরোতেই ডিম আর মাংসভাজার গন্ধ নাকে এল। আগে আগে চলেছে জর্জ, তিন গোয়েন্দার কারও সঙ্গেই কথা বলছে না, ফিরেও তাকাচ্ছে না। দাওয়াত করে এনে এ কেমন ব্যবহার?
ডাইনিং টেবিলে নাস্তা দিয়েছেন মিসেস গোবেল। কয়েকটা এঁটো প্লেট সরাচ্ছেন, বোধহয় খেয়ে উঠে গেছেন জর্জের বাবা।
জর্জের দিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠলেন মহিলা। আরে, জর্জ, এ কী চেহারা করেছিস! চুলের এ অবস্থা করেছিস কেন? নাকে কী হয়েছে? বোলতা-টোলতা কামড়েছে?

না, সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়ে চেয়ারে বসে গেল জর্জ। এক টুকরো পাউরুটি তুলে নিয়ে তাতে মাখন লাগাতে শুরু করল। কারও দিকেই তাকাচ্ছে না।
স্থির চোখে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইলেন মিসেস গোবেল। শেষে মুখ বাঁকালেন। গম্ভীর গলায় বললেন, তোর যা ইচ্ছে, করগে, আর কিছু বলব না! তোমরা বসো, বাবা, নিজের হাতে নিয়ে খাও। এটো। কাপপ্লেট তুলে নিয়ে সিঙ্কে ভেজাতে চলে গেলেন তিনি।
নাশতা শেষ হলো। মুখ তুলল জর্জ। এই প্রথম কথা বলল ছেলেদের সঙ্গে, আমি মাছ ধরতে যাব। তোমরা? মেয়েলী কণ্ঠস্বর। চেনা চেনা।
আমরাও যাব, সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল মুসা। তুমি না গেলেও যেতাম। ছিপ নিয়ে এসেছি আমরা। কাটা কাটা জবাব। এ হাসল জর্জ। কেমন যেন পরিচিত হাসিটা, সামনের দুটো দাঁত সামান্য উঁচু না হলে খুব মিষ্টি দেখাত। খুব রেগে গেছ, না? চলো, উঠে। পড়ি। বাবা এসে দেখে ফেললে হয়তো অন্য কাজে লাগিয়ে দেবে। কিংবা ঘরে আটকে দেবে।
মিসেস গোবেলকে বলে জর্জের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল তিন গোয়েন্দা। রবিনের হাতে ছিপ, মুসার হাতে এয়ারগান,, কিশোরের কাঁধে ঝুলছে ক্যামেরা।
সৈকতের ধার ধরে এগিয়ে চলল ওরা। দিগন্তের ওপরে অনেকখানি উঠে পড়েছে সূর্য, সাগরের সোনালি পানি নীল হতে আরম্ভ করেছে, ঝলমল করছে কাঁচা রোদে।
হাঁটতে হাঁটতেই হাত তুলে একটা দ্বীপ দেখাল জর্জ। কেমন যেন অদ্ভুত, পাথুরে দ্বীপ। এক পাশ থেকে একটা সরু প্রণালী বেরিয়ে মিশেছে। সাগরের সঙ্গে। দ্বীপের মাঝে একটা উঁচু টিলার ওপরে ভাঙা কিছু দালানকোঠা, অনেক পুরানো কোন দুর্গের ভগ্নাবশেষ বোধহয়। সুন্দর জায়গা, না?
হ্যাঁ, মাথা দোলাল কিশোর আর রবিন।
ওটার নাম গোবেল দ্বীপ, কিশোরের দিকে ফিরল জর্জ, তার তামাটে চোখে নীল সাগরের প্রতিফলন। খুবই সুন্দর জায়গা। একদিন। তোমাদেরকে নিয়ে যাব ওখানে। কবে, এখনি বলতে পারছি না।
কোথায় শুনেছে ওই মেয়েলী কণ্ঠস্বর? ওই চোখ কোথায় দেখেছে? মনের অলিগলিতে আঁতিপাঁতি করে খুঁজছে রবিন, কিন্তু জবাব মিলছে না।
গোবেল দ্বীপ! বিড়বিড় করল কিশোর। কাদের ওটা? তোমাদের?
আমার, হাসল জর্জ। মানে, আমারই হবে একদিন। ওই দ্বীপ, দুর্গ।
ক্ষণিকের জন্যে থ হয়ে গেল তিন গোয়েন্দা।
ওই দ্বীপ! বিশ্বাস করতে পারছে না যেন মুসা। আস্ত একটা দ্বীপ তোমার!

বললাম না, একদিন হবে, হাসছে জর্জ। বিশ্বাস না হলে মাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করো। দ্বীপটা এখন মায়ের, তার মানে, আমারই তো?
হুঁ! হলেই বা কী? আপনমনেই বলল মুসা। কালো কালো সব পাথর। নারকেল বীথি নেই, বনবাদাড় নেই। আসলে, প্রবালদ্বীপ হলো সবচেয়ে সুন্দর।
ওটাও সুন্দর, জোর গলায় বলল জর্জ। গেলেই বুঝবে। অসংখ্য খরগোশ আছে, আর কমোরেন্ট। সী-গালের তো ঝাক পড়ে একেক সময়। এয়ারগান দিয়ে আর কটা মারবে? দুর্গটাও এককালে খুব সুন্দর ছিল। এখন ভেঙেচুরে নষ্ট হয়ে গেছে, তা-ও সুন্দর।
যত যা-ই বলো, আমার কাছে ভুতুড়ে মনে হচ্ছে। সাফ জবাব দিল। মুসা।
ভূত আছে ভাবছ নাকি? তোমাদের সেই টেরর ক্যাসলের ভূত?
তুমি কী করে জানলে? ঝট করে ফিরল রবিন।
জানি জানি, রহস্যময় হাসি হাসল জর্জ। আরও অনেক কিছুই। জানি। তোমাদের নাড়িনক্ষত্র সব জানা আছে আমার।...হ্যাঁ, যা বলছিলাম, দ্বীপটা সুন্দর। আরেকটা ব্যাপার, ভূত নেই, তবে গুপ্তধন থাকতে পারে।
মানে? ভুরু কোঁচকাল কিশোর।
চলো, কোথাও গিয়ে বসি, এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে জর্জ। লম্বা কাহিনী। ওই যে, ওই পাথরগুলোর ওপর গিয়ে বসি, চলো।
কোন্‌খান থেকে শুরু করি? একটা পাথরে বসতে বসতে বলল। জর্জ। হ্যাঁ, অনেক আগে এখানকার প্রায় সমস্ত জায়গা ছিল আমার মায়ের পূর্বপুরুষদের। যতই দিন গেল, ধীরে ধীরে গরীব হয়ে পড়ল। তারা, সমস্ত জায়গাজমি বেচে বেচে খেল। কিন্তু ওই ছোট্ট দ্বীপটা বেচেনি, কিংবা হয়তো কেনার লোক পায়নি, তাই বেচতে পারেনি। কে কিনবে? ওই ভাঙা দুর্গ দিয়ে কার কী হবে?
ভালই হয়েছে। চমৎকার ওই দ্বীপটার এখন মালিক হব আমি।...দ্বীপটা ছাড়াও আরও কিছু মাকে দিয়ে যেতে পেরেছে আমার নানা, বাড়িটা, গোবেল ভিলা। ভেঙেচুরে গিয়েছিল, বাবা অনেক খরচাপাতি করে সারিয়ে নিয়েছেন। দুর্গটা বাবার কোন কাজে লাগছে না, নইলে সারিয়ে নিত।
জর্জকে ঘিরে বসেছে তিন গোয়েন্দা। আগ্রহ নিয়ে শুনছে তার কথা।
হুঁ, দ্বীপটা সুন্দরই! কিশোর বলল। মালিক হতে পারলে, আমিও তোমার মতই খুশি হতাম।
হ্যাঁ, এখানকার অনেক ছেলেমেয়েই সেকথা বলে, দ্বীপটা তাদের ঈর্ষার বস্তু। কতবার কতজন সাধাসাধি করেছে আমাকে, ওখানে নিয়ে যেতে। যাইনি। রেগে গিয়ে অনেকেই আমার সঙ্গে কথা বন্ধ করে দিয়েছে, বড় লোক বলে আমি নাকি অহঙ্কারে বাঁচি না। হিহ!

দ্বীপটার দিকে তাকিয়ে আছে চারজনেই। ভাটার টানে পানি নেমে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে, ধীরে ধীরে কাছে চলে আসছে দ্বীপটা।
ওরা নিজে নিজে চলে গেলেই তো পারে? বলল কিশোর।
এত সহজ না, মাথা নাড়ল জর্জ। নৌকা ছাড়া যাওয়ার পথ নেই। পথ চেনা না থাকলে নৌকা নিয়ে গেলেও বিপদে পড়তে হবে। প্রণালীটার জায়গায় জায়গায় ভীষণ গভীর, কিন্তু বেশির ভাগ জায়গাই অগভীর, চোখা সব পাথর বেরিয়ে আছে কোথাও পানির ওপরে, কোথাও পানির নিচে। নৌকার তলায় ঘষা লাগলেই সর্বনাশ। চিরে, কেটে ফালাফালা হয়ে যাবে। তারপর সাতরে তীরে ওঠা!
অসম্ভব! কিশোরের দিকে তাকিয়ে হাসল সে। ডুবে যাওয়া জাহাজের মাস্তুলে বাড়ি লেগে যাওয়াও বিচিত্র নয়।
ডুবে যাওয়া জাহাজ! চকচক করছে কিশোরের চোখ। আছে নাকি ওখানে!
এক কালে অসংখ্য ছিল, জর্জ বলল। এখন সাফ করে ফেলা হয়েছে, করেছে গুপ্তধন শিকারীরা। তবে ছোটখাট একটা-দুটো যে এখনও নেই তা নয়। আর বড় একটা আছে, দ্বীপের ওপাশে। গভীর পানিতে। সাগর শান্ত থাকলে নৌকো থেকে নিচে তাকালে ওটার ভাঙা মাস্তুল চোখে পড়ে, তার নিচে অন্ধকার, আর কিছু দেখা যায় না। মিটিমিটি হাসছে সে। ওই ভাঙা জাহাজটাও আমার।
হাঁ হয়ে গেছে তিন গোয়েন্দা। বলে কী জর্জ!
জোরে মাথা ঝাঁকাল জর্জ। হ্যাঁ, ঠিকই বলছি। জাহাজটা ছিল আমার নানার-নানার-বাবার। সোনা নিয়ে আসছিল ওটা, সোনার বার। গোবেল দ্বীপের কাছে ঝড়ের কবলে পড়ে ডুবে যায়।
তাই? বারগুলোর কী হলো? চোখ বড় বড় হয়ে গেছে রবিনের।
কেউ জানে না, মাথা নাড়ল জর্জ। হয়তো চুরি হয়ে গেছে। কোনভাবে। গুপ্তধন শিকারীরা আঁতিপাতি করে খুঁজেছে জাহাজটা, সোনার একটা টুকরোও পায়নি।
মেরেছে! তুড়ি বাজাল মুসা। কতখানি গভীর? ডুব দেয়া যায়? দেখতে ইচ্ছে করছে!
ডুবুরীর পোশাক হলে তো যায়ই, জর্জ বলল। তবে ওপর থেকে দেখতে চাইলে আজই যেতে পারি। বিকেলে। পুরো ভাটা থাকবে তখন, পানি নেমে যাবে অনেক, তা ছাড়া সাগরও শান্ত আজ।
দারুণ হবে! খুশিতে হাততালি দিয়ে উঠল রবিন। দেখতে খুব ইচ্ছে করছে।
কিশোর চুপ করে রয়েছে, আস্তে আস্তে চিমটি কাটছে নিচের ঠোঁটে, তার মানে গভীর ভাবনা চলেছে তার মাথায়।
তো, জর্জ, মুসা বলল, মাছ ধরার কী হবে? বাড়িতে না বলে এলে, মাছ ধরতে যাচ্ছ?

আগে রাফিয়ানকে ডেকে নিয়ে আসি, জর্জ উঠে দাঁড়াল।
রাফিয়ান? কপাল কুঁচকে গেছে মুসার।
কথাটা গোপন রাখবে তো? বাড়িতে কেউ যেন না জানে।
জানবে না, কথা দিলাম, সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল মুসা।
রাফিয়ান আমার সবচে বড় বন্ধু, জর্জ বলল। কিন্তু মা আর বাবা একদম দেখতে পারে না ওকে, কাজেই লুকিয়ে রাখতে হয়। যাই, নিয়ে আসি।
পাহাড়ি পথ ধরে ছুটে চলে গেল জর্জ। অবাক হয়ে চেয়ে আছে তিন গোয়েন্দা। তিনজনেই একমত, সাংঘাতিক রহস্যময় কিশোর জর্জ গোবেল।
ওই রাফিয়ানটা আবার কে? মুসা বলে উঠল।
হবে হয়তো কোন জেলের ছেলে-টেলে, রবিন সন্দেহ করল। জর্জের মা-বাবা তাই দেখতে পারে না।
নরম বালিতে গা ছড়িয়ে পাথরে হেলান দিয়ে বসে অপেক্ষা করে রইল ছেলেরা। খানিক পরেই বড় একটা টিলার ওপাশে জর্জের গলা শোনা গেল। আরে; আয়, রাফি; জলদি আয়, ওরা বসে আছে!
টিলার মাথায় দেখা গেল জর্জ আর তার বন্ধুকে। পিঠ সোজা হয়ে গেল তিন গোয়েন্দার। ও, এই তা হলে রাফিয়ান। জেলের ছেলে নয়, মস্ত এক কুকুর, বাদামী রঙের মাংগরল। অস্বাভাবিক লম্বা লেজ, চওড়া মুখে ছড়িয়ে রয়েছে যেন বিস্তৃত হাসি। আনন্দে জর্জের চারপাশ ঘিরে লাফাতে লাফাতে আসছে। ঢাল বেয়ে ছুটে নামছে জর্জ।
এই হলো রাফিয়ান, কাছে এসে পরিচয় করিয়ে দিল জর্জ, হাঁপাচ্ছে। খুব সুন্দর, না? একেবারে নিখুঁত।
ভুল বলেছে জর্জ। মোটেই নিখুঁত নয় রাফিয়ান, বরং খুঁতই বেশি। পিঠ সামান্য কুঁজো, শরীরের তুলনায় অনেক বড় মাথা-মাংগর কুকুরের সাধারণত এমন হয় না, কানের ডগা গোল হওয়ার কথা ছিল, হয়েছে। চোখা, বড় বড়; লেজটা এত লম্বা, মোটা রোমশ না হলে চিতাবাঘের লেজ বলেই মনে হত। সবকিছু মিলিয়ে মাংগরলের ভয়ঙ্করত্ব নেই চেহারায়, আছে একটা হাস্যকর ভাব; তবে আদর করতে ইচ্ছে করে, এটা ঠিক। প্রথম দর্শনেই তিন গোয়েন্দাকে ভালবেসে ফেলেছে কুকুরটা, তার উন্মাদ নাচ আর অনর্গল গাল-হাত চেটে দেয়া থেকেই বোঝা যায়।
লক্ষ্মী ছেলে! আদর করে রাফিয়ানের নাক চাপড়ে দিল রবিন।
মুসার নাক-মুখ চেটে দিল রাফিয়ান।
আরে, আরে, এই, করছিস কী, কুত্তার বাচ্চা কুত্তা! চেঁচিয়ে উঠল মুসা। অপবিত্র করে দিচ্ছিস! আমার মা দেখলে এখন সাতবার সোনারূপা ধোয়া পানি দিয়ে গোসল করাত! কুত্তা নাকি নাপাক জীব!

কিন্তু নাপাক জীবটা এই কটু কথায় কিছুই মনে করল না, বরং আদর করে পেছন থেকে মুসার কাঁধে দুই পা তুলে দিয়ে হ্যাঁহ্ হ্যাঁহ করে হাসল।
জোরে হেসে উঠল রবিন আর জর্জ।
ইস, ওরকম একটা কুকুর যদি থাকত আমার! কিশোর আফসোস করল। এই, রাফিয়ান, এদিকে আয়।
এক লাফে কিশোরের প্রায় কোলে এসে পড়ল রাফিয়ান।
আন্তরিক হাসি ফুটল জর্জের মুখে, জ্বলজ্বল করে উঠল তামাটে চোখের তারা। হাত-পা ছড়িয়ে ধপ করে কিশোরের পাশে বালিতে বসে পড়ল। বাহ, আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়ার ইচ্ছে নাকি? কটাক্ষ করল সে। রাফিয়ানকে ভীষণ ভালবাসি আমি। জানো, মাত্র এক বছর বয়েস ওটার, অথচ কত বড় হয়ে গেছে! জলার ধারে কুড়িয়ে পেয়েছিলাম, গত বছর। চেহারা ভাল না বলেই বোধহয় ফেলে দিয়ে এসেছিল ওকে ওর মালিক। বাড়ি নিয়ে এলাম। প্রথমে মা কিছু মনে করেনি। কিন্তু যতই বড় হতে লাগল, দুষ্টুমি বেড়ে গেল রাফিয়ানের, শেষে মা আর সইতে পারল না...
কী দুষ্টুমি করত? রবিন জানতে চাইল।
যা পেত তা-ই চিবাত। ড্রইংরুমের নতুন কার্পেটের কোনা চিবিয়ে দিয়েছে নষ্ট করে, মার একটা নতুন হ্যাট কামড়ে অর্ধেকটা খেয়ে ফেলেছে। বাবার স্যাণ্ডেল আর কাগজ চিবাতে গিয়েই পড়ল বিপদে। ধরে আচ্ছামত ধোলাই লাগাল বাবা। তারপর থেকেই বাবাকে দেখতে পারে না। ঘেউ ঘেউ করে কামড়াতে যায়। এই কাণ্ড করলে কি আর বাড়িতে রাখা যায় ওকে? শেষে দিল একদিন বাড়ি থেকে বের করে। বাবা হুঁশিয়ার করে দিয়েছে, এরপর আর ওকে বাড়িতে নিয়ে গেলে আমাকে সুদ্ধ বের করে দেবে।
হ্যাঁ, তোমার বাবাকে দেখলেই ভয় করে, মুসা মাথা দোলাল। সারাক্ষণই যেন রেগে আছে!
সাগরের দিকে চোখ ফেরাল জর্জ। বাবা ওরকমই! রাফিয়ানকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়ার পর কত কেঁদেছি, কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়ে ফেলেছি, না খেয়ে থেকেছি, কেয়ারই করল না বাবা। সাফ জবাব, কুকুর বাড়িতে ঢোকানো যাবে না। আমার দুঃখে রাফিয়ানও কেঁদেছে।
আরে, দূর! যতসব গল্প। কুকুর আবার কাঁদে নাকি? মুসা ফস করে ।বলে বসল।
দপ করে জ্বলে উঠল জর্জের চোখ। তুমি ওসবের কী বুঝবে, মুসা আমান? ঘোড়া দেখলে ভয় পাও, কুকুর পছন্দ করো না..।
ঘোড়া দেখলে ভয় পাই, তুমি জানলে কী করে? অবাক হয়ে গেছে মুসা।

না, ইয়ে, মানে, যে লোক কুকুর পছন্দ করে না, ঘোড়াকে তো ভয়। সে পাবেই, বলে তাড়াতাড়ি অন্য কথায় চলে গেল জর্জ। ও, হ্যাঁ, চলো, সাঁতার কাটতে যাই। নাকি মাছ ধরবে?
কুকুরটাকে এখন কোথায় রাখো, জর্জ? কিশোর জানতে চাইল।
ফগ-এর কাছে। ওর বাবা জেলে। গরীব, নিজেরাই খেতে পায় না, কুকুরকে খাওয়াবে কোথা থেকে? রাফিয়ানের খরচ আমিই দিই। মাঝে মাঝে ফগকেও কিছু হাতখরচ দিই; রাফিয়ানকে যত্ন করে, সেজন্যে।
টুংটাং টুংটাং ঘণ্টা বেজে উঠল। রাস্তা দিয়ে আইসক্রিমওয়ালা। যাচ্ছে।
আইসক্রিম! এক লাফে উঠে দাঁড়াল মুসা। এই, মিয়া, দাঁড়াও দাঁড়াও! মোটা সাইজের গোটা চারেক চকলেট-আইসক্রিম কিনে নিয়ে এল সে। রবিন আর কিশোরকে দিল একটা করে। জর্জের দিকে বাড়িয়ে ধরতেই ঝট করে মুখ ফিরিয়ে নিল সে।
না, তোমার আইসক্রিম আমি খাব না! ঝঙ্কার দিয়ে উঠল জর্জ। তুমি আমার রাফিয়ানকে গালমন্দ করেছ!
গালমন্দ আবার করলাম কখন! ...আচ্ছা, ঠিক আছে, আর করব না। এই, রাফিয়ান, তুইও নে, নিজেরটা বাড়িয়ে ধরল মুসা।
কখন কী গালমন্দ করেছে মুসা, তাতে থোড়াই কেয়ার রাফিয়ানের, গপ করে আইসক্রিমটা কামড়ে ধরে খেতে শুরু করে দিল সে।
নরম হলো জর্জ। আর কক্ষনো বকবে না তো ওকে?
না, বব না। নাও।
আইসক্রিম নিল জর্জ। নিজের জন্যে আরেকটা কিনে নিয়ে এল। মুসা।
নীরবে বসে আইসক্রিম খেল ওরা কিছুক্ষণ।
একসময় জর্জ বলল, সত্যি, তোমরা আসাতে যা খুশি হয়েছি না! চলো, একটা নৌকা নিয়ে আজ বিকেলেই যাই। আমার জাহাজটা দেখবে। কি বলো?
নিশ্চয়ই! প্রায় একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল তিন গোয়েন্দা।
হুফ! বলে উঠল রাফিয়ান, জোরে জোরে নাড়ছে লম্বা লেজ, তার। মানে সে-ও যেতে রাজি।
ফুড়ৎ করে উড়ে চলে গেল যেন সকালটা। গোটাকয়েক রঙিন মাছ ধরেছে আর ছেড়েছে রবিন। একের পর এক গুলি করে গেছে মুসা, কিন্তু একটা পাখিকেও লাগাতে পারেনি; তার গুলি কোনখান দিয়ে গেছে, টেরই পায়নি পাখি; রেগেমেগে শেষে ঢিল মেরে দুএকটা পাখিকে উড়িয়ে দিয়েছে, জর্জ আর রবিনের টিটকারি শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেছে, তবে রাফিয়ান খুব ভাল ব্যবহার

করেছে তার সঙ্গে। পাখি, দেখলেই আলতো হউ করে মুসার কাপড় কামড়ে ধরে টেনে ফিরিয়ে পাখিটা দেখিয়ে দিয়েছে। রীতিমত ভাব হয়ে গেছে এখন দুজনের।
দুপুর হয়ে আসছে। গরম বাড়ছে। হাতছানি দিয়ে ডাকছে ছেলেদেরকে নীল সাগর। এয়ারগান ফেলে কাপড় খুলে গিয়ে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল মুসা। তার সঙ্গে সঙ্গেই নামল রাফিয়ান। রবিন আর কিশোরও নামল। কিন্তু আশ্চর্য! জর্জ নামল না। কিছুতেই নামানো গেল না তাকে। সাঁতার কাটার মুড নেই নাকি তার আজ?
দুপুর নাগাদ ছুঁচোর নাচন আরম্ভ হলো ছেলেদের পেটে। বাড়ির পথ ধরল ওরা।
ভেড়ার মাংসের বড়া, আপেলের হালুয়া, ঘরে বানানো দই আর পনির দিয়ে চমৎকার খাওয়া হলো। সব শেষে এল গাজরের মোরব্বা! মুসার হাসি দেখে কে? মিসেস গোবেল বুঝে গেছেন, কে ভোজনরসিক, তাই সেদিকেই তার আনাগোনা বেশি।
বিকেলে কোথায় যাচ্ছ তোমরা? মহিলা সত্যিই ভাল। অল্প সময়েই একেবারে আপন করে নিয়েছেন ছেলে তিনটেকে।
আমাদেরকে তার জাহাজটা দেখাতে নিয়ে যাবে জর্জ, রবিন বলল।
চোখ বড় বড় হলো মিসেস গোবেলের। জাহাজ দেখাতে নিয়ে যাবে জর্জ! বলো কী? এ যে পশ্চিমে সূর্য উঠল রে! কত ছেলেমেয়ে ওকে সাধাসাধি করে করে হয়রান, শেষে আমাকে এসে ধরেছে, আর বলেও কিছু করাতে পারিনি! নিয়ে যায়নি। অথচ...
চুপচাপ খাচ্ছিল জর্জ, বাধা দিয়ে বলে উঠল, ওরা আমার বন্ধু, তাই নিয়ে যাব। আমার ইচ্ছে না হলে আমেরিকার প্রেসিডেন্টকেও নিয়ে যাব না।
হুঁ, আমেরিকার প্রেসিডেন্টের বয়েই গেছে তোর কাছে আসতে!...যাক, তোর যে অন্তত তিনজন বন্ধু জুটেছে, এতেই আমি খুশি। তোর এই গোয়ার্তুমির জন্যে কেউ পছন্দ করে তোকে? তোর বাপ পর্যন্ত দেখতে পারে না।
না না, খালা, হাত তুলল মুসা, আমরা খুব পছন্দ করি ওকে। তা ছাড়া ওর রা...
আঁউউ! পায়ে জর্জের প্রচণ্ড লাথি খেয়ে থেমে গেল সে।
কী, কী হলো! ব্যস্ত হয়ে উঠলেন মিসেস গোবেল।
না, কিছু না-পিঁপড়ে কামড়েছে!
অবাক হয়ে এক মুহূর্ত মুসার দিকে চেয়ে রইলেন তিনি, তারপর একটা প্লেট টেনে নিয়ে তাতে খাবার তুলতে শুরু করলেন। জর্জের বাবা টেবিলে খেতে আসেননি-স্বস্তিই বোধ করছে ছেলেরা। তার ঘরে তাকে খাবার দিয়ে আসা হবে।
.

খাওয়ার পর আর একটা মিনিটও দেরি করল না ছেলেরা। প্রায় ছুটে চলে এল সৈকতে। কুকুরটাকে আনতে গিয়েছিল যখন, খুব সম্ভব তখনই বলে রেখেছিল জর্জ, নৌকা নিয়ে অপেক্ষা করছে ফগ। ওদেরই বয়েসী আরেক। কিশোর রোদে-পোড়া বাদামী মুখের চামড়া, কোকড়ানো বড় বড় চুল। সৈকতে বালির ওপর ডিঙির অর্ধেকটা টেনে তুলে তার পাশে বসে অপেক্ষা করছে। তার পায়ের কাছে শুয়ে রয়েছে রাফিয়ান, কুকুরটার গায়ে আস্তে আস্তে হাত বুলাচ্ছে ফগ।
ছেলেদের সাড়া পেয়েই চোখ মেলল রাফিয়ান, তড়াক করে উঠেই লম্বা লেজ দুলিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটে এল। ফগ ফিরে তাকাল।
এসেছেন, উঠে দাঁড়িয়েছে ফগ। আসুন, নৌকা তৈরি। ...এরাই আপনার বন্ধু? হাত বাড়িয়ে দিল সে।
একে একে হাত মেলাল তিন গোয়েন্দা।
নৌকায় উঠল চার কিশোর, রাফিয়ানও উঠল। ধাক্কা দিয়ে ডিঙিটাকে পানিতে নামিয়ে দিল ফগ, আরেক ঠেলা দিয়ে ছেড়ে দিল। দাঁড় তুলে নিয়েছে জর্জ, পানিতে ফেলল ঝপাং করে।
সুন্দর বিকেল। নীল সাগর, ছোট ছোট ঢেউ। তিরতির করে নাচতে নাচতে এগিয়ে চলেছে ডিঙি, চারপাশ থেকে এটাকে ঘিরে রেখেছে। ঢেউয়ের সাদা ফেনা। এক পাশ থেকে এসে ছলাত করে বাড়ি মারছে ঢেউ, পানি ছিটকে উঠছে; মাথায় পানি পড়ার ভয়ে চট করে মাথা নুইয়ে ফেলছে রাফিয়ান, বার বার। হউউ করে ধমক লাগাচ্ছে ঢেউকে।
এই, দুই, বকা দিল জর্জ, চুপ করে বস।
আহা, করুক না একটু দুষ্টুমি, খাতির করতে চাইছে মুসা। কুকুরের বাচ্চা বটে, কিন্তু খুব ভাল মানুষ।
তা ঠিকই বলেছ, কুকুর যে কী করে মানুষ হলো, বোধহয় জর্জের মনেও জাগল না প্রশ্নটা। ঢেউকে ধমকাচ্ছে বটে, কিন্তু ভয় একটুও পায় না। ও খুব ভাল সাঁতারু।
হুফ! প্রশংসা বুঝতে পারল যেন রাফিয়ান; প্রথমে মুসার কান, তারপর জর্জের নাক চেটে দিল খুশি হয়ে।
বাহ, বুঝতে পারে তো? হাসিমুখে বলল মুসা।
তা তো পারেই, মাথা ঝোকাল জর্জ। ও সব কথা বুঝতে পারে।
এই যে, এসে গেছি, দ্বীপটার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ বলে উঠল কিশোর। যা ভেবেছি তার চেয়ে অনেক বড়!
আরও কাছে এসে গেল দ্বীপ। চারপাশে চোখা পাথরের। ছড়াছড়ি-দ্বীপের ধারে, পানিতে। জায়গা জানা না থাকলে কোন নৌকা কিংবা জাহাজ নোঙর করতে

পারবে না, যেতেই পারবে না কাছে। দ্বীপের ঠিক মাঝখান থেকে গজিয়েছে একটা পাহাড়, তার মাথায় দুর্গের ধ্বংসাবশেষ। শ্বেতপাথরে তৈরি হয়েছিল, দাঁড়িয়ে রয়েছে আধখানা ধনুকের মত ভাঙা খিলান, মোটা স্তম্ভ, কিছু কিছু দেয়াল। এক কালের শির উঁচু করে থাকা চমৎকার দুর্গে এখন দাঁড়কাকের বাসা, উঁচু থাম আর খিলানের মাথায় সার দিয়ে বসে আছে অগুনতি সী-গাল।
গা শিরশির করে দেখলে! কিশোর বলল। এত পুরানো ভাঙা দুর্গ আর দেখিনি। ভেতরে ঢুকে দেখা দরকার। রাত কাটাতে কেমন লাগবে। ওখানে!
হাত থেমে গেল জর্জের, ঝট করে চোখ ফিরিয়ে তাকাল। এক্কেবারে মনের কথাটা বলেছ! কখনও কাটিয়ে দেখিনি, একা একা সাহসই পাইনি। এবার দেখব। চারজন একসঙ্গে থাকলে আর…কি বলো? দারুণ হবে না?
হবে, রবিন বলল। কিন্তু তোমার মা কি রাজি হবে?
জানি না, মাথা নাড়ল জর্জ। তবে হয়েও যেতে পারে চেপে ধরলে।
আজ দ্বীপে নামছি তো? কিশোর জানতে চাইল।
সময় হবে না, জর্জ বলল। দ্বীপ ঘুরে গিয়ে জাহাজ দেখে আবার সাঁঝের আগে বাড়ি ফেরা, তাতেই দেরি হয়ে যাবে।
ঠিক আছে, চলো, আগে জাহাজটাই দেখি। দেখি, অনেক বেয়েছ, হাত বাড়াল কিশোর, এবার আমাকে দাও।
ওসব আমার অভ্যাস আছে, দাঁড় পানি থেকে তুলে ফেলল জর্জ। তবু নাও। বসে থাকতে পারলে কাজ করে কে? হাসল সে। হুশিয়ার! পাথরে লাগিয়ে দিয়ো না!
জায়গা বদল করল কিশোর আর জর্জ।
দাড় পানিতে ফেলল কিশোর। দুলে উঠল ডিঙি, নাক ঘুরে গেল শাই। করে। কিন্তু সামলে নিল সে। জর্জের মত অত ভাল বাইতে পারে না। ডিঙির নাক এদিক-ওদিক সরে যাচ্ছে সামান্য, তাতে অসুবিধে নেই, সোজা পথে চললেই হলো।
দ্বীপের অন্য পাশে চলে এল ওরা, খোলা সাগরের দিকে। দুর্গের এদিকটা একেবারে ভেঙে পড়েছে, স্তূপ হয়ে আছে সাদা পাথর।
খোলা তো, বাতাসের ঝাঁপটা খুব বেশি এদিকে, বুঝিয়ে বলল জর্জ। তাই ওই অবস্থা। জানো, এদিকে একটা ছোট্ট জেটি আছে, গোপন জেটি। দ্বীপের ভেতরে ঢুকে যাওয়া একটা খাড়িতে। এখন শুধু আমি জানি কোথায় আছে।
খানিক পরে কিশোরের হাত থেকে আবার দাঁড় নিয়ে নিল জর্জ, জায়গাটা খারাপ, আর কারও হাতে নৌকার দায়িত্ব দিতে সাহস পাচ্ছে না সে। দ্বীপের ধার ধরে আরও কিছু দূর চলে হঠাৎ ডিঙির নাক ঘোরাল, বেয়ে নিয়ে চলল খোলা সাগরের দিকে। একটা জায়গায় এসে দাঁড় বাওয়া থামিয়ে ফিরে তাকাল দ্বীপের দিকে।

জাহাজটা কোথায় কী করে বুঝবে? কিশোর ভুরু কোঁচকাল।
ওই যে, গাঁয়ের গির্জার চূড়াটা দেখছ? হাত তুলে দেখাল জর্জ। আর ওই পাহাড়ের মাথা? দুটোকে দুটো বিন্দু ধরো। এইবার দ্বীপের ওই যে বড় বড় দুটো টাওয়ার, ওগুলোর মাঝখান দিয়ে তাকাও। টাওয়ারের মাথা দুটোকে দুটো বিন্দু ধরো। চারটে বিন্দু এক লাইনে হয়েছে?
না, মাথা নাড়ল কিশোর আস্তে করে, হয়নি এখনও। টাওয়ারের মাথা দুটো একটু উঁচু মনে হচ্ছে।
হ্যাঁ, আস্তে আস্তে ডিঙিটাকে সরিয়ে নিয়ে চলল জর্জ।
খোলা সাগরের তুলনায় পানি এখানে বেশ শান্ত। কালচে-নীল একটা আয়না যেন বিছিয়ে রয়েছে। নৌকার ধার দিয়ে নিচে তাকিয়ে আছে মুসা আর ববিন, জাহাজটা দেখা যায় কিনা খুঁজছে।
আরেকটু বায়ে সরাতে হবে, জর্জ বলল।
হুফ! হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল রাফিয়ান। জোরে জোরে লেজ নাড়ছে।
হয়েছে! কিশোরও চেঁচিয়ে উঠল। এক লাইনে এসে গেছে চারটে বিন্দু! থামো! কিন্তু সে বলার আগেই দাঁড় বাওয়া থামিয়ে দিয়েছে জর্জ।
নৌকার কিনারা দিয়ে নিচে উঁকি দিল চার কিশোর, রাফিয়ানও গলা বাড়িয়ে দিল। প্রথমে কিছুই চোখে পড়ল না, তারপর ধীরে ধীরে আবছামত দেখা গেল একটা বিশাল কালো অবয়ব, ওটাতে দাঁড়িয়ে আছে একটা মোটা খুটি-ভাঙা মাস্তুল!
একটু কাত হয়ে রয়েছে না? দেখতে দেখতে বলল কিশোর। জর্জ, নামা যায় না?
কেন যাবে না? জর্জ হাসল। নামতে চাইলে নামো। ভয় লাগবে না তো?
আরে, দূর, কী যে বলো! আগেও নেমেছি, পুরানো জাহাজের খোল পানির তলায় নেমে দেখার অভ্যাস আছে। তবে ডুবুরির পোশাক পরে। ওসব ছাড়া নামতে পারব?
পারবে, যদি দম বেশিক্ষণ রাখতে পারো।
আমি পারব, জ্যাকেট খুলতে শুরু করেছে মুসা। সাঁতারে ওস্তাদ
শুধু জাঙ্গিয়া পরে আস্তে করে নেমে পড়ল মুসা। ডিগবাজি খেয়ে ঘুরিয়ে ফেলল শরীরটাকে পানির তলায়, মাথা নিচু করে দ্রুত নেমে চলল হাত-পা চালিয়ে।
তুমি যাবে? রবিনের দিকে তাকাল কিশোর।
মাথা নাড়ল রবিন। তোমরাই যাও, আমার সর্দি সর্দি ভাব।
কঙ্কাল দ্বীপে সর্দি হয়েছিল আমার, এখানে হলো তোমার, হাহ্! কাপড় খোলা হয়ে গেছে, নেমে পড়ল কিশোর।

মাথা নিচু করে সাঁতরে নিচে নামার সময় কীভাবে চোখ খোলা রাখতে হয়, জানা আছে কিশোরের, ডাইভিঙে দক্ষ ওস্তাদের কাছে ট্রেনিং নিয়েছে। চলার পথে আশপাশে তাকিয়ে দেখছে সে। বড় বেশি নীরব আর কেমন যেন বিষণ্ন লাগছে এখানে। ওপর থেকে পানি নীল মনে হয়, কিন্তু এখানে কালচে, আশপাশে কালো কালো ছায়া-বিকেল বলেই, গা
ছমছম করে। নিচে জাহাজের অবয়ব আরও স্পষ্ট হচ্ছে। মনে হচ্ছে, কাত হয়ে ঘুমিয়ে রয়েছে এক অজানা ভয়ঙ্কর দানব, সাড়া পেলেই জেগে উঠবে।
মুসার মত এতক্ষণ দম রাখতে পারল না কিশোর, আবার ওপরে ভেসে উঠতে পেরে খুশিই হলো। হাউস করে জোরে শ্বাস ফেলে নৌকায় উঠে এল সে। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, দারুণ! ...ভেতরে ঢুকে ভালমত খুঁজে দেখতে পারলে ভাল হত। কে জানে, সোনার বাক্সগুলো...
তার কথা শেষ হওয়ার আগেই নৌকার পাশে ভেসে উঠল মুসা। সেদিকে চেয়ে জর্জ বলল, নেই। এক তিল জায়গা খোঁজা বাকি রাখেনি ডাইভাররা। কিছু পায়নি। পশ্চিম দিগন্তে তাকাল সে, বেলা আন্দাজ করল। আর দেরি করা যাবে না। চলো, নইলে চায়ের দেরি হয়ে যাবে।
তাড়াহুড়ো করেও দেরি হয়েই গেল, বেশি না, মিনিট দশেক। চা নিয়ে অপেক্ষা করছেন মিসেস গোবেল।
চা খেয়ে আবার একটু হাটাহাটি করতে বেরোল ছেলেরা, জলার ধারে চলে এল। তাদের পায়ের কাছে নাচানাচি করছে রাফিয়ান, উল্লাসে।
সন্ধ্যা নামছে। বাড়ি ফিরছে জলার সব পাখিরা। এখানে-ওখানে শুধু দুএকটা সাদা বক ধ্যানমগ্ন হয়ে এক ঠ্যাঙে দাঁড়িয়ে রয়েছে, শেষ লোকমা খাবারের আশায়।
বাড়ি ফিরল ছেলেরা। রাতের খাবার খেয়ে শুতে গেল।
গুড নাইট, জর্জ, ঘুমজড়ানো গলায় বলল রবিন। চমৎকার একটা দিন কাটল, তোমারই জন্যে, ধন্যবাদ।
কাল আরও সুন্দর কাটবে, জর্জের কণ্ঠেও ঘুম। কাল আমার দ্বীপে নামব তোমাদের নিয়ে, দুর্গ দেখাব...দুর্গ...
জর্জের শেষ কথাটা রবিনের কানে গেল কিনা বোঝা গেল না, ঘুমিয়ে পড়েছে সে।
সবার আগে রবিনের ঘুম ভাঙল। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখল, উজ্জ্বল রোদ, চমৎকার আবহাওয়া। জর্জকে ডেকে তুলল সে। হাই তুলতে তুলতে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল জর্জ। উমম! আজ না গেলেই ভাল!
কেন! কেন! আঁতকে উঠল রবিন।
ঝড় আসবে, দক্ষিণ-পশ্চিম দিগন্তের দিকে তাকিয়ে আছে জর্জ, চিন্তিত।

কিন্তু আবহাওয়া তো পরিষ্কার! জর্জের পাশে এসে দাঁড়াল রবিন। সূর্যের সামনে ছায়া নেই, এক রত্তি মেঘ নেই আকাশে।
বাতাসের গতি উল্টোপাল্টা, টের পাচ্ছ না? আর ওই দেখো, দ্বীপের কাছে যে ঢেউ ভাঙছে, মাথাগুলো সাদা। অশুভ সঙ্কেত।
যাবে না তা হলে? হতাশ কণ্ঠে বলল রবিন। রাফিয়ানের কথা ভেবেছ? আমাদের সঙ্গ না পেলে আজ কী রকম দুঃখ পাবে ও?
হেসে ফেলল জর্জ। ঠিক আছে, ঠিক আছে, যাব, যাব। কেঁদে ফেলো না।
কী যে বলো! রবিনও হাসল, লজ্জা পেয়েছে। আচ্ছা, ঝড়টা কতখানি খারাপ… বলেই জর্জের চেহারা দেখে থেমে গেল; আবার না মানা করে বসে যেতে, এই ভয়ে তাড়াতাড়ি বলল, আর খারাপ হলে হলো। ঝড়ের ভয়ে তো আর ঘরে বসে থাকা যায় না। তুমি হাত-মুখ ধুয়ে নাও। আমি দেখি, কিশোর আর মুসা উঠেছে কিনা।
ভরপেট নাস্তা করল চারজনে। ছেলেরা দ্বীপে যাবে শুনে পোটলা করে খাবার বেঁধে দিলেন জর্জের মা, অনেক খাবার। বলে দিলেন, গায়ের বাজার থেকে কিছু লেমোনেডের বোতল কিনে সঙ্গে নিতে। যেখানে সেখানে যেন পানি না খায়, বার বার হুশিয়ার করে দিলেন। সৈকতের পথ ধরে হেঁটে চলল ওরা। সবাই খুশি। ঝড়ের কথা কিশোর আর মুসাও শুনেছে, কিন্তু খুব একটা আমল দিচ্ছে না। ঝড়ের।
আগে দ্বীপে পৌঁছে যেতে পারলে আর কোন ভয় নেই।
ফগদের বাড়িতে পৌঁছল ওরা। বাড়ির পেছনে শেকলে বাঁধা রয়েছে রাফিয়ান, ওদেরকে দেখেই হউ-হউ করে উঠল। চেঁচামেচি শুনে বেরিয়ে এল ফগ।
মর্নিং, মাস্টার জর্জ, বলল সে। তার কণ্ঠস্বর অবাক করল রবিনকে, কেন যেন মনে হলো, মাস্টার বলতে বাধছে ফগের। রাফিয়ানের বাধন খুলে দিল সে।
খুশিতে পাগল হয়ে গেল যেন রাফিয়ান। ছেলেদেরকে ঘিরে নাচছে, আর ঘেউ ঘেউ করছে।
গুড মর্নিং, রাফি, হেসে বলল কিশোর। আরে, অমন পাগল হয়ে গেলি কেন? আয়, এদিকে আয়।
লাফিয়ে এসে কিশোরের পায়ের কাছে পড়ল রাফিয়ান। তার গায়ে দুপা তুলে দিয়ে পেছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল, কান চেটে দিল, কিশোরের। পরক্ষণেই লাফিয়ে গিয়ে পড়ল জর্জের গায়ে।
সৈকত ধরে এগোল ওরা আবার। অনেকখানি শান্ত হয়ে এসেছে। রাফিয়ান, পিছে পিছে চলেছে, সুযোগ পেলেই চেটে দিচ্ছে জর্জের হাত।

এক জায়গায় কয়েকটা বড় বড় পাথর নেমে গেছে পানিতে, ওখানে নৌকা বাধা। একে একে উঠে পড়ল অভিযাত্রীরা, নৌকা ঠেলে পানিতে নামিয়ে দিল-ফগ। দাঁড় তুলে নিল জর্জ।
তীরে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে বিদায় জানাল ফগ। চেঁচিয়ে বলল, বেশি দেরি করবেন না। তাড়াতাড়ি চলে যান। ঝড় আসবে।
জানি, চেঁচিয়ে জবাব দিল জর্জ। ভেবো না, ঝড়ের আগেই দ্বীপে উঠে যাব। আসতে দেরি আছে এখনও।
দাঁড় বেয়ে চলল জর্জ। রাফিয়ানের আনন্দের সীমা নেই। ছোট্ট নৌকাটা ঢেউয়ের তালে তালে নাচছে, সেই সঙ্গে নাচছে কুকুরটা। লাফ দিয়ে একবার নৌকার এ-মাথায় চলে আসছে, আরেকবার ও-মাথায়। দুলে উঠছে নৌকা। তাতে আরও মজা পাচ্ছে সে, গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে।
এক দৃষ্টিতে দ্বীপটার দিকে তাকিয়ে আছে তিন গোয়েন্দা, কাছিয়ে আসছে ধীরে ধীরে। দ্বীপটার দিকে চেয়ে চেয়ে আগের দিনের মতই উত্তেজনা বোধ করছে।
জর্জ, এক সময় বলল কিশোর, উঠব কোন দিক দিয়ে? খালি তো দেখছি পাথর আর পাথর, নৌকা ভেড়ানোর জায়গা কোথায়?
আছে, আছে, রহস্যময় হাসি হাসল জর্জ। কাল বলেছিলাম না, ছোট্ট একটা জেটি আছে? লুকানো। দ্বীপের পুব ধারে।
দক্ষ হাতে চোখা পাথরের ফাঁক দিয়ে ডিঙিটাকে চালিয়ে নিয়ে চলল। জর্জ, পাকা মাঝি সে কোন সন্দেহ নেই। সামনে চোখা পাথরের দেয়াল, তার পরে কী আছে দেখা যায় না। একটা ফাঁক দিয়ে নৌকা ঢুকিয়ে দিল। জর্জ, দেয়ালের অন্য পাশে চলে এল। জেটিটা দেখতে পেল সবাই। প্রাকৃতিক জেটি। সাদা বালিতে ঢাকা ছোট্ট একটুকরো সমতল জায়গা, প্রায় চারপাশ থেকেই ঘিরে রেখেছে উঁচু পাথরের দেয়াল। বাইরে থেকে জায়গাটা দেখা যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।
সরু প্রণালী ধরে এগিয়ে চলেছে ডিঙি, জেটির দিকে। শান্ত পানি কাঁচের মত পরিষ্কার। রঙিন ছোট ছোট মাছগুলোকে মনে হচ্ছে রঙিন স্ফটিকে তৈরি। মুগ্ধ হয়ে দেখছে তিন গোয়েন্দা।
ইস, কী সুন্দর! জ্বলজ্বল করছে কিশোরের চোখ। তুমি। ভাগ্যবতী।
ঝট করে চোখ তুলে তাকাল জর্জ। মুসা ঠিক খেয়াল করল না ব্যাপারটা, কিন্তু রবিন অবাক হলো। কিন্তু সে কিছু বলার আগেই ঘঁাচ করে বালিতে ঠেকল নৌকার তলা, ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে গেল ডিঙি।
হলদে সাদা মসৃণ বালিতে লাফিয়ে নামল ওরা।
সত্যিই তা হলে দ্বীপে পৌঁছলাম! খুশিতে ওখানেই এক গড়ান দিল রবিন। তার সঙ্গে যোগ দিল রাফিয়ান। হেসে উঠল অন্যেরা।

টেনে নৌকাটাকে ডাঙায় তুলতে শুরু করল জর্জ। তার সঙ্গে হাত মেলাল মুসা। আর বেশি ওপরে তুলে কী হবে? জোয়ার কি এত ওপরে আসে? ১ঝড় আসবে ভুলে গেছ? পানি এখন শান্ত, ঝড়ের সময় দেখবে কী রকম ফুঁসে ওঠে। নৌকাটাকে টেনে নামিয়ে বাড়ি মেরে গুড়ো করে দিক, তাই চাও?
না, চায় না মুসা, পারলে এখন পাহাড়ের মাথায় তুলে রাখে। নৌকাটাকে।
চলো, চলো, ঘুরেফিরে দেখি, তর সইছে না রবিনের। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করেছে সে। এসো, এসো।
ছোট্ট একটা পাহাড়, আসলে টিলা বলাই উচিত। ওটা পেরিয়ে মোটামুটি একটা সমতল জায়গায় চলে এল ওরা। এত সুন্দর জায়গা খুব কমই দেখেছে তিন গোয়েন্দা। আশপাশে খরগোশের ছড়াছড়ি। ওর কাছাকাছি এলেই একটু সরে যাচ্ছে, ভয় পেয়ে গর্তে ঢোকার কোন লক্ষণই নেই জানোয়ারগুলোর মাঝে।
এক্কেবারে পোষা! অবাক হয়ে বলল কিশোর।
এখানে কেউ আসে না তো, তাই। আমিও ভয় দেখাই না ওদের। কুকুরটার দিকে চেয়ে হঠাৎ ধমকে উঠল জর্জ, এই, রাফি, রাফি, এলি এদিকে! ধরে থাপ্পড় লাগাব কিন্তু।
একটা খরগোশকে তাড়া করেছিল রাফিয়ান, মাঝপথেই যেন হোঁচট খেয়ে থেমে গেল, ফিরে করুণ দৃষ্টিতে তাকাল জর্জের দিকে। এই একটা ব্যাপার বুঝতে পারে না সে, আর কোন কিছুতেই মানা করে না, শুধু খরগোশ তাড়া করলে এত রেগে যায় কেন তার মনিব? বিষণ্ন ভঙ্গিতে ফিরে এল রাফিয়ান, ছেলেদের পাশে পাশে সুবোধ বালকের মত হেঁটে চলল, খরগোশগুলোর দিকে নজর, রসগোল্লার থালার দিকে যে চোখে তাকায় পেটুক ছেলে, চোখে সেই দৃষ্টি।
মনে হচ্ছে হাত থেকেই খাবার নিয়ে খাবে? খরগোশ দেখিয়ে বলল। কিশোর।
মাথা নাড়ল জর্জ। না, চেষ্টা করেছি, আসে না। ওটুকু ভয় রয়েই গেছে। ...আরে, ওই বাচ্চাটা দেখেছ! কী সুন্দর, না?
হুফ! স্বীকার করল রাফিয়ান, মনিবের আঙুল তোলা দেখে ভাবল ছাড়পত্র পেয়ে গেছে, কিন্তু লাফ দিয়ে বাচ্চাটার দিকে এগোতে গিয়েই থেমে গেল। আবার ধমকে উঠেছে মনিব, এই, শয়তান, কান ছিঁড়ে দেব কিন্তু!
দুপায়ের ফাঁকে লেজ গুটিয়ে আবার ফিরে এল রাফিয়ান।
এসে গেছি! হঠাৎ বলে উঠল কিশোর।
হ্যাঁ, ওই যে সিংহ-দরজা, হাত তুলে দেখাল জর্জ। ওখান দিয়েই দুর্গে ঢুকতে হবে।
বিশাল দরজা ছিল এক কালে, মস্ত বড় দুই থাম, ওপরে ধনুকের মত বাঁকানো খিলানের অর্ধেকটা বিশিষ্ট রয়েছে এখন, ঝুলে আছে বেকায়দা ভঙ্গিতে, ওটাও

খসে পড়তে পারে যে-কোন সময়। ওপাশ থেকে ধাপে ধাপে উঠে গেছে পাথরের ভাঙা সিঁড়ি, দুর্গের ঠিক গোড়ায় গিয়ে শেষ হয়েছে।
দুর্গ ঘিরে উঁচু দেয়াল ছিল এক সময়, বলল জর্জ। এখন জায়গায় জায়গায় পড়ে গেছে। টাওয়ার ছিল দুটো, দেখতেই পাচ্ছ, একটা পড়ে গেছে।
দেখতে পাচ্ছে ছেলেরা। আরেকটা টাওয়ার দাঁড়িয়ে আছে এখনও, তাতে কাকের বাসা। যেখানেই ফোকর পেয়েছে, বাসা বেধেছে। খড়কুটো ছাড়া আর বিশেষ কিছু দেখা যায় না এখন টাওয়ারের।
সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল ওরা। টাওয়ারের কাছাকাছি আসতেই ভড়কে গেল একজোড়া কাক, একেবারে কাছেই ওদের বাসা, হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায়। কা-কা চিৎকার করে মাথার ওপরে চক্কর দিতে লাগল পাখি দুটো। এই বেয়াদবিতে ভয়ানক রেগে গেল রাফিয়ান, হাউহাউ করে চেঁচিয়ে উঠল সে, লাফিয়ে ধরার চেষ্টা করল কাক দুটোকে, বৃথা চেষ্টা।
ওই যে, দুর্গের কেন্দ্র, হাত তুলে দেখিয়ে বলল জর্জ। ভাঙা একটা দরজার ওপাশে পাথরের ছড়ানো চত্বর, জায়গায় জায়গায় ফাটল সেখানে ঘাস আর শেওলার রাজত্ব। দেখে মনে হয়, এক সময় ওখানে মানুষ থাকত। ...ওই যে, একটা ঘর এখনও আছে। চলো, ওপাশে যাই।
দরজাটা পেরোল ওরা, ঘরটায় এসে ঢুকল। আবছা অন্ধকার। পাথরের দেয়াল, পাথরের তাক, পাথরের ছাত; এক কোণে মস্ত এক ফায়ারপ্লেস, তা-ও পাথরের। দেয়ালের অনেক ওপরে বড় বড় দুটো ফোকর, এক কালে জানালা ছিল, ওখান দিয়ে মান আলো আসছে, রহস্যময় এক আলো-আঁধারির সৃষ্টি করেছে ঘরের ভেতরে। গা ছমছম করা পরিবেশ।
যা মনে হচ্ছে, এই একটা ঘরই আস্ত আছে, ঘুরেফিরে দেখছে। কিশোর। আরেকটা দরজার কাছে গিয়ে অন্যপাশে উঁকি দিল। হুম, আরও আছে, কিন্তু আস্ত নেই কোনটাই। দেয়াল নেই, নয়তো ছাত নেই। ফিরে তাকাল সে জর্জের দিকে। ওপরতলা বলে কিছু আছে?
নিশ্চয়, কিশোরের কথার ধরনে মৃদু আহত হলো যেন জর্জ। তবে ওখানে আর ওঠা যায় না। ওই যে, দেখো, সিঁড়ি। সব আলগা। কাক টাওয়ারের ওপরেও কয়েকটা তলা আছে...ও, বুঝতে পারছ না, কাকেরা যে টাওয়ারটাতে বাস করে ওটার নাম রেখেছি কাক-টাওয়ার। কিন্তু ওখানেও উঠতে পারবে না, সিঁড়ি সব ভাঙা। আমি একবার চেষ্টা করেছিলাম। পড়ে গিয়েছিলাম। আরেকটু হলেই গিয়েছিল ঘাড়টা মটকে! তারপর আর সাহস করিনি।
পাতালঘর-টর আছে কিছু? আচমকা প্রশ্ন করল মুসা। আতঙ্কের দুর্গের সেই ডানজনের কথা মনে পড়ে গেছে তার।

জানি না, মাথা নাড়ল জ। তবে থাকার সম্ভাবনাই বেশি। চারদিকে এত ঘাস-লতা-পাতা গজিয়েছে, থাকলেও এখন আর সিঁড়ির মুখ দেত্যই, একে ঝোঁপ; পুরনের গুল

সত্যিই, একেবারে জংলা হয়ে গেছে জায়গাটা। এখানে-ওখানে ঘন হয়ে জন্মেছে বইচির ঝোঁপ; পাথরের ফাঁকে, কোনায়, যেখানেই জায়গা পেয়েছে, ঠেলে বেরিয়েছে এক ধরনের গুল্ম; মাথায় হলদে রঙের ছোট ছোট ফুল। সবুজ ঘাসের কার্পেট যেখানে-সেখানে, মাঝে মাঝেই খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে নীলচে-লাল সরু দণ্ডের মত উদ্ভিদ, মাথায় ছোট্ট একটা ক্রসের মত, একেকটা ক্রসের চার মাথায় আবার খুদে খুদে চারটে নীল ফুল।

না রে, ভাই, এত সুন্দর জায়গা কমই দেখেছি! আস্তে আস্তে মাথা নাড়ছে অভিভূত রবিন।

দিনের বেলা সুন্দর লাগছে বটে, খাপছাড়া কণ্ঠে বলে উঠল মুসা, কিন্তু রাতে? ভূত-টুত থাকে না তো?

তোমার কথাই এমন! রেগে গেল জর্জ। খালি বাজে কথা!

বাজে কথা বললাম? তোমাদের মত কল্পনার জগতে থাকি না আমি সারাক্ষণ, আমি হলাম বাস্তববাদী…

মাথার ওপর কর্কশ চিৎকার শুনে চমকে থেমে গেল মুসা। আকাশের দিকে তাকাল।

টাওয়ারের মাথায় অনেকটা হাঁটুভাঙা-দ-এর মত হয়ে বসে ছিল। এক ঝাক বড় পাখি, চকচকে কালো পালক, কী জানি কেন একসঙ্গে উড়াল দিয়েছে, চেঁচাচ্ছে সমানে। ভয় পেয়েছে নাকি কোন কারণে?

করমোরেন্ট, বলল জর্জ। খিদে পেলেই সাগরে নামে, মাছ ধরে খায়, তারপর হজম করার জন্যে এসে বসে টাওয়ারের মাথায়।

ভয় পেয়েছে মনে হচ্ছে? কিশোর বলল।

জর্জ জবাব দেয়ার আগেই দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে ভেসে এল চাপা গুডগুড। ঘাড় কাত করে বলল জর্জ, যা বলেছিলাম, ওই দেখো ঝড় আসছে। সেজন্যেই ভয় পেয়েছে পাখিগুলো। কিন্তু, একটু তাড়াতাড়িই এসে যাচ্ছে না! শেষ কথাটা বলতে গিয়ে আনমনা হয়ে গেল সে।

অবাক হয়ে সাগরের দিকে তাকিয়ে আছে ছেলেরা। দুর্গের ভিতরটা দেখায় এতই, মনোযোগী ছিল, আর কোনদিকে নজরই রাখেনি, আবহাওয়ার হঠাৎ পরিবর্তন দেখে তাই তাজ্জব হয়ে গেছে।

আরেকবার মেঘ ডাকল। মনে হলো, আকাশের কোন এক কোণে ঘাপটি মেরে বসে ভীষণ কণ্ঠে গর্জে উঠেছে হাজারখানেক বাঘ। জবাবে রাফিয়ানও গর্জে

উঠল, মেঘের তুলনায় হাস্যকর মনে হলো তার চিৎকার।
এত তাড়াতাড়িই এসে গেল! জর্জ চিন্তিত। সময়মত আর বাড়ি ফিরতে পারব না। আকাশের অবস্থা খুবই খারাপ।
ঠিকই বলেছে সে। ওরা রওনা দেয়ার সময় আকাশের রঙ ছিল গাঢ় নীল, এখন কালচে-ধূসর। আকাশের অনেক নিচে যেন ঝুলে রয়েছে ভারি মেঘ। ছেঁড়া ছেঁড়া সাদা মেঘের দল তীব্র গতিতে ছুটে যাচ্ছে দিকে দিকে, যেন তাড়া খেয়ে। মাথা কুটে একনাগাড়ে বিলাপ করে চলেছে বাতাস। ভয় পেতে শুরু করেছে রবিন।
টুপ করে বড় একটা ফোঁটা পড়ল কিশোরের কানে। বৃষ্টি আসছে! চলো, কোথাও ঢুকে পড়ি। ভিজে যাব।
আরিব্বাপ রে, ঢেউ দেখেছ! হাত তুলে বলল জর্জ। বড় রকমের ঝড় আসছে!
আকাশ চিরে ঝলসে উঠল বিদ্যুৎ, ক্ষণিকের জন্যে নীল আলোয়
আলোকিত করে দিয়ে গেল চারদিক।
কী সাগর বদলে কী হয়ে গেছে! নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না তিন গোয়েন্দা। পাহাড়ের সমান একেকটা ঢেউ ভীমবেগে ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে পাথুরে তীরে, কানফাটা গর্জন তুলে ভাঙছে; বালির সৈকত, পাথুরে টিলা সব ভিজিয়ে একাকার করে দিয়ে ফিরে যাচ্ছে আবার।
নৌকাটা আরও ওপরে তুলে রাখতে হবে, জর্জ বলল হঠাৎ।
মুসা আর রবিনকে দুর্গের ঘরে চলে যেতে বলে দ্বীপের অন্য ধারে ছুটে চলে এল কিশোর আর জর্জ, নৌকাটা যেখানে রেখেছে সেখানে। এসে ভালই করেছে, ইতিমধ্যেই নৌকার কাছে চলে এসেছে পানি, ঢেউ আরেকটু বড় হলেই ভাসিয়ে নিয়ে যেত। টেনেহিঁচড়ে নৌকাটাকে টিলার ওপরে তুলে নিয়ে এল ওরা, শক্ত করে শেকড় গেড়েছে এমন একটা ঝোঁপ দেখে তার গোড়ায় পেঁচিয়ে বাধল নৌকার দড়ি।
বৃষ্টি বেড়েছে, ভিজে চুপচুপে হয়ে গেছে দুজনে।
ওরা নিশ্চয় ঘরে চলে গেছে এতক্ষণে, কিশোর বলল।
হ্যাঁ, চলে গেছে। ভয় পাচ্ছে দুজনেই! বাইরে অন্ধকার, ঘরে আরও বেশি, তার ওপর ঠাণ্ডা। ভেজা কাপড়-চোপড় নিয়ে কিশোর আর জর্জের অবস্থা কাহিল।
আগুন জ্বালানো দরকার, কাঁপতে কাঁপতে বলল কিশোর। শুকনো কাঠকুটো কোথায় পাই?
তবে প্রশ্নের জবাবেই যেন কা-কা করে চেঁচিয়ে ঘরে এসে ঢুকল কয়েকটা কাক, মানুষের সাড়া পেয়ে দ্বিগুণ জোরে কা-কা করে উঠে বেরিয়ে গেল আবার।
এই তো পেয়েছি, কাঠকুটো! আনন্দে চিৎকার করে উঠল কিশোর। কাকের বাসা। দুতিনটে আনতে পারলেই কাজ চলে যাবে।

বৃষ্টির মধ্যেই ছুটে বেরোল সে। ভিজতে ভিজতে চলে এল টাওয়ারের কাছে। হ্যাঁচকা টানে সবচেয়ে নিচের বাসাটা খুলে বের করে দুহাতে জাপটে ধরে নিয়ে ছুটে চলে এল আবার ঘরে।
বাহ, চমৎকার! খুশি খুশি গলা জর্জের। ম্যাচ আর কাগজ দরকার, আছে কারও কাছে?
ম্যাচ আমার কাছেই আছে, ফায়ারপ্লেসে কুটোগুলো ছড়িয়ে রাখতে রাখতে বলল কিশোর। কিন্তু কাগজ…
আছে, আছে, বলে উঠল মুসা। স্যাণ্ডউইচের মোড়ক।
হেসে উঠল সবাই, কিন্তু কথাটা ঠিকই বলেছে মুসা। স্যাণ্ডউইচের মোড়ক খুলে নেয়া হলো, ঘি লেগে আছে, আগুন ধরাতে বরং সুবিধে হলো। কুটোগুলো গোল করে সাজিয়ে তার মাঝখানে কয়েকটা কাগজের টুকরো রাখল কিশোর, ওপরে আরও কিছু পাতলা কুটো ছড়িয়ে, একটা কাগজে আগুন ধরিয়ে তার ওপর ফেলল। প্রথমে ধোয়া উঠল কিছুক্ষণ, তারপর জ্বলে উঠল আগুন, সুন্দরভাবে।
পটপট করে কুটোর শুকনো গাঁট ফাটছে আগুনে, অন্ধকার ঘর লালচে আলোয় আলোকিত, দেয়ালে ছায়া নাচছে, কেমন যেন রহস্যময় করে তুলেছে ঘরের পরিবেশ। খোলা দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে কালো আকাশ, টাওয়ারের মাথায় যেন নেমে এসেছে ভারি মেঘ-ঠেকে আছে, নড়তে-চড়তে পারছে না। সাদা ছেঁড়া মেঘকে ঘোড়দৌড় করাচ্ছে বাতাস, ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে উত্তরে। সাগর দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু গর্জন কানে আসছে, তার সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে বাতাসের তীক্ষ্ণ বাঁশি। সাগরের পারে বাস, অথচ সাগরকে এমনভাবে গর্জাতে শুনিনি কখনও! রবিন বলল। ঝড় অনেক দেখেছি, কিন্তু এমন অবস্থা.. থেমে গেল সে।
এ আর এমন কী? জর্জ বলল। এর চেয়েও ভীষণ ঝড় হয় এদিকে। শীতকালে সবচেয়ে বেশি।
চেঁচিয়ে কথা বলতে হচ্ছে ওদের, নইলে একে অন্যের কথা শুনতে পাচ্ছে না।
অযথা বসে থেকে আর কী লাভ! মুসা প্রস্তাব রাখল। এসো, বোঝা কমাই। শেষ করে ফেলি স্যাণ্ডউইচগুলো।
অন্যেরা হাসল বটে, কিন্তু রাজি হলো।
ঝড়ের মধ্যে আগুনের ধারে বসে এভাবে খাওয়া! রবিন বলল। এর, আগে কতবছর আগে কে খেয়েছিল এখানে, কীভাবে খেয়েছিল, দেখতে ইচ্ছে করছে!
এই, মিয়া, চুপ করো, আর বোলো না! ভয়ে ভয়ে চারপাশে তাকাল মুসা, যেন ভূত দেখতে পাবে। আমার গায়ে কাটা দিচ্ছে! সত্যি। সত্যি যদি ওনারা থেকে থাকেন!
তার শিহরণ সংক্রমিত হলো অন্যদের মাঝেও।

চুপচাপ খাওয়ায় মন দিল ওরা। মাঝে মাঝে গলা ভিজিয়ে নিচ্ছে লেমোনেড় দিয়ে। ভালমতই ধরেছে আগুন, উত্তাপ ছড়াচ্ছে, গরম হয়ে উঠেছে ঘর। আগুনের ধার ঘেঁষে বসল জর্জ আর কিশোর, ভেজা জামাকাপড় শুকিয়ে নিতে চায়।

আরে, বাবা, এত কষ্ট করছ কেন? মাংস চিবাতে চিবাতে বলল মুসা। কাপড় খুলে চিপে নাও না। এখানে সবাই আমরা ছেলে, লজ্জার কী আছে?

ঠিক বলেছ, শার্ট খুলতে আরম্ভ করল কিশোর।

কিন্তু জর্জ দ্বিধা করছে। শার্ট খুলল না সে, মুখ ফিরিয়ে নিল আরেক দিকে, আগুনের আরও ধার ঘেঁষে বসল। সেদিকে চেয়ে হাসল কিশোর। জিনা, আর লুকিয়ে রাখতে পারবে না নিজেকে। তা ছাড়া তোমার উইগও সরে গেছে, আসল চুল বেরিয়ে পড়েছে। আগুনের আলোয় বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু তুমি ঘরের বাইরে বেরোলেই দেখে ফেলবে ওরা।

হাঁ হয়ে গেছে মুসা আর রবিন। খাওয়া থামিয়ে বোকার মত চেয়ে রয়েছে কিশোরের দিকে। ধীরে ধীরে চোখ ফেরাল ওরা জর্জের দিকে! ও...ও জিনা? বিশ্বাস করতে পারছে না রবিন।

কেন, এখনও সন্দেহ আছে? মিটিমিটি হাসছে কিশোর।

কিন্তু ওই নাক...দাঁত... মুসার গলায় খাওয়া আটকে যাওয়ার। অবস্থা।

হাত বাড়িয়ে জিনার নাক চেপে ধরল আচমকা কিশোর, দুআঙুলে টিপে ধরে টেনে খুলে নিয়ে এল আলগা রবারের নাকটা। জিনা, সামনের দাঁত দুটো খুলে ফেললো।

কারও দিকে না চেয়ে আস্তে করে ওপরের পাটির সামনের দুটো আসল দাঁতের ওপর থেকে প্লাস্টিকের দাঁত খুলে আনল জিনা। হঠাৎ মুখ তুলে হাসল সে, ঝকঝকে দাঁত, সুন্দর মিষ্টি হাসি। যাই বলো, কিছুদিনের জন্যে তো বোকা বানাতে পেরেছি।

উঁহু, আমাকে পারোনি, মাথা নাড়ল কিশোর। শার্টটা চিপে পানি ঝরিয়ে আবার গায়ে চড়াল। আমি দেখেই চিনেছি। ...ওভাবে কষ্ট করার দরকার নেই, আমরা ঘুরে বসছি। শার্ট খুলে চিপে নাও। উইগ খুলে চুল মুছে নাও।

শার্ট খুলে চিপে নিল জিনা। আবার পরে নিয়ে বলল, এবার ফিরতে পারো।

হুঁ, সেজন্যেই চেনা চেনা মনে হয়েছে। রবিন বলল। হাসি চেনা, শুধু দাঁতের জন্যে...তবে গলার স্বর...

আমারও সন্দেহ হয়েছে, মুসা বলল। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকে সব সময়, সবই করে, অথচ পানিতে নামার বেলা চুল ভিজে যাওয়ার ভয়ে নামোনি, না?

মাথা ঝোকাল জিনা।

জিনা, কিশোর বলল, গোবেল তোমার মায়ের কুলের নাম, না?
হ্যাঁ।
আবার খাওয়ায় মন দিল ওরা।
আগুন নিভু নিভু হয়ে আসছে।
আরও কুটো দরকার, জিনা বলল। ঝড় থামতে দেরি আছে। দেখি, যাই, নিয়ে আসি… বাজ পড়ার ভয়ানক শব্দে চমকে থেমে গেল।
এই ঝড় রাফিয়ানেরও পছন্দ হচ্ছে না। জিনার গা ঘেঁষে বসেছে, কান খাড়া, ব্রাজ পড়ার শব্দ হলেই গো গো করে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। মাঝে মাঝে হাড়গোড় বা দুএক টুকরো রুটি তার দিকে ছুঁড়ে দেয়া হচ্ছে, টুকিয়ে টুকিয়ে খাচ্ছে সে ওগুলো।
চারটে করে বিস্কুট পড়ল একেকজনের ভাগে। জিনা বলল। আমার চারটে রাফিকে দিয়ে দাও। ওর খাওয়ার বিস্কুট আনিনি, আমারগুলোই খাক। বেচারার নিশ্চয় খুব খিদে পেয়েছে।
আরে, দূর, তোমার সুরগুলো দেবে কেন? মুসা বাধা দিল। সবার। ভাগ থেকেই একটা করে দিই, চারটে হয়ে যাবে ওর।
তোমরা সবাই খুব ভাল, জিনা আন্তরিক গলায় বলল। সেজন্যেই এই ছুটিতে তোমাদের কথাই প্রথম মনে এল। দিলাম চিঠি লিখে। ভালই কাটছে, না?
হুফ! সবার আগে জবাব দিল রাফিয়ান। চারটে আস্ত বিস্কুট পেয়ে। হাসি ছড়িয়ে পড়েছে মুখে, কুকুরে-হাসি। চার কামড়ে চারটে বিস্কুট সাবাড় করে দিল সে, তারপর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যে চিত হয়ে শুয়ে চার পা তুলে দিল ওপর দিকে। হেসে জিনা তার পেটে আঙুল বুলিয়ে দিল।
খাওয়া শেষ, আগুনও একেবারে কমে গেছে। মুসা আরও গোটা দুয়েক বাসা ভেঙে নিয়ে আসার জন্যে উঠল। কাধ চেপে তাকে বসিয়ে দিল কিশোর। আমি ভিজেছি, ভিজি আরেকবার। তুমি বসো। তা ছাড়া বাইরের অবস্থাও দেখার ইচ্ছে হচ্ছে। মুসা কিংবা জিনাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই ছুটে বেরিয়ে গেল সে।
টাওয়ারের কাছে এসে দাঁড়াল। অঝোরে বৃষ্টি ঝরছে। থেকে থেকেই বাজ পড়ছে, আকাশটাকে চিরে ফালা ফালা করে দিচ্ছে যেন বিদ্যুতের নীল শিখা। ঝড়কে ভয় করে না কিশোর পাশা, কিন্তু এই ঝড়টা অস্বস্তি জাগাচ্ছে তার মনে, কেন জানি! ভয়ঙ্কর অবস্থা আকাশ আর সাগরের। বজ্রের গর্জন মিলিয়ে যাওয়ার পর পরই কানে আসছে সাগরের হুঙ্কার। দেখা যাচ্ছে না এখান থেকে, কিন্তু অনুমান করতে পারছে সে, ঢেউয়ের বড় বড় একেকটা পর্বত ছুটে এসে আছড়ে পড়ছে দ্বীপের গায়ে, প্রচণ্ড শব্দে ভাঙছে, তার ছিটে উঠে আসছে এই এত ওপরে, টাওয়ারের গোড়াতেও। বৃষ্টি না থাকলে ওই ছাটের জন্যেও ভিজে যেত কিশোর। সাংঘাতিক ব্যাপার-স্যাপার! বিস্মিত গলায় আপনমনেই বিড়বিড় করলসে।

কী ভেবে ঘুরল কিশোর। ভেজা পিচ্ছিল পাথরের ওপর দিয়ে দিয়ে চলে এল দেয়ালটার কাছে, যেটা এককালে পুরো দুর্গকে ঘিরে রেখেছিল, এখন জায়গায় জায়গায় ভাঙা। তেমনি একটা ভাঙা জায়গার কাছে এসে দাঁড়াল সে। সাগরের দিকে চেয়ে বোবা হয়ে গেল! এ কী দৃশ্য!

ঢেউ তো না, যেন ধূসর-সবুজ পর্বত একেকটা। ছুটে এসে গিলে। ফেলতে চাইছে ছোট্ট দ্বীপটাকে, চূড়ায় সাদা ফেনা, আকাশের বিদ্যুতের সঙ্গে চমকাচ্ছে। এত জোরে বাড়ি মারছে দ্বীপটাকে, কিশোরের ভয় হলো, ভেঙেচুরে গুঁড়িয়ে না দেয়! পায়ের তলায় মাটি কাঁপছে বাজ পড়ার শব্দে, না ঢেউয়ের গুমরানিতে ঠিক বুঝতে পারল না।

পুরো তিরিশ সেকেণ্ড নির্বাক চেয়ে রইল কিশোর খোলা সাগরের দিকে। ধীরে ধীরে ভয় কেটে গেল; বুঝতে পারছে, এই সাগরে এর চেয়ে বড় ঢেউ আর উঠবে না, গোবেল দ্বীপকেও ভেঙে নিয়ে যেতে পারবে না। পাশ ফিরে চেয়েই স্থির হয়ে গেল সে। ঢেউয়ের খাঁজে একটা নিয়মিত সময়ে বার বার বেরিয়ে আসছে ডুবো-টিলার চোখা চূড়া, তারই ফাঁকে কালো বড় একটা অবয়ব, ধীরে ধীরে ভেসে উঠছে মনে হচ্ছে। ঢেউয়ের দোলায় দুলছে; একবার, এপাশে কাত হচ্ছে, একবার ওপাশে; তলিয়ে যাচ্ছে, আবার ভাসছে। কী ওটা!

জাহাজ হতে পারে না! নিজেকে বোঝাল কিশোর বিড়বিড় করে। দ্রুত হয়ে গেছে হৃৎপিণ্ডের গতি, চোখের সমস্ত ক্ষমতা নিংড়ে নিয়ে দেখার চেষ্টা করছে ভালমত, কিন্তু বৃষ্টি আর ঢেউয়ের ছটের জন্যে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে না কিছুতেই। অথচ জাহাজের মতই লাগছে! নাকি জাহাজই! দ্বীপে ভেড়ার চেষ্টা করছে! তা হলে মরেছে ওটা, কেউ বাঁচাতে পারবে না!

স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে কিশোর। কালো বস্তুটা আরেকবার ভাসল, তারপর ডুবে গেল আবার। হঠাৎ তার মনে পড়ল আগুনের কথা, নিভে গেল না তো? ফিরল সে।

আর আধ মিনিট দেরি করলেই নিভে যেত আগুন। ফিরে আসায় কোনমতে বাঁচানো গেল।

অদ্ভুত একটা জিনিস দেখে এসেছি, বলল কিশোর। জাহাজের মতই লাগল!

হাঁ করে তাকিয়ে রইল অন্য তিনজন।

জাহাজের ভূত! ঝড়ের মাঝে বেরোয়! গলা কেঁপে উঠল মুসার।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল জিনা। চলো তো, দেখি! আগুনে আরও কয়েকটা কুটো ফেলে কিশোরের হাত ধরে টেনে নিয়ে বেরোল সে। রবিন আর মুসা চলল ওদের পেছনে।

বাতাসের গতি কমছে, কিন্তু বৃষ্টি বেড়েছে, ঝড় সরে যাচ্ছে বোধহয়। বাজ পড়ছে এখনও, তবে অনেক দূরে, সরে যাচ্ছে আরও, বিদ্যুতের ঝলকও কমছে। ভাঙা দেয়ালটার কাছে সঙ্গীদেরকে নিয়ে এল কিশোর।
ধূসর-সবুজ ঢেউ দেখল ওরা, ঢেউয়ের মাথায় ফেনা দেখল, দ্বীপ ঘিরে পানির তা-থৈ নাচ দেখল। গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়েছে মুসা আর রবিন, কিশোরের বাহু খামচে ধরে রেখেছে জিনা।
ওই যে ওদিকে, হাত তুলল কিশোর। চোখা পাথরের মাঝে। দেখেছ?
প্রথমে কিছু দেখল না, তারপর হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল জিনা, হ্যাঁ হ্যাঁ, জাহাজ! জাহাজই! বড়…অনেক বড়, সেইলিং বোট কিংবা জেলেদের বোট নয়।
ওই যে বললাম, ভুতুড়ে! ভয়ে ভয়ে বলল মুসা।
তার কথায় কান দিল না কেউ, অবাক হয়ে চেয়ে আছে জাহাজটার দিকে। পুরোপুরি ভেসে উঠেছে এখন, কালো বিশাল দেহ, দুলছে ঢেউয়ে। ধাক্কা দিয়ে দিয়ে কিনারে নিয়ে আসছে ঢেউ, খুব ধীরে ধীরে।
মরবে! কিশোর বলল। যা চোখা পাথর! তলায় খোঁচা লাগলেই খতম!
তার কথা শেষও হলো না, কাঠ ভাঙার তীক্ষ্ণ মড়মড় শব্দ উঠল, দুলে উঠে এক পাশে অনেকখানি কাত হয়ে গেল জাহাজ। দ্বীপের দক্ষিণ পশ্চিমের ভয়াল ডুবোটিলার চূড়ায় বাড়ি লেগেছে। কাত হয়েই রইল জাহাজটা, তার ওপর দিয়ে গড়িয়ে গেল মস্ত একটা ঢেউ। ঢেউ সরে যাওয়ার পরও একই জায়গায় একইভাবে থেকে গেল জাহাজটা।
গেছে আটকে! কিশোর বলল। আর নড়তে পারবে না। ঝড় থামলেই পানি নেমে যাবে, ওখানে ওভাবেই আটকে থাকবে জাহাজটা।
বৃষ্টি ধরে এসেছে, তবে একেবারে থামেনি। এরই মাঝে মেঘের ফাঁকে রোদ দেখা দিল, চকিতের জন্যে। বোঝা গেল, শিগগিরই সূর্য বেরিয়ে আসবে।
খাইছে! চেঁচিয়ে উঠল মুসা। এ আবার কী? এখনই ঝড়, এখনই রোদ!
গরমকালে এদিকের ঝড় এমনই, জিনা বলল। এই আছে, এই নেই।
মেঘ পাতলা হয়ে এল, ঝড়ো বাতাস মিলিয়ে গিয়ে তার জায়গায় এল ফুফুরে হাওয়া। মেঘের ফাঁকে হেসে উঠল সূর্য, উষ্ণ কোমল রোদ যেন স্বাগত জানাল ওদের। ঢেউ কমে গেছে, পানি নেমে গেছে অনেক, টিলার মাথায় আটকা পড়া জাহাজটা এখন স্পষ্ট।
অদ্ভুত! নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর। অদ্ভুত দেখাচ্ছে! জাহাজের এমন চেহারা…
বুঝেছি! হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল জিনা। তার ধূসর চোখে আলো। উত্তেজনায় কথা আটকে যাচ্ছে।

কী! জিনার কাধ খামচে ধরল কিশোর।
কিশোর…ওটা, ওটা আমার জাহাজ! খুশিতে হাততালি দিয়ে উঠল জি না। আমার ডুবোজাহাজ! ঝড়-ঝড় সাগরের তলা থেকে তুলে দিয়েছে! আমার জাহাজ!
পলকে বুঝে গেল অন্যেরা, জাহাজটার এই চেহারা কেন। আধুনিক জাহাজ নয়, পুরানো কাঠের জাহাজ, পাল নেই, মাস্তুল ভাঙা। জাহাজ নয়, জাহাজের ধ্বংসাবশেষ!
ভালই হলো, জিনার কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে আনল কিশোর। ভালমত খুঁজে দেখতে পারব এবার। হয়তো কে জানে, হয়তো সোনার বারগুলো পেয়েও যেতে পারি! কি বলো, জিনা?
এরপর মিনিটখানেক নির্বাক হয়ে জাহাজটার দিকে চেয়ে রইল ওরা। কালো পুরানো ভেজা ধ্বংসাবশেষের ভিতরে অসংখ্য সোনার বার! –ভাবতেই কেমন জানি লাগছে!
জিনার হাত ধরল কিশোর। কি বলো, জিনা?
তবুও জবাব দিল না জিনা, বোবা হয়ে তাকিয়ে আছে জাহাজটার দিকে। হঠাৎ করেই ফিরল কিশোরের দিকে। জাহাজটা তখন কার ছিল জানি না, হয়তো কোন রানী বা রাজার, কিন্তু এখন আমার! সাগরের তলায় ডুবে ছিল, ভেসে উঠেছে। কিশোর, ওটার ক্যাপ্টেন ছিল আমাদের নানার-নানার-বাবা। জিনিসটা তো এখন আমারই সম্পত্তি, নাকি? কেউ ছিনিয়ে নিতে আসবে না তো আবার?
সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতে পারল না কিশোর। মুসা বলল, তা আসতেও পারে! তবে আমরা ওটার কথা কাউকে না বললেই হলো।
বোকার মত কথা বোলো না! জাহাজের মালিকানা হারানোর ভয়ে মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে জিনার। জেলেরা আসে, কারও না কারও চোখে পড়ে যাবেই। এত বড় একটা জাহাজ দেখতে না দেখতে রটে যাবে খবর!
তা হলে কেউ দেখার আগেই চলো ভেতরে খুঁজে দেখি, মুসা প্রস্তাব দিল। ঢেউ আরেকটু কমলেই যাব।
ঢেউ তেমন কমতে অনেক দেরি, জিনা বলল। নৌকা নিয়ে যেতে হবে। এখন যা আছে ঢেউ, তার অর্ধেক থাকলেও আছড়ে গুঁড়ো করে দেবে ডিঙি। আজ সম্ভব না।
কাল সকালে? জিনার দিকে তাকাল কিশোর। অন্য কেউ এদিকে আসার আগেই যদি চলে আসি আমরা? ভেতরে কিছু না কিছু পেয়ে যেতে
পাবে না, মাথা নাড়ল জিনা। বললাম না, ডুবুরিরা কিছু বাকি রাখেনি…

যত যেভাবেই দেখুক, বাধা দিয়ে বলল কিশোর, পানির তলায় অত খুঁটিয়ে দেখা যায় না। ওপরে অনেক ভাল করে দেখতে পারব। তা হলে কাল সকালেই, কি বলো?

হ্যাঁ, তা আসা যায়, জাহাজটার দিক থেকে চোখ সরাতে পারছে না যেন জিনা। স্বপ্নের মত লাগছে! আমি.. আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না, এতকাল পর ওটা উঠে এল পানির তলা থেকে!

মেঘ কাটেনি পুরোপুরি, তার ভিতর দিয়েই সূর্য উঠেছে, রোদ বেশ কড়া। ভেজা কাপড় থেকে হালকা বাষ্প উঠতে শুরু করেছে, এমনকী রাফিয়ানের ভেজা রোম থেকেও বাষ্প উঠছে রোদের আছে। সে-ও তাকিয়ে আছে জাহাজের দিকে, থেকে থেকে চাপা স্বরে গোঁ গোঁ করছে।

কী রে জাহাজ দেখে অমন করছিস কেন? কুকুরটার মাথায় হাত রাখল জিনা। ওটা শত্রু না, লাগতে আসবে না তোর সঙ্গে।

হয়তো তিমি-টিমি ভেবেছে, হেসে বলল রবিন। জিনা, কাল সকালে কেন? আজই যাওয়া যায় না?

নাহ! আমারও খুবই ইচ্ছে করছে, কিন্তু সম্ভব না। দেখছ, জাহাজটা এখনও পুরোপুরি বসেনি পাথরের ফাঁকে? বড় ঢেউ এলেই দুলে উঠছে। পাথরে বাড়ি খেতে পারে নৌকা, আর যদি কোন অলৌকিক উপায়ে বেঁচে যাইও জাহাজে উঠতে পারব না কিছুতেই। খুবই বিপজ্জনক। খামোকা, ঝুঁকি নিয়ে লাভ কী? তার চেয়ে কাল সকালেই আসব।

আরও খানিকক্ষণ ওখানে দাঁড়িয়ে থেকে জাহাজটা দেখল ওরা। তারপর ঘুরল। নৌকা নিয়ে বাড়ি ফিরে যাবে। ওদেরকে দেখেই টাওয়ার থেকে নেমে এল কাকের ঝাঁক, বাসা ভাঙা হয়েছে দেখেছে, মাথার ওপর উড়ে কা-কা করতে লাগল। গর্ত থেকে আবার বেরিয়ে এসেছে। খরগোশেরা। কাকের কা-কায় কান না দিয়ে খরগোশের গর্ত এড়িয়ে, ঝোঁপঝাড় ভেঙে, টিলা ডিঙিয়ে আবার নেমে এল ওরা প্রাকৃতিক জেটিতে। মুসা একাই নামিয়ে আনল ডিঙিটা।

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা ভাল, জিনা বলল। ঢেউ এখনও বেশি। আকাশের দিকে তাকাল সে। হুমম! আবার বৃষ্টি আসবে। জোয়ারের আগে এসে গেলে মরেছি; তা হলে আজ আর বাড়ি ফিরতে পারব না।

ভাগ্য ভাল, জোয়ারের আগে এল না বৃষ্টি। ঢেউয়ের প্রতিকূলে পালা করে দাঁড় বেয়ে চলতে বেশ কষ্টই হচ্ছে ওদের।

খোলা সাগরে বেরিয়ে এল নৌকা। জাহাজটা দেখা যাচ্ছে না এখান থেকে, উল্টো দিকে রয়েছে, পাহাড়ের ওপাশে।

নাহ, দেখবে না কেউ, দাঁড় বাইতে বাইতে বলল কিশোর। জিনার দিকে ফিরল। রাতে মাছ ধরতে যায় জেলেরা?
যায়। তবে আজ যাবে না। আকাশ আবার খারাপ হচ্ছে।
এই, দাঁড়টা আমাকে দাও তো, কিশোরের দিকে হাত বাড়াল মুসা। তোমার হাতে থাকলে সারাক্ষণ ওদিকেই চেয়ে থাকবে, বাড়ি ফেরা আর হবে না। এদিকে খিদেয় আমার পেট জ্বলছে।
হুফ! সঙ্গে সঙ্গে একমত হলো রাফিয়ান। মুসার হাটু ঘেষে এসে লেজ নাড়তে লাগল।
যাক, এতদিনে মনের মত দোস্ত পেয়েছ একটা, হেসে টিপ্পনী কাটল রবিন।
তীরে নেমে টেনে ডাঙার অনেক ওপরে নৌকাটা তুলে রাখল ওরা। জিনা বলল, তোমরা দাঁড়াও, আমি রাফিকে দিয়ে আসছি এক দৌড়ে!
বাড়ি ফিরতে দেরিই হয়ে গেল। খাবার নিয়ে অপেক্ষা করছেন। মিসেস পারকার, দুশ্চিন্তা শুরু করেননি এখনও।
কাপড় বদলে হাত-মুখ ধুয়ে এসে খেতে বসল ওরা। খাবারের বহর দেখে খুশিতে দাঁত বেরিয়ে পড়ল মুসার। প্রথমেই কেকটা টেনে নিল সে। বড়সড় ডিশের প্রায় কানা ছুঁই ছুঁই করছে কেকের প্রান্ত। গাঢ় চকলেট রঙ, ঘি চুপচুপ করছে, চূড়ায় বড় বড় কিসমিস আর বাদাম গা ডুবিয়ে আটকে আছে, ভিতরে মোরব্বার কুচি আর কী কী আছে, অনুমান করতে কষ্ট হলো না তার। ছুরি দিয়ে বড় এক টুকরো কেটে নিয়ে কামড় বসাল। আরি, কী স্বাদ! কেক তৈরিতে মেরি চাচীকেও ছাড়িয়ে গেছেন জিনার মা।
দিনটা কেমন কাটল? হেসে জিজ্ঞেস করলেন মিসেস পারকার।
খুব ভাল, খুব ভাল, মুখে কেক ভর্তি, কথা স্পষ্ট হচ্ছে না মুসার। দারুণ একখান ঝড় বইল। ধাক্কা দিয়ে সাগরের তল থেকে জা…
একসঙ্গে লাথি চালাল কিশোর আর রবিন। নাগালের মধ্যে থাকলে। জিনাও লাথি মারত। আঁউক! করে উঠল মুসা, চোখে পানি এসে গেল।
কী হলো? অবাক হলেন মিসেস পারকার। গলায় আটকেছে? এত তাড়াতাড়ি কীসের, আস্তে খাও না। নাও, পানি খেয়ে নাও। গেলাস ঠেলে দিলেন মুসার দিকে। হ্যাঁ, তারপর কী হলো?
জিনার কড়া দৃষ্টি থেকে চোখ সরাল মুসা। ও, হ্যাঁ, সাগরের তল থেকে, জানেন, কী যে বড় বড় ঢেউ…
ঢেউ সাগরের তল থেকে ওঠে নাকি? বোকা ছেলে, হাসলেন। মিসেস পারকার। জর্জের দ্বীপ দেখেছ?

নিশ্চয়। এত সুন্দর না! তবে ঝড়ের জন্যে কিছু দেখতে পারলাম না। ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম, আমার মতই রাহাউক! আবার লাথি খেয়েছে পায়ে।
জিনার মা যাতে কিছু বুঝতে না পারেন সেজন্যে তাড়াতাড়ি বলল। কিশোর, খরগোশগুলো তো একেবারে পোষা।
হ্যাঁ, আর করমোরেন্টও দেখলাম, রবিন যোগ করল। অনেক অনেক করমোরেন্ট।
আর জানো, মা, জিনা বলল, কাক এত বেশি হয়েছে না। সারাক্ষণ খালি কা-কাকা-কা, একেবারে কান ঝালাপালা…
তোরাও দেখি কাকের মতই কা-কা শুরু করে দিলি! ভুরু কোচকালেন মিসেস পারকার। নে, জলদি খেয়ে নে। তারপর চুপচাপ যার যার ঘরে চলে যা। উনি ব্যস্ত, জরুরি কাজ করছেন। চেঁচামেচি শুনলে রাগ করবেন। যাই, খাবারটা দিয়ে আসি। জানালা দিয়ে বাইরে চোখ পড়তেই বললেন, আরে, আকাশ আবার খারাপ! জোর বৃষ্টি আসবে।
প্লেটে খাবার নিয়ে স্বামীর কাজের ঘরে চলে গেলেন তিনি।
গাবা কোথাকার! চাপা গলায় ধমক দিল কিশোর। দিয়েছিলে তো ফাস করে! মুখ সামলাতে পারো না?
হয়েছে, হয়েছে, আবার বকাবকি করছ কেন? মুসার মুখ গোমড়া, কিন্তু খাবার চিবানোয় বিরতি নেই।লাথি তো যা মারার মেরেছ, চামড়া ছড়ে গেছে পায়ের। এক কামড়ে একটা সামুসার আধখানারও বেশি মুখে পুরল সে।
হো হো করে হেসে ফেলল অন্য তিনজন। মুসার মুখ ভরা, হাসতে পারছে না, কিন্তু চোখ উজ্জ্বল।
খাওয়া শেষ করে ওপরে চলে এল ওরা। জিনা বলল, এবার তো ঘরে বন্দি। দাঁড়াও, লুডু নিয়ে আসছি।
খেলা শুরু হলো। কিশোর আর জিনা জুটি হয়েছে। প্রতিপক্ষ রবিন আর মুসা। খেলা চলছে, এক সময় প্রশ্ন করল কিশোর, আচ্ছা, জিনা, তোমাকে জর্জ বলে ডাকেন কেন তোমার মা-বাবা?
ছেলের খুব শখ ওদের, গুটি চালতে চালতে বলল জিনা। আমার একটা ভাই হয়ে মারা গেছে, তার নাম ছিল জর্জ। তার পরে আমি হয়েছি, তাই আমাকে দিয়েই পুত্রসন্তানের আশা পূরণ করে তারা, শেষ কয়েকটা শব্দ বিশেষ এক ভঙ্গিতে উচ্চারণ করল সে। আরে, আরে, একী! চেঁচিয়ে উঠল সে। আমার গুটি খেয়ে ফেলেছ? চুরি করেছ তুমি, স্রেফ চুরি!
না, চুরি করিনি! মুসাও চেঁচাল। ছক্কা উঠেছে আমার, ঠিকই খেয়েছি!
না, চুরি করেছ!

না, করিনি!
বেধে গেল ঝগড়া। টান দিয়ে লুডু ছিঁড়ে ফেলল জিনা। তাকে থামাতে গিয়ে ধাক্কা দিয়ে চেয়ার উল্টে ফেলে দিল রবিন। এক ঝটকায়। খুলে গেল দরজা, জিনার বাবা, রাগে লাল চোখমুখ। ধমকে উঠলেন, এই, হচ্ছে কী!
মুহূর্তে চুপ হয়ে গেল সবাই।
খালি শয়তানি, না? চুপচাপ গল্প করো। আবার যদি গোলমাল শুনি, কাল ঘরে আটকে রাখব, বেরোতেই দেব না, হ্যাঁ। যত্তসব!, গজগজ করতে করতে চলে গেলেন তিনি।
সরি, মুসা, লজ্জিত হয়েছে জিনা।
মুসা কিছু বলতে পারল না, শুধু লজ্জিত হাসি হাসল।
বাইরে অঝোর বৃষ্টি। আকাশ কালো। সন্ধ্যা নামতে দেরি আছে, অথচ বৃষ্টির জন্যে এখনই বেশ অন্ধকার। সাগরের দিকে তাকাল কিশোর, দিগন্ত চোখে পড়ছে না, আড়াল করে দিয়েছে বৃষ্টির চাদর। আনমনেই হাত বাড়িয়ে জানালার কাছের গাছ থেকে একটা গোলাপ ছিঁড়ে নিয়ে দাতে কাটতে শুরু করল ভেজা পাপড়িগুলো।
খেলা বা গল্প কিছুই আর জমল না। আর কিছু করারও নেই এখন। সকাল সকালই শুতে গেল ওরা। মুসা আর রবিন শোয়া মাত্রই ঘুমিয়ে পড়ল, কিন্তু কিশোর আর জিনার চোখে ঘুম নেই। দুজনের মনে একই ভাবনা। বৃষ্টি থামবে তো সকালের আগে? জাহাজে উঠতে পারবে? আচ্ছা, সত্যিই কি পাবে ওরা সোনার বারগুলো? সেরাতে স্বপ্ন দেখল কিশোর, জলদস্যুদের সর্দার হয়েছে সে, পালতোলা কাঠের জাহাজ নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে খোলা সাগরে, দিগ্বিজয়ে। জিনা দেখল দুঃস্বপ্ন, ভোরের দিকে
কিশোওর! কিশোওর! বাঁচাও! বাঁচাও! আমার দম আটকে আসছে...
জিনার চিল্কারে লাফ দিয়ে বিছানায় উঠে বসল রবিন। পাশের। বিছানায় ছটফট করছে জিনা। উঠে গিয়ে ঠেলা দিল, এই, জিনা, কী হয়েছে। ওঠো। দুঃস্বপ্ন দেখেছ?
চোখ মেলল জিনা। আমি পাতালঘরে বন্দি-সোনার বার...ওহ, মুখে হাসি ফুটল সহসা। স্বপ্ন দেখছিলাম! উঠে বসল সে।
জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখল ওরা, কখন বৃষ্টি থেমে গেছে। দিগন্তে পানির তলা থেকে যেন পিছলে বেরিয়ে আসছে বিশাল সূর্যটা, সাগরের পানি তো নয়, টলটলে তরল সোনা, আকাশে সাদা মেঘ রক্তাক্ত, তাতে সোনালি ছোপ। গোলাপবনে টুইই টুইই করে ডাকছে কী একটা নাম-না-জানা ছোট্ট পাখি। অপূর্ব সুন্দর এক সকাল!

কিশোরও উঠেছে। মুসাকে ঠেলা দিল, এই, এই, মুসা ওঠো। সকাল হয়েছে।
চোখ মেলল মুসা, কিশোরের দিকে চেয়ে হাসল। কেমন এক ধরনের সুখের অনুভূতি, তাদের মনে। আবহাওয়া পরিষ্কার, অভিযানে বেরোবে খানিক পরেই।
বিছানা ঝাড়ল মুসা। রবিন আর জিনাকে ডাকতে চলল কিশোর, কিন্তু বারান্দায় বেরিয়েই দেখল, ওরা দুজন তৈরি হয়ে বেরিয়ে আসছে।
কিশোরকে দেখেই ঠোঁটে আঙুল রাখল জিনা, জোরে কথা বোলো না! মা-বাবা নিশ্চয় এখনও ওঠেনি। দেখা হলেই হাজারটা প্রশ্নের জবাব দিতে হবে, তার চেয়ে, চলো, না জানিয়েই বেরিয়ে পড়ি। ফিরে এসে খাব।
পা টিপে টিপে বেরিয়ে এল ওরা বাড়ি থেকে।
রোদ বাড়ছে, সূর্যটা এখনও দিগন্তেই রয়েছে, পানির সামান্য ওপরে। আকাশ এত পরিষ্কার, মনে হয় যেন এই মাত্র ধুয়ে এনে ছড়ানো হয়েছে। উজ্জল নীল আকাশের পুবে সাদা মেঘের গায়ে গোলাপী রঙ লেগেছে, সাগর যেন একটা চকচকে আয়না। আবহাওয়া দেখে মনেই হয় না, গতকাল কী ভীষণ ঝড় বয়ে গেছে!
সৈকতে তিন গোয়েন্দাকে দাঁড়াতে বলে ফগের বাড়ি চলে গেল। জিনা। খানিক পরেই নৌকা বেয়ে নিয়ে ফিরে এল।
দ্বীপে রওনা হলো ওরা। দাঁড় বাইতে পরিশ্রম লাগছই না প্রায়, সাগর একেবারে শান্ত। দ্বীপের ধার দিয়ে ঘুরে অন্যপাশে নৌকা নিয়ে এল জিনা।
চোখা পাথরে কাত হয়ে আটকে রয়েছে জাহাজটা, পাথরের মতই অনড়। হালকা ঢেউয়ের তলা দিয়ে পানি আসছে-যাচ্ছে, কিন্তু জাহাজকে নড়াতে পারছে না, তার মানে ভালমতই আটকেছে। পানির তলায়ই ভাঙা ছিল অবশিষ্ট একটি মাত্র মাস্তুল, গতকালকের ঝড়ে সেটা ভেঙে আরও খাটো হয়েছে।
ইসস, কী অবস্থা হয়েছে! আফসোস করল জিনা। আরও ভেঙেছে! এটুকু যে রয়েছে, সেটাই আশ্চর্য! যা একেকখান বাড়ি খাচ্ছিল!
কিন্তু ওটার কাছে যাবে কী করে? মুসা বলল। জাহাজের চারপাশে চোখা পাথরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।
দেখোই না, কী করে যাই, জিনা হাসল। তার কথা বিশ্বাস করল। তিনজনেই। গোবেল দ্বীপ আর তার চারপাশের প্রতিটি ইঞ্চি জায়গা হাতের উল্টোপিঠের মতই পরিচিত জিনার কাছে। দাঁড় বাওয়ার ভঙ্গিতেই বোঝা যাচ্ছে, কতখানি আত্মবিশ্বাস রয়েছে ওর।
কাছে চলে এল ডিঙি। বিশাল জাহাজ, দূর থেকে দেখে বোঝা যায়নি এত বড়, পানির তলায় ডুব দিয়ে তো নয়ই। জাহাজের শরীর কামড়ে ধরে রেখেছে নানারকমের ছোট-বড় শামুক। এখানে-ওখানে ঝুলে রয়েছে শেওলা, বাদামী-

সবুজ, আধশুকনো। ভেজা ভেজা কেমন একটা আশটে গন্ধ ছড়াচ্ছে। জাহাজের খোলে ইয়া বড় বড় কালো ফোকর, পাথরের খোঁচায় হয়েছে। অনেক পুরানো একটা লাশ যেন, দেখলে মন খারাপ হয়ে যায়।
যে কটা পাথরে জাহাজ আটকে রয়েছে, তার একটার গা ঘেঁষে নৌকা রাখল জিনা। জোয়ার আসছে, ঢেউ ছলাতছল বাড়ি খাচ্ছে পাথরের গায়ে, পানির ছিটে ভিজিয়ে দিচ্ছে ওদের জামা।
নৌকা বাধি কোথায়! এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে জিনা।
জাহাজের সঙ্গেই, কিশোর বলল। দড়িটা কোথায়? পাটাতনের নিচ থেকে খুঁজে দড়ি বের করে নিল সে। এক মাথা নৌকার গলুইয়ের আঙটার সঙ্গে বেঁধে আরেক মাথায় একটা ফাস তৈরি করল। জাহাজের ডেকের ভাঙা রেলিঙের একটা খুটি সই করে ছুঁড়ে দিল ফাসটা, আটকাল না। তিন বারের বার কাজ হয়ে গেল। টেনে ফাসটা খুঁটিতে এটে নিল। সে। দুটো কাজ হলো এতে। নৌকাও বাধা হলো, জাহাজে ওঠারও ব্যবস্থা হলো।
দড়ি বেয়ে বানরের মত সবার আগে ডেকে উঠে গেল জিনা। কিশোর আর মুসা উঠল তার পর। সবার শেষে রবিন। রেলিঙের কাছাকাছি এসে হাঁপ ধরে গেল তার, ওপর থেকে হাত ধরে টেনে তুলে। নিল তাকে মুসা।
এই সেই ডেক, না? বিষণ্ন দৃষ্টিতে ডেকে চোখ বোলাচ্ছে জিনা। এখানেই ঘুরে বেড়াত এক সময় জ্যান্ত মানুষ, আমার নানার-নানার বাবা! বড় একটা গর্তের দিকে আঙুল তুলল সে। ওই যে, সিঁড়ি বোধহয় ওখানেই।
গর্তটার কাছে এসে ঘিরে দাঁড়াল ওরা। সিঁড়িই। মরচে ধরা লোহার একটা মই জায়গামতই আটকে আছে এখনও।
ভার সইবে তো? দেখতে দেখতে বলল জিনা। ইস, কী অন্ধকার!
প্রয়োজনীয় জিনিস সঙ্গে আনতে সাধারণত ভুল করে না কিশোর। পাশা, কোমরের বেল্ট থেকে টর্চ খুলে হাতে নিয়ে মই বেয়ে নামতে শুরু করল। তাকে অনুসরণ করল অন্য তিনজন সাবধানে, যদি ভেঙে পড়ে! না, ভাঙল না মই, নিরাপদেই নামল ওরা।
বিরাট খোল, বেজায় অন্ধকার, টর্চের আলোয় রহস্যময় দেখাচ্ছে। ভারি ওক কাঠে তৈরি নিচু ছাত, রবিনেরই মাথা নুইয়ে রাখতে হচ্ছে, মুসার তো আরও অসুবিধে। এখানে কেবিন ছিল নাকি? ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। দেয়াল-টেয়াল কিছু নেই এখন, ভেঙেচুরে সব একাকার। ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ভাঙা কাঠ। নানারকম জিনিস ছিল, সব কিছুই নষ্ট হয়ে গেছে, শামুক আর শেওলার রাজত্ব। তীব্র আশটে গন্ধ, শামুক আর শেওলা পচতে শুরু করলে গন্ধ অসহ্য হয়ে উঠবে, বোঝাই যাচ্ছে।

হাঁটতে অসুবিধে হচ্ছে, ভীষণ পিচ্ছিল। দড়াম করে এক আছাড় খেল মুসা, এরপর পা বাড়াতেই ভয় হলো তার। এক মাথায় পাটাতনে বড় আরেকটা গর্ত দেখা গেল। আগে এখানে কেবিন ছিল, স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, কেবিনের মেঝেতেই গর্তটা।

ওর নিচেই বোধহয় সোনার বাক্সগুলো রাখা হয়েছিল, গর্তে আলো ফেলে বলল কিশোর। হয়তো ছিল, কিন্তু এখন আর নেই। নোনা পানি আছে এখন, আর জ্যান্ত মাছ। ইচ্ছে করলে নামা যায় ওখানে, কিন্তু লাভ কী? উপুড় হয়ে শুয়ে গর্তের ভিতরে মাথা ঢুকিয়ে দিল সে, আলো ফেলে দেখল। না, বাক্স চোখে পড়ছে না। বড় একটা ভাঙা পিপে ভাসছে পানিতে, ভিতরে কিছু নেই।

কিশোরের পাশে শুয়ে ভিতরে উঁকি দিল জিনা। হু, পানির পিপে। মদেরও হতে পারে। কিংবা মাংস, কিংবা বিস্কুট, কিন্তু সোনা নয়। আরে, পানির তলায় ওসব কী? ও, বাঙ্ক। সাধারণ নাবিকরা থাকত ওখানে।

কোণের দিকে এক জায়গায় অনেকগুলো হুক দেখা গেল দেয়ালে, তাতে শেওলা ঝুলে রয়েছে। রান্নাঘর ছিল। বাবুর্চির কড়াই আর কাপ, প্যান ঝুলিয়ে রাখা হতো ওগুলোতে।

পুরো জাহাজটা তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখতে লাগল ওরা। ক্ষীণ একটা আশা রয়েছে মনে, যদি বাক্সগুলো মিলে যায়! কিন্তু পাওয়া গেল না, একটা বাক্সও না, বার রাখার বাক্স তো দূরের কথা, কোনরকমের কোন বাক্সই দেখতে পেল না।

এক পাশে একটা দেয়ালের কিছু তক্তা এখনও দাঁড়িয়ে আছে, দরজাটা কোথায় ছিল বোঝা যায়। বড় একটা কেবিনে এসে ঢুকল ওরা। অন্য তিন পাশের দেয়াল মোটামুটি ঠিকই রয়েছে। এক কোণে একটা বড় বাঙ্ক, তাতে নারকেলের সমান বড় এক কাকড়া শুয়ে আছে। সাড়া পেয়ে লম্বা একটা দাঁড়া বাড়িয়ে দিল সামনের দিকে, খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া করে সিদ্ধান্ত নিল, শুয়ে থাকবে আগের মতই। আরেক কোণে কাত হয়ে পড়ে আছে একটা গোল টেবিল, দুটো পায়া নেই। কাঠের বুকশেলফ আছে, তাতে বই নেই, তার জায়গায় রয়েছে রাশি রাশি শামুক আর ঝিনুক, কুৎসিতভাবে ঝুলে রয়েছে শেওলা। দেয়ালেও শামুক আর শেওলার ছড়াছড়ি।

ক্যাপ্টেনের কেবিন, বিড়বিড় করল কিশোর। কোনায় ওটা কী?

এগিয়ে গিয়ে তুলে নিল রবিন। কাপ। আধখানা পিরিচও পড়ে আছে। জাহাজটা যখন ডুবেছিল, চা বা কফি খাচ্ছিলেন বোধহয় ক্যাপ্টেন!

এমনিতেই অস্বস্তি বোধ করছে ওরা, এই প্রাপ্তি মন আরও খারাপ করে দিল। বাতাসে আঁশটে গন্ধ স্থির হয়ে আছে যেন, পায়ের তলায় কাঠের মেঝে ভেজা,

পিচ্ছিল। জিনা ভাবছে, পানির তলায়ই ভাল ছিল, কেন ভাসতে গেল জাহাজটা? গলিত লাশ কবরে মাটি চাপা থাকাই ভাল!
চলো, যাই, গলা কাঁপছে জিনার। আমার ভাল্লাগছে না! গা গুলাচ্ছে!
যাওয়ার জন্যে ঘুরল অন্য তিনজন, শেষবারের মত আলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কেবিনটা দেখে নিচ্ছে কিশোর। রওনা হতে যাবে, ঠিক এই সময় চোখে পড়ল জিনিসটা। আলো ওটার ওপর স্থির রেখে সঙ্গীদেরকে ডাকল, দাঁড়াও! এক মিনিট!
ঘুরে তাকাল অন্যরাও। ছোট একটা দেয়াল-আলমারির দরজা! তালার ফুটোটাই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে কিশোরের।
নিশ্চয় কিছু আছে ওর ভেতরে! উত্তেজিত শোনাল তার কণ্ঠ, হাতের টর্চের আলো কাঁপছে অল্প অল্প। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল সে। দরজার ধারে আঙুল বাধিয়ে টান দিল। খুলল না। তালা আটকানো।
গালে আঙুল রেখে এক মুহূর্ত ভাবল কিশোর। টর্চটা মুসার হাতে দিয়ে কোমর থেকে খুলে নিল তার প্রিয় আট ফলার ছোট ছুরিটা।
একেকটা ফলা একেকটা অতি দরকারী যন্ত্র। তালা খোলার চেষ্টা করল। সে, পারল না। মরচে পড়ে আটকে গেছে। তালার পাশে খোঁচা দিয়ে দেখল, ভিজে নরম হয়ে গেছে, সামান্য খোঁচাতেই কাঠের চলটা উঠে যায়, পচে গেছে একেবারে। শেষে তালার চারপাশের কাঠ ছুরি দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে কেটে ফেলল সে। ক্রু-ড্রাইভারটা তালার গর্তে ঢুকিয়ে চাড় দিতেই কুট করে লক-পিন ভেঙে খুলে চলে এল তালা।
দুই তাকের ছোট্ট আলমারি, ভিতরে কয়েকটা জিনিস। একটা কাঠের বাক্স, পানিতে পচে ফুলে রয়েছে। গোটা তিনেক বই, ফুলে তিন গুণ হয়ে রয়েছে। একটা মদের গেলাস, ভেঙে তিন টুকরো, আরও কয়েকটা জিনিস রয়েছে-কী ছিল চেনার উপায় নেই।
নাহ, কিছু নেই, হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল কিশোর। তবে বাক্সটা... তুলে নিল সে ওটা। ভেতরে নিশ্চয় কিছু আছে। খুলে দেখতে হবে।
বাক্সের ডালায় দুটো ইংরেজি অক্ষর খোদাই করা: আর জি।
রিচার্ড গোবেল! চেঁচিয়ে উঠল জিনা। আমার নানার-নানার-বাবা! এটা ওঁর বাক্স! নিশ্চয় মূল্যবান দলিলপত্র রয়েছে ভেতরে! খোলো, খোলা!
চেষ্টা করল কিশোর, কিন্তু তালা খুলতে পারল না। এখানে হবে না। হাতুড়ি দরকার।
চলো, বাড়ি নিয়ে যাই! চলো, চলো! তর সইছে না জিনার।

ডেকে বেরিয়ে এল ওরা। খানিক দূরে খোলা সাগরে জেলে-নৌকার ভিড়, এদিকেই তাকিয়ে আছে জেলেরা, উত্তেজিত ভাবভঙ্গি, জাহাজটা দেখে ফেলেছে।
দড়ি বেয়ে নৌকায় নামল চার অভিযাত্রী। আঙটা থেকে দড়ি খুলে দিল কিশোর, পানিতে ঝুলে রইল দড়ির মাথা, খুঁটি থেকে ফাস খোলা সম্ভব না নৌকায় বসে, দড়িটা ফেলে রেখেই যেতে হচ্ছে।
জাহাজের কাছাকাছি চলে এসেছে একটা জেলে-নৌকা। মুখের কাছে হাত জড়ো করে চেঁচিয়ে বলল গলুইয়ের কাছে দাঁড়ানো একটা লোক, এইই, শুনছ? কীসের আওয়াজ?।
পুরানো ভাঙা জাহাজ! চেঁচিয়ে জবাব দিল জিনা। ঝড়ে ভেসে এসেছে!
আর কিছু বোলো না, হুঁশিয়ার করে দিল কিশোর। চুপ! কিছু বলল না জিনা। লোকটার দিকে পেছন করে বসে দাঁড় তুলে নিল।
বাড়ি ফিরে দেখল, টেবিলে নাস্তা একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। মায়ের বকা খাবে ভেবেছিল জিনা, কিন্তু কিছু বললেন না মিসেস গোবেল। কোথায় গিয়েছিল ওরা জানতে চাইলেন শুধু। মর্নিং ওয়াক করতে বেরিয়েছিল, জিনা বলতেই চুপ করে গেলেন।
চিকেন সুপ, ডিম ভাজা আর টোস্ট যেন নাকেমুখে গুঁজে দিয়ে শেষ করল ওরা। বাক্সটা লুকিয়ে রেখে এসেছে একটা গোলাপ ঝাড়ের তলায়। খেয়ে গিয়ে কোন এক ফাঁকে বের করে নিয়ে আসবে, উঠে যাবে ওপরতলার চিলেকোঠায়, ওখানে নিয়ে গিয়েই ভাঙবে, আলোচনা করে নিয়েছে নিজেদের মধ্যে।
তিন গোয়েন্দাকে চিলেকোঠায় পৌঁছে দিয়ে নিচে নেমে গেল জিনা। বাবা কাজের ঘরে, এটো ডিশপ্লেট সরাচ্ছেন মা, খানিক পরেই রান্নাঘরে চলে। গেলেন। এই ফাঁকে বাক্সটা বের করে নিয়ে এক ছুটে ওপরে চলে এল সে।
আরেকবার তালা খোলার চেষ্টা করল কিশোর, পারল না, মুখ তুলে বলল, জিনা, একটা হাতুড়ি আর ছেনি হবে?
সবই আছে, বাবার যন্ত্রপাতির বাক্সে, জিনা বলল। দাঁড়াও, দেখি আনতে পারি কিনা।
কয়েক মিনিট পরেই ফিরে এল সে, হাতে হাতুড়ি আর ছেনি। চুরি করে এনেছি। বাবা খুব ব্যস্ত, খেয়াল করেনি। পেছন দিয়ে ঢুকে টুক করে খুলে নিয়ে এসেছি, হাসল সে।
বাক্সটা মেঝেতে রেখে ডালার ওপরে ছেনি বসিয়ে হাতুড়ি দিয়ে কষে এক ঘা লাগাল কিশোর। চলটা উঠে গেল কাঠের, কিন্তু তলায়, মানে বাক্সের ভিতরের দিক শক্ত টিনের পাত দিয়ে মোড়ানো, তাতে বেধে ফিরে এল ছেনির মাথা।

আবার ডালার আরেকখানে আক্রমণ চালাল সে, কাঠের চলটা উঠে গেল আরেক জায়গার। ছেনি দিয়ে ডালার অর্ধেকেরও বেশি তুলে ফেলা গেল, কিন্তু ভিতরের লাইনিং কাটেনি। ছেনি বসিয়ে জোরে বাড়ি দিয়ে দিয়ে লাইনিং কাটতে শুরু করল কিশোর, বিকট ঝনঝন আওয়াজ হচ্ছে। তিন ধার কাটা হয়ে গেল, এখন টিনের পাত টেনে ওপরের দিকে বাঁকিয়ে ভিতরে হাত ঢুকিয়ে কী আছে না আছে বের করে আনা যাবে। কিন্তু আনা আর হলো না। এক ঝটকায় খুলে গেল। চিলেকোঠার দরজা। জিনার বাবা! রাগে মুখচোখ লাল!
কর্কশ কণ্ঠে ধমকে উঠলেন তিনি, এই, কী হচ্ছে! হচ্ছে কী! সারা বাড়ি মাথায় তুলেছ! আওয়াজের চোটে ঘরে থাকতে পারছি না! বাক্সটার ওপর চোখ পড়ল তার। ওটা কী?
তাড়াতাড়ি বাক্সটা তুলে নিল মুসা।
কী ওটা? চেঁচিয়ে উঠলেন মিস্টার পারকার। কথা বলছ না কেন?
একটা বা-বাক্স... তোতলাতে শুরু করল মুসা।
সে তো দেখতেই পাচ্ছি! কীসের বাক্স? দেখি? হাত বাড়ালেন। তিনি।
পিছিয়ে গেল মুসা। না, কিছু না, এমনি...
কী এমনি! দেখি! গর্জে উঠলেন মিস্টার পারকার। এগিয়ে এসে মুসার হাত থেকে বাক্স কেড়ে নিয়ে বললেন, কী সব আজেবাজে জিনিস এনে খালি ঝামেলা! শয়তানীর চোটে কাজ করা যায় না! যত্তোসব! কোথায় পেয়েছ এটা?
জা-জাহাজে...
জাহাজে! কোন্ জাহাজে?
ওই যে...মানে, যেটা ভেসে উঠেছে...
মাথায় দোষ-টোষ নেই তো! কোথায় ভেসে উঠেছে জাহাজ?
এবার রেগে গেল মুসা। দোষ থাকবে কেন? কাল ঝড় হয়েছে, দেখেননি? দ্বীপের কাছে ভেসে উঠেছে একটা ভাঙা জাহাজ, আপনাদের দ্বীপের কাছে। আপনার নানা-শ্বশুর নাকি কোন এক শ্বশুরের দ্বীপ ছিল, সেটার কাছেই তাঁর জাহাজ ডুবেছিল, ভেসে উঠেছে! রাগের ঠেলায় এক নিঃশ্বাসে সব কথা ফাস করে দিল সে।
প্রমাদ গণল সবাই।
অবাক হয়ে বাক্সটার দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইলেন মিস্টার পারকারই। বিড়বিড় করলেন, হু, মূল্যবান কিছু থাকতে পারে ভেতরে! ওই জাহাজে উঠতে কে বলেছে তোমাদেরকে? নাক গলানো হয়ে গেল না?
নাক গলানো কোথায়, বাবা? বন্ধুদের অপমান সইতে না পেরে রেগে উঠল জিনা। ওটা আমার দ্বীপ, আমার জাহাজ, আমি নিয়ে গেছি ওদেরকে। হাত বাড়াল, দাও,

আমার বাক্স আমাকে দাও। সোনার বার টার থাকতে পারে ওতে।
সোনার বার! ভুরু কুঁচকে গেছে বিজ্ঞানীর। একেবারেই বুদ্ধু! আরে, বোকা, এই বাক্সে বার থাকে কী করে! দেখছিস না, ছোট? জাহাজটায় সোনার বার ছিল, গপ্পোটা আমিও শুনেছি। হয়তো ছিল, কিন্তু এখন নেই। অনেক আগেই কেউ না কেউ কোথাও সরিয়ে ফেলেছে, জাহাজে নেই।
থাকলে থাকুক, না থাকলে নেই, চোখে পানি এসে গেছে জিনার, মরিয়া হয়ে বলল, আমার বাক্স দিয়ে দাও। ওটা তুমি নিচ্ছ কেন? কেন জানি তার এখন মনে হচ্ছে, ভেতরে সোনাদানা না থাকুক, মূল্যবান। দলিলপত্র নিশ্চয় রয়েছে, যাতে গুপ্তধনের নকশা আঁকা আছে।
কিন্তু বাক্সটা দিলেন না মিস্টার পারকার, হাতে নিয়ে নেমে চলে গেলেন।
আমি মাথা ঠিক রাখতে পারিনি! লজ্জিত কণ্ঠে বলল মুসা। সব ফাঁস করে দিয়েছি!
যা হবার হয়েছে, মুসার কাঁধে হাত রাখল কিশোর। দুঃখ করে লাভ নেই।
বাক্সটা আবার পাই কী করে, ভাবছি! রবিন বলল।
হ্যাঁ, মাথা ঝোকাল কিশোর। পাই কী করে? জিনার দিকে তাকাল সে। কীভাবে?
বাবার ঘরের ওপর চোখ রাখতে হবে, ভেবে বলল জিনা। বেরোলেই চুরি করব। আর কোন উপায় দেখছি না।
ঠিকই, আর কোন উপায় নেই। কাজেই মিস্টার পারকারের কাজের ঘরের কাছে ঘুরঘুর করতে থাকল ওরা। সারাক্ষণই কেউ না কেউ চোখ রাখল দরজার দিকে।
কী কারণে বাইরে এলেন জিনার মা, ছেলেদেরকে বাগানে একই জায়গায় ঘুরঘুর করতে দেখে অবাক হলেন। আরে, অবাক কাণ্ড! তোরা সব এখানে? মুখ শুকনো কেন এমন? ঝগড়াঝাটি করেছিস নাকি?
না, খালা, তাড়াতাড়ি জবাব দিল মুসা, ঝগড়া করব কেন? এই এমনি...
হুঁ! ঠোঁট ওল্টালেন তিনি। কী জানি, বাপু! তোদের মতিগতি কিছু বুঝি না। নিজের কাজে চলে গেলেন তিনি।
কী ব্যাপার, জিনা? রবিন আর ধৈর্য রাখতে পারছে না। তোমার বাবা কি ঘর থেকে বেরোবেন না? এভাবে ঘরে বসে থাকা এটা কোন কাজের কাজ হলো?
কাজের কাজ করে নাকি বিজ্ঞানীরা? সাফ বলে দিল জিনা। সব অকাজ! এই জন্যেই তো মেজাজ এমন তিরিক্ষি হয়ে থাকে ওদের! ঘরের কোথায় একটা ইটের কণা পড়ল, তার শব্দেই চমকে ওঠে বাবা! বাবার জ্বালায় টু শব্দ করার জো আছে? হোস্টেলই আমার ভাল!
কিশোর তাদের কথায় যোগ দিল না। জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখে এল। কাজ করছেন। আর কোন কথা না বলে একটা গাছের ছায়ায় গিয়ে বই খুলে বসল।

ঘর থেকে একটিবারের জন্যে বেরোলেন না মিস্টার পারকার। দুপুর হয়ে এল। খাওয়ার জন্যে ডাকতে এলেন জিনার মা।
নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও গিয়ে খেয়ে আসতে হলো ছেলেমেয়েদের। ফিরে এসে আবার আগের জায়গায় বই খুলে বসল কিশোর। গাছের ছায়ায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল অন্য তিনজন।
বিকেল হয়ে এল। হঠাৎ বই থেকে মুখ তুলল কিশোর। তিনজনেই ঘুমিয়ে পড়েছে। জিনার গায়ে ঠেলা দিল, সে চোখ মেলতেই বলল, জিনা, কীসের শব্দ? তোমার বাবার ঘর থেকে আসছে!
কান পেতে শুনল জিনা। আর কীসের? বাবা নাক ডাকাচ্ছে।
এ-ই সুযোগ! বই রেখে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। দেখি চেষ্টা করে!
জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখল কিশোর, বড় একটা আর্ম চেয়ারে আধশোয়া হয়ে নাক ডাকাচ্ছেন জিনার বাবা, মুখ খোলা, চোখ বন্ধ, ঘুমে অচেতন। মাথা বেকায়দাভাবে কাত হয়ে রয়েছে এক পাশে, ফলে, যতবারই শ্বাস টানছেন, বিকট শব্দ হচ্ছে।
নাহ, ঘুমিয়েছে! ভাবল কিশোর, বাক্সটার দিকে তাকাল, মিস্টার পারকারের ওপাশে টেবিলে রয়েছে। নিই ঝুঁকিটা! ধরা পড়লে চড়থাপ্পড়ও দিয়ে বসতে পারে, কিন্তু আর কোন উপায় নেই!
পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকে পড়ল কিশোর। আর্ম চেয়ারের কাছে এসে থামল এক মুহূর্ত, মিস্টার পারকারের মুখের দিকে তাকাল, তারপর ঘুরে চলে এল টেবিলের কাছে। বাক্সটা তুলে নিল কাঁপা কাঁপা হাতে, দুরুদুরু করছে বুকের ভেতর, গলা শুকিয়ে কাঠ-ঘন ঘন ঢোক গিলতে হচ্ছে, তাড়াহুড়োয় বাক্সের ওপরে রাখা আলগা একটা কাঠের টুকরো পড়ে গেল মেঝেতে। ছোট্ট খুটুস শব্দ, কিন্তু কিশোরের মনে হলো বোম ফাটল। চোখের পলকে এসে লুকিয়ে পড়ল আর্ম চেয়ারের পেছনে।
কী হলো! বিড়বিড় করলেন মিস্টার পারকার, নাক ডাকানোয় ব্যাঘাত ঘটল, কয়েক মুহূর্তের জন্যে, তারপরই আবার শুরু হলো নিয়মিত, খোঁওঁওঁওঁ-খেত!
আর দেরি করল না কিশোর, বাক্সটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে এল নিঃশব্দে। বাইরে বেরিয়েই দে ছুট। সঙ্গীদের মুখের দিকে চেয়ে চাপা গলায় বলল, সোজা সৈকতে! ছুটতে শুরু করল সে, দুহাতে ধরে রেখেছে বাক্স।
বিকেলে, সৈকত একেবারে নির্জন নয়, কিন্তু দেখেও দেখল না যেন ছেলেরা। একটা পাথরের ধারে এসে ধপ করে বালিতে বসে পড়ল। কিশোর। হাসিতে দাঁত বেরিয়ে পড়েছে।
সবাই এসে বসে পড়ল কিশোরকে ঘিরে।

বাক্সটা যেমন নিয়ে গিয়েছিলেন মিস্টার পারকার, তেমনিই রয়েছে, খোলার চেষ্টাও করেননি। কোমর থেকে ছুরি খুলে তিন দিক কাটা টিনের একপ্রান্তে ঢুকিয়ে চাড় দিয়ে ওপর দিকে তুলে ফেলল কিশোর। সবাই ঝুঁকে এসেছে, মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি হয়ে যাচ্ছে, খেয়ালই করছে না যেন ওরা; বাক্সের ভিতর কি আছে, কার আগে কে দেখবে, সেই চেষ্টা।
টিনটা বাকা করে ফেলল কিশোর। না, ভিতরে সোনাদানা কিছু নেই। আছে কালো কাপড়ে মোড়ানো বইয়ের মত কিছু একটা। একটু যেন হতাশই হলো ওরা।
আরে, একেবারে শুকনো! ভিতরে তাকিয়ে আছে কিশোর। পুরানো আমলের কাজ, কী নিখুঁত
এত শত বছর পানির তলায় পড়ে ছিল, অথচ এক ফোঁটা পানি ঢোকেনি, খটখটে শুকনো! হাত ঢুকিয়ে জিনিসটা বের করে আনল সে। কাপড় খুলতেই বেরিয়ে পড়ল একটা ডায়েরি! হু, তোমার নানার-নানার-বাবার হাতের লেখা, পড়া তো যাচ্ছে না।
এত গুঁড়ি গুঁড়ি, লেখা তো না, পিঁপড়ের সারি!
একটা পাতা দুআঙুলে ধরে পরখ করে দেখল জিনা। তুলট কাগজের মত কাগজ, বয়েসের ভারে হলদে হয়ে এসেছে। ডায়েরিটা নাড়াচাড়া করছে কিশোর, হঠাৎ ভিতর থেকে ভাঁজ করা একটা কাগজ পড়ল বালিতে। প্রায় ছোঁ মেরে ওটা তুলে নিল সে। মানচিত্র! নকশা! কাগজটা ডায়েরির পাতার চেয়েও হলুদ। তাড়াহুড়ো করতে গেলে যদি ভাজে ভাজে ছিঁড়ে খুলে চলে আসে, এই ভয়ে সতর্ক হয়ে আস্তে আস্তে খুলে বিছাল ওটা বালিতে।
হুঁ, ম্যাপই মনে হচ্ছে! আপনমনে বলল সে মাথা দুলিয়ে, কিন্তু আজব ম্যাপ! ঠিক বোঝা যাচ্ছে না!
জিনা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ম্যাপটার দিকে, রক্ত সরে যাচ্ছে তার মুখ থেকে। ঝট করে মুখ তুলল, চোখে জ্বলজ্বলে আলো। কথা বলার জন্যে মুখ খুলেছে, কিন্তু বলতে পারছে না। তার ভাবভঙ্গিতে অবাক হয়ে গেছে তিন গোয়েন্দা।
কী? অবশেষে জিজ্ঞেস করল কিশোর। বোবা হয়ে গেছ? কী ব্যাপার?
জোরে জোরে মাথা ঝাঁকি দিল জিনা, ঝাঁকুনি খেয়েই যেন গলার সুড়ঙ্গে আটকে থাকা প্রতিবন্ধক ধাক্কা দিয়ে ঠেলে সরিয়ে হুড়মুড় করে বেরিয়ে এল কথার স্রোত, কিশোর, জানো ওটা কি! জানো! জানো! ওটা ম্যাপ, একটা ম্যাপ! দুর্গের ম্যাপ, গোবেল দুর্গের, যখন ওটা আস্ত ছিল, ধসে পড়েনি! এই যে, এই যে দেখো, এক জায়গায় আঙুল রাখল। ডানজন! পাতালঘর! আর এই যে, ডানজনের কোনায় কী জানি লেখা!

লেখার ওপরে রাখা জিনার কাঁপা কাঁপা আঙুল সরিয়ে দিল কিশোর। সবারই চোখ এখন লেখাটার ওপর। পুরানো ধাচের পেচানো হরফে রয়েছে একটিমাত্র অদ্ভুত শব্দ: ইনগটস।
ইন-গটস! চেঁচিয়ে উঠল মুসা। ইয়াল্লা! এটা আবার কী জীব! কোন দৈত্য-টৈত্য, নাকি ভূতের সর্দার!
হেসে ফেলল রবিন, কিশোরও।
এই জন্যেই বলি, বই-টই একটু পড়ো, বলল রবিন। দুনিয়ার কিছুই তো জানো না।
হেই, মিয়া, মুখ সামলে কথা বলবে! রেগে উঠল মুসা। জানি না। মানে? কয় ধরনের খেলা আছে, খেলার সরঞ্জাম আছে, জানো তুমি? জানো, এবার রেসলিঙে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন কে হয়েছে? কয় রকমের খাবার আছে দুনিয়ায়, জানো? জানো, ঠিকমত রাঁধতে জানলে শুয়োপোকার গন্ধও জিভে পানি ঝরিয়ে ছাড়ে…।
হুঁউক! ওয়াক থুহ! গলা চেপে ধরল জিনা, বমি ঠেকাচ্ছে। রাক্ষস কোথাকার!
বিমল হাসি ছড়িয়ে পড়ল মুসার কুচকুচে কালো মুখে। তো, যা বলছিলাম, রবিন, সবাই সব কিছু জানে না। তুমি যা জানো, সব আমি জানি না, আবার আমি যা জানি, সব তুমি জানো না…
আরে, দূর, লেকচার রাখো! বিরক্ত হয়ে হাত তুলল কিশোর। ইনগটস মানে হলো ধাতুর বার। তবে এখানে সোনার কথাই বোঝানো হয়েছে, আমি শিওর।
খাইছে! আঁ, সোনা! চোখ বড় বড় হয়ে গেছে মুসার। জাহাজ থেকে যেগুলো গায়েব! দুর্গটার তলায় না তো? ডানজনে..
মাথা ঝোকাল জিনা। মনে হচ্ছে তাই! ইস, যদি খুঁজে বের করতে পারতাম!
বাতাসের সঙ্গে তাল মিলিয়েই যেন ফিসফিস করল, ইস, যদি পারতাম!
পাই আর না পাই, খুঁজব। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে কিশোর। খড়ের গাদায় সুচ খোঁজার সামিল হবে কাজটা, তবু চেষ্টা না করে ছাড়ব না। কিন্তু ভাঙা দুর্গ, ঝোঁপঝাড়, জঙ্গল…যাক গে! আগে থেকে ভেবে লাভ নেই, উপায় একটা নিশ্চয় বেরোবে।
চিন্তিত চোখে বাক্সটার দিকে তাকাল কিশোর। এটা কী করব? নিজেকে প্রশ্ন করছে সে। আবার রেখে দিয়ে আসব? জেগে উঠে না। দেখলে নিশ্চয় খুঁজবেন, তার চেয়ে রেখেই দিয়ে আসি!
ম্যাপটা রেখে দিই আমরা। শুধু ডায়েরিটা বাক্সে ভরে রেখে দিয়ে এলেই তো হয়? মুসার প্রস্তাব।
তার চেয়ে আরেক কাজ করি বরং, রবিন বলল, সবই রেখে আসব। ম্যাপের একটা কপি করে রেখে দেব নিজেদের কাছে।

হ্যাঁ, কথাটা মন্দ না, কিশোর বলল। তবে ম্যাপ না ফিরিয়ে দিলেও তো চলে, উনি তো আর দেখেননি ভেতরে কী আছে না আছে। ...আচ্ছা, থাক, রেখেই আসব; তার আগে, চলো, কপিটা করে নিই।
বাগানে ফিরে এল ওরা। চট করে গিয়ে নিজের ঘর থেকে বল পয়েন্ট আর কাগজ নিয়ে এল জিনা। দেখে দেখে ম্যাপটর নিখুঁত একটা নকল এঁকে ফেলল কিশোর। তারপর ডায়েরির ভিতরে আবার আসলটা ভরে কাপড় দিয়ে পেঁচিয়ে দিল বাক্সে, হাত দিয়ে চেপে নামিয়ে দিল বাকানো টিন, যতটা সম্ভব সমান করে দিল আগের মত, যাতে বোঝা না যায় খোলা হয়েছিল। নকলটা সাবধানে ভাজ করে নিজের পকেটে রেখে দিয়ে বাক্স হাতে উঠে দাঁড়াল। রেখে আসি।
আবার এসে জানালায় উঁকি দিল কিশোর, আরেকটু হলেই জিনার বাবার চোখে চোখ পড়ে যেত, সঙ্গে সঙ্গে মাথা নুইয়ে ফেলল সে। কিন্তু ব্যাপার কী? এখনও হৈ-চৈ শুরু করেননি কেন? বাক্সটা নেই, খেয়ালই করেননি?
করেননি বোঝা গেল চায়ের টেবিলে। ছেলেদের দিকে তাকালেনই না, চুপচাপ খাচ্ছেন। সুযোগ বুঝে এক ফাঁকে গিয়ে বাক্সটা আবার জায়গা মত রেখে এল কিশোর, সঙ্গীদের দিকে চেয়ে চোখ টিপল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ছেলেরা।
টেলিফোন বাজল হঠাৎ। উঠে গিয়ে ধরলেন মিসেস পারকার। ওখানে দাঁড়িয়েই ডেকে বললেন, জন, তোমার।
কে? চিবাতে চিবাতে বললেন জিনার বাবা।
খবরের কাগজের লোক। দেখা করতে চায়। জরুরি কথা আছে বলল।
এখন হবে না, হাত নাড়লেন মিস্টার পারকার। বলে দাও, ছটার। সময় আসতে।
আবার চিন্তিত হয়ে পড়ল ছেলেরা। যা আপনভোলা মানুষ মিস্টার পারকার, বাক্সটা আর ভিতরের জিনিসপত্র দেখিয়ে দেবেন না তো রিপোর্টারদের? দুর্গের পাতাল ঘরে সোনার বার লুকানো রয়েছে, কোনমতে গুজবটা একবার রটে গেলে, সর্বনাশ!
ইস, গাধামি হয়ে গেছে! ভাবল কিশোর। ম্যাপটা বাক্সে রাখা মোটেই উচিত হয়নি!
পরদিন সকালে স্থানীয় সমস্ত কাগজে প্রকাশিত হলো খবরটা: কী করে ঝড়ের ধাক্কায় সাগরের তল থেকে উঠে পাথরে আটকে গেছে শত শত বছরের পুরানো জাহাজ। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে সব কথাই মিস্টার পারকারের পেট থেকে বের করে নিয়েছে ধড়িবাজ সাংবাদিক, নিখোঁজ সোনার বারের গল্পও জেনে গেছে, তার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে চলে গেছে গোবেল দ্বীপে, কীভাবে জানি পথ খুঁজে নিয়ে ওপরে উঠে গিয়ে কয়েকটা ছবিও তুলে এনেছে ভাঙা দুগটার, আর জাহাজের ছবি তো আছেই, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আকর্ষণীয় সব ছবি তুলে দিয়েছে কাগজে ছেপে।

রাগে মাথার চুল ছিঁড়তে শুরু করল জিনা। দুপদাপ করে মায়ের কাছে এসে দাঁড়াল। মা-আ! এসব কী! ওটা আমার দ্বীপ! তুমি কথা দিয়েছিলে, দাওনি!
তোর নয় একথা তো বলিনি! ভুরু কোঁচকালেন মা। ওরা দ্বীপে গিয়ে ছবি তুলেছে তো কী হয়েছে? নষ্ট তো আর করে ফেলেনি।
কিন্তু গেল কেন? কার কাছে অনুমতি নিয়ে? আরও রেগে উঠল জিনা! ওগুলো আমার! দ্বীপ, দুর্গ, জাহাজ...আমাকে না বলে ওরা যায় কী করে?
খামোকা রাগ করছিস, মেয়েকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন মা। তোর বাবা অনুমতি না দিলেই বা কী হত? সাগরের মালিক তো আর আমরা না, বোট নিয়ে গিয়ে জাহাজের ছবি তুলতই ওরা। দুর্গের ছবিও। মানা করলেও ঠেকানো যেত না।
এরপর দর্শকদের ঠেকানোর চেষ্টা করল জিনা, পারল না, কেয়ারই করল না কেউ তার কথা, রাগে-দুঃখে চোখে পানি এসে গেল তার। পুরানো একটা জাহাজ পানিতে ভেসে উঠে যে এমন শোরগোল তুলবে, এতটা শোরগোল, কল্পনাও করতে পারেনি ছেলেরা, তাজ্জব হয়ে লোকের কাণ্ড দেখল ওরা। অনেক দূর থেকেও খবর শুনে জাহাজ দেখতে এল লোকে, দ্বীপ আর দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দেখল। এত দিন চেষ্টা করেনি তাই, এখন দরকারের সময় ছোট্ট লুকানো বন্দরটা ঠিকই খুঁজে বের করে। ফেলল জেলেরা। মাছ ধরা বাদ দিয়ে ট্যুরিস্ট আনা-নেয়া করতে লাগল। নৌকায় করে, যার যা খুশি ভাড়া হাঁকছে, কামিয়ে নিচ্ছে দুপয়সা।
গুমরে মরছে জিনা, তাকে শান্ত করার চেষ্টা চালাল কিশোর। শোনো, জিনা, বারগুলোর কথা এখনও জানে না কেউ। উত্তেজনা কমে এলেই দ্বীপে গিয়ে ওগুলো খুঁজে বের করব।
আমাদের আগেই যদি অন্য কেউ পেয়ে যায়? চোখ মুছতে মুছতে বলল জিনা, কেঁদে চোখমুখ ফুলিয়ে ফেলেছে।
কী করে? বাক্সের ভেতরের নকশা এখনও কারও চোখে পড়েনি। দাঁড়াও না, আরেক সুযোগে আবার চুরি করে নিয়ে আসব নকশাটা, আর ফেরত দেব না।
কিন্তু সে সুযোগ আর পেল না কিশোর। ইতিমধ্যেই অঘটন ঘটিয়ে ফেললেন মিস্টার পারকার। পরের দিন ডাইনিং রুমে খাচ্ছিল ছেলেরা, হাসিমুখে বেরিয়ে এলেন তিনি। ঘোষণা করলেন, এক পাগলা অ্যান্টিক সংগ্রহকারীকে উপহার দিয়ে দিয়েছেন বাক্সটা। না, ভিতরে কী আছে না। আছে খুলেও দেখেননি তিনি।
আতঙ্কিত হয়ে তার দিকে চেয়ে রইল ছেলেরা। সর্বনাশ হয়ে গেছে! যদি ওই লোকটা নকশার মানে বুঝতে পারে? হয় সে গোপনে বারগুলো খুঁজে নেয়ার চেষ্টা করবে, কিংবা বোকা হলে লোকের কাছে বলবে। পরের দিনই খবরের কাগজের প্রথম পাতায় খবর হয়ে বেরোবে কথাটা, ব্যস, তারপর আর কী!

মেজাজ খুব ভাল এই মুহূর্তে জিনার বাবার, আশ্চর্য একটা ব্যাপার! কেন ভাল, কে জানে! লোকটা তোয়াজ করে ফুলিয়ে-টুলিয়ে দিয়ে গেছে। হয়তো। তবে এই মেজাজ কতক্ষণ থাকবে, ঠিক নেই; যে-কোন মুহূর্তে মেঘের আড়ালে চলে যেতে পারে রোদ, আচমকা ঝড় উঠলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। একবার ভাবল কিশোর, তাকে সব কথা খুলে বলে, কিন্তু ভেবে চিন্তে শেষে না বলারই সিদ্ধান্ত নিল। হয়তো হেসেই উড়িয়ে দেবেন, সেক্ষেত্রে না বলাই ভাল, অযথা হাসির খোরাক হয়ে কী লাভ?

নিজেদের মাঝে আলোচনা করল ছেলেরা। ঘোরালো হয়ে উঠছে পরিস্থিতি। জিনার মাকে বারগুলোর কথা বলবে কিনা, ভাবল ওরা, তারপর সে চিন্তাও বাতিল করে দিল। তিনিও বিশ্বাস করবেন বলে মনে হয় না।

ওসব বলাবলির দরকার নেই, অবশেষে বলল কিশোর। যা বলছি শোনো। খালাকে গিয়ে ধরব আমরা, গোবেল দ্বীপে পিকনিকে যেতে চাই। দুটো রাত থাকবও ওখানে। যে করেই হোক তাকে রাজি করাতে হবে। এতে সময় পাব আমরা। আগামী দুদিনের আগে কেউ গুপ্তধন খুঁজতে আসবে না আশা করছি, তৈরি হওয়ার একটা ব্যাপার আছে তো।

কিশোরের প্রস্তাব মেনে নিল সবাই। পরের দিনই সকালে রওনা দেবে, ঠিক করল ওরা। আবহাওয়া এখন পরিষ্কার, সঙ্গে করে প্রচুর খাবার নিয়ে যাবে, অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। জিনার মাকে গিয়ে ধরল। ওরা। তখন মিস্টার পারকারও রয়েছেন ওখানে। মেজাজ ভালই।

খালা, কিশোর বলল, একটা কথা বলব। রাখবেন?

কী রে? অবাক হলেন মিসেস পারকার। এমনভাবে বলছ, যেন রাজ্য আর রাজকন্যা চেয়ে বসবে?

না, খালা, হাসিমুখে বলল কিশোর, ওসব চাইতে আসিনি। আমরা গোবেল দ্বীপে যেতে চাই।

যেতে চাইলে যাবে, এটা আর এমন কী হলো?

দুএক রাত কাটাতে চাই ওখানে।

রাত কাটাবি?

কেন, কী হবে, খালা? আকাশ পরিষ্কার, চেনা জায়গা, তেমন ভয়ের কিছু নেই তো। আর অবস্থা খারাপ দেখলে তো চলেই আসতে পারব, কয় মিনিট আর লাগে যেতে-আসতে।

হুঁ, তা বটে। জন, তুমি কী বলো? স্বামীর দিকে তাকালেন মিসেস পারকার।

যেতে চাইলে যাক, বললেন মিস্টার পারকার। নইলে আর যাওয়ার সুযোগ পাবে না। পাবে, ইয়ে, মানে, আমি বলছি কী, যেতে পারবে, তবে এখনকার মত নির্জন

আর থাকবে না তখন। পিকনিক চলবে না ওখানে। লোকটা খানিক আগে আবার ফোন করেছিল। দ্বীপটা কিনতে চায়, ভাঙা দুর্গ সারিয়ে-সুরিয়ে নিয়ে একটা হোটেল করবে নাকি, ভাল আইডিয়া, না?

হাঁ হয়ে গেছে চার ছেলেমেয়ে, নাকেমুখে কষে থাবড়া মেরেছে যেন তাদেরকে কেউ। দ্বীপ বিক্রি! গোপন ব্যাপারটা ফাস হয়ে গেছে? জেনে ফেলেছে লোকটা? বুঝে গেছে, কোথায় লুকানো রয়েছে বারগুলো?

দম বন্ধ হয়ে আসছে যেন জিনার, চোখে আগুন। গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, মা-আ! তোমরা আমার দ্বীপ বেচতে পারো না! ওটা আমার দ্বীপ, আমার দুর্গ... তোমাদের কোন অধিকার নেই!

কুটি করলেন মিস্টার পারকার। বোকার মত কথা বলছ, জরজিনা! শঙ্কিত হয়ে উঠল কিশোর, মেজাজ বিগড়ে যাচ্ছে না তো বিজ্ঞানীর! ওটা এখনও তোমার হয়নি, তোমার মায়েরই রয়েছে। তোমার মায়ের থাকা মানেই আমার থাকা।

বাবা, টাকা কম আছে তোমার? কেঁদে ফেলল আবার জিনা। যা আছে তারই হিসেব রাখো না! ওই দ্বীপটা বেচলে আর কতই বা আসবে? কী করবে তুমি ওই টাকা দিয়ে? বলো, কী করবে?

ইয়ে..ইয়ে...হ্যাঁ, মানে...ও, হ্যাঁ, তোমার জন্যেই বিক্রি করছি। টাকাটা তোমার নামে ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে দেব। যখন খুশি টাকা তুলে তোমার যা খুশি কিনতে পারবে। কত ভাল ভাল জিনিস।

ভাল জিনিস আমি চাই না! আবার চেঁচিয়ে উঠল জিনা। মা! দোহাই তোমাদের, ওটা বিক্রি করো না! তুমি, তুমি কথা দিয়েছিলে, ওটা আমাকে দেবে। দাওনি?

দি-দিয়েছিলাম! দ্বিধায় পড়ে গেছেন মহিলা। কিন্তু... স্বামীর দিকে তাকালেন তিনি, মেঘ জমতে আরম্ভ করেছে মিস্টার পারকারের মুখে। কিন্তু পরিস্থিতি এখন বদলে গেছে, মা। তোর বাবা নিশ্চয় কথা দিয়ে ফেলেছেন, তাই...।

হ্যাঁ হ্যাঁ, কথা দিয়ে ফেলেছি, তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন মিস্টার দরকার।

আমাকে একবার বলারও দরকার মনে করলে না, বাবা? আমি, তোমার সন্তান নই, বললো, জবাব দাও, নই? আমাকে ছেলেমানুষ ভাবো, কিন্তু আমারও তো একটা মন আছে...

সাংঘাতিক দ্বিধায় পড়ে গেছেন মিস্টার পারকার; ওদিকে ক্রেতাকে কথা দিয়ে ফেলেছেন, এদিকে মেয়ের এই অভিমান, কী করবেন? কিছুই ঠিক করতে না পেরে আচমকা রেগে উঠলেন তিনি, চেঁচিয়ে উঠলেন, তোর খারাপ চেয়েছি নাকি আমি? বললাম, সব টাকা দিয়ে দেব, যা খুশি কর গে...

তোমার টাকা তুমিই রাখো গে, যাও! মুখ ঝামটা দিয়ে উঠল জিনা। একটা পয়সাও আমি ছোঁব না! ছোঁব না! এক ছুটে বেরিয়ে চলে গেল সে, দুপদাপ করে

সিঁড়ি বেয়ে উঠে নিজের ঘরে ঢুকে দড়াম করে দরজা লাগিয়ে দিল, বোঝা গেল আওয়াজ শুনেই।
হতভম্ব হয়ে গেলেন মিস্টার পারকার। তিন গোয়েন্দাকে বললেন, ওকে গিয়ে বোঝাও তোমরা। তোমাদের বন্ধু, হয়তো শুনবে। আসলে, এখন আর কিছু করতে পারছি না, আমার মান-ইজ্জতের প্রশ্ন! কথা দিয়ে ফেলেছি লোকটাকে!
দলিল কবে হচ্ছে, খালু? শান্ত কণ্ঠে জানতে চাইল কিশোর।
এ হপ্তার ভেতরেই। কালই চলে যাও, গিয়ে পিকনিক করে এসো। পরে নতুন মালিক আর দ্বীপে উঠতে দেবে কিনা দেবে, কে জানে!
কার কাছে বিক্রি করছেন? বাক্সটা যাকে দিয়েছেন?
হ্যাঁ, লজ্জিতই মনে হচ্ছে তাকে। প্রথমে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম! আর ব্যাটা একটা চিনেজোঁক, এমনভাবে ধরল, বোঝাল, হ্যাঁ বলে ফেললাম! ...যা হওয়ার হয়ে গেছে, জরজিকে গিয়ে বলো, ওরকম, না না, ওটার চেয়ে ভাল আরেকটা দ্বীপ ওকে কিনে দেব! যা চায়, তাই দেব, যাও বলো গে!
কথা দিচ্ছেন? রহস্যময় হাসি ফুটেছে কিশোরের মুখে।
হ্যাঁ, দিচ্ছি!
বেশ, আমিও কথা দিচ্ছি, জিনাকে শান্ত করব। মুসা আর রবিনকে নিয়ে বেরিয়ে এল কিশোর। বাইরে বেরিয়েই বলল, কিছু বুঝলে, লোকটা দ্বীপ কেন কিনতে চাইছে?
ম্যাপের মানে বুঝে ফেলেছে, আরকী? রবিন বলল।
হোটেল না কচু! মুসা বলল। শয়তানটা আসল কথা জেনে ফেলেছে, পটিয়ে-পাটিয়ে এখন দ্বীপ বিক্রিতে রাজি করিয়ে ফেলেছে জিনার বাবাকে। হারামখোর!
বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদছে জিনা। তার কাছে গিয়ে বসল কিশোর। কোমল গলায় ডাকল, জিনা!
জবাব দিল না জিনা, মুখ তুলল না।
জিনা, শোনো, কিশোর বলল আবার, এত নিরাশ হয়ো না, যা হয়েছে ভালই হয়েছে!
ভাল হয়েছে! চেঁচিয়ে উঠল জিনা। আমার এত সাধের দ্বীপ ওরা কেড়ে নিচ্ছে, আর তুমি বলছ ভাল হয়েছে?
ভালই তো হয়েছে, হাসল কিশোর। কাল যাচ্ছি আমরা গোবেল দ্বীপে। থাকব। যেভাবেই হোক খুঁজে বের করব সোনার বারগুলো। লোকটা আসার আগেই কাজ সেরে ফেলব আমরা।
মুখ ফেরাল জিনা। কিন্তু আমার দ্বীপ...।

ওটার জন্যে দুঃখ কোরো না। তোমার বাবা বলেছেন, তোমাকে আরও ভাল দেখে আরেকটা দ্বীপ কিনে দেবেন। যা চাও, তাই দেবেন। আমি হলে এই সুযোগ কিছুতেই ছাড়তাম না।
কী সুযোগ? উঠে বসল জিনা, বুঝতে পারছে না।
চাওয়ার, মিটিমিটি হাসছে কিশোর। তার ভাবভঙ্গিতে মুসা আর রবিনও অবাক হয়ে গেছে।
কী চাইব? দ্বীপ ছাড়া আর কী চাইব!
আর কিছু নেই?
না।
সত্যিই নেই? ভাল করে ভেবে দেখো…
মেঘের কোলে রোদ উঠল, হাসি ফুটল জিনার মুখে। আস্তে মাথা দোলাল, হ্যাঁ, আছে!
পরদিন সকাল সকালই রওনা দেবে, ঠিক করল ওরা। কাগজ-পেন্সিল নিয়ে লিস্ট করতে বসল, কী কী সঙ্গে নেয়া দরকার।
খাবার লাগবে, প্রথমেই বলল মুসা। বেশি করেই নেব, যাতে টান না পড়ে।
পানি নিতে হবে, জিনা বলল। খাবার পানি নেই দ্বীপে। কুয়া একটা আছে শুনেছি, তাতে মিষ্টি পানি থাকার কথা, কিন্তু আমি খুঁজে পাইনি।
খাবার, লিখতে লিখতে বলল কিশোর। পনি। আর? তিনজনের দিকেই তাকাল সে। বিড়বিড় করল, খোন্তা, লিখে ফেলল সেটা।
কী হবে? মুসা অবাক।
মাটি খুঁড়ে ডানজনে নামার দরকার পড়তে পারে, কিশোর বলল। আর কী?
দড়ি লেখো, রবিন বলল।
আর টর্চ, জিনা মনে করিয়ে দিল। ভয়ানক অন্ধকার পাতালে।
আতঙ্কের দুর্গের ডানজনের কথা মনে পড়তেই শিউরে উঠল মুসা। মনে পড়ল, কীভাবে হাত-পা বেধে পাতালঘরে ফেলে রাখা হয়েছিল ওদেরকে। ওরকম একটা ঘরে আরেকবার আটকা পড়তে চায় না সে কিছুতেই।
কম্বল, রবিন বলল। রাতে ঠাণ্ডা পড়বে, যা বাতাস লাগে দুর্গের ঘরটায়!
লিখে নিল কিশোর।
মগ লেখো, মুসা বলল। চা আর পানি খেতে লাগবে। আর কিছু যন্ত্রপাতি, এই… প্লায়ার্স, ক্রু-ড্রাইভার, এসব। কাজে লেগে যেতে পারে।
আধ ঘণ্টা পর লম্বা এক ফর্দ হয়ে গেল; যা যা মনে পড়েছে চারজনের, সব লিখে নেয়া হয়েছে। রাগ, ক্ষোভ, হতাশা অনেক কেটে গেছে জিনার

একা থাকলে, এত সহজে পারত না, তিন গোয়েন্দা সঙ্গ দেয়াতেই নিজেকে সামলাতে পেরেছে এত তাড়াতাড়ি। আর একা থাকব না, ভাবল জিনা। একা একা কোন সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করব না। একটা মাথার চেয়ে কয়েক মাথা একসঙ্গে খাটালে অনেক জটিল ব্যাপারও সহজ করে নেয়া যায়। আচ্ছা, এই ছেলে তিনটে এত শান্ত থাকে কী করে? কোন কারণেই হুট করে উত্তেজিত হয়ে যায় না। আমি হই কেন? কেন শান্ত রাখতে পারি না নিজেকে? আমার বদমেজাজের জন্যেই বাবা দেখতে পারে না আমাকে, বুঝতে পারছি এখন। মা-টা অতিরিক্ত ভাল, তাই আমার সব অত্যাচার সহ্য করে। নাহ, আর খারাপ থাকব না, ভাল হয়ে যাব। তিন গোয়েন্দা দারুণ শিক্ষা দিয়েছে আমাকে! বিশেষ করে ওই কিশোর পাশা...

জিনার দিকে নজর পড়তেই লক্ষ করল কিশোর, তামাটে চোখ দুটো তার মুখের ওপর স্থির। হাসল সে। কী ব্যাপার?

লজ্জা পেল জিনা, মুখ লাল হয়ে গেল। না, কিছু না! ...ভাবছি, তোমরা কত ভাল, কত সহজ! দুদিনেই আমার বাবা-মাকে আপন করে নিয়েছ, ওদের সন্তান হয়েও এত বছরে আমি যা পারিনি! ইস, যদি তোমাদের মত হতে পারতাম!

দোষটা তোমার না, জিনা, কিশোর বলল। ধনী বাপের একমাত্র মেয়েরা সাধারণত ওরকমই হয়। এর অনেক কারণ।

তোমরাও তো তোমাদের বাপের একমাত্র ছেলে...

তা বটে, তবে ওরা ধনী নয়, অন্তত তোমার বাবার তুলনায় তো নয়ই। তা ছাড়া, আমার বাবা-মা ছোটবেলায়ই মারা গেছে গাড়ি অ্যাকসিডেন্টে, আদর দিয়ে দিয়ে মাথা খাওয়ার কেউ নেই। চাচা কম আদর করে না, মেরি চাচীও জান দিয়ে দেয় আমার জন্যে, নিজের মা থাকলেও এর বেশি করতে পারত না; তবে চাচীর সবচেয়ে বড় গুণ, শাসনটা ঠিকই আছে। বখে যেতে দেয়নি আমাকে। মুসার মা-ও যথেষ্ট কড়া। আর আমাদের রবিন মিয়া এমনিতেই ভাল

দূর, কী যে বলো! বাবাকে তো রাগতে দেখোনি! ভালর ভাল, কিন্তু শাসনের সময়...।

হুঁ! নরম গলায় বলল জিনা। দেখো, আর কারও সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করব না আমি! উঠল সে। চলো, খানিক বেড়িয়ে আসি। রাফিকে দেখে আসি।

ফগ আর রাফির সঙ্গে সারাটা দিন কাটাল ওরা। দ্বীপে গিয়ে কীভাবে কী করবে, তার নানারকম প্ল্যান করল। ওদের কথা যেন বুঝতে পারে। রাফিয়ান, এমনি ভঙ্গিতে মুখ গম্ভীর করে পাশে বসে থাকে আলোচনার সময়, মাঝে মাঝে সমঝদারের মত লেজ নাড়ে, বড় বড় বাদামী চোখ দুটোতে ফুটে ওঠে কেমন

একটা ভাব! জ্বলজ্বল করে। বুদ্ধিমান মানুষের চোখের তারায় যেমন আলো দেখা যায়, তেমনি এক ধরনের আলো ফোটে!
পরদিন সকালে জিনিসপত্র নিয়ে নৌকা-ঘাটে চলে এল ওরা। নৌকা তৈরি রেখেছে ফগ। সবাই উঠে পড়ল। রাফিয়ানও উঠল। মালপত্র তুলে পাটাতনের একধারে রেখে দিল ফগ, তারপর ঠেলে নামিয়ে দিল নৌকাটা পানিতে। দাঁড় তুলে নিল জিনা।
সব কিছুই আনা হয়েছে, না? প্যাকেটগুলোর দিকে চেয়ে বলল কিশোর।
হ্যাঁ, মাথা দোলাল জিনা।
ম্যাপ! ম্যাপটা এনেছ! চেঁচিয়ে উঠল মুসা।
এনেছি, পকেটে হাত ঢোকাল কিশোর, বের করে আনল ভাজ করা কাগজটা দুআঙুলে ধরে। এই যে...
হঠাৎ এক ঝটকায় তার হাত থেকে কাগজটা উড়িয়ে নিয়ে পানিতে ফেলল জোরাল বাতাস। ঢেউয়ের তালে তালে দুলতে লাগল, ওটা। শঙ্কিত হয়ে প্রায় একই সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল চারজনে। তাদের মহামূল্যবান নকশা!
ঝপাং করে গলুইয়ের আরেক পাশে দাঁড় ফেলে নৌকা ঘোরাতে শুরু করল জিনা। কিন্তু তার আগেই লাফিয়ে উঠল রাফিয়ান, কোন রকম দ্বিধা না করে ঝাঁপ দিল পানিতে। অত্যন্ত ভাল সাঁতারু সে। শক্তিশালী মাংসপেশীতে কাঁপন তুলে সাতরে গিয়ে কাগজটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল।
এ মুসা আর কিশোর মিলে রাফিয়ানকে টেনে তুলল নৌকায়। দাঁতে চেপে ধরেছে কাগজটা রাফিয়ান, কিন্তু এত আলতো করে, সামান্যতম দাগও পড়েনি দাঁতের! উদ্বিগ্ন হয়ে ভাজ খুলল কিশোর, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। যাক, বাঁচা গেছে! পানিতে ভিজেছে বটে, কিন্তু লেখার কোন ক্ষতি হয়নি। বল পয়েন্ট কলমের কালি, নষ্ট হয়নি। পাটাতনে কাগজটা। বিছিয়ে আঙুল দিয়ে চেপে ধরে রাখল, যাতে আবার বাতাস উড়িয়ে নিতে না পারে। একবারেই শিক্ষা হয়ে গেছে।
বড় বাঁচা বেঁচেছি! বলল কিশোর।
অন্যেরাও স্বীকার করল কথাটা।
নৌকার মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে আবার জিনা। দ্বীপের দিকে চলেছে।
বার বার গা ঝাড়া দিয়ে রোম থেকে পানি ঝরিয়ে নিয়েছে রাফিয়ান, রোদে পিঠ শুকাচ্ছে। পুরস্কার হিসেবে বড় একটা বিস্কুট পেয়েছে, কুটুর কুটুর করে কামড়াচ্ছে, চিবাচ্ছে আয়েশ করে। চোখা ডুবো পাথরের ফাঁকফোকর দিয়ে দক্ষ হাতে নৌকা বেয়ে চলেছে জিনা। মনে মনে তার প্রশংসা না করে পারছে না কিশোর, ঘোড়ায় চড়তে যেমন ওস্তাদ মেয়েটা, নৌকা বাওয়ায়ও তেমনি।

নিরাপদেই সরু প্রণালীতে ঢুকল নৌকা, ছোট্ট বন্দরে এসে ঘঁাচ করে থামল। লাফিয়ে বালিতে নামল অভিযাত্রীরা। টেনে নৌকাটা ডাঙার অনেক ওপরে তুলে রাখল, জোয়ারের পানি আর নাগাল পাবে না। মালপত্র নামাতে শুরু করল।
দুর্গের ঘরটায় নিয়ে যাব সব, কিশোর বলল। ওখানেই নিরাপদ। ঝড়বৃষ্টিতে নষ্ট হবে না; তবে, অন্য কেউ এসে পড়লে কী ঘটবে জানি না।
দুএক দিনের মধ্যে আসবে না মনে হয়, জিনা গাল চুলকাল। বাবা বলল, দলিলপত্র তৈরি করে রেজিস্ট্রি করাতে করাতে হপ্তাখানেক লেগে যাবে। হয়তো তার আগে আসবেই না ব্যাটা। এই
তার মানে, পাহারার দরকার নেই, প্রণালী দিয়ে অনুপ্রবেশকারীদের ওপর চোখ রাখার প্রয়োজন আছে কিনা ভাবছে কিশোর। চলো, যাই। মুসা, তুমি পানির ড্রাম নাও। খাবারের বোঝা আমি নিচ্ছি, খোন্তাগুলো নিক জিনা। রবিন, অন্য পোটলা-পাটলিগুলো তুমি নাও।
খাবার আর পানি প্রচুর পরিমাণে আনা হয়েছে; রুটি, মাখন, বিস্কুট, জ্যাম, টিনজাত ফল, শুকনো আঙুর, চায়ের সরঞ্জাম আর কয়েক বোতল লেমোনেড। সবচেয়ে ভারি দুটো বোঝা নিয়েছে কিশোর আর মুসা, টিলা বেয়ে উঠতে কষ্টই হচ্ছে ওদের, পা টলোমলো করছে, পিছলে পড়ে গেলে দোষ দেয়া যাবে না।
দুর্গের ছোট ঘরটাতে এনে মালপত্র তুলল ওরা। আবার ফিরে চলল কম্বল আর চাদরের বাণ্ডিল আনতে। আনা হয়ে গেল। মালপত্র গুছিয়ে রেখে ঘরের বাইরের চত্বরে এসে বসল ওরা।
এইবার আসল কাজ, ম্যাপটা মাটিতে বিছাল কিশোর। ডানজনে ঢোকার পর খুঁজে বের করতে হবে। জিনা, দেখো তো, কিছু বোঝে কিনা?
চারজনেই ঝুঁকে এল ম্যাপের ওপর। শুকিয়ে গেছে কাগজ, লেখা ঠিকই রয়েছে। নকশা দেখেই বোঝা যায়, পুরানো দিনে যখন আস্ত ছিল। দুর্গটা, দেখার মত বিল্ডিং ছিল!
এই যে দেখো, ডানজনের ওপর আঙুল রাখল কিশোর। মস্ত বড় পাতালঘর, আর এই এখানে...এখানে চিহ্ন বোধহয় সিঁড়ির নিশানা।
হ্যাঁ, মাথা দোলাল জিনা, আমারও তাই মনে হয়। তার মানে, ডানজনে নামার দুটো পথ। একটা সিঁড়ি নেমেছে ওই ছোট ঘরটারই কোনখান থেকে... আরেকটা...আরেকটা টাওয়ারের নিচ থেকে, ওই যে ওই টাওয়ারটা, হাত তুলে কাক-টাওয়ার দেখাল সে। এটা কী, কিশোর?
একটা গোল চিহ্নের ওপর আঙুল রেখেছে জিনা, গোল একটা পাইপের মুখ যেন, পাইপটা ওপর থেকে শুরু হয়ে ডানজনের মেঝে ভেদ করে আরও নিচে নেমে গেছে।

কী জানি! নিচের ঠোঁটে বার দুই চিমটি কাটল কিশোর। ও, হ্যাঁ, বুঝেছি, কুয়ার কথা বলেছিলে না? এটাই সেটা। খুব গভীর। ওটাতে নামতে কেমন লাগবে ভেবে দেখো!।
কেমন আর লাগবে! বিড়বিড় করল মুসা। আমার রোম খাড়া হয়ে। গেছে এখুনি! কুয়া দিয়ে পাতালে নামা…আরিব্বাপ রে বাপ, আমি, বাবা, নেই ওতে!
মুসার বলার ধরনে হেসে ফেলল অন্যেরা, রাফিয়ানও কুকুরে-হাসি হাসল, বলল, হুফ! যেন বোঝাল, এত ভয় কীসের? আমি আছি না সঙ্গে?
এখন তা হলে কী করব? কিশোরকে জিজ্ঞেস করল রবিন। সিঁড়ি খুঁজব? এই ঘরে থেকে থাকলে, এটা দিয়ে নামাই ভাল। যতদূর জানি, ওসব সিঁড়ির মুখ বড় চ্যাপ্টা পাথর দিয়ে ঢাকা থাকে। খুঁজব?
হ্যাঁ, ম্যাপটা ভাঁজ করে পকেটে রেখে উঠে দাঁড়াল কিশোর।
শেওলা আর আগাছায় ঢেকে রয়েছে পাথুরে মেঝে, সিঁড়ির মুখ কোথায় বোঝার উপায় নেই।
পরিষ্কার করতে হবে, এগিয়ে গিয়ে একটা খোন্তা তুলে নিল কিশোর। তোমরাও নাও। কাজ শুরু করে দিই।
চারটে খোন্তা আনা হয়েছে। কাজে লেগে গেল ওরা। চেছে সাফ করে ফেলতে লাগল মেঝের আগাছা।
চুপচাপ কয়েক মুহূর্ত ছেলেদের কাজ দেখল রাফিয়ান, ও আর বসে। থাকে কী করে? খোন্তা ধরতে পারবে না, তাতেই বা কী? চার পায়ে
পাঁচটা করে ক্ষুরধার নখ রয়েছে, বিশটা যন্ত্র নিয়ে সে-ও লেগে গেল। কাজে। আঁচড়ে-খামচে কাজ করতে গিয়ে অকাজই করল বেশি। ধুলো মাটি আর আগাছার টুকরোর ঝড় উঠল। তার সবচেয়ে কাছে রয়েছে। কিশোর, তার গায়েই ময়লা পড়ছে বেশি।
এহহে, রাফি, থাম, থাম। ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বলল কিশোর। বালু দিয়ে চুলের সর্বনাশ করে দিচ্ছিস আমার!
দেখতে দেখতে সাফ হয়ে গেল মেঝে। চারকোনা বড় বড় পাথর জোড়া দিয়ে তৈরি মেঝে, একটার সঙ্গে আরেকটার সামান্যতম তফাৎ নেই। কোনটা আলগা বোঝাই যাচ্ছে না। টর্চের আলো ফেলে সাবধানে প্রতিটি পাথর পরীক্ষা করে দেখল কিশোর, কিন্তু পাওয়া গেল না ফাঁক।
লোহার রিং কিংবা হাতল-টাতল কিছু তো থাকার কথা, রবিন বলল। এসো তো, আরেকবার দেখি।
একবার নয়, আরও কয়েকবার দেখল ওরা। প্রতিটি ফাঁকে খোন্তার মাথা ঢুকিয়ে জোরে চাড় দিয়েও দেখল কিশোর আর মুসা, আলগা পাথর পাওয়া গেল না।

ঝাড়া তিনটি ঘণ্টা একনাগাড়ে পরিশ্রম করল ওরা, লাভ হলো না। খিদেয় চো চো করছে পেট।
খেতে বসল ওরা। খেতে খেতেই আলোচনা চলল।
আর কীভাবে দেখব? কিশোর বলল। মনে হচ্ছে এঘরে নেই। দেখি, খেয়ে উঠে আরেকবার দেখব ম্যাপটা। অন্য কোন ইঙ্গিত আছে কিনা, কে জানে!
আরেকবার খুঁটিয়ে দেখা হলো ম্যাপ, নতুন কিছু বোঝা গেল না। নকশাটার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর, চিমটি কাটছে নিচের ঠোঁটে, গভীর ভাবনায় ডুবে গেছে। দেখো, ম্যাপে আঙুল রাখল সে হঠাৎ, এই চিহ্নটা, এটাকে সিঁড়ি ভাবছি আমরা, তা না-ও তো হতে পারে? আর এই যে, কুয়ার মুখ, এটা এই চিহ্নের খুব কাছাকাছি। মানে কী? সিঁড়ির মুখ তো খুঁজে পেলাম না, চলো, কুয়ার মুখ খুঁজি। ওটা পেলে হয়তো সিঁড়ির মুখ খুঁজে বের করে ফেলতে পারব।
হয়তো, জিনা বলল। কুয়াটা আশপাশেই কোথাও...এই যে চত্বর, এরই কোথাও রয়েছে, ম্যাপের একটা জায়গায় আঙুল রেখে বলল সে।
বাইরে উজ্জ্বল রোদে বেরিয়ে এল ওরা। দুর্গের ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় এসে আশপাশে তাকিয়ে কুয়ার মুখ খুঁজল। শেওলা, ঘাস আর ঝোঁপঝাড়ের জন্যে চত্বরের পাথরই দেখা যায় না ভালমত, কুয়ার মুখ দেখবে কী? জায়গায় জায়গায় পাথর ফেটে ভেঙে বেঁকাতেড়া হয়ে গেছে, এককালে সমতল, মসৃণ ছিল, এখন হয়েছে তার উল্টো।
বড় একটা খরগোশ যেন ফুসমন্তরের বলে উদয় হলো চতুরে, কোথা থেকে উঠল ওটা, বোঝা গেল না। লাফিয়ে গিয়ে খানিক দূরের একটা, গর্তে সুড়ৎ করে ঢুকে পড়ল। আরেকটা খরগোশ বেরোল, এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়িয়ে ছেলেমেয়েদেরকে দেখল, তারপর ওটাও গিয়ে ঢুকল। আগের গর্তটায়।
খানিক পরে আরেকটা খরগোশ বেরোল, বাচ্চা। বড় বড় কান, ছোট্ট লেজ, মনে হয় যেন গোড়া থেকে কাটতে গিয়ে ভুল হয়ে গেছে, আটকে রয়েছে খানিকটা। খোশমেজাজে তিড়িং-বিড়িং করে এলোপাতাড়ি কয়েক লাফে ছেলেদের কাছাকাছি চলে এল ওটা, বসে পড়ে কৌতূহলী চোখে। তাকাল, সামনের দুই পা দিয়ে কান ঘষছে, যেন ময়লা ধুয়ে ফেলছে।
খরগোশের বাচ্চার এই চালিয়াতি আর সইতে পারল না রাফিয়ান, হুউক! করে ধমক লাগিয়েই তাড়া করল। কল্পনাই করেনি, তার চেয়ে অনেক বেশি তাঁড় ওই অত্তোটুকুন বাচ্চা, চোখের পলকে লাফ দিয়ে তিন হাত ওপরে উঠে পড়ল ওটা, শূন্যেই ঘুরল, নিঃশব্দে নেমে এল আবার মাটিতে-আগের জায়গা থেকে অন্তত পাঁচ হাত দূরে, তারপর ছুটল। কান প্রায় লেপটে গেছে ঘাড়ের সঙ্গে, ছোট্ট লেজটা নাচছে ছোটার। তালে তালে, রাফিয়ানকে কলা দেখাল সে অবলীলায়। একটা

ঝোঁপের ধারে গিয়ে ফিরে তাকাল পলকের জন্যে, মুখই ভেঙচাল বোধহয়, পরক্ষণে ঢুকে পড়ল ঝোপে।
রাফিয়ান কি আর ছাড়ে? ঝোঁপঝাড় ভেঙে হুড়মুড় করে পিছু নিল। সে-ও। ঝোঁপের ভেতরেই বোধহয় খরগোশের বাসা, গর্তের মুখ ছোট হয়তো, তাই খুঁড়তে শুরু করল কুকুরটা, ছিটকে আসা ধুলোমাটির ঝড় তা-ই প্রমাণ করছে। উত্তেজিত চাপা গর্জন শোনা যাচ্ছে তার, গলা ফাটিয়ে ডাকছে জিনা, চলে আসতে বলছে, কানেই তুলছে না রাফিয়ান। পাগলের মত গর্তের চারপাশের মাটি খুঁড়ে মুখ বড় করছে, নিশ্চয়ই তার ভাষায় বাপ-মা তুলে গাল দিচ্ছে বজ্জাত বাচ্চাকে। বোধহয় বলছে, যাবে কোথায়! আসছি আমি! শিক্ষা দিয়ে ছাড়ব!
রাফি! শুনছিস! এই, রাফি! চেঁচাল আবার জিনা। কতবার না বলেছি, খরগোশ তাড়া করবি না এখানে! শুনছিস! এই, পাজি!
রোখ চেপে গেছে রাফিয়ানের, মনিবের ডাকের তোয়াক্কাই করছে না। সে তার কাজে ব্যস্ত। কয়েকটা চড়থাপ্পড় লাগিয়ে, কান ধরে টেনে আনার জন্যে চলল জিনা। সে ঝোঁপটার কাছে এসে দাঁড়াতেই আচমকা থেমে গেল আঁচড়ের শব্দ, রাফিয়ানের ভয় মেশানো আর্তি শোনা গেল একবার, তারপরেই চুপচাপ। দুহাতে কাটাঝোঁপ সরিয়ে ভেতরে উঁকি দিল জিনা।
রাফিয়ান গায়েব! ঘটনাটা কী! চমকে গেল জিনা। খরগোশের গর্ত দেখা যাচ্ছে, কালো ছড়ানো মুখ যেন বিশাল অজগরের হায়ের মত হয়ে রয়েছে। খুঁড়ে খুঁড়ে বড় করে ফেলেছে রাফিয়ান।
কিশোর! উদ্বিগ্ন হয়ে চেঁচিয়ে ডাকল জিনা। রাফিয়ান নেই! খরগোশের গর্তে পড়ে গেছে!
ঝোঁপের ধারে জিনার পাশে বসে কিশোরও উঁকি দিল ভিতরে। রবিন আর মুসাও এসে হাঁটু গেড়ে বসল গা ঘেঁষে।
গর্তে পড়ল! বিশ্বাস করতে পারছে না কিশোর। এত্তোবড় একটা কুকুর খরগোশের গর্তে পড়ে কী করে!
যেভাবেই হোক, পড়েছে! কেঁদে ফেলবে যেন জিনা। খুঁড়ে বের করা দরকার ওকে! জলদি না করলে দম আটকে মরে যাবে!
বেশ বড় ঝোঁপ, কাঁটা-ডাল, ভেতরে ঢোকা মুশকিল। তবে ভরসা, সঙ্গে যন্ত্রপাতি রয়েছে। ছুটে গিয়ে কুড়াল নিয়ে এল কিশোর। কুপিয়ে কাটতে লাগল কাঁটা-ঝোঁপ। সে আর মুসা মিলে অল্পক্ষণেই ঝোঁপের অনেকখানি উড়িয়ে দিল। হাতের কনুই পর্যন্ত ছড়ে-কেটে গেছে, রক্ত বেরিয়ে এসেছে চামড়া কেটে, খেয়ালই করছে না।

গর্তটার পারে বসে ভেতরে ঝুঁকে তাকাল কিশোর। অন্ধকার। টর্চের আলো ফেলল। চেঁচিয়ে উঠল বিস্ময়ে। এই জন্যেই তো বলি, এতবড় একটা বাঘাকুকুর খরগোশের গর্তে ঢোকে কী করে! জিনা, এটাই কুয়া! কুয়ার পারে খরগোশের বাসার মুখ, খুঁড়ে খুঁড়ে দুটো এক করে ফেলেছে রাফিয়ান। খরগোশের গর্তে পড়েনি, পড়েছে কুয়ার ভেতরে।

হাউমাউ করে কেঁদে উঠল জিনা। বিলাপ শুরু করল, ও, রাফি, রাফি রে, তুই কোথায়! ...তোকে ছাড়া যে আমি বাঁচব না রে, রাফি...

জিনার কাণ্ড দেখে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে, মুসা আর রবিন। কিশোর মৃদু ধমক লাগাল, আরে, কী করছ, পাগলের মত! দাঁড়াও না দেখি আগে, তোলার ব্যবস্থা তো করতেই হবে। নিশ্চয়ই বেঁচে আছে রাফিয়ান!

হিউউউ করে নাকি গলায় কেঁদে উঠল রাফিয়ান, সে যে বেঁচে আছে সেটা বোঝানোর জন্যেই, অনেক দূর থেকে ভেসে এল শব্দটা, কুয়ার নিচেই আছে।

মুসার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করল কিশোর। যাও তো, এক দৌড়ে গিয়ে খোন্তা নিয়ে এসো। কুয়ার মুখ আরও বড় করতে হবে। তারপর দড়ি বেঁধে নেমে যাব।

সহজেই পরিষ্কার করা গেল গর্তের মুখ। ঝোঁপঝাড়ের শেকড় গর্তের দেয়াল ভেদ করে ঠেলে বেরিয়ে আছে; তার ওপর পাতা, আলগা মাটি জমে ঢেকে গিয়েছিল মুখটা। ওগুলো সরাতেই দেখা গেল বড় একটা পাথর, প্রায় ঢেকে দিয়েছে কুয়ার মুখ, এক ধারে সামান্য ফাঁক, ওই ফাঁক দিয়েই ভেতরে পড়েছে রাফিয়নি।

সবাই মিলে প্রচুর কায়দা-কসরৎ করে পাথরটা সরাল কুয়ার মুখ থেকে। তলায় কাঠের আরেকটা ঢাকনা। বোঝা গেল, টাওয়ার ধসে পড়ার সময় কোনভাবে গড়িয়ে এসে পাথরটা পড়েছিল মুখে, কিন্তু নিচের ঢাকনাটা মাপমত তৈরি করে বসানো হয়েছে, পানিতে যাতে কোন কিছু না পড়তে পারে সেজন্যে। ভিজে পচে গেছে কাঠ; এত নরম, রাফিয়ানের ভারও সইতে পারেনি, গোলমত একটা ফোকর হয়ে আছে।

নিচে উঁকি দিল কিশোর, তল দেখা যায় না। অন্ধকার। পাথর ফেলল, কিন্তু ছলাত করে উঠল না, কোনরকম আওয়াজই শোনা গেল না। তা হলে কি পানি নেই? নাকি পানি এত গভীরে, পাথর পড়ার আওয়াজ মাঝপথেই মিলিয়ে গেছে?

সাংঘাতিক গভীর মনে হচ্ছে! বিড়বিড় করে বলল কিশোর। কিন্তু রাফিয়ান... কোথায় ও?

টর্চের আলো ফেলল ভেতরে। অনেক কাল আগে মস্ত আরেকটা পাথরের চাঙর পড়েছিল ভেতরে, কুয়ার এক জায়গায় দেয়ালের ঘের সরু, ওখানে আটকে আছে। ওখানেই বসে আছে বেচারা রাফিয়ান; জিভ বের করে বড় বড় চোখ

মেলে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে ওপর দিকে। যেন বুঝতেই পারছে না, কী করতে কী ঘটে গেছে, কী হয়েছে ওর।
কুয়ার দেয়ালে আটকানো রয়েছে লোহার মই। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই নেমে পড়ল মুসা, লোহার মই বেয়ে নেমে চলল নিচে-ভাবেইনি বোধহয়, পুরানো মই যে-কোন মুহূর্তে খসে আসতে পারে দেয়াল থেকে। মই বেয়ে তরতর করে নেমে চলেছে সে। নিরাপদেই কুকুরটার কাছে পৌছল, অনেক চেষ্টায় কাঁধে তুলে নিল ভারি রাফিয়ানকে, ধীরে ধীরে উঠে আসতে শুরু করল।
ওপরে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে বন্ধুরা, মুসা কাছাকাছি আসতেই তার কাধ থেকে কুকুরটাকে তুলে আনল ওরা, তারপর হাত ধরে মুসাকে উঠতে সাহায্য করল। ধপ করে বসে পড়ে হাঁপাতে শুরু করল মুসা।
মুসা, আন্তরিক প্রশংসা করল কিশোর, তুমি যে আমার বন্ধু, এজন্যে গর্বে আধ হাত ফুলে যাচ্ছে আমার বুক।
জিনা কিছু বলতে পারল না, কৃতজ্ঞ জল-টলোমলো চোখে তাকিয়ে আছে মুসার দিকে।
‘সেকেণ্ড, একটা কাজের কাজই করেছ!’ রবিন বলল। তুমি দুর্দান্ত সাহসী! মই যে-কোন সময় খসে যেতে পারত, তারপর কী ঘটত সেটা জেনেও…’
খাইছে রে! ও, আল্লা!’ চেঁচিয়ে উঠল মুসা। সেকথা তো ভাবিইনি!’ চোখে আতঙ্ক ফুটেছে তার। একেবারে শুয়ে পড়ল। বাবা গো, বড় বাঁচা বেঁচে গেছি!’
হো হো করে হেসে উঠল সবাই। রাফিয়ানও তার কুকুরে-হাসি হেসে গাল, চেটে দিল মুসার।
খেঁকিয়ে উঠল মুসা, ‘দুত্তেরি, কুত্তার বাচ্চা! এখন এসেছে সোহাগ করতে! দিয়েছিলি তো আরেকটু হলে! …যা, যা এখান থেকে! ভাগ!’
মুসার এই হঠাৎ পরিবর্তনে ভড়কে গেল রাফিয়ান, এক লাফে পিছিয়ে এসে বোকা বোকা চোখে চেয়ে রইল। বিশ্বাসই করতে পারছে না যেন, খানিক আগে বাঁচিয়েছে তাকে ওই মারমুখো ছেলেটা।
আবার হেসে উঠল সবাই।
জিনা ডাকল, ‘রাফিয়ান, এদিকে আয়! দুষ্ট ছেলে, আর খরগোশ তাড়া করবি?’ একটা ডাল ভাঙতে শুরু করল সে।
কী ঘটবে বুঝে গেল রাফিয়ান, দুই লাফে এসে জিনার একেবারে পায়ের ওপর গড়িয়ে পড়ল। ডাল আর ভাঙা হলো না, হাত তুলল জিনা, “ঠিক আছে, ঠিক আছে, ওঠ, এইবার মাপ করে দিলাম। এরপর…’ হাত নেড়ে বুঝিয়ে দিল সে।
আবার ডানজনের প্রবেশপথ খোঁজায় মন দিল ওরা। ঝোপ কেটে সাফ করে খোন্তা দিয়ে খুঁচিয়ে চল ওগুলোর গোড়ায়। মাঝেমধ্যে ঠনন করে পাথরে বাড়ি

লাগছে খোন্তা, খুড়ে বের করে আনছে ওটা। সাবধানে রয়েছে, রাফিয়ানের মত আলগা মাটির আস্তর ধসে না আবার গর্তে পড়ে। উত্তেজনায় ঘামছে দরদর করে।
হঠাৎই আবিষ্কার করে ফেলল রবিন। নিতান্তই ভাগ্য বলতে হবে। পরিশ্রান্ত হয়ে খানিক জিরিয়ে নেয়ার জন্যে শুয়ে পড়েছিল সে, শুয়ে শুয়েই মাটি খামচাচ্ছিল। বালির তলায় ঠাণ্ডা কিছু আঙুলে ঠেকল তার। কৌতূহল হলো, উঠে বসে বালি সরাতেই দেখা গেল, লোহার একটা মোটা রিং!
এই এদিকে এসো তোমরা! ডাকল সে। দেখে যাও!
রিংটা কীসে আটকানো, বালি পরিষ্কার করতেই তা বোঝা গেল। চারকোনা একটা পাথরের চাঙড়। নিশ্চয় প্রবেশপথের মুখে ঢাকা দেয়া রয়েছে।
নতুন উদ্যমে এটাকে সরানোর কাজে লেগে গেল ছেলেরা। বহু টানাটানি করল, কিন্তু এক চুল নড়ল না ভারি পাথর। মুসার প্রচণ্ড শক্তিও বিফল হলো। ভুরু কুঁচকে গেছে কিশোর পাশার, নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটা শুরু হয়েছে। হবে, হবে, দৃঢ়াও! আচমকা ধ্যান ভাঙল তার। দড়ি কয়েক পাক করে পেঁচিয়ে নিয়ে ঢুকিয়ে দিল রিঙে, শক্ত করে বাঁধল।
এসো, সবাই ধরো।
দড়ি ধরল সবাই।
মারো টান! হেঁইও! …জোর সে মারো! হেঁইও!
সম্মিলিত শক্তির কাছে হার মানল পাথর। ছিপাত করে বিচিত্র শব্দ তুলে মাটির আকর্ষণ থেকে মুক্ত হলো ওটা। এর পরের কাজ সোজা। টেনে প্রবেশমুখ থেকে ঢাকনা সরিয়ে ফেলল ওরা।
একই সঙ্গে হুড়োহুড়ি করে এসে গর্তটার চারপাশ ঘিরে দাঁড়াল সবাই, নিচে উঁকি দিল। ধাপে ধাপে পাথরের সিঁড়ি নেমে গেছে।
যাক, পাওয়া গেল! বলল কিশোর। চলো এবার, নামি।
পিচ্ছিল সিঁড়ি, সবার আগে বুঝল সেটা রাফিয়ান। লাফিয়ে নামতে গিয়েই পা পিছলাল, হড়াৎ করে নেমে চলে গেল কয়েক ধাপ, ওলটপালট খেয়ে শেষে থামল এক জায়গায়, উঠল কোনমতে। কুঁই কুঁই করছে। ভয়ে। আর নামতে সাহস পাচ্ছে না।
সাবধান হয়ে গেল অন্যেরা। ধীরে ধীরে নেমে চলল। দুরুদুরু করছে বুক। ডানজন তো পাওয়া গেল, সোনার বারগুলো পাওয়া যাবে তো! কতগুলো আছে? ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে পুরো মেঝেতে?
বাঁক নিল সিঁড়ি। অন্ধকার বাতাসে ভেজা কেমন একটা ভাপসা গন্ধ। শ্বাস নিতে সুবিধে হয়।

ইঁহ! দম আটকে আসে! জিনা নাক দিয়ে খোতখোত করল।
তাও তো ভালই এখানে বাতাস, কিশোর বলল, আরও নিচে কেমন, কে জানে! কুয়া কিংবা পাতালের বদ্ধ ঘরগুলোতে নানারকম বিষাক্ত গ্যাস জমে থাকে। ফুসফুসে ঢুকলে মরণ!
নীরবে নেমে চলল ওরা। যখন ভাবতে শুরু করেছে, এই সিঁড়ির আর শেষ নেই, ঠিক তখনই শেষ হলো সিঁড়ি। চারপাশে আলো ফেলে দেখল কিশোর। রোমাঞ্চকর দৃশ্য! জায়গায় জায়গায় পাথর পড়ে রয়েছে। একটা গুহা; প্রাকৃতিক, না মানুষের খোঁড়া, বোঝা গেল না। রহস্যময় অন্ধকার সবখানেই।
ইয়াল্লা! চেঁচিয়ে উঠল মুসা। ফাঁপা এক ধরনের আওয়াজ উঠল বদ্ধ জায়গায়, দেয়ালে দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরতে লাগল : লা-লা লা-লা-লা...! জ্যান্ত একটা শব্দের সাপ যেন বিচিত্র শব্দ তুলে পাক খাচ্ছে ওদেরকে ঘিরে, দেখা যায় না, অনুভব করা যায় যেন, হাত বাড়ালেই বুঝি ধরা যাবে! গায়ে গা ঘেষে এল ছেলেরা।
আশ্চর্য! ভয়ে ভয়ে নিচু গলায় বলল জিনা। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিধ্বনি উঠল, খুব আস্তে, ফিসফিস করে পাক খেতে শুরু করল যেন এবার শব্দের সাপরের হাত খামজঙ্গে পরিচয় নেন
কিশোরের হাত খামচে ধরল জিনা। কাঁপছে। রক্ত জমেছে মুখে। এই ধরনের প্রতিধ্বনির সঙ্গে পরিচয় নেই তার, কিন্তু তিন গোয়েন্দার অভিজ্ঞতা আছে। টেরর ক্যাসলের প্রতিধ্বনি এর চেয়েও ভয়াবহ ছিল!
বারগুলো কোথায়? নিচু গলায় বলল মুসা, সঙ্গে সঙ্গে প্রতিধ্বনি উঠল: কোথায়! কোথায়! কোথায়!
হেসে উঠল কিশোর, তার হাসিকে লুফে নিয়ে শত-সহস্রভাগ করে বিচিত্র শব্দে যেন আবার তার দিকে ছুঁড়ে দিল রহস্যময় গুহা। চুপ হয়ে গেল সে। আস্তে বলল, এসো, আর কোথাও চলে যাই! এ-জায়গাটা ভাল না!
ভাল না! ভাল না! ভাল না!–প্রতিধ্বনি হলো।
সিঁড়ির কাছ থেকে সরে এল ওরা। দেয়ালে বড় ফোকর, বোধহয় দরজা। একটা ফোকর দিয়ে ঢুকে অন্য পাশে চলে এল ওরা, আরেকটা ঘরে, এটাকেও গুহা বলা যেতে পারে। এগুলো কী কাজে ব্যবহার হত? নিশ্চয় কয়েদী আটকে রাখার জন্যে, অনুমান করল কিশোর। বিড়বিড় করল, কিন্তু বারগুলো কোথায়? পকেট থেকে ম্যাপ বের করে মাটিতে বিছিয়ে তাতে টর্চের আলো ফেলল। বারগুলো কোথায় আছে, স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে বটে ম্যাপে, কিন্তু এই পাতালের ঘরে কোনটা যে-কোন্ দিক, বোঝার উপায় নেই। ইস, একটা কম্পাস নিয়ে আসা উচিত ছিল, আফসোস করল গোয়েন্দাপ্রধান।

মনে হয়… চোখ তুলল কিশোর হঠাৎ, এ-ঘরের আশপাশেই কোথাও রয়েছে! ওই যে, আরেকটা দরজা, হয়তো তার ওপারেই…আমি শিওর, ওখানেই আছে!
একসঙ্গে চারটে টর্চ ঘুরে গেল দরজার দিকে। ভারি কাঠের পাল্লা লাগানো, বড় বড় পেরেক গেঁথে আটকে দেয়া হয়েছে, যাতে সহজে না খোলা যায়। হাসি ফুটল মুসার মুখে, ছোট্ট একটা কাশির মত শব্দ করেই ছুটে গেল দরজার কাছে। ঠেলা দিয়ে, থাবা মেরে, ধাক্কা দিয়ে খোলার চেষ্টা করল।
কিন্তু বেশ ভাল করেই আটকানো হয়েছে দরজা। নড়লও না। চাবির ফোকর এত বড়, আঙুল ঢুকে যায়, চাবি নিশ্চয় আঙুলের মতই মোটা ছিল। কয়েক মুহূর্ত বোবা হয়ে দরজা আর তালার ফোকরের দিকে চেয়ে রইল ছেলেরা। এখন কী করবে? কী করে খুলবে ওই দরজা?
কুড়াল! নীরবতা ভাঙল কিশোর। কুড়াল আনতে হবে! কুপিয়ে ভেঙে ফেলব তালা!
ঠিক বলেছ! সায় দিল মুসা। চলো, গিয়ে নিয়ে আসি! তর সইছে না আর তার।
কিন্তু ফিরতে গিয়ে বুঝল ওরা, পথ হারিয়ে ফেলেছে। বিশাল ঘর, গোল দেয়াল, তাতে বড় বড় অসংখ্য ফোকর, সবগুলোই দেখতে প্রায় এক রকম; কোনটা দিয়ে ঢুকেছিল, বলতে পারবে না। অনুমানে একটা ফোকরে ঢুকে পড়ল। বেরিয়ে এল একটা ঘরে। সিঁড়িঘর নয় এটা। বড় বড় কাঠের পিপে ভেঙে-চুরে পড়ে আছে, কাঠপচা গন্ধ। নানা ধরনের খালি মদের বোতল স্তূপ হয়ে পড়ে আছে ঘরের কোণে। আর কয়েকটা টুকিটাকি ভাঙা জিনিস পড়ে রয়েছে এদিক-ওদিক।
বিচ্ছিরি! নাক কোঁচকাল কিশোর।
আবার আগের বড় ঘরটায় ফিরে এল ওরা। আরেকটা ফোকর দিয়ে। ঢুকল। কিন্তু সিঁড়িঘর পাওয়া গেল না, তার বদলে আরেকটা গোল ঘর। নানারকম বাতিল জিনিস, আর পচা ভাপসা গন্ধ।
একের পর এক ফোকর দিয়ে ঢুকল ওরা, বেরোল, কিন্তু প্রতিবারেই নতুন আরেকটা ঘরে ঢুকছে। সিঁড়িঘর পাওয়া যাচ্ছে না।
বাকি জীবন আটকে থাকতে হবে নাকি এখানে! বিড়বিড় করল মুসা।
জিনা আর রবিন চুপ, তাদের ভয় সংক্রমিত হয়েছে যেন কুকুরটার মাঝেও, সে-ও চুপ।
এখনই হাল ছেড়ে দিচ্ছ কেন? সাহস দিল কিশোর। কোন না কোনভাবে বেরিয়ে যাবই। আ-আরে, ওটা কী!
সবাই তাকাল। ইটের তৈরি মস্ত এক চিমনির মত, ছাত থেকে নেমে এসে ঢুকে গেছে মেঝেতে।

আলো ফেলে দেখতে দেখতে বলে উঠল জিনা, আমি জানি কী ওটা! কুয়া! ওপর থেকে নেমে এসে মেঝে ভেদ করে চলে গেছে। পাতালে!
ঠিকই বলেছে সে। এগিয়ে এসে ঘুরে ঘুরে দেখল সবাই। কুয়ার দেয়ালে এক জায়গায় একটা জানালামত, একবারে একজনের বেশি মাথা। ঢোকাতে পারল না তাতে। হাত ঢুকিয়ে ওপর-নিচে আলো ফেলে দেখল। কিশোর, একেবারে নিচে কী আছে দেখা গেল না। পাথর ফেলে দেখল, কোন আওয়াজ নেই। বড় বেশি গভীর! অনেক ওপরে আবছা আলো, ছোট্ট একটা ফাঁক দিয়ে আসছে। কুয়ার যেখানে চ্যাপ্টা পাথরটা আটকে আছে; ওই যে, যেটাতে রাফিয়ান পড়েছিল; তারই ফাঁক দিয়ে আসছে। আলো, বুঝতে অসুবিধে হলো না।
হ্যাঁ, মাথা বের করে এনে বলল কিশোর, কুয়াই। সুবিধে হয়েছে। কুয়াটার কাছাকাছিই কোথাও আছে সিঁড়িঘর।
এ-ঘরটায় ফোকর বেশি নেই। একটা করে ফোকরে ঢুকে ওপাশ দেখে ফিরে আসতে লাগল কিশোর। তিন নম্বরটায় ঢুকে খানিকটা দেরি করল, ফিরে এল হাসিমুখে। পেয়েছি, এসো।
অন্ধকার পিচ্ছিল সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল ওরা ওপরে, বাইরে, খোলা রোদে। মাথায়, কাঁধে সূর্যের আলো যেন অমৃতের পরশ বোলাল; ঠাণ্ডা বিশুদ্ধ বাতাস ঘন ঘন ফুসফুসে টেনে নিল ওরা, অকারণেই খিলখিল করে হাসল জিনা, তার হাসি সংক্রমিত হলো রবিন আর মুসার মাঝেও।
ঘড়ি দেখল কিশোর। আরিব্বাপ! সাড়ে ছটা বেজে গেছে। তাই। তো বলি, পেটে মোচড় দিচ্ছে কেন। চলো চলো, খেয়ে নিই। কী, সেকেণ্ড, আজ খিদে কোথায় গেল?
আরে, মিয়া, ক্ষুধা আর টুধা! মরেই তো যাব ভেবেছিলাম! মুক্তির আনন্দে খাওয়ার কথা ভুলে গেছে মুসা আমান!
আগুন জ্বেলে চায়ের জন্যে কেটলিতে পানি চাপিয়ে খোলা চত্বরেই চিত হয়ে শুয়ে পড়ল ওরা। গায়ে লাগছে কুসুম গরম রোদ, আহ্, কী আরাম!
চা, বিস্কুট আর কেক দিয়ে বিকেলের নাশতা সারা হলো, সেই সঙ্গে কিছু রুটি আর পনিরও খেল। সাংঘাতিক পরিশ্রম গেছে। কিছুটা ভারি খাওয়ার দরকার ছিল। রাফিয়ানেরও খাওয়া ভালই হলো। জিনার গা ঘেষে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল সে। চোখ বন্ধ, কান লেপটে রয়েছে মাথার সঙ্গে। সোজা হয়ে মাটিতে বিছিয়ে আছে লম্বা লেজটা। অদ্ভুত প্রতিধ্বনি, তারপর পাতালে পথ হারিয়ে বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছিল সে-ও। একবার। মাত্র গর্জে উঠেছিল প্রতিধ্বনিকে ভয় দেখানোর জন্যে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যেন শখানেক কুকুর একসঙ্গে গর্জে উঠেছিল; তারপর

সেই যে চুপ করেছে রাফিয়ান, একটা গোঙানিও বেরোয়নি ওর গলা দিয়ে, যতক্ষণ পাতালে ছিল।
আটটা পর্যন্ত শুয়ে রইল ওরা। সূর্য ডুবছে। গরম রোদ আর নেই, ঠাণ্ডা পড়তে শুরু করেছে।
উঠে বসল, কিশোর।
কী হলো? জিজ্ঞেস করল জিনা। আবার ঢুকছি নাকি আজ?
নাহ, মাথা নাড়ল কিশোর। আজ আর না। কাহিল লাগছে। চলো, ঘরে গিয়ে শুই।
ঘরে এসে বিছানা পাতল ওরা। রাতের খাওয়ার ঝামেলায় আর গেল না। সটান শুয়ে পড়ল যার যার বিছানায়। শোয়ামাত্রই ঘুম।
ভোরে রাফিয়ানের ঘেউ ঘেউ ডাকে ঘুম ভাঙল ছেলেদের। দরজার কাছে একটা খরগোশ ছিল, ওটাকে দেখেই ধমকে উঠেছে কুকুরটা। তাড়া করতে গেল, ডেকে তাকে ফেরাল জিনা।
ঘুম ভাঙতেই প্রথমে পাতালের বড় কাঠের দরজাটার কথা মনে। পড়ল কিশোরের। কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে ভাঙতে হবে ওটা। কী আছে অন্য পাশে, দেখা দরকার।
পেট ভরে খেয়ে নিল ওরা। সারাদিন আর খেতে পারবে কিনা, খাওয়ার সময় আর সুযোগ পাবে কিনা, জানে না। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, আজ একটা হেস্তনেস্ত না করে ছাড়বে না। সোনার বারগুলো থেকে থাকলে, ওগুলো খুঁজে বের করবেই।
কুড়াল তুলে নিল কিশোর। আগে আগে চলল। তার পিছনে অন্যরা। সবার পিছনে রয়েছে রাফিয়ান। কোথায় যাচ্ছে, বুঝতে পারছে; সেজন্যেই মনমরা। আবার গিয়ে পাতালের অন্ধকার গোলকধাঁধায় ঢোকার কোন ইচ্ছেই নেই তার। ভাবছে বোধহয়: কেন, বাপু; এই রোদ, এই আলো, এই খরগোশ তাড়া করার দুরন্ত মজা ছেড়ে গিয়ে বিচ্ছিরি একটা অন্ধকার গুহায় ঢোকা! তা-ও আবার যে-সে গুহা নয়, কথা বললেই ধমকে ওঠে শতকণ্ঠ! কিন্তু জিনার ইচ্ছের বিরুদ্ধে সরব প্রতিবাদ করার সাহস বা ইচ্ছে কোনটাই নেই তার।
অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে আবার সিঁড়িঘরে নেমে এল ওরা। বেশ কয়েকবারের চেষ্টায় সেই ফোকরটা খুঁজে পেল, যেটা দিয়ে কাঠের দরজাওয়ালা ঘরটায় ঢোকা যায়।
আবার পথ হারাব আজ! জিনার কণ্ঠে অস্বস্তি। কী যে অন্ধকার! সব কটা ফোকর আর ঘর যেন এক রকম! কোটা থেকে কোটা আলাদা, বোঝার জো নেই। কম্পাস আনলেই অনেক সহজ হয়ে যেত! বলল কিশোর। কিন্তু আনিনি যখন, ভেবে আর কী হবে? সাবধান থাকতে হবে, এই আর কী।
কম্পাস আনেনি বটে, কিন্তু আজ চক নিয়ে এসেছে কিশোর। যে পথেই যাচ্ছে, পাশের দেয়ালে খানিক পর পরই বড় করে আশ্চর্যবোধক চিহ্ন একে একে

এগোচ্ছে। কুয়াঘরটা খুঁজে পেয়েছে, ফোকরের পাশের দেয়ালে কয়েকটা আশ্চর্যবোধক এঁকে দিয়েছে। এবার আর পথ হারানোর ভয় নেই, ফিরে এসে এই ঘরটায় ঢুকতে পারলেই আর ভয় নেই, কারণ এর কাছাকাছিই রয়েছে সিঁড়িঘর, পাওয়া যাবেই।

কাঠের দরজা আর তাতে মারা পেরেকগুলো ভালমত পরীক্ষা করল। কিশোর। পুরানো আমলের রড, চ্যাপ্টা মাথাওয়ালা পেরেক, তাতে লাল মিহি মরচে। আঙুল দিয়ে চুলে লাল হয়ে যায় আঙুলের মাথা।

তালার পাশে দরজায় কোপ বসিয়ে দিল সে। ঘ্যাচাৎ! আশা করেছিল ভেঙে যাবে, ভাঙল না। আবার কোপ মারল কিশোর। লোহার, পাতে বাড়ি খেয়ে পিছলে কাত হয়ে গেল কুড়ালের ফল, চড়াৎ করে কাঠের চিলতে উঠে গিয়ে সোজা গাথল মুসার গালে।

ও, বাবা গো, গেছি, গেছি! চেঁচিয়ে উঠল মুসা। টান দিয়ে খসিয়ে ফেলল কাঠের চিলতে, ক্ষত থেকে দরদর করে রক্ত বেরিয়ে এল।

টর্চের আলোয় ক্ষতটা ভাল করে দেখল কিশোর, বলল, খুব লাগছে, না? সরি। যাও, ওপরে গিয়ে ভাল করে ধুয়ে ওষুধ লাগিয়ে নাও। রবিন, তুমিও যাও, ওকে সাহায্য করো।

আমিও যাই, উদ্বিগ্ন হয়ে বলল জিনা।

না, তোমার আসার দরকার নেই, কাটা জায়গা চেপে ধরে রেখেছে। মুসা। তুমি এখানেই থাকো, কিশোরকে সাহায্য করতে পারবে।

জিনা, কুড়াল বাড়িয়ে ধরে বলল কিশোর, কোপাও। দেখো, কিছু করতে পারো কিনা দরজার। আমি মুসাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

রাফিয়ানের দায়িত্বে জিনাকে রেখে সিঁড়িঘরের দিকে এগোল। তিনজনে।

কাঠের দরজাটাকে আক্রমণ করল জিনা, সব দোষ যেন ওটার, তাই শাস্তি দিচ্ছে। একটু পরেই ফিরে এল কিশোর। ইতিমধ্যে তালার চারপাশে মোটামুটি দাগ কেটে ফেলেছে জিনা।

কিশোর কুড়ালটা নিয়ে নিল জিনার হাত থেকে, কোপাতে শুরু করল। বেশিক্ষণ আর টিকল না কাঠ, খটাং করে তালাটা খুলে কাত হয়ে ঝুলে রইল এক পাশে। ধাক্কা দিতেই কড়মড় প্রতিবাদ তুলে যেন ঘুম ভাঙল দরজার মরচে ধরা কজার। টর্চ হাতে ঢুকে পড়ল দুজনে।

মাঝারি আকারের একটা গুহা, পাথর কেটে তৈরি করা হয়েছে। পুরানো পিপে আর বাক্সের বদলে এখানে অন্য জিনিস রয়েছে। একধারের দেয়াল ঘেঁষে স্তূপ হয়ে রয়েছে হলদে রঙের ছোট ছোট ইটের মত কিছু।

একটা ইট তুলে নিল কিশোর। চেঁচিয়ে উঠল হঠাৎ, সোনা! খাঁটি সোনার বার! জিনা, অনেক টাকার সোনা এখানে!
জিনার মুখে কথা জোগাল না। চোখ বড় বড় করে সোনার স্তূপের দিকে চেয়ে আছে, বিশ্বাসই করতে পারছে না। বুকের ভিতরে হৃৎপিণ্ডটা অস্থির লাফালাফি জুড়েছে। কিশোরেরও প্রায় একই অবস্থা।
রাফিয়ানের উত্তেজিত চিল্কারে চমক ভাঙল ওদের। প্রচণ্ড ঘেউ ঘেউ করছে।
এই, রাফি, চুপ, চুপ! ধমক দিল জিনা, কিন্তু কুকুরটার দিকে চেয়ে নিজেই চুপ হয়ে গেল। এমন করছে কেন! কি ব্যাপার, মুসা আর রবিন আসছে?
ফিরেও তাকাল না রাফিয়ান, চিৎকারও থামল না।
দরজার কাছে এসে ডেকে জিজ্ঞেস করল জিনা, মুসাআ! রবিইন! তোমরা? জলদি এসো! সোনার বারগুলো খুঁজে পেয়েছি!
জবাব নেই।
রাফিয়ানের চিৎকার এখন চাপা গর্জনে রূপ নিয়েছে। ভীষণ চোখে তাকিয়ে আছে দরজার ওপাশের অন্ধকারের দিকে। কী রে, রাফি! ...নাহ, মুসা আর রবিনকে দেখে ওরকম করার কথা না! এই, রাফি... কথা আটকে গেল তার।
অন্ধকার থেকে ভেসে এসেছে একজন মানুষের ভারি কণ্ঠস্বর, গুমগুম করে উঠল যেন বদ্ধ জায়গায়। বিচিত্র প্রতিধ্বনি তুলল পাথরের দেয়ালে দেয়ালে বাড়ি খেয়ে।
কে? কে ওখানে?
ভয়ে কিশোরের হাত খামচে ধরল জিনা। গুঙিয়েই চলেছে রাফিয়ান, ঘাড়ের রোম খাড়া হয়ে গেছে।
টর্চ নিভিয়ে দিয়েছে জিনা, ফিসফিস করে বলল, চুপ! চুপ, রাফি!
কিন্তু রাফি চুপ করল না।
দরজার ওপাশের ঘরের একটা সুড়ঙ্গ-মুখে জোরাল টর্চের আলো দেখা গেল। দরজা থেকে সরে যাওয়ার সময় পেল না কিশোর আর জিনা, আলো এসে পড়ল হঠাৎ ওদের ওপর, রাফির গোঙানিই এজন্যে দায়ী।
আরে, আরে! বলে উঠল ভারি কণ্ঠ। দেখেছ কারা? দুটো ছেলেমেয়ে! আমার দুর্গের ডানজনে তোমরা কী করছ?
আপনার দুর্গ! মানে? জিজ্ঞেস করল জিনা।
আমার দুর্গ মানে আমার দুর্গ, এটা না বোঝার কী হলো? আরও খুলে বলছি, এটা আমি কিনছিঃ কাগজপত্র তৈরি হতে যা দেরি।
লোকটার পাশে এসে দাঁড়াল আরেকজন। চুপচাপ এক মুহূর্ত দেখল জিনা আর কিশোরকে। জিজ্ঞেস করল, বারগুলো খুঁজে পেয়েছ বলে চেঁচাচ্ছিলে, কীসের

বার? কী খুঁজে পেয়েছ?
বোলো না, ফিসফিস করে বলল কিশোর, কিন্তু চাপা রাখা গেল না কথাটা, ফাস করে দিল প্রতিধ্বনি। অনেক গুণ জোরাল হয়ে বার বার ঘুরেফিরে বলল: বোলো না! বোলো না!! বোলো না!!!
বলবে না? বলতে বলতে এগিয়ে এল ভারি কণ্ঠ।
দাঁত খিঁচিয়ে ধমক লাগাল রাফিয়ান, কিন্তু তাকে কেয়ারই করল না। লোকটা। সোজা এগিয়ে আসতে লাগল। দরজার কাছে এসে ভিতরে। আলো ফেলেই শিস দিয়ে উঠল বিস্ময়ে। জেরি! দেখো এসে! ডাকল সঙ্গীকে। ঠিকই বলেছিলে, সোনা আছে এখানে! পড়ে আছে, তুলে নিয়ে গেলেই হলো! এমন সুন্দর দৃশ্য জিন্দেগীতে দেখিনি!
ওগুলো সব আমার! রেগে উঠল জিনা। এই দ্বীপ আর দুর্গ আমার মায়ের; এখানে যা আছে, সব আমাদেরই। ওই সোনার বার নিয়ে এসে জমা করেছিল আমার নানার-নানার-বাবা, তারপরেই তার জাহাজ ডুবে গেছে। এই সোনা তোমাদের নয়, ছিল না কোনকালে, হবেও না। এখনি গিয়ে বাবা-মাকে সব খুলে বলব, দ্বীপ আর বিক্রি করবে না, তোমরাও কিনতে পারবে না। খুব তো চালাকি করেছ! বাবাকে ভাল মানুষ পেয়ে ফাঁকি দিয়ে ম্যাপটা নিয়ে গেছ, দ্বীপ কেনার ফন্দি এঁটেছ!
নীরবে জিনার গরম বক্তৃতা শুনল লোকটা, খুক করে হাসল। আমাদেরকে রুখতে পারবে বলে মনে হয় না! দুটো শিশু তোমরা, এত শক্তি আছে? এখন তো আরও ভাল হলো, দ্বীপ কেনার টাকাটাও বাচল। বারগুলো নিয়ে গিয়ে নৌকায় তুলব, তারপর জাহাজে করে নিয়ে হাওয়া হয়ে যাব। এই পচা দ্বীপ আর দুর্গ দিয়ে কী কচুটা করব? হাসল আবার সে।
পারবে না! এগিয়ে এসে দরজা আটকে দাঁড়াল জিনা। এখুনি বাড়ি গিয়ে বাবাকে সব খুলে বলছি...
মাই ডিয়ার বালিকা, বাড়ি আর যেতে পারছ না, বলল দ্বিতীয় লোকটা, জিনাম কাঁধে হাত রাখতে গেল, ঝাড়া দিয়ে সরিয়ে দিল জি-ী। জোর করেই তার কাধ ধরে ঠেলে ভিতরে নিয়ে গেল লোকটা। তোমার ওই কুত্তাটাকে সরাও! নইলে গুলি করে মারব!
অবাক হয়ে দেখল জিনা, লোকটার হাতে বেরিয়ে এসেছে চকচকে বড়সড় একটা রিভলভার, রাফিয়ানের দিকে তাক করছে। থাবা দিয়ে তার হাত অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিল জিনা, রাফিয়ানের গলার চামড়ার কলার ধরে টেনে সরিয়ে আনল। এই, রাফি, চুপ! চুপ কর বলছি! কিছু হয়নি!

হয়নি বললেই হলো? রাফিয়ান কি এত বোকা? ঠিকই বুঝেছে সে, ঘাপলা একটা হয়েছে। চুপ তো করলই না, গোঙানি আরও বাড়িয়ে দিল। ভয়ানক হয়ে উঠেছে চেহারা। জিনা ছেড়ে দিলেই গিয়ে এখন লোকটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।
গুড, বলল লোকটা। এভাবেই আটকে রাখো, ছাড়লেই মরবে। ওটা। তোমাদের ক্ষতি করার ইচ্ছে নেই আমাদের। কিন্তু একটু এদিক ওদিক করলেই..যা বলি, শোনো, মোটরবোটে করে এসেছি আমরা, কাজেই বারগুলো এখুনি নিয়ে যেতে পারছি না। একটা জাহাজ আনতে যাচ্ছি, ততক্ষণ তোমরা আটকে থাকবে এখানে।
তোমাদের আরও দুজন সঙ্গী আছে, বুঝতে পেরেছি। চেঁচিয়ে দুজনের নাম ধরে ডাকছিলে, বলল অন্য লোকটা। কয়েক ঘণ্টার জন্যে ওদেরও আটকে থাকতে হবে এখানে। ভয় নেই, খাবার আর পানি রেখে যাব, না খেয়ে মরবে না। এক কাজ করো তো, পকেট থেকে কাগজ কলম বের করল সে। ছোট্ট একটা নোট লিখে দাও। লেখো, সোনার বারগুলো পেয়েছ। ওপরে যারা আছে তারা যেন শিগগির চলে আসে। চিঠি নিয়ে যাবে কুত্তাটা। খবরদার, কোনরকম চালাকির চেষ্টা করবে না।
করব না। মহাখাপ্পা হয়ে উঠেছে জিনা, সেটা ঢেকে রাখতে পারছে না। চালাকিও করব না, কিছু লিখবও না। কী ভেবেছ? আমাদেরকে বন্দি করে রাখবে? আবার বারগুলো নিয়ে যাবে? সেটি হতে দিচ্ছি না কিছুতেই।
ভাল চাও তো লেখো, গর্জে উঠল রিভলভারধারী। নইলে প্রথমে গুলি করব কুত্তাটাকে।
ফাটা বেলুনের মত চুপসে গেল জিনা। শীত শীত করে উঠল গা, ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে যেন রক্তস্রোত। না, না, গুলি কোরো না! ফিসফিস করে বলল সে।
বেশ, তা হলে লিখে ফেলো, কাগজ-কলম বাড়িয়ে ধরল লোকটা।
আমি পারব না! ফুঁপিয়ে উঠল জিনা, মুখ ঢাকল দুহাতে।
বেশ, তা হলে মরুক তোমাব কুত্তামিয়া, রিভলভারের মুখ ঘোরাতে শুরু করল সে। শীতল কণ্ঠস্বর।
রাফিয়ানের ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল জিনা, জড়িয়ে ধরে আড়াল করে রাখতে চাইল। না না, মেরো না, লিখছি! দাও, লিখে দিচ্ছি! কাঁপা হাতে কাগজ আর কলম নিয়ে লোকটার দিকে তাকাল সে, কী লিখব?
লেখো, আদেশ দিল ভারি কণ্ঠ, রবিন, মুসা, সোনার বারগুলো খুঁজে পেয়েছি আমরা। জলদি এসো। ব্যস, এই তো, আর কী?
নির্দেশমত লিখল জিনা। নাম সই করতে গিয়ে ভাবল এক মুহূর্ত, তারপর গোটা গোটা অক্ষরে লিখল: জরজিনা গোবেল। এই ইঙ্গিতটা যদি বুঝতে পারে দুজনে,

তা হলে উপায় একটা হলেও হতে পারে, আর কিছুই করার নেই।
লোকটার দিকে কড়া চোখে তাকিয়ে একটানা গোঁ গোঁ করে চলেছে রাফিয়ান, জিনা মানা করছে বলেই, নাহলে কখন আক্রমণ করে বসত! চিঠিটা ভাজ করে তার কলারে আটকে দিল জিনা, আরেকবার লোক দুটোর দিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছুটল।
জিনাকে ছেড়ে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না রাফিয়ানের, কিন্তু মনিবের কণ্ঠস্বরে এমন কিছু একটা রয়েছে, যাওয়াটাই উচিত বলে ধরে নিয়েছে সে। লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি ডিঙিয়ে ওপরে বেরিয়ে এল। বাতাসে নাক। তুলে গন্ধ শুকল, রবিন আর মুসার গন্ধ খুঁজছে। কোথায় ওরা?
মাটিতে গন্ধ পাওয়া গেল, যেখান থেকে হেঁটে গেছে মুসা আর। রবিন। গন্ধ শুঁকে শুঁকে অনুসরণ করে চলল রাফিয়ান। ছোট পাহাড়টার ধারে ওদের দেখতে পেল সে। ছুটে এসে দাঁড়াল কাছে। মুসা চিত হয়ে শুয়ে আছে, তার গালের ক্ষতটা লাল, তবে রক্ত পড়া থেমে গেছে।
রবিন পিছন করে বসে আছে, মুসাই আগে দেখতে পেল রাফিয়ানকে। আরে, রাফি! তাড়াহুড়ো করে উঠে বসল সে। তুই একা। পাতালে অন্ধকারে ভাল্লাগছে না বলে চলে এসেছিস?
মুসা, রাফিয়ানের কলারের দিকে চোখ রবিনের, ওটা কী? কাগজ মুচড়ে লাগিয়ে দিয়েছে! ...নিশ্চয় নোট-ফোট কিছু! জরুরি কোন খবর...
হাত বাড়িয়ে কাগজটা খুলে আনল সে, ভাজ খুলে পড়ল মুসাকে শুনিয়ে, সোনার বারগুলো খুঁজে পেয়েছি আমরা! জলদি এসো! ...জরজিনা গোবেল! ...জর-জিনা!
পেয়েছে! লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল মুসা। চলো চলো, দেখি! বসে আছ কেন?
কিন্তু রবিন উঠল না। চিঠিটার দিকে তাকিয়ে আছে, চিন্তিত।
কী ব্যাপার? আবার জিজ্ঞেস করল মুসা।
তোমার কাছে আশ্চর্য মনে হচ্ছে না? শুধু জিনা লিখলেই তো পারত, কিংবা জিনা পারকার! জরজিনা গোবেল লিখতে গেল কেন? ব্যাপারটা কেমন জানি লাগছে আমার! কোন ধরনের ইঙ্গিত? হুশিয়ারি?
দূর, কী বোকার মত কথা বলছ? হুশিয়ার করতে যাবে কেন এভাবে চিঠি লিখে?
মুসা, প্রণালীটা দেখে আসি। আমার সন্দেহ হচ্ছে। তুমি থাকো এখানে, আসছি এখনি।
কিন্তু একা একা বসে থাকার ইচ্ছে নেই মুসার, রবিনের পেছনে চলল। বলতে বলতে গেল, অযথাই সন্দেহ করছে রবিন, অহেতুক সময় নষ্ট করছে। কিন্তু

কিশোরের কাছে শিক্ষা পেয়েছে রবিন, সন্দেহ হলেই সেটা যাচাই করে দেখে সন্দেহমুক্ত হয়ে নেবে।
প্রণালীর মুখে মোটরবোটটা দেখতে পেল ওরা। ওরা ছাড়াও অন্য কেউ উঠেছে দ্বীপে, বুঝতে অসুবিধে হলো না। মুসার দিকে তাকাল রবিন, ফিসফিস করে বলল, দেখলে তো! জিনা আমাদেরকে হুশিয়ারই করেছে! আমার মনে হয় ওই লোকটা, যে দ্বীপ কিনছে, বাক্সটা চেয়ে নিয়ে গেছে জিনার বাবার কাছ থেকে নিশ্চয় ব্যাটা গিয়ে ঢুকেছে। ডানজনে, জিনা আর কিশোরকে আটকেছে। আমরা গেলে আমাদেরকেও আটকাবে। তারপর সোনা নিয়ে সরে পড়বে। আমাদের সবাইকে মেরে রেখে গেলেও অবাক হব না। ...তো, এখন কী করা?
হঠাৎ সচল হয়ে উঠল মুসা, রবিনের হাত ধরে তাকে টেনে আনল, এত প্রকাশ্য জায়গায় থাকা ঠিক না এখন। শত্রুরা দেখে ফেলতে পারে। প্রায় ছুটে চলে এল পাথরের ছোট ঘরটায়, যেটায় ঠাই নিয়েছে ওরা। এক কোণে বসে হাপাতে লাগল।
যে-ই এসেছে, ফিসফিস করল রবিন, জোরে বলতে ভয় পাচ্ছে, কিশোর আর জিনাকে আটকে ফেলেছে! কী করব ঠিক বুঝতে পারছি না! এখন ডানজনে যাওয়া উচিত না, বুঝতে পারছি, কিন্তু ওদেরকে উদ্ধারের কী উপায়? ..আরে, আরে, রাফিয়ান কোথায়!
ওরা যখন উত্তেজিত হয়ে ছোটাছুটি করছিল, তখনই এক সময় ফিরে গেছে রাফিয়ান, খেয়াল করেনি দুজনে। জিনাকে অন্ধকারে শত্রুর হাতে ফেলে এসেছে, রাফিয়ান এখানে স্বস্তি পায় কী করে? তাই ফিরে গেছে। কুকুরটা চলে যাওয়াতে অস্বস্তি আরও বাড়ল রবিন আর মুসার।
কী করবে বুঝতে পারছে না দুজনে, ভাবছে। রবিন বলল, নৌকা নিয়ে চলে যেতে পারি আমরা, সাহায্য নিয়ে আসতে পারি।
আমিও ভেবেছি কথাটা, বিষণ্ন কণ্ঠ গোয়েন্দা-সহকারীর, কিন্তু যাই কী করে? যা পথ, নৌকা বেয়ে নিয়ে যাওয়া আমার কম্ম নয়। পাথরে খোঁচা লাগিয়ে মরব।
মানুষের কণ্ঠস্বরে চমকে উঠল দুজনেই। ভাবেইনি, রাফিয়ান চলে গেছে; শত্রুরা দেখবে তার কলারে চিঠিটা নেই, তবুও আসছে না কেন ছেলে দুটো, দেখতে আসবেই। তা-ই এসেছে।
গলা শুনেই রবিনের হাত ধরে এক টানে তুলে টেনে নিয়ে দৌড় দিল মুসা। চত্বরে বেরিয়ে থমকে গেল ক্ষণিকের জন্যে, কোথায় যাবে? পরক্ষণেই দৌড় দিল কুয়ার দিকে। লুকানোর ওটাই একমাত্র জায়গা।
কুয়ার পাড়ে এসে রবিনকে ঠেলে দিল মুসা। জলদি করো, মই বেয়ে নেমে যাও! কুইক!

দ্বিধা করছে রবিন, আবার তাড়া দিল তাকে মুসা।
লোকগুলোর হাতে পড়লেও বাঁচবে কিনা জানা নেই, কুয়ায় নামলে। আশা অন্তত আছে। আর দেরি করল না রবিন, মই বেয়ে নেমে গেল। তার পিছনেই নামল মুসা।
তুমি পাথরটায় বসো, মুসা বলল। তোমার ভার সইতে পারবে, কিন্তু আমাকেসহ পারবে না। আমি মই ধরেই ঝুলে থাকছি।
ওপরে দুজন মানুষের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। রবিন আর মুসার নাম ধরে ডাকাডাকি করছে, কুয়ার একেবারে কাছেই।
মুসা, রবিন, ডাকল একটা ভারি কণ্ঠ, কোথায় তোমরা? তোমাদের বন্ধুরা ডাকছে। দারুণ খবর আছে। মুসাআআ! রবিইইন!
বাহ্, কী মধুর ডাক! চাপা গলায় বলল মুসা। তা, বাবা, তোমরা। এসেছ কেন? জিনা কিংবা কিশোরই তো আসতে পারত
চুপ! শুনতে পাবে! সাবধান করল রবিন।
আরও কয়েকবার ডাকল লোক দুটো, রেগে যাচ্ছে, ওদের কণ্ঠস্বরেই বোঝা যায়। গেল কোথায়! ...নৌকাটাও তো রয়েছে আগের জায়গায়ই। কোথাও লুকিয়ে পড়েছে! ...কিন্তু সারা দিন তো ওদের জন্যে বসে থাকা। যায় না।
চলো, কিছু খাবার আর পানি দিয়ে আসি ছেলেমেয়ে দুটোকে, বলল অন্য লোকটা। পাথরের ঘরটায় অনেক আছে, বোধহয় ছেলেরাই নিয়ে এসেছে। অর্ধেক দিয়ে আসব, অর্ধেক থাকবে। যে দুটো লুকিয়েছে, ওদের জন্যে। কি বলো?
যদি পালায়?
নৌকাটা নিয়ে যাব, পালাতে পারবে না।
তা হলে ঠিক আছে। চলো, দেরি হয়ে যাচ্ছে। যত তাড়াতাড়ি পারি। এসে বারগুলো নিয়ে যাওয়া দরকার। কখন আবার কী বিপত্তি ঘটে যায়, কে জানে!
ওটা কী? .কোনটা? ও, ওটা...কুয়া। ধড়াস করে এক লাফ মারল। রবিনের হৃৎপিণ্ড, কিন্তু পরের কথাটায়ই আবার স্বস্তি ফিরল। কেন, ওই কুয়ায় লুকিয়ে আছে ভেবেছ নাকি? অসম্ভব! যা গম্ভীর হয় এসব কুয়া:..চলো, চলো, যাই।
চলে গেল লোক দুটো। আরও খানিকক্ষণ ওদের কথাবার্তা শোনা গেল দূর থেকে, বোধহয় খাবার নিচ্ছে, কিশোর আর জিনাকে দিয়ে। আসার জন্যে। তারপর একেবারে নীরব হয়ে গেল।
এরপরও অনেকক্ষণ বেরোনোর সাহস পেল না দুই গোয়েন্দা। মই ধরে ঝুলে থাকতে থাকতে হাত ব্যথা হয়ে গেল মুসার, শেষে আর না পেরে বলল, এবার বোধহয় গেছে! চলো, উঠি। আমি আর ধরে থাকতে পারছি না!

চলো।
কুয়ার মুখে মাথা বের করে উঁকি দিল মুসা, চারপাশে দেখল। নির্জন। উঠে এল সে। তার পিছনে রবিন। মোটরবোটের ইঞ্জিনের শব্দ শোনা গেল। দুর্গের এক ধারে চলে এল দুজনে, দেখল বোটটা চলে। যাচ্ছে। তাতে দুজন লোক। কিন্তু নৌকাটা নিল না কেন ওরা? বলল তো নিয়ে যাবে! আগের জায়গায়ই বাধা রয়েছে ফগের নৌকা! নিতে পারল না, নাকি কোন কারণে মত বদলাল ব্যাটারা!
গেছে! রবিন বলল। এবার?
গেছে, কিন্তু আবার আসবে, কিশোরের অনুকরণে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল মুসা-বোধহয় ধারণা হয়েছে, এভাবে চিমটি কাটলে ব্রেনটা ঠিকমত কাজ করে। নৌকাটা নিয়ে যায়নি যখন, পালাতে পারব আমরা। চলো, জিনা আর কিশোরকে মুক্ত করি।
ছুটে এল ওরা সিঁড়িমুখের কাছে। থমকে দাঁড়াল। পাথর ফেলে মুখ রুদ্ধ করে দিয়ে গেছে ব্যাটারা! প্রথমে মস্ত এক পাথরের চাই ফেলেছে, তার ওপর রেখেছে বড় বড় পাথর-নিচ থেকে ঠেলে খুলে যাতে কোনমতেই বেরোতে না পারে কিশোর আর জিনা।
এগুলো সরানো অসম্ভব! হতাশ হয়ে মাথা নাড়ল মুসা। আমিও পারব না! অন্য কোন পথে ঢুকতে হবে। কিন্তু কোথায় পথ?
দাঁড়াও দাঁড়াও, হাত তুলল রবিন। টাওয়ারের কাছে আরেকটা মুখ আছে, নকশায় দেখেছি! চলো, দেখি, খুঁজে বের করা যায় কিনা!
ডান পাশের টাওয়ারের কাছে চলে এল দুজনে। টাওয়ার বলতে এখন আর কিছু নেই, খালি পাথর ভাঙা স্তূপ। একটু চেষ্টা করেই অসম্ভব। চেষ্টা বাদ দিল ওরা, এর মাঝে সিঁড়িমুখ খুঁজে পাওয়ার কোন আশা নেই, সময়ও নেই হাতে।
হায় হায়! কী করি এখন! মাথায় হাত দিল মুসা। কী করে বের করি ওদের! রবিন, তোমার মাথায় কিছু আসছে না?
কিচ্ছু না!
একটা পাথরের ওপর ধপ করে বসে গালে হাত রাখল রবিন। ভীষণ উদ্বিগ্ন। লাল, মুখ আরও লাল হয়ে উঠেছে। হঠাৎ উজ্জ্বল হলো তার চেহারা। মুসা, পেয়েছি! হাতে তুড়ি দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। এক কাজ করতে পারি না? কুয়া দিয়ে নেমে যেতে পারি না? কুয়াটা সিঁড়িঘরের কাছাকাছিই আরেকটা ঘরের ভেতর দিয়ে গেছে। ফোকরও রয়েছে কুয়ার দেয়ালে। ওখান দিয়ে ঘরে বেরোতে পারি আমরা! পারি না? শুধু পাথরটাই একটা বাধা, ওটা কোনভাবে পেরিয়ে যেতে পারলেই হলো!

ভেবে দেখল মুসা। তক্ষুণি কোন মন্তব্য না করে রবিনকে নিয়ে চলে। এল কুয়ার পাড়ে। ভেতরে উঁকি দিয়ে ভাবল কয়েক মুহূর্ত। তারপর বলল, ঠিক বলেছ। পাথরের ফাঁক দিয়ে গলে নেমে যেতে পারব চেষ্টা করলে।
তা হলে আর দেরি কী? চেষ্টা শুরু করে দিই!
এখন মইটা ততদূর পর্যন্ত থাকলে হয়, তার আগেই যদি শেষ হয়ে যায় তো আর হলো না! রবিনের দিকে তাকাল মুসা। আমি চেষ্টা করে দেখি। তুমি থাকো এখানে। দুজনের ভার অনেক বেশি। মই ছিঁড়ে খসে পড়ে মরার ইচ্ছে নেই। রবিনকে বাধা দেয়ার সময় না দিয়ে মই ধরে, নামতে শুরু করল সে।
সাবধান, মুসা, খুব সাবধান! চেঁচিয়ে হুশিয়ার করল রবিন ওপর থেকে। আরে, শোনো, শোনো, দড়ি নিয়ে যাও! কাজে লাগতে পারে।
ঠিক, ঠিক বলেছ! থেমে গেল মুসা, উঠতে শুরু করল আবার। দৌড় দাও। নিয়ে এসো।
দড়ি নিয়ে এল রবিন।
আমার জন্যে ভেব না, হাসল মুসা। এসব ঝোলাঝুলি আমার অভ্যেস আছে, খুব ভাল করেই জানো। আর যেভাবেই হোক, হাত পিছলে পড়ে মরব না।
সাদা হয়ে গেছে রবিনের মুখ। উত্তেজনা আর ভয়ে থরথর করে কাঁপছে সে। দাঁড়াতে পারছে না, শেষে বসেই পড়ল একটা পাথরের ওপর।
রবিন, শুনতে পাচ্ছ? কুয়ার ভেতর থেকে ডাক শোনা গেল মুসার। আমি ঠিক আছি।
হ্যাঁ, মুসা, জবাব দিল রবিন। সাবধানে থেকো, ভাই, খুব। সাবধান! তাড়াহুড়ো কোরো না! মই কি আরও নিচে আছে?
তাই তো মনে হয়, অনেক নিচ থেকে এল মুসার জবাব। না না, আর নেই, শেষ! ভেঙে খসে গেছে, না এখানেই শেষ, বোঝা যাচ্ছে না। চিন্তা নেই, আমি দড়ি বাঁধছি।
নীরবতা, দড়ি বাধছে বোধহয় মুসা।
হ্যাঁ, তাই করছে গোয়েন্দা-সহকারী। দড়ির এক মাথা শক্ত করে পেঁচিয়ে বাধল মইয়ের একটা ডাণ্ডার সঙ্গে। তারপর ঝুলে পড়ল দড়ি ধরে। চেঁচিয়ে বলল, রবিন, দড়ি বেয়ে নামছি! ঠিকই আছি, ভেব না।
রবিন কিছু একটা বলল, কিন্তু বোঝা গেল না এত নিচ থেকে। নেমে চলল মুসা। নিয়মিত ব্যায়াম করে সে, কাজেই কাজটা সহজই তার জন্যে। অন্তত এখন পর্যন্ত, পরে কী হবে জানা নেই। যা হয় হোক গে, পরের ভাবনা পরে, আগে ফোকরটা খুঁজে বের করা দরকার।

অন্ধকারে কতক্ষণ নামল মুসা, বলতে পারবে না। একটা সময় মনে হলো, আর নামার দরকার নেই, ফোকরের কাছে পৌচেছে। এক হাতে দড়ি ধরে ঝুলে থেকে আরেক হাতে টর্চ নিয়ে জ্বালল। আলো ফেলে দেখল কুয়ার দেয়ালে। তার অনুমান ঠিকই। ঠিক মাথার ওপরে রয়েছে। ফোকর, ছাড়িয়ে নেমে এসেছে। টর্চটা জ্বলন্ত অবস্থায়ই দাতে কামড়ে ধরে আবার উঠতে শুরু করল সে। ফোকরের কাছে পৌঁছে ধারে পা বাধিয়ে দিল। দোল দিয়ে শরীরটাকে নিয়ে এল কুয়ার দেয়ালের কাছে। দক্ষ দড়াবাজিকরের মত শরীর বাঁকিয়ে-চুরিয়ে ঢুকিয়ে ফেলল ফোকরের ভেতরে। আর বেশি কষ্ট করতে হলো না, নেমে পড়ল ঘরের মেঝেতে। দড়ির মাথাটা মেঝেতে ফেলে তার ওপর একটা পাথর চাপা দিয়ে দিল, যাতে দড়িটা কোনভাবে ফোকর গলে বেরিয়ে ঝুলে না পড়ে কুয়ার ভিতরে।

একটা সুড়ঙ্গ-মুখের পাশের দেয়ালে আশ্চর্যবোধক চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। এগিয়ে এসে ভিতরে আলো ফেলল মুসা। হ্যাঁ, আছে, সুড়ঙ্গের দেয়ালেও রয়েছে চিহ্ন। ঢুকে পড়ল সে। সুড়ঙ্গ পেরিয়ে আরেকটা ঘরে এসে ঢুকল। চেঁচিয়ে ডাকল জিনা আর কিশোরের নাম ধরে।

জবাব নেই।

খুঁজতে খুঁজতে আরেকটা সুড়ঙ্গ-মুখের পাশের দেয়ালে চক দিয়ে আঁকা চিহ্ন চোখে পড়ল! ঢুকে পড়ল মুসা, পেরিয়ে এল এই সুড়ঙ্গটাও। আরেকটা ঘরে ঢুকল। ওপাশের দেয়ালে বিশাল এক দরজা, দেখামাত্র চিনল সে। এটাই কুপিয়েছিল কিশোর, এই দরজার কাঠের চিলতে লেগেই গাল কেটেছে মুসার। দরজা বন্ধ, নিচে আর ওপরে বড় বড় ছিটকিনি, তুলে দেয়া হয়েছে।

দরজার কাছে এসে কিশোরের নাম ধরে ডাকল মুসা।

পরক্ষণেই শোনা গেল জবাব, রাফিয়ানের চাপা উত্তেজিত চিৎকার। তার পর-পরই কিশোরের কথা শোনা গেল। দরজার ওপাশেই রয়েছে ওরা।

ছিটকিনি খুলে দিল মুসা। পাল্লা খুলতেই এক লাফে বেরিয়ে এল রাফিয়ান, তার কাঁধে দুপা তুলে দিয়ে গাল চেটে দিল।

উহ! আরিহ্! আরে, ব্যথা পাচ্ছি! ...আমার গাল কাটা! আর্তনাদ করে উঠল মুসা।

বেরিয়ে এল কিশোর আর জিনা।

হাসল মুসা, টর্চের আলোয় ঝিক করে উঠল তার ঝকঝকে সাদা দাঁত। তারপর, জিনা বেগম, মুক্তি পেয়ে কেমন লাগছে?

দারুণ! জবাবটা দিল কিশোর।

পাগল হয়ে উঠেছে রাফিয়ান, মুসাকে ঘিরে নাচছে, আর ঘেউ ঘেউ করছে! প্রতিধ্বনি কান ঝালাপালা করে দিচ্ছে।

আরে, এই, রাফি, থাম তো, বাপু! ধমক দিল জিনা। তুই একাই বেরিয়েছিস, নাকি আমরাও? থাম, থাম!
ঢুকলে কী করে? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
অল্পকথায় সব বলল মুসা।
কুয়ার ভেতর দিয়ে...দড়ি বেয়ে নেমেছ! বিশ্বাস করতে পারছে ্না জিনা। তুমি মুসা আমান...ঘোড়াকে ভয় পাও...অথচ...
বিপদে পড়লে ভয়ডর ওর কোথায় চলে যায়! বাধা দিয়ে বলল কিশোর। তখন ওর মত দুঃসাহসী হয়ে উঠতে খুব কম লোককেই দেখেছি! মুসার দিকে ফিরল। আসল কথা বলো। ব্যাটারা কোথায়?
জানাল মুসা।
পালানো দরকার! ব্যস্ত হয়ে উঠল কিশোর। রিভলভার আছে। ব্যাটাদের কাছে। আবার এসে পড়ার আগেই ভাগব। কোন পথে বেরোব?
এসো, ডাকল মুসা। আগে আগে রওনা হলো।
কুয়াঘরে চলে এল ওরা। দড়ি দেখিয়ে বলল মুসা, ওটা ধরেই। বেরোতে হবে আবার।
আমি পারব না, বাবা! দুহাত তুলল জিনা। তাছাড়া রাফিয়ান...
পারতেই হবে, জোর দিয়ে বলল কিশোর। এছাড়া আর কোন পথ নেই। যাও, দেরি কোরো না। রাফিয়ান আপাতত এখানেই থাক, পরে সুযোগ করে এসে নিয়ে যাব।
আরেকবার দ্বিধা করল জিনা, তারপর এগিয়ে গিয়ে দড়ি ধরে মাথা ঢুকিয়ে দিল ফোকরে। তাকে বেরোতে সাহায্য করল কিশোর আর মুসা।
একসঙ্গে তিনজনে দড়ি ধরে ঝুললে ছিঁড়ে যাওয়ার ভয় আছে, তাই একজন একজন করেই চলল। জিনা মই ধরে সেকথা চেঁচিয়ে জানাতেই মুসাকে ঠেলে দিল কিশোর।
রাফিয়ানকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রেখে সব শেষে বেরোল সে। নিরাপদেই বেরিয়ে এল বাইরে, খোলা আকাশের নিচে।
আনন্দে ধেই ধেই করে নাচছে রবিন, চোখে পানি। মুসা আর কিশোরকে জড়িয়ে ধরে গালে চুমু খেয়ে ফেলল। কোন কিছু না ভেবেই
এগিয়ে গেল জিনার দিকে, লাফ দিয়ে সরে গেল জিনা। হা হা করে হেসে। উঠল মুসা। থামলে কেন, রবিন?
লাল হয়ে গেল রবিনের গাল, জিনাও লাল, দুজনেই লজ্জা পেয়েছে।
চলো, জলদি যাই, হাসিমুখে তাড়া দিল কিশোর। ব্যাটারা এসে পড়তে পারে, যে-কোন সময়ে!

প্রায় ছুটে পাহাড় ডিঙাল ওরা, ছোট্ট বন্দরে নামল। নৌকার কাছে। এসেই থমকে গেল; বুঝল, কেন নৌকা ফেলে গেছে শত্রুরা। দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে যাওয়ার ঝামেলা পোহায়নি, তার চেয়ে আরও অনেক সহজ কাজটা করেছে, দাঁড় দুটো নিয়ে গেছে।

এবারে কী করি! চিন্তিত হয়ে পড়ল কিশোর।

মুক্তির আনন্দ, উবে গেল, মুখ কালো হয়ে গেল সবারই।

জাহাজ আনতে গেছে, জিনা বলল। খুব তাড়াতাড়ি করবে ওরা। দাঁড় ছাড়া প্রণালী থেকেই বেরোতে পারব না, জেলেদের যে ডাকব সে উপায়ও নেই। এখান ক হাজার চেঁচামেচি করলেও ওদের কানে যাবে না, অনেক দূরে রয়েছে। তার মানে, লোকগুলোকে ঠেকাতে পারছি না আমরা!

চুপ! হাত তুলল কিশোর। ধীরে ধীরে বসে পড়ল একটা পাথরে। একটা আইডিয়া আসছে আমার মাথায়, চুপচাপ ভাবতে দাও! নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটা শুরু হয়ে গেল তার।

নীরব হয়ে গেল সবাই। উদ্বিগ্ন হয়ে তাকিয়ে রয়েছে। গোয়েন্দাপ্রধানের দিকে, কী আইডিয়া আসছে তার মাথায়?

মনে হয় কাজ হবে, হঠাৎ ঘোর ভাঙল যেন কিশোরের। শোনো, ওদের ফেরার অপেক্ষায় থাকব আমরা। এসে কী করবে ওরা? সিঁড়িমুখের পাথর সরিয়ে নিচে নামবে। দরজাওয়ালা ঘরটায় যাবে; ভাববে, আমরা ওখানেই রয়েছি, সেজন্যেই যাবে। এখন কথা হলো, তার আগেই যদি কেউ একজন লুকিয়ে থাকি আশপাশে, যেই ঢুকল ব্যাটারা অমনি বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে ছিটকিনি তুলে দিই? তারপর ওদের মোটরবোট নিয়ে চলে যেতে পারব খুব সহজে। কী মনে হয়?

আইডিয়াটা চমৎকার মনে হলো মুসার কাছে, কিন্তু জিনা আর রবিনের দ্বিধা রয়েছে।

আমাদের কাউকে আবার নিচে নামতে হবে, জিনা বলল। দরজাটা বন্ধ করে তার কাছেপিঠে লুকিয়ে থাকা গেলই না হয়। কিন্তু দুজন লোক যে একই সঙ্গে ভেতরে ঢুকবে, তার নিশ্চয়তা কী? আর যদি ঢোকেও, আমাদেরকে না দেখলে হুশিয়ার হয়ে যাবে ওরা। তখন ওদেরকে ভেতরে রেখে দরজা আটকানো খুব কঠিন হবে, চিতার ক্ষিপ্রতা দরকার। পারা যাবে কিনা, যথেষ্ট সন্দেহ আছে! যদি না পারি, তখন কী ঘটবে? আরও বিপদে পড়ব না? ওরা তখন উঠে এসে সব্বাইকে খুঁজে বের করবে।

তা ঠিক, চিবুক চুলকাল কিশোর। ধরা যাক, মুসা নিচে গেল, দরজা সময়মত আটকাতে পারল না, লোকগুলো উঠে এল আমাদেরকে খুঁজতে...আরেক কাজ করলেই তো পারি। লোকগুলো পাথর সরিয়ে নেমে গেলেই ওপর থেকে সিভিমুখ

আটকে দেব আমরা পাথর দিয়ে। মুসা তাদের আটকাতে না পারলেও আমরা পারব।
তা হলে মুসারই বা যাওয়ার দরকার কী? রবিন প্রশ্ন করল।
তা হলে দরজাটা আবার আটকে আসবে কে? দরজা খোলা দেখলেই ছুটে ওপরে চলে আসবে ওরা, আমরা পাথর রাখারও সময় পাব না। তা ছাড়া, এখনই শিওর হয়ে যাচ্ছি কেন, মুসা ওদেরকে ঘরে বন্দি করতে পারবে না? আর সিঁড়িমুখ আটকানোর কথা বললাম, সেটা তত নিরাপদ নয়। নিচ থেকে ঠেলে দুজন শক্তিশালী শোক পাথর সরিয়ে ফেলতেও পারে। তারচেয়ে ঝুঁকিটা নেয়াই ভাল নয়?
হয়তো! জিনা বলল। কিন্তু মুসা বেরোবে কী করে?
হাসল কিশোর। যে পথে ঢুকে বের করে এনেছে আমাদের। আমিই যেতাম, কিন্তু কাজটা আমার চেয়ে মুসা অনেক ভাল পারবে। যার কাজ তাকেই সাজে, সে-ই যাক। কি, মুসা, আপত্তি আছে?
আপত্তি? হাসল মুসা। কুয়াটা এখন ডালভাত হয়ে গেছে আমার কাছে। তিনবার নেমেছি আর উঠেছি। আরেকবারে কিছু হবে বলে মনে হয় না। একটু থেমে বলল, আমিই নামব তুমি ওপরে থাকো। আমি আটকা পড়লে অন্যদেরকে নিরাপদে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে তোমাকে দরকার। তা ছাড়া ওপরে আরও অনেক কিছু ঘটতে পারে; সেসব তুমিই সামাল দিতে পারবে, আমি পারব না। বেকায়দায় পড়লে ভেউ ভেউ করে কান্না ছাড়া আর কিছু করতে পারব না আমি…
বাহ, বাহ, আমাদের মুসা আমান আজকাল বিনয়ের অবতার হয়ে গেছেন! হেসে টিপ্পনী কাটল রবিন।
সবাই হাসল।
আর খানিক আলাপ-আলোচনার পর ঠিক হলো, মুসাই নামবে।
ঘর থেকে খাবার এনে পাহাড়ের মাথায় বসে খেল ওরা। চোখ সাগরের দিকে।
ঘণ্টা দুয়েক পর একটা বড় মাছধরা জাহাজ দেখা গেল, দ্বীপের দিকেই আসছে। প্রণালীর মুখের কাছ থেকে দূরে থেমে গেল।
আসছে! লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। মুসা, জলদি, গিয়ে ঢোকো!
ছুটে চলে গেল মুসা।
অন্যদের দিকে ফিরল কিশোর। জোয়ার আসতে দেরি আছে। নিচে, ওই যে ওই পাথরগুলোর আড়ালে লুকানো যাবে এখন।
লুকিয়ে পড়ল সবাই। কানে আসছে বোটের ইঞ্জিনের ভারি ঝকঝক ঝকঝক! বন্দরে নোঙর করল বোট, লোকের কথা শোনা গেল, দুজন নয়, বেশি। পাহাড়

বেয়ে ওদের উঠে যাওয়ার শব্দও কানে এল।
আস্তে করে মাথা উঁচু করে উঁকি দিল কিশোর। লোকগুলোকে দেখা যাচ্ছে না, নিশ্চয় চত্বরে উঠে গেছে। চাপা গলায় সঙ্গীদেরকে ডাকল, এই, বেরিয়ে এসো!
পাহাড়ের ওপরে কতগুলো পাথরের স্কুপের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। ওরা। এখান থেকে চত্বরের অনেকখানি চোখে পড়ে, সিঁড়িমুখটাও।
কাউকে দেখা গেল না। সিঁড়িমুখের পাথর ইতস্তত ছড়ানো।
ঢুকে পড়েছে! এসো! পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে দৌড় দিল কিশোর। পেছনে অন্যরা।
প্রায় নিঃশব্দে সিঁড়িমুখের কাছে এসে দাঁড়াল ওরা। মস্ত একটা চ্যাপ্টা পাথর পড়ে আছে, ওটা দিয়েই মুখ ঢাকা হয়েছিল। সরানো হয়েছে। ওটাকে আবার সিঁড়িমুখে ফেলতে হবে।
ঠেলতে শুরু করল ওরা। বেজায় ভারি পাথর। তিনটে ছেলেমেয়ের জন্যে বেশিই। গলদঘর্ম হয়ে উঠল, জিভ বেরিয়ে পড়ল, হাঁপাচ্ছে জোরে জোরে পাথর সরাতে গিয়ে। কিন্তু নড়তে চাইছে না জগদ্দল পাথর, গ্যাট হয়ে বসে আছে।
বোঝা গেল, ওটা সরানোর সাধ্য ওদের নেই। শেষে আরেকটু ছোট তিনটে পাথর দিয়ে কোনমতে মুখটা বন্ধ করে এসে কুয়ার পারে বসে হাঁপাতে লাগল। কী জানি করছে মুসা নিচে, আল্লাহ মালুম! কিশোর বিড়বিড় করল।
অনেক কিছুই করেছে মুসা, এখন লুকিয়ে বসে আছে একটা অন্ধকার সুড়ঙ্গে। আরেকটা সুড়ঙ্গে কথা বলার আওয়াজ শুনল সে, কান পেতে রইল। একটু পরেই সুড়ঙ্গের মুখে আলো দেখা গেল। কথা বলতে। বলতে বেরিয়ে এল তিনজন লোক।
তিনজন! সর্বনাশ হয়েছে! পরিকল্পনা আর কাজে লাগানো যাচ্ছে না!–শঙ্কিত হয়ে পড়ল মুসা।
ওই যে, ওই দরজাটাই, হাত তুলে দেখিয়ে বলল ভারি কণ্ঠ। ওতেই রয়েছে সোনার বারগুলো। ছেলেমেয়ে দুটো, আর কুত্তাটাও।
হ্যাঁ, তাই ভাবতে থাকো, ইবলিসের বাচ্চারা! মনে মনে হাসল মুসা। আছে তোমাদের জন্যে বসে, বসে বসে আঙুল চুষছে, দেখো
ছিটকিনি খুলল লোকটা। পাল্লা ঠেলে খুলে ঢুকে পড়ল। তার পিছনে ঢুকল আরেকজন। তৃতীয় লোকটা বাইরেই দাঁড়িয়ে রইল।
হঠাৎ চিৎকার শোনা গেল ভিতর থেকে, জেরি, ওরা নেই!
লাফ দিয়ে উঠল বাইরে দাঁড়ানো লোকটা, ছুটে ঢুকে পড়ল।
বিদ্যুৎ খেলল মুসার শরীরে, চোখের পলকে ছুটে এসে দড়াম করে লাগিয়ে দিল দরজা। ঠেলেঠুলে লাগিয়ে দিল নিচের ছিটকিনি।

কিন্তু দরজা বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সচল হয়ে উঠল ভিতরের লোকগুলোও। সব শেষে ঢুকেছে যে লোকটা, জেরি, কাধ দিয়ে জোরে ধাক্কা মারল দরজায়। মুসা সবে তখন নিচের ছিটকিনিটা লাগিয়েছে। থরথর করে কেঁপে উঠল দরজা। সে ওপরের ছিটকিনিটা লাগানোর আর সময় পেল না, তার আগেই এক যোগে এসে তিনজন লোক ঝাঁপিয়ে পড়ল পাল্লায়; সইতে পারল না পুরানো ছিটকিনি; আংটা ছিঁড়ে ছুটে খুলে গেল ওটা। খুলে গেল দরজা।
ছুট দিল মুসা। ঢুকে পড়ল সুড়ঙ্গে। পেছনে তাড়া করে এল লোকগুলো।
কুয়াঘরে চলে এল মুসা। সুড়ঙ্গের ভিতরে লোকগুলোর হৈ-চৈ শোনা যাচ্ছে। মুহূর্ত দ্বিধা না করে ফোকরে মাথা ঢুকিয়ে দিল সে। দড়ি ধরে ঝুলে পড়ল কুয়ায়। সারা শরীর কাঁপছে থরথর করে, ওই অবস্থায়ই দড়ি বেয়ে উঠে চলল। আশা করছে, ফোকরটা লোকগুলোর চোখে পড়লেও কিছু বুঝতে পারবে না। কারণ ওরা জানে না কুয়াটার অস্তিত্ব।
আটকে থাকা পাথরটার কাছে এসে হাত থেকে মই প্রায় ছুটেই যাচ্ছিল মুসার। ধড়াস করে বোয়াল মাছের মত এক লাফ মারল হৃৎপিণ্ড। ঘামে ভিজে পিচ্ছিল হয়ে আছে হাত। অবশ হয়ে আসছে শরীর, পরিশ্রমে, উত্তেজনায়।
অবশেষে নিরাপদেই বেরিয়ে এল মুসা। উদ্বিগ্ন বন্ধুদেরকে দেখে হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল, হয়নি! পারলাম না!
যা বোঝার বুঝে নিল কিশোর। চেঁচিয়ে উঠল, জলদি, দৌড় দাও। নৌকার দিকে! আর কোন উপায় নেই!
রাফিয়ান! জিনার গলা কাঁপছে। ও তো নিচে রয়ে গেছে!
ওর জন্যে ভাবনা নেই, মুসা অভয় দিল। ও নিরাপদেই থাকবে। লুকিয়ে রেখে এসেছি। এসো, যাই!
তোমরা যাও, আমি আসছি, বলেই পাথরের ঘরটা, যেতে মালপত্র রাখা আছে, সেদিকে দৌড় দিল কিশোর।
কোথায় গেল! জিনা অবাক।
নিশ্চয় কোন কাজ আছে! চলো, চলো! তাড়া দিল রবিন, দৌড় দিল নৌকার দিকে।
লাফিয়ে নৌকায় উঠল জিনা আর রবিন। মোটরবোটের পাটাতনে দাঁড় দুটো আবিষ্কার করল মুসা। আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল, পেয়েছি! দাঁড় পেয়েছি!
কিশোর এসে পড়েছে, হাতে কুড়াল।
ওটা দিয়ে কী হবে? জানতে চাইল জিনা।
জবাব দিল না কিশোর। লাফিয়ে উঠে পড়ল মোটরবোটে। ধাই করে কুড়াল বসিয়ে দিল তেলের ট্যাঙ্কে। একের পর এক কোপ মেরে চলল সে, যেন পাগল

হয়ে গেছে। দেখতে দেখতে একেবারে অকেজো করে দিল ইঞ্জিন, আর কয়েক কোপে বোটের তলা খসিয়ে দিয়ে লাফিয়ে নামল তীরে। ছুটে এসে লাফিয়ে উঠল নৌকায়। জলদি নৌকা ছাড়ো, জিনা!

প্রণালীর মাঝামাঝি চলে এসেছে নৌকা, এই সময় পাহাড়ের মাথায় লোক তিনজনকে দেখা গেল। ঢাল বেয়ে লাফাতে লাফাতে নিচে নামল। ওরা, বোটের কাছে এসে থমকে গেল। মুঠো পাকিয়ে চেঁচিয়ে বলল জেরি, বিচ্ছুর গোষ্ঠী। দাঁড়াও, আগে ধরে নিই, তারপর দেখাব মজা!

জিনার তামাটে চোখে আলোর ঝিলিক। কী করে দেখাবে? আগে আমাদের কাছে আসতে হবে তো?

তীরে দাঁড়িয়ে নিষ্ফল আক্রোশে ফুঁসতে থাকল লোকগুলো, মুঠো পাকিয়ে দেখাচ্ছে আর গাল দিচ্ছে। কিন্তু তাতে কী-ই এসে যায় গোয়েন্দাদের!

জিনা অবশ্য আনন্দে পুরোপুরি সামিল হতে পারছে না। রাফিয়ানের জন্যে ভাবছে।

মুসা বলল, আরে, বাবা, এত ভাবছ কেন? নিজের বুকে থাবা দিয়ে বলল, এই মুসা আমানের ওপর আরেকটু ভরসা রাখো না। আমি বলছি, আমাদের রাফিয়ান নিরাপদেই আছে। ভরপেট খেয়ে নিশ্চয় এখন সে সুখস্বপ্ন দেখছে!

খোলা সাগরে বেরিয়ে এল নৌকা। এখান থেকে ছোট বন্দরটা দেখা যায় না, লোক তিনজনকেও চোখে পড়ছে না। মাছধরা জাহাজের রেলিঙে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে এক খালাসী। ছেলেদেরকে দেখে ডাকল, এইই, তোমরা দ্বীপ থেকে এসেছ?

জবাব দিয়ো না, নিচু গলায় বলল কিশোর।

সবাই চুপ করে রইল।

এই, ছেলেরা, আবার ডাকল লোকটা, তোমরা দ্বীপ থেকে এসেছ? গোবেল দ্বীপ?

এবারেও সবাই চুপ। তাকালও না মুখ তুলে।

এই, জবাব দিচ্ছ না কেন? ধমকে উঠল লোকটা।

তবুও কথা বলল না ছেলেরা, যেন কানেই যাচ্ছে না লোকটার কথা।

লোকটা শিওর হয়ে গেল, ছেলেগুলো দ্বীপ থেকেই এসেছে। ঝট করে সোজা হয়ে দাঁড়াল, নিশ্চয় সন্দেহ করেছে, সব কিছু ঠিকঠাকমত ঘটেনি দ্বীপে, কোন গণ্ডগোল হয়েছে। তাড়াতাড়ি ডেক থেকে নিচে নেমে গেল সে।

যদি আমাদেরকে ধরতে আসে? মুসার উদ্বিগ্ন কণ্ঠ।

আসবে না, কিশোর বলল। নৌকা নামিয়ে প্রথমে দ্বীপে দেখতে যাবে কী হয়েছে। আমি হলে তাই করতাম। তারপর হয়তো আমাদের ধরার চেষ্টা করবে।

করলেও আর পেরেছে! মুখ বাঁকাল জিনা। ততক্ষণে আমরা পগার পার।

কিন্তু সোনাগুলো তো নিয়ে যেতে পারবে, রবিন বলল।
তা-ও পারবে না, মাথা নাড়ল কিশোর। নৌকা নিয়ে লোকটা দ্বীপে যাবে, বন্দরটা খুঁজে বের করবে, সঙ্গীদের কথা শুনবে, সোনাগুলো বের করে এনে নৌকায় তুলবে, অনেক সময়ের ব্যাপার। এত সময় নেই ওদের হাতে। জানে, যে-কোন মুহূর্তে পুলিশের বোট নিয়ে হাজির হয়ে যেতে পারি আমরা।

.

জিনার মা-বাবাকে পরিস্থিতি বোঝাতে বিশেষ সময় লাগল না। থানায় ফোন করলেন মিস্টার পারকার। পুলিশের পেট্রল বোটে করে ছেলেদের সঙ্গে তিনিও চললেন দ্বীপে।
প্রণালীর কাছে মাছধরা জাহাজটা নেই, দিগন্তের কোথাও দেখা গেল না ওটা। লেজ গুটিয়ে পালিয়েছে।
বোট থেকে ডিঙি নামিয়ে প্রণালী দিয়ে ছোট বন্দরে চলে এল ওরা। তেমনিভাবে পড়ে রয়েছে মোটরবোটটা, অর্ধেকের বেশি পানির তলায়।
তবে, সোনার বার সব নেই, বেশ কিছু গায়েব। একেবারে খালি হাতে যায়নি ডাকাতেরা। যা পেরেছে নিয়ে গেছে। এখনও যা রয়েছে, অনেক, কয়েক কোটি টাকার তো হবেই।
কিন্তু এসবের প্রতি নজর নেই জিনার, মুসাকে নিয়ে আগে রাফিয়ানকে উদ্ধার করতে চলল সে।
একটা ছোট ঘরে এসে ঢুকল মুসা। এক ধারে দেয়াল ঘেঁষে রয়েছে। বড় একটা পাথর, সেটাকে ঠেকা দিয়ে জায়গামত রাখার জন্যে আরও পাথর ব্যবহার করা হয়েছে। পাথরগুলোর ওপর দেয়ালে চক দিয়ে একটা কুকুরের মুখ আঁকা। সেদিকে দেখিয়ে হাসল মুসা। চিহ্ন দিয়ে রেখেছি।
প্রথমে কিছু বুঝল না জিনা, তারপর হেসে ফেলল। নাহ, যতটা ভেবেছিলাম, তত বোকা তুমি নও, মুসা।
দুজনে মিলে পাথর সরিয়ে দেয়ালের খোড়ল থেকে রাফিয়ানকে বের করল। নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটায় বিরক্তই হলো রাফিয়ান। কিশোর আর জিনাকে যে খাবারগুলো দিয়ে গিয়েছিল তোক দুটো, ওগুলো সব খেয়ে পেট ভারি হয়ে গেছে তার, আরাম করে শুয়ে খুব একচোট ঘুমিয়ে নিয়েছে। চুপচাপ থাকতে অনুরোধ করেছিল তাকে মুসা, বোধহয় অনুরোধ রেখেছে, টু শব্দটি করেনি রাফিয়ান, নইলে ডাকাতদের হাতে পড়ত, প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে হয়তো মেরেই রেখে যেত ওরা।

.

সিঁড়িমুখের কাছে অপেক্ষা করছেন মিস্টার পারকার। নিচে ডাকাতদেরকে খোঁজাখুঁজি করছে পুলিশ; জানে, পাবে না, তবুও করছে, রুটিন চেক।
বাবা, জিনা বলল, কিশোরকে কথা দিয়েছিলে তুমি, আমি যা চাই। দেবে। দাওনি?
কাছেই দাঁড়ানো কিশোরের দিকে চট করে তাকিয়ে নিলেন একবার মিস্টার পারকার, রবিনের মুখের দিকেও তাকালেন, দ্বিধা করলেন
অবশেষে মুখ খুললেন, হ্যাঁ, দিয়েছিলাম। কী চাই, দ্বীপটা তো?
না, মাথা নাড়ল জিনা।
সোনার বারগুলো?
তা-ও না।
তা-ও না! তা হলে? ভুরু কুঁচকে গেছে ভদ্রলোকের।
আগে বলো, দেবে কিনা? আঙুল নাড়ল জিনা।
বলে যখন ফেলেছি, দেব। কী আর করা? অস্বস্তি বোধ করছেন।
সিঁড়িমুখে ঝুঁকে বসে ডাকল জিনা, রাফি, এই, রাফি! উঠে আয়।
রাফিয়ানের ভোতা মুখটা দেখে চমকে উঠলেন মিস্টার পারকার। কোনমতে হাসি চাপল তিন গোয়েন্দা।
যা, বাবাকে সালাম কর, রাফিয়ানকে আদেশ দিল জিনা।
আরে, না, না, দরকার নেই, লাগবে না! লাফ দিয়ে সরে দাঁড়ালেন। মিস্টার পারকার।
কিন্তু রাফিয়ান কি আর সুযোগ ছাড়ে? তার একেবারে পায়ের কাছে এসে পড়ল, দুই পা তুলে দিল হাঁটুতে, জড়িয়ে তো আর ধরতে পারে না, হাত নেই যে।
ঠিক আছে, ঠিক আছে, বোকা হয়ে গেছেন মিস্টার পারকার, ঝুঁকে কুকুরটার মাথায় হাত রেখে কোনমতে বললেন, বেঁচে থাকো, বাবা! গর্জে উঠলেন পরক্ষণেই, কিন্তু খবরদার! আমার ঘরে ঢুকে জিনিসপত্র নষ্ট করলে চাবকে পাছার চামড়া তুলে ফেলব!
আর সামলাতে পারল না মুসা, হো হো করে হেসে উঠল। তাতে যোগ দিল কিশোর আর রবিন। জিনার মুখে হাসি, চোখে পানি।
হাসিটা সংক্রমিত হলো মিস্টার পারকারের মুখেও।
আরে, এ কী কাণ্ড! পেছন থেকে শোনা গেল, ভরাট কণ্ঠ, বেরিয়ে এসেছেন শেরিফ লিউবার্তো জিঙ্কোনাইশান, আধা রেড ইনডিয়ান আধা
স্প্যানিশ রক্ত শরীরে। আমাদের জনাথন পারকার ছেলেমেয়েদের সামনে হাসছে! স্বপ্ন দেখছি না তো! আচ্ছা শিক্ষা দিয়েছে তোমাকে তোমার মেয়ে…
চোখ কটমট করে বন্ধুর দিকে তাকালেন মিস্টার পারকার। মুখ থমথমে, কালো মেঘের আড়ালে-ঢাকা পড়েছে যেন মিষ্টি রোদ, কই, হাসলাম আবার কখন?

ভলিউম ৩ – কাকাতুয়া রহস্য – তিন গোয়েন্দা – রকিব হাসান – সেবা প্রকাশনী

বাঁচাও! তীক্ষ্ণ চিৎকার। বাঁচাও! খানখান হয়ে গেল নীরবতা।

পুরানো ভাঙা বাড়িটার ভেতর থেকে আসছে আর্তনাদ। শিরশিরে ঠাণ্ডা যোত যেন বয়ে গেল সহকারী গোয়েন্দা মুসা আমানের মেরুদণ্ড বেয়ে।

আবার শোনা গেল চিৎকার। শেষ হলো চাপা ঘড়ঘড় করে। শব্দের ভয়াবহতা বাড়িয়ে দিল আরও।

একটা ব্যারেল পামের গোড়ায় হুমড়ি খেয়ে আছে মুসা, চোখ খোয়া-বিছানো আঁকাঝকা পথের দিকে। কেউ আসছে কিনা দেখছে।

চিৎকার শুনে মুসার মতই পথের অন্য ধারের একটা ঝোপে গিয়ে লুকিয়েছে গোয়েন্দাপ্রধান কিশোর পাশা। চেয়ে আছে বাড়ির দিকে।

অপেক্ষা করছে দুজনেই।

স্প্যানিশ ধাঁচের একটা অনেক পুরানো বিলডিং। অযত্নে বেড়ে পুরানো গাছপালা আর লতার ঘন জঙ্গলে ঘিরে রেখেছে বাড়িটাকে।

আর শোনা গেল না চিৎকার। কিশোর, ফিসফিস করে বলল মুসা। পুরুষ না মহিলা? জানি না, ফিসফিসিয়েই জবাব এল। তবে কোনটার মতই তো লাগল না।

কোনটাই না? ঢোক গিলল মুসা। শিশুও নয়। তাহলে আর একটা সম্ভাবনাই থাকে, যেটা ভাবতেও ভয় পাচ্ছে সে।

আড়াল থেকে বেরোল না ওরা। গরমে ঘামছে দরদর করে। রকি বীচের চেয়ে গরম কি বেশি নাকি হলিউডে?

চারপাশে তাল জাতীয় গাছের ছড়াছড়ি, ঘন ঝোপঝাড়, লতা, আর নানা রকম ফুলগাছ। চমৎকার একটা বাগান ছিল এককালে। কিন্তু অযত্নে অবহেলায় এখন জঙ্গল হয়ে গেছে। ওপাশের বাড়িটাও ঠিকমত চোখে পড়ে না।

এক সময়ের বিখ্যাত অভিনেতা মিস্টার মরিসন ফোর্ডের বাড়ি, চিত্রপরিচালক ডেভিস ক্রিস্টোফারের বন্ধু। প্রিয় কাকাতুয়াটা হারিয়ে খুব মনোকষ্টে আছেন অভিনেতা, বন্ধুকে জানিয়েছেন। পরিচালকই তিন গোয়েন্দাকে অনুরোধ করেছেন ব্যাপারটা একটু তদন্ত করে দেখতে। সেজন্যেই এসেছে কিশোর আর মুসা। গেটের ভেতরে ঢুকেই শুনেছে চিৎকার, লুকিয়ে পড়েছে। কি ঘটে, দেখার অপেক্ষায় রয়েছে।

কিশোর, নিচু স্বরে বলল মুসা, খুঁজতে এলাম কাকাতুয়া। এ-যে দেখছি ভূত! ভূতুড়ে বাড়িতে ঢুকলাম না তো, টেরর ক্যাসলের মত? তিন গোয়েন্দার প্রথম রোমাঞ্চকর অভিযানের কথা মনে করল সে।

খুব আশাব্যঞ্জক, বিশেষ বিশেষ সময়ে কঠিন শব্দ ব্যবহার আর দুর্বোধ করে কথা বলা কিশোরের স্বভাব। আরেকটা কেস বোধহয় পেলাম। চলো, এগোই। কি

হয়েছে দেখা দরকার।
ভূতেরা খেলায় মেতেছে। বাজি রেখে বলতে পারি, গিয়ে একটা দরজাও খোলা পাব না, সব তালা বন্ধ। আমাদেরকে দেখলেই ঝটকা দিয়ে দিয়ে খুলে যাবে…
চমৎকার বর্ণনা! বাধা দিয়ে বলল কিশোর। মনে রেখো। ঠিক এভা, গিয়ে বলো রবিনকে, নোট করে নেবে…
দেখো কিশোর, রসিকতার সময় নয় এটা…
কিন্তু মুসার কথায় কান নেই কিশোরের। ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে গাছের আড়ালে আড়ালে নিঃশব্দে এগোতে শুরু করেছে বাড়ির দিকে।
মুসাও উঠে দাঁড়াল। পথের অন্য ধারে গাছের আড়ালে থেকে এগোল সে-ও।
বাড়িটা শ-খানেক ফুট দূরে থাকতেই কিসে যেন মুসার পা জড়িয়ে ধরল। টান দিয়ে গোড়ালি ছাড়ানোর চেষ্টা করল সে, বাধন আরও শক্ত হলো। হ্যাচকা টানে পা ছুটিয়ে নেয়ার জন্যে সামনে লাফ দিল। পাল্টা টান দিয়ে ফেলে দেয়া হলো তাকে মাটিতে, কিসে ধরেছে দেখতে পাচ্ছে না ঘন পাতার জন্যে।
কিশোর! চেঁচিয়ে উঠল মুসা। বাঁচাও আমাকে মেরে ফেলল।
ঝোপঝাড় ভেঙে ছুটে এল কিশোর।
দেখো, কিসে জানি টানছে, কোলা ব্যাঙ ঢুকেছে যেন মুসার গলায়, চোখ ছিটকে বেরিয়ে আসতে চাইছে। টেনে নিয়ে যাচ্ছে গর্তে। অজগর…না না, অ্যানাকোণ্ডা।
ভাবান্তর নেই কিশোরের চেহারায়। শান্তকণ্ঠে বলল, তোমার জন্যে দুঃখ হচ্ছে আমার, মুসা। ভয়ঙ্কর ভিটিস ভিনিফেরায় ধরেছে তোমাকে।
খাইছে! আল্লারে, মরে গেলাম! কিশোর, দোহাই তোমার, ভিটিস বি জানি… বাঁচাও…।
আট ফলার প্রিয় ছুরিটা বের করল কিশোর। ধীরে সুস্থে বসে পেঁচিয়ে কাটতে শুরু করল ভিটিস ভিনিফেরাকে।
টান মুক্ত হতেই লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল মুসা। কিসে ধরেছিল, তাকাল।
নীরব হাসিতে ফেটে পড়ছে কিশোর। ছুরিটা আবার ভাঁজ করে বেল্টে ঝুলিয়ে রাখছে।
ফিক করে হেসে ফেলল মুসা। প্লীজ, কিশোর, রবিনকে বোললা না।
পা ফেলেছিলে লতার ফাঁদে, ভেবেছ সাপ। ওই ভূতের ভয়ই তোমার মনকে . ভারাক্রান্ত করে রেখেছিল, মুসা, উপদেশ দিতে শুরু করল কিশোর। এভাবেই ভয় পেয়ে মরে দুর্বল হৃৎপিণ্ডের লোক, বোকারা ভাবে ভূতে মেরেছে। ভয় আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল তোমার মনকে, ফলে বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পেয়েছিল, বুঝতে পারোনি ওটা সাপ না লতা।

কিশোরের এ ধরনের লেকচারে এখন আর কিছু মনে করে না মুসা, অভ্যস্ত হয়ে গেছে। বলল, ঠিকই বলেছ, ওই চিৎকারই...

সেজন্যেই বিপদে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হয়। আতঙ্ক বিপদকে আরও বাড়িয়ে দেয়। সেকারণেই মনীষীরা বলেছেন বলেছেন...।

মনীষীরা যেন ভয় পেতেই বলেছেন কিশোরকে, বড় বড় হয়ে যাচ্ছে চোখ। ধীরে ধীরে ঝুলে পড়ছে চোয়াল। চেহারা ফ্যাকাসে। দৃষ্টি মুসার পেছনে।

সত্যি খুব ভাল অভিনেতা তুমি, কিশোর, প্রশংসা করল মুসা। কেন যে টেলিভিশনে অভিনয় বাদ দিলে। গোয়েন্দাগিরির চেয়ে অনেক বেশি উন্নতি করতে পারতে। এভাবে ভয় পাওয়ার অভিনয়... হঠাৎ সন্দেহ হলো তার। ফিরে তাকাল। স্থির হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

অভিনয় করছে না গোয়েন্দাপ্রধান।

বিচ্ছিরি রকম মোটা এক লোক দাড়িয়ে আছে, হাতে ভীষণ চেহারার একটা পুরানো আমলের পিস্তল, পিলে চমকে দেয়। পুরু লেন্সের চশমার জন্যে চোখ দুটো অস্বাভাবিক বড় লাগছে, গোল গোল, যেন মাছের চোখ।

এসো, পিস্তল নাড়লো লোকটা, আগে ঘরে এসো। তারপর শুনব কেন ঢোকা হয়েছে।

মুখ শুকিয়ে গেছে মুসার, পা দুটো যেন দুই মণ ভারি। কোন মতে টেনে টেনে এসে উঠল খোয়া বিছানো পথে। খবরদার, পালানোর চেষ্টা কোরো না, হুশিয়ার করল লোকটা। তাহলে পস্তাবে।

যা বলছে, করো, মূসার কানের কাছে ফিসফিস করল কিশোর। দেখি কি হয়।

পাগলু, জবাব দিল মুসা। পালানোর চেষ্টা করব মরতে? হাঁটতেই তো পারছি না ঠিকমত।

আগে আগে চলেছে দুই গোয়েন্দা।

পেছনে মোটা লোকটার জুতোর মচমচ শব্দে শিরশির করছে মুসার গা, শুয়োপোকা দেখলে অনেকের যে অনুভূতি হয়।

বিশাল সদর দরজার সামনে এসে দাঁড়াল ওরা, ওপরে টালির ছাউনি বেরিয়ে আছে সামনের দিকে।

দরজা খোলো, হুকুম করল লোকটা। জলদি করো। গুলি করার জন্যে আঙুল নিশপিশ করছে আমার।

নব ঘুরিয়ে ঠেলা দিল কিশোর। খুলে গেল দরজা। আবছা অন্ধকার একটা হলঘর।

ডানে ঘোরো, আবার বলল লোকটা। ওই যে, পাশের দরজাটা, খোলো।

আরেকটা বড় ঘরে ঢুকল ওরা। পুরানো আসবাবপত্র। খবরের কাগজ আর বইয়ে ঠাসা। উল্টো প্রান্তের দেয়াল ঘেঁষে সাজানো রয়েছে কয়েকটা বড় বড় চেয়ার, চামড়ায় মোড়া গদি।
যাও, বসো ওখানে।
যা বলা হলো, করল ওরা।
মুখখামুখি দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। মুখে সন্তুষ্টির হাসি। পিস্তলের নলের মুখে জোরে ফু দিল, যেন ভেতরে জমে থাকা বালি পরিষ্কার করছে। পথ সুগম করে দিচ্ছে বুলেটের।
এবার বলল, কি চুরি করতে এসেছ?
মিস্টার মরিসন ফোর্ডের কাছে… বলতে গিয়ে বাধা পেল কিশোর।
আমিই মরিসন ফোর্ড।
অ। আপনার কাছেই এসেছি…
কিন্তু এবারও কথা শেষ করতে দিল না ফোর্ড। নাকের একপাশ চুলকাল। আমার কাছে? তাহলে এভাবে লুকিয়ে কেন? চোরের মত?
কে যেন বাঁচাও বাঁচাও বলে চিৎকার করল, বলে ফেলল মুসা। তাই লুকিয়ে পড়েছিলাম। ভাবলাম ভেতরে চোর-ডাকাত…কত কিছুই তো ঘটছে আজকাল। দিনে-দুপুরেও লোকের বাড়িতে ডাকাত পড়ে।
অ। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বসল লোকটার। শুনেছ, না?
মিস্টার ফোর্ড, বুঝিয়ে বলল কিশোর, মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফার পাঠিয়েছেন আমাদের। আপনার নাকি একটা কাকাতুয়া হারানো গেছে, পুলিশ কিছু করতে পারছে না। সেটাই তদন্ত করতে এসেছি আমরা, পাখিটা খুঁজে বের করতে। পকেট থেকে কার্ড বের করে দিল সে। আমি কিশোর পাশা। ও আমার বন্ধু, মুসা আমান।
গোয়েন্দা, না? একনজর দেখেই কার্ডটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখল লোকটা। কাকাতুয়া খুঁজতে এসেছ। হাসল।
হাঁপ ছাড়ল মুসা। কিন্তু লোকটার পরের কথায়ই চুপসে গেল আবার।
তোমাদের কথা বিশ্বাস করতে তো ইচ্ছে করছে, চেহারা সুরতও ভালই, চোরের মত না। তোমরা ফিরে না গেলে খুব কান্নাকাটি করবে বাবা-মা, না?
খুব শান্ত ভাবে পকেট থেকে সিগারেট বের করে ঠোঁটে লাগাল লোকটা। পিস্তলের নল প্রথমে ধরল কিশোরের বুক সোজা, তারপর ঘোরাল মুসার দিকে।
টিপে দিল ট্রিগার। চাপা একটা আওয়াজ হলো।
ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলেছিল মুসা, কিছুই ঘটল না দেখে মেলল আবার।

পিস্তলের নলের মাথায় জ্বলছে নীলচে আগুন। সেটা থেকে সিগারেট ধরিয়ে নিচ্ছে মিস্টার ফোর্ড। নাক-মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল ভকভক করে, ফুঁ দিয়ে আগুন নিভিয়ে পিস্তলটা রেখে দিল টেবিলে।
হায় হায়, ভাবল মুসা, এত ভয় পেলাম। ওই সিগারেট লাইটারটা দেখে? দূর, আমি একটা ভীতুর ডিম। রক্ত ফিরে এল আবার চেহারায়। নড়েচড়ে বসল।
চমৎকার, হাসি হাসি ভাব করে বলল লোকটা। পরীক্ষায় পাশ। নাকি আমার অভিনয় ভাল হয়নি?
আরেকটু হলেই হার্টফেল করতাম, বাড়িতে ঢোকার পর এই প্রথম হাসি ফুটল মুসার মুখে। হাত মেলা। লোকটার নরম তুলতুলে হাতের চাপ খুব শক্ত, দেখে মনে হয় না এরকম হবে।
কিশোরের সঙ্গেও হাত মেলাল লোকটা। এভাবে অভিনয় করে অনেক বয়স্ক লোককেও বেহুশ করে দিয়েছি। আর তোমরা ছেলেমানুষ...ভাল গোয়েন্দাই পাঠিয়েছে ডেভিস। ও-ই বলেছিল, তোমাদের একটা টেস্ট নিতে।
মানে ইয়ে... বিশ্বাস করতে পারছে না যেন কিশোর, মিস্টার ক্রিস্টোফার বলেছেন আমাদের সাহসের পরীক্ষা নিতে!
হ্যাঁ, এই তো, একটু আগে ফোন করল। তবে তোমরা ভালই উৎরেছ। জানাব ডেভিসকে। আর হ্যাঁ, তোমাদের কিছু তদন্ত করতে হবে না, সরি।
কিন্তু আপনিই নাকি মিস্টার ক্রিস্টোফারকে জানিয়েছেন কাকাতুয়া হারিয়েছে? মুসা অবাক।
হারিয়েছিল, মাথা ঝাকাল লোকটা। তাকে জানিয়েও ছিলাম। কিন্তু ওটা যে ফিরে এসেছে, জানানো হয়নি আর। ডিয়ার বিলি, কি কষ্টটাই না দিয়েছে আমাকে।
বিলি? কিশোর জিজ্ঞেস করল, কাকাতুয়াটার নাম?
হ্যাঁ, বিলি শেকসপীয়ার, উইলিয়াম শেকসপীয়ারের...
কিন্তু বাঁচাও বাঁচাও বলে কে চেঁচাল? মুসা বলল, এ বাড়ি থেকেই...
খুব খুঁতখুঁতে তোমরা। গোয়েন্দাগিরির জন্যে ভাল। গলা ফাটিয়ে হাসল লোকটা, দুলে উঠল মস্ত ভুড়ি। ওটা বিলির কাণ্ড। নিজেকে অনেক বড় অভিনেতা ভাবে সে, মাঝেমাঝেই সেটা প্র্যাকটিস করে। আমিই শিখিয়েছিযেন হাজতে আটকে রাখা কয়েদী বিলি, তার ওপর নির্যাতন চলছে...হা-হা-হা।
বিলিকে দেখাবেন, প্লীজ? অনুরোধ করল কিশোর। খুব বুদ্ধিমান পাখি, দেখতে ইচ্ছে করছে।
সরি মেঘ জমল লোকটার চেহারায়। আজ বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিল বিলি। তাকে থামানোর জন্যে শেষে খাঁচার ওপর কাপড় দিয়ে ঢেকেছি। এখন আবার তুললেই হয়তো চেঁচানো শুরু করবে। মাথাই খারাপ হয়ে গেল, না কী।

ঠিক আছে ঠিক আছে, থাক তাহলে, হাত তুলল কিশোর। তদন্ত করার আর তো কিছু নেই, হতাশ হয়েছে খুব। যাই আমরা, মিস্টার ফোর্ড। আপনার কাকাতুয়া ফিরে এসেছে, এটা অরিশ্যি খুশির খবর।
থ্যাংকু বলল মোটা লোকটা। তোমাদের কার্ড রইল। কখনও দরকার পড়লে ডাকব। তিন গোয়েন্দা, মনে থাকবে।
সদর দরজা পর্যন্ত ছেলেদের এগিয়ে দিয়ে গেল ফোর্ড।
খুব খারাপ লাগছে, আঁকাবাঁকা পথে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বলল কিশোর। আশা হয়েছিল, দারুণ একখান কেস মিলেছে। পোড়া নির্জন বাড়ি, আর্তনাদ, অদ্ভুত এক মোটা লোক...বড় বেশি আশা করে ফেলেছিলাম।
আমার ভালই লাগছে, খুশি দেখাচ্ছে মুসাকে। ঢুকেই যা শুরু হয়েছিল, সত্যি সত্যি হলে এ-যাত্রা ঠিক ভূতের হাতে মারা পড়তাম। দরকার পড়লে আবার ডাকবে বলেছে ফোর্ড। না ডাকুক, সেটাই ভাল। ওকে মোটেও পছন্দ হয়নি ডাকবে হেলে এ-যাত্রা ঠিক খুশি দেখাচ্ছে আশা করে ফেলে নির্জন বাড়ি আমার।
হয়তো, কিছু ভাবছে কিশোর। নীরবে এগোল দুজনে, আলগা খোয়ায় জুতোর শব্দ হচ্ছে। হলিউডের একটা পুরানো এলাকা এটা, বড় বড় বাড়ি আছে। কিন্তু প্রায় সব কটাই যত্নের অভাবে ধ্বংস হতে চলেছে। মালিকেরা অভাবী হয়ে পড়েছে অনেকেই, ঠিকমত যত্ন নিতে পারে না। কিংবা যাদের এখনও টাকা আছে, তারা আর পছন্দ করতে পারছে না এলাকাটা। অন্য জায়গায় নতুন বাড়ি করে উঠে গেছে।
গেটের বাইরে পথের মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে কালো রোলস-রয়েস, জায়গায় জায়গায় সোনালি কাজ করা, আয়নার মত চকচকে শরীর, কিন্তু মডেলটা পুরানো। ইচ্ছে করেই বানানো হয়েছে। একবার বাজি জিতে গাড়িটা তিরিশ দিনের জন্যে ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছিল তিন গোয়েন্দা। এখনও দরকার পড়লে করে, তবে ভাড়া দিতে হয়। খরচ দেয় তাদের এক বন্ধু, অগাস্ট অগাস্ট, রক্তচক্ষু উদ্ধারে তাকে সহায়তা করেছিল তিন কিশোর।
বাড়ি চলুন, হ্যানসন, শোফারকে বলল কিশোর। কাকাতুয়াটা ফিরে এসেছে।
তাই নাকি? ভাল, বিশুদ্ধ ইংরেজিতে বলল হ্যানসন, খাঁটি ইংরেজ বলে গর্ব আছে তার। চলুন।
গাড়ি ঘোরাচ্ছে হ্যানসন।
মিস্টার ফোর্ডের বাগানের দিকে চিন্তিত ভঙ্গিতে চেয়ে আছে কিশোর। গাছের জঙ্গলের জন্যে বাড়িটা দেখা যায় না।
মুসা, হঠাৎ বলল সে, ভাল করে দেখো। কোথায় জানি একটা গোলমাল রয়েছে, ধরতে পারছি না।

কি? বাগানে?
বাগান, ড্রাইভওয়ে, পুরো বাড়িটাই। মাথার ভেতরে কিছু একটা খোঁচাচ্ছে, বের করে আনতে পারছি না।
হাসালে। কিশোর পাশা যেটা বুঝতে পারে না, সেটা আমি পারব?
নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে শুরু করেছে কিশোর, মুসার কথা কানে ঢুকল বলে মনে হলো না। গভীর চিন্তায় ডুবে গেছে।
হ্যানসনকে গাড়ি থামাতে বলে ভালমত দেখল মুসা। কিন্তু গোলমাল চোখে পড়ছে না। অযত্নে বেড়ে উঠেছে বাগান, মালির হাত না লাগলে উঠবেই, স্বাভাবিক ব্যাপার। ড্রাইভওয়েতে তালের পাতা জমে আছে, মাড়িয়ে গেছে গাড়ির চাকা। এতেও অস্বাভাবিক কিছু নেই।
নাহ্, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, মাথা নাড়ল মুসা। গাড়ি ছাড়তে বলল হ্যানসনকে।
কিশোরের কোন খেয়ালই নেই যেন।
গোটা দশেক রক পেরিয়েছে গাড়ি, আচমকা চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। হ্যানসন! ঘোরান! গাড়ি ঘোরান! কুইক!
ঘোরাচ্ছি, কিশোরের স্বভাব হ্যানসনেরও জানা, কোন কারণ না থাকলে ঘোরাতে বলত না। তাই কোন প্রশ্ন করল না সে।
কিশোর, কি হয়েছে? আবার কেন?
গোলমালটা ধরে ফেলেছি, উত্তেজনায় লাল হয়ে গেছে গোয়েন্দাপ্রধানের মুখ। মিস্টার ফোর্ডের বাড়িতে টেলিফোন লাইন নেই।
লাইন নেই? তাতে কি?
কারেন্টের লাইন আছে, কিন্তু টেলিফোনের নেই। অথচ ফোনে কথা বলল কি করে মিস্টার ফোর্ড, মিস্টার ক্রিস্টোফারের সঙ্গে? মিথ্যে বলেছে। আর তাই যদি হয়ে থাকে, তাহলে আর যা যা বলেছে, সবই মিছে কথা।
মিছে কথা? মাথা নাড়ল মুসা। কেন বলবে?
কারণ লোকটা মিস্টার ফোর্ড নয়। ভণ্ড, প্রতারক। খুব সম্ভব আসল মিস্টার ফোর্ডই তখন বাঁচাও বাঁচাও বলে চেঁচিয়েছিলেন।
নয়টা ব্লক নিঃশব্দে পেরিয়ে এল বিশাল রোলস-রয়েস।
মিস্টার ফোর্ডের গেট দিয়ে ছোট আরেকটা গাড়ি বেরোচ্ছে, মোড় নিয়ে। এগিয়ে আসতে শুরু করল এদিকেই। গতি বাড়ছে, সঁ করে চলে গেল পাশ দিয়ে। পলকের জন্যে ড্রাইভারকে চোখে পড়ল। মোটাসোটা, চোখে চশমা। অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছে।
মিস্টার ফোর্ড যাচ্ছেন, চেঁচিয়ে বলল মুসা।

ভুল, শুধরে দিল কিশোর, ও মিস্টার ফোর্ড নয়। হ্যানসন, পিছু নিন।
ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষল শোফার। বন বন করে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে মুখ ফেরাল আবার গাড়ির।
মোড়ের কাছে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে কালো গাড়িটা।
ধরতে পারলে কি করব? প্রশ্ন করল মুসা। ওর বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ নেই। বরং আসল ফোর্ডের অবস্থা গিয়ে দেখা উচিত। সাহায্য লাগতে পারে।
দ্বিধা করছে কিশোর। মাথা ঝাকাল। ঠিকই বলেছ। আগে মিস্টার ফোর্ডকে দেখা দরকার, কি অবস্থায় রয়েছেন কে জানে। সরি, হ্যানসন, আবার ঘোরান।
এবার আর বাইরে নয়, কিশোরের নির্দেশে গেটের ভেতরে গাড়ি ঢোকাল হ্যানসন, গাড়িপথ ধরে এগোল।
সরু পথ, এতবড় গাড়ির উপযুক্ত নয়। দুপাশের ঝোপঝাড়ের পাতা, লতার ডগা আর পামের পাতা ঘষা খাচ্ছে গাড়ির গায়ে।
অবশেষে পুরানো বাড়ির গাড়িবারান্দায় এসে থামল গাড়ি, খানিকক্ষণ আগে এখানেই আরেকবার এসেছিল দুই গোয়েন্দা।
মুসা, শান্ত কণ্ঠে বলল কিশোর, যে গাড়িটা বেরিয়ে গেল, ওটার বিশেষ কিছু চোখে পড়েছে?
টু-ডোর, স্পোর্টস মডেল রেঞ্জার, খুব ভাল ইংলিশ কার, বলল মুসা। নতুন ক্যালিফোর্নিয়ার নাম্বার, পুরোটা বলতে পারব না, তবে শেষ দুটো নাম্বার ওয়ান থ্রী।
হ্যানসন, আপনি দেখেছেন নম্বরটা?
না। গাড়ি চালানোয় ব্যস্ত ছিলাম। নজর পথের ওপর। তবে রেঞ্জার ঠিকই। লাল চামড়ার গদি।
যাক, কিছু তথ্য জানা থাকল, বলল কিশোর। পরে মোটা লোকটা আর তার গাড়ি খুঁজে বের করব। দরজা খুলে নামল সে। এখন দেখি মিস্টার ফোর্ডের কি অবস্থা।
কিশোরকে অনুসরণ করল মুসা। বুঝতে পারছে না, কিভাবে পরে লোকটা আর তার গাড়ি খুঁজে বের করবে গোয়েন্দাপ্রধান, দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার লাখ লাখ গাড়ির ভেতর থেকে।
তবে বলেছে যখন, উপায় একটা করবেই কিশোর, তাতে কোন সন্দেহ নেই মুসার।
হঠাৎ থমকে গেল ওরা। বিষণ্ন বাড়িটা থেকে আবার শোনা গেল সাহায্যের আবেদন, বাঁচাও!...শুনছ কেউ?...প্লীজ, আমাকে ছাড়াও...
জোর নেই তেমন গলায়। মারা যাচ্ছে নাকি? তাড়াতাড়ি বলল মূসা, চলো তো, দেখি।

পেছন দিক থেকে এসেছে আওয়াজ, ওদিকে ছুটল দুই গোয়েন্দা। একটা দরজা সামান্য ফাঁক হয়ে আছে, ওখান দিয়েই বোধহয় বেরিয়ে গেছে মোটা লোকটা, তাড়াহুড়োয় খেয়াল করেনি ভালমত লাগল কি-না।
ঢুকে পড়ল দুজনে। আবছা অন্ধকার। মিটমিট করে চোখে সইয়ে নিল স্বল্প আলো।
কান পেতে শুনছে। নীরব। কোথায় যেন পুরানো তক্তায় চাপ লাগার মৃদু খচখচ,আওয়াজ হলো।
ওই যে, ওই হলটায় ঢুকেছিলাম তখন, হাত তুলে দেখাল কিশোর। চলো, উল্টো দিকের ঘরটায় ঢুকি। ওই যে দরজা।
ঠেলা দিতেই খুলে গেল দরজাটা। বড় একটা লিভিং রুম। ঘুলঘুলি লাগানো মস্ত জানালা আছে একটা।
কে...কে ওখানে? দুর্বল কণ্ঠে বলে উঠল কেউ জানালাটার কাছ থেকে। জানালার নিচে বিশাল এক ফুলের টব, লাল একটা ফুল ফুটে আছে। মুসার মনে হলো, ফুলটাই যেন কথা বলেছে।
কেউ...কেউ এসেছ? গুঙিয়ে উঠল যেন ফুলটা।
টবের ছড়ানো পাতার ওপাশে একটা নড়াচড়া চোখে পড়ল মুসার। বড় বড় পাতাগুলো প্রায় ঢেকে রেখেছে শরীরটা।
ওই যে, চেঁচিয়ে উঠল মুসা।
কাত হয়ে পড়ে আছে রোগা পাতলা একটা দেহ, হাত-পা বাঁধা।
বাঁধন খুলে মিস্টার ফোর্ডকে ধরে ধরে এনে একটা সোফায় বসিয়ে দিল মূসা আর কিশোর। ক্লান্তিতে এলিয়ে পড়লেন তিনি। ফিসফিস করে ধন্যবাদ দিলেন ছেলেদের।
একটা চেয়ার টেনে মুখোমুখি বসল কিশোর। পুলিশকে খবর দিচ্ছি।
না না,আঁতকে উঠলেন ফোর্ড। ফোনও নেই। খবর দেয়া যাবে না। আমাদের গাড়িতে ওয়্যারলেস টেলিফোন আছে।
না, গড়িয়ে পড়লেন তিনি, কনুইয়ে ভর দিয়ে আধশোয়া হয়ে তাকালেন কিশোরের দিকে। তুমি কে? এখানে এলে কিভাবে?
একটা কার্ড বের করে দিল কিশোর। মিস্টার ক্রিস্টোফার তাদেরকে পাঠিয়েছে, জানাল।
ডেভিসের কাছে আমি ঋণী হয়ে গেলাম।
সত্যি বলছেন পুলিশ ডাকব না? আপনাকে জোর করে বেঁধে ফেলে রেখে গেল, এটা অপরাধ

না। তোমরা গোয়েন্দা, তোমরাই আমার কাকাতুয়াটাকে খুঁজে দাও। পুলিশকে আর ডাকছি না আমি। জানিয়েছিলাম ওদের। প্রথমে বলল, হয়তো উড়ে চলে গেছে। আমি চাপাচাপি করায় শেষে বলল, পাবলিসিটির জন্যে নাকি আমি এমন করছি।

হুঁ, বুঝলাম। এখন ডাকলে আবার বলবে, পাবলিসিটির নতুন ফন্দি করেছেন।

হ্যাঁ, বুঝেছ। তাহলে কোন পুলিশ নয়, কথা দাও?

কথা দিল কিশোর, পুলিশকে কিছু বলবে না। হারানো কাকাতুয়ার ব্যাপারে সব খুলে বলার অনুরোধ জানাল।

বিলিকে খুব ভালবেসে ফেলেছি, বললেন ফোর্ড। ওর পুরো নাম বিলি শেকসপীয়ার। উইলিয়াম শেকসপীয়ার কে ছিলেন, নিশ্চয় জানো।

জানি। দুনিয়ার সেরা নাট্যকারদের একজন। পনেরোশো চৌষট্টি সালে ইংল্যাণ্ডে জন্মেছিলেন, মারা গেছেন ষোলোমশা মোল সালে। তার নাটকগুলো এখনও মঞ্চস্থ হয় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। বেশি জনপ্রিয় নাটকটা বোধহয় হ্যামলেট।

বহুবার অভিনয় করেছি আমি হ্যামলেটে, উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন ফোর্ড। দর্শকরা বলত, খুব ভাল অভিনয় করি। সোজা হয়ে বসে এক হাত রাখলেন বুকে, আরেক হাত সোজা করে নাটকীয় ভঙ্গিতে ভরাট গলায় বললেন, টু বি, অর নট টু বি, দ্যাট ইজ দা কোয়েশচেন। ছেলেদের দিকে ফিরে বললেন, হ্যামলেটের একটা ডায়লগ। সম্ভবত শেকসপীয়ারের লেখার সবচেয়ে পরিচিত লাইন। আমার কাকাতুয়াটাও শিখেছিল, বার বার আউড়াতো।

শেকসপীয়ারের ডায়লগ বলত? মুসা বলল। খুব শিক্ষিত পাখি তো।

তা বলতে পারো। কথায় ব্রিটিশ টান ছিল। একটা মাত্র জন্মদোষ ছিল পাখিটার।

জন্মদোষ? জিজ্ঞেস করল কিশোর।

হ্যাঁ, তোতলামি। সে বলত : টু-টু-টু বি অর নট টু-টু-টু বি, দ্যাট ইজ দা কোয়েশচেন।

আগ্রহে উজ্জল হলো কিশোরের চোখ। শুনলে, মুসা? কাকাতুয়া তোতলায়, এই প্রথম শুনলাম। বোঝা যাচ্ছে, দারুণ একখান কেস পেয়েছি।

মুসারও তাই মনে হলো। তবে কিশোরের মত খুশি হলো না, শঙ্কিত হলো।

বিশ্রাম নিয়ে শক্তি ফিরে পেয়েছেন আবার মিস্টার ফোর্ড। খুলে বললেন সব। তিন হপ্তা আগে পাখিটা কিনেছেন তিনি, এক ফেরিওলার কাছ থেকে। ছোটখাট একজন লোক, কথায় জোরালো মেকসিকান টান, গাধায় টানা ছোট একটা গাড়িতে করে এসেছিল।

এক মিনিট স্যার, হাত তুলল কিশোর। আপনার বাড়িতে এল কি করে সে?

ও, মিস জলি বোরো পাঠিয়েছে, আমার পাশের রকটায়ই থাকে। সে-ও একটা কাকাতুয়া কিনেছে। যখন শুনল, শেকসপীয়ারের ডায়লগ বলে বিলি, ভাবল, আমি ইনটারেসটেড হব। তাই পাঠাল।
তাই? নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। সব সময়ই কাকাতুয়া ফেরি করে নাকি লোকটা? পাখিই শুধু বিক্রি করে?
তা-তো জানি না, চোখ মিটমিট করলেন ফোর্ড। আমার কাছে যখন এল, সঙ্গে মাত্র দুটো খাঁচা। একটায় বিলি। আরেকটায় অদ্ভুত একটা কালচে পাখি, দেখে মনে হয়েছে বারোমেসে রোগী। ফেরিওলা জানাল, ওটা দুর্লভ কালো কাকাতুয়া। কিন্তু ওরকম কোন পাখি আছে বলে শুনিনি। লোকটা বলল, পাখিটার রোগা চেহারা দেখে কেউ কিনতে চায় না।
ফেরিওলার নাম জিজ্ঞেস করেছিলেন? কিংবা গাড়িটার কোন নাম ছিল?
না, মাথা নাড়লেন অভিনেতা। পুরানো মলিন কাপড়চোপড় পরনে ছিল, কাশছিল বারে বারে। কাকাতুয়াটা বিক্রি করতে পারলে যেন বেঁচে যায়, এমন ভাবসাব। জিজ্ঞেস করায় বলল, তোতলা বলে নাকি কিনতে চায় না কেউ।
গাড়িটা সাধারণ দু-চাকার গাড়ি, না?
হ্যাঁ। কবে যে রঙ করেছে কে জানে। গাধাটার স্বাস্থ্যও বিশেষ সুবিধের না। ডিংগো বলে ডাকছিল।
কিশোর, মুসা বলল, কাকাতুয়াটা চুরি করে আনেনি তো?
মনে হয় না। ভোলাখুলি রাস্তায় নিয়ে বেরোনোর সাহস করত না তাহলে। চিন্তিত দেখাচ্ছে কিশোরকে। তবে একটা ব্যাপার পরিষ্কার, বিলির আসল মালিক নয় সে, বুলিও সে শেখায়নি।
কি করে বুঝলে?
সহজ। মিস্টার ফোর্ড বলছেন, কাকাতুয়াটার কথায় বিশিট টান ছিল। অথচ ফেরিওলার কথায় মেকসিকান্ত টান।
বিষ খেয়ে মরা উচিত আমার, কি শাস্তি হওয়া উচিত তার সে-ব্যাপারে বিন্দুমাত্র স্বজনপ্রীতি দেখাল না মুসা, মনে মনে বলল। এই সহজ কথাটা বুঝলাম না? আমি গোয়েন্দাগিরির অযোগ্য।
মিস্টার ফোর্ড, বলল কিশোর, পাখিটাহারাল কিভাবে খুলে বলুন তো।
বলছি, ছোট্ট কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে নিলেন অভিনেতা। দিন তিনেক আগে বিকেলে হাঁটতে বেরিয়েছিলাম। দরজায় তালা লাগাইনি, জানালাও খোলা ছিল। ফিরে এসে দেখলাম বিলি নেই। ড্রাইভওয়েতে গাড়ির চাকার দাগ। আমার নিজের কোন গাড়ি নেই। অনুমান করতে অসুবিধে হলো না, গাড়ি করে এসেছিল, বিলিকে চুরি করে নিয়ে গেছে। ক্ষোভের সঙ্গে বললেন, অথচ পুলিশের বক্তব্য,

বিলি উড়ে চলে গেছে। আচ্ছা তুমিই বলো, খাঁচা নিয়ে উড়ে যায় কি করে কাকাতুয়া? সম্ভব? এই হলোগে আমাদের পুলিশ সাহেবদের বুদ্ধি।
না, তা সম্ভব নয়, একমত হলো কিশোর। আজকের কথা বলুন। কি কি ঘটেছিল? কেন এসেছিল মোটা লোকটা? কেনই বা আপনাকে বেঁধে ফেলে গেল?
ওই শয়তানটা! জ্বলে উঠলেন ফোর্ড। প্রথমে এসে বলল, তার নাম হাইমাস, পুলিশের লোক। ভাবলাম, বুঝি মত পালটেছে পুলিশ, আমার পাখিটার ব্যাপারে তদন্ত করতে এসেছে। ডেকে এনে বসালাম ঘরে। নানা রকম প্রশ্ন শুরু করল কাকাতুয়া সম্পর্কে। ফেরিওলার কাছ থেকে আমার প্রতিবেশি কেউ আর কোন কাকাতুয়া কিনেছে কিনা জানতে চাইল। মিস জলি বোরোর কথা বললাম।
শুনে খুব উৎসাহী হয়ে উঠল ব্যাটা। জিজ্ঞেস করল, আমার কাকাতুয়াটা কি বুলি আউড়ায়। বললাম, সে কথা পুলিশকে আগেই বলেছি। দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে পড়ল লোকটা। আরেকবার বলার জন্যে অনুরোধ করল। নিছক রুটিন-চেকের খাতিরেই নাকি শুনতে চায়। বললাম : মাই নেইম ইজ বিলি শেকসপীয়ার। টু বি অর নট টু বি দ্যাট ইজ দা কোয়েশচেন।
শুনে খুব উত্তেজিত হয়ে উঠল সে। নোট বই বের করে লিখে নিল।
পাখিটা যে তোতলায় বলেননি তাকে? মুসা জিজ্ঞেস করল।
না, কপালে হাত বোলালেন অভিনেতা। বললে পুলিশ হাসবে মনে করে বলিনি। সোজা কথাই বিশ্বাস করে না, আর তোতলা কাকাতুয়ার কথা করবে।
অথচ, মিস্টার হাইমাস খুব উত্তেজিত হয়ে পড়ল, বলল কিশোর, ঠিক প্রশ্ন নয়। আর কিছু জানাতে পারেন?
না, আর তেমন কিছু... মাথা নাড়তে গিয়েও নাড়লেন না অভিনেতা, হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে। হাইমাস জিজ্ঞেস করেছে, ফেরিওলার কাছে বিক্রি করার মত আর কোন কাকাতুয়া ছিল কিনা। কালো পাখিটার কথা জানালাম। বলতেই এমন উত্তেজিত হয়ে পড়ল।
নিচয় ব্ল্যাকবিয়ার্ড, চেচিয়ে উঠল সে। যা, নিশ্চয় ব্ল্যাকবিয়ার্ড। তার এই ভাবভঙ্গি দেখে সন্দেহ হলো আমার। শিওর হয়ে গেলাম, হাইমাস পুলিশের লোক নয়।
নোট নিতে নিতে মুখ তুলল কিশোর, মিস্টার ফোর্ড, আপনার কাকাতুয়া কেমন তাই জিজ্ঞেস করা হয়নি। কি জাতের? নানারকম প্রজাতি আছে, জানেনই তো।
সরি, জানি না। তবে বিলি খুব সুন্দর, মাথা আর বুক হলুদ রঙের।
হ্যাঁ, তারপর? হাইমাস বুঝল, আপনি সন্দেহ করেছেন?
বুঝবে কি? আমিই তো বলছি। রেগে গিয়ে বলেছি, কিভাবে বলেছেন, অভিনয় করে দেখালেন, তুমি পুলিশের লোক নও। তুমি একটা ভণ্ড, প্রতারক, চোর,

আমার বিলিকে চুরি করেছ। জলদি ওকে ফিরিয়ে দাও, নইলে মজা বুঝিয়ে ছাড়ব।
তারপর? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
তারপর, বাইরে একটা শব্দ শুনলাম। লাফ দিয়ে উঠে জানালার কাছে চলে গেল হাইমাস। গাড়িপথ ধরে তোমাদেরকে আসতে দেখল। ভাবল, পুলিশ নিয়ে এসেছ। আমাকে কাবু করে হাত-পা বেঁধে ফেলল। মুখে রুমাল গুঁজে দিল, তার আগে কয়েকবার চেচাতে পেরেছি। বেশি ঠেসে ঢোকায়নি রুমাল, পরে আবার ফেলে দিতে পেরেছি। তা নইলে তোমাদের ডাকতে পারতাম না। হাত নাড়লেন ফোর্ড। কিন্তু কেন কি হচ্ছে, কিছুই মাথায় ঢুকছে না। আমি তো কারও কোন ক্ষতি করিনি। আমারই পাখি চুরি করেছে, আমার ওপরই যত...যাকগে, এখন আমার বিলিকে ফেরতে পেলেই হলো। তোমরা সাহায্য করবে?
সাধ্যমত করব স্যার, কথা দিল কিশোর।
মিস্টার ফোর্ডের কাছে আর কিছু জানার নেই। তাকে ধন্যবাদ আর বিদায় জানিয়ে বেরিয়ে এল দুই গোয়েন্দা।
ডলে ডলে গাড়িটাকে আরও চকচকে করে তুলছে হ্যানসন, ছেলেদেরকে দেখে থেমে গেল। এবার কোথায় যাব, মাস্টার পাশা?
বাড়ি চলুন।
আঁকাবাকা লম্বা গাড়িপথ পেরোচ্ছে রোলস রয়েস। মুসার দিকে ফিরল কিশোর। মনে হয়, হাইমাসই বিলিকে চুরি করেছে। আরও তথ্য জানার জন্যেই ফিরে এসেছে, মিস্টার ফোর্ডের সঙ্গে কথা বলেছে। আমাদের পয়লা কাজ, ওকে খুঁজে বের করা।
আমি ভরসা পাচ্ছি না, সত্য কথাই বলল মুসা। খুব বাজে লোক। তখন সিগারেট লাইটার বের করে ভয় দেখিয়েছে। ঠেকায় পড়লে আসল পিস্তল বের করে গুলিও করে বসতে পারে, ওকে বিশ্বাস নেই। তাছাড়া, কি সূত্র আছে আমাদের হাতে? খুঁজে বের করব কিভাবে?
সেটাই ভাবছি। কোন উপায় নিশ্চয় হ্যানসন, লাগল লাগল।
সতর্ক করার দরকার ছিল না। কিশোরের আগেই ধূসর সেডানটাকে দেখে ফেলেছে হ্যানসন। সাই করে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে রাস্তা থেকে সরিয়ে নিয়েছে রোলস রয়েসকে। পুরানো, অবহেলিত একটা ফুলের বিছানা মাড়িয়ে একেবারে নষ্ট করে দিল। আর কিছু করারও ছিল না।
বেখেয়ালে গাড়ি চালাচ্ছে সেডানের ড্রাইভার। দুর্ঘটনা যে এড়ানো গেছে, এই যথেষ্ট, তা-ও হ্যানসন, সতর্ক থাকায়।

আর ইঞ্চিখানেক এদিক ওদিক হলেই লেগে যেত একটার সঙ্গে আরেকটা, রোলসরয়েসের চাকচিক্য তো বটেই, বডির মসৃণতাও নষ্ট হত অনেকখানি।
দরজা খুলে ভারিক্কি চালে নেমে গেল হ্যানসন। সেডানের ড্রাইভিং সীটে বসা ছোট্ট মানুষটার মুখোমুখি হলো। কড়া দৃষ্টি নোকটার। দোষ তো করেছেই, উল্টে নেমে এসে কৈফিয়ত চেয়ে বসল, হ্যানসন কিছু বলার আগেই।
দেখেশুনে চালাতে পারো না, গরিলা কোথাকার? চেঁচিয়ে উঠল তীক্ষ্ণচোখে। হ্যানসনের ছয় ফুট দুই ইঞ্চির কাছে তাকে এতটুকু মনে হচ্ছে। তা-ও কি দাপট!
দেখো, বাপু, সম্ভ্রান্ত ইংরেজের মত কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব নিচু রাখল হ্যানসন, দোষটা আমার নয়, তোমার। এত স্পীডে গাড়ি ঘোরায় কেউ? গেট দিয়ে ঢুকতে চায়? আরেকটু হলেই তো দিয়েছিলে দুটো গাড়িকেই নষ্ট করে।
দেখো, গর্জে ওঠার আগে এক পা পিছিয়ে গেল লোকটা, বেশি সামনে থেকে গালমন্দ করার সাহস হচ্ছে না বোধহয়, চাকরের মুখ থেকে উপদেশ শুনতে চাই না।
ভদ্রভাবে কথা বললা, শান্ত কণ্ঠে বলল হ্যানসন। নইলে ভদ্রতা শিখিয়ে দেব। এক চড়ে ফেলে দেব বত্রিশটা দাঁত।
রাগে ঘুসি পাকিয়ে এগিয়ে এল তীক্ষ্ণচোখে।
আলগোছে তার হাতটা ধরে ফেলল হ্যানসন, আরেক হাতে কলার চেপে ধরে শূন্যে তুলে ফেলল। হাস্যকর ভঙ্গিতে ছটফট করতে লাগল লোকটা, করুণ হয়ে উঠেছে মুখচোখ।
সেডানের পেছনের দরজা খুলে নামল, আরেকজন লোক। দামী বেশভূষা। ধমক দিল, টমাস। গাড়িতে যাও। বেশ ভারি গলা, আদেশ দিতে অভ্যস্ত, বোঝ গেল কণ্ঠস্বরেই। কথায় ফরাসী টান। সরু গোঁফ, ঠোঁটের কোণে একটা বড় তিল।
হাত থেকে টমাসকে ছেড়ে দিল হ্যানসন। . পড়ে যেতে যেতে কোনমতে সামলে নিল টমাস। দ্বিধা করল। ফিরে গেল। গাড়িতে। পেছনে আরেকজন বসে আছে, হোঁতকা, কুৎসিত চেহারা দেখছে।
সরি, হ্যানসনকে বলল দ্বিতীয় যে লোকটা বেরিয়ে এসেছে সে, খুব বাজে কাজ করেছে আমার ড্রাইভার। রোলস-রয়েসটার দিকে চোখের ইশারা করে বলল, খুব সুন্দর গাড়ি। রঙ-টঙ নষ্ট হলে আমারই খারাপ লাগত। তা, তোমার মালিক কে? আমার সঙ্গে একটু কথা বলবেন?
একে একে এত দ্রুত ঘটনাগুলো ঘটে গেছে, বাধা দেয়ার বা কিছু করার সুযোগই পায়নি কিশোর। এখন নেমে এল।
আপনি আমার সঙ্গে কথা বলতে চান?
অবাক হলো বিশালদেহী লোকটা। তুমি মানে আপনি এটার মালিক?

তুমি বললে কিছু মনে করব না, বলল কিশোর। হ্যাঁ, আপাতত আমিই মালিক। পরে কি হবে জানি না।
অ। দ্বিধা করছে লোকটা। তুমি মানে, মিস্টার ফোর্ডের সঙ্গে কথা বলতে এসেছিলাম। তুমি কি তার কিছু হও?
তা, বন্ধু বলতে পারেন। এই তো, আমরাও কথা বলে বেরোলাম।
তাহলে হয়তো বলতে পারবে। আচ্ছা, তার বিলি শেকসপীয়ারের. কি অবস্থা?
পাওয়া যায়নি এখনও। খুব মনের কষ্টে আছেন বেচারা।
এখনও পাওয়া যায়নি, লোকটার মুখ দেখে বোঝা গেল না কিছু ভাবান্তর হয়নি চেহারায়। সত্যি খুব খারাপ কথা। কোন খবরই নেই?
না পুলিশের কাছেই যাচ্ছি, কতদূর কি করল, জানতে। আপনার কথা বলব? সাহায্য-টাহায্য করতে চান নাকি?
না না, তাড়াতাড়ি দু-হাত নাড়ল লোকটা, আমার কথা বলার দরকার নেই। আমি মিস্টার ফোর্ডের বন্ধু। এ-পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম। ভাবলাম, খোঁজটা নিয়েই যাই। তোমার কাছেই খবর পাওয়া গেল যখন, এখন-আর যাচ্ছি না। তাড়া আছে। আমার, অন্য সময় আসব। যাই।
নাম-ধাম কিছুই বলল না লোকটা, দ্রুত গিয়ে গাড়িতে উঠে ড্রাইভারকে বলল, টমাস, গাড়ি ছাড়ো। হোটেলে চলো।
ইয়েস, স্যার, ঘোৎ ঘোঁৎ করল তীক্ষ্ণচোখো ড্রাইভার। হ্যানসনের দিকে আরেকবার দৃষ্টির আগুন হেনে গাড়ি পিছাতে শুরু করল। ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেল।
খুব চমৎকার সামলেছেন, স্যার, প্রশংসা করল হ্যানসন। আপনার চাকরি করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি, কিশোরের বার বার নিষেধ সত্ত্বেও অতিবিনয় প্রকাশ করে ফেলে সে মাঝেমাঝে, দীর্ঘ দিনের স্বভাব বদলাতে পারে না।
থ্যাংক ইউ, বলে গাড়িতে উঠল কিশোর।
কিশোর, কৌতুহলে ফেটে পড়ছে মুসা, লোকটার সঙ্গে কিশোরের কি কথা হয়েছে শুনতে পায়নি, এত সহজে তাড়ালে কি করে? মনে তো হলো খুব শক্তপাল্লা। ওসব লোককে চিনি আমি, অন্ধকার গলিপথে সামনে পড়লে ঝেড়ে দৌড় দেব। মনে হলো, তুমিই ওকে ভয় পাইয়ে দিয়েছ?
চেপে রাখা নিঃশ্বাস ফোঁস করে ছাড়ল কিশোর। হেলান দিল গদিতে। তেমন কিছু না। শুধু পুলিশের নাম বলেছিলাম।
আজকাল পুলিশ এত ভয় দেখাতে শুরু করেছে লোককে, গাড়ি পিছিয়ে আবার রাস্তায় তুলছে হ্যানসন, সেদিকে চেয়ে বলল মুসা। আগে জানতাম শুধু বদ লোকেরাই ভয় পায়...।

যারা পালাল, তারাও বদলোক, মুসার কথার পিঠে বলল কিশোর। ড্রাইভারের কোটের তলায় নিশ্চয় শোল্ডার-হোলস্টার আছে। খেয়াল করোনি, হ্যানসন যখন ওকে ধরেছে, বগলের তলায় হাত দিতে যাচ্ছিল? খুন খারাপি অপছন্দ করে না সে। .
পিস্তল? ঢোক গিলল মুসা। ব্যবহার করে?
আরেকটু হলেই আজও করে ফেলেছিল। মনিবের জন্যে পারল না। তার মনিব খুব উঁচুদরের লোক, বোঝাই যায়। এমন একজন মানুষ বন্দুকবাজ ড্রাইভার রেখেছে কেন?
প্রায় নিঃশব্দে, মসৃণ গতিতে আবার চলতে শুধু করেছে রোলস-রয়েস।
ভাবছি, গাল চুলকাল মুসা, এসব লোকের সঙ্গে জড়াচ্ছি কেন? একটা সাধারণ কাকাতুয়া খুঁজতে বেরিয়েছিলাম আমরা।
তা বেরিয়েছিলাম, স্বীকার করল কিশোর। তাহলে? আজব এক মোটা লোকের পাল্লায় পড়লাম শুরুতেই। তারপর আরেক লোক, পোশাক-আশাকে ভদ্রলোক, কিন্তু বন্দুকবাজ পোষে। রহস্যময় এক মেকসিকান ফেরিওলার কথাও শুনলাম। সবাই পাখিটার ব্যাপারে আগ্রহী।
মেকসিকান ফেরিওয়ালা বাদে, শুধরে দিল কিশোর। পাখিটা বেচে দিয়ে গেছে, ব্যস। আর আসেনি।
কিন্তু কেন? তোত একটা কাকাতুয়া এমন কি দামী জিনিস, চুরি করার জন্যে, হাতে পাওয়ার জন্যে খেপে উঠেছে সবাই?
তদন্ত করলে জবাব মিলবে। এ-মুহূর্তে তোমার মতই অন্ধকারে আছি আমি।
থাকার দরকারটা কি? গজগজ করল মুসা। আমি বলি কি, শোনো…
হঠাৎ গতি কমে গেল রোলস-রয়েসের।
কি হয়েছে, হ্যানসন? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
এক মহিলা। রাস্তায় এসে উঠেছেন। কিছু হারিয়েছেন বোধহয়।
জানালা দিয়ে মুখ বের করল দুই গোয়েন্দা। ততক্ষণে ব্রেক কষে গাড়ি দাঁড় করিয়ে ফেলেছে হ্যানসন।
বেঁটে, গোলগাল এক মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন রাস্তার ওপর, গাড়ি-ঘোড়া আসছে কিনা খেয়ালই নেই। ঝোপের দিকে চেয়ে কাকে জানি ডাকছেন। এসো, লক্ষ্মী এসো, জলদি এসো। দেখো কি এনেছি। খুব ভাল সূর্যমুখীর বীচি।
বোধহয় কিছু গণ্ডগোল হয়েছে, গাড়ি থেকে নামতে শুরু করল কিশোর। চলো তো, দেখি।
মহিলার দিকে হাঁটতে শুরু করল দুই গোয়েন্দা। কিন্তু কোন খেয়ালই নেই মহিলার : ঝোপের দিকে চেয়ে মুঠো খুলে দেখালেন, কত ভাল লোভনীয় বীচি এনেছেন!

…
মাপ করবেন,কাছে এসে বলল কিশোর। কিছু হারিয়েছেন বুঝি?
অ্যাঁ…হ্যাঁ, পাখির মত মাথা একপাশে কাত করে অনেকটা পক্ষীকণ্ঠেই বললেন মহিলা। এই দেখো না, লিটল বো-পীপকে খুঁজি পাচ্ছি না। কোথায় যে গেছে কে জানে? তোমরা নিশ্চয় দেখোনি, না? লিটল বো-পীপকে?
না, ম্যাডাম, জবাব দিল কিশোর। লিটল বো-পীপ কি কোন কাকাতুয়া?
নিশ্চই, বিস্ময় ফুটল মহিলার চোখে। তুমি জানলে কি ভাবে?
পকেট থেকে কার্ড বের করে দিল কিশোর। আমরা গোয়েন্দা। বুঝতে পারছি, কাকাতুয়াই খুঁজছেন আপনি। ওই যে, ঘাসের ওপর চাটা ফেলে রেখেছেন। হাতে সূর্যমুখীর বীচি, ডাকাডাকি করছেন ঝোপের দিকে চেয়ে। কাকাতুয়া ছাড়া আর কি?
আরও বেশি অবাক হলেন মহিলা। বাহ, বেশ বুদ্ধি তো।
তারপর আরও কয়েকবার ডাকাডাকি করে হতাশ হয়ে দুই গোয়েন্দাকে নিয়ে রওনা হলেন বাড়ির দিকে, লিটল বো-পীপের নিখোজের ব্যাপারে খুলে বলবেন।
হ্যানসন, আপনি এখানেই থাকুন, ডেকে বলল কিশোর।
ইট বিছানো পথ ধরে মহিলার পিছু পিছু চলল দুই গোয়েন্দা। সামনে অনেকগুলো কলা-ঝাড়ের ওপাশে একটা বাংলো।
ছোট লিভিং রুমে দুই গোয়েন্দাকে বসালেন মহিলা, নিজেও বসলেন।
মিস বোরো, বলল কিশোর, কয়েক হপ্তা আগে এক মেকসিকান ফেরিওলার কাছ থেকে কাকাতুয়াটা কিনেছিলেন, না?
হ্যাঁ, চোখ বড় বড় হয়ে গেল তাঁর। আমার নামও জানো দেখছি? তুমি তো খুব ভাল গোয়েন্দা।
আগে থেকেই তথ্য জানা থাকলে ওগুলো বলা শক্ত কিছু না। কিশোর জানাল, মিস্টার ফোর্ড আপনার কথা বলেছেন।
তথ্য জানা থাকলেও অনেকেই বলতে পারে না, বললেন মিস বোরা। আর তথ্য জোগাড় করতেও বুদ্ধি লাগে। যাই হোক, মিস্টার ফোর্ড নিশ্চয় বিলিকে খুঁজে পেয়েছেন।
না, পাননি, মুসা বলল। ওকে খুঁজে বের করার চেষ্টা চালাচ্ছি আমরা। আপনারটা হারাল কি করে, বলবেন, প্লীজ?
দোকানে গিয়েছিলাম, মুখ বাঁকালেন মিস বোরো। বীচি ফুরিয়ে গিয়েছিল। সূর্যমুখীর বীচি খুব পছন্দ করে বো-পীপ। গেট দিয়ে বেরিয়েই মরতে বসেছিলাম, প্রায় চাপা দিয়ে দিয়েছিল আমাকে কালো একটা গাড়ি। বিদেশী গাড়ি। আজকাল লোকে যা বেখেয়ালে চালায় না।

একে অন্যের দিকে তাকাল কিশোর আর মুসা। গাড়িটা কার অনুমান করতে কষ্ট হলো না কারোই।
থামতে বললাম, থামল না, বলে গেলেন মিস বোরো। কি আর করার আছে? ভয় পেয়ে পালিয়েছে যখন? দোকানে গিয়ে বীচি কিনলাম। কোন বীচি ভাল, কোনটা খারাপ, খানিকক্ষণ আলোচনা করলাম দোকানের মেয়েটার সঙ্গে। ফিরে এসে দেখি বো-পীপের খাঁচার দরজা খোলা। সে নেই। বোধহয় দরজা খোলাই রেখে গিয়েছিলাম, এই ফাঁকে বেরিয়ে গেছে। ভাবলাম, কোন ঝোপঝাড়ে গিয়ে লুকিয়েছে। খুঁজতে খুঁজতে চলে গেলাম রাস্তায়...তারপর তো তোমাদের সঙ্গে দেখা।
কালো গাড়িটাকে পরে আর দেখেছেন? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
না, মাথা নাড়লেন মিস বোরো। সা করে গিয়ে মোড় নিয়ে হারিয়ে গেল। গাছপালা ঝোপঝাড় বেশি, মোড় নিলে আর দেখা যায় না। ভুরু কোঁচকালেন। ওই মোটা লোকটাই চুরি করেছে বলছ নাকি?
তাই তো মনে হয়, ম্যাডাম, বলল কিশোর। আমার ধারণা, বিলিকেও সেই চুরি করেছে।
সর্বনাশ! অসহায় মনে হচ্ছে মহিলাকে। তাহলে তো আর তাকে পাব না। কি নিষ্ঠুর গো। লোকের মনে কষ্ট দেয়। কিন্তু দুটো কাকাতুয়া চুরি করতে যাবে কেন? ইচ্ছে করলে তো কিনেই নিতে পারে।
এই প্রশ্নটার জবাব মুসারও খুব জানতে ইচ্ছে করছে।
কিন্তু জবাব জানা নেই গোয়েন্দাপ্রধানের। আপাতত এটা রহস্য, বলল সে। আচ্ছা; মিস বোরো, আপনার লিটল বো-পীপ কি কথা বলতে পারে?
নিশ্চয় পারে। লিটল বো-পীপ বলে তার ভেড়াটা হারিয়েছে। কোথায় হারিয়েছে, জানে না। খুঁজে দেয়ার জন্যে ডাকাডাকি করে শারলক হোমসকে। অদ্ভুত কথা, তাই না? কাকাতুয়াকে আরও কত রকম বুলিই তো শেখানো যায়।
তা যায়, নোট বই বের করল কিশোর। ঠিক কি কি বলত বলুন তো?
লিটল বো-পীপ হ্যাজ লস্ট হার শীপ অ্যাণ্ড ডাটু নো হোয়্যার টু ফাইণ্ড ইট। কল অন শারলক হোমস।
দ্রুত লিখে নিয়ে বলল কিশোর, কথায় ব্রিটিশ টান আছে?
আছে। মনে হয়, খুব যত্ন করে শিখিয়েছে কোন উচ্চ শিক্ষিত ইংরেজ ভদ্রলোক।
হু। মিস বোরো, যা মনে হচ্ছে আপনার বো-পীপকে হাইমাসই মানে, মোটা লোকটাই চুরি করেছে। পুলিশকে ফোন করে জানান।
পুলিশ? ও, মাই গুডনেস! আঁতকে উঠলেন মহিলা। ফোন নেই আমার।। তাছাড়া পুলিশের ঝামেলায় যাব না। এত দূরে শহরে গিয়ে ওদের সাহায্য চাইতে বলছ?

যাক, লাগবে না আমার। অনুরোধ করলেন, প্লীজ, তোমরাই খুঁজে দাও। দেবে?
তা দিতে পারি, বলল কিশোর। একই সঙ্গে দুটো তদন্ত চালানো এমন কিছু কঠিন না, তাছাড়া চোর যখন একজন।
প্লীজ। তোমার কথা চিরদিন মনে রাখব তাহলে। দেবে শুনেই যা ভাল্লাগছে না।
আরেকটা প্রশ্ন, মিস বোরো, তর্জনী তুলল কিশোর ! মেকসিকান ফেরিওয়ালা দুই চাকার একটা গাধায় টানা গাড়িতে করে এসেছিল, না?
হ্যাঁ। খুব কাশছিল। মনে হচ্ছিল, ভারি অসুখ। বেচারাকে দেখে খারাপই লাগছিল।
কাকাতুয়া বিক্রি করে রসিদ-টসিদ দিয়েছে কিছু?
না-তো। ইস্, বড্ড ভুল হয়ে গেছে, শূন্য দৃষ্টিতে তাকালেন মিস বোরো। চাওয়ার কথা মনেই ছিল না।
গাড়ির গায়ে কোন নাম বা কিছু লেখা ছিল?
মাথা নাড়লেন মিস বোরো। আর কোন তথ্য দিতে পারলেন না তিনি।
মহিলাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এল দুই গোয়েন্দা।
বাইরে বেরিয়েই কিশোরের বাহু খামচে ধরল মুসা। কিশোর, কাকাতুয়া দুটোকে কিভাবে খুঁজে বের করবে? কোথায় আছে ওরা কিছুই তো জানি না। একজন শেকসপীয়ার জানে, অরেকজন মাদার গুজ। কিন্তু জঙ্গল থেকে ধরে এনে ওই বুলি তো যে কোন কাকাতুয়াকে শেখানো যায়। অযথা সময় নষ্ট করছি, বুঝলে?
চিন্তিত দেখাচ্ছে কিশোরকে। হাইমসকে দেখে কি মনে হয়েছে তোমার? ছেলেমানুষী করার লোক?
মোটেই না, জোরে মাথা নাড়ল মুসা। পিস্তল-চেহারার লাইটার দেখিয়ে যে রসিকতা করতে পারে, সে ছেলেমানুষী করার লোক নয়।
এক্কেবারে ঠিক। অথচ সেই লোকই দুই রকম বুলি আউড়ায় এমন দুটো কাকাতুয়া চুরি করল কি কারণে? জোরাল কোন যুক্তি নিশ্চয় আছে, এখন বুঝতে পারছি না।
কিন্তু তাকেই বা খুঁজে পাব কি করে?
আমরা গোয়েন্দা, বুদ্ধির খেলা খেলি। কোনভাবে..সরো সরো! ঝাঁপিয়ে এসে পড়ল মুসার ওপর, নিয়ে পড়ল মাটিতে।
খানিক আগে মুসার মাথা যেখানে ছিল, শিস কেটে ঠিক সে-পথে উড়ে চলে গেল কি যেন একটা। ঘাসে ঢাকা নরম মাটিতে গিয়ে গাঁথল।
সরো…ওহ, সরো! ঠেলে গায়ের ওপর থেকে কিশোরকে সরাল মুসা, শ্বাস নিতে পারছি না।
উঠে দাঁড়াল কিশোর।
মুসাও উঠল। জোরে জোরে শ্বাস নিল কয়েকবার।

নিচু হয়ে জিনিসটা তুলছে কিশোর। লাল টালির একটা টুকরো, মিস বোরোর বাংলোর ছাতে যে-ধরনের টালি, ওখান থেকেই ভেঙে নেয়া হয়েছে কিনা কে জানে।
এটা মাথায় লাগলে না মরলেও বেহুশ হয়ে থাকতে কয়েক ঘণ্টা, কিশোর বলল। ভাগ্যিস ঝোপের দিকে চোখ পড়েছিল।
থ্যা-থ্যাংকস, কাঁপছে মুসার গলা। ছুড়ল কে?
দেখিনি। হুঁশিয়ার করল। ও চায় না আমরা বিলি কিংবা বো-পীপকে খুঁজি।
রাতের খাওয়া খেতে বসছে রবিন। বার বার তাকাচ্ছে টেলিফোনের দিকে। এই খানিক আগে ফিরেছে লাইব্রেরি থেকে, পার্ট-টাইম চাকরি করে ওখানে।
ইস্ এখনও ফোন করছে না কেন কিশোর?
খাওয়া শেষ হয়ে এসেছে রবিনের, তা-ও ফোন বাজছে না। উঠে গিয়ে সিংকে। প্লেট চোবাল, ধুয়ে পরিষ্কার করে এনে রাখল আবার জায়গামত।
কাছেই কাজ করছেন মিসেস মিলফোর্ড।
মা, বলল রবিন, কিশোর কোন খবরটবর দিয়েছে?
ও, হ্যাঁ হ্যাঁ, মুখ ফেরালেন তিনি। ভুলেই গিয়েছিলাম। একটা মেসেজ আছে।
কি মেসেজ? উত্তেজিত হয়ে উঠল রবিন। কি লিখেছে?
আগের দিন যা যা ঘটেছে, তাকে জানিয়েছে কিশোর। সঙ্গে সঙ্গে রিপোর্টের ফাইল তৈরি করে ফেলেছে রবিন, এটা তার দায়িত্ব। আজ বিকেলে হেডকোয়ার্টারে কাকাতুয়ার রহস্য নিয়েই আলোচনা করার কথা।
এই যে, লিখে রেখেছি, মা বললেন, পকেট হাতড়ে বের করলেন এক টুকরো কাগজ। কি যে সব বলে কিশোর, মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝি না। ভুলে যেতাম, তাই লিখে রেখেছি। এই যে।
ও ওরকম করেই বলে, মাকে বোঝাল রবিন, হাত বাড়াল কাগজটার জন্যে।
বেশি পড়াশোনা করে তো, বড় বড় কঠিন শব্দ আপনাআপনি মুখে চলে আসে। চাচা-চাচীর সঙ্গেও ওভাবেই কথা বলে। বেশিদিন তোমার সঙ্গে ওভাবে বললে তুমিও বুঝে যাবে, আর উদ্ভট লাগবে না।
কি বলছে, কিছুই বুঝিনি। জোরে জোরে পড়লেন মিসেস মিলফোর্ড, লাল কুকুর চার। উড়ে এসে জুড়ে বসেছে। তীর বরাবর বুকে হাঁটবে। সহজ সহজ বাক্য, অথচ মানে করতে গেলে মনে হয় গ্রীক। কি বুঝিয়েছে রে?
জবাব নেই। রবিন ততক্ষণে পৌঁছে গেছে দরজার কাছে। ডাকলেন মা। এই রবিন, না বলেই চলে যাচ্ছিস যে?
দরজায় দাঁড়িয়ে ঘুরল রবিন, হতাশ ভঙ্গিতে কপাল চাপড়াল, ওফ্‌ফো, মা, এই সহজ কথাগুলো বুঝতে পারছ না। ইংরেজিই তো লিখেছে।

কোথায় ইংরেজি। কোন ধরনের কোড। এই, বল না। হ্যাঁ, কোডই। বাইরের লোক যাতে বুঝতে না পারে… কি বলছিস তুই, রবিন? মা অবাক। আমি তোর মা, বাইরের লোক?
তোমাকে বাইরের লোক বললাম নাকি? খালি উল্টোপাল্টা বোঝো। ঠিক আছে, কোন্ কথাটা জানতে চাও?
এই যে, উড়ে এসে জুড়ে বসেছে?
কয়েকটা হারানো কাকাতুয়াকে খুঁজছি আমরা, ওটারই কোড : উড়ে এসে জুড়ে বসেছে।
হুঁ, মায়ের আশঙ্কা দূর হলো, ভয়ের কিছু নেই, বিপদ হবে না ছেলের।
যাওয়ার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে রবিন, মা আবার প্রশ্ন করার আগেই বলল, আর লাল কুকুর চার মানে…
থাক থাক, ওগুলোর মানে আর জানার দরকার নেই, হাত তুললেন মিসেস মিলফোর্ড। যা, বেশী রাত করিস না। গির্জার ফাদারকে দাওয়াত করতে যেতে হবে। আগামী রোববারে আমাদের এখানেই খাবেন।
লাল কুকুর চার হলো তিন গোয়েন্দার হেডকোয়ার্টারে ঢোকার অনেকগুলো পথের একটা। ওটা দিয়ে ঢোকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে মেসেজে।
স্যালভিজ ইয়ার্ডের বেড়ায় নানা রকম ছবি। এক জায়গায় একটা লাল কুকুর বসে আছে, একটা বাড়িতে আগুন লেগেছে, তা-ই দেখছে। কুকুরটার একটা চোখ আসলে কাঠের গিঁট। আলগা। নখ দিয়ে খুঁচিয়ে ওটা বের করে নিল রবিন, ভেতরে আঙুল ঢুকিয়ে গোপন সুইচ টিপল। আস্তে করে তিন দিকে সরে গেল বেড়ার তিনটে অংশ, গোপন দরজার পাল্লা। ভেতরে ঢুকে আবার সুইচ টিপে দরজা বন্ধ করে দিল সে।
এক জায়গায় অনেকগুলো তক্তা আর লোহার বীম আড়াআড়ি পড়ে আছে মনে হয়, ওভাবেই ওগুলো সাজিয়েছে তিন কিশোর। নিচে দিয়ে পথ। বুকে হেঁটে যেতে হয়। ওপরে একটা তীর চিহ্ন। ট্রেলারটা কোনদিকে আছে, তার নির্দেশ।
বুকে হেঁটে এগিয়ে ট্রেলারের নিচে পৌঁছে গেল রবিন। দুইবার টোকা দিতেই ভেতর থেকে তুলে নেয়া হলো একটা পান্না। হেডকোয়ার্টারে ঢুকল সে।
হেডকোয়ার্টার মানে তিরিশ ফুট লম্বা একটা বাতিল মোবাইল হোম, জঞ্জালের তলায় চাপা পড়ে আছে। সেটাকে সারিয়ে নিয়ে অফিস সাজিয়েছে তিন গোয়েন্দা। নানারকম সুযোগ-সুবিধে আছে তার মধ্যে। ছোট একটা ল্যাবরেটরিও আছে, আছে ফটো প্রসেস করার ডার্করুম।
ডেস্কের ওপাশে নির্দিষ্ট চেয়ারে বসে আনমনে একটা পেন্সিল কামড়াচ্ছে কিশোর। রবিনকে দেখে বলল, এত দেরি যে?

মেসেজ দিতে মা ভুলে গিয়েছিল। তবে আগে দিলেও আসতে পারতাম না, খেয়ে আসতে দিত না। কেন ডেকেছ? জরুরী মীটিং?
হ্যাঁ, মাথা ঝাকাল কিশোর। বিলি শেকসপীয়ার আর লিটল বো-পীপকে খুঁজে বের করা দরকার।
কিভাবে, তাই তো মাথায় ঢুকছে না, মুসা বলল। মোটকা হাইমাসকে চিনি, সন্দেহ করছি ওই ব্যাটাই চুরি করেছে। ব্যস! আর কোন সূত্র নেই। পুলিশ চেষ্টা করলে হয়তো গাড়িটা খুঁজে বের করতে পারে, কিন্তু তারা তো শুনলে হাসে। এক কাজ করলে কেমন হয়? গিয়ে পুলিশ চীফ ইয়ান ফ্লেচারকে ধরলে?
ভুলে যাও কেন? ভুরু নাচাল কিশোর। মিস্টার ফোর্ড আর মিসেস বোরো কেউই পুলিশের সাহায্য নিতে রাজি নন।
তাহলে? দু-হাত নাড়ল মুসা। আমি তো কোন উপায়ই দেখছি না।
উপায় একটা আছে।
আছে? এক সঙ্গে গলা সামনে বাড়াল রবিন আর মুসা।
আছে। ভূত-থেকে-ভূতে।
আরে, তাই তো, হাসল রবিন। এই কথাটা মনে পড়েনি!
আমিও একটা আস্ত গাধা, হতাশা চলে গেছে মুসার কণ্ঠ থেকে, উত্তেজনা ফুটেছে চেহারায়। তা এখুনি শুরু করে দিই না। আগামী কাল সকালেই খোঁজ পেয়ে যাব।
তা করতে পারো, রাজি হলো কিশোর।
আচ্ছা, একটা পুরস্কার ঘোষণা করলে কেমন হয়? প্রস্তাব রাখল রবিন।
তাহলে উৎসাহী হবে বাচ্চারা। তাড়াতাড়ি কাজ হবে।
ঠিকই বলছে। কি পুরস্কার দেয়া যায়?
আমি বলছি, হাত তুলল মুসা। বলব, যে আগে খোঁজ দিতে পারবে, তাকে রোলস-রয়েসে চড়িয়ে এক ঘণ্টা ঘোরাব।
মন্দ না, বলল কিশোর। দেখেছি তো, ছেলেমেয়েরা যেভাবে চকচকে চোখে তাকায় গাড়িটার দিকে। তা নাহয় ঘোরালাম। সেই সাথে কিছু নগদের কথাও বলি? এই বিশ-পঁচিশ ডলার? আরও বেশি আগ্রহী হবে।
তা-ই ঠিক হলো। গাড়িতে এক ঘণ্টা চড়ানো, আর পঁচিশ ডলার পুরস্কার।
চালু করে দেয়া হলো ভূত-থেকে-ভূতে।
রাত করতে মানা করে দিয়েছেন মা। উঠল রবিন।
বাড়ি ফিরে দেখল গুম হয়ে বসে আছেন মা, হাতে রিসিভার।
কি হয়েছে, মা? কোন গোলমাল?।
সেই তখন থেকে কতবার চেষ্টা করছি, মিসেস ফেনারকে আসতে বলব। একা কুলিয়ে উঠতে পারব না, অনেক মেহমান আসবেন, আমাকে একটু সাহায্য করবে

সে। লাইনই পাচ্ছি না। সব কটা লাইন এনগেজড! কি যে হলো আজ। একটাও খালি নেই।
ঢোক গিলল রবিন। জানে, কেন খালি নেই লাইন। কিন্তু সে-কথা মাকে বলা যাবে না।
আবার ডায়াল ঘোরাতে শুরু করলেন মিসেস মিলফোর্ড। মা এভাবে কষ্ট পাচ্ছেন, খারাপই লাগল রবিনের। কিন্তু কিছুই করার নেই তার এখন। সে নিজে চেষ্টা করলেও লাইন পাবে না।
দোতলায় নিজের ঘ-১ উঠে এল রবিন। কাপড় ছাড়তে ছাড়তে একটা মোটামুটি হিসাব করল : কালো গাড়িটার খোঁজ চেয়ে তারা তিনজনে পাঁচজন করে বন্ধুকে ফোন করেছে। ওরা করবে আরও পাচজনকে, হয়ে গেল পঁচাত্তর। তারা করবে আরও পাঁচজনকে। হয়ে গেল তিনশো পঁচাত্তর। তারা আরও পাঁচ...হলো আঠারোশো পঁচাত্তর...তারা আবার পাঁচ...নয় হাজার তিনশো পঁচাত্তর... আরিব্বাপরে! লস অ্যাঞ্জেলেস আর হলিউডের কোন ছেলেমেয়ের জানতে আর বাকি থাকে না। লুকাবে কোথায় হাইমাস? নাহ্ কিশোরটা একটা জিনিয়াস, বন্ধুগর্বে আধহাত উঁচু হলো রবিনের বুক।
শুয়ে পড়ল রবিন। বালিশে হাত, তার ওপর মাথা রেখে ভাবতে শুরু করল সে। বিলি শেকসপীয়ার, লিটল বো-পীপ আর তাদের বিচিত্র বুলির কথা। গতকাল থেকেই কিছু আছে, কিন্তু ধরতে পারছে না। এখন আরেকবার চেষ্টা করল। টু-টু-টু বি অর নট...আচ্ছা, কাকাতুয়া তোতলাবে কি করে? সে জানে, এর কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি নেই। ইচ্ছে করেই ভুল শেখায়নি তো? কিন্তু সন্তুষ্ট হতে পারল না রবিন, গোলমালটা ধরতে পারছে না। সেটা অন্য কোথাও।
ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল সে। মাঝরাতে ঘুমের ঘোরেই যেন কানের কাছে বলল কেউ ও লিটল বো-পীপ হ্যাজ লস্ট হার শীপ অ্যাণ্ড ডাজ নট নো হোয়্যার টু ফাইণ্ড ইট। কল অন শার্লক হোমস।
ঘুম ভেঙে গেল রবিনের। অখণ্ড নীরবতা। ভুলটা আবিষ্কার করে ফেলেছে মগজ। তার মনে পড়ল মাদার গুজ-এ লেখা লাইনটা হলো : লিটল বো-পীপ হ্যাজ লস্ট হার শীপ অ্যাণ্ড ডাজনট নো হোয়্যার টু ফাইণ্ড দেম।
দেম-এর জায়গায় ইট বলে কাকাতুয়াটা।
ব্যাপারটা হয়তো বিশেষ কিছুই নয়। কিন্তু কিশোরের কাছে শিখেছে রবিন, গোয়েন্দাগিরিতে অতি সামান্য ব্যাপারও অবহেলা করতে নেই।
হুম, চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল কিশোর, ঠিকই বলেছ, রবিন। এক বচন বহুবচন দুটোর বেলাতেই হয় শীপ, তাই ইট বললেও শুদ্ধ, দেমও শুদ্ধ। কিন্তু...

খাইছে! হাত তুলল মুসা। এই, তোমাদের ব্যাকরণ ক্লাস থামাও। গুঙিয়ে উঠল, স্কুলে শুনতে শুনতেই অবস্থা কাহিল…

হেডকোয়ার্টারে আলোচনায় বসেছে তিন গোয়েন্দা। দশটা বাজতে কয়েক মিনিট বাকি। ভুত-থেকে-ভূতের মাধ্যমে খবর আসার সময় হয়েছে।

কিন্তু ভুল করেছে, মুসার কথায় কান দিল না রবিন। যিনি শিখিয়েছেন, ভুল তাঁরই।

কটা ভুল? বলল কিশোর। বিলি শেকসপীয়ার তোতলায়, সেটা একটা ভুল। মাদার গুজ থেকে শেখানো হয়েছে লিটল বো-পীপকে, সেখানে আরেকটা ভুল।

তাতে কি? মুসার প্রশ্ন। মাত্র তো দুটো। এক গ্রামার ক্লাসেই কয়েক ডজন ভুল করি আমি। আর কবিতা মুখস্থ লিখতে দিলে তো….।

সেটা তোমার হয়, বলল কিশোর। কিন্তু উচ্চ শিক্ষিত একজন ইংরেজ ভদ্রলোক এই সাধারণ ভুল করবেন না। একটা হলে ধরে নিতাম, নাহয় হয়ে গেছে কোনভাবে। কিন্তু দুটো? উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মনে হয়।

উদ্দেশ্যপ্র… শূন্য দৃষ্টি ফুটল মুসার চোখে। তাকে দোষ দিতে পারল না রবিন। কিশোর পাশার ভাবনার সঙ্গে সব সময় তাল মিলিয়ে চলা কঠিন। অনেক সময় খুব বেশি শর্টকাটে এগিয়ে যায় তার মস্তিষ্ক।

ইচ্ছে করে ভুল শিখিয়েছেন বলতে চাইছ? জিজ্ঞেস করল রবিন।

হ্যাঁ। দুটো রহস্য আমাদের হাতে। এক : হাইমাস কেন কাকাতুয়া চুরি করছে? দুই? কেন ওগুলোকে ভুল বুলি শেখানো হয়েছে?

মাথায় ঢুকছে না, মাথা নাড়ল রবিন। এত কঠিন বুলি কেন শেখানো হয়েছে, সেটাও তো আরেক রহস্য। এসব কথা সাধারণত লোকে শেখায় না।

গভীর হচ্ছে রহস্য, বাস্তবে নেই যেন কিশোর, কণ্ঠে খুশির আমেজ। জটিল সমস্যা পেয়ে গেছে সে, জট ছাড়াবে ধীরে ধীরে, তাতেই তার আনন্দ। যে-ই শিখিয়েছে, অনেক ধৈর্যের সঙ্গে কষ্ট করে শেখাতে হয়েছে। নিশ্চয় অহেতুক কষ্ট করেনি। আর হাইমাসও বিনা কারণে কাকাতুয়া দুটোকে চুরি করেনি। নিশ্চয় কোন কারণ আছে।

কিশোর! উত্তেজিত মনে হলো রবিনকে। আরও পাখি তো থাকতে পারে? সেই কালো কাকাতুয়াটা? ব্ল্যাকবিয়ার্ড…

আরি সব্বোনাশ! আঁতকে উঠল মুসা। দুটোতেই মাথা ঘুরছে। আরও আমদানী করছ?

হাসতে গিয়েও থেমে গেল অন্য দুজন। ফোন বেজে উঠেছে। ছোঁ মেরে তুলে নিল কিশোর। হ্যালো হ্যাঁ।…তাই নাকি?…শেষ নম্বর দুটো ওয়ান থ্রী? …ও না না, তাহলে না, সরি। থ্যাংকু। হতাশ হয়ে রেখে দিল রিসিভার।

হলিউডের একটা ছেলে, জানাল সে। গাড়ির নম্বর মিলছে না।
আবার বাজল টেলিফোন। রিসিভার কানে ঠেকিয়ে স্পীকারের সুইচ টিপতে আর ভুল করল না কিশোর। সবাই শুনতে পেল ওপাশের কথা। সান্তা মনিকার একটা ছেলে কালো একটা রেঞ্জার দেখেছে, তবে কয়েক বছরের পুরানো গাড়ি। গাড়িতে ছিল দুই তরুণ দম্পতি। না, এবারেও হলো না।
আরও আটজন ফোন করল। কিন্তু সবগুলো বেঠিক।
নাহ্ কাজ হলো না, হতাশ হয়ে ভাবল কিশোর। ভূত-থেকে-ভূতে সাহায্য করল না এবার তিন গোয়েন্দাকে।
চুপ করে আছে ওরা। হাইমাসের কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।
স্পীকারে ডাক শোনা গেল মেরিচাচীর, কিশোর, এই কিশোর? একটা ছেলে তোর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। মেকসিকো থেকে।
মেকসিকো থেকে!
একই সঙ্গে কথাটা মনে পড়ে তিনজনের : কাকাতুয়া বিক্রি করেছে যে ফেরিওলা, তার কথায় জোরাল মেকসিকান টান ছিল।
হুড়োহুড়ি করে দুই সুড়ঙ্গ দিয়ে বেরিয়ে এল ওরা।
এই যে ও, রবিনের সমান লম্বা রুগ্ন চেহারার একটা ছেলেকে দেখালেন মেরিচাচী। মলিন প্যান্ট, শার্টের কয়েক জায়গায় ছেড়া।
এখন কাজের সময়, তাড়াহুড়ো করে অফিসে চলে গেলেন আবার চাচী।
সিনর কিশোর? জানতে চাইল ছেলেটা।
আমি, বলল কিশোর।
আমি ডিয়েগো, কড়া মেকসিকান টান কথায়, রিনরিনে সুরেলা কণ্ঠস্বর। আউ-টোটা কোথায়? দেখাবেন?
আউ-টো? বুঝতে পারছে না কিশোর।
কিন্তু মুসা বুঝে ফেলল। রোলস-রয়েসটার কথা বলছে।
ও, ওটা? গ্যারেজে, বলল কিশোর।
সোনালি আউ-টো। নিশ্চয় খুব সুন্দর। দেখতে ভারি ইচ্ছে করছে, হাসতে গিয়েও হাসল না ছেলেটা, সহজ হতে পারছে না, চোখে ভয়। আমি সিনর কিশোর, আমি গাড়ি খুব ভালবাসি। সব গাড়ি। কোন সময়, কোন একদিন আমিও একটা কিনব।
গাড়ি? দূরে কাজ করছে বিশালদেহী দুই ব্যাভারিয়ান ভাই, বোরিস আর রোভার, ইয়ার্ডের ট্রাকটা ধুচ্ছে, সেদিকে চেয়ে ছেলেটাকে বলল কিশোর, এসো আমার সঙ্গে।
দ্বিধা করল ডিয়েগো। এক মিনিট, বলে ওয়ার্কশপের কোণের দিকে চলে গেল।

উঁকি দিয়ে দেখল মুসা, এই প্রথম দেখতে পেল গাধাটা। লোহার খুঁটির সঙ্গে বাঁধা, কাছেই একটা দু-চাকার গাড়ি।
আদর করে ধূসর জানোয়ারটার পিঠ চাপড়াল ডিয়েগো।
থাক এখানে, ডিংগো। আমি আসছি।
বাক্স, ছোট ড্রাম, যে যা পেল তার ওপরই বসল চারজনে, ওয়ার্কশপে। নানারকম লোভনীয় জিনিস ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, চোখ বড় বড় করে দেখছে ডিয়েগো।
ডিয়েগো, বলল কিশোর, কালো একটা রেঞ্জারের কথা বলতে এসেছ?
এত জোরে মাথা কঁকাল ডিয়েগো, মুসার ভয় হলো, গলা থেকে ছিড়ে না আলগা হয়ে যায়। সি, সি, সিনর কিশোর, কাল রাতে আমার বন্ধু টিরানো দেখা করতে এসেছিল। বলল, একজন সিনর কিশোর একটা কালো, রেঞ্জারের খোঁজ জানতে চান। শেষ দুটো নম্বর ওয়ানথ্রী।
রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে তিন গোয়েন্দা।
তাদের আগ্রহী চোখের দিকে চেয়ে আশা বাড়ল ডিয়েগোর। আরও বলল..পুরস্কার দেয়া হবে।
পুরস্কার! চেঁচিয়ে উঠল উত্তেজিত মুসা, ভয় পেয়ে গেল বেচারা ডিয়েগো।
নিশ্চয়ই। গাড়িটা দেখেছ? কোথায়?
দেখেছি, তিন গোয়েন্দার মুখের দিকে তাকাচ্ছে ডিয়েগো। মোটা এক লোকের। কিন্তু সে যে এখন কোথায়... আঙুলে গুনলো, এক-দুই-তিন-চার.... সাত দিন আগে দেখেছি। তারপর আর দেখিনি।
সাত দিন? ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল মুসা, হতাশ হয়েছে। কোন লাভ হলো না। এতদিন মনে রাখলে কিভাবে?
গাড়ি সাংঘাতিক ভালবাসি আমি। গাড়ি আমার স্বপ্ন। কালো রেঞ্জারটা দারুণ এক গাড়ি। লাইসেন্স নম্বর মুখস্থ হয়ে গেছে : এ কে ফোর ফাইভ ওয়ান খ্রী। লাল চামড়ায় মোড়া গদি। সামনের বাম্পারের ডানদিকে ছোট একটা ঘষার দাগ আছে। পেছনের বাম্পারে এক জায়গায় টোল খাওয়া।
ছেলেটার ওপর ভক্তি এসে গেল তিন গোয়েন্দার। গাড়ির ব্যাপারে অনেক ছেলেরই অনেক রকম হবি আছে। কয়েক বছর পরেও একটা বিশেষ গাড়ির কথা মনে রাখতে পারে, তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বড় জোর কি গাড়ি আর কি রঙ, এই পর্যন্ত। কিন্তু ডিয়েগো ঠিক মনে রেখেছে লাইসেন্স নম্বর, বাম্পারের কোথায় দাগ, কোথায় টোল খাওয়া, সব। এক হপ্তা পরেও এত খুঁটিনাটি মনে রাখা সত্যি কঠিন।
পুলিশকে জানালে সহজেই খুঁজে বের করে ফেলতে পারবে, নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর। কিন্তু আমরা কথা দিয়ে এসেছি, পুলিশকে কিছু জানাব না।

ডিয়েগোর দিকে ফিরল। দু-এক দিনের মধ্যে আর দেখা হয়নি না?
মাথা নাড়ল মেকসিকান ছেলেটা। তার বাদামী চোখ দুটো বিষণ্ন। পুরস্কার পাচ্ছি না তাহলে।...গাড়িতে চড়তে পারছি না। সোনালি আউ-টো কি সুন্দর...।
হয়তো চড়তে পারবে, আশ্বাস দিল কিশোর। ডিয়েগো, মোটা লোকটাকে কোথায় কিভাবে দেখলে, বলো তো?
আমার চাচা স্যানটিনোর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। কাকাতুয়াগুলোর জন্যে।
কাকাতুয়া? বলে উঠল মুসা। তোমার চাচাই তাহলে বিলি শেকসপীয়ার আর লিটল বো-পীপকে বিক্রি করেছে।
মাথা ঝাকাল ডিয়েগো। অন্যগুলোও। সব কটারই অদ্ভুত নাম।
অদ্ভুত নাম? দ্রুত রবিনের দিকে তাকাল একবার কিশোর। নামগুলো মনে আছে?
ঘন কালো চুলে আঙুল চালাল ডিয়েগো, ওর আবার মাথা ঝাকাল। আছে। শের-লক হোমস আর রবিন হুড।
নোট বই বের করে ফেলেছে রবিন। লিখতে লিখতে বিড়বিড় করল, শারলক হোমস, রবিন হুড।
ক্যাপ্টেন কিড আর স্কারফেস, যোগ করল ডিয়েগো। স্কারফেসের এক চোখ কানা।
নাম দুটো দ্রুত লিখে নিল রবিন। ছটা হলো। আর ছিল?।
মাথা নাড়তে গিয়েও নাড়ল না ডিয়েগো, উজ্জল হলো চোখ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ছিল। কালোটা। ব্লাকবিয়ার্ড দা পাইরেট। সুন্দর কথা বলে। ওই একটা ছাড়া বাকি ছ-টার মাথাই হলুদ। র্যাকবিয়ার্ডের কালো।
ব্ল্যাকবিয়ার্ড দা পাইরেট! লিখে নিল রবিন। ওটার কথা বলেছিলেন বটে মিস্টার ফোর্ড। কিশোর, কি মনে হয়? সাতটাই জড়িত?
পরে জানা যাবে, জবাব দিল কিশোর। ডিয়েগো, মোটা লোকটা ওই কাকাতুয়াগুলোর জন্যেই এসেছিল?
সি।
তোমার চাচা দিয়েছেন?
না, সিনর, বিষণ্ন ছায়া নামল আবার ডিয়েগোর চেহারায়। তার আগেই বিক্রি করে দিয়েছে চাচা। লোকটা হাজার ডলার দিতে চাইল, কিন্তু পাখি কোথেকে দেবে চাচা? দিতে পারলে তো খুবই ভাল হত, এতগুলো টাকা। রেগে গিয়ে চাচাকে যাচ্ছেতাই গালাগাল করল লোকটা। কোথায় বিক্রি করেছে, ঠিকানা জিজ্ঞেস করল। চাচা তা-ও বলতে পারল না। কি করে বলবে, বলুন? চাচা তো আর লেখাপড়া জানে না। তাছাড়া কখন কোথায় কোন পাখি বিক্রি করেছে, সব কথা কি মনে থাকে ফেরিওলার?

তারমানে বাকি কাকাতুয়াগুলোরও খোজে রয়েছে হাইমাস, দুই সহকারীর দিকে চেয়ে বলল কিশোর। মূল্যবান তথ্য।
তা বলতে পারো, একমত হলো মুসা। একটা খুঁজতে গিয়ে দুটো হারানোর খবর পেলাম। যোগ হলো আরও পাঁচটা। সবগুলোই খুঁজব, না?
ঘুরিয়ে বলল কিশোর, যেহেতু সাতটা পাখিই এ-রহস্যের অংশ, খুঁজে তো বের করতেই হবে।
কিন্তু শুধু বিলি শেকসপীয়ার আর লিটল বো-পীপকে খুঁজে দেয়ার কথা বলেছি। আমরা। এ-রহস্যের মীমাংসার দায়িত্ব তো নিইনি।
রবিন বুঝতে পারছে, অযথা মুখ খরচ করছে মুসা। মুসাও জানে সেকথা। একবার যখন কিশোর পাশা রহস্যের গন্ধ পেয়েছে, ওটার সমাধান না করা পর্যন্ত তার আর স্বস্তি নেই। রক্তের গন্ধ পেয়েছে ব্লডহাউণ্ড, ডেকে তাকে আর ফেরানো যাবে না, শেষ মাথায় পৌছাবেই।
ডিয়েগোর দিকে ফিরল কিশোর। টেলিফোন করলেই তো পারতে? কষ্ট করে রকি বীচে এলে কেন?
ভেবেছি, পুরস্কার মিলবে। জিনিসপত্র কিনে নিয়ে যাব, তাই গাড়ি নিয়ে এসেছি। তাছাড়া, সিনর, ফোন করার পয়সা তো নেই আমার কাছে।
একে অন্যের দিকে তাকাল তিন গোয়েন্দা। একটা ফোন করার মত পয়সা থাকে না, এমন লোকও আছে দুনিয়ায়, বিশ্বাস করতে পারছে না। তৃতীয় বিশ্বের কিছু দরিদ্র দেশের কথা মনে পড়ল কিশোরের, বাংলাদেশের কথা মনে পড়ল, করুণ কিছু ছবি দেখেছিল পত্রিকায়। দেখে বিশ্বাসই করতে পারেনি সে, এতখানি মানবেতর জীবন যাপন করে অনেক মানুষ, ভেবেছে অতিরঞ্জিত। কিন্তু আজ বিশ্বাস করল। বাংলাদেশ কেন? এই আমেরিকাতেও তো রয়েছে সে-রকম দৃষ্টান্ত। ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ আর বন্যাপীড়িত অসহায় বাংলাদেশীদের কথা ভেবে মন খারাপ হয়ে গেল তার। তাছাড়া, রোজই শুনছে, দুর্বিষহ রাজনৈতিক গোলমাল চলছে বাংলাদেশে। একে তো সাংঘাতিক দরিদ্র দেশ, তারপর প্রাকৃতিক দুর্যোগ, তার ওপর এই গণ্ডগোল কতখানি বিপর্যস্ত করে তুলছে দেশের মানুষকে, ভাবতেই রোম খাড়া হয়ে গেল। তার। কথা বলতে পারল না কয়েক মুহূর্ত।
কিশোরকে বার কয়েক ঢোক গিলতে দেখল রবিন, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। এই প্রথম ভাল করে তাকাল ডিয়েগোর শরীরের দিকে। অস্বাভাবিক রুগ্ন দেহ, হাড়িসর্বস্ব। বলল, তুমি, বেশ কিছু মূল্যবান তথ্য জানিয়েছ, পুরস্কার তোমার পাওনাই হয়েছে। গাড়িটা খুঁজছিলাম আমরা...আচ্ছা, মোটা লোকটা, হাইমাসকোথায় থাকে বলতে পারো কিছু?

মোটা লোকটার নাম হাইমাস? উজ্জল হলো ডিয়েগোর মুখ। ভোলা পকেট হাতড়ে বের করে আনল একটা কার্ড। লোকটা যাওয়ার সময় দিয়ে গেছে চাচাকে, কার্ডটা কিশোরের দিকে বাড়িয়ে দিল সে। বলে গেছে, কাকাতুয়ারগুলোর খোঁজ পেলে যেন এই ঠিকানায় জানাই।
গলা বাড়িয়ে কার্ডের ওপর ঝুঁকে এল তিন গোয়েন্দা।
এই সময় ছাপার মেশিনের ওপর ঝোলানো লাল আলোটা জুলতে-নিভতে শুরু করল, তারমানে হেডকোয়ার্টারে ফোন বাজছে।
ডিয়েগো, বলল কিশোর, ঘুরে বসে চোখ বন্ধ করো।
অবাক হলো ছেলেটা, কিন্তু যা বলা হলো করল।
মুসা, রবিন তোমরা থাকো। আমি দেখে আসি।
দুই সুড়ঙ্গের মুখের ঢাকনা সরিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল কিশোর। আবার জায়গামত লাগিয়ে দিল ঢাকনাটা।
ফোন তুলতেই ভেসে এল এক মহিলা-কণ্ঠ, হালো, খুব নিচু গলায় বলল, যেন তার কাছাকাছি কেউ শুনে ফেলবে, তুমি কি কিশোর পাশা? মিস্টার হাইমাসের গাড়ি খুঁজছ?
হ্যাঁ, ম্যাডাম। বলতে পারেন কোথায় আছে?
এমন এক জায়গায় আছে, যেখানে কেউ খুঁজে পাবে না, রাগ বোঝা যাচ্ছে। তুমিও খোঁজার চেষ্টা কোরো না, শুনছ? উনি খুব বদরাগী, তাঁর কাজে বাধা দিলে বিপদে পড়বে। ওঁর কাজে নাক গলাবে না, ব্যস, এই বলে দিলাম।
কিশোর কিছু বলার আগেই লাইন কেটে গেল।
ওয়ার্কশপে ফিরে এল কিশোর। বলল, ডিয়েগোর পুরস্কার দিয়ে দেব আমরা। তার বাড়ি যাব, আঙ্কেল স্যানটিনোর সঙ্গে কথা বলব। ঠিক পথেই এগোচ্ছি আমরা, বোঝা যাচ্ছে, তার শেষকথাটা রহস্যময় মনে হলো অন্য দুই গোয়েন্দার কাছে।
দুই ঘণ্টা পর। দুটো গাড়ির বিচিত্র এক মিছিল দ্রুত এগিয়ে চলেছে উপকূলের মহাসড়ক ধরে, দক্ষিণে। আগেরটা কুচকুচে কালো, সোনালি অলঙ্করণ, রাজকীয় রোলস-রয়েস। অবশ্যই হ্যানসন চালাচ্ছে। পেছনের সীটে বসেছে কিশোর, মুসা আর ডিয়েগো। রবিন গেছে লাইব্রেরিতে, চাকরিতে।
উত্তেজনা চেপে রাখতে পারছে না ডিয়েগো। লাল হয়ে উঠেছে গাল। বার বার ছুঁয়ে দেখছে গাড়ির ভেতরের সোনালি প্লেটিং, পালিশ করা গদির চামড়া। সোনালি রঙের ওয়্যারলেস টেলিফোনটা দেখে এমন ভাব করল, যেন ওটা অপার্থিব, স্বপ্ন দেখছে, ধরার জন্যে হাত বাড়ালেই মিলিয়ে যাবে। বিড়বিড় করল, সোনালি আউ-টো। এত সুন্দর! চড়তে পারব কল্পনাই করিনি।

এক উচ্ছ্বসিত মুহূর্তে জানাল দুই গোয়েন্দাকে, বড় হয়ে সে গাড়ির মেকানিক হবে। রোলস-রয়েসের পেছনে আসছে স্যালভিজ ইয়ার্ডের ঝরঝরে ঐতিহাসিক (মুসা নামটা রেখেছে। শব্দটা অনেক শুনেছে কিশোরের মুখে। বাংলাদেশে কিছু হলেই নাকি সেটা ঐতিহাসিক হয়ে যায়, তাহলে ট্রাকের ঐতিহাসিক হতে বাধা কোথায়?) ট্রাক, চালাচ্ছে বোরিস। তাতে বোঝাই করা হয়েছে ডিয়েগোর পুরস্কারের টাকায় কেনা মালপত্র। ইয়ার্ড থেকেই কিনেছে সে। কি জিনিস কিনতে চায় ডিয়েগো, শুনে অবাক হয়েছিল তিন গোয়েন্দা। কিছু শক্ত তক্তা, একটা পুরানো আস্ত দরজা, একটা জানালা, কিছু তারকাটা আর টুকিটার্কি আরও কিছু জিনিস, সবই ঘর মেরামতের কাজে লাগে। মেরিচাচীর কানে কানে তখন কি ফিসফিস করেছে। কিশোর। সব জিনিসের দাম অসম্ভব কমিয়ে ধরেছেন চাচা, কিন্তু সেটা বুঝতে দেননি ডিয়েগোকে। বলেছেন, পুরানো জিনিসের দাম ওরকমই। এতকিছু কেনার পরেও পুরস্কারের পাঁচ ডলার বেঁচে গেছে, পকেটে বার বার হাত ঢুকিয়ে দেখছে ডিয়েগো, তার জন্যে এটা এখন রাজার সম্পদ।

জিনিসপত্র সব ভোলার পর সমস্যা দেখা দিয়েছিল ডিয়েগোর গাধা আর গাড়িটা নিয়ে। কি ভাবে নেয়া হবে? সমাধান করে দিয়েছে বোরিস আর রোভার। ওই দুটোও তুলে দিয়েছে ট্রাকের পেছনে। রাস্তায় লোক হাঁ করে দাড়িয়ে যাচ্ছে, কৌতূহলী চোখে দেখছে বিচিত্র মিছিলটাকে।

একটা অত্যন্ত দরিদ্র পল্লীতে এসে ঢুকল রোলস-রয়েস। ছোট ছোট কুঁড়ে, ঠেকাইকা দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে কোনমতে, বেশির ভাগই ভাঙা। একপাশে ফসলের মাঠ, ছোট। এখানেই থাকে ডিয়েগো আর তার চাচা।

গাড়ি দেখে হই-চই করে এসে ঘিরে ধরল বাচ্চা ছেলেমেয়ের দল।

জানালা দিয়ে হাত বের করে ওদের উদ্দেশ্যে নাড়ল ডিয়েগো। রোসি! চেঁচিয়ে নাম ধরে ডাকল সে। টিরাননা! নোলিটা! আমি, আরে আমি, ডিয়েগো। সোনালি আউ-টোতে চড়ছি।

হাঁকডাক শুনে ঘর থেকে আরও ছেলেমেয়ে বেরিয়ে এল, পঙ্গপালের মত ছেকে ধরল। গাড়ি থামাতে বাধ্য হলো হ্যানসন, পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে বাচ্চারা।

সবাই ছুঁয়ে দেখতে চায় রোলস-রয়েস।

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে হুশিয়ার করল ওদেরকে ডিয়েগো, স্প্যানিশ ভাষায় ধমক-ধামক দিল। পিছিয়ে গেল ওরা।

এগোব, মাস্টার পাশা? অনুমতি চাইল হ্যানসন। আশ্চর্য শান্ত মেজাজ। অন্য ড্রাইভার হলে রেগে বাচ্চার দলকে গালাগাল শুরু করত এতক্ষণে।

না, পেছনে তাকিয়ে রয়েছে ডিয়েগো। খানিকটা ভোলা জায়গার পর পড়ো পড়ো একটা কুঁড়ে, তার পেছনে ক্ষত-বিক্ষত একটা গ্রীন হাউস। ওটাই আমাদের ঘর।

গাড়ি নেয়ার দরকার কি? হেঁটেই তো যেতে পারি। পথও খুব খারাপ। এত সুন্দর গাড়িটা চোট পাবে, গদিমোড়া দেয়ালে হাত বোলাল সে।
প্রস্তাবটা মনে ধরল কিশোরের। নেমে এল তিন কিশোর।
থ্যাংক ইউ, হ্যানসন, কিশোর বলল। গাড়ি আর লাগবে না। ট্রাকে করেই ফিরতে পারব। আপনার আয় কষ্ট করে লাভ নেই? চলে যান।
বোরিস ট্রাক নিয়ে পৌঁছেছে।
তাকে বলল কিশোর, আপনি ওই বাড়িটার সামনে যান। আমরা যাচ্ছি।
স্বভাব-খসখসে গলায় হোকে (ও-কে) বলে এগোল বোরিস।
গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেল হ্যানসন।
মেকসিকো থেকে যখন এল চাচা, পকেট খালি, হাঁটতে হাঁটতে বলল ডিয়েগো। এখানেই এসে উঠল। ওই বাড়িটা মাত্র পাঁচ ডলারে ভাড়া নিয়েছে চাচা। মাস মাস সেটা দিতেই অবস্থা কাহিল। এখন একমাসের ভাড়া আছে আমার পকেটে। কিছুদিন আর খাটতে হবে না চাচাকে, শুয়ে থাকতে পারলে তার কাশি ভাল হয়ে যাবে। তখন আবার ভালমত কাজ করতে পারবে।
বাড়ির পেছন দিক দিয়ে এসেছে ওরা, তাই এতক্ষণ কালো গাড়িটা চোখে পড়েনি। সামনের দিকে রাস্তায় দাড়িয়ে আছে ওটা। না, রেঞ্জার নয়, সেডান।
ভ্রূকুটি করল ডিয়েগো। গাড়ি নিয়ে কে আবার এল? কণ্ঠস্বরেই বোঝা গেল, ব্যাপার সুবিধের লাগছে না তার। দৌড় দিল।
পেছনে ছুটল কিশোর আর মুসা। কুঁড়ের আরও কাছে আসতেই ধমক শোনা গেল।
হাইমাস, গতি বাড়াল মুসা।
বল, বলছে লোকটা, জলদি বল, শুয়োর কোথাকার, নইলে ঘাড় মটকে দেব!
চাচা! চেঁচিয়ে উঠল ডিয়েগো।
দরজার জায়গায় কিছুই নেই, খোলা। ছুটে ঢুকে পড়ল ডিয়েগো। পেছনে দুই গোয়েন্দা।
মলিন বিছানায় চিত হয়ে আছে একজন লোক, নিশ্চয় আঙ্কেল স্যানটিনো। তার ওপর ঝুকে রয়েছে মোটা হাইমাস।
মনে কর ব্যাটা! আবার চেঁচাল হাইমাস। কোথায় বেচেছিস? আরগুলোর কথা নাহয় বাদই দিলাম, কিন্তু ব্ল্যাকবিয়ার্ডের কথা তো মনে থাকার কথা। অনেক ঘুরেছিস ওটা নিয়ে, সবশেষে বেচেছিস। নিশ্চয় মনে আছে তোর, বলছিস না। সেফ শয়তানী। চারটে পেয়েছি। আরগুলো কোথায়?
শিকারী কুকুরের মত গিয়ে লোকটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ডিয়েগো।

কিন্তু টলল না দানব। হাত দিয়ে ঝেড়ে ফেলে দিল রোগা ছেলেটাকে, যেন পোকা তাড়াল। তারপর ঘুরল ঝটকা দিয়ে।
আবার এসে ঝাপ দিল ডিয়েগো।
শার্টের কলার চেপে ধরে চোখের পলকে তাকে শূন্যে তুলে ফেলল হাইমাস। অসহায় ভঙ্গিতে ঝুলে থেকে হাত-পা ছুঁড়তে লাগল ছেলেটা। মুসা আর কিশোরের দিকে চেয়ে শাসাল, খবরদার! এগোবে না। পিচকিটার ঘাড় মটকে দেব তাহলে।
থেমে গেল মুসা। কিশোরও দাড়িয়ে পড়ল।
রাগে জ্বলছে হাইমাসের চোখ। জানোয়ারের মত ঘড়ঘড় আওয়াজ বেরোচ্ছে কণ্ঠ থেকে। কলার ধরে আঁকাচ্ছেডিয়েগোকে।
সইতে পারল না পুরানো কাপড়, শার্টের কলার ছিড়ে থুপ করে মাটিতে পড়ে গেল ডিয়েগো। পড়েই দু-হাতে পা জড়িয়ে ধরল হাইমাসের।
লাথি মেরে পা ছাড়ানোর চেষ্টা করল হাইমাস, পারল না। জোঁক হয়ে গেছে যেন ডিয়েগো।
এই সুযোগ। লাফিয়ে উঠল মুসা। মাথা নিচু করে ছুষ্টি এল সে। তার বিখ্যাত কৌশল প্রয়োগ করল হাইমাসের ভূঁড়িতে।
কেঁপে উঠল যেন পাহাড়। শক্ত খুলির প্রচণ্ড আঘাতে হাঁউক করে উঠল হাইমাস। টলমল করেও সামলে নিল কোনমতে, পড়ল না।
মুসার মাথার এক গুঁতো খেয়েই বুঝে গেছে হাইমাস, ব্যাপার সুবিধের নয়। প্রাণপণে লাথি মেরে ডিয়েগোকে ছাড়িয়েই দৌড় দিল দরজার দিকে। পথরোধ করল কিশোর। কিন্তু লোকটার তুলতুলে শরীরে মোষের শক্তি। এক ধাক্কায় তাকেও ফেলে দিয়ে বেরিয়ে গেল দরজা দিয়ে।
কিশোরকে টেনে তুলতে গিয়ে দেরি করে ফেলল মুসা।
ছুটে বাইরে বেরোল তিন কিশোর।
স্টার্ট নিয়েছে ততক্ষণে কালো সেডান।
বোরিসের ট্রাকাটাও এসে থামল। কিন্তু লাভ নেই। মাল বোঝাই ঝরঝরে ট্রাক নিয়ে অনুসরণ করার কোন মানে হয় না, ধরা যাবে না সেডানটাকে।
ইস, আফসোফ করল মুসা, বোরিস নামা পর্যন্ত যদি আটকে রাখা যেত ব্যাটাকে…
হ্যানসন থাকলেও হত, পিছু নিতে পারতাম, হাঁপাচ্ছে কিশোর। কি আর করা। তবে ব্যাটার কার্ড আছে আমাদের কাছে, নামধাম আছে। কদিন পালিয়ে থাকবে? দেখেছ, কেমন রেগে যায়?
হাইমাস না ওটা, হিপোপটেমাস, মাথা ডলছে মুসা। ভুড়ি তো না, মনে হলো রবারের ব্যাগের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছিতা, ব্যাটা রাগলে আমাদের কি লাভ?

ভয় থেকেই জন্ম নেয় রাগ, ব্যাখ্যা করল কিশোর। ভয় পেয়েছে ব্যাটা। আর তোমার গুতো খাওয়ার পর তো আরও চমকে গেছে।
আমাদের ভয় পায় বলতে চাইছ? মুসা বলল। আর আমরা?
নারভাস, বাট কনফিডেন্ট, অন্যমনস্ক হয়ে গেছে কিশোর।
কি বললে এটা? ইংরেজি না গ্রীক?
জবাব না দিয়ে ঘুরল কিশোর।
চাচাকে পানি খাওয়াচ্ছে ডিয়েগো।
ঘরে একটা মাত্র নড়বড়ে চেয়ার, উল্টে পড়ে আছে। তুলে সোজা করে রাখল। ওটা মুসা।
তাদের দিকে ফিরে তাকাল স্যানটিনো। কাশল কয়েকবার। তারপর বলল, তোমরা আমাকে বাঁচিয়েছ। নইলে মেরেই ফেলত। আবার কাশতে শুরু করল।
থাক থাক, কথা বলবেন না, হাত তুলল কিশোর।
ব্ল্যাকবিয়ার্ডের খোঁজ নিতে এসেছিল মোটকাটা, বলল ডিয়েগো। মনেই রাখতে পারে না কিছু চাচা, বলবে কি? তবে সেদিন বলেছিল, কোন এলাকায় নাকি কোন একটা বাড়ি থেকে তিন-চার ব্লক দূরে এক মহিলার কাছে বিক্রি করেছে, পাঁচ ডলারে। আর কেউই কিনতে চায়নি, তাই এত কমে দিয়ে এসেছে।
মোটকা বেশি রেগে গিয়েছিল, বলল মুসা। কিছু একটা ব্যাপার আছে। পাখিগুলোর। ওই ব্যাটা জানে।
এবং ব্যাপারটা খুব জরুরী, যোগ করল কিশোর, খুব মূল্যবান তার কাছে। কিন্তু কি...
বাধা দিল বোরিস। দরজায় এসে দাড়িয়েছে। জিজ্ঞেস করল, মাল নামাব?
হ্যাঁ, নামান, বলল কিশোর। বোরিসের পেছনে এসে দাঁড়ালেন এক বয়স্ক মহিলা, হাতে কার্ডবোর্ডের একটা বাক্স, তাতে ঘোট ঘোট অসংখ্য ছিদ্র, ঝাঝরির মত।
পথে হাত তুললেন মহিলা, বলল বোরিস, এদিকেই আসছিলেন। তুলে নিলাম। সেজন্যেই আমার আসতে দেরি হয়েছে।
কই, সে ধোকাবাজটা কই? দুই গোয়েন্দার দিকে চেয়ে বললেন মহিলা। ফেরিওলার বাচ্চা, স্যানটিনো না ফ্যানটিনো?
মুসা আর কিশোরকে সরিয়ে এগিয়ে এল ডিয়েগো। চাচার শরীর খারাপ। কেন?
টাকা ফেরত চাই! কড়া গলায় বললেন মহিলা। পাখির ব্যবসা করে না ঠকবাজি করে? কাকাতুয়া বলে দিয়ে এসেছে একটা স্টারলিং। ভাগ্যিস আমার জামাই এসেছিল। পাখি চেনে। বলল এটা কাকাতুয়া না, হাতের বাক্সটা ডিয়েগোর হাতে ধরিয়ে দিলেন তিনি। দাও, আমার পাঁচ ডলার ফেরত দাও। নইলে পুলিশের কাছে যাব।

মুখ কালো হয়ে গেল ডিয়েগোর। বাক্সটা মুসার হাতে দিয়ে পকেট থেকে বের করল পাঁচ ডলার, দিয়ে দিল মহিলাকে। এই যে, নিন আপনার টাকা। যান এখন।
হুঁ, এবারের মত মাপ করে দিলাম, গজগজ করতে করতে বেরিয়ে গেলেন মহিলা।
দুই গোয়েন্দার দিকে ফিরল ডিয়েগো। নিশ্চয় ব্ল্যাকবিয়ার্ড। কি পাখি ওটা, আমিও চিনি না, চাচাও না। কোন ধরনের কাকাতুয়াই হবে।
মুসার কাছ থেকে নিয়ে বাক্সটা খুলল সে। ফুড়ুত করে বেরিয়ে সোজা গিয়ে মুসার কাধে বসল কালো পাখিটা, উজ্জ্বল হলদে ঠোর্ট।
স্টারলিং কোথায়? চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। জামাইও পাখি চেনে না। এটা ময়না। কাকাতুয়ার চেয়ে ভালভাবে কথা শেখে, বলতে পারে। ভাল ট্রেনিং পাওয়া ময়নার দাম কাকাতুয়ার চেয়ে বেশি।
আয়্যাম ব্ল্যাকবিয়ার্ড দা পাইরেট! খসখসে কঠিন কণ্ঠে বলে উঠল ময়না, যেন সত্যিই একজন জলদস্য।. আহ্যাভ বারিড মাই ট্রেজার হোয়্যার ডেড ম্যান গার্ড ইট এভার। ইয়ো-হো-হো অ্যাণ্ড অ্যা বটল অভ রাম! তারপর মুখ খারাপ করে গাল দিল কয়েকটা, যা জলদস্যুকেই মানায়।
ব্ল্যাকবিয়ার্ড! বলল উত্তেজিত কিশোর। এটার জন্যেই খেপে গিয়েছিল তখন হাইমাস।
খুব খিদে পেয়েছে যেন ময়নাটার, তাকাল এদিক ওদিক।
ধারেকাছে কোন খাবার নেই, মুসার কানটা খুব লোভনীয় মনে হলো তার কাছে। দিলে কষে এক ঠোকর, লতি ছিড়ে আনার জন্যে।
আউফ, মেরে ফেলেছেরে! বলে মুসা দিল চিৎকার।
ভয় পেয়ে উড়ে গেল ময়নাটা, বেরিয়ে গেল খোলা দরজা দিয়ে।
গেল, মাথা কাত করল কিশোর। মুসা, একটা মূল্যবান সূত্র তাড়ালে।
আমি কি করব? রুমাল দিয়ে কানের লতি চেপে ধরেছে মুসা। ফুটো করে ফেলেছে কান। এই দেখো না, রক্ত।
প্রায় ছুটে বাইরে বেরোল কিশোর।
কিন্তু কোথাও দেখা গেল না ময়নাটাকে। চলে গেছে।
ইংরেজি ভাল বলতে পারে না স্যানটিনো, তাই কিশোরের সঙ্গে কথা বলার সময় দোভাষীর কাজটা নিতে হলো ডিয়েগোকেই।
শুরুতে কয়েকটা সাধারণ প্রশ্ন করল কিশোর, মাথা নেড়ে শুধু সি সি, করল স্যানটিনো।
তারপর আরেকটা প্রশ্নের জবাবে চাচার হয়ে ডিয়েগো বলল, দু-বছর আগে এখানে এসেছে চাচা। মেকসিকো থেকে এসেছে গাধার গাড়িতে চড়ে। হ্যাঁ, ডিয়েগোই নিয়ে এসেছে। চাচা মালীর কাজ খুব ভাল জানে, বিশেষ করে ফুল

চাষে ওস্তাদ। কিন্তু হলিউডে এসে কোন কাজ পেল না। তারপর একজন বলল, ফুলের ব্যবসা করতে। খোঁজ করতে করতে চাচা চলে এল এখানে, ভাঙা গ্রীনহাউসটার কথা শুনে। হাউসের বেশির ভাগ কাচই ভাঙা। তবু দেখেটেখে চাচার মনে হলো, কোন কোন জাতের ফুল জন্মানো সম্ভব। মাসিক পাঁচ ডলারে ভাড়া নিয়ে নিল।

পুরানো টিন জোগাড় করে লাগাল ভাঙা কাচের জায়গায়, বাতাস আর তাপ মোটামুটি ঠেকানো গেল এতে। ভাল জাতের দুর্লভ কিছু ফুলের চাষ করল ভেতরে, বাইরে লাগাল সাধারণ ফুল, আবহাওয়া আর তাপমাত্রার কমবেশিতে যেগুলোর কিছু হয় না। সেই ফুল গাধার গাড়িতে করে শহরে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে, খাওয়াপরা চলে যেত কোনমতে।

চলে যাচ্ছিল। এই সময় একদিন লম্বা, রোগা এক লোক এল এখানে। তার নাম ক্যাপ্টেন লঙ জন সিলভার। রোগে ভুগে কাহিল, টাকাপয়সা নেই। এসে থাকতে চাইল। লোকটার অবস্থা দেখে মানা করতে পারল না চাচা।

সিনর সিলভারের সঙ্গে ছিল একটা নাবিকদের ব্যাগ, তাতে তার পুরানো কাপড়-চোপড়, আর একটা বাক্স। ধাতুর তৈরি, চ্যাপ্টা। এই এত বড়, হাত ছড়িয়ে দেখাল ডিয়েগো, বাক্সটা কত বড় ছিল।

সি সি, বলে মাথা নাড়ল স্যানটিনো, বোঝাল, ডিয়েগো ঠিকই বলেছে।

চোদ্দ ইঞ্চি বাই চব্বিশ, মনে মনে দ্রুত হিসেব করে নিয়ে বিড় বিড় করল কিশোর। হ্যাঁ, বলো, তারপর?

শক্ত তালা লাগানো থাকত বাক্সটায়, বলল ডিয়েগো। মাথার নিচে রেখে ঘুমাত। রোজ রাতে ডালা খুলে বাক্সের ভেতর তাকাত। খুব সুখী মনে হত তখন তাকে, মুখে হাসি ফুটত।

আবার মাথা নাড়ল স্যানটিনো, সি, সি। খুব সুখী।

চাচা একদিন সিনর সিলভারকে জিজ্ঞেস করল, বাক্সে কি আছে, ঘন চুলের বোঝায় আঙুল চালাল ডিয়েগো, মনে করার চেষ্টা চালাচ্ছে। লোকটা রহস্যময় হাসি হেসে বলল : বাক্সে আছে রামধনুর একটা টুকরো, তার তলায় একপাত্র সোনা।

রামধনুর একটা টুকরো, তার তলায় এক পাত্র সোনা, ডিয়েগোর কথার প্রতিধ্বনি করল যেন কিশোর, ভুরু কুঁচকে গেছে। রহস্যময় বর্ণনা। হ্যাঁ, তারপর?

চাচা অসুখে পড়ল, ভীষণ কাশি। আমাকে আসার জন্যে খবর পাঠাল মেকসিকোয়, তাকে দেখার কেউ ছিল না এখানে। এলাম। কিন্তু ফুলচাষের ব্যাপারে সাহায্য করতে পারলাম না, কাজ জানি না। আমাকে এনেও বিশেষ লাভ হয়নি চাচার।

কি বলিস লাভ হয়নি? বাধা দিয়ে ভাঙা ইংরেজিতে বলল স্যানটিনো। তুই এলে, আমাকে না দেখলে তো এতদিনে মরে যেতাম।
চাচা বাড়িয়ে বলে, আমাকে ভালবাসে তো, উজ্জ্বল হলো ডিয়েগোর মুখ। যাই হোক, সিনর কিশোর, আমি এসেও সিনর সিলভারকে দেখেছি। চাচার চেয়ে বেশি অসুস্থ। কি অসুখ জিজ্ঞেস করলাম। শুধু বলল, এমন এক অসুখ, যা কোনদিন সারবে না। কেন সারবে না, জিজ্ঞেস করলাম। বাক্স খুলে সোনার পাত্র থেকে সোনা বিক্রি করে ভাল ডাক্তার দেখানোর পরার্মশ দিলাম। হাসল সে। কিন্তু আমার মনে হলো, হাসি,নয়, কাদল। বলল, দুনিয়ার তাবৎ সোনা বিক্রি করেও তার রোগ সারানো যাবে না।
ও বলল... লম্বা দম নিল ডিয়েগো, মনে করার চেষ্টা করছে ঠিক কি কি বলেছিল সিলভার। ও বলল তাছাড়া পাত্রের সোনা বিক্রিও করা যাবে না। নাম ভাড়িয়ে বেআইনী ভাবে আমেরিকায় ঢুকেছে সে। বেচতে গিয়ে ধরা পড়লে পুলিশ আবার তাকে পাঠিয়ে দেবে ইংল্যাণ্ডে—যেখান থেকে এসেছে, যতদিন বাঁচে, রোজ রামধনুটা দেখে দেখে দুঃখ ভোলার চেষ্টা করবে। তারপর একদিন বলল, শিগগিরই চলে যাচ্ছে সে।
মেঘ জমল ডিয়েগোর সরল নিস্পাপ চেহারায়। তখন বুঝিনি কি বলতে চেয়েছে। একদিন বাইরে থেকে সাতটা খাঁচা নিয়ে ফিরল সিনর সিলভার, সাতটায় সাতটা কাকাতুয়া। সব কটার হলদে ঝুঁটি। গ্রীনহাউসে রেখে কথা শেখাতে শুরু করল ওগুলোকে।
দ্রুত চোখে চোখে তাকাল একবার কিশোর আর মুসা। কাকাতুয়া-রহস্যের অন্ধকারে আলোর আভাস দেখা যাচ্ছে।
পাখি পোষ মানাতে জানত সিনর সিলভার, বলে গেল ডিয়েগো। বলতে ভুলে গেছি, ব্ল্যাকবিয়ার্ডকে আগেই নিয়ে এসেছিল সে, প্রথম যখন এখানে আসে, তখনই কাঁধে ছিল কালো পাখিটা। সারাক্ষণ তার কাঁধে বসে থাকত পাখিটা, আর মুখ খারাপ করে গালাগাল করত, খুব মজা পেত সিনর সিলভার, জোরে জোরে হাসত।
গ্রীনহাউসে কাজ চলল। দিনের পর দিন ওখানে কাটাতে লাগল সিনর নয়, হয়েছে। সেজলেপলল কিশোর। ইসগুলো, ঠিক বুঝতাম, বুলি সিলভার। একেকটা কাকাতুয়ার একটা করে বিচিত্র নাম দিল। বিচিত্র সব বুলি শেখাতে লাগল। আমার কাছে খুব কঠিন মনে হত কথাগুলো, ঠিক বুঝতাম না।
হ্যাঁ, কঠিনই, মাথা দোলাল কিশোর। ইংরেজি সাহিত্য আর ইতিহাস থেকে নেয়া হয়েছে। সেজন্যেই দুর্বোধ্য ঠেকেছে তোমার কাছে। মনে আছে কোনও বুলি?

না, ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল ডিয়েগো। বুঝিইনি, মনে রাখব কি? একদিন একটা কাকাতুয়া মারা গেল। খুব মুষড়ে পড়ল সিনর সিলভার। শেষে আপনমনেই বলল, কি আর করা? ওটার জায়গা দখল করবে ব্ল্যাকবিয়ার্ড।
যাই হোক, ছ-টা কাকাতুয়া আর কালো কাকাতুয়াটাকে, তোমরা যেটাকে ময়না বলছ, বুলি শেখানো শেষ হলো। সিনর সিলভার নিজেও ময়নাটাকে বলত রেয়ার প্যারট।
কি জানি, নাক চুলকাল কিশোর। কোন ব্যাপারকে ঘোরাল করার জন্যেই হয়তো বলত। তারপর?
বিষণ্ন ভঙ্গিতে হাত নাড়ল ডিয়েগো। তারপর আর কি? চলে গেল সিনর সিলভার। যেদিন কাকাতুয়াগুলোকে বুলি শেখানো শেষ করল, সে-রাতেই। সঙ্গে নিয়ে গেল তার প্রিয় বাক্সটা। ফিরে এল তিন দিন পর আরও কাহিল, আরও রোগা হয়ে। এসেই বলল, আবার চলে যাবে। বাক্সটা সঙ্গে আনেনি কেন জিজ্ঞেস করায় বলল, ওটা নিয়ে বিপদে পড়ব আমরা। নইলে নাকি যাওয়ার আগে আমাদেরকেই দিয়ে যেত।
লম্বা একটা চিঠি লিখল সে। পোস্ট করার জন্যে দিল আমার হাতে।
ঠিকানাটা মনে আছে? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
মাথা নাড়ল ডিয়েগো। না, সিনর কিশোর। অনেকগুলো টিকেট লাগাতে হয়েছে। খামের চারধারে লাল-নীল অনেক ডোরা ছিল।
এয়ার মেইলে গেছে মনে হচ্ছে, বলল মুসা। এত বেশি স্ট্যাম্প যখন লাগানো হয়েছে, ইউরোপে পাঠিয়েছে হয়তো।
কাহিল হয়ে বিছানা নিল সিনর সিলভার, বলল আবার ডিয়েগো। হাসপাতালে নিয়ে যেতে চাইলাম। বলল দুনিয়ার কোন হাসপাতালই তাকে ভাল করতে পারবে না। বলল, আমরা তার সত্যিকার বন্ধু, আমাদের মাঝেই সে থাকতে চায়।
ভিজে এল ডিয়েগোর চোখ। খানিকক্ষণ কোন কথা বলতে পারল না।
অদ্ভুত লোক ছিল সিনর সিলভার, ধরা গলায় বলল ডিয়েগো। কিন্তু মনটা ছিল বড় ভাল। অদ্ভুত রসিকতা করত, ধাধা বলত, এমনকি কথাও বলত ঘুরিয়ে। আজব বুলি শিখিয়েছিল কাকাতুয়াগুলোকে। কিন্তু ভালবেসেছিল আমাদেরকে, আমরাও... কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে এল তার। সামলে নিয়ে বলল, সিনর সিলভার বলল, একজন খুব মোটা লোক আসবে। আমাদেরকে এক হাজার ডলার দিয়ে কাকাতুয়াগুলো কিনে নিয়ে যাবে। তারপর হাসতে শুরু করল। কাকাতুয়াগুলোকে কথা শেখানোই নাকি তার জীবনের সবচেয়ে বড় রসিকতা। তার কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝিনি। বলল, এই রসিকতা নাকি ঘাম ঝরিয়ে ছাড়বে মোটা লোকটার। হাসতে হাসতেই ঘুমিয়ে পড়ল সে।

পরদিন সকালে আর জাগল না সিনর সিলভার, ঢোক গিলে চুপ হয়ে গেল ডিয়েগো।
দুই গোয়েন্দাও চুপ করে রইল। মেকসিকান ছেলেটার দুঃখ বুঝতে পারছে।
মোটা লোকটা আসেনি? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
মাথা নাড়ল ডিয়েগো। সিনর সিলভার আমাদের বন্ধু ছিল, তার লাশ দাফন করার ভারও পড়ল আমাদের ওপর। রাস্তার ওদিকে ছোট একটা গির্জা আছে। ওখানেই তাকে কবর দিলাম। টাকা ছিল না আমাদের কাছে, বাকিতেই সব কাজ সারতে হলো। মোটা লোকটার আসার অপেক্ষায় রইলাম। এক হপ্তা গেল, দুই হপ্তা গেল, তিন হপ্তা গেল, সে এল না। ওদিকে বাকি টাকার জন্যে চাপ দিচ্ছে লোকে। শেষে বাধ্য হয়ে কাকাতুয়াগুলো নিয়ে বেরোল চাচা। হলিউডে গিয়ে বিক্রি করে এল।
লোকে কাকাতুয়া পছন্দ করে দেখলাম। একদিনেই বিক্রি হয়ে গেল সব। টাকা খুব বেশি পাওয়া গেল না, দরাদরি করলে হয়তো যেত, কিন্তু সময় একদম ছিল না। তাড়াহুড়োয় যা পেল তাতেই দিয়ে চলে এল চাচা। সিনর সিলভারের কবরের দাম শোধ করল। ভেবেছিলাম, হাজার ডলার পেলে কুঁড়েটা ঠিক হবে... অনেকক্ষণ পর হাসি ফুটল ডিয়েগোর মুখে। যাই হোক, এখন আর দুঃখ নেই। দরজা-জানালা কিনে ফেলেছি। লাগিয়ে নিলেই হলো। চাচা ভাল হয়ে আবার ফুলের চাষ শুরু করবে। আপনাকে এক হাজার ধন্যবাদ, সিনর কিশোর।
তথ্য যা জানিয়েছ, তাতে আরও কিছু পাওনা হয়ে গেছে তোমার, আশ্বাস দিল কিশোর, ভেব না। আচ্ছা, শেষতক তো মোটা লোকটা এসেছে?
এসেছে, বলল ডিয়েগো।
সি, সি, মাথা নেড়ে ভাতিজার কথায় সায় জানাল স্যানটিনোও।
কাকাতুয়াগুলো বিক্রি করে ফেলার দুই হপ্তা পর এল লোকটা, জানাল ডিয়েগো। বেচে দিয়েছি শুনে রেগে লাল। বকাবকি শুরু করল চাচাকে, শাসাল। যেখান থেকে পারে এনে দিতে বলল। শেষে নরম হলো। অনুরোধ করতে লাগল, পারলে পায়ে ধরে। কি আর করি? শেষে পেট্রল স্টেশনে থেকে গিয়ে একটা ম্যাপ চেয়ে আনলাম। চাচা লেখাপড়া জানে না, ম্যাপের কিছুই বুঝল না। তার কাছ থেকে ধারণা নিয়ে অনুমানে বের করলাম, কোন এলাকায় পাখিগুলো বিক্রি করেছে। দেখালাম মোটা লোকটাকে, ম্যাপে। আর একদণ্ড দেরি করল না সে। রেঞ্জার হাঁকিয়ে চলে গেল।
যাওয়ার আগে কার্ডটা রেখে গেল। বলে গেল, কাকাতুয়াগুলোর কোন খবর পেলেই ফোনে জানাতে। কিন্তু কোথায় পাবে চাচা খবর? পেলে তো কাজের কাজই হত। একহাজার ডলার সোজা কথা? তবে ওই টাকা ছাড়াও বাঁচতে পারব

আমরা; মাথা উঁচু করে বলল ডিয়েগো। বন্ধুর কবর দিয়েছি। ঘর মেরামতের ব্যবস্থা করেছি। কোনভাবে এ-মাসের ভাড়াও জোগাড় করব। ভাল হয়ে উঠে চাচা কাজে লাগবে। মোটকা সিনর তখন আর অপমান করার সাহস পাবে না চাচাকে।
তার শেষ কথাটায় না হেসে পারল না মুসা।
গভীর চিন্তায় মগ্ন কিশোর। ঘনঘন চিমটি কাটছে নিচের ঠোঁটে। কাকাতুয়াগুলোর ব্যাপারে অনেক কথা জেনেছে, তবে এখনও অনেক কিছু জানা বাকি। ডিয়েগোকে প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল, এই সময় দরজায় দেখা দিল বোরিস।
ডিয়েগোর কাহিনীতে এতই মগ্ন ছিল দুই গোয়েন্দা, বোরিসের কথা ভুলে গিয়েছিল।
সব নামিয়েছি, জানাল বোরিস। যাওয়া দরকার। ইয়ার্ডে অনেক কাজ।
আরেকটু। হয়ে গেছে, বলল কিশোর। ট্রাকে লস অ্যাঞ্জেলেসের ম্যাপ আছে না?
কয়েকটা। লাগবে?
আপনি ট্রাকে বসুন গিয়ে। মুসার কাছে দিয়ে দিন।
ম্যাপ নিয়ে এল মুসা।
ডিয়েগো, ম্যাপ বিছিয়ে বলল কিশোর, দেখাও তো, কোন জায়গা?
খানিকক্ষণ দেখে নিয়ে এক জায়গায় আঙুল রাখল ডিয়েগো, মনে হয়, এখানে।
পেন্সিল দিয়ে একটা এলাকায় গোল বৃত্ত আঁকল কিশোর। ভাঁজ করে পকেট রেখে দিল ম্যাপটা।
থ্যাংকস, ডিয়েগো, বলল সে। বিলি আর বো-পীপকে কোথায় বিক্রি করেছেন তোমার চাচা, জানি। অন্যগুলোও দূরে কোথাও নয় নিশ্চয়। অনেক কথা জানা গেল তোমার কাছে, কিন্তু রহস্যের কোন কিনারা তো হলোই না, আরও জটিল হলো।
ঠিক বলেছ, আঙুল তুলল মুসা।
ইস, হাতে পেয়েও হারালাম ব্ল্যাকবিয়ার্ডকে... আফসোস করল কিশোর। যাকগে, যা গেছে তা নিয়ে ভেবে লাভ নেই। হাত মেলাল ডিয়েগোর সঙ্গে। আশা করি, শিঘ্রী ভাল হয়ে যাবেন তোমার চাচা। আর হ্যাঁ, মোটকা যদি আবার বিরক্ত করতে আসে, সোজা পুলিশে খবর দেবে।
পুলিশ? জ্বলে উঠল ডিয়েগোর কালো চোখের তারা। মোটকা সিনর আবার এলে... বিছানার তলা থেকে মোটা একটা লাঠি বের করল সে। হাসপাতালে যাওয়ার অবস্থা করে ছেড়ে দেব।
হাসল তিনজনেই।
ছুটে চলেছে ট্রাক। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর।
কি ভাবছ? জবাব না পেয়ে কনুই দিয়ে বন্ধুর গায়ে তো দিল মুসা। হেই, কিশোর?

আঁ?।
কি ভাবছ?
কেসটা জটিল। –
শুধু জটিল? ।
না, বেশ জটিল।
কেন, মাথা ঘুরিয়ে দেয়ার মত বলতে লজ্জা লাগছে?
না, লাগছে না, স্বীকার করল কিশোর। মাথা ঘুরিয়ে দেয়ার মতই।
পরদিন সকালে। ইয়ার্ডে কাজকর্ম বিশেষ নেই। মেরিচাচীকে বলে-কয়ে অনুমতি নিয়ে বোরিস আর রোভারকে ডিয়েগোদের ওখানে পাঠাল কিশোর। কুঁড়ে মেরামতের কাজে ছেলেটাকে সাহায্য করার জন্যে। ডিয়েগো আর তার চাচা, দুজনকেই খুব পছন্দ হয়েছে তার। ঠিকমত খেতে পায় না, এত গরীব, কিন্তু আত্মসম্মান বোধ কি প্রচণ্ড।
দুপুরের পর ফিরে এল দুই ব্যাভারিয়ান ভাই।
হাসিমুখে ট্রাক থেকে নামল বোরিস। হাতে কার্ডবোর্ডের একটা বাক্স। ওয়ার্কশপের কাছে কিশোরকে দেখে এগোল।
বাক্সটা দেখেই চিনল কিশোর। এটাতে করেই ব্ল্যাকবিয়ার্ডকে ফেরত দিয়ে গিয়েছিলেন মহিলা।
বাক্সটা বাড়িয়ে ধরল বোরিস। ডিয়েগো দিল।
নিয়ে মুসার হাতে দিল কিশোর।
পকেট থেকে একটা চিঠিও বের করে দিল বোরিস।
বাক্স আর চিঠি নিয়ে ওয়ার্কশপে ঢুকল তিন গোয়েন্দা।
দড়ি কাটো, মুসাকে অনুরোধ করল কিশোর।
বাক্সের দড়ি কেটে ডালা তুলতেই ফড়ফড় করে উঠল কালো ময়না, হলুদ ঠোঁট তুলে তাকাল মুসার দিকে।
আরিব্বাপরে! ব্ল্যাকবিয়ার্ড, চমকে সরে এল মুসা।
হেসে রবিনকে বলল কিশোর, চিঠিটা পড়ে তো কি লিখেছে।
পড়ল রবিন :
ডিয়ার সিনর কিশোর, সিনর ব্ল্যাকবিয়ার্ডকে পাঠালাম। গতকাল দুপুরের খাওয়ার সময় এসে হাজির। আপনারা আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। আরও একটা কারণে পাঠিয়ে দিলাম, সিনর মোটকা এসে কেড়ে নিয়ে যেতে পারে। চমৎকার একটা ঘর হয়েছে আমাদের, আপনাদের সৌজন্যে। এক হাজার ধন্যবাদ।
–ডিয়েগো রটরিজ।

রবিনের চিঠি পড়া শেষ হওয়ার অপেক্ষায় ছিল যেন ময়নাটা, লাফিয়ে বেরিয়ে এসে বসল বাক্সের কিনারে। কৌতুহলী চোখে তাকাল অসাবধানে বাক্সের কোণে ফেলে রাখা মুসার একটা আঙুলের দিকে।
সময়মত খেয়াল করল মুসা, চেঁচিয়ে এক টানে সরিয়ে আনল আঙুল, না না, আর না! কালই শিক্ষা হয়ে গেছে আমার, লতিটা এখনও শুকায়নি। ব্যাটা তো একেবারে রক্তচোষা ডাকাত। মরলে নির্ঘাত ড্রাকুলা হবে।
তার কথার জবাবেই যেন বার কয়েক ডানা ঝাপটাল পাখিটা, গম্ভীর কণ্ঠে বলল, আয়্যাম ব্ল্যাকবিয়ার্ড দা পাইরেট। আহ্যাভ বারিড মাই ট্রেজার হোয়্যার ডেড ম্যান গার্ড ইট এভার। ইয়ো-হো-হো অ্যাণ্ড অ্যা বটল অভ রাম!
হ্যাঁ, বাবা, তুমি ডাকাতই।
হেসে উঠল অন্য দুজন।
এতে অপমানিত বোধ করল বোধহয় ব্ল্যাকবিয়ার্ড। আরও গম্ভীর হয়ে মুখ খারাপ করে গাল দিল গোটা দশেক।
হেডকোয়ার্টারে আলোচনায় বসেছে তিন গোয়েন্দা। তাদের মাথার ওপরে ঝোলানো খাঁচায় রাখা হয়েছে ব্ল্যাকবিয়ার্ডকে, খাঁচাটা বানানো হয়েছিল টমের জন্যে, সেই রেসিং হোমার কবুতরটা। ময়নার ভাব-ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে, মহাজ্ঞানী সে, ছেলেদের সব কথা শুনছে যেন মন দিয়ে, দরকার হলেই উপদেশ কিংবা পরামর্শ দেবে।
বিলি শেকসপীয়ার আর লিটল বো-পীপ আছে হাইমাসের কাছে, কিশোরের কথার পিঠে বলল মুসা। ও-তো কাল বললই, চারটে কাকাতুয়া আছে তার কাছে। সোজা গিয়ে এখন তাকে বলতে পারি, মিয়া, পাখিগুলো ফেরত দিলে দাও, নইলে যাচ্ছি পুলিশের কাছে। আসলে তো যাব না পুলিশের কাছে, কারণ দুজনকে কথা দিয়ে এসেছি, কিন্তু সেটা হিপোকে বলতে যাব কেন?
হুমম, আনমনে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর। সমস্যা আছে। একটা কথা ঠিক, মিস্টার সিলভার চাইছিল, কাকাতুয়াগুলো হাইমাস পাক।
সেটা সমস্যা হলো নাকি? রবিন প্রতিবাদ করল। সিলভার চেয়েছিল কিনে নিক। কিন্তু হাইমাস তো করেছে চুরি। মুসা ঠিকই বলেছে। চলো, গিয়ে পুলিশের ভয় দেখাই। সাথে বোরিস আর রোভারকে নিয়ে যাব। বেশি তেড়িবেড়ি করলে বাপের নাম ভুলিয়ে ছাড়বে মোটকার।
ঠিক আছে, কার্ড বের করে দিল কিশোর। এই যে, হাইমাসের টেলিফোন নম্বর।
পড়ল রবিন। লেখা আছে :
হাইম হাইমাস
রেয়ার আর্ট ডিলার

লণ্ডন-প্যারিস-ভিয়েনা
তার নিচে হাতে লেখা রয়েছে হলিউডের একটা অ্যাপার্টমেন্টের ঠিকানা আর টেলিফোন নম্বর।
আগে ফোন করো, রবিনকে বলল কিশোর। তোমাকে দেখেনি, গলা চিনবে। বলো, হলদে ঝুঁটিওলা একটা কাকাতুয়া আছে তোমার কাছে, বিক্রি করতে চাও। বলো, এক মেকসিকান ফেরিওলার কাছ থেকে কিনেছেনতোমার মা। হাইমাসের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করো, জিজ্ঞেস করো কোথায় দেখা করতে চায়। আমরা সবাই যাব ওখানে।
ডায়াল করল রবিন। ভাবছে, গুছিয়ে ঠিকমত বলতে পারবে তো মিছে কথাগুলো?
কিন্তু মিথ্যে বলার দরকার হলো না। অ্যাপার্টমেন্টের অপারেটর জানাল, দুই দিন আগে ঘর ছেড়ে চলে গেছেন মিস্টার অ্যাণ্ড মিসেস হাইমাস।
স্পীকারে কিশোর আর মুসাও ওপাশের কথা শুনতে পাচ্ছে। জিজ্ঞেস করো তো, কাকাতুয়াগুলোও নিয়ে গেছে কিনা? বলল কিশোর।
অপারেটর জানাল, তাঁদের সঙ্গে কোন কাকাতুয়া ছিল না। কারণ অ্যাপার্টমেন্ট কর্তৃপক্ষ ভাড়াটেদের পশুপাখি সঙ্গে রাখতে দেন না, এ-ব্যাপারে খুব কড়াকড়ি।
রিসিভার রেখে দিয়ে বলল রবিন, গেল। হাইমাসকে কোথায় পাওয়া যাবে, তা-ও জানি না এখন।
চমৎকার অগ্রগতি, নাক কুঁচকাল মুসা। খালি পিছিয়ে আসা।
এটা আপাতত হচ্ছে, সহজে নিরাশ হওয়ার ছেলে নয় কিশোর। এক ঠিকানায় নেই, নিশ্চয় আরেক ঠিকানায় আছে। এমন কোথাও যেখানে কাকাতুয়া রাখতে বাধা নেই। বেশি ভাড়ার বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্টে আর বোধহয় থাকবে না, ওসব জায়গায় নানারকম ফ্যাকরা, অন্তত তার জন্যে। তাছাড়া এমন কোথাও থাকবে না যেখানে কাকাতুয়াগুলো খুব সহজে চোখে পড়ে।
আর আমার কোন কথা নেই, হাত ডলছে মুসা। মাথায় কিছু ঢুকছে না।
রবিন কোন নতুন আইডিয়া দিতে পারো? নথি-গবেষকের দিকে তাকাল গোয়েন্দাপ্রধান।
হ্যাঁ, কিছু বললা, মূসাও অনুরোধ করল। কিন্তু দোহাই, কিশোরের মত কঠিন করে বলো না।
সবগুলো ঘটনা আবার গোড়া থেকে ভেবে দেখা দরকার। মাঝখান থেকে ঢুকেছি আমরা, বলল রবিন, মিস্টার ফোর্ডের কাকাতুয়া চুরি হওয়ার পর। অথচ
ব্যাপারটা শুরু হয়েছে আরও অনেক আগে থেকে।
ইয়ো-হো-হো অ্যান্ড অ্যা বটল রাম! কর্কশ চিৎকার করে উঠল ময়নাটা।

বলো, রবিন, হাত নাড়ল কিশোর, বলে যাও। অন্যের মুখে শোনার সময় চিন্তা করতে সুবিধে হয় আমার।
আমার ধারণা, রবিন বলল, সব কিছুর মূলে ওই ইংরেজ লোকটা, ক্যাপ্টেন লঙ জন সিলভার, শুরুটা সে-ই করেছে। কয়েক মাস আগে ডিয়েগোর চাচার ওখানে এসে উঠল। বেআইনী ভাবে পালিয়ে এসেছিল ইংল্যাণ্ড থেকে। সঙ্গে একটা চ্যাপ্টা বাক্স, যেটাতে মূল্যবান কিছু ছিল, যেটা বিক্রি করতে ভয় পাচ্ছিল সে।
কিশোরের দিকে তাকাল রবিন। কোন প্রতিবাদ বা মন্তব্য করল না কিশোর।
মারাত্মক কোন অসুখে ভুগছিল সিলভার, আবার বলল রবিন, যে অসুখ সারার নয়। দ্রুত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে বুঝতে পারছিল লোকটা। মরার আগে বাক্সটা কোথাও লুকিয়ে ফেলল, তার গুপ্তধনসহ, সত্যিই যদি কোন গুপ্তধন থেকে থাকে বাক্সে। রেখে গেল সাতটা পাখি, বিচিত্র কিছু বুলি শিখিয়ে।
হ্যাঁ, সত্যি বিচিত্র, বিড়বিড় করল মুসা। মাথা ঘুরিয়ে দেয়ার মত।
নোটবই দেখে বলল রবিন, লম্বা একটা চিঠি লিখে ডিয়েগোকে পোস্ট করতে দিল সিলভার। বলল, চিঠি পেয়ে মোটা এক লোক আসবে, স্যানটিনোকে হাজার ডলার দিয়ে নিয়ে যাবে পাখিগুলো। কিন্তু ঠিক সময়ে এল না হাইমাস। ঠেকায় পড়ে কাকাতুয়াগুলো তার আগেই বিক্রি করে দিতে বাধ্য হলো স্যানটিনো। এসে কাকাতুয়া না পেয়ে রেগে গেল মোটা লোকটা। ওগুলোর খোজে বেরোল। খুঁজে খুঁজে বের করে ফেলল চারটি পাখি। আমাদের জানামতে দুটো সে চুরি করেছে, অন্য দুটোও হয়তো তাই করেছে, কিংবা কিনে নিয়েছে। কি করেছে জানি না।
বিলি শেকসপীয়ার চুরি হওয়ার পর কেস হাতে নিয়েছি আমরা। এখন আমাদের কাছে রয়েছে ব্ল্যাকবিয়ার্ড, কোন কারণে এটাকেই বেশি মূল্যবান মনে করছে হাইমাস। গেল পাঁচটা, বাকি আর দুটো পাখির কোন খোঁজ নেই। কিন্তু পাখিগুলো লোকটার কাছে কেন এত মূল্যবান, জানি না আমরা। এ-ও জানি না, নতুন কোন জায়গায় উঠেছে হাইমাস। দম নিল রবিন। এ-যাবৎ যা যা ঘটেছে, এই হলো সারমর্ম। লম্বা লেকচার শেষ করল সে।
লুক আণ্ডার দা স্টোনস বিয়ণ্ড দা বোনস! ডানা ঝাপটে চেঁচিয়ে উঠল ব্ল্যাকবিয়ার্ড। আই নেভার গিভ আ সাকার অ্যান ইভন ব্রেক!
বেশ সাজিয়ে বলেছ, রবিনের দিকে চেয়ে মাথা কাত করল কিশোর। আমি আরও কিছু যোগ করছি। মিস্টার সিলভার বইয়ের পোকা ছিল, খুব পড়ত। নিজের ছদ্মনামটা কি রেখেছে খেয়াল করেছ? ক্যাপ্টেন লঙ জন সিলভার। ট্রেজার আইল্যাণ্ড বইয়ের সেই বিখ্যাত জলদস্যুর নামে নাম। ডাকাত সিলভারের কাঁধে থাকত একটা কাকাতুয়া, আর আমাদের মিস্টার সিলভারের কাঁধে ময়না।
তা-তো বুঝলাম, মুসা বলল। কিন্তু এসব কি প্রমাণ করে?

জলদস্যুর সঙ্গে নাম মিলিয়ে রাখাটা প্রমাণ করে, কিছু একটা চুরি করেছে সে, হয়তো তার সেই রহস্যময় গুপ্তধন, যেটা বিক্রি করার সাহস হয়নি। চুরি করেছে বলেই হয়তো।
তার সাহিত্যপ্রেমের আরেক নমুনা, নাম বাছাই, বলে গেল কিশোর। কিভাবে কাকাতুয়াগুলোর নামকরণ করেছে লক্ষ করেছ? বিলি শেকসপীয়ার, লিটল বো-পীপ, ব্ল্যাকবিয়ার্ড দা পাইরেট, শার্লক হোমস, রবিন হুড, ক্যাপ্টেন কিড।
এবং স্কারফেস, মনে করিয়ে দিল মুসা।
ওটা কোন বই থেকে নয়। মারপিটের কোন সিনেমার হীরো কিংবা ডাকাতের নাম হবে। যাই হোক, ওই একটা ছাড়া বাকি সব নামই বই থেকে নেয়া, ক্লাসিক থেকে, নয়ত ইতিহাস থেকে।
আচ্ছা, কথার মাঝেই বলে উঠল রবিন, তার গুপ্তধন কোন বইও তো হতে পারে? অনেক পুরানো দুর্লভ পুঁথি আছে, যে কোন যাদুঘর পেলে হাজার হাজার ডলার দিয়ে লুফে নেবে।
ভুরু কোঁচকাল কিশোর। হতে পারে। কিন্তু মনে করে দেখো, সিলভার অন্য কথা বলেছে। বলেছে? রামধনুর একটা টুকরোর নিচে একপাত্র সোনা। বই বলে মনে হয়?
না, সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল মুসা। কিন্তু তাতে কি? বিলি আর বো-পীপ কোথায় আছে জানি না, এমনকি হাইমাস কোথায় তা-ও অজানা। দেয়ালে ঠেকেছি আমরা, পথ বন্ধ।
কিন্তু ফোকর আছে, নাটকের সংলাপ বলছে যেন কিশোর।
গতকাল হাইমাসকে বলতে শুনেছি দুটো কাকাতুয়া এখনও নিখোঁজ। ওই দুটোকে জোগাড় করব আমরা। ব্ল্যাকবিয়ার্ড সহ আমাদের কাছে থাকবে তখন তিনটে, হাইমাসের কাছে চারটে। আগে পরে সেকথা সে জানবেই, নিতে আসবে।
কোন দরকার নেই, দু-হাত নাড়ল মুসা। আবার ওই হিপোর মুখোমুখি হব? আমি পারব না। তাছাড়া কাকাতুয়া চুরি করতেও যেতে পারব না আমি লোকের বাড়িতে।
কে চুরি করতে বলেছে তোমাকে? কিনে নেব।
যেন দোকানে আছে, গিয়ে নিয়ে এলেই হলো। কোথায় আছে তাই তো জানি না।
জানতে হবে, শান্ত কণ্ঠে বলল কিশোর। আবার চালু করে দেব ভূত-থেকেভূতে। কাকাতুয়া পছন্দ করে অনেক ছেলেমেয়ে, আর সেগুলো যদি ক্লাসিক ডায়ালগ বলে তাহলে কোন কথাই নেই। বাচ্চাদের চোখে পড়বেই পড়বে। হলিউডের একটা ম্যাপ বের করে এক জায়গায় আঙুল রাখল সে। এখানকার তিনটে ছেলেকে চিনি আমি।ওরা ছড়িয়ে দেবে খবর।

খুব সহজেই কাজ হলো এবার।
এটাই তো মনে হচ্ছে, হাতের কাগজটার দিকে চেয়ে ঠিকানা মিলিয়ে নিল মূসা দুটো ঠিকানা লিখে নিয়েছে, তার একটা মিলছে। গাড়ি রাখুন।
রাস্তার ধারে রোলস নামিয়ে আনল শোফার। হ্যানর্সন নয়, নতুন আরেকজন। বেঁটে, শয়তানী ভরা চাহনি, নাম ক্র্যাব। মুসার মনে হলো কাঁকড়ার দাঁড়ার মতই হাত নাড়ে লোকটা। রবিনও রয়েছে গাড়িতে। দুজনের কেউই পছন্দ করতে পারছে নতুন শোফারকে। সকালে রোলস-রয়েসের জন্যে ফোন করেছিল কিশোর, কোম্পানির ম্যানেজার জানিয়েছে জরুরী কারণে ছুটি নিয়েছে হ্যানসন। নতুন ড্রাইভার দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে গাড়ি।
এঞ্জিন বন্ধ করে দুই গোয়েন্দার দিকে ফিরে হাসল ক্র্যাব। কিশোর আসেনি সঙ্গে। বোরিস আর রোভার গেছে পুরানো মাল আনতে। চাচা-চাচী গেছেন আরেক কাজে। ফলে বাধ্য হয়ে ইয়ার্ডে পাহারায় থাকতে হয়েছে কিশোরকে।
কিছু তদন্ত করতে যাচ্ছ তোমরা? জিজ্ঞেস করল ক্র্যাব। হ্যানসন বলেছে। তোমাদের কথা। এসব ব্যাপারে আমিও খুব ইনটারেসটেড। যাও, আমি গাড়িতে আছি। দরকার পড়লে ডেকো। নিজের কপালে টোকা দিল। চোর-ডাকাতের স্বভাব রেকর্ড করা আছে এখানে।
লোকটার অহঙ্কারী ভাবসাব ভাল লাগল না মুসার। বলল, চোর-ডাকাত ধরতে যাচ্ছি না। একটা হারানো কাকাতুয়া খুঁজতে যাচ্ছি।
হারানো কাকা:... থেমে গেল ক্র্যাব, বিষয় পছন্দ হলো না। কিংবা হয়তো ভাবল মুসা তার সঙ্গে রসিকতা করছে। গম্ভীর হয়ে একটা খবরের কাগজ টেনে নিয়ে পড়ায় মন দিল।
ভূত-থেকে-ভূতে চালু করে দেয়ার কয়েক ঘণ্টা পরই দুটো কাকাতুয়ার খোঁজ পাওয়া গেছে। আরও কিছু তথ্যও জানা গেছে। কদিন ধরেই নাকি কয়েকটা কাকাতুয়ার জন্যে দ্বারে দ্বারে ঘুরেছে মোটা এক লোক, শেষে ক্যাপ্টেন কিড আর শারলক হোমস নামের দুটো কাকাতুয়া পেয়ে ডবল দাম দিয়ে কিনে নিয়ে গেছে।
বাকি দুটো কাকাতুয়া, স্কারফেস আর রবিন হুডকে নিতে এসেছে এখন রবিন আর মুসা। ওগুলোর বর্তমান মালিকেরা বিক্রি করতে রাজি হলে কিনে নিয়ে যাবে, আর তা নাহলে রেকর্ড করে নিয়ে যাবে কাকাতুয়া দুটোর বুলি। টেপরেকর্ডার নিয়ে এসেছে সে-জন্যে সঙ্গে করে।
সিমেন্টে বাঁধানো পথ ধরে হাঁটতে শুরু করল দুই গোয়েন্দা। দু-ধারে উঁচু পাতাবাহারের ঝাড়। পথের শেষ মাথায় পুরানো একটা বাড়ি, নতুন প্লাসটার করা হয়েছে।

ওরা বাড়িটার ফুট বিশেক দূরে থাকতেই খুলে গেল সামনের দরজা। বেরিয়ে এল ওদের চেয়ে সামান্য বেশি বয়েসী একটা ছেলে। টিংটিঙে তালপাতার সেপাই, মুসার চেয়ে লম্বা, বাঁকা নাক। দুই গোয়েন্দাকে দেখে বত্রিশ দাঁত বের করে হাসল।
এহহেরে! আবার এসেছে জ্বালাতে! বলে উঠল মুসা। এই রবিন সরো, সরো, শুঁটকির গন্ধ লাগবে গায়ে।
রকি বীচে ফিরে এসেছে আবার তিন গোয়েন্দার চিরশত্রু টেরিয়ার ডয়েল।
মুসার কথায় কিছুই মনে করল না টেরি। হাসি আরও বিস্তৃত হলো। হাতের খাঁচাটা তুলে ধরে এগোল কয়েক পা, বলল, এটার জন্যেই এসেছ, না?
খাঁচার ভেতরে একটা কাকাতুয়া। হলদে ঝুঁটি। এক চোখ কানা, ভয়ানক কোন লড়াইয়ে স্বজাতির ঠোঁট কিংবা নখের আঘাতে হারিয়েছে বোধহয় চোখটা।
কাকাতুয়া? বিস্ময় চেপে রাখতে পারল না মুসা। বলেই ফেলছিল, এটার জন্যেই এসেছে।
কিন্তু তাড়াতাড়ি বাধা দিল রবিন। কাকাতুয়া? ওই কানা পাখি আমাদের কি কাজে লাগবে, মিস্টার শুঁটকি?
কিন্তু ধাপ্পাটা কোন কাজে লাগল না। টেরি জানে, এটার জন্যেই এসেছে রবিন আর মুসা।
গতরাতে এসেই শুনল্লাম কাকাতুয়ার খবর, হেসে মুসার দিকে চেয়ে চোখ টিপল টেরি, রাগানোর জন্যে। তা কালু মিয়া কাকাতুয়া দিয়ে কি করবে? ভেজে খাবে?
শুঁটকির ভর্তা বানিয়ে খাব, রেগে গেল মুসা।
হা-হা করে হাসল টেরি। দারুণ বলেছ হে কালু মিয়া। বুদ্ধি খুলছে আজকাল। তো তোমাদের খোকা শারলক কই? কাকাতুয়ার খবর চেয়েছে কেন?
শার্টের হাতা গোটাতে শুরু করল মুসা।
হাত চেপে ধরল রবিন। টেরিকে জিজ্ঞেস করল, তুমি খবর পেলে কি করে?
এটা একটা প্রশ্ন হলো নাকি? আমেরিকার সব ছেলেই তো জানে, দুটো কাকাতুয়ার খোঁজ চায় শারলক পাশা। আমিও শুনলাম বন্ধুদের কাছে। তাই সকাল সকালই চলে এসেছি। চল্লিশ ডলারে কিনেছি এটা। নেবে নাকি? দেড়শো ডলার লাগবে।
এক আধলা দিয়েও নেব না আমরা, জবাব দিল রবিন। ওই কাতুয়া চাইনি আমরা, কানা কাকাতুয়া।
তাই নাকি? তাহলে অযথা সময় নষ্ট করছি। আরেক কাস্টোমার আগেই বলে রেখেছে আমাকে। পুরো দেড়শো দেবে। চলি, বাই-বাই। পা বাড়াল টেরি।
আই নেভার গিভ আ সাকার অ্যান ইভন ব্রেক! হঠাৎ কর্কশ গলায় বলে উঠল কাকাতুয়াটা।

অবাক হয়ে পাখিটার দিকে তাকাল টেরি। ভাবল, বকাটা তাকেই দিয়েছে। রেগে গিয়ে ধমক লাগাল, শাটাপ! গটমট করে হেঁটে গেল গাড়িবারান্দার এক দিকে। এঞ্জিন স্টার্ট নিল। শাঁ করে ঝোপের ওপাশ থেকে বেরিয়ে এল নীল একটা স্পোর্টস কার, চালিয়ে নিয়ে চলে গেল টেরি।
শুঁটকি কার কাছে বেচবে? রবিনকে জিজ্ঞেস করল মুসা। হাইমাস?
জবাব দিতে পারল না রবিন। তাড়াতাড়ি নোট বই বের করে লিখে নিল, স্কারফেস —মানে কানা কাকাতুয়াটা কি বুলি আউড়েছে।
একটা তো গেল, বলল মুসা। চলো, দেখি আরেকটা পাই কিনা।
ক্র্যাবকে আরেক ঠিকানায় যেতে বলল মুসা।
কয়েক রক পরেই বাড়িটা। এত পুরানো বিলডিং, জায়গায় জায়গায় প্ল্যাস্টার খসে গেছে, বেরিয়ে পড়েছে ইটের পাজর।
গাড়ি থেকে নেমে বাড়িটার দিকে হাঁটতে হাঁটতে বলল মুসা, ভাবছি, ভূতথেকে-ভূতের সুবিধে যেমন, অসুবিধেও তেমনি। সবাই জেনে যাচ্ছে খবর, শত্রুরাও জেনে যাচ্ছে। ফলে বেকায়দা হয়ে যায়। শুঁটকি তো কয়েকবারই অসুবিধেয় ফেলল এভাবে।
রবিন হুডকে না নিয়ে গেলেই বাঁচি, বলল রবিন।
পাওয়া গেল রবিন হুডকে। কোন কারণে খোঁজ পায়নি বা খবরই জানেনি শুঁটকি, কিংবা আগ্রহ দেখায়নি। যা-ই হোক, নিতে পারেনি, বা নেয়নি। আছে। বাড়ির মালিকের মাথা জুড়ে বিশাল টাক। জানাল, কেনার সময় একবারই কথা বলেছিল কাকাতুয়াটা, সেজন্যেই কিনেছে, তারপর একেবারে জবান বন্ধ। আর একটি বারও বুলি আউড়ায়নি। বাড়িওয়ালী গেছে রেগে। স্বামীকে কদিন ধরেই চাপ দিচ্ছে কাকাতুয়াটা বিদেয় করে দিয়ে একটা ক্যানারি কেনার জন্যে।
কাজেই, সস্তায়ই পাওয়া গেল কাকাতুয়াটা। পঁচিশ ডলারে কিনেছিল বাড়িওয়ালা, পঁচিশ ডলারেই বিক্রি করে দিল দুই গোয়েন্দার কাছে। টীকাটা গুণে নিয়ে পকেট রেখে বলল, কেন কিনছ, বুঝতে পারছি না। কথা জানে ব্যাটা, কিন্তু বলে না। দেখো, তোমরা বলতে পারো কিনা। বাচ্চারা অনেক সময় অনেক কিছু পারে, যা বুড়োদের পক্ষে অসম্ভব।
থ্যাংক ইউ, স্যার, বলল রবিন। দেখব চেষ্ট করে।
কাকাতুয়াটাকে নিয়ে বেরিয়ে এল ওরা।
বিষণ্ন হয়ে খাঁচায় বসে আছে রবিন হুড। ছেলেদের দিকে ফিরেও তাকাল না।
তাজ্জব ব্যাপার? বলল মুসা। কথা বলে না কেন?
দেখা যাক, কিশোর বলাতে পারে কিনা…আরে, গাড়িটা গেল কোথায়? এখানেই তো ছিল।

আশেপাশে গাড়িটাকে খুঁজল ওরা। কিন্তু নেই।
ওই ক্র্যাবের বাচ্চাকে দেখেই ভাল্লাগেনি আমার, গোমড়া মুখে বলল মুসা। ব্যাটা আমাদের ফেলে চলে গেছে।
তা-তো গেছে, যাই কি করে এখন? আরেকটা গাড়ি কিংবা ট্যাকসির জন্যে, এদিক ওদিক তাকাল রবিন। যেন তার মনের খবর জানতে পেরেই ঘ্যাচ করে এসে পাশে থামল একটা ঝরঝরে ভ্যান। ড্রাইভিং সীট থেকে জানালা দিয়ে মুখ বের করল এক মহিলা। রোলস-রয়েসটাকে খুঁজছ? ওদিকে চলে যেতে দেখলাম।
কেন যে গেল বুঝতে পারছি না, কপাল চুলকাল রবিন।
যাবে কোথায় তোমরা?
জানাল মুসা।
এসো, বাস স্টেশনে নামিয়ে দেব। ওদিকেই যাচ্ছি, আমন্ত্রণ জানাল মহিলা।
মহিলাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাল মুসা। এসো, রবিন। কি আর করা। উইলশায়ার থেকে বাস ধরব।
মহিলার পাশে উঠে বসল মুসা।
রবিন উঠল তার পাশে। চিন্তিত। চেনা চেনা লাগছে মহিলার কণ্ঠস্বর, আগে কোথাও শুনেছে।
চলতে শুরু করেছে ভ্যান।
আরে, ওদিকে কোথায়? তাড়াতাড়ি বলল রবিন। উল্টোদিকে যাচ্ছেন তো। উইলশায়ার ওদিকে।
উইলশায়ারে যাচ্ছেটা কে? পেছন থেকে বলে উঠল একটা কর্কশ কণ্ঠ, কথায় ব্রিটিশ টান। অন্যখানে যাচ্ছি আমরা।
চমকে ফিরে চাইল দুই গোয়েন্দা।
সীটের পেছনের একটা পার্টিশন সরে গেছে। আরাম করে বসে আছে হাইমাস। গোল মুখে কুৎসিত হাসি।
আমার সঙ্গে যাবে তোমরা, যেখানে নিয়ে যাব, আবার বলল হাইমাস। একটু গোলমাল করেছ কি... কথাটা শেষ করল না সে। ইয়া বড় এক ছুরি বের করল। পাতলা ঝকঝকে বাঁকা ফলা, হাতলের কাছটায় একটা সাপের ছবি খোদাই করা।
এটার নাম সর্প-ছুরি, ভীষণ ভঙ্গিতে ছুরিটা নাড়ল সে। হাজার বছর আগে দামেসকে তৈরি হয়েছিল। এটার একটা বাজে ইতিহাস আছে। বারোজন লোককে খুন করেছে ইতিমধ্যেই। আরও এক বা দুজনকে খুন করতে কোন আপত্তি থাকার কথা নয়। তেরো নম্বর কে হতে চাও? আনলাকি থারটিন?
দ্রুত ছুটছে ভ্যান। হলিউডের পরে খাড়া রুক্ষ পাহাড়শ্রেণী ছাড়িয়ে এল।
আগেই সতর্ক করেছি তোমাদের, এক সময় বলল মহিলা। শোনোনি।

এইবার মনে পড়ল রবিনের, কেন চেনা চেনা লাগছিল কণ্ঠস্বর। সেদিন এই মহিলাই ফোনে হুঁশিয়ার করেছিল। হাইমাসের ব্যাপারে নাক না গলাতে বলেছিল।
পাহাড়ী পথ ধরে পাহাড়ের মধ্যে ঢুকে যেতে শুরু করল গাড়ি, সরু গিরিপথ।
কেশে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বলল মুসা, একটা কথা বলবেন, মিস্টার হাইমাস, ক্র্যাবকে তাড়ালেন কিভাবে?
আরে ওটা একটা গাধা, হাসল হাইমাস। নিজেকে খুব চালাক মনে করে। সেদিন রেন্ট-আ-রাইড কোম্পানিতে একটা গাড়ি ভাড়া করতে গিয়ে দেখেছি ওকে, তখনই বুঝেছি। রেঞ্জারটা লোকের চোখে পড়ে তো, তাই সাধারণ একটা গাড়ি নিতে গিয়েছিলাম। রোলস রয়েসটা সেদিনই দেখলাম। তোমাদেরকে চড়তেও দেখেছি। জানলাম, একটা ওয়্যারলেস টেলিফোন আছে ওতে।
আজ তোমাদের অনুসরণ করেছি। গাড়ি থেকে নেমে পুরানো বাড়িটায় যখন ঢুকলে, কোণের একটা স্টোর থেকে গিয়ে ক্র্যাবকে ফোন করলাম। বললাম, বাড়ির ভেতর থেকে বলছি। তোমরা দুপুরের খাবার খেয়ে যাবে, যেতে দেরি হবে, সে যেন চলে যায়। বিকেলে এসে নিয়ে যায় তোমাদের। সামান্যতম সন্দেহ করল না গাধাটা। চলে গেল।
হাইম, কথাবার্তা থেকেই বোঝা গেল, মহিলা হাইমাসের স্ত্রী, তুমি নিশ্চই...
না, বাধা দিল হাইমাস, বুঝে ফেলেছে তার স্ত্রী কি বলতে চায়। রাস্তা খারাপ, দেখে চালাও। রিয়ার-ভিউ মিররে চোখ রাখছ তো?
হ্যাঁ। ছোট একটা গাড়ি একবার দেখলাম মনে হলো। এখন আর দেখছি না।
সাবধান। সামনে বাঁক।
গতি কমিয়ে তীক্ষ্ণ মোড় নিল গাড়ি। বেরিয়ে এল পাহাড়ের মাঝের লম্বা ফাঁপা একটা ফাঁকা জায়গায়। একটা বাড়ি আছে ওখানে। ডাবল গ্যারেজ। তাতে দাঁড়িয়ে আছে সেই কালো রেঞ্জারটা। ওটার পাশে এসে থামল ভ্যান।
বিচ্ছু মিয়ারা, নামো, আদেশ দিল হাইমাস। তাড়াহুড়ো করবে না। তোমাদের বিশ্বাস নেই।
ধীরে সুস্থেই নামল দুই গোয়েন্দা। পেছনে নামল হাইমাস।
চমকার সাজানো গোছানো বড় একটা লিভিং রুমে ছেলেদের নিয়ে এল হাইমাস। এক কোণে একটা টেবিল রাখা চারটে খাঁচায় চারটে হলদে ঝুঁটি কাকাতুয়া। মানুষের সাড়া যেন কানেই যায়নি পাখিগুলোর। একই ভাবে বসে রয়েছে, নীরব। হাইমাস যখন রবিন হুডের খাঁচাটা রাখল ওগুলোর পাশে, তখনও নড়ল না।
বড় সোফায় বসল রবিন আর মুসা। তাদের মুখোমুখি উল্টো দিকের আরেকটা সোফায় বসল হাইমাস, আনমনে আঙুল দিয়ে ছুরির ধার পরীক্ষা করছে।

তারপর বিচ্ছুরা, বলল সে, কয়েকটা কথা জানাও তো আমাকে। সিলভারের ট্রেনিং দেয়া সাতটার মধ্যে পাঁচটা কাকাতুয়াই পেয়ে গেছি। বাকি দুটোও জোগাড় করব। তা শোঁপার খপ্পড়ে পড়লে কি করে তোমরা? কতখানি জানে সে?
শোঁপা? চোখ মিটমিট করল মুসা। রবিনের দৃষ্টি শূন্য।
না জানার ভান করে লাভ হবে না, অধৈর্য হয়ে ছুরি নাড়ল সে। শোঁপা, ওই ফরাসীটা। ইউরোপের সবচে বড় আর্ট থিফ। সাংঘাতিক লোক সে। আমার পেছনে লেগেছে।
মাথা নাড়তে যাচ্ছিল রবিন, তার আগেই বলে উঠল মুসা, মাঝারি উচ্চতা, কালো সরু গোফ, কথায় ফরাসী টান, ওই লোকটার কথা বলছেন?
হ্যাঁ। চেনো তাহলে, স্বীকার করছ।
চিনি বললে ভুল হবে, তবে দেখা হয়েছে, বলল মুসা। আরেকটু হলেই রোলস-রয়েসের সঙ্গে লাগিয়ে দিয়েছিল ধাক্কা। ওই যে, বিলি শেকসপীয়ারকে যেদিন খুঁজতে গিয়েছিলাম, সেদিন। দোষ করল তার ড্রাইভার, উল্টে ঝগড়া লেগে গেল হ্যানসনের সঙ্গে, সব কথা খুলে বলল সে।
হ্যাঁ, ওই ব্যাটাই, বলল হাইমাস। কিন্তু শেপার হয়ে কাজ না করলে কাকাতুয়াগুলোর ব্যাপারে এত আগ্রহ কেন তোমাদের?
মিস্টার ফোর্ডের হারানো কাকাতুয়া খুঁজতে গিয়ে কিভাবে জড়িয়ে পড়েছে তিন গোয়েন্দা, বলল মুসা।
শঙ্কা আর উত্তেজনা দূর হয়ে গেল হাইমাসের। ও, এই ব্যাপার। আমি তো ভয় পাচ্ছিলাম, শোঁপার হয়ে কাজ করছ তোমরা। সেদিন হয়েছিল কি জানো? চশমা খুলে শার্টের কোণায় ডলে পরিষ্কার করে নিয়ে আবার নাকে বসাল সে। অ্যাপার্টমেন্ট হাউসে ফিরে দেখি রাস্তার মোড়ে বসে আছে শোঁপা। বাড়ির দিকে নজর। ঘরে ঢুকেই বুঝলাম কেউ ঢুকেছিল। কিছু খোজাখুঁজি করে গেছে। স্ত্রীর দিকে চেয়ে বলল, তুমি তো সেদিন বিশ্বাস করতে চাওনি। এখন তো মানবে? ব্যাটা ঘরে ঢুকে সেদিন নোটগুলো পড়ে গেছে।
হ্যাঁ, ঠোঁট কামড়াল মহিলা, শোঁপাই পিছে লেগেছে। তবে এখানে আমাদেরকে খুঁজে পাবে না।
তা কে জানে। ছেলেদের দিকে ফিরল হাইমাস। এই পাহাড়ের মধ্যিখানে কেন বাড়ি ভাড়া নিয়েছি জানেন? শোঁপার ভয়ে। তাছাড়া কাকাতুয়াগুলো রাখারও সুবিধেমত জায়গা পাচ্ছিলাম না। রেঞ্জারটাও এখানে লুকিয়ে রাখতে পারছি। তোমরা গাড়িটা যে খুঁজছিলে, অ্যাপার্টমেন্টের ম্যানেজারের কাছে শুনেছি। তার ছেলে বার বার নাকি জিজ্ঞেস করছিল গাড়িটার কথা। ধমক দিয়ে ছেলেকে থামিয়েছে ম্যানেজার, শাসিয়েছে, ভাড়াটের কোন কথা বাইরের কারও কাছে

ফাঁস করলে ভাল হবে না। কিন্তু ধমক-ধামক দিয়ে বাচ্চাদের মুখ বন্ধ করা যায়? তাই পালিয়েই এলাম।
ওই ছেলেটার কাছেই তোমাদের নম্বর পেয়েছি, জানাল হাইমাসের স্ত্রী। তোমাদের ভয় দেখানোর চেষ্টা করেছিলাম, হাইমাসের ব্যাপারে নাক গলাতে মানা করেছিলাম।
রেগে গেলে আমার মেজাজ ঠিক থাকে না, সামলাতে পারি না নিজেকে, স্বীকার করল হাইমাস। লোকের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে বসি। তোমাদের সঙ্গেও করেছি। এতখানি অবশ্য করতাম না, যদি না ভাবতাম শোঁপার সঙ্গে তোমরা হাত মিলিয়েছ।
হাতের ছুরিটার দিকে চোখ পড়ল তার, সরিয়ে রাখল তাড়াতাড়ি। লজ্জিত হেসে বলল, ভয় দেখাতে চেয়েছিলাম, আর কিছু না। এত বেশি দুশ্চিন্তায় আছি...
যা হয়ে গেছে, গেছে, বাধা দিয়ে বলল তার স্ত্রী। এক কাজ করো না কেন? ওদের সাহায্য চাও। বুদ্ধিসুদ্ধি আছে ওদের, বোঝাই যায়। তুমি যা পারোনি তাই ওরা করেছে। স্কারফেস আর রবিন হুডকে খুঁজে বের করেছে।
ঠিকই বলেছ, তোয়ালের সমান এক রুমাল বের করে থলথলে গালের ঘাম মুহল হাইমাস। সত্যিই আমি লজ্জিত, সরি। বদমেজাজী লোককে কেন লোকে পছন্দ করে না, বুঝতে পারছি।
দৃষ্টি বিনিময় করল দুই গোয়েন্দা। থাক থাক, ভুল হয়েই থাকে মানুষের, হাত তুলল রবিন।
আমরা বয়েসে অনেক ছোট, আমাদের কথা বাদ দিন। কিন্তু মিস্টার ফোর্ড আর মিসেস বোরোর কাছে গিয়ে মাপ চাওয়া উচিত আপনার। তাদের কাকাতুয়া চুরি করেছেন, মিস্টার ফোর্ডকে তো হাত-পা বেঁধে ফেলে এসেছিলেন। যদি আমরা না যেতাম, কি অবস্থা হত?
না, কিছু হত না, আরেক দিকে চেয়ে বলল হাইমাস। তোমরা না গেলে পরে এক সময় গিয়ে খুলে দিয়ে আসতাম। তবে হ্যাঁ, মাপ চাওয়া উচিত, ঠিকই বলেছ।
কাকাতুয়াগুলো চুরি করলেন কেন?
না করে উপায় ছিল না। জন সিলভারের লুকানো গুপ্তধনের চাবিকাঠি রেখে গেছে সে কাকাতুয়াগুলোর কাছে।
কিশোর এটাই সন্দেহ করছে, হঠাৎ বুঝে ফেলল রবিন। মিস্টার হাইমাস, বলল সে, কাকাতুয়াগুলোর বুলিতে রয়েছে সঙ্কেত। সাতটা বুলি মিলিয়ে বুঝতে
হবে কোথায় রয়েছে গুপ্তধন।
বুদ্ধিমান ছেলে, বলল হাইমাস। ঠিক ধরেছ। আমার সঙ্গে তিক্ত রসিকতা করেছে জন সিলভার। আসলে এক ধরনের প্রতিশোধ। কাকাতুয়াকে বুলি শিখিয়ে গেছে,

তাতে রয়েছে গুপ্তধনের সঙ্কেত, সেই সঙ্কেত বুঝে তারপর খুঁজে বের করতে হবে আমার। তার স্বভাবই ছিল এটা। অসাধারণ বুদ্ধিমান ছিল সিলভার, এবং পাগল।
হাইম, বলে উঠল মিসেস হাইমাস, খালি কথা বললে পেট ভরবে? কিছু খেতেটেতে হবে না? সেই কখন খেয়েছি...যাই, কয়েকটা স্যাণ্ডউইচ বানিয়ে আনি।
খাবারের কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে মোচড় দিয়ে উঠল মুসার পাকস্থলী। অবাক হয়ে ভাবল, এতক্ষণ ভুলে ছিল কি করে? রবিনেরও খিদে পেয়েছ। উত্তেজনার কারণেই ভুলে ছিল।
মিসেস হাইমাস রান্নাঘরে চলে গেল।
ইংল্যাণ্ডে থাকতেই মিস্টার সিলভারকে চিনতেন? জিজ্ঞেস করল রবিন।
হ্যাঁ, দুবছর ধরে। আমার কর্মচারী ছিল। রেয়ার আর্ট কেনাবেচার কাজে সাহায্য করত। লণ্ডনে। উচ্চ শিক্ষিত লোক, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান। তবে অদ্ভুত রসবোধ ছিল, আর এ-কারণেই কোন চাকরিতে বেশি দিন টিকতে পারত না, গুণ থাকা সত্ত্বেও। শেষে তো এমন অবস্থা হলো, কেউ আর চাকরি দিতে চায় না। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ধাধা আর জোক পাঠিয়ে কোনমতে দু-বেলা দুমুঠো জোগাড় করত। এই সময়ই একদিন চাকরির জন্যে এল আমার কাছে। সাহিত্য আর শিল্প সম্পর্কে তার জ্ঞানের বহর দেখে সত্যি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। তার দুর্নাম আমার কানেও এসেছিল, তবু চাকরি দিলাম। বুঝেছিলাম, খুব কাজে লাগবে।
ভালই কাজ চালাচ্ছিল, ছোটখাট রসিকতা করে মাঝেমাঝে জালাত অবশ্য। তবে সহ্য করে নিচ্ছিলাম। যাই হোক, একদিন একটা ছবি কিনে নিয়ে এল। অতি সাধারণ ছবি, হলদে ঝুঁটিওয়ালা দুটো কাকাতুয়া গাছের ডালে বসে আছে। অনেক বেশি দাম দিয়ে বাজে একটা জিনিস নিয়ে আসায় রাগ হয়েছিল খুব, বকে ছিলাম। চুপ করে রইল সিলভার। ভাবলাম, ওটাও আরেক রসিকতা। গেলাম রেগে, মেজাজ ঠিক রাখতে না পেরে দিলাম চাকরি থেকে বরখাস্ত করে।
জন সিলভার কিন্তু তার আসল নাম নয়, তবু ওই নামেই ডাকা হোক, এটা চাইত। নিজের নাম নিয়েও রসিকতা, পাগল আর কাকে বলে? অফিস থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে সে বলল, ওটা ডাবল পেইন্টিং। ডাবল পেইন্টিং মানে, রঙ লেপে মূল ছবিটাকে ঢেকে দিয়ে তার ওপর আরেকটা ছবি আঁকা। বিখ্যাত চিত্রকর্ম লুকিয়ে রাখার জন্যে কখনও কখনও করা হয় এটা। আমি তার কথা বিশ্বাস করলাম না। কিন্তু জোর গলায় বলে গেল সে, সেটা প্রমাণ করে দেখাবে। করলও তাই। চুপ করল হাইমাস।
আগ্রহে সামনে ঝুঁকে এসেছে রবিন আর মুসা, রোমাঞ্চকর এক গল্প শুনছে যেন।

হ্যাঁ, সত্যি সত্যি প্রমাণ করল সে। ওপরের ছবিটা মুছে ফেলল। বেরিয়ে পড়ল এক অসামান্য চিত্রকর্ম। একটা ভেড়ার বাচ্চাকে আদর করছে এক মেষপালক। আমাকে দেখাতে নিয়ে এল।
এক নজর দেখেই বুঝলাম কি ভুল করেছি তাকে তাড়িয়ে দিয়ে। এক মস্ত শিল্পীর আঁকা ওই ছবি নিখোঁজ ছিল অনেক দিন, কেন নিখোঁজ ছিল তখন বুঝতে পারলাম। চোরের ভয়ে ডাবল পেইন্ট করে ফেলা হয়েছিল। ছোট্ট ছবি, কিন্তু দাম অনেক। পাঁচ সাত-লাখ ডলারের কম নয়।
খাইছে! চেঁচিয়ে উঠল মুসা। একটা ছবির এত দাম? এক ডলারেই তো ফ্রেমসহ পাওয়া যায় কত ছবি।
সেগুলো ছাপা কপি, রবিন বলল। নিউ ইয়র্ক সিটির মেট্রোপলিটন মিউজিয়াম অভ আর্ট যাদুঘরের নাম শুনেছ? বিখ্যাত ডাচ চিত্রকর রেমব্রান্ত-এর একটা ছবি বিশ লাখ ডলারে কিনেছে ওরা। কিছু কিছু জিনিস আছে যেগুলোর আসল মূল্যের চেয়ে অ্যানটিক মূল্য বেশি।
মারছে! চোখ কপালে উঠল মুসার। একটা ছবির জন্যে বিশ লাখ ডলার। কত রকমের পাগল যে আছে দুনিয়ায়।
হ্যাঁ, তারপর কি হলো শোননা, থেমে গেল হাইমাস। খাবারের ট্রে নিয়ে এসেছে তার স্ত্রী। বড় প্লেটে কয়েকটা স্যাণ্ডউইচ, দুই গ্লাস দুধ আর দুই কাপ কফি। টেবিলে নামিয়ে রাখল।
যার যার খাবার তুলে নিয়ে খেতে শুরু করল সবাই।
স্যাণ্ডউইচ শেষ করে কফির কাপে চুমুক দিয়ে বলল হাইমাস, হা, সিলভার বলল, যেহেতু সে তখন চাকরিতে নেই, ছবিটার মালিক সে। বললাম, চাকরিতে থাকার সময় আমার টাকায় কিনেছে, কাজেই ছবির মালিক আমি। অনেক তর্কাতর্কির পর আধাআধি বখরা অফার করল আমাকে।
ভালই তো প্রস্তাব, দুধের শূন্য গেলাসটা নামিয়ে রাখল মুসা। হাজার হোক, ছবিটা তো সে-ই খুঁজে পেয়েছে।
কিন্তু আমাকে ধরল ভূতে, আফসোসের সুরে বলল হাইমাস, তাতেও রাজি হলাম না। পুলিশের ভয় দেখালাম তাকে। রুখতে পারলাম না, ছবিটা নিয়ে পালাল। থানায় ডায়েরী করে তার নামে ওয়ারেন্ট বের করলাম। কিন্তু একেবারে গায়েব হয়ে গেল। পরে জানা গেল, একটা মালবাহী জাহাজে করে ইংল্যান্ড থেকে বেরিয়ে গেছে সে। সঙ্গে করে নিয়ে গেছে দামী মেষপালক।
দোষ তো তোমারই, বলল মিসেস হাইমাস।
হ্যাঁ, আমারই দোষ। ছেলেদের দিকে ফিরে বলল হাইমাস, দেশ-বিদেশের চেনা সমস্ত চিত্রব্যবসায়ীকে জানিয়ে দিলাম ছবিটার কথা। চোখ খোলা রাখতে

অনুরোধ করলাম। কিন্তু বাতাসে মিলিয়ে গেল যেন সিলভার। ক্যালিফোরনিয়ায় এসে লুকিয়ে রইল।
হ্যাঁ, বলল রবিন, মিস্টার স্যানটিনোর বাড়িতে। সঙ্গে একটা ধাতুর বাক্স ছিল। রোজ রাতে নাকি খুলে দেখত আর বলত, আহা, কি সুন্দর রামধনুর টুকরো, নিচে একপাত্র সোনা।
একেবারে নিখুঁত বর্ণনা, সায় দিল হাইমাস। রামধনুর সাতরঙেই আঁকা হয়েছে ছবিটা। সোনার চেয়েও দামী। হ্যাঁ, তারপর হঠাৎ একদিন সিলভারের লম্বা এক চিঠি এসে হাজির আমার অফিসে। লিখেছে, ছবিটা নিরাপদেই আছে, লুকানো। সেটা বের করতে হলে একটা ধাধার রহস্য সমাধান করতে হবে। আরেক রসিকতা। আমার মনের ওপর অত্যাচার, এটা তার প্রতিশোধ।
চিঠিতে জানিয়েছে সে, ছয়টা কাকাতুয়া আর একটা ময়নাকে বুলি শিখিয়েছে, তাতেই রয়েছে ধাধার সমাধান। আমেরিকায় এসে স্যানটিনো নামের এক লোককে এক হাজার ডলার দিয়ে তার কাছ থেকে কিনে নিতে হবে পাখিগুলো। হলদে ঝুঁটি কাকাতুয়া বাছাই করেছে সে, কেন, তা-ও জানিয়েছে। ওই যে, মূল-ছবির ওপর ওই রঙের কাকাতুয়াই আঁকা ছিল, আর তাই নিয়ে আমার সঙ্গে ঝগড়া।
কিছু মনে করবেন না, নরম গলায় বলল মুসা, ঠিকই করেছে সিলভার। আপনি তার সঙ্গে যেরকম দুর্ব্যবহার করেছেন...
ঠিকই বলেছ, খুব শান্তভাবেই স্বীকার করল হাইমাস। তবে এত কষ্ট হত না। আমার। এটাকে দুর্ভাগ্য বলতে পারো, চিঠিটা যখন পৌঁছল, আমি তখন নেই। জরুরী একটা ব্যবসার কাজে জাপানে গেছি। ফিরতে দেরি হয়ে গেল। এসে চিঠি পেয়ে তো চমকে গেলাম, সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলাম আমেরিকায়। কিন্তু ততদিনে পাখিগুলো বিক্রি করে দিয়েছে স্যানটিনো।
ওই বেচারার সঙ্গেও কম দুর্ব্যবহার করেননি আপনি, কায়দামত ঝাল ঝাড়ছে মুসা।
হ্যাঁ, আগেই বলেছি, এ-জন্যে দায়ী আমার বদমেজাজ। তাছাড়া, কিভাবে জানি শুনে ফেলেছে শোঁপা, আমার পিছু নিয়েছে, সেটা আরেক দুশ্চিন্তা। মেজাজ ঠিক রাখতে পারিনি। ব্যাটা যে কিভাবে শুনল, কে জানে। হয়তো অফিসে লোকের সামনে খোলাখুলি কিছু বলে ফেলেছিলাম, ঘুষখোর কর্মচারীর তো অভাব নেই।
হ্যাঁ, শেপাকে নিয়ে ভয়ই, মাথা দোলাল মিসেস হাইমাস। গন্ধ যখন পেয়েছে, সহজে ছাড়বে না।
হ্যাঁ, যা বলছিলাম, আবার শুরু করল হাইমাস, স্যানটিনোকে অনেক রকমে জিজ্ঞেস করলাম, কিন্তু কোথায় পাখিগুলো বিক্রি করেছে সঠিক বলতে পারল

না। মোটামুটি ধারণা দিতে পারল শুধু। লোকের দ্বারে দ্বারে ফকিরের মত ঘুরলাম কয়েকদিন। চারটে পাখি জোগাড় করলাম, তোমরা বের করলে আরও দুটো।
চারটেই চুরি করেছেন? জিজ্ঞেস করল মুসা।
না, দুটো। আর দুটো ডবল দামে কিনেছি। মিস্টার ফোর্ড আর মিসেস বোরো বেচতে রাজি হলো না, তাই চুরি করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। ও হ্যাঁ, ফোর্ডের কাছেই লিটল বো-পীপ আর ব্ল্যাকবিয়ার্ডের কথা শুনেছি।
এত বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম, যে কি বলব। কোনরকম ভাবনা চিন্তা না করে গিয়ে মিসেস বোরোর বাড়িতে ঢুকলাম। খালি বাড়ি, চুরি করলাম কাকাতুয়াটা। বেরিয়ে আসছি, এই সময় দুই কিশোরকে ঢুকতে দেখলাম। তুমি একজন, মুসার দিকে আঙুল তুলল হাইমাস।
হ্যাঁ, সঙ্গে কিশোর ছিল, মুসা বলল। টালি ছুঁড়ে আরেকটু হলেই দিয়েছিলেন তো আমার মাথা ফাটিয়ে।
ভয় দেখাতে চেয়েছিলাম, কপাল ডলল হাইমাস।
ভয়? কিশোর আমাকে ধাক্কা দিয়ে না ফেললে তো গেছিলাম। মেরেছিলাম যাতে তোমার আশেপাশে পড়ে, কিন্তু নিশানা ফসকে…
হেসে ফেলল মুসা। নিশানা ফসকে লাগতে যাচ্ছিল। আমারও হয় ওরকম, এয়ারগান দিয়ে শিকারের সময়। একবার একটা ঘুঘুকে সই করে মারলাম, তিন হাত দূরের আরেকটা পড়ে গেল। হা হা…
সে-কথা মনে করে রবিনও হেসে ফেলল।
পরিবেশ সহজ হলো অনেকটা। মিস্টার আর মিসেস হাইমাসও হাসল।
এসব করেই জটিলতা আরও বাড়িয়েছেন আপনি, বলল রবিন। খোঁচা মেরে জাগিয়ে দিয়েছেন কিশোর পাশাকে। ব্যাস, লেগে গেছে পেছনে। ও একবার যেটার পেছনে লাগে শেষ না দেখে ছাড়ে না।
মুসা, তোমার খুলি ভীষণ শক্ত, এমনভাবে ভূঁড়িতে হাত ডলল হাইমাস, যেন ব্যথাটা এখনও রয়েছে।
কেন হয়েছে, জানেন? ব্যাখ্যা করল মুসা। পড়া না পারলে মা খালি গাট্টা মারত মাথায়। কত আর সওয়া যায়? একদিন টেলিভিশনে দেখলাম, জুডো-কারাতে শেখানোর আগে বালির বস্তায় ঘুসি মেরে, ইটে কোপ মেরে হাত শক্ত করে ছাত্ররা। চট করে বুদ্ধি এল মাথায়। সেদিন থেকেই লেগে গেলাম, হাত নয়, মাথা শক্ত করতে। দেয়ালে বাড়ি মেরে মেরে কপাল-মাথা ফুলিয়ে ফেলেছি কতদিন। তাআরপর একদিন, হাসিতে বিকশিত হল ঝকঝকে সাদা দাঁত, পড়তে বসে ইচ্ছে করেই ভুল করতে লাগলাম। কষে এক গাট্টা মারল মা।…হি-হি…পুরো এক কৌটা বাতের মলম শেষ করেছে বাবা, মায়ের আঙুলে ডলে।

হো-হো করে হেসে উঠল মিস্টার আর মিসেস। ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল যেন হাইমাসের ছোটখাট পাহাড়টা।
যাই হোক, আবার কাজের কথায় এল হাইমাস, তোমরা পিছু লাগলে। শোঁপা তো আগে থেকেই আছে, লুকিয়ে পড়তে হলো আমাকে। রেঞ্জারটা লুকিয়ে ভ্যানটা ভাড়া নিতে হলো। আজ সকালে কাকাতুয়া খুঁজতে বেরিয়ে তোমাদের রোলস রয়েসটা নজরে পড়ল। কৌতূহল হলো। পিছু নিলাম।
একটা বাড়ির কাছে গাড়ি রেখে নামলে তোমরা। লুকিয়ে তোমাদের ওপর চোখ রাখলাম। লম্বা একটা ছেলের সঙ্গে দেখা হলো তোমাদের।
শুঁটকি টেরি, বলল মুসা। আমাদের শত্রু। পারে না তো কচুটাও করতে, খালি ঘাপলা বাধায়।
ওর হাতে একটা খাঁচা, বলে গেল হাইমাস, তাতে একটা কাকাতুয়া। নীল স্পোর্টস কারে চড়ে চলে গেল পাখিটা নিয়ে। ভেবেছিলাম, পিছু নিই। পরে ভাবলাম, গাড়ির নম্বর তো জানাই রইল, খুঁজে বের করে ফেলব। তোমরা কি করো, দেখতে লাগলাম। থামল এক মুহূর্তের জন্যে। তাছাড়া আরও একটা কারণে তার পিছু নেয়ার দরকার মনে করিনি। কানা কাকাতুয়াটা কি বলেছে, শুনে। ফেলেছি।
কি? নোটবই বের করল রবিন।
হাইমাসও নোটবই বের করল। বলেছে, আই নেভার গিভ আ সাকার অ্যান ইভন ব্রেক।
গালি, বিড়বিড় করল মুসা।
গালি ঠিক নয়, একটা পুরানো স্ল্যাঙ। তবে সঙ্কেত হিসেবে খুবই কঠিন। কি বোঝাতে চেয়েছে সিলভার, সে-ই জানে।
সাতটা পাখির বুলি এক করে ভাবলে হয়তো কিছু বোঝা যাবে, রবিন বলল।
সেটাই তো হলো সমস্যা, মুখ বাকাল হাইমাস। সাতটার মাঝে পাচটা পেয়ে গেছি, বাকি রয়েছে শুধু স্কারফেস আর ব্ল্যাকবিয়ার্ড। স্কারফেসের বুলিও জানি। কিন্তু, সেটা সহ জানা হয়েছে মাত্র তিনটে।
তিনটে কেন? জিজ্ঞেস করল রবিন। ছ-টা তো হওয়ার কথা।
কথা, কিন্তু হয়েছে তিনটে, বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল হাইমাস। কথা বলেছে শুধু বিলি আর বো-পীপ। বাকিগুলো একেবারে চুপ। টু শব্দও করে না। কি বুলি জানে, কি জানি!
মুখ ফিরিয়ে খাঁচাগুলোর দিকে তাকাল দুই গোয়েন্দা। চুপ করে বসে আছে। পাখিগুলো, যেন প্রাণ নেই। নড়ছেও না। কথা বলার মুড যে নেই বোঝাই যাচ্ছে।
খাঁচার দিকে চেয়ে মেজাজ আবার খারাপ হয়ে গেল হাইমাসের। লাফিয়ে উঠে গটমট করে গিয়ে দাঁড়াল টেবিলের কাছে। গর্জে উঠল, বল, হারামজাদারা।

জলদি বল সিলভার কি শিখিয়েছে? এই, শুনছিস? বলবি?
ভয় পেয়ে আরও দূরে সরার চেষ্টা করল কাকাতুয়াগুলো, খাঁচার কোণে জড়সড় হয়ে রইল।
এই রকমই করে, জানাল মিসেস হাইমাস। প্রথম পাখিটা আনার পর থেকেই খালি ধমকাচ্ছে। কোনোটাকে বাদ দিচ্ছে না।
এ-কারণেই মুখ খুলছে না ওরা, হয়তো, রবিন বলল। খুব নাজুক স্বভাব। জোরে কোন শব্দ করলে, কিংবা জায়গা বদলালে চুপ হয়ে যায়।
ফিরে এসে ধপাস করে সোফায় গড়িয়ে পড়ল পাহাড়। আর ধৈর্য নেই! গুঙিয়ে উঠল হাইমাস। এভাবে আর কত? ওদিকে পিছে লেগেছে শেপা। যখনতখন এসে হাজির হতে পারে। সাংঘাতিক লোক।
তাহলে বসে আছো কেন, বাপু? টাকার লোভ ছেড়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও না, তাহলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়, কথাগুলো বলতে ইচ্ছে করল মুসার। বলল, কয়েকটা বুলি বা মেসেজও বলা যায়, জানি আমরা। কিন্তু মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে পারছি না আমি। তবে, আমরা আপনার কাছে যা যা জানলাম, কিশোরকে জানালে হয়তো উপায় একটা করে ফেলতে পারবে।
এক কাজ করি না কেন? পরামর্শ দিল রবিন। যে কটা মেসেজ জানি, লিখে ফেলি কাগজে। তারপর দেখি, কোন মানে বের করা যায় কিনা।
ভাল কথা বলেছ, তর্জনী নাচাল মিসেস হাইমাস। স্বামীকে বলল, তোমাকে সেদিনই বলেছি, ছেলেগুলো চালাক। ওদের সঙ্গে কথা বলো।
তা বলেছ। কিন্তু কতখানি দুশ্চিন্তায় রয়েছি:.
রাখো তোমার দুশ্চিন্তা, মুখ ঝামটা দিল মিসেস। এক কথা শুনতে শুনতে কান পচে গেল। রবিন, আমি একটা প্রস্তাব দিচ্ছি। ভেবে দেখো। ছবিটা যদি বের করে দিতে পারো, এক হাজার ডলার পুরস্কার দেব।
খাইছে! চেঁচিয়ে উঠল মুসা। এই রবিন, দেরি করছ কেন? শুরু করে দাও।
দাঁড়াও, হাত তুলল হাইমাস, আরেকটা কথা মনে পড়েছে। চিঠিতে সিলভার লিখেছিল, সাত ভাগে ভাগ করেছে সে মেসেজটা। সিরিয়ালি সাজিয়েছে। এভাবে ও লিটল বো-পীপ এক নম্বর, দুই-বিলি শেকসপীয়ার, তিনব্ল্যাকবিয়ার্ড, চার-রবিন হুড, পাঁচ-শারলক হোমস, ছয়-ক্যাপ্টেন কিড, এবং সাত–স্কারফেস।
ভাল পয়েন্ট মনে করেছেন, বলল রবিন, খসখস করে লিখে চলেছে নোটবুকে। নইলে উল্টোপাল্টা লিখতাম, ধাধার সমাধান হয়তো হত না।
লিখে এক টানে ফড়াত করে ছিড়ে কাগজটা হাইমাসকে দেখাল রবিন। লিখেছে : স্যাপ্টেন লঙ জন সিলভারের মেসেজ (অসম্পূর্ণ)

১। লিটল বো-পীপ : লিটল বো-পীপ হ্যাজ লস্ট হার শীপ অ্যাণ্ড ডাজ নো হোয়্যার টু ফাইণ্ড ইট। কল অন শারলক হোমস।
২। বিলি শেকসপীয়ার : টু বি অর নট টু বি, দ্যাট ইজ দা কোয়েশচেন।
৩। ব্ল্যাকবিয়ার্ড : আয়্যাম ব্ল্যাকবিয়ার্ড দা পাইরেট, অ্যাণ্ড আহ্যাভ বারিড মাই ট্রেজার হোয়্যার ডেড ম্যান গার্ড ইট এভার। ইয়ো-হো-হো অ্যান্ড অ্যা বটল অভ রাম।
৪। রবিন হুড : ?
৫। শারলক হোমস : ?
৬। ক্যাপ্টেন কিড : ?
৭। ক্ষারফেস : আই নেভার গিভ আ সাকার অ্যান ইন ব্রেক।
তাহলে, রবিন বলল, সাতটার মাঝে চারটা মেসেজই জেনে গেলাম। ব্ল্যাকবিয়ার্ডকে যে পেয়েছে তিন গোয়েন্দা, সেকথা হাইমাস দম্পতিকে জানানোর ইচ্ছে নেই। ব্ল্যাকবিয়ার্ডের বুলি শুনেছি, স্যানটিনোর ভাতিজা ডিয়েগোর কাছে।
হতাশায় চোখের দু-ধারে ভাজ পড়ল হাইমাসের। কিছু বোঝা যায় না...কিচ্ছু না।
হাইম, স্বামীর চেয়ে স্ত্রীর মেজাজ অনেক ঠাণ্ডা, বুদ্ধিও রাখে, এত ভেঙে পড়ছ কেন? দেখিই না চেষ্টা করে। প্রথম কাকাতুয়াটার কথাই ধরি, বো-পীপ তার ভেড়া হারিয়েছে বলছে। ধরে নেয়া যায়, ছবিটার কথা বলছে। ওটাও তো একরকম হারানোই আছে এখন। কোথায় আছে জানে না, তারমানে আমরা জানি না।
বেশ, হলো, বলল হাইমাস। কিন্তু শারলক হোমসকে ডাকার মানে কি?
বুঝতে পারছি না। এবার দু-নম্বরটার কথা ধরা যাক। বিলি শেকসপীয়ার বলে, টু বি অর নট টু বি...
ও ভাবে বলে না, তোতলায়, ফাঁস করে দিল মুসা।
তোতলায়! কাকাতুয়া? আঁতকে উঠেছে হাইমাস। না, আর হলো না। এ রহস্যের সমাধান আমার কাজ নয়। গোঙাতে শুরু করল সে। লরা, পেটটা চিনচিন করছে আবার।
কতবার বলেছি, উত্তেজিত হয়ো না, উদ্বিগ্ন হলো মিসেস।
ডাক্তারও তো বারণ করেছে। একটা ছবির জন্যে মিছেমিছি...হ্যাঁ, যা বলছিলাম, দুই নম্বর মেসেজ কিছুই বুঝছি না। তিন নম্বরে বোধহয় বোঝাতে চাইছে, কোন এলাকায় লুকানো রয়েছে ছবিটা।
হোয়্যার ডেড ম্যান গার্ড ইট এভার, এক হাতে পেট চেপে ধরে আরেক হাতে কপালের ঘাম মুছল হাইমাস। কোন জলদস্যুর দ্বীপ মনে হচ্ছে। জলদস্যু আর গুপধনের গল্প দারুণ ভালবাসত জন সিলভার।

হ্যাঁ, জলদস্যুর দ্বীপের মতই শোনায়, একমত হলো মিসেস হাইমাস। ভালমত ভাবতে হবে।
কিন্তু ওই সাত নম্বরটা কি? ভুরু নাচাল হাইমাস। একটা আমেরিকান স্লাঙ, শুনে মনে হয় এক ডাকাত আরেক ডাকাতকে তার ন্যায্য পাওনা কিংবা অধিকার দিতে চাইছে না। কিংবা কোন সমঝোতায় আসতে চাইছে না। এর একটাই মানে, আপনাদের পাওনা দেয়ার ইচ্ছে নেই সিলভারের, আমাদের সঙ্গে কোন চুক্তিতে আসতে রাজি নয়।
বাকি তিনটে মেসেজ পেলে হয়তো কিছু বোঝা যাবে, বলল মিসেস। ওগুলো ছাড়া হবে না।
এক কাজ করলে হয়, আঙুলে চুটকি বাজাল রবিন।
কী? এক সঙ্গে প্রশ্ন করল মিস্টার আর মিসেস।
রবিন হুড, শারলক হোমস আর ক্যাপ্টেন কিড তো আছেই। ওদের দিয়ে কথা বলালে হয়। তারপর সঙ্কেতের মানে বের করে ফেলতে পারবে কিশোর।
কিন্তু কথা তো বলে না, মুখ গোমড়া হয়ে গেল হাইমাসের। ওই দেখো না, কেমন চুপ করে আছে? চেঁ-টোও করছে না।
স্যানটিনো হয়তো বলাতে পারবে, বলল মুসা। তিন হপ্তা কাকাতুয়াগুলোকে পুষেছে, তাকে ওরা চেনে। আমার মনে হয় ও চেষ্টা করলে পারবেই।
ঠিক বলেছ, লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল হাইমাস, দুলে উঠল জালার মত পেট, স্যানটিনো পারবে। চলো, এক্ষুণি।
ছুটে চলেছে ভ্যান।
সামনের সীটে হাইমাসের পাশে বসেছে রবিন আর মুসা।
পেছনে মিসেস হাইমাস। তার মাথার ওপরে ভ্যানের ছাতের রডে ঝুলছে পাঁচটা খাঁচা।
হাইমাস যেখানে নতুন বাসা নিয়েছে, তার থেকে অনেক দূরে স্যানটিনোর গ্রাম, উপকূলের ধারের সমভূমিতে। পৌঁছতে বিকেল হয়ে যাবে।
আঁকাবাঁকা নির্জন পাহাড়ী পথ ধরে ছুটছে গাড়ি।
হঠাৎ শোনা গেল মিসেসের উত্তেজিত কণ্ঠ, হাইম, একটা গাড়ি! পিছু নিয়েছে।
গাড়ি? রিয়ার-ভিউ মিররে তাকাল হাইমাস। কই?।
মোড়ের ওধারে…ওই যে বেরোচ্ছে: কোয়ার্টার মাইল দূরে।
হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখছি। সেডান পিছু নিয়েছে, কি করে বুঝলে?
তাই তো মনে হচ্ছে?
কি রঙ? ধূসর? উত্তেজিত হয়ে বলল মুসা। কই, দেখি তো?

তার পাশের মিররে দেখা যাচ্ছে না গাড়িটা, পেছন দিকে উঁকি-ঝুঁকি দিয়েও কিছু দেখল না। শেষে কেবিনের দরজা খুলে শক্ত করে তার হাত ধরতে বলল রবিনকে। দরজা দিয়ে বের করে দিল শরীরের অর্ধেকটা। কই...ও, হ্যাঁ, দেখেছি। সেদিন ওই গাড়িটাই দেখেছিলাম, ধাক্কা লাগিয়ে দিচ্ছিল।
শোঁপা! গুঙিয়ে উঠল হাইমাস। কি করি এখন?
চালিয়ে যাও, তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে মিসেসের কণ্ঠ, সামনের শহরটায় ঢোকার আগে ধরতে দেবে না।
কিন্তু মাইল পঁচেকের ভেতর তো কোন শহর নেই। খালি পাহাড় আর পাহাড়। অ্যাক্সিলারেটর টিপে ধরল সে, যতখানি গেল। প্রচণ্ড গোঁ গোঁ করে প্রতিবাদ জানাল পুরানো এঞ্জিন, ঝনঝন করে কাপছে ঝরঝরে বডি, বিপজ্জনক গতিতে ছুটল পাহাড়ী পথ ধরে।
টায়ারের কর্কশ আর্তনাদ তুলে বাঁক ঘুরল গাড়ি। এক ধারে হালকা লোহার বেড়া, জোরে ধাক্কা লাগলে ঠেকাতে পারবে না, উড়ে গিয়ে পাঁচশো ফুট নিচের খাদে পড়বে গাড়ি। জোরে মোড় নিতে গিয়ে বেড়ার সঙ্গে নাক ছুঁই-ছুঁই হয়ে গেল ভ্যানের, দম বন্ধ করে ফেলল দুই গোয়েন্দা। কিন্তু সময়মত সরিয়ে আনল হাইমাস।
একেবারে পিছে এসে গেছে, চেঁচিয়ে জানাল মিসেস। পাশ কাটাতে চাইছে।
আয়নায় দেখতে পাচ্ছি, বিড় বিড় করল হাইমাস। কিন্তু সাইড দেব না।
সাঁই করে রাস্তার মাঝখানে গাড়ি নিয়ে এল সে। পেছনে টায়ারের তীক্ষ্ণ চিৎকার শোনা গেল, গাল দিয়ে উঠল যেন হর্ন।
ঝাঁকুনি খেতে খেতে ছুটে চলেছে পুরানো ভ্যান, বডির বিচিত্র শব্দে আরোহীদের কান ঝালাপালা। কিন্তু উপায় নেই। গতি কমানো যাবে না। পেছনে ছায়ার মত লেগে আছে বিশাল সেডান। খালি পাশ কাটানোর চেষ্টা।
খানিকদূর নেমে ধীরে ধীরে আবার উঠে গেছে পথ। হঠাৎ যেন মাটি খুঁড়ে উদয় হলো বিশাল এক ট্রাক, পথের শেষ মাথায়। পুরো রাস্তা জুড়ে আসছে, ফাঁক খুবই সামান্য।
মস্ত এক দানব যেন ছুটে আসছে পাহাড় কাঁপিয়ে।
চিল্কার করে মাথা নুইয়ে ফেলল রবিন।
শেষ মুহূর্তে স্টিয়ারিং ঘোরাল হাইমাস, কোনমতে পাশ কাটিয়ে এল ট্রাকের। পলকের জন্যে ট্রাক-ড্রাইভারের এক জোড়া বিস্মিত চোখ নজরে পড়ল মুসার।
সেডানটাও নিরাপদেই ট্রাকের পাশ কাটাল। খানিকটা পিছিয়ে পড়ল। কিন্তু গতি বাড়িয়ে পুষিয়ে নিল আবার ফারাকটা। রাস্তার মাঝখানে ভ্যান তুলে আনার কথা

যেন ভুলে গেল হাইমাস, সুযোগটা কাজে লাগাল সেডান। চলে এল ভ্যানের পাশে।
সীটের ধার, দরজার কিনার, যে যেটা পারছে খামচে ধরে সীটে বসে থাকার চেষ্টা চালাচ্ছে দুই গোয়েন্দা। ঝাঁকুনির চোটে বার বার সরে যাচ্ছে, পড়ে যেতে চাইছে সীট থেকে। ওই অবস্থায় থেকেই নজর দিল সেডানের ভেতর। চারজন আরোহী, তিনজন বয়স্ক, আরেকজন তরুণ। ফেকাসে চেহারা। লম্বা নাক চেপে ধরেছে জানালার কাচে, বিকৃত হয়ে গেছে চেহারা। কিন্তু তা-সত্ত্বেও চিনতে পারল দুই গোয়েন্দা।
টেরিয়ার ডয়েল।
শুঁটকি! বোম ফাটল যেন মুসার কণ্ঠে। হারামী কোথাকার।...দাঁড়াও, আগে ধরি, তারপর... আস্তিন গোটানোর জন্যে হাত সরিয়ে আনতেই খামচে ধরল জানালার কিনার।
ঢালু হয়ে গেছে আবার পথ। ভ্যানের এক পাশে একশো ফুট গভীর খাদ, আরেক পাশে সেডান। সরে আসছে পাশে, ইঞ্চি ইঞ্চি করে ভ্যানটাকে সরিয়ে দিচ্ছে খাদের দিকে। ধাক্কাধাক্কি করে সেডানের শক্তিশালী এঞ্জিনের সঙ্গে পারা যাবে না, বুঝে গেছে হাইমাস। ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল, না, হবে না। না থামলে খাদে ফেলে দেবে।
ব্রেক কষল সে। থেমে গেল ভ্যান, ডান পাশের চাকা দুটো খাদের কিনার থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে। বাঁ পাশে ভ্যানের একেবারে গা ঘেষে দাঁড়াল সেডান। দরজা খোলার উপায় নেই। ডান পাশের দরজা খোলা যায়, কিন্তু লাভ কি? একশো ফুট নিচে তো লাফিয়ে নামতে পারবে না।
ওদের দিকে চেয়ে মসৃণ হাসি হাসল ফরাসী লোকটা, দাঁতে চেপে রেখেছে সাগর কলার মত মোটা এক সিগার। ওটা সরিয়ে শান্ত কণ্ঠে বলল, এই যে, হাইমাস, দেখা হয়েই গেল। যতখানি ভেবেছিলাম তত বড় নয় আমেরিকা।
কি চাই এনথনি? ভোঁস ভেঁস করে নিঃশ্বাস ফেলছে হাইমাস, ঘামছে দরদর করে। মেরেই ফেলেছিলে।
কি যে বলো। মারব কেন? খুব বাজে ড্রাইভ করো তুমি, মাতালে ওরকম করে। এক কাজ করো খাঁচাগুলো আমার গাড়িতে তুলে দাও। টমাস, যাও তো, ভ্যানের পেছনের দরজাটা খুলে দেবে ওরা। খাঁচাগুলো নিয়ে এসো, সহজ ভঙ্গিতে কথা বলছে সে। যে কোন ব্যাপারই না এসব।
যাচ্ছি, স্যার, মনিবের মত শান্ত নয় বেঁটে ড্রাইভার, গাড়ি চালাতে হয়েছে তো, তাই বোধহয় সামান্য হাঁপিয়ে পড়েছে।

লরা, দরজা খুলে দাও, হাইমাস বলল, আর কিছু করার নেই। বাধা দিলে খাদে ফেলে দেবে।
অনিচ্ছাভরে উঠল মিসেস হাইমাস, পেছনের দরজার হুক সরিয়ে ওপরের দিকে তুলে দিল দরজা।
দুই গোয়েন্দা দেখছে টেরিকে। খুব মজা পাচ্ছে সে। হাসছে দাঁত বের করে। জোরে ঠোঁট কামড়ে ধরল মুসা। পারছে না নামতে, নইলে হাসি বের করে দিত। টেরির দাঁত ফেলে দেয়ার জন্যে হাত নিশপিশ করছে তার।
ব্যাপারটা বুঝতে পারছে টেরি। মুসাকে আরও রাগিয়ে দেয়ার জন্যে ভেঙচি কাটল। হাহ, গোয়েন্দা। চোরের সঙ্গে গিয়ে হাত মিলিয়েছে।
অনেক কষ্টে চুপ রইল মুসা আর রবিন।
খাঁচাগুলো নামাচ্ছে টমাস, শব্দ শোনা যাচ্ছে।
বস, টমাসের গলা শোনা গেল, জায়গা হচ্ছে না সবগুলো। ছেলেটাকে নামিয়ে দিলে হবে।
এই ছেলে,শোঁপা বলল। নামমা তো।
নামব? হাসি হাসি ভাবটা চলে গেল টেরির। নামব কেন? আমিই তো দেখালাম।
দেখানো শেষ হয়েছে। এবার নামো।
তর্ক শুরু করল টেরি।
টমাস, বলল শোঁপা, ছুঁড়ে ফেলে দাও তো বেয়াদবটাকে।
কুৎসিত হাসি হেসে এগিয়ে এল টমাস। টেরির ঘাড় ধরে বেড়াল-ছানার মত টেনে বের করে ফেলে দিল রাস্তায়।
উঠে বসল টেরি। বোকা হয়ে গেছে, বিশ্বাস করতে পারছে না এই ব্যবহার করা হবে তার সঙ্গে। কিন্তু আমাকে পাঁচশো ডলার পুরস্কার দেবেন বলেছিলেন।
বিল পাঠিয়ে দিয়ো তোমার বাবার কাছে। অনেক বড়লোক, আমাদের হয়ে দিয়ে দেবে, ময়লা দাঁত বের করে হেসে চোখ টিপল টমাস। সব কটা খাঁচা গাড়িতে তুলল। বস, একটা কম। কালো পাখিটা নেই।
নেই? জানালা দিয়ে মুখ বের করল শেপা। হাইমাস? ব্ল্যাকবিয়ার্ড কোথায়? সাতটা পাখিই তো লাগবে।
ও, আমার ঘরে ঢুকেছিলে তুমিই? কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক হচ্ছে না হাইমাসের। জেনেছ সবাই। চোর কোথাকার।
ব্ল্যাকবিয়ার্ড কোথায়? হাসি সামান্যতম মলিন হলো না শোঁপার। সাতটাই লাগবে। উড়ে গেছে।
যাহ মিছে কথা বলছ। মুসা আর রবিনের দিকে তাকাল শোঁপা, শীতল চাহনি। তোমাদের কাছে আছে, না? খুব চালাক তোমরা।

নেই, চোখ সরিয়ে নিল রবিন। কোথায় আছে জানি না।
হাইমাসের পকেটের দিকে চোখ পড়ল শোঁপার। তাড়াহুড়ো করে রবিনের লেখা কাগজটা খুঁজে রেখেছিল হাইমাস, অনেকখানি বেরিয়ে আছে। শোঁপার দৃষ্টি অনুসরণ করে পকেটের দিকে চেয়েই সামান্য চমকে গেল সে। ঠিকই খেয়াল করল ধুরন্ধর চিত্র-চোর। হাত বাড়াল, দেখি কাগজটা? নইলে ধাক্কা দিয়ে গাড়ি খাদে ফেলে দেব।
মুসার হাতে কাগজটা দিল হাইমাস, মুসা দিল শেপাকে।
হুঁ, হাসিমুখে মাথা দোলাল শেপা, সাতটার মধ্যে তিনটে। বাকিগুলো কথা বলেনি, না? বলবে, বলবে। ব্ল্যাকবিয়ার্ডকে দরকার। দেখি পারলে খুঁজে নেব। চলি হাইমাস, লণ্ডনে দেখা হবে।
চলে গেল সেডানটা।
ছাই হয়ে গেছে হাইমাসের চেহারা। স্টিয়ারিং খামচে ধরে গুঙিয়ে উঠল সে, পরক্ষণেই দু-হাতে চেপে ধরল পেট.। উফফ…
কি হলো, হাইম? ভুরু কোঁচকালো মিসেস। খারাপ লাগছে?
ব্যথা।…বেড়েছে…
হ্যাঁচকা টানে দরজা খুলে নেমে এল মিসেস হাইমাস। মুসা আর রবিনকে নামতে বলল। হাইমাসকেও নামাল ধরে ধরে। নিজে উঠে বসল ড্রাইভিং সীটে। তার পাশে উঠল আবার হাইমাস। মুসা আর রবিন উঠল পেছনে।
তাদের দিকে ফিরে বলল মিসেস, বেশি উত্তেজনা। অ্যাসিডিটি বেড়ে যায় ওর, আলসার আছে। গাড়ি স্টার্ট দিল, এখন সোজা হাসপাতাল। পড়ে থাকবে কয়েকদিন। স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে খাদের ধার থেকে গাড়ি সরিয়ে আনতে আনতে বলল, কাউকে কিছু বোলো না। পুলিশকে বলে কিছু হবে না। এদেশে শেপার বিরুদ্ধে অভিযোগ নেই পুলিশের।…তবে, তোমাদের হাজার ডলার ঠিকই পাবে, যদি ছবিটা আমাকে দিতে পারো।
ব্রেক কষল মিসেস। সামনে দু-হাত তুলে দাঁড়িয়েছে টেরিয়ার। শুনুন। আমাকে ফেলে যাবেন না, প্লীজ।
কঠিন চোখে তাকাল মিসেস হাইমাস। কুঁকড়ে গেল টেরিয়ার।
যাও, ওঠো, কড়া গলায় বলল মিসেস।
গাড়িতে উঠল টেরিয়ার।
বলল, কি হয়েছিল, গাড়ি চালাতে চালাতে বলল মিসেস হাইমাস। শোঁপা খুঁজে পেল কি করে আমাদের? তুমি কিছু করেছ।
এই শুঁটকি, সরো, গন্ধ লাগে, ঝাল মেটানোর সুযোগ পেয়ে গেছে মুসা।
থাক, মুসা, বাধা দিল মিসেস। এই, তুমি বলো। চুপ করে আছো কেন?

রকি বীচের মেইন রোডে হাঁটছিলাম, মিনমিন করে বলল টেরিয়ার। হঠাৎ পাশে এসে থামল শেপার গাড়ি। জিজ্ঞেস করল, রোলস-রয়েস চড়ে এমন তিনটে ছেলেকে চিনি কিনা। বললাম, চিনি, আড়চোখে রবিন আর মুসার দিকে তাকাল, অস্বস্তি চাপা দিতে পারছে না। শোঁপা বলল, হলুদ ঝুঁটিওয়ালা কয়েকটা কাকাতুয়া খুঁজে বের করে দিতে পারব কিনা, ওগুলো নাকি তার, চুরি হয়েছে। প্রতিটি পাখির জন্যে দেড়শো ডলার করে দেবে। বললাম, পারব। আমাকে একটা ফোন নম্বর দিয়ে সে চলে গেল।
সে-রাতে এমনি ঘুরতে গিয়েছিলাম হলিউডে, কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করলাম। ওরা সবাই জানে কাকাতুয়ার কথা, খোজাখুঁজি করছে। আমিও যোগ দিলাম। একটা কাকাতুয়া কোথায় আছে, জেনে ফেললাম। গো... ইয়ে... গোয়েন্দাদের আগেই গিয়ে হাজির হলাম। নিয়ে গেলাম। ফোন করলাম শেপাকে। খুব খুশি হলো ও। তখন বলল, কিশোর গোয়েন্দারা নাকি কয়েকটা চোরকে সাহায্য করছে। ওদের পিছু নিতে বলল।
রোলস রয়েসের পিছু নিলাম। একটা পুরানো বাড়ির সামনে থামল গাড়িটা। কিছুক্ষণ পর দেখলাম, গোয়েন্দাদের না নিয়েই গাড়িটা চলে যাচ্ছে। একটু পর দুই গোয়েন্দা বেরোল আরেকটা কাকাতুয়া নিয়ে। তারপর আপনাদের ভ্যান এল, ওদের তুলে নিতে দেখলাম।
ভ্যানকে অনুসরণ করে দেখে এলাম কোথায় থামে। পাহাড়ের চিপা থেকে বেরিয়ে একটা ফোনবুদে গিয়ে আবার ফোন করলাম শেপাকে। ছুটে এল সে।
তারপর আর কি? তিক্ত কণ্ঠে বলল টেরিয়ার। বেঈমানী করল সে, পাঁচশো ডলার দিল না...
ঘাড়েও হাত দিল...আহারে! জিভ টাকরায় ঠেকিয়ে চুকচুক শব্দ করল মুসা।
থাক, মুসা, টেরিয়ারের করুণ দশায় দুঃখ হচ্ছে রবিনের। আর কিছু বোলো।।
একটা মোড়ে এসে গাড়ি রাখল মিসেস হাইমাস। টেরিয়ারকে বলল, আমরা এখন হাসপাতালে যাব। হেটে চলে যাও বাস স্টপেজে।
টেরিয়ার নেমে গেলে দুই গোয়েন্দাকে বলল মিসেস হাইমাস। হ্যাঁ, তোমরা কিন্তু খোজা বন্ধ কোরো না, হাজার ডলার পাবে।
হেডকোয়ার্টারে আলোচনায় বসেছে তিন গোয়েন্দা।
সারাদিন ইয়ার্ডে ব্যস্ত থেকেছে কিশোর, একা একা অনেক কাজ করেছে। রবিন আর মুসাকে আরেকটা বাস স্টপেজে নামিয়ে দিয়েছিল মিসেস হাইমাস। ওখান থেকে রকি বীচে ফিরে যার যার বাড়ি গিয়ে খেয়ে তারপর ইয়ার্ডে এসেছে।
তিনজনেই শ্রান্ত।

ওই রোলস-রয়েসই যত নষ্টের মূল, কথা শুরু করল কিশোর। ওটাই ফাঁস করে দিল দু-বার, চোরেরা আমাদের পিছু নিতে পারল। শিক্ষা হলো একটা। চট করে লোকের চোখে পড়ে এমন কোন কিছু ব্যবহার করা উচিত নয় গোয়েন্দাদের।
শুধু একথা বলার জন্যেই বসেছ? হাত ওল্টাল মুসা। সারাদিন কত কাণ্ড হলো। হাতে পেয়েও হারালাম কাকাতুয়াগুলো। কষ্ট করলাম আমরা, আর শুঁটকির বদৌলতে ওগুলো সব পেল শোঁপা।
কাকাতুয়াগুলোরও অনেক হয়রানি হচ্ছে, কিশোর বলল। আমার মনে হয়, এত সহজে শোঁপার কাছে মুখ খুলবে।
কিন্তু ও খোলাবেই, রবিন বলল। ও যে-রকম মানুষ দেখলাম, কাকাতুয়াও ওর কাছে মুখ না খুলে পারবে না।
পারলেও সময় লাগবে। তাতে কিছুটা সময় পাব আমরা।
কি হবে তাতে? মুসা জিজ্ঞেস করল। চারটে মেসেজ জানি আমরা, লাগবে সাতটা। বাকি তিনটে শেপার কাছ থেকে ছিনিয়ে আনবে নাকি?
না, তা আনতে পারব না, স্বীকার করল কিশোর। মিস্টার ফোর্ডের কাকাতুয়া এনে দিতে পারব না, মিসেস বোরোরটাও দিতে পারব না। ছবিটা খুঁজতে সাহায্য করতে পারব না মিসেস হাইমাসকে…।
এমনকি শুঁটকির লম্বা নাকটা ঘুসি মেরে ভোতাও করে দিতে পারব না, মুসার সব রাগ গিয়ে পড়েছে টেরিয়ারের ওপর, তার জন্যেই হাত থেকে ফসকে গেল পাখিগুলো। ব্যাটা পালিয়েছে, আসার সময় শুনলাম। কোন আত্মীয়ের বাড়ি নাকি বেড়াতে গেছে। মরুকগে, হারামজাদা।
কয়েক মিনিট নীরবতা। চুপচুপ নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর। অবশেষে মাথা ঝাকাল, হ্যাঁ, ভরসা কম।
আবার নীরবতা। ব্ল্যাকবিয়ার্ড দানা ঠুকরে খাচ্ছে, শুধু তার মৃদু খুটখুট আওয়াজ।
ক্যাপ্টেন কিড, শারলক হোমস আর রবিন হুডকে কথা বলাতে পারলে কিছু হয়তো করা যেত, বিড়বিড় করল রবিন।
রবিন হুড, খপ করে কথাটা ধরল ব্ল্যাকবিয়ার্ড। মাথা কাত করে তাকাল তিন গোয়েন্দার দিকে। ডানা ঝাপটাল। আয়্যাম রবিন হুড, স্পষ্ট উচ্চারণ। আই শট অ্যান অ্যারো অ্যাজ এ টেস্ট, আ হানড্রেড পেসেস শট ইট ওয়েস্ট।
ঝট করে মুখ তুলে তাকাল তিনজনেই।
শুনলে কি বলল? মুসার প্রশ্ন।
তোমার কি মনে হয়… কিশোরের দিকে চেয়ে থেমে গেল রবিন, ডোক গিলল।
চুপ, ফিসফিস করে বলল কিশোর। ওকে বাধা দিয়ো না। দেখি, আবার বলে নাকি? ময়নার দিকে চেয়ে জোরে বলল, হালো, রবিন হুড।

আয়্যাম রবিন হুড, আবার বলল ব্ল্যাকবিয়ার্ড আই শট অ্যান অ্যারো অ্যাজ এ টেস্ট আ হানড্রেড পেসেস শট ইট ওয়েস্ট, বলেই ডানা ঝাপটাল আবার।
হাঁ হয়ে গেছে মুসা।
কিশোরও অবাক। আস্তে বলল, মনে আছে, ডিয়েগো বলেছিল, ময়নাটা জন সিলভারের কাঁধে বসে থাকত? কাকাতুয়াগুলোকে যখন বুলি শেখাত তখনও।
হ্যাঁ, উত্তেজনায় কথা আটকে যাচ্ছে রবিনের। আরেকটা ব্যাপার সেদিন খেয়াল করিনি, ময়নাটা কিন্তু স্কারফেসের বুলি বলেছিল, আই নেভার গিভ আ সাকার অ্যান ইভন বেক...সত্যি, ময়নারা কাকাতুয়ার চেয়ে অনেক ভাল কথা শেখে কিশোর, অন্য দুটো...।
দেখি চেষ্টা করে, বেছে ভাল একটা সূর্যমুখীর বীচি নিয়ে ব্ল্যাকবিয়ার্ডের ঠোঁটের কাছে বাড়িয়ে ধরল কিশোর। ডাকল, হালো, শারলক হোমস। হালো, শারলক হোমস।
আগের বারের মতই সাড়া দিল ময়না। ডানা ঝাপটে বলল, ইউ নো মাই মেথডস, ওয়াটসন। থ্রি সেভেনস লীড টু থারটিন, কথায় কড়া ব্রিটিশ টান।
লিখে নাও, রবিন, নিচু গলায় বলল কিশোর। দরকার ছিল না, সে বলার আগেই লিখতে শুরু করেছে নথি-গবেষক।
ক্যাপ্টেন কিড, ময়নার ঠোঁটের ফাঁকে আরেকটা বীচি ধরিয়ে দিল কিশোর। হালো, ক্যাপ্টেন কিড।
আয়্যাম ক্যাপ্টেন কিড, জবাব দিল ময়না। লুক আনডার দা স্টোনস বিয় দা বোনস ফর দা বক্স দ্যাট হ্যাজ নো লকস।
খাইছে! কণ্ঠস্বর কিছুতেই দাবিয়ে রাখতে পারল না মুসা। এ-তো দেখি জ্যান্ত টেপ রেকর্ডার। সব মুখস্থ করে রেখেছে
আগেই আন্দাজ করা উচিত ছিল আমার, গম্ভীর হয়ে বলল কিশোর। ওই যখন, স্কারফেসের বুলি বলল...। ২ বলার নেশায় পেয়েছে যেন ব্ল্যাকবিয়ার্ডকে, স্কারফেসের নাম শুনেই চেঁচিয়ে উঠল, আই নেভার গিভ আ সাকার অ্যান ইভন ৰেক! অ্যাণ্ড দ্যাটস আ লেড পাইপ সিনশ। হা-হা-হা! টেনে টেনে হাসল সে, যেন এক মহা-রসিকতা করে ফেলেছে।
কাগজের ওপর পেন্সিলের তুফান চালাচ্ছে রবিন। লেখা শেষ করে পাতাটা বাড়িয়ে দিল কিশোরের দিকে। নাও, সাতটাই হয়ে গেল।
তা হলো, মাথা কাত করল মুসা। কিন্তু আরেকটা কাজ বাকি রয়ে গেল। খুব ছোট্ট সহজ একখানা কাজ।
কি? রবিন বলল।
মেসেজগুলোর মানে বের করা। খুবই সহজ, না?

লাইব্রেরির কাজে কিছুতেই মন বসাতে পারছে না রবিন। শেষে বই গোছানো বাদ দিয়ে কোডস অ্যাণ্ড সাইফারস নাম লেখা একটা বই তাক থেকে নিয়ে টেবিলে মেলে বসল। মাথায় ঘুরছে সাতটা মেসেজ। কিন্তু বইয়ের সাহায্য নিয়ে অনেক চেষ্টা করেও কিছু বুঝল না। বিরক্ত হয়ে রেখে দিল শেষে। আশা করল, এতক্ষণে হয়তো মানে বের করে ফেলেছে কিশোর।
ছুটির পর বাড়ি ফিরে কোনমতে নাকেমুখে কিছু খুঁজে দিয়ে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল আবার।
নিরাশ হলো হেডকোয়ার্টারে ফিরে। শূন্য চোখে তার দিকে তাকাল মুসা।
নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর। রবিনের জিজ্ঞাসু দৃষ্টির জবাবে বলল, কয়েকটা ব্যাপার মোটামুটি আন্দাজ করা যাচ্ছে, বাকি কিছুই বুঝছি না। এক নম্বর ধরো, বো-পীপ তার ভেড়া হারিয়েছে, তারমানে ছবিটা হারানোর কথা বলছে, মিসেস হাইমাসেরও তাই ধারণা।
সায় জানিয়ে মাথা ঝাকাল অন্য দুজন।
কিন্তু কল অন শারলক হোমসের মানে কি? প্রশ্ন করুল রবিন।
ডেকে আনা গেলে তো ভালই হত, মুসা বলল। ভদ্রলোকের সাহায্য এখন খুব দরকার আমাদের।
বুঝতে পারছি না, মুসার রসিকতায় কান দিল না কিশোর। পাঁচ নম্বরে আবার শারলক হোমসের কথা বলা হয়েছে : ইউ নো মাই মেথডস, থ্রি সেভেনস লীড় টু থারটিন..
মাথা কাত করল ব্ল্যাকবিয়ার্ড, বলে উঠল, থ্রি সেভার্স লীড টু থারটিন।
সেভারস? মুসা ধরল শব্দটা।
সেভেনসকেই ওরকম উচ্চারণ করে অনেক ইংরেজ, বলল রবিন। তারপর, বলল, কিশোর?
দুই নম্বরে বিলি শেকসপীয়ার যা বলছে, বলল কিশোর, কিছুই বুঝতে পারছি।
তিন নম্বরে, রবিন বলল, মনে হয় কোন জলদস্যুর দ্বীপের কথা বোঝননা হয়েছে।
একটা ম্যাপ খুলল কিশোর। এই যে, এটা লোয়ার ক্যালিফোর্নিয়া। ডিয়েগো বলেছে, তিনদিনের জন্যে চলে গিয়েছিল জন সিলভার।.হেঁটে গিয়েছিল, না কাউকে ধরে গাড়িতে করে গিয়েছিল, জানি না। ওই তিন দিনেই বাক্সটা লুকিয়ে রেখে ফিরে এসেছিল। ধরি, হেঁটেই গিয়েছিল, অন্তত যাওয়ার সময়। গাড়িতে উঠলে তার চেহারা, পোশাক আর হাতের বাক্স দেখে লোকের কৌতুহল হতে পারে, সেটা এড়ানোর জন্যে। কতদূর যেতে পারে? ক্যাটালিনা আইল্যাও? মেকসিকো? বড় জোর ডেথ ভ্যালি?

ডেথ ভ্যালি, চেঁচিয়ে উঠল মুসা। মানুষের হাড়ের অভাব নেই ওখানে। ওটাই। কিন্তু একটা ছবির জন্যে যাব ওখানে? দুদিনেই ওখানে আরও তিনটে কঙ্কাল বাড়বে।
সম্ভাবনার কথা বলছি, বলল কিশোর। ওখানেই আছে, বলিনি।
চার নম্বরে বলছে, রবিন বলল, একশো কদম পশ্চিমে। কোনও একটা নির্দিষ্ট জায়গা থেকে কোনদিকে কতখানি যেতে হবে।
তা-তো বুঝলাম, সঙ্গে সঙ্গে বলল মুসা। কিন্তু কোন জায়গা থেকে? হলিউড, নাকি ভাই? নাকি পুরো উত্তর আমেরিকা?
পাঁচ নম্বর বুঝতে পারছি না, এবারেও মুসার কথায় কান দিল না কিশোর। ছয় নম্বরে আবার দিক নির্দেশনা, এবং ঠিক কোন জায়গায় খুঁজতে হবে, বলছে।
কিন্তু আবার সেই পাথর আর হাড়ের কথা, গজগজ করুল মুসা।
ঘুরেফিরে সেই জলদস্যুর দ্বীপ, রবিন যোগ করল।
ক্যাটালিনা আইল্যাণ্ডে কখনও জলদস্যু ছিল বলে তো শুনিনি? আর, ওদিকে ওই একটা দ্বীপই আছে।
স্বর্ণ-সন্ধানের যুগে দলে দলে চোর-ডাকাত ওদিকে ছুটেছিল, মনে করিয়ে দিল কিশোর। ওদের কথাও বলে থাকতে পারে।
হ্যাঁ, তা পারে, মাথা দোলাল রবিন। এবার শেষ মেসেজটা, কি বলতে চায়? আমার মনে হয় কি জানো, এটাতেই রয়েছে জন সিলভারের প্রতিশোধ। হয়তো বলছে, সবগুলো মেসেজের মানে বের করার প্রও ছবিটা তুমি খুঁজে পাবে না।
তাহলে আর কষ্ট করে লাভ কি? হাত ঝাড়ল মুসা।
রহস্য ভালবাসে কিশোর। জটিল রহস্যের সমাধান করে আনন্দ পায়। কিন্তু গোলকধাধায় পথ হারাতে রাজি নয়। এই কেস যেন অনেকটা তাই, গোলকধাধায় ফেলে দিয়েছে তাকে, কিছুতেই কিছু করতে পারছে না। শোঁপারও অবস্থা হয়তো আমাদেরই মত, বলল সে। মাথা ঘুরছে। আমাদের তো তবু ব্ল্যাকবিয়ার্ড আছে, মেসেজ সব পেয়েছি, তার তো তা-ও নেই। তবে, চিত্র-চোর তো, কোড-ফোড নিশ্চয় আরও অনেক ভেদ করতে হয়েছে, অভ্যস্ত। হয়তো বুঝে ফেলবে। তার আগেই কিছু একটা করা দরকার আমাদের।
কিছুক্ষণ নীরবতা।
তারপর উঠে দাঁড়াল গোয়েন্দাপ্রধান, যাও, বাড়ি চলে যাও, বসে থেকে লাভ নেই। কিছু বুঝলে ফোন করে জানাব। তোমরাও বুঝলে জানিয়ো।
এত তাড়াতাড়ি ছেলেকে বাড়ি ফিরতে দেখে রবিন আর মুসা দু-জনেরই বাবামা অবাক হলেন।
পরদিন, সারাদিন ইয়ার্ডে কাজ করল কিশোর। খরিদ্দারদের জিনিসের দাম হিসেব করতে ভুল করল তিনবার।

গ্যারেজে নিজেদের গাড়ি পরিষ্কার করতে গিয়ে আরও ময়লা লাগাল মুসা।
লাইব্রেরিতে এক তাকের বই আরেক তাকে রাখল রবিন, এক বই এনে দিতে বললে ভুলে এনে দিল অন্য বই। অন্যমনস্ক। ব্যাপারটা বুঝলেন লাইব্রেরিয়ান, ছুটি দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন রবিনকে।
বাড়ি এসে সোজা বিছানায় গড়িয়ে পড়ল রবিন। চিত হয়ে বালিশে মাথা রেখে খোলা জানালা দিয়ে চেয়ে রইল সান্তা মনিকা পর্বত-চূড়ার ওপরে ভেসে যাওয়া মেঘের দিকে। সাতটা প্রশ্ন অস্থির করে তুলছে তাকে।
বাড়ি ফিরে ছেলের ভাবসাব দেখে অবাক হলেন মিস্টার মিলফোর্ড। কি রে, রবিন, কি হয়েছে? শরীর খারাপ?
বাবা, একটা জিনিস বুঝতে পারছি না, একটা ধাধা, উঠে বসল রবিন। ধরো, কেউ তোমাকে বলল, আহ্যাভ বারিড মাই ট্রেজার, হোয়্যার ডেড ম্যান গার্ড ইট এভার। কি বুঝবে?
ট্রেজার আইল্যাণ্ড, দাঁতের ফাঁক থেকে পাইপ সরিয়ে বললেন মিস্টার মিলফোর্ড। রবার্ট লুই স্টিভেনসনের সেই বিখ্যাত বই, জলদস্যুদের কাহিনী।
কিন্তু ধরো, যেখানকার কথা বলা হচ্ছে, তার ধারে-কাছে কোথাও কোন দ্বীপ নেই। তাহলে গুপ্তধন আর কোথায় লুকানো থাকতে পারে?
জোরে জোরে বার দুই পাইপ টানলেন বাবা, ধোঁয়া ছাড়লেন নাক দিয়ে, তারপর বললেন, তাহলে আর একটা জায়গার সঙ্গেই ওই বর্ণনা মেলে।
কোন জায়গা? লাফিয়ে বিছানা থেকে নামল রবিন। গোরস্থান, মিটিমিটি হাসছেন তিনি।
এত জোরে টেলিফোনের দিকে ছুটে গেল রবিন, আরেকটু হলে ধাক্কা দিয়ে বাবার হাত থেকে পাইপ ফেলে দিয়েছিল।
ছেলের কাণ্ড দেখে হেসে মাথা নাড়লেন মিস্টার মিলফোর্ড, হাত-মুখ ধোঁয়ার জন্যে বাথরুমে গিয়ে ঢুকলেন।
কিশোর, ওপাশ থেকে কথা শোনা যেতেই বলল রবিন, গোরস্থান! দ্বীপ বাদ দিলে আর একমাত্র ওখানেই মরা মানুষেরা গুপ্তধন পাহারা দিতে পারে।
দীর্ঘ এক মুহূর্ত নীরবতার পর শোনা গেল আবার কিশোর পাশার কণ্ঠ, রবিন, ফোনের কাছাকাছি থেকো। কোথাও বেরিয়ো না।
খাবার টেবিলে খাবারের দিকে মন দিতে পারল না রবিন, বার বার তাকাচ্ছে ফোনের দিকে। আধপ্লেট বাকি থাকতেই বাজল ফোন। দ্বিতীয় বার রিঙ হওয়ার আগেই রিসিভার তুলে নিল সে। বলো?
রবিন, কিশোরের উত্তেজিত গলা, লাল কুকুর চার! জলদি!

রিসিভার রেখে মা-বাবার দিকে তাকাল রবিন। আমার ফিরতে দেরি হবে: রাত দশটা…
কেউ মুখ খোলার আগেই ছুটে বেরিয়ে গেল সে।
ব্যাপার কি? জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার মিলফোর্ড। এত উত্তেজিত?
একটা হারানো কাকাতুয়া খুঁজছে, জানালেন মিসেস মিলফোর্ড, সেদিন বলেছিল আমাকে।
হারানো কাকাতুয়া? হাহ-হা, কফির কাপে চুমুক দিলেন মিস্টার মিলফোর্ড। কিন্তু গোরস্থানে কি করতে যাবে
চমকে উঠলেন মা। তাড়াতাড়ি দরজার দিকে ছুটলেন। কিন্তু রবিনকে দেখা গেল না। চলে গেছে।
প্রায় একই সময়ে লাল কুকুর চার-এর কাছে পৌঁছল রবিন আর মুসা। কোন কথা বলল না। গেট খুলে সাইকেল ভেতরে ঢুকিয়ে রেখে, জঞ্জালের তলা দিয়ে ক্রল করে এসে ঢুকল হেডকোয়ার্টারে।
ডেস্কের ওধারে মহাব্যস্ত কিশোর। এক গাদা বই, ম্যাপ, কাগজ ছড়িয়ে রয়েছে ডেস্কে। তার চেহারাই বলছে, সুসংবাদ আছে।
তাড়াতাড়ি করতে হবে আমাদের, বলল কিশোর। সে জন্যেই ডেকেছি।
মানে বুঝেছ? রবিন জিজ্ঞেস করল।
পুরোপুরি নয়। তবে কাজ শুরু করা যেতে পারে। তোমার গোরস্থান থেকেই সূত্রটা পেয়েছি।
আমার আইডিয়া নয়, বাবার, বলল রবিন, কিন্তু তার কথা কিশোরের কানে ঢুকল কিনা বোঝা গেল না। বইপত্র নিয়ে আবার ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। এক সময় মুখ তুলে বলল, কিছুদূর এগিয়েছি। সাত ভাগে মেসেজগুলোকে ভাগ করেছে জন সিলভার। পাখির কথা ভুলে গিয়ে শুধু এক দুই করেই চালিয়ে যাব।
যেভাবে খুশি চালাও, গুঙিয়ে উঠল মুসা। কিন্তু জলদি আসল কথা কিছু বলো।
তিনে বলেছে গোরস্থানে ছবিটা লুকিয়ে রেখেছে জন সিলভার। তারমানে, এক আর দুই আমাদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে সেখানে।
কিভাবে? রবিনের প্রশ্ন।
এক-এ বলা হয়েছে : লিটল বো-পীপ হ্যাজ লস্ট হার শীপ অ্যাণ্ড ডাজনট নো হোয়্যার টু ফাইণ্ড ইট। কল অন শারলক হোমস। অস্বাভাবিক কিছু লক্ষ করেছ?
শারলক হোমস মারা গেছে, এই তো? মুসা বলল।
বইয়ের চরিত্র শারলক হোমস, মরল না বাচল, কিছু এসে যায় না। সাহায্যের জন্যে তাকে ডাকতে পারছি না আমরা, বলল রবিন।

ঠিক, তর্জনী দিয়ে বাতাসে কোপ মারল কিশোর। তাই মেসেজে কল ইন শারলক হোমস না বলে বলা হয়েছে কল অন...মানে? তার বাড়ি গিয়ে দেখা করো। কোথায় বাড়ি শারলক হোমসের?
লণ্ডনে, জবাব দিল মুসা।
লণ্ডনে, বেকার স্ট্রীটে, বলল রবিন।
বেশ, কিশোর বলল, তাহলে তাকে খুঁজতে বেকার স্ট্রীটেই যেতে হবে আমাদের। দুইয়ে বলা হচ্ছে, টু-টু-টু বি আর নট টু-টু-টু বিকাকাতুয়া পাখি, তোতলায় না, তার জিভ আর কণ্ঠনালীর গঠনই এরকম, তোতলামি রোগই হয় না। তার মানে? ইচ্ছে করেই শেখানো হয়েছে, যেটা আগেই সন্দেহ করেছিলাম।
তাতে কি? মুসার জিজ্ঞাসা।
একটা কাগজে কিছু লিখল কিশোর। এই যে, দেখো, বাড়িয়ে দিল দুজনের দিকে।
লিখেছে : বেকার স্ট্রীট ২২২বি।
আরি! চমকে গেল মুসা। ঠিকানা!
গোরস্থানের? ভুরু কোঁচকাল রবিন।
ম্যাপের স্তুপ থেকে দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার পুরানো একটা ম্যাপ বের করল কিশোর। শত শত শহর রয়েছে দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ায়, একাধিক বেকার স্ট্রীট। তবে, কবরস্থানই পথ দেখিয়েছে। এই যে, লস অ্যাঞ্জেলেসের দক্ষিণে একটা শহর, মেরিটা ভ্যালি। আর এই যে বেকার স্ট্রীট, আর এটা ভ্যালি স্ট্রীট, আড়াআড়ি কেটেছে দুটো পথ, এক কোণায় আঙুল রাখল সে, এই যে, গোরস্থান। এটার কেয়ারটেকারের বাড়ির নম্বর, টু-টু-টু বি।
আরিসব্বোনাশ! জানলে কি করে? মুসা অবাক।
এই যে রেফারেন্স বইগুলো ঘেঁটে, ডেস্কে ছড়ানো বইগুলো দেখাল কিশোর। তাছাড়া টেলিফোন তো আছেই। গোরস্থানের ওপর লেখা একটা পুস্তিকা পেয়েছি, ট্যুরিস্টদের জন্যে ছাপা হয়েছে। শোনো, পুস্তিকা খুলে পড়তে শুরু করল, ক্যালিফোর্নিয়ার সব চেয়ে পুরানো কবরস্থানগুলোর অন্যতম মেরিটা ভ্যালির গোরস্থান। এখন অব্যবহৃত, অযত্নে পড়ে আছে। শোনা যাচ্ছে, শিগগিরই সংস্কার করে ঐতিহাসিক স্থান হিসেবে চিহ্নিত করা হবে। পুস্তিকাটা বন্ধ করল। স্যানটিনো আর ডিয়েগো যেখানে থাকে, সেখান থেকে জায়গাটা মাত্র তিরিশ মাইল দূরে। তিন। দিনে হেঁটে গিয়ে হেঁটে ফিরে আসা সম্ভব ছিল না অসুস্থ জন সিলভারের পক্ষেও।
বাকি মেসেজগুলো কি বলে? জিজ্ঞেস করল রবিন। বুঝেছ?
না, এখানে বসে বোঝা যাবে না। গোরস্থানে গিয়ে মেলাতে হবে।

চলো, কাল ভোরেই রওনা হয়ে যাই। রোলস-রয়েসের কথা বলে রাখতে হয়, বলল মুসা।
শোঁপা এতক্ষণে বুঝে ফেলেছে কিনা কে জানে, হাত ওল্টাল কিশোর। বুঝলে সময় নষ্ট করবে না। আমাদেরও করা উচিত হয়। সকাল হতে অনেক দেরি। বেলা আছে এখনও। তাড়াহুড়ো করলে আঁধার নামার আগেই ফিরে আসতে পারব। তবে সবাই এক সঙ্গে যেতে পারছি না…
কেন?
শোঁপা নিশ্চয় লোক লাগিয়ে রেখেছে, চোখ রেখেছে আমাদের ওপর। রোলস-রয়েসটা চোখে পড়বেই। আমাদের পিছু নেবে।
তাহলে?
কি কি করতে হবে, দ্রুত ব্যাখ্যা করল কিশোর। ক্ষীণ প্রতিবাদ জানাল রবিন, কিন্তু গোয়েন্দাপ্রধানের জোরাল যুক্তির কাছে টিকল না।
কয়েক মিনিট পর হাজির হলো রোলস-রয়েস।
ধীরেসুস্থে চড়ল তাতে তিন গোয়েন্দা, কেউ যদি চোখ রেখে থাকে, যেন সে ভালমত দেখতে পারে।
ছুটি শেষ হয়নি হ্যানসনের। আজও গাড়ি নিয়ে এসেছে ক্র্যাব। হলদে দাঁত বের করে হাসল। পাখি খুঁজে পেয়েছ এক-আধটা?
কয়েকটা, লোকটার কথার ধরন পছন্দ হলো না কিশোরের। একটাকে পুলিশেও খুঁজছে। চালান এখন। সামনের গেট দিয়ে বেরিয়ে ঘুরে পেছনের রাস্তায় চলে যান। রাস্তায় গিয়ে খুব ধীরে চালাবেন, থামবেন না।
পাত্তা না পেয়ে মুখ কালো করল ড্রাইভার। তবে যা বলা হলো করল।
গাড়ি পেছনের রাস্তায় আসতেই রবিনকে হেডকোয়ার্টারে থেকো বলে দরজা খুলে ডাইভ দিয়ে লাল কুকুর চারের কাছে নেমে পড়ল কিশোর। মুসাও নামল।
তারপর, মাস্টার মিলফোর্ড? মুখ গোমড়া করে বলল শোফার। কোথায় যাব? কাকাতুয়া ধরতে?
না, কিশোর আর মুসার সঙ্গে যেতে না পারার ক্ষোভ চাপতে পারছে না রবিন। উপকূল ধরে চালান আধঘণ্টা। তারপর পুবে মোড় নিয়ে কোন একটা গিরিপথের ভেতর দিয়ে ফিরে আসবেন এখানে।
কাঁকর বিছানো অসমতল পথে ঝাঁকুনি খেতে খেতে ছুটে চলেছে ইয়ার্ডের ছোট ট্রাক। চালাচ্ছে বোরিস। পাশে বসে পথের দিকে তাকিয়ে রয়েছে দুই গোয়েন্দা।
মাত্র কয়েক মিনিট আগে উঠে বসেছে। এতক্ষণ হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল মেঝেতে। ইয়ার্ডের দশ মাইল দূরে চলে এসেছে গাড়ি। এতদূরে নিশ্চয় আর কেউ নেই তাদের ওপর চোখ রাখার জন্যে।

কেউ পিছু নেয়নি আমাদের, এক সময় বলল বোরিস। কিন্তু ও-কি? ওটা শহর না ভূতের গী। আমাদের ব্যাভারিয়ায় ওরকম অনেক শহর আছে… ভূতের গল্প আরু করল সে।
এমনিতেই চলেছে গোরস্থানে। এসব ভূতের গল্প এখন মোটেই ভাল লাগছে না মুসার।
মেরিটা ভ্যালিতে পৌঁছতে এক ঘন্টা লাগল। ঠিকই বলেছে বোরিস, এটাকে শহর বলা চলে না। বাণিজ্য কেন্দ্রগুলো ফেলে এল পেছনে। ছাল চামড়া ওঠা, পুরানো বেকার স্ট্রীট ধরে এগিয়ে চলল। দুই ধারে একটা বাড়িও চোখে পড়ল না। পথের শেষ মাথায় পাথরের ছড়ানো দেয়াল। দেয়ালের ওপাশে পাথরের শত শত কুশ আর স্মৃতিস্তম্ভ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। মেরিটা ভ্যালির গোরস্থান।
হাত তুলে দেখাল মুসা। দেয়ালের এক জায়গায় ফাঁক, মানে দেয়াল নেই ওখানে। কাঠের একটা পুরানো সাইনবোর্ডে লেখা রয়েছে।
২২২বিবেকার স্ট্রীট।
এখানেই থামব? জিজ্ঞেস করল মুসা।
মাথা নাড়ল কিশোর। বোরিস, ডানে যান। পরের রাস্তাটায়।
হোকে, যাচ্ছি।
মস্ত কবরস্থান, অনেক পুরানো। দেয়ালের কোণের দিকে আসার পর চোখে পড়ল প্রাচীন গির্জার ধ্বংসাবশেষ, পাথর আর কাঁচা ইটে তৈরি। নির্জন, পরিত্যক্ত।
মোড় নিল বোরিস। এগোল আরও শ-খানেক গজ। কবরস্থান পেছনে ফেলে চলে এল ইউক্যালিপটাস গাছের বেশ বড়সড় একটা ঝাড়ের কাছে। পথের ওপর মাথা নুইয়ে আছে ডালপালা, বয়েসের ভারে বাঁকা হয়ে গেছে যেন কোমর। পাতার ঝঝাল তৈলাক্ত গন্ধ ভারি করে তুলছে বাতাস।
গাছের নিচে রাখুন, বোরিসকে বলল কিশোর।
নামল দুই গোয়েন্দা।
আমাদের দেরি হবে, বলল কিশোর, আপনি এখানে থাকুন।
হোকে। রেডিও অন করে দিয়ে একটা খবরের কাগজ টেনে নিল বোরিস।
এবার কি? জিজ্ঞেস করল মুসা।
নীরবে একটা ফাঁকা মাঠ দেখাল কিশোর, কোণাকুণি গিয়ে মিশেছে গোরস্থানের দেয়ালের সঙ্গে। কেউ না দেখে ফেলে আবার। ভেতরে কেউ থাকতেও পারে।
নিঃশব্দে দেয়াল টপকাল দুজনে।
নেই কেউ, বলল মুসা, তবে থাকলে ভাল হত। বড় বেশি নির্জন। ভয় লাগছে।
জবাব দিল না কিশোর। অনেক দিনের অব্যবহৃত একটা পথ ধরে এগিয়ে চলল। দু-ধারে অসংখ্য ছোটবড় স্মৃতিস্তম্ভ আর ক্রুশ, কোনটা আস্ত কোনটা ভাঙা,

কোনটা হেলে রয়েছে বিষণ্ন ভঙ্গিতে।
পথ চিনে রাখো, মুসা, অন্ধকার হলেও যেন ফিরে যাওয়া যায়। তুমিই পারবে, আমাকে দিয়ে হবে না।...এহহে, যাহ, টর্চ আনতে ভুলে গেছি।
মরেছি! অন্ধকারে? কুকুরছানার মত কেউ করে উঠল মুসা। দরকার কি এতক্ষণ থাকার? হালকা এক ঝলক ধোঁয়ার মত কিছু উড়ে গেল ওদের সামনে দিয়ে। আরে? আবার কুয়াশা।
পশ্চিমে তাকাল কিশোর, প্রশান্ত মহাসাগরের অসীম বিস্তার যেন পড়ে পড়ে ঘুমাচ্ছে। হ্যাঁ, ঠিকই আন্দাজ করেছে মুসা। পানির ওপরে চাপ চাপ ধোঁয়ার মেঘ ভাসছে, বাতাসে দুলে ধীরে ধীরে সরে আসছে এদিকেই।
এরকম হয় দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ায়। কোন আভাস না দিয়েই হঠাৎ করে কুয়াশা জমতে শুরু করে সাগরের ওপর, ধেয়ে আসে উপকূলে, দিনের বেলায়ও তখন কয়েক হাত দূরের জিনিস দেখা যায় না।
দিল বোধহয় সর্বনাশ করে, কিশোরের কণ্ঠে শঙ্কার ছায়া, মুখ গম্ভীর।
অন্ধকারের চেয়েও খারাপ। এসে পড়ার আগেই যদি ছবিটা খুঁজে পেতাম।...ওই যে, রাস্তাটা।
লম্বা লম্বা পায়ে হেঁটে চলল কিশোর। দুটো বড় স্মৃতিস্তম্ভের মাঝ দিয়ে এসে থামল অনেকগুলো পথের একটা সঙ্গমস্থলে। পথের শাখাপ্রশাখা এখান থেকে বেরিয়ে আলের মত ছড়িয়ে গেছে বিশাল গোরস্থানের ভেতরে ভেতরে। জায়গাটা ২২২ বি লেখা সাইনবোর্ডের কাছেই।
এবার? অস্বস্তি লাগছে মুসার।
পকেট থেকে নোট লেখা কাগজ বের করল কিশোর। টু টু টু বি বেকার স্ট্রীটে এলাম। চার নম্বর মেসেজ বলছে, একশো কদম পশ্চিমে যাও। গেটের মুখ উত্তর দিকে...তাহলে, এই যে, এদিকে...
কি?
একশো কদম মানে একশো গজ, বিড়বিড় করল কিশোর। জন সিলভারের কথা মোতাবেক এখান থেকে একশো গজ পশ্চিমে যেতে হবে আমাদের। মুসা, শুরু করো। তোমার পা লম্বা, বড়দের সমান হবে।
এক...দুই...তিন করে গুণে গুণে পা ফেলতে শুরু করল মুসা। তার পেছনে রইল কিশোর।
এক জায়গায় চল্লিশ ফুট দূরের দেয়ালের সঙ্গে সমান্তরাল হয়ে চলে গেছে একটা পথ, ওটা ধরেই এগোচ্ছে এখন।
একশো গুণে থামল মুসা। এবার?
পাঁচ নম্বর বলছে, ইউ নো মাই মেথডস, ওয়াটসন। থ্রি সেভেনস লীড টু থারটিন।

মাথা লিখেছে, রাগ করে বলল মুসা।
চিন্তিত চোখে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে কিশোর। হঠাৎ বলল, মুসা, তোমার কদম কি পুরো এক গজ?
কি জানি। মেপে তে দেখিনি।
তাহলে মেপে দেখা যাক। পকেট থেকে একটা প্লাসটিকের টুকরো বের করল কিশোর, একটা তিন বছরের পকেট ক্যালেণ্ডার। এক ধারে চার ইঞ্চি লম্বা স্কেল রয়েছে। মুসার ছড়ানো কদম মেপে দেখল। হুমম। তিরিশ ইঞ্চি। একশো কদমে কম হয়েছে পঞ্চাশ ফুট। হাঁটো। আরও বিশ কদম।
একেবারে পেছনের দেয়ালের কাছে চলে এল ওরা। কিন্তু দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত পাথর বা কোন কিছু নেই।
দেখো, হাত তুলে উল্টোদিকে খানিক দূরের তিনটে পাথরের ফলক দেখাল মুসা। পাশাপাশি তিনটে কবরের মাথার কাছে গাথা। তিনটে ফলকে তিনটে নাম হিউগো সেভার্ন, পিটার সেভার্ন, মরিস সেভার্ন। ১৮৮৮ সালের একটা তারিখ লেখা রয়েছে নিচে, একই দিনে তিনজনে পীতজ্বরে মারা গেছে।
সেভার্ন। চেঁচিয়ে উঠল মুসা, সেদিনই ধরেছিলাম। রবিন উড়িয়ে দিল ইংরেজদের কথার টনি বলে। থ্রি সেভার্নস লীড টু থারটিন।
হ্যাঁ, সেভার্নরা রয়েছে এখানে। কিন্তু তেরোর কাছে নিয়ে যাবে কিভাবে? দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরল কিশোর।
পাথরগুলো রয়েছে এক সারিতে, বুদ্ধি খুলে যাচ্ছে মুসার, এক লাইন। লাইনটা ধরে ডানে-বাঁয়ে যে কোন একদিকে হাঁটি।...ইয়াল্লা, কিশোর, জলদি, করো। কুয়াশা এসে পড়ছে।
পাক খেয়ে খেয়ে এগিয়ে আসছে হালকা কুয়াশা, এটা সামনের স্তর, ঘিরে ধরল দুই গোয়েন্দাকে। হাহাকার করে গেল বাতাস, যেন অশরীরী কোন প্রেতের বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস। শিউরে উঠল মুসা। ককিয়ে বলল, কিশোর, জলদি করো, প্লীজ!
বিষণ্ন পরিবেশকে আরও বিষণ্ন করে তুলছে বিচ্ছিরি কুয়াশা, কিন্তু কিশোরের ভাবান্তর নেই। গালে টোকা দিচ্ছে, তাকাচ্ছে আশেপাশে। হুঁ!, লাইনটা গিয়ে শেষ হয়েছে ওই পাথরটায়। চলো তো দেখি।
আরেকটা প্রস্তরফলক। এপাশে কিছুই লেখা নেই। ঘুরে ওপাশে আসতেই দেখতে পেল ওরা, লেখা রয়েছে :
চিরনিদ্রায় ঘুমিয়ে আছে এখানে
তেরোজন অচেনা ভ্রমণকারী

ইণ্ডিয়ানরা খুন করেছে এদের সবাইকে।
জুন ১৭, ১৮৭৬
থারটিন! ফিসফিস করল মুসা, জোরে বলতে ভয় পাচ্ছে, যেন ঘুম ভেঙে যাবে তেরোজন হতভাগ্য মানুষের। তিন সেভার্ন নিয়ে এল তেরোর কাছে।
ছয় নম্বর বলছে, কিশোর বলল, লুক আনডার দা স্টোনস বিয়ণ্ড দা বোনস ফর দা বক্স দ্যাট হ্যাজ নো লকস।
কিন্তু কোন পাথরটা? এখানে তো পাথরে বোঝাই।
মেসেজ বলছে, বিয়ণ্ডা দা বোনস, বাঁকা চোখে কয়েকটা পাথরের দিকে তাকাল কিশোর। দূর, কুয়াশা এসেই পড়ল দেখি।...ওই যে, দেয়ালের ধারের ওই মনুমেন্টের কাছে, পাথর পড়ে আছে কতগুলো...কোনকালে পড়েছিল কে জানে, ঠিক করেনি আর।...আচ্ছা, তেরোজনের হাড়গোড়কে বোনস ধরে নিলে ওগুলোকেই স্টোনস বোঝায়, আশেপাশে আর যা আছে, একটা করে পাথর, সুপ নেই...।
কিশোরের কথা শেষ হওয়ার আগেই ছুটে গেল মুসা। দু-হাতে পাথর সরাতে শুরু করল। মুখ না তুলে বলল, কিশোর, হাত লাগাও। কুয়াশার আগেই শেষ করতে হবে।
কাজে এতই মগ্ন রয়েছে ওরা, পেছনে পদশব্দ শুনতে পেল না।
বাহ, খুব কাজের ছেলে, বলে উঠল কেউ।
কানের কাছে যেন বাজ পড়েছে, এত জোরে চমকে উঠল দুজনে।
ঘনায়মান কুয়াশার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে তিনটে মূর্তি, একজন শোঁপা, কোন সন্দেহ নেই, পাশের দুজনকেও চেনে, একজনের নাম জানে, টমাস, আরেকজনের জানে না।
তোমাদের কাজ শেষ, কাছে এসে হাসল শোঁপা। আর কষ্টের দরকার নেই। এবার আমরাই পারব। টমাস, ধরো ওদের।
মনে মনে, এক সঙ্গে একই সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেল দুই গোয়েন্দা। লাফিয়ে উঠে দুজন ছুটল দুদিকে। কিন্তু পারল না। ধরা পড়ে গেল।
টমাস, তুমি ধরে রাখো, আদেশ দিল শোঁপা। ডিংকি, পাথর সরাও।
মুসার হাত মুচড়ে ধরল টমাস, পিস্তল বের করে পিঠে ঠেকাল। কিশোরকে বলল, চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। নাকি বন্ধুর পিঠ ফুটো করাতে চাও?
ঠাণ্ডা, ভেজা গুড় দিয়ে ওদেরকে পেঁচিয়ে নিচ্ছে যেন ঘন কুয়াশা।
দ্রুত হাত চালাচ্ছে ডিংকি, লুকানো হাড় খুঁজছে যেন ক্ষুধার্ত কুকুর। ছোটবড় পাথর, টালি আর কাঁচা ইটের টুকরো ছুঁড়ে ফেলছে চারপাশে, একটা ভাঙা ডাল

ছুঁড়ে ফেলল, একটা পুরানো পাইপ ফেলল, কাছেই দাঁড়িয়ে থাকা টমাস আর ছেলেদের গায়েও এসে পড়ছে কিছু।
এই, দেখেটেখে ফেলো, বলল টমাস। লাগে।
হ্যাঁ, এত তাড়াহুড়ো কি? বলল শোঁপা। আরও আস্তে সরাও না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখছে দুই গোয়েন্দা। তেতো হয়ে গেছে মন। এত কষ্টের পর লাভটা কি হলো? ওরা ছবি বের করে দিল, মজা লুটবে এখন ওই বিদেশী চোর।
মন খারাপ লাগছে? শান্তকণ্ঠে বলল শোঁপা। জানো, দুনিয়ার অনেক জায়গায় গিয়েছি আমি, অনেক মিউজিয়ম থেকে ছবি চুরি করেছি, অনেক উঁদরেল পুলিশ আর গার্ডকে বোকা বানিয়ে এসেছি, নিজেকে খুব চালাক ভাবতাম। কিন্তু না বলে পারছি না, তোমরা আমার মত লোককেও বহুত নাকানি-চুবানি খাইয়েছ। ওই গাড়ি বদলানোর বুদ্ধিটা তো রীতিমত...কি বলব? হতবাক করে দিয়েছে আমাকে। কুয়াশায় ভিজে নিভে যাওয়া সিগারেট আবার ধরিয়ে নিয়ে হাসল। কুয়াশার মধ্যে জ্বলন্ত লাইটার হাতে কালো আলখেল্লা পরা মূর্তিটাকে ঠিক মানুষ মনে হচ্ছে না এখন, কবর থেকে উঠে এসেছে যেন, ভূত। আন্দাজ ঠিকই করেছিলে তোমরা, তোমাদের ওপর চোখ রাখতে বলেছিলাম। রেখেছিলও। রোলস-রয়েসটাকে অনুসরণ করেছিল। বিশ মিনিট পর ওটার পাশ কাটিয়ে আসার সময় দেখল ভেতরে মাত্র একটা ছেলে। ফোনে জানাল আমাকে। প্রথমে বুঝতেই পারিনি, ঘটনাটা কি ঘটেছে। অনেক ভাবার পর..নাহ, ইয়াং ম্যান, তোমরা প্রতিভাবান। আমার ভক্তি এসে গেছে। আমি চোর, ঠিক, কিন্তু এনথনি শোঁপার শ্রদ্ধা পেতে হলে... জোরে জোরে কয়েকবার টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল সে, কিন্তু কুয়াশার জন্যে দেখা গেল না ধোঁয়া, এক রঙ হয়ে গেছে।
পাথর সরিয়েই চলেছে ডিংকি।
জন সিলভারের কয়েকটা মেসেজ বুঝেছি তাড়াতাড়িই, আবার বলল শোঁপা। তবে এই কবরখানার কথা ভাবিনি প্রথমে। তাড়াহুড়ো ছিল। ম্যাপ-ট্যাপ নিয়ে বসতে পারলে অবশ্য বুঝে যেতাম। শেষে টুরিস্ট ব্যুরোকে ফোন করে জিজ্ঞেস করলাম, আশেপাশে নির্জন পোড়ো জায়গা কোথায় কোথায় রয়েছে। মেরিটা ভ্যালির কথা ওরাই জানাল।
টমের পায়ে এসে পড়ল মাঝারি সাইজের একটা পাথর। গাল দিয়ে উঠল সে। ধমক দিয়ে বলল, এই, দেখে ফেলতে পারো না?
দেখেই ফেলো, ডিংকি, নরম গলায় বলল শোঁপা। পাথর হাড্ডিতে পড়লে ব্যথা লাগে।
বড় চ্যাপ্টামত একটা পাথর সরিয়েই অস্ফুট শব্দ করে উঠল ডিংকি। টেনে পাথরের তলা থেকে বের করে আনল জিনিসটা। এই যে নিন, মিস্টার শোঁপা,

আপনার বাক্স।
বাহ! এগিয়ে গিয়ে বাক্সটা নিল শোঁপা। পাশে চোদ্দ ইঞ্চি, লম্বায় তার প্রায় দ্বিগুণ। ছোট শক্ত একটা তালা লাগানো রয়েছে কড়ায়। হ্যাঁ, সাইজ ঠিকই আছে। ভেরি গুড, ডিংকি।
ওটাই, বাংলায় বলল কিশোর, বিষণ্ন কণ্ঠ।
মুসা বুঝল। কিশোরের কাছে বাংলা মোটামুটি শিখে নিয়েছে সে আর রবিন।
পকেট থেকে খুব শক্তিশালী ঘোট একজোড়া কাটার বের করল শেপী, এক চাপেই কট করে কেটে ফেলল ধাতব আঙটা।
বাজে অবস্থা, কুয়াশার দিকে চেয়ে বলল শোঁপা। তবে মনে হয় না ছবিটার কোন ক্ষতি হবে। ভাল ছবি ভাল রঙ দিয়েই আঁকা হয়। এক পলক দেখি, নিজেকেই বোঝাচ্ছে সে, আসলে লোভ সামলাতে পারছে না।
সাবধানে ডালা তুলে ভেতরে চেয়েই চেঁচিয়ে উঠল রাগে। লাফ দিয়ে তার, পাশে এসে দাঁড়াল ডিংকি। ছেলেদের দিকে মনোযোগ হারিয়েছে টমাসও, গলা বাড়িয়ে উঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করল বাক্সের ভেতর কি আছে।
এক টুকরো কাগজ রয়েছে শুধু বাক্সের ভেতরে। বের করে জোরে জোরে পড়ল শোঁপা, সরি, বন্ধু, মেসেজের মানে ঠিকমত বোঝনি।
কিশোর, ফিসফিস করে বাংলায় বলল মুসা, এই-ই সুযোগ, বলেই ঝাড়া মারল। বাক্সের ভেতর কি আছে দেখার জন্যে ঢিল দিয়েছিল টমাস, ঢিলই রয়ে গেছে আঙুল, ফলে ছুটিয়ে নিতে পারল মুসা। একই সঙ্গে ডাইভ দিয়ে পড়ল সামনে। ছো মেরে তুলে নিল পায়ের কাছে পড়ে থাকা পুরানো পাইপটা। গুলি করবে কিনা দ্বিধা করছে টমাস, সুযোগটা কাজে লাগাল মুসা। এক বাড়ি দিয়ে ফেলে দিল পিস্তল। পরক্ষণেই গায়ের জোরে বাড়ি মারল টমাসের মাথা সই করে।
চট করে সরিয়ে নিয়ে মাথা কোনমতে বাঁচাতে পারল টমাস, কিন্তু কাঁধ বাঁচাতে পারল না। আঁউউ করে উঠে কাঁধ চেপে ধরে বসে পড়ল। দাঁড়িয়েই আছে কিশোর। এসব বিশেষ মুহূর্তে তার পেশী যেন জড় হয়ে যায়, নড়তে চায় না। এক হাতে পাইপ, আরেক হাতে কিশোরের কজি চেপে ধরে টান মারল মুসা। দৌড়ে গিয়ে ঢুকে গেল ঘন কুয়াশার মধ্যে। সামনে খানিকটা জায়গায় কুয়াশা যেন জট বেঁধে কালো হয়ে গেছে, আসলে ইউক্যালিপটাসের একটা ঝাড়। কিশোরকে নিয়ে ছুটে ওটার ভেতরে ঢুকে পড়ল মুসা।
ট্রাকটা ওদিকে, ফিসফিস করে বলল মুসা, হাত তুলে একটা দিক দেখাল। কিছুই চোখে পড়ল না কিশোরের। কোনটা যে কোন দিক, মুসা কি করে খেয়াল রেখেছে, সে-ই জানে। কিশোরের কাছে সব দিক একই রকম লাগছে।
কি করে বুঝলে? জিজ্ঞেস করল কিশোর।

বুঝেছি, শুধু বলল মুসা।
বিশ্বাস করল কিশোর। দিকচিহ্ন খুঁজে বের করার ব্যাপারে ওস্তাদ তার সহকারী। রাতের বেলায়ও এমন সব জায়গায় পথ খুঁজে বের করে ফেলে মুসা, কিশোর যেখানে দিনেই হারিয়ে যায়।
শোননা, দ্রুত বলল মুসা, দেয়ালের ধার ধরে যাও, মাঝে মাঝেই ইউক্যালিপটাসের ঝাড় পাবে। আমরা যেখান দিয়ে ঢুকেছিলাম সেই ফাঁকটার কাছে চলে যেতে পারবে। ঝড়ের ভেতরে ভেতরে চলে যাও!
পারব না, অনিশ্চিত শোনাল গোয়েন্দাপ্রধানের কণ্ঠ, হারিয়ে যাব।
হারাবে না...ওই যে, ব্যাটারা আসছে, ওদের ভুল পথে তুলে দিয়ে আসিগে। গাছের দিকে চোখ রাখবে। আশ্চর্যবোধক আর তীর চিহ্ন এঁকে এঁকে যাব। অসুবিধে হবে না তোমার। যাও।
কাঁধ চেপে ধরে ঝটকা দিয়ে বন্ধুকে ঘুরিয়ে সামনে ঠেলে দিল মুসা। তারপর আরেক দিকে ঘুরে লোকগুলোকে শুনিয়ে জোরে জোরে বলল, এই কিশোর, এই যে এদিকে, এসো।
হই-চই শোনা গেল তিনজন মানুষের।
আবার শোনা গেল মুসার কথা। সরে যাচ্ছে। দূর থেকে দূরে লোকগুলোকে সরিয়ে নিয়ে চলল সে।
অন্ধের মত ছুটছে কিশোর। ভাঙা কুশ, শুভ আর পাথরে হোঁচট খেলো, হুমড়ি খেয়ে পড়ল কয়েকবার। কনুই আর হাঁটুর চামড়া ছিলল কয়েক জায়গায়। এক ঝাড় থেকে বেরিয়ে অনেক কষ্টে খুঁজে পেল আরেকটা ঝাড়।
কুয়াশা এখানে সামান্য হালকা, যেন পানির নিচে রয়েছে সে। কয়েক ফুটের বেশি নজর চলে না। কুয়াশা আসছে...আসছেই ঢেউয়ের মত একনাগাড়ে। গাঢ় হচ্ছে ধূসর রঙ। ওপর দিকে কুয়াশা অনেক পাতলা, তার মধ্যে দিয়ে কোণাকুণি দৃষ্টি চলে অনেক দূর। প্রায় চল্লিশ ফুট দূরে একটা গাছের মাথা আবছামত দেখতে পেল কিশোর। দৌড় দিল সেদিকে।
তিন দিকে ছড়িয়ে পড়েছে তিনজন মানুষের কণ্ঠস্বর, পথ হারিয়েছে মনে হচ্ছে। মুসার কোন সাড়াশব্দ নেই, কোথায় রয়েছে বোঝা যাচ্ছে না।
গাছের কাছে এসে থামল কিশোর। কুয়াশা এখানে খুবই পাতলা। গাছের গায়ে নীল চকে আঁকা আশ্চর্যবোধকটা স্পষ্ট। তীর চিহ্ন বয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত করছে।
ছুটল কিশোর।
আরেকটা ঝাড়ের কাছে চলে এল। আশ্চর্যবোধক আর তীর চিহ্ন আঁকা আছে আমি টিকা দিপে ধরল

গাছের গায়ে। কি ভাবে যেন কিশোরের আগে চলে গেছে মুসা। পেছনে একজন লোকের চিৎকার শোনা গেল, কোন কিছুতে হোঁচট খেয়ে পড়ে ব্যথা পেয়েছে। অন্য দুজনের গলাও শোনা যাচ্ছে, সরে যাচ্ছে দূরে।
কিশোর যেখানে রয়েছে, সেখানেও ঘন হতে শুরু করেছে কুয়াশা। ভীষণ এক দুঃস্বপ্নে রয়েছে যেন সে, কিংবা কোন প্রেতপুরীতে। গাছের ডালপাতাগুলোকে মনে হচ্ছে কোন পিশাচের বাহু, ধারাল নখ দিয়ে খামচে ধরতে আসছে তাকে। অতি সাধারণ স্তম্ভগুলোও ভয়াবহ ভূতুড়ে রূপ নিয়ে পথ রোধ করতে চাইছে তার। ছোটার সময় কয়বার যে বাড়ি খেয়েছে, কপাল ফুলে গেছে, ব্যথা করছে বুকের একপাশ। কিন্তু সেসব খেয়াল করার সময় এখন নেই।
ছুটে চলেছে কিশোর। যখন মনে করল, দেয়ালের ফাঁকের আর দেখা পাবে না, ঠিক সেই সময়ই দেখতে পেল দেয়ালটা। কুয়াশার মধ্যে দিয়ে শুধু ওপরের অংশ দেখা যাচ্ছে, কালো মোটা রেখার মত।
দেয়ালের ওপর প্রায় হুমড়ি খেয়ে এসে পড়ল কিশোর। মোটা রেখাটা ধরার জন্যে হাত বাড়াল ওপরে।
কে যেন চেপে ধরল কব্জি, জীবন্ত আরেকটা হাত।
ঝটকা দিয়ে ছাড়িয়ে নিতে যাচ্ছিল কিশোর, ফিসফিসিয়ে বলল মূসা, কিশোর, আমি।
বন্ধুর গলা এত মধুর আর কখনও মনে হয়নি কিশোরের। টেনে তাকে দেয়ালের ওপর তুলে নিল মুসা।...
দুজনে লাফিয়ে নামল ওপাশে।
হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল মুসা। নতুন অভিজ্ঞতা হচ্ছে আজ গোয়েন্দাপ্রধানের। কোন ব্যাপারে কারও ওপর এতখানি নির্ভরও আর কখনও করেনি।
ঘন কুয়াশার ভেতরে দেখা যাচ্ছে হলুদ দুটো ঘোলাটে আলো, যেন কোন দানবের চোখ। ট্রাকের হেডলাইট।
হাঁপাতে হাঁপাতে ট্রাকের কাছে এসে থামল দুই কিশোর।
তোমরা হোকে? পাশে এলিয়ে পড়া দুই গোয়েন্দাকে জিজ্ঞেস করল বোরিস।
হ্যাঁ হ্যাঁ, হোকে, দম নিয়ে সারতে পারছে না কিশোর, ফেটে যাবে যেন ফুসফুস। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, আর আলসেমি নয়, কাল থেকেই সকালে উঠে মুসার সঙ্গে ব্যায়াম শুরু করবে সে। আরিব্বাপরে বাপ, দৌড়ানো এত কষ্ট! বাড়ি যান। হারামি এই কুয়াশার ভেতর থেকে বেরোন।
সাবধানে এগিয়ে চলল বোরিস। পুবে। পাতলা হতে হতে এক সময় পেছনে পড়ে গেল কিশোরের হারামি কুয়াশা।
ট্রাক ছুটছে।

অনেকক্ষণ কোন কথা বলতে পারল না ছেলেরা।
একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত, অবশেষে বলল কিশোর। হারামী হোক আর যাই হোক, কুয়াশা আমাদের বাঁচিয়ে দিয়েছে। পিছু নিতে পারেনি শেপার দল।
কেন পিছু নেবে? মুসা বলল। ছবিটা পাইনি আমরা।
ওদের ধারণা, পেয়েছি, নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে শুরু করল কিশোর। খুব একচোট দেখিয়েছে জন সিলভার। সাংঘাতিক রসিকতা। এত কষ্টের পর পাওয়া গেল খালি বাক্স, তার ওপর আবার একটা নোট।
জাহান্নামে যাক ব্যাটারা, কিশোরের কথায় বিশেষ কান নেই মুসার। এখন আসুক। বোরিস আছে আমাদের সঙ্গে। পিটিয়ে তক্তা করে দেব। হাতের পাইপটা দেখাল সে। এখনও রয়েছে ওটা তার হাতে, ফেলেনি এত কিছুর পরও। তার কারণ, এটা একটা অস্ত্র। টমাসের বাচ্চাকে যদি আরেকটা খিচতে পারতাম! দাতে দাঁত চাপল সে।
যা একখান খিচেছ সেটাই জিন্দিগিভর মনে রাখবে, মাথায় লাগলে মরেই যেত, বলল কিশোর। দারুণ দেখিয়েছ আজ তুমি, মুসা। আমিও অনেকদিন মনে রাখব।
অবাক হলো মুসা, খুশিও। কিশোর পাশা প্রশংসা করছে। যে শুধু লোকের দোষ ছাড়া আর কিছু দেখে না (মুসার ধারণা) যাক, আজ তাহলে দেখিয়ে দিতে পেরেছে গোয়েন্দাপ্রধানকে, সুযোগ পেলে সে-ও মনে রাখার মত কিছু করতে পারে।
মেসেজের মানে তো বের করলাম, বলল কিশোর। বাক্সটাও পেলাম। কিন্তু ছবি কই?
বলেছেই তো : আই নেভার গিভ আ সাকার অ্যান ইভন ব্রেক, মনে করিয়ে দিল মুসা। হাইমাসের ওপর প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে।
হয়তো, ভাবনায় ডুবে গেল কিশোর।
সারা পথে আর কোন কথা হলো না। কিশোর ভাবতেই থাকল, মুসাও বাধা দিল না।
রকি বীচে ঢোকার আগে খানিক দুর হালকা কুয়াশার ভেতর দিয়ে আসতে হয়েছে। ছড়িয়ে পড়েছে কুয়াশা। মেরিটা ভ্যালির গোরস্থানে এখন কি অবস্থা ভাবতেই রোম খাড়া হয়ে গেল মুসার।
জোর বাতাস বইতে শুরু করল, দ্রুত দক্ষিণে সরে গেল কুয়াশা।
নিরাপদেই স্যালভিজ ইয়ার্ডে ঢুকল ট্রাক।
চলে হেডকোয়ার্টারে, মুসাকে বলল কিশোর। রবিন নিশ্চয় বসে আছে।

অধীর হয়ে আছে রবিন। বসতে পারছে না। খালি ছটফট করছে, পায়চারি করছে ট্রেলারের ছোট্ট পরিসরে।
দুজনকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠল সে, পেয়েছ?
কিন্তু বন্ধুদের মুখ দেখেই প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেল রবিন। কারও হাতেই বাক্স নেই, মুসার হাতে শুধু পাইপটা। অস্ত্র অনুমান করতে কষ্ট হলো না রবিনের, মারপিট করে এসেছে মুসা।
শোঁপা ধরে ফেলেছিল, ধপাস করে গিয়ে নিজের চেয়ারে গড়িয়ে পড়ল কিশোর।
তবে ছবিটা সে-ও পায়নি, যোগ করল মুসা। নিজের সীটে বসল। বাক্সটা পাওয়া গেছে, ভেতরে শুধু একটা নোট। তাতে লেখা, মেসেজটার মানে নাকি ঠিকমত করতে পারিনি।
তাই? বলল রবিন। অবাক কাণ্ড! জন সিলভার শুধুই রসিকতা করল? খালি খাটানোর জন্যে? নো রেজাল্ট?
আমার তা মনে হয় না, চেহারা বিকৃত করে রেখেছে কিশোর। তাহলে অন্য কিছু লিখত। মেসেজটার মানে ঠিকমত করা হয়নি, একথা লিখত না।
আগেই বলেছিলাম... বলা আর হলো না, ফোন বেজে উঠল।
পরস্পরের দিকে তাকাল ওরা। কে? এখন তো কারও ফোন করার কথা নয়।
হবে হয়তো মিসেস হাইমাস, বলতে বলতে রিসিভার তুলে নিল কিশোর, স্পীকারের সুইচ অন করে দিয়ে বলল, হালো, তিন গোয়েন্দা।
কংগ্রাচুলেশনস, ইয়াং ডিটেকটিভস, শুকনো হাসির সঙ্গে বলল একটা খনখনে কণ্ঠ, কথায় কড়া ফরাসী টান।
কার গলা ঠিকই বুঝতে পেরেছে কিশোর, তবু জিজ্ঞেস করল, কে বলছেন?
এত তাড়াতাড়িই ভুলে গেলে? এই তো খানিক আগে মেরিটা ভ্যালির গোরস্থানে দেখা হয়েছিল। তোমাদের সঙ্গে কয়েকটা কথা বলার লোভ সামলাতে পারলাম না। জন সিলভার খুব বোকা বানিয়েছে আমাকে। আর ঘোরাঘুরি করে কি লাভ? আমি পরাজিত, হতাশা ঢাকতে পারল না এনথনি শোঁপা।
চুপ করে রইল কিশোর।
এয়ারপোর্ট থেকে বলছি, আবার বলল শোঁপা। চলে যাচ্ছি আমি। পুলিশকে জানাতে পারো, লাভ হবে না। ওরা ধরতে পারবে না আমাকে। কেন ফোন করেছি জানো? আরেকবার তোমাদের প্রশংসা করতে। হাইমাসকে বলবে, আমি তার শুভকামনা করছি।
থ্যাংক ইউ, শুধু বলল কিশোর।
আমাকে টেক্কা দিয়েছ তোমরা, আবার বলল শেপা, আজতক আর একজন কি দুজন সেটা পেরেছে। দাওয়াত দিয়ে রাখছি। যদি কখনও ইউরোপে বেড়াতে

আসসা, খুঁজে বের কোরো আমাকে। ইচ্ছে করলে সেটাও পারবে তোমরা, আমি জানি। ফ্রান্সের অপরাধ জগত ঘুরিয়ে দেখাব তোমাদের। কত রহস্য, কত রোমাঞ্চ আর উত্তেজনা যে লুকিয়ে আছে সেখানে, কল্পনাও করতে পারবে না। আরেকটা কথা, হয়তো ভাববে চোরের উপদেশ কি শুনব? তবু বলছি, মানুষের কল্যাণে লাগিয়ে তোমাদের মেধা, মানুষের উপকার কোরো, আমার মত চোর হয়ো না। তোমাদের ওপর হয়তো অনেক অন্যায় করেছি, কষ্টও দিয়েছি, মাপ কোরো।

কি যে বলেন, এতই অবাক হয়েছে কিশোর, মিটমিট করছে চোখের পাতা।

কিশোর, আবার বলল শোঁপা, লেকচারের মত শোনাচ্ছে কথাগুলো, তবু বলছি, তোমার দেশ, বাংলাদেশে গিয়েছিলাম একবার। আহা, কি যে কষ্ট ওখানকার মানুষের। চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। বড় হয়ে তোমার দেশে চলে যেয়ো, যদি কোনভাবে পারো, সাহায্য কোরো দেশের মানুষকে..ওরা সত্যি বড় অসহায়...

জোরে জোরে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর, কি যেন মনে পড়ি পড়ি করেও পড়ছে না। কিন্তু মনে পড়ে গেল হঠাৎ। মশিয়ে শোঁপা, আপনি সেই লোক নন তো? ফ্রান্সের গরীব-দুঃখীরা যাকে আধুনিক রবিন হুড বলে?

ও হ্যাঁ, আরেকটা কথা, কিশোরের প্রশ্ন এড়িয়ে গেল শোঁপা, কাকাতুয়াগুলো ওশেন স্ট্রীটের একটা গ্যারেজ আছে, ঠিকানাটা লিখে নাও চট করে...

দ্রুত লিখে নিল রবিন।

অউ রিভোয়া, মাই বয়েজ, বলল শোঁপা, অ্যাণ্ড এগেন কংগ্রাচুলেশনস।

কেটে গেল লাইন।

অদ্ভুত একটা পরিবেশ সৃষ্টি হলো হেডকোয়ার্টারে। অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা, বলতে পারল না। যেন অতি পরিচিত একজন বন্ধু চলে গেল ওদের।

কে ওই আধুনিক রবিন হুড? জিজ্ঞেস করল মুসা।

আমিও শুনেছি ওর নাম, বলল রবিন। দুর্দান্ত এক দস্যু। সেই প্রাচীন কথাটা—ধনীর যম, গরীবের বন্ধু...।

আমি পাল্টে দিচ্ছি কথাটা, কিশোর বলল। উৎপীড়কের যম, উৎপীড়িতের বন্ধু... দুনিয়ার সব ধনীরাই খারাপ নয়...যাই হোক, আমাদের আসল আলোচনা থেকে অনেক দূরে সরে গেলাম।

হ্যাঁ, ছবিটা কোথায় থাকতে পারে? পাইপ দিয়ে হাতের তালুতে আস্তে বাড়ি দিল মুসা। আরে অমন করে চেয়ে আছো কেন আমার দিকে...

ছয় নম্বর মেসেজে কি বলা হয়েছে? নিঃশ্বাস ভারি হয়ে আসছে কিশোরের।

লুক আণ্ডার দা স্টোনস বিয়ণ্ড দা বোনস ফর দা বক্স দ্যাট হ্যাজ নো লকস, জবাব দিল রবিন।
কিন্তু মূসা, কিশোর বলল, ডিংকি যে বাক্সটা পেয়েছে, ওটাতে তালা লাগানো ছিল। অথচ মেসেজে পরিষ্কার বলছে, ছবি যেটাতে থাকবে তাতে কোন তালা থাকবে না।
ঠিক! চেঁচিয়ে উঠল মুসা, আরেকবার পাইপ দিয়ে বাড়ি দিল হাতের তালুতে। আরেকটা বাক্স আছে…না। আর থাকতে পারে না। খুব ভালমত খুঁড়েছে ডিংকি।
কিন্তু এমন যদি হয়? হাতের তালুতে খুঁতনি রাখল কিশোর। ঘোট অন্য কোন ধরনের বাক্স? যেটাকে বাক্স মনে হবে না? আচ্ছা, সাত নম্বরে কি লিখেছে?
আই নেভার গিভ আ সাকার অ্যান ইভন ব্রেক, বলল মুসা। স্কারফেসকে ওকথাই বলতে শুনেছি, না রবিন?
হ্যাঁ, রবিন মাথা ঝাকাল। তবে তার সঙ্গে ব্ল্যাকবিয়ার্ড যযাগ করেছে, অ্যাণ্ড দ্যাটস আ লেড পাইপ সিশ। এটাও আরেকটা পুরানো স্যাঙ।
তাই? আপনমনে বলল কিশোর। প্রথম স্ল্যাঙে দৃষ্টি দূরে সরানো হয়েছে, তার পরেরটায় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, তাই তো বোঝায়? নাকি?
দূর! ঠকাস করে পাইপটা টেবিলে নামিয়ে রাখল মুসা। মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে আমার।
মুসা, পাইপটা কোথায় পেয়েছ? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
কেন জানো না? মুসা অবাক। গোরস্থানে। ডিংকি তুলে ছুঁড়ে ফেলেছিল।
ঝট করে পাইপটার দিকে চোখ চলে গেল রবিনের।
খাঁচার ভেতরে অযথাই ডানা ঝাপটাল একবার ব্ল্যাকবিয়ার্ড।
এটা দিয়েই খিচেছিলাম জনাব টমাস মিয়াকে, হেসে রবিনকে বলল মুসা।
ওই একই জায়গায় পাওয়া গেছে, যেখানে বাক্সটা পাওয়া গেছে, মুসার কথা কানেই ঢুকছে না যেন কিশোরের।
এবং এটা সীসার পাইপ, যোগ করল রবিন।
চোখ বড় বড় হয়ে যাচ্ছে মুসার।
এবং রবিনের কথার সঙ্গে যোগ করল কিশোর, সীসার পাইপ আজকাল খুব রেয়ার, কেউ ব্যবহার করে না। মাথায় দেখো, ক্যাপ লাগান রয়েছে। ভেতরের জিনিস সহজে নষ্ট হবে না।
তালাও নেই, থাবা দিয়ে পাইপটা তুলে নিল মুসা। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খুলতে শুরু করল ক্যাপ। এই প্রথম খেয়াল করল, পাইপটা চোদ্দ ইঞ্চির মত লম্বা।
ক্যাপটা টেবিলে রেখে পাইপের ভেতরে আঙুল ঢুকিয়ে দিল মুসা। টেনে বের করে.আনল গোল করে পাকান এক টুকরো ক্যানভাস।

খুলে টেবিলে বিছাল।
হাঁ হয়ে গেল তিন গোয়েন্দা।
চোদ্দ বাই চব্বিশ ইঞ্চি ক্যানভাসের টুকরো। তাতে আঁকা রয়েছে অপরূপ সুন্দরী এক কিশোরী, মধ্যযুগীয় মেষপালিকার পোশাক পরনে, এক মেষশিশুর ভাঙা পায়ের পরিচর্যা করছে। ছবি সম্পর্কে তেমন কোন ধারণা নেই ওদের, তবু স্বীকার করে পারল না, অপূর্ব! দক্ষ শিল্পীর তুলির ছোঁয়ায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে, যেন এখুনি ভেড়ার বাচ্চা কোলে তুলে নিয়ে নাচতে নাচতে চলে যাবে মেয়েটা।
মাস্টারপীস, কোন সন্দেহ নেই।
রামধনুর এক টুকরো, বিড়বিড় করল কিশোর, এক পাত্র সোনা। ঠিকই বলেছে জন সিলভার। এত অল্প কথায় এর চেয়ে ভাল বর্ণনা আর হয় না।
ঘুম পাতলা হয়ে এসেছিল বোধহয় ময়নার, জন সিলভার নামটা কানে যেতেই ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়াল। বার দুই ডানা ঝাপটে বলল, আমি জন সিলভার। কি সুন্দর ছবি, আহা! খুক খুক করে কাশল কয়েকবার, যেন ভারি হয়ে কফ জড়িয়ে গেছে গলায়। তারপর আবার ঠোঁট জল পালকের তলায়, ঘুমিয়ে গেল।
তিন গোয়েন্দার মনে হলো, ব্ল্যাকবিয়ার্ড নয়, কথাগুলো বলল স্বয়ং জন সিলভার।
দুই দিন পর। বিখ্যাত চিত্রপরিচালক মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফারের অফিসে ঢুকল তিন গোয়েন্দা।
খবরের কাগজ পড়ছেন পরিচালক। ইঙ্গিতে ছেলেদেরকে চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে আবার পড়ায় মন দিলেন।
পড়া শেষ হলে কাগজটা ভাঁজ করে রেখে দিলেন। হু। পত্রিকার খবর হয়ে গেছ দেখছি। ছবিও ছাপা হয়েছে।
ফাইলটা পরিচালকের দিকে ঠেলে দিল রবিন।
টেনে নিয়ে খুললেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। পাতা উল্টে চললেন একের পর এক।
ঘরে পিনপতন নীরবতা। অপেক্ষা করে আছে ছেলেরা।
ফাইল পড়া শেষ করলেন পরিচালক। ঘড়ি দেখলেন। আজকে সময় খুব কম। জরুরী কাজ আছে। সংক্ষেপে কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দাও তো। কাকাতুয়াগুলো কি করেছ?
বিলি শেকসপীয়ার আর লিটল বোপীপকে যার যার মালিকের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছি, জবাব দিল কিশোর। অন্যগুলোর তো মালিক নেই, হাইমাসের স্ত্রীকে নিতে বলেছি, রাজি হয়নি। ভাবছি মিস কারমাইকেলের পাখির আশ্রমেই দিয়ে আসব।

হ্যাঁ, সেই ভাল হবে, একমত হলেন পরিচালক। তা হাইমাসের খবর কি? তার অসুখ?
পুরোপুরি ভাল হয়নি এখনও, রবিন বলল। আরও কয়েক দিন লাগবে।
মিসেস হাইমাস তোমাদের এক হাজার ডলার দিয়েছে?
দুই হাজার দিয়েছে। এত দামী ছবি খুঁজে পাওয়ার খুশিতে আত্মহারা মহিলা, বলল কিশোর।
খুব ভাল। অনেক টাকা। আচ্ছা, ডিয়েগো আর তার চাচার কি খবর?
দুই হাজার ডলারই মিস্টার স্যানটিনোকে দিয়ে দিয়েছি আমরা, বলল কিশোর। টাকাটা তো আসলে তারই প্রাপ্য। জন সিলভারকে আশ্রয় দিয়েছিল, খাইয়েছিল। কবর দিয়েছিল। এই কেসে যে আনন্দ আমরা পেয়েছি, আমরা তাতেই খুশি।
এক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন পরিচালক। মনে মনে বোধহয় প্রশংসা করছেন। ছেলেদের। স্যানটিনো কোথায়?
মেকসিকো চলে গেছে, বাড়িতে। অনেক টাকা পেয়েছে, ওখানে গিয়ে ফুলের বাগান করতে পারবে। কাশির চিকিৎসাও করাতে পারবে, বলল কিশোর।
আর ডিয়েগো?
ও-তো মহাখুশি, স্যার, বলে উঠল মুসা। অটো কোম্পানিতে গিয়েছিলাম আমরা তিনজনে। ম্যানেজারকে অনুরোধ করতেই রাজি হয়ে গেল। ডিয়েগোকে অ্যাপ্রেনটিস হিসেবে নিয়ে নিয়েছে। মনের মত কাজ পেয়ে ডিয়েগো খুশির ঠেলায় রোজ দশবার করে ফোন করে আমাদের।
ভাল হয়েছে। গাড়ির জগতে যুগান্তকারী কিছু করে বসলেও অবাক হব না। মেধা আছে।..ততা, কিছু খাবে? আইসক্রীম…
না, আপনার তাড়া আছে বললেন, তাড়াতাড়ি হাত তুলল কিশোর। আরেকদিন। আজ যাই।
ঠিক আছে, এসো। গুড বাই, ইন্টারকমের সুইচ টিপলেন তিনি, সেক্রেটারিকে জরুরী নির্দেশ দেয়ার জন্যে।
দরজার কাজে চলে এসেছে তিন গোয়েন্দা, পেছন থেকে ডাকলেন পরিচালক, কিশোর?
ফিরে তাকাল তিনজনেই।
এনথনি শোঁপাই ফ্রান্সের আধুনিক রবিন হুড, বললেন তিনি। মহাপুরুষ হওয়ার মত অনেক গুণ আছে তার। তার উপদেশ মনে রেখো।
রাখব, স্যার, একই সঙ্গে মাথা কাত করল তিন গোয়েন্দা।

ভলিউম ৩ – ছুটি – তিন গোয়েন্দা – রকিব হাসান – সেবা প্রকাশনী

বড় ম্যাপটা ভাঁজ করে পকেটে রাখতে রাখতে বলল কিশোর পাশা, হ্যাঁ, যা চাই সবই আছে। বিশাল প্রান্তর, জলাভূমি, পাহাড়, জঙ্গল, মাঝে মাঝে ছোট খামার, বাড়ি-ঘর। কয়েকটা সরাইখানাও আছে। কাঁচা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাব আমরা। রাফিয়ানের খুব মজা হবে।

ওর তো পোয়াবারো, বলল পাশে বসা মুসা আমান। শুনেছি, অনেক খরগোশ আছে ওদিকে। হলিও।

খোলা জানালা দিয়ে হু-হু করে বাতাস আসছে, কোঁকড়া লম্বা চুল উড়ছে কিশোরের। বার বার এসে পড়ছে কপালে, চোখেমুখে, সরাতে হচ্ছে। মুসার সে ঝামেলা নেই, খাটো করে ছাটা চুল, খুলি কামড়ে রয়েছে যেন।

গাঁয়ের দিকে ছুটে চলেছে বাস।

স্কুল পালিয়েছ বুঝি? টিকিট বাড়িয়ে দিয়ে হাসল কণ্ডাকটার।

হ্যাঁ, তা বলতে পারেন, মাথা কাত করল মুসা। শহরের গ্যাঞ্জাম আর ভাল্লাগছিল না, স্কুলও ছুটি। পালিয়ে এসেছি।

শেষ স্টপেজে থামল বাস। আর সামনে যাবে না। বাস বদলাতে হবে।

সামনের দরজা দিয়ে নামল কিশোর আর মুসা। পেছনের দরজা দিয়ে রবিন, জিনা আর রাফিয়ান।

বদলানো বাসের যাত্রাও শেষ হলো। কিশোরকে বলল কণ্ডাকটার, শেষ। এবার ফিরে যাব।...তা কোথায় যাবে তোমরা? টিংকার ভিলেজ?

নামল পাঁচ অভিযাত্রী।

ছড়ানো সবুজ মাঠ, ছোট্ট পুকুরে হাঁস, মেঘের ছায়া।

আনন্যে পাগল হয়ে উঠল রাফিয়ান। চার বন্ধুকে ঘিরে নাচানাচি করছে, ছুটে গিয়ে এক দৌড়ে ফিরে আসছে আবার। লাফাচ্ছে। ঘেউ ঘেউ করছে হাঁসের দিকে চেয়ে। ঘাত ঘ্যাঁত করে তাকে ধমক দিল মস্ত এক রাজহাঁস।

খাবার-টাবার কিছু কিনে নেয়া দরকার, বলল কিশোর।

একটা দোকান দেখিয়ে জিনা বলল, চলো না, গিয়ে দেখি, কি পাওয়া যায়।

আরে, আরে! ভেতরের আরেকটা ঘর থেকে দরজায় বেরিয়ে এসেছেন এক মহিলা, দোকানের মালিক, কুত্তাটাকে ঢুকিয়েছ কেন? আরে কেমন লাফাচ্ছে। পাগলা নাকি? বের করো, বের করো।

না না, পাগল না, হেসে বলল জিনা। বেশি খুশি। খাওয়ার গন্ধ পেয়েছে তো।

অ। তাই বলো। তা কিছু মনে কোরো না। খাবারের দোকান, পরিষ্কার রাখি। ওটাকে বাইরে রেখে এসো, প্লীজ।

এই রাফি, আয়, কুকুরটার গলার বেল্ট ধরে টেনে নিয়ে চলল কিশোর। তুই বাইরেই থাক। আমরাই আনতে পারব সব।
কাউন্টারের পেছনে একটা তাক দেখিয়ে বলল মুসা, বাহ, দারুণ তো দেখতে। টেস্টও খুব ভাল হবে মনে হচ্ছে।
হ্যাঁ, ভাল, বললেন মহিলা। আমি বানিয়েছি। আমার ছেলে স্যাণ্ডউইচ খুব পছন্দ করে। এই তো, আসার সময় হয়ে এল তার। গ্রীন ফার্মে কাজ করে।
আমাদের কয়েকটা বানিয়ে দিতে পারবেন? জিজ্ঞেস করল কিশোর। চিনি না জানি না, কোথায় আবার কোন গাঁয়ে গিয়ে খুঁজব। লাঞ্চের ব্যবস্থা সঙ্গেই নিয়ে যেতে চাই।
হ্যাঁ, তা পারব। কি কি নেবে? পনির, ডিম, শুয়োর, গরু?
শুয়োর বাদে আর সবই দিন। চারটে কোক দেবেন?
নাও না, নিয়ে খাও, বললেন মহিলা। ওই যে গেলাস।
আচ্ছা। আর হ্যাঁ, ভাল পাউরুটিও দেবেন।
খারাপ জিনিস আমি বানাই না। তোমরা কোক খাও। কেউ এলে ডেকো। ভেতরের ঘরে চলে গেলেন আবার মহিলা।
ভালই হলো, বন্ধুদের দিকে ফিরে বলল কিশোর। খাওয়ার ভাবনা না থাকলে নিশ্চিন্তে ঘুরতে পারব। আজ একদিনেই অনেক জায়গা দেখা হয়ে যাবে।
কতগুলো লাগবে? হঠাৎ দরজায় দেখা দিলেন মহিলা। আমার ছেলে এক বেলায়ই ছটা স্যাণ্ডউইচ খেয়ে ফেলে। বারো টুকরো রুটি লাগে বানাতে।
অ্যাঁ...আমাদের একেকজনের জন্যে আর্টটা করে বানান, মহিলার চোখ বড় বড় করে দিল কিশোর। পাচ-আটে চল্লিশটা। সারা দিন চলে যাবে আমাদের।
মাথা ঝাঁকিয়ে আবার অদৃশ্য হয়ে গেলেন মহিলা।
ভারি কাজ দিয়ে ফেলেছি, সহানুভূতির সুরে বলল রবিন। মাকে বেশি খাটতে দেখলে কষ্ট লাগে তার, নিজেও গিয়ে সাহায্য করে। আটটা স্যাণ্ডউইচ তারমানে যোলোটা করে রুটির টুকরো, পাঁচ-যোলো আশি.নাহ, ভাবতেই খারাপ লাগছে, রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকতে ইচ্ছে হলো তার। কিন্তু মহিলা আবার কিছু মনে করে বসেন। ভেবে গেল না।
আরে অত ভেব না, প্রথমে এক চুমুকে আধ গেলাস কোকাকোলা খালি করেছে মুসা, আরেক চুমুকে বাকিটা শেষ করে ঠকাস করে গেলাস নামিয়ে রাখল টেবিলে। দেখো, কে আসছে।
দরজার বাইরে সাইকেল থেকে নামল লম্বা এক লোক, হ্যাণ্ডেল ধরে রেখেই ডাকল, মা?

কে লোকটা, চিনিয়ে দিতে হলো না। ওরা বুঝল, মহিলার ছেলে, যে গ্রীন ফার্মে কাজ করে। খেতে এসেছে।
আপনার মা ভেতরে, বলল মুসা। ডাকব?
থাক। সাইকেল রেখে ভেতরে ঢুকল লোকটা, তাক থেকে স্যাণ্ডউইচগুলো একটা প্যাকেটে নিয়ে আবার রওনা দিল। দরজার কাছে গিয়ে চেয়ে বলল, মাকে বোলো, আমি নিয়ে গেছি। তাড়াহুড়ো আছে। ফিরতেও দেরি হবে। কিছু জিনিস। নিয়ে যেতে হবে জেলে।
জোরে জোরে প্যাডাল ঘুরিয়ে চলে গেল লোকটা।
হঠাৎ দরজায় উদয় হলেন আবার মহিলা, হাতে ইয়া বড় এক রুটি কাটার ছুরি। আরেক হাতে রুটি। ডিকের গলা শুনলাম...ও-মা, স্যাণ্ডউইচও নিয়ে গেছে। ডাকোনি কেন?
তাড়াহুড়ো আছে বলল, জানাল কিশোর। ফিরতেও নাকি দেরি হবে আজ। কি নাকি নিয়ে যেতে হবে জেলে। আমার আরেক ছেলে আছে জেলখানায়।
মহিলার কথায় এক সঙ্গে তার দিকে ঘুরে গেল চার জোড়া চোখ। জেলখানায়? কয়েদী? কোন জেলে?
ওদের মনের কথা বুঝে হাসলেন মহিলা। না না, রিক কয়েদী নয়। ওয়ারডার। খুব ভাল ছেলে আমার। ওর চাকরিটা আমার মোটেই ভাল্লাগে না। চোর-ডাকাতের সঙ্গে বাস, কখন কি হয়!
হ্যাঁ, ম্যাপে দেখলাম, বলল কিশোর। বড় একটা জেলখানা আছে এদিকে। আমরা ওটার ধারে-কাছেও যাব না।
না, যেয়ো না, মহিলাও হুশিয়ার করলেন, ঢুকে গেলেন ভেতরে।
দাঁড়িয়ে আছে ছেলেরা। অনেকক্ষণ। মাত্র একজন খরিদ্দারের দেখা পেল। বিষণ্ন চেহারার এক বৃদ্ধ, পাইপ টানতে টানতে ঢুকল। দোকানের চারদিকে তাকিয়ে মহিলাকে খুঁজল। তারপর এক প্যাকেট পাউডার নিয়ে পকেটে ঢোকাল। কিশোর লক্ষ করল, পাউডারটা পাচড়ার ওষুধ।
পকেট থেকে পয়সা বের করে কাউন্টারে ফেলল লোকটা। পাইপ দাঁতে কামড়ে ধরে রেখেই বলল, মহিলাকে বোলো, নিয়ে গেলাম, বেরিয়ে গেল সে। –
লোকটার গায়ে-কাপড়ে দুর্গন্ধ, কদিন গোসল করে না, কাপড় ধোয় না কে জানে। বুড়োর ভাবভঙ্গি আর গন্ধ কোনটাই পছন্দ হলো না রাফিয়ানের, চাপা গোঁ গো করে উঠল।
অবশেষে স্যাণ্ডউইচ তৈরি শেষ হলো। বেরিয়ে এলেন মহিলা। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। সুন্দর করে প্যাকেট করে দিলেন সব খাবার, প্রতিটি প্যাকেটের ওপর পেনসিল দিয়ে লিখে দিলেন কোনটাতে কি আছে। পড়ে, অন্যদের দিকে চেয়ে

চোখ টিপল মুসা, ঝকঝকে সাদা দাঁত আর একটাও লুকিয়ে নেই, বেরিয়ে পড়েছে। হাসিতে। খাইছে! আল্লাহরে, নিশ্চয় কোন পুণ্য করে ফেলেছিলাম। এত খাবার?… আরে, ওটাতে কি?
ফ্রুট কেক, হেসে বললেন মহিলা। বেশি নেই, চার টুকরো ছিল। দিয়ে দিলাম। ফাউ। পয়সা লাগবে না। খেয়ে ভাল লাগলে ফেরার পথে জানিয়ে যেয়ো।
অনেক চাপাচাপি করেও কেকগুলোর জন্যে পয়সা দিতে পারল না কিশোর। কাউন্টারের দিকে চোখ পড়তেই বললেন, পয়সা এল কোত্থেকে?
বলল কিশোর।
ও, রিকেট বুড়ো, মাথা দোলালেন মহিলা। ঠিক আছে, তোমাদের যাত্রা শুভ হোক। ফেরার পথে দেখা করে যেয়ো। আর, খাবারের দরকার পড়লেই চলে এসো এখানে।
ঘাউ! মহিলার কথা বুঝেই যেন সায় জানিয়ে মাথা ঝাঁকাল রাফিয়ান, দরজার বাইরে থেকে।
ও, তুই। ভুলেই গিয়েছিলাম। রান্নাঘর থেকে বেশ বড় এক টুকরো হাড় এনে ছুঁড়ে দিলেন কুকুরটার দিকে।
মাটিতে আর পড়তে পারল না। শূন্যেই লুফে নিল রাফিয়ান।
মহিলাকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এল ওরা।
আহ, ছুটির কি আনন্দ! অনেক পেছনে ফেলে এসেছে স্কুল। অক্টোবরের রোদে উষ্ণ আমেজ। শরতের রঙে রঙিন হয়ে উঠেছে প্রকৃতি, গাছে গাছে হলুদ, লাল, সোনালি রঙের সমারোহ। রোদে যেন জ্বলছে। জোরে বাতাস লাগলে বোটা থেকে খসে, যাচ্ছে মরা পাতা, ঢেউয়ে নৌকা যেমন দোলে, তেমনি দুলতে দুলতে নামছে মাটিতে।
ছোট্ট যে গাঁয়ে বাস থেকে নেমেছিল ওরা, সেটা পেছনে ফেলে এল। খুব ভাল লাগছে হাঁটতে। আঁকাবাঁকা সরু পথে নেমেছে এখন। দু-ধারে পাতাবাহারের ঝাড় এত ঘন হয়ে জন্মেছে, আর এত উঁচু, ওপর দিয়ে দেখা যায় না ওপাশে কি আছে। মাথার ওপরে ডালপাতা দু-পাশ থেকে এসে গায়ে গায়ে লেগে চাদোয়া তৈরি করে দিয়েছে, তার ফাঁক-ফোকর দিয়ে চুইয়ে আসছে যেন আলো।
এ-তো দেখি একেবারে সুড়ঙ্গ, বলল মুসা। নাম কি জায়গাটার?
এটার নাম কি ঠিক বলতে পারছি না, বলল কিশোর। তবে এটা হরিণ পাহাড়ে চলে গেছে।
হরিণ পাহাড়? ভুরু কোঁচকাল রবিন। ডিয়ার হিল। বাংলা করলে হরিণ পাহাড়ই পঁড়ায়, নাকি?

হ্যাঁ, তা হয়, তার বাংলা শব্দের সীমিত ভাণ্ডার খুঁজল রবিন। শুনতেও ভাল লাগছে।
ঐখানের নামগুলোই সুন্দর। অন্ধ উপত্যকা, হরিণ পাহাড়, কুয়াশা হ্রদ, হলুদ দীঘি, ঘুঘুমারি…
ওফ, দারুণ তো! বলে উঠল জিনা। অরিজিনাল নামগুলো কি?
ব্লাইন্ড ভ্যালি, ডিয়ার হিল, মিসটি লেক, ইয়েলো পণ্ড, ডাভ ডেথ…
অপূর্ব! বলল রবিন। বাংলা ইংরেজি দুটোই।
বাংলাটাই থাক না তাহলে? দ্বিধা করছে কিশোর, যার যার মাতৃভাষা তার কাছে প্রিয়, বন্ধুরা আবার কি মনে করে। বাইরের কারও সঙ্গে বলার সময় লাগছেন করুক, ইংরেজিই বলতে হবে, আমরা নিজেরা নিজেরা…
আমি রাজি। আমার কাছে বাংলাই ভাল লাগছে, সঙ্গে সঙ্গে বলল মুসা। নিজের ভাষা কিছু কিছু জানি, কিন্তু সেটা না জানারই শামিল, বাংলার চেয়েও কম জানি। সেই কবে কোন কালে আফ্রিকা ছেড়ে চলে এসেছিল আমার দাদার দাদা…ভুল বললাম, চলে আসেনি, জোর করে ধরে আনা হয়েছিল, গোলাম করে রাখার জন্যে…শ্বেতাঙ্গরা…
আড়চোখে জিনার দিকে চেয়ে তাড়াতাড়ি হাত তুলল কিশোর, থাক থাক, পুরানো ইতিহাস ঘাটাঘাটির দরকার নেই, ঝগড়া লেগে যাবে এখন। ছুটির আনন্দই মাটি হবে। হ্যাঁ, যা বলছিলাম…
কথা বলতে বলতে এগোচ্ছে ওরা।
হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল রাফিয়ান। খরগোশের গন্ধ পেয়েছে।
আরিব্বাপরে! জিন অবাক। এত্তো খরগোশ! এই দিনের বেলায়? আমার গোবেল দ্বীপেও তো এত নেই।
হরিণ পাহাড়ে এসে উঠল ওরা। বসল, খরগোশ দেখার জন্যে। রাফিয়ানকে নিয়ে হয়েছে মুশকিল, কিছুঁতেই আটকে রাখা যাচ্ছে না। খরগোশের গন্ধে পাগল হয়ে গেছে যেন সে। এক ঝাড়া দিয়ে জিনার হাত থেকে বেল্ট ছুটিয়ে নিয়েই দিল দৌড়।
রাফি! রাফি! চেঁচিয়ে উঠল জিনা।
কিন্তু কে শোনে কার কথা? রাফিয়ানের কানেই ঢুকল না যেন ডাক, তার এক চিন্তা, খরগোশ ধরবে।
এত বোকা নয় খরগোশেরা যে চুপচাপ বসে থেকে কুকুরের খপ্পরে পড়বে। সুড়ুৎ করে ঢুকে গেল গর্তে। ভোজবাজির মত, এই ছিল এই নেই।
অনেক চেষ্টা করেও একটা খরগোশ ধরতে পারল না রাফিয়ান। তার কাণ্ড দেখে হেসে গড়াগড়ি খেতে লাগল মুসা আর জিনা।

অবশেষে হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এল ব্যর্থ রাফিয়ান, জিভ আধহাত বেরিয়ে পড়েছে।
ভুল নাম রেখেছে, বলল রবিন। নাম রাখা উচিত ছিল আসলে খরগোশ পাহাড়। চলো, উঠি।
চূড়া পেরিয়ে পাহাড়ের উল্টোদিকের ঢাল ধরে নামতে শুরু করল ওরা। এদিকে খরগোশ যেন আরও বেশি। রাফিয়ান বোধহয় ভাবল, অন্যপাশের চেয়ে এপাশের ওরা বোকা, তাই আবার তাড়া করল।
সেই একই কাণ্ড। সুড়ুৎ।
রেগে গেল রাফিয়ান। গর্তে ঢোকা? দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা। বড় একটা খরগোশকে বাইরে দেখে তাড়া করল। খরগোশটাও সেয়ানা। এঁকেবেঁকে এপাশে ওপাশে লাফিয়ে লাফিয়ে গিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল বড় একটা গর্তের ভেতর।
কোন রকম ভাবনাচিন্তা না করেই মাথা ঢুকিয়ে দিল রাফিয়ান, ঢুকে গেল গর্তে। তারপরই পড়ল বিপদে। আটকে গেল শরীর। না পারছে ঢুকতে, না বেরোতে। অসহায় ভাবে পেছনের পা ছুঁড়তে লাগল শুধু।
আরে! দৌড় দিল জিনা। এই রাফি, রাফি, বেরিয়ে আয়। আয় জলদি।
বেরোতে পারলে তো বাঁচে এখন রাফিয়ান, জিনার ডাকের কি আর অপেক্ষা করে? কিন্তু পারছে তো না। পেছনের পায়ের নখ দিয়ে আঁচড়ে ধুলোর ঝড় তুলেছে, বেরোনোর চেষ্টায়।
পুরো বিশ মিনিট লাগল রাফিয়ানকে বের করে আনতে। প্রথমেই গর্তে ঢোকার চেষ্টা করল মুসা। তার বিরাট শরীর ঢুকল না। কিশোর আর জিনাও ঢুকতে পারল না। রোগা-পটকা ক্ষীণ দেহ একমাত্র রবিনের, তাকেই মাথা ঢোকাতে হলো অবশেষে।
রাফিয়ানের পেছনের পা ধরে টানতে লাগল রবিন, তার অর্ধেক শরীর গুহার বাইরে, অর্ধেক ভেতরে। কুকুরটার কাঁধের পেছন দিক আটকে গেছে একটা মোটা শেকড়ে, টেনেও বের করা যাচ্ছে না। ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল।
আহ, এত জোরে টেনো না, চেঁচিয়ে উঠল জিনা। ব্যথা পাচ্ছে তো।
জোরে টেনেও তো বের করতে পারছি না, গর্তের ভেতর থেকে চেঁচিয়ে জবাব দিল রবিন। জোর পাচ্ছি না। আমার পা ধরে টানো।
অনেক টানা-হেঁচড়ার পর বের করা গেল অবশেষে। বিধ্বস্ত চেহারা, কুঁইকুই করে গিয়ে জিনার পায়ের কাছে গড়িয়ে পড়ল রাফিয়ান। খুব ভয় পেয়েছে বেচারা।
সাংঘাতিক ব্যথা পেয়েছে কোথাও, কুকুরটার সারা গা টিপেটুপে দেখতে শুরু করল জিনা। চারটে পা-ই টেনে টেনে দেখল। ভাঙেনি। জখমও দেখা যাচ্ছে না। ব্যথা পেয়েছেই। নইলে এমন কো কো করত না। কিন্তু লাগল কোথায়?

ভয়ে অমন করছে, কিশোর বলল। জখম থাকলে তো দেখতামই। পা-ও ভাঙেনি। কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারল না জিনা। পশু ডাক্তারকে দেখালে হয় না?
এখানে পশু ডাক্তার পাবে কোথায়? খামোকা ভাবছ। রাফিয়ান ঠিকই আছে। চলো, হাঁটি।
ঘুঘুমারিও পেরিয়ে এল ওরা। আলাপ-আলোচনা আর হাসিঠাট্টা তেমন জমছে। গুম হয়ে আছে জিনা। বার বার তাকাচ্ছে পাশে রাফিয়ানের দিকে। কোন অসুবিধে হচ্ছে কিনা বোঝার চেষ্টা করছে।
ব্যথা পেয়েছে, এমন কোন ভাব দেখাচ্ছে না রাফিয়ান, ঠিকমতই হাঁটছে, মাঝে মাঝে গুঙিয়ে উঠছে শুধু।
এখানেই লাঞ্চ সারা যাক, কি বলো? আরেকটা পাহাড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর।
হ্যাঁ, তা যায়, মাথা কাত করল মুসা। নাম কি এটার?
ম্যাপে কোন নাম নেই। তবে আমি রাখতে পারি..ঢালু পাহাড়? খুব মানাবে। দেখেছ, কেমন ঢালু হয়ে নেমে গেছে অনেক দূর... স্বপ্নিল হয়ে উঠেছে কিশোরের অপূর্ব সুন্দর দুই চোখ।
ভাল লাগার মতই দৃশ্য। মাইলের পর মাইল একটানা ছড়িয়ে রয়েছে বিশাল নিঃসঙ্গ প্রান্তর, ঘন সবুজ ঘাস চকচক করছে রোদে। তাতে চরছে লাজুক হরিণ আর উদ্দাম ছোট ছোট বুনো ঘোড়া। যেন পটে আঁকা ছবি।
বসে পড়ল ওরা ঘাসের গুচ্ছের নরম কার্পেটে।
অবারিত মাঠ গগন ললাট চুমে তব পদধূলি, ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি, দিগন্তের দিকে চেয়ে বিড়বিড় করল কিশোর, মন চলে গেছে তার হাজার হাজার মাইল দূরের আরেক স্বপ্নরাজ্যে, তার স্বপ্নের বাংলাদেশে। সেই দেশটাও কি এত সুন্দর, ভাবল সে, কবিতা পড়ে তো মনে হয় এর চেয়েও সুন্দর।
দেশটা সত্যি ভারি সুন্দর, কিশোরের মতই দূরে তাকিয়ে রয়েছে রবিন। এই সবুজ একদিন ঢেকে যাবে ধবধবে সাদা বরফে, তুষার ঝরবে পেঁজা তুলোর মত, আকাশের মুখ অন্ধকার, মেরু থেকে ধেয়ে আসবে হাড় কাঁপানো কনকনে ঠাণ্ডা...
ওদিকে স্যাণ্ডউইচগুলো তো কাঁদতে শুরু করেছে, খাচ্ছি না বলে, বেরসিকের মত বাধা দিল মুসা। কাব্যচর্চা রেখে আগে পেটচর্চা সেরে নাও। আরে এই জিনা, এত গভীর হয়ে আছো কেন? তোমার মুখ কালো দেখলে তো আমার বুকটা ছ্যাৎ করে ওঠে...
অন্য সময় হলে কথার-করাত চালাত জিনা, এখন শুধু মাথা নাড়ল। রাফি...

দূর, তুমি খামোকা ভাবছ। কিচ্ছু হয়নি। দেখো, একটু পরেই ঠিক হয়ে যাবে। পেটে বোধহয় খিদে দেখছ না আমার কেমন খারাপ লাগছে? ওরও বোধহয় তেমনি…
মুসার কথায় হেসে ফেলল জিনা। অন্যদের মুখেও হাসি ফুটল।
হুঁ, সমঝদারের ভঙ্গিতে মাথা দোলাল মুসা, দারুণ হয়েছে। ডিকের মায়ের হাতে যাদু আছে। নে, রাফি, এই কাবাবটা চেখে দেখ।
কাবাব চিবাতে চিবাতে আস্তে মাথা নাড়ল রাফিয়ান, গোঁ করে উঠল। ব্যথায় কেন, সে-ই জানে। কিন্তু এটাকেই সম্মতি ধরে নিয়ে মুসা হাসল, কি, বলেছি না ভাল?
সবার চেয়ে অনেক বেশিই খেলো রাফিয়ান, তবে চুপচাপ রয়েছে। এই ব্যাপারটাই ভাল লাগছে না জিনার।
একেক জনের ভাগে তিনটে করে স্যাণ্ডউইচ বাঁচল। আর অর্ধেক টুকরো করে কেক। বাকি সব সাবাড় করে ফেলেছে।
ডিকের চেয়ে কম কি আমরা? ভুরু নাচাল মুসা। ও ছ-টা খায়, আমরা পাঁচটা…
তুমি সাতটা খেয়েছ, শুধরে দিল রবিন। নিজেদেরগুলো সেরেও আমাদের ভাগ থেকে মেরেছ তুমি আর রাফি…
ঘউ, করে স্বীকার করল যেন রাফিয়ান। কেকের টুকরোর দিকে চেয়ে লেজ নাড়ছে। জিভে লালা। তাকে কেক দেয়া হয়নি।
বলেছিলাম না, খেলেই ভাল হয়ে যাবে রাক্ষসটা, হেসে বলল মুসা। নে খা, তুই আমার কাছ থেকেই নে… খানিকটা কেক ভেঙে কুকুরটার মুখের কাছে ফেলল।
এক চিবান দিয়েই কোত করে গিলে ফেলল রাফিয়ান। করুণ চোখে তাকাল মুসার হাতের বাকি কেকটুকুর দিকে।
তাড়াতাড়ি সরিয়ে নিল মুসা। না বাবা, আর দিচ্ছি না। রাতে খেতে হবে আমার। তুমি বাপু যত পাও ততই চাও…
হাসল সবাই। কেটে গেল নিরানন্দ ভাবটা।
চলো, ওঠা যাক, বলল কিশোর। পাঁচটার আগেই ফার্মটায় পৌঁছতে হবে। এখানে আবার তাড়াতাড়ি রাত নামে।
কোন ফার্ম? জানতে চাইল রবিন।
হলুদ দীঘি।
যদি থাকার জায়গা না থাকে?
জিনাকে একটা ঘর দিতে পারলেই হলো। আমরা গোলাঘরে খড়ের গাদায়ই ঘুমোতে পারব।
কেন, আমি পারব না কেন? গলা লম্বা করে ঝাঁকি দিল জিনা।

কারণ, তুমি মেয়ে। ছেলের পোশাক পরে আছে বটে, কিন্তু মেয়ে তো।
দেখো, মেয়ে মেয়ে করবে না। মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে কম কিসে?
তাহলে ছেলে সেজে থাকো কেন? ফস করে বলে বসল মুসা।
থাকি, থাকি, আমার খুশি,রেগে উঠল জিনা। তোমার কি?
এই তো রেগে গেল, বিরক্ত হয়ে উঠল কিশোর। তোমাদের জ্বালায় বাপু শান্তিতে পরামর্শ করারও জো নেই। জিনা, খামাকো জেদ করছ। তুমি মেয়ে, কিছু অসুবিধে তোমার আছে, ছেলেদের যা নেই। এটা কি অস্বীকার করতে পারবে?
চুপ করে রইল জিনা। মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে। তবে আর তর্ক করল না। আরেক দিকে মুখ ফিরিয়ে রাখল।
মালপত্রের বোঝা পিঠে তুলে নিয়ে আবার রওনা হলো ওরা। রাফিয়ান শান্ত। লাফঝাপ সব যেন ভুলে গেছে, জোরে হাঁটার চেষ্টাও করছে না। পা ফেলছে অতি সাবধানে, মেপে মেপে।
ব্যাপারটা জিনার চোখ এড়াল না। কি হয়েছে রাফি? খারাপ লাগছে?
জবাবে শুধু কাঁউ করল কুকুটা।
আরও খানিক দূর যাওয়ার পর খোড়াতে শুরু করল রাফিয়ান। পেছনের বাঁ পা ঠিকমত ফেলতে পারছে না।
থামল সবাই।
বসে পড়ে পা-টা ভালমত দেখল জিনা। মনে হয় মচকেছে, রাফিয়ানের পিঠে হাত বোলাল সে।
মৃদু গাউক করে উঠল রাফিয়ান।
যেখানে হাত লাগলে ব্যথা পায় কুকুরটা, সে জায়গার নোম সরিয়ে দেখল জিনা। আরে, যখম! রঞ্জু জমেছে, ফুলেছেও। ওইটানাটানির সময়ই লেগেছিল।
দেখি তো, বসে পড়ে কিশোরও দেখল। না, বেশি না। সামান্য। রাতে ঘুমোলেই সেরে যাবে।
কিন্তু শিওর হওয়া দরকার, খুব চিন্তিত দেখাচ্ছে জিনাকে। কিশোর, গ্রাম আর কদ্দূর?
এই সামনেই। র‍্যাংকিন ভিলেজ। গায়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করব, পশু ডাক্তার কোথায় পাওয়া যাবে।
জলদি চলো। ইস, কেন যে এত বড় হলো কুকুরটা, নইলে কোলে করেই নিতে পারতাম। হাঁটতেই পারছে না বেচারা।
যা পারে হাঁটুক এখন, বলল মুসা। একেবারে না পারলে তো বয়ে নিতেই হবে। সে তখন দেখা যাবে।

খুব আস্তে আস্তে হাঁটছে রাফিয়ান। বেশি খোড়াচ্ছে। শেষে আর পা-ই ফেলতে পারল না। মচকানো পা-টা তুলে তিন পায়ে লাফিয়ে এগোল।
ইস, কি কষ্ট বেচারারকেঁদে ফেলবে যেন জিনা।
র‍্যাংকিন ভিলেজে এসে ঢুকল বিষণ্ন দলটা। গাঁয়ের ঠিক মাঝখানে একটা সরাইখানা, নাম র‍্যাংকিন রেস্ট।
ঝাড়ন দিয়ে জানালার কাচের ধুলো ঝাড়ছে এক মহিলা।
কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর, ম্যাডাম। কাছাকাছি পশু ডাক্তার কোথায় আছে?
রাফিয়ানের দিকে তাকাল মহিলা। কাছাকাছি বলতে তো ছ-মাইল দূরে, ডারবিনে।
শুকিয়ে, এতটুকু হয়ে গেল জিনার মুখ। ছয় মাইল! কিছুঁতেই হেঁটে যেতে পারবে না রাফিয়ান।
বাস-টাস কিছু আছে? জিজ্ঞেস করল জিনা।
না, বলল মহিলা। তবে মিস্টার নরিসকে বলে দেখতে পারো। তার ঘোড়ার গাড়ি আছে। কুকুরটার পা বেশি খারাপ?
হ্যাঁ। ম্যাডাম, তার বাড়ি কত দূর?
এই আধ মাইল। ওই যে পাহাড়টা, ওখান থেকে ডানে চাইলেই বাড়িটা দেখতে পাবে। বড় বাড়ি। দেখলেই চিনবে। চারপাশে আস্তাবল, ঘোড়া পালে মিস্টার নরিস। খুব ভাল মানুষ। যদি বাড়িতে না পাও, বোসসা কিছুক্ষণ। রাতে বাইরে থাকে না, যেখানেই যাক ফিরে আসবে।
দ্রুত পরামর্শ করে নিল চারজনে। কিশোর বলল, মিস্টার নরিসের কাছেই যেতে হবে বোঝা যাচ্ছে। তবে সবার যাওয়ার দরকার নেই। মুসা, রবিনকে নিয়ে তুমি হলুদ দীঘিতে চলে যাও। রাতে থাকার ব্যবস্থা করে রাখখাগে। আমি জিনার সঙ্গে যাচ্ছি। ফিরতে কত রাত হয় কে জানে।
ঠিক আছে, বলল মুসা। টর্চ আছে তো তোমার কাছে? গাঁয়ে তো রাস্তায় বাতি নেই, রাতে খুব অন্ধকার হবে।
আছে, জানাল কিশোর।
চলো, কিশোর, তাড়া দিল জিনা। রবিন আর মুসার দিকে চেয়ে হাত নেড়ে বলল, রাতে দেখা হবে।
জিনা আর কিশোর পাহাড়ের দিকে রওনা হলো। পাশে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলেছে রাফিয়ান।
সেদিকে চেয়ে আনমনে বলল মুসা, ভাল হয়ে গেলেই বাঁচি। নইলে ছুটিটাই মাটি হবে।

ঘুরে আরেক দিকে রওনা হলো সে আর রবিন।
নির্জন পথ।
এক জায়গায় একটা লোকের সঙ্গে দেখা হলো। টমটম চালিয়ে আসছে। বিষণ্ন চেহারা, মাথাটা অনেকটা বুলেটের মত।
ডাকল মুসা।
ঘোড়ার রাশ টেনে থামাল লোকটা।
এ-রাস্তা কি ইয়েলো পণ্ডে গেছে? মুসা জিজ্ঞেস করল।
আ, মাথা নুইয়ে বলল লোকটা।
সোজা? নাকি ডানে বাঁয়ে আর কোন গলি আছে?
আ, আবার মাথা নোয়াল লোকটা।
এটাই পথ তো? মানে ওদিকে যেতে হবে? গলা চড়িয়ে হাত নেড়ে দেখাল মুসা।
আ, বলে চাবুক তুলে পেছন দিক দেখাল লোকটা, তারপর পশ্চিমে দেখাল।
ডানে ঘুরতে হবে?
আ, মাথা নোয়াল লোকটা। হঠাৎ খোঁচা মারল ঘোড়ার পেটে। লাফিয়ে সামনে বাড়ল ঘোড়া, আরেকটু হলেই দিয়েছিল মুসার পা মাড়িয়ে।
খালি তো আ আ করল, মুসার মতই রবিনও অবাক হয়েছে লোকটার অদ্ভুত ব্যবহারে। কি বোঝাল সে-ই জানে।
হঠাৎ করেই নামল রাত। সূর্য ডোবার পর অন্ধকার আর সময়ই দেয়নি সাঁঝকে। কাল মেঘ জমেছে আকাশে।
এ কি কাণ্ড দেখো, গম্ভীর হয়ে বলল মুসা। দিনটা কি ভাল গেল। বোঝাই যায়নি বৃষ্টি আসবে।
তাড়াতাড়ি চলো, বলল রবিন। ভিজে চুপচুপে হয়ে যাব। মাথা বাঁচানোরও জায়গা নেই।
মোড় নিয়ে কয়েক কদম এগিয়েই থমকে গেল দুজনে। খুব সরু পথ, পাতাবাহারের ঝোপের সুড়ঙ্গ। সকালে এমন একটা পথে হেঁটে এসেছে। দিনের বেলায়ই আবছা অন্ধকার ছিল ওটাতে। এটাতে এখন গাঢ় অন্ধকার।
ঠিক পথেই যাচ্ছি তো? মুসার কণ্ঠে সন্দেহ।
কি জানি। রবিনও বুঝতে পারছে না।
যা থাকে কপালে, ভেবে রবিনের হাত ধরে হাঁটতে শুরু করল মুসা। কয়বার মোড় নিয়েছে পথ, কতখানি এঁকেবেঁকে গেছে, কিছুই বোঝা গেল না। অন্ধের মত এগিয়ে চলেছে দুজনে। জুতোর তলায় ছপছপ করছে কাদা-পানি।
নর্দমায় নামলাম না তো? মুসা বলল। জুতোর ভেতর পানি ঢুকছে।

আমারও সুবিধে লাগছে না, মুসা। যতই এগোচ্ছি, পানি কিন্তু বাড়ছে। শেষে গিয়ে কুয়া-টুয়ায় না পড়ে মরি।
টর্চটা কোথায় রাখলাম? ব্যাগের ভেতরে খুঁজছে মুসা। ফেলে এলাম, না কি? রবিন, তোমারটা বের করো তো।
টর্চ বের করে দিল রবিন।
জ্বালল মুসা। আলোর চারপাশ ঘিরে যেন আরও ঘন হলো অন্ধকার। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখল সে। সামনে একটু দূরে, এক জায়গায় কাঠের বেড়া শুরু হয়েছে রাস্তার এক পাশ থেকে, ওখানে খানিকটা জায়গায় পাতাবাহার নেই, কেটে সাফ করা হয়েছে বোধহয়। পথটা সরু খালের মত, দু-ধারে উঁচু পাড়।
বেড়াটা নিশ্চয় কোন ফার্মে গিয়ে শেষ হয়েছে, বলল মুসা। আস্তাবল কিংবা গরুর খোঁয়াড় পেলেও মাথা বাঁচাতে পারি, ভিজতে হবে না। চলো, দেখি।
পাড়ে উঠে বেড়া ধরে ধরে এগোল ওরা। ফসলের খেতের মাঝখান দিয়ে সরু পথ।
মনে হচ্ছে এটা শর্টকাট, আন্দাজ করল মুসা। ফার্ম হাউসটা বোধহয় আর বেশি দূরে না।
একটা দুটো করে ফোঁটা পড়তে শুরু করল, যে কোন মুহূর্তে ঝুপঝুপ করে নামবে বৃষ্টি।
মুসার কথায় আশ্বস্ত হতে পারল না রবিন। সত্যিই পাবে তো ফার্মটা?
জোরে নামল বৃষ্টি। বর্ষাতি বের করা দরকার। দ্রুত এদিক ওদিক তাকাল ওরা। কোথায় ঢুকে বের করা যায়? ব্যাগের মধ্যে পানি ঢুকলে সব ভিজে যাবে, দুর্ভোগ পোহাতে হবে তখন।
মাঠের মধ্যেই দুটো আলের মিলনস্থলে ঘন একটা পাতাবাহারের ঝোপ চোখে পড়ল। দৌড়ে এসে তার ভেতরে ঢুকল দুজনে। ব্যাগ খুলে বর্ষাতি বের করল।
বৃষ্টি নামায় আরও ঘন হলো অন্ধকার। টর্চের আলো বেশি দূর যাচ্ছে না।
আলো তো দেখছি না, বলল রবিন। কই ফার্মটা?
কি জানি। বুঝতে পারছি না। ফিরে গিয়ে আবার সুড়ঙ্গে নামব? নাহ, তা-ও বোধহয় ঠিক হবে না।
পথ যখন রয়েছে, নিশ্চয় কোথাও গিয়ে শেষ হয়েছে। কিন্তু কোথায়?
না বুঝে আর এগোনোর কোন মানে হয় না। দাঁড়িয়ে ভিজতে ভিজতে ভাবছে। ওরা, কোন দিকে যাবে? কিছু একটা বলার জন্যে মুখ খুলতে গিয়েও থেমে গেল রবিন।
হঠাৎ করে এমনভাবে শুরু হলো শব্দটা, চমকে উঠল দুজনে। একে অন্যের হাত চেপে ধরল। নির্জন মাঠে, অন্ধকার রাতে এই দুর্যোগের মাঝে অদ্ভুত শোনাচ্ছে।

ঘণ্টার শব্দ।
বেজেই চলেছে। প্রলয়ের সঙ্কেত যেন। অন্তরাত্মা কাঁপিয়ে দিল দুই কিশোরের।
কোথায় বাজছে? এভাবে? ফিসফিস করল রবিন, জোরে বলার সাহস নেই।
কোথায় বাজছে মুসা জানবে কি করে? সে-ও রবিনের মতই চমকে গেছে। কাছাকাছি নয়, দূরে কোথাও বাজছে। কখনও জোরে, কখনও আস্তে। এলোমেলো বাতাস বইছে, একবার এদিক থেকে, একবার ওদিক। বাতাস সরে গেলে শব্দও কমে যাচ্ছে, যে-ই বাড়ছে, অমনি যেন তাদেরকে ঘিরে ধরছে বিচিত্র ঘণ্টা-ধ্বনি।
ইস, থামে না কেন? দুরুদুরু করছে মুসার বুক। গির্জার ঘণ্টা নয়।
না, তা-তো নয়ই, কেঁপে উঠল রবিনের গলা। কোন ধরনের সঙ্কেত হতে পারে…
আমি শিওর না। অস্বস্তিতে হাত নাড়ল সে। বিড়বিড় করল, যুদ্ধ?.. বীকন কই?
কি বিড়বিড় করছ?
অ্যাঁ?…বীকন। পুরানো আমলে যুদ্ধ লাগলে ওভাবে ঘণ্টা বাজিয়ে হুঁশিয়ার করা হত গাঁয়ের লোককে। সেই সঙ্গে আলোর সঙ্কেত-বীকন বলা হত।
এখন তো পুরানো আমল নয়… চমকে থেমে গেল মুসা।
রবিনের কথার মানে বুঝে ফেলেছে। কি বলতে চাইছ?
বুঝেছ তুমিও। এখন পুরানো আমল নয়, তাহলে অন্ধকারে ঝড়-বৃষ্টির মাঝে ওই ঘণ্টা…
চুপ চুপ ! আর বোলো না, ভয়ে ভয়ে চারদিকে তাকাল মুসা। অন্ধকারে কিছুই চোখে পড়ল না। টর্চের রশ্মির সামনে শুধু অগুনতি বৃষ্টির ফোঁটা।
যেমন শুরু হয়েছিল তেমনি হঠাৎ করেই থেমে গেল শব্দ।
এরপরও কান পেতে রইল দুজনে। কিন্তু আর শোনা গেল না।
চলো, হাঁটি, বলল মুসা। ফার্মটা খুঁজে বের করা দরকার। আবার কখন শুরু হয়ে যায়…
বেড়ার ধার ধরে আবার এগিয়ে চলল ওরা।
কতক্ষণ পর বলতে পারবে না, আঙুল তুলে চেঁচিয়ে উঠল রবিন, ওই যে।
মুসাও দেখল। আলো। না, বীকন নয়, জ্বলছে-নিভছে না। একভাবে জ্বলছে টিমটিম করে।
পাওয়া গেল বাড়িটা, জোরে নিঃ বাস ফেলল মুসা।
কাঠের বেড়া শেষ। একটা পাথরের দেয়ালের কাছে চলে এল ওরা। ওটার পাশ দিয়ে এল ভাঙাচোরা একটা গেটের কাছে।
ভেতরে পা রেখেই লাফিয়ে সরে এল রবিন।
কি হলো? জিজ্ঞেস করল মুসা।

আলো ফেলো তো। ডোবায় না পড়ি।
দেখা গেল, ডোবায়,পা ডোবেনি রবিনের, বৃষ্টির পানি জমেছে ছোট একটা গর্তে। গর্তটার পাশ কাটিয়ে এল দুজনে।
কাদা প্যাঁচপ্যাঁচ করছে সরু পথে। পথের শেষ মাথায় বাড়ির সাদা দেয়াল, ছোট একটা দরজা। পেছনের দরজা হবে, ভাবল মুসা। পাশের জানালা দিয়ে আলো আসছে।
জানালার কাছে এসে ভেতরে উঁকি দিল ওরা। মাথা নিচু করে সেলাই করছে এক বৃদ্ধা।
দরজার পাশে ঘণ্টার দড়ি-টুড়ি কিছু দেখতে পেল না মুসা। জোরে ধাক্কা দিল। সাড়া নেই। বন্ধ রইল দরজা। উঁকি দিল আবার জানালা দিয়ে। তেমনি ভাবে সেলাই করছে মহিলা, নড়েওনি।
কানে শোনে না নাকি? বলতে বলতেই দরজায় কিল মারল মুসা। সাড়া মিলল না এবারও। খবরই নেই যেন মহিলার।
এভাবে কিলাকিলি করে কিছু হবে না, দরজার নব ধরে মোচড় দিল মুসা।
ঘুরে গেল নব। ঠেলা দিতেই পাল্লাও খুলল।
পা মোছার জন্যে হেঁড়া একটা মাদুর বিছানো রয়েছে পাল্লার ওপাশে। তারপরে সরু প্যাসেজ। প্যাসেজের মাথায় পাথরের সিঁড়ি। সদর দরজার কাছেই ডানে আরেকটা দরজা, পান্না সামান্য ফাঁক। হারিকেনের স্নান আলো আসছে।
ঠেলে পাল্লা পুরো খুলে ভেতরে পা রাখল মুসা। তার পেছনে রবিন।
তবু তাকাল না মহিলা। সেলাই করেই চলেছে।
একেবারে তার সামনে এসে দাঁড়াল মুসা।
এইবার দেখতে পেল বৃদ্ধা। চমকে এত জোরে লাফিয়ে উঠল, ঠেলা লেগে উল্টে পড়ে গেল তার চেয়ার।
সরি, এভাবে চমকে যাবে বৃদ্ধা, ভাবেনি মুসা। দরজায় ধাক্কা দিয়েছিলাম। শোনেননি।
বুকে হাত চেপে ধরে আছে মহিলা। ইস্, কি ভয়ই না দেখালে!...কে তোমরা? এই অন্ধকারে কোত্থেকে?
চেয়ারটা তুলে আবার জায়গামত সোজা করে রাখল মুসা। হাঁপাচ্ছে অল্প অল্প। এটা কি ইয়েলো পণ্ড ফার্ম? এর খোজেই এসেছি আমরা। রাতটা কাটানো যাবে? আরও দুজন আসছে।
তর্জনীর মাথা দিয়ে বার দুই কানে টোকা দিল মহিলা, মাথা নাড়ল। শুনি না। ইশারায় বলো। পথ হারিয়েছ?
মাথা ঝাঁকাল মুসা।

এখানে তো থাকতে পারবে না, আমার ছেলে পছন্দ করে না এসব। ও এল বলে। সাংঘাতিক বদরাগী। চলে যাও।
মাথা নাড়ল মুসা। জানালা দিয়ে বাইরের বৃষ্টিভেজা রাত দেখল। তার আর রবিনের ভেজা জুতো আর কাপড় দেখাল।
হুঁ, পথ হারিয়েছ তোমরা। ভিজেছ। ক্লান্ত। যেতে চাও না, এই তো? আমার ছেলেকে নিয়ে যে বিপদ। অচেনা কাউকে সহ্য করতে পারে না।
রবিনকে দেখাল মুসা, তারপর হাত তুলে কোণের একটা সোফা দেখাল। নিজের বুকে হাত রেখে সরিয়ে এনে নির্দেশ করল দরজার দিকে।
বুঝল মহিলা। তোমার বন্ধু সোফায় থাকবে বলছ। তুমি বাইরে কোন ছাউনি কিংবা গোলাঘরে কাটিয়ে দিতে পারবে।
আবার মাথা ঝাঁকাল মুসা।
কিন্তু সেই একই ব্যাপার, আমার ছেলে পছন্দ করে না... রবিন আর মুসার ভেজা মুখের দিকে চেয়ে অবশেষে বোধহয় করুণা হলো মহিলার। হতাশ ভঙ্গিতে হাত নেড়ে এগোল একটা দেয়াল-আলমারির দিকে।
দরজা খুলল। আলমারি মনে করেছে দুই গোয়েন্দা, আসলে ওটা ঘরের আরেকটা দরজা। ওপাশ থেকে খুব সরু কাঠের সিঁড়ি উঠে গেছে।
রবিনকে বলল মহিলা, তুমি ওপরে চলে যাও। কাল সকালে আমি না ডাকলে আর নামবে না। আহ, যাও দেরি কোরো না।
মুসার দিকে চেয়ে দ্বিধা করছে রবিন। তুমি?
তুমি যাও তো, রবিনের হাত ধরে ঠেলে দিল মুসা। আমি গোলাঘরে গিয়ে থাকি। গিয়ে দেখো জানালা-টানালা আছে কিনা। রাতে বেকায়দা দেখলে ডেকো। নিচেই থাকতে হবে আমাকে।
ঠিক আছে, গলা কাঁপছে রবিনের, অনিচ্ছাসত্ত্বেও পা বাড়াল সিঁড়ির দিকে।
নোংরা পুরানো সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল খুদে একটা চিলেকোঠায়। একটা মাদুর আছে, পরিষ্কারই, আর একটা চেয়ার। একটা কম্বল ভঁজ করা রয়েছে চেয়ারের হেলানে, বসার জায়গায় এক জগ পানি।
ছোট জানালাও আছে একটা। ওটা দিয়ে গলা বাড়িয়ে ডাকল রবিন, মুসা? মুসা?
হ্যাঁ, শুনছি, নিচ থেকে সাড়া দিল মুসা। চুপচাপ শুয়ে থাকো। অসুবিধে না হলে আর ডেকো না।
সঙ্গে খাবার যা আছে খেয়ে নিল রবিন। ঢকঢক করে আধ জগ পানি খেয়ে মাদুরের ওপর কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। জিনা আর কিশোরের সাড়ার আশায় কান খাড়া। কিন্তু বেশিক্ষণ চোখ খোলা রাখতে পারল না। সারা দিন অনেক পরিশ্রম গেছে। ঘুমিয়ে পড়ল সে।

বাইরে বেশি হাঁটাহাঁটি করার সাহস হলো না মুসার। বৃদ্ধার ছেলের সামনে যদি পড়ে যায়? সহজেই খুঁজে পেল গোলাঘরটা। টর্চের আলো সাবধানে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখল।
ঘরের এক কোণে খড়ের গাদা। শোয়ার জায়গা পাওয়া গেল। ভাঙা একটা বাক্স দেখে সেটা তুলে এনে দরজার পাশে রেখে বসল। ভাঙা গেটটা দেখা যায়। কিশোর আর জিনা আসবে তো এই বৃষ্টির মাঝে? এলে কি ওই গেট দিয়েই ঢুকবে?
পেটের ভেতর ছুঁচো নাচছে। খাবার বের করে খেতে শুরু করল মুসা, একই সঙ্গে চোখ রাখল গেটের দিকে। বৃদ্ধার ছেলে এলে দেখতে পাবে।
ঘুমে জড়িয়ে আসছে চোখ। ঘন ঘন হাই তুলছে। তবু জোর করে চোখ খোলা রেখে বসে রইল।
কেউ এল না। দরজা দিয়ে মুখ বাড়ালেই চোখে পড়ে বাড়ির জানালা। বৃদ্ধাকে দেখা যায়, সেলাই করছে।
দু-ঘণ্টা পেরোল। আটটা বাজে। জিনা আর কিশোরের জন্যে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে মুসা।
ঝুড়িতে সেলাইয়ের সরঞ্জাম গুছিয়ে রাখল বৃদ্ধা। মুসার দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল, ফিরে এল না। হারিকেনটা আগের জায়গায়ই জ্বলছে, ছেলের জন্যেই জ্বেলে রেখে গেছে বোধহয় বৃদ্ধা, মুসা ভাবল।
বৃষ্টি থেমেছে। আকাশ মোটামুটি পরিষ্কার। তারা ফুটেছে। ছুটে চলা মেঘের ফাঁকে উকিঝুঁকি দিচ্ছে চাঁদ। সুযোগ পেলেই বেরিয়ে আসবে।
প্রকৃতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভয় অনেকখানি কেটে গেল মুসার। গোলাঘর থেকে বেরিয়ে পা টিপে টিপে এগোল জানালার দিকে। মনে কৌতূহল। কি করছে বৃদ্ধা?
কোণের নড়বড়ে সোফাটায় শুয়ে পড়েছে মহিলা। গলা পর্যন্ত তুলে দিয়েছে কল। বোধহয় ঘুমিয়ে গেছে।
আগের জায়গায় ফিরে এল মুসা। জিনা আর কিশোরের জন্যে বসে থেকে আর লাভ আছে? ভাবল সে। রাতে ওরা ফিরবে বলে মনে হয় না। রাফিয়ানকে ডাক্তার দেখিয়ে র‍্যাংকিন ভিলেজে ফিরে সরাইখানায় রাত কাটানোটাই স্বাভাবিক।
বৃষ্টি না হলে অবশ্য অন্য কথা ছিল।
বড় করে হাই তুলল সে। যাই, শুয়ে পড়িগে, মনে মনে বলল। যদি আসেই ওরা, সাড়া পাব।
দরজা বন্ধ করল মুসা। খিল-টিল কিছু নেই। দুটো করে আঙটা লাগানো আছে ভেতরে-বাইরে। ভেতরের আঙটা দুটোয় দুটো লাঠি ঢুকিয়ে আটকে দিল সে।

খিলের বিকল্প। কেন এই সাবধানতা, নিজেই জানে না। হয়তো অবচেতন মনে রেখাপাত করেছে বৃদ্ধার ছেলের বদমেজাজের কথাটা।
খড়ের গাদায় শুতে না শুতেই ঘুমে অচেতন হয়ে গেল মুসা।
বাইরে আরও পরিষ্কার হয়েছে আকাশ। বেরিয়ে এসেছে সঁদ, পূর্ণতা পায়নি এখনও, তবে যথেষ্ট বড় হয়েছে। পাথরের পুরানো বাড়িটাকে কেমন রহস্যময় করে তুলেছে ঘোলাটে জ্যোৎস্না।
ঘুমাচ্ছে মুসা। স্বপ্নে দেখছে রাফিয়ানকে, জিনা, কিশোর আর ভাঙা বাড়িটাকে, কানে আসছে যেন ঘণ্টাধ্বনি।
হঠাৎ ভেঙে গেল ঘুম। প্রথমে বুঝতে পারল না কোথায় রয়েছে। আরি, খোঁচা লাগছে কেন? বিছানায় কাটা ছড়িয়ে দিল নাকি কেউ? তারপর মনে পড়ল, খোঁচা তো লাগবেই। শুয়ে আছে খড়ের গাদায়। কাত হয়ে শুলো, কুঁজো হয়ে।
একটা মৃদু শব্দ কানে এল। গোলাঘরের কাঠের বেড়ায় আঁচড়ের মত। উঠে বল মুসা। ইদুর?
কান পেতে আছে সে। শব্দ ঘরের ভেতর নয়, বাইরে থেকে আসছে। থেমে, একটা নির্দিষ্ট সময় বিরতি দিয়ে আবার শুরু হলো। তারপর, মুসার ঠিক মাথার ওপরে ভাঙা একটা জানালায় আলতো টোকা দিল কেউ।
চুপ করে আছে মুসা। ইঁদুরে আঁচড়াতে পারে, কিন্তু টোকা দিতে পারে না। তাহলে কে? দম বন্ধ করে পড়ে রইল সে।
রবিন! রবিন? ফিসফিসিয়ে ডাকল কেউ।
সাড়া দিতে গিয়েও দিল না মুসা। গলাটা অচেনা, কিশোরের মত লাগছে না। কিন্তু রবিনের নাম জানল কি ভাবে? কেউ যে শুয়ে আছে ঘরে, এটাই বা কি করে জানল?
আবার টোকার শব্দ হলো। গলা আরেকটু চড়িয়ে ডাকল লোকটা, রবিন। রবিন?
না, কিশোর নয়। জিনা তো নয়ই।
ওঠো, বলল নোকটা। অনেক দূর যেতে হবে আমাকে। ওই মেসেজটা নিয়ে এসেছি।
জানালার কাছে যাওয়া উচিত হবে না, ভাবল মুসা। কিন্তু এ-ও চায় না, কোন সাড়া না পেয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ুক লোকটা। জানালার চৌকাঠের কাছে মাথা তুলল সে, কিন্তু মুখ বের করল না। মুখের ওপর হাত চাপা দিয়ে কণ্ঠস্বর বিকৃত করে ফিসফিস করে জবাব দিল, আছি, বলো।
এত ঘুম? বিরক্ত হয়ে বলল লোকটা। কখন থেকে ডাকছি। শোনো, জেরি মেসেজ দিয়েছে। টু-ট্রীজ। ব্ল্যাক ওয়াটার। ওয়াটার মেয়ার। আরও বলেছে, টিকসি নোজ।

তোমাকে এটা দিতে বলেছে, টিকসির কাছে আছে আরেকটা। নাও, জানালা দিয়ে এক টুকরো কাগজ ছেড়ে দিল সে ভেতরে।
বেড়ার ছোট একটা ছিদ্র দিয়ে দেখছে মুসা। বিষণ্ন মুখ, কুতকুতে চোখ, মাথাটা দেখতে অনেকটা বুলেটের মত।
রবিন? আবার বলল লোকটা। সব মনে রাখতে পারবে তো? টু ব্রীজ। ব্ল্যাক ওয়াটার। ওয়াটার মেয়ার। টিকসি নোজ।...যাই তাহলে।
চলে গেল লোকটা।
কাগজের টুকরোটা হাতে নিয়ে অবাক হয়ে ভাবছে মুসা। কে লোকটা? রবিনের নাম জানল কিভাবে? আর তাকেই বা রবিন মনে করার কারণ কি? রবিনের নাম যখন জানে, তার নাম কি জানে না? রাত দুপুরে ঘুম থেকে ডেকে তুলে কি এক অদ্ভুত মেসেজ দিয়ে গেল, মাথামুণ্ড কিছুই বোঝা যায় না।
ঘুম আর আসবে না সহজে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল মুসা। কিচ্ছু নেই, শুধু রহস্যময় বাড়িটার নির্জনতা, আর খোলা আকাশ।
খড়ের গাদায় বসে পড়ল সে। টর্চ জ্বেলে দেখল কাগজের টুকরোটা। ময়লা, এক পাতার ছেড়া অর্ধেক। পেনসিলে কিছু আঁকিবুকি রয়েছে, যার কোনই মানে বোঝা যায় না। কিছু শব্দ রয়েছে এখানে ওখানে, যেগুলো আরও দুর্বোধ্য।
আমার মাথায় কুলোবে না, আনমনে বলতে বলতে কাগজটা পকেটে রেখে দিল সে। শুয়ে পড়ল আবার।
জানালা দিয়ে ঠাণ্ডা আসছে। কুকুর-কুণ্ডলী হয়ে গেল মুসা, গায়ের ওপর কিছু খড় টেনে দিল। ঠাণ্ডা কম লাগবে।
শুয়ে শুয়ে ভাবছে। তন্দ্রা লাগল একসময়।
কিন্তু পুরোপুরি ঘুম আসার আগেই টুটে গেল আবার। বাইরে সতর্ক পায়ের শব্দ। ফিরে এল লোকটা?
দরজার বাইরে এসে থামল পদশব্দ। ঠেলা দিল পাল্লায়। খুলল না দেখে জোরে ধাক্কা দিল। সে বোধহয়, ভাবছে, কোন কিছুর সঙ্গে আটকে গেছে পাল্লা। ঠেলাঠেলিতে আঙটা থেকে খসে পড়ল লাঠি, ভেতরে ঢুকল নোকটা। আবার ভেজিয়ে দিল দরজা।
দরজার কাছে পলকের জন্যে লোকটার চেহারা দেখেছে মুসা। না, বুলেটমাথা নয়। এর মাথায় ঘন কালো ঝাঁকড়া চুল। ধড়াস ধড়াস করছে বুকের ভেতর। খড়ের গাদায় শুতে আসবে না তো লোকটা?
না, এল না। একটা চটের বস্তার ওপর বসে নিজে নিজেই কথা শুরু করল। হলো কি? আর কতক্ষণ বসে থাকতে হবে? বিড়বিড় করে আরও কিছু বলল, বুঝতে পারল না মুসা।

দূর কি হলো? বলে উঠল লোকটা। মাথার ওপর দু-হাত তুলে গা মোড়ামুড়ি করল। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল আবার দরজার কাছে। বাইরে উঁকি দিয়ে কি দেখল, ফিরে এসে বসল আবার আগের জায়গায়।
বিড়বিড় করছে না আর, একেবারে চুপ। হাই তুলছে।
সত্যিই দেখছে তো, অবাক হয়ে ভাবল মুসা, নাকি স্বপ্ন?
চুপ করে পড়ে রইল সে। স্বপ্ন দেখতে শুরু করল এক সময়, একটা বনের ভেতর দিয়ে চলেছে। যেদিকেই তাকায়, শুধু জোড়ায় জোড়ায় গাছ। বিচিত্র ঘণ্টার শব্দ কানে বাজছে একটানা।
দ্বিতীয়বার ঘুম ভাঙল মুসার। সকাল হয়ে গেছে। প্রথমেই চোখ গেল বস্তাটার দিকে। কেউ নেই। গোলাঘরে খড়ের গাদার ভেতরে শরীর ডুবিয়ে রয়েছে সে একা।
উঠে আড়মোড়া ভাঙল মুসা। সারা গায়ে ধুলো-মাটি, নোংরা। খিদেও পেয়েছে। আচ্ছা, পয়সা পেলে রুটি, পনির আর এক গেলাস দুধ দেবে তো বৃদ্ধা? রবিনেরও নিশ্চয় খিদে পেয়েছে। কি অবস্থায় আছে কে জানে।
সাবধানে বাইরে বেরোল মুসা। চিলেকোঠার জানালার নিচে এসে দাঁড়াল। রবিনের উদ্বিগ্ন মুখ দেখা যাচ্ছে।
কেমন? হাত নেড়ে নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল মুসা।
ভাল, হাসল রবিন। কিন্তু নিচে তো নামতে পারছি না। মহিলার ছেলে সাংঘাতিক বদমেজাজী। কয়বার যে গালাগাল করেছে বেচারী বুড়িটাকে। কানে শোনে না, এটা যেন তার দোষ।
তাহলে ও বেরিয়ে যাক, চট করে ফিরে তাকাল মুসা, কে জানি আসছে। তাড়াতাড়ি ফিরে এসে ঢুকল আবার গোলাঘরে।
বেড়ার ছিদ্র দিয়ে দেখল, বেঁটে এক লোক, চওড়া কাঁধ, সোজা হয়ে দাঁড়ালে সামান্য কুঁজো মনে হয়, মাথায় এলোমেলো চুলের বোঝা। গতরাতে দ্বিতীয় বার একেই ঢুকতে দেখেছে মুসা।
আরে, এদিকেই তো আসছে। কিন্তু না, গোলাঘরে ঢুকল না লোকটা। পাশ দিয়ে চলে গেল। গেট ভোলা আর বন্ধ হওয়ার শব্দ কানে এল মুসার।
চলে গেছে, ভাবল মুসা। যাই এবার।
আবার বেরোল গোলাঘর থেকে।
দিনের আলোয় বড় বেশি বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে ছোট্ট সাদা বাড়িটাকে। নিঃসঙ্গ, নির্জন।
ঘরে ঢুকল মুসা। রান্নাঘরে পাওয়া গেল বৃদ্ধাকে। সিংকে বাসন-পেয়ালা ধুচ্ছে। মুসাকে দেখে অস্বস্তি ফুটল চোখে। ও, তুমি। ভুলেই গিয়েছিলাম তোমাদের কথা।-

জলদি তোমার বন্ধুকে নিয়ে চলে যাও। আমার ছেলে দেখলে
কিছু রুটি আর পনির দিতে পারবেন? চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল মুসা। বুঝল, লাভ হবে না। গলা ফাটিয়ে চেঁচালেও শুনতে পাবে না মহিলা, একেবারেই কালা। হাত তুলে টেবিলে রাখা রুটি দেখাল সে।
না না! আঁতকে উঠল বৃদ্ধা। জলদি চলে যাও। আমার ছেলে এসে পড়বে।
ঠিক এই সময় পায়ের শব্দ হলো। মুসা কিছু করার আগেই ঘরে ঢুকল লোকটা, যাকে খানিক আগে বেরিয়ে যেতে দেখেছে।
হাতের ছোট ঝুড়িতে কয়েকটা ডিম।
চোখ গরম করে তাকাল লোকটা। এই ছেলে, এখানে কি? কি চাই?
না, কিছু না…মানে, এই…আমাদের কাছে কিছু রুটি বেচবে কি না…
আমাদের? তুমি একা নও?
নিজেকে জুতোপটা করতে ইচ্ছে হলো মুসার, মুখ ফসকে আমাদের বলে ফেলেছে। কিন্তু ফেলেছে তো ফেলেছেই, কথা ফিরিয়ে নেয়া আর যাবে না। চুপ করে রইল।
কি হলো? রা নেই কেন? গর্জে উঠল লোকটা। এতক্ষণে বুঝলাম, ডিম যায় কোথায়? তোমরাই চুরি করো রোজদাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা…
আর কি দাঁড়ায় মুসা? ঝেড়ে দিল দৌড়। গেট পেরিয়ে ছুটল। দুপদুপ করছে বুক, পেছনে তাকানোর সাহস নেই। ঘর থেকেই বোধহয় বেরোয়নি।
পায়ে পায়ে আবার গেটের কাছে ফিরে এল মুসা। উঁকি দিয়ে দেখল, একটা বড় কাঠের পাত্র হাতে নিয়ে উল্টো দিকে চলে যাচ্ছে লোকটা, সাদা বাড়ির পেছনে। বোধহয় মুরগীর খাবার দিতে যাচ্ছে।
এই-ই সুযোগ। ঢুকে পড়ল মুসা। চিলেকোঠার জানালায় দেখা যাচ্ছে রবিনের মুখ। ইশারায় নেমে আসতে বলল তাকে মুসা।
রবিন নেমে আসতেই আর দাঁড়াল না। বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এল দুজনে। তাড়াতাড়ি পা চালাল।
আশপাশের অঞ্চল রাতে লেগেছিল এক রকম, এখন লাগছে আরেক রকম।
অনেকখানি আসার পর প্রথম কথা বলল রবিন, আরিব্বাপরে! সাংঘাতিক হারামী লোক। আর ওটা একটা ফার্ম হলো নাকি? গরু-শুয়োর কিছু নেই। একটা কুত্তাও না।
মনে হয় না ওটা ফার্ম, বেড়ার ধার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বলল মুসা, ফিরে তাকাল একবার বাড়ির ভাঙা গেটের দিকে। শিওর, পথ হারিয়েছিলাম কাল রাতে। ভুল জায়গায় উঠেছি। ইয়েলো পণ্ড ফার্ম হতেই পারে না।

কাজটা খারাপ হয়ে গেল তাহলে, জিভ দিয়ে চুকচুক শব্দ করল রবিন। কিশোর আর জিনা নিশ্চয় ফার্মে উঠেছে। আমাদের জন্যে খুব ভাববে।
হ্যাঁ, ছোট একটা পুকুর দেখে ঘুরল মুসা। চলো, হাত-মুখ ধুয়ে নিই। চেহারার যা অবস্থা হয়েছে একেকজনের। লোকে দেখলে পাগল ভাববে।
হাত-মুখ ধুয়ে কাপড় বদলে নিল দুজনে। ময়লা কাপড় ভরে রাখল ব্যাগে, পরে সময়-সুযোগমত ধুয়ে নেবে।
পাড়ের ওপর উঠতেই একটা ছেলেকে দেখতে পেল, শিস দিতে দিতে আসছে। হাল্লো, বলল হাসিখুশি ছেলেটা। ছুটি কাটাতে বেরিয়েছ বুঝি?
হ্যাঁ, মাথা ঝাঁকাল মুসা। আচ্ছা ভাই, ইয়েলো পণ্ড ফার্মটা কোথায়? ওই ওটা? বৃদ্ধার বাড়িটা দেখাল।
আরে দূর, ওটা ফার্ম নাকি? ও-তো মিসেস হ্যাগার্ডের বাড়ি। নোংরা। নাক কুঁচকাল ছেলেটা। ওটার ধারে-কাছে যেয়ো না। বুড়ির ছেলে একটা ইবলিস, গাঁয়ের লোকে ওর নাম রেখেছে ডারটি রবিন।...ইয়েলো পণ্ড ওই ওদিকে। ব্যাংকিন রেস্ট ছাড়িয়ে গিয়ে, বায়ে। .
থ্যাংকু, বলল মুসা।
মাঠের পথ ধরে হেঁটে চলেছে রবিন আর মুসা। পেটে খিদে। মনে ভাবনা। কিশোর আর জিনা নিশ্চয় খুব দুশ্চিন্তা করছে।
সরু পথটার কাছে এসে থামল, সেই যে সেই পথটা, যেটার দু-ধারে পাতাবাহারের জঙ্গল পথকে সুড়ঙ্গ বানিয়ে দিয়েছে।
হাত তুলে দেখাল রবিন, ওই যে দেখো, কোথায় নেমে যাচ্ছিলাম। নালা।
নালায়েকের বাচ্চা, বিড়বিড় করে টমটমওয়ালাকে গাল দিল মুসা।
র‍্যাংকিন রেস্টের কাছে আসতেই কিশোর আর জিনার দেখা পাওয়া গেল। মুসা আর রবিনকে আগেই দেখেছে ওরা, নাম ধরে ডাকতে ডাকতে ছুটে আসছে। তাদের সঙ্গে লাফাতে লাফাতে আসছে রাফিয়ান।
নাস্তা কেউই খায়নি। র‍্যাংকিন রেস্টে ঢুকল ওরা।
এগিয়ে এল সেই মহিলা, গতদিন ডাস্টার দিয়ে যে জানালা পরিষ্কার করছিল। কি চাই?
নাস্তা খাইনি এখনও, বলল কিশোর। কিছু আছে?
পরিজ আর মাখন, জানাল মহিলা। আর আমাদের নিজেদের কাটা গরু, নিজেদের মুরগীর ডিম। নিজেদের হাতে চাক ভেঙে মধু এনেছি আমরা, আর পাউরুটি আমি নিজে বানিয়েছি। চলবে? কফিও আছে।
ইস, আন্টি, জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করছে আপনাকে, দাঁত আর একটাও ভেতরে রাখতে পারছে না মুসা। জলদি করুন। এক বচ্ছর কিছু খাইনি।

হেসে চলে গেল মহিলা।
ছোট গোছানো ডাইনিং রুমে আরাম করে বসল অভিযাত্রীরা। খানিক পরেই রান্নাঘর থেকে ভেসে এল ভাজা মাংস আর কড়া কফির জিভে পানি আসা গন্ধ। লম্বা জিভ বের করে ঠোঁট চাটল রাফিয়ান।
কুকুরটার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল মুসা, ও তো দেখছি ভাল হয়ে গেছে। মিস্টার নরিসের ওখানে গিয়েছিলে?
হ্যাঁ, বলল কিশোর। গিয়ে দেখলাম বাড়ি নেই। তার স্ত্রী বললেন, এসে পড়বেন শিগগিরই। খুব ভাল মহিলা। বসতে দিলেন। বসলাম।
কিন্তু শিগগির আসেননি ভদ্রলোক, জিনা যোগ করল। কাজে আটকে গিয়েছিলেন। সাড়ে সাতটার পর এলেন। খুব খারাপ লাগছিল, তাদের খাওয়ার সময় তখন।
তবে মিস্টার নরিসও ভাল, বলল কিশোর। রাফির পা দেখল, চেপে ধরে কি জানি কি করল..এমন জোরে কাউ করে উঠল রাফি, যেন ছাত ছুঁড়ে বেরিয়ে যাবে... জিনা গিয়ে লাফ দিয়ে পড়ল মিস্টার নরিসের ওপর...হাহ হাহ...ভদ্রলোক তো হেসেই বাঁচেন না...
যাব না, চোখমুখ ঘুরিয়ে বলল জিনা। যা ব্যথা দিয়েছে...
ডাক্তার যা করেন, বুঝেশুনেই করেন...
হ্যাঁ, তাই তো দেখছি, আবার রাফিয়ানের মাথায় হাত বোলাল মুসা। একেবারে ভাল হয়ে গেছে। তারপর কি করলে?
খাওয়ার জন্যে চাপাচাপি শুরু করলেন মিসেস নরিস, বলল কিশোর। কিছুঁতেই এড়াতে পারলাম না। খাওয়ার পর বেরোতেও দিতে চাইলেন না। বললেন, বৃষ্টিবাদলার মধ্যে গিয়ে কি করবে, শুয়ে থাকো এখানেই। তোমরা ভাববে বললাম। শেষে, ন-টা বাজার পর আকাশ পরিষ্কার হলে ছাড়লেন। ইয়েলো পণ্ডে গিয়ে তোমাদের পেলাম না। ভাবলাম, বৃষ্টিতে আটকে গেছ, অন্য কোথাও রাত কাটাতে উঠেছ। কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারলাম না। এতক্ষণে না পেলে পুলিশকে জানাতাম।
ফার্মটা কিন্তু দারুণ, মাথা কাত করল জিনা। ছোট একটা ঘরে থাকতে দিল আমাদের। বিছানা বেশ নরম। আমার বিছানার পাশে নিচে রাফি শুয়েছিল।
আর কি কপাল, কপাল চাপড়াল মুসা, আমি কাটিয়েছি খড়ের গাদায়...
মস্ত ট্রে-তে খাবার বোঝাই করে নিয়ে ঘরে ঢুকল মহিলা। পরিজ থেকে ধোঁয়া উঠছে। সাদা বিরাট বাটিতে সোনালি মধু। ইয়া বড় এক ডিশ ভরতি মাংস-ভাজা আর ডিম সেদ্ধ। আরেকটা বাসনে ভাজা ব্যাঙের-ছাতাও রয়েছে। .
খাইছে! হাততালি দিয়ে উঠল মুসা। ঢোক গিলল।

টেবিলে ট্রে নামিয়ে রাখতে রাখতে বলল মহিলা, এগুলো খাও। টোস্ট, ডিম ভাজা আর মাখন নিয়ে আসছি। দুধ-কফি পরে আনব। নাকি এখনি?
না না, তাড়াতাড়ি হাত নাড়ল মুসা, পরেই আনুন। একটা ডিম তুলে নিয়ে আস্ত মুখে পুরল। সেটা অর্ধেক চিবিয়েই এক টুকরো মাংস নিয়ে কামড় বসাল। প্লেটে খাবার তুলে নেয়ার তর সইল না।
হেসে যার যার প্লেট টেনে নিল অন্যেরা। খাবার তুলে নিল প্লেটে। বাকি খাবার সহ ট্রে-টা মুসার দিকে ঠেলে দিয়ে বলল জিনা, নাও, রাফিয়ানকেও কিছু দিয়ো।
কি আর বলব রে ভাই, ব্যাঙের ছাতার শেষ টুকরোটা মুখে পুরল মুসা। অন্ধকারে গিয়ে উঠেছিলাম এক বান্দরের বাড়িতে। রবিন, তুমি বলো। দরজায় দেখা দিয়েছে মহিলা, হাতে আরেক ট্রে, লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে সেদিকে গোয়েন্দা সহকারী।
সংক্ষেপে জানাল রবিন, পথ হারিয়ে কিভাবে গিয়ে উঠেছিল বাড়িটাতে।
বাধা না দিয়ে চুপচাপ শুনল কিশোর, তারপর বলল, ঘণ্টা শুনে ভয় পেয়েছে, নিশ্চয় মুসা ভূতের ভয় ঢুকিয়েছে তোমার মনে?
জোরে জোরে দুহাত নাড়ল মুসা, কি বোঝাতে চাইল সে-ই জানে। মুখ ভর্তি খাবার, কথা বলতে পারছে না।
অ, তোমরা তাহলে শোননি কিসের ঘণ্টা, বলল কিশোর। পাগলা-ঘন্টি, মিসেস নরিস বলেছেন। জেল থেকে কয়েদী পালালে নাকি ওরকম বাজিয়ে হুঁশিয়ার করে দেয়া হয় গ্রামবাসীকে।
আর আমরা এদিকে কি ভয়ই না পেয়েছিলাম, মলিন হেসে মাথা নাড়ল রবিন।
নাস্তা শেষ হলো। এক টুকরো খাবারও পড়ে রইল না। উচ্ছিষ্টও না। যা ছিল, সাবাড় করে দিয়েছে রাফিয়ান।
কিছু স্যাণ্ডউইচ কিনে নেয়া দরকার, বলল কিশোর। দুপুরে খাওয়ার জন্যে।
হ্যাঁ, নাও, সঙ্গে সঙ্গে বলল মুসা।
বাইরে বেরিয়ে রাস্তায় নেমে কিশোর বলল, মুসা, রবিনের কথা তো বললে। তুমি গোলাঘরে কিভাবে রাত কাটালে বললে না তো।
এতক্ষণে মনে পড়ল মুসার, রবিনকেও বলা হয়নি রাতের কথা। বলার অবকাশও পায়নি অবশ্য। দুজনে তখন ইয়েলো পণ্ড খোঁজায় এত ব্যস্ত, পেটে খিদে, আলাপ করার মানসিকতাই ছিল না।
এক কাণ্ড হয়েছে কাল রাতে, বলল মুসা। ওটা সত্যি ভূতের বাড়ি।
তোমার কাছে তো সবই ভূত, হাত নাড়ল কিশোর। চলো, কোথাও বসে শুনি। মনে হচ্ছে, অনেক কিছু বলার আছে তোমার।
নির্জন একটা জায়গা দেখে ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে বসল ওরা।

সব খুলে বলল মুসা। চুপ করে শুনল সবাই।
পকেট থেকে কাগজটা বের করে দিল মুসা। ওটার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল অন্যেরা। এমন কি রাফিয়ানও ফাঁক দিয়ে মাথা ঢুকিয়ে দিল, যেন মহা-পণ্ডিত।
আগামাথা কিছুই তো বোঝা যাচ্ছে না, নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে। কিশোর। তবে নকশা-টকশা কিছু হবে। কিসের কে জানে।
ব্যাটা বলল, জানাল মুসা, টিকসির কাছে নাকি বাকি অর্ধেক আছে।
এই টিকসিটা কে? বলল জিনা। আল্লাহ মালুম।
রবিনের নামই বা জানল কিভাবে? এই কিশোর, কি ভাবছ? কনুই দিয়ে কিশোরের পাজরে তো দিল জিনা।
বুঝতে পারছি না, মাথা নাড়ল কিশোর।
আমি পারছি, দু-আঙুলে চুটকি বাজাল হঠাৎ রবিন।
জিজ্ঞাসু চোখে তার দিকে তাকাল কিশোর।
মুসা, ছেলেটা কি বলেছিল? বলল রবিন। বলেছিল বুড়ির ছেলের নাম ডারটি রবিন রেখেছে লোকে। গতরাতে আমাকে নয়, ওকেই ডেকেছিল বুলেট-মাথা। বুড়ির ছেলে গোলাঘরে তার জন্যেই অপেক্ষা করেছে। জানে না, আগেই এসে তোমাকে ডারটি ভেবে মেসেজ দিয়ে চলে গেছে লোকটা।
ঠিক বলেছ, একমত হলো মুসা।
আনমনে বলল শুধু কিশোর, হুঁ। জেল পালানো কয়েদীর সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই তো? প্রশ্ন রাখল জিনা।
অসম্ভব না, বলল কিশোর। হতেও পারে। মেসেজটা সে-ই দিয়ে গেছে। হয়তো। কিন্তু কার কাছ থেকে আনল?
জেরি? মুসা বলল।
জেরি, না? হতে পারে। হয়তো সে এখন জেলে আছে, তার বন্ধু বুলেটমাথা, পালিয়েছে। বন্ধুর কাছেই মেসেজটা দিয়েছে সে। তাহলে ডারটি রবিন ওদেরই দলের কেউ। কোন বদ-মতলব আছে ব্যাটাদের।
কি মতলব?
তা জানি না। তবে হতে পারে, পাগলাঘন্টি শুনেই ডারটি বুঝেছে, যে তার বন্ধু পালিয়েছে। মেসেজ নিয়ে আসবে তার কাছে। তাই গোলাঘরে এসে বসেছিল মেসেজের আশায়।
হ্যাঁ, তাই হবে, মাথা দোলাল মুসা।
অথচ ভুলে মেসেজটা পড়ল এসে তোমার হাতে, রবিন বলল। মুসা, ভূতই মনে হয় গতরাতে আমাদেরকে পথ ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলেছিল ওখানে, কোন একটা উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে…

ধ্যাত, সব বাজে কথা, হাত নেড়ে মাছি তাড়াল যেন জিনা। চলো, গিয়ে পুলিশকে জানাই। কয়েদী ধরতে সুবিধে হবে তাদের।
হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ, চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। ছুটিতে এসেছি আনন্দ করতে, ডাকাত-টাকাতের খপ্পরে পড়তে চাই না। ম্যাপ বের করে নীরবে দেখল মিনিটখানেক। এই থানা-টানা থাকলে এখানেই থাকবে।
উঠল ওরা। খুশি হলো রাফিয়ান। নাস্তার পর পরই এত সময় ধরে বসে থাকাটা মোটেই পছন্দ হচ্ছিল না তার। লাফাতে লাফাতে আগে আগে চলল সে।
পা তো একেবারে ভাল, ছুটিটা মাঠে মারা যায়নি বলে রবিনও খুশি। ভালই হয়েছে, শিক্ষা হয়েছে একটা। বোকার মত আর খরগোশের গর্তে ঢুকবে না।
হ্যাঁ, সত্যই শিক্ষা হয়েছে রাফিয়ানের। আর গর্তে ঢুকল না। তবে পরের আধ ঘন্টায় অন্তত ডজনখানেক বার মুখ ঢোকাল খরগোশের গর্তে। ধরা তো দূরের কথা, ছুঁতেও পারল না কোনটাকে। ওর চেয়ে খরগোশের পাল অনেক বেশি তাড়। খোলা মাঠে বুনো ঘোড়া চরছে।
একবার একটা পাহাড়ী পথে মোড় নিতেই মুখোমুখি হয়ে গেল একপাল বুনো ঘোড়ার। অবাক চোখ মেলে অভিযাত্রীদের দেখল। তারপর একই সঙ্গে ঘুরে খুরের খটাখট তুলে দ্রুত হারিয়ে গেল পাহাড়ের ঢালের বনে। পিছু নেয়ার জন্যে পাগল হয়ে উঠল রাফিয়ান, জোর করে তার গলার বেল্ট টেনে ধরে রাখল জিনা।
খুব সুন্দর, না? বলল সে। আদর করতে ইচ্ছে করে।
গতদিনের মতই সকালটা সুন্দর, রোদে উজ্জল। পায়ের তলায় সবুজ ঘাস। একটা ঝর্নার পাড় দিয়ে হাঁটছে এখন। মৃদু ঝিরঝির করে বইছে টলটলে পানি, যেন গান গেয়ে নেচে নেচে ছুটে চলেছে মাতোয়ারা হয়ে।
দুপুরের দিকে জুতো খুলে ঝর্নায় পা ডুবিয়ে বসল ওরা। পায়ে হালকা পালকের মত পরশ বোলাচ্ছে পানি।
স্যাণ্ডউইচ দিয়ে দুপুরের খাওয়া সেরে পেট পুরে খেলে ঝর্নার পানি।
পানিতে পা রেখেই নরম ঘাসে চিত হয়ে শুয়ে পড়ল জিনা। খোলা নীল আকাশের দিকে তামাটে চোখ। হলুদ রোদে যেন জ্বলছে তামাটে চুল। খুব সুন্দর লাগছে তাকে।
কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আবার শুরু হলো চলা।
ডিয়াটোতে কখন পৌঁছবে জানে না। তবে তাড়াও নেই। সাঁঝের আগে কোন ফার্মহাউস খুঁজে পেলেই হলো। রাতে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে যাবে।
থানা থাকলে সেটা খুঁজে বের করতে হবে আগে, বলল কিশোর। তারপর ফার্ম...
ডিয়াটোতে থানা আছে। ছোট্ট থানা, একজন মাত্র গ্রামরক্ষী। আশপাশের চারটে গাঁয়ের দায়িত্বে রয়েছে সে, ফলে নিজেকে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট না ভাবলেও

বেশ দামী লোক মনে করে। শেরিফ হলে কি করত কে জানে।
গ্রামরক্ষী সাহেবের বাড়িটাই থানা। আরামে বসে ডিনার খাচ্ছে, এই সময় এসে হানা দিল অভিযাত্রীরা। লোভনীয় সসেজ আর তাজা কাটা পেঁয়াজগুলোর দিকে তাকিয়ে উঠে এল বিরক্ত হয়ে।
কি চাই? কমবয়েসীদের দু-চোখে দেখতে পারে না লোকটা। তার মতে, সব ছেলেমেয়েই বিচ্ছু, গোলমাল পাকানোর ওস্তাদ। কিশোর-বয়েসীগুলো বেশি ইবলিস।
অদ্ভুত কতগুলো ঘটনা ঘটেছে, সার, ভদ্রভাবে বলল কিশোর। ভাবলাম, শেরিফকে জানানো দরকার। আপনি কি শেরিফ?
অ্যাঁ?...হা...না না, কি বলবে বলো জলদি। গতরাতে একজন কয়েদী পালিয়েছিল।
মরেছে, বলে উঠল লোকটা, তুমিও দেখেছ বলতে এসেছ। কতজন যে এল, সবাই নাকি দেখেছে। একজন লোক একসঙ্গে এতগুলো জায়গায় যায় কি করে, ঈশ্বরই জানে।
আমি না, শান্ত রইল কিশোর, আমার এই বন্ধু। গতরাতে সত্যি দেখেছে। একটা মেসেজ নিয়ে এসেছিল লোকটা।
তাই নাকি? তরল কণ্ঠে বলল গ্রামরক্ষী। তোমার বন্ধু তাহলে আরেক কাটি বাড়া। শুধু দেখেইনি, মেসেজও পেয়েছে। তা মেসেজটা কি? স্বর্গে যাওয়ার ঠিকানা?।
অনেক কষ্টে কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রেখে বলল মুসা, টু-ট্রীজ, ব্ল্যাক ওয়াটার, ওয়াটার মেয়ার, টিকসি নোজ।
বাহ, বেশ ভাল ছন্দ তো, ব্যঙ্গ করল গ্রামরক্ষী। টিকসিও জানে। তাহলে টিকসিকে গিয়ে বললো, কি কি জানে এসে বলে যেতে আমাকে। তোমাদের আরেক বন্ধু বুঝি?
না, তাকে চিনি না, অপমানিত বোধ করছে মুসা। কড়া জবাব এসে যাচ্ছিল মুখে, কোনমতে সামলাল। আমার জানার কথা নয়, যদি না লোকটা এসে বলত। ভাবলাম, বুঝতে পারে এমন কাউকে জানিয়ে যাই। এই যে, এই কাগজটা দিয়েছিল।
ছেড়া পাতাটা হাতে নিয়ে দুর্বোধ্য আঁকিবুকির দিকে চেয়ে বাঁকা হাসল গ্রামরক্ষী। আরে, আবার কাগজও দিয়েছে। কি লেখা?
আমি কি জানি? হাত ওল্টালো মুসা। আর সহ্য করতে পারছে না। সেজন্যেই তো আপনার কাছে নিয়ে এসেছি। কয়েদী ধরতে সুবিধে হবে ভেবে।
কয়েদী ধরব? কুটিল হাসি ফুটল লোকটার মুখে। এত কিছু জানো, আর আসল কথাটা জানো না? কয়েদী ব্যাটা ধরা পড়েছে ঘন্টাচারেক আগে। ঘোড়ার গাড়ি

চুরি করে নিয়ে পালাচ্ছিল। এতক্ষণে জেলে ঢোকানো হয়েছে আবার। কণ্ঠস্বর পাল্টে গেল, হাসি হাসি ভাবটা উধাও হয়েছে চেহারা থেকে। আর শোনো, ছেলেছোকরাদের ভেঁপোমি আমি সইতে পারি না। আর কক্ষণো…
ভেঁপোমি করছি না, স্যার, কালো হয়ে গেছে কিশোরের মুখ। সত্যি-মিথ্যে বোঝার ক্ষমতা নেই, চোর ধরেন কি করে?
রাগে গোলাপী হয়ে গেল গ্রামরক্ষীর গাল। কয়েক মুহূর্ত কথা বলতে পারল না। তার মুখের ওপর এভাবে আর কখনও বলেনি কেউ। দেখো খোকা…
আমি খোকা নই। বয়েস আরেকটু বেশি।
চড়ই মেরে বসবে যেন গ্রামরক্ষী, এত রেগে গেল।
পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে লোকটার প্রায় নাকের নিচে ঠেলে দিল কিশোর, নিন, এটা পড়লেই অনেক কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে।
নিচের সই আর সীল দেখেই চেহারা অন্যরকম হয়ে গেল গ্রামরক্ষীর, সামলে নিল নিজেকে। কাগজটা নিয়ে পড়ল। লেখা আছে :
এই কার্ডের বাহক ভলানটিয়ার জুনিয়র, রকি বীচ পুলিশকে সহায়তা করছে। একে সাহায্য করা মানে পক্ষান্তরে পলিশকেই সাহায্য করা।
–ইয়ান ফ্লেচার
চীফ অভ পুলিশ
লস অ্যাঞ্জেলেস।
মুখ কালো করে কার্ডটা ফিরিয়ে দিয়ে বলল গ্রামরক্ষী, তা এখন কি করতে হবে আমাকে? রিপোর্ট লিখে নিতে হবে?
সেটা আপনার ইচ্ছে, ঝাল ঝাড়ল কিশোর।
ঠিক আছে, লিখে নিচ্ছি, পকেট থেকে নোটবই বের করল গ্রামরক্ষী, নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও। তবে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি, এটা তোমাদের রকি বীচ নয়। এখানকার চোর-ছ্যাচোড়রা অন্যরকম। গলাকাটা ডাকাত। ওদের সঙ্গে গোলমাল করতে গেলে বিপদে পড়বে।
সে-ভয়েই বুঝি কেঁচো হয়ে থাকো, ব্যাটা, বলার খুব ইচ্ছে হলো কিশোরের। বলল, সেটা দেখা যাবে। দিন, আমাদের কাগজটা দিন।
কয়েকজন কিশোরের কাছে হেরে গিয়ে মেজাজ খিচড়ে গেছে গ্রামরক্ষীর, কি ভাবল কে জানে, দুই টানে ফড়তি ফড়াত করে চার টুকরো করে ফেলল মেসেজটা, ফেলে দিল মাটিতে। বলল, রিপোর্ট লেখা দরকার, লিখে নিয়েছি। কিন্তু বাজে কাগজ হেঁড়ার জন্যে কচুটাও করতে পারবে না কেউ আমার, বলে নাক দিয়ে বিচিত্র শব্দ করে, গটমট করে চলে গেল ঘরের দিকে।
আস্ত ইতর! লোকটা শুনল কিনা, কেয়ারই করল না জিনা। এমন করল কেন?

লোকটাকেও দোষ দিতে পারি না, কাগজের টুকরোগুলো কুড়িয়ে নিচ্ছে মুসা, সেদিকে চেয়ে বলল কিশোর। যা একখান গল্প এসে বলেছি, বিশ্বাস করবে কি? ওর জায়গায় আমি হলেও করতে চাইতাম না। এদিকের গায়ের লোক এমনিতেই বানিয়ে কথা বলার ওস্তাদ।
তবে একটা সুখবর দিয়েছে, রবিন বলল। কয়েদী ধরা পড়েছে। ডাকাতটা ছাড়া থাকলে বনেবাদাড়ে ঘুরে শান্তি পেতাম না, মন খচখচ করতই।
ভাবতে হবে, কিশোর বলল। তবে আগে খাবার ব্যবস্থা করা দরকার। এখানে অনেক ফার্মহাউস আছে, দেখা যায়।
গ্রামরক্ষীর বাড়ির কাছ থেকে সরে এল ওরা। ছোট একটা মেয়েকে দেখে জিজ্ঞেস করল, এমন কোন ফার্মহাউস আছে কিনা, যেখানে খাবার কেনা যায়।
ওই তো, পাহাড়ের মাথায় একটা, হাত তুলে দেখাল মেয়েটা। আমার দাদুর বাড়ি। দাদী খুব ভাল, গিয়ে চাইলেই পাবে।
থ্যাংকস, বলল কিশোর।
ঘুরে ঘুরে পাহাড়ের ওপর উঠে গেছে পথ। বাড়ির কাছাকাছি হতেই কুকুরের ঘেউ ঘেউ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে পিঠের রোম খাড়া হয়ে গেল রাফিয়ানের, চাপা গোঁ গোঁ করে উঠল।
চুপ, রাফি, মাথায় আলতো চাপড় দিল জিনা। খাবারের জন্যে এসেছি এখানে। ওদের সঙ্গে গোলমাল করবি না।
বুঝল রাফিয়ান। রোম স্বাভাবিক হয়ে গেল আবার, গোঁ গো বন্ধ। রেগে ওঠা কুকুরদুটোর দিকে বন্ধু সুলভ চাহনি দিয়ে তার ফোলা লেজটা ঢুকিয়ে নিল দুই পায়ের ফাঁকে।
এই, কি চাও? ডেকে জিজ্ঞেস করল একজন লোক।
খাবার, চেঁচিয়ে জবাব দিল কিশোর। ছোট একটা মেয়েকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, সে বলল এখানে পাওয়া যাবে।
দাঁড়াও, মাকে জিজ্ঞেস করি, বলে বাড়ির দিকে চেয়ে ডাকল লোকটা, মা? মা?
সাংঘাতিক মোটা এক মহিলা বেরিয়ে এলেন, চঞ্চল চোখ, আপেলের মত টুকটুকে গাল।
খাবার চায়, ছেলেদের দেখিয়ে বলল লোকটা।
এসো, ডাকলেন মহিলা। এই চুপ, চুপ, নিজেদের কুকুরগুলোকে ধমক দিলেন।
দেখতে দেখতে কুকুরদুটোর সঙ্গে বন্ধুত্ব করে ফেলল রাফিয়ান। ছোটাছুটি খেলা শুরু করল।
বেশ ভাল খাবার। পেট ভরে খেলো অভিযাত্রীরা। রাফিয়ান তো এত বেশি গিলেছে, নড়তে পারছে না, খালি হাঁসফাঁস করছে।

ওরা খাবার টেবিলে থাকতেই সেই ছোট মেয়েটা এসে ঢুকল। হাই, হাসল সে। বলেছিলাম না, আমার দাদী খুব ভাল। আমি নিনা। তোমরা?
একে একে নাম বলল কিশোর। তারপর বলল, ছুটিতে ঘুরতে এসেছি। খুব চমৎকার কিন্তু তোমাদের অঞ্চলটা। কয়েক জায়গায় তো ঘুরলাম, বেশ ভাল লাগল। আচ্ছা, টু-ট্রীজটা কোথায় বলতে পারো?
মাথা নাড়ল মেয়েটা। আমি জানি না। দাঁড়াও, দাদীকে জিজ্ঞেস করি। দাদী? ও দাদী?
দরজায় উঁকি দিলেন মহিলা। কি?
টু-ট্রীজ? খুব সুন্দর জায়গা। এখন অবশ্য নষ্ট হয়ে গেছে। একটা হ্রদের ধারে, জংলা জায়গা। হ্রদটার নাম যে কি…কি…
ব্ল্যাক ওয়াটার? কিশোর বলল।
হ্যাঁ হ্যাঁ, ব্ল্যাক ওয়াটার। ওখানে যাচ্ছে নাকি? খুব সাবধান। আশেপাশে জঙ্গল, জলা…তো, আর কিছু লাগবে-টাগবে?
আরিব্বাপরে। আরও? না, না, হাসল কিশোর, পেট নিয়ে নড়তে পারছি।। খুব ভাল বেঁধেছেন। বিলটা যদি দেন। আমাদের এখন যেতে হবে।
বিল আনতে চলে গেলেন মহিলা।
নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল মুসা, কোথায় যেতে হবে? ব্ল্যাক ওয়াটার?
হ্যাঁ-না কিছুই বলল না কিশোর, নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে কাটতে আনমনে বলল শুধু, কালোপানি।
ফার্মহাউস থেকে বেরিয়ে বলল কিশোর, টু-ট্রীজ কতদূরে, সেটা আগে জানা দরকার। সম্ভব হলে আজই যাব, নইলে কাল। বেলা এখনও আছে।
কতদূরে সেটা, কি করে জানছি? বলল মুসা। ম্যাপ দেখে বোঝা যাবে?
যদি ম্যাপে থাকে। থাকার তো কথা, হ্রদ যখন।
উপত্যকায় নেমে এল আবার ওরা। রাস্তা থেকে দূরে নির্জন একটা জায়গা দেখে এসে বসল।
ম্যাপ বের করে বিছাল কিশোর। চারজনেই ঝুঁকে এল ওটার ওপর।
সবার আগে রবিনের চোখে পড়ল। ম্যাপের এক জায়গায় আঙুলের খোঁচা মেরে বলল, এই যে, ব্ল্যাক ওয়াটার। কিন্তু টু-ট্রীজ তো দেখছি না।
ধ্বংস হয়ে গেলে সেটা আর ম্যাপে দেখানো হয় না, যদি কোন বিশেষ জায়গা না হয়। যাক, ব্ল্যাক ওয়াটার তো পাওয়া গেল। তো, কি বলল, যাব আজ? কত দূরে, বুঝতে পারছি না।
এক কাজ করলে পারি, জিনা প্রস্তাব দিল। পোস্ট অফিসে খোঁজ নিলে পারি, ডাকপিয়নের কাছে। সব জায়গায়ই চিঠি বিলি করে, কোথায় কি আছে, সে-ই

সবচেয়ে ভাল বলতে পারবে।
সবাই একমত হলো।
সহজেই খুঁজে বের করা গেল পোস্ট অফিস। গাঁয়ের একটা দোকানের এক অংশে অফিস, দোকানদারই একাধারে পোস্টমাস্টার থেকে পোস্টম্যান। বৃদ্ধ এক লোক, নাকের চশমার ওপর দিয়ে তাকালেন ছেলেদের দিকে।
ব্ল্যাক ওয়াটার? বললেন তিনি। ওখানে যেতে চাও কেন? সুন্দর জায়গা ছিল এককালে, কিন্তু এখন তো নষ্ট হয়ে গেছে।
কি হয়েছিল? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
পুড়ে গেছে। মালিক তখন ওখানে ছিল না, শুধু দুজন চাকর ছিল। এক রাতে হঠাৎ জ্বলে উঠল বাড়িটা, কেন, কেউ বলতে পারে না। পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। দমকল যেতে পারেনি, পথ নেই। কোনমতে ঘোড়ার ছোট গাড়ি-টাড়ি যায়।
আর ঠিক করা হয়নি, না?
না, মাথা নাড়লেন বৃদ্ধ। বাকি যা ছিল, ওভাবেই পড়ে থাকল। এখন ওটা দাঁড়কাক, পেঁচা আর বুনো জানোয়ারের আজ্ঞা। অদ্ভুত জায়গা, ভূতের আগুন নাকি দেখা যায়। গিয়েছিলাম একদিন দেখতে। আগুন দেখিনি, তবে হ্রদের কালো পানি দেখেছি। যে রেখেছে, একেবারে ঠিক নাম রেখেছে।
কদ্দূর? যেতে কতক্ষণ লাগবে? জিজ্ঞেস করল জিনা।
ওরকম একটা জায়গায় কেন যেতে চাও? হ্রদের পানিতে গোসল করতে? পারবে না, পারবে না, নামলে জমে যাবে। ভীষণ ঠাণ্ডা।
নাম আর বর্ণনা শুনে খুব কৌতুহল হচ্ছে, বুঝিয়ে বলল কিশোর। কোনদিক দিয়ে যেতে হয়?
এভাবে তা বলা যাবে না। ম্যাপ-ট্যাপ থাকলে দেখে হয়তো...আছে তোমাদের কাছে?
ম্যাপ ছড়িয়ে বিছাল কিশোর।
কলম দিয়ে এক জায়গায় দাগ দিলেন বৃদ্ধ, একটা লাইন আঁকলেন, এখান থেকে শুরু করবে, এখানে, একটা ক্রস দিলেন, জায়গাটা। হুঁশিয়ার, ভয়ানক জলা। এক পা এদিক ওদিক ফেলেছ, হঠাৎ দেখবে হাঁটু পর্যন্ত ডুবে গেছে পাকে। তবে হ্যাঁ, প্রকৃতি দেখতে পারবে, এত সুন্দর! হরিণও আছে। ভাল লাগবে তোমাদের।
থ্যাংক ইউ, স্যার, ম্যাপটা রোল করে নিতে নিতে বলল কিশোর। যেতে কত সময় লাগবে?
এই ঘণ্টা দুয়েক। আজ আর চেষ্টা কোরো না, বোধহয় সময় পাবে না। অন্ধকারে ওপথে যাওয়া?...মরবে!

হ্যাঁ-না কিছু বলল না কিশোর। আবার ধন্যবাদ দিয়ে বলল, আপনার দোকানে ক্যামপিঙের জিনিসপত্র পাওয়া যাবে? দিনটা তো ভারি সুন্দর গেল, রাতটাও বোধহয় ভালই যাবে। গোটা দুই শতরঞ্জি আর কয়েকটা কম্বলও ভাড়া নিতে চাই।
অবাক হয়ে গেছে অন্য তিনজন। কিশোর কি করতে চাইছে, বুঝতে পারছে না। হঠাৎ বাইরে রাত কাটানোর মতলব কেন?
উঠে গিয়ে তাক থেকে রবারের বড় দুটো শতরঞ্জি নামিয়ে দিলেন বৃদ্ধ। আর চারটে পুরানো কম্বল। নাও। কিন্তু এই অক্টোবরে ক্যামপিং করবে? ঠাণ্ডায় না মরো।
মরব না, বৃদ্ধকে কথা দিল কিশোর।
চারজনে মিলে জিনিসগুলো গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে এল দোকান থেকে।
বাইরে বেরিয়েই জিজ্ঞেস করল মুসা, কিশোর, কি করবে?
এই একটু খোঁজাখুজি করব আরকি, বলল কিশোর। একটা রহস্য যখন পাওয়া গেছে...
কিন্তু আমরা এসেছি ছুটি কাটাতে।
তাই তো কাটাচ্ছি। রহস্যটা পেয়ে যাওয়ায় সময় আরও ভাল কাটবে।
কিশোর পাশার এহেন যুক্তির পর আর কিছু বলে লাভ নেই, বুঝে চুপ হয়ে গেল মুসা। অন্য দুজন কিছু বললই না। তর্ক করা স্বভাব নয় রবিনের, আর অ্যাডভেঞ্চার জমে ওঠায় মজাই পাচ্ছে জিনা। সে জিজ্ঞেস করল, তোমার কি মনে হয়? টু-ট্রীজে কিছু ঘটতে যাচ্ছে?
এখনি বলা যাচ্ছে না। গিয়ে দেখি আগে। খাবার কিনে নিয়ে যাব। এখন রওনা দিলে পৌঁছে যাব অন্ধকারের আগেই। ওখানে কোথাও না কোথাও ক্যাম্প করার জায়গা নিশ্চয় মিলবে। সকালে দেখব কোথায় কি আছে।
শুনতে তো ভালই লাগছে, কুকুরটার দিকে ফিরল জিনা। কি বলিস, রাফি?
হউ, সমঝদারের ভঙ্গিতে লেজ নেড়ে সায় দিল রাফিয়ান।
যাচ্ছি তো, বলল মুসা, কিন্তু ধরো, গিয়ে কিছু পেলাম না। তাহলে? এই রহস্য-টহস্যের কথা...
আমার ধারণা, পাবই। যদি না পাই, ক্ষতি কি? ঘুরতেই তো বেরিয়েছি আমরা, নাকি? পিকনিকের জন্যে ব্ল্যাক ওয়াটারের মত জায়গা এখানে আর কটা আছে?
রুটি, মাখন, টিনে ভরা মাংস ও বিশাল একটা ফুট কেক কিনে নিল কিশোর। কিছু চকলেট আর বিস্কুটও নিল।
মালপত্রের বোঝার জন্যে দ্রুত হাঁটা যাচ্ছে না, তবে অতটা তাড়াহুড়াও নেই ওদের। আঁধার নামার আগে গিয়ে পৌঁছতে পারলেই হলো। দেখতে দেখতে চলেছে।

পাহাড়ের চড়াই-উৎড়াই, সমতল তৃণভূমি, হালকা জঙ্গল, সব কিছু মিলিয়ে এক অপরূপ দৃশ্য। দূরে একদল বুনো ঘোড়া চড়ছে। কয়েকটা চিতল হরিণের মুখোমুখি হলো অভিযাত্রীরা। ক্ষণিকের জন্যে থমকে গেল হরিণগুলো, পরক্ষণেই ঘুরে দে ছুট।

আগে আগে চলেছে কিশোর, খুব সতর্ক, বৃদ্ধ পোস্টম্যানের হুঁশিয়ারিকে গুরুত্ব দিয়ে চলেছে সারাক্ষণ। বার বার ম্যাপ দেখে শিওর হয়ে নিচ্ছে, ঠিক পথেই রয়েছে কিনা।

পাটে বসছে টকটকে লাল সূর্য। ডুবে গেলেই ধড়াস করে নামবে অন্ধকার, এখানকার নিয়মই এই। তবে ভরসা, আকাশ পরিষ্কার, আর শরতের আকাশে তারাও হয় খুব উজ্জল, তারার আলোয় পথ দেখে চলা যাবে। তবু তাড়াহুড়ো করল ওরা, দিনের আলো থাকতে থাকতেই পৌঁছে যেতে পারলে ভাল, দুর্গম পথে অযথা ঝুঁকি নেয়ার কোন মানে হয় না।

ছোট একটা সমভূমি পেরিয়ে সামনে দেখাল কিশোর, জঙ্গল। বোধহয় ওটাই।

হ্রদ কোথায়? বলল রবিন। ও হ্যাঁ হ্যাঁ, আছে। কালো।

কি করে যেন বুঝে গেছে রাফিয়ান, গন্তব্য এসে গেছে। লেজ তুলে সোজা সেদিকে দিল দৌড়। ডেকেও ফেরানো গেল না। তার কাণ্ড দেখে সবাই হেসে অস্থির।

আঁকাবাঁকা পথটা গিয়ে মিশেছে আরেকটা সরু পথের সঙ্গে, তাতে ঘোড়ার গাড়ির চাকার গভীর খাঁজ। দু-ধারের ঘন আগাছা পথের ওপরও তাদের রাজ্য বিস্তৃত করে নিয়েছে।

জঙ্গলে ঢুকল ওরা। বন কেটে এককালে করা হয়েছিল পথটা, মানুষের অযত্ন অবহেলায় বন আবার তার পুরানো স্বত্ব দখল করে নিচ্ছে।

আমি আসছি, ঘোষণা দিয়ে দিয়েছে অন্ধকার।

ঠিক এই সময় হঠাৎ করেই টু-ট্রীজের ধ্বংসাবশেষের ওপর এসে যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ল অভিযাত্রীরা।

কালো, নির্জন, নিঃসঙ্গ, পোড়া ধ্বংসস্তুপ। ভাঙা দু-একটা ঘর এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে, জানালার পাল্লা আছে, কাচ নেই, ছাতের কিছু কড়িবগী আছে, কিন্তু ছাত নেই। মানুষের সাড়া পেয়ে তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উড়ে গেল দুটো দোয়েল।

বাড়িটা কালো হ্রদের ঠিক পাড়েই। নিথর, নিস্তব্ধ পানি, সামান্যতম ঢেউ নেই। যেন কালো জমাট বরফ…না না, কালো বিশাল এক আয়না।

মোটেই ভাল্লাগছে না আমার, নাকমুখ কোঁচকাল মুসা। কেন যে এলাম মরতে।

কারোই পছন্দ হলো না জায়গাটা। নীরবে হাত তুলে দেখাল কিশোর। মূল বাড়িটা যেখানে ছিল তার দু-ধারে বিশাল দুটো গাছের পোড়া কাণ্ড।

ওই গাছগুলোর জন্যেই নিশ্চয় নাম রেখেছে টু-ট্রীজ, বলল সে। এতটা নির্জন হবে, ভাবিনি।
নির্জন কি বলছ? বলে উঠল মুসা। রীতিমত ভূতুড়ে। গা ছমছম করে।
সূর্য ডোবার অপেক্ষায়ই যেন ছিল কনকনে ঠাণ্ডা। ফিসফিসিয়ে কানাকানি করে গেল এক ঝলক বাতাস, হাড় কাঁপিয়ে দিয়ে গেল অভিযাত্রীদের।
এসো, জরুরী কণ্ঠে বলল কিশোর, রাত কাটানোর জায়গা খোঁজা দরকার।
বিষণ্ন বাড়িটায় নীরবে ঢুকল ওরা। দোতলার কিছুই অবশিষ্ট নেই। নিচতলার অবস্থাও শোচনীয়। তবে এক কোণে শোয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কালো ছাইতে মাখামাখি আধপোড়া একটা কার্পেট এখনও বিছানো রয়েছে মেঝেতে, বিরাট একটা টেবিলও আছে।
বৃষ্টি এলে ওটাতে উঠে বসতে পারব, টেবিলটা দেখিয়ে বলল কিশোর। তবে দরকার হবে বলে মনে হয় না।
একেবারেই বাজে জায়গা, রবিনও মুখ বাঁকাল। গন্ধ! থাকা যাবে না এখানে।
অন্য জায়গা খোঁজা দরকার, কিশোর বলল। অন্ধকারও হয়ে এসেছে। আগে লাকড়ি নিয়ে আসি, আগুনের ব্যবস্থা করে, তারপর...
জিনাকে রেখে লাকড়ি আনতে বেরোল অন্য তিনজন। শুকনো ডালের অভাব নেই। তিন আঁটি লাকড়ি নিয়ে ফিরে এল ওরা।
জিনা বসে থাকেনি। থাকার জন্যে আরেকটা জায়গা খুঁজে বের করে ফেলেছে, প্রথমটার চেয়ে ভাল।
ছেলেদের দেখাতে নিয়ে চলল সে। রান্নাঘরের এক ধারে মেঝেতে একটা দরজা, পাল্লা তুলে রেখেছে জিনা, নিচে ধাপে ধাপে পাথরের সিঁড়ি নেমে গেছে।
ভাড়ারে গিয়েছে, সিঁড়ি দেখিয়ে বলল জিনা। ঢুকেছিলে? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
না, অনুমান। নিচে নিশ্চয় আগুন ঢুকতে পারেনি, ছাই থাকবে না। ওপরের ঘরের চেয়ে ওখানে ভাল হবে। থাকতে পারব।
টর্চ জেলে নামতে শুরু করল কিশোর, পেছনে অন্যেরা। রাফিয়ান চলেছে তার পাশে পাশে।
কয়েক সিঁড়ি বাকি থাকতেই এক লাফে গিয়ে মেঝেতে নামল কুকুরটা। ওপরেরটার চেয়ে অনেক ভাল ঘর। বিদ্যুতের তার, বোর্ড, সকেট, সুইচ সবই লাগানো আছে। জেনারেটর ছিল, বোঝাই যায়।
ছোট ঘর। মেঝেতে পোকায় খাওয়া কার্পেট। ঘুণে ধরা আসবাবপত্রে ধুলোর পুরু আস্তরণ। ভাড়ার-কাম-বসার ঘর ছিল এটা। সারাঘরে মাকড়সার জাল, গালে লাগতেই থাবা দিয়ে সরাল জিনা।
তাকে কিছু মোমবাতি পাওয়া গেল। ভালই হলো। অন্ধকারে থাকতে হবে।

লাকড়ি এনে ঘরের কোণে জড়ো করে রাখা হলো।
আসবাবগুলো কোন কাজের নয়। ঘুণে খেয়ে একেবারে নষ্ট করে ফেলেছে। একটা চেয়ারে গিয়ে বসেছিল মুসা, মড়মড় করে ভেঙে পড়ল ওটা। হাত-পা ছড়িয়ে মেঝেতে চিতপটাং হলো গোয়েন্দা-সহকারী। হেসে উঠল সবাই।
তবে টেবিলটা মোটামুটি ঠিকই আছে। ধুলো পরিষ্কার করে ওটার ওপর রাখা হলো খাবারের প্যাকেট।
বাইরে অন্ধকার। চাঁদ ওঠেনি। শরতের শুকনো পাতায় মর্মর তুলে ঘুরেফিরে বইছে বাতাস, কিন্তু কালো হ্রদটা আগের মতই নিথর। ছলছলাৎ করে তীরে আছড়ে পড়ছে না ঢেউ।
ভাঁড়ারে আলমারিও আছে একটা। খুলে দেখল কিশোর। আরও মোমবাতি, বাহ, চমত্তার। প্লেট...কাপ...এই, কুয়া-টুয়া চোখে পড়েছে কারও?খাবার পানি লাগবে।
না, কুয়া দেখেনি কেউ। তবে রবিন একটা জিনিস দেখেছে, ওপরে রান্নাঘরের এক কোণে, সিংকের কাছে। বোধহয় পাম্প, বলল সে। চলো দেখি, ঠিক আছে কিনা।
মোমবাতি জ্বেলে ওপরে উঠে এল সবাই। ঠিকই বলেছে রবিন। পাম্প-ই। ট্যাংকে পানি তোলা হত হয়তো। বড় সিংকের ওপরে কলও আছে, ট্যাংক থেকেই পানি আসত।
হাতল ধরে ঠেলে জোরে জোরে পাম্প করল রবিন। কলের মুখ দিয়ে তোড়ে বেরিয়ে এল পানি, ভিজিয়ে দিল বহুদিনের শুকনো সিংক।
রবিনকে সরিয়ে হাতল ধরল মুসা। পাম্প করে চলল। অনেক বছর পর আবার পানি উঠছে ট্যাংকে। ধুলো-ময়লা আর মরচে মিশে কালচে-লাল হয়ে কলের মুখ দিয়ে বেরোচ্ছে পানি। ধুয়ে পরিষ্কার হতে সময় লাগবে।
একনাগাড়ে পাম্প করে চলেছে মুসা। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। আস্তে আস্তে পরিষ্কার হচ্ছে পানি।
একটা কাপ ধুয়ে পানি নিল তাতে কিশোর। বরফের মত ঠাণ্ডা পানি, লালচে, রঙ রয়েছে সামান্য, তবে সেটা কেটে গেলে স্ফটিকের মত হয়ে যাবে। চুমুক দিয়ে দেখল। আহ, দারুণ। এক্কেবারে যেন ফ্রিজের পানি।
থাকার চমৎকার জায়গা পাওয়া গেছে, খাবার পানি মিলেছে, আর খাবার তো সঙ্গে করে নিয়েই এসেছে। মোমবাতি আর লাকড়ি আছে প্রচুর। আর কি চাই? বিছানা পেতে আরাম করে জাঁকিয়ে বসল ওরা।
খিদে পেয়েছে কারও? জিজ্ঞেস করল কিশোর। এই মুসা, খাবে?
আমারই পেয়েছে, আর ওর পাবে না? হেসে বলল জিনা।

কিছু রুটি, মাখন আর এক টিন গোশত খুলে নিয়ে বসল ওরা। খেতে খেতেই আলাপ-আলোচনা চলল, আগামীদিন কি কি করবে।
কি খুঁজছি আসলে আমরা? জানতে চাইল রবিন। কিছু লুকানো-টুকানো আছে ভাবছ?
হ্যাঁ, জবাব দিল কিশোর। কি আছে, তা-ও বোধহয় আন্দাজ করতে পারছি।
কী? একই সঙ্গে প্রশ্ন করল তিনজন।
ধরি, দলের নেতা জেরি। সে রয়েছে জেলে। তার যে বন্ধু পালিয়েছিল, তার কাছে একটা মেসেজ দিয়েছে অন্য দুই বন্ধু বা সহকারীকে দেয়ার জন্যে। সেই দুজনের একজন হলো ডারটি রবিন, অন্যজন টিকসি।
ধরা যাক, বেশ বড় ধরনের একটা ডাকাতি করেছে জেরি, একে একে তিনজনের মুখের দিকে তাকাল কিশোর, আগ্রহে সামনে ঝুঁকে এসেছে ওরা। রাফিয়ানও যেন গভীর আগ্রহে শুনছে, এমনি ভাবসাব, জিনার গা ঘেঁষে রয়েছে। কি ডাকাতি করেছে, জানি না, তবে সম্ভবত গহনা। টাকাও হতে পারে। সেগুলো লুকিয়ে রেখেছে কোথাও। পরিস্থিতি ঠাণ্ডা হয়ে এলে তারপর বের করবে। যে কারণেই হোক, ডাকাতির পর পরই ধরা পড়ে কয়েক বছরের জন্যে জেলে গেছে সে। ডাকাতির মাল কোথায় রেখেছে, কিছুঁতেই বলেনি পুলিশকে। কিন্তু পুলিশ ছাড়বে কেন? যেভাবেই হোক, কয়েদীর মুখ থেকে কথা আদায় করবেই। সেটা বুঝতে পেরেছে জেরি। কি করবে সেক্ষেত্রে?
জেল-পালানো বন্ধুর কাছে মেসেজ দিয়ে দেবে, বলল রবিন, অন্য দুই সহকারীকে জানানোর জন্যে, চোরাই মাল কোথায় আছে। পুলিশ আসার আগেই ওগুলো বের করে নিয়ে চম্পট দেবে ওরা।
ঠিক তাই, মাথা ঝাঁকাল কিশোর।
তাহলে ডাকাতদের আগে আমরা খুঁজে বের করব মালগুলো, জ্বলজ্বল করছে। জিনার চোখ। কাল ভোরে উঠেই খোঁজা শুরু করব।
হুঁ, তাহলে মেসেজের কোড বুঝতে হবে আগে, বলল মুসা। টু-ট্রীজ আর ব্ল্যাক ওয়াটার তো বুঝলাম। কিন্তু ওয়াটার মেয়ার?
জলঘোটকী, বাংলায় বিড়বিড় করল কিশোর।
কি বললে?
আঁ...জলঘোটকী, মানে পানির ঘোড়া। বোট...এই কোন নৌকা বা লঞ্চ।
ঠিক বলেছ, তর্জনী দিয়ে জোরে বাতাস কোপাল জিনা। যে জন্যে হ্রদ, সে জন্যে নৌকা। গোসলই যদি না করল, সাঁতার না কাটল আর নৌকা নিয়ে মাছ। ধরতে না গেল, তাহলে এতবড় হ্রদের ধারে কেন বাড়ি করতে যাবে লোকে? নিশ্চয় একটা বোট আছে কোথাও, তাতে চোরাই মাল লুকিয়েছে ব্যাটারা।

কিন্তু অতি সহজে রহস্য ভেদ হয়ে গেল না? সন্দেহ যাচ্ছে না রবিনের। একটা বোটে চোরাই মাল লুকাবে...যে কেউ দেখে ফেলতে পারে বোটটা... তাছাড়া, মেসেজ লেখা কাগজটায় আঁকিবুকিগুলো কিসের?
মুসা, হাত বাড়াল কিশোর, নকশাটা দেখি?
পকেট থেকে চার টুকরো ছেড়া কাগজ বের করে দিল মুসা।
হাসি মুখে ব্যাগ খুলে এক রোল টেপ বের করে দিল জিনা। নাও, কাজে লেগেই গেল। মনে হয়েছিল লাগতে পারে, তাই নিয়েছিলাম।
কাজের কাজ করেছ একটা, কিশোরও হাসল।
টেপ দিয়ে জুড়ে চার টুকরো কাগজ আবার এক করে ফেলা হলো।
এই যে দেখো, নকশায় আঙুল রাখল কিশোর, এখানে চারটে লাইন মিশেছে। প্রত্যেকটা লাইনের শেষ মাথায় লেখা...এত অস্পষ্ট করে লিখেছে... নুয়ে ভালমত দেখে একটা পড়ল সে, টক হিল।...এটা, স্টীপল...
আর এটা চিমনী, রবিন পড়ল তৃতীয় শব্দটা।
আর এটা হলো টল স্টোন, চতুর্থটা পড়ল জিনা।
দিল মাথা গরম করে, হাত ওল্টাল মুসা। বলি, মানে কি এগুলোর?
কিছু তো একটা নিশ্চয়, বলল কিশোর। শব্দগুলো মাথায় নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। সকাল নাগাদ পরিষ্কার হয়ে যেতে পারে।
নকশাটা সাবধানে ভাঁজ করে নিজের কাছে রেখে দিল কিশোর।
আরেকটা অংশ কিন্তু আছে টিকসির কাছে, মনে করিয়ে দিল মুসা। সেটা ছাড়া সমাধান হবে?
হতেও পারে, বলল কিশোর। হয়তো তার কাছেও এটারই আরেক কপি পাঠানো হয়েছে।
তাহলে তো সেও খুঁজতে আসবে এখানে, বলল জিনা। এলে আসবে, মুসা বলল। লুকিয়ে থাকব।
তারও দরকার নেই, মাথা নাড়ল কিশোর। আমাদের কাছে নকশা আছে জানছে কি করে? দেখে ফেললে বলব, ছুটিতে বেড়াতে এসেছি।
তারপর চোখ রাখব তার ওপর, হাসল রবিন। বেটি অস্বস্তি বোধ করবে?
করলে করুক, আমাদের কি... কথা শেষ না করেই চুপ হয়ে গেল মুসা, কিশোরের মুখের দিকে তাকিয়ে।
গম্ভীর হয়ে গেছে গোয়েন্দাপ্রধান। চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল, টিকসি একা আসবে বলে মনে হয় না। হয়তো ডারটিকে নিয়েই আসবে। ডারটির কাছে মেসেজ নেই তো কি হয়েছে? টিকসির কাছে আছে। একই মেসেজ হলে ওই একটাতেই চলবে। ডারটি যদি ওদের সহকারী হয়, কিছুঁতেই তাকে ফেলে আসবে না টিকসি।

হ্যাঁ, তাই তো, মাথা দোলাল রবিন। আর ডারটি মেসেজ পায়নি শুনলে সন্দেহ জাগবে। হুঁশিয়ার হয়ে যাবে।
তার মানে যতটা সহজ মনে হয়েছিল, হাই তুলতে তুলতে বলল রবিন, তত সহজ নয় ব্যাপারটা...এহ্, বড্ড ঘুম পেয়েছে। যাই, শুয়ে পড়ি।
মুসাও হাই তুলল। আমিও যাই।
যার যার বিছানায় শুয়ে পড়ল মুসা আর রবিন। ওদের কাছ থেকে দূরে ঘরের এক কোণে বিছানা পাতল জিনা। শুয়ে পড়ল। তার পায়ের কাছে রাফিয়ান।
একটা রেখে বাকি মোমগুলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল কিশোরও।
দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়ল চারজনেই।
লম্বা হয়ে শুয়ে আছে রাফিয়ান, চোখ বন্ধ, কিন্তু কান খাড়া। সামান্যতম শব্দ হলেই নড়েচড়ে উঠছে।
একবার মৃদু একটা শব্দ হতেই ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। নাক উঁচু করে বাতাস শুকল, পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল সিঁড়ির কাছে। একটা ফাটলে নাক নিয়ে গিয়ে কল, পরক্ষণেই শান্ত হয়ে ফিরে এল আগের জায়গায়। সাধারণ একটা ব্যাঙ।
মাঝরাতের দিকে আবার মাথা তুলল সে। ওপরে রান্নাঘরে খুটখাট শব্দ হচ্ছে। সিঁড়ি বেয়ে নিঃশব্দে উঠে এল ওপরে। চাদের আলোয় পান্নার মত জ্বলে উঠল তার সবুজ চোখ।
দ্রুত চলে যাচ্ছে একটা জানোয়ার। রোমশ মোটা লেজ। শেয়াল। কুকুরের গন্ধ পেয়েই পালাচ্ছে।
সিঁড়ির মুখে অনেকক্ষণ বসে বসে পাহারা দিল রাফিয়ান। সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল আবার।
গলে গলে শেষ হয়ে গেছে মোমটা। ঘর অন্ধকার। অঘোরে ঘুমোচ্ছে সবাই। জিনার পায়ের কাছে এসে আবার শুয়ে পড়ল সে।
সবার আগে ঘুম ভাঙল কিশোরের। শক্ত মেঝেতে শুয়ে পিঠ ব্যথা হয়ে গেছে। চোখ মেলে প্রথমে বুঝতে পারল না কোথায় আছে, আস্তে আস্তে সব মনে পড়ল। সবাইকে ডেকে তুলল সে।
তাড়াহুড়ো করে হাতমুখ ধুয়ে নাস্তা সেরে নিল সবাই। অনেক কাজ পড়ে আছে।
হ্রদের দিকে চলে গেছে একটা সরু পথ। দুই ধারে নিচু দেয়াল ছিল এক সময়, এখন ধসে পড়েছে। শেওলায় ঢেকে গেছে ইট। পথ ঢেকে দিয়েছে লতার জঙ্গল, মাঝে মাঝে ছোট ঝোপঝাড়ও আছে। পথের অতি সামান্যই চোখে পড়ে।
তেমনি নিথর হয়ে আছে কালো হ্রদটা। তবে তাতে, প্রাণের সাড়া দেখা যাচ্ছে এখন। ওদের দেখে কঁক করে পানিতে ডুব দিল একটা জলমুরগী।
বোটহাউসটা কোথায়? আনমনে বলল মুসা। আছে না নেই, তাই বা কে জানে।

হ্রদের ধারের পথ ধরে দ্রুত পা চালানোর চেষ্টা করছে ওরা, পারছে না। নানা রকম বাধা। লতা, ঝোপঝাড় যেন একেবারে পানির ভেতর থেকে গজিয়ে উঠে এসেছে ডাঙায়। বোটহাউস চোখে পড়ছে না।
এক জায়গায় হ্রদ থেকে একটা খাল বেরিয়ে ঢুকে গেছে জঙ্গলেন মধ্যে।
মানুষের কাটা খাল, বলল, কিশোর। নিশ্চয় বোটহাউসে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।
খালের পাড় ধরে এগোল ওরা। খানিক পরেই চেঁচিয়ে উঠল কিশোর, ওই যে! লাতাপাতায় এমন ঢেকে গেছে, বোঝাই যায় না। হাত তুলে দেখাল সে।
দেখল সবাই। সরু হতে হতে এক জায়গায় গিয়ে শেষ হয়েছে খাল। ঠিক সেখানে খালের ওপর নেমে গেছে সরু লম্বা একটা বাড়ি। লতাপাতা ঝোপঝাড়ে এমন ঢেকে ফেলেছে, ভালমত না দেখলে ঠাহরই করা যায় না, ওখানে কোন বাড়িঘর আছে।
মনে হয় ওটাই, খুশি হয়ে উঠেছে মুসা। ওয়াটার মেয়ারকে পেলে হয় এখন।
বৈঁচি আর এক জাতের কাঁটা-গাছই বেশি। ওগুলোর ভেতর দিয়ে পথ করে এগোতে গিয়ে কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে শরীর, কিন্তু উত্তেজনায় খেয়ালই করছে না ওরা।
বাড়ির সামনেটা পানির দিকে, ওটাই সদর। একটা চওড়া সিঁড়ি উঠে গেছে পানির ধার থেকে।
ওখান দিয়ে ওঠার চেষ্টা করল কিশোর। কিন্তু পা রাখতেই ভেঙে পড়ল পচা তক্তা। হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল সে। না, হবে না এদিক দিয়ে। অন্য পথ খুঁজতে হবে।
অনেক খোঁজাখুঁজি করেও আর কোন পথ পাওয়া গেল না।
পুরো বাড়িটাই কাঠ দিয়ে তৈরি। শেওলা জমে রয়েছে সবখানে। এক জায়গায় দেয়ালের তক্তা পচে কালো হয়ে গেছে।
লাথি মারল মুসা। জুতোশুদ্ধ পা ঢুকে গেল পচা কাঠে।
চারজনে মিলে সহজেই দেয়ালের তক্তা ভেঙে বড় একটা ফোকর করে ফেলল। আগে ঢুকল কিশোর। অন্ধকার। বাতাসে কাঠ আর পচা লতাপাতার ভেজা দুর্গন্ধ।
চওড়া সিঁড়িটার মাথায় এসে দাঁড়াল সে। নিচে কালো অন্ধকার পানি, একটা ঢেউও নেই। ফিরে ডাকল, এসো, দেখে যাও।
সিঁড়ির মাথায় এসে নিচে তাকাল সবাই। আবছা অন্ধকার। নৌকা রাখার ছাউনি এটা-বোটহাউস। পানির দিকে মুখ, কিন্তু এখন পুরোপুরি ভোলা নেই। আগাছা আর লতা অনেকখানি ঢেকে দিয়েছে। ছাত থেকে ঝুলছে লতা, নিচের পানির

ভেতর থেকে গজিয়ে উঠেছে জলজ আগাছা, এরই ফাঁক দিয়ে যতখানি আলো আসতে পারছে, আসছে। তবে অন্ধকার তাতে কাটছে না বিশেষ।
চোখে সয়ে এল আবছা অন্ধকার। দেখতে পাচ্ছে এখন।
ওই যে নৌকা! নিচের দিকে দেখিয়ে চেঁচিয়ে উঠল মুসা।
খুঁটিতে বাঁধা। ওই তো, আমাদের ঠিক নিচেই একটা।
মোট তিনটে নৌকা। দুটো অর্ধেক ডুবে রয়েছে পানিতে, দুটোরই গলুই পানির নিচে।
তলা ফুটো হয়ে গেছে বোধহয়, ঝুঁকে নিচে চেয়ে আছে কিশোর। কোমরের বেল্ট থেকে টর্চ খুলে নিয়ে জ্বালল। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে আলো ফেলে দেখল বোটহাউসের ভেতরে।
দেয়ালে ঝোলানো রয়েছে অনেকগুলো দাঁড়। কতগুলো কালচে থকথকে নরম জিনিস রয়েছে কয়েকটা তাকে, পাটাতনে ফেলে বসার গদি, পচে নষ্ট হয়ে গেছে। এক কোণে একটা নোঙর পড়ে আছে। দড়ির বাণ্ডিল সাজানো রয়েছে একটা তাকে। বিষণ্ন পরিবেশ। কথা বললেই বিচ্ছিরি প্রতিধ্বনি উঠছে।
পরিত্যক্ত বোটহাউস ভূতের বাসা—মনে পড়ে গেল মুসার। ভয়ে ভয়ে তাকাল চারদিকে। সে-ও টর্চ খুলে নিল। আলো জ্বেলে ভূত তাড়ানোর ইচ্ছে। নিচু গলায় বলল, ওয়াটার মেয়ার কোনটা?
ওই যে, একটা নৌকার গলুইয়ের কাছে আলো ফেলে বলল কিশোর, ওয়াটার কি যেন? কয়েক ধাপ নামল সে। ও, ওয়াটার লিলি।
আরেকটা নৌকার গলুইয়ের কাছে আলো ফেলল মুসা।
অকটোপাস, বলে উঠল রবিন।
বাহুঁ, চমৎকার, বলল মুসা। একটার নাম ওয়াটার লিলি, আরেকটা একেবারে অকটোপাস। মালিকের মাথায় দোষ ছিল।
আর ওই যে, ওটার কি নাম? তৃতীয় নৌকাটা দেখাল জিন। ওটাই ওয়াটার মেয়ার?
দুটো টর্চের আলো এক সঙ্গে পড়ল নৌকাটার গলুইয়ের কাছে। শুধু এম অক্ষরটা পড়া যাচ্ছে। সাবধানে আরও নিচে নামল কিশোর। তক্তা ভেঙে পানিতে পড়ার ভয় আছে। রুমাল ভিজিয়ে ঘষে ঘষে পরিষ্কার করল নামের জায়গাটা।
হুঁ, বিড়বিড় করল কিশোর, অকটোপাস, লিটল মারমেইড, ওয়াটার লিলি… অকটোপাস, জলকুমারী, জলপদ্ম শিওর, জলঘোটকীও, এই পরিবারেরই মেয়ে…
অকটোপাসটা ছেলে, না? বলল মুসা।
কি জানি, হাত ওল্টাল কিশোর। ওটার মালিকই জানে।

কিন্তু ওয়াটার মেয়ারটা কোথায়? জিনার প্রশ্ন।
পানিতে ওদিকে কোথাও ডুবে আছে? বোটহাউসের মুখের দিকে দেখাল মুসা।
মনে হয় না, মাথা নাড়ল কিশোর। দেখছ না, পানি কম? ডুবে থাকলেও দেখা যেত। তলার বালি পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট।
তবু, আরও নিশ্চিত হওয়ার জন্যে আলো ফেলে দেখল পানির যতখানি চোখে পড়ে। আর কোন নৌকা নেই এখানে।
গেল কোথায় জলঘোটকী, নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে শুরু করল কিশোর। কখন? কিভাবে? কেন?
বোটহাউসের ভেতরটা আরেকবার ভালমত দেখল ওরা। সিঁড়ির কাছে, বোটহাউসের এক পাশের দেয়ালে ঠেস দিয়ে খাড়া করে রাখা হয়েছে কাঠের বড় একটা জিনিস।
কি ওটা? জিনা বলল। ওহহো, ভেলা।
কাছে গিয়ে ভেলাটা ভাল করে দেখল সবাই।
বেশ ভাল অবস্থায়ই আছে, ভেলার গায়ে হাত বোলাল কিশোর। ইচ্ছে করলে আমরা পাঁচজনেই চড়তে পারব এটাতে।
দারুণ মজা হবে, আনন্দে হাত তালি দিয়ে লাফিয়ে উঠল জিনা। ভেলায় চড়তে যা ভাল্লাগে না আমার। নৌকার চেয়েও মজার।
নৌকাও একটা আছে অবশ্য, কিছু ভাবছে কিশোর। ইচ্ছে করলে ওটাতেও চড়া যায়।
আচ্ছা, তিনটে নৌকাই খুঁজে দেখলে হয় না? প্রস্তাব দিল মুসা। লুটের মাল আছে কিনা?
দরকার নেই, বলল কিশোর। তাহলে জলঘোটকীর নাম থাকত না মেসেজে। তোমার সন্দেহ থাকলে গিয়ে খুঁজে দেখতে পারো।
কিশোর পাশা যখন বলছে নেই, থাকবে না।
এক কাজ করো, আবার বলল কিশোর। সন্দেহ যখন হয়েছে, গিয়ে খুঁজে দেখো। এসব ব্যাপারে হেলাফেলা করা উচিত নয়। শিওর হয়েই যাই।
কিন্তু ওয়াটার মেয়ার গেল কোথায়? বলল সে। পরিবারের সবাই এখানে হাজির, আরেকটা গিয়ে লুকাল কোথায়? হ্রদের তীরে কোথাও লুকানো হয়েছে?
হ্যাঁ, তা হতে পারে, ভেলাটা ঠেলছে কিশোর, থেমে গেল। ডাঙায় না হোক, পাড়ের নিচে কোথাও কোন গলিঘুপচিতে লুকিয়ে রেখেছে হয়তো।
চলো না তাহলে, এখনি খুঁজে দেখি, ভেলায় চড়ার লোভ আপাতত চাপা দিল জিনা।

দেয়ালের ভাঙা ফোকর দিয়ে আবার বাইরে বেরোল ওরা। বুক ভরে টেনে নিল তাজা বাতাস। বোটহাউসের দুর্গন্ধ থেকে দূরে আসতে পেরে হাঁপ ছেড়েছে। সব চেয়ে বেশি খুশি হয়েছে রাফিয়ান। অন্ধকার ওই ঘরটা মোটেও ভাল লাগছিল তার। এই তো, কি চমৎকার উষ্ণ রোদ, কি আরামের বাতাস, লেজের রোম কি সুন্দর ফুলিয়ে দেয় ফুঁ দিয়ে।

কোনদিক থেকে শুরু করব? বলল রবিন। ডান, না বাম?

নীরবে পানির ধারে এগিয়ে গেল কিশোর, পেছনে অন্যেরা। ডানেও তাকাল, বায়েও। কিন্তু কোন দিকেই কোন পার্থক্য নেই, দু-দিকেই সমান ঘন ঝোপঝাড়।

পানির কাছাকাছি থাকাই মুশকিল, বলল কিশোর। দেখা যাক তবু। চলো, বাঁ দিক থেকেই শুরু করি।

শুরুতে জঙ্গল তেমন ঘন নয়, পানির কাছাকাছি থাকা গেল। পানির ওপর ঝুঁকে রয়েছে লতানো ঝোপ, যে কোনটার তলায় লুকিয়ে রাখা যায় নৌকা। উঁকি দিয়ে, পাড়ের নিচে নেমে, যতভাবে সম্ভব, নৌকা আছে কিনা দেখার চেষ্টা করল ওরা।

সিকি মাইল পর থেকেই ঘন হতে শুরু করল জঙ্গল। এত ঘন যে পথ করে এগোনোই কঠিন, থাক তো পানির ধারে গিয়ে উঁকি দেয়া। পানির ধারে মাটি রসাল বলেই বোধহয়, জঙ্গল ওখানে আরও বেশি ঘন।

নাহ্, এভাবে হবে না, এক সময় হাল ছেড়ে দিয়ে বলল কিশোর। যা কাঁটা। শেষে চামড়া নিয়ে ফিরতে পারব না।

হ্যাঁ, কাঁটা বেশিই, দুই হাতের তালু দেখছে মুসা, কেটে ছড়ে গেছে, কোন আঁচড়, এত গভীর, রক্ত বেরোচ্ছে। ঠিকই বলেছ, এভাবে হবে না।

অন্য দুজনেরও একই অভিমত। আনন্দ পাচ্ছে শুধু রাফিয়ান। বার বার উৎসুক চোখে তাকাচ্ছে বনের দিকে। বুঝতে পারছে না যেন, এত সুন্দর কাটা আর ঝোপকে কেন পছন্দ করছে না বোকা ছেলে-মেয়েগুলো?

ছেলেরা যখন ফিরল, রীতিমত আহত বোধ করল রাফিয়ান। হতাশ ভঙ্গিতে হেঁটে চলল ওদের পেছনে।

ডানে চেষ্টা করে দেখব নাকি? জিজ্ঞেস করল রবিন।

নাহ্ লাভ হবে না,মাথা নাড়ল কিশোর। ওদিকে আরও বেশি জঙ্গল। খামোকা সময় নষ্ট। তার চেয়ে এক কাজ করি এসো?...ভেলায় চড়ে ঘুরি?

ঠিক বলেছ। দারুণ হবে, সঙ্গে সঙ্গে বলল জিনা। কষ্টও হবে না, তাছাড়া পানির দিক থেকে দেখার সুবিধে অনেক। কোন ঘুপচিই চোখ এড়াবে না। সহজেই খুঁজতে পারব।

ইস্, আগে মনে পড়ল না কেন? আফসোস করল মুসা। তাহলে তো এভাবে হাত-পাগুলো ছুলতে হত না।

জঙ্গলের ভেতর দিয়ে আবার বোটহাউসের দিকে রওনা হলো ওরা।
হঠাৎ থেমে গেল রাফিয়ান। চাপা গর্জন করে উঠল।
কি হয়েছে, রাফি? থেমে গিয়ে নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল জিনা।
আবার গোঁ গোঁ করে উঠল রাফিয়ান।
সাবধানে পিছিয়ে গেল চারজনে। একটা ঝোপের ভেতর থেকে মাথা বের করে তাকাল বোটহাউসের দিকে। কই, কিছুই তো নেই? এমন করছে কেন তাহলে রাফিয়ান?
সবার আগে দেখল মুসা। কিশোরের পাঁজরে কনুই দিয়ে গুঁতো দিল।
এক তরুণী, আর একটা লোক। কথা বলছে।
নিশ্চয় টিকসি, ফিসফিস করে বলল কিশোর।
আর ওই ব্যাটা ডারটি রবিন, মুসা বলল, আমি শিওর।
ওই দুজন আসবে, জানাই আছে ছেলেদের, তাই চমকাল না।
।ডারটিকে চিনতে কোন অসুবিধে হয়নি মুসার। রাতে দেখেছে, সকালেও দেখেছে —চওড়া কাঁধ, সোজা হয়ে দাঁড়ালে সামান্য কুঁজো মনে হয়, মাথায় ঝাকড়া চুল। তবে, তার বাড়িতে তাকে যেমন লেগেছিল, এখন ঠিক ততটা ভীষণ মনে হচ্ছে না।
তবে মেয়েমানুষটাকে কেউই পছন্দ করতে পারছে না, একটুও না। পরনে ডোরাকাটা প্যান্ট, গায়ে রঙিন শার্টের ওপর আঁটসাট জ্যাকেট, চোখে বেমানান রকমের বড় সানগ্লাস, দাঁতের ফাঁকে চুরুট। ওর কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে, তীক্ষ্ণ স্বর।
ও-বেটিই তাহলে টিকসি, ভাবল কিশোর। জেরি ডাকাতকে দেখিনি, তবে ভালই সঙ্গিনী জুটিয়েছে ডাকাতটা।
সঙ্গীদের দিকে ফিরল গোয়েন্দাপ্রধান। রাফিয়ানের গলার বেল্ট টেনে ধরে রেখেছে জিনা, বেরোতে দিচ্ছে না। শোনো, কিশোর বলল, ওদেরকে না চেনার ভান করবে। কথা বলতে বলতে বেরোব আমরা, যেন জঙ্গল দেখতে ঢুকেছিলাম। যদি কিছু জিজ্ঞেস করে, বলবে বেড়াতে এসেছি। উল্টো-পাল্টা যা খুশি বলবে। বোঝাব, আমরা মাথামোটা একদল ছেলে-মেয়ে, স্রেফ ছুটি কাটাতে এসেছি। আর বেকায়দ কোন প্রশ্ন যদি করে, চুপ করে থাকবে, আমি জবাব দেব। ও-কে?
মাথা ঝাঁকাল তিনজনেই।
ঝোপের ভেতর থেকে বেরোল কিশোর হুড়মুড় করে। ডাকল, মুসা, এসো। ওই যে, বাড়িটা দেখা যাচ্ছে। মাই গড়, সকালের চেয়েও খারাপ দেখাচ্ছে এখন।
জিনা আর রাফিয়ান একসঙ্গে লাফিয়ে বেরোল, তাদের পেছনে এল রবিন।
থমকে দাঁড়িয়ে গেল দুই ডাকাত। দ্রুত কি যেন বলল একে অন্যকে। ভুরু কুঁচকে তাকাল লোকটা।

বকবক করতে করতে ওদের দিকে এগোল ছেলেরা।
তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল মেয়েমানুষটা, কে তোমরা? এখানে কি করছ?
বেড়াতে এসেছি, জবাব দিল কিশোর। ঘোরাফেরা করছি। স্কুল ছুটি।
এখানে কেন এসেছ? এটা প্রাইভেট প্রপার্টি।
তাই নাকি? বোকার অভিনয় শুরু করল কিশোর। পোড়া, ভাঙাচোরা বাড়ি, জঙ্গল:যার খুশি এখানে আসতে পারে। আসলে লেকটা দেখতে এসেছি। খুব নাম শুনেছি তো।
পরস্পরের দিকে তাকাল দুই ডাকাত। ছেলেদের দেখে অবাক হয়েছে, বোঝা যায়।
কিন্তু এ-হ্রদ দেখতে আসা উচিত হয়নি, বলল মেয়েমানুষটা। খুব বাজে জায়গা, বিপদ হতে পারে। সাঁতার কাটা কিংবা নৌকা-চড়া এটাতে নিষেধ।
তা-তো বলেনি আমাদেরকে! যেন খুব অবাক হয়েছে কিশোর। নিষিদ্ধ, তাও বলেনি। আপনারা ভুল খবর পেয়েছেন।
বাহ, কি সুন্দর একটা ডাহুক গো! হাত তালি দিয়ে নেচে উঠল রবিন। চোখ বড় বড় হয়ে গেছে হ্রদের দিকে চেয়ে। কি ভাল জায়গা। কত জানোয়ার আর পাখি যে আছে।
বুনো ঘোড়াও নাকি অনেক, মুসা যোগ করল। গতকালই তো দেখলাম কয়েকটাকে। খুব সুন্দর ছিল, না?
দ্বিধায় পড়ে গেল দুই ডাকাত।
কড়া গলায় ধমক দিল ডারটি, চুপ! যত্তোসব! এখানে আসা নিষেধ, শুনছ? ঘাড়ে হাত পড়ার আগে কাটো।
নিষেধ? কণ্ঠস্বর হঠাৎ পাল্টে ফেলল কিশোর, কঠিন হয়ে উঠেছে চেহারা। তাহলে আপনারা এখানে কি করছেন? আর, ভদ্রভাবে কথা বলুন।
তবে রে আমার ভদ্রলোক! চেঁচিয়ে উঠল ডারটি, গেছে মেজাজ খারাপ হয়ে। শার্টের হাতা গোটাতে গোটাতে আগে বাড়ল।
রাফিয়ানের বেল্ট ছেড়ে দিল জিনা।
সামনে এগোল কুকুরটা। ভয়ানক হয়ে উঠেছে চেহারা, ঘাড়ের নোম খাড়া। চাপা ঘড়ঘড় শব্দ হচ্ছে গলার গভীরে।
চমকে গেল ডারটি। পিছিয়ে গেল আবার। ধরো, কুত্তাটাকে ধরো! হারামী জানোয়ার!
হারামী লোকের জন্যে হারামী জানোয়ারই দরকার, শান্ত কণ্ঠে বলল জিনা। তুমি যেমন কুকুর, ও-ও তেমন মুগুর। তোমরা যতক্ষণ কাছে-পিঠে থাকছ, ওকে ছেড়ে রাখব।

চাপা গর্জন করে আরও দুই কদম এগোল রাফিয়ান। চোখে আগুন।
চেঁচিয়ে উঠল মেয়েলোকটা, হয়েছে হয়েছে, রাখো। এই মেয়ে, তোমার কুত্তাটা ধরো। আমার এই বন্ধু না…ওর মেজাজ ভাল না।
আমার এই বন্ধুটিরও মেজাজ খারাপ, রাফিয়ানকে দেখাল জিনা। তোমাদের সইতে পারছে না। ঘাড়ে কামড় দিতে চায়। কতক্ষণ আছ তোমরা?
সেটা তোমাকে বলব কেন? গর্জে উঠল ডারটি।
তার গর্জনের জবাবে দ্বিগুণ জোরে গর্জে উঠল রাফিয়ান। আরেক পা পিছিয়ে গেল ডারটি।
চলো, খিদে পেয়েছে, সঙ্গীদের বলল কিশোর। এদের নিয়ে মাথা ঘামানোর কিছু নেই। আমরা যেমন অন্যের জায়গায় এসেছি, ওরাও এসেছে।
সহজ ভঙ্গিতে হাটতে শুরু করল অভিযাত্রীরা। দুই পা এগিয়ে ফিরে চেয়ে সঁতমুখ খিচিয়ে আরেকবার শাসাল রাফিয়ান, তারপর চলল বন্ধুদের সঙ্গে।
দুই ডাকাতের চোখে তীব্র ঘৃণা, কিন্তু বিশাল কুকুরটার ভয়ে কিছু করতে পারল, দৃষ্টির আগুনে ছেলেদের ভস্ম করার চেষ্টা চালাল শুধু।
ওদেরকে আরও রাগিয়ে দেয়ার জন্যে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল জিনা, রাফি, খেয়াল রাখবি। ব্যাটাটাকে ধরবি আগে।
পোড়া বাড়িটায় পৌঁছল ওরা। বলতে হলো না, রান্না ঘরের দরজায় পাহারায় বসল রাফিয়ান। দুই ডাকাতের দিকে ফিরে মুখ ভেঙচাল একবার, বুঝিয়ে দিল, কাছে এলে ভাল হবে না।
ভাঁড়ারে ঢুকল অন্যেরা। যেটা যেমন রেখে গিয়েছিল, তেমনিই আছে, কেউ হাত দেয়নি।
ঢোকেইনি হয়তো এখনও, বলল কিশোর। দেখেনি। যতটা ভেবেছি, তার চেয়েও বাজে লোক ওই দুটো, টিকসি আর ডারটি।
হ্যাঁ, একমত হলো মুসা, জঘন্য। মেয়েমানুষটা বেশি খারাপ। চেহারাটাও জানি কেমন রুক্ষ।
আমার কাছে ডারটিকেই বেশি খারাপ লেগেছে, রবিন বলল। আস্ত একটা গরিলা। চুল কাটে না কেন?
কি জানি, একটা রুটির মোড়ক খুলতে শুরু করল জিনা। হয়তো ভাবছে সিনেমায় চান্স-টান্স পাবে। টারজানের বিকৃত সংস্করণ।
রাফি না থাকলে কিন্তু বিপদে পড়তাম, বলল রবিন। ও-ই ঠেকিয়েছে ব্যাটাদের।
কি করছে ব্যাটারা, দেখে আসা দরকার, প্রায় অর্ধেকটা পাউরুটি আর এক খাবলা মাখন তুলে নিয়ে সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল মুসা।

আধ মিনিটের মধ্যেই ফিরে এল সে। রুটি আর মাখন শেষ। ব্যাটাকে দেখলাম বোটহাউসের দিকে যাচ্ছে। ওয়াটার মেয়ারকে খুঁজতে বোধহয়।
হুঁ, খেতে খেতে বলল কিশোর। ব্যাপারটা নিয়ে আরও ভালমত ভাবতে হবে। কি করবে ওরা এখন? জানা আমাদের জন্যে খুব জরুরী। হয়তো মেসেজের পাঠোদ্ধার করে ফেলেছে ওরা, কঠিন শব্দ ব্যবহার শুরু করল সে। ওদের ওপর চোখ রাখতে হবে। দুর্বল মুহূর্তে কিছু ফাঁস করে দিতে পারে আমাদের কাছে।
মেসেজের সঙ্গে যে নকশাটা দিয়েছে জেরি, নিশ্চয় তার কোন মানে আছে, আপনমনে বলে যাচ্ছে গোয়েন্দাপ্রধান। হয়তো সেটা বুঝতে পেরেছে ডারটি আর টিকসি। রুটি চিবাতে চিবাতে ভাবনার অতলে তলিয়ে গেল সে। দীর্ঘ নীরবতার পর ভেসে উঠল আবার। আজ বিকেলেই কিছু একটা করতে হবে আমাদের। ভেলাটা ভাসিয়ে বেরিয়ে পড়ব হদে। যে কোন ছেলেমেয়েই তা করতে পারে, এতে কিছু সন্দেহ করবে না দুই ডাকাত। নৌকাটা খুঁজব আমরা। আর যদি হদে বেরোয় টিকসি আর ডারটি, একই সঙ্গে ওদের ওপরও চোখ রাখতে পারব।
চমত্তার বুদ্ধি, আঙুলে চুটকি বাজাল জিনা। দারুণ সুন্দর বিকেল। হদে ভেলা ভাসিয়ে দাঁড় টানা...আউফ! এখুনি বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে।
আমারও, মাথা কাত করল মুসা। ভেলাটা আমাদের ভার সইতে পারলেই হয়.জিনা, আরেক টুকরো কেক দাও তো। বিস্কুট আছে?
অনেক, জবাব দিল রবিন। চকলেটও আছে।
খুব ভাল, এক কামড়ে এক সুইস কেকের অর্ধেকটা কেটে নিয়ে চিবাতে শুরু করল মুসা। এখানেই থাকতে হবে মনে হচ্ছে। খাবারে টান না পড়লেই বাঁচি।
যে হারে গেলা শুরু করেছ, জিনা ফোড়ন কাটল, শেষ না হয়ে উপায় আছে? বিদেশ-বিভুঁই, খাবারের সমস্যা আছে, একটু কম করে খাও না বাবা...
জিনা, হাত বাড়াল কিশোর, জগটা দাও তো, পানি নিয়ে আসি। আর রাফির জন্যে কি দেবে দাও।
ধীরে সুস্থে পুরো আধ ঘণ্টা লাগিয়ে লাঞ্চ শেষ করল ওরা। এবার বোটহাউসে গিয়ে ভেলা নিয়ে বেরোনো যায়।
বোট হাউসের দিকে রওনা হলো ওরা।
হদের দিকে চেয়ে হঠাৎ বলে উঠল কিশোর, দেখো দেখো, ওই যে। নৌকা নিয়ে বেরিয়েছে ব্যাটারা। নিশ্চয় জলকুমারী, ওটাই একমাত্র ডোবেনি। শিওর, জলঘোটকীকে খুঁজছে ওরা।
দাঁড়িয়ে গেল সবাই। মুসার মুখ গোমড়া হয়ে গেল। এত কষ্ট কি শেষে মাঠে মারা যাবে? তাদের আগেই ওয়াটার মেয়ারকে পেয়ে যাবে ওই দুই ডাকাত? ওরা কি জানে, নৌকাটা কোথায় লুকানো।

দেয়ালের ফোকর দিয়ে বোটহাউসে ঢুকল ওরা। সোজা এগোল ভেলার দিকে। ঠিকই আন্দাজ করেছে কিশোর, লিটল মারমেইডকেই নিয়ে গেছে।
ভেলার কোণার চার ধারে দড়ির হাতল লাগানো রয়েছে, ধরে নামানোর জন্যে। চারজনে চারটে হাতল ধরে ভেলাটা তুলে নিয়ে চওড়া সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করল। সতর্ক রয়েছে, ভারের চোটে না আবার ভেঙে পড়ে পুরানো সিঁড়ি।
ভাঙল না। পানির কিনারে চলে এল ওরা।
এবার ছাড়ো, বলল কিশোর। আস্তে।
যতটা পারল আস্তেই ছাড়ল ওরা, কিন্তু ভারি ভেলা। ঝপাত করে পড়ল পানিতে, পানি ছিটকে উঠে ভিজিয়ে দিল ওদের শরীর।
দাঁড়গুলো খুলে নিয়ে এসো, এক কোণার হাতল ধরে রেখেছে কিশোর, নইলে ভেসে যাবে ভেলা। জলদি।
ছোট-বড় বিভিন্ন আকারের দাঁড় ঝোলানো রয়েছে দেয়ালে। ভেলা বাওয়ার জন্যে বিশেষভাবে তৈরি চারটে ছোট দাড়ি রয়েছে ওগুলোর মধ্যে। খুলে নিয়ে আসা হলো ওগুলো।
চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখছে রাফিয়ান। কোন কাজে সহায়তা করতে পারছে না। খারাপ লাগছে তার, বুঝিয়ে দিচ্ছে ভাবেসাবে।
কোণের হাতল ধরেই রয়েছে কিশোর। দাঁড় হাতে আগে উঠল মুসা। বালিতে দাড়ের ঠেকা দিয়ে ভেলা আটকাল। এরপর উঠল জিনা। দুজনেই দাঁড় বাওয়ায় ওস্তাদ। রবিন উঠল। সব শেষে উঠল কিশোর...না না, ভুল হলো, রাফিয়ানের আগে উঠল সে।
রাফি, আয়, হাত নেড়ে ডাকল জিনা। এ-রকম নৌকায় চড়িসনি আগে, কিন্তু অসুবিধে হবে না। আয়।
সিঁড়ি বেয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে পানির কিনারে নেমে এল রাফিয়ান। কালো পানি শুকল একবার, পছন্দ হচ্ছে না। তবে আর ডাকের অপেক্ষা করল না। মস্ত এক লাফ দিয়ে হঠাৎ করে এসে পড়ল ভেলায়।
জোরে ঝাঁকি দিয়ে এক পাশে কাত হয়ে গেল ভেলা।
দ্রুত আরেক পাশে একেবারে কিনারে চলে গেল রবিন, ভারসাম্য ঠিক করল। হেসে বলল, চুপ করে বোস। যা একখান বপু তোমার, নড়াচড়ারই আর জায়গা নেই। ডুবিয়ে মেরো না সব্বাইকে।
রবিনের কথায় কিছু মনে করল না রাফিয়ান। চুপ করে বসল।
বালিতে দাঁড়ের মাথা ঠেকিয়ে লগি-ঠেলার মত করে ভেলাটাকে বোটহাউস থেকে বের করে আনতে শুরু করল মুসা। জিনাও হাত লাগাল। বোটহাউসের মুখের লতাপাতা অনেকখানি পরিষ্কার করে নিয়েছে দুই ডাকাত, নৌকা বের করার

সময়। কাজেই ছেলেদের আর কিছু পরিষ্কার করতে হলো না। সহজেই খালে বেরিয়ে এল ওরা।
শান্ত পানি, ভেলাটাও শান্তই রইল। ঢেউ থাকলে অসুবিধে হত, বোঝা বেশি।
এক সঙ্গে দাঁড় বেয়ে চলল চারজনে।
রাফিয়ান দাঁড়িয়ে দেখছে। ভেলার পাশ দিয়ে সাঁ সঁ করে সরে যাচ্ছে পানি, বেশ মজা পাচ্ছে সে। ভাবছে বোধহয়, এটাও কোন ধরনের নৌকা। সাবধানে সামনের এক পা বাড়িয়ে পানি ছুঁল সে, ঠাণ্ডা, সুড়সুড়ি দিল যেন পায়ে। কুকুরে-হাসি হেসে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল সে, ভোতা নাকটা পানি ছুঁই ছুঁই করছে।
মজার কুকুর তুই, রাফি, বলল রবিন। শুয়েছিস, ভাল। দেখিস, লাফিয়ে উঠিস না হঠাৎ। ভেলা উল্টে যাবে।
খালের মুখের দিকে দ্রুত এগিয়ে চলেছে ভেলা। নৌকাটা দেখা যাচ্ছে না।
ওই যে, ভেলা আরও খানিক দূর এগোনোর পর হাত তুলল কিশোর। হ্রদের মাঝেই আছে এখনও নৌকাটা। লিটল মারমেইড। পিছু নেব নাকি? দেখব কোথায় যায়?
অসুবিধে কি? বলল মুসা।
জোরে জোরে দাঁড় বাইতে শুরু করল সবাই। দুলে উঠল ভেলা।
আরে, ও কি করছ? কিশোরকে বলল মুসা। উল্টোপাল্টা ফেলছ তো। ভেলা এগোবে না, ঘুরবে খালি। এভাবে ফেলো, এই এভাবে, দেখিয়ে দিল সে।
যতই দেখিয়ে দেয়া হোক, বিশেষ সুবিধে করতে পারল না কিশোর আর রবিন। বিরক্ত হয়ে শেষে বলল মুসা, না পারলে চুপ করে বসে থাকো। আমি আর জিনাই পারব। খালি খালি অসুবিধে করবে আরও।
সানন্দে হাত গুটিয়ে বসল কিশোর। দাঁড় বাওয়ার চেয়ে মাথা খাটানো অনেক বেশি পছন্দ তার। তা-ই করল।
জিনা আর মুসাও খুব খুশি, মনের মত কাজ পেয়ে গেছে। ঘেমে উঠছে শরীর। উষ্ণ কোমল রোদ, বাতাস নেই, শরতের নির্মল বিকেল।
দাঁড় বাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে, নৌকাটার দিকে ইশারা করে বলল জিনা। খুঁজছে। কিশোর, কি মনে হয়? আমাদেরটার মতই মেসেজ আছে ওদের কাছে? ইস্ যদি দেখতে পারতাম।
কিশোরের নির্দেশে দাঁড় বাওয়া বন্ধ করল মুসা আর টিকসি। এতই ঝুঁকেছে, কপালে কপাল লেগে গেছে প্রায়।
আস্তে দুই টান দাও তো, বলল কিশোর। আরেকটু কাছে এগোই। দেখি, কি দেখছে ব্যাটারা।

নৌকার একেবারে পাশে চলে এল ভেলা। ঘেউ ঘেউ করে উঠল রাফিয়ান। চমকে মুখ তুলে তাকাল দুই ডাকাত। ছেলেদের দেখে কালো হয়ে গেল মুখ।
হাল্লো, দাঁড় তুলে নাড়ল মুসা, হাসি হাসি মুখ। চলেই এলাম। খুব ভাল চলছে ভেলা। তোমাদের নৌকা কেমন?
রাগে লাল হয়ে গেল টিকসির মুখ। চেঁচিয়ে বলল, কাকে বলে ভেলা বের করেছ? বিপদে পড়বে।
তাই তো জিজ্ঞেস করতে এলাম, কিশোর বলল, তোমরা কাকে জিজ্ঞেস করে নৌকা বের করেছ। গিয়ে অনুমতি নিয়ে আসব তার কাছ থেকে।
হেসে উঠল জিনা, গা জ্বালিয়ে দিল দুই ডাকাতের।
কোন জবাব খুঁজে না পেয়ে রাগে ফুলতে শুরু করল টিকসি। ডারটির ভাব দেখে মনে হলো, দাড়ই ছুড়ে মারবে কিশোরের মুখে। গর্জে উঠল, কাছে আসবি না বলে দিলাম। মেরে তক্তা করে দেব।
রাগ করছ কেন, ভাই? মোলায়েম গলায় বলল মুনা। আমরা তো ঝগড়া মিটিয়ে ফেলতে এলাম। ভাব করে নেওয়া ভাল না?
আবার হেসে উঠল জিনা, বিছুটি ডলে লাগাল যেন ডাকাতদের চামড়ায়। .
পারলে ছেলেদের এখন টুকরো টুকরো করে ছিড়ে ফেলে ওরা। কিন্তু সামলে নিল টিকসি। নিচু গলায় দ্রুত কিছু পরামর্শ করল ডারটির সঙ্গে। রাগে বার দুই মাথা ঝাঁকাল গরিলাটা, কিন্তু শেষে মেনে নিল টিকসির কথা। পঁাড় তুলে নিয়ে ঝপাং করে ফেলল পারিতে, দ্রুত বেয়ে চলল।
চালাও, বলল কিশোর। পিছু নাও, সে-ও নিষ্ক্রিয় রইল না আর, অসুবিধে করে যতটুকু সম্ভব সাহায্য করতে চায় দাঁড় বাওয়ায়। …
পশ্চিম তীরের দিকে নৌকা নিয়ে যাচ্ছে ডারটি। ভেলাটাও পিছে লেগে রইল। মাঝপথেই সাঁই করে নৌকার মুখ ঘোরাল।
নৌকা হালকা, ভেলা ভারি, চলনও নৌকার চেয়ে ভারি। ফলে, চারজনে বেয়েও একজনের সঙ্গে তাল রাখতে হিমশিম খাচ্ছে। ঘনঘন ওঠানামা করছে বুক।
ডান তীরে নৌকা নিয়ে গেল ডারটি। ভেলাটা কাছাকাছি হওয়ার অপেক্ষায় রইল।
ভাল এক্সারসাইজ, তাই না? ডেকে বলল টিকসি। স্বাস্থ্যের জন্যে ভাল।
আবার হ্রদের মাঝখানে রওনা দিল নৌকা।
খাইছে! হুঁসস করে মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল মুসা। হাত অবশ হয়ে যাচ্ছে আমার। কি করছে ব্যাটারা?
খামোকা খাঁটিয়ে নিচ্ছে, দাঁড় তুলে ফেলেছে কিশোর। আমরা থাকলে জলঘোটকীকে আর খুঁজবে না। খেলাচ্ছে আমাদের।

তাহলে আর খেলতে যাচ্ছি না আমি, বুড়ো আঙুল নাড়ল মুসা। দাঁড় তুলে রেখে চিত হয়ে শুয়ে পড়ল, হাঁপাচ্ছে।
অন্যেরাও বিশ্রাম নিতে লাগল।
বন্ধুদের অবস্থা দেখে করুণা হলো যেন রাফিয়ানের, উঠে এসে এক এক করে গাল চেটে দিল চারজনেরই। তারপর ভুল করে বসে পড়ল জিনার পেটের ওপর।
হেই রাফি! আরে, দম বন্ধ হয়ে গেল তো আমার। কুকুরটাকে জোরে ঠেলে দিল জিনা। ভারিও বটে! বাপরে বাপ!
খুব অন্যায় হয়ে গেছে, বুঝতে পারল রাফিয়ান। আরেকবার জিনার গাল চেটে দিতে গেল।
এত বেশি শ্রান্ত, এসব ভাল লাগছে না জিনার। থাপ্পড় দিয়ে সরিয়ে দিল কুকুরটার মুখ।
নৌকাটা কই? উঠে বসে দেখার শক্তিও নেই যেন রবিনের।
গোঙাতে গোঙাতে উঠে বসল কিশোর। ওফফ, বিকৃত করে ফেলল মুখ, পিঠটা গেছে। ব্যথাআ! গেল কই হতচ্ছাড়া নৌকা...ও, ওই যে, খালের দিকে যাচ্ছে। আপাতত জলঘোটকী খোঁজা বাদ।
আমাদেরও বাদ দেয়া উচিত, হাতের পেশী টিপতে টিপতে বলল রবিন। যা ব্যথা হয়েছে, কালও বেরোতে পারব কিনা...হেই রাফি, সর! আমার ঘাড়ে কি মধু? যা, চাটতে হবে না।
চলো, আমরাও ফিরে যাই, বলল কিশোর। অনেক দেরি হয়ে গেছে। এখন আর নৌকা খোঁজার সময় নেই।
চলো, জিনা বলল। দাঁড়াও আরেকটু জিরিয়ে নিই। আরি, আবার বসল দেখি পায়ের ওপর....এই রাফি, সর। লাথি মেরে ফেলে দেব কিন্তু পানিতে।
কিন্তু লাথি আর মারতে হলো না। পানিতে পড়ার শব্দ হলো। লাফিয়ে উঠে বসল জিনা। ভেলায় নেই রাফিয়ান।
পানিতে সাঁতার কাটছে। খোশমেজাজেই আছে।
কি আর করবে বেচারা? হেসে বলল মুসা। সবাই খালি দূর দূর করছ। ভেলায় নেই জায়গা। বসবে কোথায় ও? মনের দুঃখে তাই আত্মহত্যা করে জ্বালা জুড়োতে চাইছে।
তুমি ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছ, রেগে উঠল জিনা।
হ্যাঁ, মাথা দোলাল মুসা। খেয়েদেয়ে তো আর কাজ নেই আমার।
তাহলে পড়ে কি করে?
আমি কি জানি?
দেখো, আমার সঙ্গে ওভাবে কথা বলবে না...

তো কিভাবে…
আহ, কি শুরু করলে? ধমক দিল কিশোর। চুপ করো। রাফিকে টেনে তোলা দরকার। নিজে নিজে উঠতে পারবে না ও।
টেনেহিঁচড়ে ভেলায় তোলা হলো রাফিয়ানকে। মুসাই সাহায্য করল বেশি। লজ্জিত হয়েছে জিনা। এখন আবার মুসার সঙ্গে ভাব জমানোর চেষ্টা করছে।
উঠেই জোরে গা ঝাড়া দিল রাফিয়ান। পানি ছিটিয়ে ভিজিয়ে দিল সবার চোখমুখ। এহহে, পরিস্থিতি সহজ করার জন্যে হেসে উঠল রবিন, ব্যাটা নিজেও ভিজেছে, আমাদেরও ভেজাচ্ছে।
দেখতে দেখতে আবার সহজ হয়ে এল ওরা। তখন এত বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, মেজাজ ঠিক রাখতে পারছিল না কেউই।
খুব সুন্দর বিকেল। স্বপ্নিল হয়ে উঠেছে কিশোরের চোখ। ধীরে ধীরে দাঁড় টানছে জিনা আর মুসা। হ্রদের কালচে নীল পানিতে ঢেউয়ের রিঙ তৈরি হচ্ছে, বড় হতে হতে ছড়িয়ে গিয়ে ভাঙছে সোনালি ঝিলিক তুলে। ভেলার দুপাশেও সোনালি : ফেনা। পাশে সঁতার কাটছে দুটো জলমোরগ, বিচিত্র ভঙ্গিতে মাথা ঘোরাচ্ছে আর কিক কিক করছে, আসছে ভেলার সঙ্গে সঙ্গে।
পানির কিনারে পাড়ের ওপর গড়িয়ে ওঠা বড় বড় গাছগুলোর মাথা ছাড়িয়ে চলে গেছে রবিনের নজর। সিঁদুর-লাল আকাশ। মাইলখানেক দূরের পাহাড়ী ঢালে বিশেষ একটা জিনিস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তার।
উঁচু একটা পাথর।
সেটার দিকে হাত তুলে বলল রবিন, কিশোর, দেখো? ওই যে পাথরটা। সীমানার চিহ্ন? অনেক বড় কিন্তু।
কই? কিশোর বলল। ও, ওটা? কি জানি, বুঝতে পারছি না।
অনেক লম্বা… বলতে গেল মুসা।
কথাটা ধরে ফেলল কিশোর। কি যেন মনে পড়ে গেছে। লম্বা! টল স্টোন। নকশায় লেখা রয়েছে না?
হ্যাঁ, তাই তো, মাথা ঝাঁকাল মুসা। চেয়ে আছে দূরের পাথরটার দিকে।
চার জোড়া চৌখই এখন ওটার দিকে। ভেলা চলছে। আস্তে আস্তে গাছপালার আড়ালে হারিয়ে গেল পাথরটা।
টল স্টোন, আবার বিড়বিড় করল কিশোর। ভুলেই গিয়েছিলাম।
তোমার কি মনে হয়, জিনা বলল, ওটার তলায়ই লুকানো আছে লুটের মাল?
না, মাথা নাড়ল কিশোর। হয়তো একটা দিক-নির্দেশ…এই, জলদি বাও। তাড়াতাড়ি ফেরা দরকার, রাতের আগে।

বোটহাউসে ঢুকল ভেলা। খুঁটিতে আগের জায়গায় বাঁধা রয়েছে লিটল মারমেইড, ডারটি আর টিকসি নেই।
গেল কোথায়? টর্চ জ্বেলে দেখছে কিশোর। শোনো, ভেলাটা এখানে রাখা ঠিক না। চলো, কোন ঝোপের তলায় লুকিয়ে রাখি।
ঠিকই বলেছে কিশোর। অন্যেরাও একমত হলো। হাত অবশ হয়ে গেছে। তবু কোনমতে ভেলাটা আবার বের করে এনে পানির ওপর এসে পড়া কিছু ডালপাতার তলার শেকড়ে শক্ত করে বাঁধল।
লতা আর শেকড় ধরে ধরে পাড়ে উঠে রওনা হলো আস্তানায়। চোখ চঞ্চল দুই ডাকাতকে খুঁজছে। ছায়াও দেখা যাচ্ছে না ওদের। পোড়া বাড়িতে ভাড়ারে ঢুকে বসে নেই তো?
আগে রাফিয়ানকে ঢুকতে বলল ওরা।
সিঁড়িমুখে মাথা ঢুকিয়ে দিল রাফিয়ান। শব্দ করল না। সিঁড়ি টপকে নেমে গেল নিচে।
নেমেই গোঁ গোঁ করে উঠল।
কি ব্যাপার? বলল কিশোর। বসে আছে নাকি নিচে?
মনে হয় না, মাথা নাড়ল জিনা। অন্য কিছু। কী?
চলো না, নেমেই দেখি, সিঁড়িতে পা রাখল জিনা।
বিছানা যেভাবে করে রেখে গিয়েছিল, ঠিক তেমনি রয়েছে। ব্যাজ আর কাপড় চোপড়ও রয়েছে জায়গামত। মোম জ্বেলে টর্চ নিভিয়ে দিল কিশোর।
কি হয়েছে, রাফি? জিজ্ঞেস করল জিনা। এমন করছিস কেন?
গোঙানি থামছে না রাফিয়ানের।
গন্ধ পেয়েছে নাকি? চারপাশে তাকিয়ে বলল মুসা। ওরা এসেছিল এখানে?
আসতেও পারে, রবিন বলল।
মরুকগে, হাত নাড়ল মুসা। খিদে পেয়েছে। কিছু খেলে কেমন হয়?
ভালই হয়, আমারও খিদে পেয়েছে, বলতে বলতে আলমারির দিকে এগোল কিশোর। কিন্তু টান দিয়ে দরজা খুলেই স্থির হয়ে গেল।
নেই!
অথচ ওখানেই রেখে গিয়েছিল সব খাবার। থালা-বাসন, প্লেট-কাপ, সব সাজানোই রয়েছে আগের মত, নেই শুধু খাবারগুলো। রুটি নেই, বিস্কুট নেই, চকলেট নেই...কিচ্ছু নেই।
কিশোরের ভাব দেখেই বুঝল অন্যেরা, কিছু একটা অঘটন ঘটেছে। এগোল আলমারির দিকে।

খাইছে! আঁতকে উঠল মুসা। কিছুই তো নেই। একটা বিস্কুটও না। ইস আগেই ভাবা উচিত ছিল। আল্লাহরে, কি খেয়ে বাঁচি এখন!।
খুব চালাকি করেছে, রবিন বলল। জানে, খাবার ছাড়া থাকতে পারব না এখানে। আমাদের তাড়ানোর এটাই সবচেয়ে ভাল কৌশল। রাতে খিদেয় মরব, সকালে উঠেই দৌড়াতে হবে গায়ে, অনেক সময় পাবে ওরা।
মাথায় হাত দিয়ে ধপ করে তালমারির কাছেই বসে পড়ল মুসা। গায়ে। যাওয়ারও সময় নেই এখন। যা পথ-ঘাট, অন্ধকার! উফ, খিদেও পেয়েছে। নাহ্ রাতটা টিকব না।
মন খারাপ হয়ে গেছে সবার। কতক্ষণ আর খিদে সওয়া যায়? ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে শরীর, ভেবেছিল খেয়েদেয়ে চাঙা হবে, তার আর উপায় নেই।
বিছানায় বসে দীর্ঘশ্বাস ফেলল রবিন। একবার ভেবে ছিলাম, কয়েকটা চকলেট সরিয়ে রেখে যাই, রাখলাম না...রাফি, ওভাবে আলমারির দিকে চেয়ে লাভ নেই। কিচ্ছু নেই ওতে।
আলমারি শুকছে, আর করুণ চোখে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে রাফিয়ান।
হারামীগুলো কোথায়? হঠাৎ রেগে গেল কিশোর। ব্যাটাদের একটা শিক্ষা দেয়া দরকার। বুঝিয়ে দেয়া দরকার লোকের খাবার চুরি করার ফল।
হুফ, পুরোপুরি একমত হলো রাফিয়ান।
সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল কিশোর। দুই ডাতাক কোথায়? ভাঙা, শূন্য দরজার কাছে গিয়ে দূরে তাকাল।
বনের মাঝে এক জায়গায় দুটো তাবু খাটানো হয়েছে। তাহলে ওখানেই ঘুমানোর ব্যবস্থা করেছে, ভাবল সে। চোরগুলোকে গিয়ে গালাগাল করে আসবে নাকি? হ্যাঁ, তাই যাবে।
আয়, রাফি, বলে পা বাড়াল কিশোর।
কিন্তু তাঁবুতে কেউ নেই। কয়েকটা কম্বল, একটা প্রাইমাস স্টোভ, একটা কেটলি আর অন্যান্য কিছু দরকারী জিনিস অগোছাল হয়ে পড়ে আছে। একটা তাঁবুর কোণে গাদা করে রাখা আছে কি যেন, কাপড় দিয়ে ঢাকা।
টিকসি আর ডারটি গেল কোথায়?
খুঁজতে বেরোল কিশোর।
পাওয়া গেল হ্রদের ধারে গাছের তলায়, পায়চারি করছে। কথা বলছে। বাহ, সান্ধ্যভ্রমণ, মুখ বাঁকাল সে। দাঁড়িয়ে পড়ল। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে, ভাবছে কিছু। যে কাজে এসেছিল, সেটা না করে ফিরে চলল আস্তানায়।
পেছনে রাফিয়ান, বাতাসে কি যেন শুকতে শুকতে চলেছে।

তাঁবু খাঁটিয়েছে, বন্ধুদের জানাল কিশোর। ব্যাটারা রয়েছে লেকের পাড়ে। লুটের মাল না নিয়ে যাবে না।
আরে রাফি কোথায়? সিঁড়িমুখের দিকে চেয়ে আছে জিনা। কিশোর, কোথায় ফেলে এলে ওকে?
পেছনেই তো আসছিল: দেখি তো, সিঁড়ির দিকে পা বাড়াতে গিয়ে থেমে গেল কিশোর। ওপরে মেঝেতে পরিচিত নখের শব্দ।
সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল রাফিয়ান।
আরে, দেখো, মুখে করে কি জানি নিয়ে এসেছে। বলে উঠল জিনা।
তার কোলের কাছে এনে জিনিসটা রাখল রাফিয়ান।
বিস্কুটের টিন! চেঁচিয়ে উঠল মুসা। পেল কই?
নীরব হাসিতে ফেটে পড়ল কিশোর। বলল, আমি যা করব ভাবছিলাম, রাফিই। সেটা করে ফেলল। তাঁবুতে কাপড়ে ঢাকা রয়েছে খাবার, অনেক খাবার। ফিরে এসেছি, সবাই মিলে গিয়ে লুট করে আনার জন্যে। আর দরকার হবে না।
আবার সিঁড়ি দিয়ে উঠে যাচ্ছে রাফিয়ান।
ওরা যেমন করমচা, আমরা তেমনি বাঘা তেঁতুল, হাসতে হাসতে বলল মুসা। কারও চেয়ে কেউ কম নই।...রাফিটা আবার গেল?
যাক, বলল জিনা।
এক মিনিটের মধ্যেই ফিরে এল রাফি। মুখে বাদামী কাগজে মোড়া মস্ত এক প্যাকেট।
বিশাল কেক।
হেসে গড়াগড়ি খেতে শুরু করল গোয়েন্দারা।
রাফি, তুই একটা বাঘের বাচ্চা, হাসি থামাতে পারছে না মুসা।
আরে না, সিংহের, শুধরে দিল জিনা।
আমার তো মনে হয় ওর বাপ বাবুর্চি ছিল, পেট চেপে ধরেছে রবিন, চোখের কোণে পানি। বেছে বেছে পছন্দসই খাবারগুলো আনছে।
আবার চলে গেছে রাফিয়ান। ফিরে এল শক্ত মলাটের একটা বাক্স নিয়ে। গরুর মাংসের বড়া।
তাজ্জব করে দিল দেখি। বলল মুসা। কোথায় পেটে পাথর বাঁধার কথা ভাবছিলাম, আর হাজির হয়ে গেল একেবারে রাজকীয় ভোগ...
দারুণ হয়েছে, মাথা ঝাঁকাল কিশোর। আমাদেরগুলো ব্যাটারা নিয়েছে, আমরা ওদেরগুলো নিয়ে এসেছি। রাফি, আবার যা।
কিশোরের বলার আগেই রওনা দিয়েছে রাফিয়ান।
কি আনে, দেখার জন্যে উৎসুক হয়ে রইল চারজন।

নিয়ে এল আরেক বাক্স মাংসের কাবাব।
তুই একটা সাংঘাতিক লোক, রাফি! উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল মুসা, খুব ভাল মানুষ। এত সুগন্ধ, তা-ও ছুঁয়েও দেখছিস না। আমি হলে তো চাখার লোভ সামলাতে পারতাম না।
খাবার চুরি করার নেশায় পেয়েছে রাফিয়ানকে। যাচ্ছে-আসছে, যাচ্ছেআসছে, প্রতিবারেই মুখে করে নিয়ে আসছে একটা কিছু।
এবার ওকে থামানো দরকার, বলল কিশোর। যথেষ্ট হয়েছে। যা নিয়েছিল ব্যাটারা, তার তিনগুণ এসেছে।
থাক, শুধু আরেকবার, হাত তুলল জিনা। দেখি, এবার কি আনে।
টেনে-হিঁচড়ে ইয়া বড় এক বস্তা নিয়ে হাজির হলো রাফিয়ান।
আবার হাসাহাসি শুরু হলো। না ঠেকালে সব নিয়ে আসবে। কিছু রাখবে না, শূন্য করে দিয়ে আসবে।
রাফি, বেল্ট টেনে ধরল জিনা, আর না। শুয়ে পড়, জিরিয়ে নে। বাঁচালি আমাদের।
প্রশংসায় খুব খুশি হলো রাফিয়ান। জিনার গালটা একবার চেটে দিয়ে গড়িয়ে পড়ল তার পায়ের কাছে। জিভ বের করে হাঁপাচ্ছে।
বস্তাটা খুলল মুসা। ঘরে বানানো পাউরুটি আর বনরুটি। হুররে... আনন্দে নাচতে শুরু করল সে। রাফি, তো পায়ে হাত দিয়ে সালাম করতে ইচ্ছে করছে।
কি বুঝল কুকুরটা কে জানে, একটা পা বাড়িয়ে দিল।
নাও, করো এবার, হা-হা করে হেসে উঠল কিশোর। সবাই যোগ দিল হাসিতে।
পেট পুরে খেলো ওরা। রাফিয়ানের পেট ফুলে ঢোল, নড়তে পারছে না ঠিকমত। হাস্যকর ভঙ্গিতে পেটটাকে দোলাতে দোলাতে উঠে গেল সিঁড়ি বেয়ে, পানি খাওয়ার জন্যে। কল ছেড়ে দিল জিনা। সামনের দুই পা সিংকে তুলে দিয়ে পানি খেলো রাফিয়ান।
সিংক থেকে থাবা নামিয়েই স্থির হয়ে গেল সে। ঘুরে বনের দিকে চেয়ে ঘেউ ঘেউ করে উঠল।
ছুটে এল সবাই। ঝোপঝাড়ের ওপর দিয়ে ডারটির মাথা দেখা যাচ্ছে। এদিকেই আসছে।
কাছে এসে চেঁচিয়ে উঠল সে, আমাদের খাবার চুরি করেছ?
কে বলল? চেঁচিয়ে জবাব দিল কিশোর, আমাদের খাবারই আমরা ফিরিয়ে এনেছি।
এত্তবড় সাহস, আমার তাঁবুতে হানা... রাগে বাকরুদ্ধ হয়ে গেল ডারটির। ঝাঁকড়া চুল নাড়ল, সঁঝের আবছা আলোয় অদ্ভুত দেখাচ্ছে তার চেহারা, চুলের জন্যে।

না আমরা যাইনি, সহজ কণ্ঠে বলল কিশোর, রাফি গিয়েছিল। আমরা বরং ঠেকিয়েছি, নইলে রাতে তোমাদের খাওয়া জুটত না। আমাদের তো উপোস। রাখতে চেয়েছিলে, আমরা তোমাদের মত অত ছোটলোক নই...না, না, আর কাছে এসো না, রাফি রেগে যাবে। আর হ্যাঁ, সারা রাত পাহারায় থাকবে ও। গায়ে ওর সিংহের জোর, মনে রেখো।
গররর, এত জোরে গর্জন করল রাফিয়ান, লাফিয়ে উঠল ডারটি। তার মনে হলো সিংহেরই গর্জন।
ভীষণ রাগে হাত নেড়ে ঝটকা দিয়ে ঘুরল সে। চলে গেল।
সিঁড়িমুখে রাফিয়ানকে মোতায়েন করে ভাঁড়ারে ফিরল চারজন।
ব্যাটাদের বিশ্বাস নেই, চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর।
নিশ্চয় পিস্তল-টিস্তল কিছু আনেনি, নইলে এতক্ষণে গুলি করে মারত রাফিকে।
তাড়াতাড়ি করা দরকার আমাদের, বলল রবিন। মালগুলো খুঁজে বের করে নিয়ে পালানো দরকার। ঠিকই বলেছ, ব্যাটাদের বিশ্বাস নেই। কখন যে কি করে... আচ্ছা, নকশা নিয়ে বসলে কেমন হয়? টল স্টোন তো দেখেছি।
নকশা বের করে সমাধান করতে বসল ওরা।
এই যে, একটা রেখার মাথায় আঙুল রাখল কিশোর। তাহলে, এটার উল্টো দিকে টক হিল, এই যে, আরেক মাথায় আঙুল রাখল।
তুমি ভাবতে থাকো, চিত হয়ে শুয়ে পড়ল মুসা। আমি একটু গড়িয়ে নিই। গতর খাটানোর দরকার পড়লে ডেকো।
মোমের আলোয় গভীর মনোযোগে নকশাটা দেখছে কিশোর। ঘন ঘন চিমটি কাটছে নিচের ঠোঁটে। বিড়বিড় করল, চারটে...টল স্টোন...টক হিল-চিমনি... স্টীপল। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, ইউরেকা! ইউরেকা!
লাফিয়ে উঠে বসল মুসা। আমেরিকা আবিষ্কার করলে নাকি?
না, লুটের মাল।
কোথায়? ঘরের চারদিকে তাকাল গোয়েন্দা-সহকারী। চোখে বিস্ময়।
আরে ওখানে না, এখানে, নকশাটায় হাত রাখল গোয়েন্দাপ্রধান। বুঝে গেছি।
এক এক করে ধরা যাক, উত্তেজনায় মৃদু কাঁপছে কিশোরের গলা। টু-ট্রীজ। এই যে, এখানে। ব্ল্যাক ওয়াটার। যেখানে লুটের মাল লুকানো রয়েছে। ওয়াটার মেয়ার। যার মধ্যে লুকানো রয়েছে। হ্রদের পানিতে কোথাও লুকিয়ে রেখেছে নৌকাটা।
বলে যাও, জিনা আর রবিনকে ঠেলে সরিয়ে এগিয়ে বসল মুসা।
টিকসি হয়তো জেরির পুরানো বান্ধবী, বলল কিশোর, তাহলে জেরির কাজকর্মের সঙ্গে পরিচয় আছে তার। নকশার মানে বুঝে ফেলেছে। বুঝেছে, কোথায় লুকানো

রয়েছে নৌকাটা।
কাগজের এক জায়গায় তর্জনী দিয়ে খোঁচা মারল সে। এখন দেখি, আমরা কি বুঝেছি। টল স্টোন তো দেখেছি আমরা, নাকি? বেশ। লেকের এমন কোন জায়গা আছে, যেখান থেকে শুধু টল স্টোন নয়, টক হিল, চিমনি, স্টীপলও দেখা যাবে। চারটে জিনিসই এক জায়গা থেকে দেখা যাবে। এবং ওই জায়গায়ই লুকানো রয়েছে লুটের মাল।
অন্য তিনজন নীরব।
আমি একটা গাধা, সরল মনে স্বীকার করল মুসা। এই সহজ ব্যাপারটা বুঝলাম না। লুটের মাল রয়েছে, তারমানে ওয়াটার মেয়ারকেও ওখানেই পাওয়া যাবে। গিয়ে খালি তুলে নেয়া।
হ্যাঁ, বলল কিশোর। তবে ডারটি আর টিকসির কথা ভুলো না। আমাদের আগে ওরাও গিয়ে হাজির হতে পারে, তুলে নিতে পারে জিনিসগুলো। কেড়ে নিতে পারব না, আমরা পুলিশ নই। নিয়ে সোজা চলে যাবে, রুখতেও পারব না।
সবাই উত্তেজিত।
তাহলে তো কাল ভোরেই যাওয়া উচিত, বলল রবিন। আলো ফুটলেই বেরিয়ে পড়ব। ডারটি আর টিকসির আগেই গিয়ে তুলে নেব। ইস, একটা অ্যালার্মক্লক থাকলে ভাল হত।
ভেলায় করে চলে যাব, মুসা বলল। বাকি তিনটে চিহ্ন খুঁজে বের করে...
তিনটে নয়, দুটো, বাধা দিয়ে বলল কিশোর। চিমনিটা টু-ট্রীজেই রয়েছে। খেয়াল করোনি, এ-বাড়িটার বায়ে উঁচু একটা চিমনি?
আমি করেছি, রবিন বলল।
আরও কিছুক্ষণ পরামর্শ আর আলাপ-আলোচনার পর ঠিক হলো, ভোরে উঠেই বেরোবে। রাত বেশি না করে শুয়ে পড়ল ওরা, নইলে সকাল সকাল উঠতে পারবে না।
সিঁড়িমুখের কাছে শুয়ে আছে রাফিয়ান, চোখ বন্ধ, কান সজাগ।
সারাদিন অনেক পরিশ্রম করেছে, শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল ছেলেরা।
কেউ বিরক্ত করল না সে-রাতে। খাবারের গন্ধে লোভ সামলাতে না পেরে চুপি চুপি এসে উঁকি দিল একবার সেই শেয়ালটা। নড়লও না. রাফিয়ান, চোখও মেলল না, চাপা গলায় গরগর করল শুধু একবার। তাতেই যা বোঝার বুঝে নিয়ে ফোলা লেজ আরও ফুলিয়ে পালাল শেয়াল মহাশয়। কর্কশ চিল্কার করে উঠল একটা হুতুম পেঁচা। ওটার সঙ্গে গলা মিলিয়ে কা-কা করল একটা দাড়কাক, ঘুমিয়ে পড়ল আবার।

হামাগুড়ি দিয়ে এল যেন আবছা আলো, বনের কালো অন্ধকারকে কঠিন হাতে তাড়ানোর সাহস নেই বুঝি। উঠে গা ঝাড়া দিয়ে ভাঙা দরজার কাছে এগোল রাফিয়ান। তঁাবু দুটো দেখল। চোখে পড়ল না কাউকে। ফিরে এসে সিঁড়ি দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে নেমে এল ভাড়ারে।
সঙ্গে সঙ্গে জেগে গেল মুসা আর কিশোর।
কটা বাজে? ঘড়ি দেখেই চমকে উঠে বসল কিশোর। সাড়ে সাতটা।
খাইছে! আঁতকে উঠল মুসা। এই ওঠো ওঠো। দুপুর হয়ে গেছে।
দ্রুত হাত মুখ ধুয়ে, দাঁত মেজে, চুল আঁচড়ে নিল ওরা। পরনের কাপড় ঝেড়ে নিল হাত দিয়ে। তাড়াতাড়ি খাবার বেড়ে দিল রবিন আর জিনা। নাকেমুখে কোনমতে খাবারগুলো খুঁজে দিয়ে সিংকের কল থেকে পানি খেলো।
বেরোনোর জন্যে তৈরি।
তাবুর কাছে কাউকে দেখা যাচ্ছে না।
গুড, বলল কিশোর। ঘুম থেকে ওঠেনি। আমরাই আগে যাচ্ছি।
ভেলায় চড়ে বসল অভিযাত্রীরা। দাঁড় তুলে নিল হাতে। সবাই উত্তেজিত, রাফিয়ানও।
আগে টল স্টোনটা বের করি, ঝপাত করে পানিঙে দাঁড় ফেলল কিশোর।
হ্রদের মাঝখানে চলে এল ওরা। টল স্টোন চোখে পড়ছে না। চেয়ে চেয়ে চোখ ব্যথা করে ফেলল। গেল কোথায় উঁচু পাথরটা?
সবার আগে দেখল মুসা। চেঁচিয়ে বলল, ওই যে, ওইই, উঁচু গাছগুলোর পরে...
টল স্টোন তো পাওয়া গেল, বলল কিশোর। এই, তোমরা উল্টোদিকে চাও তো, টক হিল দেখা যায় কিনা? কোন পাহাড়-টাহাড়? আমি টল স্টোনের ওপর চোখ রাখলাম। দরকার হলে ভেলটা সামনে পেছনে কোরো।
টক হিলও মুসাই আগে দেখল। পেয়েছি। বলল সে। ওটাই। দেখো দেখো, অদ্ভুত একটা পাহাড়, পিরামিডের মত চূড়া: কিশোর, টল স্টোন এখনও দেখা যাচ্ছ?
হ্যাঁ, বলল কিশোর। তুমি পাহাড়টা থেকে চোখ সরিও না। জিনা, দেখো তো স্টীপল দেখা যায় কিনা? টল স্টোনের ওপর থেকে মুহূর্তের জন্যে চোখ সরাচ্ছে না সে। দেখো, পুরানো বাড়ি, গির্জা, মন্দিরের চূড়া বা স্তম্ভ...
দেখেছি, দেখেছি! এত জোরে চেঁচিয়ে উঠল জিনা, যার যার চিহ্ন থেকে চোখ সরিয়ে ফেলল মুসা আর কিশোর। রবিন আগেই সরিয়েছে।
সকালের রোদে ঝলমল করছে গির্জার পাথরে তৈরি চুড়া।
চমৎকার, বলল কিশোর। রবিন, দেখো তো, চিমনিটা দেখা যায়?
না, রবিন বলল। মুসা আরেকটু বাঁয়ে সরাও...আরেকটু...হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখছি। আর না, আর না...।

দাঁড় বাওয়া বন্ধ। কিন্তু এক জায়গায় স্থির থাকল না ভেলা, আপনগতিতে অল্প অল্প করে সরে গেল। পানিতে বার দুই দাঁড়ের খোঁচা মেরে আবার সরাতে হলো ভেলাটা। ইতিমধ্যে গির্জা হারিয়ে ফেলেছে জিনা।
একটু ওদিক, একটু ওদিক করে করে আবার জায়গামত আনা হলো ভেলা, আবার চারটে চিহ্ন চোখে পড়ল।
কিছু একটা মারকার ফেলে জায়গাটার চিহ্ন রাখা দরকার, টল স্টোন থেকে চোখ সরাল না কিশোর। জিনা, দেখো তো, চূড়া আর পাথরের ওপর একসঙ্গে চোখ রাখতে পারো নাকি?
দেখি চেষ্টা করে, চুড়া থেকে চোখ সরিয়ে চট করে পাথরটার দিকে তাকাল জিনা, তারপর আবার চুড়ার দিকে। কাজটা সহজ নয়। ভেলা খালি নড়ছে, স্থির রাখা যাচ্ছে না পুরোপুরি, যাবে বলেও মনে হয় না।
দ্রুত হাত চালাল কিশোর। একটা টর্চ আর পকেট-ছুরি বের করল। জিনা, তোমার ব্যাগে ফিতা আছে?
দেখো, আছে কয়েকটা, দুটো চিহ্নের ওপর চোখ রাখতে হিমশিম খাচ্ছে জিনা।
একটার সঙ্গে আরেকটা ফিতের মাথা বেঁধে জোড়া দিয়ে লম্বা করল কিশোর। ছুরি আর টর্চ এক করে ফিতের একমাথা দিয়ে পেঁচিয়ে শক্ত করে বাঁধল। তারপর ফিতে ধরে ছেড়ে দিল পানিতে, আস্তে আস্তে ছাড়তে লাগল। টান থেমে গেল এক সময়, বোঝা গেল হ্রদের তলায় পৌঁছেছে ভার।
এক হাতে ফিতে ধরে রেখে আরেক হাতে পকেট খুঁজল কিশোর। এক অলস মুহূর্তে একটা কর্ককে ছুরি দিয়ে কেটে চেচে একটা ঘোড়ার মাথা বানিয়েছিল, সঙ্গে নিয়ে এসেছে ওটা। বের করল পকেট থেকে। ফিতেটাকে টান টান করে এমন এক জায়গায় কর্ক বঁধল, যেন ওটা পানির সমতলের ঠিক নিচে ভাসে।
ভেসে রইল কর্কটা, দাঁড়ের নড়াচড়ায় আলতো ঢেউ উঠছে, তাতে লুকোচুরি খেলতে থাকল ঘোড়ার মাথা।
হয়েছে, জোরে নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। চিহ্ন থেকে চোখ সরাতে পারো।
ঘোড়ার মাথাটার দিকে তাকাল মুসা। এত আগাম চিন্তা করো কিভাবে? বন্ধুর বুদ্ধির তারিফ করল সে। কিন্তু জিনিসটা বেশি ছোট। আবার খুঁজে বের করতে পারব? বড় কিছু হলে ভাল হত না?
সেটাই ভাবছি, বলল কিশোর। কিন্তু বড় আর কি আছে?
আমার মেকআপ বক্সটা ধার নিতে পারো, জিনা বলল। দাও, হাত বাড়াল কিশোর।
ব্যাগ খুলে বেশ বড় একটা প্লাসটিকের বাক্স বের করল জিনা। খুব শক্ত হয়ে লাগে ডালা, ভেতরে পানি তো ঢুকবেই না, বাতাসও ঢোকে না তেমন,

বায়ুনিরোধকই বলা চলে। ভেসে থাকবে। এক এক করে লিপস্টিক, পাউডারের কৌটা, চিরুনি আর টুকিটাকি অন্যান্য জিনিস ব্যাগে রেখে বাক্সটা দিল সে।
মেয়েদের অকাজের বাক্সও অনেক সময় কাজে লাগে, ফস করে বলে ফেলল মুসা।
টান দিয়ে বাক্সটা সরিয়ে আনল জিনা। দেখো, ভাল হবে না। আমাকে রাগালে বাক্স দেব না আমি।
না না, দাও, এমনি ঠাট্টা করলাম, তাড়াতাড়ি বলল মুসা।
কর্কের পরে বাড়তি যে ফিতেটুকু রয়েছে, সেটা দিয়ে বাক্স বেঁধে পানিতে ছাড়ল কিশোর। ভেসে রইল। বোঝা যাচ্ছে, থাকবে।
ফাইন, বলল কিশোর। এবার দূর থেকেও চোখে পড়বে। দেখি তো, তলায় কি আছে?
ভেলার ধার দিয়ে ঝুঁকে চারজনেই নিচে তাকাল। কিছুই না বুঝে রাফিয়ানও গলা বাড়িয়ে দিল পানির দিকে।
অদ্ভুত এক দৃশ্য। হ্রদের তলায় বড় কালো একটা ছায়া। ছোট ছোট ঢেউয়ের জন্যে অস্পষ্ট লাগছে, কেমন কাপা কাপা, তবে নৌকা যে তাতে কোন সন্দেহ নেই।
ওয়াটার মেয়ার, বিড়বিড় করল মুসা।
জেরি ব্যাটা খুব চালাক, কিশোর বলল। লুটের মাল লুকানোর কি একখান জায়গা খুঁজে বের করেছে। নৌকার তলা ফুটো করে ডুবিয়েছে নিশ্চয়।
কিন্তু নৌকাটা তুলব কি করে?
তাই তো ভাবছি, থেমে গেল কিশোর। ঘেউ ঘেউ শুরু করেছে রাফিয়ান।
একটা নৌকা ছুটে আসছে এদিকে, লিটল মারমেইড। টিকসি আর ডারটি দুজনেই দাঁড় বাইছে। ভেলার দিকে খেয়াল নেই, হ্রদের চারপাশের তীরের দিকে চোখ, একবার এদিক চাইছে, একবার ওদিক। বোঝা গেল, চিহ্নগুলো খুঁজছে ওরা।
তৈরি হয়ে যাও, সবাই, আস্তে বলল কিশোর। আজ আমাদের বাধা না-ও মানতে পারে।
কাছে এগিয়ে আসছে নৌকা। দাঁড় তুলে নিয়েছে টিকসি, দুই-তিনটা চিহ্নের ওপর একা চোখ রাখতে হচ্ছে তাকে। খালি মাথা ঘোরাচ্ছে এপাশ-ওপাশ।
ঘেউ ঘেউ করেই চলেছে রাফিয়ান।
তার মাথায় হাত রেখে শান্ত হতে বলল জিনা।
দুই ডাকাতের অবস্থা দেখে হাসি পেল অভিযাত্রীদের। ওরা চারজন চারটে চিহ্নের ওপর চোখ রাখতে হিমশিম খাচ্ছিল, আর দুজনের কতখানি অসুবিধে হবে সে

তো বোঝাই যায়।
নির্দেশ দিচ্ছে টিকসি, এদিকে আরেকটু বাঁয়ে…এহহে, বেশি হয়ে গেল… ডানে-ডানে-ডানে…
কিছু বলল ডারটি।
ঝট করে মুখ ফিরিয়ে তাকাল টিকসি। ভেলাটা দেখে রাগে জ্বলে উঠল। পরক্ষণেই আবার ফিরল চিহ্নগুলোর দিকে। নিচু গলায় বলল কিছু ডারটিকে। মাথা ঝাঁকাল-ডারটি। ভীষণ হয়ে উঠেছে দুজনেরই চেহারা।
গতি বাড়ছে নৌকার, সোজা এগিয়ে আসছে।
আরে, ধাক্কা মারো। বলে উঠল রবিন।
ধাক্কা খেয়ে দুলে উঠল ভেলা, আরেকটু হলেই পানিতে উল্টে পড়ে যাচ্ছিল রবিন, খপ করে তার হাত চেপে ধরল মুসা। চেঁচিয়ে বলল, এই চোখের মাথা খেয়েছ! শয়তান কোথাকার! ভেবেছ কি?
তোরা কেন এসেছিস এখানে? গর্জে উঠল ডারটি।
রেগে গেল রাফিয়ান, দাঁতমুখ খিচিয়ে চেঁচাতে শুরু করল।
তোর বাপের জায়গা… দাড়টা তুলে নিল মুসা, রাগে কথা সরছে না।
কাঁধে হাত দিয়ে তাকে চুপ কুরুতে বুলল কিশোর। ডারটির দিকে ফিরল, রাফিয়ানের ভয়ে ধীরে ধীরে নৌকা পিছিয়ে নিচ্ছে ডাকাতটা।
দেখো, শান্তকণ্ঠে বলল গোয়েন্দাপ্রধান, তোমরা বেশি বাড়াবাড়ি করছ। হ্রদে অনেক জায়গা, আমাদের কাছে তোমাদের না এলেও চলে। খামোকা এসব করছ কেন?
পুলিশের কাছে যাচ্ছি, রাগে লাল হয়ে গেছে টিকসির মুখ, তোমরাও বাড়াবাড়ি কম করছ না। না বলে অন্যের ভেলা নিয়ে এসেছ, অন্যের বাড়িতে জোর করে ঘুমাছে, আমাদের খাবার চুরি করেছ।
আবার সেই এক কথা, হতাশ ভঙ্গিতে দু-হাত নাড়ল কিশোর। তোমরা কি করেছ? নৌকা বলে এনেছ? আমরা খাবার চুরি করেছি না তোমরা আমাদের খাবার চুরি করেছ? একটু আগে কি করলে? ধাক্কা মেরে ভেলা ডুবিয়ে দেয়ার চেষ্টা করলে। যাও না পুলিশের কাছে, বলো গিয়ে। আমাদেরও মুখ আছে।
ফুঁসছে ডারটি। দাঁড় তুলে নিল, ছুঁড়ে মারবে।
খবরদার, আঙুল তুলল কিশোর। অনেক সহ্য করেছি, আর না। এবার কুকুর লেলিয়ে দেব। তোমাকে ছেড়ার জন্যে অস্থির হয়ে আছে রাফি।
গররররর! কিশোরের কথায় সায় দিয়ে একসারি চমৎকার দাঁত ডারটিকে দেখিয়ে দিল রাফিয়ান।

দ্বিধায় পড়ে গেল দুই ডাকাত। নিচু গলায় কিছু আলোচনা করল। তারপর মুখ ফিরিয়ে গলার স্বর নরম করে টিকসি বলল, দেখো ছেলেরা, আমরা শান্তিতে ছুটি কাটাতে এসেছি, উইক-এণ্ডে। কিন্তু আমরা যেখানেই যাই দেখি তোমরা আছ, এটা আমাদের ভাল লাগে না। আসলে, আশেপাশে কেউ না থাকুক এটাই চাইছি আমরা। ঠিক আছে, একটা রফা করা যাক। তোমরা চলে যাও, আমরা তাহলে পুলিশকে কিছু বলব না। খাবার যে চুরি করেছ, একথাও না।
পুলিশের কাছে যেতে কে মানা করছে? যাও না, বলল কিশোর। রফাটফা কিছু হবে না। আমাদের যখন খুশি তখন যাব।
জ্বলে উঠল টিকসির চোখ। সামলে নিল। আবার আলোচনা করল ডারটির সঙ্গে। ফিরে জিজ্ঞেস করল, ছুটি কদিন তোমাদের? কবে যাচ্ছ?
আগামীকাল, বলল কিশোর।
আবার কিছু আলোচনা করল দুজনে।
আস্তে করে নৌকাটা কয়েক ফুট সরিয়ে নিল ডারটি। উঁকি দিয়ে পানির নিচে তাকাল টিকসি। মুখ তুলে ডারটির দিকে ফিরে মাথা ঝাঁকাল।
ছেলেদের সঙ্গে আর একটাও কথা না বলে নৌকা নিয়ে চলে গেল ওরা।
কি করবে বুঝেছি, হাসিমুখে বলল কিশোর। কাল আমাদের চলে যাওয়ার অপেক্ষায় থাকবে। তারপর আসবে. নিরাপদে লুটের মাল তুলে নেয়ার জন্যে।
টিকসি পানির দিকে তাকিয়েছিল, খেয়াল করেছ? নৌকাটা দেখেছে। আমাদের মার্কারও দেখেছে।
তাহলে এত খুশি হয়েছ কেন? জিনা বুঝতে পারছে না। নৌকাটা আমরা তুলতে পারছি না। আর আগামীকাল চলে যেতেই হচ্ছে। স্কুল মিস করা চলবে না।
দূরে চলে গেছে নৌকা, সেদিকে চেয়ে বলল কিশোর, কাল যে যাব, এটা ইচ্ছে করেই বলেছি, ওদের সরানোর জন্যে। লুটের মাল তুলে নিতে পারব আমরা।
কিভাবে? একসঙ্গে বলল অন্য তিনজন। রাফিয়ানও মুখ বাড়াল সামনে, যেন সে-ও জানতে চায়।
নৌকা তো চাই না আমরা, কিশোর বলল, চাই মালগুলো। তাহলে নৌকাটা তোলার দরকার কি? ডুব দিয়ে গিয়ে ওগুলো তুলে নিয়ে এলেই হলো। মনে হয় কোন বস্তা বা বাক্সের মধ্যে রেখেছে। ভারি না হলে এমনিতেই তোলা যাবে, আর ভারি হলে দড়ি বেঁধে টেনে তুলতে হবে।
শুনতে তো ভালই লাগছে, কিন্তু যাচ্ছে কে? হ্রদের কালো পানির দিকে চেয়ে বলল রবিন। আমার ভাই ভয় লাগে।
আমি যাব, মুসা বলল। সেদিন থেকেই তো খালি ভেলায় করে ঘুরছি। একবারও সাঁতার কাটতে পারিনি। রথ দেখা কলা বেচা দুইই হবে। – ভালমত ভেবে দেখো,

কিশোর সাবধান করল। যা ঠাণ্ডা, শেষে না নিউমোনিয়া বাধাও।
আরে দূর, পাত্তাই দিল না মুসা। পানিতে বরফ গুলে দিলেও ঠাণ্ডা লাগবে আমার।
বিশ্বাস করল সবাই। এই হ্রদে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়ে থাকলেও কিছু হবে না তার।
তিন-চার টানে জামাকাপড় সব খুলে ফেলল মুসা। খালি হাফপ্যান্টটা রাখল পরনে। এতই নিখুত ভাবে ডাইভ দিয়ে নেমে গেল, ঢেউ প্রায় উঠলই না। বকের মত গলা বাড়িয়ে ভেলার কিনারে ঝুঁকে এল অন্য তিনজন। দেখছে, হাত-পা নেড়ে নেমে যাচ্ছে একটা আবছা মূর্তি। কালো পানিতে কেমন যেন ভূতুড়ে দেখাচ্ছে।
সময় কাটছে।
এতক্ষণ থাকে কি করে? উদ্বিগ্ন হলো রবিন। বিপদ-টিপদ...
না, বলল কিশোর। ওকে তো চেনই। অনেকক্ষণ দম রাখতে পারে। সেই যে সেবার...
হুসস করে ভেলার পাশে ভেসে উঠল মুসার মাথা। জোরে জোরে কয়েকবার শাস টেনে বলল, আছে!
কি কি দেখলে? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
ভেলার কিনার খামচে ধরে ভেসে রইল মুসা। দম নিয়ে বলল, এক ডুবে সোজা গিয়ে নামলাম নৌকায়। ভাঙা, পুরানো। তুলতে গেলে খুলে যাবে জোড়ায়, পচে গেছে। পলিথিনের একটা ব্যাগে রয়েছে মালগুলো। বেজায় ভারি। টানাটানি করেছি, তুলতে পারলাম না।
নড়েছে? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
না, নড়েনি।
তাহলে বেঁধে রেখেছে হয়তো। কিংবা অন্য কোনভাবে আটকে রেখেছে। দুড়ি বেঁধে দিয়ে আসতে হবে। তারপর সবাই মিলে টেনে তুলব। তবে তার আগে কিসে আটকানো রয়েছে, সেটাও খুলে দিয়ে আসতে হবে।
পানিতে বিচিত্র শিরশিরানি তুলে বয়ে গেল একঝলক বাতাস। সামান্য কাঁটা দিয়ে উঠল মুসার গা।
বাহ, ব্যায়ামবীরেরও কাঁপুনি ওঠে দেখি, হেসে বলল জিনা। বুঝলাম, তলায় কেমন ঠাণ্ডা। আমিও নামব ভাবছিলাম।
তাহলে এসো।
কাপড় আনিনি তো...ওঠো। গা মোছো।
দাঁড়াও, খানিকক্ষণ সাঁতার কেটে নিই।
না না, উঠে পড়ো, বাধা দিল কিশোর। পরে আরও ডোবাডুবি করতে হবে। বোটহাউস থেকে গিয়ে দড়ি আনতে হবে আগে। তীরের দিকে তাকাল সে।

নৌকা তীরের কাছে একটা শেকড়ে বেঁধে ওপরে উঠে গেছে দুই ডাকাত। দেখা যাচ্ছে না ওদেরকে। হঠাৎ আলোর ঝিলিক দেখতে পেল কিশোর, রোদে লেগে ঝিক করে উঠেছে কিছু।
আরেকবার দেখা গেল ঝিলিক। রবিনও দেখল এবার। কি ব্যাপার? সপ্রশ্ন চোখে কিশোরের দিকে তাকাল রবিন।
বুঝতে পারছ না? দূরবীণ। ব্যাটারা লুকিয়ে লুকিয়ে চোখ রেখেছে আমাদের ওপর। মুসা যে ডুব দিয়ে এসেছে, তা-ও দেখেছে।
তাহলে? জিনার প্রশ্ন।
তাহলে আর কি? এখন আর ডুব দেয়া চলবে না।
এখন ডুব দিতে যাচ্ছেও না। আগে বোটহাউস থেকে দড়ি আনতে হবে, তারপর...
তারপরও হবে না। ওরা আজ সারাদিন নড়বে না ওখান থেকে।
তাহলে? আবার একই প্রশ্ন করল জিনা।
রাতে চাঁদ থাকবে, বলল কিশোর। ভেরি গুড আইডিয়া, ভেলায় চাপড় মারল জিনা।
লুটের মাল নিয়ে চলে যাব আমরা সকালে। তারপর আসবে সাহেবরা, পাবে ঠনঠন। বুড়ো আঙুল দেখাল সে।
এখন সরে যাচ্ছি আমরা? মুসা জিজ্ঞেস করল।
মোটেই না, মাথা নাড়ল কিশোর। আমরা চলে গেলে ওরা এসে তুলে নিয়ে যেতে পারে। সারাদিন লেকে থাকব আমরা, ঘুরব-ঘারব। ওদের পাহারা দেব আমরা, আমাদেরকে দেবে ওরা।
দুপুরে না খেয়ে থাকব?
না। রাফিয়ানকে নিয়ে তুমি আর জিনা থাকবে ভেলায়। আমি আর রবিন গিয়ে নিয়ে আসব খাবার।
যদি আবার খাবার চুরি করে?
পারবে না। ভাড়ারের আলমারির পেছনে আরেকটা ছোট ঘর আছে, দেখেছি। আলমারির ভেতর দিয়ে ঢুকতে হয়। খুব ভালমত না দেখলে বোঝা যায় না কোন্‌দিক দিয়ে কিভাবে ঢুকতে হয়। ওখানে রেখে আসব।
তুমি যখন দেখেছ, ওরাও তো দেখে ফেলতে পারে, রবিন বলল।
তা পারে, সেটুকু ঝুঁকি নিতেই হবে। আর কি করার আছে বলো? তবে ওরা আমাদের চেয়ে বেশি উত্তেজিত, সেটা করতে যাবে বলে মনে হয় না। কাল চলে যাব বলেছি আমরা, খাবার চুরি করে রাগিয়ে দিতে চাইবে না।
যদি পিস্তল জোগাড় করে আনে? জিনার প্রশ্ন।
তাহলে আর কিছু করার থাকবে না আমাদের। দেখা ফ্রক, কি হয়।

হেসে খেলে কেটে গেল সারাটা দিন।
পশ্চিম দিগন্তে নেমে যাচ্ছে সূর্য। ডুবে গেল এক সময়। আকাশের লালিমা ঢেকে দিল এক টুকরো কালো মেঘ। শঙ্কা ফুটল জিনার চেহারায়।
ও কিছু না, সরে যাবে, আশ্বস্ত করল কিশোর।
ভেলা লুকিয়ে রেখে পাড়ে নামল ওরা। আস্তানায় ফেরার পথে চট করে একবার বোটহাউসে ঢুকে এক বাণ্ডিল দড়ি বের করে আনল মুসা।
ঠিকই অনুমান করেছে কিশোর, বৃষ্টি এল না। ঘণ্টাখানেক বাদেই পাতলা হয়ে গেল মেঘ, তারা দেখা দিল। পরিষ্কার আকাশ।
সিঁড়িমুখের কাছে রাফিয়ানকে পাহারায় রেখে অন্ধকার ভাঁড়ারে নামল ওরা। গোটা দুই মোম জ্বালল কিশোর।
না, কেউ ঢোকেনি ঘরে।
খাবার বের করে তাড়াতাড়ি খেয়ে নিল ওরা।
শুয়ে পড়ো সবাই, বলল কিশোর। দশটা এগারোটার দিকে বেরোতে হবে।
একটা অ্যালার্ম-কুক থাকলে ভাল হত, বলল মুসা। রবিন ঠিকই বলেছিল।
আমার ঘুম আসবে না, রবিন বলল। ঠিক আছে, জেগে থাকি, সময়মত তুলে দেব তোমাদের।
ঘুম না আসুক, শুয়ে থাকো, বলল কিশোর। বিশ্রাম হবে।
শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল কিশোর আর মুসা।.জিনার দেরি হলো।
চিত হয়ে শুয়ে আকাশ-পাতাল ভাবছে রবিন। পাতালকক্ষে বাতাস ঢুকতে পারছে না ঠিকমত, তবু যা আসছে সিঁড়িমুখ দিয়ে, তাতেই কাঁপছে মোমের শিখা, ঘরের দেয়ালে ছায়ার নাচন। সত্যি, তাদের এই অভিযানের তুলনা হয় না। আর সে দেখেছে, যতবারই জিনা সঙ্গে থাকে, অ্যাডভেঞ্চার যেন মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। তার মনে পড়ল সেই প্রেতসাধকের কথা, সাগর সৈকতে গুপ্তধন উদ্ধারের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার কথা, মৃত্যুখনির সেই বুক-কাঁপানো মৃত্যুহা...আর এবারকার অভিযানটাই বা কম কি? এক কাজ করবে-ভাবল সে, রকি বীচে ফিরেই কিশোরকে পটিয়ে-পাটিয়ে জিনাকেও গোয়েন্দাদের একজন করে নেবার কথা বলবে। জানে, সহজে রাজি হবে না কিশোর। আদৌ রাজি হবে কিনা, তাতেও যথেষ্ট সন্দেহ আছে রবিনের, তবু বলে দেখবে। এখন আর অসুবিধে নেই। রকি বীচেই স্কুলে ভরতি হয়েছে জিনা, ইচ্ছে করলে চার গোয়েন্দা করা যায়...
এগোরোটা বাজার দশ মিনিট আগে সবাইকে তুলে দিল রবিন।
সারাদিন পরিশ্রমের পর এত আরামে ঘুমিয়েছিল, উঠতে কষ্ট হলো তিনজনেরই। তৈরি হয়ে নিল।
বেরিয়ে এল বাইরে।

যেমন রেখে গিয়েছিল, তেমনি শুয়ে আছে রাফিয়ান, কিন্তু সতর্ক। সাড়া পেয়ে উঠে বসল।
আকাশে অনেকখানি উঠে এসেছে চাঁদ। উজ্জল জ্যোৎস্না। সারা আকাশ জুড়ে সাঁতার কাটছে ছোট-বড় মেঘের ভেলা। কখনও চাঁদ ঢেকে দিচ্ছে, আবছা অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে বনভূমি, চাঁদ বেরিয়ে এলেই হেসে উঠছে আবার হলুদ আলোয়।
তাঁবুর কাছে কাউকে দেখা যাচ্ছে না, উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখে বলল মুসা।
না যাক, কিশোর বলল। তবু সাবধানের মার নেই। কোন রকম শব্দ করবে। এসো যাই।
গাছপালা আর ঝোপের ছায়ার পাঁচ মিনিট হাঁটল ওরা হ্রদের পাড় ধরে। চাঁদের আলোয় চকচকে বিশাল এক আয়নার মত দেখাচ্ছে হ্রদটাকে। গুনগুন করে গান ধরল মুসা, জিনাও তার সঙ্গে গলা মেলাতে যাচ্ছিল, বেরসিকের মত বাধা দিয়ে বসল কিশোর। এই চুপ চুপ, গান গাওয়ার সময় নয় এটা। ব্যাটারা শুনলে…
ভেলায় চড়ল ওরা।
সবাই উত্তেজিত, রোমাঞ্চিত। সেটা সংক্রামিত হয়েছে রাফিয়ানের মাঝেও। চঞ্চল। কি করবে যেন বুঝে উঠতে পারছে না। রাতের এই অভিযান দারুণ লাগছে তার কাছে। আর কিছু করতে না পেরে এক এক করে গাল, হাত, চেটে দিতে লাগল সবার।
এক রত্তি বাতাস নেই। বড় বেশি নীরব। দাঁড়ের মৃদু ছপছপ শব্দও বেশি হয়ে কানে বাজছে। পানির ছোট ছোট ঢেউ আর বুদবুদ উঠে সরে যাচ্ছে ভেলার গা ঘেঁষে, রূপালি খুদে ফানুসের মত ফাটছে বুদবুদ্রগুলো।
এত সুন্দর রা খুব কমই দেখেছি, তীরের নীরব গাছপালার দিকে চেয়ে আছে রবিন। এত শান্তি। এত নীরব।
তাকে ব্যঙ্গ করার জন্যেই যেন কর্কশ চিৎকার করে উঠল একটা পেঁচা। চমকে গেল রবিন।
যাও, গেল তোমার নীরবতা, হাসতে হাসতে বলল মুসা।
রবিন ঠিকই বলেছে, কিশোর বলল, এত সুন্দর রাত আমিও কম দেখেছি। ইয়ার্ডে কাজ না থাকলে, এমনি জ্যোৎস্না রাতে ছাতে উঠে বসে থাকে রাশেদচাচা, অনেকদিন দেখেছি। আকাশের দিকে, চাদের দিকে চেয়ে চেয়ে কি যেন ভাবে। জিজ্ঞেস করেছিলাম একদিন। বিশ্বাস করবে? কেঁদে ফেলেছিল চাচা, দেশের কথা, তার ছেলেবেলার কথা বলতে বলতে। বাংলাদেশে নাকি এর চেয়েও সুন্দর চাঁদ ওঠে। ফসল কাটা শেষ হলে ধু-ধু করে নাকি ফসলের মাঠ, ধবধবে সাদা। শিশির ঝরে। চাঁদনি রাতে শেয়ালের মেলা বসে সেই মাঠে, বৈঠক বসে, চাচা নাকি

দেখেছে। চাচা প্রায়ই বলে, কোনমতে ইয়ার্ডের ভারটা আমার কাধে গছাতে পারলেই চাচীকে নিয়ে দেশে চলে যাবে…
আরে, এই রাফি, আমার কান খেয়ে ফেলবি নাবি? বেরসিকের মত মুসার গান তখন থামিয়ে দিয়েছিল কিশোর, সেই শোধটা নিল যেন এখন।
ওই যে, বাক্সটা না? হাত তুলে বলল জিনা।
হ্যাঁ, বাক্সটাই মারকার। চাদের আলো চিকচিক করছে ওটার ভেজা পিঠে।
কাছে এসে ভেলা থামাল।
কাপড় খুলতে শুরু করল মুসা। জিনা সাঁতারের পোশাক পরে এসেছে।
রিঙের মত করে পেঁচানো দড়ির বাণ্ডিলের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিল মুসা। ডাইভ দিয়ে পড়ল পানিতে। জিনা নামল তার পর পরই।
দম কেউ কারও চেয়ে কম রাখতে পারে না।
প্রথমে ভাসল জিনার মাথা।
তার কিছুক্ষণ পর মুসার। দম নিয়ে বলল, বাঁধন কেটে দিয়েছি পোটলাটার। আবার যেতে হবে, দড়ি বাঁধব।
জিনাকে নিয়ে আবার ডুব দিল মুসা।
দুজনে মিলে শক্ত করে ব্যাগের মুখে পেঁচিয়ে বাঁধল দড়ি। হ্যাঁচকা টান দিয়ে দেখল মুসা, খোলে কিনা। খুলল না। ওপর থেকে টেনে তোলা যাবে, বাঁধন খুলে পড়ে যাবে না ব্যাগে।
দড়ির আরেক মাথা হাতে নিয়ে ওপরে উঠতে শুরু করল মুসা। পাশে জিনা।
হয়েছে? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
হাঁপাতে হাঁপাতে মাথা ঝাঁকাল দুজনে।
দম নিয়ে ভেলায় উঠে এল জিনা আর মুসা।
তোয়ালেটা কোথায়? কাঁপতে কাঁপতে বলল জিনা। ইস, পানি তো না, বরফ।
তাদের দিকে নজর নেই এখন রবিন আর কিশোরের। দড়ি ধরে টেনে ব্যাগটা তুলতে শুরু করেছে। ভারের জন্যে একপাশে কাত হয়ে গেছে ভেলা। আরেকটু টান পড়লেই পানি উঠবে।
উল্টোধারে সরে গেল জিনা আর মুসা, রাফিয়ানকেও টেনে সরাল নিজেদের দিকে। সোজা হলো আবার ভেলা।
তীরের দিকে চেয়ে হঠাৎ ঘাউ ঘাউ করে উঠল রাফিয়ান।
তাড়াতাড়ি তার মুখে হাত চাপা দিয়ে ধমক দিল জিনা, চুপ! চুপ! শঙ্কিত চোখে তাকাল কুকুরটা যেদিকে চেয়ে আছে সেদিকে। টিকসিরা আসছে না তো?
কাউকে দেখা গেল না। বোধহয় শেয়াল-টেয়াল দেখেছে রাফিয়ান।
ব্যাগটা তুলে আনা হয়েছে।

আর এখানে থাকার কোন মানে নেই। তীরের দিকে রওনা হলো ওরা।
ভালয় ভালয় আস্তানায় ফিরে যেতে পারলেই বাঁচে এখন।
ভেলা আগের মতই লুকিয়ে রাখা হলো। বোটহাউসে রাখলে আর ডারটি দেখে ফেললে সন্দেহ করবে। কি ঘটেছে বুঝেও যেতে পারে।
খাড়া পাড়, শেকড় বেয়ে উঠতেই কষ্ট হয়। ভারি একটা বোঝা নিয়ে ওঠা যাবে না। ব্যাগটা নিচে রেখে, দড়িটা দাঁতে কামড়ে ধরে আগে উঠে গেল মুসা। তার পেছনে রবিন আর জিনা। কিশোর নিচে রয়েছে। দড়ি ধরে ব্যাগটা টেনে তুলতে বলল ওদেরকে।
ব্যাগটা উঠে যেতেই সে-ও উঠে এল ওপরে।
চুপ করে আছে রাফিয়ান। তারমানে ঝোপের ভেতর ঘাপটি মেরে নেই কেউ, আচমকা ঘাড়ে এসে লাফিয়ে পড়বে না।
গাছের ছায়ায় ছায়ায় আস্তানায় ফিরে এল ওরা। রাফিয়ানকে সিঁড়িমুখের কাছে পাহারায় বসিয়ে অন্যেরা নেমে এল ভাড়ারে।
মোম জালল কিশোর।
আগে কিছু খেয়ে নিলে কেমন হয়? প্রস্তাব দিল মুসা।
ভালই হয়, জিনাও রাজি।
স্যাণ্ডউইচ বের করে খেতে শুরু করল তিনজনে, কিশোর বাদে। সে ব্যাগ। খোলায় ব্যস্ত।
যা বাঁধা বেঁধেছ, ভেজা গিট কিছুঁতেই খুলতে পারল না গোয়েন্দাপ্রধান, কাটতে হবে। ছুরি বের করল সে।
বাঁধন কাটার পরেও ব্যাগের মুখ দিয়ে ভেতরের বাক্সমত জিনিসটা বের করা গেল না। দীর্ঘ পানিতে থেকে থেকে বাক্সের গায়ে আঠা হয়ে লেগে গেছে প্লাসটিকের চাদর। কেটে, ছিড়ে তারপর বের করতে হবে।
দাও তো, আমাকেও একটা দাও, হাত বাড়াল কিশোর।
একটা স্যাণ্ডউইচ দিল জিনা।
খেয়ে নিয়ে আবার চাদর কাটায় মন দিল কিশোর। ভেতরে কি আছে দেখার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে সবাই।
স্টীলের একটা ট্রাংক বেরোল, ফাঁকগুলো রবারের লাইনিং দিয়ে এমন ভাবে বন্ধ, পানি ঢোকার পথ নেই।
তালা লাগানো নেই, নইলে আরেক ফ্যাকড়া বাধত।
ডালা তুলতে শুরু করল কিশোর। দুরুদুরু করছে সবার বুক। ঝুঁকে এসেছে ট্রাংকের চারপাশ থেকে।

ডালা তোলা হলো। ভেতরে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে প্লাসটিকের অসংখ্য ছোট বাক্স। সব এক সাইজের।
গহনার বাক্স! হাত বাড়িয়ে একটা বাক্স তুলে নিল জিনা। ঢাকনা খুলে স্থির হয়ে গেল।
সবার চোখেই বিস্ময়।
কালো মখমলের শয্যায় শুয়ে আছে একটা অপূর্ব সুন্দর নেকলেস। মোমের আলোয় জ্বলছে যেন পাথরগুলো। নিশ্চয় কোন রানী-মহারানীর।
এটার ছবি দেখেছি আমি, বিড়বিড় করল জিনা। ফেলোনিয়ার রানীর গলায়।। তিনি পরে তার এক ভাস্তিকে জন্মদিনে প্রেজেন্ট করে দেন। ভাস্তির বর হলিউডের
নামকরা অভিনেতা, বিরাট বড়লোক।
হীরা, না? মুসা বলল। দাম কত হবে? একশো পাউণ্ড?
মাঝে মাঝে এত বোকার মত কথা বলো না তুমি। একশো হাজার পাউণ্ডেও দেবে না।
থাকগে তাহলে, আমার ওসব কোনদিনই লাগবে না, হাত নাড়ল মুসা।
তুমি হার দিয়ে কি করবে? ব্যাটাচ্ছেলে হার পরে? জিনা বলল।
কে বলল পরে না? হিপ্পি মার্কা গায়কগুলোর গলায় তো প্রায়ই দেখি।
আরও কয়েকটা বাক্স খুলে দেখল ওরা। প্রতিটা গহনা দামী। হীরা-পান্না-চুনিমুক্তা, সবই রয়েছে। হার, কানের দুল, চুরি, আঙটি, প্রায় সব ধরনের অলঙ্কার আছে। রাজার সম্পদ।
একসঙ্গে এত গহনা কোন মিউজিয়ামেও দেখিনি, বলল রবিন।
যাক, ভালই হলো, ফোঁস করে চেপে রাখা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল কিশোর, চোরের হাতে পড়ল না। ভাগ্যিস আমরা এসে পড়েছিলাম। নইলে পুলিশ জানতই না, অখ্যাত এক হ্রদের তলায় লুকানো ছিল এগুলো।
নেব কি করে? মুসার প্রশ্ন।
সেটাই ভাবছি। ট্রাংক নিয়ে ডারটি আর টিকসির সামনে দিয়ে যাওয়া যাবে। এক কাজ করো, যার যার ব্যাগে ভরে ফেল, যতটা পারা যায়। বাকিগুলোর বাক্স ফেলে দিয়ে রুমালে পোটলা বাঁধব।
ভাগাভাগি করে ব্যাগে ভরার পরও অনেক জিনিস রয়ে গেল। বাক্স থেকে খুলে ওগুলো রুমালে বাঁধতে হলো, তাতেও লাগল চারটে রুমাল। চারজনের কাছ থাকবে চারটে, ঠিক হলো।
সকালে উঠে প্রথমে কোথায় যাব? রবিন জিজ্ঞেস করল। পুলিশ?

এখানকার পুলিশের যা সুরত দেখে এলাম, মুখ বকাল কিশোর। হবে না। পোস্ট অফিস থেকে মিস্টার নরিসকে ফোন করব। তিনি কিছু একটা ব্যবস্থা করবেন। তাঁকে বিশ্বাস করা যায়।
আমার ঘুম পাচ্ছে, বড় করে হাই তুলল মুসা, মুখের কাছে হাত নিয়ে গিয়ে আঙুলগুলো কলার মোচার মত বানিয়ে নাড়ল বিচিত্র ভঙ্গিতে, ঢুকিয়ে দেবে যেন মুখের ভেতর।
শুয়ে পড়ল সবাই। কিন্তু ঘুম কি আর আসে? বিপদ কাটেনি এখনও।
রাফিয়ানের চেঁচামেচিতে সকালে ঘুম ভাঙল ওদের। সিঁড়িমুখ দিয়ে রোদ ঢুকছে।
লাফিয়ে উঠে বসল কিশোর। অন্যদের ঘুমও ভেঙে গেছে।
কি হয়েছে দেখার জন্যে ওপরে উঠে এল গোয়েন্দাপ্রধান।
টিকসি দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখে ভাব জমাতে চাইল, তোমাদের কুকুরটা কিন্তু খুব ভাল। ধারেকাছে ঘেষতে দেয় না কাউকে।
ধন্যবাদ, নিরস গলায় বলল কিশোর।
দেখতে এলাম, খাবার-টাবার কিছু আছে কিনা, হাসল টিকসি। লাগবে কিছু?
হঠাৎ দরদ এমন উথলে উঠল কেন? কেন, সেটা খুব ভালমতই বুঝতে পারছে কিশোর। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাদের হাত থেকে নিস্তার পেতে চায় দুই ডাকাত।
খাবার তাহলে লাগবে? কিশোরের তীব্র খোঁচাটা কোনমতে হজম করল টিকসি। তাছাড়া তাকে ভয়ও পেতে আরম্ভ করেছে। বড় বেশি ধার ছেলেটার জিভে। চাঁচাছোলা কথা। কাউকে পরোয়া করে বলে না।
নো, থ্যাংকস, আবার বলল কিশোর। অনেক খাবার বেঁচে গেছে। কারও লাগলে বরং দিতে পারি।
ও……তা, আমতা আমতা করছে টিকসি। কি বলতে গিয়ে আবার কি জবাব শুনতে হবে কে জানে! যাচ্ছ কখন?
যাব। আজ স্কুলে হাজিরা দিতেই হবে।
তাড়াতাড়ি করো তাহলে। বৃষ্টি আসবে।
আকাশের দিকে তাকাল কিশোর। কই, মেঘের নামগন্ধও তো দেখছি না।
অন্যদিকে চোখ ফেরাল টিকসি।
মুচকি হেসে ঘুরে দাঁড়াল কিশোর। সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল নিচে। টিকসি যেমন চাইছে ওরা চলে যাক, কিশোরও চাইছে সে চলে যাক। মহিলা দাঁড়িয়ে থাকলে ওদেরও বেরোতে অসুবিধে।
দশ মিনিটেই তৈরি হয়ে বেরিয়ে এল চারজনে।
টিকসি চলে যাচ্ছে, ঝোপের ওপর দিয়ে মাথা দেখা যাচ্ছে তার। ফিরে তাকাল একবার, এক মুহূর্ত থেমে দেখল, তারপর ঘুরে আবার হাটতে লাগল।

জলার ধার দিয়ে যেতে ভালই লাগবে, রবিন বলল।
সেদিন আসার সময় সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল, ভালমত দেখতে পারিনি। আজ দেখব।
কথা বলতে বলতে চলেছে ওরা। জোরে পা চালাচ্ছে। যত তাড়াতাড়ি পোড়া বাড়ির কাছ থেকে সরে যাওয়া যায়, ভাল।
সময়ের হিসেব রাখছে না ওরা, দরকার মনে করছে না। মুসার একটা কথায় হেসে উঠল সবাই। এই সময় হঠাৎ পেছনে চেয়ে গলা ফাটিয়ে ঘেউঘেউ জুড়ে দিল রাফিয়ান।
ফিরে তাকাল সবাই। চমকে উঠল। দৌড়ে আসছে দুই ডাকাত।
আরে, জলা ভেঙেই আসছে। গাধা নাকি? রবিন বলল
শর্ট-কাট, কিশোর বলল। চোরাকাদায় পড়লে ঠেলা বুঝবে। মরুকগে ব্যাটারা। হাঁটো। পথ ধরে। আমরা জলায় নামছি না।
চলার গতি বাড়িয়ে দিল ওরা।
পাগল হয়ে গেছে, ফিরে চেয়ে বলল জিনা।
হবারই কথা, কিশোর বলল। এভাবে নাকের ডগা দিয়ে লাখ লাখ ডলার চলে যাচ্ছে। নৌকায় মাল না পেয়ে নিশ্চয় আমাদের ভাড়ারে ঢুকেছিল। ট্রাংক আর বাক্সগুলো ওভাবে রেখে আসা উচিত হয়নি। জঙ্গলে ফেলে দিয়ে এলে হত।
আসুক না, কি হবে? মুসা বলল। রাফি আছে। তাছাড়া আমরা চারজন। দুজনের সঙ্গে পারব না? পিস্তল নেই ওদের কাছে।
তা-ও কথা ঠিক। দেখি কি হয়।
ছপছপ করে কাদাপানি ভেঙে আসছে ডারটি। তার পেছনে টিকসি। কোথায় পা ফেলছে, খেয়ালই করছে না।
অনেক কাছে এসে পড়ল দুজনে।
গোয়েন্দাদের সঙ্গে বোঝা, দৌড়ানোর উপায় নেই। হাঁপিয়ে পড়ল।
এভাবে হবে না, মাথা নাড়ল কিশোর। ধরে ফেলবে। তার চেয়ে দাঁড়াই। দেখা যাক কি করে।
ফিরে দাঁড়িয়ে চেঁচাতে শুরু করল রাফিয়ান। ভয়ানক হয়ে উঠেছে চেহারা। কিন্তু কেয়ার করছে না ডারটি। বাঘা কুকুরের সঙ্গে লাগতেও যেন আপত্তি নেই আর এখন। যে করেই হোক, গহনাগুলো তার চাই।
আর বেশি বাকি নেই, ধরে ফেলবে ছেলেদের, এই সময় বিপদে পড়ল ডারটি। আঠাল কাদায় আধ হাত ডুবে গেল পা। কোনমতে টেনে তুলে আরেক জায়গায় ফেলল, ভাবল ওখানটায়ও নরম কাদা। কিন্তু তলায় পাথর বা শক্ত অন্য কিছু রয়েছে, যেটাতে জোরে পা পড়ায় বেকায়দা রকম কাত হয়ে গেল পা, গোড়ালি

গেল মচকে। চেঁচিয়ে উঠল, বাবারে, গেছি। আমার পা গেল! উফ! আধহাত কাদার মধ্যেই বসে পড়ল সে।
তাকে ভোলার জন্যে লাফিয়ে এগিয়ে আসতে গিয়ে টিকসিরও দুই পা দেবে গেল কাদায়, একেবারে হাঁটু পর্যন্ত। টেনে তোলার জন্যে জোরাজুড়ি কররতেই আরও ডুবে গেল পা। আতঙ্কিত হয়ে পড়ল সে, ভাবল চোরা কাদায় ডুবে যাচ্ছে।
ভালমত আটকেছে দুজন। এমন এক জায়গায়, কেউ গিয়ে সাহায্য না করলে বেরিয়েই আসতে পারবে না। সাহায্যের জন্যে অনুনয় শুরু করল।
মায়া হলো রবিনের। যাব নাকি?
পাগল হয়েছ, বলল মুসা।
থাক, কিশোর বলল, শিক্ষা হোক কিছুটা। আমরা গিয়ে তোক পাঠিয়ে দেব। চোরাকাদায় পড়েনি, মরবে না। তুলতে গিয়ে আমরাই শেষে পড়ব বিপদে।
ওদেরকে দেখে খুশি হলো পোস্টম্যান। কেমন কেটেছে, অ্যাঁ? টু-ট্রীজে?
খুব ভাল, বলে অন্যদের রেখে টেলিফোনের দিকে এগোল কিশোর।
বাড়িতেই পাওয়া গেল মিস্টার নরিসকে। শুনে তো প্রথমে চমকে উঠলেন। বললেন, তোমরা ওখানেই থাকো। আমি আসছি।
ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে পৌঁছে গেলেন নরিস। ছেলেদের গাড়িতে তুলে নিলেন। গ্রামরক্ষীর কাছে গিয়ে কিছুই হবে না, সোজা চললেন শেরিফের কাছে। জেলখানাটার কাছেই শেরিফের অফিস।
শেরিফ লোক ভাল, বুদ্ধিমান। সাড়ে ছয় ফুট লম্বা, লিকলিকে শরীর। সব শুনে শিস দিয়ে উঠলেন। পোটলা খুলে প্রথমেই তুলে নিলেন ফেললানিয়া নেকলেসটা।
এটা যে কত খোঁজা খুঁজেছে পুলিশ, বললেন তিনি। বেল বাজিয়ে সহকারীকে ডেকে সংক্ষেপে সব জানিয়ে বললেন হ্যারি, তিনজন লোক নিয়ে যাও। ডাকাতদুটোকে তুলে আনোগে।
অবাক হয়ে শুনল হ্যারি। ছেলেদের দিকে চেয়ে সামান্য মাথা ঝাঁকাল। হেসে বলল, তোমরা বাহাদুর। যাই, নিয়ে আসিগে পাজিগুলোকে।
গহনাগুলো শেরিফের দায়িত্বে দিয়ে দিল ছেলেরা। তবে প্রতিটি জিনিসের একটা লিস্ট করে তাতে রিসিভড লিখিয়ে শেরিফের স্বাক্ষর নিয়ে নিল। সাক্ষী রইলেন মিস্টার নরিস। কাগজটা ভাঁজ করে সযত্নে পকেটে রেখে দিল কিশোর।
পাখোয়াজ ছেলে, তারিফ করলেন শেরিফ। বড় হয়ে কি হওয়ার ইচ্ছে?
হয়তো গোয়েন্দাই থেকে যাব, বলল কিশোর। জানি না এখনও।
শেরিফের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরোল ওরা। খামারে নিয়ে যাওয়ার জন্যে অনেক চাপাচাপি করলেন মিস্টার নরিস, কিন্তু রাজি হলো না ছেলেরা। স্কুল কামাই করবে না।

শেষে তাদেরকে বাস স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন মিস্টার নরিস।
বিদায় নেয়ার আগে একে একে সবাই হাত মেলাল তাঁর সঙ্গে। গম্ভীর মুখে রাফিয়ানও একটা পা বাড়িয়ে দিল।
হেসে উঠলেন মিস্টার নরিস। তুই একটা কুকুর বটে, রাফি।তোর মত একটা কুকুর যদি আমার থাকত।
গোঁ গোঁ করে কুকুরে-ভাষায় কিছু বলল রাফিয়ান, বোধহয় বলেছে, ঠিক আছে, যান। জিনা তাড়িয়ে দিলেই চলে আসব আপনার কাছে।
তার কথা যেন বুঝতে পারল জিনা, তাড়াতাড়ি গলার বেল্ট ধরে রাফিয়ানকে কাছে সরিয়ে নিল।
হাসল সবাই।
আবার এদিকে কখনও বেড়াতে এলে যেন তার বাড়িতে ওঠে, বার বার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিলেন মিস্টার নরিস। .
বাস আসতে বোধহয় দেরি আছে। মুসা বলল, কিছু খেয়ে নিলে কেমন হয়?
খুব ভাল, বলল কিশোর। আমিও একথাই ভাবছিলাম। খাবারের দোকানটা দেখিয়ে বলল, চলো, ডিকের মায়ের সঙ্গেও দেখা হবে। বলেছিলেন ফেরার পথে দেখা করে যেতে। –
ছেলেদের দেখে খুব খুশি হলেন বৃদ্ধা। তবে আগের বারের মতই রাফিয়ানকে ভেতরে ঢুকতে দিলেন না, দরজার বাইরে রাখলেন। আদর-অভ্যর্থনার পর টুকটাক আরও কিছু কথা, তারপর জিজ্ঞেস করলেন, আজ কটা স্যাণ্ডউইচ লাগবে?
আজ বেশি লাগবে না, বাড়ি ফিরছি তো, বলল কিশোর। তাছাড়া পথে খিদে পেলে খাবার পাওয়া যাবে। হিসেব করে বলল, চার-পাঁচে বিশটা।
ঠিক আছে, ঘুরে রান্নাঘরের দিকে রওনা হলেন বৃদ্ধা। দরজার কাছে গিয়ে ফিরলেন। হ্যাঁ, কেউ এলে ডেকো।
চলে গেলেন দরজার ওপাশে।

ভলিউম ৩ – ভূতের হাসি – তিন গোয়েন্দা – রকিব হাসান – সেবা প্রকাশনী

সাইকেলের লাইট জ্বেলে দিল মুসা আর রবিন। বাড়ি এখনও মাইল দুয়েক। শীতকালে ক্যালিফোর্নিয়ার এই পার্বত্য অঞ্চলে হঠাৎ করেই রাত নামে।

খাইছে! বলে উঠল সহকারী গোয়েন্দা। আরও আগে রওনা দেয়া উচিত ছিল।

হুঁ, অন্ধকারে হাসল রবিন মিলফোর্ড। খাইছে বলা মুদ্রাদোষ হয়ে গেছে তার বন্ধু মুসা আমানের।

পর্বতের ভেতরে পাহাড়ী নদীতে সাঁতার কাটতে গিয়েছিল দুই গোয়েন্দা। চমৎকার কেটেছে দিন, আরও ভাল লাগত যদি কিশোর থাকত সঙ্গে। তাদের আরেক বন্ধু কিশোর পাশা, তিন গোয়েন্দার প্রধান। স্যালভিজ ইয়ার্ডে জরুরী কাজ ছিল, তাই যেতে পারেনি।

ধীরে ধীরে প্যাডাল ঘুরিয়ে চলেছে দুই ক্লান্ত কিশোর। পাহাড়ী পথ। এক পাশে পাথরের দেয়াল শুরু হলো।

রাতের অন্ধকার চিরে দিল তীক্ষ্ণ চিৎকার। সাহায্য চায়!

চমকে ব্রেক চাপল মুসা। দাঁড়িয়ে গেল সাইকেল। সামলাতে না পেরে তার গায়ের ওপর এসে পড়ল রবিন, উফ করে উঠল।

ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করল মুসা, শুনেছ?

মুসার সাইডস্ট্যাণ্ডের ভেতর ঢুকে গেছে রবিনের সামনের চাকা, টেনে ছাড়িয়ে নিতে নিতে বলল, শুনলাম তো। কেউ ব্যথা পেল বুঝি?

কান পেতে রয়েছে দুজনে।

দেয়ালের ওপাশে ঝোপের ভেতর কিসের নড়াচড়া।

আবার শোনা গেল চিৎকার।

হ্যাঁ, সাহায্যের আবেদনই। বিপদে পড়েছে লোকটা।

ওদের ঠিক সামনে ভারি একটা লোহার গেট, পাল্লার ওপর কাটা বসানো। দেয়ালের ওপাশে যাওয়ার পথ।

এক মুহূর্ত দ্বিধা করল না আর মুসা। সাইকেল রেখে দৌড় দিল গেটের দিকে।

পেছনে ছুটল রবিন। হাউফ করে কনুই চেপে ধরে দাঁড়িয়ে পড়ল হঠাৎ। ছোট্ট কি যেন জোরে বাড়ি খেয়ে উড়ে গিয়ে পড়ল মাটিতে।

এই যে, নিচু হয়ে জিনিসটা কুড়িয়ে নিল মুসা।

ইঞ্চি-তিনেক লম্বা ধাতব জিনিস, স্পষ্ট দেখা না গেলেও বুঝতে অসুবিধে হলো, পুতুল। তারার আলোয় মৃদু চকচক করছে।

কে ছুঁড়ল, মুসা?

জানি না। দেখো, গলায় ফাঁস লাগানো। বাধা ছিল কোন কিছুর সঙ্গে।

দেয়ালের ওপাশ থেকে ছুঁড়েছে মনে হলো, রবিন বলল। তোমার... থেমে গেল।
দেয়ালের ওপাশে পায়ের শব্দ। ঝোপঝাড় মাড়িয়ে ছুটে আসছে।
কি যেন ছুঁড়ে ফেলেছে। দেখো দেখো, চাপা গলায় বলল কেউ।
দেখছি, বস, বলল দ্বিতীয়জন।
গেটের তালায় ঘষার শব্দ, খোলার চেষ্টা চলছে।
দ্রুত এদিক ওদিক তাকাল দুই গোয়েন্দা। বড় একটা ঝোপ দেখে তাড়াতাড়ি গিয়ে তার মধ্যে সাইকেল ঢোকাল, লুকিয়ে বসে রইল ভেতরে। দেয়ালের কাছাকাছি।
মরচে ধরা কব্জায় কিচকিচ শব্দ তুলে খুলে গেল লোহার ভারি পাল্লা, গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল একটা আবছা মূর্তি, রাস্তার ধার ধরে দৌড় দিল।
ঝোপের ভেতর দম বন্ধ করে রয়েছে ছেলেরা, দুরুদুরু করছে বুক। তাদের পাশ দিয়ে ছুটে চলে গেল লোকটা।
চেহারা দেখেছ? ফিসফিস করল রবিন।
না। বেশি অন্ধকার।
আমিও না। পুতুলটা খুঁজছে বোধহয়। দিয়ে দেয়া উচিত।
চুপ!
ফুট দশেক দূরে এসে দাঁড়িয়েছে আরেকটা ছায়ামূর্তি। লম্বা, চোখা নাক। পাখির মাথার মত খুদে একটা মাথা, পাখির মতই ঝটকা দিয়ে এদিক ওদিক নড়ছে।
দুজনকে চমকে দিয়ে অদ্ভুত কণ্ঠে হেসে উঠল মূর্তিটা। আতঙ্কে অবশ হয়ে এল মুসার শরীর।
তাদের আরও অবাক করে মানুষের কণ্ঠে কথা বলে উঠল আজব পক্ষীমানব, চলে এসো। এখন পাবে না।
হ্যাঁ, বস্। বেশি অন্ধকার, পথের ধার থেকে জবাব দিল দ্বিতীয় মূর্তিটা। কাল সকালে খুঁজে বের করব।
মাথার কাছে সামান্য কুঁজো কিম্ভুত ছায়াটার। অন্য ছায়াটা তার কাছাকাছি হলো।
ঝোপ মাড়িয়ে গেটের দিকে এগোল দুটোই। ভেতরে ঢুকল, বিচিত্র শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেল পাল্লা। তালা লাগল আবার। ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল পদশব্দ।
দেখেছ? গলা কাঁপছে রবিনের। মাথাটা দেখেছ? একেবারে পাখি! আর হাসিটা কি জঘন্য। পিলে চমকে যায়। কি ওটা?
আল্লা মালুম।
চলো, ইয়ার্ডে যাই। কিশোরকে বলব।
হ্যাঁ, চলো, মুসা একমত হলো।
সাইকেলে চাপল আবার দুই গোয়েন্দা। জোরে প্যাডাল ঘুরিয়ে চলল। যত তাড়াতাড়ি পারে সরে যেতে চায় ভূতুড়ে এলাকা থেকে। লা ক্যাসিটাস ধরে চলেছে

ওরা। পেছনে আবার শোনা গেল অট্টহাসি, খান খান করে দিল যেন পাহাড়ী রাতের জমাট নিস্তব্ধতা।
গতি আরও বাড়াল ওরা। গিরিপথ পেরিয়ে এসে সামনে রকি বীচের পরিচিত আলো দেখার আগে কমাল না।
নিরেট, নিখাঁদ স্বর্ণ! বিড়বিড় করল কিশোর।
হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছে পুতুলটা।
দামী? জিজ্ঞেস করল রবিন।
সোনার চেয়েও দামী, মাঝে মাঝে কঠিন শব্দ ব্যবহার, কিংবা দুর্বোধ করে কথা বলা কিশোরের স্বভাব।
সোনা আবার সোনার চেয়ে দামী হয় কিভাবে? বুঝতে পারছে না মুসা।
হাসিতে বিকশিত পুতুলটা ঠকাস করে টেবিলে নামিয়ে রাখল কিশোর। ঋষিদের মত আসন পেতে বসল সোনার পুতুল। দেখেছ, কি যত্ন করে খোদাই করেছে? দক্ষ শিল্পীর কাজ। মাথায় দেখো, যেন পালকের মুকুট। শিল্পী রেড ইনডিয়ান। অনেক পুরানো। এ-রকম জিনিস মিউজিয়ামে দেখেছি।
হেডকোয়ার্টারে আলোচনায় বসেছে তিন গোয়েন্দা।
পুরানো একটা মোবাইল হোম, ট্রেলার, বাতিলই কিনে এনেছেন কিশোরের চাচা রাশেদ পাশা। বিক্রি করা যায়নি ওটা। দিয়ে দিয়েছেন ছেলেদেরকে। লোহালক্কড় আর পুরানো জঞ্জালের তলায় চাপা পড়েছে ওটা এখন, বাইরে থেকে চোখে পড়ে না।
জঞ্জালের ভেতর দিয়ে কয়েকটা গোপন পথ বানিয়ে নিয়েছে তিন কিশোর, হেডকোয়ার্টারে ঢোকার পথ। ভাঙা ট্রেলারটাকে ঠিকঠাক করে নিয়েছে ওরা, ভেতরটা আর বোঝাই যায় না, বাতিল হয়ে পড়ে ছিল। চেয়ার-টেবিল আছে, টেলিফোন, টেপরেকর্ডার আর নানা রকম আধুনিক যন্ত্রপাতি আছে, ছোট একটা ল্যাবরেটরি, এমনকি খুদে ডার্করুমও রয়েছে ছবি প্রসেস করার জন্যে।
নিচের ঠোঁটে বার দুই চিমটি কাটল কিশোর; বলল, তাহলে, তোমাদের ধারণা, সাহায্যের জন্যে যে চেঁচিয়েছে সে-ই পুতুলটা ছুঁড়ে দিয়েছে? কিন্তু ধারণা দিয়ে তো কাজ হবে না, প্রমাণ চাই।
কি বলছ, কিশোর? প্রতিবাদ করল মুসা। চিৎকার শুনে বীরের মত এগিয়ে গেলাম সাহায্য করতে। অন্ধকারে পুতুল কুড়িয়ে নিলাম। ঝোপের ভেতরে লুকিয়ে ভূত দেখলাম, হাসি শুনলাম, তা-ও পালালাম না। আর কি করতে পারতাম?
বস্ বস্ করল, বলল রবিন। ডাকাতের দল না-তো?
তাহলে ওই ভূতুড়ে ছায়াটা কি? পাখির মত মাথা, ঠোঁটের মত নাক, কুঁজো। আর কি হাসি। ভূতের বাপ ওটা, ডাকাত না।

অযৌক্তিক কথা বলে লাভ নেই, কিশোর বলল। হাসিটা কেমন?
তীক্ষ্ণ, সঙ্গে সঙ্গে বলল মুসা। বাচ্চা ছেলের চিৎকারের মত।
না, মেয়েমানুষের, শুধরে দিল রবিন।
না, মেয়েমানুষ না। খেপার।
বদ্ধ উন্মাদের। পিলে চমকে দেয়।
বাজে হাসি, খুবই বাজে।
কেমন যেন বিষণ্ন। বুড়ো মানুষের হাসির মত লাগে।
থামো, থামো, হাত তুলল কিশোর। হাসিটা একই সঙ্গে দুজনে শুনেছ?
নিশ্চই, জোর গলায় বলল মুসা। তবে একই হাসি কিনা বলতে পারব না।
আমি শুনতে পারলে ভাল হত, কেমন হাসি বুঝতে পারতাম। তবে সাহায্যের জন্যে যে চেঁচিয়েছে,এ তে তো কোন দ্বিমত নেই, নাকি?
না, একসঙ্গে বলল দুই সহকারী-গোয়েন্দা।
গভীর ভাবনা থেকে ডুব দিয়ে উঠল কিশোর। তোমাদের কথা শুনে মনে হচ্ছে, জায়গাটা পেদ্রোজ এস্টেট।
আঙুল মটকাল রবিন। নিশ্চই। বুড়ো পেদ্রোর জমিদারি। পাঁচ হাজার একরের বেশি।
হ্যাঁ, বেশির ভাগই বন আর পাহাড়। ফসলের জমি তেমন নেই। শুনেছি, অনেক আগে বুড়োর নাকি গরুর পাল ছিল, গরু পুষত।
এখন নেই? মুসা জিজ্ঞেস করল।
মাথা নাড়ল রবিন। না, লাইব্রেরিতে রেফারেন্স বইপত্র ঘেঁটেছিলাম একদিন। স্পেন থেকে এসেছিল বুড়োর দাদা, খামার করেছিল ওখানে। বুড়ো পেদ্রোর আমলেই গরু শেষ হয়ে যায়। তার একমাত্র মেয়ে মিস ভেরা পেদ্রোর জন্যে কিছু রেখে যেতে পারেননি। মিস ভেরাও বুড়ো হয়েছেন, খুব সাধারণ ভাবে থাকেন। ল্যাণ্ড-পুয়ার বলে একটা কথা আছে না, তাই। এত জায়গা, অথচ কাজে লাগাতে পারছেন না। টাকা নেই, লোকজন রাখতে পারেন না। এক চাকরানী আর একজন মালী, ব্যস। মহিলা নাকি একা থাকতে পছন্দ করেন, কেউ কখনও দেখা করতে যায় না তাঁর সঙ্গে।
বইয়ের পোকা রবিন, তিন গোয়েন্দার সমস্ত কেসের রেকর্ড রাখার দায়িত্ব তার ওপর, ফালতু কথা বলে না। সে যা বলছে, জেনেশুনেই বলছে।
গম্ভীর হয়ে গেল কিশোর। হুঁ। আচ্ছা, পেদ্রোজ এস্টেটে কি করছিল দুজনে? মূর্তিটাই বা ছুঁড়ে ফেলল কে?
দুজন নয়, একজন, শুধরে দিল মুসা। আরেকটা তো ভূত। ভূতের সঙ্গে যোগ দিয়েছে এক ডাকাত।

কি ডাকাতি করতে যাবে ওখানে? মনে করিয়ে দিল রবিন, মিস ভেরা পেদ্রোর টাকা নেই।
পুতুলটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখছে কিশোর। আশা করছে যেন, এখুনি কথা বলে উঠবে, প্রশ্নের জবাব দেবে। হঠাৎ স্থির হয়ে গেল তার হাত।
কি হলো? জিজ্ঞেস করল রবিন।
পুতুলের নিচের দিকে এক জায়গায় নখ দিয়ে খুঁটছে কিশোর। ছোট্ট একটা দরজা খুলে মেঝেতে পড়ল কি যেন।
গোপন খুপরি! চেঁচিয়ে উঠল মুসা।
কাত হয়ে কুড়িয়ে নিল কিশোর, এক টুকরো কাগজ। ভাঁজ খুলে টেবিলে বিছিয়ে হাত দিয়ে ডলে সমান করল। দেখার জন্যে ঝুঁকে এল অন্য দুজন।
মেসেজ? বলল রবিন।
বুঝতে পারছি না, মাথা নাড়ল গোয়েন্দা-প্রধান। লেখাই মনে হচ্ছে। কি ভাষা কে জানে।
ভুরু কুঁচকে চেয়ে আছে মুসা আর রবিন, ওরাও কিছু বুঝতে পারছে না।
এ-ভাষা আর কখনও দেখিনি, বলল কিশোর।
নীরবে খানিকক্ষণ কাগজটার দিকে চেয়ে রইল ওরা।
শোশ-শোনো, তোতলাতে শুরু করল রবিন। লে-লেখার...মানে, কালি দিয়ে লেখা হয়নি...রক্ত।
আলোর কাছে সরিয়ে নিয়ে আরও ভালমত লেখাটা দেখল কিশোর।
অস্বস্তিতে মাথা চুলকাচ্ছে মুসা।
ঠিকই বলছে, রবিন, একমত হলো কিশোর। রক্তেই লেখা। হাতের কাছে কালি-টালি কিছু ছিল না লেখকের।
হয়তো কোন বন্দি, রবিন অনুমান করল।
কিংবা দল-ছুট কেউ, মুসা বলল। ডাকাতের দল থেকে বেরিয়ে...
অনেক কিছুই হতে পারে, বাধা দিয়ে বলল কিশোর। তবে বোঝা যাচ্ছে, তিন গোয়েন্দার উপযুক্ত রহস্য, আরেকটা কেস। এখন প্রথম কাজ, মেসেজের পাঠোদ্ধার করা।
কে করবে?
একজনের কথাই মনে আসছে যিনি সাহায্য করতে পারবেন।
মিস্টার ক্রিস্টোফার?
হ্যাঁ। রাত অনেক হয়েছে, আজ বিরক্ত করা ঠিক হবে না। কাল সকালে ফোন করব।

পরদিন সকালে নাস্তা সেরেই স্যালভিজ ইয়ার্ডে ছুটে এল মুসা আর রবিন। রেন্টআ-রাইড অটো কোম্পানিতে ফোন করেছিল কিশোর, রাজকীয় রোলস-রয়েস নিয়ে হাজির হয়েছে হ্যানসন। পুরানো মডেলের কুচকুচে কালো বিশাল গাড়িটার জায়গায় জায়গায় সোনালি অলঙ্করণ, খুব সুন্দর।
আগে হলিউড যাব, হ্যানসন, বলল কিশোর, মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফারের অফিসে।
ভেরি গুড, মাস্টার পাশা, বিশীত কণ্ঠে বলল খাঁটি ইংরেজ শোফার।
অফিসেই রয়েছেন বিখ্যাত চিত্রপরিচালক। বিশাল টেবিলের ওপাশ থেকে স্বাগত জানালেন তিন গোয়েন্দাকে, এসো; ইয়াং ফ্রেণ্ডস। এবার কি সে?
খুলে বলল ছেলেরা।
মন দিয়ে শুনলেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। পুতুলটা নিয়ে ভালমত দেখে নামিয়ে রাখলেন টেবিলে। পুরানো, অনেক পুরানো। অ্যামিউলেট। ইনডিয়ান কারিগরের কাজ, সন্দেহ নেই। ইনডিয়ান শিল্পের ওপর একটা ডকুমেন্টারি ফিল্ম করেছিলাম টেলিভিশনের জন্যে, অনেক কিছু জেনেছি তখন। অ্যামিউলেটটা দেখেই বোঝা যায়, চাম্যাশ ইনডিয়ানদের কাজ।
অ্যামিউলেট কি, স্যার? জিজ্ঞেস করল মুসা।
মন্ত্রপুত পুতুল। গলায় ফাঁস লাগানো থাকে, এতে নাকি শয়তান কাছে ঘেঁষতে পারে না, মূর্তির মালিকের অশুভ কিছু ঘটে না। সেফ কুসংস্কার। চাম্যাশদের অনেকের কাছেই এ-ধরনের পুতুল আছে।
রকি বীচেও ইনডিয়ান ছিল?
ছিল, জবাব দিল রবিন। আগে রকি বীচে চাম্যাশ ইনডিয়ানরা ছিল উপকূলের ধারে, স্প্যানিশ জমিদারদের গোলামী করেছে অনেকে।
হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ, মাথা দোলালেন পরিচালক। এখন পক্ষীমানবের কথা বলো। লম্বা, কুঁজো, পাখির মত খুদে মাথা, ঝটকা দিয়ে দিয়ে নড়ছিল, অট্টহাসি হেসে উঠেছিল, না?
হ্যাঁ, স্যার।
তুমি আর মুসা ছায়াটার খুব কাছে ছিলে, একই সময়ে হাসি শুনেছ, অথচ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বর্ণনা করছ। তোমার কি মনে হয়, কিশোর?
বুঝতে পারছি না, স্যার।
আমিও না, স্বীকার করলেন পরিচালক। দেখি, মেসেজটা?
কাগজের টুকরোটা বের করে দিল কিশোর।
রক্তেই লেখা, ভাল করে দেখে বললেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। আরেকটা ব্যাপার লক্ষ করেছ? খুব বেশি পুরানো নয় কাগজটা, বেশি দিন আগে রাখা হয়নি।

পড়তে পারছেন, স্যার? জিজ্ঞেস করল রবিন।
না। এরকম লেখা আর দেখিনি।
খাইছে! তাহলে? হতাশ কণ্ঠে বলল মুসা। কিশোর বলছিল, আপনি পড়তে পারবেনই।
এখন তাহলে কি করব, স্যার? রবিনও হতাশা ঢাকতে পারল না।
আমি পারিনি বলে যে অন্য কেউ পারবে না, তা-তো বলিনি, মিটিমিটি হাসছেন পরিচালক। আমার এক বন্ধু আছে। ইউনিভারসিটি অভ সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়ার প্রফেসর, প্রাচীন ভাষার বিশেষজ্ঞ। ফিচার ফিল্মটা করার সময় অনেক সাহায্য করেছে আমাকে। রকি বীচেই থাকে। আমার সেক্রেটারির কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে যাও। কি হয়, জানিও আমাকে।
মিস্টার ক্রিস্টোফারকে ধন্যবাদ জানিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা। প্রফেসরের ঠিকানা লিখে নিল সেক্রেটারির কাছ থেকে। পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ড থেকে মাত্র কয়েক রক দূরে থাকেন প্রফেসর নরম্যান এইচ. হেনরি।
হ্যানসনকে রকি বীচে ফিরে যেতে বলল কিশোর।
প্রফেসর হেনরির ছোট্ট সাদা বাড়িটা রাস্তা থেকে দূরে। ঘন গাছপালায় ঘেরা। সীমানার চারপাশে সাদা খাটো খুঁটির বেড়া। হ্যানসনকে গাড়ি নিয়ে চলে যেতে বলে, গেটের কাঠের পাল্লা ঠেলে ভেতরে ঢুকল কিশোর। পেছনে মুসা আর রবিন। ইট বিছানো পথ চলে গেছে গাড়িবারান্দায়। এগোল ওরা।
অর্ধেক পথ পেরিয়েছে, এই সময় পাশের ঘন ঝোপ থেকে বেরিয়ে পথরোধ করে দাঁড়াল এক লোক।
এই, বলেই থেমে গেল রবিন।
বেঁটে, চওড়া কাঁধ লোকটার, গাঢ়-বাদামী পালিশ করা পাকা চামড়ার মত গায়ের রঙ। কালো, চঞ্চল চোখের তারা। ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে শক্ত ঝকঝকে দাঁত। মোটা খসখসে সূতী কাপড়ের শার্ট পরনে, একই কাপড়ের পাজামা, কোমরে কাপড়ের চওড়া বেল্ট কষে বেধেছে, মাথায় সাদা বড় হ্যাট। খালি পা।
হাতে বাঁকা, লম্বা ফলাওয়ালা ভয়াল এক ছুরি।
কালো চোখ জ্বলছে লোকটার। সামান্য কুঁজো হয়ে পা পা করে এগোচ্ছে, ছুরিটা সামনে বাড়ানো।
পাথর হয়ে গেছে তিন গোয়েন্দা। আরেক পা এগিয়ে ভীষণ ভঙ্গিতে ছুরি নাড়ল লোকটা। বিচিত্র ভাষায় কি যেন বলে লাফিয়ে এসে পড়ল কাছে। থাবা দিয়ে কিশোরের হাত থেকে সোমার পুতুলটা ছিনিয়ে নিয়েই এক দৌড়ে গিয়ে ঢুকে পড়ল ঝোপে।

ঘটনার আকস্মিকতায় থ হয়ে গেছে ছেলেরা। নড়ার, এমন কি চিৎকার করার ক্ষমতাও যেন নেই।
সবার আগে সামলে নিল মুসা। নিয়ে গেল তো!
বিপদের তোয়াক্কা না করে লোকটার পিছে দৌড় দিল সে, ঝোপে গিয়ে ঢুকল হুড়মুড় করে। পেছনে ছুটল অন্য দুজন।
ঝোপঝাড় ভেঙে বাগানের এক ধারে বেরিয়ে এল ওরা। দেরি হয়ে গেছে। পুরানো রঙ-চটা একটা গাড়িতে উঠছে লোকটা। ড্রাইভিং সীটে বসে আছে। আরেকজন। ছেলেরা বেড়া ডিঙানোর আগেই গর্জে উঠল পুরানো এঞ্জিন, চলতে শুরু করল গাড়ি।
যাহ, গেল অ্যামউলেট! চেঁচিয়ে বলল মুসা।
এই সময় পেছনে কড়া গলায় ধমকে উঠল কেউ।
এই, কি হচ্ছে এখানে? হালকা-পাতলা একজন মানুষ, কাঁধ সামান্য কুঁজো। ধূসর চুল। পুরু কাচের চশমা। ছেলেদের দিকে চেয়ে আছেন।
আমাদের অ্যামিউলেট নিয়ে গেল! নালিশ করল যেন মুসা।
ছুরি দেখিয়ে, রবিন যোগ করল।
তোমাদের অ্যামিউলেট? চোখে বিস্ময় ফুটল মানুষটির। অ তোমাদেরকেই পাঠিয়েছে ক্রিস্টোফার। তিন গোয়েন্দা, না?
আপনিই প্রফেসর হেনরি? পাল্টা প্রশ্ন করল কিশোর।
একটা প্রোমে নিয়ে এসেছ? প্রশ্নের জবাব প্রশ্ন দিয়েই সারলেন প্রফেসর একটা অপরিচিত ভাষা বুঝতে পারছ না।
পোরেম নিয়ে এসেছিলাম, বিষণ্ন কণ্ঠে রবিন বলল, এখন আর নেই। লোকট, নিয়ে গেছে।
আছে, শুধরে দিল কিশোর। অ্যামিউলেট নিয়ে গেছে, কিন্তু কাগজটা আছে।
পকেট থেকে কাগজটা বের করে হাসিমুখে প্রফেসরের হাতে তুলে দিল গোয়েন্দাপ্রধান।
আশ্চর্য! লেখাটা একনজর দেখেই চেঁচিয়ে উঠলেন প্রফেসর, পুরু লেন্সের ওপাশে চকচক করছে চোখ। এসো এসো, স্টাডিতে গিয়ে বসি।
লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটতে শুরু করলেন প্রফেসর। চোখ কাগজের দিকে। কয়েক কদম গিয়েই প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়লেন একটা গাছের ওপর।
স্টাডিতে ঢুকে হাত নেড়ে ছেলেদের চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে নিজে বসলেন ফ্যানটাসটিক!
হ্যাঁ, হ্যাঁ, কোন সন্দেহ নেই। আশ্চর্য! আপনমনে বিড়বিড় করছেন প্রফেসর। ছেলেদের উপস্থিতি ভুলেই গেছেন যেন। রক্তে লেখা। খুব বেশি দিনের নয়!

ফ্যানটাসটিক!
কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে নিল কিশোর। পড়তে পারছেন, স্যার?।
আঁ! চোখ তুলে তাকালেন প্রফেসর। হা হা, পারছি। ইয়াকুয়ালি। কোন সন্দেহ নেই। ইয়াকুয়ালি ভাষা। জানোই তো, ইনডিয়ানদের মাত্র কয়েকটা গোত্রের লিখিত ভাষা আছে। স্প্যানিশ অক্ষরের রূপান্তর। মিশনারিদের কাছ থেকে স্প্যানিশ শিখে নিজেরা নতুন একটা ভাষা তৈরি করে নিয়েছিল ইয়াকুয়ালিরা।
চাম্যাশদের মত? প্রশ্ন করল মুসা।
গর্দভ নাকি ছেলেটা? রেগে উঠলেন প্রফেসর। চাম্যাশরা তো আদিম জাত, বুনো। তাদের সঙ্গে ইয়াকুয়ালিদের তুলনা? বলি, ইংরেজি ভাষার সঙ্গে চায়নিজের তুলনা?
ওরা আমেরিকান ইনডিয়ান তো? ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল রবিন।
নিশ্চয় আমেরিকান, এটা আবার জিজ্ঞেস করতে হয় নাকি? কাগজের লেখার দিকে তাকালেন আবার প্রফেসর। এখানে, এই রকি বীচে, ইয়াকুয়ালিদের হাতের লেখা মেসেজ? নাহ, বিশ্বাসই হচ্ছে না। পর্বতের ওপর থেকে পারতপক্ষে নিচেই নামে না ইয়াকুয়ালিরা, শহরে আসা তো দূরের কথা। সভ্যতাকে ঘৃণা করে ওরা।
ইয়ে, স্যার, কোন্ পর্বত? জিজ্ঞেস করতে কিশোরও ভয় পাচ্ছে। কোথায় বাস করে ইয়াকুয়ালিরা?
কোথায় মানে? মেকসিকো। কোন ক্লাসে পড়ো? কিশোরের দিকে তাকালেন প্রফেসর। এই যেন প্রথম খেয়াল করলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নয়, ওরা কিশোর, মাত্র স্কুলে পড়ে, ইনডিয়ানদের ইতিহাস জানার কথা নয় ওদের। লজ্জিত হেসে বললেন, ফরগিভ মি, বয়েজ। ইয়াকুয়ালিরা কোথায় থাকে, তোমরা জানবে কি করে? গোপনে থাকতে পছন্দ করে ওরা, আধুনিক সভ্যতাকে এড়িয়ে চলে।
কিন্তু স্যার, দ্বিধা করছে কিশোর, বলে না আবার বকা শুনতে হয়। মেকসিকো তো এখান থেকে খুব দূরে না। এক-আধজন ইয়াকুয়ালি যদি কোন ভাবে রকি বীচে এসেই পড়ে, অবাক হওয়ার কি আছে?
অসম্ভব! তিন গোয়েন্দাকে চমকে দিয়ে গর্জে উঠলেন প্রফেসর। এত জোরে চেঁচানো উচিত হয়নি বুঝেই যেন কণ্ঠস্বর নরম করলেন। কারণ, ইয়াং মেন, ওরা তাদের এলাকা ছাড়তে নারাজ। মেকসিকোর মাদ্রে পর্বতের দুর্গম অঞ্চলে বাস। লোকালয় থেকে অনেক দূরে, সাংঘাতিক শুকনো এক জায়গা। ডেভিলস গার্ডেন বলে অনেকে, শয়তানের বাগান। পর্বতের অনেক ওপরে, চুড়ার কাছাকাছি থাকে ইয়াকুয়ালিরা, টিকটিকির মত বেয়ে উঠে যায় খাড়া পাহাড়ে, পাহাড়ী ছাগলও ওদের কাছে কিছু না। তাই তো ওদের বলে ডেভিলস অভ দা ক্লিফস।

ডেভিলস? কেঁপে উঠল মুসার গলা। এতই ভয়ানক?
হ্যাঁ, ভয়ানক বটে। আক্রান্ত হলে শয়তানের চেয়েও বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। কিন্তু, সাধারণত, ওরা খুব শান্তিপ্রিয় জাত। নিজেদের নিয়ে থাকতে ভালবাসে। আরেকটা কাজ ভালবাসে, পাহাড়ে চড়া। সময় অসময় নেই, ইচ্ছে হলেই উঠে যায় উঁচু পর্বতের চূড়ায়।
এত উঁচু থেকে নিচে নামল কি করে তাহলে মেসেজটা? জিজ্ঞেস করে বসল রবিন।
জোরে জোরে চিবুক ডললেন প্রফেসর। তাই তো, কি করে নামল? কয়েক বছর ধরে অবশ্য মেকসিকান গভারনমেন্ট ওদের পোষ মানানোর চেষ্টা করছে। যত যাই হোক, ইয়াকুয়ালিরাও মানুষ, সভ্যতার লোভ পেয়ে বসতে কতক্ষণ?
তারমানে, ধরে নেয়া যায় অন্তত একজন ইয়াকুয়ালি রকি বীচে এসেছে? বলল কিশোর। কাজ করতে?
কি জানি, নিজেকেই প্রশ্ন করলেন যেন প্রফেসর, জোর নেই গলায়। নিজের এলাকা ছেড়ে কোথাও গিয়েছে ইয়াকুয়ালি, বিশ্বাস করতে পারছি না। তাছাড়া এখানে কি করতে আসবে? মেসেজটা রকি বীচে পেয়েছ, শিওর?
হ্যাঁ, স্যার। একটা অ্যামিউলেটের ভেতরে।
হ্যাঁ, মাথা দোলালেন প্রফেসর। ইয়াকুয়ালিরা অ্যামিউলেট পছন্দ করে।
কিন্তু মিস্টার ক্রিস্টোফার তো বললেন, অ্যামিউলেটটা চাম্যাশদের তৈরি, প্রশ্ন তুলল রবিন। এরকম একটা পুতুল নাকি ফিল্ম তৈরির সময় ব্যবহার করেছেন।
চাম্যাশ? আরও অবাক করলে। মিলছে না, মাথা নাড়লেন প্রফেসর। চাম্যাশদের সঙ্গে ইয়াকুয়ালিদের কোন সম্পর্ক নেই। চাম্যাশ পুতুল ইয়াকুয়ালিদের হাতে যায় কি করে? ওই পুতুলটাই তোমাদের কাছ থেকে ছিনতাই হয়েছে?
হ্যাঁ, স্যার, বলল মুসা।
খাঁটি সোনার তৈরি, জানাল রবিন।
বলো কি? ভুরু কুঁচকে ছেলেদের দিকে তাকালেন প্রফেসর। স্বর্ণ? চাম্যাশ। অ্যামিউলেট? অসম্ভব! … সত্যি বলছি, স্যার, জোর দিয়ে বলল কিশোর। আমি স্বর্ণ চিনি।
মিস্টার ক্রিস্টোফারও তো তাই বললেন, রবিন বলল।
তাজ্জব হয়েছেন প্রফেসর। হাঁ হয়ে যাচ্ছে মুখ, ঝুলে পড়ছে নিচের চোয়াল। শাট করে বন্ধ করলেন হঠাৎ। হাত বোলালেন চোয়ালে। কাছাকাছি হয়ে আসছে চোখের পাতা, চিন্তিত। আস্তে করে সামনে ঝুঁকলেন। তাই যদি হয় মাই ইয়াং ফ্রেণ্ডস, সাবধানে শব্দ বাছাই করলেন প্রফেসর, বক্তব্যের গুরুত্ব বোঝানোর

জন্যে, তাহলে কাজের কাজই করেছ। দুশো বছরের পুরানো জটিল এক রহস্যের সূত্র এসে পড়েছে তোমাদের হাতে।
বড় বড় হয়ে গেল কিশোরের চোখ। দুশো বছরের পুরানো রহস্য?
ইয়েস, মাই বয়েজ, চাম্যাশ হোর্ডের রহস্য।
শোনো, বললেন প্রফেসর, চাম্যাশরা স্বর্ণ ব্যবহার করে না। এদিকে সোনার খনি কখনই ছিল না। পুতুলটা সোনার হলে, নিশ্চয় চাম্যাশ বোর্ড থেকে এসেছে।
চ্যামাশ হোর্ড কি জিনিস, স্যার? জিজ্ঞেস করল রবিন।
সতেরোশো নব্বই সাল থেকে আঠারোশো বিশের মধ্যে, বলে চললেন প্রফেসর, ভয়ানক একদল খুনে চাম্যাশ আড্ডা গেড়েছিল এদিকের পর্বতের মধ্যে। ইয়াকুয়ালিদের মত না হলেও পাহাড়ে চড়ায় ওরাও ওস্তাদ ছিল। পাহাড়ের মধ্যে লুকিয়ে পড়লে খুঁজে বের করা খুব মুশকিল হত। দলটাকে কিছুতেই সামলাতে পারছিল না স্প্যানিশরা। শেষে অন্য ফন্দি করল, সোনার লোভ দেখাল, এটা-ওটা নানারকম সোনার জিনিস উপহার দিল। খারাপ করল আরও। সোনার কদর বুঝে গেল ওই চাম্যাশরা, এতদিন শুধু বশ্যতা স্বীকার করেনি, এবার লুটপাট শুরু করে দিল। স্প্যানিশ জমিদারদের খুন করে লুট করতে লাগল তাদের সম্পদ।
আর কোন উপায় না দেখে সেনাবাহিনীর কাছে ধর্না দিল জমিদারেরা। শেষ করে দেয়া হলো দলটাকে। ধরা পড়ল দলের নেতা ম্যাগনাস ভারদি। অনেক অত্যাচারেও মুখ খুলল না। কিছুতেই বলল না, কোথায় লুকিয়ে রেখেছে ধনরত্নের স্তুপ। মৃত্যুর আগে বলে গেল, এমন এক জায়গায় রেখেছে ওগুলো, যা, কেউ কোনদিন খুঁজে পাবে না। সত্যি, খুঁজে পেল না। কত লোক যে কতভাবে খুঁজেছে, কিন্তু পায়নি। বাতাসে হারিয়ে গেল যেন চাম্যাশ হোর্ড। আমার বিশ্বাস ছিল, পানিতে ফেলে দিয়েছে, সাগরে, যাতে কেউ কোন দিন না পায়।
অনেক দূরে চলে গেছে যেন কিশোরের নজর। এত কষ্টে জোগাড় করেছে, পানিতে ফেলে দেয়ার জন্যে? নিশ্চয় সেটা পারেনি ম্যাগনাস, মন সায় দেয়নি।
হয়তো, বললেন প্রফেসর। আর পুতুলটা হোর্ডের হয়ে থাকলে, আশা করা যায়, গুপ্তধনগুলো ধারে-কাছেই কোথাও রয়েছে। দারুণ এক আবিষ্কার হবে সেটা।
মেসেজে নিশ্চয় হোর্ডের কথা বলা আছে, সামনে ঝুঁকল কিশোর।
মেসেজ? চোখ মিটমিট করলেন প্রফেসর। কাগজটার দিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠলেন। হায় হায়, ভুলেই গিয়েছিলাম।
মেসেজটা পড়তে পড়তে কুঁচকে গেল প্রফেসরের ভুরু।
আদিম এসব ভাষা অনুবাদ করা কঠিন। আদিম বলছি, তার কারণ, ভাষাটা নতুন হলেও যাদের ভাষা তারা আদিম লোক, প্রাগৈতিহাসিক চিন্তাভাবনা রয়ে গেছে,

মনটা কাজ করে সেভাবেই। বলার ভঙ্গিও আদিম। যাই হোক, এটা বলছে। ওয়ারডস স্মোক। সিঙ ডেথ সঙ। ব্রাদার্স হেল্প। ব্যস, এই।
সাহায্যের আবেদন? বলল কিশোর।
মনে হয়, অবাক হয়ে মেসেজটার দিকে চেয়ে আছেন প্রফেসর। কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারছি না, চাম্যাশ অ্যামিউলেটের ভেতরে ইয়াকুয়ালি মেসেজ কেন? গভীর রহস্য।
সমাধান করে ফেলব, স্যার, দৃঢ় আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলল কিশোর।
হ্যাঁ, করে ফেলো, হাসলেন প্রফেসর। জানিও আমাকে, প্লীজ। চাম্যাশ হোর্ড দেখার ইচ্ছে আমার অনেক দিনের।
গেটের কাছে ছেলেদেরকে এগিয়ে দিয়ে গেলেন তিনি। রোদে উজ্জ্বল সকাল। বার বার তাকালেন এদিক ওদিক, ভয়, যেকোন সময় ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে পারে বাদামী চামড়ার লোকটা।
বাইরে বেরিয়েই কিশোরের দুদিক থেকে চেপে এল রবিন আর মুসা।
কিশোর? প্রায় চেঁচিয়ে বলল রবিন। কি মনে হয় তোমার? চাম্যাশ হোর্ড পেয়ে গেছে কেউ?
তার কাছ থেকে কেউ ছিনিয়ে নেয়ার তালে আছে? মুসার প্রশ্ন।
হয়তো অ্যামিউলেটটাই সূত্র, আবার বলল রবিন।
কিন্তু ছিনিয়ে নিল যে, কে লোকটা? মুসা বলল। ইনডিয়ান ডাকাতদের আরেকটা দল?।
বাদামী লোকটাকে কিন্তু ইনড়িয়ানের মত লাগল।
পেদ্রোর বাড়িতে সেদিন যে ছায়াটা দেখলাম, নিশ্চয় কোন ইনডিয়ানের প্রেতাত্মা।
গভীর চিন্তায় মগ্ন কিশোর, ঘনঘন চিমটি কাটছে নিচের ঠোঁটে, বিরক্ত হয়ে ঘুরে তাকাল। পাগল হয়ে গেছ নাকি? এভাবে অনুমানে কিছু হবে না। কাজ করতে হবে, কাজ। পেদ্রোজ এস্টেটে গিয়ে খোঁজখবর নিতে হবে।
গোপনে? জিজ্ঞেস করল মুসা। মানে লুকিয়ে ঢুকব?
না, লুকিয়ে ঢুকব। হয়তো কিছু জানাতে পারবেন মহিলা। কিন্তু তাঁর সঙ্গে দেখা করি কিভাবে?
নানারকম প্রস্তাব দিল রবিন আর মুসা। কোনটাই পছন্দ হলো না গোয়েন্দাপ্রধানের। শেষে ঠিক হলো, রবিনের বাবার সাহায্য নেবে। তিনি সাংবাদিক। ক্যালিফোর্নিয়ার পুরানো ইতিহাস জোগাড় করে পত্রিকায় ধারাবাহিক একটা ফিচার করছেন কিছু দিন ধরে। প্রেদ্রোজ এস্টেটে তাঁর পক্ষে সহজে ঢোকা সম্ভব। মহিলার সাক্ষাৎকার নেবেন। তার সঙ্গে ঢুকবে তিন গোয়েন্দা, ফাঁকে ফাঁকে দু-চারটা প্রশ্ন ওরাও হয়তো করতে পারবে।

বাবাকে রাজি করানোর দায়িত্ব নিল রবিন।
হাঁটতে হাঁটতে ইয়ার্ডের কাছে চলে এসেছে ওরা। গেটের দিকে চোখ পড়তেই চেঁচিয়ে উঠল মুসা, আরে, দেখো কে? শুঁটকি! ·
টেঙা, হালকা-পাতলা একটা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে গেটের পাশে, পেছন ফিরে রয়েছে। হ্যাঁ, টেরিয়ার ডয়েলই, তিন গোয়েন্দার পুরানো শত্রু শুঁটকি টেরি। বড়লোকের বখে যাওয়া ছেলে, রকি বীচে বাড়ি আছে, মাঝে মাঝে ছুটি কাটাতে আসে, জান জ্বালিয়ে ছাড়ে তিন গোয়েন্দার। মুসার দীর্ঘ দিনের ইচ্ছে, সময়সুযোগমত পেলে ওর চোখা বাঁকা নাকটা এক ঘুসিতে ভোঁতা করে দেবে। কিন্তু রকি বীচে একা নয় টেরিয়ার, অনেক বন্ধু আছে, সবগুলো শয়তান, টেরিয়ারের নীল গাড়িতে চড়া আর হোটেল-রেস্তোরাঁয় ভালমন্দ খাবার লোভে তার দলে যোগ দিয়েছে। তিন গোয়েন্দার যদিও তেমন কোন ক্ষতি আজতক করতে পারেনি ওরা, তবে যথেষ্ট ভুগিয়েছে।
এখানে কি করছে ব্যাটা? রবিনের জানার খুব ইচ্ছে।
নিচু গলায় তাগাদা দিল কিশোর। জলদি, লাল কুকুরচার।
ঘুরে, পাশ দিয়ে স্যালভিজ ইয়ার্ডের পেছনে চলে এল ওরা, টেরিয়ারের অলক্ষে। বেড়ার গায়ে ওখানে একটা অগ্নিকাণ্ডের দৃশ্য আঁকা, ১৯০৬ সালে স্যান ফ্রানসিসকোয় আগুন লেগেছিল, তারই একটা দৃশ্য। জ্বলন্ত শিখার কাছ থেকে দূরে বসে আগুনের দিকে চেয়ে আছে একটা লাল কুকুর। কাঠের একটা গিট রয়েছে একটা চোখের জায়গায়, অবিকল চোখের মতই দেখা যায়। নখ দিয়ে খুঁচিয়ে ওটা বের করে আনল কিশোর, ভেতরে আঙুল ঢুকিয়ে গোপন সুইচে চাপ দিতেই তিন দিকে সরে গেল তিনটে হার্ডবোর্ডের পান্না। ভেতরে ঢুকে গেল ছেলেরা, সুইচ টিপে আবার পাল্লা বন্ধ করে দিল কিশোর।
জঞ্জালের তলা দিয়ে চলে গেছে পথ, বুকে হেঁটে ট্রেলারের তলায় এসে পৌঁছল ওরা। ঢাকনা তুলে ঢুকল হেডকোয়ার্টারে।
চেয়ারে বসতে না বসতেই স্পীকারে ভেসে এল জোরাল মহিলা-কণ্ঠ, কিশোর? এই কিশোর?
খাইছে! আঁতকে উঠল মুসা। মেরিচাচী। নিশ্চয় জঞ্জালের বোঝা নিয়ে এনেছেন রাশেদ চাচা। মারা পড়ব এখন।
জবাব দিল না কিশোর।
কিশোর? আবার ডাক শোনা গেল। গেল কই ছেলেগুলো? আরে এই কিশোর, শুনছিস? একটা ছেলে দেখা করতে এসেছে তোর সঙ্গে, টনি পেদ্রো। কিশোর?
একে অন্যের দিকে তাকাল ছেলেরা। জনৈক পেদ্রো এসেছে তাদের সঙ্গে দেখা করতে, যখন ওরা পথ খুঁজে পাচ্ছে না কি করে ঢুকবে পেদ্রো এস্টেটে? একেই

বলে মেঘ না চাইতেই জল। কিন্তু কে এই টনি পেদ্রো?
মিস ভেরা তো শুনলাম একা থাকেন? রবিন বলল।
চলো, দেখি, দুই সুড়ঙ্গের মুখের দিকে রওনা হলো কিশোর। জিজ্ঞেস করলেই জানা যাবে।
এই যে, বেরিয়েছে, ছেলেদের দেখেই বলে উঠলেন মেরিচাচী। এই, ছিলি কোথায়? এত ডাকাডাকি করছি। একেক সময় ভাবি, ইয়ার্ডটা বানানোই হয়েছে বুঝি তোদের লুকোচুরি খেলার জন্যে। নে, কথা বল। ছেলেটাকে দেখিয়ে দিয়ে চলে গেলেন তিনি, অফিসে অনেক কাজ।
লম্বা একটা ছেলে, তিন গোয়েন্দার চেয়ে বয়েসে বড়, লম্বা কালো চুল। ধূসর স্যুট পরনে, বিদেশী ছাঁট, আমেরিকান নয়। হেসে হাত বাড়িয়ে দিল সে, আমি টনি পেদ্রো।
বিস্মিত হয়েছে, সে ভাবটা গোপন করে কিশোরও হাত বাড়াল। আমি কিশোর পাশা। ও রবিন মিলফোর্ড, আর ও মুসা আমান।
পরিচিত হয়ে খুশি হলাম, হাসল টনি। তোমাদের এক বন্ধু জানাল, তোমরা নাকি অদ্ভুত ক্যারেকটার।
টেরিয়ার ডয়েল।
অদ্ভুত ক্যারেকটার নয়, বলতে চেয়েছে আসলে আজব চিড়িয়া, বুঝল তিন গোয়েন্দা।
শুঁটকি পাঠিয়েছে তোমাকে? গুঙিয়ে উঠল রবিন।
বলল, তোমাদের মাথায় নাকি ছিট আছে, জবাবটা এড়িয়ে গিয়ে বলল টনি।
আছে নাকি? শুনেছি, সব আমেরিকান ছেলের মাথায়ই ছিট কমবেশি থাকে।
ওই শুঁটকি ব্যাটাই খাঁটি আমেরিকান, জোরে হাত নাড়ল মুসা। আমরা কেউ নেই। কিশোর বাঙ্গালী, আমি আফ্রিকান, আর রবিন অর্ধেক আইরিশ। তুমি কি আমেরিকান নাকি?
না না, তাড়াতাড়ি বলল টনি, ইংল্যাণ্ড। ক্যামব্রিজ। মিস ভেরা পেদ্রো আমার দাদী, বাবার ফুফু। ওই যে, পেদ্রোজ এস্টেটের মালিক, নাম নিশ্চয় শুনেছ। কয়েক মাস আগে বাবা মারা যাওয়ার সময় দাদীর কথা বলেছে আমাকে। আগে তো জানতামই না। আমার দাদা, ভেরা-দাদীর ভাই নাকি ফ্রান্সে খুন হয়েছিল, আমার বাবা তখন মায়ের পেটে। কঠিন অসুখে মারা গেছে বাবা। যখন বুঝল বাঁচবে না, দাদীর কাছে চিঠি লিখল। দাদীই আমাকে তার কাছে নিয়ে এসেছে।
সারাক্ষণ হাসি লেগে আছে টনির মুখে, কথা বলার সময়ও। দ্রুত অনেক বেশি কথা বলে, ফলে কথার টান ঠিক বোঝা যায় না। কেউ কিছু বলার আগেই আবার লাগাম ছেড়ে দিল, হ্যাঁ, যে কথা বলতে এসেছি। পুরানো জঞ্জালে বোঝাই হয়ে

আছে ভেরাদাদীর ভাড়ার। ওগুলো এবার পরিষ্কার করে ফেলতে চায়। ফেলেই দিতে চেয়েছিল। আমি বুদ্ধি দিলাম, ফেলে কি লাভ? পুরানো বাতিল মাল কেনার পাগলও আছে, তাদের কাছে বেচে দাও। কথাটা খুব মনে ধরল দাদীর, আমাকে খোঁজ নিতে বলল। কাউকে তো চিনি না এদিকে। দাদীর উকিলের কাছে তোমাদের কথা শুনলাম। রকি বীচেই থাকে উকিল সাহেব, তারই বন্ধুর ছেলে টেরিয়ার উয়েল। তাকে জিজ্ঞেস করলাম স্যালভিজ ইয়ার্ডটা কোথায়, দেখিয়ে দিতে পারবে কিনা। দেখিয়ে দিল বটে, কিন্তু ভেতরে আনতে পারলাম না কিছুতেই। বেশ অবাক হয়েছি।

কি যেন কাজে ওয়ার্কশপের বাইরে এসেছিলেন মেরিচাচী, পুরানো জঞ্জালে বোঝাই কথাটা তার কানে গেছে। বেড়ার এপাশে উঁকি দিলেন। কিশোর, কিসের কথা বলছে রে?।

পুরানো মাল, চাচী, বলে আবার টনির দিকে ফিরল কিশোর। হ্যাঁ, টনি, কখন দেখতে যাব?

এখন গেলেই তো ভাল হয়।

এক্ষুণি? বললেন মেরিচাচী। দুপুর তো হয়ে এল। ঠিক আছে, যা। খেয়ে যা। ফিরতে নিশ্চয় বিকেল হবে।

চাচা কই? জিজ্ঞেস করল কিশোর।

কি জানি, রোভারকে নিয়ে কোথায় গেল। বোধহয় মালটাল আনতে।

যাব কিসে? ছোট ট্রাকটা আছে?

আছে।

তাড়াতাড়ি খেয়ে নিল তিন গোয়েন্দা। অফিসে বসে রইল টনি।

ট্রাক বের করল বোরিস। চড়ল তিন কিশোর। টনি যাবে তার নিজের গাড়িতে।

গেটের বাইরে বেরিয়ে টেরিয়ারকে খুঁজল টনি, ধন্যবাদ দেয়ার জন্যে, কিন্তু কোথাও দেখা গেল না তাকে। নীল গাড়িটাও নেই। অবাকই হলো টনি।

মুচকি হাসল তিন গোয়েন্দা। শুঁটকির ব্যাপারটা কি বলো তো? মুসা বলল।

কি আর? জবাব দিল কিশোর। বরাবর যা করে, নাক গলাবে আমাদের কাজে।

ওর কথা ভাবছি না, আমি ভাবছি টনির কথা। বেশি কাকতালীয় হয়ে গেল না? তোমরাও পুতুল পেলে, তার পরদিনই এসে হাজির হলো পেদ্রোদের নাতি, আমাদেরকে এস্টেটে নিয়ে যেতে চায়।

তাই তো? পুতুলটা আমাদের কাছে আছে ভাবছে না তো? রবিনের জিজ্ঞাসা।

ইয়াল্লা! বলল মুসা। এক পুতুল কয় দলে খুঁজছে?

ছিনতাই যে হয়েছে, টনি জানে এটা? বলল রবিন।

হয়তো জানে, কিশোর বলল। তাহলে এটাও জানে মেসেজটা আমাদের কাছে আছে। সেটাই হাতাতে চায় এখন।
তাই কি? দেখে কিন্তু খারাপ মনে হয় না।
খামোকাই হয়তো সন্দেহ করছি। তবে সতর্ক থাকতে হবে আমাদের।
একমত হলো রবিন আর মুসা।
রকি বীচ থেকে বেরিয়ে এসেছে ঝরঝরে ট্রাক, টনির স্পোর্টস কারকে অনুসরণ করে উঠে যাচ্ছে পাহাড়ী পথ ধরে।
আঁকাবাঁকা গিরিপথ শেষ করে এসে এস্টেটের পুরানো লোহার দরজার সামনে থামল দুটো গাড়ি।
পাল্লা খুলল টনি।
ভেতরে ঢুকল গাড়ি দুটো। খোয়া বিছানো আধ মাইল পথ পেরিয়ে এসে থামল বিরাট এক বাড়ির সামনে। স্প্যানিশ ধাঁচের বাড়ি, সাদা দেয়াল, লাল টালির ছাত। মস্ত বড় জানালাগুলোতে মোটা লোহার শিক, দোতলার কয়েকটা দরজার সামনে ঝোলা বারান্দা। দেয়ালের সাদা রঙ মলিন, জায়গায় জায়গায় ছাতলা পড়া, চিড়ও ধরেছে কোথাও কোথাও, অযত্ন আর অবহেলার ছাপ।
পথ দেখিয়ে তিন গোয়েন্দাকে বাড়ির পেছনে আরেকটা বাড়িতে নিয়ে এল টনি, ইটের দেয়াল, গোলাঘর। ভেতরে পুরানো জিনিসপত্র ঠাসা। ভাঙা আসবাবপত্র, গৃহস্থালীর সরঞ্জাম, পুরানো আমলের এমন অনেক জিনিস আছে, যেগুলোর নামও জানে না তিন গোয়েন্দা। ধুলোয় মাখামাখি। দেখে মনে হয়, গত পঞ্চাশ বছরে ওগুলোতে হাত দেয়নি কেউ।
দাদী তত সন্ন্যাসী, বলল টনি। এখানে কি আছে না আছে জানেই না হয়তো।
পুরানো মাল ভালই চেনে কিশোর, কোনটা বিক্রি হবে না হবে, তার চাচার চেয়ে ভাল বোঝে। বলল, আরিবা, এত পুরানো। এই যে, একটা চরকা। ওটা কি? ও, জাহাজের টেবিল, লেখার ডেস্ক।
পুরো এক ঘণ্টা জিনিসপত্র দেখল সে, তাকে সাহায্য করল রবিন আর মুসা। এতই মগ্ন, চাম্যাশ অ্যামিউলেটের কথা ভুলে গেছে, মনেই পড়ছে না কারও মাত্র আগের রাতে ভূত দেখা গেছে এ-বাড়ির কাছে।
টনির দিকে ফিরল অবশেষে কিশোর, হুঁ, দেখলাম। ভালই।
ঘরে, এসে বসো তাহলে, আমন্ত্রণ জানাল টনি। কিছু খাও। দাদীর সঙ্গেও কথা বলা যাবে। তার সঙ্গেই দামদর করো।
এটাই চাইছে তিন গোয়েন্দা, মিস ভেরা পেদ্রোর সঙ্গে কথা বলতে।
খুব ভাল হয় তাহলে, সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল কিশোর। বোরিস, মালগুলোর লিস্ট করে নিন।

হো-কে (ওকে), সায় জানাল বোরিস।
ঠিক আছে, আপনি থাকুন, টনি বলল। বীয়ার পাঠিয়ে দিচ্ছি।
হো-কে। ভেরি গুড।
বিরাট বাড়ির বিশাল ড্রইংরুমে ছেলেদের নিয়ে এল টনি। ঠাণ্ডা ঘর। পুরানো আমলের আসবাবপত্র, গাঢ় রঙ। চাকরানীকে ডেকে লেমোনেড আর বিস্কুট আনার জন্যে বলল সে।
খাবারের ট্রে নিয়ে এল চাকরানী, তার পেছনে এলেন এক বৃদ্ধা। ক্ষীণ-দেহী, ধবধবে সাদা চুল। বয়েসের ভারে ঘোলাটে চোখের তারা, উজ্জ্বল হলো ছেলেদের দেখে।
আমি ভেরা প্রেদ্রো, পরিচয় দিলেন মহিলা। বুঝতে পারছি, টনির সঙ্গে তোমাদের বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। শুনলাম, স্যালভিজ ইয়ার্ড থেকে এসেছ। মাল পছন্দ হয়েছে?
হ্যাঁ, ম্যাডাম, মাথা নোয়াল কিশোর।
সব কিছু ছেড়েই দিয়েছিলাম, বললেন মহিলা। টনি এসে নতুন জীবন দিয়েছে আমাকে। বাঁচার আগ্রহ জাগিয়েছে।
টেবিলে লেমোনেড আর বিস্কুট সাজিয়ে রেখে চলে গেল কাজের মেয়েটা।
ছেলেদের হাতে হাতে খাবার তুলে দিলেন মিস ভেরা, মেহমানদের ভাল লাগছে তার, বোঝা যাচ্ছে। গতরাতে বুঝিয়েছে আমাকে টনি। খামোকা পুরানো মাল ভাঁড়ারে ফেলে রেখে লাভ কি? নষ্ট হচ্ছে। তার চেয়ে বেচে দিলে কিছু পয়সা আসবে।
সতর্ক হয়ে গেল তিন গোয়েন্দা। গত রাতে? বলল কিশোর।
হ্যাঁ, মাথা ঝাকালেন মহিলা। আমাদের নাকের সামনে দিয়ে চুরি হয়ে গেল একটা সোনার পুতুল। দুটো পুতুলের একটা। আমার পাগলা ভাইটার জিনিস, সেই যে বাড়ি থেকে পালাল, আর ফিরল না। ওগুলোই ছিল তার স্মৃতি, তা-ও একটা গেল চুরি হয়ে।
সব দোষ, ভাই, আমার, ছেলেদের শোনাল টনি, কি করে চুরি হয়েছে। বাবা জানত পুতুল দুটোর কথা, আমাকে বলেছে। লাইব্রেরিতে ড্রয়ারে খুঁজে পেয়েছি ওগুলো, নিচের দিকের একটা ড্রয়ারে। লাইব্রেরিতে দরজা খোলা রেখে বেরিয়েছিলাম, আবার ফিরে গিয়ে দেখি একটা পুতুল নেই।
কে নিয়েছে জানো না নিশ্চয়? ঘুরিয়ে প্রশ্ন করল কিশোর।
মিস্টার ডাংম্যান তো বলল একটা ছেলে নিয়েছে। দেখেছে নাকি।
হ্যাঁ, দেখেছি, শোনা গেল ভারি কণ্ঠ।
ফিরে চাইল ছেলেরা।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা, চমত্তার স্বাস্থ্য, গায়ে উজ্জ্বল জ্যাকেট, পরনে হাফপ্যান্ট, লম্বা পায়ের শক্ত মাংসপেশী ফুলে রয়েছে। ধূসর চোখজোড়া চঞ্চল। লালচে চুল। রুক্ষ চেহারা, ঠোঁটের এক কোণে গভীর কাটা একটা দাগ, সারাক্ষণ বিকৃত হাসি ফুটিয়ে রেখেছে যেন বেচারার মুখে।
পরিচয় করিয়ে দিল টনি। জানাল, মিস্টার ডাংম্যান তার দাদীর বন্ধু।
ডাকাতির কথা তো শুনলে, ডাংম্যান বলল, বিস্তৃত হলো বিকৃত হাসি। কথার টান টনির টানের সঙ্গে ঠিক মেলে না। বোধহয় খাস লণ্ডন শহরের মানুষ। ছেলেদের কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই বলে গেল, একটা ছেলেকে দেখলাম বাড়ির কাছ থেকে ছুটে পালাচ্ছে। তাড়া করলাম। গেটের কাছে গিয়ে হারিয়ে ফেললাম তাকে, আর খুঁজে পেলাম না। ছেলেটার সঙ্গে আরও এক-আধজন ছিল হয়তো। যা-ই হোক, গেল পুতুলটা, আর পাওয়া যাবে না।
আমরা চেষ্টা করে দেখতে পারি, কিশোর বলল। চোরাই মাল খুঁজে বের করার অভিজ্ঞতা আছে আমাদের।
অনেক জটিল রহস্যের সমাধান করেছি, মুসা জানাল।
হেসে উঠল ডাংম্যান। ডিটেকটিভ মনে হচ্ছে?
হ্যাঁ, স্যার, ডিটেকটিভই, বলে পকেট থেকে কার্ড বের করে দিল কিশোর।
পড়ল ডাংম্যান। আবার হাসল। যাক, আশা হচ্ছে। পাওয়া যেতে পারে পুতুল। মুসার দিকে ফিরল। তুমি যেন কি বললে? রহস্যের সমাধান?
অনেক করেছি। বিশ্বাস না হলে পুলিশ চীফ ইয়ান ফ্লেচারকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন।
তাই? আবার কার্ডটার দিকে তাকাল ডাংম্যান।
ঘরের কোণে চেয়ারে বসে আছে টনি, জিজ্ঞেস করল, আশ্চর্যবোধকগুলো কেন? তোমরা অদ্ভুত ছেলে, সেটা বোঝানোর জন্যে?
কড়া জবাব দিতে যাচ্ছিল মুসা, সেটা বুঝে তাড়াতাড়ি বলল কিশোর, ওগুলো আমাদের প্রতীকচিহ্ন। তাছাড়া নানা রকম আজব রহস্য যে সমাধান করি, সেটাও বোঝায় চিহ্নগুলো।
দারুণ, প্রশংসা না ব্যঙ্গ করল টনি, বোঝা গেল না। দাদী, ওদেরকে দাও না একটা সুযোগ?
কিন্তু টনি, দ্বিধা করছেন মহিলা, কোন বিপদে পড়ে যদি ওরা?
হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন, সুর মেলাল ডাংম্যান। বিপদে পড়তে পারে।
সতর্ক থাকব আমরা, ম্যাডাম, বলল কিশোর। তেমন বুঝলে মিস্টার ফ্লেচারকে গিয়ে ধরব সাহায্যের জন্যে। চোর কোন ছেলেছোকরা হয়ে থাকলে, আমাদের জন্যেই কাজটা উপযুক্ত হবে।

ঠিকই বলেছে ও দাদী, টনি বলল। তাছাড়া পুলিশ চীফের সঙ্গে খাতির আছে ওদের…
ঠিক আছে, নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না মিস পেদ্রো। তবে একটা কথা ঠিক, এত ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে গিয়ে পুলিশের কাছে পাত্তা পাব না আমরা।
হ্যাঁ, সায় দিয়ে বলল ডাংম্যান, পুলিশের অনেক জরুরী কাজ আছে। তারচে ওরাই খুঁজুক, তেমন বুঝলে গিয়ে পুলিশের কাছে বলবে। তবে সাবধানে থাকবে, কথা দিয়ে যেতে হবে।
তা থাকবে, বলে উঠল টনি। জানের মায়া কার না আছে? দাদী, একটা পুরস্কার ঘোষণা করলে কেমন হয়? বিপদ যেমন, তেমন খাটুনিও আছে কাজটায়?
নাতির দিকে চেয়ে হাসলেন মিস পেদ্রো। হ্যাঁ, তা মন্দ হয় না। ধরো, এই একশো ডলার?
কি বলো রাজি? গোয়েন্দাদের দিকে চেয়ে বলল টনি। এক কাজ করো, কাল লাঞ্চের সময় এখানে চলে এসো। কি ভাবে কি করা যায়, চারজনে বসে প্ল্যান করব?
লাঞ্চের সময় এসে কি করবে? তাড়াতাড়ি বলল ডাংম্যান। আমাদের খাবার কি পছন্দ হবে? আমি আর মিস পেদ্রো তত খাই নিরামিষ। তিন কিশোরের দিকে ফিরল। তোমরা হয়তো জানো না, ভেজিট্যারিয়ান লীগের প্রেসিডেন্ট আমি। রকি বীচে লীগটা আমিই শুরু করেছি, অনেক সাহায্য করছেন মিস পেদ্রো। একটা অনুষ্ঠানে তোমরা হাজির থাকতে পারো, লেকচার শুনবে। উপকার হবে। আজ বিকেলেই একটা আছে।
পারলে খুব খুশি হতাম, স্যার, বিনীত কণ্ঠে বলল, কিশোর। কিন্তু আজ অনেক কাজ। এই তো, মালপত্রগুলো নিয়ে যেতে হবে। দেরি করলে চাচী চিন্তা করবে। ম্যাডাম, জিনিসগুলোর দাম…
ও যা হোক কিছু একটা ধরে দিও তোমরা, দরাদরি করতে মহিলা নারাজ। জানাই তো আছে তোমাদের, কেমন মাল, কত দাম হতে পারে। আমাকে আর
এসবে টেনে না।
ঠিক আছে, যাই তাহলে, উঠল কিশোর। বোরিসকে গিয়ে সাহায্য করি। দুই সহকারীকে বলল, এসো।
মূর্তিটার কথা ভুলো না কিন্তু, বলল টনি।
হ্যাঁ, আর পুরস্কারের কথাটাও, হাসল ডাংম্যান।
বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা।
গোলাঘরে মাল গোছাচ্ছে বোরিস।

ভেতরে ঢুকে দ্রুত চারপাশে একবার চেয়ে নিল কিশোর, বোরিস ছাড়া আর কেউ নেই। নিচু গলায় দুই বন্ধুকে বলল সে, ব্যাপারটা খেয়াল করেছ?
কী? অবাক হয়ে বলল মুসা।
আশ্চর্যবোধকের কথা জিজ্ঞেস করল টনি।
এতে অবাক হওয়ার কি আছে? অনেকেই তো করে।
অনেকের করা আর টনির করাটা আলাদা। আমাদের কার্ড দিইনি তাকে।
তাই তো! চোখ মিটমিট করল রবিন। কার্ডটা তো ছিল ডাংম্যানের হাতে।
তারমানে আগে থেকেই আমাদের কথা সব জানে টনি? ভুরু কুঁচকে গেছে মুসার।
মাথা ঝাঁকাল কিশোর। জানে। তারমানে, বেশ কিছু মিথ্যে বলেছে আমাদের কাছে। পুরানো মাল বিক্রি তার একটা বাহানা। সেজন্যে আমাদের খোঁজ করবে কেন? সোজা গিয়ে মেরিচাচীর কাছে বললেই চলত।
চুপ করে আছে অন্য দুজন।
হঠাৎ হাসি ফুটল কিশোরের মুখে।
হাসছ যে? জিজ্ঞেস করল মুসা।
লোকে যে কত রকমের নাম রাখে। ডাংম্যান! হাহ্‌হা! জানো, বাংলা করলে কি দাঁড়ায়?
কি?
গোবরমানব, অর্থটা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিল কিশোর। দুই সহকারীগোয়েন্দাও হেসে ফেলল।
আমাদের কার্ড তাহলে কোথায় দেখল সে? মুসার প্রশ্ন।
দেখেনি, রবিন বলল। নিশ্চয় শুঁটকি বলেছে।
মনে হয় না, জোর দিয়ে বলল কিশোর। শুঁটকির কাছে যাওয়ার আগেই আমাদের কথা জেনেছে সে, আমি শিওর। আর শুঁটকি আমাদের সুনাম কিছুতেই করবে না, হিসুংক নাম্বার ওয়ান। তাছাড়া ওর কাছে শুনে থাকলে সেকথা বলত টনি।
কিন্তু বলেনি, বুঝতে শুরু করেছে রবিন। আমরা তিন গোয়েন্দা, জেনেও চুপ থেকেছে। আমরা বলার আগে মুখেও আনেনি। তারমানে, মুসা বলল, বলতে চাইছ, আগেই জেনেছে। অথচ জানে যে সেটা জানাতে চায়নি?
কিন্তু কেন? প্রশ্ন করল রবিন। আমাদের কার্ড দেখেও না বলার কি কারণ থাকতে পারে?
একটাই কারণ, ভেবেচিন্তে বলল কিশোর। এমন কোন উপায়ে জেনেছে, যেটা আমাদের বলা উচিত মনে করছে না। আচ্ছা, তোমাদের কার্ডগুলো গুণে দেখো তো? কার পকেটে কটা রেখেছিল?

সঙ্গে কয়েকটা করে কার্ড রাখে তিনজনেই। বের করে গুণে দেখল মুসা আর রবিন।
আমার একটা কম, বলল মুসা। কালও দেখেছি, পাচটা ছিল।
কাল কখন?
সকালে।
রাতে ফেলেছ তাহলে। পেদ্রোজ এস্টেটের গেটের কাছে। পকেট থেকে রুমাল বের করেছিলে পুতুল জড়ানোর জন্যে, তখনই টান লেগে পড়েছে, বলল রবিন।
এবং টনি সেটা পেয়েছে, কিশোর যোগ করল। হয়তো রাতেই গেটের কাছে এসেছিল সে। যেহেতু বলছে না...।
খাইছে। বাধা দিল মুসা। সে-ই পুতুল চুরি করেছিল ভারছ?
অসম্ভব কি?
কিন্তু, কিশোর, রবিন বলল, সে-ই যদি চুরি করবে, আমাদের সাহায্য চাইতে এল কেন? চাপাচাপি করে সে-ই তো তার দাদীকে রাজি করাল, আমাদের সাহায্য নেয়ার জন্যে।
চাপাচাপি খুব বেশি করেছে, বলল কিশোর, সেটাই সন্দেহজনক। ওর হয়তো ধারণা, পুতুলটা আমাদের কাছে আছে। ফেরত চায়। পুরস্কারের লোভ দেখিয়েছে সে-জন্যেই।
তাতে তার কি লাভ? পুতুল পেলে তো আমরা নিয়ে দেব মিস পেদ্রোর কাছে। আমাদের কাছে সরাসরি চাইলেই পারত। পারত না?
নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল দু-বার কিশোর। এই প্রশ্নটাই খোঁচাচ্ছে আমাকে। দুটো ব্যাপার শিওর। এক, পুতুলটা ফেরত চায় টনি। দুই, দরকার হলে, ওটার যা বাজারদর, তার চেয়ে বেশি দিতে রাজি।
কিন্তু হারিয়ে বসে আছি আমরা, গুঙিয়ে উঠল মুসা ফেরত পাওয়ারও কোন আশা নেই।
হয়তো আছে, সহজে নিরাশ হওয়ার ছেলে নয় কিশোর। চুরি হওয়ার পর থেকেই ভাবছি, কি করে আবার ফেরত আনব। লোকটার যা চেহারা আর পোশাক-আশাক, রকি বীচে বেশিক্ষণ লুকিয়ে থাকতে পারবে না। ভূত-থেকেভূতের সাহায্য নেব আমরা।
ঠিক, তুড়ি বাজাল মুসা।
হ্যাঁ, কটা ছেলেমেয়ের চোখ ফাঁকি দেবে? রবিন বলল।
তাড়াতাড়ি করা দরকার, বলল কিশোর। এসো, মালগুলো গুছিয়ে নিই। বোরিস একা পারছে না।

এক ঘণ্টার মধ্যেই পছন্দসই জিনিসগুলো আলাদা করা হয়ে গেল, প্রতিটির লিস্ট করে নিয়েছে কিশোর। ফিরে চলল ইয়ার্ডে।
লিস্ট দেখে খুব খুশি হলেন মেরিচাচী। কোনটার দাম কত হতে পারে, তাই নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করলেন। এখানে আর কিছু করার নেই। হেডকোয়ার্টারে চলল তিন গোয়েন্দা।
পুতুল ছিনতাইকারী আর তার সঙ্গীর চেহারার বর্ণনা নিখুঁতভাবে লিখে নিল কিশোর। তারপর এক এক করে ফোন শুরু করল তার পাঁচজন বন্ধুকে। লোকগুলো আর ঝরঝরে গাড়িটার কোন খবর পেলে জানাতে অনুরোধ করে রিসিভার তুলে দিল মুসার হাতে। সে ফোন করল তার পাঁচ বন্ধুকে। তারপর রবিন করল তার পাঁচ বন্ধুকে। ওই পনেরো জন আবার তাদের পাঁচ বন্ধুকে জানাবে, তারা জানাবে তাদের পাচজন করে বন্ধুকে। দেখতে দেখতে সারা রকি বীচের কিশোর মহলে ছড়িয়ে পড়বে খবরটা।
এবার, হেসে বলল কিশোর, শুধু অপেক্ষার পালা।
কিন্তু ছ-টা পর্যন্ত করার পরও কোন খবর এল না। নির্বাক একে অন্যের দিকে তাকাল তিন গোয়েন্দা। ব্যাপারটা কি? রকি বীচের কোন ছেলেমেয়ে দেখেনি নাকি? বাতাসে মিলিয়ে গেল ওরা?
লুকিয়ে পড়েছে, রবিন বলল।
রকি বীচে আছে কিনা, কে জানে, বলল মুসা।
আমি শিওর, আছে, আশা ছাড়তে পারছে না কিশোর। খোঁজ পেতে সময় লাগবে, এই আরকি। খবর পাবই। এখন...।
এখন আমরা বাড়ি যাব, ঘড়ির দিকে চেয়ে বলল মুসা। খিদে লেগেছে।
অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে মুখ বকাল কিশোর। মুসার এই খাওয়ার ব্যাপারটায় মাঝে মাঝে বিরক্ত হয় সে। যত জরুরী কাজই থাকুক, তার কাছে খিদেটাই আসল।
ঠিক আছে, বলল কিশোর, যাও। রবিন, ডিনার সেরে লাইব্রেরিতে যাবে একবার। লোকাল হিস্টরির ওপর অনেক বই আছে, সেদিন দেখলাম। ওগুলো ঘাঁটলেই পেয়ে যাবে। আর হ্যাঁ, মিস ভেরা পেদ্রোর ভাইয়ের কথাও কিছু লেখা আছে কিনা, দেখো তো।
আমার কি কাজ? জানতে চাইল মুসা।
তুমি? সোজা এখানে চলে আসবে। আমরা দুজন যাব পেদ্রোজ এস্টেটে। রহস্যময় কিছু ঘটছে ওখানে। কি, সেটা জানা দরকার।
কি জানার আছে? বুঝতে পারছে না মুসা।
হয়তো অনেক কিছুই। প্রথমেই ধরো, সেই ছায়ামূর্তির কথা, অদ্ভুত ছায়া আর হাসি। ওটাকে দেখতে চাই একবার। নিজের চোখে।

আবার! চমকে উঠল মুসা।
খাওয়ার পর সোজা এখানে আসবে, আবার বলল কিশোর। কালো শার্টপ্যান্ট পরে আসবে।
পশ্চিমের উঁচু পাহাড়গুলোর ওপাশে অস্ত যাচ্ছে টকটকে লাল সূর্য। এস্টেটের লোহার গেটের সামনে পৌঁছল কিশোর আর মুসা। ঝোপের ভেতর সাইকেল লুকিয়ে রেখে ক্যারিয়ার থেকে ছোট, পেটফোলা ব্যাগটা খুলে নিল কিশোর। খুব উঁচু দেয়াল, ফিসফিসিয়ে বলল সে, তাই তৈরি হয়ে এসেছি।
ব্যাগ খুলে ঘোট দুটো ওয়াকি-টকি বের করল কিশোর। চার কাঁটাওয়ালা মাঝারি সাইজের একটা হুক আর মোটা দড়ির বাণ্ডিলও বের করে নিল। যদি আমরা কোন কারণে আলাদা হয়ে যাই, সে-জন্যে, ওয়াকিটকি দেখিয়ে বলল সে। হুক আর দড়ি দেয়াল টপকানোর জন্যে।
হুকের ছিদ্র দিয়ে দড়ির এক মাথা ঢুকিয়ে শক্ত করে বাঁধল কিশোর, ছুঁড়ে দিল ওপর দিকে। দেয়ালের ওপরে আটকে গেল হুকের একটা কাটা। দুজনে মিলে দড়ি ধরে টেনে দেখল, খুলে আসছে না।
দড়ি বেয়ে আগে উঠে গেল মুসা। উঁকি দিয়ে দেখল ওপাশে। উঠে বসে ফিরে চেয়ে কিশোরকে ওঠার ইঙ্গিত করল।
উঠে এল কিশোর।
দেয়াল থেকে হুকটা খুলে নিয়ে দড়ি গুটিয়ে আবার ব্যাগে ঢুকিয়ে রাখল কিশোর। দুজনে লাফিয়ে নামল এস্টেটের সীমানার ভেতরে। ব্যাগটা একটা ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রাখল।
বাড়িটাতে ঢুকব, বলল কিশোর। খুব সাবধান।
ম্লান হয়ে আসছে সাঁঝের আলো। গাছপালা আর ঝোপঝাড়ের আড়ালে। আড়ালে সাবধানে এগোল ওরা। ছোট একটা টিলায় উঠে থামল, এখান থেকে মূল বাড়ি আর গোলাঘরটা স্পষ্ট দেখা যায়। চোখ রাখা যাবে।
দিনের আলো শেষ, হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে যেন অন্ধকার। আলো জ্বলে উঠেছে বাড়িটার ঘরে ঘরে। জানালার শার্সিতে মানুষের ছায়া, কিন্তু কেউ বেরোল না, ঘরের ভেতরেই হাঁটাচলা করছে। চারদিক শান্ত। দূরে রাস্তার দিক থেকে কদাচিত ভেসে আসছে গাড়ির এঞ্জিনের শব্দ।
এক জায়গায় একই ভঙ্গিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে থেকে শরীর ব্যথা হয়ে যাচ্ছে, জমে যাচ্ছে যেন মাংসপেশী। মুসার একটা পা প্রায় অবশ, মৃদু ডলাডলি করে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করে নিল।
কিশোর নড়ল না, পড়ে আছে তো আছেই। স্থির, পাথরের মূর্তি যেন।
সময় যাচ্ছে।

এক সময় বাড়ির নিচতলার আলো নিভে গেল। চাঁদ নেই আকাশে। আরও ঘন হলো অন্ধকার।
হঠাৎ, মুসার বাহুতে হাত রাখল কিশোর।
কি? ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল অবাক মুসা।
ওই যে!
লম্বা, আবছা একটা মূর্তি এগিয়ে যাচ্ছে বাড়িটার দিকে। দাঁড়িয়ে পড়ল, কান পেতে কিছু শোনার চেষ্টা করছে বোধহয়, তারপর আবার চলতে শুরু করল। গোলাঘরের পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে পুবের বনের দিকে।
ও বনে ঢুকলেই আমরা... কথা আর শেষ করতে পারল না কিশোর।
তীক্ষ্ণ, তীব্র, বুনো হাসি ছড়িয়ে পড়ল দিকে দিকে, খান খান করে দিল যেন আঁধার রাতের স্তব্ধ নীরবতা।
চিড়িয়াখানায় অন্ধকারে হায়েনার হাসি শুনেছে কিশোর, হাসিটা অনেকটা সেরকম লাগল তার কাছে।
ওটাই! গলা কেঁপে উঠল মুসার। ভূতের ছায়া। আজ অন্যরকম লাগছে!
মানে?
সেদিনের মত কুঁজো নয়। তবে হাসিটা একরকম।
জলদি করা দরকার। নইলে হারিয়ে ফেলব। চলো।
উঠে, টিলার উল্টো ধার দিয়ে দ্রুত নেমে এল ওরা। বনের দিকে ছুটল। যে পথ ধরে ছায়াটা গেছে, সে-পথ ধরে। যতখানি কাছে থেকে স্তব অনুসরণ করতে চায়।
ফিরে তাকাল না ছায়াটা, লম্বা লম্বা পা ফেলে একভাবে এগিয়ে চলেছে। থেমে গেছে বুনো হাসি।
মাইলখানেক পর ঘন হতে শুরু করল বন। এগিয়েই চলেছে ছায়া। আরও খানিকদ্দূর এগিয়ে মোড় নিল, মূল পথ থেকে সরে গেল একটা গলিপথে।
সরু এই পথটা গিয়ে পড়েছে বাটি-আকৃতির ছোট একটা উপত্যকায়। খোয়া বিছানো কাঁচা পথ চলে গেছে উপত্যকার বুক চিরে, পথের শেষ মাথায় ছোট, পুরানো একটা কাঠের বাড়ি। চারপাশে ঘেরা বারান্দা, খড়খড়ি লাগানো জানালা, পাথরে তৈরি চিমনি।
শিকারীর বাংলো গোছের কিছু, বলল কিশোর। হান্টিং লজ।
দেখো!
আড়াল থেকে বেরিয়ে কালো মস্ত আরেকটা ছায়া এগিয়ে আসছে বাড়ির দিকে। আরও কাছে আসার পর কানে এল এঞ্জিনের শব্দ। ট্রাক, হেডলাইট নিভানো। যেন উড়ে এসে ট্রাকটা থামল ছায়ামূর্তির কাছে, কেবিন থেকে লাফিয়ে নামল

বেঁটে, ভারি একটা লোক। দ্রুত, চাপা গলায় কথা হলো কিছু, তারপর ঘুরে ট্রাকের পেছনে গিয়ে টেইল-বোর্ড নামাল লোকটা।
পেছন থেকে নামল চারটে বেঁটে মূর্তি।
ওদেরকে এক সারিতে দাঁড় করাল লোকটা। আগে আগে বাড়িটার দিকে চলল, সে, পেছনে অন্যেরা।
লম্বা ছায়াটা আগেই গিয়ে উঠেছে বারান্দায়। আলো জ্বেলে দিল।
খাইছে! আঁতকে উঠল মুসা। কি ওগুলো?
খুবই বেঁটে চারটে মূর্তি, মাথা নেই।
মাথা! মাথা গেল কই! গলা কাঁপছে মুসার।
আ-আমি জানি না! কিশোর পাশাও কথা হারিয়ে ফেলেছে। ও-ওরা, মনে তো হচ্ছে, মুশূন্য বামন…
অন্ধকারে একে অন্যের মুখের দিকে তাকানোর চেষ্টা করল দুই কিশোর।
হচ্ছে কি এখানে? মুসার জিজ্ঞাস।
জানি না, গলা শুকিয়ে গেছে গোয়েন্দাপ্রধানের। কাছে গেলে বোঝা যাবে। চলো, জানালা দিয়ে উঁকি দিই।
ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল দুজনে।
হঠাৎ আবার বিস্ফোরিত হলো যেন ভয়াল হাসি, ঠিক তাদের পাশে।
কোনরকম ভাবনা-চিন্তার অবকাশ নেই আর। পাঁই করে ঘুরে দিল দৌড় দুজনে, যে পথে এসেছে, সে-পথে। পেছন ফিরে তাকানোর সাহস হারিয়েছে।
উত্তেজিত হয়ে লাইব্রেরি থেকে বেরোল রবিন। জবর খবর জেনেছে।
দ্রুত হেডকোয়ার্টারে এসে ঢুকল সে। কিন্তু মুসা আর কিশোর ফেরেনি। এলেই যেন বাড়িতে ফোন করে, ওদের জন্যে মেসেজ রেখে বেরিয়ে এল রবিন। বাড়ি চলল।
টেলিভিশনে স্থানীয় সংবাদ শুনছেন মিস্টার মিলফোর্ড। লস অ্যাঞ্জেলেসের একটা বিশিষ্ট পত্রিকায় সাংবাদিকতার কাজ করেন তিনি, কাজেই রেডিওটেলিভিশনের যে কোন খবর শোনা পারতপক্ষে বাদ দেন না। বাড়িতে থাকলে তো নয়ই।
রান্নাঘরে মাকে খুঁজে পেল রবিন।
এক গ্লাস দুধ আর কয়েকটা বিস্কুট এগিয়ে দিলেন মিসেস মিলফোর্ড। লাইব্রেরি থেকে এলি?
হ্যাঁ, বলল রবিন। মা, কিশোর কোন মেসেজ দিয়েছে?
না-তো।
অ। রান্নাঘরের টেবিলে বসে খেতে শুরু করল রবিন।

এই সময় বাবা ঢুকলেন সেখানে। কি যে হচ্ছে আজকাল, অনিশ্চিত কণ্ঠস্বর, কাউকে উদ্দেশ্য করে বলেননি। রকি বীচেই আজ একটা লোককে মারার চেষ্টা হয়েছিল। পাবলিক হলে, লোকজনের সামনে।
রকি বীচে? আঁতকে উঠলেন মিসেস মিলফোর্ড। সাংঘাতিক কাণ্ড ! কে? কাকে?
আর বলো না, কোন চরমপন্থী হবে। যাকে আক্রমণ করা হয়েছিল, সে এক নিরামিষভোজী সঙ্ঘের প্রেসিডেন্ট, আরেক পাগল। ভক্তদের সামনে বক্তৃতা দিচ্ছিল, এই সময় সাদা, বিচিত্র পোশাক পরা দুই নোক মঞ্চে উঠে আক্রমণ করে বসল। দুজনেরই বাদামী চামড়া।
গলায় দুধ প্রায় আটকে গেল রবিনের। একটু কেশে পরিষ্কার করে নিয়ে বলল, বাদামী চামড়া?
তাই তো বলল।
প্রেসিডেন্ট ব্যথা পেয়েছে? জিজ্ঞেস করলেন মিসেস মিলফোর্ড।
না। লোক দুটোকে ধরা যায়নি। পালিয়েছে।
নাম কি ওর, বাবা? জিজ্ঞেস করল রবিন।
কার নাম?
ওই যে, নিরামিষভোজী প্রেসিডেন্ট।
ডাংম্যান। কি ডাংম্যান যেন।
কোন সন্দেহ থাকল না আর রবিনের, পুতুল ছিনতাইকারীরাই আক্রমণ করেছে। নিরামিষভোজীদের প্রেসিডেন্টকে। দুই ঢোকে বাকি দুধটুকু শেষ করে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল সে। টেলিফোন করবে। একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গেছে, বাদামী। লোকগুলো যে-ই হোক, সাংঘাতিক কোন উদ্দেশ্য রয়েছে তাদের।
রিঙ হয়েই চলেছে হেডকোয়ার্টারে। কিন্তু ধরছে না কেউ। তারমানে ফেরেনি এখনও মুসা আর কিশোর।
হুমড়ি খেয়ে ঝোপের ভেতর পড়ে রয়েছে দুই গোয়েন্দা। হাঁপাচ্ছে জোরে জোরে। কাটা, ভাঙা শুকনো ডালের মাথার খোঁচা আর আঁচড় লেগে ছিলে গেছে গায়ের চামড়া। পাথরে হোঁচট খেয়ে পড়েছে কয়েকবার, দুই হাঁটুর চামড়াও ক্ষতবিক্ষত। তবে অনেক পেছনে ফেলে এসেছে রহস্যময় কাঠের বাংলো।
পাগলা-ভূতটা তাদের সঙ্গে সঙ্গে এসেছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না।
সাবধানে মাথা তুলে পেছনে তাকাল মুসা। কিশোর, কিছু দেখতে পাচ্ছ? .
না। এখানে আমরা নিরাপদ।
আমার তা মনে হচ্ছে না। কি ওগুলো? মুশূন্য বামনগুলো?
সহজ কোন ব্যাখ্যা নিশ্চয় আছে, অস্বস্তিবোধ পুরাপুরি যাচ্ছে না কিশোরের। ভাল মত দেখারই তো সুযোগ পেলাম না। ফিরে গিয়ে আবার যদি…

পারলে তুমি যাও, হাত নাড়ল মুসা। আমি নেই। একে তো পাগলা হাসি, তার ওপর ওই মাথাছাড়া… কেঁপে উঠল সে। আল্লাহগো, বাঁচাও !
জোরে নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। হাসিটা অবশ্য বিকটই, ভয় লাগে।
খালি ভয়? চলো পালাই। আবার এসে পড়লে, ভয়ে ভয়ে পেছনে তাকাল। মুসা।
নীরব হলো কিশোর। গভীর ভাবনায় ডুবে গেছে।
উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করছে গোয়েন্দা-সহকারী।
অবশেষে বলল কিশোর, আমার মনে হয়, সব কিছুর মধ্যেই যুক্তি রয়েছে, মুসা। বাদামী চামড়ার সেই মূর্তিচোর লোকটা, এই ভূতের হাসি, মুশূন্য বামন…
কি যুক্তি?
সেটাই জানতে হবে। তবে এখন আমাদের বাড়ি যাওয়াই ভাল।
হ্যাঁ, এইটা হলোগে কাজের কথা।
অন্ধকারে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল মুসা। এই একটা কাজে সে বিশেষ পারদর্শী। একবার কোন পথে গেলে সেটা সহজে ভোলে না, কি করে যেন ঠিক চিনে নেয়। কিশোরের খুব অবাক লাগে মাঝে মাঝে।
চলছে ঠিক পথেই, তবে গতি ধীর।
যেখানে দিয়ে ঢুকেছিল দেয়ালের সেই জায়গাটার কাছে এসে থামল দুজনে।
ঝোপের ভেতর থেকে ব্যাগটা বের করল মুসা।
হুক ছুড়ে মারল কিশোর। একবার, দু-বার, তিনবার, আটকাতে পারছে না, অথচ তখন একবারই কাজ হয়ে গিয়েছিল। তবে তখন আলো ছিল।
দেখি, আমার কাছে দাও, হাত বাড়াল মুসা। প্রথমবারে সে-ও পারল না, কাজ হলো দ্বিতীয়বারে। টেনেটুনে দেখল দড়িটা না, খুলে আসবে না। উঠতে গিয়েই স্থির হয়ে গেল। নীরবতার মাঝে রাইফেলের বোল্ট টানার ক্লিক শব্দটা বড় বেশি করে কানে বেজেছে।
এই সরে এসো! কঠিন আদেশ শোনা গেল।
পথের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে লম্বা একটা মূর্তি, হাতের রাইফেল এদিকে ফেরানো।
কিছু করার নেই। দেয়ালের কাছ থেকে সরে এল দুই কিশোর, পথে উঠল। মূর্তিটার কাছে এসে বলে উঠল কিশোর, টনি, আমি কিশোর, ও মুসা।
রাইফেল সরাল না টনি। সন্দেহ যাচ্ছে না। শীতল কণ্ঠে বলল, এখানে কি করছ?
টনি, অধৈর্য হয়ে বলল মুসা, কি করছি ভালমতই জানো। সোনার পুতুল খুঁজছি।
এই অসময়ে? ধমকের সুরে বলল টনি। অন্ধকারে চোরের মত? কই, আজ আবার আসবে বলোনি তো। সত্যি করে বললো, কেন এসেছ?
কি জ্বালা! বললাম তো পুতুল খুঁজতে, জবাব দিল কিশোর। ভাবলাম, গেটের কাছে হারিয়েছে যখন, অন্ধকারে চোরটা আবার ফিরে আসতে পারে ওখানে।

কণ্ঠস্বর পাল্টে গেল। টনি, পুতুল খোঁজার অনুমতি আমাদেরকে দিয়েছেন তোমার দাদী, নাকি?
দ্বিধায় পড়ে গেল টনি। তোমাদের বিশ্বাস করব কিনা ভাবছি।
তোমাকেও তো অবিশ্বাস করতে পারি আমরা! রেগে গেল মুসা। আমরা যে তিন গোয়েন্দা, অনেক আগে থেকেই জানো তুমি। আমাদের কার্ড পেয়েছ।
থামানোর জন্যে মুসার পায়ে লাথি মেরে বসল কিশোর, কিন্তু লাভ হলো না, ধনুক ছেড়ে বেরিয়ে গেছে তীর।
কি করে জানলে?
আর মিথ্যে বলে লাভ নেই, সত্যি কথাই বলল মুসা।
না, নরম হলো টনির গলা, রাইফেল নামাল, তোমরা চালাক ছেলে। হ্যাঁ, তোমাদের কার্ড পেয়েছি, গেটের কাছে। ডাংম্যানকে সেকথা বললাম। যা করার বুঝেশুনে করতে বলল আমাকে। দাদীর উকিলকে জিজ্ঞেস করলাম তোমাদের কথা। সে আমাকে টেরিয়ার ডয়েলের কাছে পাঠাল, সেকথা আগেই বলেছি। হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ, মাল বিক্রির ছুতোয়ই তোমাদেরকে এস্টেটে নিয়ে এসেছিলাম, চাইছিলাম, পুতুল খোঁজার কাজটা দাদী তোমাকে দিক।
তুমি ভেবেছিলে আমরা চুরি করেছি, ঝাঁঝাল মুসার কণ্ঠ।
যা, স্বীকার করল টনি, কিছু মনে করো না। মিস্টার ডাংম্যানকে সে-কথাও বলেছি। সে বলল, তা না-ও হতে পারে। চোর হয়তো তাড়াহুড়োয় পুতুলটা গেটের কাছে ফেলে গেছে, তোমরা কুড়িয়ে পেয়েছ। তাই ঠিক করলাম, পুরস্কার ঘঘাষণা করে পুতুল ফেরত দেয়ার সুযোগ করে দেব তোমাদের।
ওসব ঝামেলা না করে, বলল কিশোর, খোলাখুলি বললেই ভাল করতে।
ওই যে, মিস্টার ডাংম্যান বলল, তোমরা চোর না-ও হতে পারো।
কুড়িয়ে পেয়েছি কিনা, সেটাও তো জিজ্ঞেস করতে পারতে?
সেটাও আলোচনা করেছি আমরা। মিস্টার ডাংম্যান বলল, তোমরা স্বীকার করবে না। ভয় দেখালে কোন দিনই আর দেবে না পুতুলটা।
তাই আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে, আনমনে বলল কিশোর। পুরস্কার ঘোষণা করালে। এমন ভাব দেখালে, যেন জানোই না পুতুলটা আমাদের কাছে আছে।
হ্যাঁ। এখন তো সব খোলাখুলি হয়ে গেল। দিয়ে দাও না ওটা। তুমিই তো পেয়েছ?
রবিন আর মুসা পেয়েছিল।
পেয়েছিল?
হ্যাঁ। হারিয়েছি আবার। সকালে বাদামী চামড়ার এক লোক কেড়ে নিয়ে গেছে।
মাথা নাড়ল কিশোর। না, ফেরত পাওয়ার সুযোগ এখনও আছে। লোকটাকে খুঁজে বের করতে পারলেই...

শব্দ করে হাসল টনি। আমার সাহায্য নেবে? তোমাদের সঙ্গে কাজ করতে খুব ভাল লাগবে আমার।
হ্যাঁ, একটা সাহায্যই করতে পারো, বলল কিশোর। চোখ খোলা রাখো, এস্টেটে কারা আসে যায় খেয়াল রাখো।
ঠিক আছে।
এখন আমাদের বাড়ি যাওয়া দরকার। দেরি হয়ে গেছে।
গেট দিয়ে ওদের বের করে দিল টনি।
অন্ধকার গিরিপথ ধরে সাইকেল চালিয়ে চলল দুই গোয়েন্দা।
কিশোর, একসময় জিজ্ঞেস করল মুসা, আমরা যে ভূত দেখেছি, টনিকে বললে না কেন?
ওকে বিশ্বাস করতে পারছি না। আমার ধারণা, কিছু একটা গোপন করছে।
পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতেই লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নামল রবিন। তাড়াহুড়ো করে কাপড় পরে নিচতলায় নামল। বাবা-মা ওঠেননি। তাদের দরজায় টোকা দিয়ে ডেকে বলল, মা, আমার নাস্তা খেয়ে নিচ্ছি।
মায়ের ঘুমজড়ানো কণ্ঠ শোনা গেল, ঠিক আছে। কোথায় যাবি?
ইয়ার্ডে।
জানালা দিয়ে রোদ ঢুকছে রান্নাঘরে। রুটি, ভাজা ঠাণ্ডা ডিম আর এক গ্লাস কমলার রস দিয়ে নাস্তা শেষ করে এসে মুসাকে ফোন করল রবিন।
মুসার মা জানালেন মুসা বেরিয়ে গেছে।
ঘর থেকে ছুটে বেরোল রবিন।
ইয়ার্ডে ঢুকেই পড়ে গেল মেরিচাচীর সামনে।
এই যে, একটাকে অন্তত পাওয়া গেল, বলে উঠলেন তিনি। অন্য দুটোকে ডাকাডাকি করলাম, জওয়াবই নেই। পালিয়েছে বোধহয় ভোররাতেই। রবিন, কিশোরকে বলো, আজ তার চাচার সঙ্গে এস্টেটে যেতে হবে।
বলব, আন্টি।
মেরিচাচী অফিসে গিয়ে ঢোকার পর পা বাড়াল রবিন, ওয়ার্কশপের দিকে। দুই সুড়ঙ্গ দিয়ে ঢুকল হেডকোয়ার্টারে।
মুসা আর কিশোর দুজনেই আছে।
মেরিচাচী কি বললেন? ভুরু নাচাল মুসা।
জানাল রবিন। গম্ভীর হয়ে থাকা কিশোরকে জিজ্ঞেস করল, ভূত-থেকে-ভূতের কি খবর?
মাথা নাড়ল শুধু কিশোর, মুহূর্তের জন্যে চোখ সরাচ্ছে না টেলিফোনের ওপর থেকে।

কাল রাতে কি জেনেছি, জানো? কথা আর পেটে রাখতে পারছে না রবিন।
আমরা কি দেখেছি, শোনো আগে, মুসার অবস্থাও রবিনের মতই। হড়হড় করে উগড়ে দিতে আরম্ভ করল সে। শুনে চোখ বড় বড় হয়ে গেল রবিনের।
নিশ্চই মাথা আছে ওদের, মুসা বামনদের কথায় আসতেই বলল কিশোর। তবে দেখা যায়নি। মরুকগে ব্যাটারা। আমি ভাবছি, ভূত-থেকে ভূতের কি অবস্থা? খবর-টবর আসে না কেন? ওই বাদামী লোকদুটোই সমস্ত রহস্যের চাবিকাঠি, কিন্তু কোথায় ওরা? হ্যাঁ, রবিন, চাম্যাশ হোর্ডের কথা কি জেনেছ কাল?
এখানকার লোকাল হিস্টরি বইতে ব্যাপারটা নিয়ে বেশ ফোলানো-ফাপানো হয়েছে, জানাল রবিন। ডাকাতের দলটা মারা পড়তেই গুপ্তধন খুঁজতে বেরিয়েছিল লোকে, দলে দলে। অনেক দিন ধরে অনেক ভাবে খুঁজেছে, পায়নি। ডাকাতেরা পুরো পর্বত জুড়ে ছড়িয়ে ছিল, একেক দিন একেক জায়গায় সরে যেত। পেদ্রোজ এস্টেটেও গিয়ে লুকিয়েছিল একবার। গুপ্তধনগুলো কোথায় আছে, আন্দাজই করতে পারেনি কেউ।
অ্যামিউলেট দুটোর খবর কি? জিজ্ঞেস করল মুসা। আর মিস ভেরা পেদ্রোর ভাইয়ের নাম?
মিস পেদ্রোর ভাইয়ের নাম ছিল ফিয়ারতো, খুনী। একটা লোককে খুন করে ফেরারী হয়েছিল। অবাকই লাগে, যে লোকটাকে খুন করেছিল, সে ছিল শিকারী, থাকত এস্টেটের হানটিং লজে। কেউ জানে না, কেন তাকে খুন করেছে ফিয়ারতো। অ্যামিউলেট দুটোর কোন কথাই লেখা নেই বইতে। একবার উল্লেখও করা হয়নি।
নিচের ঠোঁটে কামড়ে ধরল কিশোর। আচ্ছা, ম্যাগনাস ভারদি মরার আগে ঠিক কি বলেছিল, বলো তো।
চারটে বইতে তিন রকম লিখেছে, নোটবই বের করল রবিন। একটাতে লিখেছে, হোয়াট ম্যান ক্যান ফাইণ্ড দা আই অভ দা স্কাই? আরেক লেখক বলছেন, দা স্কাইজ আইজ ফাইণ্ড নো ম্যান। অন্য দুটো বইতে একরকম কথা, ইট ইজ ইন দা আইজ অভ দা স্কাই হোয়্যার নো ম্যান ক্যান ফাইণ্ড ইট। চাম্যাশ ভাষা থেকে অনুবাদ করতে গিয়েই গড়বড় করে ফেলেছে মনে হয়।
খুব বেশি গোলমাল করেনি, বলল কিশোর। আই অভ দা স্কাই কথাটা সবাই বলছে।
কিন্তু, কিশোর, মুসা বলল, আই অভ দা স্কাইয়ের মানে কি?
আকাশে কি জিনিস আছে, যা দেখতে চোখের মত? পাল্টা প্রশ্ন করল কিশোর।
অনেক সময় মেঘ ওরকম দেখায়।
আমার মনে হয় সূর্য, রবিন বলল।

মাথা নোয়াল কিশোর। আমারও তাই মনে হয়। চাঁদও হতে পারে। রূপকথার বইতে, ছবিতে চাঁদ আর সূর্যকে মানুষের মুখের মত করে আঁকে অনেকে।
তাহলে কি চাঁদে গিয়ে গুপ্তধন লুকিয়েছে নাকি? প্রশ্ন তুলল মুসা।
না, তা নয়। তবে এমন কোন জায়গা হয়তো বেছে নিয়েছে, যেখানে সব সময় চাঁদ আর সূর্যের আলো পড়ে। প্রাচীন অনেক মন্দির এমনভাবে তৈরি হয়েছে, সব সময় রোদ পড়ে ওগুলোতে।
হ্যাঁ, সায় দিল রবিন। কিছু কিছু মন্দির তো আছে, ওপরের দিক খোলা, সেখান দিয়ে রোদ কিংবা জ্যোৎস্না এসে পড়ে মঞ্চের ওপর।
তাহলে কি ওরকম কোন জায়গা খুঁজতে হবে?
কোথায় খুঁজব? হঠাৎ উজ্জল হলো কিশোরের মুখ। ম্যাগনাস ভারদি অন্য কিছুওঁ বুঝিয়ে থাকতে পারে। কোন গিরিখাত, গিরিপথ বা উপত্যকার কথাও বোঝাতে পারে, যেখান থেকে চাঁদ কিংবা সূর্যকে দেখতে চোখের মত লাগে। কি মুসা, এমন কোন জায়গা চেনো?
কোত্থেকে চিনব? আমার চোখে তো পড়েনি। আর সান্তা মনিকা তো ছোট পর্বত না, সবটাতেই নাকি ঘুরেছিল ভারদির ডাকাতের দল। কোন জায়গা থেকে চাঁদ-সুরুজকে চোখের মত লেগেছে ব্যাটাদের, ওরাই জানে
হ্যাঁ, মুসার সঙ্গে একমত হলো রবিন। তাছাড়া ভারদি বলেছে, গুপ্তধন কেউ খুঁজে পাবে না, এমন জায়গায়ই রেখেছে।
আমার তা মনে হয় না, বলল কিশোর। নিশ্চয় ব্যাপারটাকে ধাধা বানিয়ে রেখে গেছে ভারদি। বাদামী লোকটা পুতুল দিয়ে কি করবে যদি খালি একথাটা জানতে পারতাম, অনেক কিছু পরিষ্কার হয়ে যেত।
ও-মা, কিশোর, ভুলেই গিয়েছি! চেঁচিয়ে উঠল রবিন। মিস্টার ডাংম্যানকে আক্রমণ করেছিল ওরা।
খুলে বলল সব।
লাফিয়ে উঠল কিশোর। এক্ষুণি মিস্টার ডাংম্যানের কাছে যাওয়া দরকার। জরুরী কিছু হয়তো জানতে পারব। না দুজন নয়, একজন এসো আমার সঙ্গে। আরেকজন থাকো ফোনের কাছে। কে থাকবে?
গতরাতে মুসা গেছে, আজ আমি যাব, বলল রবিন। বেকুব হয়ে সারাক্ষণ একা এখানে বসে থাকতে পারব না।
যাও, খুশি হয়েই বলল মুসা, কাঁটায় লেগে ছড়ে যাওয়া একটা জায়গায় হাত বোলাচ্ছে। আমি আছি।
মুসা, কিশোর বলল, ওয়াকি-টকি নিয়ে যাচ্ছি। ভূত-থেকে-ভূতের কোন খবর এলে সঙ্গে সঙ্গে জানাবে।

ফোন করে ভেজিট্যারিয়ান লীগের ঠিকানা জেনে নিয়ে হেডকোয়ার্টার থেকে বেরোল কিশোর আর রবিন। সাইকেল নিয়ে একটা গোপন পথ দিয়ে ওয়ার্কশপ থেকে বেরোল, মেরিচাচীর চোখে যাতে না পড়ে সেজন্যে এই সতর্কতা।
দশ মিনিটেই বাড়িটা খুঁজে বের করে ফেলল ওরা। শহরের এক প্রান্তে লা পামা স্ট্রীটের শেষ মাথায় ব্লকের মস্ত গথিক-স্টাইলে বানানো পুরানো বাড়িটাকে হেডকোয়ার্টার করেছে ভেজিট্যারিয়ান লীগ। শুকনো বাদামী পাহাড়ের ঢাল নেমে এসে মিশেছে পথের সঙ্গে। পর পর কয়েকটা ব্লকের পেছন দিয়ে আরেকটা সরু পথ চলে গেছে, তার কিনারে সব কটা বাড়ির গ্যারেজ।
গথিক-বাড়ির গেটের কাছে সাইকেল রাখল দুই গোয়েন্দা। সদর দরজায় এসে বেল বাজাল। বেটে তাগড়া এক লোক দরজা খুলে দিল।
মিস্টার ডাংম্যান আছেন? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
ও, তোমরা? লোকটার পেছন থেকে উঁকি দিল ডাংম্যান। এসো, এসো। ল্যাঙলী, সরো, ওদের আমি চিনি। গোয়েন্দাদের দিকে চেয়ে বলল, এত তাড়াতাড়ি আসবে ভাবিনি কিন্তু? লীগে যোগ দিতে এসেছ তো?
বেঁটে লোকটা গিয়ে কাজে লাগল আবার। আবছা আলোকিত হলঘরে অগোছাল হয়ে রয়েছে কিছু বাক্স, ওগুলোই গোছাচ্ছিল বোধহয়, ঘণ্টা শুনে দরজা খুলতে এসেছে।
বিনীত গলায় বলল কিশোর, না, স্যার, এত তাড়াতাড়ি নিরামিষ ধরার ইচ্ছে নেই। আপনার সঙ্গে কথা বলতে এসেছি।
কথা? বেশ, অফিসে এসো। সব অগোছাল হয়ে আছে, দেখেশুনে পা ফেলো। তোমরা লীগে যোগ দিলে খুব খুশি হতাম, অনেক সাহায্য করতে পারতে।
বাক্স, বই, ফাইলিং কেবিনেট, গাদা গাদা বিজ্ঞাপন আর পোস্টার ছড়িয়ে রয়েছে সারা ঘরে, ওগুলোর মাঝ দিয়ে সাবধানে পা ফেলছে ওরা।
ওক কাঠের ভারি দরজা খুলে বড় অরেকটা রোদে-উজ্জল ঘরে ছেলেদের নিয়ে এল ডাংম্যান, এটাই অফিস। প্রাচীন একটা ডেস্কে বসে দুটো প্রাগৈতিহাসিক চেয়ার দেখিয়ে মেহমানদের বসতে বলল।
বলো, কি বলতে এসেছ?
শুনলাম, আপনাকে নাকি মারতে চেয়েছিল? বলল কিশোর।
আর বোলো না, পাগল। বদ্ধ উন্মাদ। দুই জন। এমন হঠাৎ করে মঞ্চে লাফিয়ে উঠল। বক্তৃতা দিচ্ছিলাম তখন। কোন মতে নিজেকে বাঁচিয়েছি। ঠেলাঠেলি, হই-চই জুড়ে দিল মেম্বাররা, পুলিশ ডাকতে গেল, অথচ দুজনকে ধরার কথা মনে এল না কারও। পালাল।
আক্রমণ করেছিল কেন, স্যার? জিজ্ঞেস করল রবিন।

জানি না।
কিছু বলেছে? কিশোর প্রশ্ন করল।
বলেছে, তবে ইংরেজি নয়। অনেক চেঁচামেচি, বকবক করেছে, কি বলেছে ওরাই জানে। একটাকে জাপটে ধরেছিলাম, কিন্তু রাখতে পারলাম না, ঝাড়া দিয়ে ছুটে গেল। পুলিশ আসার আগেই পালাল দুব্যাটা। হয়তো ফ্যানাটিক হবে, নিরামিষভোজীদের দেখতে পারে না। ও-রকম অনেকের পাল্লায় পড়েছি আগেও। কত রকম লোক যে আছে দুনিয়ায়। মতের মিল হলো না, ব্যস, ধরে মারো ব্যাটাকে, এমন অনেক আছে।
জানি। তবে ওদের দুজনের কথা যা শুনলাম, ফ্যানটিক মনে হচ্ছে না।
অবাক হলো ডাংম্যান। নয়? তাহলে কেন মারতে এল? তোমরা অন্য কিছু ভাবছ, অন্য কারণ?
হ্যাঁ, স্যার, আমরা ভাবছি… বলতে গিয়ে থেমে গেল রবিন।
মৃদু একটা শব্দ হয়েছে।
ডাংম্যানও শুনছে, চোখ কুঁচকে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে শব্দের উৎস আবিষ্কারের জন্যে।
বীপ-বীপ-বীপ! বীপ-বীপ-বীপ!
ঝটকা দিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। মাপ করবেন, স্যার, আমাদের এখুনি বাইরে যেতে হচ্ছে। আসছি। রবিন, এসো।
তাড়াতাড়ি এসো, ডাংম্যান বলল। পেদ্রোজ এস্টেটে যাব। রোজই যাই মিস পেদ্রোর সঙ্গে দেখা করতে। তার সাহায্য না পেলে এখানে কিছুই করতে পারতাম না।
আসছি, স্যার, ঘুরে হাঁটতে শুরু করল কিশোর। পিছু নিল রবিন।
ওয়াকি-টকি সিগন্যাল দিচ্ছে। নিশ্চয় মুসা। আশেপাশে বড় বড় বিল্ডিং। শব্দঠিকমত ধরা যাবে না। খোলা জায়গা খুঁজল কিশোর। বাগানটা চোখে পড়ল, উজ্জ্বল রোদ। একটা ঝোপের ধারে ছায়ায় চলে এল দুজনে।
হুমড়ি খেয়ে বসে পড়ে সুইচ টিপল কিশোর। ফার্স্ট বলছি। সেকেণ্ড, শুনছ? ফাস্ট, শুনছ? ওভার।
শুনছি। বলো। ওভার, জবাব দিল কিশোর।
কিশোর? মুসার দুর্বল কণ্ঠ উত্তেজিত। ভূত-থেকে-ভূতে খবর দিয়েছে। এইমাত্র। একটা ছেলে লোক দুটোকে দেখেছে। ঝরঝরে গাড়িটা লা পামা স্ট্রীটের…।
কিশোর! চেঁচিয়ে উঠল রবিন। ওই যে, আসছে!
লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। রিসিভারের বোতাম থেকে আঙুল সরে গেল, কেটে গেল বেতার যোগাযোগ। স্তব্ধ হয়ে গেল মুসার কণ্ঠ।

সেকথা ভাবার সময় নেই এখন কিশোর আর রবিনের। ওদের সাইকেলের কাছে দাঁড়িয়ে আছে সেই বাদামী চামড়াদের একজন, পরনে বিচিত্র সাদা পোশাক। আরেকজন দাঁড়িয়ে আছে বাড়ির সদর দরজা আর ঝোপটার মাঝামাঝি জায়গায়। দুজনের হাতেই দুটো বড় বাঁকা ফলাওয়ালা ছুরি।
ছেলেরা ওদের দেখে ফেলতেই রওনা হলো দুজনে। ভীষণ ভঙ্গিতে ছুরি নেড়ে এগিয়ে আসতে শুরু করল।
গেটের দিকে যাওয়ারও উপায় নেই, বাড়িতে ঢোকার পথও রুদ্ধ।
দৌড় দাও! চেঁচিয়ে বলল কিশোর। সোজা পাহাড়ে!
বাড়ির কোণের দিকে দৌড় দিল ওরা।
দ্বিধায় পড়ে গেল লোক দুজন। ক্ষণিকের জন্যে। চেঁচিয়ে উঠল গলা ফাটিয়ে।
ফিরেও তাকাল না ছেলেরা। বাগানের শেষে নিচু বেড়া লাফ দিয়ে ডিঙিয়ে এসে পড়ল বাদামী পাহাড়ের গোড়ায়, পথে।
পাহাড়ে ওঠো, হাঁপাতে শুরু করল কিশোর। পরিশ্রম একেবারেই সয় না তার।
আগে ছুটছে রবিন, পেছনে কিশোর, শুকনো ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে। শক্ত, ঘন, ধূসর ঝোপের ডাল তাদের কাপড় ছিড়ছে, চামড়া ছিলছে, খেয়ালই করছে না কেউ। কানে আসছে পদশব্দ। তাড়া করে আসছে দুই বাদামী। চেচাচ্ছে।
কি বলে? রবিনও হাঁপিয়ে উঠছে।
ব্যাটাদের মাথা, জোরে জোরে হাঁপাচ্ছে কিশোর। কিচ্ছু বুঝি না।
পালাতে পারব? পারতে হবে।
আরও ওপরে উঠে সরু একটা পথ পাওয়া গেল। ঝোপঝাড় নেই। খাড়াইও অনেক কম। গতি কিছুটা বাড়ল ওদের।
ছুটছে ওরা। সরে যাচ্ছে রকি বীচ থেকে দূরে, গথিক-বাড়ি, তাদের সাইকেল পেছনে পড়ছে, কিন্তু কিছু করার নেই। বাঁচতে চাইলে পালাতে হবে। ভারি হয়ে আসছে পা। পথের ওপর জোরাল হচ্ছে জুতোর আওয়াজ।
ওহ-ন্নো! চেঁচিয়ে উঠে থমকে দাঁড়িয়ে গেল রবিন। তার প্রায় গায়ের ওপর এসে পড়ল কিশোর। আরেকটু হলেই দিয়েছিল ধাক্কা দিয়ে ফেলে।
হঠাৎ শেষ হয়ে গেছে পথ। সামনে নিচে গভীর খাদ। মাঝখানে খানিকটা খালি, তারপরে আবার পাহাড় এবং পথ।
পুল ছিল, বলল রবিন। পাহাড়ী ঢলের সময় ভেঙেছে।
ওপারে যাওয়া যাবে না। পাগলের মত এদিক ওদিক তাকাচ্ছে কিশোর। এক পাশে পাহাড়ের চূড়া দেখিয়ে বলল, চলো।
বিপথে আবার ওপরে উঠতে শুরু করল ওরা। ধুলায় ধূসর চুড়া, রোদে তপ্ত হয়ে আছে। নিচে চিৎকার শোনা গেল। গোয়েন্দাদের দেখে ফেলেছে।

ফিরে তাকাল কিশোর। উঠে আসছে লোক দুজন। পাহাড়ে চড়ার অদ্ভুত ক্ষমতা। ঝোপ, পাথর, খাড়াই কোন কিছুকেই পরোয়া করছে না।
আর পারব না ওদের সঙ্গে, দাঁড়িয়ে গেল রবিন।
থেমো না!
ঘাড়ে যেন চাপড় মারছে কড়া রোদ। গরমে কটকট করছে শুকনো ডাল পাতা। ঘামে ভিজে গেছে ওদের শরীর। শুকনো চোখা ডাল হাত দিয়ে ঠেলে
সরাতে হচ্ছে বার বার, রক্তাক্ত হয়ে গেছে তালু আর আঙুল।
অবশেষে পাহাড়ের কাধে পৌঁছল ওরা। লাল ধুলোমাটির ওপরেই ধপাস করে বসে পড়ল কিশোর, হাঁ করে হাঁপাচ্ছে, আরেকটু হলেই জিভ বেরিয়ে যাবে।
ফিরে তাকাল রবিন! হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, আসছে!
আসুক! গুঙিয়ে উঠল কিশোর, আর পারছি না।
কপালের কাছে হাত তুলে চোখ থেকে বোদ আড়াল করল রবিন। জানের ভয়ে ছুটছি আমরা, তা-ই পারছি না, আর ওদের কাণ্ড দেখো! এক্কেবারে পাহাড়ী ছাগল। এই কিশোর, ইয়াকুয়ালি না তো? দা ভেভিলস অভ দা ক্লিফস!
কৌতূহল কিছুটা শক্তি ফিরিয়ে দিল কিশোরের দেহে। উঠে দাঁড়িয়ে তাকাল সে। হতেও পারে। এজন্যেই কথা বুঝি না। ইয়াকুয়ালি বলেই হয়তো।
এসকিমো ভাষা বলুকগে, আমার কিছু না, আমার এখন পালানো দরকার, চঞ্চল হয়ে উঠল রবিন। যাই কোথায়? আচ্ছা, ডাংম্যানই আমাদের ধরতে পাঠাল না তো?
মনে হয় না, দূরে গথিক-বাড়িটার দিকে তাকাল কিশোর। শান্ত। কাউকে দেখা যাচ্ছে না।
সাইকেলের কাছে যদি খালি ফিরতে পারতাম!
সামনে কোথায় যাব? পাহাড়ের শূন্য কাঁধের দিকে তাকাল রবিন, শুকনো ঝোপ ছাড়া আর কিছু নেই। লুকানোর কোন জায়গায়ই চোখে পড়ছে না। দেখতে দেখতে হঠাৎ উজ্জ্বল হলো তার মুখ। কিশোর, পেয়েছি! এসো।
কাঁধ ধরে ছুটতে শুরু করল রবিন। পেছনে কিশোর।
পাহাড়ের চূড়া ঘিরে রেখেছে কাঁধ। খানিকটা এগোতেই লোকগুলো আড়ালে পড়ে গেল। আরও পঞ্চাশ গজমত পেরিয়ে উল্টো দিকে মোড় নিল ওরা। নেমে যাওয়া পাহাড়ের ঢালে এখানে ওকের জঙ্গল শুরু হয়েছে, ঝোপও খুব ঘন।
যাচ্ছি কোথায়? হাঁপাতে হাঁপাতে বলল কিশোর।
এখানেই।
আচমকা শুরু হয়েছে সবুজ জঙ্গল, যেন একটা সবুজ দেয়াল। তাতে এসে প্রায় ঝাঁপ দিয়ে পড়ল রবিন, ঢুকে গেল বনে।

পেছনে ছুটছে কিশোর। হঠাৎ মাটি সরে গেল পায়ের তলা থেকে, মহাশূন্যে ঝাপ দিয়েছে যেন।
ময়দার বস্তার মত এসে ধাপ্পাস করে পড়ল সরু একটা গিরিখাতের তলায়। চারপাশে ঘন গাছের জঙ্গল। আগের রাতের ছড়ে যাওয়া হাঁটুতে নতুন করে চোট লাগল, ডলতে ডলতে উঠে বসল সে। তাকাল মাতালের মত।
আগেই বলতে পারতে, খসখসে কণ্ঠ, গলার ভেতরটা সিরিশ দিয়ে ঘষা হয়েছে যেন কিশোরের।
সময় পেলাম কই? পাশ থেকে বলল রবিন। তোমার মতই আমিও তো পড়েছি। একটা সাপকে লাঠি নিয়ে তাড়া করেছিলাম। যাক, ব্যাটারা আর খুঁজে পাবে না।
কি জানি, নিশ্চিন্ত হতে পারছে না কিশোর।
শশশ, ঠোঁটে আঙুল রাখল রবিন।
হামাগুড়ি দিয়ে খাদের কিনারে সরে এল দুজনে। ঝোপে ঢুকল।
আস্তে করে ঝোপের ডালপাতা সরিয়ে ওপরে উঁকি দিল রবিন।
বড় জোর পঞ্চাশ ফুট দূরে দাঁড়িয়ে আছে লোকদুটো। কথা বলছে, একেক দিকে আঙুল তুলে দেখাচ্ছে, উত্তেজিত।
একেবারে শুয়ে পড়ল কিশোর। বুঝে গেছে, আমরা ধারে-কাছেই আছি।
কি করব এখন?
চুপ করে থাকব। আর কি করা?
চুপ করে শুয়ে রইল দুজনে, কান খাড়া। লোকগুলোর কথা আর পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। অনিশ্চিতভাবে হাঁটাহাঁটি করছে ওরা, বোধহয় ঝোপের ভেতরে খুঁজছে। স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে কথা, কিন্তু এক বর্ণও বুঝতে পারছে না ছেলেরা।
ফিসফিসিয়ে বলল কিশোর, দেখে ফেলবেই, লুকিয়ে বাচতে পারব না।
না-ও দেখতে পারে। গিরিখাতটা বাইরে থেকে দেখা যায় না।
তাহলে আমাদের মতই পা ফসকে ভেতরে পড়বে। বেরোনোর পথ আছে? ওদের চোখ এড়িয়ে?
এক মুহূর্ত ভাবল রবিন। বায়ে গভীর আরেকটা খাদ আছে, গথিক-বাড়িটার পেছনে যে আরেকটা পথ আছে, তার কাছে গিয়ে শেষ হয়েছে। এখান থেকে বেরিয়ে পঞ্চাশ ফুট খোলা জায়গা পেরোতে পারলেই খাদটায় গিয়ে নামতে পারব।
পঞ্চাশ ফুট, না? নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে শুরু করল কিশোর। দু-চোখের কোণে খাজগুলো গভীর হয়েছে। তাহলে ওদের নজর এড়ানোর অন্য ব্যবস্থা করতে হবে। এমন কিছু, যাতে ওরা এসে এখানে নামে, ওই সময়ে খোলা জায়গা দিয়ে ছুটে যাব আমরা।

তাহলে ভেনট্রিলোকুইস্ট হতে হবে আমাদের, তিক্ত কণ্ঠে বলল রবিন। খোলা জায়গায় গিয়ে এখানে আমাদের কথা ছুঁড়ে পাঠাতে হবে। এছাড়া আর কি করার আছে?
ঠিকই বলেছ! ঝট করে সোজা হলো কিশোর।
মানে? ভেনট্রির ভ্যা-ও জানি না আমরা। কথা ছুঁড়ব কিভাবে?
ইলেকট্রোনিক ভেনট্রিলোকুইস্টের সাহায্যে, পকেট থেকে ওয়াকি-টকিটা বের করল কিশোর। তোমারটা আছে না? গুড। আমারটা ফেলে যাব এখানে। তোমারটা দিয়ে কথা পাঠাব এটাতে।
দারুণ! এতক্ষণে হাসি ফুটল রবিনের মুখে। কথা শুনে এখানে ধরতে আসবে ওরা, ওই সুযোগে আমরা পগার পার। ওঠো, দেরি করছ কেন?
ঝোপ থেকে বেরোল দুজনে।
ওয়াকি-টকিটা মাটিতে রেখে একটা পাথর চাপা দিয়ে রিসিভারের সুইচ অন করে. রাখল কিশোর। রবিনের যন্ত্রটা হাতে নিয়ে নিঃশব্দে হামাগুড়ি দিয়ে এগোল খাদের এক কিনারে, খোলা জায়গাটার দিকে।
ওই যে একটা বড় গাছ দেখছ? হাত তুলে দেখাল রবিন। তারপরেই।
শুরু হোক তাহলে, হাসল কিশোর। ওয়াকি-টকি মুখের কাছে এনে জোরে বলল, রবিন, ওরা আসছে। বলেই রবিনের মুখের কাছে ধরল যন্ত্র।
আসুক। আমাদের দেখতে পাবে না।
কান পেতে রয়েছে কিশোর, দূরের যন্ত্রটায় বেজে উঠেছে কথা, এখান থেকেও শোনা গেল মৃদু।
আরেকবার ওয়াকি-টকিত্বে কথা বলল দুজনে।
ঝোপঝাড় ভাঙার দুপটুপ আওয়াজ হলো।
শুনেছে, ফিসফিস করল রবিন। খুঁজতে যাচ্ছে।
ছোটো, বলেই লাফ দিয়ে উঠে ছুটতে শুরু করল কিশোর।
মাথা নিচু করে এক দৌড়ে বড় গাছটা ছাড়িয়ে এল দুজনে। ফিরে তাকাল একবার। লোকগুলোকে দেখা যাচ্ছে না।
খাদের ধারে চলে এল ওরা। বেশি গভীর নয়। আসলে চওড়া একটা ফাটল, লম্বা, এঁকেবেঁকে চলে গেছে অনেকটা গিরিপথের মত হয়ে।
তাতে লাফিয়ে নামল দুজনে।
ঢাল বেয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে নামল গথিক-বাড়ির পেছনের পথে। লোক দুটোর দেখা নেই।
চলো, গিয়ে ডাংম্যানকে লোকগুলোর কথা জানাই, পরামর্শ দিল কিশোর।

দ্রুত বাড়ির কোণ ঘুরে সামনে সদর দরজার কাছে চলে এল ওরা। বেল বাজাল কিশোর।
অপেক্ষা করেও সাড়া পাওয়া গেল না।
আবার বেল বাজাল।
সাড়া নেই।
দরজার নব মোচড় দিয়ে দেখল, খুলল না, তালা লাগানো।
দরজার পাশে একটা জানালা দিয়ে ভেতরে উঁকি দিল কিশোর। লোক দেখা যাচ্ছে না।
এস্টেটে চলে গেছে হয়তো, রবিন বলল।
তা-ই হবে। চলো, ভাগি।
ওত পেতেই ছিলেন মেরিচাচী, রবিন আর কিশোরকে ঢুকতে দেখেই পাকড়াও করলেন।
ওয়ার্কশপের দেয়ালে সাইকেল হেলান দিয়ে রাখল দুই গোয়েন্দা। গোপন পথ দিয়ে ঢুকেও রেহাই মিলল না।
কিশোর, কই গিয়েছিলি? সেই কখন থেকে বসে আছে তোর চাচা। এস্টেটে যাবি না?
যাব, চাচী। তুমি যাও, আমি এক্ষুণি আসছি।
তাড়াতাড়ি আয়, বলে অফিসের দিকে চলে গেলেন মেরিচাচী।
দুই সুড়ঙ্গ দিয়ে হেডকোয়ার্টারে ঢুকল দুই গোয়েন্দা।
দেখেই হাঁ হাঁ করে উঠল মুসা। কি ব্যাপার, লাইন কাটলে কেন? জরুরী খবর ছিল; দুটো ছেলে লা পামা স্ট্রীটে গাড়িটা দেখেছে। লোক দুটোকেও। খানিক পর আবার ফোন করে বলল, লোকগুলো নাকি দুই জন কিশোরকে তাড়া করেছে।
জানি, মুখ বাকাল রবিন। আমরাই।
সংক্ষেপে সব বলল কিশোর।
খাইছে! শুনে চেঁচিয়ে উঠল মুসা। বড় বাঁচা বেঁচেছ।
এখন কথা হলো, বলল কিশোর, গথিক-বাড়িটার কাছে ঘোরাঘুরি করেছে কেন ওই দুজন? ডাংম্যানকে আবার আক্রমণ করার সুযোগ খুঁজছে? এস্টেটে গিয়ে হুঁশিয়ার করব।
তোমরা যাওয়ার আগেই যদি আবার অফিসে ফিরে যায়? রবিন বলল।
যেতে পারে। সেজন্যেই তোমাদের গিয়ে ওখানে বসে থাকা দরকার।
আমি এখন পারব না, সাফ মানা করল মুসা। পেটে আগুন জ্বলছে।
আমারও, রবিন বলল।
তাহলে লাঞ্চ সেরেই যাও। লোক দুটো এলে ওদের ওপরও চোখ রাখবে।

কিন্তু কিশোর, এইমাত্র ওদের হাত থেকে বেঁচে ফিরলাম। আবার দেখলে…
আর কোন উপায় নেই, চিন্তিত শোনাল গোয়েন্দাপ্রধানের কণ্ঠ। ওদের ওপর চোখ রাখলে মূল্যবান সূত্র পাওয়ার আশা আছে। খুব সাবধানে। তোমাদের যেন দেখে না ফেলে।
সেটা আর বলে দিতে হবে না, কাজটা বিশেষ পছন্দ হচ্ছে না মুসার।
কি ভাবছ? কিশোরকে জিজ্ঞেস করল রবিন। ওরা সত্যি ইয়াকুয়ালি?
তাই তো মনে হয়। কোনভাবে হয়তো চাম্যাশ হোর্ডের খবর জেনেছে। আমার ধারণা, ম্যাগনাস ভারদির মেসেজের মানে ওরা বুঝতে পারবে।
জিভ দিয়ে বিচিত্র শব্দ করল মুসা। ইস, আমরাও যদি পারতাম।
হ্যাঁ, পারলে ভাল হত, একমত হলো কিশোর। ইন দা আই অভ দা স্কাই হোয়্যার নো ম্যান ক্যান ফাইও ইট, কথাটার মধ্যেই রয়েছে জবাব। দেখি, পরে ভেবে মানে বোঝার চেষ্টা করব।
মেরিচাচীর ডাক শোনা গেল। কিশোর? কি হলো? আবার গিয়ে ঢুকেছিস?
যা বললাম, মনে থাকে যেন, তাড়াতাড়ি বলল কিশোর। ডাংম্যানকে হুঁশিয়ার করবে। লোকগুলো এলে তাদের ওপর চোখ রাখবে, বাড়িটার কাছে ঘুরঘুর করছে কেন, বোঝার চেষ্টা করবে। আমি যাই।
রবিন আর মুসা দুজনেই মাথা নাড়ল।
বেরিয়ে এল কিশোর।
বড় ট্রাকটা বের করা হয়েছে। ড্রাইভিং সিটে বোরিস, তার পাশে রাদেশচাচা।
রকি বীচ থেকে বেরিয়ে এসেছে ট্রাক। আঁকাবাঁকা গিরিপথ ধরে ছুটছে। এস্টেটে পৌঁছতে বেশিক্ষণ লাগল না।
গেট খোলা। ট্রাক নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল বোরিস। ভাড়ারের কাছে এসে থামল।
কেবিন থেকে লাফ দিয়ে নামল কিশোর। তার পরেই রাশেদ পাশা। উত্তেজিত দেখাচ্ছে। পুরানো মাল কিনতে এলে ওরকম হয় তার। জঞ্জালের ভেতর থেকে পছন্দসই জিনিস খুঁজে বের করতে ভাল লাগে।
বড় বাড়িটা থেকে বেরোলেন মিস পেদ্রো। হাসিমুখে এগিয়ে এলেন। আপনিই মিস্টার প্যাশা। খুশি হলাম। আপনার ভাতিজা তো কাল পছন্দ করে গেছে। দেখুন আপনার পছন্দ হয় কিনা। অনেক দিন পড়ে ছিল, অনেক জিনিসই নষ্ট হয়ে গেছে।
কিশোরের পছন্দ হলে আমারও হবে, আশ্বাস দিলেন রাশেদ পাশা। মস্ত গোফে পাক দিলেন। সত্যি বিক্রি করবেন তো? দাম তেমন না পেলেও?
আমি তো ফেলেই দিতে চেয়েছিলাম। টনি বোঝাল, যা পাওয়া যায় তাই লাভ। ভেবে দেখলাম, ঠিকই বলেছে। আজকাল তো একটা সুতোও পয়সা ছাড়া মেলে

না। টনি এসে আমার সব ওলট-পালট করে দিচ্ছে। ভাবছি, আবার ঠিকঠাক করে নেব এস্টেটটা।
যাই, মাল দেখি, বললেন রাশেদ পাশা। আপনি আসবেন?
চলুন, হেসে বললেন মিস পেদ্রো।
সবার পেছনে রইল কিশোর। রাশেদচাচাকে নিয়ে মিস পেদ্রো ভাড়ারে। ঢুকলেন, পেছনে গেল বোরিস। ব্যস, চোখের পলকে ঘুরে বাড়ির দিকে ছুটল কিশোর।
দেখা হয়ে গেল টনির সঙ্গে। কিছু তদন্ত করতে এসেছ?
তদন্ত ঠিক নয়, বলল কিশোর। আসলে, মিস্টার ডাংম্যানের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।
লাইব্রেরিতে। কিশোরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এল টনি।
খবরের কাগজ পড়ছিল ডাংম্যান। কিশোরকে দেখে প্রায় ছুটে এল। কাল রাতে তোমরা এসেছিলে, টনি বলেছে আমাকে। তোমাদের চোর ভেবেছি, কিছু মনে রেখো না। লোভ দেখিয়ে পুতুলটা তোমাদের কাছ থেকে বের করার জন্যেই পুরস্কার ঘোষণা করেছে।
বুঝতে পেরেছি, স্যার, শান্ত কণ্ঠে বলল কিশোর।
গুড। ঠিক করে বলো তো, পুতুলটা কি হয়েছে?
পুতুলটা কি ভাবে পেয়েছে মুসা আর রবিন, সেখান থেকে শুরু করল কিশোর। চুপচাপ শুনছে ডাংম্যান, মাঝে মাঝে ভ্রুকুটি করছে শুধু।
ভূতুড়ে হাসির কথা কিশোর বলতেই চেঁচিয়ে উঠল টনি, একটা ছায়া তো? পাগলের মত হাসে? আমিও শুনেছি কাল রাতে। অদ্ভুত হাসি।
টনির কথায় কান দিল না ডাংম্যান। ঠিক শুনেছ তো, কিশোর? মানে, বাতাসের শব্দ-টক হয়? কিংবা কল্পনা?
না। এই এস্টেটের মধ্যেই রয়েছে কোথাও ভূতটা। কয়েকজনকে বন্দী করে রেখেছে।
বন্দী? কি বলছ! চোখমুখ বিকৃত করে ফেলেছে টনি।
কে কাকে বন্দী করল। কি বলছ, কিছুই তো বুঝছি না। কেন এসব করবে?
চাম্যাশ হোর্ডের জন্যে। আমি শিওর।
কী?
গুপ্তধন। সোনার সুপ! খুলে বলল কিশোর।
আই সী, বিড়বিড় করল ডাংম্যান। বিশ্বাস করা শক্ত। তাহলে তোমার বিশ্বাস, ডাকাতেরা ওই সোনার পিছে লেগেছে? বিপদের কথা। কয়েকটা বাচ্চাকে ঢোকালাম এসবের মধ্যে।
কোডটা আরেকবার বলবে, কিশোর? অনুরোধ করল টনি।

ইন দা আই অভ দা স্কাই হোয়্যার নো ম্যান ক্যান ফাইও ইট।
মানে কি? হাত ওল্টাল টনি। আর এর সঙ্গে পুতুলের কি সম্পর্ক? আর ওই যে বললে, এস্টেটে কাদেরকে নাকি বন্দী করে রাখা হয়েছে?
জবাব দিতে গিয়েও থেমে গেল কিশোর। মিস পেদ্রো ডাকছেন।
টনি? দেখে যা তো। কোথায় গেলি?
সাড়া দিয়ে বেরিয়ে গেল টনি।
হাসি আমিও শুনেছি, স্যার, নিজের কানে, বলল কিশোর। আর পুতুলের সঙ্গে সম্পর্ক হলো, মেসেজ। ভেতরে একটা মেসেজ ছিল। আমি নিজে খুলেছি।
মেসেজ? পুতুলের ভেতর? অবাক মনে হলো ডাংম্যানকে।
বোধহয় সাহায্যের আবেদন। ওই বন্দিদেরই কেউ লিখেছে।
পুলিশকে জানিয়েছ? গভীর হলো ডাংম্যান।
না। গিয়ে কি বলব? পুলিশকে বিশ্বাস করাতে হলে প্রমাণ দরকার।
হুঁ, কিছু ভাবল ডাংম্যান। তুমি কখনও দেখেছ ছায়াটা?
কাল রাতে। টনির সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে, টনির ওপর জোর দিল কিশোর। চারটে বেঁটে লোক দেখেছি, মাথা ছিল না।
পাগল হয়ে গেল নাকি!
ছিল না, মানে দেখা যাচ্ছিল না। বোধহয় চটের বস্তা দিয়ে ঢেকে দিয়েছিল।
কী? চেঁচিয়ে উঠল ডাংম্যান। চারজন বন্দী? এই এস্টেটের মধ্যে? মিস পেদ্রোর এলাকায়? তা কি করে হয়?
হাসল কিশোর। হয়েছে বলেই তো বলছি, স্যার। বন্দীদের রাখা হয়েছে একটা হানটিং লজে। চট করে দরজার দিকে তাকাল একবার সে, স্বর খাদে নামিয়ে জিজ্ঞেস করল, টনিকে কতদিন ধরে চেনেন?
টনি? বেশি দিন না তো, চোখ মিটমিট করছে ডাংম্যান। কেন? তাকে সন্দেহ করছ?
হ্যাঁ-না কিছুই বলল না কিশোর, শুধু হাসল।
ঘুরল ডাংম্যান। লম্বা পায়ে ডেস্কের কাছে গিয়ে টান দিয়ে ডয়ার খুলল। আবার যখন ফিরল, তার হাতে একটা পিস্তল।
কঠিন হয়ে উঠেছে ডাংম্যানের চেহারা। শক্ত করে ধরে রেখেছে পিস্তল। বুনো পথ ধরে কিশোরের পিছু পিছু প্রায় ছুটে চলেছে শিকারীর বাংলোটার দিকে।
তোমার ধারণা, বলল ডাংম্যান, যারা পুতুল ছিনিয়ে নিয়েছে, তারাই আমাকে আক্রমণ করেছিল? তোমাদেরও তাড়া করেছিল?
কোন সন্দেহ নেই।

তাহলে ওরাই চারজনকে বন্দী করে রেখেছে। হুঁশিয়ার। বোঝা যাচ্ছে, লোক মোটেই সুবিধের না ওরা।
এতক্ষণ ওখানে আছে কিনা কে জানে। বিশেষ করে, ছায়াটা।
গেলেই দেখা যাবে। আমার মনে হয় না দুটো ছেলের ভয়ে পালাবে। কি করছে ওরা আসলে?
জানি না, স্বীকার করল কিশোর। যাদেরকে ধরে এনেছে, তারা হয়তো জানে গুপ্তধন কোথায় আছে। চাপ দিয়ে ওদের মুখ খোলাতে চাইছে হয়তো ভূতুড়ে ছায়ার মালিক।
হ্যাঁ, এটা হতে পারে। দেখি, হাতে-নাতে ধরতে পারি কিনা।
ঘন বনের ভেতর দিয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছে ওরা। বাটি-আকৃতির উপত্যকার কাছে চলে এল। বাংলোর সামনে ট্রাকটা নেই। রাতের মতই দিনেও রহস্যময় দেখাচ্ছে বাড়িটা।
গাছের আড়ালে কিশোরকে চুপ করে বসে থাকার নির্দেশ দিল ডাংম্যান। গাছপালা আড়ালে আড়ালে নেমে যেতে শুরু করল ঢাল বেয়ে।
বাংলোটার দিকে চেয়ে আছে কিশোর। নির্জন, কোন সাড়া-শব্দ নেই। জানালাগুলোর খড়খড়ি খোলা, সামনের দরজাটাও। দেখে তার দৃঢ় ধারণা হলো, ভেতরে কেউ নেই।
কোন রকম ঝুঁকি নিল না ডাংম্যান। মাথা নিচু করে নিঃশব্দে পৌঁছে গেল উপত্যকার খোলা জায়গাটার ধরে। এক মুহূর্ত থেমে বাড়িটা দেখল। ডেকে বলতে চাইল কিশোর, গিয়ে লাভ হবে না। কিন্তু সে মুখ খোলার আগেই মাথা নিচু করে দৌড় দিল ডাংম্যান। হাতে উদ্যত পিস্তল।
জানালায় গিয়ে উঁকি দিল ডাংম্যান। ঘুরে চলে গেল খোলা দরজার কাছে। ভেতরে ঢুকল।
বসে আছে কিশোর। বাংলোর ভেতর থেকে খুটখাট আর নানা রকম শব্দ কানে আসছে। তারপর দরজায় বেরোল ডাংম্যান। হাতের ইশারায় কিশোরকে ডাকল।
উঠে দৌড় দিল কিশোর।
খালি, বলল নিরামিষভোজী। কেউ নেই। তবে ছিল, দেখো।
ছোট একটা পামাজা দেখাল সে, সাদা কাপড়। এ-রকম কাপড়ই পরে ছিল ওই বাদামী-চামড়ার লোক দুটো, যারা পুতুল ছিনিয়ে নিয়েছে, কিশোর আর রবিনকে পাহাড়ে তাড়া করেছে।
ইনডিয়ান পোশাকের মত লাগছে, বলল ডাংম্যান। তোমার বাদামীরা এখানে এসেছিল মনে হচ্ছে। ট্রাকটাও ঠিকই দেখেছ। পথে তেলের দাগ দেখেছি। শুকিয়ে গেছে। তারমানে ট্রাকটা গেছে যে, অনেকক্ষণ।

কোথায় গেছে আন্দাজ করতে পারেন?
কি করে বলি? চলো, আরেকবার দেখি। কিছু বোঝো কিনা দেখো।
বাংলোয় ঢুকল দুজনে।
খুঁটিয়ে দেখছে কিশোর। তাড়াহুড়ো করে পালিয়েছে লোকগুলো। মদের খালি বোতল পড়ে আছে টেবিলে। প্লেটের অবশিষ্ট খাবার শুকিয়ে মড়মড়ে হয়ে গেছে। সব কিছু নোংরা। কিন্তু ওসব দেখে লোকগুলো কোথায় গেছে অনুমান করার উপায় নেই।
নাহ, এখানে কিছু নেই, বলল সে। এস্টেটের অন্য কোথাও গিয়ে লুকিয়েছে হয়তো।
তাহলে খুঁজে পাওয়া মুশকিল। অনেক বড় এলাকা এটা, পাহাড়-পর্বতের মধ্যে লুকালে কে খুঁজে বের করবে? তবে ওদের প্ল্যান বরবাদ করে দিয়েছ তুমি। ভয় পেয়ে পালিয়েছে।
আমার মনে হয় না, মাথা নাড়ল কিশোর। এত সহজে ভয় পাওয়ার লোক ওরা নয়। আজও আমাকে আর রবিনকে তাড়া করেছিল, আপনার অফিস থেকে বেরোনোর পর।
তাড়া করেছিল? আমার বাড়ির কাছে? বিশ্বাস করতে পারছে না যেন ডাংম্যান। আর কি চায় তোমাদের কাছে?
আমাদের কাছে চায় না, চায় আপনার কাছে।
আমার কাছে? আমার কাছে কি চায়?
হয়তো কিছু আছে। আমাদের কাছ থেকে পুতুলটা ছিনিয়ে নেয়ার পর আপনাকে আক্রমণ করেছিল। তারপর আমরা আপনার বাড়ি থেকে বেরোলে তাড়া করল আমাদেরকে। হয়তো ভেবেছে, জিনিসটা আমাদেরকে দিয়েছেন আপনি।
আ-আমি...কি জিনিস! ও হ্যাঁ হ্যাঁ, চেঁচিয়ে উঠল ডাংম্যান। আছে আরেকটা পুতুল। অফিসে নিয়ে রেখেছি। একটা পুতুল চুরি হওয়ার পর ঘাবড়ে গেলেন মিস পেদ্রো, আরেকটাও চুরি হতে পারে। আমিই পরামর্শ দিয়েছি, আমার কাছে নিয়ে রাখার জন্যে, নিরাপদে থাকবে। কি ভুলো মন আমার, ভুলেই গিয়েছিলাম। ওই পুতুলটাও চায় হয়তো ব্যাটারা।
মাথা ঝাঁকাল কিশোর। দুটো পুতুল এক করলে হয়তো গুপ্তধনের খোঁজ মিলবে, সে-জন্যে চায়।
হ্যাঁ, হতে পারে। কিন্তু জানল কি করে, আরেকটা পুতুল আমার কাছে?
আপনাকে নিতে দেখেছে হয়তো।
অসম্ভব। বাক্সে ভরে পকেটে ঢুকিয়ে তারপর বেরিয়েছি। অফিসে লুকিয়ে রাখার আগেও আশেপাশে ভালমত দেখে নিয়েছি, কেউ ছিল না।

আপনার সহকারীরাও না?
না। আর ওরা দেখলেও কিছু হত না, খুব বিশ্বাসী অনেকদিন ধরে আছে। আমার সঙ্গে, আমাকে গুরু মানে।
নিচের ঠোঁট কামড়ালো কিশোর। মিস পেদ্রো জানেন...।
তাতে কি? বাধা দিল ডাংম্যান। উনি চোরের সঙ্গে হাত মেলাননি। আর গুপ্তধন চাইলে আগেও তো অনেক সুযোগ ছিল, দুটো পুতুলই অনেক বছর ছিল তাঁর কাছে। শুধু মিস পেদ্রো আর টনি...
টনি! ডাংম্যানের কথায়ও বাধা দিল কিশোর। সে-ও তো জানে।
হাঁ হয়ে গেল ডাংম্যানের মুখ, চোয়াল ঝুলে পড়ল, ধীরে ধীরে আবার বন্ধ হলো ফাঁক। কিশোর-মিস পেদ্রো:টনি কোন কিছুতে জড়ালে বেচারী খুবই দুঃখ পাবেন, শেষ হয়ে যাবেন!
রবিন আর মুসা যখন পুতুলটা পায়, টনি তখন গেটের কাছে ছিল। গতরাতেও অন্ধকারে এস্টেটের মধ্যে ঘুরঘুর করছিল। কতদিন থেকে চেনেন ওকে, মিস্টার ডাংম্যান?
খুব বেশি দিন না। ইংল্যাণ্ডে পরিচয় হয়েছে, এখানে আসার জন্যে রওনা হয়েছে তখন সে। আমিও লস অ্যাঞ্জেলেসে আসছিলাম। টনিই বলেছে, তার দাদী নিরামিষভোজী, অনেক আগে থেকেই। তাই প্রথমেই এসে তার সঙ্গে দেখা করলাম, থামল ডাংম্যান। গভীর। চলো, টনির সঙ্গে কথা বলা দরকার। তার দাদীকে পরে জানাব।
বুনো পথ ধরে ফিরে চলল আবার দুজনে। খুব জোরে ছুটতে পারে লোকটা, তাল রাখতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে কিশোর।
ট্রাকে মাল বোঝাই শেষ হয়নি। গলদঘর্ম হয়ে উঠেছেন রাশেদ পাশা আর বোরিস। কোথায় গিয়েছিলি? জিজ্ঞেস করলেন রাশেদ পাশা।
এই, একটু ঘুরে দেখতে, বলে কিশোরও এসে হাত লাগাল। তবে কাজে বিশেষ মন নেই, বার বার তাকাচ্ছে বাড়ির সদর দরজার দিকে। ডাংম্যান গেছে টনির সঙ্গে কথা বলতে, কেউই বেরোচ্ছে না।
অবশেষে বেরোল ডাংম্যান। কাছে এসে বলল, টনি গাড়ি নিয়ে কোথায় যেন গেছে। আমি অফিসে যাচ্ছি।
টনি আপনার অফিসে গেলে চোখে পড়বে, জানাল কিশোর। রবিন আর মুসা আছে ওখানে।
বরফ হয়ে গেল যেন ডাংম্যান। কী?
লোকদুটোর ওপর চোখ রাখতে পাঠিয়েছি ওদের।

কিশোর। চেঁচিয়ে উঠল নিরামিষভোজী, চেহারা ফ্যাকাসে, আমার সেফে আরেকটা পুতুল রয়েছে। ভীষণ বিপদে পড়বে ওরা। এখুনি যাচ্ছি আমি। তোমার চাচার বোধহয় হয়ে গেল। রকি বীচে ফিরেই পুলিশের কাছে যাবে।
গাড়ির দিকে ছুটল ডাংম্যান।
লাঞ্চ শেষে ইয়ার্ডে ফিরে হেডকোয়ার্টারে ঢুকল আবার রবিন আর মুসা। ফোনধরার যন্ত্রটা দেখল। না, কোন মেসেজ কোড করা নেই, কেউ ফোন করেনি তাদের অবর্তমানে। বেরিয়ে এসে ভেজিট্যারিয়ান লীগ-এ রওনা হলো দুজনে।
খুব সতর্ক রয়েছে ওরা। লোক দুটোকে চোখে পড়ল না। কোন নড়াচড়া, কোন রকম সাড়া নেই গথিক-বাড়িটার ভেতরে বাইরে। ডাংম্যানের গাড়িটা নেই। সদর দরজা তালাবন্ধ।
এস্টেটে গেছে, অনুমান করল মুসা।
তাহলে কিশোরের সঙ্গে দেখা হবে। আমরা এখানেই থাকি। লোকগুলো আসতে পারে।
ভেজিট্যারিয়ান লীগের উল্টোধারে দুটো বাড়ির মাঝে সরু একটা গলি। ওখানে সাইকেল রেখে ঘাপটি মেরে থাকবে ঠিক করল দুই গোয়েন্দা। তা-ই করল। রুক্ষ পাহাড়ের দিকে চোখ। গরম রোদ পাঁউরুটির মত সেঁকছে যেন পাহাড়টাকে, বাতাসে বাষ্পের অদ্ভুত ঝিলিমিলি। অনেক ওপরে ডানা মেলে ভাসছে একটা গলাছেলা ধাড়ী শকুন, পাক দিয়ে দিয়ে ঘুরছে।
কুৎসিত পাখিটাকে দেখে অস্বস্তিতে ভরে গেছে মুসা আমানের মন। আমাদের কথা ভাবছে না তো ইবলিস পাখিটা?
গালাগাল করছ কেন? খুব ভাল পাখি ওরা, প্রতিবাদ করল রবিন। পচা-গলা খেয়ে সাফ করে, জায়গা পরিষ্কার রাখে।
সেজন্যেই তো ভয়। আমিও তো পচতে পারি। আমি মরি, সেই দোয়া করছে কিনা এখন কে জানে? শকুনের দোয়ায় গরু মরে না মরে না করেও তো অনেক মরে।
কেমন যেন শুকনো, জমাট নীরবতা। গত এক ঘণ্টায় একটা গাড়িও যায়নি গরম সড়কটা ধরে। চুপ করে বসে থাকা আর সইল না মুসার, হাতের কাছে কয়েকটা ছোট পাথর দেখে ওগুলো নিয়ে খেলতে শুরু করল। আরও খানিক পর পা সোজা করল। ঝি ঝি ধরে গেছে। গুঙিয়ে উঠল, গোয়েন্দাগিরির এই একটা ব্যাপার মোটেই ভাল্লাগে না আমার। বসে থাকা আর থাকা।
কিশোর তো বলে খুব জরুরী কাজের একটা এটা, গোয়েন্দাদের জন্যে। কখনও কখনও এক জায়গায় হপ্তার পর হপ্তা নাকি কাটাতে হয়।
ওরকম বসে থাকার গোয়েন্দা হতে আমি চাই না, থ্যাংকু, হাত নাড়ল মুসা। চোরা-ব্যাটারা আবার এখানে আসবে এ-ধারণা হলো কেন কিশোরের?

মনে হয়, ডাংম্যানের বাড়িতে এমন কিছু আছে, ওরা নিতে চায়। গুপ্তধনের কোন সূত্র-টুত্র হতে পারে।
মারছে! তাই নাকি? আবার গুঙিয়ে উঠল মুসা, দ্রুত তাকাল এদিক ওদিক! তাহলে তো আসবেই।
হ্যাঁ। আর সে-কারণেই চোখ রাখাটা জরুরী।
হঠাৎ, পথের ওপার থেকেই বোধহয়, ভেসে এল চাপা চিৎকার। এ-ভাই, কেউ আছ?
মৃদু কণ্ঠ, কিন্তু তপ্ত দুপুরের এই নীরবতায় স্পষ্ট বোঝা গেল কথা।
এই কেউ আছ? বাঁচাও! আবার এল সাহায্যের আবেদন।
বাড়িটার মধ্যে, ফিসফিস করে বলল মুসা। ওদিকে। ভেজিট্যারিয়ান লীগের পেছনে দিক দেখাল।
ডাংম্যানকে আটকে রাখেনি তো? রবিনের সন্দেহ, চোরেরা?
দ্বিধা করছে দুই গোয়েন্দা। যাবে? চোরেরা কাছেপিঠে নেই তো? তাহলে বেরিয়ে পড়বে মহাবিপদে। কিন্তু অসহায় লোকটাকে সাহায্য করাও দরকার।
কি করি? বুঝতে পারছে না মুসা।
গিয়ে দেখা উচিত। তবে হুশিয়ার থাকতে হবে। বিপদ দেখলেই যাতে পালাতে পারি।
সাবধানে ছুটে নির্জন শূন্য পথটা পেরোল ওরা। সদর দরজা বন্ধ, তাই ওদিকে গেলই না, ঘুরে সোজা চলে এল পেছনে। পেছনের দরজা দিয়ে ঢোকার চেষ্টা করবে।
নবে মোচড় দিয়েই বলে উঠল মুসা, খোলা। ঠেলে পাল্লা খুলে পা রাখল অন্ধকার চওড়া একটা গলিতে।
রান্নাঘরে এসে ঢুকল ওরা। কেউ নেই। সেখান থেকে বেরিয়ে বাড়ির পেছনের ছোট একটা হলঘরে ঢুকল, জিনিসপত্র সব এলোমেলো। ঠাণ্ডা, আবছা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কান পাতলো শোনার জন্যে।
কই, কিছুই শুনছি না, ফিসফিসিয়ে বলল রবিন।
কিন্তু এদিক থেকেই শব্দ হয়েছে। চলো তো, অফিসে দেখি।
সাবধানে দোর খুলল মুসা। ভেতরে উঁকি দিল। নীরব, নির্জন।
আলমারীর দরজার মত একটা দরজার দিকে ইশারা করল রবিন। পা টিপে টিপে সেটার কাছে এসে তাতে কান রাখল দুজনে। ওপাশের শব্দ শোনার চেষ্টা করছে।
কিন্তু পুরো এক মিনিট দাঁড়িয়ে থেকেও কিছু শোনা গেল না।
আস্তে করে গিয়ে ডাংম্যানের টেবিল থেকে বড় একটা পেপারওয়েট তুলে নিয়ে এল মুসা। চোখের ইশারায় দরজা খুলতে বললু রবিনকে।

হ্যাঁচকা টানে পাল্লা খুলে ফেলল রবিন। কিন্তু কারও মাথায় পাথরটা বসানোর সুযোগ হলো না মুসার ভেবেছিল ওপাশে ঘর আছে, নেই। আসলেই ওটা আলমারী, দেয়াল আলমারী। শূন্য।
এদিকেই কোথাও থেকে হয়েছে, আবার বলল মুসা।
এমন জায়গায় আছে লোকটা, যেখানে বাতাস ঢোকে না। বেহুশ হয়েযেতে পারে।
তা পারে। তাড়াতাড়ি করা দরকার।
নিচতলার সব কটা ঘর খুঁজল ওরা। নেই। দোতলায় উঠল। তিনটে ছোট ছোট ঘরের পার্টিশন সরিয়ে বড় একটা বৈঠক-ঘর করা হয়েছে। এক কিনারে একটা মঞ্চ। ওতে উঠেই ভাষণ দেয় ডাংম্যান, বোঝা গেল, ওখানেই আক্রান্ত হয়েছিল।
তোমরা এসেছ? বাঁচাও! শোনা গেল আবার চিৎকার। মাথার ওপরে।
চেঁচিয়ে উঠল রবিন, তেতলায়।
এসো, সিঁড়ির দিকে দৌড় দিয়েছে মুসা।
তেতলায় আলো খুব সামান্য। জানালার সমস্ত খড়খড়ি নামাল। ধুলোর পুরু আস্তরণ সব কিছুতে। এক ধারে কতগুলো তক্তা পড়ে আছে, তাতেও ধুলো। কয়েকটা দরজা, পাল্লা খোলা, সব কটা থেকে করিডর চলে গেছে দিকে দিকে।
চুপচাপ দাঁড়িয়ে কান পেতে রয়েছে ছেলেরা।
হঠাৎ এলোমেলো করাঘাতের শব্দ হলো একটা করিডরের শেষ মাথায়। বড় একটা তক্তা তুলে নিয়ে দৌড় দিল মুসা, পেছনে রবিন। আরেকটা দরজা, তারপরে আরেকটা ঘর। খালি।
আবার দাঁড়িয়ে পড়ল ওরা। শব্দের আশায় কান পাতল।
দূরের দরজাটা আগে চোখে পড়ল রবিনের, ঘরের উল্টোধারে। মুসা, ওখানে।
মাথা নুইয়ে সায় জানিয়ে এগোল মুসা।
দরজার নব ধরে মোচড় দিল রবিন। তক্তা তুলে তৈরি রয়েছে মুসা।
তালা দেয়া, জানাল রবিন। ভাঙা যাবে?
দড়াম করে তাদের পেছনে দরজার পাল্লা বন্ধ হলো, যেটা দিয়ে ঢুকেছিল। চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরল দুজনে, চোখ কোটর থেকে ছিটকে বেরোনোর অবস্থা। তক্তা মাথার ওপর তুলে ফেলেছে মুসা। কিন্তু বাড়ি মারার জন্যে কাউকে পেল না। শুধু, খোলা ছিল দরজাটা, এখন বন্ধ।
কিট করে দরজার বাইরে একটা শব্দ হলো।
মুসা! চেঁচিয়ে উঠল রবিন। তালা লাগিয়ে দিয়েছে।
হা-হা করে হেসে উঠল কেউ ওপাশে। নিজেদেরকে খুব চালাক ভাবো, না মিয়ারা?
আবার হাসি। পরিষ্কার চেনা যাচ্ছে এখন গলা। টেরিয়ার ডয়েল।

দরজার কাছে ছুটে গেল দুই গোয়েন্দা। বন্ধ। ধাক্কা দিল মুসা, লাথি মারল, নাড়লও না পাল্লা।
শুঁটকি, জলদি দরজা খোলো! চেঁচাল রবিন।
জলদি, হুমকি দিল মুসা, নইলে বেরিয়ে দেখাব মজা।
বেরোতে তো হবে আগে, ওপাশ থেকে বলল টেরিয়ার। তারপর না মজা দেখানো। আমি যাচ্ছি, বুঝেছ? গরম তো টেরই পাচ্ছ। ঘাম শুকাও। ইস, হোমসের বাচ্চাটাকে পেলাম না, আফসোস, করল সে। ওটাকে শিক্ষা দেয়ার বেশি ইচ্ছা ছিল।
কিশোর তোমার মত গর্দভ নাকি? রেগে গেল রবিন। তোমার মত শুঁটকি?
চুপ! ধমক দিল টেরিয়ার। তার চেয়ে কিশোরের বুদ্ধি বেশি এটা কেউ বললেই তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে সে। তোমরা গাধারা যে কি বিপদে পড়েছ, বুঝতে পারছ আশা করি?
বিপদে পড়বি ব্যাটা দুই, রাগে কাঁপছে মুসা। ভেবেছিস কি…
কি ভেবেছি? হাসি হাসি গলায় জবাব দিল টেরিয়ার, বলছি, শোনো। একজন ভদ্রলোকের বাড়ি চোরের হাত থেকে বাঁচিয়েছি। দুটো চোরকেই আটকেছি। এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, বাড়ির ভেতরে শব্দ শুনে সন্দেহ হলো। ঢুকে দেখি দুটো ছিঁচকে চোর।
পাগল! রবিন বলল। শুঁটকি যে শুঁটকিই। কে বিশ্বাস করবে তোমার কথা?
সবাই করবে, খিকখিক করে হাসল টেরিয়ার। সামনের দরজায় তালা। পেছনের দরজা তাহলে কে খুলল? তোমরা। নাহলে ঢুকলে কিভাবে? আবার হাসল সে। টনি পেদ্রো তোমাদের কথা বলার পর থেকেই চোখ রাখছিলাম ময়লার ডিপোটার ওপর। আজ বাচ্চা হোমসকে সঙ্গে নিয়ে বেরোতে দেখলাম ফোচাচাকে। কার মুরগীর মরা চামড়া কিনতে গেছে, কে জানে। তোমাদেরও বেরোতে দেখলাম, ঢুকতে দেখলাম, আবার বেরোতে দেখলাম। ধরেই নিলাম, ইবলিস দেখা করেছে তোমাদের সঙ্গে, কিছু একটা নিয়ে মেতেছ। পিছু নিলাম। হি-হি-হিহ!
নরকে পচে মরবি তুই, শুঁটকির বাচ্চা! গাল দিল মুসা। ইবলিস বলেছে বুঝি? হি-হিহ।
ইবলিস নয়, শুঁটকি, বোঝানোর চেষ্টা করল রবিন, মিস্টার ডাংম্যান। তিনি জানেন আমরা এখানে আছি। মিস পেদ্রোর কাজ করছি।
বোকা বানাতে চেয়ো না। টনি পেদ্রো আমাকে বলেছে, একটা দামী পুতুল খুঁজছে সে। তার ধারণা, তোমরা চুরি করেছ ওটা।

তোমার মুণ্ডু! চেঁচিয়ে উঠল মুসা। টনির সঙ্গে চুক্তি হয়ে গেছে আমাদের। ও-ই আমাদের অনুরোধ করেছে পুতুলটা খুঁজে দেয়ার জন্যে। তোর গিয়ে লটকে থাকা উচিত জেলেদের জালে, তা না করে ব্যাটা এখানে ভদ্রলোকের পাড়ায় আসিস কিশোর পাশার সঙ্গে পাল্লা দিতে। কিশোর তোর মত দূর?
কে ইঁদুর একটু পরেই বুঝবে। খাঁচায় তো সবে আটকেছ, দারুণ মজা পাচ্ছে টেরিয়ার, রাগছে না তাই। এতই যদি বুদ্ধি বাচ্চা হোমসের, কান্নাকাটি করে তাকেই ডাকো না, এসে তালা খুলে দিয়ে যাক। তো, থাকো তোমরা, ধূলো খাও। আমি বাড়ি যাচ্ছি। গুড বাই। করিডরে পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল।
অস্থির চোখে মুসার দিকে তাকাল রবিন, তারপর দরজায় গিয়ে কান ঠেকাল। নিচ তলায় নেমে যাচ্ছে টেরিয়ার। আরও খানিকক্ষণ পর নিচতলার দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ হলো, যেটা দিয়ে ঢুকেছিল ওরা।
হতাশ চোখে একে অন্যের দিকে তাকাল দুই গোয়েন্দা। সরে এল দরজার কাছ থেকে। ভাল বিপদেই পড়েছে।
জানালায়ও শিক লাগানো, বলল মুসা। অন্য দরজাটায়ও তালা।
পুরানো বাড়ি। দেয়ালে কিংবা মেঝেতে নরম জায়গা থাকতে পারে। খোলা তক্তাক্তা।
সঙ্গে সঙ্গে কাজে লেগে গেল মুসা। মেঝেতে দুর্বল জায়গা খুঁজতে শুরু করল। নেই।
রবিন খুঁজল দেয়াল। পাথরের মত শক্ত, বিষণ্ন কণ্ঠস্বর।
এখন কিশোর কিংবা ডাংম্যান তাড়াতাড়ি এলেই বাঁচি।
সাইকেল দুটো গলিতে আছে। কিশোরের চোখে পড়বে।
হ্যাঁ, বলল মুসা। তাহলে বুঝবে, আশেপাশেই আছি আমরা।
দুজনেই হাসল, কিন্তু প্রাণ নেই তাতে। নিজেদের সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করছে, মনকে বোঝাচ্ছে, কিশোর এই এল বলে, ওদের উদ্ধার করবে। সময় যাচ্ছে।
দুর্বল গলায় এক সময় বলল রবিন, কিশোর না এলেও ডাংম্যান তো আসবেই। তার বাড়ি যখন।
ধরো, এল না।
তাহলে বেরোনোর উপায় আমাদেরকেই করতে হবে।
আবার সারাটা ঘর খুঁজল ওরা। নেই। জায়গামতই এনে তাদেরকে আটকেছে টেরিয়ার। _ রবিন! চেঁচিয়ে উঠল মুসা, একটা দরজার দিকে চেয়ে আছে। এটা ভেতরের দিকে খোলে। কজাগুলো দেখে যাও। ভেতরে।
স্ক্রু খোলার কথা ভাবছ
হ্যাঁ। সহজ কাজ।

স্ক্রু-ড্রাইভার থাকলে সহজ।
শক্ত ছুরি দিয়েও ভোলা যাবে, ভারি স্কাউট-নাইফটা বের করল মুসা, বিপদের আশঙ্কা থাকে এ-রকম কোন জায়গায় গেলে সঙ্গে নেয়।
যতটা সহজ মনে করল, কাজটা তত সহজ নয়। কজা আর স্ক্রু পুরানো, জং পড়ে গেছে। ঘষে ঘষে আগে মরচে সাফ করল মুসা, তারপর ক্রু খোলার চেষ্টা চালাল।
ইয়ার্ডে পৌঁছেই আগে হেডকোয়ার্টারে ঢুকল কিশোর। মুসা আর রবিন ফেরেনি। মেসেজ-রিসিভার যন্ত্রটা দেখল, কোন মেসেজ নেই, ফোন আসেনি। বেরিয়ে এসে তাড়াতাড়ি থানায় ছুটল সে।
অফিসেই পাওয়া গেল পুলিশ চীফ ইয়ান ফ্লেচারকে।
এই যে, ইয়াং ডিটেকটিভ, এসো এসো, হেসে ডাকলেন তিনি। তারপর, কি মনে করে?
একটা কেস, স্যার, বলল কিশোর। আপনার সাহায্য লাগবে।
বসো, চেয়ার দেখালেন তিনি। খুলে বলল, কি হয়েছে?
বাসার সময় নেই, স্যার। ডাংম্যান…
ধীরে, কিশোর। গোড়া থেকে বলো, রিপোর্ট লিখতে হবে তো।
ঠিক আছে, বলল কিশোর। তবে দেরি করা যাবে না, স্যার। পুতুল কুড়িয়ে পাওয়া থেকে শুরু করল, যত তাড়াতাড়ি পারে শেষ করতে চায়।
থামো, থামো, হাত তুললেন চীফ। ভূতের ছায়া? নিশ্চয় ভুল করেছে রবিন আর মুসা। কল্পনা। তোমার কি মনে হয়?
না, স্যার, কাল রাতে আমিও শুনেছি। বিচ্ছিরি হাসি। লম্বা একটা ছায়া, তবে কুঁজো মনে হয়নি আমার। ওরা নাকি লম্বা নাকও দেখেছে, পাখির মাথার মত মাথা, ঝটকা দিয়ে দিয়ে নড়ছিল। কাল রাতে আমি আর মুসা ছায়াটার পিছু নিয়েছিলাম। উপত্যকায় গিয়ে এক জায়গায় একটা ট্রাক এল কোত্থেকে, চারজন মুণ্ডুশূন্য বামনকে নামাল।
কাশলেন চীফ। মুণ্ডশূন্য বামন?
মাথা দেখা যাচ্ছিল না আরকি। চটের বস্তা দিয়ে ঢেকে রেখেছিল, যাতে কোথায় এসেছে না দেখতে পারে। বন্দী।
ওদেরই কেউ সেরাতে পুতুলটা ছুঁড়ে ফেলেছিল? সাহায্যের জন্যে চেঁচিয়েছিল?
তাই তো মনে হয়, স্যার। বামনদেরই কেউ চুরি করেছে পুতুলটা। তাতে মেসেজ ভরে বাইরে ছুঁড়ে দিয়েছে। আশা, কারও না কারও চোখে পড়বেই, উদ্ধারের ব্যবস্থা হবে।
বেশি আশা করেছে। নির্জন এলাকায় ঝোপের ধারে ফেলেছে ছোট্ট পুতুল, তাতে লুকানো কুঠুরীতে মেসেজ, তা-ও আবার বোঝা যায় না কিছু।

মরিয়া হয়ে উঠেছিল হয়তো। কিংবা, আশেপাশে তার বন্ধুরা ঘোরাঘুরি করছে জানত, তাদেরকেই ডেকেছে, পুতুল তাদের হাতে পড়বে বলেই ছুঁড়ে ফেলেছে। ওরা পায়নি, আমাদের হাতে এসে পড়ল। আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিল দুই বাদামী চামড়ার লোক।

বাদামী চামড়া? খুলে বলল সব কিশোর।

ওরা? স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন এতক্ষণে চীফ। কিশোর আবল-তাবল কথা বলে না, জানেন। তাই ভূতুড়ে ছায়া আর মাথাশূন্য বামনদের কথা শুনে দ্বিধায় পড়ে গিয়েছিলেন। যাক, বাস্তব কিছু পাওয়া গেল। হ্যাঁ, ওদের ব্যাপারে খোঁজ-খবর নেয়া যায়। চলো, ডাংম্যানের ওখানেই যাই আগে।

দুজন পুলিশ সঙ্গে নিলেন চীফ। শহরতলীতে ঢুকল পুলিশের গাড়ি। নির্জন পথ ধরে ছুটছে।

দূর থেকেই গথিক-বাড়িটার গাড়িবারান্দায় ডাংম্যানের গাড়িটা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল কিশোর। বাড়িতেই আছে। ওই যে গাড়ি।

বেল বাজানোর আগেই সদর খুলে গেল। ডাংম্যান। কিশোরকে দেখে উদ্বিগ্ন হলো, ওরা কোথায়? রবিন আর মুসা?।

নেই? আমি তো ভাবছিলাম, এখানেই আছে। টনিকে দেখেছেন?

না। স্যালভিজ ইয়ার্ডের কাছে তার গাড়ি দেখলাম মনে হলো। ছুটে গেলাম, কিন্তু মোড় পেরিয়ে আর দেখলাম না গাড়িটা। ইয়ান ফ্লেচারের দিকে তাকাল, এই প্রথম যেন চোখে পড়ল।

ইনি ইয়ান ফ্লেচার, লস অ্যাঞ্জেলেস পুলিশের চীফ, পরিচয় করিয়ে দিল কিশোর। আপনার কথামতই থানায় গিয়েছিলাম।

আপনি এসেছেন খুব ভাল হয়েছে, চীফ, স্বভাব-বিনীত গলায় বলল ডাংম্যান। সমস্যায় পড়ে গেছি। দুজন লোক মারার চেষ্টা করল আমাকে। আমিষভোজী ফ্যানাটিক হবে-টবে প্রথমে ভেবেছি। কিন্তু কিশোর আমার মনে ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছে অদ্ভুত সব কথা বলে।

ভূতুরে ছায়া আর মুণ্ডুশূন্য বামন? বললেন চীফ।

হ্যাঁ। বেশি কল্পনা করে বোধহয় ছেলেটা। তবে, মিস পেদ্রোর সোনার পুতুল চুরি হয়েছে, এটা সত্যি।

চিন্তিত মনে হলো চীফকে। চাম্যাশ হোর্ডের কথা এখানকার অনেকেই শুনেছে, আমিও শুনেছি। থাকলে থাকতেও পারে।

ওসব সোনা-দানার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই আমার, হাত নাড়ল ডাংম্যান। আমি ভাবছি মুসা আর রবিনের কথা। কোথায় গেল?

খোঁজা দরকার, বললেন চীফ।

বাড়ির ভেতরে অনেক জায়গায় খোঁজা হলো। নেই।
দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল কিশোর। গেল কই?
চোরগুলোর পিছু নেয়নি তো? ভুরু কোঁচকালো ডাংম্যান।
নিতেও পারে, চীফ বললেন।
কিন্তু তাহলে আমাকে জানানোর ব্যবস্থা করত, কিশোর মেনে নিতে পারছে না।
সুযোগই পায়নি হয়তো। চোরগুলোর পিছু নিয়ে থাকলে ভাবনার কথা। বিপদ। হতে পারে।
মুখ কালো হয়ে গেছে কিশোরের।
লক্ষ করলেন চীফ। কিছু বললেন না।
ডাংম্যানের অফিসে ঢুকল ওরা। সেফ খুলে ছোট একটা বাক্স বের করে নিয়ে টেবিলের কাছে চলে গেল সে। খাবারের এঁটো আর মোড়কের কাগজ পড়ে আছে।
বেল শুনে উঠে গেলাম, সলজ্জ হাসল ডাংম্যান, ফেলার সময় পাইনি। কাগজ দলেমুচড়ে ঝুড়িতে ফেলল সে, খাবারের টুকরো পরিষ্কার করল। বাক্স খুলে পুতুলটা বের করে বাড়িয়ে দিল। এই যে, এটা নিয়েই গোলমাল। চোরগুলো বার বার আক্রমণ করছে আমাকে।
পুতুলের গোপন কুঠুরি খুলল কিশোর। চীফের দিকে ফিরল, মেসেজ নেই।
থাক না থাক, ওসব জেনে কাজ নেই আমার, বলল ডাংম্যান। জিনিসটা পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছি, ব্যস, এবার আমি নিশ্চিন্ত। চুরি আর হবে না।
চোরগুলো কোথায়, হয়তো রবিন আর মুসা বলতে পারবে, বললেন চীফ। কিশোর, এসো, খুঁজি।
হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখুন, ডাংম্যান বলল। কিশোর, নতুন কিছু খবর পেলেই আমাকে জানিও ! আমি আছি আজ এখানেই। কাল এস্টেটে যাব, টনির সঙ্গে কথা আছে।
বাড়ির ভেতরে পাওয়া গেল না রবিন আর মুসাকে।
বেরিয়ে পুলিশ দুজনকে নিয়ে গাড়ির দিকে চললেন চীফ। পেছনে আস্তে আস্তে হাঁটছে কিশোর, চারপাশে তাকাচ্ছে, চিহ্ন খুঁজছে। দুটো বাড়ির মাঝের একটা গলির দিকে চোখে পড়ল তার। কপালে হাত রেখে রোদ আড়াল করে ভালমত দেখল।
চীফ! চেঁচিয়ে উঠল সে, দেখুন। টায়ারের দাগ।
গলির দিকে ছুটল কিশোর। পেছনে ফ্লেচার।
এখানে ছিল ওরা, দেখতে দেখতে বলল কিশোর। এই যে, দেখুন, সাইকেলের টায়ারের দাগ। আর এই যে এটা দেখছেন, পাথর দিয়ে বানানো খুদে একটা

পিরামিড মত জিনিস দেখাল। মুসার কাজ। চুপচাপ বসে থাকতে পারে না, হাতের কাছে পাথর পেলেই এরকম বানায়।
নিশ্চয় তাহলে কারও পিছু নিয়ে গিয়েছে, বললেন ফ্লেচার।
গলিটার দুই দিকেই তাকাল কিশোর। বুঝতে পারছি না। গেলে তো চিহ্ন রেখে যেত, চকের দাগ। দেয়ালগুলো দেখল ভাল করে। নেই।
হয়তো সময় পায়নি। নাকি অফিসে গিয়ে একটা অল পয়েন্ট বুলেটিন ছাড়ব?
বাড়ি গিয়ে দেখি আগে, ফিরেছে কিনা।
হ্যাঁ, চলো। ভূতুড়ে ছায়াটার কথা ভাবছি। চোরদের কেউ না তো?
না, স্যার। ওরা বেঁটে, ছায়াটা অনেক লম্বা। টনির সমান।
কিন্তু টনির গলা চেনো তোমরা।
চিনি। কিন্তু ইচ্ছে করলে খানিকটা বদলে নেয়া যায়, জানেনই তো। তবে, হাসিটা মানুষের মনে হলো না। মানুষ ওরকম হাসে না।
তো কি? সেটাই তো ভাবছি।
এডগার অ্যালান পোর সেই গল্প মনে পড়ে যাচ্ছে, হাসলেন চীফ। কেউ চিনতে পারছিল না খুনীর গলা, কথা বলে না, শুধু বিচিত্র শব্দ করে। মানুষের কণ্ঠের মত নয়। বানর জাতীয় না, ঝট করে দেয়ালের দিক থেকে চোখ ফেরাল কিশোর।
অস্ট্রেলিয়ায় এমন কি জীব আছে স্যার, যেটা হাসে?
মানে?
ঠোঁট কামড়াল কিশোর, চোখ মুখ কুঁচকে গেছে। কি যেন একটা আছে, স্যার, মনে পড়ি পড়ি করেও পড়ছে না। আচ্ছা, টনির কথায় টান আছে। বলেছে ইংল্যাণ্ড থেকে এসেছে, মিছে কথাও হতে পারে। হয়তো অস্ট্রেলিয়ান। আসল টনি নয় সে।
তাহলে ডাংম্যানের কথা বাদ দিচ্ছে কেন? তার কথায়ও তো টান রয়েছে।
উজ্জল হলো কিশোরের চোখ। অস্ট্রেলিয়ান টান? ব্রিটিশ যে নয়, এটা ঠিক।
বোঝা যায় না। অস্ট্রেলিয়ান পুলিশের সঙ্গে কথা বললেই বুঝতে পারব, লোকটার বদনাম থাকলে জানাবে। চলো যাই।
কিশোরকে স্যালভিজ ইয়ার্ডের গেটে নামিয়ে দিয়ে গেল পুলিশের গাড়ি।
সোজা এসে হেডকোয়ার্টারে ঢুকল সে। রবিন আর মুসা নেই। কোন মেসেজও পাঠায়নি।
দুজনের বাড়িতে ফোন করল কিশোর। জানল, দুপুরে খেয়ে যে বেরিয়েছে, আর ফেরেনি।

আর নিশ্চিন্ত থাকা যায় না। পুলিশ হেডকোয়ার্টারে ফোন করে চীফকে খরবটা জানাল কিশোর। তারপর ফোন করল রেন্ট-আ-রাইড অটো কোম্পানিতে। রোলস-রয়েস গাড়িটা দরকার।
পনেরো মিনিট পর সবুজ ফটক এক দিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল কিশোর। উঠল রাজকীয় রোলস-রয়েসে। চকচকে কালো শরীরে সোনালি অলঙ্করণ, চমত্তার একটা গাড়ি, যদিও মডেলটা পুরানো।
ভেজিট্যারিয়ান লীগ, হ্যানসন। জলদি, ঠিকানা বলল কিশোর।
ছুটতে শুরু করল রোলস-রয়েস। ইঞ্জিনের শব্দ প্রায় নেই বললেই চলে। উড়ে চলল যেন। দেখতে দেখতে এসে পড়ল লা পামা স্ট্রীটে। উৎকণ্ঠায় দুলছে কিশোরের মন, জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে, যেন আশা করছে, যে-কোন মুহূর্তে বাদামী চোরদেরকে দেখা যাবে।
রোলস রয়েসটা গথিক-বাড়ির রকখানেক দূরে থাকতেই শাঁ করে ছুটে এল ডাংম্যানের গাড়ি। ধুলোর মেঘ উড়িয়ে চলে গেল পাশ দিয়ে। চেঁচিয়ে ডাকল কিশোর, কিন্তু লোকটার কানেই যেন ঢুকল না। তাকালও না রোলস-রয়েসের দিকে। স্টিয়ারিঙের ওপর নুয়ে রয়েছে, গভীর।
চেনেন নাকি? জিজ্ঞেস করল হ্যানসন। পেছনে যাব?
না, দ্রুত দূরে সরে যাওয়া গাড়িটার দিকে চেয়ে আছে কিশোর, চিন্তিত। বলল আজ বেরোবে না, মুসা আর রবিনের খবর শোনার অপেক্ষায় থাকবে। তাহলে? নতুন কিছু ঘটল?
গথিক-বাড়ির সামনে এসে থামল রোলস-রয়েস। ঝটকা দিয়ে দরজা খুলে বুলেটের মত বেরোল কিশোর, ছুটল বাড়ির সদর দরজার দিকে। তার পেছনে এল হ্যানসন। দরজা খোলা। ছুটে ঢুকে পড়ল কিশোর। কান খাড়া।
শুনছেন কিছু? হ্যানসনকে জিজ্ঞেস করল।
না, মাথা নাড়ল ইংরেজ শোফার।
আশ্চর্যবোধক চিহ্ন দেখা যায় কিনা দেখুন।
ওরা কোন বিপদে পড়েছে?
জানি না, বলল কিশোর। পুলিশের ধারণা কারও পিছু নিয়ে গেছে। হয়তো তাই। কিন্তু তাহলেও কোন চিহ্ন রেখে যাবে।
হ্যাঁ, শান্তকণ্ঠে বলল হ্যানসন।
ওপরের সব ঘর খোঁজা হয়েছে। আপনি গিয়ে দেখুন আরেকবার। আমি বাইরে গিয়ে দেখি।
ঠিক আছে।

পুরো রকটা খুঁজে দেখল কিশোর, দেয়াল, বেড়া, পথ, সব। গাছ, কাঁচা রাস্তায়ও সঙ্কেত খুঁজল, নেই। পাশরের পিরামিডটা ছাড়া আর কোন নিশানাই রেখে যায়নি ওরা।
বাড়িতে এসে ঢুকল আবার কিশোর।
সিঁড়ি দিয়ে নামছে হ্যানসন। মাথা নাড়ল, কিচ্ছু নেই।
ঠোঁট কামড়াল কিশোর। ডাংম্যান গেল কোথায়? এত তাড়াহুড়ো করে? আনমনে বলল সে।
হয়তো মিস্টার ফ্লেচার ডেকেছেন। আচ্ছা, গ্রাউণ্ড ফ্লোর কিন্তু দেখলাম না।
আমি তখন দেখেছি ভালমতই।
মিসও তত হতে পারে। অনেকবার দেখলে ক্ষতি কি?
রাজি হলো কিশোর। কয়েকটা ঘরে দেখে গিয়ে ঢুকল ডাংম্যানের অফিসে। দেয়াল, মেঝে, আসবাবপত্র, সব দেখল, কোথাও কোন চিহ্ন নেই।
ডেস্কের ওপর থেকে ময়লা ফেলার ঝুড়ির দিকে চোখ ফেরাল কিশোর। সরে আসতে গিয়েও থমকে গেল। ঝুঁকে ঝুড়ি থেকে তুলে নিল একটা কাগজ। চেঁচিয়ে উঠল হঠাৎ, হ্যানসন, দেখুন।
ছুটে এল শোফার। মোম মাখানো কাগজটা নিল কিশোরের হাত থেকে। স্যাণ্ডউইচের কাগজ। এতে এমন কি দেখার আছে?
দাগগুলো দেখছেন? গন্ধ শুকে দেখুন।
দেখল হ্যানসন। সরিষা, আর মাংসের গন্ধ। তেলের দাগ। স্যাণ্ডউইচে থাকবেই।
কিন্তু হ্যানসন, মিস্টার ডাংম্যান ভেজিট্যারিয়ান। লীগের প্রেসিডেন্ট, নিরামিষভোজীদের সর্দার। বুঝলেন না? শজিভোজীদের যে নেতা মাংস আর সরিষা খায়, সে একটা ভণ্ড।
এগুলো ডাংম্যানই খেয়েছে, আপনি শিওর?
শিওর মানে? ও নিজে বলেছে তখন, পুলিশের সামনে। সে ভণ্ড, তারমানে পুরো লীগটাই একটা ভোগলামী। গল্প শুনিয়েছে, অনেক বড় সংগঠন আছে ডাংম্যানের, অনেক দেশ ঘুরে এবার রকি বীচে এসেছে নিরামিষভোজীর সংখ্যা বাড়াতে, সব শয়তানী, এখন বুঝতে পারছি। কোথাও কোন সংগঠন নেই তার।
এ-তো রীতিমত ক্রাইম, তীক্ষ্ণ হলো হ্যানসনের কণ্ঠ। কি কারণ থাকতে পারে? লোক ঠকিয়ে টাকা আদায়?
না, অন্য কিছু। সে জেনেছে, মিস ভেরা পেদ্রো নিরামিষভোজী, হয়তো ইংল্যাণ্ডে টনিই তাকে জানিয়েছে সেকথা। জেনেছে চাম্যাশ হোর্ডের কথা। টনিকে ব্যবহার করার ইচ্ছেয় যোগাযোগ করেছে মিস, পেদ্রোর সঙ্গে, নিরামিষভোজীদের

প্রেসিডেন্ট বলে নিজেকে চালিয়ে দিয়ে খাতির করেছে। পেদ্রোজ এস্টেটে ঢোকার খুব চমৎকার এবং সহজ বুদ্ধি।
টনি কে?
জানাল কিশোর। সোনার পুতুল ছিনতাইয়ের কথাও বলল।
এমনও তো হতে পারে, শুনে বলল হ্যানসন, চাম্যাশ হোর্ডের কথা আগে থেকেই জানে ডাংম্যান। ওগুলো খুঁজে বের করার প্ল্যান করেছে। সেই প্ল্যানমাফিকই যেচে এসে পরিচিত হয়েছে টনির সঙ্গে।
হুঁ, হতে পারে। টনিকে দিয়েও এমন কাজ করিয়েছে, যাতে ওর ওপর চোখ পড়ে আমাদের, সন্দেহ হয়, গুঙিয়ে উঠল কিশোর। ইস, আমি একটা গাধা! সব কথা বলে দিয়েছি ডাংম্যানকে। হায় হায়রে, হুঁশিয়ারও করে দিয়েছি।
বুঝে তো আর বলেননি, সান্তনা দেয়ার জন্যে বলল হ্যানসন। সব্বাইকে বোকা বানিয়েছে ব্যাটা, মহা-ধড়িবাজ।
হ্যাঁ, মাথা কাত করল কিশোর। সব কিছুর মূলেই হয়তো সে। ওই ভূতুড়ে ছায়া, মুণ্ডুশূন্য বন্দি, ঝট করে মুখ তুলল সে। হ্যানসন! জলদি চলুন। পুলিশ হেডকোয়ার্টার।
চলুন। কোন প্ল্যান করেছেন?
না। তবে ডাংম্যান আরেক শয়তানী করেছে। এস্টেট থেকে বেরিয়ে এখানে পৌঁছতে অনেক দেরি হয়েছে তার, সেটা আমাদের জানার কথা নয়। সে-ই জানিয়েছে। তার ভয়, কৈফিয়ত চেয়ে বসব। তাই আমরা জিজ্ঞেস করার আগেই কৈফিয়তও দিয়ে দিয়েছে, স্যালভিজ ইয়ার্ডে নাকি টনিকে খুঁজতে গিয়েছিল, তাই আসতে দেরি হয়েছে। সব মিথ্যে কথা। আমরা আসার অনেক আগেই এখানে এসেছে। তারমানে রবিন আর মুসার নিখোঁজ হওয়ার পেছনে তার হাত রয়েছে।
মরচে ধরা পুরানো একটা লোহার টেবিলের সামনে বসে আছে ডাংম্যান। চেয়ে রয়েছে রঙচটা কাঠের দেয়ালের ধারে বসা মুসা আর রবিনের দিকে।
সত্যি বলছি, তোমাদের ব্যথা দিতে খুব খারাপ লাগছে আমার, হাসল ডাংম্যান।
জবাব দিল না দুই গোয়েন্দা। কি বলবে? শক্ত করে হাত-পা বাঁধা। কোথায় রয়েছে, জানে না। শুধু জানে, একটা পাহাড়ী অঞ্চলে রয়েছে। চোখ বেঁধে নিয়ে আসা হয়েছে এখানে ওদের। দরজার গুলো সব খুলে ফেলেছিল মুসা, ঠেলা দিতেই বাড়ি কাঁপিয়ে দড়াম করে পড়েছিল পান্না, সেই শব্দ শুনে উঠে এসেছিল ডাংম্যান।
পালাতে পারেনি ওরা। ডাংম্যান আর তার দুই চেলা মিলে ধরে ফেলেছে ওদের, চোখের পলকে হাত-পা-মুখ বেঁধে এনে তুলেছে একটা ট্রাকে। সাইকেল দুটোও তুলে নিয়েছে ট্রাকে। তারপর তাদেরকে নিয়ে আসা হয়েছে এখানে।

অন্যের ব্যাপারে নাক গলানো উচিত হয়নি তোমাদের, বুঝতে পারছ তো? হাসল ডাংম্যান। চুরি করে আমার বাড়িতে ঢুকেছ, কাজটা ভাল করোনি। আইনের চোখে অপরাধু! পুলিশে দিতে পারতাম, কিন্তু তার চেয়ে এখানে নিয়ে আসাটাই আমার জন্যে নিরাপদ হয়েছে। পুলিশ গেছে আমার বাড়িতে, কিশোরও ছিল তাদের সঙ্গে। না না, বেশি আশা করো না, ওরা কিছুই পায়নি। তোমাদের সমস্ত চিহ্ন নষ্ট করে দিয়েছি। কিছুই বুঝতে পারোনি।
থাকো এখানে, আমার মেহমান হয়ে। কদ্দিন? তা, আমি যতদিন না যাচ্ছি। তবে এখানকার কাজ ফুরিয়ে এসেছে আমার, আর বেশি সময় লাগবে না।
ধৈর্যের বাধ ভাঙল রবিনের। তুমি একটা চোর।
চাম্যাশ হোর্ড চুরির তালে আছ, ঝাঁঝাল কণ্ঠে বলল মুসা।
হা-হা করে হেসে উঠল ডাংম্যান। তোমরা চালাক ছেলে। ঠিকই আন্দাজ করেছ। আজ রাতেই বের করে আনব ওগুলো।
ছেলেদেরকে আরেকবার দেঁতো হাসি উপহার দিয়ে ঘুরে কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল ডাংম্যান।
নীরবে একে অন্যের দিকে তাকাল দুই গোয়েন্দা। জানালার ময়লা কাচের, ভেতর দিয়ে দেখতে পাচ্ছে, সূর্য ডুবছে। রাতের দেরি নেই, ডাংম্যানকে থামানোর কোন উপায় বের করতে পারছে না ওরা।
পেদ্রোজ এস্টেটের কোথাও রয়েছি, অনুমানে বলল মুসা।
কোন চিহ্নও তো রেখে আসতে পারলাম না। দরজাটা অবশ্য ভাঙা...।
ভাঙা নয়, ভ্রু খুলেছিলাম শুধু, শুধরে দিল মুসা। বলল না, কোন চিহ্ন রাখেনি। আমাদেরকে পাঠিয়ে দেয়ার পর নিশ্চয় আবার দরজা লাগিয়ে ফেলেছে। সাইকেলেদুটোও নিয়ে এসেছে, কেউ কিছু বুঝবে না।
হ্যাঁ। দেয়ালে-টেয়ালে চিহ্নও আঁকতে পারলাম না, সময়ই দিল না ব্যাটারা।
তবু, কিশোর আমাদের খুঁজে বের করবেই, বন্ধুর ওপর অগাধ আস্থা মুসার। বাঁধন খোলা গেলে আমরাও চেষ্টা করতে পারতাম।
দরজায় দেখা দিল ডাংম্যান। হাসতে হাসতে ঢুকল কেবিনে। পরাস্ত হবে না কিছুতেই, আঁ। তোমাদের প্রশংসা না করে পারছি না।
এসব করে পার পাবে না তুমি, কঠিন গলায় বলল মুসা।
হাসি মুছল না ডাংম্যানের মুখ থেকে। খুব পাব। তোমরা আমাকে সুযোগ করে দিয়েছ আরও। কিশোর আর পুলিশ থাকবে তোমাদের খোঁজে, বাদামী চোরদুটোর খোজে, আমাকে সন্দেহ করার সুযোগই পাবে না। দারুণ হয়েছে।
কিশোর পাশাকে চেনো না তুমি, ডাংম্যান, বলল রবিন। তোমার পরিণতি আমি এখনই বলে দিতে পারি। জেল।

নাহ্, তা আর হচ্ছে না, দৃঢ় আত্মবিশ্বাসে বলল ডাংম্যান। অনেক সময় নিয়ে অনেক ভাবনাচিন্তা করে প্ল্যান করেছি, প্ল্যানমাফিক কাজ করেছি, কয়েকটা ছেলে আর ছোট্ট শহরের কয়েকটা পুলিশ আমাকে ঠেকাবে এখন? পারবে না। আমার কথা শুনবে? আমারও সুবিধে, তোমাদেরও।
না, শুনব না, সাফ জবাব দিল মুসা।
হুঁ, সাহস আছে। তবে বোকামি করছ। অবশ্য দুনিয়ায় বোকার সংখ্যাই বেশি, নইলে আমার কপালে চাম্যাশ হোর্ড থাকত না। অনেক আগেই অন্য কেউ তুলে নিয়ে যেত।
এত আশা করছ কেন? রবিন বলল। না-ও তো পেতে পারো।
পাবো, মাই বয়, পাবো। ম্যাগনাস ভারদির ছোট্ট ধাধার সমাধান আমি করে ফেলেছি। আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই চাম্যাশ হোর্ড এসে যাবে আমার হাতে। ছেলেদের দিকে চেয়ে ডাংম্যানের চোখের পাতা কাছাকাছি হলো। তখন তোমাদের একটা ব্যবস্থা করা যাবে।
বলে ঘুরল সে। দরজার নবে হাত রেখে ফিরে চাইল। পালানোর চেষ্টা কোরো না, লাভ হবে না। পাহাড়ের ওপরে এই কেবিন, তিন ধারে একশো ফুট গভীর খাদ। এক দিক দিয়ে শুধু সরু একটা পথ, তাতে লোক পাহারা রেখেছি। গলাকাটা এক ডাকাত সে। সারাক্ষণ কেবিনের দরজায় চোখ রাখছে। কাজেই পালাতে পারছ না তোমরা।
জোরে আরেকবার হেসে উঠে বেরিয়ে গেল ডাংম্যান।
বাইরে থেকে তালা লাগানোর ক্লিক শব্দ শোনা গেল।
পিছমোড়া করে হাত বাধা হয়েছে, খোলার চেষ্টা করল মুসা। খানিকক্ষণ টানাটানি করে ব্যর্থ হয়ে বলল, রবিন, আমার পিঠে পিঠ ঠেকাতে পারবে? গড়িয়ে চলে এসো তো।
দুজনেই রুক্ষ মেঝেতে গড়িয়ে গড়িয়ে কাছাকাছি হলো, পিঠে পিঠ ঠেকাতে পারল।
রবিনের কব্জির বাঁধন খোলার চেষ্টা শুরু করল মুসা। দরদর করে ঘাম ঝরল কপাল থেকে, দাঁতে দাতে চাপল সে। মনে হলো, যুগ যুগ পেরিয়ে গেছে, আঙুল ব্যথা হয়ে গেল, কিন্তু কিছুই করতে পারল না। ক্লান্ত হয়ে হাল ছেড়ে দিল।
নাগালই পাই না, হাঁপাচ্ছে সে।
নাগাল পাওয়ার জন্যে কি আর বেঁধেছে, রবিন বলল।
ছুরিটাও নিয়ে গেছে হারামজাদা। দাতে কামড়ে ধরে...
দাঁত! শুয়ে পড়ো তো। কাত হয়ে।

রবিন শুয়ে দুই মোচড় দিয়ে সরে এল খানিকটা, মুখ নামিয়ে আনল মুসার হাতের কাছে। কব্জির দড়ি বেশ ভালমতই নাগাল পেল দাঁত দিয়ে। গিঁট কামড়াতে লাগল। লালা লেগে সামান্য নরম হলো দড়ি, প্রথম গিটটা কামড়ে ধরে টানাটানি করতে লাগল, কাঁচা মাংস কামড়ে ধরে কুকুর যেভাবে দু-পাশে মুখ-মাথা নেড়ে টেনে ছেড়ার চেষ্টা করে, সেভাবে।
কিছুক্ষণ টানাটানি করে থামল সে, জিরিয়ে নিয়ে আবার শুরু করল।
তিনবারের মাথায় ঢিল হতে লাগল গিঁট।
চেঁচিয়ে উঠল মুসা, হচ্ছে! টের পাচ্ছি। আরও জোরে।
প্রথম গিটটা খুলে গেল। দ্বিতীয়টা খোলা আরও সহজ হলো।
বাঁধন মুক্ত হয়ে উঠে বসল মুসা, খুলে ফেলল পায়ের বাঁধন। এরপর রবিনের বাঁধন খোলাটা কোন ব্যাপারই না।
ডলাডলি করে বাধনের জায়গাগুলোতে রক্ত চলাচল সহজ করে নিল দুজনে। তারপর উঠে এসে দাঁড়াল জানালার কাছে। মুসা সামনের জানালায়, রবিন পেছনের।
মুসা বলল, গার্ডটাকে দেখতে পাচ্ছি। অন্ধকারেও ওর চোখ এড়িয়ে যেতে পারব না, এমন জায়গায় রয়েছে।
সব চেয়ে উঁচু চূড়াটার ওপাশে নেমে গেছে সূর্য। এপাশে আলো কমছে। রাত নামল বেশ তাড়াতাড়ি।
এদিক দিয়েও সম্ভব না, রবিন বলল। কয়েক ফুট পরেই খাদ। নাহ, যাওয়ার আশা বাদ।
ঘরের মাঝে রাখা টেবিলের কাছে ফিরে এল দুই গোয়েন্দা।
টেবিলে রাখা লণ্ঠনের কাচে হাত বোলাতে বোলাতে বলল মুসা, কোথায় আছি অনুমান করতে পারছি। পশ্চিমে গিরিপথটা দেখা যায়। পর্বতের মধ্যে কোথাও রয়েছি আমরা, মিস পেদ্রোর বাড়ি থেকে মাইল পাচেক দূরে।
সঙ্কেত পাঠালে কেমন হয়, লণ্ঠনটার দিকে তাকিয়ে আছে রবিন। পাঁচ-ছয় মাইল দূর থেকে দেখা যাবে রাতের বেলা।
প্রথমে কিছু বুঝল না মুসা। কিন্তু রবিনকে লণ্ঠনের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে সে-ও তাকাল। ঠিক বলেছ। কিন্তু লণ্ঠন জ্বালাতে দেশলাই লাগবে।
লণ্ঠন যখন আছে, নিশ্চয় দেলাইও আছে, টেবিলের ড্রয়ার টান দিয়ে খুলল রবিন। এই যে আছে, বললাম না।
দুজনেরই মুখ উজ্জ্বল হলো। মোর্স কোড জানা আছে, রাতে এস ও এস পাঠাতে পারবে। কারও চোখে পড়ার সম্ভাবনা অবশ্য খুবই ক্ষীণ, তবু বলা তো যায় না। যদি পড়ে গেল?

পেছনের জানালার দিকে চেয়েই চমকে উঠল মুসা।
কি হলো? বলতে বলতেই ফিরল রবিন, দেখে স্থির হয়ে গেল সে-ও।
জানালার বাইরে একটা মুখ। বাদামী চামড়া।
পাল্লা খুলে ফেলে একে একে ভেতরে ঢুকল দুজন লোক। পরনে বিচিত্র সাদা পোশাক। হাতে লম্বা, বাঁকা ফলাওয়ালা ছুরি।
হুড়মুড় করে অফিসে ঢুকল কিশোর আর হ্যানসন।
ডেস্কের ওপাশে বসে আছেন ইয়ান ফ্লেচার। দুজনকে ওভাবে ঢুকতে দেখে ভুরু কোঁচকালেন।
ডাংম্যান একটা ভণ্ড, স্যার! কণ্ঠস্বর সংযত রাখতে কষ্ট হচ্ছে কিশোরের। হোর্ভ চুরির তালে আছে ব্যাটা। তাড়াহুড়ো করে চলে যেতে দেখলাম ওকে। নিশ্চই পেদ্রোজ এস্টেটে গেছে। আমি শিওর, মুসা আর রবিন ওখানেই আছে। স্যাণ্ডউইচের মোড়কটা ঠেলে দিল সে।
কাগজটা দেখলেন চীফ, নাকের কাছে নিয়ে গন্ধ শুকলেন। হুঁ, খায় আমিষ, করে ভেজিট্যারিয়ান লীগ। মিলে যাচ্ছে।
কী?
আমি যা জেনেছি, কিশোরের কৌতূহল দেখে মিটিমিটি হাসছেন চীফ। দুনিয়ায় তোমরাই একমাত্র ডিটেকটিভ নও। হ্যাঁ, অস্ট্রেলিয়ান পুলিশের সঙ্গে কথা বলেছি। টনি পেদ্রোর ব্যাপারে ওরা কিছু জানে না, তবে ফগ ডাংম্যানের নাম অবশ্যই জানে।
কি জেনেছেন, স্যার?
উঠে দাঁড়ালেন চীফ। চলো, যেতে যেতে বলব। দেরি করা ঠিক না। বাদামী চোর দুটোকে পাইনি, কিন্তু আমার ধারণা, ডাংম্যানকে ধরতে পারলেই ওদেরও পেয়ে যাব। মিস্টার মিলফোর্ডকে ফোন করে দিয়েছি, পথে তুলে নেব। মুসার বাবাকে পাইনি, বেরিয়ে গেছে।
যাচ্ছি কোথায়? জানতে চাইল কিশোর।
পেদ্রোজ এস্টেট। তোমার ধারণা বোধহয় ঠিক। ওখানেই পাওয়া যাবে শয়তানটাকে।
রোলস-রয়েসটা নিয়ে যাই, প্রস্তাব দিল কিশোর। ডাংম্যান ওটা চেনে না। পুলিশের গাড়ি দেখলেই পালাবে।
মন্দ বলনি। ঠিক আছে, আমি ওতে চড়েই যাব। আমার লোককে বলি, পুলিশ-কার নিয়ে পিছে আসুক।
চারজন পুলিশকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে রোলস-রয়েসে উঠলেন চীফ। কিশোর আগেই উঠেছে। গাড়ি ছেড়ে দিল হ্যানসন। রবিনদের বাড়ি থেকে তার

বাবাকে তুলে নেয়া হলো।
উঠেই জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার মিলফোর্ড, ওদের খোঁজ পেয়েছেন, চীফ?
না, তবে পাবো।
ব্যাপার কি?
জানালেন ফ্লেচার। শেষে বললেন, ভাল কাজ দেখিয়েছে ছেলেরা। ওদের নিয়ে গর্ব করা উচিত আপনাদের, এমন ছেলের বাপ হয়েছেন। ওরা না থাকলে সাংঘাতিক বিপদে পড়ত টনি আর তার দাদী। আমরা জানতে জানতে দেরি হয়ে যেত। সব্বাইকে বোকা বানিয়েছে ডাংম্যানের বাচ্চা! পুলিশী মেজাজ ঠাণ্ডা রাখলেন জোর করে।
কে লোকটা? অস্বস্তি বোধ করছেন মিস্টার মিলফোর্ড। ইয়ান ফ্লেচার তার বন্ধু, অনেক দিন থেকে চেনেন। সহজে রাগেন না চীফ, রেগেছেন যখন, ব্যাপার গুরুতর।
চোর, ভণ্ড, ওই যে কিশোর যা যা বলেছে, আঁকাবাকা গিরিপথের দিকে চেয়ে বললেন চীফ। দিনের আলো শেষ। সিডনি-পুলিশের সঙ্গে কথা বলেছি। ডাংম্যানের নামে ওয়ারেন্ট আছে ওখানে। সাংঘাতিক এক ঠগ, ধোকাবাজ, প্রতারক, চোর-উঁচু উঁচু বাড়িতে দড়ি কিংবা পানির পাইপ বেয়ে উঠে চুরি করেছে। মানুষ ধরে নিয়ে গিয়ে আটকে রেখে টাকা আদায় করেছে। এমন কোন কুকর্ম নেই, যা সে করেনি। একেক জায়গায় গিয়ে একেক সংগঠনের দোহাই দিয়ে মানুষকে ঠকিয়েছে। মেকসিকোতেও পুলিশ খুঁজছে তাকে। এমন কি সহজ সরল ইনডিয়ানদেরকেও ফাঁকি দিয়েছে সে।
মেকসিকো? বলল কিশোর। কবের ঘটনা?
একবার তো যায়নি, কয়েকবার। তবে শেষ গিয়েছিল নাকি বছরখানেক আগে। অস্ট্রেলিয়ান পুলিশের ধারণা, তারপর থেকেই আছে ক্যালিফোর্নিয়ায়।
তাহলে বছরখানেক আগেই জেনেছে চাম্যাশ হোর্ড আর মিস পেদ্রোর কথা।
মনে হয়। মহিলার ভাইয়ের মৃত্যুর খবর পড়েছে হয়তো পত্রিকায়, বললেন চীফ। তখনই ঠিক করেছে, ইংল্যাণ্ডে গিয়ে টনির সঙ্গে দেখা করবে।
পাহাড়ী পথ ধরে উঠে চলেছে রোলস-রয়েস। অনেক পেছনে রয়েছে পুলিশের হ্যানসন গাড়ি। কালো বিশাল গেটটা দেখা গেল, খোলা। গতি না কমিয়েই মোড় নিয়ে ঢুকে পড়ল হ্যানসন। শক্তিশালী এঞ্জিনের কোনরকম বিকার নেই, প্রতিবাদ জানাল শুধু মোটা টায়ার।
স্প্যানিশ-স্টাইল বিরাট বাড়ির সামনে এনে গাড়ি রাখল হ্যানসন। একটা ঘরেও আলো নেই, নির্জন মনে হচ্ছে। প্রাণের সাড়া নেই কোথাও।
রোলস-রয়েস থেকে নামল সবাই।

কেউ নেই নাকি? নিচু গলায় বললেন চীফ।
তাই তো মনে হয়, কিশোর বলল।
ঢুকে দেখা দরকার, বললেন মিস্টার মিলফোর্ড। হয়তো হাত-পা বেঁধে অন্ধকারে ফেলে রেখেছে মুসা আর রবিনকে।
পুলিশের গাড়িটাও এসেছে, থামল বাড়ি থেকে কিছু দূরে। নিঃশব্দে নেমে এল চারজন পুলিশ। ইশারায় ওদেরকে ছড়িয়ে পড়তে বলে কিশোর আর মিস্টার মিলফোর্ডকে নিয়ে সদর দরজার দিকে এগোলেন ফ্লেচার। তাদের পেছনেই রইল হ্যানসন।
নিচতলার প্রতিটি ঘর খুঁজে দেখা হলো। কেউ নেই।
জোরে জোরে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর। সবাইকে ধরে নিয়ে গিয়ে আটকে রেখেছে ডাংম্যান? চাম্যাশ হোর্ড নিয়ে পালানোর সময় মুক্তিপণ হিসেবে কাজে লাগানোর জন্যে?
কান খাড়া করল সবাই।
অন্ধকারে মৃদু থ্যাপ থ্যাপ শব্দ শোনা গেল।
ওপরে, বললেন চীফ। বাড়ির পেছন সাইডে।
পিস্তল বের করে হাতে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করলেন ফ্লেচার। পেছনে অন্যেরা। সাবধানে দোতলায় উঠে এল সবাই। করিডর ধরে এগিয়ে চলল পেছনে, যেদিক থেকে শব্দ এসেছে।
আবার শোনা গেল শব্দটা।
ওখানে, টর্চের আলোয় একটা দরজা দেখিয়ে বললেন মিস্টার মিলফোর্ড।
দরজায় তালা লাগানো। সবাইকে পাশে সরতে বলে খানিকটা পিছিয়ে এলেন ফ্লেচার। ছুটে গিয়ে কাঁধ দিয়ে জোরে ধাক্কা লাগালেন দরজায়। ভারি শরীরের প্রচণ্ড আঘাত সইতে পারল না পুরানো পাল্লা, হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল।
উদ্যত পিস্তল হাতে ঢুকলেন চীফ।
ওই যে, দরজার কাছ থেকেই চেঁচিয়ে উঠলেন মিস্টার মিলফোর্ড।
ঘরের কোণে চিত হয়ে আছে যেন একটা মিশরীয় মমি—সারা শরীর দড়ি দিয়ে এমনভাবে পেঁচিয়ে বাঁধা হয়েছে। টনি। মুখেও কাপড় গোঁজা, চেঁচানোর উপায়, নেই। পায়ের নিচের দিক কোনমতে নড়াতে পারছে, সে-ই লাথি মেরেছে দেয়ালে।
মুখের কাপড় খুলে ফেলতেই চেঁচিয়ে উঠল টনি, দাদী, ওই যে, ওখানে!
একটা চেয়ারে বসিয়ে শক্ত করে বেঁধে রাখা হয়েছে মহিলাকে, মুখে কাপড়। তার বাঁধন খুলে দিল হ্যানসন।
আমি...আমি...কি হয়েছে? ঘোরের মধ্যে রয়েছেন যেন মিস পেদ্রো ও, মনে হয়েছে। ডাংম্যান। ট্রেতে করে বিকেলের চা নিয়ে এসেছিল, খেয়েছি। তারপর

আর মনে নেই। হুঁশ ফিরলে দেখলাম এই অবস্থা। ঈশ্বর, এত ভয় জীবনে পাইনি! টনি, আরে, মেঝেতে কেন?
লাফিয়ে চেয়ার ছাড়তে গিয়ে টলে উঠলেন মহিলা। ধপ করে বসে পড়ে জিরিয়ে নিলেন এক মুহূর্ত। তারপর উঠে এসে বসলেন টনির পাশে। মুখে-মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। তার দিকে চেয়ে হাসল টনি।
দড়ির বাঁধন কেটে দেয়া হলো। উঠে বসল টনি, বিকৃত করে ফেলেছে মুখ।
কি হয়েছিল? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
দাদী ডাকলে পরে তোমাদেরকে লাইব্রেরিতে রেখে গিয়েছিলাম না? ফিরে এসে দেখি, তুমিও নেই, ডাংম্যানও না। শেষ বিকেলে ফিরে এল আবার। বলল, পুতুলটার ব্যাপারে জরুরী খবর আছে, দোতলায় গিয়ে বলবে। একটুও সন্দেহ না করে গেলাম। কি দিয়ে জানি বাড়ি মারল মাথার পেছনে। হুঁশ ফিরলে দেখলাম, মমি বানিয়ে রাখা হয়েছে আমাকে বানিয়ে রাখা হয়েছে আমাকে।
হুঁ, ডাংম্যানের পুরো পরিকল্পনাই পরিষ্কার হয়ে আসছে কিশোরের কাছে। ও আমাদেরকে বলেছে, তোমাকে খুঁজতে গেছে, ইয়ার্ডে নাকি তোমার গাড়িও দেখেছে, তারপর নাকি হঠাৎ করেই গায়েব হয়ে গেছ।
সব শয়তানী, বললেন চীফ। আসলে অনেক আগেই গিয়ে নিজের বাড়িতে বসে ছিল, রবিন আর মুসাকে ধরে আটকেছে। ওরা ওখানে আছে, কিশোরই জানিয়েছিল ব্যাটাকে।
প্লীজ, গুঙিয়ে উঠল কিশোর, আর লজ্জা দেবেন না। সব আমার দোষ, আমিই সব কথা বলেছি তাকে, হুঁশিয়ার করে দিয়েছি।
আজ রাতেই গুপ্তধন খুঁজে বের করবে সে, বলল টনি। আমার দোষ সবচেয়ে বেশি। এখানে ঢোকার সুযোগ আমিই করে দিয়েছি তাকে। তোমরা চোর, পুরস্কার ঘোষণা করে পুতুলটা তোমাদের হাত থেকে ফেরত আনার আইডিয়া, সব তার। ও-ই বুদ্ধি দিয়েছে জঞ্জাল বিক্রির ছুতোয় তোমাদের সঙ্গে পরিচয় করতে। দম দেয়া পুতুলের মত খেলিয়েছে সে আমাকে।
আমার দোষও কম নয়, বলে উঠলেন মিস পেদ্রো। ওর দলে ঢুকিয়েছে আমাকে, তার লীগে বেশ কিছু টাকাও চাঁদা দিয়েছি আমি। আমার চেনা অনেক নিরামিষভোজীর কাছু থেকে চিঠি এনেছে, দেখিয়েছে আমাকে।
সব জাল, আমি শিওর, বললেন ফ্লেচার। ইবলিসটা জানে না, এমন কোন শয়তানী নেই।
যা-ই হোক, ওকে এখন খুঁজে বের করে ধরা দরকার, মনে করিয়ে দিল কিশোর। টনি, বাদামী চামড়ার লোক, কিংবা মুছাড়া বামনদের কথা কিছু বলেছে ডাংম্যান?

মুণ্ডুছাড়া! না-তো!
ভ্রূকুটি করল কিশোর। ওই বামনরাই এ-রহস্যের চাবিকাঠি মনে হচ্ছে। ওদেরই কেউ পুতুলটা চুরি করে মেসেজ ভরে দেয়ালের ওপর দিয়ে ছুঁড়ে ফেলেছিল। ইয়াকুয়ালী ইনডিয়ান হতে পারে। কিন্তু ওদেরকে আটকেছে কেন ডাংম্যান?
ধৈর্য হারালেন মিস্টার মিলফোর্ড। বামন আর পুতুল নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি কেন? মুসা আর রবিনকে খোঁজা দরকার আগে।
কিন্তু ডাংম্যানকে না পেলে ওদের পাওয়া যাবে না, বললেন চীফ। তাকেই আগে দরকার।
ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে মিস পেদ্রোর দিকে ফিরল কিশোর। ম্যাডাম, আপনার ভাই কখনও চাম্যাশ হোর্ডের কথা বলেছিল?
না। ও তখন পালানোর জন্যে অস্থির, বেশি কথা বলার সময়ই ছিল না।
পুতুল দুটোর কথা কি বলেছিল?
তেমন কিছুই না। চলে যাওয়ার আগে পুতুল দুটো আমার হাতে দিয়ে বলল, ওগুলো আর কোন কাজে লাগবে না। হাঁসটাকে নাকি মেরে ফেলেছে সে। কথাটা অনেক ভেবেছি, কি বলতে চেয়েছে কিছুই বুঝিনি।
চোখ মিটমিট করল কিশোর। বলতে চেয়েছে সোনার-ডিম-পাড়া হাঁসটাকে মেরে ফেলেছে। যে লোকটাকে খুন করেছে, নিশ্চয় চাম্যাশ হোর্ড কোথায় আছে জেনেছিল লোকটা। পুতুলের মধ্যে কোন সূত্রই ছিল না। চাম্যাশ হোর্ড আছে, শুধু একথা প্রমাণ করে ওদুটো।
হোর্ড কোথায় আছে জানত না তাহলে ফিয়ারতো, ফ্লেচার বললেন। কিন্তু ডাংম্যান জানে। কিভাবে জানল?
ম্যাগনাস ভারদির ধাধার সমাধান করে ফেলেছে আরকি। কিংবা বাদামী চামড়ার লোক দুটো করেছে। আমাদেরও করতে হবে এখন।
ইন দা আই অভ দা স্কাই হোয়্যার নো ম্যান ক্যান ফাইও ইট, বিড়বিড় করলেন চীফ। মানে কি?কোথায় খুঁজতে হবে?
জবাব নেই কারও মুখে! একে অন্যের দিকে নীরবে তাকাল শুধু।
বাদামী চামড়ার লোকদুটোকে পাই কোথায়? আনমনে বলল কিশোর।
নীরবতা দিয়ে ঠাট্টা করুল যেন তাকে বিশাল বাড়িটা।
ছুরি হাতে আবছা অন্ধাকার কেবিনে দাঁড়িয়ে আছে লোক দুজন।
ধীরে ধীরে পিছিয়ে যাচ্ছে রবিন আর মুসা।
টেবিলের কাছে এসে থামল মুসা, হাত বাড়াল লণ্ঠনটার দিকে, ছুঁড়ে মারবে যে কোন একজনের মুখে।

মুসার উদ্দেশ্য বুঝে মাথা নাড়ল একজন, ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বলল, না না, আমরু বন্ধু। সাহায্য করব।
স্থির হয়ে গেল রবিন। ইংরেজি জানো?
সি, অল্প। আমি জ্যাকোয়া। ও আমার ভাই জেরমি।
সাহায্য করতে চাইলে পুতুলটা চুরি করেছিলে কেন?
ভাবলাম ভেতরে আমার ভাইয়ের চিঠি আছে। তোমার পিছু নিলাম, পুতুল কেড়ে নিলাম, চিঠি নেই ভেতরে।
মেসেজটা আমরা রেখে দিয়েছি, মুসা জানাল।
কি লেখা? জিজ্ঞেস করল জ্যাকোয়া।
কি লেখা আছে, বলল রবিন।
উত্তেজিত হয়ে মাথা ঝাঁকাল জ্যাকোয়া, বিচিত্র ভাষায় জেরমিকে কি বলল। তার মুখেও উত্তেজনা ফুটল। ছুরি খাপে ভরে রাখল দুজনে।
এই ভয়ই করছিলাম, ইংরেজিতে বলল জ্যাকোয়া। আমাদের ছোট ভাইয়ের বিপদ। ডাংম্যান মিথ্যুক, খারাপ লোক।
তোমরা ইয়াকুয়ালি ইডডিয়ান, মেকসিকো থেকে এসেছ না? জিজ্ঞেস করল রবিন। তোমাদের ভাইকে বন্দি করে রেখেছে ডাংম্যান?
সেদিন আমাদের তাড়া করেছিলে যখন, ইংরেজি বললে না কেন? অনেক কিছু সহজ হয়ে যেত, বলল রবিন।
তখন উত্তেজিত। ইংরেজি মনে ছিল না, বিষণ্ন জবাব দিল জ্যাকোয়া। ডাংম্যান তোমার ভাইদের ধরে এনেছে কেন? কি করছে সে?
ভাঙা ইংরেজিতে যা বলল জ্যাকোয়া, তার সংক্ষেপ : মাসখানেক আগে, মেকসিকোর সিয়েরা মাদ্রে পর্বতের গভীরে ইয়াকুয়ালিদের গাঁয়ে গিয়েছিল ডাংম্যান। পাবলিক অ্যামিউজমেন্ট পার্কে দড়াবাজিকরের চাকরি দেয়ার লোভ দেখিয়ে চারটে কিশোরকে নিয়ে আসে আমেরিকায়। অভিভাবকরা রাজি ছিল না, কিন্তু ছেলেদের মন, আমেরিকা আর শহর দেখার লোভ সামলাতে পারল না, বলে-কয়ে রাজি করাল বাপ-মাকে। চার কিশোরের একজনের নাম নিউকা।
তারপর, হপ্তাখানেক আগে একটা চিঠি পৌচেছে গাঁয়ে। রকি বীচ থেকে পাঠিয়েছে নিউকা, সাহায্যের আবেদন। চিঠিটা কিভাবে পোস্ট করেছে, সে-ই জানে।
এখানে এলাম, পুরানো গাড়ি জোগাড় করলাম, বলে গেল জ্যাকোয়া। ডাংম্যানকে পর্বতের ভেতরে এক বাড়িতে দেখলাম। নিউকার চিৎকার শুনলাম মনে হলো। সন্ধ্যায় তোমাদেরকে দেখলাম বড় বাড়িটার সামনে। তোমরা কোথায় থাকো, দেখে এলাম। পরদিন সকালে তোমাদের পিছু নিলাম। বড় স্টুডিওতে যেতে

দেখলাম। ভাবলাম, ওটার ভেতরে নিউকার লেখা আছে। ছিনিয়ে নিলাম। লেখা পেলাম না। ডাংম্যানকে খুঁজতে খুঁজতে পেলাম আরেকটা বড় বাড়িতে। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, ছেলেগুলো কোথায়। ঝগড়া লেগে গেল আমাদের সঙ্গে।
সে-ই তাহলে ঝগড়া শুরু করেছে। তোমরা আক্রমণ করোনি, বলল রবিন।
সি। ভয় দেখাল, পুলিশকে বলে আমাদের জেলে পাঠাবে। ভয়ে পালিয়ে এলাম। চোখ রাখলাম বাড়িটার ওপর। তোমাকে আর আরেকটা ছেলেকে ঢুকতে দেখলাম। বেরিয়ে এলে। কথা বলার জন্যে ডাকলাম, তোমরা দৌড় দিলে। পালালে। আবার বাড়ির ওপর চোখ রাখলাম। তোমাদেরকে আবার ঢুকতে দেখলাম। পরে তোমাদের বেঁধে ট্রাকে তুলতে দেখলাম। পিছু নিয়ে এখানে এসেছি কথা বলতে। ডাংম্যান কোথায় জানো?
জানি না, বলল মুসা।
তোমাদের ছেলেদের দিয়ে কি করাচ্ছে, জানো? জিজ্ঞেস করল রবিন।
নিশ্চয় কোন খারাপ কাজ, বলল জ্যাকোয়া। তারপর মেরে ফেলবে। ওরা জানে, সে কি করছে, তাই মারবে।
নিশ্চয় হোর্ড খোঁজার কাজে লাগিয়েছে, বুঝতে পেরে বলে উঠল মুসা। পাহাড়ে চড়তে ওস্তাদ ওরা। ঠিকই বলেছ, জ্যাকোয়ার কাজ শেষ হলে ওদেরকে মেরে ফেলবে ইবলিসটা।
পুলিশকে জানানো দরকার, রবিন বলল।
বাইরে যেতে চাও? জিজ্ঞেস করল জ্যাকোয়া। এসো।
কি করে? পাহারা আছে। নিশ্চয় বন্দুক আছে তার কাছে, মুসা বলল।
এদিক দিয়ে নামব, খাদের দিকে দেখাল জ্যাকোয়া।
জ্যাকোয়া কি বলছে, আন্দাজে বুঝে মাথা ঝাঁকাল জেরমি। বিচিত্র ভাষায় কিছু বলল। বোধহয় বলেছে, নেমে যাওয়াটা কোন ব্যাপারই নয় ওদের জন্যে।
ওই খাড়া পাড় বেয়ে? আঁতকে উঠল মুসা।
খাড়া কই? বলল জ্যাকোয়া। সহজ।
মুসার দিকে তাকাল রবিন, দৃষ্টি ফেরাল জ্যাকোয়ার দিকে। চলো, যাব। আর কোন পথ যখন নেই।
যাবে? কাঁধ ঝাঁকাল মুসা, হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গিতে।
ঠিক আছে। আগে সঙ্কেত পাঠিয়ে নিই। পড়ে গিয়ে হাড়গোড় ভেঙে তো মরব জানিই, লাশগুলো অন্তত এসে নিয়ে যেতে পারবে।
লণ্ঠন জেলে জানালার কাছে এসে দাঁড়াল মুসা। ঘরের কোণ থেকে খুঁজেপেতে ছোট একটা কাঠের টুকরো এনে দিল রবিন। টুকরোটা লণ্ঠনের সামনে ধরে-সরিয়ে, ধরে-সরিয়ে এস ও এস পাঠাতে শুরু করল মুসা।

তারপর জানালা দিয়ে বেরিয়ে এল চারজনে।
সঙ্গের ঝোলা থেকে চামড়ার তৈরি সরু শক্ত দড়ি আর মোটা দুটো কাঠের গোঁজ বের করল দুই ভাই। পাথরের দুটো গভীর খাঁজে গোজ দুটো ভালমত ঢুকিয়ে দিয়ে দুটো দড়ির এক মাথা বাঁধল। হাতে তৈরি চামড়ার স্ট্রাপ বের করে কাঁধে-পিঠে বেঁধে নিল। স্ট্রাপে চামড়ার আঙটা রয়েছে, ওগুলোর ভেতর দিয়ে ঢুকিয়ে দিল দুটো দড়ির অন্য মাথা। কোন কারণে হাত যদি ছুটেও যায় দড়ি থেকে, ওই আঙটায় আটকে যাবে দড়ি, মারাত্মক পতন ঠেকাবে।
খাদের কিনারে এসে নিচে উঁকি দিল মুসা। অন্ধকার, কিছুই দেখা যায় না। ভালই হলো, বিপদের পরিমাণ চোখে দেখা না গেলে ভয় অনেক কম লাগে।
শক্ত করে ধরে রাখবে গলা আর আঙটা, মুসাকে বলল জ্যাকোয়া। ছাড়বে। আমরা নামতে পারব।
মুসাকে পিঠে নিল জ্যাংকোয়া, জেরমি নিল রবিনেক। তারপর আলগোছে দড়ি ধরে ঝুলে পড়ল।
পাক দিয়ে উঠল মুসার মাথা। ক্ষণিকের জন্যে মনে হলো মহাশূন্যে ভাসছে। জ্যাকোয়ার গলা জড়িয়ে ধরে রেখেছে, আরেক হাতে আঁকড়ে রেখেছে স্ট্র্যাপের পিঠের একটা আঙটা। দাঁতে দাঁত চেপে রেখেছে, ঝাঁকুনির চোটে গোড়া থেকে হাত ছিঁড়ে গেলে যাক, কিন্তু আঙুল ছুটাবে না।
পাহাড়ের দেয়ালে পা ঠেকিয়ে দোল দিতে দিতে নেমে চলেছে দুই ইয়াকুয়ালি। ঠেলে বেরিয়ে থাকা পাথর, খজ, কিছুই রুখতে পারছে না ওদের, গতি কমছে না একটুও।
ধরে থাকতে থাকতে হাত ব্যথা হয়ে গেছে দুই গোয়েন্দার। ওদের মনে হচ্ছে, এ-নামার বুঝি আর শেষ নেই, শেষ হবে না কোনদিন।
হঠাৎ প্রচণ্ড ঝাঁকুনি লাগল, ধরে রাখতে পারল না মুসা, জ্যাকোয়ার গলা থেকে হাত ছুটে গেল তার। আঙটা থেকে খুলে এল আঙুল। চোখ বন্ধ করে ফলল সে। দড়াম করে আছড়ে পড়ল কঠিন পাথরে। পিঠে তীব্র ব্যথা, চোখা গরম এক শিক ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে যেন মেরুদণ্ডের পাশে। গুঙিয়ে উঠল সে।
হাসি শোনা গেল জ্যাকোয়া আর জেরমির।
হাত ধরে মুসাকে টেনে তুলল জ্যাকোয়া।
চোখ মেলল গোয়েন্দা-সহকারী। লজ্জা পেল। জ্যাকোয়ার পা মাটিতে ঠেকায় ঝুঁকুনি লেগেছিল, আর তাতেই ছুটে গেছে তার হাত।
ব্যথা পাচ্ছে পিঠে, কিন্তু সেটা কাউকে বুঝতে দিল না মুসা।
নামলাম তাহলে! রবিনের কণ্ঠে বিস্ময়। বিশ্বাস হচ্ছে না।
আবার হাসল জ্যাকোয়া। সহজ।

কঠিনগুলোর কথা আর বোলো না, সোজা হতে গিয়ে আঁউ করে উঠল মুসা। কোমরের এক পাশে হাত চেপে ধরে দুর্বল কণ্ঠে বলল, তাড়াতাড়ি করা দরকার। তোমাদের গাড়িটা কোথায়?
বাঁয়ে, পথে। পুলিশের কাছে যাব? সাহায্য করবে?
করব, বলল রবিন।
গাড়ির দিকে রওনা হলো ওরা। পথ নেই, কঠিন পাথুরে অঞ্চল, এবড়োখেবড়ো, রুক্ষ। তাড়াতাড়ি হাঁটা যাচ্ছে না।
অবশেষে পথে পার্ক করে রাখা গাড়ির কাছে পৌঁছল ওরা।
ঠিক এই সময় মোড়ের কাছে দুটো হেডলাইট জ্বলে উঠল, চোখ ধাধিয়ে দিল তীব্র আলো। একটা ট্রাক।
আবছা মত দেখা গেল ট্রাকের কেবিন থেকে লাফিয়ে নামল একটা মূর্তি, হাতে রাইফেল। অনেক জ্বালান জ্বালিয়েছ, ডাংম্যানের গলা। আর ছাড়ব না।
কি ভাবে...কথা সরছে না রবিনের, জানলে...আমরা এখানে।
ইয়াল্লা! গুঙিয়ে উঠল মুসা।
হেসে উঠল ডাংম্যান। তার হোঁতকা সঙ্গী ল্যাঙলীও নেমেছে ট্রাক থেকে। তার হাতেও রাইফেল।
বিচিত্র ভাষায় গাল দিয়ে ডাংম্যানের ওপর লাফিয়ে পড়তে গেল জেরমি। সঁ্যাত করে সরে গেল ডাংম্যান, রাইফেলের বাট দিয়ে প্রচণ্ড বাড়ি মারল ইনডিয়ানের মাথায়। মুখ থুবড়ে পড়ল লোকটা, উঠল না। নিথর হয়ে গেছে।
পালাচ্ছে! চেঁচিয়ে উঠল ল্যাঙলী। আরেকটা পালাচ্ছে!
চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরল ডাংম্যান, রাইফেল তুলল, কিন্তু তার আগেই অন্ধকারে হারিয়ে গেল জ্যাকোয়া।
যাক, বলল ডাংম্যান। একটু পরেই মাল নিয়ে হাওয়া হয়ে যাব আমরা। ওই ব্যাটার তোয়াক্কা না করলেও চলবে।
অস্বস্তি বোধ করছে ল্যাঙলী। ঠিক তো, বস? সত্যিই পারব?
পারব না মানে? যাও, রিগোকে ডেকে নিয়ে এসো, আর পাহারার দরকার নেই। এই বিচ্ছু দুটো বেশি জ্বালাচ্ছে। ঠাণ্ডা করে দেয়া দরকার।
কিভাবে? হতাশা ঢাকতে পারলেন না মিস্টার মিলফোর্ড। কোথায় আছি কিছুই জানি না। কোন সূত্র নেই। ধারণা নেই। কি করে খুঁজব?
সবাই বেরিয়ে এসেছে বাড়ির বাইরে। চাঁদের আলোয় প্রতিটি জিনিসকে কেমন রহস্যময়, ভূতুড়ে দেখাচ্ছে। গাড়ি বারান্দায় পায়চারি করতে করতে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল কিশোর।

চীফ, কয়েকটা ব্যাপার আলোচনা করে দেখা যাক, বলল সে। এক, পর্বতের মধ্যেই কোথাও রয়েছে গুপ্তধন। দুই, ডাংম্যানের একটা কার একটা ট্রাক আছে। তিন, আজ রাতেই গুপ্তধন সরানোর মতলব করেছে সে।
তাতে কি? প্রশ্ন করল টনি।
তাতে? একটা ব্যাপার শিওর, কোন একটা পথ ব্যবহার করতে হবে তাকে। আর সেই পথটা রয়েছে এই এস্টেটেরই কোথাও। পর্বতের ভেতরে, এখান থেকে বেশি দূরে নয়। গেট দিয়ে ঢুকেছে যে পথ, সেটা নয়, হান্টিং লজে যেটা গেছে, সেটাও নয়, তৃতীয় আরেকটা পথ আছে কোথাও। মিস পেদ্রো হয়তো বলতে পারবেন।
মাই গড। কিশোর, ঠিকই বলেছ, একমত হলেন ফ্লেচার। মিস পেদ্রোর দিকে ফিরলেন। মিস পেদ্রো, মিস্টার মিলফোর্ড, টনি, হ্যানসন সবাই তাকিয়ে আছে পুবের অন্ধকার পাহাড় শ্রেণীর দিকে। মিস পেদ্রো, আর কোন পথ আছে, জানেন?
ভেবে বললেন মহিলা, খুব বেশি ঘোরাঘুরি করিনি এস্টেটের ভেতরে...
চেঁচিয়ে উঠল টনি, আরে, ওটা কি? আলো! জ্বলছে নিভছে।
ঘুরে আরেক দিকের পাহাড়ের দিকে তাকাল সবাই। দম বন্ধ করে ফেলল। ম্লান আলো ঝিলিক দিয়েই নিভে গেল, আকাশের অনেক নিচে, কাছের গাছগুলোর মাথার ওপর দিয়ে দেখা গেছে আলোটা।
এস ও এস, কিশোর বলল। বাজি রেখে বলতে পারি, মুসা আর রবিন। বন্দি করে রেখেছে ওদেরকে।
চার পাঁচ মাইল হবে, বললেন ফ্লেচার। পর্বতের গোড়ায় কোন টিলার মাথায়।
ওই যে, আবার, বলল হ্যানসন।
জ্বলে উঠেই নিভে গেল আলো।
কি আছে ওদিকে, মিস পেদ্রো? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
কি যেন আছে? মাথা চুলকালেন মহিলা, মনে করার চেষ্টা করছেন। অনেক দিন আগের কথা। বাবা বলত...ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে, পুরানো একটা কেবিন। আজকাল আর কেউ যায় না ওদিকে।
কি ভাবে যেতে হয়? জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার মিলফোর্ড।
পথ একটা আছে, খুব সরু। একটা ছোট পাহাড়ের ধার দিয়ে গিয়ে ঢুকেছে পর্বতের ভেতরে। পাহাড়টার চূড়া চ্যাপ্টা, টেবিলের মত অনেকটা, ওই মেসা বলে যাকে। মেসার ওপরই তৈরি হয়েছে কেবিন। ওখানে ওঠা খুব কঠিন।
বন্দি রাখার জন্যে ভাল জায়গাই খুঁজে বের করেছে ডাংম্যান, মন্তব্য করল কিশোর।

পূব দিকে তাকিয়ে রয়েছে সবাই। কিন্তু আর দেখা গেল না আলোর সঙ্কেত। কিছু হলো না তো? উদ্বিগ্ন মনে হলো মিস্টার মিলফোর্ডকে।
চলুন, বললেন চীফ, গিয়ে দেখি।
রোলস-রয়েসে উঠল কিশোর, ইয়ান ফ্লেচার, মিস্টার মিলফোর্ড আর টনি। পুলিশের গাড়িতে এখন তিনজন পুলিশ, একজন রয়ে গেল মিস পেদ্রোর পাহারায়। কোন দিক দিয়ে কিভাবে যেতে হবে, বলে দিয়েছেন মিস পেদ্রো। সেভাবেই, হাইওয়ে দিয়ে ঘুরে এসে সরু পথটায় নামল গাড়ি দুটো।
পাহাড়ী পথে নেমেই নিভিয়ে দেয়া হলো গাড়ির আলো। আশপাশে টিলাটক্কর আর পাহাড়, ফলে চাদের আলো ভালমত পড়ছে না পথে, আবছা অন্ধকার।
বিশাল পর্বতের গোড়ায় এসে থামল গাড়ি। সবাই নামল।
মেসার মাথায় কেবিনটা দেখাল কিশোর, ওই যে।
অন্ধকার কেন? ফিসফিস করে কথা বললেন মিস্টার মিলফোর্ড।
সাবধান! হুঁশিয়ার করলেন ফ্লেচার। ফাঁদ হতে পারে।
তাড়াতাড়ি করুন, চীফ। কি বিপদে আছে ছেলেগুলো কে জানে।
অনিচ্ছা সত্ত্বেও মাথা ঝাঁকাল কিশোর।
খাড়া সরু পথ ধরে মেসায় উঠতে শুরু করল চীফ আর তার তিন সহকারী। শব্দ শুনে থেমে গেল। হঠাৎ, ফিরে তাকাল।
রোলস-রয়েসের কাছ থেকে খানিক দূরে একটা লোককে ধরে ফেলেছেন মিস্টার মিলফোর্ড আর হ্যানসন। ছাড়া পাওয়ার চেষ্টা করছে লোকটা।
বাদামী চামড়া! চেঁচিয়ে উঠল কিশোর।
ধরে রাখুন, ছাড়বেন না, চেঁচিয়ে বললেন চীফ। ছুটে এলেন দুজন পুলিশ সঙ্গে নিয়ে।
টেনেহিঁচড়ে লোকটাকে পথের ওপর নিয়ে আসা হলো। কিশোরকে দেখেই হাসল জ্যাকোয়া। চিনতে পেরেছে। তুমি কিশোর না? আমি জ্যাকোয়া। ইয়াকুয়ালি বন্ধু। পালিয়েছি।
বন্ধু কিনা বোঝা যাবে এখনি, কঠিন গলায় বললেন চীফ। ছেলেদের তাড়া করেছিলে কেন?
ভুল। ভেবেছি ওরা খারাপ-মানুষ ডাংম্যানের লোক। ভুল করেছি, অন্য ছেলেদের বলেছি। বিশ্বাস করেছে।
রবিন আর মুসাকে দেখেছো? জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার মিলফোর্ড। কোথায়? জলদি বলো।
হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল জ্যাকোয়া। খারাপ-মানুষ ডাংম্যান ধরে নিয়ে গেছে। আমার ভাই জেরমিকেও নিয়েছে। নিউকা আর অন্য ছেলেদের আটকে রেখেছে।

জোরে নিঃশ্বাস ফেললেন ফ্লেচার। গোড়া থেকে বলো। খুলে বলো সব।
এক মিনিট, চীফ, সামনে এগোল কিশোর। জ্যাকোয়া, ইংরেজি তো ভাল বলতে পারো না। স্প্যানিশ পারো?
মাথা ঝাঁকাল ইনডিয়ান।
তাহলে তাই বলো। খুলে বলতে সুবিধে হবে তোমার।
মাথা কাত করল জ্যাকোয়া। গড়গড় করে বলে গেল পুরো কাহিনী, মুসা আর রবিনকে যা যা বলেছে। চুপ করে শুনল সবাই। ডাংম্যানের ওপর বিষিয়ে উঠল মন।
আরও চারটে ছেলে? বলল কিশোর, ঠিক প্রশ্ন নয়। হতেই হবে। আমি গর্দভ তো, তাই তখন বুঝিনি। ইয়াকুয়ালি ছেলেদের ব্যবহার করছে ব্যাটা। ম্যাগনাস ভারদির গুপ্তধন নামিয়ে আনার জন্যে। অথচ, ভুল কথা নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছি আমরা।
ভুল? ফ্লেচার বললেন।
তাই তো। আমরা জানি, ইটস ইন দা আই অভ দা স্কাই হোয়্যার নো ম্যান। ক্যান ফাইণ্ড ইট। ম্যান। তারমানে বড়রা পারবে না। কিন্তু একটা ছেলে পারবে।
ছেলে?
হ্যাঁ। ইয়াকুয়ালিরা এমনিতেই আকারে ছোট, ছেলেরা আরও অনেক ছোট। এমন জায়গায় গুপ্তধন লুকিয়েছে ভারদি, যেখানে খুব ছোট একটা ছেলেই শুধু ঢুকতে পারবে। কোনও গুহায় রেখেছে, সুড়ঙ্গমুখটা খুব সরু। পাহাড়ে উঠে ওখান দিয়ে ঢুকতে হবে।
তারমানে, বলতে চাইছ, ইয়াকুয়ালিদের গায়ে গিয়ে চারটে ছেলেকে নিয়ে এসেছে এ-কারণেই?
হ্যাঁ। বড়দের মতই ছোটরাও পাহাড়ে চড়তে ওস্তাদ।
অনেক ওপরে কোথাও লুকানো আছে তাহলে। কিন্তু, এত কষ্টের দরকার কি ছিল? ডিনামাইট দিয়ে কিংবা অন্য কোনভাবে সুড়ঙ্গটা মোটা করে নিলেই পারত?
বোধহয় সম্ভব না, সে জন্যেই করেনি। পাহাড় ধসে পড়তে পারে। তাহলে চিরতরে হারিয়ে যাবে সোনার স্তুপ। তাছাড়া, বোমা মারলে লোকে শুনবে। সে তো চায় চুপচাপ কাজ সারতে।
এসব পরে ভাবলেও তো চলে, বাধা দিলেন মিস্টার মিলফোর্ড। ছেলেগুলোকে আগে বের করে আনা দরকার। জ্যাকোয়া, কোথায় লুকিয়েছে ওদের?
উঁচু পর্বতের দিকে দেখাল জ্যাকোয়া। এ-পথ ধরেই গেছে। ট্রাকে করে।
পর্বতের ভেতরে খোঁজাই তো মুশকিল, চিন্তিত হয়ে পড়লেন ফ্লেচার। দিনে হলে হেলিকপ্টার আনা যেত।
সকাল হতে তো অনেক দেরি! অধৈর্য হয়ে পড়েছেন মিস্টার মিলফোর্ড।

কিন্তু এখন গিয়ে খোঁজাখুঁজি করাটাও ঠিক হবে না। সাড়া পেলে সতর্ক হয়ে যাবে ডাংম্যান, ছেলেদের বিপদ আরও বাড়বে।
চুপ করে কি ভাবছিল কিশোর, হঠাৎ ফিরল জ্যাকোয়ার দিকে। ট্রাকের চাকার দাগ অনুসরণ করতে পারবে?
চাকার দাগ? সি, পারব। খুব সহজ।
তাহলে চলো। সময়মত পৌঁছতে পারলেই হয় এখন।
চাঁদের আলোয় দাগ দেখে দেখে প্রায় ছুটে চলল জ্যাকোয়া। অনুসরণ করুল সবাই।
শক্ত দড়ি দিয়ে কষে বাঁধা হয়েছে মুসা আর রবিনকে। নির্জন পর্বতের ভেতরে চাদের আলোয় তাদের পাশে দাঁড়িয়ে আছে ডাংম্যান।
ছায়া থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল ল্যাঙলী। ছেলেগুলো তৈরি, বস।
চলো।
উজ্জ্বল জ্যোৎস্না ছায়া সৃষ্টি করেছে সর্বত্র। বাক্সের মত গিরিসঙ্কটে ছায়ায় হারিয়ে গেল দুই চোর। পড়ে থেকে দেখল রবিন আর মুসা। তাদের পাশে গোঙাচ্ছে হাত পা বাঁধা জেরমি।
কি করি এখন? রবিন বলল।
কিশোর নিশ্চই খুঁজছে আমাদের।
আমাদের সিগন্যাল কি দেখেছে?
কি করে বলি, বলো। একবার মাত্র পাঠিয়েছি। দেখে থাকলেও কেবিনে যাবে খুঁজতে, এখানে আসবে কেন?
কি জানি। তবে এলে ভাল হত। আমার ভয় করছে, মুসা। মনে হচ্ছে, আগামী ভোর আর দেখব না।
মুসা জবাব দেয়ার আগেই ফিরে এল ডাংম্যান আর ল্যাঙলী।
ঝুঁকে বসে রবিনের বাঁধন খুলল ল্যাঙলী।
ওঠো, ডাকল ডাংম্যান। ল্যাঙলী, মনে আছে তো কি করবে?
আছে বস।
গুড। কয়েক ঘণ্টার বেশি লাগবে না। হুঁশিয়ার থাকবে। তীরে এসে তরী ডোবাতে চাই না।
রবিনের পিঠে ঠেলা দিল ডাংম্যান। তাকে নিয়ে চলে গেল গিরিসঙ্কটের দিকে।
সেদিকে চেয়ে অস্বস্তি বোধ করছে মুসা। রবিনকে নিয়ে গেল কেন?
কোথায় রয়েছে, মোটামুটি আন্দাজ করতে পারছে সে। এই বক্স-ক্যানিয়নটার কোন নাম নেই, তবে রয়েছে ইনডিয়ান হেড মাউনটেইনের গোড়ায়, পেদ্রোজ

এস্টেটের গভীরে। রাস্তা থেকে মাইলখানেক দূরে। ওখানে ট্রাক রেখে এসেছে ডাংম্যান।
ল্যাঙলী, পটানোর চেষ্টা করল মুসা। ডাংম্যান তোমাকে ফেলে যাবে...।
চুপ! রেগে উঠল ল্যাঙলী। বস্ এমন কাজ করবে না।
চুপ হয়ে গেল মুসা। লাভ নেই চেষ্টা করে।
মোড়ামুড়ি করে কোনমতে উঠে বসল জেরমি। ভীষণ হয়ে উঠেছে চেহারা, চোখে বুনো দৃষ্টি, চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তার দিকে চেয়ে হাসল মুসা। জবাব দিল না ইনডিয়ান। ইংরেজি জানে না। মুক্তির জন্যে কিছু করতে হলে মুসাকে একাই করতে হবে, জেরমিকে বলে কিছু বোঝাতে পারবে না।
কিন্তু কি করবে? মাত্র কয়েক ফুট দূরে বসে আছে ল্যাঙলী। কোলে রাইফেল।
মাথা ঘুরিয়ে এদিক-ওদিক তাকাল মুসা। উপায় খুঁজছে।
হঠাৎ চোখ মিটমিট করল সে। ওগুলো কি সত্যিই দেখা যাচ্ছে! না তার চোখের ভুল?
না, সত্যি। রূপালী ছায়ায় ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে অসংখ্য মূর্তি।
চেঁচিয়ে উঠল মুসা, এই যে, আমি এখানে! এখানে! ছুটে আসতে লাগল মূর্তিগুলো।
লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল ল্যাঙলী। কোলের ওপর থেকে রাইফেল পড়ে গেল, তোলার চেষ্টা করল না। মহাবিপদ, বুঝে গেছে। পেছন ফিরে দিল দৌড়।
ধরো, ব্যাটাকে, ধরো, পুলিশ চীফ ইয়ান ফ্লেচারের গলা।
মুহূর্ত পরেই মুসাকে ঘিরে দাঁড়াল কিশোর, মিস্টার মিলফোর্ড আর হ্যানসন। বাঁধন খুলতে শুরু করল। জেরমির পাশে গিয়ে বসল তার ভাই জ্যাকোয়া।
ল্যাঙলীকে ধরে নিয়ে এল দুজন পুলিশ। ছাড়া পাওয়ার জন্যে ছটফট করছে চোরটা।
ডাংম্যান কোথায়? মুসাকে জিজ্ঞেস করল কিশোর।
হাত তুলে দেখাল মুসা। রবিনকে নিয়ে গেছে।
ছায়ার দিকে তাকালেন মিস্টার মিলফোর্ড।
হোঁতকা ল্যাঙলীর দিকে কড়া চোখে তাকালেন ফ্লেচার। ধমক দিয়ে বললেন, ডাংম্যান কই? ছেলেগুলোকে কোথায় রেখেছে?
দাঁত খিচালো ল্যাঙলী। ওকেই গিয়ে জিজ্ঞেস করো না, পুলিশ।
আরেক ব্যাটা আছে, মুসা জানাল। ওই চোরটার নাম রিগো।
থাকুক, বললেন চীফ। পালাতে পারবে না, ফাঁদে পড়েছে। বক্স-ক্যানিয়ন এটা, আর কোন পথ নেই।

বড় বড় কথা না বলে আগে ধরে দেখাও না, পুলিশ, শুয়োরের মত ঘোৎঘোৎ করে উঠল ল্যাঙলী।
বেশি দূর যায়নি ব্যাটা, ল্যাঙলীর কথায় কান না দিয়ে বলল মুসা। ওই ক্যানিয়নের দিকে।
আর কোথাও যেতেও পারবে না, কিশোর বলল। যেতে হলে আমাদের। এখান দিয়েই যেতে হবে।
হ্যাঁ, বললেন চীফ। নিজের লোকদের নির্দেশ দিলেন, ছড়িয়ে পড়ো।
হাতে রিভলভার নিয়ে তিন দিকে চলে গেল তিনজন পুলিশ।
চাঁদের দিকে মাথা তুলে রয়েছে যেন ইনডিয়ান হেড মাউনটেইনের চূড়া। যেন একটা টাওয়ার।
গিরিসঙ্কটের দিকে এগোল সবাই, পুলিশ তিনজন ছাড়া। কিশোরের চোখ চূড়ার দিকে। তার পেছনে রয়েছে মুসা আর হ্যানসন।
মুসা, দেখো, থেমে গেল কিশোর। কথাটা শেষ করতে পারল না।
গিরিসঙ্কটে ছায়ার ভেতর থেকে শোনা গেল তীক্ষ্ণ অট্টহাসি, পাহাড়ের দেয়ালে দেয়ালে প্রতিধ্বনি তুলে মিলিয়ে গেল বুনো হাসির রেশ।
সেই ভূত! জোরে বলতে ভয় পাচ্ছে মুসা।
দেখি, টর্চটা ধরো তো, চেঁচিয়ে বললেন চীফ।
ছায়ার দিকে আলো ফেলল একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা একজন পুলিশ।
হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে ডাংম্যান। খুব অসময়ে এসে পড়েছেন। সামান্য নিয়েই খুশি থাকতে হবে এখন আমাকে।
তার কাছেই কোথাও থেকে শুরু হলো আবার বুনো অট্টহাসি, ঢেকে দিল কথা।
নড়ো না, ডাংম্যান, কঠিন গলায় আদেশ দিলেন ফ্লেচার। তাকে ধরার নির্দেশ দিলেন সহকারীদের। ডাংম্যান, আরেকটা চোর কোথায়?
এই যে, স্যার, ধরেছি, অন্ধকার থেকে বলে উঠল একজন পুলিশ।
সার্চ করা হচ্ছে ডাংম্যানকে, হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে সে। তার কাছ থেকে ছোট একটা বস্তা নিয়ে চীফের দিকে বাড়িয়ে দিল একজন পুলিশ। ধাক্কা দিয়ে রিগোকে এনে দাঁড় করিয়ে দেয়া হলো তার বসের পাশে।
বস্তা খুলে ডাংম্যানের দিকে তাকালেন ফ্লেচার। স্বর্ণ। চাম্যাশ হোর্ড পেয়েছ। ভাল চাইলে বলো কোথায় আছে। তোমার কথা সব জানি আমরা।
আমার কথা? হাসছে ডাংম্যান। নোংরা ওই ইনডিয়ানগুলো কিছু বানিয়ে বলেছে?
অস্ট্রিলিয়ান পুলিশের সঙ্গে কথা বলেছি আমি।
হাসি মুছে গেল ডাংম্যানের মুখ থেকে। অস্ট্রেলিয়া? জানলেন কি করে?
কিশোর, মাথা নেড়ে কিশোরকে বলতে ইঙ্গিত করলেন চীফ।

অন্ধকার থেকে উড়ে এসে ডাংম্যানের মাথায় বসল বড় একটা পাখি। কাকের সমান, মাছরাঙার মত লম্বা ঠোঁট, তেমনি খাটো লেজ, শরীরের তুলনায় মাথাটা অনেক বড়, ঝটকা দিয়ে দিয়ে নাড়ছে। বড়সড় মাছরাঙাই বলা যায়।
কি পাখি? অদ্ভুত পাখিটার দিকে তাকিয়ে আছে মুসা।
কেউ জবাবু দেয়ার আগেই ঠোঁট ফাঁক করে হেসে উঠল পাখিটা, বিকট অট্টহাসি ছড়িয়ে দিল পর্বতের কন্দরে কন্দরে।
এই তাহলে ভূতের হাসি! চেঁচিয়ে উঠল মুসা। হায় হায়, একটা পাখির ভয়ে কাবু হয়ে ছিলাম!
কুক্যাবুরা, মোটেই অবাক হয়নি কিশোর। অস্ট্রেলিয়ায় একে বলে লাফিং জ্যাকাস। চীফ, এই নামটাই মনে করতে পারছিলাম না।
একটা টর্চ নিয়ে বিশেষ অ্যাঙ্গেলে ডাংম্যান আর পাখিটার ওপর আলো ফেলল সে। ছায়া পড়ল গিয়ে পাহাড়ের চেয়ালে। বিচিত্র কুঁজো একটা ছায়া, মাথাটা ঝটকা দিয়ে দিয়ে নড়ে, লম্বা নাক। ওই যে আমাদের ভূতের ছায়া।
বুঝলাম, ডাংম্যান বলল, তুমিই আমার সর্বনাশ করেছ। এই পাখিটাও করেছে অনেকখানি। সরিয়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু এত বেশি ভক্ত হয়ে পড়েছে, সরতে চায় না, তাড়িয়ে দিলেও বার বার আসে।
খালি পাখিটার দোষ না, ডাংম্যান, চীফ বললেন, তোমার স্যাণ্ডউইচের মোড়কও দায়ী। আরও হুঁশিয়ার হওয়া উচিত ছিল তোমার।
হুঁ, ছেলেটাকে আণ্ডার এস্টিমেট করেই ভুল করেছি। যাক, যা হয়েছে হয়েছে, কিছু অন্তত পেয়েছি। তো, ছেলেগুলোকে চাই?
চেঁচিয়ে উঠলেন মিস্টার মিলফোর্ড, কি করেছ ওদের?
আর চালাকির চেষ্টা করো না, ডাংম্যান, কড়া গলায় বললেন চীফ। এমনিতেই বহুদিন জেল খাটতে হবে তোমাকে।
তা বোধহয় হবে না, কারণ, আমি চলে যাচ্ছি। পথ-খরচের ব্যবস্থা করেই রেখেছি, হেসে চোখ টিপল ডাংম্যান। ওই বস্তাটায় কিছু সোনা আছে। হোর্ডের তুলনায় খুবই সামান্য, কিন্তু তা-ই বা কম কি? ওগুলো নিয়েই আমি চলে যাব, আপনারা কিছু বলতে পারবেন না। তবে, আসামী যদি একান্তই চান, ল্যাঙলী আর রিগোকে রেখে দিতে পারেন।
শয়তান! ধোকাবাজ! চেঁচিয়ে উঠে বসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল ল্যাঙলী, কিন্তু দুজন পুলিশ ধরে ফেলল তাকে।
চুঁ-চুঁ, ল্যাঙলী, কি ছেলেমানুষী করছ? তিরস্কার করল ডাংম্যান। তোমাদের ভাগ দেব বলেছিলাম, মাল সব পেলে দিতামও। আমিই তো পেয়েছি এই এত্তোটুকুন। হ্যাঁ, চীফ, একটা প্রস্তাব দিতে চাই। আপনি আমাকে ওই সোনাগুলো আর এখান

থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেবেন, বিনিময়ে ছেলেরা কোথায় আছে আমি জানাব।
কঠিন কণ্ঠে ধমকে উঠলেন চীফ, ডাংম্যান!
ওসব ধমক-ধামকগুলো রাখুন এখন। কোন লাভ হবে না, হাসি হাসি ভঙ্গিটা চলে গেল ডাংম্যানের, কর্কশ হয়ে উঠল কণ্ঠস্বর। যা বলছি করুন, নইলে ছেলেগুলোকে জ্যান্ত পাবেন না। ওদের কাছে খাবার পানি কিচ্ছু নেই। আমাকে চলে যেতে দিন। ফোনে জানাব কোথায় আছে ওরা। তা নাহলে মরুক।
এতখানি করার সাহস পাবে না।
পাব, চীফ, পাব। আপনি আমাকে চেনেন না। খিকখিক করে হাসল ডাংম্যান। তার সঙ্গে গলা মেলানোর জন্যেই বুঝি বুনো হাসি হেসে উঠল মাথায় বসা পাখিটা।
অস্থির হয়ে উঠলেন মিস্টার মিলফোর্ড। ফ্লেচারকে কিছু বলার জন্যে এগোলেন, তার আগেই বলে উঠল কিশোর, চীফ, রাজি হবেন না। আমি বুঝে গেছি কোথায় আছে ওরা।
ঝট করে কিশোরের দিকে ফিরল ডাংম্যান।
কোথায়, কিশোর? জলদি বলো? তর সইছে না আর মিস্টার মিলফোর্ডের।
ওই যে ওখানে, টাওয়ারের মত খাড়া হয়ে থাকা পর্বত-চূড়া দেখাল সে। ম্যাগনাস ভারদির কথাগুলো ছিল : ইট ইজ ইন দা আই অভ দা স্কাই হোয়্যার নো ম্যান ক্যান ফাইও ইট। ম্যান কেন বলেছে সেটা তো বুঝলামই, বাকি থাকল আই অভ দা স্কাই। সূর্য কিংবা চাঁদের কথা বলেনি। সত্যি সত্যি চোখের মত দেখতে একটা জিনিসের কথা বলেছে। ওই দেখুন।
জ্যোৎস্নায় আলোকিত আকাশের পটভূমিতে বিরাট একটা মুখ দেখা গেল, মানুষের মুখের আদল, দুটো চোখ, নাক, মুখ-নিখুঁত মানুষ যেন। বিশাল এক পাথর, আবছা আলোয় ওরকম লাগছে।
বাঁ চোখটা দেখছেন? বলল কিশোর। বেশি কালো। মনে হচ্ছে সুড়ঙ্গমুখ। ওটার ভেতরেই রয়েছে চাম্যাশ হোর্ড। রবিন ওখানেই আছে।
তোমার ধারণা আমি উঠেছি ওখানে? ডাংম্যানের কথায় জোর নেই।
মাথা ঝাঁকাল কিশোর। ইনডিয়ান ছেলেদের সাহায্যে উঠেছ। অস্ট্রেলিয়ান পুলিশ জানিয়েছে, বড় বড় দালান বেয়ে উঠে চুরি করেছ তুমি। কাজেই পাহাড়েও উঠতে পেরেছ।
বেশ, ধরলাম আছে ওরা ওখানে। নামাবে কি করে?
জ্যাকোয়া আর জেরমি যাবে।
সঙ্গে সঙ্গে বলল জ্যাকোয়া, সি, সহজ। খুব সহজ।

একটা ছেলের কথা শুনবেন আপনারা? ফ্লেচারকে বলল ডাংম্যান। আগেই বলে দিচ্ছি, পরে আমাকে দুষতে পারবেন না। ওর অনুমান ভুল হলে আমাকে কিছু বলবেন না। পরে আমি কোন কথা শুনব না। যা করার বুঝেসুঝে করুন।
দ্বিধায় পড়ে গেলেন ফ্লেচার। চেয়ে আছেন মিস্টার মিলফোর্ডের দিকে, শোনার জন্যে অধীর।
আস্তে কাশি দিলেন মিস্টার মিলফোর্ড। কিশোরের ওপর ভরসা আছে আমার।
অল রাইট, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন চীফ। জ্যাকোয়া আর জেরমি যাবে। ছেলেদেরকে বেঁধে রেখেছে কিনা কে জানে। তাহলে কাউকে গিয়ে নেমে তুলে আনতে হবে ওদের, কিংবা বাঁধন কেটে দিয়ে আসতে হবে, যাতে ওরা নিজেরাই বেরিয়ে আসতে পারে। জ্যাকোয়া আর জেরমি ঢুকতে পারবে তো?
ওরা ঢুকতে না পারলে নিশ্চয় ডাংম্যানও পারেনি, কিশোর বলল। তারমানে, গুহার মুখে পাথর চাপা দিয়ে এসেছে। একটা ছেলেকে বাধ্য করেছে অন্য চারজনকে বাধতে, তারপর ওই ছেলেটাকেও বেধে ঠেলে ফেলে দিয়েছে ভেতরে। তার ওপর পাথর চাপা…খুব খারাপ লোক তুমি, ডাংম্যান!
ভেতরে ঢুকবে কে তাহলে? চীফের জিজ্ঞাসা।
আমি, এগিয়ে এল মুসা।
তুমি পারবে না, কিশোর বলল। তোমার শরীর না-ও ঢুকতে পারে। আমাকেই যেতে হবে।
দীর্ঘ একটা মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে দুজনের দিকে তাকিয়ে রইলেন চীফ। তোমরা, সত্যি, অমন ছেলে! ঠিক আছে, যাও।
ওঠার জন্যে তৈরি হলো দুই ইনডিয়ান। কিশোরকে পিঠে তুলে নিল জ্যাকোয়া। উঠতে শুরু কল দেয়াল বেয়ে।
নিচে, গিরিসঙ্কটের অন্ধকার মেঝেতে দাঁড়িয়ে ওপর দিকে চেয়ে আছে দর্শকরা। অনেক ওপরে উঠে গেছে তিনজন। কালো কয়েকটা পোকার মত লাগছে এখন।
উঠে যাচ্ছে দুই ইনডিয়ান। কিশোর সঙ্গে না থাকলে আরও তাড়াতাড়ি উঠতে পারত।
অবশেষে পৌঁছল ওরা বাঁ চোখটার কাছে।
থামল এক মুহূর্ত। তারপর হারিয়ে গেল অন্ধকারে।
পেরেছে! হাঁপ ছাড়লেন ফ্লেচার।
নামবে কি করে আবার, ভাবছি, বিড়বিড় করলেন মিস্টার মিলফোর্ড।
উঠতে যখন পেরেছে, নামতেও পারবে।
বাটির মত একটা গর্ত, তলায় বড় পাথর চাপা দেয়া। মোটা একটা লোহার দণ্ড পড়ে আছে পাথরটার কাছে, আর কিছু স্বর্ণ।

ওই ডাণ্ডা দিয়ে চাড় মেরে পাথর ফেলেছে ডাংম্যান, বলল কিশোর। জ্যাকোয়া, সরাতে হবে।
তিনজনে মিলে সরিয়ে ফেলল পাথরটা। ছোট কালো একটা গর্ত দেখা গেল, সরু সুড়ঙ্গের মুখ। ঠিকই আন্দাজ করেছে কিশোর, জ্যাকোয়া কিংবা জেরমি ঢুকতে পারবে না, মুসারও কষ্ট হত ঢুকতে। বেল্ট থেকে টর্চ খুলে ঢোকার জন্যে তৈরি হলো সে। নিজের এক পায়ে দড়ি বেঁধে নিয়ে অন্য প্রান্ত ধরতে বলল দুই ভাইকে। আমি তিনবার হ্যাঁচকা টান দিলে টেনে তুলবে আমাকে।
লম্বা হয়ে শুয়ে সুড়ঙ্গে মাথা ঢুকিয়ে দিল কিশোর। কল করে এগোল। খুবই সরু, এক জায়গায় এসে কিশোরও আটকে গেল। জোরাজুরি করে, বান মাছের মত শরীর মুচড়ে পেরোল সে জায়গাটা।
কয়েক ফুট পরে আরও সরু আরেকটা জায়গা, কাঁধ আটকে গেল কিশোরের। কিছুতেই ঢুকতে পারছে না। বাঁয়ে একটা নড়াচড়া টের পেয়ে টর্চ জ্বালল। আঁতকে উঠল, আরেক মুহূর্ত দেরি করলেই পাথরের রাড়ি খেয়ে ছাতু হয়ে যেত মাথা। রবিন!
সাড়া দাওনি কেন? হেসে হাত থেকে পাথরটা ফেলে দিল রবিন। এই একটু আগেও ছেলেগুলোকে বলছিলাম, তুমি আসবে।
আলো ফেলে দেখল কিশোর। আর দুই ফুট পেরোতে পারলেই গুহায় ঢুকতে পারত। টর্চ ঘোরাল সে। হাসিমুখে তার দিকে চেয়ে আছে বাদামী চামড়ার এক কিশোর, বয়েস রবিনের চেয়ে কম।
আলো আরও পিছে সরিয়ে দেখো, হেসে বলল রবিন।
ছোট্ট গুহার শেষ মাথায় আলো ফেলল কিশোর। কেঁপে উঠল হাত, আরেকটু হলেই টর্চ ছেড়ে দিয়েছিল হাত থেকে।
আরও তিনটে ছেলে বসে আছে। তাদের কাছেই রয়েছে গুপ্তধনের স্তুপ। সোনার ছোট-বড় ইঁট, নুড়ি, নানা রকম মোহর, অলঙ্কার, আর প্রায় সব ধরনের মূল্যবান পাথর। টর্চের আলোয় জ্বলছে রামধনুর সাত রঙ সৃষ্টি করে।
চাম্যাশ হোর্ড! বিড়বিড় করল কিশোর। সত্যি পাওয়া গেল তাহলে!
পরদিন বিকেলে। বিশাল ডেস্কের ওপাশ থেকে তিন গোয়েন্দার দিকে চেয়ে হাসলেন বিখ্যাত চিত্রপরিচালক ডেভিস ক্রিস্টোফার। চাশ্যাম হোর্ড তাহলে পেলে। দুশো বছর বোকা বানিয়ে রেখেছিল সবাইকে ম্যাগনাস ভারদি।
ইন দা আই অভ দা স্কাই হোয়্যার নো ম্যান ক্যান ফাইণ্ড ইট, কিশোর বলল, সত্যি কথাই বলেছে সে। কেউ বোঝেনি।
তোমরা বুঝেছ। আর ডাংম্যান। তবে তার লাভ হলো না কিছু।

লাভের মধ্যে জেল, হাসল রবিন। আমেরিকার জেল থেকে ছাড়া পেয়ে গিয়ে পড়বে অস্ট্রেলিয়ায়।
অপরাধীর ভবিষ্যৎ কোন সময়ই ভাল হয় না, শুকনো কণ্ঠে বললেন পরিচালক। তা-ও তো করে লোকে।
হ্যাঁ, স্যার, মুসা মাথা ঝাঁকাল। ডাংম্যানের মত ধড়িবাজ চোরও বাঁচতে পারল না। ম্যাগনাস ভারদির হোর্ড আর ধাধার কথা শুনেছে সে। কোথায় আছে খুঁজে বের করেছে। ইনডিয়ান হেড মাউনটেইনের চূড়ায় উঠে দেখল, সুড়ঙ্গের ভেতরে ঢুকতে পারছে না। তখন সোজা মেকসিকোতে ইয়াকুয়ালিদের গায়ে গিয়ে ফাঁকি দিয়ে তাদের চারটে ছেলেকে নিয়ে এল।
রবিন যোগ করল, সে স্বীকার করেছে, আমেরিকান ছেলেদের দিয়েও কাজটা করাতে পারত। অনেক আমেরিকান ছেলে আছে, পাহাড়ে চড়ায় ওস্তাদ, ইনডিয়ান হেড মাউনটেইনে উঠতে পারবে। কিন্তু ওরা গায়েব হলে হই-চই পড়বে, সতর্ক হয়ে যাবে পুলিশ, তাই গিয়ে দূর গাঁয়ের ইনডিয়ানদের ছেলে নিয়ে এসেছে।
কুটি করলেন বিখ্যাত পরিচালক। মনটা খুবই কালো। ওর শয়তানী থামিয়ে দিয়ে একটা কাজের কাজ করেছ তোমরা।
তবে ছেলেরা চুপ করে ছিল না, কিশোর বলল। নিউকা ইংরেজি বোঝে। ডাংম্যান তার দুই সহকারীর সঙ্গে আলাপ করছিল, সেটা শুনে ফেলেছিল নিউকা। বুঝেছে, তাদেরকে কেন নিয়ে আসা হয়েছে। অনেক কৌশলে কাগজ জোগাড় করে আঙুল কেটে রক্ত দিয়ে চিঠি লিখে ফেলে দিয়েছে ট্রাক থেকে। ভাগ্য ভাল ওদের, একজন পেয়েছিল চিঠিটা, ঠিকানা লেখা ছিল, পোস্ট করে দিয়েছে।
দা ফ্যাকটর অভ চান্স, বললেন পরিচালক। একে মেনে নিতেই হবে। অলৌকিক নয়, কিন্তু অনেক সময় এমন সব ব্যাপার ঘটে, অলৌকিক বলেই মনে হয়। এই যেমন ওই চিঠির ব্যাপারটা। ওটা তো পাওয়ারই কথা না কারও, অথচ পেল, পোস্টও করা হলো। জায়গামত গিয়ে পৌঁছল। নইলে ছেলেগুলো বাঁচত?
তা, ঠিকই বলেছেন, স্যার, একমত হলো কিশোর।
একটা জিনিস বুঝতে পারছি না, বললেন পরিচালক, গুপ্তধনগুলো আছে। জেনেও এত দেরি করল কেন ডাংম্যান?
তাড়াহুড়ো করে লোকের চোখে পড়তে চায়নি। অনেক ভেবেচিন্তে প্ল্যানপ্রোগ্রাম করে কাজে নেমেছে। টনি আর মিস পেদ্রোর ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়েছে, ওদের সাহায্য পেলে কাজ হাসিল করতে সহজ হবে ভেবেছে। মিস পেদ্রোর সাহায্য নেয়ার জন্যেই শুধু তার ওই ভেজিট্যারিয়ান লীগের ভাঁওতাবাজি। কিন্তু উল্টে গেল দাবার ছক। নিউকাই দিল সব গোলমাল করে। সোনার পুতুলের ভেতর মেসেজ ভরে ছুঁড়ে দিল দেয়ালের ওপর দিয়ে, আর ভাগ্যের এমনই ফের

ডাংম্যানের, ওটা এর্সে পড়ল দুই গোয়েন্দার হাতে। নইলে কে জানত এই খবর? এতক্ষণে হয়তো দক্ষিণ আমেরিকায় থাকত ডাংম্যান, দুনিয়ার টাকার কুমিরদের তালিকায় আরেকটা নাম যোগ হত, থামল সে।
কাহিনীর খেই ধরল মুসা, সেদিন বিকেলে কেবিন থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল নিউকা। এস্টেটের কাছে ঘুরঘুর করছিল, তার তিন জাতভাইকে নিয়ে পালানোর উপায় খুঁজছিল। লাইব্রেরির জানালায় উঁকি দিয়ে দেখল, একটা সোনার পুতুল হাতে নিয়ে দেখছে টনি। সোনা সহজে লোকের চোখে পড়বে, পথে পড়ে থাকতে দেখলে আকৃষ্ট হবে ভেবে পুতুলটা চুরি করেছে সে, মেসেজ ভরে ছুঁড়ে ফেলেছে।
এবং তার পর পরই আবার ধরা পড়েছে, রবিন বলল। তার চিৎকারই শুনেছি আমরা।
ওদের ভাগ্য ভাল, পুতুলটা তোমাদের হাতে পড়েছে, বললেন পরিচালক। আচ্ছা, পুতুলে যে মেসেজ লিখে ভরেছে, তাতে হোর্ডের কথা কিছু ছিল?
না, শুধু সাহায্যের আবেদন, বলল কিশোর। তবে পুতুলদুটো প্রমাণ করেছে, চাম্যাশ হোর্ড সত্যিই আছে। প্রথম পুতুলটা জ্যাকোয়া ছিনিয়ে নিয়েছে, তার কারণ, সে আশা করেছিল ওটা নিউকার কাছ থেকে এসেছে। দ্বিতীয় পুতুলটাই ভুল পথে নিয়েছে আমাকে, সেই সুযোগটা নিয়েছে ডাংম্যান। নানা রকম মিথ্যে বলে আমার চোখ সরিয়ে দিয়েছে অন্যদিকে।
ভুল পথে? ভুরু সামান্য তুললেন পরিচালক।
হ্যাঁ, স্যার। টনিকে অপরাধী ভেবেছি, সোনার পুতুলে যে মেসেজ ছিল সেটাকে গুপ্তধনের নির্দেশ ভেবেছি। সত্য থেকে দূরে সরে গিয়েছিলাম। এর জন্যেই সহজে আমাদের বোকা বানাতে পেরেছে ডাংম্যান।
আস্তে মাথা দোলালেন পরিচালক। হ্যাঁ, গোয়েন্দার জন্যে ভুলটা সাংঘাতিক। আচ্ছা, কুক্যাবুরা পাখির কথাটা মনে এল কি করে তোমার?
হাসল কিশোর। পাখির কথা ভাবিনি প্রথমে। মিস্টার ফ্লেচার এডগার অ্যালান পোর গল্পটার কথা তুলতেই মনে এল দুটো প্রাণীর কথা। তার একটা হায়েনা, কিন্তু। হায়েনার হাসি ওরকম নয়, ভূতুড়ে ছায়াটা যে-রকম করে হাসে। বাকি আরেকটা প্রাণীর নাম মনে করতে পারলাম না, তবে আবছা ভাবে মনে পড়ল ওগুলোর বাস অস্ট্রেলিয়ায়। সেজন্যেই অস্ট্রেলিয়ান পুলিশের কাছে ডাংম্যান আর টনির ব্যাপারে খোঁজ নিতে বলেছিলাম।
পোষা পাখিটাই শেষে কাল হলো ডাংম্যানের, হাসলেন পরিক। এক মুহূর্ত চুপ থেকে বললেন, চাম্যাশ হোর্ড কেমন দেখলে?
দারুণ, স্যার, বলল রবিন। আপনার জন্যে একটা স্যুভনির নিয়ে এসেছি। পকেট থেকে ছোট একটা সোনার নুড়ি বের করে টেবিলেন ওপর দিয়ে গড়িয়ে দি সে।

যেহেতু পেদ্রোজ এস্টেটে পাওয়া গেছে, মিস পেদ্রোই মালিক হয়েছে গুপধনের। সরকারী টোরির হিসসা দিয়ে যা বাকি থাকবে সব তার তিনিই এটা আপনাকে প্রেজেন্ট করেছেন। আপনার কথা বলেছিলাম।
আমার অসংখ্য ধন্যবাদ জানিও মহিলাকে। দেখি, চাম্যাশ হোর্ড দেখতে যাব একদিন। ইনডিয়ানদের খবর কি?
গায়ে ফিরে গেছে। অনেক সাহায্য করেছে ইয়াকুয়ালিরা, ধরতে গেলে ওদের জন্যেই পাওয়া গেছে গুপ্তধনগুলো, অনেক টাকা দিয়েছেন তাদেরকে মিস পেদ্রো।
মাথা ঝাকালেন পরিচালক। দারুণ একটা কেস, ছবি করা যাবে। মুখ তুললেন, চোখদুটো হাসছে। শেষ কিন্তু হলো না। একটা কাজ বাকি রয়েছে, সিনেমার ফিনিশিং।
বাকি? ভুরু কোঁচকাল মুসা।
বুঝলাম না, স্যার! কিশোর অবাক।
মুসা আর রবিনের দিকে চেয়ে চোখ নাচালেন পরিচালক। টেরিয়ার ডয়েল যে তোমাদের আটকে রেখে বিপদে ফেলল, তার কি করেছ?
তড়াক করে লাফিয়ে উঠল মুসা। ইয়াল্লা! ভুলেই গিয়েছিলাম, শার্টের হাত। গোটাতে শুরু করল সে। যেন এখানেই রয়েছে শুঁটকি টেরি।
ধীরে, বন্ধু, ধীরে, হাত ধরে টেনে মুসাকে চেয়ারে বসিয়ে দিল কিশোর আমি ভুলিনি। ওর জন্যে প্ল্যান একটা ঠিকই করে রেখেছি।
সামনে ঝুঁকলেন পরিচালক। ছোট্ট একটা কাশি দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আমাকে বলতে অসুবিধে আছে?
না না, হাসল কিশোর। খুলে বলল।
দারুণ হবে, সৌজন্যবোধ ভুলে গিয়ে টেবিলে চাপড় মেরে বসল মুসা, হাসিতে বিকশিত ঝকঝকে সাদা দাঁত।
রবিন হাসছে হা-হা করে।
মিস্টার ক্রিস্টোফারের মুখেও হাসি।

ভলিউম ৩ – মুক্তোশিকারী – তিন গোয়েন্দা – রকিব হাসান – সেবা প্রকাশনী

কোথাও ঢুকে একটা হ্যামবারগার খেয়ে নিলে কেমন হয়? প্রস্তাব দিল মুসা আমান।

গ্রীষ্মের ছুটি শুরু হয়েছে। ওদের প্রিয় সৈকতে সাঁতার কাটতে গিয়েছিল তিন গোয়েন্দা-কিশোর পাশা, মুসা আমান আর রবিন মিলফোর্ড। প্রায় সারাটা দিনই কাটিয়েছে সৈকতে। সাগর পাড়ের রাস্তা ধরে সাইকেলে করে রকি বীচে বাড়ি ফিরছে এখন। দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার উপকূলবর্তী ছোট্ট একটা শহর রকি বীচ, সান্তা মনিকা থেকে কয়েক মাইল দূরে।

গোয়েন্দা সহকারীর প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেল রবিন, সাইকেলের গতি বাড়িয়ে পাশাপাশি হলো মুসার।

যে কোন ব্যাপারে ঠাণ্ডা মাথায় ভালমত খতিয়ে দেখা স্বভাব প্রধান গোয়েন্দা কিশোর পাশার। সাইকেল চালিয়ে গরম হয়ে উঠেছে শরীর, সারা দিন সাঁতার কেটে ক্লান্ত। ভেবে দেখল, মুসার কথাটা মন্দ না। তারও খিদে পেয়েছে। সামনেই পথের পাশের পাহাড় চূড়ায় পুরানো স্ন্যাকস রেস্টুরেন্টটায় থেমে কিছু খেয়ে নিলে ভালই হয়, পেটও ঠাণ্ডা হবে, বিশ্রামও হবে।

কিন্তু হ্যাঁ বলল না কিশোর, আরও খতিয়ে ডাবল। এখন বাজে বিকেল তিনটে, নাস্তা করেছে সেই সকাল ছটায়। কিছু মুখে না দিয়ে বাড়ি ফিরলে–মেরিচাচী যদি শোনেন-এত বেলা পর্যন্ত কিছু খায়নি ওরা, বকা যে কি পরিমাণ দেবেনো, খেয়ে নেয়াই ভাল।

ঠিক আছে, চেঁচিয়ে সামনের দুই সঙ্গীকে বলল কিশোর সামনে থাম। ওশনসাইড রেস্তোরায় খাব।

এ-সময়ে ভিড় থাকে না, এক-দেড় ঘণ্টা আগেই দুপুরের খাওয়া খেয়ে চলে গেছে লোকে। রেস্তোরা প্রায় খালি। রাস্তার দিকে একটা জানালার পাশে বসল তিন গোয়েন্দা। পা লম্বা করে দিয়ে চেয়ারেই আধশোয়া হয়ে পড়ল মুসা। মেনু দেখায় মন দিল রবিন।

ঘরে যে কজন খদের আছে তাদেরকে দেখছে কিশোর। লোকের চেহারা দেখে তাদের স্বভাব অনুমান করা তার হবি। তাছাড়া সব জিনিসই খুব খুঁটিয়ে দেখে সে, কোথাও এতটুকু ফাক রাখতে চায় না।

একটা লোক বিশেষভাবে কিশোরের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। হালকা-পাতলা, ওদেশের মানুষের তুলনায় বেটেই বলা চলে, পাঁচ ফুট পাঁচের বেশি না। গাঢ় বাদামী সুট পরনে, সাদা শাট-গলার কাছে দুটো বোতাম খোলা, চোখা কালো জুতো, অবিশ্বাস্য রকমের বড় পায়ের পাতা। বুক পকেটে ভঁজ করে রাখা একটা

মুক্তোশিকার কাগজ, তার কয়েকটা শব্দ বেরিয়ে আছে, পড়া যায়, তা থেকেই বুঝল কিশোর, লোকটার ঘোড়দৌড়ের নেশা আছে, জুয়াড়ী।
কাউন্টারের সামনে এক কাপ কফি নিয়ে টুলে বসেছে লোকটা, খালি নড়ছে, উসখুস করছে, খানিক পর পরই মাথা বাড়য়ে জানালা দিয়ে উঁকি মারছে রাস্তার দিকে। বেশ বড়সড় টুলে বসেছে, পাশে রেখেছে- চার কোণা একটা বাক্স, একটু পর পরই ছুঁয়ে দেখছে বাক্সটা জায়গামত আছে কিনা। যেন কেউ নিয়ে যাবে ওটা। একটা জালি কাপড় দিয়ে মোড়া বাক্স, কাপড়ের জোড়াগুলো নিপুণভাবে টেপ দিয়ে আটকানো।
আরেকবার জানালার বাইরে লোকটা উঁকি দিতেই কিশোরও মাথা খানিকটা সরিয়ে চট করে দেখে নিল রাস্তায় কি দেখা যাচ্ছে। একই সঙ্গে চোখের কোণ দিয়ে লোকটার ওপরও নজর রেখেছে।
কই, তেমন কিছু তো না। প্রায় নিঃশব্দে চলে গেল কয়েকটা লিমোসিন। ওগুলোকে গুরুত্ব দিল না লোকটা। তারপর শোনা গেল মোটরের জোরাল গো গো, আরেকটা গাড়ি আসছে। টুল থেকে লাফিয়ে উঠে জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে রইল নোকটা, সতর্ক দৃষ্টি, কারও আসার অপেক্ষা করছে বুঝি। একটা ক্যাম্পার গাড়ি দেখা গেল। আবার এসে টুলে বসে পড়ল সে।
ভারি কোন গাড়ি-ভ্যান বা ট্রাক জাতীয় কিছুর অপেক্ষায় রয়েছে লোকটা-ডাকল কিশোর।
হ্যামবারগার নিয়ে এল ওয়েইটেল। নিজের প্লেট টেনে নিল কিশোর। বন রুটির ওপরের অংশ ছিড়ে আলাদা করে রেখে মাংসসহ বাকিটুকু তুলে নিয়ে কামড় বসাল।
অবাক কাণ্ড! চোখ টিপল লোকটা।হেসে তার জবাব দিল কিশোর।
ব্যাপারটাকে আমন্ত্রণ ধরে নিল লোকটা। চারকোণা বাক্সটা হাত নিয়ে এগিয়ে এল তিন গোয়েন্দার দিকে।
সাঁতার কাটতে গিয়েছিলে? সাধারণ একটা প্রশ্ন, লোকটার বলার পরনে বিশেষ অর্থবহ হয়ে উঠল। চোখও টিপল সেই সঙ্গে।
হ্যাঁ, হ্যামবারগারে মুখ বোঝাই মুসার, হাসতে পারছে না ঠিকমত। উইলস বীচে।
উইলস বীচ? মুসার কথার প্রতিধ্বনি করল যেন লোকটা। এজন্যেই এত খিদে পেয়েছে। চোখ টিপল।
এমনি একটা কথার কথা বলল লোকটা, তাতে হাসির কিছু নেই, কিন্তু হেসে ফেলল তিন গোয়েন্দা। কথার সঙ্গে চোখ টেপাটা বেশ মজার মনে হয়েছে ওদের কাছে।
লোকটাও হাসল।

বসি তোমাদের কাছে? চোখ টিপল লোকটা।
জানালার কাছে রে সরিয়ে নিল কিশোর, তার পাশের খালি চেয়ারে বসল লোকটা। বাক্সটা নামিয়ে রাখল মেঝেতে।
আমার নাম মেটার, অসকার স্লেটার, বলতে বলতেই ডান চোখ টিপল বেশ জোর দিয়ে।
নিজেদের নাম বলল তিন গোয়েন্দা।
পরিচিত হয়ে খুশি হলাম, স্বাভাবিক কথা, কিন্তু লোকটার চোখ টেপ অস্বাভাবিক করে তুলল কথাটা ভারি এঞ্জিনের শব্দ শোনা যেতেই লাফিয়ে উঠে জানালা দিয়ে উঁকি দিল একটা তেলের ট্রাক চলে গেল। আবার বসে পড়ল সে।
আমার নাম স্লেটার বটে, বলল সে, কিন্তু চোখ টিপি বলে সবাই ডাকে রিংকি। বলতে বলতেই আরেকবার চোখ টিপল।
এবার আর হাসি এল না ছেলেদের, খারাপ লাগছে লোকটার জন্যে। চোখ সে ইচ্ছে করে টেপে না, এটা তার মুদ্রাদোষ। চেষ্টা করেও ঠেকাতে পারে না।
এক সঙ্গে বসে চা খেলো ওরা। একটা দশ ডলারের বিল ওয়েইট্রেসের হাতে ধরিয়ে দিয়ে স্লেটার বলল, হ্যামবারগারের দামও রাখুন, চোখ টিপল। না না, মানা কোরো না। আমি তোমাদের খাওয়ালাম। বন্ধু ভাবতে আপত্তি আছে? চোখ টিপল।
কোমরে হাত রেখে দাঁড়িয়েছে ওয়েইট্রেস, স্লেটারের চোখ টেপার কি অর্থ করেছে কে জানে, রাগ দেখা গেল তার চোখে। কিছু বলতে গিয়েও বলল না। নোটটা নিয়ে গটমট করে হেঁটে চলে গেল। বিল রেখে ভাঙতি নিয়ে ফিরে এল।
মেহমানদারীর জন্যে সেটারকে ধন্যবাদ জানাল ছেলেরা।
পরের কয়েক মিনিটেও ভারি কোন এঞ্জিনের শব্দ শোনা গেল না। সেটার উত্তেজিত, কথা বলার পরিবেশ নয়। তাছাড়া কি বলবে? অর্ধেকটা রুটি রেখে দিয়েছিল বলে নিজেই নিজেকে ধন্যবাদ জানাল এখন কিশোর, চুপচাপ খাচ্ছে ওটা
কথা বলতে হচ্ছে না উসখুস করছে অন্যেরা।
অবশেষে কিশোরই সহজ করল পরিবেশ। জিজ্ঞেস করল, সান্তা মনিকায় থাকেন আপনি, না?
ঝট করে সোজা হয়ে গেল স্লেটার। হাত চলে গেল বাক্সের ওপর। পরের কয়েকটা সেকেণ্ড তার ডান চোখটা দ্রুত বার বার উঠল নামল। কি করে জানলে? শুকনো কণ্ঠ।
লোকটাকে চমক দিতে চায়নি কিশোর। হাসল। না না, তেমন কিছু ভেবে বলিনি। এটা আমার কাছে খেলা; এক ধরনের খেলা, বুঝিয়ে বলল সে। পার্কিং লটে

তিনটে গাড়ি দেখলাম। একটার সামনের সীটে একটা খেলনা ভালুক পড়ে আছে। ধরে নিলাম ওটা ওই মহিলার, ওই যে সলে একটা মেয়ে। আরেকটা গাড়ির ছাতে দেখলাম সাফবোর্ড বাধা। সুগঠিত স্বাস্থ্য, রোদে পোড়া বিবর্ণ চুল এক তরুণ কোক খাচ্ছে কাউন্টারের কাছে দাঁড়িয়ে, তাকে দেখিয়ে বলল গোয়েন্দা প্রধান, ওই গাড়িটা ওর। কি করে বুঝলাম? স্বাস্থ্য আর চুল দেখেছেন? সার্ফবোর্ড নিয়ে ঢেউয়ের ওপর দিয়ে ছুটে চলা ওকেই মানায়, না? স্লেটারের দিকে চেয়ে মাথা নাড়ল সে। বাকি থাকল আর একটা গাড়ি। সান্তা মনিকার নাম্বার প্লেট।
নীরবে কিশোরের দিকে চেয়ে আছে সেটার। চমৎকার খেলা। একেবারে গোয়েন্দাগিরি।
গোয়েন্দাই আমরা, কথাটা গোপন রাখার প্রয়োজন দেখল না কিশোর। এরা দুজন আমার সহকারী।
পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে স্লেটারের দিকে বাড়িয়ে ধরল সে।
বিড়বিড় করে পড়ল লোকটা, কিশোর পাশা, গোয়েন্দাপ্রধান...মুসা আমান, সহকারী গোয়েন্দা...রবিন মিলফোর্ড, নথি গবেষক।..., টেলিফোন নম্বরটাও পড়ল। পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডের নম্বর নয়, তিন গোয়েন্দার ব্যক্তিগত টেলিফোন নম্বর। নিজেদের রোজগার থেকে ওটার বিল দেয় ওরা।
আশ্চর্যবোধক চিহ্নগুলো কেন? জিজ্ঞেস করল স্লেটার।
অদ্ভুত সব রকম রহস্যের কিনারা করতে আমরা প্রস্তুত, বিশেষ বিশেষ সময়ে দুর্বোধ করে কথা বলা কিংবা কঠিন শব্দ ব্যবহার করা কিশোরের স্বভাব।
মাথা ঝাঁকাল স্লেটার। কি ভেবে কার্ডটা রেখে দিল পকেটে। খুব বেশি:... থেমে গেল সে।
কি বলতে চেয়েছিল-বেশি রহস্য, বেশি মক্কেল, না বেশি কেস-বোঝা গেল। লাফিয়ে উঠে গিয়ে দাঁড়িয়েছে জানালার কাছে। ভারি মোটরের গর্জন,কানে আসছে। শব্দের অসঙ্গতিই প্রকাশ করে দিচ্ছে, দোষ আছে এঞ্জিনে।
কিশোরও তাকিয়ে আছে জানালা দিয়ে। পাহাড়ী পথের মোড় ঘুরে গো গো করতে করতে আসছে একটা গাড়ি। ড্রাইভারকে জাপানী বলে মনে হলো।
স্লেটারের দিকে ফিরল কিশোর। কিন্তু আগের জায়গায় নেই...দরজার কাছে চলে গেছে। আরেক মুহূর্ত পরেই বেরিয়ে ছুটে যাবে পারকিং লটের দিকে।
সবার আগে লাফ দিয়ে উঠল মুসা। নিয়মিত ব্যায়াম করে, শরীরের ক্ষিপ্রতাও তাই অন্য দুজনের চেয়ে বেশি। মেঝেতে রাখা বাক্সটা থাবা দিয়ে তুলে দৌড় দিল লোকটার পেছনে। এই যে, শুনুন, চেঁচিয়ে ডাকল সে, আপনার বাক্স...।
থামল না স্লেটার।

পেছন পেছন দৌড়াল মুসা। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। গাড়িতে উঠে দরজা বন্ধ করছে স্লেটার। স্টার্ট নিয়ে শাঁ করে বেরিয়ে গেল দুই দরজার কালো সিডান গাড়িটা, হাইওয়েতে উঠেই স্পীড বাড়িয়ে দিল।
ফিরে এল মুসা। বাক্সটা নামিয়ে রাখল টেবিলের পাশে।
নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর, গভীর ভাবনায় মগ্ন। চিমটি কাটে কেন জিজ্ঞেস করেছে মুসা। কিশোরের জবাব, এতে নাকি তার একাগ্রতা আনতে সুবিধে হয়।
বাক্সটা ওয়েইট্রেসের কাছে রেখে যাব, রবিন বলল। রিংকি শিওর ফিরে আসবে। ওটা নিতে।
মুসাও তার কথায় সায় দিল।
কিন্তু কিশোর চুপ। চিমটি কেটেই চলেছে। সবুজ ভ্যান দেখে স্লেটারের অস্বাভাবিক উত্তেজনা কৌতূহলী করে তুলছে তাকে। তার সদা-সন্দিহান মন সব প্রশ্নের জবাব খোজে, জবাব না পাওয়া পর্যন্ত নিরস্ত হয় না।
আমি বলি কি, বাক্সটা হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যাওয়া যাক, অবশেষে মুখ খুলল কিশোর, তার ধারণা আরেকটা রোমাঞ্চকর জটিল রহস্যের সন্ধান মিলতে যাচ্ছে। যত্ন করে রেখে দেব। রংকি যোগাযোগ করবেই। ওর কাছে আমাদের ফোন নম্বর আছে। প্রতিবাদ করার জন্যে মুসা মুখ খুলতে যাচ্ছে দেখে তাড়াতাড়ি বলল, তাছাড়া ওয়েইট্রেসের কাছে বাক্সটা ফেলে যায়নি রিংকি, তাই না? আমাদের কাছে রেখে গেছে। আমাদের বিশ্বাস করেছে?
বিশ্বাস না ছাই, বাধা দিলই মুসা। ভুলে ফেলে গেছে। বলল বটে, কিন্তু জানে সে, কোন লাভ হবে না। একবার যখন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে কিশোর, বাক্সটা নিয়ে যাবেই।
আধ ঘণ্টা পর, হেডকোয়াটারে ফিরে এল তিন গোয়েন্দা।
পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে তিরিশ ফুট লম্বা একটা মোবাইল হোম ট্রেলারের ভেতরে ওদের হেডকোয়ার্টার। অনেক দিন আগে পুরানো মাল হিসেবে কিনে এনেছিলেন ওটা কিশোরের চাচা রাশেদ পাশা! এতই বাতিল, বিক্রি করতে। পারেননি। জঞ্জালের তলায় চাপা পড়ে গেছে এখন পুরোপুরি। ওটাকেই মেরামত করে ঠিকঠাক করে হেডকোয়ার্টার বানিয়েছে কিশোর, বেরোনো আর ঢোকার জন্যে কয়েকটা গোপন পথ আছে, জানে শুধু ওরাই।
ট্রেলারের ভেতরে সাজানো-গোছানো ছোট্ট একটা অফিস আছে, চেয়ারটেবিল-ফাইলিং কেবিনেট, সবই আছে তাতে। ডেস্কের ওপর রয়েছে টেলিফোন। ছোট একটা আধুনিক ল্যাবরেটরি, আর ফটোগ্রাফিক ডার্করুমও রয়েছে ট্রেলারে।

সাইকেলের ক্যারিয়ারে করে বাক্সটা এনেছে মুসা, অফিসে ঢুকে নামিয়ে রাখা ডেস্কের ওপর। নিয়ে তো এলাম অন্যের জিনিস, খুশি হতে পারছে না সে। কি করবে এখন? খুলে দেখবে?

ডেস্কের ওপাশে তার সুইভেল চেয়ারে বসেছে কিশোর। মাথা নাড়ল। সেটা বোধহয় উচিত হবে না... থেমে গেল। কুঁচকে গেছে ভুরু। কাত হয়ে কান ঠেকাল অয়েলপেপারে মোড়া বাক্সটার গায়ে।

শুনতে পাচ্ছে তিনজনেই। বাক্সের ভেতর মৃদু ফড়ফড় শব্দ। জীবন্ত কিছু একটা রয়েছে।

খাইছে! বলে উঠল মুসা। আর ফেলে রাখা গেল না। খুলতেই হচ্ছে।

জন্তু-জানোয়ারের ভক্ত মুসা। আগে প্রায়ই রাস্তা থেকে ভবঘুরে কুকুর-বেড়াল ধরে নিয়ে আসত পোষার জন্যে। একদিন তো কোথা জানি একটা রোমওঠা, রোগা, বেতো গাধাই ধরে নিয়ে এসেছিল। মুসার মা তার ঠিক উল্টো, দুচোখে দেখতে পারে না জন্তু-জানোয়ার। কুকুর বেড়াল পর্যন্ত সহ্য করেছেন তিনি, কিন্তু গাধাটাকে আঁটাপেটা করে তাড়িয়েছেন, দু-এক ঘা মুসার পিঠেও পড়েছে। এখন বাক্সের ভেতরে নড়াচড়া শুনে তার পুরানো ভালবাসা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল, হয়তো পোষার মত কিছু পাওয়া যাবে, এমন কিছু যাতে মা আপত্তি করবেন না।

ফড়াত করে এক টানে বাক্সের কোণের চীজকুথ ছিড়ে ফেলল মুসা। খানিকটা তারের জাল দেখা গেল! পুরো কাগজটাই ছাড়িয়ে নিল সে। জালের খাঁচার ভেতরে একটা কবুতর।

খুব সুন্দর একটা পাখি। ফুলে থাকা পালক, হাত পাখার মত ছড়ানো লেজ। গাঢ় ধূসর পালকগুলো এত চকচকে, আলাদা একটা উজ্জ্বল বেগুনী আভা ছড়াচ্ছে।

কিশোরই প্রথম লক্ষ করল খুঁতটা, পাখিটার একটা আঙুল নেই। ডান পায়ে তিনটেই আছে, কিন্তু বাঁ পায়ে দুটো।

এত ছোট খাঁচায় রাখা যাবে না, বলল মুসা। যদি রাখতেই হয়, রেখেই দিই কি বলো? হ্যাঁ, তাহলে বড় আরেকটা খাঁচা বানিয়ে নিতে হবে।

হ্যাঁ, একমত হলো কিশোর। চার বাই দুই ফুট ছ-টা জাল লাগবে। কিছু তার কাটা, একটা হাতুরি। তক্তা লাগবে কয়েকটা।

ইয়ার্ডেই পাওয়া গেল সব। পুরানো মালের ডিপো, এসব জিনিসের অভাব নেই। তিন গোয়েন্দার ব্যক্তিগত ওয়ার্কশপে কাজ চলল। কবুতরটার জন্যে আরামদায়ক শক্ত একটা খাঁচা বানিয়ে ফেলল ওরা দেখতে দেখতে।

অফিস থেকে পাখিটাকে নিয়ে এল মুসা। একটা প্লাসটিকের বাকেটে কিছু গমের দানা রেখে খাঁচার ভেতরে ঠেলে দিল কিশোর। পানির বন্দোবস্ত করল রবিন।

ছোট খাঁচা থেকে বের করে বড় খাঁচায় কবুতরটাকে ঢুকিয়ে দিল মুসা। যাও, আরাম করে থাকো।
বেশ সুখী মনে হলো পাখিটাকে। গমের দানা করে খেলো কিছুক্ষণ, পানিতে ঠোঁট ডুবিয়ে ঝটকা দিয়ে ওপরের দিকে তুলে তুলে পানি খেতে লাগল। বার দুই বাগবাকুম করে খাঁচার কোণায় গিয়ে পাখার ভেতরে মাথা ঢুকিয়ে বসে পড়ল। তার জন্যে দিন শেষ, ঘুমানোর সময়।
পাখিটাকে ওয়ার্কশপেই রেখে আঙিনায় বেরিয়ে এল ওরা। সাইকেল নিয়ে যার যার বাড়ি রওনা হলো মুসা আর রবিন, কিশোর চলে গেল তার ঘরের দিকে।
পরদিন খুব সকালে ঘুম থেকে উঠল কিশোর। হাতমুখ ধুয়ে কাপড় পরে চলে এল ওয়ার্কশপে।
দানা খাচ্ছে কবুতরটা, বেসাবে মনে হয়, রাতে কোন অসুকেধি হয়নি।
বসে পড়ে খাঁচার তারে নাক ঠেকাল কিশোর। দেখতে দেখতে বলল, কোথা থেকে এসেছ? ওই বাক্সে ভরে রেখেছিল কেন তোমাকে রিংকি? এত নার্ভাস দেখাচ্ছিল কেন তাকে?
কবুতরটাকে ঘিরে কোন একটা ঘোর রহস্য রয়েছে। কি, সেটা ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ করে ব্যাপারটা চোখে পড়ল কিশোরের। রহস্যটা আরও ঘনীভূত হলো।
পাখিটার দুই পায়েই এখন তিনটে করে আঙুল।
ওটা বেলজিয়ান রেসিং হোমার, বলল রবিন। মানে, ওই দুটোই।
নতুন কবুতরটা দেখার পরই গিয়ে দুই সহকারীকে ফোন করেছে কিশোর। কিন্তু নানা কাজের ঝামেলায় লাঞ্চের পরে ছাড়া আলোচনায় বসতে পারল না ওরা।
রকি বীচ পাবলিক লাইব্রেরিতে পার্ট টাইম চাকরি করে রবিন, সকালে ওখানেই গিয়েছিল। ছুটির পর একটা বই খুঁজে বের করে নিয়ে এসেছে। বই খুলে বেলজিয়ান রেসিং হোমারের রঙিন একটা ছবি দেখাল সে।
ছবিটা দেখল কিশোর। তার সামনে ডেস্কের ওপরই রয়েছে ছোট খাঁচায় ভরা নতুন কবুতরটা, ওটার সঙ্গে ছবি মিলিয়ে দেখল।
ঠিকই বলেছ, মাথা দোলাল সে। দুটো পাখিই দেখতে অবিকল এক। শুধু যেটা হারিয়েছে, সেটার এক পায়ে আঙুল ছিল দুটো। দুটোই রেসিং হোমার, বইটা রবিনের দিকে ঠেলে দিল কিশোর।
খাঁচার ফাক দিয়ে আঙুল ঢুকিয়ে দিল মুসা, পাখিটার পালকে আঙুল বোলাল।
ব্যাপারটা পছন্দ হলো কবুতরের, ঘাড় কাত করে উজ্জ্বল চোখে তাকাল সে, সহকারী গোয়েন্দার দিকে।
এখানে প্রায়ই ওরকম ঘটে, কিশোরের দিকে তাকাল মুসা। খেয়াল করোনি? সৈকতের আশেপাশে অনেক বুনো পায়রা দেখেছি, দু-একটা করে আঙুল খোয়া

গেছে।
আনমনে মাথা নোয়াল গোয়েন্দাপ্রধান। খেয়াল করেছে কি করেনি বোঝা গেল না এই ভঙ্গি থেকে। ইঁদুর ধরার কল দিয়ে পাখি ধরতে চেষ্টা করে হয়তো লোকে, বেচারা পায়রাগুলোর আঙুল কাটে। রবিনের দিকে তাকাল সে। কিন্তু এগুলোর নাম বেলজিয়ান হোমার হলো কেন?
কবুতরের বই থেকে মুখ তুলল রবিন। ওরা খুব ভাল উড়তে পারে। জন্মায়ই যেন ওড়ার জন্যে, রেসের ঘোড়া যেমন দৌড়ানোর জন্যে জন্মায়। ঘোড়া। বিশেষজ্ঞের মত কবুতর বিশেষজ্ঞও আছে, শত শত পাখির মধ্যে থেকেও আসল পাখিটা ঠিক চিনে বের করে ফেলে। বইয়ের একটা বিশেষ পাতা ঝুড়িতে কিংবা খাঁচায় ভরে-অনেক সময় খাঁচার চারদিকে ঢেকে নিয়ে যায় ওদেরকে লোকে। পাঁচ-ছয় শো মাইল দূরে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেয়, পথ চিনে ঠিক বাড়ি ফিরে আসে। পাখিগুলো। ঘণ্টায় ষাট মাইল গতিতে উড়তে পারে, একটাও পথ হারায় না।
আবার বইয়ের দিকে তাকাল সে। বেলজিয়ামের জাতীয় খেলা এই কবুতর ওড়ানো। একবার করেছিল কি, একটা রেসিং হোমারকে ঢাকনাওয়ালা ঝুড়িতে ভরে জাহাজের অন্ধকার খোলে করে ইন্দো চায়নায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সাত হাজার মাইল পেরিয়ে, চব্বিশ দিন পর দেশে ফিরে এসেছিল ওটা, বেলজিয়ামে। পুরাটাই তার জন্যে অচেনা পথ ছিল।
হুঁ, বিড় বিড় করল কিশোর।
দেখি, বইটা নিয়ে মিনিটখানেক পড়ল মুসা। চেঁচিয়ে উঠল, খাইছে, খবর আনা-নেয়ার কাজও দেখছি করে কবুতর। জানতাম না তো। ঐতিহাসিক ব্যাপারস্যাপার। গল জয় করার সময় সীজার কবুতর ব্যবহার করেছিলেন। আমেরিকান আর্মি বহু বছর ধরে কবুতর কাজে লাগিয়েছে। এই তো কিছুদিন আগে, কোরিয়ার যুদ্ধেও নাকি কবুতর ব্যবহার হয়েছিল। কাণ্ড! নিয়মিত কবুতর ডাক বিভাগ নাকি ছিল লস অ্যাঞ্জেলেস আর ক্যাটালিনা দ্বীপের মাঝে। কিশোর, তুমি জানো এসব?
জবাব দিল না কিশোর। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে। খানিকক্ষণ পর বলল, প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে, কিভাবে? এবং কেন?
বই বলছে, কেউই সঠিক জানে না, কিভাবে পথ চিনে বাড়ি ফেরে ওরা, মুসার হাত থেকে বইটা নিল রবিন। ব্যাপারটা নিয়ে কর্নেল ইউনিভার্সিটিতে অনেক গবেষণা হয়েছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা, বায়ুমণ্ডলের চাপের ওপর নির্ভর করে কবুতর।
বাতাসের চাপের তারতম্য নিখুঁতভাবে বুঝতে পারে, আর শ্রবণশক্তিও অত্যন্ত প্রখর ওদের। তবে এ-সবই অনুমান। এই যে, এখানে একজন প্রফেসর বলেছেন :

পায়রা পথ চিনে কিভাবে বাড়ি ফেরে জানতে হলে ঠিক ওদের মতই হতে হবে আমাদের, ওদের মত অনুভব করতে হবে, ওদের মত করে ভাবতে হবে।
বন্দি থাকতে পাখিটার কেমন লাগছে, কি ভাবছে এখন, অনুমানের চেষ্টা করল রবিন।
মাথা নাড়ল কিশোর। কিভাবে ওরা বাড়ি ফেরে আমি জানতে চাইনি। আমার প্রশ্ন, এই পাখিটা কি করে খাঁচায় এল, আর দু-আঙুলেটাই বা গেল কোথায়? রাতের বেলা এই বদলটা কে করেছে? কি করে জানল, দু-আঙুলেটা কোথায় আছে? আর কেনই বা এই কাজ করল সে?
আমার দিকে চেও না, হাত নাড়ল মুসা, কিছু বলতে পারব না। টোকা দিয়ে পায়রাটাকে আবার আদর করল সে। মৃদু বাগবাকুম করে পালক ফুলিয়ে তার আদরের জবাব দিল পাখিটা, মনিব আদর করলে কুকুর আর বেড়াল যেমন করে অনেকটা তেমনি। একটা নাম দেয়া দরকার। কি রাখা যায়, বলত? টম?
এক নম্বর, মুসার কথা যেন শুনতেই পায়নি কিশোর, রিংকি নিজেই পাখিটাকে সরিয়েছে। আমাদের কার্ড আছে ওর কাছে। রকি বীচে আমরা পরিচিত। যে কাউকে জিজ্ঞেস করলেই দেখিয়ে দেবে কিশোর পাশা কোথায় থাকে।
হ্যাঁ, তা দেবে,মুসা মাথা দোলাল।
নাম্বার টু, কথা অব্যাহত রাখল কিশোর, রিংকি যাকে অনুসরণ করেছে, সেই সবুজ ভ্যানওয়ালাও এ-কাজ করতে পারে। পথের মোড়ে গাড়ি রেখে ঘাপটি মেরে ছিল, মুসার সাইকেলে বাক্সটা দেখে পিছু নিয়ে আমাদের জায়গা চিনে গেছে। তবে এটা ঠিক মেনে নেয়া যায় না। সাইকেলের পেছনে এলে দেখতে পেতাম। তবুও, গভীর হয়ে তাকাল পাখিটার দিকে, যেন সব দোষ ওটার। রিংকি আর তার সবুজ গাড়িটার দিকে, যেন সব দোষ ওটার। রিংকি আর তার সবুজ গাড়িঅলা সঙ্গীর সম্পর্কেও কিছু জানি না আমরা। রিংকির ঠিকানা জানি না, শুধু জানি, সান্তা। মনিকায় কোথায় থাকে। গাড়ির নাম্বার প্লেটে এমও কে লেখা দেখেছি, এত তাড়াতাড়ি গাড়ি ঘুরিয়ে চলে গেল, নম্বরটা পড়তে পারিনি। সবুজ ভ্যানের প্লেটে কাদা লেগে ছিল, পড়া যাচ্ছিল না। কোন সূত্র নেই আমাদের হাতে, একটা ব্যাপার বাদে।
কী? আগ্রহে সামনে ঝুঁকল মুসা।
পায়রা। সাধারণ কবুতর নয়। খুব সাবধানে যত্ন করে বড় করা, নিখুঁত টেনিং দেয়া রেসিং হোমার। রেসের ঘোড়ার মত এসব নিয়ে যেসব লোক মাথা ঘামায় তাদের একজন আরেকজনকে চেনার কথা। সম্ভাবনাটা খুবই জোরাল। নিশ্চয় কোন ক্লাব বা সংগঠন রয়েছে যেখানে মিলিত হয় ওরা, বলতে বলতেই হাত বাড়িয়ে

টেলিফোন গাইড টেনে নিল। ওই কবুতর পোষে কিংবা ট্রেনিং দেয় এমন কারও খোঁজ পেলে পাখিটা দেখানোও যাবে। চেনে কিনা জানা যাবে...।
পাখি পাখি করছ কেন? প্রতিবাদ করল মুসা। নাম বললেই হয়। টম নামটা মন্দ কি?
হয়তো বলতে পারবে কে এটার মালিক! হলদে রঙের পাতাগুলো দ্রুত উল্টে চলল কিশোর, সেই সঙ্গে বিড় বিড় করে গেল, পি ফর পিজিয়ন...এ ফর অ্যাসোসিয়েশন...সি ফর ক্লাব। তারপর প্রায় মিনিটখানেক নীরব রইল মুখ, আঙুলগুলো কাজ করেই গেল, তীক্ষ্ণ চোখে পরীক্ষা করল পাতার পর পাতা। অবশেষে হতাশ কণ্ঠে বলল, নাহ্ কিচ্ছু নেই। শুধু পি ফর পেট শপ, পোষা পশুপাখির দোকান, শেষ তিনটে শব্দ বাংলায় বলল।
কিংবা মিস কারমাইকেল, রবিন যোগ করল।
গাইড থেকে চোখ তুলল কিশোর। এই মিস কারমাইকেলটা কে?
প্রায়ই আমাদের লাইব্রেরিতে আসেন। বই যা নেন, সব পাখি সম্পর্কে লেখা! পাখি বলতে পাগনা! একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম। বললেন, একটা পাখিসংগঠনের প্রেসিডেন্ট তিনি।
গাইড বুকটা বন্ধ করে কেবিনেটে রেখে দিল কিশোর। তাহলে তাকে গিয়ে ধরতে হয়। কবুতর বিশেষজ্ঞ কেউ আছে কিনা হয়তো তিনি জানবেন। মহিলার ঠিকানা জানো?
না, গাল চুলকাল রবিন। তবে রকি বীচেই থাকেন, নইলে এখানকার লাইব্রেরিতে আসতেন না। পুরো নামটা অবশ্য জানি, লাইব্রেরি কার্ডে দেখেছি। কোরিন কারমাইকেল।
নামটা গাইড বুকে সহজেই খুঁজে পেল কিশোর। হ্যাঁ, রকি বীচেই থাকেন মহিলা, মহিল দুয়েক দূরে, অ্যালটো ড্রাইভে।
সাইকেল নিয়েই যেতে পারি, মুসা বলল। কিন্তু টমকে কি করব?।
কি টম টম করছ? বলল কিশোর। কবুতরের আর কোন নাম খুঁজে পেলে না।
কেন মন্দ কি? মানুষের নাম টম, কুকুর-বেড়াল-ছাগল-শুয়োর-ঘোড়া সব কিছুর নামই যদি টম হতে পারে, কবুতরের বেলায় অসুবিধে কি?
হুঁ, মুসার অকাট্য যুক্তির পর আর তর্ক করল না কিশোর। কিন্তু কবুতরটাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আপত্তি জানাল।
কোথায় রেখে যাব তাহলে? বলল মুসা।
এখানেই...
খুব কষ্ট পাবে। তারচে বাইরের বড় খাঁচাটায়...
না, মাথা নাড়ল কিশোর, চুরির ভয় আছে। গত রাতের কথা ভুলে গেছ?

তাহলে নিয়ে যাওয়াই ভাল।
আমারও তাই মনে হয়, মুসার পক্ষ নিল রবিন। নইলে ফিরে এসে হয়তো দেখব তিন আঙুলের জায়গায় চার আঙুলওলা আরেকটা পায়রা বসে আছে।
ভোটে হেরে যাচ্ছে কিশোর, কি ভেবে রাজি হয়ে গেল সঙ্গে নিতে।
দুই সুড়ঙ্গের মুখের ঢাকনা সরিয়ে খাঁচাটা নিয়ে নামল মুসা। তার পেছনে রবিন।
নামার জন্যে এগিয়েও থমকে গেল কিশোর, কুটি করে ফিরল। ডেস্কের কাছে এসে তার নতুন আবিষ্কার ফোন-এলে-জবাব-দেয়ার মেশিনটার সুইচ অন করে দিল। তারপর এসে নামল দুই সুড়ঙ্গে।
রকি বীচের পূর্ব প্রান্তে অ্যালটো ডাইভ। ধনী মানুষের পাড়া। অনেক জায়গা নিয়ে বিশাল সব বাড়ি। রাস্তার ধারে গেট, গেটের পরে একরের পর একর জুড়ে বাগান, লন আর গাছপালার পরে রয়েছে বাড়িগুলো, কোনটা আংশিক চোখে পড়ে, কোনটা গাছের জঙ্গলের ওপাশে একেবারেই অদৃশ্য।
লোহার মস্ত এক সদর দরজার সামনে সাইকেল থেকে নামল তিন গোয়েন্দা। গেটের পাশে কংক্রিটের থামে বসানো শ্বেত পাথরের ডিম্বাকৃতি ফলক, তাতে কুচকুচে কালো হরফে লেখা রয়েছে : মিউজিক নেস্ট।
এটাই, বলল কিশোর।
আরেক পাশের থামে খোপ কেটে তাতে ইনটারকম সিসটেম বসান হয়েছে। সুইচ টিপে যন্ত্রটার সামনে দাঁড়াল কিশোর জবাব দেয়ার জন্যে। কিছুই শোনা গেল না। আবার সুইচ টিপে যন্ত্রটায় কান ঠেকাল সে।
জবাব এলেও কথা বোঝা যাবে কিনা সন্দেহ। মিউজিক নেস্টের আশেপাশে অনেকখানি জায়গা জুড়ে যে হারে কলরব আর হই চই। চেঁচিয়ে কথা বলেও একে। অন্যের কথা ঠিকমত শুনতে পাবে না।
অবস্থা অনেকটা বড় সড় ইলেকট্রনিক মার্কেটের মত। পুরো ভলিয়ুমে বাজানো রেডিও আর টেপরেকর্ডারের মিউজিকের শব্দে ওখানে যেমন টেকা দায়, এখানেও তেমনি অবস্থা। তফাত শুধু মার্কেটে মানুষের কণ্ঠ আর নানারকম বাদ্যযন্ত্রের বাজনা, এখানে পাখির কলরব। শিস, কিচির-মিচির, তীক্ষ একঘেয়ে চিৎকার, কা-কা, সব মিলিয়ে সে এক এলাহি কাণ্ড।
আবার সুইচ টিপল কিশোর। জবাবে কিছু একটা শোনাও গেল, কিন্তু বোঝ গেল না। আর ঠিক সেই মুহূর্ত কর্কশ ডাক ছেড়ে আকাশে উড়ল একঝাক টিয়ে।
ইনটারকমের কাছ থেকে সরে এল কিশোর, বিরক্ত চোখে তাকাল গাছপালার মাথার ওপরে উড়ন্ত পাখিগুলোর দিকে। গাছের ডালে অসংখ্য কাকাতুয়া, উজ্জ্বল লাল, হলুদ আর নীলের মাঝে গাছের ঘন সবুজ পাতাও ফেকাসে

দেখাচ্ছে। টিয়েগুলোর সঙ্গে পাল্লা দিয়েই যেন কণ্ঠস্বর আরও উঁচু পর্দায় তুলে দিল কাকাতুয়ার। দল।
পাখি! চেঁচিয়ে বলল মুসা। পুরো এলাকাটা পাখিতে… শেষ শব্দটা বোঝা গেল না, টিয়েগুলো সমস্বরে আবার চেঁচিয়ে উঠেছে।
ভরা, মুসার চেয়েও জোরে বলল কিশোর। শুধু কাকাতুয়া আর টিয়েই নয়, স্টারলিং, ক্যানারি, লার্ক, চড়ুই, কাক, চিল, শকুন, বাজ, দোয়েল, বুলবুল, কোন পাখিরই অভাব নেই এখানে। ডালে বসে চেঁচাচ্ছে কেউ, কেউ লাফালাফি করছে, কেউ এক ডাল থেকে আরেক ডালে উড়ে যাচ্ছে ফুরুত করে, কেউ বা আবার মহা গভীর হয়ে বসে রয়েছে চুপচাপ।
বাড়ির ভেতরে ঢোকার পথ খুঁজল কিশোর। গেটের পাল্লায় শুধু খিল লাগানো, তালা-টালা নেই। শিকের ফাক দিয়ে হাত ঢুকিয়ে খিল তুলে ফেলল। পাহারাদার কেউ আছে কিনা তাকিয়ে দেখল এপাশ-ওপাশ। নির্জন সাইলে নিয়ে ঢুকে পড়ল সে ভেতরে।
অন্য দুজনও ঢুকল। পান্না ঠেলে লাগিয়ে আবার জায়গা মত খিলটা তুলে দিল মুসা। এবার কি? কিশোরের কানে মুখ ঠেকিয়ে জিজ্ঞেস করল।
গাছপালার ভেতরে দিয়ে একেবেঁকে যাওয়া গাড়িচলা পথটা দেখাল কিশোর, সাইকেল চালিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত করল।
এগিয়ে চলেছে তিন গোয়েন্দা। কলরং সামান্যতম নি, বরং বাড়ছে বলে মনে হলো ওদের। ওই প্রচণ্ড শব্দ বেশিক্ষণ আর সইতে পারত . বিন, হ্যাণ্ডেল ছেড়ে দিয়ে দু-হাতে কান ঢাকল, শুধু পা আর কোমরের সাহায্যে ব্যালান্স করে সাইকেল চালাচ্ছে।
আগে আগে ছিল কিশোর, হঠাৎ থেমে গেল। গাছগাছালি আর পঙ্গপালের মত পাখির ঝাকের ফাঁক-ফোকর দিয়ে একটা বিশাল বাড়ির খানিকট চোখে পড়ছে। কিন্তু বাড়ি দেখে থমকায়নি সে, অন্য কারণ
পাখির কলকাকলী ভেদ করে কানে আসছে আরেকটা কণ্ঠ, মহিলা কণ্ঠের গান, তীক্ষ্ণ, উঁচু পর্দা, কিন্তু শুনতে খারাপ লাগে না। নরম গলায় গাইলে আর এত
সব কোলাহল না থাকলে বেশ মিষ্টিই শোনাবে।
আরেকটু আগে বাড়ল ওরা।
আবার গান গাইল মহিলা, কথাগুলো বোঝা গেল এবার : তিনটে ছেলে ড্রাইভওয়েতে, কি চাই ওদের, কি চাই।
সুরটা পরিচিত মনে হলো রবিনের। ও, মনে পড়েছে দি ব্যাট হাইম অভ দা রিপাবলিক।

আসছে ওরা আরও কাছে, গেয়েই চলেছেন মহিলা, আসছে ওরা আসছে গো। ভয় পেয়ো না মিষ্টি পাখি, ভয় পেয়ো না লক্ষ্মীরা! হয়তো ওরা কোনই ক্ষতি করবে নাকো তোমাদের।
সাইকেল থেকে নেমে হ্যাণ্ডেল ধরে ঠেলে নিয়ে চলল তিন কিশোর।
গাছের জঙ্গল আর বাড়ির মাঝের ছড়ানো লনে দাঁড়িয়ে আছেন মাঝবয়েসী মহিলা। সাধারণের চেয়ে বেশিই লম্বা! গরমকালের ঢেলা হালকা পোশক পরনে। মাথায় নরম হ্যাট, চওড়া কানা। গোলগাল বেশ সুন্দর চেহারা।
তার কাঁধে বসে আছে একটা তোতা, হ্যাটের চঁদিতে শুয়ে ঝিমাচ্ছে একটা ক্যানারি। আর ঠিক মাথার ওপরে শূন্যে ফড়ফড় করে ডানা ঝাপটাচ্ছে একটা বাজ, বসার সুবিধেমত জায়গা খুঁজছে।
কথা কিছু থাকলে বলার, বলে শুনি গান গেয়ে, তিন গোয়েন্দা একেবারে কাছে চলে এল বললেন মহিলা। দরাজ গলায় গাইবে গান, নইলে কানে ঢুকবে না, কিছুই কানে ঢুকবে না।
পাগলের পাল্লায় পড়েছে, কোন সন্দেহ নেই মুসার, জরুরী অবস্থায় পালানোর জন্যে তৈরি হয়ে রইল। রবিন,চুপ। বার বার তাকাচ্ছে কিশোরের দিকে।
কিশোর বুঝল, জবাব তাকেই দিতে হবে। খুব ভাল অভিনেতা সে, শিশুকালেই টেলিভিশনে অভিনয় করে অনেক সুনাম-কুড়িয়েছে, কিন্তু গানের ব্যাপারে সে আনাড়ি। কখনও গলা সেধে দেখেনি। এমনকি বাথরুমেও কখনও গুনগুন করেছে কিনা মনে পড়ে না। সমস্যায় পড়ে গেল। মনে মনে গুছিয়ে নিল শব্দগুলো কবিতার মত করে, তারপর হেঁড়ে গলায় গান ধরল? মিস কোরিনকে খুঁজি মোরা, পাখির যিনি বিশারদ; আপনি কি সেই...আপনি কি সেই...ইয়ে মানে... ইয়ে-তাল ছন্দ কথা সব হারিয়ে তোলাতে শুরু করল গোয়েন্দাপ্রধান।
হা-হা করে হেসে উঠেই রবিনের কনুইয়ের তো খেয়ে আঁউক করে থেমে গেল মুসা। বোধহয় শুনতে পাননি মহিলা, তাই ফিরে তাকালেন না। কিশোরের, কথার জবাব দিলেন আমিই সেই মিস কোরিন, খুঁজছ যাকে তোমরা।
আবার কিশোরের পালা। কেশে গলা পরিষ্কার করে নিল সে, অসহায় ভঙ্গিতে তাকাল মিস কারমাইকেলের দিকে। সুর করে বলল, অনুপ্রবেশ করেছি বলে আমরা সবাই দুঃখিত। দি ব্যাটল হাইম অভ দ্য রিপাবলিক ঠিক রাখতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে সে। কিন্তু কোন ছিল না উপায়... থেমে গেল সে। না, কথা আটকে যায়নি, তার প্রতি মনোযোগ হারিয়েছেন মহিলা, চেয়ে রয়েছেন মুসার হাতের খাঁচাটার দিকে।
হাসলেন মিস কারমাইকেল, আন্তরিক হাসি, নেচে নেচে এগোলেন মুসার দিকে।

এক লাফে পিছিয়ে গেল মুসা। দ্রুত একবার তাকাল দু-পাশে। কোনদিকে দৌড় দিলে সুবিধে হবে আন্দাজ করল
কিন্তু দৌড় দিতে হলো না। তার আগেই গান গেয়ে উঠলেন মহিলা, সোনা আমার, লক্ষ্মী সোনা, কি চমৎকার দেখিতে টিটিরিংনা টিটিরিং টিটুটিরিংনা টিউটিরিং। বলেই কবুতরের গলা নকল করে বাগবাকুম করে উঠলেন।
ছোঁ মেরে মুসার হাত থেকে খাঁচাটা ছিনিয়ে নিলেন মিস কারমাইকেল। বুকে জড়িয়ে ধরে আবার গাইলেন, সেনা আমার, লক্ষ্মী সোনা, দেব ওদের পুরস্কার। টিউটিরিংনা টিউটিরিংনা…
কি পুরস্কার… গেয়ে উঠে আবার থেমে গেল কিশোর, তার দিকে খেয়ালই নেই মহিলার, খাঁচার দরজা খুলছেন।
প্লীজ, চেঁচিয়ে উঠল কিশোর, প্লীজ, খুলবেন না। তারপর যথাসম্ভব ভদ্রভাবে মিস কারমাইকেলের হাত থেকে নিয়ে নিল খাঁচাটা। বলল, মনে কিছু করবেন না, এটা আমাদের পায়রা না।
এরপর কি বলবে? মনে মনে ছন্দ সাজাতে গিয়ে সমস্যায় পড়ে গেল কিশোর। ব্যাখ্যা করে বোঝানো এক কথা, আর সেটা গান গেয়ে শোনানো, তা-ও আবার ব্যাট হাইমসের সুর, নাহ, অসম্ভব। পারবে না। জোরে জোরে চেঁচিয়ে এমননিতেই গলা-মুখ ব্যথা হয়ে গেছে, আর বেশিক্ষণ এই অবস্থা চালালে কথাই বলতে পারবে না শেষে।
ব্যাটল অভ, হাইমসের ধার দিয়েও আর গেল না কিশোর, কিছু মনে করলে করুনগে মহিলা, সে না পারলে কি করবে? নিজেই একটা বেসুরো সুর বানিয়ে নিয়ে চেঁচাল, এখানে আর পারছি না, আর কোথাও চলুন না। অনেক কথা বলার আছে, দয়া করে নবেন কি?
গলায় ঝোলানো তিনরী মুক্তার হারটায় আঙুল বোলাচ্ছেন মহিলা, ছেলেদের দেখছেন। কিশোর ওভাবে খাঁচাটা নিয়ে নেয়ায় মনে আঘাত পেয়েছেন তিনি, তবে প্রকাশ করছেন না।
কিশোরের কথায় মাথা ঝাকালেন; ইঙ্গিত করলেন বাড়ির দিকে। ঘুরে হাঁটতে শুরু করলেন। মাথার ওপর চক্কর দিচ্ছিল বাজ পাখিটা, কাধে বসার আর সুযোগ হবে না বুঝে গিয়ে বসল একটা ডালে। ক্যাঁধের তোতাটা তেমনি বসে আছে, হ্যাটে বসা ক্যানারি ঝিমাচ্ছে আগের মতই। . মিস কারমাইকেলকে অনুসরণ করে বড় একটা জানালা গলে একটা ঘরে ঢুকল। তিন গোয়েন্দা। বিরাট বসার ঘর, প্রচুর আলো। আরও কয়েকটা জানালা রয়েছে, তবে সবগুলোই পুরু কাচে ঢাকা।
খোলা জানালার কাচের পাল্লা বন্ধ করে দিলেন মিস কারমাইকেল। বাইরের কোলাহল তাতে কিছুটা কমল। দেয়ালে বসানো একটা বোতাম টিপলেন।

জানালার ফ্রেমের ওপরের একটা খাজ থেকে নেমে এল পুরু কাচের পর্দা, ফ্রেমের নিচের দিকের খাজে শক্ত হয়ে বসে গেল। সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল কোলাহল, নীরব হয়ে গেল ঘর।
চমৎকার ব্যবস্থা, ভাবল মুসা, একেবারে সাগরের তলার নীরবতা। স্কুবা ডাইভিঙের সময় এই নীরবতা খুব লাগে তার, খুব উপভোগ করে। প্রচণ্ড শব্দের পর এই হঠাৎ নীরবতায় হাঁপ ছাড়ল ছেলেরা।
পায়রাটাকে ছেড়ে দিচ্ছ তাহলে? স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন মিস কারমাইকেল, কিশোরের দিকে চেয়ে।
কিশোর বুঝল, বাইরে পাখিদের সঙ্গে একাত্মতা রক্ষার জন্যেই গানের মত করে কথা বলেন তিনি।
কিশোর জবাব দেয়ার আগেই বললেন মিস কারমাইকেল, আমি ভেবেছিলাম ওটাকে এখানে ছেড়ে দেয়ার জন্যে এনেছ। হ্যাণ্ডবিল ছেড়েছি আমি, পত্রিকায় ঘোষণা দিয়েছি, কেউ খাঁচায় বন্দি কোন পাখি এনে এখানে ছাড়লে প্রতিটা পাখির জন্যে বিশ ডলার করে পুরস্কার দেব। বন্দি পাখি দেখলে বড় কষ্ট হয় আমার। এ ভারি নিরতা।
নিষ্ঠুর প্রতিধ্বনি করল যেন তার কাঁধে বসা তোতাটা। নিষ্ঠুর নিষ্ঠুর!
পুরস্কারের ব্যাপারটা পরিষ্কার হলো ছেলেদের কাছে।
কিশোর জানাল মিস কারমাইকেলকে, কবুতরটা তাদের নয়। কিভাবে কোথায় পাওয়া গেছে, খুলে বলল। এখন পাখিটাকে তার আসল মালিকের কাছে ফিরিয়ে দিতে চায়।
মিস কারমাইকেলের সঙ্গে কোন একজন অভিনেত্রীর অনেক মিল আছে, ভাবছে রবিন, নামটা মনে করতে পারছে না।
কিশোরের কথা শেষ হলে মুখ খুলল মুসা, আসল মালিকের কাছে টমকে ফিরিয়ে দিতে চাই। আমার বিশ্বাস, ছেড়েই রাখা হবে ওকে।
টম গলার মুক্তোর হারে আঙুল বোলাচ্ছেন মিস কারমাইকেল। এটা কি রকম নাম হলো? না না, পাখির এমন নাম হওয়া উচিত না। তার চেয়ে অন্য কিছু। রাখো, এই যেমন কোন ধাতু কিংবা মূল্যবান পাথরের সঙ্গে মিলিয়ে। ওটার পালক নীলচে তো…এক কাজ করো, কোবাল্ট রাখো…
দুর! নাক কোঁচকাল মুসা।
ঠিক আছে, ঠিক আছে, একটা বিচ্ছিরি কিছু না ঘটে যায়, এই ভয়ে তাড়াতাড়ি হাত তুলে বাধা দিল রবিন, নাম একটা হলেই হলো। কোয়ান্ট নামটাও খারাপ না। কি বলো কিশোর?

হ্যাঁ, যা বলছিলাম, রবিনের কথার জবাব দিল না কিশোর। ম্যাডাম, রবিনের কাছে শুনলাম, রবিনকে দেখাল, সে, লাইব্রেরিতে নাকি পাখি নিয়ে ওর সঙ্গে আপনার আলোচনা হয়েছে। ভাবলাম, আপনার কাছেই খোঁজ পাওয়া যাবে, তাই ছুটে এসেছি। রেসিং হোমারকে ট্রেনিং দেয় এমন কাউকে চেনেন?
জবাব দিলেন না মিস কারমাইকেল। ছেলেদের পেছনে জানালার দিকে নজর। এক মিনিট, বলেই এগিয়ে গিয়ে দেয়ালে বসানো বোতাম টিপে জানালার কাচের পদা উঠিয়ে দিলেন। ঘরের ভেতর ঝাপিয়ে এসে পড়ল যেন প্রচণ্ড কোলাহল।
জানালার পাল্লা খুললেন তিনি। পথের ওপর দাঁড়িয়ে আছে একটা পাখি। একটা দোয়েল। জানালা খুলতেই উড়ে এসে বসল চৌকাঠে।
পাখিটার ঠোঁট থেকে কি একটা জিনিস নিলেন মিস কারমাইকেল।
আহা, কি বুদ্ধিমান বন্ধু আমার, গান গেয়ে উঠলেন তিনি। তাই তো ওকে ডাকি হীরা।
পাখিটা উড়ে বাগানের দিকে চলে গেল।
আবার জানালা বন্ধ করে কাচের পর্দা নামিয়ে দিলেন মিস কারমাইকেল। ছেলেদের কাছে এসে বললেন, চুরি করা, দোয়েল পাখির স্বভাব। তবে আমার পাখি দুটো এমন নয়। হীরা তো খাটি হীরা, অন্য দোয়েলটাও ভাল। চুরিদারি একদম করে, তবে কোথাও কিছু পড়ে থাকলে হীরার সেটা কুড়িয়ে নেয়া চাই-ই। কত সুন্দর সুন্দর জিনিস যে সে এন দেয়,আমাকে। এই দেখো।
মাংসল সাদা হাতের মুঠো খুলে দেখালেন তিনি হীরা কি এনেছে।
মস্ত একটা মুক্তো, ঝকমক করছে।
এই নিয়ে তিনটা হলো, বললেন তিনি, এক মাসে তিনটা মুক্তো এনেছে। কোথায় পায় কে জানে। মুক্তো আমি খুব ভালবাসি। পাখি আর মুক্তো।
হ্যাঁ, যা বলছিলাম, আবার আগের কথা তুলল কিশোর। রেসিং হোমারকে ট্রেনিং দেয়…
মাথা নাড়লেন মিস কারমাইকেল। না, তেমন কারও কথা মনে পড়ছে না।
আচ্ছা, ঠিক আছে, যদি মনে পড়ে… পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে বাড়িয়ে ধরুল কিশোর, দয়া করে এই নাম্বারে ফোন করে জানালে খুব খুশি হব।
কার্ডটা ধরলেন মিস কারমাইকেল, কিন্তু পড়তে পারলেন না। তার আগেই ডাইভ দিয়ে নেমে এল তোতা, কার্ডটা ঠোঁটে করে নিয়ে গিয়ে বসল আবার আগের জায়গায়।
আপনার অনেক সময় নষ্ট করলাম, ব্যাংকিউ, বলল কিশোর। মহিলাকে পছন্দ করতে শুরু করেছে সে। তবে যে কাজে এসেছিল, তার কিছুই হয়নি, কোন রকম

সাহায্য হলো না। সাউণ্ডপ্রুফ এই ঘরটাকে এখন একটা খাঁচা মনে হচ্ছে তার, এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারলে বাঁচে।
জানালার কাচের পর্দা সরিয়ে পাল্লা খুলে দিলেন মিস কারমাইকেল। একে একে বেরিয়ে এল ছেলেরা মহাকোলাহলের মধ্যে। একবার ফিরে তাকাল কিশোর, তাদের দিকে নজর নেই মহিলার। হাতের মুক্তোটা দেখছেন, মুখে হাসি।
ড্রাইভওয়ে ধরে সাইকেল চালিয়ে ফিরে চলল তিন গোয়েন্দা। এখানে কথা বলার চেষ্টা বৃথা। দূরে গিয়ে তারপর যা বলার বলবে, ভাবল কিশোর। পাখির কলরব কান ঝালাপালা করে দিচ্ছে, অসহ্য লাগছে তার।
হঠাৎ তীক্ষ্ণ চিৎকারে থেমে গেল কিশোর। প্রথমে ভেবে ছিল পাখির ডাক, কি ভেবে ফিরে তাকাল বাড়ির দিকে। পাখি নয়, বাজ পাখির গলা নকল করে চেঁচিয়ে উঠেছেন মিস কারমাইকেল, কিশোর ফিরে তাকাতেই হাত তুলে ডাকলেন।
আমার এক বন্ধু আছে, গাইলেন মিস কারমাইকেল, রিচার্ড হ্যারিস নামটি তাহার, বাস করে এই শহরেই; পায়রা পোষার শখ ছিল তার, বলেছে সে একদিন। কি আফসোস, ভুলেই ছিলাম, কি আফসোস, ভুলেই ছিলাম।
ব্যাংকিউ, মিস কারমাইকেল, বলল কিশোর। রিচার্ড হ্যারিস নামটি আমি আর সহজে ভুলব না, শেষের কথাগুলো সুর করে বলল।
রিচার্ড হ্যারিস, মিউজিক নেস্ট থেকে দূরে মহাসড়কের শান্ত পরিবেশে ফিরে এসে বন্ধুদেরকে বলল কিশোর, মেইন স্ট্রীটের একটা অলঙ্কারের দোকানের নাম।
পথের ধারে ঘাসের ওপর সাইকেল নিয়ে এল সে, সাইকেল থেকে নামল। রবিন আর মুসাও নামল।
শোনো, মুসা প্রস্তাব দিল, এত সব ঝুট ঝামেলা না করে চলো আবার মিস, কারমাইকেলের বাড়িতে ফিরে যাই। তার সামনে খাঁচা থেকে ছেড়ে দিই টমকে। কুড়ি ডলার নিয়ে ফিরে আসব। ছাড়া পেলেই বাড়ি ফিরে যাবে টম, তার বন্ধুদের কাছে। আমাদেরও ঝামেলা শেষ।
এই আশঙ্কাই করছিল কিশোর। তবে একেবারে মন্দ বলেনি মুসা, অন্তত পাখিটার পক্ষ থেকে ভাবলে সেটা করাই ভাল। কেন খাঁচায় বন্দি রেখে কষ্ট দেয়া? ছাড়া পেলে নিজের ঝাঁকে বন্ধুদের মাঝে ফিরে যেতে পারবো।
কিন্তু এই পায়রাটাই এখন একমাত্র সূত্র রহস্যভেদী কিশোর পাশার কাছে, হাতছাড়া করতে সায় দিচ্ছে না তার মন। চমৎকার একটা রহস্য দানা বেঁধে উঠেছে, শুরুতেই দেবে সব ভণ্ডুল করে, এটা ভাবতে পারছে না।
হেডকোয়ার্টারে চালু করে দিয়ে আসা জবাব দেয়ার যন্ত্রটার কথা ভাবল কিশোর। সবুজ গাড়িওয়ালা লোকটা আগের কবুতরটাকে চুরি করে থাকলে, আর সেটা

স্লেটারের জানা না থাকলে শিগগিরই ফোন করবে। দু-আঙলাকে ফেরত চাইবে। নিতে আসবে। তখন তার সামনে থাকতে চায় কিশোর। দেখতে চায়, তিন-আঙলাকে দেখে কি প্রতিক্রিয়া হয় সুেটারের। চিনতে পারে কিনা কবুতরটাকে।
এখুনি ছেড়ে না দিয়ে, বলল কিশোর, আগে রিচার্ড হ্যারিসের সঙ্গে দেখা করে নিই। যাওয়ার সময় পথেই পড়বে তার দোকান। রবিন, তুমি কি বলে?
ঠিক আছে,অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলল মুসা, তোমরা যখন চাও:হ্যালো, মিটার রিচার্ড হ্যারিস, আসিতেছি আমরা।
রকি বীচের সব চেয়ে দামী অলঙ্কারের দোকান রিচার্ড হ্যারিস-মালিকের নামে নাম। খরিদ্দার আকৃষ্ট করার জন্যে বাইরের শো-কেসে ঘুড়ি কিংবা আঙটির। মত শস্তা জিনিস নেই। আছে কুচকুচে কালো মখমলে মোড়া ধাতব স্ট্যাণ্ডে ঝোলানো মুক্তার অনেক দামী, একটা হার, আর সেটার দুপাশে বেশ কায়দা করে আটকানো হীরের দুটো ব্রোচ। উজ্জল দিবালোকে ঝলমল করে জ্বলছে, য়েন, নীরবে ঘোষণা করছে আমাদের দেখেই অবাক হয়ে গেলেন? ভেতরে এসে দেখুন না, আরও কত কি আছে।
ভেতরে অনেকগুলো কাচের বাক্স সাজানো। ভেতরে দামী দামী সব গহনা।
বড় একটা বাক্সের ওপাশে দাঁড়ানো একজন লোক। বেঁটে গাঁট্টাগোট্টা শরীর, গায়ে কালো কোট, পরনে কড়া ইস্তিরী করা ডোরাকাটা প্যান্ট। সিল্কের টাই আর শক্ত মাড় দেয়া কারও মনে হচ্ছে আছে পরনে, তবে সেটা দেখা যায় না দাড়ির জন্যে। লম্বা কালো দাড়ি মুখের পুরোটাই প্রায় ঢেকে দিয়েছে, শুধু নাক আর চোখ দেখা যাচ্ছে। ঘন জঙ্গলের মাঝে খোলা জায়গার মত ঠোঁট দেখা যায়, তবে অস্পষ্ট।
বলো? তিন গোয়েন্দাকে কতে দেখে প্রশ্ন করল লোকটা।
মিস্টার রিচার্ড হ্যারিস? জানতে চাইল কিশোর।
হ্যাঁ।
কিশোর জানাল, তারা মিস কোরিন কারমাইকেলের বন্ধু। মহিলার নাম নেই উজ্জ্বল হয়ে উঠল হ্যারিসের চোখ।
বলে গেল কিশোর, কারমাইকেলের কাছেই মিস্টার হ্যারিসের নাম শুনেছে ওরা। একটা বেলজিয়ান রেসিং হোমার নিয়ে এনেছে। দেখে দয়া করে যদি মিস্টার হ্যারিস জানান কবুতরটা কার (যদি অবশ্য চিনতে পারেন) তো সারা জীবন কৃতজ্ঞ থাকবে কিশোর, ইত্যাদি ইত্যাদি।
আরে না না, কে বলে আমি বিশারদ, বিনয়ে গলে গেল মিস্টার হ্যারিস। একবার কবুতর পোষার শখ হয়েছিল, চেষ্টা করেছিলাম। ভাল লাগেনি, ছেড়ে দিয়েছি। সে অনেক বছর আগের কথা। মুসার হাতের খাঁচার দিকে তাকাল। ওটাই নাকি?
হ্যাঁ, খাঁচাটা ওপরে তুলল মুসা, হ্যারিসকে ভালমত দেখানোর জন্যে।

মিনিটখানেক নীরবে পাখিটাকে দেখল হ্যারিস, জিজ্ঞেস করল, পেলে কোথায়? তোমাদের কাছে এল কি করে?
আমাদের বাড়িতে কে জানি ফেলে রেখে গেছে, সেটারের কথা চেপে গেল কিশোর।
কে?
জানি না, মুসা জবাব দিল। সকাল বেলা পেলাম। সে জন্যেই এসেছি আপনার কাছে। ভাবলাম, আপনি হয়তো জানেন...।
মাথা নাড়ল হ্যারিস। বেলজিয়ান রেসিং হোমার নয় এটা। মানে, হোমারই, তবে রেসার বলা চলে না। মেয়ে পাখি তো, রেস দেয় না।
কিন্তু বলতে গিয়েও কি ভেবে থেমে গেল রবিন। চুপ হয়ে গেল!
তাহলে বলতে পারছেন না এটা কার? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
না, আবার মাথা নাড়ল হ্যারিস। মনে হলো, হাসছে।
ঠোঁট পুরোপুরি দেখা যায় না তো, ঠিক বোঝা গেল না। সরি, তোমাদের সাহায্য করতে পারলাম না। মিস কারমাইকেলকে আমার সালাম জানিও।
জানাবে, বলল কিশোর। মূল্যবান সময় নষ্ট করে তাদের কথা শোনার জন্যে বার বার ধন্যবাদ দিল মিস্টার হ্যারিসকে।
দোকান থেকে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা।
ফুটপাথে তুলে রাখা সাইকেলগুলো স্ট্যাণ্ড থেকে নামাল। সাইকেলের ক্যারিয়ারে খাঁচাটা বসিয়ে বাধছে মুসা। মোড়ের ওপাশ থেকে বেরোল একটা কালো গাড়ি, ওদের পাশ দিয়ে গেল।
সাইকেলে চড়তে যাচ্ছিল মুসা আর কিশোর, থামাল রবিন ইশারা করল অলঙ্কারের দোকানের দিকে!
কি? ভুরু কোচকাল কিশোর।
ওই লোকটা, আবার দোকানের দিকে হাত তুলল রবিন, রিচার্ড হ্যারিস। হয় কবুতরের ক-ও জানে না সে, কিংবা মিছে কথা বলেছে।
কেন? মিছে বলবে কেন? মুসা বলল।
জানি না। সকালে লাইব্রেরি থেকে যে বইটা এনেছি, তাতে লেখা আছে, পুরুষ-মেয়ে নিয়ে কোন কথা নেই, ট্রেনিং পেলে সব হোমারই রেসার হতে পারে। বেশ কয়েকবার ওয়ার্ল্ড চ্যামপিয়ন হয়েছে মেয়ে কবুতর।
ঘড়ি দেখল কিশোর। ডিনারের সময় হয়ে গেছে। চলো বাড়ি যাই। খাওয়ার পর হেডকোয়ার্টারে বসে আলোচনা করব।
ঠিক বলেছ, মাথা দোলাল মুসা, আগে খাওয়া, তারপর অন্য সব। কিন্তু এই টমকে যদি রাখতেই হয়...

মেয়ে তো, হেসে বলল রবিন, টম আর হয় কি করে? টমনী রাখো।
ছেলে হোক মেয়ে হোক, নাম একবার রেখে ফেলেছি, ব্যস। টমই সই। অনেকেই ছেলের নাম রাখে মেয়েদের, মেয়ের নাম ছেলেদের। আমাদের জরজিনা বেগমের কথাই ধরো না, জিনা:শুনতে নাকি তার ভাল লাগে না, বলে জর্জ।
ঠিক আছে, বাবা টমই, যাও, হাত তুলল রবিন।
যা বলছিলাম, টমকে যদি রাখতেই হয়, নিরাপদ জায়গায় রাখতে হবে। হেডকোয়ার্টারের ভেতর বড় খাঁচাটা নিয়ে গিয়ে তাতে রাখব। আরামেও থাকবে, নিরাপদও।
রেখো, ফুটপাথ থেকে সাইকেল নামাল কিশোর।
খাওয়ার পর তাদের ব্যক্তিগত ওয়ার্কশপে চলে এল তিন গোয়েন্দা। প্রথমেই কবুতরের বড় খাঁচাটা হেডকোয়ার্টারে ঢোকানোর পালা। দুই সুড়ঙ্গ দিয়ে ঢুকবে না। কিন্তু অসুবিধে নেই। আরও অনেক গোপন পথ আছে। মোবাইল হোমের ছাতের স্কাইলাইটের ঢাকনা সরিয়ে সে-পথে ঢোকানো যাবে।
বড় খাঁচাটা নিয়ে জঞ্জালের ওপর দিয়ে উঠে গেল মুসা। অনেক দিন একভাবে পড়ে থেকে থেকে একটার সঙ্গে আরেকটা শক্ত হয়ে আটকে গেছে আলগা জঞ্জাল, মুসার ভারে নড়লও না। কিশোর আর রবিন কবুতর সহ ছোট আঁচাটা নিয়ে দুই সুড়ঙ্গ দিয়ে ট্রেলারে ঢুকল। ছাতের ওপর থেকে স্কাইলাইটের ফোকর দিয়ে দড়িতে বেঁধে খাঁচা নামিয়ে দিল মুসা। নিজেও নেমে এল। ভেতর থেকেই আবার লাগিয়ে দিল টাকনা।
ছোট খাঁচা থেকে বড় খাঁচায় কবুতর সরানোয় ব্যস্ত হলো মুসা, রবিন তাকে সাহায্য করল। কিশোর এগোল ডেস্কের দিকে। মুখচোখ উজ্জল। ঢুকেই তাকিয়েছে আগে যন্ত্রটার দিকে। সিগন্যাল লাইট জ্বলছে। তারমানে মেসেজ টেপ করেছে যন্ত্রটা।
রিংকি, ভাবল কিশোর। ও-ই ফোন করেছিল। তাহলে সবুজ গাড়িওয়ালাই... ডেস্কে ঘুরে গিয়ে নিজের চেয়ারে বসল সে।
শোনো, শোনো, টেপটা চালু করে দিয়ে দুই সঙ্গীকে ডাকল সে।
ফিরে তাকাল মুসা আর রবিন।
সাহায্য! মহিলা কণ্ঠ। সাহায্য চাই।
প্লীজ, সাহায্য করো আমাকে কেঁদে ফেলবেন যেন মিস কারমাইকেল। খুন! এই মাত্র দেখলাম ওর লাশ... কান্নায় রুদ্ধ হয়ে গেল কণ্ঠ। কয়েক মুহূর্ত কোপানোর পর আবার শোনা গেল, হীরা! হীরাকে পিটিয়ে মেরেছে। আরও একটা লাশ পেয়েছি। আমার সুন্দর একটা বাজ পাখি। প্লীজ, সাহায্য করো আমাকে। আমার পাখিগুলোকে খুন করছে কেউ।

তোমাদের কার্ডটা পেয়ে মনে হলো হাতে চাঁদ পেয়েছি, বললেন মিস কারমাইকেল। ওই মুহূর্তে তোমাদের মতই কারও কথা ভাবছিলাম। গোয়েন্দা।
মেসেজ পাওয়ার পরই সাইকেল নিয়ে মিউজিক নেস্ট-এ চলে এসেছে তিন গোয়েন্দা। মিস কারমাইকেলের সাউণ্ডপ্রুফ ঘরে বসে কথা বলছে।
পুলিশকে জানাইনি, কাঁধে বসা তোতাটাকে আদর করলেন মিস কারমাইকেল। ইতিমধ্যেই বার কয়েক ঝামেলা করে গেছে। নালিশ জানিয়েছে, প্রতিবেশীরা নাকি আমার পাখিদের জ্বালায় অস্থির। ভেবেই পাই না, ওদের কি এমন জ্বালাচ্ছে পাখিগুলো।
আমি আপনার প্রতিবেশী হলে নালিশ জানাতাম না, বহু আগেই তল্লাট ছেড়ে পালাতাম, মনে মনে বলল মুসা।
মহিলার কথা কিশোরের কানে ঢুকছে বলে মনে হলো না। গভীর মনোযোগে লাশ পরীক্ষা করছে। টেবিলে বিছানো সাদা কাপড়ের ওপর রাখা হয়েছে মৃত পাখি দুটোকে। দোয়েলের মাথা থেঁতলে দেয়া হয়েছে, বোধহয় লাঠি দিয়ে বাড়ি মেরে। বাজটার গায়ে কোন ক্ষত নেই। বিষ খাইয়ে মেরেছে, মনে হয়।
বাজটাকে কি খাওয়ান? ফিরে জিজ্ঞেস করল কিশোর।
মাংস, বললেন মিস কারমাইকেল। জানো নিশ্চয়, ওরা মাংসাশী। সাংঘাতিক ধূর্ত শিকারী। ইদুর, খরগোশ, ছোট ছোট পাখি, যা পায় ধরে খায়। খাওয়ার জন্যেই শিকার করে তো, দোষ দিতে পারি না। তবু একেক সময় মনে হয় বড় বেশি নিষ্ঠুর ওরা।
নিষ্ঠুর প্রতিধ্বনি করল কাঁধে বসা তোতা, নিষ্ঠুর নিষ্ঠুর! এই একটা শব্দই শিখেছে নাকি, ভাবল মুসা।
মাথা নেড়ে লাশ দুটো দেখিয়ে প্রশ্ন করল কিশোর, পেয়েছেন কোথায়, মানে, কোথায় পড়েছিল?
হীরা পড়ে ছিল লনের ধারে। বেচারাকে তোলার কথা ভাবছি, এই সময় চোখ পড়ল... রুমাল বের করে চোখ মুছলেন মিস কারমাইকেল। দেখলাম, টীল পড়ে আছে গাছের তলায়। কুঁপিয়ে উঠলেন তিনি। কোনমতে বললেন, ওর খাওয়া... যেমন ছিল তেমনি পড়ে আছে। খায়নি। পাথর হয়ে ও পড়ে আছে গাছতলায়... আর কোন দিন উড়বে না... শব্দ করে কেঁদে ফেললেন তিনি।
সহানুভূতি দেখিয়ে মাথা নাড়ল কিশোর। মহিলার উচ্ছাস থামার সময় দিল। তারপর জিজ্ঞেস করল, জায়গাটা দেখাবেন?
নিশ্চই, জানালা দিয়ে তাকালেন মিস কারমাইকেল। অন্ধকার হয়ে গেছে। দাঁড়াও, একটা টর্চ বের করি।
লাগবে না, বলল কিশোর। আমাদের সাইকেলে লাইট আছে, খুলে নেব। চলুন।

সূর্য ডোবার পর নীরব হয়ে গেছে পাখির দল। মিস কারমাইকেলের পেছনে আলো হাতে হাঁটছে তিন গোয়েন্দা। মাঝেসাঝে পেঁচার কর্কশ ডাক কানে আসছে। তার জবাবেই যেন অন্ধকার ডাল থেকে হেসে উঠছে কোন কাকাতুয়া, বুড়ো মানুষের খসখসে হাসির মত।
ওই যে ওখানে পড়েছিল হীরা, ভাঙা গলায় বললেন মিস কারমাইকেল।
জায়গাটায় আলো ফেলল কিশোর। নিচু হয়ে একটা রক্তাক্ত পালক তুলল।
কেঁপে উঠলেন মিস কারমাইকেল। বাজপাখিটা পড়ে ছিল ওই গাছতলায়।...কিছু যদি মনে করো, আমি যাই। একটু শোব। ভাল লাগছে না।
বুকের ওপর দুই হাত আড়াআড়ি চেপে ধরে দ্রুত বাড়ির দিকে রওনা হলেন মিস কারমাইকেল।
মহিলার অবস্থা দেখে দুঃখই হলো কিশোরের, একই সঙ্গে দুই সন্তান মারা গেছে যেন তার। তবে তিনি চলে যাওয়ায় খুশিও হয়েছে, কাজ করতে অস্বস্তি বোধ করছিল।
বাজটা যেখানে পড়েছিল সেখানে এসে দাঁড়াল কিশোর। একটা পালকও নেই। মাংসের টুকরোও না। বিষ খেয়েই যদি মারা গিয়ে থাকে বাজটা, হয় অন্য কোথাও থেকে খেয়ে এসেছে, কিংবা ওটার খাওয়া শেষ হওয়ার পর এসে সব কিছু পরিষ্কার করে দিয়ে গেছে যে খাইয়েছে।
আশেপাশের অনেকখানি জায়গায় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আলো ফেলে দেখল কিশোর। খুব খারাপ, নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটা শুরু হলো তার।
কি খারাপ? জিজ্ঞেস করল রবিন।
শক্ত মাটি, এর চেয়ে বেশি কিছু বলার দরকার মনে করল না আপাতত কিশোর, সময়ও নেই, কাজ রয়েছে। রবিন, তুমি ওদিকের বনে ঢোকো। মুসা, তুমি এদিকে। মাঝের জায়গাটায় আমি ঢুকছি। ঠিক আছে?
তা আছে, মাথা কাত করল মুসা। কিন্তু কিশোর, একটা কথা বলবে?
কি?
খুঁজছ কি তুমি?
পায়ের ছাপ, আরার মাটিতে আলো ফেলল কিশোর। পড়েনি, বেশ শক্ত মাটি। তবে দিন দুই আগে বৃষ্টি হয়েছে, বনের কোথাও কোথাও নরম মাটি আছেই। ভিজে নরম হয়ে আছে। মিস কারমাইকেলের প্রতিবেশীদের কথা যা শুনলাম, মনে হয় না কেউ তার সঙ্গে আলাপ করতে আসে। তাই, যদি কারও পায়ের ছাপ পাওয়া যায়, ধরে নিতে হবে সেটা খুনীর।
চমৎকার, অনেকটা টিটকারির সুরে বলল মুসা। যদি পেয়ে যাই, তো কি করবে? প্লাসটার কাস্ট করে ল্যাবোরেটরিতে পাঠাব?

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল কিশোর। এই সহজ কথাটাও বুঝছ না। রিংকির কথা ভুলে গেছ? ওর জুতো দেখোনি? কত বড়? তাছাড়া চোখা মাথা। এবার বুঝেছ?
চোখা হলে তো বুঝলাম ব্লিংকির, কথা কল রবিন, আর যদি তা না হয়? কি বুঝব?
সেটা তখন ভাবা যাবে।
ছাপ দেখতে পেলে কি করব? মুসার প্রশ্ন।
আলোর সঙ্কেত দেবে। জালবে-নেভাবে জালবে-নেভাবে, তিন বার করে, খানিক বিরতি দিয়ে আবার তিন বার। যতক্ষণ জবাব না পাবে, দিয়েই যাবে।
তিনজন তিন দিকে রওনা হয়ে গেল।
সামান্য ঝুঁকে পা পা করে এগোচ্ছে কিশোর, বার বার লাইট ঘুরিয়ে দেখছে সামনে আর আশেপাশে। তার মনে হচ্ছে, মাঝের দিকটা বেছে নিয়ে ঠিক করেনি, এদিকে সুবিধে হবে না। ছাপ পাওয়ার আশা নেই। ঘন ঝোপঝাড়, নুড়ি আর বালিতে ঢাকা সরু পথ। এখানে পায়ের ছাপ বসবে না।
মুসা আর রবিনও নিশ্চয় কিছু দেখতে পায়নি, পেলে সঙ্কেত দিত। ফিরে যাবে। কিনা ভাবছে কিশোর, এই সময় চোখে পড়ল ডানের ঝোপে কালোমত কি যেন। থমকে গেল সে।
স্থির দাঁড়িয়ে রইল এক মুহূর্ত। হঠাৎ করেই নড়ে উঠল, প্রায় দৌড়ে এসে বসে পড়ল এটার কাছে।
অন্ধকারে কাছেই কোথাও কর্কশ চিৎকারে নীরবতা ভাঙল একটা পেঁচা। কিশোরের মনোযোগ ছিন্ন করতে পারল না বটে, কিন্তু পেছনে নড়াচড়ার শব্দটা ঢেকে দিল পাখির ডাক।
হালকা খসখস শব্দটা বড় বেশি দেরিতে কানে এল কিশোরের। গোড়ালিতে ভর করে বসা অবস্থায়ই পাই করে ঘুরল। সরে যাওয়ার চেষ্টা করল, পারল না, তবে মাথাটা বাচল। শক্ত লাঠির আঘাত কান দুয়ে শিস কেটে এসে লাগল কাঁধে।
তীব্র বেদনার পর পরই মনে হলো অবশ হয়ে গেছে ডান হাত। আঙুলগুলো কোনমতে ধরে রইল লাইটটা। এক পাশে কাত হয়ে পড়ল সে, গড়ান দিয়েই চিত হলো, লাইটটা বুকের ওপর ধরে লেসটা ফেরাল কোণাকুণি ওপর দিকে।
কালো অয়েলফিন পরা একজন মানুষের মুখে পড়ল আলো।
মুখ না বলে বলা যায় দাড়ির জঙ্গল। নাক দেখা যাচ্ছে, ঠোঁট অস্পষ্ট। চোখ দুটোও এখন দেখা যায় না, কালো চশমায় ঢাকা।
চোখে আলো পড়ায় স্থির হয়ে গেল লোকটা, পরক্ষণেই ঘুরে এক দৌড়ে ঢুকে গেল পাশের ঘন জঙ্গলে। পিছু নেয়ার চেষ্টা করল না কিশোর। উঠে দাঁড়াল। শরীর কাঁপছে। বাঁ হাতে ডলতে শুরু করল কাপ। শুরু হলো তীব্র ব্যথা; অবশ

ভাবটা কেটে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। লাইটের লেন্স একটা বিশেষ দিকে ফিরিয়ে হাত দিয়ে ঢাকল, সরাল, আবার ঢাকল, আবার সরাল,পর পর তিনবার করল এরকম। সাড়া এল না। আবার একই রকম করল। থামল। আবার সঙ্কেত দিল। সঙ্কেতের জবাব দিল মুসা। ছুটে আসতে শুরু করল।
কিশোর?
এই যে, এখানে আমি।
ঝোপের ওপাশ থেকে ঘুরে এসে দাঁড়াল মুসা। একটু পরেই উল্টো দিক থেকে এসে পৌছুল রবিন।
কাঁধ ডলেই চলেছে কিশোর। ব্যথা একটু কমছে মনে হচ্ছে।
কি হয়েছে, কিশোর উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করল রবিন।
রিচার্ড হ্যারিস, বলল কিশোর। ব্যাটা আমাকে লাঠি দিয়ে বাড়ি মেরেছে। কপাল ভাল মাথায় লাগেনি, তাহলে গেছিলাম।-মুখে আলো পড়তেই চমকে গেল, ছুটে পালাল। ওই যে ওদিকে, হাত তুলে দেখাল। কোন শব্দ শোনোনি? দেখেছ ওকে?
নাহ্। ঝোপঝাড় খুব বেশি। আর গেটের দিকে গিয়ে থাকলে আমার কাছ দিয়ে যাওয়ার কথা না।
পিছু নেব নাকি? বলল বটে মুস্য, কিন্তু অন্ধকারে একটা বাজে লোককে অনুসরণের কথা ভাবতেই জানি কেমন লাগছে, তাছাড়া লোকটার হাতে রয়েছে। মোটা লাঠি, অন্যের মাথায় বাড়ি মারার প্রবণতাও আছে।
না, মুসার মত একই কথা ভাবছে কিশোরও। একটা কিছু আছে এখানে, ওব্যাটার জন্যে দেখতে পারিনি ভালমত। আলো ফোল ঝোপের কিনারে। কালোমত বস্তুটার কাছে এসে বলল আবার, তার পাশে বসল রবিন আর মুসা।
খাইছে! মুসা চেঁচিয়ে উঠল এ-যে দেখছি, এ-যে দেখছি…
হ্যাঁ, কাল কিশোর, ঠিকই দেখছ। মরা কবুতর।
কবুতর না বলে বলা উচিত কবুতরের অবশিষ্ট। মাথাসহ শরীরের ওপরের অংশ নেই, টেনে ছিড়ে ফেলা হয়েছে, বাকি রয়েছে লেজের কাছের অতি সামান্য চামড়া আর মাংস, পালকগুলো গেঁথে রয়েছে তাতে। একটা ডানার খানিকটা আর পা দুটোও আছে।
হাত বাড়িয়ে একটা পা তুলে নিল কিশোর। গোড়ালিতে অ্যালুমিনিয়মের পাতলা আংটা পরানো। নিজের লাইট মাটিতে রেখে রবিনের লাইটের আলোয় পা থেকে জিনিসটা খুলল সে, পাতলা মোড়কের ভেতর ছোট একটা উজ করা কাগজ। সাবধানে মোড়কের জোড়া দুটিয়ে সোজা করল, ভেতরের কাগজ বের করে মেলল। সমান করল হাত দিয়ে ডলে।
বুকের মত গলা বাড়িয়ে দুপাশ থেকে কাগজটার ওপর ঝুঁকে এল অন্য দুজন।

হায় হায়, এটা কি ভাষা? বলে উঠল মুসা। চীনা নাকি?
ছাপার অক্ষর হলে হয়তো বোঝা যেত, কিন্তু হাতে লেখা, তাই প্রথমে রবিনও চিনতে পারল না। চীনাই বোধহয়, বিড়বিড় করল সে। না না, জাপানী পাঠকও আছে, বই নিতে আসে। চিনি কয়েকজনকে।
চিন্তিত জিতে মাথা নাড়ল কিশোর, কাগজটা বহ করে রেখে দিল পকেটে। তারপর বুকে আবারদেখতে লাগল কবুতরের দেহাবশেষগুলো।
দেখো দেখো, উত্তেজিত কণ্ঠে বলল সে, বা পা-টা দেখো!
মুসা আর রবিনও দেখল।
যে-ই মেরেছে পাখিটাকে, কোন কারণে পা-দুটো নষ্ট করেনি, নিচের অংশ অক্ষত রয়েছে। বাঁ পায়ে তিনটের জায়গায় রয়েছে দুটো আঙুল।
আজ মুক্তো নেই, সাইকেল চালাতে চালাতে আনমনে বিড়বিড় করল কিশোর। তার পাশে পাশে চলেছে রবিন আর মুসা।
সকাল বেলায়ই বেরিয়ে পড়েছিল ওরা। রবিনের পরিচিত একজন জাপানী, ভদ্রলোকের বাড়ি গিয়েছিল। লাইব্রেরিতে বই নিতে আসেন তিনি প্রায়ই। তাকে দিয়ে মেসেজটা পড়িয়েছে, মর্মোদ্ধার করেছে। তিনটে শব্দ শুধু লেখা : আজ মুক্তো নেই।
ভাবনার ঝড় বইছে গোয়েন্দাপ্রধানের মাথায়। মুক্তো। কবুতর। মৃত দোয়েল। মৃত বাজ পাখি। আর রিচার্ড হ্যারিস।
স্যালভিজ ইয়ার্ডে পৌঁছে দেখা গেল, উত্তেজিত হয়ে আছেন মেরিচাচী। ভারি ভারি অনেক মালপত্র নিয়ে এসেছেন, রাশেদ চাচা। সেগুলো গোছাতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে ইয়ার্ডের দুই বিশালদেহী কর্মচারী, দুই ব্যাভারিয়ান ভাই, বোরিস ও রোভার।
তিন কিশোরকে দেখে এগিয়ে এলেন মেরিচাচী। এই যে, তোরা এসেছিস। ভালই হয়েছে। তোর চাচার কাণ্ড দেখ কিশোর, কি সব নিয়ে এসেছে। বাকাচোরা এসব লোহার পাইপ দিয়ে হবেটা কি? বিক্রি হবে ওজন দরে ছাড়া? আর তাতে লাভ তো কিছু হবেই না, লোকসান যাবে প্রচুর।
ভেব না চাচী, লোকসান যাবে না, আশ্বাস দিল কিশোর। কোন একটা উপায় হয়ে যাবেই।
অফিসের বাইরে ছায়ায় বসে পাইপ টানছিলেন রাশেদ পাশা, মুখ থেকে সরিয়ে খুকখুক করে কাশলেন, মস্ত গোঁফের ডগার আলতো মোচড় দিয়ে উঠে এলেন। বোঝা তুই, কিশোর, আমি তো পারলাম না। তখন থেকে চেঁচামেচি করছে।
কি করে বিক্রি হবে শুনি? কোমরে দু-হাত রেখে দাঁড়ালেন মেরিচাচী।

হবে হবে, আবার পাইপ মুখে দিলেন রাশেদ পাশা, কিশোরের দিকে তাকালেন, ইচ্ছে, বুদ্ধিটা বাতলে দিক কিশোর।
হবে হবে তো বলছই শুধু, কি করে হবে?
এই কিশোর, বলে দে না, ভাতিজার ওপর গভীর আস্থা রাশেদ চাচার, হার স্থির বিশ্বাস আইনস্টাইন কিংবা নিউটনের চেয়ে কোন অংশে কম যায় না কিশোর, একটা উপায় বের করে ফেলবেই।
চাচী, তুমি খামোকা ভাবছ। বাজারে পাইপের যা দাম এখন, বলল কিশোর, ডবল দামে বিক্রি করতে পারব। গত বছর পাইপ ঢালাইয়ের একটা বাতিল মেশিন এনেছিল না চাচা, যেটা পড়ে আছে এখনও, সেটা মেরামত করে নেব। তারপর মুক্তোশিকার জনা দুই ঢালাই মিস্ত্রিকে ভাড়া করে নিয়ে এলেই হবে। এক ঢিলে দুই পাখি মারা হয়ে যাবে। মেশিনটাও বিক্রি হবে, পাইপগুলোও ডবল দর…
হো হো হো, মুখ থেকে পাইপ খসে পড়ল রাশেদ পাশার তোলার চেষ্টা করলেন না, হাততালি দিয়ে লাফিয়ে উঠলেন বাচ্চা ছেলের মত। মেরি বেগম, এবার কি বলবে? আঞ্চলিক বাংলায় টেনে টেনে বললেন, কইছিলাম না, আমাগো কিশোর থাকতে কোন চিন্তা নাই। অই মিয়ারা, খাড়া খাড়ায়া কি দেখছো, তোলো তোলো, তুইল্লা রাখো পাইপলান। শেষ কথাগুলো দুই ব্যাভারিয়ান ভাইয়ের উদ্দেশ্যে বললেন, কিন্তু কিছুই বুঝল না ওরা, হাঁ করে চেয়ে আছে রাশেদ পাশার মুখের দিকে।
হাসি ছড়িয়ে পড়েছে মেরিচাচীর সারা মুখে। কিশোর, আজ তোদের আমি ফুট কেক খাওয়াব।
কেক না চাচী, আইসক্রীম…
দুটোই বানাতে যাচ্ছি, হেলেদুলে আনন্দে প্রায় নাচতে নাচতে বাড়ির দিকে রওনা হলেন মেরিচাচী।
পুরো দুই ঘণ্টা লাগল পাইপগুলো গোছগাছ করতে। কাজ শেষ করে হাতমুখ ধুয়ে, খৈয়ের, ওয়ার্কশপে চলে এল তিন গোয়েন্দা।
দুই সুড়ঙ্গের মুখের ধাতব পাত সরিয়ে প্রথমে ঢুকল কিশোর, তার পেছনে রবিন, সব শেষে মুসা।
পাইপের অন্য মুখের ঢাকনা সরিয়ে ট্রেলারের ভেতরে উঁকি দিল কিশোর। প্রথমেই তাকাল জবাব-দেওয়া মেশিনটার দিকে। আলো জ্বলছে না, তানে কোন ফোন আসেনি। হতাশ হলো। উঠে এসে বসল নিজের চেয়ারে।
পুরানো একটা রকিং চেয়ারে বসে ফাইলিং কেবিনেটের ড্রয়ারে পা তুলে দিল মুসা। রবিন কাল একটা টুলে, দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে।

চিরাচরিত নিয়মে আলোচনার সূত্রপাত করল কিশোর। মুক্তা। এই কেসের প্রধান রহস্য।
কবুতরও, খাঁচার ভেতরে বসা পায়রাটাকে দেখিয়ে বলল মুসা। দু-আঙুলে কবুতর, তিন আঙুলে কবুতর, জ্যান্ত কবুতর, মরা কবুতর।
মুক্তো, আবার বলল কিশোর। মেসেজ লেখা : আজ মুক্তো নেই। মিসকোরিন কারমাইকেলের মুক্তোপ্রীতি। তার একটা দোয়েল ছিল, যেটা মুক্তো এনে দিত।
হীরা, মাথা ঝোঁকাল রবিন, নোট বই বের করছে পকেট থেকে। ঠোঁটে করে মুক্তো নিয়ে এল। মিস কারমাইকেল বললেন? এই নিয়ে তিনটে হলো।
তারপর কেউ খুন করল হীরাকে, চিন্তিত ভঙ্গিতে বলে চলল কিশোর। হতে পারে রিচার্ড হ্যারিস। তার গহনার দোকান আছে, মুক্তো বিক্রি করে। এই রহস্যের প্রধান বিষয়ব যদি মুক্তো হয় মাঝে মাঝে দুর্বোধ করে কথা বলা তার স্বভাব, আসলে মনে মনে না ভেবে জোরে জোরে ভাবে সে তখন, তাই এমন মনে হয় কথাগুলো, মুক্তোই যদি আসল কথা হয়, তাহলে এর মাঝে কবুতর আসছে কি, করে? কবুতর ডিম পাড়ে, মতো পাড়ে না। যোগাযোগটা কোথায়?
হয়তো পাড়ে। সোনার ডিম-পাড়া রাজহাঁসের কিচ্ছা পড়নি... বাধা পেয়ে থেমে গেল মুসা।
ফোন বেজে উঠেছে।
লাইনের সঙ্গে যুক্ত স্পীকারের সুইচ অন করে দিয়ে রিসিভার তুলে নিল কিশোর। হ্যালো তিন গোৱেন্দা।
হ্যালো, কিশোর পাশা? পরিচিত কণ্ঠ, উদ্বিগ্ন। কিশোরকে চাই।
বলছি।
কিশোর, এক মুহূর্ত নীরবতা, থমকে গেছে বোধহয় লোকটা, কিংবা দ্বিধা করছে, আমাকে চিনতে পারছ? আমি, আমি, ওই যে দুই দিন আগে রেস্টুরেন্টে দেখা হয়েছিল। ভুলে বাক্সটা ফেলে গেছিলাম। পরে ফিরে গিয়ে ওয়েইট্রেসকে জিজ্ঞেস করে জানলাম, তোমরা নিয়ে গেছ। নানা ঝামেলায় আর খোঁজ নিতে পারিনি।
মাউথ পীসে হাত চাপা দিল কিশোর, ফিসফিস করে উত্তেজিত গলায় বলল, ক্লিকি।
হ্যালো? নার্ভাস মনে হচ্ছে ওপাশের লোকটাকে। হ্যালো। শুনছ?
শুনছি, বলুন, জবাব দিল কিশোর। বাক্সটা নিয়ে এসেছি আমরা, ঠিকই বলেছে ওয়েইট্রেস।
দীর্ঘ আরেক মুহূর্ত নীরবতা। হ্যালো, আছে তো এখন তোমাদের কাছে? আমার বাক্সটা?

আছে। চারকোণা বাক্স, চীজথে মোড়া, সেভাবেই আছে। আপনি ফেলে গেছেন দেখে নিয়ে এসেছিলাম, জানি ফোন করবেনই।
খুব ভাল করেছ, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল স্লেটার। তোমাদের একটা পুরস্কার পাওনা হয়েছে। বাক্সটা যদি নিয়ে আসো, পঞ্চাশ ডলার পাবে।
থ্যাংক ইউ। কোথায় আনব?
আমি জানি তুমি কোথায় থাকো.মানে অনুমান করেছি আরকি। রকি বীচ, না? তাহলে ট্রাসটি ব্যাঙ্কের পারকিং লটে সুবিধে বেশি।
ঠিক আছে। কখন আসব?
আজ রাত নটার দিকে? ঠিক আছে।
তাহলে রাত নটায় দেখা হচ্ছে, আবার নার্ভাস হয়ে পড়েছে লোকটা, কণ্ঠস্বরে সেটা স্পষ্ট।
লাইন কেটে গেল।
রিসিভার নামিয়ে রাখল কিশোর।
খাইছে বলে উঠল মুসা, একটা কবুতরের জন্যে পঞ্চাশ ডলার!
জবাব দিল না কিশোর। জোরে জোরে চিমটি কাটছে নিচের ঠোঁটে, গভীর ভাবনায় মগ্ন।
চীজক্লথটা রেখে দিয়েছি, বলতে বলতে ফাইলিং কেবিনেট খুলল রবিন। টমকে ছোট খাঁচায় ভরে আবার মোড়াবে?
পুরো এক মিনিট কোন কথা বলল না কিশোর, তারপর মাথা নাড়ল।
ব্লিংকির করাগুলো পর্যালোচনা করে দেখি আগে, জোরে জোরে ভাবতে শুরু করল সে, বলল, আমি জানি তুমি কোথায় থাকো...তারপর শুধরে নিয়ে বলল, মানে অনুমান করেছি আরকি। রকি বীচ, না? এটা জানা আর অনুমানের মধ্যে তফাতটা কোথায়? আমাদের কার্ডে তো রয়েছে কোন নম্বর, ঠিকানা জেনে নেয়াটা কোন ব্যাপারই না। দ্বিধা করেছে, তারমানে মিথ্যে কথা বলেছে, খুব ভালমতই জান, আমরা কোথায় থাকি, অনুমান-টমান কিছু না!
তাহলে সেই কবুতর বদল করেছে, বলল রবিন।
তাই তো মনে হয়। আমি মিছে কথা বলেছি, জানে সে। কিন্তু চেপে গেছে। আবার চীজথে মুড়ে যদি খাঁচাটা নিয়ে যাই, হাতে নিয়ে বলবে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ...
এবং পঞ্চাশ ডলার দেবে মনে করিয়ে দিল মুসা।
এবং ভাব দেখাবে, খাঁচার ভেতরে আগের কবুতরটাই আছে, সেভাবেই নিয়ে চলে যাবে। তারপর আর কোন দিন তার দেখা পাব না আমরা। এই কেসের মহামূল্যবান একটি মাত্র সূত্রও হাতছাড়া হয়ে যাবে।
কি করতে বলে তাহলে? জিজ্ঞেস করল রবিন।

চূড়ান্ত কিছু একটা করতে হবে। না মুড়েই খাঁচা নিয়ে তার সামনে হাজির হব, তাকে আমাদের কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দিতে বাধ্য করব। তোমার কি মনে হয় মুসা?
মাথা চুলকাল সহকারী-গোয়েন্দা। ঠিক আছে, যা ভাল বোঝে। পঞ্চাশ ডলার, হারাতে রাজি নই আমি। মেলা টাকা। তবে একটা কথা ঠিকই বলেই, এই রহস্যের সমাধান করতে চাইলে রিংকির মুখ খুলতে হবে আমাদের।
আরও কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনার পর বাড়ি রওনা হলো মুসা আর রবিন। সেই সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে, মা-বাবা নিশ্চয় দুশ্চিন্তা করছেন, রাতে আবার বেরোনোর আগে তাদের সঙ্গে অন্তত একবার দেখা করে আসা দরকার। ইয়ার্ডে আর ফিরবে না। ট্রাসটি ব্যাংকে পারকিংলটে চলে যাবে যার যার মত, নটার মিনিট দশেক আগে মিলিত হবে ওখানে।
সাড়ে আটটায় টমকে ছোট খাঁচায় ভরে সাইকেলের ক্যারিয়ারে খাঁচাটা বেঁধে নিল কিশোর। শহরের দিকে রওনা হলো।
ব্যাংকটা মেইন স্ট্রীটে, হ্যারিসের দোকান থেকে দূরে নয়। বিশাল সাদা বাড়িটার পেছনে পার্কিংলটে সাইকেল নিয়ে ঢুকে পড়ল কিশোর। ব্যাংক বন্ধ হয়ে গেছে, অল্প কয়েকটা গাড়ি আছে এখন টে। পারকিঙের জায়গাটাকে তিন দিক থেকে ঘিরে রেখেছে বিল্ডিং। আধো অন্ধকার সেখানে।
দেয়াল ঘেঁষে সাইকেলটা রেখে আলো নিভিয়ে দিল কিশোর, ক্যারিয়ার থেকে খুলে নিল খাঁচা।
চারপাশে তাকাল। অন্ধকারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ছয়-সাতটা গাড়ি। কোনটাতেই প্রাণের সাড়া নেই।
ঘড়ি দেখল কিশোর। পৌনে নটা। আর পনেরো মিনিট পরে প্রংকির আসার কথা। মুসা আর রবিন আসতে আর পাঁচ মিনিট। পার্কিংলটের প্রবেশ মুখে ওদের অপেক্ষায় থাকার সিদ্ধান্ত নিল সে। ওখানে আলো আছে যথেষ্ট, রর লাইটের আলো। পা বাড়াল।
এই ছেলে, থামো, পেছনের অন্ধকার ছায়া থেকে বলে উঠকেউ।
যা বলা হলো করল কিশোর। যেখানে ছিল সেখানেই অনড় হয়ে গেল, খাচটা দুহাতে পেটের সঙ্গে শক্ত করে চেপে ধরেছে।
আস্তে করে ঘোরো, আবার আদেশ হলো।
যতখানি আস্তে পারল ঘুরল কিশোর।
বিষণ্ন ছায়া থেকে বেরিয়ে এল লোকটা। সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে ডাক হাত। কিছু একটা ধরে রেখেছে। আধো অন্ধকারেও চমকাচ্ছে জিনিসটা।

আগ্নেয়াস্ত্রের ধাতব নল, চিনতে কোন অসুবিধে হলো না কিশোরের। চেঞ্জ সরাতে পারল না ওটার ওপর থেকে।
খাঁচাটা রাখো তোমার সামনে, মাটিতে, আদেশ দিল লেকট। ঝুঁকে রাখল কিশোর।
আরেকটু কাছে এল লোকটা। কিশোরের দিক থেকে নল না সরিয়েই উবু হলো, পরীক্ষা করে নিশ্চিত হলো কবুতরটা রয়েছে খাঁচার ভেতরে।
গুড।
সোজা হলো লোকটা। চকিতের জন্যে তার চেহাব স্পষ্ট দেখতে পেল কিশোর। উজ্জল কালো অয়েলস্কিন পরনে, চোখে কালো চশম, মুখ ঢেকে আছে দাড়িগোফ। রিচার্ড হ্যারিস।
ঘোরে, বলল লোকটা। উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ো মাটিতে।
লোকটার কণ্ঠস্বর অবাক করল কিশোরকে। নিচু পর্দ, কথা বলতে খুব কষ্ট হচ্ছে, যেন জোর করে বলছে। আমার চেয়ে কম ভয় পাচ্ছে না ব্যাটা-ভাবল কিশোর, এবং সেটা লুকাতে চাইছে।
শাসানোর ভঙ্গিতে নল নড়ল লোকটা।
আর দ্বিধা করল না কিশোর, যা বলা হলো, করল। শুয়ে পড়ল।
দুই হাত পেছনে, পিঠের ওপর তুলে আনো।
তুলল কিশোর। কানে এল হেঁড়ার শব্দ, টেনে কাপড় ঘেঁড় হচ্ছে নাকি, রোল থেকে অ্যাঢেসিভ টেপ হ্যাঁচকা টান দিয়ে ছাড়াচ্ছে? মুহূর্ত পরেই বুঝল, কি জিনিস। টেপ দিয়ে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বাঁধা হলো তার হাত, দড়ি কিংবা কাপড়ের ফালির চেয়ে অনেক শক্ত বাঁধন।
নড়ল না কিশোর। চমকে নলের চেহারাটা মনের পর্দায় উজ্জ্বল। চুপচাপ শুয়ে অনুভব করল, পা-ও বাধা হচ্ছে।
শুনল, চলে যাচ্ছে লোকটার পদশব্দ। পেছনে কোথাও গুঞ্জন তুলল গাড়ির এঞ্জিন, হেড লাইট জ্বলল। হাত-পা এমনভাবে বাঁধা, মাথা তুলতেও অসুবিধে হচ্ছে। তবু যতখানি পারল তুলল, সাবধানে, ঘুরে তাকাল।
চলতে শুরু করেছে গাড়ি। অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না গাড়ির বডি, চেনা না অচেনা বোঝা যাচ্ছে না। বিশগজ দূর দিয়ে চলে গেল গাড়ি, টায়ারের কর্কশ শব্দ তুলে মোড় নিয়ে নামল রাস্তায়, অদৃশ্য হয়ে গেল।
শুয়ে শুয়ে নিজেকে দোষারোপ করছে কিশোর। পারকিংলটে ঢোকার আগে মুসা আর রবিনের জন্যে অপেক্ষা করা উচিত ছিল। অন্ধকারে বোকর মত ঢুকে পড়েছে একা একা, লোকটাকে সুযোগ দিয়েছে।
গেটের দিক থেকে পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে। সাইকেলের লাইট দেখা গেল।

মুসা, ডাকল কিশোর। রবিন।
দুপাশ থেকে কিশোরের ওপর ঝুঁকে বসল দুই সহকারী গোয়েন্দা। কজি আর গোড়ালি থেকে টেপ তুলতে শুরু করল। চড়চড় করে রোম ছিড়ে নিয়ে উঠে আসছে টেপ, জ্বালা করছে, চামড়ায়।
আহত জায়গা ডলতে ডলতে জানাল কিশোর কি ঘটেছে।
নরম শিস দিয়ে উঠল মুসা, পিস্তল
তাই তো মনে হলো, উঠে দাঁড়াল কিশোর। গুলি ভরা ছিল কিনা জিজ্ঞেস করিনি, যদি আমার ওপরই প্রমাণ করে দেখাতে চায়। প্যান্টের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে ঝলল, তোমরা কিছু দেখেছ?।
মাথা ঝেকাল রবিন। গাড়ি দেখলাম একটা, কালো। ক্লিংকিরটার মতই মনে হলো। লাইসেন্স প্লেটে দেখলাম এম ওকে লেখা। ঠিক
রিংকির গাড়ির প্লেটে যে রকম লেখা ছিল বলল কিশোর। যেটাতে করে স্ন্যাকস রেস্টুরেন্টে গিয়েছিল। যেটা... নিশ্চিত নয়, তাই বাক্যটা শেষ করল না সে। রিচার্ড হ্যারিসের অলঙ্কারের দোকান থেকে বেরিয়ে সেদিন যে গাড়িটা দেখেছে, সেটার কথাই বলতে যাচ্ছিল। লাইসেন্স প্লেটের নাম্বার পুরোটা পড়তে পারেনি, তবে শুরুতে এম লেখাটা দেখেছে বলে মনে পড়ছে।
তো, এখন কি করা? মুসা বলল। টমকে নিয়ে গেছে হ্যারিস, রিংকি...
হ্যাঁ, মুসার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল রবিন, রিংকি এলে তাকে কি জবাব দেব?
ঘড়ি দেখল কিশোর। নটা বাজতে দুই মিনিট বাকি। কিছুই না, কারণ তার জন্যে.আর অপেক্ষাই করছি না আমরা। চলো কেটে পড়ি। যার যার বাড়ি চলে যাব। সকালে হেডকোয়ার্টারে আলোচনা হবে।
সাইকেল নিয়ে তাড়াতাড়ি পারকিংলট থেকে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা। সে রাতে ভাল ঘুম হলো না কিশোরের। মনে ভাবনার বোঝা। টমকে হারিয়েছে ওরা, চূড়ান্ত কিছু একটা করা সম্ভব হয়নি রংকির সঙ্গে, তাকে প্রশ্ন করা যায়নি। মিস, কারমাইকেলকে বলার কিছু নেই। তাঁকে গিয়ে বলা যাবে না; তাঁর বন্ধু রিচার্ড হ্যারিস পাখিগুলোকে খুন করেছে। প্রমাণ করতে পারবে না সেটা। যদি মিস কারমাইকেল জিজ্ঞেস করেন, সাধারণ দুটো পাখিকে খুন করে রিচার্ডের কি লাভ, জবাব দিতে পারবে না কিশোর। জবাব তার নিজেরই জানা নেই। আর সত্যি কি রিচার্ডই খুন করেছে পাখিগুলোকে?
এবারের কেসটায় বিশেষ সুবিধে করতে পারছে না তিন গোয়েন্দা। সূত্র একটা যা-ও ছিল হাতে, তা-ও খুইয়ে এসেছে। এখন একমাত্র ভরসা রিংকি, যদি সকালে

ফোন করে কৈফিয়ত চায়। অর্থাৎ যদি সে যোগাযোগ করে। তাহলে তাকে কয়েকটা প্রশ্ন করা যেতে পারে, যদিও ফোন করার সুবনাটা খুবই ক্ষীণ।
পারকিংলটে অপেক্ষা করাই বোধহয় উচিত ছিল, চলে এসে ভুল করলাম না তো? মনে একগাদা প্রশ্ন নিয়ে ঘুম ভাঙল কিশোরের। যতগুলো প্রশ্ন মনে নিয়ে ঘুমিয়েছিল, একটারও জবাব মেলেনি।
ইদানীং তার হয়েছে আরেক বিপদ, মেরিচাচীর হঠাৎ করেই খেয়াল হয়েছে, আজকাল খাওয়ার প্রতি কিশোরের বিশেষ আগ্রহ নেই। ফলে সকালে উঠেই গাদা গাদা গিলতে হয়। মেরিচাচী সামনে বসে থাকেন, ফাঁকি দেয়ার উপায় মেই। কিশোরের ধারণা, এতে তার চিন্তাশক্তি ব্যাহত হচ্ছে।
ঘুম থেকে উঠেই দেখল কিশোর, নাস্তা রেডি। টেবিলে বসে কাগজ পড়ছেন চাচী, কিশোরকে দেখেই কাগজটা সরিয়ে রেখে প্লেট.চামচ টানাটানি শুরু করলেন।
ডিম, মাংস, মাখন, পনির, রুটি, আপেল আর দুই গ্লাস দুধ খাঙ্খার পর মনে। হলো কিশোরের, আগামী এক বছর আর কিছু খাওয়ার দরকার হবে না। এরপরও যখন কয়েকটা আঙুল মুখে দেয়ার জন্যে চাপাচাপি শুরু করলেন চাচী, রেগে গেল কিশোর। মুখের ওপর বলে দিল, যদি এরকম করে, হলে সোজা গিয়ে শুয়ে পড়বে বিছানায়, বাকাচোরা পাইপের ব্যাপারে কোন সহযোগিতা করবে না। এত ভারি পেট নিয়ে না নড়তে পারে মানুষ, না কাজ করতে পারে?
ঠিক আছে ঠিক আছে, তাড়াতাড়ি হাত তুলে বললেন চাচী, এখন থাক। ঘণ্টাখানেক পরেই খাস।
গটমট করে বাইরে বেরিয়ে এল কিশোর। সোজা রওনা হলো ওয়ার্কশপে। ঢুকেই থমকে গেল। একটা বাক্সের ওপর বেশ আরাম করে বসে আছে পাখিটা। তাকে দেখেই চোখ ফিরিয়ে তাকাল।
কাছে গিয়ে পাখিটাকে তুলে নিল কিশোর। ডানা আর লেজের চকচকে পালকগুলো দেখল। না, কোন ভুল নেই। সাদা ফুটকিগুলো অবিকল এক। তাছাড়া পাখিটাও চিনতে পেরেছে তাকে, নইলে ধরা দিত না।
টম। ফিরে এসেছে।
টমই, মুসা বলল, কোন সন্দেহ নেই। এই যে লেজের সাদা ফুটকি, কয়েক বছর পর দেখলেও ঠিক চিনতে পারতাম। আমাদেরকেও চিনতে পেরেছে। পারিনি, টম?
হেডকোয়ার্টারে আলোচনায় বসেছে তিন গোয়েন্দা। আবার আগের জাগায়, বড়চায় ফিরে গেছে মৈ। দানা ঠুকরে খাচ্ছে, মাঝে মাঝে চোখ ফিরিয়ে তাকাচ্ছে এদিকে।

রিচার্ড হ্যারিস ছিনিয়ে নিল ওকে আমার কাছ থেকে নিচের ঠোঁটে জোরে জোরে চিমটি কাটছে কিশোর, কাউকে উদ্দেশ্য করে বলল না কথাগুলো। কয়েক ঘন্টা পর ছেড়ে দিল কবুতরটাকে ফিরে এল ওটা আবার আমাদের কাছে। কেন?
আমাদের কাছে ফিরে আসবে হয়তো ভাবেনি হ্যারিস, বলল রবিন।
মানে? ভুরু কোঁচকাল মুসা।
বইতে পড়লাম, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মেসেজ বহন করত রেসিং হোমার। মিলিটারি যখন অ্যাডভান্স করত, কবুতরগুলোকে খাঁচাশুদ্ধ করে নিত, নতুন জায়গায় আটকে রাখত কয়েকদিন, তারপর ছাড়ত। সঙ্গে সঙ্গে ছাড়লে আগের জায়গায় ফিরে যেত পাখিগুলো। এই কবুতরের স্বভাব হলো, পুরানো আশ্রয়ের কথা তাড়: তড়ি ভুলে যায়, দুতিন দিন অন্য কোথাও থাকলে সেটার কথাই মনে রাখে। সেখান থেকে সরিয়ে আরেক জায়গায় নিয়ে দু-তিন দিন রাখলে, এর আগেরটার কথা আবার ভুলে যায়। হয় তোলে, কিংবা যেতে চায় না, যেটাই হোক…
হুঁ, এজন্যেই তাহলে ফিরে এসেছে টম, মাথা দোলাল কিশোর। বলে ভালই করেছ, রবিন। পাখিটার মালিক বোধহয় রিচার্ড হ্যারিস নয়। আমাদের কাছ থেকে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। তার ধারণা ছিল, বাড়ি ফিরে যাবে টম। তা না গিয়ে চলে এসেছে এখানে, স্বভাবের কারণে।
এটাই এখন তোর বাড়ি, না টম? খাঁচার ফাক দিয়ে আঙুল ঢুকিয়ে-পায়রাটার, মাথায় ছোঁয়াল মুসা, আদর করল। তাই ফিরে এসেছিস। খুব খুশি হয়েছি।
কথায় বাধা পড়ল। লাউডস্পীকারে বেজে উঠল মেরিচাচীর কণ্ঠ। কিশোর। কিশোর।
কিশোরের এটা আরেকটা নতুন সংযোজন। ওরা হেডকোয়ার্টারে থাকলে দরকার পড়লে ডাকেন চাচী। অনেক কারণে সব সময় সে ডাক স্কাইলাইটের ভেতর দিয়ে শোনা যায় না। তাই ওয়ার্কশপে একটা মাইক্রোফোন লাগিয়ে দিয়েছে সে হেডকোয়ার্টারে স্পীকারের সঙ্গে যোগ করে দিয়েছে।
এই কিশোর, শুনছিস? আবার ডাক শোনা গেল। ডাকের ধরন বিশেষ সুবিধের মনে হলো না মুসার কাছে। বলেই ফেলল, আল্লাহরে। কি জানি নিয়ে এসেছে রাদেশ-চাচা! এবার হয়তো বেঁকাবঁকা ইলেকট্রিকের খাম্বা, দেড় টন করে ওজন একেকটার… বলতে বলতে দুই সুড়ঙ্গের ঢাকনার দিকে এগোল সে।
ওদিকে না, বাধা দিল কিশোর। স্কাইলাইট দিয়ে বেরিয়ে ওয়ার্কশপের পেছনে গিয়ে নামব, মিটিমিটি হাসছে সে।
জঞ্জালের ওপর দিয়ে নেমে এল ওরা। মেরিচাচী ওদের দিকে পেছন করে দাঁড়িয়ে আছেন ওয়ার্কশপে।

আস্তে গিয়ে চাচীর কাঁধে হাত রাখল কিশোর।
চমকে উঠলেন চাচী। ফিরে তাকালেন। এই দেখে শয়তান ছেলের কাণ্ড। এই বেরোলি কোথকেতোরা? ওদিকে তো সব জায়গা খুঁজে এলাম...।
জঞ্জালেতে বাসা আমার, আকাশ দিয়ে পথ,হেঁড়ে গলায় গান ধরল কিশোর, বলো শুনি,লক্ষ্মী চাম, তোমার কি বিপদ।
অবাক হয়ে কিশোরের দিকে চেয়ে রইলেন চাচী। চোখে শঙ্কা, ছেলেটার মাথা-টাতা খারাপ হয়ে যায়নি তো!
ভয় নেই, চাল, হেসে আশ্বস্ত করল রবিন। ওটা দা হাইমন অভ দ্য ব্যাটলের সুর। মিস কারমাইকেলের কাছ থেকে শিখে এসেছে।
কিন্তু শঙ্কা গেল না মেরিচাচীর। তাঁর মনে হতে লাগল, কোথাও কিছু একটা গোলমাল হয়েছে। সকালে বেশি খেয়ে ফেলায় কিশোরের পেটে পাঁচক রসের ক্ষণে বিঘ্ন ঘটেছে হয়তো, সেটা প্রতিক্রিয়া করেছে মাথায়। বললেন, কিসের সুর বললি?
ব্যাটল অভ দা হাইমস, আবার কাল রবিন।
এই কিশোর, খবরদার, আর কক্ষনো গাইবি না। যার গলায় যেটা মানায় না...।
বেশ গাইব না,শান্ত কণ্ঠে বলল কিশোর। তবে কথা দিতে হবে, আর কক্ষনো তুমিও খাওয়ার জন্যে চাপাচাপি করবে না।
ওহহো, ভুলেই গিয়েছি, এড়িয়ে যাওয়ার জন্যে তাড়াতাড়ি বললেন মেরিচাচী, দুজন লোক দেখা করতে এসেছে তোর সঙ্গে। গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছে, বলেই আর এক মুহূর্ত দাঁড়ালেন না। থাকলেই আবার কোন ফাঁদে ফেলে দেয় কিশোর। দ্রুত আগলেন।
সেদিকে চেয়ে মুচকি হাসল কিশোর। চলো, হাত নাড়ল দুই সহকারীর দিকে চেয়ে।
গেটের বাইরে রাস্তায় পার্ক করা একটা ভ্যানের কাছে দাঁড়িয়ে আছে লোকগুলো। দুজনেরই বয়েস তিরিশের কাছাকাছি, গায়ে চী-শার্ট, পরনে নী জিনসের প্যান্ট। দুজনেই জাপানী।
তোমরা তিন গোয়েন্দা? এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল একজন। কিশোর, মুসা আর রবিন?
হ্যাঁ, মাথা আঁকাল কিশোর।
মিস্টার মিটসুশিতাকে চেনো?
চিনি, জবাব দিল রবিন। ওই ভদ্রলোকের কাছেই মেসেজ অনুবাদ করাতে নিয়ে গিয়েছিল।

ফিরে সঙ্গীকে কি বলল লোকটা। জাপানী ভাষা, অনুমান করুল কিশোর। একই ভাষায় জবাব দিল সঙ্গী।
ও আমার বন্ধু, দ্বিতীয় লোকটাকে দেখিয়ে বলল প্রথমজন, নাম হ্যারিকিরি। ওর কয়েকটা প্রশ্ন আছে, জবাব দিলে খুব খুশি হবে। ইংরেজী জানে না। ওর হয়ে আমিই প্রশ্ন করছি, কেমন?
সম্মতি জানাল কিশোর।
শুড, বলে লোকটা। জাপানীতে লেখা একটা মেসেজ নিয়ে গিয়েছিলে মিস্টার মিটসশিয়ার কাছে। উনি হ্যারিকিরিকে বলেছেন সেকথা। তার হাতের লেখা চিনতে পেরেছেন।
প্রশ্ন নয়, কাজেই চুপ করে রইল কিশোর।
মেসেজটা কোথায় পেয়েছ? এবার প্রশ্ন।
ভাবছে কিশোর, জবাব না দিলেও পারে সে, তবে দিলে হয়তো তার কয়েকটা প্রশ্নের জবাবও মিলতে পারে। বলল, একটা মরা কবুতরের পায়ে আটকানো ছিল।
হাসল লোকটা। হ্যারিকিরির কাছে গিয়ে তার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল ভ্যান থেকে খানিক দূরে।
চেয়ে আছে রবিন, জাপানী ভাষায় কথা বলছে লোকগুলো। তার মনে হলো, দুজনেরই এক চেহারা, একই রকম কালো চুল, ঠেলে বেরোনো চোয়াল, হালকা বাদামী চামড়া। রাস্তায় হঠাৎ আরেকদিন দেখলে বলতে পারবে না, কে হ্যারিকিরি আর কে অন্য লোকটা!
হয় এ-রকম। এক দেশের লোক অন্য দেশের লোকের চেহারায় বিশেষ তফাৎ দেখতে পায় না—সব ক্ষেত্রে হয় না এটা। তবে সব চেয়ে বেশি হয় আফ্রিকান ও ককেশিয়ানদের, রবিনের তাই ধারণা।
কিশোরও স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে জনের দিকে। ফিসফিস করে বলল, সেই সবুজ ভ্যানটা, স্ন্যাকস রেস্টুরেন্টে যেটা দেখেছিলাম। এটাকে অনুসরণ করতে পারলে... জাপানী দুজন এখনও আলাপরত, সেদিকে চেয়ে থেকেই বলল সে, রবিন বীপারটা আনতে পারবে? ওরা যাতে সন্দেহ করতে না পারে।
দেখি চেষ্টা করে, ফিসফিসিয়ে জবাব দিল রবিন। কিশোরের কাছ থেকে সরে দাঁড়াল। পেছনে চেয়ে কান পেতে কি যেন শোনার ভঙ্গি করল, তারপর নোক দুজনকে শুনিয়ে জোরে জোরে বলল, কিশোর, মনে হচ্ছে ডাকছেন। যাই, শুনে আসি।
অপেক্ষা করল না রবিন, ঘুরে রওনা হয়ে গেল।

আবার ফিরে এল দুই জাপানী। হ্যারিকিরির সঙ্গী কিশোরকে বলল, আরেকটা প্রশ্ন, কোথায় পেয়েছ কবুতরটা?
এটাও ভেবে দেখল কিশোর। মিথ্যা বলতে বাধে তার, কিন্তু গোয়েন্দাগিরি এমনই একটা কাজ, সময়ে না বলেও পারা যায় না। এক্ষেত্রে মিছে কথা বলার দরকার আছে কিনা, ভাবল। সেটা কি অন্যায় হবে? বোধহয় না। কারণ, তার মক্কেলের সপক্ষে বলতেই হবে তাকে, আর মিস কারমাইকেল তার মক্কেল।
পথের ওপর পেয়েছি, মিছে বলল না কিশোর, কিন্তু খোলাসাও করল না।
কোন পথে?
শহরের পুব ধারের একটা পথ।
আবার হাসল লোকটা। তৃতীয় প্রশ্ন, কি করে মারা গেছে কবুতরটা, জানো?
না, সত্যই জানে না কিশোর। তবে জানতে পারলে ভাল হত।
দেখে কি মনে হয়েছে? গুলি-টুলি করে মেরেছে?
না, মাথা নাড়ল কিশোর। পেছনে পায়ের আওয়াজ শুনে বুঝল, রবিন আসছে। আর যেভাবেই মারা হোক, গুলি নয়, এটা ঠিক।
গুড। থ্যাংক ইউ, বলে হ্যারিকিরিকে নিয়ে গাড়ির দিকে রওনা হলো লোকটা।
পৌঁছে গেল রবিন।
দুই লাফে এগিয়ে গিয়ে প্রথম লোকটার বাহুতে হাত রাখল কিশোর। আমি তো আপনার কথার জবাব দিলাম, এবার আমার কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দেবেন, প্লীজ?
এইবার লোকটার ভাবনার পালা। ডেকে নিয়ে বলল, কি প্রশ্ন?
মেসেজে লেখা ছিল : আজ মুক্তো নেই। মিস্টার টিসুশিতা অনুবাদ করে তো তাই বললেন।
হ্যাঁ।
আড়চোখে রবিনের হাতের দিকে তাকাল কিশোর, ছোট্ট যন্ত্রটা আছে। লোকটার দিকে ফিরে বলল, এর মানে কি? বোকার অভিনয় খুব ভাল করতে পারে কিশোর, এ-মুহূর্তে তাকে দেখলে মনে হবে তার মত হাঁদারাম, মাথামোটা ছেলে দুনিয়ায় আর দ্বিতীয়টি নেই। কথাটার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝলাম না। কিসের মুক্তো, কিসের আজ? বোকার মতই হাত নাড়ল সে।
হ্যারিকিরির দিকে তাকাল লোকটা, এই সুযোগে পাশে দাঁড়ানো রবিনের গায়ে খোচা দিয়ে ইঙ্গিত করল কিশোর।
ফিরল লোকটা, হাসল। খুব সহজ। আমার বন্ধু হ্যারিকিরি তরকারির চাষ করে। খেত আছে। জাপানী পাড়ায় বাজারে বিক্রি করে সেই তরকারি। খেতগুলো

বাজার থেকে দূরে, উপকূলের কাছে। দোকানদাররা জানতে চায়, কি তরকারি আছে তার কাছে…
হাঁ করে আছে কিশোর, বোকা বোকা দৃষ্টিতে সামান্যতম পরিবর্তন নেই। চোখের কোণ দিয়ে দেখছে, ভ্যানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে রবিন।
পৌঁছল রবিন। পেছনের বাম্পারের কাছে দাঁড়িয়ে চট করে একবার নিচু হয়েই সোজা হলো।
…কাজেই খবর জানাতে হয় হ্যারিকিরিকে, বলে যাচ্ছে লোকটা। কবুতর দিয়ে মেসেজ পাঠাতে পয়সা লাগে না, তাছাড়া তাড়াতাড়িও হয়, তাই পুরানো পদ্ধতিই বেছে নিয়েছে আমার বন্ধু। লিখে দেয়? আজ শালগম আসছে, আজ বাঁধাকপি কিংবা গাজর।
হাত নাড়ল রবিন। দু-হাতের মুঠোই খোলা, তারমানে কাজ হয়ে গেছে।
তাই নাকি? খুব অবাক হয়েছে কিশোর। আপনার বন্ধু কি মুক্তোও কলায় নাকি? ওগুলো সজি না ফল?
জোরে হেসে উঠল লোকটা। মনে মনে আস্ত গর্দভ ভারছে কিশোরকে, বুঝল কিশোর। মুক্তো সব্জিও না, ফলও না। সাগরে হয়, বিনিকের পেটে, একধরনের মুল্যবান পাথর। আমার বন্ধু যে মুক্তোর কথা লিখেছে, সেটা পেঁয়াজ। মুক্তোপেঁয়াজ বলে।
অ। থ্যাংক ইউ, বলল কিশোর। আপনার কাছে অনেক কিছু জানা গেল।
কিশোরকে আরেকবার ধন্যবাদ জানিয়ে গাড়িতে গিয়ে উঠল লোকটা। তার পাশে কল হ্যারিকিরি। স্টার্ট নিল এঞ্জিন।
গাড়িটা মোড়ের কাছে পৌঁছতেই লাফিয়ে উঠল কিশোর। রবিন, জলদি, ট্র্যাকারটা।
বুদ্ধি করে নিয়েই এসেছে রবিন, গেটের ভেতরে এক জায়গায় রেখে এসেছে। এক ছুটে গিয়ে নিয়ে এল। ছোট একটা বাক্স মত, তাতে অ্যান্টেনা লাগানো। পুরানো আমলের একটা রেডিওকে পরিবর্তন করে বীপারের সিগন্যাল ধরার যন্ত্র বানিয়েছে কিশোর। সুইচ টিপে ডায়াল ঘেরাল সে।
বীপ। বীপ। বীপ।
সম্পষ্ট শব্দ ভেসে এল যন্ত্রটার স্পীকারে। কাজ করছে ভ্যানের বাম্পারে লাগানো বীপার, চুম্বকের সাহায্যে ওটাকে আটকে দিয়েছে রবিন।
অ্যান্টেনাটা দক্ষিণে ঘোরাল কিশোর।
আরও স্পষ্ট হলো বীপ-বীপ।
উপকূলের দিকে যাচ্ছে, বলল কিশোর। চলো, আমরাও যাই।

বলতে হয়নি, ইতিমধ্যেই এক এক করে তিনটে সাইকেল গেটের বাইরে নিয়ে এসেছে মুসা।
দ্রুত প্যাডাল ঘুরিয়ে চলেছে ওরা। নিজের সাইকেলের হ্যাণ্ডেলে ট্র্যাকারটা বেঁধে নিয়েছে কিশোর। এক হাতে হ্যাণ্ডেল ধরেছে, আরেক হাতে অ্যান্টেনার মাথা ঘোরাচ্ছে এদিক ওদিক। শব্দের কম-বেশি শুনে অনুমান করছে, কোনদিকে গেছে। ভ্যান।
গাড়ির খুব বেশি কাছে যাওয়ার দরকার নেই, এক মাইল দূর থেকেও সঙ্কেত দেবে বীপারটা। সহজেই অনুসরণ করতে পারছে কিশোর। গাড়ি এখন স্যান ফ্রানসিসকোর দিকে না গেলেই বাচি-মনে মনে বলল সে।
কয়েক মিনিট পুরোদমে প্যাডাল ঘোরানোর পর স্বস্তির নিঃশাস ফেলল কিশোর। সবুজ ভ্যানটা স্যান ফ্রানসিসকোর দিকে যাচ্ছে না, এমনকি সান্তা মনিকার দিকেও নয়। সোজা শহরের দিকে।
সিগন্যালের শব্দ পরিষ্কার বলে দিচ্ছে কোনদিকে কখন মোড় নিচ্ছে গাড়িটা। রকি বীচের মেইন টীট দিয়ে চলেছে এখন। ইশারায় গতি কমানোর নির্দেশ দিল দুই সহকারীকে কিশোর। সিগন্যাল, অনেক জোরাল, তারমানে খুব কাছেই রয়েছে গাড়ি। ট্রাফিক পোস্টে লাল আলো দেখে থেমেছে বোধহয়। তাড়াতাড়ি চলে ওটার একেবারে গায়ের ওপর গিয়ে পড়তে চায় না সে। রিয়ার ভিউ মিররে তাদের দেখে ফেলতে পারে হ্যারিকিরি বা তার সঙ্গী।
রিচার্ড হ্যারিসের অলঙ্কারের দোকান আর ট্রাসটি ব্যাঙ্ক পেরো ওরা। হঠাৎ থেমে গেল বীপ-বীপ। হাত তুলে মুসা আর রবিনকে থামার নির্দেশ দিল কিশের। এক পা মাটিতে নামিয়ে দিয়ে সাইকেলেই বসে রইল। এদিক ওদিক ঘোরল ট্র্যাকারের অ্যান্টেনা। বায়ে ঘোরাল, শব্দ নেই। পুরো ডানে ঘোরাতেই আবার শোনা গেল বীপ-বীপ।
সামনে পথটাকে আড়াআড়ি কেটেছে আরেকটা পথ, শহরের বাইরে বেরিয়ে ঘুরে ঘুরে উঠে গেছে পাহাড়ের ওপর। সে-পথেই এগিয়ে চলল তিন গোয়েন্দা।
রাস্তায় মোড় আর ঘোরপ্যাঁচ এত বেশি এখন, সিগন্যাল শুনে ভ্যানটাকে অনসকণ করা কঠিন হয়ে দাঁড়াল। এই আছে জোরাল বীপ-বীপ, পরক্ষণেই কমতে কমতে একবারে মিলিয়ে যাচ্ছে। সিগন্যাল ধরার জন্যে বার বার অ্যান্টেনা ঘোরাতে হচ্ছে, তবে বিশেষ ভাবছে না কিশোর। আন্দাজ করে ফেলেছে, কোথায় যাচ্ছে ভ্যান।
রকি বীচের উত্তর-পশ্চিমে নিচু পাহাড়শ্রেণীর ঢালের গায়ে আর পাদদেশে বেশ কিছু বাড়িঘর আছে। জায়গাটা লিটল টোকিও নামে পরিচিত, রকি বীচের জাপানী পল্লী।

লিটল টোকিওর সীমানায় পৌঁছেই আবার থামার নির্দেশ দিল কিশোর। শখানেক গজ দূরে একটা একতলা বাড়ির গাড়ি বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে সবুজ ভ্যান।
পথের ধারে সাইকেল রাখল তিন গোয়েন্দা, গাছের সারির আড়ালে লুকিয়ে চোখ রাখল বাড়িটার ওপর।
হ্যারিকিরির বাড়ি নাকি? বলল মুসা।
জবাব দিল না কিশোর। ভ্যানের দিকে তাকিয়ে আছে।
গাড়িবারান্দায় একজন লোক, গাড়িটার পাশ কাটিয়ে আসছে। বাড়ির ভেতরে থেকেই বেরিয়েছে মনে হয়। রাস্তায় এসে নামল লোকটা। আরেকটা লাল গাড়ি পার্ক করা ওখানে, তাতে চড়ে চলে গেল।
হ্যারিকিরি? শিওর হতে পারছে না রবিন। সব জাপানীর চেহারাই এক রকম লাগে তার কাছে।
না, মাথা নাড়ল কিশোর, তার সঙ্গী।
কিশোরের দৃষ্টিশক্তির ওপর পুরো আস্থা রয়েছে রবিনের, তবু জিজ্ঞেস না করে পারল না, কি করে বুঝলে?
সহজ। ওর হাঁটা, ওর চোখ, ওর কান। কেন, আরেকটা জিনিস খেয়াল করোনি? কোমরের কেষ্ট…আর প্যান্টে লেগে থাকা গ্রিজের দাগ?
খেয়াল করেনি রবিন। অতি সাধারণ জিনিস বলেই।
তাহলে, ধরে নিতে অসুবিধে নেই, ওটা হ্যারিকিরিরই বাড়ি, বিড়বিড় করল কিশোর, কিন্তু এই ধরে নেয়ার ব্যাপারটায় মোটেই সন্তুষ্ট হওয়া যায় না। শিওর হওয়া দরকার। ডাকবাক্সটায় নাম দেখলে বোঝা যাবে কার বাড়ি।
ডাকবাক্স দেখতে হলে বাড়ির কাছে যেতে হবে। বাক্সটা এপাশে আছে না ওপাশে, বলা যাচ্ছে না, ওপাশে থাকলে বাড়ির পাশ কাটিয়ে যেতে হবে।
রবিন তুমি যাও, বলল কিশোর। মুসা বেশি লম্বা। আমারও চুল বেশি কোঁকড়া, দূর থেকেই চোখে পড়ব দুজনে। জানালার কাছে যদি হ্যারিকিরি থাকে, সহজেই আমাদের চিনে ফেলবে। তোমার উইণ্ডচীটারটা খুলে চুলগুলো এলোমেলো করে নাও। আর দশজন আমেরিকান ছেলের সঙ্গে তোমার তফাত বুঝতে পারবে না সে, তুমি যেমন জাপানীদের আলাদা করে চিনতে পারো না।
ও-কে, আর দশটা সাধারণ ছেলের মতই দেখতে, জেনে খারাপ লাগছে রবিনের। তবে সে চোখে পড়ার মত নয় বলে গোয়েন্দাগিরিতে উন্নতি করতে পারবে ভেবে ভালও লাগছে। চিয়াত করে চেন টেনে উইচীটার খুলে কিশোরের হাতে দিয়ে রওনা হলো রবিন।
গাড়িবারান্দার ধারেই রয়েছে সাদা রঙ করা ডাকবাক্স। দেখেও থামল না রবিন, সোজা হেঁটে গেল আরও খানিকটা যেন এখানকার কোন কিছুর প্রতি কোন

আগ্রহই নেই তার-তারপর থেমে ফিরে তাকাল।
লেখা রয়েছে : এম হারিকিরি।
সাদা বাক্সে উজ্জল কালো কালিতে লেখা অক্ষরগুলো ফুটে রয়েছে। পড়তে কোন অসুবিধে হলো না। ঘুরে আবার পা বাড়াতে যাবে, এই সময়েই জাগল সন্দেহটা। মনে হলো, হ্যারিকিরির আগে আরেকটা নাম লেখা ছিল ঠিক ওই জায়গাটাতেই।
নিশ্চিত হতে হলে ভালমত দেখা দরকার। তার জন্যে আরও কাছে যেতে হবে। ঝুঁকিটা নেবে সে ঠিক করল।
ঠিকই সন্দেহ করেছে রবিন। সাদা রঙের প্রলেপ দিয়ে ঢেকে দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে আগের লেখা, তবে তেমন যত্ম নেয়নি, নইলে চোখে পড়ত না। কখন রঙ করা হয়েছে? সতর্ক দৃষ্টিতে বাড়ির দিকে তাকাল সে, কাউকে দেখা যাচ্ছে না। আরও এগোল, চলে এল বাক্সের একেবারে কাছে। ছুঁয়ে দেখল, আঠা আঠা লাগে। হুঁ, বেশিক্ষণ হয়নি, তাই এমন চকচকে। বাড়িও কি এই কিছুক্ষণ আগে বদলাল নাকি হারিকিরি?
কাজের কাজ করেছি একটা, নিজের প্রশংসা না করে পারল না রবিন। কিশোরও এর চেয়ে বেশি কিছু করতে পারত কিনা সন্দেহ। বন্ধুদেরকে খবরটা জানানোর জন্যে তাড়াতাড়ি ঘুরে রওনা হলো সে।
দুই কদম এগিয়েই শব্দ শুনে ফিরে তাকাল রবিন, স্থির হয়ে গেল পাথরের মত। গাড়িবারান্দার ওপার থেকে আসছে একজন লোক। বেঁটে, কালো কোট গায়ে, ডোরাকাটা প্যান্ট, মুখে দাড়িগোঁফের জঙ্গল। কালো চশমা নেই এখন চোখে।
এই ছেলে, শোনো, এই, ডাকল রিচার্ড হ্যারিস।
দৌড়ে পালাতে চাইল রবিন। পারল না। পা কথা শুনছে না। অনেক সময় দুঃস্বপ্নে যেমন প্রচণ্ড ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও হাত-পা নাড়ানো যায় না, অনেকটা যেন সেই রকম।
কাছে এসে দাঁড়াল হ্যারিস। লোকটার হাতে লাঠি নেই, কিন্তু তাতে কি? পকেটে পিস্তল তো থাকতে পারে।
ভালই হলো, বলল হ্যারিস, তোমাদেরকেই খুজছি মনে মনে।
ঠোঁট ভালমত দেখা যায় না, ফলে হাসছে কি না বোঝা গেল না। তবে চোখ দুটো আন্তরিকতা মাখানো বলে মনে হলো রবিনের।
অন্যেরা কোথায়? তোমার বন্ধুরা?
ভেবেছিল হাতও নড়াতে পারবে না, কিন্তু পারল, হাত তুলে দেখাল রবিন রাস্তার দিকে। হ্যারিসকে সঙ্গে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল।

সাইকেলের হ্যান্ডেলে বাধা ট্র্যাকারটা রবিনের উইণ্ডচীটার দিয়ে ঢেকে দিয়েছে কিশোর।
লিটল টোকিওতে প্রায়ই আসো তোমরা? জিজ্ঞেস করল হ্যারিস।
জাপানী রেস্টুরেন্টে খেতে আসি, জবাব দিল কিশোর। জাপানী খাবার মুসার খুব পছন্দ।
হ্যাঁ, ভাল খাবার। বিশেষ করে ফুজিয়ামা, আমিও যাই মাঝেমধ্যে, বলল হ্যারিস। হাসল কিনা বুঝতে পারল না রবিন। চলো না আজও যাই। আমি লাঞ্চ খাওয়াব তোমাদের?
দ্বিধা করছে কিশোর, কি জবাব দেবে? শেষবার যখন হ্যারিসের সঙ্গে দেখা হয়েছে, তার দিকে পিস্তল তাক করে রেখেছিল। তার আগের বার লাঠি দিয়ে বাড়ি মেরে মাথা ফাটিয়ে দিতে চেয়েছিল। সেই লোকই এখন লাঞ্চের দাওয়াত দিচ্ছে, ঘটনাটা কি?
ঠিক আছে, খাইয়ে যদি খুশি হন, অবশেষে বলল কিশোর। আমাদের আপত্তি নেই। থ্যাংক ইউ।
চলো তাহলে, হাঁটতে শুরু করল হ্যারিস। তাকে অনুসরণ করল তিন গোয়েন্দা, যার যার সাইকেল ঠেলে নিয়ে চলেছে।
কিশোরের কাছাকাছি রইল রবিন। ফিসফিস করে বলল, কি কি দেখে এসেছে।
নীরবে মাথা নোয়াল শু কিশোর।
রেস্টুরেন্টের বাইরে সাইকেল স্ট্যাণ্ডে তুলে রাখল ওরা।
ছেলেদেরকে নিয়ে কোণের একটা বড় টেবিলে এসে বসল হ্যারিস।
ওয়েইটার এসে জাপানী ভাষায় কিছু জিজ্ঞেস করল, হ্যারিসও একই ভাষায় জবাব দিল।
বাহ গহনার দোকানের মালিক দেখছি আবার ভাষাবিদও মনে মনে বলল মুসা। তা অর্ডার কি দিল? সাপ-ব্যাঙ না হলেই বঁচি এখন।
জাপানে ছিলাম কয়েক বছর,ছেলেদেরকে জানাল হ্যারিস। মুক্তোর ব্যবসা করতাম। সেখানেই ভাষাটা শিখেছি।
শুরুতেই চা নিয়ে এল ওয়েইটার। সবার কাপে কাপে ঢেলে দিল হ্যারিস। আবার চেয়ারে বসে বলল, জানালাম, তোমরা গোয়েন্দা।
এইবার হাসিটা দেখতে পেল রবিন। কিছু বলল না। অন্য দুজনও চুপ।
মিস কোরিন কারমাইকেল তোমাদের মক্কেণ, আবার বলল হ্যারিস। পাখি খুনের তদন্ত করছ।
মাথা নোয়াল কিশোর।

হ্যারিকিরি বলল একটা মরা কবুতরের পায়ে বাধা, একটা মেসেজ পেয়েছ তোমরা।
আবার মাথা নোয়াল কিশোর, মুখে কিছু বলল না।
বাজারে যে তরকারী সাপ্লাই দেয়, সে ব্যাপারে নাকি কিছু লেখা ছিল।
হ্যাঁ, মুক্তো-পেঁয়াজ, বলল কিশোর।
ওয়েইটার ফিরে আসায় আলোচনায় বাধা পড়ল। ছোট ছোট ডজনখানেক ডিশ টেবিলে নামিয়ে রেখে চলে গেল।
নীরবে খাওয়া চলল কিছুক্ষণ।
কবুতরটা কি মিস কারমাইকেলের বাগানে পেয়েছ? মুখ তুলল হ্যারিস।
না, কিশোরের মুখভর্তি সরু চালের ভাত, স্যামন মাছ, বাঁশের কোড় আর নোনা সালাদ, চমৎকার খাবার। গিলে নিয়ে বলল, রাস্তায় পেয়েছি। হ্যারিকিকে যা যা বলেছে, হ্যারিসকেও ঠিক তাই বলবে।
আবার নীরবে খেয়ে চলল হ্যারিস। শেষ করে ন্যাপকিন দিয়ে মুখ মুছল। তারপর হাত ঢোকাল পকেটে।
স্থির হয়ে গেছে মুসা, মুখের সামনে থেমে গেল কাঁটাচামচে গাথা মাছের টুকরো। পিস্তল বের করবে না তো লোকটা? এই প্রকাশ্য জায়গায় সাহস পাবে?
মানিব্যাগ বের করল হ্যারি।
ব্যাপার হলো কি জানো মিস কারমাইকেল আমার খুব ভাল বন্ধু, খুব দামী কাসটোমার, ক্ষণিকের জন্যে উজ্জ্বল হলো তার চোখ। পাখি কিরকম ভালবাসে জানি, ওগুলো মারা পড়লে কতখানি দুঃখ পায় তা-ও জানি। ওকে সাহায্য করতে চাই আমি, যতটা পারি, মানিব্যাগ থেকে পঞ্চাশ উলারের একটা নোট বের করে কিশোরের দিকে বাড়িয়ে ধরল। নাও, এটা রাখো। তোমাদের ফিরে কিছুটা, আগাম। তদন্ত চালিয়ে যাও। দরকার হলে আরও দেব। কে পাখিগুলোকে খুন করেছে, ব্যাগটা আবার পকেটে রাখতে রাখতে বলল, জানার চেষ্টা করো।
থ্যাংক ইউ, নোটটা নিয়ে পকেটে ঢোকাল কিশোর। আমাদের সাধ্যমত চেষ্টা করব।
হ্যাঁ, সাধ্যমতই করব, বাইরে বেরিয়ে সাইকেলের তালা খুলতে খুলতে আরেকবার বল কিশোর, চোখ হ্যারিসের দিকে চলে যাচ্ছে গহনার দোকানের মালিক।
নিশ্চয় কর, বলল মুসা, পঞ্চাশ ডলার… থেমে গেল কিশোরের দিকে তাকিয়ে।
চিন্তামগ্ন গোয়েন্দাপ্রধান, তার কথা শুনছে বলে মনে হলো না।
ওর দোকানে টমকে নিয়ে গেলাম, বিড় বিড় করল কিশোর। পায়রাটা তার প্রয়োজন হলে সে বল? হ্যাঁ, চিনেছি। জানি, কার। রেখে যাও, মালিকের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে আসব। মাথা নাড়ল সে, যেন কিছু একটা ব্যাপার বিশ্বাস হচ্ছে না।

তা না করে কাল : জীবনে দেখিনি। পায়রাটাকে নিয়ে বেরিয়ে এলাম, তা-ও কিছু বলল না। তারপর, পিস্তল দেখিয়ে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিল। থামল এক সেকেণ্ড, নিচের ঠোiটে চিমটি কাটতে কাটতে আবার মাথা নাড়ল। মিস কারমাইকেলের বাগানে রাতের অন্ধকারে লাঠি দিয়ে বাড়ি মেরে আমার মাথা ফাটিয়ে দেয়ার চেষ্টা করল। সবশেষে, আজ ডেকে এনে লাঞ্চ খাওয়াল...ভ্রুকুটি করল। হ্যাঁ, লাঞ্চ খাওয়াল। টাকাও দিল। পাখির খুনীকে ধরে দিতে পারলে আরও টাকা দেবে বলল। অবাকই লাগছে, এতগুলো পরস্পর বিরোধী কাণ্ড। কিন্তু সব চেয়ে অবাক করেছে রিচর্ড হ্যারিস, হঠাৎ যেন বাস্তবে ফিরে এল সে।
কি? খেই ধরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করল রবিন। বলো না, কি? কেন অবাক করল রিচার্ড হ্যারিস?
শুধু রাতের বেলা কালো কাচের চশমা পরে।
কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল মুসা, মাথা নেড়ে বারণ করছে কিশোর। কথা বলা বৃথা এখন। চেঁচামেচির জন্যে বোঝা যাবে না ঠিকমত, অযথা চেঁচিয়ে গলা ফাটানোই সার হবে।
হ্যারিস যেদিন লাঞ্চ খাইয়েছে তার পরদিন শেষ বিকেলের ঘটনা। সাইকেল নিয়ে মিস কারমাইকেলে বাড়ি এসেছে তিন গোয়েন্দা।
লিটল টোকিও থেকে বাড়ি ফিরে গিয়েই মহিলাকে ফোন করেছিল কিশোর, পরদিন সকালে তার বাড়িতে যাওয়ার অনুমতি চেয়েছিল। পেয়েছিল অনুমতি, কিন্তু সকালে বেরোতে পারল না। কোথা থেকে জানি বিশাল এক পুরানো রেফ্রিজারেটর আর কতগুলো বাতিল পুরানো আমলের লোহার চুলা নিয়ে এসেছেন রাশেদ পাশা। বরাবরের মতই চাচী গেছেন রেগে। তাদের ঝগড়া থামাতে হয়েছে কিশোরকেই, এরপর কাজে লাগতে হয়েছে। তার ওপর আগের রাতে হয়েছে বৃষ্টি। বাইরে চত্বরে ফেলে রাখা কিছু জিনিস মুছে গোছগাছ করতে করতে দুপুর। খেয়ে ইয়াভের আরও কিছু জরুরী কাজ সেরে বেরোতে বেরোতে একেবারে বিকেল।
আজ আর রাত করবে না, ভাবল কিশোর। কাজ শেষ করে রাতের আগেই ফিরে যাবে। কে জানে, আজ কি নিয়ে বোপের ভেতর অপেক্ষা করছে রিচার্ড হ্যারিস। হয়তো ইয়া বড় এক রাম দা। ঘাড়টা নাগালে পেলেই দেবে কোপ মেরে।
বেল বাজার সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিলেন মিস কারমাইকেল। কালো মখমলের লম্বা হাতাওয়ালা পোশাক পরেছেন, শোক প্রকাশের জন্যে। বার বার রুমাল দিয়ে চোখ মুছছেন। ছেলেদেরকে নিয়ে এলেন সাউণ্ড ঘরে।
দেখো, আর কিছুই বলতে পারলেন না, কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল। শুধু হাত তুলে দেখিয়ে দিলেন টেবিলের দিকে।

সাদা কাপড়ের ওপর পড়ে আছে আরেকটা বাজ পাখি।
টেবিলের দিকে এগোচ্ছে মুসা, কি মনে করে মিস কারমাইকেলের কাধ থেকে উড়ে এসে মুসার মাথার ওপর এক মুহূর্ত ফড়ফড় করল তোতাটা, তারপর কাঁধে বসে পড়ল।
কি নিষ্ঠুর! রীতিমত ফেঁপাচ্ছেন এখন মিস কারমাইকেল।
নিষ্ঠুর! প্রতিধ্বনি করল তোতাটা। নিষ্ঠুর নিষ্ঠুর!
মরা বাজটাকে পরীক্ষা করে দেখল কিশোর। আঘাতের কোন চিহ্ন নেই। অন্য বাজটার মত এটাকেও বোধহয় বিষ খাইয়ে মারা হয়েছে।
কখন পেয়েছেন এটা? জিজ্ঞেস করল সে।
সামলে নেয়ার চেষ্টা করলেন মিস কারমাইকেল, ফেঁপানী বন্ধ হয়েছে, তবে বার বার রুমাল দিয়ে চোখ মোছা থামেনি। এই তো, খানিক আগে।
কোথায়?
আগের জায়গায়, ঢোক গিললেন, আঙুল বোলালেন মুক্তার হারে। স্টীলকে যেখানে পেয়েছিলাম সেখানেই।
বাজের খাবার যেখানে রেখে আসেন?
নীরবে মাথা ঝোঁকালেন মিস কারমাইকেল।
মহিলার অবস্থা দেখে খারাপই লাগছে কিশোরের, সহানুভূতি জানিয়ে বলল, আপনার এখন মনের অবস্থা কেমন, বুঝতে পারছি। তবু দয়া করে কয়েকটা প্রশ্নের জবাব যদি দেন…
নীরবে মাথা কাত করলেন মিস কারমাইকেল। মুক্তার হারে আঙুল বুলিয়েই চলেছেন, বোধহয় বেদনা কিছুটা লাঘব হচ্ছে এতে।
চেষ্টা করব, বললেন তিনি।
আগের বার যখন এসেছিলাম, বলল কিশোর, আপনার পোষা দোয়েল, হীরা… থেমে গেল সে, আবার না পুরানো শোক মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে মহিলার, কেঁদে ফেলেন, তাহলে তার প্রশ্নের জবাব পাওয়ার আর আশা নেই।
কিন্তু কাঁদলেন না মিস কারমাইকেল, মাথা ঝাকালেন শুধু। আপনি বলেছেন, পাখিটা নাকি নানারকম জিনিস কুড়িয়ে আনার ওস্তাদ ছিল।
মুক্তো, প্রিয় অতীতের কথা মনে করে মলিন হাসি ফুটল মিস কারমাইকেলের ঠোঁটে। তিন তিনটে মুক্তো এনে দিয়েছিল আমাকে।
বলেছিলেন, দুটো দোয়েল আছে আপনার। আরেকটার নাম কি?
পান্না।
সে-ও কি জিনিস এনে দেয়?

মাঝেমধ্যে, রুমালটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখলেন মিস কারমাইকেল, আর কাঁদবেন না স্থির করেছেন বোধহয়, কিন্তু হীরার তুলনায় পান্না কোন কাজেরই না। যত সব অকাজের জিনিস কোত্থেকে গিয়ে নিয়ে আসে, একেবারেই বাজে।
মরা বাজটার দিকে চেয়ে আনমনে ঠোঁট কামড়াচ্ছে কিশোর। কখনও কোন মেসেজ এনে দিয়েছে?
মেসেজ?
এই, কাগজের টুকরো। তাতে লেখা-টেখা কিছু?
না আনেনি। তেমন কিছু কখনও আনলে মনে থাকত। এই তো, আজ সকালে দেখো না, কি এনেছে। দেখতে চাও?
অবশ্যই দেখতে চায়, জানাল কিশোর।
সাইড টেবিলের ওপর থেকে একটা কাঁচের অ্যাশট্রে নিয়ে এলেন মিস কারমাইকেল। বাড়িয়ে ধরলেন কিশোরের দিকে।
দেখল কিশোর। চুল দিয়ে পাকানো খুদে একটা বল। হাতে নিয়ে পরীক্ষা করল সে। খসখসে, কালো কোঁকড়ানো চুল দিয়ে তৈরি। দোয়েল পাখির আজব খেয়াল, অনেক সময় নিয়ে ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে আশ্চর্য নৈপুণ্যে বানিয়েছে বলটা। মিস কারমাইকেলের অনুমতি নিয়ে যত্ন করে বলটা পকেটে রেখে দিল কিশোর। আচ্ছা, কোথায় পেয়েছে এটা, বলতে পারবেন?
না, অ্যাশট্রেটা আবার আগের জায়গায় রেখে এলেন মিস কারমাইকেল। হীরা ও মুক্তোগুলো কোত্থেকে এনেছিল, জানি না।
জানালার বাইরে তাকাল কিশোর। বেলা শেষ, তবে আঁধার হতে এখনও ঘণ্টা দুই বাকি। মুসা আর রবিনকে বলল, চলো যাই, আরেকবার ঘুরে দেখিগে বাগানে। মিস কারমাইকেলের দিকে ফিরল, আপনার আপত্তি নেই তো?
না না, আপত্তি থাকবে কেন? তোমরা যা করছ আমার জন্যে, কে কার জন্যে করে? মিস্টার হ্যারিসের কাছেও আমি ঋণী। কিন্তু বাবা, কিছু মনে কোরো না, আমি তোমাদের সঙ্গে যেতে পারছি না। সইতে পারব না, রুমাল রে করলেন তিনি।
আবার যদি কিছু দেখি... গলা কেঁপে উঠল তার।
ঠিক আছে ঠিক আছে, আপনি থাকুন, তাড়াতাড়ি হাত নাড়ল কিশোর।
বিশাল জানালা দিয়ে কোলাহলের মধ্যে বেরিয়ে এল ওরা। তোতাটা বসে আছে মুসার কাঁধে। ওদের সঙ্গে বাগানে ঘোরার ইচ্ছে হয়েছে বুঝি। মুসা থাকতে দিল পাখিটাকে, টমের মতই তোতাটাকেও পছন্দ হয়েছে তার।
লনের প্রান্তে খোয়া বিছানো পথের ধারে এসে থামল ওরা। খানিক দূরে গাছ, যেটার তলায় মরে পড়ে ছিল দুটো বাজপাখি। আজ জায়গাটা পরিষ্কার। মাংসের

টুকরো পড়ে নেই, পায়ের ছাপ নেই।
চলো, বনের দিকে দেখিয়ে চেঁচিয়ে বলল কিশোর, আলাদা হওয়ার দরকার নেই। এক সঙ্গে যাই।
সেটাই ভাল, গলা ফাটিয়ে জবাব দিল মুসা। রিচার্ড হ্যারিসের লাঠির বাড়ি খেতে চাই না। তার মেজাজ আজ ভাল না মন্দ কে জানে।
এক ঘণ্টা ধরে ঘোরাঘুরি করল তিন গোয়েন্দা, বনের ভেতর, ঝোপের ধারে, সরু পথে। বৃষ্টিতে ভিজে মাটি নরম হয়ে আছে কোথাও কোথাও। আজ আর কারও সঙ্গেই সাক্ষাৎ হলো না।
অবশেষে বনের ধারে ঘাসে ঢাকা ছোট একটা খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল ওরা। আশ্চর্য নীরবতা এখানে। কোলাহলকারী পাখিরা যেন এড়িয়ে চলে জায়গাটাকে, ওদের কলরব অনেক পেছনে।
শুকনো জায়গা দেখে বসে পড়ল কিশোর। হাঁপিয়ে উঠেছে, জিরিয়ে নেবে।
মুসা পা ছড়িয়ে বসল তার পাশে। খানিকদূরে একটা গাছে হেলান দিয়ে বসল রবিন!
প্রায় মিনিট পাঁচেক গেল। একটা রবিন এসে বসেছে তাদের কয়েক গজ সামনে, ভেজা মাটি থেকে ঠুকরে কেঁচো বের করে খাচ্ছে। আনমনে পাখিটাকে দেখছে মুসা।
নাহ, এবার ওঠা দরকার। উঠতে যাবে কিশোর, এই সময় একসঙ্গে তিনটে ঘটনা ঘটল, চোখের পলকে।
আঙ্কে চিৎকার দিয়ে তোতাটা উড়ে গেল মুসার কাঁধ থেকে। মাথা তুলে আকাশের দিকে চেনেই চমকে গেল রবিনটা। কালে! একটা ছায়া পাথরের মত এসে পড়ল তার ওপর। পালানোর কোন সুযোগই পেল না পাখিটা। ভয়ানক এক শিকারী বাজ নাপিয়ে পড়েছে। ধারাল নখ আর ঠোঁট দিয়ে টেনে টেনে রবিনের শরীরটা নিমেষে ছিড়ে ফেলে, যা যা খাওয়ার বের করে নিল বাজ। মাংসটা নখে ঝুলিয়ে নিয়ে উড়ে চলে গেল রকেটের মত। মাটিতে পড়ে রইল শুধু রবিনের মাথা, পা দুটো আর কয়েকটা রক্তাক্ত পালক।
পুরো এক মিনিট কোনও কথা বলতে পারল না তিন কিশোর। ঘটনার আকস্মিকতায় বোবা হয়ে গেছে যেন ওরা।
গাছের ডাল থেকে ফিরে এসে আবার মুসার কাঁধে বসল তোতাটা। নিষ্ঠুর! চেঁচিয়ে উঠল তীক্ষ্ণ স্বরে। নিষ্ঠুর! নিষ্ঠুর!
ঠিকই বলেছিস, পাখিটার সঙ্গে একমত হলো কিশোর। তবে রবিনটা জীবন দিয়ে জানিয়ে দিয়ে গেল আমাদের, দুআঙুলে পায়রাটাকে কে খুন করেছে।

এবং কেন বাজ মারছে কেউ,যোগ করল রবিন। রেসিং হোমারদের খুন করে বলেই তো বাজ মারে, নাকি?
হ্যাঁ, পকেট থেকে কাগজে মোড়া চুলের বলটা বের করল কিশোর। মোড়ক খুলে তাকাল। কিন্তু কে বিষ খাওয়াচ্ছে জানি না এখনও। হীরাকে পিটিয়ে মেরেছে কে, তা-ও জানি না। উঠে দাঁড়াল সে। পায়ের ছাপ, চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল, গতরাতে বৃষ্টি হয়েছে, মাটি জায়গায় জায়গায় এখনও ভেজা, ছাপ থাকতে বাধ্য। আমরা খুঁজে পাইনি, কিন্তু আছেই। আকাশের দিকে তাকাল। এসো, যাই। আরও. এক ঘণ্টা আলো থাকবে। এবার ভাগ হয়ে তিন দিকে চলে যাব, ছড়িয়ে পড়ে খুঁজব। মুসা, তুমি এদিকে যাও, রবিন তুমি ওদিকে। মাটিতে প্রতিটা ইঞ্চি দেখবে, বিশেষ করে কাদামাটি যেখানে আছে।
কিছু দেখলে কিভাবে জানাব? জিজ্ঞেস করল রবিন। কি সঙ্কেত?
আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি, সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল কিশোর। জোরে জোরে গাইবে।
দি হাইমস অভ দা ব্যাটল?
না। অন্য সুর। এসো, আমার সঙ্গে সঙ্গে গাও। আমার সোনার বাংলা…
কিশোরের সঙ্গে সঙ্গে বার কয়েক গেয়ে প্র্যাকটিস করে নিল মুসা আর রবিন। তারপর নিজে নিজে গাইল, কিশোরের চেয়ে গলা ডাল দুজনেরই, রবিন তো মৎকার গাইল।
পায়ের ছাপ খোঁজার জন্যে তিনদিকে ছড়িয়ে পড়ল ওরা। মুসা জে পেল, মিনিট পনেরো পরে। সরু পথ ধরে এগিয়ে গেছে একজোড়া বুটের ছাপ, ভেজা নরম মাটিতে বেশ গভীর হয়ে বসেছে।
দাঁড়িয়ে পড়ল মুসা। মলে নিভে আসছে দ্রুত! রাতের সাড়া পেয়েই কলরব কমিয়ে দিয়েছে পাখির দল, শব্দ এখন অনে? কম। আবছা অন্ধকার বনপথ দাঁড়িয়ে অকারণেই গা ছমছম করে উঠল মুসার। ভয়ে ভয়ে তাকল চারদিকে, মাথায় ডাণ্ডা মারতে আসছে ন-তে আবার কেউ?
গান গাওয়ার জন্যে মুখ খুলল মুসা।
কিন্তু সুর ভুলে গেছে। অথচ তখন বেশ গেয়েছিল, এত তাড়াতাড়িই ভুলে গেল? গেছে, কি আর করবে। চেষ্টা করল, আ-আমার সোনার দূর হচ্ছে না। আবার চেষ্টা করল। হলো না।
আমার সোনার বাংলা, গেয়ে উঠা কাঁধে বসা তোতাটা, চমৎকার শিখে নিয়েছে, সুরও বেশ হয়েছে।
ধন্যবাদ, তোতামিয়া, হেসে আলতো চাপড় দিয়ে পাখিটাকে আদর করা মুসা। সাধনা করলে ওস্তাদ হতে পারতে। গলা চড়িয়ে গাইল, আমার সোনার বাংলা

আমি তোমায় ভালবাসি।
কাছাকাছিই রয়েছে কিশোর আর রবিন, সাড়া মিলল সঙ্গে সঙ্গেই।
মিনিটখানেক পরই আবার একসাথ হলো তিনজনে।
গভীর মনোযোগে বুটের ছাপগুলো দেখল কিশোর। পকেট থেকে আবার বের করল চুলের বল। তাড়াতাড়িই পেয়েছ, মুসা, গুড। এগুলো হ্যারিসের নয়। গতকাল ওর সঙ্গে লাস্থ করার সময় ভালমত দেখেছি ওর জুতো। অনেক ছোট পা, জুতোর নাক ভোঁতা। সুতরাং, চুলের বনটার দিকে তাকিয়ে বলল, এটা হ্যারিসের দাড়ি নয়। কাটা ঝোপে আটকে তার দাড়ি ছেড়েনি, যেটা খেলার সময় পেয়ে গিয়ে বল বানিয়েছে পান্না।
আপাতত আর কিছু দেখার নেই। বন থেকে বেরিয়ে এল ওরা, যেখানে সাইকেল রেখেছে সেখানে।
দোতলায় মিস কারমাইকেলের শোবার ঘরে আলো জ্বলছে। কিশোর অনুমান করল, তিনি শুয়ে পড়েছেন, ঘুমিয়ে শোক ভুলতে চাইছেন।
তাঁকে জানানোর মত এখনও কিছু আবিষ্কার করিনি আমরা, কারও উদ্দেশে কথাগুলো বলছে না কিশোর। যা জানি, শুধুই অনুমান।
রংকির পায়ের ছাপ সন্দেহ করছ? রবিনের মনে পড়েছে, কিশোর বলেছিল, স্ন্যাকস রেস্টুরেন্টে চোখা মাথাওয়ালা বুট পরা ছিল সেটারের পায়ে।
তাকে পয়লা সন্দেহ, মাথা ঝাঁকিয়ে বলল কিশোর। দ্বিতীয় সন্দেহ হারিকিরি। আমার ধারণা, সমস্ত রহস্যের চাবিকাঠি ওই জাপানীটা।
কেন? জানতে চাইল মুসা।
মেসেজটা হ্যারিকিরিই লিখেছে : আজ মুক্তো নেই, এক আঙুল তুলল কিশোর। দুই আঙুল তুলে বলল, লিটুল টোকিওয় হ্যারিকিরির বাড়িতেই গিয়েছিল রিচার্ড হ্যারিস। তিন আঙুল তুলল, আর স্ন্যাকস রেস্টুরেন্টে হ্যারিকিরির জন্যেই
অপেক্ষা করছিল ব্লিংকি।
হুঁ, মাথা দোলাল মুসা, পরিষ্কার হচ্ছে।
রবিনের সৌজন্যে জেনেছি, কেন অপেক্ষা করছিল ব্লিংকি, আর কেনই বা ছুটে গিয়েছিল সবুজ ভ্যানকে অনুসরণ করার জন্যে।
আমার সৌজন্যে? ভুরু কোচকাল রবিন।
হ্যাঁ, তাই তো। তুমিই তো দেখে এসেছ, হ্যারিকিরির ডাকবাক্সে নতুন রঙ করা হয়েছে, তারমানে নতুন বাড়ি বদলেছে জাপানীটা। এটাই জানতে চেয়েছিল রিংকি কোথায় নতুন বাড়ি নিয়েছে হ্যারিকিরি।
কেন?

সেটাই জানতে হবে আমাদের। হ্যারিকিরির সঙ্গে ব্লিংকির কি সম্পর্ক, আর মুক্তোরই বা কি সম্পর্ক।
এক মুহূর্ত চুপ থেকে বলল কিশোর, সবুজ ভ্যানটাকে আবার অনুসরণ করতে হবে আমাদের। জানার এটাই একমাত্র উপায়।
বীপার তো লাগানোই আছে, বলল মুসা।
মাথা নাড়ল কিশোর। এটা দিয়ে আর কাজ হবে না। নিশ্চয় এতক্ষণে ব্যাটারি ফুরিয়ে গেছে। হ্যারিকিরির বাড়ি গিয়ে ব্যাটারি বদলে দিয়ে আসা খুব ঝুঁকির ব্যাপার।
তাহলে?
কাজটা তোমাকেই করতে হবে, মুসা, গোয়েন্দা-সহকারীর দিকে তাকাল কিশোর।
ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল মুসা। দু-হাত নেড়ে বলল, হ্যাঁ, এই ভয়ই করছিলাম। কপালই খারাপ। যত কঠিন আর ঝুঁকির কাজ, সব এই মুসা আমানের ঘাড়ে। কি আর করব, মাথায় তো আমারই সইবে,চোখ নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল
তা জনাব, কাজটা কি?
নিষ্ঠুর! চেঁচিয়ে উঠল তোতা। নিষ্ঠুর নিষ্ঠুর!
দূর ব্যাটা! তিক্ত কণ্ঠে বলল মুসা। চুপ থাক!
তোতাটাও বল, দূর ব্যাটা! চুপ থাক!
পরদিন খুব ভোরে অন্ধকার থাকতেই উঠে পড়ল মুসা। তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুয়ে জনসের প্যান্ট পরে নিল। ধূসর সোয়েটার গায়ে দিল। তারপর মীকার পায়ে দিয়ে পা টিপে টিপে নেমে এল নিচে, রান্নাঘরে, যা-ই পাওয়া যায় কিছু মুখে দিয়ে বেরোবে।
রান্নাঘরের টেবিলে পড়ে আছে একটা কালো সানগ্লাস, গতরাতে নিশ্চয় তার বাবা ফেলে গেছেন। চশমাটা নেবে কি নেবে না তবতে ভাবতেই গিয়ে ফ্রিজ খুলল। ঠাণ্ডা কেক ছাড়া আর কিছু নেই, তা-ই বের করে নিল গোটা দুয়েক, তারপর একটা গ্লাসে দুধ ঢেলে নিয়ে এসে বসল টেবিলে।
চশমা পরলে কি তার চেহারা বদলে যাবে? তাকে দেখলে তখন চিনতে পারবে হ্যারিকিরি?
চশমাটা নেবে ঠিক করল মুসা। দরকার হলে পরতে পারবে। খাপসুদ্ধ চশমাটা নিয়ে বেরিয়ে এল সে। ছাউনির তলায় রাখা আছে দুটো সাইকেল। তার মধ্যে। একটা দশ গীয়ারের ইংলিশ রেসার, মুসার খুব প্রিয়, গত জন্মদিনে বাবা উপহার দিয়েছেন। সাইকেলটাকে খুব যত্ন করে সে। পুরানো সাধারণ সাইকেলটা সব সময় ব্যবহার করে, অন্যটা বের করে বিশেষ দরকার পড়লে। ঘণ্টায় তিরিশ

মাইল গতিতে সহজেই চলতে পারে ইংলিশ রেসার, সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘণ্টায় চল্লিশ।
আদর করে সাইকেলটার গায়ে চাপড় দিল মুসা, ঘোড়াপ্রেমিক যেমন তার প্রিয় ঘোড়ার গায়ে চাপড় দেয়। ছাউনি থেকে বের করে চড়ে বসল।
দশ মিনিটেই পৌঁছে গেল লিট টোকিওর সীমান্তে। রাস্তার ধারে গাছপালার আড়ালে সাইকেলটা পার্ক করে একটা শেকড়ে বসল সে, চোখ রাখল হ্যারিকিরির বাড়ির দিকে।
ঠিক সময়েই এসেছে মনে হচ্ছে। গাড়িবারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে সবুজ ড্যান, পোর্টিকোয় আলো জ্বলছে।
পুব পাহাড়ের মাথায় সবে উঁকি দিয়েছে সূর্য, এই সময় নীল একটা সেডান এসে থামল বাড়ির সামনে। একজন লোক নেমে হেঁটে গেল গাড়িবারান্দার দিকে। কালো কোট, ডোরাকাটা প্যান্ট, মুখভর্তি দাড়িগোঁফ, নোকটা রিচার্ড হ্যারিস ছাড়া আর কেউ না, মুসা শিওর। আলো খুব স্পষ্ট নয়, কিন্তু এতবার এই পোশাকে দেখেছে লোকটাকে, ভুল হতে পারে না তার।
কালো চশমা পরেনি হ্যারিস, হাতে একটা বাক্সমত জিনিস, সম্ভবত খবরের কাগজ মোড়া। ভ্যানের পেছনের দরজা খুলে প্যাকেটটা ভেতরে রাখল সে।
পোর্টিকোর আলো নিভে গেল।
ভ্যানের দরজা বন্ধ করে ফিরে এল হ্যারিস, সবুজ গাড়ি নিয়ে চলে গেল।
আবার গাছে হেলান দিল মুসা। মিনিট দশেক পর হ্যারিকিরির বাড়ি থেকে একজন জাপানী বেরিয়ে সবুজ ভ্যানের দিকে এগোল।
রবিনের মতই দ্বিধায় পড়ল মুসা, কে লোকটা? হ্যারিকিরি না তার সঙ্গী দোভাষী সেই জাপানী?
মনে পড়ল, কিশোর বলেছে, দোভাষীর পরনে ছিল চওড়া বেল্ট, জীনসের প্যান্টে গ্রীজের দাগ। ভালমত দেখল মুসা, কিন্তু বেল্ট পরেনি এলাকটা, প্যান্টেও দাগ নেই। তারমানে, হ্যারিকিরি। মোটা সুতার রঙ চটা পোশাক পরেছে, হাতে একটা ধাতব বাক্স, লাঞ্চ বক্স।
গাছের আড়াল থেকে সাইকেল বের করে পিছু নেয়ার জন্যে তৈরি হলো মুসা।
পেছনের দরজা খুলল না হ্যারিকিরি, এমনকি পেছনের জানালা দিয়ে ভেতরেও চেয়ে দেখল না। ড্রাইভিং সীটে উঠে এঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে গাড়ি পিছিয়ে বের করে আনতে শুরু করল।
রাস্তায় সাইকেল মামাল মুসা।
গাড়ি পথের শেষ মাথায় এসে ডানে মোড় নিল ভ্যান, তারপর সোজা ছুটে এল মুসার দিকে। এটা আশা করেনি সে, তাড়াতাড়ি সাইকেল নিয়ে ঢুকে পড়ল আবার

গাছের আড়ালে।
সাঁ করে ছুটে চলে গেল ভ্যান।
আস্তে আস্তে দশ পর্যন্ত গুণল মুসা, তারপর গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে পিছু নিল গাড়ির।
পাহাড়ী পথ ধরে শহরের দিকে ছুটে চলেছে ভ্যান, অনুসরণ করতে কোনই অসুবিধে হলো না মুসার। মেইন স্ট্রীটে পড়ে আরও সুবিধে হয়ে গেল, একটা নিদিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে পিছে পিছে চলল সে।
কোস্ট রোডের দিকে মোড় নিল ভ্যান। গতি বাড়ছে ওটার, মুসাও বাড়াচ্ছে সাইকোটার গতি এভাবে পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ হয়নি আগে, খুশিই হলো নে, গাড়ির একশো গজ পেছনে থেকে প্যাডল ঘুরিয়ে চলেছে দ্রুত, আরও দ্রুত।
স্ন্যাকস রেস্টুরেন্টকে যখন পাশ বাড়াচ্ছে...তিরিশ...পঁয়তিরিশ...চল্লিশ, টপ গীয়ারে চলছে এখন সাইকেল।
কয়েক মিনিট পর উইস বীচ পেরোল ওরা। এখানকার সৈকতে ক্যাম্প করার অনুমতি আছে, তবে আগুন জ্বালানো নিষিদ্ধ। ঝকঝকে বালিতে কয়েকটা তার টানো। একটা তবু থেকে একটা মেয়ে বেরিয়ে এল। মুসার দিকে হাত নাড়ল। কি ব্যাপার? পরিচিত কেউ নাকি? কিন্তু ভালমত খেয়াল করার সময় এখন নেই তার।
উইলস বীচের মাইল দুয়েক দূরে সাগরের দিকে মোড় নিয়েছে রাস্তাটা। দূরে সাগরের দিকে তাকাল সে তৃষিত নয়নে। বড় বড় ঢেউ ভাঙছে। গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার ইচ্ছেটা অনেক কষ্টে রোধ করল।
চোখ ফিরিয়েই চমকে গেল! সহসা ব্রেক চেপে ধরায় তীব্র প্রতিবাদের ঝড় লল সাইকেলের টায়ার, কর্কশ আর্তনাদ করে পিছলে গেল কয়েক গজ, ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে দাঁড়াল।
ভ্যানের পেছনের লাল লাইট জ্বলছে আর নিভছে, হুশিয়ার করে দিচ্ছে পেছনের যানবাহনকে।
হ্যান্ডেল চেপে ধরে সীটেই বসে রইল মুসা। সামনে থেমে গেল ভ্যান। মনে পড়ল, হ্যারিকিরির সদাসতর্ক দৃষ্টির কথা। জাপানীরাই কারাতে নামক ভয়ঙ্কর মারপিটের আবিষ্কর্তা, কথাটা মনে হতেই মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল তার। তৈরি হয়ে গেল পালানোর জন্যে। একটু এদিক ওদিক দেখলেই ছুটে পালাবে। লজ্জা কিসের, কেউ যদি না দেখল? এখানে তার বন্ধুরা কেউ নেই, টিটকারি মারার মত শত্রুও নেই। শুটকি টেরির কথা মনে পড়ল হঠাৎ করেই। সেই যে করে নিউ ইয়র্ক গেছে টেরিয়ার ডয়েল, আর দেখা নেই, ফেরেনি রাক বীচে। কড়া শাসনে রেখেছে বোধহয় তার বাবা। শুটকিকে পছন্দ করে না তিন গোয়েন্দা, কিন্তু ও না থাকলে জমে না।

চলতে শুরু করেছে সবুজ ভ্যান। ধীরে ধীরে এগিয়েই মোড় নিল বলে।
সাগরের দিকে চলে গেছে একটা সরু পথ, এতক্ষণ দেখেনি মুল, খেয়ালই করেনি। সাবধানে প্যাডাল ঘোরাল সে। থেমে গেল মোড়ে এসে। গজ তিরিশেক দুরে একটা পার্কিং লটে গিয়ে শেষ হয়েছে সরু পথ। তারপরে মোটা কাটা তারের বেড়া, গেট। তার ওপাশে কাঠের একগুচ্ছ কুড়ে।
পার্কিং টে থামল সবুজ ভ্যান।
কড় রাস্তার ধারে বনতুলসীর ঝাড় ঘন হয়ে জন্মেছে, সাইকেলটা তার মধ্যে শুইয়ে নিজেও ঝাড়ের ভেতর উপড় হয়ে শুয়ে পড়ল মুস!। দেখন, ভ্যান থেকে নেমে লাঞ্চ বক্স হাতে গাড়ির পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে হ্যারিকিরি, দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল। বন্ধ করে দিল আবার দরজা।
ব্যাপার কি, বেরোচ্ছে না কেন লোকটা? এত দেরি? করছে কি ভেতরে কাপড় বদলাচ্ছে?
বদলায়নি, আগের পোশাকেই বেরিয়ে এল হ্যারিকিরি। হাতে লাঞ্চ বক্স। দুহাতে ধরে সেটা সামনে বাড়িয়ে রেখে এগোল গেটের দিকে।
কাঠের একটা কুঁড়ে থেকে বেরিয়ে এল একজন লোক, পরনে খাকি ইউনিশ্চম। পুলিশ নয়, সিকিউরিটি গার্ড গোছের কিছু হবে, আন্দাজ করল মুসা। কাঁটাতারের পা খুলে দিল গার্ড, ভেতরে ঢুকল হ্যারিকিরি। আবার পাল্লা লাগিয়ে তালা আটকে দিল গার্ড।
গাড়ির শব্দে ফিরে তাকাল মুসা, বড় রাস্তা ধরে ছুটে আসছে একটা পিকাপ। আরও ঘন ঝোপের ভেতরে ঢুকে গেল সে, যাতে গাড়ির লোকের চোখে না পড়ে। মো নিয়ে সরু রাস্তায় নেমে কাঁটাতারের বেড়ার দিকে এগুলো পিকআপটা। পার্কিং লটে থামল। সামনে থেকে নামল দুজন, পেছন থেকে দুজন, চারজনই জাপানী। সবার হাতেই একটা করে লাঞ্চবক্স। এগিয়ে গেল গেটের দিকে।
তালা খুলে চারজনকেই ভেতরে ঢুকতে দিল গার্ড।
কি ধরনের এলাকা এটা?—অবাক লাগছে মুসার। এত কড়াকড়ি কেন? কয়েকটা কাঠের কুঁড়ে ছাড়া আর তেমন কিছু তো চোখে পড়ছে না। কুঁড়েগুলোর পরে বেশ অনেকখানি ছড়ানো সমভূমি সাগরে গিয়ে মিশেছে। কোন গাছপালাও দেখা যাচ্ছে না ওখানে।
আরে না, সমভূমি তো নয়, ভালমত লক্ষ্য করতেই বুঝল মুসা। বিশাল এক কৃত্রিম হ্রদ, খুদে উপসাগরও বলা চলে। খাল কেটে সাগরের পানি ঢোকার ব্যবস্থা হয়েছে, খালে পাথরের নিচ বধ। সুদের পানির কয়েক ইঞ্চি ওপরে কাঠের অনেকগুলো সাঁকো, একটার ওপর আরেকটা আড়াআড়ি ফেলে তৈরি হয়েছে

অণতি চারকোণা খোপ, অনেক ওপর থেকে দেখলে মনে হবে চেককাটা বিছানার চাঁদরের মত।
ওই সাঁকোতে উঠল গিয়ে জাপানীরা, একেকদিকে ছড়িয়ে পড়ল। খোপের কিনারে উবু হয়ে বসে টেনে তুলল দড়িতে বাধা খাঁচা, একের পর এক। খাঁচায় কি আছে, দেখতে পাচ্ছে না মুসা, তবে জাপানীরা যে গভীর আগ্রহে দেখছে, এটা বোঝা যাচ্ছে। খাঁচার ভেতর থেকে কিছু বের করছে ওরা, তারপর কিছু একটা করছে।
হ্যারিকিরিকে চেনা যাচ্ছে না এখান থেকে, তবে ওই পাঁচজনেরই কোন একজন সে, তাতে সন্দেহ নেই।
আধ ঘণ্টা ঝোপের ভেতর পড়ে রইল মুসা, কিছুই ঘটল না। কিছুই বদলাল। বেড়ার ভেতরে তিনজন গার্ড দেখা যাচ্ছে, টহল দিচ্ছে। জাপানীরা তাদের খাঁচা নিয়ে ব্যস্ত। খানিক পর পর একটা করে খাঁচা নামিয়ে দিয়ে নতুন আরেকটা টেনে তুলছে।
ওদের মাথার ওপর ঘনঘন চক্কর দিচ্ছে সীগাল আর পায়রার ঝক। এটা স্বাভাবিক দৃশ্য। এদিককার উপকূলে ওই পাখি না থাকাটাই বরং অস্বাভাবিক।
আর অপেক্ষা করে লাভ নেই, কিশোরকে জানানো দরকার। আসার সময় দেখেছে, মাইল খানেক দূরে একটা পেট্রল স্টেশন গেছে। ঝোপ থেকে সাইকেল বের করে চড়ে বসল মুসা।
একবার বাজতেই ওপাশ থেকে রিসিভার তুলল কিশোর। খুলে বলল সব মুসা। জানাল, এখন উইলস বীচের মাইলখানেক দূরে রয়েছে। কিশোর আর রবিনের জন্যে এখানেই অপেক্ষা করবে সে।
সাইকেলটা দারুণ।
উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনে ফিরে চাইল মুসা। তার চেয়ে বছর দুয়েকের বড় একটা ছেলে চকচকে চোখে দেখছে ইংলিশ রেসারটাকে। স্টেশনেরই কর্মচারী।
ধন্যবাদ জানাল মুসা।
পাশে বসে পড়ল.ছেলেটা। মুসার মতই সাইকেলের ভক্ত, বোঝা গেল কয়েকটা কথা বলেই। বেশ ভালই জমল ওদের আলোচনা। সাইকেল সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান ছেলেটার, বকবক করে চলল একনাগাড়ে।
এক সময় মুসার মনে হলো, তাই তো, খালি সাইকেল কেন, আরও তো কিছু জানা যেতে পারে ছেলেটার কাছে? জিজ্ঞেস করতে দোষ কি?
আচ্ছা, মুসা বলল, মেইন রোড থেকে একটা সরু পথ নেমে গেছে না সাগরের দিকে, এই তো মাইলখানেক দূরে, কাঁটাতারের বেড়া, গার্ড। ব্যাপারটা কি, বলো তো? – শুনেছি, ঝিনুকের খামার। কয়েক বছর আগে এক ধনী জাপানী করেছে

ওটা। বিরাট দীঘি খুড়ে তাতে সাগরের পানি ঢোকার ব্যবস্থা করেছে। ওখানে নাকি ঝিনুকের চাষ করে।
আর কিছু জানা গেল না ছেলেটার কাছে, জানে কিনা জিজ্ঞেস করার সুযোগও অবশ্য হলো না মুসার। গাড়ির ভিড় বেড়েছে, পেট্রল নিতে ঢুকছে, সবারই তাড়া দিতে একটু দেরি হলেই রেগে যাচ্ছে। হাত থেকে পাম্প রাখারই সময় পাচ্ছে না ছেলেটা।
কিশোর আর রবিন পৌঁছে গেল। পরিশ্রমে লাল দুজনের মুখ, ঘামছে, হাঁপাচ্ছে। আরও দুটো কোকাকোলার টিন আনতে গেল মুসা, ইতিমধ্যে ফোয়ারার পানিতে হাত-মুখ-মাথা ভিজিয়ে নিল কিশোর। তিনজনেই গিয়ে বসল আবার ছায়ায়। পেট্রল স্টেশনের ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করে যা জানা গেছে, কিশোরকে
জানাল মুসা।
ঝিনুকের খামার, চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। সিকিউরিটি গার্ড। রিচার্ড হ্যারিস। বাদামী কাগজে মোড়া বড় প্যাকেট। কাজের কাজ করেছ, মুসা।
তাই নাকি? তা কি করেছি বলো না শুনি। আমি তো ছাই কিছুই বুঝতে পারছি না।
জবাব দিল না গোয়েন্দাপ্রধান। উঠে দাঁড়াল। চলো, যাই। লুকানোর ভাল একটা জায়গা খুজে বের করতে হবে। ওরা কি করে দেখব।
এক সারিতে সাইকেল চালাল তিন গোয়েন্দা।
কয়েক মিনিট পরে পৌঁছে গেল সরু রাস্তা আর বড় রাস্তার মিলনস্থলে। এমন একটা জায়গা খুঁজে বের করল যেখানে তুলসীর ঝাড়ে লুকিয়ে থেকে সরু পথ, বড় রাস্তা আর ঝিনুকের খামারের ওপর এক সঙ্গে চোখ রাখা যায়।
বিনকিউলার নিয়ে খানিকক্ষণ দেখে বলল কিশোর। তারের বেড়ার জন্যে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। ঝিনুক নিয়ে ওরা কি করছে বোঝা যায় না। ঝিনুকগুলো খুলছে মনে হচ্ছে।
অনেক ওপরে উঠেছে সূর্য, কড়া রোদ। পেট্রল স্টেশন থেকে আরও কয়েক টিন কোকাকোলা নিয়ে আসা উচিত ছিল, ভাবল মুসা। সানগ্লাস বের করে চোখে লাগাল। তারপর চোখ বন্ধ করে শুয়ে পড়ল ছায়া ছায়া ঝাড়ের ভেতরে। কালো কাচের জন্যে আলো কম লাগছে চোখে।
দুপুরের দিকে গার্ডের বাশি বাজল। শ্রমিকদের খাবার সময়। সঁকোতে রোদে বসেই টিফিন বাক্স থেকে খাবার বের করে খেতে শুরু করল ওরা।
মাথার ওপর, আশেপাশে কবুতর আর সীগালের ভিড় জমে গেল, খাবারের উচ্ছিষ্টের লোভে। হেই, যাহ, হুসস এমনি নানারকম শব্দ করে ওগুলোকে দূরে রাখার চেষ্টা করল শ্রমিকেরা। অবশেষে খাওয়ার আশা ছেড়ে একে একে উড়ে চলে গেল বেশির ভাগ পাখি।

বিনকিউলার চোখ থেকে নামাল কিশোর। জাপানীয়ে খেতে দেখে তারও খিদে লেগে গেল। জোর করে খাওয়ার ভাবনা দূর করে রহস্য সমাধানে মনোনিবেশের চেষ্টা চালাল সে। আনমনে চিমটি কাটতে শুরু করল নিচের ঠোঁটে।
ধূসর কাগজে মোড়া প্যাকেটটা ভ্যানের পেছনে রাখল হ্যারিস। কি ছিল তাতে মুসা দেখেছে, প্যাকেটটা গাড়িতে রেখে শুধু লাঞ্চ বক্স হাতে নিয়ে বেড়ার ভেতরে ঢুকেছে হ্যারিকিরি।
মুসার গায়ে ঠেলা দিল কিশোর। হ্যারিকিরি ভ্যানের পেছনের দরজায় তালা লাগিয়েছে?
মাথা তুলল মুসা। না, ঘুম জড়ানো কণ্ঠ, লাগায়নি। কেন? জবাবের, অপেক্ষা না করেই আবার শুয়ে পড়ল।
যাবে নাকি, ডাবল কিশোর, গিয়ে দেখবে প্যাকেটটায় কি আছে? সঙ্গে সঙ্গেই বাতিল করে দিল ভাবনাটা। শ্রমিকেরা খেতে বসেছে বটে, কিন্তু গার্ডরা সতর্ক। গেটের কাছে রয়েছে একজন সারাক্ষণই।
কয়েক মিনিট পর আবার বাশি বাজল। টিফিন বাক্স রেখে আবার কাজে লাগল। শ্রমিকেরা।
চোখ ভোলা রাখার যথেষ্ট চেষ্টা করল কিশোর, পারুল না। কোন কিছুই আর দেখার নেই, বিনকিউলারের ভেতর দিয়েও না। স্তব্ধ গরম, নীরবতা, ক্ষুধা সব কিছু মিলিয়ে তালগোল পাকিয়ে ফেলছে যেন, চোখ খোলা রাখতে পারছে না কিছুঁতেই। অবশেষে মুসার পাশেই গড়িয়ে পড়ল সে।
স্বপ্ন দেখছে কিশোর, আপেলের হালুয়া খাচ্ছে, তাতে প্রচুর কাঁচা মাখন মেশানে। এক চামচ খেয়ে আরেক চামচ তুলে নিতে গেল।
বাঁশির তীক্ষ্ণ শব্দে ঘুম ভেঙে গেল তার। ঘড়ি দেখল, তিনটে বাজে। জাপানীরা খাঁচাগুলো নামিয়ে রাখছে পানিতে।
আজকের মত দুটি। গেটের দিকে এগোল শ্রমিকেরা।
ঘুমিয়ে নেয়ায় মাথা একদম পরিষ্কার হয়ে গেছে কিশোরের। তাই বোধহয় মুসার কালো চশমার দিকে চেয়ে চকিতে মনে পড়ে গেল কথাটা। মিস কারমাইকেলের বাগানে আর ট্রাসটি ব্যাঙ্কের পার্কিং লটে সাগ্লাস পরেছিল রিচার্ড হ্যারিস। দুবারই রাতে। কালো কাচ শুধু আলোই ঠেকায় না, চোখও ঢেকে রাখে অন্যের নজর থেকে। এই তো, এত কাছে থেকেও মুসার চোখ দেখতে পাচ্ছে না সে। বুঝতে পারছে না, খোলা না বন্ধ।
তারের বেড়ার দিকে তাকাল কিশোর। গেটের কাছে আসেনি জাপানী শ্রমিকেরা, একটা কুঁড়েতে ঢুকেছে। গার্ডদেরও কেউ বাইরে নেই, ওরাও ঢুকেছে শ্রমিকদের সঙ্গে।

এক লাফে উঠে দাঁড়াল সে। দুটল সরু পথ ধরে পার্কিং লটের দিকে।
চোখ মেলল রবিন। পাশে কেউ নেই। কিশোর গেল কোথায়? পার্কিং লটের দিকে তাকাতেই দেখতে পেল সবুজ ভ্যানের পেছনের দরজা খুলে ঢুকে যাচ্ছে গোয়েন্দাপ্রধান। বন্ধ হয়ে গেল আবার দরজা।
ইয়াল্লা! চেঁচিয়ে উঠল মুসা। করছে কি?
চুপ! হুঁশিয়ার করল রবিন। আমরা এখন কি করি?
কিছু তো বলে গেল না। তোমার কি মনে হয়? হ্যারিকিরির গাড়িতে লুকিয়ে কোথাও যাওয়ার ইচ্ছে?
জানি না, মাথা নাড়ল মুসা। কিন্তু আমাদের কিছু করতে হবে মনে করলে বলেই যেত। নাকি?
তা ঠিক। ভ্যানটা খুঁজে দেখতে গেল না তো? দেখি, কি করে? হ্যারিকিরির হাতে ধরা না পড়লেই হয়... কিশোরের ফেলে যাওয়া বিনকিউলারটা তুলে নিল রবিন। সাকো, বেড়ার আশপাশ আঁতিপাতি করে খুঁজল। নির্জন একটা কুঁড়ের জানালায় চোখ পড়তেই থেমে গেল হাত।
স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না, তবে বোঝা গেল ঘরটাতে শ্রমিক আর গার্ডে গিজগিজ করছে। শ্রমিকেরা সব কাপড় খুলে ফেলেছে। মনে হচ্ছে তল্লাশি চালাচ্ছে গার্ডেরা, শ্রমিকদের কাপড়-চোপড় খুঁজছে, লাঞ্চ বাক্সের ভেতরে দেখছে।
বিনকিউলার নামাল রবিন। দৌড়ে আসছে কিশোর। ধপাস করে এসে বসে পড়ল পাশে। মুখ লাল, জোরে জোরে হাঁপাচ্ছে। চোখে উত্তেজনা।
জিরিয়ে নিয়ে বলল, গার্ডরা ওদের সার্চ করছে, না?
তাই তো মনে হলো, মাথা ঝাঁকাল রবিন। তুমি জানলে কি করে? কি খুঁজছে ওরা?
দেখে এসেছি, প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল কিশোর, প্যাকেটে কি আছে। মুসা, আলো তখন কম ছিল তো, বুঝতে পারোনি। ধূসর জিনিসটা খবরের কাগজ নয়, চীজকুথ।
চীজকুথ, হা হয়ে গেছে মুসা। মানে, ব্রিংকির প্যাকেটটার মত?
অবিকল এক জিনিস। ছেড়া খাঁচাটা পড়ে আছে। খালি। তবে বাজি রেখে বলতে পারি, সকালে রিচার্ড হ্যারিস যখন রেখে গেছিল, তখন খালি ছিল না। কারণ, এই জিনিস পেয়েছ ভেতরে,মুঠো খুলে দেখাল কিশোর, কি পেয়েছে।
পায়রা, চোখ ছোট হয়ে গেছে মুসার। খাঁচার মধ্যে কবুতর ছিল...
এবং সেটাকে লাঞ্চ বক্সে ভরে গেট পার করে নিয়ে গেছে। দারুণ ফন্দি। ঢোকার সময় শ্রমিকদের টিফিন বক্স পরীক্ষা করেনা গার্ডরা, বেরোনোর সময় করে।
ভুরু কাছাকাছি হয়ে গেছে রবিনের। কেন করে? কি খোঁজে?
মুক্তো, শান্তকণ্ঠে বোমাটা ফাটাল কিশোর।

মুক্তো, আবার বলল কিশোর। মুক্তো এবং রেসিং হোমার কবুতর।
হেডকোয়ার্টারে আলোচনায় বসেছে তিন গোয়েন্দা। বিকেলে অসময়ে ফিরে এসে মেরিচাচীর বকাঝকা আর তার হাতে তৈরি অনেকগুলোস্যাণ্ডউইচ খেয়ে পেট ভরেছে মুসা আর কিশোর।
দুধের গেলাসটা হাতে নিয়ে গিয়ে ফ্রিজ খুলেছে কিশোর, হতাশা চেপে রাখতে পারেনি, মুখ দিয়ে বেরিয়েই গেছে, দূর, নেই।
এই, কি নেই রে? কাছেই বসা ছিল চাচী।
আপেলের হালুয়া। বেশি করে কাঁচা মাখন দেয়া।
হঠাৎ করে হালুয়া খাওয়ার শখ হলো কেন? অন্য সময় তো সাধাসাধি করেও গেলাতে পারি না।
দুপুরে স্বপ্নে খেলাম তো, তখন থেকেই খেতে ইচ্ছে করছে।
স্বপ্ন দেখলি?কোথায় ঘুমিয়েছিলি? উঠে দাঁড়াচ্ছেন মেরিচাচী।
চুপ হয়ে গেল কিশোর। অনেক বেশি বলে ফেলেছে।
তুলসীবনে, চাচী, বেজায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম, ঢাকতে গিয়ে আরও ফাঁস করে দিল মুসা।
প্রমাদ গুণল কিশোর, তাড়াতাড়ি বলল, ওই পাহাড়ের ধারে, চাচী তুলসী গাছ ছিল কাছে, তার ছায়ায়। সাইকেল চালাতে চালাতে ক্লান্ত হয়ে জিরোতে বসেছিলাম, কখন যে তন্দ্রা এসে গেল…হি-হি…তো চাচী, হালয়া…
কোথায় যে কবে মরে পড়ে থাকবি, চাচীর মুখের মেঘ সরছে না। এই, তুলসীবন থেকে যদি সাপ বেবরাত? যদি…
দূর, চাচী, তুমি কিছু জানো না, হাত তুলল কিশোর। তুলসীবনে সাপ থাকে না।
তবে কি থাকে?
কিছুই থাকে না। হ্যাঁ, চাচী, হালুয়া…আপেল আছে তো, নাকি বাজার থেকে এনে দেব?
আছে আছে, রাতে খাস, বানিয়ে রাখব। তবে কথা দিতে হবে, তুলসীবনে…
ঠিক আছে, চাচী, আর যাব না, যাও, এক চুমুকে বাকি দুধটুকু খেয়ে মুসার হাত ধরে টেনে নিয়ে বেরিয়ে এসেছে কিশোর, চাচী আর কিছু বলার আগেই। সোজা এসে ঢুকেছে দুজনে হেডকোয়ার্টারে।
রবিন পরে এসেছে। কিশোরের অনুরোধে লাইব্রেরিতে গিয়েছিল দুটো বই আনতে,পথে রেস্টুরেন্টে খেয়ে এসেছে।
হ্যাঁ, রবিনের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল কিশোর, মুক্তো চাষের ব্যাপারে কি লিখেছে বইতে?

মূল্যবান পাথরের ওপর লেখা বইটা খুলল রবিন। ভেতরে এক পাতা আলগা কাগজ, তাতে নোট লিখেছে সে। হ্যাঁ, মুক্তোর চাষ।...স্প্যাট, মানে শিশু ঝিনুক জোগাড় করে খাঁচায় ভরে পানিতে ডুবিয়ে রেখে দেয়া হয়। এগুলোর বয়েস যখন তিন বছর হয়, তুলে ফাক করে ভাঙা এক কণা মুক্তো ফেলা হয় ভেতরে। তারপর ঝিনুকগুলোকে আবার খাঁচায় ভরে ডুবিয়ে রাখা হয় পানিতে। শক্ত পাথর অস্ত্রের কাছের বিশেষ থলিতে আটকে খুব যন্ত্রণা দেয় ঝিনুককে, আপনা আপনি এক ধরনের রস বেরিয়ে তখন লাগতে থাকে কণাটার সঙ্গে, শক্ত হয়ে জমতে থাকে। এভাবেই ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে কাটা, পূর্ণাঙ্গ মুক্তোয় রূপ নেয় এক সময়। তিন থেকে ছয় বছর লাগে একটা মুক্তো তৈরি হতে।

কণাটার চারপাশে ব্যাণ্ডেজের মত জড়িয়ে যায় রস, না? মুসা বলল। খুব নিষ্ঠুর মনে হচ্ছে। বছরের পর বছর প্রাণীগুলোকে এভাবে জ্যান্তরেখে কষ্ট দেয়া...

মানুষের কাজই তো এরকম। ওই যে, জোর যার মুল্লুক তার। হ্যাঁ, আবার নোট পড়ায় মন দিল রবিন। মুক্তো বড় হলে ঝিনুকের ভেতর থেকে বের করে নিয়ে পাঠানো হয় বাজারে। কালচার্ড মুক্তোর ব্যবসা জাপানেই বেশি, বড় বড় ফার্ম গড়ে উঠেছে। কালচার্ড হলে কি হবে, দাম কম না, কোন কোনটা কয়েকশো ডলারও ওঠে।

আচ্ছা, কালচার্ড বলে কেন এগুলোকে? জিজ্ঞেস না করে পারল না মুসা। সভ্য কিংবা সাংস্কৃতিমনা ঝিনুকের ভেতরে জন্মায়?

মুসার মোটা বুদ্ধি দেখে হতাশ ভঙ্গিতে ঠোঁট ওল্টালো কিশোর।

না না, অধৈর্য হলো না রবিন। কৃত্রিম বলে এই নাম রাখা হয়েছে।

অ, মাথা দোলাল মুসা, মুক্তোর ফার্মেই কাজ করে তাহলে হ্যারিকিরি, পেছনে বাগবাকুম শুনে ফিরে দেখল, তার দিকেই চেয়ে আছে টম। জালের ফাক দিয়ে আঙুল ঢুকিয়ে পাখিটাকে আদর করল সে। এজন্যেই ওখানে গার্ডের এত, কড়াকড়ি, মুক্তো যাতে চুরি হতে না পারে, তাই না, কিশোর?

তাই, চেয়ারে হেলান দিল কিশোর। ঢোকার সময় শ্রমিকদের তল্লাশি করা হয় না। তাতেই আইডিয়াটা খেলেছে হ্যারিকিরি আর হ্যারিসের মাথায়। সহজ ফন্দি, মজাটাই ওখানে, বেশি সহজ হওয়াতেই ধোকা খাচ্ছে গার্ডেরা। খাঁচায় ভরে একটা রেসিং হোমারকে ভ্যানে রেখে দিয়ে আসে হ্যারিস। ফার্মে ঢোকার আগে খাঁচা থেকে পাখিটাকে বের করে লাঞ্চ বক্সে ভরে নেয় হ্যারিকিরি, চুপ করল সে।

অপেক্ষা করছে অন্য দুজন।

ঝিনুকে ভাল মুক্তো পেলে সেটা রেখে দেয় হ্যারিকিরি, আবার বলল কিশোর, লাঞ্চের সময় বাক্স থেকে কবুতরটাকে বের করে তার পায়ে ঝিনুক বেঁধে দেয় কোনভাবে, হয়তো ছোট থলিটলিতে ভরে বা অন্য কোনভাবে। আশেপাশে এত

পাখির ছড়াছড়ি, বিশেষ কবুতরটাকে খেয়ালই করে না গার্ডের। উড়ে সোজা বাড়ি চলে যায় ওটা, তখন খুলে নেয় রিচার্ড হ্যারিস।
বুঝলাম, বলল রবিন, লাঞ্চের আগে ভাল মুক্তো পাওয়া না গেলে একটা মেসেজ বেঁধে কবুতর ছেড়ে দেয় হ্যারিকিরি। জাপানী ভাষায় মেসেজটাতে লেখা থাকে, আজ মুক্তো নেই, যে রকম পেয়েছি আমরা দু-আঙুলা কবুতরটার পায়ে বাধা।
কিন্তু, থামল সে, কিছু একটা ভেবে অবাক হচ্ছে, খাপে খাপে মেলাতে পারছে না বোধহয়। আবার বলল, কিন্তু…
কিন্তু এটা রিচার্ড হ্যারিসের নয়, রবিনের কথাটা শেষ করল কিশোর, ব্লিংকির, এই তো? অন্তত স্ন্যাকস রেস্টুরেন্টে তার কাছে ছিল ওটা। খাঁচাটাও হ্যারিসের কবুতরের খাঁচার মত; একই ধরনের চীজকুথে মোড়া, হাত বাড়াল সে, দেখি,অন্য বইটা দাও।
দ্বিতীয় যে বইটা লাইব্রেরি থেকে নিয়ে এসেছে রবিন ওটা আসলে ম্যাপ, দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার রোড অ্যাটলাস। পাতা উল্টে স্মল-স্কেলের একটা ম্যাপ বের করল কিশোর, তাতে রকি বীচ আর সান্তা মনিকার বিভিন্ন পথ দেখানো রয়েছে। অন্য দুই গোয়েন্দাও প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল ম্যাপের ওপর।
এই যে, এটা উইলস বীচ, ম্যাপের এক জায়গায় আঙুল রাখল কিশোর। ঝিনুকের খামারটা হবে এখানে। আর রিচার্ড হ্যারিসের বাড়ি, উপকূল বরার ধীরে ধীরে আঙুল সরাল কিশোর, রকি বীচে এসে থামল। এই যে, এখানে। ফোন গাইডে তার ঠিকানা পেয়েছি। এটা হলোগে শহরের পশ্চিম সাইড।
ড্রয়ার থেকে একটা রুলার বের করে ফার্ম আর রিচার্ডের বাড়ি, এই দুটো পয়েন্টের ওপর রাখল কিশোর, কি বোঝা যায়?
সরাসরি আকাশ পথ বেশির ভাগটাই সাগরের ওপর দিয়ে, বলে উঠল মুসা। ফার্ম থেকে হ্যারিসের বাড়ি ছয় মাইল!
রেসিং হোমারের জন্যে বড় জোর ছয় মিনিটের পথ, মুসার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল রবিন। দুপুরে বাড়ি গিয়ে হ্যারিসকে মোটেই অপেক্ষা করতে হয় না, মুক্তো কিংবা মেসেজ পেয়ে যায়।
কিন্তু তাহলে মিস কারমাইকেলের বাগানে কবুতর মরে কি করে, মানে রেসিং হোমারের লাশ পাওয়া যায় কিভাবে? প্রশ্ন রাখল মুসা। তাঁর বাড়ি তো শহরের পুবধারে। ম্যাপে আঙুল রাখল, এই যে, এখানে। রিচার্ডের বাড়ি থেকে অনেক দূরে। কোর্স থেকে এতখানি সরে গিয়েছিল দু-আঙুলা?
হ্যারিসের বাড়িতে যায় ভাবলে সেটা মনে হবে, লার সরিয়ে ফার্ম আর মিস কারমাইকেলের বাড়ির ওপর রাখল কিশোর। কিন্তু যদি এখানে যায়? ম্যাপের আরেক জায়গা নির্দেশ করল সে।

সান্তা মনিকা, বিড় বিড় করল রবিন।
রিংকির বাড়িতে? মুসা বলল।
হতে পারে, রবিনের মনে পড়ল, রিংকি বলেছিল সে সান্তা মনিকায় থাকে…
সুতরাং, আগের কথার খেই ধরল কিশোর, দু-আঙুলার মালিক যদি রিংকি হয়, আর বাড়ি যেতে চায় কবুতরটা তাহলে মিস কারমাইকেলের বাগানের ওপর দিয়ে যেতে হবে। ধরে নিতে অসুবিধে নেই, বাজের কবলে পড়েছে ওটা তখনই। টেবিলে বার দুই টোকা দিল সে। আর, আমার মনে হয় দু-আঙুলাই প্রথম মারা পড়েনি, রিংকির আরও কবুতর মারা পড়েছে মিস কারমাইকেলের বাগানে। মহিলা বলেছেন, এক মাসে তাকে তিনটে মুক্তো এনে দিয়েছিল হীরা। পেল কোথায় পাখিটা? নিশ্চয় বাগানে, মরা কবুতরের পায়ে বাধা, ঠুকরে ঠুকরে কোনভাবে খুলে নিয়ে গেছে মনিবকে উপহার দিতে।
মিলছে, একমত হলো মুসা।
ম্যাপ বই বন্ধ করল কিশোর, ভুরু কেঁচকাল মেলে, যদি হ্যারিস আর রিংকি পার্টনার হয়। তাহলে একদিন হ্যারিসের কবুতর ব্যবহার করবে, আরেক দিন রংকির। আর তা হলেই শুধু হ্যারিসের আজব ব্যবহারের একটা অর্থ করা যায়। ব্রিংকির পাখি মারা পড়ায় পার্টনার হিসেবে সে-ও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল, রাতের বেলা তদন্ত করতে গিয়েছিল মিস কারমাইকেলের বাগানে। আমাকে দেখে ভেবেছিল আমিই খুনী, তাই রাগ সামলাতে না পেরে বাড়ি মেরে বসেছে।
মাথা নাড়ল সে, নিজের কথাই যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। তারপর মিস কারমাইকেলের কাছে শুনল, আমরা তাঁকে সাহায্য করছি। তখন খাতির করার চেষ্টা করল আমাদের সঙ্গে। ডেকে নিয়ে গিয়ে খাওয়াল, পাখির খুনীকে ধরে দেয়ার জন্যে উৎসাহিত করল। ধরে নিতে হয়, সে চাইছিল, মিস কারমাইকেলের পাখি খুনের তদন্ত করতে গিয়ে রিংকির কবুতর কিভাবে মারা গেছে সেটা বের করি আমরা। আবার মাথা নাড়ল সে। কিন্তু রিংকি আর হ্যারিস বন্ধু হতে পারে না।
কেন? সঙ্গে সঙ্গে কথাটা ধরল রবিন। পারে না কেন?
ঠোঁট কামড়াল কিশোর। পারে না এই জন্যে, রিংকি আর হ্যারিকিরিকেও তাহলে পার্টনার হতে হয়। তাহলে রিংকির জানার কথা হ্যারিকিরির নতুন বাসার খবর। জানা থাকার কথা, হ্যারিকিরি নতুন বাড়ি নিয়েছে। স্ন্যাকস রেস্টুরেন্টে বসে থেকে অনুসরণ করার দরকার পড়ত না। সবুজ ভ্যানের পিছু নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে দেখে আসার দরকার পড়ত না কোথায় বাড়ি নিয়েছে হ্যারিকিরি।
উঠে দাঁড়াল কিশোর। বাড়ি যাও তোমরা। রাতে বাইরে কাটানোর অনুমতি নিয়ে এসো। দু-ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসবে। স্লীপিং ব্যাগ নিয়ে আসবে সঙ্গে করে।

কেন? রবিন আর মুসা, দুজনেই জানতে চাইল।
কাল সকালে হ্যারিকিরির জন্যে তৈরি থাকতে পারব আমরা।
আবার কি করতে হবে, প্রশ্ন করল মুসা। অনুসরণ?
না, মাথা নাড়ল কিশোর। কেসটার সমাধান করব। খুব সহজ উপায়ে। খাঁচার দিকে তাকাল সে। টমকে দিয়ে ফাদে ফেলব রিংকিকে।
ব্যাগের ভেতরে নড়েচড়ে উঠল কিশোর। সারারাত খোলা আকাশের নিচে শক্ত মাটিতে পড়ে থেকে পিঠ ব্যথা হয়ে গেছে। দূর, সৈকত না কচু, বালি এত শক্ত! চোখ মিটমিট করল, পাতার ওপর থেকে ঝরে পড়ল কয়েক কণা বালি, বাতাসে উড়িয়ে এনে ফেলেছে। শুকনো ঠেট চাটতেই জিভের সঙ্গে মুখের ভেতরে চলে গেল ঠোঁটের বালি। বিরক্ত ভঙ্গিতে মুখ বাঁকাল।
ঘড়ি দেখল সে, ছটা বাজে। যাওয়ার সময় হয়েছে। হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল ব্যাগের ভেতর থেকে।
অন্য দুই গোয়েন্দা আগেই উঠেছে। টমকে দানা খাওয়াচ্ছে মুসা। রবিন নাস্তা সাজাচ্ছে। কয়েকটা কেক ও এক ব্যাগ দুধ ঠেলে দিল কিশোরের দিকে।
কেকে কামড় দিয়েই আবার মুখ বকাল কিশোর। দাঁতে কিচকিচ করছে বালি। দুধের ব্যাগের কোণা ছিড়ে পাইপ ঢুকিয়ে চুমুক দিল, আস্তে আস্তে টেনে তুলে দুধ দিয়ে ধুয়ে ফেলল মুখের ভেতরটা, বালি সব পেটে চলে গেল। এইবার কেক খেতে আর কোন অসুবিধে নেই।
দশ মিনিটেই মালপত্র গুছিয়ে তৈরি হয়ে গেল ওরা। টমের খাঁচা চীজকুথ দিয়ে মোড়াতে মুসাকে সাহায্য করল কিশোর। নিজের সাইকেলের ক্যারিয়ারে খাঁচাটা বেঁধে নিল সে। ক্যারিয়ারে মালপত্র বেঁধে নিল মুসা, হ্যাণ্ডেলে ঝুলিয়ে নিল প্ল্যাসটিকের একটা শপিং ব্যাগ!
রওনা হলো, ওরা। মাইলখানেক দূরের পেট্রল স্টেশনে এসে থামল। সেই অ্যাটেনডেন্ট ছেলেটাই ডিউটিতে আছে, মালপত্রগুলো সেখানে রাখার অনুরোধ জানাল মুসা। ঘন্টা দুয়েকের জন্যে মাল পাহারা দিতে রাজি হলো ছেলেটা।...
বেশির ভাগ মাল পেট্রল স্টেশনে রেখে আবার সাইকেলে চাপল তিন গোয়েন্দা। পাহাড়ী পথ ধরে উঠে গেল আধ মাইল, ঝিনুকের ফার্মের দিকে। আগের দিনেই সুবিধেমত একটা জায়গা বেছে রেখেছে কিশোর। বড় রাস্তাটা যেখানে মোড় নিয়েছে, তার পাশে ঘাসে ঢাকা চওড়া এক ফালি জমি আছে, তাতে তুলসী গাছের বড় বড় ঝোপঝাড়।
ঝোপের ভেতরে সাইকেল শুইয়ে রাখলে রাস্তা থেকে দেখা যাবে না। লুকিয়ে ফেলল মুসা আর রবিন। ক্যারিয়ার থেকে খাঁচাটা খুলে নিয়ে কিশোরও সাইকেল লুকাল। তিনজনে এসে বসল তুলসীবনে। সাইকেল পাম্প আছে সবার

সাইকেলেই, খুলে নিয়েছে। মুসার হাত থেকে শপিং ব্যাগটা নিয়ে খুলল রবিন। মুঠো মুঠো বেলুন বের করে ভাগ করে দিতে লাগল। নানা আকারের উজ্জ্বল রঙের বেলুন—লাল, নীল, হলুদ, সবুজ। বেলুনের মুখ বেঁধে ফেলতে লাগল ওরা। দেখতে দেখতে পথের ধারে বেলুনের ছোটখাট একটা পাহাড় গড়ে উঠল।
খুব সকালে লোকজন বেরোয়নি, এতক্ষণে একটা গাড়িকেও যেতে দেখা যায়নি.ওপথে। খুশিই হলো কিশোর, নিরাপদে কাজ করা যাচ্ছে। বাতাসও নেই আজ, ভালই হয়েছে, বেলুন উড়িয়ে নিচ্ছে না। দিনের শুরুটা বেশ ভালই।
ব্যাগ খুলে ভঁজ করা এক টুকরো সাদা কাপড় বের করল রবিন। গতরাতে কিশোরের নির্দেশে তৈরি করেছে ব্যানারটা। ভাজ খুলে ছড়িয়ে লম্বা করে দুটো গাছের সঙ্গে কাপড়ের কোণগুলো বেধে দিল ওরা। লাল কালিতে বড় বড় করে লেখা হয়েছেঃ
আমাদের ডানাওয়ালা বন্ধুদের
রক্ষা করুন।
একটা বেন কিনুন।
পথের তীক্ষ্ণ মোড়ের গজ বিশেক দূরে তাকাল কিশোর, খুদে একটা পাহাড় আছে ওখানে, মেসকিট আর তুলসী গাছের ঝোপঝাড়ে ঢাকা।
রবিন, নির্দেশ দিল কিশোর, ওখানে গিয়ে লুকাও। আমার আর মুসার ওপর চোখ রাখতে পারবে। রুমাল আছে তোমর কাছে?
আছে, জিনসের প্যান্টের পকেট থেকে রুমাল বের করল রবিন। মুসা, এভাবে নাড়ব, সামনে-পেছনে। তাহলে বুঝবে, কাজ হয়ে গেছে।
নীরবে মাথা ঝুকিয়ে সায় জানাল মুসা। এসব ভাল লাগছে না তার। হ্যারিকিরিকে না রাগিয়ে পারবে তো কাজ সারতে? এখন তার মনে হচ্ছে, কারাতে ফাইটে নিশ্চয় ব্ল্যাক বেল্ট আছে জাপানীটার। যদি মুসাকে চিনে ফেলে, সঙ্গে সঙ্গে দুহাত দিয়ে কোপাতে শুরু করবে।
বাবার কালো চশমাটা নিয়ে এসেছে মুসা, বের করে পরল। কি করে জানছি সে আসছে? গলা কাপছে মৃদু।
তিনবার শিস দিলে বুঝবে গাড়ি দেখা যাচ্ছে, বলল কিশোর। আমাকে পেরিয়ে যাওয়ার পর আরও দুবার শিস দেব। ঠিক আছে?
ঠিক আছে।
মুসার কণ্ঠে অনিশ্চয়তা বুঝতে পারল কিশোর। খারাপ লাগছে তার, সব চেয়ে কঠিন কাজটা করতে হচ্ছে মুসাকে। সে নিজে পারলে ভাল হত। কিন্তু অতিরিক্ত ঝুঁকি নেয়া হয়ে যাবে তাতে, সব কিছু ভণ্ডুল হয়ে যাওয়ার সম্ভবনা আছে। এতদূর

এগিয়ে সব গণ্ডগোল করে দিতে চায় না। তাকে দেখলেই সঙ্গে সঙ্গে চিনে ফেলবে হ্যারিকিরি, ইয়ার্ডে তার সঙ্গেই কথা বলেছে।
মুখ গোমড়া করে রেখেছ কেন? বন্ধুকে ভরসা দিল কিশোর। হাসো, হাসি হাসি করে রাখা। কথা বলবে সহজ ভাবে। গোমড়ামুখ লোককে চাদা দেয় না কেউ।
কি বলব?
যা মুখে আসে। ব্যাটা ইংরিজি বোঝে না।
আচ্ছা, জোরে নিঃশ্বাস ফেলল মুসা।
ঘড়ি দেখল কিশোর। সময় হয়ে গেছে।
ছোট পাহাড়টায় উঠে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে বসল রবিন।
কিশোর গিয়ে ঢুকল তুলসীবনে, সাইকেলগুলো যেখানে রেখেছে। মুসা যেখানে আছে জায়গাটা তার চেয়ে উঁচু। কবুতরের খাঁচাটায় হাত রেখে তৈরি হয়ে রইল।
বেলুনের পাহাড়ের পাশে ধপ করে বসে পড়ল মুসা, বিড়বিড় করল, আমাদের ডানাওয়ালা বন্ধুদের রক্ষা করুন। জাহান্নামে যাক ডানাওলারাহ! আমাকে রক্ষা করে কে?
রোদ চড়েনি, আবহাওয়া ঠাণ্ডা, কিন্তু দরদর করে ঘামছে কিশোর। জুলফির কাছ থেকে ঘাম গড়িয়ে গাল বেয়ে এসে জমা হচ্ছে চিবুকে, সেখান থেকে টুপ করে পড়ছে তুলসী পাতায়। তুলসীর নেশা ধরানো গন্ধ ভোরের বাতাসে, কিন্তু উপভোগ করার সময় এখন নেই। মুসার জন্যে দুশ্চিন্তা হচ্ছে, ভাবছে আবল-তাবল, নিজেকে ধমক লাগাল সে। চোখ ফেরাল বায়ে, পথের দিকে, যেখান দিয়ে আসবে সবুজ ভ্যানটা।
এক মিনিট গেল...পাঁচ মিনিট...দশ...আসবে তো? নাকি আজ হ্যারিকিরির ছুটি? কোথাও কোন কারণে আটকে গেল? না আসুক, সে-ই ভাল, তাহলে খারাপ কিছু ঘটা থেকে বেঁচে যাবে মুসা।
ঠিক এই সময় শোনা গেল ইঞ্জিনের শব্দ।
মুখে আঙুল পুরে তিনবার তীক্ষ্ণ শিস দিল কিশোর।
গাড়িটা গো গো করে বেরিয়ে গেল তার সামনে দিয়ে। আরও দুবার শিস দিল সে।
গাড়িটা বাঁকের ওপাশে অদৃশ্য হয়ে যেতেই খাঁচাটা নিয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। তুলসীবন ভেঙে দুপদাপ করে এসে পড়ল রাস্তায়, দৌড় দিল গাড়ির পেছনে।
শিসের শব্দ শুনে উঠে দাঁড়িয়েছে মুসাও। সবগুলো বেলুনের মুখে বাধা-লম্বা সুতোর মাথা এক করে ধরে রেখেছে, হ্যাঁচকা টানে সব নিয়েই এসে নামল রাস্তায়।
দ্বিতীয়বার শিস যখন দেয়া হলো, একগাদা বেলুনের মাঝে শুধু বেরিয়ে আছে তার চশমা পরা মুখটা।

দেখা গেল গাড়ি। গতি কমছে। অনিশ্চিত ভঙ্গিতে থেমে গেল বেলুনের ব্যারিকেডের কয়েক গজ দূরে।
জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে চেঁচিয়ে কিছু বলল হ্যারিকিরি, জাপানী ভাষায়।
শুনতেই যেন পায়নি মুসা, ভাব দেখাল রেলুন সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে। আসলে ব্যারিকেড আরও ছড়িয়ে দিচ্ছে সুতোয় ঝাঁকুনি দিয়ে, গাড়ি বেরোনোর পথ রুদ্ধ করে দিচ্ছে। হালকা বাতাসে রঙিন একটা দেয়াল গজিয়েছে যেন পথের ওপর।
গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে এল হ্যারিকিরি। মুসার দিকে চেয়ে বিস্ময় ফুটল চোখে। সব চেয়ে কাছের বেলুটা সই করে ধা করে এক লাথি চালাল। বাতাসে দোল খেল বেলুনটা, আলতো করে গিয়ে লাগল তার নিজেরই নাকে। থাবা দিয়ে চোখের সামনে থেকে ওটা সরিয়ে আবার কিছু বলল সে।
জোর করে হাসল মুসা। আমাদের ডানাওয়ালা বন্ধুদের রক্ষা করুন, একটা বেলুন কিনুন।
জাপানীতে বিড়বিড় করল হ্যারিকিরি।
হাসি বজায় রাখল মুসা। যা খুশি বলবে, বলে দিয়েছে কিশোর। কিন্তু যাখুশিও মুখে আসছে না এখন মুসার। বেকায়দা অবস্থায় পড়ে রেগে গেল সে। চুলোয় যাক ডানালার বাচ্চারা। নাক ভোতা জাপানীর বাচ্চা জাপানী, চোরের শুষ্টি চোর, ব্যাটা মুক্তো চুরি করে এখন আমাকে ফেলেছিস বিপদে। বেলুন কিনবি তো কেন, নইলে... গাল দিয়ে মনের ঝাল মেটাতে পেরে এতক্ষণে সত্যি সত্যি হাসি ফুটল তার মুখে। দুঃখিত, চোরা সাহেব, আপনাকে জায়গা দিতে পারছি না। কিশোর, নিষেধ করেছে। আপনি এখানে আটকে থাকলে আমাদের বিশেষ সুবিধে। আপনার হাতে হাতকড়া পরিয়ে শ্রীঘরে পাঠিয়ে দিতে চাই তো, তাই এই ব্যবস্থা।
না, বেশিক্ষণ আটকাব না, চোখের কোণ দিয়ে দেখল, কিশোর দৌড়ে আসছে, গাড়ির দশ গজ দূরে রয়েছে। পায়ে মীকার পরা থাকায় শব্দ হচ্ছে না।
সব চেয়ে শক্ত কাজটা এখন করতে হবে কিশোরকে, হ্যারিকিরির অলক্ষে খুলতে হবে ভ্যানের পেছনের দরজা। কোন রকম শব্দ করা যাবে না। ভ্যানের ইঞ্জিন চালু রয়েছে, এটাই ভরসা।
চাইলে তোমার কারাতে এসে পরীক্ষা করতে পারো আমার ওপর, সাহস ফিরে পেয়েছে মুসা। ভয়ঙ্কর জলদস্যুদের নাকানিচোবানি খাইয়ে এসেছে ওরা, আর সামান্য একটা পুঁচকে জাপানীর ভয়ে মচকে যাবে, এ হতে পারে না, নিজেকে বোঝাল সে। তুমি দশটা দিলে আমি একটা তো দিতে পারব। জোরে জোরে বলল কিশোরের কাছে শেখা বাংলা কবিতার একটা লাইন, বিনা যুদ্ধে নাহি দিব, সূচ্যগ্র মেদিনী:
পকেটে হাত ঢোকাল হ্যারিকিরি।

কি খুঁজছে ব্যাটা? কণ্ঠস্বর আরও চড়িয়ে বলল মুসা, আল্লাহরে, ব্যাটা আবার পিস্তল বের করবে না তো? নাহ্ হয়তো পয়সা…
পৌঁছে গেছে কিশোর! সাবধানে দরজার হাতল ধরে ঘোরাল। খুলে ফেলল দরজা।
পাহাড়ের ওপর থেকে রবিন দেখতে পাচ্ছে ভালমত।
কিশোরকে নিচু হয়ে গাড়িতে ঢুকে যেতে দেখল। হাতের রুমালটা আরও শক্ত করে চেপে ধরল সে।
আছে, গাড়ির পেছনে,খাঁচাটা আছে। ওটা সরিয়ে টমের খাঁচাটা ওই জায়গায় রেখে দিল কিশোর। কানে আসছে মুসার কণ্ঠ, যত ভেলকিই দেখাও বাবা, জায়গা ছেড়ে আমি নড়ছি না…আঁউ! চমকে গেছে কোন কারণে, থেমে গেল কণ্ঠস্বর। কিশোর জানে না, পয়সা নয়, ছুরি বের করেছে হ্যারিকিরি। লম্বা, বাকা, ঝকঝকে ফলা।
দরজা বন্ধ করে দিল কিশোর। ফটাস করে শব্দ হলো, বেলুন ফুটল বোধহয়।
এগিও না, খবরদার! জোর নেই মুসার গলায়।
আরও কয়েকটা বেলুন ফুটল ফটাস ফটাস করে।
চেঁচিয়ে উঠল মুসা, কিশোর, জলদি করো! আর আটকাতে পারছি না। ছুরি চালাচ্ছে ব্যাটা, বেলুনগুলোর দফারফা, আমারও হবে…
দরজা খুলে লাফিয়ে নামল কিশোর, নিঃশব্দে। খাঁচাটা দুহাতে ধরে রেখেছে। বুকের ওপর। একবারও ফিরে না তাকিয়ে সোজা দৌড় দিল যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে।
ভাগো, কিশোর, জলদি করো! বেলুনগুলো হাত থেকে ছেড়ে দিয়েছে মুসা, এদিক ওদিক উড়ছে আর রাস্তায় গড়াগড়ি খাচ্ছে ওগুলো। তার ভেতরে একবার এদিকে লাফ দিয়ে পড়ছে সে, একবার ওদিক, হ্যারিকিরির ছুরির পোচ থেকে বাচার জন্যে। বার বার তাকাচ্ছে ছোট পাহাড়টার দিকে। ইস্, এত দেরি হচ্ছে কেন?
ছুটে পালাবে কিনা ভাবছে মুসা, এই সময় দেখতে পেল রবিনকে। পাগলের মত রুমাল নাড়ছে সামনে-পিছনে।
এগিয়ে আসছে হ্যারিকিরি।
দু-হাত সামনে তুলে তাকে বলল মুসা, যাচ্ছি, বাবা, যাচ্ছি, সরে যাচ্ছি। আমাদের কাজ শেষ। জাহান্নামে যেতে পারো এবার তুমি। বলেই ঘুরে দিল দৌড়, সরে চলে গেল রাস্তা থেকে।
গাড়িতে ফিরে গেল হ্যারিকিরি। চলে গেল শাঁ করে। চাকার নিচে পড়ে ফাটল আরও কয়েকটা বেলুন।

ধপ করে বসে পড়ল মুসা তুলসীবনের ধারে। হাঁপাচ্ছে।
খাঁচা হাতে ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল কিশোর। কাছে এসে মুসার কাঁধে হাত রেখে শুধু বলল, থ্যাংক ইউ।
রবিনও এসে দাঁড়াল। মুসা, তোমার হয়নি তো কিছু? পোঁচটোঁচ লাগেনি?
ধীরে ধীরে এপাশ ওপাশ মাথা নাড়ল মুসা। না, বেলুনগুলোর ওপর দিয়ে গেছে। তবে আমার বুকের ধড়ফড়ানি বোধহয় আর কোনদিন যাবে না। পারমানেন্ট রোগ বাধালাম।
যাই হোক, জিরিয়ে নিয়ে বলল কিশোর, কাজ হয়েছে। গাড়িতে করে টমকে নিয়ে গেছে হ্যারিকিরি।
তা গেছে, কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বলল মুসা। কিন্তু এরপর কি?
খাঁচার চীজক্লথ খুলছে কিশোর। আমাকে একটু সাহায্য করবে, রবিন?
চীজক্লথ ছিড়ে খাঁচার দরজা খুলে পায়রাটাকে বের করল দুজনে।
ধরো, শক্ত করে ধরে রাখো, বলল কিশোর।
রবিন ধরে রাখল।
পকেট থেকে একটা অ্যালুমিনিয়মের পাতলা পাতের আঙটা বের করে লাগিয়ে দিল কিশোর কবুতরের পায়ে, তাতে কায়দা করে লাগিয়ে দিল তিন গোয়েন্দার একটা কার্ড। কার্ডটা ভাঁজ করে শক্ত করে গুঁজে দিয়েছে আঙটার ভেতরে, কেউ না খুললে আপনা-আপনি খুলে পড়বে না। আরও নিশ্চিত হওয়ার জন্যে পায়ের সঙ্গে শক্ত করে টেপ দিয়ে পেঁচিয়ে দিল।
মুসা, বলল কিশোর, পায়রাটাকে ছাড়ার সম্মান তোমারই প্রাপ্য।
খুশি হলো মুসা। কবুতরটাকে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। এক হাতে ধরে রেখে আরেক হাত ওটার পিঠে বুলিয়ে আদর করল। বলল, বাড়ি যাও, খোকা, বলে উড়িয়ে দিল।
কয়েক সেকেণ্ড মাথার ওপর ফড়ফড় করল পাখিটা, তারপর কোণাকুণি উড়ে শ করে উঠে গেল রকেটের মত, তীব্র গতিতে উড়ে গেল উপকূলের দিকে।
দুই ঘণ্টা পর ইয়ার্ডে ফিরে এল তিন গোয়েন্দা।
এসেছ, ওদের দেখেই এগিয়ে এলেন মেরিচাচী। আমি তো ভাবলাম, দিনটাও কাটিয়ে আসবে কিশোর, একগাদা মাল নিয়ে এসেছে তোর চাচা। বোরিস আর রোভার মাল আনতে গেছে আরেকখানে, তোরা একটু হাত লাগাবি?
মাথা কাত করল কিশোর। কাজ করতে অসুবিধে নেই। দুপুরের দেরি আছে এখনও আরও দু-ঘন্টা। তাছাড়া অপেক্ষার মুহূর্তগুলো হয় বড় দীর্ঘ। কাজ করলে, বরং দ্রুতই কাটবে সময়।

হাত চালাচ্ছে বটে, কিন্তু কাজে মন নেই ওদের। বার বার তাকাচ্ছে আকাশের দিকে। কান খাড়া করে রেখেছে ডানার ঝটপট শব্দের জন্যে।
সাড়ে এগারোটার দিকে চাচাকে ড্রাইভার বানিয়ে নিয়ে চাচী গেলেন বাজার করতে। দুটোর আগে ফিরবেন বলে মনে হয় না। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। চাচীর সামনে কবুতরটা নামলে প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে জান খারাপ হয়ে যেত ওর। সেদিক থেকে আপাতত নিশ্চিন্ত।
দুপুরের আগে কাজ থামিয়ে দিল ওরা। ওয়ার্কশপের বাইরে বসে অপেক্ষা করতে লাগল। আকাশের দিক থেকে চোখ নামাচ্ছে না তিনজনের একজনও।
বার বার ঘড়ি দেখছে কিশোর।
হঠাৎ লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল মুসা। কিন্তু বোকা বনে গেল পরমুহূর্তেই। একটা সোয়ালো উড়ে চলে গেল স করে।
ঠিক কখন যে ছাড়বে হ্যারিকিরি, জানি না, বলল কিশোর। হয়তো আগে খাওয়া-দাওয়া, তারপর…
আবার লাফিয়ে উঠল মুসা।
না, এবার আর ভুল করেনি।
কিশোর আর রবিনও দেখল, চকচকে পালক। মাথার ওপর একবার চক্কর দিয়ে নেমে আসতে শুরু করল।
টম! হাত নেড়ে চেঁচিয়ে ডাকল মুসা। টম! এই যে, এখানে টম!
টমও দেখেছে। গোত্তা দিয়ে নেমে পড়ল একেবারে মুসার বাড়ানো হাতের তালুতে। বার দুই ডানা ঝাপটে চুপ হয়ে বসল।
প্রায় ছোঁ মেরে পাখিটাকে ছিনিয়ে নিল কিশোর। প্রথমেই পা দেখল। পাতলা ধাতুর একটা আঙটা পরানো। কাঁপা হাতে আঙটাটা খুলে ফেলতেই টুপ করে মাটিতে পড়ল উজ্জ্বল একটা কিছু।
উবু হয়ে তুলে নিল কিশোর।
অন্য দুজনও ঝুঁকে এল দেখার জন্যে।
কিশোরের খোলা হাতের তালুতে ঝকমক করছে মস্ত একটা মুক্তো।
যাক, আমাদের অনুমান তাহলে ঠিকই হয়েছে, বলল কিশোর। হ্যারিকিরি, রিচার্ড হ্যারিস, দু-আঙুলা কবুতর…
আমাকে দাও ওটা, কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠল কেউ।
ঝট করে ফিরে তাকাল তিন গোয়েন্দা।
ওয়ার্কশপের ভেতর থেকে কথা বলেছে লোকটা। জঞ্জালের বেড়া ঘুরে দরজায় বেরিয়ে এল। পরনে কালো অয়েলস্কিন, চোখে কালো চমশা। দাড়িগোফের জঙ্গলের মাঝে একটুখানি পরিষ্কার জায়গা নাকের ফুটো দুটো।

ডান হাত বাড়িয়ে ধীরে ধীরে এগোল লোকটা। শক্ত করে ধরে রেখেছে লম্বা ব্যারেলের একটা পিস্তল।
মুসার মনে হলো নলের কালো ছিদ্রটা তার বুকের দিকেই নিশানা করে আছে। বুক ধড়ফড়ানি শুরু হলো আবার তার। মনে মনে বলল, বলেছিলাম না, রোগটা পারমানেন্ট হয়ে গেছে। আস্তে করে পাশে সরে যাচ্ছে সে, বেড়ার কাছে।
কিশোরের দিকে এগিয়ে আসছে লোকটা। দাও, মুক্তোটা আমাকে দাও।
লোকটার পিস্তল বা মুখের দিকে নজর নেই কিশোরের, সে তাকিয়ে আছে পায়ের দিকে, জুতোর দিকে। লোকটা কিছু বুঝে ওঠার আগেই চোখের পলকে মুক্তোটা মুখে পুরে জিভের ডগা দিয়ে ঠেলে একদিকের গালের কোণায় নিয়ে এল সে। শান্তকণ্ঠে বলল, আর এক পা যদি এগোন, মুক্তোটা আমি গিলে ফেলব।
রাগে কেঁপে উঠল লোকটা। ঝাপিয়ে পড়ল কিশোরের ওপর। গলা চেপে ধরতে চায়, যাতে গিলতে না পারে কিশোর।
লাফ দিয়ে এগিয়ে এল রবিন। লোকটার কাঁধ চেপে ধরে হ্যাঁচকা টানে সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করল।
সরতে গিয়ে একটা ঝাড়ুর ডাণ্ডায় হোঁচট খেল মুসা।
কিশোরের গলা চেপে ধরে আরেক হাতে পিস্তল দিয়ে বাড়ি মেরে রবিনকে ঠেকানোর চেষ্টা করছে লোকটা। বুকে বাড়ি খেয়ে ব্যথায় উফ করে উঠল রবিন। কিন্তু লোকটার কাঁধ ছাড়ল না, অয়েলস্কিন খামচে ধরে প্রায় ঝুলে রইল।
ঝাড়া দিয়ে লোকটার হাত ছাড়াতে চাইছে কিশোর। মুক্তোটা গালের কোণে আটকে রেখেছে শক্ত করে।
সরো, রবিন, সরো! চেঁচিয়ে উঠল মুসা।
সাহস ফিরে পেয়েছে আবার গোয়েন্দা-সহকারী। তার এই আরেক গুণ, এমনিতে ভয় পেলেও সত্যিকার বিপদের সময় বাঘের বাচ্চা হয়ে ওঠে সে, রীতিমত দুঃসাহসী বলা যায় তখন।
সরে গেল রবিন। ঝাটার ডাণ্ডা দিয়ে ধা করে নোকটার ঘাড়ে বাড়ি লাগিয়ে দিল মুসা।
কিশোরের গলা ছেড়ে দিল লোকটা, টলে পড়ে যাচ্ছে। হাত থেকে পিস্তল ছুটে গেল, নাকের ওপর থেকে খসে পড়ল চশমা।
কোনমতে সামলে নিল সে আবার, কিন্তু দাঁড়ানোর শক্তি নেই। বসে পড়ল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, পারলাম না আমি। তোমাদেরই জিত হলো! চোখ টিপল অদ্ভুত ভঙ্গিতে।
পিস্তলটা কুড়িয়ে নিল কিশোর। গুলি আছে?

না না, বাতিল, নষ্ট পিস্তল। বন্দুক-টন্দুককে সাংঘাতিক ভয় পাই আমি, চোখ পিটল লোকটা পর পর দুবার। ইচ্ছে করে করছে না এমন, এটা তার মুদ্রাদোষ। দুর্বল ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল।
বাড়ি মারার জন্যে ডাণ্ডা তুলল মুসা।
মেরো না, মেরো না, তাড়াতাড়ি দু-হাত নাড়ল লোকটা। আর ভাল লাগছে না আমার এসব। কেন যে মরতে এই অকাজ করতে গিয়েছিলাম। সব সর্বনাশের মূল ওই ঘোড়া, বুঝেছ, ঘোড়া। রেস খেলে ফতুর হয়ে গেছি, ধারকর্জ করে করে...লোকজন তাগাদা দিচ্ছে টাকার জন্যে। তাই কিছু টাকা জোগাড় করতে চেয়েছিলাম।
লোকটার জন্যে এখন দুঃখই হচ্ছে কিশোরের। হয়ে যেত জোগাড়, মিস কারমাইকেলের বাজপাখিগুলোর জন্যে পারলেন না।
মুখ থেকে মুক্তোটা বের করে পকেটে রেখে দিল কিশোর।
চুপচাপ দেখল লোকটা, অসহায় ভাবভঙ্গি।
ওগুলো আর খামোকা লাগিয়ে রেখেছেন কেন? বলল কিশোর। ওই দাড়িগোঁফ। খুলে ফেলুন। অস্বস্তি লাগছে না?
হ্যাঁ, খুলেই ফেলি, চোখ টিপল রিংকি।
দাড়িগোঁফ আর কালো অয়েলস্কিন খুলে ফেলার পর উলঙ্গ মনে হলো অসকার স্লেটারকে। দেহের আকারও যেন এক ধাক্কায় কমে গেছে অনেক।
নার্ভাস ভঙ্গিতে ক্রমাগত চোখ টিপে যাচ্ছে লোকটা। রবিন আর মুসাকে পাহারায় রেখে থানায় ফোন করতে চলল কিশোর।
সব স্বীকার করেছে অসকার স্লেটার, বলল কিশোর। তিনজনকেই অ্যারেস্ট করে হাজতে ভরেছিল পুলিশ। রিংকি, রিচার্ড হ্যারিস, হ্যারিকিরি। হ্যারিস আর হ্যারিকিরি জামিনে মুক্তি পেয়েছে। কিন্তু রিংকি ইচ্ছে করেই রয়ে গেছে হাজতে, জামিনে মুক্তি নেয়ার চেষ্টা করছে না। ওর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, গোপনে বলেছে আমাকে একথা হাজতে থাকলেই নাকি এখন তার ভাল, নিজেকে শোধরাতে বাধ্য হবে! রেস খেলা বন্ধ হবে। তবে আমার ধারণা, আসল কারণটা অন্য, হ্যারিস আর হরিকিরির ভয়েই আসলে বেরোতে সাহস পাচ্ছে না।
বিখ্যাত চিত্রপরিচালক মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফারের অফিসে বসে আছে তিন গোয়েন্দা। তাদের এবারকার কেসের রিপোর্ট দিচ্ছে পরিচালককে!
ওদের মুক্তো চুরির খবর জানল কি করে ব্লিংকি? জিজ্ঞেস করলেন পরিচালক।
রিচার্ড হ্যারিসের চাকরি করত সে, জবাব দিল রবিন। কবুতর দেখাশোনা করত, গহনার দোকানেও সাহায্য করত মাঝেসাঝে। তারপর একদিন কাশ চুরি। করে ধরা পড়ল! বের করে দিল তাকে হ্যারিস। কিন্তু ততদিনে হ্যারিসের গোপন

ব্যবসার অনেকখানিই জেনে ফেলেছে রিংকি, জেনে গেছে বেআইনী পথে মুক্তো। আসে।
কিন্তু কোন পথে আসে, জানত না, রবিনের কথার রেশ ধরে বলল মুসা। চাকরি যাওয়ার পর পেছনে লাগল সে। বের করে ছাড়ল, কোন পথে মুক্তো আসে।
আকাশ পথে, চেয়ারে হেলান দিলেন পরিচালক। তাতেই মতলবটা মাথায় ঢুকল রিংকির, ওরা যদি কবুতর দিয়ে আনাতে পারে, সে কেন পারবে না। এর জন্যে তার নিজস্ব কয়েকটা রেসিং হোমার দরকার শুধু তাই না, কিশোর?
মাথা ঝাঁকাল কিশোর। দুটো সুবিধে ছিল রিংকির। এক, রিচার্ড হ্যারিস একজন অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী, বেশি তাড়াহুড়ো করতে গেলে যে বিপদ হয়, এটা তার জানা, ফলে ধীরে সুস্থে এগোচ্ছিল সে। হপ্তার নির্দিষ্ট কয়েকটা দিনে কেবল কবুতর রেখে আসত হ্যারিকিরির ভ্যানে, কখনও সকালে, কখনও আগের দিন বিকেলে। হ্যারিকিরির সঙ্গে দেখা করত না সে, খুব হুশিয়ার লোক, টাকা দিত মাসে একবার। তা-ও হাতে হাতে নয়, খামে টাকা ভরে খাঁচার সঙ্গে টেপ দিয়ে আটকে চীজকুথ মুড়ে রেখে আসত ভ্যানে, কবুতরের সঙ্গে।
তবে জরুরী দরকার পড়লে দেখা করতেই হত, যোগ করল কিশোর। তেমন একটা জরুরী অবস্থায় ফেলে দিয়েছিলাম আমরা, টমকে নিয়ে তার কাছে গিয়ে। ভয় পেয়ে যায় হ্যারিস, ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করার জন্যে ছোটে হ্যারিকিরির বাড়িতে। আমাদের সঙ্গে সেদিনই দেখা হয়েছিল তার।
তোমাদেরকে লাঞ্চ খাইয়েছে যেদিন, মাথা নোয়ালেন পরিচালক। কিশোর, দ্বিতীয় সুবিধেটা কি?
হ্যারিকিরি জাপানী, বলল কিশোর। মাঝারি উচ্চতা, মুখ ভর্তি দাড়িগোঁফওয়ালা যে কোন আমেরিকানের চেহারা তার কাছে একরকম। দূর থেকে পোর্টিকোর ম্লান আলোয় আলাদা করে চিনতেই পারে না। অয়েলস্কিন পরে, নকল দাড়িগোঁফ লাগিয়ে যখন যেত রিংকি, ভ্যানে কবুতর রাখতে, বুঝতেই পারত না হ্যারিকিরিযে লোকটা হ্যারিস নয়। আড়ালে থেকে লক্ষ রাখত ব্লিংকি, হ্যারিস আসে কিনা, যদি না আসত, খাঁচায় ভরা নিজের কবুতর নিয়ে গিয়ে রেখে আসত ভ্যানে।
হুঁ, বুদ্ধিটা ভালই, বললেন পরিচালক।
হ্যাঁ, ভালই চলছিল বেশ কিছুদিন। হ্যারিকিরি টের পাচ্ছিল না, ফলে ব্রংকিও মুক্তো পাচ্ছিল। বাধ সাধল মিস কারমাইকেলের শিকারী বাজ।
রিংকিকে নিশ্চয় চেনেন মিস কারমাইকেল, না? জিজ্ঞেস করলেন পরিচালক। অনেক দিন হ্যারিসের ওখানে চাকরি করেছে লোকটা, মহিলাও দামী কাস্টোমার, পরিচয় হয়ে যাওয়ার কথা। তারমানে মহিলার বাড়িও চেনে। কবুতর যখন ফিরল না একদিন, নিশ্চয় খোঁজখবর নিতে শুরু করল। সন্দেহ করল, মিস

কারমাইকেলের বাজপাখিই এজন্যে দায়ী। ব্যস, গিয়ে শুরু করল বাজগুলোকে বিষ খাওয়ানো, ঠিক বলিনি?
হ্যাঁ। আরেকটা গোলমাল হলো, হঠাৎ করে বাড়ি বদল করল হ্যারিকিরি। ওদিকে পাওনাদারেরা চাপ দিতে শুরু করেছে। টাকার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠল রংকি। হ্যারিকিরিকে অনুসরণ করে তার বাড়ির খোঁজ বের করা ছাড়া আর কোন উপায় দেখল না সে। সেদিন সেজন্যেই বসেছিল সে স্ন্যাকস রেস্টুরেন্টে। তাড়াহুড়োয় ভুলে দু-আঙুলার খাঁচাটা ফেলে যায়।
হুঁ, এই প্রশ্নটারই জবাব পাচ্ছিলাম না, ওপরে নিচে মাথা দোলালেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। তারপর কি করল? দু-আঙুলাটাকে বদলে আনল কেন আবার?
হ্যারিকিরির পিছু নিয়ে তার নূতন বাড়িতে চলে গেল রিংকি, বলে গেল কিশোর। লুকিয়ে রইল দূরে, চোখ রাখল বাড়ির ওপর। সেদিন বিকেলেই এল হ্যারিস, কবুতর নিয়ে। আগের দিন বাড়ি বদলেছে হ্যারিকিরি, ঝামেলা ছিল, ফলে ছুটি নিতে হয়েছে, তাই পরের দিন ছুটির মধ্যে কাজ করে দেয়ার কথা। দুদিন মুক্তো পায়নি, তাই হ্যারিসও সেদিন কবুতর নিয়ে এসেছে। ভ্যানের পেছনে খাঁচা রেখে সে চলে গেল। ব্লিংকির তখন টাকার খুব দরকার। সে গিয়ে খাঁচাটা বের করে নিয়ে এল, তার নিজের কবুতর রাখবে তার জায়গায়। কিন্তু রেস্টুরেন্টে ফোন করে করে জানল, তার খাঁচা নিয়ে গেছি আমরা। ফলে আমাদের খুঁজে বের করতে হলো তাকে। হ্যারিসের কবুতরটা ছাড়তে সাহস হয়নি তার, ওটা ফিরে যাবে বাড়িতে, তাহলে গণ্ডগোল লাগবে। তাই তারটা খাঁচা থেকে বের করে নিয়ে হ্যারিসেরটা ভরে রেখে গেল।
কিন্তু পরদিন দুপুরে তার কবুতর মুক্তো নিয়ে ফেরেনি, বললেন পরিচালক।
না, মাথা নাড়ল কিশোর। এর আগেও দুটো কবুতর আর মুক্তো খুইয়েছে রিংকি। তিন নম্বরটা হারিয়ে ভীষণ রেগে গেল সে। মিস কারমাইকেলের বাড়ি গিয়ে বাজপাখিকে বিষ খাওয়াতে শুরু করল। আমাদেরকে ঢুকতে দেখেছে সে। দোয়েলটা যে তার মুক্তো চুরি করেছে, এটাও নিশ্চয় দেখেছে।
তাই মাথা আর ঠিক রাখতে পারেনি, মুচকি হাসলেন পরিচালক। রাগের মাথায় পিটিয়ে মেরেছে দোয়েলটাকে।
আমাদেরকে বেরোতেও দেখেছে সে, আবার বলল কিশোর, টমকে দেখেছে আমাদের সঙ্গে। পিছু নিয়েছে। আমাদেরকে হ্যারিসের দোকানে ঢুকতে দেখে সাংঘাতিক ভয় পেয়েছে।
ফুটপাথে বেরিয়ে দেখেছি আমরা কালো গাড়িটাকে, প্রমাণ দিল রবিন।
নিশ্চয় দ্বিধায় পড়ে গিয়েছিল রিংকি, বললেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। হ্যারিসের সঙ্গে তোমাদের কি কথাবার্তা হয়েছে, জানার কথা নয় তার।

নহ্যাঁ, হেলান দিল কিশোর। খুব বেশি চালাকি করেছে হ্যারিস আমাদের সঙ্গে। টমকে যেন চিনতেই পারেনি, এমন ভাব দেখিয়েছে। মেয়ে রেসিং হোমার রেস দেয় না, একথা বলে বোকা বানানোর চেষ্টা করেছে আমাদেরকে।
সে তো আর কল্পনা করেনি, কার পাল্লায় পড়েছে, হাসল মুসা।
তিন গোয়েন্দাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে ভুলই করেছে সে, স্বীকার করলেন পরিচালক। তারপর?।
রিংকি গেল ভয় পেয়ে, আগের কথার খেই ধরল কিশোর! সে চাইল, আমাদের সন্দেহ হ্যারিসের ওপর পড়ুক, একই সঙ্গে টমকে ছেড়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে হ্যারিসকেও ঠাণ্ডা রাখতে চাইল, তাই ফোন করল আমাদেরকে। টমকে নিয়ে যেতে বলল। গেলাম। পাখিটা ছিনিয়ে নিল আমার কাছ থেকে।
থামল কিশোর। আমাকে বোকা প্রায় বানিয়েই ফেলেছিল। আবছা অন্ধকারে এক পলকের জন্যে চেহারা দেখেছি তার। তাছাড়া মিস কারমাইকেলের বাগানে যে চেহারা দেখেছি, ওটা সেই একই চেহারা।
সন্দেহ শুরু করলে কখন?।
বাগানেই সন্দেহ করেছি। সাইকেলের আলো মুখে পড়ায় যখন ঘাবড়ে পালাল। এক বাড়ি মেরে মিস করেছে, আরও তো মারতে পারত। তা না করে দৌড়, ভয় যে পেয়েছে সেটা প্রকাশ করে দিল। তারপর পেলাম পায়ের ছাপ। তবে স্পষ্ট করে দিয়েছে মুসা…
আমি? সহকারী গোয়েন্দা অবাক।
হ্যাঁ, তুমি, মানে তোমার বাবার কালো চশমা। সেদিন তুলসীবনে ওটা পরেই ঘুমিয়েছিলে, তোমার চোখ দেখতে পাইনি। শিওর হয়ে গেলাম, কেন চশমা না পরে সামনে আসে না রংকি। কারণ, তার চোখ মিটমিট করার মুদ্রাদোষ আছে। চশমা ছাড়া লুকায় কি করে?
হুঁ, চেয়ারের হাতলে আস্তে আস্তে চাপড় দিলেন পরিচালক। তা, মিস কারমাইকেল কেমন আছেন? তার পাখি খুনের রহস্য তো ভেদ হলো।
ভাল, হেসে বলল মুসা। তার বাজ পাখিকে বিষ খাওয়াবে না আর কেউ। তবে হীরার কথা তুললেই মন খারাপ হয়ে যায়।
দোয়েল তো আরেকটা আছে…কি যেন নাম…
পান্না। কিন্তু ওটা তো হীরার মত মুক্তো আনে না। আনে যত্তোসব চুলদাড়ি, ভাঙা কাচ…
তবে দাড়ি পেয়ে কিশোরের সুবিধে হয়েছে, বললেন পরিচালক। তাই না, কিশোর?
হ্যাঁ, স্যার। রিংকির দাড়িগোঁফ যে নকল, বুঝতে পেরেছি।

দরজায় নক করে ভেতরে ঢুকল মিস্টার ক্রিস্টোফারের বেয়ারা। এক হাতে কয়েকটা খাবারের বাক্স, আরেক হাতের তালুতে বসে আছে একটা হোতা।
মুসার উজ্জ্বল চোখের দিকে চেয়ে ব্যাখ্যা করলেন পরিচালক, জানি তো, অনেক কথা থাকবে তোমাদের। তাই আসছ ফোন পেয়েই অর্ডার দিয়ে রেখেছি... বেয়ারার দিকে ফিরলেন! কার তোতা ওটা? কোথকে আনলে?
মুসা আমানের সাইকেলে বসা দেখলাম, জবাব দিল বেয়ারা। খালি চেঁচাচ্ছিল। কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। ভাবলাম, ওনাদেরই কারও, তিন গোয়েন্দাকে দেখাল সে! আসবে নাকি জিজ্ঞেস করতেই উড়ে এসে বসল হাতে। রেখে আসতে পারলাম না।
এটাই মিস কারমাইকেলের সেই তো নাকি? মুসাকে জিজ্ঞেস করলেন পরিচালক।
হ্যাঁ, স্যার, বলল মূলা। তাঁর বাড়ি গিয়েছিলাম, তোতাটা কিছুঁতেই ছাড়ল, তাই সঙ্গে নিয়ে এসেছি। মিস কারমাইকেলকে বলেছি, সন্ধ্যায় ফিরিয়ে দিয়ে আসব।
জিম বলছে, কিছু নাকি বলছিল।
কি রে, কি বলছিলি? তোতাটাকে হাতে নিয়ে জিজ্ঞেস করল মুসা।
যেন মুসার প্রশ্নের জবাবেই গেয়ে উঠল তোতা, আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।
ভুরু কুঁচকে মুসার দিকে তাকালেন পরিচালক। চোখ নাচালেন, অর্থাৎ মানে কি?
বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত, স্যার, বলল মুসা। সেদিন সন্ধ্যায় গেয়েছিলাম আমরা, শিখে নিয়েছে।
কি মিস্টার, খাবারের বাক্স খুলতে খুলতে তোরাটার দিকে ফিরে চাইল বেয়ারা, বাড়ি আমেরিকায়, থাকো আমেরিকায়, খাও এখানকার, গান বাংলাদেশের কেন? খুব খারাপ কথা। .
নিষ্ঠুর! চেঁচিয়ে উঠল তোতা। নিষ্ঠুর! নিষ্ঠুর!
হেসে উঠল তিন গোয়েন্দা। সদাগম্ভীর চিত্রপরিচালক পর্যন্ত সব কিছু ভুলে হেসে উঠলেন হো হো করে।

ভলিউম ৩ – মৃত্যুখনি – তিন গোয়েন্দা – রকিব হাসান – সেবা প্রকাশনী

এই যে, কিশোর, দুই সুড়ঙ্গের ঢাকনা তুলে উঁকি দিয়েই বলল মুসা আমান, জানন, কার সঙ্গে দেখা হয়েছে?

মুসার পেছনে হেডকোয়ার্টারে ঢুকল রবিন মিলফোর্ড।

হেডকোয়ার্টার মানে পুরানো বাতিল একটা ট্রেলার-মোবাইল হোম, পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডের পাহাড় প্রমাণ লোহালকড়ের জঞ্জালের তলায় চাপা পড়েছে অনেক দিন আগে, বাইরে থেকে দেখা যায় না। ভেতরে ঢোকার জন্যে কয়েকটা গোপন পথ বানিয়ে নিয়েছে তিন গোয়েন্দা, তারই একটা দুই সুড়ঙ্গ।

জানি, বলল ডেস্কের ওপাশে সুইভেল চেয়ারে বসা কিশোর পাশা, মেরিচাচী। আজ ভোর ছটায় উঠে নাস্তা খাইয়ে জোর করে রাশেদ চাচাকে পাঠিয়েছে একটা গ্যারেজে, পেপারে বিজ্ঞাপন দিয়েছে ওখানে নাকি অনেক পুরানো মাল বিক্রি হবে, জিনিসপত্রের লিস্ট দেখে খুব পছন্দ হয়েছে চাচীর।

ঘড়ির দিকে তাকাল সে। সোয়া একটা বাজে। এতক্ষণে নিশ্চয় এসে পড়েছে চাচা। ট্রাক বোঝাই করে মালপত্র নিয়ে এসেছে। বোরিস আর রোভার একা পারছে না, নামানোর জন্যে আমাদেরকেও দরকার। তাই ওয়ার্কশপে খুঁজতে এসেছে চাচী, আসার সময় তাকেই দেখে এসেছ।

হলো না, হাসল রবিন। ভুল করলে মিস্টার শার্লক হোমস, চেয়ারে বসতে বসতে বলল সে। কিশোর পাশাও ভুল করে তাহলে।

চাচী নয়, কিশোর, চাচী নয়, মুখ টিপে হাসল মুসা। অনুমান করো তো, আর কে হতে পারে?

উঁ-হুঁ, পারছি না, অবাক হয়েছে যেন কিশোর। তোমরাই বলো।

ধীরে বন্ধু, ধীরে, খুব মজা পাচ্ছে সহকারী গোয়েন্দা, এত তাড়াহুড়ো কেন? এসেছি, দু-দণ্ড বসি, জিরাই, তারপর বলব। এখন কেমন লাগছে? কোন রহস্য যখন বুঝি না, আমাদের ধাধায় রেখে খুব তো মজা পাও। এখন?

না ভাই, আর থাকতে পারছি না, আগ্রহে সামনে ঝুঁকে এল কিশোর। বলো না, বলেই ফেলো।

তাহলে ভবিষ্যতে আর ভোগাবে না তো আমাদের?

না।

রবিনের দিকে তাকাল মুসা। কিরবিন, বলব?

মাথা কাত করল রবিন। কিশোরের হাবভাব সন্দিহান করে তুলছে তাকে। এভাবে আগ্রহ প্রকাশ করবে কিশোর পাশা?...নাহ ঠিক মানাচ্ছে না স্বভাবের, সঙ্গে...

সকালে বাজারে গিয়েছিলাম, বলার জন্যে উদগ্রীব হয়ে আছে মুসা, এতক্ষণ চেপে রাখতে তারই কষ্ট হয়েছে। দেখা হয়ে গেল জিনার সঙ্গে।

জিনা? ঝট করে সোজা হলো কিশোর।
আরে হ্যাঁ, জিনা। আমাদের জরজিনা পারকার।
তাই নাকি? আমি তো জানতাম নিউ মেসিকোয় ছুটি কাটাচ্ছে ও, চাচার র‍্যাঞ্চে। তার মা-বাবা গেছেন জাপানে, সেখানে এক বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে যোগ দেবেন মিস্টার পারকার।
তুমি জানতে? কই বলোনি তো।
জিজ্ঞেস তো করোনি। যাকগে, কোথায় এখন জিনা?
পারকার হাউসে, জবাব দিল রবিন। মুসার কাছে শুনলাম, কিছু জিনিসপত্র নিতে এসেছে, গুছিয়ে নিচ্ছে হয়তো।
জ্বী না, জনাবেরা। আমি এখানে,পর্দা সরিয়ে ল্যাবরেটরি থেকে বেরিয়ে এল জিনা। পরনে রঙচটা জিনসের প্যান্ট, গায়ে ধবধবে সাদা সিল্কের ওয়েস্টান শার্ট যেন এই মাত্র নামল ঘোড়ার পিঠ থেকে।
হাঁ হয়ে গেল মুসা আর রবিন।
মিটিমিটি হাসছে কিশোর।
তু-তুমি! তোতলাচ্ছে মুসা কিশোরের দিকে চেয়ে। আমাদের বোকা...দুত্তোর! নিজের ওপর রেগে গেল সে। ভেবেছিল কিশোরকে জব্দ করবে, উল্টে তাদের দুজনকেই এমন চমকে দিল গোয়েন্দাপ্রধান। হতাশ চোখে রবিনের দিকে তাকাল মুসা।
তুমি বাড়ি যাওনি? মবিন জিজ্ঞেস করল জিনাকে।
না, বাজার থেকে সোজা চলে এসেছি। এই তো, আমিও ঢুকলাম, তোমরাও ঢুকলে।
তবে না বলেছিলে, বাড়ি যাবে? ক্ষোভ ঢেকে রাখতে পারল না মুসা, যেন সব দোষ জিনার।
বলেছিলাম, কিন্তু যাইনি। ইচ্ছে করেই যাওনি, আমাদের জব্দ করার জন্যে।
আরে, কি মুশকিল? আমি জানি নাকি, তুমি এসে এরকম করবে কিশোরের সঙ্গে। এতই যদি ঠকানোর ইচ্ছে ছিল, আগে বললে না কেন আমাকে?
আরে দূর, রাখো তো, ধমক দিয়ে দুজনকে থামাল রবিন। কি ছেলেমানুষী করছ? মুসা, তখনই বলেছিলাম, এসবের দরকার নেই, পারবে না কিশোরের সঙ্গে। ও সব সময় এক ধাপ এগিয়ে থাকে।
খামোকা লজ্জা দিচ্ছ, রবিন, বাধা দিল কিশোর। এটাতে আমার কোন মত ছিল না, নিতান্ত ভাগ্যক্রমেই ঘটে গেছে, জিনা তোমাদের আগে জল এসেছে যাকগে, জিনা, বসো। তা কি মনে করে?

এমনি। চাচার কাজ ছিল রকি বীচে। জিজ্ঞেস করল আসব নাকি? ভাবলাম, তোমাদের সঙ্গে দেখা করে যাই। তাছাড়া কয়েকটা জিনিস রয়েছে বাড়িতে, নিয়ে যাব।
কবে যাচ্ছ? আজই?
আগামীকাল।
ভালই কাটছে তাহলে ছুটি।
দারুণ, মাথা ঝাঁকি দিল জিনা, মুখের ওপর এসে পড়ল এক গোছা রোদেপোড়া তামাটে চুল, সরালো। যা একখান কেস পেয়েছি না। উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে বড় বড় তামাটে দুটো চোখের তারা।
কেস? মুসার রাগ পানি।
হ্যাঁ, ওপরে নিচে মাথা দোলাল জিনা। চাচার চোখে ধূলো দেয়ার চেষ্টা করছে, কিন্তু আমি তা হতে দেব না।
কেন বোকা নাকি তোমার চাচা?
তুমি যে কি বলো, মুসা, চাচা বোকা হবে কেন? আমার বাপের ফুফাত ভাই কোয়েনটিন উইলসনকে বোকা বলে কার সাধ্য? স্টক মার্কেটে অনেক টাকা কামিয়েছে, নিউ মেকসিকোয় র‍্যাঞ্চ আর জায়গা কিনে এখন ক্রিস্টমাস গাছের ব্যবসা ফেঁদেছে। এমনিতে খুব চালাক। কিন্তু মানুষের ব্যাপারে একেবারে দিল-দরিয়া, সবাইকেই বিশ্বাস করে, সেজন্যে ঠকেও মাঝে-মধ্যে, তা-ও শিক্ষা হয় না।
তুমি তাহলে মানুষ চেনো কলতে চাও, হাসল মুসা।
সবাইকে চিনি বলাটা ঠিক হবে না, রাগল না জিনা, কিন্তু মুসার খেচাটা ফিরিয়ে দিল, তবে হদ্দ বোকা, আর হারামী লোক দেখলেই চিনতে পারি। কিশোরের দিকে ফিরল। চাচা যে জায়গাটা কিনেছে, সেটা আগে মাইনিং কোম্পানির ছিল। একটা খনি এখনও আছে, নাম ডেথ ট্যাপ মাইন।
মৃত্যুখনি, বিড়বিড় করুল কিশোর।, আরিাব, সাংঘাতিক নাম তো,চোখ বড় বড় করল মুসা। তা কি পাওয়া যায় এই খনিতে? ডাইনোসরের হাড়?
রূপা, মুসার কথা গায়ে মাখল না জিনা। খনিটা এখন মৃত। রূপাও ফুরিয়েছে। ওরকম নাম দেয়ার কারণ, এক মহিলা ওটাতে পড়ে মরেছিল। টুইন লেকসে খনির আশেপাশে এখনও নাকি মাঝে-সাঝে ওই মহিলার ভূত দেখা যায়। আমি এর একটা বর্ণও বিশ্বাস করি না। তবে শয়তানের ছোঁয়া আছে ওখানে। খনি আর তার আশপাশের অনেক জায়গা কিনে নিয়েছে এক ব্যাটা। রোদে পোড়া গালের চামড়ায় রক্ত জমল তার। কিছু একটা কুকাজ করছে হারামীটা, বদমতলব আছে। আরও মজা কি জানো, ব্যাটা জমেছেও টুইন লেকসে।
সেটা কি অপরাধ নাকি? অবাক হলো রবিন।

না। তবে কেউ জন্মের পর পরই যদি কোনও জায়গা ছেড়ে চলে গিয়ে কোটিপতি হয়ে ফিরে আসে, অনেক জায়গা কিনে বসবাস শুরু করে আর ভাব দেখায়, আহা আমার মাতৃভূমি, আমি তোমায় কত ভালবাসি।তাহলে গা জ্বলে? আস্ত ভণ্ড! লোকটা ব্যাটল সাপের চেয়েও বদ। খনির মুখ আবার খুলেছে সে। লোহার গ্রিল দিয়ে বন্ধ করা ছিল, সে খুলেছে, তারপর খনির মুখে পাহারায় রেখেছে এক বাঘা কুকুর। ওই মরা খনিতে কি পাহারা দেয়? ঝকঝকে নতুন জিনস আর শক্ত হ্যাট পরে ঘুরে বেড়ায় ব্যাটা, একেবারেই বেমানান। মেয়েদের মত নখের যত্ন করে আবার। বলল, ব্যাটাছেলের এই ন্যাকামি সহ্য হয়? চুপ করল জিনা। ছেলেরা কেউ কিছু বলছে না দেখে আবার মুখ খুলল, খনির ধারে-কাছে ঘেঁষতে দেয় না কাউকে। ব্যাপার সুবিধে ঠেকছে না আমার। চাচার ঠিক নাকের সামনে কিছু একটা করছে সে। চাচা বুঝতে পারছে না বটে, কিন্তু আমি সন শয়তানী বের করেই ছাড়ব।

আল্লাহ তোমার সহায় হোন, শান্তকণ্ঠে বলল মুসা।

মুসার ছাল ছাড়ানোর জন্যে মুখ খুলতে যাচ্ছিল জিনা, এই সময় স্পীকারে ডাক শোনা গেল, জিনা?

উঠে গিয়ে ট্রেলারের ছাতে বসানো পেরিস্কোপ সর্বদর্শন-এ চোখ রাখল রবিন। একজন লোক, সাদা চুল, বড় গোঁফ। মেরিচাচীও সঙ্গে আছেন।

আমার চাচা, উঠে দাঁড়াল জিনা। বলে এসেছিলাম আমি এখানে থাকব। তোমরা দেখা করবে চাচার সঙ্গে? খুব ভাল মানুষ, আমি খুব পছন্দ করি।

উঠল কিশোর।

বেরিয়ে এল ওরা চারজনেই।

এই যে, দেখেই বলে উঠলেন মেরিচাচী। গর্ত থেকে বেরিয়ে এসেছে শেয়াললো। এত চেষ্টা করলাম, গর্তটার মুখ খুজে পেলাম না আজক।

চাচী, কেমন আছেন? জিজ্ঞেস করল জিনা।

ভাল। তুমি কেমন?

শুধু মাথা কাত করে বোঝাল জিনা, ভালই আছে।

এগিয়ে এলেন মিস্টার উইলসন, একে একে হাত মেলালেন তিন কিশোরের সঙ্গে। আন্তরিক হাসিতে উদ্ভাসিত মুখ।

তোমরাই তাহলে তিন গোয়েন্দা। তোমাদের প্রশংসা এত করেছে জিনা...

দর, কই এত বললাম, লজ্জা পেয়েছে জিনা, অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

পকেট থেকে কার্ড বের করে বাড়িয়ে ধরল কিশোর। আমাদের কার্ড। যদি কখনও দরকার লাগে...

কার্ডটা পড়লেন উইলসন। ভুরু কোঁচকালেন, আশ্চর্যবোধকগুলো কেন?

আমাদের মনোগ্রাম, গভীর মুখে জবাব দিল কিশোর। সব রকম আজব রহস্যের কিনারা করতে আমরা প্রস্তুত, এটা তারই সঙ্কেত।
হুঁ, হাসলেন তিনি। রহস্য সমাধান করতে তোমাদের দরকার কখনও পড়বে না… তবে হ্যাঁ, অন্য একটা কাজে সাহায্য করতে পারো। মালির কাজ করেছ কখনও?
তা বোধহয় করেনি, হেসে বলল জিনা। তবে ইয়ার্ডে জোগালীর কাজ প্রায়ই করে। গুনেছি, তার জন্যে টাকাও নেয় আবার।
তাই নাকি? তাহলে তো খুব ভাল। তোমরা গাছ ছাঁটতে পারবে?
গাছ? রবিন বলল।
ক্রিস্টমাস গাছ, বললেন উইলসন। হেঁটে হেঁটে ডাল পাতা ঠিক রাখতে হয়, নইলে বড়দিনের সময় মাপমত থাকে না, বেয়াড়া রকম ছড়িয়ে যায় এদিক ওদিক। টুইন লেকসে লোক পাচ্ছি না। এখন তো তোমাদের ছুটি, চলো না কাল আমাদের সঙ্গে। দুই হপ্তায় অনেক উপকার হবে আমার।
চাচীর দিকে তাকাল কিশোর নীরবে।
ইঙ্গিতটা বুঝলেন উইলসন। মেরিচাচীকে বললেন, কোন অসুবিধে হবে না ওদের, মিসেস পাশ। অনেক ঘর খালি আছে আমার, খাওয়া-দাওয়ার কোন অসুবিধে নেই। কিশোরকে যাওয়ার অনুমতি দিন আপনি, মুসা আর রবিনের মায়ের সঙ্গে আমি নাহয় কথা বলবো।
আমি বললেও রাজি হবে, ভাবলেন মেরিচাচী। কিন্তু কথা সেটা না। ইয়ার্ডেও অনেক কাজ। ভাবছিলাম, জঞ্জাল অনেক জমেছে, ওদের স্কুল যখন ছুটি, সাফ করে ফেলত পারত।
চাল, এগিয়ে গিয়ে চাচীর দুই কাঁধে হাত রাখল কিশোর, তোমার কাজ পরেও করে দিতে পারব আমরা। মেকসিকোয় যাওয়ার শখ আমার অনেকদিনের, সুযোগ পাইনি। আঙ্কেল এত করে বলছেন
চাচী, মানা করবেন না, প্লীজ, জিনাও কিশোরের সঙ্গে সুর মেলাল। ওদের খাওয়ার দিকে আমি খেয়াল রাখব, নিজে…
ঠিক আছে, আর অমত করলেন না মেরিচাচী।
কিশোরের দিকে চেয়ে চোখ টিপল জিনা, মুখে রহস্যময় হাসি।
হঠাৎ বুঝে ফেলল কিশোর, ফাদে ফেলেছে ওদেরকে জিনা। বেশ কায়দা করে রাজি করিয়ে নিয়েছে। গাছকাটা না ছাই, আসলে জিনার ইচ্ছে, একবার তিন গোয়েন্দাকে নিউ মেসিকোয় নিয়ে গিয়ে ফেলতে পারলে হয়, হারামী লোকটার রহস্য সমাধানে সাহায্য না করে যাবে কোথায়?
নিজের ওপর রেগে গেল কিশোর, এত সহজে ধরা দিল বলে। কিন্তু এখন আর পিছিয়ে আসার উপায় নেই, মেরিচাচীকে রাজী করাতে সে নিজেই চাপাচাপি

করছে। তবে অখুশি হওয়ারও কোন কারণ নেই, রহস্যের পূজারী সে, রহস্যের গন্ধ পাচ্ছে, তাছাড়া রয়েছে নতুন দেশ দেখার উন্মাদনা।
চাচী, হাসিতে ঝকঝকে সাদা দাঁত বেরিয়ে পড়েছে মুসার, মাকে আগে আপনি ফোন করে দিন, তারপর আমি গিয়ে বলব।
যাই লাইব্রেরিতে গিয়ে ছটি নিয়ে আসি, রবিন বলল। চাচী, আমার মাকেও বলবেন। বাবাও মনে হয় বাসায় আছে এখন। সাইকেলের দিকে দৌড় দিল সে।
সেদিকে চেয়ে হাসলেন চাচী।
হ্যাঁ, মিসেস পাশা, বললেন উইলসন, কিছু ভাববেন না। বেশি খাটাব না ছেলেদের মোটেও ভাবি না আমি, হেসে বললেন মেরিচাচী, আদৌ খাটাতে পারেন কিনা দেখেন। কি ভাবে যে ফাঁকি দেবে, টেরই পাবেন না। আপনার কি মনে হয়, গাছ কাটার জন্যে ওদের এত উৎসাহ? মোটেও না। মস্ত কোন ঘাপলা আছে কোথাও, জিনার দিকে তাকালেন তিনি।
চট করে অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে নিল জিনা।
ওই যে, টুইন লেকস, ঘোষণা করলেন মিস্টার উইলসন।
বড় একটা এয়ার-কণ্ডিশনড স্টেশন ওয়াগনে করে অ্যারিজোনা মরুভূমি পাড়ি দিচ্ছে ওরা। দক্ষিণ-পশ্চিমে মাথা চাড়া দিচ্ছে নিউ মেকসিকোর পাহাড়শ্রেণী। পেছনের সীটে বসে উৎসুক হয়ে জানালা দিয়ে দেখছে ছেলেরা। পাকা, চওড়া সড়কের শেষ মাথায় রুক্ষ পর্বতের কোলে সবুজে ছাওয়া একটা মরুদ্যান যেন হঠাৎ করে গজিয়েছে। ধুলোয় ধূসর পথের ধারে কাঠের বাড়িঘর চোখে পড়ছে এখান থেকেই।
আরও এগোলো গাড়ি। মেইন রোডের ধারে পথের দিকে মুখ করে রয়েছে মুদ দোকান, ওষুধের দোকান, খবরের কাগজের অফিস, আর ছোট একটা লোহালক্কড়ের দোকান।
শহরের কেন্দ্রে দোতলা একটা পাকা বাড়ি, কোর্টহাউস! বাড়িটা ছাড়িয়ে একটু দূরে পেট্রল স্টেশন, তারও পরে টুইন লেকসের দমকল বাহিনীর অফিস।
আগুন! হাত তুলে দেখাল মুসা।
শহরের বাইরে এক জায়গায় ধোঁয়ার কুণ্ডলীতে কালো হয়ে গেছে বিকেলের আকাশ।
ভয় নেই, ফিরে বলল জিনা, সামনে, চাচার সীটের পাশে বসেছে। করাত কলের চুলোর ধোয়া।
এককালে খনিই ছিল এখানকার গরম ব্যবসা, গাড়ি চালাতে চালাতে বললেন মিস্টার উইলসন। এখন কাঠের কলই ভরসা। কাঠের ব্যবসাই টিকিয়ে রেখেছে শহরটাকে। অথচ, পয়তাল্লিশ বছর আগে কি জমজমাট শহরই না ছিল।

বেশি হট্টগোল আমার ভাল্লাগে না, বলল মুসা। মন টেকে না। শান্তই ভাল।
ক্ষণিকের জন্যে ফিরে তাকালেন মিস্টার উইলসন। শান্ত? জিনা, গপ্পো দুয়েকখান শোনাও তোমার বন্ধুকে। টুইন লেকস শান্ত, হাঁহ আমি বলতে চেয়েছি, আগের টাকার গরম আর নেই এখন শহরটার।
আমার গপ্পো এখন একটাই, সামনের দিকে চেয়ে থেমে গেল জিনা। হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে এক মহিলা। গাড়ি থামালেন মিস্টার উইলসন, জিনসের প্যান্ট আর লম্বা বুলিওয়ালা পশমী শার্ট পরা এক মিহলাকে রাস্তা পেরোতে দিলেন।
একটাই কথা,আবার বল জিনা, হ্যারি ম্যাকআরার একটা আস্ত ভণ্ড।
নাক দিয়ে হাসি আর গোঙানির মাঝামাঝি একটা বিচিত্র শব্দ করলেন মিস্টার উইলসন, ব্রেক চেপে রেখে ফিরলেন ছেলেদের দিকে। দেখো, জিনার কথায় মিস্টার ম্যাকআরবারের ওপর গোয়েন্দাগিরি করতে যেয়ো না। ও আমার পড়শী, আর পড়শীর সঙ্গে মুখ কালাকালি ভাল না। তাছাড়া সুখ্যাতি আছে তার। তার ওপর রয়েছে টাকা, প্রচুর টাকা। টুইন লেকস তার জন্মভূমি, এত বছর পরও তাই ফিরে এসেছে। আমাকে বলেছে, ছেলেবেলায় খনি শহরের অনেক রোমাঞ্চকর গল্প শুনেছে মা-বাবার মুখে, তখন থেকেই তার ইচ্ছে, সুযোগ হলেই সে ফিরে আসবে এখানে। খনিটা কিনেছে, তার কারণ, এককালে তার বাবা কাজ করত ওখানে। ওর কাজকর্ম আমার কাছে তো কই, অস্বাভাবিক ঠেকে না।
তাহলে খনির মুখ আবার খুলল কেন? তর্ক শুরু করল জিনা।
তাতে তোর মাথাব্যথা কিসের? বললেন চাচা। তার খনির মুখ সে খুলল না বন্ধ করল, তাতে কার কি? খোঁজ খবর নিয়েছি আমি অনেক, লোকটার কোন বদনাম শুনিনি।
ছেলেদের দিকে চেয়ে হাসলেন। কেন দেখতে পারে না জানো? জিনাকে শার্টের কলার চেপে ধরে বের করে দিয়েছিল ম্যাকআরথার, তারপর থেকেই যত রাগ। তবে অন্যায় কিছু করেনি সে, তাহলে আমিই তো গিয়ে ধরতাম। কয়েক বছর আগে ওই খনিতে পড়ে এক মহিলা মরেছে। দুর্ঘটনা আরও ঘটতে পারে। জিনাকে সেজন্যেই বের করে দিয়েছে সে।
হেসে ফেলল মুসা, কি শুনছি, জিনা? তোমাকে নাকি ঘাড় ধরে…
চুপ! রাগে কেঁপে উঠল জিনার গলা।
জিনাকে কলার ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে একজন লোক, দৃশ্যটা কল্পনা করে কিশোরও হাসি চাপতে পারছে না। বুঝতে পারছে, এজন্যেই চাচাকে ভজিয়েভাজিয়ে রকি বিচে নিয়ে গেছে জিনা, তিন গোয়েন্দাকে দাওয়াত করে এনেছে। ম্যাকআরথারের ওপর প্রতিশোধ নিতে, এক কুলিয়ে উঠতে পারেনি…
ব্যাটা আস্ত ভণ্ড! চেঁচিয়ে বলল আবার জিনা।

একআধটু পাগলাটে হতে পারে, কিশোর বলল। কোটিপতিদের কেউ কেউ যেমন হয়।
তাতে দোষের কিছু আছে? বললেন মিস্টার উইলসন, ব্রেক ছেড়ে গাড়ি চালু করে দিলেন আবার। জিনা, আমি চাই না ভদ্রলোককে তুমি বিরক্ত করো। তোমাদেরও বলে রাখলাম, কিশোর।
একটা কাঠের ব্রিজের ওপর উঠল গাড়ি, ঝাঁকুনি খেতে খেতে এগোচ্ছে। নিচে রু খাল, দুই মাথা গিয়ে পড়েছে দুটো ক্ষুদে দে, পুকুরই বলা চলে। ছেলেরা অনুমান করল জোড়া হদের জন্যেই নাম হয়েছে টুইন লেকস।
পুলের পরে একটা কাঁচা রাস্তায় নামলো গাড়ি, পেছনে ধুলোর মেঘ উড়িয়ে চলল। মাইলখানেক দূরে পথের বাঁয়ে সবুজ খেত। আরও পরে একটা খোলা গেট দেখা গেল, তার ওপাশে কয়েকটা বাড়িঘর। একটা বাড়ি নতুন রঙ করা হয়েছে, বাকিগুলো পুরানো, দেখে মনে হয় না মানুষ থাকে।
গতি কমালেন মিস্টার উইলসন, হর্ন বাজালেন একজন লম্বা, হালকা-পাতলা মহিলাকে উদ্দেশ্য করে, ছোট একটা বাড়ির সামনে বাগানে পানি দিচ্ছেন তিনি।
মিসেস ফিলটার, ছেলেদেরকে বলল জিনা।
হেসে হাত নাড়লেন মহিলা। পরনে ঢিলা পাজামা, গায়ে সাদা শার্ট, গলায় নীলকান্তমনি, খচিত রুপার একটা বেশ বড়সড় হার। ধূসর চুলে রুপালি ছোপ লেগেছে, বয়েস ষাটের কাছাকাছি, কিন্তু হোস নেড়ে যেভাবে পানি দিচ্ছেন, ক্ষিপ্রতা দেখে মনে হয় না এত বয়েস।
এই শহরের সুদিন কালে এখানে জন্মেছিলেন মহিলা, জিনা বলল। খনির সুপারিনটেনডেন্টকে বিয়ে করেছিলেন। খনি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর চলে গিয়েছিলেন দুজনেই। স্বামীর মৃত্যুর পর ফিনিক্সে এক দোকানে কাজ নিলেন মহিলা, টাকাটুকা জমিয়ে, চাকরি ছেড়ে এখানে ফিরে এসেছেন বাকি জীবনটা শান্তিতে কাটাতে। যে বাড়িতে বৌ হয়ে ঢুকেছিলেন, বিক্রি করে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন, সেটাই কিনে নিয়েছেন আবার। আরও কিছু জায়গা কিনেছেন মহিলা, বোধহয় পুরানো দিনের
স্মৃতি ধরে রাখার জন্যেই ভুলেও কখনও ব্যবহার করেন না ওগুলো।
ম্যাকআরবারের সঙ্গে মহিলার যথেষ্ট মিল দেখা যাচ্ছে, বলল রবিন।
না না, জোর গলায় বলল জিনা, মহিলা খুব ভাল।
আসলে, এখানে যারা ফিরে আসে তাদের একজনের সঙ্গে আরেকজনের মিল থাকেই, বললেন উইলসন, টুইন লেকসকে একবার ভালবেসে ফেললে দুনিয়ার আর কোথাও গিয়ে শান্তি নেই, ফিরে আসার জন্যে খালি আনচান করে মন। শেষ বয়েস কাটানোর এত চমৎকার জায়গা কমই আছে। গেটের সামনে এনে গাড়ি

থামালেন। হাত তুলে দেখালেন, পথটা গিয়ে শেষ হয়েছে পর্বতের উপত্যকায়। ওটা পশ্চিম। তার বাঁয়ে পোয়াটাক মাইল দূরে কালো রঙ করা কাঠের বেড়া। ওটাই খনিমূখ। আর ওই যে কেবিনটা, ওটাতে থাকে ম্যাকআরথার। পেছনে যে বিল্ডিংটা, ওটাও তার। আগে ওখানে খনির নানারকম কাজকর্ম হত।

গেটের ভেতরে গাড়ি ঢোকালেন তিনি। মাটির রাস্তা, তাতে চাকার গভীর খাজ। চলার সময় আপনাআপনি চাকা ঢুকে যায় খাজের মধ্যে, সরানো কঠিন। পথের দুধারে সারি সারি নবীন ক্রিস্টমাস গাছ। বেড়া দেয়া একটা পশু রাখার খোয়াড়ের পাশ কাটিয়ে এল গাড়ি, ভেতরে গোটা চারেক ঘোড়া ঘাস খাচ্ছে, ওগুলোর মাঝে জিনার কমেটকে চিনতে পারল তিন গোয়েন্দা। আরও পরে, বায়ে সুন্দর একটা র‍্যাঞ্চ হাউস, ছোট ছোট গাছ ঘিরে রেখেছে। সীডার-লাল রঙের ওপর সাদা অলঙ্করণ, চার পাশের সবুজের মাঝে ছবির মত লাগছে বাড়িটাকে। পথের শেষ মাথায় ভাঙাচোরা পুরানো একটা গোলাবাড়ি, কতকাল আগে রঙ করা হয়েছিল এখন আর বোঝা যায় না।

র‍্যাঞ্চ-হাউসের সামনে এনে গাড়ি রাখলেন উইলসন, হাই তুললেন, আড়মোড়া ভাঙছেন। আউফ। বাড়ি এলাম।

গাড়ি থেকে নামল ছেলেরা, আশপাশ দেখছে। গোলাবাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটা পিকআপ ট্রাক, ধুলোয় মাখামাখি। বাড়ির একপাশে তারের বেড়া দেয়া খানিকটা জায়গা, একাংশ চোখে পড়ছে, ভেতরে কয়েকটা মুরগী।

গাড়ি থেকে নামলেন উইলসন। তাজা ডিম পছন্দ আমার, মুরগীর খোঁয়াড় দেখিয়ে বললেন। সকালে মোরগের ডাকে ঘুম ভাঙার মাঝে এক ধরনের আনন্দ আছে, খুব শান্তি। আমার মোরাটার ধারণা, রাত্রি তাড়ানোর দায়িত্বটা বুঝি তারই ওপর বর্তেছে, ভোর না হতেই চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করে। আমার খুব ভাল লাগে।

মনিবের কথার জবাবেই যেন বাড়ির পেছন থেকে শোনা গেল তার কণ্ঠ, ডাক নয়, উত্তেজিত চিৎকার।

এক সেকেন্ড পরেই যেন একসঙ্গে খেপে গেল সব কটা মোরগ-মুরগী, বাচ্চাকাচ্চা সব। পরক্ষণে শটগানের বিকট শব্দ।

চেঁচিয়ে উঠে হুমড়ি খেয়ে পড়ল মুসা, দুহাতে মাথা ঢাকল। গাড়ির আড়ালে মাথা নুইয়ে ফেলল কিশোর আর রবিন। মুরগীর খামারের ওদিক থেকে তীব্র গতিতে ছুটে আসছে একটা বিরাট ছায়া।

পলকের জন্যে কিশোরের চোখে পড়ল একসারি ঝকঝকে ধারাল দাঁত আর কালো দুটো চোখ। পরক্ষণেই ধাক্কা দিয়ে তাকে মাটিতে ফেলে গায়ের ওপর দিয়ে লাফিয়ে চলে গেল জানোয়ারটা, হারিয়ে গেল পশ্চিমে ক্রিস্টমাস খেতের ভেতরে। শান্তির রাজ্যে স্বাগতম। বেদম হাসিতে দুলছে জিনা।

বিকেলের শান্ত নীরবতা ধীরে ধীরে নেমে এল আবার র‍্যাঞ্চ হাউসে।
উঠে দাঁড়িয়ে চোখ মিটমিট করল মুসা। খাইছিল! কি ওটা?
কিছু না, টিটকারির ভঙ্গিতে বলল জিনা, বিশিষ্ট ভদ্রলোক জনাব হ্যারি ম্যাকআরবারের শিকারী কুকুর, মুরগী চুরির তালে ছিল।
কিশোর উঠে দাঁড়াচ্ছে, সেদিকে তাকিয়ে বলল, বেড়ার নিচ দিয়ে সিধ কেটে ঢোকার চেষ্টা করে। কয়েকবারই করেছে এ-রকম। মুরগীগুলো চেচামেচি শুরু করে দেয়, শটগান নিয়ে ছুটে বেরোয় ভিকিখালা। আজও ফাকা গুলিই ছুঁড়েছে, কিন্তু এই অত্যাচার চলতে থাকলে কপালে দুঃখ আছে কুত্তাটার। ছররা দিয়ে পাছার চামড়া ঝাঝরা করে দেবে।
ভিকিখালা? জিজ্ঞেস করল রবিন।
আমাদের কাজের লোক, জানালেন উইলসন।
গোলাবাড়ির ওপাশ থেকে বেরিয়ে এল মোটাসোটা এবং মেকসিকান মহিলা, কালো চুল। সুতার পোশাক পরনে, গলা আর হাতার কাছটায় এমব্রয়ডারি করা উজ্জ্বল রঙের বড় বড় ফুল। হাতে একটা শটগান।
এই যে, সিনর উইলসন, চেঁচিয়ে বলল ভিকি। জিনাও এসেছ। খুব ভাল হয়েছে। তোমরা না থাকলে কেমন খালি খালি লাগে।
উইলসন হাসলেন। সেজন্যেই পূর্ণ করে রেখেছ নাকি?
ওই কুত্তাটার কথা আর বলবেন না, ঝাঁঝালো কন্ঠে বলল ভিকি। আস্ত চোর!
স্বভাব বদলে যাবে, ভেব না, হাসি মুখে বললেন উইলসন। আকাশে গোলাগুলি চালিয়ে যাও, চুরি না ছেড়ে যাবে কোথায় ব্যাটা। হ্যাঁ, ভিকি, এরা। জিনার বন্ধু। কিশোর পাশারবিন মিলফোর্ড মুসা আমান। হপ্তা দুই বেড়াবে আমাদের এখানে।
ওমা, তাই নাকি? উজ্জ্বল হয়ে উঠল ভিকির কালো চোখ। খুব ভাল, খুব ভাল। বাড়িতে এক দল বাচ্চা-কাচ্চা না থাকলে ভাল লাগে? এসো, আমি খাবার ব্যবস্থা করছি। এতদূর এসেছ, নিশ্চয় খিদে পেয়েছে।
র‍্যাঞ্চ হাউসের ভেতরে ঢুকে গেল ভিকি।
সত্যিই খিদে পেয়েছে তো তোমাদের? বললেন উইলসন। ভিকির সামনে কম খেলে চলবে না, রেগে যাবে।
কিছু ভাববেন না,অভয় দিল মুসা। আন্তরিক হাসিতে দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। কখনও যাতে না রাগে সেই ব্যবস্থাই করব।
গাড়ি থেকে স্যুটকেসগুলো নামিয়ে বারান্দায় রাখতে শুরু করলেন উইলসন। তাড়াতাড়ি তাঁকে সাহায্য করতে এগোল তিন গোয়েন্দা। কয়েক মিনিট পর খোলামেলা বিশাল লিভিং রুমের ওপরে দোতলার বড় একটা বাংকমে জিনিস-

পত্র নিয়ে এল ওরা। জিনার ঘর নিচে, চাচার ঘরের পাশে। ভিকির ছোট একটা অ্যাপার্টমেন্টই আছে, রান্নার্থরের পেছনে।
গোসল করবে তোমরা? জিজ্ঞেস করলেন উইলসন। বেশি দেরি কোরো। ডিনারের আগেই আশপাশটা ঘুরিয়ে দেখাতে চাই তোমাদের।
আলমারিতে কাপড় গোছাচ্ছিল মুসা, উইলসনের কথা শুনে গোছানোর আগ্রহ নষ্ট হয়ে গেল। টান দিয়ে বড় একটা তোয়ালে নিয়ে বলল, পরেও গোছানো যাবে। আগে আপনার সঙ্গেই যাই। বাথরুমের দিকে রওনা হলো সে।
খানিক বাদে জিনা আর তার চাচার সঙ্গে বেরোল তিন গোয়েন্দা। ওপরে নিউ মেকসিকোর পরিষ্কার নীল খোলা আকাশ। জিনার হাতে ইয়া বড় বড় দুই টুকরো চিনি, গাড়িপথ ধরে প্রায় দৌড়ে চলল ছোড়র খোয়াড়ের দিকে। ডাকহে, কমেট। কমেট?
ডাক শুনে ফিরে তাকাল ঘোড়াটা, দৌড়ে এল বেড়ার কাছে। গলা বাড়িয়ে দিল বেড়ার বাইরে। আনন্দে নাক দিয়ে বিচিত্র শব্দ করছে। গলা জড়িয়ে ধরে আদর করল জিনা।
দেখো না কাণ্ড, হাসলেন উইলসন, দুদিন মাত্র হয়েছে, অথচ মনে হচ্ছে কত যুগ একে দেখেনি। ওরা থাকুক। তোমরা এসো, গাছ ছাঁটার ছুরি দেখবে।
পিকআপের পাশ কাটিয়ে গোলাবাড়ির কাছে চলে এল ওরা। দরজা খুললেন উইলসন। শুকনো খড়ের গন্ধ লাগল নাকে। উঁকি দিয়ে দেখল ছেলেরা, ঘরের কোণে গাদা করে রাখা আছে খড়ের বোঝা। দোলের হুক থেকে ঝুলছে হোস পাইপের কয়েল। খন্তা, কোদাল, বেলচা, বড় কাঁচি আর নানা রকম দরকারী যন্ত্রপাতি সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে একটা ওয়ার্কবেঞ্চের পাশে। কাছেই। একটা র‍্যাঞ্চে রাখা আছে পাঁচটা বড় বড় ভোজালীর মত ছুরি।
বাড়িতে বাগানের গাছ তো কাঁচি দিয়েই হুঁটি, মুসা বলল।
সে অল্প কয়েকটা গাছের বেলায় সম্ভব, বুঝিয়ে বললেন উইলসন। কিন্তু হাজার হাজার ক্রিস্টমাস গাছ কাঁচি দিয়ে হাঁটতে অনেক সময় লাগবে, ছুরি দিয়ে কোপানো ছাড়া উপায় নেই। তাছাড়া ছুরি দিয়ে এক কোপে ওপর-নিচের অনেকগুলো ভাল তুমি ছেটে ফেলতে পারছ, তাতে সমান হয় বেশি, কাঁচি দিয়ে সেটা হয় না। র‍্যাঞ্চ থেকে একটা ছুরি নিয়ে এলেন তিনি। আপনা-আপনি সুন্দর হয় না ক্রিস্টমাস ট্রী, নিয়মিত যত্ন লাগে। বছর তিনেক আগে জায়গাটা যখন কিনলাম, তখন ভাবতাম, এ আর কি? কয়েকটা চারা মাটিতে পুঁতে দিলেই হলো, নিজে নিজেই বড় হয়ে সাইজমত হয়ে যাবে। এখন বুঝি কত কঠিন। নিয়মিত আগাছা পরিষ্কার করতে হয়, ডাল পাতা ছাঁটতে হয়, আর বোজ পানি দেয়া তো আছেই। ছুরি চালানো কিন্তু সহজ ভেব না, কিভাবে চালাতে হয় দেখালেন তিনি।

এই যে, এভাবে ধরে, ওপর থেকে নিচে এভাবে কোপ মারতে হয়, সাই করে বাতাস কাটল তীক্ষ্ণ ধার ফলা। খুব সাবধানে কোপাতে হয়। বেশি নিচে যদি নামিয়ে ফেলো, পায়ে এসে লাগবে। ফেড়ে যাবে। পারবে তো?
পারব, বলল মুসা।
সাবধানে আবার জায়গামত ছুরিটা রেখে দিলেন উইলসন।
গোলাবাড়ির একধারে ফেলে রাখা অনেক পুরানো একটা গাড়ি দেখালেন, নিরেট রবারে তৈরি চাকা, ফাঁপা টায়ার নয়। নতুন আরেকটা গোলাঘর বানাব। ওই গাড়িটারও একটা ব্যবস্থা করব তখন।
কাছে গিয়ে গাড়ির আধখোলা একটা জানালা দিয়ে ভেতরে উঁকি দিল কিশোর। কুচঁকে গেছে সীটের কালো চামড়ার কভার, নগ্ন হয়ে বেরিয়ে আছে কাঠের মেঝে। টি মডেলের ফোর্ড, না? ফিরে জিজ্ঞেস করল সে।
হ্যাঁ, বললেন উইলসন। বাড়িটা যখন কিনি তার আগে থেকেই ছিল, ফাউ পেয়েছি। ওখানেই ছিল ওটা, খড়ের তলায় চাপা পড়ে ছিল। খড় সরিয়েছি, কিন্তু গাড়িটার কিছু করতে পারিনি। সময়ই পাই না। তবে ঠিকঠাক করব, মডেল টি এখন প্রাগৈতিহাসিক জিনিস, সংরক্ষণের বস্তু।
দরজায় দেখা দিল জিনা, ঘোষণা করল, মহামান্য হ্যারি ম্যাকআরথার তশরিফ রাখছেন।
আহ, জিনা, একটু ভদ্রভাবে কথা বল, বিরক্ত হলেন উইলসন। দেখিস, তার সামনে আবার কিছু বলে বসিস না।
চুপ করে রইল জিনা।
বাইরে পায়ের আওয়াজ হলো। ডাক শোনা গেল, মিস্টার উইলসন?
এই যে, এখানে সাড়া দিলেন তিনি।
হালকা-পাতলা একজন লোক উঁকি দিল দরজায়। মাথায় সোনালি চুল, বয়েস চল্লিশের কাছাকাছি। পরনের জিনস এতই নতুন, কাপড়ের খসখসে ভাবও কাটেনি। চকচকে পালিশ করা বুটে মুখ দেখা যাবে যেন। গায়ের ওয়েস্টার্ন শার্টটা যেন এইমাত্র প্যাকেট ছিড়ে খুলে পরে এসেছে।
এগিয়ে গেলেন উইলসন। হাত মেলালেন দুজনে।
কুকুরের অসদাচরণের জন্যে ক্ষমা চাইল ম্যাকআরবার।
লোকটার পরিচ্ছদ আর কথাবার্তায় একটা ব্যাপারে শিওর হলো কিশোর, মেকি একটা ভাব রয়েছে তার মধ্যে। একেবারে বানিয়ে বলেনি জিনা। কিন্তু আরেকটা প্রশ্নও জাগছে কিশোরের মনে, টুইন লেকসের মত জায়গায়, এই সুন্দর বিকেলে এছাড়া আর কি পোশাক পরতে পারত ম্যাকআরখার? এমনও তো হতে পারে,

এখানে আসার আগে ওরকম কাপড় আর কোনদিন পরেনি সে, আসার সময় নতুন কিনে নিয়ে এসেছে। ওগুলো পুরানো হতে তো সময় লাগবে।
শেকল দিয়ে বেঁধে রেখেছি শয়তানটাকে, বলল ম্যাকমারধার। আর জালাবে না আপনাকে।
আরে না না, এটা কিছু না, তাড়াতাড়ি বললেন উইলসন। পোষা জন্তুজানোয়ার থাকলে ওরকম একআধটু অত্যাচার করেই। সেটা নিয়ে মাইণ্ড করে বসে থাকলে চলে নাকি।
ছেলেদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন উইলসন।
ম্যাকআরবারের প্রতি অবজ্ঞা দেখিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে রইল জিনা।
ব্যাপারটা লক্ষ করল ম্যাকআরথার, হাসি হাসি পরিষ্কার নীল চোখের তারা কঠিন হয়ে গেল চকিতের জন্যে। তারপর জিনার শরীর ভেদ করে যেন তার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল মডেল টি-এর দিকে। আরে, দারুণ একটা গাড়ি! দুর্লভ জিনিস।
একটু আগে এটার কথাই বলছিলাম ছেলেদেরকে। সময় বের করে শিগগিরই ঠিকঠাক করে নেব।
এগিয়ে গিয়ে গাড়িটার গায়ে হাত রাখল ম্যাকআরবার।
হ্যারি ম্যাকআরথার! হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল মুসা। নামটা আগেও শুনেছি মনে হচ্ছে।
তাই নাকি? ফিরে তাকাল লোকটা।
সিনেমায় কাজ করে আমার বাবা। কিছু দিন আগে খাওয়ার টেবিলে বসে আপনার কথা বলছিল। একটা ছবি বানাচ্ছে এখন, তাতে নাকি একটা পুরানো রিও গাড়ি দরকার। কোথাও পায় না পায় না, শেষে নাকি আপনার কাছ থেকে চেয়ে এনেছে। পুরানো গাড়ি কালেকশনের বাতিক আছে আপনার।
তাই নাকি? ও হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিকই, অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল যেন ম্যাকআরথার।
আপনার সংগ্রহের কথা বলছিল বাবা। বিরাট এক প্রাইভেট গ্যারেজ নাকি আছে আপনার, একজন ফুলটাইম মেকানিক রেখে দিয়েছেন বেতন করে। ওর কাজ শুধু গাড়িগুলোকে সব সময় সচল রাখা। সাধারণ কাজ, কিন্তু গাড়ি এত বেশি তাতেই নাকি হিমশিম খেয়ে যায় বেচারা।
হ্যাঁ। সাধারণ বলছ কেন? কাজটা কঠিনই। পুরানো এঞ্জিন, আধুনিক
মেশিনের মত ভাল না, সচল রাখা যথেষ্ট কঠিন।
রানিং বাগ ছবিতে আপনার সিলভার ক্লাউডটাই তো ব্যবহার হয়েছিল?
সিলভার ক্লাউড? ও, হ্যাঁ। হ্যাঁ হ্যাঁ, একটা স্টুডিওকে ধার দিয়েছিলাম...বেশি দিন আগের কথা নয়।
সিলভার ক্লাউড? বলে উঠলেন উইলসন। আমার মডেল টি-ওতো ওটার কাছে নাতি।

শুরুতে অত কোনো গাড়ি আমারও ছিল না, বিনীত কণ্ঠে বলল ম্যাকারবার। তবে একবার নেশায় পেয়ে বসলে কোত্থেকে কোত্থেকে জানি জোগাড় হয়ে যায়। কেনা শুরু করলেই টের পাবেন, এই গোলাঘরে কুলাবে না তখন আর। হয় নতুন বানাতে হবে, কিংবা বাড়াতে হবে।
নতুন আরেকটা গোলাঘর বানানোর কথা এমনিতেও ভাবছি, বললেন উইলসন।
কথা বলতে বলতে বেরিয়ে গেলেন দুজনে। হাত নেড়ে নেড়ে বোঝাচ্ছেন উইলসন, কোন জায়গায় কতবড় করে বানাবেন ঘরটা, পুরানোটার কি করবেন।
কি মনে হলো? দুজনে দূরে চলে গেলে বলল জিনা। এরকম ভণ্ড আর দেখেছ?
কাপড়-চোপড় নতুন, বলল মুসা, তাতে কি? নামটা চেনা চেনা লাগছিল, মডেল টি-র প্রতি আগ্রহ দেখে মনে পড়ে গেল। বাবা বলেছে, লোকটার অনেক টাকা, এমনিতেও পাগল, গাড়িরও পাগল। ম্যানডেভিল ক্যানিয়নে নাকি মস্ত বাড়ি আছে তার, দশ ফুট উঁচু দেয়ালে ঘেরা।
মৃদু কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে নিল কিশোর। কিন্তু রানিং বাগ এর জন্যে তার সিলভার ক্লাউড ধার দেয়নি, বলল সে। ফিল্ম ফান পত্রিকায় গাড়িটার ওপর একটা আরটিকেল বেরিয়েছিল। ম্যাকআরধারের গাড়ি নয়, ওটা ছিল জোনাথন হ্যামিলটনের। ছবির খরচও তিনিই দিয়েছেন। আর ছবিটা আজকের নয়, বহু আগের।
কেউ তর্ক করল না। ওরা জানে, না জেনে কোন কথা বলে না কিশোর, ও যখন বলছে, ঠিকই বলছে।
লাফিয়ে উঠল জিনা। কি বলেছিলাম? ব্যাটা একটা ভণ্ড। মিথক।
হাসল কিশোর। তা বলা যায় না, জিনা। হ্যারি ম্যাকআরবারের অনেকগুলো গাড়ি আছে। তার মধ্যে একটা গাড়ি কখন কাকে ধার দিল না দিল, মনে না থাকলে মোষ দেয়া যায় না। তাছাড়া তার কাছেই গাড়ি চেয়েছে স্টুডিও এমন না-ও হতে পারে। হয়তো তার কোন কর্মচারীই গাড়ির ব্যাপারগুলো দেখাশোনা করে, হয়তো তার মেকানিকের ওপরই রয়েছে দায়িত্ব।
আমার বিশ্বাস হয় না, গোয়ারের মত হাত নাড়ল জিনা।
অকস্মাৎ পরিবেশটাই কেমন জানি বদলে গেল। অস্বস্তিকর নীরবতা। সহজ করে দিল ভিকি, ডিনারের জন্যে ডাক দিয়ে।
আরে আরও কয়েকটা কেক নাও না, রান্নাঘরে লম্বা টেবিলের কিনার থেকে বলে মৃত্যু খনি উঠল ডিকি। খুব ভাল জিনিস, জ্যাম মেশানো।
মাথা নাড়ল কিশোর, না আর পারব না। অনেক খেয়েছি।
ভুরু কোঁচকাল ভিকি। অনেক খেয়েছ মানে? দিয়েছিই তো এই কটা। এজন্যেই এমন পাকাটির মত শুকনো, হাড় জিরজিরে। ওই জিনাটাও হয়েছে এমন।

আজকালকার ছেলেপুলে, খালি ওজন নিয়ে ভাবে। আরে বাপু, ছেলেমানুষ তোমরা, অমন চড়ুইর খাবার খেয়ে বাড়বে কি করে?
আমাদের দিকে নজর দিও না, খালা, অনুরোধ করল জিনা। ওই ওকে খাওয়াও, শান্তি পাবে,মুসাকে দেখিয়ে দিল সে।
খাওয়াবই তো। খায় বলেই তো এমন চমৎকার স্বাস্থ্য। তোমাদের মত শোলা নাকি, ফুঁ দিলেই পড়ে যাবে। এই মুসা, কেকের ট্রে-টা ঠেলে দিল ভিকি,
চট করে শেষ করে ফেলো তো এগুলো। আরও এনে দিচ্ছি।
ও-কি, উঠে যাচ্ছিস কেন, জিনা? বললেন উইলসন। তুই বাপ একেবারেই বেয়াড়া হয়ে গেছিস, তোর মাকে জানাতে হবে। বলি, আমরা সবাই রয়েছি টেবিলে, তুই উঠে যাচ্ছিস, ভদ্রতার খাতিরেও না হয় বসে থাক।
না খেলে বসে থেকে কি করবে? জিনার পক্ষ নিল ভিকি। ছেলেপিলের ওসব ভদ্রতার দরকার নেই। যাও, মুখ ধুয়ে ফেলো।
প্লেটটা নিয়ে সিংকে চুবাল জিনা।
হয়েছে হয়েছে, পেছন থেকে বলল ডিকি, ওটা তোমার ধুতে হবে না। আমিই সব খোব। তুমি মুখ ধুয়ে ফেলো।
রবিনও উঠল, হাতে এটো প্লেট।
তুমি এটা নিয়ে কোথায় যাচ্ছ? ডাক দিল ভিকি।
ধুয়ে ফেলি। কি হবে? বাড়িতে কি ধুই না?
যাও তো। খাওয়া শেষ, হাত ধুয়ে ভাগো। রান্নাঘরে ভিড় পছন্দ নয় আমার। কাউকেই কোন সাহায্য করতে দিল না ভিকি, প্রায় জোর করে তাড়াল রান্নাঘর থেকে।
লিভিং রুমে এসে বসল সবাই। টেলিভিশনের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে সোফায় বসেই ঘুমিয়ে পড়লেন উইলসন। ছেলেরাও হাই তুলতে শুরু করল।
সব বাচ্চা খোকা, ঝাঝাল কণ্ঠে বলল জিনা। বিকেল না হতেই ঘুম। নটাও তো বাজেনি।
ভোর পাঁচটায় উঠেছি, সে খেয়াল আছে? প্রতিবাদ করল রবিন।
আমিও তো উঠেছি। এসো, দাবা খেলি...
আমি বাদ, তাড়াতাড়ি হাত তুলল কিশোর। মাথার ভেতরে একটা ঘড়ি কানো আছে আমার। ওটা জানাচ্ছে : রাত সাড়ে দশটা, শুতে যাও। আমি চললাম।
আমিও কিশোরের পিছু নিয়ে সিঁড়ির দিকে রওনা হলো মুসা।
বড় করে আরেকবার হাই তুলে রবিনও আগের দুজনকে অনুসরণ করল।
ধ্যাত্তোর! রাগে সোফার হাতলে থাবা মারল জিনা। আলসের ধাড়ী সব।

এত কম খেয়েও এত এনার্জি পায় কোথায় জিনা? নিজেদের ঘর বাংরুমে কাপড় ছেড়ে বিছানায় উঠে বলল মুসা।
মাথার নিচে হাত দিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল কিশোর। আনমনে বলল, আমি শিওর না।
টেলিভিশনের শব্দ থেমে গেল। শোনা গেল উইলসনের ঘুমজড়িত কণ্ঠ। একটা দরজা বন্ধ হওয়ার পর শাওয়ারে পানি ছাড়ার শব্দ হলো। বন্ধ হলো আরেকটা দরজা।
জিনাও ঘরে গেছে, বলল কিশোর।
কাত হয়ে বালিশে মাথা রেখে বেডসাইড ল্যাম্পটা নিভিয়ে দিল সে। অন্ধকার হয়ে গেল ঘর, কিন্তু পুরোপুরি নয়। জানালা দিয়ে জ্যোৎস্না আসছে। ঠাণ্ডা, জালি কাটা আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে কাঠের মেঝেতে।
চোখ মুদল কিশোর। ঘুমিয়ে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল তার। ভোতা একটা শব্দ শুনেছে। ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল প্রতিধ্বনির রেশ।
বিছানায় উঠে বসল সে। কান পেতে অপেক্ষায় রইল আবার শব্দ হয় কিনা শোনার জন্যে।
নিজের বাংকে গুঙিয়ে উঠল মুসা। ভিকি। আবার গুলি করেছে কুকুরটাকে।
না, জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল কিশোর। গুলির শব্দই, কিন্তু ভিকি না। অনেক দূর থেকে এসেছে।
বিস্তৃত ক্রিস্টমাস ক্ষেতের দিকে তাকাল সে, চাদের আলোয় রহস্যময় মনে হচ্ছে গাছগুলোকে। ডানে মিসেস ফিলটারের বাড়ি আর পরিত্যক্ত বিশেষ স্থানগুলো। নাক বরাবর সোজা, ধীরে ধীরে উঠে যাওয়া উপত্যকার ম্যাকআরবারের সম্পত্তি। ছোট একটা ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে খনিমুখের কাছে। কেবিনের কাছে একটা ছায়ার নড়াচড়া। শেকলে বাধা কুকুরটা মাথা তুলে হউউউ করে উঠল।
উইলসনের এলাকায় ঢোকার গেটের ওধারে ছোট বাড়িটার এক ঘরে আলো জ্বলল, আলো এসে পড়ল গেটের কাছে। ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এল মিসেস ফিলটার, পরনে ড্রেসিং গাউন। বারান্দায় দাঁড়িয়ে তাকাল, বোধহয় ম্যাকআরবারের
কেবিনের দিকেই।
নিচে লিভিং রুমে কথাবার্তা শোনা গেল। উইলসন উঠে পড়েছেন, ভিকিও।
আমি না, ভিকির কণ্ঠ, আমি গুলি করিনি।
সিঁড়িতে খালি-পায়ের শব্দ হলো। দরজায় করাঘাত। শুনছ, মশাইরা? জিনা। শুনেছ কিছু?
ড্রেসিং গাউন পরে দরজা খুলে বেরোল তিন গোয়েন্দা।

একটা জানালার চৌকাঠে হাতের ভর রেখে বাইরে মাথা বের করে দিয়েছে। জিনা। ফিসফিস করে বলল, ম্যাকআরথার। আমি শিওর, ওদিক থেকেই শব্দটা এসেছে। দেখে যাও।
জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল মুসা। কি? মৃত্যু খনি
রোজি ফিলটারের বাড়ির দিকে দেখাল জিনা। ঘুরে গিয়ে ঘরে ঢুকে আবার দরজা বন্ধ করে দিলেন মহিলা। মিসেস ফিলটারও জেগে গেছেন, জিনা বলল। ম্যাকআরবারের কুত্তাটাও। ইস, রাফিয়ানকে নিয়ে আসা উচিত ছিল। বাবার জন্যেই পারলাম না। এমনিতে দেখতে পারে না, অথচ এখন বাড়ি পাহারায় রেখে দিব্যি কেমন নিশ্চিন্তে বিদেশ চলে গেছে। ওই কুত্তাটা কি রকম ঘাউ দাউ করছে শুনছ? আগে থেকে ওরকম চেচালে ওর ডাকেই ঘুম ভেঙে যেত আমাদের। অথচ কানের কাছে থেকেও ম্যাকআরখারের ঘুম ভাঙছে না। তুমি আমি হলে কি করতাম? আলো জ্বেলে বাইরে বেরিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করতাম, কেন এমন করছে জানার চেষ্টা করতাম। অথচ ব্যাটা কিছুই করছে না। ও নিজেই তো গুলি করেছে, জানার চেষ্টা করবে কি?
জিনা? নিচ থেকে ডাকলেন উইলসন। তুই ওখানে কি করছিস?
দেখছি, জবাব দিয়ে বেয়ে সিঁড়ির মাথায় উঠে গেল জিনা। চাচা, দেখে যাও। ম্যাকআরথারই গুলি করেছে।
জিনা, কয়েক ধাপ উঠে এলেন উইলসন, নাহ, ম্যাকআর্থার রোগেই ধরল দেখি তোকে। মাথাটা খারাপ করে দিল। ও কিছু না, বুঝলি। কেউ খরগোশ মারছে। কিংবা কয়োট।
কে? প্রশ্ন করল জিনা। পুরো এলাকাটা দেখতে পাচ্ছি আমি। কাউকে দেখছি। কথোট হলে আমাদের মুরগীগুলো খেতে আসে না কেন?
কি করে আসবে? ওদিকেই আগে হানা দিয়েছিল, গুলি করে তরে ফেলেছে, বললেন উইলসন। যা, নিচে, শো গিয়ে। ওদেরকে ঘুমোতে দে।
ধ্যাত্তোর! বিরক্তি চাপতে পারল না জিনা। সিঁড়ি বেয়ে নামতে যাবে, জানালার কাছ থেকে ডাকল কিশোর।
এগিয়ে গেল জিনা।
কেবিনের বাইরের খোলা জায়গায় বেরিয়ে এসেছে ম্যাকআরথার। বগলতলায় চেপে ধরে রেখেছে শটগান। পাহাড়ের দিকে ফিরে কি দেখল সে, তারপর বন্দুক কাধে ঠেকিয়ে ফায়ার করল।
আরেকবার রাতের নীরবতা ভাঙল বন্দুকের গর্জন। আবার চেঁচিয়ে উঠল কুকুরটা। এগিয়ে গিয়ে ঝুঁকে ওটার মাথায় চাপড় দিল ম্যাকআরথার।

ঘেউ ঘেউ থামাল কুকুরটা, কেবিনে ঢুকে গেল তার মনিব। ঠিকই বলেছ, জিনা, মুসা বলল পাশ থেকে, ম্যাকআরথারই।
তোমার চাচা ঠিকই বলেছেন, বলল রবিন। কয়োটই। ওই যে তাড়াল ম্যাকআরথার।
নাক দিয়ে বিচিত্র শব্দ করল জিনা। নেমে গেল নিজের ঘরে।
ম্যাকআরবারের পেছনে ভালমত লেগেছে জিনা, বাংকে উঠে বলল রবিন। এখন যা-ই করুক লোকটা, জিনা তার অন্য অর্থ করবে। খালি বলবে কুমতলব আছে।
আমি যদি কখনও খনির মালিক হই, বিছানায় উঠতে উঠতে বলল কিশোর, আর জিনা যদি ভেতরে ঢুকে দেখতে চায়, সঙ্গে সঙ্গে দেখিয়ে দেব। ওর শত্রু হয়ে বিপদে পড়তে চাই না।
রসিকতায় হাসল তিনজনেই।
আবার ঘুমিয়ে পড়ল মুসা আর রবিন। কিশোরের চোখে ঘুম এল মা। অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে ভাবছে আর কান পেতে শুনছে ক্রিস্টমাস পাতার মরমর।
হঠাৎ উঠে বসল সে। জোরে জোরে বলল, পয়লা গুলিটার সময় কোথায় ছিল ম্যাকআরধার?।
উঁম? ঘুমের ঘোরে পাশ ফিরল মুসা।
আঁ...কী? রবিন জেগে গেছে।
বলছি পয়লা গুলিটা কোথা থেকে করেছে ম্যাকআরথার? আবার বলল কিশোর।
পয়লা গুলি? মুসার ঘুম ভেঙে গেছে। বাড়ির ভেতর থেকে।
বাড়ির ভেতর থেকে বেরোতে দেখেছ তাকে? প্রশ্ন করল কিশোর। দ্বিতীয় গুলিটা করার আগে কোথা থেকে বেরিয়েছে, দেখেছ?।
না তো। জিনা আর তার চাচার কথা শুনছিলাম তখন।
রবিন?
দেখেছি।
মাটি খুঁড়ে উদয় হয়নি নিশ্চয়, বলল কিশোর। মুসা দেখেনি-না হয় ধরলাম সে তাকায়নি। কিন্তু তুমিও দেখোনি, আমিও দেখিনি। তাছাড়া কোথা থেকে গুলি করলে ওরকম ভোতা শব্দ শোনা যাবে? খনির ভেতরে থেকে।
তাতে কি? বুঝতে পারছে না মুসা।
হয়তো কিছুই না, বলল কিশোর। তবে খনির ভেতর কয়োট ঢুকেছিল, এটাও বিশ্বাস করব না আমি। কয়োটের সাড়া পেলেই চেমোনো শুরু করত কুকুরটা। কিন্তু গুলির শব্দের আগে রা করেনি। এমনও তো হতে পারে, খনির ভেতরে গুলি ছুড়েছিল ম্যাকআরথার, তারপর বাইরে বেরিয়ে দেখল পড়শীরা জেগে উঠেছে। তা যদি হয়, আর সন্দেহমুক্ত হতে চায়, কি করবে তাহলে?

চুপ করে রইল অন্য দুজন।
বাইরে খোলা জায়গায় বেরিয়ে গুলি করবে না? নিজেকেই প্রশ্ন করছে কিশোর। বোঝাতে চাইবে না, কয়োট তাড়ানোর জন্যে গুলি করেছে?
জিনার মতই সন্দেহ রোগে ভুগতে শুরু করেছ তুমি, রবিন বলল।
হয়তো বা, অস্বীকার করল না কিশোর। তবে মিস্টার হ্যারি ম্যাকআরথারের আচার-আচরণও সন্দেহ করার মতই। মনে হচ্ছে, ধীরে ধীরে একটা কেস দাঁড়িয়ে যাচ্ছে তিন গোয়েন্দার জন্যে।
পরদিন সকালে বেলা করে ঘুম ভাঙল কিশোরের। জানালা দিয়ে বাইরের উজ্জ্বল রোদের দিকে চেয়ে গত রাতের কথা মনে পড়ল, সব কিছু এখন হাস্যকর মনে হলো। কাপড় পরে নেমে পড়ল, এল নিচে রান্নাঘরে। মুসা আর রবিন খাচ্ছে। টেবিলের এক মাথায় বসে আছেন উইলসন। ভিকি গরম কেক নামিয়ে বেড়ে দিচ্ছে টেবিলে।
কিশোরকে দেখে হাত তুলল মুসা, এসেছ। ডাকতে যাচ্ছিলাম। জিনা গেছে ঘোড়া দৌড়াতে। কয়েক কামড় কেক চিবিয়ে নিয়ে বলল কিশোর।
রুচি বদল হবে, বলল কিশোর।
ইয়ার্ডে মালপত্র গোছানো একঘেয়ে হয়ে গিয়েছিল।
ও। গাছকাটা মনে হয় ভালই লাগবে তোমাদের, হাসলেন উইলসন। আমার তো লাগে। এর মাঝে শিল্প আছে, অনেকটা নিজ হাতে গড়ার মত মজা। বেয়াড়া রকম বেড়ে ওঠা গাছকে হেঁটে নিজের মত সাজিয়ে নেয়া। দিনটা ভালই কাটবে তোমাদের। কিন্তু পয়লা দিনেই বেশি খাটাখাটনি কোরো না। ঘণ্টাখানেক পর পর কিছুক্ষণ করে জিরিয়ে নিও।
নাস্তা সেরে গোলাঘর থেকে তিনটে ছুরি নিয়ে এলেন উইলসন। ছেলেদেরকে নিয়ে খেতে চললেন।
র‍্যাঞ্চ হাউস আর পথের মাঝের একটা খেতে এল ওরা। ছুরি দিয়ে কুপিয়ে কেটে দেখিয়ে দিলেন উইলসন, কিভাবে কতখানি হাঁটতে হয়। বললেন, গাছের বেশি কাছে যেও না। দূরে দাঁড়িয়ে পাশ থেকে কোপ দেবে, যাতে পায়ে এসে না লাগে।
কোপাতে শুরু করল তিন কিশোর। দাঁড়িয়ে থেকে দেখলেন খানিকক্ষণ উইলসন। যখন বুঝলেন, ছেলেরা শিখে গেছে, বাড়িতে ফিরে গেলেন। কয়েক মিনিট পর ভিকিকে নিয়ে স্টেশন ওয়াগনে করে চলে গেলেন কোথাও।
নীরবে কাজ করে চলল তিন গোয়েন্দা। ঘোড়ার খুরের শব্দে চোখ তুলে তাকাল। ম্যাকআরথারের সীমানার ওদিক থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে জিনা। খোয়াড়ে ঢুকল, অ্যাপলুসাটাকে ওখানে রেখে চলে গেল বাড়ির ভেতরে।

খানিক পরে এঞ্জিনের শব্দ কানে এল ছেলেদের। গোলাবাড়ির দিকে চেয়ে বলে উঠল মুসা, খাইছে? কাণ্ড দেখো।
পিকআপের ড্রাইভিং সীটে দেখা যাচ্ছে জিনাকে। গিয়ার দেয়ার শব্দ হলে। এলোমেলো ভাবে দুলতে দুলতে পথ ধরে ছুটে এল গাড়িটা।
চেঁচিয়ে বলল মুসা, জিনা, পাগল হয়ে গেছ নাকি! করছ কি?
ট্রাকের নাক সোজা রাখতে পারছে না জিনা.। ছুটে এল ছেলেদের দিকে, শেষ মুহূর্তে ব্রেক প্যাডালে পা রেখে প্রায় দাঁড়িয়ে গেল। জোর কাশি দিয়ে থেমে গেল এঞ্জিন। পারছি, শোনা গেল জিনার আনন্দিত কণ্ঠ, চালাতে পারছি। খোলা জায়গায় ঠিকই পারব।
চালাতে হলে আরও বড় হওয়া লাগবে তোমার, রবিন বলল।
লাইসেন্স পেতে বড় হওয়া লাগবে, জিনা জবাব দিল। কিন্তু সীটে বসে প্যাডাল যখন ছুঁতে পারছি, চালাতেও পারব।
আবার এঞ্জিন স্টার্ট দেয়ার চেষ্টা করল, পারল না। হুঁ, গ্র্যাকটিস দরকার।
তোমার চাচা জানেন? জিজ্ঞেস করল মুসা।
নিশ্চই। চাচা বলে বড়রা যা করে, ছোটদেরও তা করতে পারা উচিত। আমার কোন কাজে চাচা বাধা দেয় না।
সেজন্যেই বুঝি চাচা আর ভিকি বেরিয়ে যাওয়ার অপেক্ষায় ছিলে? ওরা থাকতে সাহস পাওনি?
জানালা দিয়ে মুখ বের করল জিনা, চোখ উজ্জ্বল। মুসার কথার জবাব এড়িয়ে গিয়ে বলল, দুজনে বাজারে গেছে, ফিরতে দেরি হবে। ম্যাকআরথারও বাড়ি নেই, কুত্তাটাকে বেঁধে রেখে গেছে। চলো, এই সুযোগ।
খনিতে তো? একাই যাও, আমরা এর মাঝে নেই।
ছুরি হাতে দাঁড়িয়ে চুপচাপ ভাবছে কিশোর। গতরাতে গুলির শব্দ কোথা থেকে এসেছিল, সে কথা।
ভীতুর ডিম, মুসার দিকে চেয়ে মুখ বাঁকাল জিনা। থাকো তোমরা, আমি চললাম।
আবার চেষ্টা করল সে, এবার স্টার্ট নিল এঞ্জিন।
রাখো রাখো, হাত তুলল কিশোর, আমি যাব।
গুড, হাসল জিনা। ছুরিটা নিয়ে এসো। ম্যাকআরথার দেখে ফেললে তাড়াতাড়ি খেতে নেমে গাছ কাটার ভান করবে। কি, তোমরা দুজন যাবে না?
কিশোরের দিকে তাকাল মুসা, ভাবল কে জানে, কিন্তু আর আপত্তি না করে এসে উঠল গাড়িতে। রবিনও উঠল।
কাঁচা হাতে গিয়ার দিল জিনা। প্রচণ্ড প্রতিবাদ জানাল এঞ্জিন, ঝাঁকুনি দিয়ে চলতে শুরু করল গাড়ি। এবড়োখেবড়ো মাঠের ওপর দিয়ে লাফাতে লাফাতে

ছুটে চলল ম্যাকআরথারের সীমানার দিকে।
দারুণ একখান গাড়ি, উল্লাসে ফেটে পড়ছে জিনা। গাড়ি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যে বাকা হচ্ছে, সোজা হচ্ছে, এদিকে কাত হচ্ছে, ওদিকে কাত হচ্ছে। এরই মাঝে এক ফাঁকে মুসার দিকে চেয়ে বলল, খুব সহজ, বুঝলে? কোন ব্যাপারই না, শুধু গিয়ারগুলো ঠিকমত ফেলতে পারলেই হলো…
তা তো দেখতেই পাচ্ছি, মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল মুসা। গাড়ি উল্টে ঘাড় না মটকালেই বাঁচি এখন। আস্ত এক কৌটা বাতের মলম লাগবে আজ আমার।
বেশি ভয় পাও তুমি…আঁউউ। ক্যাঙারুর মত আচমকা এক লাফ দিল গাড়ি, আলের মত একটা জায়গায় হোঁচট খেয়ে। আপনা আপনি জিনার হাত থেকে স্টিয়ারিং ছুটে গেল, পা সরে এল ক্লাচ থেকে। জোরে আরেকটা ঝাঁকুনি দিয়ে গাড়ি থেমে গেল, এঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেছে আগেই। যাক, জায়গামতই এনে রেখেছি, মুসার দিকে তাকাচ্ছে না সে। এখান থেকেই ম্যাকআরবারের সীমানা শুরু।
সামনে রুক্ষ, অসমতল ভোলা জায়গা, হঠাৎ করে গিয়ে শেষ হয়েছে যেন, পর্বতের গোড়ায়। এক ধারে কালো বেড়া, খনির কালো মুখ দেখা যাচ্ছে। বেড়ার ওপর দিয়ে খনির ভেতরটা দেখতে অসুবিধে হচ্ছে, তবু কয়েক ফুট পর্যন্ত নজর চলে। সুড়ঙ্গের মেঝেতে সাদা মিহি বালি, এখান থেকেও বোঝা যায়। খনির ডানে ম্যাকআরথারের নোংরা কেবিন।
আস্ত মেথর, নাক কোচকাল জিনা। পরিষ্কার করার সময় পায়নি হয়তো, বলল রবিন। কদ্দিন হলো এসেছে?
প্রায় এক মাস। এসেছে তো একটা ফকিরের মত, বিছানা, হাঁড়ি-কড়াই আর কয়েকটা বাসন-পেয়ালা, ব্যস। নতুন আর কিছু কিনেছে বলে মনে হয় না। একেবারে চামার।…ওই যে বিল্ডিংটা ওতে খনির কাজকর্ম হত। খনি থেকে আকরিক তুলে নিয়ে জমা করা হত ওখানে, তারপর রুপা আলাদা করা হত।
শেকলের শব্দ শোনা গেল, কেবিনের কোণ থেকে বেরিয়ে এল কুকুরটা। ছুটন্ত অবস্থায় যতখানি বিশাল মনে হয়েছিল সেদিন কিশোরের তত বড় নয়, তবে বড়। শিকারী-লাব্রাডর আর জার্মান ভেড়া-তাড়ানো কুকুরের শঙ্কর। আগন্তুকদের দেখে চাপা গর্জন করে উঠল।
চেনটা শক্ত কিছুঁতে বাঁধা তো? বিড়বিড় করল মুসা।
হ্যাঁ,মুসার ভয় দেখে হেসে ফেলল জিনা। তখন চেতিয়ে দিয়ে পরীক্ষা করে দেখে গেছি। টানাটানি অনেক করেছে, ছুটতে পারেনি।
কখন করলে? জিজ্ঞেস করল রবিন।
এই তো খানিক আগে, কমেটকে নিয়ে এলাম না।
এত সাহস যে দেখালে, যদি ছুটে তে।

গেলে যেত। কমেন্টের সঙ্গে দৌড়ে পারত নাকি? লাথি খেলেও বাপের নাম ভুলে যেত। ভিকি খালা তো গুলি ছুঁড়ে ভুল করে, কমেটকে ডেকে এনে একটা লাথি খাওয়ানো দরকার ছিল। জিন্দেগীতে আর মুরগীর দিকে চোখ তুলে তাকাত না।
তুমি না কুকুর ভালবাস, জিনা? মুসা বলল, এটাকে দেখতে পারো না কেন? রাফিয়ানকে তো…
চুপ। কার সঙ্গে তুলনা। কোথায় ভদ্রলোকের বাচ্চা, আর কোথায় চোরা ম্যাকআরবারের মুরগীচোর।
কুকুর ভদ্রলোকের বাচ্চা হয় কি করে? ফস করে জিজ্ঞেস করল মুসা।
ভদ্রলোকের না হোক ভদ্রকুকুরের তো?
তা বলতে পারো…
আরে কি বকবক শুরু করলে তোমরা? বিরক্ত হয়ে বলল কিশোর, গভীর মনযোগে খনি আর তার আশপাশের অঞ্চল দেখছিল। জিনা, নামো, পথ দেখাও।
খনিমুখের ভেতরে ঢুকে টর্চ জ্বালল জিনা। চালু হয়ে নিচে নেমে গেছে সুড়ঙ্গ। দুপাশের দেয়াল ঘেঁষে পোতা হয়েছে রেললাইনের সীপারের মত বড় বড় মজবুত তক্তা, তার ওপর বীম লাগিয়ে পাথুরে ছাত সহজে যাতে ধসে না পড়ে সেই ব্যবস্থা করা হয়েছে।
সুড়ঙ্গের ভেতরে স্তব্ধ নীরবতা। সব কিছু শান্ত, তবু পরিবেশটা এমন, অকারণেই গা ছমছম করে।
খুব ধীরে ধীরে অমসৃণ ঢাল রেয়ে নামতে শুরু করল ওরা।
পর্বতের ভেতরে পঞ্চাশ গজমত ঢুকে দূ-ভাগ হয়ে গেছে সুড়ঙ্গ, একটা সোজা এগিয়েছে, আরেকটা বায়ে সামান্য মোড় নিয়েছে। এক মুহূর্ত দ্বিধা করে বায়ের পথটাই ধরল জিনা। তাকে অনুসরণ করল ছেলেরা। ঘুটঘুটে অন্ধকার। সুড়ঙ্গমুখ দিয়ে যে আবছা আলো আসছিল এতক্ষণ, মোড় নেয়ায় সেটাও হারিয়ে গেল।
পাথুরে মেঝেতে নিজেদের জুতোর শব্দই কেমন যেন ভুতুড়ে শোনাচ্ছে।
মহিলা পড়েছিল যেন কোথায়? নিচু গলায় বলল জিনা। গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।
জিনা, দাঁড়াও, হাত তুলল কিশোর। সামনে মেঝেতে কিছু একটা চোখে পড়েছে।
এই যে, এদিকে, আলো ফেরাও?
আলো ফেলল জিনা। আলগা পাথর, নুড়ির ছোট একটা স্তুপ। দেয়াল আর হাত থেকে খসে পড়ে জমা হয়েছে বোধহয়।
এগিয়ে গিয়ে তুলে নেয়ার জন্যে ঝুঁকল কিশোর, এই সময় আলো সরে গেল।
আরে আরে, যাচ্ছ কোথায়? চেঁচিয়ে উঠল মুসা। টর্চটা…এই জিনা?
কিন্তু জিনা থামল না। টর্চের আলো নাচতে নাচতে সরে যাচ্ছে দূরে। পাশের একটা করিডরে ঢুকে গেল সে।

জিনা! চেঁচিয়ে ডাকল রবিন।
হঠাৎ পেছনে আলো দেখা গেল, উজ্জ্বল আলো যেন নগ্ন করে দিল তাদেরকে! বুঝল, হঠাৎ কেন ছুটে পালিয়েছে জিনা।
এই এই, কি করছ ওখানে? ম্যাকআরথারের কড়া গলা।
মরেছি! ফিরে তাকানোর সাহস হচ্ছে না মুসার।
জিনার হাত থেকে টর্চ খসে পড়ার শব্দ হলো। ঝনঝন করে উঠল পাথরে বাড়ি খেয়ে, কাচ ভাঙল।
অন্ধকার করিডরের শেষ মাথা থেকে ভেসে এল জিনার রহিম-করা চিৎকার।
চেঁচিয়েই চলল সে, একনাগাড়ে।
জিনা? কি হয়েছে, জিনা? ডেকে জিজ্ঞেস করল কিশোর।
জবাবে শুধুই চিৎকার। মাথা খারাপ হয়ে গেছে যেন জিনার।
মরছে নাকি! আলো হাতে পাশ দিয়ে ছুটে চলে গেল ম্যাকআরখার, করিডরে গিয়ে ঢুকল।
পেছনে গেল ছেলেরা।
মস্ত এক কালো খাদের পাড়ে দাঁড়িয়ে চেঁচাচ্ছে জিনা। আরেক পা এগোলেই যেত পড়ে গর্তের মধ্যে।
থামো! এই মেয়ে, শুনছ? চুপ! ধমক দিল ম্যাকআরথার। হাত ধরে হ্যাঁচকা টানে জিনাকে সরিয়ে আনল গর্তের ধার থেকে। কি, হয়েছে কি?
থরথর করে কাঁপছে জিনা, হাত তুলে ইঙ্গিত করল গর্তের দিকে। ও-ওখানে... নিচে...
সাবধানে খাদের পাড়ে এসে দাঁড়াল চারজনে। ভেতরে আলো ফেলল ম্যাকআরখার, উঁকি দিল ছেলেরা। বেশি গভীর নয়, দশ-বারো ফুট। তবে একেবারে খাড়া দেয়াল।
খাদের তলায় কি যেন পড়ে আছে। প্রথমে কাপড়ের স্তুপ বলে মনে হলো। কিন্তু ঠিকমত আলো ফেলে ভাল করে তাকাতেই দেখা গেল, একটা হাত বেরিয়ে আছে। কাপড়ের ভেতরে রয়েছে দেহটা, দুমড়ে-মুচড়ে বিকৃত। চোখের জায়গায়। দুটো শূন্য কোটর, মাথার চুল পাটের রুক্ষ আঁশের মত লেপটে রয়েছে খুলির সঙ্গে।
মরা! চেঁচিয়ে উঠল আবার জিনা। মরা!...মরে গেছে।
আহ, থামোতো। আবার ধমক লাগাল ম্যাকআরথার।
ঢোক গিলল জিনা, চুপ করল।
বেরোও, আদেশ দিল ম্যাকআরথার। সব্বাই।

দু-পাশ থেকে জিনার দু-হাত ধরে টেনে নিয়ে এগোল কিশোর আর রবিন। পেছনে টলমল পায়ে চলল মুসা। সবার পেছনে আলো হাতে রয়েছে। ম্যাকআরথার।
খোলা আকাশের নিচে উজ্জ্বল রোদে বেরিয়ে এল ওরা।
কুকুরের পরিচিত ডাক অপার্থিব লাগছে কিশোরের কানে। যেন এইমাত্র ভয়ঙ্কর এক দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে উঠেছে। গুহার তলায় কাপড়ের স্তূপের ভেতরে কোচকানো চামড়া আর হাড্ডি সর্বস্ব হাত, শূন্য কোটর, লেপটানো চুল...শিউরে উঠল সে, কড়া রোদের মাঝেও শীত শীত লাগছে।
যাও, বাড়ি যাও, বলল ম্যাকআরথার। খবরদার, আর কখনও এদিকে আসবে না। যদি আর কোনদিন দেখি...
গটমট করে গিয়ে কেবিনে ঢুকল সে, দড়াম করে বন্ধ করে দিল দরজা।
ধীর পায়ে এগোল ছেলেরা। খনিমুখের কাছে দাঁড়িয়ে আছে এখন একটা উজ্জ্বা লাল শেভি সুবারব্যান ট্রাক, ম্যাকআরথারের। ওটার পাশ দিয়ে মাঠ পেরিয়ে এগোল। পিকআপের পাশ কাটিয়ে এল, চালানোর সাধ্য নেই আর এখন জিনার। হেঁটে চলল বাড়িতে।
র‍্যাঞ্চ হাউসে ফিরতে আবার স্বাভাবিক হয়ে এল জিনা। রক্ত ফিরল মুখে। শেরিফকে খরব দিতে হবে। ম্যাকআরথারের কাজ। আগেই বলেছি, বাটা নাম্বার ওয়ান শয়তান।
তোমার দরকার নেই, বলল কিশোর, সেই এতক্ষণে খবর দিয়ে ফেলেছে। শেরিফকে। শেরিফের কাছে ওর কথা উল্টো-পাল্টা কিছু বলবে না, সাবধান।
কেন বলব না? তর্ক শুরু করল জিনা। ওর খনিতে মানুষ মরে পড়ে আছে...
শহরের দিক থেকে ছুটে আসছে ছোট্ট একটা ধুলোর মেঘ। কয়েক সেকেন্ড পর ওদের পাশ কাটিয়ে গেল মেঘটা, বাদামী রঙের একটা সিডান গাড়ি। দরজায় বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে ওশেরিফ। পলকের জন্যে ড্রাইভারকে দেখতে পেল ছেলেরা, বিশালদেহী লোক, মাথায় স্টেটসন হ্যাট! ম্যাকআরথারের কেবিনের সামনে গিয়ে থামল গাড়ি।
কি বলেছিলাম? জিনার দিকে চেয়ে হাসল কিশোর।
হাসিটা ফিরিয়ে দিল জিনা, কিন্তু তাতে প্রাণ নেই। শেরিফকে কি বলে ম্যাকআরথার কে জানে।
তোমার চাচাকে কি বলবে, তাই ভাববা, পথের দিকে নির্দেশ করল কিশোর। স্টেশন ওয়াগনটা ফিরছে।
গেটের কাছে পৌঁছে গেছে ছেলেরা, স্টেশন ওয়াগনও এসে ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষল। জানালা দিয়ে মুখ বের করে ডাকলেন উইলসন, জিনা? শেরিফকে।

দেখলাম। কিছু হয়েছে?
ম্যাকআরথারের খনিতে একটা লাশ পড়ে আছে, আরেক দিকে চেয়ে জবাব দিল জিনা।
লাশ? খনিতে?
মাথা ঝোঁকাল জিনা।
মাদ্রে দু দিও! বিড় বিড় করল ভিকি, বেরিয়ে আসছে গাড়ি থেকে। জিনা, তুমি জানলে কিভাবে?
অস্বস্তিকর নীরবতা। ভাইঝির দিকে তাকিয়ে রয়েছেন উইলসন। জিনা, আবার ঢুকেছিলি খনিতে?
কোনমতে মুখ তুলে বলল জিনা, হ্যা...গতরাতে গুলির শব্দ শুনলাম তো... ভাবলাম...।
কোন কৈফিয়ত শুনতে চাই না, কড়া গলায় বললেন তিনি। যাও, বাড়ি যাও। খবরদার, আর বেরোবে না।
গাড়ি থেকে নেমে মাঠের ওপর দিয়ে ম্যাকআরবারের বাড়ির দিকে দৌড় দিলেন উইলসন। তার সঙ্গে যোগ দিলেন মিসেস ফিলটার, শেরিফের গাড়ি দেখেই বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন।
র‍্যাঞ্চ হাউসের দোতলায় এক জানালা থেকে আরেক জানালায় গিয়ে উঁকি দিতে লাগল চারজনেই। বাইরে, ম্যাকআরথারের বাড়িতে কি হচ্ছে দেখার জন্যে উদগ্রীব। আরও কিছুক্ষণ পর একটা অ্যামবুলেন্স গিয়ে থামল খনিমুখের সামনে। ঘন্টাখানেক পর চলে গেল শহরের দিকে। ইতিমধ্যে আরও কয়েকটা গাড়ি এসেছে। তার একটা হাইওয়ে পেট্রল পুলিশের।
বেলা তিনটায় পিকআপটা নিয়ে ফিরে এলেন উইলসন।
চাচা, দেখেই বলে উঠল জিনা, ম্যাকআরথারকে অ্যারেস্ট করেছে?
তাকে কেন করবে? খনির ভেতর লোকটা অনেক আগে মরেছে। ময়না তদন্তের পর বোঝা যাবে কয় বছর আগে ঘাড় ভেঙেছিল। এতে ম্যাকআরথারের দোষ কি? খনির মুখ শিক দিয়ে বন্ধ করার আগেই মরেছে লোকটা।
পাঁচ বছর, উইলসনের সাড়া পেয়েই রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে ভিকি। আহা, বেচারা। পাঁচ-পাঁচটি বছর ধরে মরে পড়ে আছে ওখানে, কেউ জানে না।
মাত্র পাঁচ? মুসা বলল। আমি তো ভেবেছি চল্লিশ বছর।
খনি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল অনেক আগেই, জানাল ভিকি, তবে মুখ বন্ধ করা হয়নি, লোক যাতায়াত থামেনি। অ্যাকসিডেন্টের ভয়ে শেষে বছর পাচেক আগে, বসন্তকালেই বুঝি...হা, হ্যাঁ, বসন্তকালে শিক দিয়ে শক্ত করে বন্ধ করে দেয়া হয়।

মেঝেতে পা ছড়িয়ে বসে আছে কিশোর, আনমনে একটা কিছু ছুঁড়ছে আর লুফে নিচ্ছে।
কি, ওটা? জিজ্ঞেস করল জিনা।
খপ করে ধরল আবার কিশোর। খনিতে পেয়েছি। এটার জন্যেই আলো ধরতে বলেছিলাম তোমাকে। ডান হাতের তর্জনী জিভে ঠেকিয়ে ভিজিয়ে নিয়ে পাথরের মত জিনিসটার গা ডলল। শুনেছি ওটা রুপার খনি ছিল। সোনাও ছিল নাকি?
না, শুনিনি তো? উইলসন বললেন।
পাথরটা আলোর দিকে ধরল কিশোর। উজ্জ্বল একটা দাগ। আয়রন পাইরাইট হতে পারে। ফুলস গোল্ড বলে একে। বাংলায় বলল, বোকার স্বর্ণ...না না, সোনালি ফাঁকি।
আয়রন পাইরাইট না কিসের পাইরাইট, তা নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই আমার,বলে উঠল জিনা। আমি জানতে চাই, আগে কেন লাশটার কথা পুলিশকে বলেনি ম্যাকআরখার? আমরা দেখে ফেলায় জানাতে বাধ্য হয়েছে।
ধৈর্য হারালেন উইলসন। ম্যাকআরথার জানত নাকি, লাশ আছে? গত হপ্তায় মাত্র শিকগুলো সরিয়েছে সে, খনির ভেতরে পুরোপুরি দেখার সময়টা পেল কই? পাঁচ বছর আগের একটা মড়া লুকানোর কোন দরকার আছে তার? দেখো জিনা, বেশি মাথায় উঠে গেছ।
বাইরে একটা গাড়ি এসে থামল। শব্দ শুনেই দরজা খুলে দিল ভিকি।
বারান্দা পেরিয়ে ঘরে ঢুকলেন শেরিফ। সরাসরি তাকালেন জিনার দিকে। জিনা, তুমি জানো, খনিটার নাম কেন ডেথ ট্রাপ রাখা হয়েছে?
মাথা ঝাঁকাল জিনা। ওখানে অ্যাকসিডেন্টে লোক মারা যায়। যায় তো?
আবার মাথা ঝাঁকাল জিনা। যায়। জানি।
আবার যদি ওখানে যাও, ধরে নিয়ে গিয়ে সোজা হাজতে ভরবো। কোর্টে যেতে হবে তোমার চাচাকে, তোমাকে ছাড়াতে। ছেলেরা, তোমাদেরও হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি।
একটা চেয়ার টেনে বসলেন শেরিফ।
লোকটা কে, জানা গেছে? জিজ্ঞেস করলেন উইলসন।
বোধহয়, শেরিফ বললেন। পকেটে মানি ব্যাগ আর একটা আইডেনটিটি কার্ড পেয়েছি, তাতে স্যান ফ্রানসিসকোর ঠিকানা। ওখানে ফোন করলাম। পুলিশ জানাল, বছর পাঁচেক আগে জানুয়ারি মাসে বাড হিলারি নামে একটা লোক নিখোঁজ হয়েছে, রেকর্ড আছে। লোকটার অনেকগুলো ছদ্মনাম, এই যেমন, বেরি হারবার্ট, বন হিরাম, বার হুম্যান। ডাকাতি করতে গিয়ে ধরা পড়ে স্যান কুয়েনটিন-এ জেল খেটেছে ছয় বছর। ছাড়া পাওয়ার পর পুলিশ স্টেশনে নিয়মিত হাজিরা

দিয়েছে মাত্র দুবার, তারপরই গায়েব। পুলিশের ওয়ানটেড লিস্টে আছে দীর্ঘ দিন ধরে। খনিতে পাওয়া লাশের সঙ্গে হিলারির চেহারার বর্ণনা মিলে যায়। বদ্ধ বাতাসে একই আবহাওয়ায় থেকে পচেনি দেহটা, মমি হয়ে গেছে। আরও শিওর হওয়ার জন্যে তার ডেন্টাল চার্ট চেক আপ করার নির্দেশ দিয়েছি।
বেচারা ম্যাকআরথার, ব্যঙ্গ প্রকাশ পেল জিনার কণ্ঠে, লাশটা যে আছে তার খনিতে, জানেই না।
জানেনা-ই তো। জানলে সঙ্গে সঙ্গে ফোন করত আমাকে, উঠে দাঁড়ালেন শেরিফ। তো, যা বলেছি মনে থাকে যেন, ইয়াং লেডি। খনির ধারে কাছে যাবে
শেরিফকে এগিয়ে দিতে বেরোলেন উইলসন।
শিক খোলার পর খনির ভেতরটা ঘুরে দেখেনি ম্যাকআরথার, অবাকই লাগে, বলল কিশোর। আমার খনি হলে আমি আগে ঘুরে দেখতাম।
বলছিই তো ব্যাটা আস্ত ইবলিস! জিনার সেই এক কথা।
পাঁচ বছর আগে, জানুয়ারি মাসে, চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর, বাড হিলারি নামের এক ডাকাত, ছাড়া পেল জেল থেকে। এরপর নিয়মিত দুই বার দেখা করল সে স্যান ফ্রানসিসকো পুলিশ অফিসে, তারপর গায়েব। তখন ছিল বসন্তকাল, খনির মুখ বন্ধ করার সময়। পালিয়ে টুইন লেকসে চলে এসেছিল লোকটা, খনিতে পড়ে মরল। কিন্তু স্যান ফ্রানসিসকো থেকে পালানো আর খনিতে পড়ার আগে মাঝখানের সময়টা সে কোথায় ছিল? কি করেছিল? ভিকিখালা, বলতে পারো, টুইন লেকসেই কি ছিল সে।
মাথা নাড়ল ভিকি। টুইন লেকস খুব ছোট জায়গা, সবাই সবাইকে চেনে। নতুন কেউ এলে চোখে পড়েই।
মাথা ঝাঁকাল কিশোর। ঠিক পুলিশের নজর থেকে পালিয়ে এলে অন্য কারও. চোখে পড়তে চাইবে না। অথচ ইচ্ছে করেই যেন এখানে চোখে পড়তে এল সে।
পাঁচ বছর আগে টুইন লেকসে আসলে কি ঘটেছিল? কিশোরের কথার পিঠে বলল জিনা। একটা চোর ভেতরে থাকতেই বন্ধ করে দেয়া হলো খনির মুখ। এ ব্যাপারে কারও বিশেষ আগ্রহ ছিল না তো? হ্যারি ম্যাকআরথারের মত?
আমার মনে হয় না, টেবিলে শুপ করে রাখা সংবাদপত্রগুলো ঘটছে রবিন। তবু খোঁজ নিয়ে দেখতে পারি আমরা। তাতে যদি তোমার দুশ্চিন্তা দূর হয়, ভাল।
কি ভাবে?
স্থানীয় খবরের কাগজ, একটা কাগজ তুলে দেখাল রবিন। দি ডেইলী টুইন লেকস। শহরের কোথায় কি ঘটছে না ঘটছে সব ছাপা হয়। এমন কি কার বাড়িতে কবে কজন মেহমান এল সে খবর পর্যন্ত। পুরানো কাগজ ঘাটলে বাড হিলারির ব্যাপারে কিছু বেরিয়েও যেতে পারে।

দারুণ আইডিয়া! আনন্দে হাত তালি দিয়ে জিনা বলল, চলো এখুনি যাই। সম্পাদক সাহেবকে আমি চিনি। আমি আসার খবর পেয়েই এসে দেখা করেছিলেন, কেন এসেছি, কদিন থাকব, নানা রকম প্রশ্ন। ছেপে দিয়েছেন পত্রিকায়। তোমরা যে এসেছ, সে খবরও নিশ্চয় পেয়েছেন। এখনও আসছেন না কেন তাই ভাবছি।
বাড়ি থেকে বেরোতে দেবেন তোমার চাচা? মুসার প্রশ্ন।
দেবে না মানে, একশো বার দেবে। খনি ছাড়া অন্য যে কোন জায়গায় যেতে দেবে।
কিন্তু যেতে দিলেন না উইলসন, স্রেফ মানা করে দিলেন। উপরন্তু তিন গোয়েন্দাকে নিয়ে গিয়ে লাগিয়ে দিলেন গাছ ছাঁটার কাজে, কড়া নির্দেশ দিয়ে রাখলেন, ডিনারের আগে কতখানি জায়গার গাছ ছাঁটতে হবে। বাড়িতে একা একা বসে আঙুল চোষা ছাড়া আর কিছু করার থাকল না জিনার।
পর দিন সকালে মেজাজ ভাল হয়ে গেল উইলসনের। জিনা যখন বলল তিন গোয়েন্দাকে শহর দেখাতে নিয়ে যেতে চায়, শুধু বললেন, সারাদিন কাটিয়ে এসো না।
না, কাটাব না, বলল জিনা। আর টুইন লেকসে আছেই বা কি, এত সময় দেখবে?
ধুলো-ঢাকা কাঁচা সড়ক ধরে হেঁটে চলল ওরা। পর পর কয়েকটা গাড়ি পাশ কাটাল ওদের, ম্যাকআরথারের বাড়ি যাচ্ছে। একটা গাড়ি থেমে গেল কাছে এসে। জানালা দিয়ে মুখ বের করল একজন, জিজ্ঞেস করল, ডেথ ট্র্যাপ মাইনে কি এদিক দিয়েই যেতে হয়?
হ্যাঁ, বলল জিনা।
থ্যাংকিউ, গাড়ি ছাড়তে গিয়ে কি মনে করে আবার থেমে গেল লোকটা। এই শোনো, তোমরাই কি লাশটা আবিষ্কার করেছ?
হয়েছে! আঁতকে উঠল রবিন। তাড়াতাড়ি জিনার হাত ধরে টান দিল, জিনা, এসো, জলদি। খবরের কাগজ।
এই শোনো, শোনো, গাড়ি থেকে ক্যামেরা হাতে নামছে লোকটা। এই, এক সেকেণ্ড, তোমাদের একটা ছবি
লাগবে না, হাত নেড়ে জবাব দিয়েই হাঁটার গতি বাড়াল মুনা।
প্রায় ছুটতে শুরু করল ওরা। আরেকটা গাড়ি পাশ কাটাল। কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাদের দেখছে আরোহীরা।
জানতাম এরকমই হবে, গতি কমাল না কিশোর। গতরাতে টেলিভিশনে খবরে দেখিয়েছে, লোকের কৌতূহল হবেই। সব পাগল। যেন আর কোন কাজ নেই দুনিয়ায়।

খবরদার, ছবি তুলতে দিয়ো না, জিনাকে হুঁশিয়ার করল মুসা। তোমার চাচা রেগে যাবেন।
শহরের প্রধান সড়কে বেশ ভিড়। পথের ধারে গাড়ির মেলা। কোর্ট হাউসের সামনে ঠেলাঠেলি করছে নারী-পুরুষ, ওদেরকে সামলাতে হিমশিম খাচ্ছেন শেরিফ, ঘেমে নেয়ে উঠেছেন, মুখ-চোখ লাল। এক সঙ্গে কজনের প্রশ্নের জবাব দেবেন?
রিপোর্টারের দল, বলল রবিন। স্টোরি চায়।
ডেইলী টুইন লেকসের অফিসটা এককালে মুদী দোকান ছিল। ওটাকেই সামান্য পরিবর্তন করে প্রেস বসানো হয়েছে। পথের দিকে মুখ করা রয়েছে বিশাল কাচের জানালা, দোকান যে ছিল বোঝাই যায়। ভেতরে গোটা দুই পুরানো নড়বড়ে ডেস্ক। একটাতে বিভিন্ন অফিশিয়াল কাগজ আর পত্রিকা-ম্যাগাজিনের তুপ। আরেকটার সামনে বসে আছেন রোগাটে এক তালপাতার সিপাই, শরীরের যেখানে সেখানে দড়ির মত ফুলে আছে মোটা মোটা রগ। লালচে চুল, তীক্ষ্ণ চেহারা। মহাউত্তেজিত, টাইপ রাইটারের চাবিগুলোতে ঝড় তুলেছেন, একনাগাড়ে টিপে যাচ্ছেন।
আরে, জিনা! দেখেই বলে উঠলেন সম্পাদক। এসো, এসো। তোমার কথাই ভাবছি। লেখাটা শেষ করেই যেতাম। শেরিফের কাছে শুনলাম, তুমিই লাশটা খুঁজে পেয়েছ।
হাসল জিনা। আপনিই স্যার একমাত্র লোক, যিনি খুশি হলেন। ম্যাকআরথার তো পারলে ঘাড় মটকে দিত। শেরিফ বলল, জেলে ভরবে। আর আমার নিজের চাচা, পুরো চোদ্দ ঘন্টা আটকে রাখল বাড়িতে।
জানি জানি। সব ঠিক হয়ে যাবে, ভেব না। তবে এখন আর খনির কাছাকাছি যেও না। তা, ইন্টারভিউ দিতে আপত্তি আছে? তিন গোয়েন্দাকে দেখালেন। তোমার বন্ধুরা না? লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে এসেছে?
শুনে ফেলেছেন তাহলে। এ-হলো কিশোর পাশা, ও মুসা আমান। আর ও রবিন মিলফোর্ড, ওর বাবা লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমসের রিপোর্টার।
আহ্ পত্রিকা একখান! দীর্ঘশ্বাস ফেললেন সম্পাদক।
ঠিকই বলেছেন, স্যার, পার্টিশনের ধার দিয়ে সরে যেতে লাগল রবিন, লক্ষ্য ওপাশের আধো অন্ধকার বড় ঘরটা। একটা ছোট রোটারি প্রেস আর লাইনোটাইপ মেশিন চোখে পড়েছে তার। ধুলোয় ভারি হয়ে আছে বাতাস, ছাপার কালির কড়া গন্ধ।
ঘুরে দেখতে চাও? জিজ্ঞেস করলেন সম্পাদক।

দেখালে খুব খুশি হব, স্যার, বলল রবিন। পত্রিকার কাজ খুব ভাল লাগে আমার। লাইনোটাইপটা কি আপনিই চালান?
কম্পোজ থেকে শুরু করে সবই আমি করি। তবে কাজ বিশেষ থাকে না। এ-হপ্তার কথা অবশ্য আলাদা। জিনা, বসো ওখানটায়। হ্যাঁ, এবার খুলে বলো তো সব। রবিন, তুমি গিয়ে দেখো। লাইট জ্বেলে নিও।
মুসা আর কিশোরও চলল রবিনের সঙ্গে। সুইচ খুঁজে বের করে টিপে দিল কিশোর। সিলিঙে লাগানো উজ্জল ফুরোসেন্ট আলোয় ভরে গেল ঘর। এক ধারে দেয়াল ঘেঁষে রয়েছে তাক, তাতে বড় বড় ড্রয়ার, প্রতিটি ড্রয়ারের হাতলের নিচে সাদা রঙে লেখা রয়েছে তারিখ, মাস, বছর।
পুরানো ইস্যুগুলো এদিকে, রবিন দেখাল।
পাঁচ বছর আগেরগুলো দরকার, কিশোর বলল।
কয়েকটা ড্রয়ার নামিয়ে নিল ওরা। খনির মুখ যখন বন্ধ করা হয়, তখনকার কপি আছে ওগুলোতে।
প্রত্যেকটা কপি দেখবে, বলল কিশোর। হেডলাইনগুলো পড়বে। আমাদের দরকারে লাগতে পারে এমন কোন কিছুই যেন চোখ এড়িয়ে না যায়।
পত্রিকার বোঝা নিয়ে মেঝেতেই পা ছড়িয়ে বসল ওরা। পাশের ঘর থেকে শোনা যাচ্ছে জিনার কথা।
ঘেঁটে চলেছে ওরা পত্রিকা। বিরক্তিকর কাজ। মজার কিছুই নেই, অতি সাধারণ কভার, কার বাড়িতে আগুন লেগেছিল, শেরিফ কবে নতুন গাড়ি কিনলেন, কোন আত্মীয় কবে টুইন লেকসে কার বাড়িতে বেড়াতে এল, ইত্যাদি। বাড হিলারির নাম-গন্ধও নেই। তবে ২৯ এপ্রিলের পত্রিকার এক জায়গায় এসে থমকে গেল কিশোর, বোধহয় কিছু পেলাম।
কি? জিজ্ঞেস করল রবিন।
পুরো এক মিনিট নীরবে পড়ল কিশোর। মুখ তুলে বলল, বাড়ি থেকে বেরিয়ে হারিয়ে গিয়েছিল পাঁচ বছরের একটা মেয়ে, তিন ঘণ্টা নিখোঁজ হয়ে ছিল। খুঁজতে খুঁজতে গিয়ে শেষে ডেথ ট্র্যাপ মাইনে পাওয়া গেছে তাকে। খনিতে ঢুকে ঘুমিয়ে পড়েছিল মেয়েটা। আঁতকে উঠল লোকে, টনক নড়ল, মারাও যেতে পারত মেয়েটা। চাদা তুলতে শুরু করল তার বাবা-মা, খনির মুখ ভালমত বন্ধ করার জন্যে।
খুঁজল কিশোর। মে-র ছয় তারিখের পেপারটা কোথায়? দেখো তত তোমার ওখানে?
এই যে, বের করল রবিন। হ্যাঁ, পয়লা পাতায়ই আছে খনির খবর। টুইন লেকস মার্কেটের মালিক দোকানের সামনে পা গ্যালনের একটা ড্রাম রেখে দিয়েছিল,

তার গায়ে লেখা ছিল? খনি বন্ধ করার জন্যে মুক্তহস্তে দান করুন। দুদিনেই লোহার গ্রিল কেনার টাকা উঠে গেল। লর্ডসবুর্গ থেকে অর্ডার দিয়ে বানিয়ে আনা হলো গ্রিল। ঠিক হলো, মে-র চোদ্দ তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে বন্ধ করা হবে খনির মুখ!

তেরো তারিখের পত্রিকায় আরও বিস্তারিত লেখা রয়েছে, কি ভাবে বন্ধ করা হবে মুখটা। প্রচণ্ড উত্তেজনা গিয়েছে কদিন ছোট্ট শহরটায়। অনেক তোড়জোড় করে নির্দিষ্ট দিনে সিমেন্ট গেঁথে লাগিয়ে দেয়া হয়েছে গ্রিল—এসব কথা লেখা আছে। বিশ তারিখের পত্রিকায়।

বাপরে বাপ, যেন আমেরিকার জন্মদিন গেছে, বলল মুসা।

সম্পাদক সাহেব কি বললেন শুনেছ তো, রবিন মনে করিয়ে দিল। কাজ তেমন নেই তার। হোট শহর, হাতে গোণা কয়েকজন লোক, ওই খনি বন্ধ করার ব্যাপারটাই একটা বিরাট ঘটনা।

টুইন লেকসবাসীরা মিছিল করে যাচ্ছে খনির দিকে, ছবিটার দিকে চেয়ে রইল। রবিন। হঠাৎ বলে উঠল, আরে, এই তো। চার পৃষ্ঠায়। খনির সীমানার মধ্যে সেদিন পরিত্যক্ত একটা গাড়ি পাওয়া গিয়েছিল। একটা শেভ্রলে সেডান। পুলিশ পরে জেনেছে, লর্ডসবুর্গের সুপার মার্কেট থেকে তিন দিন আগে চুরি হয়েছিল ওটা। এই যে, শেরিফ থ্যাচারের মন্তব্যও কোট করা হয়েছে। তার ধারণা, টুইন লেকসের কোন তরুণের কাণ্ড। বিনে পয়সায় তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার জন্যে গাড়ি চুরি করেছে। হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন, এরপর যদি এ-ধরনের ঘটনা ঘটে, টুইন লেকসের সব উজ্জ্বল তরুণকে নিয়ে হাজতে ঢোকাবেন।

মুখ তুলল রবিন।

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর, গভীর ভাবনায় মগ্ন। বিড় বিড় করল, লর্ডসবুর্গ থেকে চুরি…পাওয়া গেল খনির কাছে। খনির ভেতরে তখন এক চোর, সে-ই চুরি করেছিল বললে অতিকল্পনা হয়ে যাবে? কোন কারণে খনির ভেতরে ঢুকেছিল…আর বেরোতে পারেনি।

তা না হয় হলো, কথাটা ধরল মুসা, কিন্তু তাতে আমাদের কি লাভ? আমরা তে যেখানে ছিলাম সেখানেই রয়ে যাচ্ছি। ধরে নিলাম, স্যান ফ্রানসিসকো থেকে পালিয়ে লর্ডসবুর্গে এসেছিল হিলারি, সেখান থেকে গাড়ি চুরি করে নিয়ে এসেছে টুইন লেকসে। কিন্তু কেন? কিসের তাগিদে?

মুখ বাকিয়ে কাঁধ ঝাঁকাল শুধু কিশোর।

পুরানো কাগজ ঘেঁটে চলল রবিন। এই রহস্যের সঙ্গে যোগাযোগ আছে, তো কিছুই আর চোখে পড়ছে না। হ্যারি ম্যাকআরথারের উল্লেখ নেই। জানা গেল, ওই বছরেরই অক্টোবর মাসে টুইন লেকসে এসেছিল মিসেস রোজি ফিলটার। পরে

দুটো সংখ্যায় বিস্তারিত জানানো হয়েছে, কোথায় কবে কতখানি জায়গা কিনেছে মহিলা। জায়গাগুলো ছিল খনির সম্পত্তি।
ভাবছি, স্যান ফ্রানসিসকো থেকে পালিয়ে এসে কতদিন লর্ডসবুর্গে ছিল হিলারি? আনমনে বলল কিশোর।
লাইনোটাইপ মেশিনের গায়ে হেলান দিল মুসা। কে জানে? পুলিশকে না জানিয়ে পালিয়ে এসে আইন অমান্য করেছে সে, ঠিক। তবে সেটা পাঁচ বছর আগে। এতদিনে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে নিশ্চয় পরিস্থিতি।
হ্যাঁ, মাথা দোলাল কিশোর। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, বিনা কারণেই এসেছিল এখানে। খনিতে ঢুকেছিল। এমন একটা খনি, যেটা কিনেছে হ্যারি ম্যাকআরথার। লাশটা যে ছিল খনিতে, কেন জানল না সে? দুজনের মাঝে, ঘটনাগুলোর মাঝে কি কোন যোগসূত্র রয়েছে? একজন জেলফেরত দাগী আসামী আর একজন রহস্যময় ধনীর মাঝে? একটাই কাজ এখন করার কাছে আমাদের।
কী? আগ্রহে সামনে ঝুঁকল মুসা।
সময়কে পিছিয়ে নিতে পারি আমরা।
হাঁ হয়ে গেল মুসা। কি আবল-তাবল বকছ? এই কিশোর?
অ্যাঁ? সংবিৎ ফিরল যেন কিশোরের। হ্যাঁ, সময়কে পিছিয়ে নিতে পারি। হিলারির অতীত উদঘাটনের চেষ্টা করতে পারি। লর্ডসবুর্গে থেকে থাকলে, নিশ্চয় রাতে ঘুমাতে হয়েছে তাকে। কোথায়? এত বছর পর জানার চেষ্টা করা কঠিন, হয়তো বৃথাই হবে, তবু চেষ্টা করতে ক্ষতি নেই। পুরানো খবরের কাগজ আর টেলিফোন ডিরেকটরি ঘেটে দেখতে পারি। হ্যাঁ, এই একটাই কাজ করার আছে এখন আমাদের।
শেষ বিকেলে বাড়ি ফিরল ওরা।
বারান্দায় অস্থির ভাবে পায়চারি করছেন উইলসন। গাড়ি বারান্দায় তিনটে গাড়ি। জটলা করছে কয়েকজন লোক, কিছু বোঝানোর চেষ্টা করছে।
কারও সঙ্গে কথা বলবে না আমার ভাস্তি, রাগ করে বললেন উইলসন। এমনিতেই ও বদমেজাজী, তার ওপর এই ঘটনায় মেজাজ আরও খারাপ হয়ে গেছে...
ছেলেদেরকে দেখে থেমে গেলেন। জিনা, ঢোকো। সোজা ওপরতলায়। লাফ দিয়ে সিঁড়ির কাছে এসে জিনার বাহু ধরে টেনে নিয়ে ঠেলে দিলেন ঘরের ভেতরে। পিঠে ধাক্কা দিয়ে ছেলেদেরও ঢুকিয়ে দিলেন তাড়াতাড়ি। নিজেও ঢুকে দড়াম করে বন্ধ করে দিলেন দরজা।
রিপোর্টার না জোক, লাল হয়ে গেছে তার মুখ। একটা কথাও বলবে না ওদের সঙ্গে।

কেন, কি হবে? প্রশ্ন না করে পারল না জিনা। আমি তো এখন মস্ত বড় খবর, তাই না?
কি হবে? তোমার মা শুনলে আমার মুণ্ডু কেটে নেবে, এই হবে।
আগে হুঁশিয়ার করলে না কেন? আমি তো সব বলে এসেছি সম্পাদক পিটারসনকে।
পিটারসনের কথা আলাদা, ছেলেদের অবাক করে দিয়ে শান্ত কণ্ঠে বললেন উইলসন। সে চালায় একটা অখ্যাত পত্রিকা। জাপানে বসে এটা পাবে না তোর মা, জানবেও না কিছু। যা বলছি, শুনবি। বাড়ি থেকে একদম বেরোবি না আজ। কালও যদি জোকগুলো না যায়, কালও বেরোনো চলবে না।
আংকেল, কিশোর বলল, কাল আমরা লর্ডসবুর্গে যেতে চাই।
কেন?
পকেট থেকে নুড়িটা বের করল কিশোর, আগের দিন খনিতে যেটা কুড়িয়ে পেয়েছিল। দেখিয়ে বলল, জুয়েলারকে দেখাব।
হাসলেন উইলসন। সোনার টুকরো মনে করেছ? হতাশ হবে। ডেথ ট্র্যাপে সোনা নেই। যেতে পারো, তবে কাল নয়। এ-হপ্তায়ই আমি যাব, তুমি আর জিনা যেতে পারবে তখন। চাইলে, চারজনেই যাবে। তোমাদেরকে রেখে যাওয়ার চেয়ে নিয়ে যাওয়াই নিরাপদ।
রিপোর্টারদের বিদায় করার জন্যে আবার বেরোলেন উইলসন।
সারাটা বিকেল বই পড়ে আর আলোচনা করে কাটাল ওরা। খানিক পর পরই বাংরুমের লাগোয়া ঝোলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে তাকাল ম্যাকআরথারের বাড়ির দিকে। জিনা এসে জানাল একবার, শটগান হাতে গুহা পাহারা দিচ্ছে ম্যাকআরথার। তার হারামী কুত্তাটা দর্শক তাড়াতে তাড়াতে এতই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, ঘেউ ঘেউ করারও আর শক্তি নেই। লম্বা হয়ে মাটিতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।
রাতে সকাল সকাল খেয়ে বাংরুমে এসে ঢুকল ছেলেরা। ম্যাকআরবারের জানালায় আলো দেখতে পেল। কিন্তু ওরা বিছানায় ওঠার আগেই নিভে গেল আলো। একটু পরে মিসেস ফিলটারের বাড়ির আনোও নিভে গেল।
সবাই যেন আজ বেশি ক্লান্ত, বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে বলল মুসা। আমিও। কিন্তু কেন বুঝতে পারছি না।
উত্তেজনা, ব্যাখ্যা করল রবিন। প্রচণ্ড উত্তেজনায় দ্রুত ক্ষয় হয় শরীর, কাহিল হয়ে পড়ে। এখানকার সবার বেলায়ই তো আজ এই ঘটনা ঘটেছে। তাছাড়া কোন কারণে হঠাৎ বেশি চমকে গেলেও পরে অবসাদ আসে শরীরে। কাল খনিতে যা দেখলাম, ভয়ানক দৃশ্য। বড় কষ্ট পেয়ে মরেছে বেচারা।

কিন্তু কি করছিল সে ওখানে? সারা দিন নিজেকে অনেকবার প্রশ্নটা করেছে কিশোর। লর্ডসবুর্গে হয়তো কোন জবাব মিলবে।
জুয়েলারকে পাথর দেখাতে সত্যি যাচ্ছ? রবিন জিজ্ঞেস করল।
ক্ষতি কি? এটা একটা ভাল ছুতো, আংকেলের কাছ থেকে সরে যাওয়ার। যদি ঘুণাক্ষরেও টের পেয়ে যান, খনি-রহস্যের তদন্ত করছি আমরা, মুহূর্তের জন্যে কাছছাড়া করবেন না আর।
জিনা কিন্তু হিলারিকে নিয়ে মোটেও ভাবছে না। তার একটাই লক্ষ্য, ম্যাকআরথারকে ভণ্ড প্রমাণ করা।
কিন্তু লাশটাকে কেন আগে দেখল না ম্যাকআরথার? প্রশ্নটা খালি খোচাচ্ছে। আমাকে। নিজের খনি একটু ঘুরে দেখার কৌতুহলও হলো না?
নানারকম প্রশ্ন মনে নিয়ে একে একে ঘুমিয়ে পড়ল তিনজনেই।
হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল মুসার। অন্ধকারেই ভ্রুকুটি করে কান পাতল। কিছু একটা নড়ছে বাইরে, জানালার নিচে কোথাও। আরেকবার শোনা গেল, শব্দটা, মচমচ, ক্যাঁচকোচ। কনুয়ের ওপর ভর রেখে উঠল সে।
কিশোর, এই কিশোর? ফিসফিস করে ডাকল। রবিন? শুনছ?
উঁ...কি? পাশ ফিরল রবিন।
গোলাঘরের দরজা খুলল কে জানি, উঠে পা টিপে টিপে জানালার দিকে এগোল মুসা। চৌকাঠের ওপর দিয়ে ঝুঁকে তাকাল। পাশে এসে দাঁড়াল অন্য দুজন।
কই, দরজা তো বন্ধ, রবিন বলল।
পর মুহূর্তেই আলো দেখা গেল গোলাঘরের জানালার ময়লা কাচে, নাচছে। আলোটা মৃদু। নিভে গেল। জ্বলল আবার।
দেশলাই জ্বালছে, কিশোর বলল! চলো তো, দেখি।
দ্রুত শার্ট-প্যান্ট আর জুতো পরে নিল ওরা। নিঃশব্দে নেমে এল সিঁড়ি বেয়ে। সাবধানে খুলল সামনের দরজা।
চাঁদ ডুবে গেছে। বেশ অন্ধকার। আগে আগে এগোল গোয়েন্দাপ্রধান, তাকে অনুসরণ করল সহকারীরা। গোলাঘরের দরজার কাছে প্রায় পৌঁছে গেছে, এই সময় আলগা পাথরে পা পড়ে পিছলাল রবিন, গোড়ালি গেল মচকে, জোরে চিৎকার দিয়ে বসে পড়ল সে।
সঙ্গে সঙ্গে নিভে গেল ঘরের আলো। জানালা অন্ধকার।
খাইছে! জোরে কথা বলতে ভয় পাচ্ছে মুসা।
একটা পাথরে বসে গোড়ালি ডলতে শুরু করল রবিন, চোখ গোলাঘরের দিকে। খানিক পরেই উঠে দাঁড়াল সে। আবার এগোল তিনজনে। আস্তে করে দরজার বাইরে খিলে হাত রাখল কিশোর, মৃদু খড়খড় করে উঠল ওটা।

ঝটকা দিয়ে খুলে গেল দরজা। বুকে জোর ধাক্কা খেয়ে উল্টে মাটিতে পড়ে গেল কিশোর। মোটাসোটা মূর্তিটাকে দেখেই লাফিয়ে একপাশে সরে গেল মুসা। ওদের মাঝখান দিয়ে ছুটে চলে গেল লোকটা, হারিয়ে গেল গাড়ি পথের ওপাশের ক্রিস্টমাস খেতে।
কে? বাড়ির ভেতর থেকে ডাক শোনা গেল। কে ওখানে?
উঠে দাঁড়াল কিশোর। জবাব দিল, গোলাঘরে চোর ঢুকেছিল।
তাই নাকি? সর্বনাশ! বললেন উইলসন। এখুনি শেরিফকে ফোন করছি।
ম্যাকআরথারের বাড়ির দিকে হাত তুলে বলল মুসা, ব্যাট। ওদিকে গেছে।
কান পেতে রয়েছে ছেলেরা, কিন্তু আর কোন শব্দ শোনা গেল না। অন্ধকার খেত, গাছগুলো নিথর।
বেশি দূর যায়নি, বলল কিশোর।
ঢোক গিলল মুসা, পায়ে পায়ে এগোল খেতের দিকে। কান খাড়া; কোন গাছ নড়ছে কিনা, অন্ধকারে বোঝার চেষ্টা করছে। তার পেছনেই রয়েছে কিশোর আর রবিন। আরেকটু এগিয়ে আস্তে করে বায়ে সরে গেল কিশোর, রবিন সরলো জানে। খেতে ঢুকে পড়ল মুসা, খুব সাবধানে এগোচ্ছে যাতে নিচের দিকের কোন ডালে পা বেধে হুমড়ি খেয়ে না পড়ে।
হঠাৎ থেমে গেল মুসা! দুরুদুরু করছে বুক, কানের কাছে শুনতে পাচ্ছে যেন রক্তের দ্রুত সঞ্চালন। আরেকটা শব্দ শুনতে পাচ্ছে সে, জোরে নিঃশ্বাস ফেলার আওয়াজ। জোর করে শব্দটা চেপে রাখতে চাইছে যে লোকটা। দৌড়ে এসে হাঁপিয়ে পড়েছে। রয়েছে কাছেই।
স্থির হয়ে গেছে মুসা, শুনছে ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাস। তার কাছ থেকে মাত্র কয়েক ফুট দূরে গাছের আড়ালে রয়েছে, হাত বাড়ালেই ছুঁতে পারে। সঙ্গীদের ডাকার জন্যে মুখ খুলতে গিয়েও থেমে গেল সে। চোরটা ভাগবে তাহলে।
এই সময় গাড়ির আওয়াজ শুনে হাসি ফুটল মুসার মুখে। শেরিফ ছুটে আসছেন। চোরটাকে পাকড়াও করতে পারবে এবার।
গেটের কাছে মোড় নিল গাড়ি, হেডলাইটের আলো ঘুরে এসে পড়ল মুসা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। এক দৌড়ে গিয়ে আরেকটা ঘন ঝাড়ের ভেতরে ঢুকে গেল চোর। লাফিয়ে উঠে তার পিছু নিল মুসা। কিন্তু দুই পা এগিয়েই থেমে গৈল। ওপরের দিকে ভোলা একটা হাত দেখতে পাচ্ছে, নড়তে শুরু করেছে। হাতটা।
ঝট করে নিচু হয়ে গেল মুসা। শাঁ করে তার মাথার ওপর দিয়ে বেরিয়ে গেল ধারাল লম্বা ফলা, একটা গাছের মাথা দু-টুকরো হয় গেল, আরেক মুহূর্ত দেরি করলে গাছের পরিণতি হত মুসার।
গাছপালা ভেঙে মাড়িয়ে আবার দৌড় দিল চোর।

সোজা হলো মুসা। হাঁটু কাঁপছে। বড় বাঁচা গেছে, আরেকটু হলেই আজ...আর ভাবতে পারল না সে।
পাশে এসে দাঁড়াল কিশোর।
ভোজালী! কোনমতে বলল মুসা। গাছ কাটার ছুরি! আরেকটু হলেই দিয়েছিল আমার মুণ্ডু আলাদা করে!
সঙ্গে করে এক যুবক সহকারীকে নিয়ে এসেছেন শেরিফ, নাম ডিক। সব কথা মন দিয়ে শুনল ওরা, তার পর জোরাল একটা টর্চ নিয়ে চোর খুঁজতে বেরোল। ক্রিস্টমাস খেতে পায়ের ছাপ পাওয়া গেল, মুসা যেখানে দাঁড়িয়েছিল তার কাছেই। ম্যাকআরবারের সীমানার ভেতরে অন্য অনেকগুলো ছাপের সঙ্গে গিয়ে মিশেছে। চোরের ছাপ। আর অনুসরণ করা গেল না, কোনটা যে কার বোঝাই মুশকিল।
দোতলায় দাঁড়িয়ে দেখছে ছেলেরা।
ম্যাকআরথারকে ডেকে তুলে তার কেবিনে ঢুকলেন শেরিফ আর তার সহকারী। কুকুরটা চেঁচাচ্ছে। কিন্তু কান দিল না ওরা, তিনজনে গিয়ে ঢুকল খনিতে।
মিসেস ফিলটার জেগে গেছেন, আলো দেখা যাচ্ছে তার জানালায়।
মহিলার বাড়িতেও ঢুকলেন শেরিফ, অব্যবহৃত ঘরগুলোতে ঢুকে দেখলেন।
ঘণ্টাখানেক পরে র‍্যাঞ্চহাউসে ফিরে এলেন শেরিফ আর ডিক।
চোরটা, উলইসনকে বললেন শেরিফ, পাহাড়ের ওদিকে চলে গেছে। অন্ধকারে খুঁজে বের করা যাবে না, তাই আর পিছু নিলাম না। রিপোর্টারদের কেউও হতে পারে। কিছু একটা ঘটলেই পঙ্গপালের মত এসে হেঁকে ধরে। কিন্তু। ছুরিটা কেন নিল বুঝলাম না।
সহকারীকে নিয়ে শহরে ফিরে গেলেন শেরিফ।
দরজা বন্ধ করলেন উইলসন, নিচ তলায় জানালাগুলোও সব বন্ধ করে দিলেন।
সকালে হো-হো হাসি শুনে ঘুম ভাঙল ছেলেদের। নিচে রান্নাঘরে নেমে দেখল বেশ জমিয়ে নিয়েছে জিনা আর ভিকি। টেবিলে বসে কফি খাচ্ছে জিনা।
কি ব্যাপার? খুব আনন্দে আছ মনে হচ্ছে? হেসে জিনাকে বলল কিশোর।
আনন্দই তো, জবাব দিল ভিকি। পুরানো দিনের কথা মনে করে দিচ্ছে। পঁয়তাল্লিশ বছর আগে টুইন লেকসে এ-রকম উত্তেজনাই ছিল। শনিবারে এমন কোন রাত যেত না, যেদিন মারপিট হত না। শেষে শেরিফকে এসে থামাতে হত।
খালা, জিনা বলল শিও ম্যাকআরখারকে দেখেছু?
দেখব না মানে? হেসে বলল ভিকি। ওসব ভোলা যায় নাকি?
সত্যি এখানে জন্মেছে?

তবে কোথায়? কোর্ট হাউসের কাছে ছোট একটা সবুজ বাড়িতে থাকত তার মা-বাবা। তার বাপ ছিল খনির ফোরম্যান। খনির কাজে ওস্তাদ। হ্যারির পরে আর কোন শিশুকে জন্মাতে দেখিনি এ-শহরে, তার আগেই চলে গিয়েছিলাম। খনিরও। তখন শেষ দশা, লোকে গাঁটরি গোছাতে শুরু করেছে। অনেক দিন পর আমি ফিরেছি। হ্যারিও ফিরল। তার বাবা-মা কেমন, কোথায় আছে, টুইন লেকস থেকে যাওয়ার পর কেমন কেটেছে, গিয়ে জিজ্ঞেস করব ভাবছি একদিন, সময়ই করে উঠতে পারি না। তাছাড়া হ্যারিও খুব ব্যস্ত। সারাক্ষণ লাল ট্রাকটা নিয়ে ঘোরে, কি করে, কে জানে। আজ ভোরে দেখলাম, তাড়াহুড়ো করে কোথায় যাচ্ছে, মাথায় সেই অদ্ভুত হ্যাট। কেন যে পরে, বুঝি না।

রাস্তায় গাড়ির শব্দ হলো।

দোতলায় ছুটল জিনা। নেমে এসে জানাল, ম্যাকআরথার ফিরেছে। সূঙ্গে আরও দুজন লোক। মনে হলো মেকসিকান,বলল সে। আবার কোন্ মতলব?

জিজ্ঞেস করলে না কেন? ভিকি বলে উঠল।

করলেই যেন বলবে। তাছাড়া ওকে বিরক্ত করলে চাচা যাবে রেগে। বলেছে, আমাকে ঘরে তালা দিয়ে রাখবে।

পারবে কিনা যথেষ্ট সন্দেহ আছে আমার, বলে, কোয়ার্টারের দিকে চলে গেল ভিকি।

নাস্তা সেরে খেতে কাজ করতে চলল তিন গোয়েন্দা। বড় একটা খেতের গাছ সব ছেটে আরেকটায় এসে ঢুকল। জিনাও এসে হাত লাগাচ্ছে মাঝে মাঝে, তবে ম্যাকারবারের বাড়ির দিকেই তার খেয়াল। কমেটের পিঠে চড়ে বারবার গিয়ে টু মেরে আসছে ওদিক থেকে। খবর জানাচ্ছে বন্ধুদেরকে। খনিমুখের কাছেই কাঠের ছোট একটা ছাউনি আছে, সেটার দরজায় নাকি এখন ঝকঝকে নতুন তালা ঝুলছে। ম্যাকআরথার তার বিচিত্র পোশাক আর হ্যাট পরে গাড়িতে করে ঘুরছে, সাংঘাতিক ব্যস্ত।

সেদিন নতুন কিছু ঘটল না।

দ্বিতীয় দিনে শ্রমিকেরা এল। ট্রাকে করে নিয়ে এসেছে সিমেন্টের বস্তা, স্টীলের খুঁটি। ম্যাকআরথারের সীমানা ঘিরে আট ফুট উঁচু বেড়া দিতে শুরু করল।

দুপুরে খাওয়ার সময় জিনা বলল, বাতিল একটা খনির জন্যে বেহুদা খরচ করছে লোকটা। ওটা নিয়ে কে মাথা ঘামাতে যাচ্ছে?

তুমি যাচ্ছ, সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন তার চাচা। পাগল হয়ে আছ ভেতরে ঢোকার জন্যে। জোকগুলোর কথা বাদই দিলাম। করবে কি বেচারা? ক্রিস্টমাস গাছের প্রতি লোকে এত আগ্রহ দেখালে আমিও বেড়া দিতে বাধ্য হতাম।

খাওয়ার পর রাস্তার ধারের খেতে আগাছা বাছতে চলে গেলেন উইলসন।

চেয়ারে হেলান দিয়ে ভ্রুকুটি করল কিশোর। ক্রিস্টমাস গাছের ব্যাপারে যদি আগ্রহী না-ই হয়, গোলাঘরে ঢুকল কেন চোর?
কেউ জবাব দিল না।
এঁটো বাসনগুলো ঠেলে দিয়ে হাত ধুয়ে বেরিয়ে এল ওরা। গোলাঘরের দিকে চলল। ভালমত দেখবে।
কিচ্ছু নেই, মুসা বলল। খড়, কিছু যন্ত্রপাতি, হোস পাইপ আর একটা পুরানো অচল গাড়ি।
হয়তো ছুরির দরকার পড়েছিল ব্যাটার। খুব খারাপ কথা, রবিন মন্তব্য করল। যা একেকটা ছুরি, এক কোপে ধড় থেকে কল্লা নামিয়ে দেয়া যাবে। ওই জিনিস কার দরকার পড়ল?
গোলা থেকে বেরোল ওরা। গেটের সামনে দিয়ে চলে গেল ম্যাকআরথারের লাল শেভি সুবারব্যান। খনির দিকে চলেছে। ম্যাকআরথারের পাশে বসে আছে আরেকজন, হালকা সামার-সুট আর সাদা হ্যাটে বেশ ভান্ত মনে হচ্ছে।
দৌড়ে র‍্যাঞ্চ হাউসে চলে এল ছেলেরা, দুপদাপ করে সিঁড়ি বেয়ে এসে উঠল দোতলায়। বাকরুমের ঝোলা বারান্দায় এসে দাঁড়াল। ম্যাকআরথারের বাড়িতে কি ঘটে দেখার জন্যে উদগ্রীব।
শ্রমিক দুজন এখন বেড়া লাগাচ্ছে না। একজন বেরিয়ে এল খনির ভেতর থেকে, একটা ঠেলাগাড়ি ঠেলে নিয়ে, তাতে পাথর আর মাটি বোঝাই। কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় তাকে থামাল ম্যাকআরথার, গাড়ি থেকে এক মুঠো মাটি-পাথর তুলে নিয়ে মেলে ধরল তার সঙ্গীর চোখের সামনে। তারপর কিছু বলল শ্রমিককে। গাড়িটা এক জায়গায় রেখে ওয়ার্কশপ বিল্ডিঙে চলে গেল শ্রমিক।
অতিথিকে নিয়ে ম্যাকআরথার ঢুকল খনিতে।
মিনিটখানেক পর চাপা বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেল খনির ভেতর থেকে। কয়েক সেকেণ্ড দূরাগত মেঘ গর্জনের মত গুমগুম করে মিলিয়ে গেল শব্দের রেশ।
আবার গুলি করছে, চেঁচিয়ে উঠল জিনা।
গুলি না, মাথা নাড়ল কিশোর। তার চেয়েও অনেক বেশি শক্তিশালী। ডিনামাইট।
বারান্দায় বেরিয়ে এলেন মিসেস ফিলটার। ম্যাকআরথারের বাড়ির দিকে নজর।
খনিমুখে দেখা দিল ম্যাকআরথার আর তার অতিথি। পেছনে বেরোল দ্বিতীয় শ্রমিকটা। সে-ও আরেকটা ঠেলাগাড়ি ভরে মাটি আর পাথর নিয়ে বেরিয়েছে।
খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে কয়েক মিনিট কথা বলল ম্যাকআরথার আর তার সঙ্গী। তারপর লাল ট্রাকে চড়ে এগিয়ে এল পথ ধরে।

বারান্দায় একই ভাবেড়িয়ে আছেন মিসেস ফিলটার, তার সামনে দিয়েই গেল ট্রাক, কিন্তু ফিরেও তাকাল না ম্যাকআরথার।
ট্রাকটা চলে যাওয়ার পর রাস্তা পেরিয়ে র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে এগিয়ে এলেন মিসেস ফিলটার, অধৈর্য্যভাবে নাড়ছেন হাতের চুড়ি।
তাড়াতাড়ি নিচে নেমে এল ছেলেরা। দরজা খুলে দিল জিনা।
কাণ্ড দেখেছ? যেন জিনাকে বলার জন্যেই এসেছেন মিসেস ফিলটার। খনিতে আবার কাজ শুরু করেছে মিস্টার ম্যাকআরথার।
রান্নাঘর থেকে বেরোল ভিকি। কিন্তু কি লাভ? ওই খনিতে আর কিছু নেই। সব রূপা শেষ।
কিন্তু তা-ও তো কাজ শুরু করল। ডিনামাইট ফাটাল। শোনোনি? আমার ভুল হতে পারে না। ওই শব্দ জীবনে এত বার শুনেছি, কোনদিন ভুলব না।
খেলাধুলা করছে আরকি, হালকা গলায় বলল মুসা। কিংবা টুরিস্ট আকৃষ্ট করার চেষ্টা চালাচ্ছে। জানেনই তো, পুরানো ভূতুড়ে শহর কিনে ঠিকঠাক করে ব্যবসা ফেঁদে বসে লোকে। এ-ও হয়তো তেমনি কিছু।
অস্বস্তি ফুটল মিসেস ফিলটারের চোখে। জায়গাটার বারোটা বাজাবে লোকটা। শান্তি তাহলে শেষ।
তার জায়গা, সে যা খুশি করবে, ঠোঁট বাঁকাল জিনা, আসলে চাচাকে ভেঙাল, উইলসনও এমনি করেই বলেছিলেন।
বিরক্তি চাপতে পারলেন না মিসেস ফিলটার, নাক দিয়ে বিচিত্র একটা শব্দ করে ফিরে চললেন বাড়িতে।
আমার বিশ্বাস হয় না টুরিস্টদের জন্যে খনি ওপেন করতে যাচ্ছে ম্যাকআরথার, বলল কিশোর। টুইন লেকস অনেক দূর, রাস্তাও ভাল না।
কি করছে তাহলে? প্রশ্ন করল মুসা।
হাসল কিশোর। ওর মেকসিকান শ্রমিকদের জিজ্ঞেস করে দেখব। ম্যাকআরথার নেই এখন। চলো তো যাই।
মিনিট কয়েক পর নতুন ভোলা বেড়ার কাছে এসে দাঁড়াল ওরা। শ্রমিকদের ডাকল। ইংরেজিতে কথা বলল ওরা। জবাব নেই। ভাঙা ভাঙা প্যানিশ জানে কিশোর, চেষ্টা করে দেখল। তা-ও সাড়া মিলল না। সন্দিগ্ধ চোখে তাদের দিকে তাকাচ্ছে মেকসিকান দুজন।
হতাশ হয়ে ফিরে এল ওরা। ভিকির সাহায্য চাইল।
তুমি তো মেকসিকোর ভাষা জানো, ভিকিখালা, মুসা বলল। গিয়ে বলে দেখো না একটু। তোমাকে হয়তো বিশ্বাস করবে।

বেশ আগ্রহ নিয়েই গেল ভিকি। ফিরে এল একটু পরেই। ভার দিকে নাকি তাকিয়েও দেখেনি শ্রমিকেরা, তার ওপর রয়েছে কুকুরটা। দেখা মাত্র চিনে ফেলেছে শত্রুকে, ঘেউ ঘেউ করে তেড়ে এসেছে। চেঁচামেচির মাঝেও শ্রমিকদের নিজেদের আলোচনার একটা শব্দ কানে এসেছে, ওরো।
ওরো? ভিকির উচ্চারণের প্রতিধ্বনি করল কিশোর। মানে স্বর্ণ! ম্যাকআরথার কি সোনা খুঁজছে নাকি খনিতে?
কিন্তু ওটা তো রূপার খনি? প্রতিবাদ করল ভিকি।
সোনা আর রূপা অনেক সময় কাছাকাছিই পাওয়া যায়, পকেট থেকে নুড়িটা বের করল কিশোর। জিনা, তোমার চাচা কবে লর্ডসবুর্গ যাবেন, কিছু বলেছেন?
আগামীকাল, জানাল জিনা।
কালই বোঝা যাবে, কি মেশানো আছে নুড়িটাতে।
লর্ডসবুর্গে পোস্ট অফিসের সামনে গাড়ি পার্ক করলেন উইলসন। স্যান জোসেতে চারার অর্ডার দিয়েছিলাম, বললেন তিনি। ওগুলো ডেলিভারি নিয়ে বিল্ডারস সাপ্লাই কোম্পানিতে যাব, কাজ আছে। ঠিক একটায় এখানে থাকব, তোমরাও থেকো। লাঞ্চ সেরে তারপর বাড়ি রওনা হব।
চাচা, ওদের সঙ্গে আমি যাই? জিনা অনুরোধ করল।
যাবে? ঠিক আছে, যাও। কোন রকম গোলমাল পাকিও না আবার। এখানে অবশ্য খনি-টনি কিছু নেই, কিন্তু তোমাকে বিশ্বাস কি। কখন যে কোথায়... বাক্যটা শেষ করলেন না তিনি।
আর কিছু না বলে পোস্ট অফিসে ঢোকার দরজার দিকে এগোলেন উইলসন।
আগে নুড়িটা দেখাচ্ছ তো? কিশোরকে জিজ্ঞেস করল মুসা। তাতে সময় লাগবে। কোথায় পাওয়া গেছে, বলবে নাকি জুয়েলারকে?
পাগল। টুইন লেকসে সোনা আছে শুনলে মৌমাছির মত গিয়ে ভিড় করবে লোকে। রিপোর্টারদের জ্বালায় পালানো ছাড়া পথ থাকবে না। দেখি, কিছু একটা বানিয়ে বলে দেব জুয়েলারকে।
পোস্ট অফিসের দুটো ব্লক পরেই পাওয়া গেল জুয়েলারের দোকান। জানালায়। সাইনবোর্ড লেখা :
ঘড়ি মেরামত করা হয়।
পুরানো স্বর্ণ আর রৌপ্য
কেনা-বেচা করা হয়।
ঠিক এরকম কাউকেই খুঁজছিলাম, বলে দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ল কিশোর।
মোটা, প্রায় গোলাপী রঙের একটা লোক বসে আছে কাচের পার্টিশনের ওপাশে। চোখে একটা ঘড়ির মেকানিকের লেন্স, ঘড়ি মেরামত করছে লোকটা। তার পাশে

একটা শো-কেসে সাজানো রয়েছে রূপার পুরানো জিনিসপত্র, কয়েকটা সোনার টাই-পিন আর আঙটি।
আপনিই মালিক? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
হাতের ছোট ভ্রু-ড্রাইভারটা রেখে চোখ থেকে লেন্স খুলে রাখল লোকটা। হাসল।
পকেট থেকে নুড়িটা বের করল কিশোর। সিলভার সিটিতে বন্ধুর ওখানে বেড়াতে এসেছি আমরা। গতকাল পাহাড়ে ঘুরতে গিয়েছিলাম, এক বুড়োর সঙ্গে দেখা, খনিজ পদার্থের সন্ধানে পাহাড়ে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায় সে।
মাথা ঝাঁকাল মালিক। আজকাল অনেকেই ঘোরে।
লোকটা বলল, তার টাকা দরকার। এটা বের করে দিল, নুড়িটা বাড়িয়ে দিল কিশোর। বলল, অনেক দিন ধরে আছে তার কাছে। টাকা লাগবে, তাই বিক্রি করে দিতে চায়।
চোখ তেরছা করে নুড়িটা দেখল মালিক, জোরে জোরে ডলল আঙুল দিয়ে। হাসিটা তেমনি রয়েছে। কত দিয়েছ?
পাঁচ ডলার, বলল কিশোর।
এটা আসল? জিজ্ঞেস করল জিনা।
মনে তো হচ্ছে, ঘুরিয়ে বলল লোকটা। স্বর্ণ আছে কিনা বোঝা যাবে এখুনি। ড্রয়ার খুলে ছোট একটা শিশি আর একটা উখা বের করল সে। উখা দিয়ে ঘষে সরু একটা দাগ কাটল নুড়ির গায়ে, শিশি থেকে এক ফোঁটা তরল পদার্থ ফেলল খাজে। নাইট্রিক অ্যাসিড, জানাল সে। বেশির ভাগ ধাতুরই বিক্রিয়া ঘটায়, তবে সোনার কিছু হয় না। কয়েক সেকেণ্ড পর মাথা ঝাঁকাল। হ্যাঁ, সোনা আছে।
রেডিমেড সোনা মেলে প্রকৃতিতে? জিজ্ঞেস করল কিশোর। আমি বলতে চাইছি, প্রসেসিং ছাড়াই খাঁটি সোনা বের করা যায়?
সাধারণত অন্য ধাতুর সঙ্গে মেশানো থাকে স্বর্ণ। তবে এটা খুব ভাল পেয়েছ। কোথায় পেল লোকটা, কে জানে।
বলেনি, তাড়াতাড়ি জবাব দিল কিশোর।
হুঁ, নুড়িটা আবার ফিরিয়ে দিল জুয়েলার। কোন বাতিল খনিতে পেয়েছে বোধহয়, ক্যালিফোর্নিয়ার কোন জায়গায় হবে। খনি বন্ধ করে দেয়ার পরেও এসব খনিজ-সন্ধানীরা বহুদিন তার আশেপাশে ঘুরঘুর করে, ছিটেফোটা পায়ও মাঝে মাঝেই।
নুড়িটা পকেটে রাখতে রাখতে বলল কিশোর, অন্য ধাতুর সঙ্গে মেশানো থাকে বললেন। এটার সঙ্গে কি মেশানো আছে? রূপা-টুপা কিছু?
না। লালচে। তার মানে তামা। রূপা থাকলে সবজে দেখাত। বাক্স খুলে পুরানো একটা টাই-পিন বের করল জুয়েলার। ওক পাতার মত ডিজাইন, খুব হালকা সবুজ একটা ভাব রয়েছে। এই যে, এটাতে আছে। অনেকে সবুজ সোনা বলে

একে। পঁচিশ পারসেন্ট রূপা, তারমানে এটা আঠারো-ক্যারাট স্বর্ণ। আর এই যে আঙটিগুলো, পঁচিশ-ক্যারাট। বাচ্চাদের জন্যে বানানো হয়েছে বড়দিনের উপহারের জন্যে কেনে লোকে। তবে খুব নরম, সেটা বলে দিই আমি বিক্রির। সময়। তোমার নুড়িটাতে এই জাতের স্বর্ণই আছে।
পাঁচ ডলার দাম ঠিক আছে?
তা আছে। আজকাল তো একটা প্ল্যাসটিকের টুকরোর দামও এর চেয়ে বেশি। যত্ন করে রেখে দাও। কখনও টাই-পিন বা আঙটি বানাতে ইচ্ছে হলে সোজা চলে এসো আমার কাছে।
জুয়েলারকে ধন্যবাদ জানিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে এল ওরা।
খাইছে! উত্তেজনা আর চেপে রাখতে পারল না মুসা। খনিটাতে সত্যি সত্যি সোনা রয়েছে!
তামাও, চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। কিন্তু অবাক লাগছে, এটাতে রূপার বদলে তামা কেন? রূপা থাকাটাই তো স্বাভাবিক ছিল, কারণ পাওয়া গেছে রূপার খনিতে। সোনা আর রূপা এক খনিতে পাওয়া যায়, এটা জানি আমি, কিন্তু সোনা, রূপা, তামা…নাহ, মিলছে না।
মজার ব্যাপার,? জিনা বলল। শয়তানের চেলা তো ব্যাটা, ওর ওস্তাদই বোধহয় গোপনে ওকে জানিয়েছে, খনিটার ভেতরে সোনার স্তর লুকানো আছে। ওর বাপ ছিল ফোরম্যান, দক্ষ খনিকার। হয়তো সে-ই খোঁজ পেয়েছিল সোনার, চুপ থেকেছে, ছেলে বড় হওয়ার পর তাকে বলেছে। ব্যস, জনাব ম্যাকআরথার এসে কিনে নিয়েছেন খনিটা। গল্প ফেঁদেছেন, জন্মভূমির জন্যে কেঁদে কেঁদে তার অন্তত চুরচুর হয়ে গেছে, আহারে। মিথুকের বাচ্চা মিথ্যুক!
তাই যদি হয়, কিশোর বলল, তাহলে আরও আগেই এল না কেন? তার। বয়েস এখন চল্লিশ, আরও বিশ বছর আগেই আসতে পারত। কয়েক বছর আগে সোনার দাম চড়েছিল, তখনও তো আসতে পারত, আর আসার মোক্ষম সময় ছিল সেটাই। কেন এল না?
আসেনি যে সেটা জানছি কি করে? পাল্টা প্রশ্ন করল জিনা। পাঁচ বছর আগে যখন ডাকাত বাড হিলারি খনিতে পড়ে মরল, তখন ম্যাকআরথারও যে আসেনি সঙ্গে, শিওর হচ্ছি কিভাবে? দুজনে পার্টনার হিসেবেই হয়তো এসেছিল। কোন কারণে মতের মিল হয়নি, ঝগড়া লেগেছিল, তাই হয়তো লোকটাকে গর্তে ঠেলে ফেলে দিয়েছে ম্যাকআরথার।
খুব বেশি কল্পনা করছ, জিনা, প্রতিবাদ করল রবিন। একজন কোটিপতি পুরানো এক খনিতে এক ডাকাতের সঙ্গে ঝগড়া করতে আসবে কেন? কোন কারণ নেই। আর যদি ম্যাকআরথার জানেই খনিটাতে স্বর্ণ আছে, তাহলে পার্টনার নেয়ার

কোন দরকার নেই। ওই স্বর্ণ তোলার সামর্থ্য তার একারই আছে। আর তার খনি থেকে সে যদি সোনা তোলেই, সেটা বেআইনী কিছু নয়, কাজেই গোপনে তোলার চেষ্টা করার তো কোন কারণ দেখছি না। ওসব বাদ দিয়ে এসো এখন কাজের কথা বলি, বা হিলারির খোঁজ লাগাই।

পকেট থেকে নোটবুক বের করে জোরে জোরে পড়ল রবিন বাড হিলারি, দাগী আসামী, নিয়মিত দুবার দেখা করেই গায়েব হয়েছে। অনেকগুলো ছদ্মনাম ব্যবহার করেছে সে, বেরি হারবার্ট, বন হিরাম, বার হুম্যান। স্যান কোয়েনটিন থেকে ছাড়া পেয়ে পাঁচ বছর আগে স্যান ফ্রানসিসকো থেকে নিখোঁজ হয়েছে। সেটা সম্ভবত জানুয়ারির শেষ কিংবা ফেব্রুয়ারির গোড়ার দিকে। টুইন লেকসে পৌচেছে হয়তো মে মাসের কোন এক সময়, লর্ডসবুর্গ থেকে গাড়ি চুরি করে নিয়ে।

খুব ভাল রের্কড লিখেছ, নথি, প্রশংসা করল কিশোর।

একটা ব্যাপার লক্ষ করার মত, বলে গেল রবিন, তার আসল নাম আর ছদ্মনাম, সবগুলোরই আদ্যাক্ষর বি এইচ। লর্ডসবুর্গেও যদি কোন ছদ্মনাম নিয়ে থাকে, এই দুটো অক্ষর দিয়েই হয়তো নাম বানিয়েছে। সেভাবেই খোঁজা দরকার আমাদের। কিশোর, পাবলিক লাইব্রেরি থেকে শুরু করব? ফোন বুক, সিটি ডিরেকটরি, পুরানো খবরের কাগজ, সবই পাওয়া যাবে ওখানে।

সায় দিল কিশোর।

জিনা চেনে লাইব্রেরিটা। পথ দেখিয়ে তিন গোয়েন্দাকে নিয়ে এল সেখানে। খুব ভদ্রভাবে লাইব্রেরিয়ানকে জানাল কিশোর, এই অঞ্চলে বেড়াতে এসেছে ওরা। তার এক মামা নাকি থাকে এখানে, অনেক দিন কোন খোঁজখবর নেই, তাই আসার সময় কিশোরের মা বলে দিয়েছে, পারলে মামার খোঁজ নিয়ে আসতে। লাইব্রেরিয়ান মানুষটা ভাল, তাছাড়া এমনভাবে অভিনয় করে বলেছে কিশোর, গলে গেলেন। নিজেই উঠে গিয়ে ফোন বুক, সিটি ডিরেকটরি বের করে দিলেন। পাঁচ বছরের পুরানো বই-পুত্র নিয়ে লম্বা একটা টেবিলে বসে গেল ওরা। নামের আদ্যাক্ষর বি এইচগুলো খুঁজছে।

বেশিক্ষণ লাগল না। দশ মিনিটেই যোলোটা নাম পেয়ে গেল। কিন্তু পনেরোজনই লর্ডসবুর্গের স্থায়ী বাসিন্দা। বাকি থাকল একজন, তার নাম বেকার। হেইম্যান। পাঁচ বছর আগেরর ডিরেকটরিতে আছে, মাঝখানে কয়েকটা বছর নেই, তারপর একেবারে চলতি বছরের বইতে আবার নাম উঠেছে।

মাঝখানে কোথাও চলে গিয়েছিল হয়তো, কিশোর বলল আবার ফিরেছে। আগে যে বাড়ির ঠিকানা ছিল, এখনও তাই আছে।

না, ও আমাদের চোর না, মাথা নাড়ল মুসা। বোঝা যাচ্ছে, কোথাও নামধাম না লিখিয়েই কেটে পড়েছে লর্ডসবুর্গ থেকে আমাদের বি এইচ।
থাকার তো কথা মাত্র কয়েক মাস, রবিন বলল।
পেয়েছ? নিজের ডেস্ক থেকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন লাইব্রেরিয়ান।
না, স্যার, হতাশ ভঙ্গিতে জবাব দিল কিশোর। মা বোধহয় ভুল অনুমান করেছে। এখানে আসেইনি মামা। আর এসে থাকলেও হয়তো ডিরেকটরিতে নাম তোলেনি, ফোন নেয়নি। একটা ব্যাপার অবশ্য...মামা যেখানে যায়, শুনেছি কিছু একটা করে মাত করে দেয়, খবরের কাগজে নাম উঠে যায়। পুরানো কাগজগুলো, স্যার...
দেখতে চাও? ওই যে, ওখানে, দেখিয়ে দিলেন লাইব্রেরিয়ান।
একের পর এক পাতা উল্টে চলল ওরা। কিছুই পাওয়া গেল না। অবশেষে, ১০ই মে-তে এসে থমকে গেল। ডেথ ট্র্যাপ মাইনের মুখ বন্ধ করার খবর ছেপেছে। পড়ে বলল রবিন, হুঁ, লর্ডসবুর্গের কাগজেও লিখেছে দেখা যাচ্ছে। হিলারির মৃত্যুর সঙ্গে এর কোন যোগাযোগ থাকতে পারে?
কি জানি, কাঁধ ঝাঁকাল কিশোর। হয়তো খবরটা পড়ে কোন কারণে টুইন লেকসে ছুটে গিয়েছিল হিলারি, খনির ভেতরটা দেখতে। গাড়িটা কবে চুরি হয়েছে, লিখে রেখেছ না?
নোটবুক দেখে জানাল রবিন, মে-র এগারো। লর্ডসবুর্গের কাগজে খবর বেরোনোর পরদিন। আর খনির মুখ বন্ধ করার তিন দিন আগে। যোগাযোগ আছে। মনে হচ্ছে।
কিন্তু কি যোগাযোগ? প্রায় চেঁচিয়ে উঠল জিনা। খনির মুখ বন্ধ করা হবে জানল চোরটা, তারপর এতই উত্তেজিত হয়ে পড়ল, গাড়ি চুরি করে নিয়ে ছুটে গেল ওখানে গর্তে পড়ে মরার জন্যে? যাতে পাঁচ বছর আর কোন খবর না থাকে তার? আমার মনে হয়, ম্যাকআরথারই তাকে ওখানে দেখা করতে...
দূর! বিরক্ত হয়ে বলল মুসা। মুহূর্তের জন্যেও ম্যাকআরথারকে তুলতে পারো না নাকি তুমি?
যে অন্ধকারে ছিলাম, সেখানেই রয়ে গেছি আমরা, রবিন বলল। আমরা জানি, বাড হিলারি লর্ডসবুর্গে এসেছিল, গাড়ি চুরি করেছিল, টুইন লেকমে সে-ই গাড়ি নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু প্রমাণ করতে পারব না। সকালটাই মাটি।
পুরোপুরি মাটি না, সান্ত্বনা দিল কিশোর। নুড়িটা আবার বের করে দেখাল। যেদিন এই নুড়িটা পেলাম, সেদিনই বাড হিলারির লাশও আবিষ্কার করলাম। কি যোগাযোগ আছে জানি না, তবে এটুকু জোর দিয়ে বলতে পারি, যোগাযোগ কিছু একটা আছেই।

বিকেল নাগাদ র‍্যাঞ্চে ফিরে এল ওরা। গাড়ি থেকে মালপত্র নামাতে উইলসনকে সাহায্য করল ছেলেরা। চারাগুলোকে গোলাঘরের কাছে রেখে পানি দিয়ে ভিজিয়ে রাখল। বাড়ির ভেতরে চলে গেছেন উইলসন।
মিসেস ফিলটারের বাড়ির দিকে তাকাল কিশোর। ডেথ ট্র্যাপ মাইনের কথা আর সবার চেয়ে ওই মহিলাই বেশি বলতে পারবেন।
মিসেস ফিলটার? জিনা বলল, হ্যাঁ, তা পারবেন।
চলো যাই তাহলে, তার সঙ্গে দেখা করে আসি।
অন্য দুজনও এক কথায় রাজি। রাস্তা পেরিয়ে মিসেস ফিলটারের বাড়িতে এসে দাঁড়াল চারজনে, দরজায় ধাক্কা দিল কিশোর।
সাড়া দিলেন মিসেস ফিলটার, ভেতরে যেতে বললেন ছেলেদেরকে।
ভেজানো দরজা, ঠেলা দিতেই খুলে গেল। পথ দেখিয়ে ছেলেদেরকে রান্নাঘরে নিয়ে এল জিনা। মিসেস ফিলটারকে জিজ্ঞেস করল, ব্যস্ত?
হাসলেন মহিলা, চোখের কোণের ভাঁজগুলো গভীরতর হলো। আজকাল আর ব্যস্ততা কোথায়? তবে আমাকে যদি একটু সাহায্য করতে, প্লীজ...আমার ট্রাকে কিছু মালপত্র আছে, যদি নামিয়ে দিতে। মুদীর কাছে গিয়েছিলাম।
ঠিক আছে, ঠিক আছে, এক্ষুণি দিচ্ছি নামিয়ে, বলল মুসা।
কাঁচা মাটির গাড়িবারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে মিসেস ফিলটারের ট্রাক। বড় একটা কার্ডবোর্ডের বাক্স বোঝাই বাদামী রঙের কাগজে মোড়া প্যাকেট। রান্নাঘরে বয়ে নিয়ে এল ওটা মুসা, নামিয়ে রাখল।
থ্যাংক ইউ, বললেন মিসেস ফিলটার। বয়েস হয়েছে তো, আগের মত কাজ আর করতে পারি না। প্যাকেট খুলে শাকসজি, রুটি ও টিনের খাবার বের করে তাকে সাজিয়ে রাখতে লাগলেন।
হঠাৎ চাপা বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেল। জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন মিসেস ফিলটার। খনি-খনি খেলা শুরু করেছে আবার ম্যাকআরথার। এটাই আশা করছিলাম। আধ ঘন্টা আগে তার শহুরে বন্ধুকে নিয়ে ঢুকতে দেখেছি তো।
খনি খুঁড়ছে নাকি আবার? বলল কিশোর।
দেখেশুনে তা-ই মনে হয় বটে, সায় দিয়ে বললেন মিসেস ফিলটার। বিস্ফারণ ঘটাচ্ছে খনির ভেতরে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এখানেই জন্মেছি তো, ওই শব্দ আমি চিনি, কোনদিন ভুলব না। এই বাড়িতেই বাস করেছি, যখন আমার স্বামী সুপারিনটেনডেন্ট ছিল। খনির সুড়ঙ্গে ডিনামাইট ফাটার শব্দ কয়েকদিন শুনলেই তোমরাও আর ভুলবে না। কিন্তু সব সময় খনিতে বোমা ফাটায়
ম্যাকআরথার, শুধু সঙ্গী থাকলেই ফাটায়। তার লস অ্যাঞ্জেলেসের বন্ধুকে দেখায় বোধহয়।

অদ্ভুত শখ, রনি মন্তব্য করল।
অনেকেরই থাকে এ-রকম, হাসলেন মিসেস ফিলটার। একটা লোককে চিনতাম, তার বাড়ির পেছনে মাঠে তিনশো গজ লম্বা এক লাইন বসিয়েছিল, পুরানো একটা রেলইঞ্জিন কিনে তাতে চালাত। বার বার সামনে-পেছনে করত, চালানোর সময় ড্রাইভারের পোশাক পরে নিত। বেশি টাকা থাকলেই এসব ভূত চাপে লোকের মাথায়। ম্যাকআরথারেরও হয়তো ওরকম কিছু হয়েছে। সারাজীবন বাপের মুখে খনির গল্প শুনে শুনে খনি-খোড়ার ভূত চেপেছে আর কি। সেই পুরানো দিনের স্বাদ পেতে চাইছে। এতে দোষের কিছু দেখি না।
এত নির্দোষ ভাবছেন ওকে? জিনার পছন্দ হলো না মিসেস ফিলটারের কথা।
দেখো, কিছু মনে করো না, একটা কথা বলি। কোন সময় সহজ ব্যাপারকে ঘোরাল করবে না। তুমি তার সব কাজেই দোষ দেখতে পাও, তাকে পছন্দ করো না বলে। তবে তোমাকেও দোষ দিই না। নোকটা তেমন মিশুক নয়। সীমানায় বেড়া লাগিয়ে ভালই করেছে। যা একটা কুত্তা পোষে, কখন কাকে কামড়ে দিয়ে বিপদ বাধাবে।
আবার শোনা গেল বিস্ফোরণের শব্দ।
মিসেস ফিলটার, কিশোর বলল, সত্যিই কিছু নেই তো খনিতে? মানে কাজের কাজ কিছু করছে না তো?
জোরে মাথা নাড়লেন মিসেস ফিলটার। ডেথ ট্র্যাপ মাইন শেষ, মরা। চল্লিশ বছর আগেই ফুরিয়ে গেছে রুপা। তোমরাও হয়তো জানো। খনি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর অনেক দিন খুব দুঃসময় গিয়েছিল আমাদের। এখান থেকে চলেই যেতে হলো শেষে বাধ্য হয়ে। এখানে সামান্যতম সম্ভাবনা থাকলে যেতাম ভাবছ? তারপর রিচার্ড মারা গেল, সে-ও বাইশ বছর আগের ঘটনা। তার বীমার টাকা সব তুলে ফিনিক্সে একটা দোকান দিলাম। ইনডিয়ানদের কাছে মোকাসিন আর গহনা বিক্রি করতাম, কিন্তু ব্যবসার কিছুই বুঝি না, খোয়ালাম সব। দোকান-টোকান বেচে দিয়ে আবার ফিরে আসতে হলো যেখান থেকে গিয়েছিলাম সেখানে। টেনেটুনে চলছি কোনমতে এখন। ঘৃণা ফুটল চোখে, বোধহয় নিজের ওপরই। হঠাৎ করেই কোমল হলো তাঁর দৃষ্টি। তবে, এখানে আসার জন্যে ছটফট করছিলাম আমি। যেখানে জন্মেছি, অনেকগুলো সুখের বছর কাটিয়েছি, সেখানে জীবনের বাকি দিনগুলো কাটানোর ইচ্ছে কার না হয়? ম্যাকআররও বোধহয় তাই চায়। তার ছোটবেলা দেখেছি, নোঙরা, ললিপপ চুষত, রঙিন লালা লেগে থাকত সারা মুখে। তখনও অদ্ভুত কিছু ছিল ছেলেটার মধ্যে। কী, ঠিক মনে করতে পারছি না।

কিন্তু সত্যি যদি কিছু পাওয়ার আশা করে থাকে ম্যাকআরথার, কোন লাভ হবে না, এটা তো ঠিক? বলল কিশোর।
তা ঠিক। কিচ্ছু নেই আর ওই খনিতে।
রূপা নেই, কিন্তু যদি স্বর্ণ থাকে? দুটো ধাতু অনেক সময় পাশাপাশি থাকে তো।
থাকে। কিন্তু ডেথ ট্র্যাপ মাইনে নেই।
তামা?
না। শুধু রূপা ছিল, শেষ হয়ে গেছে, পুরানো দিনের স্মৃতি মনে করেই বোধহয় বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন মিসেস ফিলটার! সব শেষ। এক কালে কি শহরই না ছিল টুইন লেকস, কি আরামেই না ছিলাম আমরা। আবার যদি অলৌকিক কিছু ঘটত, সত্যি সত্যি কিছু পাওয়া যেত খনিটাতে, বুড়ো বয়েসে আবার হয়তো সুখের মুখ দেখতে পারতাম। কিন্তু তা-তো হবার নয়। যাকগে, এসো আমার ছোটখাট জমিদারী দেখাই তোমাদের, কথাগুলো তিক্ত শোনাল।
ছেলেদেরকে নিয়ে বাইরে বেরোলেন মিসেস ফিলটার। এখানে আসার পর ভেবেছিলাম, দরজায় তালা লাগানোর ব্যবস্থা করব, বললেন তিনি। কিন্তু পরে দেখলাম কোন দরকার নেই। জিনা লাশটা দেখার পর অবশ্য অবস্থা অন্য রকম হয়েছে। এখন অচেনা লোক আসছে। হ্যাঁ, জিনা, ভাল কথা, তোমার চাচার ছুরি পাওয়া গেছে?
নাহ্। নিয়ে গেলে আর কি পায়?
পাবে হয়তো কেউ একদিন পাহাড়ের ওদিকে, মরচে-টরচে পড়া অবস্থায়। হাঁটতে হাঁটতে বাড়ির উত্তর ধারে পুরানো একটা ঘরের কাছে চলে এলেন মিসেস ফিলটার। বললেন, মিলানোর ঘর ছিল এটা। খনির পে-মাস্টার ছিল সে।
দরজায় ঠেলা দিলেন মিসেস ফিলটার। মৃদু ক্যাচকোচ প্রতিবাদ জানিয়ে খুলে গেল দরজা। সবাইকে নিয়ে ভেতরে ঢুকলেন। দীর্ঘ দিনের অব্যবহৃত আসবাবপত্র, দেয়ালের প্লাসটার খসা, আলমারির দরজা ভেঙে খুলে ঝুলে রয়েছে। ভেতরে নিত্য প্রয়োজনীয় কিছু জিনিসপত্র, কিছু ভাঙাচোরা, কিছু মোটামুটি ভাল।
অনেকেই অনেক কিছু ফেলে গেছে, বললেন মিসেস ফিলটার। নেয়ার দরকারই মনে করেনি, বোঝা মনে করে ফেলে গেছে।
বাড়িগুলো খালি ফেলে রেখেছেন কেন? জিনা জিজ্ঞেস করল।
তো কি করব?
ভাড়া দিয়ে দিলেই পারেন। অনেক ঝামেলা আছে অবশ্য, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা।
তা নাহয় করলাম। কিন্তু ভাড়া নেবে কে? তোক কোথায়?

ঘুরে ফিরে দেখছে ছেলেরা। বালি উড়ছে, বদ্ধ ঘরের পুরানো ভ্যাপসা গন্ধে বাতাস ভারি। জায়গায় জায়গায় ছাতের প্লাসটার খসে পড়েছে, বৃষ্টির পানি চুইয়ে পড়ে আরও বেশি করে নষ্ট হয়েছে ওসব জায়গা। মুসার ভয় হলো, গায়ের ওপরই ধসে পড়ে।

মরচে ধরা একটা স্টোভের কাছে একগাদা খবরের কাগজ স্কুপ হয়ে আছে, হলদে হয়ে গেছে পুরানো হতে হতে।

কাগজের স্তুপের পাশে গিয়ে বসে পড়ল রবিন। উল্টে দেখল দু-একটা। মিসেস ফিলটারকে জিজ্ঞেস করল, আপনি যখন জায়গাটা কেনেন, তার আগে থেকেই ছিল? মানে, পাঁচ বছর আগে যখন এলেন?

বোধহয় ছিল, মনে করার চেষ্টা করছেন মিসেস ফিলটার। হ্যাঁ, ছিলই। নইলে পরে আসবে কোত্থেকে? আমি তো রাখিনি।

ইনটারেসটিং, গালে আঙুল রাখল রবিন। আমি নিতে পারি এগুলো?

এই বস্তাপচা পুরানো খবরের কাগজ দিয়ে কি করবে? ভুরু কোঁচকালেন মিসেস ফিলটার।

ও খবরের কাগজের পোকা, হেসে বলল জিনা। পুরানো কাগজ জোগাড় করা হবি। কত রকম পাগলই তো আছে দুনিয়ায়। লাশটা পাওয়ার পর দি টুইন লেকসের অফিসে গিয়েছিলাম আমরা। জানার চেষ্টা করেছি কেন এসেছিল বাড হিলারি, কি করছিল। অনেক কিছুই জেনেছি, কিন্তু…

বার বার জিনার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপছে কিশোর, কিছু না বলার ইঙ্গিত করছে, কিন্তু দেখছেই না জিনা।

রবিন বুঝল ব্যাপারটা, তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বলল, আমার বাবা খবরের কাগজের লোক। পুরানো কাগজের প্রতি ভীষণ আগ্রহ। সে জন্যেই নিতে চাইছি। নেব?

কিছুটা বিস্মিত মনে হলো মিসেস ফিলটারকে। নাও। নিয়ে যাও।

সাবধানে, যেন না ছেড়ে এমনিভাবে সাজিয়ে কাগজের গাদা তুলে নিল রবিন। ঘর থেকে বেরিয়ে এল সবাই। বাইরে পড়ন্ত বিকেলের সোনালি রোদ।

কিছু খাবে তোমরা? জিজ্ঞেস করলেন মিসেস ফিলটার। ঠাণ্ডা কিছু?

মুসার আপত্তি নেই, হেসে বলল জিনা।

চলো। কমলার শরবত আছে।

মিসেস ফিলটারের ছোট রান্নাঘরে আবার ফিরে এল ওরা। ফ্রিজ খুললেন মহিলা। কিন্তু কমলার রসের বোতল নেই। তাক খোঁজা হলো, আলমারি খোঁজা হলো, কিন্তু কোথাও নেই। আরে, গেল কই? মহিলা তো অবাক। দু বোতল ছিল। আমি তো আজ খাইনি। তাহলে?

সব কিছুই খুঁটিয়ে দেখা কিশোরের স্বভাব। মুদী দোকান থেকে সদ্য আনা জিনিসগুলো যেখানে সাজিয়ে রাখা হয়েছে, সে-তাকের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে। বলল, রুটিও একটা কম। আর এক টিন মাছ। আপনি তখন, রেখেছিলেন, দেখেছি।

কিশোরের দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকালেন মহিলা, যেন কথা বুঝতে পারছেন। তাকের দিকে এক নজর চেয়েই দৌড়ে গেলেন দরজার দিকে, বাইরে তাকালেন। যেন দেখতে পাবেন, তার খাবারগুলো হাতে নিয়ে দ্রুত হেঁটে চলে যাচ্ছে কোন লোক।

খবরের কাগজের গাদা নামিয়ে রাখল রবিন। রান্নাঘরের সিংক থেকে তুলে আনল একটা পোড়া সিগারেটের টুকরো। মিসেস ফিলটার, আপনি নিশ্চয় সিগারেট খান না?

রবিনের হাতের দিকে চেয়ে রইলেন মিসেস ফিলটার। চেঁচিয়ে উঠলেন হঠাৎ, কিছুই তো বুঝতে পারছি না। এ-কার কাজ? কার এত খিদে পেয়েছে? আমার কাছে চাইলেই পারত, চুরি করল কেন?

শুধু খাবারই, মুসা বলল, হয়তো আরও এমন কিছু দরকার হয়েছে তার, যেটা চাইলে দিতেন না আপনি। আসুন না খুঁজে দেখি। এমনও হতে পারে, চোর এখনও বাড়িতেই লুকিয়ে আছে।

রান্না ঘর থেকে বেরিয়ে এল সবাই। প্রতিটি ঘর, আলমারি, বিছানার তলা খুঁজে দেখল। চোর নেই।

তেমন মূল্যবান কিছু নেই আমার, চোরে নেয়ার মত, বললেন মিসেস ফিলটার। আর কিছু খোয়াও যায়নি।

শেষ পর্যন্ত তালা আপনাকে লাগাতেই হচ্ছে, মিসেস ফিলটার, বলল কিশোর। এখন থেকে বাইরে বেরোলে তালা লাগিয়ে বেরোরেন।

কিন্তু টুইন লেকসে কেউ তালা লাগায় না, করুণ কণ্ঠে বললেন মহিলা।

আগে অচেনা কেউ ছিল না, এখন অনেকেই আসা-যাওয়া করছে। কে ভাল কে খারাপ, কি করে বুঝবেন? এই তো, খাবার চুরি করে নিয়ে গেল। একবার যখন করেছে, খিদে পেলে আবারও আসতে পারে। হুশিয়ার থাকা ভাল না?

র‍্যাঞ্চ হাউসে ফিরে এল ওরা। দু-হাতে পাজাকোলা করে খবরের কাগজের গাদা নিয়ে এসেছে রবিন।

কেন এনেছ এগুলো? মুসা জিজ্ঞেস করল। ইতিহাসে ডক্টরেট নেবে নাকি? থিসিস লিখবে?

আর আমাকেই বা চুপ করিয়ে দিয়েছিলে কেন তখন? জিনা অনুযোগ করল।

কারও কথারই জবাব না দিয়ে রবিন বলল, বেশির ভাগ কাগজই দা টুইন লেকস। চল্লিশ বছরের আগেও কপিও আছে। তবে এই যে, এটা, ফিনিক্স থেকে বেরোয়, পাঁচ বছর আগের, মে-র নয় তারিখের কপি। দেখো দেখো, হেডলাইনটা দেখো।
দেখে গভীর ভঙ্গিতে মাথা দোলাল কিশোর। হুম! নিরাপদ কোথাও বসে ভালমত পড়া দরকার।
গোপন আর নিরাপদ জায়গা এখানে একটাই গোলাঘরটা। ভেতরে ঢুকে মডেল টি-র ধারে এসে বসল ওরা। কাগজের গাদা নামিয়ে রেখে ফিনিক্স থেকে বেরোনো পেপারটা মেলল রবিন। চারপাশ থেকে ঝুঁকে এল সবাই ওটার ওপর।
জোরে জোরে পড়ল রবিন :
আর্মার্ড ট্রাক লুট
দশ লক্ষ ডলার নিয়ে পালিয়েছে
মুখোশধারী ডাকাতেরা।
আজ বিকেল তিনটায় নর্থ ইনডিয়ান হেড রোডে এক দুঃসাহসিক ডাকাতি হয়েছে। ট্রাকটা সিকিউরিটিস ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির! মুখখাশপরা তিনজন সশস্ত্র ডাকাত অতর্কিতে আক্রমণ করে ড্রাইভার হিনো মারকিং আর গার্ড ডিয়েগো পিটারকিনকে বেঁধে ফেলে, হাত-মুখ বেঁধে রাখে ট্রাকের পেছনে। তারপর দশ লক্ষ ডলার লুট করে নিয়ে পালিয়ে যায়। এখানে উল্লেখযোগ্য, ডাকাতদের হাতে ছিল কাটা-শটগান।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক প্রত্যক্ষদর্শীর বক্তব্য : সাদা একটা ক্রাইসলার সিডানে করে এসেছিল ডাকাতেরা। ফিনিশিয়ান লোন কর্পোরেশনের সামনে এসে আর্মার্ড ট্রাকটা থামার আগে থেকেই পথের ধারে দাঁড়িয়েছিল সাদা গাড়িটা। ডাকাতেরা মেঝেতে লুকিয়েছিল। টাকা লুট করে ওরা সাদা গাড়িতে তোলার পর পরই পাশের একটা কার্ড শপ থেকে এক মহিলা বেরিয়ে ড্রাইভিং সিটে বসল, দ্রুত গাড়ি চালিয়ে চলে গেল ইনডিয়ান হেড রোডের উত্তর দিকে। মুখোশধারীদের চেহারার বর্ণনা পাওয়া যায়নি, তবে মহিলাকে ভালমতই দেখেছে প্রত্যক্ষদর্শী। মহিলার বয়েস পঞ্চাশ থেকে ষাটের মধ্যে, হালকা-পাতলা গড়ন, চুল হালকা ধূসর, গায়ের রঙ তামাটে। পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চিমত লম্বা, ওজন, আন্দাজ একশো তিরিশ পাউণ্ড। গাঢ় রঙের প্যান্ট ছিল পরনে, গায়ে টারটল-নেক সাদা শার্ট। গলায় অস্বাভাবিক বড় একটা ইনিডিয়ান হার ছিল, রূপার তৈরি, নীলকান্তমনি খচিত।
খাইছে! বলে উঠল মুসা। এক মিলিয়ন নিয়ে পালাল?
মে-র নয় তারিখ, বিড় বিড় করল কিশোর। পাঁচ বছর আগে। রবিন, তার পরদিনই তো ডেথ ট্র্যাপ মাইনের মুখ সীল করার কথা বেরিয়েছিল লর্ডবুর্গের

কাগজে?
হ্যাঁ, বলল রবিন। এবং এগারো তারিখ গাড়িটা চুরি গিয়েছিল।
সেই সময়, আপন মনেই বলে গেল কিশোর, মিসেস ফিলটারের বাড়ি ছিল খালি। আসেননি তখনও টুইন লেকসে। এলেন অক্টোবরে, জায়গা আর বাড়ি কিনলেন। কিন্তু কেউ একজন ছিল তখন ও-বাড়িতে, যে মে-র নয় তারিখে ফিনিক্সে ছিল, যে কাগজটা ফেলে গেছে।
বাড হিলারি! চেঁচিয়ে উঠল মুসা।
অসম্ভব নয়, সায় দিয়ে বলল কিশোর। লর্ডসবুর্গ থেকে বেশি দূরে না ফিনিক্স। ডেথ ট্র্যাপ মাইন সীল করার মাত্র কয়েক দিন আগে দশ লক্ষ ডলার ডাকাতি হলো, তারপর লর্ডর্সবুর্গে একটা গাড়ি চুরি হলো, পাঁচ বছর পর খনিতে পাওয়া গেল এক জেলখাটা দাগী আসামীর লাশ। হ্যাঁ, কল্পনা করতে দোষ নেই, হিলারি ওই ট্রাক ডাকাতদের একজন, নয় তারিখে ফিনিক্স ছিল, তারপর লর্ডসবুর্গ থেকে গাড়ি চুরি করে পালিয়ে এসে লুকিয়েছিল টুইন লেকসে। মনে হচ্ছে, বুঝতে পারছি, কেন সে এসেছিল এখানে।
লুকাতে, বলল মুসা।
না। টুইন লেকসে লুকানোর জায়গা নেই। এখানে নতুন কেউ এলেই সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়ে যাবে। ধরা যাক, হিলারি ডাকাতদের একজন, তার ভাগের টাকা লুকানোর জন্যে নিরাপদ একটা জায়গার খোঁজ করছিল। মুখ বন্ধ করে দেয়া হবে শিগগিরই, এমন একটা খনির চেয়ে টাকা লুকানোর ভাল জায়গা আর কোথায় হতে পারে?
চোখ বড় বড় করে ফেলেছে জিনা। কিন্তু রাখলে আবার বের করবে কি করে?
বাড হিলারির মত একটা ডাকাতের জন্যে সামান্য কয়েকটা লোহার শিক এমন কি বড় বাধা, রবিন জবাব দিল।
টাকাগুলো তাহলে ম্যাকআরথারই পেয়েছে। চেঁচিয়ে উঠল জিনা। খনিতে লুকানো থেকে থাকলে সে ছাড়া আর কেউ পায়নি। এজন্যেই কাউকে খনির ধারেকাছে ঘেঁষতে দেয়নি ব্যাটা। লাশটা আছে জেনেও বলেনি। সুযোগ মত লুকিয়ে ফেলত লাশটা, তাহলে টাকার কথা আর অনুমান করতে পারত না কেউ। কিন্তু তার কপাল খারাপ, আমরা তার আগেই গিয়ে দেখে ফেলেছি।
সেটা সম্ভব, বলল কিশোর। কিন্তু আপাতত ম্যাকআরবারের কথা ভাবছি। না আমরা। হিলারির টুইন লেকসে আসার আরও একটা কারণ থাকতে পারে।
কি? জিজ্ঞেস করল রবিন।
হতে পারে, লর্ডসবুর্গের খবরের কাগজে খনিটা সম্পর্কে যা যা বেরিয়েছে, তার চেয়ে বেশি জানত হিলারি। হতে পারে, কেউ তাকে বাতিল খনিটার কথা সব

বলেছিল, বলেছিল খনির পরিত্যক্ত জায়গাগুলোর কথা। হতে পারে, সেই লোক হিলারির কুকাজের এক সহকারী।
কি বলতে চাইছ? বুঝতে পারছে না জিনা।
ফিনিক্সের ছোট একটা দোকানে কয়েক বছর চাকরি করে টুইন লেকসে ফিরে এলেন মিসেস ফিলটার, ডাকাতিটার কয়েক মাস পরে। বেশ বড় সাইজের একটা সম্পত্তি কেনার মত টাকা নিয়ে এলেন সঙ্গে করে। হিলারির সহকারী হতে পারেন না?
তু-ত্তুমি পাগল হয়ে গেছ! উত্তেজনায় কথা স্পষ্ট করে বলতে পারল না জিনা।
তু-তুমি পাগল হয়ে গেছ! উত্তেজনায় কথা স্পষ্ট করে বলতে পারল না
না, তা হইনি, হালকা গলায় বলুল কিশোর। যে গাড়িতে করে পালিয়েছিল ডাকাতেরা, সেটার ড্রাইভার ছিলেন মহিলা।
ঠিক! দু-আঙুলে চুটকি বাজাল রবিন। ঠিক বলেছ। মহিলার বয়েস ছিল পঞ্চান্ন থেকে ষাটের মধ্যে, হালকা ধূসর চুল, গায়ের রঙ তামাটে। পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি লম্বা, একশো তিরিশ পাউন্ড ওজন। গলায় রূপার হার, তাতে বসানো নীলকান্তমনি।
কি জিনা, ভুরু নাচাল কিশোর, এ-রকম কাউকে চিনি আমরা?
কিন্তু কিন্তু ওরকম আরও অনেক মহিলা থাকতে পারে, আর ওই হার একা মিসেস ফিলটার পরেন না, বাজারে আরও কিনতে পাওয়া যায়। মিসেস ফিলটার একজন অত্যন্ত ভাল মহিলা।
ব্যবহার ভাল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ডাকাতিটা যখন হয়, তখন মহিলা ফিনিক্সে ছিলেন, এটা তো ঠিক। ব্যবসায় নেমে জমানো টাকা সব খুইয়েছিলেন, তারপর চাকরি নিয়েছিলেন ছোট একটা দোকানে, সেখানে কত আর বেতন পেতেন?
খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার পর কত আর জমানো যায় ওই টাকা থেকে? কিন্তু দেখা গেল বেশ মোটা টাকা নিয়ে ফিরেছেন, ডাকাতির কয়েক মাস পর। কোন কাজ করেন না, অথচ বেশ আছেন এখানে। শান্ত, ভদ্র, আত্মবিশ্বাসী, এতবড় একটা ডাকাতির জন্যে পারফেক্ট চরিত্র। সব চেয়ে বড় কথা, প্রত্যক্ষ দর্শীর বিবরণের সঙ্গে পুরোপুরি মিলে যাচ্ছে সব কিছু।
তাতে কি! রেগে উঠল জিনা। দেখো কিশোর, কোন প্রমাণ নেই তোমার হাতে। কিছু প্রমাণ করতে পারবে না।
না তা পারব না, স্বীকার করল কিশোর, তবে কতগুলো অদ্ভুত যোগাযোগ দেখতে পাচ্ছি। প্রমাণ খোঁজা শুরু করতে পারি আমরা, নরম চোখে তাকাল জিনার

দিকে। আরেকটা সম্ভাবনার কথা ভেবে দেখতে পারি। যদি মিসেস ফিলটার ডাকাতিটার সঙ্গে যুক্ত থাকেন... নাটকীয় ভঙ্গিতে চুপ করে গেল সে।
বলো। থামলে কেন? চেঁচাল জিনা।
তাহলে এমনও হতে পারে, বাড হিলারি একা আসেনি টুইন লেকসে। হয়তো... হয়তো টাকা লুকানোর সুযোগই পায়নি।
মিসেস ফিলটার ধাক্কা দিয়ে তাকে খাদে ফেলে দিয়েছেন, জিনার কণ্ঠ কাপছে, মুখচোখ লাল, এই তো বোঝাতে চাইছ? তুমি...তুমি বদ্ধ পাগল হয়ে গেছ, কিশোর পাশা। তোমার আর কোন কথা শুনতে চাই না, ঝড়ের বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে।
কিশোরের দিকে তাকাল রবিন। সত্যি তুমি ভাবছ, মিসেস ফিলটার হিলারিকে খুন করে তার ভাগের টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন?
না, মাথা নাড়ল কিশোর। এমনি কথার কথা বলছিলাম জিনার সঙ্গে। তবে, ডাকাতিটায় ওই মহিলাও জড়িত থাকলে অবাক হব না।
পরদিন সকালে রান্নাঘরে নাস্তা সারল ছেলেরা। তাদের সঙ্গে রয়েছে কেবল জিনা। গভীরভাবে কি যেন ভাবছে কিশোর, তার আনমনা ভাব দেখেই বোঝা যায়। নিজের প্লেটের দিকে চেয়ে জিনাকে বলল, ফিনিক্সে মিসেস ফিলটার যে দোকানে কাজ করতেন, দোকানটার নাম জানো?
সেটা জেনে তোমার কোন লাভ নেই, কড়া গলায় জবাব দিল জিনা। দোকানটার নাম ছিল টিড-বিট। প্রথমে মিসেস ফিলটারই দোকানটা দিয়েছিলেন, ব্যবসায় লালবাতি জ্বালিয়ে পরে বিক্রি করে দেন মিসেস ম্যালকম নামে আরেক মহিলার কাছে। সেই মহিলা মিসেস ফিলটারকে ওই দোকানের সেলসউম্যান হিসেবে রেখে দেয়। মিসেস ম্যালকমেরও টাকাপয়সা বিশেষ ছিল না, দোকানও যা চলত, তাতে বেতন খুব একটা দিতে পারত না।
তাই নাকি? মিসেস ফিলটার জমি কেনার টাকা পেলেন কোথায় তাহলে? খোঁজখবর করতে হয়।
কিশোর! খবরদার! গলা ফাটিয়ে চিৎকার করল জিনা। মিসেস ফিলটারের ব্যাপারে নাক গলাবে না। খুব ভাল মহিলা। আমি পছন্দ করি।
এবং ম্যাকআরথারকে অপছন্দ করো, শান্ত কণ্ঠে বলল কিশোর, জানি। তাতে প্রমাণিত হয় না, হ্যারি ম্যাকআরথার চোর-ডাকাত, আর মিসেস ফিলটার সাধু-সন্ন্যাসী। সত্যি কথা কি জানো, মহিলাকে আমিও পছন্দ করি। কিন্তু একজন রহস্যভেদী হিসেবে আবেগকে প্রশ্রয় দিতে পারি না, দেয়া উচিতও নয়।
তাই নাকি। তীব্র ব্যঙ্গ ঝরল জিনার কণ্ঠে। খুব নীতিবান। নির্দোষ একজন ভদ্রমহিলাকে চোর ভাবতে তোমার লজ্জা হওয়া উচিত।

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল কিশোর, শব্দ করে নিঃশ্বাস ফেলল, বলল, দেখো, জিনা, মিসেস ফিলটার কি করেছেন না করেছেন, আমি জানি না। কিন্তু এটা তো জানি ডাকাতিটার সময় তিনি ফিনিক্সে বাস করতেন, এবং ঠিক তার মতই একজন মহিলা অংশ নিয়েছিল ডাকাতিতে। তারপর একটা লোক পড়ে মরল এমন একটা খনিতে, যেটা মিসেস ফিলটারের অতি-পরিচিত। যোগাযোগগুলো খুব বেশি মাত্রায় হয়ে যাচ্ছে না? সেজন্যেই খোঁজ নিতে চাইছি। শুরুতে গিয়ে খোঁজ নিয়ে আসতে চাই সেই দোকানটায়, টিড-বিটে। শুরুতেই জানা দরকার, টিড-বিটে সত্যি কাজ করতেন কিনা মহিলা।

ফোন করো না, দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল জিনা। তাহলেই সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। তোমারও মুখ বন্ধ হবে।

তাই করব, উঠে লিভিং রুমে রওনা হলো কিশোর, টেলিফোন করবে।

ডিরেকটরিতে নাম্বার পাওয়া গেল। ডায়াল করল কিশোর। ওপাশ থেকে সাড়া মিলতে নিজের কণ্ঠস্বর ভারি করে, বয়স্ক লোকের গলা নকল করে বলল, টিড-বিট? মিসেস ম্যালকমের সঙ্গে কথা বলতে পারি, প্লীজ?

দীর্ঘ নীরবতা।

মিসেস ম্যালকম? অবশেষে বলল কিশোর। লর্ডবুর্গের বিউটি পারলার থেকে বলছি, আমি হ্যারি কোলম্যান। একজন সেলস-উওম্যান চেয়েছিলাম, দরখাস্ত পেয়েছি, নাম মিসেস রোজ ফিলটার। অভিজ্ঞতার জায়গায় আপনার দোকানের রেফারেন্স দিয়েছে। পাঁচ বছর আগে টিড-বিট ছেড়েছিল, হ্যাঁ হ্যাঁ রিজাইন দিয়েছিল

চুপ হয়ে গেল কিশোর। মনযোগ দিয়ে শুনছে ওপাশের কথা।

পনেরো বছর পর? এক সময় বলল সে।

অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে অন্যেরা।

বলেছিলাম না? ফিসফিস করে বলল জিনা। মহিলা বাজে কথা বলেন না। জিনার দিকে ফিরেও তাকাল না কিশোর, শুনছে। তাই?...হ্যাঁ, বিশ্বাস করা শক্তহ্যাঁ হ্যাঁ। থ্যাংক ইউ মিসেস ম্যালকম, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।

রিসিভার নামিয়ে রাখল কিশোর।

কি বলল? মুসা আর ধৈর্য রাখতে পারছে না।

পনেরো বছর কাজ করেছেন ওখানে, মিসেস ফিলটার, জানাল কিশোর। পাঁচ বছর আগে বসন্ত কালে চলে এসেছেন। মিসেস ম্যালকম বললেন, এপ্রিল কি মে মাসে হবে। পরিষ্কার মনে করতে পারলেন না। তবে, রিজাইন দিয়ে আসেনি মিসেস ফিলটার।

তাড়িয়ে দিয়েছে, যেন কিছুই না ব্যাপারটা, এমনি ভাবে বলল জিনা। তাতে কি?

তাড়ায়ওনি। ওয়ান ফাইন মরনিং জাস্ট কাজে যাননি। এমন কি টেলিফোনও করেননি। দোকানের এক লোক খোঁজ নিতে গিয়ে দেখে, বাসা ছেড়ে চলে গেছেন মিসেস ফিলটার। কোথায় গেছেন, কেউ বলতে পারল না। কাউকে জানিয়ে যাননি।

শূন্য চোখে তাকাল জিনা।

সোফায় হেলান দিয়ে ছিল রবিন, সামনে ঝুঁকল। পাঁচ বছর আগের বসন্তেই ডাকাতিটা হয়েছিল। কিশোর, বোধহয় তোমার কথাই ঠিক। হয়তো মিসেস ফিলটারই সাদা গাড়ি ড্রাইভ করেছিলেন। কিন্তু টিড-বিট ছাড়া ও টুইন লেকসে আসার মাঝের সময়টা কাটিয়েছেন কোথায়?

সেটা তাকেই গিয়ে জিজ্ঞেস করে দেখি না কেন? প্রস্তাব দিল কিশোর।

গল্পের ছলে কথা আদায়? মুসা হাসল। তা মন্দ হয় না। টেকনিকটা ভালই তোমার। চলো।

তোমাদের মন এত ছোট! কেঁদে ফেলবে যেন জিনা।

কিছু মনে করো না, জিনা, নরম গলায় বলল মুসা। তুমি থাকো।

না, জ্বলে উঠল জিনা, আমিও যাব। তোমাদের মুখ থুবড়ে পড়া না দেখে ছাড়ব ডেবেছ?

কিন্তু মিসেস ফিলটারের পিকআপটা গাড়িবারান্দায় নেই। ডেকে, দরজায় ধাক্কা দিয়েও সাড়া মিলল না।

মনে হয় শহরে গেছেন, জিনা অনুমান করল। এসো, ঢুকি। একটা নোট রেখে যাব, যেন আমাদের বাড়িতে দুপুরের খাওয়া খান।

দরজা ভেজানো রয়েছে। সোজা রান্নাঘরে চলে এল জিনা। পেছনে এল ছেলেরা।

মিসেস ফিলটার? ডাকল জিনা।

সাড়া নেই।

কাগজ-কলমের জন্যে লিভিং রুমে চলে গেল সে। গোয়েন্দারা রান্নাঘরেই রইল। রান্নাঘরটা আগের দিনের মত এত গোছানো নয়, অপরিষ্কার। স্টোভের ওপর হাঁড়ি চড়ানো, খাবারের টুকরো লেগে আছে। সিংকে ময়লা বাসন-কোসন, কোন কারণে ধোয়া হয়ে ওঠেনিবোঝা যায়।

কিশোর, লিভিং রুম থেকে জিনার ডাক শোনা গেল, মিসেস ফিলটার কোথাও বেড়াতে যাবেন মনে হচ্ছে।

দরজায় উঁকি দিয়ে কিশোর জিজ্ঞেস করল, কি করে বুঝলে?

বেডরুমের খোলা দরজা দেখাল জিনা। ছোট একটা স্যুটকেস উপড় হয়ে পড়ে আছে বিছানায়, পাশে এলোমেলো কিছু কাপড় চোপড়।

খোলা দরজার কাছে চলে এল কিশোর। এক নজর দেখেই বলল, তিনি অলরেডি চলে গেছেন।
চলে গেছেন? কিশোরের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে মুসা।
হাত তুলে খোলা আলমারি দেখাল কিশোর। কাপড় কই? সব নিয়ে গেছেন। ড্রয়ারগুলো কিভাবে খুলে আছে, দেখেছ? খালি। তিনি গিয়েছেন, এবং খুব তড়িৎ-অন্তর্ধান।
মানে? জিনা ঠিক মেনে নিতে পারছে না কিশোরের টিটকারি।
দেখে কিছু বুঝতে পারছ না? গতকালও এ-ঘর দেখেছ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, ঝকঝকে তকতকে। এই ঘর তো ভালই, রান্নাঘরে গিয়ে ভালমত দেখো। নোংরা। এটো বাসনগুলো পর্যন্ত সিংকে ভেজানো রয়ে গেছে। কোন কারণে এক্সপ্রেস ট্রেনের গতিতে তিনি জেগেছেন।
কিডন্যাপ! হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল জিনা। তাকে ধরে নিয়ে গেছে! খাবার চুরি করেছিল যে, নিশ্চয় ওই ব্যাটা…
ঠিক তাই, মাথা দোলাল কিশোর। তা এজন্যেই বুঝি সব কিছু গুছিয়ে নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি করে লোকটার সঙ্গে কিডন্যাপ হয়েছেন? কেউ কিডন্যাপ করলে এভাবে স্যুটকেস গোছানোর সুযোগ দেয়?
বোধহয় বেড়াতেই গেছেন, মুসা বলল।
সন্দেহ আছে। বেড়াতে গেলে এভাবে নোংরা রেখে যেতেন না বাড়িঘর, এটা তার স্বভাববিরুদ্ধ। তাছাড়া গতকাল ঘুণাক্ষরেও জানাননি বেড়াতে যাবেন।
জরুরী কোন কারণে কোথাও যেতে পারেন, রবিন বলল। আমরা যাওয়ার পর হয়তো ফোন পেয়েছিলেন।
নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর, কুটি করল, হ্যাঁ, এটা হতে পারে। তবে আরও একটা কারণ হতে পারে। ফিনিক্স থেকে বেরোনো খবরের কাগজটা তুমি দেখে ফেলেছ।
কিন্তু কাগজে কি আছে তিনি জানেন না, প্রতিবাদ করল জিনা। তিনি বাড়ি কেনার আগে থেকেই ওগুলো ছিল ওখানে।
হয়তো ছিল, মেনে নেয়ার ভঙ্গি করল কিশোর। কিন্তু তিনি ডাকাতিতে জড়িত থাকলে আর রবিন হাতে নেয়ার পর কাগজটার হেডলাইন নজরে পড়ে থাকলে, জেনে গেছেন কি লেখা রয়েছে। বুঝে গেছেন, গোলমালে পড়তে যাচ্ছেন। কারণ, তুমি, জরজিনা পারকার, কথা বেশি বলতে গিয়ে বলে ফেলেছ মৃত লোকটার ব্যাপারে তদন্ত করছি আমরা। দুয়ে দুয়ে চার মেলাতে বেশি সময় যে লাগবে না আমাদের, এটা না বোঝার মত বোকা তিনি নন। এবং বোঝার পর তার কি করা উচিত?

পালানো, ফস করে বলে ফেলল মুসা।
মুখে কিছু আটকায় না তোমাদের। জিনার চোখে তিরষ্কার। এতই যদি আত্মবিশ্বাস, শেরিফকে ডাকছ না কেন?
ডেকে কি বলব? ভুরু নাচাল কিশোর। বলব, মিসেস ফিলটা চলে গেছেন? যে কোন স্বাধীন দেশে স্বাধীন ভাবে বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার অধিকার আছে যে কোন স্বাধীন নাগরিকের। ডাকাতির সঙ্গে তিনি জড়িত, এর কোন প্রমাণ নেই আমাদের কাছে সবই অনুমান।
ধুলোয় ঢাকা গাড়িবারান্দায় বেরিয়ে এল কিশোর। মাটির দিকে চোখ রেখে এগোল। এক জায়গায় থেমে বালিতে চাকার দাগ পরীক্ষা করল। পিকআপের চাকার দাগের ওপর অন্য চাকার দাগও পড়েছে। পিছিয়ে গিয়ে রাস্তায় উঠে ম্যাকআরবারের বাড়িমুখো এগিয়েছে।
অদ্ভুত, আঙুল দিয়ে ঠোঁটে টোকা দিল কিশোর। শহরের দিকে যাননি। অন্য দিকে গেছেন।
যদি দাগগুলো তার গাড়ির চাকার হয়ে থাকে, জিনা বলল।
তার গাড়িবারান্দায় যে দাগ দেখেছি, তার সঙ্গে মিল তো রয়েছে।
ধুলোয় ঢাকা পথে চাকার দাগ ধরে ধরে এগোল ওরা। ম্যাকআরবারের গৌ ছাড়িয়ে এল। তাদেরকে দেখেই লাফ দিয়ে বেড়ার কাছে চলে এসেছে বিশাল কুকুরটা, বড় বড় লাফ মারছে পেরোনোর জন্যে, চেচাচ্ছে গলা ফাটিয়ে। বেগ থাকায় কুকুরটাকে আর বাধেনি ম্যাকআরথার। কিন্তু তাকে আর তার মেকসিকান শ্রমিকদেরকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না।
ম্যাকআরবারের সীমানার পর শ-খানেক গজ দূরে মোড় নিয়েছে গাড়ি, অনেক আগে রাস্তা ছিল এখানে, ভাল করে না তাকালে বোঝাই যায় না এখন। একেবেঁকে তী কয়েকটা মোড় নিয়ে পাহাড়ের দিকে চলে গেছে পথটা।
কিন্তু কেন কেন তিনি পুরানো হ্যামবোনের পথে গেছেন? বলল জিনা।
হ্যামবোন? ফিরে তাকাল কিশোর।
ওই যে ওখানে, চূড়ার ওদিকে একটা সত্যি সত্যি ভূতুড়ে শহর আছে। ওটার নাম হ্যামবোন। আরেকটা খনি আছে ওখানে, ভেথ ট্র্যাপের মতই মৃত। ওখানে টুইন লেকসের মত স-মিলও নেই, তাই শহরটা পুরোপুরি মরে গেছে। কখনও যাইনি, রাস্তা নাকি খুব খারাপ। তবে ফোর-হুইল-ড্রাইভ জীপ বা ট্রাক হলে যাওয়া যায়।
মিসেস ফিলটারের গাড়িটা ফোর-হুইল-ড্রাইভ, কিশোর বলল। তিনি ওদিকেই গেছেন।
উত্তেজিত হয়ে পড়েছে মুসা। তাহলে আমরা যাচ্ছি না কেন? চিহ্ন ধরে ধরে তাকে অনুসরণ করতে পারি। জিনা তোমার চাচার একটা ফোর-হুইল-ড্রাইভ ট্রাক

আছে, আর…
আর আমি সেটা চালাতেও পারি, মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল জিনা। তবে সেটা ব্যাঙ্ক এলাকার মধ্যে, সমতল জায়গায়। এখানে আমি তো দূরের কথা, আমার ওস্তাদ… হঠাৎ উজ্জল হলো তার চেহারা। ঘোড় নিতে পারি আমরা। মিসেস ফিলটারের কি অবস্থা কে জানে। গাড়ি খারাপ হয়ে গিয়ে থাকলে ভীষণ বিপদে পড়বেন। আমরা তাকে সাহায্য করতে পারব। ডিকিখালা এখন দয়া করে যদি কিছু খাবার গুছিয়ে দেয়, আর চাচাকেবোঝায়
…তাহলে সত্যিকারের একটা ভূতুড়ে শহরে দেখতে পাব আমরা, রবিনও উত্তেজিত।
ডিকিখালাকেবোঝানোর দায়িত্ব তোমার, জিনা, হেসে বলল মুসা। তুমি এক মিনিটে যতগুলো মিছে কথা বলতে পারবে, আমরা তিনজনে মিলে এক বছরেও তা পারব না।
খাবার গুছিয়ে দিতে কার্পণ্য করল না ভিকি। স্যাডল ব্যাগে সেগুলো ঠেসে ভরে নিতে হলো অভিযাত্রীদের।
খাবার গরম করার সময় খুব সাবধান, হুঁশিয়ার করে দিল ভিকি। পুরো পূর্বতটা জ্বালিয়ে এসো না আবার, বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে বিদায় জানাল সে।
জিনা চড়েছে তার প্রিয় অ্যাপলুসায়। কিশোরেরটা মোটাসোটা মাদী ঘোড়া। মুসারটা হাড় জিরজিরে। হেসেই বাঁচে না জিনা, ঠাট্টা করে বলেছে, দেখো, তোমার যা ওজন, বেচারার মেরুদণ্ড না বাঁকিয়ে দাও। রবিনেরটা আংকেল উইলসনের তৃতীয় এবং সর্বশেষ, বেশ তেজী একটা ঘোড়া, ধূসর রঙের চামড়ায় সাদা ফুটকি।
মাঝারি কদমে ম্যাকআরথারের গেট পেরোল ওরা। ওদের দেখে যেন পাগল হয়ে গেল কুকুরটা, তার চিৎকারে ফিরে না চেয়ে পারল না দুই মেকসিকান শ্রমিক। ওরা এখন কেবিন রঙ করায় ব্যস্ত।
পাহাড়ী পথ ধরে আগে আগে চলেছে জিনা। তার কাছাকাছি রয়েছে কিশোর, কমেটের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হিমশিম খাচ্ছে হোঁতকা মাদীটা। তাছাড়া তাল রাখার দিকে থোরাই নজর ঘোড়াটার, তার খেয়াল পথের দুপাশে কোথায় তাজা। ঘাস আছে। দেখলেই সেদিকে এগোনোর চেষ্টা। সামলাতে সামলাতে ইতিমধ্যেই ঘেমে উঠেছে কিশোর। এক সময় হাল ছেড়ে দিল। মনের ভাব : যা খুশি করগে মুটকির বেটি মুটকি।
বাধ্য হয়ে সাহায্যের হাত বাড়াতে হলো জিনাকে। কমেটকে ঘুরিয়ে এনে মাদীটার পাশাপাশি হলো, কিশোরের হাত থেকে রাশ নিয়ে জোরে টান দিয়ে দেখিয়ে দিল অবাধ্য ঘোড়াকে কি করে বাগ মানাতে হয়।

জোরে রাশ টেনে ধরে ঘোড়ার মাথা ওপরের দিকে তুলে রাখল কিশোর। কিন্তু কতক্ষণ আর এভাবে জোর জবরদস্তি করা যায়, কয়েক মিনিট পরই ঢিল দিয়ে দিল। আবার সেই একই কাণ্ড, হাঁটার চেয়ে ঘাস খাওয়ার দিকে মনযোগ বাড়াল ঘোড়া।

এভাবে গেলে তো সারা দিন লাগবে, বিরক্ত হয়ে বলল জিনা।

ঘোড়র পেটে জোরে লাথি লাগাল কিশোর, এই মুটকি, হাট।

বড় জোর দশ কদম ঠিকমত এগোল ঘোড়া, তারপর আবার এক পা বাড়ে তো দুপা পাশে সরে। একটা বাংলা কবিতা মনে পড়ে গেল কিশোরের, বিড়বিড় করল?

এক যে ছিল সাহেব তাহার
গুণের মধ্যে নাকের বাহার
তার যে গাধা বাহন সেটা
যেমন পেটুক তেমনি চেঁটা
ডাইনে বললে যায় সে বামে
তিন পা যেতে দুবার থামে…
ব্যাপার দেখে এমনি তরো
সাহেব বললেন সবুর করো
মূলোর কুঁটো ঝুলিয়ে নাকে…

এ পর্যন্ত বলেই আপনমনে হাসল কিশোর, বলল, দাঁড়াও, তোমার ব্যবস্থাও করছি, বলেই নেমে পড়ল ঘোড়া থেকে। রাশটা জিনার হাতে ধরিয়ে দিয়ে রাস্তার পাশ থেকে একটা লাঠি কুড়িয়ে নিল। খুব তাজা আর সবুজ দেখে এক আঁটি ঘাস তুলে নিয়ে বাঁধল লাঠির মাথায়। তারপর আবার ঘোড়ায় চেপে লাঠিটা ধরল ওটার নাকের সামনে, এমনভাবে, যাতে কোনমতেই নাগাল না পায় ঘোড়া।

ব্যস, কাজ হয়ে গেল। ঘাস ধরার জন্যে মাথা উঁচু করে ছুটল ঘোড়া, যতই ছোটে ততই আগে বাড়ে ঘাস, নাগাল আর মেলে না। হাসতে হাসতে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হলো মুসার। জিনা আর রবিনও হাসছে। হাসতে হাসতে রবিন বলল, জিনা, তোমার রাশ টানার চেয়ে কিশোরের ঘাস টানার বুদ্ধি অনেক মোক্ষম হা-হা-হা!

টায়ারের দাগ ধরে এগিয়ে চলেছে ওরা। দু-ধারে পাইনবন, তার ওপাশে পর্বতের ঢালে কি আছে দেখা যায় না। বেলা একটার দিকে নয় চূড়ায় পৌঁছলো ওরা, দ্রুত নেমে চলল হ্যামবোনের ধুলোয় ঢাকা প্রধান সড়ক ধরে। চারপাশে খটখটে শুকনো কাঠের বাড়িঘর, ভাঙাচোরা জানালা, রঙচটা সানশেড়। সাইনবোর্ডগুলো পড়া যায় না। পথের ওপর পড়ে আছে বিছানা আর সোফায় মরচে ধরা স্প্রিং,

ভাঙা আসবাবপত্র, কাচের টুকরো, ছড়িয়ে আছে বাড়ির সামনে, আনাচে-কানাচে।
একটা বাড়ির সামনে এসে ঘোড়া থেকে নামল জিনা। এককালে ওটা হ্যামবোনের জেনারেল স্টোর ছিল। বারান্দার রেলিঙের সঙ্গে ঘোড়াটাকে বাঁধল সে।
ছেলেরাও নামল। অনেকক্ষণ ঘোড়ার পিঠে বসে থেকে শক্ত হয়ে গেছে যেন শরীর। যার যার ঘোড়া বেঁধে, হাত-পা ঝাড়া দিল।
বাবারে, কি নির্জন, চার দিকে তাকাতে তাকাতে বলল মুসা, আশঙ্কা করছে যেন এখুনি একটা ভূত বেরিয়ে আসবে।
লোক থাকে না বলেই তো ভূতুড়ে শহর বলে, জিনা বলল। রাস্তার মাথায় বড় একটা ছাউনির দিকে হাত তুলল। বেড়া আর ছাত করোগেটেড টিনের, জায়গায় জায়গায় মস্ত কালো ফোকর। শ্রমিকরা নিশ্চয় কাজ করত ওখানে।
মস্ত ছাউনিটার দিকে এগোল ওরা।
দেখেশুনে চলবে, হুঁশিয়ার করল জিনা। ওই যে, টিনের টুকরো কাঠের টুকরো পড়ে আছে, ওগুলোর কাছে যাবে না, কোন জিনিস তোলার চেষ্টা করবে না। রোদ থেকে বাচার জন্যে র্যাটল স্নেক লুকিয়ে থাকে ওসবের নিচে। ভয় পেলে
জানি কি করে, বলল মুসা। ভেব না। জঞ্জালের ভেতর কিছু খুঁজতে যাচ্ছি না আমরা।
ছাউনির কাছে এসে দাঁড়াল ওরা। অনেক আগেই খসে পড়ে গেছে দরজার পাল্লা। উঁকি দিয়ে ভেতরের বিষণ্নতা দেখল সবাই।
হুঁ, কাঠের মেঝে, রবিন বলল। আমাদের ভার সইতে পারবে?
সওয়াতে যাচ্ছে কে, কিশোর বলল। ভেতরে ঢুকছি না আমরা। ট্রাক নেই ওখানে। শুধু ভূতুড়ে শহর দেখতে আসিনি আমরা। রাস্তায় সরে এসে টায়ারের দাগ পরীক্ষা করল। দাগ ধরে ধরে গিয়ে থামল ছাউনির এক কোণে। উঁকি দিয়ে একবার তাকিয়েই বলে উঠল, ওই তো।
কি? ছুটে এল জিনা।
মুসা আর রবিনও এল।
পিকআপটা দাঁড়িয়ে রয়েছে।
মিসেস ফিলটার! চেঁচিয়ে ডাকল জিনা। ছুটে গেল গাড়ির দিকে, মিসেস ফিলটার! আপনি কোথায়?
গাড়ির কাছে প্রায় পৌঁছে গেছে জিনা, এই সময় শোনা গেল একটা বিচ্ছিরি টি-রু-র শব্দ।
জিনা! খবরদার! চেঁচিয়ে উঠল কিশোর।

লাফিয়ে পেছনে সরার চেষ্টা করল জিনা, কিন্তু তাড়াহুড়োয় পিছলে গেল পা। ধড়াস করে চিত হয়ে পড়ল বালিতে। ট্রাকের নিচ থেকে উড়ে এল যেন একটা মোটা দড়ি, ছোবল হানল এক মুহূর্ত আগে জিনার পা যেখানে ছিল ঠিক সেখানে। কুৎসিত একটা চ্যাপটা মাথা, হাঁ করা চওড়া চোয়ালে ভয়ঙ্কর দুটো বিষদাত।
পাথর হয়ে গেছে যেন জিনা।
পুরো এক সেকেণ্ড লম্বা হয়ে পড়ে রইল সাপটা, তারপর লেজের টি শব্দ তুলে গুটিয়ে নিতে লাগলু শরীর।
নড়ে না, জিনা, ফিসফিস করল মুসা। একটা পাথর তুলে নিয়ে নিশানা করে ছুঁড়ে মারল জোরে।
বাহ, এক্কেবারে বুলস-আই, হাততালি দিল রবিন। মাথা খতম। বড় বাঁচা বাচা গেছে জিনা।
কোনমতে উঠে দাঁড়াল জিনা, দুর্বল রোগীর মত রক্তশূন্য চেহারা। কাঁপা গলায় মুসার দিকে চেয়ে শুধু বলল, থ্যাংক।
মরে গেছে সাপটা, কিন্তু এখনও শরীর মোচড়াচ্ছে, পাক খাচ্ছে। ধীরে ধীরে থেমে এল নড়াচড়া।
ট্রাকের পাশে হাঁটু মুড়ে বসে নিচু হয়ে তলায় উঁকি দিল মুসা। আর না থাকলেই বাঁচি।
সাপটার পাশ ঘুরে ট্রাকের একেবারে কাছে চলে এল ওরা। কেবিনের ভেতরে উঁকি দিল। মিসেস ফিলটার নেই। খালি। সামনে-পেছনে কোথাও মালপত্র নেই। ইগনিশনের চাবিটাও নেই।
এখানে এভাবে গাড়িটা ফেলে গেল, কানের পেছনে চুলকাল রবিন। কিছু বুঝতে পারছি না।
আমিও না, জিনা বলল, কোথায় যেতে পারে? মালপত্রই বা কোথায়?
কোথাও লুকিয়ে নেই তো? এদিক ওদিক তাকাল মুসা। শহরটা খুজে দেখল ওরা। জানালা-দরজায় দাঁড়িয়ে উঁকি দিয়ে দেখল ঘরের ভেতরে। কিন্তু ভাঙা আসবাব আর ময়লা জঞ্জাল ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ল না। এখানে ওখানে বালিতে পায়ের ছাপ আছে।
মিসেস ফিলটার নেই।
লোক যাতায়াত আছে, চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। আবার পিকআপের কাছে এল ওরা। ওদের পায়ের ছাপ ছাড়াও ছাপ আছে। ওগুলো অনুসরণ করে এগোল কিশোর। বিশ গজ দূরে আরেক সেট টায়ারের দাগ দেখা গেল।
জীপ কিংবা ট্রাক নিয়ে আরও কেউ এসেছিল, মুসা বলল।

দাগ ধরে এগোল ওরা। শহরের এক কিনারে চলে এল। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে গেছে আরেকটা সরু পথ, ওরা যেটা দিয়ে এসেছিল তার উল্টোদিকে, এই পথটা মোটামুটি ভাল অবস্থায়ই রয়েছে।
চুপ করে কিছু দেখছে কিশোর। বলল, কারও সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন কিনা কে জানে। টুইন লেকস থেকে এসেছেন নিজের গাড়ি নিয়ে। আগেই ঠিক করা ছিল অন্য কেউ এখানে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করবে। নিজের গাড়িটা এখানে ফেলে মালপত্র নিয়ে অন্য গাড়িতে করে চলে গেছেন মিসেস ফিলটার। জিনা, এ-পথটা কোথায় গেছে?
শিওর না, মাথা নাড়ল জিনা। শুনেছি, ওদিকে মরুভূমি।
নিচে গাছের মাথায় ধুলোর ঝড় দেখা গেল, ঢালের দিক থেকে ভেসে এল এঞ্জিনের শব্দ, লো-গীয়ারে চলছে গাড়ি, ফলে গোঁ গোঁ বেশি করছে।
ফিরে আসছে বোধহয়, ভুরু কুঁচকে পথের মোড়ের দিকে চেয়ে আছে মুসা।
কিন্তু মিসেস ফিলটার ফেরেনি। একটা জীপ। আলগা নুড়িতে ঠিকমত কামড় বসাতে পারছে না চাকা, এবড়োখেবড়ো পথের ঝুঁকুনি আর খাড়াই গাড়ির গতি একেবারে কমিয়ে দিয়েছে। ড্রাইভিং সিটে বসে আছে একজন বয়স্ক লোক, মাথায় ছড়ানোকানাওয়ালা খড়ের তৈরি হ্যাট। পাশে বসা এক মহিলা, পরনে ছাপার সুতি পোশাক।
হাই! পাশে এসে গাড়ি থামাল লোকটা। হাসল।
হাই, হাত তুলে জবাব দিল মুসা।
তোমরাই শুধু?
মাথা নোয়াল মুসা।
বোতল শিকারে এসেছ নিশ্চয়?
বোতল শিকার? জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল রবিন।
আমরা সেজন্যেই এসেছি, মহিলা বলল। সেই ক্যাসা ভারডে থেকে। এসব পুরানো জায়গায় মাঝেসাঝেই পুরানো আমলের চমৎকার সব বোতল পাওয়া যায়। তবে খোঁজার সময় সতর্ক থাকতে হয়। হাত দেয়া উচিত না। লাঠি দিয়ে সরিয়ে নেয়াটাই ভাল। নইলে সাপের যা আজ্ঞা এসব পোছড়া জায়গায়।
জানি, বলল কিশোর। আচ্ছা, আরও নোক আসে নাকি এখানে?
হয়তো আসে, জবাব দিল লোকটা। রাস্তা খুব খারাপ নয় সেটা একটা কারণ। আর বোতল না পাওয়া গেলেও, অন্যান্য জিনিস পাওয়া যায়। গত হপ্তায় অন্য একটা গোস্ট টাউনে গিয়েছিলাম। পুরানো আমলের একটা কেরোসিনের ল্যাম্প পেয়েছি, প্রায় নতুন।
জীপটা চালিয়ে নিয়ে জেনারেল স্টোরের সামনে রাখল সে।

টায়ারের দাগের ব্যাপারে আর শিওর হওয়া যাচ্ছে না, হাত নাড়ল রবিন। যে দাগ ধরে এলাম এখানে, সেটা কোন অ্যানটিক শিকারিরও হতে পারে।
হুঁ, ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। মিসেস ফিলটারকে খুঁজে বের করার আর কোন উপায় দেখছি না।
খাবার গরম করে খেয়ে আবার ঘোড়ায় চড়ল ওরা। গতি ধীর। রাস্তা খুব খারাপ, পিছলে পড়ে হাড়গোড় ভাঙার ইচ্ছে নেই কারও। কাছাকাছি রয়েছে ওরা। প্রাণের ভয় সবারই আছে, জানোয়ারগুলোও তাই খুব সর্তক, কিশোরের হোতকাটাও আর ঘাসের লোভ করছে না এখন।
বিশ্বাস হচ্ছে না, এক সময় বলল কিশোর। মিসেস ফিলটারের মত মহিলা আতঙ্কিত হয়ে পালাবেন...।
সব তোমার অনুমান, জিনা বলল। তার আসলে কি হয়েছে কে জানে।
একটা ব্যাপারই হয়েছে, জোর দিয়ে বলল কিশোর, যেই বুঝতে পেরেছেন তাকে সন্দেহ করা হচ্ছে, অমনি পোটলা বেঁধে পালিয়েছেন। এমনও হতে পারে, টুইন লেকসে তার কোন সঙ্গী ঘোরাঘুরি করছিল কদিন ধরে। ভুলে যাচ্ছ কেন, ছুরিটা এখনও পাওয়া যায়নি।
মুসার মুখ উজ্জ্বল হলো। হ্যাঁ, তাই তো। ওই ব্যাটাই চুরি করেছে। মিসেস ফিলটারই হয়তো সে-রাতে চোরটাকে নিজের বাড়িতে লুকিয়ে রেখেছিলেন।
খাবার চুরির রহস্যটাই বা কি? রবিন বলল। আর সিগারেটের গোড়া?
কি? জিজ্ঞেস করল জিনা।
হতে পারে চোরটা তখনও মিসেস ফিলটারের ঘরেই ছিল, আমরা যেদিন তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। খিদে পেয়েছিল, তাই আমরা ঘর থেকে বেরোতেই খেয়ে নিয়েছে সে। মনে করে দেখো, খাবার নেই এ-ব্যাপারটা প্রথমে মিসেস ফিলটারের চোখে পড়েনি, কিশোর বলার পর
চমৎকার যুক্তি, রবিন, বলল কিশোর। ঠিক পথেই ভাবছ।
তোমাদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে! রেগে গেল জিনা।
উত্তেজিত হয়ো না জিনা, কিশোর বলল। সবই আমাদের অনুমা। অনেকগুলো উদ্ভট ব্যাপার ঘটছে তো। পাঁচ বছরের পুরানো একটা লাশ পেলাম খনিতে, পাঁচ বছর আগের এক ডাকাতির সঙ্গে জড়িত ছিল লোকটা। সন্দেহভাজন বিধবা মহিলা রহস্যজনক ভাবে নিখোঁজ হয়ে গেলেন। গাছ কাটার একটা ছুরি চুরি গেল, ডাকাতদের সঙ্গে এটারও কোন সম্পর্ক থাকতে পারে। একটা বাতিল রূপার খনির মুখ খুলে খনি-খনি খেলা শুরু করেছে এক আধপাগলা কোটিপতি। কুড়িয়ে পেলাম একটা সোনা মেশানো নুড়ি। অথচ, মিসেস ফিলটারের কথামত এক আউন্স সোনা থাকার কথা নয় খনিতে।

হয়তো মিছে কথা বলেছেন, মুসা বলল।
কেন বলবেন? ম্যাকআরবারের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক আছে বলে তো মনে হলো না।
যদি টাকাগুলো খনিতে লুকানো থাকে? মিসেস ফিলটারের সে কথা জানা থাকলে, ম্যাকআরবারের মতই চাইবেন খনিতে কেউ না ঢুকুক।
এরপর বাকি পথটা প্রায় নীরবে পেরোল ওরা, বিশেষ কোন কথা হলো না। শেষ বিকেলে এসে নামল উপত্যকায়। ম্যাকআরবারের লাল ট্রাকটা নেই। কেবিনের কাছে পড়ে রয়েছে রঙের বালতি, কিন্তু মেকসিকান শ্রমিকেরা অদৃশ্য। বিকেলের সোনালি রোদে লম্বা হয়ে শুয়ে ঘুমে অচেতন বিশাল কুকুরটা।
স্তব্ধ নীরবতার মাঝে শুধু ঘোড়ার খুরের খটাখট শব্দ, বেশি হয়ে কানে বাজছে। বেড়ার কিনার দিয়ে এল ওরা। কিন্তু কুকুরটার খবরই নেই যেন, ঘুমাচ্ছে।
অদ্ভুত তো, কিশোর বলল। এতক্ষণ তত বেড়া ভাঙার চেষ্টা করার কথা।
র‍্যাঞ্চে ফিরে ঘোড়াগুলো খেয়াড়ে ঢুকিয়ে রাখল ওরা। বাড়ির সদর দরজা খোলা। রান্নাঘরের টেবিলে একটা নোট পাওয়া গেল, মিস্টার উইলসন লিখে রেখে গেছেন?
ভিকির বোন জরুরী
খবর দিয়েছে। তাকে
নিয়ে সিলভার
সিটিতে গেলাম।
ফিরতে রাত হবে।
ঠাণ্ডা খাবার দিয়েই
কোনমতে আজ
ডিনার সেরে নিও।
-লাভ, আঙ্কেল
উইলসন।
দারুণ! উজ্জ্বল হয়ে উঠল কিশোরের মুখ।
আমার কাছে তো দারুণ লাগছে না, জিনা বলল তোমার হয়েছে কি, কিশোর, ডিকিখালার বোনের শরীর খারাপও তো হতে পারে?
না হলেই খুশি হব, অন্তর থেকেই বলল কিশোর।
খুশি হয়েছি কেউ নেই দেখে। মিসেস ফিলটার নেই, ম্যাকআরের ট্রাকটা নেই—তারমানে সে-ও নেই, তার শ্রমিকেরা নেই। আঙ্কেল উইলসন আর ভিকিখালাও নেই। দারুণ বলব না? খনিতে ঢোকার এর চেয়ে মোক্ষম সুযোগ আর পাব?

পকেট থেকে নুড়িটা বের করে শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে খপ করে ধরল আবার সে, সঙ্গীদের দিকে তাকাল। চলো, এখুনি। এমন সুযোগ আর পাব না। দেখি গিয়ে কি মেলে খনিতে।
কুত্তাটা? মনে করিয়ে দিল মুসা। কেউ না থাকলেও ওটা তো আছে।
ব্যবস্থা করছি, ফ্রিজের কাছে প্রায় উড়ে গিয়ে পড়ল জিনা। ভেড়ার আস্ত এক রান বের করে নিয়ে বলল, বাঘা কুত্তার ওষুধ। অনেকক্ষণ ব্যস্ত থাকবে।
কয়েক মিনিট পর ম্যাকআরথারের বেড়ার ধারে এসে দাঁড়াল ওরা। কুকুরটা এখনও ঘুমাচ্ছে।
সেৎসি মাছি কামড়েছে নাকি ব্যাটাকে? মুসা বলল।
সেৎসির কামড়ে কুকুরের কিছু হয় না, জানাল রবিন। শুধু মানুষ আর গাধার ওপর কাজ করে ওদের বিষ।
খাইছে! গাধা আর মানুষ তাহলে এক টাইপের প্রাণী? ইজ্জত গেল। হেই কুত্তা, হেই বাঘা। ওঠ, ওঠ।
এই যে তোর খাবার নিয়ে এসেছি, ভেড়ার ঠ্যাঙটা নাড়ল জিনা।
কিন্তু নড়লও না বাবা।
আবার ডাকল মুসা। কিন্তু সাড়া নেই। অশেষে বেড়া ডিঙাল সে, ওপরে চড়ে লাফিয়ে নামল অন্য পাশে, ম্যাকআরবারের সীমানা ভেতরে।
সাবধান, হুঁশিয়ার করল রবিন, জেগে উঠে কামড়ে দিতে পারে।
জিনা, দেখি রানটা দাও তো, বলল মুসা। ওপর দিয়ে ছুঁড়ে দাও। কুত্তা মিয়া কখন আবার লাফিয়ে ওঠে।
রানটা লুফে নিয়ে কুকুরটার দিকে ফিরল মুসা। মরে গেল নাকি?
মুসার মতই বেড়া ডিঙাল তিনজনে। রানটা নিয়ে নিল আবার জিনা। এক সঙ্গে চারজনে এগোল কুকুরটার দিকে।
এই তো ছেলে, লক্ষ্মী ছেলে, রাগে না, কোমল গলায় বলতে বলতে হাঁটু মুড়ে বলল জিনা। কুকুরটার দিকে হাত বাড়াল।
হুঁশিয়ার! বাঘা কুত্তা কিন্তু, ফিসফিস করে বলল কিশোর।
কিন্তু বাঘা কুত্তার ঘুম ভাঙল না। জিনা গায়ে হাত বোলালে মৃদু লেজ নেড়ে শুধু গোঁ গোঁ করল ঘুমের মধ্যেই।
কুকুরের এত ঘুম? এদিক ওদিক তাকাল সে। বেড়ার কাছে একটা টিন দেখে এগিয়ে গেল। যা সন্দেহ করেছিল। খানিকটা মাংস অবশিষ্ট রয়েছে এখনও। ওখান থেকেই ঘোষণা করল, ঘুমের ওষুধ খাইয়েছে।
কে খাওয়াল, দেখার জন্যেই যেন চারদিকে তাকাল অন্য তিনজন। কিন্তু কাউকে চোখে পড়ল না।

মেকসিকানগুলো গেল কোথায়? নিচু কণ্ঠে বলল রবিন।
এই, শুনছেন? চেঁচিয়ে ডাকল মুসা। কেউ আছেন? প্রতিধ্বনি তুলে তার ডাকের সাড়া দিল শুধু পাহাড়।
বোঝা গেছে, কেউ নেই, উঠে দাঁড়াল জিনা। প্যান্টের পেছনের পকেট থেকে টর্চটা টেনে বের করে বলল, চলো, কেউ চলে আসার আগেই ঢুকে পড়ি।
খনিমুখের দিকে এগোল সে। অন্ধকার একটা কালো গহ্বর, ভেতরের কিছুই চোখে পড়ছে না। সূর্য ডোবেনি, তবে পাহাড়ের ওপারে অদৃশ্য হয়েছে। অন্ধকার নামছে তাই উপত্যকায়।
ভেতরে ঢুকল ওরা।
আলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখল জিনা। কি করেছে ব্যাটারা? বোমা মেরেছে কোন জায়গায়?
আসিনি এখনও সেজায়গায়, কিশোর বলল। আরও ভেতরে ঢুকতে হবে। চাপা আওয়াজ হয়েছে, তারমানে অনেক গভীর থেকে বেরিয়েছে। চলো, যে জায়গায় নুড়িটা পেয়েছি সেখানে।
জিনার হাত থেকে টর্চটা নিয়ে আগে আগে চলল কিশোর। আগের বারের মত পরিষ্কার নয় আর এখন পথ, আলগা নুড়ি আর পাথরে বিছিয়ে আছে, জায়গায় জায়গায় ছোট ছোট খুপ। পঞ্চাশ ফুট মত এগিয়ে পাওয়া গেল ফোকরটা, এখানেই বোমা মারা হয়েছে। ভেতরে কি যেন চকচক করছে।
দেখো দেখো, চেঁচিয়ে উঠল মুসা, সোনা!
ফোকরে ঢুকল কিশোর। টর্চের আলোয় ঝকঝক করছে হলদে ধাতু। আঙুল দিয়ে খুঁচিয়ে টুকরোটা বের করে নিয়ে এল সে। আশ্চর্য!
মিসেস ফিলটার ভুল বলেছেন, জিনা বলল। খনিটাতে স্বর্ণ আছে।
হঠাৎ স্থির হয়ে গেল চারজনেই।
খনির বাইরে শব্দ। গুলি করেছে কেউ, কিংবা গাড়ির এঞ্জিনের মিসফায়ার।
কে যেন আসছে, ফিসফিস করল মুসা।
চলো ভাগি, জরুরী কণ্ঠে বলল জিনা। আবার ধরা পড়তে চাই না।
সোনার টুকরোটা পকেটে রেখে তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে এল কিশোর, অন্যেরাও বেরোল ফোকর থেকে। মোড় নিয়ে গলি থেকে বেরিয়ে প্রধান সুড়ঙ্গে ঢুকতেই অতি আবছা আলো চোখে পড়ল, খনিমুখ দিয়ে আসছে সঁঝের ফেকাসে সবুজ আলো। টর্চ নিভিয়ে দিল কিশোর। পায়ে পায়ে এগোল মুখের দিকে।
কুকুরটা তেমনি শুয়ে আছে, আবছা অন্ধকারে অস্পষ্ট ভাবে দেখা যাচ্ছে। বেড়ার বাইরে টায়ারের শব্দ তুলে থামল একটা গাড়ি। দুজন লোক বেয়োল গাড়ি থেকে।
হ্যারি, বলল একজন, পাথর দিয়ে বাড়ি মারো।

দরকার কি? খসখসে কণ্ঠস্বর দ্বিতীয় জনের। গুলি করলেই তো হয়।
তোমার যা কথা না। গুলির শব্দ শুনে ফেলুক কেউ, আর মোটকা শেরিফটাকে খবর দিয়ে দিক। নাও, পাথর নাও। দূর থেকেও তার নিঃশ্বাসের ফোঁস ফোঁস শব্দ শুনতে পাচ্ছে ছেলেরা।
কিশোর! ফিসফিসিয়ে বলল মুসা। এই ব্যাটাই! ও-ই ঢুকেছিল সেদিন গোলাঘরে। আমাকে কোপ মারার আগে ওরকম করেই শাস ফেলেছিল।
খনির অন্ধকারে পিছিয়ে এল আবার চারজনে।
কি করি এখন? জিনা বলল। দৌড় দিয়ে পেরোতে পারব না, ধরে ফেলবে। ভাসাব দেখে মোটেই ভাল লোক মনে হচ্ছে না।
পাথর দিয়ে বাড়ি মারার ঠনঠন শব্দ কানে এল। খানিক পরই ভেঙে পড়ল গেটের তালা।
এখনও থাকলে, ওই ঘরেই আছে, হ্যারির খসখসে কণ্ঠ। বিংগো, কি মনে হয় তোমার?
না-ও থাকতে পারে, জবাব দিল ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাস। উঠান পেরোচ্ছে ওরা। যথেষ্ট সময় পেয়েছে, সহজেই অন্য কোথাও লুকিয়ে ফেলতে পারে।
ঘরে না পেলে খনিতে খুঁজব।
সেখানে না পাওয়া গেলে চুপ করে গিয়ে লুকিয়ে বসে থাকব। সাহেব এলেই ধরব গলা টিপে।
রসিকতায় হাসন দুজনেই। দরজা খোলার শব্দ হলো। কেবিনে ঢুকছে।
আমাদের দেখে ফেলবে এখানে এনে, চি চি করে উঠল জিনার কণ্ঠ। কোনমতে পালানো দরকার। র‍্যাঞ্চে গিয়ে শেরিফকে ফোন করব।
পাগল নাকি? আঁতকে উঠল মুসা। ওদের সামনে দিয়ে? বন্দুক আছে।
হামাগুরি দিয়ে খনিমুখের কাছে গিয়ে সাবধানে বাইরে উঁকি দিল কিশোর। ছাউনিটার কাছে এক বালতি তরল পদার্থ পড়ে আছে। আরেকটু এগিয়ে তরলের গন্ধ শুকল সে, ছুঁয়ে দেখল ছাউনির খটখটে শুকনো কাঠের পাল্লা।
খনিতে ফিরে এল কিশোর। রঙ গোলানোর তেল, মেকসিকানরা ফেলে গেছে, বলল সে। ছাউনিতে আগুন ধরিয়ে দিলে শহরের কারও না কারও চোখে পড়বে। ফায়ার ব্রিগেডকে খবর দেবে। মুসা, দেশলাই আছে না তোমার কাছে? হ্যামবোনে খাবার গরম করেছিলে যে?
দেশলাই বের করে দিল মুসা।
ছাউনিতে গিয়ে পালা আর বেড়ার কাঠ তেল দিয়ে ভেজাল যতখানি পারল। কাঠি জ্বেলে তাতে দিল লাগিয়ে। দপ করে জ্বলে উঠল আগুন, চোখের পলকে ছড়িয়ে গেল। সময় মত সরে এল সে।

চমৎকার! হাসিমুখে কাল মুসা। কাজ না হয়েই যায় না।
কি মনে পড়তে আচমকা চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। জলদি জলদি ঢোকো! ধাক্কা দিয়ে জিনাকে সরিয়ে দিল সে আরও ভেতরে, মুসা আর রবিনের হাত ধরে টান দিয়ে নিজে ডাইভ দিয়ে পড়ল মেঝেতে। বিচিত্র ভঙ্গিতে অনেকটা ব্যাঙের মত লাফিয়ে সরে গেল যতটা পারল।
কি ব্যাপার বলতে গিয়ে বাধা পেল মুসা।
ডিনামাইট, বলেই আরও ভেতরে সরে গেল কিশোর। নিশ্চয় ছাউনিতে রেখেছে ম্যাকআরথার।
তার কথার প্রমাণ দিতেই যেন প্রচণ্ড বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল ধরণী।
একের পর এক বোমা ফাটতে লাগল, বাজ পড়ার মত প্রচণ্ড শব্দে কানে তালা লেগে যাবার জোগাড়।
এক সময় থামল সেটা। পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনির রেশ মিলাতে আরও কয়েক সেকেন্ড লাগল।
হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে কোনমতে খনি থেকে বেরিয়ে এল ছেলেরা। খনিমুখের চারপাশে পোড়া কাঠ আর জ্বলন্ত অন্যান্য জিনিস।
শুধু আগুন চেয়েছিলাম… উত্তেজনায় কথা রুদ্ধ হয়ে গেল মুসার।
এরপর সাংঘাতিক দ্রুত ঘটতে শুরু করল ঘটনা। বিল্ডিঙের দরজা খুলে বেরিয়ে এল দুই মেকসিকান শ্রমিক। বেড়া ডিঙিয়ে ছুটে হারিয়ে গেল খনিমুখের ওপরে পাথরের স্তুপের আড়ালে। কেবিন থেকে লাফিয়ে বেরোল হ্যারি আর বিগো। ঠিক এই সময় গেট দিয়ে ঢুকতে শুরু করল ম্যাকআরবারের লাল ট্রাক।
মিস্টার ম্যাকআরথার, চেঁচিয়ে উঠে দৌড়ে গেল মুসা। সাবধান! ব্যাটাদের কাছে বন্দুক আছে।
ঝট করে ঘুরে তাকাল হ্যারি।
এক ঝটকায় দরজা খুলে গাড়ি থেকে লাফিয়ে নামল ম্যাকআরথার, হাতে শটগান। থামো ওখানে! আর এক পা বাড়ালে
কিন্তু থামল না হ্যারি। ম্যাকআরথার বন্দুক সোজা করার আগেই মুসার কাধ খামচে ধরে হ্যাঁচকা টানে ঘুরিয়ে ফেলল, তার পেছনে চলে এল। গুলি খেলে এখন মুসা খাবে।
পিঠে কঠিন ধাতব স্পর্শ অনুভব করল মুসা।
বন্দুক ফেলে দাও ম্যাকআরখার, আদেশ দিল হ্যারি। নইলে ছেলেটার পিঠ ফুটো করে দেব।
ধীরে ধীরে বন্দুক নামাল ম্যাকআরখার, ছেড়ে দিল হাত থেকে।

ছুটে এসে বন্দুকটা কুড়িয়ে নিল বিংগো, মুখে কুৎসিত হাসি। জিনার দিকে চেয়ে বলল, এদিকে এসো, খুকি। জলদি!
না, যেও না, জিনার পথরোধ করে দাঁড়াল রবিন।
সরো, ধমক দিল বিগো। এগিয়ে এসে এক ধাক্কায় রবিনকে সরিয়ে জিনার কজি চেপে ধরল, মুচড়ে হাত নিয়ে এল পিঠের ওপর। ঠেলা দিয়ে বলল, হাঁটো।
দূরে শোনা গেল সাইরেনের তীক্ষ্ণ বিলাপ, ফায়ার ব্রিগেড আসছে।
একে অন্যের দিকে তাকাল হ্যারি আর বিংগো, জিম্মিদেরকে আরও শক্ত করে ধরল।
হ্যামবোনের দিকের পথটা ঠিকমত নজরে আসছে না, সেদিকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল বিগো, পথটা কোথায় গেছে, খুকি?
একটা…একটা ভূতুড়ে শহরে, জবাব দিল জিনা।
পাহাড়ের ওদিকে কি আছে?
শুধু মরুভূমি, ভয় পাচ্ছে জিনা, কিন্তু প্রকাশ করছে না।
ম্যাকআরধারের ট্রাকটা দেখাল বিংগো। এতে করেই যেতে পারব। ফোরহইল-ড্রাইভ।
এসব করে পার পাবে না। চেঁচিয়ে বলল জিনা।
চুপ! ফোঁস ফোঁস করে উঠল বিংগো।
এগিয়ে আসছে ফায়ার ব্রিগেডের সাইরেন।
জলদি। ট্রাকে। জিনাকে ঠেলা দিল বিংগো। তাকে সামনে তুলে দিয়ে নিজে মুসাকে নিয়ে হ্যারি উঠল পেছনে।
অসহায় চোখে তাকিয়ে রইল কিশোর, রবিন আর ম্যাকআরথার। তাদের চোখের সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে ট্রাকটা, কিন্তু কিছুই করতে পারছে না।
গেটের বাইরে ছুটে গেল কিশোর আর রবিন। আলো না জেলেই গাড়ি চালাচ্ছে বিগো, অল্পক্ষণেই হারিয়ে গেল পাইনবনের আড়ালে।
উল্টো দিকে, আঙ্কেল উইলসনের গেটের আরও ওদিকে দেখা যাচ্ছে ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ির লাল আলো।
কয়েক মিনিট পর ম্যাকআরথারের গেটের কাছে এসে থেমে গেল সাইরেন। পেছনেই এসেছেন শেরিফ, হঠাৎ ব্রেক কষায় স্কিড করে থেমে গেল গাড়ি।
ছাউনির ভস্মযুপ দেখলেন শেরিফ। ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ির হুইলে বসা লোকটাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, জরুরী অবস্থা শেষ। জুলার আর কিছু বাকি নেই। ম্যাকআরবারের দিকে এগোলেন। হয়েছিল কি? শহর থেকে তো মনে হলো পুরো পর্বত ধসে পড়ছে।

দ্রুত সামনে এসে দাঁড়াল কিশোর। ছাউনিতে আগুন দিয়েছিলাম আমি। দুটো লোক তালা ভেঙে মিস্টার ম্যাকআরবারের বাড়িতে ঢুকল, হাতে বন্দুক। আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে আগুন লাগিয়েছি, আর কোন উপায় ছিল না। জিনা আর মুসাকে ধরে নিয়ে গেছে ওরা। হ্যামবোনের দিকে...লোকগুলোকে বেপরোয়া মনে হলো।

অন্ধকার পথের দিকে চেয়ে বললেন শেরিফ, জিনাকে নিয়ে গেছে?

আর আমার বন্ধু মুসা আমানকেও। গানপয়েন্টে।

নিজের গালে মত্ত থাবা বোলালেন শেরিফ। কতক্ষণ আগে?

এই কয়েক মিনিট। তাড়াতাড়ি করলে এখনও ধরা যায়। আলো জ্বলেনি, জোরে চালাতে পারবে না, বেশি দূরু যায়নি।

আমাকে পিছে দেখলে তখন ঠিকই চালাবে। এভাবে তাড়া করে লাভ নেই। বাচ্চাদুটোর বিপদ বাড়বে আরও।

তাইলে পথের ও-মুখে পাহারার ব্যবস্থা করুন, তাড়াতাড়ি। হ্যামবোনে থামবে না ওরা, ওপাশ দিয়ে বেরোনোর চেষ্টা করবে। তার আগেই যদি পথ আটকানো যায়...

কোন পথ?

হুঁ হয়ে গেল কিশোর। কয়টা পথ আছে?

হ্যামবোন থেকে ডজনখানেক সরু সরু পথ বেরিয়ে গেছে বিভিন্ন দিকে। কোনপথে যাবে ওরা কে জানে। ছোট ছোট কেবিন পাবে, যেখানে খুশি লুকাতে পারবে। মরুভূমির ওদিকেও যেতে পারে। খুব সহজেই এক হপ্তা লুকিয়ে থাকতে পারবে ওরা ইচ্ছে করলে।

তাহলে? চেঁচিয়ে উঠল রবিন।

গাড়ির কাছে গিয়ে পড়ালেন শেরিফ। জানালা দিয়ে টু-ওয়ে রেডিও বের করে বললেন, হাইওয়ে পেট্রোলকে জানাচ্ছি, হেলিকপ্টার নিয়ে আসুক। এছাড়া আর কোন পথ নেই। ঈশ্বরই জানে কি করবে ওরা। তাড়াহুড়ো করে পালানোর জন্যে বাচ্চাদুটোকে না, ... বাক্যটা শেষ করলেন না তিনি।

সঙ্গে নেয়ার অনুরোধ জানাল কিশোর আর রবিন। হেসে মাথা ঝাঁকাল হেলিকপ্টারের পাইলট জ্যাক বোরম্যান।

তোমাদের যাওয়া ঠিক হচ্ছে না, বললেন শেরিফ। গোলাগুলি চলতে পারে। বললেন বটে, কিন্তু সরে দাঁড়িয়ে ছেলেদেরকে ওঠার জন্যে জায়গাও ছেড়ে দিলেন।

পাইলট আর প্যাসেঞ্জার সিটের মাঝের ছোট্ট পরিসরে গাদাগাদি করে বসল রবিন আর কিশোর। প্যাসেঞ্জার সিটে উঠে বসলেন শেরিফ, টেলিস্কোপিক সাইট

লাগানো রাইফেলটা রাখলেন কোলের ওপর।
মস্ত ফড়িঙের মত ডানা ফড়ফড় করে আকাশে উঠল কপ্টার।
আকাশে চাঁদ, নিচে উপত্যকায় আলোর চেয়ে অন্ধকার বেশি। শূন্যে উঠেই সুইচ টিপল বোরম্যান, ফেকাসে অন্ধকারের চাদর যেন কুঁড়ে গেল সার্চলাইটের নীলচে-সাদা তীব্র আলোক-রশি। একটা লেভার দেখিয়ে শেরিফকে বলল, ওটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে যেখানে খুশি আলো ফেলতে পারবেন।
সামনে ঝুঁকলেন শেরিফ। এখনও হয়তো আলো জ্বালায়নি। লেভার ঘুরিয়ে নিচের ঢালে আলো ফেললেনু।
বড় বড় পাথরের চাঙড় কিভূত ছায়া সৃষ্টি করছে। ওপর থেকে আঁকাবাকা একটা ফিতের মত লাগছে হ্যামবোনের সড়কটাকে। সবুজ গাছপালার মাঝে এখন প্রায় সাদাই দেখাচ্ছে ওটা।
ট্রাকটা এখুনি ফেলে রেখে যাওয়ার চেষ্টা করবে না, বোরম্যান বলল। এই পথেই অন্তত হ্যামবোন পর্যন্ত যাবে।
হঠাৎ মোড় নিল কপ্টার। তৈরি ছিল না, পাক দিয়ে উঠল কিশোরের পেটের ভেতর, এক ধরনের অদ্ভুত শূন্যতা।
টুইন লেকস টু হ্যামবোন সড়কের প্রতিটি ইঞ্চি খুঁজে দেখা হলো, কিন্তু ট্রাকটা পাওয়া গেল না। এত তাড়াতাড়ি পেরিয়ে গেল? বিশ্বাস করতে পারছেন না শেরিফ। তা-ও আবার আলো না জেলে?
নড়ে উঠল রবিন।
তার দিকে তাকালেন শেরিফ, অভয় দিয়ে বললেন, ভেব না, থোকা। আমার অ্যাসিসটেন্ট জীপ নিয়ে আসছে। যাবে কোথায় ব্যাটারা?
হ্যামবোনে কপ্টার অনেক নিচুতে নামিয়ে আনল বোরম্যান। বাড়িঘরের প্রায় ছাত ছুঁয়ে উড়ে চলেছে।
ওটা কি? চেঁচিয়ে উঠলেন শেরিফ। একটা ট্রাক-খনির ছাউনিটার কাছে।
ঝুঁকে দেখে বলল কিশোর, ওটা মিসেস রোজি ফিলটারের। বিকেলেই দেখেছি আমরা, খালি। মহিলা নেই।
কি ঘটছে এসব?
আরও অনেক ব্যাপার আছে, পরে সব খুলে বলব। আগে জিনা আর মুসাকে খুঁজে বের করা দরকার।
হ্যামবোন পেরিয়ে গিয়ে থাকলে পশ্চিমের ঢালে কোথায় আছে, কোনও একটা সরু পথে। কিন্তু কোনটায় যে গেল, সেটা বোঝাই তো মুশকিল।
একটাই উপায় আছে, বলতে বলতেই কপ্টারের নাক পশ্চিমে ঘোরাল বোরম্যান। দ্রুত পেছনে পড়তে লাগল ভূতুড়ে শহর হ্যামবোন।

মাথার ওপরে হেলিকপ্টারের শব্দ শুনছে জিনা আর মুসা। গাছের পাতার ওপর দিয়ে গিয়ে রাস্তায় নামল সার্চলাইটের আলো।
কিন্তু আলো আর ফিরে এল না ওখানে চলে যাচ্ছে হেলিকপ্টার। দূর থেকে দূরে মিলিয়ে গেল এঞ্জিনের শব্দ।
খিকখিক করে হাসল বিংগো। এবার যাওয়া যায়। এঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে আবার পথে নামিয়ে আনল ট্রাক। আলো না জ্বেলেই আবার এগিয়ে চলল হ্যামবোনের দিকে।
একবার বেরোতে পারলে এই হতচ্ছাড়া পথে আর আসছি না, ফোঁস ফোঁস করে শ্বাস টানল সে। এসে আর লাভও নেই। নিশ্চয় এতক্ষণে জোরেশোরে খুঁজতে শুরু করেছে ম্যাকআরখার, আগে না পেয়ে থাকলে কিছু যে খুঁজতে গেছি আমরা, নিশ্চয় বুঝে ফেলেছে।
দশ লাখ ডলারের বোঝাটা কতবড়? জিজ্ঞেস করে বসল জিনা।
ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষল বিংগো, ফিরে তাকাল। তোমাকে কে বলেছে?
চুপ করে রইল জিনা।
সিগারেট বের করে ধরাল বিংগো। হ্যারি, এ দুটোকে কোথাও ফেলে দেয়া দরকার। এমন কোথাও, যাতে তার বাড়ি ফিরতে না পারে।
কেশে উঠে হাত নেড়ে নাকের সামনে থেকে ধোয়া ত্যাভাল জিন। এত বাজে অভ্যাস, এই ধোয়া টানা, বলল সে। ফুসফুসের দফা রফা, গলাও শেষ, কথা বললে বঙের আওয়াজ বেরোয়। হ্যাঁ, কি যেন বলছিলে, আমাদের কোথাও ফেলে যাবে? তাতে কি লাভ? ফিনিক্সে যে তোমরা ডাকাতি করেছ, তিন ডাকাত আর এক ডাকাতনী মিলে, এটা আরও লোকে জানে।
গুঙিয়ে উঠল হ্যারি। অন্য ছেলে দুটো? বোকার মত রেখে এলাম।
বোকা নয়, শুধরে দিল জিনা, বলো, গাধার মত। গর্দভচন্দ্র।
বন্দুক তুলে পেছন থেকে হুমকি দিল হ্যারি। চুপ হয়ে গেল জিনা।
হ্যামবোন থেকে উল্টো দিকের পথ ধরে নেমে চলল ওরা। লো গীয়ারে চালাচ্ছে বিংগো এক জায়গায় এসে ডানে আরেকটা শাখাপথ বেরিয়েছে, সরু পথ, বেজায় রুক্ষ।
উপচে পড়া অ্যাশট্রেতে সিগারেট টিপে নেভাল বিংগো। মূল সড়ক, যেটাতে রয়েছে সেটা দেখিয়ে জিনাকে জিজ্ঞেস করল, এটা কোথায় গেছে?
জানি না।
পেছন থেকে ডেকে বলল হ্যারি, এটা দিয়ে যাওয়া উচিত না, মন সায় দিচ্ছে। নিচে হাজারখানেক পুলিশ নিশ্চয় ঘাপটি মেরে আছে। পাশের রাস্তায় নামো।
ঘোৎ-ঘোৎ করে কি বলল বিংগো, বোঝা গেল না। মোড় ঘুরে পাশের রাস্তায় গাড়ি নামাল। কাঁচা রাস্তা, অনেক কষ্টে যেন ওখানে জন্মানো থেকে নিজেদেরকে

ঠেকিয়ে রেখেছে দুপাশের গাছের জঙ্গল। গভীর দুটো খাজ, টায়ারের দাগ, তার ওপর মাঝেমাঝেই পাথর পড়ে আছে। ফলে আটকে যেতে চাইছে চাকা; জোর করে সরিয়ে আনার চেষ্টা করলেই লাফিয়ে উঠছে ভীষণভাবে।
আরেকটা সিগারেট ধরাল বিংগো, কিন্তু টানতে পারল না। গাড়ি সামলাতেই হিমশিম খাচ্ছে। গাল দিয়ে জ্বলন্ত সিগারেটটা বাইরে ছুঁড়ে ফেলে শক্ত হাতে স্টিয়ারিং ধরল।
আগুনসহ তো ফেলেছ, বলল জিনা। দেখো, জঙ্গলে দাবানল লেগে যায় নাকি? তাহলে পুরো পুলিশ ফোর্স ছুটে আসবে তোমাদের নাকে লাগাম পরাতে।
তীক্ষ্ণ টিটকারি নীরবে হজম করল বিংগো, জবাব দেয়ার উপায় নেই, গাড়ি সামলাতে ব্যস্ত।
মুসা আর জিনার মনে হলো অনন্ত কাল ধরে চলেছে তারা ওই পাহাড়ী পথ ধরে। মাঝে মাঝে বনের ভেতর পরিত্যক্ত কেবিন চোখে পড়ছে, কি এক গোপন রহস্য লুকিয়ে রেখেছে যেন অন্ধকার ঘরগুলো। হ্যামবোনের চেয়ে ছোট আর বেশি ভূতুড়ে আরেকটা শহর পেরোলেন। সামনে এক জায়গায় একটা কথোট বসে ছিল রাস্তার ওপর, মহাগভীর, কিন্তু হেডলাইটের আলো চোখে পড়তেই ভীতু শেয়ালের মত কুঁই করে উঠে গিয়ে লুকালো পাশের অন্ধকার ঝোপে। মাথার ওপর কয়েক বার হেলিকপ্টারের আলো দেখা গেল। প্রতিবারেই জঙ্গলে ট্রাক ঢুকিয়ে ফেলল বিংগো। কপ্টার দূরে সরার আগে বেরোল না। ঘুমানোর চেষ্টা করল মুসা আর জিনা, কিন্তু যা ঝাঁকুনি ঝিমানোও সম্ভব নয়, ঘুম তো দূরে কথা।
ওপরের দিকে গাড়ি উঠছে তো উঠছেই। কিন্তু অবশেষে বাঁক নিল পথ। সাপের মত একেবেঁকে খানিক দূর নেমে গিয়ে সোজা হলো।
বোধহয় বাচলাম, ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল বিংগো।
স্টিয়ারিঙে হাতের চাপ যদিও শিথিল করতে পারছে না। ঢিল পড়লেই নাক ঘুরিয়ে গাছের গায়ে গুতো মারার জন্যে রওনা দেয় গাড়ি।
চাঁদ ডুবে গেছে। আকাশে শুধু তারা মিটমিট করছে, ওপরেও ছায়াপথ, নিচেও ছায়াপথ বানিয়ে রেখেছে। যতই নামছে গাড়ি, দু-ধারে সরে যেন বেশি করে জায়গা ছেড়ে দিচ্ছে বন, পথ চওড়া হচ্ছে।
উপত্যকায় নামল গাড়ি। সামনে আড়াআড়ি চলে গেছে আরেকটা পাকা রাস্তা। তার ওপাশে বিস্তৃত মরুর খোলা শূন্যতা।
গাড়ি থামিয়ে ডানে-বাঁয়ে তাকাল বিংগো। অল্প অল্প হাঁপাচ্ছে, বেড়েছে। ফোঁসফোসানি।
হেসে বলল হ্যারি, পুলিশ নেই। বলেছিলাম না, মেইন রোডে থাকবে ওরা। এদিকে আসব আমরা, কল্পনাও করেনি।

এখনও বলা যায় না, বিংগো খুশি হতে পারছে না। রোড ধরে যাবই না। সোজা চালাল সে। ঝাঁকুনি খেয়ে পাকা রাস্তায় উঠল ট্রাক, রাস্তা পেরিয়ে আবার ঝাঁকুনি খেয়ে নামল মরুভূমিতে।
মাথায় বাড়ি খেয়ে আঁউক! করে উঠল জিনা। মস্ত এক গর্তে পড়ে ক্যাঙারুর মত লাফ দিয়ে আবার উঠে পড়েছে গাড়ি। জিন্দেগীতে জায়গামত যাবে না এই ট্রাক।
চুপ! ধমক দিল বিংগো। অস্বস্তিতে ভুগছে। ঝাল ঝাড়ল আধপোড়া সিগারেটের ওপর, অ্যাশট্রেতে পিয়ে মারল ওটাকে। যেতেই হবে। মরুভূমি পেরোলে সামনে অন্য পথ পাবই। ওখানে পুলিশ থাকবে না।
শেষ তারাটাও মলিন হলো, মিলাল মহাশূন্যে।
ফিরে তাকাল মুসা, পেছনে পাহাড়ের চূড়ায় লালচে আভা। আঁধার কাটছে দ্রুত। খানিক পরেই উঁকি দেবে টকটকে লাল সূর্য। পাকা রাস্তা এখন অনেক পেছনে।
সামনে শিগগিরই আরেকটা পথ পাব, বিড়বিড় করে নিজেকে আশ্বাস দিল যেন বিংগো। যেটাতে...হুঁক...
চোরা গর্তে পড়ে কাত হয়ে গেছে ট্রাক। জোর হিসহিস শোনা গেল, ধোয়া বেরোতে শুরু করল রেডিয়েটর থেকে।
সব্বোনাশ! এঞ্জিন বন্ধ করে, ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলে বালিতে লাফিয়ে গিয়ে পড়ল বিংগো। ঘুরে গিয়ে উঁকি দিল ট্রাকের নিচে। এঞ্জিনের সামনের অংশ থেকে বালিতে পড়ছে মরচে রঙের পানি, ময়লা করছে ধবধবে সাদা বালি।
কি হলো? হ্যারির গলার ভেতরটা সিরিশ দিয়ে ঘষেছে যেন কেউ।
রেডিয়েটর খতম, অচেনা লাগছে বিংগোর কণ্ঠস্বর। অ্যাক্সেল দুই টুকরো। গুঙিয়ে উঠল হ্যারি। সর্বনাশ!
জানালার কাছে এসে জিনার দিকে পিস্তল তাক করল বিংগো। নামো। মুসাকে বলল, এই, তুমিও।
হলো তো এখন? কালো হয়ে গেছে জিনার মুখ।
চুপ। নামো।
নামল দুজনে। হ্যারিও নামল। শূন্য চোখে তাকাল ছড়ানো মরুর দিকে। সামনে দেখিয়ে বলল, ওদিকে পাহাড় পেছনে রেখে সোজা হাঁটব। আগে-পরে পথ পেয়ে যাবই।
না, জেদ ধরল জিনা। এখানে হাঁটতেই থাকবে, হাঁটতেই থাকবে, পথ আর পাবে না। তারপর সূর্য উঠলে টের পাবে মজাটা। দেখতে দেখতে একশো ডিগ্রী ছাড়িয়ে যাবে গরম, কাবাব হয়ে যাবে। ট্রাকে বসে থাকাই ভাল।
ট্রাকে থাকলে মরব, বলল হ্যারি।
বাজে কথা রেখে হাঁটো তো, আবার ধমক দিল বিংগো।

না, বালিতে বসে পড়ল জিনা। গুলি করে মেরে ফেললেও আমি যাব না। রোদে কাবাব হওয়ার চেয়ে গুলি খেয়ে মরা অনেক আরামের। গরমে মগজ গলে নাক দিয়ে বেরিয়ে আসবে।
দ্বিধা করল মুসা। তারপর বসে পড়ল জিনার পাশে।
ভীষণ দৃষ্টিতে তাকাল বিংগো। পিস্তলের হাতলে চাপ বাড়ছে, সাদা হয়ে যাচ্ছে আঙুল।
হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল হ্যারি, লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটতে শুরু করল সামনের দিকে।
জিনা আর মুসার ওপর বার দুই নজর সরাল বিংগো, কাঁধ ঝাঁকিয়ে পিস্তলটা ঢুকিয়ে রাখল পকেটে। ঘুরে রওনা হয়ে গেল সঙ্গীর পেছনে।
নীরবে চেয়ে আছে জিনা আর মুসা।
ছোট হতে হতে যেন ধোয়ার ভেতর মিলিয়ে গেল দুই ডাকাতের অবয়ব। দ্রুত চড়ছে সূর্য, গরম বাড়ছে। রাতের শিশিরে ভেজা বালি থেকে বাষ্প উঠতে শুরু করেছে ধোয়ার মত।
হতাশ হয়ে যদি ফিরে যায় ওরা? কোলা ব্যাঙের স্বর বেরোল মুসার কণ্ঠ থেকে। যদি খোঁজা বাদ দেয়? পিপাসার ছাতি ফেটে মরব।
জিনা আর মুসা যেখানে রয়েছে, তার থেকে অনেক ওপরে বসে কিশোর আর রবিন দেখল, পর্বতের চূড়া লাল হয়ে উঠছে ভোরের কাঁচা রোদে।
সুইচ টিপে সার্চ লাইট নিভিয়ে দিয়ে বড় করে হাই তুললেন শেরিফ। সারা রাত জেগে থেকে চোখ লাল।
নড়েচড়ে বসল বোরম্যান। সারারাত পাহাড়ের ওপরে আকাশে চক্কর দিয়েছে, আরেকবার দেয়ার জন্যে তৈরি হলো।
অবাক কাণ্ড! বলল সে। হাওয়া হয়ে গেল নাকি ওরা? কোনও জায়গা তো আর বাদ রাখিনি।
গেল কই? না ঘুমিয়ে আর দুশ্চিন্তায় শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে রবিনের মুখ। মেইন লোভ ধরে নামেনি, তাহলে পুলিশের চোখ এড়াতে পারত না। আরেকটা কপ্টার যে বেরিয়েছে, তারাও কোন খোঁজ পাচ্ছে না। বাতাসে তো আর মিলিয়ে যেতে পারে না।
পাহাড়ে জঙ্গলে কোথাও লুকিয়ে আছে, ক্লান্ত কণ্ঠে বলল কিশোর। অসংখ্য পোড়ো শহর আছে, ছাউনি আছে, তার মধ্যে ঢুকে বসে থাকলেও আকাশ থেকে দেখব না।
ঠিকই বলেছ, সায় দিলেন শেরিফ। দেখা যাবে না। কিন্তু আমি ভাবছি, মরুভূমিতে নেমে যায়নি তো? রোড ক্রস করে? সেটা করলে মরবে। পানিও নেই ওদের সঙ্গে, খাবারও নেই।

মরুভূমিতে নামলে দেখা যাবে? রবিন প্রশ্ন করল।
তা তো যাবেই। একেবারে খোলা। তবে অনেকখানি জুড়ে চক্কর দিতে হবে।
হেলিকপ্টারের নাক ঘুরে গেল পশ্চিমে। গাছপালার মাথার ওপর দিয়ে উড়ে চলল মরুভূমির উদ্দেশে।
রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছল জিনা।
সাদা হচ্ছে সূর্য, রোদের তেজ বাড়ছে।
শরীরে প্রচণ্ড ক্লান্তি, কিন্তু উত্তেজনায় ঘুম আসছে না জিনার। পঞ্চমবারের মত ঘুরে এল ট্রাকের চারপাশে। ধপ করে বসে পড়ল মুসার পাশে।
ট্রাকের ছায়ায় বসে আছে মুসা। বেশিক্ষণ থাকবে না এই ছায়া, যে হারে দ্রুত সরছে।
দুপুর তো হয়ে এল, বলল জিনা। ওরা আসছে না কেন?
বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল মুসা। ইস, যা খিদে লেগেছে না। গতকাল দুপুরের পর আর কিছু পেটে পড়েনি।
তুমি তো ভাবছ খাওয়ার কথা। আমার যে গলা শুকিয়ে কাঠ, খাবার পেলেও এখন গলা দিয়ে নামবে না।
রেডিয়েটরটাও তো লীক হয়ে গেছে। নইলে ওখান থেকে পানি নিয়ে খেতে, পারতাম।
হুঁ, কাঁধ নিচু করল জিনা। ঝট করে সোজা হলে পরক্ষণেই, চেঁচিয়ে উঠল, ও মাই গড! হলো কি আমার?
লাফিয়ে উঠল সে। ইগনিশন থেকে খুলে বের করল ফাস্ট এইড কিটস। ভেতরে একটা ডাক্তারী কচি পাওয়া গেল। উজ্জ্বল হয়ে উঠল মুখচোখ।
এটা দিয়ে কি করবে? জিনার আনন্দের কারণ বুঝতে পারছে না মুসা।
কাছেই একটা ব্যারেল ক্যাকটাস দেখাল জিনা। ক্যাকটাসের ভেতরে পানি থাকেই। বৃষ্টির সময় শুঁষে নিয়ে জমিয়ে রাখে শরীরের ভেতর। শুকনো মৌসুমে কাজ চালায়, বেঁচে থাকে। আরও আগেই মনে পড়ল না কেন ভাবছি।
বেটার লেইট দ্যান নেভার, মুসা,বলল। রসাল জিনিসের সন্ধান যে পাওয়া গেছে এতেই আমি খুশি। কাঁচিটা নিয়ে দৌড় দিল সে। কুপিয়ে খুঁচিয়ে শক্ত চামড়া কেটে ভেতর থেকে দু-টুকরো নরম শাঁস বের করল। ফিরে এসে একটা দিল জিনার হাতে।
মুখে দিয়েই চেহারা বিকৃত করে ফেলল দুজনে।
বুঝতে পারছি না কোনটা খারাপ, তিক্ত কণ্ঠে বলল মুসা। পিপাসায় মৃত্যু...নাকি এটা?

চুষে চুষে সবটুকু রস খেয়ে ছোবড়াটা ফেলে দিল জিনা। মাথার ওপর উঠে এসেছে সূর্য। ছায়া নেই। ট্রাকের নিচে ঢুকতে হবে, আর কোন উপায় নেই, বলল সে। কপ্টার এলে ট্রাকটা দেখতে পাবে, আমরাও তখন বেরিয়ে আসতে পারব।
ক্রল করে ট্রাকের তলায় চলে এল দুজনে।
আরে, বেশ ঠাণ্ডা তো এখানে, হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল জিনা!
ক্যাকটাসের রস খেয়ে আর ছায়ায় শুয়ে সামান্য ভাল বোধ করছে ওরা। দূর থেকে ভেসে এল কি এক নাম না জানা মরু-পাখির বিষণ্ন ডাক।
কনুই দিয়ে আস্তে করে জিনার পাজরে গুতো দিল মুসা, ইঙ্গিতে দেখাল।
বানির তলা থেকে মাথা তুলেছে একটা ক্যাংগারু-ইদুর, সতর্ক চোখে দেখল কয়েক মুহূর্ত, বিপদ নেই বুঝে বেরিয়ে এল। আরও কয়েক সেকেণ্ড চুপচাপ থেকে হঠাৎ মস্ত লাফ দিয়ে ছুটে গেল এক দিকে, বোধহয় খাবার দেখতে পেয়েছে।
কোথা থেকে জানি, যেন মাটি খুঁড়ে উদয় হলো কয়েকটা গিরগিটি, ট্রাকের নিচে এসে ঢুকল গুটিগুটি পায়ে, খাবার খুঁজছে।
চারপাশে সাদা বালির সমতল বিস্তার, আগুন হয়ে উঠেছে। মরুর তপ্ত বাতাসে একধরনের অদ্ভুত ঝিলিমিলি, মনে হচ্ছে যেন কাঁপছে বাতাস।
সময়ের হিসেব রাখেনি ওরা, ঠিক কতক্ষণ পর বলতে পারবে না, মাথা তুলল মুসা। কান পেতে শুনছে।
জিনাও মাথা তুলল। হ্যাঁ, আমিও শুনছি। অনেক দূরে। কপ্টারের এঞ্জিনই। চেঁচিয়ে উঠল, আসছে, ওরা আসছে!
তাড়াহুড়ো করে ট্রাকের নিচ থেকে বেরোল দুজনে। কিন্তু মিলিয়ে যাচ্ছে শব্দ।
আকাশের দিকে মুখ তুলে আঁতিপাতি করে খুঁজল, কিন্তু গাঢ় নীলের মাঝে কোথাও কোন কলঙ্ক নেই।
কিন্তু শুনলাম তো, হতাশ কণ্ঠে বলল জিনা।
শুনেছি আমিও, কান পেতে আছে মুসা।
শোনা যাচ্ছে না আর শব্দটা।
এদিকে কেন এল না? কেঁদে ফেলবে যেন জিনা। আর বেশিক্ষণ টেকা যাবে। মরব।
ভেঙে পড়ছ কেন এখনই? আসবে ওরা আমাদের খুঁজে বের করবে... বলল বটে, কিন্তু নিজেই ভরসা পাচ্ছে না মুসা, গলায় জোর নেই।
কয়েক মিনিট পর আবার শোনা গেল শব্দটা; দূরে, আওয়াজ বাড়ছে আস্তে আস্তে। সাদাটে-নীল দিগন্তে দেখা দিল কালো একটা বিন্দু।
এগিয়ে আসছে কপ্টার। লাফিয়ে উঠল জিন আর মুসা, পাগলের মত হাত নেড়ে, চেঁচিয়ে ওটার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা চালাল।

দেখতে পেল হেলিকপ্টার। দ্রুত নাক ঘুরিয়ে কাত হয়ে ছুটে এল সাঁ করে।
বালিতে ঘূর্ণিঝড় তুলল কপ্টারের পাখা, তার ভেতর দিয়েই মাথা নুইয়ে দৌড়ে গেল জিনা আর মুসা।
তাড়াতাড়ি নামতে গিয়ে হাঁসফাঁস করছেন সুলদেহী শেরিফ। তোমরা ঠিক আছ? চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন।
ধাক্কা দিয়ে আরেকটু হলে তাঁকে ফেলেই দিয়েছিল রবিন আর কিশোর, কে আগে নামবে সেই প্রতিযোগিতা। ছুটে এল দুহাত তুলে। আনন্দে কে যে কাকে জড়িয়ে ধরল সে হুঁশ থাকল না।
সবার আগে সামলে নিল জিনা। শেরিফকে বলল, ডাকাতদুটো ওদিকে পালিয়েছে। পায়ে হেঁটে গেছে।
ট্রাক ভেঙে পড়ার পরই ভেগেছে, যোগ করল মুসা!
তাড়াতাড়ি আবার গিয়ে কপ্টারে উঠলেন শেরিফ। পাশে কাত হয়ে কিছু বললেন পাইলটকে।
মাথা নেড়ে সায় জানিয়ে রেডিওর ওপর ঝুঁকল বোরম্যান। বোধহয় হাইওয়ে পেট্রোলকে খবর জানাচ্ছে। জানালা দিয়ে মুখ বের করে এঞ্জিনের গর্জন ছাপিয়ে চেঁচিয়ে বলল, তোমরা থাকো এখানে। মেসেজ পাঠিয়ে দিয়েছি, আরেকটা হেলিকপ্টার আসছে। ব্যাটাদের ধরতে চললাম আমরা। পানির একটা ক্যান্টিন। বাড়িয়ে দিল মুসার দিকে।
উড়াল দিল আবার হেলিকপ্টার। সোজা পশ্চিমে রওনা হলো হ্যারি আর বিংগোর খোঁজে।
পরস্পরের দিকে চেয়ে হাসল জিনা আর মুসা।
আমি শিওর, বেশি দূর যেতে পারেনি ব্যাটারা, জিনার কণ্ঠে সন্তোষের আমেজ।
ঠিকই অনুমান করেছে জিনা।
বেশি দূর যেতে পারেনি হ্যারি আর বিংগো। এক ঘণ্টা পরই ওদেরকে হাতকড়া পরা অবস্থায় নামানো হলো ম্যাকআরবারের কেবিনের সামনে উঠানে। দুপাশে পাহারায় রইল পাইলট বোরম্যান আর শেরিফের সহকারী।
করুণ অবস্থা হয়েছে দুই ডাকাতের। রোদে পোড়া, চামড়া, জায়গায় জায়গায় ফোঁসকা পড়ে গেছে, এতই পরিশ্রান্ত-বসে বসে কুকুরের মত জিভ বের করে হাঁপাচ্ছে। ভাগ্য ভাল ওদের, হেলিকপ্টারের চোখে পড়েছে, নইলে মারাই যেত। ট্রাক ছেড়ে যাওয়ার পর মাত্র কয়েক মাইল এগিয়েছিল, তাতেই এ-দশা।
ডাকাতদের আগেই টুইন লেকসে ফিরে এসেছে ছেলেরা। হাতকড়া পরা ডাকাতদের নামতে দেখে আনন্দে হাত তালি দিয়ে উঠল জিনা। …

আঙ্কেল উইলসন আর ভিকিখালাও রয়েছে ওখানে। মেকসিকান শ্রমিকদের সহায়তায় সবাইকে স্যাণ্ডউইচ পরিবেশন করছে ভিকি, দিতে একটু দেরি করলেই রেগে যাচ্ছে শ্রমিকদের ওপর। …

আগের রাতেই ফিরে এসেছিল শ্রমিকেরা, সারারাত বসে কাটিয়েছে কেবিনের দাওয়ায়, ভয়ে কারও সঙ্গে কথা বলেনি। ছেলেদেরকে এখন ঠিকঠাকমত ফিরতে দেখে হাসি ফুটেছে মুখে, স্বেচ্ছায় মেনে নিয়েছে ভিকির তাবেদারী।

কেবিনের পাশে চুপচাপ শুয়ে আছে ম্যাকআরথারের কুকুর, দুই ডাকাতের মতই জিভ বের করে নীরবে হাঁপাচ্ছে। ওষুধের ক্রিয়া শেষ হয়নি এখনও পুরোপুরি।

ম্যাকআরথারকেও তার কুকুরটার মতই দেখাচ্ছে, বিধ্বস্ত, ক্লান্ত।

সবাই তো এল, যেন সভার কাজ শুরু করছে, এমনি ভঙ্গিতে বলল সে, দয়া করে কেউ কি বলবেন, ব্যাপারটা কি? দুই ডাকাতকে দেখিয়ে বলল, কি ঘটেছে এখানে?

ম্যাকআরথারের কথায় কান না দিয়ে কিশোরের দিকে তাকাল জিনা, বলল, ঠিকই আন্দাজ করেছিলে। বাড হিলারি সেই চার ডাকাতের একজন, আর এই যে এখানে দুজন। গতরাতে স্বীকার করেছে ওরা।

আমরা কিছুই স্বীকার করিনি, ঘোষণা করল হ্যারি।

করেছ, জোরে মাথা ঝাঁকাল জিনা। আমাদেরকে ফেলে দেয়ার কথাও বলেছিলে, যাতে কোনদিন ফিরে আসতে না পারি।

মিষ্টি করে হাসল কিশোর। আমাদের কেস প্রায় শেষ। সব কিছুই খাপে খাপে বসে যাচ্ছে।

মানে? জিজ্ঞেস করলেন শেরিফ।

কি ব্যাপার, কিশোর? আংকেল উইলসনও জানতে চাইলেন। আমি তো ঘোর অন্ধকারে। একটু খুলে বলো তো।

বলছি, হাতের বাকি স্যাণ্ডউইচটুকু দুই কামড়ে শেষ করল কিশোর। ঢকঢক করে পুরো এক গেলাস পানি খেয়ে মুখ মুছে শুরু করল, যখন জানলাম, খনিতে পাওয়া লাশটা পাঁচ বছর আগের এক দাগী আসামীর, মনে প্রশ্ন জাগল, ওর মত লোক টুইন লেসের নির্জন খনিতে কি করছিল? মাইনে কেন ঢুকেছিল? প্রথমেই মনে এল, টুইন লেকসের স্থানীয় পত্রিকাটার কথা। গিয়ে খুঁজতে শুরু করলাম।

জানা গেল, পাঁচ বছর আগে এসেছিল বাড হিলারি, খনিতে ঢুকে আর বেরোতে পারেনি, তার আগেই খনির মুখ সীল করে দেয়া হয়। সেদিন একটা পরিত্যক্ত গাড়ি পাওয়া গেল খনির কাছে, লর্ডনবুর্গ থেকে চুরি গিয়েছিল ওটা। অনুমান করলাম, ওই গাড়িতে করেই এসেছিল হিলারি। সুতরাং, গেলাম লর্ডসবুর্গে, তার

খোঁজ নেয়ার জন্যে। ওখানকার একটা পত্রিকাতেই ডেথ ট্র্যাপ মাইনের মুখ সীল করার সংবাদ বেরিয়েছিল, জানলাম সেটা।
পাঁচ বছর আগে মিসেস রোজি ফিলটার টুইন লেকসে ফিরে এসে সম্পত্তি কিনেছেন। তার অব্যবহৃত একটা ঘরে আরেকটা পত্রিকা পেলাম, পাঁচ বছরের পুরানো, ফিনিক্স থেকে বেরোয়। সেই সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল একটা ডাকাতির খবর। পত্রিকাটা ছিল খনিমুখ সীল করার আগের দিনের। তার কয়েক মাস পর এসে সম্পত্তি কিনেছেন মিসেস ফিলটার। আন্দাজ করতে কষ্ট হলো না, পত্রিকাটা বাড হিলারিই: এনেছে, খনিতে ঢোকার আগের রাত ওই ঘরে কাটিয়েছে, পরদিন পত্রিকাটা অন্যান্য পত্রিকার স্তুপের ওপর ফেলে রেখে বেরিয়ে গেছে। ধরে নিলাম, চার ডাকাতের একজন সে। এখন তো জানি, ঠিকই আন্দাজ করেছি। বাকি দুজন এই যে, হ্যারি আর বিংগোর দিকে চেয়ে হাসল কিশোর। তারপর, গত হপ্তায় পাওয়া গেল হিলারির লাশ। কৌতূহলীরা ছুটে এল দলে দলে। খবরটা শুনে, তুমি, বিংগোও এসেছ। আঙ্কেল উইলসনের গোলাঘরে ঢুকেছিলে রাতে চুরি করে। আমরা যখন দেখে ফেললাম, ছুরি হাতে বেরিয়ে দৌড়ে গিয়ে লুকালে খেতে, মুসাকে আরেকটু হলেই শেষ করে দিয়েছিলে। কোন কিছু খুঁজতে ঢুকেছিলে তুমি গোলাঘরে। পাওনি। কাজেই বাধ্য হয়ে তোমাকে থাকতে হয়েছে টুইন লেকসে। কোথায় থাকবে। লোকে তো দেখে ফেলবে। ঠাই নিলে গিয়ে মিসেস ফিলটারের অব্যবহৃত ঘরে। তুমিই সেদিন তার রান্নাঘর থেকে খাবার চুরি করেছিলে, সিংকে পোড়া সিগারেটের টুকরো ফেলে গিয়েছিলে। নাকি মিসেস ফিলটারই তোমাকে খাবারগুলো দিয়েছিলেন?
জবাব দিল না বিংগো।
যাই হোক, আবার বলে গেল কিশোর, ধারে-কাছেই কোথাও ছিল হ্যারি। কিন্তু তোমার মত সূত্র রাখেনি। ও কোথায় ছিল কে জানে। যাকগে, তক্কে তক্কে ছিলে, গতকাল বিকেলে পেয়ে গেলে সুযোগ। আশেপাশে কেউ নেই। কুকুরটাকে ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়ালে। তারপর গিয়ে হ্যারিকে নিয়ে এসে দুজনে খোঁজাখুঁজি শুরু করলে। হ্যাঁ, ওই যে লুট করেছিলে দশ লাখ ডলার, সেগুলো। তোমাদেরকেও ঠকিয়েছিল হিলারি না? সব টাকা নিয়ে পালিয়ে এসেছিল এখানে। পাঁচ বছর পর খোঁজ পেলে।
ম্যাকআরআরের দিকে ফিরল কিশোর। খনিতে টাকাগুলো পেয়েছেন আপনি, না?
জোরে মাথা নাড়ল ম্যাকআরথার। না। বলেইছি তো, খনির ভেতরে ঢুকে দেখিনি ভালমত। লাশটা পাওয়া যাওয়ার পর অবশ্য শেরিফ তন্ন তন্ন করে খুঁজেছেন, কিন্তু টাকাটুকা কিছু পাওয়া যায়নি। আসলে কিছুই নেই খনিতে।

কিছুই না, মিস্টার ম্যাকরখার? পকেট থেকে সোনার টুকরো বের করে শূন্যে ছুঁড়ল কিশোর, লুফে নিয়ে বলল, এটাও না? খাটি সোনা।
বিস্মিত হলো ম্যাকআরথার।
স্বর্ণ? ভুরু কোঁচকালেন শেরিফ। ডেথ ট্র্যাপে সোনা আছে বলে তো শুনিনি?
কিন্তু এখন আছে, মুচকি হাসল কিশোর। এটা পেয়েছি...আরেকটা, পকেট থেকে মুড়ি বের করে দেখাল, এই যে, এটাও পেয়েছি। লর্ডর্সবুর্গে জুয়েলারের দোকানে গিয়ে পরীক্ষাও করিয়েছি, খাটি সোনা। তামার সঙ্গে মেশানো।
তাজ্জব হয়ে গেছেন শেরিফ। কিন্তু...কিন্তু ওই খনিতে তো সোনা ছিল না। থাকলে আগে তার চিহ্নও পাওয়া গেল না কেন?
সেটাই তো মজা, হাসল কিশোর। তখন আসলেই ছিল না। পরে পাওয়া সোনার টুকরোটা শেরিফের হাতে দিয়ে বলল, খনির দেয়ালে গেথে ছিল। ভাল করে দেখুন তো কিছু বুঝতে পারেন কিনা?
পারলেন না শেরিফ, মাথা নাড়লেন।
গতরাতে হেলিকপ্টারে বসে ভালমত ভেবেছি, বলল কিশোর। জানি, অন্যান্য ধাতু-এই যেমন, তামা, রূপার সঙ্গে থাকে অনেক সময় স্বর্ণ, কিন্তু তামাই হোক আর রূপাই হোক, এত গায়ে গায়ে মেশামেশি করে থাকে না, এত বেশি পরিমাণে। সন্দেহ হলো। মনে পড়ল টুইন লেকসে এসে পয়লা রাতে গুলির শব্দ শুনেছি।...
শেরিফ, আরেকবার ভাল করে দেখুন তো টুকরোটা, কিছু চোখে পড়ে কিনা?
তালুতে রেখে আরেকবার দেখলেন শেরিফ। নকশা।...নকশার মত কি যেন...
নকশাই, মাথা কাত করল গোয়েন্দাপ্রধান। কমলা ফুলের কুঁড়ি আঁকা ছিল। বিয়ের আঙটি ছিল ওটা।
আগে বাড়ল ম্যাকআরথার। কোথায় পেয়েছ তুমি ওটা? খনিতে পেয়েছ, বিশ্বাস করতে বলো একথা?
আমার চেয়ে আপনিই তো ভাল জানেন। এত অসতর্ক হওয়া উচিত হয়নি আপনার। বাজারে সোনার টুকরোও কিনতে পাওয়া যায়। পুরানো গহনা কিনেই তো ভুলটা করেছেন। শেরিফের দিকে ফিরে বলল কিশোর, পুরানো এক খেলা খেলতে চেয়েছিলেন মিস্টার ম্যাকআরহার। শটগানের নলে অলঙ্কার ভরে, চেম্বারে গুলি ভরে ফায়ার করেছেন গিয়ে খনির দেয়ালে। তারপর লোক ডেকে এনেছেন দেখানোর জন্যে যে খনিতে সোনা আছে। যখনই কাউকে দেখাতে এনেছেন, মেকসিকান শ্রমিকদের দিয়ে ডিনামাইট ফাটিয়েছেন ভেতরে, যেন নিয়ম মাফিক খোঁজা হচ্ছে খনি। মনে হয়, বোকা টাকার কুমীরগুলোকে লর্ডসবুর্গে পাকড়াও করেছেন মিস্টার ম্যাকআরথার। ওদের ধরে নিয়ে এসেছেন। দেখিয়েছেন, ডেথ ট্র্যাপে সোনা আছে, টাকা ইনভেস্ট করতে রাজি করিয়েছেন।

কিন্তু একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না, বাধা দিয়ে বললেন আঙ্কেল উইলসন, ম্যাকআরথার এ-কাজ করতে যাবে কেন? সে তো কোটিপতি। টাকার অভাব নেই। কেন তৃতীয় শ্রেণীর ঠগবাজি কুরতে যাবে?
দাঁত বের করে হাসল, না হুমকি দিল ম্যাকআরথার, বোঝা গেল না। বলল, বুঝতে পারছেন না, কারণ আমি এসব করিনি। বাজে গল্প ফেঁদেছে।
খনিতে ঢুকলেই প্রমাণ হয়ে যাবে, বলল কিশোর। গল্প না, সত্যি...।
খবরুদার! রাগে জ্বলে উঠল ম্যাকআরথার। আমার খনিতে ঢুকবে না! আগে আমার উকিলকে ডাকছি...
হ্যাঁ হ্যাঁ, ডাকো, কঠিন কণ্ঠে বললেন শেরিফ। তোমাকে অ্যারেস্ট করছি আমি। দরকার হলে অফিসে গিয়ে সার্চ ওয়ারেন্ট নিয়ে আসব।
শেরিফ, আপনি ওই পাগল ছেলেটার কথা বিশ্বাস করছেন?
আমার কাছে তো পাগল মনে হচ্ছে না।
থ্যাংক ইউ, শেরিফ, বলল কিশোর। আরেকটা ব্যাপার পরিষ্কার করে দিচ্ছি। হ্যারি আর বিংগোর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, মিসেস ফিলটার কোথায়? তোমাদের সঙ্গে কোথায় দেখা করার কথা?
মিসেস ফিলটার? শূন্য দৃষ্টিতে তাকাল হ্যারি।
আরে, ওই বুড়িটা, বলল বিংগো। ওই যে, ওদিকে ওই বাড়িটায় থাকে।
অবাক হলো কিশোর। তুমি তোমার মিসেস ফিলটার তোমাদের দলে ছিলেন না?
মাথা নাড়ল হ্যারি। ভাবে মনে হলো, সত্য কথাই বলছে।
জোরে জোরে কয়েকবার নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। আমি তো ভেবেছিলাম, মিসেস ফিলটারও চারজনের একজন। কিন্তু কোন প্রমাণ পাইনি, শুধু সমস্ত বর্ণনা পুরোপুরি মিলে যায়। ডাকাতির পর পরই ফিনিক্স থেকে নিখোঁজ হয়ে যান। তারপর, বাড হিলারি আর ডাকাতির ব্যাপারটা যখন তদন্ত করছি আমরা, আবার গায়েব হলেন তিনি।
চেঁচিয়ে উঠল ম্যাকআরথার, তখন থেকেই বলছি, ছেলেটা পাগল। নইলে মিসেস ফিলটারের মত মহিলাকে সন্দেহ করে? চকিতের জন্যে খনিমুখের দিকে তাকাল সে, দৃষ্টিতে শঙ্কার ছায়া।
আমি না হয় পাগল, কিন্তু আপনি ঘামছেন কেন, মিস্টার ম্যাকআরথার? ভুরু নাচাল কিশোর। হঠাৎ চাপড় মারল নিজের কপালে। আমি একটা আস্ত গাধা, ক্ষমার অযোগ্য, বুদ্ধ। হায়, হায়, কি ভেবেছি? ডাকাতিতে জড়িত ছিলেন বলে তো গায়েব হননি মহিলা! তাকে গায়েব করা হয়েছে! মিস্টার ম্যাকআরথার, আপনাকে চিনে ফেলেছিলেন তিনি, না? আপনার ব্যাপারে অস্বাভাবিক কিছু মনে পড়ে গিয়েছিল তাঁর। কি করেছেন তাকে, কোথায় রেখেছেন?

ঢোক গিলল ম্যাকআরথার। আমি কি জানি? আবার খনিমুখের দিকে তাকাল।
লাফিয়ে উঠে দৌড় দিল কিশোর। শেরিফের গাড়ি থেকে একটা শক্তিশালী টর্চ নিয়ে ছুটল খনির দিকে।
ম্যাকআরথারকে দেখিয়ে গর্জে উঠলেন শেরিফ, এ-ব্যাটাকে আটকাও, সহকারীকে নির্দেশ দিয়েই দৌড় দিলেন কিশোরের পেছনে। তাদেরকে অনুসরণ করল জিনা, মুসা, রবিন, আংকেল উইলসন।
ঢালু সুড়ঙ্গ ধরে প্রায় দৌড়ে নামতে লাগল কিশোর। তার ঠিক পেছনেই রয়েছে অন্যেরা।
যে দেয়ালে সোনার টুকরো পাওয়া গেছে, তার পাশ কাটিয়ে এল ওরা। মোড় নিয়ে সেই করিডরে ঢুকে পড়ল, যেটার শেষ মাথায় রয়েছে গর্ত, যাতে পাওয়া গেছে হিলারির লাশ।
ঠিকই অনুমান করেছে কিশোর।
খাদের ভেতরে পড়ে আছেন মিসেস ফিলটার। হাত-পা বাঁধা, মুখে রুমাল গোজা। অসহায়।
উজ্জ্বল হলো মিসেস ফিলটারের চোখ।
তাড়াতাড়ি ফিরে গিয়ে একটা মই এনে গর্তে নামলেন শেরিফ।
ইস্, খুব কষ্ট পেয়েছি, মুখ থেকে রুমাল সরাতেই বললেন মিসেস ফিলটার। আমি তো ভাবছিলাম আর বুঝি কেউ আসবেই না।
হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিতেই স্বচ্ছন্দে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। বাঁধা জায়গাগুলো বার কয়েক ডলে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করে নিলেন, হাত দিয়ে কাপড়ের ধুলো ঝেড়ে এসে মই ধরলেন।
মিসেস ফিলটারের সুটকেসটা তুলে আনলেন শেরিফ।
ঠগটা কোথায়? ওপরে উঠে জিজ্ঞেস করলেন মিসেস ফিলটার।
মিস্টার ম্যাকআরথার? পাল্টা প্রশ্ন করল কিশোর।
ও ম্যাকআরথার নয়। বাচ্চাটার মাঝে অদ্ভুত কি ছিল, পরে মনে হয়েছে। জন্মের সময়ই ওর চোখ ছিল বাদামী। এমনিতে, নীল চোখ নিয়ে জন্মায় যে কোন বাচ্চা, বড় হলে ধীরে ধীরে চোখের রঙ বদলায়, একেক জনের একেক রকম হয়। কিন্তু ম্যাকআরথারের জন্মের সময় যা ছিল, পরেও তাই রয়েছে, কয়েক বছর তো দেখেছি, এখনও নিশ্চয় ওরকমই আছে। নীল বদলে বাদামী হয়, কিন্তু বাদামী বদলে নীল হয়েছে শুনিনি।
লোকটাকে বলেছেন নাকি একথা?
বলেই তো পড়লাম বিপদে। বন্দুক ধরে রেখে আমাকে সুটকেস গোছাতে বাধ্য করল। এখানে এনে ফেলল। কোথায় সে?

বাইরে, জানালেন শেরিফ। আরেকটু পরেই হাজতে ঢুকবে।
হাজত তার জন্যে অনেক ভাল জায়গা, এই শাস্তি পছন্দ হচ্ছে না মিসেস ফিলটারের।
আপাতত এরচে খারাপ জায়গা আর পাচ্ছি না, মিসেস ফিলটার, হেসে বললেন শেরিফ। পরে অন্য ব্যবস্থা করব।
আসামীদেরকে হাজতে নিয়ে গেলেন শেরিফ।
সেই বিকেলেই ফিরে এলেন আবার আংকেল উইলসনের র‍্যাঞ্চে, একা। ইতিমধ্যে হ্যামবোনে গিয়ে মিসেস ফিলটারের পিকআপটা চালিয়ে নিয়ে এসেছেন উইলসন আর ভিকি।
উইলসনের ঘরেই রয়েছেন মিসেস ফিলটার, চা খাচ্ছেন বসে।
কি খবর, শেরিফ? শেরিফকে দেখে হাসলেন তিনি।
শেরিফও হাসলেন। একে একে তাকালেন তিন গোয়েন্দা আর জিনার দিকে। ঠিকই বলেছ তোমরা। ওই দুই ব্যাটা ডাকাতিতে জড়িত। একেবারে দাগী আসামী। অপকর্ম এর আগেও অনেক করেছে। চারটে স্টেটের পুলিশ খুঁজছে
ওদেরকে। আর হ্যাঁ, বাড হিলারিও ছিল ওদের দলে।
হারামীটার কি করলেন? জানতে চাইলেন মিসেস ফিলটার।
উকিলকে ফোন করেছে। লাভ হবে কচু। ওর আঙুলের ছাপ নিয়ে ওয়াশিংটনে পাঠিয়েছি। আমার ধারণা, পুলিশের খাতায় রেকর্ড মিলবেই। লোক ঠকানোয় ওস্তাদ তো, সেটা একবারে হয়নি। ঠিকই ধরেছেন, ম্যাকআরথার নয় সে, আসল ম্যাকআরথারের সঙ্গে ফোনে কথা বলে এলাম।
শুরু থেকেই বলছি, ওটা একটা আস্ত ভণ্ড! সুযোগ পেয়ে ঝাল ঝাড়ল জিনা। কেউ শুনলেন না আমার কথা। পুরানো গাড়িটার কথা যখন মিথ্যে বলল, তখনই বোঝা উচিত ছিল আমার চাচারু।
যা হবার হয়েছে, মিস জিনা, ভুল স্বীকার করছি, যাও, হাত-জোড় করে দেখিয়ে জিনার রাগ কমালেন শেরিফ। এখন তো ধরা পড়েছে। সার্চ ওয়ারেন্ট নিয়ে এসেছি, বাড়ি তল্লাশি করব ওর।
আরও প্রমাণ খুঁজছেন? জিজ্ঞেস করল রবিন।
হ্যাঁ। এবং দশ লাখ ডলার।
খবরটা হজম করার সময় দিলেন সবাইকে, তারপর বললেন, হ্যারি আর বিংগো মুখ খুলেছে। ওদের সঙ্গে যে মেয়েমানুষটা ছিল, তার নাম ভিকি নরমা...না না, ভিকি, তুমি চমকে ওঠো না, তুমি না। আরেকজন। জেলে পচছে এখন। ডাকাতি করে সোজা লঙর্সবুর্গে গিয়ে এক হোটেলে উঠেছিল চারজনে। কিন্তু পরদিন অন্য তিনজনকে ফাঁকি দিয়ে সব টাকা নিয়ে কেটে পরে চোরের সর্দার বাড হিলারি।

পালিয়ে আসে টুইন লেকসে। তারপর থেকে তার আর কোন খবর পায়নি সহকারীরা। ইতিমধ্যে আরেক চুরির কেসে ফেঁসে গিয়ে ধরা পড়ল ভিকি। কিন্তু হ্যারি আর বিংগোকে ধরতে পারেনি পুলিশ। তারা হিলারির লাশ পাওয়া গেছে শুনে ছুটে এসেছে টুইন লেকসে, টাকার সন্ধানে।
কিন্তু ম্যাকআরথার পেয়ে গিয়ে যে কোথাও লুকিয়ে রাখেনি, কি করে জানছেন? প্রশ্ন রাখল মুসা।
না, তা মনে হয় না, মাথা নাড়ল কিশোর। এত টাকা পেলে ও ঠগবাজি করার জন্যে আর এখানে বসে থাকত না এক মুহূর্তও। টাকাগুলো নিয়ে সোজা, নিখোঁজ হয়ে যেত। আমি ডাকাত হলে অন্তত তাই করতাম।
আমিও, শেরিফ বললেন। সেজন্যেই ভাবছি, টাকাগুলো কাছাকাছিই কোথাও রয়েছে। কিন্তু কোথায়? খনিতে নেই, আমি শিওর। লাশটা পাওয়ার পর খনির ভেতরে কোথাও খোঁজা বাদ রাখিনি, টাকা খুঁজিনি অবশ্য, সূত্র খুঁজেছি।
মিসেস ফিলটারের কোন ঘরে লুকায়নি তো? বলে উঠল জিনা। ওখানেই তো প্রথমে উঠেছিল হিলারি।
অসম্ভব না, একমত হলো মুসা। চলো, খোঁজা শুরু করি। আরিব্বাপরে, দশ লাখ। জিন্দেগীতে এক সঙ্গে চোখে দেখিনি।
এর চেয়ে অনেক বেশি দেখেছ, জলদস্যুর দ্বীপে, মনে করিয়ে দিল জিনা।
সে তো সোনার মোহর, নগদ টাকা না।
প্রথমে মিসেস ফিলটারের বাড়ি থেকে শুরু করল ওরা। এক ঘরে একটা : সোফার নিচে পাওয়া গেল আঙ্কেল উইলসনের হারানো ছুরি। কিন্তু টাকা নেই।
খনিতে খোঁজা হলো আরেকবার!!
খনির কাজকর্মের বিল্ডিং, নকল ম্যাকআরথারের কেবিন, চিরুনি দিয়ে উকুন খোঁজার মত করে খোঁজা হলো। তার বিরুদ্ধে যায়, এমন কিছু কাগজপত্র পাওয়া গেল? বেশ কিছু ধনী লোকের নাম ঠিকানার তালিকা, ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট বই- ধাপ্পা দিয়ে লোকের কাছ থেকে টাকা নিয়ে ওসব অ্যাকাউন্টে জমা করত ঠগটা। কিন্তু লুটের টাকা পাওয়া গেল না।
কেবিনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ঘনঘন নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর। শেরিফ বেরিয়ে আসতেই বলল, আর একটা মাত্র জায়গা আছে।
কোথায়? ভুরু কোচকালেন শেরিফ।
আংকেল উইলসনের গোলাঘরে।
হই হই করে ছুটল সবাই।
ধুলো আর মাকড়সার জালে ঢাকা কোণা-ঘুপচি কিছুই বাদ দেয়া হলো না? কিন্তু পাওয়া গেল না টাকা।

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে কাটতে পুরানো টি-মডেলের দিকে এগোল কিশোর। কি ভেবে ঢুকে গেল ভেতরে। শেরিফের কথা কানে আসছে, বোধহয় টাকাগুলো অন্য কোথাও রেখে এসেছিল ব্যাটা, টুইন লেকসে আনেইনি…
প্রথমেই পেছনের সীটে চাপ দিল কিশোর।
নড়ে উঠল গদি। আলগা।
হ্যাঁচকা টানে সরিয়ে আনল গদি। চেঁচিয়ে উঠল, পেয়েছি। পেয়েছি।
ছুটে এল সবাই। হুড়মুড় করে গাড়িতে উঠে পড়ল জিনা আর মুসা, অন্যেরা পারল না, জায়গা নেই।
আরিব্বাপরে! এত টাকা? চোখ বড় বড় করে ফেলল মুসা। যাক বাবা, চোখ সার্থক হলো।
সুন্দর পরিপাটি করে অনেকগুলো বাণ্ডিল করা হয়েছে নোটের তাড়া দিয়ে, যত্ন করে ভরেছে প্লাসটিকের ব্যাগে।…
একটা ব্যাগ ছিড়ল কিশোর। পাঁচ বছর পরেও আনকোরাই রয়েছে বিশ ডলারের নোটলো, তাজা গন্ধ আসছে।
গুণতে কদিন লাগবে? মুসার প্রশ্ন।
ঈশ্বরই জানে, হাত নাড়লেন শেরিফ। বাইরে দাঁড়িয়ে গাড়ির জানালায় নাকমুখ চেপে রেখেছেন, ধুলো-ময়লায় যে মাখামাখি হচ্ছে খেয়ালই নেই।
কয়েক দিন পর রকি বীচে ফিরে এসেছে তিন গোয়েন্দা। বিখ্যাত চিত্রপরিচালক, মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফারের অফিসে এসেছে দেখা করতে, সেই সাথে লেটেস্ট কেসের রিপোর্ট দিতে।
কি ব্যাপার? তিন গোয়েন্দাকে দেখে বললেন চিত্রপরিচালক। টেলিফোনে তো বললে মালির কাজ করতে গেছ? হাতে ফাইল কেন? জবাবটা নিজেই দিলেন। বুঝেছি। এমন একটা জায়গায় গেছ। রহস্য কি আর মিলবে না। তাছাড়া সঙ্গে ছিল জরজিনা পারকার…
হেসে ফাইলটা টেবিলের ওপর দিয়ে পরিচালকের দিকে ঠেলে দিল রবিন।
মন দিয়ে রিপোর্টের প্রতিটি শব্দ পড়লেন পরিচালক। তারপর মুখ তুললেন। মিসেস ফিলটারের কাছে মাপ চেয়েছ তো, কিশোর? ভাগ্য ভাল, বাড়ি গিয়ে তাকে পাওনি সেদিন, নইলে আরও লজ্জা পেতে।
পাইনি বলেই ভুলটা আরও বেশি হয়েছে, স্যার, স্বীকার করল কিশোর। নইলে জানতে পারতাম, নকল ম্যাকআরথারকে চিনে ফেলেছেন তিনি। আরও আগেই ধরা যেত হ্যারি আর বিংগোকে, জিনা আর মুসারও মরু-সফর হত না।
হুঁ, তা ঠিক, মাথা দোলালেন চিত্রপরিচালক। কিন্তু ডাকাতির পর পরই কোথায় গায়েব হয়ে গিয়েছিলেন মহিলা? টুইন লেকসে জায়গা কেনার টাকা পেলেন

কোথায়?
ঘটনাগুলো অনেকটা, কি বলব, কোইনসিডেন্সই হয়ে গেছে। ডাকাতিও। হলো, সেই সময় মিসেস ফিলটার খবর পেলেন, তার এক ফুফু মরে মরে অবস্থা। দোকানে খবর দেয়ার সময় পাননি তিনি, আর কিছুটা গাফিলতিও বটে, দেননি। না দিয়েই চলে গেলেন ফুফুকে দেখতে, আল পেসোতে। সেটা মে আর সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি। জান দিয়ে ফুফুর সেবা করলেন কয়েকদিন। কিন্তু বাঁচলেন না মহিলা, অনেক বয়েস হয়েছিল। চিরকুমারী ছিলেন, আর কোন আত্মীয় নেই। তাই, মৃত্যুর আগে যার কাছ থেকে সেবা পেয়েছেন, সমস্ত সম্পত্তি তাকেই দিয়ে গেছেন। তবে সেটা খুব বেশি কিছু ছিল না। তবু, সেটাই তখন ছিল মিসেস ফিলটারের কাছে অনেক বেশি। ফুফুর জায়গা বিক্রি করে দিয়ে টুইন লেকসে, তাঁর প্রিয় শহরে এসে জায়গা কিনলেন।
বুঝলাম।...তা, নকল ম্যাকআরথারকে কি আদালতে হাজির করেছে?
করেছে। তার আসল নাম জনি হারবার। অনেক জায়গায় তার নামে পুলিশ ওয়ারেন্ট আছে। অনেক জায়গায় ঠগবাজি করে এসেছে। শেষবার করতে চেয়েছে ডাৱাস-এর এক মস্ত ধনীর সঙ্গে। তাঁকে নিয়ে গিয়েছিল ডেথ ট্র্যাপ মাইন দেখাতে। শুধু ধাপ্পাবাজই নয়, পাকা জালিয়াতও সে। ব্যাঙ্ক সার্টিফিকেট আর জায়গার দলিল জাল করে মক্কেলদের দেখিয়েছে, সে কত বড় লোক। একেক জায়গায় গিয়ে একেক সময় একেক পরিচয় দিয়েছে। শেষবার ম্যাকআরথার সেজে এসেছে।
তবে ডেথ ট্যাপ মাইনে বিশেষ সুবিধে করতে পারেনি জনি, সময়ও পায়নি অবশ্য। আংকেল উইলসনের কাছ থেকে জায়গা কিনেছে পঁচিশ হাজার ডলারের, কিন্তু দিয়েছে মাত্র এক হাজার। বুঝিয়েছে, স্টক মার্কেটে তার কোটি কোটি টাকা আটকে গেছে, এই ছুটল বলে, তারপর এক সঙ্গে বাকি চব্বিশ হাজার দিয়ে দেবে। আসলে আর এক পয়সাও দিত না। খালি সময় বাড়াত, ইতিমধ্যে বোকা কিছু মক্কেল জুটিয়ে ভাল রকম একটা দাও মেরে সরে পড়ত একদিন। আগেও এ-রকম করেছে বহুবার।
কিশোর থামতেই রবিন বলল, কিন্তু এবার বাদ সাধলেন মিসেস ফিলটার। বুঝে ফেললেন লোকটা ম্যাকআরথার নয়। ফলে তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে খনির মুখে গর্তে ফেলে রাখল জনি। পিকআপটা নিয়ে গিয়ে রেখে এল হ্যামবোনে। এমনভাবে সাজল, যেন হঠাৎ জরুরী খবর পেয়ে তাড়াহুড়ো করে বেড়াতে কিংবা অন্য কোন কারণে চলে গেছেন মিসেস ফিলটার, কাউকে কিছু জানানোর সুযোগ পাননি। পিকআপটা হ্যামবোনে নিয়ে ফেলে এসেছে যাতে কেউ খুঁজে না পায়।

পার। পেয়েও যেত, কিন্তু এবারে জনির কপাল খারাপ। আমরা গিয়েছি টুইন লেকসে। তছাড়া হ্যারি আর বিংগোও গেছে লুটের টাকার খোঁজে।
মেকসিকান দুই শ্রমিকের ব্যাপারটা কি? জিজ্ঞেস করলেন পরিচালক। জনি হারবারের সহকারী ছিল?
না, জবাব দিল কিশোর। ওদেরকে শ্রমিকের কাজ করার জন্যেই ভাড়া করে এনেছে জনি। বেড়া দেয়া, বাড়িঘর রঙ করানো থেকে শুরু করে খনিতে ডিনামাইট ফাটানো, সব কাজই করত। তবে, ওরাও একেবারে সুধু নয়, সীমান্ত পেরিয়ে পালিয়ে এসেছে, বেআইনী অনুপ্রবেশ, তাই জনির শয়তানী কিছুটা বুঝে থাকলেও মুখ বুজে ছিল। আর এ-কারণেই বেছে বেছে ওদেরকে ভাড়া করেছে জনি।
তবেলোকগুলোভাল, মেকসিকোয় কাজের আশায়ই এসেছে, ক্রিমিনাল নয়, রবিন বলল। সব খুলে বলেছে আংকেল উইলসনকে। কর্তৃপক্ষেরসঙ্গে যোগাযোগ করে ওদের কাগজপত্র ঠিক করেছেন আংকেল, নিজের র‍্যাঞ্চে কাজ দিয়ে রেখে দিয়েছেন। জনির কুকুরটা নিয়ে এসেছে ভিকিখালা। এনেই আগে পেট ভরে। খাইয়েছে, তার ভক্ত হয়ে গেছে কুকুরটা। রাতে তার বিছানার পাশে শোয়। পেট ভরা থাকে, ফলে মুরগীর দিকে ফিরেও তাকায় না আর, চুরির স্বভাবও চলে গেছে।
শুনে সুখি হলাম, চেয়ারে হেলান দিলেন পরিচালক। চমৎকার একটা কেস। কিন্তু পুরোপুরি মীমাংসা হলো না সব কিছুর।
কোনটা, স্যার? জিজ্ঞেস করল মুসা।
বাড হিলারি খনিতে পড়ে মরেছে, এতে কোন সন্দেহ নেই, বললেন পরিচালক। কিন্তু কেন মরেছে, জানা যাবে না। আর টাকাগুলোই বা কেন টিফোর্ডের সীটের তলায় লুকাল?
অনুমান করা যেতে পারে, বলল কিশোর। সাময়িকভাবে হয়তো গাড়িতে টাকাগুলো লুকিয়েছিল হিলারি, তারপর খনিতে গিয়ে ঢুকেছিল আরও ভাল কোন জায়গা খোঁজার আশায়। তারপর কোন কারণে আর বেরোতে পারেনি। কারণটা কি, কোনদিন জানা যাবে না। আরও একটা ব্যাপার জানা যাবে না, খনিমুখ যখন বন্ধ করা হয়, তখন সে জীবিত ছিল, না মৃত...।
মৃতই হবে, বাধা দিয়ে বলল মুসা। নইলে হাঁকডাক শুনে মুখের কাছে চলে আসত। দেখলে তো আর তখন তাকে ভেতরে রেখে সীল করা যেত না।
কিন্তু তার আগেই যদি গর্তে পড়ে গিয়ে থাকে? পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মরে গেলে তো বেঁচে গেছে, কিন্তু যদি জীবিত থাকে? ক্ষুধাতৃষ্ণায় ধুকে ধুকে মরেছে বেচারা...
এত বড় শাস্তি আল্লা পম শত্রুকেও না দিক, কথাটা অন্তর থেকে বেরোল মুসার।

আরেকটা ব্যাপার, বললেন পরিচালক, লাশটা নিশ্চয় আগেই দেখেছিল জনি?
হ্যাঁ, কিশোর বলল, এ-জন্যে কাউকে খনিতে ঢুকতে দিত না, জানাজানি হলেই লোক ছুটে আসবে দলে দলে। চোরের মন পুলিশ পুলিশ। জনির হয়েছে। তাই বেশি লোক যাতায়াত করলে কত রকম গোলমালই হতে পারে, তার আসল কাজে বাধা আসতে পারে, তাই ব্যাপারটা চেপে রাখতে চেয়েছিল।
হুঁম, মাষ্টা দোলালেন পরিচালক।
আপনার জন্যে একটা জিনিস নিয়ে এসেছি, স্যার, পকেটে হাত ঢোকাল কিশোর। একটা ছোট স্যুভনির। তামা মেশানো সোনার টুকরোটা বের করে দিল।
খুব আগ্রহ দেখিয়ে জিনিসটা নিলেন পরিচালক। থ্যাংক ইউ। খনি থেকে পাওয়া কাঁচা সোনার টুকরো বেশ কয়েকটা আছে আমার, কিন্তু ওগুলো কৃত্রিম, আসল একটাও নেই। তার ওপর আবার নকশা কাটা...আচ্ছা, তামা মিশল কি করে? কার্তুজের ভেতরে তো জানি, সীসা বা লোহার বল থাকে?
সেটাও জনি হারবারের কীর্তি, হেসে বলল কিশোর। নিজেই কার্তুজ বানিয়ে নিয়েছে সে, লোহার বলের জায়গায় ছোট ছোট তামার টুকরো ভরেছে।
হুঁ, চালাক ঠিকই। ফেঁসে গেছে কপাল খারাপ বলে।...নুড়িটা কি করেছ?
জিনাকে দিয়ে দিয়েছি।
ওটা ওর প্রাপ্য, মুসা বলল, আরিবারে, অনেক মেয়ে দেখেছি, কিন্তু ওর মত মেয়ে খুনে ডাকাতগুলোর সঙ্গেও যা...ইয়ে, যা...
গোয়ার্তুমি, শব্দটা ধরিয়ে দিলেন চিত্রপরিচালক।
হ্যাঁ, যা গোয়ার্তুমি করল। কিছুঁতেই হেঁটে যেতে রাজি হলো না ভাকাতগুলোর সঙ্গে। গেলে আর আমাদের খুঁজে পেত না হেলিকপ্টার। এই কেসই হত তিন গোয়েন্দার শেষ কেস।

ভলিউম ৩ – হারানো তিমি – তিন গোয়েন্দা – রকিব হাসান – সেবা প্রকাশনী

ওই যে, তিমির ফোয়ারা! চেঁচিয়ে উঠল উত্তেজিত রবিন। আরে দেখছ না, ওই যে…ওইই, সাগরের দিকে হাত তুলে দেখাল সে।

এইবার দেখল মুসা। ঠিকই। তীর থেকে মাইল তিন-চার দূরে ভেসে উঠেছে যেন ছোটখাট এক দ্বীপ, পানির ফোয়ারা ছিটাচ্ছে। মিনিটখানেক এদিকওদিক পানি ছিটিয়ে ডুবে গেল আবার ধূসর মস্ত জীবটা।

সৈকতের ধারে উঁচু পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে তিন গোয়েন্দা ও কিশোর পাশা, মুসা আমান আর রবিন মিলফোর্ড। আবার এসেছে বসন্ত, স্কুল ছুটি। এই ছুটিতে তিমির ওপর গবেষণা চালাবে ওরা, ঠিক করেছে। খুব ভোরে তাই সাইকেল নিয়ে ছুটে এসেছে সাগর পারে, তিমির যাওয়া দেখার জন্যে।

প্রতি বছরই ফেব্রুয়ারির এই সময়ে আলাসকা আর মেকসিকো থেকে আসে তিমিরা, হাজারে হাজারে, প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল ধরে চলে যায়, যাওয়ার পথে থামে একবার বাজা ক্যালিফোর্নিয়ায়। মেয়েরা বাচ্চা দেয় ল্যাগুনের উষ্ণ পানিতে, পুরুষেরা বিশ্রাম নেয়।

কয়েক হপ্তা পর বাচ্চারা একটু বড় হলে আবার বেরিয়ে পড়ে ওরা। এবার আর থামাথামি নেই, একটানা চলা। প্রায় পাঁচ হাজার মাইল সাগরপথ পেরিয়ে গিয়ে পৌঁছায় উত্তর মেরুসাগরে। গরমের সময় ওখানকার পানি ছেয়ে থাকে খুদে চিঙড়ি আর প্ল্যাঙ্কটনে, ধূসর তিমির প্রিয় খাবার।

যাওয়ার সময় সবাই দেখে ওদেরকে, বলল রবিন, কিন্তু ফেরার সময় দেখে। আগের দিন রকি বীচ লাইব্রেরিতে তিমির ওপর পড়াশোনা করে কাটিয়েছে সে। যা যা গিলেছে সেগুলো উগড়াচ্ছে এখন।

কেন? জানতে চাইল মুসা।

ফেরার পথে হদিস রাখা যায় না বোধহয়, হাতের খোলা নোটবুকের দিকে তাকাল আরেকবার রবিন। যাওয়ার সময় দল বেঁধে যায় ওরা, সবার চোখে পড়ে। ফেরার পথে বড় একটা পড়ে না, হয়তো একা একা ফেরে বলে। কারও কারও মতে ফেরে একা নয়, জোড়ায় জোড়ায়। তাহলেও বিশাল সাগরে দুটো তিমির পেছনে কে কতক্ষণ লেগে থাকতে পারবে? পথ তো কম নয়, হাজার হাজার মাইলের ধাক্কা।

তা ঠিক, সায় দিল মূসা। কিশোর, তোমার কি মনে হয়? কিন্তু ওদের কথায় কান নেই গোয়েন্দাপ্রধানের। দূরে সাগরের যেখানে তিমির ফোয়ারা দেখা গেছে, সেদিকেও চোখ নেই। সে তাকিয়ে আছে নিচের নির্জন সৈকতের একটা অগভীর খাঁড়ির দিকে। আগের দিন রাতে ঝড় হয়েছিল, ঢেউ নানারকম জঞ্জাল-ভাসমান কাঠের গুড়ি, প্ল্যাসটিকের টুকরো, খাবারের খালি টিন, উপড়ানো আগাছা, শেওলা, আরও নানারকম টুকিটাকি জিনিস এনে ফেলেছে খাঁড়িতে।

কি যেন একটা নড়ছে, বলে উঠল কিশোর। চলো তো, দেখি। কারও জবাবের অপেক্ষা না করেই ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল সে। তাকে অনুসরণ করল অন্য দুজন।
ভাটা শুরু হয়েছে, ইতিমধ্যেই অর্ধেক নেমে গেছে পানি। খাঁড়ির কাছে এসে থামল কিশোর, আঙুল তুলে দেখাল।
আরে তিমি! মুসা বলল। মাথা ঝাঁকাল কিশোর। আটকে গেছে। সাহায্য না পেলে মরবে।
তাড়াতাড়ি জুতো-মোজা খুলে নিল তিনজনে। শুকনো বালিতে রেখে, প্যান্ট গুটিয়ে এসে নামল কাদাপানিতে।
ছোট্ট একটা তিমি, মাত্র ফুট সাতেক লম্বা। বাচ্চা তো, তাই এত ছোট-ভাবল রবিন। ঝড়ের সময় কোনভাবে মায়ের কাছছাড়া হয়ে পড়েছিল, ঢেউয়ের ধাক্কায় এসে আটকা পড়েছে চরায়।
সৈকত এখানে বেশ ঢালু, ফলে খুব দ্রুত নামছে পানি। ওরা তিমিটার কাছে আসতে আসতেই গোড়ালি পর্যন্ত নেমে গেল পানি এতে সুবিধেই হলো ওদের। বেশি পানি হলে অসুবিধে হত, ভীষণ ঠাণ্ডা পড়েছে, বরফ-শীতল পানি। তবে পানি কমে যাওয়ায় বাচ্চাটা পড়ল বিপদে, সাগরে নামতে পারছে না।
তিনজনে মিলে গায়ের জোরে ঠেলা-ধাক্কা দিল, কিন্তু নড়াতে পারল না ওটাকে। হাজার হোক তিমির বাচ্চা তো, যত ছোটই হোক, মানুষের জন্যে বেজায় ভারি। তিরিশ মণের কম না, ভাবল কিশোর। বান মাছের মত পিচ্ছিল শরীর, হাত পিছলে যায়। তার ওপর না ধরা যাচ্ছে পাখনা, না লেজ, কিছু ধরে টেনেটুনে যে সরাবে তারও উপায় নেই। বেশি জোরে টানাটানি করতেও ভয় পাচ্ছে, কি জানি কোথাও যদি আবার ব্যথা পায় তিমির বাচ্চা।
ওদের মোটেও ভয় পাচ্ছে না বাচ্চাটা, যেন বুঝতে পেরেছে, ওকে সাহায্য করারই চেষ্টা হচ্ছে। অদ্ভুত দৃষ্টিতে দেখছে ওদেরকে। কথা বলতে পারলে বুঝি বলেই উঠত মারো জোয়ান হেঁইও, জোরসে মারো হেঁইও। .
রবিন এসে দাঁড়াল মাথার কাছে। বিশাল মাথা ধরে ঠেলার চেষ্টা করতে গিয়েই খেয়াল করল, ফোয়ারার ছিদ্রটা অন্যরকম। ভুল ভেবেছে এতক্ষণ। বাচ্চা তিমি না এটা।
কিশোর আর মুসাকে কথাটা বলতে যাবে, এই সময় বিশাল এক ঢেউ এসে আছড়ে পড়ল, এক ধাক্কায় চিত করে ফেলল ওদেরকে। হাঁচড়ে-পাঁচড়ে আবার খাড়া হলো ওরা, ততক্ষণে চলে গেছে পানি। ঢেউ আসার আগে গোড়ালি অবধি ছিল, সেটা কমে গিয়ে হয়েছে বুড়ো আঙুল সমান। খাঁড়ি থেকে উঠে তিমিটা গিয়ে

আরও খারাপ জায়গায় আটকেছে, সৈকতের বালিতে। খাঁড়িতে যা হোক কিছু পানি আছে, ওখানে তা-ও নেই।
মরছে, বলে উঠল মুসা। এবার আরও ভালমত আটকাল। জোয়ার আসতে আসতে কর্ম খতম।
বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল রবিন। হ্যাঁ, আরও অন্তত ছয় ঘণ্টা।
শুকনোয় এতক্ষণ বাঁচতে পারে তিমি? জিজ্ঞেস করল মুসা।
মনে হয় না। পানি না পেলে খুব তাড়াতাড়ি ডি-হাইড্রেটেড হয়ে পড়ে ওদের শরীর, চামড়া শুকিয়ে খসখসে হয়ে যায়।
ঝুঁকে বিশাল মাথাটায় আলতো চাপড় দিল রবিন, দুঃখ হচ্ছে তিমিটার জন্যে। পানিতে রাখতে হবে, নইলে বাঁচবে না।
কথা বুঝতে পেরেই যেন ক্ষণিকের জন্যে চোখ মেলল তিমি। বিষণ্ন হতাশা মাখা দৃষ্টি, রবিনের তা-ই মনে হলো। ধীরে ধীরে আবার চোখের পাতা বন্ধ করল তিমিটা।
কিভাবে রাখব। বলল মুসা, পানিতে যখন ছিল তখনই ঠেলে সরাতে পারিনি, আর এখানে তো খটখটে শুকনো।
জবাব দিতে পারল না রবিন। কিশোরের দিকে তাকাল। অনেকক্ষণ কোন কথা বলছে না গোয়েন্দাপ্রধান, তাদের আলোচনায় মন নেই।
গভীর চিন্তায় মগ্ন কিশোর, ঘন ঘন তার নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটা দেখেই সেটা বোঝা যাচ্ছে। বিড়বিড় করল, পর্বতের কাছে যদি যাওয়া না যায় পর্বতকেই কাছে আনতে হবে।
আরে, এই কিশোর, জোরে বলল মুসা, কি বলছ? ইংরেজী বললো, ইংরেজী বললো। এখানে কিসের পর্বত? আমরা পড়েছি তিমি-সমস্যায়।
মাঝে মাঝে কঠিন শব্দ বলা কিংবা দুর্বোধ্য করে কথা বলা কিশোরের স্বভাব।
তিমির কথাই তো বলছি। সাগরে দেখাল কিশোর, ওই যে, পর্বত, ওটাকেই কাছে আসতে বাধ্য করতে হবে। একটা বেলচা দরকার। আর...আর একটা তুরপুলিন। আর পুরানো একটা হ্যাণ্ড পাম্প, গত মাসে যেটা বাতিল মালের সঙ্গে কিনে এনেছে চাচা...
গর্ত, চেঁচিয়ে উঠল রবিন।
গর্ত! কিসের গর্ত? মুসা অবাক।
একটা গর্ত খুঁড়ে, তাতে তারপুলিন বিছিয়ে পাম্প করে পানি দিয়ে ভরে দিতে হবে গর্তটা, বলল কিশোর। ছোটখাট একটা সুইমিং পুল বানিয়ে দেব তিমিটার জন্যে, যতক্ষণ না জোয়ার আসে টিকে থাকতে পারবে।

দ্রুত সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর ঠিক হলো, সাইকেল নিয়ে পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে গিয়ে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে আসবে মুসা আর রবিন। ততক্ষণ তিমিটাকে পাহারা দেবে কিশোর।
মুসা, রবিন চলে গেল। কিশোর বসে রইল না। প্লাসটিকের একটা বাঁকাচোরা বাকেট খুঁজে আনল খাঁড়ি থেকে। হাত দিয়ে চেপেচুপে কোনমতে কিছুটা সোজা করে নিয়ে ওটাতে করে পানি এনে গায়ে ছিটাল তিমিটার।
পরের আধ ঘণ্টা পানি ছিটানোয় ব্যস্ত রইল কিশোর। রবিন আর মুসা যা করতে গেছে, তার চেয়ে কঠিন কাজ করতে হচ্ছে তাকে, সন্দেহ নেই। ঢালু ভেজা পাড় বেয়ে সাগরে নেমে পানি তুলে নিয়ে দৌড়ে ফিরে আসতে হচ্ছে, এতবড় একটা শরীর ভিজিয়ে রাখা সোজা কথা নয়। ছোট বাকেটে কতটুকুই বা পানি ধরে, তার ওপর তিমির চামড়া যেন মরুভূমির বালি, পানি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শুঁষে নিচ্ছে।
গতর খাটাতে কোন সময়েই বিশেষ ভাল লাগে না কিশোরের। ঠেকায় পড়লে কাজ করে, তার চেয়ে মগজ খাটানো অনেক বেশি পছন্দ তার। ওই যে, এসে গেছে, তিমিটাকে বলল সে।
হাঁপাতে হাঁপাতে এসে দাঁড়াল দুই সহকারী গোয়েন্দা। যা যা দরকার নিয়ে এসেছে। প্রায় নতুন একটা বেলচা, তারপুলিনের রোল, হ্যাণ্ড-পাম্প, হোস। পাইপের কুণ্ডলী নামিয়ে রাখল বালিতে।
কিশোরও হাঁপাচ্ছে। বলল, ওটার গা ঘেষে গর্ত খুঁড়তে হবে। তারপর যে ভাবেই হোক ঠেলেঠুলে ফেলব গর্তে। তিনজনের মাঝে গায়ে জোর বেশি মুসার, কায়িক পরিশ্রমেও অভ্যস্ত, বেলচাটা সে-ই আগে তুলে নিল। গর্তের বেশির ভাগটাই সে খুঁড়ল। ভেজা বালি, আলগা, খুঁড়তে বিশেষ বেগ পেতে হলো না, সময়ও লাগল না তেমন। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই দশ ফুট লম্বা, তিন ফুট চওড়া আর তিন ফুট মত গভীর একটা গর্ত খুঁড়ে ফেলল ওরা।
গর্তে তারপুলিন বিছিয়ে দিল ভালভাবে, চারপাশের দেয়ালও তারপুলিনে ঢাকা। পড়ল, ফলে পানি শুঁষে নিতে পারবে না বালি। পাম্প নিয়ে সাগরের দিকে দৌড়াল মুসা। রবিন আর কিশোর হোস পাইপের কুণ্ডলী খুলল, পাম্পের সঙ্গে এক মাথা লাগিয়ে আরেক মাথা টেনে এনে ফেলল গর্তে। পাম্পটা বেশ ভাল, কোন মাছধরা নৌকায় পানি সেঁচার কাজে ব্যবহার হত হয়তো।
পালা করে পাম্প করে অল্পক্ষণেই গর্তটা পানি দিয়ে ভরে ফেলল ওরা।
সব চেয়ে শক্ত কাজটা এবার, ফোস করে নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর।
আল্লাহ ভরসা, হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছল মুসা। এসো ঠেলা লাগাই।

দাঁড়াও, একটু জিরিয়ে নিই, ধপাস করে বালিতে বসে পড়ল কিশোর। আর কয়েক মিনিটে মরবে না।
জিরিয়ে নিয়ে উঠল ওরা। ভারি পিপে ঠেলে গড়িয়ে নেয়ার ভঙ্গিতে তিমির গায়ে হাত রেখে দাঁড়াল কিশোর আর মুসা। মাথার কাছে চলে এল রবিন। তিমির মাথায় আলতো চাপড় দিল।
চোখ মেলল তিমি। রবিনের মনে হলো, তার দিকে চেয়ে হাসছে।
ঠেলো বললেই ঠেলা লাগাবে। এক সঙ্গে... কিন্তু কিশোরের কথা শেষ হলো না। তার আগেই ভীষণভাবে নড়ে উঠল তিমি। বান মাছের মত মোচড় দিয়ে শরীর বাঁকিয়ে, বালিতে লেজের প্রচণ্ড ঝাপটা মেরে পাশে সরে গেল, ঝপাত করে কাত হয়ে পড়ল পানিতে। পানি ছিটকে উঠল অনেক ওপরে।
তিমির গায়ে বেশি ভর দিয়ে ফেলেছিল মুসা, উপুড় হয়ে পড়ে গেল সে। লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল আবার। চেঁচিয়ে উঠল, ইয়াল্লা!
আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল রবিন।
হাতের তালু ঝাড়তে ঝাড়তে কিশোর বলল, যাক বাবা, বাঁচা গেল। নিজের কাজ নিজেই সেরে নিল।
পুরো এক মিনিট পানিতে গা ডুবিয়ে রইল তিমি, মুখ দিয়ে পানি টানল, তারপর সামান্য ভেসে উঠে ফোয়ারা ছিটাল মাথার ফুটো দিয়ে, তিন গোয়েন্দার গা ভিজিয়ে দিয়ে যেন ধন্যবাদ জানাল।
ঝকঝকে সাদা দাঁত বের করে হাসল মুসা। ব্যাটা, আবার রসিকতা জানে...
যাক, মুসার কথায় কান না দিয়ে বলল রবিন, জোয়ার আসাতক বেঁচে থাকতে পারবে।
জোয়ার তো সময়মত ঠিকই আসবে, আমাদেরও সময়মত যাওয়া দরকার, বলল কিশোর। মনে নেই, আজ ইয়ার্ডে কাজ আছে? তাছাড়া নাস্তা...
যাহ, মুসা বলল, এক্কেবারে ভুলে গেছি! আপেলের বরফি আর মুরগীর রোস্ট খাওয়াবেন কথা দিয়েছেন মেরিচাচী! চলল, চলো। তিমিটার দিকে ফিরল, হেই মিয়া, তুমি পানি খাও, আমরা যাই, মুরগী ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।
মুসার কথায় সায় জানাতেই যেন আরেকবার তাদের গায়ে পানি ছিটাল তিমি।
গর্তের কিনারে এসে দাঁড়াল রবিন। তিমিটার উদ্দেশ্যে বলল, থাক। কোন অসুবিধে হবে না। আবার আসব আমরা।
তাড়াহুড়ো করে জুতোমোজা পরে নিল তিনজনে। পাম্প, বেলচা আর হোসপাইপ গুছিয়ে নিয়ে এসে উঠল পাড়ের ওপর। মাটিতে শুইয়ে রাখা সাইকেলগুলো তুলে মাল বোঝাই করল। রওনা হতে যাবে, এই সময় একটা শব্দে ফিরে তাকাল কিশোর।

মাইল দুয়েক দূরে ছোট একটা জাহাজ-একটা কেবিন ক্রুজার, আউটবোর্ড মোটর-ধীরে ধীরে চলেছে। দুজন লোক দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এত দূর থেকে চেহারা বোঝা গেল না।
হঠাৎ আলোর ঝিলিক দেখা গেল জাহাজ থেকে। পর পর তিনবার।
আয়নার সাহায্যে সিগন্যাল দিচ্ছে, বলল মুসা।
মাথা নাড়ল কিশোর, আমার মনে হয় না। যেভাবে ঝলকাচ্ছে, কোন নিয়মিত প্যাটার্ন নেই। অন্য কোন জিনিস, বোধহয় বিনকিউলারের কাচে রোদ লেগে প্রতিফলিত হচ্ছে।
ব্যাপারটা অন্য দুজনের কাছে তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে হলো না, কিন্তু কিশোর সাইকেলে চড়ল না। স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে জাহাজটার দিকে। নাক ঘুরে গেছে ওটার, ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে এদিকেই।
কি হলো, চলো, অধৈর্য হয়ে তাড়া দিল মুসা। সব কিছুতেই রহস্য খোঁজার স্বভাব ছাড়ো। রোজ শয়ে শয়ে লোক এদিক দিয়ে যায় আসে, তাছাড়া ইদানীং অনেকেই আমাদের মত শখের তিমি গবেষক হয়েছে। তিমির যাওয়া দেখার শখও আমাদের একলার না।
জানি, সন্তুষ্ট হতে পারছে না কিশোর, হ্যাণ্ডেল ধরে ঠেলে নিয়ে চলল সাইকেল বাধ্য হয়ে রবিন আর মুসাকেও ঠেলেই এগোতে হলো। কিন্তু বোটের লোকটা তিমি দেখছে না। ওর বিনকিউলারের চোখ তীরের দিকে, এদিকে। আমাদেরকেই দেখছে না তো?
দেখলে দেখছে। কোন অসুবিধে আছে তাতে? বলল মুসা।
জবাব দিল না কিশোর।
মেরিচাচী অপেক্ষা করছেন। হাসিখুশি মানুষ, সারাক্ষণ হাসি লেগেই আছে মুখে। হাসেন না শুধু ছেলেদেরকে কাজ করানোর সময়, আর ইয়ার্ডের দুই কর্মচারী-দুই ব্যাভারিয়ান ভাই বোরিস আর রোভারকে খাটানোর সময়। ও, আরও একটা সময় হাসেন না, যখন রাশেদচাচা একগাদা পুরানো বাতিল জঞ্জাল মাল নিয়ে আসেন, যেগুলো কোনভাবেই বিক্রি করা যাবে না, তখন।
মাল জোগাড়েই ব্যস্ত থাকেন রাশেদ পাশা, ইয়ার্ডের দেখাশোনা মেরিচাচীকেই করতে হয়। কোনটা সহজেই নেবে খদ্দের, কোনটা নেবে না, স্বামীর চেয়ে অনেক ভাল বোঝেন তিনি।
তিন ছেলেকে দেখে হাঁ হাঁ করে উঠলেন মেরিচাচী, এই, তোরা কি রে? সেই কখন থেকে খাবার নিয়ে বসে আছি, সব জুড়িয়ে গেল, সাইকেল থেকে কিশোরকে পাম্প নামাতে দেখে অবাক হলেন তিনি। আরে এই কিশোর, পাম্প নিয়েছিলি

কেন? রবিন আর মুসা নিয়ে যাওয়ার সময় দেখেননি তিনি, বোরিসের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে গিয়েছিল ওরা।
সাগর সেঁচতে গিয়েছিলাম, চাচী, হাসল কিশোর।
তোর মাথা-টাতা খারাপ হয়ে যায়নি তো, এই কিশোর।
মুসার এখন পেট জ্বলছে, মজা করার সময় নেই, তাড়াতাড়ি সব বুঝিয়ে বলল মেরিচাচীকে।
ভরপেট নাস্তা খেয়ে কাজে লেগে গেল তিন গোয়েন্দা। দুপুর পর্যন্ত গাধার মত খাইল। দুপুরের খাওয়া রেডি করে ডাকলেন মেরিচাচী। হাতমুখ ধুয়ে এসে খেতে কসল ওরা।
খাওয়ার পর আবার রওনা হলো সাগর পারে, তিমিটাকে দেখতে।
হয়তো গড়িয়ে-টড়িয়ে নেমে চলে গেছে সাগরে, বলল বটে মুসা, কিন্তু কথাটা সে নিজেই বিশ্বাস করতে পারছে না।
অসম্ভব, রবিন বলল, যা শুকনো বালি…নাহ, ইমপসিবল।
কিশোর চুপ। গর্তের আশেপাশে ঘুরছে, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কি দেখছে বালিতে।
একটা ট্রাক এসেছিল, সঙ্গীদের দিকে ফিরল কিশোর, ফোর হুইল ড্রাইভ। ওই ওদিকে কোথাও দিয়ে নেমেছিল, তারপর সৈকত ধরে এগিয়ে এসেছে। এই যে এখানটায়, গর্তের দিকে পেছন করে দাঁড়িয়েছিল অনেকক্ষণ, কয়েক ইঞ্চি দেবে গিয়েছিল চাকা, পরে সামনের চাকার নিচে বোর্ড ফেলে তুলতে হয়েছে।
কোনটা কিসের দাগ বুঝিয়ে দিল কিশোর।
ট্রাক! বিড়বিড় করল মুসা।
কেন, কোন সন্দেহ আছে?
তারমানে তুলে নিয়ে গেছে তিমিটাকে?
তাই করেছে, জোর দিয়ে বলল কিশোর। কিন্তু কারা? চরায় আটকা পড়ায় তিমি কারা নিতে পারে? কাদের দায়িত্ব?
জবাবের অপেক্ষা করল সে। এগিয়ে গিয়ে গর্ত থেকে তারপুলিনটা ধরে টান দিল। তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল রবিন আর মুসা।
ওশন ওয়াল্ড, আধ ঘণ্টা পরে প্রশ্নের জবাব দিল কিশোর নিজেই। সকালে আমরা চলে আসার পর কেউ গিয়েছিল সৈকতে, তিমিটাকে দেখে ওশন ওয়ারল্ডে খবর পাঠিয়েছিল। ওরাই এসে তুলে নিয়ে গেছে।
হেডকোয়ার্টারে বসে আছে তিন গোয়েন্দা।
তিরিশ ফুট লম্বা একটা মোবাইল হোম ট্রেলারের ভেতরে গঠিত হয়েছে হেডকোয়ার্টার। অনেক আগে ওটা কিনে এনেছিলেন রাশেদ পাশা, বিক্রি হয়নি। নানা রকম লোহালক্কড়ের জঞ্জালের নিচে এখন পুরোপুরি চাপা পড়ে গেছে

ট্রেলারটা। তার ভেতরে ঢোকার কয়েকটা গোপন পথ আছে, জানে শুধু তিন গোয়েন্দা। পথগুলো ওরাই বানিয়েছে।
অনেক যত্নে হেডকোয়ার্টার সাজিয়েছে ওরা। ভেতরে ছোটখাট একটা আধুনিক ল্যাবরেটরি বসিয়েছে, ফটোগ্রাফিক ডার্করুম করেছে, অফিস সাজিয়েছে–চেয়ার টেবিল ফাইলিং কেবিনেট সবই আছে। একটা টেলিফোনও আছে, বিল ওরাই দেয়। অবসর সময়ে ইয়ার্ডে কাজ করে, মুসা আর কিশোর, পারিশ্রমিক নেয়। স্থানীয় পাবলিক লাইব্রেরিতে বই সাজানো-গোছানোর পার্ট টাইম চাকরি করে রবিন। তাছাড়া গোয়েন্দাগিরি করেও আজকাল বেশ ভাল আয় হচ্ছে।
টেলিফোন ডিরেক্টরিটা টেনে নিল কিশোর, ওশন ওয়ারল্ডের নাম্বার বের করে। ডায়াল করল।
ফোনের সঙ্গে স্পীকারের যোগাযোগ করা আছে, ওপাশের কথা তিনজনে একই সঙ্গে শোনার জন্যে এই বিশেষ ব্যবস্থা।
রিঙ হওয়ার শব্দ শোনা গেল, তারপর জবাব এল।
ওশন ওয়ারল্ডে ফোন করার জন্যে ধন্যবাদ কেমন যেন যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর, সাজানো কথা। টোপাঙ্গা ক্যানিয়নের উত্তরে, প্যাসিফিক কোস্ট হাইওয়ের ঠিক পাশেই মিলবে ওশন ওয়ারল্ড। গড়গড় করে আরও অনেক কথা বলে গেল লোকটাঃ টিকেটের দাম কত, দেখার কি কি জিনিস আছে, কোন দিন কটা থেকে কটা পর্যন্ত খোলা থাকে, ইত্যাদি। বলল, ওশন ওয়ার্ল্ড রোজই ভোলা থাকে, সকাল দশটা থেকে বিকেল ছটা পর্যন্ত সোমবার ছাড়া... রিসিভার নামিয়ে রাখল কিশোর। এটাই জানতে চেয়েছিল।
হায় হায়রে, কপাল চাপড়াল মুসা, বদনসীব একেই বলে। হপ্তার যে দিনটায় বন্ধ সেদিনই ফোন করলাম আমরা।
আনমনে মাথা ঝোঁকাল কিশোর। ভাবছে কি যেন, নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটা শুরু হয়েছে।
তো এখন কি করব? জিজ্ঞেস করল রবিন। আগামীকাল আবার ফোন করব?
ফোন করে আর কি হবে? বলল কিশোর। যা জানার তো জেনেছিই। মাত্র কয়েক মাইল এখান থেকে। সাইকেলেই যাওয়া যাবে। কাল একবার নিজেরাই গিয়ে দেখে আসি না কেন?
পরদিন সকাল দশটায় ওশন ওয়ারল্ডের বাইরে সাইকেল-স্ট্যাণ্ডে সাইকেল রেখে টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকল তিন গোয়েন্দা। খানিকক্ষণ ঘুরে বেড়াল বিশাল অ্যাকোয়ারিয়ামের আশেপাশে, কৃত্রিম ল্যাগুনে সী-লায়নের খেলা দেখল, তীরে পেইনের হুটোপুটি দেখল, তারপর চলল অফিসবিল্ডিঙের দিকে। একটা দরজার ওপরে সাদা কালিতে ইংরেজিতে লেখা রয়েছে : অ্যাডমিনিসট্রেশন।

দরজায় টোকা দিল কিশোর।
মোলায়েম মেয়েলী গলায় সাড়া এল ভেতর থেকে, কাম ইন।
অফিসে ঢুকল তিন গোয়েন্দা।
ডেস্কের ওপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক তরুণী পরনে টু-পীস সুইম স্যুট-সাঁতার কাটতে যাচ্ছিল বোধহয়। গায়ের চামড়া রোদে পোড়া, গাঢ় বাদামী। ছোট করে ছাটা কালো চুল, কোমল, রেড ইণ্ডিয়ানদের মত। মুসার চেয়েও লম্বা, চওড়া কাঁধ, অস্বাভাবিক সরু কোমর, কেন যেন মাছের কথা মনে করিয়ে দেয়। মনে হয়, ডাঙার চেয়ে পানিতেই তাকে মানাবে ভাল।
আমি চিনহা শ্যার্টানোগা, বলল তরুণী। কিছু বলবে?
একটা তিমির খবর নিতে এসেছি, বলল কিশোর। চরায় আটকা পড়েছিল... খুলে বলল সে।
নীরবে সব শুনল টিনহা। কিশোরে কথা শেষ হলে বলল, কবের ঘটনা? গতকাল?
মাখা ঝোঁকাল কিশোর।
গতকাল আমি ছিলাম না। আলমারি খুলে একটা ডাইভিং মাস্ক বের করল টিনহা। সোমবারে দু-চারজন শুধু স্টাফ থাকে, আর সবার ছুটি! মাস্কের ফিতে খুলে নিয়ে আবার ছেলেদের দিকে ফিরল সে, কিন্তু গতকাল কোন তিমি আনা হলে, আমি আজ আসার সঙ্গে সঙ্গে জানানো হত আমাকে।
আনা হয়নি? হতাশ শোনাল রবিনের কণ্ঠ।
মাথা নাড়ল টিনহা। মাস্কটা দেখতে দেখতে বলল, না, আনলে জানানো হতই। সরি, কিছু করতে পারলাম না তোমাদের জন্যে।
না না, দুঃখ পাওয়ার কি আছে... তাড়াতাড়ি বলল মুসা।
আমি দুঃখিত, আবার বলল টিনহা। আমাকে এখন যেতে হচ্ছে। একটা শো আছে।
যদি তিমিটা সম্পর্কে কিছু জানতে পারেন, তিন গোয়েন্দার একটা কার্ড বের করে দিল কিশোর, আমাদের জানালে খুব খুশি হব।
কার্ডটা নিয়ে টেবিলে রেখে দিল টিনহা, একবার চোখ বুলিয়েও দেখল না।
ঘুরে সারি দিয়ে দরজার দিকে এগোল ছেলেরা। দরজা খোলার জন্যে সবে হাত বাড়িয়েছে মুসা, পেছন থেকে ডেকে বলল টিনহা, তিমিটার জন্যে সত্যিই কষ্ট হচ্ছে তোমাদের, না? সাধারণ একটা পাইলট কিংবা গ্রে...
হ্যাঁ, হচ্ছে, বাধা দিয়ে বলল রবিন। কারণ ওটাকে বাচাতে অনেক কষ্ট করেছি।
চিন্তা কোরো না, হাসল টিনহা। ভালই আছে ওটা। কেউ ওটাকে নিশ্চয় উদ্ধার করে নিয়ে গেছে, বলেই আরেক দিকে তাকাল সে।

স্ট্যাণ্ড থেকে সাইকেল নিয়ে ঠেলে এগোল কিশোর, চড়ল না। নিশ্চয় কোন উদ্দেশ্য আছে, বুঝতে পারল অন্য দুজন, তারাও ঠেলে নিয়ে এগোল।
ওশন ওয়ার থেকে একটা সরু পথ গিয়ে মিশেছে বড় রাস্তার সঙ্গে। সেখানে এসে সরু রাস্তার পাশের দেয়ালে সাইকেল ঠেস দিয়ে রাখল কিশোর। দেখাদেখি অন্যেরাও তাই করল। কিশোরের হাসি হাসি মুখ, কোন জটিল রহস্যের সন্ধান পেলে যেমন হয়, তেমনি।
রবিন বিষণ্ন, মুসা হতাশ। তিমিটার খোঁজ মেলেনি।
এত হাসির কি হলো, ঝাঁঝাল কণ্ঠে বলল মুসা।
কোন কাজই তো হলো না।
কে বলল? পাল্টা প্রশ্ন করল কিশোর।
কে বলল মানে? তিমির খোজ পাওয়া গেছে?
পুরোপুরি নয়, তবে নিরাপদে আছে বোঝা গেছে, বলল কিশোর। বিশদ পর্যালোচনা করে দেখা যাক। ওশন ওয়ারল্ডের কথাই ধরো, সোমবারে বন্ধ থাকে। সেদিন কেউ ওখানে ফোন করলে জ্যান্ত মানুষের সাড়া পাবে না, শুনতে পাবে কতগুলো টেপ করা কথা। ও হ্যাঁ, আমার বিশ্বাস, কাল ফোনে যে কথাগুলো আমরা শুনেছি, সব টেপ করা বখা। সোমবারের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা। কেউ রিঙ করলেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে মেশিন চালু হয়ে যায়, গড় গড় করে শ্রোতাকে শুনিয়ে দেয় একগাদা তথ্য। এর মানে কি? কোন মানুষ যদি ফোন না ধরে…
তাহলে তিমিটার কথা জানানো যাবে না, কিশোরের কথা শেষ করে দিল মুসা।
না। তবে টিনহা শ্যাটানোগাকে বাড়িতে ফোন করতে কোন বাধা নেই, যদি তার নম্বর জানা থাকে। এবং সেটাই কেউ করেছিল।
কে বলল তোমাকে? রবিনের প্রশ্ন। কেউ বলেনি, অনুমান করে নিয়েছি, টিনহার কথা থেকেই। তিমিটার চরায় আটকা পড়ার কথা শুনে অবাক হয়নি, গায়েব হওয়ার কথা শুনে হয়নি। আমি বলে গেছি, সে শুনেছে, যেন শোনা কথাই আরেকবার শুনছে। তাছাড়া সে জানল কি করে, গতকালের ঘটনা এটা? আমি তো একবারও বলিনি।
ওটা তো প্রশ্ন করেছে, তর্ক করল মুসা।
ওই প্রশ্নটাই জবাব! কবের ঘটনা, এটুকু বললেই তো পারত। আবার উল্লেখ করার কি দরকার ছিল। আসলে কথাটা ঘুরছিল তার মনে, ফলে বলে ফেলেছে। তারপর আরও একটা ব্যাপার, প্রথমে স্বীকারই করতে চায়নি তিমিটার কথা, গতকাল অফিসে আসেনি বলে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে। শেষে রবিনের উৎকণ্ঠা দেখে বলেই ফেলেছে নিরাপদ আছে। কিছুই যদি না জানে নিরাপদে আছে, জানল কি করে?

ঠিকই বলেছ, মাথা দোলাল রবিন। আরেকটা ব্যাপার লক্ষ করেছ? বলল পাইলট কিংবা গ্রে হোয়েল। শুধু ওই দু-জাতের নাম কেন? আরও তো অনেক জাতের তিমি আছে। তাছাড়া পাইলটের নামই বা প্রথমে কেন...
তুমি জানো ওটা পাইলট? ভুরু কোচকাল মুসা।
জানি, বলল রবিন। গতকালই বুঝতে পেরেছি। বলার সুযোগ পাইনি, তারপর আর মনে ছিল না।
অ।...পাইলট আর গ্রে-র তফাতটা কি?
গ্রে-র ফোয়ারার ছিদ্র থাকে দুটো, নাকের ফুটোর মত পাশাপাশি পাইলটের থাকে একটা। আকারেও পাইলটের চেয়ে অনেক বড় হয়ে গেল যেটাকে বাঁচিয়েছি আমরা, ওটা শিশু নয়, যুবক পাইলট বলেই এত ছোট। রবিনের জ্ঞানের বহর দেখে অবাক হয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল মুসা, তার আগেই কিশোর বলল, হুঁ, তা যা বলছিলাম। তিমিটার কথা ভালমতই জানে টিনহা। কিন্তু বুঝতে পারছি না, ওশর্ন ওয়ারল্ডের একজন ট্রেনার সাধারণ একটা তিমি হাইজ্যাক করতে যাবে কেন? কেন মিছে...।
গাড়ির হর্নের তীক্ষ্ণ শব্দে বাধা পড়ল কথায়।
ওশন ওয়ারল্ড থেকে বেরিয়ে তীব্র গতিতে ছুটে এল একটা সাদা পিকআপ, বড় রাস্তায় উঠে মোড় নিয়ে চলে গেল দ্রুত। চালাচ্ছে টিনহা শ্যাটানোগো।
হুঁ, খুব দ্রুত ঘটতে শুরু করেছে ঘটনা, বিড়বিড় করল কিশোর।
মানে? বুঝতে পারছে না মুসা।
কয় মিনিট আগে কি বলেছিল আমাদেরকে? ভুরু নাচাল কিশোর। একটা জরুরী শশা দেখাতে যাচ্ছে। শশা হলে তো অ্যাকোয়ারিয়ামের ভেতরে হবে, বাইরে কি? আর এত তাড়াহুড়ো কেন?
শো দেখাতেই তৈরি হচ্ছিল, মুসার কথায় বিশেষ কান দিল না কিশোর, কিন্তু বাধ সেধেছি আমরা। হয়তো কোন ভাবে চমকে দিয়েছি। তাই শো ফেলে রেখে আরও জরুরী কোন কাজ করতে চলে গেছে।
না হয় ধরলামই মিছে কথা বলেছে টিনহা, বলল মুসা, কিন্তু তাতে কি প্রমাণ হয়?
শেষ বিকেল। সকালে ওশন ওয়ার থেকে রকি বীচে ফিরেই লাইব্রেরিতে কাজে চলে যায় রবিন। মুসা যায় বাড়ির লন পরিষ্কার করতে, মাকে কথা দিয়েছিল। আজ সাফ করে দেবে। ইয়ার্ডে বোরিস আর রোভারকে সাহায্য করেছে কিশোর। চাজ সারতে সারতে বিকেল হয়ে গেছে তিনজনেরই। হেডকোয়ার্টারে জমায়েত হয়েছে এখন। এর আগে আর আলোচনার সুযোগ হয়নি।
তাছাড়া মিথ্যে কথা বলা বড়দের স্বভাব, বলেই গেল মুসা, কোন কারণ ছাড়াই মিছে কথা বলবে। গিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করো, দশটা প্রশ্ন করে আগে তোমার

মেজাজ বিগড়ে দেবে। তারপর যে জবাবটা দেবে সেটা হয় ঘোরানো-প্যাঁচাননা নয় স্রেফ মিছে কথা…
কথা শেষ করতে পারল না মুসা, টেলিফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুলল কিশোর।
হালো, স্পীকারে শোনা গেল পুরুষের গলা। কিশোর পাশার সঙ্গে কথা বলতে চাই, প্লীজ।
বলছি।
আজ সকালে ওশন ওয়ারল্ডে একটা হারানো তিমির খোঁজ নিতে গিয়েছিলে, কথায় কেমন একটা অদ্ভুত টান, তাছাড়া কিছু কিছু শব্দ ভেঙে ভেঙে উচ্চারণ করে
যেমন, ওয়ারল্ডকে বলছে ওয়া-রলড়।
হয়ত মিসিসিপির ওদিকের কোনখানের লোক, ভাবল রবিন, অ্যালবামার হতে পারে। ওই অঞ্চলের কারও সঙ্গে আগে কখনও পরিচয় হয়নি তার, তবে টেলিভিশনে দেখেছে, দক্ষিণাঞ্চলের লোকেরা ওরকম করেই টেনে টেনে কথা বলে, তবে এই লোকটা আরও এক কাটি বাড়া, শব্দও ভেঙে ফেলেছে।
হ্যাঁ, গিয়েছিলাম, জবাব দিল কিশোর। কেন?
আমি আরও জেনেছি তোমরা একধরনের শখের গোয়ে-নদা…
হ্যাঁ, আমরা গোয়ে-নদাই। নানা রকম সমস্যা…
কিশোরকে বলতে দিল না লোকটা। তাহলে নিশ্চয় একটা কেস নিতে আগ্রহী হবে, আগ্রহীকে বলল আগ-রহী, তিমিটাকে খুঁজে বের করে সাগরে ফিরিয়ে দিয়ে আসতে পারলে একশো ডলার পুরস্কার দেব।
একশো ডলার। ফিসফিস করে বলল রবিন, ব্যাটার কি লাভ?
কিশোর জবাব না দেয়ায় আবার বলল নোকটা, তাহলে কেসটা নিচ্ছ? কেসটা উচ্চারণ করল কেস-আস।
খুশি হয়ে নেব, হাত বাড়িয়ে একটা প্যাড আর পেনসিল টেনে নিল কিশোর। আপনার নাম আর ফোন নম্বর…
ফাইন, বাধা দিয়ে বলল লোকটা। তাহলে এখুনি কাজে নেমে পড়ো। দিন দুয়েকের মধ্যেই আবার খোজ নেব।
কিন্তু আপনার নাম… থেমে গেল কিশোর, লাইন কেটে দিয়েছে ওপাশ থেকে। এক মুহূর্ত হাতের রিসিভারটার দিকে তাকিয়ে রইল সে, তারপর আস্তে করে নামিয়ে রাখল। কাজ দিল, পুরস্কার ঘোষণা করল, আনমনে বলল কিশোর, কিন্তু নিজের নাম বলল না। আজ সকালে ওশন ওয়ারল্টে গিয়েছি সেকথাও জানে…
নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে শুরু করল সে।

কিশোর, মুসা বলল, কেসটা নিচ্ছ তে? একশো ডলার, কম কি?
মোটেই কম নয়। টাকার চেয়েও বড় এখন এই রহস্যময় কল, এর রহস্য ভেদ করতেই হবে। তার ওপর যোগ হয়েছে একটা হারানো তিমি। কিন্তু কথা হচ্ছে, তদন্ত শুরু করি কোনখান থেকে? কয়েক সেকেণ্ড নীরব রইল কিশোর, তারপর টেনে নিল টেলিফোন বুক। টিনহা.শ্যাটাগো এই একটাই সূত্র আছে আমাদের হাতে।
দ্রুত ডিরেক্টরির পাতা উল্টে চলল কিশোর। প্রথমে নামটা বিদঘুটে মনে হয়েছে তার কাছে, কিন্তু একেবারে যে দুর্লভ নাম নয়, ফোন বুক ঘেঁটেই সেটা বোঝা গেল। এক শহরেই শ্যাটানোগা পাওয়া গেল আরও তিনজন জিমবা শ্যাটানোগা, শিয়াওঁ শ্যাটানোগা আর ম্যারিবু শ্যাটানোগা! কিন্তু টিনহ, শাটানোগার নাম নেই।
মিস্টার জিমবাকে দিয়েই শুরু করল কিশোর তিনটে রঙের পর জবাব দিল অপারেটর, জিমবা শ্যাটানোগার লাইন কেটে দিয়েছে টেলিফোন বিভাগ।
অনেকক্ষণ ধরে শিয়াওঁ শ্যাটানোগার ফোন কেউ ধরল না, তারপর মোলায়েম একটা গলা প্রায় ফিসফিসিয়ে জবাব দিল। জানাল ব্রাদার শিয়াওঁ মন্দিরে ধ্যানমগ্ন রয়েছেন। যদি তিনি এসে ফোন ধরেনও কিশোরের কথা শুধু শুনতেই পারবেন, জবাব দিতে পারবেন না, কারণ ছ-মাস ধরে কথা বন্ধ রেখেছেন তিনি, আরও অনেকদিন রাখবেন। শুধু ইশারায়ই নিজের প্রয়োজনের কথা জানান।
হেত্তোরি! লাইন কেটে দিয়ে তিক্ত কণ্ঠে বলল কিশোর। আগে ভাবতাম পাগলের গোষ্ঠী খালি ভারত আর আমার দেশেই আছে, এখন দেখছি এখানে আরও বেশি। কথা বন্ধ রেখেছে না ছাই, হুঁহু, বলতে বলতেই তৃতীয় নম্বরটায় ডায়াল করল।
আগের দুজনের তো কোনভাবে জবাব পাওয়া গেছে, এটার কোন সাড়াই এল। কেউ ধরল না ফোন।
ম্যারিবু শ্যাটানোগার নামের নিচে লেখা রয়েছেঃ চার্টার বোট ফিশিং। আরেকবার চেষ্টা করে দেখল কিশোর, কিন্তু এবারও সাড়া মিলল না।
চার্টার-বোট-ফিশিং-শ্যাটানোগার খবরই নেই, রিসিভার নামিয়ে রাখল কিশোর। হলো না। অন্য কোন উপায় বের করতে হবে।
টিনহাকে কোথায় পাওয়া যাবে, জানি আমরা, বলল রবিন। হপ্তায় ছ-দিন পাওয়া যাবে তাকে ওশন ওয়ারল্ডে।
আরও একটা ব্যাপার জানি, কিশোর যোগ করল, মানে চিনি। তার পিকআপ ট্রাক। চোখ আধবোজা করল সে, ভাবনা আর কথা একই সঙ্গে চলছে। বিকেল ছটায় বন্ধ হয় ওশন ওয়ার। তারপরেও নিশ্চয় অনেকক্ষণ থাকতে হয় টিনহাকে, কারণ সে ট্রেনার। দর্শক চলে যাওয়ার পরও তার কাজ থাকে। ঝট করে সোজা

হলো সে। মুসা তোমাকে একটা দায়িত্ব দিতে চাই। আজ হবে না, দেরি হয়ে গেছে। কাল যাবে।
জোরে নিঃশ্বাস ফেলল মুসা। কোথায়?
কাল বলব।
পরদিন বিকেল সাড়ে পাঁচটায় বোরিসকে পাকড়াও করল কিশোর, তাদেরকে ওশন ওয়ারন্ডে নামিয়ে দিয়ে আসতে হবে।
ইয়ার্ডের ছোট ট্রাকটা বের করল বোরিস, তাতে দুটো সাইকেল তোলা। হলো। তিন কিশোরের কাজেকর্মে আজকাল আর বিশেষ অবাক হয় না সে, তবু প্রশ্ন না করে পারল না, তোমরা মানুষ তিনজন, সাইকেল নিয়েছ দুটো। তৃতীয়জনকে কি দুই সাইকেলে ঝুলিয়ে নিয়ে ফিরবে?
মুসার সাইকেলের দরকার হবে না,বোাকে আশ্বস্ত করুল কিশোর। বিনে পয়সায় গাড়িতে চড়বে সে।
হোকে (ও-কে), শ্রাগ করল বোরিস। আর কিছু না বলে ড্রাইভিং সীটে উঠে কল।
ওশন ওয়ারন্ডের পার্কিং লটে গাড়ি থামাল বোরিস। সাইকেল নিয়ে নেমে পড়ল তিন কিশোর।
জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দিল বোরি, আমাকে দরকার হলে ফোন কোরো ইয়ার্ডে। ট্রাক ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেল সে।
টিনহার গাড়িটা খুঁজতে শুরু করল ওরা। বেশি খোঁজাখুজি করতে হলো না, দড়ির বেড়া দেয়া, স্টাফ লেখা সাইনবোর্ড লাগানো একটা জায়গায় দেখা গেল সাদা পিকআপটা। ঘুরে গাড়ির পেছনে চলে গেল কিশোর আর মুসা, গেটে পাহারায় রইল রবিন। টিনহাকে আসতে দেখলেকদের হুঁশিয়ার করে দেবে।
ট্রাকের পেছনটা খালি নয়। নানারকম জিনিসপত্র ফোম রবারের লম্বা লম্বা ফালি, এলোমেলো দড়ি, আর বেশ বড়সড় এক টুকরো ক্যানভাস, ছড়িয়ে পড়ে আছে।
মেঝেতে শুয়ে পড়ল মুসা। ক্যানভাস দিয়ে তাকে ঢেকে দিল কিশোর। রবারের ফানি এমনভাবে গরণে আর ওপরে রেখে দিল যাতে বোঝ না যায় কিছু। তাছাড়া আরেকটু পরেই অন্ধকার হয়ে যাবে, গাড়ির পেছনে কেউ খুঁজে দেখতে আসবে বলেও মনে হয় না।
আমরা কেটে পড়ি,মুসাকে বলল কিশোর। ঘোরাঘুরি করতে দেখলে সন্দেহ করে কুৰে টিনহা। হেডকোয়ার্টারে অপেক্ষা করব তোমার জন্যে। ঠিক আছে?
ঠিক আছে,ক্যানভাসের তলা থেকে জবাব দিল ফুস। যত শীঘ্রি পারি ফোন করব।
কিশোরের নেমে যাওয়ার আওয়াজ শুনল মুসা। তারপর অনেকক্ষণ আর কোন শব্দ নেই, শুধু পার্কিং লটে মাঝে মাঝে গাড়ির ইঞ্জিন স্টার্ট নেয়া ছাড়া।

বেশ আরামেই আছে মুসা, সারাটা দিন পরিশ্রমও কম করেনি। ঘুম এসে গেল তার। হঠাৎ একটা শব্দে তন্দ্রা টুটে গেল। ক্যানভাসের ওপর পানি ছিটকে পড়েছে, কয়েকটা ফোটা চুইয়ে এসে তার মুখ ভিজিয়ে দিল। ঠোঁটেও লাগল পানি। কি ভেবে জিভ দিয়ে চাটল। নোনা পানি।

ট্রাকটা স্টার্ট নিল। গতি বাড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল মুসা, তারপর সাবধানে মুখের ওপর থেকে ক্যানভাস সরিয়ে উঁকি দিল। তার মুখের কয়েক ইঞ্চি দূরে রয়েছে বড় একটা প্ল্যাসটিক কনটেইনার। চার পায়ের ওপর রয়েছে জিনিসটা। মূসা রয়েছে তলায়। পানি ছলাৎছল করছে ভেতরে। জীবন্ত কিছু ঘষা মারছে কনটেইনারের গায়ে।

মাছ, অনুমান করল মুসা, মাছ জিয়াননা রয়েছে ভেতরে। আবার মুখের ওপরে ক্যানভাস টেনে দিল সে।

ছুটে চলেছে ট্রাক, ঝাকুনি প্রায় নেই। তারমানে সমতুল মসৃণ রাস্তা দিয়ে চলেছে। বোধহয় কোস্ট হাইওয়ে ধরেই। কয়েক মিনিট পর গতি কমল ট্রাকের। ওপর দিকে উঠতে শুরু করল পাহাড়ী পথ বেয়ে। কোথায় এল? সান্তা মনিকা? কোন দিকে কবার মোড় নিচ্ছে গাড়ি খেয়াল রাখার চেষ্টা করল সে। কিন্তু বেশিক্ষণ পারল না। গোলমাল হয়ে গেল। আবার সমতলে নেমে এল গাড়ি।

অন্ধকার নামার পর আবার ওপরের দিকে উঠতে শুরু করল গাড়ি। নেশ ঘোরানো পথ। সান্তা মনিকায় পাহাড়ী অঞ্চলেরই কোন জায়গা হবে, অনুমান করল মুসা।

অবশেষে থামল পিকআপ। টেইল গেট নামানোর শব্দ শোনা গেল। তারপর খালি পায়ের শব্দ। দম বন্ধ করে রইল মুসা।

পানির জোর ছলাৎছল, নিশ্চয় কনটেইনারটা তোলা হচ্ছে। চলে গেল পায়ের শব্দ।

মিনিট তিনেক অপেক্ষা করল মুসা, তারপর ওপর থেকে ক্যানভাস সরাল।

বেশ বড়সড় বিলাসবহুল একটা র‍্যঞ্চ হাউসের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। পিকআপ। সদর দরজার সামনে একটা ল্যাম্প ঝুলছে। কংক্রিটের সিড়ি উঠে গেছে দরজা পর্যন্ত। সিড়ির গোড়ায় একটা মেইলবক্স। নামটা পড়তে পারছে মুসা : উলফ।

আরও এক মিনিট অপেক্ষা করল মুসা, তারপর খুব সাবধানে নামল ট্রাক থেকে। ঘুরে চলে এল গাড়ির সামনের দিকে, বনেটের ওপর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বাড়িটার ওপর নজর রাখার ইচ্ছে।

কাউকে দেখা যাচ্ছে না। এই এলাকায় ওরকম বাড়ি থাকতে পারে ভাবেনি সে। তবে অবাক হলো অন্য একটা কারণে। দরজার কাছে ওই একটি মাত্র আলো

ছাড়া পুরো বাড়িটা অন্ধকার। কোন জানালায় আলো নেই। টিনহা ওই বাড়ির ভেতরে গিয়েছে কিংবা আছে বলে মনে হয় না ভাবসাব দেখে।
এখানে সারারাত এভাবে ঘাপটি মেরে থাকার কোন মানে নেই, ডাবল মুসা। দুটো কাজ করতে পারে সে এখন। গলির মাথায় গিয়ে রাস্তার নাম-নম্বর জেনে উলফের ঠিকানা জানিয়ে কোথাও থেকে ফোন করতে পারে কিশোরের কাছে। কিংবা খোজ করে দেখতে পারে, টিনহা কোথায় গেছে, কি অবস্থায় আছে, কি করছে প্ল্যাসটিক কনটেইনারের জ্যান্ত মাছ নিয়ে।
দুটোর মধ্যে প্রথমটাই মনঃপূত হলো মুসার। গলির মাথায় যাওয়ার জন্যে সবে পা বাড়িয়েছে, এই সময় মেয়েলী কণ্ঠে কথা শোনা গেল, কাকে জানি নাম ধরে ডাকছেঃ রোভার! রোভার!
ডাকের জবাব শোনা গেল না।
মুসা শিওর, ঘরের ভেতর থেকে কথা বলেনি মেয়েটা, বাইরে কোথাও রয়েছে। হয়তো পেছনের আঙিনায়।
বাড়িতে ঢোকার পথ খুঁজতে লাগল মুসা। চোখে পড়ল, বাঁ দিকে কংক্রিটের একটা সরু পথ ধীরে ধীরে উঠে গেছে গ্যারেজে। গ্যারেজের পাশে একটা কাঠের ঘোট গেট, তার ওপরে তারাজ্বলা কালো আকাশের পটভূমিকায় কয়েকটা পাম গাছের মাথা।
নিঃশব্দে গেটের কাছে চলে এল মুসা। সাধারণ একটা খিল দিয়ে গেটের পান্না আটকানো রয়েছে। ভেতরে ঢুকে আবার লাগিয়ে দিল পান্না।
গ্যারেজের পেছনে সিমেন্ট বাঁধানো একটা পাকা পথ। এদিক ওদিক তাকিয়ে ঝুঁকে নিঃশব্দে এগিয়ে চলল পা পা করে।
আবার ডাক শোনা গেল : রোভার! রোভার!
খুব কাছেই রয়েছে মহিলা। মূসার মনে হলো, মাত্র কয়েক গজ দূরে। থমকে দাঁড়িয়ে গেল সে। সামনে আর বাঁয়ে এক চিলতে করে ঘাসে ঢাকা জমির কিনারে দাঁড়িয়ে আছে পামের সারি, রাস্তা থেকেই দেখেছে ওগুলো। ডানের কিছু দেখতে পারছে না। বাগান বা যা-ই থাকুক ওখানে দেখা যাচ্ছে না এখনও গ্যারেজের দেয়ালের জন্যে। এক সেকেণ্ড চুপচাপ দাঁড়িয়ে চিন্তা করল সে, তারপর এক ছুটে ঘাসে ঢাকা জমি পেরিয়ে চলে এল পামের সারির কাছে। লম্বা দম নিয়ে ঘুরে তাকাল।
চোখে পড়ল বিশাল এক সুইমিং পুল, মূল বাড়িটার প্রায় সমান লম্বা। পানির নিচে আলো, ঝিকমিক করছে টলটলে পানি।
রোভার। লক্ষ্মী ছেলে রোভার, বলল টিনহা।

সুইমিং পুলের কিনারে দাঁড়িয়ে আছে সে, পরনে সেই টু-পীস সাঁতারের পোশাক, অফিসে যেটা পরে ছিল সকালে। তার পাশে কংক্রিটের চত্বরের ওপর রাখা আছে প্ল্যাসটিকের কনটেইনারটা।

ঝুঁকে কনটেইনার থেকে একট মাছ তুলে নিল টিনহা, জ্যান্ত মাছ, ছটফট করছে, লেজ ধরে ওটাকে ছুঁড়ে মারল। বৈদ্যুতিক আলোয় ক্ষণিকের জন্যে রূপালী একটা ধনুক সৃষ্টি করে পুলের ওপর উড়ে গেল মাছটা।

সঙ্গে সঙ্গে পানি থেকে মাথা তুলল একটা ধূসর জীব। উঠছে, উঠছে, উঠছে, পানি থেকে বেরিয়ে এল পুরো সাত ফুট শরীর। একটা মুহূর্ত শূন্যেই স্থির হয়ে ঝুলে রইল যেন। মুখ হাঁ করে রেখেছে। শুন্যে থেকেই মোচড় দিয়ে শরীর বাকিয়ে ধরে ফেলল উড়ন্ত মাছটা, তারপর নিখুত ভাবে ডিগবাজি খেয়ে আবার পানিতে পড়ল মাছ মুখে নিয়ে।

রোভার লক্ষী ছেলে, হাসি মুখে প্রশংসা করল টিনহা। ডুবুরীর ফ্লিপার পরাই আছে তার পায়ে, ডাইডিং গগলসটা ফিতেয় ঝুলছে গলা থেকে, ওটা পরে নিল চোখে। পুলে নামল।

বেশ ভাল সাঁতারু মুসা নিজে, অনেক ভাল ভাল সাঁতারুকে দেখেছে, কিন্তু টিনহার মত কাউকে আর দেখেনি। সাঁতার কাটার জন্যেই যেন জন্ম হয়েছে তার, ডাঙা নয়, পানির জীব যেন সে, এমনি স্বচ্ছন্দ সাবলীল ভঙ্গিতে সাঁতার কাটছে। হাত-পা প্রায় নড়ছেই না, বাতাসে ডানা মেলে যে ভাবে ভেসে উড়ে চলে সোয়ালো পাখি টিনহার সাঁতার কাটার ভঙ্গি অনেকটা সেরকম।

চোখের পলকে চলে এল পুলের মাঝখানে ছোট তিমিটার কাছে। এমন ভাবভঙ্গি যেন অনেক পুরানো বন্ধুত্ব। নাক দিয়ে আস্তে করে টিনহার গায়ে এতো মারল তিমিটা। ওর গোল মাথাটা ডলে দিল টিনহা, ঠোঁটে টোকা দিয়ে আদর করল। এক সঙ্গে ডাইভ দিয়ে নেমে চলে গেল পুলের তলায়, হুঁশ করে ভেসে উঠল আবার। পাশাপাশি সাঁতার কাটল কিছুক্ষণ, তারপর তিমির পিঠে সওয়ার হলো টিনহা।

কোথায় রয়েছে ভুলেই গেছে মুসা দেখতে দেখতে। নিজের অজান্তেই একটা গাছের গোড়ায় ঘাসের ওপর বসে পড়েছে, থুতনিতে হাত ঠেকানো। এরকম দৃশ্য সিনেমায়ও দেখা যায় না, পুরোপুরি মগ্ন হয়ে গেছে সে।

নতুন খেলা শুরু করল টিনহা। তিমিটাকে নিয়ে চলে এল পুলের এক প্রান্তে, মূসা যেদিকে বসে আছে সেদিকে তিমির মাথায় আস্তে করে চাপড় দিয়ে হঠাৎ পানিতে ডিগবাজি খেয়ে শরীর ঘুরিয়ে শাঁ করে চলে গেল দূরে। তিমিটা অনুসরণ করল তাকে।

আবার তিমির মাথায় চাপড় দিল টিনহা, মাথা ধরে ঝাঁকিয়ে দিল। আবার সরে গেল তিমির কাছ থেকে। এবার আর পিছু নিল না তিমি, যেখানে আছে সেখানেই রইল।
পুলের অন্য প্রান্তে গিয়ে কংক্রিটে বাঁধানো পাড়ের কিনারে উঠে পানিতে পা ঝুলিয়ে বসল টিনহা। অপেক্ষা করে আছে তিমি।
রোভার! রোভার! ডাকল টিনহা।
পানি থেকে মাথা তুলল তিমি। চোখ সতর্ক হয়ে উঠেছে, দেখতে পাচ্ছে মুসা। দুটতে শুরু করল তিমি। পানির মধ্যে দিয়ে শাঁ করে উড়ে গিয়ে পৌঁছল যেন টিনহার পায়ের কাছে।
লক্ষ্মী ছেলে, লক্ষ্মী রোভার, তিমির ঠোঁট ছুঁয়ে আদর করল টিনহা। কাত হয়ে হাত বাড়িয়ে কনটেইনার থেকে একটা মাছ এনে গুজে দিল রোভারের খোলা মুখে।
লক্ষ্মী ছেলে, লক্ষ্মী রোভার, আবার তিমিটাকে আদর করল সে। তারপর পাশে ফেলে রাখা একটা বিযেন তুলে নিল।
জিনিসটা কি চিনতে পারছে না মুসা। পূলের নিচে আলো আছে, তাতে পুরোপুরি আলোকিত হয়েছে পানি। কিন্তু পুলের ওপরে চারধারে অন্ধকার।
নাম ধরে ডাকল তিমিটাকে টিনহা।
মাথা তুলেই রেখেছে, রোভার, আস্তে আস্তে উঁচু করতে শুরু করল শরীর। নেজের ওপর খাড়া হয়ে উঠল আশ্চর্য কায়দায় পানিতে ভর রেখে। ওটাকে জড়িয়ে ধরল টিনহা। না না, জড়িয়ে তো ধরেনি, দুহাত তিমির মাথার পেছনে নিয়ে গিয়ে কি যেন করছে।
ভাল করে দেখার জন্যে মাথা আরেকটু উঁচু করল মুসা। চিনে ফেলল জিনিসটা। ক্যানভাসের তৈরি একটা লাগাম পরাচ্ছে টিনহা। ঘাড় তো নেই তিমির চোখের পেছনে যেখানে ঘাড় থাকার কথা সেখানে লাগিয়ে দিচ্ছে কেট। শক্ত করে বকলেস আটকে দিল। ঠিক লাগাম বলা যায় না ওটাকে, কুকুরের গলায় যে রকম কলার আটকানো হয় তেমন ধরনের একটা কিছু কলারও ঠিক বলা চলে না।
হঠাৎ মাথা নুইয়ে ফেলল মূসা। উপড় হয়ে শুয়ে পড়ল ঘাসের ওপর।
গেট খোলার শব্দ। বন্ধ হওয়ার শব্দ শোনা গেল। এগিয়ে আসছে পায়ের আওয়াজ। এত কাছে এসে গেল, মুসার ভয় হলো তাকে না দেখে ফেলে।
পুলের দিকে চলে গেল পদশব্দ, থামল।
হাই টিনহা, পুরুষের গলা।
শুড ইভিনিং, মিস্টার উলফ।

মাথা তুলে দেখার সাহস হলো না মুসার, শুধু থুতনিটা ঘাসের ছোঁয়া মুক্ত করে তাকাল পলের দিকে।
টিনহার পাশে দাঁড়িয়েছে লোকটা। বেঁটেই বলা চলে, মেয়েটার চেয়ে ইঞ্চি। ছয়েক খাটো। অন্ধকারে রয়েছে মুখ। চেহারা বোঝার উপায় নেই। তবে একটা জিনিস দিনের আলোর মত স্পষ্ট। টাক। পুরো মাথা জুড়ে টাক, আবছা
অন্ধাকরেও চকচক করছে। হাতের চামড়া আর শরীরের বাধন দেখে অনুমান করল মুসা, লোকটার বয়েস তিরিশের বেশি হবে না, বয়েসের ভারে চুল উঠে গেছে তা নয়।
কেমন চলছে? জিজ্ঞেস করল লোকটা। কখন রেডি হবে? টেনে টেনে কথা বলে।
শুনুন, মিস্টার উলফ, লোকটার দিকে তাকাল টিনহা, শীতল কণ্ঠস্বর। রেগে যাচ্ছে বোঝাই যায়। শুধু বাবার জন্যে আপনাকে সাহায্য করতে রাজি হয়েছি। আমাকে আমার মত কাজ করতে দিন। সময় হলে বলব। বেশি বাড়াবাড়ি যদি করেন, রোভার সাগরে ফিরে যাবে। আরেকটা তিমি এক আরেকজন ট্রেনার খুঁজে বের করতে হবে তখন আপনাকে। এক মুহূর্ত থেমে বলল, বুঝেছেন?
বুঝেছি, মিস শ্যাটআ-নোগা।
ঠিক শুনেছ তুমি? মুসাকে জিজ্ঞেস করল কিশোর। শিওর, ওই একই গলা?
র‍্যঞ্চ বাড়িটা থেকে বেরিয়ে ডবল মার্চ করে পাহাড়ী পথ ধরে একটা পেট্রল স্টেশনে নেমে আসতে বিশ মিনিট লেগেছে মুসার, হেডকোয়ার্টারে ফোন করেছে। আরও বিশ মিনিটের মাথায় বোরি আর রবিনকে নিয়ে গাড়িসহ পৌঁছেছে কিশোর, তিনজনেই ফিরে যাচ্ছে এখন রকি বীচে।
যা যা ঘটেছে সব বলেছে মুসা। মাথার নিচে হাত রেখে ট্রাকের মেঝেতে চিত হয়ে শুয়ে পড়েছে সে।
শিওর মানে? ঘুমজড়ানো গলায় বলল মুসা, একশোবার শিওর। মিসটার উলকই তখন ফোন করেছিল। ওই একই কণ্ঠ টেনে টেনে কথা বলে।
মাথা ঝাঁকাল কিশোর, নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটা শুরু হয়েছে। মাথামুণ্ড কিছু বুঝতে পারছে না। কেন একজন তার নিজের পূলেই একটা তিমি লুকিয়ে রেখে ওটাকে খুঁজে বের করার অনুরোধ জানাবে, এবার তার জন্যে একশো ডলার পুরস্কার ঘোষণা করবে?
অনেক ভেবেও কিছু বুঝতে পারল না কিশোর! এখন আর পারবে না, বুঝতে পারল। প্রশ্নটা মনে নিয়ে ঘুমাতে হবে। হয়তো ঘুম ভাঙার পর পেয়ে যাবে জবাব।
প্রথমে মুলার বাড়িতে তাকে নামিয়ে দেয়া হলে তারপর রবিনকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে ইয়ার্ডে ফিরে এল বোরিস আর কিশের কথ হয়েছে, আগামী সকালে যত তাড়াতাড়ি পারে এসে হেডকেটরে মিলি হারে তিন গোয়েন্দ।

পরদিন রবিন এল সবার পরে। মা আটকে দিয়েছিলেন। সবে বেরোতে যাচ্ছে রবিন, ডেকে বললেন, নাস্তার পরে অনেক কাপ-ডিশ জমে আছে, ওগুলো ধুয়ে দিয়ে গেলে তার উপকার হয়।

ইয়ার্ডের এক কোণে তিন গোয়েন্দার ওয়ার্কশপের বাইরে সাইকেল রাখল রবিন। একটা ওয়ার্কবেঞ্চের ওপাশে জঞ্জালের গায়ে কাত হয়ে যেন অবহেলায় পড়ে রয়েছে একটা লোহার পাত, ইচ্ছে করেই রাখা হয়েছে ওভাবে। সরাল ওটা রবিন। বেরিয়ে পড়ল মোটা একটা লোহার পাইপের মুখ। এর নাম রেখেছে ওরা দুই সুড়ঙ্গ। জঞ্জালের তলা দিয়ে গিয়ে পাইপের অন্য মুখটা যুক্ত হয়েছে মোবাইল হোমের মেঝের একটা গর্তের সঙ্গে।

পাইপের ভেতর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এসে, ট্রেলারের মেঝের গর্তের মুখে লাগানো পাল্লা তুলে অফিসে ঢুকল রবিন। অন্য দুজন অপেক্ষা করছে।

ডেস্কের ওপাশে তার নির্দিষ্ট চেয়ারে বসেছে কিশোর। পুরানো একটা রকিং চেয়ারে গা ঢেলে দিয়েছে মুসা, পা রেখেছে ফাইলিং কেবিনেটের একটা আধখোলা ড্রয়ারের ওপর। কেউ কিছু বলল না।

এগিয়ে গিয়ে একটা টুলে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসল রবিন।

সব সময়ই যা হয়, আজও তার ব্যতিক্রম হলো না। আলোচনার শুরুতে মুখ খুলল প্রথমে কিশোর, বড় রকম কোন সমস্যায় যদি পড়োও, ভাবতে ভাবতে তোমার মন গিয়ে ধাক্কা খায় কোন দেয়ালে, সামনে পথ রুদ্ধ থাকে, রবিনের দিকে তাকাল সে, দুটো উপায় খোলা থাকে তোমার জন্যে। হয় দেয়ালে মাথা কুটে মরা, কিংবা ওটা ঘরে গিয়ে অন্য কোনখান দিয়ে কোন পথ বের করে নেয়া।

ব্যস, বোঝো এখন, মরোগে দেয়ালে মাথা কুটে! রাবনের দিকে চেয়ে হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল মুসা। কিশোর, তোমার দোহাই লাগে, ল্যাটিন ছেড়ে ইংরেজি বলো। চাইলে বাংলাও বলতে পারো, তা-ও এত কঠিন লাগবে না।

ম্যারিবু শ্যাটানোগার কথা বলছি, কঠিন কথার সহজ ব্যাখ্যা করল কিশোর। ম্যারিবু শ্যার্টানোগা, চার্টার বোট ফিশিং।

হতাশ ভঙ্গিতে দুই হাত তুলল মুসা। কিছু বুবলি না।

ডাকো তাকে, কিশোরকে বলল রবিন। আমার মনে হয় না, সে এতে জড়িত। তবে জিজ্ঞেস করতে দোষ কি?

নাস্তার পর থেকে কয়েকবার চেষ্টা করেছি, বলল কিশোর। সাড়া নেই।

হয়ত মাছ ধরতে গেছে, জেলে তো, মন্তব্য করল মুসা। বাড়িতে না থাকলে ফোন রবে কি করে? নাকি বাড়ি না থাকলেও ফোন ধরে লোকে? বুঝতে না পেরে রেগে যাচ্ছে সে।

আমার মনে হয় ও জড়িত, মুসার কথায় কান দিল না কিশোর। সোমবারে বাড়িতে টিনহা শ্যাটানোগাকে ফোন করেছিল কেউ। তাকে তিমিটার কথা বলেছে…

রোভার, বাধা দিয়ে বলল মুসা। নাম যখন একটা রাখা হয়েছে, তিমি তিমি করে রোভার বলতে দোষ কি?

আচ্ছা, ঠিক আছে যাও, রোভারই, মুসার কথা রাখল কিশোর। টিনহাকে ওশন ওয়ারস্তে ফোন করা হয়নি, কারণ যে করেছে তার জানা আছে সোমবারে ফোন ধরবে না কেউ। জিমবা শ্যাটানোগার বাড়িতে করতেই পারবে না, কারণ তার লাইন কাটা।

আর ব্রাদার শিয়াওঁর মন্দিরেও করবে না, রবিন যোগ করল, কারণ সে বোবা সেজেছে। কোন লাভ নেই ওখানে করে।

বাকি থাকল আর মাত্র একজন শ্যাটানোগা, যার বাড়িতে ফোন আছে, বলল কিশোর। যে স্যান পেড্রোতে বাস করে, মাছ ধরার জন্যে বোট ভাড়া দেয়। হতে পারে, সে টিনহার আত্মীয়, তার ওখানেই ফোন করেছে লোকটা।

হুঁ, মাথা ঝাঁকাল রবিন। গতরাতে উলফকে বলেছে টিনহা, বাপের জন্যেই নাকি তার কথা শুনছে।

বেশ, গোমড়া মুখে বলল মুসা, ম্যারিবু নাহয় বাবাই হলো টিনহার, তাতে কি? দেয়ালের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক?

সহজ, বুঝিয়ে বলল কিশোর। টিনহা আর উলফ আমাদের কাছে মুখ খুলবে। খুললেও মিছে কথা বলবে, আর উলফ কিছুই বলবে না। ওদের কাছ থেকে যেহেতু কিছু জানতে পারছি না আমরা, অন্যের কাছ থেকে ওদের সম্পর্কে জানার চেষ্টা করব। সে জন্যেই স্যান পেড্রোতে গিয়ে ম্যারিবুর সঙ্গে কথা বলতে চাই, সে কতখানি জড়িত বোঝার জন্যে।

যদি বাড়ি না থাকে? প্রশ্ন তুলল মুসা। মাছ ধরতে গিয়ে থাকে?

তাহলে তার প্রতিবেশীদের সঙ্গে, কিংবা অন্য জেলেদের সঙ্গে কথা বলব। জিজ্ঞেস করব টিনহার সম্বন্ধে কি জানে, ম্যারিবুর কোন বন্ধু বা পরিচিত লোক আছে কিনা উলফ নামে। বোঝার চেষ্টা করব, রোভারকে রেখে আমরা যখন ফিরে আসছিলাম সেদিন, ওরাই বোট থেকে চোখ রেখেছিল কিনা আমাদের ওপর।

ঠিক আছে, উঠে দাঁড়াল মুসা, চান্স খুবই কম, তবু চেষ্টা করতে ক্ষতি নেই। তা স্যান পেড়োতে যাব কি করে? তিরিশ মাইলের কম না। বোরিস নিয়ে যাবে?

বললে তো যাবেই, কিন্তু উচিত হবে না। ইয়ার্ডে অনেক কাজ, বোরিস আর রোভার দুজনেই খুব ব্যস্ত।

তাহলে?
রোলস রয়েসটার কথা একেবারেই ভুলে গেছ? চাইলেই তো পেতে পারি আমরা ওটা।
ঠিকই তো। অনেকদিন চড়ি না তো, ভুলেই গেছি। ফোন করব রেন্ট আ রাইড কোম্পানিতে, হ্যামসনকে?
করে দিয়েছি আমি। এসে পড়বে কিছুক্ষণের মধ্যেই। চলো, বাইরে যাই।
ওরা বেরোনোর কয়েক মিনিট পরেই ইয়ার্ডের খোলা গেট দিয়ে ঢুকল বিশাল এক গাড়ি, রাজকীয় চেহারা। পুরানো মডেলের এক চকচকে কালো বোলস রয়েস, জায়গায় জায়গায় সোনালি কাজ করা। এক আরবী শেখের জন্যে তৈরি হয়েছিল, শেখের পছন্দ হয়নি, নেয়নি, তারপর রেন্ট আ রাইড কোম্পানি রেখে দিয়েছে গাড়িটা। বাজিতে জিতে তিরিশ দিন ব্যবহার করার সুযোগ পেয়েছিল একবার কিশোর, তিরিশ দিন পেরিয়ে যাওয়ার পর জোরজার করে আরও দুদিন ব্যবহার করতে পেরেছিল। তারপর আর পারবে না, কঠোর ভাবে বলে দিয়েছিলকোম্পানির ম্যানেজার। সেই সময় অগাস্ট নামে এক ইংরেজ কিশোরকে রক্তচক্ষু খুঁজে পেতে সাহায্য করেছিল তিন গোয়েন্দা। যাওয়ার সময় অগাস্ট ব্যবস্থা করে দিয়ে গেছে, তিন গোয়েন্দা যখনই চাইবে, তখনই তাদেরকে গাড়িটা দিয়ে সাহায্য করতে হবে কোম্পানির, খরচ-খরচা যা লাগে; সব তার।
অগাস্ট চলে যাওয়ার পর গাড়িটা ব্যবহারের তেমন প্রয়োজন পড়েনি, আজ পড়েছে।
গাড়ি থেকে নামল ধোপদুরস্ত পোশাক পরা ইংরেজ শোফার হ্যানসন। বিনীত ভঙ্গিতে সালাম জানাল তিন কিশোরকে।
এই ব্যাপারটা কিশোরের পছন্দ নয়, কিন্তু হ্যানসনকে বললে শোনে না। কর্তব্য পালন থেকে বিরত করা যায় না খাটি ইংরেজ বলে অহঙ্কারী লোকটাকে।
প্রায় নিঃশব্দে ছুটে চলেছে রোলস বয়েস। তিরিশ মাইল পথ পাড়ি দেয়া কিছুই ওটার শক্তিশালী ইঞ্জিনের জন্যে। স্যান পেড্রোতে পৌঁছল গাড়ি। ফোন বুক লেখা ঠিকানা টুকে নিয়েছে কিশোর। সেইন্ট পিটার স্ট্রীট খুঁজে বের করল হ্যানসন।
ডকের ধারে পথ। দু-ধারে পুরানো ভাঙাচোরা মলিন বাড়িঘর, বেশিরভাগই কাঠের। কয়েকটা স্টোর আছে, মাছ ধরার সরঞ্জাম, বড়শিতে গাঁথার জ্যান্ত টোপ আর চকোলেট-লজেন্স থেকে শুরু করে নিত্য প্রয়োজনীয় সব জিনিসই পাওয়া যায় ওগুলোতে।
একটা স্টোরে খোঁজ নিতেই ম্যারিবুর বাড়ি চিনিয়ে দিল। আশপাশের অন্যান্য বাড়ির চেয়ে সুরক্ষিত মনে হলো এটা, তিন তলা বিল্ডি, মাটির নিচেও একটা তলা রয়েছে, তাতে অফিস। জানালায় লেখা রয়েছে? চার্টার বোট ফিশিং।

জানালা দিয়ে উকি দিয়ে দেখল কিশোর, একটা ডেস্কের ওপর একটা ফোন, আর আশেপাশে কয়েকটা কাঠের চেয়ার। একটা প্যাকে ঝুলছে কি সাঁতারের পোশাক আর ডুবুরীর সরঞ্জাম।
দরজার দিকে চলল তিন গোয়েন্দা। এই সময় দরজা খুলে বেরিয়ে এল একটা লোক। আবার লাগিয়ে দিয়ে তালা আটকে দিল। ফিরে কিশোরকে দেখেই চমকে গেল। পকেটে চাবি রাখতে রাখতে জিজ্ঞেস করল, কি চাই?
লম্বা-পাতলা লোক, ঢালু কাঁধ, মুখে বয়েসের রেখা। পরনে মলিন নীল সুট, সাদা শার্ট, খয়েরি টাই।
লোকের চেহারা, পোশাক, আচার-ব্যবহার খুব খুঁটিয়ে দেখা কিশোরের স্বভাব। এসব থেকে লোকটা কেমন স্বভাব-চরিত্রের, কি করে না করে, বোর চেষ্টা করে। তার অনুমান খুব কমই ভুল হয়। এই লোকটাকে দেখে তার মনে হলো, কোন ছোট দোকানে কেরানী কিংবা হিসাব রক্ষকের কাজ করে, কিংবা হয়তো ঘড়ির কারিগর। শেষ কথাটা মনে হলো লোকটার ডান চোখের দিকে চেয়ে।
ডান চোখের নিচেটায় অদ্ভুত ভাবে কুঁচকে গেছে চামড়া, অনেকটা কাটা দাগের মত মনে হয়। হয় মনোকল পরে লোকটা, নয়তো ঘন্টার পর ঘন্টা ম্যাগনিফাইং গ্লাস চোখে আটকে রাখে, ঘড়ির কারিগররা যে জিনিস ব্যবহার করে।
মিস্টার ম্যারিবু শ্যাটানোগাকে খুঁজছি, ভদ্রভাবে বলল কিশোর।
বলো।
আপনি মিস্টার শ্যাটানোগা?
হ্যাঁ। ক্যাপটেন শ্যাটানোগা।
অফিসে ফোন বাজল। দরজার দিকে ঘুরে তাকাল ম্যারিবু, খুলবে কিনা দ্বিধা করল, শেষে না খোলারই সিদ্ধান্ত নিল।
আমাকে দিয়ে আর কি হবে? ম্যারিবুর কণ্ঠে হতাশা। গত হপ্তায় ঝড়ে আমার বোট ডুবে গেছে। লোকে মাছ ধরার জন্যে ভাড়া নিতে আসে, বোট দিতে পারি না।
সরি, বলল রবিন। আমরা জানতাম না।
তোমরা কি মাছ ধরতে যেতে চাও?
শুদ্ধ ইংরেজি বলে, ম্যারিবু। কথায় তেমন কোন টান নেই, তবে বলার ধরনে বোঝা যায়, ইংরেজি তার মাতৃভাষা নয়। হয়তো মেকসিকো থেকে এসেছে, ডাবল রবিন, অনেকদিন আমেরিকায় আছে।
না না, মাছ নয়, তাড়াতাড়ি বলল কিশোর, আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই। আপনার মেয়ের কাছ থেকে একটা খবর নিয়ে এসেছি।
আমার মেয়ে? একটু যেন অবাক হলো ম্যারিবু। ও, টিনহার কথা বলছ?
হ্যাঁ।

তা খবরটা কি? জিজ্ঞেস করল ম্যারিবু।
না, তেমন জরুরী কিছু নয়। ওশন ওয়ারল্টে তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, এদিকে আসব বলেছিলাম। আপনাকে জানাতে বলল, আজ অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করবে সে।
অ, একে একে কিশোর, রবিন আর মুসার ওপর নজর বোলাল ম্যারিবু। তোমরা তিন গোয়েন্দা?
মাথা ঝাঁকাল মুসা। আবাক হয়েছে, কি করে ক্যাপটেন শ্যাটানোগা তাদের কথা জানল? তারপর মনে পড়ল, টিনহাকে একটা কার্ড দিয়েছিল কিশোর। তাদের কথা নিশ্চয় বাবাকে বলেছে টিনহা।
তোমরা এসেই, খুশি হলাম, হেসে হাত বাড়িয়ে দিল ম্যারিবু। খাওয়ার সময় হয়েছে। চলো না কিছু খেয়ে নিই। কাছেই দোকান।
ধন্যবাদ জানিয়ে সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল মুস! খাওয়ার আমন্ত্রণে কোন সময় না করে না সে।
খেতে খেতেই প্রচণ্ড ঝড় আর বোট হারানোর গল্প শোনাল ম্যারিবু।
বিংগো উলফ নামের এক লোককে মাছ ধরতে নিয়ে গিয়েছিল বাজা ক্যালিফোর্নিয়ায়। উপকূলের কয়েক মাইল দূরে থাকতেই কোন রকম জানান না দিয়ে আঘাত হানে ঝড়। বোট বচানোর অপ্রণ চেষ্টা করেছে ম্যারিব, কিন্তু। ঢেউয়ের সঙ্গে কুলাতে পারেনি। কাত হয়ে ডুবে যায় বোট। কোন রকমে টিকে ছিল দুজনে, ভেসে ছিল, পরনে লাইফ-জ্যাকেট ছিল তাই রক্ষা। অবশেষে কোস্ট গার্ডের জাহাজ ওদেরকে দেখতে পেয়ে উদ্ধার করে।
শুনে খুব দুঃখ পেল দুই সহকারী গোয়েন্দা। রবিন জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল, বোটটা বীমা করানো আছে কিনা, কিন্তু তার আগেই বলে উঠল কিশোর, আপনার মেয়ে খুব ভাল সাঁতারু, ক্যাপ্টেন। তিমির সঙ্গে যা সাঁতারায় না। ভাল ট্রেনার।
উঁ!...হ্যাঁ হ্যাঁ, ওশন ওয়ারল্ডে।
অনেকদিন ধরেই একাজ করছে, না? জিজ্ঞেস করল রবিন। বুঝতে পেরেছে, টিনহার আলোচনা চালাতে চায় কিশোর।
বেশ কয়েক বছর।
অনেক দূরে যেতে হয় রোজ, ওশন ওয়ারল্ড তো কম দূরে না, কিশোর বলল। এখান থেকেই যায় বুঝি?
আনমনা হয়ে মাথা ঝাঁকাল ম্যারিবু। অন্য কিছু ভাবছে, বোঝা যায়। কফি শেষ করল। তারপর ধীরে ধীরে বলল, আসলে হয়েছে কি, তিন গোয়েন্দাকে বিশ্বাস করানোর চেষ্টা করছে যেন সে, তিমিকে ট্রেনিং দেয়ার ব্যাপারে মিস্টার উলফের

খুব আগ্রহ। সান্তা মনিকায় পাহাড়ের ওপর তার একটা বাড়ি আছে। বাড়িটার ঠিকানা দিল সে, যেটা আগের রাতেই চিনে এসেছে মুসা। একটা সুইমিং পুল আছে তার বাড়িতে। অনেক বড় পুল।
রাস্তায় বেরোনোর আগে আর কিছু বলল না ম্যারিবু। আবার তিন গোয়েন্দার সঙ্গে দেখা হবে, এই ইচ্ছে প্রকাশ করে, হাত মিলিয়ে বিদায় নিল।
ছেলেরা বার বার ধন্যবাদ দিল তাকে আতিথেয়তার জন্যে।
চলে যাচ্ছে লম্বা লোকটা। সেদিকে চেয়ে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর।
হুঁমম! মুসার কথার জবাবে, না এমনি বলল কিশোর, বোঝা গেল না। হাঁটতে শুরু করল। মোড়ের কাছে গাড়ি রেখে এসেছে।
গাড়ি ছাড়ল হ্যানসন। গলি থেকে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, বাড়ি পাওয়া গেছে?
হ্যাঁ, জবাব দিল মূসা। খুব ভাল লোক। আমাদেরকে খাওয়াল।
তাই নাকি? ফিরে তাকাল একবার হ্যানসন, তারপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করল আবার পথের ওপর। ভুল হয়েছে আপনাদের। গাড়ি যেখানে রেখেছিলাম, তার পাশেই একটা গ্যারেজ আছে, দেখেছিলেন? চাকায় হাওয়া দিতে নিয়ে গিয়েছিলাম, দেখি পুরানো এক দোস্ত, মেকসিকান। সে বলল, ক্যাপটেন শ্যাটানোগার বোট ডুবে গেছে।
হ্যাঁ, বলেছে আমাদেরকে, বলল রবিন।
যে বলেছে, সে অন্য লোক, ক্যাপটেন শ্যাটানোগা নয়।
কেন নয়? লম্বা লোকটা চলে যাওয়ার পর এই প্রথম কথা বলল কিশোর। ভাবে মনে হলো না অবাক হয়েছে, এটাই যেন আশা করছিল সে।
কারণ, ক্যাপটেন শ্যাটানোগা এখন হাসপাতালে। খুব অসুস্থ। কড়া নিউমোনিয়া বাধিয়েছে। এতক্ষণ পানিতে থাকা, হবেই তো। কারও সঙ্গে কথা বলার ক্ষমতা নেই বেচারার।
লোকটা ক্যাপটেন শ্যাটানোগা সাজতে গেল কেন? প্রশ্ন করল মুসা।
রকি বীচে ফিরে এসেছে তিন গোয়েন্দা, হেডকোয়ার্টারে বসেছে।
লম্বা লোকটা আসলে কে? রবিনের প্রশ্ন।
সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না কিশোর। চেয়ারে হেলান দিয়ে বসেছে, চোখেমুখে বিরক্তির ছাপ। হাতের তালুর দিকে চেয়ে বলল, আমি একটা আস্ত গাধা, বোকার সম্রাট, মাথামোটা বলদ।
কেন, জিজ্ঞেস করতে গিয়েও করল না রবিন, কিশোরের এই ধরনের কথার সঙ্গে সে পরিচিত। মুসাও চেয়ে আছে কিশোরের মুখের দিকে।
কেন জানো? নিজেই ব্যাখ্যা করল গোয়েন্দাপ্রধান।

আমি আমার নিজের চোখকে বিশ্বাস করিনি। অফিসের বাইরে তখন লোকটাকে দেখেই বুঝেছি, ও ক্যাপটেন শ্যাটানোগা নয়, হতে পারে না। নাবিকের মত পোশাক পরেনি, হাত আর কাঁধের গঠন নাবিকের মত নয়। ওর ডান চোখের নিচে লক্ষ করেছ?

কুঁচকানো চামড়া? রবিন বলল। করেছি। আমি দেখে ভেবেছিলাম স্বর্ণকার বা ঘড়ির কারিগর। কিন্তু এমন আন্তরিক হয়ে গেল লোকটা, হ্যামবারগার কিনে খাওয়াল, ভুলেই গেলাম সব কিছু। হুতোম পেঁচার মত জমিয়ে বসে শুনে যাচ্ছিলাম ওর কথা… কিবোকামিই না করে ফেলেছে ভেবে লাল হয়ে উঠল তার গাল।

তখন আমিও বিশ্বাস করেছি তার কথা, কিশোর বলল। শানকিতে ফেন দিয়ে চুচু করে ডাক দিল আর অমনি খেতে চলে গেলাম। ছি…।

তুমি একা না, আমরাও গেছি, কিশোর নিজেকে এত বেশি দোষারোপ করছে দেখে কষ্ট হলো রবিনের। একটা কথা কিন্তু ঠিক, নিজের পরিচয় ছাড়া আর কোন মিথ্যে বলেনি লোকটা…

হ্যাঁ, কয়েকটা সত্যি কথা বলেছে অবশ্য। ঝড়ে ক্যাপটেন শ্যাটানোগার বোট ডুবে যাওয়ার কথা বলেছে। বিংগো উলফের র্যাঞ্চের ঠিকানা দিয়েছে, সত্যিকার ঠিকানা। তারপর

কিশোরের মত সয় বিচার ক্ষমতা নেই রবিনের, তবে স্মরণ শক্তি খুব ভাল। তারপর, বলেছে, তিমি ট্রেনিং দেয়ার ব্যাপারে খুব উৎসাহ উলফের-তার বাড়িতে যে ম বড় একটা সুইমিং পুল আছে সেকথাও বলল।

বলেছে, মাথা ঝাঁকাল মুসা। কিন্তু এতে রহস্য কোথায়?

যেভাবে বলেছে সেটাই রহস্য, বলল কিশোর। ইচ্ছে করেই উখে করেছে। আমাদের জানিয়েছে আসলে। কিন্তু টিনহার বাবা সাজতে গেল কেন? লোকটা কিভাবে বেরিয়ে এসেছিল, দেখেছ। দরজা বন্ধ করে তালা আটকাল, আমাদের দেখেই চমকে গেল, কেন? একটাই কারণ হতে পারে, চুরি করে ক্যাপটেনের অফিসে ঢুকেছিল সে, কিছু খুঁজছিল। শুধু অফিস না, হয়তো পুরো বাড়িই খুঁজেছে। – কি? রবিন প্রশ্ন করল। লোকটাকে দেখে তো চোর মনে হলো না। কি খুঁজেছে?

তথ্য, ভাবনার জগত থেকে ফিরে এল কিশোর। আমরা যে কারণে স্যান পেড্রো গিয়েছি, হয়তো একই কারণে সে-ও গিয়েছে—টিনহা আর ক্যাপটেন শ্যাটানোগা সম্পর্কে জানতে চায়। তারপর বেরিয়ে এসে আমাদের দেখে চমকে গিয়ে যা মুখে এসেছে বলেছে, নিজেকে ক্যাপটেন বলে চালিয়েছে, নইলে যদি প্রশ্ন করি ও কি করছিল ওখানে।

উঠে দাঁড়াল কিশোর? হয়েছে, চলো। ঘোড়া ছোটাইগে। মুসাও উঠে দাঁড়াল, হাঁ করে চেয়ে আছে কিশোরের দিকে, বুঝতে পারছে না।
রবিন বলল, উলফের বাড়ি যাচ্ছি?
আরি সব্বোনাশ, এখন? আঁতকে উঠল মুসা। কিশোরের মুখের দিকে চেয়ে মত পরিবর্তন করে বলল, ঠিক আছে, যেতে আপত্তি নেই, তবে আগে পেটে কিছু পড়া দরকার। কিংবা আরেক কাজ করতে পারি, মেরিচাচীর কাছ থেকে কয়েকটা স্যাণ্ডউইচ চেয়ে আনতে পারি, সাইকেল চালাতে চালাতে খাব। কয়েক টুকরো ভাজা মাংসও দেবেন চাচী যদি চাই, আর সকালে দেখলাম সুইস পনির বানাচ্ছেন…
ওশন ওয়ার বন্ধু হতে দেরি আছে। তাড়াহুড়ো করল না ছেলেরা, শান্ত ভাবেই সাইকেল চালাল। পার্কিং লটে এসে সাদা পিকআপটার কাছে অপেক্ষা করতে লাগল। অবশেষে আসতে দেখা গেল টিনহা শ্যাটানোগাকে।
শীতটা যেতে চাইছে না, এই বিকেলেও বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। তবে টিনহার পোশাক দেখে মনে হলো না তার শীত লাগছে। হাতে একটা টেরিকুথের তৈরি আলখেল্লা ধরনের পোশাক অবহেলায় ঝলছে। মনে মনে তাকে পেইনের সঙ্গে তুলনা করল কিশোর। সেই টু-পীস সাঁতারের পোশাক পরনে, পায়ে সাধারণ স্যাণ্ডাল।
আরে, তোমরা, তিন গোয়েন্দাকে দেখে বলে উঠল সে, আমাকে খুজছ?
মিস শ্যাটানোগা, সামনে এগোল কিশোর, বুঝতে পারছি, অসময়ে এসে পড়েছি। সারাদিন কাজ করে নিশ্চয় ক্লান্ত এখন আপনি। তবু যদি কয়েক মিনিট সময় দেন…
আমি ক্লান্ত নই, কিশোরের দিকে তাকিয়ে বলল টিনহা, তবে খুব ব্যস্ত। তোমরা কাল এসো।
আসলে, এখুনি বলা দরকার, আরেক পা সামনে বাড়ল কিশোর। ব্যাপারটা
কাল, আবার বলল টিনহা। এই দুপুর নাগাদ, সামনে পা বাড়াল, আশা করছে কিশোর পথ ছেড়ে দেবে।
কিন্তু কিশোর সরল না, আগের জায়গায়ই ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। টিনহার মুখের দিকে চেয়ে লম্বা দম নিল। তারপর নিঃশ্বাস ফেলে একটা মাত্র শব্দ উচ্চারণ করল, রোভার।
থমকে গেল টিনহা। আলখেল্লাটা কাঁধে ফেলে কোমরে দুই হাত রেখে দাঁড়াল, বদলে গেল কণ্ঠস্বর, রোভারের পেছনে লেগেছ কেন?
পেছনে লাগিনি, হাসার চেষ্টা করল কিশোর। মিটার উলফের পূলে ও আছে জেনে খুশি হয়েছি। এ-ও জানি, ওর যত্ন নিচ্ছেন আপনি। কয়েকটা কথা জানতে চাই আপনার কাছে।

আপনাকে সাহায্য করতে চাই আমরা, মিস শ্যাটানোগা, নরম গলায় বলল রবিন। বিশ্বাস করুন।
কিভাবে? রবিনের দিকে ঘুরে চাইল টিনহা, কোমর থেকে হাত সরায়নি। কিভাবে সাহায্য করবে?
আমাদের সন্দেহ, কেউ আপনার ওপর গুপ্তচরগিরি করছে, মুসা বলল। আজ স্যান পেড্রোতে গিয়েছিলাম। ক্যাপটেন শ্যাটানোগার অফিস থেকে একটা লোককে বেরোতে দেখলাম। আমাদের দেখে চমকে গেল। আপনার বাবা বলে নিজেকে চালানোর চেষ্টা করল।
ও আপনার বাবা হতেই পারে না, তাই না? মুসার কথা পিঠে বলল কিশোর। আপনার বাবা জাহাজডুবিতে অসুস্থ হয়ে এখন হাসপাতালে।
দ্বিধা করছে টিনহা, চোখের কড়া দৃষ্টি দূর হয়ে গেছে। ভাবছে কি করবে। হাসল সে। বুঝতে পারছি তোমরা সত্যিই গোয়েন্দা।
এক্কেবারে, মুসাও হেসে জবাব দিল। আমাদের কার্ডেই তো লেখা রয়েছে।
ও-কে, আলখেল্লার পকেট হাতড়ে গাড়ির চাবি বের করল টিনহা। চলো না, গাড়িতে বসেই কথা হবে।
থ্যাংক ইউ, মিস শ্যাটানোগ, রাজি হলো কিশোর। ভালই হয় তাহলে।
পাশা, গাড়ির দরজার তালা খুলতে খুলতে বলল টিনহা, তোমাকে শুধু পাশা বলেই ডাকব।
কিশোর।
ও-কে, কিশোর।...তোমাকে শুধু মুসা, আর তোমাকে রবিন। আপত্তি নেই তো?
না, আপত্তি কিসের? তাড়াতাড়ি বলল রবিন।
ওদের দিকে চেয়ে হাসল টিনহা। এসো, ওঠো।
ড্রাইভারের পাশে দুজনের জায়গা হয়। নিজে থেকেই বলল মুসা, তোমরা বসো, আমি পেছনে গিয়ে বসছি। কিশোর, যা যা কথা হয়, পরে আমাকে সব বোলো।
টিনহার পাশে বসেছে কিশোর, তার পাশে রবিন। হাইওয়ের দিকে চেয়ে কি ভাবছে টিনহা। সামনের একটা ট্রাফিক পোস্টে লাল আলো। গাড়ি থামিয়ে সবুজের জন্যে অপেক্ষা করতে করতে বলল, ওই যে লোকটা, যে বাবার অফিসে ঢুকেছিল, চেহারা কেমন তার?
নিখুঁত বর্ণনা দিল কিশোর।
মাথা নাড়ল টিনহা। চিনলাম না। হতে পারে বাবার কোন বন্ধু...কিংবা তার বিরুদ্ধে গোলমাল পাকাতে চায় এমন কেউ।
সবুজ আলো জ্বলছে।
ওকে, গাড়ি চালাতে চালাতে বলল টিনহা, তো বলল কি বলবে। কি জানতে চাও?

গোড়া থেকে সব, বলল কিশোর। সোমবার সকালে স্যান পেড্রোতে উলফ আপনাকে টেলিফোন করার পর যা ঘটেছে সব। চরায় আটকা পড়া তিমিটা বিনকিউলার দিয়ে ও-ইতো দেখেছে, নাকি?

সেদিন সকালে হাসপাতালে বাবাকে দেখে সবে ফিরে এসেছি, শুরু করল টিনহা, ওর অফিসে ফোন বাজল। ধরলাম। বিংগো উলফ। দক্ষিণ অঞ্চলের লোক, বড়ি খুব সম্ভব অ্যালাবামায়। এর আগেও দু-তিনবার দেখেছি ওকে, বাবার সঙ্গে মাছ। ধরতে গেছে। ফোনে উলফ বলল, সৈকতে আটকে পড়া একটা তিমি দেখেছে সে।

বলে গেল টিনহা, কিভাবে উদ্ধার করেছে ওরা তিমিটাকে। তার দুজন মেকসিকান বন্ধুকে নিয়ে গেছে ট্রাকসহ। ক্রেনের সাহায্যে তিমিটাকে ট্রাকে তুলেছে, ভেজা স্পঞ্জ দিয়ে জড়িয়ে বেঁধেছে সারা গা, যাতে ডিহাইড্রেটেড না হয়। তারপর তাড়াতাড়ি এনে ছেড়ে দিয়েছে উলফের সুইমিং পুলে, তারই অনুরোধে। টিনহা তিমিটার নাম রেখেছে রোভার, ওটার সঙ্গে সাঁতরেছে বণ্টার পর ঘণ্টা,ওটার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়েছে।

একটা স্টোর থেকে জ্যান্ত মাছ জোগাড় করে দিয়েছে উলফ, তিমিটার খাবার জন্যে। ভালই চলছিল সব কিছু। খুব দ্রুত শিখে নিচ্ছিল রোভার, বুদ্ধিমান জীব তো।

সব তিমিই বুদ্ধিমান, সান্তা মনিকার দিকে গাড়ি চালাতে চালাতে বলল টিনহা। কিছু কিছু ক্ষেত্রে মানুষের চেয়ে বেশি বুদ্ধির পরিচয় দেয়, হাজার, হোক, এতবড় একটা মগজ। কিন্তু রোভারের বুদ্ধি যেন আর সব তিমিকে ছাড়িয়ে গেছে। অনেক বছর ধরে তিমিকে ট্রেনিং দিচ্ছি, কিন্তু ওর মত এত দ্রুত কেউ শিখতে পারেনি। বয়েস আর কত হবে, বড়জোর দুই-মানুষের তুলনায় অবশ্য পচ কিংবা ছয়, বাচে তো মানুষের তিন ভাগের এক ভাগ সময়-কিন্তু দশ বছরের বুদ্ধিমান ছেলেকে ছাড়িয়ে গেছে ওর বুদ্ধি।

তারপর উলফের বাড়িতে সেদিন কি হয়েছে, বলল টিনহা।

রোভারকে মাছ খাওয়ানো শেষ হলো। টিনহা ঠিক করল, স্যান পেড্রোতে যাওয়ার পথে হাসপাতালে নেমে বাবাকে আরেকবার দেখে যাবে। গাড়িতে করে তাকে পৌঁছে দেয়ার অনুরোধ করল উলফকে। পুলের ধারে দাঁড়িয়েছিল উলফ, রোদে চকচক করছিল তার টাক।

হিসেবী ভঙ্গিতে টিনহার দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ উলফ।

অস্বস্তি বোধ করতে লাগল টিনহা। বলল, আগামীকাল ওশন ওয়ারল্ডে লোক পাঠাব, ওরা তিমিটাকে সাগরে ছেড়ে দিয়ে আসবে, বলেই গাড়িপথের দিকে হাঁটতে শুরু করল।

থামাল তাকে উলফ। এক মিনিট, টিনহা। একটা কথা তোমার জানা দরকার, তোমার বাবা সম্পর্কে।
তোমার বাবা চোরাচালানী। টেপ রেকর্ডার, পকেট রেডিও, আরও নানারকম ইলেকট্রনিক জিনিসপত্র মেকসিকোতে নিয়ে গিয়ে তিন-চার গুণ দামে বিক্রি করে। কয়েক বছর ধরে করছে একাজ।
চুপ করে রইল টিনহা। উলফের কথা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হলো না। তবে অবিশ্বাসও করতে পারল না। কি জানি, হতেও পারে। মাঝে মধ্যেই মুখ ফসকে বেশি কথা বলে ফেলে বাবা, উলফের কাছেও হয়তো বলেছিল। বাবাকে ভালবাসে টিনহা, আর দশটা মেয়ের চেয়ে বেশিই বাসে। ছোটবেলায় টিনহার মা মারা গেছে, তারপর আর বিয়ে করেনি বাবা, মা-বাবা দুজনের আদর দিয়েই মানুষ করেছে। এটাও অশ্য অস্বীকার করে না টিনহা, তার বাবা পুরোপুরি সৎ নাগরিক নয়।
গত ট্রিপে বেশ কিছু মাল নিয়ে চলেছিল, আবার বলল উলফ। বেশিরভাগই পকেট ক্যালকুলেটর, মেকসিকোয় খুব চাহিদা। ঝড়ে পড়ে বোট ডুবল, সেই সঙ্গে মালগুলোও।
তবুও কিছু বলল না টিনহা।
বিশ তিরিশ হাজার ডলারের কম দাম হবে না, আমেরিকাতেই, বলে চলল উলফ। তার অর্ধেক আমার। দুজনে শেয়ারে ব্যবসা করতাম আমরা। ওয়াটারপ্রুফ কনটেইনারে রয়েছে ক্যালকুলেটরগুলো, পানি ঢুকতে পারবে না, নষ্ট হবে না। আমার ইনভেস্টমেন্ট আমি হারাতে রাজি নই। বোটটা খুঁজে বের করে জিনিসগুলো তুলে আনা দরকার। তুমি আমাকে সাহায্য করবে, শেষ কথাটা বেশ জোর দিয়েই বলল সে। ভয় দেখানোর একটা ভঙ্গিও রয়েছে। টিনহার মুখের দিকে তাকাল উলফ। তুমি আর তোমার এই তিমি। করছ তত সাহায্য?
জবাব দেয়ার আগে ভালমত ভেবে দেখেছে টিনহা। ও জানে, আমেরিকান সরকার ধরতে পারবে না তার বাবাকে বেআইনী কাজ বলতে পারবে না। পকেট ক্যালকুলেটর কিনে আমেরিকা থেকে বের করে নিয়ে যাওয়ার মাঝেও বেআইনী কিছু নেই। আর যাই করুক, আমেরিকান পুলিশের ভয় দেখিয়ে টিনহাকে ব্লেকমেল করতে পারবে না উলফ। মেকসিকান পুলিশের ভয় দেখিয়েও লাভ নেই। কারণ। হাতে-নাতে ধরতে না পারলে কোন চোরাচালানীর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে পারবে না ওরাও।
তবে সমস্যা হলো তার বাবাকে নিয়ে। বোটের বীমা করায়নি, কাজেই গেছে ওটা। নিজেরও চিকিৎসা-বীমা নেই। অথচ হাসপাতালে রোজ শয়ে শয়ে ডলার খরচ, আসবে কোথা থেকে? যদি উলফকে সাহায্য করে টিনহা, বোর্টটা খুঁজে পায়,

ক্যালকুলেটরগুলো তুলতে পারে, শেয়ারের অর্ধেক টাকা মিলবে। দশ পনেরো হাজার দিয়ে হাসপাতালের বিল তো মেটাতে পারবে।
ভেবে দেখেছে টিনহা, সে-ও কোন বেআইনী কাজ করছে না। বোটটা তাদের। সেটা খোঁজার মধ্যে দোষের কিছু নেই। বরং এটাই স্বাভাবিক।
কাজেই রাজি হয়ে গেলাম, পাহাড়ী পথের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বলল নিহা। ওপরের দিকে উঠছে এখন গাড়ি। বোটটা খুঁজে বের করার জন্যেই রোভারকে ট্রেনিং দিচ্ছি।
চুপচাপ সব শুনেছে এতক্ষণ কিশোর, একটি কথাও বলেনি। আরও এক মিনিট চুপ থেকেবলল, তাহলে এই ব্যাপার। রোভারকে কলার পরিয়েছেন এ-কারণেই। গলায় একটা টেলিভিশন ক্যামেরা বলিয়ে দেবেন, গভীর পানিতে ডুব দিয়ে ছবি তুলে আনবে। ভাল বুদ্ধি। দুনিয়ার যে কোন ভাল ডুবুরীর চেয়ে ভাল পারবে রোভার, ওর মত এত নিচে কোন ডুবুরীই নামতে পারবে না। অনেক কম সময়ে অনেক বেশি জায়গা ঘুরে দেখতে পারবে।
ঠিক বুঝেছে, হেসে প্রশসা করল টিনহা। তুমি আসলেই বুদ্ধিমান, তোমার বয়েসী অনেক কিশোরের চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধিমান।
হাসি ফিরিয়ে দিল কিশোর। রোভারের চেয়েও বেশি?
তার রসিকতায় আবার হাসল টিনহা। ওকে। এবার তোমার কথা বলো। রোভারের ব্যাপারে এত আগ্রহনে? কি তদন্ত করছ তোমরা?
ভাবল কিশোর। একশো ডলার পুরস্কার ঘোষণার কথা বলবে? সত্যি বলাই স্থির করল সে, টিনহা যখন তার সঙ্গে মিথ্যে বলেনি, সে-ও কলবে না। আমাদের এক মক্কেল-নাম বলতে পারব না, বলেনি সে-তিমিটাকে খুঁজে বের করে সাগরে কিরিয়ে দিতে পারলে একশো ডলার পুরস্কার দেবে বলেছে।
সাগরে ফিরিয়ে দিতে পারলে! কেন? কি লাভ তার?
জানি না, মাথা নাড়ল কিশোর।
হুঁ? তো অর্ধেক কাজ তো তোমরা সেরে ফেলেছ, উলফের বিরাট র‍্যঞ্চ হাউসের সামনে এনে গাড়ি রাখল টিনহা। বাকি কাজটা আমাকেই করতে দাও। পারলে সাহায্য কোনো আমাকে।
নিশ্চয় করব, এতক্ষণে মুখ খুলল রবিন। কিন্তু কিভাবে?
ডাইভিং জাননা?
কিশোর জানাল, জানে তিনজনেই। তবে এ-ব্যাপারে মুসা ওস্তাদ, দক্ষ সাঁতারু, একথাও বল।
দারুণ, বলল টিনহা, তোমাদের ওপর ভক্তি বাড়ছে আমার। তাহলে এক সঙ্গে কাজ করছি আমরা? যত তাড়াতাড়ি পারি রোভারকে সাগরে ছেড়ে দেব। তবে

ছাড়লে চলে যাবে না এব্যাপারে শিওর হয়ে নিতে হবে। তারপর বাবার বোর্টটা খুঁজতে সাহায্য করবে তোমরা আমাকে। কি বলো?
রাজি, একই সঙ্গে জবাব দিল রবিন আর কিশোর। ওরা তো এইই চায়, রহস্য, রোমাঞ্চ, উত্তেজনা। খুশি হয়ে উঠেছে। ছুটিটা ভালই কাটবে। সাগরে ডুবন্ত একটা বোট উদ্ধার, তিমির সাহায্যে, চমৎকার!
এসো আমার সঙ্গে ধাক্কা দিয়ে এক পাশের দরজা খুলে ফেলল টিনহা, রোভারের সঙ্গে দেখা করবে।
চোখ বুজে পানিতে চুপচাপ ভেসে রয়েছে রোভার, শরীরের অর্ধেক পানির নিচে। পূলের আলো জ্বেলে দিল টিনহা, সঙ্গে সঙ্গে চোখ মেলল তিমিটা। নড়ে উঠল। সাঁতরে চলে এল কিনারে, প্রভু বাড়ি ফিরলে কুকুর যে চোখে তাকায়, সেই দৃষ্টি। পাখনা আর লেজ নেড়ে স্বাগত জানাল টিনহাকে।
মনে হলো, তিন গোয়েন্দাকেও চিনতে পেরেছে সে। ওরা পুলের কিনারে বসে পানিতে হাত রাখল। সবার হাতেই ঠোঁট দুইয়ে আনন্দ প্রকাশ করল রোভার।
খাইছে, দাঁত বেরিয়ে পড়েছে মুসার। ও আমাদের চিনতে পেরেছে।
চিনবে না মানে? টিনহা বলল। ওর প্রাণ বাঁচিয়েছ তোমরা। ও কি মানুষের মত অকৃতজ্ঞ যে ভুলে যাবে?
কিন্তু একটা…
কনুয়ের গুতো মেরে তাকে থামিয়ে দিল রবিন তাড়াতাড়ি, নইলে মুসা বলেই ফেলছিল একটা সাধারণ তিমি, তাতে মনঃক্ষুন্ন হত টিনহা। মুসাকে এক পাশে টেনে নিয়ে গিয়ে গাড়িতে যা যা কথা হয়েছে, সংক্ষেয়ে সব জানাল রবিন।
রোভারকে আগে খাওয়াল টিনহা। তারপর ফ্লিপার পরে নিল পায়ে। পানিতে পা নামাতে যাচ্ছিল, থেমে গেল একটা শব্দে। ঘুরে তাকাল। র‍্যঞ্চ, হাউস থেকে বেরিয়ে এদিকেই আসছে দুজন লোক।
মূসার কাছে চেহারার বর্ণনা শুনেছে, দেখেই উলফকে চিনতে পারল কিশোর। অন্য লোকটাকে চিনল তিনজনেই। সেই লম্বা লোকটা, যে নিজেকে টিনহার বাবা বলে পরিচয় দিয়েছিল।
আপনি এখানে আসবেন না বলেছিলেন, উলকে দেখে রেগে গেছে টিনহা। খবরদার আর আসবেন না। রোভারের ট্রেনিং শেষ না হওয়া পর্যন্ত আসতে পারবেন না।
জবাব দিল না উলফ। তিন গোয়েন্দার দিকে তাকিয়ে আছে। ওরা কারা? কারা উচ্চারণ করল ও কা-আরা।
আমার বন্ধু, বলল টিনহা। স্কুবা ডাইভার। আমাকে সাহায্য করতে রাজি হয়েছে।

মাথা ঝাঁকাল উলফ, যদিও বোঝা গেল, এসব পছন্দ করছে না সে। কিন্তু টিনহা বলেছে তার বন্ধু, তাই আর প্রতিবাদ করতে পারল না।
উলফের পাশে দাঁড়ানো লোকটাকে দেখছে টিনহা। বন্ধুটি কে?
আমার নাম বনেট, নিজেই পরিচয় দিল লম্বা লোকটা। নীল বনেট। উলফের পুরানো বন্ধু। আপনার বাবার বন্ধু মিস। হেসে বলল, মেকসিকো থেকে এসেছি।
অ। ওকে।
কিশোর বুঝতে পারছে, নামটা টিনহার অপরিচিত, আগে কখনও দেখেনি লোকটাকে। কিন্তু তার মেকসিকো থেকে এসেছি কথাটা বলার পেছনে একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত রয়েছে!
তিন গোয়েন্দার দিকে চেয়ে বনেটের হাসি বিস্তৃত হলো। তাহলে তোমরা স্কুবা ডাইভার। ওশন ওয়ারল্ডে মিস শ্যাটানোগার সঙ্গে কাজ করো?
মাঝে মাঝে, চট করে জবাব দিল টিনহা, স্থায়ী কিছু না। ও, সরি, পরিচয় করিয়ে দিই। কিশোর, মুসা, রবিন।
পরিচিত হয়ে খুশি হলাম, আগে থেকেই যে চেনে এটা সামান্যতম প্রকাশ পেল না লোকটার দৃষ্টিতে, হাসিমুখে হাত মেলাল তিন গোয়েন্দার সঙ্গে।
হয় স্মরণশক্তি সাংঘাতিক খারাপ, নয়তো দিনের বেলায়ও ঘুমের ঘোরে হাঁটে ব্যাটা, লোকের সঙ্গে কথা বলে, ডাবল কিশোর। কিন্তু এর কোনটাই বিশ্বাস করতে পারল না সে। আসলে লোকটা একটা মস্ত ধড়িবাজ, তাদের সঙ্গে আগেই পরিচয় হয়েছে, এটা জানাতে চায় না টিনহাকে।
কেন? অবাক লাগছে কিশোরের। কি লুকাতে চায় নীল বনেট?
নীল বনেটের, বলল কিশোর, এই রহস্যের সঙ্গে কি সম্পর্ক?
প্রশ্নটা করেছে সে নিজেকেই। মুখ ফুটে ভাবনা বলা যেতে পারে একে।
টিনহার সঙ্গে উলফের বাড়ি গেছে, তার পরের দিনের ঘটনা। স্যালভিজ ইয়ার্ডের গেটে অপেক্ষা করতে করতে অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে তিন গোয়েন্দা, বা বার তাকাচ্ছে পথের দিকে। বিকেলে ওশন ওয়ারল্ড থেকে ছুটি নিয়ে লাঞ্চ খেয়ে সোজা এখানে চলে আসার কথা টিনহার, তিন গোয়েন্দাকে তুলে নিয়ে যাওয়ার কথা :
এই কাহিনীর একটা অংশ বনেট, আপনমনেই বিড়বিড় করল কিশোর। টিনহা ওকে চেনে না। কিন্তু নোকটা সব জানে বলে মনে হলো, টিনহার বাবার মেকসিকোতে ট্রিপ দেয়ার কথাও নিশ্চয় অজানা নয়।
ক্যাপটেন শ্যাটানোগার বাড়িতেও সার্চ করতে গিয়েছিল, রবিন বলল।
ক্যাপটেন কাটানোগার নাকি আবার বন্ধু, বলল রবিন। তাহলে চুরি করে তার বাড়িতে ঢোকে কেন?

উলফেরও বন্ধু, কিশোর বলল। সেদিন বোটে যে দুজনকে দেখেছিলাম, একজন বনেট হতে পারে।
কারও ভাল বন্ধু নয় সে। উলফকেও তো জানাতে চাইল না, আমাদের সঙ্গে স্যান পেড্রোতে তার পরিচয় হয়েছে।
একটা কথা ঠিক, মুসা মুখ খুলল, আগে থেকেই ও আমাদের নাম জানে, নইলে স্যান পেড্রোতে দেখা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চিনল কিভাবে?
আমিও তাই বলি, চিন্তিত ভঙ্গিতে পথের দিকে চেয়ে আছে কিশোর। ব্যাটা সবই জানে। স্মাগলিঙের কথা জানে, ঝড়ে বোট ডুবে যাওয়ার কথা জানে, তিমির সাহায্যে পকেট ক্যালকুলেটর উদ্ধারের কথাও জানে। শুধু বুঝতে পারছি না, ও এর মাঝে আসছে কি চুপ হয়ে গেল সে। পথের মোড়ে দেখা দিয়েছে সাদা পিকআপ।
ছুটে গিয়ে নিজের ঘর থেকে ছোট একটা ধাতব বাক্স নিয়ে এল কিশোর।
পিকআপে উঠল তিন গোয়ন্দা, আগের দিনের মতই কিশোর আর রবিন সামনে, মুসা পেছনে।
বাক্সটা টিনহাকে দেখিয়ে বলল কিশোর, এই জিনিসই চেয়েছিলেন আপনি।
বানিয়ে ফেলেছ? খুশি হলো টিনহা।
মাথা ঝাঁকাল কিশোর। ভোর পাঁচটায় উঠে কাজে লেগেছিল, আগের রাতে নির্দেশ পেয়েছে টিনহার কাছ থেকে, সারাটা সকাল ব্যয় করে বানিয়েছে জিনিসটা। বাক্সটা কি করে খোলে দেখাল সে।
ভেতরে একটা টেপ রেকর্ডার ব্যাটারিতে চলে, একটা মাইক্রোফোন আর স্পীকারও আছে। এমনভাবে সাজিয়েছে জিনিসগুলো, বাক্সটা বন্ধ করে রাখলেও রেকর্ড কিংবা ব্রডকাস্ট করতে পারবে। বাথটাবে পরীক্ষা রে দেখেছে। পানির নিচে নিখুঁত কাজ করে যন্ত্রটা, এক বিন্দু পানি ঢোকে না বাক্সের ভেতরে।
ইলেকট্রনিক্সের যাদুকর তুমি, প্রশংসা করল টিনহা।
আরে না না, কি যে বলেন। সাধারণ একটা হবি, মুখে বিনয় প্রকাশ করছে বটে কিশোর, কিন্তু রবিন জানে নিজেকে টমাস এডিসন মনে করে সে। তবে ইলেকট্রনিক্সের টুকটাক কাজে যে তার বন্ধু ওস্তাদ এটা স্বীকার করতেই হয়। ওই তো, চোখের সামনেই তো রয়েছে কিশোরের অ্যাসেমবল করা একটা জিনিস।
সঙ্গে স্কুবা মাস্ক আর ফ্লিপার নিয়েছে তিন গোয়েন্দা। র্যাঞ্চে পৌঁছে পোশাক বদলে সুইমস্যুট পরে নিল। পুলের কাছে জড় হয়েছে সবাই।
উলফ কিংবা তার বন্ধু নীল বনেটকে দেখা যাচ্ছে না কোথাও।
আমাদের কাজে নাক গলাতে নিষেধ করে দিয়েছি ওদের, বলল টিনহা। যদি শোনে... বাক্যটা শেষ করল না সে।

না শুনলেও না করে পারবেন না, তাই না? নরম গলায় বলল রবিন।
হতাশ ভলিতে কাঁধ ঝাঁকাল টিনহা। ঠিকই বলেই, পারব না। বাবার খুব টাকার দরকার। ওই মালগুলো খুঁজে আনতেই হবে।
আপনার বাবা কেমন আছেন? জিজ্ঞেস করল মুসা।
ভাল না। তবে জান খুব শক্ত, খাটি মেকসিকান বুড়ো তো, বেশ গর্বের সঙ্গেই বলল টিনহা। ডাক্তাররা লছে, ভাল হয়ে যাবে। রোজ কয়েক মিনিট দেখা করার সময় দেয়, বাবা বিশেষ কিছু বলতে পারে না। একটা কথাই বার বার বলে থামল সে, টেনেটুনে পায়ে জায়গামত লাগিয়ে লি ফ্লিপার, তারপর বলল, তোমরা গোয়েন্দা। হয়তো কিছু বুঝতে পারবে। বাবা বলে : দুটো পোলের দিকে নজর রাখবে। একই লাইনে রাখবে।
পুলে নামল টিনহা। পানির তলা দিয়ে উড়ে এসে তাকে স্বাগত জানাল রেজর।
দুটো পোল, নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটা শুরু হলো কিশোরের, একই লাইনে রাখবে। দুই সহকারর দিকে তাকাল। কিছু বুঝতে পেরেছ?
পোল পোলিশকে বুঝিয়েছে হয়তো, বলল রবিন। নীল বনেট পোল্যান্ডের লোক হতে পারে। নামটা এরকম, কথায় টান নেই বটে, কিন্তু বলার ভঙ্গি...
লক্ষ করেছ তাহলে, বাধা দিয়ে বলল কিশোর। বলার ভঙ্গির মধ্যে পোলিশ একটা গন্ধ রয়েছে। আচ্ছা, একজন যদি বনেট হয়, আরেকজন কে? মুসার দিকে চেয়ে বলল সে।
আমাকে মাপ করো, বলতে পারব না। পূলের দিকে চোখ পড়তেই চেঁচিয়ে উঠল মুসা, আরে দেখো, দেখো!
পুলের মধ্যে চক্কর দিচ্ছে রোভার, তার পিঠে সওয়ার টিনহা, জড়িয়ে ধরে রেখেছে দুই বাহু দিয়ে।
পরের আধ ঘন্টা রোভার আর টিনহার খেলা দেখল তিন গোয়েন্দা। আনাড়ি যে কেউ দেখলে বলবে খেলা, কিন্তু টিনহা জানে, এটা খেলা নয়, কঠিন ট্রেনিং। ওর বাধ্য করে নিচ্ছে তিমিটাকে। কোন ইঙ্গিতে কি করতে হবে বোঝাচ্ছে।
মানুষ আর তিমিতে আজব বন্ধুত্ব। ভাবল মূসা। কাণ্ড দেখে মনে হচ্ছে, একে অন্যের মনের কথা পড়তে পারছে টিনহা আর রোভার। টিনহার মুখের সামান্যতম ভাব পরিবর্তনের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ঘটছে তিমিটার মাঝে!
রোভারকে খাওয়াল টিনহা। তিন গোয়েন্দাকে পুলে নেমে তিমিটার সঙ্গে খেলতে বলল।
রোভারের পাশে সাঁতরাতে প্রথম একটু ভয় ভয় করুল মুসাব, রোভার তার গায়ে ঠোঁট ঘষতে এলেই ভয় পেয়ে সরে গেল, আস্তে আস্তে সহজ হয়ে এল সে। রবিন আর কিশোরের চেয়ে তার সঙ্গেই বেশি বড় হয়ে গেল বিশাল, বুদ্ধিমান জীবটার।

টিটকারি মারতেও ছাড়ল না একবার রবিন। গায়েগতরে এক রকম তো, কাজেই দোস্ত।
কিছু মনে করল না মুসা, হাল শুধু।
দেখাচ্ছে ভালই, মুসাকে বলল টিনহা। কিশোর, তোমার যন্ত্রটা কাজে লাগাও।
পুলের অন্য প্রান্তে ভাসছে রোভার। ওখানেই থাকতে শিখিয়েছে টিনহা, না ডাকলে আর কাছে আসবে না।
দেখি, দাও আমার কাছে, কিশোরের হাত থেকে রেকর্ডারটা নিল টিনহা। রেকর্ডিং সুইচ টিপে দিল।কোমরে একটা ওয়েটকেট পরে নিয়ে ডাইভ দিয়ে পড়ল পুলে। ইঙ্গিত পেয়ে রোভারও ডাইভ দিয়ে চলে গেল পুলের তলায়।
তাজ্জব হয়ে দেখছে তিন গোয়েন্দা। টিনহা ডুব দিয়েছে তত দিয়েছেই, ওঠার নাম নেই। এতক্ষণ দম রাখছে কি করে? পরিষ্কার পানিতে দেখা যাচ্ছে তিমির মুখের কাছে যন্ত্রটা ধরে রেখেছে টিনহা, আরেক হাতের আঙুল নাড়ছে, মাঝেমধ্যে মটকাচ্ছে-দেখেই অনুমান করা যায়।
প্রায় দুই মিনিট পর ভেসে উঠল টিনহা। আস্তে আস্তে দম নিচ্ছে, ছাড়ছে, তাড়াহুড়ো করছে না। ফুসফুসকে শান্ত করে হাসল। ডেকে বলল, রেকর্ড করেছি।
শোনা যাক, কেমন উঠেছে।
টেপটা শুরুতে গুটিয়ে নিল কিশোর, তারপর প্লে করল। প্রথমে ঢেউয়ের মৃদু ছলাতছল ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। তারপর কয়েকটা মটমট, টিনহার আঙুল ফুটানোর আওয়াজ।
তারপর স্পীকারে স্পষ্ট ভেসে এল পাখির কাকলীর মত শব্দ, একবার উঁচু পর্দায় উঠেছে, আবার নামছে, সঙ্গে করতালি দিয়ে সঙ্গত করা হচ্ছে যেন।
হাতহালি বাদ দিলে একেবারে পাখি, ডাবল কিশোর। তবে অনেক বেশি জোরাল, গভীর, কম্পন সৃষ্টি করার ক্ষমতা অনেক বেশি। এ-জাতীয় শব্দ আগে কখনও শোনেনি সে, ডাঙার কোন কিছুর সঙ্গেই পুরোপুরি তুলনা করা যায় না।
রোভার? ফিসফিস করে বলল রবিন, জোরে বললে ধেন আবেশ নষ্ট হবে। বোডারের গান?
গান বলো, কথা বলো, যা খুশি বলতে পারো, বলল টিনহা। এরকম শব্দ করেই ভাব প্রকাশ করে তিমি। তিমির ভাষা বোঝা সম্ভব হয়নি। হলে হয়তো দেখাযাবে, আমাদের কথার মতই অর্থবহ, জটিল ওদের কথাও।
ফ্লিপার খুলে নিল টিনহা। তবে মানুষের মত ঝগড়া করে না ওরা, লড়াই করে না। মানুষের চেয়ে অনেক বেশি সভ্য। মিথ্যেও বলে না নিশ্চয়। কথা বলেই বা কি লাভ, যদি সেটাকে ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে খালি খারাপের দিকে নিয়ে যাই
আবার শুনি? মূসা অনুরোধ করল।

দাঁড়াও, আগে রোভারকে শুনিয়ে নিই।
টেপটা আবার শুরুতে এনে প্লে টিপে যন্ত্রটটিনহার হাতে দিল কিশোর। পুলের কিনারে ঝুঁকে বাক্সটা পানির তলায় নিয়ে গেল টিনহা। রোভারকে লক্ষ করছে তিন গোয়েন্দা।
আরাম করে শুয়ে আছে পলের তলায় রোভার। হঠাৎ শিহরণ খেলে গেল বিশাল শরীরটায়। শরীরের দুপাশে টান টান হয়ে গেল পাখনাগুলো। শাঁ করে এক ছুটে চলে এল পুলের এপাশে। রবিনের মনে হলে হাসছে তিমিটা, প্রথমদিন যেমন করে হেসেছিল, তেমনি।
কাছে এসে থামল রোভার। এক মুহূর্ত দ্বিধা করে ঠোঁট ছোয়াল বাক্সের গায়ে।
ও-কে, গুড, কক্সটা পানি থেকে তুলল টিনহা। লক্ষ্মী রোভার, লক্ষ্মী ছেলে। সন্তুষ্ট হতেছে। একটা মাছ উপহার দিল।
পানি থেকে লাফিয়ে উঠে শুন্যেই খপ করে মাছটা ধরল রোভার, ঝপাত কর, পড়ল আবার পানিতে।
এটাই দেখতে চেয়েছিলাম, বাক্সের দিকে ইঙ্গিত করে বলল টিনহা। মনে হচ্ছে কাজ হবে। সাগরে ছাড়লে দূরে চলে গেলেও এর সাহায্যে ডেকে আনতে পারব। ওর ডাকই একে ফিরিয়ে আনবে।
আরেকটা ক্যাসেটে রি-রেকর্ড করে দিতে পারি, কিশোর পরামর্শ দিল। এটাকে বার বার প্লে করে অন্য ক্যাসেটে রেকর্ড করতে থাকব, এখানে আছে দেড়দুই মিনিট, আধ ঘণ্টা বানিয়ে ফেলতে পারব এটাকে।
মন্দ বুদ্ধি না, বাক্সটা বাড়িয়ে দিল টিনহা। হাসপাতালে যাওয়া দরকার। চলো, তোমাদেরকে বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে যাই।
র‍্যঞ্চ হাউসের বাইরে পথের পাশে পার্ক করা আছে সাদা পিকআপ। আগের মতই এবারেও মুসা উঠল পেছনে, অন্য তিনজন সামনে।
খুব সতর্ক, দক্ষ ড্রাইভার টিনহা। কিন্তু এখন তার চালানো দেখে মনে হচ্ছে, কেমন যেন বেসামাল। মোড়ের কাছেও গতি কমাচ্ছে না, বেপরোয়া গতির রেকর্ড ভঙ্গ করতে চলেছে যেন।
সামনে ডান দিকে তীক্ষ্ণ একটা মোড়। লাগামছাড়া পাগলা ঘোড়ার মত ছুটে যাচ্ছে গাড়ি।
হ্যাণ্ডব্রেক টানল টিনহা। কিছুই হলো না! গতি কমল না গাড়ির। ইমারজেন্সী ব্রেকটা পুরো চাপল। কিন্তু স্পীডোমিটারের কাটা তোয়াক্কাই করল না, দ্রুত সরে যাচ্ছে ডানে, চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ-পঞ্চাশ।
কি হয়েছে..., কথা আটকে যাচ্ছে রবিনের। ব্রেকে গোলমাল।

মাথা ঝাঁকাল টিনহা। কিছুতেই কাজ করাতে পারছি না। শীয়ারের হাতল চেপে ধরে টান দিল, ইঞ্জিন নিচু গীয়ারে এনে গতি কমাতে চাইছে। থরথর করে কাপছে গাড়ি। মিটারের কাঁটা অস্থির।
পথের মাঝখানে গাড়ি নিয়ে এসেছে টিহা উল্টো দিক থেকে যদি কোন গাড়ি আসে এখন, মুখোমুখি সংঘর্ষে চুরমার হয়ে যাবে দুটোই।
সামনে গাড়ি দেখা গেল না। ভীষণ দৈত্য মনে হচ্ছে এখন সামনের মোড়ের পাথুরে পাহাড়ী দেয়ালটাকে!
ড্যাশবোর্ডে পা, আর সীটের পেছনে পিঠের চাপ দিয়ে শরীরটাকে কঠিন করে তুলেছে কিশোর আর রবিন। ধাক্কা প্রতিরোধের জন্যে তৈরি কতখানি ঠেকাতে পারবে, আদৌ পারবে কিনা, জানে না।
শাঁই করে ভানে স্টিয়ারিং কার্ট টিনহা, একই সঙ্গে রিভার্স করে দিল গীয়ার এখনও দেয়ালটা চটে আসছে মানে হচ্ছে।
চোখের পলকে ঘটে গেল অনেকগুলো ঘটনা, একটা স্ফুলিঙ্গ ছুটতে যতখানি সময় লাগে, ততটুকু সময়ের মধ্যে; হঠাৎ যেন এক পাশে সরে গেল দেয়াল, পরক্ষণেই পাশের জানালার কয়েক ইঞ্চি তফাতে চলে এল। গো গো চিৎকারে তার প্রতিবাদ জানাচ্ছে ইঞ্জিন। সীট খামচে ধরেছে কিশোর আর রবিন। কাজগুলো করছে অনেকটা অবচেতন, স্বয়ংক্রিয়ভাবে। আসলে তাদেরকে দিয়ে করিয়ে নিচ্ছে তাদের মগজ।
স্টিয়ারিং এখনও জানেই চেপে রেখেছে টিনহা! ঘষা খেয়ে তীক্ষ্ণ চিৎকারে কান ঝালাপালা করে দিচ্ছে টায়ার। জোর ঘষা লাগছে জানালার সঙ্গে দেয়ালের! খামচে টেনে জানালার চামড়া ছিড়ে রাখতে চাইছে রুক্ষ পাথরের দেয়াল।
স্টিয়ারিং সোজা করল টিনহা। দেয়ালের সঙ্গে একপাশের পুরো বডির ঘষা লাগছে এখন। চাকা জ্যাম হয়ে গেল। পিছলে আরও দশ গজ মত সামনে বাড়ল গাড়ি, প্রচণ্ড ঝাকুনি দিয়ে থেমে গেল। বন্ধ হয়ে গেল ইঞ্জিন।
পুরো এক মিনিট কেউ কোন কথা বলতে পারল না। স্টিয়ারিঙে মাথা রেখে বিশ্রাম নিচ্ছে টিনহা, জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ছে।
ও-কে, মাথা তুলল টিনহা কণ্ঠস্বর খসখসে, কিন্তু সামলে নিয়েছে অসাধারণ স্নায়ুর জোর। চলো, নামি। দেখি, ক্ষতি কতখানি হয়েছে। রবিন, তোমার দিক দিয়ে বেরোতে হবে, এদিকে দরজা আটকে গেছে! – নামল তিনজনে। রবিনের গায়ের কাঁপুনি থামেনি। গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে পঁড়িয়ে থাকল আরও কিছুক্ষণ। মনে পড়ল মুসার কথা।
ঝট করে সোজা হলো রবিন, তাড়াতাড়ি গিয়ে পেছনের টেইলগেট নামিয়ে উকি দিল। চেঁচিয়ে ডাকল, কিশোর, দেখে যাও।

ছুটে এল কিশোর। দুজনে উঠে পড়ল ট্রাকের পেছনে।
হাত-পা ছড়িয়ে উপুড় হয়ে পড়ে আছে মুসা। নিথর। তাড়াতাড়ি তার হাত তুলে নিয়ে নাড়ি দেখল রবিন।
নড়েচড়ে উঠল মুসা। চোখ মেলল। ফিসফিস করে বলল, আল্লাহরে।...বেঁচে আছি না মরে গেছি...
বেঁচেই আছ, এত উত্তেজনার মাঝেও মুসার কথার ধরনে না হেসে পারল না রবিন, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল বন্ধুকে নিরাপদ দেখে। পালস ঠিক আছে, কপার ভঙ্গিও আগের মতই।
কে বলল আগের মত? উঠে বসে হাত-পা ভেঙেছে কিনা টিপেটুপে দেখল সা। গলার ভেতরে কোলাব্যাঙ ঢুকেছে বুঝতে পারছ না?...কিন্তু হয়েছিল কি? ঠাটা পড়েছিল? নাকি দৌড়ের বাজি লাগিয়েছিল।
মাথা নাড়ল কিশোর। আমার মনে হয় ব্রেকের সংযোগ কেটে দিয়েছে কেউ।
ইচ্ছে করে উঠে দাঁড়াল মুসা।
চলো, গিয়ে দেখি, বলল রবিন!
কিশোরের অনুমান ঠিক, বোঝা গেল। ওরা ট্রাকের পেছন থেকে নেমে এসে দেখল, বনেট তুলে ভেতরে দেখছে টিনহা। ব্রেক প্যাডালের কানেকশন রডটা কাটা, হ্যাণ্ডব্রেকের সংযোগও বিচ্ছিন্ন। করাত দিয়ে নিখুতভাবে কাটা হয়েছে।
উলফের বাড়ির বাইরে যখন ছিল, তখন কেটেছে, কিশোর বলল। অনেকক্ষণ সময় পেয়েছে কাটার।
কে কাটল? ভুরু কোঁচকাল টিনহা। কেন?
কিশোরও জানে না এই প্রশ্নের জবাব। এ-নিয়ে ভাবতে হবে ঠাণ্ডা মাথায়।
পরের দুঘন্টায় অনেক কাজ করতে হলো। একটা টেলিফোন বুদে গিয়ে ওশন ওয়ারল্ডে ফোন করল টিনহা। ক্রেন নিয়ে এল তার দুই মেকসিকান বন্ধু। সাদা পিকআপটাকে টেনে নিয়ে চলল ওরা। তিন গোয়েন্দাকে গাড়িতে করে নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দিল ইয়ার্ডে।
সোজা এসে হেডকোয়ার্টারে ঢুকল কিশোর। সুইভেল চেয়ারে হেলান দিয়ে আরাম করে বসল। পুরোপুরি চালু করে দিল মগজ।
কে, শব্দ করে ভাবছে কিশোর, যাতে তার ভাবনায় সাহায্য করতে পারে রবিন আর মুসা, কেউ একজন চাইছে না, আমরা ক্যাপটেন শ্যাটানোগার বোটটা খুঁজে বের করি। আজ আমাদের খুন করতে চেয়েছিল সে-ই, কিংবা মারাত্মক আহত, টিনহাকে ঠেকাতে চেয়েছিল। ঠেকাতে চেয়েছিল আমাদের সবাইকেই, যাতে রোভারকে ট্রেনিং দিয়ে বোর্টটা খুঁজতে না পারি। থামল সে, নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল, তারপর বলল, তিনজন এখন আমাদের সন্দেহভাজন, চিনি, এমন

তিনজন। এক, এক আঙুল তুলল সে, বিংগো উলফ। কিন্তু বোটটা খুঁজে পেলেই তার লাভ বেশি। সে-ই তো সব করেছে, টিনহাকে ফোন করেছে, তিমিটাকে উদ্ধার করতে সাহায্য করেছে, তার বাড়িতে পুলে জায়গা দিয়েছে, ওটাকে ট্রেনিং দেয়াতে বাধ্য করেছে টিনহাকে। এ সবই প্রমাণ করে, আমাদের সাফল্য চায় সে।
আবার থামল কিশোর। দুই আঙুল তুলল। দুই নম্বর, নীল বনেট।.ওর সম্পর্কে কি জানি আমরা? বলতে গেলে কিছুই না। আমাদের সম্পর্কে অনেক কিছু জানে সে। আমাদের সঙ্গে তার দেখা হওয়ার আগে থেকেই জানে আমাদের নাম, আমরা কে? কি করে জানল?
কেউ জবাব দিল না।
অনেক মিছে কথা বলেছে সে আমাদের সঙ্গে, টিনহার বাবা সেজেছে, আবার বলে চলল কিশোর। তবে কিছু সত্যি কথাও বলেছে। বলেছে, ক্যাপটেন শ্যাটানোগার সঙ্গে মাছ ধরতে গিয়েছিল উলফ, সে-সময় ঝড়ে ক্যাপটেনের বোট ডুবেছে মেকসিকোতে যাওয়ার সময়, না না, দড়াও, হাত তুলল সে, ভুল বলেছি। বাজা ক্যালিফোর্নিয়া থেকে ফেরার সময়।
চুপ করে রইল দুই সহকারী।
নিথর হয়ে বসে রইল কিশোর কয়েক মুহূর্ত, তারপর হাত বাড়িয়ে টেনে নিল টেলিফোন। ডায়াল করল।
হ্যালো, স্পীকারে বেজে উঠল টিনহার কণ্ঠ।
আমি কিশোর।
ও, কিশোর। ভাল আছো? উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে।
না, উদ্বিগ্ন নই, জবাব দিল কিশোর। বিস্মিত।
বিস্মিত! কেন?
কয়েকটা কথা জানা দরকার। হয়ত সাহায্য করতে পারবেন।
বলো।
ওশন ওয়ারন্ডে আপনাকে আমাদের একটা কার্ড দিয়েছিলাম মনে আছে? কাউকে দেখিয়েছেন?
না।
কার্ডটা কি করেছেন?
ডেস্কের ওপরই ফেলে রেখেছিলাম।
অন্য কেউ দেখে ফেলতে পারে?
পারে। আরও কয়েকজন ট্রেনার বসে ওঘরে। দরজার তাল্য প্রায় সব সময়েই ভোলা থাকে। তোমরা সেদিন চলে যাওয়ার পর কার্ডটা রেখে তাড়াতাড়ি…
…চলে গিয়েছিলেন রোভারের কাছে, ও ভাল আছে কিনা দেখতে।

তুমি জানলে কি করে? মোড়ের কাছেই ছিলাম আমরা। আপনাকে পিকআপ নিয়ে যেতে দেখেছি।
অ। তোমাদের নাকের ডগা দিয়েই গেছি তাহলে, থামল টিনহা। আর কিছু বলবে? আপনার বাবার সম্পর্কে। উলফকে শেষ কবে নিয়ে গিয়েছিলেন আপনার বাবা যেবার তাঁর বোট ডুবেছে?
দীর্ঘ নীরবতা। মনে করার চেষ্টা করছে বোধহয় টিনহা। বলতে পারব না। মাঝেমধ্যেই কাজে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়ি, তখন আর স্যান পেড্রোতে যাওয়া সম্ভব হয় না। সান্তা মনিকায় আমার এক বান্ধবীর ঘর শেয়ার করি। প্রতি সোমবারে বাবাকে দেখতে যেতাম স্যান পেড্রোতে। কিন্তু সেবার সান ডিয়েগোতে গিয়েছিলাম, বাড়ি যাইনি। দু-হপ্তা বাবার খোজ নিতে পারিনি, তারপর হাসপাতাল থেকে ফোন এল... কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে গেল তার। মর্মান্তিক সেই মুহূর্তটা মনে পড়েছে হয়তো।
সহানুভূতি দেখিয়ে চুপ করে রইল কিশোর, টিনহাকে সামলে নেয়ার সময় দিল। কোন দিকে নিয়ে যা বুঝাতে পারছি। পুরো চোদ্দ-পনেরো দিনই হয়তো বাবা আর উল সাগরে ছিল, এবং সেটা জানার উপায় ছিল না, এই তো?
তাই নয় কি? পাল্টা প্রশ্ন করল কিশোর।
ব্যাপারটা খুব জরুরী?
জরুরী, জানাল কিশোর।
টিনহা লাইন কেটে দেয়ার পরও অনেকক্ষণ গুম হয়ে বসে রইল গোয়েন্দা প্রধান, গভীর ভাবনায় ডুবে রইল। সত্যিই কি বাজায় গিয়েছিল ক্যাপটেন আর উল? ফেরার পথেই ঝড়ে পড়েছিল? জানতে হবে।
কিন্তু কিভাবে? মুখ তুলে তাকাল মুসার দিকে। মিস্টার ক্রিস্টোফারের সঙ্গে দেখা করতে হবে। যাবে?
নিশ্চই? উঠে দাঁড়াল মুসা। যাব না মানে।
রবিন?
যাব, বিখ্যাত চিত্রপরিচালককে সাহায্যের অনুরোধ করবে, বুঝতে পারছে রবিন, কিন্তু একটা কথা ভুলে যায়নি। তিনজন সন্দেহভাজনের মধ্যে দুজনের নাম উল্লেখ করেছে কিশোর, আরেকজন কে?
কিশোর, এক সেকেণ্ড, বলল রবিন। আরেকজন কাকে সন্দেহ করছ?
দুই সুড়ঙ্গের পান্না তুলে ফেলেছে কিশোর, রবিনের কথার জবাব দিল না। অদৃশ্য হয়ে গেল সুড়ঙ্গের ভেতরে।
হুঁ, বেশ জটিলই মনে হচ্ছে, সব শুনে বললেন ডেভিস ক্রিস্টোফার। বলো, দেখি কিছু করা যায় কিনা।

পর পর কয়েকটা ফোন করলেন তিনি বিভিন্ন জায়গায়। তারপর বেয়ারাকে ডেকে আইসক্রীম আনতে বললেন। বিশাল টেবিলে তার সামনে পড়ে থাকা খোলা ফাইলটা আবার টেনে নিতে নিতে বললেন, তোমরা খাও, আমি কাজটা সেরে নিই, খুব জরুরী। চিন্তা নেই, খবর এসে যাবে।
ধীরে ধীরে খেলো ছেলেরা। কাজ করেই চলেছেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। চুপচাপ বসে থেকে তাদের সময় আর কাটতে চাইছে না। কথাও বলতে পারছে না, চিত্রপরিচালকের কাজের অসুবিধে হবে। অস্বস্তিকর পরিবেশ। কিশোর প্রায় বলেই ফেলেছিল, আমরা এখন যাই, বাড়ি গিয়ে ফোন করে খবর জেনে নেব, ঠিক এই সময় বাজল ফোন।
রিসিভার তুলে নিলেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। নীরবে শুনতে লাগলেন ওপাশের কথা শুনছেন, মাঝে মধ্যে হাঁ করছেন।
উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করছে ছেলেরা, মুসা কাত হয়ে গেছে একপাশে, যেন ওভাবে ঝুঁকে কান খাড়া করলেই রিসিভারের কথা শোনা যাবে।
অবশেষে রিসিভার নামিয়ে ছেলেদের দিকে তাকালেন মিস্টার ক্রিস্টোফার, খবর কিছু পেয়েছি। কিন্তু তোমাদের কেসে এটা কি করে ফিট হবে বুঝতে পারছি না।
কি খবর, স্যার? উত্তেজনায় সামনে ঝুঁকে এল কিশোর, আর ধৈর্য ধরতে পারছে না।
মেকসিকান ইমিগ্রেশন অথরিটির কাছে ফোন করেছিলাম। খোজ নিয়েছে ওরা। ফেব্রুয়ারির দশ তারিখে ক্যাপটেন শ্যাটামোগার বোটে উঠেছিল বিংগো উলফ। লা পাজে, বন্দরে ছিল দুদিন, বারোই ফেব্রুয়ারি রওনা হয়েছে।
মাথা নোয়াল কিশোর, কুটি করল। থ্যাংক ইউ, স্যার, বলল সে। ক্যাপটেন শ্যাটানোগার বোট ডুবেছে সতেরো তারিখে, নিঃসন্দেহ বাজা থেকে ফেরার পথে। স্যান পেড্রোতে ফিরছিল, এই সময় ঝড়ে পড়ে বোট। মূসা আর রবিনের দিকে তাকাল। আমার যা মনে হয়, মেকসিকো উপকূলের কাছেই কোথাও মাল চালান দেয়। তবে, আবার চিত্রপরিচালকের দিকে ফিরল সে, সেবার বোধহয় কোন কারণে মাল নামাতে পারেনি। ওগুলো নিয়েই আবার ফেরত আসছিল। কিংবা মিছে কথা বলেছে উলফ, ক্যালকুলেটরগুলো আদৌ নেই জাহাজে। আপনার কি মনে হয়, স্যার?
বুঝতে পারছি না, হাসলেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। প্রথমেই তো বললাম, এবারের কেসটা বেশ জটিল।
আমার কাছেও পরিষ্কার হয়নি এখনও, উঠল কিশোর। তো আমরা আজ যাই, স্যার।
এসো।

দরজার দিকে চলল তিন গোয়েন্দা। পেছন থেকে চেয়ে আছেন চিত্রপরিচালক মুচকি হাসি ফুটল ঠোঁটে। বিড় বিড় করলেন, ছেলে একখান। ওর পেট থেকে কথা আদায় করা ফাইলটা টেনে নিলেন আবার।
কি বুঝলি, কিশোর? মেরিচাচী বললেন। পারবি?
ওয়ার্কশপের কোণে রাখা পুরানো ওয়াশিং মেশিনটার দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। আগের দিন কিনে এনেছেন ওটা রাশেদ চাচা। এককালে বোধহয় সাদা রঙ ছিল, এখন হলদে হয়ে গেছে, জাগায় জায়গায় চলটা ওঠা। জায়গায় জায়গায় বাকাচোরা, টেপ খাওয়া। কিশোরের মনে হলো, দোমড়নো কাগজ হাত দিয়ে চেপেচুপে আবার সোজা করা হয়েছে। মোটরটার অবস্থা কি হবে, আন্দাজ করা যাচ্ছে। বলল, চেষ্টা করে দেখতে পারি। সারা দিন লাগত।
চাচী হাসলেন। দুশ্চিন্তা অনেকটা দূর হলো। কিশোরের চেষ্টা করা মানেই তিনি ধরে নিলেন, হয়ে গেছে। নগদ পয়সা দিয়ে একটা জিনিস কিনে এনে বিক্রি হবে না, এ-দুঃখ কি সওয়া যায়? অন্তত মেরিচাচীর জন্যে এটা রীতিমত মনঃকষ্টের ব্যাপার।
কর বাবা, কাজে লেগে যা, ঠিক করে ফেল, খুশি হয়ে বললেন তিনি। তোকে আজ স্পেশাল লাঞ্চ খাওয়াব।
বেশি করে বেঁধ্যে, চাচী। নইলে মুসা এসে শুনলে হার্টফেল করবে।
হেসে চলে গেলেন চাচী।
এসব কাজে সারাদিন কেন সারা বছর ব্যয় করতেও কোন আপত্তি নেই। কিশোরের, অকেজো যন্ত্রপাতি মেরামত করে আবার চালু করার মধ্যে দারুণ আনন্দ আছে।
ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই জংধরা সমস্ত ঔ খুলে মেশিনটাকে টুকরো টুকরো করে ফেলল কিশোর, মোটরটা আলগা করে ফেলল। বেজায় ভারি, ওয়ার্কবেঞ্চের ওপর হাতে বেশ কসরত করতে হলো। যতখানি আশঙ্কা করছিল, তত খারাপ অবস্থায় নেই। অনেক পুরানো মডেল, তিরিশ বছরের কম হবে না। তবে জিনিস বানাত বটে তখন, যত্ন করে ব্যবহার করলে একজনের সারা জীবন চলে যাবে একটাতেই। এখনকার মত এত কমার্শিয়াল ছিল না প্রস্তুতকারকরা।
একটা ড্রাইভিং বেল্ট দরকার, ডাবল কিশোর, বানিয়ে নিতে হবে। ওয়ার্কশপের জঞ্জালের সুপ খুঁজতে শুরু করল সে, শক্ত রবার দরকার। একই সঙ্গে ভাবনা চলছে, মেশিনটার কথা নয়, ভাবছে তাদের নতুন কেসের কথা। আগামীকাল সকালে টিনহার সঙ্গে দেখা করার কথা তিন গোয়েন্দার, সৈকতের এক জায়গায় একটা খাঁড়ির কাছে, টিনহার মেকসিকান বন্ধুদের সাহায্যে রোভারকে নিয়ে

যাওয়া হবে ওখানে। তিন গোয়েন্দা আর রোভারকে নিয়ে দুবহু বোটটা খুঁজতে যাবে টিনহা।
হঠাৎ স্থির হয়ে গেল কিশোর। ওয়ার্কবেঞ্চের ওপরে ঝোলানো লাল আলোটা জ্বলছে-নিড়ছে, তারমানে ফোন বাজছে হেডকোয়ার্টারে। এই বিশেষ ব্যবস্থাটা কিশোরই করেছে।
রবার খোঁজা বাদ দিয়ে এক টানে সরিয়ে ফেলল দুই সুড়ঙ্গের মুখের লোহার পাত। হামাগুড়ি দিয়ে আধ মিনিটেই পৌঁছে গেল অফিসে। ছোঁ মেরে তুলে নিল বিসির।
হাল্লো, হাঁপাচ্ছে, কিশোর পাশা।
আলো, কিশোর, পরিচিত কণ্ঠস্বর, তিমিটার খোজ পেরেছ? খোজকে বলল খো-ওজ।
ফোন করছেন, ভালই হয়েছে, স্যার, কিশোর বলল। অনেক এগিয়েছি। আমরা। আশা করি, কাল সকাল সাতটা নাগাদ রোডারকে ছেড়ে দিতে পারব সাগরে!
দীর্ঘ নীরবতা।
হালো? জোরে বলল কিশোর। হালো?
হালো, ভাল সংবাদ, জবাব এল। খুব ভাল।
থ্যাংক ইউ।
ও হ্যাঁ, একশো ডলার পুরস্কার দেব বলেছিলাম।
হ্যাঁ,বলেছিলেন। নাম-ঠিকানা যদি দেন, বিল পাঠিয়ে দেব। তিমিটা যে সাগরে ছাড়ছি, তার একটা ফটোগ্রাফও দেব। কাজ করেছি, তার প্রমাণ।
আরে না না, তার দরকার নেই। তোমার মুখের কথাই যথেষ্ট। আসলে, আগামী কিছু দিন শহরের বাইরে থাকব আমি, আজ বিকেলেই যদি দেখা করো, টাকাটা দিয়ে দিতে পারি। কারও পাওনা আটকে রাখা পছন্দ না আমার।
তাহলে তো খুবই ভাল হয়, বলল বটে, কিন্তু সন্দেহ জাগল কিশোরের, টাকা দেয়ার জন্যে এত আগ্রহ কেন? নাম ঠিকানাই বা জানাতে চায় না কেন? আর তিন গোয়েন্দাকেই বা এত বিশ্বাস কিসের, মুখের কথায়ই টাকা দিয়ে দেয়? কোথায় দেখা করব আপনার সঙ্গে, স্যার?
বারব্যাংক পার্ক চেনো?
চেনে কিশোর। অনেক বছর আগে একটা জনপ্রিয় জায়গা ছিল। পার্কের মাঝখানে পুরানো একটা ব্যাণ্ডস্ট্যাণ্ড আছে, এককালে নামকরা বাজিয়েরা বাজনা বজাত সেই মঞ্চে উঠে, চারপাশে ভিড় করে দাঁড়িয়ে লোকে শুনত। আস্তে আস্তে সরে চলে এল রকি বীচ শহর, এলাকা ছেড়ে চলে এল লোকে। পার্কটা এখনও আছে ওখানে কিন্তু কদর নেই, অযরে লম্বা লম্বা ঘাস গজিয়ে ঢেকে

দিয়েছে ফুলের বাগান, পথ। আগাছা আর ছোট ছোট ঝোপঝাড়ের জঙ্গল এখন ওখানে। রাতের বেলা আর ওদিক মাড়ায় না এখন কেউ।
সন্ধ্যা আটটায় আসবে ওখানে, বলল লোকটা। তোমার বন্ধুদের আনার দরকার নেই। তুমি একলা। ব্যাণ্ডস্ট্যান্ডের কাছে অপেক্ষা করব আমি। ব্যাণ্ডস্ট্যাণ্ড উচ্চারণ করল বেই-অ্যাণ্ড স্টেই-অ্যাণ্ড।
স্যার... আর কোন ভাল জায়গায় দেখা করা যায় কিনা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল কিশোর, কিন্তু লাইন কেটে গেল।
রিসিভার রেখে দিয়ে ডেস্কের দিকে চেয়ে ভাবতে লাগল কিশোর। একা যেতে বলল কেন লোকটা? আর এমন বাজে একটা জায়গায় কেন? সন্দেহ গাঢ় হলো তার। আবার রিসিভার তুলে মুসা আর রবিকে ফোন করল, জানাল সব। তারপর ফিরে এল ওয়ার্কশপে।
বিকেল পাঁচটা নাগাদ মোটর ঠিক হয়ে গেল। নতুন স্ক্রু দিয়ে জায়গামত জুড়ে দিল সেটা। মেরিচাচীকে ডেকে এনে উদ্বোধন করল মেরামত করা যন্ত্রের। সকেটে প্লগ চুকিয়ে দিয়ে বলল, সুইচ টেপো, চাচী।
গো-ওঁওঁওঁ করে স্টার্ট নিল মোটর, আস্তে আস্তে শব্দ বাড়তে লাগল, শেষে গর্জে উঠল ভীষণ ভাবে। এত জোরে কাঁপতে লাগল, মনে হচ্ছে ভূমিকম্প কাঁপছে। যা-ই হোক, চাল তো হয়েছে, মেরিচাচী এতেই খুশি। তার মতে এই ভয়ঙ্কর জিনিস নেয়ার মত হাড়কিপটে লোকও পাওয় যাবে এ শহরে।
তুই সত্যি একটা ভাল ছেলে, কিশোর, উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন মেরিচাচী। হোর মত ছেলে আর একটাও নেই দুনিয়ায় (সব সময়ই মেরিচাচীর এই ধারণা, কিন্তু বলেন না। আজ এতই খুশি হয়েছেন, চেপে রাখতে পারলেন না আর)। কাজ অনেক হয়েছে। চল, হাতমুখ ধুয়ে খাবি। হাত ধরে কিশোরকে নিয়ে চললেন চাচী।
প্রায় ডিনারের সময় লাঞ্চ খেতে বসল কিশোর। ভরপেট খাওয়ার পর বেশ বড় সাইজের একটা আইসক্রীম শেষ করল। সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে এল ইয়ার্ড থেকে।
পড়ন্ত আলোয় বেশ বড় জঙ্গল মনে হচ্ছে বারব্যাংক পার্ককে। কাছে এসে সাইকেল থেকে নামল কিশোর। পকেট থেকে সাদা চক বের করে পথের ওপর বড় একটা আশ্চর্যবোধক চিহ্ন আঁকল।
তিন গোয়েন্দার তিনজনেই পকেটে চক রাখে, একেকজন একেক রঙের। কিশোর রাখে সাদা, রবিন সবুজ, মুসা নীল। কোন কেসের তদন্তের সময় কেউ কোন বিপদে পড়লে অনেক কাজে লাগে এই চক আর আশ্চর্যবোধক চিহ্ন।
পার্কে ঢোকার পথের সন্ধান পাওয়া গেল। রাস্তা দেখা যাচ্ছে না, তবে দু-ধারে স্ট্রীট লাইট দেখে অনুমান করে নিল, পথটা কোথায় থাকতে পারে। কাছে এসে

দেখল, দুপাশ থেকে এসে পথের প্রায় পুরোটাই ঢেকে দিয়েছে আগাছা আর লতা ঝোপ, মাঝখানের সরু একটুখানি শুধু বাকি। এগিয়ে চলল সে। খানিক পর পরই একটা করে আশ্চর্যবোধক একে দিচ্ছে গাছের গায়ে, কিংবা ভাঙা কোন বেঞ্চিতে।

কল্পনা-বিলাসী নয় কিশোর। বাস্তবতার বাইরে কোন কিছুই বিশ্বাস করে না। ঝোপকে ঝোপই মনে করে, লুকানোর খুব ভাল জায়গা, বিষাক্ত সাপখোপ থাকতে পারে ভেতরে, তবে তৃত থাকে না।

কিন্তু হাজার হোক মানুষের মন, হোক না সেটা কিশোর পাশার। নির্জন জংলা পার্কের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে অকারণেই গা ছম ছম করে উঠল তার। মনে হলো, আশেপাশের সব কিছুই যেন জীবন্ত, নড়ছে, কথা বলছে ফিসফিস করে। গাছের বাকা ডালগুলো যেন কোন জীবের পঙ্গু হাত-পা। ছোট ছোট শাখাগুলো আঙুল, তাকে আঁকড়ে ধরে ছিনিয়ে যাওয়ার জন্যে হাত বাড়িয়ে আছে, ধরতে পারলেই টেনে নিয়ে গিয়ে ভরবে অন্ধকার জঠরে।

অন্ধকার নামতে শুরু করেছে। সামনে মঞ্চটা দেখতে পেল কিশোর। ছাউনি ধসে পড়েছে, চারপাশে আগাছার জঙ্গল, আর কিছুদিন পর একেবারে ঢেকে যাবে। তখন মনে হবে ঘাসের একটা উঁচু ঢিপি।

মঞ্চের গায়ে সাইকেল ঠেস দিয়ে রেখে ভাঙা একটা কাঠের বোর্ডে আশ্চর্যবোধক চিহ্ন আঁকল।

কিশোর পাশা।

এতই চমকে উঠল কিশোর, ঘুরতে গিয়ে হাতের ধাক্কায় আরেকটু হলেই ফেলে দিয়েছিল সাইকেলটা। চারপাশের বিষঃ অন্ধকারে লোকটাকে খুঁজল তার চোখ, কিন্তু দেখা গেল না।

কে কোনমতে বলল।

খসখস শব্দ শোনা গেল। লম্বা ঘাসের ভেতর দিয়ে এগিয়ে আসছে। গজখানেকের মধ্যে আসার পর একটা মানুষের অবয়ব চোখে পড়ল কিশোরের। খুব লম্বা, মাথায় হ্যাটের কিনারা নিচু হয়ে নেমে এসেছে কানের ওপর। চোখ দেখা যাচ্ছে না, চেহারাও বোঝা যাচ্ছে না, নাক মুখ কিছুই যেন নেই, লেপটানো। অদ্ভুই।

লোকটা বিশালদেহী। গায়ে উইণ্ডব্রেকার, কাঁধ এত চওড়া, আর এত মোটা বাহু, কিশোরের মনে হলো একটা গরিলা, মানুষ নয়।

এগোও, কিশোর, বলল লোকটা। যা নিতে এসেছ নিয়ে যাও। কথাবার্তাও জানি কেমন।

আগে বাড়ল কিশোর।

চোখের পলকে তার কাঁধ চেপে ধরে এক ঝটকায় তাকে লাঠুর মত ঘুরিয়ে ফেলল লোকটা। ঘাড় চেপে ধরল। পেছনে হাত নিয়ে গিয়ে লোকটার বাহু খামচে পরে ছাড়ানোর চেষ্টা করল কিশোর। অদ্ভুত একটা অনুভূতি। নরম পাউরুটির ভেতরে দেবে গেল যেন তার আঙুল।
ছটফট শুরু করল কিশোর, ঝাঁকুনি দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা চালাল। লোকটার আরেক হাত গলা চেপে ধরল তার। হাতের আঙুলগুলো হাভিডসর্বস্ব। অবাক কাণ্ড! এত মোটা লোকের এই আঙল।
পুরো অসহায় হয়ে গেল গোয়েন্দাপ্রধান।
যা করতে বলব, ঠিক তাই করবে, বলল আগন্তুক।
মাথা নুইয়ে আচ্ছা বলার চেষ্টা করল কিশোর, পারল না। হ্যামারলকে আটকে ফেলা হয়েছে তাকে।
যদি না করো, কানের কাছে গোঙাল লোকটা, যা বলব যদি না করো, ঘাড় মটকে দেব। ঘাড় মটকের উচ্চারণ মনে হলো অনেকটা ঘাড়ম-টকে।
যা যা করতে বলা হলো, ঠিক তাই করল কিশোর।
মঞ্চের কাছ থেকে হেঁটে চলল, যে পথে এসেছে, সেটা নয়, অন্য পথে। আরেকটা গাছের গায়ে আচযবোধ আঁকার সুযোগ খুজছে। কিন্তু পকেট থেকে চক বের করার সুযোগ নেই। অন্য কায়দার ধরেছে এখন তাকে লোকটা, ডান হাত মুচড়ে নিয়ে এসেছে পিঠের ওপর, একেবারে শোল্ডার ব্লেডের কাছাকাছি। ব্যথা পাচ্ছে কিশোর।
পার্কের বাইরে পথের ওপর দাঁড়িয়ে আছে একটা পুরানো ঝরঝরে লিমোসিন।. কিশোরকে গাড়িটার কাছে নিয়ে এল লোকটা। হাত মুচড়ে ধরে রেখেই আরেক হাতে পকেট থেকে চাবিবের করে বুটের তালা খুলল।
ঢোকো, আদেশ দিল লোকটা।
পথের শেষ মাথার দিকে তাকাল কিশোর। কেউ নেই। সাহায্যের জন্যে ঙ্গিকার করে লাভ হবে না।
হাতে সামান্য ঢিল পড়ল। টান দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিল কিশোর, লোকটাও অবশ্য ছেড়ে দিল। বিশাল, তুলতুলে নরম বুকের চাপ রেখেছে কিশোরের পিঠে, হাত মুক্ত হলেও পালাতে পারবে না কিশোর। পেট আর বুক দিয়ে ঠেলছে লোকটা, তাকে বুটে ঢোকার জন্যে। আরেকটু হলেই ভারসাম্য হারিয়ে ভেতরে পড়বে কিশোর।
আঁউ, করে হাত-পা ছেড়ে দিল কিশোর, যেন সহসা জ্ঞান হারিয়েছে। পড়ে গেল পথের ওপর, মুখ গুজে রইল। পড়ার সময়ই চক বের করে ফেলেছে, ডান হাতটা ঢুকিয়ে দিয়েছে গাড়ির তলায়। পথের ওপর একটা আশ্চর্যবোধক একে ফেলল।

দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ল লোকটা, ভাবছে কি করবে। ছেলেটা হঠাৎ এভাবে বেহুশ হয়ে পড়বে, আশা করেনি।
কিশোরের ঝাকড়া চুল ধরে টেনে তুলল সে, প্রায় ছুঁড়ে ফেলল বুটের মধ্যে। দড়াম করে নামিয়ে দিল ডালা।
চলতে শুরু করল গাড়ি।
বুটের ভেতরে ঘন অন্ধকার, অপরিসর জায়গা, তার ওপর পোড়া মোটর অয়েল আর পেট্রলের তীব্র গন্ধ, পাক দিয়ে ওঠে নাড়ীভুড়ি। পোড়া গন্ধেই বোঝা যাচ্ছে, তেল খাওয়ার রাক্ষস গাড়িটা। গ্যালনে দশ মাইল যায় কিনা সন্দেহ। এ সমস্ত গাড়িতে আলাদা ট্রেল ক্যান রাখে লোকে।
অন্ধকারে হাতড়াতে শুরু করল কিশোর। একটু পরেই পেয়ে গেল যা খুজছিল। কোমরের কেট থেকে আট-ফলার প্রিয় দুরিটা খুলে একটা বাকা কলা দিয়ে খোচাতে লাগল কানের গায়ে। ছোট একটা ছিদ্র করে ফেলল।
পুরানো গাড়ি, বুটের ভেতরটা আরও পুরানো। মেঝেতে মরচে, রঙ করার তাগিদ নেই মালিকের। কিশোরের জন্যে সহজই হয়ে গেল। ছুরির আরেকটা ফলা ব্যবহার করে মেঝেতেও আরেকটা গর্ত করে ফেলল সে।
ক্যানের ছিদ্রটা অনুমানে রাখল মেঝের গর্তের ওপর। অল্প অল্প করে তেল ঝরতে লাগল রাস্তার ওপর, ক্যানের মুখ দিয়ে ঢাললে হড়হড় করে অনেক বেশি পড়ে যেত, তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যেত তেল, তাই ছিদ্র করে নিয়েছে। যাক, একটা চিহ্ন রেখে যেতে পারছে। রাস্তায় পড়ে শুকিয়ে যাবে, কিন্তু আবছা একটা চিহ্ন থেকে যাবেই।
আস্তে চলছে গাড়ি, জোরে চলার ক্ষমতাই নেই বোধহয় এঞ্জিনের। খুব বেশি দূর গেল না। ক্যানটা মাত্র অর্ধেক খালি হয়েছে। বেশ জোরেশোরে একটা দোল দিয়ে থেমে দাঁড়াল আদ্যিকালের লিমোসিন।
বুটের ডালা উঠল আবার। চুল খামচে ধরে টান দিল লোকটা। বেরোও।
তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল কিশোর। কেউ তার চুল টানুক, মোটেও পছন্দ করে না সে।
টলমল পায়ে খাড়া হলো কিশোর। যেন এই মাত্র হুঁশ ফিরেছে। ভাঙাচোরা একটা কাঠের বাড়ির ড্রাইভ-ওয়েতে দাঁড়িয়েছে গাড়ি। চুল ছাড়েনি লোকটা, আবার যদি কেহুঁশ হয়ে যায় কিশোর, এই আশঙ্কায় বোধহয়। টেনে, ঠেলে-ধাক্কিয়ে তাকে নিয়ে এসে তোলা হলো বাড়ির বারান্দায়। ক্যাঁচকোঁচ করে আপত্তি জানাল জীর্ণ বারান্দা। কিশোরের ভয় হলো, ভেঙে না পড়ে।
চাবি বের করে দরজা খুলল লোকটা। ঢোকো। চুল ধরে জোরে ঠেলে দিল কিশোরকে ঘরের ভেতর।

অন্ধকারে মেঝেতে হুমড়ি খেয়ে পড়ল কিশোর। দরজা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ হলো। সুইচ টেপার খুট শব্দ, আলো জ্বলল।
প্রথমেই লোকটার মুখের দিকে তাকাল কিশোর। কেন তার চেহারা লেপটানো মনে হয়েছে বোঝা গেল। কাল একটা মোজা টেনে দিয়েছে মাথার ওপর দিয়ে। গোটা তিনেক ফুটো, দুটো চোখের কাছে, একটা নাকের কাছে।
আলোয় আরও বিশাল মনে হচ্ছে লোকটাকে। কিন্তু এত নরম কেন শরীর, চামড়ার নিচে খালি চর্বি, মাংস নেই?
ঘরের দিকে চোখ ফেরাল কিশোর, কি আছে না আছে দেখে নিল। কয়েকটা কাঠের চেয়ার, একটা পুরানো টেবিল-ঠেলা দিলেই হয়তো বুড়ো মানুষের দাতের মত নড়ে উঠবে, তাতে একটা টেলিফোন, জানালায় মলিন পর্দা। নোংরা দেয়াল। লোকটা বোধহয় থাকে না এখানে।
ওদিকে, হাত তুলে আরেকটা দরজা দেখাল দৈত্য।
কিশোরকে ঠেলে দরজার কাছে নিয়ে এল সে, এক ধাক্কায় ভেতরে ঢুকিয়ে বন্ধ করে দিল পান্না। বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দিল।
আবার অন্ধকারে এসে পড়েছে কিশোর। হাতড়ে হাতড়ে আবিষ্কার করল, ছোট্ট একটা ঘরে ঢোকানো হয়েছে তাকে, চিলেকোঠার চেয়ে ছোট।
হাল্লো, বাইরের ঘরে দৈত্যটার গলা শোনা গেল, টেলিফোনে কথা বলছে। মিস টিনহা শ্যাটানোগা আছে?
দরজায় কান পেতে দাঁড়াল কিশোর।
কয়েক মুহূর্ত নীরবতা। তারপর আবার শোনা গেল, মিস শ্যাটানোগ্য, আপনার বন্ধু কিশোর পাশা এখন আমার এখানে বন্দি। বন্দিকে বলল বন্দি।
নীরবতা।
হ্যাঁ, তা বলতে পারেন, মিস, কিডন্যাপ করেছি আমি। কিডন্যাপকে বলল কিডনে-আপ।
আবার নীরবতা।
না, টাকা চাই না। শর্ত একটাই তিমিটাকে সাগরে ছেড়ে দিতে হবে, এখুনি। আর আপনার বাবার বোট খোঁজা চলবে না।
দীর্ঘ নীরবতা।
তাহলে আপনার কিশোর বন্ধুকে আর দেখবেন না, মানে জ্যান্ত দেখবেন না। রিসিভার রেখে দেয়ার শব্দ হলো।
রহস্যের সমাধান করতে গিয়ে অনেক জটিল পরিস্থিতিতে পড়েছে তিন গোয়েন্দা। বিপদে পড়েছে। উদ্ধারও পেয়েছে কোন না কোনভাবে। এবারে কি ঘটবে জানে

না কিশোর। তবে টিনহা দৈত্যটার কথা না শুনলে সে যে কিশোরকে খুন করবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। মিথ্যে হুমকি দেয়নি লোকটা, কণ্ঠস্বরেই বোঝা গেছে।
আলোচনার সময় সেদিন মুসা আর রবিনকে বলেছিল কিশোর, তিনটে লোককে সন্দেহ করে সে। দুজনের নাম বলেছে, আরেকজনের বলেনি। তৃতীয় লোকটা সেই রহস্যময় ব্যক্তি, যে ফোন করে তিমিটাকে ছেড়ে দিতে বলেছে, একশো ডলার পুরস্কার ঘোষণা করেছে। এই দৈত্যটাই সেই লোক।
লোকটা চায় না ক্যাপটেন শ্যাটানোগার বোট উদ্ধার হোক। সেজন্য দরকার হলে মানুষ খুন করতেও পিছপা হবে না। এক বার তো করেই ফেলেছিল প্রায়, টিনহার পিকআপের ব্রেক নষ্ট করে দিয়ে।
আট ফলার দুরি খুলে নিল আবার কিশোর। তালা খোলার চেষ্টা করবে।
নোকটা দৈত্য, কিন্তু সেই তুলনায় স্বাস্থ্য ভাল না, পেশী বহুলনা। হয়তো হয়তো আচমকা ওকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়া যাবে আশা করল কিশোর, তারপর দেবে ঝেড়ে দৌড়। কিন্তু আগে তালা খুলতে হবে।
দুরির একটা সরু ফলা তালার ভেতরে ঢুকিয়ে নিঃশব্দে চাড় দিল কিশোর, খুঁচিয়ে চলল নীরবে।
বাইরের ঘরে পায়ের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, মচমচ করছে কাঠের মেঝে। ফলে তালা খোলার চেষ্টায় অতি সামান্য শব্দ যা হচ্ছে, সেটা ঢেকে যাচ্ছে।
হঠাৎ, আর সাবধানতার প্রয়োজন দেখল না কিশোর। মড়াৎ করে ভাঙল কি যেন পাশের ঘরে। কাঠের কিছু ভেঙেছে। কি ব্যাপার? লোকটা মেঝে ভেঙে নিচে পড়ে গেল নাকি?
তালা ল গেল। হাতল ধরে হ্যাচকা টানে দরজা খুলে ফেলল কিশোর। সেও ঢুকল বড় ঘরে, আর অমনি ঝটকা দিয়ে প্রায় ভেঙে খুলে ছিটকে পড়ল বাইরের দরজা।
অন্ধকার থেকে আলোয় এসে চোখ মিটমিট করছে কিশোর। আবছা দেখল, খোলা দরজা দিয়ে উড়ে এসে পড়ল একজন মানুষ।
ডাইভ দিয়ে মোটা লোকটার গায়ে এসে পড়ল মুসা, তাকে নিয়ে ধড়াম করে পড়ল কাঠের মেঝেতে। সারা বাড়িটাই যেন কেঁপে উঠল থরথর করে। মুসার পেছনে ছুটে ঢুকল রবিন।
মাত্র কয়েক মুহূর্ত পরেই বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা। এ ধরনের পরিস্থিতিতে আগেও অনেকবার পড়েছে, জানা আছে কি করতে হয়। এক সঙ্গে রইল না ওরা। তিনজুন তিনদিকে ছড়িয়ে পড়ে ছুটল। ধরা পড়লে একজন পড়বে। পেছনে প্রচণ্ড কাচকোচ শুনে একবার ফিরে তাকাল কিশোর। নড়বড়ে বারান্দায় বেরিয়ে

এসেছে দৈত্যটা। এলোমেলো পদক্ষেপ। টলছে। পেটে মুসার আফ্রিকান খুলির জুতসই একখান ওঁতো খেয়েছে, সুস্থির হতে সময় লাগবে।
ওই যে তোমার সাইকেল, ছুটতে ছুটতেই হাত তুলে কিশোরের সাইকেল দেখাল রবিন। তার আর মুসারটাও রয়েছে ওখানেই।
টান দিয়ে যার যার সাইকেল তুলে নিয়ে লাফিয়ে চড়ে বসল ওরা। শাঁই শাঁই করে প্যাডাল ঘোরাল। দৈত্যটা আসছে কিনা দেখারও সময় নেই, প্রাণপণে ছুটে চলল অন্ধকার পথ ধরে।
প্রথমে একটু দ্বিধায় পড়ে গিয়েছিলাম, বলল রবিন। তোমার সাইকেলটা দেখলাম মঞ্চের গায়ে ঠেকা দেয়া। চকের চিহ্ন দেখে ঢুকেছি, কিন্তু কোন পথে বেরিয়েছ, তার কোন চিহ্ন নেই।
মাথা নাড়ল কিশোর। যাওয়ার আগে বুদ্ধি করে তোমাদের জানিয়ে ভালই করেছি, বেঁচে গেছি, নইলে যা বিপদে পড়েছিলাম।
কথা হচ্ছে পরদিন সকালে। ছোট খাঁড়িটার কাছে এসে বসে আছে ওরা। পরনে সাঁতারের পোশাক।
আগের দিন রাতে বাড়ি ফিরেই টিনহাকে ফোন করেছে কিশোর, জানিয়েছে সে ভাল আছে। বোট খুঁজতে যাওয়ায় আর কোন অসুবিধে নেই।
রবিন বুঝতে পেরেছে আগে, কিশোরকে জানাল মুসা। পথে তেলের দাগ দেখতে পেলাম। কাছেই চকের দাগ। রবিন অনুমান করল, পুরানো একটা গাড়ি পঁড়িয়েছিল ওখানে, এঞ্জিন থেকে তেল ঝরে।
তা বুঝেছি, রবিন বলল, কিন্তু একশ গজ দূরে আরেকটা তেলের দাগ। আবিষ্কার করেছে মুসাই। ওটা না দেখলে তোমাকে খুঁজে পেতাম না। দুগ ধরে এগিয়ে গেলাম। দেখি, ভাঙা বাড়ির ড্রাইভওয়েতে দাঁড়িয়ে আছে ঝরঝরে একটা লিমোসিন।
শব্দ শুনে ঘুরে তাকাল ওরা। একটা ট্রাক, কাঁচা রাস্তা ধরে পরে ধীরে পিছিয়ে আসছে, এদিকেই। ট্রাকের পেছনে ফোম-রবারে আবৃত রোভার। ওর চোখ বন্ধ, ভাব দেখে মনে হচ্ছে যে আরামেই আছে।
সৈকতের সরু চিলতেটুকু পেরিয়ে পানির কিনারে নেমে গেল ট্রাক। পেছনের চাকার অ্যাকসেল এখন পানির নিচে। খাঁড়ির এই পারটা বেছে নিয়েছে টিনহা, তার কারণ জায়গাটা খুব ঢালু। কিনার থেকে কয়েক গজ দূরেই পানি এত বেশি গভীর, সহজেই সাঁতরাতে পারবে রোভার।
ট্রাক থেকে নামল টিনহা আর তার মেকলিকান বন্ধু। টিনহার পরনে সাঁতারের পোশাক, গলায় ঝুলছে স্কুবা গগলস। ঘুরে ট্রাকের পেছনে চলে এল সে, পানিতে দাঁড়িয়ে আলতো চাপড় মেরে আদর করল রোভারকে।

মস্ত বড় ট্রাক, ক্রেনও আছে। হাত তুলে মুসাকে ডাকল টিনহা। কাছে গিয়ে দেখল মুসা, বেশ চওড়া একটা ক্যানভাসের বেল্ট আটকে দেয়া হয়েছে রোভারের শরীরের মাঝামাঝি এমন জায়গায়, যাতে ওটা ধরে ঝোলালে দুদিকের ভারসাম্য বজায় থাকে।
মুসাকে সাহায্য করতে বলল টিনহা।
মুসা আর মেকসিকান লোকটা মিলে ক্রেনের হুক ঢুকিয়ে দিল ক্যানভাসের বেল্টের মধ্যে, রোভারের পিঠের কাছে। এঞ্জিন চালু করে টান দিতেই শুন্যে উঠে গেল রোভার। তার মাথায় আরেকবার চাপড় দিয়ে ভয় পেতে নিষেধ করল টিনহা।
সামান্যতম উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে না তিমিটাকে। চোখ মেলে দেখছে লেজ নাড়ছে। কিশোর আর রবিনও এসে দাঁড়িয়েছে ওখানে। তিন কিশোর মিলে ঠেলে বুলন্ত তিমিটাকে নিয়ে গেল বেশি পানির ওপর। চেঁচিয়ে নামানোর নির্দেশ দিন টিনহা ক্রেন ড্রাইভারকে।
আস্তে করে পানিতে নামিয়ে দেয়া হলো রোভারকে। বেল্ট খুলে দিল মুসা। সাঁতরাতে শুরু করল তিমি, আবার নিজের জগতে, স্বাধীন খোনা দুনিয়ায় ফিরে এসেছে। এক ছুটে চলে গেল কয়েক গজ দুরে।
রোভার, রোভার, দাঁড়াও, ডাকল টিনহা।
সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল রোভার। শরীর বঁকিয়ে ঘুরে গেল মুহর্তে, ছুটে এল, কোমর পানিতে দাঁড়িয়ে থাকা টিনহার গায়ে মুখ ঘষল। মাথায় চাপড় মেরে ওকে আদর করল টিনহা।
ও-কে,মেকসিকান বন্ধুকে বলল টিনহা, মুচাস গ্রেশাস!
হেসে গিয়ে ট্রাকে উঠল মেকসিকান। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলল, বুয়েনা সুয়েরটি, স্টার্ট দিয়ে গাড়ি নিয়ে চলে গেল সে।
রেডি? তিন গোয়েন্দাকে জিজ্ঞেস করল টিনই। সাগরের দিকে চেয়ে দেখল, একশো গজ দূরে তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে উলফের কেবিন ক্রুজার। কিশোর, টেপ রেকর্ডারটা নিয়ে নাও। রোভার আমার কাছছাড়া হবে না, জানি, তবু যন্ত্রটা সঙ্গে থাকা ভাল। বলা তো যায় না।
আমি বলি কি, পানিতে টিনহার পাশে চলে এল কিশোর।
কি?
ভেবে দেখলাম, রেকর্ডারটা নিয়ে রবিনের এখানে থাকা উচিত।
কেন?
কেন, সেটা বলল কিশোর। উলফকে বিশ্বাস কি? একাই হয়তো মেকসিকো উপকূলে গিয়ে ক্যালকুলেটরের চালান দিয়ে আসতে পারবে, ক্যাপটেন

শ্যাটানোগার দরকার পড়বে না। সেক্ষেত্রে আপনার শেয়ার মারা যেতে পারে। রবিন থাক এখানে।
তাতে কি লাভ?
খুলে বলল কিশোর।
মন দিয়ে শুনল টিনহা। তারপর বলল, তারিখের ব্যাপারে তুমি শিওর?
শিওর। মেকসিকান ইমিগ্রেশন অফিসে খোজ নিয়েছি। লাপাজ থেকেই বোট ছেড়েছিল।
চুপচাপ ভাল কিছুক্ষণ টিনহা। ওকে, গগলসটা পরে নিল চোখে। রবিনকে ছাড়াই পারব আমরা। রোভার, এসো যাই।
দ্রুত সাঁতরে চলল টিনহা। পাশে রোভার। পেছনে কিশোর, টিনহা আর তিমিটার সঙ্গে তাল রাখতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে।
সৈকতে এসে উঠল মুসা। একটা প্লাসটিকের ব্যাগে করে ছোট একটা ওয়াকিটকি নিয়ে এসেছে কিশোর, খাঁড়ির কাছে ফেলে রেখে গেছে, ওটা ঝুলিয়ে নিল কোমরে।
এটা নিয়ে সাঁতরাতে পারবে? জিজ্ঞেস করল রবিন।
পারব, বলল মুসা। যথেষ্ট ভারি, কিন্তু পানিতে নামলে ভার কমে যাবে।
মূসাকে নেমে যেতে দেখল রবিন। গলা পানিতে নেমে সাঁতরাতে শুরু করেছে। পানি নিরোধক ব্যাগে রয়েছে ওয়াকি টকি, পানি ঢুকবে না। ভেতরে বাতাস রয়ে গেছে, ভেসে উঠেছে ব্যাগটা। সাঁতরাতে অসুবিধে হচ্ছে না মুসার, অল্পক্ষণেই ধরে ফেলল কিশোরকে।
পানির কিনার থেকে উঠে এল রবিন। আগের বাক্সটাতেই রয়েছে টেপরেকর্ডার, ওটা তুলে নিয়ে চলে এল তোর সাইকেলের কাছে। পেছনের ক্যারিয়ারে পুটুলি করে রেখেছে তার সোয়েটার, ওটার ভেতর থেকে বের করল। আরেকটা ওয়াকিটকি। আনটেনা তুলে দিয়ে সুইচ টিপে অন করল যন্ত্রটা। শব্দ গ্রহণের জন্যে তৈরি।
শুকনো একটা জুতসই পাথর খুঁজে নিল রবিন, সোয়েটারটা তার ওপর বিছিয়ে আরাম করে বসল, ওয়াকি টকিটা রাখল কোলে। পাশে রাখল রেকর্ডারের বাক্স।
উলফের বোটের কাছে প্রায় পৌঁছে গেছে টিনহা আর রোভার, দেখা যাচ্ছে।
স্বাগত জানাল উলফ। টিনহাকে টেনে তোলার জন্যে একটা হাত বাড়িয়ে দিল।
চাইলও না টিনহা। রোভার, থাকো এখানে, বলে কাঠের নিচু রেলিঙ ধরে এক ঝটকায় উঠে পড়ল, স্বচ্ছন্দে।
টিনহার মত এত সহজে উঠতে পারল না কিশোর, বেগ পেতে হলো। পেছনে কয়েক গজ দূরে চুপ করে ভেসে রয়েছে মুসা।

যন্ত্রপাতিগুলো পরীক্ষা করব, মিস্টার উলফ? কিশোর বলল।
হ্যাঁ হ্যাঁ, এসে, কিশোরকে ককপিটে নিয়ে এল উলফ। ছোট্ট ক্লোজড সার্কিট টেলিভিশন ক্যামেরাটা দেখাল।
পরীক্ষা করে দেখল ওটা কিশোর, হুইলের ওপরে বালক হেডের সঙ্গে আটকানো মনিটর স্ক্রীনটাও দেখল।
পানির নিচে কাজ করবে ক্যামেরাটা? শিওর? জিজ্ঞেস করল।
নিশ্চয়। ওশন ওয়াল্ড থেকে ধার নিয়েছে টিনহা। ওখানে প্রায় সারাক্ষণই কাজ চলে এটা দিয়ে, সারাক্ষণকে উচ্চারণ করল সারা-কখণ। আর কোন প্রশ্ন আছে?
আরও অনেক প্রশ্ন তৈরি করে ফেলেছে কিশোর, করেই যাবে একের পর এক, যতক্ষণ না মুসা কাজ সারে। জাহাজে উঠে কোমর থেকে প্রাসটিকের ব্যাগ খুলে জাহাজের পেছনের অংশে লুকাতে হবে, উলফকে না দেখিয়ে।
কিশোর ভাল অভিনেতা, তবে বোকর ভান করার মত এত ভাল কোন অভিনয় করতে পারে না। বোকা বোকা ভাব দেখিয়ে বলল, আমি ভাবছি, পানির নিচ থেকে রেঞ্জ কতখানি দেবে? বোটের কত কাছে থাকা লাগবে রোভারের?
পঞ্চাশ গজ দুরে থাকলেও স্পষ্ট ছবি আসবে, চকচক করে বিরক্ত প্রকাশ করছে যেন উলফের টাক। টিনহা তোমাকে এসব বলেনি?
হ্যাঁ, মনে হয় বলেছে। কিন্তু রোভারের মাথায় সার্চলাইট বেঁধে... আর বলার দরকার নেই, থেমে গেল কিশোর। মুসা এসে দাঁড়িয়েছে পেছনের ডেকে। কিশোরের চোখে চোখ পড়তেই ভেজা চুলে আঙুল চালাল–সংকেত : নিরাপদে লুকিয়ে রাখা হয়েছে ব্যাগটা।
ও, হ্যাঁ, খুব শক্তিশালী লাইট তো, হবে মনে হয়, আগের কথাটা শেষ করল কিশোর, হঠাৎফেন বুঝতে পেরেছে সব কিছু।
চলো তাহলে, কাজ সারা যাক। ডেকে বেরিয়ে এল উলফ।
রেলিঙে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে রোভারের সঙ্গে কথা বলেছে টিনহা, তাকে বলল উলক, আরেকটা ছেলে কোথায়? তিনজন ছিল না?
ঠাণ্ডা লেগেছে, পেছন থেকে চট করে জবাব দিল মুসা! খাঁড়ির কাছে বসিয়ে রেখে এসেছি। ভাবলাম
থাকুক, আউটবোর্ড মোটরের থ্রটলে গিয়ে হাত রেখে টিনহার দিকে ফিরল উলফ, কত জোরে সাঁতরাতে পারবে মাছটা?
ও মাছ নয়, রেগে উঠল টিনহা। অত্যন্ত ভদ্র, সত্য, বুদ্ধিমান, স্তন্যপায়ী প্রাণী।...
হ্যাঁ, চাইলে ঘণ্টায় পনেরো মাইল বেগে ছুটতে পারবে। কিন্তু আপনি বেশি জোরে চালাবেন না বোট। আট নটের নিচে রাখবেন। নইলে ও তাড়াতাড়ি ক্লান্ত হয়ে যাবে।

জো হুকুম, থ্রটল ঠেলে দিয়ে হুইল ধরল উলফ। খোল সাগরের দিকে বোটের নাক ঘোরাল।
টিনহা আগের জায়গায়ই রইল। খেলতে খেলতে বোটের সঙ্গে এগোচ্ছে রোভার, ওটার সঙ্গে কথা বলছে। তিমিট কখনও শাঁ করে ছুটে যাচ্ছে দূরে, পরক্ষণেই ডাইভ দিয়ে চলে আসছে আবার, ভুসস করে মাথা তুলছে বোটের পাশে।
জরুরী একটা কথা জানার জন্যে উসখুস করছে কিশোর, কিন্তু সে বোকা সেজে রয়েছে, তার জিজ্ঞেস করাটা উচিত হবে না। আপাতত বোকা থাকারই ইচ্ছে। মুসার কাছে এসে ফিসফিস করে বলল সে-কথা, কি জিজ্ঞেস করতে হবে শিখিয়ে দিল।
উলফের কাছে গিয়ে বলল মুসা, তীর থেকে কতদূরে পাওয়া গিয়েছিল আপনাদেরকে?।
মাইল পাঁচেক, সামনে সাগরের দিকে তাকিয়ে জবাব দিল উলফ। কোস্টগার্ডরা তাই বলেছে।
মুসার দিকে চেয়ে নীরবে ঠোঁট নাড়ল কিশোর।
বুঝল মুসা। উলফকে আবার জিজ্ঞেস করল, কতক্ষণ ছিলেন পানিতে?
এই ঘণ্টা দুয়েক।
আবার ঠোঁট নাড়ল কিশোর।
মুসা বলল, জোয়ার ছিল, না ভাটা?
অন্ধকার হয়ে এসেছিল, মনে করার চেষ্টা চালাচ্ছে উলফ। আর যা বড় বড় ঢেউ, ভালমত কিছু দেখারই উপায় ছিল না। তবে ঢেউয়ের মাথার যখন উঠে যাচ্ছিলাম, তখন তীর চোখে পড়ছিল। চেষ্টা করেও তীরের কাছে যেতে পারছিলাম না। বোধহয় ভাটাই ছিল তখন।
মনে মনে দ্রুত হিসেব শুরু করল কিশোর। ঝড়ের সময় উত্তর-পশ্চিম থেকে বইছিল হাওয়া, তীর বরাবর ঠেলে নেয়ার কথা দুজনকে। লাইফ-জ্যাকেট পরা ছিল, ওই অবস্থায় হাত পা নড়ানোই মুশকিল, নিশ্চয় সঁতরে বিশেষ এগোতে পারেনি। তাছাড়া ঢেউয়ের জন্যে এগোচ্ছে না পিছাচ্ছে সেটাও ভাল মত দেখার উপায় ছিল না। বলছে, দু-ঘন্টা ছিল পানিতে, ভাটা হলে ওই সময়ে অন্তত দুমাইল সরে গেছে সাগরের দিকে। কোস্ট গার্ডরা পেয়েছে ওদেরকে পাঁচ মাইল দূরে, তারমানে তীর থেকে তিন মাইল দূরে ডুবেছে বোট।
মুসাকে চোখের ইশারায় কাছে ডাকল কিশোর। ফিসফিস করে জানাল।
ডেকে কয়েক মুহূর্ত পায়চারি করল মুসা, হিসেব করার ভান করল, তারপর আবার উলকের কাছে গিয়ে বলল, তীর থেকে মাইল তিনেক দূরে ডুবেছিল বোট, না?

জানলে কি করে? মুসার দিকে তাকাল উলক।
আপনার কথা থেকে।
হুঁ, আমারও তাই ধারণা, ঘড়ির দিকে চেয়ে কি হিসেব করল উলফ। এঞ্জিন নিউট্রাল করে নিল, মিনিটখানেক আপন গতিতে চলল ঘোট। এসে গেছি, টিনহার দিকে ফিরে বলল সে। মাছটাকে লাগাম... টিনহাকে কড়া চোখে চাইতে দেখে থেমে গেল। না, মানে স্তন্যপায়ী জীবটাকে পাঠানো যায় এবার। আমরা পৌঁছে গেছি।
এক জায়গায় ভাসছে এখন বোট, মৃদু ঢেউয়ে দুলছে।
রোভার, কাছে এসো, রোভার, টিনহা ডাকল। ডেকে ফেলে রেখেছে ক্যানভাসের কলারটা, টেলিভিশন-ক্যামেরা আর সার্চলাইট ওতে বেঁধে রেখেছে আগেই। ওগুলো তুলে নিয়ে পানিতে নামল সে। তিমির মাথা গলিয়ে পরিয়ে দেবে ক্যানভাসের কলার, সামনের দুই পাখনার ঠিক পেছনে রেখে শক্ত করে বাকলেস আটকে দিলে হাজার ঝাকুনিতেও আর খুলে আসবে না।
নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর। তিন মাইল দূরে ডুবেছে বোট, কিন্তু কোন জায়গা থেকে তিন মাইল? উলফের স্পষ্ট ধারণা নেই। এখানে দু-পাশের দশ মাইলের মধ্যে যে কোন জায়গায় ডুবে থাকতে পারে। এতবড় এলাকায় ছোট্ট একটা বোট খোঁজা খড়ের গাদায় সুচ খোঁজার সামিল, সেটা তিমিকে দিয়ে খোঁজালেও।
কলার পরিয়ে ডেকে ফিরে এল টিনহা। তার পাশে এসে নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল কিশোর, আপনার বাবা আর কিছু বলতে পেরেছেন? ঝড়ের সময়কার কথা?
মাথা নাড়ল টিনহা। নাহ আর কিছু না। যা বলেছে, বলেছি তোমাকে।
কি বলেছে, মনে আছে কিশোরের। দুটো পোলের ওপর নজর রাখতে বলেছে। কিছু একটা নিশ্চয় বোঝাতে চেয়েছে। কি?
তিন মাইল দূরের তীরের দিকে তাকাল কিশোর।
তেমন কিছুই দেখার নেই। পাহাড়ের উঁচু উঁচু চূড়া, ওপাশে কি আছে কিছুই চোখে পড়ছে না, শুধু আরও উঁচু পর্বতের চূড়া ছাড়া। পাহাড়ের ওপর মাঝেমধ্যে দাঁড়িয়ে আছে একআধটা নিঃসঙ্গ বাড়িঘর। টেলিভিশনের একটা রিলে টাওয়ার আছে, আরেক পাহাড়ের মাথায় একটা ক্যাকটরি, অনেক উঁচু চিমনি।
ওয়েট স্যুট পরে নাও, মুসা, কানে এল টিনহার কথা। এয়ার ট্যাংকগুলো চেক করে নেয়া দরকার।
পাহাড়গুলোর দিকে তাকিয়েই রয়েছে কিশোর, নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটার সময় এত জোরে টান মারছে, প্রায় থুতনির কাছে চলে আসছে ঠোঁট।

ক্যাপটেন শ্যাটানোগা অভিজ্ঞ নাবিক, ভাবছে কিশোর। বোট ডুবে যাচ্ছে। বুঝতে পেরে নিশ্চয় কোন না কোন নিশানা রেখেছে। যদি খালি ভালমত কথা বলতে পারত…

টেলিভিশন টাওয়ার আর ফ্যাকটরির চিমনির ওপর দ্রুত বার দুই আসা যাওয়া করল কিশোরের দৃষ্টি। হঠাৎ পরিষ্কার হয়ে গেল ব্যাপারটা।

দুই পোল!

প্রায় ছুটে এসে উলফের বাহু খামচে ধরল কিশোর। বোকা সেজে থাকার সময় এখন নয়। চেঁচিয়ে বলল, ওই পোল দুটো এক লাইনে আনু।

কি? বোকার মত কি ভ্যাড়ভাড় করছ?

বোট ডুবে যাওয়ার সময় লক্ষ রেখেছিলেন ক্যাপটেন শাটানোগা। চিহ্ন রেখেছিলেন। ওই যে টেলিভিশন টাওয়ার, আর ওই যে চিমনি।

কী।

দেখতে পাচ্ছেন না? কিশোরের মনে হলো এখন উলফই বোকার অভিনয় করছে। বোটটা পেতে চান? জাহাজ সরিয়ে নিন। ওই পোল দুটোর দিকে লক্ষ রেখে পিছান, এদিক ওদিক সরান, যতক্ষণ না জাহাজের সঙ্গে এক লাইনে আসে ও দুটো।

বিনকিউলার চোখে লাগিয়ে সামনের ডেকে দাঁড়িয়ে আছে কিশোর। তিন মাইল দূরে তীরের দিকে নজর। জাহাজটা নড়ছে, টাওয়ার দুটোও সরছে। আরও একশো গজ-হিসেব করল সে, তারপরই এক লাইনে এসে যাবে দুটো।

হুইল ধরে রয়েছে উলফ।

গতি কমান, নির্দেশ দিল কিশোর। হ্যাঁ, এই গতি স্থির রাখুন।

একে অন্যের দিকে সরছে টাওয়ার দুটো। সরছে…সরছে…হ্যাঁ মিশে গেছে। চিমনিটার ঠিক সামনাসামনি হয়েছে টেলিভিশন টাওয়ার। জাহাজের সঙ্গে এক লাইন।

রাখুন, চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। রাখুন এখানেই, নড়াবেন না। চোখ থেকে ইনোকুলার সরাল সে।

পানি খুব গভীর, নোঙ্গর ফেলা গেল না। এঞ্জিন চাল রেখে যোতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এক জায়গায় রাখতে হবে জাহাজটাকে, হুইল ধরে রাখতে হবে সারাক্ষণ।

তীরের দিকে জাহাজের নাক ঘোরাল উলফ। চকচকে টাকটা কয়েক মিনিট আগে ভোতা ভেঁতা লাগছিল, এখন মনে হলো কিশোরের, বেশ জুলজুল করছে। মুখের ভাব টাকের চামড়ায় প্রকাশ প্রায় নাকি? ফিরে গিয়ে এ-ব্যাপারে পড়াশোনা করতে হবে, ঠিক করল সে। আর যা-ই হোক, সারেঙ হিসেবে উলফের জুড়ি কম, স্বীকার করতেই হলো তাকে। সেটা নিশ্চয় টাকের জন্যে নয়।

ও-কে, মুসা, হয়েছে, মুসার পিঠে এয়ার ট্যাংক বেঁধে দিয়ে বলল টিনহা।
মাস্ক পরে নিল মুসা, ব্রীদি হোস আর এয়ার-প্রেশার গজ চেক করে দিল টিনহা। বাতাসের ট্যাংক ফুল শো করছে গজের কাঁটা।
পারে ফ্লিপার, বিচিত্র একটা জন্তুর মত থপাস থপাস করে ডেক দিয়ে হেঁটে গেল মুসা টিনহার পেছনে। রেলিঙে উঠে বসল টিনহা, সাগরের দিকে পেছন করে, রেলিঙ ধরে আস্তে করে উল্টে গিয়ে আলগোছে ছেড়ে দিল হাত, ঝপাং করে পড়ল পানিতে।
মুসা পড়ল টিনহার পর পর।
কয়েক ফুট নেমে গিয়ে ডিগবাজি খেয়ে শরীর সোজা করল মুসা, মাথা নিচু করে ভেসে রইল। মনে করার চেষ্টা করল ওস্তাদ কি কি শিখিয়েছেন। কি করতে হবে এখন।
মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস ফেলবে, তাতে তোমার মাস্ক ধোয়াটে হবে না, পরিষ্কার দেখতে পাবে। এয়ার হোস চেক করা, হোসে গিটটিট লেগেছে কিনা, বাতাস রুদ্ধ হয়েছে কিনা শিওর হয়ে নাও। তোমার সুইম স্যুটের ভেতরটা নিশ্চয় ভেজা-ভেজা লাগছে, অপেক্ষা করো, সাগরের পানি আর তোমার দেহের তাপমাত্রা এক হয়ে নিক। এবার নামতে শুরু করে, মনে রাখবে, যত নিচে নামবে পানির তাপ ততই কমবে, চাপ বাড়বে। মাথা গুলিয়ে উঠছে টের পেলেই আর নামবে না, সঙ্গে সঙ্গে উঠতে শুরু করবে, তবে আস্তে আস্তে, তাড়াহুড়ো করবে না।
তিন ফুট পানির নিচে অলস ভঙ্গিতে কয়েক মিনিট সঁতরে বেড়াল মুসা, শরীরকে ঢিল হওয়ার সময় দিল, সইয়ে নিল এখানকার পানির সঙ্গে।
ডাইভিং খুব পছন্দ মুসার। দারুণ একটা অনুভূতি। মনে হচ্ছে, বাতাসে ভাসছে সে, পাখি যেভাবে ভাসে। আশ্চর্য এক স্বাধীনতাবোধ। দেখতে পাচ্ছে, কয়েক গজ দূরে তারই মত ভেসে রয়েছে টিনহা আর রোভার। হাত তুলে ইঙ্গিত করল মুসা, বুড়ো আঙুল আর তর্জনীর মাথা লাগিয়ে গোল করে দেখাল, তারমানে ডাইভ দেয়ার জন্যে তৈরি। .
রোভারের পিঠ চাপড়াল টিনহা। নিচের দিকে মুখ করে ডাইভ দিল রোভার, তার আগে আগে পানি ছুঁড়ে নেমে যাচ্ছে শক্তিশালী সার্চলাইটের উজ্জ্বল আলোকরশ্মি। নামছে...নামছে...নামছে... ওকে অনুসরণ করতে কো পেতে হচ্ছে মুসার, এমনকি টিনহারও।
ককপিটে বসে দেখছে কিশোর, টেলিভিশন মনিটরের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ। হুইলে হাত রেখে গভীর মনোযোগে তাকিয়ে রয়েছে উলফও।
দেখতে দেখতে মনে হলো কিশোরের, পানির তলার দৃশ্য নয়, মহাকাশের বিচিত্র দৃশ্য দেখছে। তীব্র সাদা গোল একটা আলোর চক্র যেন মহাকাশের কালো

অন্ধকারে ফুটে উঠেছে, তার মাঝে ফুটছে নানা রকম রঙ, আকৃতি। একবার মনে হলো, মেঘলা আকাশ দেখছে, তারপর এলোমেলো হয়ে ঝাপসা হয়ে গেল মেঘ, সরে গেল, লাফ দিয়ে এসে যেন সে জায়গা দখল করল এক ঝাক রঙিন মাছ। সরে গেল ওগুলোও।

রোভার বোট থেকে পাশে বেশি সরলে আবছা হয়ে আসে ছবি, তাড়াতাড়ি সেটুকু দূরত্ব আবার পূরণ করে নেয়া উলফ বোট সরিয়ে নিয়ে। চিমনি আর টাওয়ারের সঙ্গে অদৃশ্য লাইন একটু এদিক ওদিক হলেই ঘটছে এটা। ছবি আর আলো আবার স্পষ্ট হলেই জাহাজ স্থির করে ফেলছে সে, দক্ষ হাত, সন্দেহ নেই। কাজটা যথেষ্ট কঠিন।

রোভারের অনেক ওপরে থাকতেই থেমে গেল মুসা। আর নামার সাহস হলো না। তার জানা আছে, মানুষের দেহের ওপর পানির চাপ অসহ্য হয়ে উঠলে এক ধরনের অদ্ভুত অনুভূতি জাগে, অনেকটা মাতলামির মত, তাল পায় না যেন শরীর। অতিআত্মবিশ্বাসী হয়ে তখন উল্টোপাল্টা অনেক কিছু করে বসতে পারে সাঁতারু, নিজের জীবন বিপন্ন করে তোলে নিজের অজান্তেই।

সেই পর্যায়ে যেতে চাইল না মুসা। অনেক নিচে রোডারের সার্চলাইটের আলো দেখতে পাচ্ছে। রোভারের ক্ষমতায় ঈর্ষা হলো তার। আফসোস করল, আহা তিমির মতই যদি মানুষের শরীরের গঠন হত, গভীর পানিতে সহজে নামতে পারত। তিমি ডাইভ দিয়ে এক মাইল গভীরেও নেমে যেতে পারে, ঘণ্টাখানেক সহজেই কাটিয়ে দিয়ে আসতে পারে এই ভয়ঙ্কর গভীরতায় অকল্পনীয় পানির চাপের মধ্যে।

ব্রীদিং টিউবটা সোজা করার চেষ্টা করল মুসা। বাকা পাইপটার পুরোটায় আঙুল বোলাল, একেবারে এয়ার ট্যাংকের গোড়া পর্যন্ত।

অদ্ভুত তো! ভাবল সে। পাইপে কোনরকম গিঁট নেই, জট নেই, তার পরেও…

উদ্বিগ্ন হয়ে আবার হাত বোলাল পাইপে, কোথাও একটা জট আছেই আছে, থাকতেই হবে, নইলে বাতাস পাচ্ছে না কেন ফুসফুস? শ্বাস নিতে পারছে না।

কোমরের ওয়েট বেল্টের বাকসে হাত দিল সে। শান্ত থাকার চেষ্টা করছে। নিজেকে বোঝাল, দম বন্ধ রাখো। ভারিকেল্টটা খুলে ফেলে দিয়ে ধীরে ধীরে উঠে যাও ওপরে। আতঙ্কতি হয়ো না, গর্দভ কোথাকার! খোলো, খুলে ফেলো কেল্ট।

কিন্তু কথা শুনছে না আঙুল, অসাড় হয়ে গেছে। চোখেও কি গোলমাল হয়েছে। নইলে চারপাশের পানির রঙ বদলে যাচ্ছে কেন? হালকা গোলাপী থেকে লাল… তারপর গাঢ় লাল…গাঢ় হতে হতে এমন অবস্থা হলো, কালো মনে হচ্ছে লনকে…

বাতাসের জন্যে হাঁসফাঁস করছে সে। লাথি দিয়ে পা থেকে খুলে ফেলতে চাইছে ফ্লিপার। অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে ঠেলে উঠতে চাইছে ওপরে…

উজ্জ্বল আলো ঝিলিক দিয়ে উঠল চোখের সামনে। বুকে চাপ দিতে শুরু করেছে ভারি শক্ত কিছু। বুলডোজারের মত শক্তিশালী কিছু একটা ঠেলে তুলছে যেন তাকে ওপরে।
বাধা দিল না মুসা, দেয়ার সামর্থ্যও নেই। শরীরের শেষ শক্তি বিন্দু দিয়ে আঁকড়ে ধরতে চাইল ভারি জিনিসটাকে।
পানির ওপরে ভেসে উঠল মুসার মাথা। পাশ থেকে হাত বাড়িয়ে একটানে তার মাস্ক খুলে নিল কেউ। হাঁ করে দম নিল সে, ফুসফুস পূর্ণ করে টানল বিশুদ্ধ বাতাস।
ধীরে ধীরে চোখের সামনে থেকে সরে গেল লাল অন্ধকার। নিচে তাকিয়ে আবছা একটা ঝিলিমিলি দেখতে পেল। ছবিটা স্পষ্ট হতে সময় নিল।
ক্যানভাসের কলারটা চিনতে পারল সে। একটা সার্চলাইট। একটা ক্যামেরা।
রোভারের পিঠে শুয়ে আছে মুসা।
পাশে ভাসছে টিনহা। সেই খুলে নিয়েছে মুসার মাস্ক। চুপ, কথা নয়। লম্বা লম্বা দম নাও। এক মিনিটেই ঠিক হয়ে যাবে।
তা-ই করল মুসা। রোভারের পিঠে গাল রেখে চুপচাপ শুয়ে রইল। সহজ হয়ে এল শ্বাস-প্রশ্বাস। হাপাচ্ছে না আর। সেই ভয়ঙ্কর লাল অন্ধকারের ছায়াও নেই, সরে গেছে পুরোপুরি। কথা বলার ক্ষমতা ফিরে এল।
কিন্তু কোন প্রশ্ন করার আগে, কি হয়েছিল টিনহাকে জিজ্ঞেস করার আগে, আপনা-আপনিই একটা কথা বেরিয়ে এল অন্তর থেকে, তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ, রোভার।
তুমিও একদিন ওর প্রাণ বাঁচিয়েছিলে, মনে নেই? রোভারের মাথায় হাত রাখল টিনহা। ও কিছু ভোলে না…
পাশে চলে এসেছে বোট। হুইল ধরেছে কিশোর। রেলিঙের ওপর ঝুঁকে রয়েছে উলফ।
দেখেছি, চেঁচিয়ে বলল সে, উত্তেজনায় জ্বলছে যেন টাক। মনিটরে দেখলাম, এক ঝলক। কিন্তু দেখেছি, তাতে কোন সন্দেহ নেই। শ্যাটানোগার বোট। কিশোরের দিকে ফিরে বলল, ধরে রাখো, নড়বে না। ঠিক আমাদের নিচেই রয়েছে। রোভার ওপরে ওঠার সময় আলো পড়ল, তখনই দেখলাম বোটটা। তাহলে…
এখন পারব না, কড়া গলায় বাধা দিল টিনহা। মুসাকে আগে ডেকের ওপর তুলি, দেখি কি হয়েছে, কি গোলমাল।
কিন্তু…রেলিঙে থাবা মারল উলফ।
পরে, কণ্ঠস্বর বদলাল না টিনহা। যান, গিয়ে হুইল ধরুন, কিশোরকে পাঠিয়ে দিন, সাহায্য দরকার।

দ্বিধা করল উলফ। কিন্তু জানে, এখন সব কিছু টিনহার হাতে। এ-মুহূর্তে ওকে চটানো উচিত হবে না। ওর সাহায্য ছাড়া বোট থেকে মাগুলো উদ্ধার করতে পারবে না। গোমড়া মুখে মাথা ঝাঁকাল সে, গিয়ে কিশোরের হাত মুক্ত করল।
মুসাকেবোটে উঠতে সাহায্য করল কিশোর আর টিনহা। এখনও দুর্বল লাগছে, ডেকেই বসে পড়ল মুসা। এক মগ গরম কফি এনে দিল টিনহা। ইতিমধ্যে বেল্ট খুলে এয়ার ট্যাংক আর অন্যান্য যন্ত্রপাতির বোঝা মুসার পিঠ থেকে নামিয়ে দিয়েছে কিশোর।
ও-কে, জিজ্ঞেস করল টিনহা, এবার বলো, কি হয়েছিল। গোলমানটা কি ছিল? পানির চাপ না, এত গভীরে নামোনি। কি?
দম নিতে পারছিলাম না, মগে চুমুক দিল মুসা, কফি খুব ভাল বানানো হয়েছে। টিউব দিয়ে বাতাস আসছিল না। ভাবলাম জট লেগেছে। কিন্তু লাগেনি।
তার কি কি অসুবিধে হয়েছিল, জানাল মুসা। কি ভাবে চোখের সামনে রঙ বদলে গিয়েছিল, লাল হতে হতে কালো হয়ে গিয়েছিল, সে অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে কেঁপে উঠল গলা।
কারবন-ডাই-অকসাইড, বলল টিনহা। কারবন-ডাই-অকসাইড টানছিলে।
এয়ার ট্যাংকটা টেনে নিয়ে ভালভ খুলল সে, হিসহিসিয়ে চাপ চাপ বাতাস বেরোল না।
এজন্যেই শ্বাস নিতে পারোনি, বাতাসই নেই ট্যাংকে।
কিন্তু নামার আগে চেক করেছি, বলল মুসা।
প্রেসার গজটা পরীক্ষা করল কিশোর। কাটা এখনও ফুল নির্দেশ করছে। দেখাল টিনহাকে। কেউ গজ জ্যাম করে দিয়েছে। তারপর ট্যাংক থেকে বাতাস বের করে দিয়েছে।
একমত হলো টিনহা। এটাই একমাত্র ব্যাখ্যা।
যন্ত্রপাতিগুলো কোত্থেকে এনেছেন? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
ওশন ওয়ারল্ড। আমি নিজে এনে রেখেছি গতরাতে। সব কিছু ঠিকঠাক ছিল তখন। উলফের কাছে গিয়ে দাঁড়াল টিনহা। মুসার ট্যাংকে গোলমাল কে করেছে? আমি জানতে চাই
আমি কি জানি? রেগে গেল উল। যন্ত্রপাতি আমি নষ্ট করতে যাব কেন? আমি কি গাধা, জানি না, গণ্ডগোল করে দিলে বোটের মাল তুলতে অসুবিধে হবে? এই যে দেরিটা হচ্ছে, ক্ষতি কি আমার হচ্ছে না? আমি শুধু চাই... কি চায়, উত্তেজিতভাবে দ্রুত বলে গেল সে, তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে অনেক শব্দ ভেঙে ফেলল, হাস্যকর করে তুলল কথাগুলো।

উলফের কথা বিশ্বাস করল কিশোর, সত্যি কথাই বলছে। মুলার ট্যাংক নষ্ট করে দিয়ে তাকে মেরে ফেললে উলফের কোন লাভ হবে না। জিজ্ঞেস করল, গতরাতে এই বোট কেউ উঠেছিল? কিংবা আজ ভোরে?
না, মাথা নাড়ল উলফ। ঘাটে বাঁধা ছিল। গতরাতে আমি বোটে ঘুমিয়েছি। টিনহা যাওয়ার পর একবারও নামিনি।
কেউ দেখা করতে এসেছিল?
না। শুধু আমার বন্ধু নীল বনেট। আমার সঙ্গে বসে হুইসকি খেয়েছে, কিন্তু নীলকে আমি অবিশ্বাস করি না…
ওকে কতদিন থেকে চেনেন? বাধা দিয়ে বলল কিশোর। ও কে? ওর সম্পর্কে কি কি জানেন?
প্রশ্ন। বোকার মত খালি প্রশ্ন, বিরক্তিতে মুখ বাঁকাল উলক, টাকে খামচি মারল। এত কথা বলতে পারব না। যাও, গিয়ে বাক্সটা তোলো…
জবাব দিন, কঠিন শোনাল টিনহার গলা, কোমরে দুই হাত রেখে দাঁড়িয়েছে। যা যা জিজ্ঞেস করে, সব কথার জবাব দেবেন। নইলে ওই বোটের ধারেকাছে যাব আমি।
ঠিক আছেহ্! হাত নাড়ল উলফ, রাগ দমন করে বলল, কি জানতে চাও? নীলের সঙ্গে কতদিনের পরিচয়?
মাথা নোয়াল কিশোর।
কয়েক বছর। ইউরোপে দেখা হয়েছিল। ওখানে দুজনে… দ্বিধা করল উলফ। কিছু ব্যবসা করেছি একসঙ্গে। তারপর আবার দেখা হয়েছে মেকসিকোতে।
কবে?
কয়েকবারই হয়েছে…
শেষবার যখন গিয়েছিলেন, হয়েছিল?
হ্যাঁ। লা পাজে ছোটখাট ছাপাখানার ব্যবসা করছে। পুরানো দোস্ত, মেকসিকো গেলেই ওর সঙ্গে দেখা না করে ফিরি না। তাতে দোষের কি?
নীরব রইল কিশোর, ভাবছে।
আর কিছু জিজ্ঞেস করবে, কিশোর? বলল টিনহা।
না। আর কিছু না।
শুড, টিনহার দিকে ফিরুল উলফ। আবার কাজ শুরু করা যেতে পারে?
পারে। তবে আগে ভালমত আবার ট্যাংক-ফ্যাংকগুলো চেক করে নিই। মরতে চাই না।
ডেকের ওপর নিজের যন্ত্রপাতিগুলো ফেলে রেখেছে টিনহা। গিয়ে ট্যাংকের ভালভ খুলল। এখান থেকেই বাতাসের হিসহিস শুনতে পেল কিশোর।

যে শয়তানী করেছে, সবগুলো যন্ত্র নষ্ট করার সময় পায়নি। কিংবা ইচ্ছে করেই করেনি। হয়তো ভেবেছে, মারাত্মক একটা দুর্ঘটনাই পুরো উদ্ধার কাজটা পর্যন্ত করে দেবে, ব্যর্থ করে দেবে।
টিনহার পাশে এসে দাঁড়াল কিশোর। ফিসফিস করে বলল, বাক্সটা উলককে দেব আগে ভেতরে কি আছে দেখতে চাই। আমার সন্দেহ হচ্ছে।
প্রস্তাবটা ভেবে দেখল টিনহা। ওকে চিন্তিত কণ্ঠে বলল, তাই হবে।
থ্যাংকস। তার ওপর টিনহার বিশ্বাস দেখে খুশি হলো কিশোর। তবে বিশ্বাস না করলে ভুল করত, কারণ এখন প্রায় সব প্রশ্নের জবাবই কিশোরের জানা।
জাম হওয়া প্রেসার গজ। উলফের পুরানো বন্ধু, নীল বনেট। লা পাজে ট্রিপ। বনেটের চোখের নিচের দাগ, কুঁচকানো চামড়া। ছড়ানো ছিটানো প্রতিটি টুকরো প্রশ্নের উত্তরই খাপে খাপে জোড়া লেগে গেছে গোয়েন্দাপ্রধানের মনে।
এত নিচে নামা সম্ভব না,ককপিটে উলফের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে টিনহা। ওই বোট পর্যন্ত যেতে পারব না।
তাহলে?
যা বলছি, শুনুন। রোভারকে দিয়ে কাজ করাতে হলে ফালতু একটা কথা বলবেন না। যা যা জিজ্ঞেস করব, বলবেন। সব ইনফরমেশন চাই। ওকে?
টিনহার চোখে চোখে চেয়ে রইল উলফ, লোকটার দৃষ্টিতে আগুন দেখতে পাচ্ছে কিশোর। আরও প্রশ্ন? বেশ, কি জানতে চাও?
ঠিক কোন জায়গায়? ক্যালকুলেটর ভরা বাক্সটা আছে কোথায়?
হুঁ... চোখ সরিয়ে নিল উলফ, টিনহার দিকে তাকাতে পারছে না। কেবিন। বাংকের তলায়।
বাধা? আই মিন, কোন কিছুর সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে?
না, উসখুস করছে উলফ। ভেলা ভাসাতে চেয়েছিল তোমার বাবা। তাহলে বাক্সটা সঙ্গে নিতে পারতাম। কিন্তু সময়ই পেলাম না। তার আগেই তলিয়ে গেল। বোট, তিক্ত হয়ে উঠল কণ্ঠস্বর। বাক্স আর নিতে পারলাম না, জান বাঁচানোই মুশকিল হয়ে উঠল।
কেবিনের দরজায় তালা আছে?
নাহ্। তুমি তো জানোই...
মাথা ঝাঁকাল টিনহা। বোটটার প্রতিটি ইঞ্চি চেনা তার। দশ বছর বয়েস থেকেই ওই বোটে করে মাছ ধরতে গিয়েছে বাবার সঙ্গে। জানি দরজা খোলা। রাখত বাবা, যাতে ইচ্ছে হলেই চট করে গিয়ে ঢুকতে পারে। বীয়ারের প্রচণ্ড নেশা তো, দেরি সইতে পারে না।
হ্যাঁ, টিনহার দিকে তাকাতে পারল আবার উলফ।

বাক্সটা দেখতে কেমন?
সবুজ রঙের। ইস্পাতে তৈরি। দু-ফুট লম্বা, এক ফুট চওড়া, আর নয় ইঞ্চি পুরু।
হ্যানডেল আছে?
আছে।...বাক্সটাইয়ে, মানে, ক্যাশবক্সের মত দেখতে। ডালায় লাগানো হ্যাণ্ডেল।
হুঁ, বাক্সটা কি করে বের করে আনবে ভাবছে টিনহা। দড়ি লাগবে। সরু, শক্ত দড়ি। আর একটা তারের কাপড় ঝোলানোর হ্যাঙ্গার।
যাচ্ছি, বলল উলফ। কিশোর, হুইলটা ধরো তো।
দড়ি আর হ্যাঙ্গার আনতে দেরি হলো না।
হ্যাঙ্গারটাকে বাঁকা করে চৌকোনা করে নিল টিনহা। বকা হুকটা দাঁড়ানো রয়েছে একটা বাহুর ওপর। শক্ত মাইলনের দড়ির এক মাথা বাঁধল হ্যাঙ্গারের সঙ্গে।
ওকে, এবার যাওয়া যায়।
মুসা এগিয়ে এল। আমি আর যেতে চায় না সে, যা ঘটে গেছে খানিক আগে, এরপর আজ আর পানিতে ডুব দেয়ার ইচ্ছে হচ্ছে না। কিন্তু একেবারেই কিছু না বললে ভাল দেখায় না, কিছু যদি মনে করে বসে টিনহা, তাই বলছে। আমিও যাব...
হেসে তাকাল টিনহা। তুমি থাকো। দরকার হলে আসতে বলব।
মনে মনে হাপ ছেড়ে বাঁচল মুসা, হাসল। সরাসরি না বলে দিতে পারত টিনহা, তা না বলে ঘুরিয়ে বলেছে। এতে তার অনেকখানি হালকা হয়ে গেছে মূসার। অঘটনটা ঘটার পর থেকেই নিজেকে দোষী ভাবছে, যদিও দোষটা মোটেই তার নয়।
দড়ির বাণ্ডিল কাঁধে ঝুলাল টিনহা, মাস্ক ঠিক করল, তারপর নেমে গেল আবার সাগরে।
কয়েক গজ দূরে ঝিমোচ্ছিল রোভার, শব্দ শুনে চোখ মেলল। এগিয়ে এল টিনহার দিকে।
রোভারের পিঠে চাপড় দিল টিনহা, পুরো এক মিনিট তার গায়ে গাল ঠেকিয়ে রইল।
মুসা দেখছে। বুঝতে পারছে, তিমিটার সঙ্গে কথা বলছে টিনহা। কিন্তু কি বলছে, শোনা যাচ্ছে না।
পরে অনেক ভেবেছে মূসা। কিন্তু কিছুতেই তার মাথায় আসেনি, কিভাবে কি করতে হবে, তিমিটাকে কি করে বুঝিয়েছে টিনহা। মানুষের মনের ঘোরপ্যাঁচ কি করে বুঝল একটা জন্তু!
মনিটরের দিকে চেয়ে আছে কিশোর।

সাদা আলোর চক্র ফুটল পর্দায়, রোভারের মাথার লাইট জ্বেলে দিয়েছে টিনহা। তীব্র আলোয় পানিকে দেখাচ্ছে ধোয়াটে সাদা মেঘের মত। ফুটে উঠল এক আঁক রঙিন মাছ চোখে ভয়, দ্রুত সরে গেল ওগুলো।
আবার দেখা গেল সাগরের তলদেশ। নুড়ি আর বালিময় গোল একটুকরো জায়গার পাশে একটা পাথর, শামুক ছেয়ে আছে।, কিশোরের পেছনে হুইলে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে উলফ, তার চোখও পর্দার দিকে। উত্তেজনায় সোজা হয়ে গেছে সে, না চেয়েও টের পেল কিশোর।
বোটের সামনের দিকটা খুঁজে পেয়েছে ক্যামেরার চোখ।
ওই যে, কিশোরের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে মুসা, বলে উঠল উত্তেজিত কণ্ঠে।
বড় হচ্ছে বোটের গলুই, ভরে দিচ্ছে আলোর চক্র। হঠাৎ সরে গেল, গাড়ির পাশ দিয়ে যেভাবে সরে যায় থাম কিংবা গাছ, সেভাবে। ডেক দেখা গেল, এক ঝলকের জন্যে হুইলটা ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল, মেঘে ঢাকা পড়েছে সাদা চক্র। সরে গেল মেঘ, আগের চেয়ে উজ্জ্বল হলো আলো, স্পষ্ট হলো ছবি। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে একটা চেয়ার, একটা পোর্টহোল।
সোজা কেবিনে ঢুকে পড়েছে রোভার।
কয়েক সেকেণ্ড পর্দায় এত তাড়াতাড়ি নানারকম আকৃতি ফুটল, ঝাকুনি খেলো ছবি, কিছুই বোঝা গেল না। টানটান হয়ে গেছে উলকের স্নায়ু, উত্তেজনায় শক্ত হয়ে গেছে পেশী।
ছবির উন্মাদ নাচ ঝিমিয়ে এল এক সময়, স্থির হলো, স্পষ্ট হলো আবার। চেনা যাচ্ছে এখন। ধাতব বাক্সটা দেখা যাচ্ছে।
ওটাই, হইলের ওপর ঝুঁকে পড়েছে উলফ, মনিটরের পর্দা থেকে ছোঁ মেরে তুলে আনবে যেন।
বড় হচ্ছে বাক্সটা...আরও...আরও বড়, ভরে দিল আলোর চক্র, বাক্সের খুব। কাছে চলে গেছে ক্যামেরার চোখ।
ভীষণভাবে দুলে উঠল বাক্সটা আচমকা, পরক্ষণেই হারিয়ে গেল। আর কিছু নেই পর্দায়, শুধু শূন্য গোল সাদা আলো।
কুটি করল কিশোর। ক্যামেরায় কোন গণ্ডগোল হলো? তারপর বুঝল, না ক্যামেরা ঠিকই আছে, নইলে আলো আসত না, আসলে সাদা দেয়ালের ওপর স্থির হয়ে রয়েছে যন্ত্রটার চোখ। নিশ্চয় বাংকের নিচে মাথা ঢুকিয়ে দিয়েছে রোভার।
কিছুক্ষণ প্রায় অনড় হয়ে রইল সাদা আলো, তারপর আবার দুলে উঠল। নানারকম অস্পষ্ট ছবি ঝড় তুলল আবার পর্দায়। কিশোরের মনে হলো, আবছাভাবে দেখতে পেয়েছে বোটের তামার রেলিঙ।
আবার আলোর সামনে ফুটল পরিচিত ধোয়াটে মেঘ। উঠে আসছে রোভার।

আস্ত একটা গর্দভ জানোয়ার! গলা কাপছে উলকের, হুইল এত জোরে চেপে ধরেছে সাদা হয়ে গেছে আঙুল। বাক্সটা তোলার চেষ্টাই করল না। রাগে ঝটকা দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে তাকাল তীরের দিকে।
উলফের কথায় কান দিল না কিশোর। পলকের জন্যে পর্দায় একটা ব্যাপার দেখেছে, যা মিস করেছে লোকটা। ক্যামেরার চোখের সামনে অনেক বড় হয়ে ফুটেছিল একটা মানুষের হাত, নিশ্চয় টিনহার, সরে গেছে সঙ্গে সঙ্গেই। তার কয়েক মুহূর্ত পরই নিবে গেল গোল আলো। ক্যামেরা অফ করে দিয়েছে টিনহা।
এই, হুইল ধরো, মুসার বাহু ধরে টান দিল উলফ। সোজা রাখবে বোট, নড়ে না যেন।
ছুটে ডেকে বেরোল উলফ, রেলিঙে গিয়ে ঝুঁকে দাঁড়াল। তার পিছু নিল কিশোর, কিন্তু গঁড়াল না, পাশ কাটিয়ে চলে এল বোটের পেছনে, লকারের কাছে। সাগরের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, অপেক্ষা করছে।
বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। বিশ গজ দূরে ভেসে উঠ টিনহার মাথা। কাধে দড়ির বাণ্ডিলটা নেই, এখান থেকেই দেখা যাচ্ছে।
টিনহার পাশে ভেসে উঠেছে রোভার। আরেকটা ব্যাপার লক্ষ করল কিশোর, ক্যামেরা আর সার্চলাইট নেই, তার জায়গায় বাধা রয়েছে সবুজ ধাতব বাক্সটা।
লকার খুলে সার বকিয়ে রাখা প্লাসটিকের ব্যাগটা বের করল কিশোর। এক টানে ব্যাগের মুখ ছিড়ে ভেতর থেকে বের করল একটা ওয়াকিটকি। টেনে অ্যান্টেনা পুরো তুলে দিয়ে সুইচ অন করল।
যন্ত্রটা মুখের কাছে এনে জরুরী কণ্ঠে বলল, রবিন, প্লে করো! রবিন, প্লে করো!
ফিরে তাকাল উলফের দিকে। রেলিঙে ঝুঁকে রয়েছে লোকটা, আর সামান্য কলেই উল্টে পড়ে যাবে পানিতে, এদিকে নজরই নেই।
নিয়ে এসো! চেঁচিয়ে বলল উল। বাক্সটা নিয়ে এসো। এই মেয়ে, শুনছ?
রবিন, প্লে করো! আবার বলল কিশোর। রোভারের গান প্লে করো! রবিন, প্লে করো! রোভারের গান প্লে করো!
শুনেছি, কিশোর। ওভার অ্যাণ্ড আউট!
ওয়াকি টকির সুইচ অফ করে পাশের পাথরের ওপর রেখে দিল রবিন।
এখান থেকে উলফের বোট দেখা যাচ্ছে না। কতদূরে আছে, তা-ও বোঝার উপায় নেই। তবে তিমির শ্রবণশক্তি খুবই তীক্ষ্ণ, এটা জানা আছে, জেনেছে বই। পড়ে। সাধারণ দৃষ্টিতে তিমির কান চোখে পড়ে না, কাছে গিয়ে ভাল করে দেখলে দেখা যাবে, চোখের ঠিক পেছনে সুচের ফোঁড়ের মত অনেকগুলো ছিদ্র।
রেডিওর স্পীকারের সামনে যেমন তারের জাল বা কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়া। হর, তিমির কানও তেমনিভাবে ছিদ্রওয়ালা চামড়ায় ঢাকা। মানুষের কানের চেয়ে

অনেক অনেক বেশি শক্তিশালী কান। অসাধারণ আরেকটা ক্ষমতা আছে ওই কনেক-সোনার সিসটেম, শব্দের প্রতিধ্বনি শুনেই বলে দিতে পারে, কি জিনিসে আঘাত খেয়েছে শব্দ, জিনিসটা কত বড় এবং কত দূরে আছে, একশো গজ দূর থেকেও সেটা নির্ভুলভাবে বুঝতে পারে তিমি। পানির নিচে একে অন্যের ডাক কয়েক মাইল দূর থেকেও শুনতে পায় ওরা।

তাড়াহুড়ো করে সোয়েটার আর জুতো খুলে নিল রবিন। বাতাসনিরোধক বাক্সে ভরা টেপরেকর্ডারটা তুলে নিয়ে এসে নামল সাগরে। পানিতে ডুবিয়ে টিপে দিল প্লে করার বোতাম। ধীরে ধীরে ঘুরতে শুরু করল ক্যাসেটের চাকা, ফিতে পেঁচাচ্ছে। ফুল ভলিয়ুমে সাগরের পানিতে ছড়িয়ে দিচ্ছে রোভারের রেকর্ড করা কণ্ঠ।

মানুষের কান সে শব্দ শুনতে পাবে না, কিন্তু রোভারের কানে হয়তো পেছবে, অনেক দূর থেকেও।

বোটের পেছনে আগের জায়গায়ই রয়েছে কিশোর। তাড়াতাড়ি আবার লকারে লুকিয়ে ফেলল ওয়াকি-টকিটা।

বিশ গজ দূরে এখনও পাশাপাশি ভাসছে টিনহা আর রোভার। বাক্সটা নিয়ে আসার জন্যে থেমে থেমে চেঁচিয়েই চলেছে উলফ।

হাত তুলে সিগন্যাল দিল কিশোর। আগেই বলে রাখা আছে টিনহাকে, এর অর্থ : রবিনকে খবর পাঠানো হয়েছে।

হাত নেড়ে জবাব দিল টিনহা ও বুঝতে পেরেছে। রোভারের মাথায় আলতো চাপড় দিল। এক সঙ্গে ডাইভ দিল দুজনে।

রেলিঙে সোজা হলো উলফ। কি হচ্ছে? হচ্ছেটা কি? চেঁচিয়ে উঠে দৌড়ে গিয়ে ককপিটে চুকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল মুসাকে। বনবন করে হুইল ঘুরিয়ে বোটের নাক ঘুরিয়ে দিল একটু আগে টিনহা আর রোভার যেখানে অদৃশ্য হয়েছে সেদিকে।

জায়গাটায় প্রায় পৌঁছে গেছে বোট, এই সময় মাথা তুলল টিনহা। বোট থামিয়ে হুইল আবার মুসার কাছে ফিরিয়ে দিল উল। ধরে রাখো, বলেই ছুটে বেরোল ককপিট থেকে।

বাক্সটা কোথায়? রেলিঙে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল উলফ।

জবাব দিল না টিনহা। এক হাতে ক্যামেরা আর সার্চ লাইট, আরেক হাতে রেলিঙ ধরে উঠছে পানি থেকে।

তিমিটা কোথায়? আবার বলল উলফ।

তবু জবাব নেই। ধীরে সুস্থে মাস্ক খুলল টিনহা, এয়ার ট্যাংকটা পিঠ থেকে খুলে রাখল ডেকে।

কোথায়? রাগে লাল হয়ে গেছে উলফের মুখ। বাক্স কোথায়? তিমি কোথায়?
আমারও সেই প্রশ্ন, মিস্টার উলফ, সাগরের দিকে চেয়ে বলল টিনহা।
মানে? পাই করে কিশোরের দিকে ফিরল উলফ। এই বিনকিউলার নিয়ে তুমি কি করছ? দেখি, আমাকে দাও।
বাইনোকুলার চোখে লাগিয়ে সাগরে আঁতিপাতি করে তিমিটাকে খুঁজল সে। রোভারের চিহ্নও নেই।
তিমির স্বভাবই ওরকম, বোঝানোর চেষ্টা করল টিনহা। উলফ এদিকে পেছন করে আছে। কিশোরের দিকে চেয়ে মুচকি হেসে চোখ টিপল টিনহা। সঙ্গে আছে, আছে, হঠাৎ করে হাওয়া। একেবারে গায়েব। মুক্তির নেশায় পেয়ে বসে, না কী, কে জানে। যায় তো যায়ই, আর আসে না।
বিনকিউলার চোখ থেকে সরাল উলফ। হারামজাদা আমার বাক্স নিয়ে গেছে। ওটার মাথায় বেঁধেছিল কেন? টিনহার দিকে তাকাল, চোখে সন্দেহ। কেন?
কাঁধ ঝাঁকাল টিনহা, মুখ বাঁকাল হতাশ ভঙ্গিতে। উপায় ছিল না। আর কোনভাবে তুলে আনতে পারতাম না। ভাল কাজ দেখিয়েছে, এটা তো অস্বীকার করতে পারবেন না। কেবিনে ঢুকে কি সহজেই না বাংকের তলা থেকে বাক্সটা বের করে আনল। হ্যাঙ্গারটা মুখে করে নিয়ে গিয়ে হ্যাণ্ডেলে হুক লাগিয়ে টেনে বের করে আল বাক্স। তারপর দড়ি ধরে টেনে তুলেছি আমি…
বোটে আনলে না কেন?
বোকার মত কথা বলবেন না। অনেক নিচে নেমে, অনেকক্ষণ পানিতে ডুবে থেকেছি, ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলাম। এরপর ভারি একটা বোঝা নিয়ে সঁতরে
তত ভারি নয় বাটা…
তবু ঋমোকা কথা বলছেন। উঠে দাঁড়িয়ে কোমরে দু-হাত রাখল টিনহা। ইস্পাতের একটা বাক্স, ভেতরে ক্যালকুলেটর বোঝাই, ভারি নয় তো কি হালকা? রোভারের মাথায় বেঁধে আনাটাই তো সহজ নাকি? রেলিঙে ঝোলানো তোয়ালে তুলে নিয়ে চুল মুছতে শুরু করল সে। খারাপ কি আমারও কম লাগছে? আপনার যেমন অর্ধেক গেছে, আমারও তো গেছে।
গেছে না! উলফের কণ্ঠে তিক্ত হতাশা। বিনকিউলারটা আবার চোখে গল। কোথায়? কোথায়, পাজি, নচ্ছাড়, হারামীর বাচ্চা হারামী, পোকাখেকো জানোয়ারটা? গেল কোথায় বেঈমান মাছটা?
কিশোরের দিকে চেয়ে নিরীহ গলায় বলল টিনহা, কিশোর, কোথায় গেল, হতে পারো?
হয়তো পারি, দ্রুত ভাবনা চলেছে গোয়েন্দাপ্রধানের মাথায়। পনেরো মিনিট পেরিয়ে গেছে, পুরোদমে এঞ্জিন চালালেও পিছু নিয়ে ওটাকে এখন ধরুত পারবে

না উলফ। তার আগেই তীরে পৌঁছে যাবে রোভার। রবিন একলা রয়েছে খাঁড়ির ধারে, তার হয়তো সাহায্য দরকার হতে পারে। শুধুই অনুমান। আমার মনে হয় তারে চলে গেছে রোভার, খাঁড়ির দিকে। ওখানেই তো সকালে সাগরে নামানো। হয়েছিল তাকে।
ঝট করে বিনকিউলার নামিয়ে ফিরে চাইল উলফ। চোখে সন্দেহ। কেন তা করতে যাবে?
বাড়ি ফেরার প্রবণতা, শান্ত কণ্ঠে বলল কিশোর। বলেইছি তো, মিস্টার উলফ, এটা আমার অনুমান।
ওঁমম... তীরের দিকে তাকিয়ে কি বল উলফ। যাও, গিয়ে হুইল ধরো। খাঁড়ির দিকে চালাও।
সামনের ডেকে চলে এ উলফ। মুসার হাত থেকে হুইল নিল কিশোর।
ফুল স্পীড! আদেশ দিল উলফ।
আই আই, স্যার, দারুণ মজা পাচ্ছে কিশোর, খুশিতে দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। পুরো বাড়িয়ে দিল এঞ্জিনের গতি। নষ্ট হলে উলফের হবে, তার কি? সে তো আদেশ পালন করছে মাত্র। তবে বাড়িতে তাড়াতাড়ি পৌছানোর ব্যাপারে উলফের চেয়ে কম উদ্বিগ্ন নয় সে। দেখতে চায়, তার প্ল্যানমাফিক সব হয়েছে কিনা। নিজের গাওয়া গানের প্রতি সাড়া দিয়ে সত্যিই তীরে ছুটে গেছে কিনা রোভার। সবার আগে বাক্সটা খুলতে চায় কিশোর। দেখতে চায়, কি আছে ভেতরে।
হাতের ওয়াটারপ্রুফ ঘড়ির দিকে তাকাল রবিন। পঁচিশ মিনিট।
পঁচিশ মিনিট ধরে রোভারের গান বাজাচ্ছে সে। আর পাঁচ মিনিট পরেই শেষ হয়ে যাবে ফিতে, আবার শুরুতে পেঁচিয়ে এনে তারপর প্লে করতে হবে।
পানিতে নেমে উবু হয়ে পানির নিচে ধরে রেখেছে বাক্সটা। একবার এপায়ের ওপর ভর রাখছে, একবার ও-পায়ের ওপর। পা নাড়াতেই হচ্ছে, নইলে যা ঠাণ্ডা পানি, জমে যেতে চায়। বাকা হয়ে থাকতে থাকতে কোমর ধরে যাচ্ছে।
সামান্য সোজা হলো রবিন। এই সময় দেখতে পেল তীর থেকে শ-খানেক গজ দুরে স্থির পানিতে মৃদু নড়াচড়া, নিচ দিয়ে ড় কিছু একটা আসছে, ওখানকার পানি অস্থির। সত্যিই দেখছে তো, নাকি কল্পনা?
না, সত্যিই দেখছে। আবার দেখা গেল নড়াচড়া। এবার বেশ জোরে। উত্তেজনায় পা নড়াতে ভুলে গেল রবিন। সাগরের দিকে চেয়ে আছে, চোখে পলক পড়ছে না।
সবার আগে চোখে পড়ল ধাতব বাক্সটা। রবিনের মাত্র কয়েক ফুট দূরে ভেসে উঠল। মুহূর্ত পরেই ভুসস করে ভাসল রোভারের মাথা। নিঃশব্দে ভেসে চলে এল রবিনের কাছে, হাঁটুতে নাক ঘষল।

রোভার! রোভার! ঠাণ্ডার তোয়াক্কাই করল না রবিন, ঝাপিয়ে পড়ল পানিতে, তিমিটাকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে লাগল। রোভার, দিয়েছ কাম সেরে।
রবিনকে দেখে রোভারও খুশি। শরীর উঁচু করে, লেজের ওপর প্রায় দাঁড়িয়ে
সরি, রোভার, আন্তরিক দুঃখিত মনে হলো রবিনকে, তোমাকে ধোকা দিয়েছি।
ভাবছে সে-পথের শেষে কি দেখবে আশা করেছিল তিমিটা? আরেকটা তিমি? নিজের কণ্ঠস্বর চিনতে পেরেছিল? নাকি স্রেফ কৌতূহল? দূরে নিজের কণ্ঠ শুনলে রবিনের যে-রকম লাগবে, তেমনি কোন ব্যাপার?
কিছু মনে কোরো না, রোভার। লক্ষ্মী ছেলে। দাঁড়াও তোমার লাগাম খুলে দিই, তারপর খুশি করে দেব তোমাকে।
সকালে আসার সময় এক বালতি মাছ নিয়ে এসেছে টিনহা।
কয়েক সেকেণ্ডেই রোভারের লাগাম খুলে নিল রবিন, বাক্সটা খুলে নিল। আরে, বেশ ভারি তো! তবে আরও অনেক গরি হবে মনে করেছিল সে। দাঁড়াও এখানে। আমি তোমার খাবার নিয়ে আসছি।
দু-হাতে বাক্সটা বুকের কাছে জড়িয়ে ধরে ঘুরল সে, উঠে আসতে শুরু করল পানি থেকে।
শুকনো বালিতে প্রায় পৌঁছে গেছে, এই সময় চোখে পড়ল লোকটাকে। সৈকতের মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে এদিকেই চেয়ে আছে।
লম্বা, গায়ে উইণ্ডব্রেকার, চোখের ওপরে নামিয়ে দিয়েছে হ্যাট। প্রথমেই লোকটার কাঁধ দৃষ্টি আকর্ষণ করল রবিনের। তারপর অস্বাভাবিক মোটা বাহু।
এগিয়ে আসতে শুরু করল লোকটা। অবাক কাণ্ড! মুখ কোথায়? আরও কাছে আসার পর বোঝা গেল, মাথার ওপর দিয়ে নাইলনের কালো মোজা টেনে দিয়েছে।
শুড, বলল লোকটা। দাও, কেসটা দাও। কেসটা উচ্চরণ করল কেস
চেনা কণ্ঠস্বর, আগেও শুনেছি রবিন, এই লোকই ফোন করেছিল তাদেরকে, একশো ডলার পুরস্কার ঘোষণা করেছিল। কিশোরকে কিডন্যাপ করেছিল। মুসা এর পেটে তো মেরেই চিত করে ফেলেছিল মড়মড়ে কাঠের মেঝেতে।
দাও, হাত বাড়াল লোকটা। দ্রুত এগিয়ে আসছে, মাত্র দুই গজ দূরে রয়েছে।
চুপ করে রইল রবিন। কি বলবে? বাক্সটা আরও শক্ত করে বুকে চেপে ধরে পিছিয়ে আসতে শুরু করল।
দাও। গতি বাড়াল লোকটা।
হাঁটু পানিতে চলে এসেছে রবিন। লোকটাও কাছে এসে গেছে। থাবা দিয়ে ক্সটা ছিনিয়ে নিতে গেল।

আরও পিছানোর চেষ্টা করল রবিন, কিন্তু তার আগেই বাক্স ধরে ফেলল দৈত্যটা। রবিনের হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে চাইল।
বাক্স ছাড়ল না রবিন, বুঝতে পারছে, লাভ হবে না। লোকটার বুক আর বাহুর আকার দেখে হতবাক হয়ে গেছে। ওর সঙ্গে পারবে না সে।
কিন্তু সহজে বাক্স ছাড়ল না। টানাহেঁচড়া চলল, পিছিয়ে আসছে সে ধীরে পীরে। কোমর পানিতে চলে এল। লোকটা তার গায়ের ওপর এসে পড়েছে। চাপ আরেকটু বাড়লেই চিত হয়ে পড়ে যাবে, তার ওপর পড়বে দৈত্যটা। তখন আর বাক্স না ছেড়ে পারবে না।
ভারসাম্য হারাল রবিন। এই অবস্থায়ই দেখতে পেল, উঠতে শুরু করেছে লোকটার শরীর। হঠাৎ প্রচণ্ড ঝাকুনি দিয়ে শূন্যে উঠে পড়ল, চার হাত-পা ছড়িয়ে চিত হয়ে ঝপাস করে পড়ল পানিতে। তার নিচেই দেখা গেল তিমির প্রকাণ্ড মাথা। ঝাড়া মেরে আবার লোকটাকে শূন্যে তুলে ফেলল রোভার। অতি সহজে। টেনিস বল লোফালাফি করছে যেন বাচ্চা ছেলে। বার বার ছুঁড়ে মেরে তাকে নিয়ে চলল গভীর পানির দিকে।
চেঁচাচ্ছে দৈত্যটা, সাহায্যের জন্যে। পানিতে দাপাদাপি করছে, ভেসে থাকার চেষ্টায়।
আবার লোকটার পিঠের নিচে মাথা নিয়ে গেছে রোভার, শূন্যে ছুঁড়বে আবার। চেঁচামেচিতে থমকে গেল। পানি থেকে মাথা তুলে স্থির দৃষ্টিতে দেখল এক মুহূর্ত, তারপর তীরের দিকে ঠেলে আনতে শুরু করল লোকটাকে।
ভেসে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করছে লোকটা, পারছে না। বুকে যেন জগদ্দল পাথর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, তারের চোটে তলিয়ে যাচ্ছে পানিতে। হাত-পা ঘেঁড়াছুঁড়ি করে ফল হচ্ছে না।
এই খানিক আগেও পরম শত্রু ভেবেছিল লোকটাকে রকি। কিন্তু এখন দুঃখ হচ্ছে তার জন্যে। তার ডুবে মরা দেখতে পারবে না চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে।
সৈকতে উঠে এক দৌড়ে এসে একটা পাথরের আড়ালে আগে বাক্সটা লুকাল সে। তারপর আবার ছুটে ফিরে এসে নামল পানিতে।
এতক্ষণে প্রায় ডুবেই গেছে নোকটা। পানির ওপরে রয়েছে শুধু মোজায় ঢাকা মুখ। তার পাশে ভাসছে রোভার। চোখে বিস্ময়।
ওর নিচে ঢোকো, নোভার, রবিন বলল। ভাসিয়ে রাখতে পারো কিনা দেখো।
তিমিটা তার কথা বুঝল কিনা কে জানে, কিন্তু রবিন যা বলল ঠিক তা-ই করল। না বললেও বোধহয় করত। তিমি আর ডলফিনের স্বভাব এটা-ডুবন্ত মানুষকে ঠেলে তুলে তীরে পৌঁছে দিয়ে যাওয়ার অনেক কাহিনী আছে। দৈত্যটার বিশাল

বুক ভেসে উঠল পানির ওপরে। খামচে টেনে উইণ্ডব্রেকারটা ছিড়ে ফেলার চেষ্টা করছে। পারছে না। চেনখোলার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলো।
লোকটাকে ঠেলে কাছে নিয়ে এল রোভার।
চেন খুলে অনেক টানাটানি করে লোকটার গা থেকে উইণ্ডব্রেকার খুলে আনল রবিন। বাক হয়ে গেল। এতক্ষণে বুঝল, কিসের ভারে ডুবে যাচ্ছিল লোকটা। উইণ্ডব্রেকারের ভেতরের দিকে কোম-বারের পুরু আস্তরুণী, স্পঞ্জের মত পানি শুঁষে ফুলে ঢোল হয়ে উঠেছে, ভীষণ ভারি!
উইণ্ডব্রেকার খুলতেই নোকটার আসল রূপ বেরিয়ে পড়ল। হালকা-পাতলা দুর্বল একজন মানুষ, বেচারার দুরবস্থা দেখে করুণা হচ্ছে রবিনের। রোভারের সাহায্যে পানির একেবারে কিনারে নিয়ে এল নোকটাকে। তারপর ঠ্যাং পরে টেনে এনে ফেল বালিতে।
চিত হয়ে পড়ে হাঁপাচ্ছে নোকটা। এত কাহিল, ওঠার ক্ষমতা নেই। হ্যাট খুলে পড়ে গেছে পানিতে। মাথার ওপর টেনে দেয়া মোজাট রয়েছে।
টেনে মোজা খুলে রবি।
বেরিয়ে পড়ল লম্বা, ধারাল নাক। সামান্য বসা গাল। ডান চোখের নিচে কুঁচকানো দাগ।
নীল বনেট।
ওই, চেঁচাল উলফ, ওই জানোয়ারটা। জানোয়ারকে বলল জান-ওয়ার।
চোখ থেকে বিনকিউলার সরিয়ে কিশোরকে বলল সে, ঠিকই আন্দাজ করেছ। ব্যাটা ওখানেই ফিরে গেছে। তাড়াতাড়ি ককপিটে এসে কিশোরকে সরিয়ে হুইল ধরল।
টিনহাও দেখেছে রোভারকে। রেলিঙে বুকে দাঁড়িয়েছে সে। ডাকল, রোভার। এই রোভার!
ডাক শুনে সঙ্গে সঙ্গে মাথা তুলল রোভার। ছুটে আসতে শুরু করল।
বাক্স কই? বকের মত মাথা বাড়িয়ে দেখছে উলফ। বাক্সটা কই?
তীরের দিকে চেয়ে আছে কিশোর। বালিতে পড়ে আছে একটা লোক, তার পাশে দাঁড়ানো রবিন। এদিকেই চেয়ে রয়েছে সে। তর্জনী আর বুড়ো আঙুলের মাথা ঠেকিয়ে গোল করে দেখিয়ে ইঙ্গিত দিল ঃ সব ঠিক আছে! – তাড়াতাড়ি যাওয়া দরকার, মুসাকে ফিসফিস করে বলল কিশোর। উলফ কিছু বোঝার আগেই।
ঠিকই বলেছ, ওয়েট সুট খোলেনি মুসা। পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতরাতে শুরু করল।
জামা খুলে কিশোরও পানিতে নামল, সাঁতরে চলল তীরের দিকে।

আরে, নীল বনেট! হাত দিয়ে গায়ের পানি মুছতে মুছতে বলল কিশোর। ও কি করছিল এখানে? রবিন, কি ব্যাপার?
সংক্ষেপে সব জানান রবিন। সব শেষে বলল, মরেই গিয়েছিল আরেকটু . শরীরে কিছু নেই, একেবারে কাহিল।
কাঁধের ওপর দিয়ে ঘুরে তাকাল কিশোর। তীরের যতটা সম্ভব কাছে বোট নিয়ে এসেছে উলফ। নোঙ্গর ফেলেছে। রোদে চকচক করছে টাকা উত্তেজিত ভঙ্গিতে হাত নেড়ে লাফিয়ে নামল পানিতে।
বাক্সটা কোথায়? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
লুকিয়ে ফেলেছি... উলফকে দেখে চুপ হয়ে গেল রবিন।
নীল বনেটের দিকে তাকালই না উলফ। ওকে এখানে দেখে বিন্দুমাত্র অবাক নি। ছেলেদের কাছে এসে রবিনকে বলল বাক্সটা কোথায়?
জবাব দিল না রবিন।
এই ছেলে, তোমাকে বলছি, খেকিয়ে উঠল উলফ। বাক্সটা দাও।
কিসের বাক্স? আকাশ থেকে পড়ল যেন রবিন। কনুই দিয়ে আলতো গুঁতো দিল মূসার শরীরে। উলফের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে ইঙ্গিত। তার ইচ্ছে, মূসা লোকটাকে আটকে রাখতে পারলে দৌড়ে গিয়ে বাক্স নিয়ে সাইকেলে করে পালিয়ে যাবে।
ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরে ধমকে উঠল উলফ, খবরদার! কোন চালাকি নয়। কোমর পর্যন্ত ভেজা তার। খাটে ডেনিম জ্যাকেটে পানি লাগেনি। পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল। আবার যখন বের করল, হাতে দেখা গেল ভোতা নাক ছোট একটা পিস্তল, কুৎসিত চেহারা।
রবিনের দিকে পিস্তল তাক করল উলফ। বাক্স। তিমিটা নিয়ে এসেছে। দাও, কেই-আটা, জলদি।
অসহায়ভাবে কিশোরের দিকে তাকাল রবিন।
কিশোর চেয়ে আছে পিস্তলের দিকে। আগ্নেয়াস্ত্রের ওপরে পড়াশোনা মোটামুটি করছে। উলফের হাতে ওটা কোন কোম্পানির চিনতে পারল না, তবে ব্যারেলের আকার দেখে অনুমান করল, নিশানা মোটেই ভাল হবে না অস্ত্রটার। দশ গজ দূর থেকেও ওটা দিয়ে লক্ষ্য ভেদ করা কঠিন হবে। কিন্তু উলফ ধরে রেখেছে রবিনের বুকের এক ফুট দূরে।
রবিন, কিশোর বলল, দিয়ে দাও বাটা।
মাথা ঝাঁকাল রবিন। মুখ কালো, এত কষ্ট করে লাভ হলো না। পাথরের কাছে এসে দাঁড়াল। তার পেছনেই রয়েছে উলফ। বাক্সটা তুলল রবিন। নেয়ার জন্যে হাত বাড়াল উলফ।

না-আ-আ-আ! তীক্ষ্ণ চিৎকার।
প্রথমে বুঝতে পারল না রবিন চিৎকারটা কোথা থেকে এসেছে। তারপর দেখল, এলোমেলো পায়ে দৌড়ে আসছে বনেট।
ঘুরে চেয়েছে উলফ। চিৎকারে সে-ও অবাক হয়েছে।
রবিনের মাত্র কয়েক গজ দূরে রয়েছে কিশোর, মাথা নেড়ে ইশারা করল। বক্সট ছুঁড়ে দিল রবিন। লুফে নিল কিশোর।
উলকে গাল দিতে দিতে আসছে বনেট, বেঈমান! হারামী! মিথ্যুক! চোর!
রবিন আর কিশোরের দিকে নজর দেয়ার আগেই উলফের ওপর এসে ঝাপিয়ে পড়ল বনেট। আঙুল বাঁকা করে খামচি মারতে গেল চকচকে টাকে, গলা চেপে ধরতে গেল। পিস্তল নামিয়ে ফেলেছে উলফ, কনুই দিয়ে পেটে তো মেরে বনেটকে গায়ের ওপর থেকে সরানোর চেষ্টা করল, এপাশ-ওপাশ সরাচ্ছে মাথা।
ধাক্কা খেয়ে চিত হয়ে পড়ে গেল বনেট, কিন্তু উলফের জ্যাকেট ছাড়ল না, তাকে নিয়ে পড়ল।
বাক্সটা কিশোরের হাতে মুসা দাঁড়িয়ে আছে দশ গজ দূরে, পানির কিনারে। আরেকটু দূরে পানিতে রোভারের গায়ে গা ঠেকিয়ে দেখছে টিনহা।
মুসার কাছে বাক্সটা ছুঁড়ে দিল কিশোর।
ঝাড়া দিয়ে জ্যাকেট ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল উলফ। আবার কাহিল হয়ে গেছে বনেট, দুর্বল পায়ে উঠে দাঁড়াল সে-ও।
বাক্সটা ধরেছে মুসা। টিনহার দিকে তাকাল।
বুঝতে পারল টিনহা। তীরের দিকে সারাতে শুরু করল।
বাক্সটা দু-হাতে বুকে ঝাপটে ধরে টিনহার দিকে ছুটল মুসা। ছুটতে শুরু করেছে উলফ। চেঁচিয়ে উঠল, দাঁড়াও। দাঁড়াও, বলছি।
কে শোনে তার কথা? ফিরেও তাকাল না মুসা। বুঝতে পারছে, তার দিকেই চেয়ে আছে উলফের পিস্তল, কিন্তু তোয়াক্কা করল না।
দাও, হাত বাড়াল টিনহা। ছুঁড়ে মারো।
বাসকেট বল খেলে মুসা, ভালই খেলে। ক্ষণিকের জন্যে ভুলে গেল উলফের কথা। ভুলে গেল, যে কোন মুহূর্তে গর্জে উঠতে পারে পিস্তল। বাক্সটাকে বাসকেট বলের মত করে ধরে দূর থেকে ছুঁড়ে দিল টিনহার দিকে, বল ছোড়ার কায়দায়।
লম্বা ধনুক সৃষ্টি করে উড়ে গেল বাক্সটা, কোমর পানিতে দাঁড়িয়ে সেটা ধরল টিনহা।
বাক্সটা ছুঁড়ে দিয়েই আর দেরি করেনি মূসা, ঝাপ দিয়েছে পানিতে। ডুবে গেল সঙ্গে সঙ্গে। ভাসল না। পানির নিচ দিয়েই সাঁতরে চলল গভীর পানির দিকে। দম একেবারে ফুরিয়ে এলে, আসল।

বিশ গজ দূরে চলে গেছে টিনহা। তীরের দিকে চেয়ে আছে। বাক্সটা কামড়ে ধরে রেখেছে রোভার।
মাথা নিচু করে রেখে ফিরে চাইল মুসা।
পিস্তল নেই উলফের হাতে, বোধহয় পকেট ঢুকিয়ে রেখেছে। টেকো মাথাটা সামান্য ঝুঁকিয়ে তাকিয়ে আছে এদিকে। মূসার মনে হলো, ভয়ানক রেগে গিয়ে কুঁসছে একটা ষাড়, কি করবে বুঝতে পারছে না। তার কাছেই দাঁড়িয়ে আছে কিশোর আর রবিন।
হাত নেড়ে মুসাকে ডাকল কিশোর।
পানি থেকে উঠে এল মুসা।
…আপনার জিনিস ডাকাতি করার কোন ইচ্ছেই নেই আমাদের, মিস্টার উলফ, কিশোর কাছে। বাক্সের জিনিস অর্ধেক আমাদের, মানে, মিস শাটানোগার প্রাপ্য। সেটা নিশ্চিত করার জন্যেই একাজ করেছি।
অনেকক্ষণ কোন কথা বলল না উলফ। জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছে। ভুরু নাচাল, কি করতে চাইছ?
বাক্সটা শহরে নিয়ে যাব, বলল কিশোর। থানায়, ইয়ান ফ্লেচারের অফিসে। উনি এখানকার পুলিশ চীফ, জানেন বোধহয়। খুব ভাল লোক। পুলিশকে ভয়ের কিছু নেই, বেআইনী কিছু করেননি, আমাদেরকে পিস্তল দেখানো ছাড়া। সেকথা বলব না আমরা। সব খুলে বলবেন, তাঁকে। মিস্টার ফ্লেচার বাক্সের জিনিসগুলো ভাগাভাগি করে দেবেন আপনাকে আর টিনহাকে।
আবার দীর্ঘ নীরবতা। সাগরের দিকে তাকাল উল। পাশাপাশি ভাসছে টিনহা আর রোভার। ওদের কাছ থেকে বাক্সটা ফেরত নেয়ার কোন উপায় নেই। পিস্তল তাক করেও কোন লাভ হবে না, বিচ্ছ একেকটা, কেয়ারই করবে না। উল্টে আরও বেকায়দা অবস্থায় ফেলে দিতে পারে তাকে।
বেশ, তেঁতা গলায় বলল উলফ। বোটে করে যাব আমরা। রকি বীচের নৌকাঘাটায় বোট রেখে থানায় যাব। ঠিক আছে?
রাজি হলো না কিশোর, মাথা নাড়ল। উলফের চালাকি বুঝতে পারছে, কিন্তু সেকথা বলল না। নরম গলায় বলল, এত ঘুরে যাওয়ার দরকার কি? আসলে এখান থেকে যাওয়ারই দরকার নেই। চীফকেই ডেকে নিয়ে আসতে পারি আমরা।
ডেকে? কিভাবে? ষাড়ের মত ফোস ফোস করে উঠল উলফ। এখানে ফোন কোথায়? সব চেয়ে কাছেরটাও…
…আধ মাইল দূরে, কথাটা শেষ করে দিল কিশোর, কোস্ট রাডের ধারে একটা কাফেতে। সাইকেল নিয়ে পাঁচ-সাত মিনিটেই চলে যাবে রবিন। চীফকে ফোন করে আসবে। কি রবিন, পারবে না?

খুব পারব, হাসল রবিন।
মিস্টার উলফ, আপনার স্কিলটা যদি বোটে রেখে আসেন, মোলায়েম গলায় বলল কিশোর, টিনহাকে বাক্সটা আনতে বলতে পারি। তারপর রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে পারি পুলিশ আসার অপেক্ষায়। কি বলেন?
কি আর বলবে উলফ? কোঁকড়াচুলো, সাংঘাতিক পাজি, ইবলিসের দোসর ছেলেটাকে কষে দুই চড় লাগানোর ইচ্ছেটা অনেক কষ্টে দমন করল সে। চোখ পাকিয়ে তাকাল অতি নীরিহের ভান করে থাকা মুখটার দিকে। কিন্তু কিছুই করার নেই।
পুলিশকে ফোন করতে গেল রবিন।
বোটের লকারে পিস্তলটা রেখে এল উলফ। মুসা আবার গিয়ে দেখে এল, সত্যিই রেখেছে কিনা।
তীরে এসে মাছের বালতিটা নিয়ে গেল টিনহা, রোভারকে খাওয়াল। তাকে বিদায় জানিয়ে ফিরে এল। সঙ্গে সঙ্গে এল তিমিটা, তীরের কাছে এসে মাথা তুলে চেয়ে রইল, টিনহাকে চলে যেতে দেখে খারাপ লাগছে তার।
এতক্ষণে খেয়াল করল কিশোর, বনেট নেই। কোথাও দেখা গেল না তাকে। কেটে পড়েছে কোন এক ফাঁকে।
পথের ধারে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না ওদের, রবিন ফিরে এল। কয়েক মিনিট পরেই পুলিশের গাড়ি। আরও পনেরো মিনিট পর থানায় পৌঁছল ওরা।
ওদের দিকে চেয়ে অবাকই হলেন ইয়ান ফ্লেচার। তাকে দোষ দিতে পারল না কিশোর, কাদা-পানিতে যা চেহারা হয়েছে ওদের একেকজনের, পোশাক-আশাকের যা অবস্থা, তাতে তিনি অবাক না হলেই বরং, অস্বাভাবিক লাগত।
কি ব্যাপার কিশোর? জানতে চাইলেন পুলিশ-প্রধান।
তিন গোয়েন্দাকে চেনেন তিনি। কয়েকবার পুলিশকে সাহায্য করেছে ওরা। বেশ কয়েকটা জটিল কেসের সমাধান করে দিয়েছে। কিশোরের বুদ্ধির ওপর যথেষ্ট আস্থা তাঁর।
উলকে দেখিয়ে বল কিশোর, উনি মিস্টার উক। উনিই বলুন সব, সেটাই ভাল হবে।
বলুন, মিস্টার উলফ, অনুরোধ করলেন ফ্লেচার।
উঠে দাঁড়াল উল। পকেট থেকে ভেজা কাগজপত্র বের করে তা থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্সটা নিয়ে বাড়িয়ে ধরল।
লাইসেন্সটা একজন সহকারীকে দিলেন ক্যাপ্টেন, পরীক্ষা করে দেখার জন্যে।
সব খুলে বলল উলফ। মেকসিকোয় ক্যালকুলেটর চোরাচালান করতে নিয়ে যাওয়া থেকে শুরু করে ফেরার পথে ঝড়ে বোট ভোলা, তারপর তিমির সাহায্যে

বাক্সটা উদ্ধার, কিছুই বাদ দিল না। কিশোরকে দেখিয়ে বলল, আমার এই খুদে বন্ধুটি পরামর্শ দিল, বাক্সটা আপনার সামনে খুলতে। তাতে আমার আর মিস্টার শ্যাটানোগার ভাগ নিয়ে পরে কোন গোলমাল হবে না। ভেবে দেখলাম ঠিকই বলেছে। রাজি হয়ে গেলাম।
পকেট থেকে বাক্সের চাবি বের করে ক্যাপটেনকে দিল উলফ। টিনহা, বাক্সটা দাও ক্যাপটেনের কাছে।
মনে মনে স্বীকার না করে পারল না কিশোর, অভিনয় মোটামুটি ভালই করেছে উলফ। যেন নিরীহ একজন মানুষ। কারও সঙ্গে বেঈমানী করতে চায় না। মিস্টার স্ট্যাটানোগার প্রাপ্য ভাগ দিতে বিশেষ আগ্রহী।
তালা খুলে বাক্সের ডালা তুললেন ক্যাপটেন। কুঁচকে গেল ভুরু।
টিনহা চমকে গেল। রবিন আর মুসার চোখ দেখে মনে হলো, হঠাৎ সার্চ লাইটের তীব্র উজ্জ্বল আলো ফেলেছে কেউ তাদের চোখে।
ধীরে সুস্থে এগিয়ে এল কিশোর, উঁকি দিয়ে দেখল বাক্সের ভেতরে কি আছে। সামান্যতম অবাক মনে হলো না তাকে, যেন জানত এ-জিনিসই থাকবে।
দশ ডলারের কড়কড়ে নতুন নোটের বাণ্ডিলে ঠাসা বাটা।
রবার ব্যাণ্ড দিয়ে বেধে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। কিশোর অনুমান করল, দশ লাখ ডলারের কম হবে না।
তো, দেখলেন তো চীফ, স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল উলফ। লা পাজে এবারের ট্রিপে যা আয় হয়েছে, আছে এখানে। সেই সঙ্গে টেলিফোন বেজে ওঠায় থেমে গেল।
রিসিভার কানে ঠেকিয়ে কয়েক সেকেণ্ড চুপচাপ শুনলেন মিস্টার ফ্লেচার। নামিয়ে রেখে বললেন, আপনার আই ডি চেক করা হয়েছে। পরিষ্কার। আপনার নামে কোথাও কোন ওয়ারেন্ট নেই। হ্যাঁ, যা বলছিলেন, সেই সঙ্গে কি?
পকেট ক্যালকুলেটরগুলো লা পাজে বিক্রি করে দিয়েছিলাম, সেই টাকা আছে এখানে। সেই সঙ্গে রয়েছে আমার অন্য টাকা। লা পাজে আমার কিছু সম্পত্তি ছিল, একটা হোটেল ছিল, সব বিক্রি করে দিয়ে এসেছি। সেই টাকা। এখন টিনহা বলুক, তার বাবার ক্যালকুলেটরগুলোর জন্যে কত চায়।
চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাকালেন ক্যাপটেন। আপনার বিরুদ্ধে কোন কেস দাড় করাতে পারছি না। ট্যাক্স যদি ক্লিয়ার থাকে... শ্রাগ করলেন তিনি। মিস শ্যাটানোগা, বলুন কত চান?
হাসল টিনহা। বুঝতে পারছি না। মিস্টার উলফ বলেছিলেন, বাক্সে ক্যালকুলেটর রয়েছে, পঁচিশ-তিরিশ হাজার ডলার দাম। মিছে কথা কেন বলেছিলেন, জানি না। যাক গে। বাবার অর্ধেক শেয়ার হয় সাড়ে বারো থেকে পনেরো হাজার কিন্তু

তুলতে খরচাপাতি লেগেছে। হাসপাতালের বিল হাজার দশেক লাগবে, ওটা পেলেই আমি খুশি।
ঠিক আছে, দশ হাজারই দেব, বাক্সটা তুলে নেয়ার জন্যে সামনে ঝুঁকল উল। কাল সকালে চেক দিয়ে দেব তোমাকে। কালই টাকা তুলে নিতে পারবে ব্যাংক থেকে।
এখান থেকে নগদ নয় কেন জিজ্ঞেস করতে গিয়েও করল না টিনহা, সঙ্কোচে।
বাক্সটা টেবিলের ওপর দিয়ে টেনে আনল উলফ। ডালা আটকাবে। তারপর বেরিয়ে যাবে এতগুলো টাকা নিয়ে।
এক কদম সামনে বাড়ল কিশোর। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছিল, হাত সরিয়ে ক্যাপটেনকে বলল, স্যার, ছোট্ট একটা অনুরোধ আছে।
চাবিটা উলফকে দিতে গিয়েও থেমে গেল ক্যাপটেনের হাত। কি?
বাক্সটা আবার খুলুন। নোটের সিরিয়াল নাম্বার মেলান।
সিরিয়াল?
মেলান। আমার ধারণা, একই নাম্বারের অনেকগুলো পাবেন। বলতে বলতেই টান দিয়ে নিজেই নিয়ে এল বাক্সটা। ডালা তুলে একটা বালি বের করে ঠেলে দিল ক্যাপটেনের দিকে। আর, ট্রেজারিতে ফোন করুন, এক্সপার্ট পাঠাক। সব জাল নোট, আমি শিওর।
সহজেই নীল বনেটকে ধরে ফেলেছে পুলিশ, বিখ্যাত চিত্রপরিচালক ডেভিস ক্রিস্টোফারের অফিসে তার বিশাল টেবিলের সামনে বসে কাছে কিশোর। ওর ঝরঝরে লিমোসিনে করে মেকসিকো পালাচ্ছিল। পথে খারাপ হয়ে যায় গাড়ি। স্যান ডিয়েগোর কাছে। পুলিশের কাছে সব বলে দিয়েছে ও।
চেয়ারে হেলান দিলেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। বনেট স্বীকার করেছে জাল নোটগুলো সে বানিয়েছে?
করেছে, জবাব দিল রবিন। শুধু তাই না। মিস শাটানোগার গাড়ির ব্রেকের কানেকশন কেটেছে। যত ভাবে পেরেছে, ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে আমাদেরকে, যাতে বাক্সটা না তুলতে পারি। লোকটার জন্যে এখন আমার দুঃখই হচ্ছে। বেচারা।...আসলে উলফ তাকে বাধ্য করেছিল নোট জাল করতে। বনেট তার ব্ল্যাকমেলের শিকার।
ব্ল্যাকমেল? কিভাবে?
ইউরোপে কাজ করত বনেট। পাসপোর্ট, ড্রাইভিং লাইসেন্স আরও নানা রকম দরকারী কাগজপত্র জাল করত। সেটা জেনে ফেলল পুলিশ। উলফও জানল। বনেটের কাজকর্মের কিছু প্রমাণও জোগাড় করে ফেলল। পালাল বনেট। মেকসিকোতে গিয়ে ঢুকল। মনস্থির করল, আর বেআইনী কাজ করবে না। তার

যা দক্ষতা, প্রেসের কাজে উন্নতি করতে পারবে। তা-ই করল.সে, লা পাজে প্রেস দিল। ভালই চলছিল, এই সময় একদিন সেখানে গিয়ে হাজির হলো উলক। দেখা হয়ে গেল বনেটের সঙ্গে। নোট জাল করতে বাধ্য করল তাকে। ভয় দেখাল, তার কথা না শুনলে পুলিশে ধরিয়ে দেবে।

হুঁ, মাথা নাড়লেন চিত্রপরিচালক। কিশোর, তুমি কি করে বুঝলে নোটগুলো জাল?

বনেটের চোখের নিচের দাগ, স্যার, বলল কিশোর। কারা কারা ঘড়ির মেকানিকের গ্লাস পরে, ভাবলাম। হঠাৎ মনে পড়ল, লেখা কিংবা নকশা জালিয়াতির কাজ যারা করে, তারাও পরে।

আমার হলে মনে পড়ত না, স্বীকার করলেন পরিচালক। অনেক তলিয়ে ভাব তুমি। যাক, বাক্সটা তুলতে বাধা দিল কেন বনেট, নিশ্চয় তার জাল করা সমস্ত নোট ছিল ওটাতে? ডুবে গিয়েছিল বলে খুব খুশিই হয়েছিল সে, না?

হ্যাঁ, বলল কিশোর। টাকাগুলো ছড়িয়ে পড়লে তার অপরাধ আরও বাড়ত। বোট ডুবে যাওয়ায় খুশি হয়েছিল সে, সেজন্যেই ওটা তুলতে বাধা দিচ্ছিল। উলফ জানত না। একজন তুলতে চাইছে, আরেকজন বাধা দিচ্ছে, ব্যাপারটায় প্রথমে খুব। অবাক হয়েছিলাম। থামল কিশোর। তারপর বলল, আপনার জানা আছে, স্যার, প্রতিটি জালিয়াতের কাজে কিছু না কিছু ফারাক থাকেই, বিশেষজ্ঞর চোখে ধরা পড়ে সেটা। বনেটও জানত, টাকাগুলো ব্যাংক থেকে পাবলিকের কাছে যাবে, সেখান থেকে কিছু যাবে ট্রেজারিতে, ট্রেজারির চোখে ধরা পড়ে যাবে ওগুলো জাল। জালিয়াতকে খুঁজতে শুরু করবে ওরা। এক সময় না এক সময় বনেটের কাছে পৌঁছে যাবেই।

বানাতে গেল কেন তাহলে? মানা করে দিলেই পারত।

ভয়ে। মুখের ওপর উলফকে না করতে পারেনি, কিন্তু বোটটা ডুবে যাওয়ার পরু ওগুলো যাতে আর তোলা না যায়, সে ব্যবস্থা করতে চেয়েছে। শেষ দিকে মরিয়া হয়ে উঠেছিল সে।

হুঁ। অপরাধবোধ সঠিক চিন্তা করতে দেয় না মানুষকে। দ্বিধাগ্রস্ত করে ফেলে। কিন্তু বনেটেই বাধা দিচ্ছে তোমাদেরকে, শিওর হলে কি করে?

অনেক সময় লেগেছে, স্যার। তিনজনকে সন্দেহ করলাম। বিংগো উলফ, নীল বনেট, আর যে লোকটা একশো ডলার পুরস্কার দেবে বলেছে তাকে। রবিনের দিকে তাকাল সে। বনেটের মাথা থেকে সেদিন সৈকত মোজা খোলার আগেতক বুঝতে পারিনি, সে-ই বাধা দিয়েছে।

মাথা দোলালেন চিত্রপরিচালক, ই উলফের ওপর তোমাদের নজর ঘুরিয়ে দেয়ার জন্যেই ওভাবে কথা বলেছে বনেট। টেনে টেনে ভেঙে ভেঙে বলেছে, গোয়ে-নদা,

কেই-আস...
বেই-অ্যাণ্ড, হাসল কিশোর। পাকা জালিয়াত লোকটা, অভিনয়ও ভাল করে। যেভাবে উলফের কথা নকল করল, বেশ দ্বিধায় ফেলে দিয়েছিল আমাদেরকে।
বোমরা তিন গোয়েন্দা, সেটা জানল কিভাবে? জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। স্যান পেড্রোতে দেখেই নাকি চিনেছিল?
রোভারকে যেদিন বাচালাম, সেদিন বোটে উলফের সঙ্গে ৰনেটও ছিল, বলল কিশোর। তিমিটাকে বাঁচিয়েছি, দেখেছে ওরা। তিমিটার সাহায্যে বোটের মাল তোলার কথা বলল তাকে উলফ, পুরো প্ল্যানটা বলল। তখনই ঠিক করে ফেলেছে বনেট, পরদিন ওশন ওয়ারন্ডে যাবে। ওখানে দেখল আমাদেরকে। আগের দিন সৈকত দেখেছিল, পরদিন ওশন ওয়ারন্ডে আমাদের দেখে ধরে নিল তিমিটার ব্যাপারে খোজখবর নিতেই গেছি আমরা। টিনহার অফিসে ঢুকতে দেখল, পরে টিনহার টেলি আমাদের কার্ডটা দেখল। তার ধারণা হলো, আমাদেরকে দিয়েই তার কাজ হবে, ঠেকাতে পারবে উলফকে। তিমিটা সাগরে ছেড়ে দিতে পারলেই আর বোটের মাল তোলা যাবে না।
তিমি ছেড়ে দিলেও হয়তো অন্য উপায় বের করত উলফ, বললেন চিত্রপরিচালক। এতগুলো টাকা, পুরো এক মিলিয়ন ডলার। আচ্ছা, ম্যারিবু শ্যাটানোগার অফিসে ঢুকেছিল কেন বনেট? নিশ্চয় একটা নকল চাবি বানিয়ে নিয়েছে। কিন্তু ঢুকল কেন?
শ্যাটানোগার স্কুবা যন্ত্রপাতিগুলো নষ্ট করতে। ওশন ওয়ারন্ড থেকে যন্ত্রপাতি ধার নিল টিনহা। বেকায়দায় পড়ে গেল বনেট। শেষে উলফের বোটে উঠে কোনমতে একটা যন্ত্র নষ্ট করতে পারল।
আর সেটা পড়ল মুসার ভাগে, মুচকি হাসলেন পরিচালক। মুসা, তোমার কপালই খারাপ।
হ্যাঁ, স্যার,মাথা ঝাঁকাল মুসা। আরেকটু হলেই দিয়েছিল শেষ করে।
ঘড়ির দিকে তাকালেন পরিচালক। আরিব্বাবা, অনেক বেজেছে। লাঞ্চের সময়। আরে বসো বসো, তোমাদের জন্যেও আনতে বলছি। এখানেই খেয়ে যাও। আড়চোখে তাকালেন মুসার হাসি হাসি মুখের দিকে একটু আগের গোমড়া কুচকুচে কালো মুখটা হাসিতে উজ্জ্বল।
বেল টিপে বেয়ারাকে ডেকে খাবার আনতে বললেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। রবিনের দিকে ফিরলেন। রবিন, টিনহার বাবার কি খবর? ভদ্রলোক সেরে উঠেছেন? হাসপাতালের টাকার কি ব্যবস্থা?
ভালো, স্যার, রবিন জবাব দিল। তবে টাকার ব্যবস্থা পুরোপুরি হয়নি। এতবড় একটা জালিয়াতি পিরয়ে দেয়ার জন্যে আমাদেরকে ছোটখাটো একটা পুরস্কার

দিয়েছে ট্রেজারি। আমাদের ভাগেরটাও টিনহাকে দিয়ে দিতে চেয়েছিলাম, তার বাবার চিকিৎসার জন্যে, নেয়নি। তার ভাগেরটাই শুধু নিয়েছে। আশা করছে, কেস করে ক্যালকুলেটর বিক্রির অর্ধেক টাকা আদায় কবরে উলফের কাছ থেকে।
ভাবছি, সামনে ঝুকলেন চিত্রপরিচালক, তোমাদের এবারের কেসটা নিয়ে ছবি করব। ভাল কাহিনী। নামটা কি দেয়া যায়?
লস্ট হোয়েল, সঙ্গে সঙ্গে বলল মূসা।
নাহ, মাথা নাড়ল রবিন। লস্ট ওয়ারল্ড লস্ট ওয়ারল্ড মনে হয়। তাছাড়া তিমিটাকে তো আবার পাওয়া গেছে।
কিডন্যাপ হোয়েল, বিড় বিড় করল কিশোর। বাংলায় বলল, হারানো তিমি।
ঠিক, আঙুল তুললেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। কিডন্যাপড় হোরেল। চমৎকার নাম।
খাবার এল। সাজিয়ে দিয়ে চলে গেল বেয়ারা।
নাও, শুরু করো, বলতে বলতে নিজের প্লেটটা টেনে নিলেন পরিচালক। খাওয়ার সময় আর বিশেষ কথা হলো না। শূন্য প্লেটটা ঠেলে সরিয়ে বললেন তিনি, কফি?
ঘাড় কাত করল কিশোর। মূসা আর রবিনও সায় দিল।
আচ্ছা, কাপে চুমুক দিয়ে নামিয়ে রাখতে রাখতে বললেন পরিচালক। রোভারের কি খবর? চলে গেছে?
নড়েওনি, হেসে বলল রবিন। তাকে যেখানে রেখে এসেছিল টিন, থানা থেকে ফিরে গিয়ে দেখল, ওখানেই রয়েছে। ঘোরাঘুরি করছে। টিনহার বড় বেশি ভক্ত হয়ে পড়েছে। ভেবেচিন্তে আবার নিয়ে এসেছে ওটাকে।
কোথায়? ওশন ওয়ারন্ডে?
হ্যাঁ।
শুড, চেয়ারে হেলান দিলেন আবার পরিচালক। টিনহার উপকার করা যায় কিভাবে, ভাবছিলাম। ছবিতে ওকে আর রোভারকে দিয়েই অভিনয় করাতে পারি। দুজনের বেশ কিছু সম্মানী পাওনা হয় তাহলে আমার কাছে।
তিনজনেই তাকিয়ে আছে পরিচালকের দিকে।
হাজার দশেক অগ্রিমও দিতে পারি, আবার বললেন তিনি।
টিনহার বাবার বিলের টাকা হয়ে যায় তাহলে! লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল মুসা। কিশোর, বসে আছ কেন? চলো জলদি, টিনহাকে খবরটা দিতে হবে না? চলো, চলো।
চিত্রপরিচালককে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে দরজার দিকে রওনা দিল তিন কিশোর।

হাসিতে ভরে উঠল মিস্টার ক্রিস্টোফারের কুৎসিত মুখ। হাসলে আর তত খারাপ দেখায় না তাকে।

ভলিউম ৪ – গুহামানব – তিন গোয়েন্দা – রকিব হাসান – সেবা

অমন করছেন কেন? শোনা গেল উদ্বিগ্ন নারীকণ্ঠ।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনছে কিশোর পাশা।

বিকেলের ঘন কুয়াশা, প্যাসিফিক কোস্ট হাইওয়ের যানবাহন চলাচলের শব্দকে যেন চেপে ধরে কমিয়ে দিয়েছে। পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ড আর রাস্তার ধারের বাড়িগুলোর মাঝখানে ভারি হয়ে ঝুলছে কুয়াশার চাদর। কিশোরের ওপরও পড়ছে যেন এর চাপ। প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মাঝে বড় একা একা লাগছিল তার, মনে হচ্ছিল সমস্ত দুনিয়ায় এতক্ষণ সে-ই ছিল একমাত্র মানুষ।

এই সময় কথা বলে উঠল কে যেন, জুতোর আওয়াজ এগিয়ে এল ইয়ার্ডের দিকে।

দুটো ছায়া দেখা গেল, দু-জন মানুষ। ধূসর আলোয় চেহারা অস্পষ্ট। ঝুঁকে হাঁটছেন একজন প্রৌঢ়, পা টেনে টেনে, জুতোর তলা ঘষা খাচ্ছে রাস্তায়। অন্যজন তরুণী, লম্বা চুল এসে পড়ে মুখের অনেকখানি ঢেকে দিয়েছে।

এই যে, একটা বেঞ্চ! স্যালভিজ অফিসের কাছে এসে সঙ্গীকে বসিয়ে দিতে দিতে বলল মেয়েটা, চুপ করে বসুন। তখুনি বলেছিলাম, আমি ড্রাইভ করি, আমাকে দিন। শুনলেন না।

কি হয়েছে? এগিয়ে এল কিশোর।

কপালে হাত রেখে ঘোলা চোখে তাকালেন ভদ্রলোক। আমরা... মেয়েটার হাত ধরলেন। জিজ্ঞেস করো..আমরা কোথায়...

হারবারভিউ লেন, কিশোরকে বলল তরুণী। হারবারভিউ লেনটা খুঁজছি আমরা।

আরও সামনে যেতে হবে আপনাদের, সানসেট পেরিয়ে তারপর... বলল কিশোর। উনি কি অসুস্থ নাকি? ডাক্তার ডাকতে

না বলে উঠলেন ভদ্রলোক। না না, লাগবে না! এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে।

তাঁর দিকে ঝুঁকল কিশোর।

ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখ। ঘামছেন। খুব দুর্বল লাগছে। কপাল টিপে ধরলেন। মাথাব্যথা করছে। আশ্চর্য! আগে কখনও করেনি!

ডাক্তার ডাকছি, আবার বলল কিশোর।

জোর করে উঠে দাঁড়ালেন ভদ্রলোক।

না না, লাগবে না, সেরে যাবে... দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে আবার বসে হেলান দিলেন অফিসের দেয়ালে। ভারি, খসখসে হয়ে উঠেছে শ্বাস-প্রশ্বাস। কুঁচকে গেল কপাল। উফ, ব্যথা!

তাঁর হাত ধরল কিশোর। ঠাণ্ডা, ঘামে ভেজা। চোখ স্থির, পাতা। পড়ে না।

হঠাৎ যেন বড় বেশি নীরব হয়ে গেল ইয়ার্ডের ভেতরটা। ভদ্রলোকের কপালে হাত রেখেই গুঙিয়ে উঠল মেয়েটা।
আবার পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। এগিয়ে এলেন মিসেস মারিয়া পাশা, কিশোরের মেরিচাচী।
কি হয়েছে রে, কিশোর?
বোধহয়, মারা গেছেন ভদ্রলোক!
.
প্রচুর আলো, সাইরেনের আওয়াজ, মানুষের হুড়োহুড়ি। কুয়াশার মধ্যে পুরো ব্যাপারটাই অবাস্তব লাগছে কিশোরের কাছে, এখানে নয়, যেন অন্য কোনখানে ঘটে চলেছে ঘটনাগুলো, দূর থেকে দেখছে সে। মেরিচাচীকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে সোনালিচুল মেয়েটা।
ইয়ার্ডের গেটের কাছে লোকের ভিড়।
স্ট্রেচারে করে লাশটা অ্যাম্বুলেন্সে তোলার সময় নীরব হয়ে গেল সবাই।
তারপর আবার সাইরেনের তীক্ষ্ণ চিৎকার।
অ্যাম্বুলেন্সের পেছনে চলল ইয়ার্ডের গাড়ি। ড্রাইভ করছেন। মেরিচাচী। তার আর কিশোরের মাঝে বসেছে মেয়েটা।
পুরো ব্যাপারটা এখনও স্বপ্ন মনে হচ্ছে কিশোরের কাছে।
তবে হাসপাতালে পৌঁছে ঘোর কেটে গেল, আবার যেন ফিরে এল। বাস্তবে। উজ্জ্বল আলোকিত করিডরে লোকজনের চলাফেরা। বড় একটা বসার ঘরের বাতাস সিগারেটের ধোঁয়ায় ভারি।
কিশোর, মেরিচাচী আর মেয়েটা বসল বসার ঘরে। পুরানো ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টানো ছাড়া কিছু করার নেই।
অনেক, অনেকক্ষণ পর এলেন একজন ডাক্তার।
সরি, মেয়েটার দিকে চেয়ে বললেন, কিছু করতে পারলাম না।...আপনার কিছু হয়?
মাথা নাড়ল মেয়েটা।
ময়না তদন্ত করতে হবে, বললেন ডাক্তার। না করে উপায় নেই। এটা একটা অস্বাভাবিক কেস, পথে হঠাৎ মারা যাওয়া। সামনে। তখন কোন ডাক্তারও ছিল না। যা বুঝলাম মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণে মারা গেছে। কাটলে বোঝা যাবে। ওর আত্মীয়স্বজনকে কোথায় পাওয়া যাবে?
আবার মাথা নাড়ল মেয়েটা। জানি না। রিসার্চ সেন্টারের ওরা জানতে পারে। ফোঁপাতে শুরু করল। একজন নার্স এসে সরিয়ে নিল তাকে।
বসে আছে কিশোর আর মেরিচাচী।

অনেকক্ষণ পর ফিরে এল মেয়েটা।
সেন্টারে ফোন করে এলাম। ওরা আসছে।
কৌতূহল হচ্ছে কিশোরের, কিসের সেন্টার? কিন্তু জিজ্ঞেস করল না কিছু।
চা খাওয়া দরকার, মেরিচাচী বললেন। উঠে, মেয়েটার হাত ধরে টেনে নিয়ে চললেন কফিশপে।
কিশোর গেল পেছনে।
নীরবে চা খাওয়া চলল কিছুক্ষণ।
খুব ভাল মানুষ ছিলেন, অবশেষে নিচু গলায় বলল মেয়েটা। চেয়ে আছে হাতের খসখসে চামড়ার দিকে। নখের মাথা ক্ষয়া, কোন কোনটা ভাঙা। জানাল, ভদ্রলোক ডাক্তার ছিলেন, জিনেটিসিস্ট। কাজ করতেন গ্যাসপার রিসার্চ সেন্টারে। প্রজনন বিদ্যায় এক্সপার্ট, নানারকম জন্তু-জানোয়ারের ওপর পরীক্ষা চালাতেন। মেয়েটাও ওখানেই কাজ করে।
সেন্টারটার নাম শুনেছি, কিশোর বলল।
উপকূলের ওদিকে, তাই না? স্যান ডিয়েগোর কাছে?
মাথা ঝাঁকাল মেয়েটা। পাহাড়ের মাঝে ছোট একটা শহরে। মরুভূমির দিকে একটা পথ গেছে, ওই পথের কিনারে।
জানি। শহরটার নাম সাইট্রাস গ্রোভ।
এই প্রথম হাসল মেয়েটা। তুমি জানো, কিন্তু অনেকেই জানে না। সেন্টারটার নাম শুনে থাকলেও শহরের নাম জানে না অনেকে।
কিশোর অনেক পড়াশোনা করে, বললেন মেরিচাচী। যা পড়ে মনেও রাখে। আমিই তো ওই শহরটার নাম শুনিনি। প্রতিষ্ঠানটার নামও না। কি হয় ওখানে?
বৈজ্ঞানিক গবেষণা, কিশোর বলল। কৌতূহলী চোখে তার দিকে তাকাল মেয়েটা।
প্লাস্টিকের জিনিস বানানোর ফ্যাক্টরি ছিল ডেনি গ্যাসপারের, আবার বলল কিশোর। কোটি কোটি টাকা কামিয়েছিলেন ব্যবসা করে। ডাক্তার হওয়ার ইচ্ছে ছিল তাঁর, কিন্তু কোনদিন হতে পারেনি। তাই, মৃত্যুর আগে উইল করে গেছেন, তার টাকা যেন বিজ্ঞানের গবেষণায় ব্যবহার করা হয়, মানুষের উন্নতির জন্যে।
এসবও জানে! অবাক হয়ে মেরিচাচীর দিকে তাকাল মেয়েটা।
হাসলেন মেরিচাচী। বললাম না, অনেক পড়াশোনা ওর।
ভাল, খুব ভাল। ও হ্যাঁ, এখনও নামই তো বলা হয়নি আমার। লিলি অ্যালজেডো।..
শুনিনি।
শোনার কথাও না। আমি বিখ্যাত কেউ নই।
আমি মারিয়া পাশা। ও আমার ছেলে, কিশোর।

হেসে সামান্য মাথা ঝাঁকাল লিলি।
হ্যাঁ, গ্যাসপার রিসার্চ সেন্টারের কথা বলো। কিসের গবেষণা হয় ওখানে? জিজ্ঞেস করলেন মেরিচাচী।
জন্তু-জানোয়ারের জবাব দিল লিলি। সাদা ইঁদুর, শিম্পাঞ্জী, ঘোড়া এসব।
ঘোড়া? ল্যাবরেটরিতে ঘোড়া রাখে!
ল্যাবরেটরিতে, না, আস্তাবলে। ওখানে রেখেই পরীক্ষা চালানো হয়। আইসোটোপ ব্যবহার করে কি কি সব পরীক্ষা করতেন ডাক্তার ক্লডিয়াস। ক্রোমসম নিয়ে গবেষণা হচ্ছে। অনেক চালাক বানিয়ে ফেলা হয়েছে একটা ঘোড়াকে। অঙ্ক করতে পারে।
হাঁ হয়ে গেলেন মেরিচাচী।
কিশোরও অবাক।
না না, তেমন জটিল অঙ্ক না, বলল লিলি। প্রথমে দুটো আপেল সামনে রেখে, পরে আরও তিনটা রাখলে, পাঁচবার মাটিতে পা ঠোকে ওটা। তার বেশি কিছু পারে না। ডাক্তার ক্লডিয়াস বলতেন, ঘোড়ার খুলির আকৃতি নাকি ভাল না, বুদ্ধিমান হওয়ার উপায় নেই। শিম্পাঞ্জীর খুলি অনেক ভাল, অনেক জটিল বিষয়ও তাই শিখে ফেলে।
জানোয়ারকে লেখাপড়া শিখিয়ে ওদেরকে দিয়ে কি করাতে চেয়েছিলেন ডাক্তার?
না, কিছু করাবেন না। আসলে, ঘোড়া কিংবা শিম্পাঞ্জীকে কথা বলানোর চেষ্টাও তিনি করছেন না। তিনি চাইছেন মানুষের উন্নতি করতে। কিন্তু সেটা করার জন্যে জানোয়ারের ওপরই তো আগে গবেষণা চালাতে হবে, তাই না? মানুষ কি আর হাসপাতালের গিনিপিগ হতে রাজি হবে?
কেঁপে উঠলেন মেরিচাচী।
মুখ নামাল লিলি। আপনারা অনেক করেছেন। আমি এখন সামলে নিতে পারব। ডাক্তার রুডলফ আর মিসেস গ্যারেট এসে পড়বেন...
ওঁরা না আসা পর্যন্ত আমরা থাকছি, শান্তকণ্ঠে বললেন মেরিচাচী।
লম্বা, কঙ্কালসার, ধূসর চুলওয়ালা একজন মানুষ ঢুকলেন। কফিশপে। ডাক্তার রুভলফ, পরিচয় করিয়ে দিল লিলি। তার সঙ্গে এসেছে একজন মোটাসোটা মহিলা, বয়েস ষাটের কাছে, চোখের পাতায় নকল পাপড়ি লাগিয়েছে, মাথায় আগুনরঙা নকল চুল। মিসেস গ্যারেট। লিলির হাত ধরে নিয়ে গেল মহিলা। ডাক্তার রুডলফ গেলেন। ডাক্তার ক্লডিয়াসকে পরীক্ষা করেছেন যে ডাক্তার তার খোঁজে।
আনমনে মাথা নাড়লেন মেরিচাচী। আজব মানুষ! জন্তু জানোয়ারের সিসটেমে গোলমাল করে দিয়ে আবার কেপে উঠলেন তিনি। কিশোর, ওই কঙ্কাল ডাক্তারটা

কি কাজ করে বলে তোর মনে হয়?
কোন ধরনের গবেষণা।
ভ্রুকুটি করলেন মেরিচাচী। গবেষণা না ছাই! বদ্ধ উন্মাদ ওরা! শেষে না ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন বানিয়ে বসে! ভাল হবে না। ন্যাচারাল জিনিসকে বদলে দিতে গিয়ে ভাল করবে না, দেখিস, বিপদ ডেকে আনবে; সারা দুনিয়ার জন্যে!
ডাক্তার ক্লডিয়াসের মৃত্যু সংবাদ খবরের কাগজে প্রকাশিত হলো ফলাও করে। স্ট্রোক হয়ে মারা গেছেন বিজ্ঞানী। তাঁর জীবনের কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণীও ছাপা হলো। সব শেষে বলা হলো, জাহাজে করে, তার লাশ দেশে নিয়ে যাওয়া হবে কবর দেয়ার জন্যে।
হপ্তাখানেক বাদেই এক যুগান্তকারী আবিষ্কার করে বসল গ্যাসপার সেন্টার। ঝাঁকে ঝাঁকে রিপোর্টার ছুটে গেল সাইট্রাস গ্রোভ শহরে। সেন্টারের একজন প্রত্নতত্ত্ববিদ, ডাক্তার জর্জ হ্যারিসন নাকি ওই শহরের সীমান্তে পাহাড়ের গুহায় এক প্রাগৈতিহাসিক জীবের কঙ্কাল আবিষ্কার করেছেন।
দারুণ তো! খবর পড়ে বলে উঠল কিশোর।
পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে লোহালক্কড়ের জঞ্জালের নিচে চাপা পড়েছে। একটা পুরানো মোবাইল হোম ট্রেলার। তাতে তিন গোয়েন্দার হেডকোয়ার্টার।
মে মাসের এই বিকেলে হেডকোয়ার্টারে আলোচনায় বসেছে তিন গোয়েন্দা।
কি দারুণ? জিজ্ঞেস করল সহকারী গোয়েন্দা মুসা আমান।
সাইট্রাস গ্রোভের গুহামানব, খবরের কাগজটা নামিয়ে রেখে বলল কিশোর। আসলে মানুষ কিনা, বোঝা যায়নি এখনও। বয়েস কত, জানা যায়নি, তবে অনুমান করা হচ্ছে অনেক পুরানো। ডাক্তার হ্যারিসনের মত ওটা হোমিনিড। মানুষ, কিংবা মানুষের মত জীব। মানুষের আদিপুরুষ হবে হয়তো।
বুকশেলফের ওপরে রাখা ছোট টেলিভিশন সেটটা অন করল মুসা।
ছবি ফুটতেই পর্দা জুড়ে দেখা গেল একটা হাসিখুশি মুখ। ওর নাম। এলান ফিউজ। বলল, আজ টেলিভিশনে আমাদের অতিথি হয়ে এসেছেন ডাক্তার জর্জ হ্যারিসন। দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ায় সবচেয়ে। পুরানো গুহামানবের কঙ্কাল খুঁজে পেয়েছেন তিনি।
সরে গেল ক্যামেরার চোখ। মোটা একজন মানুষকে দেখা গেল, গোলগাল চেহারা, ছোট করে ছাটা চুল। পাশে বসে আছে ভুড়িওয়ালা, বেঁটে আরেকজন। গায়ে কাউবয় শার্ট, কোমরে চওড়া বেল্ট, তাতে কারুকাজ করা চকচকে বাস্। পায়ে হাইহীল বুট।
ডাক্তার হ্যারিসনের সঙ্গে এসেছেন মিস্টার কিংসলে ম্যাকম্বার, আবার বলল এলান ফিউজ। ব্যবসা করেন। সাইট্রাস গ্রোভে তাঁর জমিতেই কঙ্কালটা পাওয়া

গেছে। এ রাইট! রুক্ষকণ্ঠে বলে উঠলেন বিজ্ঞানী। ব্যবসায়ীই। লোকের গলা কেটে টাকা নেয়।
অপ্রস্তুত হয়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি বলল এলান ফিউজ, ডাক্তার হ্যারিসন এখন আমাদেরকে ফসিলটার কথা কিছু বলবেন।...কোথায়। পেয়েছেন, স্যার? কিভাবে?
চেয়ারে সোজা হয়ে বসলেন প্রত্নতত্ত্ববিদ। নেহাত ভাগ্যের জোরেই পেয়েছি বলা যায়। হাঁটতে বেরিয়েছিলাম। বৃষ্টি সবে থেমেছে তখন। পথের ধারে একফালি জমি, তার পরে পাহাড়। বৃষ্টিতে ঢালের মাটির আস্তর ধুয়ে উঠে গেছে, একটা গর্তের ভেতর থেকে সাদামত কি যেন বেরিয়ে আছে দেখলাম। অন্ধকার হয়ে এসেছে তখন...
তোমার আগেই আমি দেখেছি, বাধা দিয়ে বলল ম্যাকম্বার। আমি দেখার পর...
স্পষ্ট দেখা যায় না, ম্যাকম্বারের কথা না শোনার ভান করে আবার আগের কথার খেই ধরলেন ডাক্তার, আলো দরকার। টর্চ আনতে গেলাম সেন্টারে।
এসে দেখলে শটগান হাতে দাঁড়িয়ে আছি আমি, বলল ম্যাকম্বার। ভাগ্য ভাল, বেশি গোলমাল করোনি, নইলে...
লম্বা করে শ্বাস টানলেন হ্যারিসন। ধৈর্য রাখতে কষ্ট হচ্ছে। ওর জায়গা, তাই ওকে সঙ্গে নিয়েই গেলাম। মুখের ঠিক ভেতরেই পড়ে আছে ওটা, কাদায় দেবে আছে বেশির ভাগ। খুলি দেখেই বুঝলাম
পুরানো! চেঁচিয়ে উঠল ম্যাকম্বার। অনেক পুরানো! হাজার হাজার বছর আগের!
খুলিটার কাছেই ছিল অন্যান্য হাড়, প্রায় পুরো কঙ্কালটাই ছিল, বলে চললেন হ্যারিসন। ভালমত পরীক্ষা করে দেখতে পারিনি এখনও। তবে, আফ্রিকায় যেসব পুরানো ফসিল পাওয়া গেছে, সেগুলোর সাথে অনেক মিল আছে।
কঙ্কালটা কি মানুষের? জিজ্ঞেস করল ফিউজ।
কপালে ভাঁজ পড়ল বিজ্ঞানীর। আধুনিক মানুষের সঙ্গে অনেক মিল আছে বটে। তবে, পুরোপুরি মানুষ বোধহয় বলা যায় না। আমেরিকায় এ যাবৎ যত হোমিনিড পাওয়া গেছে তার মধ্যে এটা সবচেয়ে পুরানো।
সামনে ঝুঁকলেন হ্যারিসন। বলা হয়, আজকের আমেরিকান ইনডিয়ানরা আদিম মংগোলিয়ান যাযাবরদের বংশধর। বরফ যুগের শেষ দিকে সাইবেরিয়া আর আলাসকা থেকে এসেছিল ওরা। আট থেকে দশ হাজার বছর আগে। বেশির ভাগ সাগরের পানিই জমে বরফ হয়ে গিয়েছিল সে-সময়, সমুদ্র সমতল ছিল অনেক নিচে। সাইবেরিয়া আর আলাসকার মাঝে দূরত্ব এত কমে গিয়েছিল, পা বাড়ালেই এক দেশের মানুষ আরেক দেশে ঢুকে পড়তে পারত। আর তা-ই করেছিল এশিয়ান যাযাবরেরা। শিকার করতে করতে চলে এসেছিল নতুন দেশে। শিকার

পাওয়া যেত বেশি, তাই আর ফিরে যায়নি ওরা, ছড়িয়ে পড়ে বিশাল অঞ্চলে। কেউ কেউ চলে যায় একেবারে দক্ষিণ আমেরিকার শেষ মাথায়।
এসবই অবশ্য বিজ্ঞানীদের অনুমান। কেউ কেউ অন্য কথাও বলেন। বরফ যুগের আগে থেকেই নাকি আমেরিকায় মানুষ ছিল। কেউ তো আরও বাড়িয়ে বলে আনন্দ পান। বলেন মানুষের আদি জন্ম এই আমেরিকাতেই, পরে অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে গেছে। দেশ ত্যাগ করে চলে গেছে ইউরোপ, এশিয়ায়।
সাইট্রাস গ্রোভে পাওয়া ফুসিলটা কি প্রমাণ করে? জিজ্ঞেস করল ফিউজ।
এখুনি কিছু বলা যাবে না। কত পুরানো, তা-ই জানা হয়নি। আমাদের এই কঙ্কালটা…
এখানে আমাদের কথাটা আসছে কিভাবে? ওটা তো শুধু আমার, গোঁয়ারের মত বলে উঠল ম্যাকম্বার। আমার জায়গায় পাওয়া গেছে। সন্দেহেরও কিছু নেই, ওটা মানুষেরই কঙ্কাল। লাখ লাখ বছর ধরে পড়ে আছে, এই একটু আগে যে হাজার হাজার বলেছে, বেমালুম ভুলে গেছে।
পাগল নাকি! আর ধৈর্য রাখতে পারলেন না হ্যারিসন, ধমকে উঠলেন।
পাগলের কি আছে? গলা আরও চড়াল ম্যাকম্বার। বিজ্ঞানীদের সন্দেহ থাকতে পারে, কিন্তু আমি শিওর, এই আমেরিকাতেই প্রথম মানুষের জন্ম হয়েছিল। গুহায় যে পড়ে আছে, হয়তো ওটাই প্রথম মানুষ, ওরই বংশধর আমরা। গার্ডেন অভ ইডেন হয়তো সাইট্রাস গ্রোভের ধারেকাছেই কোথাও মাটির তলায় চাপা পড়ে আছে। ব্যাকারসফিল্ড, কিংবা ফ্রেজনোতে…
অ্যাই, তুমি থামবে? হাত নাড়লেন হ্যারিসন।
কেন, ঠিক কথাই তো বলছি…
ঠিক! চেয়ার নিয়ে ঘুরে ম্যাকম্বারের মুখোমুখি হলেন ডাক্তার।
কি করে জানলে, ঠিক? স্টাডিই তো করলাম না…
করার দরকারও নেই। আর করতে দিচ্ছে কে তোমাকে? যেখানে পাওয়া গেছে ওটা, সেখানেই থাকবে, যেভাবে পাওয়া গেছে, সেভাবে। মাইক্রোস্কোপের তলায় রাখা তো দূরের কথা, ছুঁতেও দেব না তোমাকে। তবে হ্যাঁ, লোকে দেখতে চাইলে অবশ্যই দেখাব।
সর্বনাশ! ফসিল নিয়েও ব্যবসা করবে নাকি? শশা দেখাবে? আমিও সেটি হতে দিচ্ছি না। কত পুরানো হাড় ওগুলো…
অনেক অনেক পুরানো, সেটা বুঝতে আর স্টাডি করার দরকার হয় না। দেখেই বলে দেয়া যায়। আমার ওই গুহায়ই জন্মেছিল প্রথম মানুষ, সভ্যতার সূচনা হয়েছিল। আমাদের সবারই আদিপিতা ওই মানুষটি। তাকে দেখার অধিকার সব মানুষেরই আছে।

পয়সা লোটার মওকা পেয়েছ তো, এছাড়া কি বলবে, চামার কোথাকার! রাগে ফেটে পড়লেন হ্যারিসন। কি বলছ বুঝতে পারছ?
পারছি। সরাসরি ক্যামেরার চোখের দিকে তাকাল ম্যাকম্বার। ওটা পৃথিবীর প্রথম মানুষ, বাবা আদমের হাড়, নিশ্চয় আপনারাও বুঝতে পারছেন। আপনাদের সবারই দেখার অধিকার আছে। আমার গুহায় সবাই আমন্ত্রিত। তবে দয়া করে একটু ধৈর্য ধরুন, একটু সময় দিন আমাকে, জায়গাটাকে ঠিকঠাক করে রেডি করে ফেলি। তারপর গুহার মুখ খুলে দেব সবার জন্যে। ক্যালিফোর্নিয়ার সবচেয়ে দর্শনীয় জায়গা হবে
চামারের বাচ্চা চামার! চেঁচিয়ে উঠে দু-হাত বাড়িয়ে ম্যাকম্বারের। ওপর ঝাঁপ দিলেন হ্যারিসন।
দ্রুত সরে গেল ক্যামেরা। এরপর কি ঘটল, টেলিভিশনের দর্শকেরা আর দেখতে পেল, না। তবে নানারকম শব্দ ভেসে এল স্পীকারে। কি ঘটছে স্টুডিওতে, বুঝতে অসুবিধে হলো না কারও।
পর্দায় দেখা দিল এলান ফিউজ। প্রিয় দর্শকবৃন্দ, চমৎকার এই অনুষ্ঠানটি এখানেই শেষ করছি। আরও অনেক কথা জানার ছিল ডাক্তার হ্যারিসনের কাছে, সময়ের অভাবে তা সম্ভব হলো না। এখন দেখবেন ফার্নিচারের রঙের ওপর একটি বিশেষ প্রতিবেদন...
সুইচ অফ করে দিল মুসা। খাইছে! কাণ্ডটা কি কুরল? কিশোর, কে জিতেছে বলে মনে হয়? হ্যারিসন নাকি ম্যাকম্বার? এ প্রশ্নের জবাব না দিয়ে কিশোর বলল, ম্যাকম্বার খুব বাজে লোক। হাড়গুলো সরাতে না দিলে...
রাখতে পারবে? বাধা দিয়ে বলল রবিন।
কেন পারবে না? গুহাটা যদি তার সম্পত্তি হয়? স্পষ্ট বোঝা গেল, দু-জনের মাঝে আগে থেকেই খারাপ সম্পর্ক ছিল। নইলে হ্যারিসনকে দেখে শটগান আনতে যাবে কেন ম্যাকম্বার? হ্যারিসনও বদমেজাজী। শেষ পর্যন্ত দু-জনের মাঝে কি যে হয় বলা যায় না।
রক্তারক্তি কাণ্ড, মুসা বলল।
হলে অবাক হব না। ম্যাকম্বার চাইবে কঙ্কাল দেখিয়ে পয়সা কামাতে, আর হ্যারিসন চাইবে তুলে নিয়ে গিয়ে ল্যাবরেটরিতে ঢোকাতে। একজন লোভী, আরেকজন বদমেজাজী। খুনখারাপিও হয়ে যেতে পারে।
সেদিনের ওই বিচিত্র সাক্ষাত্তারের পর টেলিভিশনে আর একবারও এলেন না ডাক্তার হ্যারিসন। তবে কিংসলে ম্যাকম্বারকে কয়েকবারই দেখা গেল। শো-এর ব্যাপারে কথা বলল। সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন, যেখান থেকে যে গেল, সবাইকেই সাক্ষাৎকার দিল সে। বসন্ত গিয়ে গ্রীষ্ম এল। জুলাইয়ের মাঝামাঝি

নাগাদ দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার প্রায় প্রতিটি মানুষই জেনে গেল ম্যাকম্বারের গুহামানবের কথা। এরপর শুরু হলো শো-এর বিজ্ঞাপন। জানানো হলো, আগস্টের শুরুতে সাধারণ দর্শকদের জন্যে খুলে দেয়া হবে গুহামুখ।
জুলাইয়ের শেষ দিকে আরও অনেকের মত তিন গোয়েন্দাও সাইট্রাস গ্রোভে যাওয়ার জন্যে তৈরি হলো।
হ্যানসনকে খবর দিল কিশোর।
এক সুন্দর সকালে ইয়ার্ডের গেটে এসে দাঁড়াল রাজকীয় রোলস রয়েস। চড়ে বসল তিন গোয়েন্দা।
একটানা দুই ঘণ্টা দক্ষিণে চলল গাড়ি। তারপর পুবে মোড় নিয়ে উঠে এল পাহাড়ী পথে। পথের ধারে কোথাও কমলা বাগান, কোথাও ঝোঁপঝাড়। খোলা মাঠ আর তৃণভূমিও আছে, তাতে চরছে গরু।
আরও আধ ঘণ্টা পর সেন্টারডেল নামে ছোট একটা শহরে ঢুকল গাড়ি। শহর পেরিয়ে ওপাশে আবার পথ। দুই ধারে ঝোঁপঝাড়, জঙ্গল, মাঠ-মাইলের পর মাইল একই দৃশ্য। অবশেষে একটা সাইনবোর্ড দেখা গেল। তাতে ইংরেজিতে লেখা:
সাইট্রাস গ্রোভে স্বাগতম।
খুবই ছোট শহর, মাত্র কয়েকটা ঘর। একটা সুপারমার্কেট, দুটো পেট্রোল স্টেশন, একটা গাড়ির দোকান, আর একটা ছোট মোটেল আছে নাম-রেস্ট-আ-বিট। শহরের সুইমিং পুলের পাশ কাটাল গাড়ি। পুরানো, ধুলোয় ঢাকা একটা রেল স্টেশনের ধার দিয়ে এসে পড়ল পুরানো শহরের মাঝখানে। পথের একধারে একটা পার্ক, আরেক ধারে কিছু দোকানপাট! একটা ব্যাংক, হার্ডওয়্যারের দোকান, ওষুধের দোকান, আর পাবলিক লাইব্রেরি দেখা গেল। শহরটা ছোট বটে, কিন্তু লোকে লোকারণ্য। মোটেলের কপালে নিওন সাইনে নো ভ্যাকান্সি লেখা। সাইট্রাস গ্রোভ কাফের সামনে লম্বা লাইন, খাবার কেনার জন্যে অধীর হয়ে আছে লোকে।
এ সবই ওই গুহামানবের কল্যাণে, বলল রবিন। কি ভিড় দেখেছ?
হ্যামবার্গার শপের দিকে চেয়ে হাসল কিশোর। মনে হচ্ছে এই খেয়েই থাকতে হবে।
থামতে বলল হ্যাঁনসনকে। দিন সাতেক পরে এসে আবার এই জায়গা থেকেই তুলে নিতে বলল।
গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেল হ্যাঁনস।
একজন দোকানদারকে জিজ্ঞেস করে, ম্যাকম্বারের বাড়িটা কোথায় জেনে নিল কিশোর।

সহজেই খুঁজে পাওয়া গেল বাড়িটা। সামনে গাড়িবারান্দা, ছোট লন। এককালে সুন্দর থাকলেও এখন তেমন কিছু নেই। দেয়ালে রঙ করা হয়নি অনেকদিন, জানালার পর্দা পুরানো। কিছু কিছু পাল্লার শার্সি উধাও। অযত্নে বেড়ে উঠেছে বাগানের ঘাস।
আমি তো ভেবেছিলাম বড়লোক, রবিন বলল। মনে করেছি, হার্ডওয়্যার আর গাড়ির দোকানটা ওরই।
হলেই বা কি? কিশোর বলল। যা শহর, লোক আছে কয়জন, আর বেচাকেনাই বা কি হবে?
গাড়িবারান্দায় একটা নোটিশ, তাতে লেখা রয়েছে: যারা রাতে থাকার জায়গা চায় তারা যেন বাড়ির পাশ দিয়ে ঘুরে এগোয়।
নির্দেশ পালন করল ছেলেরা। দেখল, একটা পথের ধার থেকে শুরু হয়েছে মাঠ, তার ওপাশে বন। মূল বাড়িটার কাছে একটা গোলাঘর, বয়েসের ভারে ধুকছে, বিবর্ণ। মাঠের ধারে পাহাড়। পাহাড়ের কোলে চমৎকার একটা নতুন বিল্ডিং। ছিমছাম, সুন্দর, আধুনিক। একটা জানালাও নেই। ডাবল ডোর দরজার ওপরে সাইনবোর্ড:
গুহামানবের গুহায় স্বাগতম।
বাহ্! মুসা বলল। মাল কামানোর বেশ ভাল ব্যবস্থা হয়েছে।
কিছু চাই? পেছনে নরম গলায় কথা শোনা গেল।
দেখেই চিনল কিশোর। আরে, লিলি অ্যালজেডো, আপনি!
ও, কিশোর। তোমরাও দেখতে এসেছ।...তা তোমার মা কেমন আছেন?
হাসল কিশোর। ভাল।
কথা শুনেই বোধহয়, বাড়ির পেছনের দরজা খুলে বেরোল একজন মোটা-খাটো মহিলা, পাতলা চুল।কে রে, লিলি?... কি চায়?
জেলডা আন্টি, ও কিশোর পাশা, পরিচয় করিয়ে দিল লিলি।
ওর কথাই বলেছিলাম। ওরা সাহায্য না করলে খুব বিপদ হত সেদিন রকি বীচে।
মুসা আর রবিনের পরিচয় দিল কিশোর।
গুহামানব দেখতে এসেছে, লিলি বলল, আন্টি, ওদের থাকার ব্যবস্থা করা যায় না?
মহিলার পেছনে উঁকি দিল আরেকজন। কিংসলে ম্যাকম্বার।
আবার পরিচয় করানোর পালা।
তোমাদের কথা লিলির কাছে শুনেছি, বলল ম্যাকম্বার। জায়গা দিতে পারলে খুশিই হব। কিন্তু বাড়িতে তো হবে না। অবশ্য গোলাঘরের মাচায় শুতে পারো। ঘরের পেছনে অনেক জায়গা, ব্যবহার করতে পারবে। একটা পানির কলও আছে

ওখানে। কুঁচকে এল লোকটার ধূর্ত চোখের পাতা। ভাড়াও খুব কম নেব তোমাদের কাছ থেকে। একরাতের জন্যে, এই দশ ডলার। কি বলো, অ্যাঁ? তিনজনের জন্যে।
কি বলছ, আংকেল! চেঁচিয়ে উঠল লিলি।
তুমি চুপ করো, মেয়ে, বলেই স্ত্রীর দিকে তাকাল ম্যাকম্বার। চোখ সরিয়ে নিল জেলড়া।
দশ ডলারে এখানে কোথাও থাকার জায়গা পাবে না, আবার বলল ম্যাকম্বার।
বনের মধ্যে গিয়ে থাকলেই তো পারি? কিশোরের দিকে চেয়ে বলল রবিন।
পয়সাও লাগবে না…
না না, সেটা উচিত হবে না, তাড়াতাড়ি বলে উঠল ম্যাকম্বার। জায়গাটা নিরাপদ না। যখন-তখন আগুন লাগে। শুকনো মৌসুম। দাবানলের ভয় আছে।
মানিব্যাগ থেকে দশ ডলারের একটা নোট বের করে বাড়িয়ে ধরল। কিশোর। নিন। আজ রাতের ভাড়া।
গুড, নোটটা নিয়ে পকেটে ভরল ম্যাকম্বার। কণ্ঠে খুশির আমেজ। লিলি, যাও তো, পানির কলটা দেখিয়ে দিয়ে এসো।
দেখো, ছেলেরা, সাবধান থাকবে, হুশিয়ার করল মিসেস ম্যাকম্বার। ঘরে আগুনটাগুন লাগিয়ে দিয়ো না আবার।
সিগারেট খাও নাকি? জিজ্ঞেস করল ম্যাকম্বার।
না, মুখ গোমড়া করে জবাব দিল মুসা। এই, কিশোর, এদের বিরক্ত করছ কেন? বনে না থাকি, পার্কে গিয়েও তো:..
পার্কে থাকা নিষেধ, বাধা দিয়ে বলল ম্যাকম্বার। মুচকি হেসে ঘরে ঢুকে গেল সে।
ছেলেদের নিয়ে চলল লিলি। রাগে, লজ্জায় লাল হয়ে গেছে গাল।
খুব খারাপ লাগছে আমার। দেখো, কালও যদি থাকো, টাকা দেবে না। আমার কাছে কিছু আছে। চাইতে এলে ভাড়াটা আমিই দিয়ে দেব আংকেলকে।
আরে, রাখুন তো। ওসব ভেবে মন খারাপ করবেন না, কিশোর বলল। টাকাটা কোন ব্যাপার না।
কিন্তু আংকেল যখন এরকম ছ্যাচড়ামি করে না, আমার খুব খারাপ লাগে, তিক্ত কণ্ঠে বলল লিলি। কিছু বলতেও পারি না…আমাকে মানুষ করেছে ওরাই। কার অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে। আমার বাবা-মা। আমার তখন আট বছর বয়েস।
বিষণ্ন কণ্ঠে কিশোর বলল, আপনার আর আমার অনেক মিল। আমার বাবা-মাও কার অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে।
তাই নাকি? তাহলে মেরিআন্টি…

আমার চাচী। নিঃসন্তান। মায়ের আদর দিয়ে মানুষ করছে আমাকে। অপরিচিত কারও কাছে আমাকে ছেলে বলেই পরিচয় দেয়।
ও! দীর্ঘশ্বাস ফেলল লিলি। তাহলে তো মা-ই!
ছেলেরা, ভাবছে, ম্যাকম্বার দম্পতি কি যত্ন নেয় না এতিম মেয়েটার? তার শীর্ণ হাত-পা, রুক্ষ চুল, রক্তশূন্য চেহারা..
গোলাঘরের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল লিলি। পেছনে তিন গোয়েন্দা।
ধুলোয় মলিন ঘরের মাঝে ঝকঝকে নতুন একটা পিকআপ ট্রাক আর একটা ফোরডোর সিডান কার, বড় বেমানান। ঘরের কোনায় কোনায় জমে আছে জঞ্জাল, পুরানো হলদেটে খবরের কাগজের স্তূপ, বাক্স। ওয়ার্কবেঞ্চের ওপরে আর আশপাশে পড়ে রয়েছে মরচে ধরা যন্ত্রপাতি-করাত, হাতুড়ি, বাটালি, এসব।
পেছনের দেয়ালের কাছ থেকে মাচায় উঠে গেছে কাঠের সিঁড়ি।
চালার নিচের অন্ধকার, গুমট মাচায় উঠে এল ছেলেরা। একধারে জানালা একটা আছে বটে, তবে ধুলো আর মাকড়সার জালে এমনই মাখামাখি, আলো আসার পথও নেই। ধাক্কা দিয়ে পাল্লা খুলল কিশোর। হুড়মুড় করে এসে ঢুকল বাইরের তাজা, ঠাণ্ডা বাতাস।
তোয়ালে-টোয়ালে কিছু লাগবে? নিচ থেকে জিজ্ঞেস করল লিলি।
না, মুসা জবাব দিল। দরকারী জিনিস সব নিয়ে এসেছি আমরা।
মইয়ের গোড়ায় দাঁড়িয়েই আছে লিলি। যেতে ইচ্ছে করছে না যেন। আবার বলল, একটু পরেই সেন্টারে যাব আমি। জানোয়ারগুলো দেখতে চাইলে তোমরাও আসতে পারো।
ওপর থেকে মাচার ফোকর দিয়ে মুখ বের করে বলল কিশোর, আর্কিওলজিস্ট ভদ্রলোককে চেনেন নিশ্চয়? গুহামানবকে যিনি পেয়েছেন?
ডাক্তার হ্যারিসন? চিনি। দেখা করতে চাও? বাড়ি থাকলে ওনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে পারি।
তাহলে তো খুব ভাল হয়। কঙ্কালটার বয়েস কত জানা গেছে? কি করে গুহায় এল?
মুখ বাঁকাল লিলি। সবাই ওটার কথা জানার জন্যে পাগল। বিচ্ছিরি দেখতে। নিশ্চয় গরিলার মত ছিল চেহারা।-খবরদার! গুহার ধারেকাছে যেয়ো না। শটগান নিয়ে পাহারা দেয়, আংকেল। রান্নাঘরের দরজার পেছনে লুকিয়ে বসে থাকো। গুলি খেয়ে মরবে শেষে।
তাই নাকি?
হ্যাঁ। ভীষণ বদরাগী লোক।...ওই গুহামানব নিয়ে কিছু একটা ঘটবে এখানে, বলে দিলাম, দেখো। খুব খারাপ কিছু!

ম্যাকম্বারের বাড়ি থেকে আধ মাইল দূরে একটা পাহাড়ের ওপর ছোটবড় কিছু বাড়ির সমষ্টি গ্যাসপার রিসার্চ সেন্টার। ঘন সবুজ লন। কাঁটাতারের বেড়া নেই, এ ধরনের সেন্টারে সাধারণত যেমন থাকে। তবে পাথরের গেটপোস্ট আছে, তাতে শক্ত পাল্লা। লিলির পেছন পেছন গাড়িপথ ধরে বাড়ির গেটে এসে দাঁড়াল তিন গোয়েন্দা।
গেট খুলে ভেতরে ঢুকল ওরা। সদর দরজায় কোন পাহারা নেই। পাল্লায় টোকা দেয়ারও প্রয়োজন মনে করল না লিলি, ঠেলা দিয়ে খুলে ফেলল।
কোন এনট্রি হল নেই। বড় একটা লিভিং রুমে সরাসরি এসে ঢুকল ওরা। ঘরেই আছেন জর্জ হ্যারিসন। পায়চারি করছিলেন, ওদের দেখে থামলেন।
তিন গোয়েন্দার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল লিলি।
ভ্রুকুটি করলেন ডাক্তার। ও, তোমরাও ভণ্ডামী দেখতে এসেছ?
গুহামানবকে দেখতে, স্যার, জবাব দিল মুসা!
কি যে কাণ্ড! পাগল হয়ে গেছে লোক! আবার পায়চারি শুরু করলেন হ্যারিসন। দলে দলে আসবে। মাড়িয়ে শেষ করে দিয়ে যাবে সবকিছু। পাহাড়ের নিচে নিশ্চয় আরও ফসিল আছে। আমার বন্দুক থাকলে…
সব্বাইকে গুলি করে মারতে, বলল শান্ত একটা কণ্ঠ।
ঘুরে তাকাল ছেলেরা।
লম্বা, বিষণ্ন চেহারার একজন লোক ঘরে ঢুকেছেন। কঙ্কালসার দেহ। কিশোর চিনল। রকি বীচ হাসপাতালে দেখেছে। সেদিন পরেছিলেন মলিন একটা ধূসর স্যুট। আজ পরনে রঙচটা খাকি হাফপ্যান্ট আর পোলো শার্ট। ফায়ারপ্লেসের ধারে একটা আর্ম-চেয়ারে বসে তাকিয়ে রইলেন নিজের হাড়সর্বস্ব হাঁটুর দিকে।
ডাক্তার রুডলফ, লিলি বলল, কিশোর পাশার সঙ্গে নিশ্চয় পরিচয় আছে?
অবাক হলেন ডাক্তার। আছে কি?
রকি বীচ হাসপাতালে যেদিন মারা গেলেন ডাক্তার ক্লডিয়াস, লিলি মনে করিয়ে দিল, আমাকে সাহায্য করেছিল ও। আপনি যখন ঢুকলেন তখনও ছিল। মনে নেই?
ও হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে, হাসলেন ডাক্তার। হাসলে তার বয়েস কম মনে হয়। কেমন আছ?
ভাল, মাথা কাত করল কিশোর।
ডাক্তার রুডলফও আর্কিওলজিস্ট, লিলি জানাল। একটা বই লিখছেন।
আবার হাসলেন ডাক্তার।
আল ম্যানও তো আপনারই লেখা, তাই না? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
ওপরে উঠে গেল রুডলফের ভুরু। তুমি ওটা পড়েছ?..

হ্যাঁ। লাইব্রেরিতে পেয়েছিলাম। দারুণ লেখা, তবে মন খারাপ হয়ে যায়। এভাবে সব সময়ই যদি মানুষকে মানুষের সঙ্গে লড়াই করে টিকে থাকতে হয়...
খুব খারাপ, তাই না? কিশোরের বাক্যটা শেষ করলেন রুডলফ। জন্ম থেকেই আমরা নিষ্ঠুর, পৈশাচিকতা ভালবাসি। সেটাই আমাদের, মানে মানুষের বৈশিষ্ট্য। বড় মগজ থাকায় আর সোজা হয়ে হাঁটতে পারি। বলে এসব করার সুবিধে হয়েছে।
ফালতু কথা! প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন ডাক্তার হ্যারিসন। ভায়োলেন্স মানুষের বৈশিষ্ট্য নয়, জন্ম থেকে নিষ্ঠুর হয় না মানুষ। সব তালগোল পাকিয়ে ফেলছ তুমি।
তাই নাকি? বাঁকা চোখে সহকারীর দিকে তাকালেন রুডলফ। বেশ, ডেনি গ্যাসপারের কথাই ধরা যাক। মানুষের উন্নতি চাইতেন তিনি, তার কারণেই সৃষ্টি হয়েছে এই গ্যাসপার সেন্টার; কিন্তু তাই বলে কি তাঁকে নিষ্ঠুর বলা যাবে না? নিশ্চয় যাবে। রীতিমত খুনী ছিলেন। বিগ-গেম হান্টার ছিলেন। শিকার মানেই খুন, আর খুন মানেই পৈশাচিকতা, কিংবা ভায়োলেন্স, যা-ই বলো। ম্যানটেলপিস-এর দিকে দেখালেন। সেখানে সাজিয়ে রাখা হয়েছে শিংওয়ালা একটা জন্তুর স্টাফ করা মাথা, মৃত চোখদুটো চেয়ে আছে জানালার দিকে। কয়েকটা বুককেসের ওপরের দেয়ালে সাজানো রয়েছে বাঘ, পুমা আর একটা বিশাল জলমহিষের মাথা। ভালুক, সিংহ আর চিতার চামড়া আছে। কয়েকটা। এখন যুগ পাল্টেছে, তাই মানুষের পরিবর্তে জন্তু শিকার করে তার মাথা কিংবা চামড়া এনে ঘরে সাজিয়ে রাখা হয়। বহুকাল আগে কি হত? অন্য কোন শিকার না পাওয়া গেলে মানুষ মানুষকেই মারত। আমরা যেমন মুরগীর ঠ্যাঙ চুষি, তেমনি করে মানুষের হাড় চুষত সে-কালের মানুষেরা।
সব গুবলেট করে ফেলছ! খেঁকিয়ে উঠলেন হ্যারিসন।
তারমানে ঠিকই বলছি, হাত তুললেন রুডলফ। তোমার রেগে যাওয়া মানেই, নিজের যুক্তির স্বপক্ষে জবাব খুঁজে না পাওয়া।
ঠিক এই সময় ঘরে ঢুকলেন টাকমাথা, ছোটখাটো একজন মানুষ। আবার শুরু করেছ! নাহ্, তোমাদের নিয়ে আর পারা গেল না। মানুষ নিষ্ঠুর হোক বা না হোক তাতে কি এসে যায়?
আগন্তুকের পরিচয় দিল লিলি, ইনি ডাক্তার এনথনি রেডম্যান, ইমিউনোলজিস্ট। অনেকগুলো সাদা ইঁদুর আছে ওঁর।...স্যার, এদেরকে ওগুলো দেখাতে চাই। দেখাব?
দেখাও, তবে হাত দিতে পারবে না, অনুমতি দিলেন ডাক্তার রেডম্যান।
না, দেব না।
আরেকটা হলরুমে ঢুকল ছেলেরা।

ওঅর্করুম, ল্যাবরেটরি, সব জায়গায়ই যাওয়া যায় এখান থেকে। ওই যে, একটা দরজা দেখাল লিলি, ওটার ওপাশে ডাক্তার রেডম্যানের ল্যাবরেটরি।
দরজা ঠেলে ছোট একটা ওয়াশরুমে ঢুকল ওরা। চারটে সার্জিক্যাল মাস্ক বের করে একটা নিজে নিয়ে বাকি তিনটে তিনজনকে দিল লিলি। পরে নাও। মাস্ক মুখে লাগিয়ে ভারি একজোড়া রবারের দস্তানা পরে নিল সে।
দেখাদেখি তিন গোয়েন্দাও মুখোশ পরল।
আরেকটা দরজা ঠেলে বড় একটা ঘরে এসে ঢুকল ওরা। রোদের আলোয় আলোকিত। দেয়াল ঘেঁষে রাখা আছে সারি সারি কাঁচের খাঁচা। ভেতরে অসংখ্য সাদা প্রাণী ছুটাছুটি করছে।
বেশি কাছে যেয়ো না, সাবধান করল লিলি, ছুঁয়ো না। ইঁদুরগুলোকে খাওয়ানোয় মন দিল সে।
এগুলো বিশেষ ধরনের ইঁদুর, খানিক পরে আবার বলল। ওদের ইমিউনিটি নষ্ট করে দিয়েছেন ডাক্তার রেডম্যান…
এক মিনিট, হাত তুলল মুসা। ইমিউনিটিটা কি?
এক কথায় ব্যাখ্যা করা যাবে না, বলল রবিন। রোগ-প্রতিরোধ। ক্ষমতা জাতীয় কোন ব্যাপার।
হ্যাঁ, বলল লিলি। অনেকটা তাই। ছুঁলে ওগুলোর মধ্যে রোগ সংক্রমণ ঘটতে পারে, খুব সহজে। ইনফেকশন প্রতিরোধের ক্ষমতা প্রায় নেই বললেই চলে এখন ওদের।
হুঁ, মাথা দোলাল মুসা। তারমানে রোগে ধরলেই মরবে?
কয়েকটা ইতিমধ্যেই মরেছে, লিলি জানাল। জীবদেহে একধরনের বিশেষ কোষ তৈরি হতে থাকে, যেগুলো রোগজীবাণু খেয়ে ফেলে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে ওই কোষই দেহের ক্ষতির কারণ হয়ে ওঠে। ওই ইমিউন রিঅ্যাকশন থেকেই তখন বাতে ধরে মানুষকে, পাকস্থলীতে ঘা হয়, এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে পাগলামি রোগেও ধরে।
খাইছে! আঁতকে উঠল মুসা। আল্লারে! কি সাংঘাতিক!
ইমিউনিটি না থাকলে বসন্ত রোগ ঠেকাতে পারব না আমরা, রবিন বলল, হাম হবে…
জানি, বলল লিলি। সেজন্যেই ইমিউনিটি নিয়ে গবেষ করছেন ডাক্তার রেডম্যান, যাতে ইচ্ছেমত ইমিউন কন্ট্রোল করতে পারি আমরা, রিঅ্যাকশন না হয়, অন্য রোগে আক্রান্ত না হই…
চমৎকার আইডিয়া! কিশোর বলল। বই-টই লিখছেন নাকি?
এখনও না। তবে ইচ্ছে আছে। ডাক্তার রুডলফ লিখছেন, ডাক্তার হ্যারিসনও লখছেন তার ঘরে কেবিনেটে বন্দি মানুষটাকে নিয়ে।

কেবিনেটে বন্দি? ভুরু কোঁচকাল রবিন।
মানুষের ফসিল, বুঝিয়ে বলল লিলি। আফ্রিকায় পেয়েছিলেন হাড়গুলো। জোড়া লাগিয়ে লাগিয়ে আস্ত কঙ্কাল বানিয়ে ফেলেছেন।
এখানকার গুহায় পাওয়া গুহামানবকে নিয়েও তাই করতে চান বোধহয়? কিশোর জিজ্ঞেস করল।
হ্যাঁ, লিলির কণ্ঠে অস্বস্তি, কিন্তু ম্যাকম্বার আংকেল দিতে রাজি না।
উঁদুরগুলোকে খাওয়ানো শেষ হলে আবার ওয়াশরুমে ফিরে এল ওরা। মাস্ক-গ্লাভস খুলে সিংকের পাশে একটা ঢাকনাওয়ালা পাত্রে ফেলল লিলি। তিন গোয়েন্দাও তাদের মাস্ক খুলে রাখল। তারপর এসে ঢুকল আবার হলরুমটায়।
এবার শিম্পাঞ্জীগুলো দেখবে, চলো, লিলি বলল।
একটা করিডরের শেষ মাথায় ডাক্তার ক্লডিয়াসের ল্যাবরেটরি। রেডম্যানের ঘরটার চেয়ে বড়। জানালার কাছে একটা খুঁচায় দুটো শিম্পাঞ্জী গম্ভীর হয়ে বসে আছে। খাঁচার ভেতরে নানারকমের খেলনা রয়েছে। ছোট একটা ব্ল্যাকবোর্ড আছে, রঙিন চক দিয়ে ওটাতে লেখে ওরা।
লিলিকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠল শিম্পাঞ্জী দুটো। খাঁচার ফাঁক দিয়ে। হাত বের করল বড়টা।
আরে, রাখ, রাখ, খুলছি! এগিয়ে গিয়ে খাঁচার দরজা খুলে দিল। লিলি। শিম্পাঞ্জীটা বেরিয়ে এসে তার হাত ধরল।
ভাল আছিস? জিজ্ঞেস করল লিলি। রাতে ভাল ঘুম হয়েছে?
চোখ বুজে মানুষের মতই মাথা কাত করে সায় জানাল শিম্পাঞ্জীটা। তারপর দেয়ালঘড়ি দেখিয়ে এক আঙুল দিয়ে বাতাসে
একটা অদৃশ্য চক্র আঁকল।
ও, অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছিস।
তিরিং করে মস্ত এক লাফ দিয়ে হাততালি দিল জানোয়ারটা।
দ্বিতীয় শিম্পাঞ্জীটাও বেরিয়ে এসে একটা টেবিলে উঠে বসেছে।
এই, খবরদার! ধমক দিল লিলি।
তাকের ওপর রাখা কেমিক্যালের বোতলগুলোর দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে ওটা। কয়েকবার তাকিয়ে সেদিকে লিলির কোন আগ্রহ
দেখে, লাভ হবে না বুঝতে পেরে টেবিল থেকে খালি একটা বীকার নিয়ে লাফ দিয়ে নামল মাটিতে। খেলতে শুরু করল।
রেফ্রিজারেটর থেকে ফল আর দুধ বের করল লিলি, তাক থেকে বড় বাসন নামাল।
আপনার কথা বোঝে ওরা? জিজ্ঞেস করল কিশোর।

বোঝে। ইঙ্গিতে অনেক কিছু বোঝাতেও পারে। ডাক্তার ক্লডিয়াস শিখিয়েছেন। বোবা ইস্কুলে যেভাবে সাইন ল্যাঙগোয়েজ শেখানো হয়, তেমনি।
ডাক্তার সাহেব তো নেই, রবিন বলল। এখন এগুলোর কি হবে?
দীর্ঘশ্বাস ফেলল লিলি। জানি না। বোর্ডের মেম্বাররা আগামী মাসে মিটিঙে বসে ঠিক করবেন। কয়েকটা শিম্পাঞ্জী ইতিমধ্যেই মরে গেছে। অনেক দাম দিয়ে কিনে আনা হয়েছিল ওগুলোকে। ছলছল করছে তার চোখ।
টেবিলে খাবার দিল লিলি। ছোট চেয়ারে উঠে বসে খেতে শুরু করল শিম্পাঞ্জীগুলো।
খাওয়া শেষ হলে ওগুলোকে হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে আবার খাঁচায় ভরল লিলি। চেঁচামেচি, বাদপ্রতিবাদ অনেক করল ওরা, বড়টা তো লিলির হাতই আঁকড়ে ধরে রাখল, খাঁচায় বন্দি থাকতে রাজি নয়।
থাক, কোমল গলায় বলল লিলি, আমি আবার আসব।
একটা ব্যাপার লক্ষ করেছে কিশোর, ল্যাবরেটরিতে ঢোকার পর লিলির আচরণ অন্যরকম হয়ে গেছে। অথচ ম্যাকম্বারের বাড়িতে থাকার সময় মনমরা হয়ে থাকে।
ডাক্তার ক্লডিয়াসকে মিস করছে ওরা, লিলি বলল। আমিও। এখানে ঢুকলে তার জন্যে খারাপ লাগে। খুব ভাল মানুষ ছিলেন। হাসিখুশি। অসুস্থ হয়েও হাসি যায়নি মুখ থেকে।
আগে থেকেই অসুস্থ? কিশোর ধরল কথাটা। আমি তো ভেবেছিলাম, রকি বীচে হঠাৎ করেই স্ট্রোকটা হয়েছে।
হঠাৎ করেই হয়েছে। তবে কিছু কিছু লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। এখানে থাকতেই। চেয়ারেই ঘুমিয়ে পড়তেন। হয়তো শিম্পাঞ্জীগুলো তখন বাইরে রয়েছে, জিনিসপত্র তছনছ করছে, খেয়াল করতেন না। সেদিন তার সঙ্গে আমার যাওয়ার কারণই ছিল এটা। বুঝতে পারছিলাম, একা এতটা পথ যেতে পারবেন না।
কেন গিয়েছিলেন রকি বীচে? এমনি, সাধারণ কথাচ্ছলেই প্রশ্নটা করল কিশোর, কিছু ভেবে নয়।
কিন্তু চমকে উঠল লিলি, লাল হয়ে গেল গাল।
ইয়ে...তিনি...আমি জানি না, আরেক দিকে মুখ ফেরাল লিলি। দরজার দিকে হাঁটতে শুরু করল।
চট করে একে অন্যের দিকে তাকাল মুসা আর কিশোর।
ব্যাপার কি? নিচু গলায় বলল মুসা।

নাক কুঁচকাল কিশোর। মিথ্যে বলছে। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার। কিন্তু কেন? কি লুকানোর চেষ্টা করছে?
লিভিংরুমে ফিরে দেখা গেল, বিজ্ঞানীদের একজনও নেই। সোফার কভার ঝেড়ে, সোজা করছে মোটা এক মহিলা। কালোচুল এক তরুণ জানালা-দরজার কাঁচ মোছায় ব্যস্ত।
অ, লিলি, মহিলা বলল। তোমার বন্ধু নাকি? ভাল।
মহিলাকে চিনল কিশোর। মিসেস গ্যারেট। মাথায় এখন একটা ছাই-সোনালি উইগ। তবে চোখের পাপড়ি আগেরগুলোই আছে।
ছেলেদের সঙ্গে মহিলার পরিচয় করিয়ে দিল লিলি।
হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে, কিশোরের সঙ্গে হাত মেলাতে মেলাতে বিচিত্র শব্দ করল মিসেস গ্যারেট, ছানাকে আদর করার সময় মুরগী যেমন কঁক-কঁক করে অনেকটা তেমনি। তুমি সেই ছেলেটাই তো। খুব ভাল ছেলে। মানুষের খারাপ সময়ে যে উপকার করে সে-ই তো ভাল মানুষ। জানো, তখন হাসপাতালে হালের কথা খুব মনে পড়ছিল। ও, হাল কে চেনো না? হাল গ্যারেট। আমার স্বামী, শেষ স্বামী। ওর মত মানুষই হয় না।
বকবক করে চলল মিসেস গ্যারেট।
কয়েক মিনিটেই জানা হয়ে গেল ছেলেদের, মোট তিনজন স্বামী বদল করেছে মহিলা। প্রথমজন ছিল বীমার দালাল, দ্বিতীয়জন চিত্রপরিচালক, আর তৃতীয়জন, তার পছন্দের মানুষ এবং শেষ স্বামী-একজন পশুচিকিৎসক।
সব মানুষই ভাল হয় না, বলে গেল মিসেস গ্যারেট, সবাই বাঁচে না বেশিদিন। আমার স্বামীদের বেলায়ও তাই হয়েছে। কম বয়েসে মারা গেল। তারপর এসে এখানে হাউসকীপারের চাকরি নিলাম। ডাক্তারগুলোকে প্রথম প্রথম খুব ভয় পেতাম, একেকজনের একেক রকম স্বভাব, অদ্ভুত। আবোলতাবোল বকে, আর সুযোগ পেলেই বসে বসে গালে হাত রেখে ভাবে। বলো দেখি কি কাণ্ড! তবে একবার ওদের স্বভাব বুঝে ফেললে আর কোন অসুবিধে নেই। বলে একটা, করে আরেকটা। ডাক্তার রুডলফের কথাই ধরো। মুখে নিষ্ঠুরতা, পৈশাচিকতা, খুন এসব ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। অথচ একটা মাছি মারতে পারবে না, মারলে কেঁদে বুক ভাসাবে। ডাক্তার হ্যারিসন হয়েছে। তার উল্টো। খুনটুন এসব কথা শুনলেই আঁতকে ওঠে। অথচ যা বদমেজাজী, মানুষ খুন করতেও হাত কাঁপবে বলে মনে হয় না।...লিলি, ওকে তোমার আংকেলের সামনে বেশি যেতে দিও না। কখন যে কি ঘটাবে কে জানে।
আমি বুঝি, মিনমিন করে বলল লিলি।
কাজে মন দিল আবার মিসেস গ্যারেট।

ভেজা ব্রাশ বালতির পানিতে ফেলে ঘুরে দাঁড়াল তরুণ। লিলিকে বলল, আমার সঙ্গে পরিচয় করালে না? এগিয়ে এল।
লজ্জা পেল লিলি। ও, হ্যাঁ, কিশোর, ওর নাম বিল উইলিয়ামস। সেন্টারে কাজ করে, আমার মত।
হেসে হাত বাড়িয়ে দিল বিল। হাই। পরিচিত হয়ে খুশি হলাম।...লিলি, গতরাতের জন্যে আমি লজ্জিত। টায়ার পাংচার হয়ে আটকে গিয়েছিলাম...আমার জন্যে বেশি অপেক্ষা করোনি তো?
ওসব কথা থাক, বলে ছেলেদের নিয়ে আরেকটা দরজার দিকে রওনা হলো লিলি।
লাইব্রেরিতে ঢুকল ওরা। তারপর ছোট একটা চৌকোনা ঘর পার হয়ে বেরিয়ে এল বাড়ির একপ্রান্তে।
ওখান থেকে পঞ্চাশ মিটার দূরে আস্তাবল। নীরবে সেদিকে এগোল লিলি।
প্রিয় ঘোড়াটার কাছে এসে মেজাজ ভাল হয়ে গেল তার। ঘোড়ার নাম রেখেছে পাইলট। মুসার বেশ পছন্দ হলো নামটা।
গলায় হাত বোলাতে বোলাতে নিচু স্বরে ওটার সঙ্গে কথা বলল লিলি। চারটে আপেল মাটিতে রেখে জিজ্ঞেস করল, ক-টা?
চারবার পা ঠুকল ঘোড়াটা।
লক্ষ্মী ছেলে, বলে চারটে আপেলই পাইলটকে উপহার দিয়ে দিল লিলি।
আস্তাবল থেকে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা। লিলি রইল ভেতরে, ঘোড়ার সেবাযত্ন শেষ হতে সময় লাগবে।
পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে শহরের দিকে চলল ছেলেরা, খিদে পেয়েছে।
রাস্তায় লোকের ভিড় আরও বেড়েছে। স্ন্যাকসের দোকানের সামনে এসে লাইন দিতে হলো তাদের। সাধারণ হ্যামবার্গার জোগাড় করতেই লেগে গেল এক ঘণ্টার বেশি।
খাওয়া সেরে শহর দেখতে চলল। দোকানিদের দম ফেলার অবকাশ নেই। আগামী দিন গুহামুখ খুলে দেয়া হবে। পিঁপড়ের মত পিলপিল করে বাইরে থেকে আসছে লোক। তাদের সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে সব ক-জন দোকানি। তার ওপর রয়েছে দোকান সাজানোর কাজ। কয়েকটা দোকানের সামনের কাছে বড় করে আঁকা হয়েছে গুহামানবের ছবি, পরনে পশুর ছাল, হাতে মুগুর। একটা দোকানের ছবি তো আরেক কাটি বাড়া। চুল ধরে এক গুহামানবীকে টেনে নিয়ে চলেছে ভয়ানক চেহারার এক উন্মত্ত গুহামানব। প্রায় সমস্ত দোকানের সামনেটাই রঙিন কাগজের ত্রিকোণ পতাকা কেটে সাজানো হয়েছে।

গুহামুখ খোলার অনুষ্ঠান হবে ছোট পার্কটায়। তাই রঙিন বাল্ব দিয়ে সাজানো হচ্ছে গাছগুলোকে। স্ট্যাণ্ডগুলোয় নতুন করে রঙ করা হচ্ছে। অটোমেটিক স্প্রিঙ্কলার সিসটে আছে একটা, নিদিষ্ট সময়ে ওটার ঝাঁঝরিগুলোর মুখ খুলে যায়, বৃষ্টির মত পানি ঝরে পড়ে পার্কের গাছপালার ওপর।
পুরানো রেলস্টেশনের কাছে আস্তানা গেড়েছে এক আইসক্রীম। ফেরিওয়ালা। ছোট ট্রাকে করে আইসক্রীম এনেছে। ভাল বিক্রি।
কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে ম্যাকম্বারের গোলাবাড়িতে ফিরে এল তিন গোয়েন্দা। সেখানেও উত্তেজনা।
লম্বা, রগ বের হওয়া একজন লোক তার ওঅভ্যানের পাশে দাঁড়িয়ে কাজে ব্যস্ত, যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করতে করতে বিড়বিড় করছে আপনমনে। ঠিক হচ্ছে না। মোটেই উচিত হচ্ছে না। পস্তাবে, দেখো, পস্তাবে বলে দিলাম।
কাছে এগোল ছেলেরা। উঁকি দিয়ে দেখল, ভ্যানের দেয়াল ঘেঁষে একটা আলমারি বসানো। একটা গ্যাসের চুলা আর ছোট একটা রেফ্রিজারেটরও রয়েছে। আর আছে একটা বিছানা, নিখুঁতভাবে বিছানো। অবাক হয়ে ছেলেরা ভাবল, শুকনো ঢেঙা লোকটা ওই ভ্যানের মধ্যেই বাস করে নাকি?
ছেলেদের দেখে ভ্রুকুটি করল লোকটা। তোমরাও ভাল বলবে না।
চেঁচাতে শুরু করল কে জানি।
ডাক্তার জর্জ হ্যারিসন। জানালাশূন্য নতুন বাড়িটার বাইরে দাঁড়িয়ে মুঠো পাকিয়ে শাসাচ্ছেন কাউকে। চেঁচিয়ে বললেন, তুমি..তুমি একটা। জন্তু!
ডাবলডোর খুলে গেল, দরজায় দেখা দিল ম্যাকম্বার। হাতের শটগান নেড়ে কড়া গলায় বলল, ভাগো! যাও এখান থেকে!
পিছিয়ে এলেন হ্যারিসন। জন্মের পর পরই খাঁচায় ভরা উচিত ছিল তোমাকে, জন্তু কোথাকার। ভেবেছ কি তুমি, অ্যাঁ? তোমার জায়গায় পাওয়া গেছে বলেই কি ওই হাড় তোমার সম্পত্তি? কেন, তোমার জায়গায় আলোও তো আছে, বাতাস আছে, রোদ আছে, ওগুলোও কি তোমার হয়ে গেল? ওই হোমিনিডটা আটকে রাখার কোন অধিকার নেই তোমার।
ভাল হবে না বলে দিচ্ছি, পাল্টা জবাব দিল ম্যাকম্বার।বেআইনীভাবে ঢুকেছ আমার জায়গায়, মাফ করে দিলাম। ভাগো এখন। দেখতে চাইলে কাল এসো। আর সবার মত পাঁচ ডলারের। টিকেট কিনে। যাও।
গলা টিপে ধরেছে যেন কেউ, এমনভাবে ফাঁসাস করে উঠলেন হ্যারিসন। ঝটকা দিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে গটমট করে হাঁটতে শুরু করলেন।
হেসে ছেলেদের বলল ম্যাকম্বার, খুব রেগেছে।
উচিত হচ্ছে না! গোঁ গোঁ করে বলল ভ্যানের মালিক।

তোমাকে কে জিজ্ঞেস করছে? ধমক দিল ম্যাকম্বার। তোমার। কাজ তুমি করো। এই যে, ছেলেরা, আসবে নাকি। দেখতে চাও, কেমন সাজিয়েছি?
ঘুরে ভেতরে ঢুকে গেল আবার ম্যাকম্বার।
ছেলেরা গেল তার পেছনে। ভেতরে ঢুকেই হা হয়ে গেল।
জাদুঘর সাজিয়েছে বটে ম্যাকম্বার। বড় বড় ছবি। হাড় আর কঙ্কালের ছবি আছে, এনলার্জ করা ফটোগ্রাফ আছে। আছে নানারকম রঙিন ছবি, আদিম পৃথিবীর প্রাকৃতিক দৃশ্য। জলাভূমি থেকে বাষ্প উঠছে, উঁচু পাহাড় থেকে ঝরে পড়ছে ঝর্না, রুক্ষ সৈকতে ভাঙছে সাগরের ঢেউ-মাথায় ফেনার মুকুট।
ঘরের মাঝখানে অনেকগুলো টেবিল। তার ওপর সাজানো কাঁচের বাক্সে নানারকম প্রতিকৃতি। কোথাও বরফযুগের দৃশ্য, বরফে ঢেকে রেখেছে আমেরিকার একাংশ, কোথাও গলতে শুরু করেছে বরফ। বেরিয়ে পড়েছে গভীর হ্রদ, উঁচু উপত্যকা। একটা বাক্সে দেখা গেল। কয়েকজন উলঙ্গ রেড ইনডিয়ান শীত থেকে বাঁচার জন্যে আগুনের কাছে জড়সড় হয়ে আছে। আরেকটা বাক্সে বিশাল এক রোমশ ম্যামথ। হাতিকে আক্রমণ করেছে গুহামানবের দল।
ক্লাসিক হয়েছে, না? গর্বের হাসি ফুটল ম্যাকম্বারের মুখে। আসল জিনিস ওই ওদিকে।
দরজার ঠিক উল্টো দিকে একটা মঞ্চ তৈরি হয়েছে, চারটে সিঁড়ি ভেঙে উঠতে হয়। মঞ্চের পরে পাহাড়ের উলঙ্গ ঢাল, তাতে রয়েছে সেই গুহামুখটা। উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত প্রবেশপথ।
সিঁড়ি বেয়ে মঞ্চে উঠল তিন গোয়েন্দা। গুহামুখ দিয়ে ভেতরে উঁকি দিল।
দম বন্ধ করে ফেলল কিশোর।
কেঁপে উঠল রবিন।
পুরো কঙ্কালটা নেই, আংশিক। খুলির বেশির ভাগই রয়েছে, কালের ক্ষয়ে বাদামী, কুৎসিত। বীভৎস ভঙ্গিতে যেন তাকিয়ে রয়েছে শূন্য অক্ষিকোটর। ওপরের চোয়ালটা আছে, মাঢ়ীতে বিকট দাঁতের সারি। গুহার মেঝে থেকে ঠেলে বেরিয়ে আছে মাটিতে গাঁথা পাঁজরের কয়েকটা হাড়। তার নিচে শ্রোণীর হাড়ের খানিকটা, তারও নিচে পায়ের কয়েকটা হাড়। একটা হাতের হাড় লম্বা হয়ে পড়ে আছে, পাঁচ আঙুলের তিনটে উধাও, দুটো রয়েছে একেবারে গুহামুখের ধারে। যেন মৃত্যুর আগে হাত বাড়িয়ে কিছু ধরার চেষ্টা করছিল।
গুহার ছাতে আলো ঝোলানো হয়েছে। কঙ্কালের কাছে জ্বলছে একটা কৃত্রিম অগ্নিকুণ্ড। তারও পরে যেন নিতান্ত অবহেলায় ফেলে রাখা হয়েছে কয়েকটা ন্যাভাজো কম্বল আর ইনডিয়ান কায়দায় তৈরি বেতের ঝুড়ি।

ডাক্তার হ্যারিসনের রাগের কারণ বুঝতে অসুবিধে হলো না ছেলেদের। আদিম রূপ দিতে গিয়ে পুরো ব্যাপারটাকেই হাস্যকর করে তুলেছে ম্যাকম্বার, অনেক কিছু বেমানান। চোখে আরও লাগে কঙ্কালের। চারপাশে আধুনিক বুটের অসংখ্য ছাপ। বোধহয় ইলেকট্রিশিয়ান আর টেকনিশিয়ানদের জুতোর।
কেমন বুঝছ? হেসে জিজ্ঞেস করল ম্যাকম্বার। আচ্ছা, আরেক কাজ করলে কেমন হয়? একজোড়া মোকাসিন যদি রেখে দিই ওটার পায়ের কাছে? ভাবখানা, জুতো খুলে শুয়েছে, ঘুমিয়ে পড়েছে? প্রশ্নের জবাব নিজে নিজেই দিল আবার। না, ভাল হবে না। বেমানান লাগবে।
অস্ফুট শব্দ বেরোল রবিনের মুখ থেকে।
আবার বলল ম্যাকম্বার, আমার মনে হয় না, এত আগে মোকাসিন পরত মানুষ। না?
জবাব দিল না ছেলেরা।
ঘুরে মঞ্চ থেকে নেমে আরেকদিকে রওনা হলো। এক জায়গায় সাজিয়ে রাখা হয়েছে অনেকগুলো চকচকে রিঙ, তাতে খাটো শেকল দিয়ে আটকানো প্লাস্টিকের গুহামানবের প্রতিকৃতি। কিছু টি-শার্ট আছে, বুকে গুহামানবের ছবি ছাপা।
ওগুলো বিক্রির জন্যে, জানাল ম্যাকম্বার। আজ তো দিতে পারবে না, বিক্রি শুরু হয়নি। কাল এসো।...চলো, বেরোই। সুইচ টিপে আলো নিভিয়ে দরজার দিকে এগোল সে। চলতে চলতেই বলল, দরজায় তালা লাগিয়ে রাখব। রাতে পাহারা দেবে জিপসিটা।
ভ্যানের কাছে যাকে দেখলাম? কিশোর বলল।
হ্যাঁ। ওর নাম ফ্রেনটিস, সংক্ষেপে ফ্রেনি।
বাইরে বেরিয়ে দরজায় তালা লাগাল ম্যাকম্বার। আসলে জিপসি নয় ও
গাড়িতে বাস করে তো, জিপসিদের মত যাযাবর, তাই লোকে ওর নাম রেখেছে জিপসি ফ্রেনি।
নিজের বাড়ির দিকে চলে গেল ম্যাকম্বার।
ভ্যানের দরজা খুলে উঁকি দিল ফ্রেনি। আমাকে দারোয়ান রেখেছে বেতন দিয়ে, বেশ, পাহারা দেব। কিন্তু ভাল করছে না। মানুষটা এসব পছন্দ করবে না। আমার হাড় নিয়ে এসব করলে আমি কি সহ্য করতাম?
কিন্তু ও জানছে কিভাবে? বলল মুসা। ও তো মরা, তাই না? ওকে নিয়ে কে কি করল না করল তাতে ওর কিছুই যায়-আসে না।
তাই নাকি? রহস্যময় শোনাল জিপসির কণ্ঠ।

ডিনারও সারতে হলো হ্যামবার্গার দিয়েই। ফেরিওয়ালার কাছ থেকে আইসক্রীম কিনে খেল তিনজনে। তারপর এসে উঠল গোলাঘরের মাচায়। খোলা জানালা দিয়ে দেখল সূর্যের অস্ত যাওয়া আর চাঁদের উদয়। বাতাস ঠাণ্ডা। তৃণভূমির ওপর হালকা ধোয়ার মত উড়ছে কুয়াশা।
স্লীপিং ব্যাগ টেনে নিল ছেলেরা। ঘুমিয়ে পড়ল।
অন্ধকারে দরজা খোলার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল কিশোরের। কে যেন ঢুকেছে গোলাঘরে। ভীত জানোয়ারের মত গোঙাচ্ছে। উঠে বসে কান পাতল সে।
মুহূর্তের জন্যে থামল গোঙানি, তারপর আবার শুরু হলো।
নড়েচড়ে মুসাও উঠে বসল। ফিসফিসিয়ে বলল, কে?
জবাব না দিয়ে মাচার ফোকরের কাছে গিয়ে নিচে উঁকি দিল কিশোর। অন্ধকার।
এই, ছেলেরা, শুনছ? খসখসে ভাঙা কণ্ঠস্বর। আছ ওখানে?
জিপসি ফ্রেনি। এগোতে গিয়ে কিসের সঙ্গে পা বেধে ধুড়স করে পড়ল।
ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল রবিন।
টর্চের জন্যে হাত বাড়াল মুসা। স্লীপিং ব্যাগের পাশেই তো ছিল। গেল কই? হাতড়ে হাতড়ে বের করে নিয়ে এসে মই বেয়ে নামল কয়েক ধাপ। নিচের দিকে মুখ করে জ্বালল।
একটা খালি বাক্সে পা লেগে পড়ে গেছে ফ্রেনি। উঠে তাকাল আলোর দিকে। তোমরাই তো? কণ্ঠে আতঙ্ক। জবাব দিচ্ছ না কেন? তোমরা তো?
হ্যাঁ, জবাব দিল কিশোর।
মই বেয়ে নেমে এল তিনজনে।
ম্যাকম্বারের পিকআপে হেলান দিয়ে কাঁপছে জিপসি।
কি হয়েছে, জিজ্ঞেস করল কিশোর।
মড়া…মড়াটা! ভয়ে ভয়ে বলল ফেনি। বলেছিলাম না, পছন্দ করবে না!
হয়েছেটা কি? মুসা জানতে চাইল।
ও উঠে চলে গেছে। কাল যখন গিয়ে দেখবে কঙ্কলটা নেই, আক্কেল হবে ম্যাকম্বারের। দোষ দেবে আমার। বলবে আমি সরিয়েছি। আসলে তো হেঁটে চলে গেছে। নিজের চোখে দেখলাম।
গোলাঘরের দরজা খোলা। পাহাড়ের ঢালে নতুন বাড়িটা, মানে ম্যাকম্বারের মিউজিয়ামটার দিকে তাকাল ছেলেরা। চাঁদের আলোয় দেখা যাচ্ছে-দরজা লাগানো। তালা আছে কিনা বোঝা যায় না।
স্বপ্ন দেখেননি তো? মোলায়েম গলায় বলল রবিন।
না, মাথা নাড়ল লোকটা। গাড়ির মধ্যে শুয়ে ছিলাম। দরজা খোলার শব্দ শুনে উঁকি দিয়ে দেখি একটা গুহামানব। গায়ে পশুর ছাল জড়ানো। চোখ দুটোও

দেখেছি। ভয়ঙ্কর। সোজা আমার দিকেই চেয়ে ছিল। জ্বলছিল কয়লার মত। লম্বা লম্বা চুল। গাড়ির পাশ দিয়ে চলে গেল মাঠের দিকে।
চোখ বুজল জিপসি, যেন চোখ বুজলেই স্মৃতি থেকে দূর হয়ে যাবে ভয়ানক দৃশ্যটা।
চলো তো দেখি, কিশোর বলল সঙ্গীদের।
কাছাকাছি রইল ওরা। যেন ভয়, যে কোন মুহূর্তে জীবন্ত হয়ে উঠে। এসে সামনে দাঁড়াবে প্রাগৈতিহাসিক মানুষটা।
দেখা গেল, মিউজিয়ামের দরজা বন্ধ।
কথাবার্তার আওয়াজ শুনে দরজা খুলে বেরোল ম্যাকম্বার। কি হয়েছে? এই, তোমরা এখানে কি করছ?
দেখছি, জবাব দিল কিশোর। আপনার দারোয়ান মাঠের ওদিকে কাকে নাকি যেতে দেখেছে।
মিসেস জেলা ম্যাকম্বারও উঁকি দিল পেছনে।
সিঁড়ি বেয়ে নেমে এগিয়ে এল ম্যাকম্বার। কি হয়েছে? ফ্রেনিকে জিজ্ঞেস করল। হ্যারিসন এসেছিল নাকি?
গুহামানব, বলল জিপসি, চলে গেছে।
কি পাগলের মত বকছ? ধমক লাগাল ম্যাকম্বার। জেলডা, চেঁচিয়ে বলল, চাবি আনো তো।
তালা খুলে মিউজিয়ামে ঢুকল ম্যাকম্বার। আলো জ্বালল। এগিয়ে গেল গুহামুখের দিকে। পেছনে চলল ছেলেরা।
কই, ঠিকই তো আছে। আগের মতই তাকিয়ে আছে শূন্য কোটর। বিকট নীরব হাসিতে ফেটে পড়ছে যেন একটিমাত্র চোয়াল। বুকের পাঁজর, হাত-পায়ের হাড়, সব ঠিক আছে।
জিপসির দিকে ফিরল ম্যাকম্বার। কি দেখেছ? এই তো, কঙ্কাল তো এখানেই।
হেঁটে গেছে! বিড়বিড় করল ফ্রেনি। আমি দেখেছি। গায়ে পশুর ছাল। বড় বড় চুল। হেঁটে চলে গেল মাঠের ওপর দিয়ে।
তোমার মাথা। যত্তোসব।
আলো নিভিয়ে সবাইকে নিয়ে মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে এল ম্যাকম্বার। যাও, ভালমত পাহারা দাও, ধমক দিয়ে বলল ফ্রেনিকে।
ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখার জন্যে বেতন দিই না আমি তোমাকে।
ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল আবার জেলডা আর ম্যাকম্বার।
আপনমনে কি বলতে বলতে ভ্যান থেকে একটা ফোল্ডিং চেয়ার বের করল জিপসি। শটগান হাতে পাহারায় বসল।

গোলাঘরে ফিরে এল তিন গোয়েন্দা।
নিশ্চয় স্বপ্ন দেখেছে, মুসা মন্তব্য করল।
বোকা মনে হয় লোকটাকে, বলল রবিন।
আমার মনে হয় না, মাথা নাড়ল কিশোর।
তাহলে সত্যি দেখেছে কিছু?
হতে পারে। হয়তো কেউ বেরিয়েছিল মিউজিয়াম থেকে।
কিভাবে? মুসার প্রশ্ন। দরজায় তালা ছিল।
চাবি জোগাড় করে নিয়েছে, স্লীপিং ব্যাগের ওপরে বসে খোলা জানালা দিয়ে চন্দ্রালোকিত মাঠের দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। রাতের আকাশের পটভূমিকায় ওপাশের বনকে ঘন কালো দেখাচ্ছে। চাঁদের আলোয় সাদা লাগছে ঘাসের ওপরে জমা শিশিরকে, যেন সাদা চাদর। তাতে কালো কালো ছোপ এক সারিতে এগিয়ে গেছে বনের দিকে।
এর একটাই ব্যাখ্যা হতে পারে, ভাবল কিশোর। হেঁটে গেছে। কেউ। পায়ের চাপে ঘাস বসে গেছে, শিশির ঝরে গেছে ওখান থেকে। ফলে কালো দেখাচ্ছে।
নামতে গিয়েও থেমে গেল কিশোর। চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে জিপসি ফ্রেনি। বগলে শটগান। মাঠের দিকে ফিরে কান পেতে কিছু শোনার চেষ্টা করছে।
ভ্যানে গিয়ে ঢুকল ফ্রেনি। বেরিয়ে এল একটা কম্বল নিয়ে। ভাল করে গায়ে জড়িয়ে আরাম করে বসল চেয়ারে।
ফ্রেনির বিশ্বাস, সে গুহামানব দেখেছে, আনমনে বলল কিশোর।
বাইরে তাকাল মুসা। জ্যোৎস্নায় আলোকিত তৃণভূমির দিকে চেয়ে অস্বস্তি জাগল মনে। ওকে দোষ দেয়া যায় না। বেশি ভয় পেলে জেগে থেকেও দুঃস্বপ্ন দেখে মানুষ।
পরদিন শনিবার।
আগে ঘুম ভাঙল কিশোরের, মাচা থেকে নেমে বেরিয়ে এল গোলাঘরের বাইরে। উজ্জ্বল রোদে এখন আর রাতের মত কালো দেখাচ্ছে না বন, রহস্যময় লাগছে না। তৃণভূমির ওপর দিয়ে হাঁটতে শুরু করল সে। মাটির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। কিন্তু একটা পায়ের ছাপও চোখে পড়ল না। কালো দাগগুলোও মুছে গেছে নতুন করে শিশির জমায়।
তিরিশ মিটারমত এগিয়ে দেখল এক জায়গায় ঘাস বেশ পাতলা। কালো মাটি দেখা যায়। হাঁটু গেড়ে বসে ভালমত দেখে কেঁপে উঠল উত্তেজনায়।
মুসা এসে যখন তার পাশে দাঁড়াল, তখনও একইভাবে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর।
কী? জিজ্ঞেস করল মুসা। কিছু পেলে?
পায়ের ছাপ। এখান দিয়ে হেঁটে গেছে কেউ, খালি পায়ে। বেশিক্ষণ হয়নি।

ঝুঁকে মুসাও দেখল ছাপ। সোজা হয়ে তাকাল বনের দিকে। চেহারা ফ্যাকাসে।
খালি পায়ে!...তারমানে জিপসি সত্যি দেখেছিল...
জবাব দিল না কিশোর। উঠে হাঁটতে শুরু করল বনের দিকে।
কিছুই না বুঝে তার পিছু নিল মুসা।
মাটির দিকে তাকিয়ে হাঁটছে কিশোর। ধীরে ধীরে আবার ঘন হয়ে এসেছে ঘাস, আর একটা ছাপও চোখে পড়ল না তার। বনের কিনারে চলে এসেছে। গাছের নিচ দিয়ে চলে গেছে পায়ে চলা পথ। সেখানে ছাপ নেই। ঘন হয়ে বিছিয়ে রয়েছে পাইনের কাটা।
এখানে দেখা যাবে না, বলল কিশোর। আরও এগোলে...
এক মিনিট, বাধা দিয়ে বলল মুসা। এখনি যাবে? হয়তো ঝোঁপের মধ্যে এখনও লুকিয়ে রয়েছে...আমি বলি কি চলো আগে কিছু। খেয়ে আসি? বেলা হলে, ভিড় বেড়ে গেলে হয়তো পাওয়াই যাবে না কিছু। শেষে না খেয়ে মরব।
মুসা, এটা খুব জরুরী! বলল কিশোর।
কার জন্যে? চলো, আগে পেট ঠাণ্ডা করি। বনের ভেতর। সারাদিনই খোঁজা যাবে, সময় তো আর চলে যাচ্ছে না।
অনিচ্ছাসত্ত্বেও ফিরতে হলো গোয়েন্দাপ্রধানকে।
গোলাঘরের কাছে পৌঁছুল ওরা। ম্যাকম্বার বেরোল। মর্নিং, বয়েজ। দারুণ সকাল, তাই না? মনে হচ্ছে, মিউজিয়ামে আজ দিনটা কাটবে ভাল। ভ্যানের দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে ডাকল, অ্যাই, ফ্রেনি।
দরজায় দেখা দিল জিপসি। হাতে খাবারের প্লেট।
আর গুহামানব দেখেছ, রাতে? হেসে জিজ্ঞেস করল ম্যাকম্বার।
না। একটাই যথেষ্ট, ভেতরে ঢুকে গেল ফ্রেনি।
রেগে উঠল ম্যাকম্বার। অ্যাই, আবার ঢুকলে যে? এখনও খাওয়াই শেষ করোনি, কাজ করবে কখন?
ওদের কথা শোনার জন্যে আর দাঁড়াল না তিন গোয়েন্দা, চলল শহরের দিকে।
কাফের সামনে ভিড় হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই।
অনেক কষ্টে গুতোগুতি করে ভেতরে ঢুকে তিনটে চেয়ার দখল করল ছেলেরা। খাবারের অর্ডার দিল। লোকের কোলাহল ছাপিয়ে কানে আসছে ব্যাণ্ডবাদকদের বাজনা, মহড়া দিচ্ছে। মেইন রোডে গাড়ির সারি। কয়েকটা টেলিভিশন স্টেশনের ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে পার্কের একধারে।
খাবার এল। চামচ দিয়ে সবে মুখে তুলেছে ছেলেরা, এই সময় ঢুকলেন ডাক্তার রুডলফ। সঙ্গে ডাক্তার রেডম্যান, ইমিউনোলজিস্ট। এদিক-ওদিক তাকিয়ে কিশোরের ওপর চোখ পড়তেই হাসলেন রুলফ।

ওঁদের এখানে বসতে বললে কেমন হয়? বন্ধুদের পরামর্শ চাইল কিশোর।
ভাল, মুসা বলল। জিজ্ঞেস করো আগে, বসবেন কিনা।
উঠে গিয়ে আমন্ত্রণ জানাল কিশোর। সানন্দে রাজি হলেন দুই ডাক্তার। কোন টেবিল খালি নেই, জায়গা পেয়ে খুশিই হলেন।
থ্যাংক ইউ, বসতে বসতে বললেন ডাক্তার রুডলফ।
পাগল খানা হয়ে গেছে শহরটা। কতদিন এরকম থাকবে কে জানে। আমার মনে হয় সারাটা গরমই এভাবে যাবে। শীত পড়লে, তারপর গিয়ে কমতে শুরু করবে লোক। খানিকটা মাখন নিজের প্লেটে তুলে নিয়ে বললেন, এমনিতে সেন্টারেই নাস্তা সারি আমরা। কিন্তু আজকাল হ্যারিসনের যা মেজাজ-মরজি। তার সঙ্গে বসে খেয়ে আর আরাম নেই। ওর দুঃখটাও বুঝি। হাতের কাছে রয়েছে গবেষণার এমন লোভনীয় জিনিস, অথচ হাত লাগাতে পারছে না…
হ্যাঁচচো করে উঠলেন রেডম্যান। নাকচোখ মুছে ছেলেদের দিকে চেয়ে হাসলেন, সর্দির জ্বালায় আর বাঁচি না। রুডলফের দিকে ফিরে বললেন, যা-ই বলল, হ্যারিসন বাড়াবাড়িই করছে।
মাথা খারাপ হয়ে গেছে বেচারার, নরম গলায় বললেন রুডলফ। প্রায় আস্ত একটা কঙ্কাল, অথচ ছুঁতে দেয়া হচ্ছে না ওকে, কল্পনা। করো। ওর জায়গায় আমি হলে আমারও একই অবস্থা হত।
ডাক্তার হ্যারিসন কি করতে চাইছেন? জিজ্ঞেস করল রবিন। কার্বন ফরটিন টেস্ট?
কার্বন ফরটিন দিয়ে বোধহয় কাজ হবে না এটাতে। বুঝিয়ে বললেন রুডলফ, কার্বন ফরটিন রেডিওঅ্যাকটিভ এলিমেন্ট, প্রাণীর হাড়ে থাকে। জীব বা উদ্ভিদ মারা যাওয়ার সাতান্নশত বছর পরে হাড়ে এই এলিমেন্ট কমে অর্ধেক হয়ে যায়। আরও সাতান্নশো বছর পরে তার অর্ধেক। এভাবে কমতে কমতে চল্লিশ হাজার বছর পরে হাড়ে কার্বন আর থাকেই না। তখন পরীক্ষা করেও আর কিছু বোঝা যায় না।
চোখ বড় বড় হয়ে গেল রবিনের। আপনার কি ধারণা ফসিলটার বয়েস চল্লিশ হাজারের বেশি?
হলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। বয়েস কত, সেটা বোঝার আরও উপায় আছে, কার্বন ফরটিন টেস্ট ছাড়াও। কিন্তু পরীক্ষার জন্যে ল্যাবরেটরিতে তো আনতে হবে…।
ওই যে এসে গেছে আমাদের নাস্তা, ওয়েইট্রেসকে দেখে বলে উঠলেন রেডম্যান। যাক, বাবা, পাওয়া গেল।
কিছুক্ষণ নীরবতা। চুপচাপ খাচ্ছে সবাই।

আচ্ছা, হঠাৎ জিজ্ঞেস করল কিশোর, ডাক্তার ক্লডিয়াস কি নিয়ে গবেষণা করতেন?
প্রয়াত বিজ্ঞানীর কথা উঠতেই গম্ভীর হয়ে গেলেন ডাক্তার রুডলফ। ব্রিলিয়ান্ট লোক ছিল।–মস্ত ক্ষতি হয়ে গেল আমাদের।
হয়তো হয়েছে, কথার পিঠে বললেন রেডম্যান। কিন্তু জিনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিঙের বিপদও আছে। এটম নিয়ে গবেষণা করে শেষে যেমন এটম বোমা বানিয়ে ফেলা হলো। জিন নিয়ে গবেষণা চালালে ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন তৈরি হয়ে যাওয়ার ভয় আছে।
ডাক্তার ক্লডিয়াস নাকি মানুষের দৈহিক উন্নতির চেষ্টা করছিলেন? কিশোর বলল। লিলি বলেছে আমাদের ঘোড়া আর শিম্পাঞ্জীকে নাকি ইতিমধ্যেই অনেক বুদ্ধিমান বানিয়ে ফেলা হয়েছে।
কিছুটা, বললেন রুডলফ।
এসব গবেষণায় শেষকালে ক্ষতিই হয় বেশি, রেডম্যান বললেন। প্রকৃতি যাকে যেভাবে তৈরি করেছে, সেভাবেই থাকতে দেয়া উচিত। নইলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা।
তা ঠিক। কিন্তু ক্লডিয়াসের উন্নতির কথা একবার ভেবে দেখো। ক্ষতি না করে সত্যি সত্যি যদি প্রাণিদেহের উন্নতি করা যায়, কি সাংঘাতিক ব্যাপার হবে! ছেলেদের দিকে ফিরে বললেন রুডলফ
বেঁচে থাকলে গ্যাসপার পুরস্কার পেয়ে যেত ক্লডিয়াস। এক বছর পর পর দেয়া হয় এই পুরস্কার। দশ লাখ ডলার।
সেটা তো গেল, মুসা মুখ খুলল এতক্ষণে। এরপর কে পাবেন?
ত্যাগ করলেন রুডলফ। কি জানি। পাকস্থলীর আলসার কিভাবে প্রতিরোধ করা যায়, সেটা নিয়ে গবেষণা করছে রেডম্যান। সফল হলে সে পাবে। কিংবা মানুষের অরিজিন আবিষ্কার করতে পারলে ডাক্তার হ্যারিসন পাবে…
বাঁচবে অনেকদিন, বাধা দিয়ে বললেন রেডম্যান। ওই যে, আসছে।
জানালার দিকে ঘুরে তাকাল অন্যেরা। সোজা কাফের দিকে আসছেন হ্যারিসন। ভেতরে ঢুকতেই হাত নেড়ে তাকে ডাকলেন রুডলফ।
কিশোরের পাশে একটা খালি চেয়ার টেনে এনে বসলেন। হ্যারিসন। হউফ করে মুখ দিয়ে বাতাস ছেড়ে বললেন, অনেক চেষ্টা করলাম। গভর্নরকে পাওয়া গেল বটে, কথা বলতে পারলেন না। ব্যস্ত। লাঞ্চের পর আবার রিঙ করতে বলেছেন।
গভর্নর এসে কি করবে? গুহা থেকে তোমাকে কঙ্কালটা বের করে এনে দেবে? ঝাঁঝাল কণ্ঠে বললেন রুডলফ।
এই তো, যাচ্ছে লেগে! ঝগড়ার ভয়ে তাড়াতাড়ি বললেন রেডম্যান, এই, ইউজেন, কি মনে হয় তোমার? কাজ হবে?

কেন হবে না? ভুরু নাচালেন রুডলফ। রাস্তা কিংবা স্কুল বানানোর দরকার হলে তখন তো লোকের জায়গা নিয়ে নেয় সরকার। ফসিলটাকে বাঁচানোর জন্যে কেন পারবে না? গভর্নরকে বলব, এলাকাটাকে রিজার্ভ এরিয়া বলে ঘোষণা করতে। আশপাশে নিশ্চয় আরও ফসিল আছে। ওগুলো নষ্ট হতে দেয়া যায় না... পার্কে ব্যাণ্ড বেজে উঠতেই থেমে গেলেন বিজ্ঞানী।

ঘড়ি দেখলেন রেডম্যান। দশটা বাজতে পাঁচ। অনুষ্ঠানের সময় হয়ে এল। দেরি করে ফেলেছ, ইউজেন। ঠেকাতে পারবে না ওদের।

অনুষ্ঠান শুরু হতে কিছুটা দেরি হয়ে গেল।

তিন ডাক্তার আর তিন গোয়েন্দা পার্কে পৌঁছে দেখল, মঞ্চে উঠে বসেছে ম্যাকম্বার। পাশে তার স্ত্রী জেলডা। পরনে সাদা-কালো প্রিন্টের পোশাক, হাতে কনুই-ঢাকা সস্তা দস্তানা। তার পাশে বসেছে শুকনো এক লোক, গায়ে রঙচঙে জ্যাকেট। কড়া রোদের জন্যে কুঁচকে রেখেছে। চোখ।

ওয়েসলি থারগুড, লোকটাকে দেখিয়ে নিচু কণ্ঠে তিন গোয়েন্দাকে বললেন রুডলফ। এখানকার মেয়র। ওষুধের দোকানটার মালিক। অনুষ্ঠানের সভাপতি। বক্তৃতা দেয়ার খুব শখ।

কালো স্যুট আর পাদ্রীর আলখেল্লা পরা একজন এসে উঠলেন মঞ্চে, মেয়রের পাশে বসলেন। গির্জার পাদ্রী, বুঝতে অসুবিধে হলো না ছেলেদের।

একে একে শহরের আরও কয়েকজন গণ্যমান্য লোক এসে জায়গা নিল মঞ্চে। তাদের মাঝে রয়েছে মোটেলের মালিক, সুপারমার্কেটের ম্যানেজার, এসিসটেন্ট ম্যানেজার। মঞ্চে মহিলা উঠল আরেকজন, এখানকার একমাত্র গিফট শপের মালিক। খাবার বিক্রি করতে করতে দেরি করে ফেলল কাফের মালিক। ছুটে আসতে দেখা গেল তাকে। তারপর এল গ্যারাজের মালিক, সামনের সারিতে জায়গা না পেয়ে মন খারাপ হয়ে গেল তার। অগত্যা বসতে হলো পেছনের সারিতে।

দোকানপাট সব বন্ধ করে দিয়ে এসেছে, রুডলফ বললেন। সারা শহরের লোক এসে জমেছে এখানে। টাকা কামানোর ভাল মওকা পেয়েছে ম্যাকম্বার।

পার্কের ভেতরে লোক গিজগিজ করছে। পা রাখার জায়গা নেই। এদিক-ওদিক চেয়ে কিশোর দেখল, ক্যাম্পফায়ার গার্ল আর বয়স্কাউটদের। আরও রয়েছে জুনিয়র চেম্বার অভ কমার্সের তরুণেরা।

পরনে কালো স্যুট, আর হ্যাঁটে সাদা পালক গোঁজা কয়েকজন জড় হয়ে আছে এক জায়গায়। সেদিকে তাকিয়ে আছে কিশোর, এই সময় পাশে এসে দাঁড়াল মিসেস গ্যারেট। প্রশ্ন না করেই জেনে গেল কিশোর, লোকগুলো নাইটস অভ কলাম্বাস-এর সদস্য।

পার্কের কিনারে ট্রাক এনে দাঁড় করিয়েছে আইসক্রীমওয়ালা। চুটিয়ে ব্যবসা করছে। তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে বেলুনওয়ালা, হাতে একগুচ্ছ গ্যাস-ভর্তি বড় বেলুন। ঘিরে রেখেছে তাকে বাচ্চারা।
যখন বোঝা গেল, মাননীয় আর কেউ আসার নেই, ধীরে সুস্থে উঠে দাঁড়াল মেয়র। গম্ভীর ভঙ্গিতে টোকা দিল মাইক্রোফোনে, হাত তুলে ইশারা করল জনতাকে নীরব হওয়ার জন্যে।
লিলিকে দেখতে পেল কিশোর। মেয়েটার চোখে উৎকণ্ঠা, অধিকাংশ সময়ই যেমন থাকে।।
মাননীয় জনতা! শোনা গেল মেয়রের খড়খড়ে কণ্ঠ।
সম্বোধনের কি ছিরি!–ভাবল কিশোর।
মাননীয় জনতা! আবার বলল মেয়র। দয়া করে থামুন আপনারা, চুপ করুন। আমাদের অনুষ্ঠান শুরু হতে যাচ্ছে। প্রথমেই অনুরোধ করব, পাদ্রীর দিকে ফিরে একবার মাথা ঝোকাল মেয়র, মিস্টার ডেভিড ব্যালার্ডকে। আমাদের নতুন প্রতিষ্ঠানের জন্যে যেন দোয়া করেন তিনি। তারপর ব্যাণ্ড বাজাবে সেন্টারডেল হাইস্কুলের ছেলেরা, তোমরা। অনুষ্ঠান শেষে মার্চ করে এগোবে, পেছনে দল বেঁধে যাব আমরা। মিউজিয়ম ওপেন করবে আমাদের মিস লোটি হাম্বারসন। থেমে জনতার ওপর চোখ বোলাল মেয়র। লোটি, তুমি কোথায়?
এই যে, এখানে! ভিড়ের মধ্য থেকে বলে উঠল একটা পুরুষকণ্ঠ। লোটি, যাও।
সরে জায়গা করে দিল লোকে। এগিয়ে এসে মঞ্চে উঠল পাতলা একটা মেয়ে, এত রোগা, মনে হয় ফুঁ দিলেই উড়ে যাবে। মাথায় সোনালি চুল। সে মঞ্চে উঠলে চেঁচিয়ে স্বাগত জানাল জনতা।
হঠাৎ চালু হয়ে গেল পার্কের অটোমেটিক স্প্রিঙ্কলার সিসটেম, বৃষ্টির মত জনতার ওপর ঝরে পড়তে লাগল পানি।
শুরু হলো চেঁচামেচি, হই-হট্টগোল। ঠেলাঠেলি, হুড়াহুড়ি।
কিশোরের মুখে এসে লাগল পানির ছিটা, মাথা ভিজল, কাপড় ভিজল। মুসার দিকে ফিরল। তাকে অবাক করে দিয়ে হাঁটু ভাজ হয়ে পড়ে যেতে শুরু করল মুসা।
কি ঘটে পুরোটা দেখার সময় পেল না কিশোর, তার দেহও টলে উঠল। বোঁ করে উঠল মাথার ভেতর। মনে হলো শূন্যে ভেসে চলেছে। সে, অনন্ত শূন্য, অসীম অন্ধকার।
শীত শীত লাগল। নড়েচড়ে উঠল কিশোর। ভেজা মাটিতে মুখ গুঁজে পড়ে রয়েছে সে। নাকে সুড়সুড়ে অনুভূতি। চোখ মেলে দেখল, একটা ঘাসের ডগা ঢুকেছে নাকে। থেমে গেছে স্প্রিঙ্কলার, পানি ছিটানো বন্ধ।

উহহ! গুঙিয়ে উঠল একটা পরিচিত কণ্ঠ।
ফিরে চেয়ে দেখল কিশোর, চোখ মেলছে রবিন। মুসা পড়ে আছে, মাথা ডাক্তার হ্যারিসনের কোমরে ঠেকে আছে।
বিড়বিড় গোঙানী, ফোঁসফোঁস, চিৎকার, নানারকম বিচিত্র শব্দ। একে একে হুশ ফিরছে জনতার।
ঢং ঢং করে বেজে উঠল গির্জার ঘণ্টা, সময় জানাচ্ছে।
চট করে ঘড়ি দেখল কিশোর। আরি! চল্লিশ মিনিট পেরিয়ে গেছে! এগারোটা বাজে! কোন অদ্ভুত কারণে পুরো চল্লিশটি মিনিট বেহুশ হয়ে ছিল পার্কের লোক।
স্প্রিঙ্কলার সিসটেম! বিড়বিড় করল কিশোর। গোলমালটা ওটাতেই। কোন রাসায়নিক দ্রব্য মিশিয়ে দেয়া হয়েছিল পানিতে, বেহুশ করার জন্যে।
পার্কের কিনারে চেঁচিয়ে কাঁদছে কয়েকটা বাচ্চা। বেলুনওয়ালার হাতে একটা বেলুনও নেই। গুচ্ছসহ উড়ে গেছে, আকাশের অনেক ওপরে বিন্দু হয়ে গেছে এখন ওগুলো।
মাথা ঝাড়া দিয়ে মাথার ভেতরের ঘোলাটে ভাবটা দূর করার চেষ্টা করল কিশোর। টলোমলো পায়ে উঠে দাঁড়াল। রবিনকে উঠতে সাহায্য করল।
এই সময় ছুটে আসতে দেখা গেল জিপসি ফ্রেনিকে। যেন দিন দুপুরে ভূতে ধরেছে!
মিস্টার ম্যাকম্বার! চেঁচিয়ে উঠল সে। মিস্টার ম্যাকম্বার। সর্বনাশ হয়ে গেছে! গুহামানব!...নেই! চলে গেছে!...নিয়ে গেছে!
একনাগাড়ে কয়েক ঘণ্টা ধরে চলল সীমাহীন ব্যস্ততা।
শেরিফের লোকেরা ছবি তুলছে, সূত্র খুঁজছে, পাউডার ছিটিয়ে আঙুলের ছাপ নিচ্ছে। মিস্টার আর মিসেস ম্যাকম্বারের বক্তব্য রেকর্ড করছে টেলিভিশনের লোকেরা। কথা বলবে কি? রাগে, ক্ষোভে পাগল হয়ে গেছে ম্যাকম্বার। মাথার চুল ছিঁড়ছে, হাত-পা ছুড়ছে থেকে থেকেই।
ডাক্তার হ্যারিসনের সাক্ষাৎকার নিল রিপোর্টাররা। ম্যাকম্বারের মত এতটা না হলেও তিনিও অস্থির।
মেয়রের সাক্ষাৎকার নিল। এমনকি জিপসি ফ্রেনিকেও ঘেঁকে ধরল টেলিভিশন আর খবরের কাগজের রিপোর্টাররা।
কি জানি এল! জানাল জিপসি। পাহারা দিচ্ছিলাম, মিস্টার ম্যাকম্বারের কথামত। পেছনে আওয়াজ শুনে ফিরে চাইলাম...আরিব্বাবা, দেখি কি, সাংঘাতিক এক জীব! একচোখা! এত বড় চোখ!...আর, হাতির মত দাঁত। মানুষ না, বুঝেছেন, মানুষ হতেই পারে না। তারপর আর কিছু মনে নেই। চোখ মেলে দেখলাম, মাটিতে

পড়ে আছি। মিউজিয়ামের দরজা খোলা। ভেতরে ঢুকে দেখি, মড়াটা নেই! গায়েব!
বেশি টেনে ফেলেছে, ভিড়ের ভেতর থেকে বলল একজন।
কিন্তু মদ স্পর্শও করেনি ফ্রেনি। আর গুহামানবের কঙ্কাল গায়েব, এটাও সত্যি।
সাক্ষাৎকার নিয়ে তাড়াহুড়ো করে চলে গেল রিপোর্টাররা।
দু-জন লোককে পাহারায় রেখে শেরিফও চলে গেল।
ধীরে ধীরে কমে এল জনতার ভিড়। যাকে দেখতে এসেছিল, সে-ই নেই, থেকে আর কি করবে?
ডেপুটি শেরিফের সঙ্গে কথা বলছে ম্যাকম্বার।
কাছাকাছিই ছিল তিন গোয়েন্দা, ভিড় কমলে এগোল মিউজিয়ামের দিকে।
সরি, বয়েজ, ছেলেদের দেখে বলল ডেপুটি শেরিফ। ভেতরে ঢুকতে পারবে না।
ডাবলডোরের ফাঁক হয়ে থাকা পাল্লার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর, চাবি ছিল লোকটার কাছে, না? যে কঙ্কাল চুরি করেছে?
বিস্ময় ফুটল ডেপুটির চোখে। চট করে তাকাল একবার খোলা। দরজার দিকে।
দরজায় কোন দাগটাগ নেই তো, তাই বলছি, বুঝিয়ে বলল কিশোর। তারমানে, তালা কিংবা কজা ভেঙে ঢোকেনি চোর। তাহলে দাগ থাকতই।
দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইল ডেপুটি শেরিফ, বোধহয় ভাবল ছেলেটার নজর বড় কড়া, গুরুত্বপূর্ণ আরও কিছু চোখে পড়ে যেতে পারে। তাই হেসে সরে দাঁড়াল। অল রাইট, শার্লক হোমস। ভেতরে গিয়ে দেখার খুব ইচ্ছে? যাও, দেখে বলো আমাকে যা। যা বোঝে।
মিউজিয়ামের ভেতরে গিয়ে ঢুকল তিন গোয়েন্দা।
ভেতরের জিনিসপত্র যেমন ছিল, তেমনই আছে, নাড়াচাড়া বিশেষ হয়নি। তবে সব কিছুর ওপরই কালি আর পাউডারের আস্তর। ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্টদের কাজ। আঙুলের ছাপ খুঁজেছে।
সারা ঘরে একবার চোখ বুলিয়ে, আলোকিত গুহার ভেতরে এসে উঁকি দিল কিশোর। এখানেও সব কিছু আগের মতই আছে, শুধু কঙ্কালটা নেই। ওটা যেখানে ছিল সেখানকার মাটিতে গর্ত, দাগ, এলোমেলো আলগা মাটি ছড়িয়ে আছে। এখানেই এক জায়গায় একটিমাত্র পায়ের ছাপ চোখে পড়ল, বিশাল ছাপ।
রাবারসোল জুতো পরেছিল, আনমনে বলল কিশোর। ম্যাকম্বারের ছিল কাউবয় বুট, আর জিপসি ফ্রেনির পায়ে লেইসড-আপ জুতো, চামড়ার সোল। চোরের পায়ে ছিল স্বীকার জাতীয় কিছু, সোল আর গোড়ালিতে তারা তারা ছাপ।

মাথা ঝাঁকাল ডেপুটি। ঠিকই বলেছ। জুতোর ছাপের ছবি তুলে নেয়া হয়েছে। কাজে লাগতে পারে ভেবে।
পকেট থেকে ফিতে বের করে ছাপ মাপতে বসল কিশোর। বারো। ইঞ্চি। লম্বা লোক, মন্তব্য করল সে।
হাসি ফুটল ডেপুটির মুখে। বাহ, ভালই তো, কাজ দেখাচ্ছ। গোয়েন্দা হওয়ার ইচ্ছে?
হয়েই আছি, ব্যাখ্যা করার দরকার মনে করল না কিশোর। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল। কিন্তু একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না। এত কষ্ট করে এত সব কাণ্ড করতে গেল কেন চোর? স্প্রিঙ্কলার সিসটেমে কেমিক্যাল ঢেলে দিয়ে ঘুম পাড়াল পুরো শহরকে…
ঠিকই বলেছ, কথার মাঝে বলল ডেপুটি, মনে হয় কেমিক্যালই ঢেলেছে। পানির স্যাম্পল নিয়ে ল্যাবরেটরি টেস্টের জন্যে পাঠানো হয়েছে। পানির ট্যাংকও পরীক্ষা করা হবে। ওখান থেকেই স্প্রিঙ্কলারে পানি যায়।
সাইন্স ফিকশন সিনেমার মত লাগছে, বলল কিশোর। পুরো শহরকে ঘুম পাড়িয়ে বিকট জন্তুর রূপ ধরে গিয়ে চড়াও হয়েছে জিপসি ক্রেনির ওপর। তাকেও ঘুম পাড়িয়েছে কোনভাবে। কিংবা হয়তো পার্কের রাসায়নিক বাস্পই বাতাসে ভেসে গিয়ে লেগেছে তার নাকে। যেভাবেই হোক, বেহুশ হয়েছে। চোর তারপর আরামসে মিউজিয়ামে ঢুকে কঙ্কালটা তুলে নিয়ে চলে গেছে।
এখন প্রশ্ন হলো, কেন? সাধারণ লোকের কাছে ওই হাড়ের কোন মূল্য নেই। দর্শকদের কাছ থেকে পয়সা আদায় করা যায়, তবে যেখানে যে অবস্থায় পাওয়া গেছে, সেভাবে থাকলে। ওই হাড়ের ওপর দু-জনের আগ্রহ বেশি। একজন হ্যারিসন, অন্যজন ম্যাকম্বার। কিন্তু চুরিটা যখন হয়, তখন দু-জনেই পার্কে বেহুশ হয়ে পড়ে ছিল।
সোনা চুরি যায়, অলঙ্কার চুরি যায়, মুখ বাঁকাল ডেপুটি, কিন্তু হাড়ি চুরি যেতে দেখলাম এই প্রথম।
কিশোর, রবিন বলল, কি মনে হয়? চোরকে ধরতে পারবে?
চুপ করে রইল কিশোর। ভাবছে।
রবিনের প্রশ্নের জবাব দিল ডেপুটি, অনেক চুরিরই সমাধান হয় না। রহস্য রহস্যই থেকে যায়। এটাও তেমনই কিছু হবে। পুরানো কয়েকটা হাড়ের পেছনে সময় নষ্ট করবে কে?…চলো, বেরোই। আর কিছু দেখার নেই।
ডেপুটির পিছু পিছু বেরিয়ে এল ছেলেরা।
গোলাঘরের কাছে দাঁড়িয়ে আছে ম্যাকম্বার। কাছেই রয়েছে জেলা আর লিলি। লিলির হাতে চিঠিপত্রের বাণ্ডিল আর একটা ম্যাগাজিন। এইমাত্র ডাকে এসেছে।

ম্যাকম্বারের হাতে একটা চিঠি। চেহারা থমথমে।
ডেপুটি আর ছেলেরা কাছে যেতেই নড়ে উঠল ম্যাকম্বার। চিঠিটা ডেপুটির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, পড়ন! পড়ে দেখুন! রাগে খসখসে হয়ে গেছে কণ্ঠস্বর।
চিঠিটা হাতে নিল ডেপুটি।
দেখার জন্যে কাছে ঘেঁষে এল ছেলেরা।
কাগজটায় উজ্জ্বল রঙে বড় বড় অক্ষরে ইংরেজিতে লেখা:
আমার কাছে আছে গুহামানব।
ফেরত চাইলে ১০,০০০ ডলার লাগবে।
টাকা না দিলে এমন জায়গায় লুকাব
কোনদিনই আর খুঁজে পাবে না।
পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষায় থাকো।
চারটে শব্দের বানান ভুল, বিড়বিড় করল কিশোর। তবে একটা ব্যাপার শিওর হওয়া গেল, টাকার জন্যে চুরি করেছে ওই হাড়।
দশ হাজার! চেঁচিয়ে উঠল লিলি।
নাক দিয়ে বিচিত্র শব্দ করল ম্যাকম্বার। হারামজাদাকে ধরতে পারলে... দাঁতে দাঁত চাপল সে।
এ ম্যাকম্বারের কাছ থেকে খামটা নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখল ডেপুটি। ডাকঘরের ছাপ দেখল.। নোটটা পড়ল আরেকবার।
ব্যাটা ইংরেজিতে কাঁচা, বলল সে। বানান ভুল দেখছ না। তবে ভেবেচিন্তে কাজ করে। চিঠি পোস্ট করে দিয়েছে গতকালই, সেন্টারডেল থেকে। চিঠিটা পকেটে রাখল।মিস্টার ম্যাকম্বার, মিউজিয়ামের চাবি কার কাছে?
পকেট থেকে চাবির গোছা বের করে দিল ম্যাকম্বার। আরেক গোছা আছে রান্নাঘরের বোর্ডে ঝোলানো। লিলি, দেখ তো গিয়ে আছে কিনা।
বাড়ির দিকে চলে গেল লিলি। খানিক পরেই উত্তেজিতভাবে ফিরে এসে জানাল, নেই। চাবির রিঙে ট্যাগ লাগানো থাকে তো। চোরের বুঝতে অসুবিধে হয়নি...
কোনটা কোন তালার চাবি, লিলির বক্তব্য শেষ করে দিল। ডেপুটি। দরজা খোলা রেখেছিলেন, তাই না, মিস্টার ম্যাকম্বার? বিড়বিড় করে নিজেকেই যেন বোঝাল, রাখবেনই তো। এ শহরের সবাই রাখে। ঘরে ঢুকে চাবি বের করে আনতে কোন অসুবিধে হয়নি চোরের।
খুব হতাশ হয়ে ঘরে ফিরল ম্যাকম্বার দম্পতি।
গোলাঘরের মাচায় চড়ে জানালার ধারে বসল তিন গোয়েন্দা।
ভাবছি, কিশোর বলল, চাবি যে রান্নাঘরে থাকে, চোর সেটা কিভাবে জানল?

সে-ই জানে, বলল মুসা। তাছাড়া জানার দরকারই বা কি? লোকে রান্নাঘরেই চাবি রাখে বেশি। আর দরজাও যখন ভোলা রাখে। এখানকার লোকে...
সহজেই যে-কেউ ঢুকে নিয়ে যেতে পারে, এই তো? আরও একটা ব্যাপার বেশ অবাক লাগছে। গুহার মধ্যে জুতোর ছাপ।
ভুরু কোঁচকাল রবিন। তাতে অবাক হওয়ার কি আছে? টেনিশ শূ কিংবা রানিং পরেছিল চোর। তাতে কি?
গতরাতে গুহার ভেতরে কি কি ছিল মনে আছে? কিশোর বলল। ম্যাকম্বার যখন দেখাচ্ছিল আমাদেরকে?
মুসা আর রবিন দু-জনেই অবাক হলো।
হাড়ের আশপাশের মাটি মাড়ানো ছিল। চোখ বন্ধ করে দৃশ্যটা মনে করার চেষ্টা করছে যেন কিশোর। তারপর, রাতে দুঃস্বপ্ন দেখল জিপসি ফ্রেনি। বলল, গুহা থেকে বেরিয়ে গেছে গুহামানব। ম্যাকম্বার মিউজিয়ামের দরজা খুলল। গুহার ভেতরে কঙ্কালটাকে জায়গামতই দেখলাম। তখন কি পায়ের ছাপ ছিল?
ভ্রূকুটি করল দুই সহকারী গোয়েন্দা।
মুসা বলে উঠল, না না, ছিল না, ঠিক বলেছ। তারমানে...তারমানে, মুছে সমান করে ফেলা হয়েছিল।
আসছি। মাচা থেকে নেমে প্রায় দৌড়ে গিয়ে ম্যাকম্বারের ঘরের সামনে দাঁড়াল কিশোর। দরজায় ধাক্কা দিল। জেলডা খুলল। পেছনে উঁকি দিল তার স্বামী। তাদের সঙ্গে কি যেন কথা হলো কিশোরের। আবার মাচায় ফিরে এল সে।
ম্যাকম্বার বলল, সে মোছেনি, জানাল কিশোর। জিপসিকে দিয়েও মোছায়নি।
তাহলে রাতে অন্য কিছু ঢুকে মুছে এসেছে, বলল মুসা। কিভাবে? দরজায় তালা ছিল। যদি-যদি না কঙ্কালটা...অসম্ভব!
তবে, তৃণভূমিতে একটা ছাপ রেখে গেছে, যে-ই হোক, কিশোর বলল। শহরে যাচ্ছি আমি। গতকাল আসার সময় একটা হবি শপ দেখেছি। কিছু জিনিস কিনে আনব। তোমরা এখানেই থাকো, চোখ রাখো।
আবার মই বেয়ে নেমে চলে গেল কিশোর।
ফিরে এল আধ ঘণ্টা পর। হাতে একটা প্যাকেট। প্ল্যাস্টার অভ প্যারিস, বলল সে। পায়ের ছাপের একটা ছাঁচ তৈরি করব।
গোলাঘরের ওয়ার্কবেঞ্চে বসে কাজ শুরু করল সে। ঘরেই পাওয়া গেল রঙের একটা খালি টিন আর কয়েক টুকরো বিভিন্ন মাপের কাঠ।
টিনে প্লাস্টার অভ প্যারিস ঢেলে তাতে পানি মিশাল কিশোর। ছোট একটা কাঠের দণ্ড দিয়ে ঘুঁটে ঘন কাইমত করল।
কি প্রমাণ করবে? জিজ্ঞেস করল মুসা।

জানি না, জবাব দিল কিশোর। হয়তো কিছুই না। খালি পায়ে একজন লোক যে হেঁটে গিয়েছিল, আপাতত সেই প্রমাণ রাখব। পরে আর ছাপটা না-ও থাকতে পারে। নষ্ট হয়ে যেতে পারে, মুছে যেতে পারে, কত কিছুই হতে পারে।
ছাপের ছাঁচ তুলতে চলল ওরা।
ওটার পাশে বসে কাজ করে চলল কিশোর।
এত কষ্ট করে কি হবে বুঝতে পারছি না, দেখতে দেখতে বলল মুসা।
হ্যাঁ, কেউ তো আমাদের করতে বলেনি, বলল রবিন। মক্কেল নেই। কিশোর, তোমার কি মনে হয়? ম্যাকম্বার আমাদেরকে ভাড়া করবে?
ওর মত লোককে কি মক্কেল হিসেবে পেতে চায় তিন গোয়েন্দা? পাল্টা প্রশ্ন করল কিশোর।
না, তা অবশ্য চায় না, মুসা হাত নাড়ল। পাজি লোক। ওর বউটাও। ওই দুটোকে সহ্য করে কিভাবে লিলি, বুঝি না।
জোরে নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। হবি শপের মালিক মহিলা। লিলির মাকে চিনত। মিসেস অ্যালজেড্ডা নাকি খুব সুন্দরী ছিলেন। জেলড়া তাঁকে দেখতে পারত না। সেই সোধই নাকি নিচ্ছে এখন লিলির ওপর। ম্যাকম্বারও নাকি খুব বাজে ব্যবহার করে লিলির সঙ্গে, মহিলাই বলল। থাকাখাওয়ার টাকা পর্যন্ত নেয়। নিচ্ছে লিলির মা-বাবা মরার পর থেকেই।
বিস্মিত হলো রবিন। তা কি করে হয়? তখন তো বয়েস ছিল মাত্র আট। টাকা দিত কোত্থেকে, কিভাবে? ব্যাংকে টাকা রেখে গিয়েছিলেন। লিলির বাবা-মা?
হলিউডে একটা বাড়ি আছে ওদের। ওটা ম্যাকম্বারই ভাড়া দেয়, টাকাও সে-ই নেয়।
ও। কিন্তু হবি শপের মহিলার মুখ খোলালে কি করে? এত কথা জানলে।
সহজ। জানতে চাইল, আমরা কোথায় উঠেছি। ম্যাকম্বারের মাচার কথা শুনেই গেল রেগে। আমাকে আর প্রশ্ন করতে হলো না। নিজে নিজেই অনেক কিছু বলল। বলল, জিপসি ফ্রেনি লেখাপড়া জানে না। মহিলার সন্দেহ, কোন বেআইনী কাজ করে জিপসি। সেটা জানে ম্যাকম্বার। আর তাই সুযোগ পেয়ে বিনে পয়সায় খাঁটিয়ে নিচ্ছে। লোকটাকে।
তবে চিঠিটা জিপসি লেখেনি, এটুকু শিওর হওয়া গেল। লিখতেই তো নাকি জানে না।
কাউকে দিয়ে লিখিয়ে তো নিতে পারে। তবে মনে হয় না তা করেছে। এত চালাক না সে। আজ সকালে যা করল, সেটাও অভিনয়। মনে হয়নি। সত্যি ভয় পেয়েছিল। তাকে সন্দেহের খাতা থেকে বাদ দিচ্ছি।
তারমানে কেসটা নিচ্ছি আমরা? মুসার প্রশ্ন, আমাদের মক্কেল কে? লিলি?

মক্কেল কি থাকতেই হবে? মাথা ঝাঁকাল কিশোর। আমাদের কাজ হলো রহস্যের কিনারা করা। অনেক রহস্য আছে এখানে। ফসিল চুরি গেল। স্প্রিঙ্কলার সিসটেমে ওষুধ ঢেলে সারা শহরকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়া হলো। কোন গোয়েন্দার আগ্রহ জাগাতে এ-ই কি য েই নয়?

রবিন হাসল। যথেষ্টর চেয়েও বেশি। পকেট থেকে নোটবুক আর কলম বের করে লিখতে শুরু করল। মুখে বলল, গুহামানব চুরি। পানিতে রহস্যময় ওষুধ। মুক্তিপণের টাকা চেয়ে চিঠি, লেখায় বানান ভুল। তবে সেটা ইচ্ছে করেও করে থাকতে পারে, বিশেষ কারও ওপর সন্দেহ ফেলার জন্যে। মুখ তুলল হঠাৎ। হ্যারিসন? কঙ্কালটা হয়তো তিনিই চুরি করেছেন। তারপর মুক্তিপণের টাকা চেয়ে নোট পাঠিয়েছেন। চুরির উদ্দেশ্য অন্যরকম বোঝানোর জন্যে।

চুরিটা যখন হয়, মুসা মনে করিয়ে দিল, তখন তিনি আমার পাশে বেহুশ হয়ে ছিলেন। আমার পরে ঘুম ভেঙেছে তাঁর। কাকে সন্দেহ করব? পুরো শহরই তো তখন পার্কে ঘুমিয়েছিল।

সবাই যে ছিল অনুষ্ঠানে, শিওর হচ্ছি কি করে? প্রশ্ন রাখল কিশোর। এত লোকের মধ্য থেকে কোন একজন সহজেই সরে পড়তে পারে।

চুপ, সাবধান করল রবিন। লিলি আসছে।

ফিরে দেখল কিশোর, মাঠের ওপর দিয়ে হেঁটে আসছে মেয়েটা। তাড়াতাড়ি জিনিসপত্রগুলোকে আড়াল করে বসল সে, ছাঁচটা যাতে লিলির চোখে না পড়ে। ও এলে হেসে বলল, এই যে, আপনিও এসেছেন।...আমরা চুরির ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করছিলাম।

মাথা ঝাঁকাল লিলি। এখানে অনাহূত কিনা বোঝার চেষ্টা করল। চোখে সেই চিরন্তন অস্বস্তি। বসল তিন গোয়েন্দার দিকে মুখ করে। আমি সেন্টারে যাচ্ছি। ভাবলাম, তোমরাও যদি আসো...দেখতে চাও...

গেলে তো ভালই হয়, কিশোর বলল। কিন্তু...

ইচ্ছে না থাকলে এসো না, বাধা দিয়ে বলল লিলি। ভাবলাম, হয়তো বসে বসে বিরক্ত হচ্ছ, কিছু করার নেই... সামান্য উসখুস করে বলল, আসলে...দশ হাজার ডলার। অনেক টাকা। আঙ্কেল ম্যাকম্বার কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ করেছেন, কিভাবে জোগাড় করা যায়..

এত ভাবনার কিছু নেই তার, রবিন বলল। জ্যান্ত মানুষ ধরে নিয়ে গিয়ে তো আর জিম্মি করেনি।

না, তা করেনি। তবে ভীষণ খেপে গেছে আঙ্কেল। আমার ভয় করছে। তার অনেক টাকার ক্ষতি! সবার সঙ্গে দুর্ব্যবহার শুরু করেছে।

কিন্তু আপনার তো কোন দোষ নেই, বলল কিশোর।

দোষটা টাকার। অনেক টাকা আসত কঙ্কালটা দেখাতে পারলে। হার্ডঅয়্যারের দোকান থেকে তার একআনাও আসে না।
দোকানে যান নাকি?
যাই, যখন সেন্টারে কাজ থাকে না। বেচাকেনায় সাহায্য করি। তবে বাধ্য হয়ে যেতে হয়, ভাল লাগে না একটুও। ভাল লাগে সেন্টারে কাজ করতে। সেখানে কেউ গালমন্দ করে না। ডাক্তার হ্যারিসন মাঝে মাঝে চেঁচায়, হাসি ফুটল লিলির ঠোঁটে, তবে তাতে মনে করার কিছু নেই। ডাক্তারের স্বভাবই ওরকম। এমনিতে খুব ভাল মানুষ। আমাকে প্রায়ই বলে আমার কলেজে ভর্তি হওয়া উচিত, স্যান ডিয়েগোতে, অথবা অন্য কোথাও।
ঠিকই তো। হন না কেন? জিজ্ঞেস করল রবিন।
সেখানে যেতে গাড়ি লাগে। কোথায় পাব? জেলডা আন্টিকে একদিন বলেছিলাম, সোজা মানা করে দিয়েছে। মেয়েমানুষের বেশি পড়ে নাকি লাভ নেই, অযথা টাকা নষ্ট। তাছাড়া, আমার মায়ের পরিণতির কথাও নাকি আমার মনে রাখা উচিত।
মানে? মুসার প্রশ্ন।
মানে, কলেজে গেলেই নাকি নাক উঁচু স্বভাবের হয়ে যায় মেয়েরা। বেশি লেখাপড়া শিখে আমার মার-ও নাকি এমন হয়েছিল। এই শহরে আর মন টেকেনি। চলে গিয়েছিল বড় শহরে। আমার বাবাকে বিয়ে করেছিল। আর সেজন্যেই নাকি কার অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে ওরা।
গরু নাকি মহিলা! ফস করে বলে ফেলল মুসা।
আচ্ছা, তোমরাই বলল, চোখ ছলছল করছে লিলির, এটা কোন। কথা হলো? এ শহরে থাকলেই যে কার অ্যাক্সিডেন্টে মারা যেত না, তার কোন গ্যারান্টি আছে? আর বলে কিনা, কলেজে গেলে উন্নাসিক হয়। আমি তো দেখেছি আমার মাকে, কত ভাল ছিল। সুন্দরী ছিল। আমার বাবাও ভাল ছিল। খুব সুন্দর শানাই বাজাত। শানাই খুব ভাল লাগে আমার। এখানে তো টিভি আর রেডিও ছাড়া কিছুই নেই। ভাল মিউজিক শোনার উপায় নেই।
থেমে দম নিল লিলি। তারপর আবার বলল, আমি এখান থেকে পালাতে চাই। টাকা জমাচ্ছি। সেন্টারে চাকরি করে যা পাই, তা থেকে। একশো ডলার জমিয়েছি। হলিউডে যে বাড়িটা আছে, সেটার ভাড়া তো আঙ্কেলই নিয়ে যায়, আমার থাকা-খাওয়ার খরচ বাবদ।
কত ভাড়া আসে, জিজ্ঞেস করেছেন কখনও? কিশোর বলল। সব টাকা লাগে আপনার খাওয়ায়? আপনি এখান থেকে চলে গেলে তো বাড়িভাঁড়ার কানাকড়িও পাবে না আপনার আঙ্কেল।

অবাক মনে হলো লিলিকে। কিন্তু আমি তো সেটা করতে পারব না। ভীষণ রেগে যাবে ওরা। আমাকে আর জায়গা দেবে না।
কি হবে তাতে? মুসা বলল। বাড়িভাঁড়ার টাকা দিয়েই তো আপনি চলতে পারবেন।
বলছি বটে পালাব, কিন্তু কোথায়, সেটাও ভাবি। যাওয়ার কোন জায়গা নেই আমার।
কেন, হলিউডে চলে যাবেন, পরামর্শ দিল রবিন। আপনার নিজের বাড়িতে।
তা কি করে হয়? ওটাতে লোক থাকে। তারা যাবে কোথায়? উঠে দাঁড়াল লিলি। ওখানে যেতে পারব না। আগে টাকা জমাই, তারপর দেখি কোথায় যাওয়া যায়।...তা তোমরা আসবে নাকি? যাবে। সেন্টারে?
আপনি যান, বলল কিশোর। গোলাঘরে যেতে হবে আমাদের। কয়েকটা জিনিস নিয়ে, তারপর আসছি।
লিলিকে চলে যেতে দেখল ছেলেরা।
পালানোর সাহস আছে ওর? মুসা বলল।
কি জানি, নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। এখানে থাকতেও চায় না, আবার অচেনা জায়গায় যেতেও ভয়।
ছাঁচ তোলার কাজটা শেষ করতে বসল সে।
তৈরি হয়ে গেল ডান পায়ের চমৎকার একটা প্রতিকৃতি।
দারুণ হয়েছে! চেঁচিয়ে উঠল মুসা।
হুম্‌ম্‌, দেখতে দেখতে আপনমনে মাথা দোলাল কিশোর। গুহামানবের পায়ে গণ্ডগোল ছিল।...দেখো, এই যে বুড়ো আঙুল। তারপর অনেক ফাঁক। এর পরে বাকি তিনটে আঙুল। মাঝের দ্বিতীয় আঙুলটা গেল কই? বুড়ো আঙুল আর বাকি তিনটের চাপে পড়ে ওপরে উঠে গিয়েছে। ছাপ পড়েনি মাটিতে।
গুহামানবের ছাপ! অবাক হয়েছে রবিন।
ঠিক মানাচ্ছে না, না? জুতো ঠিকমত পায়ে না লাগলে এবং সেই জুতো অনেক দিন পরলেই কেবল আঙুলের এরকম গোলমাল হয়।
ফিতে বের করে ছাঁচটা মাপল কিশোর। নয় ইঞ্চি।
মিউজিয়ামে চোর যে ছাপ রেখে গেছে, সেটা অনেক বড়, বলল সে। এটা ছোট।
ঢোক গিলল মুসা। তারমানে বলতে চাইছ, এটা গুহামানবের?
গুহামানব মরা, বলল কিশোর। অনেক বছর আগে মরেছে। আর মরা মানুষ কখনও উঠে হাঁটে না। এই ছাপটা আর যারই হোক, মরা মানুষের নয়।
আস্তাবলে পাওয়া গেল লিলিকে, ঘোড়ার যত্ন নিচ্ছে। বিল উইলিয়ামও। আছে সেখানে, একটা স্টলে হেলান দিয়ে কাজ দেখছে।

চুরির খবর শুনলাম, তিন গোয়েন্দাকে দেখে বলল বিল। আমার কপাল খারাপ, এমন একটা অনুষ্ঠান মিস করেছি। সর্দিতে কাহিল হয়ে শুয়ে ছিলাম বাড়িতে।
তাই নাকি? বলল কিশোর। এখন কেমন?
অনেকটা ভাল। এসব অসুখ বেশিক্ষণ থাকে না।
পার্কে যা-তা কাণ্ড হয়ে গেল, মুসা বলল। পৌনে এক ঘণ্টা ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিল সবাই।
ঘুম পেয়েছিল, কি আর করবে? রসিকতার সুরে বলল বিল। লিলির দিকে চেয়ে বলল, বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলো। আমি যাই। নীরবে চলে গেল সে, রবারসোল জুতোয় শব্দ হলো না।
রানিং শূ পরেছে, নিচু গলায় বলল মুসা।
অনেকেই পরে, লিলি বলল।
ঘোড়ার গা ডলা শেষ করল সে। আস্তাবল থেকে বেরিয়ে ল্যাবরেটরির দিকে রওনা হলো।
সঙ্গে চলল তিন গোয়েন্দা।
ডাক্তার ক্লডিয়াসের ল্যাবরেটরিতে ঢুকল ওরা। লিলিকে দেখে আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল শিম্পাঞ্জী দুটো, খাঁচার ভেতরে লাফালাফি শুরু করল।
আরে, থাম, থাম, হাসতে হাসতে বলল লিলি। খুলে দিল খাঁচার দরজা। দুই লাফে বেরিয়ে এসে তাকে জড়িয়ে ধরল শিম্পাঞ্জী দুটো।
হয় ওদের মানুষ হওয়া উচিত ছিল, কিংবা আপনার শিম্পাঞ্জী, হেসে বলল মুসা।
খুব ভাল ওরা, তাই না? কি মিষ্টি। আমাকে খুব ভালবাসে। ডাক্তার ক্লডিয়াসকে আরও ভালবাসত।
না বাসলেই বরং অবাক হতাম, রবিন বলল।
কিশোর কিছুই বলছে না। মরহুম বিজ্ঞানীর ডেস্কের কাছে দাঁড়িয়ে টেবিলের জিনিসপত্র দেখছে। অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুকটা চোখে পড়ল তার। খুলে পাতা ওল্টাতে লাগল। এক জায়গায় এসে আটকে গেল দৃষ্টি।
একটা পাতায় ছাপা রয়েছে, এপ্রিল ২৮। পরের পৃষ্ঠাটায় মে ১৯। মাঝখানের এতগুলো পাতা গায়েব।
বিশটা পৃষ্ঠা নেই, বিড়বিড় করল কিশোর। ইনটারেসটিং। আচ্ছা, মে-র শুরুতে কি মারা গিয়েছিলেন ডাক্তার ক্লডিয়াস?
আরেকদিকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছে লিলি। ইয়েমে-রই কোন একদিন, জোর নেই কণ্ঠে।
পাতাগুলো ছিঁড়ল কেন?

আ-আমি জানি না, একটা শিম্পাঞ্জীকে বাহুতে নিয়ে দোলাচ্ছে লিলি, মানুষের বাচ্চাকে যেভাবে দোলায় মা।
রবিন আর মুসা চেয়ে আছে তার দিকে, সতর্ক, কৌতূহলী দৃষ্টি।
সেদিন রকি বীচে ডাক্তার ক্লডিয়াসের সঙ্গে কেন গিয়েছিলেন? জিজ্ঞেস করল কিশোর। তার সঙ্গে এই ছেঁড়া পাতার কোন সম্পর্ক আছে?
না।...আমার মনে হয় না।
শিম্পাঞ্জীর কোন ব্যাপার?
হতে পারে। তার কাজকর্মের ব্যাপারে তেমন কিছু জানতাম না, শুধু জানোয়ারগুলোকে দেখাশোনা করতাম। সঙ্গে গিয়েছিলাম, কারণ কারণ তিনি ভাল বোধ করছিলেন না।
হারবারভিউ লেনের কোথায় যেতে চাইছিলেন? কে থাকে ওখানে?
লিলির চোখে অস্বস্তি বাড়ল। কেশে গলা পরিষ্কারের চেষ্টা করল অযথা। দু-গালে অশ্রুধারা।
আজ আমার ভাল্লাগছে না, অবশেষে বলল সে। কিছু মনে কোরো না। তোমরা আজ যাও।
ল্যাবরেটরি থেকে বেরিয়ে এল ছেলেরা। ওয়ার্করুমে দেখা হলো মিসেস গ্যারেটের সঙ্গে। ছাপার পোশাকের ওপরে দোমড়ানো একটা অ্যাপ্রন পরেছে। মাথায় উইগ-কালো চুলের মাঝে সাদা একটা ব্রেখা।
সব ঠিক আছে তো? হেসে জিজ্ঞেস করল মহিলা।
কিশোরের মনে হলো, বেশি কথা বলা এবং বেশি মিশুক যেহেতু, নিশ্চয় মূল্যবান তথ্য জানাতে পারবে মিসেস গ্যারেট। চেহারাটাকে বিষণ্ন করে তুলল চোখের পলকে। লিলির মন খারাপ করে দিয়ে এসেছি। ডাক্তার ক্লডিয়াসের কথা তুলেছিলাম। কাঁদতে আরম্ভ করল।
আফসোসের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল মহিলা। ডাক্তারকে খুব ভালবাসত। আমরা সবাই বাসতাম। ভাল লোক ছিল।
লস অ্যাঞ্জেলেসে সেদিন কেন গিয়েছিল, জানেন? মারা গেল যেদিন। কোন আত্মীয় থাকে ওখানে?
জানি না। কথা খুব কম বলত তো, কিছু জানার উপায় ছিল না। আমার মনে হয়, জানোয়ারগুলোর ব্যাপারে কোন কিছু। যা কাণ্ড করত না ওগুলোকে নিয়ে। সন্তানের মত ভালবাসত। কোনটা মরে গেলে দিনের পর দিন তো সন্তানের মত ভাল।কান কিছু। যা কাওছ।
কটা মরেছে?

অনেকগুলো। লাশগুলো কেটে-চিরে দেখত ডাক্তার। জ্যান্ত জানোয়ারের অপারেশনও করত। ওগুলো যখন ঘুমিয়ে থাকত, প্রায়ই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখত। কি যেন ভাবল মিসেস গ্যারেট। ওগুলো তখন ঘুমাতও কেন জানি খুব বেশি। এখন অনেক সজীব হয়েছে।

ঝনঝন করে কি যেন ভাঙল হলরুমে।

হায়, হায়, কি ভাঙল। দরজার কাছে ছুটে গেল মহিলা। আরে, বিলি। হাতে জোর নেই?

বেরিয়ে এল বিল উইলিয়ামস। এক হাতে ঝাড়, আরেক হাতে ভাঙা সাদা একটা ডিশ জাতীয় পাত্র। তেমন কিছু নষ্ট করিনি। খালিই ছিল।

খালি ছিল বলে দাম নেই নাকি? আরও হুঁশিয়ার হয়ে কাজ করবে।

ছেলেদের দিকে আলতো মাথা নুইয়ে হাঁটতে শুরু করল বিল।

মার্কেট থেকে ওগুলো কখন আনবে? পেছন থেকে চেঁচিয়ে। জিজ্ঞেস করল মিসেস গ্যারেট।

আমি এখন পারব না! চেঁচিয়েই জবাব দিল বিল। এত ক্যাট ক্যাট করে! চলে গেল দরজার বাইরে।

নাকমুখ কুঁচকে বিচিত্র শব্দ করল মহিলা।

বাইরে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা।

ড্রাইভওয়েতে পার্ক করা আছে একটা পুরানো দুই-দরজার সিডান গাড়ি। তাতে উঠছে বিল। ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে অপেক্ষা করল। ছেলেরা কাছে এলে বলল, বুড়ি হলে মেয়েমানুষগুলো একেকটা শয়তান হয়ে যায়, বাঁকা হাসল সে। ছেলেদেরকে লিফট দিতে চাইল।

থ্যাংকস, বলল কিশোর। ওদিকে যেতে চাই না। দেখল, পেছনের সীটে গাদাগাদি হয়ে আছে ম্যাগাজিন, কাদামাখা বুটজুতো, দোমড়ানো একটা কাগজের বাক্স, একটা স্কুবা মাস্ক, আর একটা ওয়েট স্যুট।

মাথা ঝাঁকিয়ে, গাড়ি নিয়ে চলে গেল বিল।

বড় বেশি আজেবাজে কথা বলে, তিক্ত কণ্ঠে বলল মুসা। একজন মহিলাকে শ্রদ্ধা করতে জানে না। ওর মা বুড়ো হয়নি?।

হুঁ! মুসার কথা কিশোরের কানে গেছে বলে মনে হলো না। খানিক আগে মিসেস গ্যারেটের সঙ্গে যা যা কথা হয়েছে, সেগুলো নিয়ে ভাবছে।

ডাক্তার ক্লডিয়াস এতটা চাপা স্বভাবের না হলে ভাল হত, অবশেষে বলল সে। রকি বীচে কেন গিয়েছিলেন, মিসেস গ্যারেটকে একথা বললে, আমরা জানতে পারতাম। পেটে কথা থাকে না মহিলার। ওদিকে লিলি হয়েছে উল্টো। কথাই বের

করা যায় না তার কাছ থেকে। আমি শিওর, লিলি অনেক মিথ্যে কথা বলেছে।
কেন? কি গোপন করছে?
গুহামানব সম্পর্কে কিছু? রবিন বলল।
কে জানে?
গোলাঘরের কাছে পৌঁছে জেলডাকে পেছনের বারান্দায় দেখল কিশোর।
গোলাঘরের দিকে চলল ওরা।
ওখানে পৌঁছে জেলডাকে দেখা গেল তার বাড়ির পেছনের বারান্দায়।
ছেলেদের দেখেই চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, লিলিকে দেখেছ?
দেখেছি, জবাব দিল রবিন। সেন্টারে।
হুম। হতচ্ছাড়া জানোয়ারগুলোর কাছে। সুযোগ দিলে এই ঘরের মধ্যেই এনে তুলত ওগুলোকে। সাফ বলে দিয়েছি, ভাড়া দিতে না পারলে এখানে কারও জায়গা হবে না।
তা তো নিশ্চয়ই, মোলায়েম স্বরে বলল কিশোর। আচ্ছা, ম্যাডাম, স্পিঙ্কলার সিসটেমের পানি যে নিয়ে গেছে পরীক্ষা করতে, করেছে? কোন খবর এসেছে? কিছু পাওয়া গেছে?
পাওয়া যায়নি। ট্যাংকের পানিতেও না, স্পিৃঙ্কলারেও না! শেরিফ তো অবাক। বলল, সারা শহর নাকি পাইকারী সম্মোহনের শিকার হয়েছিল।
জেলা ম্যাকম্বার ভেতরে চলে যেতেই চেপে রাখা নিঃশ্বাসটা ছাড়ল কিশোর। পাইকারী সম্মোহনে আমার বিশ্বাস নেই। মরহুম বিজ্ঞানীও অস্থির করে তুলেছে আমাকে।
মরা মানুষেরা অস্থির করেই, মুসা বলল। সেজন্যেই তো ওদের। কাছে ঘেঁষতে নেই...
সে কথা বলছি না। আমি ভাবছি ছেঁড়া পাতাগুলোর কথা। নিশ্চয় মূল্যবান কিছু ছিল ওগুলোতে। ইস, ডাক্তার ক্লডিয়াসের অফিসের কাগজপত্র আর কয়েকটা ফাইল যদি পড়তে পারতাম।
পারবে না, রবিন নিরাশ করল। মূল্যবান কাগজপত্র আলমারিতে তালা দিয়ে রাখাই স্বাভাবিক।
হুঁ, বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা দোলাল কিশোর। তারপর উজ্জ্বল হলো চোখের তারা। বিল কিন্তু আজ পার্কে যায়নি, সকালে। ওই সময়ে শহরের আর কে কে অনুপস্থিত ছিল?
রবিনের কপালে ভাঁজ পড়ল। আমাদের চেনা সবাইই তো ছিল...শুধু, বিল আর জিপসি ফ্রেনি বাদে।

আচ্ছা, জিপসিকে বাদ দিচ্ছি কেন আমরা? মুসা বলল। ওর কথা ভাবছি না কেন? হয়তো বোকা সেজে থাকা তার একটা ভান।
না, মাথা নাড়ল রবিন। অনেক বছর ধরে আছে সে এখানে। ফন্দিবাজ হলে অনেক আগেই লোকের চোখে পড়ত।
আমারও তাই মনে হয়, কিশোর একমত হলো। গতরাতে কাউকে সত্যি সত্যি দেখেছে সে। তার প্রমাণও পেয়েছি আমরা। পায়ের ছাপ। লোকটা কোথায় গেল, দেখা হলো না কিন্তু।
মাঠের ওপারে বনের দিকে তাকাল মুসা। চলো না, গিয়ে দেখি এখন।
ছাপটার কাছে এল ওরা প্রথমে। তারপর সোজা হাঁটতে লাগল। বনের মধ্যে এক জায়গায় খোলা মাটি পাওয়া গেল, নরম। পায়ের ছাপও মিলল সেখানে।
সাবধানে এগিয়ে চলেছে তিন গোয়েন্দা। ভয়, যেন গাছের আড়ালে ঘাপটি মেরে আছে বিপদ।
অবশেষে পাতলা হয়ে এল বন। বনের কিনারে এসে দাঁড়াল ওরা। সামনে আবার তৃণভূমি আর বৈচিঝোঁপ। পুরানো একটা ভাঙা বিল্ডিং দেখা গেল। দেয়ালের লাল ইটের পাঁজর বেরিয়ে পড়েছে এখানে সেখানে, কোথাও কোথাও ধসে পড়েছে। লাল টালির ছাতের বেশির ভাগটাই ধসা। থামের মাথা বেরিয়ে আছে।
গির্জা ছিল, অনুমান করল রবিন।
জবাব দিল না কেউ।
বাড়িটার দিকে এগোল ওরা।
বিশাল কাঠের দরজার একটা পাল্লা কজা খুলে পড়ে গেছে, আরেকটা আছে জায়গামত। পড়ে থাকা পাল্লাটা পেরিয়ে ভেতরে ঢুকল। ওরা।
গুহামানব গতরাতে এখানেই ঢুকেছিল? প্রশ্ন করল মুসা।
কি করে বলি, চিহ্ন খুঁজছে কিশোর। কোন চিহ্নটিহ্ন তো দেখছি না।
এক মুহূর্ত দ্বিধা করে গির্জার সামনের দিকে এগোল রবিন। একধারে খানিকটা উঁচু জায়গা, দুটো সিঁড়ি ডিঙিয়ে উঠতে হয়।
মঞ্চ, বলল রবিন। দেখো, ওই যে আরেকটা দরজা। ঘর আছে। ভেস্ট্রি হতে পারে, পাদ্রীরা তাদের আলখেল্লা বোধহয় ওখানেই রাখত।
দাঁড়িয়ে আছে ছেলেরা। মাত্র দুটো সিঁড়ি ডিঙানোর সাহস নেই যেন। নীরবে চেয়ে আছে দরজাটার দিকে। কি আছে ওপাশে?
একটা শব্দ শোনা গেল। হৃৎপিণ্ডের গতি দ্রুত হয়ে গেল ওদের। দরজার ওপাশে কে জানি নড়ছে। মড়মড়, খসখস আওয়াজ। ঝমঝম করে কি যেন পড়ল। তারপর আবার নীরবতা। এক পা পিছিয়ে গেল মুসা। বিপদ দেখলেই ঘুরে দেবে দৌড়।

সাহস দেখাল রবিন। পা বাড়াল সিঁড়িতে ওঠার জন্যে। খপ করে তার হাত চেপে ধরল মুসা। যেয়ো না! ফিসফিস করে বলল। হয়তো ওটাই...
কোটা, খুলে বলার দরকার হলো না, বুঝল রবিন। গুহামানবের কথা বলছে মুসা। তার ধারণা, গুহা থেকে জ্যান্ত হয়ে উঠে চলে এসেছে। ওটা।
অসম্ভব! নিচু গলায় বলল কিশোর। এগিয়ে গেল সিঁড়ির দিকে। উঠল উঁচু জায়গাটায়। হাত রাখল দরজার নবে।
শিউরে উঠল হঠাৎ। সে ঘোরানোর আগেই ঘুরতে শুরু করেছে দরজার নব। গুঙিয়ে উঠল মরচে ধরা কজা, খুলতে শুরু করল পাল্লা!
আরে, তোমরা! প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন ডাক্তার রেডম্যান। খুব চমকে দিয়েছ যা হোক। এখানে কি করছ?
কাঁপছে তখনও কিশোর। জোর করে হাসল। এই একটু ঘুরে দেখতে এসেছি।
ঠিকই আন্দাজ করেছে রবিন। ওটা ভেস্টিরুমই। তারপরে গির্জার হল। সব শেষে আরেকটা ছোট ঘরের পরে বেরোনোর দরজা। খোলা। দেখা যাচ্ছে মঞ্চ থেকেই।
আসা উচিত হয়নি, বললেন ডাক্তার। এটা প্রাইভেট প্রোপার্টি। ওয়ারনারদের সম্পত্তি। পাহাড়ের ওদিকে বিরাট বাড়ি আছে ওদের। অনুমতি নিয়ে আমি এসেছি। বাইরের কারও আনাগোনা এখানে পছন্দ করে না ওরা। সিঁড়ির ওপর বসলেন তিনি। তবে, তোমাদের দোষ দেয়া যায় না। এ-বয়েসে আমিও ওরকম ছোঁক ছোঁক করতাম। পুরানো বাড়ির কত ভাঁড়ার আর চিলেকোঠায় যে চুরি করে ঢুকেছি।
জোরে হাঁচি দিলেন ডাক্তার। নাক টানলেন। পকেট থেকে রুমাল বের করে নাক-চোখ মুছে বললেন, ইস, হতচ্ছাড়া এই সর্দি আর গেল না। অ্যালার্জি আছে আমার। আর এটাই আমাকে ইমিউনিটির ব্যাপারে আগ্রহী করেছে। উঠে দাঁড়ালেন। যাওয়া দরকার। শরীরটা ভাল লাগছে না। শহরে যাবে, নাকি আরও ঘোরাঘুরি করবে? তবে করাটা উচিত হবে না। বুড়ো ওয়ারনার পছন্দ করে না এসব। একটা শটগান। আছে, দেখলেই ওটা নিয়ে তাড়া করে লোককে। বিশেষ করে তোমাদের বয়েসী ছেলেদের।
শটগান আরও একজনের আছে, হেসে বলল কিশোর। জনাব কিংসলে ম্যাকম্বারের।
চলো, ফিরেই যাই, মুসা বলল।
ডাক্তার রেডম্যানের সঙ্গে বেরিয়ে এল ওরা।
অ্যালার্জির ব্যাপারে আগ্রহ? বুনোপথ ধরে চলতে চলতে বলল কিশোর। কিন্তু আপনি তো ইমিউনোলজিস্ট। অ্যালার্জি বিশেষজ্ঞদের
অ্যালির্জিস্ট বলে না? তাই তো জানি।

ঠিকই জানো। তবে একটার সঙ্গে আরেকটার যোগাযোগ আছে। ইমিউনিটিও একধরনের অ্যালার্জিক রিঅ্যাকশন।
তাই নাকি? রবিন বলল।
মাথা ঝাঁকালেন ডাক্তার। আমাদের শরীর নিজেকে বাঁচানোর জন্যে নানারকম উপায় করে রেখেছে। প্রয়োজনে অ্যান্টিবডি তৈরি করতে পারে। ওই অ্যান্টিবডি ক্ষতিকারক ভাইরাস আর ব্যাকটেরিয়া নষ্ট করে দেয়। ধরো, তোমার হাম হলো। তখন তোমার শরীরের ভেতরে অ্যান্টিবডি তৈরি হবে, ওই রোগের জীবাণুর সঙ্গে লড়াই করার জন্যে। রোগ সেরে যাওয়ার পরেও ওই অ্যান্টিবডির খানিকটা তোমার শরীরে থেকেই যাবে। ফলে সহজে আর হাম হবে না।
কিংবা ধরো, বিশেষ কোন কিছুতে তোমার অ্যালার্জি আছে। এই, কোনধরনের ফুলের রেণুতে। ওসবের সংস্পর্শে এলেই প্রতিক্রিয়া হবে। তোমার শরীরে, অ্যান্টিবডি তৈরি শুরু হবে। যেহেতু কোন জীবাণু পাবে না নষ্ট করার মত, রিঅ্যাকশন করে বসবে তখন ওই অ্যান্টিবডি। একধরনের রাসায়নিক দ্রব্য বেরোতে থাকবে, যাকে বলে হিসটামিন। হয়তো তখন নাক ফুলে যাবে তোমার, চোখ দিয়ে পানি পড়বে।
শরীরের এই ইমিউন সিসটেমই অনেক রকম ক্ষতি থেকে বাঁচিয়ে রাখে আমাদের। তবে কখনও কখনও এই সিসটেম শারীরিক ক্ষমতার আওতার বাইরে চলে যায়। আর তখনই দেখা দেয় বিপদ। নানারকম মারাত্মক অসুখ দেখা দেয়। যেমন, গেঁটে বাত। সর্দি-কাশি। আজকাল বলা হয়ে থাকে, ক্যানসার নাকি ইমিউন রিঅ্যাকশনের জন্যেই হয়ে থাকে। তবে সেটার প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়নি।... এমনকি, ইমিউনিটিই মানুষের মাঝে অপরাধ প্রবণতা জাগিয়ে তোলার জন্যে দায়ী।
অপরাধ প্রবণতা? প্রতিধ্বনি করল যেন মুসা।
অনেক সময় ভয়ের প্রতিক্রিয়া থেকে জন্ম নেয় অপরাধ, ব্যাখ্যা করলেন ডাক্তার। ধরো, কোন বিপজ্জনক জায়গায় বেড়ে উঠছে। একজন মানুষ। সারাক্ষণ ভীতির মাঝে কাটাতে হয় তাকে। ফলে শরীরে গড়ে ওঠে ভয়কে রোধ করার বিশেষ ব্যবস্থা। স্বভাব বদলে যায় মানুষটার। অনেকটা বুনো জানোয়ারের মত হয়ে ওঠে। নিজেকে বাঁচানোর তাগিদে আক্রান্ত হওয়ার আগেই আক্রমণ করে বসে। গম্ভীর হয়ে গেছেন রেডম্যান। শরীরের এই প্রতিরোধ ব্যবস্থা আমাদের জন্যে। খুবই দরকারী, আবার মস্ত বড় হুমকিও বটে। ল্যাবরেটরিতে ইঁদুরের ওপর পরীক্ষা চালাচ্ছি আমি। ওগুলোর ইমিউন সিসটেম নষ্ট করে দিয়ে ভরে রেখেছি জীবাণু-নিরোধক কাঁচের বাক্সে। দেখেছি, ইমিউন সিসটেম নিয়ে অপ্রতিরোধ্য অবস্থায়

যেগুলো থাকে, সিসটেম ছাড়াগুলো তার চেয়ে বেশি বাঁচে। ইমিউন থেকে জন্ম নেয় যেসব রোগ, তেমন রোগ স্পর্শ করে না ওগুলোকে।
কল্পনা করো এখন, ইমিউন ছাড়া, কিংবা ভিন্ন ইমিউন সংযোজিত মানুষের কথা। কত মারাত্মক রোগ থেকে বেঁচে যাবে। যদি সফল হতে পারি! মাথা নাড়লেন ডাক্তার। আর কি সব ছাইপাঁশ নিয়ে আছে অন্য ডাক্তাররা। ক্লডিয়াসের কথাই ধরো। কি করতে চেয়েছে? বুদ্ধিমত্তায় পরিবর্তন ঘটাবে, আহা! তাতে কি কচুটা হবে? হ্যারিসনটা আছে পুরানো হাড়গোড় নিয়ে। কখন কোটার জন্ম হয়েছে জানলে কি পৃথিবীর রূপ বদলে যাবে? যত্তোসব, এনার্জি লস!
বনের বাইরে বেরিয়ে এল ওরা।
ছেলেদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে, বিদায় নিয়ে সেন্টারের দিকে রওনা হলেন রেডম্যান।
কিছুক্ষণ স্তব্ধ নীরবতার পর মুসা বলল, আমি শিওর, এবারকার গ্যাসপার পুরস্কার ডাক্তার রেডম্যানই পাবেন।
আনমনে মাথা ঝাঁকাল শুধু কিশোর। খাওয়ার জন্যে কাফেতে চলল ওরা।
শহরের ভিড় অনেক কমে গেছে। কাফে প্রায় খালি। আরাম করে বসে খেতে খেতে আলোচনা চালাল ছেলেরা।
জটিল এক রহস্য, মুখ বাঁকিয়ে বলল মুসা। কি কাণ্ড রে, বাবা! সারা শহর একসাথে ঘুমিয়ে পড়া! ওদিকে গুহা থেকে গায়েব হয়ে গেল গুহামানব।
পায়ের ছাপের ছাঁচটা, কিশোর বলল, ডাক্তার হ্যারিসনকে দেখালে কেমন হয়?
কি হবে তাতে? প্রশ্ন রাখল রবিন। গুহামানব যে নয়, এটা তো আমরাই জানি।
তা জানি। তবে, কি থেকে কি বেরোয় কে জানে।
হ্যাঁ, চেষ্টা করতে দোষ নেই।
খাওয়া শেষ করে গোলাঘরে ফিরে এল ছেলেরা। ছাঁচটা নিয়ে চলল গ্যাসপার সেন্টারে।
ওয়ার্করুমেই পাওয়া গেল ডাক্তার হ্যারিসনকে। কাগজ আর বইপত্র বোঝাই ডেস্কের সামনে বসে আছেন। ছেলেদের দেখে মুখ তুলে তাকালেন। ওদের ভয় ছিল, দেখেই ফেটে পড়বেন। সেসব কিছু করলেন না। হাতের বইটা বন্ধ করে রেখে জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার?
কিছু পরামর্শ চাই, স্যার, খুব বিনীতভাবে বলল কিশোর, কিংবা বলতে পারেন, কিছু তথ্য। রাতে মিস্টার ম্যাকম্বারের গোলাঘরের মাচায় থাকি আমরা। গতরাতে একটা কাণ্ড ঘটেছে, সেখানে থাকায় শুনতে পেয়েছি।
জিপসি যে গুহামানব দেখেছে, সেই গল্প বলল কিশোর। শেষে পায়ের প্রতিকৃতিটা বের করে দিল।

একনজর দেখেই ওটা টেবিলে রেখে হাসলেন ডাক্তার। প্রাগৈতিহাসিক মানুষের ছাপ পেয়েছ ভেবে খুশি হলে নিরাশ হতে হবে। বেশিদিন খালি পায়ে হাঁটলে পায়ের পাতা ছড়িয়ে যায়, আর এটাতে ছড়ানো তো দূরের কথা, একটা আঙুলই অস্পষ্ট। তারমানে খুব। টাইট জুতো পায়ে দেয়।
কিন্তু জিপসি বলল একজন গুহামানবকে দেখেছে, রবিন বলল। লম্বা লম্বা চুল। পরনে পশুর ছাল।
শব্দ করে হাসলেন এবার হ্যারিসন। গুহামানবেরা যে পশুর ছাল পরতই, এটা কি শিওর? জানো? জিপসি কি দেখেছে কে জানে, তবে গুহামানব হতেই পারে না। পায়ের ছাপই সেটার প্রমাণ। এটা কোন হোমিনিডের পায়ের ছাপ নয়। অনেক বড়।
বড়? অবাক হলো মুসা। কিন্তু মাত্র নয় ইঞ্চি।
তারমানে ওই পায়ের মালিকের উচ্চতা পাঁচ ফুট তিন-চার ইঞ্চি। গুহায় যে কঙ্কালটা ছিল, তার চেয়ে অনেক বড়।...দাঁড়াও, দেখাচ্ছি। আফ্রিকায় একটা কঙ্কাল পেয়েছি আমি। হোমিনিড়। প্রায় বিশ লাখ বছর আগের। এখানে যেটা পাওয়া গেছে, তার চেয়ে কিছু ছোট। তবু ধারণা করতে পারবে।
একটা বড় কেবিনেটের দরজা খুললেন ডাক্তার।
ভেতরে তাকিয়েই স্থির হয়ে গেলেন। নেই! ফিসফিসিয়ে বললেন কোনমতে। তারপর চেঁচিয়ে উঠলেন। নেই! নেই ওটা! চুরি করে নিয়ে গেছে!
সেই বিকেলে ম্যাকম্বারকে একহাত নিল কিশোর।
ভাড়া চাইতে এলে বলল, ওরা চলে যাচ্ছে। লোকের ভিড় নেই। বাইরেই ক্যাম্প করে রাত কাটাবে।
একধাক্কায় মাচার ভাড়া অর্ধেক করে ফেলল ম্যাকম্বার। পাঁচ ডলার, রাতপিছু।
তাতেও রাজি হলো না কিশোর।
শেষে, তিন ডলারে রফা হলো। টাকা গুনে দিয়ে হাসতে হাসতে মাচায় এসে উঠল মুসা আর রবিনকে নিয়ে।
অন্ধকারে শুয়ে রইল ওরা কিছুক্ষণ, নীরবে। ভাবছে, দিনের ঘটনাগুলোর কথা।
নীরবতা ভাঙল মুসা, অবাক কাণ্ড! এই কঙ্কাল চোর এতদিন ছিল কোথায়?
আজ নিয়েছে, না আগেই নিয়েছে, কে জানে, রবিন বলল।
ডাক্তার তো বললেন, মাস তিনেক ধরে আর কেবিনেট খুলে দেখেননি। এর মাঝে যে কোন সময় চুরি হয়ে থাকতে পারে।
হ্যাঁ, সায় জানাল কিশোর। ডাক্তার ক্লডিয়াসের মৃত্যুর সময়ও হতে পারে।
গুঙিয়ে উঠল মুসা। আবার ক্লডিয়াস। তাঁর সঙ্গে কঙ্কাল চুরির কোন যোগ থাকতে পারে না। তিনি শুধু সেন্টারে ওটার কাছাকাছি বাস করতেন, ব্যস।

লিলির ব্যাপারটা ঠিক পরিষ্কার হচ্ছে না, বলল কিশোর। সে জানে, সেদিন হারবারভিউ লেনে কেন যাচ্ছিল, কিন্তু বলছে না।
হ্যাঁ, জানে, রবিন বলল। দেখলে না, কথা বলার সময় আরেকদিকে চেয়ে ছিল। তারমানে মিছে কথা বলছিল?
আর কেনই বা ডাক্তার ক্লডিয়াসের অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক থেকে পাতাগুলো নিখোঁজ হলো? কি লেখা হয়েছিল ওগুলোতে? তিনিই ছিঁড়েছেন, না অন্য কেউ?
অ্যাই, শোনো, উত্তেজনা ফুটল রবিনের কণ্ঠে। হারবারভিউ লেন আমি চিনি। কাল ওখানে গিয়ে খোঁজ নিলে কেমন হয়? আমি একাই নাহয় যাব। খুব ছোট লেন। হয়তো কোন তথ্য জানতে পারব। বের করে ফেলতে পারব, কার কাছে যাচ্ছিলেন ক্লডিয়াস।
ভালই হয়, কিশোর বলল। আমি সেন্টারে গিয়ে চেষ্টা করব তাঁর কাগজপত্র পড়ার।
তাহলে আমি যাব সেন্টারডেলে, উঠে বসল মুসা।
ওখানে কি? জানতে চাইল রবিন।
জানি না। তবে সাইট্রাস গ্রোভের পাশের শহর ওটা। আর ওখান থেকেই এসেছে মুক্তিপণের চিঠি। খোঁজ নিলে আমিও হয়তো কোন তথ্য জানতে পারব।
খুব ভাল হয়, বলল কিশোর।
গির্জার ঘড়িতে ঘণ্টা বাজল।
আর কোন কথা হলো না, ঘুমিয়ে পড়ল ওরা।
সবে যেন চোখ মুদেছে কিশোর, আর অমনি ঝাঁকাতে শুরু করল। তাকে মুসা।
কী? চোখ না খুলে জিজ্ঞেস করল সে।
আর কত ঘুমাবে? আটটা বাজে, মুসা বলল।
ওঠো, ওঠো। রবিন আগেই উঠেছে।
বাইরের কলে হাতমুখ ধুয়ে নিল ওরা। ভীষণ ঠাণ্ডা। গায়ে কাঁপুনি তুলে দেয়।
কাফেতে এসে পেট ভরে নাস্তা খেল। তারপর তিনজন চলে গেল তিনদিকে।
সেন্টারের দরজায় এসে দাঁড়াল কিশোর। পাল্লা খোলা। ভেতর থেকে মিসেস গ্যারেটের কণ্ঠ কানে আসছে।
কসম খেয়ে বলতে পারি, জোরগলায় বলছে মহিলা, গতকাল ছিল না ওটা ওখানে। কত খোঁজা খুঁজেছি।
ভেতরে উঁকি দিল কিশোর। মিসেস গ্যারেটকে দেখা গেল। ধূসর একটা উইগ পরেছে আজ, কাঁধ পর্যন্ত লম্বা চুল।
বললামই তো, পাবে, খোজো ভালমত, বলল আরেক মহিলা। একে আগে দেখেনি কিশোর। নীল ইউনিফর্ম পরেছে, তার ওপরে সাদা। অ্যাপ্রন। হাতে

পালকের ঝাড়ন।
আমি বলছি, খুঁজেছি, রেগে গেল মিসেস গ্যারেট। এখানে
অন্তত দশবার খুঁজেছি। কাল ছিল না।
আর তর্ক না করে কাঁধ ঝাঁকিয়ে মুখ বাঁকিয়ে ঝাড়ন হাতে চলে গেল দ্বিতীয় মহিলা।
ফিরে তাকিয়ে দরজায় কিশোরকে দেখল মিসেস গ্যারেট। লিলিকে খুঁজছ? নেই।
ডাক্তার হ্যারিসন আছেন?
আছে। মুখ হাউপ! গাল ফুলিয়ে দেখাল মহিলা। তার ঘরে।
মহিলাকে ধন্যবাদ দিয়ে সেখানে চলল কিশোর। ওয়ার্করুমের কাছাকাছি আসতেই কানে এল ডাক্তারের উত্তেজিত চিৎকার, ধমক। ধুড়ম-ধাড়ম করে কি যেন ফেলা হচ্ছে।
দরজায় দাঁড়িয়ে দ্বিধা করল কিশোর। টোকা দিল।
ঝটকা দিয়ে খুলে গেল দরজা। কী? চেঁচিয়ে উঠলেন হ্যারিসন। কি চাই?
ওকে ধমকাচ্ছ কেন? ভেতর থেকে বলল একটা শান্ত কণ্ঠ, ডাক্তার রুডলফ। আর্মচেয়ারে বসে আছেন।
আবার চিৎকার করার জন্যে মুখ খুলেও থেমে গেলেন হ্যারিসন, কিশোরকে অবাক করে দিয়ে হাসলেন। সরি। এসো, ভেতরে এসো।
ঘরে ঢুকল কিশোর।
সারা ঘরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বই, কাগজপত্র। টাইপরাইটার রাখার টেবিলটা কাত হয়ে পড়ে আছে। মেশিনটাও মেঝেতে।
কিশোরের দিকে চেয়ে হাসলেন ডাক্তার রুডলফ।
দেখে হাটো। পা রাখার তো আর জায়গা রাখেনি।
লজ্জিত হলেন হ্যারিসন। টেবিলটা সোজা করে তার ওপর তুলে রাখলেন মেশিনটা। খসে পড়ে গেল রোলারের ভাঙা একটা গোল মাথা। মেঝের ওপর দিয়ে গড়িয়ে চলে গেল।
দূর! সেদিকে চেয়ে আবার চেঁচিয়ে উঠলেন হ্যারিসন।
জিনিসপত্র নষ্ট করার ওস্তাদ ও, সহকর্মীকে দেখিয়ে বললেন রুডলফ।
করব না তো কী? প্রতিবাদ করলেন হ্যারিসন। কার মাথা ঠিক থাকে। এতসব গণ্ডগোল। তার ওপর ম্যাকম্বারের বাচ্চা দিয়েছে মেজাজ আরও খারাপ করে। বলে বেড়াচ্ছে, আমিই নাকি তোক দিয়ে তার কঙ্কাল চুরি করিয়েছি। যাতে লোকে অন্যরকম ভাবে, সেজন্যে নাকি মুক্তিপণের নোট পাঠিয়েছি। তারপর, আমার কঙ্কাল আমিই লুকিয়ে রেখে রটিয়েছি চুরি গেছে। শয়তান কোথাকার! কিশোরের

দিকে তাকালেন। অন্যকে যে বলছে, শুধু তাইই না। আমাকে ফোন করেও বলে এ কথা। ব্যাটাকে খুন করব আমি।
ও বলে বলুক না, তোমার কি? বোঝানোর চেষ্টা করলেন। রুডলফ। কে বিশ্বাস করছে ওর কথা?
এখান থেকেও যে কঙ্কাল চুরি গেল, সাবধানে বলল কিশোর, অবাক লাগছে না আপনার?
অবাক! মাথাই খারাপ হয়ে গেছে আমার।
তারমানে, গুহামানবকে যে চুরি করেছে, এটাও সে-ই করেছে, এমনও তো হতে পারে।
ঝট করে চোখ তুললেন হ্যারিসন। তাই তো। একথা তো ভাবিনি। কিন্তু কে? আমার কঙ্কালটার কথা তো সেন্টারের বাইরের কেউ জানে না। মিসেস গ্যারেট আর ডাক্তার রুডলফ, এই তো।
কেন, লিলি জানে তো।
ও জানলেও কিছু হবে না। ভীতুর ডিম। হোমিনিড চুরি করার সাহস ওর হবে না। আরে তাই তো..এখন মনে পড়ছে। আমার ওপর চোখ রাখত মেয়েটা। হাঁ করে তাকিয়ে থাকত। আলমারি কিংবা টেবিলের আড়াল থেকে…অদ্ভুত! ভাবিনি তো আগে।
হেসে উঠলেন রুডলফ। ব্যঙ্গ করে বলল, ভেবেছে, সত্যিই পাগল হয়ে গেল কিনা লোটা, দেখি তো। নাহলে আর কি কারণ? পরক্ষণেই বদলে গেল কণ্ঠস্বর, দেখো, ওকে সন্দেহ করবে না বলে দিলাম। বাচ্চা মেয়ে। স্কুলের গন্ধও যায়নি গা থেকে। ও চুরি করবে না।
তাহলে কে করেছে? এমনভাবে বললেন হ্যারিসন, যেন রুডলফ জানেন।
তবে লিলির জানাশোনা আছে অনেকের সঙ্গে, বলল কিশোর। সেন্টারের বাইরেও লোকের সঙ্গে পরিচয় আছে, তাদের সঙ্গে কথা বলে।
চোখের পাতা সরু হয়ে এল হ্যারিসনের। তোমার এত আগ্রহ কেন?
আমি আর আমার দুই বন্ধু গোয়েন্দা, সহজ গলায় বলল কিশোর।
গোয়েন্দা? হাসলেন হ্যারিসন।
হ্যাঁ, পকেট থেকে তিন গোয়েন্দার নাম লেখা কার্ড বের করে দিল কিশোর।
আই সী, পড়ে বললেন ডাক্তার। ভালই হলো। এখন আমার। সবচেয়ে বেশি দরকার গোয়েন্দার। হ্যাঁ, যা বলছিলাম। লিলিকে সন্দেহ করছ তো? অহেতুক। চুরি করার সাহস ওর হবে না।
ডাক্তার ক্লডিয়াস পছন্দ করতেন ওকে, মনে করিয়ে দিল কিশোর। কঙ্কাল চুরি আর ডাক্তার ক্লডিয়াসের রকি বীচে যাওয়ার পেছনে কারও যোগাযোগ থাকতে

পারে।
তা কি করে হয়? প্রতিবাদ করলেন ডাক্তার রুডলফ। সেটা তো তিনমাস আগের ঘটনা। গুহামানবের কঙ্কাল তখনও পাওয়াই যায়নি।
ডাক্তার ক্লডিয়াস রকি বীচে কেন গিয়েছিলেন, কিছু বলতে পারবেন?
না, জবাব দিলেন হ্যারিসন। চাপা স্বভাবের ছিল। কাউকে কিছু বলত না।
আমার মনে হয় লিলি জানে। কিন্তু সে-ও কম চাপা নয়। বলে না। আরেকটা ব্যাপার, ডাক্তার ক্লডিয়াসের অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুকের মাঝখানের অনেকগুলো পাতা ছেঁড়া। এপ্রিলের শেষ আর মে-র শুরুর। ওগুলোতে নিশ্চয় কোন সূত্র ছিল।
রুডলফের দিকে তাকালেন একবার হ্যারিসন, মাথা ঝাঁকালেন।
ক্লডিয়াসের ঘরের কোন কাগজ সরানো হয়নি। যেমন ছিল, তেমনি আছে। অন্তত আমরা ধরিনি।
দেখার জন্যে তিনজনেই চলল ডাক্তার ক্লডিয়াসের ল্যাবরেটরিতে।
কাগজপত্র আর নোটের অভাব নেই। অসংখ্য ফাইল। সুন্দর করে সাজানো-গোছানো, ডাক্তার হ্যারিসনের কাগজপত্রের মৃত এলোমলো নয়।
তিনটে ফাইলের ওপরের টাইটেল দৃষ্টি আকর্ষণ করল কিশোরের-রিঅ্যাকশন টাইমস, ম্যানুয়্যাল ডেকসটারিটি, আর কমুনিকেশন স্কিলস। কিছু নোটবুক আছে। ওগুলোর ওপরে লেখা রয়েছে কেমিকেল স্টিমুলেশন, এক্স-রে এক্সপোজার টাইমস, ইত্যাদি। কিছু কিছু লেখা পড়তে পারলেও মানে কিছুই বুঝল না কিশোর।
বোঝাতে হলে আরেকজন জিনেটিসিস্ট লাগবে, বললেন রুডলফ।
একমত হলো কিশোর। তবু, বোঝা যায় এমন কিছুও পাওয়া যেতে পারে। যার সঙ্গে যোগাযোগ আছে গুহামানব অন্তর্ধান রহস্যের।
পাতার পর পাতা উল্টে চলল তিনজনে। খালি খসখস শব্দ।
কিছুক্ষণ পর মুখ তুলল কিশোর। এপ্রিলের দশ তারিখের পর আর কোন গবেষণার নোট নেই।
হাতের খাতাটার শেষ পৃষ্ঠাটাও উল্টে দেখলেন হ্যারিসন। ঠিকই বলেছ। এটাতে শেষ লেখা রয়েছে পঁচিশে মার্চের নোট। ব্যস।
আরও অনেক খাতা, ফাইল, নোটবুক ঘাঁটল ওরা। এপ্রিল ১০-এর পরে আর কিছু পাওয়া গেল না।
কিন্তু এর পরেও তো কাজ করেছে, বললেন হ্যারিসন। রোজই করেছে। ওসব দিনের নোটগুলো কই?
অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুকের কাগজের যা দশা হয়েছে, তা-ই হয়েছে, মন্তব্য করল কিশোর।

ওয়ার্কবেঞ্চের ওপর গাদা করে রাখা আছে অনেকগুলো ম্যাগাজিন। সবচেয়ে ওপরেরটা তুলে নিয়ে পাতা ওল্টাল কিশোর। ভেতরে একটা স্লিপ পাওয়া গেল। প্রোপার্টি অভ দ্য ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট লাইব্রেরি ছাপ মারা।
স্লিপটা যেখানে পাওয়া গেল সেই পৃষ্ঠা পড়ে বলল কিশোর, সোডিয়াম পেনটোগ্যাল মগজের ওপর কি ক্রিয়া করে তা-ই পড়ছিলেন ডাক্তার ক্লডিয়াস।
সোডিয়াম পেনটোথ্যাল একটা অ্যানাসথেটিক, বললেন রুডলফ। অনুভূতি নষ্ট করে। বেহুশ করে দেয়।
আরেকটা ম্যাগাজিন তুলে নিল কিশোর। জানাল অভ দি আমেরিকান মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের একটা কপি। নাইট্রাস অক্সাইডের ওপর একটা লেখা ছেপেছে।
আরেকটা অ্যানাসথেটিক, বললেন হ্যারিসন! দাঁতের ডাক্তাররা। হরদম ব্যবহার করে। ওরা বলে একে লাফিং গ্যাস।
আরও ম্যাগাজিন আছে, তাতে আরও আরটিক্যাল। সব কটাতেই কোন না কোন অ্যানাসথেটিকের ওপর লেখা রয়েছে।
ঠিকই আছে, বললেন রুডলফ। শিম্পাঞ্জীর ওপর অপারেশন চালাত তো, অ্যানাসথেটিকের দরকার ছিল।
এবং গতকাল পুরো শহরকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়া হয়েছে, কাউকে উদ্দেশ্য করে বলল না কিশোর কথাটা। মনের ভাবনাটাই মুখ ফুটে বেরিয়ে গেছে।
অনেক খোঁজাখুঁজি করা হলো। কিন্তু ল্যাবরেটরিতে অ্যানাসথেটিকের কোন নমুনা পাওয়া গেল না। ইথার, সোডিয়াম পেনটোথ্যাল, এমনকি নোভাকেনও নেই।
সেন্টার থেকে বেরিয়ে এল কিশোর। লিলির কথা ভাবছে। নোটগুলো কি সেই গায়েব করেছে? যদি করে থাকে, কেন করেছে? পাতাগুলো কি নষ্ট করে ফেলেছে? আবার প্রশ্ন, কেন? কঙ্কাল চুরিতে তার কোন হাত আছে? আছে, এ কথা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না, এতটাই নিরীহ।
কিন্তু সত্যি কি এতটা নিরীহ?
দুপুর নাগাদ মুসার মনে হলো, অযথা সময় নষ্ট করছে। সাইট্রাস গ্রোভের চেয়ে বড় সেন্টারডেল শহর, অন্যরকম। দুটো সুপারমার্কেট আছে, চারটে পেট্রোল স্টেশন। ওষুধের দোকানের সামনে সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়ল না মুসার। পড়ার কথাও নয়, কি খুঁজতে এসেছে তা-ই জানে না।
ফিরে যাওয়ার কথা ভাবছে মুসা, এই সময় চোখে পড়ল ধূলিধূসরিত পুরানো গাড়িটা। শাঁ করে তার সামনে দিয়ে গিয়ে মোড় নিয়ে নামল আরেকটা শাখাপথে। ড্রাইভিং সীটে বিল উইলিয়ামস।

সরু পথের দু-ধারে গাছের সারি। তার ভেতর দিয়ে এগিয়ে একটা পুরানো বাড়ির গাড়িবারান্দায় ঢুকল গাড়ি। দরজা খুলে নামল বিল, হাতে বাদামী কাগজে মোড়া একটা প্যাকেট।
দাঁড়িয়ে আছে মুসা। মিনিট দুয়েক পর বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এল বিল।
গাড়িতে উঠে আবার এগিয়ে আসতে লাগল মুসা যেখানে আছে সেদিকে।
আরেকদিকে মুখ ফিরিয়ে রাখল মুসা, যাতে বিল দেখতে না পায়। দেখল না বিল। চলে গেল সাইট্রাস গ্রোভের দিকে।
বাড়িটার দিকে এগোল মুসা। গাড়িবারান্দায় এসে দাঁড়াল। এখন কি করবে?
আরেকটা গাড়ি এসে থামল গাড়িবারান্দায়। দরজা খুলে নামল একজন মোটা, বয়স্কা মহিলা।
কিছু চাও? জিজ্ঞেস করল।
না, ম্যাম, দ্বিধা করছে মুসা। সন্তোষজনক একটা জবাব খুঁজছে মনে মনে। বিল উইলিয়ামসকে খুঁজছিলাম। সাইট্রাস গ্রোভে ফিরে গেলে একটা লিফট নিতাম আরকি। ওকে এখানে ঢুকতেও দেখলাম। কিন্তু আমি আসতে আসতে চলে গেল। ডাকলেই পারতে। আজ আর আসবে না।
ঠিক আছে। দেখি, বাসেই চলে যাব। এতে
হ্যাঁ, তাই যাও। গাড়ির ট্রাঙ্ক খুলে জিনিসপত্র নামাতে শুরু করল মহিলা। মুদি দোকানে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে তাকে মাল নামাতে সাহায্য করল মুসা।
পাশে হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞেস করল মুসা, আপনি কি মিসেস উইলিয়ামস?
বিলির মা মনে করেছ? না, আমি তার বাড়িওয়ালী। আমার এখানে একটা রুম ভাড়া নিয়ে থাকে সে।
হাতের প্যাকেটগুলো রান্নাঘরের টেবিলে নামিয়ে রাখল মুসা।
সাইট্রাস গ্রোভে থাকো তুমি? জিজ্ঞেস করল মহিলা। জবাবের অপেক্ষা না করেই বলল, গতকাল ওই কাণ্ডটা যখন ঘটল, পার্কে সবাই ঘুমাল, তখন কোথায় ছিলে।
আমি শিওর, পানিতে কোন ঘাপলা ছিল। পানি পরীক্ষা করে দেখা উচিত ছিল।
করেছে তো। ল্যাবরেটরিতে নিয়ে গিয়ে। কিছু পায়নি।
মাথা নাড়ল মহিলা। যে-ই করেছে, জঘন্য কাজ করেছে। কাল বিলির ওপর খুব রাগ লাগছিল। অসুখের আর সময় পেল না। সারাটা সকাল শুয়ে রইল বিছানায়। এমনিতে অসুখ খুব একটা হয় না তার। কাল সাইট্রাস গ্রোভে গিয়ে দেখে আসতে পারলে তার মুখ থেকেই সব শুনতে পারতাম। কঙ্কালটা দেখতে যাওয়ার ইচ্ছে আমারও ছিল, ভিড়ের কথা শুনেই যাইনি। গাড়ি পার্ক করারই নাকি জায়গা ছিল না।

না গিয়ে ভালই করেছেন। সাংঘাতিক ভিড় হয়েছিল। ঠিক আছে, যাই এখন, দরজার দিকে পা বাড়াল মুসা।
বিলি এলে কিছু বলব? কি নাম তোমার?
না, কিছু বলার দরকার নেই। আমার নাম মুসা।
আচ্ছা।
বাস ধরে সাইট্রাস গ্রোভে ফিরে এল মুসা।
গোলাবাড়ির পেছনে বসে বসে তখন ভাবছে কিশোর। মুসার মুখে সব শুনে বলল, সত্যি তাহলে কাল অসুস্থ ছিল বিল। আমার তো সন্দেহ হচ্ছিল, চুরিতে সে-ও জড়িত। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে শক্ত অ্যালিবাই রয়েছে তার।
ঘাসের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল মুসা।
একইভাবে বসে নিচের ঠোঁটে চিমটি কেটে চলল কিশোর।
বিকেল চারটেয় ফিরে এসে দু-জনকেই ওই অবস্থায় পেল রবিন।
খবর ভাল? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
ডক্টর ফিল ডিকসনের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলেন সেদিন ডক্টর ক্লডিয়াস, জানাল রবিন। হারবারভিউ লেনে থাকেন ডক্টর ডিকসন। অ্যানাসথেটিস্ট। সান্তা মনিকার সেইন্ট ব্রেনড্যান হাসপাতালে চাকরি করেন। তাঁকে যখন জিজ্ঞেস করলাম, ডক্টর ক্লডিয়াস কি কোন ব্রিফকেস ফেলে গেছেন? মার্থা নাড়লেন। বললেন, সেদিন সারা দিন অপেক্ষা করেছেন ডক্টর ক্লডিয়াসের জন্যে। পরে অবশ্য তাঁর মৃত্যুর সংবাদ পেয়েছেন।
অ্যানাসথেটিস্ট? ডক্টর ক্লডিয়াসের বন্ধু ছিলেন?
তাই তো বললেন। ডক্টর ক্লডিয়াস সেদিন কেন দেখা করতে চেয়েছিলেন, বলতে পারলেন না। কথায় কথায় তাকে জিজ্ঞেস করলাম, এমন শক্তিশালী কোন অ্যানাসথেটিক আছে কিনা, যেটা নিমেষে কয়েকশো লোককে ঘুম পাড়িয়ে দিতে পারে?
কি বললেন? আগ্রহে সামনে ঝুঁকল কিশোর।
নেই। গতকালকের কথা তিনি শুনেছেন।
হুম।
বাড়ির পেছনের দরজা খুলে বেরোল লিলি। ছেলেদের দিকে একবার মাথা নুইয়ে হনহন করে চলল গোলাঘরের দরজার দিকে।
পেছনে বেরোল ম্যাকম্বার। ডেকে জিজ্ঞেস করল, লিলি, কোথায়। যাচ্ছ?
আন্না ফিঙ্গার দাওয়াত দিয়েছে, তার সঙ্গে সাপার খেতে, না ফিরে জবাব দিল লিলি।
তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরো।

পিকআপটা বের করে নিয়ে চলে গেল লিলি।
সেদিকে তাকিয়ে রইল ম্যাকম্বার।
উঠে এল কিশোর। কাশি দিয়ে ম্যাকম্বারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, চোরের আর কোন খবর আছে?
চোখ পাকিয়ে জবাব দিল ম্যাকম্বার, থাকলেও তোমাকে বলতাম না। দুপদাপ পা ফেলে চলে গেল বাড়ির ভেতরে।
বিকেলের একটা অংশ কাফেতে বসে খেয়ে আর অ্যানাসথেটিকের ব্যাপারে আলোচনা করে কাটাল ছেলেরা। বাকি সময় কাটল শহরে ঘোরাঘুরি করে।
মাঝরাতের পর বাড়ি ফিরল লিলি। মাচায় শুয়ে ইঞ্জিনের শব্দ শুনল ছেলেরা। বাড়ির ভেতরে ম্যাকম্বারের কড়া গলা শোনা গেল-এতক্ষণ কোথায় কাটিয়ে এসেছে লিলি, জিজ্ঞেস করছে। দড়াম করে বন্ধ হলো। দরজা-জানালা, তারপর মেয়েকণ্ঠের কান্না আর ফোঁপানি।
লিলির সঙ্গে খুব দুর্ব্যবহার করে ওরা, বিষণ্ন কণ্ঠে বলল মুসা।
চলে যায় না কেন? বয়েস তো যথেষ্ট হয়েছে, রবিন বলল, অত ভীতু কেন?
এরপর আর তেমন কিছু ঘটল না। ঘুমিয়ে পড়ল ছেলেরা।
পরদিন, সোমবার, খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠল ওরা। ম্যাকম্বারের বাড়িতে কেউ ওঠেনি, কোন নড়াচড়া নেই। কাফেতে নাস্তা সারল।
মেইন রোড ধরে হাঁটছে, এই সময় চোখে পড়ল পিকআপ নিয়ে পেট্রোল স্টেশনে ঢুকছে লিলি।
গতরাতে বান্ধবীকে নিয়ে নিশ্চয় হাওয়া খেতে বেরিয়েছিল ও, রবিন অনুমান করল। গতকাল টাংকি ভরেছে ম্যাকম্বার, দেখেছি। আজ সকালেই এত তেলের দরকার হলো...
টুং টুং করে ঘণ্টা বাজল দু-বার। পাম্প বন্ধ করে, ট্যাংক থেকে হোস বের করে, ট্যাংকের মুখে ক্যাপ লাগাল লিলি। টাকা গুনে দিল অ্যাটেনডেন্টের হাতে।
স্টার্ট নিয়ে স্টেশন থেকে বেরিয়ে গেল পিকআপ।
দুই গ্যালনের কিছু বেশি, চলমান গাড়িটার দিকে চেয়ে আছে। কিশোর। তারমানে অন্তত চল্লিশ মাইল। সেন্টারডেল পর্যন্ত যাওয়া যাবে, তাই না?
হয়তো ওখানে কোন বান্ধবী-টান্ধবী থাকে, মুসা বলল। কিংবা হয়তো কাল রাতে বেশি ঘোরাঘুরি করে তেল খরচ করে ফেলেছিল। এখন চাচার ভয়ে আবার ভরে রেখেছে।
আচ্ছা, ওকে সন্দেহ করছি কেন? নিজেকেই প্রশ্ন করল যেন · কিশোর। আর করছিই যখন, সরাসরি জিজ্ঞেস করে ফেললেই পারি। দ্বিধা কিসের?
মিছে কথা বলবে, রবিন বলল। আগেও বলেছে।

বড় বেশি নিঃসঙ্গ। কে জানে, তেমন করে যদি জিজ্ঞেস করতে পারি, মনের ভার লাঘব করার জন্যেও সব বলে দিতে পারে। জিজ্ঞেস করতে অসুবিধে কি?
কিছু না। তবে তুমি একা যেয়ো। আমি থাকছি না সামনে। কথায় কথায় ভ্যাক ভ্যাক করে কেঁদে ফেলে। এত কান্না আমার সয় না। খুব খারাপ লাগে।
আমারও, মুসা বলল।
ঠিক আছে, আমি একাই যাব, বলল কিশোর।
ম্যাকম্বারের বাড়ি পৌঁছে দেখল ওরা, লিলি পিকআপ রেখে সেন্টারে চলে গেছে। দুই সহকারীকে রেখে কিশোরও চলল সেন্টারে। দরজায় পৌঁছেই দাঁড়িয়ে গেল। লিলির চেঁচামেচি শোনা যাচ্ছে।
দেরি হয়েছে কে বলল? চেঁচিয়ে উঠল লিলি। মোটেই দেরি হয়নি।
দরজার কাছ থেকে সরে এসে লিভিংরুমের জানালা দিয়ে ভেতরে উঁকি দিল কিশোর।
কেউ নেই। শুধু দেয়ালে বসানো পশুর মাথাগুলো শূন্য নিষ্প্রাণ চোখে তাকিয়ে রয়েছে।
কি করেছ সেটা শোনার আমার দরকার নেই, আবার চেঁচাল লিলি। আরেকবার ফোন করো। বলল, এটা একটা রসিকতা।
কিশোরের মনে পড়ল, ল্যাবরেটরির বাইরে, হলরুমে যাওয়ার পথে দেয়ালে ঝোলানো একটা টেলিফোন আছে। টেলিফোনে কথা বলছে লিলি।..
মিথ্যুক! আরও জোরে চেঁচিয়ে উঠল লিলি। এরকম করা মোটেই উচিত হয়নি তোমার। আমার কি হবে ভেবেছ? .খানিক নীরবতা। তারপর চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, বেশ, দেখো, আমি কি করতে পারি।
খটাশ করে রিসিভার নামিয়ে রাখার শব্দ হলো।
জানালার কাছ থেকে সরে গেল কিশোর।
মুহূর্ত পরেই ঝটকা দিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে এল লিলি।
ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বসেছে। ডান-বা কোনদিকে না তাকিয়ে ধুপধাপ করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে, প্রায় দৌড়ে গেল গেটের দিকে।
পিছু নিল কিশোর। ডাকল না।
মাঠ পেরিয়ে ম্যাকম্বারের গোলাঘরে ঢুকে পিকআপটা বের করল লিলি। ঝাঁকুনি খেতে খেতে গিয়ে পথে উঠল গাড়িটা। ছুটল শহরের দিকে।
গোলাঘরের দিকে এগোল কিশোর। দরজায় বেরিয়ে এল মুসা আর রবিন।
গেল কই? জিজ্ঞেস করল মুসা।
জানি না, কিশোর জবাব দিল। খুব রেগেছে। অবশেষে করতে চলেছে কিছু একটা।

শুধু ও-ই না, রবিন বলল। মিনিট দশেক আগে ম্যাকম্বারও খুব। রেগেমেগে বেরিয়েছে বাড়ি থেকে। ওর স্ত্রী পেছন থেকে ডাকছিল। গুহামানবের পেছনে আর টাকা নষ্ট না করতে বলল। শুনলই না যেন ম্যাকম্বার। শহরের দিকে চলে গেল।
মুক্তিপণ। এক মুহূর্ত চুপ থেকে বলল কিশোর, মুক্তিপণের টাকা দিতে গেছে। ঘটনা ঘটতে আরম্ভ করেছে ভালমতই।
চলো, যাই। দেখি, কি করে সামলায় ম্যাকম্বার। বলেই রওনা হলো কিশোর।
কিভাবে করবে? পেছন থেকে বলল মুসা। গাড়ি তো নিল না!
গেলেই দেখব।
মেইন রোড ধরে হেঁটে কাফেটা প্রায় পেরিয়ে যাচ্ছিল ছেলেরা, এই সময় দরজায় বেরোল ম্যাকম্বার। তার সঙ্গে রয়েছে কাফের মালিক, মিস্টার মরিসন। পেছনে আরও দু-জন বেরোল। একজনকে চেনে কিশোর, এখানকার ওষুধের দোকানের মালিক।
দ্রুতপায়ে ব্যাংকের দিকে হাঁটতে লাগল চারজনে। মাঝপথে তাদের সঙ্গে মিলিত হলো মোটেলের মালিক।
যা আন্দাজ করেছিলাম, নিচু কণ্ঠে বলল কিশোর। শহরের সব ব্যবসায়ী একজোট হয়ে গুহামানবের পেছনে টাকা ঢেলেছে। মুক্তিপণের টাকাও সবাই ভাগাভাগি করে দেবে।
পার্কের একটা বেঞ্চে বসে ব্যাংকের ওপর চোখ রাখল কিশোর। জানালার ভেতর দিয়ে দেখা গেল, তাড়াহুড়ো করে ডেস্ক থেকে উঠে আসছে ব্যাংকের ম্যানেজার। পাঁচজনের সঙ্গেই হাত মেলাল। তারপর ওদেরকে নিয়ে গেল পেছন দিকের একটা কামরায়।
এবার কি করব? জিজ্ঞেস করল রবিন।
অপেক্ষা, জবাব দিল কিশোর। বেশিক্ষণ বসে থাকতে হবে না।
পাঁচ মিনিট পর, গির্জার ঘড়িতে যখন দশটার ঘণ্টা বাজছে, ব্যাংক থেকে বেরিয়ে এল ম্যাকম্বার। হাতে ক্যানভাসের তৈরি একটা টাকা রাখার বটুয়া। সঙ্গে বেরোল কাফের মালিক।
দ্রুতপায়ে হেঁটে গেল দু-জনে কাফের পাশের পার্কিং লটে। একটা ফোক্সওয়াগেনে চড়ে চলে গেল।
এবারও বেশিক্ষণ লাগবে না, বলল কিশোর।
ব্যাংকের দরজায় দেখা দিল আরও দু-জন, ম্যাকম্বারের সঙ্গে যারা ঢুকেছিল। তাদের পেছনে বেরোল ম্যানেজার। সবাই উদ্বিগ্ন। আস্তে
আস্তে হেঁটে গিয়ে কাফের কাউন্টারের উল্টোদিকের বুথে বসল। বসেই আছে ছেলেরা।

গির্জার, ঘড়িতে সোয়া দশটা বাজল, সাড়ে দশটা। ফিরে এসে পার্কিং লটে ঢুকল ফোক্সওয়াগেন। গাড়ি থেকে নামল ম্যাকম্বার আর তার সঙ্গী। ম্যাকম্বারের হাতে বটুয়াটা নেই। ক্লান্তপায়ে হেঁটে গিয়ে কাফেতে ঢুকল দু-জনে।
যাব নাকি? বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল কিশোর। পার্ক থেকে বেরিয়ে পথ পেরোল। রবিন আর মুসা চলল তার পেছনে।
বুথের মানুষগুলো ছাড়া আর কেউ নেই কাফেতে, শুধু একজন। ওয়েইট্রেস পাত্রে চিনি ঢালছে। ছেলেদের দিকে একবার চেয়েই চোখ ফিরিয়ে নিল ম্যাকম্বার।
বড়দের কাছ থেকে খানিক দূরে বসল ছেলেরা।
ম্যাকম্বার আরেকবার এদিকে তাকাতেই আন্তরিকতার ভঙ্গিতে হাসল কিশোর। জিজ্ঞেস করল, চোরের ফোন আসবে?
ঝুলে পড়ল ম্যাকম্বারের নিচের চোয়াল, বন্ধ হলো আবার।
টাকা দিয়ে দিয়েছেন, না? আবার জিজ্ঞেস করল কিশোর।
লাফ দিয়ে টুল থেকে নেমে এসে কিশোরের শার্টের কলার চেপে ধরল ম্যাকম্বার। তুমি কি করে জানলে?...চোরের সঙ্গী নাকি? লক্ষ করেছি, সারাক্ষণ চোখ রাখো আমার ওপর। কেন?
কলার ছাড়ানোর চেষ্টা করল না কিশোর। শান্তকণ্ঠে বলল,, চোরের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।
অ্যাই, কিং, কি করছ? বাধা দিল কাফের মালিক।
রাগে গোঁ গোঁ করে উঠল ম্যাকম্বার, কিন্তু কলার ছেড়ে দিল।
অপরাধ নিয়ে কারবার আমার আর আমার বন্ধুদের হবি, নাটকের সংলাপ বলছে যেন কিশোর। তবে আমরা নিজেরা অপরাধ করি না, অপরাধীকে ধরিয়ে দিতে সাহায্য করি। রহস্যের সমাধান করি।
কথার ধরন দেখে বড় বড় হয়ে গেল ম্যাকম্বারের চোখ। ফিরে গিয়ে টুলে বসল।
আপনি কি মনে করেন কঙ্কালটা কোথায় রেখেছে জানাবে। আপনাকে চোর? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
জবাব দিল না ম্যাকম্বার।
কিন্তু কাফের মালিক বলল, শিওর হওয়ার উপায় নেই। না-ও বলতে পারে।
অন্য কারও হাতে যদি পড়ে টাকাটা? একসময় বলল ব্যাংক। ম্যানেজার। পিকনিক করতে আসে অনেকেই। হয়তো কারও চোখে পড়ে গেল...
থামো তো! হাত তুলল ম্যাকম্বার। কপালে ঘামের বিন্দু জমছে।
কনুইয়ে ভর রেখে কাত হলো রবিন। লোকগুলোকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, সিনেমায় দেখি, বাস স্টেশনের লকারে জিনিস লুকিয়ে রাখে কিডন্যাপাররা। এখানে তো তেমন বাস স্টেশনও নেই। সবাই নামে। ওষুধের দোকানের সামনে।

ঝট করে সোজা হলো কিশোর। কিন্তু রেল স্টেশন আছে।
পিনপতন নীরবতা নামল কাফের ভেতরে। পার্কের শেষ মাথা ছাড়িয়ে ওপাশে পুরানো রেল স্টেশনটা, মরিসন আর ম্যাকম্বারের মুখ ঘুরে গেল সেদিকে। সেই একই রকম রয়েছে ধুলোয় ঢাকা পোড়া বাড়িটা।
হঠাৎ লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল কাফের মালিক।
চোখের পলকে টুল ছাড়ল অন্যেরা। দরজায় আগে পৌঁছল ম্যাকম্বার। ছুটে বেরোল। তার পেছনে অন্যেরা।
কাফে থেকে বেরিয়ে ছেলেরাও দৌড় দিল স্টেশনের দিকে।
বাড়িটার বারান্দায় উঠে জানালার ময়লা কাঁচের মধ্য দিয়ে ভেতরে তাকাল ম্যাকম্বার।
হাত দেবেন না! চেঁচিয়ে সাবধানে করল কিশোর। আঙুলের ছাপ লেগে যাবে।
জানালার কাছ থেকে সরে ছুটে গিয়ে দরজার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ম্যাকম্বার। কাঁধের ধাক্কায় ছুটে গেল পাল্লার মরচেধরা কজা। মড়মড় করে উঠল তক্তা।
দেখতে দেখতে ভিড় জমে গেল সেখানে। সুপারমার্কেট থেকে দৌড়াদৌড়ি করে এল লোক। মেয়েরা বেরিয়ে এল ঘর থেকে। সে-পথ দিয়েই গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলেন ডাক্তার হ্যারিসন, সঙ্গে ডাক্তার রুডলফ। হট্টগোল শুনে দু-জনেই নেমে এলেন। ওষুধের দোকান থেকে বেরিয়ে এলেন ডাক্তার রেডম্যান।
আবার দরজার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ম্যাকম্বার। বেশিক্ষণ সইতে পারল না পুরানো দরজা। ছিটকে খুলে গেল। স্টেশনের বারান্দায় ওঠার জন্যে হুড়াহুড়ি লাগিয়েছে লোকে।
সরো! ধমকে উঠল ম্যাকম্বার। কোন কিছুতে হাত দেবে না।
স্থির হয়ে গেল সবাই।
পুরানো, দোমড়ানো একটা ট্রাংক পাওয়া গেল ঘরের ভেতরে।
ধুলোতে দাগ দেখে বোঝা গেল, জানালা দিয়ে ঢুকিয়ে মেঝের ওপর দিয়ে টেনে আনা হয়েছে ওটা।
কি ওটাতে? জিজ্ঞেস করল কে যেন।
ট্রাংকের ডালা তুলেই সোজা হয়ে গেল মরিসন। অস্ফুট একটা শব্দ বেরোল মুখ থেকে।
ভিড় ঠেলে এগিয়ে এলেন হ্যারিসন। দেখলেন ট্রাংকে কি আছে। কতগুলো হাড়, কোষ্টা কোন জায়গার সহজে বোঝার উপায় নেই। খুলির শূন্য কোটরদুটো চেয়ে আছে ছাতের দিকে।
হাঁ হয়ে গেলেন ডাক্তার। মুখ থেকে রক্ত সরে গেছে। পাঁই করে ঘুরলেন ম্যাকম্বারের দিকে। কি এ সব?

কি ভেবে পিছিয়ে গেল ম্যাকম্বার।
হ্যারিসনের বাহুতে হাত রাখলেন রুডলফ! শান্ত হও। থামো। ম্যাকম্বারের দিকে ফিরে বললেন, এগুলো এখানে এল কিভাবে?...আফ্রিকায় পাওয়া হোমিনিডের কঙ্কাল...।
বাজে কথা! চেঁচিয়ে উঠল ম্যাকম্বার। এটা আমার গুহামানব!
কড়া কিছু বলতে গিয়েও সামলে নিলেন হ্যারিসন। তাই নাকি। দেখো তাহলে ভাল করে, লেবেল লাগানো আছে প্রত্যেকটা হাড়ে। নাম্বার, তারিখ, আর কোন্ জায়গায় কোন্টা পাওয়া গেছে, লেখা আছে। পড়ে দেখো।
মিস্টার মরিসন! বাইরে থেকে ডাকল কেউ। মিস্টার ম্যাকম্বার!
সরে পথ করে দিল জনতা। ভেতরে ঢুকল কাফের কাউন্টারম্যান।
ফোন এসেছে। বলল, স্টেশনঘরে ট্রাংকের মধ্যে আছে... ট্রাংকের ভেতরে চেয়েই হাঁ হয়ে গেল। এই তো!
শুনলে তো? হ্যারিসনের দিকে চেয়ে হাত নাড়ল ম্যাকম্বার। ওগুলো আমার হাড়। আমার গুহামানবের। চোরটা নইলে জানল কিভাবে? ভুরু কুঁচকে গেল হঠাৎ। জ্বলে উঠল চোখ। শয়তান! ধাপ্পাবাজ! ধাপ্পা দিয়েছ আমাকে! দু-হাত বাড়িয়ে ডাক্তারের গলা টিপে ধরতে এল সে। তাকে ধরে ফেলল মরিসন।
ছাড়া পাওয়ার জন্যে ধস্তাধস্তি করতে লাগল ম্যাকম্বার, চেঁচিয়ে বলল, তুমি ব্যাটাই গুহায় গিয়ে কঙ্কালটা গেড়ে রেখে এসেছিলে। তারপর এমন ভাব দেখিয়েছ, যেন পেয়েছ ওখানে। লোকের নজর পড়ক, বড় ধরনের আলোড়ন হোক, এটা চেয়েছ। আর সেজন্যে। ব্যবহার করেছ আমাকে।
ব্যাটা বলে কি? মিথ্যুক কোথাকার, ঘুসি পাকিয়ে এগোতে গেলেন হ্যারিসন, আটকালেন রুডলফ।
ঘরে ঢুকল ডেপুটি শেরিফ। এগিয়ে এল। একটা ব্যাপার লক্ষ। করল এই সময় কিশোর, ভিড়ের কিনারে দাঁড়িয়ে এদিকে চেয়ে আছেন রেডম্যান। হাসছেন মিটিমিটি। হ্যারিসনের দুরবস্থা দেখেই বোধহয় তার কালো চোখে খুশির ঝিলিক।
হ্যারিসন সম্মানী লোক, বললেন রুডলফ। সে এরকম কাজ করতে পারে না।
নিশ্চয় করেছে! চেঁচিয়ে উঠল ম্যাকম্বার। চোরটা নাহলে জানল কিভাবে হাড়গুলো এখানে আছে?
আগে বাড়ল কিশোর। শান্তকণ্ঠে বলল, চোরই রেখেছে এগুলো এখানে।
শুনলে তো, হাঁদারাম... ম্যাকম্বারের দিকে চেয়ে মাথা নাড়লেন হ্যারিসন।
এক মিনিট, স্যার, হাত তুলল কিশোর। শুনুন। দুই সেট ফসিল ছিল না?
হ্যাঁ, বললেন হ্যারিসন।

পরশু রাতে মিউজিয়ামের সামনে পাহারা দিচ্ছিল জিপসি ফ্রেনি। বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিল, জেগে উঠল একটা শব্দে। গোলাঘরের মাচায় শুয়েছিলাম আমরা, তার ডাকাডাকিতে ঘুম ভেঙে গেল। নেমে এসে শুনলাম একটা গুহামানবকে নাকি মাঠের দিকে চলে যেতে দেখেছে। সে। লম্বা লম্বা চুল, গায়ে ছাল জড়ানো।
কি দেখেছে ফ্রেনি? গুহামানব তো হতেই পারে না। হয়তো গুহামানবের রূপ ধরে এসে তাকে ধোঁকা দিয়েছিল কেউ। মিস্টার ম্যাকম্বারের রান্নাঘর থেকে চাবি নিয়ে এনেছিল, মিউজিয়ামে ঢুকে গুহার কঙ্কালটা তুলে তার জায়গায় রেখে দিয়েছিল আফ্রিকান কঙ্কালটা। দ্বিতীয় কঙ্কালটা নিয়ে বেরিয়ে এসে, দরজায় তালা লাগিয়ে চলে গিয়েছিল মাঠের ওপর দিয়ে।
পাগল! বলে উঠল ম্যাকম্বার। ওই পাগলামি কে করতে যাবে?
ডাক্তার হ্যারিসনের ওপর যে দোষ চাপাতে চায়, তাকে খেলো করতে চায়। সে জানে, আগে হোক, পরে হোক, গুহার কঙ্কাল বিশেষজ্ঞরা পরীক্ষা করতে আসবেই। লেবেল দেখলেই বুঝবেন, ওটা আফ্রিকান, ডাক্তার হ্যারিসন আফ্রিকায় যেটা পেয়েছেন।
মাথা নাড়লেন রুডলফ। তাতে কিছু হত না। গুহামানবের ছবি নিয়েছে হ্যারিসন, ফটোগ্রাফ। আফ্রিকান হোমিনিডের সঙ্গে আমেরিকানটার পার্থক্য আছে।
ছবি দেখে কি সত্যি বোঝা যায়? প্রশ্ন তুলল কিশোর। তাছাড়া কঙ্কালের বেশির ভাগই ছিল মাটির তলায়। আফ্রিকান হোমিনিডই ওখানে রেখে যে ফটো তোলেননি ডাক্তার হ্যারিসন, তার কি প্রমাণ? বোঝার উপায় আছে?
তাই তো সে করেছে, চেঁচিয়ে উঠল ম্যাকম্বার। সে ওটা রেখেছে। তারপর কেউ চুরি করে নিয়ে গেছে। মাঝখান থেকে আমাদের দশ হাজার ডলার গচ্চা। হ্যারিসনের দিকে ফিরল। সহজে ছাড়ব তোমাকে ভেবেছ? কেস করব আমি তোমার নামে। জেলের ভাত না খাইয়েছি তো... রাগে কথা আটকে গেল তার। গটগট করে বেরিয়ে গেল।
জ্বলন্ত চোখে তার দিকে তাকালেন হ্যারিসন। তারপর কুঁকলেন ট্রাংক থেকে হাড়গুলো বের করার জন্যে।
সরি, ডাক্তার হ্যারিসন, বাধা দিল ডেপুটি। এগুলো এখন ছুঁতে পারবেন না। আমাদের কাছে থাকবে। আদালতে হাজির করার দরকার হতে পারে।
মুখ বিকৃত করে ফেললেন হ্যারিসন। তারপর ম্যাকম্বারের মত বেরিয়ে গেলেন তিনিও।
উত্তেজনা শেষ। পাতলা হতে লাগল ভিড়।
তিন গোয়েন্দা রাস্তায় বেরিয়ে এল, উজ্জ্বল রোদে।
হেসে বলল মুসা, হয়ে গেল কেসের সমাধান।

না, হয়নি, বলল কিশোর। এখনও জানি না আমরা, কে ওই গুহামানব। জানি না, কে ঘুম পাড়াল পার্কভর্তি লোককে। আমেরিকান ফসিলটার কি হলো, তা-ও জানি না।
ম্যাকম্বারের বাড়ির দিকে চলল তিনজনে। অর্ধেক পথ পেরিয়েছে, ওই সময় তাদেরকে ডাকল বিল উইলিয়ামস। পথের মোড়ে গাড়ি রেখে তাতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।
কি হয়েছে ওখানে? স্টেশনের দিকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল সে। এত লোক?
চোরাই কঙ্কালটা পাওয়া গেছে, একটা ট্রাংকের ভেতরে, জবাব দিল রবিন।
তাই নাকি? চোর ধরা পড়েছে? মুক্তিপণের টাকা দিয়েছে ম্যাকম্বার?
দিয়েছে, কিশোর বলল। সকালে।
ভাল করেছে। ঝামেলা গেল। আবার ট্যুরিস্ট জমাতে পারবে।
ঝামেলা আছে। হঠাৎ কি মনে হলো কিশোরের, অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল। লিলিকে দেখেছেন?
মাথা নাড়ল বিল। না। কেন?
না, কয়েকটা কথা ছিল। মনে হয় সেন্টারডেলে গেছে। আপনিও ওখানে যাচ্ছেন নাকি?
হ্যাঁ। যাবে?
দরজা খুলে ড্রাইভিং সীটে বসল বিল। বাঁকা হয়ে ঘুরে খুলে দিল পেছনের দরজা। ডুবুরীর যন্ত্রপাতি সীটের একধারে ঠেলে দিয়ে উঠে বসল মুসা, তার পাশে রবিন। কিশোর বসল সামনে, বিলের পাশে।
চলতে শুরু করল গাড়ি। দোকানপাট আর স্টেশন ছাড়িয়ে এল। সুইমিং পুলের পাশ দিয়ে চলল। ড্রাইভিং বোর্ডে উঠে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ছে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা।
দারুণ মজা, না? ওদের দেখিয়ে বলল বিল। আমারও খুব ইচ্ছে করে। ইস, যদি সাঁতার জানতাম।
শহর থেকে বেরিয়ে আঁকাবাঁকা পথ ধরে সেন্টারডেলের দিকে ছুটেছে গাড়ি। পেছনে তাকাল কিশোর। মুসার হাতে স্কুবা মাস্কটা। চোখাচোখি হলো দু-জনের। কথা হয়ে গেল ইঙ্গিতে। মাস্কটা আবার সীটে নামিয়ে রেখে পেছনে হেলান দিল মুসা।
আড়চোখে বিলের মুখের দিকে তাকাল কিশোর।
হাসি ফুটেছে বিলের ঠোঁটে। ফাঁক হয়ে আছে সামান্য, শিস দেয়ার ভঙ্গিতে।
দু-জনের মাঝখানে সীটের ওপর পড়ে রয়েছে কয়েকটা চিউইং গামের মোড়ক, একটা প্লাস্টিকের বাক্স-ঢাকনাটা নেই, খালি একটা কোকাকোলার টিন, একটা

সবুজ বলপেন, খালি একটা খাম-উজ্জ্বল সবুজ রঙে উল্টোপিঠে লেখা রয়েছে কিছু, বোঝা যায়।
উল্টে নিয়ে পড়ল কিশোর। একটা লিস্ট। ওপরে পেট্রোল পাম্প আর একটা অটো সার্ভিস সেন্টারের নাম লেখা রয়েছে। লিস্টের সবচেয়ে নিচের নামটা দৃষ্টি আকর্ষণ করল তার:
এ সাইনস সার্ভিস, ওঅ্যাডলি রোড।
খামটা রেখে দিল কিশোর। বলল, আপনি সাঁতার জানেন না, না?
না।
তাহলে ওই ডুবুরীর যন্ত্রপাতিগুলো কার?
আমার এক বন্ধুর।
তাই? কিশোরের কণ্ঠে এমন কিছু ছিল, তার দিকে না তাকিয়ে পারল না বিল।
শহর ছাড়িয়ে অনেক দূরে চলে এসেছে গাড়ি। পথের দুই ধারে গাছপালা। ব্রেকে পা রেখে কান পেতে কি শোনার চেষ্টা করছে বিল। কিসের শব্দ?
কই?
ইঞ্জিনে গোলমাল...শুনছ না?
পথের পাশে গাড়ি রাখল বিল। দরজা খুলে বেরোতে শুরু করল।
পেছনের সীটে ভুরু কোঁচকাল মুসা। কই, আমি তো কিছু শুনতে পাচ্ছি না?
কান ভাল না আরকি তোমাদের, গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে নিচু হয়ে জানালা দিয়ে ছেলেদের দিকে তাকাচ্ছে বিল। মুখে রহস্যময় হাসি।
জোরে নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর! ডুবুরীর যন্ত্রপাতির মানে এখন। পরিষ্কার হয়েছে। ক্লডিয়াসের ল্যাবরেটরি থেকে এমন কোন অ্যানাসথেটিক চুরি করা হয়েছে, যেটা ঘুম পাড়িয়ে দিতে পারে পার্কভর্তি লোককে। তারপর হারিয়ে যায়, কোন চিহ্ন থাকে না। কিন্তু আপনি ওই গ্যাসের মধ্যে শ্বাস নিতে চাননি, এমনকি আপনার চামড়ায় লাগুক তা-ও চাননি। সেজন্যেই মুখে লাগিয়েছিলেন মাস্ক, পরেছিলেন। ওয়েট স্যুট। আর আপনাকে ওই পোশাকে দেখে জিপসি ভাবল একচোখা, দাতাল কোন দানব। পলকের জন্যে দেখেছিল তো, ঠিক বুঝতে পারেনি।
চেয়ে আছে বিল। চেহারায় কোন পরিবর্তন নেই।
লিলি আজ সকালে আপনার সঙ্গেই দেখা করতে গিয়েছিল। কোথায় ও?
স্প্রে করার ছোট প্লাস্টিকের বোতলটা অনেক দেরিতে দেখল কিশোর। ড্রাইভিং সীটের পাশেই কোথাও লুকিয়ে রেখেছিল, বের করে হাতে নিয়েছে বিল। ওটার মুখ সই করল কিশোরের দিকে।
চেঁচিয়ে উঠে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল মুসা।

স্প্রে করল বিল।
হালকা ভেজা ভেজা কিছু এসে লাগল ছেলেদের নাকেমুখে।
পরক্ষণেই পিছিয়ে গিয়ে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল বিল। আরও সরে গেল পেছনে।
অসাড় হয়ে এল কিশোরের হাত-পা। শরীরে এক বিন্দু শক্তি নেই। মাথাটা গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে সীটের একপাশে। ঘন হয়ে নামছে। অন্ধকারের চাদর, ঢেকে দিচ্ছে সবকিছু। জ্ঞান হারাল সে।
কিশোরের হুঁশ ফিরল। নাকে লাগছে ভাপসা গন্ধ। কাছেই জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছে কারা যেন, নড়ে উঠল কেউ।
ঘন অন্ধকার।
উঠে বসল কিশোর। হাতে লাগল মাটি। অন্ধকারে গুঙিয়ে উঠল কেউ।
কে? হাত বাড়াল কিশোর।
গায়ে হাত লাগতেই চেঁচিয়ে উঠল একটা নারীকণ্ঠ।
লিলি? বলল কিশোর। লিলি অ্যালজেড্ডা?
ছাড়ো! চেঁচিয়ে উঠল মেয়েটা। আমাকে ছেড়ে দাও।
কাছেই গুঙিয়ে উঠল মুসা। বিড়বিড় করে কি বলল রবিন।
আমি, কিশোর, শান্তকণ্ঠে বলল সে। মুসা, তুমি ভাল আছ? রবিন?
আ-আমি…ভাল, জবাব দিল মুসা। আল্লাহ্ রে, কোথায় এলাম?
রবিন? আবার ডাকল কিশোর।
ভাল।
লিলি, জিজ্ঞেস করল কিশোর, কোথায় রয়েছি জানেন?
পুরানো একটা গির্জার মাটির তলার ঘরে। লাশ রাখত আগে এখানে। ফুঁপিয়ে উঠে নাকি গলায় কাঁদতে শুরু করল লিলি। আর কোনদিন বেরোতে পারব না গো! কেউ আমাদের বাঁচাতে আসবে না! হায় হায় গো, এবার মরব!
মারছে রে! গুঙিয়ে উঠল আবার মুসা। শুরু হলো! থামুন না, প্লীজ!
লিলি, প্লীজ, মাথা ঠাণ্ডা করুন, অনুরোধ করল কিশোর।
বেরোনোর নিশ্চয় পথ আছে। কোনদিক দিয়ে এনেছে আমাদেরকে?
সিঁড়ির মাথায় ঢাকনা আছে একটা, ট্র্যাপডোর। ওই পথে। খানিক আগে উঁকি দিয়েছিল বিল, আমি জেগে গেছি দেখে আরেক দফা স্প্রে করে গেছে নাকের ওপর। জোরে জোরে শ্বাস টানল লিলি। কান্না থেমেছে। সকালে কথা কাটাকাটি হয়েছে ওর সঙ্গে। ওকে বলেছি, কঙ্কালটা ফিরিয়ে না দিলে শেরিফকে সব বলে দেব।
সেজন্যেই এনে ভরে রেখেছে? জানতে চাইল মুসা।

হ্যাঁ। কেঁপে উঠল লিলির কণ্ঠ। প্রথমবার হুঁশ ফিরলে অন্ধকার দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। জোরে চেঁচাতেও সাহস হয়নি। যদি কোন ফাঁকফোকর থেকে সাপ কিংবা অন্য কিছু বেরিয়ে আসে। চিৎকার শুনে ঢাকনা তুলল বিল। সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলাম। ফোকরের কাছাকাছি যেতেই আবার আমার নাকে ওষুধ ছিটাল সে। আবার বেহুশ। হয়ে গেলাম।
ওষুধটা নিশ্চয় ডাক্তার ক্লডিয়াসের আবিষ্কার, তাই না? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
হ্যাঁ। ওটার নাম রেখেছিলেন এফ-টোয়েন্টি থ্রি। এপ্রিলের তেইশ তারিখে আবিষ্কার করেছেন তো, সেজন্যে। নানারকম পরীক্ষা। চালানোর ফলে শিম্পাঞ্জীগুলো খুব দ্রুত বেড়ে উঠছিল, তাড়াতাড়ি বুড়ো হয়ে মরে যাচ্ছিল। সেটা ঠেকানোর জন্যে ওষুধ আবিষ্কারের চেষ্টা করছিলেন তিনি। বানিয়ে বসলেন বেহুশ করার ওষুধ।
এ-ব্যাপারে আলোচনা করার জন্যেই হারবারভিউতে যাচ্ছিলেন, তাই না? বলল কিশোর, অ্যানাসথেটিস্টের কাছে। কিন্তু কাজ শেষ করে যেতে পারলেন না। আচ্ছা, ফরমুলাটার কথা আপনিই বিলকে জানিয়েছেন তাই না? পার্কের লোককে ঘুম পাড়িয়ে গুহামানব চুরি করার ফন্দিটা কার?
আবার কান্না আশা করেছিল কিশোর, কিন্তু কাঁদল না লিলি। বলল, ফন্দিটা বিলের। ফরমুলাটার কথা আমি বলেছি। টাকার দরকার ছিল। কয়েকশো ডলার। তাহলে এখান থেকে চলে যেতে পারতাম। কিন্তু বেঈমানী করল সে।
এসব কথা তো পরেও জানা যাবে, নাকি? বলে উঠল মুসা। এখন বেরোনোর চেষ্টা করা দরকার।
কারও কিছু বলার অপেক্ষা না করেই হাতড়ে হাতড়ে সিঁড়িটা বের করল সে। সাবধানে উঠতে শুরু করল। পিছু নিল রবিন। ওপরে উঠে মাথা ঠেকে গেল ট্র্যাপডোরে। দুই হাতে ঠেলে দেখল মুসা, উঠল না ঢাকনাটা।
আর কোন পথ নেই? জানতে চাইল রবিন।
না, নিচ থেকে জবাব দিল লিলি। কাঁদতে শুরু করল। আমরা...আমরা ফেঁসেছি ভালমত...বিল এসে খুলে না দিলে...হায় হায়, কেন একাজ করতে গেলাম গো...
আহ, কি শুরু করলেন? বলল কিশোর। এখান থেকে ঠিকই বেরিয়ে যাব আমরা। থামুন তো।
এই, মুসা, বলল রবিন। গালে বাতাস লাগছে। এই যে, এই দেয়ালটায় ফাঁকটাক কিছু আছে। সিঁড়ির পাশের দেয়ালের কথা বলল সে।
দেয়ালে হাত বুলিয়ে দেখল দু-জনে। পুরানো ইট, ভেজা ভেজা। নখ দিয়ে খোঁচা দিলেই নরম মাটির মত নখের ভেতর ঢুকে যায়। বেরিয়ে থাকা একটা ইটের মাথা ধরে হ্যাঁচকা টান মারল মুসা। তাকে অবাক করে দিয়ে খুলে বেরিয়ে এল ওটা।

ফোকরে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে দেখল সে, ওপাশে আরেক সারি হঁট। দুই সারি হঁট দিয়ে তৈরি হয়েছে। দেয়াল।
কাজে লেগে গেল দু-জনে। সহজেই খুলে আসছে একের পর এক ইট। জোরে ঠেলা দিলে কোন কোনটা খুলে পড়ে যাচ্ছে অন্যপাশে। ছোট একটা ফোকর হয়ে গেল দেখতে দেখতে। আলো আর বাতাস এখন দুইই আসছে ওপথে।
মানুষ বেরোনোর মত একটা ফোকর করে ফেলল ওরা। দু-জনের আঙুলের মাথাই রক্তাক্ত, ব্যথা নিশ্চয় করেছে, কিন্তু টের পেল না। উত্তেজনায়।
উঠে এসে কিশোরও হাত লাগাল।
ফোকরের ভেতর দিয়ে মাথা গলিয়ে দিল মুসা। মাত্র দু-তিন ফুট নিচে মাটি। দেয়ালের বাকি অংশটা মাটির তলায়। সেটা বরং ভালই হলো ওদের জন্যে।
খুব সহজেই বেরিয়ে চলে এল ওরা।
সারা গায়ে ধুলো-ময়লা আর শ্যাওলা, ভূত সেজেছে যেন। একেকজন। হাতে-পায়ে আঁচড়ের দাগ, কোন কোনটা থেকে রক্ত বেরোচ্ছে। লিলির চোখ লাল, কেঁদে কেঁদে ফুলিয়ে ফেলেছে চোখমুখ।
চলো, শয়তানটাকে ধরি গিয়ে, বলল লিলি। পালানোর আগেই। নইলে লোকের সর্বনাশ করবে সে। এফ-টোয়েন্টি থ্রির ফরমুলা এখন তার হাতে।
আরও ওষুধ বানিয়ে মানুষকে ঘুম পাড়াবে ভাবছেন? বলল মুসা।
তাই তো করবে। ঘুম পাড়াতে পারলে কত কিছুই করা সম্ভব। পকেটের টাকা লুট করা থেকে শুরু করে অনেক কিছু..চলো, জলদি চলো।
বনের ভেতর দিয়ে দৌড়ে চলল ওরা। বনের শেষে মাঠ পেরিয়ে গোলাবাড়িতে পৌঁছে দেখল, ম্যাকম্বারের গাড়িটা আছে। ইগনিশন কী লাগানোই আছে। পেছনের সীটে এক গাদা প্যাকেট, টিন। এইমাত্র বোধহয় মুদির দোকান থেকে এসেছে ম্যাকম্বার।
এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে ড্রাইভিং সীটে উঠে বসল লিলি। মোচড় দিল চাবিতে।
আরে, দাঁড়ান, দাঁড়ান, আমাদেরকেও নিয়ে যান, বলতে বলতেই একটানে পেছনের দরজা খুলে ভেতরে মাথা ঢুকিয়ে দিল মুসা। রবিনও উঠল। কিশোর উঠে বসেছে লিলির পাশে।
দরজায় দেখা দিল জেলডা ম্যাকম্বার। চেঁচিয়ে উঠল।
কিন্তু কানই দিল না লিলি। ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে ফেলেছে। গীয়ার বদলে টান দিল গাড়ি। একটানে উঠে চলে এল পথের ওপর। ছুটে চলল শহরের দিকে।
যাচ্ছি কোথায়? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
হঠাৎ যেন সংবিৎ ফিরল লিলির। গতি কমিয়ে মুখ ফেরাল কিশোরের দিকে, ভা-ভাবছি সেন্টারডেলে…

ওখানে গেছে বিল, কি করে জানলেন?
আর কোথায় যাবে… থেমে গেল লিলি। দ্বিধায় পড়েছে।
সামনে কোথাও গাড়ি রেখে আগে শেরিফকে ফোন করুন, রামর্শ দিল কিশোর।
চোখ বন্ধ করে বার দুই চিমটি কাটল নিচের, ঠোঁটে। বিলের গাড়িতে যে খামটা দেখেছিল, সবুজ কালিতে তাতে লেখা ঠিকানাগুলো মনে করার চেষ্টা করল। চোখ মেলল হঠাৎ। ওঅ্যাডলি! ওঅ্যাডলি রোডটা কোথায় জানেন?
সেন্টারডেলে। ইনডাস্ট্রিয়াল এরিয়ায়।
তাহলে সেখানেই! চেঁচিয়ে উঠে দু-আঙুলে চুটকি বাজাল কিশোর। খামে আরেকটা নাম দেখেছি…হ্যাঁ, সাইনস সার্ভিস। নিশ্চয় কোন কেমিকেল কোম্পানির নাম। এফ-টোয়েন্টি থ্রি বানাতে কেমিকেল দরকার। যেহেতু নাড়া একটা পড়েছে, আমরা জেনে গেছি, অনেক বেশি ওষুধ বানিয়ে এখন হাতে রাখতে চাইবে সে, পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্যে।…সে বানাতে জানে তো?
জানে, জবাব দিল লিলি। কলেজে কেমিস্ট্রি ছিল।
তাহলে আর কোন সন্দেহ নেই। সেন্টারডেলেই গেছে সে। তাড়াতাড়ি ফোন করে আসুন।
টেলিফোন বুথের সামনে গাড়ি রেখে পকেট হাতড়াল লিলি। ইসসি, একটাও নেই।
এই যে, নিন, পকেট থেকে কয়েন বের করে দিল রবিন।
কয়েন ফেলে ডায়াল করার পরে প্রায় ত্রিশ সেকেণ্ড অপেক্ষা করতে হলো লিলিকে। তারপর রিসিভার তুলল কেউ ওপাশে। হ্যালো, আমি লিলি অ্যালজেডো। কিংসলে ম্যাকম্বারের…হা হা, আমিই। শুনুন, একটা খবর আছে। গুহামানবের কঙ্কাল বিল চুরি করেছে। হ্যাঁ, সেন্টারে কাজ করে যে সে-ই। তাকে ধরতে এখন সেন্টারডেলে যাচ্ছি। ওঅ্যাডলি রোডে, সাইনস সার্ভিস কোম্পানিতে আছে। আমরা যাই, আপনারা আসুন।
রিসিভার নামিয়ে রেখে গাড়িতে এসে উঠল লিলি। আমাদেরকে যেতে মানা করছিল। লাইন কেটে দিয়েছি।
সেন্টারডেলের দিকে গাড়ি ছুটল।
শহর থেকে বেরোতেই গ্যাস পেডালে জোরে চেপে বসল লিলির পা। এক লাফে গাড়ির গতি বেড়ে গেল অনেক। তীব্র গতিতে ছুটল। শাই শাই করে পাশ দিয়ে সরে যাচ্ছে গাছপালা। ফ্লোরবোর্ডে পা চেপে ধরেছে ছেলেরা। কোন মোড়টোড় এলে চাপ আরও বাড়ায়। শরীর সোজা রাখতেই হিমশিম খাচ্ছে। তারপরেও গতি বাড়িয়েই চলেছে লিলি। শান্তশিষ্ট ভীতু মেয়েটা অকস্মাৎ খেপে গিয়েছে।
সবাই নীরব।

পথের পাশের সাইনবোর্ড জানিয়ে দিল, সেন্টারডেলে প্রবেশ করেছে গাড়ি। ব্রেক চেপে ধরল লিলি। কর্কশ আর্তনাদ তুলল টায়ার। গাড়ির গতি স্বাভাবিক গতিবেগে নামিয়ে আনল সে, নইলে পুলিশের ঝামেলায় পড়তে হবে। এখন কোন বাধা আসুক, এটা চায় না।
দুটো সুপারমার্কেটের পাশ কাটিয়ে এসে ডানে মোড় নিল লিলি। পথের দুই ধারে ছোট ছোট দোকানপাট, তার পরে বাড়িঘর। মাঝে মাঝে গজিয়ে উঠেছে বিরাট বিরাট বিল্ডিঙ।
এটাই ওঅ্যাডলি রোড, জানাল লিলি। সাইনস সার্ভিস খুঁজে বের করতে সময় লাগল না। পার্কিং লটে বিলির পুরানো গাড়িটা নেই।
আসেনি নাকি? চিন্তিত কণ্ঠে বলল লিলি।
এক কাজ করুন, নিচের ঠোঁটে বারবার চিমটি কাটছে কিশোর।
শেরিফের অফিসে চলুন। হয়তো এসে ধরে নিয়ে গেছে ওকে।
সামনে এগিয়ে মোড় নিতেই দেখা গেল দুটো গাড়ি। সাইনস সার্ভিসের সীমানার মধ্যে, একটা গুদামের সামনে। শেরিফের গাড়ির পাশেই বিলের পুরানো গাড়িটা। বিল দাঁড়িয়ে আছে শেরিফের গাড়ির জানালার ধারে, হাতে স্প্রে-বটল। স্টীয়ারিং হুইলে মাথা রেখে পড়ে আছে একজন লোক, বোধহয় বেহুঁশ।
ইঞ্জিনের শব্দে মুখ ফিরিয়ে চেয়েই প্রায় দৌড়ে গিয়ে নিজের গাড়িতে উঠল বিল। স্টার্ট দিল। বিকৃত করে ফেলেছে মুখচোখ। গো গোঁ করে উঠেই বন্ধ হয়ে গেল ইঞ্জিন। আবার চাবি ঘোরাল সে। স্টার্ট নিতে চাইছে না ইঞ্জিন, থেমে থেমে যাচ্ছে। অবশেষে স্টার্ট নিল। নড়ে উঠল গাড়ি।
গ্যাস পেডালে পা চেপে ধরল লিলি। সোজা এগিয়ে যাচ্ছে বিলের গাড়ি সই করে। প্রচণ্ড জোরে গুঁতো লাগাল পুরানো গাড়িটার পেটে। ঝনঝন করে কাঁচ ভাঙল, ধাতুর সঙ্গে ধাতুর সংঘর্ষে শব্দ হলো বিকট।
ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলল তিন গোয়েন্দা।
যখন চোখ মেলল, দেখল, ম্যাকম্বারের গাড়ির বাম্পারে আটকে গেছে বিলের গাড়ির পেছনের চাকা। দুটো গাড়ির কোনটাই নড়তে পারছে না।
মুখ খারাপ করে গাল দিয়ে উঠল বিল। দরজা খুলে স্প্রে-বটল হাতে দৌড়ে এল লিলির দিকে।
পেছনের দরজা খুলে বেরিয়ে গেল মুসা। বিলকে সই করে ছুঁড়ে মারল হাতের জিনিসটা।
বিলের ঠিক কপালে লাগল ওটা। টলে উঠল সে। হাত থেকে খসে পড়ল বোতল। সে নিজেও হুমড়ি খেয়ে পড়ল পথের ওপর।
সাইরেনের শব্দ শোনা গেল।

ঘ্যাঁচ করে এসে থামল শেরিফের দ্বিতীয় আরেকটা গাড়ি, বিলের কয়েক ফুট দূরে। পিস্তল হাতে লাফিয়ে নামল অফিসার। ভুরু কুঁচকে তাকাল পড়ে থাকা দেহটার দিকে, তারপর ছেলেদের দিকে ফিরল।
টমেটোর টিন, স্যার, হাসিতে বত্রিশ দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। মুসার। গাড়ির পেছনের সীটে রাখা ছিল। তুলে মেরে দিয়েছি।
পরদিন, বুধবার, সকাল।
গ্যাসপার রিসার্চ সেন্টারের চত্বরে বসে রৌদ্রোজ্জ্বল সুইমিং পুলের দিকে তাকিয়ে আছে ডেপুটি শেরিফ। খুব সাঁতার কাটতে ইচ্ছে করছে। ডিউটি না থাকলে এতক্ষণে গিয়ে নেমে পড়ত পানিতে।
বিলের বিরুদ্ধে অনেক প্রমাণ জোগাড় করেছি, বলল সে। ট্রাংকের গায়ে তার আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে। ওটা চুরি করে এনেছে তার বাড়িওয়ালীর স্টোররুম থেকে।
বসে থাকা সকলের ওপর চোখ বোলাল ডেপুটি। জেলডা আর কিংসলে ম্যাকম্বার পাশাপাশি বসেছে। সকালে ফোন করেছিল তাদেরকে রুডলফ, এখানে আসার জন্যে, অবশ্যই ডেপুটির অনুরোধে। আগের রাতটা মিসেস গ্যারেটের বাড়িতে কাটিয়েছে লিলি, দু-জনেই এসেছে এখন। মুষড়ে পড়েছে লিলি, তার বাহুতে হাত রেখে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করছে মহিলা।
আগের দিন সারাটা বিকেল সেন্টারডেলে শেরিফের লোকের সঙ্গে কাটিয়েছে তিন গোয়েন্দা, এখানে-ওখানে গেছে। তারপর সাইট্রাস গ্রোভে ফিরে এসেছে লিলির সঙ্গে।
ওয়ার্করুম থেকে বেরিয়ে এলেন ডাক্তার রুডলফ আর ডাক্তার হ্যারিসন। সুইমিং পুল থেকে গা মুছতে মুছতে এসে তোয়ালে গায়ে জড়িয়েই চেয়ারে বসলেন ডাক্তার রেডম্যান।
আমার গুহামানবের কি হলো তাই বলুন, জিজ্ঞেস করল ম্যাকম্বার। কখন পাব?
ট্রাংকের হাড় তোমার না! চেঁচিয়ে উঠলেন হ্যারিসন। ওগুলো আমার। আফ্রিকান হোমিনিড।
দুটো কঙ্কাল ছিল, দুই আঙুল তুললেন ডাক্তার রুডলফ। আরেকটা কোথায়?
এই চোরনীটাকে জিজ্ঞেস করছেন না কেন? বুড়ো আঙুল দিয়ে লিলিকে দেখাল জেলডা। চোরের দোসর। কোথায় লুকিয়েছে, বলুক।
ঝট করে মাথা তুলল লিলি। রাগে চোখ জ্বলছে। জানি না!
আরি, আবার তেজ দেখায়। এটা এখানে কেন? হাজতে ভরা হয়নি কেন? ধরে আচ্ছামত কয়েক ঘা লাগালেই পেট থেকে সুড়সুড় করে বেরিয়ে আসবে কথা। জানে না, হুহ!

জামিনে মুক্তি দেয়া হয়েছে, বলল ডেপুটি।
জামিন! খেঁকিয়ে উঠল ম্যাকম্বার। ওর জামিন হতে গেল কে?
আমি, শান্তকণ্ঠে বললেন হ্যারিসন।
তুমি? তুমি হওয়ার কে?
ওর বস্। আসলে জামিন হওয়ার তো কথা ছিল তোমার। গেলে তো না।
যাইনি বলে কি মহা অন্যায় করে ফেলেছি নাকি?
ঝাঁঝাল কণ্ঠে বলল জেলডা। আর যাবই বা কেন? চোরের শাস্তি হওয়া উচিত।
হ্যাঁ, তা তো হওয়াই উচিত, মুখ ছুটে গেল লিলির। আমার চেয়ে বড় বড় চোরেরা আছে এখানেই। তাদের জন্যেই আজ আমার এ দশা। নইলে লস অ্যাঞ্জেলেস কিংবা স্যান ডিয়েগোতে কলেজে পড়ার কথা এখন আমার।
এহ, আবার কলেজে পড়ার শখ। টাকা পাবে কোথায়? চুরি করে?
চুরি তত তোমরা করেছ! মুখের ওপর বলল লিলি। আমার বাবার ইনসুরেন্সের টাকাগুলো গেল কোথায়?
জোঁকের মুখে নুন পড়ল যেন, কুঁচকে গেল জেলডা।
থামল না লিলি, বলল, আর আমার বাড়িভাড়া? হলিউডের বাড়িভাড়া কত আসে জানি না আমি, না? কত টাকা লাগে আমার খেতে, থাকতে?
কেশে গলা পরিষ্কার করল ম্যাকম্বার। আহহা, অযথা রাগ করছিস তুই, লিলি। একেবারে বদলে গেছে ম্যাকম্বারের কণ্ঠস্বর, গলায় যেন মধু ঝরছে। যেতে চাইলে যাবি, কলেজে ভর্তি হতে চাইলে হবি, সে তো ভাল কথা। আমরাই সব ব্যবস্থা করে দেব। স্যান ডিয়েগো, কিংবা ওশনসাইড, যেখানে খুশি গিয়ে লেখাপড়া কর। বাড়ি ভাড়া করে দেব, খরচ দেব। আর কি চাস?
আমার বাবা মারা যাওয়ার পর কত টাকা বাড়িভাড়া এসেছে, তার হিসেব চাই। ইনসুরেন্সের টাকা কত পাওয়া গেছে, কতটা আমার পেছনে খরচ হয়েছে, তার হিসেব চাই। সেটা বাদ দিয়ে যা থাকবে সব চাই আমার।
কত আর থাকবে, হাত ওল্টাল জেলড়া। কয়েকশো। বড় জোর হাজারখানেক।
বেশ। তাহলে উকিলের কাছেই যাব আমি। এসে হিসেব-নিকেশ করুক। যদি একহাজার বাকি থাকে, সেটা আর নেব না, দান করে দেব তোমাদেরকে।
নাহয় পাঁচ হাজারই হবে, তাড়াতাড়ি বলল জেলডা।
মুচকি হাসল ডেপুটি। হাত তুলল, থামুন, থামুন। লিলি বড় হয়েছে। ও যদি উকিলের কাছে যেতে চায় যাক না। আপনাদের অসুবিধে কি?
না না... আমতা আমতা করল ম্যাকম্বার। আমাদের আর অসুবিধে কি? গেলে যাক না...
হ্যাঁ, এখন তো বড় হয়েছে, মুখ কালো হয়ে গেছে জেলডার।

পেলেপুষে বড় করেছি। এখন পাখা গজিয়েছে। আট বছরের যখন ছিল…
আহা রে, কি আমার মায়া রে! মুখ বাঁকাল, লিলি। এনেছ তো টাকার লোভে। দয়া কিংবা মায়া দেখিয়ে নয়।
আচ্ছা, ওসব কথা পরে হবে, বাধা দিলেন ডাক্তার রুডলফ।
আসল কথায় আসা যাক। কঙ্কালটা…
আমার কঙ্কাল আমাকে দিয়ে দেয়া হোক, বলে উঠল ম্যাকম্বার, ব্যস, আর কিছু চাই না।
সরি, বলল ডেপুটি, এই কেসের মীমাংসা হওয়ার আগে দেয়া যাবে না।
অন্য কঙ্কালটাও লাগবে? মানে, এই কেসের জন্যে। যদি দরকার হয়, বলুন।
একসঙ্গে সবগুলো মুখ ঘুরে গেল কিশোরের দিকে।
বনের মধ্যে পুরানো একটা গির্জায় পাওয়া যাবে ওটা, আবার বলল কিশোর। তাই না, ডাক্তার রেডম্যান?
পাথর হয়ে গেলেন যেন রেডম্যান।
ডাক্তার হ্যারিসনকে খেলো করতে চেয়েছিলেন। ডাক্তার ক্লডিয়াস মৃত, তার পরে যার গ্যাসপার পুরস্কার পাওয়ার কথা, তার দুর্নাম করে দেয়া গেলে পুরস্কারের তালিকায় সহজেই নাম উঠে যাবে আপনার। দশ লক্ষ ডলার, সোজা কথা তো নয়। মিউজিয়ামে সে-রাতে আপনিই ঢুকেছিলেন। মিস্টার ম্যাকম্বারের রান্নাঘর থেকে চাবি চুরি করে নিয়ে গিয়েছিলেন। ডাক্তার হ্যারিসনের আফ্রিকান হোমিনিডের কঙ্কালটা আগেই চুরি করেছেন, সেটা মিউজিয়ামে রেখে অন্যটা তুলে নিয়ে চলে গেছেন। আফ্রিকান কঙ্কালটা আমেরিকানটার জায়গায় রেখে এমনভাবে আশপাশের মাটি সমান করে দিয়েছেন, যাতে কিছু বোঝা না যায়।
মিউজিয়াম থেকে বেরোনোর সময় শব্দ করে ফেলেছিলেন। তাতে জেগে যায় জিপসি ফ্রেনি। তবে সেরকম কিছু ঘটতে পারে ভেবে তৈরিই হয়ে গিয়েছিলেন আপনি। গায়ে পশুর ছাল জড়িয়ে নিয়েছিলেন, সেন্টারে আছে ওরকম ছাল, কয়েক ঘণ্টার জন্যে একটা তুলে নিয়ে যেতে অসুবিধে হয়নি আপনার। মাথায় পরেছিলেন উইগ, মিসেস গ্যারেটের। সে কারণেই উইগটা অনেক খুঁজেও পাননি মিসেস গ্যারেট, পরদিন আবার যথাস্থানেই পেলেন। তারমানে কাজ শেষ করে এনে আবার জায়গামত রেখে দিয়েছিলেন আপনি। আর আপনার ওই বিকট সাজসজ্জা দেখে জিপসি ভাবল, বুঝি গুহামানবটাই জ্যান্ত হয়ে উঠে চলে যাচ্ছে।
যতসব আবোলতাবোল কথা! বললেন বটে রেডম্যান, কিন্তু গলায় জোর নেই।
আপনাকে প্রথমে সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ রেখেছিলাম, বলে গেল কিশোর। স্টেশনের ঘরে ট্রাংকে কঙ্কালটা পাওয়ার পর আর পারলাম না। ডাক্তার হ্যারিসনের দুর্দশা দেখে কেমন খুশি হয়েছিলেন, মনে আছে? হাসি ফেটে পড়ছিল

আপনার চোখেমুখে। ঢাকতে পারেননি। দেখে ফেলেছিলাম। তারপর থেকে নতুন করে ভাবতে বসলাম। পশুর ছাল আর উইগ নির্দেশ করল সেন্টারের দিকে। আমি, মুসা আর রবিন যখন সেদিন গির্জায় গিয়েছিলাম, আপনিও ছিলেন ওখানে। আমাদের দেখে ভয় পেয়ে যান, যদি কঙ্কালটা দেখে ফেলি? তাই ওখানে থাকতেই দেননি। নানারকম কথা বলে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন আমাদের।
তোমার বকর বকর থামাবে? জোর করে হাসলেন রেডম্যান।
বকর বকর নয়, স্যার, প্রমাণ দিতে পারি। বেশি ভেবেচিন্তে কাজ। করেন আপনি, আর তা করতে গিয়েই ভুল করে সূত্র রেখে গেছেন। গুহামানবের পায়ে জুতো থাকার কথা নয়, সেটা বোঝানোর জন্যেই আপনিও পরেননি। সে-রাতে আমেরিকান কঙ্কালটা নিয়ে গির্জায় যাওয়ার সময় মাঠের ধারে নরম মাটিতে আপনার পায়ের ছাপ রেখে গেছেন। সেটার ছাঁচ তুলে এনেছি আমি। আপনার ডান পায়ের একটা আঙুলে দোষ আছে, বুড়ো আঙুলের পরেরটা..।
সবগুলো চোখ ঘুরে গেল রেডম্যানের খালি পায়ের দিকে। তাড়াতাড়ি পা চেয়ারের নিচে লুকিয়ে ফেলার চেষ্টা করলেন ডাক্তার, এবং আরেকটা ভুল করলেন। সবাই দেখল, যা দেখার। আর প্রতিবাদ করে লাভ হবে না বুঝেই উঠে দাঁড়ালেন তিনি। যাই, কাপড় পরে ফেলি। আমার উকিলকেও খবর দিতে হবে।
এনথনি, এমন একটা কাজ তুমি করতে পারলে! বিষণ্ন শোনাল ডাক্তার রুডলফের কণ্ঠ।
তার দিকে তাকালেন না রেডম্যান। ধীরপায়ে হাঁটতে শুরু করলেন ঘরের দিকে। পিছু নিল ডেপুটি।
আমার উকিলকেও খবর দেয়া দরকার, বাঁকা চোখে ম্যাকম্বারের দিকে চেয়ে বললেন হ্যারিসন। একটা ইনজাংকশন জারি করাতে হবে। দ্বিতীয়বার আর আমেরিকান হোমিনিড নিয়ে খেলা জমাতে দেব না তোমাকে, ম্যাকম্বার।
উঠে দাঁড়ালেন তিনি। গুনগুন করে উঠলেন মনের সুখে।
পারবে না! চেঁচিয়ে উঠল ম্যাকম্বার। ওগুলো আমার হাড়!
কে বলল? রসিকতা করলেন রুডলফ। তোমার হাড় তো তোমার গায়েই রয়েছে। বলতে পারো, তোমার কোন নিকট আত্মীয়ের হাড়। তবে সেটা প্রমাণ করতে হবে আদালতে। তার আগে আর গুহামানবের হাড় নিয়ে গুহায় ঢোকাতে পারছ না।
দিন সাতেক পর।
হলিউডের বিখ্যাত চিত্রপরিচালক মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফারের অফিসে, তার বিশাল ডেস্কের সামনে বসে আছে তিন গোয়েন্দা।
ডেস্কের অন্য পাশে বসে গভীর মনোযোগে একটা ফাইল পড়ছেন পরিচালক। গুহামানবের কেস ফাইল। যত্ন করে টাইপ করে এনেছে রবিন।

টেরিফিক! অবশেষে মুখ তুলে বললেন পরিচালক। ফাইল বন্ধ করতে করতে বললেন, আরেকটু হলেই ফসকে বেরিয়ে যাচ্ছিল বিল উইলিয়ামস।
মাথা ঝাঁকাল কিশোর। বেশি হেলাফেলা করে ফেলেছিল, সাবধান থাকলে তাকে ধরা কঠিন হত। ডাক্তার ক্লডিয়াসের অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুকের পাতাগুলো সে-ই নষ্ট করেছিল। যাতে কেউ না জানতে পারে, হারবারভিউ লেনে একজন অ্যানাসথেটিস্টের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলেন ক্লডিয়াস। সেটা জানত শুধু লিলি। তার মুখ বন্ধ করার ব্যবস্থাও করে ফেলেছিল বিল।
বোকা মেয়ে, বললেন পরিচালক।
গাফিলতির জন্যেই ধরা পড়ল বিল, আবার বলল কিশোর। গাড়ির পেছনের সীটে ডুবুরীর যন্ত্রপাতি ফেলে রাখল। এমন কি সবুজ বলপেনটাও ফেলে দেয়নি, যেটা দিয়ে মুক্তিপণের টাকা চেয়ে চিঠি, লিখেছিল। ইচ্ছে করেই বানান ভুল করেছিল, যাতে সবাই ভাবে, অল্প শিক্ষিত লোকের কাজ।
মুক্তিপণের টাকা সে নিয়েছিল সাইট্রাস গ্রোভ আর সেন্টারডেলের মাঝের একটা রেস্ট এরিয়া থেকে, ওখানেই টাকা রেখে আসার নির্দেশ দিয়েছিল ম্যাকম্বারকে। টাকার বটুয়া তার গাড়ির বুটেই পাওয়া গেছে। জুতোজোড়াও, যেগুলো পরে গুহামানবের কঙ্কাল চুরি করতে গিয়েছিল।
তাকে সন্দেহ করলে কিভাবে?
সাইট্রাস গ্রোভে যত ঘটনাই ঘটেছে, কোনটা ঘটার সময়ই সামনে। ছিল না সে। সেটা চোখে পড়ার মত। পার্কে সারা শহরের লোক যখন বেহুশ, তখনও সে সেখানে ছিল না। স্টেশনে ট্রাংকটা যখন পাওয়া গেল, তখনও সে সেখানে এল না। অথচ কাছাকাছি যারা ছিল, সবাই এসেছে, কেউ না এসে পারেনি। স্বাভাবিক কৌতূহল।
যেদিক থেকেই ভাবা হোক, সন্দেহ পড়ে তার ওপর। সেন্টারে। তার অবাধ যাতায়াত। লিলির সঙ্গে ভাব। ম্যাকম্বারের রান্নাঘর থেকে চাবি চুরি করা তার জন্যে সহজ। ডাক্তার ক্লডিয়াসের আবিষ্কৃত ফরমুলাটা লিলির কাছ থেকে জেনে নিতে পারে সে অনায়াসে।
কঙ্কাল চুরির সময় সে যে তার বাসায় ঘুমাচ্ছিল, এই অ্যালিবাইও ততটা জোরাল ছিল না, যতটা মনে হয়েছে। বাড়িওয়ালীকে বলেছে, সে তার ঘরে ঘুমাবে। বাড়িওয়ালী দেখতে যায়নি, সত্যি সে ঘুমাচ্ছিল কিনা। সে আছে কিনা, এই খোঁজ নেয়ারও দরকার মনে করেনি। পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে চলে এসেছিল বিল। বাড়িওয়ালী এসে তার ঘরে উঁকি দিতে পারে, এই আশঙ্কা করেনি, কারণ, যতদিন সে থেকেছে ওবাড়িতে, কোনদিন, কোন কারণে একবারের জন্যেও তার ঘরে উঁকি দিতে আসেনি মহিলা।

গাড়ি নিয়ে সোজা সাইট্রাস গ্রোভে চলে গেল বিল, পানির ট্যাংকের কাছে। শহরের লোক তখন সবাই পার্কে, উত্তেজিত, কেউ লক্ষ করল না তাকে। অটোমেটিক স্প্রিঙ্কলারের টাইমার সেট করল সে, পানিতে ওষুধ মেশার ব্যবস্থা করে বেরিয়ে এল ট্যাংক হাউস থেকে। ঠিক দশটা বিশ মিনিটে আপনাআপনি চালু হয়ে গেল স্প্রিঙ্কলার সিসটেম।

সিসটেম চালু হতেই সে সোজা চলে গেল মিউজিয়ামে। পরনে স্কুবা স্যুট, মুখে মুখোশ। স্প্রে-বটল থেকে ওষুধ ছিটিয়ে বেহুশ করল জিপসি ফ্রেনিকে। কঙ্কালটা চুরি করে নিয়ে পালাল। হাড়গুলো একটা বস্তায় ভরে নিয়ে এল স্টেশনের ঘরে, ওখানে আগেই রেখে গেছে ট্রাংকটা। হাড়গুলো ট্রাংকে ভরে বেরিয়ে দরজায় তালা লাগিয়ে দিল। ডুপ্লিকেট একটা চাবি আগেই বানিয়ে নিয়েছিল। চুরির কাজটা খুব সহজেই সারল সে, কারণ তখন শহরের সব লোক ঘুমাচ্ছে পার্কে। পুলিশের কাছে নিজেই বলেছে এসব বিল, দম নেয়ার জন্যে থামল কিশোর। তারপর বলল, লিলির সাহায্যেই ল্যাবরেটরি থেকে অ্যানাসথেটিক চুরি করেছে সে। লিলিকে বলেছিল, কঙ্কালটা চুরি করে নিয়ে গিয়ে কোন মিউজিয়ামে বিক্রি করে দেবে। তাতে হাজারখানেক ডলার আসতে পারে। অর্ধেক দেবে লিলিকে।

কিন্তু যখন ম্যাকম্বারের কাছে দশ হাজার ডলার দাবি করে বসল বিল, লিলি আঁতকে উঠল। তাকে বোঝানোর চেষ্টা করল। কাজ হলো না। এমন কি লিলির পাঁচশো ডলার দিতেও রাজি হলো না সে। সব টাকাই নিজে মেরে দিতে চাইল। তাতেই আরও বেশি রেগেছে লিলি।

বোকা মেয়ে, আবার বললেন পরিচালক।

তবে, পরে উকিল আর শেরিফের সামনে সব বলে দিয়েছে লিলি। সে-ই এখন সরকার পক্ষের প্রধান সাক্ষী। নিজের কুকর্মের জন্যে লজ্জিত। সব দিক বিবেচনা করে বিচারক তাকে জেলে না ঢুকিয়ে একটা ফাইন করে ছেড়ে দেবেন বলে মনে হয়।

কিন্তু কঙ্কাল চুরির আইডিয়াটা প্রথমে কার মাথায় এসেছিল?

বলা যায়, দু-জনেরই। কথায় কথায় একদিন ফরমুলাটার কথা বিলকে বলল লিলি। ক্লডিয়াসের মৃত্যুর পর ফরমুলাটা গোপন করে ফেলার পরামর্শ দিল লিলিকে বিল। তার মনে হয়েছিল, এই ফরমুলা দিয়ে অনেক কিছু করা সম্ভব। তখনও আর কেউ জানে না ওই ফরমুলার কথা, একমাত্র লিলি আর সে ছাড়া। তাই, অন্য কেউ জানার আগেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক থেকে পাতাগুলো ছিঁড়ে ফেলল, ফরমুলাটা চুরি করল।

হুঁ, মাথা দোলালেন পরিচালক, অনেক কিছুই করা সম্ভব ওই অ্যানাসথেটিক দিয়ে। ব্যাংকের সমস্ত লোককে ঘুম পাড়িয়ে ব্যাংক লুট করা যায়, জুয়েলারীর

দোকান সাফ করে দেয়া যায়, হাজারটা অপরাধ করা যাবে ওই একটিমাত্র অ্যানাসথেটিকের সাহায্যে। কিন্তু একটা ব্যাপার, পানিতে মিশিয়ে দিল, অথচ ল্যাবরেটরি টেস্টে কিছু পাওয়া গেল না কেন?
সেটা ওই অ্যানাসথেটিকের আরেকটা বিশেষত্ব। ছড়ানোর কয়েক সেকেণ্ড পরই সমস্ত লক্ষণ মুছে যায়। একেবারে উবে যায়। কোন টেস্টেই আর ধরা পড়ে না।
খুব বিপজ্জনক। আচ্ছা, রেডম্যানের কি হলো?
এ সম্মানিত লোক, আর অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনা করে তাকেও জেলে ঢোকাননি বিচারক। তবে ফাইন করা হয়েছে। গ্যাসপার সেন্টার থেকে চাকরি গেছে তার। যা বদনাম হয়েছে, আর কেউ তাকে নেবে কিনা, সে-ব্যাপারেও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। জেল খাটার চেয়ে বড় শাস্তি হয়েছে তার।
সবচেয়ে বড় মার তার জন্যে, রবিন বলল, বোর্ড সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, এবারকার গ্যাসপার পুরস্কারটা তাকেই দেয়া হবে। কারণ, জনহিতকর অনেক বড় গবেষণা করছিল রেডম্যান। বেশি লোভ করতে গিয়ে সব দিক হারাল লোকটা।
হুঁ। ইউনিভারস্যাল ফেইলিং অভ ক্রিমিনালস, গম্ভীর হয়ে বললেন পরিচালক। সব অপরাধীই ভাবে, সে ধরা পড়বে না।...হাড়গুলোর কি
দুই সেটই রয়েছে শেরিফের অফিসে, কেবিনেটে তালাবন্ধ, বলল কিশোর। বিলের কেস পুরোপুরি শেষ না হওয়া পর্যন্ত থাকবে ওখানেই। ইতিমধ্যে গভর্নরের সঙ্গে দেখা করেছেন ডাক্তার হ্যারিসন। গভর্নরকে বুঝিয়েছেন, পুরো জায়গাটাকে রিজার্ভ এরিয়া ঘোষণা করার পরামর্শ দিয়েছেন। ওখানে আরও হাড় পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। মূল্যবান বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হবে সেগুলো। ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছেন গভর্নর।
ম্যাকম্বারের কি অবস্থা?
প্রায় পাগল। মাথায় চুল ছেঁড়া ছাড়া আর কিছুই করার নেই। তাকেও কোর্টে হাজির করিয়ে ছাড়তে পারত লিলি, কিন্তু ছোটবেলায় তাকে একটা আশ্রয় তো অন্তত দিয়েছে তারা, এই ভেবে আর উকিলের কাছে যায়নি। ইনসুরেন্সের টাকার কথা আর তোলেনি। তবে হলিউডের বাড়িটার দখল নিয়ে নিয়েছে সে। ভাড়াটেদের নোটিশ দিয়ে দিয়েছে। ওরা বাড়ি ছেড়ে চলে গেলে বাড়িটাকে গার্লস বোর্ডিং বানাবে লিলি। তার মতই যারা অনাথ, তাদেরকে জায়গা দেবে ওখানে, খুব সহজ শর্ত আর কম ভাড়ায়। নিজেও ওখানেই থেকে কলেজে পড়বে।
খুব ভাল আইডিয়া, মাথা নাড়লেন পরিচালক। খুব ভাল। আর। একটা প্রশ্ন। ফরমুলাটার কি হলো?
বিলের পকেটে ছিল। ধরা পড়ার পর চিবিয়ে খেয়ে ফেলেছে। তার কথা, সে যখন পেল না, আর কারও হাতে পড়তে দেবে না।

আহ্‌হা, গেল একটা মহামূল্যবান আবিষ্কার। তবে এক হিসেবে বোধহয় ভালই হলো। মানুষের উপকারে যেমন আসত, অপকারেও লাগানো যেত ওই ওষুধ।
অনেকক্ষণ পর চেয়ারে হেলান দিলেন পরিচালক। মুসার দিকে চেয়ে বললেন, তারপর, মুসা আমান, তুমি তো একেবারে চুপ। কি ব্যাপার? খিদে পেয়েছে?
না, স্যার, নড়েচড়ে বসল মুসা। এমনি। ওরাই তো সব বলছে। আমি আর কি বলব…
তোমার টিন ছোঁড়াটা কিন্তু সময়মত হয়েছিল, মৃদু হাসলেন পরিচালক। নাহলে বিলকে ধরা হয়তো কঠিন হয়ে যেত। যাই হোক, চমৎকার এই কেসের সমাধান উপলক্ষে ফুটকেক আর আইসক্রীম হয়ে যেতে পারে, কি বলে?
না, স্যার, কি দরকার… মাথা চুলকে বলতে গিয়েও থেমে গেল মুসা। দরজা খুলে ঘরে ঢুকেছে বেয়ারা। দুই হাতে উঁচু হয়ে আছে। অনেকগুলো বাক্স। বুঝল, আগেই অর্ডার দিয়ে রেখেছেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। হাসিতে ঝকঝকে সাদা দাঁত বেরিয়ে গেল সহকারী গোয়েন্দার। বলল, থ্যাংকিউ, স্যার, থ্যাংকিউ।
হাসিটা সংক্রমিত হলো সবার মাঝে।
***

ভলিউম ৪ – ছিনতাই – তিন গোয়েন্দা – রকিব হাসান – সেবা প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ : জুলাই, ১৯৮৮

অবশেষে এল সেই বহু প্রতীক্ষিত দিন।

সাউথ আমেরিকান এয়ারলাইনসের বিমানে চড়ল তিন গোয়েন্দা, সঙ্গে জরজিনা পারকার, যাবে দক্ষিণ আমেরিকার রিও ডি জেনিরোতে। এবার ছুটিতে ব্রাজিল দেখবে ওরা। সমস্ত খরচ দিয়েছেন জিনার বাবা মিস্টার পারকার, এটা তার তরফ থেকে জিনার জন্মদিনের উপহার।

লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে প্লেনে নিউইয়র্ক এসেছে ওরা, এখানে প্লেন বদল করতে হয়েছে।

বসার জায়গা দেখিয়ে দিল সুন্দরী স্টুয়ার্ডেস।

সবাই হাসিখুশি, তবে জিনাকে কিছুটা উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে, রাফিয়ানের জন্যে দুশ্চিন্তা। মানুষের সঙ্গে একসাথে যাওয়ার নিয়ম নেই, প্লেনে জন্তু-জানোয়ারের জন্যে আলাদা ব্যবস্থা।

স্টুয়ার্ডেসকে জিজ্ঞেস করল জিনা, আমার কুকুরটাকে ঠিকমত ভোলা হয়েছে, জানেন?

কিচ্ছু ভেব না। তোমাদের মতই আরামে যাবে কুকুরটাও, আরেকটা হাসি উপহার দিয়ে চলে গেল স্টুয়ার্ডেস।

আশ্বস্ত হলো জিনা। নরম গদিমোড়া সীটে আরাম করে হেলান দিয়ে চারদিকে তাকাল। জানালার ধারে বসেছে সে। তার পাশে মুসা আমান। ওদের পেছনের সীটে কিশোর পাশা আর রবিন মিলফোর্ড।

যাত্রীরা সব অল্পবয়েসী, কিশোর-কিশোরী, কিংবা আরও ঘোট স্কুল লেভেলের ওপরে কেউ নেই। সবারই ছুটি, কেউ পেয়েছে জন্মদিনের উপহার, কেউ বা পরীক্ষায় ভাল ফল করার প্রেজেন্ট-এই বেড়াতে যাওয়া।

হাসছে, কথা বলছে, উত্তেজনা আর খুশিতে গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে কেউ কেউ বা গান ধরেছে বেসুরো গলায়। কোলাহল, কলরবে মুখর করে তুলেছে বিরাট বিমানের বিশাল কেবিন।

খাইছে! ঝকঝকে সাদা দাঁত বের করে হাসল মুসা। চিড়িয়াখানায় ঢুকলাম নাকিরে বাবা?

খানিক পর সবাইকে সীট-বেল্ট বাঁধার নির্দেশ দিল স্টুয়ার্ডেস।

রানওয়েতে চলতে শুরু করল বিমান।

বিমান বন্দরের বড় বড় ভবনগুলো যেন ছুটতে লাগল জানালার পাশ দিয়ে।

আকাশে উঠল বিমান। যাত্রা হলো শুরু।

দেখতে দেখতে ছাড়িয়ে এল শহর। নদী-নালা মাঠ-বন পেরিয়ে বেরিয়ে এল খোলা সাগরের ওপর। নিচে নীল আটলান্টিক।
শোনা গেল স্টুয়ার্ডেসের কণ্ঠ, চুপ করার অনুরোধ জানাচ্ছে। সিনেমা দেখানো হবে।
কেবিনের সামনের দিকে ওপর থেকে সাদা পর্দা নেমে এল। নিভে গেল আলো। ছবি শুরু হলো।
সিনেমা শেষে এল খাবার।
খেয়েদেয়ে আবার জাঁকিয়ে বসে গল্প শুরু করল কেউ, কেউ মিউজিক শুনতে লাগল, কেউ ঘুমিয়ে পড়ল, কেউ বা জানালা দিয়ে তাকিয়ে রইল সাগরের দিকে। দিগন্তজোড়া বিশাল এক নীল চাদর যেন বিছিয়ে রয়েছে, মাঝে মাঝে ছোট-বড় দ্বীপগুলোকে দেখাচ্ছে সবুজ ফুটকির মত। খুব সুন্দর।
স্যান স্যালভ্যাডরে নামল বিমান।
স্টুয়ার্ডেস জানাল, এখানে কিছুক্ষণ দেরি করবে প্লেন, যাত্রীরা ইচ্ছে করলে নেমে খানিকক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে আসতে পারে, চাইলে এয়ারপোর্ট ক্যাফেটেরিয়া থেকে কোকা কোলা কিংবা মিল্কশেক খেয়ে আসতে পারে। অনেকেই নামল।
তিন গোয়েন্দা বসে রইল, কিন্তু জিনা নামল। অনেকক্ষণ রাফিয়ানকে দেখেনি, আবার দুশ্চিন্তা শুরু হয়েছে তার। কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে দেখে আসবে। একবার।
ঠিকই বলেছে স্টুয়ার্ডেস, সত্যি, খুব আরামে রাখা হয়েছে কুকুরটাকে। তার কেবিনে রাফিয়ানই একমাত্র যাত্রী, আর কোন কুকুর কিংবা অন্য জানোয়ার নেই।
ফেরার পথে সরু গলিতে ধাক্কা লাগল একটা লোকের সঙ্গে। দোষটা কার। বোঝা গেল না, দুজনেরই তাড়াহুড়ো। জিনা নাহয় উঠেছে কুকুর দেখতে, কিন্তু লোকটা কেন উঠেছে।
জিনা তাকে চেনে, নাম চ্যাকো। বাচ্চাদের দেখেশুনে রাখার জন্যে চারজন। লোক দিয়েছে ট্রাভেল এজেন্সি, চারজন কেয়ার টেকার, চ্যাকো তাদের একজন।
ভুরু কুঁচকে তাকাল চ্যাকো। দেখে চলতে পারো না?
আপনিও তো দেখে চলতে পারেন, পাল্টা জবাব দিল জিনা।
ক্ষণিকের জন্যে জ্বলে উঠল লোকটার চোখ, তারপর জিনাকে অবাক করে দিয়ে হাসল। মাথা নাড়ল আপনমনেই। নেমে চলে গেল একটা সিগারেটের দোকানের দিকে।
ফিরে এসে বন্ধুদেরকে জানাল জিনা।
মুসা আর রবিন দুজন দুরকম মন্তব্য করল।

ও কিছু না, শান্ত কণ্ঠে বলল কিশোর। বাচ্চাকাচ্চা সামলানো, যা-তা ব্যাপার নাকি। সব তো বিচ্ছু। ওর জায়গায় হলে আমার মেজাজ আরও আগেই খারাপ হয়ে যেত।
কিন্তু তবু মেনে নিতে পারছে না জিনা, ওভাবে না ধমকালেও পারত।
পরে তো আবার হেসেছে, মুসা বলল। তুমিও তো ভাল ব্যবহার করোনি। ধাক্কা মেরেছ, তারপর ক্ষমা চাওয়া তো দূরের কথা, মুখে মুখে আবার তর্ক করেছ। তারপরও মেজাজ ঠাণ্ডা হচ্ছে না তোমার। কে বেশি বদমেজাজী? জিনা, কিছু মনে। করো না, এ-কারণেই লোকে পছন্দ করে না তোমাকে।
তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল জিনা, ওই হারামীটার সঙ্গে আমার তুলনা করছ।
আহহা, হাত তুলল কিশোর, গেল তো লেগে। জিনা এ-রকম যদি করো, আর কখনও তোমার সঙ্গে কোথাও যাব না।
কেন, মুসার দোষ দেখছ না? ও আমাকে বাজে কথা বলছে কেন?
বাজে বলছে কোথায়? ও-তো তোমাকে বোঝাচ্ছে।
থাক! অত বোঝার দরকার নেই আমার, ঝটকা দিয়ে জানালার দিকে ফিরল সে, তাকিয়ে রইল বাইরে।
আবার ছাড়ল বিমান। নিচে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল আলোকিত রাতের শহর। মাঝে আর কোন স্টপেজ ধরবে না, একেবারে রিও ডি জেনিরোতে গিয়ে নামবে প্লেন।
কমে এল কেবিনের শোরগোল, খানিক পরে থেমে গেল পুরোপুরি। হালকা মিউজিক আর নিঃশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কোন আওয়াজ নেই।
জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রয়েছে জিনা এখনও।
মুসা সীটে মাথা রেখে ঘুমাচ্ছে, রবিন তুলছে।
কিশোরের ঘুম আসছে না। একটা ম্যাগাজিন টেনে নিল। মন বসাতে পারল। রেখে দিয়ে শেষে লোকগুলোর দিকে তাকাল। চারজন কেয়ার টেকার এক জায়গায় বসেছে।
চ্যাকো ব্যাটার চেহারা মোটেও ভাল না, ভাবছে কিশোর। মস্ত এক ষাড় যেন, গুতো মারার জন্যে তৈরি হয়ে আছে। চারকোণা চোয়াল, আর কি বিচ্ছিরি চওড়া কপাল। ব্যাটার গায়ে মোষের জোর, সন্দেহ নেই, তবে মাথায় ঘিলু কম। বাচ্চাদের পাহারা দেয়ার জন্যে এমন একটা বাজে লোককে কি করে বাছাই করল এজেন্সি?
দ্বিতীয় লোকটার নাম জিম। বয়েস বাইশের বেশি না। মোটামুটি সিরিয়াস। লোক বলে মনে হলো কিশোরের। কারলোর মত ষাঁড় নয়, সুদর্শন। ধোপদুরস্ত পোশাক।

তৃতীয়জন ওরটেগা। বেঁটে, রোগা, চামড়ার রঙ গাঢ় বাদামী। ইংরেজিই বলছে, তবে তাতে কড়া বিদেশী টান, কথা বলার সময় খালি হাত নাড়ে।
পর্তুগীজ নাকি? ভাবছে কিশোর। ব্রাজিলের ভাষা পর্তুগীজ। লোকটার কথায়ও পর্তুগীজ টান, ভাষাটা জানে বলেই বোধহয় তাকে বাছাই করা হয়েছে।
চতুর্থ লোকটার নাম হেনরিক। কিশোরের মনে হলো, ওই একটিমাত্র লোক সত্যিকারের কেয়ার টেকার, বাচ্চাদের কিভাবে সামলাতে হয় জানে। সারাটা দিন ওদের নিয়ে ব্যস্ত থেকেছে, ক্লান্ত হয়ে ঢুলছে এখন ওদের সঙ্গে সঙ্গে।
অন্য তিনজনের দিকে চোখ ফেরাল আবার কিশোর। তাদের চোখে ঘুমের লেশমাত্র নেই। এত উত্তেজিত কেন ওরা? ভাবল সে। কোন কিছুর অপেক্ষায় আছে?
হাই তুলতে শুরু করল কিশোর।
হঠাৎ তন্দ্রা টুটে গেল তার। লাউডস্পীকারে বেজে উঠেছে ক্যাপ্টেনের গমগমে কণ্ঠ। গুড মর্নিং, লেডিজ অ্যাণ্ড জেন্টলমেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই রিও ডি জেনিরোতে নামছি আমরা। দয়া করে।
কথা শেষ হলো না, থেমে গেল আচমকা, বিচিত্র কিছু ফিসফাস আর খুটখাট শোনা গেল স্পীকারে।
অবাক হলো কিশোর। কিসের শব্দ? যন্ত্রটন্ত্র খারাপ হয়ে গেল, নাকি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন ক্যাপ্টেন?
দেখল, চ্যাকো আর জিম নেই, ওরটেগা দাঁড়িয়ে আছে ককপিটের দরজার কাছে। পাহারা দিচ্ছে যেন। দৃষ্টি চঞ্চল, একবার কেবিনের দিকে তাকাচ্ছে, একবার দরজার দিকে।
তাজ্জব ব্যাপার তো! এমন করছে কেন?
একজন স্টুয়ার্ডেসের সঙ্গে কথা বলছে হেনরিক। দুজনকেই চিন্তিত মনে। হচ্ছে। সারাক্ষণ লেগে থাকা হাসি উধাও. স্টুয়ার্ডেসের মুখ থেকে। বার বার তাকাচ্ছে স্পীকারের দিকে, হঠাৎ থেমে যাওয়ার কারণ আন্দাজ করতে চাইছে।
শেষে আর থাকতে না পেরে বলল, যাই, দেখে আসি কি হলো?
কিন্তু তাকে ককপিটে ঢুকতে দিল না ওরটেগা।
যাওয়া যাবে না, এত জোরে বলল, কেবিনের সবাই শুনতে পেল। সীটে। গিয়ে বসুন।
বোকা বনে গেল স্টুয়ার্ডেস। ঢোক গিলে বলল, কাকে কি বলছেন? যাওয়া যাবে না মানে? যান, সীটে গিয়ে বসুন। এখানে আসার অনুমতি নেই আপনার, বেআইনী কাজ করছেন।

বিদ্রুপের হাসি ফুটল ওরটেগার ঠোঁটে। কেন বাজে বকছেন? যান, গিয়ে লক্ষ্মী মেয়ের মত চুপ করে বসুন।
মৃদু গুঞ্জন যেন ঢেউয়ের মত বয়ে গেল যাত্রীদের মাঝে।
ওরটেগার হাতে বেরিয়ে এসেছে একটা পিস্তল।
স্টুয়ার্ডেসের দিকে ফেরাল সে নলের মুখ।

.

কি করছেন আপনি, জানেন? জোর নেই স্টুয়ার্ডেসের কণ্ঠে।
জবাব দেয়ার প্রয়োজন বোধ করল না ওরটেগা।
ককপিটের দরজায় দেখা দিল চ্যাকো, তার হাতেও পিস্তল।
আর কোন সন্দেহ রইল না কিশোরের। ফিসফিস করে বন্ধুদের বলল, হাইজ্যাকার!
গুঞ্জন বাড়ল। চেঁচিয়ে উঠল একজন। কি হচ্ছে, জানতে চায়। তার সঙ্গে গলা মেলাল আরও কয়েকজন।
লাফিয়ে উঠল হেনরিক। কি করছ? ভয় দেখাচ্ছ কেন ছেলেমেয়েদের। এসব রসিকতার কোন মানে হয়?
এগিয়ে এসে ধাক্কা দিয়ে আবার তাকে বসিয়ে দিল চ্যাকো। না, হয় না। কিন্তু রসিকতা করছি না, এটা আসল। বসে থাকো চুপচাপ।
তর্ক করে লাভ হবে না, বুঝল হেনরিক, আর কথা বাড়াল না।
আতঙ্কিত ছেলেমেয়েদের দিকে ফিরল চ্যাকো। শোনা খোকাখুকুরা, কর্কশ। কণ্ঠ মোলায়েমের ব্যর্থ চেষ্টা করল, অনুমান করতে পারছ কিছু?
হাইজ্যাক! চেঁচিয়ে উঠল মুসা। প্লেন হাইজ্যাক করেছ।
মুসার বলার ধরন পছন্দ হলো না চ্যাকোর, হাসল বটে, কিন্তু চোখ দুটো শীতল। ঠিক ধরেছ। এখন ভাল-মন্দ তোমাদের ওপর। আমাদের কথা শুনলে কারও কোন ক্ষতি হবে না। যেখানে আছ, থাকো, যা করছিলে করো। গল্প করো, পড়ো, কিংবা মিউজিক শোনো।
কেবিনে বেরিয়ে এল জিম।
তার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল চ্যাকো, ওদিকে সব ঠিক আছে?
আছে। ক্যাপ্টেন, কো-পাইলট, রেডিওম্যান, কেউ গোলমাল করবে না।
কি করেছ ওদের? আবার সীট থেকে উঠতে শুরু করল হেনরিক।
বসো, পিস্তল নাচাল চ্যাকো।
মারিনি, বেধে রেখেছি। যাতে নড়তে না পারে, জিম বলল।
তাহলে কি..

হ্যাঁ, অটোমেটিক পাইলটে চলছে প্লেন। এখানকার অবস্থা দেখতে এসেছি। সবাইকে শান্ত করে গিয়ে কন্ট্রোল হাতে নেব। আমিই চালাব প্লেন। চ্যাকো
সীটের মাঝের গলিপথে আর কেবিনের পেছনে স্থির হয়ে আছে স্টুয়ার্ড স্টুয়ার্ডেসরা। ওরটেগারের কাছে দাঁড়ানো একজন স্টুয়ার্জেসের কাছে এগিয়ে গেল গ্যাকো। পিঠে পিস্তল ঠেকিয়ে বলল, হাঁটো।
বাথরুম আর রান্নাঘরে বিমানের সমস্ত কর্মচারীদের আটকে রেখে এল হাইজ্যাকাররা। তারপর জিম চলে গেল ককপিটে।
চালাতে পারবে তো? বিদ্রুপের হাসি ফুটল ওরটেগার ঠোঁটে। কিশোর বুঝল ওরকম করেই হাসে লোকটা।
পারবে তো বলল, জবাব দিল চ্যাকো।
পারলে ভাল। আমাদের জীবন এখন ওর হাতে। হালকা টুরিস্ট প্লেন ছাড়া। আর তো কিছু চালায়নি। এতবড় প্লেন সামলাতে পারলে হয়।
কড়া চোখে তাকাল চ্যাকো। বেশি কথা বলো। জিম যখন বলেছে চালাতে পারবে, পারবেই। খামোখা ভয় দেখাচ্ছে বাচ্চাগুলোকে।
হাইজ্যাকারদের ওপর থেকে চোখ সরাচ্ছে না জিনা। রোমাঞ্চ ভাল লাগে তার। ভয় পায়নি। অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধে রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছে।
প্রথম চমকটা কেটে গেছে। শত্রুদের ভালমত লক্ষ করছে এখন জিনা। চ্যাকোকে শুরুতে ভাল লাগেনি তার, নিষ্ঠুর মনে হয়েছে, কিন্তু এখন যতখানি খারাপ লাগছে না। আসলে দেখে যতটা মনে হয়, তত খারাপ নয় বিশালদেহী লোকটা.।
একটু আগের কথা কাটাকাটির কথা বেমালুম ভুলে গেল জিনী, আস্তে করে কনুই দিয়ে গুতো দিল মুসার গায়ে। কি ভয় পাচ্ছ?
ভয়? হ্যাঁ, তা-তো পাচ্ছিই। কি ঘটে কিছুই বলা যায় না।
কি মনে হয়? দারুণ একখান অ্যাডভেঞ্চার হবে, না?
তোমার কাছে দারুণ লাগছে। আমার সুবিধের মনে হচ্ছে না। হাইজ্যাকারদের বিশ্বাস নেই। আর আমরা এখানে ভাল থাকলেই কি? বাবা-মা চিন্তা করবে না?
মুসা ঠিকই বলেছে, পেছন থেকে বলল কিশোর। রেডিও অপারেটরকে বেঁধে রেখেছে। রিওর কন্ট্রোল টাওয়ার নিশ্চয় যোগাযোগের চেষ্টা করছে প্লেনের সঙ্গে। জবাব পাবে না।
হ্যাঁ, রবিন একমত হলো। হাইজ্যাকের খবর সব সময়ই খবরের কাগজের হেডলাইন হয়। খুব তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়বে খবর। বাবা, মা, সাংঘাতিক দুশ্চিন্তা করবে।
আচ্ছা, শেষ পর্যন্ত ওরা কি করবে বলো তো? জিনা বলল। ইস, রাফিয়ান এখন এখানে থাকলে হত। ওরটেগা আর চ্যাকোকে কাবু করে ফেলতে পারতাম।

আবার সব ঠিক হয়ে যেত।
জবাব দিল না তিনজনের কেউ।
বেশি অবাস্তব কল্পনা করছে জিনা। কিন্তু কিশোর আন্দাজ করতে পারছে, কতখানি বিপদে পড়েছে ওরা। প্লেনের সমস্ত কর্মচারী আর যাত্রী এখন হাইজ্যাকারদের হাতের পুতুল, যেভাবে বলা হবে, সেভাবেই কাজ করতে হবে।
ছেলেমেয়েদের গুঞ্জনে মনে হচ্ছে, হাজার হাজার মৌমাছি এনে ছেড়ে দেয়া হয়েছে কেবিনে। কেউ আস্তে কথা বলছে, কেউ জোরে। বেশি বাচ্চা কয়েকজন। ফোপাচ্ছে নিচুস্বরে, থামানো যাচ্ছে না কিছুতেই।
সব আওয়াজ ছাপিয়ে শোনা গেল চ্যাকোর কর্কশ কণ্ঠ, এই, চুপ! শুনছ? চুপ! শোনো, আমার কথা শোনো।
থেমে গেল গুঞ্জন।
তোমাদের কারও কিচ্ছু হবে না, বলল চ্যাকো। কি করব, সেটা পরে বলছি। কেন করেছি সেটা আগে শোনো। প্লেনটা আমাদের দরকার। কিছু মাল। নিরাপদে কলাম্বিয়ায় পার করতে চাই। কাস্টমস গোলমাল করবে, তাই....
সোজা করে বলো না, বাধা দিয়ে বলল ওরটেগা, কিছু মাল স্মাগল করব আমরা।
চোখ বড় বড় হয়ে গেল বাচ্চাদের। শুধু হাইজ্যাকারই নয়, চোরাচালানীর পাল্লায় পড়েছে ওরা।
টাকা নেই আমাদের, বলে গেল চ্যাকো। ভাড়ার পয়সাও নেই। ভাবলাম, একটা প্লেন হাইজ্যাক করতে পারলে কাজ হয়। ঝুঁকিটা নিয়েই ফেললাম। তিনজন কেয়ার টেকারের কাগজপত্র জাল করে তার বদলে আমরা উঠেছি, আসল লোকেরা রয়ে গেছে নিউইয়র্কে, এয়ারপোর্টে এক বাথরুমে, আটক। তাই কোন অসুবিধে হয়নি। সন্দেহ হয়নি কারও। বুঝতে পারছি, সফল হব, তবে তার জন্যে তোমাদের সহায়তা দরকার।
বাহ, বড় বেশি আত্মবিশ্বাস দেখছি, বলে উঠল হেনরিক। আমাকে আটকাওনি কেন?
তোমাকে এখানে দরকার ছিল। কেয়ারটেকারের ট্রেনিং আছে তোমার, আমাদের নেই। সবাই আনাড়ি হলে মুশকিল। ধরা পড়ে যেতাম, বলল ওরটেগা।
নতুন কাজ নিয়েছি ওই ট্র্যাভেল এজেন্সিতে, বলল হেনরিক। এ-লাইনে। এটাই প্রথম সফর। অন্য তিনজনকে চিনি না বলেই করতে পারলে।
সেজন্যেই তো তোমাকে বেছে নিয়েছি, দরাজ হাসি হাসল চ্যাকো। যাকগে। ছেলেরা, যা বলছিলাম। রিওতেই নামব আমরা।
রিও ডি জেনিরোতে প্লেন নামলে বাঁচার কোন উপায় হয়েও যেতে পারে, ভাবল মুসা।

নামব, বলে যাচ্ছে চ্যাকো, প্লেনের তেল নেয়ার জন্যে। আর কিছু খাবারও দরকার আমাদের। কন্ট্রোল টাওয়ারের সঙ্গে কথা বলছে ক্যাপটেন, আমাদের কি কি দরকার, জানাচ্ছে। নেমে সব তৈরিই পাব আমরা। এখন আসছি আসল কথায়। শুধু বিমানটা দরকার আমাদের। এর স্টাফ আর যাত্রীদের নামিয়ে দেয়াই বরং আমাদের জন্যে নিরাপদ, ঝামেলা অনেক কমে যাবে।
ওরটেগা হয়তো ভাবল, এরপরের বিশেষ কথাগুলো তার নিজের বলা দরকার, তাই চ্যাকোর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল, কাজেই, তোমাদের কোন ভয় নেই। তোমরা গোলমাল না করলে আমরাও করব না। নামিয়ে দেব জায়গামত।
স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল যাত্রীরা। গুঞ্জন শুরু হলো।
নিচু কণ্ঠে বন্ধুদের বলল মুসা, ব্যাটারা পাগল, বদ্ধ উন্মাদ! যাত্রীদেরকে নামিয়ে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্লেনে উঠবে পুলিশ।
আমার তা মনে হয় না, কিশোর বলল। এত সহজ নয় ব্যাপারটা। এসব ভাবেনি, এত বোকা নয় ওরা। কোন মতলব নিশ্চয় আছে।
জানা গেল শিগগিরই।
তবে, হাত তুলল চ্যাকো, গুঞ্জন থামানোর জন্যে নিজেদের নিরাপত্তার কথাও ভাবতে হবে আমাদের। তাই, অন্তত একজন জিম্মি রাখতে হবে।
জিম্মি শব্দটা শুনেই ফ্যাকাসে হয়ে গেল যাত্রীদের মুখ। কার পালা?
জিনা, হুশিয়ার! ফিসফিস করে বলল কিশোর। তোমার দিকে তাকাচ্ছে।
কালো হয়ে গেল জিনার মুখ। চোখের পাতা কাছাকাছি হয়ে যাচ্ছে।
সরাসরি জিনার দিকে তাকিয়ে রয়েছে চ্যাকো। হাসল। তারপর এগিয়ে এল। ধীরে পায়ে।
এই, তুমি উঠে এসো, ডাকল চ্যাকো।
নড়ল না জিনা।
কি হলো? আসছ না কেন? জলদি এসো।
উঠল না জিনা।
এগোল চ্যাকো।
হাত তুলল মুসা। দাঁড়ান। জিম্মি হলেই তো হয় আপনাদের। আমি, আসছি।
পেছন থেকে বলে উঠল রবিন, ওরা থাক। আমাকে নিন।
নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর। গভীর চিন্তা চলছে মাথায়।
উঠে দাঁড়াল জিনা, না না, কারও দরকার নেই। আমিই আসছি।
ভুরু কুঁচকে গেছে চ্যাকোর। হ্যাঁ, তুমিই এসো। ছেলেদের দরকার নেই। আমার। জিম্মি হিসেবে সুন্দরী কিশোরী খুব ভাল হবে। ছবি আর খবর ছাপা হলে নাড়া দেবে সবাইকে।

এক মিনিট, হাত তুলল কিশোর, ধীরেসুস্থে উঠে দাঁড়াল। মিস্টার চ্যাকো, আরেক কাজ করলে তো পারেন। আমরা চারজন এক জায়গা থেকে একই সঙ্গে বেরিয়েছি, আমাদের চারজনকেই নিন। জিম্মি বেশি হলেই তো বরং আপনাদের সুবিধে।

দ্বিধায় পড়ে গেল চ্যাকো। কি করবে বুঝতে পারছে না। সিদ্ধান্ত নিতে পারছে দেখে শেষে রেগে গেল নিজের ওপরই। ধমক দিয়ে বলল, বড় বেশি ফ্যাচফ্যাচ করছ তোমরা। এটা কি সিনেমা পেয়েছ নাকি? বেশি জিম্মি রাখলে ঝামেলা বেশি, একজনকেই রাখব। যাকে নেব ঠিক করেছি, তাকেই শুধু। এই মেয়ে, এসো।

মুসার সামনে দিয়ে গলিতে বেরিয়ে এল জিনা।

তার হাত ধরতে গেল চ্যাকো।

ঝটকা দিয়ে হাত সরিয়ে নিল জিনা। খবরদার, ষাঁড়, গায়ে হাত দেবে না। চলো, কোথায় যেতে হবে।

পিস্তলের ইশারায় ককপিট দেখাল চ্যাকো। ওখানে। জিমের পাশে চুপ করে বসে থাকবে।

ককপিটের দরজা খুলে দিল ওরটেগা। জিনা ভেতরে ঢুকতেই আবার বন্ধ করে দিল।

শোনো তোমরা, যাত্রীদের বলল চ্যাকো, সীট-বেল্ট বেঁধে নাও। একটু পরেই ল্যাণ্ড করব। কোন চেঁচামেচি নয়, ধাক্কাধাক্কি নয়। সিঁড়ি দিয়ে একজনের পেছনে একজন নেমে যাবে, শান্তভাবে। আমি আর ওরটেগা পিস্তল নিয়ে পেছনে থাকব। কেউ শয়তানী করলেই গুলি খাবে। পুলিশকে বলবে, ওরা কিছু করার চেষ্টা করলে জিম্মি মেয়েটা মরবে। বুঝেছ? আই রিপীট, মরবে!

নীরবে সীট-বেল্ট বেঁধে নিল যাত্রীরা।

এঞ্জিনের শব্দ ছাড়া আর কোন আওয়াজ নেই, টু শব্দ করল না কেউ। নিজেদের কথা ভাবছে ওরা, জিনাকে নিয়ে চিন্তিত নয়–তিন গোয়েন্দার কথা অবশ্য আলাদা। বিপদ যে সামান্যতম কমেনি, এটা বোঝার বুদ্ধি আছে। ছেলেমেয়েদের। জিম যদি ঠিকমত প্লেন ল্যাণ্ড করাতে না পারে? যদি ক্র্যাশ করে? যদি নামার সঙ্গে সঙ্গে গুলি চালাতে শুরু করে পুলিশ?

নিচে রানওয়ে আর বিমান বন্দরের বাড়িঘর দেখা যাচ্ছে।

নামতে শুরু করল প্লেন। সবাই চুপ। প্রচণ্ড উত্তেজনা। ঠাণ্ডা এয়ারকুলড কেবিনেও দরদর করে ঘামছে অনেকে।

অবশেষে নিরাপদেই নামল বিমান। চারপাশ থেকে ছুটে এল অসংখ্য মূর্তি। তাদের মাঝে ইউনির্ফম পরা পুলিশও রয়েছে।

রেডিওতেই সমস্ত নির্দেশ দিয়ে রেখেছে হাইজ্যাকাররা। প্লেনের ধারেকাছে যাতে কোন গাড়ি না আসে, বলে দিয়েছে। গাড়ি এল না। পুলিশদের হাতেও কোন অস্ত্র নেই। একটা বিশেষ দূরতে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল ওরা।
পরিকল্পনা মাফিকই হচ্ছে সব কিছু। একে একে নেমে গেল ছেলেমেয়েরা, খালি হাতে। তাদের মালপত্র সব রয়ে গেল বিমানে।
বিমানের কর্মচারীদের মুক্তি দেয়া হলো। তারাও নেমে গেল একে একে। কেউ কোন গোলমাল করল না। চ্যাকোর হাতে পিস্তল। ওরটেগা একটা সাব-মেশিনগান। বের করে নিয়েছে। তার ওপর ককপিটে জিম্মি রাখা হয়েছে এক কিশোরীকে। কাজেই কিছু করার চেষ্টা করল না কেউ।

.

খুব ধীরে ধীরে কাটছে জিনার সময়। দুঃস্বপ্নের মাঝে রয়েছে যেন সে। জিমের পাশে বসে ভাবছে, এরকম বিশ্রী অবস্থায় জীবনে কখনও পড়েনি। এখন পর্যন্ত খারাপ কিছু করেনি হাইজ্যাকাররা, কিন্তু চাপে পড়লে করবে না এর নিশ্চয়তা কোথায়?
জিনাকে অবাক করে দিয়ে তার কাঁধে হাত রাখল জিম। আলতো চাপ দিয়ে। বলল, মন খারাপ কোরো না। কোন ক্ষতি হবে না তোমার। দিন কয়েকের মধ্যেই মুক্তি দেয়া হবে। হাসল সে। আমরা অমানুষ নই। বেআইনী কাজ হয়তো করছি, কিন্তু খারাপ লোক নই।
জেনেশুনে তাহলে করছেন কেন?
একবার খারাপ পথে পা দিলে, ফেরার রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। একটা প্রাইভেট অ্যাভিয়েশন ক্লাবের ইনস্ট্রাকটর ছিলাম। গাধার মত একদিন ওখানকার ক্যাশ চুরি। করে বসলাম। তারপর থেকে জড়িয়ে পড়লাম নানারকম অপরাধের সঙ্গে, আর ফিরতে পারলাম না। এখন তো অনেক বেশি দেরি হয়ে গেছে।
কে বলল? আমার তা মনে হয় না। ইচ্ছে করলে এখনও ফিরতে পারেন, সময় আছে, নরম গলায় বলল জিনা। সত্যি বলছি, যদি হাইজ্যাকার না হতেন, চোরাচালান না করতেন, আপনাকে আমি পছন্দই করতাম।
হাসল শুধু জিম, জবাব দিল না। সামনে ঝুঁকে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। কি হচ্ছে, দেখল।
একটু বাদেই উড়ব আবার, বলল সে। আমাজনে প্লেন নিয়ে যেতে পারব আশা করছি। ওখানে ল্যাণ্ড করব। অস্থায়ী একটা রানওয়ে তৈরি করা হয়েছে ওখানে। একটু থেমে যোগ করল, আমাদের বন্ধুরা কাছেই থাকবে। অনেকদিন, থেকেই ওরা স্মাগলিঙের সঙ্গে জড়িত।

অজানা আশঙ্কায় কেঁপে উঠল জিনা। যে কোন মুহূর্তে রিও ছাড়বে প্লেন, একা হয়ে যাবে তখন। বন্ধুদের কাছ থেকে দূরে সরে যাবে। হঠাৎ করেই মনে পড়ল। রাফিয়ানের কথা। আছে তো, না তাকেও নামিয়ে দিয়েছে? রাফিয়ান সঙ্গে থাকলে অনেক ভরসা পায় জিনা, বিপদে-আপদে সাহায্য পাবে।

জানালা দিয়ে দেখছে জিনা, বাইরে সবাই ব্যস্ত। অসংখ্য পুলিশ ঘিরে রেখেছে। প্লেনটাকে, কিন্তু বিষদাত ভাঙা সাপের অবস্থা হয়েছে ওদের, কিছুই করতে পারছে। না। অসহায় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্লেনে তেলভরা দেখছে শুধু।

বিমানের কর্মচারী আর যাত্রীরা ঢুকে যাচ্ছে এয়ারপোর্টের মেইন বিল্ডিঙে, তাদেরকে ঘিরে রয়েছে এক ঝাঁক রিপোর্টার। নিশ্চয় তাদের মাঝেই রয়েছে, কিশোর, মুসা আর রবিন।

আচ্ছা, কিশোর কি করছে? এত সহজে হাল ছেড়ে দেয়ার ছেলে তো সে নয়। ক্ষীণ আশা হলো জিনার, কিশোর যখন মুক্ত রয়েছে, কিছু একটা সে করবেই। জিনাকে উদ্ধার করার সব রকম চেষ্টা চালাবে, বুদ্ধি একটা ঠিক বের করে ফেলবে।

মুসা আর রবিনের কথা ভাবল। কি একেক জন সোনার টুকরো ছেলে। তাকে বাঁচানোর জন্যে স্বেচ্ছায় নিজেদেরকে বিপদে ঠেলে দিতে চেয়েছিল। আর সে কিনা ওদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে, সারাক্ষণ ঝগড়া বাধিয়ে রাখে।

বাবা-মার কথা মনে পড়তেই চোখে পানি এসে গেল জিনার। তারা ওকে কত ভালবাসেন, অথচ সে খারাপ ব্যবহার করে তাদের সঙ্গে। সেই মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিয়ে। ফেলল জিনা, আর কারও সঙ্গেই খারাপ ব্যবহার করবে না। ভাল হয়ে যাবে। কিন্তু ভাল হওয়ার কথা তো পরে, আগে এখান থেকে বেরোতে তো হবে। মুক্তি পেলে তবে না...

ককপিটে ঢুকল চ্যাকো, তার পেছনে ওরটেগা।

এবার যাওয়া যায়, জিম, চ্যাকো বলল।

রানওয়েতে চলতে শুরু করল প্লেন। দুরুদুরু করছে জিনার বুক। সময় অনেক দীর্ঘ মনে হচ্ছে।

অবশেষে মাটি ছাড়ল প্লেন, দ্রুত ওপরে উঠতে লাগল।

জিম ঘোষণা করল, অলটিচিউড বারো হাজার মিটার। স্পীড এক হাজার কিলোমিটার।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল চ্যাকো আর ওরটেগা।

সেরে দিলাম কাজ! হাসি ফুটল ওরটেগার মুখে। নিরাপদ। জিনাকে ধন্যবাদ। ওর জন্যেই কেউ পিছু নিতে সাহস করবে না।

জিনাকে বলল চ্যাকো, ইচ্ছে করলে ঘোরাঘুরি করতে পারো। বলেছি না, তোমার কোন ক্ষতি করব না।
কেবিনের দরজা খুলে দিল সে।
জিনা বেরোল। চেঁচিয়ে উঠল, তোমরা! তোমরা এখানে।
চিৎকার শুনে দরজায় উঁকি দিল চ্যাকো। তাজ্জব হয়ে গেল। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। সেই ছেলে তিনটে, জিনার বন্ধু। বোধহয় সীটের নিচে। লুকিয়ে ছিল এতক্ষণ। বেশ খুশি খুশি লাগছে ওদের।
যাওনি? কেবিনে নামল চ্যাকো।
নাহ, যেন কিছুই না এমনি ভঙ্গিতে বলল কিশোর। জিনাকে দেখিয়ে বলল, ও রয়ে গেছে। ফেলে যাই কি করে?
ছিলে কোথায়?
সীটের নিচে।
হু, এত ব্যস্ত ছিলাম, গুণে দেখার কথা মনে হয়নি। তাছাড়া ভাবতেও পারিনি, ঝুঁকি নিয়ে কেউ রয়ে যাবে প্লেনে। শুধু বন্ধুর সঙ্গে থাকার জন্যেই রয়ে গেলে?
একসঙ্গে বেরিয়েছি, রবিন বলল, একসঙ্গে যাব। বিপদের মোকাবেলা করতে। হলেও একসঙ্গেই করব। একা রেখে গেলে ওর বাপ-মাকে গিয়ে কি জবাব দেব?
প্রশংসা ফুটল চ্যাকোর চোখে। কাজটা বোধহয় ভাল করলে না। যাকগে, আমাদের কি? ঝামেলা বাড়ল বটে, কিন্তু সুবিধেও হলো। নিজেকে বোঝাচ্ছে সে। একজন জিম্মির চেয়ে চারজন
পাঁচ, শুধরে দিল জিনা। যদি রাফিয়ানকে নামিয়ে না দিয়ে থাকেন?
রাফিয়ান? কুঁচকে গেল চ্যাকোর ভুরু।
আমার কুকুর। আপনার সঙ্গে যে ধাক্কা লাগল, ওকেই তখন দেখতে গিয়েছিলাম। আপনি গিয়েছিলেন কেন?
হাসল চ্যাকো। জানোয়ারের ঘরের পাশেই বিমানের ভাড়ার। অস্ত্রপাতিগুলো ওখানেই রেখেছিলাম।
আর কিছু না বলে ককপিটে চলে গেল সে। জিম. আর ওরটেগাকে খবরটা জানানোর জন্যেই হয়তো।
কিশোরের হাত ধরল এসে জিনা। থ্যা-থ্যাংকিউ..
খাইছে! বলে উঠল মুসা। যেন শুধু কিশোরই থেকেছে। আমরা থাকিনি?
হাসল জিনা মুসা আর রবিনেরও হাত ধরে ঝাঁকিয়ে দিল। ধন্যবাদ দিল বার। বার। ওরা রয়ে যাওয়ায় সে কৃতজ্ঞ বোধ করছে, জানাল নির্দ্বিধায়।
সহজ হয়ে গেল পরিবেশ।

পরের কয়েক ঘণ্টায় হাইজ্যাকারদের সঙ্গেও সম্পর্ক সহজ করে নিল চার। অভিযাত্রী। বাবুর্চি আর স্টুয়ার্ডের দায়িত্ব নিল চ্যাকো। ট্রেতে খাবার সাজাতে গিয়ে ভুলভাল করে ফেলল। হেসে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল রবিন। দুজনে মিলে খাওয়া সরবরাহ করল সবাইকে।
জিমের পাশে খাবারের ট্রে নামিয়ে রাখল রবিন।
থ্যাংকস, জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রয়েছে জিম। অন্ধকার হয়ে যাবে। শিঘ্রী। তখন আর খেতে পারব না। এতবড় প্লেন এর আগে কখনও চালাইনি তো, সারাক্ষণ সতর্ক থাকতে হচ্ছে।
তিনজনের কাজ একা করছ, আর কি? সাহস দিল ওরটেগা। ভালই তো চালাচ্ছ।
আরও কয়েক ঘণ্টা লাগবে, চ্যাকো বলল। পারবে তো?
চেষ্টা তো করতেই হবে, বলল জিম। রেডিওতে যোগাযোগ করতে হবে ওদের সঙ্গে। নামার নির্দেশ চাইব। না না, এখন না, আরও অনেক পরে।
আমাদের কখন যেতে দেবেন? জিজ্ঞেস করল কিশোর। আমাজনের ওদিকে তো ঘোর জঙ্গল। সভ্য লোকালয় আছে?
ভেব না, জবাব দিল ওরটেগা। জঙ্গলের মাঝে মিশনারিদের ক্যাম্প আছে। ওখানে দিয়ে আসব। ওরাই তোমাদের পৌঁছে দেবে লোকালয়ে।
সংবাদটা বিশেষ আশাব্যঞ্জক মনে হলো না ছেলেদের কাছে, কিন্তু কি আর করা। এতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে।
রাত নামল। জিনা বলল, এসো, ঘুমাই। দুশ্চিন্তা কমবে।
কেবিনের সীটে বসে ঘুমানোর চেষ্টা করল ওরা।
সবাই ঘুমাল, কিন্তু জিনার চোখে ঘুম নেই। রাফিয়ানের কথা ভাবছে। কয়েকবার চ্যাকোকে অনুরোধ করেছে সে, রাফিয়ানকে কেবিনে নিয়ে আসার। জন্যে। রাজি হয়নি চ্যাকো, কুকুর পছন্দ করে না।
সামনের দিকে একটা সীটে চ্যাকোর নাক ডাকার শব্দ শোনা গেল।
নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল জিনা। চুপি চুপি চলল কেবিনের পেছন দিকে।
তখন প্লেনের পেছনের দরজা দিয়ে উঠেছিল রাফিয়ানের কামরায়। এদিকের পথ চেনে না। কিন্তু থামল না জিনা। একের পর এক দরজা খুলে উঁকি দিতে লাগল ভেতরে। ভাড়ারটা পেল। চ্যাকো বলেছে, ভাঁড়ারের সঙ্গেই রয়েছে জন্তু জানোয়ারের ঘর।
কি করে জানি টের পেয়ে গেল রাফিয়ান, জিনা কাছাকাছি রয়েছে। বোধহয় গন্ধ পেয়েছে। চাপা গোঁ গোঁ করে উঠল সে।
দরজা খুলে ছুটে গিয়ে রাফিয়ানের গা ঘেঁষে বসে পড়ল জিনা। পিঠে হাত বুলিয়ে, মাথায় আলতো চাপড় দিয়ে আদর করতে লাগল। রাফি, কষ্ট পাচ্ছিস? তোর তো

পাওয়ার কথা না। আরামেই আছিস। আমরাও অবশ্য খুব একটা খারাপ নেই, হাইজ্যাকাররা লোক ভাল। বুঝলি রাফি, এবার আর কোন রহস্যের সমাধান নয়। অ্যাডভেঞ্চার, পিওর অ্যাডভেঞ্চার।
হউ! লেজ নেড়ে বলল রাফিয়ান, একমত হলো যেন জিনার কথায়। হউ! হউ!
রাফিয়ানের মুখের দিকে তাকাল জিনা। ঠিক বলেছিস। অ্যাডভেঞ্চার মানেই অ্যাকশন। দাঁড়া, আগে নেমে নিই। তোর সাহায্যে হাইজ্যাকারদের ফাঁকি দিয়ে পালাব আমরা। ও হ্যাঁ, কিশোর, মুসা আর রবিনও আছে। আমাদের ছেড়ে যায়নি।
হউ! বলল আবার রাফিয়ান।
কুকুরটার বাঁধন খুলে দিল জিনা। তাকে নিয়ে ফিরে এল কবিনে। কিন্তু নিজের সীটে পৌঁছার আগেই ভীষণভাবে দুলে উঠল বিমান। তাল সামলাতে না পেরে, উল্টে পড়তে পড়তে একটা সীট খামচে ধরে সামলে নিল সে কোনমতে।
হলো কি? সোজা হয়ে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল জিনা।
জেগে গেছে চ্যাকো। লাফিয়ে উঠল।
ধাক্কার চোটে তিন গোয়েন্দাও জেগে গেল।
আবার কেঁপে উঠল বিমান, গা ঝাড়া দিচ্ছে যেন দুরন্ত ঘোড়া।
ককপিটের দিকে ছুটল চ্যাকো। ছেলেরা পিছু নিল।
রেডিওর কাছ থেকে উঠে গিয়ে জিমের পাশে ঝুঁকে দাঁড়িয়েছে ওরটেগা, নজর কন্ট্রোল প্যানেলের দিকে। নিয়ন্ত্রণ নিয়ে হিমশিম খাচ্ছে জিম।
কি হলো? জিম উদ্বিয়।
ফিরে তাকাল না জিম। এই সময় আবার কেঁপে উঠল প্লেন, প্রচণ্ডভাবে। সামান্য কাত হয়েই আবার সোজা হলো। কি জানি, বুঝতে পারছি না, দাঁতে দাঁত চেপে রেখেছে সে। কিছু একটা…
কথা শেষ করতে পারল না, দুলে উঠল বিমান ভীষণভাবে।
সোজা করার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা চালাল জিম, কিন্তু এবার আর ঠিক হতে চাইছে না বিমান। গোলমাল একটা কিছু হয়েছে। কি, বুঝতে পারছি না। চালানোয় কোন ভুল হয়নি আমার।
চ্যাকো আর ওরটেগার মুখ কালো। নিঃশ্বাস ফেলতে ভুলে গেছে যেন ছেলেরা। রাফিয়ানও উদ্বিগ্ন, অদ্ভুত কোন উপায়ে টের পেয়ে গেছে বিপদ।
মরব না তো, জিম? ওরটেগার গলা কাঁপছে। নামাতে পারবে তো?
কন্ট্রোল কথা শুনতে চাইছে না, জিম জানাল। খারাপের দিকেই যাচ্ছে। জোর নেই গলায়। জাদ তো আর জানি না, অলৌকিক কিছু ঘটাতে পারব না।

ঝাঁকুনি দিয়ে নাক নিচু করে ফেলল প্লেন। গাঢ় অন্ধকারে শা শা করে মাটির দিকে ছুটে চলল।
চুপ করে রয়েছে ছেলেরা। রক্ত সরে গেছে মুখ থেকে। নিজেদের অজান্তেই একে অন্যের হাত ধরে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে, যেন শক্তি সঞ্চয় করছে। রাফিয়ান জিনার পা ঘেষে রয়েছে।
কন্ট্রোলের ওপর আরও ঝুঁকে গেছে জিম। তার দুপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে চ্যাকো আর ওরটেগা, আতঙ্কিত।
মাত্র কয়েক সেকেণ্ড পেরোল, কিন্তু ওদের মনে হলো, কয়েক যুগ।
অবশেষে মাথা সোজা করল জিম। জলদি গিয়ে সীটে বসে সীট-বেল্ট বাধা। ক্র্যাশ-ল্যাণ্ড করা ছাড়া আর কোন উপায় দেখছি না। চলেছে জঙ্গলের ওপর দিয়ে, নামতে পারলে হয় এখন, গোপন না করে সত্যি কথাই বলল সে।
সবাই বুঝল, বাঁচার আশা কম।
আরে, মুখ অমন কালো করে রেখেছ কেন? হাসার চেষ্টা করল কিশোর, সীট-বেল্ট বাধছে। আগেও বিপদে পড়েছি, উদ্ধারও পেয়েছি, নাকি?
কই কালো কই? এই তো হাসছি, কিন্তু জিনার হাসিটা কান্নার মত দেখাল।
সাধ্যমত চেষ্টা করছে জিম। অলটিমিটারের ওপর চোখ, প্লেনের নাক সোজা করার চেষ্টা চালাচ্ছে। সোজা হলে গতি অন্তত সামান্য কমবে, তাতে নাক সোজা করে মাটিতে গিয়ে গাঁথবে না প্লেন।
কিন্তু কথা শুনল না প্লেন, খামখেয়ালির মত চলেছে। নাক তো সোজা করলই, বিপদ আরও বাড়ানোর জন্যেই যেন বিপজ্জনক ভঙ্গিতে কাত হয়ে গেল। একপাশে। কোথায় যাচ্ছে, অন্ধকারে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না জিম।
পাহাড়-টাহার নেই তো? তাহলে আর কিছুই করার থাকবে না। পাহাড়ের ধাক্কা খেলে আর ভাবতে পারল না সে।
পরের কয়েকটা মুহূর্ত ভয়াবহ এক দুঃস্বপ্নের মাঝে কাটল যেন ওদের। হঠাৎ প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে সামনে ঝুঁকে গেল সবাই, টান টান হয়ে গেল সীট-বেল্ট। আরও কাত হয়ে পুরো আধচক্কর ঘুরল বিমান, সোজা হলে সামান্য, পরক্ষণেই তার ধাতব শরীর ছেঁড়ার তীক্ষ্ণ চড়চড় শব্দ কানে এল। আরেকবার প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে স্থির হয়ে গেল নাক নিচে, লেজ ওপরে তুলে।
আরও কয়েক মুহূর্ত কেউ নড়ল না!
সবার আগে সামলে নিল জিনা। না না, ভুল হলো, রাফিয়ান। তাকে কোলে নিয়ে দুহাতে আঁকড়ে ধরে রেখেছে জিনা। তার গাল চেটে দিল কুকুরটা। লেজ নেড়ে চেঁচিয়ে উঠল, খউ! খউ!

রাফি, সব ঠিক হয়ে গেছে, না? দুর্বল লাগছে জিনার, সারা শরীর কাঁপছে। রাফিয়ানকে ছেড়ে দিয়ে কাঁপা হাতে বেল্ট খুলল। ঘুটঘুঁটে অন্ধকার, আলো নিভে গেছে। অন্যেরা ঠিক আছে তো?
এই সময় সাড়া দিল মুসা, আল্লাহরে! দুনিয়ায় আছি, না দোজখে?
মুসা, তুমি ভাল আছ? উৎকণ্ঠায় ভরা জিনার কণ্ঠ।
তা আছি। তবে দুনিয়াতে, না আল্লাহর কাছে, বুঝতে পারছি না। তুমি?
দুনিয়াতেই আছ। আমি ভাল। কিশোর আর রবিনের কি খবর?
ওরাও সাড়া দিল, ভাল। তবে পুরোপুরি অক্ষত কেউই নয়, কমবেশি আহত হয়েছে সবাই। কারও চামড়া ছড়েছে, কেউ কনই কিংবা হাটুতে ব্যথা পেয়েছে।
অন্ধকারে চ্যাকো আর ওরটেগার কথা শোনা গেল। ওরাও ঠিকই আছে বোঝা গেল। কিন্তু জিমের কি অবস্থা?
ককপিটে গিয়ে ঢুকল তার দুই সহকারী। জিমের নাম ধরে ডাকল চ্যাকো। সাড়া নেই। বিড়বিড় করে কিছু বলে একটা টর্চ খুঁজে বের করে জ্বলল।
কন্ট্রোল প্যানেলের ওপর ঝুঁকে পড়ে রয়েছে জিম। দ্রুত পরীক্ষা করে দেখল ওরটেগা। না, মরেনি, বেহুশ হয়ে গেছে।
কপাল কেটেছে। বাড়ি খেয়েছে ভালমতই।...এই যে, হুশ ফিরছে।
চোখ মেলল জিম, আপনাআপনি হাত চলে গেল কপালের কাটায়। প্লেন অনড় হয়ে রয়েছে বুঝতে পেরে হাসল, পেরেছি তাহলে।
হ্যাঁ, পেরেছেন, পেছন থেকে বলে উঠল কিশোর। ওরাও এসে ঢুকেছে। ককপিটে। দারুণ দেখিয়েছেন। আগুন ধরছে না কেন এখনও?
আর ধরবেও না। ভাগ্য ভাল আমাদের। ধরলে নামার সময় ধাক্কা যখন লেগেছে, তখনই ধরে যেত।
প্লেনের বিশ্বাস নেই, নিশ্চিন্ত হতে পারছে না জিনা। ধরে যেতেও পারে। চলুন বেরিয়ে যাই।
না, ধরবে না, বলল জিম। বাইরে যাব কোথায়? যা অন্ধকার, আর জঙ্গল। কি বিপদ রয়েছে কে জানে। তার চেয়ে এখানেই আপাতত নিরাপদ। ভোরে উঠে বেরোব। তখন দেখব কোথায় পড়েছি, কিভাবে উদ্ধার পাব।
হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন, একমত হলো কিশোর।
খুঁজে ফাস্ট-এইড কিট বের করল জিনা। জিমের কপালের রক্ত পরিষ্কার করে মলম লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিল।
সীটগুলোকে মেলে বিছানা বানিয়ে শুয়ে পড়ল সবাই। ঘুমাতে পারলে ভাবনা। অনেকখানি দূর হবে, ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করতে পারবে। তাছাড়া যা ধকল গেছে সারাটা দিন, ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে শরীর।

কিন্তু নরম গদিতে আরামে শুয়েও সহজে ঘুম আসতে চাইল না। নানারকম। ভাবনা ভিড় করে আসছে মনে।
সবার আগে ঘুম ভাঙল মুসার। বাইরে উজ্জল দিন, জানালা দিয়ে আলো আসছে। আশেপাশে চেয়ে দেখল, তার বন্ধুরা সবাই ঘুমিয়ে আছে। তিন হাইজ্যাকারের কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। কেটে পড়ল নাকি?
রেডিওর কাছ থেকে শোনা গেল ওরটেগার গলা, যন্ত্রটাকে গালমন্দ করছে। খারাপ হয়ে গেছে বোধহয়, চালু করতে পারছে না। টু শব্দও তো করছে না। করি কি এখন?
এই সময় হাজির হলো জিম আর চ্যাকো। বাইরে বেরিয়েছিল। চেহারা দেখেই বোঝা গেল, খবর ভাল না।
কিশোর, জিনা আর রবিনেরও ঘুম ভাঙল। ভুরু কুঁচকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে জিমের দিকে তাকাল জিনা।
খালি জঙ্গল, জানাল জিম। তবে এই জঙ্গলই বাঁচিয়ে দিয়েছে আমাদের। কাদামাটি বেশি, জলাভূমিই বলা চলে। কলামবিয়ার বর্ডার থেকে দূরে, ইয়াপুরার কাছে রয়েছি, আমাজন এলাকার মধ্যে। সভ্যতা অনেক দূর। ওরটেগা, রেডিওর, খবর কি? কাজ করছে?
না, ফিসফাসও করে না। ভাল আটকান আটকেছি। এ-থেকে বেরোতে পারব কিনা যথেষ্ট সন্দেহ আছে আমার।
কাছেই একটা ছোট পাহাড় আছে, রুক্ষ কণ্ঠে বলল চ্যাকো। টিলা বলাই ভাল। ওতে চড়ে দেখা দরকার, কোন দিকে কি আছে। তারপর ঠিক করা যাবে। কি করব।
চলো, আমিও যাচ্ছি তোমার সঙ্গে, জিম বলল।
আমরা আসি? অনুরোধ করল কিশোর। হাত-পা সব শক্ত হয়ে গেছে, একটু নাড়াচাড়া দরকার।
হাত নাড়ল জিম। ক্ষতি কি? এসো।
ওরটেগাকে রেডিওর কাছে রেখে বাকি সবাই নেমে এল বিমান থেকে।

.

দেখে স্তব্ধ হয়ে গেল ছেলেরা।
এমন জঙ্গল আর কখনও দেখেনি। বড় বড় গাছ, এত উঁচু আর এমনভাবে ডালপালা ছড়িয়েছে, সূর্যের আলো ঢুকতে পারে না ঠিকমত। পায়েরতলায় ভেজা। নরম মাটি, জলাভূমি বলা না গেলেও কাদাভূমি বলা চলে। তার ওপর সবুজ। শ্যাওলা। কাদায় পা দেবে যায়। সাবধানে চলতে হচ্ছে। কে জানে কোথায়। ঘাপটি মেরে রয়েছে চোরাকাদার মরণফাঁদ।

কিছুক্ষণ হাটার পর মাটি শক্ত হয়ে এল।
যে পাহাড়টার কথা বলেছে চ্যাকো, আসলেই ওটাকে টিলা বলা উচিত গাছপালার মাথা ছাড়িয়ে খুব সামান্যই উঠেছে। পাথুরে, খুদে কৃত্রিম পর্বত যেন রাফিয়ান পাহাড়ে চড়তে পারে না বিশেষ, কিন্তু এটাতে চড়তে তারও অসুবিধে হলো না।
চুড়াটা চোখা নয়, বিশাল ছুরি দিয়ে পোঁচ মেরে কেটে ফেলা হয়েছে যেন, সমান। দাঁড়ানোর চমৎকার জায়গা। নিচে তাকিয়ে অবাক না হয়ে পারল না ওরা। অস্ফুট শব্দ করে ফেলল কেউ কেউ। ঠিক যেন তাদের পায়ের নিচ দিয়ে বয়ে চলেছে ইয়াপুর নদী, পুবে। নদীর দুই তীরে চওড়া চরা, হলুদ বালি চিকচিক করছে। রোদে। তিন কিলোমিটার মত উঁচু উঁচু পাথরের চাইয়ের মাঝে ঢুকে হারিয়ে গেছে। নদীটা। তার পরে ছড়িয়ে রয়েছে পাহাড় শ্রেণী, মহান অ্যাণ্ডিজের বিশাল পার্বত্য এলাকা।
অপরূপ সে সৌন্দর্য থেকে জোর করে দৃষ্টি সরিয়ে আনতে হলো। একে অন্যের দিকে তাকাল অভিযাত্রীরা, নীরবে। লোকালয়ের চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। জীবনের সাড়া নেই। চারপাশে গাছপালার বিস্তারের মাঝে এমন জায়গায় হারিয়েছে। ওরা, পথ খুঁজে পাওয়া মুশকিল।
বললাম না, ভাল আটকান আটকেছি, তিক্ত কণ্ঠে বলল চ্যাকো। বেরোনোর পথ নেই। রেডিও খারাপ, এসওএস পাঠাতে পারব না। খাবার-দাবার যা আছে, খুব তাড়াতাড়িই ফুরিয়ে যাবে। তিন-চারজনের আন্দাজ নিয়েছিলাম, তাতেও বেশি দিন চলত না। তার ওপর আরও তিন-চারটে মুখ যোগ হয়েছে। এমন ভাবে তাকাল সে, কুঁকড়ে গেল ছেলেরা।
কি আছে চ্যাকোর মনে? তাদেরকে এই জঙ্গলে ফেলে চলে যাবে না তো।
ছেলেদের মনের কথা বুঝতে পেরে হাসল জিম, ভয় পেয়ো না। তোমাদের ফেলে যাব না। ভাগাভাগি না হয়ে জোট বেঁধে এই বিপদ থেকে বাঁচার চেষ্টা করব। পরিস্থিতি হালকা করার জন্যে বলল, ধরা যাক, আমরা ভ্রমণকারী, নতুন দেশ আবিষ্কারে বেরিয়েছি। হাহ্-হা।
হাসল বটে জিম, কিন্তু তার চোখের উৎকণ্ঠা দূর হলো না।
নীরবে পাহাড় বেয়ে নেমে আবার ফিরে চলল ওরা।
বাতাসে আর্দ্রতা এত বেশি, অসহ্য মনে হচ্ছে গরম। চটচটে ঘাম, যেন আঠা মাখিয়ে দেয়া হয়েছে শরীরে। অস্বস্তিকর। ঘন ঝোপঝাড়ের দিকে তাকালে গায়ে কাটা দিয়ে ওঠে। মনে হয়, অন্ধকারে ঘাপটি মেরে আছে হিংস্র সব নাম-না-জানা। জানোয়ার, যে কোন মুহূর্তে এসে ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে।
বিমানে ফিরে দেখল হতাশ হয়ে বসে আছে ওরটেগা।

নাহ, হলো না, দেখামাত্র বলল সে। অনেক সময় লাগবে মেরামত করতে, আদৌ যদি মেরামত হয়। কয়েক দিন এমন কি কয়েক হপ্তাও লাগতে পারে। ততদিনে না খেয়েই মরে যাব।
এত ভেঙে পড়লে চলবে না, জিম বুলল। প্ল্যান করে এগোতে হবে। এখনই বাঁচার আশা ছেড়ে দিলে মরবই তো.। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ, হাল ছাড়ব না। কিছুতেই। উপযুক্ত লোক জিম, নেতা হওয়ার গুণ তার আছে।
প্লেনটা আমাদের হেডকোয়ার্টার, বলল সে। এখান থেকেই আশপাশে অভিযান চালাব, পথ খুঁজে বের করব।
খাবারের কি হবে? মনে করিয়ে দিল মুসা।
হ্যাঁ, ঠিক, কিশোরও বলল, খাবার?
কিছু খাবার তো আছে। ওগুলো থাকতে থাকতে রেডিও ঠিক হয়ে গেলে, বেঁচে যাব।
এরপর কাজে লাগল জিম। সব খাবার বের করে নিজের দায়িত্বে নিল। হিসেব। করে খেতে হবে।
ফুরিয়ে গেলে কি করব? প্রশ্ন করল চ্যাকো।
পানির ভাবনা নেই, বলল জিম। নদীর পানি এনে ভালমত ফুটিয়ে খেলেই অসুখের ভয় থাকবে না। তবে হ্যাঁ, শিকার একটা বড় সমস্যা।
কয়েকটা পিস্তল আর একটা সাব-মেশিনগান ছাড়া আর কোন অস্ত্র নেই হাইজ্যাকারদের কাছে। ফাঁদ পাততে জানে না। বলতে গেলে, জঙ্গলে টিকে থাকার কোন অভিজ্ঞতাই তাদের নেই।
আলাপে কান না দিয়ে নতুন রেডিও মেরামতে মন দিল ওরটেগা। বুঝতে পারছে, তাদের সবার জীবন এখন ওই যন্ত্রটার ওপর নির্ভর করছে, যে ভাবেই হোক সারাতে ওটাকে হবেই। কিন্তু এমন ভাঙা ভেঙেছে, সারানোও খুব কঠিন। কিছু স্পেয়ার পার্টস আছে প্লেনের যন্ত্রপাতির ইমারজেন্সি বক্সে। আর কিছু বদলাতে পারবে অন্যান্য যন্ত্রপাতি থেকে খুলে এনে। কিন্তু তারপরেও ঠিক হবে তো? তেমন ভাল টেকনিশিয়ান নয় ওরটেগা।
কাজ মোটামুটি ভাগ করে নিয়েছে ওরা। চ্যাকো রান্না করে, তাকে সাহায্য করে রবিন আর জিনা। জিমের সঙ্গে শিকারে যায় মসা, পাওয়া যায় না প্রায় কিছুই, তবু রোজ বেরোয়। ওরটেগা রেডিও নিয়ে থাকে, তাকে সহায়তা করে কিশোর। রাফিয়ানও অকেজো থাকে না। শিকারে যায়, রাতে পাহারা দেয়। তার খাবারটা সে অর্জন করেই নেয়।
হাইজ্যাকার আর জিম্মিদের মাঝের ফারাকটা আর নেই, বন্ধু হয়ে গেছে ওরা।

কয়েক দিন চলে গেল, কিন্তু রেডিও ঠিক হলো না। হতাশ হয়ে মাথা নাড়ল। ওরটেগা, আমার ক্ষমতায় কুলাবে না।
খাবারও ফুরিয়ে এসেছে, বিষণ্ন কণ্ঠে বলল চ্যাকো। জিম, কিছু একটা করো। আর তো দেরি করা যায় না।
কিছু একটা করা দরকার, তাড়াতাড়ি সবাই একমত হলো এতে। কিন্তু কি করবে। রেডিও অচল, হাইজ্যাকাররা বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছে না। বাইরে থেকে সাহায্য আসার কোন আশা নেই। একটাই পথ আছে, বেরিয়ে পড়া। তারপর ভাগ্য ভাল হলে বাচবে, নইলে মৃত্যু। বিকল্প আর কিছু নেই।
খাবার যা অবশিষ্ট আছে গুছিয়ে নেয়া হলো। ফাস্ট-এইড কিট, কয়েকটা কম্বল, রান্নার সরঞ্জাম আর আরও দুয়েকটা টুকিটাকি জিনিস বেধে ভাগাভাগি করে কাঁধে তুলে নিল ওরা, বেরিয়ে পড়ল নিরুদ্দেশ যাত্রায়।
কয়েক দিন প্লেনটাই ছিল তাদের ঘর, এখন ছেড়ে যেতে খারাপ লাগছে। বার। বার পেছনে ফিরে তাকাল ওরা। আর যাই হোক, নিরাপদ আশ্রয় তো অন্তত ছিল।
ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলল দলটা, সাতজন মানুষ আর একটা কুকুর। কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে গেল ইয়াপুরার তীরে।
কিশোর পরামর্শ দিল, নদী ধরেই এগোনো যাক। খাবার আর গোসলের পানি পাব। সবচে বড় কথা, পথ হারানোর ভয় থাকবে না। নদীর ধারে মানুষের বসতি থাকার সম্ভবনাও বেশি।
সবাই রাজি হলো। নদীর ধার ধরেই এগোল ওরা।
খোলা চরা, গাছপালার ছায়া নেই। কড়া রোদ। ভীষণ গরম। দ্রুত ক্লান্ত হয়ে পড়ল সকলে। ঝামেলা বাড়াল রবিন। একটা পাথরে হোঁচট খেয়ে পড়ে পায়ে ব্যথা পেল। ওই পা-টা অনেক দিন আগে একবার ভেঙেছিল পাহাড়ে চড়ার সময়, আবার চোট লাগল ওটাতেই। খোঁড়াতে শুরু করল সে।
জোর করে রবিনের বোঝা ভাগ করে নিল মুসা আর কিশোর।
দাঁতে দাঁত চেপে চলেছে জিনা। ঘোড়ায় চড়া আর ব্যায়ামের অভ্যাস আছে। বলে হাঁটতে পারছে এখনও। মুসা কষ্ট সহ্য করতে পারে, কাজেই কিশোর কিংবা জিনার মত হাঁপিয়ে ওঠেনি সে।
বেচারা রবিনের অবস্থা করুণ। মুখ চোখ লাল হয়ে গেছে, পায়ের গোড়ালি ফুলে গেছে, পা ফেলতে কষ্ট হচ্ছে তার। তবু টু শব্দ করছে না, এগিয়ে চলেছে। সবার সাথে, কিন্তু খুব মন্থর।
ইসসি, দেরি করিয়ে দেবে দেখছি, বলল চ্যাকা।

রবিনের দিকে ফিরে হাসল জিম। সান্ত্বনা দিয়ে বলল, যতক্ষণ পারো, হাঁটো। পারলে বয়ে নিয়ে যাব। ভয় নেই।
রোদ যতই চড়ছে, গরমও বাড়ছে সেই অনুপাতে। দুপুরের দিকে তো মনে হলো, সেদ্ধ হয়ে যাবে একেকজন। থামল। কাপড় খুলে ঝপাং করে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল মুসা।
একে একে সবাই নামল।
অনেকক্ষণ ধরে গোসল করল ওরা। তারপর গাছের ছায়ায় খেতে বসল। ভ্যাপসা গরম না থাকলে, আর পর্যাপ্ত খাবার থাকলে পিকনিক ভালই জমত।
বিকেলের দিকে যেন সহ্যশক্তির পরীক্ষা শুরু হলো। বিরূপ প্রকৃতি যেন। দেখতে চায়, তার দাপট কতখানি সইতে পারে অভিযাত্রীরা। রাফিয়ানের পর্যন্ত জিভ বেরিয়ে গেল।
রবিনের অবস্থার আরও অবনতি হয়েছে। ডাল কেটে, তাতে কম্বল বেঁধে। স্ট্রেচার বানিয়ে বয়ে নেয়া হচ্ছে তাকে। খুব লজ্জা পাচ্ছে রবিন, নিজেকে দোষারোপ করছে। আছাড় খেয়ে পা ভাঙার জন্যে নিজেকেই দায়ী করছে।
পায়ের মাংসপেশীতে খিচ ধরে গেছে জিনা আর কিশোরের। আধমন ভারি মনে হচ্ছে একেকটা পা।
সামান্যতম প্রাণের সাড়া নেই কোথাও। এ-এক অদ্ভুত জঙ্গল। ভয় ভয়। লাগে। নীরবতা যেন ভারি হয়ে ঠাই নিয়েছে এখানে। কথা বলতে অস্বস্তি লাগে।
হঠাৎ করে ঝাঁপিয়ে পড়ল রাত। সাঝ প্রায় হলোই না, এই দেখা গেল শেষ। বিকেল, পরক্ষণেই ঝপাত করে রাত্রি।
থামো, বলল জিম। এখানেই রাত কাটাব।
দিনটা যেমন গরম গেছে, রাতটা তেমনি ঠাণ্ডা হবে, গত কদিনে বুঝে গেছে ওরা। শুকনো ডালপাতা জোগাড় করে আগুন জ্বালল জিম। কয়েকটা কাঁচা ডাল কেটে তাতেও আগুন ধরাল। জুলবে ধীরে, ধোয়া হবে বেশি। মশা তাড়ানোর ব্যবস্থা। কিন্তু এই ধোয়ায় কি আর মশা যায়? ভারি চাঁদরের মত ঝাঁক বেধে এসে অভিযাত্রীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।
আগুনের চারপাশ ঘিরে বসে রাতের খাওয়া সারল ওরা। সবাই বিষণ্ন। মন। হালকা করার জন্যে রসিকতা করল কিশোর, আমি যখন দাদা হব, তিন কুড়ি নাতিপুতি হবে, তাদেরকে এই অভিযানের গপ্পো শোনাব। চোখ এত্তো বড় বড় করে শুনবে ওরা। বিশ্বাস করতে পারবে না। বাবা-মাকে গিয়ে সেকথা জিজ্ঞেস করবে, সত্যি কিনা। ওরা ধমক দিয়ে বলবে, বাজে বকিস না। বুড়োহাবড়াটার সঙ্গে থেকে থেকে ছেলেগুলোর মাথাও গেল। খালি মিছে কথা। হি-হি।
কেউ হাসল না।

মুসা বলল, ইস, কি আমার গল্পরে! তা-ও যদি ইনডিয়ানরা আক্রমণ করে ধরে। নিয়ে যেত, শেষে অনেক কষ্টে পালাতাম, নাহয় এককথা ছিল। প্লেন থেকে নেমে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে হেঁটে যাওয়া, রাতে মশার কামড় খাওয়া, হলো নাকি কিছু এটা? যা জঙ্গল, বাঘ তো দূরের কথা, একটা শেয়ালও নেই।
এত বড় বড় কথা বোলো না, অন্য ধার থেকে হুঁশিয়ার করল চ্যাকো। ইনডিয়ান নেই কে বলল তোমাকে? সিনেমায় যেমন দেখো, তেমনটি হয়তো নেই। কিন্তু যারা আছে, তারাও কম হারামী না।
আছে নাকি এদিকে? চিত হয়ে ছিল, কনুয়ে ভর দিয়ে আধশোয়া হলো রবিন।
আছে। জিভারো ইনডিয়ানদের এলাকা এটা।
জিভারো? জিনা মুখ তুলল।
হ্যাঁ, জিভারো। অনেক ইনডিয়ানদের মত ওরাও নরমুণ্ডের ট্রফি রাখে। যদি টের পায় আমরা আছি, চোখের পলকে এসে হাজির হবে। কিছু বোঝার আগেই দেখব আমাদের ঘিরে ফেলেছে।
থাক থাক, আর বলবেন না, হাত নাড়ল মুসা। পরক্ষণেই হয়তো দেখব। বর্শার মাথায় আমাদের কাটা মুণ্ডগুলো শোভা পাচ্ছে! ভয়ে ভয়ে জঙ্গলের দিকে তাকাল সে। আমার রোম খাড়া হয়ে যাচ্ছে।
হঠাৎ টককো, টকো করে বিচিত্র একটা শব্দ হলো ঝট করে জঙ্গলের দিকে তাকাল ছেলেরা। কিসের শব্দ?
সর্বনাশ, জিভারো! ভীষণ ভয় পেয়েছে যেন চ্যাকো, এমনি ভঙ্গিতে ফিসফিস করে বলল, জঙ্গলের মধ্যে একজন আরেকজনকে সঙ্কেত দিয়ে জানাচ্ছে, শিকার। পাওয়া গেছে।
আবার শোনা গেল টককো টককো। আরও কাছে।
আহ, তোমরা কি শুরু করলে? মৃদু ধমক দিল জিম। খামোকা ভয় দেখাচ্ছ ছেলেগুলোকে!
খামোকা ভয়? জিমের কথা বুঝতে পারল না মুসা।
জিভারো না ঘোড়ার ডিম, ওরটেগার শয়তানী:.. কথাটা শেষ করল না জিম। এই, কম্বল খোলো। শোয়া দরকার।
আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না! মুসার মত জিনাও অবাক। শব্দ তো একটা হয়েছে। সবাই শুনেছি আমরা। শয়তানীটা কিসের?
ভেনট্রিলোকুইজম! বুঝে ফেলেছে কিশোর। ওরটেগা এই বিদ্যে জানে। আমাদের ভয় দেখানোর জন্যে সে-ই করেছে ওই শব্দ।
ও, এই ব্যাপার। স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল মুসা। বুকে ফুঁ দিতে দিতে বলল, ইস, কি ভয়টাই না পাইয়ে দিয়েছিলেন।

কম্বলের বাণ্ডিল খুলছে ওরটেগা। শব্দ করে হাসল।
চ্যাকোও হাসল।
কম্বল খোলা শেষ হলে ওরটেগা ডাকল, এসো, শুয়ে পড়া যাক।
এক মিনিট, বাধা দিয়ে বলল জিম। একজনকে পাহারায় থাকতে হবে। পালা করে পাহারা দেব। ওরটেগা, শুরুতে তুমি থাকো। মাঝরাতের দিকে আমাকে তুলে দিয়ো। শেষরাতে আমি চ্যাকোকে তুলে দেব।
আমি আর মুসাও পাহারা দিতে পারব, কিশোর প্রস্তাব রাখল।
না না, দরকার নেই। তোমরা ঘুমাও। প্রয়োজন হলে বলব।
শোয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ল সবাই। গা ঘেঁষাঘেঁষি করে রয়েছে। ছেলেরা। জিনার গা ঘেঁষে আছে রাফিয়ান। চোখ বোজা, কিন্তু কান খাড়া। সামান্যতম শব্দ হলেই জেগে যাবে।
কিন্তু এতবড় একটা জঙ্গলেও জাগিয়ে দেয়ার মত কোন শব্দ ঢুকল না। রাফিয়ানের কানে। খালি মশার বিরক্তিকর একঘেয়ে গান, আর আগুনে কাঠ। পোড়ার মৃদু চড়চড় ছাড়া আর কোন আওয়াজই নেই। ও হ্যাঁ, আছে, নিঃশ্বাসের শব্দ। আর মশার ঘ্যানর ঘ্যানরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নাক ডাকাচ্ছে চ্যাকো।
কমে আসছে দেখে আগুনে কয়েকটা কাঠ ফেলল ওরটেগা। পাহারা দেবে। কি? সারাদিনের অমানুষিক পরিশ্রমে তার চোখও ঢুলুঢুলু, টেনে মেখের পাতা খোলা রাখতে পারছে না। কখন যে ঘুমিয়ে পড়ল, টেরও পেল না।
ঘুম ভেঙে গেল মুসার। মাথা তুলে রাফিয়ানের দিকে চেয়ে দেখল, সে-ও সতর্ক হয়ে উঠেছে। চোখ মেলা। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে জঙ্গলের দিকে।
কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠে জঙ্গলের দিকে তাকাল মুসা। কিছুই দেখল না। শব্দ একটা হয়েছে, সে নিশ্চিত। নাহলে ঘুম ভাঙল কেন?
বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে হলো না। চারপাশে হঠাৎ জীবন্ত হয়ে উঠল জঙ্গল।
ঝোপঝাড় ভেঙে ছুটে এল একদল মানুষ। সে-কি বিকট চিৎকার ওদের। হাতে বল্লম। কয়েকজনের কাছে পুরানো আমলের বন্দুক। ঘিরে ফেলল অভিযাত্রীদের।
জিভারো! ফিসফিসিয়ে বলল আতঙ্কিত চ্যাকো। এবার আর রসিকতা নয়। কিছুই করতে পারল না অভিযাত্রীরা। দেখতে দেখতে বুনো লতা দিয়ে শক্ত করে বেধে ফেলা হলো ওদের। দুই হাত দুই পাশে রেখে বুক আর পিঠের ওপর। দিয়ে এমনভাবে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বেঁধেছে, হাত নড়ানোরও উপায় রইল না।
ভয়ে দুরুদুরু করছে সবার বুক। কিন্তু রাফিয়ানের কথা আলাদা। সে ভয় পেল না। বন্ধুদের সাথে দুর্ব্যবহার করা হচ্ছে দেখে ভীষণ রেগে গেল। লাফিয়ে পড়তে গেল একজন ইনডিয়ানের ওপর।

না, রাফি, না! চেঁচিয়ে উঠল জিনা। রাফি, খবরদার, মেরে ফেলবে! চোখের সামনে তার প্রিয় কুকুরটাকে খুন হতে দেখতে পারবে না সে।
কি বুঝল রাফিয়ান কে জানে, আর আক্রমণের চেষ্টা করল না।
বন্দিদের দিকে চেয়ে খুশিতে দাঁত বেরিয়ে পড়েছে ইনডিয়ানদের। বিজাতীয় ভাষায় কথা বলছে, তার এক বর্ণও বুঝল না অভিযাত্রীরা।
জংলীদের সারা গা খালি, কোমরের কাছে কিছু পাতা বেশ কায়দা করে জড়িয়েছে, সুন্দর ঝালরের মত ঘিরে রেখেছে সেই বিচিত্র পোশাক। ঝাল বানানোর আগে পাতাগুলোকে লাল আর হলুদ রঙে রাঙিয়ে নিয়েছে। একই ধরনের ছোট ঝালর জড়িয়েছে গোড়ালি আর বাজুতে। একজনের মাথায় লতার। বন্ধনীতে পাখির দুটো পালক গোঁজা। বোঝা যাচ্ছে, সে দলটার নেতা। লোকটার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল জিম, কি চাও?
ইংরেজি বোঝার কথা নয় জংলীটার, কিন্তু বোধহয় অনুমান করে নিয়েই। জঙ্গলের দিকে হাত তুলে তার ভাষায় বলল কিছু। তারপর ইশারায় হাটার নির্দেশ দিল বন্দিদের।
ইনডিয়ানদের হাতের জ্বলন্ত মশালের আলোয় বুনোপথ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।
কোথায় নিয়ে যাচ্ছে আমাদেরকে? ফিসফিস করে জানতে চাইল জিনা। ওদের রাজার কাছে?
তাছাড়া আর কোথায়? তিক্ত হাসি হাসল ওরটেগা। নিজের ওপর মহা খাপ্পা। শালার ঘুম আর রাখতে পারলাম না। তা না হলে…
তা না হলেও কিছু করতে পারতেন না, বাধা দিয়ে বলল কিশোর। এটা বরং ভালই হলো। জেগে থাকলে বাধা দেয়ার চেষ্টা করতেন, আরও খারাপ হত তাহলে।
ঠিকই, কিশোরের কথা মেনে নিল ওরটেগা, দলে অনেক ভারি ইনডিয়ানরা।
ঘন বনের ভেতর দিয়ে সরু একটা পায়ে চলা পথ ধরে এগোচ্ছে ওরা। বিশ্রাম নেয়ায় রবিনের পায়ের ফোলা অনেক কমেছে, কিন্তু সবার সঙ্গে তাল। মিলিয়ে চলতে গিয়ে আবার ব্যথা শুরু হয়েছে। তার মনে হলো, শ-খানেক বছর
একটানা চলে লক্ষ লক্ষ মাইল বুনোপথ পেরোনোর পর একটা খোলা জায়গায়। বেরোল। ছোট ছোট অসংখ্য কুঁড়ে, গাছের ডালপাতা দিয়ে তৈরি। জিভারো ইনডিয়ানদের গ্রাম।
মাঝখানের কুঁড়েটা আশপাশেরগুলোর চেয়ে বড়। বন্দিদেরকে ওটার দিকে নিয়ে চলল জংলীরা।
বিশাল এক ইনডিয়ান বেরিয়ে এল বড় কুঁড়েটার দরজায়, গায়েগতরে যেন একটা দৈত্য। মাথায় টিউকান পাখির পালক গোঁজা। বোঝা গেল, সে-ই রাজা। কিংবা সর্দার।

তার দিকে বন্দিদের ঠেলে দিল জংলীরা।
লোকটার বয়েস যে কত হয়েছে কে জানে, একশো থেকে দেড়শোর মাঝে যা। খুশি হতে পারে। ছেলেমেয়েদের দেখে অবাক হয়েছে সে। তাদের দিকে নীরবে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ, তারপর আদেশ দিল কিছু। গমগমে ভারি কণ্ঠ, মেঘ। ডাকল যেন।
দু-দলে ভাগ করে ফেলা হলো বন্দিদের। হাইজ্যাকাররা একদিকে, ছেলেমেয়েরা অন্যদিকে। দু-দিক থেকে প্রত্যেকেরই হাত চেপে ধরল দুজন করে ইনডিয়ান। বন্দিরা. ভাবল, তাদের শেষ সময় উপস্থিত। ভয়ে আতঙ্কে কাঁপছে সবার বুক।
কিন্তু মারল না তাদেরকে ইনডিয়ানরা। টেনে নিয়ে চলল। একটা খালি কুঁড়েতে ছেলেদের ঠেলে দেয়া হলো, হাইজ্যাকারদেরকে আরেকটা কুঁড়েতে। তারপর বাইরে থেকে দরজা লাগিয়ে দিয়ে চলে গেল জংলীরা।
তিন গোয়েন্দা আর জিনার সঙ্গেই রয়েছে রাফিয়ান।
গোটা দুই হোট মশাল জ্বলছে কুঁড়েতে। আধার কাটছে না। সেই ম্লান। আলোয় পরস্পরের দিকে তাকাল চারজনে।
ভাল বিপদে পড়েছি, মুখ খুলল মুসা। বেরিয়েছিলাম বেড়াতে আহ, কি একখান বেড়ান বেড়াচ্ছি। স্বপ্নেও ভাবিনি কখনও এরকম হবে, তাহলে কি আর বেরোই? প্লেন হাইজ্যাক, জঙ্গলের মাঝে ক্রাশ-ল্যাণ্ডিং তারপর এসে পড়লাম নরমুণ্ড শিকারীদের কবলে।
তো-ত্তুমি কি সত্যি মনে করো... কথা আটকে যাচ্ছে রবিনের, ওরা আমাদের মাথা কেটে ট্রফি বানাবে? পায়ের গোড়ালিতে হাত বোলাল সে।
তোমার কি মনে হয়? পাল্টা প্রশ্ন করল কিশোর।
বইয়ে তো পড়েছি অন্যরকম, এক মুহূর্ত চুপ রইল রবিন। কিন্তু বইয়ের সঙ্গে বাস্তবের মিল কতখানি আছে কে জানে। আজকাল নাকি নরমুণ্ড শিকারী আর নেই। জিভারোরা মানুষের মাথার ট্রফি এখনও রাখে শুনেছি-কিন্তু অভিজ্ঞ ভ্রমণকারীদের ধারণা, সেগুলো জ্যান্ত মানুষের মাথা কেটে নয়, যারা মরে যায়, তাদের।
আমিও শুনেছি, কিশোর বলল। মরা মানুষেরই হোক আর জ্যান্ত মানুষেরই হোক, ব্যাটারা ট্রফি বানায়, তাতে কোন সন্দেহ নেই। মিউজিয়মে ওরকম একটা ট্রফি দেখেছি, অনেক পুরানো মানুষের। মাথার আসল আকার নেই, ছোট করে ফেলেছে, একটা টেনিস বলের সমান।
মারছে রে! দেখতে কেমন? জিজ্ঞেস করল মুসা।
খুব খারাপ। গা গুলিয়ে ওঠে।
অত ছোট করে কি করে? জিনা জানতে চাইল।

হাড়-মগজ-মাংস সব বের করে ফেলে। চুল ঠিকই রাখে। তারপর চামড়া শুকাতে শুকাতে এমন অবস্থায় নিয়ে আসে…

থাক থাক, আর বলার দরকার নেই, যথেষ্ট হয়েছে, বাধা দিল মুসা। আমাদের পালানো উচিত, যত জলদি পারা যায়। জংলীদের বিশ্বাস নেই। মরা মানুষের মাথা কাটে বলেছে তো? আমিও বিশ্বাস করি। কাজটা খুবই সহজ। জ্যান্ত মানুষকে মেরে ফেললেই মরে যায়, তখন আর মাথা কেটে নিতে অসুবিধে কোথায়। বই লেখে যারা, ওসব ধড়িবাজ শিকারী আর ভ্রমণকারীদের কথা ছাড়ো।

কিন্তু পালাই কিভাবে? নিচের ঠোঁটে বার দুই চিমটি কাটল কিশোর। পালিয়ে যাবই বা কোথায়? বড়জোর গিয়ে প্লেনটায় উঠতে পারব। জিম আর তার সঙ্গীদেরও বের করে নিয়ে যেতে হবে। ওদেরকে ছাড়া মাইলখানেও টিকব না এই জঙ্গলে। ধরো, এত কিছু করে পালাতে পারলাম। কিন্তু তারপর কি হবে? আমাদের পিছু নিয়ে ঠিক প্লেনের কাছে হাজির হয়ে যাবে ইনডিয়ানরা, আবার ধরে আনবে।

কিন্তু তাই বলে চুপ করে থাকলে তো হবে না। কিছু একটা করা দরকার।

দেখো আগে এ-ঘর থেকেই বেরোতে পারো কিনা, হাত ওল্টাল কিশোর। তারপর তো অন্য কথা।

দেয়ালের প্রতিটি ইঞ্চি পরীক্ষা করে দেখল জিনা আর মুসা। কিশোর আর রবিন বসে রইল, অযথা কষ্ট করতে গেল না। ইনডিয়ানদের এসব কুঁড়ে সম্পর্কে প্রায় সবই জানা আছে ওদের, বইয়ে পড়েছে। শক্ত সোজা গাছ কেটে গায়ে গায়ে লাগিয়ে গভীর করে মাটিতে পোতা হয়। ওগুলোকে মজবুত করে বাধা হয় পাকা বেত দিয়ে। বোমা মারলেও ওই গাছের বেড়ার কিছু হবে কিনা সন্দেহ, আর ছেলেদের সঙ্গে তো রয়েছে শুধু সাধারণ ছুরি। বেতই কাটতে পারবে নাঃ থাকতো গাছ কাটা।

মাটির মেঝে, কিন্তু নিয়মিত লেপে লেপে সিমেন্টের মত শক্ত করে ফেলা। হয়েছে। সুড়ঙ্গ কেটে যে নিচ দিয়ে বেরোবে, তারও উপায় নেই।

বেড়া দেখা শেষ। বাকি রইল দরজা।

কিন্তু দরজায় ঠেলা দিয়েই অবাক হয়ে গেল জিনা। খোলা। শুধু ভেজিয়ে রেখে গেছে।

বিশ্বাস হচ্ছে না তার। আস্তে করে ঠেলে ফাঁক করল খানিকটা। উঁকি দিয়ে। দেখল, অনেক কুড়ের সামনে আগুন জ্বলছে। লালচে আলোয় আলোকিত হয়ে আছে পুরো এলাকাটা।

খুব সাবধানে, নিঃশব্দে দরজা আরেকটু ফাঁক করল জিনা। বাকি তিনজনও এসে তার পাশে দাঁড়িয়েছে, না না, চারজন, রাফিয়ানও।
এদিক ওদিক চেয়ে আস্তে বাইরে পা রাখল মুসা।
সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার ছায়া থেকে উদয় হলো একটা মূর্তি। একজন জিভারো যোদ্ধা। আগুনের আলোয় লোকটার মুখ দেখা যাচ্ছে, তাতে ভয়াল কিছু নেই। শান্ত।
আবার পিছিয়ে এসে কুঁড়েতে ঢুকল মুসা। কেন দরজা বন্ধ করেনি ইনডিয়ানরা, বোঝা গেল।
দরজাটা ফাঁকই রইল। ছেলেরাও বন্ধ করল না, পাহারাদারও না।
বুঝলে তো? কিশোর বলল। পালাতে পারব না।
বন্ধ কুঁড়েতে রাফিয়ানের আর ভাল লাগল না। দরজা খোলা পেয়ে লেজ নাড়তে নাড়তে বেরিয়ে গেল খানিক হাঁটাহাঁটি করে আসার জন্যে। ফিরেও তাকাল না পাহারাদার। তার ওপর নির্দেশ রয়েছে ছেলেদের দেখে রাখার জন্যে, কুকুর থাকল না গেল, তা নিয়ে তার মাথাব্যথা নেই।
একটা মতলব এল কিশোরের মাথায়।
শোনো, নিচু স্বরে বলল সে। রাফিকে দিয়ে জিমের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারি আমরা।
কি ভাবে? প্রায় একসঙ্গে প্রশ্ন করল অন্য তিনজন।
সহজ। একটা নোট লিখে রাফির গলায় বেঁধে দেব। বললেই দিয়ে আসবে সে।
কি লিখব, আমরা পালানোর ঝুঁকি নিতে চাই? আমার বিশ্বাস, ওদের দরজাও আটকানো নেই। কি নীরব দেখছ না? ইনডিয়ানরা সব ঘুমাচ্ছে, মাত্র দুজন পাহারাদার ছাড়া সবাই। একজন আমাদের কুড়ে পাহারা দিচ্ছে, আরেকজন ওদের। একই সঙ্গে দুজনকে ধরে যদি কাবু করে ফেলতে পারি, তাহলেই হলো।
খুব রিস্কি মনে হচ্ছে, রবিন বলল।
যে অবস্থায় পড়েছি, রিস্ক তো নিতেই হবে। পাহারাদারকে কাবু করার কথা বলল বটে কিশোর, কিন্তু কিভাবে করবে সেটা এখনও জানে না। আক্রান্ত হলে নিশ্চয় চেঁচামেচি করবে সে, সারা গ্রাম জাগিয়ে ছাড়বে। তখন?
সেটা পরে দেখা যাবে, ভেবে পকেট থেকে নোটবই বের করে একটা পাতা ছিঁড়ে নিল কিশোর। লিখে, কাগজটা ভাজ করে জিনার হাতে দিল।
আস্তে শিস দিয়ে রাফিয়ানকে ডাকল জিনা। কুকুরটা ফিরে এলে তার কলারে শক্ত করে কাগজটা আটকে দিল। রাফি, এটা জিমকে দিয়ে আয়।
একবারেই বুঝল বুদ্ধিমান কুকুরটা। বেরিয়ে গেল। ফিরে এল খানিক পরে। কলারে আটকানো আরেকটা কাগজ।

খুলে জোরে জোরে পড়ল কিশোর :
হুট করে কিছু কোরো না। যেখানে রয়েছ, থাকো। আমরা পালানোর উপায় খুঁজছি। আধঘণ্টা পর রাফিকে পাঠাবে।
অপেক্ষার পালা।
আধ ঘণ্টাই অনেক বেশি মনে হলো। রাত বেশি বাকি নেই। অন্ধকার। থাকতে থাকতে না পারলে পরে কঠিন হয়ে যাবে পালানো।
অবশেষে রাফিয়ানকে আবার পাঠানোর সময় হলো।
আরেকটা নোট নিয়ে ফিরে এল রাফিয়ান। খুলে পড়ে বোকা হয়ে গেল ছেলেরা। জিম লিখেছে:
আমরা তিনজন যাচ্ছি। তোমাদের নিতে পারছি না, কারণ, তাতে আমাদের চলা ধীর হয়ে যাবে। নিরাপদ জায়গায় যাওয়ার চেষ্টা করব। পারলে, যত তাড়াতাড়ি পারি সাহায্য নিয়ে ফিরে আসব তোমাদেরকে উদ্ধার করার জন্যে। চিন্তা কোরো না। সাহস হারিয়ো না।
ইয়াল্লা! মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল মুসা। আর কোন উপায় নেই। জংলীদের টফির জন্যে মাথাটা বুঝিখোয়াতেই হলো।
অন্য সময় হেসে ফেলত ওরা, কিন্তু এখন ভাবনা বড় বেশি।
পালানোর আশা শেষ। চুপ করে থাকা ছাড়া আর উপায় কি? এই অবস্থায় ঘুম আসার প্রশ্নই ওঠে না। বেড়ায় হেলান দিয়ে কান পেতে রইল ওরা, হাইজ্যাকারদের পালানোর শব্দ শোনার জন্যে।
সময় যাচ্ছে। নীরবতায় কোন রকম ছেদ পড়ল না। তাহলে কি পালানোর চেষ্টা করছে না ওরা? নাকি ইতিমধ্যেই বেরিয়ে গেছে, নিঃশব্দে?
পুব আকাশে আলোর আভাস দেখা গেল। ফিকে হতে শুরু হলো অন্ধকার, ভোর হয়ে আসছে। জিভারোদের কুঁড়ের সামনে আগুন নিভু নিভু হয়ে এসেছে, সেগুলোতে কাঠ ফেলে আবার বাড়িয়ে দেয়া হলো। কেউ কেউ আর ঘরে ঢুকল না, হাঁটাহাঁটি করতে লাগল, ভোরের তাজা হাওয়া গায়ে মাখছে।
আলো বাড়ল।
হঠাৎ ঝটকা দিয়ে পাল্লা পুরো খুলে গেল। কুঁড়েতে ঢুকল একটা মেয়েলোক। হাতে বেতের ঝুড়িতে ফল। নীরবে ঝুড়িটা ছেলেদের সামনে নামিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল।
এসো, নাস্তা, ডাকল কিশোর। ইস, এক প্লেট ডিম ভাজা আর রুটি যদি পেতাম।
যা পাওয়া গেছে তাই বা মন্দ কি? দুহাতে দুটো ফল তুলে নিল মুসা, কটাস করে এক কামড়ে অর্ধেকটা মুখে নিয়ে চিবাতে শুরু করল। আঁউম, বেশ মিষ্টি, মুখ খাবারে বোঝাই থাকায় শোনাল বেম্মিট্টি।
হঠাৎ শোনা গেল চেঁচামেচি। মেয়ে কণ্ঠ। কথা বোঝা গেল না অবশ্যই।

দরজা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখল ছেলেরা, কয়েকজন যোদ্ধা ছুটে যাচ্ছে খানিক দূরের আরেকটা কুড়ের দিকে। ওটাতেই রাখা হয়েছিল হাইজ্যাকারদের। শোরগোল বাড়ল। দেখতে দেখতে পুরো গ্রাম এসে ভিড় জমাল কুঁড়ের সামনে।
পালিয়েছে তাহলে! ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুসার চেহারা। দেখেছ কেমন রেগে গেছে? সব ঝাল না এসে আমাদের ওপর ঝাড়ে এখন ব্যাটারা।

.

দরজার ফাঁক দিয়ে দেখছে ছেলেরা, ইনডিয়ানরা কি করে।
একদল জিভারো যোদ্ধা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তৈরি হয়ে চলে গেল জঙ্গলের দিকে। কেন গেছে, সেটা আর বলে দিতে হলো না ছেলেদের, বুঝল। পলাতকদের কি ধরতে পারবে?
জঙ্গলের ভেতর মিলিয়ে গেল যোদ্ধাদের শোরগোল। গাঁয়ের লোকেরা দৈনন্দিন কাজে ব্যস্ত হলো। কেউ এল না ছেলেদের ঘরের দিকে। আস্তে আস্তে অস্বস্তি দূর হলো ওদের।
মেয়েলোকটা নিশ্চয় বলেছে যে, ছেলেরা কুঁড়েতে রয়েছে। যুক্তি মানে, এমন। কেউ ভাববে না, তিনজন লোকের পালানোর ব্যাপারে ছেলেদের কোন যোগসাজশ রয়েছে। কিন্তু কথা হলো, যুক্তি কতখানি মানে কিংবা বোঝে জিভারোরা?
দীর্ঘশ্বাস ফেলল মুসা। আল্লাই জানে কি হবে।
বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। গতরাতে যে পাহারায় ছিল, সেই লোকটা এল। চেহারা দেখে ভালমন্দ কিছু বোঝা গেল না। ইশারায় বাইরে বেরোতে বলল তাদেরকে।
কুঁড়ে থেকে বেরোল ছেলেরা। লোকটার পিছু পিছু সর্দারের কুঁড়ের দিকে এগোল। কিন্তু সর্দারের কুঁড়েতে না গিয়ে কাছের আরেকটা বড় কুঁড়েতে তাদেরকে নিয়ে এল লোকটা। কুঁড়ের কাছ থেকে বড় জোর দশ কদম দূরে রয়েছে ওরা, এই সময় দরজায় দেখা দিল অদ্ভুত দর্শন এক মুর্তি।
আর দশজন সাধারণ জিভারোর চেয়ে লম্বা, বিকট মুখোশে মুখ ঢাকা। মাথার বন্ধনীতে লম্বা লম্বা পালক গোঁজা। জানোয়ারের চামড়ায় তৈরি বিচিত্র পোশাক পরনে। পালক আর পশুর দাঁতের তৈরি লম্বা মালা কয়েক প্যাঁচ দিয়ে রেখেছে গলায়।
রবিন জানে, বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে ওই ধরনের পোশাক, মুখোশ আর মালা পরে জংলী ওঝারা। তাহলে এখন কি কোন বিশেষ অনুষ্ঠান হবে? কি সেটা? ইনডিয়ানদের নিষ্ঠুর কোন দেবতার উদ্দেশ্যে বলি দেয়া হবে বন্দিদের?

অনেকক্ষণ নীরবে একদৃষ্টিতে তাদের দিকে চেয়ে রইল ওঝা। তারপর এগিয়ে এসে আস্তে করে হাত রাখল কিশোরের মাথায়। তার ব্যবহারে ভয় পাওয়ার মত কিছু নেই। একে একে, মুসা, রবিন আর জিনার মাথায়ও একইভাবে হাত রাখল সে।

আর দাঁড়াল না পাহারাদার, বোধহয় থাকার প্রয়োজন মনে করল না। ঘুরে। চলে গেল।

ওঝার সঙ্গে বন্দিরা একা। অনুমান করতে কষ্ট হলো না, ওই অদ্ভুত লোকটা তাদেরকে তার ছত্রছায়ায় নিয়ে নিয়েছে। কিন্তু তাতে এখুনি খুশি হওয়ার কিছু নেই। কেন নিয়েছে কে জানে?

কুঁড়ের সামনের আঙিনায় লোকের ভিড়, মেয়ে-পুরুষ-বাচ্চারা সবাই চেয়ে রয়েছে এদিকে। ইশারায় গ্রামবাসীকে বুঝিয়ে দিল ওঝা, বন্দিদেরকে তার দায়িত্বে নিয়েছে।

তিক্ত কণ্ঠে রসিকতা করল মুসা, মাকড়সা বলছে মাছিকে : আমার বাড়ি এসো বন্ধু বসতে দেব... বিড়বিড় করে আরও কিছু বলল, বোঝা গেল না। তারপর ওঝার দিকে চেয়ে বলল, গলায় যা একেকখান দাঁত ঝুলিয়েছ না, জংলীদাদা। মানুষের গোশত খাওয়ার সময় ওগুলো লাগিয়ে নাও নাকি?

আহ, চুপ করো! বিরক্ত হয়ে ধমক দিল কিশোর। বিপদ আরও বাড়াবে। দেখছি!.

ছেলেদেরকে তার কুঁড়েতে নিয়ে এল ওঝা। দেয়ালে দেয়ালে ঝলছে নানা আকৃতির অসংখ্য মুখোশ, একেকটার মুখভঙ্গী একেক রকম। আরও নানারকম অদ্ভুত জিনিস রয়েছে, তার মাঝে নরমুণ্ড শিকারী ইনডিয়ানদের তৈরি মানুষের মাথার সঙ্কুচিত ট্রফিও আছে।

এই গল্প নিয়ে দারুণ একখান অ্যাডভেঞ্চার ফিল্ম করতে পারবেন মিস্টার ক্রিস্টোফার, মুসা বলল।

না তা পারবেন, মাথা দোলাল জিনা। কিন্তু আগে আমাদের বেঁচে ফিরে তো যেতে হবে?

অপার্থিব লাগছে ঘরের পরিবেশ। ওঝাকেও কেমন যেন মেকি মনে হচ্ছে। কিশোরের কাছে। কেন, বলতে পারবে না। পুরো ব্যাপারটাই যেন সাজানো অভিনয়।

ঘরে দুজন ইনডিয়ান মেয়ে আছে। কর্কশ কণ্ঠে তাদের কিছু বলল ওঝা।

হাত ধরে নিয়ে ছেলেদের বসাল ওরা। প্রত্যেকের গালে লাল আর হলুদ রঙের আলপনা একে দিল। চামড়ার তৈরি খাটো আলখেল্লা পরতে দিল, সেগুলোতেও লাল-হলুদ আঁকিবুকি। রাফিয়ানের মুখেও কয়েকটা রঙিন পোচ লাগিয়ে দিল একটামেয়ে।

সাজানো শেষ হলে ছেলেদের আবার বাইরে নিয়ে এল ওঝা, অপেক্ষমাণ জনতাকে দেখাল।
সন্তুষ্টির গুঞ্জন উঠল জনতার মাঝে।
কুঁড়েতে ফিরে গেল আবার ওঝা।
যার যার কাজে গেল জনতা। একা হয়ে গেল ছেলেরা। কেউ নেই তাদের কাছে, কোন পাহারাদার নেই।
ব্যাপার কি? মুসা না বলে থাকতে পারল না। মাথামুণ্ড তো কিছুই বুঝছি না।
মুক্তি দিল নাকি? রবিনের প্রশ্ন।
না, মাথা নাড়ল কিশোর, আমার মনে হয় না ব্যাপারটা এত সহজ। নিশ্চয় কোন কারণ আছে এসবের।
মরুকগে! মুখ ঝামটা দিল জিনা। গালে রঙ চড়চড় করছে। চলো, ধুয়ে ফেলিগে।
দাঁড়াও, বাধা দিল কিশোর। অযথা লাগায়নি এগুলো। হয়তো কোন ধরনের ছাড়পত্র। এসো, পরীক্ষা করে দেখি।
ধীরে ধীরে হেঁটে গাঁয়ের একদিকের সীমানায় চলে এল ওরা। তারপরে জঙ্গল। সেদিকে পা বাড়াতেই পথরোধ করে দাঁড়াল পাহারাদার। চেহারায় কোনরকম। ভারান্তর নেই তার, কিছু বলল না।
সেদিক থেকে ফিরে এল ছেলেরা।
চারদিকেই গিয়ে দেখল। সব জায়গায় একই ব্যাপার ঘটল। বোঝা গেল, গায়ের মধ্যে ওরা স্বাধীন, কিন্তু সীমানার বাইরে বেরোতে দেয়া হবে না।
যাক, কিশোর বলল, কিছুটা স্বাধীনতা তো মিলল। সুযোগ বুঝে পালানোর চেষ্টা করব।
নতুন জীবনে মানিয়ে নিতে বাধ্য হলো অভিযাত্রীরা। প্রথম দিনের সেই কুঁড়েটাতেই ঘুমায়। দিনের বেলা গ্রামের এখানে ওখানে কাটায়। কেউ কিছু বলে না।
তিন দিনের দিন তাদের ডাক পড়ল সর্দারের কুঁড়েতে। ওঝা তাদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল। এক এক করে তাদের মাথায় হাত রেখে দ্রুত কিছু বলল সর্দারকে। একটা শব্দ কয়েকবার উচ্চারণ করল : হামু। কিশোরের ধারণা হলো, হামু সর্দারের নাম। সর্দারও একটা শব্দ বার বার বলল : বিটলাঙগোরগা।
মারছে রে। ওঝার নাম... নিচু স্বরে বলতে গিয়ে বাধা পেল মুসা। ঠোঁটে আঙুল রেখে ইশারায় তাকে থামিয়ে দিল কিশোর।
একটা ব্যাপার স্পষ্ট হলো, সর্দারের ওপর যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে ওঝার। দীর্ঘ আলোচনা শেষে ওঝা আবার ছেলেদের নিয়ে বেরিয়ে এল। খুশি খুশি মনে হলো তাকে।

কুঁড়েতে ফিরে কিশোর বলল, ওঝার ব্যাপারে অদ্ভুত কিছু লক্ষ করেছ?
কিছু কি? সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল মুসা। পুরোটাই অদ্ভুত। ওরকম অদ্ভুত মানুষ জিন্দেগীতে দেখিনি।
ওকথা বলছি না। জিভারোদের সঙ্গে পার্থক্য রয়েছে ওর, ঠিক মেলে না।
হ্যাঁ, মাথা ঝাঁকাল রবিন, আমিও খেয়াল করেছি।
তা-তো হবেই, মুসা বলল আলাদাই যদি না হলো, ওঝা কিসের? বিচিত্র পোশাক, অদ্ভুত ব্যবহার আর একটু রহস্য রহস্য ভাব যদি বজায় না রাখে, কেন ভয় করবে লোকে?
আমার মনে হয়েছে, গাল ফুলিয়ে ভেঙচাল জিনা, আস্ত একটা ভাঁড়। একটা রামছাগল। শুধু জিভারো যোদ্ধাদের সঙ্গেই যা কিছুটা মিল রয়েছে:
কই আর মিল? মুসা বলল। সেজেগুঁজে যেতে দেখলাম তো কয়েকটাকে সেদিন। ফিরে এল যোদ্ধারা। খালি হাতে। হাইজ্যাকারদের ধরতে পারেনি।
আশা হলো ছেলেদের। হয়তো সভ্যজগতে ফিরে যেতে পারবে জিম। তাহলে সাহায্য আসবে।
ওঝাকে নিয়ে আবার কথা উঠল।
আমি আসলে বোঝাতে চাইছি, কিশোর বলল। এ-গাঁয়ের জিভারোরা সাধারণ মানুষ। মনও তাদের ভাল। কিন্তু ওঝার স্বভাব, চালচলন কেমন যেন অন্যরকম। আর, সারাক্ষণ মুখে মুখোশ পরে রাখে কেন?
হয়তো চেহারা খুব কুৎসিত, মুসা বলল। কিংবা মুখে বাজে কোন চর্মরোগ। আছে। অথবা মুখে খোলা বাতাস লাগানো পছন্দ করে না সে।
এমনও হতে পারে, কর্তৃত জাহির করার জন্যেই মুখোশ পরে সে রবিন বলল। কিংবা অলৌকিক কোন ক্ষমতা আছে ওটার।
ওসব হয়তো-টয়তোর ধার দিয়ে গেল না জিনা, সাফ বলে দিল, ওর মুখটা আসলে তাপিরের মত, তাই ঢেকে রাখে।
বিকেলে গাঁয়ের ভেতর বেড়াতে বেরোল ওরা। ওঝার কুঁড়ের ধার দিয়ে। যাচ্ছে, এই সময় দুজন মেয়ের একজন বেরিয়ে হাত নেড়ে ডাকল তাদের।
দরজায় দেখা দিল ওঝা বিটলাঙগোরগা। ইশারা করল।
বিটলা ডাকছে কেন? মুসার প্রশ্ন।
বিটলামী করার জন্যে, জিনার জবাব।
তোমরা বেশি কথা বলো! কড়া ধমক লাগাল কিশোর।
যেতে দ্বিধা করছে ছেলেরা।
ভয় কি? এসো, ইংরেজিতে বলল কেউ।

ঝট করে তাকাল সবাই। কে? ওঝা ছাড়া ধারেকাছে তো আর কেউ নেই? ইনডিয়ান মেয়েটাও ঢুকে গেছে আবার কুঁড়েতে।
দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়াল ওঝা। ছেলেদের ভেতরে ঢোকার পথ করে দিল। তারপর মেয়েদুটোকে কিছু বলল, বেরিয়ে গেল ওরা।
ছেলেরা ঢুকলে দরজা লাগিয়ে দিল ওঝা। আস্তে করে খুলে আনল মুখোশ।
ইওরোপীয়ান! চেঁচিয়ে উঠল বিস্মিত মুসা।
আপনি ইংরেজি বলেছেন? রবিনের জিজ্ঞাসা।
কে আপনি? জানতে চাইল জিনা।
কিশোর তেমন অবাক হয়েছে মনে হলো না, এ-রকম কিছুই যেন আশা করছিল সে।
হাসল ওঝা। বয়েস পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ হবে, ধূসর চুল, হাসি হাসি নীল চোখ। মুখের চামড়া ফ্যাকাসে, সর্বক্ষণ মুখোশ পরে থাকে বলেই হয়তো। খুব চমকে। দিয়েছি, না? আসলে আমি বিটলাঙগোরগার অভিনয় করছি, বিটলা নই। শব্দ করে হাসল সে।
কত কত বাজে কথা বলেছে ভেবে লজ্জা পেল মুসা আর জিনা, চোখ তুলে তাকাতে পারল না।
আমার নাম কারলো ক্যাসাডো। ছিলাম বৈমানিক, কপাল-দোষে হয়ে গেলাম। জিভারোদের ওঝা।
আপনাকে আমি চিনেছি, স্যার, কিশোরের কণ্ঠে উত্তেজনা। আপনিই সেই বিখ্যাত কারলো ক্যাসাডো, দুর্ধর্ষ বৈমানিক হিসেকে যার অনেক নামডাক। আপনার অনেক অভিযানের কাহিনী আমি পড়েছি। আপনার নিখোঁজ হওয়ার সংবাদও…
পড়েছ, না? এই রাজিলের। জঙ্গলেই হারিয়েছি আমি, বিষণ্ন শোনাল। বৈমানিকের কণ্ঠ।
কি হয়েছিল? জিজ্ঞেস করল জিনা।
এঞ্জিনের গোলমাল। নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল প্লেন। বেঁচে যে আছি এটাই আশ্চর্য। প্যারাসুটও আটকে গিয়েছিল, খুলল শেষ মুহূর্তে। আরেকটু দেরি হলেই গেছিলাম। পড়লাম একেবারে জিভারোদের সর্দার হামুর কুঁড়ের সামনে। ভেবেছি, সঙ্গে সঙ্গে আমাকে কেটে ফেলবে। তা-তো করলই না, আমাকে তোয়াজ শুরু করল। পরে বুঝেছি, নীল চোখ আর আকাশ থেকে পতনই আমাকে বাঁচিয়েছে। আমাকে ওরা কালুম-কালুম ভেবেছে।
কালুম-কালুম! মুখ বাঁকাল মুসা।
জিভারো ইনডিয়ানদের পবন, কিশোর বলল তাকে। বাতাসের দেবতা।

বাহ, বুদ্ধিমান ছেলে, প্রশংসা করল ক্যাসাডো। অনেক কিছু জানো।
ইনডিয়ানরা প্লেন দেখেনি? জিজ্ঞেস করল রবিন।
দেখে, মাঝে-সাঝে। জঙ্গলের ওপর দিয়ে উড়ে যায়। কিন্তু ওগুলো কি জিনিস, জানে না ওরা। সভ্যতার সঙ্গে পরিচয় নেই। আর প্যারাসুট তো দেখেইনি। আমার প্লেনটা গিয়ে পড়েছে ওখান থেকে অনেক দূরে, বাতাসে উড়িয়ে। নিয়ে এসেছে আমাকে।
ওদের ভুল ধারণা ভাঙলেন না কেন?
চেষ্টা করেছি, মানতে রাজি নয়। ওদের ধারণা, দেবতারা সহজে মানুষের। কাছে ধরা দেয় না, তাই নানা রকম বাহানা করে। আমি কালুম-কালুম যদি না-ও হই, তার প্রেরিত দূত যে তাতে কোন সন্দেহ নেই ওদের।
হেসে বলল মুসা, বাঘের সাজে যে সাজিয়েছেন আমাদের, আমরা তাদের কাছে কী? হালুম-হালুম?
হেসে ফেলল ক্যাসাডো। হালুম-হালুম না হলেও অনেকটা ওরকমই। দেবতার বাচ্চা।
ওদের ভাষা শিখলেন কোথায়? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
পর্তুগীজ ভাষার কিছু শব্দ মিশে গেছে ওদের ভাষায়। কিছু কিছু জিভারো জানতাম। শুরুতে কাজ চালিয়ে নিয়েছি। থাকতে থাকতে এখন পুরোপুরিই শিখে ফেলেছি।
আপনি চলে যান না কেন?
যেতে দেয় না। আমি নাকি ওদের সৌভাগ্যের ধারক। চলে গেলে আবার যদি দুর্ভাগ্য এসে ভর করে?
তাদের এ-বিশ্বাসের কারণ? রবিন জানতে চাইল।
আমি নেমেছিলাম সর্দারের কুঁড়ের সামনে। এমন এক সময়, যখন জিভারোদের দুঃসময় চলছে। বনে শিকার নেই, প্রচণ্ড খরা। এমনিতেই খাবারের খুব সমস্যা বেচারাদের, খুরা কষ্ট আরও বাড়িয়ে দেয়। খাওয়ার অভাব, লোক। মরছে। ওই সময় আমি নামলাম। যেদিন এলাম, অনেক দিন পর সেদিনই পাঁচট = শুয়োর মেরে আনল শিকারীরা, তার পরদিন থেকে শুরু হলো বৃষ্টি। আসনে আবহাওয়ার পরিবর্তন দেখেই বনে জন্তু-জানোয়ারেরা ফিরে আসা শুরু করেছিল। ইনডিয়ানরা ভাবল, সব আমার দয়া। আমি বলেছি বলেই খাবার আর পানি দিয়েছে কালুম-কালুম। এ-রকম একজনকে কেন ছেড়ে দেবে ওরা?
তা-তো ঠিকই, মুসা বলল। আমরা কালুম-কালুমের ছেলে, বলেছেন বুঝি তাদের?
তোমাদের ভালর জন্যেই বলতে হয়েছে, হাসল বৈমানিক। সারাক্ষণ মুখোশ পরে থাকেন কেন? জিজ্ঞেস করল কিশোর।

থাকতেই হবে যখন, ভাবলাম ক্ষমতা নিয়েই থাকব। দেবতারা নাকি সহজে নিজেদের চেহারা মানুষকে দেখতে দিতে চায় না। তাই মুখোশ বানালাম। একমাত্র সর্দারের সামনে ছাড়া আর কারও সামনে খুলি না। এতে হামুও খুব খুশি, তাকে অনেক বড় সম্মান দেয়া হয়েছে বলে।
পালানোর কথা ভাবেন না?
ভাবি না মানে? পালাতে পারলে বাঁচি। কিন্তু এই গভীর জঙ্গল পেরিয়ে একা। যাব কি করে? সভ্যতা অনেক দূর। সাহস হয় না। এক মুহূর্ত চুপ থেকে বলল, কিন্তু তোমাদের কথা তো কিছু জানা হলো না? কে তোমরা? কি করে এলে?
খুলে বলল সব কিশোর। মাঝে মাঝে কথা যোগ করল অন্য তিনজন।
জিম, চ্যাকো আর ওরটেগা ফিরে যেতে পারলে আমাদের উদ্ধার করবে, সব শেষে বলল জিনা।
অনেকগুলো যদি আছে তাতে। যদি ফিরে যেতে পারে, যদি উদ্ধার করার ইচ্ছে থাকে, এবং যদি ওরা আসার আগেই আমাদের বলি না দিয়ে দেয় ইনডিয়ানরা, মুসা বলল।
অত নিরাশ হও কেন? সান্ত্বনা মুসাকে নয়, নিজেকেই দিল আসলে কিশোর।
দীর্ঘ নীরবতা।
ক্যাসাডো ভাবছে।
রবিন চুপ।
জিনা চিন্তিত।
মনিবের চেহারা দেখে রাফিয়ানও বিষণ্ন হয়ে উঠেছে, লেজ নাড়ছে ধীরে ধীরে।
হঠাৎ নীরবতা ভাঙল ক্যাসাডো, আমার প্লেনের রেডিওটা যদি খালি পেতাম। এসওএস পাঠানো যেত।
আমরা যে প্লেনে এসেছি, কিশোর বলল, তাতেও আছে রেডিও। ভাঙা, অর্ধেক মেরামত হয়েছে।
তাই নাকি? ভুরু কোঁচকাল ক্যাসাডো। রেডিও?
অনেক চেষ্টা করেছি আমি আর ওরটেগা, জানাল কিশোর। ঠিক করতে পারিনি।
আমি একবার দেখতে পারলে হত, বলল ক্যাসাডো।
এখান থেকে অনেক দূরে, বিশেষ আশাবাদী হতে পারল না জিনা।
না, বেশি দূরে নয়। প্লেনটা কোথায় পড়েছে, অনুমান করতে পারছি। ওই ইয়ারা নদী আর পাহাড়ের কথা যে বলছ, আমার চেনা। শর্টকাট আছে, এখান থেকে মাত্র এক ঘণ্টা লাগে। অনেক এগিয়ে গিয়েছিলে তোমরা, ঘুরপথে, পিছিয়ে আনা হয়েছে আবার! আমি যাব প্লেনটা দেখতে।
বললেন না বেরোতে দেয় না? কিশোর মনে করিয়ে দিল।

দেয় না মানে, জিভারোদের ছেড়ে চলে যেতে দেবে না। কিন্তু গায়ের বাইরে বেরোনোতে নিষেধ নেই, অবশ্য একলা বেরোতে দেবে না। কতবার শিকারে। গেছি ওদের সঙ্গে। অনেক জায়গা চিনেছি।
তাহলে একলা যাবেন কি করে? আটকাবে না?
হাসল ক্যালাডো। আসলে একা বেরোনোর চেষ্টাই করিনি কখনও। একলা। পালাতে পারব না, জঙ্গলে মরব, তাই। তবে চেষ্টা করলে যে ওদের চোখ এড়িয়ে কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে আসতে পারব না, তা নয়।
গত কয়েক দিনের তুলনায় সে-রাতে ভাল ঘুম হলো ছেলেদের।
পরদিন সকালে ঝরঝরে শরীর-মন নিয়ে ঘুম ভাঙল।
রোজ নাস্তা নিয়ে আসে সে মেয়েমানুষটা, সে-ই নিয়ে এল সেদিনও। ঝুড়ি নামিয়ে রেখে চলে গেল।
একটা পেঁপের নিচে ভাজ করা একটা কাগজ পাওয়া গেল। ক্যাসাডো লিখেছে :
কাল রাতে বেরিয়ে গিয়েছিলাম। প্লেনটা খুঁজে পেয়েছি। একটা ভুল করেছিল ওরটেগা, রেডিওর একটা পার্টস উল্টো লাগিয়েছিল, ফলে ঠিক হয়নি। সেটা মেরামত করেছি। রেডিও কাজ করছে এখন। এসওএস-ও পাঠিয়েছি একটা। জবাব পাইনি। সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছি। আবার গিয়ে মেসেজ পাঠানোর চেষ্টা করব।
–ক্যাসাডো।
খবর শুনে এত খুশি হলো, বাইরে গিয়ে কিছুক্ষণ নেচে নেয়ার লোভ সামলাতে পারল না মুসা আর জিনা। তাড়াহুড়ো করে নাস্তা সেরে কুঁড়ের বাইরে বরোল। নাচতে শুরু করল। তাদের সঙ্গে যোগ দিল রাফিয়ান। তিড়িং বিড়িং করে লাফাচ্ছে, সেই সাথে ঘেউ ঘেউ হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ার যোগাড়ু কিশোর আর রবিনের।
এই মজার কাণ্ড ইনডিয়ান ছেলেমেয়েদেরও দারুণ ভাবে আকৃষ্ট করল। পায়ে। পায়ে এগিয়ে এল ওরা। কাছে এসে সাহস পেয়ে তারাও যোগ দিল নাচে।
এল সর্দার হামুর ছেলে পুমকা। বয়েস যোলো। খুব ভদ্র, শান্ত। তাকে অপছন্দ করার জো নেই। সে-ও নাচতে শুরু করল, হাসছে হা-হা করে।
এত হই-হল্লা কিসের! সর্দার মনে করল, সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটে গেছে। কুঁড়ের দরজায় উঁকি দিল সে। দেখল, দেবতার ছেলেদের সঙ্গে তার ছেলের ভাব। হয়েছে। খুব খুশি হলো সে। হেসে, আপনমনে মাথা দুলিয়ে আবার ভেতরে চলে গেল।
নাচতে নাচতেই কনুই দিয়ে মুসার পাঁজরে গুঁতো মারল জিনা। বোঝে এবার। এদের ভয়েই কিনা আমরা কেঁচো হয়ে ছিলাম। এই জিভারোদের মত ভদ্র জংলী–

আর হয় না।
তা হোক, মুসা বলল। তবু আমি থাকতে চাই না এখানে। দেখা যাক, ক্যাসাডোর এসওএস-এর জবাব আসে কিনা।
কিছুটা আশার আলো দেখতে পাচ্ছে ছেলেরা। ফলে মনের ভার অনেকখানি। হালকা হয়েছে। সহজ ভাবে ইনডিয়ানদের সঙ্গে মিশতে পারছে।
প্রায় প্রতিদিনই ক্যাসাডোর সঙ্গে তার কুঁড়েতে দেখা হয়। আলাপ-আলোচনা হয়। সুযোগ পেলেই প্লেনে গিয়ে এসওএস পাঠায় বৈমানিক। যদিও একটা জবাবও আসেনি এখনও।
সময় কাটাতে এখন আর তেমন অসুবিধে হয় না গোয়েন্দাদের। ইনডিয়ান। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ভাব হয়েছে। বন্ধুত্ব হয়েছে পুমকার সঙ্গে। তার কাছে। জিভারো ভাষা শিখছে ওরা। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই কাজ চালানোর মত ভাষা শিখে ফেলল দুতরফই। মোটামুটি আলাপ করতে পারে। আর এই আলাপের মাধ্যমেই একদিন অদ্ভুত কিছু কথা শুনল অভিযাত্রীরা।
ভালমত বুঝিয়ে বলতে পারল না পুমকা, তত শব্দ দু-তরফের কারও স্টকেই জমা হয়নি এখনও। স্পষ্ট বোঝা গেল শুধু চারটে শব্দ : গুপ্তধন, মন্দির, চাঁদ এবং উপত্যকা।
কান খাড়া হয়ে গেল কিশোর পাশার। অনেক ভাবে জিজ্ঞেস করল পুমকাকে, বোঝানোর চেষ্টা করল।
পুমকা বুঝল ঠিকই, কিন্তু বলতে পারল না। আবার একই কথা বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, গুপ্তধন। মন্দির। চাঁদ।
নাহ, হবে না, হতাশ হয়ে মাথা নাড়ল কিশোর। ক্যাসাডোকে জিজ্ঞেস করে দেখি, কিছু বলতে পারেন কিনা।
ছেলেদের আগ্রহ দেখে হাসল ক্যাসাডো।
পুরানো একটা জিভারো কিংবদন্তী, বলল সে। সব কিংবদন্তীই তিল থেকে তাল হয়, তবে তিল একটা থাকে। এটাতেও বোধহয় রয়েছে। কোন্ কথাটা সত্যি আর কোনটা রঙ চড়ানো বোঝা মুশকিল। জঙ্গলের পরে এক পাহাড়ী উপত্যকায় অনেক পুরানো একটা মন্দির আছে, নাম চন্দ্রমন্দির। ইনকাদের মত একটা সভ্য। জাতির বাস নাকি ছিল ওখানে, এখনও আছে ধ্বংসস্তূপ। সেখানেই আছে গুপ্তধন বা। মূল্যবান কিছু। সম্ভবত দামী ধাতুর তৈরি দেব-দেবীর মূর্তি।
দারুণ ভো! জিনা বলল।
হউ! তার সঙ্গে একমত হলো রাফিয়ান, চোখে কৌতূহল।
বা-বা, আলোচনায় যোগ দিতে চাস মনে হয়? আরও শুনবি? হেসে বলল ক্যাসাডো। পুরানো কিংবদন্তী, অথচ অনেক চেষ্টা করেও এতদিন গুপ্তধন খুঁজে

পায়নি কেউ। এখন আর উৎসাহ নেই কারও। তাছাড়া গুপ্তধন দিয়ে করবেটাই বা কি তারা? কেউ আর খুজতে যায় না। ওসব ধনরত কিংবা সোনাদানার চেয়ে। শিকার খোঁজাই অনেক বেশি জরুরী প্রয়োজন ওদের।
হ্যাঁ, তা ঠিক, মাথা দোলাল কিশোর। তারমানে, গুপ্তধনের ব্যাপারে তাদের আগ্রহী করতে চাইলে, এমন কিছু বলতে হবে, যাতে স্বার্থ থাকবে জিভারোদের।
হ্যাঁ। এটাই তোমাদের সুযোগ। ওদের বোঝানো সহজ হবে, কারণ... নাটকীয় ভঙ্গিতে চুপ হয়ে গেল সে, চোখ টিপল। আগ্রহ বাড়াচ্ছে ছেলেদের।
কারণ! প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মুসা। জলদি বলুন?
কারণ, কিংবদন্তী আরও বলে, ওই গুপ্তধন খুঁজে পাবে কয়েকটা ছেলেমেয়ে।
বলেন কি? উত্তেজনায় গলা কাঁপছে রবিনের। তাহলে তো মস্ত সুযোগ। আজই গিয়ে বলুন না সর্দারকে, আমরা গুপ্তধন খুজতে যেতে চাই। বলবেন ওই গুপ্তধনের মধ্যে রয়েছে ওদের সৌভাগ্য।
রবিন ঠিকই বলেছে, কিশোর বলল। অন্যভাবেও বলতে পারেন। বলবেন, ওই গুপ্তধনে রয়েছে কালুম-কালুমের আশীর্বাদ। আমরা থাকলে যতখানি সৌভাগ্য আসবে, গুপ্তধনগুলো তার চেয়ে বেশি সৌভাগ্য বয়ে আনবে। তাছাড়া ওগুলো অমর। দর কষাকষি করবেন, আমরা ওগুলো খুঁজে বের করে দেব, বিনিময়ে। আমাদের মুক্তি দিতে হবে।
আস্তে, এত উত্তেজিত হয়ো না, হাত তুলল ক্যাসাডো। গুপ্তধন খুঁজে পাবেই, এত শিওর হচ্ছ কেন? মন্দিরটার কাছে হয়তো নিয়ে যেতে পারবে। জিভারো গাইড, কিন্তু গুপ্তধন বের করবে কি ভাবে? কোথায় খুঁজবে?
কোন নির্দেশ নেই?
আছে। কিন্তু শত শত বছর ধরে মুখে মুখে ফিরেছে কথাগুলো, কিছু বাদ। পড়েছে, কিছু রঙ চড়েছে, বিকৃত হয়েছে। আসল সত্য বের করে নেয়া খুব কঠিন। প্রায় অসম্ভবই বলা চলে।
তবু, চেষ্টা করতে দোষ কি? রহস্যের গন্ধ পেয়েছে কিশোর পাশা, তাকে থামানো এখন আরও অসম্ভব কিন্তু সেকথা জানে না ক্যাসাডো। জায়গাটা নিশ্চয়। এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয়, তাহলে জিভারোদের কানে আসত না। মিস্টার ক্যাসাডো, আপনি গিয়ে বলুন সর্দারকে। চেষ্টা করে দেখি, তারপর যা হয় হবে।
হাসল বৈমানিক। তা নাহয় বলব। কিন্তু লাভ কতখানি হবে জানি না। এমনও হতে পারে, বলতে পারে, হাতে যা আছে তা-ই ভাল, যেটা নেই সেটার পেছনে ছুটোছুটি করার দরকার নেই।
কিন্তু ওগুলো পাওয়ার পর তো আর ‘নেই’ থাকবে না।

হুঁ, নাছোড়বান্দা ছেলে। ছেলেমী হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ঠিকই বলেছ, চেষ্টা করতে দোষ কি? কথায় আছে : ফরচুন ফেভারস দা ব্রেভ। হাহ।
পর দিনই হামুর সঙ্গে দেখা করতে গেল বিটলাঙগোরগা।
অধীর হয়ে কুঁড়ের বাইরে অপেক্ষা করতে লাগল ছেলেরা।
অনেকক্ষণ পর বেরিয়ে এল ওঝা। মুখোশের জন্যে তার মুখ দেখা গেল না, দীর্ঘ আলোচনার ফল কি হয়েছে, আন্দাজ করা গেল না।
ইশারায় ডাকল ওঝা। ছেলেদের নিয়ে আবার কুঁড়েতে ঢুকল।
মাদুরে বসে রয়েছে সর্দার। পাশে তার ছেলে পুমকা, জ্বলজ্বলে চোখে তাকাল বিদেশী বন্ধুদের দিকে।
উঠে এসে এক এক করে চারজনের গায়েই এক আঙুল রাখল সর্দার, কয়েকবার করে মাথা নাড়ল, সম্মান দেখাল দেবতার বাচ্চাদের।
পুমকাও উঠে এসে হাত মেলাল ইউরোপীয়ান কায়দায়, বন্ধুদের কাছে। শিখেছে।
ব্যাপার দেখে হাঁ হয়ে গেল তার বাবার মুখ, চোখ বড় বড়। স্বর্গের রীতি শিখে ফেলছে তার ছেলে। ছেলের এত বড় সম্মানে গর্বে আধ হাত ফুলে উঠল হামুর। বুক। সরল হাসিতে ভরে গেল মুখ।
মনে হয় খবর ভাল, ফিসফিস করে বলল জিনা।
অভ্যর্থনার পালা শেষ হলে ছেলেদের নিয়ে তার কুঁড়েতে চলে এল। ক্যাসাডো। মুখোশ খুলে হাসল।
সর্দারের সঙ্গে কি কথা হয়েছে শোনার জন্যে উদগ্রীব হয়ে আছে ছেলেরা, রাফিয়ানও যেন খুব উৎকণ্ঠার মধ্যে রয়েছে। সে-ও বসল ছেলেদের পাশে, গম্ভীর ভাবভঙ্গি।
হামুকে বুঝিয়ে বললাম, ক্যাসাডো বলল। বললাম, তোমরা স্বর্গ থেকে এসেছ কালুম-কালুমের নির্দেশ নিয়ে। কিংবদন্তীর গুপ্তধন খুঁজে বের করার জন্যে। প্রথমে বিশেষ গায়ে মাখল না হামু। তার কাছে গুপ্তধনের কোন মূল্য নেই। শেষে। বললাম, কাল রাতে কালুম-কালুমের আদেশ পেয়েছি আমি।
আল্লাহরে, কি কাণ্ড! এপাশ ওপাশ মাথা নাড়ল মূলা। এক আমেরিকায়ই মানুষে মানুষে কী ফারাক। এক অঞ্চলের মানুষ পাড়ি দিচ্ছে মহাশূন্য, আরেক অঞ্চলের মানুষ এখনও পড়ে আছে সেই গুহামানবের যুগে।
তা কি আদেশ এল কালুম-কালুমের কাছ থেকে? হেসে জিজ্ঞেস করল কিশোর।
কালুম-কালুম তো বাতাসের দেবতা, নাকি? ক্যাসাডোও হাসছে। গত রাতে, ঝড়ো হাওয়া বয়েছে, টের পেয়েছ? সেটাই বললাম হামুকে : বাতাসের মধ্যে রয়েছে জিভারোদের সব চেয়ে বড় সৌভাগ্য। ওগুলো একবার এনে তুলতে পারলে,

শিকারের আর কোন দিন অভাব পড়বে না, দীর্ঘজীবী হবে জিভারোরা, শত্রুর সঙ্গে লড়াইয়ে প্রতিবারেই জিতবে-কখনও হারবে না।

তারমানে আমরা এখন খুব দামী বস্তু হয়ে গেলাম ওদের কাছে, রবিন মন্তব্য করল। এজন্যেই এত সম্মান দেখিয়েছে মিস্টার হামু।

হ্যাঁ।

আসল কথা কি বলল? আর তর সইছে না কিশোরের। যেতে দেবে?

যদি গুপ্তধন পাওয়া যায়, দেবে মুক্তি পথ দেখিয়ে উপত্যকায় নিয়ে যাওয়ার জন্যে লোক দেবে। এত উত্তেজিত হয়েছে, মোটেই দেরি করতে চায় না, পারলে এখুনি রওনা হয়। পাওয়া গেলে কথা রাখবে হামু, জঙ্গল পেরোতে সাধ্যমত সাহায্য করবে তোমাদের। তখন কোন একটা ছুতোয় আমিও সঙ্গে যাব তোমাদের।

খুব ঠাণ্ডা স্বভাবের লোক হামু। কোন ব্যাপারে হুট করে উত্তেজিত হয় না। ভেবে-চিন্তে কাজ করে। কিন্তু কোন ব্যাপারে যদি একবার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে, সেকাজ থেকে আর ফেরানো যায় না তাকে, শেষ না দেখে ছাড়ে না।

বিটলাঙগোরগা বলেছে, ছেলেরা এসেছে গুপ্তধন খুঁজে বের করে জিভারোদের চিরসৌভাগ্য বহাল করার জন্যে, এর চেয়ে খুশির খবর আর কি হতে পারে হামুর জন্যে?

এতবড় দায়িত্ব, যাকে তাকে সঙ্গে নেয়া যায় না। বেছে বেছে লোক ঠিক করল হামু। সবাই ভাল যোদ্ধা, তার খুব বিশ্বস্ত। পুমকাকেও নেবে সঙ্গে।

আনন্দে উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটতে লাগল পুমকা। গায়ের ছেলেরা তার সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত। সেদিন থেকে অভিযাত্রীদের কাছছাড়া হয় না সে পারতপক্ষে, ওরা যেখানে যায়, সে-ও সঙ্গে সঙ্গে যায়।

এক্কেবারে আরেক রাফিয়ান, জিনা মন্তব্য করল।

কিন্তু এসব হালকা রসিকতায় কান দেয়ার মানসিকতা নেই কিশোরের। রবিন। আর মুসাও বুঝতে পারছে, কতখানি জটিল হয়ে উঠেছে পরিস্থিতি।

গুপ্তধন পাওয়া গেলে তো খুবই ভাল, বাঁচলাম, কিশোর বলল, কিন্তু যদি না পাই, কি হবে ভেবে দেখেছ? ক্যাসাডোর কি অবস্থা হবে? হামু ধরে নেবে, তার সঙ্গে মিথ্যাচার করা হয়েছে, তাকে ফাঁকি দেয়া হয়েছে, ঠকানো হয়েছে। ঠাণ্ডা মানুষ রাগলে ভয়ানক হয়ে যায়। দেবতার কাছ থেকে এসেছি আমরা, সে-বিশ্বাস হারাবে হামু। ধরে সোজা বলি দিয়ে ফেলবে তখন।

তাই তো, এটা তো ভাবিনি! নিমেষে হাসি হাসি মুখটা কালো হয়ে গেল জিনার।

যা হবার হবে, মুসা বলল। আমার বিশ্বাস, তুমি ওগুলো খুঁজে পাবেই।

বেশি ভরসা করছ মুসা, কিশোর বলল। যদি সত্যি থাকে, হয়তো পাব। কিন্তু যদি না থাকে?

.
ধাঁধার তিনটে অংশ, সাবধানে নোট করে নিল কিশোর। ক্যাসাডোর মুখে শুনেই মুখস্থ করে ফেলেছে, তবু লিখে নিল। অনেক সময়, লেখার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অনেক জটিল রহস্যের গিট খুলে যায়, কিশোরের বেলায়ই কয়েকবার ঘটেছে এই ঘটনা।
বন্ধুদেরকে নিয়ে গায়ের ধারে বিশাল এক গাছের ছায়ায় এসে বসল সে। ধাঁধা। সমাধানের চেষ্টা করবে। খানিক দূরে বসে উৎসুক হয়ে তাদের দিকে চেয়ে রইল। রাফিয়ান আর পুমকা।
দূরে কুঁড়ের দরজায় বসে এদিকেই ফিরে রয়েছে ক্যাসাডো। সে কি ভাবছে, জানে না, ছেলেরা। সে ভাবছে, কাজটা খুব খারাপ হয়ে গেল। নিজের ওপরই রেগে গেছে। যাওয়ার সব যোগাড় করে ফেলেছে হামু, এখন তাকে আর কিছুতেই ফেরানো যাবে না, কিছু বলেই বোঝানো যাবে না। যেতে না চাইলে খারাপ অর্থ করবে। ভাল বিপদেই পড়া গেছে। কেন যে বাচ্চাদের কথায় নাচলাম! ধাঁধা। সমাধানের চেষ্টা তো আমিও অনেক করেছি। পেরেছি? কয়েকটা ছেলে পারবে, কেন বিশ্বাস করতে গেলাম?
ঘাসের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েছে কিশোর। সামনে খোলা নোটবুক। পুকুরের ঠিক মাঝখানে পড়বে সূর্য, বিড়বিড় করল সে। তারপর পশ্চিমে দেখতে পাবে অস্তপ্রায় চন্দ্র। তারও পরে রয়েছে হলুদ দেবা, তোমার দিকে তাকিয়ে থাকবে সবুজ চোখে। মানে কি?
কেউ জবাব দিল না।
তিনটে ধাঁধা, আবার বলল সে, একটার সঙ্গে আরেকটা কোনভাবে গাথা।
হ্যাঁ, তাই মনে হচ্ছে, রবিন বলল। দ্বিতীয় ধাঁধাটা শুরু হয়েছে তারপর দিয়ে। তৃতীয়টা শুরু হয়েছে তারও পরে দিয়ে। সিরিয়াল ঠিকই আছে।
হুঁম! মাথা দোলাল জিনা।
মুসা কিছুই বলল না। মাথাখাটানো নিয়ে বিশেষ মাথাব্যথা নেই তার, ধাঁধা– আর বুদ্ধির কচকচি ভালও লাগে না।
পুকুর তো বুঝলাম, কিশোর বলল, কিন্তু তাতে সূর্য পড়ে কিভাবে?
সূর্য ডোবার কথা বলেনি তো? রবিন বলল।
সেটাও অসম্ভব, পুকুরে সূর্য ডোবে না।
তাহলে কথাটা হয়তো অন্য কিছু ছিল, মুখে মুখে বিকৃত হয়েছে।
তা হতে পারে, ঘন ঘন নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর। কথাটা হয়তো ছিল রোদ পড়েনা না, তা-ও না, রোদ পড়লে শুধু মাঝখানে পড়বে কেন? সারা পুকুরেই

পড়বে। আরেকটা ব্যাপার হতে পারে, পুকুরের মাঝখানে সূর্যের। প্রতিবিম্ব পড়াকে বুঝিয়েছে। তীরে দাঁড়িয়েই হয়তো দেখা যায় সেটা।
ঠিক বলেছ! নিজের উরুতে চাপড় মারল রবিন। দুপুর বেলা পুকুরে সূর্যের প্রতিবিম্ব পড়তেই পারে। পুকুরটা খুঁজে বের করব। তারপরের ধাঁধাটা?
তারপর পশ্চিমে দেখতে পারে অস্তপ্রায় চন্দ্র, পড়ল কিশোর।
নিচের চোয়াল ঝুলে পড়ল রবিনের। এইটা কি ভাবে সম্ভব? এর কোন মানেই হয় না। ধরা যাক, পুকুরটা আমরা খুঁজে পেলাম, যাতে ঠিক দুপুরে সূর্যের প্রতিবিম্ব পড়ে। কিন্তু ওই সময় চাঁদ দেখব কি করে, তা-ও পশ্চিমে, আবার অস্তগামী? তারও ওপর রয়েছে জঙ্গল, উঁচু উঁচু গাছ, সত্যি সত্যি যখন অস্ত যায়, তখনও তো দেখা যাবে না।
ভূগোলের কোন গোলমাল হয়তো আছে ওই এলাকায়, মিনমিন করে বলল মুসা।
আরে দূর! ঝাড়া দিয়ে ফেলে দিল যেন রবিন। যত ভৌগোলিক গোলমালই হোক, দুপুরবেলা চাঁদ ডুবতে দেখা যায় না।
চুপ হয়ে গেল মুসা।
কিশোর, কি হবে? জিজ্ঞেস করল রবিন।
বুঝতে পারছি না। এখানে বসে মাথা ঘামিয়ে লাভ হবে না। পুকুরটা খুঁজে বের করার পর হয়তো কিছু বোঝা যাবে।
ওটা কোথায় আছে, কি করে জানছ?
ক্যাসাডো বলল না, এখান থেকে কয়েক মাইল দূরে একটা জলা জায়গা আছে। পুকুরটা সম্ভবত ওখানে। চারপাশে জঙ্গল ঘিরে রাখলে রোদই পড়বে না ঠিকমত, থাকত সূর্যের প্রতিবিম্ব।
কিন্তু ওখানে যাওয়া খুব কঠিন, ক্যাসাডো একথাও বলেছে, মনে করিয়ে দিল। মুসা। ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যেতে হবে, নানারকম হিংস্র জানোয়ার আছে, বিষাক্ত পোকামাকড় আছে। যেতে অনেক সময়ও লাগবে।
লাগুক না, কিশোর বলল। সময়ের তোয়াক্কা কে করছে? সময়টা আমাদের। জন্যে কোন সমস্যা না, যত খুশি লাগুক। হ্যাঁ, এবার তৃতীয় ধাঁধাটা কি বলে দেখি।
নোটবুকটা নিয়ে পাতা ওল্টাচ্ছে পুমকা। সাদা কাগজে বিজিবিজি কালো অক্ষরগুলো খুদে গোবরে পোকার মত লাগছে তার কাছে, ব্যাপারটা ভারি মজার আর রহস্যময় মনে হচ্ছে।
তার হাত থেকে নোট বই নিয়ে ধাঁধাটা বের করে পড়ল কিশোর, তারও পরে রয়েছে হলুদ দেবী, তোমার দিকে তাকিয়ে থাকবে সবুজ চোখে।
এটা সহজ, জিনা বলল।
তাই মনে হচ্ছে? মুসার কাছে সহজ লাগছে না।

তাই তো।
কি?
গুপ্তধন। হলুদ দেবী মানে হলুদ কোন মূর্তিতি হবে, আইডল।
হ্যাঁ হ্যাঁ, জিনার কথায় সায় দিল রবিন। হলুদ বলেছে তো, তার মানে। সোনার মূর্তি।
আর সবুজ চোখ কোন মূল্যবান পাথর? মুসার প্রশ্ন।
সম্ভবত পান্না, কিশোর জবাব দিল। ব্রাজিলে এক সময় খনি থেকে দারুণ। দারুণ পান্না তোলা হত। হয়তো প্রাচীন সেই সভ্যতার যুগে—
আর কিছু শোনার দরকার মনে করল না মুসা। হুররে! বলে চেঁচিয়ে উঠে নাচতে শুরু করল। হয়ে গেছে কাজ। সমাধান করে ফেলেছি আমরা।
কিছুই বুঝল না পুমকা, কিন্তু মুসার আনন্দ সংক্রামিত হলো তার মাঝে। সে ও, লাফাতে শুরু করল। যোগ দিল রাফিয়ান। জিনা আর বসে থাকে কি করে? রবিনই বা কেন বসে থাকবে? বসে রইল শুধু কিশোর। সে বুঝতে পারছে, আসলে কোন সমাধান হয়নি। এত সহজ নয় ব্যাপারটা। কিন্তু সেটা বলে বন্ধুদের আনন্দে বাধা দিতে চাইল না।
কুঁড়ের দরজায় বসে ছেলেদের আনন্দ দেখে ক্যাসাডোর মুখও উজ্জ্বল হলো। সে ধরেই নিল, ধাঁধার সমাধান হয়ে গেছে। উঠল। পায়ে পায়ে এগোল সে, জানার জন্যে।

.
উত্তেজনা চরমে পৌঁছল। হামু দলবল নিয়ে তৈরি।
ওঝা বিটলাঙগোরার নির্দেশ মত ওভদিন ওভক্ষণ দেখে বেরিয়ে পড়ল দলটা।
জিভারো গায়ের মাহল কয়েক পর থেকেই শুরু হলো ঘন জঙ্গল। লতা এমন ভাবে ছড়িয়ে রয়েছে হাটাই মুশকিল।
শুরুতে যা ছিল, তার চেয়ে গতি অনেক কমে গেল।
আগে আগে চলেছে কয়েকজন জিভারো যোদ্ধা, ওরা পথ-প্রদর্শক। তাদের পেছনে সর্দার হাম আর তার ছেলে, ঠিক পেছনেই ওঝা। তার পরে মালপত্র বাহকদের সঙ্গে ছেলেরা। রাফিয়ান তাদের পাশেই চলছে।
ওরা যেদিন রওনা হয়েছে, তার আগের দিন প্লেনে গিয়ে শেষবারের মত এস ও এস পাঠিয়েছে ক্যাসাডো, কিন্তু দুর্ভাগ্য, কোন জবাব মেলেনি।
হলো না। ফিরে এসে হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলেছে বৈমানিক। যাকগে, যা হওয়ার হবে। ভেঙে পড়লে চলবে না আমাদের। ফিরে এসে আবার যোগাযোগের চেষ্টা চালিয়ে যাব। অবশ্য যদি ফিরতে পারি। যা ভয়ানক জঙ্গল।

সামনে যারা চলেছে, তাদের হাতে ভোজালির মত বড় ছুরি।, ওগুলো দিয়ে ঘন, ঝোপ আর লতা কেটে পথ করে নিচ্ছে। খুব কষ্টকর আর ধীর কাজ।
অসহ্য ভ্যাপসা গরমে ঘামছে ছেলেরা। আঠা আঠা হয়ে যাচ্ছে.সে ঘাম, ভীষণ অস্বস্তি হয়।
রাফিয়ানেরও জিভ বেরিয়ে পড়েছে, হাপাচ্ছে। এই গরম সে-ও সইতে পারছে
হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল সে কুজো করে ফেলেছে পিঠ। ঘাড়ের রোম খাড়া হয়ে গেছে। জঙ্গলের দিকে চেয়ে আছে স্থির দৃষ্টিতে, চাপা ঘড়ঘড় শব্দ বেরোচ্ছে গলার গভীর থেকে।
কুকুরটার মতই দাঁড়িয়ে গেছে জিভাবোরা। জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে আছে। রাফিয়ানের মতই বিপদের গন্ধ পেয়েছে ওরাও।
জাগুয়ার! ফিসফিস করে বলল ক্যাসাডো।
ব্রাজিলের জঙ্গলের ভয়ঙ্করতম জানোয়ার জাগুয়ার, বলল মুসা। ইদানীং জন্তু জানোয়ার সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে উঠেছে সে। কারণও আছে। তার বাবা মিস্টার রাফাত আমানের মাথায় ঢুকেছে, জানোয়ারের ব্যবসা সাংঘাতিক লাভজনক। দেশবিদেশ থেকে দুর্লভ জানোয়ার ধরে এনে বিভিন্ন চিড়িয়াখানা, সার্কাস পার্টি আর জন্তু জানোয়ার পোষার সংগঠনগুলোতে বিক্রি করা যায়, যথেষ্ট চাহিদা। লস অ্যাঞ্জেলেসে মাত্র একজন ব্যবসায়ী আছে, তা-ও খুব ভাল ব্যবসায়ী নয়, চাহিদামত সরবরাহ করতে পারে না। ব্যবসাটা খুব মনে ধরেছে মূসার বাবার। সেটা আবার কথায় কথায় জানিয়েছেন কিশোরের চাচা রাশেদ পাশাকে। ব্যতিক্রমধর্মী ব্যবসার। দিকে এমনিতেই ঝোঁক রাশেদ চাচার, মুসার বাবার কথায় লাফিয়ে উঠেছেন, পার্টনারশিপে ব্যবসা করবেন দু-জনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন। স্যালভিজ ইয়ার্ডের দুই কর্মচারী বোরিস আর রোভারের সাহায্যে অনেকখানি জায়গার জঞ্জাল পরিষ্কার। করে সেখানে জানোয়ার রাখার খাঁচাও বসাতে শুরু করেছেন। পড়াশোনা শুরু করেছেন মিস্টার আমান, তার দেখাদেখি মুসাও। জন্তু-জানোয়ার সম্পর্কে যত বই পাচ্ছেন সর্ব কিনে এনে পড়ে ফেলছেন। কিভাবে ধরতে হবে, সেটা জানার জন্যে, প্র্যাকটিকাল ট্রেনিং নিচ্ছেন মাস্টার রেখে। ইতিমধ্যেই অনেক কিছু শিখে ফেলেছে মুসা। এই জন্তু জানোয়ার ধরে এনে বিক্রি করার ব্যবসা কতখানি। লাভজনক হবে, তা নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই কিশোর বা মুসার, কিন্তু। সাংঘাতিক সব অভিযানে বেরোতে পারবে বুঝতে পেরে ভীষণ আগ্রহী হয়েছে ওরাও রাশেদ চাচার সংগ্রহ করা বইগুলো প্রায় মুখস্থ করে ফেলেছে কিশোর।
কত বড় হয়? জানতে চাইল জিনা।

পূর্ণবয়স্ক জাগুয়ার দেড়শো কিলোগ্রাম পর্যন্ত হয়, গড়গড় করে মুখস্থবিদ্যা, ঝাড়ল মুসা। প্রচণ্ড শক্তি গতি আর ক্ষিপ্রতা চমকে দেয়ার মত। আর রঙ..রঙ ... চিতার মত। চিতা বাঘের মত ফুটকি...।

ভয়ঙ্কর শব্দ হলো। তুলনা করা কঠিন। নাম শুনে বিশেষ প্রতিক্রিয়া হয়নি। ছেলেদের, কিন্তু ডাক শুনে ভয়ে কেঁপে উঠল বুক। ডাকই যার এমন, কতখানি ভয়ানক জানোয়ার সে!

ইশারায় সবাইকে চুপ থাকতে বলে হাতের রাইফেলটা শক্ত করে চেপে ধরল হামু। পা টিপে টিপে এগোল চিৎকারটা যেদিক থেকে এসেছে, সেদিকে। হারিয়ে গেল গাছপালার আড়ালে।

ভেবে অবাক হয় ক্যাসাডো, রাইফেল আর গুলি কোথা থেকে সংগ্রহ করে হামু? অনেক চেষ্টা করেছে বৈমানিক, রহস্যটা রহস্যই থেকে গেছে তার কাছে। জানতে পারেনি। ২ পাথর হয়ে গেছে যেন সবাই। চোখের পাতা নাড়তে ভয় পাচ্ছে। এক চিৎকারেই কাপুনি তুলে দিয়েছে জাগুয়ার।

গোঁ গোঁ করেই চলেছে রাফিয়ান, ছাড়া পাওয়ার জন্য ছটফট করছে। শক্ত করে তার কলার চেপে ধরে রেখেছে জিনা। কোনভাবেই গোঙানি থামাতে না পেরে শেষে মুখ চেপে ধরল।

একটি মাত্র গুলির শব্দের পর অখণ্ড নীরবতা।

হাসিমুখে জঙ্গলের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল হামু।

এই হাসির অর্থ জানা আছে জিভারোদের। শোরগোল তুলে ছুটে গিয়ে ঢুকল বনের ভেতরে। বেরিয়ে এল খানিক পরেই। টানতে টানতে নিয়ে এসেছে শিকার।

জানোয়ারটা আসলেই বড়!

অনেকক্ষণ ধরে নানাভাবে সর্দারের প্রশংসা করল যোদ্ধারা। তারপর জাগুয়ারের ছাল ছাড়িয়ে মাংস কেটে ভাগাভাগি করে কাঁধে তুলে নিল।

আবার শুরু হলো চলা। জাগুয়ারের ডাক আর চেহারা দেখে ভয় পেয়েছে ছেলেরা, চুপসে গেছে ফাটা বেলুনের মত। শুরুতে যে হাসি হাসি ভাবটা ছিল, এখন আর নেই।

দুই দিন পর শুরু হলো জলাভূমি।

গত দু-দিনের যাত্রাটা সুখকর হয়নি মোটেও। আঠাল, গরম, ভেজা পথ, মশা, তাড়ানোর জন্যে রাতে ক্যাম্পের আগুনের ধোয়া, সারাক্ষণ হিংস্র জানোয়ারের আনাগোনা, ভাল লাগার কথাও নয়। জাগুয়ারটা মারার পর থেকে হাটার সময়ও স্বস্তি পায়নি ছেলেরা। মনে হয়েছে, এই বুঝি অন্ধকার কোন ঝোপ থেকে লাফিয়ে। এসে ঘাড়ে পড়ল আরেকটা জাগুয়ার।

ব্রাজিলের জঙ্গলের জলা কেমন, অস্পষ্ট ধারণা আছে বটে ছেলেদের, কিন্তু এতখানি খারাপ, কল্পনাও করেনি। এখনও ভালমত শুরু হয়নি জলাভূমি, তাতেই এই অবস্থা, আসল জায়গায় গেলে কেমন হবে ভেবে ভয় পেল ওরা।
বড় বড় গাছ ডালপাতা ছড়িয়ে রেখেছে, প্রায় প্রতিটি গাছের নিচ দিয়েই বয়ে যাচ্ছে অসংখ্য নালা, নালার জল বলা চলে। বনতলে আবছা অন্ধকার, বাষ্প। উঠছে। এত আঠা করে দেয় শরীর, গায়ে জামাকাপড় রাখাই দায় কেন শুধু পাতার আচ্ছাদন কোমরে জড়ায় এখানকার ইনডিয়ানরা, বোঝা গেল। য়েখানে। পানি নেই, সেখানটাও শুকনো নয়, প্যাঁচপেচে কাদা। পচা পাতার গন্ধে বাতাস ভারি। ওসব পাতার ভেতরে ভেতরে কিলবিল করছে জোক আর নানারকম পোকামাকড়, কোন কোনটা সাংঘাতিক বিষাক্ত।
আস্ত নরক? নাক কুঁচকাল জিনা। এসব জায়গায় মানুষ আসে নাকি!
তাহলে আমরা এলাম কেন? ভুরু নাচাল মুসা, আমরা কি মানুষ নই?
আমরা কি আর ইচ্ছে করে এসেছি? ঠেকায় পড়ে।
জবাব নেই মুসার। চুপ হয়ে গেল।
চওড়া একটা খালের ভেজা তীর ধরে এগিয়ে চলল ওরা।
হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে লাফিয়ে সরে এল রবিন। ঝপাং করে গিয়ে পানিতে পড়ল। একটা জীব। গাছের গুঁড়ি মনে করে ওটার ওপর পা দিয়ে ফেলেছিল সে।
অ্যালিগেটর। আবার বিদ্যা ঝাড়তে শুরু করল মুসা। খুব পাজি জীব। দেখেশুনে পা ফেলবে।
কিন্তু খানিক পরেই মুসা নিজে যখন একটা অ্যালিগেটরের ওপর পা ফেলল, আর ঝাড়া দিয়ে তাকে উল্টে ফেলে পালাল ওটা, হাত ধরে টেনে তুলে গম্ভীর মুখে বলল রবিন, অ্যালিগেটর যে কুমিরের এক প্রজাতি, তা কি জানো? বড়গুলো মানুষখেকোও হয়। ঠিকই বলেছ, খুব পাজি জীব। সুতরাং, সাবধান, কানার মত পা ফেলো না। শেষে অ্যালিগেটরের নাস্তা হয়ে যাবে।
হেসে উঠল জিনা আর কিশোর, খুব একহাত নিয়েছে রবিন।
ক্যাসাডোও হাসি চাপতে পারল না।
ইনডিয়ানরা তো দাঁত বের করে হাসছে মুসার অবস্থা দেখে।
বেশ অনেকখানি পথ পেরোল সেদিন দলটা। খালের পাড়ের কুচকুচে কালো মাটি নরম, স্পঞ্জের মত, পা পড়লে দেবে যায়। তোলার সময় আবার কামড়ে ধরে রাখে। কলা পাতা কেটে আনল ইনডিয়ানরা। সেগুলো দিয়ে পা মুড়ে লতা দিয়ে বাধল। এই আদিম জুতো বেশ কাজের। কাদা লাগে না, মাটির কামড় বসে না। তাছাড়া পোকামাকড়ের কামড়ও ঠেকায়।
রবিনের আহত গোড়ালি আবার ব্যথা শুরু করেছে। জ্বর জ্বর লাগছে তার।

পুকুরটা কোথায় পাওয়া যাবে? বিকেলের দিকে বলল সে। আর তো পারি। খড়ের গাদায় সুচ খোঁজার অবস্থা।
ডজন ডজন পুকুর আর ডোবা তো পেরিয়ে এলাম, বলল জিনা।
হ্যাঁ, কিশোর চিন্তিত। ওগুলোর কোনটাই নয়। এত কালো আর ঘোলা ওগুলোর পানি, চারপাশে জঙ্গল ঘিরে রেখেছে, ওগুলোতে রোদই পড়ে না। ঠিকমত। মাঝপরে সূর্যের প্রতিবিম্ব দেখা যাবে কি করে? তাছাড়া ওগুলোর ধারেকাছে কোন পাহাড় নেই।
তবে, রবিন বলল, মনে হয়, পেয়ে যাবই। কিশোর, আরেকটা কথা ভেবেছ? ধাঁধা অনেক পুরানো। যখনকার কথা, তখন হয়তো পুকুরপাড়ে গাছ ছিল। না। কিন্তু এতদিনে কি জন্মায়নি? কে সাফসুতরো করে রাখতে গেছে?
মাথা ঝাঁকাল ক্যাসাডো। যুক্তি আছে কথায়। কিন্তু আমার ধারণা, আরও বড় কোন পুকুর, কিংবা ছোটখাট হদের কথা বলা হয়েছে। যা দেখলাম ওগুলো সবই প্রায় ডোবা। যারা এই ধাঁধা বানিয়েছে, তারা যে বুদ্ধিমান ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। যখন দেখল, তাদের দিন শেষ হয়ে আসছে, গুপ্তধনগুলো লুকিয়ে ফেলল। সেই তারা বোধহয় চন্দ্রমন্দিরের ধর্মগুরুর দল। কেন লুকিয়েছে, তারাই জানে। তবে নিশ্চয় এমন কোথাও লুকায়নি, সহজেই যেখানকার চিহ্ন মুছে যাবে, অল্প কিছুদিন পরেই আর চেনা যাবে না। তারমানে, ধরে নেয়া যায়, এমন কোথাও লুকিয়েছে, অনেক বছর পরেও যে জায়গাটা নষ্ট হবে না।
সেটা হলেই ভাল, জিনা বলল।
আপনি ঠিকই বলেছেন, ক্যাসাডোকে বলল কিশোর। তা-ই করা হয়েছে।
পরদিন ইয়াপুরার একটা শাখা-নদীর তীরে পৌঁছল ওরা।
সরু নদী, খালই বলা চলে। এক ধারে জলা, অন্য ধারে ঘন জঙ্গল, কোথাও কোথাও অনেক সরে গেছে গাছপালা। ওসব জায়গায় বনের সীমানা আর পানির। সীমানার মাঝে শুকনো চরা, আঠাল মাটির নাম নিশানাও নেই। প্রকৃতির অদ্ভুত খেয়াল। একই জায়গায় শতরূপ।
গত কয়দিনে কাহিল হয়ে পড়েছে গোয়েন্দারা। সেটা দেখে হামুর সঙ্গে পরামর্শ করল ক্যাসাডো। সর্দার দেখল, শুধু দেবতার ছেলেরাই নয়, তার নিজের ছেলেও কাহিল হয়ে পড়েছে। তাছাড়া খাবার ফুরিয়ে এসেছে, শিকার করা দরকার। ভেবেচিন্তে পুরো একটা দিন বালির চরায় বিশ্রামের কথা ঘোষণা করল হামু। ছেলেরা বিশ্রাম করবে, তাদের সঙ্গে থাকবে কুলিরা। যোদ্ধারা শিকারে যাবে।
দলবল নিয়ে শিকারে চলে গেল হামু।
আগুন জ্বেলে রান্নায় ব্যস্ত হলো কুলিদের কেউ, কেউ স্রেফ হাত-পা ছড়িয়ে বসে রইল।

জায়গাটা সুন্দর। ঝকঝকে সাদা বালি। নদীর পানিও টলটলে পরিষ্কার।
ক্যাসাডো আর মুখোশ রাখতে পারছে না মুখে। কত আর পারা যায়? গাঁয়ে থাকতে তো রাতের বেলা অন্তত খুলে রাখতে পারত। কিন্তু অভিযানে বেরোনোর পর সবার সঙ্গে একসাথে ঘুমাতে হয়, ফলে খুলতে পারে না।
কিন্তু এই গরমের মধ্যে নদীর পানির হাতছানি আর ঠেকাতে পারল না। কুলিদের কাছ থেকে সরে এল। এক জায়গায় পুমকা আর ছেলেরা বসে আছে। সেখানে এসে মুখোশ খুলে ফেলল সে।
ওঝার মুখ দেখতে পারায় নিজেকে খুব সৌভাগ্যবান মনে করল পুমকা।
গোসল করবে নাকি? জিজ্ঞেস করল ক্যাসাডো।
ছেলেরাও সে-কথাই ভাবছিল; সে বলার পর আর দেরি করল না। জিনা ছাড়া বাকি সবাই টান দিয়ে দিয়ে কাপড় খুলে ফেলল। পুমকার কাপড়ই নেই, কোমরের আচ্ছাদন খোলার দরকার হয় না। কাপড়ের মত ভেজে না। পানি লাগলে ঝাড়া দিলেই পড়ে যায়।
নদীতে নামার আগে ভালমত দেখে নিল ওরা, নিশ্চিন্ত হয়ে নিল যে ওখানে অ্যালিগেটর নেই।
দাপাদাপি শুরু করল সবাই। ডুব দিচ্ছে, একে অন্যকে পানি ছিটাচ্ছে।
সব চেয়ে বেশি খুশি রাফিয়ান।
কুত্তাটা খুব ভাল, বলল পুমকা।
খুশি হলো জিনা। একটা ডাল ছুঁড়ে দিয়ে দেখো না, কেমন সঁতরে গিয়ে নিয়ে আসে। যত দূরেই ফেলো, নিয়ে আসবে।
নতুন ধরনের একটা খেলা পেয়ে গেল পুমকা। বার বার ডাল ছুঁড়ে ফেলে পানিতে, সাতরে গিয়ে নিয়ে আসে রাফিয়ান। নদীটা তেমন চওড়া নয়। জোরে একটা ভাল ছুঁড়ে মারল পুমকা। অন্য পাড়ের কাছে গিয়ে পড়ল ডালটা। চেঁচিয়ে বলল পুমকা, যাও তো দেখি, নিয়ে এসো। বাপের ব্যাটা বলব তাহলে।
এটা একটা কাজ হলো নাকি? এত সহজেই যদি বাপের ব্যাটা হওয়া যায়, ছাড়ে কে? রওনা হয়ে গেল রাফিয়ান। হাসিমুখে চেয়ে আছে সবাই।
অপর পাড়ে প্রায় পৌঁছে গেছে রাফিয়ান, হঠাৎ হাসি মুছে গেল পুমকার মুখ থেকে।
তার এই পরিবর্তন লক্ষ করল জিনা। পুমকার দৃষ্টি অনুসরণ করে চেয়ে তারও মুখের রঙ পাল্টে গেল। বড় বড় হয়ে গেল চোখ, তাতে আতঙ্ক।
মস্ত এক সাপ। একটা গাছের ডাল থেকে নেমে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে রাফিয়ানের দিকে। কুকুরটা টের পায়নি।

মুসাও দেখেছে সাপটা। অ্যানাকোণ্ডা! ফিসফিসিয়ে বলল সে। দুনিয়ার সব। চেয়ে বড় সাপ। এক নম্বর হারামী।
ক্যানোডি...ক্যানোডি! অ্যানাকোণ্ডার জিভারো নাম। দাঁতে দাঁতে বাড়ি লাগছে পুমকার, কথা জড়িয়ে যাচ্ছে।
ঘেউ ঘেউ শুরু করল রাফিয়ান, দেখে ফেলেছে সাপটাকে।
খালি সাপের বয়ান দিচ্ছ তোমরা, চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। কিছু একটা করা দরকার।
পাঁচ-ছয় মিটার লম্বা হবে সাপটা। ভীষণ মোটা। জলপাই-সবুজের ওপর কালো ফুটকি।
জলদি! মুসা বলল। পুমকা, কুলিদের ওখান থেকে লাঠি নিয়ে এসো কয়েকটা। কুইক! বইয়ে পড়েছে কি করে বড় সাপ তাড়াতে হয়।
এক দৌড়ে গিয়ে কয়েকটা লাঠি নিয়ে এল পুমকা।
একটা লাঠি নিয়ে বলল মুসা, আমি যা করব, সবাই করবে। ভয় দেখিয়ে তাড়ানোর চেষ্টা করব।
লাঠি দিয়ে গায়ের জোরে পানি পেটাতে শুরু করল ছেলেরা, ক্যাসাডোও তাদের সঙ্গে যোগ দিল। সেই সঙ্গে গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে লাগল সকলেই।
মুসা, অযথা চেঁচাচ্ছি, জোরে বলল রবিন। সাপের কান নেই, শব্দ শোনে।
তাই তো! ঠিক আছে, পেটানো থামিও না। কম্পন টের পাবে। ভড়কে যেতে পারে।
ঠিকই বলেছে মুসা।
সাপটা বোধহয় ভাবল : আহ, এ-কি জালাতন! কি কাঁপাটা- না কাঁপছে। পানি। ঝড় উঠল নাকিরে বাবা? শুরু করেছে কি দু-পেয়ে জীবগুলো? যে চারপেয়েটাকে ধরতে যাচ্ছি, সেটাকেও তো চিনতে পারছি না। বানর কিংবা শুয়োরের মত মোটেও নয়। খেতে কেমন লাগবে কে জানে?
দ্বিধা করছে সাপটা। তারপর সিদ্ধান্ত নিল : এই জঘন্য জায়গা থেকে চলে যাওয়াই ভাল। খাওয়ার সময় এত গণ্ডগোল ভাল লাগে? যাই, অন্য কোথাও গিয়ে কিছু ধরে শান্তিতে খাই।
গাছের ডালে আর ফিরে গেল না সাপটা। পানিতে নেমেছে তো নেমেছেই। স্রোতে গা ভাসিয়ে দিল। ধীরে ধীরে ভেসে চলল ভাটির দিকে।
জিনার ডাকে ফিরে আসছে রাফিয়ান, নিরাপদ দূরতে চলে এসেছে।
মোড়ের কাছে গিয়ে কোণাকুণি সাঁতরাতে শুরু করল সাপটা। চিত হারিয়ে। গেল ওপাশে।
ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল জিনা। মুসা, তোমার জন্যেই রাফিয়ান বাচল আজ!
সবাই প্রশংসা করছে মুসাকে।

রবিন বলল, তোমার বই-পড়া কাজে লাগছে। মনে হচ্ছে শিকারী হিসেবে নাম কামাবে। জানোয়ারের ব্যবসার সব দায়দায়িত্ব শেষে না তোমার ঘাড়েই চাপে।
জবাবে হাসল মুসা। বলল, কতবড় দানব, দেখলে! এগুলোকেই ধরে ধরে খায় ইনডিয়ানরা। ওরা আরও বড় দানব।
হেসে উঠল ক্যাসাডো। স্বাদ কিন্তু ভালই। আমি খেয়ে দেখছি। ছোটগুলোর চেয়ে বড়গুলো অনেক বেশি টেস্ট। খাবে নাকি?
মুসা হ্যাঁ-না কিছুই বলল না। বোঝা গেল খুব একটা অমত নেই। কিন্তু জিনা তাড়াতাড়ি দু-হাত নেড়ে বলল, না, বাবা, না, আমি নেই। সাপের গোস্ত! ওয়াক থুহ!
মুসা, তোমার ইচ্ছে আছে মনে হচ্ছে? রবিন জিজ্ঞেস করল।
জন্তু-জানোয়ার ধরতে গেলে কখন কি খেতে হবে কে জানে? মুসা বলল। সব সময় সঙ্গে খাবার না-ও থাকতে পারে। তখন তো জানটা বাঁচাতে হবে কোনমতে।
কিশোর বলল, হারাম...
আরে ধ্যাত্তোর, হারাম। জান বাঁচানো ফরজ।
এ-তো দেখছি জাত অ্যানিমেল ক্যাচার হয়ে যাচ্ছে। কৃত্রিম বিস্ময় প্রকাশ করল জিনা।
পাল্টা জবাব দিল মুসা, ফাঁকি দিলে কোন কাজেই উন্নতি হয় না।
হাসাহাসি করছে ছেলেরা, এই সময় হামুকে দেখা গেল। যোদ্ধাদের কারও কাছে কোন শিকার নেই। উদ্বিগ্ন, চোখেমুখে ভয়।
তাড়াহুড়ো করে মুখোশ পরে ফেলেছে ক্যাসাডো। সোজা তার কাছে এসে থামল হামু। প্রচুর হাত নেড়ে, মাথা ঝাঁকিয়ে নিচু গলায় বলল কিছু। বেশির ভাগ শব্দই বুঝল না ছেলেরা।
ইংরেজিতে তাদেরকে জানাল ক্যাসাডো, হামু বলছে, শিকার মেলেনি। তার বদলে জঙ্গলের ভেতর দেখে এসেছে তাদের চিরশত্রু ট্র্যাকো ইনডিয়ানদের পায়ের ছাপ। ভয়াবহ যোদ্ধা ওরা। সুযোগ পেলেই অন্য গোত্রের ইনডিয়ানদের আক্রমণ। করে বসে। সব সময় একটা যুদ্ধংদেহী ভাব। কাজেই একেবারে চুপ, টু শব্দ করবে না। হামু বলছে, এখন থেকে নড়াও উচিত হবে না, তাহলে টের পেয়ে যাবে ট্রাকোরা। ওরা নাকি একটা জায়ারের পিছু নিয়েছে।
কিন্তু ট্রাকোরা যে টের পেয়ে গেছে ইতিমধ্যেই, বুঝতে পারেনি হাম। জিভারোদের পায়ের ছাপ দেখে ফেলেছে একজন ট্রাকো যোদ্ধা। হামুর দলের পিছু নিয়ে চলে এসেছে। বনের ভেতর তাদের সতর্ক নড়াচড়ার আভাস পাওয়া যাচ্ছে।
ঘাড়ের রোম খাড়া হয়ে গেছে রাফিয়ানের। চাপা গলায় গাউ করে উঠল।
চুপ। তার কানের কাছে ধমক দিল জিনা নিচু স্বরে। চুপ থাক!

ইশারায় কুলিদের চুপ থাকতে বলল হামু।
যোদ্ধারা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তৈরি। উত্তেজনায় টান টান হয়ে আছে সবাই কুলিদের হাতেও লাঠি, বল্লম কিংবা তীর-ধনু।
চায় কি ব্যাটারা? কথা না বলে থাকতে পারল না মুসা।
ওরা হয়তো ভাবছে, হামু কোন বড় শিকার পেয়েছে, প্রায় শোনা যায় না, এমন ভাবে বলল ওঝা। ওটা ছিনিয়ে নিতে চায়। যখন দেখবে শিকার নেই, আমাদের সঙ্গে যা খাবার আছে লুট করে নিয়ে যাবে।
অবশ্যই যদি জিততে পারে, রহস্যময় শোনাল কিশোরের কণ্ঠ।
তাদের যথাসর্বস্ব লুট করে নিয়ে যাবে ট্রাকোরা, আর তারা এই গহন বনে না খেয়ে মরবে, এটা ভাবতেই ভাল লাগছে না কিশোরের। ফন্দি আঁটছে সে মনে। মনে। ফিফটি-ফিফটি চান্স যখন, ঝুঁকিটা নিতেই হবে।
জিনার মুখ সাদা হয়ে গেছে। পুমকার আতঙ্কিত চেহারা দেখেই আন্দাজ করতে পারছে ট্র্যাকোরা কতটা ভয়ঙ্কর। মূসার দিকে তাকাল রবিন। দুজনের। চোখেই ভয়। রক্ত সরে গেছে মুখ থেকে।
মিস্টার ক্যাসাডো, হাত বাড়াল কিশোর, আপনার মুখোশটা দিন। আ যোদ্ধাদের বলন, ওদের মাথা থেকে কিছু পালক খুলে দিতে। জলদি!
কেন চাইছে ওগুলো, বুঝতে পারল না ক্যাসাডো। কিন্তু বিনা প্রতিবাদে মুখোশটা খুলে দিল। যোদ্ধাদেরকে বলতেই ওরাও পালক খুলে দিল।
তাদের কাছ থেকে কয়েকটা বিচিত্র মালা নিয়ে রাফিয়ানের গলায় পেঁচিয়ে বাঁধল কিশোর। মাথায় আটকে দিল জিভারোদের মাথার একটা বন্ধনী, তাতে কয়েকটা পালক লাগানো। নিজে পড়ল মুখোশটা। মাথায় পালক গুজল।
অবাক হয়ে দেখছে সবাই। সর্দার হামুও এই বিচিত্র সাজ দেখে স্তম্ভিত। করছে। কি দেবতার ছেলে?
রাফিয়ানকে নিয়ে সামনে ছুটে গেল কিশোর, জঙ্গলের দিকে।
ঠিক ওই মুহূর্তে ঝোপ দু-হাতে ফাঁক করে বেরিয়ে এল দশ-বারোজন ট্র্যাকো, জিভারোদের আক্রমণ করার জন্যে। কিন্তু বেশিদূর এগোতে পারল না। কিশোর আর কুকুরটার দিকে চোখ পড়তেই পাথরের মত জমে গেল ট্র্যাকো-নেতা। লড়াইয়ের আগে চিৎকার করে যোদ্ধারা, একে বলে যুদ্ধ-চিৎকার। নেতাও ওরকম চিৎকার করে উঠতে যাচ্ছিল, থেমে গেল মাঝপথেই। এমন অদ্ভুত দৃশ্য জীবনে, দেখেনি সে।
মুখোশটা ভীষণ ভারি, মাথা সোজা রাখতেই কষ্ট হচ্ছে কিশোরের, দম আটকে যাবে যেন। কিন্তু সে-সব পরোয়া না করে গলা ফাটিয়ে বিকট চিৎকার করে উঠল। সেই সঙ্গে হাত-পা নেড়ে নাচতে শুরু করল। নাচ মানে টারজান ছবিতে

দেখা জংলী মানুষখেকোদের লাফঝাপের অবিকল নকল। মুখোশটা এক ধরনের অ্যামপ্লিফায়ারের কাজ করছে, ফলে কয়েক গুণ জোরাল শোনাল চিৎকার। সঙ্গে গলা মেলাল রাফিয়ান। তুমূল ঘেউ ঘেউ জুড়ে দিল, সেই সঙ্গে তার বিশেষ নাচ–এক লাফে তিন হাত উঠে বাকা হয়ে আবার মাটিতে নামা। শুধু ইনডিয়ানরা কেন, এমন যুগল-নৃত্য জিনা, মুসা রবিন আর ক্যাসাডোও দেখেনি আর।
জিভারোরা চোখের পাতা ফেলতেও যেন ভুলে গেছে। তাদের চেয়ে বেশি চেঁচাতে পারে দেবতার বাচ্চা, এই প্রথম জানল।
নাচতে নাচতে ট্রাকো-নেতার দিকে এগোল কিশোর। বার বার হাত ছুঁড়ছে তার দিকে। আঙুল নির্দেশ করছে, যেন কোন সাংঘাতিক বান মারতে যাচ্ছে। হঠাৎ চেঁচিয়ে বলল, রাফি, যা ধর! দে ব্যাটাকে কামড়ে!
এ-রকম অনুমতি কালেভদ্রে পাওয়া যায়, আর কি ছাড়ে রাফিয়ান? ঘেউ ঘেউয়ের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিয়ে দুই লাফে গিয়ে পড়ল নেতার সামনে। বিশাল হাঁ করে কামড় মারতে গেল তার পায়ের গোছায়।
চোখের পলকে ঘুরে গেল নেতা! কাণ্ড দেখে পিলে চমকে গেছে তার। রাফির কামড় খাওয়ার জন্যে দাঁড়াল না। লাফ দিয়ে গিয়ে পড়ল ঝোঁপের ধারে। তারপর দৌড়, লেজ তুলেই বলা যায়–কারণ, বিশেষ ওই অঙ্গটা থাকলে সত্যি সত্যি এখন খাড়া হয়ে যেত এক ছুটে হারিয়ে গেল বনের ভেতরে।
নেতারই এই অবস্থা, দলের অন্য যোদ্ধাদের আর দোষ কি। পড়িমড়ি করে দৌড় দিল ওরা নেতার পেছনে, যে যেদিক দিয়ে পারল। ঝোপঝাড় ভেঙে গিয়ে। পড়ল বনের ভেতরে।
বেদম হাসিতে ফেটে পড়ল মুসা। তার সঙ্গে যোগ দিল রবিন আর জিনা। ক্যাসাডোও হাসছে।
জিভারোরা হাসল না। দেবতার বাচ্চার ক্ষমতা দেখে বিস্ময়ে বোবা হয়ে গেছে যেন। এক বিন্দু রক্তপাত না, কিছু না, তাড়িয়ে দিল ট্রাকোদের। খুব জোরাল কোন মন্ত্র নিশ্চয় পড়েছে, নইলে ট্রাকোদের মত হারামী মানুষ এভাবে পালায়?
এগিয়ে এসে কিশোরের সামনে দাঁড়াল হামু। শ্রদ্ধায় মাথা নুইয়ে প্রণাম করল। তারপর নাচতে শুরু করল তার চারপাশে। দেখাদেখি অন্য যোদ্ধারাও এসে কিশোর আর রাফিয়ানকে ঘিরে নাচতে লাগল। তালে তালে নাড়ছে হাতের বল্লম। আর তীর-ধনু। পুমকা নাচছে হাততালি দিয়ে দিয়ে।
নাচ থামল। মুখোশটা ক্যাসাডোকে ফিরিয়ে দিল কিশোর।
ক্যাসাডোও এমন ভঙ্গিতে হাতে নিল, যেন মুখোশটাতে মন্ত্র ভরে দিয়েছিল। সে। কাজ শেষ হওয়ার পর ছুঁড়ে দেয়া মন্ত্র বাতাস থেকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে মুখোশে ভরে তারপর মুখে লাগল।

জিভারোদের আর কোন সন্দেহ রইল না, ক্যাসাডোর মুখোশের মন্ত্রের জোরেই তাড়ানো হয়েছে ট্র্যাকোদের।
এবার সম্মান দেখানোর পালা।
জাগুয়ারের দাঁত গেঁথে তৈরি বিশেষ মালাটা গলা থেকে খুলে কিশোরের গলায় পরিয়ে দিল হামু। তারপর তার সামনে হাটু গেড়ে বসে লাল-হলুদ আলখেল্লার। এটা কোণা সাবধানে ছোঁয়াল কপালে।
এই বার বিপদে পড়ল কিশোর। এই সম্মানের একটা জবাব দেয়া দরকার, জিভারোদের কায়দায়। দেবতার বাচ্চা এই রীতি জানে না, এটা হতেই পারে না, মানবে না ইনডিয়ানরা। কিন্তু সেই রীতিটা কি? ভুল হলে কি খারাপ ভাবে নেবে ওরা? ভাবার সময়ও নেই। আস্তে করে হাত রাখল হামুর মাথায়। রেখেই বুঝল, ঠিক কাজটি করে ফেলেছে।
আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল জিভারোরা। সর্দারকে আপন করে নেয়া মানেই তাদের সবাইকে আপন করা। দেবতার ছেলে তা-ই করেছে।
ইনডিয়ানদের উচ্ছাস শেষ হলে এগিয়ে এল মুসা, রবিন আর জিনা। কিশোরের বুদ্ধির জন্যে তাকে ধন্যবাদ জানাল। রাফিয়ানকে জড়িয়ে ধরে আদর করল জিনা।
আর ওখানে থাকা নিরাপদ নয়। সাহস সঞ্চয় করে আবার ফিরে আসতে পারে ট্রাকোরা। তল্পিতল্পা গুছিয়ে রওনা দিল দলটা। অনেক ঘুরপথে পার হয়ে এল ট্র্যাকোদের এলাকা।
এতে, চিন্তিত হয়ে বলল রবিন, একটা অসুবিধে হতে পারে। আসল জায়গা পার হয়ে যদি চলে আসি?
আসতেও পারি, কিশোর বলল। তবে পাহাড়-টাহার কিছু দেখিনি ওদিকে। পাহাড় না থাকলে উপত্যকা থাকবে না।
হ্যাঁ, তা-ও তো বটে।
আসল কথা হলো, মুসা বলল, ভাগ্যের ওপর অনেকখানি নির্ভর করতে হবে। আমাদের। কপাল ভাল হলে জায়গাটা পাব, খারাপ হলে পাব না।
আরও কত বিপদ আছে সামনে কে জানে। জিনা বলল, জাগুয়ার গেল, সাপ গেল, ট্র্যাকো গেল। আর কি কি আছে এই জঙ্গলে?
ও-ধরনের আর কোন বিপদের মুখোমুখি হলো না ওরা। তবে অসুবিধে অনেক হলো। শিকার খুবই সামান্য, ফলে খাবারে টান পড়ল। ইনডিয়ানদের বিশেষ অসুবিধে হলো না, তাদের সঙ্গে জাগুয়ারের মাংস রয়েছে। তবে নদীর ধার থেকে সরে আসার পর পানির কষ্ট দেখা দিল সকলেরই। ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে। চলেছে, পানি নেই, অথচ পরিশ্রম করতে হচ্ছে বেশি।

হাঁপিয়ে উঠেছে ছেলেরা, শরীর আর পারছে না। রাফিয়ান সারাক্ষণই জিভ বের করে হাঁপায়। তার ওপর আরও কষ্ট বেচারার–জোঁক আর রক্তচোষা কীট পতঙ্গে ছেয়ে ফেলেছে শরীর। বেছে দেয় জিনা, তিন গোয়েন্দাও হাত লাগায়। কিন্তু কটা আর বাছা যায়।
রাতে ঘুমাবার সময় ওরা কড়া পাহারার ব্যবস্থা করল।
এতই পরিশ্রান্ত, শোবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে গেল অভিযাত্রীরা। মনে হলো ফুরুত করে শেষ হয়ে গেল রাতটা। তবে ভোরে চোখ মেলে পালকের মত হালকা মনে হলো সবার শরীর। বেশ ভাল বিশ্রাম হয়েছে।
নাস্তা খেয়ে রওনা হলো দলটা।
রোদ যত চড়ছে, গরম বাড়ছে। পানি নেই। পিপাসায় কাতর হয়ে পড়ল সবাই।
ওঝার পরামর্শ চাইল হামু।
বিটলাঙগোরগা বলল, চিন্তা নেই। আরেকটু এগিয়েই পানি পাওয়া যাবে। বলেছে সে আন্দাজে। সামনে উঁচু পর্বত দেখা যাচ্ছে, মাথায় বরফ। উপত্যকায় হ্রদ-টদ কিছু থাকতে পারে, এই ভরসাতেই বলেছে। জানে, ভুল হলে সর্বনাশ হবে। তার জাদু-ক্ষমতার ওপর ইনডিয়ানরা বিশ্বাস হারালে ভীষণ বিপদ হতে পারে।
তবে আপাতত বিপদ কেটে গেল।
পর্বতের তলায় একটা হ্রদ দেখা গেল দুপুর নাগাদ। রোদে ঝকমক করছে স্বচ্ছ পরিষ্কার পানি।
ছুটে গিয়ে জানোয়ারের মত উপুড় হয়ে পানিতে মুখ ডুবিয়ে দিল ইনডিয়ানরা। পেটভরে পানি খেয়ে, গায়ে মাথায় ছিটিয়ে উঠে এল।
ছেলেরা আর ক্যাসাডো খেল আঁজলা ভরে। খুব মিষ্টি। বোধহয় পর্বতের ওপরের বরফ গলা পানি ঝর্না বেয়ে এসে পড়ে এই হ্রদে।
হ্রদটা বেশি বড় না। বড় দিঘির সমান। কিশোরের মনে হলো, এটাই বোধহয়। সেই জলাশয়, যেটার কথা বলা হয়েছে ধাঁধায়।
ঠিক দুপুর। সূর্য মাথার ওপরে।
ব্যাপারটা আগে চোখে পড়ল মুসার, তার দৃষ্টিশক্তি খুব জোরাল। দেখো দেখো! একেবারে মাঝখানে দেখা যাচ্ছে সূর্যটা। অদ্ভুত, না?
অন্য ছেলেরাও দেখল।
বোধহয় উঁচু জায়গায় রয়েছি বলেই দেখতে পাচ্ছি, কিশোর বলল। ভৌগোলিক আরেকটা ধাঁধা। যাকগে, ওটা নিয়ে আমাদের মাথা না ঘামালেও চলবে। পশ্চিমে দেখো এখন, চাঁদ দেখা যায় কিনা?
অনেকক্ষণ ধরে খুজল মুসা। মাথা নাড়ল, নাহ চাঁদ নেই।

পকেট থেকে কম্পাস বের করল কিশোর। পশ্চিম কোনদিকে, দেখল। তার কাছে ঘেঁষে এসেছে জিভারোরা। চোখে কৌতূহল নিয়ে দেখছে।
পশ্চিম ওদিকে, হ্রদের অন্য পাড়ের ঘন জঙ্গলের দিকে হাত তুলে দেখাল কিশোর। এই দিনের বেলায় চাঁদ ওঠার তো প্রশ্নই ওঠে না। যদি উঠতও, ওই জঙ্গলের জন্যে দেখা যেত না।
আমিও তাই ভাবছি, রবিন বলল।
দাঁড়াও দাঁড়াও, এক মিনিট! বলে উঠল জিনা। ওই যে দেখো, ওইই যে, ওদিকে।
ক্যাসাডোও দেখেছে ওটা। হাত তুলে দেখাল।
উল্লাসে চিৎকার করে উঠল জিভারোরা, ওরাও দেখেছে। ঘন জঙ্গলের দিকে এতক্ষণ চেয়ে ছিল বলে দেখতে পায়নি।
তিন গোয়েন্দা দেখল, পশ্চিমে এক জায়গায় প্রায় পানির ভেতর থেকে উঠে গেছে হালকা ঝোপঝাড়। তার মাঝেই দাঁড়িয়ে আছে মিটার চারেক উঁচু বাসনের মত গোল একটা বস্তু। মুক্তোর মত দ্যুতি ছড়াচ্ছে। সবুজ বনের মাঝে বিশাল এক মুক্তোর থালা যেন। দাঁড়িয়ে আছে লালচে পাথরের মঞ্চের ওপর।
গোল জিনিসটা কী, কি দিয়ে তৈরি, বুঝতে পারল না ছেলেরা।
ক্যাসাডোও পারল না।
তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর, ঘন ঘন চিমটি কাটছে নিচের ঠোঁটে। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, বুঝেছি। সূর্যের আলো।
সূর্যের আলো? মুসা বুঝতে পারল না।
বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে ছোট ছোট, আয়না বসানো রয়েছে চাকাটায়। সূর্যরশ্মি পানিতে প্রতিফলিত হয়ে গিয়ে পড়ছে আয়নাগুলোতে। তাতেই সৃষ্টি হয়েছে ওই কৃত্রিম চাঁদ। আশ্চর্য! এত শত বছর আগেও জানত?
কারা জানত? কী?মুসার প্রশ্ন।
যারা ওই চক্র বানিয়েছে। সূর্যের আলোতে যে চাঁদ আলোকিত হয়, জানত একথা?
হয়তো জানত, রবিন বলল। হাজার হাজার বছর আগেই নাকি মানুষ। জ্যোতির্বিদ্যায় উঁচু পর্যায়ের জ্ঞান অর্জন করেছিল। মিশরের পিরামিড, ইনকা পিরামিড, স্টোনহেঞ্জ নাকি তারই স্বাক্ষর:..
বুদ্ধি ছিল মানতেই হবে, চক্রটার দিকে হাত তুলল মুসা। শুধু কাঁচ দিয়ে এত সুন্দর একটা জিনিস তৈরি করে ফেলল।
আমাদের দ্বিতীয় ধাঁধারও জবাব পেয়ে গেলাম।
হ্যাঁ, রবিনের সঙ্গে একমত হয়ে মাথা ঝাঁকাল কিশোর। এখন আইডল্টা খুঁজে বের করতে পারলেই…

কেল্লা ফতে! তুড়ি বাজাল মুসা।
দ্রুত জ্যোতি হারাচ্ছে কৃত্রিম চাঁদ। কারণ ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে সূর্য, হেলে পড়ছে বলে বিশেষ অ্যাঙ্গেলটা আর থাকছে না। খানিক পরে কোন জ্যোতিই রইল না আর চক্রটায়, অতি সাধারণ একটা পাথরের বাসন।
জিভারোদের দিকে ফিরে ছোটখাটো একটা বক্তৃতা দিল ক্যাসাডো।
খুশিতে হুল্লোড় করে উঠল ইনডিয়ানরা।
ক্যাসাডোর ওপর শ্রদ্ধা, ভক্তিতে গদগদ। হবেই। মুখোশের ক্ষমতায় শত্রু তাড়াতে পারে যে ওঝা, পানির হ্রদ হাজির করে দিতে পারে, যে গুপ্তধন এত বছরেও কেউ পায়নি, সেটা পাওয়ারও ব্যবস্থা করতে পারে, তাকে ভক্তি না করে উপায় আছে।
ছেলেদের ওপরও ভক্তি বেড়েছে ওদের।
কাছে থেকে চাঁদটা দেখতে চলল কিশোর। সঙ্গে চলল মুসা, রবিন জিনা ও রাফিয়ান। পেছনে ক্যাসাডো, হামু আর তার দলবল।, তারও পরে রয়েছে হলুদ, দেবী, বিড়বিড় করল কিশোর। তোমার দিকে তাকিয়ে থাকবে সবুজ চোখে।
শুরুতে হালকা ঝোপঝাড়। কিন্তু খানিক পরে জঙ্গল এত ঘন হলো, পথ করে এগোনোর সাধ্য হলো না ছেলেদের। বাধ্য হয়ে পিছিয়ে এল। আগে বাড়ল কয়েকজন যোদ্ধা। পথ কেটে কেটে এগোল।
তিনশো মিটার মত এগিয়ে হঠাৎ থেমে গেল ওরা। ক্যাসাডো আর ছেলেরা বুঝতে পারল, অবশেষে দেখা পাওয়া গেছে চন্দ্রমন্দিরের।
সামনে অদ্ভুত একটা বিল্ডিং। সাদা রঙ করা। সামনের দিকটা বিচিত্র তৃতীয়ার চাঁদের আকার। চাঁদের ঠিক পেটের কাছে গোল বিরাট এক দরজা, ঢোকার জন্যে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে অভিযাত্রীদের।
মন্দির দর্শনেই কুঁকড়ে গেল জিভারোদের মন। ভক্তিভরে মাথা নুইয়ে প্রণাম করল ওরা, এগোতে সাহস করল না আর।
ছেলেদেরও বুক কাঁপছে। ঘন বনের ভেতরে ওই নির্জন এলাকায় এত পুরানো, একটা বাড়ি দেখলে অতি বড় সাহসীরও গা ছমছম করবে।
মাথা ঝাড়া দিয়ে অস্বস্তি তাড়াল যেন কিশোর। এসো, যাই। নিশ্চয় আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন সবুজ-চোখো চন্দ্রদেবী।
আরেকটু ভদ্রভাবে সম্মানের সঙ্গে বলো, নিচু স্বরে বলল মুসা, যেন দেবী সত্যিই শুনতে পাবে।
এগোতে যাবে ওরা, ডেকে থামাল ক্যাসাডো।
অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর, কি?
ওই যে, দেখো।
তিনটে ব্যাগ। প্রায় নতুন। মন্দিরের দরজার কাছেই মাটিতে পড়ে আছে।

ইয়াল্লা! চোখ বড় বড় করে ফেলল মুসা। এ-তো সভ্য মানুষ! এখানে এসে ঢুকল কারা?
কি জানি? হাত নাড়ল ক্যাসাডো। আমাদের হুশিয়ার থাকতে হবে...
তার কথা শেষ হওয়ার আগেই ঘাউ করে উঠে দৌড় দিল রাফিয়ান। এক ছুটে ঢুকে গেল গোল দরজা দিয়ে। স্তম্ভিত ভাবটা কাটতে সময় লাগল জিনার। ডাকতে দেরি হয়ে গেল।
রাফির হলো কি? মুসা অবাক।
অবাক ক্যাসাডোও হয়েছে। ভয় পেল বলে তো মনে হলো না।
না, পায়নি, জিনা বলল। চেনা কারও গন্ধ পেয়েছে।
অসম্ভব। রবিন মাথা নাড়ল। হতেই পারে না। এখানে চেনা-জানা কে আসতে যাবে?
আন্দাজে কথা না বলে চলো না দেখি, কিশোর বলল।
হাত তুলে জিভারোদের ডাকল ক্যাসাডো। ওরা কাছে এলে বলল, কাছাকাছি থেকো। আমরা ভেতরে যাচ্ছি। দরকার হলেই ডাকব। সঙ্গে সঙ্গে ঢুকে পড়বে। ভয় পেয়ে পালিও না যেন।
এবার নেতৃত্ব নিল ক্যাসাডো। খুব সাবধানে আগে আগে চলল সে, ছেলেরা পেছনে। দরজার কাছে পৌঁছে মুখোশটা খুলে হাতে নিল, একবার দ্বিধা করেই পা রাখল ভেতরে। অদৃশ্য হয়ে গেল।
দ্বিধা করল কিশোরও। চলো, আমরাও যাই। ওঁকে একা যেতে দেয়া ঠিক হবে না।
ছেলেরাও ঢুকল মন্দিরে।
আলো খুব কম। ক্যাসাডোর গায়ে ধাক্কা লাগল মুসার। চোখে আলো সইয়ে নেয়ার জন্যে দরজার সামান্য ভেতরেই দাঁড়িয়ে গেছে বৈমানিক।
মন্দিরের দেয়ালের অসংখ্য ফুটো দিয়ে ম্লান আলো আসছে। আবছা আলো চোখে সয়ে এলে দেখল ওরা, বিশাল এক হলরুমে ঢুকেছে। অনেকটা জাহাজের খোলের মত লাগছে ঘরটা। এক সারি বিভিন্ন আকারের শুভ : ছোট থেকে ধীরে ধীরে বড় হয়েছে, ঠিক মাঝের স্তম্ভটার পর থেকে আবার ছোট হওয়া শুরু হয়েছে। কাস্তের মত বাকা মেঝেতে দাঁড়িয়ে ছাত ঠেকা দিয়েছে স্তম্ভগুলো। দু-দিকে দুটো। সিঁড়ি। একটা উঠে গেছে চাঁদের বাঁ প্রান্তের কাছে, আরেকটা ডান প্রান্তে। দুটো সিঁড়ির শেষ ধাপের ওপরে হাতে গোল দুটো ফোকর।
বাঁ সিঁড়িটা দিয়ে ওপরে উঠে বাইরে মাথা বের করে দেখল কিশোর, ফোকরের বাইরে মস্ত বড় একটা চ্যাপ্টা পাথর ফেলে রাখা হয়েছে বলির পাথর। নিশ্চয় নরবলি দেয়া হত ওখানে। পাশেই একটা মঞ্চ, পুরোহিত কিংবা ওঝা। দাঁড়াতো হয়তো।

শশশ! হুঁশিয়ার করল ক্যাসাডো। ডান সিঁড়ি দিয়ে উঠতে যাচ্ছিল, নেমে এল তাড়াতাড়ি। ওপরে শব্দ।
লুকিয়ে পড়ার আগেই উজ্জ্বল আলো এসে পড়ল নিচে। ইংরেজিতে বলল। কেউ, হলো তাহলে ঠিক। আমি তো ভাবলাম গেল টর্চটা।

.

ওরটেগা! চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। কণ্ঠস্বর চিনে ফেলেছে।
দ্রুত নড়ল আলোটা। একে একে পড়ল পাঁচজনের ওপর।
আরি, কাণ্ড দেখো! বিশ্বাস করতে পারছে না ওরটেগা, ছেলেগুলো। সঙ্গে আরেকজন লোকও আছে।
ডানের সিঁড়ি দিয়ে আরও দু-জন নেমে এল, চ্যাকো এবং জিম।
ক্যাসাডোই ওঝা বিটলাঙগোরগা শুনে হেসেই বাঁচে না তিন হাইজ্যাকার।
ভাল আছ, জিনা? জিজ্ঞেস করল জিম। এসেছ, ভালই হলো। এক সঙ্গে যেতে পারব।
তারমানে যাননি আপনারা এখনও? মুসা বলল। আমি তো ভাবছিলাম, আপনারা আমাদের উদ্ধার করতে ফিরে এসেছেন।
না, যেতেই পারিনি এখনও. বিষণ্ন কণ্ঠে বলল জিম। জিভারোদের গা থেকে পালিয়ে প্লেনে ফিরে গিয়েছিলাম। তাড়াহুড়ো করে তিনটে ব্যাগ গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি। পথ হারিয়েছি পরের দিনই। চলে এসেছি এদিকে। মন্দিরটা দেখে ঢুকলাম। জানো, কি আবিষ্কার করেছি? এসো, দেখাই।
ডানের ফোকর দিয়ে ছাতে বেরিয়ে এল ছেলেরা।
খাইছে! চিৎকার করে উঠল মুসা।
একটা বেদীর ওপর দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে বিরাট দেবী-মূর্তি, নিরেট সোনায় তৈরি। মাথায় সোনার মুকুটের সামনের দিকে রূপালী বাকা চাঁদ, রূপা দিয়ে বানিয়ে পরে লাগিয়ে দেয়া হয়েছে মুকুটে। কাঁধে রূপার চাঁদরের শাল জড়ানো। আশ্চর্য দুটো চোখ, সবুজ দ্যুতি ছড়াচ্ছে।
পান্না, ওরটেগা বলল। খুলে নেব। ভাল দাম পাওয়া যাবে রিওতে।
একটা ছুরি বের করে মুর্তিটার দিকে এগোল সে।
আর তাকে থামাল কাসাডো। এক মিনিট। আমরা এখানে কি করে এলাম, জিজ্ঞেস করেননি। আগে শুনুন, তারপর পান্না খুলবেন।
খুলে বলল সব ক্যাসাডো। মূর্তিটা হামুকে দিয়ে দিলে, কথা শেষ করল সে, আমাদের মুক্তি দেবে। সবাই আমরা দেশে ফিরে যেতে পারব।
হেসে উঠল চ্যাকো, বিশ্রী শোনাল হাসিটা। জিভারোরা জানছে কি করে মূতিটা ছিল এখানে? পেছনে আরেকটা ছোট দরজা আছে, চোখ দুটো নিয়ে বেরিয়ে যাব

আমরা, ঢুকে পড়ব জঙ্গলে। ওরা দেখবেও না, জানবেও না কিছু।
কিন্তু দরজার বাইরে যে ব্যাগ পড়ে আছে? রবিন প্রশ্ন তুলল।
জাহান্নামে যাক ব্যাগ। ওগুলোর মধ্যে তেমন কিছু নেই। ওরটেগা, জলদি খোলা।
ওরটেগার হাত চেপে ধরল ক্যাসাডো। পাগল হয়েছেন। শুনুন, মূর্তিটা অক্ষত। অবস্থায় হামুকে দিতে হবে। নইলে সে কোনদিনই আমাদের যেতে দেবে না।
আপনাদের কথা কে ভাবছে? ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে উঠল চ্যাকো। আমি চাই টাকা।
চুপ করে ছিল জিম। বলল, চ্যাকো, জিভারোদের হাত থেকে পালাতে পারবে না। সহজেই ওরা ধরে ফেলবে। এই জঙ্গল থেকে বেরোতেই যদি না পারো, টাকা পাবে কিভাবে? তার চেয়ে ক্যাসাডো যা বলছে শোনো। আমাদের সবারই মঙ্গল তাতে।
কিন্তু চ্যাকো তখন অন্ধ। তার পক্ষ নিল ওরটেগা। মহামূল্যবান পান্না দুটো তাদের মাথা খারাপ করে দিয়েছে। কতখানি বিপদে রয়েছে, আরও কতখানি। বাড়বে, বুঝতেই চাইছে না।
ক্যাসাডোও নাছোড়বান্দা। কিছুতেই পান্না খুলতে দেবে না।
কথা কাটাকাটি, শেষে হাতাহাতি শুরু হয়ে গেল। ক্যালাডোকে ঘুসি মেরে বসল চ্যাকো।
ওকে এমনিতেই পছন্দ করে না রাফিয়ান। তার ওপর ক্যাসাডোকে মারায়। মেজাজ খারাপ হয়ে গেল তার। ঝাঁপিয়ে পড়ল চ্যাকোর ওপর। টুটি কামড়ে ধরতে গেল।
বিকট চিৎকার করে মাটিতে পড়ে গেল চ্যাকো। কুকুরটা উঠে এল তার বুকের ওপর।
চেঁচিয়ে থামতে বলছে জিনা, কিন্তু কানেও ঢুকছে না রাফিয়ানের। রোখ চেপে গেছে তার। চ্যাকোর রক্ত না দেখে ছাড়বে না।
চেঁচামেচি শুনে জিভারোরা ভাবল, তাদেরকে ডাকা হচ্ছে। হুড়মুড় করে এসে ঢুকল ভেতরে। দুপদাপ করে উঠে এল ছাতে।
হামু বোকা নয়। কুসংস্কারে বিশ্বাসী বটে, কিন্তু মগজটা তার পরিষ্কার। সোনার দেবী-মূর্তি, ওরটেগার হাতে ছুরি, দেবীর চোখের কাছে আঁচড়, কিছুই চোখ এড়াল না তার। বুঝে ফেলল, কি হচ্ছে।
সর্দারের নির্দেশে নিমেষে তিন হাইজ্যাকারকে কাবু করে ফেলল জিভারোরা। হাত পিছমোড়া করে শক্ত করে বাধল বুনো লতা দিয়ে।
জিমকে ছেড়ে দেয়ার জন্যে অনুরোধ করেও লাভ হলো না। এত রেগে গেছে। হামু, কারও কথাই শুনল না, এমনকি ওঝার কথাও নয়। সাংঘাতিক অপরাধ করেছে তিন বন্দী। গ্রাম থেকে পালিয়েছে, তারপর এখানে এসে দেবীর চোখ চুরি

করতে চেয়েছে। ওদের অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য। সেখানেই ঘোষণা করল হামু গায়ে নিয়ে গিয়ে আগামী পূর্ণিমাতেই তিনজনকে দেবতার উদ্দেশ্যে বলি দেয়া হবে। এটাই ওদের যোগ্য শাস্তি।
যে জিনিসের জন্যে এসেছিল, পাওয়া গেছে, গায়ে ফেরার জন্যে তৈরি হলো দলটা। ছেলেদেরকে আর ক্যাসাডোকে মুক্তি দেয়া হয়েছে, কথা রেখেছে হামু। বলল, যখন যেখান থেকে খুশি স্বর্গে ফিরে যেতে পারে। বাধা দেয়া হবে না।
কিন্তু তিন হাইজ্যাকার আবার ধরা পড়ায় আনন্দ মাটি হলো ছেলেদের। তিনজনকে জিভারোদের হাতে রেখে ফিরে যাওয়ার কথা ভাবতে পারল না ওরা।

আমাদেরও গাঁয়ে ফিরে যেতে হবে, বলল ক্যাসাডো। কিছু দিন বিশ্রাম দরকার। নইলে আবার জঙ্গল পাড়ি দিতে পারব না। তাছাড়া সমস্যায় ফেলে দিয়েছে ওই তিন ব্যাটা। ছাড়ানোর কিছু একটা ব্যবস্থা করতে হবে। আগামী পূর্ণিমার দিন বলি দেবে ওদেরকে হামু, মাঝে বেশ কিছুদিন সময় আছে। আশা করি একটা উপায় করে ফেলতে পারব।
গাঁয়ে ফিরে চলল সবাই।
সোনার মূর্তিটা পালা করে বইল দুজন যোদ্ধা, মহা-সম্মানের কাজ মনে করল এটাকে ওরা।
গাঁয়ে ফিরে তিন হাইজ্যাকারকে কুঁড়েতে ভরল জিভারোরা। অনেক পাহারাদার রাখা হলো, আর যাতে পালাতে না পারে। সারাক্ষণ চোখে চোখে রাখার ব্যবস্থা হলো।
ছেলেদের ওপর কেউ আর চোখ রাখছে না এখন। যখন যেখানে খুশি যেতে পারে তারা। ক্যাসাডো ও মুক্ত। আলাদা আলাদা কুঁড়েতে না শুয়ে একই কুঁড়েতে। রাত কাটায় এখন। ফলে আলাপ-আলোচনার সুবিধে হলো।
কিন্তু উপায়টা কি এখন? প্রশ্ন করল জিনা।
আমারও তাই জিজ্ঞাসা, জবাব দিল বৈমানিক। ভাবতে ভাবতে তো মগজ ঘোলা করে ফেললাম, কোন উপায় দেখছি না। ব্যাটাদের ছাড়াই কি করে?
চুপ করে রইল সবাই।
দেখি, কি করা যায়। আবার বলল ক্যাসাডো। তবে আগে প্লেনে যেতে হবে একবার। এস ও এস পাঠাতে। জবাব না পাওয়া পর্যন্ত পাঠিয়েই যাব। এখন। আর ভয় নেই, আমি দিনের পর দিন না থাকলেও কেউ খোঁজ করবে না।
ভাগ্য যখন ভাল হতে শুরু করে, সব দিক থেকেই হয়। সেদিন দ্বিতীয়বারের চেষ্টায়ই জবাব পেয়ে গেল ক্যাসাডো। খুশিতে লাফাতে লাফাতে গায়ে ফিরে এল সে।

ঘুম থেকে ছেলেদের ডেকে তুলে জানাল খবরটা। পেয়েছি। কাঠ-ব্যবসায়ী। কোম্পানির এক দল লোক কাজ করছে বনে। তারাই ধরেছে সিগন্যাল। বলেছে, ব্রাজিল পুলিশকে জানাবে, যত তাড়াতাড়ি পারে। দশ-বারো ঘন্টা পরে আবার যাব প্লেনে। খবর নেব, কদর কি হলো। যাক, দুঃস্বপ্ন শেষ হতে চলেছে এতদিনে।
সময় মত সাহায্য এলেই হয় এখন, কিশোর বলল। পূর্ণিমার আর মাত্র ছয় দিন বাকি।
সে-কথা ক্যাসাডোর মনে আছে কিন্তু উপায় এখনও বের করতে পারেনি।
ভাল ঘুম হলো সে রাতে। ঝরঝরে শরীর মন নিয়ে পরদিন সকালে উঠল অভিযাত্রীরা।
নাস্তা সেরেই প্লেনে চলে গেল ক্যাসাডো।
ছ-দিনের মধ্যে কি সাহায্য আসবে? রবিনের প্রশ্ন। কিশোর?
জানি না।
না এলে লোকগুলোকে বাঁচানো যাবে না, মুসা বলল।
অনেক মাথা ঘামাল ওরা, কিন্তু কোন উপায় বেরোল না। তিন হাইজ্যাকারের। কপালে বলিই লেখা আছে বোধহয়।
সন্ধ্যায় ফিরে এল ক্যাসাডো। মুখ উজ্জ্বল। এতক্ষণে সারা দুনিয়া জেনে গেছে আমাদের খবর।
চকচকে চোখে সমস্ত, শুনল ছেলেরা।
চার দিনের মধ্যেই আর্মি হেলিকপ্টার আসবে আমাদের নিতে, বলল। ক্যাসাডো। কপ্টার নামার জন্যে একটা ল্যাণ্ডিং প্যাড বানিয়ে ফেলতে হবে। আমাদের। সেটা কোন ব্যাপারই না। জিভারোদের দেখিয়ে দিলেই বানিয়ে ফেলতে পারবে। দেবতার ক্যান নামবে শুনলে খুব আগ্রহ করে কাজ করবে।,
তা-তো হলো, জিনা বলল। তিন হাইজ্যাকারের কি হবে?
হাসি হাসি মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল ক্যাসাডোর। সরি, জিনা, ওদের জন্যে কিছু করতে পারছি না। মিলিটারিকে বললে বল প্রয়োগ করবে, তাতে জিভারোদের সঙ্গে লড়াই অনিবার্য। তখন তোমরাও আহত হতে পারো। তিনটে আসামীর। জন্যে সে রিস্ক আমি নিতে পারব না।
আমাদের নামিয়ে দিয়ে তো ফিরে আসতে পারবে?
মনে হয় না। আমাদের যেতেই অনেক সময় লাগবে। তার পর ফিরে আসতে আসতে বলি শেষ হয়ে যাবে। আরও একটা ব্যাপার আছে। ব্রাজিলিয়ান কর্তৃপক্ষ সহজে উপজাতীয়দের সঙ্গে বিরোধে যাবে না। এমনিতেই বশ্যতা মানতে চায় না ওরা, তার ওপর গোলাগুলি চললে আরও খেপে যাবে। ভাল মানুষ হলে কথা ছিল, তিনটে ক্রিমিন্যালের জন্যে কেন ওদের খেপাতে যাবে সরকার?

সবাই বিষণ্ন। রাফিয়ানও বুঝতে পারছে, আনন্দের সময় নয় এটা। লেজ নিচু করে রেখেছে সে, কান ঝুলে পড়েছে। চুপচাপ বসে এর-ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছে।
কিন্তু এভাবে তিনটে মানুষকে জবাই করে ফেলবে, কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না জিনা, আর আমরা কিছুই করতে পারব না?
সে-রাতে কেউ ঠিক মত ঘুমাতে পারল না।
শুয়ে শুয়ে অনেক ভাল কিলোর। কি যেন একটা মনে আসি আসি করেও আসছে না, ধরতে পারছে না সে। ভোররাতের দিকে ঘুমিয়ে পড়ল, ভেঙে গেল খানিক পরেই। লাফিয়ে উঠে বসল সে। বাইরে তখন ভোরের আলো। ডাকল। সবাইকে।
কি ব্যাপার, কিশোর? চোখ রগড়ে জিজ্ঞেস করল মুসা।
পথ পেয়ে গেছি।
কিসের পথ?
ওদের বাঁচানোর।
ঘুম দূর হয়ে গেল মুসার চোখ থেকে। অন্যেরাও সতর্ক। কিশোর কি বলে শোনার জন্যে অধীর।
কাজটা সহজ হবে না, কিশোর বলল। মিস্টার ক্যাসাডো, আপনার সহায়তা দরকার। ওরটেগাকেও খাটতে হবে।
ওরটেগা? ক্যাসাডো অবাক।
হ্যাঁ। সে ভেনট্রিলোকুইজম জানে।
তাতে কি? ক্যাসাডোর বিস্ময় বাড়ল। কিছুই বুঝতে পারছে না। খুলে বলো।
বুঝতে পারছেন না? ধরুন আরেকবার কথা ছুঁড়ে দিল ওরটেগা। কথাটা বেরোল চন্দ্রদেবীর মুখ দিয়ে…
তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বসল ক্যাসাডো। ঠিক বলেছ! ঠিক! সহজেই বোঝাতে পারব হামুকে। দেবীকে অপমান করছে যারা তাদের বিচার দেবীই করুক, রায় দিক। তারপর তারপর আমি মূর্তিটাকে প্রশ্ন করব, সে জবাব দেবে.. চমৎকার! কিশোর, তুমি একটা জিনিয়াস।
এখনই এত শিওর হবেন না, মাথা নাড়ল কিশোর। জিভারোরা ইংরেজি জানে না। ওরটেগাও এদের ভাষা জানে না। কথা হবে কোন ভাষায়?
ওটা এমন কিছু কঠিন না, ক্যাসাডো বলল। জিভারো ভাষায় শব্দ খুবই কম, উচ্চারণও খুব সহজ, তা এতদিনে নিশ্চই বুঝেছ। তাছাড়া প্রশ্ন ঠিক করব আমি, জবাবও। সেই জবাবই মুখস্থ করাব তাকে।

খুশি হলো সবাই। যত শত্রুতাই করুক, তিনজন মানুষকে বলি দেয়া হবে– চোখের সামনে, এটা সহ্য করা যায় না।
সময় নষ্ট করল না ক্যাসাডো। তখুনি গেল হামুর কাছে।
সহজভাবেই মেনে নিল হামু। দেবতা কালুম-কালুম তার দেবীর অপমান হতো। দেখেছে, প্রতিশোধ তো নিতেই চাইবে। আর দেবীর বিচার দেবীই করুক, এটা চাওয়াটাও যুক্তিসঙ্গত। হামু.কেন মাঝখান থেকে উল্টোপাল্টা বিচার করে দেবতার কুনজরে পড়তে যাবে?
এক সঙ্গে দুটো কাজ করার হুকুম দিল সে তার লোকজনকে।
দেবতাদের উড়ুক্কু-নৌকা নামার জন্যে মঞ্চ বানানোর নির্দেশ দিল। আরেকটা উঁচু ছোট মঞ্চ বানাতে বলল তার কুড়ের সামনে, ওটাতে দেবীকে রাখা হবে। ওখান থেকেই বিচার করবে দেবী।
দেবীর মঞ্চ বানাতে বেশি সময় লাগল না।
খুব ধুমধাম করে নানারকম আচার-অনুষ্ঠান সেরে দেবীকে মঞ্চে তুলল ওঝা বিটলাঙগোরগা। গায়ের সবাই এসে ভক্তিভরে প্রণাম করে গেল দেবীকে।
এরপর অপেক্ষার পালা। কবে আসবে সেই শুভক্ষণ, যখন তিন বন্দির বিচার করবে দেবী। সময়টা ওঝা ঠিক করবে।
খুব বেশি সময় নেয়া যাবে না। ওরটেগাকে ভাষা শেখাতে শুরু করল, ক্যাসাডো। তবে জিভারোদের অলক্ষে। সে ওঝা। বন্দিদের কুঁড়েতে তার যাতায়াত কেউ সন্দেহের চোখে দেখল না।
অবশেষে এল সেই দিন।
সকাল থেকেই খুব উত্তেজনা। বিভিন্ন কারণে সবাই উত্তেজিত। গায়ের লোক, তিন গোয়েন্দা, জিনা, বন্দিরা, সবাই।
মঞ্চের সামনে এসে জড় হলো সব লোক। সকালের সোনালী রোদে ঝকঝক করে জ্বলছে চন্দ্রদেবী। নিজের কিরণ ছড়িয়ে দিয়ে স্ত্রীর ঝলমলে রূপকে শতগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে, যেন তার স্বামী সূর্যদেবতা। ভক্তিভরে বার বার প্রণাম করতে লাগল ইনডিয়ানরা।
মঞ্চে দেবীর পাশে গিয়ে দাঁড়াল ওঝা। যতরকম মালা আর সাজপোশাক। আছে, সব আজ গায়ে চাপিয়েছে। সব চেয়ে বিকট চেহারার মুখোশটা পরেছে। অপার্থিব লাগছে তাকে, ভয়ঙ্কর।
ঢিবঢিব করছে ছেলেদের বুক। হবে তো? কাজ হবে?
মঞ্চের পাশে বিশেষ আসনে বসেছে হামু, দু-পাশে আর সামনে বসেছে তার পরিবারের লোকজন। তাদের কাছেই সম্মানজনক দূরতে সম্মানিত আসনে বসেছে। তিন গোয়েন্দা আর জিনা। জিনার পাশে রাফিয়ান, গম্ভীর হয়ে আছে।

বুঝতে পেরেছে, এটা ঘেউ ঘেউ কিংবা হালকা কিছু করার সময় নয়। ফিসফাস কানাঘুষা। করছে গায়ের লোকর স্বর্গের কুকুর তো, দেখো, কেমন ভাবভঙ্গি! দেবতার চেয়ে কম কি?
হাত তুলে ইশারা করল হামু।
পলকে থেমে গেল সমস্ত শব্দ।
আবার ইশারা করল সর্দার।
কয়েকজন যোদ্ধা গিয়ে বন্দিদের নিয়ে এল।
চ্যাকোর চেহারা ধসে গেছে। জিম আর ওরটেগা মোটামুটি ঠিকই আছে।
তিন বন্দিকে উদ্দেশ্য করে লম্বা বক্তৃতা দিল ওঝা। ওরটেগা কিছু কিছু বুঝল, অন্য দু-জন কিছুই বুঝল না। তবে ছেলেরা বুঝল বেশির ভাগই।
ঘন ঘন হাততালিতে ফেটে পড়ল জনতা। আরেকবার দেবীকে প্রণামের ধুম পড়ে গেল।
হাত তুলল বিটলাঙগোরগা।
নিমেষে স্তব্ধ হয়ে গেল কোলাহল।
বন্দিদের আরও কাছে আসার ইশারা করল ওঝা।
সময় উপস্থিত। সবাই উত্তেজিত। চোখ মঞ্চের দিকে।
জনতা যাতে শুনতে পায় সে জন্যে চেঁচিয়ে বলল ওঝা, হে সম্মানিত দেবী, শুনতে পাচ্ছেন আমার কথা?
ছেলেদের বুকের কাঁপুনি বেড়ে গেল। ঠিকমত বলতে পারবে তো ওরটেগা? পণ্ড করে দেবে না তো সব?
হঠাৎ শোনা গেল কথা, কাঁপা কাঁপা কথা। পুরুষ কণ্ঠ, না মহিলা, বোঝা গেল না। মনে হলো, দেবীর অনড় ঠোঁটের কাছ থেকেই এল কথাগুলো, হ্যাঁ, শুনছি।
অস্ফুট শব্দ করে উঠল জনতা, শব্দের একটা শিহরণ বয়ে গেল যেন। শ্রদ্ধায় আপনাআপনি মাথা নিচু হয়ে গেল জিভারোদের।
হে সম্মানিত দেবী, আবার বলল ওঝা, ওই তিনজন মানুষকে চিনতে পারছেন?
জবাব এলঃ নিশ্চয় পারছি! রাগান্বিত মনে হলো দেবীর কণ্ঠ।
পরস্পরের দিকে তাকাল ছেলেরা। ভালই অভিনয় করছে ওরটেগা। উতরে। যাবে মনে হচ্ছে।
ওঝা বলল, সর্দার হামু তাদেরকে মৃত্যুদণ্ড দিতে চায়। আপনিও কি তাই চান?
জবাব ও নিশ্চয়। মৃত্যুদণ্ডই তাদের একমাত্র শাস্তি।
চমকে উঠল ছেলেরা। বলে কি ওরটেগা? দিল নাকি সব গড়বড় করে?
ভাবার সময় পেল না, তার আগেই শোনা গেল আবার ওঝার প্রশ্ন, মৃত্যু কিভাবে হবে তাদের বলুন, হে সম্মানিত দেবী।

দীর্ঘ এক মুহূর্ত নীরবতা। মনস্থির করে নিচ্ছে যেন দেবী। জিভারোদের উত্তেজনা চরমে, নিশ্বাস ফেলতে যেন ভুলে গেছে তারা।
অবশেষে শোনা গেল দেবীর রায়ঃ
স্বর্গে গিয়ে হবে তাদের মৃত্যু। দেবতা কালম-কালুম নিজের হাতে বলি দেবেন তাদের। প্রচণ্ড ঝড় বইবে তখন সমস্ত পৃথিবী জুড়ে। পাপীরা ধ্বংস হবে, দেবতার পূজারিরা হবে পুরস্কৃত। তিন বন্দিকে সঙ্গে করে স্বর্গে নিয়ে যাবেন ওঝা বিটলাঙগোরগা।
রায় শুনে স্তব্ধ হয়ে গেল ইনডিয়ানরা। কি সাংঘাতিক পাপী ওই তিনজন। দেবতা নিজের হাতে বলি দেবেন, তার মানে মৃত্যুর পরেও তাদের পাপ মোচন। হবে না, নরকে জ্বলেপুড়ে মরবে। হাজার রকম শাস্তি পাবে।
তাছাড়া দেবী বলেছেন, সেদিন পাপীরা ধ্বংস হবে। আতঙ্কিত হয়ে পড়ল জিভারোরা। দেবীকে বার বার প্রণাম করল। বাঁচাও দেবী, তোমার পাপী বান্দাকে ছেড়ে দাও কালুম-কালুম, এমনি নানারকম গুঞ্জন।
হাত তুলল ওঝা।
চুপ হয়ে গেল গুঞ্জন।
রায় দিয়েছেন দেবী, বলল ওঝা। সবাই শুনেছ?
চিৎকার করে জানাল সবাই, শুনেছে।
হামু বলল, সম্মানিত বিটলাঙগোরগা, কালুম-কালুমের আদেশ তো শুনলে। বন্দিদেরকে নিয়ে যাবে সঙ্গে করে?
নিশ্চয়, বলল ওঝা। দেবতার আদেশ অমান্য করতে পারি? সর্দার হামু, তোমার দেবভক্তির কথা সব আমি বলব কালুম-কালুমকে।
খুব খুশি হলো সর্দার। বলল, আমার গায়ের কথাও বোলো, বিটলাঙগোরগা। আমি কথা দিচ্ছি, যারা এখনও খারাপ আছে, তারা ভাল হয়ে যাবে। কালুম-কালুম যেন শাস্তি না দেন।
ওঝা বলল, বলব।
সর্দার আর ওঝার বদান্যতায় খুশি হলো জনতা। শতমুখে তারিফ করতে লাগল দু-জনের।
আরও বিমর্ষ মনে হলো তিন বন্দিকে। ভেতরে ভেতরে আসলে পুলকে ফেটে পড়ছে, কিন্তু সেটা প্রকাশ হতে দিল না।
উল্লাস ঢেকে রাখতে খুব কষ্ট হলো ছেলেদের।
আবার অপেক্ষার পালা। কবে আসে হেলিকপ্টার? জিভারোরা অপেক্ষায়। রয়েছে কবে নামবে দেবতার উড়ুকু-নৌকা?
অবশেষে এল সেই দিন।

ছেলেরা সবে নাস্তা শেষ করেছে, এই সময় শোনা গেল এঞ্জিনের শব্দ। কপ্টারের শব্দ তাদের কানে এত মধুর শোনায়নি আর কখনও। তাড়াহুড়ো করে, বাইরে বেরিয়ে এল ওরা।
একের পর এক নামতে লাগল হেলিকপ্টার।
জিভারোদের চোখে ভয় মেশানো কৌতূহল। এমন আজব নৌকা এই প্রথম। দেখছে। অতি দুঃসাহসী দু-একজন কাছে আসার চেষ্টা করল। কিন্তু রোটর ব্লেডের জোরাল বাতাস গায়ে লাগতেই পিছিয়ে গেল, যতখানি না ধাক্কায়, তার চেয়ে অনেক বেশি, ভয়ে ভক্তিতে। এই বাতাস তাদের বিশ্বাস আরও বাড়িয়ে দিল শতগুণ। ধরেই নিল, কালুম-কালুম অদৃশ্য ভাবে কাছেই রয়েছেন। তিনি বাতাসের দেবতা, শরীর অদৃশ্য রেখেছেন বটে, কিন্তু বাতাস সেটা প্রকাশ করে দিচ্ছেই। হেলিকপ্টারগুলোকে এক দফা প্রণাম করে নিল জিভারোরা।
এক সারিতে এগিয়ে গেল স্বর্গবাসীরা, তাদের পেছনে জিভারোদের দীর্ঘ মিছিল.। একে একে কপ্টারে উঠল ছেলেরা। আরেকটা কপ্টারে তোলা হলো তিন বন্দিকে। ওঠার সময় এমন ভান করল ওরা, যেন যেতে চায় না।
চাইবে কেন? ভাবল জিভারোরা। বলির শুয়োর হতে কে যেতে চায়?
বাকি রইল বিটলাঙগোরগা।
হামুকে কাছে আসার ইশারা করল সে।
এল সর্দার। চোখ ছলছল। ওঝাকে ভালবেসে ফেলেছিল।
মুখোশ খুলে বাড়িয়ে দিল ক্যাসাডো, নাও, এটা তোমাকে উপহার দিলাম। এটা দেখে আমাকে মনে কোরো।
চোখের পানি আর ধরে রাখতে পারল না সর্দার। পাল বেয়ে গড়িয়ে নামল। ওঝার একটা হাত আলগোছে তুলে নিয়ে উল্টো পিঠে চুমু খেল। ধরা গলায় বলল, স্বর্গে গিয়ে আমাকে ভুলে যেও না, বিলাঙগোরগা।
কপ্টারে উঠল ক্যাসাডো।
এক এক করে আকাশে উঠতে লাগল কপ্টারগুলো।
বকের মত গলা লম্বা করে তাকিয়ে আছে জিভারোরা।
খোলা দরজা দিয়ে হাত বের করে নাড়ল কিশোর। ঠিকই চিনতে পারল পুমকা। জবাবে সে-ও নাড়ল। জিভারোরা বুঝল, এটা স্বর্গবাসীদের বিদায় সঙ্কেত। তারাও হাত নাড়তে শুরু করল।
খারাপ লাগল কিশোরের, সহজ-সরল মানুষগুলোকে এভাবে ধোঁকা দিয়ে। এসেছে বলে। কিন্তু এছাড়া আর করারই বা কি ছিল?
রোদে ঝকমক করছে সোনার মূর্তিটা, ছোট হতে হতে মিলিয়ে গেল এক সময়।
সবুজ বনের উপর দিয়ে উড়ে চলল হেলিকপ্টার।

ইস, কি একখান অ্যাডভেঞ্চারই না করে এলাম, বলল মুসা।
কিশোর আর রবিন জবাব দিল না, জিভারোদের কথা ভাবছে।
জিনা বলল, হ্যাঁ, অনেক দিন মনে থাকবে।
হউ! করে সায় জানাল রাফিয়ান।

.

একটা সামরিক বিমানক্ষেত্রে নামল হেলিকপ্টার।
কপ্টার বদল করল অভিযাত্রীরা। আরেকটা বেসামরিক বিমান বন্দরে নিয়ে গেল তারেদকে বেসামরিক হেলিকপ্টার! ওখান থেকে ছোট বিমানে করে ম্যানাও। ম্যানাও থেকে যাত্রীবাহী বড় বিমানে করে পৌঁছল রিও ডি জেনিরোতে।
সঙ্গে সঙ্গে বিমানটাকে ঘিরে ফেলল পুলিশ। তিন গোয়েন্দা আর জিনা নামল রাফিয়ানকে নিয়ে, ক্যাসাডো নামল। তিন হাইজ্যাকারকে সারা পথ পাহারা দিয়ে। এনেছে মিলিটারি পুলিশ। রিও ডি জেনিরোর পুলিশের হাতে তুলে দিয়ে ফিরে গেল তারা।
ছেলেদের বুকে জড়িয়ে ধরতে ছুটে এলেন চার জোড়া দম্পতি। কিশোরের চাচা-চাচা, রবিন, মুসা আর জিনার বাবা-মা, সবাই এসেছেন। যেদিন শুনেছেন ছেলেদের খবর পাওয়া গেছে, সেদিনই ছুটে এসেছেন ব্রাজিলে।
ক্যাসাডোর জন্যেও অপেক্ষা করছে উষ্ণ সম্বর্ধনা। অ্যাভিয়েশন ক্লাবের লোক, তার কিছু কলিগ আর বন্ধুবান্ধব এসেছে তাকে স্বাগত জানাতে। মৃত ধরে নিয়েছিল। যাকে, জ্যান্ত হয়ে সে আবার ফিরে এসেছে, আবেগে তাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল কেউ কেউ।
বিমান বন্দরের লাউঞ্জে ঢুকতেই ছেকে ধরল রিপোর্টাররা। ছবির পর ছবি তোলা হলো। প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে পাগল হয়ে যাওয়ার অবস্থা হলো অভিযাত্রীদের। শেষে পুলিশকে এসে উদ্ধার করতে হলো।
আরও দিন কয়েক রিও ডি জেনিরোতেই থাকতে হলো ওদের।
তিন হাইজ্যাকারের বিচার শুরু হয়েছে। সাক্ষি দিতে হবে।
ছেলেদের সাক্ষ্যে শাস্তি হালকা হয়ে গেল জিমের। তাকে অল্প কিছুদিনের জেল দিলেন বিচারক। লম্বা জেল হলো ওরটেগা আর চ্যাকোর।
কিন্তু ওরা কিছু মনে করল না। অপরাধ করেছে, শাস্তি পেয়েছে। তিনজনেই দেখা করতে চাইল তিন গোয়েন্দা আর জিনার সঙ্গে।
দেখা করল ওরা।
জিভারোদের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে বার বার ওদের ধন্যবাদ দিল। হাইজ্যাকাররা।

জিম কথা দিল, জেল থেকে বেরিয়ে আবার নতুন করে জীবন শুরু করবে। ভাল হয়ে যাবে। অপরাধের পথে পা বাড়াবে না আর কোনও দিন।
জেলখানা থেকে ফেরার পথে মুসা বলল, কিশোর, আবার বোধহয় আমাদের জঙ্গলে যেতে হবে। আমাজনের জঙ্গলে?
মাথা নাড়ল কিশোর, বোধহয়।

ভলিউম ৪ – ড্রাগন – তিন গোয়েন্দা – রকিব হাসান – সেবা প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ: অক্টোবর, ১৯৮৮

এমন চমকে উঠল তার দুই সহকারী যে, রবিনের হাত থেকে কার্ডের বাণ্ডিল পড়ে খুলে ছড়িয়ে গেল, বেকায়দা ভঙ্গিতে ঝাঁকুনি দিয়ে ওপরে উঠে গেল মুসার হাতে ধরা স্ক্রু-ড্রাইভারটা। এতদিন পুরানো ছাপার মেশিনটা মুসা একাই রকিব হাসান ব্যবহার করেছে, কিন্তু কিশোরের নির্দেশে রবিন এখন শিখে নিচ্ছে কাজটা। মুসাকে শিখে নিতে বলা হয়েছে ইলেকট্রনিকের কাজ, এতদিন এই কাজটা কিশোর করত। তার মতে, সব কাজ মোটামুটি জানা থাকলে গোয়েন্দাগিরিতে অনেক সুবিধে।

কি বললে? স্ক্রু-ড্রাইভারের খোঁচা লেগে রেডিওর বাক্সের পেছনে হার্ডবোর্ডের কভারে বিশ্রী একটা আঁচড় পড়েছে, সেটা মোছার চেষ্টা করল মুসা।

বলছিলাম কি, আবার বলল কিশোর, এই অঞ্চলে আগে কখনও হয়নি, এমন একটা ডাকাতি করলে কেমন হয়? ধরা যাক, অনেক বড় অপরাধী আমরা, মাস্টার ক্রিমিন্যাল…

তাহলে আগে ভাবো, ধরা পড়লে কি হবে? শুনেছি, অপরাধ করে শেষ পর্যন্ত কোন অপরাধীই পার পায় না।

কার্ডগুলো কুড়িয়ে নিচ্ছে রবিন। মাস্টার ক্রিমিন্যাল হয়ে সুবিধে করতে পারব না। প্রেসে কার্ড ছাপাটাই শিখতে পারলাম না ঠিকমত, এত সহজ একটা কাজ।

কথার কথা বললাম আর কি, কিশোর বলল। আমরা গোয়েন্দা তো, মনে হলো বড় ডাকাতি কিভাবে কিভাবে হতে পারে, সেটা আগেই যদি ভেবে রাখি, অপরাধীদের চেয়ে এগিয়ে থাকতে পারব। মাস্টার মাইণ্ড ক্রিমিনালদের অপরাধী মনে কি কি ভাবনা চলে, বুঝতে পারব। অনেক সময় দুর্বোধ্য করে কথা বলা কিংবা কঠিন শব্দ ব্যবহার করা কিশোরের স্বভাব।

মাথা ঝাঁকাল মুসা, তা ঠিক। এই যেমন, তোমার ফর্মুলায় ফেললে, রেডিওর মালিকদের কুৎসিত মনে কি কি ভাবনা চলে সেটা জানা থাকলেও আমার জন্যে অনেক সুবিধে হবে। দেখেছ, রেডিওটার কি অবস্থা করেছে? কতখানি বাজে লোক হলে এমন সুন্দর একটা জিনিসকে এভাবে নষ্ট করতে পারে? খারাপ করে আবার নিজে নিজেই কারিগরি ফলাতে গেছে। একটা তারও জায়গামত নেই… দাঁড়াও, আগে ঠিক করে নিই। তারপর ডাকাতির আলোচনায় যোগ দেব।

কাজ শেষ, শুধু একটা স্ক্রু লাগানো বাকি। শক্ত করে লাগাল সেটা মুসা। তারপর হাসিমুখে রেডিওটা তুলে কিশোরকে দেখিয়ে বলল, এটা বেচতে পারলে কম করেও তিন ডলার লাভ হবে তোমার চাচার। বাতিল জিনিস ছিল, একেবারে নতুন করে দিলাম।

হাসল কিশোর। দেখতে তো ভালই লাগছে। দেখো, কাজ করে কিনা।
ছোট্ট একটা নব টিপে দিয়ে ডায়াল ঘোরাতে শুরু করল মুসা। করছে!...এই যে লাইট জ্বলে।
খরুখর আওয়াজ বেরোল স্পীকার থেকে, ফিসফাস, ঝনঝন আর নানারকম বিচিত্র শব্দ করল কয়েক মুহূর্ত, তারপর শোনা গেল কথা।
স্পষ্ট ভারি গলায় খবর হচ্ছে: ...সী-সাইডের অদ্ভুত ঘটনার কোন সমাধান করতে পারছে না কর্তৃপক্ষ। গত এক হপ্তায় পাঁচটা কুকুর নিখোঁজ হওয়ার খবর এসেছে। কুকুরের মালিকেরা উদ্বিগ্ন।...কুকুর মালিক সমিতির সভাপতি মিস্টার ক্যাঙরুনিয়ান আজ
দূর, দাও বন্ধ করে, হাত নাড়ল কিশোর।
হাহ, শেষমেশ কুত্তা চোর, নব ঘুরিয়ে রেডিও অফ করে দিল। মুসা। পাঁচটা কুকুর নিয়ে গেছে। করবে কি?
মাস্টার ক্রিমিন্যাল কিশোর পাশাকে সমাধান দিতে অনুরোধ করছি, হেসে নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল রবিন। তবে সেই সঙ্গে আমার অনুমানটাও বলে দিই। কুকুর চুরি করে লুকিয়ে রাখবে চোর। এ এলাকার সব কুকুর যখন শেষ হয়ে যাবে, বাজারে কুকুরের চাহিদা বাড়তে বাড়তে অসম্ভব দাম হয়ে যাবে, তখন একদিন ঝপাৎ করে এনে অনেক কুকুর বাজারে ফেলবে। বিক্রি করে রাতারাতি বড়লোক হয়ে যাবে।
নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর, তারমানে গভীর ভাবনা চলছে তার মনে। অদ্ভুত! আনমনে বিড়বিড় করল।
কি অদ্ভুত? জানতে চাইল রবিন। পাঁচটা কুকুর? পাঁচ আমার কাছেও অদ্ভুত লাগে...
মাথা নাড়ল কিশোর। পাঁচ সংখ্যাটা অদ্ভুত লাগছে না, লাগছে পাঁচটা কুকুর। এক হপ্তায় পাঁচটা হারাল, বেশি হয়ে গেল না?
ওই যা বলছিলাম, কুত্তা চোরের কাজ, কুকুরের বাজার দর ওঠাতে চাইছে। কিংবা মাংসের কারখানার মালিকের সঙ্গে শত্রুতা হয়েছে চোরের। কুকুর না থাকলে কুকুরের জন্যে মাংস কিনবে না কেউ, ফলে মার খাবে কোম্পানি। বিচিত্র প্রতিশোধ বলতে পারো।
আলতো হাসি ফুটল কিশোরের ঠোঁটে। অনেক ঘুরিয়ে ভাবছ। এভাবে ভাবলে হবে না। আমি জানতে চাই, এক হপ্তায় পাঁচটা কেন? আর এই রহস্যের সমাধান করার জন্যে এখনও ডাকা হলো না কেন আমাদের?
হয়তো রহস্যটা তেমন জটিল মনে করছে না, মুসা বলল। মাঝেমধ্যেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় কুকুর, কদিন পর আবার ফিরেও আসে। এটা কোন ব্যাপারই না।

আমারও তাই মনে হয়, মাথা দোলাল রবিন। খবরে কিন্তু বলেনি কুকুরগুলো দামী। শুধু বলেছে, নিখোঁজ।
হয়তো তোমাদের অনুমানই ঠিক, মেনে নিতে পারছে না। কিশোর। ভাবছি, কেউ তো এখনও ডাকল না, রহস্যটায় নাক গলাই কিভাবে? যেচে খোঁজ নিতে গেলে যদি মালিকেরা বিরক্ত হয়, কিংবা আমাদেরকেই চোর ভেবে বসে?
যাচ্ছে কে? বলল মুসা।
বা-রে, এমন একটা জটিল রহস্য…
জটিল রহস্য? রবিনের দিকে একবার তাকিয়ে আবার কিশোরের দিকে ফিরল মুসা, কুকুর হারানোটা একটা অতি সাধারণ ঘটনা, দু চারটা সব সময়ই হারায়। এর মধ্যে রহস্য দেখলে কোথায়?
কর্তৃপক্ষ যখন সমাধান করতে পারছে না, নিশ্চয় রহস্য। আচ্ছা, নাক গলানো বলছি কেন? নিজেকেই যেন বোঝাল কিশোর। আমরা গোয়েন্দা, যে কোন রহস্যের সমাধান করার জন্যে এগিয়ে যেতে পারি। সী-সাইড এখান থেকে বেশি দূরে না, ইচ্ছে করলেই চলে যেতে পারি। যাচ্ছি না কেন?
কার্ড ছাপানো শেষ, মেশিন বন্ধ করে দিল রবিন। ঘটারং-ঘট, ঘট ঘটু-ঘটাং করে অন্তিম আর্তনাদ তুলে চুপ হয়ে গেল আদিম যন্ত্রটা। একটা কার্ড হাতে নিয়ে ছাপাটা দেখে নিজেই নিজের প্রশংসা করল সে, চমৎকার ছেপেছি।
হুঁ, ভালই, দেখে বলল কিশোর। চলো, হেডকোয়ার্টারে গিয়ে আলোচনা করি। জবাবের অপেক্ষা না করেই উঠে পড়ল সে।
পরস্পরের দিকে তাকাল অন্য দু-জন। তারপর গোয়েন্দাপ্রধানকে। অনুসরণ করল। বলে কোন লাভ হবে না যে জানে, তবু হেসে বলল মুসা, গণতান্ত্রিক দেশে বাস করছি আমরা, কিশোর, আমাদের তিনজনের মধ্যেও গণতান্ত্রিক চেতনা থাকা উচিত। যে কোন সিদ্ধান্ত নিতে ভোটাভুটি আবার চালু করলে কেমন হয়?
কিন্তু কিশোর শুনল বলে মনে হলো না। ছাপার মেশিনটার খানিক দূরে মোটা একটা পাইপের মুখ থেকে একটা লোহার পাত সরাচ্ছে। হামাগুড়ি দিয়ে পাইপের ভেতর ঢুকে গেল সে। কি আর করবে, মুসাও ঢুকল তার পেছনে। সব শেষে ঢুকল রবিন, ভেতরে থেকেই হাত বাড়িয়ে পাতটা আবার দাঁড় করিয়ে দিল পাইপের মুখে, ঢেকে দিল। কৃত্রিম সুড়ঙ্গমুখ। হেডকোয়ার্টারে ঢোকার এটা একটা গোপন পথ, ওরা নাম রেখেছে দুই সুড়ঙ্গ। ১৪ পাইপের মেঝেতে নরম কার্পেট বিছানো রয়েছে, কাজেই হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে কোন কষ্ট হচ্ছে না। প্রায় চল্লিশ ফুট মত জঞ্জালের ভেতর দিয়ে এগিয়ে একটা ট্রেলারের তলায় এসে শেষ হয়েছে পাইপ। মাথায় আলগা ঢাকনা, ওপর দিকে খোলে। ঠেলে তুলে ট্রেলারের ভেতরে ঢুকল কিশোর।

এক সময় এটা একটা মোবাইল হোম ছিল, দুর্ঘটনায় পড়ে না কিভাবে যেন ভেঙে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, বাতিল অবস্থায় কিনে এনেছিলেন রাশেদ পাশা। কোনভাবেই আর বিক্রি করতে না পেরে দিয়ে দিয়েছেন ছেলেদের। জঞ্জালের তলায় এখন পুরোপুরি চাপা পড়েছে ট্রেলারটা, বাইরে থেকে দেখা যায় না।
ওটাকেই সারিয়ে নিয়ে ভেতরে হেডকোয়ার্টার করেছে তিন। গোয়েন্দা। সাজানো-গোছানো ছোট্ট অফিস, খুদে ল্যাবরেটরি, ছবি প্রসেস করার ডার্ক-রুম, টেলিফোন, টাইপরাইটার, আর নানারকম আধুনিক প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আছে তাতে।
ডেস্কের ওপাশে নিজের চেয়ারে গিয়ে বসল কিশোর। পুরানো নষ্ট রিভলভিং চেয়ারটা অল্প পয়সায় কিনে এনে সারিয়ে নিয়েছে সে নিজেই। ডেস্কটাও পুরানো। কিন্তু ঘষেমেজে বার্নিশ করে চকচকে করে তোলা হয়েছে, নতুনই মনে হয় এখন। রবিন আর মুসা বসল তাদের চেয়ারে।
ঠিক এই সময় বাজল টেলিফোন।।
তিনজনেই তাকাল একে অন্যের দিকে। কোন রহস্যের তদন্তের সময় না হলে সাধারণত ফোন করে না কেউ তাদেরকে।
দ্বিতীয়বার রিঙ হতেই রিসিভার তুলে নিল কিশোর। কানে ঠেকানোর আগে একটা সুইচ টিপল। স্পীকারের সঙ্গে যোগাযোগ অন হয়ে গেল, সবাই একসঙ্গে শুনতে পাবে এখন ওপাশের কথা।
কিশোর পাশা? মহিলা কণ্ঠ, মিস্টার ক্রিস্টোফার কথা বলবেন।
নতুন কেস! প্রায় চেঁচিয়ে উঠল রবিন। হলিউডের বিখ্যাত। চিত্রপরিচালক ডেভিস ক্রিস্টোফার ফোন করলে বুঝতে হবে, নতুন একটা জটিল কেস পাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি।
হাল্লো, কিশোর পাশা, স্পীকারে গমগম করে উঠল পরিচালকের কণ্ঠ। হাতে কোন কাজ আছে তোমাদের? আই মীন, কোন কেস?
না, স্যার। তবে মনে হচ্ছে একটা কিছু পাব এবার?
কি করে বুঝলে?
আপনি ফোন করেছেন।
মৃদু হাসি শোনা গেল। ঠিকই আন্দাজ করেছ। আমার এক পুরানো বন্ধু, এক্স ফিল্ম ডিরেক্টর একটা সমস্যায় পড়েছে।
কি সমস্যা, স্যার? সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করল কিশোর।
দ্বিধা করছেন পরিচালক। অল্প কথায় কিভাবে পরিবেশন করবেন কথাটা, ভাবছেন বোধহয়, সাজিয়ে নিচ্ছেন মনে মনে। অবশেষে বললেন, কুকুর। এই খানিক আগে ফোন করে বলল, তার কুকুরটা খুঁজে পাচ্ছে না।

উজ্জ্বল হলো কিশোরের চোখ। আপনার বন্ধু কি সী-সাইডে থাকেন?
দীর্ঘ এক মুহূর্ত নীরবতার পর যখন কথা বললেন পরিচালক, বোঝা গেল তাজ্জব করে দিয়েছে তাঁকে কিশোর। হ্যাঁ। তুমি জানলে কি করে?
জানাটা কঠিন কিছু নয়। সাধারণ কয়েকটা ছিন্ন সুতো জোড়া দিয়েছি কেবল, জটিল করে কথা বলার সুযোগ পেলে সেটা ছাড়ে না কিশোর, যার সঙ্গেই বলুক।
হুঁ, চুপ করে গেলেন পরিচালক।
শুধু কুকুর নয়, স্যার, মনে হচ্ছে আরও ব্যাপার আছে। বলুন না?
আসলে, আমিই বিশ্বাস করছি না তো, তাই..ধরো, একটা জলজ্যান্ত ড্রাগন যদি চোখে পড়ে যায় হঠাৎ, মনের অবস্থাটা কেমন দাঁড়াবে?
গলা পরিষ্কার করে নিল কিশোর। ড্রাগন?
হ্যাঁ। আমার বন্ধুর বাড়ি সাগরের তীরে, পাহাড়ের ওপর। নিচে গুহা আছে। একটা বিশাল ড্রাগনকে সাগর থেকে উঠে এসে সেই গুহায় ঢুকতে দেখেছে সে।
স্তব্ধ হয়ে রইল তিন গোয়েন্দা।
এখন কি বলবে, বলো? আবার বললেন পরিচালক।
আমিই বিশ্বাস করতে পারছি না, তোমাদের কি করে করতে বলি? তা গিয়ে একবার দেখবে নাকি?
এত উত্তেজিত হয়েছে কিশোর, তোতলাতে শুরু করল, আ আপনার ব-বন্ধুর ঠিকানা বলুন, স্যার। দারুণ জমবে মনে হয় কেসটা, তিন গোয়েন্দার সবচেয়ে রোমাঞ্চকর কেস।
কাগজ-কলম নিয়ে তৈরিই আছে রবিন, তিন গোয়েন্দার সমস্ত কেসের রেকর্ড রাখা আর প্রয়োজনীয় লেখাপড়ার দায়িত্ব তার ওপর। লিখে নিল ঠিকানা।
ড্রাগন
ছেলেদের গুড লাক জানিয়ে লাইন কেটে দিলেন পরিচালক। দুই সহকারীর দিকে তাকাল কিশোর। এই আধুনিক যুগে জ্যান্ত ড্রাগন দেখাটা সৌভাগ্য বলতে হবে, তাই না?
মাথা ঝাঁকাল রবিন।
কিন্তু মুসা মুখটাকে এমন করে ফেলল যেন নিমের তেতো গিলেছে।
কি ব্যাপার, সেকেণ্ড, খুশি হওনি মনে হচ্ছে? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
রোমাঞ্চকর শব্দটার সঙ্গে আরও তিনটে শব্দ যোগ করা উচিত ছিল, মুখ গোমড়া করে বলল মুসা, মিস্টার ক্রিস্টোফারকে বলনি সে কথা।
ভুরু নাচাল শুধু কিশোর; অর্থাৎ, কী?
রোমাঞ্চকর এবং শেষ কেস, বলল মুসা। জ্যান্ত ড্রাগনের সামনে গেলে বেঁচে আর ফিরব না কোনদিন!

রকি বীচ থেকে প্যাসিফিক কোস্ট হাইওয়ে ধরে মাইল বিশেক গেলেই সী-সাইড, প্রশান্ত মহাসাগরের কূলের ছোট্ট একটা শহর। ঠিক হলো, লাঞ্চের পর ওখানে যাবে তিন গোয়েন্দা। নিয়ে যাবে বোরিস, ইয়ার্ডের কর্মচারী, বিশালদেহী দুই ব্যাভারিয়ান ভাইয়ের একজন। ইয়ার্ডের ছোট পুরানো ট্রাকটাতে করে কিছু মাল ডেলিভারি দিতে সে যাবে সী-সাইডের ওদিকে, তিন গোয়েন্দাকে সঙ্গে নিতে কোন অসুবিধে নেই।

মেরিচাচীর রান্না ভরপেট খেয়ে ট্রাকে এসে উঠল তিন কিশোর, বোরিসের পাশে গাদাগাদি করে বসল। ইয়ার্ড থেকে বেরিয়ে এল ট্রাক, উপকূলের ধারের মহাসড়ক ধরে ছুটে চলল দক্ষিণে।

রবিন, রেফারেন্স বই দেখেছিলে? এতক্ষণে জিজ্ঞেস করার সুযোগ পেল কিশোর, ড্রাগনের কথা কি কি জেনেছ?

ড্রাগন হলো পৌরাণিক দানব। ডানাওয়ালা বিশাল সরীসৃপ, উড়তে পারে; বড় বড় বাঁকা নখ আছে, নিঃশ্বাসের সঙ্গে আগুন বেরোয়।

আমি রেফারেন্স বই দেখিনি, মুসা বলে উঠল। কিন্তু বাজি রেখে বলতে পারি, মোটেই শান্ত স্বভাবের নয় ড্রাগন। সাংঘাতিক পাজী জানোয়ার।

তা ঠিক, সায় দিল রবিন। পৌরাণিক জীব, তারমানে বাস্তবে নেই। আর নেই যখন পাজী হলেই কি, ভাল হলেই বা কি?

ঠিক, কিশোর বলল। রূপকথার গল্পে আছে ড্রাগনের কথা। যখনকার গল্প তখন যদি সত্যি সত্যি এই জীব থেকেও থাকে, তাহলেও এতদিন পর এখনকার পৃথিবীতে থাকার কথা নয়, ইভালুশনের থিওরি তাই বলে। বিশালদেহী ডাইনোসররা যেমন আর বেঁচে নেই আজ।

না থাকলেই ভাল, মুসা বলল। কিন্তু ইভালুশনের থিওরি যদি সব প্রাগৈতিহাসিক দৈত্য-দানবকে হাওয়া করে দিয়েই থাকে, এই ড্রাগনটা এল কোত্থেকে?

মুসার কথায় কান না দিয়ে কিশোর বলল, গত হপ্তায় সী-সাইড থেকে পাঁচটা কুকুর হারিয়েছে, তার মধ্যে মিস্টার ক্রিস্টোফারের বন্ধুরটাও থাকতে পারে। বাড়ির কাছে ড্রাগনও দেখেছেন তিনি। কিছু বোঝা যায়?

নিশ্চয় যায়, বলল মুসা, ওসব কুকুরকে ধরে ধরে খেয়ে ফেলে। ড্রাগনটা। মানুষের মাংসেও নিশ্চয় তার অরুচি হবে না। ড্রাগন ধরতে যাওয়াটা মোটেও উচিত হবে না আমাদের।

ধরতে পারলে তো কাজই হত। রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে যেতাম। আমরা।

বিখ্যাত হয়ে লাভটা কি হবে?

সে সব তুমি বুঝবে না।

সী-সাইডে ঢুকল ট্রাক। ঠিকানা বলল কিশোর।

গতি কমিয়ে রাস্তাটা খুঁজতে শুরু করল বোরিস। আরও মাইলখানেক এগিয়ে গাড়ি থামাল। মনে হয় এটাই।
পাতাবাহারের উঁচু বেড়া, তারপরে সারি সারি পাম গাছ, বাড়িটা থাকলে লুকিয়ে আছে তার ওপারে।
গাড়ি থেকে নামল ছেলেরা।
বোরিস, কিশোর বলল, দুই ঘণ্টার বেশি লাগবে না। ফেরার পথে নিয়ে যাবেন।
বলল ও-কে, কিন্তু উচ্চারণের কারণে শব্দটা শোনাল হো-কে। কর্কশ ভারি কণ্ঠস্বর তার। ট্রাকের মুখ ঘুরিয়ে সরু পথটা ধরে চলে গেল। আবার শহরের দিকে।
চলো, আগে আশপাশটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিই, পরামর্শ দিল কিশোর। সুবিধে হবে।
পাহাড়ী এলাকা, উঁচু ঢালের ওপর বাড়ি। পুরো অঞ্চলটাই কেমন নিঃসঙ্গ, নির্জন। চিত্রপরিচালকের বাড়ির সামান্য দূরে ছোট একটা খোলা জায়গায় এসে দাঁড়াল ছেলেরা, নিচে তাকাল। পাহাড়টা এখানে। খাড়া নেমে গেছে অনেক নিচের সৈকতে। তীরে এসে ঢেউ ভাঙছে।
সেদিক তাকিয়ে রবিন বলল, খুব সুন্দর। কি শান্তি।
বলল, খুব সুন্দরে এসে ঢেউটা এখানে
শান্তি না ছাই, গজগজ করল মুসা, ঢেউ দেখেছ একেকটা!
তেমন আর বড় কই? কিশোর বলল। ফুট তিনেকের বেশি না। তবে রাতে জোয়ারের সময় নিশ্চয় আরও ফুলে ওঠে। ড্রাগন আসার উপযুক্ত সময় তখন। ঢেউয়ের তলায় লুকিয়ে লুকিয়ে চলে আসতে পারবে। বকের মত গলা বাড়িয়ে নিচে তাকাল সে। গুহাটা দেখা যায় না। এখান থেকে দেখা যাবে না। আগে কথা বলে আসি মিস্টার জোনসের সঙ্গে, তারপর নেমে দেখব।
সৈকতের দিক থেকে চোখ ফেরাল না রবিন। নামবে কি করে?
পুরানো কয়েকটা তক্তা দেখাল মুসা, ধাপে ধাপে নেমে গেছে। এককালে বোধহয় সাদা ছিল ওগুলো, কিন্তু এখন আর রঙ চেনা যায় না। রোদ, বৃষ্টি এবং সাগরের নোনা হাওয়ায় করেছে এই অবস্থা। সিঁড়ির কি ছিরি, বলল সে, নামতে গেলেই খসে পড়ে কোমর ভাঙবে।
খাড়া পাড়ের কিনারটা দেখিয়ে কিশোর বলল, আরও সিঁড়ি নিশ্চয় আছে। এখান থেকে দেখছি না বটে, খুঁজলেই পাওয়া যাবে। চলো এবার, বাড়িটাতে ঢুকি।
আগে আগে চলল কিশোর। পাতাবাহারের বেড়ার চাপে জড়সড় হয়ে আছে যেন কাঠের গেটটা। ঠেলা দিতেই পাল্লা খুলে গেল। পামের জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ঘুরে ঘুরে চলে গেছে পথ। নারকেলের ঝাড়, ঘন ঝোঁপ আর বুনো ফুলের আড়াল

থেকে উঁকি দিচ্ছে বিবর্ণ হলদে ইটের একটা বাড়ি। অযত্নে হয়েছে এই অবস্থা, বোঝাই যায়। সাগর থেকে হু-হুঁ বাতাস এসে সরসরানি তুলছে নারকেল শাখায়, বুনো ফুল আর লতাকে নড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে। বাড়িটা সাগরের একেবারে কিনারে। সদর দরজায় এসে ঘণ্টা বাজাল কিশোর।

দরজা খুলে দিলেন মিস্টার জোনস। বেঁটে, মোটাসোটা মানুষ। বিষণ্ন বড় বড় বাদামী চোখ, ঘন ভুরু, সাদা চুল, মুখের রোদে পোড়া চামড়ায় বয়েসের ভাজ।

এসো এসো, হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি। ডেভিস পাঠিয়েছে তো? তিন গোয়েন্দা?

হ্যাঁ, স্যার, পকেট থেকে কার্ড বের করে দিল কিশোর। আমি কিশোর পাশা..ও মুসা আমান, আর ও রবিন মিলফোর্ড।

সন্তুষ্ট হয়ে মাথা ঝাঁকালেন জোনস, কার্ডটা পকেটে রাখলেন। এসো। স্টাড়িতে গিয়ে কথা বলি।

রোদ ঝলমলে মস্ত এক খোলামেলা ঘরে ওদের নিয়ে এলেন। তিনি।

হাঁ হয়ে গেল ছেলেরা। বিরাট ঘরের দেয়ালে মেঝে থেকে ছাত পর্যন্ত খালি ছবি আর ছবি, এক তিল জায়গা নেই। নানা রকম বিখ্যাত চিত্রকর্ম, বড় বড় অভিনেতা-অভিনেত্রীর সই করা ফ্রেমে বাঁধানো ছবি, আর সিনেমা জগতের কিছু বিশেষ অনুষ্ঠানের দৃশ্য।

পড়ার টেবিলটায় টেবিল-টেনিস খেলা যাবে, এত বড়; কাগজ, বই আর কাঠের ছোটবড় খোদাইকর্মে বোঝাই। শেলফ ও শো কেসগুলোতেও ঠাই নেই, অদ্ভুত সব মূর্তি, পুতুল, খেলনায় ভর্তি। দুটো জিনিস কিশোরের দৃষ্টি আকর্ষণ করল: দুটোই মূর্তি-একটা ডাইনীর, মধ্যযুগে তৈরি হয়েছিল; আরেকটা আফ্রিকান, এক কালো দেবতার, কুৎসিত, নিষ্ঠুর চেহারা।

ছেলেদের চেয়ার দেখিয়ে বসতে বললেন বৃদ্ধ। ঘুরে গিয়ে বসলেন। ডেস্কের ওপাশে সিংহাসনের মত এক চেয়ারে। আমি কি কাজ করতাম নিশ্চয় বলেছে ডেভিস?

হ্যাঁ, কিশোর জানাল। চিত্রপরিচালক।

ছিলাম, হেসে বললেন জোনস। অনেক বছর আগেই রিটায়ার করেছি। ডেভিস তখন নতুন পরিচালক হয়েছে। ও তো এখন বিখ্যাত লোক, আমার সময়ে আমিও ছিলাম। আমাদের দুজনের কাজের ধারা প্রায় এক। দু-জনেই রহস্য-রোমাঞ্চের ভক্ত, তবে মানসিকতার দিক থেকে কিছুটা আলাদা। ও বাস্তব জিনিস পছন্দ করে, আমি অবাস্তব।

বুঝলাম না, স্যার।

বাস্তবে যা ঘটে, ঘটতে পারে, সে-সব কাহিনী নিয়ে ছবি তৈরি করে ডেভিস। আমি করতাম অতিকল্পিত কাহিনী নিয়ে, ফ্যান্টাসি। ড্রাগনের কথা পুলিশের কাছে

বলতে পারলাম না তো এ জন্যেই। উদ্ভট, অবাস্তব কাহিনী নিয়ে ছবি করেছি সারা জীবন, ভয়াবহ দুঃস্বপ্নেও যা কল্পনা করা যায় না। আমার ছবিতে থাকত ভয়ানক সব দৈত্য-দানব, মায়ানেকড়ে, ভূতপ্রেত, ডাইনী...সোজা কথা, আমার স্পেশালিটি ছিল হরর ফিল্ম।
মাথা ঝাঁকাল কিশোর। হ্যাঁ, স্যার, আপনার নাম শুনেছি। এবার চলচ্চিত্র উৎসবে আপনার একটা ফিল্মও দেখেছি। রোম খাড়া হয়ে গিয়েছিল।
থ্যাংক ইউ, বললেন বৃদ্ধ। তাহলে বুঝতেই পারছ, কেন পুলিশের কাছে যাইনি। দীর্ঘ দিন কোন ছবি বানাই না, নতুন দর্শকেরা অনেকেই আমার নাম জানে না, পুরানোরা ভুলে গেছে। কিছু বোকা লোক ভাববে, ড্রাগনের গল্প ফেঁদে নতুন করে পাবলিসিটি করতে চাইছি আমি, আবার সিনেমায় ঢোকার জন্যে।
কিন্তু আমি জানি, আমার কাজ শেষ, দিন শেষ। এখন কিছু বানালে চলবে না, ফ্লপ করবে, নেবে না আধুনিক দর্শক। এই বয়েসে নতুন কিছু যে বানাব, তা-ও সম্ভব না। সেই পুরানোই হয়ে যাবে। তার চেয়ে নতুনদের জন্যে পথ ছেড়ে দিয়ে সরে এসেছি। অনেক কাজ করেছি জীবনে, আর না, বুড়ো বয়েসটা একটু শান্তিতে কাটাতে চাই। টাকার অসুবিধে নেই আমার। শান্তিতেই কাটাচ্ছিলাম এখানে, নিরিবিলি...
ড্রাগনটা এসে সব পণ্ড করল, না? জোনসের বাক্যটা শেষ করল কিশোর।
নাক কুঁচকালেন পরিচালক, হ্যাঁ। এক এক করে তাকালেন ছেলেদের মুখের দিকে, তার কথা বিশ্বাস করছে কিনা বোঝার চেষ্টা করলেন। সাগর থেকে উঠেছে। একটা কথা ডেভিসকে বলতেও বেধেছে, বলিনি, যদি হেসে ফেলে। ড্রাগনটা শুধু যে দেখেছি তাই নয়, তার গর্জনও শুনেছি।
হঠাৎ যেন বড় বেশি নীরব হয়ে গেল ঘরটা।
শুনেছেন, শান্ত রয়েছে কিশোর। শব্দটা ঠিক কেমন? তখন কোথায় ছিলেন আপনি?
ছোট তোয়ালের সমান একটা রঙিন রুমাল বের করে ঘন ভুরুর ঘাম মুছলেন জোনস। একটা টিলার ওপর। এই তো, কাছেই। ওখান থেকে পরিষ্কার দেখা যায় সাগর।...চোখের ভুলও হতে পারে, কি। জানি!
তা পারে। কিন্তু শোনাটা? শব্দ তো আর চোখের ভুল নয়?
তা নয়। তবে কানেও তো ভুল শুনতে পারি? বুড়ো হলে চোখ কান সবই খারাপ হয়ে যায়। আবার কপালে রুমাল বুলালেন তিনি। তবে, এ-ক্ষেত্রে ভুল হয়েছে এটা বিশ্বাস করতে পারছি না, দেখেছি যে সেটাও মেনে নিতে পারছি না। বাস্তবে ড্রাগন নেই, সেই রূপকথার যুগেও ছিল না, আর এখন তো থাকার প্রশ্নই ওঠে না। ড্রাগন নিয়ে ছবি বানিয়েছি আমি, সবই যান্ত্রিক দানব, খেলনা। ভারি ইঞ্জিনের গর্জনের

সঙ্গে তীক্ষ্ণ হুইসেল মিলিয়ে, সেটাকে বিশেষ কায়দায় ভোতা করে চালিয়ে দিয়েছি ড্রাগনের গর্জন বলে। সেই সঙ্গে পর্দায় বিশেষ আবহ সৃষ্টির ব্যবস্থা করে ভয় পাইয়েছি হলের দর্শকদের। অন্ধকারে ভীতিকর। শোনায় ওই গর্জন।
কিন্তু গতরাতে যা শুনেছি, আমার সৃষ্টি করা শব্দের সঙ্গে তার কোন মিল নেই। উঁচু পর্দার তীক্ষ্ণ একধরনের খসখসে শব্দ, যেন শ্বাস নিতে খুব কষ্ট হচ্ছে জানোয়ারটার, সেই সঙ্গে কাশি। আসলে, বলে। ঠিক বোঝানো যাবে না শব্দটা কেমন।
শুনলাম, আপনার বাড়ির নিচে একটা গুহা আছে? জিজ্ঞেস করল কিশোর। ছোট, না বড়? ড্রাগনের মত কোন জানোয়ারের জায়গা হবে?
তা হবে। একটা না, অনেক গুহা আছে এখানে, মাটির তলায় সুড়ঙ্গের জাল রয়েছে বলা যেতে পারে। উত্তর-দক্ষিণে অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে গেছে। এককালে জলদস্যু, চোরাচালানি আর ডাকাতের আড্ডা ছিল ওসব জায়গায়। বছর কয়েক আগে ভূমিকম্পে একটা পাহাড়ের চূড়া ভেঙে গিয়ে ভূমিধস নামে, বেশ কিছু সুড়ঙ্গ আর গুহা বুজে যায়, হ্যাঁগিটিজ পয়েন্টের কাছে। তবে এখনও অনেক গুহা আর সুড়ঙ্গ আগের মতই আছে।
হুম্। আনমনে মাথা দোলাল কিশোর। অনেক বছর ধরেই তো আছেন এখানে, কিন্তু এই প্রথম ড্রাগন দেখলেন। তাই না?
মাথা ঝাঁকালেন বৃদ্ধ, হাসলেন। একবারই যথেষ্ট, আর দেখতে চাই না। কুকুরটা না হারালে এটাকেও দেখতাম না। পাইরেটকে খুঁজতে গিয়েই তো চোখে পড়ল।
কুকুরটার কথা কিছু বলুন। রবিন, নোটবই অর পেন্সিল নাও, কিশোর বলল।
ছেলেদের খাঁটি পেশাদারী ভাবভঙ্গি দেখে মুচকি হাসলেন পরিচালক। বললেন, গত দু-মাস ছিলাম না এখানে। ছবি বানাই না বটে, কিন্তু সিনেমা-জগৎ থেকে পুরোপুরি বিদায়ও নিতে পারিনি। প্রতি বছর বড় বড় যত চলচ্চিত্র উৎসব হয়, সবগুলোতে যোগ দিই; ইউরোপে যাই, দুনিয়ার বড় বড় অনেক শহরে যাই। এবারও গিয়েছিলাম। রোম, ভেনিস, প্যারিস, লণ্ডন আর বুদাপেস্ট সফর করেছি, উৎসবে যোগ দিয়েছি, পুরানো বন্ধুদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করেছি।
আমি বাইরে গেলে পাইরেটকে একটা কুকুরের খোঁয়াড়ে রেখে যাই, কাছেই খোয়াড়টা। গত হপ্তায় ফিরে এসে ওখান থেকে নিয়ে এসেছিলাম ওকে। খুব সুন্দর কুকুর, আইরিশ সেটার। দিনে বেঁধে রাখি, রাতে ছেড়ে দিই। মাঝে মাঝেই বাড়ির সীমানার বাইরে চলে যেত পাইরেট, খানিকক্ষণ পরেই ফিরে আসত। কাল রাতে বেরিয়ে আর ফিরল না। তিন বছর ধরে আছে, কোনদিন এ রকম হয়নি। ফোন করলাম খোয়াড়ে। ভাবলাম, দু-মাসের অভ্যাস, বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে

গেছে। কিন্তু ওখানে যায়নি কুকুরটা। নিজেই খুঁজতে বেরোলাম তখন। ড্রাগনটাকে দেখলাম।
সৈকতে যাননি নিশ্চয়? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
মাথা নাড়লেন বৃদ্ধ। না। কি যে খারাপ লেগেছে না। সারাজীবন লোর্ককে ভয় দেখিয়েছি, আতঙ্কিত করেছি, তাদের ভয় দেখে হেসেছি, মজা পেয়েছি। নিজে ভয় পাওয়ার পর বুঝলাম, ওদের কেমন লেগেছে...ভয়ানক ড্রাগনটা পাইরেটকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়েছে ভাবলেই মনটা খারাপ হয়ে যায়...ওটাকে দেখে ভাবলাম, আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে...কি, বিশ্বাস হচ্ছে?
প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর, সকালে আপনার বন্ধুকে ফোন করলেন, তাই না?
আবার ভুরু আর কপাল মুছলেন বৃদ্ধ। ডেভিস আমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু। রহস্যের জগতে অনেক উদ্ভট ঘটনা ঘটে, জানা আছে তার। তাই প্রথমেই তার কথা মনে পড়ল। ভাবলাম, কোন সাহায্য করলে সে-ই। করতে পারবে। ভুল করিনি। বিশ্বাস না করলে তোমাদের পাঠাত না। তোমাদের ওপর ভরসা করে সে, বুঝতে পারছি।
আপনি করছেন?
করছি। ডেভিস আমার চেয়ে অনেক বেশি খুঁতখুঁতে। সে যাদের ওপর আস্থা রাখতে পারে, তাদের ওপর আমিও রাখতে পারি চোখ
থ্যাংক ইউ, মিস্টার জোনস, খুশি হলো কিশোর। এই শহরে আরও কুকুর হারিয়েছে, জানেন? গত এক হপ্তায় পাঁচটা, আপনারটা ছাড়াই।
আবার মাথা ঝাঁকালেন বৃদ্ধ। শুনেছি, তবে পাইরেট নিখোঁজ হওয়ার পর। আগে জানলে ওকে ছেড়ে রাখতাম না।
যাদের হারিয়েছে, তাদের কারও সঙ্গে কথা বলেছেন?
না। ভয়েই যাইনি। মুখ ফসকে যদি ড্রাগনের কথাটা বেরিয়ে যায়!
এখানে সবারই কুকুর আছে?
হাসলেন জোনস। সবার নেই। রাস্তার ওপারে মিস্টার হেরিঙের নেই। আমার বাড়ির ডানে আরেক প্রতিবেশী আছে, রোভার মারটিন, তারও নেই। আর তেমন কাউকে চিনি না। নিরিবিলি একা থাকা পছন্দ আমার। বই, ছবি, আর পাইরেটকে নিয়ে কাটাই। এখানে কারও সঙ্গে বিশেষ আলাপ নেই। দেখা হলে, কেমন আছেন, ভাল, ব্যস।
উঠল কিশোর। যাই এখন। কিছু জানতে পারলে জানাব। আপনাকে।
তিন গোয়েন্দার সঙ্গে আবার হাত মেলালেন জোনস। গেটের কাছে, এগিয়ে দিয়ে গেলেন ওদেরকে। বাইরে বেরিয়ে পাল্লাটা বন্ধ করে দিল। কিশোর। ওপরের হুক লাগিয়ে দিল।

হেসে বলল মুসা, ভয় পাচ্ছ? ড্রাগন বেরোবে ভাবছ বাড়ির ভেতর থেকে?
যা গেট, ড্রাগনের বাচ্চাকেও ঠেকাতে পারবে কিনা সন্দেহ, বলল কিশোর। এমনি তুলে দিলাম। ভদ্রতা।
নির্জন পথের দিকে তাকাল মুসা। ঘড়ি দেখল। বোরিস আসছে না কেন? এই এলাকা ছাড়তে পারলে যেন বাঁচে।
এত তাড়াতাড়ি আসার কথা না। আরও দেরি হবে।
রাস্তা পেরোতে শুরু করল কিশোর।
যাচ্ছ কোথায়? জিজ্ঞেস করল রবিন।
মিস্টার হেরিঙের সঙ্গে দেখা করব। তারপর যাব মারটিনের ওখানে। এমন একটা জায়গায় থাকে অথচ কুত্তা পালে না, তারা কেমন লোক, দেখার আগ্রহ নেই তোমাদের?
না, নেই, দু-হাত নাড়ল মুসা। এখানে সব পাগলদের বাস। একজন দেখেছে ড্রাগন, আরেকজন হয়তো বলবে আরব্য উপন্যাসের চেরাগওয়ালা দৈত্য দেখেছে। আমার গিয়ে কাজ নেই।
কিন্তু দেখা গেল, কিশোরের পেছনে মুসাই গেল আগে, তারপর রবিন।
সরু পথ পেরিয়ে গেট খুলে ঢুকল মিস্টার হেরিঙের সীমানায়। জোনসের বাড়িতে যেমন অযত্ন, এখানে তেমনি অতিযত্ন। সব কিছু ছিমছাম, পরিচ্ছন্ন। পাতাবাহারের একটা পাতাও এদিক-ওদিক হয়ে নেই, সমান করে ছাঁটা, সমান উঁচু প্রতিটি গাছ, ঝকঝকে সবুজ লন, নিয়মিত ঘাস ছাঁটা হয়, একটা মরা ডাল নেই বাগানের কোন গাছে। ফুলের বিছানাগুলো দেখার মত। বাড়ির মালিক পরিষ্কার থাকতে পছন্দ করেন।
বেল টিপল কিশোর।
প্রায় সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল দরজা। মাঝারি উচ্চতার বলিষ্ঠ একজন লোক কড়া চোখে তাকালেন ওদের দিকে। কি চাই? বাজখাই কণ্ঠ।
মাপ করবেন, স্যার, বিনয়ে বিগলিত গোয়েন্দাপ্রধান। রাস্তার ওপারে আপনার পড়শীর সঙ্গে দেখা করে এলাম, মিস্টার জোনসের কথা বলছি। তার কুকুরটা হারিয়ে গেছে। আপনি কিছু জানেন কিনা। জিজ্ঞেস করতে এলাম।
চোখের পাতা কাছাকাছি হলো ভদ্রলোকের, ঘন ভুরুজোড়া কাছাকাছি হয়ে আবার সরে গেল। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বসল।
কুত্তাটা তাহলে হারিয়েছে? খুব ভাল। আর না পাওয়া গেলেই খুশি। যত্তসব পাগল-ছাগল, কুত্তা পালে, হুহ্!
জ্বলে উঠল তার চোখ, মুঠো হলো আঙুল।
বাপরে, ঘুসি মারতে আসবে নাকি! ভয় পেয়ে গেল মুসা।

জোর করে চেহারাটা স্বাভাবিক রাখল কিশোর। বুকের মধ্যে। কাঁপুনি শুরু হয়ে গেছে তারও। আপনি যে কুকুর দেখতে পারেন না, নিশ্চয় যথেষ্ট কারণ আছে। কি করেছে ওরা যদি বলেন…
কি করেছে, না; কি করেছে! বলি, কি করেনি? সব সময় যা করে তাই করেছে। সারা রাত হউ হউ করে চেঁচায়, চিল্কারের জ্বালায় ঘুমাগো যায় না। আমার ফুলের বেড় মাড়িয়ে শেষ করে, লন নষ্ট করে, ডাস্টবিন উল্টে ফেলে ময়লা-আবর্জনা সব পথের ওপর ছড়িয়ে দেয়। আরও শুনবে?
তাই নাকি? বলল কিশোর। মালিকদের আরও সাবধান হওয়া উচিত। আমরা, স্যার, এই এলাকায় এই প্রথম এসেছি, মিস্টার জোনস কুকুরটা খুঁজে দিতে ডেকেছেন। তাঁকে বলব আপনার অসুবিধের কথা। তার কুকুর আপনার জিনিস নষ্ট করে থাকলে ক্ষতিপূরণ দিতে তিনি বাধ্য। কুকুরের জন্যে সব কিছুই তিনি করতে রাজি…
বাধা দিলেন হেরিঙ, রাজি, না; রাজি! কুকুরের জন্যে সব কিছুই করবেন! একটু দাঁড়াও, দেখাচ্ছি, ভেতরে চলে গেলেন তিনি।
দাঁড়িয়ে আছে তিন গোয়েন্দা, ভদ্রলোকের ব্যবহারে অবাক।
ঝটকা দিয়ে খুলে গেল আবার দরজা। ফিরে এসেছেন হেরিঙ। হাতে শটগান।
ওরা কেউ কিছু করবে না। যা করার এরপর থেকে আমাকেই করতে হবে। জানো কি করব? ফেটে পড়ল বাজখাই কণ্ঠ। কুত্তাটা আবার এলে দুটো নলই খালি করব হারামীটার পাছায়। কুত্তার ছায়া আমার বাড়িতে দেখলেই গুলি করব! অনেক সহ্য করেছি, আর না!
বন্দুকের বাঁট কাঁধে ঠেকালেন তিনি। নিশানা করলেন তিন গোয়েন্দাকে, এমন ভঙ্গি, যেন ওরাই কুত্তার ছায়া।
ট্রিগারে আঙুলের চাপ বাড়ছে। কর্কশ কণ্ঠে ধমকে উঠলেন হেরিঙ, নিশানা খুব ভাল আমার, মিস করি না। আর কিছু বলার আছে। তোমাদের?
দুরুদুরু করছে মুসার বুক। তার মনে হলো নলের কালো ফুটো দুটো তার দিকেই চেয়ে আছে।
অস্বস্তিতে মাথা নাড়ল কিশোর। না, স্যার, আর কিছু জানার নেই। ডিসটার্ব করেছি, সরি। চলি।
শক্ত হলো হেরিঙের ঠোঁট। হ্যাঁ, যাও, জোনসকে বলে দিও, মিষ্টি কথায় কোন কাজ হবে না। আর যেন খাতির করার জন্যে কাউকে না পাঠায় আমার কাছে।
তিনি, স্যার, পাঠাননি। আমরাই…
খোঁচা মারার ভঙ্গিতে সামনের দিকে বন্দুকের নলটা ঠেলে দিলেন। হেরিঙ। গুহ করে থুতু ফেললেন মাটিতে।

ধীরে ধীরে পিছাতে শুরু করল ছেলেরা।
আহ্, দেখে হাঁটো! কানা নাকি! ধমকে উঠলেন হেরিঙ। লন মাড়িয়ে দিচ্ছ তো!
আড়চোখে দুই বন্ধুর দিকে তাকাল কিশোর। ভয় পাচ্ছে ওরা। পাগলের পাল্লায় পড়েছে ভাবছে। ঘুরতেও যেন ভয় পাচ্ছে, যদি গুলি। করে বসেন।
ফিসফিস করে মুসাকে বলল রবিন, আস্তে ঘোরো। তাড়াহুড়ো কোরো না।
মাথা সামান্য একটু কাত করে সায় জানাল মুসা। সাবধানে ঘুরল। দু-জনে। ছোটার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে, কিন্তু ছুটছে না।
বোম ফাটল যেন পেছনে।
ভীষণ চমকে গেল মুসা। ধড়াস করে উঠল বুক। পরমুহূর্তে বুঝল না, বন্দুকের গুলি নয়, দরজার পাল্লা লাগানোর শব্দ।
জোরে নিঃশ্বাস ফেলে ঘুরে তাকাল কিশোর। হেরিঙকে দেখা যাচ্ছে না।
অর্ধেক পথ এসে আরেকবার ফিরল। এখনও দরজা বন্ধ।
দ্রুত গেটের বাইরে বেরিয়ে এল ওরা।
উফ্ফ্! হাঁপাতে হাঁপাতে বলল রবিন, বড় বাঁচা বেঁচেছি!
ঠিকই বলেছ, মুসা বলল, আমরা একটু এদিক-ওদিক করলেই দিত গুলি মেরে!
না, মারত না, মাথা নাড়ল কিশোর। বোল্ট লক করা ছিল, সেফ পজিশন।
বোকা হয়ে গেল দুই সহকারী গোয়েন্দা।
অ, এ জন্যেই, মাথা দোলাল মুসা, এ জন্যেই ভয় পাওনি তুমি! তাই তো বলি…
আমাদের গুলি করার জন্যে বন্দুক আনেননি, কিশোর বলল।
রাগ দেখাতে, ভয় দেখাতে এনেছিলেন। কুকুরের কথা বলেই ভুল করেছি।
গেছি কুকুরের কথা জিজ্ঞেস করতে, বলল মুসা, আর কি করতাম?
আনমনে ঠোঁট কামড়াল কিশোর। আবার গেলে সাবধানে কথা বলতে হবে মিস্টার হেরিঙের সঙ্গে।
আবার? মাথা নাড়ল মুসা। না, ভাই, আমি এর মধ্যে নেই। যেতে হলে তুমি যাও। আমি আর যাচ্ছি না ওখানে।
আমিও না, মানা করে দিল রবিন।
সহকারীদের কথায় বিশেষ কান দিল না কিশোর। এমনও হতে পারে, রাগ দেখানোটা একটা অভিনয়। কুকুরগুলোর খবর হয়তো তাঁর জানা।
কথাটা কিন্তু মন্দ বলনি! একমত হলো রবিন।
এভাবে আর হুট করে কোথাও ঢুকব না। বুঝে-শুনে, তারপর।
কি বলছে ও? কিশোরকে দেখিয়ে রবিনকে জিজ্ঞেস করল মুসা।
জবাবটা কিশোরই দিল। হাত তুলে আরেকটা বাড়ি দেখিয়ে বলল, মিস্টার জোনসের আরেক প্রতিবেশী। একজনের সঙ্গে তো মোলাকাত করলাম, বাকি

আরেকজন। তাঁর মেজাজটা জানাই বা বাকি রাখি কেন? মিস্টার রোভার মারটিনকেও কয়েকটা প্রশ্ন করব।
বুক সমান উঁচু ধাতব একটা গেট পথরোধ করল ওদের। তার ওপর দিয়ে বিরাট বাড়িটার দিকে তাকাল ওরা।
ভালই তো মনে হচ্ছে, রবিন বলল। কামান-টামান নেই।
শটগান আছে কিনা দেখো! খুব সাবধানে কয়েক ইঞ্চি পাশে সরল মুসা। ওপর আর নিচতলার সবগুলো জানালায় নজর বোলাল।
কই, কাউকে দেখা যাচ্ছে না। মিস্টার মারটিন বাড়ি নেই নাকি?
আগে বাড়ল কিশোর। গেলেই দেখা যাবে… থেমে গেল সে, হাঁ করে চেয়ে আছে গেটের পাল্লার দিকে। নিঃশব্দে খুলে যাচ্ছে।
খাইছে! ককিয়ে উঠল মুসা, জাদুকরের বাড়ি…
আরে, না, বাতাসে খুলেছে, রবিন বলল।
মাথা নাড়ল কিশোর। ডানার মত করে দু-পাশে দু-হাত ছড়িয়ে দিয়ে রবিন আর মুসাকে আটকাল, পিছিয়ে যেতে বলে নিজেও পিছিয়ে এল। আপনা-আপনি বন্ধ হয়ে গেল গেট।
আবার সামনে এগোল কিশোর। খুলে গেল গেট।
ইলেকট্রনিকের জাদু, বলল সে। এয়ারপোর্ট, সুপারমার্কেট, অফিস-পাড়ার বড় বড় বিল্ডিংগুলোতে দেখনি?
তা দেখেছি, মুসা বলল। কিন্তু কারও বাড়িতে এই প্রথম…
এতেই প্রমাণ হচ্ছে কুসংস্কার কিংবা ভূতপ্রেতে বিশ্বাস করেন না। মিস্টার মারটিন। ড্রাগনের ব্যাপারটা হেসেই উড়িয়ে দেবেন।
তাহলে আর গিয়ে লাভ কি?
এসেছি যখন দেখেই যাই না, ভেতরে ইলেকট্রনিকের আরও জাদু থাকতে পারে।
গেটের ভেতরে পা রাখল ওরা। পথের ধারে লন, ঠিক মাঝখানে বড় একটা সূর্যঘড়ি, চমৎকার তার অলঙ্করণ। সামনে মাথার ওপরে।
একটা ফুলের জাফরি, তাতে অনেকগুলো ফুলগাছ, ফুল ফুটে রয়েছে।
সামনে এগোল ওরা। পেছনে নিঃশব্দে বন্ধ হয়ে গেল গেট। জাফরির তলা দিয়ে পথ। ওটার নিচ দিয়ে এগোতেই হঠাৎ যেন ভেঙে খসে পড়ল জাফরি। এক সঙ্গে পিছিয়ে আসতে গিয়ে একে অন্যের গায়ে ধাক্কা লাগাল ওরা। পড়ে যাচ্ছিল রবিন, খপ করে তার হাত চেপে ধরল মুসা।
আসলে পুরো জাফরিটা খসে পড়েনি। মস্ত এক মাচার চারধারে ধাতব রেলিঙ দিয়ে ঘেরা, চারপাশের ওই রেলিঙগুলো খসে পড়েছে চারদিক থেকে, মাচাটা

আর তাতে লাগানো ফুলগাছগুলো রয়ে গেছে তেমনি। শিকের একটা খাঁচায় বন্দি হলো যেন ছেলেরা, মাথার ওপরে ফুলের কেয়ারি।
আজব রসিকতা। শুকনো ঠোঁট চাটল কিশোর। পোর্টকালিস দেখে আইডিয়াটা পেয়েছে বোধহয়।
সেটা আবার কি জিনিস? জানতে চাইল মুসা।
ভারি লোহার শিকের কপাট। পুরানো দুর্গের দরজার ওপরে শেকল দিয়ে ঝোলানো থাকত। শেকল ছেড়ে দিলেই ওপর থেকে ঝমঝম করে নেমে এসে পথ বন্ধ করে দিত।
বইয়ে ছবি দেখেছি, রবিন বলল। বেশির ভাগ পুরানো দুর্গেরই সদর দরজায় লাগানো থাকত ওই জিনিস। পাল্লাও থাকত দরজায়। শত্রুরা পাল্লা ভেঙে ফেললে তাদেরকে ঠেকানোর শেষ চেষ্টা হিসেবে ছেড়ে দেয়া হত পোর্টকালিস, পাল্লার চেয়ে অনেক শক্ত।
আমরা কি দুর্গে ঢুকছি নাকি? হাত ওল্টাল মুসা।
অদ্ভুত একটা হিসহিস শব্দ তুলে আবার উঠে যেতে শুরু করল রেলিঙগুলো। মাচার চারধারে জায়গামত গিয়ে বসে গেল আবার।
পরস্পরের দিকে তাকাল ছেলেরা।
রসিকতা, বিড়বিড় করল কিশোর! চলো।
কিশোরের হাত চেপে ধরল মুসা। যাওয়াটা কি ঠিক হচ্ছে? এই দুর্গে আমাদেরকে ঢুকতে দিতে চায় না বোধহয়।
হাসল কিশোর। ভয় পেলে? পাওয়ারই কথা অবশ্য। অটোমেটিক গেট, জাফরির ইলেকট্রনিক কনট্রোলড রেলিঙ। বিজ্ঞানের জাদুকর মিস্টার মারটিন। দেখা না করে যাচ্ছি না আমি।
এগোল কিশোর। পেছনে ভয়ে ভয়ে পা ফেলতে ফেলতে চলল তার দুই সহকারী।
সদর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সঙ্গীদের দিকে চেয়ে হাসল গোয়েন্দাপ্রধান। তারমানে, দেখলে তো, আর কিছু হলো না। বেল বাজানোর সুইচে আঙুল রাখল।
আঁউ! করে চিৎকার দিয়ে ছিটকে সরে এল কিশোর। হাত ঝাড়ছে। সুইচেও কারিগরি করে রেখেছে। কারেন্ট!
আগেই বলেছি তোমাকে, মুখ গোমড়া করে বলল মুসা। আমাদের ঢুকতে দিতে চায় না। তা-ও জোরাজুরি করছ। যথেষ্ট হয়েছে, চলো এবার। মিস্টার মারটিনের সঙ্গে দেখা করা আর লাগবে না।
আসলে আমাদের পরীক্ষা করছে। ফেরার কোন ইচ্ছেই নেই কিশোরের। ভয় দেখিয়ে তাড়াতে চাইছে। শেষ পর্যন্ত যদি থাকতে পারি, দেখা করবে এসে।

কিশোরের কথার জবাবেই যেন মৃদু ক্লিক করে উঠে নিঃশব্দে খুলে যেতে শুরু করল দরজা।
দারুণ! রবিন বলল। পুরো বাড়িটাকে ইলেকট্রনিকসের জালে ঘিরে রেখেছে।
সাবধানে ভেতরে পা রাখল ওরা। আবছা অন্ধকার, বড় বেশি নীরব।
কাউকে দেখা গেল না। কেশে গলা পরিষ্কার করে অদৃশ্য কারও উদ্দেশ্যে জোরে জোরে বলল কিশোর, গুড ডে, মিস্টার মারটিন। আমরা তিন গোয়েন্দা। আপনার প্রতিবেশী মিস্টার জোনসের হয়ে কথা বলতে এসেছি। আসব, স্যার?
জবাব নেই।
তারপর, অতি মৃদু একটা খসখস শোনা গেল মাথার ওপরে। ডানা ঝাঁপটানোর আওয়াজ। নেমে আসছে।
ঝট করে চোখ তুলে তাকাল তিনজনে।
ছাত দেখা যাচ্ছে না, অনেক উঁচু আর অন্ধকার। সেই অন্ধকার থেকে নেমে আসছে পাখিটা। বিশাল এক কালো বাজ পাখি। ছো মারার জন্যে নামছে, গতি বাড়ছে দ্রুত। তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠল, বাঁকা ভীষণ ঠোঁট ফাঁক, ভেতরে চোখা লাল জিভ, চোখে তীব্র ঘৃণা। ধারাল নখ বাড়িয়ে ওদেরকে ছিঁড়তে আসছে।
খাইছে! চেঁচিয়ে উঠল মুসা। ঝাঁপ দিয়ে পড়ল মেঝেতে।
তার দেখাদেখি রবিন আর কিশোরও শুয়ে পড়ল।
থামল না পাখিটা। ভীষণ গতিতে নেমে এল। থেমে গেল ওদের মাথার এক ফুট ওপরে এসে। তিন গোয়েন্দাকে অবাক করে দিয়ে ঝুলে রইল ওখানেই। চিৎকারও থেমে গেছে।
আস্তে মাথা কাত করে ওপর দিকে তাকাল কিশোর। উঠে বসল। ভয় দূর হয়ে গেল চেহারা থেকে, সে-জায়গা দখল করল হাসি।
ওঠো, ডাকল সে। জ্যান্ত পাখি না ওটা।
কী? ভয়ে ভয়ে মাথা তুলল মুসা। চোখে অবিশ্বাস।
রবিনের অবস্থাও তারই মত।
সরু তামার তারে ঝুলছে পাখিটা।
খেলনা, ছুঁয়ে দেখে বলল কিশোর। বেশির ভাগই প্ল্যাস্টিক।
আল্লারে, কোন্ পাগলের পাল্লায় পড়লাম! মুখ বিকৃত করে ফেলল মুসা।
বিশাল ঘরের অন্ধকার থেকে ভেসে এল খসখসে অট্টহাসি। মাথার ওপর দপ করে জ্বলে উঠল একাধিক উজ্জ্বল আলো।
লম্বা, রোগাটে একজন মানুষ চেয়ে আছেন ওদের দিকে, পরনে কালো ঢোলা আলখেল্লার মত ওভারকোট। খাট করে ছাঁটা চুল, তামাটে লাল।

রহস্যের দুর্গে স্বাগতম, ভারি খনখনে গলায় বললেন তিনি, মুসার মনে হলো কবর থেকে উঠে এসেছে জিন্দালাশ।
সামনের দিকে বাঁকা হয়ে গেল তার শরীর, প্রবল হাসিতে দুলছে। হাসতে হাসতে কেশে ফেললেন, তারপরও কাশি চলল কিছুক্ষণ, দমকে দমকে।
রসিকতা-বোধ না ছাই! নিচু কণ্ঠে বিড়বিড় করল মুসা। বদ্ধ উন্মাদ!
হাসি আর কাশির জন্যে মুসার কথা কানে গেল না বোধহয় তাঁর। ধীরে ধীরে সোজা হলেন, চোখের কোণে পানি জমেছে। রোভার মারটিন বলছি। পাখিটাকে সরিয়ে দিচ্ছি, নইলে যদি ঠোকর মারে।
উঠে দাঁড়াল তিন গোয়েন্দা।
হাসিমুখে তাদের কাছে এগিয়ে এলেন মারটিন। হুক থেকে খুলে নিলেন পাখিটা।
ছাতের দিকে চেয়ে কিশোরও হাসল। সঙ্গীদের বলল, সরু লাইন। বানিয়ে তার ওপর দিয়ে চালায়। ইলেকট্রিক খেলনা ট্রেনের মত।
ওপর দিকে চেয়ে মুসা আর রবিনও দেখল বিশেষ কায়দায় তৈরি লাইন। সামান্য ঢালু। ওটার ওপর দিয়ে পাখিটা পিছলে নামে বলে গতি বাড়ে। লাইন শেষ হলে ছিটকে নেমে আসে, আবছা অন্ধকারে মনে হয় ছোঁ মারতে আসছে।
ট্রেন অনেক ভাল, মুসা বলল। মানুষকে ভয় দেখায় না।
হাসছেন মারটিন। খুব বোকা বানিয়েছি, না? সরি। বিচিত্র খেলনা বানানো আমার হবি। হাত তুলে দেখালেন, ওই যে আমার কারখানা।
ঘরের এক ধারে ওঅর্কশপ, নানারকম যন্ত্রপাতি, কাঠ, তারের জাল, প্ল্যাস্টিকের টুকরো, তারের বাণ্ডিল ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।
পাখিটা একটা টেবিলে রাখলেন মারটিন। তারপর, কি মনে করে? কণ্ঠস্বর পাল্টে গেছে, একেবারে স্বাভাবিক, তারমানে ইচ্ছে। করেই তখন স্বর বিকৃত করে কথা বলছিলেন।
একটা কার্ড বের করে দিল কিশোর। এটা দেখলেই বুঝবেন।
তিন গোয়েন্দার কার্ডটা পড়লেন তিনি, তারপর হাসিমুখে ফিরিয়ে দিলেন। হারানো কুকুরের খোঁজ নিতে এসেছ তো?
হ্যাঁ, বলল কিশোর। মিস্টার জোনসের আইরিশ সেটারটা পাওয়া যাচ্ছে না। ভাবছি, সী-সাইডের অন্যান্য কুকুর নিখোঁজের সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে।
থাকতে পারে, বললেন মারটিন। রেডিওর খবরে শুনেছি। জোনস তো মাঝে মাঝেই থাকে না, শুনেছি, গত দু-তিন মাসও নাকি ছিল না। গত হপ্তায় ফিরেছে। কুত্তাটা হারিয়েছে তাহলে। খুঁজে বের করতে পারবে তো?
চেষ্টা করব। ভাবলাম, মিস্টার, জোনসের প্রতিবেশীদের সঙ্গে আলাপ করলে জরুরী তথ্য পাওয়া যাবে, তাই এসেছি। মিস্টার হেরিঙের ওখানেও গিয়েছিলাম।

চেনেন নিশ্চয়?
হাসলেন মারটিন। এখানে কে তাকে না চেনে? যা বদমেজাজ। বন্দুক দেখিয়েছে?
দেখিয়েছেন। তবে সেফটি ক্যাচ অন করা ছিল। শাসিয়েছেন, আবার যদি তার বাড়িতে কুকুর ঢোকে, গুলি করে মারবেন। কুকুর দু চোখে দেখতে পারেন না ভদ্রলোক।
শুধু কুকুর কেন, কোন কিছুই দেখতে পারে না। মানুষও না।
আপনি পারেন বলেও তো মনে হয় না, ফস করে বলে বসল মুসা, অযথা ভয় পেয়েছে বলে রাগ লাগছে এখন। মানুষকে এভাবে ভয় দেখানোর কোন মানে হয়?
ভুল করলে। মানুষকে আমি খুবই পছন্দ করি। কিন্তু যখন তখন অবাঞ্ছিত লোক ঢুকে পড়ে তো, শান্তিতে কাজ করতে দেয় না, তাই এই বিশেষ ব্যবস্থা। ফেরিওলা আর কোম্পানির এজেন্টরা হচ্ছে সবচেয়ে বিরক্তিকর। তোমরা ভয় পেয়েছ, না?
দুর্বল হার্ট হলে এতক্ষণে তিনটে কফিনের অর্ডার দিতে হত আপনাকে।
হেসে উঠলেন মারটিন। খুব মজার মজার কথা বলল যা হোক। হ্যাঁ, আমি জাতে ইঞ্জিনিয়ার। ছোটখাটো আবিষ্কারও করেছি। আগেই বলেছি, খেলনা বানানো আমার হবি, তবে ওগুলো ক্ষতিকর। নয়।
কুকুরের কথা কিছু বলুন, আগের কথার খেই ধরল কিশোর। কিছু জানেন-টানেন?
মাথা নাড়লেন মারটিন। সরি। রেডিওতেই যা শুনেছি। মালিকদের সঙ্গে গিয়ে আলাপ করে দেখতে পারো।
মিস্টার জোনসের সঙ্গে অবশ্য করেছি। কিন্তু তিনি যে কথা বললেন, বিশ্বাস করাই শক্ত।
কি কথা?
ঠোঁট কামড়াল কিশোর। বলা কি উচিত হবে?
কেন হবে না?
হয়তো ব্যাপারটা ভালভাবে নেবেন না মিস্টার জোনস। সরি, মিস্টার মারটিন।
একেবারে উকিলের মত কথা বলছ। মক্কেলের গোপন কথা ফাঁস হয়ে যাবে যেন।
মাথা ঝাঁকাল কিলোর। অনেকটা সে রকমই, মিস্টার মারটিন। আপনি তো তাঁর প্রতিবেশী। সাংঘাতিক কোন রহস্যময় ঘটনা এখানে ঘটলে, আর সেটা তিনি জানলে, আপনারও জানার কথা।
হাসলেন মারটিন। বাহ, বেশ গুছিয়ে কথা বলতে পারো তো। তা খুলেই বলল না কি হয়েছে?

কিশোরের এই ইনিয়ে-বিনিয়ে বলা সহ্য হলো না মুসার, এমনিতেই কিছুক্ষণ যাবৎ স্নায়ুর ওপর অসম্ভব চাপ গেছে। অধৈর্য হয়ে বলেই ফেলল, ড্রাগন দেখেছেন মিস্টার জোনস। গতরাতে সাগর থেকে উঠেছিল ওটা।
ড্রাগন! তাই নাকি? দেখেছে? ভুরু কোঁচকালেন মারটিন।
দ্বিধা করছে কিশোর। এভাবে ফস করে মুসার বলে ফেলাটা পছন্দ হয়নি তার। কিন্তু আর গোপন রেখে লাভ নেই, যা বলার বলেই ফেলেছে। দেখেছেন, বলল সে। লোক জানাজানি হোক, এটা চান না। মিস্টার জোনস, হাসির পাত্র হতে চান না।
অসম্ভব!
শুধু দেখেননি, রবিন বলল, ওটার গর্জনও শুনেছেন। তাঁর বাড়ির নিচে গুহায় নাকি গিয়ে ঢুকেছে।
মিস্টার জোনস যখন দেখেছেন, কিশোর বলল, আপনিও দেখে থাকতে পারেন, একই এলাকায় থাকেন তো। তাই জিজ্ঞেস করতে এলাম।
না, আমি দেখিনি। সৈকতের ধারেকাছে যাই না আমি। সাঁতারও পছন্দ নয়। আর গুহার কাছে যাওয়া বাদ দিয়েছি অনেক দিন আগে। সাংঘাতিক খারাপ জায়গা।
কেন? জিজ্ঞেস করল রবিন।
কেন? যখন তখন ভূমিধস নেমে মুখ বন্ধ হয়ে যায় বলে। ভেতরে আটকা পড়লে জ্যান্ত কবর হয়ে যাবে।
শুনেছি চোর-ছ্যাচড়েরও নাকি আড্ডা? কিশোর বলল।
আগে ছিল, অনেক আগে। ধসের ভয়ে ওরাও ঢোকে না এখন। কাছে গিয়ে একবার দেখে এসো না, তাহলেই বুঝবে। অনেক সময় পাড় ধসে বাড়িসুদ্ধ পড়ে যায়। ক্ষণিকের জন্যে আলো ঝিলিক দিল মারটিনের চোখে। আহা, তোমাদের বয়েস যদি এখন হত আমার। ড্রাগন দেখার জন্যে গুহায় ঢুকতামই। তোমরাও ঢুকবে বুঝতে পারছি, কিন্তু সাবধান। খুব খারাপ জায়গা। মোরো না যেন।
থ্যাংকস, বলল কিশোর। তাহলে ড্রাগনের কথা বিশ্বাস করছেন না?
হাসলেন মারটিন, তুমি করছ?
দ্বিধায় পড়ে গেল কিশোর। ইয়ে…
আরও জোরে হেসে উঠলেন মারটিন।
আপনার সঙ্গে আলাপ করে ভাল লাগল, মিস্টার মারটিন, বলল কিশোর। মিস্টার জোনস আসলে কি দেখেছেন, খোঁজ নিয়ে জানার চেষ্টা করব।
হ্যাঁ, দেখো। জানি, অনেক হরর ফিল্ম বানিয়েছে জোনস। মাথায় সারাক্ষণ নানা রকম উদ্ভট চিন্তাভাবনা খেলে। ড্রাগন দেখাটা তার কল্পনা হতে পারে। কিংবা এমনও হতে পারে, তার সঙ্গে রসিকতা করেছে তার কোন পুরানো বন্ধু।

তা হতে পারে, স্বীকার করল কিশোর।
হ্যাঁ, মাথা ঝাঁকালেন মারটিন, কত রকমের পাগল আছে এই দুনিয়ায়।
তুমিও তো এক পাগল! বলতে ইচ্ছে করল মুসার, কিন্তু বলল না।
সরি, আবার বলল মারটিন। তোমাদের কোন সাহায্য করতে পারলাম না। চলো, এগিয়ে দিয়ে আসি।
দরজা খুলে বেরিয়ে এল ছেলেরা। ..
দরজার ওপাশ থেকে হাত বাড়িয়ে দিলেন ইঞ্জিনিয়ার। গুড লাক, সন।
বাড়ানো হাতটা শক্ত করে চেপে ধরল কিশোর। থ্যাংক ইউ, স্যার, বলে আলতো ঝাঁকি দিল।
নিঃশব্দে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। হাতটা ধরাই আছে কিশোরের হাতে। হা হয়ে গেল সে। শিরশির করে মেরুদণ্ড বেয়ে নেমে গেল। ভয়ের ঠাণ্ডা স্রোত।
শরীর থেকে আলাদা হয়ে গেছে ইঞ্জিনিয়ারের ডান হাতটা।
আতঙ্কিত দৃষ্টিতে ছেঁড়া হাতটার দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। মনে হচ্ছে একেবারে আসল, রক্ত-মাংসের তৈরি। আচমকা অস্ফুট একটা শব্দ করে উঠে ছেড়ে দিল হাতটা।
ফিরে তাকাল অন্য দুই গোয়েন্দা।
কি হয়েছে? জিজ্ঞেস করল মুসা।
দেখে চমকে গেল রবিনও, আরি! এ কি! একটা ছেঁড়া হাত!
খাইছে! আঁতকে গেল মুসা।
বিড়বিড় করে বলল কিশোর, এটা...এটা মিস্টার মারটিনের হাত, হ্যান্ডশেক করার সময় ছিঁড়ে এসেছে!
বাড়ির ভেতর থেকে জোর হাসি শোনা গেল। শেষ হলো চাপা কাশির মত শব্দ দিয়ে, আচমকা গলা টিপে ধরা হয়েছে যেন।
কিশোরের মুখে রক্ত জমল। গাধা বানিয়েছেন আমাকে মারটিন। রসিক লোক, ভুলেই গিয়েছিলাম।
হাতটা তুলে দুই সহকারীর দিকে বাড়িয়ে ধরল সে।
মাথা নাড়ল মুসা।
রবিন নিল হাতটা। এক্কেবারে আসল মনে হয়। ডান হাত নেই আরকি মিস্টার মারটিনের। আরটিফিশিয়াল হাত লাগানো ছিল। জোরে ঝাঁকুনি দিয়েছ, খুলে চলে এসেছে।
মাথা নাড়ল কিশোর। মনে হয় না। হাসলেন, শুনলে না। এটাও রসিকতা। মানুষকে ভয় দেখানোর জন্যে উদ্ভট সব কাণ্ডকারখানা করে রেখেছেন।

হ্যাঁ, মুখ বাঁকাল মুসা। নেই কাজ তো খই ভাজ, আর কি করবে? চলো, আরও কিছু করে বসার আগেই পালাই।
হাতটা ছুঁড়ে ফেলে দিল রবিন।
জোরে জোরে হাঁটতে শুরু করল তিনজনে।
ফুলের জাফরিটার ভেতর দিয়ে না গিয়ে পাশ কাটিয়ে এল। থেমে গেল ধাতব গেটটার সামনে এসে।
নিঃশব্দে খুলে গেল পাল্লা।
পথে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা।
বাঁচলাম! স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রবিন, মানুষকে কামড়ানোর জন্যে যে গেটে কোন ব্যবস্থা রাখেনি, এতেই আমি খুশি।
থেমো না, হাঁটো, হুঁশিয়ার করল মুসা। এখনও বিপদ-মুক্ত নই আমরা।
বেশ খানিকটা দূরে এসে থামল ওরা, হাঁপাচ্ছে।
এবার কি? রবিনের প্রশ্ন। বোরিসের জনে দাঁড়িয়ে থাকব?
তারচেয়ে চল রকি বীচের দিকে হাঁটতে থাকি, প্রস্তাব দিল মুসা।
এখানে যে কাণ্ডকারখানা, তাতে বিশ মাইল হাঁটাও কিছু না। কষ্ট হয়তো হবে, কিন্তু নিরাপদ জায়গায় তো গিয়ে পৌঁছব।
নিচের ঠোঁটে টান দিয়ে ছেড়ে দিল কিশোর। ঘড়ি দেখল। সময় আছে এখনও। নিচে গিয়ে গুহাটা একবার দেখলে কেমন হয়? কি বলো?
একটা পাহাড়ের চূড়ার দিকে তাকাল মুসা, ওই ড্রাগনের গুহায়? আমি বলি কি, কিশোর, এই একটা রহস্য তুমি ভুলে যাও। বাদ দাও কেসটা।
রবিনের দিকে ফিরল কিশোর, তোমার কি বক্তব্য?
মুসার সঙ্গে আমি একমত। মারটিন কি বললেন, মনে নেই? খুব বিপজ্জনক জায়গা। ড্রাগনের কথা না হয় বাদই দিলাম, ভূমিধসও কম খারাপ না। মেরে ফেলার জন্যে যথেষ্ট।
পাড়ের কাছে এসে দাঁড়াল কিশোর। উঁকি দিয়ে নিচে তাকাল একবার! পুরানো কাঠের সিঁড়ির রেলিঙে হাত রেখে বলল, না দেখে ফিরে যাওয়াটা কি ঠিক হবে? দেখে গেলে, বাড়ি গিয়ে ভাবনাচিন্তা করার একটা বিষয় পাব। না দেখে গেলে কি বুঝব?
কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করল সে।
রবিনের দিকে তাকাল মুসা। নিচু স্বরে কিশোর যাতে শুনতে না পায় এমন করে বলল, আমাদের মতামতের কোন দামই দিল না। তার কথা কেন শুনতে যাব?
ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল রবিন। জানোই তো, ও গোঁয়ার। যা বলে, করে ছাড়ে। ধরে নাও না, আমরা ওর চেয়ে অনেক বেশি ভদ্রলোক, হাসল সে।

মুসাও হাসল। হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। আমরা ভদ্রলোকই। চলো। এখানে দাঁড়িয়ে থাকা মোটেও নিরাপদ নয়। কে জানে, মারটিন না আবার কোন উড়ুক্কু ঝামেলা ছুঁড়ে মারে। হেরিঙকেও বিশ্বাস নেই। মানুষের ওপর টার্গেট প্র্যাকটিসের শখ চাপলে মরেছি।
রেলিঙ ধরে নামতে শুরু করল রবিন।
তারপর মুসা।
খুবই পুরানো সিঁড়ি, সরু ধাপগুলো বেশি কাছাকাছি, নড়বড়ে। কাঁচম্যাচ করে উঠছে। খাড়াও যথেষ্ট।
ভয়ে ভয়ে নামছে দু-জনে। নিচের দিকে তাকাচ্ছে না।
ওপরে তাকাল কিশোর। দুই সহকারী নামতে দেখে মুচকি হাসল। কিন্তু হাসি মুছে গেল শিগগিরই। পনেরো ফুট ওপরে রয়েছে তখনও, এই সময় ঘটল অঘটন।
কোন রকম জানান না দিয়ে মুসার ভারে ভেঙে গেল একটা তক্তা। পিছলে গেল পা। রেলিঙ চেপে ধরে পতন রোধ করার অনেক চেষ্টা করল সে, পারল না। জোরাজুরিতে রেলিঙের জোড়াও গেল ছুটে। নিচে পড়তে শুরু করল সে।
মুসার চিৎকারে চমকে ওপরে তাকাল রবিন। তাড়াতাড়ি নামার চেষ্টা করল। কিন্তু কয় ধাপ আর নামবে? তার গায়ের ওপর এসে পড়ল মুসা।
রবিনের হাতও ছুটে গেল। সে-ও পড়তে লাগল।
ময়দার বস্তার মত এসে কিশোরকে আঘাত করল যেন দুটো শরীর। ঠেকানোর প্রশ্নই ওঠে না। রেলিঙ ভাঙল, পায়ের নিচের তক্তা ভাঙল, ভেঙে সবসুদ্ধ নিচে পড়তে শুরু করল কিশোরের শরীর।
ধুপ ধুপ করে নিচে পড়ল তিনটে দেহ।
কিশোরের ওপর কে পড়ল দেখার সময় পেল না সে, তার আগেই মাথা ঠুকে গেল পাথরে।
আঁধার হয়ে গেল সবকিছু।
কিশোর, তুমি ঠিক আছ?
মিটমিট করে চোখ মেলল কিশোর। মুসা আর রবিনের চেহারা। আবছা দেখতে পেল, কেমন যেন হিজিবিজি দেখাচ্ছে দুটো মুখই, চেয়ে রয়েছে তার দিকে।
চোখ বন্ধ করে মাথা ঝাড়া দিয়ে আবার মেলল সে। উঠে বসল। চোখের পাতায় লেগে থাকা বালি সরাল, মুখের বালি পরিষ্কার করল, তারপর বলল, হ্যাঁ, ঠিকই আছি। আমার ওপর কে পড়েছিল?
নাকমুখ ভোতা করে ফেলেছ। বালিতে দেবে গিয়েছিল তাই রক্ষা।
ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল কিশোর। আশপাশে ভাঙা তক্তা পড়ে আছে, তার একটা তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। না, এটাতে নেই। ফেলে দিয়ে আরেকটা

তুলল। চতুর্থ তক্তাটা এক নজর দেখেই মাথা ঝাঁকাল সে। মুসা, তোমার দোষ নয়। তোমার ভারে ভেঙেছে বটে, তবে কারসাজি করে না রাখলে ভাঙত না। এমনভাবে করে রেখেছে, যাতে পায়ের চাপে ভেঙে যায়।
দুই সহকারীর দিকে কাঠটা বাড়িয়ে দিল সে। ভাল করে দেখলেই বুঝতে পারবে। নিচের দিকে কেটেছে, যাতে দেখা না যায়।
হাতে নিয়ে রবিন আর মুসাও দেখল।
রবিন বলল, ঠিক বোঝা যায় না। ধরলাম, তোমার কথাই ঠিক। কিন্তু আমরা নামব, এটা কে জানে?
ঠিক, রবিনের কথায় সায় দিয়ে বলল মুসা। কিশোর, এটা তোমার অনুমান। দেখে তো বোঝা যায় না, কাটা হয়েছে। আমরা যে আসব, কে কে জানে, বলো? নিশ্চয় মিস্টার জোনস, মারটিন কিংবা হেরিঙ কাটেননি?
মাথার যেখানটায় বাড়ি খেয়েছে কিশোর, ফুলে উঠেছে সুপারির মত। সেখানে হাত বোলাচ্ছে, দৃষ্টি দূরের আরেক সিঁড়ির দিকে। কি জানি, কণ্ঠে অনিশ্চয়তা। ভুলও হতে পারে আমার। তবে করাতে কাটা বলেই মনে হলো।
পরস্পরের দিকে তাকাল মুসা আর রবিন। সাধারণত কোন ব্যাপারে ভুল করে না কিশোর পাশা, ভুল যে করেনি জোরগলায় বলেও সেটা; সে জন্যেই এত সহজে ভুল স্বীকার করাটা বিস্মিত করেছে দু জনকে।
ঠোঁট কামড়াল কিশোর। যা হবার তো হয়েছে, চলো, যাই।
কোথায়? জানতে চাইল মুসা। ওই সিঁড়িটা দিয়ে উঠে চলে যাব? দূরের সিঁড়িটা দেখাল সে।
না। অঘটন যা ঘটার তো ঘটেই গেছে। এখন আর ফিরে যাব কেন? যে কাজে এসেছি, সে কাজ সারব। সৈকতে, গুহায় ড্রাগনটার চিহ্ন খুঁজব।
মনে মনে খুশি হলো কিশোর, তবে সেটা প্রকাশ করল না।
সাগরের দিকে হাঁটতে শুরু করল। বলল, পানির ধার থেকে শুরু করব। কারণ, সাগর থেকে উঠে ড্রাগনটাকে গুহায় ঢুকতে দেখা গেছে।
মাটিতে বসল একটা পাখি। সেটা দেখিয়ে মুসা বলল, চলো না, ওকে জিজ্ঞেস করি, ড্রাগন দেখেছে কিনা? অনেক কষ্ট বাঁচবে তাহলে আমাদের।
ভাল বলেছ, মুসার রসিকতায় হাসল রবিন। ও না বললে ওই টাগবোটের মাঝিদেরকে জিজ্ঞেস করব।
মাইলখানেক দূরে একটা বার্জকে টেনে নিয়ে চলেছে একটা টাগবোট, স্যালভিজ রিগ-জাহাজ কোন দুর্ঘটনায় পড়লে উদ্ধার করা ওগুলোর কাজ।
তাড়াহুড়ো আছে বলে তো মনে হচ্ছে না, মুসা বলল। দেখছ না কি রকম ধীরে ধীরে চলছে। ড্রাগন শিকারে বেরিয়েছে কিনা কে জানে। হাহ্ হাহ্।

টিটকারিতে কান দিল না কিশোর। গুহা আর পানির সঙ্গে একটা কল্পিত সরলরেখা বরাবর দৃষ্টি, একবার এপাশে তাকাচ্ছে, একবার ওপাশে। কি যেন বোঝার চেষ্টা করছে। অবশেষে বলল, এই এলাকায়ই কোথাও ড্রাগনের পায়ের ছাপ মিলবে। একসঙ্গে না থেকে ছড়িয়ে পড়ো।
আলাদা আলাদা হয়ে তিনদিকে ছড়িয়ে হাঁটতে লাগল ওরা। নিচে বালির দিকে চোখ। ড্রাগনের চিহ্ন খুঁজছে।
কি আর দেখব? একসময় বলল রবিন। খালি আগাছা।
আমিও তাই বলি, মুসা বলল। তবে কিছু শামুক আর ভেসে আসা কাঠ আছে। ড্রাগনের এ সব পছন্দ কিনা বুঝতে পারছি না।
খানিকক্ষণ পর পর মাথা নাড়ল রবিন। কিছু নেই। কিশোর, জোয়ারের পানিতে মুছে যায়নি তো?
নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর। আনমনে বলল, হয়তো এখানে, পানির ধারে...না না, ওখানে...শুকনো বালি..গুহামুখ পর্যন্ত রয়েছে। থাকলে ওখানে থাকবে।
ধরো, মুসা বলল, ড্রাগনটা গুহায় বসে আছে। কি করব আমরা তাহলে? লড়াই করব ওর সঙ্গে? খালি হাতে? আদ্যিকালের রাজকুমারদের কাছে তো তবু জাদুর তলোয়ার থাকত...
কারও সঙ্গে লড়াই করতে আসিনি আমরা, মুসা, গম্ভীর হয়ে বলল কিশোর। সাবধানে গুহার মুখের কাছে এগিয়ে যাব। ভেতরে বিপদ নেই এটা বুঝলেই কেবল গুহায় ঢুকব।
কুটি করল মুসা। নিচু হয়ে একটা কাঠ তুলে নিয়ে বলল, যত যা-ই বলল, খালি হাতে ঢুকতে আমি রাজি না। মরি আর বাঁচি, একখান বাড়ি তো মারতে পারব।
হেসে ফেলল কিশোর।
রবিন আরেকটা কাঠ তুলে নিল। নৌকার একটা দাঁড়, আধখানা ভেঙে গেছে। ঠিকই বলেছে মুসা। সেইন্ট জর্জ অ্যাণ্ড দ্য ড্রাগন ছবিটা দেখেছি। তলোয়ার দিয়ে কিভাবে ড্রাগনকে খোঁচা মেরেছে মনে আছে। আমরা অবশ্য খোঁচা মারতে পারব না, তবে দু-জনে মিলে পেটালে ভড়কে গিয়ে পালিয়েও যেতে পারে। পুরানো আমলের জন্তু তো, নতুন আমলের মানুষকে ভয় না পেয়েই যায় না।
কিশোরের দিকে তাকাল সে। তুমি কিছু নিলে না? ভাঙা রেলিঙটা এনে দেব? বড় বড় পেরেক বসানো আছে মাথায়, দেখেছি, চোখা কাঁটা বেরিয়ে আছে। ড্রাগনকে আঁচড়ে দিতে পারবে।
হেসে বলল কিশোর, তা মন্দ বলোনি। হাতে করে একটা লাঠিটাটি নিয়েই নাহয় গেলাম। রেলিঙের দরকার নেই। লম্বা ভেজা একটা তক্তা তুলে নিয়ে কাঁধে ফেলল

সে, যেন তলোয়ার নিয়ে চলেছে। গর্বিত রাজকুমার। তারপর হাঁটতে শুরু করল বন্ধুদের পাশে পাশে।
গুহামুখের দিকে এগিয়ে চলেছে তিন ড্রাগন-শিকারী। মুখে যতই বড় বড় কথা বলুক, গুহাটার কাছাকাছি এসে কিশোরের বুকের ধুকপুকানিও বাড়ল।
হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল সে। শুকনো বালির দিকে আঙুল তুলে বলল, দেখো দেখো!
মুসা আর রবিনও দেখল। নরম বালি বসে গেছে এক জায়গায়, গভীর দাগ।
নতুন প্রজাতির ড্রাগন নাকিরে বাবা? নিচু কণ্ঠে বলল রবিন। পায়ের ছাপ তো নয়, যেন ঘোড়া গাড়ির চাকা।
মাথা ঝাঁকাল কিশোর। তারপর তাকাল পানির দিকে, দু-দিকের সৈকতও দেখল। কোন গাড়ি-টাড়ি তো দেখছি না। তবে চাকার দাগ যে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। বীচ-বাগি হতে পারে, লাইফ-গার্ডদের। পেট্রলে এসেছিল এদিকে।
হয়তো, মেনে নিতে পারছে না রবিন। কিন্তু তাই যদি হবে, তাহলে তো চাকার দাগ পড়বে উত্তর-দক্ষিণে, সৈকতের একদিক থেকে আরেক দিকে। অথচ এটা গেছে গুহার দিকে।
কারেক্ট, আঙুলে চুটকি বাজাল কিলোর। বুদ্ধি খুলছে। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল দাগ পরীক্ষা করার জন্যে।
পানির দিকে ফিরল রবিন। পানির কাছে গিয়ে দেখে এলে কেমন হয়?
ওখানে বোধহয় পাবে না, কিশোর বলল। ঢেউয়ের জোর বেশি, জোয়ারের পানিতে মুছে গিয়ে থাকতে পারে।
মুসা বলল, মিস্টার জোনসের বুড়ো চোখের ওপর ভরসা করা যাচ্ছে না আর। কি দেখতে কি দেখেছেন, কে জানে। জীপের সার্চলাইটকেই হয়তো ড্রাগনের চোখ ভেবেছেন, ইঞ্জিনের শব্দকে ড্রাগনের গর্জন।
তা-ও হতে পারে। তবে আগে থেকেই এত অনুমান করে লাভ নেই। গুহায় ঢুকে ভালমত দেখা দরকার।
গুহামুখের গজ দশেক দূরে হঠাৎ করে শেষ হয়ে গেল দাগ। সামান্যতম চিহ্নও নেই আর।
একে অন্যের দিকে তাকাল ছেলেরা।
আশ্চর্য! বিড়বিড় করল মুসা।
গুহামুখে পৌঁছে ভেতরে উঁকি দিল ওরা। শূন্য মনে হচ্ছে।
ড্রাগন তো ড্রাগন, আস্ত বাস ঢুকে যেতে পারবে এই মুখ দিয়ে, ওপর দিকে চেয়ে বলল রবিন। দেখি ভেতরে ঢুকে, কত বড় সুড়ঙ্গ?
যাও, কিশোর বলল। তবে কাছাকাছি থেকো, ডাকলে যাতে শুনতে পাও। আমি আর মুসা আশপাশটা ভালমত দেখে আসছি।

দাড়টা বল্লমের মত বাগিয়ে ধরে ভেতরে ঢুকে গেল রবিন।
হঠাৎ এত সাহসী হয়ে উঠল কিভাবে? মুসা বলল।
ওই যে, হেসে বলল কিশোর, মানুষের তৈরি চাকা দেখলাম। তাতেই অনেকখানি দূর হয়ে গেছে ড্রাগনের ভয়।
কান খাড়া করল সে। দেখি তো ডেকে, রবিনের সাড়া আসে কিনা। ওর কথার প্রতিধ্বনি শুনলেই আন্দাজ করতে পারব, গুহাটা কত বড়। চেঁচিয়ে ডাকল, রবিন? কি দেখছ?
মুসাও কান খাড়া করে ফেলেছে।
শব্দটা শুনতে পেল দু-জনেই। বিচিত্র একটা শব্দ, কিসের বোঝা গেল না।
পরক্ষণেই ভেসে এল রবিনের চিৎকার, তীক্ষ্ণ, আতঙ্কিত। তারপর একটি মাত্র শব্দ: বাঁচাও!
চোখ বড় বড় করে আবছা অন্ধকার গুহার ভেতরে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর আর মুসা, কি করবে বুঝতে পারছে না। এই সময় আবার শোনা গেল রবিনের চিৎকার।
বাঁচাও! আমাকে বাঁচাও!
বিপদে পড়েছে! চেঁচিয়ে উঠল মুসা। এসো। ছুটে সুড়ঙ্গের ভেতরে ঢুকে গেল সে।
তাকে অনুসরণ করতে কষ্ট হচ্ছে কিশোরের। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, আরেকটু আস্তে, মুসা। ও বেশি দূরে নয়, হুঁশিয়ার থাকা দরকার...
কথা শেষ করতে পারল না কিশোর, মুসার গায়ে এসে পড়ল। বাড়ি খেয়ে হুক করে সমস্ত বাতাস বেরিয়ে গেল তার ফুসফুস থেকে। পড়তে পড়তে কোনমতে সামলে নিল।
কানে এল মুসার গলা, সরো, কিশোর, সরে যাও! ও এখানেই!
কোথায়? কই, আমি তো কিছুই দেখছি না।
চোখ মিটমিট করল কিশোর। চোখে সয়ে এল আবছা আলো। তার সামনেই চার হাত-পায়ে ভর রেখে উপুড় হয়ে রয়েছে মুসা।
আরেকটু হলেই গেছিলাম গর্তে পড়ে, বলল সে। রবিন ওতেই পড়েছে।
কই? মুসার কাঁধের ওপর দিয়ে দেখার চেষ্টা করল কিশোর। রবিন, কোথায় তুমি?
এত কাছে থেকে শোনা গেল রবিনের কণ্ঠ, চমকে উঠল কিশোর। এই যে, এখানে! চটচটে কিছু! খালি নিচে টানছে!
ইয়াল্লা! চিৎকার করে বলল মুসা। চোরাকাদা!
অসম্ভব! এই জরুরী মুহূর্তেও যুক্তির বাইরে গেল না গোয়েন্দাপ্রধান। সাধারণত গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চল ছাড়া চোরাকাদা দেখা, যায় না। মুসার পাশ দিয়ে ঘুরে এসে

কিনারে বসল, সাবধানে হাত নামিয়ে দিল নিচে। কই, দেখছি তো না। রবিন, আমাদের দেখছ?
হ্যাঁ! এই তো, তোমাদের নিচেই।
নিচু হয়ে হাত আরেকটু নামাল কিশোর। আমি দেখছি না। রবিন, ধরো, আমার হাতটা ধরো। আমি আর মুসা টেনে তুলব।
নিচে আঠাল তরলে নড়াচড়ার ফলে চপচপ শব্দ হলো। পারছি না।...নড়লেই ডুবে যাচ্ছি আরও। নাগাল পাচ্ছি না।
হাতের ডাণ্ডাটা আছে তোমার? মুসা জিজ্ঞেস করল। ওই দাঁড়ভাঙাটা। থাকলে...
নেই! প্রায় ককিয়ে উঠল রবিন। পড়ে গেছে!
নিজের হাতের কাঠটায় মুঠোর চাপ শক্ত হলো মুসার। আমারটাও এত শক্ত না। ভার সইবে না, ভেঙে যাবে। গোঙানির মত একটা শব্দ করল সে।
শুঁয়োপোকার মত কিলবিল করে গর্তের ধারে হামাগুড়ি দিতে শুরু করল কিশোর। রবিন, চুপ করে থাকো, নোড়ো না। গর্তটা কত বড়, বুঝে নিই।
জলদি করো। কেঁদেই ফেলবে যেন রবিন। তোলো আমাকে। গর্ত মাপার সময় নয় এটা।
খুব ধীরে ধীরে এগোচ্ছে কিশোর। মাপতেই হবে। এ ছাড়া তোমাকে তুলে আনার আর কোন উপায় দেখছি না।
অন্ধকারে খুব সাবধানে গর্তটার চারধারে ঘুরল কিশোর, হুশিয়ার থাকা সত্ত্বেও কিনারের মাটি ভেঙে ঝুরঝুর করে পড়ল ভেতরে। আরে, করছ কি! নিচ থেকে চেঁচিয়ে উঠল রবিন। ভূমিধস নামাবে নাকি?
সরি। কিনারে আলগা মাটি, হাত লাগলেই পড়ে যাচ্ছে।
মুসার গায়ে হাত পড়তেই বুঝল কিশোর, গর্ত ঘোরা শেষ হয়েছে। থামল। মুসা, মনে হয় পারব। রবিন, তোমার পা কি তলায় ঠেকেছে? বুঝতে পারছ কিছু?
আরেকবার চপচপ করে উঠল আঠাল তরল। না, তিক্ত শোনাল রবিনের কণ্ঠ। একটু নড়াচড়ায়ই আরও অনেকখানি তলিয়ে গেছি। দোহাই তোমাদের, কিছু একটা করো! তোলো আমাকে! তোমার হিসেবনিকেশটা পরে কোরো, কিশোর!
মুসা বলল, কিশোর, আমার পা শক্ত করে ধরতে পারবে? আমি গর্তের ভেতর পেট পর্যন্ত ঢোকাতে পারলেই ওকে তুলে আনতে পারব।
মাথা নাড়ল কিশোর, অন্ধকারে মুসা সেটা দেখতে পেল না।
আমার কাঠটা ব্যবহার করতে পারি, কিশোর বলল।
টেনে তোলা যাবে না। গর্তের কিনারে আলগা নরম বালি, ভার রাখতে পারবে না, চাপাচাপি করলে দেবে যাবে। তবে, কাঠটা আড়াআড়ি গর্তের ওপর রাখা যায়, দু-মাথা গর্তের কিনারে মোটামুটি ভালই আটকাবে।

তাতে লাভটা কি? রবিন তো নাগাল পাবে না।
মনে হয় পাবে, যদি কোনাকুনি ঢুকিয়ে দিই। কি করব, বুঝতে পারছ তো? একমাথা গর্তের ভেতরে কোনাকুনি ঢুকিয়ে ঠেসে ঢোকাব দেয়ালে। নরম মাটিতে ঢুকে যাবে সহজেই। আরেক মাথা থাকবে ওপরে, কিনারে শক্ত করে চেপে ধরব। সিঁড়ি তৈরি হয়ে যাবে…
ঠিক বলেছ! জলদি করো, জলদি…
বেশি আশা করতে পারল না কিশোর, পাতলা কাঠ। ভার সইতে পারলে হয়। তবু, দেখা যাক চেষ্টা করে।…রবিন, তোমার মাথার কাছে। দেয়ালে ঢোকানোর চেষ্টা করছি। খুব সাবধানে উঠবে। পিছলালে কিন্তু মরবে। কাঠটা ভেঙে গেলেও…খুব সাবধান।
জলদি করো! আরও ডুবেছি! গলা কাঁপছে রবিনের।
দ্রুত গর্তের অন্য ধারে চলে এল কিশোর, মুসা যেখানে রয়েছে তার উল্টো দিকে। লম্বা হয়ে শুয়ে কাঠটা ঠেলে দিল গর্তের ভেতরে। আস্তে আস্তে, এক ফুট এক ফুট করে।
হঠাৎ নিচ থেকে রবিনের চিৎকার শোনা গেল, আরেকটু, আরেকটু ঠেলে দাও, ধরতে পারছি না।
আরও কয়েক ইঞ্চি ঠেলে দিল কিশোর।
আরও একটু, নিচে থেকে বলল রবিন। এই আর কয়েক ইঞ্চি।
কাঠটা আরেকটু আসার অপেক্ষা করছে রবিন। এল না। তার বদলে শুনল ওপরে কিশোরের চাপা গলা, অস্ফুট একটা শব্দ। কি হলো, কিশোর?
কাঠের ভারে পিছলে যাচ্ছি, ব্যালান্স রাখতে পারছি না। কাঠ না ছাড়লে আমিও পড়ব গর্তে। সাংঘাতিক নরম বালি…
আর কিছু শোনার অপেক্ষা করল না মুসা। লাফিয়ে উঠে বিপজ্জনক কিনার ধরে প্রায় ছুটে চলে এল কিশোরের কাছে। ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। উপুড় হয়ে শুয়ে কিশোরের পা ধরে টেনে সরিয়ে আনল খানিকটা। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, এবার পারবে?
থ্যাংক ইউ, কিশোরের কণ্ঠও কাঁপছে। পা ছেড়ো না। কাঠটা আবার ঢোকাচ্ছি আমি। বড় বাঁচা বেঁচেছি। আরেকটু হলেই আমিও গিয়েছিলাম… কাঠটা আবার ঠেলে দিল সে। গর্তের দেয়ালে ঠেকতেই হ্যাঁচকা ঠেলা দিয়ে ঢুকিয়ে দিল কয়েক ইঞ্চি। জোরে জোরে শ্বাস নিল কয়েকবার।
মুসা জিজ্ঞেস করল, কি হলো, পারছ না?
হ্যাঁ, দেয়ালে ঠেকেছে।
আমি ধরে আছি, ছাড়ব না। তুমি ঠেলো।

জোরে জোরে কয়েকটা হ্যাঁচকা ঠেলা দিয়ে কাঠের মাথা অনেকখানি গর্তের দেয়ালে ঢুকিয়ে দিল কিশোর। ডেকে বলল, রবিন, দেখো এবার। ঝুলে ঝুলে আসবে, আস্তে আস্তে হাত সরাবে, একটুও তাড়াহুড়ো করবে না। কাঠ ভাঙলে সর্বনাশ!
কাঠের মৃদু কড়মড় প্রতিবাদ শুনেই বোঝা গেল উঠে আসছে রবিন। কতক্ষণ সইতে পারবে কে জানে।
আসছে, না? জানতে চাইল মুসা।
হ্যাঁ, বলল কিশোর। পা ছেড়ো না আমার। কখন কি হয় বোঝা যাচ্ছে না। গর্তের ভেতরে হাত আর মাথা ঢুকিয়ে দিল সে, বিপজ্জনক ভঙ্গিতে ঝুলে পড়ল, রবিন নাগালের মধ্যে এলেই যাতে টেনে তুলতে পারে।
গুঙিয়ে উঠল রবিন। কিশোর, আর পারছি না! ইস, এত পিছলা! খালি হাত পিছলে যায়!
আমার হাত দেখতে পাচ্ছ? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
পাচ্ছি। আর তিন-চার ফুট উঠতে পারলেই ধরতে পারব। কিন্তু পারছি না তো।
চুপ! তাড়াহুড়ো কোরো না। জোরে জোরে হাঁপাচ্ছে কিশোর। আনমনে বলল, ইস, একটা দড়ি যদি পেতাম।
দড়ি পাবে কোথায়? পেছন থেকে বলল মুসা।
কিশোর, আর পারছি না! নিচে থেকে ককিয়ে উঠল রবিন। হাত ছিঁড়ে যাচ্ছে!
আরেকটু ধরে থাকো। মুসা, আরও শক্ত করে ধরো।
অনেক কায়দা কসরত করে কোমর থেকে বেল্টটা খুলে ফেলল কিশোর। বাকসের ভেতর চামড়ার ফালিটা ঢুকিয়ে ছোট একটা ফাঁস বানাল। তারপর মাথা ধরে ঝুলিয়ে দিল নিচে। রবিন, দেখতে পাচ্ছ?
হ্যাঁ হ্যাঁ, পাচ্ছি।
ফাঁসের মধ্যে হাত ঢোকাও।
আস্তে করে কাঠ থেকে একটা হাত সরিয়ে ফাঁসের মধ্যে ঢোকাল রবিন। আরেক হাতে অনেক কষ্টে ঝুলে রইল। পিছলে সরে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে।
টান দিয়ে তার হাতে ফাঁসটা আটকে দিল কিশোর। মুসা, টানো। টেনে টেনে পেছনে সরাও আমাকে।
ব্যথা পাবে তো।
আরে, রাখো তোমার ব্যথা। টাননা।
টানতে শুরু করল মুসা। দু-হাতে বেল্টের একমাথা ধরে রেখেছে। কিশোর। ঘামে ভিজে পিছল হয়ে গেছে হাতের তালু, বেল্টটা না ছুটলেই হয় এখন।
অবশেষে গর্তের বাইরে বেরিয়ে এল রবিনের হাত। মাথা বেরোল। উঠে এল সে।

থামল না মুসা। টেনে আরও সরিয়ে আনল কিশোরকে, সেই সঙ্গে রবিনকে। যখন বুঝল আর ভয় নেই, কিশোরের পা ছেড়ে দিয়ে ধপ করে বসে পড়ল। আরিব্বাপরে, কি একখান টাগ অভ ওয়ার গেল!

হাঁপাচ্ছে কিশোর আর রবিন, ঘড়ঘড় শব্দ বেরোচ্ছে গলা থেকে।

রবিনের গায়ে হাত রাখল কিশোর, ইস, এত পিছলা। কাদায় গড়িয়ে ওঠা শুয়োরও তো এত পিচ্ছিল না।

তিনজনেই হাসল।

বন্ধুদেরকে বার বার ধন্যবাদ জানাল রবিন। মুখের কাদা মুছে বলল, কিশোর, ঠিকই বলো তুমি, বিপদে মাথা গরম করতে নেই। তোমার ঠাণ্ডা মাথাই আজ আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে।

সব ভাল যার শেষ ভাল, মুসা বলল। তো, এখন কি করব?

বাড়ি ফিরব, সঙ্গে সঙ্গে বলল কিশোর। গোসল করে কাপড় বদলানো দরকার, বিশেষ করে রবিনের। নিশ্চয় খুব অসুবিধে হচ্ছে ওর। সব দোষ আমার। টর্চ না নিয়ে অন্ধকারে গুহা দেখতে এসেছি, গর্দভের মত কাজ করেছি।

আমারই দোষ, রবিন বলল। তুমি তো হুঁশিয়ার থাকতে বলেইছিলে। আমি গাধার মত ছুটে গিয়ে পড়েছি গুহায়। এত তাড়াহুড়ো না করলেই তো পড়তাম না।

উঠে দাঁড়াল কিশোর। চিন্তিত কণ্ঠে বলল, গুহামুখের অত কাছে এমন একটা গর্ত, কৌতূহলী লোককে ঠেকানোর ভালই ব্যবস্থা! দূরে সরিয়ে রাখবে!

খাইছে! হঠাৎ কি মনে পড়ে যাওয়ায় বলে উঠল মুসা, হয়তো কুত্তাগুলো সব গিয়ে পড়েছে ওই গর্তে, চোরাকাদায় ডুবে মরেছে।

কিশোর বলল, হতে পারে। কিন্তু ঢোকার আগেই ভালমত দেখেছি আমি। কুকুরের পায়ের ছাপ তো চোখে পড়ল না।

হুঁ! যাকগে, ওসব পরে ভাবা যাবে। চলো, বেরোই। জায়গাটা মোটেও পছন্দ হচ্ছে না আমার। ভয় ভয় করছে।

তিনজনেই একমত হলো এ-ব্যাপারে।

গর্তের কাছ থেকে সরে এল ওরা।

তখন উত্তেজনা আর তাড়াহুড়োয় খেয়াল করেনি কিশোর, এখন দেখল, গুহামুখের উল্টো দিকে বড় বড় পাথরের চাই। আরেকটা সুড়ঙ্গমুখ দেখা যাচ্ছে।

কদ্দূর গেছে কে জানে, আপনমনে বিড়বিড় করল সে। চোর-ডাকাত আর চোরাচালানীর আখড়া ছিল তো শুনলাম।

সে তো ছিলই, জোর দিয়ে বলল মুসা। কিন্তু তাতে কি?

দেখে কিন্তু সেরকম মনে হয় না। এতবেশি খোলামে, ঢোকা আর বেরোনো খুব সহজ, একটু সাবধানে চললেই বিপদ এড়ানো সম্ভব।

আরও সুড়ঙ্গ-টুড়ঙ্গ আছে হয়তো, রবিন বলল। নরম মাটিকে ক্ষয় করে ফেলে পানির স্রোত, ধুয়ে নিয়ে যায়, অনেক সুড়ঙ্গ তৈরি হয়। তবে তাতে সময় লাগে, অনেক ক্ষেত্রে লাখ লাখ বছর। মনে হচ্ছে, অনেক আগে এই জায়গাটাও পানির তলায় ছিল। যদি তাই হয়, আরও অনেক সুড়ঙ্গ আছে এখানে।
হয়তো, স্বীকার করল কিশোর। তবে সেগুলো খুঁজতে পারব না এখন। বাড়ি যাওয়া দরকার।
হ্যাঁ, সেই ভাল, মুসা বলল।
গুহামুখের কাছে চলে এসেছে, সাগরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে গেল কিশোর। তার গায়ের ওপর এসে পড়ল অন্য দু-জন।
কি হলো? মুসার প্রশ্ন।
নীরবে হাত তুলে দেখাল কিশোর।
তার পাশে দাঁড়িয়ে অন্য দু-জনও তাকাল। চোখ মিটমিট করল।
হাত দিয়ে চোখ ডলে আবার তাকলি মুসা। বিশ্বাস করতে পারছে না।
ইয়াল্লা!বিড়বিড় করল সে।
কালো, চকচকে কিছু একটা মাথা তুলছে পানির ওপরে।
কি ওটা! ফিসফিস করল রবিন।
কম্পিত কণ্ঠে মুসা বলল, ড্রাগনের মাথার মতই তো লাগছে!
গড়িয়ে এল মস্ত এক ঢেউ, ঢেকে দিল কালো জিনিসটা।
চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে ছেলেরা। চোখ সরাচ্ছে না।
প্রচণ্ড শব্দে সৈকতে আছড়ে পড়ে ভাঙল বড় ঢেউটা। তার পেছনে এল আরেকটা ছোট ঢেউ, ওটাও ভাঙল, সাদা ফেনার নাচানাচি চলল কয়েক মুহূর্ত, তারপর সরতে শুরু করল পানি।
ঢেউ সরে যেতেই আবার দেখা গেল কালো জীবটা। নড়ছে। সাগর থেকে উঠে এল টলোমলো পায়ে।
স্কিন ডাইভার, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মুসা। ফেস মাস্ক…ফ্লিপার…অথচ কি ভয়ই না পেলাম। চলো, আমাদের পথে আমরা যাই।
ঘুরতে গিয়েও দাঁড়িয়ে গেল কিশোর। ফিসফিসিয়ে বলল, সাবধান! ওর হাতে স্পীয়ারগান!
হেসে উঠল সহকারী গোয়েন্দা। তাতে কি? মাছ মারতে নেমেছিল হয়তো সাগরে।
মাথা নাড়ল কিশোর। এদিকে আসছে দেখছ না?
হঠাৎ হাঁটু গেড়ে বসল ডুবুরি। স্পীয়ারগান তুলল।
আরে! চেঁচিয়ে উঠল রবিন। আমাদেরকেই তাক করছে!
অ্যাঁ! চমকে গেল মুসা। কেন… দ্রুত চোখ বোলাল আশপাশে।

কিশোর, রবিন ঠিকই বলেছে! আর কেউ নেই, আমাদেরকেই নিশানা করছে!
একশো গজ দূরে রয়েছে লোকটা।
দৌড় দাও! চেঁচিয়ে বলল কিশোর। একেকজন একেকদিকে।
কিন্তু দেখা গেল, একদিকেই দৌড় দিয়েছে তিনজন, ওপরে ওঠার কাঠের সিঁড়ির দিকে। কাছে যাওয়ার আগে মনেই পড়ল না, ওটা ভাঙা। ওরাই ভেঙেছে খানিক আগে। পেছনে পাহাড়ের খাড়া পাড়, বেয়ে ওঠা প্রায় অসম্ভব।
আরেকটা সিঁড়ি যেটা আছে, ওটার দিকে তাকাল কিশোর। অনেক দূরে। নরম বালির ওপর দিয়ে তাড়াতাড়ি দৌড়াতে পারবে না, সিঁড়ির কাছে যাওয়ার আগেই স্পীয়ারগান থেকে ছোঁড়া বর্শা বিধবে শরীরে। খোলা সৈকতে খুব সহজ টার্গেট হয়ে যাবে ওরা।
দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল কিশোর। একটাই উপায় আছে। আবার গুহায় ঢুকতে হবে। কুইক!
ঘুরে আবার গুহামুখের দিকে দৌড় দিল ওরা। ফিরে তাকানোর সাহস নেই। ভাবছে, এই বুঝি এসে পিঠে বিধল চোখা ইস্পাত।
আলগা নরম বালি, জুতোর ঘায়ে ছিটকে যাচ্ছে।
ডাইভ দাও! হাঁপাতে হাঁপাতে বলল কিশোর।
গুহামুখের ভেতরে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল তিনজনে। হামাগুড়ি দিয়ে সরে গেল একটা বড় পাথরের আড়ালে।
ওফ, মুখ দিয়ে বাতাস ছাড়ল মুসা। বাঁচলাম!...এবার?
লুকাতে হবে, জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছে কিশোর। বাঁচিনি
এখনও। খানিকটা সময় পেয়েছি মাত্র।
কোথায় লুকাব? রবিন বলল। ভেতরে আরও সুড়ঙ্গ নাকি আছে? চলো, খুঁজে বের করি। ওগুলোর কোনটাতেই ঢুকব।
মাথা ঝাঁকাল কিশোর। তাই বোধহয় করতে হবে। তবে এখুনি নড়ছি না। লোকটা আসুক আগে। তেমন বুঝলে পাহাড়ের একেবারে ভেতরে ঢুকে যাব।
কিশোরের কাঁধের ওপর দিয়ে তাকিয়ে রয়েছে মুসা। এখুনি সরতে হবে। আসছে।
যাব কোন দিক দিয়ে? রবিন বলল। আবার গিয়ে ওই গর্তে পড়তে চাই না, কাদার মধ্যে।
গুহার দেয়ালের কাছে পিছিয়ে গেল কিশোর। হঠাৎ ডাকল, এই, দেখে যাও।
মেঝে থেকে ছাতের কাছে খাড়া উঠে গেছে কয়েকটা তক্তা।
খাইছে, মুসা বলল। তখন দেখলাম না কেন?
ধুলোবালিতে কেমন ঢেকে আছে দেখছ না? সহজে চোখে পড়ে না। তক্তায় থাবা দিল কিশোর, ফাঁপা শব্দ হলো। গোপন পথ-টথ আছে। মনে হয় খোলা যাবে।

মুসা, চট করে দেখে এসো তো ও আসছে কিনা?
গিয়েই সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এল মুসা। উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, ভাল বিপদে পড়েছি! একজন না, দু-জন আসছে!
দু-জন? জলদি এসো, হাত লাগাও।
তক্তার ফাঁকে আঙুল ঢুকিয়ে ধরে জোরে জোরে টানতে শুরু করল ওরা।
এভাবে হবে না, রবিন বলল। ওপরে-নিচে শক্ত করে গেঁথে দিয়েছে।
মাথা নাড়ল কিশোর। নিশ্চয় হবে। পায়ের কাছে মাটিতে জুতোর ডগা দিয়ে খোঁচা দিয়ে দেখল মাটি আলগা। বসে পড়ে দু-হাতে খুঁড়তে শুরু করল তক্তার গোড়ার কাছে।
অন্য দু-জনও হাত লাগাল।
কিছুটা খুঁড়ে টান দিতেই নড়ে উঠল তক্তা।
এই তো হয়েছে, বলল কিশোর। এটাই তো সবচেয়ে চওড়া, নাকি?...হ্যাঁ, সরালে ভেতরে ঢোকা যাবে... মাথা ঢুকিয়ে দিল সে, কিন্তু কাধ ঢোকাতে পারল না, চাড় দিয়েও কাজ হলো না।
আরও খানিকটা মাটি সরাল মুসা আর রবিন। টান দিয়ে আরও ফাঁক করল তক্তা, হ্যাঁ, এবার ঢোকা যায়।
ঢুকে গেল কিশোর। পেছনে দুই সহকারী। তারপর আবার টেনে আগের জায়গায় লাগিয়ে দিল তক্তা।
অন্ধকার গুহায় বসে কান পেতে রয়েছে ওরা।
ওপাশে কথা শোনা গেল। তক্তার ফাঁক দিয়ে টর্চের আলো দেখল।
নিক, বলল একজুন, ওরা এখানেই ঢুকেছে, আমি শিওর। তুমি পড়ে গেলে, আমিও চোখ সরালাম। নইলে ঠিকই দেখতে পেতাম। ঢুকেছে এখানেই। বাতাসে তো আর মিলিয়ে যেতে পারে না।
এখানে থাকলে যাবে কোথায়? বলল অন্যজন। বের করে ফেলব। আর না থাকলে তো নেই-ই। আমাদের কাজ শুরু করব।
নিঃশ্বাস বন্ধ করে রইল তিন গোয়েন্দা।
গুহার ভেতরে আলো ফেলে ফেলে দেখছে লোকটা।
তক্তার ফাঁকে চোখ রেখে দেখছে কিশোর। তার ওপর ঝুঁকে রয়েছে রবিন আর মুসা, ওরাও দেখছে।
দু-জনের পরনেই কালো ওয়েট স্যুট, পানির নিচ থেকে উঠে এসেছে। আলো ফেলে গুহার চারপাশটা একবার দেখে অন্য দিকে চলে গেল। ফ্লিপার পরা পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল, হারিয়ে গেল আলো।

দ্বিতীয় লোকটা, অর্থাৎ নিকের খসখসে গলা শোনা গেল গর্তটার ধার থেকে, যেটাতে পড়েছিল রবিন, কই, জো? কোথায় ওরা? ভুল করেছ তুমি। এখানে ঢোকেনি।
আরেকটা সিঁড়ি যে আছে ওদিকে, ওটা বেয়ে উঠে গেল না তো? অনিশ্চিত শোনাল জো-র কণ্ঠ।
তা-ই গেছে হয়তো।
টুলুপ টুলুপ করে মৃদু শব্দ হলো, তারপর নীরবতা। কিছুই আর কানে এল না কিশোরের, কিছু দেখছে না। ফাঁক থেকে চোখ সরিয়ে আনল সে। চোখের কোণে, নাকের ভেতরে কিচকিচ করছে বালি। সুড়সুড় করছে নাক। হাঁচি এলে এখন সর্বনাশ। তার সঙ্গীদেরও কি একই অবস্থা নাকি?
মুসাকে বিশ্বাস নেই। অসময়ে হাঁচি দেয়ার জুড়ি নেই তার। বিপদ, দেখলে কিংবা বেশি উত্তেজিত হলেই যেন সুড়সুড় করতে থাকে তার নাকটা। হুশিয়ার করল কিশোর, দেখো, হাঁচি দিও না। নাক ধরো।
শুধু মুসাই নয়, রবিনও নাক টিপে ধরল। চুপ করে বসে আছে। অন্ধকার গুহায়, অস্বস্তিতে ভুগছে।
কিছুক্ষণ পর উঠে দাঁড়াল কিশোর। নেই মনে হচ্ছে। চলো, সময় থাকতে কেটে পড়ি।
তক্তা সরিয়ে বেরোল ওরা। জায়গামত আবার তক্তাগুলো দাঁড় করিয়ে গোড়া বালি দিয়ে ঢেকে সমান করে দিল আগের মত।
কিশোর, তুমি আগে বেরোও, ফিসফিস করে বলল মুসা। আমি আর রবিন পেছনে নজর রাখছি।
নিঃশব্দে গুহামুখের কাছে চলে এল ওরা। খুব সাবধানে বাইরে। উঁকি দিল কিশোর। নির্জন সৈকত। কাউকে দেখা যাচ্ছে না। পিছিয়ে এসে বন্ধুদের বলল, কেউ নেই। এসো।
তারপর, কি বুঝলে? প্রশ্ন করল কিশোর।
হেডকোয়ার্টারে বসেছে সে আর মুসা। ঘণ্টাখানেক হলো ফিরে এসেছে রকি বীচে। রবিন বাড়ি গেছে। তার শরীর আর কাপড়চোপড়ের যা অবস্থা হয়েছে কাদায়, শুধু হাতমুখ ধুলে হবে না, গোসল দরকার।
ঠোঁট ওল্টাল মুসা। কিছুই বুঝতে পারছি না। ডুবুরীরা কারা, তা-ও জানি না; শুধু নাম জানি-নিক আর জো। স্পীয়ারগান তুলে আমাদের নিশানা করেছিল কেন, জানি না। জানি না কেন আমাদের পিছু নিয়ে এসে ঢুকেছিল গুহায়। তারপর কিভাবে কোথায় গায়েব হয়ে গেল, জানি না। এমনকি এ-ও জানি না, কি করে বেঁচে ফিরে এলাম আমরা।

নিচের ঠোঁটে চিমটি কেটে মাথা ঝাঁকাল কিশোর। হ্যাঁ, আরও অনেক কিছুই জানি না। সিঁড়ি কে কেটে রাখল? কুকুর কিভাবে গায়েব হলো? কেউ কি চুরি করল ওগুলোকে? তাহলে কেন করল? এই কেসের–কিনারা করতে হলে এ-ধরনের অনেক কেনর জবাব জানতে হবে আমাদের।
এক কাজ করলে আর দরকার হবে না, পরামর্শ দিল মুসা।
উ! রিভলভিং চেয়ার ঘুরিয়ে মুসার দিকে ফিরল কিশোর। চোখে জ্বলজ্বলে আগ্রহ। কি?
ফোনটা দেখাল মুসা। ওটা তুলে ফোন করো মিস্টার জোনসকে। বলো, হারানো কুত্তা নিয়ে আর মাথা ঘামাচ্ছি না আমরা। আরেকটু হলে আমরাই হারিয়ে যাচ্ছিলাম। বলে দাও, ড্রাগনের কথাও ভুলে যেতে রাজি আছি আমরা।
নিরাশ হলো কিশোর। দপ করে নিভে গেল চোখের আলো। দুঃখিত। তোমার পরামর্শ মানতে পারছি না। এখন আমাদের প্রথম সমস্যা, এক আঙুল তুলল সে, ডুবুরীরা কে, এবং গুহায় কি করছিল সেটা জানা?
ওদের নিয়ে এত মাথা ঘামানোর কি হলো? আমরাও তো গিয়েছিলাম গুহায়। কেন? সেটাই কি জানি?
মিস্টার জোনসের ড্রাগন দেখার সপক্ষে সূত্র খুঁজছিলাম, মাঝে মাঝে কঠিন শব্দ ব্যবহার, কিংবা লম্বা বাক্য, কিংবা দুর্বোধ্য করে কথা বলা কিশোরের স্বভাব। এবং তার আইরিশ সেটার কুকুর পাইরেটের সন্ধানে গিয়েছিলাম, রাতারাতি হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে যেটা।
এবং তাহাতে আমরা মোটেও কৃতকার্য হই নাই, কিশোরের সুরে সুর মেলাল মুসা। অবশ্য কুয়া আবিষ্কারের ব্যাপারটা বাদ দিতে রাজি আমি, যদি ওটা কোন সূত্র হয়। এবং সেজন্যে রবিনের কাছে মহাকৃতজ্ঞ আমরা, নাকি?
মুসার টিটকারি গায়েই মাখল না কিশোর। কিছু পাইনি, তাই বা বলি কিভাবে? তক্তার ওপাশে আরেকটা সুড়ঙ্গ পেয়েছি, হয়তো কোন গোপন গুহায় যাওয়ার পথ ওটা। হয়তো পুরানো আমলে দস্যু-তস্কররা হেডকোয়ার্টার হিসেবে ব্যবহার করত ওটাকে।
তাতে আমাদের কি? কুত্তা লুকিয়ে রাখার জায়গা নিশ্চয় নয় ওটা?
ভ্রূকুটি করল কিশোর। একটা কথা ভুলে যাচ্ছ, মুসা আমান, আমরা গোয়েন্দা। সামান্যতম সূত্রকেও অবহেলা করলে চলবে না আমাদের। ওই গুহা আর সুড়ঙ্গগুলো আরও ভালমত দেখা দরকার, কি বলো?
তা তো নিশ্চয়, ভোতা গলায় বলল মুসা। তবে খামোখা যাবে। ওখানে কুত্তা পাওয়ার আশা নেই। লুকিয়ে রাখা হয়নি। আবোল তাবোল ভাবনা হচ্ছে, অথচ অবাক হওয়ার মত যেটা ব্যাপার, সেটা নিয়েই ভাবছি না?

কী? আবার আগ্রহে সামনে ঝুঁকল কিশোর।
রবিন যে কুয়াটায় পড়েছিল, দুই ডুবুরী ওটাতে পড়ল না কেন? তারমানে এই নয় কি, ওরা গুহার ভেতরে কোথায় কি আছে জানে?
দ্বিতীয়বার নিরাশ হতে হলো কিশোরকে। ভাবার কি দরকার? ওদের হাতে টর্চ ছিল, রবিনের কাছে ছিল না। আর ওরা কোথায় কিভাবে গায়েব হলো, টর্চ নিয়ে আমরা যখন যাব…
ফোন বেজে উঠল।
যন্ত্রটার দিকে তাকিয়ে রইল দু-জনে।
আবার রিঙ হলো।
মুসা জিজ্ঞেস করল, তুলব?
আমি তুলছি, রিসিভার তুলল কিশোর। স্পীকারের সঙ্গে যোগাযোগের সুইচ অন করে দিয়ে বলল, হ্যালো।
জবাব নেই।
আবার বলল, হ্যালো?
জবাব নেই।
রঙ নাম্বার-টাম্বার হবে, মন্তব্য করল মুসা।
আমার মনে হয় না। জবাব তো দেবে-..
অদ্ভুত একটা শব্দ শোনা গেল স্পীকারে, ঘড়ঘড়ে, গলা টিপে ধরে ঠিকমত শ্বাস নিতে দেয়া হচ্ছে না যেন, অনেক কষ্টে দম টানছে
বেচারা। তা ধীরে ধীরে বদলে গেল ঘড়ঘড়ানি, কথা ফুটল। কোনমতে উচ্চারণ করল একটা মাত্র শব্দ, দূরে…!
তারপর আবার শুরু হলো ঘড়ঘড়ানি। অনেক কষ্টে যেন গলা থেকে আঙুলের চাপ সামান্য শিথিল করে আবার বলল, দূরে দূরে থাকবে…! জোরে জোরে শ্বাস টানল।
কি করে থাকব? গলা চড়িয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর।
আমার…গুহা…! আবার ঘড়ঘড়ানি, আগের চেয়ে বেড়েছে। শ্বাসকষ্ট, মৃত্যুযন্ত্রণা শুরু হয়েছে বুঝি।
কে বলছেন? উত্তেজনায় রিসিভার-ধরা হাত কাঁপছে কিশোরের।
স্পীকারে ভেসে এল কাঁপা কাঁপা কণ্ঠস্বর, যেন বহু দূর থেকে, মরা…মানুষ…! অনেক দিন আগে মরে যাওয়া একজন…গুহায় আটকে রেখে খুন করা হয়েছিল আমাকে…?
কাঁপা দীর্ঘ ঘড়ঘড়ানি, ফিসফাস হলো কিছুক্ষণ, তারপর নীরব হয়ে গেল।
আস্তে করে রিসিভার নামিয়ে রাখল কিশোর। দু-জনেই চেয়ে রইল যন্ত্রটার দিকে।

হঠাৎ উঠে দাঁড়াল মুসা। আমি যাই। মা বলে দিয়েছে সকাল সকাল বাড়ি ফিরতে, জরুরী কাজ আছে। ভুলেই গেছিলাম।
যাবে? নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর।
হ্যাঁ, যাই, দুই সুড়ঙ্গের ঢাকনার দিকে এগোল মুসা। কিশোরকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে নেমে পড়ল সুড়ঙ্গে।
ভূতের ভয়ে পালাচ্ছে মুসা, বুঝল কিশোর। সে ভয় পায়নি, কিন্তু অবাক হয়েছে খুব। বিড়বিড় করল, দূরে থাকবে...আমার গুহা...
মিস্টার জোনস বলেছিলেন, ড্রাগন দেখেছেন। সাগর থেকে উঠে দানবটাকে গুহায় ঢুকতে দেখেছেন। কিন্তু কই, কোন ভূতের কথা তো বলেননি?
একা একা বসে থাকতে ভাল লাগল না তার। ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে-ও।
গোসল সেরে, কাপড় বদলে, হালকা খাবার খেয়ে অনেকটা ভাল বোধ। হলো রবিনের। রকি বীচ পাবলিক লাইব্রেরিতে চলল, পার্ট টাইম চাকরিতে।
রবিনকে ঢুকতে দেখে মুখ তুলে তাকালেন লাইব্রেরিয়ান, হাসলেন। এই যে, রবিন, এসেছ। খুব ভাল হয়েছে। সাংঘাতিক ভিড় আজ, কুলিয়ে উঠতে পারছি না। অনেক বই ফেরত এসেছে, রীডারও বেশি। ওই দেখো, কত বই নিচে জমে আছে। তাকে তুলে দেবে, প্লীজ?
এখুনি দিচ্ছি, বলে বইয়ের স্তূপের দিকে এগোল রবিন।
ফেরত আসা বইগুলো এক এক করে তাকে সাজিয়ে রাখতে লাগল সে। সেগুলো ভোলা শেষ করে চোখ ফেরাল রীডিং রুমের দিকে। টেবিলে অনেক বই জমে আছে। তুলতে শুরু করল। হঠাৎ একটা বইয়ের মলাটে দৃষ্টি আটকে গেল তার। নামটা নজর কেড়েছে:
লিজেন্ডস অভ ক্যালিফোর্নিয়া আনমনে বইটা হাতে নিয়ে পাতা ওল্টাতে লাগল। দৃষ্টি আটকে গেল আবার বইয়ের একটা অধ্যায়ে:
সী-সাইড: ড্রীম অভ আ সিটি দ্যাট ডাইড
হুমম, আপন মনে মাথা দোলাল রবিন, ইনটারেসটিং!
বইটা একপাশে সরিয়ে রাখল সে। বেশ ভাল একটা লেখা পেয়ে গেছে। পড়ার জন্যে আকুল হয়ে উঠল মন, কিন্তু আগে কাজ শেষ করতে হবে। তাড়াহুড়ো করে বই তুলতে লাগল।
বই তোলা শেষ হলে তাকে ডাকলেন লাইব্রেরিয়ান। কয়েকটা বইয়ের মলাট, পাতা ছিঁড়ে গেছে, আঠা দিয়ে ওগুলো জোড়া দিতে বললেন।
পেছনের একটা ঘরে সমস্ত সরঞ্জাম রয়েছে। বইগুলো তুলে নিয়ে সেখানে চলে এল রবিন। খুব দ্রুত হাত চালাল। কিন্তু কাজটা সহজ নয়, সময় লাগলই।

মেরামত সেরে সেগুলো নিয়ে আবার লাইব্রেরিয়ানের কাছে ফিরে এল সে। হয়ে গেছে। আর কিছু?
হাসলেন লাইব্রেরিয়ান। খুব তাড়া আছে মনে হচ্ছে?
হ্যাঁ, একটা বই পেয়েছি, হেসে বলল রবিন।
আর থাকতে পারছ না, না? হাসলেন লাইব্রেরিয়ান। নাহ, আপাতত আর কিছু নেই। যাও, পড়োগে। দরকার হলে ডাকব।
তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে পড়ার টেবিলে চলে এল রবিন।
অধ্যায়টা চিহ্ন দিয়েই রেখেছিল। খুলে পড়তে শুরু করল:
দুর্ভাগ্যের শিকারে পরিণত হয়, এমন অনেক শহর আছে। শহরের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলোর বাসিন্দাদের ভাগ্যেও নেমে আসে অমঙ্গল। সী সাইডের অবস্থাও হয়েছে তাই। কী রিসোর্ট কমিউনিটি হওয়ার কথা ছিল ওটার, কিন্তু সে-স্বপ্ন নস্যাৎ হয়ে গেছে পঞ্চাশ বছর আগে।
ঝলমলে যে কর্মব্যস্ত শহরের কল্পনা করেছিল এর পরিকল্পনাকারীরা, তাদের সর্বস্ব বাজি ধরেছিল এর পেছনে, কার্যকর হয়নি। তারা কল্পনা করেছিল, ভেনিস নগরীর মত এটাতেও জালের মত বিছিয়ে থাকবে খাল আর প্রণালী। কিন্তু তাদের আশাকে দুমড়ে-মুচড়ে দিয়ে গড়ে উঠল অসংখ্য কারখানা। একদা রমরমা হোটেলগুলোর কিছু পরিবর্তিত হয়ে গেল বোর্ডিং হাউসে, বাকিগুলো সব প্রাণ দিল বুলডোজারের কঠিন চোয়ালে-উত্তর-দক্ষিণে চলে যাওয়া সুবিশাল মহাসড়ককে জায়গা ছেড়ে দেয়ার জন্যে।
সী-সাইডের সবচেয়ে তিক্ত ঘটনা সম্ভবত এর ভূগর্ভ রেলওয়ে তৈরির ব্যর্থতা। পশ্চিম উপকূলে পাতালরেল ওটাই প্রথম তৈরি হওয়ার কথা ছিল। ব্যর্থতার একটা মূল কারণ, সাধারণ মানুষের কাছ থেকে বিশেষ সাড়া মেলেনি। ফলে শুরুতেই থেমে গেল কর্মব্যস্ততা, কয়েক মাইল সুড়ঙ্গ তৈরি হলো বটে, কিন্তু ওই পর্যন্তই। পরিত্যক্ত হতে সময় লাগল না। ভূতুড়ে সুড়ঙ্গ এখন ওটা।
এই অবস্থা! অবাক হলো রবিন। বইটা লেখা হয়েছে অনেক আগে, প্রায় পঞ্চাশ বছর। তারমানে সী-সাইড মারা গেছে তারও আগে, অর্থাৎ পঞ্চাশ বছরের বেশি। ভাগ্যিস পেয়ে গিয়েছিল টেবিলের ওপর, নইলে শহরটার এই করুণ ইতিহাস হয়তো জানা হতো না কোন দিনই।
কিছু কিছু পয়েন্ট নোটবুকে টুকে নিয়ে বইটা তাকে তুলে রাখল সে। তারপর বসে বসে ভাবতে লাগল। কিশোরকে বলার মত অনেক কিছু জেনেছে, কিন্তু সেগুলো উগরানোর জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। ছুটি হতে দেরি আছে।
সময় হলো। লাইব্রেরিয়ানকে গুডবাই জানিয়ে বেরিয়ে এল রবিন। সাইকেল চালিয়ে বাড়ি ফিরল। মা রাতের খাবার সাজাচ্ছেন। বাবা খবরের কাগজ

পড়ছেন, মুখে পাইপ। রবিনের সাড়া পেয়ে মুখ তুলে হাসলেন। এই যে, রবিন, কি হয়েছিল তোমার? এত কাদা লাগল কোত্থেকে? ওয়াশিং মেশিনটা তো বাপ বাপ ডাক ছাড়ল ধুতে গিয়ে।
গর্তে পড়েছিলাম, বাবা। প্রথমে ভেবেছিলাম চোরাকাদা। পরে বুঝলাম, সাধারণ কাদা। তবে সাংঘাতিক আঠা।
কোথায় সেটা?
সী-সাইডে গিয়েছিলাম কেসের তদন্ত করতে। একটা গুহায় ঢুকলাম। অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না। ঢুকেই পড়লাম গর্তের মধ্যে। চোরাকাদা ভেবে তো জানই উড়ে গিয়েছিল।
মাথা ঝাঁকিয়ে কাগজটা নামিয়ে রাখলেন মিস্টার মিলফোর্ড। হু, জায়গাটা খারাপই। সব ছিল চোর-ডাকাতের আড্ডা। লোকে তো ঢোকারই সাহস পেত না। শুনেছি অনেকেই নাকি ঢুকে আর বেরোতে পারেনি।
আমিও শুনেছি। লাইব্রেরিতে একটা বই পেয়ে গেলাম আজ হঠাৎ করে। জন্মেই নাকি মারা গেছে সী-সাইড, বেড়ে ওঠার আর সুযোগ পায়নি। তুমি কিছু জানো?
খবরের কাগজের লোক মিস্টার মিলফোর্ড, প্রচুর পড়াশোনা। রবিনের তো ধারণা, তার বাবা চলমান জ্ঞানকোষ।
আবার মাথা ঝাঁকালেন তিনি। হ্যাঁ। কত লোকের সর্বনাশ যে করেছে শহরটা। ওটার পেছনে টাকা খরচ করে ফকির হয়ে গিয়েছিল কত কোটিপতি, শেষে রুটি কেনার পয়সা পর্যন্ত জোটেনি। কপালই খারাপ ওদের, নইলে অ্যামিউজমেন্ট পার্কে আগুন লাগবে কেন? ওই হলো ধ্বংসের সূত্রপাত।
আমার কাছে কিন্তু এত খারাপ লাগল না শহরটা। বেশ বড়, প্রায় রকি বীচের সমান।
হাসলেন মিস্টার মিলফোর্ড। পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে হলে এ কথা বলতে পারতে না। শহর ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর যারা তখনও টিকে রইল, তারা আবার ওটাকে গড়তে শুরু করল তিল তিল করে। অনেক পরিশ্রম আর আত্মত্যাগের পর আজ ওই অবস্থায় এসেছে। এখন আর পোড়া শহর বলে না কেউ, তবে স্বপ্ননগরীও আর হবে না কোনদিন। এখন ওটা কারখানা-শহর, টাকা কামানোর জায়গা।
যা দেখলাম-টেখলাম, কামানো বোধহয় খুব কঠিন। আচ্ছা, একটা আণ্ডারগ্রাউণ্ড রেলওয়ে তৈরি হওয়ার কথা নাকি ছিল ওখানে?
ছিল। সামনে ঝুঁকলেন মিস্টার মিলফোর্ড, স্বপ্ননগরী তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন একজন কোটিপতি। আর এই ভুলের জন্যে, শেষমেশ প্রাণ দিতে হয়েছিল তাকে। কাজটা শুরু করেই বোকা বনে গিয়েছিলেন ভদ্রলোক। বিশাল পরিকল্পনা। একচুমুকে যেন কোটি কোটি টাকা গিলে শেষ করে ফেলল পরিকল্পনার বিশাল

দৈত্যটা। চোখের পলকে ফুরিয়ে গেল সব টাকা। এমনটা যে ঘটবে কল্পনাই করতে পারেননি তিনি। আশা করেছিলেন, শুরু করলে অনেকেই এগিয়ে আসবে সাহায্য করতে, কিন্তু এল না। পথের ফকির হয়ে শেষে আত্মহত্যা করতে হলো তাকে।

ঘনঘন বারকয়েক পাইপে টান দিয়ে ধোয়া ছাড়লেন তিনি। নামটা এখন মনে করতে পারছি না। শেষ মুহূর্তে যদি কিছু লোক বিশ্বাসঘাতকতা না করত, সী-সাইড সত্যি একটা দেখার মত শহর হত এখন...

বেরসিকের মত বাধা দিলেন মিসেস মিলফোর্ড, খাবার তৈরি।

আরও অনেক কিছু জানার ইচ্ছে ছিল রবিনের, কিন্তু হলো না। দেরি করলে মা রেগে যাবেন। উঠে বাবার পিছু পিছু খাবার টেবিলের দিকে এগোতে হলো তাকে।

ডিনারের পর আবার হেডকোয়ার্টারে এসে ঢুকল তিন গোয়েন্দা।

আমি বলছিলাম কি, দৃঢ়কণ্ঠে বলল মুসা, মিস্টার জোনসের কুত্তা খোঁজার কাজটা আমাদের বাদ দেয়া উচিত। কি কাণ্ড! ভয়াবহ এক মানুষখেকো ড্রাগন, দু-জন শয়তান ডুবুরী-সঙ্গে আবার স্পীয়ারগান থাকে, লোকের গায়ে বর্শা গাঁথার জন্যে হাত নিশপিশ করে ওদের। মানুষ পেলেই গিলতে চায় যে কাদা-ভরা গর্তটা, ওটার কথা নাহয় বাদই দিলাম। আর পুরানো কাঠের সিঁড়ি, যেটা থেকে পড়ে কোমর ভাঙার জোগাড় হয়, ওটাও নাহয় ধরলাম না। বাড়িতে ফিরেও যন্ত্রণার কমতি নেই। ভূতুড়ে টেলিফোন আসে, গুহার কাছ থেকে দূরে থাকতে বলে। উপদেশটা খুব পছন্দ হয়েছে আমার।

ভূতুড়ে টেলিফোন? চোখ বড় বড় হয়ে গেল রবিনের।

তুমি যাওয়ার পর, কিশোর বলল, একটা ফোন এসেছিল। কি কি বলেছে, জানাল রবিনকে।

আমার কাছে ভোগলামী মনে হচ্ছে, শুকনো গলায় বলল রবিন।

কারও শয়তানী। সে চায় না, আমার গুহাটার কাছে যাই। না যাওয়াই বোধহয় ভাল।

যাব না মানে? গম্ভীর হয়ে গেল কিশোর, এখনও ড্রাগনটাকেই দেখিনি। ভাবছি, আজ রাতেই দেখতে যাব।

ভোটাভুটি হয়ে যাক তাহলে, প্রস্তাব দিল মুসা। আমি, না। কারও হ্যাঁ বলার থাকলে বলতে পারো।

হা! হা! হা! মাথার ওপরে ঝোলানো খাঁচা থেকে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল ব্ল্যাকবিয়ার্ড, লঙ জন সিলভারের সেই ময়নাটা, রেখে দিয়েছে তিন গোয়েন্দা।

চুপ, ব্যাটা! কড়া ধমক লাগাল মুসা। তোকে কথা বলতে কে বলেছে? তুই কি তিন গোয়েন্দার কেউ? হারামীপনার আর জায়গা পাওনি, ব্যাটা। ভোট নিয়ে মস্করা

করতে এসেছ। বেশি জ্বালাতন করলে খাঁচাসুদ্ধ নিয়ে গিয়ে ফেলে দিয়ে আসব গুহায়।
গ্রাহ্যই করল না ব্ল্যাকবিয়ার্ড। টেনে টেনে বলল, মরা মানুষ...মরা মানুষ। অ্যায়াম ব্ল্যাকবিয়ার্ড দ্য পাইরেট। হেহ হেহ হেহ্! তারপর মুখ খারাপ করে গাল দিল কয়েকটা, কান গরম করে দিল মুসার।
যা শোনে তাই মনে রাখে ব্যাটা, বলল রবিন। ওই যে শুনেছে, মরা মানুষ, ব্যস, আর ভুলবে না। চান্স পেলেই বলবে।
একদিন ওটার ঘাড় না মটকে দিয়েছি তো আমার নাম মুসা আমান নয়, ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল মুসা। কিন্তু রবিন আর কিশোর জানে, তা সে কোনদিনই করবে না। তার অনুরোধেই পাখিটা রেখে দিয়েছে কিশোর, নইলে অন্যগুলোর সঙ্গে ওটাকেও দিয়ে আসত মিস কারমাইকেলের পাখির আশ্রমে। তবে বেশি জ্বালাতন করলে কিশোরের কথাও আর শুনবে না, ঠিকই চালান করে দিয়ে আসবে।
যাকগে। তো, এখন কি ঠিক হলো? আগের কথার খেই ধরল। কিশোর।
আমি যাচ্ছি না, মুসার সাফ জবাব।
কেন?
ভয় পাচ্ছি।
ভণিতা করছ তুমি, মুসা, হাসল কিলোর। এই সামান্য ব্যাপারে ভয় পাওয়ার ছেলে তুমি নও। মাঝে মাঝে তোমার সাহস দেখে আমারই তাক লেগে যায়। সেই আমাজনের জঙ্গলে...
ব্যস ব্যস, হয়েছে, আর ফোলাতে হবে না, হাত তুলল মুসা, যাব, যাও। মরলে তারপর দেখাব মজা...
মরলে তো মরেই গেলে, কিশোরের হাসি রবিনের মাঝেও সংক্রমিত হয়েছে। আর দেখাবে কি করে?
মরে গেলাম মানে? তোমরা মরবে না, যখনই মরো? আমি নরকে গেলে তোমরাও ওখানে যাবে। আগে মরলে বরং কিছু সুবিধে, শয়তানের সঙ্গে ভাব হয়ে যাবে আমার। তোমরা যখন যাবে তখন আমি অনেক পুরানো দোজখী, চোটপাট অনেক বেশি...
হয়েছে, হয়েছে, বাধা দিল কিশোর। তোমার চোটপাট বেশি হলেই আমাদের সুবিধে। নরকে সুযোগ-সুবিধা বেশি পাব। রিসিভারের দিকে হাত বাড়াল সে।
কাকে করবে? জিজ্ঞেস করল মুসা।
হ্যানসনকে। গাড়িটা দরকার। তোমার সম্মানার্থে আজ রোলস রয়েসে করেই যাব।

.
ঘণ্টাখানেক পর, গাড়ির জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রয়েছে মুসা।
রাজকীয় রোলস রয়েস। চকচকে কালো শরীরের ওপর সোনালী অলঙ্করণ, শত গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে গাড়িটার রূপ। শক্তিশালী বিশাল ইঞ্জিনের শব্দ প্রায় নেই বললেই চলে। উড়ে চলেছে যেন উপকূলের মহাসড়ক ধরে। দক্ষ, ভদ্র, খাঁটি ইংরেজ শোফারের হাতে পড়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছে গাড়ি, তার প্রতিটি নির্দেশের সাড়া দিচ্ছে চোখের পলকে, বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ না করে।
বাজিটা সেদিন তুমি না জিততে পারলেই বোধহয় ভাল হত, কিশোর, মুসা বলল। এই গাড়িটাই যত নষ্টের মূল। তিন গোয়েন্দা সৃষ্টিতে ওর মস্তবড় অবদান রয়েছে, অবশ্যই খারাপ অর্থে। কত বিপদে যে পড়লাম।
দোষটা কিশোরের চেয়ে অগাস্টের বেশি, মুসা, হেসে মনে করিয়ে দিল রবিন। বাজি জিতে তো মাত্র তিরিশ দিনের জন্যে পাওয়া গিয়েছিল গাড়িটা। কিন্তু অগাস্টই তো চিরকালের জন্যে বহাল করে দিল।
এবং সর্বনাশ করল আমাদের, ঘোঁৎ-ঘোৎ করল মুসা। নরম গদিতে আরাম করে হেলান দিয়ে হাসল। তবে এরকম গাড়িতে চড়ার আলাদা আনন্দ। আরামের কথা বাদই দিলাম, নিজেকে খুব হোমরা চোমরা মনে হয়। আহ, কোটিপতি ব্যাটারা কি মজায় না আছে।
সী-সাইডে পৌঁছল রোলস রয়েস। হ্যাঁনসনকে পথ বাতলে দিল কিশোর।
সাগরপাড়ে পৌঁছল গাড়ি।
আপনি এখানেই থাকুন, হ্যাঁ, শোফারকে বলল কিশোর। আমরা আসছি।
ভেরি গুড, মাস্টার পাশা, বিনয়ের চূড়ান্ত করে ছাড়ে হ্যাঁনসন, এত বেশি, একেক সময় কিশোরের লজ্জাই লাগে।
বড় বড় হেডলাইট দুটো জ্বেলে রেখেছে হ্যাঁনসন, তিন গোয়েন্দার হাঁটার সুবিধের জন্যে। হেডলাইট তো নয়, যেন সার্চলাইট, পথের ওপর ছড়িয়ে দিয়েছে তীব্র আলো।
নামল ছেলেরা। গাড়ির পেছনে গিয়ে বুট খুলল কিশোর।
টর্চ.ক্যামেরা:-টেপরেকর্ডার, নিতে নিতে বিড়বিড় করছে সে, নিজেকে বোঝাচ্ছে, জরুরী অবস্থার জন্যে তৈরি এখন আমরা। ডকুমেন্ট রাখতে পারব।
রেকর্ডারটা রবিনের হাতে দিল। ড্রাগন, কিংবা ভূতের যে শব্দই শোনো, রেকর্ড করবে। কিছুই বাদ দেবে না।
মুসার হাতে খুব শক্তিশালী একটা টর্চ দিল সে। আরেকটা দিল রবিনকে। নিজে রাখল একটা। এক বাণ্ডিল দড়ির ভেতরে হাত ঢুকিয়ে। দিয়ে কাঁধে ঝুলিয়ে নিল সেটা।

দড়ি কেন? জিজ্ঞেস করল মুসা।
কোটা যে কখন কাজে লাগবে কে জানে। তৈরি থাকা ভাল। একশো ফুট নাইলনের দড়ি আছে এখানে, হালকা, কিন্তু খুব শক্ত। একটা সিঁড়ি তো ভেঙেছে, আরেকটার কি অবস্থা কি জানি। যদি ওটাকেও ভেঙে পড়ার অবস্থা করে রাখে? দড়ি লাগবে না তখন? উঠে আসব কি বেয়ে?
আর কিছু বলল না মুসা।
গাড়ির আলোর সীমানা শেষ হলো। তারপর অন্ধকার পথটুকু চুপচাপ হাঁটল তিন গোয়েন্দা। দ্বিতীয় সিঁড়িটার কাছে এসে দাঁড়াল। প্রথমটা, ওই যেটা সকালে ভেঙে ছিল, সেটার কাছ থেকে কয়েকশো গজ দূরে দ্বিতীয়টা।
সবাই ঝুঁকে তাকাল নিচে। নির্জন সৈকত। হালকা মেঘের ফাঁকে লুকোচুরি খেলছে উঠতি চাঁদ। ঘোলাটে আলো ছড়িয়ে পড়েছে। বেলাভূমিতে। বালিয়াড়িকে একনাগাড়ে চুমু খাচ্ছে ছোট ছোট ঢেউ, তার মোলায়েম মৃদু হিসহিস শব্দ কানে আসছে। নিয়মিত সময় পর পর ছোট ঢেউয়ের মাথায় ভর করে যেন ছুটে আসছে পাহাড়-প্রমাণ বিশাল ঢেউ, আছড়ে পড়ে ভাঙছে তীরে, বিকট শব্দে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে হিসহিসানি, সামান্য বিরতি দিয়ে আবার শুরু হচ্ছে।
অস্বস্তি বোধ করছে মুসা। শুকনো ঠোঁটে জিভ বোলাল। পুরানো কাঠের সিঁড়ির রেলিঙ আঁকড়ে ধরে রেখেছে, ধীরে ধীরে বাড়ছে আঙুলের চাপ। কান খাড়া করে শুনছে।
রবিন আর কিশোরও কান খাড়া রেখেছে।
বড় ঢেউয়ের ভোঁতা গর্জন, আর ছোট ঢেউয়ের মোলায়েম হাসি ছাড়া আর কিছুই কানে আসছে না। না না, আসছে, যার যার বুকের ঢিপঢিপানি।
চলো, নামি, অবশেষে বলল মুসা। আল্লাহগো, তুমিই জানো।
কয়েক ধাপ নেমেই থেমে গেল কিশোর। পেছনে অন্য দু-জন।
কি হলো? ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল মুসা।
সাগরের গর্জন একটু বেড়েছে না? বলল কিশোর।
কান পেতে ভালমত শুনল মুসা।
তার শ্রবণশক্তি অন্য দু-জনের চেয়ে জোরাল। কি জানি। সেরকমই তো লাগছে। হয়তো আমাদেরকে হুশিয়ার করছে ঢেউ।
সিঁড়ির ধাপগুলো অস্পষ্ট। মুখে কামড় মারছে যেন রাতের নোনা হাওয়া। ঠেলে বেরিয়ে রয়েছে পাহাড়ের চূড়া, চাঁদের আলোয় বিষণ্ন ছায়া ফেলেছে বালিতে।
ওদের ভারে ভেঙে পড়ল না সিঁড়ির তক্তা। ভয় কাটল, পরের কয়েকটা ধাপ পেরোল দ্রুত। লাফিয়ে বালিতে নেমে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।
ওপরে তাকাল কিশোর। পাড়ের দু-একটা বাড়িতে এক-আধটা আলো জ্বলছে।

গুহামুখের কাছে এসে দাঁড়াল ওরা। কান পাতল শোনার জন্যে, ভালমত দেখল আশপাশটা। শব্দও নেই, কিছু চোখেও পড়ল না। গুহার ভেতরে নড়ছে না কিছু।
আবার ওপরে তাকাল কিশোর। ঠেলে বেরোনো চূড়ার জন্যে। পাড়ের ওপরের বাড়িঘর কিছু চোখে পড়ছে না। ভ্রুকুটি করল সে। এই যে না দেখা যাওয়ার ব্যাপারটা, এটাকে একটা পয়েন্ট বলে মনে হলো তার, কিন্তু কেন সেটা বুঝতে পারল না।
অবশেষে মাথা ঝাঁকাল সে, অল ক্লিয়ার।
নিঃশব্দে ভেতরে ঢুকে পড়ল ওরা। কান পাতল আবার কিশোর।
মুসার অবাক লাগছে। গেরিলা যোদ্ধার মত আচরণ করছে। গোয়েন্দাপ্রধান, যেন যে-কোন মুহূর্তে আক্রমণের ভয় করছে।
ব্যাপার কি? ফিসফিস করল মুসা। বিপদ আশা করছ?
সাবধানের মার নেই, ঘুরিয়ে জবাব দিল কিশোর। টর্চ জ্বালল মুসা। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আলো ফেলে গুহাটা দেখতে শুরু করল। মাটিতে চোখ পড়তেই অস্ফুট শব্দ করে উঠল। বলল, আরি! ওখানেই শেষ হয়ে গেল গুহাটা, ওই যে, ওই গর্তের ওপারে। ডাইভার দু-জন তাহলে গেল কই?
আলো জ্বেলে কিশোরও দেখছে। গুহাটা এত ছোট হবে ভাবিনি। মুসা, ঠিকই বলেছ, ওরা গেল কই? কোন পথে?
গুহার দেয়াল পরীক্ষা করতে লাগল তিনজনে।
নিরেট, মাথা নাড়ল মুসা। নাহ্, মাথামুণ্ড কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।
কি বোঝা যাচ্ছে না? জিজ্ঞেস করল রবিন।
দেখছ না, কি ছোট গুহা? গর্তটাও ছোট। ড্রাগনের জায়গা হবে না।
বিস্ময় ফুটল কিশোরের চোখে। অথচ মিস্টার জোনস বললেন, চূড়ার নিচে এদিকেই কোথাও ড্রাগন ঢুকতে দেখেছেন। গর্তের পাড়ে দাঁড়িয়ে নিচে তাকাল সে। আর, ডাইভার দু-জনও বাতাসে মিলিয়ে যেতে পারে না। হয় ধারেকাছেই আরও গুহা আছে, কিংবা এই গুহারই আরও মুখ আছে। সুড়ঙ্গ আছে।
কিশোর! বলে উঠল রবিন। একটা কথা মনে পড়েছে।
দ্রুত জানাল সে, বইয়ে কি পড়েছে, আর বাবার মুখে কি কি শুনেছে।
চিন্তিত দেখাল কিশোরকে। সুড়ঙ্গ?
উত্তেজিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল রবিন। পাতাল রেলের জন্যে খোঁড়া হয়েছিল। কাজ শেষ হয়নি। এখনও আছে, ভূতুড়ে রেলপথ বলা যায়।
হুঁ! মাথা দোলাল কিশোর। কিন্তু কোথায় সেটা কে জানে। কয়েক মাইল দূরেও হতে পারে। এমনও হতে পারে, এখানেই এসে শেষ হয়েছে সুড়ঙ্গের মাথা, কিংবা এখান থেকেই শুরু হয়েছে।

কিশোর পাশাকে চমকে দেবে ভেবেছিল, কিন্তু হতাশ হতে হলো রবিনকে। হতে পারে।
খুঁজে বের করব রেলপথটা, কিশোর বলল। ম্যাপ পেলে ভাল হত। সী-সাইড সিটি প্ল্যানিং বোর্ড অফিসে গেলে হয়তো পাওয়া যাবে।
পঞ্চাশ-ষাট বছর পর? হেসে উঠল মুসা। যে এঁকেছিল, এতদিনে নিশ্চয় মরে ভূত হয়ে গেছে। আর ম্যাপটা থাকলেও চাপা পড়েছে পুরানো কাগজ আর বালির তলায়। খুঁজে পাওয়া যাবে না।
মাথা ঝাঁকাল কিশোর। হয়তো। এসো, এখন ম্যাপ ছাড়াই খুঁজে দেখি পাওয়া যায় কিনা।
এক কাজ করলে কেমন হয়? আজ সকালে তক্তার আড়ালে যে গুহাটা দেখেছি, ওটা থেকে শুরু করলে?
মন্দ বলনি, কিশোর বলল।
রবিনও একমত হলো।
গুহাটার কাছে চলে এল তিন গোয়েন্দা।
বালি সরাতেই বেরিয়ে পড়ল একটা বড় তক্তা। উত্তেজনায় জ্বলে, উঠল কিশোরের চোখ।
লক্ষ করল রবিন। গলা বাড়িয়ে দিল, কী?
ভুরু কুঁচকে গেছে কিশোরের। বুঝতে পারছি না এখনও। মনে হচ্ছে এটা প্লাইউড।
প্লাইউড? হলেই বা কি বুঝতে পারছে না রবিন।
আমার তাই বিশ্বাস। তক্তায় হাত বুলাচ্ছে কিশোর। এই রহস্যের সঙ্গে এর কি সম্পর্ক?...থাক, পরে ভাবব। আপাতত বালি সরাই, তক্তাগুলো যাতে সরানো যায়।
বালি সরিয়ে তক্তার গোড়া আলগা করে ফেলল ওরা। তক্তা সরিয়ে পথ করে সাবধানে ঢুকল সরু জায়গাটায়। আবার আগের জায়গায় লাগিয়ে রাখল তক্তা। টর্চ জ্বালল।
ছোট্ট একটা গুহা। নিচু ছাত। আর সামান্য নিচু হলেই সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারত না মুসা, মাথায় লাগত। ভেজা ভেজা। খানিক দূর এগিয়ে হঠাৎ ঢালু হয়ে মিশেছে উল্টোদিকের একটা পাথুরে তাকের সঙ্গে।
পথ নেই, বিড়বিড় করল মুসা।
চোর-ডাকাতের জন্যে চমৎকার লুকানোর জায়গা, বলল কিশোর। অতীতে নিশ্চয় খুব ব্যবহার হত। তক্তা যেভাবে লাগিয়েছে, বোঝাই যায়, গোপন কুঠুরী বানিয়েছিল এটাকে।
মেঝেতে আলো ফেলল রবিন। ডাকাত হলে কিছু মোহর কি আর ফেলে যায়নি?

মোহরের কথায় রবিনের সঙ্গে মুসাও খুঁজতে লেগে গেল। বসে পড়ে বালির স্তর সরিয়ে দেখতে লাগল কোথায় লুকিয়ে আছে গুপ্তধন।
আগে হাল ছাড়ল মুসা। দূর, কিছু নেই।
রবিন খুঁজতে খুঁজতে চলে গেল শেষ মাথার কাছে। কোণের দিকেই মোহর স্তূপ করে রাখে ডাকাতরা। আঁউ!
তক্তাগুলোর ওপর আলো ফেলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কি দেখছিল কিশোর, ঝট করে ঘুরল। কি হলো, রবিন?
ঘড়ঘড় একটা শব্দ। রবিন গায়েব।
রবিন! চেঁচিয়ে উঠে দৌড় দিল কিশোর। দাঁড়িয়ে গেল যেন। হোঁচট খেয়ে, হাঁ হয়ে গেছে।
কি হয়েছে? উঠে দাঁড়িয়েছে মুসা।
হাত তুলে দেখাল কিশোর। মুহূর্ত আগেও ওখানে ছিল। দেখনি? তারপর দেয়ালটা যেন গিলে ফেলেছে ওকে!
কী? কিশোরের পাশ দিয়ে দেয়ালের দিকে ছুটল মুসা। কাছে গিয়ে আলো ফেলে ভালমত দেখল। কই, কিছু তো নেই। গর্ত-টর্তও নেই।
খানিক আগে রবিন মোহর খুঁজছিল যে জায়গাটায় সেখানে মাটিতে বসে হাত বুলিয়ে দেখল মুসা। আবার হলো ঘড়ঘড় শব্দ। চমকে সরে এল সে। চোখ বন্ধ করে ফেলল ভয়ে।
ও-কে, হাসিহাসি কণ্ঠ কিশোরের, আবার উদয় হচ্ছে রবিন।
চোখ মেলল মুসা। ছোট্ট একটা অংশ সরে গেছে, দেয়ালের ওখানে কালো ফোকর যেন মুখব্যাদান করল। হামাগুড়ি দিয়ে ওপথে বেরিয়ে এল রবিন। আবার বন্ধ হয়ে গেল ফোকর।
কি বুঝলে? মিটিমিটি হাসছে রবিন। পাথরের গোপন দরজা। ঠেস দিয়ে বসেছিলাম ওটায়। ব্যস, গেল সরে।
ওপাশে কি আছে? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
ঝুলে পড়ল রবিনের চোয়াল। দেখারই সময় পাইনি। এত তাড়াতাড়ি ঘটে গেল সব কিছু...দেখি তো আবার খোলা যায় কিনা।
দেয়ালে আবার হেলান দিয়ে বসল সে। চাপ দিল। কিছুই ঘটল। না। সামান্য সরে কাঁধ দিয়ে আবার ঠেলা দিল। ক্লিক করে মৃদু একটা শব্দ হলো, তারপরই শুরু হলো ঘড়ঘড়। পাথর সরে যেতেই পেছনে হেলে পড়ল তার শরীর। আবার ঢুকছি! জলদি এসো, বন্ধ হয়ে যাবে।
লাফ দিয়ে এগিয়ে এল কিশোর আর মুসা। ঢুকে গেল রবিনের পিছু পিছু।

বাব্বারেহ্! গাল ফুলিয়ে ফুস করে মুখ দিয়ে বাতাস ছাড়ল মুসা। আরব্য রজনীর জিন নাকি? চিচিং ফাঁব বলতেই, দুই হাত দুই দিকে ছড়াল সে, হাঁ!
এটা অনেক বড় গুহা, ছড়ানো। ছাতও অনেক উঁচু।
ফোকরের কাছ থেকে সরে এল ওরা, গুহাটা ঘুরেফিরে দেখার জন্যে।
ক্লিক করে শব্দ, পরক্ষণেই ঘড়ঘড়। ঘুরল ওরা, কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। বন্ধ হয়ে গেছে ফোকর।
খাইছে! আঁতকে উঠল মুসা। বেরোব কি করে?
রবিন যেভাবে বেরিয়েছে, শান্তকণ্ঠে বলল কিশোর।
ও কিছু না। সহজ কোন লিভারেজ সিসটেম। চলো আগে গুহাটা দেখি, পরে এসে লিভার খুঁজে বের করব। ভয় পেয়ো না, খোলা যাবে ঠিকই।
ছাতের দিকে তাকাল রবিন। কিশোর, আমার মনে হয় এটাই। এটার কথাই পড়েছি রেফারেন্স বইয়ে। সাইজ দেখেছ?
হতে পারে, কিশোর বলল। কিন্তু, রবিন, লক্ষ করেছ আর সব প্রাকৃতিক গুহার মত এটার দেয়ালও রুক্ষ, খসখসে। ছাতে খোঁচা খোঁচা পাথর বেরিয়ে আছে। মানুষের তৈরি হলে সমান হত, মসৃণ। পাতাল রেলের সুড়ঙ্গ সিমেন্ট দিয়ে তৈরি হয়, সমান হতেই হবে।
আলো ফেলে ফেলে দেয়াল, ছাত আবার দেখল সে, মাথা নাড়ল। নাহ, প্রাকৃতিক গুহাই মনে হচ্ছে। সাগরের দিক থেকে ঢোকার সরাসরি কোন পথ দেখছি না। নিরেট পাথরের দেয়াল। চলো, এগিয়ে। দেখি। যে সুড়ঙ্গটা খুঁজছি, হয়তো সামনেই আছে সেটা।
যাক, বাঁচা গেল। হাত নাড়ল মুসা। সাগরের দিকে পথ নেই। তারমানে ড্রাগন ঢুকতে পারবে না এখানে।
তা তো হলো, হেসে বলল কিশোর। কিন্তু ভুলে যাচ্ছ, গুহাটা বিরাট। জায়গা হয়ে যাবে, চমৎকার বাসা হবে ড্রাগনের।
মনে করিয়ে দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ, অস্বস্তি ফিরে এল আবার মুসার কণ্ঠে। একটা সেকেণ্ডের জন্যে নিশ্চিত হওয়ার জো নেই, এমনই কাণ্ড!
মেঝে বেশ সমান, মসৃণ বলা না গেলেও আর সব গুহার মত খসখসে নয়।
শেষ মাথায় এসে থমকে দাঁড়াল ওরা। ছাত থেকে খাড়া নেমেছে। পাথরের দেয়াল.। পথ নেই।
নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর।
কি ভাবছ? জিজ্ঞেস করল রবিন।
ওই দেয়ালটা, সামনে হাত তুলে দেখাল কিশোর, ঠিক দেয়ালের মত লাগছে না।

আমার কাছে তো দেয়ালই লাগছে।...ভেবেছিলাম পথটথ পাব, সুড়ঙ্গে... থেমে গেল সে। কিশোরের মনোযোগ তার দিকে নেই।
চোখ আধবোজা হয়ে গেছে গোয়েন্দাপ্রধানের, এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল দেয়ালের কাছে। থাবা দিল, কিল মারল, টোকা দিল। কান খাড়া করে আওয়াজ শুনছে। আরেকটা জায়গায় আঘাত করে শুনল, হাত রেখে অনুভব করল কি, যেন।
তফাৎ আছে, অবশেষে বলল সে। বোঝাতে পারব না কেমন, তবে...
তাতে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল? অধৈর্য হয়ে পড়েছে। মুসা। চলো। শীত করছে আমার।
উজ্জ্বল হলো কিশোরের মুখ। পেয়েছি! চুটকি বাজাল দুই আঙুলে। ঠাণ্ডা...
সে কথাই তো বলছি...
আমি শীতের কথা বলছি না। বলছি, দেয়ালটা ঠাণ্ডা নয়। কিন্তু এই গুহারই অন্য সব দেয়াল ঠাণ্ডা। বিশ্বাস নাহলে গিয়ে হাত রেখে দেখতে পারো।
দেখল দুই গোয়েন্দা।
ঠিকই তো, মাথা দোলাল মুসা। তত ঠাণ্ডা নয়। কিন্তু তাতে কি? ছাতের ওপর বাড়িঘর আছে, ওগুলো থেকেই কোনভাবে নেমে এসেছে। উত্তাপ। দেয়াল গরম করেছে।
তাপ ওপর দিকে ওঠে, নিচে নামে না।
ওপাশে আরও গুহাটুহা আছে হয়তো, অনুমান করল রবিন। হয়তো ওই পাশটা গরম।
মাথা নাড়ল কিশোর। যুক্তিটা মানতে পারছে না। পকেট থেকে ছুরি বের করল।
হেসে উঠল মুসা। পাগল! ছুরি দিয়ে পাথর কাটবে? ফলা ভাঙবে খামাকা। ডিনামাইট দরকার।
মুসার কথায় কান না দিয়ে আঁচড় কাটল কিশোর। ছুরির আগা দিয়ে খোঁচা দিল। ধূসর আঠা আঠা পদার্থ লেগে গেল ছুরির ফলায়।
সঙ্গীদের দিকে ফিরল গোয়েন্দাপ্রধান। মুখে জয়ের হাসি, যেন সাংঘাতিক কিছু আবিষ্কার করে ফেলেছে। দুই গোয়েন্দার কাঁধের ওপর দিয়ে চোখ পড়তেই হাসি মুছে গেল মুখ থেকে। আ-আরে খুলে যাচ্ছে ...
চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরল দুই সহকারী গোয়েন্দা। বিশ্বাস করতে পারছে না। এ-কি কাণ্ড? সরে যাচ্ছে দেয়াল।
খুলছে খুলছে-ফিকে হচ্ছে অন্ধকার। বাতাস এসে লাগল ওদের মুখে।
স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ওরা। দুরুদুরু করছে বুক। দেয়ালের খোলা জায়গা দিয়ে আবছামত চোখে পড়ল সৈকতের বালি, তার পেছনে সাগরের সীমারেখা।
আগে সামলে নিল কিশোর। জলদি! ছোট গুহাটায় ঢোকো...

ছুটে এসে প্রায় দেয়ালে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল তিন গোয়েন্দা, এখান দিয়েই বেরিয়েছিল।
পাগলের মত লিভার খুঁজতে শুরু করল রবিন। পেল না। কাঁধ দিয়ে জোরে ধাক্কা দিল দেয়ালে। খুলল না। সঙ্গীদের দিকে ফিরে বলল, খুঁজে পাচ্ছি না..! গলা কাঁপছে।
পেতেই হবে, জোর দিয়ে বলল কিশোর।
তিনজনে তিন জায়গায় খুঁজতে লাগল। কোন ধরনের হাতল বা এমন কিছু রয়েছে, যাতে চাপ লাগলে খুলে যায় দরজা।
হঠাৎ আলোর বন্যায় ভেসে গেল গুহার ভেতর। জমে গেল যেন তিন কিশোর। দেয়াল আরও ফাঁক হয়েছে। কি যেন আসছে, এদিকেই। বিশাল একটা ছায়ামত, সাগর থেকে উঠেছে।
কিশোরের কাঁধ খামচে ধরল মুসা। সত্যিই দেখছি তো. কথা আটকে গেল।
কিশোরও স্তম্ভিত। মাথা নেড়ে সায় দিল। গলা শুকিয়ে কাঠ, চোখের পাতা ফেলছে ঘনঘন। ড্রাগন!
এগিয়ে আসছে দানবীয় সরীসৃপ। ভেজা চকচকে চামড়া, পানির কণা লেগে আছে। শরীরের তুলনায় ছোট মাথা, ত্রিকোণ। এদিক ওদিক দুলছে লম্বা সাপের মত গলা। হলুদ দুই চোখ থেকে আলো আসছে গুহার ভেতরে, যেন দুটো বিশাল, হেডলাইট। একটানা শব্দ করছে, অদ্ভুত একধরনের গুঞ্জন।
দেয়ালের খোলা অংশ জুড়ে দাঁড়াল ওটা। প্রাগৈতিহাসিক ডাইনোসর যেন মাথা নোয়াল। হাঁয়ের ফাঁকে লকলকে জিভটা ঢুকছে বেরোচ্ছে। ভোস ভোঁস করে শ্বাস ফেলছে, যেন দীর্ঘশ্বাস।
হাতল খোঁজায় বিরতি দিল না ওরা। বার বার দেয়ালে ধাক্কা দিয়ে দেখছে, খোলে কিনা।
গুহায় ঢুকছে ড্রাগন। শ্বাস টানছে জোরে জোরে, হাঁপানী রোগীর মত।
দেয়ালের গা ঘেঁষে দাঁড়াল ওরা, কুঁকড়ে বাঁকা করে রেখেছে। শরীর। আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে হাত উঠে গেছে মাথার ওপর।
লম্বা গলাটা বাড়িয়ে দিল ড্রাগন।
ভেজা চোয়াল ঝুলে পড়ল নিচে, বেরোল একসারি ঝকঝকে সাদা ধারাল দাঁত। আবার জোরে জোরে শ্বাস টানল কয়েকবার, ছোট্ট একটা কাশি দিয়ে থেমে দাঁড়াল।
আমাজনের জঙ্গলের জাগুয়ারের কথা মনে পড়ল কিশোরের। শিকার ধরার আগে এরকম করেই কাশে ওই ভয়ানক বাঘ। তারমানে ড্রাগনও এখন শিকার ধরবে।

কালচে মাথাটার দিকে স্থির হয়ে আছে কিশোরের চোখ, নড়াতে পারছে না, যেন সম্মোহিত করে ফেলেছে তাকে দানটা। ঝটকা দিয়ে মাথা সামনে বাড়াল, কিশোরকে ধরার জন্যেই বোধহয়।
পিছু হটার জায়গা নেই, বন্ধুদের কাছে সরে এল কিশোর। আঙুলগুলো মরিয়া হয়ে খুঁজল পেছনের দেয়াল। ইস্, কোথায় হাতলটা?
এগিয়ে আসছে ড্রাগনের হাঁ করা চোয়াল। গায়ে এসে লাগছে বাষ্পের মত ভেজা উত্তপ্ত নিঃশ্বাস।
পেছনের দেয়ালে কিট করে একটা শব্দ হলো। ঘড়ঘড় করে সরে গেল পাথর। ফোকর দিয়ে ভেতরে উল্টে পড়ল রবিন। তাকে ঠেলে সরিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকল মুসা। তার পর-পরই ঝাঁপ দিয়ে পড়ল কিশোর।
বন্ধ হয়ে গেল আবার পাথরের দরজা।
হাঁপ ছাড়ল ছেলেরা। কিন্তু সেটা ক্ষণিকের জন্যে।
ড্রাগনের চাপা, গর্জন শোনা যাচ্ছে ওপাশ থেকে। কেঁপে উঠল দেয়াল। থাবা মারছে যেন দানবটা, ধাক্কা দিচ্ছে।
ভাঙতে চাইছে। চেঁচিয়ে উঠল মুসা।
গর্জন বাড়ছে ওপাশে। ধাক্কায় থরথর করে কাঁপছে গুহার দেয়াল। ছাত থেকে ঝরতে শুরু করল বালি আর ছোট ছোট পাথর।
বাতাসে বালি উড়ছে, নাক দিয়ে ঢুকছে বালির কণা। দাঁতে কিচকিচ করছে বালি। কেশে উঠল মুসা, থুথু করে থুতু ফেলল।
ভূমিধস!
পড়েছি ফাঁদে আটকা! রবিনও কাশতে শুরু করল। দম বন্ধ হয়ে মরব এবার!
মনে পড়ল কিশোরের, বলা হয়েছে এখানে যখন তখন ভূমিধস নামে, জ্যান্ত কবর হয়ে যায় লোকের। কত লোক যে মরেছে এভাবে তার হিসেব নেই। বোঝা যাচ্ছে বানিয়ে বলেননি মিস্টার জোনস।
আরও পাথর পড়ল। ওপাশে যেন পাগল হয়ে গেছে ড্রাগনটা। গর্জনে কান ঝালাপালা।
ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল কিশোর, আতঙ্কে বুদ্ধি ঘোলা হয়ে গেছে। নইলে এই গুহা থেকেও যে বেরিয়ে যাওয়া উচিত সে কথা মনে পড়ত। তক্তার ওপর চোখ পড়তেই চেঁচিয়ে উঠল, তক্তা! বেরিয়ে যেতে হবে!
লাফ দিয়ে এগিয়ে গেল তিনজনে। পাগলের মত মাটি সরাতে লাগল দুই হাতে। যখন মনে হলো, আর কোনদিনই সরাতে পারবে না, ঠিক এই সময় নড়ে উঠল তক্তাটা।

ছোট ফাঁক দিয়ে হুড়োহুড়ি করে বেরিয়ে এল ওরা। তক্তাটা আবার জায়গামত বসিয়ে লাথি দিয়ে দিয়ে বালি ঠাসতে লাগল ওটার গোড়ায়। হাঁপাচ্ছে জোরে জোরে।
ভাগো, বলেই দৌড় দিল কিশোর।
এক ছুটে গুহা থেকে বেরিয়ে দৌড়ে চলল সৈন্ত ধরে। পাশে ছুটছে মুসা। রবিন পেছনে।
ওদের হাতের টর্চ নাচছে ছোটার তালে তালে, আলোর বিচিত্র রেখা তৈরি করছে বালিতে বার বার। ভাঙা সিঁড়িটা পেরিয়ে এল। এসে পৌঁছল ভাল সিঁড়িটার গোড়ায়। থামল না। পুরানো কাঠ ভেঙে পড়ার পরোয়া করল না, উঠে চলল একজনের পেছনে একজন। পাড়ের ওপরে নিরাপদ জায়গায় উঠে যেতে চায় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। ওখানে রয়েছে হ্যাঁনসন আর রাজকীয় রোলস রয়েস, একবার পৌঁছতে পারলে ছুটিয়ে নিয়ে যাবে ড্রাগনের কাছ থেকে দূরে। কিন্তু পারবে তো? পেছনে শোনা যাচ্ছে দানবের ভয়াবহ গর্জন।
অর্ধেক সিঁড়ি উঠে যাওয়ার পরেও ড্রাগনটাকে দেখা গেল না, তাদেরকে কামড়াতে এল না ভয়াবহ চোয়াল। শুধু শব্দ শোনা যাচ্ছে।
ওপরে উঠে এল ওরা। হাপরের মত ওঠানামা করছে বুক।
সামনে, দূরে লস অ্যাঞ্জেলেস শহরের আলো মিটমিট করছে। পথের মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে রোলস রয়েস।
গাড়ির কাছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল কিশোর, হ্যানসন, বাড়ি চলুন!
নিশ্চয়। উঠুন।
প্রাণ পেল বিশাল ইঞ্জিন। শাঁ করে মোড় নিয়ে প্যাসিফিক কোস্ট হাইওয়ে ধরে তীব্র গতিতে ছুটে চলল গাড়ি।
একটু সুস্থির হয়ে নিয়ে মুসা বলল, এত জোরে দৌড়তে পারো তুমি, কিশোর, জানতাম না।
আমিও না, গাল ফুলিয়ে মুখ দিয়ে বাতাস বের করে দিল কিশোর। দৌড়েছি কি আর সাধে?…জীবনে আর কখনও ড্রাগনের সামনে পড়েছি, বলো?
চামড়ামোড়া নরম গদিতে হেলান দিল রবিন। উফ্, বড় বাঁচা বেঁচেছি আজ। আরেকটু হলেই…
…গেছিলাম, কথাটা শেষ করে দিল মুসা। কিশোর, ড্রাগনের সামনে যে পড়ব কি করে জানলে তুমি? শুরু থেকেই হুঁশিয়ার ছিলে দেখেছি।
এমনি, না জেনেই হুঁশিয়ার। ড্রাগন দেখা গেছে শুনেছি তো।
আরিব্বাপরে, কি চেহারা ওটার। জীবনে ভুলব না।

আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না, রবিন মাথা নাড়ল। যত বই পড়েছি, কোনটাতেই লেখা নেই যে ড্রাগন, আজও বেঁচে আছে। কোনদিন ছিল, সে কথাও বিশ্বাস করেন না বিজ্ঞানীরা। ছিল শুধু রূপকথাতেই।
মাথা দোলাল কিশোর। চিমটি কাটতে শুরু করল নিচের ঠোঁটে। কোনদিন ছিল কিনা জানি না, কিন্তু এখন নেই। আর বাস্তবে যদি না-ই থাকে, তাহলে ড্রাগন দেখিনি।
কি বলছ? মুসা বলল। তিনজোড়া চোখ ভুল দেখতে পারে না। গুহায় ওটা কি দেখলাম? গরম নিঃশ্বাস এখনও গায়ে লাগছে মনে হচ্ছে।
আমারও লাগছে, রবিন বলল।
এক্সকিউজ মী, জেন্টলমেন, আর চুপ থাকতে পারল না হ্যাঁনসন। ড্রাগন দেখেছেন? জ্যান্ত?
হ্যাঁ, মুসা জবাব দিল। সাগর থেকে উঠে সোজা এসে ঢুকল গুহায়, আমরা যেটাতে ছিলাম সেটাতেই। আচ্ছা, হ্যাঁনসন, আপনার কি মনে হয়, ড্রাগন আছে?
মাথা নাড়ল শোফার। আমার মনে হয় না। তবে, স্কটল্যাণ্ডে শুনেছি ড্রাগনের মত একটা জীব আছে, অনেকে নাকি দেখেছে। বিশাল এক লেকে থাকে দানবটা।
লক নেস মনস্টারের কথা বলছেন? আগ্রহ দেখাল কিশোর।
হ্যাঁ। লোকে আদর করে ডাকে নেসি। একশো ফুট লম্বা।
আপনি কখনও দেখেছেন?
না। ছেলেবেলায় অনেকবার গেছি ওই হ্রদের ধারে, শুধু নেসিকে দেখতে। কিন্তু একবারও চোখে পড়েনি।
হুম। ড্রাগন তো তাহলে নিশ্চয় দেখেননি।
দেখেছি, পথের দিকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছে, হ্যাঁনসনের হাসিটা। দেখতে পেল না ছেলেরা।
দেখেছেন! এই না বললেন, দেখেননি?
দেখেছি, ফুটবল মাঠে, খেলার আগে।
ফুটবল মাঠে? বুঝতে পারছে না রবিন।
মাথা ঝাঁকাল হ্যাঁনসন। নতুন বছরের খেলার সময় প্যাসাডেনার লোকেরা বেলুনে বেঁধে ড্রাগন ছেড়ে দেয় আকাশে।
হ্যাঁনসন দেখেছে শুনে উত্তেজনায় সামনে ঝুঁকে বসেছিল মুসা, চেপে রাখা নিঃশ্বাসটা ফোঁস করে ছেড়ে বলল, ওগুলো তো ফুল দিয়ে বানানো, তাই না, কিশোর?
হ্যাঁ। আমি জিজ্ঞেস করছি, আসল ড্রাগন দেখেছেন কিনা।
আমাদের মত, যোগ করল মুসা।

না।
আবার নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটা শুরু করল কিশোর। চুপচাপ চেয়ে আছে জানালা দিয়ে পথের দিকে।
স্যালভিজ ইয়ার্ডে পৌঁছল রোলস রয়েস। হ্যাঁনসনকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলল কিশোর, দরকার পড়লেই আবার ডাকবে।
ভেরি গুড, মাস্টার পাশা, হ্যাঁনসন বলল। আপনাদের সঙ্গে সময়টা খুব ভাল কাটে। ধনী বিধবাদের কাজ করতে বিরক্ত লাগে। তাই আপনারা যখন ডাকেন, খুশিই হই। কিছু মনে না করলে, একটা প্রশ্নের জবাব দেবেন?
নিশ্চয়। কি?
রক্ত-মাংসের জ্যান্ত ড্রাগন দেখেছেন আজ আপনারা? খুব কাছে থেকে?
কাছে মানে? বলে উঠল মুসা। হাত বাড়ালেই ছুঁতে পারতাম। গায়ের ওপর এসে উঠেছিল।
আপনাদের নিশ্চয় জানা আছে, নিঃশ্বাসের সঙ্গে ড্রাগনের নাকমুখ দিয়ে আগুন বেরোয়। ওটার কি বেরিয়েছিল?
আস্তে মাথা নাড়ল কিশোর। না, আগুন দেখিনি। তবে ধোয়া-হা, ধোঁয়া বেরিয়েছে বলা যায়।
তাহলে ড্রাগনের আসল ভয়ঙ্কর রূপই দেখেননি…
যা দেখেছি তা-ই যথেষ্ট, বাধা দিয়ে বলল মুসা। অনেক দিন ঘুমাতে পারব না। ভাবলেই রোম খাড়া হয়ে যায়।
আর কিছু না বলে গাড়ি নিয়ে চলে গেল হ্যাঁনসন।
জাঙ্কইয়ার্ডে ঢুকল তিন গোয়েন্দা। চাচা-চাচীর বেডরুমে আলো নেই, ঘুমিয়ে পড়েছেন। শুধু কিশোরের ঘরে ম্লান একটা আলো জ্বলছে।
বন্ধুদের দিকে ফিরল কিশোর। আমাদের বোধহয় আরেকবার গুহায় যেতে হবে।
কী? চমকে উঠল মুসা। আবার। একবার যে বেঁচে ফিরেছি, যথেষ্ট নয়?
হত, যদি বোকামিটা না করতাম।
একবার যাওয়াটাই তো বোকামি হয়েছে। আরেকবার গেলে আরও বড় বোকামি হবে, কারণ এবার ড্রাগন আছে জেনেশুনে যাচ্ছি।
কিন্তু যেতেই হবে, উপায় নেই। ক্যামেরা, রেকর্ডার সব কিছু ফেলে রেখে ভয়ে দিয়েছি দৌড়। ওগুলো আনতে হবে।
ইচ্ছে করে ফেলে রেখে আসোনি তো? আবার ফিরে যাওয়ার
ছুতো?চ্ছে করে কেহ দৌড়। ওই ক্যামেরা
ছুতো? নাহ, আরেক দিকে তাকিয়ে মাথা চুলকাল কিশোর।
কিছু বলবে মনে হয় তুমি? কিশোরের উসখুস ভাবটা ধরে ফেলল রবিন।

বোম ফাটাল কিশোর, আমার ধারণা, ড্রাগনটা আসল নয়।
বোকা হয়ে গেল অন্য দু-জন। বলে কি?
আসল না? বিড়বিড় করল মুসা। আমাদের খেয়ে ফেলতে চাইল, আর তুমি বলছ ওটা আসল না?
মাথা নাড়ল কিশোর, না।
তাহলে কামড়াতে চাইল কেন? রবিনের প্রশ্ন।
চায়নি, হয়তো ভঙ্গি করেছে।
তাই বা কি করে করল?
আসলে, ভঙ্গিও করেছে কিনা, সে ব্যাপারেও শিওর নই। জ্যান্ত জানোয়ারের মত আচরণ করেনি ওটা, ওটুক বলতে পারি। আরেক বার গুহায় গিয়ে দেখলেই পুরো শিওর হতে পারব। তবে প্রাণী যে নয় ওটা, বাজি ধরে বলতে পারি।
কখন মরতে চাও? জিজ্ঞেস করল মুসা।
এমন ভঙ্গিতে প্রশ্নটা করল সে, কিশোরও বুঝতে পারল না।
মরতে চাই মানে?
বুঝলে না। আরেকবার গুহায় দেখলে তো আর ছাড়বে না, গিলে খাবে আমাদের। তাই জিজ্ঞেস করছি, ড্রাগনের নাস্তা হতে চাও কখন?
ও, এই কথা, হাসল কিশোর। এখন আর সময় নেই। কালকে সকালের আগে হবে না। এতক্ষণ না খেয়েই থাকতে হবে ড্রাগনটাকে।
সে-রাতে ভাল ঘুম হলো না রবিনের।
ভীষণ ক্লান্ত হয়ে শুয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ার কথা। পড়লও তাই, কিন্তু চোখ বোজার সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল দুঃস্বপ্ন, গুহা থেকে গুহায় তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াতে লাগল ভয়ঙ্কর এক ড্রাগন, আগুনের হলকা আর বাষ্পের মত গরম নিঃশ্বাস দিয়ে পুড়িয়ে দিল চামড়া।
দুঃস্বপ্ন কখন গেল, বলতে পারবে না রবিন, ঘুম ভাঙল মায়ের ডাকে। নাস্তা রেডি। খাবার টেবিলে এসে দেখল, তার বাবার খাওয়া প্রায় শেষ। মাথা সামান্য ঝাঁকিয়ে ইশারায় গুড মর্নিং জানিয়ে ঘড়ি দেখলেন মিলফোর্ড।
গুড মর্নিং, বাবা।
মুখের খাবারটুকু গিলে নিয়ে বাবা জিজ্ঞেস করলেন, কাল রাতে বন্ধুদের সঙ্গে কেমন কাটালে?
ভাল, আরেক দিকে তাকিয়ে জবাব দিল রবিন।
গুড! ন্যাপকিনে মুখ মুছে দলেমুচড়ে ওটা টেবিলে ফেলে উঠে দাঁড়ালেন মিলফোর্ড। ও হ্যাঁ, ভাল কথা, কাল সী-সাইডের কথা বলছিলে না, তুমি যাওয়ার

পর নামটা মনে পড়ল! স্বপ্নের শহর বানাতে গিয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন যে মানুষটা…
তাই? কি নাম?
ডন হেরিঙ।
হেরিঙ? জন হেরিঙের কথা মনে পড়ল রবিনের। বদমেজাজী, হাতে শটগান।
হ্যাঁ। ভাল স্বাস্থ্য ছিল। কিন্তু সী-সাইড টাউন কাউন্সিল যখন তার স্বপ্ন ভেঙে চুরমার করে দিল, স্বাস্থ্যও ভাঙতে লাগল তার। টাকা, স্বাস্থ্য, সুনাম হারালে আর কি থাকে একজন মানুষের? বেঁচে থাকার আর কোন যুক্তি দেখলেন না তিনি।
হ্যাঁ, শুনলে খারাপই লাগে। তার পরিবারের আর কেউ নেই?
আছে। হেরিঙ মারা যাওয়ার কিছুদিন পরেই তার স্ত্রীও মারা গেলেন। থাকল শুধু একমাত্র ছেলে জনহেরিঙ।…এখনও বেঁচে আছে। কিনা জানি না। অনেক কাল আগের কথা তো।
বেরিয়ে গেলেন মিলফোর্ড, অফিসে যাবেন।
তথ্যগুলো নোট করে রাখল রবিন। খেতে খেতে ভাবল, এসব শুনলে কি করবে কিশোর? এমন একজন মানুষকে পাওয়া গেছে, যিনি সুড়ঙ্গগুলো চেনেন। বাবার মৃত্যুর কারণ হয়েছিল বলে টাউন কাউন্সিলের ওপর যার রাগ আছে।
তাড়াহুড়া করে নাস্তা সেরে বেরিয়ে গেল রবিন।

.

খাইছে, বলে উঠল মুসা, কিশোর, আজব কথা শোনাল তো রবিন!
হেডকোয়ার্টারে জড় হয়েছে তিন গোয়েন্দা। আগে হেরিঙের খবর জানাল রবিন। তারপর বলল, বাড়ি থেকে সোজা লাইব্রেরিতে গিয়েছিলাম। ড্রাগনের ওপর যত বই পেয়েছি, ঘেঁটে দেখে এসেছি।
রবিনের নোট বইয়ের গিজিগিজি লেখার দিকে তাকাল কিশোর এক পলক। কি জানলে? জ্যান্ত ড্রাগন আছে?
মাথা নাড়ল রবিন। না। নো ড্রাগন। একটা বইতেও লেখেনি। এমন কি ড্রাগন আছে, এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহও প্রকাশ করেনি কেউ।
গাধা! ফেটে পড়ল মুসা, ব্যাটারা আস্ত গাধা। বই যারা লিখেছে, কিছুদিন এসে সী-সাইডের গুহায় বাস করা উচিত তাদের। তাহলেই বুঝবে আছে কি নেই। ধরে ধরে যখন গিলবে…
হাত তুলল কিশোর। আহ, আগে রবিনের কথা শুনি। হ্যাঁ, তারপর, নথি?
আবার নোটের দিকে তাকাল রবিন। একটি মাত্র ড্রাগনের নাম লেখা আছে, একমাত্র প্রজাতি, কমোডো ড্রাগন। বিশাল গিরগিটি, দশ বারো ফুট লম্বা হয়। আমরা যেটাকে দেখেছি ওটার চেয়ে অনেক ছোট।

মানুষের মধ্যে দানব আছে না, ফস করে বলল মুসা, ওটাও হয়তো তেমনি। একটা কমোডো ড্রাগনের গায়ে ভিটামিন বেশি জমেছে আর কি।
হুঁ, বলেছে তোমাকে, অধৈর্য হয়ে হাত নাড়ল কিশোর। রবিন, বলো।
কিন্তু কমোডো ড্রাগনের নিঃশ্বাসের সঙ্গে আগুন বা ধোয়া কিছুই বেরোয় না, রবিন বলল। ওয়েস্ট ইনডিজের ছোট্ট একটা দ্বীপ কমোডোতে ছাড়া দুনিয়ার আর কোথাও পাওয়াও যায় না। গুহায়। যেটাকে দেখেছি, চেহারায়ও ওটার সঙ্গে কোন মিল নেই। জোর দিয়ে বলা যায়, ড্রাগন নেই পৃথিবীতে। ওই ধরনের কোন জীব কাউকে আক্রমণ করেছে বলেও শোনা যায়নি। অথচ... মুখ তুলল রবিন। আরও পড়ব?
হ্যাঁ হ্যাঁ, পড়ো, বলল কিশোর।
অনেক জানোয়ার আছে, মানুষকে আক্রমণ করে, মেরে খেয়েও ফেলে অনেকে। এর একটা হিসেবও টুকে এনেছি। এই যে, রোগজীবাণুবাহী পোকামাকড়ের কারণে প্রতি বছর সারা পৃথিবীতে দশ লাখ মানুষ মারা যায়। চল্লিশ হাজার মরে সাপের কামড়ে, দুই হাজার বাঘে মারে, এক হাজার যায় কুমিরের পেটে, আরও এক হাজার। হাঙরের শিকার হয়। মুখ তুলল সে।
মুসা, শুনলে তো, কিশোর বলল। ড্রাগনের কথা কিন্তু এখানেও বলা হয়নি।...হা, রবিন, পড়ো।
অন্যান্য জন্তু-জানোয়ারের আক্রমণেও মরে মানুষ। হাতি, গণ্ডার, জলহস্তী, নেকড়ে, সিংহ, চিতা, হায়েনা-সুযোগ পেলে কিংবা কোণঠাসা হলে এদের কেউই মানুষ মারতে ছাড়ে না। এগুলোর মাঝে আবার মানুষখেকোও আছে কিছু।
ম্যান ইজ দ্য প্রে বইতে জন ক্লার্ক লিখেছে: মেরুভালুক, পুমা, অ্যালিগেটর, এমন কি কিছু কিছু ঈগলও মানুষকে আক্রমণ করে মেরে ফেলে। তবে সেটা খুব রেয়ার। টারানটুলা মাকড়সার কামড়েও মানুষ মরে, গ্রিজলি ভালুক আর গরিলাও মাঝেসাঝে মারে। সবচেয়ে বিপজ্জনক জায়গা হলো, আফ্রিকা আর ভারতের জঙ্গল। সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা আয়ারল্যাণ্ড। নোট বই বন্ধ করল রবিন।
কিছুক্ষণ চুপ করে রইল সবাই।
মুসার দিকে ফিরল কিশোর। কোন মন্তব্য?
মাথা নাড়ল মুসা। ক্লার্ক মিয়া সী-সাইডে আসেনি, এলে অন্য কথা বলত। ওসব বইটইয়ের কথা কমই বিশ্বাস করি। নিজের চোখে ড্রাগন দেখে এলাম। ওরা বললেই হবে নাকি? বিশ্বাস করতে পারি, যদি তুমি দেখিয়ে দাও ওটা আসল নয়।
বেশ... টেলিফোনের শব্দ বাধা দিল কিশোরকে। রিসিভারে হাত রাখল, তুলতে দ্বিধা করছে।

তোলো, মাথা ঝাঁকিয়ে বলল মুসা। গুহার ভূতটাই হয়তো করেছে আবার।
মৃদু হেসে রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল কিশোর।
হ্যালো? অন করল স্পীকারের কানেকশন।
হ্যালো, পরিচিত কণ্ঠস্বর। ডেভি ক্রিস্টোফার। কিশোর?
ও, স্যার, আপনি। নিশ্চয় কুকুরের খোঁজ নিতে করেছেন?
হ্যাঁ, স্পীকারে গমগম করছে ভারি কণ্ঠ। জোনসকে বড় মুখ করে বলেছি এ-রহস্যের সমাধান তোমরা করতে পারবেই। কুকুরের খোঁজ পেয়েছ?
এখনও পাইনি। তবে ড্রাগনটা দেখে এসেছি।
সত্যি আছে! তাহলে তো ড্রাগন বিশেষজ্ঞের সঙ্গেই তোমাদের আবার কথা বলা উচিত।
কে, স্যার?
কেন, আমার বন্ধু জোনস। বলেনি? সারাজীবন দৈত্য-দানব আর ড্রাগন নিয়েই ছিল তার কারবার।
হ্যাঁ, বলেছেন। সিনেমার জন্যে নাকি খেলনা ড্রাগন বানাতেন। ঠিক আছে, এখুনি ফোন করছি তাকে।
দরকার নেই। আমি লাইন দিচ্ছি। সে লাইনেই আছে। ফোন করে কুকুরের খবর জানতে চাইছিল।
সেক্রেটারীকে নির্দেশ দিলেন মিস্টার ক্রিস্টোফার।
কয়েক সেকেণ্ড খুটখাটের পর স্পীকারে ভেসে এল বৃদ্ধ পরিচালকের কণ্ঠ। হাল্লো, কিশোর?
হ্যাঁ, মিস্টার জোনস। আপনার কুকুরের খোঁজ এখনও পাইনি, তবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।
ভেরি গুড। এত তাড়াতাড়ি পাবে আশাও করিনি, তবু মন মানছিল না…
আপনার পড়শীদের কুকুরগুলো পাওয়া গেছে?
না। প্রায় একই সময়ে সবগুলো হারাল, এটাই অবাক লাগে।
হ্যাঁ।
আমার পড়শীদের সঙ্গে দেখা করেছিলে?
করেছিলাম দু-জনের সঙ্গে, যাঁদের কুকুর নেই। মিস্টার হেরিঙ আর মিস্টার মারটিন।
বলেছে কিছু?
আজব লোক দু-জনেই। মিস্টার হেরিঙ শটগান নিয়ে এসে গুলি করার হুমকি দিলেন। কুকুর দু-চোখে দেখতে পারেন না। তার বাগান টাগান নাকি সব নষ্ট করে ফেলে।

হাসি শোনা গেল। ও এমনি ভয় দেখিয়েছে। মানুষ তো দূরের কথা, একটা ইঁদুর মারার ক্ষমতা নেই তার। মারটিন কি বলল?
ভয় তিনিও দেখিয়েছেন, তবে অন্যভাবে।
আবার হাসলেন বৃদ্ধ চিত্রপরিচালক। ওর বাড়ির আজব খেলনাগুলোর কথা বলছ তো? আসলে খুব রসিক লোক। এই রসিকতার জন্যে মস্ত ক্ষতি হয়ে গেছে তার। ভাল একটা চাকরি হারিয়েছে।
মুসা ও রবিনের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করল কিশোর।
কি হয়েছিল?
সেটা বেশ কয়েক বছর আগের ঘটনা। সিটি প্ল্যানিং ব্যুরোতে ইঞ্জিনিয়ার ছিল সে। তার এক জন্মদিনে কি জানি কি করে সারা শহরের কারেন্ট ফেল করিয়ে দিল। তার বক্তব্য, শহরে আলোই যদি থাকল, কেকের ওপর মোম জ্বেলে কি লাভ?
তারপর? আগ্রহী হয়ে উঠেছে কিশোর।
কয়েক ঘণ্টা কারেন্ট বন্ধ থাকায় অনেকের অনেক রকম ক্ষতি হলো। বড় বড় কয়েকজন কর্তাব্যক্তি গেল খেপে। চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হলো মারটিনকে। শুধু তাই নয়, শহরে আর কোথাও যেন চাকরি না পায় সে ব্যবস্থা করে ছাড়ল।
তারপর আর চাকরি পাননি? চলেন কিভাবে?
ভাল ইঞ্জিনিয়ার, কাজ জানে। এটা-ওটা টুকটাক প্রাইভেট কাজ করে। সবই আজব ধরনের। তবে তাতে বিশেষ আয় হয় বলে মনে হয় না।
হুঁ। দেখে কিন্তু মনে হয় না অসুবিধেয় আছেন। খেলনা বানিয়ে মানুষকে ভয় দেখান, সুখেই তো আছেন।
ভয় দেখানোর রসিকতা সব সময় পছন্দ করে না লোকে। আচ্ছা, রাখি?
আরেকটা প্রশ্ন, স্যার। যে ড্রাগনটা দেখেছেন আপনি, সেটা কি গোঙায়?
নিশ্চয়ই। কি রকম যেন গোঁ গোঁ করে।
পাড়ে দাঁড়িয়ে নিচে গুহায় ঢুকতে দেখেছেন, না?
হা। রাতে দেখেছি তো, মনে হলো গুহায়ই ঢুকেছে। তবে ড্রাগন দেখেছি তাতে কোন সন্দেহ নেই।
থ্যাংক ইউ, স্যার। শিগগিরই যোগাযোগ করব আপনার সঙ্গে। লাইন কেটে গেল।
মারটিন তাহলে ভাল লোক নন, বলে উঠল মুসা। মানুষকে অহেতুক ভয় দেখানোটা আমারও ভাল লাগে না। বাজপাখিটার কথাই ধরো, ড্রাগনের চেয়ে কম কিসে... তার কথায় কিশোরের কান নেই দেখে থেমে গেল।
বিড়বিড় করল কিশোর, মিস্টার জোনসের কথায় নড়চড় আছে।
অ্যাঁ! ভুরু কুঁচকে গেল সহকারী গোয়েন্দার।
মিথ্যুক বলতে চাও? রবিনও অবাক।

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। বলেছেন পাড়ে দাঁড়িয়ে ড্রাগনটাকে গুহায় ঢুকতে দেখেছেন।
ভুরু আরও কুঁচকে গেল মুসার। তাতে দোষটা হয়েছে কোথায়? তাছাড়া শিওর হয়েছেন এ কথা তো বলেননি, বলেছেন মনে হলো।
মাথা চুলকাল মুসা। কি জানি। বুঝতে পারছি না। শিওর হওয়া যায় কিভাবে?
আজ বিকেলে আবার যাব গুহায়। আশা করি আজই ড্রাগন রহস্যের সমাধান করে ফেলতে পারব।
চুপ করে রইল দুই সহকারী গোয়েন্দা।
মিস্টার জোনসকেও সন্দেহের বাইরে রাখতে পারছি না আর, বলে চলল কিশোর। আমাদের ভেবে দেখতে হবে, এই শহরের লোকের ওপর কার ব্যক্তিগত আক্রোশ রয়েছে। এবং কারা কারা গুহা আর সুড়ঙ্গগুলো চেনে। মিস্টার জোনস চেনেন। শহরবাসীর ওপরও আক্রোশ থাকতে পারে। হেরিঙ আর মারটিনের তো আছেই। এর সঙ্গে ড্রাগনটাকে যদি কোনোভাবে যোগ করতে পারি, খোলাসা হয়ে যাবে স। দেখি আজ রাতে গুহায় গিয়ে।
আবার, মিনমিন করল মুসা, জানে প্রতিবাদ করে লাভ নেই। কিশোর যখন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, যাবেই।
জবাব না দিয়ে সামনে রাখা প্যাডে খসখস করে কিছু লিখল গোয়েন্দাপ্রধান। হাত বাড়াল ফোনের দিকে। ইস্, আরও আগেই মনে পড়া উচিত ছিল।
প্লীজ, মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফারকে দিন, ফোনে বলল কিশোর। বলুন কিশোর পাশা বলছি।
শূন্য দৃষ্টিতে একে অন্যের দিকে তাকাল মুসা আর রবিন।
ভেসে এল চিত্রপরিচালকের ভারি কণ্ঠ, কি ব্যাপার, কিশোর?
স্যার, আপনার বন্ধু মিস্টার জোনস তো হরর ফিল্ম বানাতেন।
হ্যাঁ, বাদুড়, মায়ানেকড়ে, ভ্যাম্পায়ার, ভূত-প্রেত, ড্রাগন…মানে যা যা মানুষকে ভয় দেখাতে পারে, সব।
আচ্ছা, তাঁর দানবগুলোকে কি ছবিতে আসল মনে হয়?
নিশ্চয়। না হলে লোকে সেসব দেখবে কেন?
দানবগুলো কে বানাত?
স্টুডিওতে ওই পেশার অনেক লোক আছে, তারাই।
কাজ হয়ে গেলে ওগুলো কি করে? ফেলে দেয়?
কিছু কিছু রেখে দেয়, পরে আবার কাজে লাগায়। কিছু নিলামে কিনে নিয়ে যায় লোকে, সংগ্রহে রাখে। বাকি সব নষ্ট করে ফেলা হয়।

স্যার, মিস্টার জোনসের কোন ছবি সংগ্রহে আছে আপনার? এমন কিছু, যাতে ড্রাগন আছে?
আছে একটা, অবাক মনে হলো পরিচালকের কণ্ঠ। দেখতে চাও?
তাহলে খুব ভাল হয়, স্যার। ফিল্ম, না ক্যাসেট?
ফিল্ম।
তাহলে তো আপনার ওখানে গিয়েই দেখতে হয়। কখন সময় হবে, স্যার।
চলে এসো, এখুনি। চার নম্বর প্রোজেকশন রুমে থাকব আমি। লাইন কেটে দিলেন পরিচালক।
আস্তে করে ক্রেডলে রিসিভার নামিয়ে রাখল কিশোর। দুই সহকারীর দিকে তাকাল। খুব ভালমত লক্ষ করবে, ছবির ড্রাগন কি করে না করে, আচার-আচরণ, স্বভাব। হয়তো পরে কাজে লাগতে পারে। কে জানে, প্রাণও বাঁচতে পারে।
মানে? একই সঙ্গে প্রশ্ন করল রবিন আর মুসা।
মানে? আবার রিসিভারের দিকে হাত বাড়াল কিশোর। আমার ধারণা, সী-সাইডের দানবটা মানুষের বানানো।
.
সময় মতই রোলস রয়েস নিয়ে পৌঁছল হ্যাঁনসন। তিন গোয়েন্দাকে নিয়ে চলল হলিউডে।
চার নম্বর প্রোজেকশন রুমে অপেক্ষা করছেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। মেশিনপত্র, ফিল্ম সব রেডি। ইশারায় তিন গোয়েন্দাকে চেয়ার দেখিয়ে বসতে বললেন। তারপর ইশারা করলেন মেশিনম্যানকে।
শুরু হলো ছবি। কয়েক মিনিটেই ভুলে গেল ছেলেরা, কোথায় রয়েছে। সত্যি ছবি বানাতেন বটে মিস্টার জোনস। দর্শককে এভাবে সম্মোহিত করে ফেলার ক্ষমতা সব পরিচালকের থাকে না।
পর্দায় চলছে একটা গুহার দৃশ্য। ঝাঁকুনি দিয়ে বেরোল একটা মুখ, গুহামুখ জুড়ে দাঁড়াল। বিশাল দানব। এতই আচমকা ঘটল ঘটনাটা, চমকে উঠল তিন গোয়েন্দা। তাদের মনে হলো, যেন সত্যি সত্যি একটা ড্রাগন তাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।
কানফাটানো গর্জন করে উঠল দানবটা। হাঁ করতেই দেখা গেল বড় বড় বাঁকা ধারাল দাঁত।
খাইছে! চেয়ারের পেছনে পিঠ চেপে ধরল মুসা। আসল ড্রাগন।
ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে ড্রাগন। চেয়ারের হাতল খামচে ধরল রবিন।

কিশোর শান্ত। গভীর মনোযোগে দেখছে ড্রাগনের প্রতিটি নড়াচড়া। ছবির গল্পের দিকে তার কোন খেয়াল নেই।
স্তব্ধ হয়ে ছবিটা শেষ পর্যন্ত দেখল ওরা। ছবি শেষে উজ্জ্বল আলো জ্বলার পরও বিমূঢ় হয়ে রইল কিছুক্ষণ, যেন ঘোরের মধ্যে রয়েছে।
মিস্টার ক্রিস্টোফার নেই। কোন এক ফাঁকে চলে গেছেন তার অফিসে।
সেদিকে চলল তিন গোয়েন্দা। পায়ে জোর নেই যেন, কাঁপছে।
সব্বোনাশ, কিশোর! প্রথম কথা বলল মুসা। গতরাতে যেটা দেখেছি ঠিক ওই রকম। যেন জ্যান্তটাই এনে ছবিতে বসিয়ে দিয়েছে।
মাথা ঝাঁকাল কিলোর। গুণী লোকের কাজই এমন। একটা ছবি দেখেই বোঝা গেল কতখানি দক্ষ পরিচালক ছিলেন মিস্টার জোনস। আরিব্বাপরে, কি ছবি! ভয় পাবে না এমন মানুষ কম আছে।
ফাইলে ডুবে ছিলেন মিস্টার ক্রিস্টোফার, ছেলেদের সাড়া পেয়ে। মুখ তুললেন। কেমন দেখলে?
মাথা কাত করল কিশোর। সাংঘাতিক।
অনেক প্রশ্নের ভিড় জমেছে মনে, এক এক করে করার ইচ্ছে ছিল তার, কিন্তু পরিচালককে ব্যস্ত দেখে আর করা হলো না। এমনিতেই তার অনেক সময় নষ্ট করেছে ওরা। ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এল অফিস থেকে।
রোলস রয়েসে উঠে রকি বীচে ফিরে যেতে বলল কিশোর। স্টুডিও থেকে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে এল হ্যাঁনসন।
ভালমত লক্ষ করতে বলেছিলে, রবিন বলল, করেছি। মুসা ঠিকই বলেছে, গতকাল যেটাকে গুহায় দেখেছি তার সঙ্গে কোন পার্থক্য নেই।
কিছুই না? কিশোরের প্রশ্ন।
না, কেবল ওই গর্জনটা বাদে, মুসা জবাব দিল। ছবিরটা বেশি গর্জাচ্ছিল, আর গুহারটা গোঙাচ্ছিল, আর মাঝে মাঝে ছোট ছোট কাশি।
একদম ঠিক। তুড়ি বাজাল কিশোর।
গুহার ওটার ঠাণ্ডা লেগেছে বোধহয়।
ড্রাগনের ঠাণ্ডা লাগে কি করে? ব্যাঙের সর্দির মত হয়ে গেল না। ব্যাপারটা? ড্রাগনটা থাকে পানিতে আর ভেজা গুহায়। ঠাণ্ডা লাগে কি করে?
জবাব দিতে পারল না দুই সহকারী গোয়েন্দা।
আশা করি, আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ভেদ করে ফেলব কাশির রহস্য, বলল কিশোর। আর সেটা পারলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে অনেক কিছু।
যদি ততক্ষণ জীবিত থাকি, জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল মুসা। ড্রাগনের পেটে চলে যাই।

বলা যায় না, রহস্যময় কণ্ঠে বলল কিশোর, শেষ পর্যন্ত ড্রাগনের পেটেও ঢুকতে হতে পারে আমাদের!
ড্রাগনের পেটে! আঁতকে উঠল মুসা। কি বলতে চাও তুমি, কিশোর? কিছু একটা ভাবছ, বুঝতে পারছি। এরকম অন্ধকারের মধ্যে না রেখে খুলে বলো না। হাজার হোক, আমরা তোমার সহকারী। তুমি যেমন মরতে যাচ্ছ, আমরাও যাচ্ছি। জানার অধিকার আমাদের আছে। কি বলো, রবিন?
হাসল গবেষক। তা তো নিশ্চয়। বলল, কিশোর। আগে থেকে জানা থাকলে হুঁশিয়ার থাকতে পারব। আমরা মরে গেলে এত ভাল সহকারী আর কোথায় পাবে?
রবিনের শেষ কথাটায় কিশোরও হাসল। আসলে আমি নিজেই শিওর না। ঝুঁকি একটা নিতে যাচ্ছি আর কি।
জোরে মাথা নাড়ল মুসা। না জেনে কোন ঝুঁকি নিতে রাজি না আমি। বলতে ভুলে গেছি, গতরাতে একটা ছবি দেখেছি বাসায়। একটা সাইন্স ফিকশন। বোকার মত না বুঝে ঝুঁকি নিয়েছেন এক বিজ্ঞানী, প্রাণটা খোয়াতে হয়েছে তাঁকে।
ভ্রুকুটি করল কিশোর। কি ছবি?
দাঁত বের করে হাসল মুসা। পোকামাকড়।
পোকামাকড়?
পিঁপড়ে আর সামান্য বিষাক্ত পোকা দুনিয়া দখল করতে চায়। যে ছবিটা এইমাত্র দেখে এলাম তার চেয়ে কম ভয়ঙ্কর নয়। একশো ফুট লম্বা একেকটা পিঁপড়ে, পঞ্চাশ ফুট উঁচু। বড় বিল্ডিঙের সমান।
করে কিভাবে এটা? আনমনে বলল কিশোর।
আসল পিঁপড়ে দিয়ে।
আসল পিপঁড়ে? রবিন বিশ্বাস করতে পারছে না। কিভাবে, জানো?
বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, মুসা বলল।
বলেছেন? জানতে চাইল কিশোর।
বলেছে। আতস কাঁচের ভেতর দিয়ে প্রথমে পিঁপড়ের ছবি তোলে। তারপর বড় করে ছবিকে, সুপার ইমপোজ করে, সেগুলোকে। আবার বিল্ডিঙের ছবির পটভূমিকায় রেখে ছবি তোলে। পর্দায় দেখে মনে হয় জ্যান্ত পিঁপড়েগুলো একেকটা বিল্ডিঙের সমান। যে ছবিটা দেখেছি, তার গল্পটা হলো মহাকাশের কোন এক গ্রহ থেকে এসে হাজির হয়েছে একদল পোকামাকড়...
মাঝপথে থেমে গেল মুসা।
শুনছে না কিশোর। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটা শুরু হয়েছে, তারমানে গভীর চিন্তায় ডুবে গেছে। হঠাৎ যেন ডুব দিয়ে উঠে এল ভাবনার জগৎ থেকে। ছবিটা

দেখেছ?
বললামই তো, হাত নাড়ল মুসা।
ফিল্ম, না ক্যাসেট?
ফিল্ম। দেখতে চাও? চলো আজ রাতে।
মাথা নাড়ল কিশোর। রাতের আগেই দরকার হতে পারে ওটা। ঘড়ির দিকে তাকাল। তোমাদের প্রোজেকটরে দেখেছ, না?
কিশোরের কথা বুঝতে পারছে না মুসা। তো আর কারটা দিয়ে দেখব?
আনমনে বিড়বিড় করল কিশোর, জিনিসটা হয়তো আমাদের প্রাণ বাঁচাতে সাহায্য করবে। হয়তো রহস্যের সমাধান করতে পারব। মুসা, আজ রাতের জন্যে প্রোজেকটরটা আনতে পারবে?
চোখ মিটমিট করল মুসা। কেন, আমাদের বাড়ি গিয়ে দেখতে অসুবিধে কি?
হ্যাঁ। ছবিটা কাউকে দেখাতে চাই। ওই ছবিই এখন আমার দরকার।
মাঝেমাঝে রহস্য করে কথা বলা কিশোরের স্বভাব। রবিন আর মুসাও বুঝতে পারে না তখন তার কথার অর্থ।
নাক ডলল মুসা। আনা যাবে। মাকে বললেই দিয়ে দেবে। তবু বাবাকে একবার জিজ্ঞেস করে নিলে ভাল, তার জিনিস তো।
ঠিকই বলেছ, বলল কিশোর। আংকেলকে ফোন করে অনুমতি নিয়ে নাও।
ধরে নাও, প্রোজেকটর পেয়ে গেছ, মুসা বলল। তবে তার আগে জানতে হবে, আজ রাতে কি করতে যাচ্ছি আমরা। অন্ধকারে থাকতে রাজি না আমি।
রবিনও মুসার সঙ্গে একমত হলো।
দু-জনেই তাকাল কিশোরের দিকে।
দ্বিধা করল কিশোর। ধড়াস করে দুই হাত ফেলল টেবিলে।
আমার নিজের কাছেই স্পষ্ট নয় এখনও ব্যাপারটা। পুরো রহস্যটাই কেমন যেন অদ্ভুত, ঘোরাল। শুরু করেছি কুকুর হারানো দিয়ে, জড়িয়ে পড়েছি ড্রাগন শিকারে। ২ বার বার একটা কথাই বোঝাতে চাইছ, ড্রাগনটা নকল, রবিন বলল।
কেন এই সন্দেহ?
অনেক কারণে। গুহাটা আসল নয়। পুরানো সুড়ঙ্গটা আসল নয়। গুহামুখ আসল নয়। ড্রাগনটাও আসল হওয়ার কোন কারণ নেই।
এসব তো খেয়াল করিনি! বিস্ময় ঢাকতে পারল না রবিন।
প্রথমে গুহার কথাই ধরো। তা সরিয়ে একটা ছোট গুহায় ঢুকলাম।
হ্যাঁ, অদ্ভুত চোখে তখন তাকিয়েছিলে আমার দিকে। আসল নয় বুঝলে কি করে?
গুহাটা পুরানো সন্দেহ নেই। চোর-ডাকাতের আড্ডা ছিল। কিছু কিছু তক্তাও পুরানো।

কিছু কিছু? কথাটা ধরল মুসা। সব নয় কেন?
সবগুলো পুরানো নয়, সেজন্যে। যে তক্তা আমরা সরিয়েছি ওগুলো পুরানো। কিন্তু পাশেই আরও কিছু রয়েছে, যেগুলো অনেক পরে লাগানো হয়েছে। প্লাইউড। মাত্র এই সেদিন আবিষ্কার হয়েছে। ওগুলো প্রাচীন চোর-ডাকাতেরা লাগায়নি। পায়ইনি, লাগাবে কোত্থেকে?
প্লাইউড? ভুরু কাছাকাছি হলো মুসার। তা নাহয় হলো। কিন্তু তাতেই কি প্রমাণ হয় সব কিছু নকল?
না হলে আরও প্রমাণ আছে। তারপরের গুহাটার কথা ধরো। বড় গুহাটা, রবিন যেটা আবিষ্কার করেছে, সেটার দরজাটা কি প্রাকৃতিক? মোটেও না, মানুষের তৈরি। বড় গুহাটার শেষ মাথায় কি দেখলাম? দেয়াল। অন্য পাশে যাওয়ার পথ নেই। অথচ আমরা আশা করেছিলাম। ওই গুহা ধরে এগিয়ে গেলে একটা সুড়ঙ্গ-টুড়ঙ্গ পাব। কি মনে হয়?
একমত হলো দুই সহকারী।
ছুরি দিয়ে খোঁচাচ্ছিলে, মনে পড়ছে, মুসা বলল। পাথরে ঘষে নষ্ট করেছিলে ছুরিটা?
পকেট থেকে ছোট ছুরিটা বের করল কিশোর। নিজেই দেখো।
কি লেগে আছে ফলায়?
শুঁকে দেখো।
আরি! রঙ! চেঁচিয়ে উঠল গোয়েন্দা-সহকারী।
রবিনও শুঁকে একমত হলো।
ভাঁজ করে আবার ছুরিটা পকেটে রেখে দিল কিশোর। পুরানো গুহার দেয়ালে বাড়িঘরের মত রঙ করা হয়, শুনেছ কখনও? ছুরির আঁচড়ের দাগ বসেছে দেয়ালে। আমার অনুমান, ওটা পাথরের দেয়াল নয়, প্ল্যাসটারবোর্ড। তার ওপর ধূসর রঙ করা হয়েছে। এবং তার ওপর বালি আর পাথরের কণা এমনভাবে লাগিয়েছে, দেখে মনে হয় আসল দেয়াল।
মানে? রবিন বলল। অন্য পাশের কোন মূল্যবান আবিষ্কার লুকিয়ে রাখতে চাইছে কেউ?
হতে পারে।
ঠিক, আঙুল তুলল মুসা। পুরানো সুড়ঙ্গটা হয়তো কেউ আবিষ্কার করে ফেলেছে। জানাজানি হলে লোকে ভিড় করে নষ্ট করে ফেলবে, তাই লুকিয়ে রাখতে চাইছে।
নাকি আগেব চোর-ডাকাতেরাই কোন কারণে ওই দেয়াল লাগিয়েছিল? রবিনের প্রশ্ন।
না। মাথা নাড়ল কিশোর। প্ল্যাসটারবোর্ড ছিল না তখন।

চুপ হয়ে গেল রবিন।
আরেকটা ব্যাপার, কিশোর বলল, আমরা ঢুকেছি চিচিং ফাঁক দিয়ে। কিন্তু ড্রাগনটা?
ঢোক গিলল মুসা। নিশ্চয় পাহাড়ের আরেকটা চিচিং ফাঁক দিয়ে ঢুকেছে। আমাদের চোখে পড়েনি ওটা।
তাহলে ওই দরজা কে বানাল? কি সিসটেমে খোলে ওটা?
নিশ্চয় ড্রাগনটা জানে, মুখ ফসকে বলে ফেলল রবিন।
অনেকটা সে রকমই। বলেছি তো, সব নকল। ওই ড্রাগনটাও। গিয়ে দেখোগে, মানুষে চালায় ওটা।
চোখ মিটমিট করল মুসা। রবিনের দিকে তাকিয়ে নিল একবার চট করে। আবার কিশোরের দিকে ফিরল, কি বলছ?
যা বলা উচিত, তাই।
তোমার ধারণা, উত্তেজনায় লাল হয়ে গেছে রবিনের মুখ, আমাদের কেশো ড্রাগনটা একটা রোবট?
এখনও শিওর না। হতে পারে। আর তা হয়ে থাকলে, পাহাড়ের যে দরজা দিয়ে ওটা ঢোকে, সেটা মানুষের তৈরি। সিনেমায় যেমন করে বানানো হয়।
রোলস রয়েসের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল মুসা। আজ রাতে দরজাটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করব। কিশোরের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, ড্রাগনটা আসল নয় কিভাবে বুঝলে?
সীটে হেলান দিল কিশোর, কোলের ওপর রাখল দুই হাত। ড্রাগনটা যখন সামনে এল, কি দেখলাম, কি শুনলাম, মনে করার চেষ্টা করো।
চুপ করে ভাবতে লাগল রবিন আর মুসা।
গুঞ্জন, অবশেষে বলল রবিন। আর গোঙানি। মাঝে মাঝে কাশি।
উজ্জ্বল আলো দেখেছি, মুসা যোগ করল। সার্চ লাইটের মত।
হ্যাঁ। আর চলে কিভাবে খেয়াল করেছ?
খুব দ্রুত।
রবিনের দিকে ফিরল কিশোর, কিভাবে চলে?
হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কপালের বিন্দু বিন্দু ঘাম মুছল রবিন। মুসা ঠিকই বলেছে, খুব দ্রুত ছোটে। যেন উড়ে যায়।
সিনেমায় যে ড্রাগনটা দেখলাম, ওটা কি ওভাবে চলে?
মাথা নাড়ল রবিন। না, ওটা হাঁটে। আমাদেরটা ওড়ে।
দেখে ওরকমই লাগে বটে, আসলে ওড়ে না। ওটার চেহারাটাই শুধু ড্রাগনের মত, কাজেকর্মে অন্যরকম। মানুষকে ভয় দেখানোর জন্যে কিংবা দূরে সরিয়ে রাখার

জন্যেই ওরকম চেহারা তৈরি করা হয়েছে। আর ওড়ে মনে হয় কেন বলো তো? চাকায় ভর করে চলে বলে। সৈকতের বালিতে চাকার দাগ দেখেছিলাম মনে আছে?
হাঁ করে কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইল দুই সহকারী।
ড্রাগনের আবার চাকা! বিড়বিড় করল মুসা।
তার সঙ্গে যোগ করল রবিন, আরও একটা ব্যাপার, মিস্টার জোনসের সিনেমার ড্রাগন গর্জন করে, আর আমাদেরটা গোঙায়, কাশে।
হ্যাঁ, মুচকি হাসল কিশোর। মানুষের তৈরি বলেই এই কাণ্ড করে। কাশিটা ড্রাগনের না হয়ে মানুষেরও হতে পারে।
মানে? বুঝতে পারছে না মুসা।
হাসি বিস্তৃত হলো কিশোরের। ওই ড্রাগনের ভেতরে বসা কোন একজন মানুষের হয়তো ঠাণ্ডা লেগেছে, খুকুর খুকুর সে-ই করে...
বেরসিকের মত বাধা দিল হ্যাঁনসনের কণ্ঠ, ইয়ার্ডে পৌঁছে গেছি।
নামতে গেল কিশোর।
জিজ্ঞেস করল শোফার, আমি থাকব?
হ্যাঁ, থাকুন। কয়েকটা জিনিস নিতে হবে আমাদের। আজ রাতে আবার সী-সাইডে যাব।
ছবিটার কিছু অংশ আগেই দেখে নেয়ার ইচ্ছে কিশোরের।
প্রোজেকটর চালাচ্ছে মুসা। ফিতে গুটিয়ে নিয়ে সুইচ টিপল সে। পর্দায় ফুটল ছবি। বাড়িয়ে বলেনি ও। রবিন আর কিশোরও দেখল; ঠিকই, বিশাল সব পিঁপড়ে ভয়ানক ভঙ্গিতে চলাফেরা করছে পর্দায়।
মিনিটখানেক পরই থেমে গেল প্রোজেকটর। অন্ধকারে মুসার গলা শোনা গেল, রবিন, লাইটটা জ্বালবে, প্লীজ?
কি হয়েছে? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
ভুল ফিল্ম লাগিয়েছি, জবাব দিল মুসা। এটা ছয় নম্বর। অনেক পরের সিরিয়াল।
সিনেমা দেখতে বসিনি, মুসা, বাধা দিয়ে বলল কিশোর।
এটাতেই চলবে। চালাও।
প্রথমটা দেখো। ওটাতেও অনেক ভয়ঙ্কর ব্যাপার-স্যাপার আছে। পিঁপড়েরা কি করে শহর আক্রমণ করে...
দরকার নেই। যেটা দেখছি এটাই ভাল। মনে হবে গুহা আক্রমণ করতে আসছে পিঁপড়েরা।
অবাক হলো দুই সহকারী।
মনে হবে? বুঝতে পারল না মুসা।

হ্যাঁ, হবে।
হবে মানে… হঠাৎ বুঝে ফেলল মুসা, ড্রাগনের গুহায় ছবি দেখাতে যাচ্ছি নাকি আমরা?
হ্যাঁ। প্রোজেকটরটা ভাল, আমাদের কাজের উপযুক্ত। বিল্ট-ইন, স্পীকার রয়েছে, শব্দ সৃষ্টি করতে কোন অসুবিধে হবে না। চলেও ব্যাটারিতে। গুহায় গিয়ে চমৎকার চালাতে পারব।
বাবার কাজের জিনিস তো, পোর্টেবল, এখানে-ওখানে নিয়ে যায়। দেখে-শুনেই কিনেছে।
হয়েছে, কথা থামিয়ে ছবিটা দেখি, এসো, বলে উঠল রবিন। চালাও।
আবার চলল প্রোজেকটর। তাজ্জব হয়ে পিঁপড়েদের কাণ্ডকারখানা দেখল রবিন আর কিশোর।
শেষ হলো রীলটা। প্রোজেকটর বন্ধ করে মুসা জিজ্ঞেস করল, আরেকটা চালাব?
অন্ধকারে হেসে বলল কিশোর, না, এটাতেই চলবে।
আলো জ্বালল রবিন।
ফিল্ম গুটিয়ে নিতে নিতে মুসা বলল, কি করতে চাইছ তুমি, বলো তো? পিঁপড়ের ছবি দেখিয়ে গুহার ভূত তাড়াবে?
ধরো, অনেকটা ওই রকমই। তবে রসিকতার জবাব রসিকতা দিয়ে দিলে কি ঘটে আমার দেখার খুব ইচ্ছে।
রসিকতা? রবিন জানতে চাইল, আমাদের চেনা কাউকে সন্দেহ করছ?
মিস্টার হেরিঙ? মুসার প্রশ্ন।
না, শান্তকণ্ঠে বলল কিশোর। ড্রাগনটা তিনি বানাননি। শটগান হাতে যে হুমকি দিচ্ছিলেন, সেটাও রসিকতা মনে হয়নি।
এত শিওর হচ্ছ কি করে? মুসা চোখ নাচাল।
কথা বলার সময় প্রচুর চেঁচামেচি করেছেন মিস্টার হেরিঙ, কিন্তু কাশেননি। ঠাণ্ডা লাগেনি তার। কিন্তু মারটিনের লেগেছিল। কথা বলার সময় কাশছিলেন।
ড্রাগনটা তাঁরই কীর্তি বলতে চাইছ?
বানালে অসুবিধে কি? হাত নাড়ল কিশোর। এসব কাজে তো তিনি ওস্তাদ।
কিন্তু স্বার্থটা কি? নিজের বাড়িতে নানা রকম খেলনা বানিয়েছেন, সেটা আলাদা কথা। অনুমতি না নিয়ে কেউ ঢুকে পড়লে তাকে তাড়াতে কাজে লাগে। গুহায় ড্রাগন ঢোকাতে যাবেন কেন? গুহাটা তার সম্পত্তি নয়। ওখান থেকে তোক তাড়ানোরও কোন প্রয়োজন নেই।
আছে কিনা সেটাই দেখতে যাব আজ। তবে মিস্টার জোনসের কাজও হতে পারে। ড্রাগন বানানোর অভিজ্ঞতা তারও আছে। হাতঘড়ির দিকে তাকাল

কিশোর। তৈরি হওয়া দরকার।
এক মিনিট, হাত তুলল মুসা। তোমার ধারণা, জোনস কিংবা মারটিন দু-জনের একজন বানিয়েছেন ড্রাগনটা। বেশ। কিন্তু সেদিন যে দু-জন ডুবুরীকে গুহায় ঢুকতে দেখলাম, তারা কারা?
হ্যাঁ, তারা কারা? রবিনেরও জিজ্ঞাসা।
প্রোজেকটর বাক্সে ভরে ফেলেছে মুসা। তালা আটকে দিয়ে মুখ তুলে তাকাল কিশোরের দিকে। বলল, কারা?
সেটাও আজ রাতেই জানতে পারব। হেসে বলল কিশোর, বেশ ভাল একখান সিনেমা দেখতে পাবে ওরা।
আর ড্রাগনটাও যদি আসে?
তাহলে তো আরও ভাল, আরেকটা পরীক্ষা হয়ে যাবে, রহস্যময় কণ্ঠে বলল কিশোর। ভয় দেখিয়ে ইঁদুর যে হাতি তাড়িয়েছে সেই গল্পটা শোনোনি? ইঁদুর যদি হাতি তাড়াতে পারে, পিঁপড়ে কেন ড্রাগন তাড়াতে পারবে না?
সৈকতের পাশে পাড়ের ওপরে অন্ধকার। শান্ত পথের মোড়ে গাড়ি রাখল হ্যাঁনসন। সবার আগে নামল রবিন। নির্জন পথের এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখল কেউ আছে কিনা। এত দূরে রাখতে বললে কেন? নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল সে। সিঁড়ি তো অনেক দূরে।
ভারি বোঝা নিয়ে কোনমতে বেরোল মুসা, প্রোজেকটরের ভারে নুয়ে পড়েছে। আল্লারে, কি ভার, হাত না লম্বা হয়ে যায়!
ভালই তো, হেসে বলল রবিন। গরিলা হয়ে যাবে। তোমাকে দেখলে ভয়ে পালাবে তখন ড্রাগন।
জবাবে গোঁ গোঁ করে কি বলল গোয়েন্দা-সহকারী, স্পষ্ট হলো না। বোঝাটা কাঁধে তুলে নিল।
দেখি, হাত বাড়াল কিশোর, আমাকেও কিছু দাও।
মাথা নাড়ল মুসা। নো, থ্যাঙ্কস, আমিই পারব। কষ্টটা যদি কাজে লাগে তাহলেই খুশি।
তোমার খুশি হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি, হাসল কিশোর।
হ্যানসনকে গাড়িতে বসিয়ে রেখে নির্জন পথ ধরে দ্রুত হেঁটে চলল তিনজনে। মেঘে ঢাকা পড়েছে চাঁদ। সৈকতে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের গর্জন ছাড়া আর কোন শব্দ নেই।
সিঁড়ি থেকে বিশ কদম দূরে থাকতে কানে এল পদশব্দ।
জলদি লুকাও! বলতে বলতেই ভারি বোঝা নিয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ল মুসা। হামাগুড়ি দিয়ে এগোল ছোট্ট একটা হালকা ঝোঁপের দিকে।

তাকে অনুসরণ করল অন্য দুই গোয়েন্দা।
কাছে আসছে পায়ের আওয়াজ। আরও কাছে এসে কমে গেল গতি, কেমন যেন অনিশ্চিত। কিছু সন্দেহ করেছে? গায়ে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে এল ছেলেরা।
অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এল আবছা ছায়াটা...কাছে, আরও কাছে...দুই কদম পাশে সরলেই এসে পড়বে একেবারে গায়ের ওপর
দুরুদুরু করছে গোয়েন্দাদের বুক। মোটা ওই মানুষটাকে আগেও দেখেছে। চোখ চলে গেল তার হাতের দিকে। আছে সেই ভয়ঙ্কর চেহারার ডাবল-ব্যারেল শটগানটা। মিস্টার জন হেরিঙ; যিনি কুকুর দেখতে পারেন না, বাচ্চাদের ভালবাসেন না, পছন্দ করেন না দুনিয়ার কোন কিছুই।
মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছেন তিনি, বোঝা যায় কিছু সন্দেহ করেছেন। অবাক কাণ্ড! আপনমনেই বিড়বিড় করলেন। নড়তে যে দেখেছি তাতে কোন ভুল নেই...
আরেকবার মাথা নেড়ে, ভাবনা ঝেড়ে ফেলে হাঁটতে শুরু করলেন।
পায়ের শব্দ দূরে মিলিয়ে যাওয়ার পরও খানিকক্ষণ নড়ল না ওরা।
অবশেষে মাথা তুলল রবিন। হউফ! করে মুখ দিয়ে বাতাস ছেড়ে বলল, বাচা গেল! আমি তো ভাবলাম, দেখেই ফেলেছেন।
আমিও, মুসা বলল। কিন্তু বন্দুক নিয়ে কি করতে বেরিয়েছেন? খুঁজছেন কাউকে?
এসো, নিচু কণ্ঠে ডাকল কিশোর। যাই। মিস্টার হেরিঙ অনেক দূরে চলে গেছেন। এ-ই সুযোগ, সিঁড়ি দিয়ে নেমে পড়া দরকার। মাথা নামিয়ে রাখো।
সিঁড়ির কাছে প্রায় ছুটে চলে এল ওরা।
ভালমত দেখে বলল মুসা, কেউ নেই।
নিঃশব্দে সিঁড়ি বেয়ে নামল তিনজনে। হাঁপ ছাড়ল। ঢেউয়ের গর্জন এখন তাদের পায়ের শব্দ ঢেকে দেবে, কারও কানে পৌঁছবে না।
চলো, জলদি চলল, তাড়া দিল মুসা। গুহায় ঢুকি। দেখি গিয়ে সিনেমা কেমন পছন্দ ড্রাগনের।
যদি সে বাড়িতে থেকে থাকে, কিশোর যোগ করল।
না থাকলেই আমি খুশি, রবিন বলল। আমার আকর্ষণ ওই সুড়ঙ্গ।
গুহার কাছে এসে গতি কমাল দুই সহকারী গোয়েন্দা। কিন্তু তাদেরকে অবাক করে দিয়ে এগিয়েই চলল কিশোর।
এই, কিশোর, এটাই তো, রবিন বলল।
নীরবে ঘাড় নেড়ে সায় দিল কিশোর। ইঙ্গিতে দেখাল ঠেলে বেরিয়ে থাকা চূড়াটা। ওপাশে রয়েছে বড় গুহাটার মুখ। চলো, দেখি, খুঁজে বের করতে পারি কিনা।
চূড়ার নিচে এসে থামল ওরা। মাথার ওপরে তিনটে বিশাল পাথরের চাঙড় চূড়ার গায়ে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে রয়েছে।

বোধহয় ওগুলো নকল, আনমনে বলল কিশোর। মুসা, নাগাল পাবে তুমি। চাপড় দিয়ে দেখো তো। মনে হয় এর নিচেই দরজা, লুকিয়ে রাখা হয়েছে।
এগিয়ে গিয়ে একটা পাথরে চাপড় দিল মুসা। ভোতা, ফাপা শব্দ। মুচকে হেসে বলল, ঠিকই বলেছ। পাথর নয়, নকল। সিনেমার স্টুডিওতে যেমন তৈরি করে, হালকা কাঠ, প্লাস্টার আর তার দিয়ে।
মাথা নেড়ে সায় জানিয়ে ঘুরে দাঁড়াল কিশোর। চলো, তোমাকে গুহায় রেখে আসি। তারপর আমি আর রবিন ঘুরতে বেরোব।
কী? চমকে উঠল মুসা। আমাকে একা...
আমাদের চেয়ে অনেক নিরাপদে থাকবে তুমি, ভরসা দিল কিশোর। এগোল প্রথম গুহামুখের দিকে। আমাদের কাজ অনেক বেশি বিপজ্জনক। গঁাট হয়ে বসে থাকবে চুপচাপ, সিনেমা দেখানোর জন্যে তৈরি হয়ে।
বিস্ময় গেল না মুসার। আশপাশে তাকাল। দেখাব কাকে? বাদুড় টাদুড় কোন কিছু...
জবাব না দিয়ে গুহায় ঢুকে পড়ল কিশোর। পেছনে রবিন। মুসাকেও ঢুকতে হলো।
ছোট গুহাটার সামনের তক্তা সরিয়ে ফেলল কিশোর। সাবধানে ঢুকল ভেতরে। অনুসরণ করল সহকারীরা। তক্তাটা আবার আগের জায়গায় লাগিয়ে রাখল সে।
নরম শিস দিয়ে উঠল কিশোর। এই যে, আমাদের জিনিসপত্র, যেগুলো ফেলে গিয়েছিলাম। থাক, যাওয়ার সময় নেব। রবিন, দেখো তো পাথরটা আবার খুলতে পারো কিনা।
এগিয়ে গিয়ে ঝুঁকে বসল রবিন। সামান্য চেষ্টার পরেই আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল, পেরেছি।
ঘড়ঘড় করে ঘুরে গেল পাথরের দরজা, ওপাশে ঢোকার পথ মুক্ত।
মুসা, কিশোর বলল, এখানেই থাকো। এই ফাঁক দিয়ে প্রোজেকটরের মুখ বের করে গুহার দেয়ালে ছবি ফেলবে। ফাঁকে পাথর আটকে দিচ্ছি, পুরোপুরি আর বন্ধ হবে না, দরজাটা। আমি সঙ্কেত দিলেই ছবি শুরু করবে।
পা ছড়িয়ে আরাম করে বসে প্রোজেকটর খুলতে শুরু করল মুসা। টর্চের আলোয় ফিল্মের ক্যানটা দেখল, সিধে করে নিয়ে মেশিনে ফিতে পরাতে পরাতে বলল, ঠিক আছে। সঙ্কেতটা কি?
ভেবে নিয়ে বলল কিশোর, বাঁচাও! বাঁচাও!
মুসাকে রেখে বিশাল গুহায় বেরিয়ে এল কিশোর আর রবিন। এগিয়ে চলল। বাতাস ভেজা ভেজা, ঠাণ্ডা, গায়ে কাঁটা দিল ওদের।
খানিকটা এগিয়ে বলে উঠল রবিন, আরি!

কি?
খোলা। আলো ফেলল সামনে। ধূসর ছড়ানো দেয়ালের মাঝে একটা ফোকর। কিংবা বলা যায় মস্ত এক ফাঁক, মেঝে থেকে ছাত পর্যন্ত।
রবিন, মনে হয় হারানো সুড়ঙ্গটা পাওয়া গেল।
খুব সাবধানে ফাঁক দিয়ে অন্যপাশে বেরিয়ে এল ওরা।
সুড়ঙ্গ এখানে আরও বেশি চওড়া, উচ্চতা বেশি। লম্বা হয়ে চলে গেছে সামনে। যতদূর দৃষ্টি চলে, কিছু নেই, তারপরে অন্ধকার।
আরও কিছুদূর এগিয়ে থমকে দাঁড়াল দু-জনে। ধড়াস করে উঠল বুকের মধ্যে। খাড়া হয়ে গেল ঘাড়ের রোম।
সুড়ঙ্গের আবছা অন্ধকারে হুমড়ি খেয়ে আছে বিরাট এক ছায়া, শান্ত, নিথর।
প্রায় ঝাঁপ দিয়ে মেঝেতে পড়ল ওরা। উপুড় হয়ে শুয়ে হাঁপাতে লাগল। জোরে নিঃশ্বাস ফেলতেও ভয় পাচ্ছে।
চুপ করে আছে তো আছেই। কিছুই ঘটল না।
ড্রাগনটা যেমনি ছিল তেমনি রয়েছে। লম্বা গলার ডগায় বসানো মাথাটা লুটিয়ে আছে মাটিতে।
ঘু-ঘুমোচ্ছে, ফিসফিস করে বলল রবিন।
মাথা নাড়ল কিশোর। কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করছে। ভুলে যাও কেন, আসল না-ও হতে পারে।
সেটা তোমার ধারণা। হতেও পারে।
আরও কিছুক্ষণ চুপ করে রইল ওরা। তারপর টর্চ জ্বালল কিশোর। ধীরে ধীরে আলোকরশি এগিয়ে নিয়ে গেল ড্রাগনের দিকে। হঠাৎ হাসি ফুটল মুখে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। ড্রাগনের নিচের দিকে দেখো, পায়ের জায়গায়, পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়ে গেছে কণ্ঠস্বর।
চোখ মিটমিট করল রবিন। বিশ্বাস করতে পারছে না। লাইন! রেললাইনের মত!
উঠে বসল কিশোর। যা আন্দাজ করেছিলাম, ওটা বানানো ড্রাগন। এই লাইনই তৈরি করেছিল ডন কারটার। তবে একটা কথা ভুল। বলেছ, রবিন। বলেছ, ওটা কখনও ব্যবহার হয়নি।
ভুল কই বললাম?
ভুলই তো বলেছ। ড্রাগনটা ওই লাইন ব্যবহার করছে না?
করছে!
হ্যাঁ, করছে। এখনই বুঝতে পারবে। চলো, গিয়ে দেখি। তাড়াতাড়ি করতে হবে, ওরা চলে আসতে পারে।
কারা? জিজ্ঞেস করল রবিন।

জবাব দিল না কিশোর। হাঁটতে শুরু করেছে।
সুড়ঙ্গ জুড়ে পড়ে থাকা বিশাল আকৃতিটার কাছে এসে দাঁড়াল ওরা।
কুটি করল কিশোর, নাক দিয়ে বিচিত্র শব্দ করল।
কি হয়েছে? জানতে চাইল রবিন।
ঠিক বুঝতে পারছি না। বাইরের দিকে, মানে সৈকতের দিকে মুখ করে পড়ে আছে এটা। ধূসর দেয়ালটা খোলা, কিন্তু বাইরের পথ এখনও বন্ধ। কি মানে হয়?
ঠোঁট ওল্টাল রবিন। মাথা নাড়ল, একই সঙ্গে হাতও নাড়ল। সে-ও বুঝতে পারছে না।
মনে হয়, জবাবটা কিশোরই দিল, এটার ভেতরে যে বা যারা ছিল তারা বেরিয়ে চলে গেছে। ড্রাগনটাকে এমনভাবে ফেলে রেখে গেছে, যাতে কেউ ঢুকলেই দেখে ভয়ে পালায়।
চুপ করে রইল রবিন।
ড্রাগনের মুখে টর্চের আলো ফেলল কিশোর। চোখ নয়, খুদে হেডলাইট, মুভেবল।
আবার ড্রাগনের পাশে চলে এল দু-জনে। আঁশ আঁশ কালচে চামড়ায় কি একটা চোখে পড়ল কিশোরের, হাত বাড়িয়ে চেপে ধরল। দরজার হাতল। কিন্তু দরজাটা কই?
কিশোরের কাঁধের ওপর দিয়ে তাকাল রবিন। ওই যে আরেকটা হাতল, তার ওপরে আরেকটা।
ফিক করে হাসল কিশোর। আবার বোকা বানাল। দরজার হাতল নয় ওগুলো। পা-দানী। পা রেখে উঠে যাওয়ার জন্যে।
হাতলের সিঁড়ি বেয়ে উঠে যেতে শুরু করল সে। কিছুটা উঠে ফিরে তাকিয়ে রবিনকে ওঠার জন্যে ডাকল। পিঠের ওপরে উঠে রাস্তার ম্যানহোলের মত ঢাকনাটা দেখতে পেল।
আরি, একেবারে সাবমেরিনের হ্যাঁচ, অবাক কণ্ঠে বলল কিশোর। রবিন, থাকো এখানে, পাহারা দাও। আমি নিচে যাচ্ছি।
ঢোক গিলল রবিন, কিছু বলল না, মাথা কাত করল শুধু।
উবু হয়ে হ্যাঁচের হাতল ধরে জোরে টান দিল কিশোর। উঠে গেল ঢাকনা। সিঁড়ি বেয়ে ভেতরে নামল কিশোর।
অপেক্ষা করে আছে রবিন। খানিক পরেই সাড়া এল ভেতর থেকে। থাবা দেয়া হচ্ছে খোলসে। তারমানে ড্রাগনের পেটে ঢুকে গেছে গোয়েন্দাপ্রধান।
ভয় পাচ্ছে রবিন, অস্বস্তিতে বার বার তাকাচ্ছে এদিক-ওদিক। অন্ধকারে লম্বা সুড়ঙ্গে বেশিদূর এগোচ্ছে না টর্চের আলো। সুড়ঙ্গের দেয়াল কংক্রিটে তৈরি, ছাতে ইস্পাতের কড়িবরগা।

এতই অন্যমনস্ক ছিল রবিন, হ্যাঁচ খোলার শব্দে চমকে উঠল। চেয়ে দেখল, মাথা বের করেছে কিশোর। ডাকল, এসো, দেখে যাও।
সিঁড়ি বেয়ে ভেতরে নামল রবিন।
টর্চ জ্বেলে আলো ফেলল। চমৎকার, তাই না? বাইরে থেকে মনে হয় জ্যান্ত ড্রাগন। চলে রেলের ওপর দিয়ে। এই যে দেখো, পেরিস্কোপ। আর এটা, পোর্টহোল। আসলে, রবিন, এটা একটা সাবমেরিন। অদ্ভুত সাবমেরিন।
ভেতরের দিকে বাঁকা, মসৃণ দেয়ালে হাত বোলাল রবিন। কি দিয়ে বানিয়েছে?
সাধারণত লোহা আর ইস্পাত দিয়েই সাবমেরিন বানানো হয়। তবে এটা অন্য কিছু দিয়ে তৈরি। দেখি তো, ইঞ্জিনরুমটা কেমন?
সরু গলিপথ ধরে মাথার দিকে এগোল দু-জনে।
এক জায়গায় এসে চেঁচিয়ে উঠল রবিন, গীয়ারশিফট, ড্যাশবোর্ড, ব্রেক, প্যাডাল! কি ধরনের সাবমেরিন এটা? এক্কেবারে তো গাড়ি।
আঙুল মটকাল কিশোর। সবচেয়ে প্রথম যে সাবমেরিনটা তৈরি হয়েছিল, তার কথা বইয়ে পড়েছি। সাগরের তলার মাটি দিয়ে গাড়ির মত চাকায় গড়িয়ে চলত ওটা। গাড়ির মতই জানালা ছিল, কাঁচে ঢাকা, যাতে তার ভেতর দিয়ে বাইরে দেখতে পারে দর্শকরা। ভেতরে বিশেষ এয়ার কম্পার্টমেন্টের ব্যবস্থা ছিল, বাইরের পানির চাপ থেকে সাবমেরিনকে রক্ষা করার জন্যে। মনে হয় ওই আইডিয়াটাই কাজে লাগিয়েছে এই ড্রাগনের ইঞ্জিনিয়াররা। অনেকটা ওই রোজ বাউল ফ্লোটসের মত ব্যাপার। গাড়ির চ্যাসিসকে ফুল দিয়ে ঢেকে সাজানো হয়, জানো হয়তো। ভেতরে বসে থাকে ড্রাইভার, লুকিয়ে, তাকে। দেখতে পায় না কেউ। লো গীয়ারে গাড়ি চালায়।
এই ড্রাগনটাকেও অনেকটা ওভাবেই চালানো হয়, উত্তেজিত হয়ে উঠেছে রবিন। দেখে মনে হয় বালির ওপর দিয়ে ভেসে আসে, চাকা চোখে পড়ে না বলে। মিস্টার ক্রিস্টোফারের ওখানে যে সিনেমাটা দেখেছি, তাতে ড্রাগন কিন্তু অন্য রকমভাবে হাঁটে। দুলে দুলে, পায়ের পর পা ফেলে।
ওই ড্রাগন অন্য রকমভাবে বানানো হয়, যাতে পর্দায় আসল ড্রাগনের মত লাগে। কিন্তু এটা বানানো হয়েছে মানুষকে ভয় দেখিয়ে দূরে সরানোর জন্যে।
কেন? প্রশ্নটা করতে গিয়েও থেমে গেল রবিন। বিচিত্র একটা। গোঙানি শোনা গেল, টানা টানা।
চমকে গেল দু-জনেই।
কি-ক্কী? কণ্ঠস্বর খাদে নেমে গেল রবিনের।
ওখান থেকে আসছে, লেজের দিকে দেখাল কিশোর।

চলো, পালাই। জেগে উঠছে সাবমেরিন। পানিতে গিয়ে ডুব দিলে মরেছি। অটোপাইলটে চলে মনে হয়।
আবার শোনা গেল গোঙানি, কেমন যেন বিষণ্ন, গা-শিরশির করা শব্দ।
কেঁপে উঠল রবিন। আমার একদম ভাল্লাগছে না!
কিন্তু তাকে বিস্মিত করে দিয়ে সরু গলিপথ ধরে ড্রাগনের লেজের দিকে ছুটে গেল কিশোর।
আবার গোঙানি শোনা গেল।
মেঝের দিকে ঝুঁকল কিশোর। কিছু বোঝার চেষ্টা করছে।
কাছে চলে এল রবিন। কী?
জবাব দিল না কিশোর। টর্চের আলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেয়াল পরীক্ষা করতে লাগল। তারপর রবিনকে আরেকবার অবাক করে দিয়ে হাসল। আরও একটা রহস্যের কিনারা হলো।
কিনারা?
শুনছ না? রবিনের কথার জবাব দিল না কিশোর।
কান পেতেই আছে রবিন। শুনছি তো। কিন্তু মোটেই ভাল্লাগছে না আমার।
ভয় পেয়েছ বলে লাগছে না। এসো, দেখো, ভয় কাটবে, হাসতে হাসতেই হাতল টেনে ছোট একটা দরজা খুলে ফেলল কিশোর। আলো ফেলল ভেতরে। জোরাল হলো গোঙানি।
কুকুরের গলা মনে হচ্ছে না? বকের মত গলা বাড়িয়ে দরজার ওপাশে তাকাল রবিন। আরে, কুকুরই তো! এক আলমারি ভরতি!
এবার বুঝলে তো? কুকুর-হারানো রহস্যের সমাধান হলো।
ঘটনাটা কি? দেখে মনে হচ্ছে নড়াচড়ার ইচ্ছে নেই বিশেষ। কুকুরের এত ঘুম?
ইচ্ছে করে ঘুমাচ্ছে না। ঘুমের ওষুধ খাওয়ানো হয়েছে।
ওষুধ? কেন?
জেগে থাকলে হয়তো কারও অসুবিধে হয়। কুকুরগুলোকে শান্তও রাখতে চায় সেই লোক, আবার ক্ষতি হোক এটাও চায় না। সেজন্যেই মারেনি, ধরে এনে আটকে রেখেছে।
আবার গুঙিয়ে উঠল একটা কুকুর, ঘুমঘুম চোখে তাকাল। খানিক আগেও এটাই গুঙিয়েছে, স্বর শুনেই বোঝা যায়।
আইরিশ সেটার! চেঁচিয়ে উঠল রবিন। মিস্টার জোনসেরটা না তো?
কুকুরটার দিকে চেয়ে ডাকল কিশোর, পাইরেট, আয়।
লালচে রোমশ কুকুরটা শরীর টানটান করল, হাই তুলল, আড়মোড়া ভাঙল, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে শরীর ঝাড়া দিল আলস্য তাড়ানোর ভঙ্গিতে। লটপট করে

উঠল লম্বা লম্বা কান।
আয়, পাইরেট, আবার ডাকল কিশোর। আয়। হাত বাড়িয়ে দিল।
হাত শুঁকল কুকুরটা। লেজ নাড়তে শুরু করল। লাফিয়ে নেমে এল আলমারির তাক থেকে। টলছে মাতালের মত। সামলে নিতে সময় নিল। কিশোরের পায়ে গা ঘষছে, কুঁই-কুঁই আওয়াজ বেরোচ্ছে নাক দিয়ে।
দারুণ কুকুর, মাথা চাপড়ে দিতে দিতে বলল কিশোর। খুব। ভাল।
মিস্টার জোনসও তাই বলেছেন অবশ্য। হাত বাড়াল রবিন। কুকুরটা চলে এল তার কাছে, পায়ে গা ঘষতে লাগল।
আরে, যে ডাকে তার কাছেই তো যায়।
বাড়ি যাবি? কুকুরটাকে বলল কিশোর।
কি বুঝল পাইরেট কে জানে, ঘেউ ঘেউ শুরু করল। তার ডাকে আস্তে আস্তে চোখ মেলল অন্য কুকুরগুলোও। শুরু হলো নানারকম বিচিত্র মিশ্র শব্দ। কেউ কেউ নেমে এসে কুকুরের কায়দায় স্বাগত জানাল দুই গোয়েন্দাকে।
ছয়টা, গুনল রবিন। হারানো সবগুলোই এক জায়গায়।
মাথা ঝাঁকাল কিশোর। প্রতিটি কুকুরের গলার কলারে আটকে দিল এক টুকরো লেখা কাগজ।
কি? জিজ্ঞেস করল রবিন।
মেসেজ। কুকুরের মালিকেরা জানবে, কে, কিভাবে বের করেছে। এগুলোকে। বিজ্ঞাপন হবে আমাদের সংস্থার।
গোঁ গোঁ করে উঠল পাইরেট।
ঝুঁকে তার গলা চাপড়ে আদর করে বলল কিশোর, ও-কে ও-কে, তুইই আগে যাবি।
কোলে করে কুকুরটাকে তুলে নিয়ে এল হ্যাঁচের বাইরে। যা, দৌড় দে, সোজা বাড়ি।
আনন্দে আরেকবার কো কো করল পাইরেট, লাফ দিয়ে মাটিতে নেমে দৌড় দিল দেয়ালের ফাঁকের দিকে।
নিচ থেকে এক এক করে কুকুরগুলোকে তুলে দিল রবিন, ওপর থেকে ধরল কিশোর। ভোলা বাতাসে ওষুধের ক্রিয়া পুরোপুরি কেটে গেছে কুকুরগুলোর, তরতাজা হয়ে উঠেছে। আইরিশ সেটারটার পেছনে ছুটল সব কটা।
কাপড়ে হাত মুছতে মুছতে বলল রবিন, মুসা শুনলে খুব অবাক হবে। তো, আমরা আর এখানে থেকে কি করব? কাজ তো শেষ। চলো, যাই।
এখন যাওয়া যাবে না।
কেন?

সুড়ঙ্গের ভেতরে কিছু নড়ল দেখলাম। আসছে কেউ।
হায় হায়! গেলাম তো আটকে। লুকাই কোথায়?
সাবমেরিনের ভেতরে এসে ঢুকল আবার দু-জনে। রবিনকে নিয়ে আলমারিটার কাছে চলে এল কিশোর, যেটাতে কুকুর রাখা হয়েছিল। টান দিয়ে খুলল আলমারির দরজা।
ঠাণ্ডা বেশি নয়, তবু ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে মুসার হাত। তালুতে তালু ঘষে গরম রাখার চেষ্টা করছে। জায়গামত বসিয়ে ফেলেছে প্রোজেকটর। সুইচ টিপলেই ছবি শুরু হবে এখন।
শেষবারের মত আরেকবার সবকিছু চেক করে নিল সে, দেখল ঠিকঠাক আছে কিনা। তারপর দেয়ালে হেলান দিয়ে পা লম্বা করে বসে। রইল চুপচাপ। সঙ্কেত শুনলেই চালু করে দেবে মেশিন।
শব্দ শুনল, তবে সঙ্কেত নয়। তাছাড়া সামনের দিক থেকেও নয়, পেছন থেকে আসছে খসখস শব্দটা।
স্থির হয়ে গেল সে। ভুল শোনেনি তো? না, আবার শোনা গেল।
ছোট্ট গুহার বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে কেউ। প্রবেশ মুখের তক্তার নিচের বালি সরাচ্ছে।
নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরল মুসা। কি করবে? উঠে দৌড়ে বেরিয়ে যাবে বড় গুহায়? কিশোর আর রবিনের কাছে? কিন্তু তাহলে তো সব পণ্ড হবে। জায়গা ছেড়ে নড়তে মানা করে দিয়ে গেছে কিশোর। তার কথা অমান্য করলে আবার না আরও বড় বিপদে পড়ে। এসব ব্যাপারে অতীত অভিজ্ঞতা আছে মুসার। কিশোর পাশার নির্দেশ না মেনে অনেক বড় বিপদে পড়েছে।
সরে যাচ্ছে তক্তা। দ্রুত চিন্তা চলছে তার মাথায়। যা করার জলদি করতে হবে। কিছু একটা অস্ত্রের জন্যে মেঝে হাতড়াল অহেতুক। এই সময় খেয়াল হলো, টর্চটা জ্বলছে।
তাড়াতাড়ি নিভাল ওটা। গাঢ় অন্ধকার গ্রাস করে নিল তাকে। কিন্তু এই অন্ধকার কতক্ষণ আচ্ছাদন দেবে? লোকটার হাতেও তো আলো থাকতে পারে।
বেশি ভাবার সময় পেল না মুসা। দেয়াল ঘেঁষে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল।
সরে গেল তক্তা। আবছা আলোর পটভূমিকায় মূর্তিটাকে দেখতে পেল সে। এত মোটা মানুষ, সরু ফাঁক দিয়ে সামনাসামনি ঢুকতে পারবেন না, পাশ ফিরে আসতে হবে। আকার দেখেই তাকে চিনতে পারল। বদমেজাজী হেরিঙ! হাতে শটগান।
গুহার দেয়াল নিচু। মাথা ঠেকে যায়। নুয়ে নুয়ে এগোতে হলো হেরিঙকে। দুই পা এগিয়েই থমকে দাঁড়ালেন। কান পেতে কিছু শুনছেন মনে হলো।

শব্দ মুসাও শুনতে পাচ্ছে। কুকুরের ঘেউ ঘেউ। শিকারী কুত্তা ছেড়ে দেয়া হয়েছে? প্রমাদ গণল সে। মিশে যেতে চাইল দেয়ালের সঙ্গে। কিন্তু খুব একটা লাভ হবে বলে মনে হলো না তার। চোখ নাহয় এড়াতে পারল, কিন্তু গন্ধ?
তীব্র গতিতে ছুটে এল ওগুলো। পাথরের দরজার পাল্লা ফাঁক করে রেখে গেছে কিশোর। সেদিক দিয়ে স্রোতের পানির তোড়ের মত ঢুকল একটার পর একটা।
কিন্তু মুসাকে আক্রমণ করতে এল না ওগুলো। ছুটে গেল গুহামুখের দিকে। গিয়ে পড়ল একেবারে হেরিঙের গায়ে। আঁউ করে উঠলেন তিনি। পড়ে গেলেন মাটিতে।
ঢোক গিলল মুসা। ড্রাগনের ভয় করছিল সে, কিন্তু কুকুর আশা। করেনি। মিস্টার হেরিঙকে বাঁচাতে হলে কিছু একটা করা দরকার। নইলে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে কুত্তার দল। আর কিছু না পেয়ে হাতের টর্চটাই উঁচু করে ধরল বাড়ি মারার জন্যে।
কিশোর আর রবিনও পড়েছে বেকায়দায়। আলমারিতে বসে দরজায় কান পেতে শুনছে।
ইস, কত কাজ যে করলাম, তিক্ত কণ্ঠ শোনা গেল একজনের। এসব লাইন-টাইন পরিষ্কার–তারপর কি খোঁড়াটাই না খুঁড়লাম।
খামোক কষ্ট করোনি, নিক, জবাবে বলল আরেকজন। বিফলে যাবে না। পুরস্কার শিগগিরই পাবে।
তা ঠিক। কিন্তু, জো, লোকটা খুব হারামী। বিশ্বাস করা যায়?
হেসে উঠল নিক। ও একলা, আর আমরা দুজন। নৌকাটাও আমাদের। গিয়ে দেখো, ও-ও হয়তো ভাবছে আমাদের বিশ্বাস করা যায় কিনা।
মই বেয়ে লোক নেমে আসার শব্দ শোনা গেল। সরু গলিপথে পদশব্দ।
জীবন্ত হলো ইঞ্জিন। কেঁপে উঠল সাবমেরিন, একবার ধাক্কা দিয়েই মসৃণ গতিতে চলতে শুরু করল লাইনের ওপর দিয়ে।
অন্ধকারে কিশোরের হাঁটুতে হাত রাখল রবিন। ফিসফিসিয়ে বলল, দুই ডাইভার না তো? সাগরে নামতে যাচ্ছে নাকি?
মনে হয় না। ডুবিয়ে রাখার মত ভার তোলা হয়নি সাবমেরিনে। পানিতে নামার আগে ভার বোঝাই করে নিতে হবে।
না নামলেই বাঁচি, মুখ দিয়ে বাতাস ছাড়ল রবিন।
পেছনে চলেছি। সুড়ঙ্গের গভীরে।
বুঝতে পারছি। কিন্তু কেন যাচ্ছে? কি করবে?
জানতে পারলে ভাল হত। তবে যা-ই করুক, ব্যাপারটা গোলমেলে।
হঠাৎ আবার ঝাঁকুনি খেয়ে দাঁড়িয়ে গেল ড্রাগন। পেছনে ধাক্কা খেল কিশোর আর রবিন।

ড্রাইভার ফিরে এল মইয়ের কাছে। চলো, নিক। মাল বোঝাই করার সময় সাবধান থেকো।
ব্যাটা কোনরকম চালাকি করবে না তো? অস্বস্তি যাচ্ছে না জো-র। করলে কিন্তু বিপদে পড়বে সে। ওই ইট দিয়েই মাথায় বাড়ি মেরে বসব।
মেরো। চালাকি করলে আমিও ছাড়ব না। দুই কোটি ডলারের মামলা, সোজা কথা?
অন্ধকারের দিকে শূন্য চোখে তাকিয়ে রয়েছে দুই গোয়েন্দা। দুই কোটি ডলার? ঠিক শুনছে তো?
মই বেয়ে ওঠার শব্দ হলো। হ্যাঁচ উঠল..নামল...দুই বার। দু জনেই বেরিয়ে গেছে।
রবিনের কাঁধে হাত রাখল কিশোর। বেরোও।
সাবধানে দরজা খুলে বেরিয়ে এল ওরা। কয়েক পা এগিয়েই থমকে দাঁড়াল। বাইরে কথা বলে উঠেছে কেউ, খসখসে কণ্ঠ, কথার মাঝে মাঝে কাশছে।
জলদি করো, বলল সে। গার্ডকে ঠাণ্ডা করে দিয়েছি। কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে থাকবে। ও জাগার আগেই সরিয়ে নিতে হবে ইটগুলো।
কনুই দিয়ে কিশোরের গায়ে গুতো দিল রবিন। রোভার মারটিনের গলা চিনতে পেরেছে। তোমার অনুমান ঠিকই ছিল।
ড্রাগনের কাশি রহস্যেরও সমাধান হলো। বাকি রইল আর একটা রহস্য।
ওরা কি করছে এখানে, সেটা তো?
না। বার বার ইটের কথা বলছে। কিসের ইট?
রবিনের পিঠে ঠেলা দিয়ে চলার নির্দেশ দিল কিশোর। ম্লান আলোয় আলোকিত গলি ধরে এসে আস্তে করে বাইরে মাথা বের করল সে।
হাঁ হয়ে গেল দেখে। ড্রাগনের পাশেই কংক্রিটের দেয়াল। মস্ত একটা গর্ত করা হয়েছে ওতে, একজন মানুষ হেঁটে ঢুকে যেতে পারবে ওতে, এতটাই বড়। হাতে পাঁজাকোলা করে কি যেন নিয়ে গর্তের মুখে দেখা দিল একজন লোক, ভারের চোটে পেছনে বাঁকা হয়ে গেছে।
উফ, ভারিও! বলল লোকটা। এক টন হবে।
তুমি কি ভেবেছিলে, শোলার মত পাতলা? বললেন মারটিন। এতই যদি সহজ হবে, তোমাদের ভাড়া করতে যাব কেন?
আমি সে কথা বলছি না। বলছি, বেজায় ভারি।
তা ঠিক। একেকটা ইট সত্তর পাউণ্ড। বাইরে সারি দিয়ে রাখো। পরে ঢোকাবে।
বোঝা নামিয়ে রেখে আবার গর্তের দিকে চলল লোকটা। সে ঢোকার আগেই বেরোল তার সঙ্গী। পাঁজাকোলা করে ইট নিয়ে এসেছে। হাঁপাচ্ছে। ওই অবস্থায়ই হেসে বলল, সাংঘাতিক ভারি, হে, জো।

মারটিনের নির্দেশ মত সে-ও বোঝা নামাল ড্রাগনের পাশে। আরও আনতে ফিরে চলল।
নিঃশব্দে হ্যাঁচ নামিয়ে নেমে এল কিশোর।
একেকটা ইট সত্তর পাউণ্ড, রবিনকে শুনিয়ে শুনিয়ে হিসেব শুরু করল সে। নিক আর জো বলল, দুই কোটি ডলার। কিসের ইট বোঝাই যাচ্ছে। স্বর্ণ।
স্বর্ণ! জোর করেও কণ্ঠস্বর খাদে রাখতে পারল না রবিন। আনছে কোত্থেকে?
সরকারী ইঁট, বর্তমানে সবচেয়ে বড় স্ট্যাণ্ডার্ড, সত্তর পাউণ্ড। ব্যাটারা ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক লুট করছে।
নরম সুরে শিস দিয়ে উঠল রবিন।
চুপ! তার মুখ চেপে ধরল কিশোর। শুনে ফেলবে।
কিশোরের হাত সরিয়ে ফিসফিস করে বলল রবিন, চলো, পালাই। দেখলে আমাদের ছাড়বে না ডাকাতেরা, খুন করে ফেলবে।
কিন্তু পালাই কি করে? প্রশ্নটা নিজেকেই করল কিশোর। বেরোতে গেলেই মারটিনের চোখে পড়ব।
সামনের দিকে রওনা হলো কিশোর। রবিন ভাবল, নতুন কোন গুপ্তস্থানের সন্ধান করছে গোয়েন্দাপ্রধান, যেখানে নিরাপদে লুকিয়ে থাকা যায়।
হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল কিশোর। গায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। রবিন। কথা বলে উঠল, সরি…
তাড়াতাড়ি তার মুখ চেপে ধরল কিশোর, ফিসফিস করে বলল, তুমি দেখছি ধরা পড়িয়েই ছাড়বে! উত্তেজনায় চকচক করছে তার চোখ। ইগনিশান কী রেখে গেছে!
মানে-তুমি, মানে ড্রাইভ করবে? চালাবে এটাকে? গাড়ি তো চালাতে জানে না। তাছাড়া জানালাও নেই। তাকাবে কোনখান দিয়ে?
দেখি কি করতে পারি। লাইনের ওপর দিয়ে চলবে যখন, দেখার দরকার হবে না বোধহয়। আর গাড়ি চালাতে জানি না বটে, কি করে চালাতে হয় তা তো জানি। ক্লাচ, ব্রেক, অ্যাকসিলারেটর, গীয়ারশিফট, সবই গাড়ির মত।
ছোট ড্রাইভিং সীটে বসল কিশোর। মোচড় দিল চাবিতে।
গর্জে উঠল ইঞ্জিন।
কিন্তু পুরোপুরি চালু হওয়ার আগেই ছোট্ট কয়েকটা কাশি দিয়ে থেমে গেল।
মারটিন না, কিশোর, চেঁচিয়ে উঠল রবিন, উত্তেজনায় আস্তে কথা বলার কথা ভুলে গেছে আবার, মারটিন, কাশেনি! ইঞ্জিনের কাশিই শুনেছি আমরা।
নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরেছে কিশোর। রবিনের কথার জবাব না দিয়ে মরিয়া হয়ে আবার মোচড় দিল চাবিতে। ধরেই রাখল।

আবার ইঞ্জিন চালু হলো। বন্ধ হলো না।
স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে গীয়ার দিল কিশোর, আস্তে করে পা সরিয়ে আনুল ক্লাচ প্যাডাল থেকে।
ঝাঁকুনি দিয়ে এগিয়ে হোঁচট খেয়ে যেন থেমে গেল গাড়ি। কাশি দিয়ে বন্ধ হলো ইঞ্জিন।
ইস্, ক্লাচটা ডোবাল, বলেই আবার ইগনিশনে মোচড় দিতে গেল কিশোর। ঠিক এই সময় হ্যাঁচ খোলার শব্দ হলো।
সর্বনাশ! বড় বড় হয়ে গেছে রবিনের চোখ। হ্যাচ খোলা!
হ্যাঁ, ভুলই হয়ে গেল! ভয় ফুটেছে গোয়েন্দাপ্রধানের চোখেও। হ্যাচ আটকে নেয়া উচিত ছিল!

.
মুসা কাঁপছে। কাঁপছে তার হাতে টর্চ। এই সামান্য টর্চের বাড়ি মেরে কি ওই ভয়ানক কুকুর ঠেকাতে পারবে? হেরিঙ করছেনটা কি? তার হাতে তো শটগান রয়েছে। গুলি করছেন না কেন?
হঠাৎ বুঝতে পারল ব্যাপারটা। আক্রমণ করেনি কুকুরগুলো, তাড়াহুড়ো করে বাইরে বেরোতে চাইছে। ফলে পথ যেটা ভোলা পেয়েছে সেই পথেই ছুটে গেছে হুড়মুড় করে। অন্ধের মত ছুটতে গিয়েই হেরিঙের গায়ের ওপর পড়েছিল, ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে তাকে।
ব্যাপার কি? নড়ছে না কেন?
সাহস খানিকটা ফিরে পেয়েছে মুসা। পায়ে পায়ে এগোল। হেরিঙের গায়ে হাত দিয়ে দেখল। নড়ছেন না। শ্বাস-প্রশ্বাস ঠিকই বইছে। নিশ্চয় পড়ে গিয়ে পাথরে বাড়ি খেয়েছে মাথা, বেহুশ হয়ে। গেছেন।
পালাতে চাইলে এই সুযোগ। হেরিঙের হুঁশ ফিরলে আর পারবে বা।
দ্রুত ফিরে এসে প্রোজেকটরটা তুলে নিল মুসা। পাথরের দরজা ঠেলে ফাঁক করে বেরিয়ে এল বড় গুহায়। ফাঁক করার জন্যে গোজ লাগানোর ছোট পাথরটা সরাতে হয়েছে। সেটা আর লাগানোর সময় পেল না। এক হাতে প্রোজেকটর-ওটার ভারেই হিমশিম খাচ্ছে; ফলে অন্য আরেক হাতে দরজাটা ধরেও রাখতে পারল না। জোর পেল না। ছুটে গেল হাত থেকে। বন্ধ হয়ে গেল আপনাআপনি।
যা হয় হোকগে। বাঁচলে পরে খোলার চেষ্টা করতে পারবে। আগে কিশোর আর রবিনকে খুঁজে বের করা দরকার।
ধূসর দেয়ালের দিকে এগোল মুসা। ফাঁক দেখল। কোন রকম ভাবনা চিন্তা না করেই ঢুকে পড়ল ভেতরে। অদ্ভুত একটা শব্দ হতেই ঝট করে পেছনে ফিরে

তাকাল। ক্ষণিকের জন্যে থেমে গেল যেন হৃৎপিণ্ড। পাক দিয়ে উঠল পেটের মধ্যে।
পেছনে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে দরজার ফাঁক!
বিচিত্র শব্দ হলো এবার সামনে। ফিরে চেয়েই আরেকটা ধাক্কা খেল মুসা। সামনে লম্বা সুড়ঙ্গ, অন্ধকারে আবছামত দেখা যাচ্ছে মস্ত একটা অবয়ব। চেনে ওটাকে। হলুদ দুই চোখে উজ্জ্বল আলো। হাঁ করা মুখ। গর্জে উঠল ড্রাগন।
টর্চ নিভিয়ে নিজের অজান্তেই পিছিয়ে এল মুসা। পিঠ ঠেকল দেয়ালে। আর পিছানোর জায়গা নেই।
পাশে সরতে শুরু করল সে। চলে এল একটা অন্ধকার কোণে। ভারি প্রোজেকটরটা সামনে তুলে ধরেছে অনেকটা বর্মের মত করে।
অদ্ভুত কাণ্ড করছে ড্রাগনটা। লাফিয়ে লাফিয়ে এগোচ্ছে। খানিকটা এগিয়েই থেমে যাচ্ছে, খানিক পরই গর্জে উঠে আরও খানিকটা এগোচ্ছে। এইই করছে বার বার। কিশোর আর রবিনের চিহ্ন নেই। জোরে ঠোঁট কামড়ে ধরেছে সে, চাপা একটা গোঙানি বেরোল গলা দিয়ে।
নিশ্চয় তার দুই বন্ধুকে গিলে ফেলেছে ওটা। ওরা এখন দানবের পেটে হজম হচ্ছে। ওদেরকে বাঁচানোর আর কোন উপায় নেই। সে নিজে এখন বাঁচতে পারবে কিনা, সেটাই সন্দেহ।
খোলা হ্যাঁচ দিয়ে ভেসে এল রোভার মারটিনের চিৎকার, বেরোও! কে ওখানে, বেরিয়ে এসো! যদি ভাল চাও তো বেরোও!
কিশোরের দিকে তাকাল রবিন।
মাথা নাড়ল কিশোর। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বসেছে, দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। আঙুলগুলো দ্রুত নড়ছে কন্ট্রোল প্যানেলের ওপর। এটাই বাঁচার একমাত্র উপায়, ড্রাগনটাকে চালিয়ে নেয়া।
আবার চালু হলো ইঞ্জিন। ঝাঁকুনি দিয়ে আগে বাড়ল ড্রাগন। হঠাৎ কি জানি কি হলো, ছেড়ে দেয়া স্প্রিঙের মত লাফিয়ে উঠল লম্বা গলাটা।
কিশোর! দেখো দেখো! চেঁচিয়ে বলল রবিন। নিশ্চয় কোন বোতামে চাপ লেগেছে। কিভাবে সোজা হলো দেখলে? ওই যে একটা জানালা, বাইরে দেখা যায়।
মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানিয়ে গ্যাস প্যাডাল চেপে ধরল কিশোর, যতখানি যায়। আগের মতই কিছুদূর এগিয়ে কাশি দিয়ে থেমে গেল ইঞ্জিন। শোনা গেল মারটিনের চিত্তার।
খটাং করে হ্যাঁচ বন্ধ হলো, খোলস বেয়ে কি যেন গড়িয়ে ধুপ করে, পড়ল মাটিতে। যেন ময়দার বস্তা পড়ল।

মারটিন পড়েছে, রবিন বলল। ঝাঁকুনি সামলাতে পারেনি। চালাও, চালাও।
চেষ্টা তো করছি। পারছি না। কিছু একটা গোলমাল আছে, খালি থেমে যায়।
চাবি ঘোরাতেই আবার চালু হলো ইঞ্জিন। ইঞ্জিনের শব্দ ছাপিয়ে শোনা গেল মারটিনের চেঁচামেচি, সাহায্যের জন্যে ডাকছেন নিক আর জোকে।
পেছন দিকে পোর্টহোলের কাছে ছুটে গেল রবিন, কাঁচে নাক চেপে ধরে বাইরে তাকাল। কিশোর, ব্যাটারা আসছে। জলদি কিছু করো। পাগলা কুত্তা হয়ে গেছে ওরা।
গীয়ার দিয়ে ক্লাচ ছাড়তেই লাফ দিয়ে আগে বাড়ল ড্রাগন। অ্যাকসিলারেটরের ওপর প্রায় দাঁড়িয়ে গেল কিশোর, এত জোরে চাপ দিচ্ছে।
ভীষণ ঝাঁকুনি দিয়ে আবার থেমে গেল ড্রাগন, ইঞ্জিন স্তব্ধ।
দাঁতে দাঁত চেপে আবার চালু করল কিশোর। আগে বাড়ল ড্রাগন, আবার থেমে গেল।
এভাবেই চালিয়ে যাও, বলল রবিন। থেমো না।
চালু হলো ইঞ্জিন।
ওরা কদ্দূর? চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর।
ধরে ফেলল। চালাও।
প্রাণপণে ছুটছে দুই ডাকাত, তাদের পেছনে চেঁচামেচি করছেন। আর হাত-পা ছুঁড়ছেন মারটিন।
কয়েক ফুট এগিয়ে থেমে গেল ড্রাগন।
গতি আরও বাড়াল দুই ডাকাত।
ফ্যাকাসে হয়ে গেল রবিন। দেখছে, ড্রাগনের লেজ প্রায় ধরে ফেলেছে ওরা!... ধরল। চেপে ধরে টান দিল পেছনে। দু-জনের গায়েই মোষের জোর। ইঞ্জিন বন্ধ থাকলে টেনেই পিছিয়ে নিয়ে যাবে সাবমেরিনটাকে।
ধরে ফেলেছে! চেঁচিয়ে উঠল রবিন।
প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আগে বাড়ল ড্রাগন। সেই একই ব্যাপার। কয়েক ফুট গিয়েই ঝাঁকি দিয়ে থেমে গেল।
নাহ্, হবে না। কুটি করল কিশোর। কপালের ঘাম মোছারও অবকাশ নেই। এখন আর ইঞ্জিনই স্টার্ট নিচ্ছে না।
নিলেও আর লাভ নেই, হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল রবিন। ধরে ফেলেছে।
লেজ চেপে ধরে গায়ের জোরে টানছে দুই ডাকাত, টানের চোটে পেছনে হেলে পড়েছে দু-জনের শরীর। বুঝতে পারল, টানার দরকার নেই, ইঞ্জিন স্টার্ট নিচ্ছে না। লেজ ছেড়ে দিয়ে দৌড়ে এল একজন। পা-দানী ধরে ফেলল। দেখতে দেখতে উঠে চলে এল হ্যাঁচের কাছে, টান দিয়ে খুলে ফেলল ঢাকনা।

ধরে তো ফেলল, কিশোর! কাঁদো কাঁদো হয়ে গেছে রবিন। কি করি এখন?
কি আর করার আছে? সীট থেকে উঠে সরু গলিপথ ধরে এগিয়ে এল কিশোর। আত্মসমর্পণ করব। তাহলে হয়তো আর কিছু বলবে না, কিন্তু কথাটা নিজেই বিশ্বাস করল না সে।
মই বেয়ে উঠে বাইরে হাত বের করে নাড়ল কিশোর। মিস্টার মারটিন, আমরা বেরিয়ে আসছি।
মারটিনের রাগান্বিত চিৎকার শোনা গেল। কি বললেন, কিছু বোঝা গেল না।
এই সময় বদ্ধ গুহা ভরে গেল আরেকটা বিকট চিৎকারে। ভয়ঙ্কর আওয়াজ। অন্ধকার সুড়ঙ্গের পুরু দেয়ালে প্রতিধ্বনি উঠল।
হ্যাচের বাইরে মাথা বের করেছে কিশোর। শব্দ শুনে ঝটকা দিয়ে ফিরে তাকাল। তাদের সামনের দেয়ালটা রুদ্ধ, যেটা ফাঁক ছিল খানিক আগে, যেখান দিয়ে ঢুকেছে ওরা।
খবরদার, জো! চেঁচিয়ে সাবধান করল নিক।
ওদের চেহারায় প্রথমে বিস্ময়, তারপর আতঙ্ক ফুটতে দেখল কিশোর। ওদের দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকাল। গুহার দেয়ালে উদয় হয়েছে বিশাল এক পিঁপড়ে, যেন একটা পাহাড়। দূরে রয়েছে এখনও। ছুটে আসছে দ্রুত। বিকট চিৎকার করছে ওটাই, সুড়ঙ্গ জুড়ে যেন এগিয়ে আসছে।
রাক্ষস! খেয়ে ফেলবে! আতঙ্কে কোলা ব্যাঙের ডাক ছাড়ল নিক। টান দিয়ে পকেট থেকে পিস্তল বের করল। পিঁপড়েটাকে সই করে গুলি করল দু-বার।
গুলি খেয়েই যেন আরও বিকট চিৎকার করে উঠল পিঁপড়ে। আরও জোরে ছুটে এল। ওটার পেছনে দেখা যাচ্ছে এখন আরেকটা পিঁপড়ে।
দেখলে কাণ্ড! বিস্ময়ে কোটর থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসবে যেন নিকের চোখ। গুলি খেয়েও কিছু হলো না। টেরই পায়নি যেন! একের পর এক গুলি করে গেল সে।
গর্জন থামছে না পিঁপড়ের, অগ্রগতি কমছে না সামান্যতম। আগের দুটোর সঙ্গে আরও পিঁপড়ে এসে যোগ হয়েছে। সারি দিয়ে এগিয়ে আসছে যেন মানুষ ছিঁড়ে খাওয়ার জন্যে।
রবিন দেখল, রোভার মারটিনের চোখে বিস্ময় ফুটেছে, তবে তাতে আতঙ্ক নেই, আছে কৌতূহল।
জো-ও গুলি শুরু করেছে।
আসছে রে, আসছে! চেঁচিয়েই চলেছে নিক। খেয়ে ফেলল রে, বাবা! মেরে ফেলল!

জো-র মাথা নিকের চেয়ে ঠাণ্ডা। গুলি করে ফল হবে না বুঝতে পেরে ছুটে গেল মারটিনের কাছে। পিস্তল উঁচিয়ে ধরে চেঁচিয়ে বলল, জলদি দরজা খোলো! কুইক!।
ঠাণ্ডা চোখে ওর দিকে তাকালেন মারটিন। কাঁধ ঝাঁকালেন হতাশ ভঙ্গিতে। পকেটে হাত দিলেন। বের করলেন হুইসেলের মত একটা জিনিস। ঠোঁটে লাগিয়ে ফুঁ দিলেন।
রবিন আশা করেছিল, তীক্ষ্ণ শব্দ হবে।
কিছুই হলো না, কোন শব্দই নেই। অবাক হয়ে দেখল, ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে ধূসর দেয়ালের দরজা।
ফাঁক বড় হওয়ার আগেই নিকের হাত ধরে টান দিল জো, এসো।
পিঁপড়েগুলোর দিকে ফিরেও তাকাল না আর ওরা, ছুটে বেরিয়ে গেল ফাঁক দিয়ে।
পালাও, গাধার দল, পালিয়ে যাও! পেছন থেকে মুখ বাঁকিয়ে ভেঙচালেন মারটিন, নইলে যে খেয়ে ফেলবে! গবেট কোথাকার! হ্যাঁচ দিয়ে মুখ বের করে রেখেছে কিশোর, তার দিকে তাকালেন ইঞ্জিনিয়ার। খুব দেখিয়েছ যা হোক। কিন্তু এতখানি এসে খালি হাতে ফিরব না আমি। বেরোও, বেরিয়ে এসো। আবার পকেটে হাত দিলেন। বের করলেন চকচকে কালো আরেকটা মারাত্মক জিনিস। কিশোরের দিকে নিশানা করে নাড়লেন, নেমে এসো।
আগ্নেয়াস্ত্রের বিরুদ্ধে কিছু করার নেই। লক্ষ্মী ছেলের মত নেমে এল কিশোর আর রবিন।
অন্ধকার কোণের দিকে ফিরে ডাকলেন মারটিন। আর এই যে, তুমি, প্রোজেকটরওয়ালা, তুমিও এসো।
থেমে গেল পিঁপড়ের চিৎকার। দেয়াল থেকে গায়েব হয়ে গেল ওগুলো।
গু-গুলি করবেন না, অন্ধকার থেকে শোনা গেল মুসার কণ্ঠ। আমি আসছি।
নিথর ড্রাগনের পাশে বন্ধুদের কাছে এসে দাঁড়াল সহকারী গোয়েন্দা। কৌতূহলী চোখে ড্রাগনটাকে দেখে ফিরল কিশোরের দিকে, তাহলে ঠিকই বলেছিলে, আসল নয়।
মাথা নাড়ল কিশোর। তোমার পিঁপড়েগুলোর মতই আসল, ব্যঙ্গ ঝরল মারটিনের কণ্ঠে। পিস্তল নেড়ে বলল, এসো আমার সঙ্গে…
থেমে গেল ঘেউ ঘেউ শব্দ।
ওহ-নো! আবার আসছে। তাড়াতাড়ি পকেট থেকে হুইসেলটা বের করলেন আবার মারটিন। ফুঁ দিলেন। আগের বারের মতই কোন শব্দ শোনা গেল না। কিন্তু মৃদু শব্দ তুলে বন্ধ হতে শুরু করল দেয়ালের ফাঁক।

হাসি ফুটল কিশোরের মুখে। টর্চ জ্বালল, আলো ফেলল ফাঁকের বাইরে। জ্বলজ্বল করে উঠল কয়েকজোড়া চোখ। হাঁ করা মুখে ঝকঝকে ধারাল দাঁতের সারি বিকশিত।
আল্লাহ্ রে! আঁতকে উঠল মুসা। কুত্তাগুলো আবার...
দরজা বন্ধ হলো ঠিকই, কিন্তু দেরিতে। ততক্ষণে ভেতরে ঢুকে পড়েছে কুকুরগুলো। ঘেউ ঘেউ করে লাফ দিয়ে এসে পড়ল একটা মারটিনের ওপর।
পাইরেট! বিড়বিড় করল কিশোর। ডাকল, এই, পাইরেট, এদিকে আয়।
শুনলই না যেন কুকুরটা, দুই পা তুলে দিল মারটিনের বুকে। অন্য কুকুরগুলো এসে অর্ধচন্দ্রাকারে ঘিরে দাঁড়াল তাকে।
ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মারটিনের চেহারা। ঘামছেন। পিস্তল নেড়ে ধমক দিলেন কুকুরগুলোকে, সরে যাওয়ার জন্যে।
লাভ নেই, মিস্টার মারটিন, বলল কিশোর। আপনি জানেন, গুলি করতে পারবেন না। কুকুর খুব বেশি ভালবাসেন আপনি, ওরাও আপনাকে ভালবাসে।
হ্যাঁ। বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা দোলালেন মারটিন। আমার জন্যে পাগল। মুখ বাঁকালেন। আনমনে বিড়বিড় করলেন, শেষ পর্যন্ত তীরে এসে তরী ডুবল।
ঠিকই বলেছেন, একমত হলো কিশোর। আর কিছু করার নেই। আপনার। সোনা লুট করে পার পাবেন না। সে চিন্তা বাদ দিন।
কি করব তাহলে?
আমার কথা শুনবেন? পিস্তলটা সরান।
পিস্তলের দিকে তাকালেন একবার মারটিন, ভাবলেন। দ্বিধা। করলেন, তারপর ঢুকিয়ে রাখলেন পকেটে। বলো।
এ-শহরের সবাই জানে, জোক করতে ভালবাসেন আপনি। ধরে নিন, এই সোনা লুটের ব্যাপারটাও একটা জোক।
কিভাবে?
এই যে, এত কিছু করার পর, নেয়ার সমস্ত সুযোগ থাকা সত্ত্বেও নিলেন না।
কই সুযোগ? তাহলে তো নিতামই।
সেটা তো আমরা জানি। আমরা যদি কাউকে কিছু না বলি, চেপে যাই, বেঁচে যাবেন আপনি। দরকার হলে আমরাই ঘোষণা করে দেব, আপনি জোক করেছেন। লোকেও বিশ্বাস করবে। এত সোনা হাতের কাছে পেয়েও নেননি আপনি, এটাই তো আপনার সততার প্রমাণ।
হাসি ফুটল মারটিনের ঠোঁটে, খুব চালাক ছেলে তুমি।
দুই দিন পর।

চিত্রপরিচালক মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফারের অফিসে তার বিশাল ডেস্কের অন্য পাশে বসে আছে তিন গোয়েন্দা।
ড্রাগনের কেসের ওপর লেখা রবিনের নোটটা গভীর মনোযোগে পড়ছেন তিনি।
পড়া শেষ করে মুখ তুললেন। হু, অবিশ্বাস্য! গমগম করে উঠল। ভারি কণ্ঠস্বর। নকল ড্রাগনকে আসল বলে চালিয়ে দেয়া, খুব বুদ্ধিমান লোকের কাজ। হ্যাঁ, কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দাও দেখি এবার, নোটে লেখোনি এগুলো।
সামনে ঝুঁকল রবিন, অর্থাৎ, কি প্রশ্ন?
স্বভাব-চরিত্রে তো মনে হয় না ক্রিমিন্যাল টাইপের লোক রোভার মারটিন, বললেন পরিচালক। ডাকাতদের সঙ্গে জুটল কিভাবে?
জবাবটা কিশোর দিল, সী-সাইডের গুহা আর সুড়ঙ্গগুলোর প্রতি আগ্রহ ছিল মারটিনের, আকর্ষণ ছিল। প্রায়ই ঢুকতেন গিয়ে ওগুলোতে, নতুন গুহা আর সুড়ঙ্গ আবিষ্কারের আশায়। ঘুরতে ঘুরতেই একদিন আবিষ্কার করে বসলেন, ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকের নিচ দিয়ে গেছে। একটা সুড়ঙ্গ। সুড়ঙ্গগুলোর ম্যাপ এঁকে রাখতেন, কোনটা কিসের তলা দিয়ে গেছে বোঝার চেষ্টা করতেন, এভাবেই জেনেছেন ব্যাংকের তলা। দিয়ে গেছে সুড়ঙ্গ।
সাগরের পাড়ে বাস। সৈকতে দেখা হলো নিক আর জো-র সঙ্গে। ওরা স্যালভিজের কাজ করে, স্যালভিজ রিগ আছে একটা, পুরানো। ওদের সঙ্গে পরিচয় হলো তার, আলাপে আলাপে ঘনিষ্ঠতা। কথায় কথায় একদিন বলে ফেললেন ব্যাংকের নিচ দিয়ে সুড়ঙ্গ গেছে যে সে কথা।
ব্যস, ধরে বসল ওরা। বোঝাতে শুরু করল মারটিনকে। শেষে রাজি করিয়ে ফেলল সোনা লুট করতে। মার্টিনের দুঃসময় চলছে, টাকার খুব অভাব। এত টাকার লোভ ছাড়তে পারলেন না। তিনজনে মিলে পরামর্শ করে ঠিক করলেন, সাবমেরিনের সাহায্যে লুট করবেন সোনা। পানির তলায় থাকবে সাবমেরিন, সেটাকে রিগের সঙ্গে বেঁধে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে মেকসিকোতে, তখন কেউ আর ধরতে পারবে না।
তবে ড্রাগন তৈরির বুদ্ধিটা মারটিনের। তাঁর মাথায় সব সময়ই উদ্ভট সব বুদ্ধি খেলে। এক ঢিলে দুই পাখি মারার সিদ্ধান্ত আরকি। ড্রাগন দেখলে লোকে ভয় পাবে, গুহার কাছে ঘেঁষবে না। যে দেখবে, সে অন্য কাউকে বলতে পারবে না, কারণ তার কথা লোকে বিশ্বাস করবে না, বরং পাগল ঠাওরাবে।
গুহায় বসেই ড্রাগন বানিয়েছেন তিনি, নিক আর জো সহায়তা করেছে। গুহার মুখ খোলা থাকলে লোকে যখন-তখন ঢুকে পড়তে পারে, তাই ওটাকে আগে বন্ধ করে নিয়েছেন কৃত্রিম উপায়ে, বাইরে থেকে দেখতে আসলের মত লাগে।

কোনরকম লিভার রাখেননি, খোলার ব্যবস্থা করেছেন সাউণ্ড সিসটেম দিয়ে, সোনিক বীমের সাহায্যে।
হুঁ, হাসলেন পরিচালক। বাদ সেধেছে কুকুরগুলো। কুকুরের বাঁশি আর দরজা খোলার সিসটেম এক হয়ে গিয়েছিল।
তা-ই, মাথা ঝাঁকাল কিশোর। দরজা খোলার জন্যে হুইসেল বাজালেই কুত্তার দল ছুটে চলে আসে। লোকের চোখে পড়ে যেতে পারে ব্যাপারটা! তাহলে গুহার গোপনীয়তা আর থাকবে না। সুতরাং কুত্তাগুলোকেই আগে সরানোর মতলব করলেন মারটিন। বাঁশি বাজিয়ে। ওগুলোকে গুহায় ডেকে নিয়ে গেলেন। সাবমেরিনের মধ্যে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিলেন। কাজ শেষ হলেই ছেড়ে দিতেন, বলেছেন আমাদের।
মারেনি কেন?
একটা পিঁপড়ে মারার ক্ষমতাও নেই তার। তাছাড়া কুকুর দারুণ ভালবাসেন, কুকুররাও তাকে পছন্দ করে। কদিনেই ভক্ত হয়ে গিয়েছিল। লোক হিসেবে খারাপ নন তিনি। অভাবে স্বভাব নষ্ট, আর অসৎসঙ্গে সর্বনাশ-দুটো প্রবাদ বাক্যই একসঙ্গে আসর করছিল মারটিনের ওপর। খারাপ লোক হলে সেদিন এত সহজে আমাদের ছেড়ে দিতেন না। কোন না কোনভাবে সোনা নিয়ে পালানোর চেষ্টা করতেনই, প্রয়োজনে আমাদের খুন করে হলেও।
বুঝলাম। মাথা কাত করলেন পরিচালক। সে-ই তোমাদের সেদিন ফোন করেছিল? ভূতের ভয় দেখিয়েছিল?
হ্যাঁ, জবাব দিল মুসা। কিশোর চাপাচাপি না করলে ওই গুহায় আর যেতামই না আমি, ভূতের ভয়ে।
ভয় আরও নানারকমভাবে দেখিয়েছেন, বলল কিশোর। স্যালভিজ রিগ থেকে ডুবুরির পোশাক পরে সাগরে নামত নিক আর জো, হাতে স্পীয়ারগান থাকত, যাতে লোকে দেখলে মনে করে মাছ। মারতে নেমেছে। ওরা সেদিন সাগর থেকে ওঠার সময়ই আমরা দেখেছি। আমাদের দেখে খানিকটা ভয় দেখানোর লোভ ছাড়তে পারেনি ওরা। তারপর আমরা গুহায় ঢুকে পড়লাম, ওরাও ঢুকল। আসলে গুহায় ঢুকতেই আসছিল। ডুবুরির পোশাক পরার আরও একটা কারণ ছিল ওদের। ওই যে, যে গর্তটায় পড়ে গিয়েছিল রবিন, ওটা একটা সুড়ঙ্গমুখ। শুরুতে অনেকটা গ-এর মত বাঁকা, তারপর সোজা। ফলে গ-এর তলার দিকে থাকে পানি আর কাদা, ওপরের অংশটা শুকনো। টানেলে ঢোকার ওটা আরেকটা গোপনপথ। ওখান দিয়েই ঢুকেছিল ওরা, তাই পরে আমরা আর ওদের দেখতে পাইনি। মনে হয়েছে, যেন গায়েব হয়ে গেছে।

এক মুহূর্ত চুপ করে কিছু ভাবলেন পরিচালক। বললেন, আচ্ছা, হেরিঙের ব্যাপারটা কি? শটগান নিয়ে তিনি এত রাতে কি করছিলেন ওখানে?
মারটিনের মত তিনিও প্রায়ই সৈকতে বেড়াতে যেতেন। গুহায়ও ঢুকতেন মাঝে মাঝে। আমরা প্রথম যে গুহাটায় ঢুকেছিলাম, ওটা তার পরিচিত। তক্তা সরিয়ে যেটাতে ঢুকতে হয়, ওটাও। পুরানো তক্তাগুলো প্রাচীন ডাকাতেরা লাগিয়েছিল, তার দুয়েকটা ভেঙে গিয়েছিল। নতুন করে আবার লাগিয়েছেন হেরিঙ। মাঝে মাঝে গুহার ভেতরে পিকনিক করতে যেতেন তিনি। চুপ করল কিশোর।
তার মানে তার চোখে কিছু পড়েছিল। কিছু সন্দেহ করেছিলেন।
হ্যাঁ। রাতের বেলা ড্রাগনটাকে তিনিও দেখেছেন। ডাইভারদের আনাগোনা দেখেছেন। সেদিন রাতে সী-সাইডের আলো দেখে তদন্ত করতে এসেছিলেন। বোধহয় নিক আর জো-র টর্চের আলো চোখে পড়েছিল তার। তিনি বেহুশ হয়ে না গেলে কপালে খারাপি ছিল নিক আর জো-র। মারটিনেরও।
তিনি তাহলে জানেন না কিছু?
না। সোনাগুলো আবার ব্যাংকের ভল্টে ভরে রেখেছেন মারটিন। উল্টোপাল্টা করে রেখেছেন। যাতে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ বুঝতে পারে কিছু একটা গড়বড় হয়েছে।
হুঁ, বেশ ভালই জোক হয়েছে। বুদ্ধিটা ভালই করেছিলে, কিশোর। আর কেউ জানে?
না, স্যার, শুধু আপনাকে বললাম।
চুপচাপ কিছু ভাবলেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। মুখ তুললেন। ভাবছি, ওকে আমার স্টুডিওতে একটা কাজ দেব। ওর মত গুণী ইঞ্জিনিয়ার..কাজে আসবে আমার।
উজ্জ্বল হলো কিশোরের মুখ। খুব ভাল হবে, স্যার। আপনি তো হরর ফিল্ম তৈরি করেন। মারটিনকে খুব কাজে লাগবে আপনার। তবে আগেই হুঁশিয়ার করে রাখবেন, যাতে কোন জোক-টোক না করে।
আচ্ছা, ড্রাগনটা কি করেছে? ভেঙে ফেলেছে?
না, আছে। কেন?
ভাবছি, ওটা একদিন লস অ্যাঞ্জেলেসের পথে নামাব। লোকে দেখলে কি করবে ভাব একবার।
আপনি নামাবেন, স্যার? বদনাম হয়ে যাবে তো।
না, আমি না। তুমি চালাবে। তোমরা তিনজন থাকবে ওতে, চাইলে মারটিনকেও সঙ্গে নিয়ে নিও।
দারুণ মজা হবে। খুশিতে সৌজন্য ভুলে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল মুসা। হাততালি দিল জোরে।

কিশোরের দিকে চেয়ে মুচকি হাসলেন পরিচালক, এক কাজ কোরো, কি করে ক্লাচ ছাড়তে হয় ওটার, শিখে নিও মারটিনের কাছে। আমার ধারণা, ক্লাচের মধ্যেই কিছু একটা ব্যাপার আছে। বড় বাসের মত যানবাহনে যেভাবে ডাবল-ডিক্লাচ করতে হয়, তেমন কিছু। আর সেজন্যেই ক্লাচ ছাড়া সত্ত্বেও ঝাঁকি দিয়ে দিয়ে থেমে গেছে ওটা বার বার।

ঠিক, ঠিক বলেছেন, স্যার। আঙুল তুলল কিশোর। তাই তো বলি, ক্লাচ ছাড়ি আর বন্ধ হয়ে যায়, ছাড়ি আর বন্ধ হয়ে যায়, কেন?

ভলিউম ৪ – ভীষণ অরণ্য ১ – প্রথম খণ্ড – তিন গোয়েন্দা – রকিব হাসান – সেবা প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট, ১৯৮৮

হ্যাঁ, পৃথিবীর সব চেয়ে বড় নদী দেখবে, গল্প করছে। কুইটো হোটেলের মালিক ডেবিটো ফেরিও। দেখবে, পৃথিবীর সব চেয়ে বড় জঙ্গল। বেশির ভাগ জায়গাতেই এখনও সভ্য মানুষের পায়ের ছাপ। পড়েনি। খাবারের গুদাম বলা চলে ওটাকে। একদিন সারা দুনিয়াকে খাওয়াবে ওই আমাজন…

লোকটার বকবক ভাল লাগছে না কিশোর পাশার। তাকে থামানোর জন্যে স্টাফ করা মস্ত এক কুমির দেখিয়ে বলল, এত বড় কুমির সত্যি আছে আমাজানে? আমি তো জানতাম…

এর চেয়ে বড়ও আছে। জানোয়ার চাও তো? পাবে। এত আছে ওখানে, নিয়ে কল করতে পারবে না। পৃথিবীর অন্য সব জানোয়ার এক করলেও এত রকমের হবে না। ভুল বললাম, মিস্টার আমান? মুসার বাবাকে সাক্ষি মানল ফেরিও।

জন্তু-জানোয়ার সম্পর্কে অগাধ জ্ঞান মিস্টার আমানের। ভাল শিকারী। হলিউডে এক সিনেমা কোম্পানিতে খুব উঁচু দরের টেকনিশিয়ানের কাজ করেন। কিন্তু সুযোগ পেলেই অ্যাডভেঞ্চারে বেরিয়ে পড়েন–চলে যান শিকারে, কিংবা সাগর, হ্রদে মাছ ধরতে। কি শিকার করেননি তিনি? মেকসিকোর কলোরাডোতে পার্বত্য সিংহ, আলাসকায় গ্রিজলী ভালুক, এমনকি একবার তিমি শিকারীদের সঙ্গে গিয়ে তিমিও ধরেছেন। আফ্রিকার হাতি-মোষ আর চিতা-সিংহ তো মেরেছেনই।

কেউ জানে না, ঘুরিয়ে বললেন তিনি, কত রকমের জানোয়ার আছে। ওখানে। ওই যে বললেন, বেশির ভাগ জায়গাতে এখনও যেতে পারেনি সভ্য মানুষ। তাই ঠিক করেছি, নতুন জায়গায় যাব আমরা। যেখানে আগে কেউ যায়নি। প্যাসটাজা নদীর কথাই ধরুন।

প্যাসটাজা! আঁতকে উঠল ফেরিও। বলেন কি, সাহেব? মারা পড়বেন, মারা পড়বেন। অ্যানডোয়াজের ওধারেই যেতে পারেনি কেউ। গত বছর দু-জন। শ্বেতাঙ্গ চেষ্টা করেছিল। পারেনি। ইণ্ডিয়ানরা ধরতে পারলে, হাত তুলে একটা। জিনিস দেখাল সে। ও-রকম করে ছেড়ে দেবে।

হোটেলের লবিতে বসে কথা হচ্ছে। ফায়ারপ্লেসের ওপরে তাকে রাখা আছে অদ্ভুত জিনিসটা। মানুষের একটা সঙ্কুচিত মাথা, কমলার সমান।

কাছে গিয়ে জিনিসটা ভালমত দেখল মুসা আমান। ছোঁয়ার সাহস হলো না। জিভারো ইণ্ডিয়ানদের কাজ?

হ্যাঁ, মাথা নোয়াল ফেরিও। তবে তোমরা যেখানে গিয়েছিলে, ওখানকার জিভারো নয়, ওরা অনেক ভদ্র। ফাঁকিফুঁকি দিয়ে ছুটে এসেছ। এখন যেখানে যেতে চাইছ,

ওরা ধরতে পারলে…
ছাড়বে না বলছেন? একটা রেফারেন্স বই পড়ছিল রবিন মিলফোর্ড, মুখ তুলল। কিন্তু আমি যদ্দর জানি, আজকাল আর বিদেশীদের মাথা কেটে ট্রফি বানায় না ওরা। শুধুশত্রু আর আত্মীয় যারা মারা যায়:
জোরে জোরে মাথা নাড়ল ফেরিও। জিভারো ব্যাটাদের আমি বিশ্বাস করি। তোমাদেরকেই যদি শত্রু ভেবে বসে?
অকাট্য যুক্তি। চুপ হয়ে গেল রবিন।
কিশোর তাকিয়ে আছে মাথাটার দিকে। জিভারোরা ধরতে পারলে কি করবে, আপাতত সে-সব নিয়ে তার মাথাব্যথা নেই, সে ভাবছে অন্য কথা। রকি বীচ মিউজিয়ামে ওই জিনিস নেই। ওরা পেলে ভাল দাম, দেবে ওরা। ব্যবসা করতে যখন নেমেছে, সব কিছুকেই ব্যবসায়ীর চোখে দেখা উচিত। জন্তু-জানোয়ার ধরে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করবে চিড়িয়াখানা, সার্কাস পার্টি আর জানোয়ার পোষে এমন সব সংগঠনে। সেই সঙ্গে দু-চারটে অন্য জিনিস যেগুলোতে টাকা আসবে–নিতে ক্ষতি কি? ওটা বিক্রি করবেন?
দ্বিধায় পড়ে গেল ফেরিও।
তাড়াতাড়ি বললেন মিস্টার আমান, যা বলেছ বলেছ, আর মুখেও এনো না। ওরকম একটা অফার দিয়েছ শুনলেই ধরে নিয়ে গিয়ে জেলে ভরবে পুলিশ। মাথা বেচাকেনার ব্যাপারে আইনের খুব কড়াকড়ি চলছে এখানে। যারা আগে নিয়ে ফেলেছে, ফেলেছে। তবে ছাগল কিংবা ঘোড়ার চামড়ায় তৈরি নকল জিনিস নিতে পারো।
রহস্যময় হাসি হাসল ফেরিও। আমি কিন্তু বলে দিতে পারি, আসল মাথা কোথায় পাবে।
কোথায়? সামনে ঝুঁকল কিশোর।
জিভাবরা ইনডিয়ানদের কাছে।
ওদের কাছ থেকে আনলে আইন কিছু বলবে না?
না। যদি মাথাটা ইনডিয়ানদের কারও হয়।
হুঁ, অনেক আইনেই গলদ থাকে, বিড়বিড় করল কিশোর। যাকগে, মাথা পাওয়া দিয়ে কথা আমার, পলেই হলো, যেখান থেকেই হোক।
ওখানে না গেলেই কি নয়? হাত নাড়ল মুসা, অস্বস্তি বোধ করছে। বাবা, আমাদের তো যাওয়ার কথা ছিল আমাজনে। প্যাসটাজায় কেন আবার?
জবাবটা দিল রবিন, প্যাসটাজা নদী আমাজনের প্রধান পানির উৎসগুলোর একটা। আমাজন কোন মূল নদী নয়, অনেকগুলো জলধারার মিশ্রণ। ওগুলোর জন্ম হয়েছে আবার অ্যাণ্ডিজ পর্বতমালার বরফগলা পানি থেকে। প্যাসটাজা

তারই একটা। এবং এটার ব্যাপারে ভৌগোলিকদের আগ্রহও খুব। কারণ এর বেশির ভাগ অঞ্চলই ম্যাপে নেই, চার্ট করা যায়নি।
কাজেই এমন একটা জায়গা দেখার লোভ ছাড়ি কি করে? যোগ করলেন মিস্টার আমান। কেন, তোমার ভয় করছে? ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন।
ভয়? ট্রফিটার দিকে আরেকবার তাকাল মুসা। তা-তো করবেই। মাথাটা আলাদা করে দিলে তো গেলাম।
দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল হোটেলের একজন কর্মচারী। হাতে একটা খাম। বাড়িয়ে দিল।
খামটা নিয়ে ছিড়লেন মিস্টার আমান। ভাজ করা ছোট এক টুকরো কাগজ বের করলেন। টেলিগ্রাম। পড়তে পড়তে ভুরু কুঁচকে গেল। বিশ্বাস করতে পারছেন না যেন। দু-বার, তিনবার পড়লেন লেখাটা।
কি? এগিয়ে এল কিশোর। খারাপ খবর?
অ্যাঁ? না, হঠাৎ হেসে ফেললেন তিনি। আমাদের সঙ্গে রসিকতা করছে কেউ।
দেখি তো। কাগজটা নিয়ে পড়ল কিশোর। লেখা রয়েছে?
রাফাত আমান
কুইটো হোটেল
কুইটো
ইকোয়াডর।
আমাজন খুব খারাপ জায়গা দূরে থাকলেই ভাল করবেন
বাড়ির অবস্থা ভাল নয় জলদি ফিরে যান।
কে পাঠিয়েছে নাম নেই।
টেলিগ্রামটা এসেছে লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে।

.
কে পাঠাল? কাগজটার দিকে চেয়ে আছে কিশোর।
হয়তো অ্যানিমেল ক্লাবের কেউ, একটু মজা করতে চেয়েছে, বললেন বটে মিস্টার আমান, কিন্তু নিজের কানেই বেখাপ্পা শোনালো কথাটা।
বাবা, বাড়িতে কিছু হয়নি তো? মুসা বলল।
নাআহ। তাহলে তোমার মা টেলিগ্রাম করত।
নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর, কোন ব্যাপারে গভীর ভাবে চিন্তা করার সময় এটা করে সে। মনে হচ্ছে, জানোয়ার ধরতে এসেও রহস্যে জড়াতে যাচ্ছি। আমরা। কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধে কার এই আক্রোশ? আমরা আমাজনে গেলে কার। কি ক্ষতি? কে থামাতে চায়?

কি জানি, বললেন মিস্টার আমান। ফেলে দাও। সামান্য ব্যাপার। টেলিগ্রামে নাম লেখার যার সাহস নেই, সে আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।
খোঁজ তো করতে পারি? টেলিগ্রাম অফিসে নিশ্চয় নাম-ঠিকানা লিখেছে, রবিন বলল, ফর্মে।
তা-তো নিতেই পারি, কিশোর জবাব দিল। লাভ কি হবে? তোমার কি ধারণা, যে লোক এভাবে লুকোচুরি খেলতে চায় সে আসল নাম লিখবে?
ছেলেদের উদ্বিগ্ন ভাব লক্ষ করলেন মিস্টার আমান। খামোকা ভাবছ। এটা কোনও ব্যাপার? কেউ রসিকতা করেছে আমাদের সঙ্গে। হ্যাঁ, কাল খুব সকালে। রওনা হব। ভোর রাতে উঠতে হবে আমাদের। প্লেনটা ঠিক হয়েছে কিনা কে জানে।
গিয়ে দেখে আসব? প্রস্তাব দিল মুসা।
মন্দ বলোনি, কিশোর সায় জানাল।
ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি, বললেন মিস্টার আমান।
তুমি শুয়ে থাকো, বাবা, আমরাই পারব। রবিন, যাবে?
আমি? নাহ তোমরাই যাও। ততক্ষণে আমি এই চ্যাপটারটা শেষ করে। ফেলি, রেফারেন্স বই খুলে বসল আবার রবিন।
হোটেল থেকে বেরোল কিশোর আর মুসা। প্লাজা ইনডিপেনডেনসিয়ায় গানের জলসা হচ্ছে, ব্যাণ্ড বাজাচ্ছে একটা দল। রাস্তার ওপাশের বিশাল গির্জা আর পাদ্রীর প্রাসাদে বাড়ি খেয়ে প্রতিধ্বনি তুলছে ঢোলের দ্রিম দ্রিম। প্লাজায় লোক গিজগিজ করছে। বেশির ভাগই ধোপদুরস্ত পোশাক পরা নাগরিক, স্পেন থেকে এসেছিল। তাদের পূর্বপুরুষরা। বেশ কিছু স্থানীয় ইণ্ডিয়ানও রয়েছে তাদের মাঝে, ছড়ানো কানাওয়ালা চ্যাপ্টা হ্যাট মাথায়, গায়ে জড়ানো কম্বলের মত পোশাক–পনচো।
রহস্যঘেরা অতি সুন্দর একটা শহর, ভাবল কিশোর। পর্বতের কোলে বিশাল উপত্যকায় শুয়ে রয়েছে যেন। চাঁদের আলোয় ঝিলমিল করছে পর্বতের বরফে ছাওয়া চুড়া। কুইটোর লোকেরা যে বলে, কুইটো থেকে স্বর্গ এত কাছে, হাত বাড়ালেই নাগাল পাওয়া যায়, ভুল বলে না।
খানিক হেঁটেই হাপিয়ে পড়ল দুই গোয়েন্দা। গতি কমাতে বাধ্য হলো। সমুদ্র সমতল থেকে সাড়ে নয় হাজার ফুট ওপরে রয়েছে ওরা, তাই পরিশ্রম বেশি। লাগছে। হাত বাড়ালেই স্বর্গ নাগাল পাওয়া যায় বলার আরেকটা কারণ অনেক উঁচুতে এই শহর। পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু শহরগুলোর একটা। কিন্তু উচ্চতার তুলনায় শীত বেশি নয়, কারণ, শহরের ঠিক গা ঘেঁষে চলে গেছে বিষুবরেখা, তবে যেটুকু শীত আছে তাতেই হাড় কাঁপিয়ে ছাড়ে। ওভারকোটের বোম এটে দিল।

কিশোর। উজ্জ্বল আলোকিত প্লাজা থেকে নেমে এল পুরানো শহরের সরু অন্ধকার গলিতে।
খুব সাবধানে হাঁটতে হচ্ছে। খোয়া বিছানো পথের দু-ধারে সারি সারি পুরানো বাড়িঘর, রোদে শুকানো ইটে তৈরি। মাথার লাল টালির হাত কোকালে ঢেকে গেছে সবুজ শ্যাওলা আর লতাপাতায়, দু-দিক থেকে এসে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে প্রাকৃতিক বানিয়ে দিয়েছে। ফলে মনে হয় একটা সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে হাঁটছে।
পথের মাঝে মাঝে আলো আরও ঘন করেছে অন্ধকারকে। বাড়িঘরের ছায়াগুলো নিঃশব্দ পায়ে সরে যাচ্ছে যেন ওদের পাশ দিয়ে। গা ছমছমে পরিবেশ।
নিঃশব্দতার মাঝে তাই শব্দটা বড় বেশি কানে বাজছে কিশোরের, অনেকক্ষণ থেকেই পাচ্ছে। জুতোর মচমচ। শুরুতে বিশেষ গুরুত্ব দিল না। কিন্তু ভেনিজুয়েলা রোড থেকে ডানে মোড় নিয়ে সুক্রিতে পড়ার পরও যখন শব্দটা আসতেই থাকল, মনযোগ না দিয়ে আর পারল না। বাঁয়ে মোড় নিয়ে পিচিনচা গলিতে পড়ল। শব্দের কোন ব্যতিক্রম নেই, আসছে।
মুসাও শুনতে পাচ্ছে জুতোর শব্দ। তার গায়ে কনুই দিয়ে আলতো গুতো। মেরে ইশারা করল কিশোর, পাশে সরে দাঁড়িয়ে গেল একটা বাড়ির ছায়ায়। মুসা। দাঁড়াল তার গা ঘেঁষে।
সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল জুতোর আওয়াজ।
কোন সন্দেহ নেই, অনুসরণই করছে।
ছায়া থেকে বেরিয়ে আবার এগোল দুই গোয়েন্দা। আবার শুরু হলো অনুসরণ। আরও শ-খানেক গজ পর আরেকটা বাড়ির সামনে এসে থামল দু-জনে। দরজার সামনেটা অন্ধকারে ঢাকা। পকেট থেকে টর্চ বের করে সদর দরজার কপালে বসানো নেমপ্লেটের ওপর আলো ফেলল, কিশোর। হ্যাঁ, এই বাড়িটাই। সকালে এখানেই এসেছিল। এক আইরিশম্যান থাকে, পাইক জোনস তার নাম। কুইটোর লোকেরা বলে পাগলা পাইক। প্রায়ই নাকি বিমান নিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে এই খেপা বৈমানিক। বাড়িয়ে বলাটা অবশ্য লোকের স্বভাব, সে যে কোন দেশেরই হোক না কেন।
পেছনে এগিয়ে আসছে জুতোর মচমচ। এলোমেলো পদশব্দ, থামবে কিনা। ভাবছে বোধহয়, দ্বিধায় ভুগছে। থামল একবার, এগোল..আবার থামল আবার এগিয়ে এসে একেবারে গোয়েন্দাদের পেছনে দাঁড়াল।
হঠাৎ ঘুরে লোকটার মুখে আলো ফেলল কিশোর।
ইকোয়াডরিয়ান নয়। হোঁতকা, বিশালদেহী। ল্যাটিন আমেরিকার লোকেরা সাধারণত হালকা-পাতলা ছোটখাটো হয়। ইনডিয়ানরাও হালকা-পাতলা, তবে

ল্যাটিনদের মত ছোট নয়, আর চেহারা বেশ কর্কশ। এই লোকটা তার কোনটাই নয়। কিশোরের মনে হলো, এককালে মুষ্টিযোদ্ধা ছিল, কিংবা শিকাগো শহরের গুণ্ডা-সর্দার। চোখে আলো পড়ায় বিকৃত হয়ে গেল নিষ্ঠুর চেহারাটা! চমকে যাওয়া বাঘের চোখের মত জ্বলছে রক্তলাল দুই চোখ।
মুসার ধারণা হলো, আমাজন জঙ্গলের নরমুণ্ড শিকারীদের চেহারাও এত ভয়ঙ্কর নয়।
আমাদের পেছনে আসছেন কেন? জোর করে কণ্ঠস্বর ঠিক রাখল কিশোর।
চোখ মিটমিট করল লোকটা। তোমাদের পেছনে আসব কেন? হাঁটতে বেরিয়েছি। আমরা যে যে পথে যাচ্ছি ঠিক সে-পথেই হাঁটা লাগছে আপনার? আর জায়গা। নেই? ভয়ে ভয়ে রয়েছে কিশোর, মেরে না বসে ডাকাতটা।
তোমাদের পথেই এসেছি কেন ভাবছ?
ভাবছি না, জানি। যা জুতো পরেছেন না…
মাশাআল্লাহ। কিশোরের বাক্যটা শেষ করল মুসা। দশ মাইলের মধ্যে। মরাও জেগে যাবে। আপনার কানে খারাপ লাগে না?
খারাপ? কেন? খোয়ায় হাঁটলে সব চামড়ার জুতোই মচমচ করে, কম আর বেশি।
২
তবে আপনারগুলো মিউজিয়ামে রাখার মত।
অনুসরণ করছিলেন কেন? কিশোর বলল। ছিনতাই-টিনতাইয়ের ইচ্ছে?
জ্বলে উঠল লোকটার চোখ। হাত তুলতে গিয়েও কি ভেবে তুলল না। বোধহয় ভাবল, দুটো ছেলেকে এক সঙ্গে কাবু করতে পারবে না। নিগ্রো ছেলেটা আবার গায়েগতরে বেশ তাগড়া। ওকে কাহিল করতে তার মত ফাঁইটারেরও বেগ। পেতে হবে। তাছাড়া এখানে ঘনবসতি। চেঁচামেচি শুনে লোক বেরিয়ে আসবে, আর এলে ছেলেদের পক্ষ যে নেবে না তার কি নিশ্চয়তা আছে?
হাসল লোকটা। জোর করে হাসছে বোঝাই যায়। ঠিকই বলেছ, তোমাদের পিছুই নিয়েছি। তবে চুরি-ডাকাতির জন্যে নয়। দেখলাম তোমরা বিদেশী, আমিও বিদেশী। এখানে তো ইংরেজি জানা লোকের অভাব। তোমরা হয়তো জানো, তাই জিজ্ঞেস করতে এসেছি, স্যানটো ডোমিংগো গির্জাটা কোথায়। আজ রোববার, সারাদিন সময় পাইনি। ভাবলাম, শেষ কয়েকটা মোম জ্বেলে দিয়ে আসি, আকাশের দিকে রক্তলাল চোখ তুলল সে। ঈশ্বর তো দেখছেন।
ভূতের মুখে রাম নাম, বাংলায় বিড়বিড় করল কিশোর। ইংরেজিতে বলল, ঠিক জানি না কোনদিকে। ওদিকে হবে হয়তো, ফ্লোরেস রোডের মোড়ে। ঘণ্টা শুনেছিলাম।

ধন্যবাদ, ভদ্রভাবে বলার চেষ্টা করল লোকটা, কিন্তু স্বভাব-কর্কশ কণ্ঠ কত আর মোলায়েম করা যায়? আবার দেখা হবে।
আমার কোন ইচ্ছে নেই, এই কথাটাও বাংলায় বলে ঘুরল কিশোর। জোনসের দরজায় থাবা দিল।
দরজা খুলল তরুণ পাইলট। ছেলেদেরকে ডেকে নিয়ে গিয়ে বসাল বসার ঘরে। ফায়ার প্লেসে গনগনে আগুন। উষ্ণ বাতাস। খুব আরাম।
কি ব্যাপার? কিছু হয়েছে নাকি? ছেলেদের মুখ দেখেই কিছুটা আন্দাজ করে। নিয়েছে জোনস। চোরাচোড় লেগেছিল পেছনে?
কি করে জানলেন? পাল্টা প্রশ্ন করল কিশোর।
জানা লাগে না। এখানে ওদের অভাব নেই, হাসল বৈমানিক। বিদেশী দেখলেই পেছনে লাগে।
চেহারা যাই হোক, হাসিটা খুব সুন্দর লোকটার।
খুলে বলল সব কিশোর।
মুসা বলে দিল রহস্যময় টেলিগ্রামের কথাটা। বিমান ভাড়া করতে গিয়ে মাত্র সেদিনই পরিচয় হয়েছে জোনসের সঙ্গে। কেন তার কাছে এত কথা বলল, ওরা জানে না। বোধহয় তার হাসিটাই দ্রুত আপন করে নেয় মানুষকে।
হু, সব শুনে মাথা দোলাল জোনস। কিন্তু দুটো ব্যাপারকে এক করছ কেন?
করছি এ-জন্যে, কিশোর বলল, লোকটা ডাকাত হলে ডাকাতি করত। হয়তো শেষ মুহূর্তে ঘাবড়ে গেছে।
উঁহু, হতেই পারে না। ঘুসি মারলেই চিত হয়ে যেতাম আমরা। চুরি ডাকাতির জন্যে নয়, অন্য কোন ব্যাপার আছে।
আচ্ছা, জিজ্ঞেস করল জোনস, লস অ্যাঞ্জেলেসে কি তোমাদের কোন শত্রু আছে?
যে কাজ করি, থাকতেই পারে…
কি কাজ করো?
শখের গোয়েন্দাগিরি। তিন গোয়েন্দা আমরা।
বাহ, শুনে তো দারুণ মনে হচ্ছে, মিটিমিটি হাসছে বৈমানিকের চোখ দুটো। তা খুলেই বলো না। দাঁড়াও, কফি করে নিয়ে আসি। আপত্তি আছে?
না, মুসা বলল। যা ঠাণ্ডার মধ্যে এসেছি। একটু কড়া হলে ভালই হয়।
কফি খেতে খেতে কথা হলো।
সংক্ষেপে তাদের কথা জানাল কিশোর।
চমৎকার! দারুণ! ইস, এখানে যদি থাকতে তোমরা, শিওর তোমাদের দলে যোগ দিয়ে ফেলতাম, ঠেলেও সরাতে পারতে না।…আচ্ছা, কিশোর, ওই লোকটা পিছু

নিল কেন কিছু ভেবেছ? সামান্য আলাপেই গোয়েন্দাগিরির শখটা সংক্রমিত হয়েছে জোনসের মাঝে।
বুঝতে পারছি না। তবে, লস অ্যাঞ্জেলেসে আরেকজন জানোয়ার ব্যবসায়ী আছে। আমরা ব্যবসা খুলতে যাচ্ছি শুনে আমার চাচার সঙ্গে দেখা করেছিল। মুসার বাবার সঙ্গেও। এই ব্যবসা ভাল না, হেন না তেন না বলে অনেক রকমে বোঝাতে চেয়েছিল। যাতে আমরা এই ব্যবসায় না নামি।
তার কি অসুবিধে?
প্রতিযোগী হয়ে যাব না? জবাব দিল মুসা। এমনিতেই ওর ব্যবসা মন্দা। আমরা নামলে হয়তো ফেলই মারবে।
হু, তা-ও তো কথা।
হ্যাঁ, প্লেনের কি হলো? আসল কথায় এল কিশোর।
কাল সকালেই রওনা হতে চাও?
নিশ্চয়। ব্রেক ঠিক হয়েছে?
ভালভাবে করতে সময় লাগবে। তবে কাজ চালানোর মত হয়েছে।
চলবে তো?
তা চলবে। অন্তত আমি চালাতে পারব।
বিশ্বাস করল কিশোর। অল্পক্ষণের পরিচয়েই লোকটাকে অনেকখানি চিনে। ফেলেছে। জোনস যখন পারবে বলছে, পারবে।
ঠিক আছে, উঠল কিশোর। কাল ভোরে মাঠে হাজির থাকব। খুব ভোরে।
দরজার কাছে দুজনকে এগিয়ে দিয়ে গেল জোনস। বলল, যেতে পারবে? নাকি আমি আসব?
আরে পারব, পারব, হেসে বলল মুসা। হাতের মুঠো পাকিয়ে দেখাল, ও দশটা দিলে আমরা দুজন দুটো তো দিতে পারব। এত সহজে কাবু হব না। চলি। গুড বাই।
নিরাপদেই হোটেলে ফিরে এল দুজনে।
সবুজ নরকে যাওয়ার জন্যে সবাই তৈরি? নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল জোনস। তাহলে আসুন, উনি আমার পক্ষিরাজে, আদর করে চার সীটের বোনানজা বিমানটার গায়ে চাপড় মারল সে।
উঠল যাত্রীরা। জোনসের পাশে মিস্টার আমান।
পেছনে গাদাগাদি করে বসল তিন গোয়েন্দা, দুজনের জায়গায় তিনজন। দুটো সীটের মাঝে হাতল নেই বলেই বসতে পারল। তাদের মালপত্র আর রাইফেল বন্দুক তোলা হয়েছে লাগেজ কম্পার্টমেন্টে।
অসুবিধে হবে না তো? জিজ্ঞেস করল কিশোর।

নাহ, এঞ্জিন স্টার্ট দিল জোনস। তোমরা তো মোটে তিনজন, তা-ও ছেলেমানুষ। ওই জায়গায় চার-চারজন পূর্ণবয়স্ক ইনডিয়ানকে তুলেছি আমি।
চারজন! জায়গা কোথায়?
মেঝেতে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েছে একজন। তার ওপর পা তুলে দিয়ে সীটে বসেছে তিনজন। সামনের সীটেও দুজন ছিল।
উড়তে অসুবিধে হয়নি?
উড়ব তো আমি। আমার ইচ্ছে না প্লেনের ইচ্ছে?
জোনসের ইচ্ছেতেই যে প্লেনটা চলে, সেটা বোঝা গেল খানিক পরেই। কেন তাকে লোকে পাগলা পাইক বলে, তারও প্রমাণ মিলল।
রানওয়ে নেই। ঘাসে ঢাকা বিশাল এক মাঠ, ওটাই এয়ারফিল্ড। এর ওপর দিয়েই ঝাঁকুনি খেতে খেতে ছুটে চলল বোনানজা।
গতি বাড়ছে দ্রুত। ঘণ্টায় একশো দশ কিলোমিটারে উঠে গেল, এই সময় পাশ থেকে কোণাকুণি এসে ধাক্কা মারল জোর হাওয়া, ঝড়ো হাওয়াই বলা যায়। নিমেষে নাক ঘুরে গেল প্লেনের, তীব্র গতিতে ছুটে গেল ফায়ার ব্রিগেডের একটা লরির দিকে।
দুটো উপায় আছে এখন জোনসের হাতে। ব্রেক কষা কিংবা ওড়ার চেষ্টা করা। ব্রেক কষে সুবিধে হবে না, যা গতি এখন, আটকাতে পারবে না। জোরাজুরি করতে গেলে, ব্রেক যা-ও বা আছে, তা-ও যাবে খারাপ হয়ে। বাকি রইল উড়ে যাওয়া। কিন্তু ক্ষমতার তুলনায় ভার নিয়েছে বেশি, উড়তে পারবে কিনা ঠিক মত তাতেও সন্দেহ আছে। ঘোরানো হয়তো যায় এখনও, তাহলে বিমানের এক পাশের ডানা খোয়াতে হবে। এতবড় ক্ষতি করতে রাজি নয় জোনস, প্রাণ যায়। যাক, সে-ও ভাল।
বিপদ আঁচ করে ফেলেছে এয়ারফিল্ডের লোকেরা। তীক্ষ্ণ স্বরে চেঁচিয়ে উঠল ক্র্যাশ সাইরেন। গ্যাস-ভরা বোতল থেকে ছিটকে বেরোনো ছিপির মত বেরিয়ে আসছে লরির ভেতরের ফায়ারম্যানেরা, যে যেদিকে পারছে লেজ তুলে দৌড়। যেভাবে ছুটে আসছে বোনানজা, লরি সরানোর সময় নেই।
হাসি ফুটেছে পাগলা পাইকের ঠোঁটে, সোজা ছুটে যাচ্ছে লরির দিকে। এক ধাক্কায় গতিবেগ অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে প্লেনের। আত্মহত্যা যেন তার কাছে এক ভীষণ রোমাঞ্চকর ব্যাপার।
স্তব্ধ হয়ে গেছে যাত্রীরা। নিরুপায় হয়ে হাত-পা ছেড়ে দিয়ে বসে আছে সবাই।
গতি আরও বাড়ল। প্রচণ্ড গর্জনে প্রতিবাদ জানাচ্ছে এঞ্জিন। কিন্তু জানিয়ে যে লাভ নেই, সেটাও নিশ্চয় বুঝতে পারছে, এত দিন ধরে গোলামি করছে খেপা

লোকটার। কাজেই প্রতিবাদ জানালেও মনিবের নির্দেশ অমান্য করছে না। সাধ্যমত চেষ্টা করছে বাঁচার জন্যে।
সামনে বিশাল লাল ধাতব গাড়িটা পাহাড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে যেন। গুতো লাগাতে ছুটে যাচ্ছে প্লেন।
হঠাৎ কি জানি কি করল পাগলা পাইক, খেয়াল রাখতে পারল না যাত্রীরা। ঝটকা দিয়ে বোনজার সামনের চাকা উঠে গেল ওপরে, মসৃণ গতিতে মাটি ছাড়ল। পেছনের চাকা। শা করে উড়ে চলে এল লরির কয়েক ইঞ্চি ওপর দিয়ে। আর এক মুহূর্ত দেরি করলেই গিয়েছিল।
চেপে রাখা বাতাস ফোঁস করে ছেড়ে ফুসফুস খালি করল যাত্রীরা। কিন্তু। বিপদ পুরোপুরি কাটেনি তখনও।
টলমল করছে প্লেন, সোজা হতে চাইছে না কিছুতেই, লেজের দিকটা খালি ঝুলে পড়তে চায়। মাল বেশি বোঝাই করে ফেলেছে, সেটা একটা কারণ। আরেকটা কারণ, সমুদ্র সমতল থেকে এত উঁচুতে বাতাস খুবই পাতলা, ঠিকমত কামড় বসাতে পারছে না প্রপেলার।
মাতুলামি সামান্য কমলো। ধীরে ধীরে ওপরে উঠতে শুরু করল প্লেন।
কিশোর জিজ্ঞেস করল, ওঠার রেট কি আপনার?
সী লেভেলে মিনিটে নয় শো ফুট, জবাব দিল জোনস। কিন্তু এখানে বড় জোর পাঁচশো।
সার্ভিস সিলিং? আকাশ ছুঁড়ে ওঠা বরফে ছাওয়া পর্বতের চূড়ার দিকে চেয়ে আছে কিশোর, দৃষ্টিতে ভয় মেশানো বিস্ময়।
সতেরো হাজার ফুট। নেহায়েত মন্দ না, কি বলো?
কিন্তু ওই চূড়া তো পেরোতে পারবেন না, সামনে হাত তুলে দেখাল কিশোর। দুই হাঁটুর ওপর বিছানো ম্যাপের দিকে তাকাল। তেরোটা বিশাল আগ্নেয়গিরি মাথা চাড়া দিয়ে আছে ইকোয়াডরে। কয়েকটা প্রায় গায়ে গায়ে ঠেকে গিয়ে ঘিরে রেখেছে কুইটোকে। ওই তো কোটোপ্যাক্সি, পৃথিবীর বৃহত্তম জীবন্ত আগ্নেয়গিরি, উঠে গেছে উনিশ হাজার ফুট উঁচুতে। কেইয়ামবি আর অ্যানটিসানার চুড়াও ওটার চেয়ে খুব একটা কম যায় না।
পেরোতে যাচ্ছে কে? বলল জোনস, গিরিপথের মাঝখান দিয়ে চলে যাব।
গিরিপথ?
ওই হলো। দুই পর্বতের মাঝের পথকেই তো গিরিপথ বলে? ঠিক আছে, শুধরে দিচ্ছি। আমরা যাব গিরি-আকাশের মধ্যে দিয়ে। নিচে হাঁটাপথ নেই ওখানটায়।
কিন্তু উত্তরে যাচ্ছেন কেন?

তোমাদেরকে বিষুবরেখা দেখানোর জন্যে। ওই যে স্তম্ভটা দেখছ? উনিশশো ছত্রিশ সালে একটা ফরাসী জরিপকারী দল বসিয়েছিল ওটা, বিষুবরেখার নির্দেশক। বুড়ো পৃথিবীটাকে দু-ভাগে ভাগ করার জন্যে বিজ্ঞানীদের কতই না চেষ্টা, আহা! আমরা এখন রয়েছি উত্তর গোলার্ধে, বলেই শাই করে নাক ঘুরিয়ে প্লেনটাকে নিয়ে চলল স্তম্ভটার দিকে। পেরিয়ে এল ওটা। এই ছিলাম উত্তর গোলার্ধে, চলে এলাম দক্ষিণে। মজার ব্যাপার না?

ভীষণ ঠাণ্ডা। ফুঁ দিয়ে হাতের তালু গরম করতে করতে মুসা বলল, বিষুবরেখা না ছাই। আমার তো মনে হচ্ছে বিষুবমেরুতে ঢুকেছি।

বিষুবমেরু বলে কিছু নেই, গম্ভীর হয়ে বলল রবিন।

না থাকলে কি? নাম একটা বানিয়ে নিলেই হলো।

ওটা কোন রাস্তা? নিচে দেখিয়ে বললেন মিস্টার আমান। প্যান-আমেরিকান হাইওয়ে?

হ্যাঁ, মাথা ঝাঁকাল জোনস।

সড়কটার ডাকনাম ওয়ানডার রোড বা বিস্ময় সড়ক, অনেক লম্বা, সেই আলাস্কা থেকে শুরু করে শেষ হয়েছে গিয়ে প্যাটাগোনিয়ায়।

ইস, মুসা বলল, ওই পথে যদি যেতে পারতাম একবার।

পারবে পারবে, আশ্বাস দিলেন তার বাবা। এখন যেখানে যাচ্ছি সেখানেই যেতে পারবে ভেবেছিলে কোন দিন? কিন্তু যাচ্ছি তো। এই নতুন ব্যবসায় যখন নেমেছি, দুনিয়ার অনেক জায়গাই দেখতে পাবে। নেমেছিই তো সেজন্যে। পয়সাও এল, খরচও পোষাল, জায়গাও দেখা হলো।

তা ঠিক, মনে মনে স্বীকার করল কিশোর, এক ঢিলে তিন পাখি। জন্তু জানোয়ার ধরাটা একটা ছুতো আসলে, দেশভ্রমণের জন্যেই এই ব্যবসার ফন্দি এটেছে দুই বুড়ো–তার চাচা আর মুসার বাবা। কিন্তু খুবই দুঃখের বিষয়, প্রথম অভিযানেই আসতে পারেননি রাশেদ পাশা। ইয়ার্ডে নাকি জরুরী কাজ, রিও ডি জেনিরো থেকেই তাকে বগলদাবা করে নিয়ে গেছেন মেরিচাচী, রকি বীচে। কিশোরকে আসতে দিয়েছেন শুধু মুসার বাবা সঙ্গে আছেন বলেই। তা-ও হুশিয়ার করে দিয়েছেন, তিনটে ছেলের একটারও যদি কোন কারণে একটু চামড়া ছিলে, দুই মিনসের সারা শরীরের চামড়া ছিলবেন তিনি। বুড়োদের ভীমরতিতে মুসার মায়েরও যথেষ্ট আপত্তি ছিল, কিন্তু মেরিচাচীর ওই সাংঘাতিক হুমকির পর আর কিছু বলার প্রয়োজন মনে করলেন না। আর রবিনের বাবা-মা আপত্তিই করেননি। তাদের কথা, ছেলে হয়ে যখন জন্মেছে, সারা জীবন কোলে বসিয়ে তো আর রাখা যাবে না। তার চেয়ে এখন থেকেই যাক যেখানে খুশি, সাহস বাড়ুক ছেলের, বেঁচে ফিরে আসতে পারলেই ওঁরা খুশি।

রাশেদ চাচা, মেরিচাচী, মুসার মা, রবিনের বাবা-মা, জিনার বাবা-মা আর রাফিয়ান এক সঙ্গেই চলে গেছে লস অ্যাঞ্জেলেসে। এই অভিযানে আসার খুব ইচ্ছে ছিল জিনার, কিন্তু তার বাবা-মা রাজি হননি।

পথটা কি একটানা গেছে, না ভেঙে ভেঙে? জিজ্ঞেস করল মুসা।

তিনটে ভাঙা আছে, রবিন বলল। তবে অসুবিধে নেই। ভাঙাগুলো জোড়া দিয়েছে সংক্ষিপ্ত নৌ কিংবা রেলপথ। গাড়ি সঙ্গে থাকলেও ঝামেলা হবে না। জাহাজে কিংবা রেলগাড়িতে তুলে সহজেই পার করে নিতে পারবে ওসব জায়গা।

সত্যি, আশ্চর্য এক সড়ক, অনেক নিচে আঁকাবাঁকা ফিতের মত পথটার দিকে তাকিয়ে বললেন মিস্টার আমান। দুই আমেরিকাকে জোড়া দিয়েছে।

যত যা-ই বলুন, আকাশপথের জুড়ি নেই, আদর করে কন্ট্রোল প্যানেলে হাত রাখল জোনস। শুধু আমেরিকা কেন, সারা পৃথিবীকেই তো জোড়া দিয়ে দিয়েছে বিমান।

প্রতিবাদ করলেন না মিস্টার আমান। পৃথিবী জোড়া দেয়ার ব্যাপারে নৌ পথেরও কৃতিত্ব কম নয়, কিন্তু সে-কথা তুললেন না, খেপে যাবে পাগলা পাইক। বিমান ছাড়া আর কিছু বোঝে না সে। দুর্গম এই পাহাড়ী অঞ্চলে বিমান চালাচ্ছে পাঁচ বছর ধরে। দূরদুরান্তে চলে যায়, কোন বাধাই তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি। আজ পর্যন্ত। কুইটো থেকে উপকূলের গোয়োইয়াকইলেই যেতে চায় না অনেক, বৈমানিক, কিন্তু জোনসের কাছে ওটা ছেলেখেলা। মনের আনন্দে অ্যান্ডিজ। পর্বতমালা পেরিয়ে সীমাহীন জঙ্গল ছাড়িয়ে তারও পরের দুর্গম অঞ্চলে চলে যায় সে, যেখানে রয়েছে অগুনতি রবার বাগান, যেখান থেকে জোগাড় হয় কুইনিন। ভেবে। অবাক হতে হয়, আজতক একটা দুর্ঘটনা ঘটায়নি সে। আকাশছোঁয়া পাহাড়ের দেয়াল, বরফে ছাওয়া পর্বত-চূড়া, ভীষণ জঙ্গল, প্রতিকূল আবহাওয়া কোন কিছুই পরাজিত করতে পারেনি তাকে, সব কিছুই হার মেনে পথ ছেড়ে দিয়েছে। তার এই রেকর্ড এ-অঞ্চলে এখনও কেউ ভাঙতে পারেনি।

এসব কথা তিন গোয়েন্দাও জানে, মিস্টার আমানই বলেছেন। দেখা যাক এবার কি খেল দেখায়, ভাবল সবাই।

সামনের পাহাড়ের দেয়ালে একটা সরু ফাটল দেখা গেল। ওটাই বোধহয় জোনসের গিরি-আকাশ। কি একখান জায়গা। দুই ধারে দুই পাহাড়ের চুড়া, হাঁ করে রয়েছে, যেন প্রকাণ্ড এক দৈত্য চোখা চোখা পাথর ঠেলে বেরিয়ে রয়েছে, যেন হায়ের মাঝে দৈত্যের দাঁত। ওসব দাঁতের যে কোন একটাতে শুধু ছোঁয়া লাগলেই ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে খুদে বিমানটা। সাংঘাতিক বিপজ্জনক পথ।

সীট থেকে উঠে জোনসের কাঁধের ওপর দিয়ে অলটিমিটারের দিকে তাকাল কিশোর। সতেরো হাজারের ঘর ছুঁই ছুঁই করছে কাটা। তার মানে পর্বত ডিঙিয়ে

যাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না, ওপর দিকে ফাঁকটা যেখানে বেশি সেখান দিয়েও যেতে পারবে না।
কিন্তু সতেরো হাজারও টিকল না। হঠাৎ করে সরতে শুরু করল অলটিমিটারের কাটা।
আরি! এই, কি করছিস? বোনানজাকে ধমক দিল জোনস। ওঠ ওঠ, এত নামলে চলবে কেন? ওপরে তোলার চেষ্টা করতে লাগল সে।
বোনানজার তো ওঠার খুবই ইচ্ছে কিন্তু ভর রাখতে পারছে না, উঠবে কি করে? বাতাসের ভয়াবহ নিম্নগামী স্রোত প্লেনটাকে দ্রুত নিচে টেনে নামাচ্ছে। অনেক চেষ্টা করল জোনস; ওঠাতে পারল না। নামছে তো নামছেই।
ভয় পেল যাত্রীরা। এইবার বোধহয় রেকর্ড আর টিকল না জোনসের। পাথুরে পাহাড়ে আছড়ে পড়ে ছাতু হয়ে যাবে প্লেন।
কিন্তু টানাহেঁচড়ায় এবারেও জোনসেরই জয় হলো। গিরিপথের পাথুরে মেঝের ছয়শো ফুট ওপরে এসে থামল বিমানের নিম্ন-গতি। ঢুকে পড়েছে দানবের হায়ের মধ্যে।
সোজা যদি চলে যেত পথটা, এক কথা ছিল। বেজায় সরু, তার ওপর রয়েছে নানা রকম বাঁক, মোচড়। কোনটা ইংরেজি S অক্ষরের মত, কোনটা বা U; হাত পা ছেড়ে দিল যাত্রীরা। ম্যাপের দিকে চোখ নেই কিশোরের, গাইডবুক বন্ধ করে ফেলেছে রবিন। মুসার চোখ বন্ধ। তাকাতেই সাহস পাচ্ছে না।
পাগলা পাইক নির্বিকার। স্বচ্ছন্দে এগিয়ে নিয়ে চলেছে বিমানকে। প্রতিটি বাক, মোড়, মোড় তার চেনা। সেটা বড় কথা নয়। সরু পথে যেভাবে। বিমানটাকে সামালাচ্ছে, সেটাই দেখার মত। এই মুহূর্তে আরেকটা নিম্নগামী ট্রেতে যদি পড়ে বিমান, কি হবে বোধহয় ভাবছেই না সে। কিন্তু ভেবে ভেবে এই ভীষণ ঠাণ্ডার মাঝেও দরদর করে ঘামছে যাত্রীরা।
দুধর্ষ পাইলটের কাছে আরেকবার হার মানল বিরূপ প্রকৃতি। নামতে শুরু করেছে পাথুরে মেঝে, ফাঁক হচ্ছে ফাটল। হুশ করে খোলা আকাশে বেরিয়ে এল। বিমান। পেছনে গুটিসুটি মেরে পড়ে থাকল যেন পরাজিত, মার খাওয়া পাহাড় আর গিরিপথ।
নতুন এক পৃথিবীতে বেরিয়ে এসেছে বোনানজা। পেছনে হারিয়ে গেছে প্রশান্ত উপকূলের রুক্ষ, ধূসর অঞ্চল, বৃষ্টি যেখানে প্রায় হয়ই না। নিচে, আশেপাশে আর; সামনে এখন ছড়িয়ে আছে উজ্জ্বল সবুজ বনভূমি, যেখানে পানির কোন অভাব নেই। রোদ চকচকে সবুজের মাঝে জালের মত বিছিয়ে রয়েছে যেন রূপালি নদী নালাগুলো।

দেখো দেখো! উচ্ছাসে চেঁচিয়ে উঠল মুসা, খানিক আগে ভয়ে চোখ বন্ধ করে রেখেছিল যে ভুলেই গেছে। মেঘ! কি টকটকে লাল!
নিচে, সবুজের ঠিক ওপর দিয়ে ভেসে চলেছে ছোট্ট এক টুকরো: হ্যাঁ, মেঘই বলা যায়।
প্রজাপতি, হেসে বলল জোনস। বেশি না, এই কয়েক হাজার কোটি হবে। একসঙ্গে রয়েছে তো, মেঘের মত লাগছে। ওই যে দেখো, আরেকটা সবুজ মেঘ।
টিয়ে না? বলল রবিন।
হ্যাঁ।
ইয়াপুরা নদীর ওদিকে কিন্তু এতসব দেখিনি।
ওটা তো মরু জঙ্গল। এদিকে সেরকম না। এখানে শুধু রঙ আর রঙ। উজ্জল সবুজ, হলুদ, লাল। মিশ্র রঙ যে কত আছে। কাকাতুয়া আর টিউকান পাখির রাজ্যে। তো যাইনি এখনও। বিশ্বাস করতে পারবে না। মনে হবে বুঝি ছবি দেখছ, কাঁচা রঙ গুলে লাগিয়ে দিয়েছে কেউ।
ওই যে নিচে একটা নদী, মুসা বলল। ওটাই আমাজন?
আমাজনের দাদীর মা বলতে পারো। ওটার নাম প্যাটেট, কিছু দূরে গিয়ে জন্ম দিয়েছে আমাজনের দাদী প্যাসটাজাকে। প্যাসটাজার মেয়ে ম্যারানন, এবং ম্যারাননের ছেলে হলে গিয়ে আমাজন।
খুব সুন্দর বলেছেন, আন্তরিক প্রশংসা করল কিশোর।
প্রশংসায় লজ্জা পেল জোনস, লজ্জিত হাসি হাসল। অবাক হলো কিশোর-পাগলা পাইকও লজ্জা পায় তাহলে?
আশ্চর্য কি জানো? মিস্টার আমান বললেন, প্যাটেটের উল্টো দিকে মাত্র। একশো মাইল দূরে প্রশান্ত মহাসাগর। অথচ সেদিকে ফিরেও তাকাল না নদীটা। মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে তিন হাজার মাইল পাহাড়-জঙ্গল পাড়ি দিয়ে, ঘুরে-ফিরে গিয়ে পড়েছে আটলান্টিকে।
আমরাও তাকেই অনুসরণ করতে যাচ্ছি, হাসল কিশোর, তাতে ভয়ের। ছোঁয়া। কত বিপদ আর রহস্য অপেক্ষা করছে কে জানে!
নদীর ওপর দিয়ে উড়ে চলেছে প্লেন।
অবশেষে শ্যাম্বো নদীর সঙ্গে মিলিত হলো প্যাটেট, জন্ম দিল প্যাসটাজার।
ওই যে প্যাসটাজা, হাত তুলল জোনস। বিড়বিড় করল, রহস্যময় নদী। জিভারোদের নদী।
টপো নামের ছোট্ট একটা সীমান্ত ঘাটি পেরোল ওরা, তার পর মেরা ছাড়াল। সভ্যতার সামান্যতম ছোঁয়া যা ছিল, তা-ও এখন শেষ। পুরোপুরি অসভ্য এলাকার ওপর এসে পড়েছে ওরা।

সামনে ইনডিয়ানদের একটা গ্রাম, নাম পুইয়ো।
গাইডবুক দেখে বলল রবিন, পুইয়োর পর থেকে শুরু হয়েছে ঘন জঙ্গল। পথ। এত বেশি দুর্গম, হেঁটে যাওয়াও সম্ভব না। উপায় একটাই, নৌকা।
হ্যাঁ, হাঁটুতে রাখা ম্যাপে টোকা দিল কিশোর। বিন্দু বিন্দ বসিয়ে চিহ্ন দিয়েছে। অর্থাৎ, এখানটায় সার্ভে হয়নি এখনও।
ছোট একটা পাহাড়ী নদী দেখা গেল। সেটা পেরোনোর জন্যে তৈরি হয়েছে। দড়ির ঝোলানো সেতু। সেতুর পরে খানিকটা ভোলা জায়গা।
গন্তব্য এসে গেছে। নামার জন্যে তৈরি হলো জোনস।
স্টলিং স্পীড কত? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
পঁচানব্বই কিলোমিটার, জবাব দিল জোনস।
আরিব্বাবা। চমকে গেল কিশোর। নিচে মাঠটা খুবই ছোট 1 মিনিটে দেড় কিলোমিটারেরও বেশি গতিবেগ। এই অবস্থায় ল্যাণ্ড করবে কি করে প্লেন? তার ওপর ঠিকমত ব্রেক কাজ করে না। আরেকটা কেরামতি দেখাতে হবে জোনসকে।
মাঠের শেষে কতগুলো কুঁড়ে। এধরনের কুঁড়ে তিন গোয়েন্দার পরিচিত। জিভারো ইনডিয়ানদের বাড়িঘর, ইয়াপুরায় দেখেছে। আস্ত গাছের বেড়া। শুধু ঘাসের বেড়াও আছে কিছু কিছু ঘরের।
বিমানের নাক নামাল জোনস, চিলের মত ছোঁ মারল যেন। মাটিতে হোঁচট খেল চাকা, প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে ছুটতে শুরু করল। একটা বড় কুঁড়ের ঘাসের বেড়া ভেঙে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল ভেতরে। গতি এমনিতেই কমে এসেছিল, বাধা পেয়ে ধাক্কা দিয়ে থেমে গেল। ঘরে কয়েকজন ইনডিয়ান শুয়ে-বসে আরাম করছিল নিশ্চিন্তে। তাতে ব্যাঘাত ঘটাল বেরসিক বোনানজা। লাফিয়ে উঠে যে যেদিকে পারল দৌড় দিল ওরা। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে।
বিচিত্র কায়দায় নরমুণ্ড শিকারীদের স্বাগতম জানাল, যেন পাগলা পাইক। ভাগ্যিস ইনডিয়ানদের কেউ আহত হয়নি। তাহলে কুঁড়ের তাকে সাজিয়ে রাখা খুদে মুণ্ডগুলোর সঙ্গে নির্ঘাত যোগ হত আরও পাঁচটা মাথা।
.
মনে হলো ভীমরুলের চাকে ঢিল পড়েছে। ছুরি-বল্লম নিয়ে ছুটে এল ইনডিয়ানরা। যোদ্ধাদের বিকট চিৎকার তো আছেই, সেই সঙ্গে চেঁচিয়ে গ্রাম মাথায় করেছে। মেয়েমানুষ আর বাচ্চারা।
ককপিটের দরজা দিয়ে মাথা বের করে দিল জোনস। মুখে হাসি। জিভারোদের কায়দায় স্বাগত জানাল বুড়ো সর্দারকে। চেঁচামেচি কমল না তাতে, কিন্তু নিমেষে রাগ মুছে গিয়ে জন্ম নিল উল্লাস। পাগলা পাইক তাদের অতিপরিচিত। সিংকোনা আর কুইনিন সংগ্রহকারীদের নিয়ে আগেও অনেকবার এসেছে।

যাত্রীদের পরিচয় করিয়ে দিল জোনস।
স্বাগত জানাল ইনডিয়ানরা। মেহমানদের নিয়ে চলল সর্দারের কুঁড়েতে। খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন গ্রাম, ঝকঝকে তকতকে, হামুর গ্রামটা এত পরিষ্কার ছিল না। ইনডিয়ানদের একই উপজাতি, কিন্তু গ্রামে গ্রামে কত তফাৎ।
গ্রাম দেখে মানুষগুলোকে মনেই হয় না। এরা ভয়াবহ নরমুণ্ড শিকারী। গ্রামের বাইরে ভুট্টা আর সীমের খেত, কলা বাগান। কিছু কিছু কুঁড়েতে রয়েছে তাত, কাপড় তৈরি হয়। খরস্রোতা প্যাসটাজীর ঘাটে বাঁধা রয়েছে সারি সারি নৌকা, আস্ত গাছ কুঁদে তৈরি।
বুদ্ধিমান লোক ওরা বলল জোনান, আমার খুব সাহসী! ইনকারা কোন দিন। হারাতে পারেনি ওর। নয়াড়রা জোর করে কিছুদিন শাসন করেছিল বটে, কিন্তু পরে সব ইনডিয়ানরা এক হয়ে শুয়োর খেদান খেদিয়েছে তাদের। ইকোয়াডর সরকারও ওদের ঘাটায় না, হার যার মত থাকতে দেয়।
শার্ট-প্যান্ট পায় কোথায়? সভ্য জগতের পোশাক? জিজ্ঞেস করল মুসা।
তাঁত আছে, বানিয়ে নেয়। এমনিতে কাপড়-চোপড় পরেই থাকে ওরা, কিন্তু লড়াই বাধলে অন্যরকম। উলঙ্গ হয়ে গায়ে রঙ মেখে সঙ সাজে, একেকটা যোদ্ধা। তখন একেকটা ভূত। বিকট করে ফেলে চেহারা।
শার্ট-প্যান্ট পরা অবস্থায়ও কিছু লোককে বুনো দেখাচ্ছে। কালো ঝাঁকড়া চুল এলোমেলোভাবে নেমেছে ঘাড়ের কাছে। মাথায় টিউকান পাখির পালকে তৈরি মুকুট।
প্রতি দু-জন জিভারোর একজন সভ্য, আরেকজন বুনো, বলল জোনস। সে এক মজার ব্যাপার। কোন্‌জনের পাল্লায় পড়লে কি ঘটবে নিশ্চয় আন্দাজ করতে পারছ।
সর্দারের কুঁড়ের বেড়ায় ঝুলছে রাশি রাশি ব্লো-গান,বল্লম, ধনুক আর তীর। আছে রাজকীয় টিগ্রে আর কুটিল চিতাবাঘের চামড়া।
খাবারের সময় হয়েছে। খাবার এল।
আরিব্বাবা, এত বড় ডিম! বলল রবিন। মুরগীগুলো কত বড়?
হাসল জোনস। মুরগীগুলো? একেকটা কম পক্ষে দশ ফুট লম্বা। যা দাঁত আর চোয়ালের যা জোর, আমাদেরই চিবিয়ে কিমা বানিয়ে দিতে পারে।
অ্যালিগেটরের ডিম, রবিন, হেসে বলল কিশোর। কেমন লাগছে?
মুখ বিকৃত করে ফেলল রবিন। এতক্ষণ তো ভালই লাগছিল। জেনেও খেতে খারাপ লাগছে না তোমার?
এখানে খাওয়ার বাছবিচার করলে মারা পড়ব। মনকে মানিয়ে নিয়েছি। স্বাদ যখন ভাল, অসুবিধে কি?

কাবাবটা কিসের মাংসের? জিজ্ঞেস করল মুসা। নিশ্চয় জংলী ছাগল?
জংলীই, তবে ছাগল নয়, ইগুয়ানা, জবাব দিল জোনস। পাঁচ-ছয় ফুট লম্বা এক জাতের গুইসাপ, এদিকের জঙ্গলে অভাব নেই। চিড়িয়াখানার জন্যে নিতে পারো।
খাচ্ছ যে, কিসের মাংস বলো তো ওটা?
বনগরু, রবিন বলল। এত অখাদ্যের মধ্যে এটা মোটামুটি ভাল খাদ্য মনে হচ্ছে তার, অন্তত রুচিসম্মত। আরেক টুকরো কেটে নিয়ে কামড় বসাল।
উঁহু। সিংহ, পার্বত্য সিংহ।
মানে…পুমার মাংস! ওয়াক, থুহ! চিবানো মাংস থুথু করে ফেলে দিল। রবিন।
ও কিছু না। দু-দিনেই অভ্যাস হয়ে যাবে, বললেন মিস্টার আমান। কিশোর বলল না, মনটাকে তৈরি করে নিলেই হলো।
কিন্তু পারল না রবিন। আমিষ খাওয়া বাদ দিয়ে নিরামিষের দিকে ঝুঁকল। ভুট্টার। আটার মোটা রুটি আর কলা-পেঁপে। কিন্তু ঘিনঘিনে ভাবটা দূর করতে পারল না। রুচি আরও নষ্ট করল তাকে সাজানো অসংখ্য নরমুণ্ড। একটা মাথা ঝুলছে দরজার ঠিক ওপরে। রবিন যেখানে বসেছে সেখান থেকে খুব বেশি চোখে পড়ে।
রবিনের দৃষ্টি অনুসরণ করে সেদিকে তাকালেন মিস্টার আমান। বললেন, ওটাকে বেশি সম্মান দেয়া হয়েছে।
ইংরেজি বোঝে না সর্দার। কিন্তু মুণ্ডটার দিকে মেহমানদের ঘনঘন তাকাতে দেখে অনুমান করে নিল, ওটার আলোচনাই হচ্ছে। জোনসকে কিছু বলল।
জিভারোদের সবারই ভাষা মোটামুটি এক হলেও অঞ্চলে অঞ্চলে কিছু রদবদল রয়েছে। ইয়াপুরার যে ভাষাটী তিন গোয়েন্দা জানে, তার সঙ্গে পুইয়োর ভাষার পার্থক্য আছে, তাই পুরোপুরি বুঝতে পারল না।
সর্দারের দাদার মুণ্ড ওটা, দোভাষীর কাজ চালাল জোনস। একটু থেমে বলল, কারও কারও মতে মুণ্ড সংরক্ষণ বর্বরতা। আসলে কি তাই? এরা তো শুধু মাথাটা মমি করে রাখছে, মিশরী রাজারা যে পুরো দেহটাই মমি করে রাখত? মরে যাওয়ার পর লাশটা নিয়ে কি করা হলো না হলো, সেটা কোন ব্যাপারই নয়। এই ইণ্ডিয়ানদের রীতিটা বরং ভালই মনে হয় আমার কাছে। মৃত্যুর পরও প্রিয়জনের স্মৃতি এভাবে ধরে রাখতে পারাটা…দাদা নাকি খুব ভালবাসত সর্দারকে, সর্দারও ভালবাসত দাদাকে। তাই এভাবে সবচেয়ে বড় সম্মান দিয়ে ঝুলিয়ে রেখেছে। দরজার ওপর।
আত্মীয়-স্বজনের মুণ্ড যত খুশি রাখুক, কে বলতে যাচ্ছে, মুসা বলল, কিন্তু। শত্রুর মাথা যে রাখে? নিশ্চয় সম্মান দেখানোর জন্যে নয়?
সেটা অন্য কারণ। ওদের বিশ্বাস, শক্তিশালী একজন যোদ্ধার মাথা কাছে। রাখতে পারলে মৃতের শক্তিটা তার মধ্যে চলে আসবে। দুর্বল লোক, মেয়েমানুষ কিংবা

বাচ্চার মাথা তো রাখে না। মুণ্ড সংরক্ষণের পদ্ধতিটাও খুব জটিল, তাই আজেবাজে মাথার পেছনে সময় নষ্ট করতে চায় না।
যদি না সেটা থেকে কিছু আয় হয়, যোগ করলেন মিস্টার আমান, তাই না?
হ্যাঁ। তবে নিজের কুঁড়েতে বাছা বাছা মাথা ছাড়া রাখবে না কিছুতেই।
আমাদেরকে আবার সম্মানিত করার চেষ্টা করবে না তো? তাকের। মুণ্ডগুলোর দিকে বাঁকা চোখে তাকাল মুসা।
বিশ্বাস কি? হাসল জোনস। একটা কথা কিন্তু বলিনি। বিদেশীদের মাথার বিশেষ কদর করে ওরা। ওদের ধারণা, ওসব মাথায় জাদুশক্তি খুব বেশি। তাই অলৌকিক ক্ষমতার লোভে ওগুলো জোগাড় করে।
খাইছে। নিজের মাথা চেপে ধরে সর্দারের দিকে ফিরল মলা : না বাপু.. সর্দারের পো, আমার এটাতে কিছু নেই বাবা। আমি নেহায়েত মুখখ-সুখখু মানুষ। প্রায়ই বোকা, আদা, গর্দভ বলে গাল দেয় কিশোর। টিচাররা তো বলদ ছাড়া কিছুই বলে না। তবে হ্যাঁ, বুদ্ধি যদি বাড়াতেই চাও, ওরটা রাখতে পারো। আর বইয়ের বিদ্যে চাইলে রবিনেরটা।
হেসে উঠল জোনস। কিশোর আর রবিন হাসল। মিস্টার অমানও হাসছেন। কিছুই না বুঝে সর্দারও জোরে জোরে হাসতে লাগল।
হাসার পর, হাসার কারণ জানতে চাইল সর্দার।
বলল জোনস।
আঁতকে উঠল সর্দার। গম্ভীর হয়ে গেছে। জোরে জোরে মাথা নেড়ে কিছু, বলল।
ও বলছে, অনুবাদ করল জোনস, মেহমানদের মাথা কিছুতেই কাটে না জিভারোরা। তাতে নাকি ভীষণ পাপ হয়।
যাক বারা, বাচলাম, এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হলো মুসা। এত ভাল ভাল খাবার, গিলতেই পারছিলাম না।
শেষ হলো খাওয়া।
উঠে গিয়ে তাকে সাজানো ট্রফিগুলো দেখতে লাগলেন মিস্টার আমান। ওরকম একটা মুণ্ডের জন্যে হাজার ডলার দিতে রাজি আছে লস অ্যাঞ্জেলেসের মিউজিয়াম অভ নেচারাল হিস্ট্রি।
কিশোর এসে দাঁড়িয়েছে পাশে। আংকেল, একটা কিনে নিলে কেমন হয়?
প্রথমে রাজি হলো না সর্দার।
কিন্তু নাছোড়বান্দা জোনসের কবলে পড়েছে। নানা রকম ভাবে বোঝানোর চেষ্টা করল সে। বোঝাল, বিশাল কুঁড়েতে নিয়ে দরজার কাছে রাখা হবে মাথাটা। এত বড় কুঁড়ে ইনডিয়ানদের কোন গ্রামে নেই। হাজার হাজার মানুষ দেখতে আসবে

রোজ। দেখে জিভারোদের প্রশংসা করবে। এত বড় সম্মান কি ছেড়ে দেয়া, উচিত?
গলে গেল সর্দার, প্রথমেই চোখ তুলে তাকাল তার দাদার দিকে। কিন্তু না, দাদাকে কাছছাড়া করতে পারবে না সে, বড় বেশি ভালবাসে। তাক থেকে আরেকটা সুন্দর ট্রফি নিয়ে এল। আমাদের সব চেয়ে বড় যোদ্ধাদের একজন। খুব। জ্ঞানী আর ভাল লোক। ও যাবে তোমাদের দেশে।
নাম কি?
কিকামু।
দাম কত?
দ্বিধায় পড়ে গেল সর্দার। উপহারের দাম নেয়াটা ভাল দেখায় না। মাথা নাড়ল সে।
জোনসও ছাড়বে না।
শেষে জোর করে কিছু টাকা সর্দারের হাতে গুঁজে দিলেন মিস্টার আমান। বললেন, এটা মেহমানদের তরফ থেকে উপহার।
এরপর সর্দার জানতে চাইল, মেহমানরা কেন এসেছে।
শুনে মুখের ভাব বদলে গেল সর্দারের। অনেক কথা বলল।
সর্দার বলছে, জোনস জানাল, ওদিকে যাওয়া ঠিক হবে না আপনাদের। মারা পড়বেন। ভাটির ইনডিয়ানরা নাকি মোটেও সুবিধের নয়। সাংঘাতিক বুনো, মাথা কাটার বাছবিচার নেই, বিদেশীদের একদম দেখতে পারে না।
কিন্তু ফিরে যেতে রাজি নন মিস্টার আমান। ওদের কাছে বন্দুক নেই।
নেই। কিন্তু ব্লো-গান আছে, বিষাক্ত চোখা কাঠি ছোড়ে। তাছাড়া বল্লম। আছে, বিষমাখা তীর আছে, নিশানা মিস করে না।
জানি। ওদের সঙ্গে ভাব করে নেব।
ভাব করার আগেই যদি বিষ ঢোকায় আপনাদের রক্তে?
ঝুঁকি নিতেই হবে। আমেরিকান জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটিকে কথা দিয়ে। এসেছি, প্যাসটাজার ভাটি অঞ্চলের একটা খসড়া ম্যাপ করে নিয়ে যাব। চুক্তি মোতাবেক বেশ কিছু টাকাও দিয়েছে খরচের জন্যে। চিড়িয়াখানা আর সার্কাস পার্টির কাছ থেকেও আগাম টাকা নিয়ে এসেছি, দুর্লভ জানোয়ার জোগাড় করে দেব। বলে। এখন তো আর পিছিয়ে যেতে পারি না। সর্দারকে জিজ্ঞেস করুন, একটা নৌকা বিক্রি করবে কিনা।
তাতে আপত্তি নেই সর্দারের। কিন্তু বিষণ্ন মুখে বার বার বলল, মেহমানদের কিছুতেই যাওয়া উচিত হচ্ছে না ওদিকে। বোকা বিদেশীগুলোকে কিছুতেই নিরস্ত

করতে না পেরে, শেষে রাতটা অন্তত তার সঙ্গে কাটিয়ে যাওয়ার দাওয়াত করল সর্দার।
এতে রাজি হলো অভিযাত্রীরা। সর্দারকে অখুশি করতে চাইল না।
আবার কুমিরের ডিম খেতে হবে। গুঙিয়ে উঠল রবিন।
তা নাহয় খেলাম। আমার ভয়, জংলী হারামীদের তীর খেয়ে না মরি, মুসা। বলল।
দেখো, গম্ভীর হয়ে বললেন মিস্টার আমান, ভয় পেলে কিংবা খুঁতখুঁত করলে অ্যাডভেঞ্চার হয় না। আরাম চাইলে বাড়িতে বসে থাকলেই পারতে। এখনও সময় আছে, ইচ্ছে করলে জোনসের সঙ্গে ফিরে যেতে পারো। …
ম্যাজিকের মত কাজ করল তার কথা। ডজন ডজন কুমিরের ডিম খেতেও আপত্তি রইল না রবিনের। জংলীদের তীর কেন, বল্লমের খোঁচায় মোরব্বা হতে রাজি আছে মুসা, তবু কাপুরুষ দুর্নাম নিয়ে রকি বীচে ফিরে যাবে না।
প্রায় সারাদিনই খায় এখানকার জিভারোরা।
কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই আবার এল খাবার। তবে এবার আর কুমিরের ডিম। নয়। লালচে-সাদা মাংসের বেশ বড় বড় টুকরো।. খুব নরম। আশটে গন্ধ, অনেকটা মাছের মত, তবে স্বাদটা মুরগীর। মুখে দিয়ে ভাল লাগল রবিনের, জিজ্ঞেস। করল না কিসের মাংস। জানলেই যাবে অরুচি হয়ে।
কিন্তু মুসা জিজ্ঞেস করে বসল।
বোয়া কনসট্রিকটর, জানাল জোনস। এক জাতের মস্ত অজগর।
ব্যাটারা সাপও বাদ দেয় না, বিড়বিড় করল রবিন। চিবানো থামাল না, কিন্তু। বিস্বাদ হয়ে গেল খাবার। কোত করে গিলে ফেলল। বকা শুনতে আর রাজি নয়।
তার অবস্থাটা বুঝলেন মিস্টার আমান। হেসে বললেন, খেলে ক্ষতিটা কি বলো? যদি হজম হয় আর স্বাদ খারাপ না হয়? কেন, সভ্য ফরাসীরা শামুক খায় না, চীনারা পাখির বাসা খায় না, জাপানীরা আগাছা খায় না? আর আমরাও তো সী সাইডের রেস্টুরেন্টগুলোতে গিয়ে পিচ্ছিল ঝিনুক খেয়ে আসি হরহামেশা। তুমিও তো অনেক খেয়েছ। ধর্মের কারণে আমরা শুয়োর খাই না, তোমরা তো খাও। তোমার আমার মাঝেই তো খাবারের ফারাক। আসল কথা হলো, মানুষ যেখানে যেভাবে থাকে, প্রকৃতি তাকে যে খাবার সাপ্লাই করে, তাই খেয়ে বেঁচে থাকতে হয়। কারও কাছে সেটা অমৃত, কারও কাছে কিলবিলে শুয়োপোকা
কিন্তু লেকচারে কি আর কাজ হয়? অভ্যাস বড় বাজে জিনিস। খাওয়াটা আর ফেলল না বটে রবিন, তবে রুচিও হলো না, জোর করেই গিলতে লাগল।
বিকেলে কুইটোতে ফিরে চলল জোনস।
বিষণ্ন মুখে তাকে বিদায় জানাল অভিযাত্রীরা। দিগন্তে হারিয়ে গেল প্লেন। তাদের মনে হলো, সভ্যতার শেষ ছোঁয়াটুকুও যেন মুছে গেল।

সাঁঝ হতেই আশপাশের বনে শুরু হলো নানারকম গর্জন, চিৎকার, কাশি– দিনের শব্দগুলোর সঙ্গে ওগুলোর মিল নেই।
সারারাত ভাল ঘুম হলো না কিশোরের। খালি এপাশ ওপাশ করল মাদুরের। ওপর বিছানো কম্বলে শুয়ে। একটা ব্যাপারে শিওর হয়ে গেল, ঠিক জায়গায়ই এসেছে ওরা, ঠিক জায়গাতেই চলেছে দুর্লভ জন্তু ধরার জন্যে। জন্তু-জানোয়ারের স্বর্গ এই অঞ্চল।
শেষ রাতের দিকে সামান্য তন্দ্রামত এসেছিল। স্বপ্ন দেখল, তাদের তাড়া করছে ভীষণ চেহারার নরমুণ্ড শিকারী জংলীরা।
টুটে গেল তন্দ্রা। ঘেমে গেছে সারা শরীর। জংলীদের ভয়াবহ চেহারা ভাসছে এখন্ও চোখের সামনে। তাদের মাঝেই ধীরে ধীরে উঁকি দিল আরেকটা চেহারা, জংলীদের চেয়ে কম কুৎসিত নয়। সেই লোকটা, কুইটোতে সেরাতে যে পিছু। নিয়েছিল।
জোর করে মন থেকে চেহারাটা দূর করার চেষ্টা করল কিশোর। নিজেকে বোঝাল, কুইটো থেকে অনেক দূরে দুর্গম জঙ্গলের মধ্যে রয়েছে ওরা, এখানে। আসতে পারবে না সেই লোক।
কিন্তু বুঝ মানল না মন।
পর দিন খুব ভোরে উঠল অভিযাত্রীরা।
ভাল একটা নৌকা দিয়েছে সর্দার। ওদেরই তৈরি একটা ক্যানূ।ফুট পঁচিশেক লম্বা, পেটের কাছের সবচেয়ে চওড়া জায়গাটার মাপ দুই ফুট। চার-পাঁচ জন মানুষ আর প্রয়োজনীয় মালপত্র বহন করার উপযোগী।
আস্ত গাছ কেটে তৈরি, নৌকাটা না দেখলে কারিগরের দক্ষতা আচ করা যায়। কুঁদে কুঁদে ফেলে দেয়া হয়েছে ভেতরের সমস্ত কাঠ, এক ইঞ্চি পরিমাণ রেখে। নৌকাটার যেখানেই হাত দেয়া যাক, এক ইঞ্চি পুরু। কাঁচা লোহায় তৈরি হাতুড়ি বাটালে কাজ করেছে কারিগর; শুধু হাতের আন্দাজে কি করে মাপ ঠিক রাখল। কোথাও কম বেশি হলো না, কিংবা ছিদ্র হলো না, ভাবলে অবাক হতে হয়। নৌকা। তৈরির পর তার ভেতরে-বাইরে দু-দিকেই পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। না, পোড়ানো হয়েছে বললে ভুল হবে, বরং বলা যায় ভালমত আগুনের ছ্যাঁকা দেয়া হয়েছে। আলকাতরা তো আর নেই ইনডিয়ানদের, তাই পানি যাতে না লাগে তার জন্যে এই ব্যবস্থা।
হাঁসের পিঠে পানি পড়লে যেভাবে গড়িয়ে পড়ে যায়, চিহ্ন থাকে না, নৌকাটার অবস্থাও তা-ই। তবে একটা দোষ আছে, পানিতে দু-পাশে গড়ায় খুব বেশি। ভারসাম্য ঠিক রাখা কঠিন। ইনডিয়ানদের অভ্যাস হয়ে গেছে। স্বচ্ছন্দে চালিয়ে

নিয়ে যায় ওরা, সব চেয়ে খরস্রোতা নদীতে উথাল-পাথাল ঢেউয়েও কাত হয় না নৌকা, দিব্যি তরতর করে ছুটে যায়।
আমরাও অভ্যাস করে নেব, মুসা বলল। নৌকা বাওয়ার ওস্তাদ সে। রকি বীচে যখন ফিরে যাব, বুকে থাবা মেরে হাত নাড়ল, আচার আচরণে খাওয়া দাওয়ায় আমরা তখন পুরোদস্তুর জিভারো ইনডিয়ান।
কথা বাদ দিয়ে কাজ করো, তাড়া দিলেন তার বাবা। জিনিসপত্রগুলো তোলা দরকার।
ছোট ছোট পোটলা করে বাঁধা হলো সমস্ত মাল। খুব সাবধানে সাজিয়ে রাখা হলো নৌকার তলায়। ওজন কোথাও কম বেশি হলে ভারসাম্য নষ্ট হবে। একটা পোটলার ওপর আরেকটা এমন ভাবে রাখা হলো, প্রয়োজনরে সময় যাতে ওগুলো। টপকে কিংবা ওগুলোর ওপর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে যাওয়া যায়। যাত্রী-কাম-মাল্লারা বসে দাঁড় বাওয়ার জন্যে মালের ফাঁকে ফাঁকে অনেকখানি করে জায়গা ছাড়া। হলো। ওসব ইনডিয়ান ক্যানূতে পাটাতন থাকে না, তাই পাটাতন বসানোর জন্যে। আড়াআড়ি তক্তা লাগানোরও দরকার পড়ে না। নিজেদের সুবিধের জন্যে কয়েকটা তক্তা লাগিয়ে নিল অভিযাত্রীরা। সেগুলোর সঙ্গে শক্ত করে বাধল বন্দুক আর ভারি। জিনিসপত্র। কোন কারণে নৌকা উল্টে গেলেও জিনিসগুলো পানিতে হারাবে না।
ঠিকই আছে সব, বললেন মিস্টার আমান। এবার ছাড়া যায়।
তীরে দাঁড়িয়ে মেহমানদের বিদায় জানাল জিভারোরা।
পথ-প্রদর্শক হিসেবে একজন জিভারো যোদ্ধাকে অভিযাত্রীদের সঙ্গে দিয়েছে সর্দার।
দিনটা ভারি চমৎকার। উজ্জল বোদ। বানরের চেঁচামেচি, টিয়ে আর কাকাতুয়ার ডাকে মুখর হয়ে আছে নদীর দুই তীরের বনভূমি। পশ্চিমে, অনেক দূরে সবুজ বনের মাথা ছাড়িয়ে বিশ হাজার ফুট উঠে গেছে শিমবোরাজো পর্বতের বরফে ছাওয়া চুড়া। দুই পাশে তার দুই মহাসাগর। একপাশে প্রশান্ত, আরেক পাশে আটলান্টিক-যেদিকে এগিয়ে চলেছে অভিযাত্রীরা।
তীক্ষ্ণ বাঁক নিল নদী। জিভারোদের গ্রাম আড়ালে পড়ে গেল। দু-ধারেই ঘন জঙ্গল। নদীটা এখানে শ-খানেক ফুট চওড়া। কারও সঙ্গে যেন দেখা করার কথা, সময় বয়ে যাচ্ছে, তাই তাড়াহুড়ো করে ছুটে চলেছে টলটলে স্বচ্ছ পানি। সেই সাথে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে নৌকা। পাঁচটা দাড়ের কোন কাজ নেই, নৌকার মুখ সোজা রাখা ছাড়া।
দেখো দেখো, চেঁচিয়ে উঠল রবিন।
ওপরে তাকাল মুসা।

আরে নিচে, নিচে। পানির তলায়।
গভীরতা কম। পরিষ্কার দেখা যায় তলার বালি। কালো রঙের ছোট ছোট কয়েকটা পাখি খাবার খুঁজছে।
পাখিগুলোকে বেশিক্ষণ দেখার সুযোগ হলো না, দ্রুত সরে যাচ্ছে নৌকা।
ওয়াটার উজল, বলল কিশোর। জলগায়ক বলতে পারো।
পানির তলায় উড়ছে, বলল মূসা।
উড়ছে না, সাঁতরাচ্ছে, শুধরে দিলেন মিস্টার আমান। ওড়ার মত করেই ডানা ঝাপটায়। শামুক আর পোকা খুজছে। দমও রাখতে পারে অনেকক্ষণ।
মস্ত কালো একটা ছায়া উড়ে এল মাথার ওপর, ওদের সঙ্গে সঙ্গে চলল।
আরি, কনডর! বলল মুসা।
উত্তেজিত হয়ে উঠল বাকু। খুব খারাপ। আমেরিকান শিংকোনা ব্যবসায়ীদের কাছে ভাঙা ভাঙা ইংরেজি শিখেছে সে। বিচিত্র ভঙ্গিতে মাথার ওপর হাত বুলাল, অশুভ শক্তিকে ঠেকাল যেন।
কুসংস্কার, রবিন বলল। জিভারোদের বিশ্বাস, কনডর মানেই অশুভ সঙ্কেত। মরার গন্ধ পেলে, কিংবা কোন অঘটন ঘটবে বুঝলেই নাকি হাজির হয় ওরা।
খাইছে! তাই নাকি? ভূতের ভয় মুসার বরাবর। পয়েন্ট টু-টু রাইফেলের দিকে হাত বাড়াল। ব্যাটাকে শেষ করে দেয়াই ভাল।
বাধা দিলেন মিস্টার আমান। পয়েন্ট টু-টুর গুলিতে কিচ্ছু হবে না ওর। গুলিই নষ্ট করবে শুধু।
খাওয়া যায় না?
ইনডিয়ানরাও খায় না, মাংস এত বাজে।
মাথার ওপর চক্কর দিচ্ছে বিশাল পাখিটা। এক ডানার মাথা থেকে আরেক ডানার মাথা দশ ফুটের কম নয়।
বিড়বিড় করল মুসা, আরিব্বাপরে, কত বড়।
এটা তো ছোটই, বলল কিশোর। এর চেয়ে অনেক বড় হয়, দুনিয়ার বৃহত্তম উড়ুকু পাখি কনডর। যেমন বড়, তেমন ভারি। অথচ অন্য সব পাখির চেয়ে বেশি ওপরে উঠতে পারে। না খেয়ে কাটিয়ে দিতে পারে একটানা চল্লিশ দিন। খাবার। পেলে একবারেই খেয়ে ফেলে আট-দশ কেজি।
শুনেছি, আস্ত ছাগল-ভেড়া নাকি তুলে নিয়ে যায়? মানুষের বাচ্চাও?
ভুল। নখে খুব ধার, কিন্তু বেশি ভারি জিনিস তোলার মত করে তৈরি নয়। সাংঘাতিক পাজি, আর দুঃসাহসী। বাগে পেলে ঘোড়াকেও আক্রমণ করতে ছাড়ে না।
অবশ্য যদি ঘোড়াটা রোগা কিংবা দুর্বল হয়, যোগ করল রবিন।

দুর্বল ঘোড়া এখানে না পেয়েই যেন কিছুটা হতাশ, কিছুটা মনের দুঃখেই যেমন এসেছিল, তেমনি নিঃশব্দে উড়ে চলে গেল উত্তরে।
কিন্তু বাকুর ভয় কাটল না। বারে বারে তাকাচ্ছে পাখিটা যেদিকে গেছে সেদিকে, মাথা নাড়ছে আর বলছে, ভাল না, ভাল না! ফিরে যাব, ফিরে যাব!
কিন্তু যাব বললেই তো আর যাওয়া যায় না। ঢালু বেয়ে তীব্র গতিতে নামছে স্রোতধারা, শুধু সামনেই এগোনো সম্ভব। পিছানো আর যাবে না।

.

অযথাই ভয় পেয়েছে রাকু। নিরাপদেই কাটল দিনটা। কোন অঘটন ঘটল না। অনেক পথ পেরিয়ে এল ওরা।
বিকেলের দিকে নোঙর ফেলল। রাত কাটাবে।
জায়গাটা ভারি সুন্দর। নদীর এক পারে সাদা বালির চর। তার পর ছোট একটা পুকুর। তাতে মাছ ঘাই মারছে। পুকুরের ওপাশ থেকে শুরু হয়েছে জঙ্গল; হঠাৎ করে যেন গজিয়ে উঠেছে কালচে গাছের দেয়াল। গাঢ় হলুদ আর টকটকে লাল বুনোফুল পড়ন্ত আলোয় জ্বলছে।
মাথার ওপর দিয়ে ধীর গতিতে ভেসে যাচ্ছে সাদা বক।
নদীর পারে বড় বড় কয়েকটা গাছ, তার নিচে ক্যাম্প করবে ঠিক করেছে। ওরা। তলাটা পরিষ্কার, ঝোপঝাড় নেই।
খালি জায়গার পরে যেখানে বন শুরু হয়েছে, সেখানে ঠাসাঠাসি ঝোপঝাড়ের মধ্যে সরু একটা ফাঁক দেখা গেল।
পথ মনে হচ্ছে? বাকুর দিকে ফিরলেন মিস্টার আমান, ইনডিয়ান?
দ্বিধা দেখা দিল বাকুর চোখে। সে নিজে একবার পরীক্ষা করে দেখল। নরম বালিতে পায়ের ছাপ দেখিয়ে মাথা নাড়ল। ইনডিয়ান নয়।
ছেলেদেরকে ডেকে এনে দেখালেন মিস্টার আমান। এগুলো পেকারির খুরের দাগ।
আমাজনের বুনো শুয়োর তো? কিশোর বলল, দল বেঁধে নাকি চলে। মানুষকে আক্রমণ করতেও দ্বিধা করে না।
হ্যাঁ।
আমিও পড়েছি, রবিন বলল। একবার নাকি একজনকে তিন দিন তিন রাত। গাছের ডালে আটকে রেখেছিল পেকারির দল, নামতে দেয়নি।
তারমানে এক নম্বর হারামী, মুসা মন্তব্য করল।
আশপাশে আরও পায়ের ছাপ দেখালেন মিস্টার আমান। রাতে এখানে পানি খেতে আসে জানোয়ার। এই দেখো, ক্যারিবারার পায়ের দাগ। দুনিয়ার সব চেয়ে বড় ইঁদুর, ভেড়ার সমান একেকটা। আর এই যে, হরিণের পায়ের ছাপ।

হ্যাঁ, হরিণের খুরের দাগ মুসাও চেনে। বাবার সঙ্গে কলোরাডোতে শিকারে গিয়েছিল, তখন দেখেছে। বাবা, এটা কিসের দাগ? এরকম তো জীবনে দেখিনি। বড় বড় পিরিচের চাপে যেন তৈরি হয়েছে দাগগুলো।
টিগ্রে! ভয়ে ভয়ে বনের দিকে তাকাল বাকু। খারাপ জায়গা, খারাপ জায়গা।
এই টিগ্রেটা কি জিনিস? জানতে চাইল মুসা।
স্প্যানিশ ভাষায় টাইগারকে টিগ্রে বলে, জবাব দিল কিশোর। মেক্সিকো আর সমস্ত দক্ষিণ আমেরিকায় জাগুয়ারের নাম টিগ্রে। বাঘই এটা। তবে ডোরাকাটা নেই, আছে কালো গোল গোল ছাপ। ব্রাজিলিয়ান সীমান্তের কাছের পর্তুগীজেরা বলে ওনকা,। যে নামেই ডাকা হোক, আমাজন বনের ওরা রাজা।
ভালো না, ভালো না, কেঁদে ফেলবে যেন বাকু। ফিরে যাব, ফিরে যাব!
আরে কি মুশকিল, বিরক্ত হয়ে বলল মুসা। খালি ফিরে যাব ফিরে যাব। করে। কে আসতে বলেছিল?
ভালো জায়গা পাওয়া গেছে, দু-জনের কারও কথায়ই কান না দিয়ে বলল। কিশোর। পানি খেতে এলে আজ রাতেই জাগুয়ারের ছবি তুলব।
এসে যদি মানুষের মাংসও খেতে চায়? রবিন বলল।
না, সে ভয় তেমন নেই, আশ্বাস দিলেন মিস্টার আমান। আমরা কিছু না। করলে ওরাও কিছু বলবে না। তাছাড়া আমরা থাকব অনেক ওপরে, হ্যামকে।
তাঁবু-টাবু আর স্লীপিং ব্যাগের ঝামেলা নেই, দশ মিনিটেই ক্যাম্প তৈরি হয়ে গেল। প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটা জিনিসও জঙ্গলে সঙ্গে নেয় না অভিজ্ঞ শিকারীরা। নিলে শুধু বোঝাই বাড়ে, চলার অসুবিধে হয়, কাজে তেমন লাগে না।
মোট চারটে হ্যামক টানানো হয়েছে।
হ্যামক এক ধরনের বিছানা 1 আমাজন জঙ্গলের ইনডিয়ানরা তো বটেই, দক্ষিণ আমেরিকার শহর অঞ্চলের অনেক বাড়িতেও হ্যামকই একমাত্র বিছানা। দিনের বেলা গায়েব, দেয়ালে দেয়ালে শুধু দেখা যাবে লোহার হুক গাঁথা। রাতে লিভিং রুম হয়ে যাবে বেডরুম। ওই হুক থেকেই ঝুলবে ঝুলন্ত বিছানাগুলো। জায়গা নষ্ট হয় না, বাড়তি বিছানা বিছিয়ে রাখার ঝামেলা নেই, মেহমান এলে কোথায় শোয়ানো যায়–ভেবে ভেবে যন্ত্রণা পাওয়ার কারণ নেই, সঙ্গে করে নিয়ে আসে যার যার হ্যামক। জিনিসটা অনেকটা ইজিচেয়ারে শোয়ার মত। ওই রকমই এক টুকরো কাপড় ঝুলিয়ে বিছানা হয়ে যায়। বাড়িঘরে যেগুলো ব্যবহার হয়, ওগুলোর চার কোণায় চারটে ফাঁস থাকে, ফাঁসগুলোকে হুকে আটকে দিতে হয়। আর জঙ্গলে ব্যবহারের সময় চার কোণার চারটে দড়ি গাছে বাধতে হয়। দুই দড়ির। হ্যামকও আছে। সেগুলোতে ইজি চেয়ারের ভাণ্ডার মতই কাপড়ের দুই প্রান্তে ডাণ্ডা ঢোকানো থাকে।

আমাজন জঙ্গলের সর্ব ইনডিয়ানরা অবশ্য হ্যামক ব্যবহার করে না, যেমন জিভারোরা। বাকু তাই অন্য ব্যবস্থা করল। মাটিতে ছোটখাটো একটা কবর খুড়ল। রাতে তার মধ্যে ঢুকে শুধু মাথাটা বাইরে রেখে গায়ের ওপর মাটি চাপা দিয়ে দেবে। দিনের বেলা অসহ্য গরম, রাতে তেমনি হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডা। রোদ-তপ্ত মাটি। রাতে গরম কম্বলের কাজ দেয়।

বিছানা তৈরি শেষ। তীর-ধনুক নিয়ে বাকু চলল মাছ মারতে। ছেলেরাও চলল। সঙ্গে। তীর দিয়ে কিভাবে মাছ শিকার করে, দেখেনি কখনও।

পুকুরে মাছের অভাব নেই। ঝাকে ঝাকে ভেসে রয়েছে। দেখতে দেখতে গোটা দুই বেশ ভাল সাইজের মাছ ধরে ফেলল বাকু, পাঁচজনেরই চলবে।

শিকার নিয়ে ক্যাম্পে ফিরে এল ওরা।

আগুন ধরিয়ে ফেলেছেন মিস্টার আমান। শুকনো ডাল-পাতা ফেলতেই দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল।

রাঁধতে বসল বাকু। ইনডিয়ান রান্না। নদীর পার থেকে পরিষ্কার কাদা তুলে এনে দুটো মাছের গায়েই পুরু করে মাখাল, বড় বড় দুটো কাদার পিণ্ড হয়ে গেল। কয়লার গনগনে আগুনে ফেলে দিল ওগুলো। তারপর বস্তা থেকে আলু বের করে মাছের মত একই ভাবে কাদা মাখালো। ওগুলোও ফেলল আগুনে।

কাদা শুকিয়ে শক্ত হয়ে গেল এক সময়। পিণ্ডগুলোকে আগুন থেকে বের করে পিটিয়ে কাদার আস্তরণ ভাঙল বাকু। ছুরি দিয়ে কেটে মাছ আর আলু বেড়ে দিল সবার পাতে।

ভোজনরসিক মুসা আমানকেও স্বীকার করতেই হলো, চমৎকার রান্না, ভাল স্বাদ।

রাত নেমেছে। আর বসে থেকে লাভ নেই। হ্যামকে উঠল অভিযাত্রীরা। বাকু গেল তার কবরে।

হ্যামকের ওপরে ঝোলানোর জন্যে মশারি আছে, কিন্তু সেগুলো খোলার দরকার হলো না। মশা নেই এখানে। তবে বিষাক্ত কীট, এই যেমন পিঁপড়ে, শতপদী, বিচ্ছু, এসব আছে এন্তার। গাছ থেকে দড়ি বেয়ে বিছানায় উঠে আসতে পারে। তাই দড়িতে তাগন্ধী কীটনাশক মাখিয়ে দেয়া হয়েছে।

তিন গোয়েন্দার কেউই আগে কখনও হ্যামকে শোয়নি। খাট তো নয় যে ধড়াস করে তাতে শুয়ে পড়লেই হলো। দুটো দড়ির ওপর ভার, ভারসাম্য ঠিক রাখার ব্যাপার আছে। একটু এদিক-ওদিক হলেই বিছানা যাবে উল্টে, ধুপুত করে গড়িয়ে তখন একেবারে মাটিতে।

সোজা শুয়ো না, হুঁশিয়ার করলেন মিস্টার আমান। কোণাকুণি শোও। নাহলে থাকতে পারবে না।

দ্রুত অভ্যাস করে নিল ছেলেরা। কঙ্কল টেনে দিল গায়ের ওপর।

মিস্টার আমান আর মুসার নাক ডাকানোর শব্দ শোনা গেল। রবিনও ঘুমিয়ে পড়ল। কিশোর জেগে রইল ক্যামেরা নিয়ে। বেশি নড়াচড়ার উপায় নেই। সাবধানে কাত হয়ে বাকুর দিকে তাকাল সে।
খুব ভালমত জায়গা বেছে গর্ত করেছে বাকু। জন্তু-জানোয়ারের চলার পথ। থেকে দূরে উঁচু জায়গায়। আগুনের আলোয় তার মুখটা আবছা দেখা যাচ্ছে। ঘুমিয়েছে কিনা বোঝার উপায় নেই।
দিবাচরেরা ঘুমিয়েছে, জেগে উঠল নিশাচরেরা। শুরু হলো হাঁক-ডাক। যেন বলছে, এই ওঠো ওঠো, বেলা হয়েছে। আর কত ঘুমাবে।
ঝিঁঝির কানে-জ্বালা-ধরানো ডাক দিয়ে শুরু হলো। কিছুক্ষণ ডেকে ক্লান্ত হয়ে। সুর পাল্টাল ওরা। খাদে নামল শব্দ, দ্রুত লয় থেকে সরে এসেছে টানা লয়ে।
ড্রেইম ড্রেইম করে ডেকে উঠল একটা ব্যাঙ। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চারদিক থেকে শুরু হয়ে গেল ডাক। সেই সঙ্গে যোগ হলো অন্য প্রজাতির হোউ-হেহা এবং ক্রোক ক্রোক। আরও ব্যাঙ আছে, তাদের কেউ গোঙাল, কেউ বা ঘ্যানর ঘ্যানর। করতে লাগল। সে এক বিচিত্র কলতান।
হঠাৎ বেরসিকের মত বেসুরো গলায় চিৎকার করে উঠল একটা নাইটজার। ভূত বিশ্বাস করে না কিশোর। তার মনে হলো, যদি ভূত থাকত তাহলে হয়তো ওভাবেই কাদত। গায়ে কাটা দিল তার।
আরও নানারকম শব্দ হচ্ছে। বেশির ভাগই অচেনা।
হঠাৎ ভীষণ গলায় কেশে উঠল কে যেন! নিমেষে চুপ হয়ে গেল অন্য সমস্ত শব্দ। ওই কাশি কিশোরের চেনা।
শিকারে বেরিয়েছেন মহাবনের মহারাজা, মহাবীর টিগ্রে!
.
দুপ করে একটা শব্দ। মুহূর্ত পরেই কানের পর্দা ফুড়ে দিল যেন তীক্ষ্ণ চিত্তার।
এত চমকে গেল কিশোর, আরেকটু হলেই পড়ে গিয়েছিল। টর্চের আলো ফেলল মাটিতে।
মিস্টার আমান জেগে গেছেন, রবিনও। আরও দুটো টর্চ জ্বলে উঠল।
আবার বুনো চিৎকার। মুসার গলা মনে হচ্ছে? জাগুয়ারে ধরল না-তো! কিন্তু। কই, কাউকেই তো দেখা যাচ্ছে না।
বাচাও! বাঁচাও! চেঁচিয়ে উঠল মুসা।
তিনটে আলো একসঙ্গে ঘুরে গেল সেদিকে।
পাগল হয়ে গেছে যেন মুসা। জংলী-নৃত্য জুড়েছে। শরীরের যেখানে-সেখানে খামচি মারছে, থাপ্পড় মারছে। টেনে-ছিড়ে খুলে ফেলল শার্ট-প্যান্ট, গেঞ্জি আর।

জাঙ্গিয়াও গায়ে রাখতে পারল না। একেবারে দিগম্বর। সেই অবস্থাতেই নাচানাচি। ঘাম-চকচকে কালো শরীর। সে-এক দেখার মত দৃশ্য।
হেই, কিছু করো! কেঁদে ফেলবে যেন মুসা। কিছু করো!
লাফিয়ে হ্যামক থেকে নামলেন মিস্টার আমান। অলো ফেললেন মুসার কাছাকাছি মাটিতে। সরো, জলদি সরো ওখান থেকে! খেয়ে ফেলবে তো!
কালো একটা সারি এগিয়ে চলেছে পিলপিল করে, ফুটখানেক চওড়া। শুরুও নেই, শেষও নেই।
কী? জিজ্ঞেস করল রবিন।
সৈনিক পিঁপড়ে। জবাব দিল কিশোর। দেখো দেখো, অফিসারগুলোকে দেখো।
ওদের সম্পর্কে পড়েছে রবিন। মাঝে মাঝে মাইলখানেকেরও বেশি লম্বা হয়। একেকটা দল। চলার পথে জীবন্ত কিচ্ছু রাখে না, খেয়ে সাফ করে ফেলে। ভাল করে তাকাল দলটার দিকে। সারির পাশে ছুটাছুটি করছে কিছু পিঁপড়ে। সামনে দৌড় দিচ্ছে, পেছনে যাচ্ছে, মনে হয় দলছুট। আসলে তা নয়, খবরদারি করছে। সৈনিকদের।
অগ্নিকুণ্ড থেকে জ্বলন্ত একটা চ্যালাকাঠ তুলে নিলেন মিস্টার আমান। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে বললেন মুসাকে।
বললেই কি আর চুপ থাকা যায়? তবু সাধ্যমত স্থির রইল মুসা।
পিঁপড়ের গায়ে জ্বলন্ত কয়লা ঠেসে ধরলেন মিস্টার আমান।
শক্ত, ধারাল বিশাল চোয়াল মাংসে গভীর ভাবে ঢুকিয়ে কামড়ে ধরে আছে পিঁপড়ে, গরম ছ্যাকা লাগতেই চোয়াল খুলে খসে পড়ছে। দু-চারটা ছ্যাকা মুসার। চামড়ায়ও লাগছে। কিন্তু কামড়ের জ্বলুনির চেয়ে ছ্যাকার জ্বালা অনেক কম।
টেনে, খামচে অনেকগুলো শরীর ছিঁড়ে ফেলেছে মুসা। চোয়ালগুলো গেঁথে। রইল গায়ে। ওগুলো ভোলাই মুশকিল হলো। ছুরির মাথা দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে অতিসাবধানে একটা একটা করে চোয়াল তুললেন মিস্টার আমান। তারপর ওষুধ। লাগিয়ে দিলেন আহত জায়গাগুলোতে। ছোপ ছোপ দাগ পড়েছে, বিচিত্র আলপনা কাটা হয়েছে যেন মুসার শরীরে।
মুখ টিপে হাসল কিশোর ও রবিন, অবশ্যই আরেক দিকে চেয়ে।
যাও কাপড় পরে ফেলো, বললেন মিস্টার আমান। হ্যামক থেকে নামলে কেন?
নামিনি তো, লজ্জা পাচ্ছে এখন মুসা। পড়ে গিয়েছিলাম। ইবলিসগুলোও যাওয়ার আর জায়গা পেল না, একেবার আমার নিচে দিয়েই: আচ্ছা,বাকুকে ধরল না কেন?
তাই তো? উত্তেজনায় তার কথা ভুলেই গিয়েছিল সবাই। আলো ফেলা হলো। কবরটা আছে, কিন্তু বার মাথাটা নেই।

খেয়ে ফেলল নাকি! আঁতকে উঠল মুসা।
না, খায়নি। কবরের ওপর দিয়েই যাচ্ছে পিঁপড়ে। আশেপাশে ছড়িয়ে পড়ে কিলবিল করছে কিছু। বাকুর মাথাটা যেখানে ছিল, সেখানে সামান্য ফুলে আছে। মাটি। তারমানে মুখটাও নিয়ে গেছে মাটির তলায়।
আহত জায়গা ডলল মুসা। ইস, কামড়ও মারে! যা জ্বালা।
জানো, ওই পিঁপড়ে দিয়ে শরীরের কাটা সেলাই করে ইনডিয়ানরা, বললেন মিস্টার আমান। কাটার দুটো ধার টিপে এক করে ধরে সেখানে কামড়াতে দেয় পিঁপড়েকে। চোয়াল মাংসে গম্ভীর হয়ে গেঁথে গেলে টেনে শরীরটা ছিঁড়ে ফেলে। আটকে থাকে চোয়াল। কাটা জায়গা শুকিয়ে জোড়া না লাগার আগে আর খোলে না।
জানি, মাথা ঝাঁকাল কিশোর। মুসা তো ছোট দলের সামনে পড়েছে। বড় দলগুলো যখন যায়, সাফ করে ফেলে সব। সামনে গ্রাম পড়লেও পথ পরিবর্তন করে না।
হ্যাঁ, গ্রামের ওপরই চড়াও হয়, বললেন তিনি। পিপড়ের বিরুদ্ধে কিছুই করার নেই, গ্রাম ছেড়ে পালায় ইনডিয়ানরা। জঙ্গলে নিরাপদ জায়গায় সরে যায়। তবে পিঁপড়ের সামনে যাদের গ্রাম পড়ে তারা ভাগ্যবান। ফিরে এসে দেখে সব পরিষ্কার। পোকামাকড় সাপ-ব্যাঙের গোষ্ঠী সাফ।
শেষ হলো দল। কবরের ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে চলে গেল, লেজটা। কিভাবে জানি জেনে গেল বাকু মাটি সরিয়ে আস্তে করে উঁকি দিল ওপরে।
হ্যামকে উঠল আবার সবাই। খুব সাবধানে রইল এবার মুসা।
হই-হট্টগোলে জন্তু-জানোয়ারের আনাগোনা থেমে গিয়েছিল কিছুক্ষণের জন্যে, আস্তে আস্তে শুরু হলো আবার।
চুপ করে পড়ে আছে কিশোর। আশা, যদি কেউ আসে এপথে? তবে সে ব্যাপারে সন্দেহ আছে যথেষ্ট। যা, হই-চই হয়েছে, মাথামোটা গরু না হলে এপথে। পানি খেতে আসার কথা নয় আর আজ রাতে কারও।
কিন্তু গরু সব জায়গায়ই আছে, আমাজনের জঙ্গলেও।
ঝোপে ঘষা লাগার খসখস আওয়াজ হলো, পায়ের চাপে মটমট করে শুকনো ডাল ভাঙছে। কোন ভারি জানোয়ার আসছে। উত্তেজনায় টানটান হয়ে রইল কিশোর।
ঝোপ থেকে বেরোল জীবটা। খোলা জায়গা পেরোচ্ছে। পানি খেতে নামবে। নদীতে। ঠিক এই সময় ক্যামেরার শাটার টিপে দিল কিশোর।
স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল জীবটা। তীব্র নীলচে আলোয় ক্ষণিকের জন্যে তার। বোকাবোকা দৃষ্টি দেখতে পেল কিশোর। জীবটার মুখ এখন ক্যামেরার দিকে।

ফেরানো। আবার শাটার টিপল সে। আবার।
অ্যাপারচার হোট-বড় করে তিনটে ছবি তুলেছে কিশোর। একটা অন্তত ভাল। হবেই।
কোথায় যেন পড়েছে সে: দক্ষ নেচারালিস্ট প্রথমে ছবি তুলে নেয়, তারপর লক্ষ্য করে জীবটাকে। কারণ, আগে না তুললে পরে আর ছবি তোলার সুযোগ না ও পাওয়া যেতে পারে। তা-ই করেছে কিশোর। টর্চ জেলে আগ্রহের সঙ্গে দেখতে। লাগল জীবটাকে। চোখে আলো পড়ায় অবাক হয়ে চেয়ে আছে ওটা, নড়ছেও না।
এর ছবি অনেক দেখেছে নেচারাল-হিস্টরি বইতে, চিড়িয়াখানায় জীবন্তও দেখেছে। কিন্তু যে কোন জানোয়ারকে বনে তার নিজস্ব জায়গায় দেখার ব্যাপারই আলাদা। তাই ওটাকে দেখে অবাক না হয়ে পারল না কিশোর।
দক্ষিণ আমেরিকার সবচেয়ে বড় বুনো-জানোয়ার তাপির। সামনে যেটা রয়েছে, একশো চল্লিশ কেজির কম হবে না, অনুমান করল কিশোর। ফুট পাঁচেক উঁচু, লম্বা প্রায় ছয় ফুট। বিভিন্ন জানোয়ারের দেহের নানা অংশ জোড়া দিয়ে যেন তৈরি হয়েছে। শরীরটা বিশাল এক শুয়োরের, ঘাড়ে ঘোড়ার কেশর, আর মুখের ওপরে হাতির ছোটখাটো একখান শুড়।
বিজ্ঞানীরা মনে করেন, জীবটা হাতির পূর্বপুরুষ। উড়টা খুবই খাটো, কিন্তু আসল হাতির শুড়ের মতই ব্যবহার করে। কিশোরের মনে হলো, জীবটার নাম তাপির না হয়ে শুঘোহা হওয়া উচিত ছিল, অর্থাৎ শুয়োর-ঘোড়া-হাতি।
একটা তাপিরের জন্যে মোটা টাকা অফার করেছে সিনসিনাটি চিড়িয়াখানা। ধরতে পারলে কাজই হয়। ধরাও হয়তো যায়–যদিও খুব কঠিন কাজ, কিন্তু নেবে। কি করে? যা নৌকার নৌকা প্রায় চার মন ওজনের জীবটাকে তোলাই যাবে না। ওতে, থাক তো বয়ে নেয়া। পোর্টেবল সাইজের একটা তাপির পেলে কাজ হত।
কিশোরের ডাকে সাড়া দিয়েই যেন এসে হাজির হলো পকেট এডিশন। পকেটে ধরবে না অবশ্যই, কিন্তু ক্যানুতে জায়গা হবে।
একটা শিও তাপির। হোঁতকা মায়ের মত ভোতা বাদামী রঙ নয় চামড়ার। হালকা হলুদ ডোরা আর সাদা সাদা ছোপ। বড় হলে মুছে যাবে। শিশুসুলভ গো গো, কুতকুত করে মায়ের দিকে ছুটে গেল সে। ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছে, দুধের। জন্যে গলা শুকিয়ে কাঠ।
এই বাচ্চাটাকে ধরতে পারলে কাজ হয়, ভাবল কিশোর। ডাকবে নাকি সবাইকে? নাহ থাক। ডাকাডাকিতে যদি বাচ্চাকে নিয়ে চলে যায় মা? তার চেয়ে একা চেষ্টা করাই ভাল। তাপির সম্পর্কে যতখানি জানে কিশোর, খুব নিরীহ জীব। বিশেষ

ঝামেলা করবে বলে মনে হয় না। তাছাড়া দৃষ্টশক্তি খুব দুর্বল ওদের। কিশোরকে হয়তো দেখতেই পাবে না।
নিশব্দে হ্যামক থেকে মাটিতে নামল সে। তাপির মায়ের চোখ থেকে আলো সরাল না।
দ্রুত হিসেব করে নিল মনে মনে। ভয় পেলে কোনদিকে পালাতে চাইবে মা? কাছাকাছি নদী থাকলে পানিতে ডুব মারে তাপির। এটাও হয়তো নদীতেই ঝাঁপ দেবে। মায়ের মত তাড়াহুড়ো করতে পারবে না বাচ্চাটা, দৌড়ে গিয়ে ধরে ফেলা যাবে।
পায়ে পায়ে এগোল কিশোর। মট করে ভাঙল একটা শুকনো ডাল।
অনেক অপেক্ষা করেছে তাপির। আর করল না। সামান্য শব্দেই ওর ধৈর্যের। বধ ভাঙল। কিন্তু নদীতে ঝাঁপ দিল না, বরং মাথা নিচু করে ভীমবেগে ছুটে এল। আলোর দিকে। ভুলেই গিয়েছিল কিশোর, নিরীহ মাতাও সন্তানকে রক্ষার সময় ভীষণ হয়ে ওঠে।
চেঁচিয়ে উঠল মা। চেহারা আর আকারের সঙ্গে ডাকটা বড় বেশি বেমানান। মেঘের মত গুড়গুড় নয়, হাতি-কিংবা গণ্ডারের মত খনখনে ডাকও নয়, খেপা ঘোড়ার মত তীক্ষ্ণ চি-চি করে উঠল। শেষ হলো টানা লয়ে, শিসের মত শব্দে। বিচিত্র জানোয়ারটার সব কিছুই অদ্ভুত।
সবাই জেগে গেল। লাফিয়ে হ্যামক থেকে নামলেন মিস্টার আমান। রবিন আর মুসাও নামল। কবর থেকে উঠে এল বাকু, প্রথম বসন্তের সাড়া পেয়ে গর্ত থেকে বেরোল যেন শজারু। তেমন করেই গা ঝাড়া দিয়ে মাটি ফেলল শরীর থেকে।
কেউ কিছু করার আগেই কিশোরের কাছে পৌঁছে গেল চারমনী দানবটা।
টর্চ ফেলে দিয়েছে কিশোর। একটাই উপায় দেখল বাঁচার। লাফ দিয়ে মাথার ওপরের একটা ভাল ধরে উঠে যেতে চাইল। কিন্তু ভার সইল না। ডাল ভাঙল। তাপিরের পিঠের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে পড়ল সে। পতন রোধ করার জন্যে ঘাড়ের কেশর আকড়ে ধরল।
চকিতে মনে পড়ে গেল কথাটা। পিরের বড় শত্রু জাগুয়ার। পিঠে চেপে গলায় নখ বসিয়ে আঁকড়ে ধরে। তাপির তখন ছুটে যায় ঘন কাঁটাঝোপের দিকে, কিংবা নিচু মোটা ডালের দিকে। তলা দিয়ে ছুটে যায় তীব্র গতিতে। শক্ত ডালে বাড়ি লেগে অনেক সময় ছাতু হয়ে যায় জাগুয়ারের মাথা। ছিটকে পড়ে রক্তাক্ত থেতলানো দেহটা।
কিশোরও জাগুয়ারের মতই জীবটার পিঠে চেপেছে। এখানে কাঁটা ঝোপ। নেই, তবে নিচু ডাল অনেক আছে। সে-রকম একটা ডালের দিকেই ছুটছে। তাপির।

আতঙ্কিত হয়ে পড়ল সে। আপনাআপনি কেশর থেকে খুলে এল আঙুলগুলো। মাটিতে গড়িয়ে পড়ে গেল।
গতি রুখতে পারছে না তাপিরটা। ছুটে যাচ্ছে।
হাঁপ ছাড়ল কিশোর। যাক, অল্পের ওপর দিয়েই গেছে।
কিন্তু একথা ভেবে আরেকটা ভুল করল সে। নিরীহ মাতা ক্রুদ্ধ হলে। কতখানি ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে, তাপিরটা তা-ই বুঝিয়ে দিল।
কয়েক গজ এগিয়ে ব্রেক কষে দাঁড়াল সে। তারপর চোখের পলকে টক দিয়ে ঘুরল। এত মোটা থলথলে একটা শরীর নিয়ে যেভাবে ঘুরল, অবাক না হয়ে পারা যায় না। ছুটে এল যেন কালবৈশাখীর ঝড়। সেই সঙ্গে একটানা তীক্ষ্ণ শিল!
কিভাবে খাড়া হলো কিশোর, বলতে পারবে না। গুতো লাগে লাগে এই সময় ঝাঁপ দিয়ে পড়ল এক পাশে।
কয়েক গজ গিয়ে আবার ঘুরল জানোনায়ারটা। আবার ছুটে এল। পুরোপুরি। গণ্ডারের স্বভাব। শত্রুকে শেষ না করে স্বস্তি নেই।
এক সাথে দুটো টর্চের আলো এসে পড়ল পিরের চোখেমুখে। গর্জে উঠল রাইফেল। থরথর করে কেঁপে উঠল বনভূমি। পয়েন্ট টু-সেভেন-জিভারো ক্যালিবারের উইনচেস্টার রাইফেল থেকে বেরোনো একশো তিরিশ গ্রেন এক্সপ্যানডিং বুলেটের প্রচণ্ড আঘাতে প্রায় উল্টে পড়ল ভারি জীবটা।
লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। বাচ্চাটা কোথায়? এদিক-ওদিক তাকাল সে? ওই তো। মায়ের দিকে ছুটে যাচ্ছে। ঝাঁপিয়ে পড়ল গিয়ে নিথর দেহটার ওপর। মা যে মারা গেছে, বুঝল না। শুড়ের মত নাক দিয়ে গুতো মারতে লাগল মায়ের। পেটে। মনে করল বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছে। ওরকম তো প্রায়ই ঘুমোয় মা। তখন আরামসে শুয়ে শুয়ে দুধ খায় সে। এখনও তাই করল।
নিজের চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে হলো কিশোরের। এ-কি করল? তার দোষেই তো মা-হারা হলো অতটুকুন দুধের বাচ্চাটা।
সবাই স্তব্ধ হয়ে দেখছে।
কিশোর চুপ, রবিন স্থির। রাইফেলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন মিস্টার আমান।
ছুটে গিয়ে হাঁটু গেড়ে এতিম বাচ্চাটার পাশে বসে পড়ল মুসা। আস্তে করে ওটার মখমলের মত মসৃণ চামড়ায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, ভাবিসনে, খোকা। দুঃখ করিসনে। মা-তো চিরকাল কারও বেঁচে থাকে না। খুব ভাল চিড়িয়াখানায়। নিয়ে যাব তোকে, ভাল ভাল খাবার খেতে দেবে ওরা। তোর একলার জন্যেই। চমৎকার একটা সুইমিং পুল বানিয়ে দেবে। সেখানে জাগুয়ারের ভয় নেই। আল্লার। কসম, তোকে আমরা মরতে দেব না কিছুতেই।
পরদিন সকালে আবার নৌকা ভাসাল ওরা।

ধীরে ধীরে বাড়ছে স্রোত, ঢালু হচ্ছে নদী। খানিক পরেই বোঝা গেল কারণটা। সামনে জলপ্রপাত। কাজেই বয়ে নিতে হলো নৌকা আর মালপত্র।
জলপ্রপাতের নিচ থেকে আবার শুরু হয়েছে নদী। প্রথমে মালগুলো বয়ে এনে নদীর পাড়ে রাখল ওরা। তারপর নৌকাটা বয়ে নিয়ে এল। আবার ভাসল। পানিতে। মাল সাজিয়ে রেখে নৌকায় উঠল সবাই, বাকু বাদে।
পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে বাকু। দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করল, ফিরে যাব!
বোঝাতে চাইলেন মিস্টার আমান, তর্ক করলেন, কোন লাভ হলো না। বাকুর এক কথা, ফিরে যাবে। তার চেনা অঞ্চল এখানেই শেষ। জলপ্রপাতের পর কি আছে জানে না সে, যায়নি কখনও। কোন রহস্যময় আতঙ্ক লুকিয়ে আছে ওখানে, জানে না। লোকজনকে চেনে না। শুধু শুনেছে, ওখানকার লোকেরা নাকি খুব খারাপ।
নদীর ধার বরাবর উজানে হেঁটে গেলে তার গায়ে পৌঁছতে দিন দুই লাগবে।
পাওনা টাকা মিটিয়ে দিলেন মিস্টার আমান। কিছু খাবার দিতে চাইলেন।
নিল না বাকু। হেসে কাঁধে ঝোলানো ধনুকে চাপড় দিল। আমি খাব। খাবার অভাব হবে না তার। নদী আর বন থেকে জোগাড় করে নিতে পারবে।
নৌকাটা বেশি পানিতে ঠেলে দিল বাকু। দাঁড়িয়ে রয়েছে। বন্ধুদের চলে যেতে দেখে যেন খারাপ লাগছে তার।
এক টানে ক্যানূটাকে নদীর মাঝখানে নিয়ে এল স্রোত। ভাসিয়ে নিয়ে চলল। হাত নেড়ে জিভারো ভাষায় গুড বাই জানাল বাকু, তারপর ঘুরে দাঁড়াল। উঠতে শুরু করল প্রপাতের ধারের পাথুরে ঢাল বেয়ে। ওপরে উঠে ফিরে তাকাল আবার। আরেকবার হাত, নাড়ল। তারপর লম্বা লম্বা পা ফেলে হারিয়ে গেল বনের ভেতরে।
নিজেদের বড় একা মনে হলো অভিযাত্রীদের। একজন মাত্র চলে গেছে, ওরা রয়েছে চারজন, অথচ একা লাগছে। ভারি অদ্ভুত। বার বার প্রপাতের দিকে ফিরে, তাকাচ্ছে। এই জঙ্গল, এই প্রকৃতি ওদের অচেনা। বাকু যতক্ষণ ছিল, কিছুটা ভরসা অন্তত ছিল। এমন এক জায়গায় রয়েছে ওরা এখন, যেখানে সভ্য মানুষ আর আসেনি। ওরাই প্রথম। সেজন্যে কিছুটা গর্বও বোধ করছে।
কথা শুরু করল মুসা।
নাকু খেতে চাইছে।
শুড়ের মত লম্বা নাকের জন্যে পিরের বাচ্চার নাম রেখেছে কিশোর, নাকু।
খায় কি? রবিনের প্রশ্ন।
কি আর খাবে? কিশোর বলল। লতাপাতা, মূল, রসাল শাকসজি। তবে বাচ্চাদের বোধহয় দুধ দরকার।
দুধ পাব কোথায়? কচি ঘাসই খাওয়াতে হবে।

দাঁড় বেয়ে নৌকা তীরে নিয়ে এল ওরা। বালিতে ঘ্যাঁচ করে নৌকার তলা লাগতেই তীরে নামল মুসা। ঘাসের অভাব নেই। ভাল দেখে দুই মুঠো ছিঁড়ে নিয়ে। এল। বাড়িয়ে দিল নাকুর মুখের কাছে।
নাক ফিরিয়ে নিল নাকু। খাবে না।
হুঁ, জ্বালাবে দেখছি, চিন্তিত কণ্ঠে বললেন মিস্টার আমান।
আরেকবার ঘাস খাওয়ানোর চেষ্টা করল মুসা।
খেল তো না-ই, চাপাচাপিতে বিরক্ত হয়ে লাফিয়ে নৌকা থেকে পানিতে পড়ার চেষ্টা করল না। তার গলায় বাধা লিয়ানা লতার রাশ টেনে ধরে থামানো হলো অনেক কষ্টে। দুলে উঠল নৌকা। আরেকটু হলেই গিয়েছিল উল্টে।
হয়েছে, ঘাস খাওয়ানোর দরকার নেই, হাত নাড়লেন মিস্টার আমান। থাক উপোস। মরবে না। পরে দেখা যাবে। কাগজের প্যাড, পেন্সিল আর কম্পাস বের করলেন তিনি।
নদীর ম্যাপ আঁকবেন নাকি? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
হ্যাঁ।
আমার কাছে দিন, উত্তেজনা চাপতে পারল না কিশোর। আমি দেখি চেষ্টা করে। অজানা জায়গার ম্যাপ আঁকার মধ্যে একধরনের রোমাঞ্চ আছে। হাসলেন মিস্টার আমান। গুড। নাও।
জ্বলজ্বল করছে কিশোরের চোখ। চার দিকে তাকাল। কোনটা থেকে শুরু করি? …জলপ্রপাত। কি নাম দেয়া যায়? মুসার দিকে তাকাল।
আমি কি জানি? দু-হাত শূন্যে তুলল মূসা।
বাকু ফলস! চেঁচিয়ে উঠল রবিন।
উঁহু, নাকুনাপ্রপাত, বলল কিশোর। নাকুর মায়ের সম্মানে। বাকু ব্যাটা তো আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। তাকে সম্মান দিতে যাব কেন?
ফলসের বাংলা জলপ্রপাত, না? মাথা ঝাঁকালেন মিস্টার আমান, ঠিক আছে, রাখো।
কাগজের ওপর দিকে একটা চিহ্ন আঁকল কিশোর। পাশে লিখল, নাকুমাপ্রপাত।
গ্রাফপেপারে আঁকছে সে। নীল রঙের ছোট ছোট অসংখ্য বর্গক্ষেত্র আকা। রয়েছে পেপারে। সেগুলোর ভেতর দিয়ে বাকা রেখা একে চলল। নাকুমাপ্রপাতের পর নদীটা যত বার বাক কিংবা মোড় নিল, কিশোরের লাইনও ততবার মোড় আর বাক নিল। কোনদিকে খেয়াল নেই, কাজ করে চলেছে একমনে। মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে কম্পাসের দিকে। দিক মিলিয়ে নিচ্ছে। সার্ভেয়াররা কি করে কাজ করে, দেখেছে। মাপও মোটামুটি আকতে জানে সে। অসুবিধে তেমন হলো না।
ইস, যন্ত্রপাতি যদি থাকত, আফসোস করল।

সার্ভে করার যন্ত্রপাতি অনেক ভারি, ওদের পক্ষে আনা সম্ভব ছিল না। মিস্টার আমান বললেন, খসড়া একে নিয়ে গেলে, আর কর্তৃপক্ষকে বোঝানো গেলে হয়তো সাভে টিম পাঠাবে।
টিলা-পাহাড়-পর্বত কিছুই বাদ গেল না কিশোরের ম্যাপ থেকে। আনুমানিক অলটিচিউড় দিয়ে রাখছে। মার্জিনের বাইরে নোট লিখে রাখছে–বন কোথায় ঘন, কোথায় রয়েছে দামী কাঠের গাছ।
সাহায্য করছেন মিস্টার আমান। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জঙ্গলের ব্যাপারে জ্ঞান দিচ্ছেন ছেলেদের।
নদীটা কোথায় চওড়া, কোথায় সরু, গভীরতা, ঢালু কতখানি, কিছুই চোখ এড়াচ্ছে না কিশোরের। আন্দাজে কাজ করতে হচ্ছে, তবু যতখানি সম্ভব নিখুঁতভাবে আকার চেষ্টা করছে।
উত্তেজনায় বার বার ভুরু কুঁচকে যাচ্ছে তার। ভাবতে ভাল লাগছে, তার। আঁকা ম্যাপের ওপর ভরসা করে হয়তো আসবে আগামী দিনের অভিযাত্রীরা। তার। কথা বলাবলি করবে। হয়তো রেফারেন্স বইয়ে চিরদিনের জন্যে উঠে যাবে তার নাম। লেখা হবে ও কিশোর পাশা, দা ফাস্ট ইয়াং পাইআনিয়ার ফ্রম দা নাকুমাপ্রপাত…আর ভাবতে পারল না সে। রোমাঞ্চিত হলো শরীর।
অন্যদের যেমন তেমন, দিনটা কিশোরের ভালই কাটল। এতই তন্ময় হয়ে। কাজ করল, ঘনবনে মারাত্মক শত্রু থাকতে পারে, সেকথাও মনে হলো না একবার।
বিকেলের দিকে বেশ চওড়া হয়ে এল নদী। তার মাঝে ছোট্ট একটা দ্বীপে রাত কাটানোর জন্যে ক্যাম্প করল ওরা। ইচ্ছে করেই বেছে নিয়েছে জায়গাটা। বনের ভেতর থেকে নরমুণ্ড শিকারী ইনডিয়ানরা এলে, তাদের অলক্ষে আসতে পারবে না।
রাতে জন্তু-জানোয়ারের কোলাহলের মাঝে ঢাকের শব্দ কানে এল বলে মনে হলো ওদের। তবে নিঃসন্দেহই হতে পারল না।
পরের দিনও একটানা চলল ক্যানু, সেই সঙ্গে চলল ম্যাপ আঁকা। ইনডিয়ানদের দেখা নেই। নাকুকেও খাওয়ানো গেল না। মাঝে মাঝেই কুই কুই করে উঠছে। খিদে পেয়েছে জানাচ্ছে, মাকে ডাকছে। ওর ব্যাপারে আর নির্লিপ্ত থাকা গেল না। এই অবস্থা চলতে থাকলে চিড়িয়াখানা দেখানো যাবে না তাকে।
সমস্যার সমাধান করল বটে মুলা, কিন্তু নাকুকে বাঁচাতে গিয়ে আরেকটু হলে সবাই মরেছিল।
একটা মোড় ঘুরে কাদাপানিতে দুটো ছাগল দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল ওরা। পানি খেতে নেমেছে। নদীর পাড়ে খানিকটা খোলা জায়গা, তৃণভূমি। সেখানে। চরছে

আরও কয়েকটা ছাগল। কয়েকটা মাদীও আছে, সঙ্গে ছোট বাচ্চা। তারমানে মাগুলো একেকটা দুধের ডিপো।
বনছাগল! চেঁচিয়ে উঠল মুসা। নাকুর দুধ জোগাড় হবে।
পানি খাওয়া বাদ দিয়ে নৌকার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ছাগলদুটো। নড়ছেও না।
উঁহু, বুনো না, মাথা নাড়ল কিশোর। নৌকা দেখলেই পালাত তাহলে।
গাঁ-টাও তো দেখছি না, রবিন বলল।
আছে হয়তো বনের ভেতরে কোথাও, বললেন মিস্টার আমান।
ওখানেই নামা দরকার, খোলা জায়গা দেখাল মুসা। দুপুরের খাওয়াটা সেরে নিই।
সবাই রাজি।
নৌকা ভিড়িয়ে তীরে নামল ওরা। খাওয়া-দাওয়ার পর সামান্য জিরিয়ে নেয়ার জন্যে ঘাসের ওপরই শুয়ে পড়ল সবাই, মূসা বাদে। একটা পানির বোতল খালি করে নিয়ে পা টিপে টিপে এগোল। চরতে চরতে একটা উঁচু ঢিপির ওপাশে চলে গেছে ছাগলগুলো।
মিনিট পনেরো পরেই মুসার চিৎকারে লাফিয়ে উঠল তিনজনে। শাঁ করে। বাতাস কেটে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল একটা তীর।
দুধের বোতল হাতে নিয়ে লাফাতে লাফাতে আসছে মুসা। জলদি! তীর ছুঁড়ছে!
চোখের পলকে নৌকায় উঠে দাঁড় বেয়ে ওটাকে মাঝনদীতে নিয়ে এল ওরা। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল তীব্র স্রোত। টেনে নিয়ে চলল ক্যাটাকে। আরেকটা তীর উড়ে এল, কিন্তু পড়ল নৌকার পেছনে কয়েক হাত দূরে। দেখতে দেখতে একটা মোড়ের আড়ালে চলে এল ওরা, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।
বেশিক্ষণ টিকল না স্বস্তি। বাকের কাছে খানিকটা জায়গার ঝোপঝাড় পরিষ্কার, ঘাটে একটা ক্যানু বাঁধা।
শাঁই শাঁই করে ক্যানুটার পাশ কাটিয়ে এল ওরা। কিন্তু বড়জোর শ-পাঁচেক গজ এগিয়েই কানে এল উত্তেজিত চিৎকার। ফিরে চেয়ে দেখল, লাফিয়ে ঘাটের ক্যানুতে উঠছে তিনজন ইনডিয়ান। বাকুর গাঁয়ের মানুষের মত পোশাক পরা নয়, প্রায় উলঙ্গ।
নাকুকে দুধ খাওয়াতে গিয়ে মারাত্মক বোকামি করে ফেলেছে, ঠোঁট কামড়াচ্ছে এখন মুসা।
দাড়ের ওপরে ঝুঁকে পড়েছে ওরা, যেন ওগুলোই তাদের এখন বাঁচার একমাত্র অবলম্বন।
তিনজনের বিরুদ্ধে চারজন। সংখ্যায় বেশি বটে, তবে সেটা হাতাহাতি লড়াইয়ের বেলায়। ইনডিয়ানদের কাছে রয়েছে বিষাক্ত তীর, রক্তে ওই বিষ ঢুকলে সর্বনাশ

হবে। ওদের তীর কিংবা ডাটগানের রেঞ্জের বাইরে থাকতে হবে। গুলি আপাতত করতে চাইছেন না মিস্টার আমান। মানুষের রক্তে কখনও হাত ভেজাননি, রেকর্ডটা ভাঙার কোন ইচ্ছে তার নেই। তবে তেমন ঠেকায় পড়লে...
দ্রুত দাঁড় বেয়ে চলল চার অভিযাত্রী।
কিন্তু এসব অঞ্চল ইনড়িয়ানদের পরিচিত। এখাকার নদীতে নৌকা চালিয়ে তারা অভ্যস্ত। তাদের সঙ্গে দৌড়ের পাল্লায় পারবে কেন বিদেশীরা? তবু চেষ্টার ত্রুটি করল না।
মাইলখানেক পর্যন্ত আগে আগে রইল ওরা, তারপর গতি কমাতে বাধ্য হলো। নিচে পানি কম, বালিতে ঠেকে যাচ্ছে নৌকার তলা। গায়ের জোরে ঠেলে নিতে হচ্ছে এখন।
প্রায় উড়ে চলে এল ইনডিয়ানদের ক্যানূ। রেঞ্জের মধ্যে পেয়ে গেছে। একজন। দাঁড় ফেলে দিয়ে সাত ফুট লম্বা এক ধনুক হাতে খাড়া হয়ে গেল।
টংকার উঠল ধনুকের ছিলায়। শিস কেটে উড়ে এল তীর।
খ্যাট করে বিধল নৌকার একপাশে। র‍্যাটল সাপের লেজের হিড়হিড় শব্দ তুলে কাপল কিছুক্ষণ তীরের পালক লাগানো পুচ্ছ, যেন জীবন্ত।
সংগ্রাহক হিসেবে কিশোর পাশা অনন্য। এই বিপদের মাঝেও ভুলে যায়নি, দুর্গম এলাকার নরমুণ্ড শিকারীদের তৈরি এরকম একটা তীর সাড়া জাগাবে শহুরে দর্শকদের মাঝে, লুফে নেবে নেচারাল হিসট্রি মিউজিয়ম। আস্তে করে তীরটা খুলে নিয়ে নৌকার তলায় ফেলল সে, তারপর আবার দাঁড় তুলে নিল হাতে।
মিস হয়েছে দেখে রাগে চেঁচিয়ে উঠল ইনডিয়ানরা। আরেকটা তীর ধেয়ে, এল। গলা বাঁচাতে হাত তুললেন মিস্টার আমান, তীরটা গাথল তার ডান বাহুতে।
আর উপায় নেই। রাইফেল তুলে নিলেন তিনি। পয়েন্ট টু-সেভেন-জিভারো নয়, অন্য আরেকটা। পয়েন্ট থ্রি-জিভারো-জিভারো। ভোতা-মাথা প্রচণ্ড শক্তিশালী বুলেট, ধ্বংস-ক্ষমতার জন্যে কুখ্যাতি আছে।
হাত কাঁপছে মিস্টার আমানের। ডান বাহুতে তীক্ষ্ণ ব্যথা।
আমাকে দাও, বাবা, হাত বাড়াল মুসা। আগে এয়ারগান দিয়ে একটা ঘুঘুকে মারলে পড়ত তার তিনহাত দূরে বসা ঘুঘুটা, কিন্তু শুটিং ক্লাবে ভরতি হওয়ার পর হাত অনেক সোজা হয়ে গেছে তার। ছোটখাটো বাজিও জিতেছে কয়েকটা শুটিঙে।
মেরো না, রাইফেলটা বাড়িয়ে দিলেন তিনি।
না, মারব না। ক্যানূর কিনারায় রাইফেলের নল রেখে প্রায় শুয়ে পড়ল মুসা। জংলীদের নৌকার এক পাশে পানির সমতলের একটু নিচে সই করে টিপে দিল ট্রিগার।

নীরবতা খানখান করে দিল ভারি রাইফেলের কানা-ফাটা শব্দ। নৌকার পাশে পানি ছিটকে উঠল, চেঁচিয়ে উঠল জংলীরা। ফুটো দিয়ে পানি ঢুকেছে, ডুবতে শুরু করল নৌকা।
তাড়াহুড়ো করে ডুবন্ত নৌকাটা তীরের দিকে নিয়ে চলল ইনডিয়ানরা।
আংকেল, বেশি ব্যথা করছে? কিশোর জিজ্ঞস করল। কিছু করতে হবে?
দাঁড় বাও। মুসা, খানিকটা লবণ দাও তো।
অবাক চোখে তাকাল মুসা। পাগল হয়ে যাচ্ছে নাকি বাবা।
হ্যাঁ, হ্যাঁ লবণের কথাই বলছি।
মুসা, দাও জলদি, দাঁড় বাইতে বাইতে বলল কিশোর।
হ্যাঁচকা টানে তীরটা খুলে অন্য তীরটার কাছে ফেললেন মিস্টার আমান। দুটো তীরের মাথায়ই কালচে আঠামত জিনিস মাখানো। কিউরেয়ার বিষ।
আস্তিন গুটিয়ে ওপরে তুলে দিলেন তিনি। সামান্য ক্ষত, কিন্তু যেটুকু হয়েছে। তা-ই যথেষ্ট। বিষ ঢুকছে শরীরে। বেশি ঢুকলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই মৃত্যু ঘটাবে। ইনডিয়ানরা লবণ বিশেষ খায় না, জন্তু-জানোয়ারেরা তো আরও কম। খায়। তাই তাদের শরীরে কিউরেরায় ক্রিয়া করে বেশি। কিন্তু লবণ-খেকো শহুরে। মানুষকে কতখানি কাবু করতে পারবে, বলা যাচ্ছে না।
ছুরি দিয়ে কেটে ক্ষতটা বড় করলেন মিস্টার আমান। তাতে লবণ ডলতে শুরু করলেন। খানিকটা লবণ মুখে ফেলে পানি দিয়ে গিলে নিলেন।
তোমরা বাও, থেমো, না, প্রচণ্ড ক্লান্তি বোধ করছেন তিনি। আমি আর বসতে পারছি না।
নৌকার তলায় শুয়ে পড়লেন লম্বা হয়ে।
নৌকা তীরে ভেড়াব, আংকেল? উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল রবিন। ভালমত শুতে পারবেন।
না না, ওকাজও করো না। জলদি ভাগতে হবে এখান থেকে। ভেব না, আমি ঠিক হয়ে যাব।
দেহের স্নায়ু আর মাংসপেশীর যোগাযোগ নষ্ট করে দেয় কিউরেয়ার। ফলে আজকাল ইউরোপ আমেরিকার বড় বড় হাসপাতালে ব্যবহার হচ্ছে এই জিনিস, রোগীর পেশীর পীড়ন দূর করে তাকে ঘুম পাড়ানোর জন্যে। মিস্টার আমানেরও ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। কতখানি বিষ ঢুকেছে শরীরে, বোঝা যাচ্ছে না। ঘুম থেকে আর, জাগবেন তো?
মাথা আর ঘাড়ের মাংসপেশী প্রথমে অসাড় হবে। হলোও তাই। মাথা ঘোরাতে পারছেন না মিস্টার আমান। ধীরে ধীরে নিচের দিকে নামছে অসাড়তা, ছড়িয়ে পড়ছে বুকে, পিঠে, বক্ষপিঞ্জরের ফাঁকে ফাঁকে মাংসপেশীতে। শ্বাস নিতে কষ্ট

হচ্ছে। কিন্তু যত ব্যথাই করুক, অসুবিধে হোক, জোর করে শ্বাস টানতে হবে। ফুসফুসকে বাতাস-শূন্য হতে দেয়া চলবে না কিছুতেই। তাহলে নিশ্চিত মৃত্যু।
অবস্থা কতখানি সঙ্গিন, কিছুটা বুঝতে পারছে রবিন। কিশোর পারছে। পুরোপুরিই। কিউরেয়ারের মারণ-ক্ষমতার কথা ভালমতই জানা আছে তার। মুসা। জানে না। মুখ খুলতে যাচ্ছিল রবিন, কিন্তু চোখ টিপে তাকে নিষেধ করল কিশোর। ভয় পেয়ে যাবে মুসা। যা হওয়ার হয়ে গেছে, এখন তাদের কিছু করার নেই।
জংলীদের চেঁচামেচি কানে আসছে। বাড়ছে আস্তে আস্তে। তারমানে লোক জড় হচ্ছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সরে যেতে হবে দূরে।

.

ধ্রিম-ধ্রিম-ধ্রিম-ধ্রিম! ছড়িয়ে পড়েছে একটানা শব্দ।
ঢাক! চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। সতর্ক করে দিচ্ছে গায়ের লোককে।
শঙ্কিত হয়ে পেছনে ফিরে তাকাল সে, কিন্তু আর কোন ক্যা দেখা গেল না। কে কত তাড়াতাড়ি পানিতে দাঁড় ফেলতে পারে, সেই প্রতিযোগিতা লাগিয়েছে যেন তিনজনে। তার ওপর সাহায্য করছে স্রোত।
স্রোত অবশ্য জংলীদেরকেও সহায়তা করছে।
উত্তেজিত অশ্বশাবকের মত ফুঁসছে নাকু।
চুপ থাক, খোকা, মুসা বলল। তোকে দেখার সময় নেই এখন।
দুধের বোতলটার ওপর নজর পড়ল তার। কড়া রোদে পড়ে আছে। গরমে নষ্ট হয়ে যাবে দুধ। অনেক মূল্য দিতে হয়েছে ওর জন্যে। আরও কত দিতে হবে। কে জানে। মালপত্রের ছায়ায় বোতলটা ঠেলে দিল মুসা। ভেজা রুমাল দিয়ে ঢেকে দিল।
ম্যাপের কথা ভোলেনি কিশোর। কিন্তু এখন যা অবস্থা, প্রাণ বাঁচানোই মুশকিল, থাক তো ম্যাপ আঁকা। তার সমস্ত হতাশা আর ক্ষোভ গিয়ে পড়ল যেন দাড়ের ওপর, গায়ের জোরে ঝপাত করে ফেলল পানিতে।
সামনে আরেক বিপদ। পানির গর্জনেই বোঝা যায় হঠাৎ ঢালু হয়ে গেছে নদীটা, অনেক গুণ বেড়ে গেছে স্রোতের তীব্রতা। রোদে লাফিয়ে উঠছে সবুজ সাদা ঢেউ। খুব সুন্দর, কিন্তু সৌন্দর্য অনেকখানি মলিন করে দিয়েছে ঢেউয়ের নিচ থেকে হঠাৎ হঠাৎ বেরিয়ে পড়া বড় কালো পাথরের বিষণ্ন ভোতা মুখ।
ফেরার সময় নেই। আর ফিরে যাবেই বা কোথায়? হড়াৎ করে এক টানে সেই তা-থৈ ঢেউয়ের মধ্যে ক্যানূটাকে ফেলল স্রোত।
প্রচণ্ড ঘূর্ণিতে চরকির মত পাক খেল নৌকাটা, তারপর নাক নিচু করে ছুটে চলল ভীষণ গতিতে, আকাবাকা পথ ধরে। দানবীয় এক অজগরের মত বার বার একে

বেকে গেছে নদী, সেই পথ অনুসরণ করল নৌকা। যে কোন মুহূর্তে উল্টে যাওয়ার ভয়কে যেন তোয়াক্কাই করছে না।
বিশাল দুই পাথরের চাইয়ের মাঝে যেন ডাইভ দিয়ে পড়ে শেষ হয়েছে ঢাল। সরু পথ, দু-ধারে পাথরের দেয়াল। সামান্যতম এদিক ওদিক হলেই দেয়ালে বাড়ি। খেয়ে চুরমার হয়ে যাবে নৌকা।
সামনের গলুইয়ের কাছে বসেছে কিশোর, মাঝে রবিন, পেছনে মুসা–নৌকা। বাওয়ায় দক্ষ বলে একই সঙ্গে হাল ধরা এবং দাঁড় বাওয়ার কঠিন দায়িত্বটা নিয়েছে সে।
আতঙ্কিত চোখে গিরিপথের দিকে তাকাল কিশোর। কি করবে? দাঁড় আড়াআড়ি ধরে ঠেকানোর চেষ্টা করবে? কয়েকটা ঘটনা ঘটতে পারে তাহলে। প্রচণ্ড তাপ সইতে না পেরে দু-টুকরো হয়ে যেতে পারে দাঁড়। ধাক্কা দিয়ে চিত। করে ফেলতে পারে তাকে। কিংবা ছুটে এসে বুকে বাড়ি মেরে ফেলে দিতে পারে। পানিতে। তারমানে, দাঁড় দিয়ে ঠেকানোর চেষ্টা করে লাভ হবে না।
কিশোর সিদ্ধান্ত নেয়ার আগেই লাফ দিয়ে গিয়ে গিরিপথের মুখে পড়ল নৌকা। শা করে ঢুকে গেল, ভেতরে। ভাগ্য আরেকবার পক্ষ নিল তাদের, কোন দেয়ালেই ধাক্কা লাগল না, এমনকি সামান্যতম ঘষাও নয়। স্রোতের ঠিক মাঝখান দিয়ে। তীরবেগে ছুটে চলল নৌকা।
ভীষণ গর্জন, দু-পাশ দিয়ে ঝঞ্ঝার বেগে ছুটে চলেছে যেন দুটো এক্সপ্রেস ট্রেন। চাপে পড়ে পাগল হয়ে গেছে বুঝি মাতাল ভোত, গা ঝাড়া দিয়ে পথ পরিষ্কারের চেষ্টা করছে, ফলে বৃষ্টির মত ছিটাচ্ছে পানির ছাট, অন্ধ করে দিতে চাইছে যেন অভিযাত্রীদের। এত ঘন ছাট, মনে হচ্ছে পথ জুড়ে রয়েছে সাদাটে অসংখ্য চাদর। ওই চাদরকে ছিঁড়ে সুড়ঙ্গ তৈরি করে তার ভেতর দিয়ে ছুটে চলেছে ক্যানূটা।
ঢালু জায়গা সোজা হয়ে গেছে অনেক আগেই। কমতে শুরু করল স্রোতের। তীব্রতা। সামনে সামান্য উঁচু হয়েছে পথ, তার গোড়ায় পানির ফেনা।
পাথরের চাঙড় পেছনে ফেলে এল নৌকা। গর্জন হঠাৎ করে অনেক কমে গেছে। সামনে পথ উঁচু, তাই তেও খুব কম। দাঁড় বাইতে হচ্ছে। পানির। আওয়াজ কমে যেতেই এখন আবার শোনা যাচ্ছে ঢাকের শব্দ।
দারুণ দেখিয়েছ, নৌকার তলায় শুয়ে দুর্বল কণ্ঠে বললেন মিস্টার আমান।
মনে হয় ওদিক দিয়ে ঘুরে আসবে ব্যাটারা, বলল কিশোর। অনেক সময় লাগাবে।
a.
ওই যে, আসছে। চেঁচিয়ে উঠল রবিন।
ঝট করে পেছন ফিরে তাকাল কিশোর আর মুসা। ঘুরে নয়, চাঙড়ের ভেতর দিয়েই আসছে ওরাও।

অভিযাত্রীদের দেখে পানির গর্জন ছাপিয়ে চেঁচিয়ে উঠল জংলীরা। সোজা ছেড়ে দিয়েছে তাদের ক্যানু, ঢাল বেয়ে পড়ছে। চাঙড় দুটোর মাঝে পড়ে ক্ষণিকের জন্যে হারিয়ে গেল নৌকাটা, আবার যখন ভাসল, দেখা গেল উল্টে গেছে। ঢেউয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে তিনটে কালো মাথা।
আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল ছেলেরা।
কিন্তু তাদেরটা ডুবল না, ইনডিয়ানদেরটা ডুবল কেন? ওরা তো ক্যানু চালানোয় অনেক বেশি দক্ষ। কিশোর অনুমান করল, মালের বোঝা-ই তাদের নৌকাটা বাঁচিয়ে দিয়েছে। তার ওপর তলায় শুয়ে রয়েছেন মিস্টার আমান। তুলা ভারি হয়ে যাওয়ার ভারসাম্য ভাল হয়েছে নৌকাটার, গড়াগড়ি করছে কম, কাত প্রায় হচ্ছেই না।
ঢালের ওপরে আরেকটা ক্যানু দেখা গেল। তার পেছনে আরেকটা। দুটোই নেমে এল ঢালের নিচে। চাঙড়ের মাঝে ঢোকার আগের মুহূর্তে শাই করে পাশ কেটে সরে গেল পাশের প্রণালীতে। অভিযাত্রীদের পিছু না দিয়ে আশ্চর্য দক্ষতায় পাথরে ঠেকিয়ে নৌকা আটকাল জংলীরা। উল্টে যাওয়া ক্যামূটা তুলতে শুরু করল, আর পড়ে যাওয়া তিনজনকেও।
জোরে জোরে দাঁড় বাইতে লাগল তিন গোয়েন্দা। খানিকটা সময় পাওয়া গেছে, এই সুযোগে সরে যেতে হবে যত দূরে পারা যায়।
সমান জায়গাটা পেরিয়ে এল। আবার ঢালু হতে শুরু করেছে পথ। অনেক দীর্ঘ একটা মোড় নিয়েছে, নদী। তারপরে আরেক সমস্যা।
বিশাল পাহাড়ের মাঝে একটা সরু সুড়ঙ্গ, ওপরে ছাত নেই, তার মাঝে ঢুকে গেছে নদীটা। জায়গাটা ওখানে ঢালু, ফলে স্রোতের বেগ বেড়েছে। এগিয়ে গেলে ওটার মধ্যেই ঢুকতে হবে, আর কোন পথ নেই। মস্ত ঝুঁকি হয়ে যাবে সেটা। একবার সুড়ঙ্গে ঢুকে গেলে আর পিছিয়ে আসা যাবে না, পেছনে উজান। নামতে হবে ভাটির দিকে। চলে যেতে হবে শেষ মাথা পর্যন্ত। সেখানে কি আছে জানে না ওরা।
তীরে ভেড়ানোর সময় আছে এখনও। কিন্তু তাতে লাভটা কি হবে? জঙ্গলের মধ্যে ইনডিয়ানদের ফাঁকি দিয়ে একশো গজও যেতে পারবে না, তার আগেই ধরা পড়বে। ফিরে চেয়ে দেখল কিশোর, উল্টানো নৌকাটা সোজা করে ফেলেছে জংলীরা, আরোহী তিনজনও তাতে উঠে বসেছে। তাড়া করে আসবে আবার।
নাহ, তীরে ভেড়ানো যাবে না। বেশি ভাবারও সময় নেই। দাঁড় বেয়ে এড়িয়ে চলল ওরা সুড়ঙ্গমুখের দিকে।
দূর থেকেই শোনা গেল সুড়ঙ্গের পানি ঢোকার গর্জন। পাহাড়ের পাথুরে দেয়ালে বাড়ি খাচ্ছে শব্দ, তাতে শব্দ আরও বেশি মনে হচ্ছে।

পেছনে আর একশো গজ দূরেও নেই জংলীরা, দাঁড় বেয়ে এগিয়ে আসছে দ্রুত। একনাগাড়ে চেঁচাচ্ছে। তীর ছুঁড়তে শুরু করেছে, কেউ কেউ। কিন্তু রেঞ্জ, পাচ্ছে না, অভিযাত্রীদের অনেক পেছনে পড়ছে তার।
সুড়ঙ্গমুখ তো নয়, যেন হা করে রয়েছে এক মহাদানব। তার কালো মুখগহ্বরে গলগল করে ঢুকছে রাশি রাশি পানি। ভাবনা-চিন্তার সময় নেই। দানবের মুখে ঢুকে পড়ল অভিযাত্রীরা, ছুটে চলল তার কণ্ঠনালী ধরে।
পেছনে আবার শোনা গেল উত্তেজিত চিৎকার। চকিতের জন্যে একবার মুখ ফেরাল কিশোর। সুড়ঙ্গে ঢোকার আগের মুহূর্তে নৌকার মুখ ঘুরিয়ে ফেলেছে জংলীরা, ভেতরে ঢুকছে না।
আসছে না! আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল রবিন। ভয় পেয়েছে।
কিন্তু কিশোরের মুখ কালো হয়ে গেল। তলপেটে শূন্য এক ধরনের অনুভূতি, শীত শীত লাগল। কড়া রোদ থেকে আচমকা সুড়ঙ্গের ঠাণ্ডা ছায়ায় ঢোকার কারণে নয়, ভয় পেয়েছে সে। ভীষণ ভয়। ইনডিয়ানরা যেখানে ঢুকছে সাহস পায়নি, সেখানে নিশ্চয় লুকিয়ে রয়েছে ভয়ঙ্কর কিছু। হয়তো সামনে রয়েছে নিশ্চিত মৃত্যু।
কাউকে কিছু বলল না সে। চুপ করে কান পেতে শুনছে। দ্রুত পেছনে পড়ছে। পানির গর্জন, সুড়ঙ্গমুখের পর থেকে আর শব্দ করছে না পানি, নিঃশব্দে বয়ে চলেছে ঢাল বেয়ে। সামান্যতম কলকল শব্দও নেই। স্নায়ুর ওপর দশ মন ভারি চাপ, সৃষ্টি করতে থাকে যেন এই অদ্ভুত নীরবতা।
পাহাড়ের দুই দেয়ালের মাঝে মাত্র তিরিশ ফুট মত ফাঁক। খাড়া প্রায় দু-শো ফুট উঠে গেছে দেয়াল। ফিতের মত এক চিলতে নীল আকাশ চোখে পড়ে সেই ফাঁক দিয়ে। আকাশটা যেন অপরিচিত, অন্য কোন পৃথিবীর।
সোজা এগোলে এক কথা ছিল। অভিযাত্রীদের বিপদ বাড়ানোর জন্যেই যেন জায়গায় জায়গায় বাঁক নিয়েছে গিরিপথ, ছোট বড় মোড় নিয়েছে, হাল ধরে নৌকার নাক ঠিক রাখতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে মুসা। দেয়ালের সঙ্গে নাকের একটা বাড়ি লাগলেই শেষ।
বড় আরেকটা মোড় পেরোল নৌকা।
জোরে দীর্ঘশ্বাসের মত শব্দ হলো। চমকে উঠল ওরা। ঝট করে তাকাল। ওপরে। বাতাস, না পানির শব্দ? না, বাতাস নয়। অনেক ওপরে পাহাড়ের মাথায় গজিয়েছে পাতলা ঝোপ, লতাপাতা। নিথর হয়ে আছে। দুলছে না। তারমানে বাতাসও নয়। ফাঁকের ওপর দিয়ে সারি বেধে উড়ে চলেছে একদল রক্তলাল আইবিস পাখি। শব্দটা হয়তো ওরাই করেছে।
রোদ-চকচকে সেই নীল আকাশের দিকে চেয়ে কিশোরের মনে হলো, জেলহাজতের লোহার গরাদের ফাঁক দিয়ে লোলুপ দৃষ্টিতে মুক্ত দুনিয়া দেখছে।

কয়েদীদের কেমন লাগে, অনুভব করতে পারল। এই জায়গাটা আসলেই যেন একটা জেলখানা। তাড়াতাড়ি দাঁড় ফেলল পানিতে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বেরিয়ে। যেতে চায় এই পাথরের কারাগার থেকে। সামনে যা থাকে থাকুক, পরোয়া করে না মরলে মরবে। এই মানসিক যন্ত্রণার চেয়ে সেটা অন্তত ভাল।
গায়ে কাঁটা দিল তার। কাছেই বিষুবরেখা, গরম হওয়ার কথা, তা না হয়ে। হয়েছে ঠাণ্ডা। হবেই, কারণ, দুই দেয়ালের মাঝের এই কালো ছায়ায় কোন কালেই রোদ ঢুকতে পারে না। তার কাছাকাছিই রয়েছে আরও তিনজন, কিন্তু তবু মনে হচ্ছে ভীষণ একা সে, অসহায়। মিস্টার আমানের দিকে তাকাল। চোখ বন্ধ করে পড়ে রয়েছেন। ঘুম, গা বেহুশ? মুসা আর রবিনও নীরব। কেউ কারও দিকে তাকাচ্ছে না।
অসহ্য এই নীরবতা আর সইতে পারল না মুসা। দুধের বোতলের মুখ খুলে দুধ। খাওয়াতে বসল নাকুকে। একহাতে হাল ধরে রেখে আরেক হাতে বোতলটা কাত করে ধরল বাচ্চাটার মুখের কাছে। চুকচুক করে বোতলের মুখ থেকে দুধ খেতে। লাগল নাকু, ভেতরে ঢুকছে সামান্যই বেশির ভাগ গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে দুই কম। বেয়ে। খাটো বাকা ডটার জন্যে বোতল থেকে ঠিকমত খেতে পারছে না। বেচারা। তার জিভের প্রতিটি শব্দ দেয়ালে বাড়ি খেয়ে ফিরে আসছে কয়েকগুণ। জোরাল হয়ে, কানে বাড়ি মারছে, যেন অশরীরী কোন প্রেতের ব্যঙ্গ-ঝড়া হাসি।
পথ এখন সোজা। কাজেই হাল ধরে রাখতে বিশেষ অসুবিধে হচ্ছে না মুসার।
ভাবছে কিশোর, ভুল সিদ্ধান্ত নিল না তো? সুড়ঙ্গের বাইরে থেকে জংলীদের। সঙ্গে লড়াই করাটাই কি উচিত ছিল না? ওদের কাছে বন্দুক রয়েছে, নয়জন। ইনডিয়ানকে শেষ করে দিতে পারত।
কিন্তু সত্যই কি পারত? জংলীরাও বসে থাকত না, তীর ছুঁডত। ওই বিষমাখা। তীর গায়ে গাথলে তাদের অবস্থাও হত মিস্টার আমানের মত। ওই তিনটে ক্যানূ। আর নয়জন জংলীই শেষ নয়, গায়ে আরও আছে। নয়জন মরলে শতজন এসে চড়াও হত। খেপে যেত ওরা তখন। যেভাবেই হোক, ধরতই অভিযাত্রীদের।
আবার শোনা গেল দীর্ঘশ্বাস। ওপর দিকে তাকিয়ে কিছু চোখে পড়ল না।
ছোট একটা মোড় পেরোল ক্যানূ। কিশোর আশা করেছিল, ওপাশে চওড়া হবে দেয়াল। তা না হয়ে হলো আরও সরু। সামনে ধীরে ধীরে সরে আসছে, গায়ে গায়ে লেগে যাওয়ার ইচ্ছে হয়েছে যেন। ওপরে ঝোপঝাড় বেশ ঘন, বড় গাছের চারাও আছে অনেক। দেয়াল যতই কাছাকাছি হলো, গাছের গায়ে গাছ ঠেকে গিয়ে চাদোয়া তৈরি করে ফেলতে লাগল। এতক্ষণও যা-ও বা আকাশ দেখা যাচ্ছিল, এখন আর তা-ও দেখা গেল না, অন্ধকার।

দুধ খাওয়ানো অনেক আগেই বাদ দিয়েছে মুসা। শক্ত হাতে হাল ধরেছে। যতই এগোচ্ছে, ঘন হচ্ছে অন্ধকার। হাতের দাঁড়ই ভালমত দেখা যায় না।
কেন আসেনি ইনডিয়ানরা, বোঝা যাচ্ছে এখন। অবাক হয়ে ভাবছে কিশোর, পাতালনদীর সঙ্গে এর তফাৎ কতখানি?
আরি! কি ওটা। চেঁচিয়ে উঠল রবিন।
কি? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
কি জানি গায়ে লাগল!
ডানা ঝাপটানোর শব্দ শোনা যাচ্ছে চারপাশে, সেই সঙ্গে অনেকগুলো দীর্ঘশ্বাস।
বাদুড়-টাদুর হবে।
একটা দুটো নয়, ডানার আওয়াজেই বোঝা যায়, শয়ে শয়ে। মাথা নিচু করে রাখল কিশোর, যাতে বাড়ি না লাগে। জানে যদিও, ইচ্ছে করে যদি বাড়ি না লাগায় বাদুড়েরা, লাগবে না। রাডারের মত যন্ত্র রয়েছে তাদের শরীরে, নিকষ। অন্ধকারেও পথ চিনে নিতে পারে সেই যন্ত্রের সাহায্যে। কোথায় একটা খুদে পোকা লুকিয়ে রয়েছে, তা-ও বুঝতে পারে।
এই সময় কথাটা মনে পড়ল কিশোরের–ভ্যাম্পায়ার ব্যাটা নয়তো? বুকের ঢিপঢিপানি বেড়ে গেল। শুনেছে, দক্ষিণ আমেরিকার- এসব এলাকায় রক্তচোষা। বাদুড়ের বাস। উষ্ণ-রক্তের প্রাণীদের দিকেই ওদের ঝোঁক।
মসৃণ কিচকিচ আওয়াজে ভরে গেছে সুড়ঙ্গ। এরই মাঝে শোনা যাচ্ছে। আরেকটা শব্দ, বেশ ভারি। দুর থেকে আসা গর্জনের মত।
পানির গর্জন, কোন সন্দেহ নেই। দূরে রয়েছে এখনও।
তবে কি পাতালনদীতে পড়তে হবে, শেষ অবধি? বিপদের যোলোকলা পূর্ণ না করে ছাড়বে না দেখা যাচ্ছে পাহাড়ী নদী!
হঠাৎ মোড় নিল সুড়ঙ্গ। খ্যাঁচ করে দেয়ালে ঘষা লাগল নৌকার ধার। ধাক্কা। দিয়ে ঠেলে সরাতে গিয়ে কিশোরের হাত পড়ল নরম কিছুর ওপর। ফুরফুর করে উড়ে পালাল ওগুলো। ছোট আকারের বাদুড়।
ক্যানূটাকে ফুটিয়ে নিয়ে চলেছে স্রোত।
দূরে আবছা আলো চোখে পড়ল। মাথার ওপর আর আশপাশে উড়ন্ত বাদুড়গুলোর আকৃতি বোঝা যাচ্ছে এখন। যতই এগোচ্ছে নৌকা, আলো বাড়ছে, সেই সঙ্গে বাড়ছে পানির গর্জন।
বেরোতে পারব মনে হচ্ছে, আশা হলো রবিনের। সামনে যা-ই থাক, পেছনের ওই মৃত্যুফাঁদ থেকে ভাল, ভাবল সে।
মাথার ওপরে ফাটল শুরু হয়েছে, চোখে পড়ছে আকাশ। ওদের মনে হলো, কতযুগ পরে যেন আবার দেখা পেল ওই নীল আকাশের।

আরেকটা তীক্ষ্ণ মোড়। হুস করে হঠাৎ খোলা জায়গাটা বেরিয়ে এল নৌকা। চোখ ধাধিয়ে দিল তীব্র আলো। খোলা মুখে আদর করে চাপড় মারল যেন ভেজা বিশুদ্ধ বাতাস। বড় বড় এলোমেলো ঢেউ একে অন্যের সঙ্গে বাড়ি খেয়ে ইলশেগুড়ির মত মিহি পানির কণা ছিটিয়ে ভিজিয়ে দিচ্ছে গা।
সামনে মুখ বাড়াল মুসা। যাচ্ছি কোথায়?
নদীটা যেন হঠাৎ শেষ হয়ে গেছে সামনে। খেপা ঘোড়ার মত সেদিকে ছুটে চলেছে ক্যানূ। আর বড় জোর বারো-চোদ্দ গজ। তীরের দিকে নৌকা যোরানোর উপায় নেই।
জলপ্রপাত! চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। পানির গর্জনে ঢাকা পড়ে গেল চিৎকার।
রবিন আর মুসাও অনুমান করতে পেরেছে। জোরে জোরে উল্টো দিকে দাঁড় বাইছে ওরা, নৌকাটাকে টেনে সরিয়ে রাখতে চাইছে।
চট করে একবার বাবার দিকে তাকাল মুসা। চোখ বন্ধ করে পড়ে আছেন, চেতনা নেই যেন।
শূন্যে উঠে গেল নৌকা। ধড়াস করে আছড়ে পড়ল আবার পানিতে। মাত্র দশ গজ নিচে পড়ল। তাতে সময় আর কতটা লাগে? কিন্তু গোয়েন্দাদের মনে। হলো, অনন্তকাল ধরে শূন্যে ভেসে থাকার পর যেন পড়ল। তবে মালপত্র বোঝাই ভারি একটা ক্যানূর জন্যে ওইটুকু উচ্চতাও অনেক।
ওদের প্রার্থনায় সাড়া দিয়েই যেন তলিয়ে যেতে যেতেও সোজা হয়ে গেল। নৌকা। হাঁপ ছাড়ল তিন গোয়েন্দা, ঢিল দিল, এবং ভুলটা করল। পাশ থেকে সজোরে এসে ধাক্কা মারল বিশাল ঢেউ, চোখের পলকে কাত করে দিল নৌকা।
একই সঙ্গে কয়েকটা ঘটনা ঘটল। পানিতে পড়েই মাথা তুলল মুসা। ভেসে যাচ্ছেন তার বাবা। পানির মধ্যে ডিগবাজি খেয়ে তার কাছে চলে এল মুসা, দুই বাহুর তলা দিয়ে হাত ঢুকিয়ে আঁকড়ে ধরল। ডুবন্ত মানুষকে কিভাবে উদ্ধার করতে হয় জানা আছে তার, স্কাউটিঙে ট্রেনিং আছে। সাঁতরে চলল তীরের দিকে।
কিশোর আর রবিন নৌকার দুই ধার দুদিক থেকে আঁকড়ে ধরেছে। বেশির ভাগ মালপত্রই বাধা রয়েছে নৌকার সঙ্গে, ভেসে গেল না। ঠেলাঠেলি করে সোজা করার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না, কাত হয়েই থাকল ক্যানূ। সোজা করার চেষ্টা বাদ দিয়ে শেষে ওটাকে ঠেলে নিয়ে চলল ওরা।
নৌকা নিয়ে তীরে পৌঁছে দেখল, বালিতে চিত হয়ে আছে বাপ-বেটা, যেন দুটো লাশ। হাপরের মত ওঠা-নামা করছে মুসার বুক। আস্তে আস্তে মাথা নাড়ছেন। মিস্টার আমান, চোখ আধখোলা।ধাক্কার চোটে ঘুম ভেঙেছে, কিংবা হুশ ফিরেছে।

টেনে নৌকাটা শুকনোয় তুলল তিন কিশোর। জিনিসপত্র সব খুলে ছড়িয়ে দিল। রোদে শুকাতে। তারপর নাকুর কথা মনে পড়ল ওদের।
যার জন্যে এত কাণ্ড, সে-ই গেল হারিয়ে। মন খারাপ হয়ে গেল ছেলেদের।
কিন্তু মন খারাপ করেছে অযথাই। পাওয়া গেল ওকে। বড় একটা পাথরের চাঙড়ের ওপাশে খুদে একটা ডোবায় পড়ে আছে নাকু। ডুবছে-ভাসছে, নাক দিয়ে পানি ছিটাচ্ছে। আছে মহাআনন্দে। এই মুহূর্তে তাকে দেখলে মনেই হবে না সে ডাঙার জীব।
ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ছোটবড় নানারকম পাথর। ওসবের মাঝে পরিষ্কার। পানিতে গোটা দুই ক্যানূর ধবংসাবশেষ দেখা গেল। নৌকা দুটোয় করে কারা এসেছিল–ইনডিয়ান নাকি শ্বেতাঙ্গ ভ্রমণকারী, বেঁচে ফিরে গেছে, না মারা গেছে, জানা যাবে না কোনদিন।
নাকুকে নিয়ে ফিরে এল ওরা।
সাড়া পেয়ে চোখ মেললেন মিস্টার আমান। থ্যাংক ইউ বয়েজ।
মেহমান এল সে-রাতে। অভিযাত্রীরা আশা করেছিল জিভারোরা আসবে, কিন্তু এল। অন্য অতিথি। নরমুণ্ড শিকারীদের চেয়ে এরা কম ভয়ঙ্কর নয়।
শুরুতেই এল সৈনিক পিঁপড়ের খুদে একটা দল। মার্চ করে এগোতে গিয়ে থমকে গেল, মুখ ঘুরিয়ে রওনা হলো মুসার দিকে। কোন কোনও মানুষের দেহে এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থের পরিমাণ বেশি থাকে, কীটপতঙ্গকে আকৃষ্ট করে তার গন্ধ। মুসার গায়েও এই জিনিস বেশি।
মাটিতে আর শোয়া গেল না, বাধ্য হয়েই চরার কাছ থেকে ভেতরের দিকে সরে যেতে হলো সবাইকে। গাছে হ্যামক টাঙিয়ে শোয়ার জন্যে।
হ্যামকে শোয়ার পর বড় জোর ঘণ্টাখানেক ঘুম, তারপরই আবার জেগে যেতে হলো। ডান পায়ের আঙুলের মাথায় খুব হালকা চিনচিনে ব্যথা অনুভব করল। মুসা। তাতেই ঘুমটা ভাঙল তার। ছুঁয়ে দেখল আঠা আঠা লাগে।
টর্চ জ্বেলে দেখল, তুরপুন দিয়ে যেন নিখুঁতভাবে করা হয়েছে ছোট্ট একটা ছিদ্র। সেখানে থেকে রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে।
খাইছে! চেঁচিয়ে উঠল মুসা, জ্যান্তই খেয়ে ফেলবে নাকি!
দুঃস্বপ্নে মানুষখেকো জংলীরা তাড়া করছিল কিশোরকে, হঠাৎ মিলিয়ে গেল। সব। জেগে উঠে দেখল, ঘামে জবজবে শরীর। তাতে কোন দুঃখ নেই তার, জংলীদের কবল থেকে যে বেঁচেছে এতেই খুশি।
মুসার ক্ষতটা দেখে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল রবিন, হু, কাঁটা ফুটেছিল।
গম্ভীর হয়ে গেছে কিশোর, কাঁটা কই এখানে?

হ্যামক থেকে দুর্বল কণ্ঠে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার আমীন, এই, শুনতে পাচ্ছ তোমরা?
অসংখ্য, অগুনতি ডানার মৃদু শব্দ শোনা যাচ্ছে।
অন্ধকার সুড়ঙ্গের বাদুড়গুলোর কথা মনে পড়ে গেল কিশোরের। মুসার ক্ষতটার দিকে তাকিয়ে থেকে শঙ্কিত ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে আপনমনেই বলল, বাদুড়, না তো!
তাতে কি? রুমাল দিয়ে রক্ত মুছছে মুসা। বাদুড়ে কামড়ালে আর কি হয়?
তাতে? নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর। সাধারণ বাদুড় যদি না হয়? যদি ভ্যাম্পায়ার হয়?
এইবার ভয় পেল মুসা। শিউরে উঠল ভূতের ভয়ে। সাংঘাতিক রক্তচোষা ভ্যাম্পায়ার পিশাচ ড্রাকুলার গল্প সে পড়েছে। রুমালটা পুটুলি বানিয়ে শক্ত করে। ঠেসে ধরল ক্ষতস্থানে। ককিয়ে উঠল, রক্ত বন্ধ হচ্ছে নাতো!
রবিন, আয়োডিনের বোতল বের করতে পারবে? মুসার হাত থেকে রুমাল নিতে নিতে অনুরোধ করল কিশোর।
রুমাল দিয়ে ক্ষতের নিচে আঙুলটা শক্ত করে পেচিয়ে বাধল সে। ঘষে ঘষে আয়োডিন লাগাল।
আবার শুয়ে পড়ল সবাই।
দশ মিনিটও গেল না, চেঁচিয়ে উঠল মুসা। আল্লাহরে, আজ শেষ করে ফেলবে আমাকে।
কম্বল মুড়ি দিয়েই শুয়েছিল মুসা। ঘুমের মধ্যে সরে গেছে কম্বল। নিতম্বের কাছে খানিকটা জায়গার প্যান্ট ছেঁড়া। তুরপুন ফুটিয়ে দেয়া হয়েছে সেখানেই।
রক্ত বন্ধ করে আবার আয়োডিন লাগিয়ে দিল সেখানে কিশোর।
ডবল ভাঁজ করে কম্বল মুড়ি দিল এবার মুসা।
তার সঙ্গে আর সুবিধে করতে না পেরে অন্যদের দিকে নজর দিল তুরপুনধারীরা। থাবা দিয়ে ধরার চেষ্টা করলেন মিস্টার আমান। একটাকেও ধরতে পারলেন না। সব পালাল।
ছোট একটা হাতে বোনা জাল বের করল কিশোর। জাল দিয়ে ধরব।
টোপ হচ্ছে কে? ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল মুসা।
তুমি, কিশোর হাসল।
আমি বাপু এসবে নেই। পারলে তুমি হওগে, তাড়াতাড়ি আবার কম্বলে মুখ ঢাকল সে।
নিজেই টোপ হলো কিশোর। অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল রক্তচোষা বাদুড়ের কথা।

নানারকম কথা প্রচলিত আছে রহস্যময় এই প্রাণীটাকে নিয়ে। শোনা যায়, অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ভ্যাম্পায়ার। পাখার বাতাসে জাদু করে ঘুম পাড়ায়। শিকারকে। তারপর রক্ত চুষে খেয়ে পালায়।
গল্পটা সত্য কিনা; যাচাই করে দেখার ইচ্ছে কিশোরের। প্রমাণ ছাড়া, যুক্তি ছাড়া কোন কথা মানতে রাজি নয় সে। হাত লম্বা করে ফেলে চুপচাপ পড়ে রয়েছে।
অনেকক্ষণ কিছুই ঘটল না।
তারপর ডানা ঝাপটানোর খুব মৃদু শব্দ কানে এল। কাছে আসছে। হালকা কিছু বুকে এসে নামল বলে মনে হলো কিশোরের। জেগে থেকেই অনুভব করতে পারছে না ঠিকমত, ঘুমের মধ্যে হলে টেরই পেত না।
আর কোন রকম নড়াচড়া নেই।
এসেই যদি থাকে, কিছু করছে না কেন ওটা? নাকি সব তার কল্পনা? কিছুই নামেনি?
কব্জির সামান্য নিচে মৃদু বাতাস লাগল জোরে নিঃশ্বাস ফেলল যেন ওখানে কেউ। ডানার বাতাস? নিশ্চিত হতে পারছে না কিশোর। মুখ ফিরিয়ে দেখতেও পারছে না, নড়লেই যদি উড়ে যায়।
কনুইয়ের দিকে সরে আসছে বাতাসটা। ফুঁ দেয়া হচ্ছে যেন ওখানটায়। বাতাসও হতে পারে।
আরও কিছুক্ষণ কাটল। কনুইয়ের উল্টোদিকে সামান্য একটু জায়গায় ঝিমঝিম শুরু হয়েছে, অসাড় হয়ে আসছে। মনে মনে চমকে গেল কিশোর। ভ্যাম্পায়ার। সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানতে পারেনি বিজ্ঞানীরা। তবে যেটুকু জেনেছেন, তাজ্জব। করে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট। কেউ কেউ বলেন, শিকারের গায়ে এত সাবধানে ছিদ্র করে এই বাদুড়, যে শিকার সেটা টেরই পায় না। আসল ব্যাপারটা তা নয়। যেখানে ছিদ্র করে, তার চারপাশে আগেই লালা লাগিয়ে দেয় ওরা, ফলে সাময়িক ভাবে অবশ হয়ে যায় জায়গাটা। ছিদ্র করার ব্যথা টের পায় না তখন শিকার।
কিশোর কল্পনা করল, ছিদ্র হয়ে গেছে। রক্ত চোয়াতে শুরু করেছে। কিন্তু তবু নড়ল না।
একটু পরেই বুঝতে পারল, কল্পনা নয়, সত্যি। যেটুকু জায়গা অবশ হয়েছে, রক্ত গড়িয়ে তার বাইরে চলে আসতেই টের পাওয়া গেল। তার মানে রক্ত খাওয়া শুরু করেছে বাদুড়টা।
প্রথমবারেই অনেক জ্ঞান হয়েছে, অনেক কিছু জেনেছে। আর বেশি জানার চেষ্টা করল না। রক্ত খেয়ে পেট ভরে গেলে উড়ে যাবে বাদুড়, তার আগেই ধরতে হবে।

মনের আর বাঁ হাতের সমস্ত জোর এক করে জালটা ঘুরিয়ে এনে ফেলল সে। ডান হাতের ওপর। এমন ভাবে চেপে ধরল, যাতে কোন ফাঁক না থাকে, বেরিয়ে যেতে না পারে শিকার। খুব সাবধানে আস্তে করে ডান হাতটা সরিয়ে আনল জালের তলা দিয়ে। তারপর জালের মুখের দড়ি টেনে ফাঁস আটকে বন্ধ করে দিল থলের মুখ বন্ধ করার মত করে।

টর্চ জ্বালল।

না, কল্পনা নয়, ঠিকই। হাতের ইঞ্চি দুয়েক জায়গা জুড়ে রক্ত। থাকুক, কিছু হবে না। পরে মুছে নিলেই চলবে। জালের ভেতরে কি আছে দেখল।

ছটফট করছে কুৎসিত চেহারার একটা প্রাণী।

ধরেছি! ধরেছি! চেঁচিয়ে উঠল কিশোর।

লাফ দিয়ে হ্যামক থেকে নেমে এল রবিন আর মুসা।

আরে, এ যে দেখছি একেবারে সেই লোকটার চেহারা। ওই ব্যাটাই ভূত হয়ে এল না তো! বলে উঠল মুসা।

কার কথা বলছ? জিজ্ঞেস করল কিশোর।

রাতে কুইটোতে যে লোকটা আমাদের পিছু নিয়েছিল।

ভুল বলেনি মুসা, লোকটার সঙ্গে এই জীবটার চেহারার অনেক মিল।

ভ্যাম্পায়ারকে নিয়ে অনেক রোমাঞ্চকর গল্প, পিশাচকাহিনী লেখা হয়েছে। খুব জনপ্রিয় হয়েছে সেগুলো। বাদুড়টাকে দেখে সে-সব মনে পড়ছে কিশোরের। সবচেয়ে সাড়া জাগানো ভ্যাম্পায়ারের গল্প ড্রাকুলা। জীবটার চেহারা দেখে মনে হয় না, গল্পগুলোতে বাড়িয়ে বলা হয়েছে কিছু। অন্ধকারের জীব, যেন অন্ধকারে মিশিয়ে রাখার জন্যেই কালো রোমশ চামড়া দিয়েছে ওকে প্রকৃতি। লাল লাল চোখ, ছবিতে দেখা শয়তানের চোখের কথা মনে করিয়ে দেয়। ভোতা নাক, খাড়া চোখা কান, চূড়ার কাছে কয়েকটা লম্বা রোম। নিচের চোয়াল ঠেলে বেরিয়ে আছে। সামনের দিকে, কুৎসিত, ভীষণ কুৎসিত।

এই, আনো তো দেখি, ডাকলেন মিস্টার আমান। দেখেটেখে বললেন, হু, শয়তান আর বুলডগের মাঝামাঝি চেহারা।

হঠাৎ বিকট ভঙ্গিতে হাঁ করে তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠল জীবটা। বেরিয়ে পড়ল। লম্বা চোখা জিভ, টকটকে লাল, তাতে রক্ত লেগে রয়েছে। দাঁত মাত্র কয়েকটা, ছোট ছোট কিন্তু ধারাল। ওপরের পাটিতে দুই দিকে দুটো শ্বদন্ত-সরু, চোখা, একেবারে যেন ড্রাকুলা ছবিতে দেখা ড্রাকুলার দাঁত, যেগুলো দিয়ে মানুষের গলা ফুটো করে রক্ত খায় ভূতটা।

বাদুড়টার মুখে রক্তের পাশাপাশি চটচটে পিচ্ছিল এক ধরনের পদার্থ লেগে রয়েছে। নিশ্চয় তার দেহ-কারখানায় তৈরি কোন সাংঘাতিক ক্রিয়াশীল

অবশকারী পদার্থ মিশে আছে ওই লালায়। যা লাগলে দেহ তো অবশ হয়ই, রক্তও বেরিয়ে জমাট বাঁধতে পারে না।
হাতের দিকে তাকাল আবার কিশোর। জমাট বাঁধছে না রক্ত। টুইয়ে চুঁইয়ে ফোঁটা ফোঁটা এখনও বেরোচ্ছে।
খুব খারাপ এটা, বিশেষ করে ছোট ছোট প্রাণীর জন্যে। ভ্যাম্পায়ারের কামড়ে। মরে না প্রাণীগুলো। বাদুড় রক্তও খায় খুব সামান্য, ওটুকু রক্ত শরীর থেকে গেলে। কিছুই হওয়ার কথা নয়। মরে অন্য কারণে। রক্ত জমাট বাঁধতে পারে না, ক্ষত দিয়ে অনবরত বেরোতে থাকে বলে। রক্তক্ষরণে মারা যায় তার শিকার।
জোরে ডানা ঝাপটে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল বাদুড়টা। কিন্তু শক্ত জাল। একটা সুতোও ছিঁড়তে পারল না, পারবেও না।
ফলখেকো বিশাল বাদুড়ের তুলনায় এটা অনেক ছোট। ওগুলোর ডানা ছড়ালে হয় তিন ফুট, এটা বারো ইঞ্চি হবে কিনা সন্দেহ। আর শরীরটা এত্তটুকুন, এই ইঞ্চি চারেক। শয়তানীর বেলায়ও এর সঙ্গে ফলখেকো বাদুড়ের কোন তুলনা হয় না।
নিয়ে যেতে পারলে পুরো পাঁচ হাজার ডলার, হাতের পাঁচ আঙুল দেখাল। কিশোর। যে কোন চিড়িয়াখানাই দেবে। কিন্তু বাঁচিয়ে নিয়ে যাওয়াটাই হবে মুশকিল।
হ্যাঁ, মুশকিলটা হবে খাওয়া নিয়ে, বলল রবিন। খাওয়াবে কি?
হেসে মুসার দিকে তাকাল কিশোর।
দুই হাত নাড়তে নাড়তে পিছিয়ে গেল মুসা, খবরদার, আমার দিকে চেয়ে! আমি রক্ত দিতে পারব না।
হেসে ফেলল সবাই।
সে পরে দেখা যাবে। জালটা মুসার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল কিশোর, ধরো এটা। রক্ত বন্ধ করি আগে। থামে তো না আর। রবিন, আয়োডিন...
বোতল আনার জন্যে রওনা হয়ে গেল রবিন।
ভ্যাম্পায়ার তো ধরা পড়ল, সমস্যা হলো খাওয়াবে কি সেটা নিয়ে।
মিস্টার আমান পরামর্শ দিলেন, উষ্ণ রক্তের কোন প্রাণী শিকার করে আনার জন্যে।
সকালে নাস্তা সেরে শিকারে চলল তাই কিশোর আর মুসা। মিস্টার আমান। দূর্বল, হ্যামকে শুয়ে রইলেন। ক্যাম্প পাহারায় রইল রবিন।
কিশোর শটগান নিয়েছে।
মুসা নিয়েছে তার বাবার পয়েন্ট টু-টু মসবার্গ রাইফেল। টেলিস্কোপ। লাগানো। পনেরো গুলির ম্যাগাজিন। হাইস্পিড লং-রেঞ্জ রাইফেল বুলেট ভরা আছে তাতে।

হালকা, কিন্তু বেশ শক্তিশালী অস্ত্র। এটা দিয়ে কলোরাডোতে পুমার মত জানোয়ার মেরেছেন মিস্টার আমান।
পুমা যখন মরেছে, মুসার আশা টিগ্রেও মরবে।
আধ ঘণ্টা ঘোরাঘুরির পর পছন্দসই একটা জানোয়ারের দেখা পাওয়া গেল। কিশোর জানাল, ওটা ইঁদুর-গোষ্ঠীর সবচেয়ে বড় প্রাণী ক্যাপিবারা। বড়গুলো। আকারে ভেড়ার সমান হয়। তবে এটা অনেক ছোট, বোধহয় বাচ্চা।
একটা ঝোপে লুকিয়ে নিশানা করল মুসা। টিপে দিল ট্রিগার।
বাজ পড়ল যেন। রাইফেলের আওয়াজ সামান্যই, এত জোরে হয় না। তাহলে কে করল ওই শব্দ? মুসার ধারণা হলো ক্যাপিবারাটাই গর্জন করেছে। লুটিয়ে পড়ল ওটা।
দু-জনকেই চমকে দিয়ে ঝড় উঠল যেন ক্যাপিবারার পেছনের একটা ঝোপে। লাফিয়ে বেরিয়ে এল একটা হলদে জানোয়ার, গায়ে কালো কালো গোল ছাপ। টিগ্রে! ওটাই গর্জন করেছে। ঝোঁপের আড়ালে থেকে নিশানা করছিল। ক্যাপিবারাটাকে। গোলমাল হয়ে গেছে দেখে গর্জন করে বেরিয়ে এক লাফে গিয়ে ঢুকল আরেকটা ঝোপে।
আরিব্বাবা, কতবড় দানব! ক্ষিপ্রতা কি! শক্তিও নিশ্চয় তেমনি। পয়েন্ট টু-টু দিয়ে টিগ্রে মারার চিন্তা বাদ দিল মুসা। ক্যাপিবারাটাকে মারার আগে যে জাগুয়ারটাকে দেখেনি, গুলি করে বিপদে পড়েনি সে জন্যে বার বার ধন্যবাদ দিল। ভাগ্যকে। এই খেলনা দিয়ে ওই দানব ঠেকাতে পারত না।
টিগ্রে চলে যাওয়ার পরও অনেকক্ষণ নড়ল না দুজনে। তারপর কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে সাবধানে বেরোল। পা টিপে টিপে চলল শিকারের দিকে।
ঘাসের ওপর পড়ে রয়েছে ক্যাপিবারা। অনড়।
এদিক ওদিক চেয়ে জানোয়ারটাকে তুলল মুসা। শটগানে এল জি ভরে পাহারা দিচ্ছে কিশোর।
ক্যাপিবারা নিয়ে দু-জনে দিল ছুট। এক দৌড়ে চলে এল ক্যাম্পে।
তারের জাল, খুব সরু লোহার শিক, আর খাঁচা বানানোর অন্যান্য যন্ত্রপাতি নিয়ে আসা হয়েছে। ইতিমধ্যে একটা খচা প্রায় বানিয়ে ফেলেছে রবিন।
মুসা আর কিশোরও হাত লাগাল।
খাঁচা তৈরি করে তার ভেতরে ভ্যাম্পায়ারকে রাখা হলো।
এর একটা নাম রাখা দরকার, প্রস্তাব দিল রবিন।
ইবলিস, বলে উঠল মুসা।
শুনতে ভাল্লাগে না, কিশোর বলল।
তাহলে কি? ভুরু নাচাল রবিন।

রক্তচোষা?
হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব ভাল। ইংরেজি ব্লড সাকারের চেয়ে ভাল।
ক্যাপিবারাটাকে ভরে দেয়া হলো রক্তচোষার খাঁচায়। ঘিরে এল তিন। গোয়েন্দা। কৌতূহলী চোখে দেখছে।
নড়লও, না রক্তচোষা। খাঁচার কোণে উল্টো হয়ে চুপচাপ ঝুলে রইল।
নিচের ঠোঁটে বার দুই চিমটি কাটল কিশোর। বড় বেশি আলো খাঁচার ভেতর। একটা কম্বল দিয়ে ওপরটা ঢেকে দিল সে। ছায়া তৈরি করল ভেতরে।
আগের মতই ঝুলে রইল রক্তচোষা। তারপর নড়তে শুরু করল। খাঁচার জালে নখ আটকে ঝুলে ঝুলে এগোল। খুব সতর্ক। ক্যাপিবারাটার ওপরে এসে ঝুলে রইল এক মুহূর্ত। তারপর আলগোছে ছেড়ে দিল নখ। হালকা পালকের মত পড়ল ওটার ওপর। গুলির ক্ষতের কাছে রক্ত জমে আছে। আস্তে করে ওটার কাছে গিয়ে অনেকটা মাকড়সার মত জাপটে ধরল চামড়া, চেটে চেটে খেতে শুরু করল রক্ত।
হাসি ফুটল কিশোরের মুখে। ব্যাপারটা তাহলে সত্যি। বেশির ভাগ লোকের ধারণা, ভ্যাম্পায়ার চুষে রক্ত খায়। কেউ কেউ অন্য কথা বলে, চেটে খায়। তাই তো করছে দেখা যাচ্ছে। কুৎসিত মুখ থেকে ফুলিঙ্গের মত ছিটকে বেরোচ্ছে যেন। নীলচে-লাল জীবটা। ঢুকছে-বেরোচ্ছে, ঢুকছে-বেরোচ্ছে, সেকেণ্ডে চারবারের কম না, অনুমান করল কিশোর। বেড়াল আর কুকুর যেমন করে তরল খাবার খায়। তেমনি করে খাচ্ছে ওটা, তবে অনেক দ্রুত।
ওর নাম রক্তচাটা হওয়া উচিত, বলল সে।
অন্য দুজনের আপত্তি নেই।
মালপত্র গুছিয়ে আবার ক্যানু ভাসাল ওরা।
সেদিন আরেকটা জীব ধরা পড়ল।
দুপুরে খাওয়ার জন্যে নৌকা থামিয়ে নেমেছিল ওরা।
মুসা দেখল জীবটাকে। মাথার ওপর গাছে বসে চেয়ে রয়েছে ওদের দিকে খুদে, লেজ বাদ দিলে ইঞ্চি তিনেক হবে। কয়েক আউন্স ওজন। নরম, সোনালি রোমে ঢাকা শরীর, চোখের চারপাশ আর মুখটা বাদে। সেখানটা সাদা, যেন চুরি করে টিন থেকে ময়দা, খেতে গিয়ে ময়দা লাগিয়েছে।
ইশারায় কিশোর আর রবিনকে দেখাল সে। বাবাকেও দেখাল।
পিগমি মারমোসেট, ফিসফিসিয়ে বললেন মিস্টার আমান। ধরতে পারো। কিনা দেখো। ভাল টাকা পাওয়া যাবে।
বসেই আছে জীবটা। বাতাসে ডাল দুলছে, আঁকড়ে ধরে ওটাও দুলছে ধীরে ধীরে।
ব্যাগ খুলে ডার্টগান বের করল কিশোর। ডার্ট ভরল।

আগের জায়গাতেই রয়েছে মারমোসেট। অন্যান্য বানরের মতই কৌতূহলী, মানুষের কাজকর্ম দেখছে। তবে আর সব জাতভাইয়ের মত বানর নয়, দুষ্টুমি নেই, লাফালাফি নেই, শান্ত-সুবোধ-লক্ষ্মী ছেলে।
নাও, মারো, ডার্টগানটা মুসার দিকে বাড়িয়ে দিল কিশোর। গোয়েন্দা সহকারীর নিশানার ওপর এখন অগাধ আস্থা তার।
তুমিই মারো, মুসা বলল।
অনেকক্ষণ লাগিয়ে ভালমত সই করল কিশোর। ট্রিগার টিপল। ভেবেছিল লাগবে না। কিন্তু লাগল।
পাখির মত কিচির মিচির করে উঠল বানরটা। সুচের মত জিনিসটা ধরে টানাটানি শুরু করল। মুখে বিরক্তি। যেন বলছে, আহ, কি জ্বালাতন! মানুষের। জালায় একটু শান্তিতে বসার জো নেই।
ক্রিয়া শুরু করেছে ঘুমের ওষুধ। টলে উঠল বানরটা। মাথা উল্টে দিল, ডাল থেকে ছুটে গেল আঙুল, খসে পড়তে শুরু করল। পেছনে সোজা হয়ে রইল লেজটা।
এতই হালকা, প্রায় নিঃশব্দে ঘাসের ওপর পড়ল জীবটা। দৌড়ে গিয়ে তুলে নিল মুসা।
ঘুম ভাঙতে বেশি সময় নিল না। চোখ মেলল মারমোসেট। চোখের ঘোলাটে তারা ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হলো। লেজের সোনালি রোম ফুলে উঠল কাঠবেড়ালীর লেজের মত। কিচমিচ শুরু করল। বিচিত্র ভঙ্গিতে মুখের ভেতর থেকে বেরোচ্ছে। অদ্ভুত সাদা জিভ। গাল দিচ্ছে যেন মানুষের বাচ্চা মানুষ, জীবনে আর বানর হবি না তোরা। একেবারে বখে গেছিস।
হেসে আদর করে ওটার মাথায় হাত বোলাল কিশোর, কেমন লাগছে, ময়দাখেকো?
ব্যস, নাম একটা হয়ে গেল মারসোসেটেরও।
ওই খেকো-টেকো বাদ দাও, প্রতিবাদ করল মুসা। খালি ময়দা।
মুচকি হাসল কিশোর। ঠিক আছে, তাই সই।
রবিন কিছু বলল না। জানে, বলে লাভ নেই। একবার মুসা বলে যখন ফেলেছে, আর পাল্টাবে না। নাম রাখার ব্যাপারে মুসার কিছু জেদ আছে। ভুল করে পুরুষ ভেবে একবার একটা কবুতরের নাম রেখে ফেলেছিল টম। যখন জানা গেল ওটা মেয়ে, তারপরও ওটার নাম টমই রইল, কিছুতেই পাল্টাতে রাজি হলো না সে।
পৃথিবীর সবচেয়ে খুদে বানর, বিড়বিড় করল রবিন। হ্যাপেইল পিগমেইয়াস।
কি বললে? ভুরু কুঁচকে তাকাল মুসা।
ওটার ল্যাটিন নাম। বৈজ্ঞানিক…

চুলোয় যাক ল্যাটিন। বাংলা অনেক সোজা, ময়দা। ওই হ্যাপেল-ফ্যাপেল মুখে আসবে না আমার।
আবার ভাসল ক্যানূ।
গুণ আর রূপ দিয়ে দেখতে দেখতে সবাইকে আপন করে নিল ময়দা। পাখির মত কিচমিচ করে বড় বড় লাফ মারে। একবার এর ওপর গিয়ে পড়ে, একবার ওর ওপর। কিন্তু এত হালকা সে, কারও কোন অসুবিধে হয় না।
ওর সবচেয়ে আনন্দ, কিকামুর সঙ্গে খেলা করা। ভিজে যাওয়ার পর নষ্ট হওয়ার ভয়ে বস্তা থেকে খুলে ফেলা হয়েছে ওকে। নৌকায় একটা খুটি বেধে তাতে ওর চুল বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। লম্বা কালো চুলে ঝুলে ঝুলে যেন বাতাস খায় মহাবীর। তার চুল নাড়াচাড়া করতে খুব ভালবাসে বানরটা।
নাকুর সঙ্গে ভাব হয়ে গেছে ময়দার। রক্তচাটাকে দু-চোখে দেখতে পারে না। খানিক পর পরই লাফ দিয়ে গিয়ে তার খাঁচার ওপর উঠে কয়েকটা করে গাল দিয়ে আসে।
দুধের অভাবে থাকতে থাকতে বিরক্ত হয়েই যেন ঘাস খাওয়া শুরু করেছে নাকু। তার খাবার নিয়ে আর দুশ্চিন্তা নেই কারও।
বিকেলের দিকে রোদ যেন আগুন হয়ে উঠল। আর নৌকায় থাকতে পারল না নাকু। লাফিয়ে পড়ল পানিতে। কেউ কিছু বলল না। নৌকায় বাধা রয়েছে তার। গলার লম্বা দড়ি। ক্যানূর পাশে-পাশে সাঁতরে চলল।
গম্ভীর হয়ে ব্যাপারটা দেখল কিছুক্ষণ ময়দা। তারও গরম লাগছে কিনা যেন বোঝার চেষ্টা করল। তারপর দিল লাফ। পানিতে পড়েই বুঝল, মহাভুল হয়ে গেছে। এই জায়গা তার জন্যে নয়। তাড়াহুড়ো করে গিয়ে উঠল নাকুর নাকে, তারপর পিঠে, সেখান থেকে লাফ দিয়ে এসে একেবারে মুসার কোলে।
গা ঝাড়া দিয়ে রোম থেকে পানি ঝাড়ল ময়দা। ঠাণ্ডা কমছে না দেখে হামাগুড়ি। দিয়ে ঢুকে গেল মুসার শার্টের ভেতরে। গায়ে গা ঠেকিয়ে রইল, উষ্ণতা খুঁজছে।
এই দুটো ছেলে পেলে, নৌকার তলায় শুয়ে থেকে হাসিমুখে বললেন মিস্টার আমান।
দুটো না, তিনটে, শুধরে দিল রবিন। বাদুড়টা বাদ কেন?
দূর! মুখ বাকাল মুসা, ওই ইবলিসের বাপ হতে যায় কে?
হেসে ফেলল সবাই।

.

আমাজন! আমাজন! চেঁচিয়ে উঠল রবিন।
অনেক বড় একটা মোড় ঘুরেই বিশাল জলরাশিতে ঝাঁপ দিল ক্যানূ। মোহনায় পৌঁছে গেছে। পাক খেয়ে খেয়ে বইছে বাদামী স্রোত। কোথাও ঢেউ উটের পিঠের

মত কুঁজো, কোথাও ফুলে ফুলে উঠছে সিংহের কেশরের মত। দেখেই অনুমান করা যায় স্রোতের প্রচণ্ডতা।
ম্যাপে আঁকা রহস্যময় বিন্দু রেখা ধরে পাঁচ দিন চলেছে ওরা। নতুন একটা ম্যাপ যখন তৈরি হবে, ওই বিন্দুগুলো আর থাকবে না, পুরোপুরি রেখা হয়ে যাবে। মাঝখানে কিছু সময় বাদে, ম্যাপ আঁকা চালিয়ে গেছে কিশোর। যাতে নষ্ট না হয়, সেজন্যে কাগজটা যত্ন করে একটা ওয়াটারপ্রুফ বোতলে ঢুকিয়ে সেটা আবার ঢুকিয়েছে ওষুধের বাক্সে।
আমাজন, পৃথিবীর বৃহত্তম নদী।
মিস্টার আমান উত্তেজিত, ছেলেরা উত্তেজিত। ক্যানূর অন্য আরোহীদের মাঝেও উত্তেজনা দেখা যাচ্ছে-নদী দেখে নয় হয়তো, নৌকা বড় বেশি দোল খাচ্ছে বলেই। তাপিরের বাচ্চা গোঁ গোঁ করল, মারমোসেট কিচমিচ করল, এমন কি তন্দ্রালু ভ্যাম্পায়ারও কর্কশ চিৎকার করে উঠল খাঁচার অন্ধকার কোণ থেকে। একমাত্র কিকামু নির্বিকার। আধবোজা চোখ মেলল না। লম্বা চুলে ঝুলে থেকে ঢেউয়ের। তালে তালে খালি মাথা দোলাচ্ছে বিষণ্ন ভঙ্গিতে।
সত্যিই এটা আমাজন! বিশ্বাস করতে পারছে না মুসা।
হ্যাঁ-না দুটোই বলা যায়, মুখ খুলল কিশোর। তবে হ্যাঁ বলাই ঠিক। আমেরিকান জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটির ম্যাপ খুলে দেখো। দেখবে, এখান থেকে আটলান্টিক পর্যন্ত পুরোটার নামই আছে। যেমন এই অংশটার নাম ম্যারানন, ম্যারানন নদী এসে মিশেছে বলে। পরের অংশটার নাম সলিমোজ। আসলে, সবটাই আমাজন।
তা, ভেলাটা বানাচ্ছি কখন? জিজ্ঞেস করল রবিন।
সরু প্যাসটাজায় ইনডিয়ান ক্যানূ উপযুক্ত জিনিস, সন্দেহ নেই, কিন্তু এই বিশাল পানিতে ওটা মোটেই নিরাপদ নয়। তাছাড়া ছোট্ট ক্যানূতে জানোয়ার। রাখার অসুবিধে, জায়গাই নেই। দরকার, বড়সড় একটা ভেলা।
ভেলার নামও বাছাই করে ফেলেছে রবিন : নূহ নবীর বজরা। আল্লাহর আদেশে মস্ত এক বজরা বানিয়ে নাকি তাতে সব রকমের প্রাণী তুলেছিলেন তিনি। ভেসে থেকেছিলেন ভয়াবহ বন্যায়।
আলাপ-আলোচনার পর নাম ঠিক হলো শুধু বজরা।
যত তাড়াতাড়ি পারো, বানিয়ে ফেলো, দুর্বল কণ্ঠে বললেন মিস্টার আমান। ক্যানূতে থাকা আর ঠিক না।
মাইলখানেক দূরে নদীর অপর পাড় থেকে বয়ে আসছে বিশুদ্ধ হাওয়া। এক পাড় থেকে আরেক পাড়ের দূরত্ব এত বেশি, স্রোত না থাকলে নদীটাকে হদ বলেই মনে হত। এপাড়ে গাছে গাছে যেন বুনোফুলের মেলা বসেছে। মাটির কাছাকাছি।

অগভীর পানিতে ডুবছে-ভাসছে অসংখ্য জলমুরগী। ক্যান্ ওগুলোর কাছাকাছি হলেই কক কক করে উড়ে যাচ্ছে ঝাঁক বেঁধে।
শটগানের দিকে হাত বাড়াল মুসা। কিন্তু বাধা দিলেন মিস্টার আমান। নৌকা। দুলছে। নিশানা ঠিক হবে না।
গাছে ফুল যেমন আছে, তেমনি রয়েছে পাখি। নানা জাতের, নানা রঙের, নানা রকম আজব তাদের ডাক। জায়গাটা পাখির স্বর্গ। তীরে পানির ধারে এক আজব পাখি দেখা গেল। এক জাতের সারস, নাম তার জ্যাবিরু স্টর্ক। প্রায় মানুষের সমান লম্বা। তীর ধরে হাঁটছে গভীর রাজকীয় চালে।
মোড় নিল ক্যানু। মস্ত এক বাক পেরিয়ে এল। তেরছা ভাবে ঝাঁপ দিয়ে এসে। পড়ল যেন ঢেউ, আরোহীদের ভিজিয়ে দিল। স্রোতও এলোমেলো। খানিক দূরে। সরু একটা খাল ঢুকে গেছে ডাঙার ভেতরে। শেষ মাথায় ছোট একটা প্রাকৃতিক পুকুর। খালে নৌকা ঢুকিয়ে দিল মুসা। চলে এল পুকুরের নিথর পানিতে।
এক চিলতে বেলাভূমি রয়েছে পুকুরের পাড়ে। ঝকঝকে মসৃণ বালি। ঘ্যাচ করে তাতে নৌকার আধখানা তুলে দিয়ে লাফিয়ে নামল তিন গোয়েন্দা। দানবীয় এক সিবা গাছের শেকড়ে বাধল দড়ি। এত বড় গাছ সচরাচর দেখা যায় না। প্রায়। এক একর জুড়ে রয়েছে। তলায় ছোট ঘাস ছাড়া আর কিছু জন্মানোর সাহস পায়নি। সুন্দর ছায়াঢাকা একটা পার্কের মত।
ক্যাম্প করার জন্যে তো বটেই, ভেলা বানানোর জন্যেও খুব চমৎকার জায়গা। মালমসলারও অভাব নেই। পুকুরের পাড়ে রয়েছে ঘন বাশবন, আছে লিয়ানা লতা।
ভেলা বানাতে দুই দিন লাগল। পাকা লম্বা বাশ কেটে শক্ত লতা দিয়ে বাঁধা। হলো। ওরকম কয়েকটা ভেলা নদীতে ভেসে যেতে দেখেছে গত দু-দিনে। ইনডিয়ানদের জলযান। আমাজনে এই ধরনের ভেলা বেশ চালু জিনিস।
সব ভেলায়ই তো ঘর দেখলাম, মুসা বলল। আমরাও একটা বানিয়ে নিই।
বাঁশ দিয়েই তৈরি হলো ঘরের খুঁটি, চালার কাঠামো। বেড়া হলো নল খাগড়ায়, তালপাতার ছাউনি। বাঁশের ভেলায় ভাসমান এক মজার কুটির।
বেশ বড় করে বানিয়েছে ভেলা। বড় জানোয়ার কিছুই ধরা হয়নি, জায়গার অভাব আর পরিবহনের অসুবিধের জন্যে, এবার ধরবে।
প্রথমেই ধরা পড়ল এক মস্ত ইগুয়ানা, ছয় ফুট লম্বা।
নিচু গাছের ডালে শুয়েছিল ওটা। একটা পাখিকে নিশানা করতে গিয়ে চোখে পড়ল মুসার। মাত্র বারো-তেরো ফুট দূরে।
তাজ্জব হয়ে গেল মুসা। সিনেমায় দেখা এক প্রাগৈতিহাসিক দানবের প্রতিমূর্তি যেন সবুজ শরীর, লেজে বাদামী ডোরা, পেচিয়ে রয়েছে। পিঠে কয়েক সারি।

কাটা, এদিক ওদিক মুখ করে আছে। থুতনির নিচেও এক গুচ্ছ কাটা।
ধীরে ধীরে পিছিয়ে এল মুসা, তারপর ক্যাম্পের দিকে দিল দৌড়।
কি ব্যাপার? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
বললে বিশ্বাস করবে না, ফিসফিসিয়ে বলল মুসা। ডাইনোসর। গাছের ডালে।
ডাইনোসর? ঠিক দেখেছ?
মাথা ঝাঁকাল মুসা।
চলো তো, দেখি, রবিন আর কিশোর দু-জনেই আগ্রহী হলো।
নিঃশব্দে এসে দাঁড়াল তিন গোয়েন্দা।
আগের জায়গায়ই রয়েছে জীবটা। টেরই পায়নি যেন। বোধহয় গভীর ঘুমে অচেতন।
ইগুয়ানা! কণ্ঠস্বর যতটা সম্ভব খাদে নামিয়ে বলল কিশোর। ধরতে পারলে কাজ হয়।
কিন্তু ধরি কি করে? রবিন বলল।
চলো, বাবাকে জিজ্ঞেস করি, মুসা বলল।
গলায় ফাঁস আটকাতে হবে, শুনে বললেন মিস্টার আমান।
ফাঁস? কাছে যেতে দেবে? গাল চুলকালো মুসা। তা হয়তো দেবে, তবে ফাঁস পরাতে দেবে না সহজে।
তাহলে? কিশোরের প্রশ্ন।
কাছে গিয়ে গান গাইতে হবে। আর পিঠ চুলকাতে হবে, নির্বিকার কণ্ঠে জবাব দিলেন মিস্টার আমান।
মারছে! আড়চোখে বাবার দিকে তাকাল মুসা। বিষের ক্রিয়া নয় তো? গোলমাল দেখা দিয়েছে মাথায়? গানের কি বুঝবে ওটা?
কি বুঝবে জানি না, তবে ইনডিয়ানরা ওভাবেই ধরে, বললেন মিস্টার। আমান।
ঠিক, মনে পড়ল রবিনের। আমিও শুনেছি... মানে, বইতে পড়েছি। সুরের ওপর নাকি বিশেষ মোহ আছে ইগুয়ানার, গায়ে হাত বোলানো পছন্দ করে।
হাত নয়, লাঠি, বললেন মিস্টার আমান। লম্বা দেখে একটা লাঠি নিয়ে যাও। খুব আস্তে আস্তে বাড়ি দেবে...আমারই যেতে ইচ্ছে করছে...
না না, তুমি শুয়ে থাকো, তাড়াতাড়ি বাধা দিল মুসা।
ভাল অভিনেতা কিশোর, কিন্তু গলা সাধায় একেবারে আনাড়ি। তবু তাকেই গান গাইতে হলো। দড়ির ফাঁস নিয়েছে মূসা, রবিনের হাতে লাঠি।
হেঁড়ে গলায় গান ধরল গোয়েন্দাপ্রধান। মানুষ, জানোয়ার কোন কিছুকেই আকৃষ্ট করার কথা নয় সে গান, তবু দেখা যাক ইগুয়ানার বেলায় কি ঘটে।

দূরে দাঁড়িয়ে জীবটার খসখসে চামড়ায় আলতো খোঁচা দিল রবিন। খুব আস্তে বাড়ি মারল কয়েকবার।
ফাঁস হাতে দাঁড়িয়ে আছে মুসা, উত্তেজনায় কাঁপছে।
নড়ল ইগুয়ানা। চোখ মেলল। মুখ ফিরিয়ে তাকাল অভিযাত্রীদের দিকে। প্রতিটি নড়াচড়ায় কুঁড়েমির লক্ষণ। হাঁ করে হাই তুলল। নিচের দিকে ঝুলে পড়েছে, চোয়াল। আঁতকে উঠল মুসা। সারি সারি ধারাল দাঁত।
গান থেমে গেল কিশোরের।
শক্ত কামড় দেয়, হুঁশিয়ার করল রবিন। তবে খারাপ ব্যবহার না করলে কিছু বলবে না। কিশোর, থামলে কেন? গাও। বাড়ি মারা থামাল না সে। মুলা, তাড়াহুড়ো করো না। ঘাবড়ে দিও না ওকে। লেজ খসে গেলে কোন চিড়িয়াখানাই নেবে না।
ভুরু কুঁচকে গেল মুসার। লেজ খসে যাবে?
হ্যাঁ, টিকটিকির মত।...ওভাবে না, ওভাবে ফাঁস পরাতে পারবে না।
একটা লাঠিতে বেঁধে নাও। তারপর আস্তে করে গলিয়ে দাও ওর মুখের ওপর দিয়ে।...ওকি কিশোর, গান থামাও কেন? গাও গাও।
মুখ ব্যথা হয়ে গেল যে।
চলে যাবে তো। গাও।
লাঠি জোগাড় করে আনল মূসা। গান আর লাঠির বাড়ি সমানে চলছে। লাঠির মাথায় ফাঁসটা ঝুলিয়ে আস্তে সামনে বাড়িয়ে দিল সে। ইগুয়ানা নড়লেই থেমে যাচ্ছে তার হাত, ওটা স্থির হলেই আবার ধীরে ধীরে সামনে বাড়াচ্ছে।
ফাঁস গলার কাছাকাছি নিয়ে সাবধানে টেনে আটকে দিল মুসা। লাঠি ফেলে। চেঁচিয়ে উঠল, দিয়েছি আটকে! আর পালাতে পারবে না।
চুপ! বলল কিশোর। টানাটানি কোরো না! লেজ খসাবে!
দু-জনে মিলে খুব নরম হাতে দড়ি ধরে টান দিল।
গ্যাঁট হয়ে রইল ইগুয়ানা। দড়িতে টান বাড়ছে। মাথা ঘোরাতে শুরু করল, সে। এত কুড়ে, নড়তেই চাইছে না। অনিচ্ছাসত্ত্বেও গাছ বেয়ে নেমে এল মাটিতে। পেছনে লেজের খানিক ওপরে বাড়ি মেরেই চলেছে রবিন।
চাপাচাপি করল না ওরা, কিন্তু দড়িতে ঢিলও দিল না। টেনেটুনে ক্যাম্পের কাছে নিয়ে এল ইগুয়ানাটাকে ভেলায় তুলতে হবে।
কাজটা অনেকখানি সহজ করে দিল ইগুয়ানা। মুসা ভেলায় উঠে টানছে। অনেক সহ্য করেছে এতক্ষণ ইগুয়ানা, আর করল না। পায়ে কামড় বসাতে ছুটে গেল। লাফ দিয়ে সরে গেল মূসা। ততক্ষণে শরীরের বেশির ভাগটাই ভেলায় উঠে গেছে জীবটার। বাকিটুকু তুলতে বিশেষ কষ্ট হলো না ছেলেদের।

ভেলা থেকে মাটিতে নেমে বসে পড়ল মুসা। যথেষ্ট পরিশ্রম হয়েছে। ধরলাম তো। খাওয়াব কি?
সবই খায় ব্যাটা, কিশোর বলল, নরম পাতা, ফল, পাখি, ছোট জানোয়ার, সব। তারমানে ইগুয়ানার খাবারের জন্যে ভাবতে হবে না।
সেদিনই আরেকটা প্রাণী ধরা পড়ল। ইগুয়ানার মতই ছয় ফুট লম্বা, তবে লেজ থেকে মুখ নয়, পায়ের আঙুল থেকে চাদি পর্যন্ত। বড়শি দিয়ে অনেকগুলো মাছ ধরে জমিয়েছে মুসা, সেগুলোর গন্ধেই পায়ে পায়ে এসে হাজির হয়েছে। জাবিরু স্টর্ক, মুসার ভাষায় লম্বু বগা, অর্থাৎ বক।
পাখিটাকে এগোতে দেখেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল মুসা। মাছগুলো যেখানে। আছে রেখে উঠে চলে এল।
লম্বা লম্বা পায়ে যেন রনপা-য় ভর করে এগিয়ে এল বিরাট পাখিটা। মাথা কাত করে গম্ভীর চোখে তাকাল মাছের ঝুড়ির দিকে। জ্যাবিরুর চেহারায় একটা ঋষি ঋষি ভাব আছে, প্রায়ই ধ্যানমগ্ন হয়ে থাকে–যদিও এই ধ্যানের বেশির ভাগটাই মাঝের ভাবনায়-তাই একে দার্শনিক পাখি বলে অনেকে।
না, কিছু না, মাছ কেমন পড়েছে দেখছি শুধু এরকম চেহারা করে মাছগুলো দেখল পাখিটা। নদী থেকে ধরার চেয়ে এখান থেকে খেয়ে ফেলা যে অনেক সহজ, বুঝতে বিন্দুমাত্র সময় লাগল না।
সত্যিই একটা রাজকীয় পাখি, ভাবল মুসা। দুধের মত সাদা পালকে ঢাকা শরীর। মাথাটা কুচকুচে কালো। লম্বা গলায় লাল রঙের আঙটি। পাখা সামান্য তুলে রেখেছে, লড়াইয়ের আগে কুস্তিগীররা যেমন বাহু তুলে রাখে অনেকটা তেমনি। মুসা আন্দাজ করল, ওটার এক ডানার মাথা থেকে আরেক ডানার মাথা সাত ফুটের কম হবে না। মানসচক্ষে দেখতে পেল, দুনিয়ার সবচেয়ে বড় সারসটা লস অ্যাঞ্জেলেস চিড়িয়াখানায় হেঁটে বেড়াচ্ছে রাজকীয় চালে, আর তাকে দেখার জন্যে ভিড় জমিয়েছে অসংখ্য দর্শক।
হঠাৎ পেছন দিকে বাকা হয়ে গেল রনপা পা। ঝুড়িতে ঠোকর মেরে বসল সারসরাজ। দেখে যতখানি চালাক মনে হয় পাখিটাকে, আসলে তা নয়। বোকাই বলা যায়। নইলে দেখা নেই, শোনা নেই, ফেলে রাখা খাবারে এভাবে ঠোকর মারে কেউ? কত রকম বিপদের ভয় আছে।
দেখতে দেখতে খালি হয়ে গেল মাছের ঝুড়ি। মুসার ইচ্ছে ছিল, ফাঁস ছুঁড়ে ধরবে। কিন্তু সে এগোনোর আগেই মাছ খতম। খাওয়া শেষ, আর এখানে থাকার কোন কারণ নেই। ডানা মেলে উড়ে গেল জীবন্ত এরোপ্লেন।
আফসোস করল না মুসা। পাখিটার স্বভাব-চরিত্র দেখে তার যা মনে হয়েছে, অত্যন্ত লোভী, আবার আসবে। এত সহজ খাবারের আশা সহজে ছাড়তে

পারবে।
আরও কিছু মাছ ধরে ঝুড়ি ভরল মুসা। ফেলে রাখল ওখানেই। ফাঁস টুডে লকে ধরা যাবে না, বুঝে গেছে। জাল পাতল। ঝুড়ির চার পাশে আট ফুট উঁচু চারটে সরু খুঁটি পেতে তার ওপর বিছিয়ে রাখল জাল। একটা দড়ি বাঁধল জালে, এমন ভাবে, যাতে দূর থেকে ওই দড়ি টেনেই জালটা ফেলতে পারে। সিবা গাছটার অনেক শেকড় আর ঝুড়ি আছে। দড়িটা নিয়ে গেল ওগুলোর কাছে। আড়ালে লুকিয়ে বসে রইল।
এই আসে এই আসে করতে করতে দিনই ফুরিয়ে গেল। পাটে বসল টকটকে লাল সূর্য। বগাটার আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছে মুসা, এই সময় আকাশে দেখা দিল। ছড়ানো ডানা। শা করে উড়ে এসে ঝুড়ির বিশ ফুট দূরে নামল লঘুমান।
আরি! ঝুপড়ি এল কোত্থেকে!ভাবল যেন সারসটা। আগে তো এটা ছিল না। ওখানে? ভাবনা দরকার। আচ্ছা, দেখি ধ্যানে বসে। আশ্চর্য কৌশলে এক পায়ের। ওপর ভারি শরীরের ভর রেখে, লম্বা ঠোঁটের আগা বুকের ফোলানো পালকে গুঁজে ধ্যানমগ্ন হলো সে।
কিন্তু সামনে লোভনীয় খাবার থাকলে ধ্যান আর কতক্ষণ? যখন দেখল, ঝুড়িও নড়ে না, ঝুপড়িটাও না, চুলোয় যাক ধ্যান বলে যেন ঠোঁট সোজা করল সে। পলকে বেরিয়ে এল আরেক পা। রনপা-য় ভর দিয়ে এগোল।
একটা মুহূর্ত দ্বিধা করল ঝুপড়ির কাছে এসে, তারপর ঢুকে পড়ল ভেতরে। খ্যাচাং করে মাছের ঝুড়িতে ঢুকে গেল চোখা ঠোঁট।
মুসাও মারল দড়ি ধরে হ্যাঁচকা টান। ঝুপ করে জালের চারদিক খুলে ছড়িয়ে। পড়ল নিচে। উড়তে গেল সারস, এবং দ্বিতীয় ভুলটা করল। জড়িয়ে পড়ল জালে। আঙুল, ভানার মাথা, ঠোঁট, ঢুকে গেল জালের খোপে। ছুটাতে গিয়ে আরও জড়াল। ছোঁড়া বালিশের তুলোর মত বাতাসে উড়তে থাকল সাদা পালক।
থামল না পাখিটা। যেভাবে ঝাপটা-ঝাঁপটি করছে, জাল ছিঁড়তে দেরি হবে না।
কিশোর আর রবিনও এসে দাঁড়িয়েছে।
দূরে বসে দেখছেন মিস্টার আমান। বললেন, জলদি পা বাঁধো।
ছুটে গিয়ে দড়ির বাণ্ডিল নিয়ে এল মুসা।
কিশোর আর রবিন এগোল তাকে সাহায্য করতে।
প্রথমেই পেটে সারসের জঘন্য লাথি খেল রবিন। বাঁশ দিয়ে তার পেটে খোঁচা মারা হলো যেন। আউফ করে পেট চেপে ধরল।
লাথি খেয়ে তার জেদ গেল বেড়ে। যে পায়ে লাথি মেরেছে, সারসের সেই পাটা দু-হাতে চেপে ধরল।

দড়ির এক মাথায় গিঁট দিয়ে ফাঁস বানিয়ে ফেলেছে কিশোর। সেটা সারসের পায়ে পরিয়ে টেনে আটকে দিল মুসা।
জাল ছিঁড়ছে। ঝাড়া দিয়ে রবিনের হাত থেকে পা ছুটিয়ে নিয়ে লাফিয়ে শূন্যে উঠল সারস।
সড়াৎ করে মুসার হাত থেকে অনেকখানি দড়ি চলে গেল। জ্বালা করে উঠল। হাত, চামড়া ছিলে গেছে। কিন্তু দড়ি ছাড়ল না।
রবিনও দড়ি চেপে ধরল।
ক্ষণিকের জন্যে মনে হলো ওদের, সিন্দবাদ নাবিকের রুক পাখির মত উড়িয়ে নিয়ে যাবে লম্বু বগা! আঙুল ঢিল করে দড়ি ছাড়তে লাগল।
শাঁই শাঁই করে উড়ে গেল সারস। পঞ্চাশ ফুট উঠে শেষ হয়ে গেল দড়ি, ঝটকা দিয়ে টানটান হয়ে গেল।
ইতিমধ্যে দড়ির অন্য মাথাটা নিয়ে গিয়ে ভেলার একটা খুঁটিতে বেঁধে ফেলেছে। কিশোর। উঁচুতে আর উঠতে না পেরে চক্কর দিয়ে উড়তে লাগল পাখিটা। ভয় আর বিস্ময় ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে দিচ্ছে না যেন তাকে।
কিন্তু খানিক পরেই ভয়-ডর সব চলে গেল। অবাক হয়ে যেন ভাবল সারস, আমি না জ্যাবিরু? এত ভয় পাওয়া কি আমার সাজে? দ্রুত নামতে শুরু করল সে। ভেলা আলো করে জুড়ে বসল। গম্ভীর ভঙ্গিতে একবার এদিক একবার ওদিক তাকিয়ে আশপাশের সবাইকে তুচ্ছজ্ঞান করল। যেন বলল, ভয় আমি পাইনি, তোমাদেরকে চমকে দিতে চেয়েছিলাম। যাকগে, অনেক হয়েছে। এবার খানিক ধ্যানমগ্ন হই। খবরদার, আমাকে বিরক্ত করবে না।
বেশবাস ঠিক করল সে। ঝাড়া দিয়ে আলগা পালক ঝড়িয়ে ফেলল, ঠোঁট দিয়ে ডলে সমান করল এলোমেলো হয়ে থাকা পালক। একটা পা গুটিয়ে লুকিয়ে ফেলল ডানার তলায়। তারপর আরেক পায়ে ভর রেখে দাঁড়িয়ে ঠোঁট গুজল বুকের পালকে। ধ্যানমগ্ন হলেন দার্শনিক।
পরদিন সকালে আমাজনে বজরা ভাসাল অভিযাত্রীরা।
কিশোর সাজল ক্যাপ্টেন, মূসা ফার্স্ট মেট, আর রবিন স্টুয়ার্ড। মিস্টার আমানের দুর্বলতা কাটছে না চিন্তিত হয়ে পড়েছে ছেলেরা। বিষের ক্রিয়া কাটেনি যে এটা পরিষ্কার। তাকে নিয়ে কি করবে বুঝতে পারছে না ওরা।
সাগরে চলেছে স্রোত, ভেলাও চলেছে সেদিকে।
বিচিত্র সব যাত্রী ও তাপিরছানা, ভ্যাম্পায়ার, পুঁচকে বানর মারমোসেট, দানব। ইগুয়ানা, দার্শনিক জ্যাবিরু, চারজন হোমো স্যাপিয়েনস (মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম), আর মহাবীর কিকামুর মমি করা শুকনো মাথা।

নাকু এখন ঘাসই খায়, কচি পাতাও খায়। রক্তচাটা বেশ ঝামেলা করে, গরম রক্ত না হলে তার চলে না। ফলে দিনে অন্তত একবার তীরে নেমে ছোট জানোয়ার। শিকার করতে হয় মুসাকে। জাতভাই অন্য বানরের মত শজি আর ফল ভালবাসে না ময়দা, পোকামাকড় আর ছোট গিরগিটি না পেলে মুখ ভার করে রাখে। ডাইনোসরকে (ইগুয়ানাটার নাম) নিয়ে ভাবনা নেই। পাতা, ফল মাংস সবই খায়। আর লম্বুর জন্যে তো রোজই ঈদ। মাছের অভাব নেই নদীতে। ভেলার কিনারে দাঁড়িয়ে নিজেও ধরে, বড়শি ফেলে মুসাও ধরে দেয়।
দিনে চলে, রাতে ভেলা তীরে ভিড়িয়ে কোন গাছের সঙ্গে শক্ত করে বেধে তারপর ঘুমায় অভিযাত্রীরা। মাঝেসাঝে দু-একটা ভেলা দূর দিয়ে চলে যেতে দেখে। ইনডিয়ানদের ভেলা। নদীর পাড়ে কোন গ্রাম চোখে পড়ে না, খালি জঙ্গল। কোথা থেকে আসে ইনডিয়ানরা, কোথায় যায় ওরাই জানে। অভিযাত্রীদের দিকে ফিরেও তাকায় না।
মিস্টার আমানের অবস্থা আরও খারাপ হলো। উঠতেই পারেন না এখন।
এই সময় একদিন সকালে দেখা গেল শহর।

.

খুদে শহর, কিন্তু দীর্ঘ দিন শুধু জঙ্গল দেখে দেখে ওটাকেই নিউইয়র্ক নগরী বলে মনে হলো ওদের। শহরটার নাম হকিটোজ।
তাদের যাত্রাপথে এটাই শেষ শহর। সামনে একটানা গহীন অরণ্য, নদীর দুই তীরেই।
জেটিতে ভিড়ে একটা খুঁটিতে ভেলা বাধল ওরা। শতশত ছোটবড় নৌকা। রয়েছে ঘাটে। প্রায় সবাই মাল নিয়ে এসেছে। খালাস করা হচ্ছে রবার, তামাক, তুলা, কাঠ, নানা রকমের বাদাম।
সীমান্ত শহর। বেশির ভাগই কলকারখানা। কাঠের মিল, জাহাজ আর নৌকা মেরামতের ডকইয়ার্ড, সুতার কল, যন্ত্রপাতি মেরামতের কারখানা আছে। আর আছে মদ চোলাইয়ের বিশাল কারখানা-আখের রস থেকে রাম তৈরি করে। কাস্টমস আছে, মিউনিসিপ্যালিটি আছে, একটা সিনেমা হলও আছে। বিকেলের দিকে শহর ঘুরতে গিয়ে ছেলেরা দেখল, তাতে চলছে অনেক পুরানো একটা ছবি। কয়েক বছর আগেই রকি বীচে দেখে ফেলেছে ওটা ওরী।
ভেলায় ফিরে দেখল, নির্জীব হয়ে পড়ে আছেন মিস্টার আমান। ছেলেদের সাড়া পেয়ে চোখ মেললেন। বললেন, আমাদের বোধহয় বাড়িই ফিরে যেতে হবে।
কেন যেতে হবে, বলতে হলো না, বুঝল ছেলেরা। হাসপাতাল ছাড়া ভাল হবেন না মিস্টার আমান।

মঙ্গল, বৃহস্পতি আর শনিবারে প্লেন ছাড়ে ইকিটোজ থেকে। কাল সকালেই একটা ছাড়বে। যেতে হলে কালই যাওয়া দরকার।
মাঝরাত পর্যন্ত গুজগুজ ফিসফাস করল ছেলেরা।
ভোরে সূর্য ওঠার আগেই ছেলেদের ডেকে তুললেন মিস্টার আমান। তাড়াতাড়ি নাস্তা সেরে টিকেট কাটতে যেতে বললেন।
খেতে খেতে মুসা বলল, বাবা, একটা টিকেট কাটলেই চলবে।
মানে? ভুরু কুঁচকে তাকালেন মিস্টার আমান। রক্তশূন্য, ফ্যাকাসে চেহারা। অনেকগুলো ভাজ পড়ল কপালে।
বাবার জন্যে কষ্ট হলো মুসার। আমরা থেকে যাই। শেষ করেই যাই কাজটা।
না, পারবে না। তোমরা সবাই ছেলেমানুষ।
কেন পারব না, আংকেল? কিশোর বলল, আমরা তো চালিয়ে এসেছি। এযাবত।
পারব না কেন? কয়েকজন লোক ভাড়া করে নেব শুধু।
হাসলেন মিস্টার আমান। শুকনো ঠোঁটে দুর্বল দেখাল হাসিটা। কিন্তু সামনে গভীর জঙ্গল
তাতে কি? মুসা জিজ্ঞেস করল, যা পেরিয়ে এসেছি, তার চেয়ে বেশি বিপদ হবে?
বাবা, ভেবে দেখো, তোমার জমানো টাকা প্রায় সব খরচ করেছ এই অভিযানের পেছনে। কাজ শেষ করে যেতে না পারলে ফকির হয়ে যাবে। অতগুলো টাকা জমাতে কত বছর সময় লাগবে আবার? শোধ করবে কিভাবে? যে কটা জানোয়ার ধরেছি, বিক্রি করে ধারই শোধ করতে পারবে না।
সবই বুঝি। কিন্তু তোমরা ছেলেমানুষ।
ছেলে ছেলে করছ কেন? এতখানি যখন আসতে পেরেছি বাকিটাও যেতে পারব, দৃঢ়কণ্ঠে বলল মুসা।
কিন্তু কিশোরের চাচী আর তোমার মাকে কি বলল? রবিনের বাবা-মাকে হয়তো বোঝাতে পারব…
কি আর বলবে? মা বকবক করবে, তুমি চুপ করে থাকবে।
হ্যাঁ, হাসল কিশোর। আমরা ঠিকমত ফিরে গেলেই তো হলো। তখন সব ঠিক হয়ে যাবে। আর মেরিচাচীর বকা আপাতত আপনাকে খেতে হবে না। চাচার ঘুম হারাম করে দেবে। দিকগে, আপনার কি? তাছাড়া এখনই আপনাকে পাচ্ছে।
কোথায় ওরা? আপনি তো থাকবেন হাসপাতালে।
ঝকঝকে সাদা দাঁত বেরিয়ে পড়ল মিস্টার আমানের। হাসিটা অবিকল মুসার মত। বাপ-ছেলে দু-জনেই একরকম করে হাসে। গভীর ষড়যন্ত্র! হাহ হা…কিন্তু দেখো ছেলেরা, আমাকে কথা দিতে হবে, জ্যান্ত ফিরে যাবে তোমরা। যদি তা না

পারো, আমাকে খামোকা ফেরত পাঠিও না। হাসপাতাল থেকে হয়তো বেঁচে ফিরব, কিন্তু আমি শিওর, তারপর খুন করা হবে আমাকে।
হাসল সবাই।

.

সেদিন সকালের প্লেনেই চলে গেলেন মিস্টার আমান।

.

চেয়েই রইল ছেলেরা। দিগন্তে বিন্দু হয়ে মিলিয়ে গেল প্লেনটা।
ফিরে তাকাল ওরা পরস্পরের দিকে। বিষণ্ন। বড় একা লাগছে। ভীষণ অরণ্যের বিরুদ্ধে ওরা তিন কিশোর। খানিক আগে মিস্টার আমানকে বলা বড় বড় কথাগুলো এখন অর্থহীন মনে হচ্ছে ওদের।
কিছু হবে না, বলল কিশোর, নিজেকেই সান্তনা দিচ্ছে। মুশিকারীদের সামনে না পড়লেই হলো। কয়েকটা জন্তুজানোয়ার ধরা তো। পারব। আমাজনের অনেকখানি চেনা হয়ে গেছে আমাদের।
ঘাটে ফিরে এল ওরা।
আগের জায়গায়ই বাঁধা রয়েছে ভেলাটা। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। কেন যেন মনে হচ্ছিল তার, জায়গামত পাবে না ওটা।
ওরা ভেলার দিকে যেতেই এগিয়ে এল একজন পুলিশ।
উত্তেজিতভাবে চেঁচিয়ে আর হাত নেড়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করল।
ভাঙা ভাঙা স্প্যানিশ আর পর্তুগীজ শিখে ফেলেছে এতদিনে কিশোর। লোকটার কথার তুবড়ি থেকে যতটুকু উদ্ধার করতে পারল তা হলো, ওদের অনুপস্থিতিতে নৌকা করে কয়েকজন লোক এসে ভেলার দড়ি খুলতে শুরু করেছিল।
লোকগুলোর হাবভাবে সন্দেহ হয়েছিল পুলিশ কনস্টেবলের, চ্যালেঞ্জ করেছিল। নৌকার একজন জবাব দিয়েছে, সে ভেলার একজন মালিক। এখানে সুবিধে হচ্ছে না, নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিতে চায়। সন্দেহ আরও বেড়েছে পুলিশম্যানের। তর্কাতর্কি করেছে। শেষে সাফ বলে দিয়েছে, অন্য মালিকরাও আসুক, তারপর ভেলার দড়ি খুলতে দেবে।
অপেক্ষা করতে রাজি হয়নি লোকটা। পরে আসবে বলে নৌকা নিয়ে চলে গেছে।
লোকটার চেহারার বর্ণনা চাইল কিশোর।
কনস্টেবল যা বলল, তাতে বোঝা গেল, লোকটা বিশালদেহী, খারাপ চেহারা এবং নো জেন্টলম্যান। ইংরেজির টানে স্প্যানিশ বলে।
কনস্টেবলের হাতে একটা ডলার গুঁজে দিল কিশোর। খুশিতে ময়লা দাঁত সব বেড়িয়ে পড়ল লোকটার।
মুসা আর রবিনকে ভেলা পাহারায় রেখে থানায় গেল কিশোর ডায়রি করাতে।

থানার লোকেরা হেসেই উড়িয়ে দিল।
ভুল করেছে আরকি, বলল চীফ। যাও তুমি, আবার কোন গোলমাল হলে এসে বলো।
পরিষ্কার বুঝল কিশোর, আবার কিছু হলে তাদেরকেই সামলাতে হবে, পুলিশের সাহায্য পাওয়ার আশা নেই। ইউ এস কনসালের সঙ্গে দেখা করল সে। খুলে বলল সব।
শুধু চেহারার ওই বর্ণনা দিয়ে এখানে ধরা যাবে না কাউকে, কনসাল বললেন। ওরকম চেহারার অনেক আছে। দেখো, তোমরা যদি খুঁজে বের করতে। পারো। কিন্তু তাহলেও কিছু করার নেই। ওর বিরুদ্ধে কোন কিছু খাড়া করতে পারবে না, কোন প্রমাণ নেই তোমাদের হাতে। দড়ি খুলতে এসেছিল, কনস্টেবল। মানা করায় চলে গেছে। জেলে যাওয়ার মত কিছুই করেনি সে। কোন অ্যাকশন না। নিয়ে ঠিকই করেছে পুলিশ। ধরলেও আবার ছেড়ে দিতে হত। সেক্ষেত্রে আরও বেপরোয়া হয়ে যেত তোমাদের ভিলেন।
ঠিকই বলেছেন কনসাল। কিশোর জিজ্ঞেস করল, তাহলে আপনার পরামর্শ কি?
বলব? মিস্টার আমানের পথ ধরো। প্লেনে চড়ে সোজা বাড়ি চলে যাও। বুঝতে পারছি, তোমাদের শত্রু আছে এখানে। জানোয়ারগুলোর অনেক দাম। চোর-ডাকাতের চোখ তো পড়বেই। এখানে ওদের অভাবও নেই। গলাকাটা। ডাকাত অনেক আছে। ইকিটোজে যতক্ষণ আছ, আইনের সাহায্য পাবে, সে ব্যবস্থা করতে পারব। কিন্তু জঙ্গলে পুলিশ যাবে না। সেখানে একটাই আইন ও হয়। মারো, নয় মরো। সেটা অভিজ্ঞ পুরষমানুষের কাজ, তোমরা ছেলেমানুষ, টিকতে পারবে না।
ছেলেমানুষ শুনতে শুনতে কান পচে গেছে কিশোরের। মনে মনে রেগে গেল। পেয়েছে কি বুড়োরা? বয়েস কম হতে পারে, কিন্তু যে কোন বড়মানুষের চেয়ে কম কি ওরা? আর শিখতে শিখতেই ছেলেরা বড় হয়, অনভিজ্ঞরা অভিজ্ঞ হয়।
অনেক ধন্যবাদ, গম্ভীর হয়ে বলল কিশোর। কারও সাহায্য পাই আর না পাই, কাজ চালিয়ে যাব আমরা, কেউ ঠেকাতে পারবে না। আজতক পারেনি কেউ।
স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন কনসাল। হাসি ফুটল ধীরে ধীরে। খুব জেদি ছেলে। ওরকম মনোবল থাকা ভাল। গুড লাক।
কনসালের অফিস থেকে বেরোল কিশোর।
জেটিতে পৌঁছে দেখল ভেলায় টহল দিচ্ছে রবিন আর মুসা। দুজনের হাতেই রাইফেল। মূসার কোমরের ডান পাশে ঝোলানো খাপে ভরা পিস্তল, তার বাবার কোল্ট :৪৫, বাঁ পাশে বিরাট ছুরি। রবিনের কোমরে শুধু ছুরি। ভেলার কাছে খালি এসে দেখো, দেখাব মজা!-এমনি ভাবভঙ্গি।

আসলে ভয়ে কাতর হয়ে আছে দু-জনে। কিশোরকে দেখে হাঁপ ছাড়ল।
কাজ হলো? জিজ্ঞেস করল মুসা।
না। যা করার আমাদেরই করতে হবে।
সে-ভয়ই করছি। পারব?
দেখা যাক পারি কিনা। আগে থেকেই কেঁচো হয়ে গিয়ে লাভ নেই।
যাত্রার জন্যে তৈরি হতে লাগল ওরা।
নদীর উজানে ভেলা দিয়ে মোটামুটি কাজ চলেছে। কিন্তু ভাটিতে যেখানে স্রোত বেশি, ঝড়তুফানেরও ভয়, সেখানে এই জিনিস টিকবে না। ভাল, বড় নৌকা। দরকার। জাগুয়ার কিংবা অ্যানাকোণ্ডার মত বড় ভারি জীব রাখতে হলে অনেক বেশি জায়গা প্রয়োজন। আর বড় নৌকা চালানোর জন্যে মাল্লাও লাগবে।
সেই পুলিশ কনস্টেবলকে আবার দেখা গেল জেটির কাছে। বোধহয় আবার। ডিউটি পড়েছে এদিকে। মুসা আর রবিনকে ভেলায় রেখে তীরে উঠল কিশোর। পুলিশম্যানকে ভেলার দিকে নজর রাখতে বলে চলল ডকইয়ার্ডের অফিসে, নৌকা কিনতে।
ম্যানেজার লোক খুব ভাল সহজেই বোঝানো গেল তাকে, কি জিনিস চায় কিশোর। একটা নৌকা দেখাল।
নৌকা বা জাহাজের ব্যাপারে বাস্তব ধারণা প্রায় নেই কিশোরের, শুধু বই পড়ে যা জেনেছে। তবু দেখেই বুঝল, এই জিনিসই তাদের দরকার।
নৌকাটা পঞ্চাশ ফুট লম্বা। খুবই মজবুত। এর স্থানীয় নাম ব্যাটালাও। সামনের গলইয়ের কাছে কিছুটা বাদ দিয়ে পুরো নৌকার ওপরেই ছাত, ঘরের। মত। একে বলে টলডো। বাংলাদেশী বজরার ছবি দেখেছে কিশোর, এই নৌকাটাও অনেকটা বজরার মতই। তাই এর নাম রাখল বড় বজরা।
বেশ চওড়া বড় বজরা, পেটের কাছে প্রায় দশ ফুট। পেছনে হালের কাছে। একটা উঁচু মঞ্চ। ওখানে দাঁড়িয়ে হাল ধরে মাঝি। আশপাশ তো বটেই, ছাতের। ওপর দিয়ে সামনের দিকেও নজর রাখা যায় ওখানে থেকে। চারটে দাড়ের ব্যবস্থা। রয়েছে, একসঙ্গে দাঁড় টানতে পারবে চারজন মাল্লা। বাড়তি পাটাতনমত রয়েছে। নৌকার দুই ধারে। ওগুলো থাকাতে অল্প পানিতে লগি বেয়ে যাওয়া যাবে।
নৌকাটা কিনল কিশোর পঁচিশ ফুট লম্বা আরেকটা ছোট নৌকা কিনল, ওটার। স্থানীয় নাম মনট্যারিয়া। সে নাম দিল ছোট বজরা। বড় বজরার মত এর ওপরেও টলডো রয়েছে। হালকা বলে বড়টার চেয়ে জোরে ছুটতে পারে।
ডকইয়ার্ডের ম্যানেজারই মান্না জোগাড় করে দিল। ছয় জন। নৌকা বাইবে। ওরা, জানোয়ার ধরায়ও সাহায্য করবে। পাঁচজন ইনডিয়ান, আর অন্য লোকটা ক্যাবোক্লো-ইনডিয়ান ও পর্তুগীজের মিশ্র রক্ত; তার নাম জিবা।

ভেলার আর দরকার নেই, কিন্তু ক্যানূটা ফেলল না কিশোর। ওটাতে করেই এতদূর এসেছে। কাজের জিনিস। ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। দুই বজরার সঙ্গে। বেঁধে নিল ওটাও।
সামনে দীর্ঘ যাত্রা। তিন গোয়েন্দা উত্তেজিত। ভেলার পাশে বজরা বেঁধে ওগুলোতে মাল আর জানোয়ার তুলতে শুরু করল। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। আলো থাকতে থাকতেই কাজ শেষ করতে চায় কিশোর। পরদিন খুব ভোরে উঠে রওনা দেবে।
ঘাটে অনেক দর্শক জমেছে। জানোয়ার তোলা দেখছে ওরা, মাঝেসাঝে দু একটা পরামর্শও দিচ্ছে। পিরের বাচ্চা, বানর আর বাদুড় তোলাটা কিছুই না। ঝামেলা করল ইগুয়ানা। নড়তে চায় না। ওটাকে বেশি চাপাচাপিও করা যায় না, লেজ খসে যায় যদি?
যা-ই হোক, তোলা গেল অবশেষে।
হাঁকডাকে জ্যাবিরু গেল ঘাবড়ে। উড়ে গেল ওটা। পায়ে বাধা পঞ্চাশ ফুট দড়িতে হ্যাঁচকা টান লাগতেই ওপরে উঠা থামিয়ে চক্কর দিয়ে উড়তে শুরু করল। দড়ি ধরে ধীরে ধীরে টেনে নামিয়ে আনা হলো ওটাকে।
কাজ প্রায় শেষ, ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল বিশালদেহী এক লোক। ভেলায় এসে উঠল।
দেখামাত্র চিনল ওকে কিশোর আর মুসা। অন্ধকার হয়ে গেছে। আরও ভালমত দেখার জন্যে লোকটার মুখে টর্চের আলো ফেলল কিশোর। না, কোন ভুল নেই। সেই লোকটাই। চোখা কান। কুৎসিত নিষ্ঠুর চেহারা।
হাল্লো, বলল কিশোর। আপনাকে কোথাও দেখেছি মনে হয়?
হ্যাঁ। কুইটোতে। গির্জা খুঁজছিলাম।
মোম নিশ্চয় জেলেছেন?
মিছে কথা বলেছি। আসলে তোমাদের পিছুই নিয়েছিলাম।
আজ ভেলার দড়ি কে খুলতে এসেছিল? আপনি?
ভুল করেছিলাম। আমাদের ভেলা ভেবেছিলাম।
নিশ্চয়, টিটকারির ভঙ্গিতে মাথা দোলাল কিশোর। তা আপনার নামই তো। জানা হলো না এখনও।
হাসল লোকটা। নাম? নাম জেনে আর কি হবে? বন্ধু বলে ডাকতে পারো। দাঁত বের করে হাসল আবার লোকটা। সরু চোখা দাঁত, ওপরের পাটিতে দুদিকের দুটো দাঁতের মাথা এত চোখা ও লম্বা, শ্বদন্ত বলেই ভুল হয়।
হু, মাথা দোলাল আবার কিশোর। নাম একটা আমিই দিই আপনার। ভ্যাম্পায়ার। সংক্ষেপে ভ্যাম্প। তা কি করতে পারি আপনার জন্যে?

দেখো, কণ্ঠস্বর বদলে গেল লোকটার, হাসি হাসি ভাবটা আর নেই, গোলমাল করতে চাই না। একটা চুক্তিতে আসা যাক।
কার তরফ থেকে? মার্শ গ্যাম্বল? অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ল কিশোর। ওই লোকটাই লস অ্যাঞ্জেলেসে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী জানোয়ার ব্যবসায়ী।
চমকে উঠল ভ্যাম্প, চোখে বিস্ময়। কার কথা বলছ?
ভালমতই জানেন, কার কথা বলছি। আপনার মত আরেকটা ভ্যাম্প। নিজের মুরোদ নেই, জানোয়ার ধরার জন্যে লোক রেখেছে। বোঝাই যাচ্ছে, ঠকায় ওদেরকে, ফলে পছন্দসই জানোয়ার পায় না। এখন আরও একটা ব্যাপার পরিষ্কার হলো, অন্যের জিনিস ছিনিয়ে নেয়। ডাকাত পোষে সে জন্যে।
জ্বলে উঠল ভ্যাম্পের চোখ। দেখো, কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রাখতে কষ্ট হচ্ছে তার, ছিনিয়ে নেব বলিনি আমি…
না, চুরি করতে এসেছিলেন আরকি দুপুরবেলা।
বেশি ফ্যাঁচফ্যাঁচ কোরো না, ছেলে। যা বলছি, শোনো। জানোয়ারগুলো বিক্রি করে দাও আমার কাছে।
কত দেবেন?
এক হাজার ডলার।
মুচকি হাসল কিশোর। জবাব দিল না।
দু-হাজার?
দশ হাজারেও না। বিশ হাজার দিতে যে কেউ রাজি হবে।
আর একটা আধলাও দেবো না। দুই, ব্যস।
পথ দেখতে পারেন তাহলে।
পস্তাবে, খোকা, এই বলে দিলাম। ভাল চাও তো দিয়ে দাও।
শার্টের হাতা গুটিয়ে এগিয়ে এল মুসা। আরেক পাশ থেকে রবিনও এগোল, হাতে শটগান।
ব্যাটাকে পানিতে ফেলে দেব? কিশোরের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল মুসা।
ভ্যাম্পের লাল চোখ টকটকে হয়ে গেল। ইঁদুরের বাচ্চারা, দেখাব… রাগে কথা ফুটছে না। দাঁড়া, দেখাব তোদের মজা! সোজা আঙুলে ঘি যখন উঠল না
থাবা দিয়ে রবিনের হাত থেকে শটগানটা ছিনিয়ে নিল মুসা। নামো। নইলে খোঁড়া হয়ে যাবে জন্মের মত।
দুপদাপ করে নেমে গেল ভ্যাম্প। জনতার ভিড় ঠেলে হারিয়ে গেল ওপাশে।
নিচুস্বরে রবিন বলল, আবার আসবে। সকালের আগেই।
আমিও তাই ভাবছি, কিশোর বলল। রাতেই আসবে। কিংবা আমাদের পিছু নেবে সকালে।

কি করব তাহলে? মুসার প্রশ্ন।
উপায় একটাই?
কী?
এগিয়ে থাকো। ভিড় সরে গেলেই নৌকা ছাড়ব। রাতের মধ্যেই এগিয়ে থাকব। অনেকখানি। ভ্যাম্প রওনা হতে হতে অর্ধেক দিনের পথ এগিয়ে যাব আমরা।
কিন্তু আমরা যখন জানোয়ার ধরব, ওই সময় আবার এগিয়ে আসবে, রবিন বলল।
হারিয়ে যাব আমরা। খুঁজে পাবে না, বলল কিশোর।
মানে?
নদীটা কয়েক মাইল চওড়া, মাঝে ছোট-বড় অনেক দ্বীপ আছে। অসংখ্য খাল আছে ওগুলোর ভেতরে ভেতরে। কোটা দিয়ে আমরা ঢুকেছি, কোন দিকে গেছি, কি করে জানবে?
হ্যাঁ, তা ঠিক, মেনে নিল রবিন
জিবাকে ডেকে বলল কিশোর, এক ঘণ্টার মধ্যেই রওনা দেবে। লোকজন যেন তৈরি রাখে।
না না, সিনর, প্রবল আপত্তি জানাল জিবা। সকালের আগে যাওয়া যাবে না।
আজ রাতে ঠিক দশটায় বজরা ছাড়ব, সিদ্ধান্তে অটল রইল কিশোর।
বিপদে পড়বে, সিনর। রাতে যাওয়া যাবে না।
কিশোর বুঝল, অহমে লাগছে লোকটার। বয়স্ক, এদিককার নদী-বন সম্পর্কে। অভিজ্ঞ তাকে কিনা আদেশ দিচ্ছে এক পুঁচকে ছেলে। মানবে কেন?
কিন্তু জিবাকে বুঝিয়ে দেয়া দরকার, কে মনিব। পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে টাকা গুণলো কিশোর। বাড়িয়ে দিয়ে বলল, এই নাও।
কি?
বিকেলে যে কাজ করেছ, তার টাকা। নিয়ে বিদেয় হও।
হাঁ হয়ে গেল জিবা। বলে কি ছেলেটা? আমাকে ছাড়া যেতে পারবে না। এই নদীর কিচ্ছু চেনো না তুমি।
পারব পারব, হাসল কিশোর। তোমাকে ছাড়া এতখানি যখন আসতে পেরেছি, যেতেও পারব।
টাকা নিল না জিবা। গোমড়ামুখে বলল, রাত দশটায়ই রওনা দেব, সিনর।
ভেরি গুড। টাকাটা আবার মানিব্যাগে রেখে দিল কিশোর।
জানোয়ার তোলা শেষ। দেখার আর কিছু নেই, একে একে চলে গেল সবাই। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই একেবারে জনশূন্য হয়ে গেল ঘাট।

নিঃশব্দে নোঙর তুলল তিনটে নৌকা। ভেসে পড়ল আমাজনের ষোতে। পেছনে পড়ে থাকল ভেলাটা, শূন্য, রিক্ত।
ভ্যাম্প মিয়া ভেলা চেয়েছিল, হেসে বলল মুসা। নিয়ে যাক এখন।
মঞ্চে হাল ধরে দাঁড়িয়েছে জিবা। দাঁড় বাইছে চারজন ইনডিয়ান। একজনকে সরিয়ে দিয়ে তার জায়গা নিল কিশোর। অধীনস্থদের বোঝানো দরকার, মনিবেরা কাজের লোক।
ছোট বজরায় গিয়ে দু-জন মান্নার সঙ্গে দাঁড় টানায় যোগ দিল মুসা। রবিন গেল কফি বানাতে।
বড় বজরাটায় টলডোর ভেতরে রাখা হয়েছে জানোয়ারগুলোকে। খাঁচার ছাত থেকে চুপচাপ ঝুলে রয়েছে রক্তচাটা। বসে বসে ঝিমুচ্ছে ময়দা, নৌকা জোরে দুললেই মৃদু কিচকিচ করে উঠছে। খানিক পর পরই এসে দরজার বাইরে নাক বের। করছে না, নৌকার দুলুনী ভাল লাগছে না তার। ভীতু ঘোড়ার বাচ্চার মত চি চি করে প্রতিবাদ জানিয়ে ফিরে যাচ্ছে আবার নিজের ঘাসপাতার বিছানায়। কুঁড়ের। বাদশাহ ডাইনোসর একেবারে চুপ, পাটাতনে শুয়ে গভীর নিদ্রায় অচেতন। এক পায়ে ভর রেখে ঘরের কোণে ধ্যানমগ্ন হয়ে আছে লম্বু দার্শনিক, দুনিয়ার আর কোন খেয়ালই যেন নেই তার। মাস্তুলে ঝুলছে চুলে বাধা কিকামু। তারার দিকে চেয়ে মাথা নাড়ছে যেন আপনমনে।
আবছা অন্ধকার আকাশ থেকে যেন ঝুলে রয়েছে কৃষ্ণপক্ষের একটুকরো ক্ষয় চাঁদ, ক্লান্ত, বিষণ্ন। ভুতুড়ে হলদে আলো ছড়াচ্ছে, আঁধার তো কাটছেই না, কেমন। যেন আরও রহস্যময় হয়ে উঠেছে। চাঁদের দিকে তাকাতে সাহস করছে না মুসা, গা ছমছম করে। কিশোর দাঁড় টানায় এত ব্যস্ত, তাকানোর সময়ই নেই।
পাশের বন থেকে ভেসে এল রক্ত-জমাট-করা ভয়াক গর্জন। না, টিগ্রে নয়। শুনে মনে হয় মরণযুদ্ধে মেতেছে একপাল ভয়াল নেকড়ে, কিংবা ভীষণ সিংহ। কিন্তু কিশোর জানে, নেকড়েও নয়, সিংহও নয়, ওটা এক জাতের বানরের ডাক। নিশার ফুরফুরে বাতাসে মাতোয়ারা হয়ে দরাজ গলায় গান ধরেছে গুটি কয়েক হাওলার। মাংকি। সাধারণ কুকুরের চেয়ে বড় নয়, অথচ গলায় এত জোর, তিন মাইল দূর থেকেও শোনা যায় চিৎকার।
মানুষের স্নায়ুর ওপর খুব খারাপ প্রতিক্রিয়া করে ওই শব্দ। একজন নেচারালিস্ট-এর কথা মনে পড়ল কিশোরের। তিনি লিখেছেন :
ডাকটা প্রথম যেদিন শুনলাম, মনে হলো, বনের ভেতরে মরিয়া হয়ে লড়াইয়ে মেতেছে আমাজনের সমস্ত জাগুয়ার।
তার বিশ্বাস, হিংস্রতার দিক দিয়ে বেবুনের পরেই হাওলার মাংকি। এমনিতে মানুষকে ভয় করে, কিন্তু আক্রান্ত হলে ভয়ানক হয়ে ওঠে ওরা। চোয়ালে

অসাধারণ জোর। একবার নাকি এক ভ্রমণকারীর শটগানের নল কামড় দিয়ে চ্যাপ্টা করে দিয়েছিল একটা হাওলার।
হাওলারের গর্জন থামলে কানে আসে হাজারো; লাখো ব্যাঙের কোলাহল। এরই মাঝে খুব আবছা শোনা যায় নিঃসঙ্গ কুমিরের কান্নার মত ডাক, শিংওলা পেঁচার তীক্ষ্ণ কর্কশ চিৎকার, পিরের হেষারব, পেকারির ঘোৎ-ঘোৎ। আরও নানা রকম অজানা জীবের বিচিত্র সব ডাকও শোনা যাচ্ছে।
সব কিছুকে ছাপিয়ে মাঝে মাঝে কেশে উঠছে, কিংবা ধমক দিচ্ছে জাগুয়ার। ক্ষণিকের জন্যে চুপ হয়ে যাচ্ছে সবাই। খানিক পরে আবার শুরু করছে হট্টগোল।
বাতাসের বেগ বাড়ল। পাল তোলার নির্দেশ দিল কিশোর।
প্রতিবাদ জানাল জিবা। অন্ধকার নদীর বাঁকে বাঁকে ঘাপটি মেরে আছে বিপদ, কালো পাথরের চোখা চাঙর, বালির ডুবোচরা, ভেসে যাওয়া কাঠের গুঁড়ি।
ওসব জানা আছে কিশোরের। ওগুলোতে লাগলে কি সর্বনাশ হবে, তা-ও বুঝতে পারছে। কিন্তু ভ্যাম্পের কাছ থেকে সরে যেতে হলে ঝুঁকি না নিয়ে উপায় নেই।
ফুলে উঠল পাল। সেই সঙ্গে দাঁড় বাওয়া চলছে। তারওপর ভাটিয়াল স্রোত। তরতর করে ছুটে চলল নৌ-বহর।
দু-বার ঘষা লাগল বালির চরায়। আটকে যেতে যেতে, কোনমতে পার হয়ে এল নৌকা। একবার ধাক্কা লাগল বিরাট এক গাছের গুঁড়ির সঙ্গে। কিন্তু চোখের। পলকে জীবন্ত হয়ে উঠল গুঁড়িটা, কান্নার মত ডাক দিয়ে পানিতে আলোড়ন তুলে, ডুবে গেল।
ঘোলাটে জ্যোৎস্নার, চেয়ে তারার আলোই যেন বেশি।
সাদার্ন ক্রসের গায়ে বুঝি শিশির জমেছে। ভেজা বাতাস কনকনে ঠাণ্ডা।
মাঝরাতের দিকে কমতে কমতে একেবারে থেমে গেল বনের চিৎকার, ভোর রাতে শুরু হলো আবার। ঘড়ির দরকার হয় না। ওই শব্দ শুনলেই বুঝতে হবে, ভোরের আর মাত্র আধঘণ্টা বাকি।
উঠতি সুর্যের সোনা-রোদে যেন জ্বলে উঠল বুনো ফুলের স্তবক। সবুজ বন সোনালি, নদীর ঘোলা পানিও সোনালি, তরল সোনা গুলে দেয়া হয়েছে যেন সব কিছুতে। পাখির কলরবে বনভূমি মুখর। ঝলমলে রঙিন ডানা মেলে উত্তরে উড়ে চলেছে এক ঝাঁক শুনবিল।
রোদ চড়ল। গাছের মাথা থেকে নামতে নামতে গোড়ায় পৌঁছল। দুটো দ্বীপের। মাঝের খাল দিয়ে চলল নৌবহর। দু-দিকেই ঘন বন। পাল নামিয়ে ফেলা হলো। দাঁড় বাওয়াও বন্ধ। তোতের টানে আপন গতিতে ভেসে চলল তিনটে নৌকা।
নাস্তা করতে বসল যাত্রীরা। মানুষের জন্যে কফি, ম্যানডিওকার তৈরি মোটা রুটি আর শুকনো গরুর মাংস। জানোয়ারগুলোরও খিদে পেয়েছে, একেকটার জন্যে

একেক রকম খাবারের ব্যবস্থা হলো।
সারা রাত চলেছে, বিশ্রাম দরকার। আমার নির্দেশ দিল কিশোর।
মোড় নিয়ে একটা দ্বীপের ভেতর ঢুকে গেছে সরু একটা উপখাল। তার মধ্যেও ঢুকল নৌবহর। বড় বড় কতগুলো বাদাম গাছের নিচে নোঙর ফেলল।
তীরের কাছে ঘুমাচ্ছে বিশাল এক কুমির। এতই গভীর ঘুম, গেল না ওটা, কয়েক হাত সরে জায়গা করে দিল শুধু নৌকাগুলোকে। চোখ আর নাকের দু-দিক ইলেকট্রিক বালবের মত ফোলা, ভেসে রয়েছে পানির ওপরে, বাকি শরীর পানির নিচে। লম্বা থুতনি বালিতে ঠেকানো।
পরিশ্রমে মাল্লারা সবাই ক্লান্ত, তিন গোয়েন্দারও শরীর ভেঙে আসছে। চোখে ঘুম। পিঁপড়ে, জোঁক আর পোকামাকড়ের ভয়ে তীরে নামল না জিবা ও তিনজন ইনডিয়ান, ক্যানূর তলায় শুয়ে নাক ডাকাতে শুরু করল।
অন্যেরা শুলো খালপাড়ের নরম বালিতে। শোয়া মাত্রই ঘুম, কিন্তু মুসা জেগে রইল। কুমিরটাকে দেখে দুষ্টবুদ্ধি মাথাচাড়া দিয়েছে তার।

ভলিউম ৪ – ভীষণ অরণ্য ২ – দ্বিতীয় খণ্ড – তিন গোয়েন্দা – রকিব হাসান – সেবা প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট, ১৯৮৮

এমন সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইল না মুসা।

লম্বা নাকে ফাঁস লাগিয়েই ধরা যায়। কুমিরটাকে। এত বড় দানব সচরাচর চোখে পড়ে না।

কুমিরের চাহিদা কেমন, জানা নেই তার। আশা করল, অনেক দামে বিক্রি হবে। ধরতে পারলে নেবে কিভাবে, ভাবল না একবারও।

কুমিরের নাক অনেক লম্বা, অ্যালিগেটরের মত ভোঁতা নয়।

নিঃশব্দে ক্যানূর দড়ির এক মাথা গাছ থেকে খুলে নিয়ে ফাঁস বানাল মুসা। পা টিপে টিপে এগোল ঘুমন্ত সরীসৃপের দিকে।

আস্তে করে ফাঁস গলিয়ে দিল চোখা নাকটায়, তারপর হ্যাঁচকা টান। লাফিয়ে। সরে গেল।

রাগে হিসিয়ে উঠল কুমির। মুসাকে ধরার জন্যে লাফ দিতেই দড়িতে লাগল টান। দ্বিধায় পড়ে গেল। লেজের ঝাপটায় পানি তোলপাড় করে ঘুরে গিয়ে পড়ল। খালের মাঝখানে। টানটান হয়ে গেল ক্যানূতে বাধা দড়ি।

ঝাঁকুনির চোটে ঘুম ভেঙে গেল আরোহীদের। চেঁচাতে শুরু করল গলা ফাটিয়ে।

দড়ি ছাড়ানোর জন্যে একবার এদিকে ঘুরে টান মারছে কুমির, একবার ওদিক। ঝটকা দিয়ে বার বার ঘুরে যাচ্ছে ক্যানূর নাক। টালমাটাল অবস্থা।

কিছুতেই দড়ি ছাড়াতে না পেরে খালের মাঝখান দিয়ে সোজা ছুটতে শুরু করল কুমির। টেনে নিয়ে চলল ক্যানূটাকে।

খানিক দূর গিয়ে বোধহয় মনে করল, ক্যানূটাই তাকে তাড়া করছে, যত শয়তানী ওটারই। ঘুরে এসে তাই আক্রমণ করে বসল ওটাকে। বিশাল হাঁ করে কামড় লাগাল একপাশে। মড়মড় করে উঠল কাঠ। হ্যাঁচকা টানে সরিয়ে না নিলে আরেকটু হলে জিবার হাতটাই গিয়েছিল।

শক্ত কাঠে কামড় দিয়ে বিশেষ সুবিধে করতে না পেরে আক্রমণের ধারা। পাল্টাল কুমির। লেজের বাড়ি মারতে শুরু করল। থরথর করে কেপে উঠল ক্যানূ।

দিশেহারা হয়ে গেছে মুসা।

চেঁচামেচিতে অন্যদেরও ঘুম ভেঙেছে। লাফিয়ে গিয়ে মনট্যারিয়াতে উঠেছে সবাই। মুসাও উঠল। ক্যানূর দিকে ছুটল নৌকা।

কিছুতেই দড়ি খসাতে না পেরে আবার সোজা ছুটেছে কুমির। ধরা যাবে না ওই দানবকে। দড়িটা কাটতে পারলে এখন বাঁচা যায়। ছুরি বের করল জিবা।

কিন্তু দড়ি কাটার আগেই ডুব দিল কুমির। পানি ওখানে গভীর। টানের চোটে ক্যানূর গলুই গেল ডুবে। খাড়া হয়ে গেল আরেক গলুই। ঝুপঝাপ করে পানিতে পড়ল মানুষেরা, হাত-পা ছুড়ছে অসহায় ভঙ্গিতে। আতঙ্কে চিৎকার করছে। তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল পাশের বনের বানর আর পাখির দল।
সর্বনাশ! পানিতে খেপা কুমিরের সঙ্গে চারজন মানুষ। রাইফেল তুলল মুসা।
না না! চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। কার গায়ে লাগে ঠিক নেই।
কি করব তাহলে?
দড়ি কাটতে হবে। ছাড়া পেলে হয়তো পালাবে। আর কোন উপায় নেই।
দ্রুত মনস্থির করে নিল মুসা। অঘটন সে ঘটিয়েছে, তাকেই করতে হবে যা করার। রাইফেল রেখে একটানে কোমর থেকে ছুরি খুলে নিয়ে ডাইভ দিয়ে পড়ল পানিতে।
ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল রবিন।
পানিতে রক্ত। জিবা আর তার দুই সঙ্গীর মাথা দেখা যাচ্ছে পানির ওপরে, আরেকজন নেই। কুমিরে টেনে নিল?
দড়িতে ঢিল পড়েছে। কাত হয়ে ভেসে উঠল ক্যানূ। দড়িতে পোঁচ মারল মুসা।
হঠাৎ ক্যানূর খানিক দূরে পাগলা ঘোড়ার মত লাফিয়ে উঠল কুমির, ভারি কাঠের মত এক গড়ান দিয়ে আবার ডুবে গেল। তার কাছেই ভাসল তৃতীয় ইনডিয়ান লোকটার মাথা। হাতে শিকারের বিশাল ছুরি, তাতে পানি মেশানো হালকা রক্তের ধারা। তাকে কুমিরে ধরেনি, মরিয়া হয়ে সে-ই কুমিরকে ছুরি মারছে।
তাড়াহুড়ো করে ক্যানূ সোজা করে তাতে চড়ে বসল চারজনে। মুসাকে টেনে তোলা হলো মনট্যারিয়ায়। পানিতে নতুন বিপদ। রক্তের গন্ধে এসে হাজির হয়েছে।
ডুবে গিয়েছিল, আবার ভেসে উঠল কুমির। দাপাদাপি করছে, অস্থির, পাগল হয়ে গেছে যেন।
পিরানহা! আমাজন নদীর আতঙ্ক।
রক্তের গন্ধে হাঙর যেমন পাগল হয়ে ছুটে আসে, পিরানহাও তেমনি আসে। ঝাঁপিয়ে পড়ে শিকারের ওপর। বড় জোর ফুটখানেক লম্বা এই মাছ। মুখ বন্ধ রাখলে নিরীহ দেখায়। কিন্তু হাঁ করলে বেরিয়ে পড়ে দুই সারি ক্ষুরধার দাঁত।
নদীর পানিতে এমন কোন প্রাণী নেই, যে পিরানহাকে ভয় পায় না, এমনকি কুমিরও এড়িয়ে চলে। ঝাকে ঝাকে থাকে ওরা, শয়ে শয়ে, হাজারে হাজারে। মোটাতাজা একটা তাপিরকে শেষ করতে কয়েক মিনিটের বেশি লাগে না, পড়ে থাকে শুধু জানোয়ারটার ঝকঝকে সাদা কঙ্কাল।
কুমিরটার চারপাশে পানি যেন টগবগ করে ফুটছে। রক্তে লাল।

ইনডিয়ানরা উত্তেজিত। নৌকা থেকে মাছ ধরার বল্লম নিয়ে ক্যানু চালিয়ে চলে গেল কাছাকাছি। দেখতে দেখতে ধরে ফেলল গোটা বিশেক মাছ। ক্যানুর তলায়। তুপ করে রাখল। ডাঙায়ও নিরাপদ নয়, ওগুলোর কাছ থেকে দূরে রইল ওরা।
খালের মাঝখানে ছোট এক চিলতে বালির চরা, শুকনো। গাছপালা নেই। তাতে মাছগুলো ছড়িয়ে ফেলল ইনডিয়ানরা, ছুরি দিয়ে কুপিয়ে মাথা আলাদা করল।
ভালমত দেখার জন্যে একটা হাঁ হয়ে থাকা মাথা তুলল রবিন। সঙ্গে সঙ্গে খটাস করে বন্ধ হয়ে গেল চোয়াল, যেন স্প্রিং লাগানো রয়েছে। চমকে ওটা হাত থেকে ফেলে দিল সে।
রবিনের দিকে চেয়ে হাসল এক ইনডিয়ান যুবক। চমৎকার স্বাস্থ্য। সে-ই কুমিরটাকে ছুরি মেরেছিল। নাম মিরাটো। হাতের ছুরির আগা আরেকটা কাটা মাথার হায়ের মধ্যে ঢুকিয়ে নাড়া দিল। এত জোরে বন্ধ হলো চোয়াল, ছুরিতে লেগে কয়েকটা দাঁতের মাথা গেল ভেঙে।
ছুরিটা দাঁতের ফাঁক থেকে টেনে ছাড়াল মিরাটো। ফলার দুই পিঠেই গভীর দাগ বসে গেছে।
নিউ ইয়র্ক অ্যাকোয়ারিয়ামে, রবিনের মনে পড়ল, খবরের কাগজে পড়েছিল, একটা পিরানহা কামড় দিয়ে স্টেনলেস স্টীলের কাঁচিতে দাগ ফেলে দিয়েছিল। হাঙরের মতই স্বভাব, একে অন্যকে ধরে খেয়ে ফেলে। অ্যাকোয়ারিয়ামে এক চৌবাচ্চায় দুটো পিরানহা একসঙ্গে রাখে না। রাখলে সবলটা দুর্বলটাকে খেয়ে ফেলে।
ইনডিয়ানরা যে মাছগুলোকে ধরেছে, কয়েকটার পিঠের মাংস নেই, খুবলে খেয়ে ফেলা হয়েছে। মিয়োটো জানাল, বল্লমে গাঁথার পর ওগুলোকে তুলতে সামান্য দেরি হয়েছিল, ওইটুকু সময়েই কামড় বসিয়ে দিয়েছে অন্য পিরানহা। আরেকটু দেরি করলে বল্লমের মাথায় শুধু কঙ্কালটা উঠে আসত।
ওই দেখো, কঙ্কালের কথায় হাত তুলে দেখাল কিশোর।
ফুটন্ত পানি ঠাণ্ডা হয়েছে। চলে গেছে পিরানহার ঝাঁক। অল্প পানিতে পড়ে রয়েছে সাদা একটা কঙ্কাল, মিউজিয়মে দেখা প্রাগৈতিহাসিক দানবের কঙ্কাল বলে। ভুল হয়।
আমাদের গরু-ছাগলেরও ওই দশা করে, মিরোটো বলল। রাতে রক্তচোষা বাদুড়ে রক্ত খেয়ে যায়, ক্ষতের চারপাশে রক্ত লেগে থাকে। সকালে যখন গোসল করতে নামে, ব্যস, হারামী মাছের ঝাঁক এসে হাজির।
এরপর আর ঘুম হলো না কারও।
মুসা আর কিশোর গেল রক্তচাটার জন্যে একটা ক্যাপিবারা শিকার করার জন্য। গাছতলায় আরাম করে বসে রেফারেন্স বই পড়ায় মন দিল রবিন। ইনডিয়ানরা

কেউ শুয়ে-বসে গল্প-গুজব চালাল, কেউ রান্নায় ব্যস্ত।
স্বভাব যত খারাপই হোক পিরানহার, মাংস খুব ভাল। রবিন, যে ইনডিয়ানদের খাবার পছন্দ করে না, সে-ও তারিফ করল।
কুমির ধরতে পারলে না বটে, হেসে বলল কিশোর, কিন্তু ভাল লাঞ্চ জোগাড় হলো।
তা হলো, হাত নেড়ে বলল মুসা। কিন্তু আরেকটু হলে আমরাই লাঞ্চ হয়ে যাচ্ছিলাম।

.

খানিক পর পরই গিয়ে নদীর উজানের দিকে তাকায় কিশোর। ভ্যাম্পের দলবল আসছে কিনা দেখে।
ক্বচিৎ একআধটা ইনডিয়ান নৌকা দূর দিয়ে যেতে দেখল শুধু।
হয়তো এখনও আসেইনি ভ্যাম্প। কিংবা এলেও দ্বীপ আর গাছপালার ওধার দিয়ে চলে গেছে, অভিযাত্রীদের দেখেনি। চলে গেলেও যে আবার ফিরে আসবে না। ভালমত দেখার জন্যে, সেটা বলা যায় না। নিশ্চিন্ত হওয়ার উপায় নেই।
রাইফেল-বন্দুক আছে অভিযাত্রীদের কাছে, তবে তারা তিনজনেই ছেলেমানুষ। ইনডিয়ানদের কাছে রয়েছে শুধু তীর-ধনুক আর বল্লম, গোটা দুই রোগানও আছে। কিন্তু লড়াই লাগলে ভ্যাম্পের গলাকাটা ডাকাতদের সঙ্গে পারবে না ওই অস্ত্র নিয়ে।
তারমানে, লুকিয়ে থাকতে হবে। এই খালপাড়েই কাটাতে হবে দিনটা, রাতের আগে বেরোনো উচিত হবে না। রাত্রে চলতে অসুবিধে হয়তো হবে, কিন্তু উপায় কি?
ভরপেট খেয়ে খালের পাড়ে শুয়ে নাক ডাকাচ্ছে ইনডিয়ানরা। ক্যাতে শোয়ার সাহস নেই কারও। কুমিরের পেটে যাওয়ার চেয়ে পোকামাকড়ের কামড় সওয়া বরং অনেক ভাল।
তিন গোয়েন্দা ও শুয়ে পড়ল।
সবাই গভীর ঘুমে অচেতন। মহিলার আগমন তাই কেউ টের পেল না। এত সুন্দরী, কিন্তু তাকে দেখার জন্যে কেউ জেগে নেই।
মসৃণ কোমল হালকা বাদামী চামড়ার ওপর ঘন বাদামী গোল গোল ছাপ দিয়ে অলঙ্করণ করা হয়েছে, গোল ছাপের মাঝখানটা আবার ফ্যাকাসে। মাথাটা দেখতে কুকুরের মাথার মত। এই মাথায় ভর রেখে খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পারে সে। প্রায় দুই মানুষ সমান লম্বা। লাল-কালো আর হলুদ আলপনা কাটা সুন্দর লেজটা পেচিয়ে। রয়েছে গাছের ডালে।

মাটিতে থুতনি ঠেকিয়ে ধীরে ধীরে লেজ খুলতে শুরু করল সে। এক মুহূর্ত খাড়া হয়ে রইল চুপচাপ, লেজের ডগা মাটি থেকে বারো ফুট উঁচুতে। আস্তে করে শরীরটা নেমে এল মাটিতে।
মাথা তুলে ঘুমন্ত শরীরগুলো দেখল সে। খাবার হিসেবে কেমন হবে যাচাই করছে। নিজের শরীরের তিন গুণ বড় জিনিস গিলে খাবার ক্ষমতা আছে আমেরিকার দ্বিতীয় বৃহত্তম সাপ বোয়া কনসট্রিকটরের।
সারির প্রথম ইনডিয়ান লোকটার ওপর দিয়ে বয়ে গেল বোয়া, এতই হালকাভাবে, টেরই পেল না লোকটা। পরের জন, তার পরের জন করতে করতে এসে থামল রবিনের ওপর। দেখল। গেলা হয়তো যায়, কিন্তু হজম করতে লাগবে কম পক্ষে ছয় হপ্তা। নাহ, এত ভারি খাবার খেয়ে আরাম নেই। ছোট কিছু দরকার।
বড় বজরা থেকে মৃদু একটা শব্দ আসছে। ফিরে তাকাল বোয়া। মাস্তুলের ওপরে কিকামুর চুল নিয়ে খেলা করছে ময়দা।
রবিনকে ডিঙিয়ে এল বোয়া। কিশোর আর মুসার দিকে ফিরেও তাকাল না। খোলা জায়গাটুকু নিঃশব্দে পেরিয়ে এসে উঠল বজরায়।
থেমে দার্শনিককে দেখল। মাংস-টাংস ভালই, পেটও ভরবে, কিন্তু লম্বুর লম্বা লম্বা শুটকো ঠ্যাঙ আর হাড়ি সর্বস্ব বিশাল ঠোঁটটা নিয়েই ঝামেলা। পালকসহ শরীরটা গিলতে পারলেও পা দুটো বেরিয়ে থাকবে মুখের বাইরে। আর ঠোঁটের মধ্যে না আছে মাংস, না রক্ত, না কোন প্রোটিন। বরং ভেতরে গিয়ে পাকস্থলী ফুটো করে দেয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। ধরতে গেলেই ঠোকর খেয়ে শরীর। কয়েক জায়গায় ফুটো করে নিতে হবে আগে। থাকগে, কে যায় ঝামেলা করতে।
মাস্তুলের ওপরে রসালো নাস্তার দিকে আবার তাকাল বোয়া।
সাপটাকে ময়দাও দেখেছে। তাড়াহুড়ো করে উঠে গেল মাস্তুলের মাথায়।
মাস্তুলের গা মসৃণ, পিচ্ছিল। কিন্তু বোয়ার নাম খানোকা কনসট্রিকটর রাখা হয়নি, কোন জিনিসকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে রাখায় তার জুড়ি মেলা ভার। মাস্তুল। বেয়ে স্বচ্ছন্দে উঠতে শুরু করল সে।
চোখ বড় বড় করে নীরবে চেয়ে রইল ময়দা। যেন বোয়ার ঠাণ্ডা শীতল চোখ। সম্মোহিত করে ফেলেছে তাকে।
কিকামুর দিকে তাকালও না বোয়া, আলগোছে পেরিয়ে এল। বিরাট হা করে গিলতে এল ময়দাকে।
শেষ মুহূর্তে যেন সংবিত ফিরে পেল ময়দা। প্রকাণ্ড এক লাফ দিয়ে গিয়ে নামল টলডোর ছাতে।

যেন কিছুই হয়নি, এমনি ভঙ্গিতে আবার নামতে শুরু করল বোয়া। এমন কিছু ঘটতে পারে, জানা ছিল বোধহয়। বাতাসে. জোরে জোরে দুলছে এখন কিকামু। নামার পথে তাই অবহেলা করতে পারল না বোয়া, ক্ষণিক থেমে পরীক্ষা করে দেখল খাওয়া চলবে কিনা। চলে, কিন্তু লাভ নেই। শুকনো চামড়া আর চুল। খাওয়ার কোন মানে হয় না।
মাস্তুলের গোড়ায় চলে এসেছে বোয়া, এই সময় দরজায় উঁকি দিল নাকু।
সঙ্গে সঙ্গে যেন জমে গেল বোয়া। কাঠে জড়ানো ব্রোঞ্জের একটা মূর্তি যেন।
অভিজ্ঞতা নেই, বিপদ টের পেল না তাপিরশিও। খিদে পেয়েছে তার, খাবার খুঁজতে এসেছে। গাইগুই করে মুসাকে ডাকছে। বেরিয়ে এল বাইরে।
দুই ফুটের মধ্যে চলে এল নাকু।
আঘাত হানল বোয়া। তার সিল্কের মত কোমল নরম ঘাড়টা কঠিন লোহার পাইপ হয়ে গেছে নিমেষে। বাকা, চোখা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল নাকুর নাক।
ভয়ে, যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠল না। জাগিয়ে দিল পাড়ের ঘুমন্ত মানুষগুলোকে।
বন্দুক হাতে দৌড়ে এল কিশোর। কিন্তু সাপটাকে দেখে থেমে গেল, গুলি করা চলবে না। জ্যান্ত ধরতে পারলে দারুণ হবে। দ্বিধায় পড়ে গেল। নাকুকে হারাতেও রাজি নয়।
বোয়ায় প্রথম কাজ, ভাইসের মত কঠোর ভাবে শিকারকে কামড়ে ধরা। সেটা ধরেছে। এরপর দ্রুত মাশুল থেকে শরীর খুলে এনে পেচিয়ে ধরবে। ইতিমধ্যেই খুলতে শুরু করেছে প্যাঁচ। শিকারকে পেঁচিয়ে ধরে চাপ দিতে শুরু করবে। হাড়মাংস ভর্তা করে পিণ্ড বানিয়ে ফেলবে। তারপর শুরু হবে গেলা। অনেক, অনেক সময় লাগিয়ে গিলবে আস্তে আস্তে, ধীরে ধীরে।
শিকারকে পেঁচিয়ে ফেলার আগেই কিছু করা দরকার। কিন্তু কি করবে? আর কোন উপায় না দেখে বোয়াকে ভয় দেখানোর জন্যে তার মাথার কাছে বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করল কিশোর।
আরে, না বুঝে বলল মূসা, এত কাছে থেকে মিস।
ইয়া বড় ছুরি হাতে ছুটে এল জিবা।
না, না, বাধা দিল কিশোর। জ্যান্ত ধরব। লাফিয়ে নৌকায় উঠে দড়ি আনতে ছুটল।
কিন্তু দড়ি নিয়ে ফিরে এসে দেখল অবস্থা অন্যরকম হয়ে গেছে।
সাপের লেজ গিয়ে বাড়ি লেগেছিল ঘুমন্ত ইগুয়ানার মাথায়। ব্যস, আর যাবে কোথায়। রাগের মাথায় লেজটাই কামড়ে ধরেছে ডাইনোসর। ছাড়ানোর সাধ্য নেই বোয়ার। খালি গড়াগড়ি করছে। তার পাকের মধ্যে পড়ে বেচারা নাকুর অবস্থা শোচনীয়। বেরোতেও পারছে না, গলা ব্যথা করে ফেলছে চেঁচিয়ে।

কিছু একটা করা দরকার। থামাতে হবে ওগুলোকে। কিভাবে থামাবে, ভেবে। কুলকিনারা পাচ্ছে না কিশোর।
লেজ ছাড়াতে না পেরে বোয়াও গেল খেপে। ডাইনোসরকে আক্রমণ করে বসল। এ-যেন বিউটি আর বীস্টের লড়াই। মাঝখান থেকে নাকুর হয়েছে মহাবিপদ।
কিশোর বুঝতে পারছে, তাড়াতাড়ি কিছু করতে না পারলে অন্তত দুটো জীবকে খোয়াতে হবে। নাকু, এবং দুই দানবের যে কোন একটাকে। দড়ি হাতেই রয়েছে, কিন্তু ফাঁস পরানোর উপায় নেই।
সমস্যার সমাধান করে দিল মুসা। লাফিয়ে গিয়ে পড়ল লড়াইয়ের মাঝে।
টেলিভিশনে দেখেছে, কি করে খালি হাতে বড় অজগর ধরা হয়। সব সাপেরই ঘাড়ের কাছে বিশেষ নার্ভ সেন্টার থাকে, সাপের সবচেয়ে দুর্বল জায়গা।
দুই হাতে বোয়ার ঘাড় চেপে ধরল সে। বুড়ো আঙুল দিয়ে টিপে টিপে খুজতে লাগল নার্ভ সেন্টার।
ঝাড়া মেরে ছুটে যাওয়ার চেষ্টা করল সাপটা। গিয়েছিল আরেকটু হলেই। কিন্তু হঠাৎ বোধহয় চাপ লাগল নার্ভ সেন্টারে। পলকের জন্যে অবশ হয়ে গেল। ওটা। স্থির। এই সুযোগে আরও ভালমত ঘাড় চেপে ধরল মুসা। টেনে সরিয়ে নিয়ে এল ডাইনোসরের কাছ থেকে।
ইনডিয়ানরাও যোগ দিল মুসার সঙ্গে। সাপের বিভিন্ন জায়গা চেপে ধরল ওরা।
ঢিল পেয়ে আরও ভালমত ধরার জন্যে কামড় খুলল ডাইনোসর। কিন্তু আর সুযোগ পেল না। ঝটকা দিয়ে লেজ সরিয়ে নিয়েছে বোয়া।
পাক খুলে যাওয়ায় ইতিমধ্যে নাকও বেরিয়ে সরে গেছে নিরাপদ জায়গায়। কুঁই কুঁই করছে আর শুড় বোলাচ্ছে শরীরের এখানে ওখানে।
এক ইনডিয়ানের গায়ে লেজ দিয়ে সপাসপ বাড়ি মারতে লাগল বোয়া। ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠল লোকটা।
ছুটে গিয়ে লেজ চেপে ধরুল রবিন। রাখতে পারল না। টানের চোটে গড়িয়ে পড়ল পাটাতনের ওপর।
মাথাটা ধরে রাখতে পারছে না আর মুসা। ঘাড় ঘুরিয়ে বিশাল হাঁ করে তাকে কামড়াতে চাইছে বোয়া। ঘামে পিচ্ছিল হাত। শত চেষ্টা করেও নার্ভ সেন্টার খুঁজে পাচ্ছে না আর।
শুয়ে থেকেই আবার লেজ চেপে ধরল রবিন। তাকে সাহায্য করতে এগোল কিশোর। হুমড়ি খেয়ে এসে পড়ল লেজের ওপর।
ছেড়ে দেয়ার আগে আরেকবার শেষ চেষ্টা করল মুসা।
অবশ হয়ে গেল আবার বোয়া।
গেছে, পাওয়া গেছে। আনন্দে আরও জোরে টিপে ধরল মুসা।

পাটাতনে ফেলে সাপটাকে চেপে ধরল সবাই। ঠিক কোন জায়গায় চাপ দিতে হয়, জেনে গেছে মুসা। অজিলের চাপ সরাচ্ছে না।
ধরলাম তো,হাঁপাতে হাঁপাতে বলল কিশোর। রাখি কই?
আঙুল তুলে মনট্যারিয়ার টলডো দেখাল জিবা।
তা-ই করা হলো। সাপটাকে তুলে নিয়ে গিয়ে টলডোতে ভরে দরজা আটকে দেয়া হলো।
হ্যাঁ, বেশ ভাল জায়গা পেয়েছে, বলল কিশোর।
বড় বজরার পাটাতনে, টলডোর হাতে জিরাতে বল সবাই। একটিমাত্র সাপ ঘাম ঝরিয়ে ছেড়েছে এতগুলো লোকের।
আরিব্বাপরে, এত শক্তি! ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলছে মুসা। টলডোর বেড়া ভেঙে না পালায়।
না, তা বোধহয় করবে না, রবিন বলল। পানিকে ভয় পায়। তবে বলাও যায় না। শান্ত করে ফেলা দরকার।
শান্ত? মুখ তুলল মুসা। কিভাবে?
পেটে খিদে ওটার, জবাব দিল কিশোর। পেট ভরাতে হবে। তাহলেই দিন। কয়েকের জন্যে চুপ।
বোয়ার খাবারের সমস্যা নেই। বুনো জানোয়ার চলাচলের পথে মাটিতে গর্ত করে ফাঁদ পেতে সহজেই একটা অল্প বয়েসী পেকারি ধরে নিয়ে এল ইনডিয়ানরা। টলডোর দরজা খুলে জানোয়ারটাকে ভেতরে ঠেলে দিয়েই আবার বন্ধ করে দিল।
প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শোনা গেল পেকারির আতঙ্কিত আর্তনাদ। দ্রুত কমে এল চিৎকার, তারপর চাপা গোঙানি, অবশেষে তা-ও বন্ধ হয়ে গেল।
টলডোর দরজা খুলে সাবধানে উঁকি দিল মিরাটো। এক নজর দেখে ইশারায় ডাকল কিশোরকে। তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল তিন গোয়েন্দা।
বোয়ার বিশাল হাঁয়ের ভেতরে অর্ধেক ঢুকে গেছে পেকারি।
খাইছে। মুসা অবাক। এত বড়টা ঢোকাল কিভাবে?
চোয়ালের গোড়া আলাদা ওদের, বোঝাল কিশোর। আমাদের চোয়ালের মত নয়। ওপরের আর নিচের চোয়ালের মাঝে ইলাসটিকের মত জিনিস রয়েছে, ইচ্ছে করলেই অনেক বেশি ছড়াতে পারে চোয়াল।
দেখতে দেখতে পেকারিটাকে গিলে ফেলল বোয়া।
মারছে। মাথা নাড়ল মুসা। ওই রাক্ষসের জন্যে রোজ খাবার জোগাড় করবে কে?
ভয় নেই, রোজ লাগে না, রবিন বলল। ওই এক পেকারিতেই ওর এক হপ্তা চলে যাবে। দুই হপ্তাও যেতে পারে। ওর রাগ-টাগ সব শেষ। চুপচাপ গিয়ে এখন

অন্ধকার কোণে শুয়ে পড়বে। সাত চড়েও আর রা করবে না। পড়ে পড়ে ঘুমাবে। খিদে পেলে তারপর জাগবে।
ঠিকই বলেছে রবিন।
খাওয়া শেষ হতেই টলভোর কোণের দিকে রওনা হলো বোয়া। সুবিধেমত একটা জায়গা বেছে নিয়ে কুণ্ডলী পাকাল। মাথাটা কুণ্ডলীর ওপরে রেখে চুপ হয়ে গেল। আবছা অন্ধকারেও দেখা যাচ্ছে, বেমক্কাভাবে ঢোল হয়ে ফুলে থাকা পেটটা, ওখানেই রয়েছে পেকারি।
পরের সারাটা দিন বোয়ার আর কোন সাড়াই পাওয়া গেল না।
এই সময়ে আরেক কাণ্ড হয়েছে। বনের ভেতরে শিকারের খোঁজে গিয়েছিল মিরাটো আর দুজন ইনডিয়ান। ঝুড়িতে ভরে নিয়ে এসেছে, আরও ডজনখানেক সাপের বাচ্চা। একটা বোয়ার বাসা পেয়ে গিয়েছিল, তাতেই ছিল বাচ্চাগুলো।
খুশি হলো কিশোর। বোয়ার বাচ্চারও নেহায়েত কম চাহিদা নয়। বারোটা বাচ্চার অনেক দাম।
অন্ধকার ঘনালে রওনা হলো বজরা-বহর।
মাঝরাতের দিকে অনুকুল হাওয়া পেয়ে পাল তোলা হলো। আশপাশের জঙ্গল নীরব। সরু একটা প্রণালীর ভেতর দিয়ে চলেছে এখন তিনটে নৌকা। এক পাশে মূল ভূখণ্ড, আরেক পাশে ছোট একটা দ্বীপ।
হঠাৎ সামনের আবছা অন্ধকারের চাদর ফুড়ে বেরোল যেন নৌকাটা, একটা ক্যানু। পর্তুগীজ ভাষায় চিৎকার শোনা গেল, মনে হলো সাহায্যের আবেদন। সন্দেহ হলো কিশোরের-ফাঁদ নয়তো? কিন্তু সত্যি যদি বিপদে পড়ে থাকে লোকটা? পাল নামানোর নির্দেশ দিল সে।
ক্যানুর পাশাপাশি হলো বড় বজরা।
কিশোর প্যাশাআ (পাশা)? ক্যানু থেকে বলল একটা কণ্ঠ।
হ্যাঁ, সন্দেহ বাড়ল কিশোরের। নাম জানল কিভাবে? ক্যান্তে মাত্র দু-জন লোক ওরাই। অদৃশ্য কারও উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে বলল ক্যানুর একজন।
তীরের কাছে অন্ধকার থেকে সাড়া এল। পানিতে একসাথে অনেক দাঁড়। ফেলার ছপছপ শব্দ।
পাল! চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। জলদি!
কিন্তু পালের দড়িতে হাত দেয়ার আগেই ক্যানুর একজন ঝুঁকে বড় বজরার কিনারা আঁকড়ে ধরল। হাতের রিভলভার নেড়ে বলল, খবরদার! নড়লেই মরবে!
পাথর হয়ে গেল যেন ইনডিয়ানরা।
সাপের ঝুড়িটার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে মুসা। জায়গাটা অন্ধকার। তাকে দেখা যাচ্ছে না।

এগিয়ে আসছে দাড়ের শব্দ। যা করার এখুনি করতে হবে। আস্তে ঝুঁকে সাপের বাচ্চা ভরা ঝুড়িটা তুলে নিল সে।
নৌকাটা আবছা দেখা যাচ্ছে এখন। বেশ বড়। তাতে অনেক লোক। নিশ্চয় ভ্যাম্প আর তার দলবল।
আর দেরি করল না মুসা। দুহাতে ধরে ঝুড়িটা মাথার ওপরে তুলে ছুঁড়ে মারল ক্যানূর দুজনকে লক্ষ্য করে।

.

ঝুড়ির মুখ খুলে গিয়ে মাথার ওপর যেন সর্পবৃষ্টি হলো।
কি সাপ, বিষাক্ত কিনা, কি করে জানবে ওরা? মাথা ঢাকার জন্যে হাত উঠে গেল ওদের। ট্রিগারে আঙুলের চাপ লেগে গুলি ফুটল। কিন্তু কারও কোন ক্ষতি। করল না বুলেট, আকাশমুখো উড়ে গেল। আতঙ্কে চেঁচাচ্ছে ক্যানূতে বসা লোকটা, থাবা দিয়ে গা থেকে সরাচ্ছে কিলবিলে জীবগুলোকে।
বড় বজরার কিনার থেকে হাত সরিয়ে নিয়েছে অন্যজন। তাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেল পানিতে, কাত করে ফেলল ক্যানূ। অন্য লোকটাও পানিতে পড়ল।
বাঁ-ব্বাচাও! হাত ছুঁড়ছে একজন। আ-আমি সাঁতার জানি না..প্লুপ!
কেউ বাঁচাতে গেল না তাকে। পালের দড়ি বাধা হয়ে গেছে বজরা-বহরের। ঝপাত করে পানিতে পড়ল দাঁড়। উল্টানো ক্যানূটার পাশ দিয়ে ধেয়ে বেরোল নৌকা।
পেছনে বড় নৌকাটায় চেঁচামেচি শোনা যাচ্ছে। স্প্যানিশ আর পর্তুগীজ শব্দ কম, বেশির ভাগই অশুদ্ধ ইংরেজি। ডাকাতগুলোকে বোধহয় ইকিটোজ থেকেই জোগাড় করেছে ভ্যাম্প। তাদের মাঝে একজন কি দু-জন রয়েছে ইনডিয়ান কিংবা ক্যাবোকো, যে নদীপথ চেনে। বাকিগুলো সব আনাড়ি। দক্ষ জাহাজ হতে পারে। কিন্তু নদীপথে দাঁড় বেয়ে নৌকা চালানো এক কথা, আর সাগরে এঞ্জিনের জাহাজ চালানো আরেক।
বোঝা যাচ্ছে দাঁড় বাওয়া দেখেই। মনট্যারিয়া নিয়ে ধাওয়া করেছে। দুই ধারে চারজন করে দাড়ি। বেশি ভিড় বলা যাবে না। কিন্তু এতেই গোলমাল করছে ওরা, দাড়ে দাড়ে লাগিয়ে দিচ্ছে, ফলে ব্যাহত হচ্ছে নৌকা বাওয়া। একে অন্যকে দোষ। দিচ্ছে, গালাগাল করছে মুখ খারাপ করে।
পানিতে পড়া দু-জনকে ভোলার জন্যে থামতে হলো ভ্যাম্পকে। ক্যাটা সোজা করে বাধল মনট্যারিয়ার সঙ্গে। সময় নষ্ট হলে তাতে।
থ্যাংকিউ, মুসা, এতক্ষণে বলল কিশোর।
মুসা বুদ্ধি করে সাপের ঝুড়ি ফুড়ে মারাতেই বেঁচেছে ওরা। কিন্তু স্বস্তি বেশিক্ষণ থাকল না। ঝাকে ঝাকে বুলেট ছুটে এল মনট্যারিয়া থেকে। প্রচণ্ড রাগে যেন

এলোপাতাড়ি ছুটতে লাগল। শক্তিশালী রাইফেল, শব্দ শুনেই বোঝা যায়। পাঁচশো ফুট দূরত্ব কিছুই না ওগুলোর জন্যে।
বড় বজরার গলুইয়ের কাছে কাঠের চলটা ওঠাল একটা বুলেট, টলজের ছাত কুঁড়ে গেল একটা, আরেকটা এসে ভেঙে দিল মঞ্চের এক পা। বেকায়দা ভঙ্গিতে সামান্য কাত হয়ে গেল মঞ্চটা। হাল ছেড়ে লাফ দিয়ে নেমে এল জিব।
শাঁই করে নাক ঘুরে গেল বড় বজরার।
ধমক দিয়েও জিবাকে আর পাঠানো গেল না মঞ্চে।
তোতলাচ্ছে জিবা, কি বলল বোঝা গেল না। নাকমুখ গুঁজে গিয়ে টলডোর ভেতরে পড়ল।
দাঁড় ফেলে লাফিয়ে গিয়ে টলোতে উঠল মুসা। ছুটে গিয়ে চড়ল মঞ্চে। হাল ধরে নৌকার মুখ সোজা করল আবার। কিন্তু ইতিমধ্যে মহামূল্যবান খানিকটা সময় নষ্ট হয়ে গেছে।
তার চারপাশে বুলেট ছুটছে। আকাশ আর তারার পটভূমিকায় বেশ স্পষ্ট নিশানা এখন সে। যে কোন মুহূর্তে এসে পিঠে বিধতে পারে গুলি। কিন্তু পরোয়া করল না। হাল ধরে না রাখলে বজরা-বহরের সবাইকে মরতে হবে। এখন তাকে দেখলে কে বলবে এই সেই ভুতের ভয়ে-কাব স্বভাবভীতু মুসা আমান?
কিশোর! চেঁচিয়ে বলল মূসা, ক্যানূর দড়ি কাটতে বলো।
কেন… বলেই থেমে গেল কিশোর। বুঝতে পেরেছে।
মিরোটাও পেরেছে। ছুরি হাতে ছুটে গেল সে।
সরু খালে পঁচিশ ফুট লম্বা ক্যান্ আড়াআড়ি পড়ে থাকলে ওটা না সরিয়ে কোন নৌকা এগোতে পারবে না।
দড়ি ধরে টেনে ক্যানূটাকে কাছে নিয়ে এল মিরাটো। কয়েক পোচেই দড়ি কেটে ফেলল। ক্যানূর গলুই ধরে ধাক্কা লাগাল জোরে। আধ চক্কর ঘুরে আড়াআড়ি হয়ে গেল ক্যানূ। ভাসতে লাগল খাল জুড়ে।
মিনিটখানেক দেরি করাবে, বিড়বিড় করল মু
সা। তার কথার জবাবেই যেন ছুটে এল বুলেট। প্যান্টের হাটুর ওপরে কাপড়ে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি লাগল। অল্পের জন্যে বেঁচে গেল উরু। মনে মনে বলল, আল্লা, ক্যানূটা যেন না দেখে।
সময়মত চোখে না পড়লে জোরে এসে তাতে ধাক্কা খাবে মনট্যারিয়ার গলুই, ভেঙে যাওয়ার মোনলা আনা সম্ভাবনা।
সময়মতই দেখল ভ্যাম্প, কিন্তু বেশি মাতব্বরী করতে গিয়ে পড়ল বিপাকে। সময় নষ্ট হবে, তাই ক্যানূ না সরিয়ে ওটার এক গলুই ঠেলে সরিয়ে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করল। আসতে পারত, যদি মাল্লারা আনাড়ি না হত।

বুনো চিৎকার করে উঠল নৌকা বোঝাই ডাকাতেরা। তাদের চিৎকার ছাপিয়ে শোনা গেল আরেকটা কণ্ঠ, পর্তুগীজ ভাষায় হুঁশিয়ার করছে। বোধহয় ইনডিয়ান, যে এই এলাকা চেনে। পানিতে দাঁড়ের খোঁচা মেরে মনট্যারিয়াকে সরানোর প্রাণপণ চেষ্টা করল ওরা। পারল না। বালির চরায় নৌকার তলা ঘষা খাওয়ার তীক্ষ্ণ খচখচ শব্দ দূর থেকেও শোনা গেল। কাত হয়ে গেল নৌকা। পালের জন্যে আরও বেশি কাত হয়ে পানিতে ডুবে গেল একটা পাশ। মাল্লাদের কিছু চরায় ছিটকে পড়ল, কিছু পানিতে।

জোরে! মঞ্চ থেকে চেঁচিয়ে উঠল মুসা। জোরে টানো দাঁড়। পালানোর এই সুযোগ। গুলি বন্ধ হয়েছে দেখে আবার গিয়ে হাল ধরল জিবা।

অন্ধকারে আঁকাবাঁকা খাল ধরে তীব্র গতিতে ধেয়ে চলল বজরা-বহর। ধীরে ধীরে পেছনে পড়ল ডাকাতদের উত্তেজিত চেঁচামেচি, একটা সময় আর শোনা গেল না। হাঁপ ছাড়ল নৌকার সবাই।

কিন্তু এই অবস্থা বেশিক্ষণ থাকবে না, জানে কিশোর। নৌকা সোজা করে নিয়ে খানিক পরেই আবার ছুটে আসবে ভ্যাম্পের দল। যত খারাপ মাল্লাই হোক, ওরা সংখ্যায় বেশি। তাছাড়া মনটারিয়া হালকা নৌকা। ভারি ব্যাটালাওয়ের চেয়ে দ্রুতগতি। তার ওপর ব্যাটালাও একা চলছে না, টেনে নিতে হচ্ছে আরেকটা নৌকাকে। বোঝা তো আছেই।

কাজেই, ভ্যাম্পের নৌকার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বজরা-বহরের পারার কথা নয়।

পালের ওপর বিশেষ ভরসা নেই। অনুকূল হাওয়া না থাকলে পাল অকেজো। আর খালি যদি সামনে ছোটার ব্যাপার হত, এক কথা ছিল। পথে পথে থামতে হবে। তাদেরকে, জানোয়ার ধরার জন্যে। ধরতেই যদি না পারল, এই অভিযানই বৃথা।

যা উঁচু মাস্তুল, লুকাবে কোথায় নৌকাদুটোকে?

খাল দিয়ে বেরিয়ে এসে আবার চওড়া নদীতে পড়ল বজরা-বহর। প্রায় পাঁচ মাইল চওড়া এখানে নদী। সামনে আরও চওড়া হয়েছে। যেন অকুল পাথর। মাঝে একটা দ্বীপও আর চোখে পড়ছে না। দিনের বেলা এই খোলা নদীতে রাইফেলের সহজ নিশানায় পরিণত হবে ওরা।

উষার আগমন ঘোষণা শুরু করল পাশের জঙ্গলের পশু পাখি। পুব আকাশে মলিন হয়ে এল তারার আলো। ধূসর, ঠাণ্ডা আলো ফুটতে শুরু করেছে দিগন্তরেখা বরাবর। তার খানিক ওপরে মেঘের গায়ে রঙের ছোঁয়া লাগল, গাঢ় থেকে গাঢ়তর। হলো লাল, তারপর হঠাৎ করে যেন ঝাপি খুলে লাফিয়ে বেরিয়ে এল টকটকে লাল। সূর্য।

বজরা-বহরের পেছনে দূরে কালো একটা বিন্দু দেখা যাচ্ছে। নিশ্চয় ভ্যাম্পের মনট্যারিয়া। ওটা যখন এরা দেখতে পাচ্ছে, ওদের জন্যে বজরা-বহর দেখতে পাওয়াটা আরও সহজ।
চওড়া হওয়া যেন শেষ হবে না নদীর। এখনই এক তীর থেকে আরেক তীর দশ মাইল হয়ে গেছে।
ম্যাপ দেখল কিশোর। সামনে এক গুচ্ছ দ্বীপ থাকার কথা, তার পরে আবার খোলা নদী। এক জায়গায় নীল মোটা একটা রেখা মূল ভূখণ্ডের ভেতর দিয়ে একেবেঁকে গেছে। নদী একখান থেকে ঢুকেছে ডাঙার ভেতরে, আরেকখান দিয়ে বেরিয়ে আবার পড়েছে নদীতে।
ওখানে কি আছে জিবাকে জিজ্ঞেস করল কিশোর।
কিছু নেই, মাথা নাড়ল জিবা। তোমার ম্যাপ ভুল। থাকলে, জানতাম।
কিন্তু এই ম্যাপ ভুল হতে পারে না, তর্ক করল কিশোর। আমেরিকান জিওগ্রাফিক্যাল
বুঝতে চাইল না জিবা। তার এক কথা, ম্যাপ ভুল।
কিন্তু শেষে দেখা গেল, জিবাই ভুল করেছে। চওড়া খালটা পাওয়া গেল। কিশোরের নির্দেশে তাতে ঢুকে পড়ল বজরা-বহর। দুই ধারে জঙ্গল এত ঘন, ভ্যাম্পের চোখকে ফাঁকি দিতে পারবে, যদি না তার কাছেও এ-রকম একটা ম্যাপ থেকে থাকে।
পানির ভেতর থেকে গজিয়ে উঠেছে বড় বড় গাছ। খাড়া উঠে গেছে দুশো ফুট। তারপর দু-দিক থেকে এসে মিশেছে দুদিকের ডালপালা, মাথার ওপরে ছাত তৈরি করে দিয়েছে। সেই ছাতকে জীবন্ত করে রেখেছে বানরের দল আর রাশি রাশি পাখি-চোখ ধাঁধানো রঙ।
বাতাস নেই এখানে। পাল তুলে রাখার আর কোন মানে হয় না। নামিয়ে ফেলা হলো। পানিতে ঢেউও নেই, কাঁচের মত স্বচ্ছ। দাঁড় বাওয়া সহজ।
এগিয়ে চলেছে বজরা বহর, ভেসে থাকা কুমিরের নাকে ঢেউ লাগছে, বিচিত্র। শব্দ করে তলিয়ে যাচ্ছে ওগুলো। এক জায়গায় ধ্যানমগ্ন হয়ে ছিল দুটো জ্যাবিরু। সারস, নৌকা দেখে ধ্যান ভাঙল। এক পায়ের জায়গায় দুই পা দেখা দিল। পাশ। দিয়ে যাওয়ার সময় ওদের সঙ্গে কথা বিনিময় হলো লম্বুর।
আরি! দেখো দেখো! আঙুল তুলে দেখাল মুসা। পানির ওপর দৌড়াচ্ছে গিরগিটি। দাঁড় বাওয়া থামিয়ে অদ্ভুত জীবটাকে দেখল সবাই। লেজসহ ফুট তিনেক, লম্বা। পেছনের দুই পা আর লেজের ওপর ভর, সামনের দুই পা তুলে রেখেছে অনেকটা মোনাজাতের ভঙ্গিতে।
ব্যাসিলিস্ক, বলল কিশোর।

অনেক দাম, রবিন বলল। ধরতে পারলে কাজ হয়।
কিন্তু ধরা কঠিন। পানির ওপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে দৌড়ে যাচ্ছে একপাড় থেকে আরেক পাড়ে, আবার আসছে এ-পাড়ে, খাবার খুঁজছে। আসছে-যাচ্ছে। নৌকার সামনে দিয়েই। কারও দিকে খেয়াল নেই, নিজের কাজে ব্যস্ত।
আরেকবার নৌকার সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় ঝাঁপ দিল মিরাটো। পড়ল গিরগিটিটার ওপর। তলিয়ে গেল। খানিক পরে আবার যখন ভেসে উঠল, দেখা গেল তার হাতে ছটফট করছে ব্যাসিলিস্ক।
গলায় দড়ি লাগিয়ে বড় বজরার টলডোর ভেতরে একটা খুঁটিতে বেঁধে রাখা। হলো জীবটাকে। বাধা না থাকলে ঝামেলা করে, তাই মোট চারটে জীবকে বেঁধে রাখা হয়েছে এখন। লম্বুর ঠ্যাঙ-এ শুরু থেকেই দড়ি ছিল, বোয়ার সঙ্গে গোলমাল। করার পর নাকু আর ডাইনোসরের গলায় দড়ি পড়েছে।
খালটা আট মাইল লম্বা। শেষ হলো একটা মোহনায়-ন্যাপো আৰু আমাজনের মিলনস্থল।
ভ্যাম্প পিছে পিছে খাল ধরে আসছে কিনা, জানে না কিশোর। সরাসরি আমাজন ধরে আর যেতে চাইল না। তার চেয়ে বায়ে-মোড় নিয়ে ঢুকে যাবে ন্যাপো নদীতে। খোলা আমাজন ধরে গেলে ডাকাতদের চোখে পড়ার সম্ভাবনা বেশি।
নদীটার বড় একটা বাঁক ঘুরতেই গাছপালা আড়াল করে ফেলল বজরা বহরকে। আমাজন থেকে আর দেখা যাবে না।
আরও খানিক দূর এগিয়ে শান্ত একটা বাকের কাছে নৌকা বাঁধার নির্দেশ দিল, কিশোর। দিনটা ওখানেই কাটাবে।
তীর ঘেঁষে নৌকা রাখলে বোয়া নেমে যেতে পারে, তাই রাখা হলো বিশ ফুট দূরে। কিন্তু এত দূরেও গভীরতা বড়ই কম, মাত্র হাঁটু পানি ওখানে। নিচে নরম. বালি। কাদা নেই। পানি ভেঙে সহজেই হেঁটে গিয়ে ওঠা যাবে ডাঙায়।
আগে নামল মুসা। ডাঙায় উঠল। এবং উঠেই জড়াল গোলমালে।

.

হাঁ হয়ে গেছে মুসা। চোখ ডলল। বিশ্বাস করতে পারছে না, এ-রকম জীব আছে। দুনিয়ায়, ওই চেহারার!
ভালুকের মত পেছনের দুই পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছে। শরীরটাও গলা পর্যন্ত ভালুকের মত। কিন্তু গলার ওপরে…কিসের সঙ্গে তুলনা করবে? শুড়? না। নাক? তা-ও না। মাথা নেই, মুখ নেই, চোয়াল নেই। মোটা একটা নল যেন ঘাড়ের সঙ্গে জুড়ে দেয়া হয়েছে, আগাটা সরু, তাতে গোল ছিদ্র। সেটা দিয়ে ক্ষণে ক্ষণে। বেরোচ্ছে লকলকে…হ্যাঁ, বোধহয় জিভই।

পেশীবহুল বিশাল দুই শক্তিশালী বাহু, থাবা কিংবা আঙুল নেই, তার জায়গায় রয়েছে ইঞ্চি চারেক লম্বা বাঁকা নখ। ওই নখ দিয়ে মানুষের সমান উঁচ, কঠিন উইয়ের ঢিবি এত সহজে চিরছে, যেন ছুরি দিয়ে মাখন কাটছে। পিলপিল করে বেরোচ্ছে। উই।দুই ফুট লম্বা, লাল, সাপের জিভের মত জিভে আটকে পোকাগুলোকে নলের ভেতরে চালান করছে জীবটা। নাক-মুখ দুয়েরই কাজ করে তার নল।

মুসার পাশে এসে দাঁড়াল কিশোর। জায়ান্ট অ্যান্টইটার! ফিসফিসিয়ে বলল। ধরতে পারলে কাজ হয়।

পিঁপড়েখেকো এত বড় হয়!

হয়, পেছন থেকে বলল রবিন। অনেক জাতের পিঁপড়েখেকো আছে। এটা সবচেয়ে বড় জাতের। অ্যান্টবিয়ারও বলে একে।

সেটাই ঠিক নাম। ভালুকের মতই। তো, ধরতে বলছ? বেশ, ধরে দিচ্ছি। এমন ভঙ্গি করল মুসা, যেন ভোয়াড় থেকে মুরগী ধরে আনতে যাচ্ছে।

সাবধান! কিশোর বলল। ডেনজারাস।

ডেনজারাস? কিভাবে? দাঁতই নেই…

নখ আছে।

পেছন থেকে ধরব, সাপটাকে ধরে সাহস বেড়ে গেছে মুসার। নিজেকে টারজান ভাবতে আরম্ভ করেছে।

পিঁপড়েখেকোর দৃষ্টিশক্তি খুবই ক্ষীণ, গন্ধেই আঁচ করে নিল ব্যাপার সুবিধের নয়। সামনের দুই পা নামিয়ে পিছু হটতে শুরু করল। পেছনে দুলছে অদ্ভুত লেজটা। এমন লেজ থাকতে পারে কোন জানোয়ারের, কল্পনাও করেনি কোন দিন। মুসা। কয়েক ফুট লম্বা একটা ব্রাশ যেন, ব্রাশের রোয়াগুলো প্রায় দুই ফুট লম্বা। নাকের মাথা থেকে লেজের ডগা পর্যন্ত জীবটা লম্বায় ফুট সাতেক।

পা টিপে টিপে পিঁপড়েখেকোর পেছনে চলে এল মুসা। পিঠের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দু-হাতে পেট জড়িয়ে ধরল। দমে গেল শুরুতেই। অসাধারণ জোর জানোয়ারটার গায়ে। ঝাড়া দিয়ে পিঠ থেকে ফেলে দিল তাকে। নখের সামান্য ছোঁয়া লাগল শুধু গোয়েন্দা-সহকারীর বাহুতে, তাতেই গভীর আঁচড় পড়ল চামড়ায়, রক্ত দেখা দিল।

আবার দু-পায়ে দাঁড়িয়ে এগিয়ে এল পিঁপড়েখেকো। লম্বা জিভটা নলের ভেতর। ঢুকছে-বেরোচ্ছে।

পিছু হটতে গিয়ে মাটিতে পড়ে থাকা একটা মরা ডালে হোঁচট খেয়ে উল্টে পড়ে গেল মুসা। চোখের পলকে তার গায়ের ওপর এসে পড়ল রোমশ দানবটা। দুই বাহু বাড়িয়ে দিল জড়িয়ে ধরার জন্যে।

প্রমাদ গুণল কিশোর। শুনেছে, ওভাবে ধরে চাপ দিয়ে পুমার পাজরও গুঁড়িয়ে দেয় পিঁপড়েখেকো।
ধরা পড়ার আগেই গড়িয়ে সরে এল মুসা, উঠে দাঁড়াল। একপাশ থেকে চেপে ধরল লম্বা নলটা।
হ্যাঁচকা টানে নল ছুটিয়ে নিল পিঁপড়েখেকো। বাইসাইকেলের প্যাডাল ঘোরানোর মত করে দুই বাহু চালাল। ভয়াবহ নখ দিয়ে চিরে দিতে চায়। আক্রমণকারীকে।
জানোয়ারটার দুর্বল জায়গা কোথায়, বুঝে ফেলেছে মুসা। পাশ থেকে লাফিয়ে এসে আবার চেপে ধরল লম্বা নল। মোচড় দিয়ে ঘুরিয়ে মাটিতে ফেলে দেবে কোরবানীর গরুর মত, তারপর পিঠে চেপে বসে কাবু করবে।
হঠাৎ পাশের ঝোপ সরিয়ে বেরিয়ে এল আরেকটা পিঁপড়েখেকো। প্রথমটার চেয়ে বড়, বোধহয় মন্দা।
হতভম্ব হয়ে গেল মুসা, কিন্তু নল ছাড়ল না।
রবিন বোবা।
ঝট করে ঘুরে দৌড় দিল কিশোর, নৌকা থেকে বন্দুক আনার জন্যে।
বিচিত্র আওয়াজ করে সঙ্গিনীকে সাহায্য করতে ছুটে এল পুরুষ জানোয়ারটা।
বিদ্যুত খেলে গেল যেন মিরাটোর শরীরে। লাফিয়ে এসে পড়ল পিঁপড়েখেকোর সামনে। শাঁই করে হাতের ছুরি চালাল। ছরি না বলে তলোয়ার বলাই ভাল। ওটাকে, তিরিশ ইঞ্চি লম্বা ফলা।
সোজা হয়ে দাঁড়াল পিঁপড়েখেকো-পুরো ছয় ফুট, মিরাটোর চেয়ে পাঁচ ইঞ্চি উঁচু। থাবা চালাতে শুরু করল। মিরাটোর হাতে একটা ছুরি, কিন্তু ওটার দুই হাতে তিন-দু-গুণে ছয়টা। চার ইঞ্চি করে লম্বা, বাকা, ক্ষুরের মত ধার। ইস্পাতের চেয়ে শক্ত।
খুব সর্তক মিরাটো, ক্ষিপ্র। লাফ দিয়ে দিয়ে সরে যাচ্ছে, একই সাথে ছুরি চালাচ্ছে শাঁই শাঁই করে। কিন্তু লাগাতে পারছে না। আরও কাছে থেকে কোপাতে হবে।
কাছে এসেই নখের আওতায় পড়ে গেল মিরাটো। তার নগ্ন বুক চিরে ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এল রক্ত।
লাফিয়ে ডানে সরে গেল সে। সামান্য সামনে ঝুঁকেছে পিঁপড়েখেকো। সোজা হওয়ার সুযোগ না দিয়েই ছুরি চালাল মিরাটো। এক কোপে ঘাড় থেকে আলাদা করে ফেলল লম্বা নল। কাটা গলা দিয়ে পিচকারির মত ছিটকে বেরোল রক্ত। দড়াম করে মাটিতে আছড়ে পড়ল বিশাল ধড়টা।
বোতল আনতে নৌকায় ছুটল একজন ইনডিয়ান। রক্তচাটাকে খাওয়ানোর জন্যে রক্ত জমিয়ে রাখবে।
ওদিকে তুঙ্গে উঠেছে মুসা আর মাদী-পিঁপড়েখেকোর লড়াই। অন্য কোনদিকে নজর দিতে পারছে না। নল চেপে ধরে মোচড় দিয়ে বার বার ফেলে দিচ্ছে মুসা,

কিন্তু রাখতে পারছে না, লাফিয়ে উঠে দাঁড়াচ্ছে জানোয়ারটা।
না, এভাবে হবে না। মুসার ধারণা, জীবটা সাঁতার জানে না। নল চেপে ধরে। তাই ঠেলে নিয়ে চলল পানির দিকে। ইচ্ছে, চুবিয়ে কাবু করবে।
সাহায্য করতে এগোল মিরাটো। কিন্তু সে কিছু করার আগেই পিঁপড়েখেকোকে নিয়ে পানিতে পড়ল মুসা। ভুল যে করেছে, বুঝতে পারল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। দক্ষ সাতারু পিঁপড়েখেকো। জোর কমল না, দাপাদাপি বাড়িয়ে দিল আরও।
একটাই উপায় আছে এখন। নলের মুখ পানিতে ডুবিয়ে ধরা। শ্বাস নিতে না পারলে কাহিল হবেই জানোয়ারটা।
সেই চেষ্টাই করল মুসা। কিন্তু কপাল খারাপ তার। পা পিছলে ঝপাং করে। পড়ল। সুযোগ ছাড়ল না পিঁপড়েখেকো। জড়িয়ে ধরল শত্রুকে। একটু আগে তার সঙ্গে যে দুর্ব্যবহারটা করা হচ্ছিল সেটা ফিরিয়ে দিতে চাইল। দু-পেয়ের কাছে শেখা পদ্ধতিতেই তাকে পানির তলায় চেপে ধরে কাহিল করতে চাইল।
হাত থেকে নল ছুটে গিয়েছিল, থাবা দিয়ে আবার চেপে ধরল মুসা। প্রাণপণ চেষ্টায় টেনে নামাল পানির তলায়। শ্বাসরুদ্ধ করে দিল। ...
দুজনেরই নাক এখন পানির তলায়। যে বেশিক্ষণ দম রাখতে পারবে, সে-ই জিতবে।
সাঁতারু, বিশেষ করে ডুবসাঁতারে মুসার চেয়ে দুর্বল পিঁপড়েখেকো, সুতরাং মাগেই দম ফুরাল। মরিয়া হয়ে নাক ভোলার চেষ্টা করতে লাগল সে। ঢিল হয়ে গেল বাহুর বাঁধন, বাঁচার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে এখন জানোয়ারটা। নল ধরে রেখেই তার নিচ থেকে সরে এল মুসা, মাথা তুলল পানির ওপর।
দাপাদাপি কমে গেল পিঁপড়েখেকোর, ছটফট করছে শুধু এখন।
ইনডিয়ানরা সাহায্য করতে এগিয়ে এল।
ধরে ফেলা হলো পিঁপড়েখেকোকে। বেঁধে এনে তোলা হলো বড় বজরায়।
বালির চরায় চিত হয়ে শুয়ে পড়েছে মুসা। ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়ছে।
তাড়াতাড়ি গিয়ে মলম আর আয়োডিন নিয়ে এল রবিন। মুসার ক্ষতগুলো পরিষ্কার করতে বসল।
দারুণ দেখিয়েছ হে, সেকেণ্ড, হেসে বলল কিশোর। স্কুলে গিয়ে বললে বিশ্বাসই করবে না কেউ।
প্রশংসায় খুশি হলো মুসা। ধরতে বলেছ, ধরে দিয়েছি, আমি আর কিছু জানি না। খাওয়ানোর দায়িত তোমাদের। ওর জন্যে রোজ চার-পাঁচ কেজি পিঁপড়ে জোগাড় করবে কে?
পিঁপড়ে লাগবে না, হাত নাড়ল কিশোর। চিড়িয়াখানায় মাংসের কিমার সঙ্গে কাঁচা ডিম মেখে খাওয়ায়। তা-ই খাওয়াব।

রাখবে কোথায়?
বজরাতেই। শান্ত স্বভাবের জানোয়ার। দুর্ব্যবহার না করলে রাগে না। দু দিনেই পোষ মেনে যাবে।
মরা জানোয়ারটাকে কেটে রান্না করল ইনডিয়ানরা।
কিশোর এক টুকরো মুখে দিয়েই থু থু করে ফেলে দিল।
মুখে দিয়ে মুখ বাঁকা করে ফেলল মুসা। এহহে, এক্কেবারে সিরকা। এর চেয়ে কাঁচা পিঁপড়ে খাওয়া সহজ।
রবিন মুখেই দিল না।
ইনডিয়ানরা খেলো। পিঁপড়েখেকোর মাংস নাকি রোগ সারায়।

.

আগুন! আগুন! বনের দিকে হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠল কিশোর।
আমাজনের কিনার দিয়ে চলেছে আবার বজরা-বহর।
ইনডিয়ানদের গাঁ জ্বলছে, অনুমানে বলল রবিন।
না, মাথা নাড়ল জিবা। বিদেশীর ঘর, রিও থেকে এসেছে। ফার্ম করেছে। ওখানে। বোধহয় ইনডিয়ানরা জ্বালিয়েছে।
এই, নৌকার মুখ ঘোরাও, নির্দেশ দিল কিশোর।
হাল ঘোরাল না জিবা। ইনডিয়ানরা যদি থাকে? ধরে কেটে ফেলবে।
জলদি ঘোরাও, জিবার কথা কানেই তুলল না কিশোর। আগুন নেভাতে হবে। জলদি।
কথা শুনল না জিবা। আগের মতই হাল ধরে রইল।
মঞ্চে উঠে ধাক্কা দিয়ে তাকে সরিয়ে হাল ধরল মুসা। ঘুরিয়ে দিল নৌকার গলুই।
বিড়বিড় করতে করতে মঞ্চ থেকে নেমে এল জিবা।
তীর থেকে কয়েক ফুট দুরে নোঙর ফেলা হলো। মাটিতে গলুই ঠেকিয়ে। রাখলে বন্দিরা পালাতে পারে, সেজন্যে এই সতর্কতা।
তীরে নামল সবাই। কিশোর আর রবিনের হাতে বন্দুক, মুসার হাতে রাইফেল। ইনডিয়ানদের হাতে তীর-ধনুক, রো-গান আর বল্লম। জিবার হাতে বিশাল এক ছুরি।
চলার সময় খালি পেছনে পড়ছে সে। নৌকার দড়ি কেটে নৌকা নিয়ে পালানোর মতলব আঁটছে বোধহয়। সতর্ক রয়েছে কিশোর। লোকটাকে চোখের আড়াল করল না।
কিন্তু দেরি করিয়ে দিচ্ছে জিবা। শেষে বিরক্ত হয়ে তাকে সবার সামনে ঠেলে দিল কিশোর। তুমি আগে থাকো। জোরে হাঁটো।
গোঁ গোঁ করে প্রতিবাদ জানাল জিবা। কিন্তু কান দিল না কিশোর।

খানিক দূর এগোতেই আগুন আরও ভালমত দেখা গেল। বালতি নিয়ে। ছোটাছুটি করছে একজন লোক, কুয়া থেকে পানি এনে আগুনে ছিটাচ্ছে। কিন্তু কুলিয়ে উঠতে পারছে না।
জিবার পিঠে বন্দুকের নল দিয়ে খোঁচা মেরে বলল কিশোর, দৌড় দাও।
দৌড়ে এগোল সবাই।
একদল সশস্ত্র লোক দেখে চমকে কোমরের কাছে হাত দিল তরুণ লোকটা, হতাশ হলো। রিভলভার থাকার কথা, কিন্তু নেই।
বালতি-টালতি আর আছে? চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর।
ভয় চলে গেল লোকটার চেহারা থেকে। ইংরেজিতেই জবাব দিল, ওই যে, ওখানে আছে। একটা চালাঘর দেখাল।
যে যা পারল-বালতি, ড্রাম, মগ তুলে নিয়ে কুয়ায় ছুটল সবাই।
গোটা দুই চালা জ্বলে শেষ। বড় ঘরটায় আগুন ধরেছে। পানি নিয়ে ওটা বাঁচাতে ছুটল। টিনের চাল, গাছের বেড়া, তাই ঘরের আগুন দ্রুত ছড়াতে পারল না। নিভিয়ে ফেলা গেল।
হাঁপাতে হাঁপাতে ভেতরে ঢুকল লোকটা। এক দিকের বেড়া পুড়েছে, ঘর কালিতে মাখামাখি। ছাইয়ে ভরা মেঝেতেই চিত হয়ে শুয়ে পড়ল সে।
ধরাধরি করে তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে খাঁটিয়ায় শুইয়ে দিল তিন গোয়েন্দা। হারিকেন জ্বালল। প্রায় বেহুঁশ হয়ে পড়ে রইল লোকটা, চোখ বন্ধ। জখম-টখম আছে কিনা, পরীক্ষা করে দেখল কিশোর। না, তেমন কোন জখম নেই। বেশি পরিশ্রমে কাহিল হয়ে গেছে।
দৌড়ে গিয়ে কুয়া থেকে তোয়ালে ভিজিয়ে আনল মিরাটো।
ভেজা তোয়ালে ভাঁজ করে লোকটার কপালে বিছিয়ে দিল কিশোর।
আস্তে করে চোখ মেলল লোকটা। চোখা চেহারা। চোখে বৃদ্ধির ছাপ। ফ্যাকাসে মুখে হাসি ফুটল। নড়ে উঠল ঠোঁট, থ্যাংকস।
এক গেলাস খাবার পানি নিয়ে এল রবিন।
লোকটার মাথার নিচে হাত দিয়ে ধরে তুলে আধশোয়া করল মুসা।
রবিনের হাতে গেলাস রেখেই পানি খেলো লোকটা। সোজা হয়ে বসে ঘরের চারদিকে চোখ বোলাল। সব কিছু এলোমেলো, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। বাক্সগুলো মেঝেতে পড়ে আছে, খালি। আলমারির দরজা খোলা, তাক খালি। ভেতরের কিছু কিছু জিনিস ছড়িয়ে আছে মেঝেতে। বোঝা গেল, ডাকাতি হয়েছে। লুট করে নিয়ে গেছে জিনিসপত্র। মূল্যবান কিছুই রেখে যায়নি ডাকাতরা। মেঝেতে আর কিছু কাগজে রক্তে লেগে আছে।

একটা মানিব্যাগ পড়ে আছে দেখে তুলে নিয়ে খুলল কিশোর। খালি। একটা চেয়ার উল্টে পড়ে আছে, পায়ায় রক্ত। মারামারিও হয়েছিল মনে হচ্ছে?
মাথা নোয়াল লোকটা। হ্যাঁ, গলায় জোর নেই।
একাই থাকেন?
আবার মাথা নোয়াল।
খুব বিপজ্জনক জায়গা। ইনডিয়ানদের এলাকা, না?
ডাকাতরা ইনডিয়ান নয়।
ইনডিয়ান নয়? তাহলে... থেমে গেল কিশোর। ভ্যাম্প না-তো? কি ভাষায় কথা বলেছে?
ইংরেজি, অশুদ্ধ। আমাকে এসে জিজ্ঞেস করল, দুটো বড় নৌকা দেখেছি কিনা, জানোয়ার বোঝাই। বললাম, না। খাবার চাইল। আট-দশজন লোকের কম লাগে? তা-ও যা পারলাম, দিলাম। আরও চাইল। শেষে আমার সমস্ত সাপ্লাই কেড়ে নিল। বাধা দেয়ায় আমাকে ঘুসি মেরে ফেলে দিল দৈত্যটা।
ভ্যাম্পায়ার বাদুড়ের মত চেহারা?
তুমি জানলে কিভাবে?
আমাদের পিছু নিয়েছে ওরা। মেঝের রক্ত দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর, ভ্যাম্পের?
না, আরেকটার। আমার বন্দুক-টন্দুক আগেই কেড়ে নিয়েছে। দৈত্যটাকে ছুরি মারতে গেলাম। সরে গেল সে, ছুরি গাধল তার পেছনের লোকের গায়ে। রাগে। ওই ব্যাটাই আগুন লাগিয়েছে ঘরে। আমার সবকিছু নিয়ে চলে গেছে। আমাকে ফেলে গেছে কষ্ট পেয়ে মরার জন্যে।
দেখে তো ইংরেজ মনে হয় না আপনাকে। কিন্তু ইংরেজি তো ভালই বলছেন?
আমি ব্রাজিলিয়ান। নাম বুয়েনো ল্যানসো। রিওতে স্কুলে ইংরেজি শিখেছি।
বসে থাকতে কষ্ট হচ্ছে, শুয়ে পড়ল আবার লোকটা। কয়েক সেকেণ্ড জিরিয়ে নিয়ে বলল, রিওতে এখন স্লোগান, দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার ও গো ওয়েস্ট, ইয়াং ম্যান। আমাদের সরকার চায়, এই পতিত অঞ্চলটাও আবাদ হোক। তাই আমি চলে এসেছি এখানে। হয়তো বোকামিই করেছি, চোখ বুজল ল্যানসো।
খানিক পরেই মেলল আবার। ম্লান আলোয় জ্বলজ্বল করছে চোখের তারা। নিজেকে যেন সান্তনা দিল, না, বোকামি করিনি। নতুন দুনিয়া খুঁজতে বেরিয়ে কলম্বাস কি বোকামি করেছিলেন? আমেরিকানরা যদি মনে করত, পশ্চিমে যাওয়া বোকামি, তাহলে কি গড়ে উঠত আজকের ইউনাইটেড স্টেটস? কনুয়ে ভর দিয়ে কাত হয়ে কিশোরের দিকে তাকাল সে। জানো, কি বিরাট সম্ভাবনা লুকিয়ে রয়েছে এখানে? পৃথিবীর বৃহত্তম পতিত জায়গা এটা। এর বেশিরভাগ

জায়গাতেই মানুষ যায়নি এখনও। খনিজ আর বনজ সম্পদে সমৃদ্ধ এই অঞ্চল। শুধু এই এক আমাজনই পৃথিবীর সব মানুষের মুখে খাবার তুলে দিতে পারে। এখানে এখন প্রতি বর্গমাইলে একজনেরও কম মানুষ। নোক দরকার, বুঝেছ, অনেক লোক দরকার এখানে। আমাজনকে আবাদ করতে পারলে দুনিয়ার মানুষ আর না খেয়ে মরবে না। যারা এখানে আগে এসে বসত করবে, কাজের লোক হলে তাদের কপাল খুলে যাবে, আমি লিখে দিতে পারি।
ল্যানসোর কথাতেই বোঝা যায়, উচ্চশিক্ষিত।
ঠিক আছে, কথা পরে হবে, বলল কিশোর। আপনি এখন বিশ্রাম নিন।
শুয়ে পড়ল আবার ল্যানসো, কিন্তু কথা বন্ধ করল না, দুনিয়ায় কেন এত হাহাকার জানো? কেন শান্তি নেই? মূল সমস্যাটা হলো, ক্ষুধা। সেই ক্ষুধা মিটাতে পারবে আমাজন। আর সেটা মিটলেই পৃথিবীতে শান্তি ফিরে আসবে।
আপনি দুর্বল। ঘুমোন?
হাসি ফুটল ল্যানসোর ঠোঁটে। পাগলের প্রলাপ ভাবছ তো? সকালেই বুঝবে, মিছে কথা বলছি না আমি। এখনকার মাটিতে কি জাদু আছে বুঝবে।
পোড়া বেড়ার দিকে তাকাল কিশোর। ভেঙে ফেলা আসবাবের ওপর চোখ বোলাল। গান-র‍্যাক খালি, একটা বন্দুকও নেই, সব নিয়ে গেছে। ড্রয়ারগুলো শুন্য। বাক্স খালি। মানিব্যাগ ফাঁকা। ফতুর করে দিয়ে গেছে আপনাকে, বলল সে। এখানে থাকবেন কি করে আর?
চুপ করে রইল ল্যানসো।
আপনি শিক্ষিত লোক, কথা শুনেই বুঝেছি। কিছু মনে করবেন না, একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করি, এখানে আসার আগে কি কাজ করতেন?
রিওতে কলেজের লেকচারার ছিলাম।
তাহলে আবার রিওতেই ফিরে যেতে পারেন। এখানে থেকে কি করবেন। নানা উটকো ঝামেলা, ডাকাত, ইনডিয়ান..এই ভীষণ জঙ্গলে একা কারও পক্ষে কিছু করা সম্ভব নাঃ..আমি আর কি বোঝাব? আপনিই আমাকে পড়াতে পারেন। এক কাজ করুন, কাল চলুন আমাদের সঙ্গে।
ল্যানসোর শুয়োরের খোঁয়াড় খালি, যা ছিল নিয়ে গেছে ভ্যাম্প। গোয়ালে একটা গরু নেই, জ্যান্ত নিতে পারেনি, জবাই করে মাংস নিয়ে গেছে।
কিন্তু বাগান নিয়ে যেতে পারেনি। ধান আর গমের খেত আছে, আছে সীম, লেটুস, শশা, গাজর, বাঁধাকপির বাগান।
পরদিন সকালে সে-সব দেখে তাজ্জব হয়ে গেল কিশোর। আমি তো ভেবেছিলাম, এত বৃষ্টি, মাটির রসকস কিছু নেই!

কিন্তু আছে যে, এখন তো বুঝতে পারছ? হাসল ল্যানসো। বরং অনেক বেশি আছে। দুনিয়ার চাষীদের সর্বক্ষণের চিন্তা-কি করে বেশি ফলাবে, বড় ফলাবে। এখানে এলে হয়তো ভাবতে শুরু করত, কি করে কম ফলিয়ে ফলন স্বাভাবিক রাখা যায়। এত বেশি ফলে, ঠেকিয়ে রাখা যায় না। রাতারাতি বেড়ে যায় ঘাসের জঙ্গল। রোজ নিড়ানি লাগে। বিশ্বাস করবে? এক রাতে এক ফুট বেড়ে যায় বাশের কোড়। ইউনাইটেড স্টেটসে শস্যের যে চারা বড় হতে দুই-তিন হপ্তা। লাগে, এখানে লাগে বড় জোর তিন দিন। আর দেখো, কমলার সাইজ দেখো।

হাঁ হয়ে গেল কিশোর। পাকেনি এখনও। এখনই ফুটবলের সমান একেকটা, এত ধরেছে, পাতা দেখা যায় না। এগুলো কমলা!

কমলা। এখান থেকে বীজ নিয়ে গিয়ে ক্যালিফোর্নিয়ায় চাষের চেষ্টা হচ্ছে। ফলছে ঠিকই, কিন্তু কিছুতেই এত বড় করতে পারছে না। এর তিন ভাগের এক ভাগ বড় হয় ওগুলো।

ফল গাছেরও অভাব নেই। আম, অ্যাভোকাডো, কোকা, রুটিফল গাছে ধরে আছে রাশি রাশি ফল। কলার ঝাড়ের প্রায় প্রতিটি গাছেই কলা। খানিকটা খোলা জায়গায় ঘন সবুজ হাতিঘাস, তারপরে শুরু হয়েছে মূল্যবান গাছের জঙ্গল। লোহাকাঠ, মেহগনি, সিভার ও রবার গাছের সীমা-সংখ্যা নেই। আট-দশতলা বাড়ির সমান উঁচু ব্রাজিল-বাদাম আর মাখন-বাদাম গাছে যে কত বাদাম ধরেছে, আন্দাজ করা মুশকিল। আর আছে ছড়ানো বিশাল ডুমুর গাছ। আরও কিছু গাছ আছে, যেগুলো থেকে তেল বের করা যায়, সেই তেল কারখানার কাজে লাগে।

ইদানীং ইউনাইটেড স্টেটস আগ্রহ দেখাচ্ছে আমাজনের দিকে, বলল ল্যানসো। আমাজন ইনস্টিটিউট গড়েছে। বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞ ডজন ডজন। বিশেষজ্ঞ পাঠাচ্ছে আমাজন বেসিনে গবেষণা চালানোর জন্যে। কয়েকজন আমার ফাম দেখে গেছে। উৎসাহ দিয়ে গেছে ওরা।

ল্যানসোর হাত ধরল কিশোর। আমাকে মাপ করবেন, স্যার, আপনাকে চলে যেতে বলেছি বলে। এখন আমারই থাকতে ইচ্ছে করছে। চলি, গুড বাই।

বজরা-বহরে ফিরে এল অভিযাত্রীরা। নৌকা ভাসাল।

বুয়েনো ল্যানসোর অজান্তে তার গান-র্যাকে একটা রিভলভার, আর ২৭০ উইনচেস্টার রাইফেলটা রেখে দিয়ে এসেছে কিশোর। কয়েক বাক্স গুলি আর কিছু কাপড়-চোপড়ও রেখে এসেছে। বিছানার ওপর মানিব্যাগটা পাবে ল্যানসো, তবে এখন আর সেটা খালি নয়, তাতে কিছু ভলার রয়েছে।

দিয়েছে যতটা, এনেছে তার চেয়ে অনেক বেশি–অসাধারণ ওই শিক্ষকের দুর্জয় সাহস আর প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসের খানিকটা, যা ছাড়া টিকতে পারবে না এই ভয়াবহ আমাজনে।

দিন যায়, ভ্যাম্পের আর কোন সাড়া নেই। কিন্তু কিশোর জানে, তাদের আগে আগে চলেছে ডাকাতের দল। এখনও হয়তো বুঝতে পারেনি, যাদেরকে খুজছে, তারা রয়েছে পেছনে। যেই বুঝবে, পথে কোথাও ঘাপটি মেরে থাকবে। বজরা বহর কাছাকাছি হলেই দখলের চেষ্টা চালাবে।
রোজই কিছু না কিছু নতুন যাত্রী যোগ হচ্ছে বজরা-বহরে। একটা টকটকে লাল আইবিস পাখি, একটা গোলাপী শুনবিল, একটা সোনালি কনিউর, একটা কিউরেসো আর একটা কক অভ দা রক ধরল। সব কটাই পোষ মানল।
জানোয়ার ধরার নেশায় পেয়েছে কিশোরকে। এত ধরেও কিছুতেই সন্তুষ্ট হতে পারছে না।
আসল দুটোকেই ধরতে পারলাম না এখনও, একদিন বলল সে। অ্যানাকোন্তা আর টিগ্রে। মিরাটো, কিভাবে ধরি, বলো তো?
তরুণ ইনডিয়ানের ওপর বিশ্বাস জন্মে গেছে তিন গোয়েন্দার। পছন্দ করেছে তাকে। সে-ও পছন্দ করেছে ওদেরকে। অবসর সময়ে ঘন্টার পর ঘন্টা টলডোর ছাতে বসে গোয়েন্দাদের লিঙগুয়া জেরাল (জেনারেল ল্যাংগোয়েজ) শেখায় সে। আমাজনে প্রতিটি ইনডিয়ান গোত্রেরই নিজস্ব ভাষা রয়েছে। এছাড়া একটা সাধারণ ভাষা চালু আছে, যেটা আমাজন বেসিনের সবাই জানে, এখানকার ইনটারন্যাশ নাল ভাষা বলা চলে। বাইরের যারা ওখানে বেড়াতে কিংবা থাকতে যায়, ওই ভাষা শেখা তাদের জন্যে অতি জরুরী। কারণ বেশিরভাগ ইনডিয়ানই পর্তুগীজ জানে না, আর ইংরেজি প্রায় কেউই জানে না।
শিমি এল-টিগ্রের দেখা পাবে,বলল মিরাটে। বাঘের রাজ্যে চলে এসেছি।
এল-টিগ্রে কিংবা জাওয়ারের চেয়ে বাঘ বলাটাই সহজ। তাই না? মূসা বলল।
মাথা ঝাঁকাল কিশোর। বাঘই তো ওটা।
বাঘের সঙ্গে আবার কুস্তি করতে যেয়ো না,হেসে মুসাকে বলল রবিন। সাপ আর পিঁপড়েখেকো মনে কোরো না টিগ্রেকে। এক থাবায় টারজানগিরি খতম করে। দেবে।
হ্যাঁ, একমত হলো কিশোর। ভীষণ একরোখা। হার্টে গুলি খেয়েও নাকি থামে না, শিকারীর দিকে তেড়ে আসে। সহজে দম বেরোতে চায় না।
ঠিকই বলেছে মিরাটো, বাঘের রাজ্যে ঢুকেছে ওরা। রাতে প্রায়ই শোনা যায়। গর্জন। কাছ থেকে ভয়ঙ্কর শোনায়। বাতাসে কাপন তোলে সে-শব্দ, সেই সঙ্গে বুকের ভেতরেও।
একদিন রাতে দেখা দিল টিগ্রে।
হ্যামকে শুয়ে আছে কিশোর, মুখ ফিরাতেই দেখে বাঘ। বিশ ফুট দূরে। তাকে দেখতে পায়নি বাঘটা, আগুনের কুণ্ডের দিকে চেয়ে আছে কৌতূহলী চোখে। বড়

বড় হলুদ চোখ দুটো আগুনের মতই জ্বলছে। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বেড়ালের মত লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল, বেড়ালের মতই হা করে জিভ বের করে হাই তুলল।
বাঘের এই হঠাৎ আগমন আশা করেনি কিশোর। খাঁচা রেডি হয়নি, জাল তৈরি নেই, লোকজন সব ঘুমাচ্ছে; কেউ নৌকায়, কেউ তার কাছাকাছি-হ্যামকে কিংবা মাটিতে।
ওদের ডাকতে গেলে সতর্ক হয়ে যাবে বাঘটা।
কিশোরের পাশে রাখা আছে বন্দুক, কিন্তু এত সুন্দর জীবটাকে গুলি করতে চায় না সে। বিশ ফুট দূরে বাঘ শুয়ে আছে, ঘুমাতেও পারবে না। খুব তাড়াতাড়ি বাঘটারওনড়ার ইচ্ছে নেই, বোঝা যায়।
আগুনে কাঠ ফেলতে উঠল একজন ইনডিয়ান।
ঝট করে উঠে বসল বাঘ।
বন্দুকে হাত চলে গেল কিশোরের। কিন্তু তেমন বিপদে না পড়লে গুলি করবে। না। একে তো এই হ্যামকে থেকে নিশানা ঠিক রাখতে পারবে না, তার ওপর এক গুলি খেয়ে হয়তো কিছুই হবে না বাঘের, মাঝখান থেকে শান্ত বেড়ালটা উন্মত্ত শয়তান হয়ে যাবে।
হ্যাঁ, এখন তো দেখে শান্ত বেড়ালই মনে হচ্ছে ওটাকে। কিশোর জানে, সব। জানোয়ারই মানুষকে এড়িয়ে চলে। নিতান্ত বাধ্য কিংবা কোণঠাসা না হলে সহজে আক্রমণ করে না। জাগুয়ারও করে না। কিন্তু মানুষখেকো হলে আলাদা কথা।
ঘুমের ঘোরে কাঠ ফেলছে লোকটা। কাছে বসে আছে ভয়ঙ্কর এক জীব, তাকে লক্ষ্য করছে, খেয়ালই নেই তার।
ঘামছে কিশোর। বন্দুকে হাত। এমন করে তাকিয়ে আছে কেন বাঘটা? মানুষখেকো?
কাজ শেষ করে আবার শুয়ে পড়ল লোকটা।
বাঘটা শুয়ে পড়ল না। না, মানুষখেকো বোধহয় না। লোকটা নড়াচড়া করাতে সতর্ক হয়েছিল।
হাঁপ ছাড়ল কিশোর।
হঠাৎ পেছনের জঙ্গলে পিরের তীক্ষ্ণ নাকি ডাক শোনা গেল। চকিতে সেদিকে ঘুরে গেল হলুদ-কালো বিশাল মাথাটা। নিঃশব্দে উঠে ঝোপের ভেতরে, হারিয়ে গেল বাঘ।
অপেক্ষা করছে কিশোর।
এক সঙ্গে হুইসেল বাজল এবং বাজ পড়ল যেন বনের ভেতরে। পিরের তীক্ষ্ণ আর্তনাদ, আর বাঘের ভীষণ গর্জন। কয়েক সেকেণ্ড হুটোপুটির পর থেমে গেল।

সব শব্দ।
ক্যাম্পের সবাই জেগে গেছে।
বাঘে ধরল না! হ্যামক থেকে ভেসে এল মুসার কম্পিত কণ্ঠ।
ভাগ্যিস আগুন জ্বলছে। বলল রবিন।
হ্যামকে থেকেই জানাল কিশোর, কি হয়েছে।
এরপর আবার ঘুমাতে দেরি হলো সকলেরই।
সকালে নাস্তা সেরে বেরোল অভিযাত্রীরা। বাঘের পায়ের ছাপ ধরে এগোল।
স্যুপ-প্লেটের সমান বড় একেকটা ছাপ, গোল। পিরিচের কিনারে আঙুলের ছাপ স্পষ্ট, কিন্তু নখের দাগ নেই। হাটার সময় নখ ভেতরে লুকিয়ে রাখে জাগুয়ার, বেড়ালের মত।
দেখে মনে হয়, মুসা বলল, পায়ে মখমলের প্যাড লাগানো।
ওই প্যাড লাগানো থাবারই থাপ্পড় খেয়ে বড় বড় ষাড়ের মেরুদণ্ড ভেঙে যায়, মিরাটো বলল।
আগে আগে হাঁটছে সে। সে না থাকলে এই ছাপ অনুসরণ করে এগোতে পারত না তিন গোয়েন্দা, বুঝতই না কিছু।
তাপিরকে যেখানে আক্রমণ করেছে বাঘটা, সে-জায়গাটায় এসে দাঁড়াল ওরা। ঝড় বয়ে গেছে যেন। ঝোপের ডাল ভাঙা, লতা ছেঁড়া, পাতা ছেঁড়া, খানিকটা জায়গার ঘাস দলে-মুচড়ে রয়েছে। রক্ত লেগে আছে।
কিশোর আশা করেছিল, তাপিরের মড়ির অবশিষ্টটা দেখতে পাবে। হতাশ হলো। কিছুই নেই। তারমানে জাগুয়ার আর ফিরে আসবে না এখানে। শিকার কাহিনীতে পড়েছে, মডির কিছু হাড়গোড় বাকি থাকলেও খাওয়ার জন্যে ফিরে আসে বাঘ। কাছাকাছি ওত পেতে থাকে তখন শিকারী। ফাঁদ পেতে। জানোয়ারটাকে ধরে, কিংবা গুলি করে মারে। ধরার আশায়ই দলবল নিয়ে এসেছে। কিশোর, লাভ হলো না।
দেখো, হাত তুলল রবিন। নিশ্চয় ইনডিয়ানরা গেছে।
ইনডিয়ান না, মিরাটো মাথা নাড়ল। বাঘ।
এত চওড়া! কটা বাঘ গেছে?
একটাই, মুচকি হাসল মিরাটো। তাপির টেনে নিয়ে গেছে।
অবিশ্বাস্য কাণ্ড। ঝোপের মাঝে তিন-চার ফুট চওড়া একটা পথ করে রেখেছে, রোলার চালানো হয়েছে যেন ওখান দিয়ে।
এত ভারিটাকে টেনে নিল? চোখের সামনে দেখছে আলামত, তবু মুসার বিশ্বাস হচ্ছে না।

ওই পথ ধরে এগোল ওরা। সাবধানে খুব আস্তে আস্তে পা ফেলছে। যে কোন মুহূর্তে মড়ির সামনে পড়তে পারে, হয়তো বা বাঘেরও।
কিন্তু শেষ আর হতে চায় না পথ। মাইলখানেক পেরিয়ে নদীর পাড়ে এসে পড়ল ওরা। চিহ্ন শেষ।
ভুরু কুঁচকে তাকাল কিশোর। নদীটা কয়েক মাইল চওড়া।
ওই নদী পেরিয়েছে। গালে আঙুল রাখল রবিন।
পেরোলে অবাক হব না, মিরাটো বলল। এর চেয়ে বেশি ভার নিয়ে সাঁতরে নদী পেরোতে দেখেছি টিগ্রেকে। তবে মনে হয়, এই বাঘটা তা করেনি। পানিতে নেমে শিকারকে খানিকদূর টেনে নিয়ে গিয়ে এপাড়েই আবার কোথাও উঠেছে। এদিকেও হতে পারে, ওদিকেও। হয়তো তার বৌ-বাচ্চা আছে, তাদেরকে নিয়ে খাবে।
এ-রকম ঘটনার কথা কিশোর পড়েছে। ঘোড়া মেরে ঘন ঝোপঝাড়ের মধ্যে। দিয়ে জাগুয়ারকে টেনে নিয়ে যেতে দেখেছেন একজন বিখ্যাত ব্রাজিলিয়ান শিকারী জেনারেল রনডন। শিকারীর চোখকে ফাঁকি দেয়ার জন্যে নদীতে নেমে কিনারের পানি দিয়ে টেনে নিয়ে গেছে খানিক দূর, যাতে চিহ্ন না থাকে। তারপর আবার উঠে পানির ধারে একটা ঘন ঝোপে লুকিয়েছে ঘোড়াটাকে।
তাপির নিয়ে যেখানে নদীতে নেমেছে জাগুয়ার তার আশেপাশে কিছুদূর। খোঁজাখুজি করল মিরাটো। কিন্তু আর কোন চিহ্ন চোখে পড়ল না। বিড়বিড় করল, নদীর ওপারেই চলে গেল নাকি?
ক্যাম্পে ফেরার পথে জাগুয়ারের ক্ষমতার আরও নজির দেখা গেল। মাটি থেকে ছয়-সাত ফুট উঁচুতে বিশাল এক গাছের বাকল ফালাফালা। মিরাটো জানাল, ওখানে নখ ধার করেছে টিগ্রে। নখের আচড়ের কয়েক ফুট নিচে খসখসে বাকল মসৃণ হয়ে গেছে। জানোয়ারটার পেটের ঘষায় হয়েছে ওরকম।

.

নৌকা চলেছে।
বড় বজরার গলুইয়ের কাছে বসে আছে রবিন। হঠাৎ হাত তুলল সে। কি ব্যাপার? দেখতে এল অন্য দুই গোয়েন্দা
ইশারায় দেখাল রবিন।
নদীর পাড়ে এক জায়গার ঝোপঝাড় সামান্য ফাঁকা। একটা মরা গাছ পানিতে পড়ে আছে। তার ওপর বসে আছে একটা জাগুয়ার। মুখ আরেক দিকে ফেরানো, মাছ ধরায় ব্যস্ত সে।
লেজ দিয়ে পানিতে বাড়ি মারছে, পানিতে ফল কিংবা বড় পোকা পড়লে যেমন হয়, তেমনি আওয়াজ করছে।

হঠাৎ থাবা মারল জাগুয়ার। পানির ওপরে তুলতেই দেখা গেল নখে গেঁথে। ছটফট করছে একটা মাছ।
আরাম করে চিবিয়ে মাছটাকে খেলো সে। আবার লেজ নামাতে গিয়ে কি মনে করে মুখ ফেরাল। অলস ভঙ্গিতে দেখল নৌকা আর যাত্রীদের। মনে মনে। বোধহয় বলল, নাহ, আর হবে না। গেল আমার মাছ ধরা। আস্তে করে উঠে গাছ। থেকে লাফিয়ে নামল মাটিতে। আরেকবার নৌকার দিকে চেয়ে, রাজকীয় চালে হেলেদুলে হেঁটে ঢুকে গেল বনে।
দাঁত বের করে হাসছে মিরাটো। খুব চালাক, এমনভাবে বলল, যেন ওটা তার পোষা বাঘ।
কাণ্ডটা করল কি। রবিনের দিকে ফিরল মুসা। নথি. তোমার বই কি বলে? সত্যি লেজের বাড়ি দিয়ে মাছ ডেকে আনল?
নিজের চোখেই তো দেখলাম, রবিন বলল। অবিশ্বাস করি কি করে? দাঁড়াও, আসছি। টলডোর ভেতরে গিয়ে একটা বই নিয়ে এল। নেচারালিস্ট ওয়ালেসের লেখা। বইয়ের পাতা উল্টে এক জায়গায় এসে থামল। এই যে, লিখেছেন : ব্রাজিলের জঙ্গলের সবচেয়ে বুর্ত জীব জাগুয়ার। যে কোন পাখি কিংবা জানোয়ারের ডাক নকল করতে পারে। ডেকে কাছে নিয়ে আসে। তারপর ধরে ধরে খায়। মাছ ধরে আড়ত কৌশলে লেজ দিয়ে পানিতে বাড়ি মারে। ফল কিংবা পোক পড়েছে ভেবে ওপরে উ আনে মাছ, ধারে ফেলে তখন জাগুয়ার। কাছিমও ধরতে পারে। শুধু তাই না, পাতি কাতাশকেও আক্রমণ করে বসে। একজন। প্রত্যক্ষদর্শী আমাকে জানিয়েছে, একটা শুভশকে মেরে ফেলতেও নাকি দেখেছে সে। গরুর ওজনের প্রাণীকে সহজেই টেনে তুলেছে ডাঙায়।
খাইছে! কিশোরের দিকে ফিরল মুসা। এই জীবকে ধরতে চাও? পাগল!
আগ্রহ দেখাল জিবা, সিনর কি টিগ্রে ধরতে চাও?
হ্যাঁ, কিশোর আশা করল, জিবা তাকে সাহায্য করতে চায়।
কিন্তু টিগ্রে তো ধরতে পারবে না।
কেন?
বিশ-তিরিশজন দরকার। আমরা আছি নয়জন, তা-ও তিনজন... মুসার ওপর চোখ পড়তে শুধরে নিল, দু-জন ছেলেমানুষ।
ভুল বলেনি জিবা, মনে মনে স্বীকার করল কিশোর। কিন্তু যে যা-ই বলুক, টিগ্রে না ধরে ছাড়বে না সে। গায়ের জোরে না পারলে বুদ্ধির জোরে ধরবে।
দুপুরে নৌকা তীরে ভেড়ানোর নির্দেশ দিল সে। খাওয়া সেরে নিয়ে কাজে লাগিয়ে দিল লোকজনকে। জিবা প্রতিবাদ জানালে বলল, দেখো, বাঘ না ধরে আমি যাচ্ছি না এখান থেকে। যত দিন লাগে লাগুক।

সোজা, শক্ত দেখে বাঁশ কাটা হলো। সেগুলোকে কাঁচা লিয়ানা লতা দিয়ে বেধে মজবুত খাঁচা তৈরি হলো। একটামাত্র দরজা রাখা হলো খাঁচার।
ইচ্ছে করেই ছোট রেখেছে খাঁচাটা কিশোর। যাতে ভেতরে ঢুকে নড়াচড়ার বিশেষ জায়গা না পায় বাঘ, তাহলে ভাঙতে পারবে না। চার ফুট উঁচু আর চার ফুট পাশে, লম্বা দশ ফুট।
নদীতে কোন পথে পানি খেতে যায় বাঘ, খুঁজে বের করল মিরাটো।
পথের ওপর একটা গর্ত খুঁজতে বলল কিশোর, সবার সঙ্গে সে-ও হাত লাগাল। জিবাকে দিয়ে কোন কাজই করানো যাচ্ছে না। একটা গাছের তলে বসে বকবক করছে আপনমনে।
গর্ত খোঁড়া শেষ হলো। ছয় ফুট গভীর, ব্যাসও প্রায় ছয় ফুট। কয়েকটা বাঁশ কেটে টুকরো করে বিছানো হলো গর্তের ওপরে। লতাপাতা দিয়ে এমনভাবে ঢেকে দেয়া হলো, যাতে গর্ত আছে বোঝা না যায়। মোটা দড়ির ফাঁস বানিয়ে তার ওপর রাখল কিশোর, সেটাকেও ঘাসপাতা দিয়ে ঢাকা হলো। গর্তের প্রায় ওপরে এসে ঝুঁকেছে বিশাল এক ডুমুর গাছের ডাল। দড়ির আরেক মাথা ওই ডালে বেঁধে দিল সে। বাঘ এসে গর্তে পড়লে ওই ফাসের মধ্যখান দিয়ে পড়বে, আটকে যাবে।
খাঁচাটা এনে রাখা হলো গর্তের কাছে, ঝোপের ভেতর লুকিয়ে। বাঘ ধরা পড়লেই যাতে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে ঢোকানো যায় খাঁচায়। তাই
কোন কাজ হবে না, নাকমুখ কুঁচকে বলল জিবা।
কান দিল না কেউ।
ক্যাম্পে ফিরে অপেক্ষায় রইল সবাই।
দিন শেষ। রাতের শুরুতেই গর্তের কাছে চেঁচামেচি শোনা গেল। গিয়ে দেখা গেল, বাঘ নয়, ঝামেলা পাকানোর ওস্তাদ তাপির। হতাশ হলো কিশোর। একটা আছে, আরেকটা নিয়ে কি করবে? নৌকায় জায়গাও নেই। বাধ্য হয়ে ছেড়ে দিতে হলো।
ভারি জানোয়ারটাকে টেনে তুলে ফাঁসমুক্ত করে গর্তের মুখে আবার লতাপাতা বিছাতে, ফাঁস পাততে, দুই ঘণ্টা লেগে গেল। অযথা সময় নষ্ট আর পরিশ্রম।
আবার ফিরে এল ওরা ক্যাম্পে। আবার অপেক্ষার পালা। সময় যাচ্ছে। বাঘের সাড়াশব্দ নেই।
মিরাটো, কিশোর বলল। বাঘ তো নেই মনে হচ্ছে। অন্য জানোয়ার এসে খামোকা ঝামেলা করবে। কি করি?
বাঘকে ডেকে আনতে হবে, শান্তকণ্ঠে বলল মিরাটো।
কিশোর, রবিন এমনকি মুসাও জানে কাজটা অসম্ভব নয়। ভারতের জঙ্গলে আসল বাঘকেও ডেকে এনে গুলি করে মেরেছেন জিম করবেট আর কেনেথ

অ্যাণ্ডারসনের মত শিকারীরা। করবেট চিতাবাঘকেও ডেকে এনেছেন। কিশোর। জানে, উত্তর আমেরিকার মুজ হরিণকেও ডেকে আনা যায়। আনে শিকারীরা।
পোঁটলা থেকে একটা শিঙ্গা বের করল মিরাটো। রওনা হলো গর্তের দিকে। সঙ্গে চলল তিন গোয়েন্দা!
গর্তের কাছ থেকে খানিক দূরে নদীর দিকে পেছন করে পথের পাশে ঝোপে ঢুকল মিরাটো। তার পাশে বসল তিন কিশোর।
শিঙ্গায় ফুঁ দিল মিরাটো। নিখুঁত জাগুয়ারের ডাক, কাশি দিয়ে শুরু হলো, ভারি গর্জন শেষ হলো কয়েকবার খোত খোত করে।
স্তব্ধ হয়ে গেল সারা বন, নিমেষে চুপ হয়ে গেল সমস্ত ডাকাডাকি। ভয়ে অবশ হয়ে গেছে যেন সব। কিন্তু বাঘ সাড়া দিল না।
ধারেকাছে নেই, নিচুকণ্ঠে বলল কিশোর।
খানিক বিরতি দিয়ে দিয়ে সারা রাতই ডাকল মিরাটো।
ভোরের একটু আগে আশা প্রায় ছেড়ে দিয়েছে ওরা, এই সময় শোনা গেল কাশি। নদীর অন্য পাড়ে।
জায়গা বদলাল চারজনে। গর্তের উল্টো ধারে আরেকটা ঝোপের ভেতরে। ঢুকল, মুখ এখন নদীর দিকে। আলো ফুটছে। কালো নদীর পানি ধূসর হয়েছে, কিন্তু বনের তলায় আগের মতই অন্ধকার।
ডাকল আবার মিরাটো। সঙ্গে সঙ্গে জবাব এল। আবার ডাক। আবার। জবাব। এগিয়ে আসছে বাঘ। আর মাইলখানেক দূরেও হবে না।
খানিকক্ষণ আর সাড়া নেই। হঠাৎ যেন একেবারে কানের কাছে বাজ পড়ল। নদী পেরিয়ে এসেছে জাগুয়ার। আর ডাকার সাহস হলো না মিরাটোর। চুপ করে রইল।
আরও কাছে বাজ পড়ল আরেকবার।
উত্তেজনায়, ভয়ে চোখের পাতা ফেলতে ভুলে গেছে যেন ওরী। ঝোপের দিকে চেয়ে আছে। তাই জানোয়ারটাকে দেখতে পেল না। প্রচণ্ড গর্জনে চমকে উঠল। ঝড় উঠল যেন গর্তের মধ্যে।
লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। পড়েছে! পড়েছে!
গর্তের কাছে দৌড়ে এল ওরা! চেঁচামেচি শুনে ক্যাম্প থেকে ইনডিয়ানরাও ছুটে এল।
ঘূর্ণিঝড় বইছে যেন গর্তের ভেতরে। পাতা, লতা আর ধুলো উড়ছে। মাঝে মাঝে কালো-হলুদ রঙের ঝিলিক।
গর্তের বেশি কাছে যাওয়ার সাহস নেই কারও।
সবাই খুশি, জিবা ছাড়া। মুখ কালো করে দাঁড়িয়ে আছে ডুমুর গাছটার গোড়ায়।

টানটান হয়ে গেছে দড়ি, ডালটা যেন তুফানে দুলছে। নুয়ে যাচ্ছে বার বার, ঝটকা দিয়ে সোজা হচ্ছে। বোঝা গেল, ফাসে আটকেছে বাঘ।
ফাঁদে তো পড়ল, এখন আসল কাজটা বাকি। বাঘকে খাঁচায় পোরা। কি করে। ঢোকাবে? গর্জনের দাপটেই বুকের ভেতরে হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে সবার।
খাঁচাটা গর্তের একেবারে কিনারে নিয়ে যেতে বলল কিশোর। গাছে চড়ে ডাল। থেকে দড়িটা খুলে আনল। তারপর খাঁচার খোলা দরজা দিয়ে দড়ির মাথা ঢুকিয়ে উল্টো দিকের দেয়ালের ফাঁক দিয়ে বের করল। এখন সবাই মিলে টানলে উঠে আসবে বাঘ, দরজা দিয়ে ঢুকতে বাধ্য হবে। শুনতে খুব সহজ, কিন্তু যারা করছে, তারা বুঝতে পারছে কাজটা কতখানি কঠিন।
খাঁচার পেছনে ঝোপে লুকিয়ে দড়ি ধরে টান দিল সবাই, জিবা বাদে। সে এসবে নেই, সাফ মানা করে দিয়েছে। দাঁড়িয়ে ছিল, এখন বসে পড়েছে ডুমুর গাছের গোড়ায়। কাজ তো করছেই না, টিটকারি দিচ্ছে, ভয় দেখাচ্ছে। ইনডিয়ানদের। ধমক দিয়েও চুপ করানো যাচ্ছে না তাকে।
চমৎকার ফন্দি করেছে কিশোর। উঠে এল জাগুয়ার। খাঁচার দরজায় মাথা ঢোকাল, আরেকটু হলেই ঢুকে যাবে শরীরটা। যারা টানছে তাদেরকে দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু মুখ ভোরাতেই চোখ পড়ল জিবার ওপর।
আর যায় কোথায়? ধরেই নিল, সমস্ত শয়তানীর মূলে ওই দু-পেয়ে জীবটা। জ্বলে উঠল হলুদ চোখ। ভয়ঙ্কর গর্জন করে হ্যাঁচকা টান মারল দড়িতে।
এতগুলো লোক মিলেও আর ধরে রাখতে পারল না, সরসর করে বেরিয়ে গেল। দড়ি, ঘষা লেগে তাদের হাতের চামড়া ছিলল।
আতঙ্কে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে গাছে উঠতে শুরু করল জিবা।
মাথা ঠাণ্ডা থাকলে হয়তো এই ভুল করত না। কারণ, তার জানা আছে। জাগুয়ার গাছেও চড়তে পারে।
গুলি করো! গুলি করো! চেঁচাচ্ছে জিবা।
মুসার রাইফেল আর কিশোরের বন্দুক সঙ্গেই রয়েছে। কিন্তু গুলি করল না। কেউ। এত কষ্ট করে ডেকে এনে ধরার পর মারতে চায় না বাঘটাকে।
ওপরে উঠে চলেছে জিবা। ভাবছে উঁচুতে সরু ডাল, ভেঙে পড়ার ভয়ে ওখানে। উঠবে না বাঘ। তা-ই হয়তো করত, কিন্তু জিবার কপাল খারাপ, সে নিজেই। যেতে পারল না ওখানে। ঘন পাতার আড়ালে রয়েছে বোলতার বাসা, না দেখে। হাত দিয়ে বসল তাতে।
আর যায় কোথায়। কার এত্তবড় সাহস! বোলতার বাসায় হাত দেয়! রাগে বনবন করে উঠল ওগুলো। চোখের পলকে এসে ছেকে ধরল জিবাকে। বিচার আচার-শুনানীর বালাই নেই, শরীরের যেখানে খোলা পেল সেখানেই হুল ফুটিয়ে দিল।

বাবাগো! মাগো! বলে চেঁচিয়েও রেহাই পেল না মিরাটো।
ওদিকে উঠে আসছে জাগুয়ার। বেয়াড়াপনা আজ ঘুচিয়েই ছাড়বে তার।
নিচ থেকে দেখছে দর্শকরা। গাছের বাকলে নখ বিধিয়ে ইঞ্চি ইঞ্চি করে উঠে। যাচ্ছে বাঘটা। শরীর লম্বা করে মিশিয়ে ফেলেছে ডালের সঙ্গে, অপূর্ব সুন্দর একটা কালো-হলুদ মোটা সাপ যেন।
কিন্তু জাগুয়ারের হাঁ করা মুখের দিকে তাকিয়ে কোন সৌন্দর্য দেখতে পেল না জিবা। তার মনে হলো, নরকের ইবলিসের দুটো চোখ, হাঁ করা চোয়ালে ধারাল দাঁতগুলো শয়তানের দাঁত। মুহূর্ত পরেই তাকে কেটে টুকরো টুকরো করবে। চেঁচিয়ে বন কাঁপাচ্ছে না আর বাঘ, গম্ভীর গোঁ গোঁ করছে কেবল। জিবার মনে হলো, ব্যাটা হাসছে। বাগে পেয়ে বেড়াল যেমন ইঁদুরকে খেলায়, টিগ্রে বদমাশটাও তা-ই করছে।
হা-হা করে হাসতে ইচ্ছে করছে মুসার। জাগুয়ারের ভয়ে পারছে না। যদি শব্দ শুনে তাদের দিকে নজর দেয় আবার? জিবার শাস্তিতে খুব খুশি সে। উচিত শিক্ষা হয়েছে বেয়াদবটার। গুলি সে অবশ্যই করবে জাগুয়ারকে, তবে শেষ মুহূর্তে। যখন দেখবে জিবার ঘাড় ভাঙতে উদ্যত হয়েছে। ততক্ষণ চালিয়ে যাক বোলতারা।
কিন্তু কিশোর আর চুপ থাকল না। জাগুয়ারের গলায় আটকে আছে এখনও ফাঁস, দড়ির আরেক মাথা ঝুলছে। তাড়াতাড়ি গিয়ে সেই মাথাটা গাছের সঙ্গে শক্ত করে বেধে দিল সে।
পাগলের মত দুই হাতে বোলতা তাড়াচ্ছে জিবা।
আরও কয়েক ইঞ্চি উঠে দড়িতে টান পড়ল। হঠাৎ বাধা পেয়ে রেগে গেল। আবার জাগুয়ার, প্রচণ্ড গর্জন করে হ্যাঁচকা টান মারল। টানাটানি আর ঘষাঘষিতে দড়ির একটা জায়গা নরম হয়ে গেছে, পট করে গেল ছিঁড়ে।
এবার ভয় পেল কিশোর।
হাসি উধাও হয়ে গেল মুসার মুখ থেকে।
রবিন হতবাক।
ইনডিয়ানরা বোবা।
আর বুঝি বাঁচানো গেল না জিবাকে!
বিপদটা জিবাও বুঝতে পেরেছে। কেঁদে ফেলল সে। বোলতার পরোয়া আর করল না, উঠে যেতে লাগল ওপরে। হুলের যন্ত্রণা এক সময় কমবে, কিন্তু জাগুয়ারে ধরলে নির্ঘাত মৃত্যু।
জাগুয়ারটা নাছোড়বান্দা। উঠে যাচ্ছে।

হাতের টিপ ভাল না কিশোরের, বন্দুকের গুলি বাঘের গায়ে না লেগে যদি জিবার গায়ে লাগে?–এই ভয়ে ট্রিগার টিপতে সাহস পাচ্ছে না।
কিন্তু মুসা আর দেরি করল না। রাইফেল তুলে গুলি করেই সরে গেল।
এত জোরে চেঁচিয়ে উঠল জিবা, মনে হলো গুলিটা সে-ই খেয়েছে।
গর্জে উঠল জাগুয়ার। মুখ ফিরিয়ে তাকাল। নতুন শত্রুদের দেখে আরেকবার গর্জন করে লাফ দিল পনেরো ফুট ওপর থেকে। চোখের পলকে এসে পড়ল মুহূর্ত আগে মুসা যেখানে ছিল সেখানে।
জাগুয়ারের একেবারে গায়ে নল ঠেকিয়ে গুলি করল কিশোর।
কাত হয়ে পড়ে গেল জীবটা। পরক্ষণেই গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল আবার যেন কিছুই হয়নি।
আবার গুলি করল মুসা। তাড়াহুড়োয় মিস করল।
গুলি করল কিশোর। পড়ে গিয়ে আবার উঠল জাগুয়ার। মুখে রক্ত। গর্জাচ্ছে। বাতাসের সঙ্গে নাক দিয়ে রক্তের ছিটে বেরোচ্ছে, মুখের কষেও রক্ত। কিন্তু থামল না। শাঁই শাঁই দুই থাবা চালাতে চালাতে ছুটে এল। মস্ত হাঁ, রক্তে মাখামাখি হয়ে। যাওয়ায় বিকট দেখাচ্ছে।
বন্দুকের দুটো নলই খালি। বোকার মত হাঁ করে চেয়ে আছে কিশোর।
গুলির পর গুলি করে চলেছে মুসা। কিন্তু বাঘের গায়ে লাগছে বলে মনে হলো না।
আর কিছু না পেয়ে একটা বাঁশের টুকরো তুলে নিয়ে ধা করে বাঘের পিঠে বসিয়ে দিল রবিন। ঘুরে তাকে ধরতে গেল জানোয়ারটা।
ভয়ে যে যেদিকে পারল ছুটে পালাল ইনডিয়ানরা। কিন্তু মিরাটো গেল না। বল্লম নিয়ে সাহায্য করতে এগোল তিন গোয়েন্দাকে। ইনডিয়ানদের বাঘ মারার বিশেষ বল্লম, দুই দিকেই ফলা।
ভয়ানক গর্জন করে, মুখ দিয়ে রক্তের ফোয়ারা ছিটিয়ে নতুন শত্রুকে সই করে। লাফ দিল বাঘ। শা করে পাশে সরে বল্লম বাড়িয়ে দিল মিরাটো। বাঘের বুক ছেদা করে ঢুকে গেল চোখা ফলা।
তাতেও থামল না দানব। ঝাড়া দিয়ে বুক থেকে বল্লম খুলে ফেলে আবার লাফ দিল।
আবার বল্লম বাড়িয়ে দিল মিরাটো। বাঘের বুকে আবার গাথল বল্লম। বল্লমের আরেক ফলা মাটিতে ঠেকিয়ে ছেড়ে দিল সে, লাফিয়ে সরে এল।
চাপে ধনুকের মত বাকা হয়ে গেল বল্লম। কিন্তু খুলল না। সোজা হলো, বাঘের পিঠ ফুড়ে বেরিয়ে গেল। এবার কাবু হয়ে এল জাগুয়ার, কিন্তু থামল না। মিরাটোর গলা সই করে লাফ দিল, ধরতে পারলে এক কামড়ে ছিঁড়ে ফেলবে কণ্ঠনালী।

সরে গেল মিরাটো।
বুক-পিঠ এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিয়েছে বল্লম, নড়াচড়া আর বেশি করতে পারছে না জাগুয়ার। থাবা আটকে যাচ্ছে, বল্লমের জন্যে নড়াতে পারছে না।
বন্দুকে গুলি ভরে ফেলেছে আবার কিশোর। বাঘের হৃৎপিণ্ড সই করে গুলি করল।
পড়ে গেল জাগুয়ার। তবু থামল না। এগোনোর চেষ্টা করল।
মাথায় গুলি করল মুসা।
এইবার শেষ হলো। লুটিয়ে পড়ল বাঘ।
কিন্তু জয়ের আনন্দে হাসতে পারল না কিশোর। তার মনে হলো, পরাজয়ই হয়েছে তাদের। জাগুয়ারকে জ্যান্ত ধরতে পারেনি।

.

ইনভিয়ানরা জাগুয়ারের মাংসও খেলো। মুসা এক টুকরো মুখে দিয়েই ফেলে দিল। কেমন শক্ত শক্ত রবারের মত, দাঁত দিয়ে কাটতে কষ্ট হয়, বাজে স্বাদ। ইনডিয়ানরাও ভাল বলছে না, তবু খাচ্ছে। ওদের বিশ্বাস, এই মাংস খেলে। জাগুয়ারের মতই সাহসী আর শক্তিশালী হয়ে উঠবে।
সেদিন রাতে গর্তের ওপর আবার ফাঁস পেতে রাখা হলো।
কিন্তু জাগুয়ার এল না।
ঠিক আছে, পরদিন সকালে বলল কিশোর, বাঘ না এলে আমরাই বাঘের কাছে যাব।
বেরিয়ে পড়ল সবাই।
বনের ভেতরে জাগুয়ারের পায়ের তাজা দাগ খুঁজে বের করল মিরাটো।
অনুসরণ করে চলে এল একটা পাহাড়ের গোড়ায়। একটা গুহার ভেতরে গিয়ে ঢুকেছে ছাপ।
বন্দুক হাতে টিপে টিপে গুহামুখের কাছে পৌঁছল কিশোর। সাবধানে উঁকি দিল ভেতরে। অন্ধকার। কিছুই চোখে পড়ল না। কোন নড়াচড়া নেই, সাড়া নেই, এমনকি নিঃশ্বাসের শব্দও নেই। মাংশাসী জীবের গায়ের বোটকা তীব্র গন্ধ রয়েছে। বাতাসে, তারমানে আছে জাগুয়ার। সুড়ঙ্গের অনেক ভেতরে।
সঙ্গে করে শক্ত জাল আনা হয়েছে, ম্যানিলা দড়ি দিয়ে তৈরি। গর্তের মুখে বিছিয়ে দেয়া হলো জাল।
চারপাশে খুঁটি গেঁথে তাতে আটকানো হলো এমনভাবে, উল্টোদিক থেকে যাতে সামান্য গুতো লাগলেই খুলে যায়।
জালের চার কোণায় চারটে লুপ রয়েছে, সেগুলোর ভেতর দিয়ে ঢুকিয়ে দেয়া হলো লম্বা মোটা একটা দড়ি। দড়ির দুটো প্রান্তই ঘুরিয়ে আনা হলো একটা

গাছের। ডালের ওপর দিয়ে।
জাল ঠেলে বেরোনোর চেষ্টা করবে জাগুয়ার। তাতে তার শরীরটা ঢুকে যাবে। জালের মধ্যে। দড়ি ধরে হ্যাঁচকা টান দিলেই তখন জালের চারকোণা এক হয়ে যাবে, আটকা পড়বে জীবটা। শূন্যে টেনে তোলা হবে তখন ওটাকে গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখা হবে, যতক্ষণ না তেজ কমে। তারপর খাঁচা এনে দরজা ওপরের দিকে করে জালসহ তার ভেতর নামিয়ে দেয়া হবে জাগুয়ারটাকে। দরজা বন্ধ করে জাল ছাড়ানোর ব্যবস্থা হবে, সেটা যেভাবেই হোক করা যাবে, পরের কথা পরে। আগেতো ধরা পড়ুক।
সারাক্ষণই চারজন করে পাহারা রইল দড়ির মাথার কাছে। চার ঘণ্টা পর পর পাহারা বদল হলো।
সারাটা দিন অপেক্ষা করে আছে সবাই। জাগুয়াবের দেখা নেই। বেলা। ডোবার সময় উত্তেজনা চরমে পৌঁছল। এই বুঝি নড়ে ওঠে জাল, মাথা দেখা যায়।
দিবাচরদের বাসায় ফেরার সময় হলো, জেগে উঠল নিশাচরেরা। ধীরে ধীরে শুরু হলো তাদের জারিগান, কিন্তু তার সঙ্গে সুর মেলাল না জাগুয়ার।
এতক্ষণ তো ভেতরে থাকার কথা নয়! হতাশ হলো কিশোর। নেই নাকি? . অন্য কোন মুখ আছে সুড়ঙ্গের, সেদিক দিয়ে বেরিয়ে গেছে।
গায়ে লাগছে সাঁঝের ফুরফুরে হাওয়া। পশ্চিম আকাশে রঙের খেলা। পাখি আর বানরের কিচির-মিচির কমতে কমতে থেমে গেল।
তবু মহারাজের দেখা নেই।
এভাবে হবে না, বলল মিরাটো।
আর তো কোন উপায়ও দেখছি না, হতাশা ঢাকতে পারল না কিশোর।
আছে। উপায় আছে। চলো, নৌকায় চলো।
বসে থাকতে থাকতে কিশোরেরও ভাল লাগছে না, উঠতে পেরে খুশিই হলো। সঙ্গে একজন ইনডিয়ানকে নিল মিরাটো। অন্যেরা বসে রইল দড়ির কাছে, মুসা আর রবিন, সেখানেই থাকল। জালও পাহারা দেবে, ইনডিয়ানদেরও। ব্যাটাদের বিশ্বাস নেই, সুযোগ পেলেই ফাঁকি দেয়।
ছোট বজরার দড়ি খুলল মিরাটো। দাঁড় বেয়ে চলল দুই ইনডিয়ান। চুপচাপ পাটাতনে বসে রইল কিশোর।
মাঝ নদীতে এসে নৌকা থামাল। দাঁড় রেখে শিঙ্গা মুখে লাগাল মিরাটো।
না হেসে পারল না কিশোর। বাঘের ডাক এত নিখুঁতভাবে বাঘও ডাকতে পারবে কিনা সন্দেহ।
নদীর পানি কি শান্ত দেখছ, এক সময় বলল মিরাটো। এমন রাতে সাঁতার কাটতে ভালবাসে টিগ্রে। মাছ ধরে। তখনই তাকে ধরতে সুবিধে। পানিতে জোর পায় না।

বিরতি দিয়ে দিয়ে ডেকে চলল সে।
ঘণ্টার পর ঘণ্টা পেরোল। নদীর খোলা বাতাসে শীত করছে কিশোরের। ঘুমে। জড়িয়ে আসছে চোখ। আগে ভাবত, বাঘ শিকারে সাংঘাতিক উত্তেজনা আর আনন্দ, কিন্তু এখন বুঝতে পারছে, বিরক্তকরও বটে। আহ, হ্যামকে শুয়ে এখন গায়ের ওপর ভারি কম্বল টেনে দিতে পারল:
আসছে, অনেক দূর থেকে যেন কানে এল মিরাটোর কণ্ঠ।
চোখ মেলল কিশোর। তীরের কাছে পানিতে মৃদু ছপছপ শোনা যাচ্ছে, আর কুমিরের কান্নার মত একটা শব্দ।
আবার ডাকল মিরাটো।
জবাব এল। কান্নার সঙ্গে কাশি মেশানো, মুখে পানি ঢোকায় অস্পষ্ট শোনাল আওয়াজটা।
বাঘ!
ঝট করে সোজা হলো কিশোর। ঘুম পালিয়েছে। ভাল করে তাকাল। তারার আলোয় আবছামত দেখা যাচ্ছে মাথাটা।
থামল ওটা, বাঘই, কোন সন্দেহ নেই। ছোট। এদিক ওদিক নড়ল, দ্বিধা করছে এগোতে। বোধহয় বোঝার চেষ্টা করছে, কোনদিকে আছে তার সাথী।
আস্তে আবার শিঙ্গায় ফুঁ দিল মিরাটো।
এগোতে শুরু করল আবার বাঘ।
উত্তেজনায় কাঁপছে কিশোর। কি করতে চাইছে তরুণ ইনডিয়ান?
নৌকার কিনারে চলে এল বাঘ। মাথাটা, আর লেজের খানিকটা পানির ওপরে, শরীর নিচে। ইচ্ছে করলে হাত বাড়িয়ে লেজ চেপে ধরা যায়, এত কাছে। সু তা-ই করল মিরাটো। শিঙ্গা রেখে হঠাৎ বাঘের লেজ চেপে ধরল। টেনে। তুলে ফেলল ওপর দিকে। ইনডিয়ান লোকটার নাম ধরে চেঁচিয়ে বলল, জলদি ছোটো, জলদি।
পাগলের মত দাঁড় বাইতে লাগল লোকটা।
নৌকা ছুটল। লেজ টেনে বাঘের পেছনের অনেকখানি পানির ওপরে তুলে ফেলেছে মিরাটো। মাথা ডুবে গেছে, তুলতেই পারছে না জানোয়ারটা। শ্বাসও নিতে পারছে না। অসহায় ভঙ্গিতে ছটফট করছে শুধু। লড়াই তো দূরের কথা, বেশিক্ষণ এই অবস্থা চললে দম বন্ধ হয়েই মরবে।
আস্তে আস্তে থেমে গেল বাঘের নড়াচড়া। ভেজা তুলোর বস্তা টেনে নিচ্ছে যেন এখন মিরাটো। দাঁড় বাওয়া থামাতে বলল।
নৌকায় তুলে নেয়া হলো বাঘটাকে। ছোট, বেশি ভারি না। যেটাকে সেদিন। মারা হয়েছে, তার তুলনায় বাচ্চা।

জাল এনে তার ওপর শুইয়ে দেয়া হলো বাঘটীকে। নড়ছেও না। মরে গেল নাকি? সাবধানে বুকে হাত রাখল কিশোর। না, ধুকপুক করছে।
নড়ে উঠল বাঘ।
লাফিয়ে সরে এল কিশোর। মিরাটো, জলদি! জাল!
দ্রুত জালের চার কোণ এক করে বেঁধে ফেলা হলো। হুশ ফিরেছে বাঘের। গোঁ গোঁ করছে আর জালের খোপ দিয়ে পা বের করে থাবা মারার চেষ্টা করছে। কিন্তু সুবিধে করতে পারল না, আটকা পড়েছে ভালমত। শূন্যে তুলে জালশুদ্ধ তাকে বাধা হলো মাস্তুলের সঙ্গে। ঝুলে থেকে বৃথাই অসহায় তর্জন-গর্জন চালাল টিগ্রে।
সকালে আরেকটা খাঁচা বানাতে হবে, বলল কিশোর।
কেন? খাঁচা তো আছেই? মিরাটো বলল।
তা আছে। কিন্তু গুহার মুখে জালও পাতা আছে। একটা ধরেছে, আরেকটা বাঘ ধরার লোভ ছাড়তে পারছে না কিশোর। বড় একটা।
ভোরের আলো ফুটল। কিন্তু সুড়ঙ্গের ভেতর থেকে বাঘ বেরোল না।
ঢুকে দেখবে নাকি?- ভাবল কিশোর। নাহ, বেশি ঝুঁকি হয়ে যাবে। কি একবার যখন মাথায় ঢুকেছে, কথাটা খোঁচাতে থাকল তাকে। শেষে উঠেই পড়ল। ঢুকবে, তারপর যা হয় হবে। গন্ধ আছে, বাঘ নেই, তাহলে গেল কোথায়? কোন রহস্যের সমাধান না করা পর্যন্ত তার স্বস্তি নেই।
সবাই বাধা দিল, ঠেকাতে পারল না। যাবেই সে। একটা বাঁশের টুকরোর মাথায় টর্চ বেধে হাতে নিল, আরেক হাতে মুসার বাবার পিস্তল। আশা, বাঘের প্রথম আঘাত আলো আর বাশের ওপর দিয়ে যাবে।
জালের এক কোণা তুলে সুড়ঙ্গে ঢুকল কিশোর।
অন্ধকার সুড়ঙ্গ, কয়েক পা এগিয়েই বয়ে মোড় নিয়েছে। বাতাসে বাঘের গায়ের গন্ধ তীব্র। মোড় নিতেই চাপা গর্জন কানে এল। হঠাৎ শীত করতে লাগল। কিশোরের। বোকামিই করে ফেলেছে!
বাঁশটা নেড়ে এখানে ওখানে আলো ফেলল। কিছুই নেই, শুধু দুটো আলোর গোলক
আরেকবার গোঁ গোঁ শব্দ।
কিন্তু বাঘ কই? আলো দুটো যদি চোখ হয়, পেছনে তো শরীরটা থাকবে। হলদে-কালো রঙ কই?
টর্চের আলো নড়তেই আবার হলো গর্জন।
কিশোর জানে, কোন জানোয়ারই আত্রান্ত না হলে সহজে মানুষকে আক্রমণ করে না। এক পা-ও আর এগোল না সে, তাহলে নিজেকে কোণঠাসা ভেবে। বসতে পারে জানোয়ারটা। তাড়াহুড়ো করে পিছিয়েও আসা যাবে না। তাহলে ও লাফিয়ে

এসে পড়তে পারে বাঘ। মোটকথা, এখন কোন ভাবেই চমকে দেয়া যাবে না ওটাকে।
ঢিবঢিব করছে বুকের ভেতর। কিশোরের ভয় হলো, তার হৃৎপিণ্ডের শব্দ চমকে দেবে বাঘটাকে।
আলো দুটো দেখা যাচ্ছে।
টর্চ নড়তেই আবার গর্জন। সামান্য আগে বাড়ল আলোদুটো।
এবার দেখল, কিশোর। কুচকুচে কালো মুখ। কালো শরীর। বুকের খাঁচায়। ধড়াস করে যেন আছাড় খেলো তার হৃৎপিণ্ডটা।
আমাজনের জঙ্গলের মহামূল্যবান সম্পদ, দুর্লভ কালো জাগুয়ার। যে কোন চিড়িয়াখানা লুফে নেবে, অনেক দামে।
পিস্তল উদ্যত রেখেছে কিশোর, কিন্তু ব্যবহার করতে পারবে না, জানে। করলে ক্ষতি ছাড়া লাভ হবে না। পিস্তলের গুলি ঠেকাতে পারবে না ওটাকে, মাঝখান থেকে জানোয়ারটাকেও হারাবে, তার নিজেরও প্রাণ যেতে পারে।
খুব সাবধানে পিছাতে শুরু করল কিশোর। একটা পার্থরের সঙ্গে হোঁচট লাগল, উল্টে পড়তে পড়তে সামলে নিল কোনমতে। ততক্ষণে যা হওয়ার হয়ে গেছে, ভড়কে গেছে জাগুয়ার। লাফিয়ে এসে পড়ল। থাবার প্রচণ্ড আঘাতে চুরমার হয়ে গেল বাঁশটা, টর্চ ভেঙে নিভে গেল।
বাঁশ ফেলে দিয়ে ঘুরে দৌড় দিল কিশোর। উন্মাদের মত ছুটে এসে পড়ল। গুহামুখের জালে। ঠেলার চোটে কোণগুলো ছুটল ঠিকই, সে জড়িয়ে গেল জালে। পেছনে কালো জাগুয়ারের ভীমগর্জন। রাগিয়ে দেয়া হয়েছে তাকে।
ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে লোকজন। তাদের হাতের দড়িতে টান পড়ল-ধরেই নিল তারা, জালে বাঘ পড়েছে। হ্যাঁচকা টানে তুলে ফেলল কয়েক ফুট। ভারি লাগছে। শিকার যে পড়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। টেনে আরও ওপরে তুলে ফেলল জাল।
আড়ালে বসেছে, গুহামুখটা দেখা যায় না। কিন্তু জালটা ওপরে উঠতেই দেখা গেল। সবার আগে দেখতে পেল মুসা। চোখ বড় বড়, হাঁ হয়ে গেল মুখ, কথা। ফুটছে, না। এ-কি! হেসে উঠল হো হো করে। রবিন হাসল। হেসে ফেলল ইনডিয়ানরাও। হাসির হুল্লোড় উঠল।
শিকার হাতছাড়া হয়ে গেছে। গর্তের মুখে দাঁড়িয়ে বার দুই ধমক দিল জাগুয়ার। আবার ঘরে ঢুকলে দেখাবে মজা; বোধহয় এটাই শাসিয়ে ফিরে গেল।
জালে ঝুলছে গোয়েন্দাপ্রধান। মাথা নিচে, ঠ্যাঙ ওপরে, জালের খোপ দিয়ে। বেরিয়ে ঝুলিছে দুই হাত এর চেয়ে মজার দৃশ্য আর আছে। হাসতে হাসতে মাটিতে শুয়ে পড়ল মুসা, পেট চেপে ধরে পা ছুড়ছে।

রবিনেরও মুখ দিয়ে ফেনা বেরিয়ে যাওয়ার জোগাড়, চোখে পানি এসে গেছে। কিন্তু হাসি থামাতে পারছে না। তাতে সুড়সুড়ি দিচ্ছে মুসার হাসি, আরও বেশি। হাসি আসছে।

হাসির কি হলো? ধমক দিল কিশোর, গলায় জোর নেই। নামাও। জলদি নামাওঃ::রাখো রাখো, আগে দেখো গুহার মুখে বাঘটা আছে কিনা।

বাঘ নেই দেখে জাল নামানো হলো। বেরিয়ে এল কিশোর।

হোওহ-হোহ্ হা-হা! হাসি থামছে না মুসার। দা গ্রেট টাইগার ম্যান! বাঘ ধরতে গুহায় ঢুকেছে! হা-হা-হা!

হাসছে রবিন।

রবিন, ইসসি, কি একখান মওকা গেল! হাসতে হাসতে বলল মূসা, তোমার ক্যামেরাটা থাকলে…ওই ছবি ইস্কুলে ভাড়া দিতে পারতাম…হো হো-হো!

.

আলোচনা-সভা বসল কি করে ধরা যায় কালো জাগুয়ার?

একেকজন একেক কথা বলল।

ধরতেই হবে ওটাকে, ঘোষণা করল কিশোর। সুন্দরবনের বাঘও এত দামী নয়।

কিন্তু কিভাবে? প্রশ্ন রাখল মুসা।

গতকাল থেকেই তো চেষ্টা হচ্ছে, রবিন বলল, ফাঁদে তো পা দিল না। ব্যাটা খুব চালাক।

একটা কথাও বলছে না মিরাটো। একমনে কাজ করে যাচ্ছে চুপচাপ। রুটিফুল গাছের রস দিয়ে আঠা তৈরি করছে, খুব ঘন।

ইনডিয়ানরা পাখি ধরতে ব্যবহার করে এই আঠা। যেখানে সব সময় পাখি। বসে গাছের সে-ডালে আঠা মাখিয়ে রাখে। বসলে আর উঠতে পারে না পাখি, পা আটকে যায়। ছোটার জন্যে ছটফট করে, পাখায় লাগে আঠা, ডানা জড়িয়ে যায়। উড়তেও পারে না। ধরা পড়ে শিকারীর হাতে।

পাখি ধরার জন্যেই আঠা বানাচ্ছে মিরাটো। দুপুরে পাখির মাংসের রোস্ট খাওয়ার ইচ্ছে হয়েছে।

বানাতে বানাতেই থমকে গেল সে, মুখ তুলে তাকাল কিশোরের দিকে। মাথায় একটা ফন্দি এসেছে। আঠা দেখিয়ে বলল, এ-জিনিস দিয়েই বাঘ ধরব।

হেসে উঠল কিশোর। পাখি আর বানর ধরতে পারবে, তা ঠিক। বাঘ ধরতে পারবে না, অন্তত এই আঠা দিয়ে নয়।

বাঘই ধরব, চ্যালেঞ্জ করে বসল মিরাটো। আমার দাদা নাকি একবার ধরেছিল।

সঙ্গী ইনডিয়ানদের সাক্ষি মানল, কি মিয়া, ধরেনি? শুনেছ না?

মাথা নাড়ল ইনডিয়ানরা, শুনেছে।

বিশ্বাস হলো না কিশোরের। তবু মিরাটো যখন বলছে..
ঠিক আছে, মাথা কাত করল সে। পারলে ধরো। আমার কথা হলো, ধরা চাই। পালিয়ে যেতে দেয়া চলবে না।
পাখি ধরা চুলোয় গেল, লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল মিরাটো.। উত্তেজিত কথার ফুলঝুরি ছোটাল সঙ্গীদের দিকে চেয়ে। ছুটাছুটি শুরু হয়ে গেল। জোগাড় করে আনল আরও আঠা!
গুহা থেকে বেরিয়ে কোনদিকে যায়, বাঘ চলাচলের সে-পথটা খুঁজে বের করল। ভালমত দেখে নিশ্চিত হয়ে নিল, তারপর গুহার কয়েকশো ফুট দূরে ফাঁদ পাতল। গুহামুখে যে জালটা পাতা হয়েছিল, সেটা খুলে এনে বিছাল বাঘ চলাচলের এ পথে। পাতা দিয়ে ঢেকে দিল, যাতে দেখা না যায়। তার ওপর পুরু করে ফেলল আঠা। সেই আঠার ওপর আবার পাতা ছড়িয়ে দিল।
ব্যস, সন্তুষ্ট হয়ে বলল মিরাটো। এবার শুধু চুপ করে বসে থাকা।
অপেক্ষা আর অপেক্ষা। কত আর বসে থাকা যায়? ক্যাম্প থেকে হ্যামকগুলো সরিয়ে আনা হলো ফাঁদের কাছে। ঝোপঝাড়ের আড়ালে গাছে ঝুলিয়ে শুয়ে পড়ল তাতে তিন গোয়েন্দা। বাকি দিনটা পড়ে পড়ে ঘুমাল।
বায় এল না।
রাতে সবাই ঘুমাল, পালা করে পাহারা দিল।
বাঘের পথ, গন্ধে ও-পথে এল না কোন জানোয়ার। বাঘও এল না। ভোরের দিকে ভুল করেই যেন এসে পড়ল ছোট একটা জীব। ইঁদুর গোষ্ঠীর দুই ফুট লম্বা প্রাণী, অ্যাগুটি। আঠার ফাঁদে আটকা পড়ল।
ধ্যাত্তোর। বিরক্ত হয়ে হ্যামক থেকে নামতে গেল কিশোর, প্রাণীটাকে ছাড়ানোর জন্যে।
রাখো, রাখো, বাধা দিল মিরাটো। ভালই হয়েছে। থাক ওটা। ওটার গন্ধেই টিগ্রে আসবে।
বলতে না বলতেই বাঘের চাপা গর্জন শোনা গেল। ঝট করে ঘুরে তাকাল দু জনে। গুহামুখে বাঘের মাথা।
নিকষ কালো। উজ্জ্বল হলুদ চোখ। অল্প ফাঁক হয়ে আছে মুখ, ঝকঝকে ধারাল দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। ইনডিয়ানরা যে বলে ও কালো জাগুয়ার, বাঘের মধ্যে সব। চেয়ে হিংস্র, বোধহয় ঠিকই বলে, দেখে তা-ই মনে হচ্ছে কিশোরের।
গুহার বাইরে বেরিয়ে এসে বসল বাঘ। এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। অনেকক্ষণ থেকেছে গুহার ভেতরে, নিশ্চয় তৃষ্ণা পেয়েছে, নদীতে পানি খেতে যাবে। তার আগে ভালমত দেখে নিচ্ছে আশপাণ্টা। চলার পথে এখন যে জানোয়ার পড়বে। তার কপালে খারাপী আছে।

ঘন বনে ঢোকার জন্যে পা বাড়াল কিশোর।
হাত চেপে ধরল মিরাটো। না, আমাদের পিছু নিতে পারে। ফাঁদ থেকে দূরে সরে যাবে তাহলে।
মুসা আর রবিনের ঘুম ভাঙেনি, অন্য ইনডিয়ানরাও ঘুমিয়ে আছে।
কিশোরকে টেনে নিয়ে দৌড় দিল মিরাটো। বাঘ চলার পথ ধরে ছুটল নদীর দিকে। এখন ফাঁদটা রয়েছে বাঘ আর তাদের মধ্যে। অ্যাগুটির মতই ওরাও বাঘের টোপ হয়ে গেছে।
পেছনে ফিরে তাকাল একবার কিশোর, রওনা হয়েছে বাঘ। সাপের মত নিঃশব্দ মসৃণ গতি। চকচকে ওই কালো চামড়ার তলায় অন্তত দু-শো কেজি হাড় মাংস-রক্ত রয়েছে, অনুমান করল সে। এত ভারি শরীর নিয়ে ওভাবে চলে কি করে!
অস্বস্তি বোধ করছে কিশোর। ভয় লাগছে। যদি মিরাটোর কৌশল বিফল হয়? সাধারণ ওই আঠা আটকাতে পারবে এত শক্তিশালী একটা জানোয়ারকে।
গতি বাড়ছে জাগুয়ারের। দৌড়ে রূপ নিচ্ছে হাঁটা। পা ফেলার তালে তালে এমনভাবে নড়ছে আর কাঁপছে কাঁধের পেশী, মনে হয় যেন পিস্টন চলছে তলায়। তাকালে দৃষ্টি আটকে যায়।
তা-ই গেছে কিশোর আর মিরাটোর। দাঁড়িয়ে দেখছে।
অ্যাগুটির দিকে তাকাচ্ছে না কেন?–ভাবছে কিশোর। খালি আমাদের দিকে চোখ। বোকা হয়ে গেল যেন সে। সম্মোহিতের মত তাকিয়ে আছে বাঘের দিকে, গায়ে এসে লাফিয়ে পড়ার অপেক্ষায় রয়েছে যেন।
চাপা গোঁ গোঁ করল জাগুয়ার। হঠাৎ বন কাপিয়ে গর্জন করে উঠল। জালের কাছাকাছি এসে পড়েছে। অ্যাগুটির ওপর চোখ পড়তেই যেন ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে গেল। লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল আস্তে আস্তে, মাটির সঙ্গে পেট মিশিয়ে ফেলল। চামড়ার তলায় থিরথির করে কাঁপছে মাংসপেশী, দেখা যাচ্ছে। নড়ছে লেজটা, বাড়ি মারছে মাটিতে।
অবিশ্বাস্য রকম দ্রুত গতিতে লাফ দিল।
একলাফে বারো ফুট পেরিয়ে এসে পড়ল আশুটির ওপর। ঘাড় কামড়ে ধরল।
প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ছেড়ে দিল আবার। পায়ের তলার আঠা নজর কেড়েছে।
এইবার দেখা যাবে-ভাবল কিশোর-মিরাটোর আঠা কতখানি কাজের? কত শক্ত? সামনের এক পা তুলছে বাঘ। তুলে ফেলল, আঠায় আটকে রইল না। থাবা, সাদা আঠায় মাখামাখি। আরেক পা তুলে অবাক হয়ে দেখল, একই জিনিস লেগে রয়েছে।
আর দেখার ইচ্ছে নেই কিশোরের। চেঁচিয়ে বলল, চলো, ভাগি! আঠায়। আটকাবে না।

কিশোরের বাহু খামচে ধরল মিরাটো। দাঁড়াও! দেখো।
চেটে আঠা ছাড়ানোর চেষ্টা করল বাঘ। পারল না। রাগে কামড় মারল থাবায়। ফল হলো আরও খারাপ, মুখেও লেগে গেল আঠা। ডলে মুখ থেকে ছাড়াতে গিয়ে লাগল চোখের আশেপাশে। আঠা ছাড়ানোর চেষ্টায় শুয়ে পড়ল সে, লাগল পেটে। পাগল হয়ে গেল যেন। যতই ছাড়ানোর চেষ্টা করে, আরও বেশি করে লাগে।
এতক্ষণে বুঝল কিশোর ঘটনাটা। তার এক নানী-মেরি-চাচীর মা–বলেন, বেড়ালকে ব্যস্ত রাখতে চাইলে তার পায়ে ভালমত মাখন মাখিয়ে দাও। ওই মাখন ছাড়াতেই হিমশিম খেয়ে যাবে সে, তোমাকে বিরক্ত করবে কখন?
জাগুয়ারও বেড়ালের জাত, পরিষ্কার থাকতে পছন্দ করে, আঠা ছাড়ানোর। ব্যস্ততায় তাই মানুষ আর অ্যাগুটির কথা ভুলে গেল বেমালুম।
মুসা, রবিন আর ইনডিয়ানরা জেগে গেছে। কি হচ্ছে দেখতে এল। জাগুয়ারের এক চোখ পাতায় ঢেকে গেছে, আরেক চোখে আঠা, ফাঁক দিয়ে আবছামত দেখতে পেল মানুষগুলোকে। চাপা গর্জন করে ধমক লাগাল, এগোতে মানা করছে। তারপর আবার আঠা পরিষ্কারে মন দিল। বেড়ালের মতই পেছনের পায়ের ওপর বসে লম্বা জিভ বের করে চাটছে শরীরের এখানে ওখানে।
এবার ধরা যায়, বলল মিরাটো।
ইনডিয়ানদেরকে খাঁচাটা আনতে বলল সে।
খাঁচা এলে, জালের দড়ি দরজা দিয়ে ঢুকিয়ে পেছনের দেয়ালের ফাঁক দিয়ে। টেনে বের করল। দড়ি ধরে আস্তে টানতেই টান পড়ল জালের কোণের চারটে শূপে। অন্যেরাও এসে হাত লাগাল তার সঙ্গে।
আস্তে, হুশিয়ার করল মিরাটো। আরও আস্তে।
জালের আলতো টান লাগল বাঘের পেছন দিকটায়। সামান্য এগিয়ে বসল ওটা, আঠা চাটার বিরাম নেই। আবার টান লাগলে আরেকটু এগিয়ে বসল। ইঞ্চি ইঞ্চি করে এভাবে নিজের অজান্তেই এগিয়ে আসতে লাগল খাঁচার দিকে।
দরজার ভেতরে বাঘের শরীর অর্ধেক ঢুকে যেতেই জোরে টানল মিরাটো। জালের পেছনের দুটো কোণ উঠে এল জাগুয়ারের কাঁধের ওপর, আরেকবার টানতেই খাঁচায় ঢুকে পড়ল ওটা। ফিরে না চেয়ে জোরে ধমক দিল একবার। যেন বলল, উঁহু, জালাল দেখছি। আমি মরি আঠার যন্ত্রণায়। এই চুপ থাকো, নইলে দেখাব মজা। আবার আঠা পরিষ্কার করতে লাগল।
বন্ধ করে দেয়া হলো খাঁচার দরজা। ফিরে তাকাল জাগুয়ার, দরজার বাশে বার দুই আলতো থাবা মেরে আবার আগের কাজে লাগল।
হপ্তাখানেক ধরে চলবে এখন, হাসছে মিরাটো। এক বিন্দু আঠা গায়ে থাকলেও থামবে না। চাটতেই থাকবে, চাটতেই থাকবে।

তাজ্জব হয়ে গেছে তিন গোয়েন্দা। এত সহজে ধরে ফেলল বাঘটাকে? বিশ্বাস হচ্ছে না তাদের।
এরপর খাঁচাটা নদীর পারে নেয়ার পালা। বিশেষ বেগ পেতে হলো না। কয়েকটা বাশের টুকরোর ওপর দিয়ে ঠেলে ঠেলে নিয়ে আসা হলো ওটা,বাঁশের টুকরো চাকার মত গড়ায়, তার ওপর দিয়ে খাঁচা চলে। জনবল মন্দ নয়, বজরায়। তোলাও খুব একটা কঠিন হলো না। কাজটা আরও সহজ হয়েছে জাগুয়ারটা কোন রকম বাধা না দেয়ায়। সে আছে তার কাজে ব্যস্ত। মাঝে মাঝে শুধু ঘড়ঘড় করে হুশিয়ায় করেছে, ব্যস!
ছোট হলুদ জাগুয়ারটার নাম রাখা হলো মিস ইয়েলো, আর কালোটার নাম মিস্টার ব্ল্যাক, ডাক নাম বিগ ব্ল্যাক।
তোমার দোস্ত, মুচকি হেসে মুসাকে বলল কিশোর। চেহারা-সুরতে অনেক মিল।
যত যা-ই বলো, দাঁত, বেরিয়ে পড়ল মুসার, তোমার ওই জালে। আটকানোর তুলনা হয় না। কথাটা মনে পড়ায় আবার হাসতে শুরু করল সে।
রবিন হাসল।
কিশোরও হাসল এবার। তার আনন্দ বাগ মানছে না। একই দিনে দু-দুটো জাগুয়ার, তার একটা আবার দুর্লভ কালো চিতা। সবাইকে ধন্যবাদ জানাল সে, এমনকি জিবাকেও, যে জাগুয়ার ধরায় কোন সাহায্যই করেনি।
আর একটিমাত্র প্রাণী ধরতে পারলেই পুরোপুরি সন্তুষ্ট হয় কিশোর, অ্যানাকোন্ডা। তবে তার পরেও অনেক কাজ বাকি থাকে–ভ্যাম্পের চোখ এড়িয়ে নদীর ভাটিতে গিয়ে কোন শহরে থেমে স্টীমার ধরা, তারপর বাড়ি ফেরা। কঠিন এবং ঝক্কির কাজ।

.

এগিয়ে চলেছে বজরা-বহর।
পেরিয়ে এল আরও দু-শো মাইল। ইতিমধ্যে আরও কিছু প্রাণী ধরেছে ওরা–একটা শ্লথ, একটা আরমাডিলো, আর এক জাতের খুদে, খুব সুন্দর একটা আমাজন হরিণ। কিন্তু যার জন্যে বেশি আগ্রহ, সেই অ্যানাকোন্ডারই দেখা পাওয়া গেল না।
একদিন, রাত কাটানোর জন্যে একটা বড় খালে ঢুকল বজরা। এতদিন যেসব খাল দেখেছে, এটা সেরকম নয়। ঝকঝকে বালির চরা নেই। দুই পাড়েই ঘন ঘাস আর কাশবন। খালের পানিতেও নানারকম জলজ তৃণলতা জন্মে আছে।
মিরাটো বলল, এখানে অ্যানাকোণ্ডা না থেকে যায় না।
রাতটা কাটল।
সকালে জন্তু-জানোয়ারের তদারকিতে লাগল মূসা আর কিশোর।

আইবিস পাখিটা গায়েব। যেখানে ছিল, সেখানে এখন পড়ে রয়েছে কয়েকটা পালক। খাঁচাটা চুরমার। ওই কাজ আইবিসের নয়, সে পারবে না। করেছে ভারি, শক্তিশালী কেউ। মাংসাশী জানোয়ারগুলোর দিকে একে একে তাকাল কিশোর, কার চোখে চোরা চাহনি আছে, খুঁজল। চোখ মুদে আরামে রোদ পোহাচ্ছে। ডাইনোসর। তার ক্ষমতা আছে খাঁচা ভেঙে আইবিস বের করে খাওয়ার, কিন্তু গলার দড়ি এত খাটো, খাঁচার কাছেই যেতে পারে না। না, সে নয়। একটিমাত্র, চোখ খোলা রেখে চেয়ে আছে লম্বু-বগা, নিষ্পাপ চাহনী। না, তার কাজও নয়। ইঁদুর, ব্যাঙ আর মাছ খেয়েই কল করতে পারে না, রাতে চুরি করে খাঁচা ভেঙে স্বজাতী খাওয়ার কষ্ট করতে যাবে কোন দুঃখে।

বোয়ার গায়ে খাঁচা ভাঙার মত জোর আছে, পাখির মাংসেও অরুচি নেই। কিন্তু সে রয়েছে অন্য নৌকায়। পেটের শুয়োর এখনও পুরোপুরি হজম হয়নি, তাছাড়া পানিকে তার অপছন্দ। নাহ্, সে-ও নয়।

তাহলে?

বেশি ভাবার সময় পেল না কিশোর। খাঁচার ভেতরে চেঁচামেচি জুড়েছে রক্তচাটা, খাবার চায়।

বোতলে ভরা আছে ক্যাপিবারার রক্ত। ঠাণ্ডা। সেটা আবার রুচবে না, বাদুড়টার, গম চাই, উষ্ণ রক্ত। তাজা না হলেও চলে, কিন্তু গরম হতেই হবে, ধমনীতে প্রবাহিত হওয়ার সময় যতখানি গরম থাকে ততখানি।

একটা পাত্রে এক কাপ রক্ত ঢেলে চুলায় বসাল কিশোর। দেশলাইয়ের কাঠি জেলে আগুন ধরাতে গিয়ে চোখে পড়ল ব্যাপারটা। টলডোর নলখাগড়ায় তৈরি। বেড়ায় মস্ত এক গোল ফোকর। কৌতূহল হলো তার। ভালমত দেখার জন্যে এগোল।

কিসে করল এই ছিদ্র আগের দিনও ছিল না ওটা। রাতে করা হয়েছে। আইবিসের খাঁচা ভাঙা পাখি গায়েব, পড়ে থাকা কিছু পালক, তারপর এই ফোকর...চকিতে মনে হলো তার–অ্যানাকোণ্ডা নয়তো?

রাতে হয়তো নৌকায় উঠেছিল, পাখিটাকে খেয়ে ওদিক দিয়ে পথ করে বেরিয়ে গেছে।

হঠাৎ দুলে উঠল নোকা। আরে, কি ব্যাপার? আমাজনে এত বড় ঢেউ উঠল, যে খাল বেয়ে এসে নৌকা দুলিয়ে দিয়েছে? নাকি ভূমিকম্প? দেখার জন্যে তাড়াতাড়ি টলডো থেকে বেরোল সে।

কই? ঢেউ-টেউ তো দেখা যাচ্ছে না। তীরের দিকে চেয়ে ভূমিকম্পের কোন লক্ষণও দেখল না।

প্রচণ্ড জোরে ঝাঁকুনি লাগল দৌকার ভলায়, কিসে যেন ঠেলা দিয়ে তুলে কাত করে ফেলছে একপাশে তাল সামলাতে না পেরে ডেকের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল কিশোর।
আবার সোজা হয়ে গেল নৌকা।
উঠে কিনারা দিয়ে তাকাল। পানিতে ভয়ানক তোলপাড়।
অ্যানাকোন্ডা। কিশোর আশে এসে দাঁড়িয়েছে মিরাটো, কণ্ঠ কাঁপছে। নৌকার তলায় বাস।
চেঁচাতে শুরু করেছে জিবা, লোকজনদের তৈরি হতে বলছে। এখুনি চলে যেতে হবে এখান থেকে। অ্যানাকোণ্ডা খুব খারাপ। দুষ্ট প্রেত।
এমনিতেই ইনডিয়ানরা সাংঘাতিক কুসংস্কারাচ্ছন্ন, তাদের মনে আরও বেশি ভয় ঢুকিয়ে দিচ্ছে জিবা।
যাচ্ছেটা কে? জিবার কথা প্রতিবাদ করল কিশোর। সবাই শুনে রাখো, অ্যানাকোণ্ডা ধরার আগে নড়ছি না এখান থেকে। যার থাকতে ইচ্ছে করবে না, চলে যেতে পারো, বাধা নেই।
কিন্তু সে-আগ্রহ দেখা গেল না কারও মধ্যে।
মিরাটোর সঙ্গে আলোচনায় বসল তিন গোয়েন্দা। কি ভাবে সাপ ধরবে, ধরে কোথায় রাখবে, এসব আলোচনা।
খাঁচা তো লাগবেই, মিরাটো বলল। পানি রাখার বড় পাত্রও লাগবে। একনাগাড়ে বেশিক্ষণ পানি ছাড়া থাকতে পারে না অ্যানাকোণ্ডা।
সেটা জানে কিশোর। বিশাল ওই সাপগুলোকে অনেকে এজন্যে জলজ-সাপ বলে। কিন্তু এত বড় পাত্র কোথায়? বাথটাব দরকার।
বানিয়ে নেব। গাছের ছাল দিয়ে।
মিরাটোর ওপর এখন অগাধ ভক্তি আর বিশ্বাস কিশোরের। কি করে বানাবে, জানতে চাইল না। বলল, তাহলে চলো বানিয়ে ফেলি।
তীরে নামল সবাই।
বড় সোজা একটা গাছ বেছে বের করল মিরাটো। পারপলহার্ট জাতের বিশাল গাছ, ছাল বেশ মোটা কিন্তু নরম, কাঠ থেকে সহজেই ছাভিয়ে আনা যায়। গোড়ার কাছে গোল করে কাটল মিরাটো, বিশ ফুট ওপরে আবার চারদিকে ঘিরে গোল করে কাটল। ওপরের কাটা থেকে নিচের কাটা পর্যন্ত সোজা চিরে ফেলল। তারপর নিচের কাটা জায়গা ধরে টেনে ছাড়িয়ে নিল আস্ত ছালটা। বিশ ফুট লম্বা আর দশ ফুট চওড়া একটা ছালের চাদর বেরোল। কলাগাছের আস্ত খোল কেটে দুই ভাজ করে মিশিয়ে, বেধে, পাত্র তৈরি করে তাতে শিং মাগুর জিয়ল এসব মাছ রাখে জেলেরা। ছালটা দিয়ে নিচের দিকে চ্যাপ্টা, ওপরের দিকে গোল ওরকমই

একটা বিশাল পাত্র বানানো হলো। বাধা হলো লিয়ানা লতা দিয়ে। দুই ধারেই লম্বা লম্বা দুটো ফাঁক, পানি চোয়াবে সেখান দিয়ে। তাই রবার গাছের আঠা পুরু করে লাগিয়ে বন্ধ করে দেয়া হলো ফাঁক। ব্যস, চমৎকার বাথটাব তৈরি হয়ে গেল, পানি রাখলে পড়বে না।
এরপর একটা খাঁচা তৈরির কাজে লাগল সবাই।
গাধার মত খেটেও খাঁচা বানিয়ে তাতে বাথটাব বসিয়ে বাধতে বাধতে পরদিন দুপুর হয়ে গেল। রাতে পাহারা রাখা হলো, যাতে অ্যানাকোন্ডা এসে আর কোন জানোয়ার চুরি করে নিতে না পারে।
খাঁচা তৈরি শেষ। এবার ফাঁদ পাততে হবে।
বড় বজরার মাস্তুলে একটা দড়ি বেঁধে আরেক মাথা নিয়ে যাওয়া হলো তীরে। চল্লিশ ফুট দূরের একটা গাছের দো-ভালার জোড়ার ওপর দিয়ে দড়িটা পেচিয়ে এনে। অন্য মাথায় বাধা হলো আমাজন হরিণটাকে। ফাঁস তৈরি করা হলো তিনটা, একটা অ্যানাকোণ্ডার গলায় আটকানোর জন্যে, আর দুটো লেজে।
সব তৈরি। এবার সাপ এলেই হয়।
ঝোপের ভেতরে লুকিয়ে বসল শিকারীরা। আবার সেই অপেক্ষার পালা। অনড় বসে থাকা আর থাকা
গড়িয়ে গেল দিন।
পানির কিনারে সারাক্ষণ চরল হরিণটা, তাজা ঘাস ছিঁড়ে খেল। পিপাসা পেলে পানি তো আছেই। খুব সুন্দর একটা জীব। চকচকে চামড়া যেন ট্যান করা, বড় বড় বাদামী চোখ, ডালপাতাওয়ালা দেখার মত শিং। ওটাকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করতে মন খুতখুত করছে কিশোরের, কিন্তু এছাড়া উপায়ও নেই। হরিণ খুবই পছন্দ অ্যানাকোণ্ডার, ডিয়ার সোয়ালোয়ার বা হরিণখেকো ডাকনামই হয়ে গেছে এ-কারণে। আরেকটা হরিণ ধরে আনা, সময়ের ব্যাপার।
তিন ঘণ্টা পেরিয়ে গেল। আর বসে থাকতে ভাল লাগছে না কিশোরের। সত্যি আছে তো এখানে সাপ বজরার তলায় আসলেই অ্যানাকোণ্ডার বাসা আছে, নাকি ভুল করেছে মিরাটো? অ্যানাকোন্ডার বাসা দেখতে কেমন? কৌতূহল মাথাচাড়া দিয়ে উঠল রহস্যভেদীর মনে। বাড়তে বাড়তে এমন অবস্থায় এল, আর। থাকতে পারল না কিশোর। মুসাকে বলল, চলো।
কোথায়?
অ্যানাকেণ্ডার বাসা দেখব।
ওই পানির তলায় ডুব দিয়ে? দুই হাত নাড়ল মুসা। আমি পারব না, বাবা। আমার সাহসে কুলাবে না।
মুচকি হাসল মিরাটো। চলো, আমি যাচ্ছি।

পানিতে নামল দু-জনে। ঢালু হয়ে নেমে গেছে পাড়। গলা পানিতে নেমে ডুব দিল কিশোর, পাশে মিরাটো। পানি স্বচ্ছ নয়, আবার ঘোলাও না। কয়েক হাতের বেশি দৃষ্টি চলে না। আচ্ছা, পিরানহা নেই তো? আশা করল সে, নেই। জলজ আগাছার মধ্যে ওই মাছের ঝাঁক না থাকার সম্ভাবনাই বেশি।
পানির তলায় তাকিয়ে অ্যানাকোন্ডার বাসা খুজল কিশোর।
আজব এক জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চলেছে মনে হলো। লম্বা লম্বা লতা, দুলছে। নলখাগড়ার মত এক জাতের ঘাস জন্মে রয়েছে গুচ্ছে গুচ্ছে। পিচ্ছিল, কেমন যেন গা শিরশির করা ওগুলোর ছোঁয়া। কোথাও সোজা কোথাও আড়াআড়ি, একটার ওপর আরেকটা পড়ে আছে মোটা ডাল ও ঝড়ে ভেঙে পড়া গাছের কাণ্ড, কালো কালো। দেখলেই গায়ে কাটা দেয়। ওগুলোর মাঝে ফাঁক এত কম, অ্যানাকোণ্ডার মত বড় প্রাণী থাকতে পারবে না।
দম নেয়ার জন্যে ভাসল কিশোর। তার পাশে মিরাটো। বুক ভরে বাতাস টেনে আবার ডুব দিল। আরও কয়েক হাত এগিয়ে কালো একটা গুহামুখ চোখে পড়ল। মুখটা পানির তলায়, সুড়ঙ্গটা গিয়ে শেষ হয়েছে তীরের কোন শুকনো গুহায়, আন্দাজ করল কিশোর।
ওটা যে সাপের বাসা, তার প্রমাণ মিলল। ফুট পাঁচেক লম্বা দুটো সাপ বেরিয়ে একেবেঁকে ঢুকে গেল নলখাগড়ার জঙ্গলে।
তারপরই দেখা গেল বিশাল আরেকটা মাথা, গুহা থেকে বেরিয়ে ধীরে ধীরে এগোল কিশোরের দিকে। ধ্বক করে উঠল তার হৃৎপিণ্ড।
হাত ধরে হ্যাঁচকা টান মারল মিরাটো, ওপরে ওঠার জন্যে। কিন্তু তার আগেই ওঠার জন্যে ঘুরতে শুরু করেছে কিশোর। জোরে জোরে হাত-পা ছুড়ছে। ভয়, এই বুঝি এসে পা কামড়ে ধরল অ্যানাকোণ্ডা। টেনে নিয়ে যাবে অন্ধকার গুহায়। চিপে শ্বাসরুদ্ধ করে মেরে রসিয়ে রসিয়ে গিলবে।
তার মনে হলো, পানির ওপরে বুঝি আর ওঠা হবে কোন দিনই।
ওপরে মাথা তুলে, সাঁতরে কিভাবে যে তীরে এসে উঠল, বলতে পারবে না সে। হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এসে ধপ করে বসল ঝোপের কিনারে।
কী? একসঙ্গে প্রশ্ন করল মুসা আর রবিন।
অ্যানাকোণ্ডা..মনে হয় তার বাড়ির ওপরই বসে আছি আমরা...পানির তলা। দিয়ে সুড়ঙ্গ চলে এসেছে ডাঙায়।
আবার অপেক্ষা।
অনেক সময় পেরোল। ঝোপের ভেতরই শুয়ে ঘুমাচ্ছে মুসা। রবিন ঢুলছে। কিশোরের চোখেও ঘুম। একবার পাতা মেলছে, একবার বন্ধ। দেখার কিছু নেই।

হরিণটা ঘাস খাচ্ছে, তার পায়ের কাছ থেকে খানিক দূরে ছোট ছোট ঢেউ। ছপছপ করছে পাড়ে বাড়ি খেয়ে।
ছপছপ কিছুটা বাড়ল মনে হলো না? চোখ মেলল কিশোর। হরিণটার জন্যে। প্রথমে চোখে পড়ল না, তারপর দেখল ওটাকে। নড়ছে। সাবমেরিনের পেরিস্কোপের মত। পলকে ঘুম দূর হয়ে গেল। অ্যানাকোন্ডা আসছে, কোন সন্দেহ নেই। ডাঙার চেয়ে পানিতে থাকে বেশিক্ষণ ওই সাপ, তাই পানিতে থাকার মত। করেই তৈরি হয়েছে শরীর। নাকটা ওপর দিকে ঠেলে তোলা, পুরো মাথাটা পানির তলায় থাকলেও ফুটো দুটো ওপরে থাকে, শ্বাস নিতে অসুবিধে হয় না।
ঢেউয়ের তলা থেকে মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়ছে চোখ দুটো। এমনভাবে। বসানো; ওপরে, নিচে, সামনে, পাশে সব দিকেই দেখতে পায় অ্যানাকোণ্ডা, আর কোন সাপের এই সুবিধে নেই। দুই চোখের মাঝের দূরত্ব দেখেই অনুমান করতে পারল কিশোর, সাপটা বিরাট।
হরিণের দিকে এগিয়ে আসছে জীবন্ত পেরিস্কোপ। পেছনে অনেক দূর পর্যন্ত পানিতে আলোড়ন, মস্ত প্রপেলার চলছে যেন পানির তলায়, পঁচিশ-তিরিশ ফুটের কম হবে না সাপটা।
নিঃশব্দে ঝোপ থেকে বেরিয়ে গাছের পেছনে চলে এল কিশোর। দড়ি ধরে টেনে সঙ্কেত দিল। মাস্তুলের গোড়ায় বসে পাহারা দিচ্ছে একজন ইনডিয়ান। সতর্ক হয়ে গেল সে। (তীরে ঠেকল অ্যানাকোণ্ডার থুতনি। বেয়ে উঠে আসতে শুরু করল। ঘাস। খাওয়া থামিয়ে ফিরে তাকাল হরিণ, সাপটাকে দেখেই লাফ মারল। দড়ি না থাকলে তিন লাফে হারিয়ে যেত বনের ভেতর। সেটা তো পারল না, দড়িটাকে টেনে টানটান করে রেখে পা ছুঁড়তে লাগল অনবরত। খুরের ঘায়ে মাটি উড়ে গিয়ে লাগছে সাপের মুখে।
দড়ি টেনে সঙ্কেত দিল আবার কিশোর।
টান দিল মাস্তুলের কাছে বসা লোকটা। আস্তে আস্তে সরিয়ে নিতে লাগল হরিণটাকে।
একটু একটু করে হরিণটা সরছে গাছের দিকে, সাপ এগোচ্ছে তার দিকে। কামড় বসাবার জন্যে মাথা তুলেও নামিয়ে ফেলছে, বার বার সরে নাগালের বাইরে। চলে যাচ্ছে শিকার।
একটা ফাঁসি হাতে মুসা তৈরি। তার পেছনে আর আশেপাশে অন্যেরা।
গাছের গোড়ায় চলে এল হরিণ। সাপটা তার থেকে ছয় ফুট দূরে। দ্রুত আসছে।
এবার! চেঁচিয়ে উঠল কিশোর।
ফাঁস হাতে গাছের আড়াল থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এল মুসা। অন্যেরা। বেরোল দু-দিক থেকে। লেজে ফাঁস পরানোর জন্যে ছুটে গেল দু-জন।

মুসাকে দেখে পিছাল না সাপটা, ভীষণ ভঙ্গিতে মাথা তুলল। সামান্যতম ভুল এখন মারাত্মক বিপদ ডেকে আনতে পারে। ছোবল হানার আগেই সাপের গলায় পরিয়ে দিতে হবে ফাঁস।
ধীরে ধীরে পিছিয়ে যাচ্ছে বিশাল মাথাটা, ফাঁক হয়ে গেছে চোয়াল। তীব্র গতিতে এগিয়ে আসবে যে কোন মুহূর্তে। মুসাও ফাঁস ছুঁড়ল, সাপটাও ছোবল হানল। কিন্তু ধরতে পারল না মুসাকে। লাফিয়ে পাশে সরে গেছে সে। ফাঁসটা মাথা গলে গলার কাছে চলে গেছে। হ্যাঁচকা টানে আটকে দেয়া হলো।
দড়ির আরেক মাথা খাঁচার দরজার ভেতর দিয়ে নিয়ে গিয়ে, পেছনের বেড়ার ফাঁক দিয়ে বের করে গাছের সঙ্গে বেধে রাখা হয়েছে আগেই। জাগুয়ারকে যেভাবে টেনে ঢুকিয়েছে, সাপটাকেও সেভাবেই ঢোকানোর ইচ্ছে। লেজে ফাঁস লাগিয়ে টেনে শরীরটাকে সোজা রাখতে পারলে ঢোকানো যাবে ওভাবে।
কিন্তু মোটেই সহজ হলো না কাজটা।
এক জায়গায় থাকছে না লেজ, খালি এপাশ ওপাশ নড়ছে। অনেক চেষ্টায়। একটা মাত্র ফাঁস পরানো গেল। কিন্তু ধরে রাখতে পারল না লোকটা, হ্যাঁচকা টানে দড়ি ছুটে গেল তার হাত থেকে।
লেজের বাড়িতে চিত হয়ে গেল জিবা আর দু-জন ইনডিয়ান।
আরেকটা ফাঁস হাতে এগোল মিরাটো। এত বেশি কাছে চলে গেল, দড়ির ফাঁস পরানোর আগে সে নিজেই আটকা পড়ল লেজের ফাসে। শরীর মুচড়ে মুচড়ে ফাঁসটাকে ওপরের দিকে সরিয়ে আনছে সাপ। বিচিত্র ভঙ্গিতে ঘুরে ঘুরে সরে, যাচ্ছে মিরাটোর শরীরটা। পুরোপুরি অসহায় সে, কিছুই করতে পারছে না। মুক্তি পাওয়ার জন্যে খালি হাত-পা ছুঁড়ছে।
তাকে সাহায্য করতে এগোল কিশোর।
মিরাটোকে শরীরের মাঝামাঝি জায়গায় নিয়ে এল সাপ, লেজটা মুক্ত করে ফেলেছে। এদিক ওদিক নাড়ছে আবার আরেকজনকে ধরার জন্যে।
কিশোরের ভাগ্য ভাল, ফাসে আটকা পড়ল না, কিন্তু বাড়ির চোটে উড়ে গিয়ে পড়ল কয়েক হাত দূরে। গাছের সঙ্গে ঠুকে গেল কপাল, বেহুশ হয়ে গেল সে।
ছুটে গেল রবিন। টেনেহিঁচড়ে সরাল কিশোরকে। দৌড়ে গিয়ে আঁজলা ভরে পানি এনে ছিটাতে, লাগল তার চোখেমুখে।
মুসার দিকে এগোচ্ছে সাপটা। পিছাতে গিয়ে শেকড়ে লেগে চিত হয়ে পড়ে গেল সে। এই সুযোগে দ্রুত এগোল বিশাল মাথাটা, বিকট হয়ের ভেতর থেকে বাঁকা চোখা দাঁতের ফাঁক দিয়ে লকলক করে বেরোচ্ছে লম্বা জিভ। অ্যানাকোণ্ডার। মানুষ আত্রমণের রোমাঞ্চকর সব গল্প মনে পড়ল তার।
কোনমতে সরে এল সে। লাফিয়ে উঠে দৌড় দিল লেজের দিকে।

প্যাঁচে আটকে রয়েছে মিরাটো। নাক-মুখ দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে। অবশ নিষ্প্রাণ মাথাটা নড়াচড়ায় একবার এদিক ঝুলে পড়ছে, একবার ওদিক। ঘুরে ঘুরে এগিয়ে। চলেছে সাপের মাথার কাছে।
মুখ ঘোরাল সাপটা।
মিরাটোকে বাঁচানোর জন্যে মরিয়া হয়ে উঠল মুসা। বিপদের পরোয়া না করে ছুটে গিয়ে দু-পা ফাঁক করে দাঁড়াল সাপের ওপর, বুড়ো আঙুল দিয়ে টিপে ধরল দুই চোখ। অ্যানাকোন্ডার সবচেয়ে দুর্বল জায়গা।
যন্ত্রণায় মোচড়াতে শুরু করল সাপের শরীর, চাবুকের মত সপাসপ বাড়ি মারছে লেজ দিয়ে। কিন্তু কারও গায়ে লাগছে না, সবাই রয়েছে নিরাপদ দূরতে। প্যাঁচ থেকে খুলে একটা ঝোপের ওপর গিয়ে পড়ল মিরাটোর দেহটা।
চোখ ছেড়ে দিয়ে ছুটে গেল মুসা। মিরাটোর বুকে কান পেতে শুনল, নাড়ি দেখল। নেই। সব শেষ।
উঠে দাঁড়াল আবার সে। কড়া চোখে তাকাল সাপটার দিকে। মিরাটোর মৃত্যু বৃথা যেতে দেবে না।
কিশোরের জ্ঞান ফিরেছে।
টানাটানিতে সাপের গলার ফাঁসটা আরও চেপে বসেছে। দড়ি ধরে খাঁচার দিকে টানতে লাগল তিন গোয়েন্দা। দম বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কাবু হয়ে আসছে অ্যানাকোন্ডা। লেজে আটকানো ফাসের দড়িও টেনে নিয়ে গিয়ে পেচিয়ে ফেলা। হলো আরেকটা গাছে। দড়িটা ধরে রাখল দু-জন ইনডিয়ান, অন্য দু-জন আরেকটা ফাঁস আটকে দিল লেজে।
এরপর আর বিশেষ অসুবিধে হলো না। মাথার দিক থেকে দড়ি টানতে লাগল কয়েকজন, অন্যেরা লেজের দড়ি একটু একটু করে ছাড়তে লাগল। শরীর মুচড়ে, আঁকিয়ে-বাকিয়ে ছাড়া পাওয়ার চেষ্টা করল সাপ, পারল না, ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল খাঁচার দিকে।
অবশেষে বিশাল মাখাটা ঢুকল দরজার ভেতর।
সাপের অর্ধেকটা শরীর খাঁচায় ঢুকে যাওয়ার পর লেজের দড়িতে বেশি করে ঢিল দেয়া হলো। বার দুই এদিক ওদিক নেড়ে মানুষ ধরার চেষ্টা করল লেজটা, তারপর আপনাআপনি ঢুকে গেল ভেতরে। লাগিয়ে দেয়া হলো দরজা।
খুশি হতে পারল না কেউ। অ্যানাকোণ্ডার জন্যে অনেক বেশি মূল্য দিতে হয়েছে।
গায়ের ছেঁড়া শার্ট খুলে ভিজিয়ে এনে মিরাটোর রক্তাক্ত মুখ মুছে দিল মুসা। চোখের পানি ঠেকাতে পারল না। ভালবেসে ফেলেছিল তরুণ ইনডিয়ানকে। আজ একজন বড় বন্ধুকে হারাল তিন গোয়েন্দা।

মিরাটো চলে যাওয়ায় বড় বেশি অসহায় মনে হলো নিজেদেরকে, ভবিষ্যৎ অন্ধকার। লাশের পাশে বসে রইল তিনজনে।
খাঁচাটা নৌকায় তুলল ইনডিয়ানরা। বাথটাবে পানি ভরল। তারপর ফিরে এল কবর খুঁড়তে।
যে গাছের তলায় জীবন দিয়েছে মিরাটো, সেদিন সন্ধ্যায় সেখানেই কবর দেয়া হলো তাকে।
নদীর ভাটির দিকে একটানা চলেছে বজরা-বহর। সবাই বিষণ্ন। কিশোরের একমাত্র ভাবনা, কি করে এখন ম্যানাও পৌঁছে স্টীমারে জানোয়ারগুলো তুলবে।
তিন গোয়েন্দার কাছে এখন জঙ্গল শুধু মৃত্যু আর আতঙ্ক।
এই সময় মুসার উঠল জ্বর। অবহেলা করে ম্যালেরিয়া নিরোধক ট্যাবলেট খায়নি নিয়মিত, হ্যামকের ওপর মশারী খাটায়নি। এক রাতের মশার কামড়েই ধরে ফেলেছে। ছোট বজরার টলডোর ছাতে শুয়ে রইল সে।
ভ্যাম্পের দেখা নেই। কিশোর আশা করল, ডাকাতটার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া গেছে। কিন্তু একদিন জংলীদের ঢাকের শব্দ কানে এল। একটা বাক পেরিয়ে দেখা গেল গ্রামে আগুন। ভ্যাম্পের দলের কাজ না-তো? ওরা লাগিয়েছে? শিওর হলো কিছুক্ষণ পরই, যখন দেখল, চরের ওপর পড়ে রয়েছে ডাকাতদের নৌকাটা। ভেসে যাওয়ার ভয়ে ডাঙায় তুলে রেখে গেছে।
আতঙ্কিত হয়ে পড়ল কিশোর। মুসা অসুস্থ, মিরাটো নেই, এখন যদি এসে ভ্যাম্পের দল আক্রমণ করে, ঠেকাতে পারবে না। ডাকাতদের অলক্ষে এখন কোনমতে পালাতে পারলে বাঁচে।
আরও মাইল পাঁচেক ভাটিতে একটা খালের মুখে থামল সেদিন রাত কাটানোর জন্যে।
বার বার কান পেতে শুনছে লোকেরা। ঢাক এখনও মাঝে মাঝেই বেজে। উঠছে। অনেক দূর থেকে জবাব আসছে সে-শব্দের। তারমানে খবর দেয়া হচ্ছে। অন্য গ্রামের জংলীদের, দাওয়াত করছে, কিংবা সাহায্যের আবেদন। ঢাকের শব্দে কেপে কেপে উঠছে বন।
ভীষণ ভয় পাচ্ছে কিশোরদের সঙ্গের ইনডিয়ানরা। আগুনের কাছে গায়ে গা ঠেকিয়ে জড়সড় হয়ে বসেছে। ফিসফাস করছে। তাদের আরও উত্তেজিত করে। তুলছে জিবা।
কাছে এসে দাঁড়াল কিলোর। কি হয়েছে, জিবা?
ঢাক, সিনর। এরা ঢাকের শব্দে ভয় পাচ্ছে।
কেন? এক ইনডিয়ান অন্য ইনডিয়ানকে জবাই করবে না।

এক গোত্রের না হলে করবে। এখানকার ইনডিয়ানরা ভারি পাজী, বুনো। বিদেশী মানুষকে দেখতে পারে না, তাদেরকে যারা সাহায্য করে, তাদেরকেও না। তোমাকে ধরতে পারলে খুন করে ফেলবে, সঙ্গে যারা আছে কাউকে ছাড়বে না।
হাসল কিশোর। যতখানি বলছ, ততটা হয়তো নয়। প্রথম থেকেই তো বাড়িয়ে বলা শুরু করেছ।
নদীর ধারে গেল জিবা আর তার সঙ্গীরা, গায়ে কি ঘটছে দেখার জন্যে। উত্তেজিত হয়ে উজানের দিকে কি যেন দেখাচ্ছে আর বলাবলি করছে। পায়ে পায়ে তাদের কাছে চলে গেল কিশোর, রবিন রইল মুসার কাছে।
রক্তাক্ত সূর্যাস্তের পটভূমিতে জংলীদের জ্বলন্ত গায়ের ধোয়া কেমন যেন বিষণ্ন করে তুলেছে পরিবেশ। কিন্তু সেটা দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি ইনডিয়ানদের, তারা চেয়ে আছে নোকার দিকে। এদিকেই ভেসে আসছে নৌকাটা। দূর থেকেই যাত্রীদের দেখা গেল। কিশোর গুণল, নয় জন। চুপ করে বসে আছে ওরা, দাঁড় বাইছে না।
একেবারে নড়ছে না, আশ্চর্য তো!
হঠাৎ ঠাণ্ডা হয়ে গেল কিশোরের হাত-পা।
আরও কাছে এসে গেছে নৌকা। সাঁঝের আবছা আলোয় এখন কিছুটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে নয় জন মানুষকে। কেন কেউ নড়ছে না বোঝা গেল এতক্ষণে। একজনেরও মাথা নেই।
স্রোতের টানে পঞ্চাশ ফুটের মধ্যে চলে এল নৌকা। সাংঘাতিক ভয় পেয়েছে। জিবা, থরথর করে কাঁপছে।
নয়টা মুণ্ডশূন্য ধড়! কাপড় দেখেই বোঝা যাচ্ছে, ওরা ইনডিয়ান নয়।
নিশ্চয় ভ্যাম্পের ডাকাতদল। এতদিন অন্যের গলা কেটেছে, এবার নিজেদের গলাই কাটা পড়ল। জংলীদের গায়ে আগুন লাগানোর পরিণতি।
আতঙ্কিতযেমন হয়েছে, সেই সাথে স্বস্তিও পাচ্ছে কিশোর।

.

সকালে চোখেমুখে রোদ লাগলে ঘুম ভাঙল কিশোরের। অলস ভঙ্গিতে আড়মোড়া ভাঙল, মুখের ওপর হাত রেখে পড়ে রইল চুপচাপ।
সকালের এই কয়েকটা মুহূর্ত এখানে উপভোগ করে সে। আগুন জ্বালানোর জন্যে এই সময় কাঠ জোগাড়ে ব্যস্ত হয় ইনডিয়ানরা। তাদের অলস কথাবার্তা, কেটলি আর মগের ঠোকাঠুকির শব্দ, ধোয়া আর কফির গন্ধ, ভাল লাগে তার।
কিন্তু আজ এত চুপচাপ কেন? শুধু জঙ্গলের পরিচিত কোলাহল, আর মাঝে মাঝে জংলীদের ঢাকের একঘেয়ে দিডিম দিড়িম।

চোখের ওপর থেকে হাত সরিয়ে কাত হয়ে তাকাল কিশোর। আগুনের পাশে গোল হয়ে বসে থাকার কথা ইনডিয়ানদের, হাতে মগ।
কিন্তু কেউ নেই। জনশূন্য ক্যাম্প।
এমন তো হওয়ার কথা নয়। হ্যামক থেকে নামল কিশোর। গাছের আড়াল থেকে বেরিয়েই যেন হোঁচট খেল। বড় বজরার পেছনে নোঙর করা মনট্যারিয়াটা নেই।
ভয় পেল কিশোর, প্রচণ্ড ভয়। মনকে বোঝাল, নৌকা নিয়ে মাছ ধরতে গেছে লোকগুলো, নাস্তার জন্যে। কিন্তু তা-ই যদি হবে, সবাই কেন? বড় জোর, দু-জন যাবে, অন্যেরা থাকবে আগুনের কাছে।
ভাটির দিকে যতদূর চোখ যায়, তাকাল সে। কোন নৌকার চিহ্নও নেই।
নিজেকে প্রবোধ দেয়ার আর কোন মানে হয় না। যা সত্য, সেটাকে মেনে নেয়াই উচিত। ইনডিয়ানদের নিয়ে পালিয়েছে জিবা।
রবিনকে ডেকে তুলল কিশোর। মুসা প্রায় অচেতন।
দেখা গেল, শুধু নৌকাটাই নিয়েছে ওরা, মালপত্র সব আছে। এমনকি মনট্যারিয়ায় সেসব জানোয়ার ছিল, সেগুলোকেও রেখে গেছে বড় বজরায়, বোধহয় ভার কমিয়েছে। ছেড়ে দিল না কেন? খাবার, জাল, মাছ ধরার সরঞ্জাম, মূল্যবান কাগজপত্র, ওষুধ, বন্দুক, গুলি, সব রয়েছে। ছোয়ওনি কিছু।
ভীষণ জঙ্গলে একা এখন তিন গোয়েন্দা, অসহায়। মুসা জ্বরের ঘোরে বেহুশ। নরমুণ্ড শিকারীরা খেপে আছে। আগের দিন বিকেলের বীভৎস দৃশ্যটা মনে পড়ল। কিশোরের। শিউরে উঠল। কল্পনা করল, বড় বজরায় জানোয়ারের সঙ্গে তিনটি কাটা ধড়..আর ভাবতে পারল না সে।
দুর্বল কণ্ঠে ডাক দিল মুসা।
তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল রবিন।
পানি চায় মুসা।
কপালে হাত দিয়ে দেখল রবিন, পুড়ে যাচ্ছে। পকেটেই টেবলেট আছে, পানির সঙ্গে ওষুধও খাইয়ে দিল। সংক্ষেপে জানাল, কি ঘটেছে।
ম্যালেরিয়া চিন্তাশক্তি ঘোলাটে করে দিয়েছে মুসার। রবিনের কথা ঠিকমত বুঝতে পারল না, কিংবা কানেই ঢুকল না। বিরক্ত হয়ে বলল, আমাকে ঘুমাতে দিচ্ছ না কেন?
উঠে চলে এল রবিন।
ইতিমধ্যে আগুন ধরিয়ে ফেলেছে কিশোর। নাস্তা বানাতে বসল দু-জনে। কানে আসছে ইনডিয়ানদের ঢাক। ইস থামে না কেন? পাগল করে দেবে নাকি?
চামচ দিয়ে ডিম আর কফি খাওয়ানো হলো মুসাকে।

তারপর রাইফেল নিয়ে শিকারে চলল, কিশোর আর রবিন। জানোয়ারগুলোকে খাওয়াতে হবে, বিশেষ করে অ্যানাকোন্ডাকে। ক্ষুধায় অস্থির। হয়ে উঠেছে ওটা। লেজের বাড়ি মেরে সমস্ত পানি ফেলে দিয়েছে খোল থেকে। আগে তার পেট ঠাণ্ডা না করে পানি ভরেও লাভ নেই, আবার ফেলে দেবে।
চওড়া খাল। খালের ধার ধরে এগিয়ে চলল দু-জনে। কোন জানোয়ার পানি খেতে এলে গুলি করবে।
হঠাৎ থেমে গেল কিশোর। রবিনকেও থামাল। হাত তুলে দেখাল সামনে। কোমর পানিতে দাঁড়িয়ে আছে একজোড়া ইনডিয়ান দম্পতি, মেয়েটা কোলের বাচ্চাকে দুধ খাওয়াচ্ছে।
ভালমত আরেকবার দেখে হেসে ফেলল গোয়েন্দাপ্রধান। খুদে চোখ, ভোতা নাক আর মোটা ঠোঁট দেখা যাচ্ছে।
গ্রীষ্মমণ্ডলীয় সাগরে কত নাবিক যে বোকা বনেছে ওগুলোকে দেখে। সাগর। থেকে ফিরে এসে গল্প করেছে, মৎসকন্যার দেখা পেয়েছে তারা। ওগুলোর অর্ধেক শরীর মানুষের মত, অর্ধেক মাছের। সাগরের কিনারে পাথরে বসে বাচ্চাকে দুধ খাওয়ায়, চুল আচড়ায়। যা দেখেছে তার সঙ্গে রঙ চড়িয়েছে অনেক বেশি।
নাবিকদের দোষ দেয়া যায় না। এই তো, এইমাত্র কিশোর আর রবিনও তো। বোকা বনল, কাছে থেকে দেখেও।
আরও এগোল দু-জনে। মুখ অনেকটা গরুর মত জীবগুলোর। ম্যানাটি। ব্রাজিলিয়ানরা বলে কাউফিশ, অর্থাৎ গরুমাছ।
ঘন শেওলায় লেজ ডুবিয়ে বসে আছে ম্যানাটি দুটো। মাদাটা বাচ্চাকে দুধ খাওয়াচ্ছে, মদ্দাটা পদের কড়ি খুঁটছে। দশ ফুট করে লম্বা হবে একেকটা, হোঁতকা, টনখানেকের কম হবে না ওজন। অ্যানাকোন্তার প্রিয় খাবার, কিন্তু এতবড়গুলোকে মেরে নিয়ে যাওয়া যাবে না।
পাখনা আর লেজের ঝাপটা শুনে চোখ ফেরাল কিলোর। আরও ম্যানাটি রয়েছে কাছাকাছি। ছোট একটা দেখল, পাঁচ ফুটও হবে না। হ্যাঁ, এইটা হলে চলে। পাড়ের কাছে অল্প পানিতে জলজ ঘাসের ডগা ছিঁড়ে খাচ্ছে জীবটা।
খুব কাছে থেকে গুলি করল কিশোর।
গুলির শব্দে ঝাঁপিয়ে পড়ে ডুব দিল বড় ম্যানাটি দুটো। ছটফট করছে গুলি খাওয়াটা। তলিয়ে যেতে পারে, এই ভয়ে ছুটে এসে প্রায় মাথায় ঠেকিয়ে আবার গুলি করল কিশোর। রাইফেল বলে মারতে পেরেছে, বন্দুক হলে পারত না। খুব। শক্ত ম্যানাটির চামড়া, ইনডিয়ানরা বর্ম বানায়, শটগানের গুলি হয়তো চামড়াই ভেদ করত না।

দুটো গুলি খেয়েও সঙ্গে সঙ্গে মরল না ম্যানাটিটা। তীরের মাটিতে গরুর মত নাক দিয়ে গুতো মারতে লাগল, তারপর স্থির হয়ে গেল। ডাঙায় তোলার চেয়ে পানি দিয়ে টেনে নেয়া সহজ, খাটনি কম হবে। লেজ ধরে ওটাকে টেনে নিয়ে চলল। দু-জনে।

পিচ্ছিল চামড়া। তাই নৌকায় টেনে তুলতেও বিশেষ অসুবিধে হলো না। খাঁচার দরজার কাছে ম্যানাটিটাকে নিয়ে এল ওরা।

খিদেয় পাগল হয়ে গেছে সাপটা। খাঁচার দরজায় বার বার বাড়ি মারছে মাথা দিয়ে। এরকম চালিয়ে গেলে এক সময় খাঁচা ভেঙে যাবেই। তিরিশ ফুট লম্বা শরীরটা কুণ্ডলী পাকিয়ে রেখেছে। খুব শয়তান জীব। অ্যানাকোণ্ডা কখনও পোষ। মেনেছে বলে শোনা যায়নি। ইনডিয়ানদের বন্ধু বোয়া, কুকুর-বেড়ালের মতই পোষ মানে। কিন্তু সাপের জগতের ডাকাত অ্যানাকোণ্ডাকে এড়িয়ে চলে জংলীরাও। কারও সঙ্গেই ভাব ভাল না দানবগুলোর।

খাবার তো আনা হলো, এখন খাওয়ায় কি করে? খাঁচার দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে ছোবল হানবে কুৎসিত মাথাটা, পা কামড়ে ধরে চোখের পলকে কিশোরকে টেনে নেবে ভেতরে, পাকে জড়িয়ে ভর্তা করে ফেলবে।

কুঁই কুঁই করে ছুটে এল নাক, খিদে পেয়েছে জানাচ্ছে। ক্ষুধার্ত চোখে তার দিকে তাকাল অ্যানাকোণ্ডা, মাথাটা পিছিয়ে নিয়ে বিদ্যুৎগতিতে ছোবল মারল, খাঁচায় বাঁশের বেড়া না থাকলে নাকুর জীবনের ওখানেই ইতি ঘটত।

উপায় পাওয়া গেল। নাকুকে তুলে নিয়ে খাঁচার কোণার কাছে চলে এল কিশোর। সেদিকে চোখ রেখে খাঁচার ভেতরে অনুসরণ করল অ্যানাকোন্তার মাথা, কোণায় চলে এল।

খাঁচার বাইরে কয়েক ফুট দুরে নাকুকে রেখে, রবিনকে ধরতে বলল কিশোর।

স্থির চোখে চেয়ে আছে অ্যানাকোণ্ডা, সম্মোহন করছে যেন। এভাবে সম্মোহন। করে নাকি শিকারকে দাঁড় করিয়ে রাখে, তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে খপ করে ধরে। কিন্তু নাকুর ওপর বিশেষ সুবিধে করতে পারল না সাপ, শক্ত করে ধরে রেখেছে রবিন। তাপিরটাকে নড়তেই দিচ্ছে না।

খাঁচার দরজার কাছে চলে এল কিশোর। অ্যানাকোপ্তার দৃষ্টি অন্য দিকে, এই সুযোগে খাঁচার পাল্লার কিনারে দড়ি পেঁচাল সে। তারপর বাঁধন খুলল। দড়িটা সামান্য ঢিল রেখেছে, দুই-তিন ইঞ্চি ফাঁক হয় টানলে। ম্যানাটির চ্যাপ্টা লেজ। ঢুকিয়ে দিল সেই ফাঁকে। তাপিরটাকে সরিয়ে নিতে বলল।

নিয়ে গেল রবিন।

ম্যানাটির ওর চোখ পড়ল অ্যানাকোণ্ডার। এক লাফে চলে এল মাথাটা। খপ করে কামড়ে ধরে টানতে শুরু করল।

পেঁচানো দড়িতে আরেকটু ঢিল দিল কিশোর, খানিকটা ঢুকল ম্যানাটির শরীর। এভাবে ঢিল দিতে দিতে অনেকখানি ফাঁক করে ফেলল দরজা, টান দিয়ে শিকারের। পুরো শরীরটাই খাঁচার ভেতরে নিয়ে গেল সাপ। তাড়াতাড়ি আবার দরজা বন্ধ করে বেধে ফেলল কিশোর।
অ্যানাকোন্ডা যখন শিকার ধরে, আর কোন দিকে খেয়াল করে না। কি করে শিকার গিলবে, খালি সেই ভাবনা দেখতে দেখতে গিলে ফেলল ভারি ম্যানাটিটাকে।
যাক, কয়েক হপ্তার জন্যে নিশ্চিন্ত, ভাবল কিশোর। পেট খালি না হলে আর গোলমাল করবে না।
বাকি জীবগুলোকে খাওয়াতে লাগল সে। রবিন সাহায্য করছে বটে, কিন্তু। মুসার মত পারছে না। এসবের জন্যে মুসা একাই যথেষ্ট। এই মুহূর্তে সহকারী গোয়েন্দার অভাব খুব অনুভব করছে কিশোর, জানোয়ারগুলোর ভাবভঙ্গিতেও মনে হচ্ছে, ওরা মুসাকে খুঁজছে।
খাওয়াচ্ছে, সেই সঙ্গে ভাবনা চলেছে কিশোরের মাথায়। ভ্যাম্পের ডাকাতদলের সবাই কি মারা গেছে? কতজন লোক ছিল দলে? সেদিন রাতে যখন আক্রমণ করছিল, আট-দশজনকে দেখা গেছে। নৌকায় ভেসে গেছে নয়টা ধড়। দশজন হলে বাকি থাকে একজন। কেন যেন তার মনে হচ্ছে, একজন জীবিত আছেই, ভ্যাম্প। ভ্যাম্পায়ার মরেনি। এত সহজে মরতে পারে না তার মত শয়তান। দিনের বেলা জেগে জেগেই দুঃস্বপ্ন দেখতে লাগল সে। হেসে উড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করল, পারল না। অমাবস্যার রাতের চেয়ে ভয়ঙ্কর, নির্জন, আর ভূতুড়ে মনে হচ্ছে এখন জঙ্গলটাকে। সঙ্গী আরও দু-জন রয়েছে তবু মনে হচ্ছে বড় একা সে। কালোবনের এই ভয়াবহ নিঃসঙ্গতাবোধ পাগল করে দিয়েছে অনেক অভিযাত্রীকে।
নৌকা থেকে নামল দুজনে।
রবিন গেল মুসার কপালে জলপট্টি দিতে। কিশোর বসে রইল একটা গাছের গোড়ায়। কাজ তেমন কিছু করেনি, অথচ সাংঘাতিক ক্লান্তি লাগছে। ম্যালেরিয়া তাকেও ধরছে না-তো?
মাথায় কারও হাতের স্পর্শ লাগল। না, রোগেই ধরছে। আবল-তাবল কল্পনা। শুরু হয়ে গেছে তাই। কিন্তু চাপ বাড়ছে মাথায়, কল্পনা নয়। ফিরে তাকাল সে। হ্যাঁ, কল্পনাই। নইলে ভ্যাম্পের চেহারা দেখবে কেন? কুৎসিত চেহারাটা আরও কুৎসিত দেখাচ্ছে এখন। শার্ট-প্যান্ট শতছিন্ন, রক্তাক্ত। উষ্কখুষ্ক চুল। গালে-মুখে হাতে কাঁটার আঁচড়।

মাথা ঝাড়া দিয়ে দুঃস্বপ্নটা দূর করতে চাইল কিশোর। পাশে রাখা রাইফেলে হাত দিল। লাফ দিয়ে উঠে পিছিয়ে গেল। রাইফেল তুলল। গুলি করার দরকার হলো না। তার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ল নিরস্ত্র দুর্বল ভ্যাম্প।
আবার মুখ তুলল, মেরো না, আমাকে দোহাই তোমার! করুণ মিনতি। ওদেরকে ধরতে দিও না। কেটে ফেলবে আমাকে... ধড় থেকে কল্লা আলাদা করে ফেলবে..
সেটাই তোমার উচিত সাজা হবে, কঠিন,কণ্ঠে বলল কিশোর। আমাদের কাছে এসেছ সাহায্য চাইতে। লজ্জা করে না?
শোনো, ভাই, কেঁদে ফেলল ভ্যাম্প, আমরা বিদেশী। শত্রু হলেও এখন বন্ধু। আমাদের একসঙ্গে থাকা উচিত। ওদের হাতে তুলে দিও না আমাকে।
ওদের গাঁয়ে আগুন দিয়েছিলে?
ভুল করে ফেলেছিলাম।
কাউকে মেরেছ?
বেশি না। কয়েকটা জংলী মরলে কি এসে যায়, বলো? উঠে বসল সে, থরথর করে কাঁপছে। আমার পিছু নিয়েছে ওরা।
পুরো এক মিনিট ভ্যাম্পের পেছনে জঙ্গলের দিকে চেয়ে রইল কিশোর। ভাবল, কেন সাহায্য করবে খুনে ডাকাতটাকে?
কিন্তু অবশেষে না করে পারল না। নিরস্ত্র একজন মানুষকে মুণ্ড কাটার জন্যে তুলে দিতে পারল না ইনডিয়ানদের হাতে।
এসো, ক্যাম্পের দিকে হাঁটতে শুরু করল কিশোর।
কাঁপতে কাঁপতে সঙ্গে চলল ভ্যাম্প, বার বার বনের দিকে ফিরে তাকাচ্ছে। ঈশ্বর তোমার ভাল করবেই, ভাই। কোলা ব্যাঙের ঘ্যা-ঘ্যা বেরোচ্ছে গলা দিয়ে। আমি জানি, আমাকে মারবে না তুমি। খুব ভাল ছেলে। তোমার বন্ধুরা কোথায়, ভাই? ওরাও খুব ভাল। জানি, আমাকে কিছু বলবে না। হাজার হোক, সবাই আমরা বিদেশী। ইনডিয়ানদের সঙ্গে কেন হাত মেলাব?
ক্যাম্পে এসে এদিক ওদিক তকাল ভ্যাম্প। তোমার লোকজন কোথায়?
পালিয়েছে।
হারামজাদারা। বেঈমান। ইনডিয়ান তো। বিশ্বাস নেই। জানোয়ারগুলো নিয়ে গেছে?
না। নৌকায় ওই বাঁকের মুখেই আছে।
ফাইন! স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ভ্যাম্প। তোমাদের কপাল খুব ভাল। লোকজন চলে গেছে বটে, কিন্তু আমি এসে পড়েছি। আর কোন চিন্তা নেই। আমাকে বিশ্বাস করতে পারো। আমি নৌকা চালিয়ে নিয়ে যাব ভাটিতে.তা ভাই, খাবার-টাবার আছে কিছু? চব্বিশ ঘণ্টা পেটে দানা পড়েনি।

লোকটাকে খেতে দিল কিশোর।
ওর কি হয়েছে? মূসাকে দেখাল ভ্যাম্প।
জ্বর। ম্যালেরিয়া।
তাই নাকি? খুব খারাপ, খুব খারাপ। তা সত্যিই তোমরা একা? আর কেউ নেই?
ঝট করে মুখ তুলল কিশোর, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। তাতে কি? কোন চালাকির চেষ্টা কোরো না। তুমিও একা। আমাদের কাছে বন্দুক আছে, তোমার কাছে তা-ও নেই: তোমার গলাকাটা দোস্তদের ভেসে যেতে দেখলাম কাল বিকেলে, নিজেদেরই গলা কাটা। তুমি পালালে কিভাবে? ওরা যখন লড়াই করছিল, নিশ্চয়। ঝোপের মধ্যে চোরের মত লুকিয়েছিলে?
আমি হলাম গিয়ে নেতা, কেন ওদের সঙ্গে লড়াই করে মরতে যাব? বেতন। খেয়েছে, কাজ করেছে। যাকগে, ওসব ফালতু আলোচনা করে লাভ নেই। যা। ছিলাম ছিলাম, এখন ভাল হয়ে গেছি। প্রতিজ্ঞা করেছি, জীবনে আর কারও কোন ক্ষতি করব না। কারও একটা চুল ছিড়ব না, যত টাকাই দিক না কেন আমাকে। অন্যের কাজ করতে গিয়েই তো আজ এই অবস্থা, মরতে মরতে বেচেছি। মার্শ হারামীটা বলল জানোয়ার চুরি করতে, আর আমিও রাজি হয়ে গেলাম.ছিহ! বিশাল একটুরো মাংস মুখে পুরল সে। তোমাদের দেখে যা খুশি হয়েছি না, কি বলব। নিজের মায়ের পেটের ভাইকে দেখলেও এতটা হতাম না।
হ্যাঁ, হাবিল-কাবিলের মত ভাই, টিটকারির ভঙ্গিতে বলল কিশোর।
মানেটা বুঝল না ভ্যাম্প। হেসে বলল, ঠিক বলেছ। জঙ্গলের দিকে চাইল। ফিরে তাকাল পানির দিকে।
ফুলে উঠছে খালের পানি। কিশোরও খেয়াল করেছে ব্যাপারটা। আগের দিন বিকেলে যতখানি ছিল, তার চেয়ে অনেক বেড়েছে পানি। স্রোত চলেছে নদীর দিকে। ভেসে যাচ্ছে উপড়ানো একটা গাছ। শুধু গাছই নয়, বন্যার সময় ভাসমান। দ্বীপও দেখা যায় আমাজনে। কয়েক দিন ধরে দেখা যাচ্ছে। তারমানে আসছে। প্রচণ্ড বন্যা। প্রতিবছরই এই সময়ে বন্যা হয় এ-অঞ্চলে।
ভীষণ বৃষ্টি হচ্ছে উজানে, আনমনে বলল ভ্যাম্প। কিশোরের দিকে ফিরল। এখন যেখানে বসে আছি, আর হপ্তাখানেক পরে এটা থাকবে কয়েক ফুট পানির তলায়। কিংবা হয়তো দ্বীপ হয়ে ভেসে যাবে। চার-পাঁচতলা বাড়ির সমান বড় বড় মাটির টুকরো ভেঙে ভেসে যায় নদী দিয়ে। অদ্ভুত কাণ্ড, না দেখলে বিশ্বাস হয় না। নোকার সঙ্গে ওগুলোর ধাক্কা লাগলে...না না, তোমাদের চিন্তা নেই। নৌকা আমি সামলাব। যেভাবেই হোক, ম্যানাও পৌঁছে দেব তোমাদের খেয়ে-দেয়ে অনেক সুস্থ হয়েছে সে। কুৎসিত হাসিতে হলদে দাঁত বের করে বলল, আর ভয় নেই তোমাদের, আমি এসে গেছি। বুকে হাত রাখল। আমি পৌঁছে দেব।

সাঁ করে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গিয়ে খট করে গাছে বিঁধল একটা তীর।
দুই লাফে ঝোপে গিয়ে ঢুকল ভ্যাম্প। ঝোপঝাড় ভেঙে ছুটল।
কি হলো? বলে উঠল রবিন।
মুসাও,মাথা তুলেছে।
জংলী! ফিসফিসিয়ে বলল কিশোর। মুসা, শুয়ে থাকো।
যেদিক থেকে তীর এসেছে সেদিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বলল সে, আমরা বন্ধু!
লিংগুয়া জেরাল, অর্থাৎ ইনডিয়ানদের সাধারণ ভাষায় কথা বলেছে কিশোর, বোঝার কথা নয় ওদের। কিন্তু জবাবে আরেকটা তীর উড়ে এল, অল্পের জন্যে তার কাঁধটা বাচল।
নয়টা ধড়ের কথা মনে পড়ল কিশোরের। চট করে তাকাল হ্যামকে শুয়ে থাকা মুসার দিকে। পাশে রবিন। ওদেরকে বাঁচানোর একমাত্র উপায় লড়াইটা এখান থেকে সরিয়ে নেয়া।
ইনডিয়ানরা যেদিকে রয়েছে, একছুটে সেদিকের জঙ্গলে ঢুকে পড়ল সে। হাতে রাইফেল। ওরা বন্ধুত না চাইলে গুলি খাবে।
এই কিশোর, এই, কোথায় যাচ্ছে? শোনা গেল রবিনের চিৎকার।
আরেকটা তীর শিস কেটে গেল কিশোরের কানের পাশ দিয়ে। মাত্র একটা করে তীর আসে কেন? ব্যাপার কি?
কারণটা জানা গেল। মাত্র একজন ইনডিয়ান। দৌড়ে গেল কিশোর।
রাইফেল-বন্দুক চেনা আছে ইনডিয়ানদের। কিশোরের হাতে রাইফেল দেখে ঘুরে দিল দৌড়। চেঁচিয়ে পেছন থেকে ডাকল কিশোর। কিন্তু কে শোনে কার কথা। গতি আরও বাড়িয়ে দিল জংলীটা।
প্রায় আধ মাইল পিছে পিছে গেল কিশোর। কিন্তু লোকটা থামল না। হারিয়ে গেল ঘনবনের ভেতরে, পোড়া গ্রামটা যেদিকে, সেদিকে।
কিশোর বুঝল, নোকটা গুপ্তচর। ভ্যাম্পের চিহ্ন অনুসরণ করে এসেছে। গ্রামে ফিরে গিয়ে এখন জানাবে সব, দলবল নিয়ে আসবে।
ছুটে ক্যাম্পে ফিরে এল কিশোর। একটা মুহূর্ত নষ্ট করা চলবে না এখন। মুসাকে বয়ে নিয়ে গিয়ে তুলতে হবে বজরায়, যত তাড়াতাড়ি পারা যায় নোঙর তুলে পালাতে হবে।
দু-তিন কথায় রবিনকে সব বুঝিয়ে বলল কিশোর। হ্যামক খুলতে শুরু করল। দু-জনে ধরাধরি করে মুসাকে বয়ে নিয়ে এল নদীর পাড়ে।
উত্তেজনায় ভ্যাম্পের কথা ভুলে গিয়েছিল কিশোর, ঝোপঝাড়ের ভেতর থেকে পাড়ের উজ্জ্বল রোদে বেরিয়েই থমকে গেল। ধ্বক করে উঠল বুক।
বজরাটা নেই আগের জায়গায়।

তীব্র স্রোতে ভাটির দিকে ছুটে চলেছে ওটা। পাল তোলা। হাল ধরে থাকা। ছাড়া আর কিছুই করতে হচ্ছে না ভ্যাম্পকে। মঞ্চে দাঁড়িয়ে হাল ধরে রয়েছে অলস ভঙ্গিতে।
তিন গোয়েন্দাকে দেখে হাত নাড়ল। চেঁচিয়ে বলল, বিদায়, দোস্তরা। নরকে দেখা হবে আবার!

.
রাইফেল তুলেও নামিয়ে নিল কিশোর। রেঞ্জ অনেক বেশি। তাছাড়া ম্যাগাজিনে একটি মাত্র বুলেট অবশিষ্ট রয়েছে। তিনটে ছিল, দুটো খরচ হয়েছে ম্যানাটি মারতে।
মাথা গরম করলে চলবে না, নিজেকে বোঝাল সে। হ্যামকসহ মুসাকে মাটিতে নামিয়ে রেখেছে, তার পাশে বসে পড়ল। চিমটি কাটতে শুরু করল নিচের ঠোঁটে।
কতখানি খারাপ অবস্থায় পড়েছে, বোঝার চেষ্টা করছে। নৌকা নেই। সঙ্গে কোন যন্ত্রপাতিও নেই যে বানিয়ে নেবে। শুধু শিকারের ছুরিটা ঝোলানো আছে। কোমরে। চেষ্টা করলে হয়তো একটা ভেলা বানাতে পারবে, কিন্তু তাতে অন্তত এক হপ্তা লাগবে। এত সময় নেই হাতে, আছে বড় জোর এক ঘণ্টা। হয়তো গা পর্যন্ত যেতে হবে না ইনডিয়ান লোকটাকে, ভ্যাম্পকে খুজতে আরও লোক যদি বেরিয়ে থাকে, তাদের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। ধরার জন্যে ছুটে আসবে ওরা। তাহলে এক ঘণ্টার আগেই আসবে।
জঙ্গলে গিয়ে লুকাতে পারে। কিন্তু বনে টিকে থাকার সরঞ্জাম সঙ্গে নেই, সব রয়ে গেছে বড় বজরায়।
কি কি আছে, হিসেব করল কিশোর। তিনজনের পরনের শার্ট-প্যান্ট, জুতো। তিনটে হ্যামক, একটা ছুরি, একটা রাইফেলে একটি মাত্র বুলেট, ব্যস।
এসব নিয়ে জঙ্গলে লুকিয়ে টিকতে পারবে না। আর লুকাবে কার কাছ থেকে? ইনডিয়ানদের? চব্বিশ ঘণ্টাও বাঁচতে পারবে না, ধরা পড়ে যাবে। সবচেয়ে বড় কথা, জঙ্গলে ঢুকলে ভ্যাম্পের দেখা আর কোন দিনই পাবে না। পাবে না এমনিতেও, তবে নদী পথে এগোনো গেলে ক্ষীণ সম্ভাবনা আছে।
খালের মুখের কাছ দিয়ে ভেসে যাচ্ছে একটা দ্বীপ। ঝিক করে উঠল ভাবনাটা। বিপদের কথা ভাবল না, ঝুঁকি নিতেই হবে, এছাড়া উপায় নেই। বলল, রবিন, জলদি!
কি জলদি, জিজ্ঞেস করল না রবিন। কিশোরকে ঘন ঘন দ্বীপটার দিকে তাকাতে দেখেই অনুমান করে নিয়েছে।
অন্য দুটো হ্যামক গুটিয়ে দিয়ে মুসার হ্যামকে রাখল। তারপর দুজনে মিলে তাকে বয়ে নিয়ে চলল খালের মুখের কাছে।

ঘোলা হয়ে গেছে নদীর পানি। পাক আর স্রোত বাড়ছে। তুমুল বর্ষণ হচ্ছে নিশ্চয় অ্যাণ্ডিজের ওদিকে, পানি সরে আসছে নিচের দিকে। অসংখ্য ছোট-বড় ভাসমান দ্বীপ দেখা যাচ্ছে এখন, ভেসে চলেছে স্রোতে।

সামনে দিয়ে ভেসে চলেছে একটা দ্বীপ। না, এটাতে ওঠা যাবে না। কচুরিপানার সঙ্গে অন্যান্য লতা আর ঝোপ মিশে বিশাল এক ভেলামত তৈরি। হয়েছে। প্রায় পুরোটাই পানির তলায়, ওপরে ভেসে রয়েছে শুধু নাল ফুলগুলো। ফুটখানেক পুরু, ছেলেদের ভার সইবে না। আর যদি সয়ও, অন্য বিপদ আছে। বড় বড় গাছ ভেসে যাচ্ছে, গড়াচ্ছে প্রাচীন স্টীমারের চাকার মত, ওগুলোতে লাগলে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে কচুরি পানার ভেলা।

ওটাতে উঠল না ওরা।

আরেকটা দ্বীপ এল। ঝোপঝাড় লতাপাতা শক্ত হয়ে লেগে তৈরি হয়েছে। বড় একটা ঝোপ উপড়ে আটকে গিয়েছিল হয়তো চোখা পাথরে, তার সঙ্গে যোগ। হয়েছে আরও ঝোপ, লতাপাতা, গাছের ডাল, ধীরে ধীরে বড় হয়েছে, পাথরের আর সাধ্য হয়নি আটকে রাখার। ছুটে ভেসে চলে এসেছে ভেলাটা। এটাও ভাসমান দ্বীপ, কিন্তু মাটি নেই এতে।

সবচেয়ে আজব দ্বীপ হলো যেগুলোর মাটি আছে, ঝোপঝাড়, এমনকি গাছও আছে। পুরোপুরি দ্বীপ, ভাসমান, এবং সচল। প্রকৃতির এক আজব খেয়াল। কিশোর শুনেছে, ওগুলোর কোন কোনটা দুশো ফুট লম্বা হয়, বিশ ফুট পুরু। গাছপালা, মাটির বোঝা নিয়ে কি করে ভেসে থাকে, সেটা এক বিস্ময়।

বাছবিচারের সুযোগ বা সময় কোনটাই নেই। ঝুঁকি নিয়ে উঠে পড়তে হবে একটাতে। তবে কচুরিপানা কিংবা শুধু ঝোপের তৈরি ভেলায় ওঠা চলবে না।

রবিনকে কথাটা বলল কিশোর। রবিনও একমত হলো। মুসাকে কিছু বলে। লাভ নেই, সে এখনও জ্বরের ঘোরে রয়েছে।

এগিয়ে আসছে আরেকটা ভেলা, ছোটখাটো একটা মাঠের সমান। তীর ঘেঁষে চলছে, কোণগুলো ঘষা খেতে খেতে আসছে পাড়ের সঙ্গে। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল কিশোর, ওটাতেই উঠবে।

সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় উঠে পড়ল সে, দু-হাতে ধরে রেখেছে হ্যামকের কোণ। অন্য দুই কোণ ধরে রবিনও উঠে পড়ল। খসে গেল কিনারের মাটি, লাফিয়ে সরে গেল সে, কিন্তু হ্যামক ছাড়ল না। দ্বীপের ভেতরের দিকে সরে এসে তারপর নামাল ওটা।

সামনে নদীর বাঁকে বাধা পেয়ে ঘুরতে ঘুরতে গভীর পানিতে সরে এসেছে স্রোত, দ্বীপটাও সরে চলে এল। আজব-যানে চড়ে নিরুদ্দেশ যাত্রায় চলল তিন গোয়েন্দা।

দ্বীপে ওঠাটা পাগলামি মনে হচ্ছে এখন কিশোরের। কিন্তু তীরে বসে মুণ্ড কাটা যাওয়ার অপেক্ষায় থাকার চেয়ে এটা ভাল। যা হওয়ার হবে, ভেবে লাভ নেই। আপাতত জংলীদের হাত থেকে তো রেহাই পাওয়া গেল। তাছাড়া, ভ্যাম্প যেদিকে গেছে সেদিকেই চলেছে ওরা।

ভাসমান দ্বীপের চেয়ে অনেক দ্রুত এগোচ্ছে ভ্যাম্প, সন্দেহ নেই। কারণ সে রয়েছে নৌকায়। দ্বীপের চেয়ে অনেক হালকা, তার ওপর রয়েছে পাল। কিন্তু যদি বাতাস পড়ে যায়? কিংবা কোন বালির ডুবোচরে আটকায়? এমনও হতে পারে, ভেসে যাওয়া কোন গাছের সঙ্গেই আটকে গেল। যদিও সবই অতিকল্পনা, কিন্তু, ভাবনাগুলো আসতেই থাকল কিশোরের মাথায়। ক্ষীণ একটা আশা–যদি ঘটে? যদি ঘটে যায় কোন কারণে?

নিজেদের ভাসমান রাজ্যটা ঘুরেফিরে দেখল কিশোর আর রবিন। পায়ের তলায় মাটি খুব শক্ত, খসে পড়ার ভয় নেই। আধ একর মত হবে। বেশির ভাগটাই ঘাসে ঢাকা। ছোট ছোট গাছপালাও আছে–সিক্রোপিয়া, রবার গাছ আর বাঁশ। বাঁশ বেশ লম্বা–দ্রুত গজায় বলে, কিন্তু অন্য গাছগুলো কয়েক ফুটের বেশি না।

হিসেব করে ফেলল কিশোরের হিসেবী মন। দ্বীপটা বছরখানেকের পুরানো। আগের বছরের বন্যায় আধ একর পলিমাটি জমেছিল কোন জায়গায়, বন্যা চলে যাওয়ার পর দ্বীপে রূপান্তরিত হয়েছিল। তার ওপর গাছের চারা গজিয়েছে। এ-বছর স্রোত ওই দ্বীপের তলা কেটে ভাসিয়ে নিয়ে এসেছে আস্ত দ্বীপটাকে, গাছপালাসহ।

কিন্তু বছরখানেকের পুরানো যদি হবে, দ্বীপের শেষ মাথার ওই মস্ত গাছটা এল কিভাবে? দেখেই বোঝা যায়, একশো বছরের কম হবে না ওটার বয়েস। ভালমত পরীক্ষা করে দেখল দু-জনে। বিশাল তুলা গাছ। কাণ্ডটা পানির তলায়, কিন্তু। ডালপালাগুলো ছড়িয়ে উঠে গেছে পঞ্চাশ ফুট ওপরে।

না, এই গাছ এ দ্বীপের নয়। ভেসে আসার সময় গাছটার সঙ্গে ধাক্কা লেগেছিল দ্বীপের, শক্ত হয়ে আটকে গেছে একটা আরেকটার সঙ্গে। ভাল। হ্যামক টানানোর চমৎকার জায়গা। মাটিতে থাকা নিরাপদ নয়। সাপের ভয় আছে। আরও নানা পোকামাকড়, বিশেষ করে সামরিক পিঁপড়ে। বন্যার সময় সবাই আশ্রয় খোঁজে। শুকনো জায়গা দেখলেই উঠে পড়ে।

কিচির মিচির শোনা গেল।

বানর, হাত তুলে দেখাল রবিন।

কিশোরও মুখ তুলে তাকাল। তাদের দিকেই চেয়ে আছে ছোট প্রাণীটা। বানভাসির শিকার।

যানটা মোটামুটি ভালই, টিকবে ভরসা হচ্ছে। এখন প্রধান সমস্যা হলো খাবারের। আলোচনায় বসল দুই গোয়েন্দা।
বাকি দিনটা খাবার খুঁজে বেড়াল ওরা। বাঁশের কোঁড় খুঁজল, কিন্তু সবই বড় বড়। খাওয়ার মত কচি একটাও নেই। একটা ঝোপে ছোট ছোট জামের মত কিছু ফল পেকে আছে। কয়েকটা খেয়েই বমি করে ভাসাল দু-জনে, খাওয়ার অযোগ্য, বিষাক্ত। ছোট একটা গাছ দেখল, আমাজনের বিখ্যাত কাউট্রি বা গরুগাছ। ছাল কাটলে গরুর দুধের মত সাদা কষ বেরোয়, প্রোটিন সমৃদ্ধ। কিন্তু এই গাছটার ছাল কেটে কয়েক ফোঁটার বেশি রস পাওয়া গেল না, একেবারে চারা।
সারভাইভাল এর ওপর যত বই পড়েছে ওরা, প্রায় সবগুলোতেই একটা ব্যাপারে জোর দেয়া হয়েছে... জঙ্গল, মেরু অঞ্চল, মরুভুমি, সাগর, সবখানেই বেচে থাকা যায় সামান্য কষ্ট করলে। কিন্তু এখন তাদের কাছে মোটেই সামান্য মনে হচ্ছে না ব্যাপারটা। এতক্ষণ চেষ্টা করেও খাবারের কোন ব্যবস্থা করতে পারল না।
নদীতে মাছ অনেক আছে। কিন্তু বড়শি বা জাল নেই, ধরবে কি দিয়ে? ইনডিয়ানরা ধরে তীর ধনুক কিংবা বর্শা দিয়ে। ছুরি দিয়ে বাঁশ কেটে, চেঁছে, দুই ঘণ্টা পরিশ্রম করে একটা বল্লম বানানো গেল। কিন্তু দ্বীপের পাড়ে মাছ ধরতে এসে হতাশ হলো ওরা। যা স্রোত, মাছ দেখাই যায় না। বেশি উঁকিঝুঁকি মারতে গিয়ে পানিতে পড়লে শেষ। আর উঠতে পারবে না দ্বীপে।
ইতিমধ্যে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল, ভিজিয়ে দিয়ে গেল জামাকাপড়। দুটো হ্যামক টাকা দিয়ে মুসাকে শুকনো রাখা গেছে কোনমতে।
বৃষ্টির পর এল জোর বাতাস। আট-নয় মাইল চওড়া খোলা নদীর ওপর দিয়ে বয়ে গেল তুফানের মত, দাঁতে দাঁতে কাঁপুনি তুলে দিয়ে গেল ছেলেদের। মনে হলো মেরু অঞ্চলে ঢুকেছে ওরা। অথচ রয়েছে বিষুবরেখার খুব কাছাকাছি।
অন্ধকার হওয়ার আগ পর্যন্ত খাবার জোগাড়ের চেষ্টা করল ওরা। কিছুই পেল না। রাতে গাছের ডালে হ্যামক বেঁধে তাতে শোয়াল মুসাকে, আরেকটা দিয়ে ঢেকে দিল, বৃষ্টি এলে যাতে না ভেজে সেজন্যে। বাকি একটা হ্যামকে পালা করে রাত কাটানোর ব্যবস্থা করল রবিন আর কিশোর।
অন্ধকার রাতে এই শীতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন আগুন। জ্বালাতে পারবে না। ম্যাচ নেই। বিকল্প কোন উপায়ে হয়তো জ্বালানো যায়, কিন্তু জংলীরা দেখে ফেলার ভয় রয়েছে।
ক্ষুধায়, শীতে কাতর হয়ে হ্যামকে গিয়ে উঠল কিশোর।
গাছের ডালে বসে পাহারায় রইল রবিন। ভাসমান দ্বীপে কোন অজানা বিপদ লুকিয়ে আছে কে জানে। সাবধান থাকা উচিত। কয়েক ঘণ্টা পরে কিশোর এসে তার জায়গায় বসবে।

অন্ধকারে ছুটে চলেছে দ্বীপ। স্রোতের ওপর ভরসা এখন। সবচেয়ে বড় ভয়, নদীতে গজিয়ে থাকা আসল দ্বীপের সঙ্গে ধাক্কা লাগার। নিমেষে গুঁড়িয়ে যাবে। তাহলে এটা। কিন্তু স্রোতের গুণাবলী সম্পর্কে যতখানি জানে রবিন, কোন কিছুর সঙ্গে ধাক্কা খায় না, পাশ দিয়ে কেটে বেরিয়ে যায়! শুনেছে, এসব ভাসমান দ্বীপের সঙ্গে রাতে কানু বেধে আরামসে ঘুমায় ইনডিয়ানরা। সকালে উঠে দেখে নিরাপদে পেরিয়ে এসেছে তিরিশ-চল্লিশ মাইল।

হ্যাঁ, ভ্যাম্পের তুলনায় এই একটা সুবিধে তাদের রয়েছে। অন্ধকারে নৌকা। চালানোর সাহস করবে না ভ্যাম্প, কোথাও থামতেই হবে। কিন্তু ওরা চলবে। এগিয়ে যাবে অনেক পথ।

কখনও কখনও তীরের খুব কাছ দিয়ে যাচ্ছে দ্বীপ। বনের হাকডাক কানে। আসছে। একবার তো এত কাছে একটা জাগুয়ার গর্জে উঠল, রবিনের মনে হলো, ওটা দ্বীপেই উঠে এসেছে। এমনিতেই বিপদের কূল নেই, তার ওপর জাগুয়ার উঠে এলে..ধ্যাত্তোর! যা হয় হোকগে। ভাগ্যের ওপর কারও হাত নেই। এই যে, এই মন বিপদ পড়েছে, চব্বিশ ঘণ্টা আগেও কি ভাবতে পেরেছিল এমন ঘটবে?

মাঝরাতের দিকে কিশোরকে তুলে দিলু রবিন।

নিরাপদেই কাটল রাতটা। সকালে বানরটার চেঁচামেচিতে ঘুম ভাঙল রবিনের। ভোরের নিয়মিত প্রাত্যহিক কোলাহল জুড়েছে ওটা, সঙ্গীসাথী না পেয়ে একাই শুরু করেছে।

মুসার সঙ্গে কথা বলছে কিশোর।

খুশি হলো রবিন। মুসার শরীর তাহলে কিছুটা ভাল। নেমে এসে গায়ে হাত দিয়ে দেখল, জ্বর নেই।

মলিন হাসি হাসল মুসা।

পেটে আগুন জ্বলছে তিনজনেরই। তাড়াতাড়ি খাবারের ব্যবস্থা করা দরকার। বিশেষ করে মুসার জন্যে। এমনিতেই কাহিল, খাবার না পেলে আর মাথাই তুলতে পারবে না। হয়তো জরও ফিরে উঠবে আবার।

কিন্তু কি ব্যবস্থা করবে?

বিশুদ্ধ খাবার পানিও নেই। নদীর কাঁচা পানি খেলেই ধরবে টাইফয়েড কিংবা আমাশয়ে। ফুটিয়ে খেতে হবে। আগুন পাবে কোথায়? আর কেটলি? কোন পাত্রই তো নেই সঙ্গে।

কেটলির ব্যবস্থা করে ফেলল কিশোর। বাঁশ দিয়ে। একটা কচি বাঁশের গোড়ার দিকে একটা গাঁটের ঠিক নিচে থেকে কাটল। গাটের ওপরে আট ইঞ্চিমত রেখে

বাকিটা কেটে ফেলে দিল। সারভাইভালের বইতে পড়েছে, কাঁচা বাঁশে পানি ফুটানো যায়, ভেতরে পানি ভরা থাকলে বাঁশ পোড়ে না।
কেটল তো হলো, এবার আগুন?
আগুন জ্বালানোর চেষ্টা চালাল কিশোর আর রবিন। হ্যামকে শুয়ে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল শুধু ক্লান্ত মুসা। কিছুই করার নেই তার। কোন সাহায্য করতে পারবে না।
গোড়াতেই সমস্যা দেখা দিল। আগুন জ্বালানোর জন্যে চাই শুকনো। কাঠকুটো। নেই। সব ভিজে আছে আগের দিনের বৃষ্টি আর ভোর রাতের শিশিরে।
তবে জ্বালানীর ব্যবস্থা করা গেল। তুলা ফলের খোসা ভাঙতেই ভেতর থেকে বেরোল শুকনো পেঁজা পেঁজা তুলা। গাছের ডালের ভেজা বাকল কেটে ফেলে দিয়ে বের করা হলো মোটামুটি শুকনো লাকড়ি। তুলোর ওপর বিছিয়ে দেয়া হলো ওগুলো। তুলাতে আগুন ধরলে পরে লাকড়িতেও ধরবে।
এবার পাথর আর ইস্পাত দরকার, ঘষা দিয়ে আগুনের স্ফুলিঙ্গ ফেলবে। তুলায়। ইস্পাত আছে, ছুরিটা। কিন্তু পাথর? আমাজনে পাথরের খুব অভাব, বিশেষ করে বন্যা উপদ্রুত এলাকায়। আর ভাসমান দ্বীপে থাকে পলিমাটি, পাথর থাকার প্রশ্নই ওঠে না।
সারা দ্বীপ আঁতিপাতি করে খুঁজেও একটা পাথর পেল না ওরা।
অন্যভাবে চেষ্টা করল জালানোর। চ্যাপ্টা কাঠে আরেকটা কাঠির মাথা জোরে জোরে ঘষলে উত্তাপে নাকি আগুন জ্বলে ওঠে। সেই চেষ্টাও করে দেখা হলো। ডলে ডলে দু-জনের হাতের চামড়াই শুধু ছিলল, আগুন জ্বলল না।
ইনডিয়ানরা আরেক কায়দায় আগুন জ্বালায়। চ্যাপ্টা কাঠে একটা খাজ কাটে। কাঠির মাথা চোখা করে ওই খাজের ওপর জোরে জোরে ডলে খুব তাড়াতাড়ি। সেই একই ব্যাপার উত্তাপে জ্বলে ওঠে আগুন।
কিন্তু কিশোর আর রবিন চেষ্টা করেও পারল না। আগুন তো দুরের কথা, বোয়াই বেরোল না। এসব কাজের জন্যেও অভিজ্ঞতা আর দক্ষতা দরকার।
নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে কাটতে হতাশ হয়ে পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল কিশোর। কি যেন লাগল আঙুলে। আনমনেই বের করে আনল।
চকচকে জিনিসটা কিশোরের হাতে দেখেই চেঁচিয়ে উঠল রবিন। পেয়েছি!
অবাক হয়ে কিশোরও তাকাল হাতের দিকে। হাসি ফুটল।
ক্যামেরার একটা লেন্স। একটা বদল করে অন্য একটা লেন্স লাগানোর সময় এটা খুলে পকেটে রেখেছিল যে, পকেটেই রয়ে গেছে।
ভেজা ধোঁয়ার গন্ধ জীবনে আর এত ভাল লাগেনি কখনও ওদের কাছে। বুক ভরে টানতে গিয়ে বেদম কাশি উঠল রবিনের।

হ্যামকে শুয়ে হি-হি করে হাসল মুসা। ভারিক্কি ভাবটা কেটে গিয়ে হালকা হলো পরিবেশ। অনেকক্ষণ পর হাসি ফুটল তিনজনের মুখে।
পানি ফুটিয়ে আগে পিপাসা মেটাল ওরা।
এবার খাবার। মাছ ধরতে হবে, যেভাবেই হোক। আর কিছু পাওয়া যাবে না এখানে। বড়শির কাটা হয়তো বানানো যাবে, তবে আগে দরকার সূতা। ঘাস। পাকিয়ে বানানোর চেষ্টা করল। শক্ত হয় না, ছিঁড়ে যায়। সমাধান করে দিল একটা ছোট গাছ। এর আঁশ দিয়ে ব্রাশ, ঝাড়ু আর দড়ি তৈরি করা যায়।
দড়ি তো হলো, এবার বড়শি চাই। গাছের বাকা ডালের কথা ভাবল কিশোর। সাইজমত কেটে একমাখা চোখা করলে কি হবে? উঁহু। অন্য কিছু দরকার।
আগুন দেখে মাথার ওপর এসে কিচির মিচির শুরু করল বানরটা।
কিশোর, দুর্বল কণ্ঠে ডাকল মুসা। ইশারায় বানরটাকে দেখাল।
দূর, কি বলো? রবিন মাথা নাড়ল। সাপবিচ্ছু তো অনেকই খেলাম এই জঙ্গলে এসে। আর যাই বলো, বানর খেতে পারব না। মনে হবে মানুষ খাচ্ছি।
এই দৃষ্টিতে বানরটার দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। একেবারে মাথার ওপর, মাত্র কয়েক ফুট দূরে। হাত বাড়িয়ে ছোঁয়া যায় না অবশ্য। বাঁশ দিয়ে বানানো বল্লমটা তুলে নিল সন্তর্পণে। বানরটা কিছু বোঝার আগেই ধাঁই করে ছুঁড়ে মারল।
বল্লমে গেঁথে ধুপ করে পড়ল বানরটা।
খাবে তাহলে! রবিন বিশ্বাস করতে পারছে না।
কেন, অসুবিধে কি? হাসল কিশোর। অনেকেই তো খায়। ইনডিয়ানদের প্রিয় খাবার। আফ্রিকার পিগমিরা তো হরহামেশাই খায়। আর চীনারা কি করে জানো না?
এসব সবই জানে রবিন। আস্ত বানরশিশুর চামড়া ছিলে, দামী ডিশে করে টেবিলে দেয়া হয়। কাঁচা। চীনের কিছু অঞ্চলের মানুষের কাছে এটা খুব প্রিয়। খাবার। বিশেষ করে বানরের কাঁচা মগজ। দাম খুব বেশি বলে সাধারণ মানুষেরা খেতেই পারে না, যাদের পয়সা আছে তারাই কেবল পারে। মাথা নাড়ল সে, আমি খাব না। মরে গেলেও না। ওয়াক-গুহ! শেষমেষ বানরের মগজ!
কিন্তু খাওয়ার জন্যে মারেনি কিশোর। চামড়া ছুলে টুকরো টুকরো করে কাটল মাংস। হাড় দিয়ে চমৎকার কয়েকটা বড়শি হলো। ওগুলো পিয়াসাভার সরু দড়িতে বেঁধে, বাঁশ কেটে ছিপ বানাল। মাংসের একটা টুকরো গেথে বড়শি ফেলল। পানিতে। দেখা যাক, ভাগ্য কি বলে?
ফেলতে না ফেলতেই টান পড়ল ছিপে। পিরানহা নাকি? তাহলেও চলে। খেতে ভালই।

ছিপ তুলল কিশোর। বিশেষ জোর লাগল না। আরে, এ-কি! আস্ত এক ফুটবল! রবিনও অবাক।
ছুরির মাথা দিয়ে খোঁচা মারল কিশোর। ঠুস করে বেলুনের মত ফাটল ওটা। মাছটা ছোট, পেটটাকেই ফুলিয়ে এত বড় করেছে। বেলুন মাছ, বিড়বিড় করল সে। ছুঁড়ে ফেলে দিল পানিতে। এ-মাছ খাওয়া যায় না, বিষাক্ত
আবার ছিপ ফেলল।
এবার উঠল বেশ বড়সড় একটা পেইচি খাওয়া চলে, স্বাদ ভাল।
পেট ঠাণ্ডা হলো।
আর কোন কাজ নেই। আবার মাছ ধরতে বসল কিশোর আর রবিন।
আবার ছিপে টান পড়ল। বেশ জোর লাগল এবার তুলতে।
সাপ! চেঁচিয়ে উঠল রবিন। শরীর মোড়াচ্ছে প্রাণীটা।
বাইন, বলল কিশোর। খাওয়া যেতে পারে। বুঝতে পারল না ওটা কোন প্রজাতির। বড়শি থেকে খুলে নেয়ার জন্যে ধরতেই চিৎকার করে চোখ উল্টে পড়ল, বিকৃত হয়ে গেল চেহারা।
চোখ মেলে দেখল, রবিনের কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে।
ইস, কি ভয়টাই পাইয়ে দিয়েছিলে, বলল উদ্বিগ্ন রবিন। কি হয়েছিল?
মুসাও হ্যামক থেকে মাথা বাড়িয়ে তাকিয়ে আছে।
জবার না দিয়ে কাত হয়ে বাইনটার দিকে তাকাল কিশোর। বড়শি ছুটে গেছে মুখ থেকে, ঘাসের ওপর দিয়ে এঁকেবেঁকে এগোচ্ছে রবিনের দিকে।
উঠে বসল সে। একটা লাঠির জন্যে তাকাল এদিক ওদিক।
রবিনেরও চোখ পড়ল বাইনটার ওপর।
না না, ছুঁয়ো না! চেঁচিয়ে উঠল কিশোর।
কিন্তু তার কথা শেষ হওয়ার আগেই সরানোর জন্যে ছুঁয়ে ফেলেছে রবিন। সঙ্গে সঙ্গে বিকট চিৎকার, তবে কিশোরের মত চোখ উল্টে পড়ল না। কারণ সে ছুঁয়েছে মাত্র, ধরেনি।
হাতের অবশ ভাবটা কাটল ধীরে ধীরে।
হলো কি তোমাদের? অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল মুসা।
আস্ত জেনারেটর, ভয়ে ভয়ে বাইনটার দিকে তাকাল রবিন। কিলবিল করে এগিয়ে আসছে ওটা। লাফ দিয়ে সরে গেল সে। হাত ঝাড়ছে এখনও।
গর্ত খুঁড়তে শুরু করল কিশোর।
কি করছ? রবিন জিজ্ঞেস করল।
জবাব দিল না কিশোর। গর্ত খুঁড়ে তাতে পানি ভরে, একটা লাঠি দিয়ে ঠেলে নিয়ে গর্তে ফেলল বাইনটাকে। তারপর বলল, থাক।

কি হবে রেখে? জিজ্ঞেস করল মুসা। খাওয়া যাবে?
দেখা যাক। আর কোন ব্যবস্থা করতে না পারলে তো খাবই। বাইন মাছ। অখাদ্য নয়।
কিন্তু ওটাকে ধরলেই তো চিত হয়ে যাচ্ছ? কি আছে ওর গায়ে?
এখনও বুঝতে পারছ না? রবিন বলল। বিদ্যৎ। ওটা বিদ্যুৎ-বাইন।
ও। আচ্ছা, ইলেকট্রিক শক তো বাত সারায় শুনেছি। ম্যালেরিয়া সারায় না?
সারায়। চিরতরে, জবাব দিল কিশোর।
মানে?
এমন সারানো সারাবে, কোনদিন আর ম্যালেরিয়া হওয়ারই সুযোগ পাবে। না। সোজা পরপারে পাঠিয়ে দেবে তোমাকে।
কিশোরের রসিকতা বুঝতে পেরে একটা মুহূর্ত চুপ করে রইল মুসা। তারপর জিজ্ঞেস করল, কত ভোল্ট?
যে শক খেয়েছি, তিনশোর কম তো হবেই না।
যত বেশি বড় হয়, বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতাও নিশ্চয় তত বেশি?
না, মাথা নাড়ল কিশোর, সেটা নির্ভর করে কোন জাতের বাইন, তার ওপর। বিদ্যুৎ-বাইনেরও অনেক প্রজাতি। কোন কোনটার জেনারেটর সাংঘাতিক শক্তিশালী। মাত্র আড়াই ফুট লম্বা একটা বাইন ধরা পড়েছিল। পাঁচশো ভোল্ট বিদ্যুৎ তৈরি করতে পারত ওটা।
খাইছে! চমকে গেল মুসা। মানুষ মারা তো কিছুই না!
মানুষ কি, ঘোড়াও মেরে ফেলতে পারে। পানিতে নেমে গরুঘোড়া অনেক মারে। বাইন মাছ গায়ে লাগে, শক খেয়ে অবশ হয়ে যায় শরীর। তারপর ডুবে মরে।
কি মনে পড়ায় লাঠি দিয়ে আবার বাইনটাকে তোলার চেষ্টা করল কিশোর।
কি হলো? আবার তুলছ কেন? জিজ্ঞেস করল রবিন।
রকফেলার ল্যাবরেটরিতে দেখেছি, বড় বড় বাইনকে লেজ ধরে পানি থেকে তুলছে। অবাক হয়েছি। জিজ্ঞেস করে জেনেছি, লাইন কেটে বিদ্যুৎ চলাচল বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়েছে ওগুলোর। ডায়নামোটা থাকে বাইনের মাথায়। লম্বা একটা নার্ভ ওখান থেকে লেজের ডগা পর্যন্ত চলে যায়। ওই নার্ভের কোন জায়গায় কেটে দিলে তার নিচের দিকে আর বিদ্যুৎ যেতে পারে না। তখন ওখানে ধরলে আর অসুবিধে। নেই।
এক্সপেরিমেন্ট করবে?
হ্যাঁ, বলতে বলতেই লাঠির এক খোঁচায় বাইনটাকে ডাঙায় তুলে ফেলল, কিশোর। লাঠি দিয়ে চেপে ধরল লেজের ছয় ইঞ্চি ওপরে। রবিনকে বলল, ধরো তো, লাঠিটা শক্ত করে ধরো।

ছুরি বের করল সে। কাঠের হাতল, বিদ্যুৎ-নিরোধক। এক পোচে কেটে ফেলল বাইনের নার্ভ যে জায়গায় থাকার কথা সেখানটা। সাবধানে আঙুল ছোঁয়াল লেজে। শক লাগল না। জোরে চাপ দিল। না, নেই। মুঠো করে চেপে ধরল। লেজ। হাসি ছড়িয়ে পড়ল মুখে। অপারেশন সাকসেসফুল!
বাইনটাকে আবার গর্তে রেখে দেয়া হলো।
আরও কয়েকটা পেইচি ধরা পড়ল সেদিন। খাবার আর পানির সমস্যা নেই। দ্বীপটা ভেঙে না গেলে এটাতে কয়েকদিন টিকে থাকতে পারবে ওরা।
রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা মুসার অসাধারণ। দ্রুত সেরে উঠতে লাগল সে।
পরদিন দূরে একটা ক্যানু দেখা গেল।
তার পরদিন দেখা গেল বড় বজরাকে। তীরে নোঙর করা।
দূর দিয়ে সরে যেতে লাগল ভাসমান দ্বীপ। হতাশ চোখে নৌকাটার দিকে তাকিয়ে রইল তিনজনে। ক্ষোভে, দুঃখে মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে। কুমিরের তোয়াক্কা না করে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল মুসা, ঠেকাল কিশোর। কুমির ছাড়াও ভয়ঙ্কর পিরানহা আছে নদীতে।
ভ্যাম্পকে দেখা যাচ্ছে না। হয়তো বনে ঢুকেছে জানোয়ারগুলোর খাবার। জোগাড় করতে। আচ্ছা, কোনটাকে কি খাওয়াতে হয় জানে তো?~-ভাবছে। কিশোর। যত্ন নিতে পারছে ঠিকমত??
আস্তে আস্তে দূরে মিলিয়ে গেল বজরা।
পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখল ওরা, ভাটির দিকে চলছে না আর দ্বীপ। পাক খেতে খেতে এগিয়ে চলেছে চওড়া একটা খালের মুখের দিকে। মূল স্রোত থেকে কিভাবে যেন সরে গিয়ে ঘূর্ণিপাকে পড়েছে।
চুড়ান্ত হলো হতাশা, বড় বজরাকে ধরার আশা একেবারে শেষ। চোখের সামনে দিয়ে পাল তুলে শা শা করে পার হয়ে যাবে নৌকাটা, ওরা কিছুই করতে পারবে না। বাঁশ কেটে লগি বানানো যায়, কিন্তু লগি দিয়ে ঠেলে এক চুল নড়াতে পারবে না এত ভারি দ্বীপ।
ভাটির দিকে না গিয়ে পাশে সরে ঘূর্ণাবর্তে পড়েছে কেন দ্বীপটা, বুঝতে পারল কিশোর। বাতাস এখন উজান বইছে। দ্বীপের তুলা গাছে ধাক্কা দিচ্ছে জোরাল। বাতাস, ঠেলছে। ভাটিয়াল স্রোতের তোড় কম। বিপরীত স্রোত ঠেলে না পারছে উজানে যেতে, বাতাসের জন্যে না ভাটিতে নামতে পারছে, বেকায়দায় পড়ে পাশে সরতে বাধ্য হয়েছে দ্বীপ।
উজানে বড় বজরাকে আসতে দেখা গেল। পাল নেই। তাতে অবাক হওয়ারও কিছু নেই, কারণ বাতাস বিপরীত। স্রোতে ভেসে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে নৌকাটা।

আশা জাগল আবার ছেলেদের মনে। দ্বীপের মতই বড় বজরাও যদি বিপথে সরে, ঘূর্ণাবর্তে এসে পড়ে?
ভ্যাম্পের সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা মনে হতেই রাইফেলে হাত বোলাল কিশোর।
জলদি, বলল সে, গাছের আড়ালে লুকাও, সবাই।
তুলা গাছের ডালপালার আড়ালে লুকাল তিনজনে।
ডালে ঝোলানো হ্যামকগুলোর ওপর চোখ পড়ল কিশোরের। ভ্যাম্পের নজরেও পড়ে যেতে পারে। তাড়াতাড়ি গিয়ে ওগুলো খুলে আনল।
সরে যাচ্ছে নৌকা। নাহ, আশা আর নেই। বিপথে পড়েনি।
হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল মুসা, ইয়াল্লা!
ঝটকা দিয়ে নৌকার মুখ ঘুরে গেছে। মূল স্রোত থেকে সরে আসতে শুরু করল পাক খেয়ে খেয়ে। পড়েছে ঘূর্ণির টানে!
একটিমাত্র বুলেট রয়েছে রাইফেলে, মিস করতে চাইল না কিশোর। অস্ত্রটা তুলে দিল মুসার হাতে।
ভ্যাম্পকে খুঁজল তিনজোড়া চোখ। নৌকা আরও কাছে এলে দেখা গেল ডেকে শুয়ে আছে সে। নড়ছে না, নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছে।
জন্তু-জানোয়ারের ডাক কানে আসছে। বোঝা যায়, ওরা ক্ষুধার্ত। নাকুর চি চি, জাগুয়ারের ভারি গোঙানি, আর ময়দার কিচির মিচিরের সঙ্গে যোগ হয়েছে। পাখিগুলোর নানারকম ডাক।
বজরার পরিচিত পরিবেশ দেখে ভাল লাগছে তিন গোয়েন্দার। মাস্তুলে ঝুলন্ত শুকনো কিকামুকেও মনে হচ্ছে যেন পরম আত্মীয়। ধ্যানমগ্ন হয়ে একপায়ে দাঁড়িয়ে আছে লঘু বগা, ভাল লাগছে তাকে। সুন্দর খুদে হরিণ, তাকে ভাল লাগছে। এমনকি ডাকাত অ্যানাকোণ্ডাকেও এই মুহূর্তে ভালবাসতে ইচ্ছে করছে ওদের।
দ্বীপের কাছাকাছি চলে এল বড় বজরা, চারপাশে পাক খেয়ে ঘুরতে লাগল, যেন গ্রহের চারপাশ প্রদক্ষিণ করছে একটা উপগ্রহ। কাছে আসছে ধীরে ধীরে। পানির গভীরতা এখানে কম, মাঝে মাঝেই ঘষা লাগছে দ্বীপের তলায়। দ্বীপ ভেঙে যাওয়ার ভয় করছে ছেলেরা।
তবে ভাঙল না। তীরে ঠেকে আটকে গেল। নৌকাটা নাক সোজা করে এসে ধাক্কা খেল দ্বীপের কিনারে, নরম মাটিতে গেঁথে গেল গলুই।
দারুণ হয়েছে! ফিসফিসিয়ে বলল মুসা। এবার যাওয়া যায়, নাকি?
চলো, বলল কিশোর।
হ্যামকগুলো নিল রবিন। মুসার হাতে রাইফেল। গর্ত থেকে লেজ ধরে বাইনটাকে তুলে নিয়ে এগোল কিশোর।

নিঃশব্দে এসে নৌকায় উঠল ওরা।
অঘোরে ঘুমাচ্ছে ভ্যাম্প, কি ঘটছে খবরই নেই।
ভ্যাম্পের মাথা সই করে রাইফেল তুলল মুসা। তার হাত চেপে ধরল। কিশোর, মাথা নেড়ে ইশারায় বোঝাল, না। অ্যানাকোণ্ডার দিকে তাকাল একবার। ঘুমাচ্ছে। পেট ফোলা, ম্যানাটি হজম হতে দেরি আছে। জ্বলন্ত হলুদ চোখে তার দিকে তাকাল বিগ ব্ল্যাক। মৃদু গোঁ গোঁ করল মিস ইয়েলো। নাকু পাগল হয়ে গেছে; দড়ি ছিঁড়ে চলে আসতে চাইছে। বিরাট লাফ দিয়ে মুসার কাঁধে এসে নামল ময়দা, আদর করে ঠাস ঠাস দুই চাপড় লাগাল গালে।
টলডোর ভেতরে উঁকি দিল মুসা। নড়েচড়ে উঠল বোয়া। তারপর আবার কুণ্ডলীর ওপর মুখ রেখে ঘুমিয়ে পড়ল। পেট এখনও অনেক ফোলা।
কিশোর তাকাল আবার ভ্যাম্পের দিকে। চিত হয়ে নাক ডাকাচ্ছে। কোমরের খাপে মুসার বাবার ৪৫ অটোমেটিক। নিচু হয়ে সাবধানে পিস্তলটা খুলে হাতে নিল সে। আরেক হাতে বাইনটা। শরীর মোচড়াচ্ছে ওটা, নিজের শরীর বেয়েই মাথা ওপরে তোলার চেষ্টা করছে। পারছে না। কয়েক ইঞ্চি উঠেই পড়ে যাচ্ছে আবার।
ভ্যাম্প তাদেরকে অনেক কষ্ট দিয়েছে, তার পাঁজরে আলতো একটা লাথি লাগানোর লোভ সামলাতে পারল না কিশোর।
আঁউ! কোন হারামীরে… চোখ মেলেই স্থির হয়ে গেল ভ্যাম্প। চোখে অবিশ্বাস। হাঁ হয়ে গেল মুখ। হাত চলে গেল খাপের কাছে। পিস্তলটা পেল না।
এই যে, আমার হাতে, হাসিমুখে পিস্তলটা দেখাল কিশোর।
তবে রে! লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল ভ্যাম্প। পিস্তল ছিনিয়ে নিতে এগোল।
সরে গেল কিশোর। বাইনটা ছুঁড়ে দিল ভ্যাম্পের গলা সই করে।
বিকট চিৎকার দিয়ে উঠল ডাকাতটা। ঝট করে হাত চলে গেল গলার কাছে। টলছে। কয়েক মুহূর্তের বেশি দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। কাটা কলাগাছের মত আছড়ে পড়ল পাটাতনের ওপর।

.

ভ্যাম্পের গলা থেকে পাটাতনে নামল বাইন। বুকে হেঁটে এগিয়ে চলল নৌকার কিনারে।
ওটার প্রয়োজন ফুরিয়েছে, আর আটকে রেখে লাভ নেই। লেজ ধরে তুলল কিশোর। অনেক কষ্ট দিয়েছি, বাইন, কিছু মনে রাখিস না। অনেক উপকার করেছিস আমাদের। গুড বাই। আলতো করে ছেড়ে দিল পানিতে।
সাপের মত কিলবিল করে উঠল একবার ওটা, শরীরটাকে এক মোচড় দিয়েই তলিয়ে গেল।

এর একটা ব্যবস্থা করতে হয়, ভ্যাম্পকে দেখাল রবিন। হুশ ফিরলেই তো গোলমাল শুরু করবে।
হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখি, পরামর্শ দিল মুসা।
না, মাথা নাড়ল কিশোর। শাস্তি আরেকটু বেশি পাওনা হয়েছে ওর।
কি?
অ্যানাকোন্ডার খাঁচার দিকে তাকাল কিশোর। রবিনের দিকে ফিরে বলল, দুটো তালা আছে না, বড়টা নিয়ে এসো। আর একটা শেকল, জানোয়ার বাধার। জন্যে যে এনেছিলাম। তাড়াতাড়ি।
কিশোরের উদ্দেশ্য বুঝল না রবিন। প্রশ্নও করল না। কথা না বাড়িয়ে গিয়ে। ঢুকল টলডোর ভেতরে। কি করে দেখতেই পাবে।
চুপ করে চোখ বন্ধ করে পড়ে আছে অ্যানাকোণ্ডা, মাথাটা খাঁচার মেঝেতে, শরীরের বেশির ভাগ বাথটাবের ভেতরে। আরামে ঘুমাচ্ছে।
আস্তে করে দরজা খুলল কিশোর। তিনজনে মিলে টেনেহিঁচড়ে ভ্যাম্পকে খাঁচায় ভরল।
দরজায় শেকল পেঁচিয়ে তালা লাগিয়ে দিল কিশোর।
ভ্যাম্পের মাথার মাত্র এক ফুট দুরে অ্যানাকোণ্ডার বিশাল মাথা।
খুব ধীরে নিঃশ্বাস পড়ছে ভ্যাম্পের, চেহারা রক্তশূন্য। হুঁশ আর ফেরে না। উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল তিন গোয়েন্দা। মরে যাবে না-তো? বৈদ্যুতিক শক খেলে যা যা করতে হয়, সে-সব করা দরকার?
খাঁচার দরজা আবার খুলতে যাবে কিশোর, এই সময় শিহরণ খেলে গেল যেন ভ্যাম্পের বিশাল কাঠামোটায়। শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি বাড়ল, জোরাল হলো। চোখ মেলল সে। চোখের সামনে পড়ে থাকতে দেখল বিশাল কুৎসিত মাথাটা। ভীষণ। চমকে গিয়ে এত জোরে উঠে বসল, খাঁচার বাশে টুকে গেল তার মাথা।
দ্রুত চোখ বোলাল চারপাশে। দেখল, খাঁচায় আটকা পড়েছে।
দরজায় খামচি মারল সে। গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, খোলো! বেরোব?
চুপ, ঠোঁটে হাত রাখল কিশোর, কৃত্রিম ভয় ফুটিয়ে তুলল চোখেমুখে। তোমার দোস্ত জেগে যাবে। ধরে টুক করে গিলে ফেলবে তাহলে।
বেরোতে পারলে, খসখসে কণ্ঠে ফিসফিস করে বলল ভ্যাম্প, খুন করব আমি তোদের!
জানি। সেজন্যেই তো আটকে রেখেছি।
বাঁশ ভাঙার চেষ্টা করল ভ্যাম্প। কিন্তু অ্যানাকোণ্ডারই সাধ্যে কুলোয়নি, সে কি করে পারবে? খানিকক্ষণ চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিল।

নড়ে উঠল সাপের মাথা। খাঁচার বেড়ায় শরীর মিশিয়ে ফেলতে চাইল ভ্যাম্প, রক্তলাল চোখদুটো ছিটকে বেরোবে যেন কোটর থেকে। সাপটার ব্যাপারে তার কোন জ্ঞানই নেই বোঝা গেল, নইলে এত ভয় পেত না। ভরা পেটে টোড়া সাপের মতই নিরীহ ওই দানব। নেহায়েত ঠেকায় না পড়লে ঘুম থেকেই জাগে না।
গালাগাল শুরু করল ভ্যাম্প।
কান দিল না ছেলেরা।
তাদেরকে ভয় দেখাতে না পেরে সুর পাল্টাল ভ্যাম্প। দেখো, রসিকতা। অনেক হয়েছে। আর ভাল লাগছে না। আমি জানি, তোমরা খুব ভাল ছেলে। আমি মরে যাই, সেটা নিশ্চয় চাও না?
না, শান্তকণ্ঠে বলল কিশোর, তাহলে পুলিশের হাতে আর তুলে দিতে পারব না। তোমার যা স্বভাব-চরিত্র, ভাল করতে হলে কিছুদিন জেলে বাস করা প্রয়োজন। তবে তাতেও ভাল হবে কিনা কে জানে।
দেখো, তোমরা ছেলেমানুষ, এই জঙ্গলে টিকতে পারবে না আমার সাহায্য ছাড়া! আমি তোমাদের ভালই চাই।
তা তো বটেই, আহা! জিভ দিয়ে চুক চুক শব্দ করল কিশোর। আমাদের বাঁচানোর জন্যে কত দরদ। সেজন্যেই বুঝি ইনডিয়ানদের কাছে ফেলে নৌকা নিয়ে পালিয়েছিলে?
দেখো ভাই, আমাকে ভুল বুঝছ তোমরা তোমাদের নৌকা আর জানোয়ারগুলোকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম কেবল। ভাল কাজ দেখিয়েছি, তাই না? একটা জানোয়ারও মরেনি। সব ঠিক আছে।
তা আছে। মানুষের মত রোজ রোজ খাবার লাগে না বলেই বেচে আছে, নইলে কবে মরে ভূত হয়ে যেত। তুমি কি খাওয়ানোর মানুষ? দুই সহকারীর দিকে তাকিয়ে বলল কিশোর, চলো, অনেক কাজ পড়ে আছে। এটার সঙ্গে বকরক করে লাভ নেই।
আবার রেগে উঠল ভ্যাম্প। গালাগাল শুরু করল। আওয়াজে সাপটা নড়েচড়ে উঠতেই ভয় পেয়ে থেমে গেল।
জানোয়ারগুলোকে খাওয়াতে লাগল তিন গোয়েন্দা। ওগুলোর হাবভাবেই বোঝা যাচ্ছে, কিছু খাওয়ায়নি ভ্যাম্প।
খা, রক্ত গরম করে রক্তচাটাকে দিতে দিতে বলল কিশোর। এই শেষ। ম্যানাওয়ে পৌঁছার আগে আর পাবি না।
এত কাছে চলে এসেছি? জিজ্ঞেস করল মুসা।
হ্যাঁ। বাতাস পেলে কালই পৌঁছে যাব।

দুপুরের পর ভাটিয়াল বাতাস শুরু হলো, বাড়ল স্রোতের বেগ। দ্বীপটা চলতে, শুরু করল। সঙ্গে সঙ্গে নৌকাটাও। লগি দিয়ে ঠেলে দ্বীপের গা থেকে নৌকাটাকে ছুটাল তিন গোয়েন্দা। দাঁড় বেয়ে এনে ফেলল মূল স্রোতে। পাল তুলে দিতেই তরতর করে ছুটে চলল নৌকা।

জ্বর ছেড়েছে, পেট ভরে খেয়েদেয়ে আবার সুস্থ হয়ে উঠেছে মুসা। মঞ্চে উঠে হাল ধরে বসল। গান ধরল গুনগুন করে।

সমস্তটা দিন নানারকম ভাবে ছেলেদের মন গলানোর চেষ্টা করল ভ্যাম্প। ফিরেও তাকাল না ওরা। একবার বিশ্বাস করেই যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে।

বকাবাহ্যি করে কাহিল হয়ে খাঁচার দেয়ালে হেলান দিয়ে বসল ভ্যাম্প। বড় বড় হাই তুলছে, কিন্তু সাপের ভয়ে চোখ বন্ধ করছে না। ঘুমোলেই যদি সুযোগ পেয়ে তাকে গিলে ফেলে অ্যানাকোণ্ডা।

সাঁঝের বেলা নৌকা পাড়ে ভেড়ালো ছেলেরা। ঘাসে ঢাকা খানিকটা খোলা জায়গা, ক্যাম্প করল সেখানেই।

আগুন জ্বেলে খাবার গরম করে খেল। ভ্যাম্পকেও দিল।

ঠিক হলো, পালা করে পাহারা দেবে রাতে। ভ্যাম্পকে বিশ্বাস নেই। খাঁচার বেড়া খুলে বেরিয়ে আসাটা তেমন কঠিন কিছু না।

হুশিয়ার করল কিশোর, চুপ করে শুয়ে থাকো। শয়তানী করতে চাইলেই খোচ দিয়ে জাগিয়ে দেব সাপটাকে।

চোখের আগুনে তাকে ভস্ম করার জোর চেষ্টা চালাল ভ্যাম্প। তবে চুপ করে। রইল।

সকালে উঠে নাস্তা সেরে আবার নৌকা ছাড়ল ওরা।

দুপুরের আগে নদীর পানির রঙ বদলে গেল, এতদিন ছিল বাদামী, হয়ে গেল। কালো। তার মানে ওখানে আমাজনের সঙ্গে মিলিত হয়েছে কালো নদী রিও নিগ্রো।

আর দশ মাইল, বলল কিশোর। নৌকার মুখ ঘোরাতে বলল মুসাকে।

আমাজন থেকে সরে এসে রিও নিগ্রোতে ঢুকল নৌকা। এগিয়ে চলল জঙ্গল শহর ম্যানাওয়ের দিকে। অনেক বছর আগে রবার চাষের স্বর্ণযুগে তৈরি হয়েছিল শহরটা, আটলান্টিক মহাসাগর থেকে হাজার মাইল দূরে। এখন হয়ে গেছে বড় বন্দর।

ছোট-বড় অসংখ্য জলযান দেখতে পেল ছেলেরা। মাল নিয়ে বড় বড় মালবাহী স্টীমার যায় উত্তর আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড আর ইউরোপের বিভিন্ন দেশে। ওগুলোর। পাশে বিরাট বজরাটাকে নগণ্য লাগল। গ্লাসগো থেকে আসা একটা দানবীয়। জাহাজের পাশে জেটিতে নৌকা বাঁধল ছেলেরা।

নানারকম জন্তু-জানোয়ার, আর বিশেষ করে অ্যানাকোণ্ডার খাঁচায় ডাকাতে চেহারার বন্দি একজন মানুষ দৃষ্টি আকর্ষণ করল লোকের। ভিড় করে দেখতে এল ওরা।
নৌকা পাহারায় রইল মুসা আর রবিন। কিশোর চলল থানায়।
থানার ইনচার্জকে সব খুলে বলল সে।
প্রথমে তো বিশ্বাসই করতে চাইলেন না ইন্সপেক্টর। শেষে বললেন, একটা কাজের কাজই করেছ। চেহারার বর্ণনা শুনে মনে হচ্ছে, গাই ক্যাশার। কয়েকটা। ডাকাতি আর খুনের মামলার আসামী, হন্যে হয়ে খুঁজছে তাকে পুলিশ। বছর দুই তার কোন খোঁজ পাইনি। শেষবার দেখা গিয়েছিল কোকামায়। লোক দিচ্ছি, নিয়ে যাও সঙ্গে। ধরে নিয়ে আসবে ব্যাটাকে।
খাঁচা থেকে খুলে ভ্যাম্পের হাতে হাতকড়া পরাল পুলিশ।
স্টীমার অফিসে গেল এরপর কিশোর। জাহাজে নিজেদের জন্যে কেবিন আর জানোয়ারগুলোর জন্যে জায়গা ভাড়া করল।
জাহাজ ছাড়বে তিন দিন পরে।
এই কটা দিন ব্যস্ততার মধ্যে কাটল তিন গোয়েন্দার। ভাল খাঁচা বানানো, ওগুলোতে জানোয়ারগুলোকে সরানো, জাহাজে ভোলা, অনেক কাজ।
নির্দিষ্ট দিনে জাহাজ ছাড়ল।
রেলিঙে দাঁড়িয়ে আছে তিন গোয়েন্দা। কালো নদীর কালো পানি দিয়ে ছুটে চলেছে জাহাজ।
নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর।
কি ভাবছ? জিজ্ঞেস করল মুসা।
ভাবছি, জানোয়ার ধরতে এরপর কোথায় যাব।
আদৌ যাওয়া হবে কিনা কে জানে। মা কি আর যেতে দেবে?
হবে না কেন? রবিন বলল। ব্যবসা যখন, দেবে। তাছাড়া, এবার তো সাকসেসফুল হয়েছি আমরা।
বাবার কি অবস্থা, কে জানে? ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল মুসা। বাবা ভাল হলে যাওয়ার অসুবিধে হবে না। এরপর আফ্রিকা যাব আমরা।
পাড়ের গভীর অরণ্যের দিকে চেয়ে নীরবে মাথা দোলাল শুধু কিশোর।

ভলিউম ৪ – হারানো উপত্যকা – তিন গোয়েন্দা – রকিব হাসান – সেবা প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি, ১৯৮৯

কিশোর, তোর চিঠি, ডেকে বললেন মেরিচাচী, অ্যারিজোনা থেকে।

বারান্দায় ছিল কিশোর, স্যালভিজ ইয়ার্ডের কাঁচেঘেরা ছোট্ট অফিস ঘরটায় ঢুকল। কই, দেখি?

কার চিঠি রে? ওখানে কাকে চিনিস?

কি জানি, বুঝতে পারছি না, খাম ছিঁড়ে চিঠিটা খুলল কিশোর। আরে, ভিকিখালা।

ভিকি? কোন ভিকি? একজন তো আছে বলেছিলি টুইন লেকসে।

জবাব না দিয়ে নীরবে পড়তে শুরু করল কিশোর:

কিশোর

নিশ্চয় অবাক হচ্ছ, এতদিন পর লিখলাম। সেই যে খনির রহস্য ভেদ করে দিয়ে এসেছিলে, তারপর টুইন লেকসে তো আর একবারও এলে না। সত্যি, রহস্য ভেদ করার ক্ষমতা আছে বটে তোমার।

চিঠি থেকে মুখ তুলে বলল কিশোর, হ্যাঁ, চাচী, সেই ভিকিখালাই।

ভাল আছে তো ও? আর মিস্টার উইলসন?

দেখি পড়ে।

আবার পড়তে লাগল কিশোর

আমরা এখন টুইন লেকসে নেই। মিস্টার উইলসন ওখানকার সব কিছু বেচে দিয়েছেন, উন্নতি হচ্ছিল না তেমন, তাই। তারপর ফিনিক্সের পুবে এসে সুপারস্টশন মাউনটেইনের কাছে লস্ট ভ্যালিতে পুরানো এক র‍্যাঞ্চ কিনেছেন। ফিটনেস হেলথ রিসোর্ট করবেন। কাজ চলছে, খুব কাজের চাপ আমাদের। আগামী শীতের গোড়ায় টুরিস্ট সীজনের শুরুতেই স্টার্ট করার ইচ্ছে। কিন্তু সে-আশা পূরণ হবে কিনা সন্দেহ।

র‍্যাঞ্চটার প্রধান আকর্ষণ একটা পুরানো বিল্ডিঙ। ওটাকেই মেরামত-টেরামত করে আধুনিক একটা হোটেল করা হবে। জায়গার নামের সঙ্গে মিলিয়ে বাড়িটার নামও রাখা হয়েছে লস্ট ভ্যালি। এটা নতুন নাম। আগে নাম ছিল ইনডিয়ান হাউস। মাঝখানের বড় একটা হলরুমে ইনডিয়ানদের তৈরি অসংখ্য পুতুল সাজিয়ে রাখা হয়েছে, কাচিনা পুতুল। খুব সুন্দর। আগের মালিক জোগাড় করেছিল। মিস্টার উইলসনের কাছে বিক্রি করে গেছে সব।

বাড়ির ভেতরটা সারিয়ে নিয়ে গত বড়দিনেই এখানে উঠেছি আমরা। তারপর শুনলাম কাচিনার অভিশাপের কথাটা। আমরা বাড়িতে ওঠার পর থেকেই অদ্ভুত কিছু কাণ্ড ঘটতে শুরু করেছে এখানে, নানারকম গোলমাল হচ্ছে। জিনা মানতে

চায় না-এখানেই আছে ও–কিন্তু টনির দৃঢ় বিশ্বাস বাড়িতে ভূত আছে। আরও অনেকেই একথা বিশ্বাস করে, ভয় পায়। ভূতের কথা কিছুতেই পুলিশকে বোঝানো যাচ্ছে না। তুমি যদি সাহায্য না করো, লস্ট ভ্যালি হেলথ রিসোর্টের স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে।
অনেক কামরা আছে বাড়িতে, জায়গার অভাব নেই। স্কুল নিশ্চয় ছুটি এখন তোমাদের, মুসা আর রবিনকে নিয়ে চলে এসো না। বসন্তে মরুভূমি কিন্তু খুব সুন্দর হয়, এলেই দেখতে পারবে। ভালই লাগবে তোমাদের।
তোমাদের আশায় রইলাম। কাচিনার অভিশাপ থেকে মুক্ত করো লস্ট ভ্যালিকে, প্লীজ।
শুভেচ্ছা
– ভিকিখালা।
কিশোরের পড়া শেষ হলে মেরিচাচী জানতে চাইলেন, কি লিখেছে?
চিঠিটা তাঁর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে কিশোর বলল, নাও, পড়ো। একটা চেয়ার টেনে বসল সে।
চাচীও পড়লেন। চিঠির কোনায় হাতে আঁকা একটা ছবি দেখালেন, এটা কি? ক্যাচিনা?
মাথা ঝাঁকাল কিশোর। অনেক দিন আগে পড়েছিলাম, কাঠ কুঁদে পুতুল বানায় দক্ষিণ-পশ্চিমের ইনডিয়ান উপজাতিরা। ওগুলোর ছবিও দেখেছি। যেমন সুন্দর, তেমনি দামী।
এটা তেমন সুন্দর লাগছে না, মুখ বাঁকালেন মেরিচাচী। চিঠিটা ফিরিয়ে দিতে দিতে বললেন, তা কি করবি?
যাব। অ্যারিজোনায় যাওয়ার এমন সুযোগ হাতছাড়া করব নাকি? তাছাড়া ভিকিখালা এত করে অনুরোধ করেছে।...দেখি, চাচাকে জিজ্ঞেস করে, কি বলে। রবিন আর মুসাও যেতে পারবে কিনা জানা দরকার।
টেলিফোনের দিকে হাত বাড়াল কিশোর, এই সময় দেখা গেল মুসাকে। স্ট্যাণ্ডে সাইকেল তুলে অফিসের দরজায় উঁকি দিল।
এই যে, একেবারে সময়মত এসে পড়েছ, হাত নেড়ে ডাকল। কিশোর। এসো।
কি ব্যাপার? কোন খবর আছে নাকি?
খবর মানে? হাসলেন মেরিচাচী। ক্যাচিনা ভূতের খপ্পরে পড়তে যাচ্ছ এবার। যাই দেখি, বোরিস কি করছে।
বিস্মিত মুসাকে চিঠিটা দেখাল কিশোর। পড়ো।
যাচ্ছ তাহলে? চিঠি পড়ে জিজ্ঞেস করল মুসা।
মেরিচাচী যখন আপত্তি করেনি, আর ঠেকায় কে? তুমি যাবে? ইচ্ছে আছে?

বলে কি লোকটা? অ্যারিজোনা র‍্যাঞ্চে ছুটি কাটানো…
তোমার আম্মা যদি রাজি না হন…
রাজি না হলে বাড়ি থেকে পালাব না! বাবাকে আগে বলব। বাবা মাকে রাজি করাগে। কিন্তু, ভাই, ওই ভূতটুতের ব্যাপারটাই ঠিক পছন্দ হচ্ছে না।
আগেই এত ভাবছ কেন? দেখিই না গিয়ে।
বাইরে কোথাও বেড়াতে যাওয়ার ব্যাপারে রবিনের বাবা-মায়ের আপত্তি কোন সময়ই খুব একটা থাকে না।
শুক্রবার সকালের প্লেনে সীট বুক করা হলো। ছুটির সময়, ভিড় বেশি, আগে থেকে টিকেট কেটে না রাখলে পরে সীট পাওয়া যায় না। ভিকিখালাকে খবর পাঠিয়ে দিল কিশোর, ওরা যাচ্ছে।
টুকিটাকি কিছু জিনিসপত্র কেনা দরকার। বাজারে গিয়ে কিনে নিল তিন গোয়েন্দা।
রকি বীচ পাবলিক লাইব্রেরিতে পার্টটাইম চাকরি করে রবিন, বুধবারে গিয়ে ছুটি নিল ওখান থেকে। রেফারেন্স বই ঘেঁটে ক্যাচিনার ওপর কিছু তথ্য জোগাড় করে লিখে নিল নোটবইতে।
অদ্ভুত সব কাঠের পুতুলের অসংখ্য ছবি রয়েছে বইটাতে।
হোপি ইনডিয়ান আর আরও কয়েকটা ইনডিয়ান উপজাতির ধর্মে রয়েছে ক্যাচিনার উপাখ্যান। পুতুলগুলো আসলে ইনডিয়ানদের কল্পিত প্রেতাত্মার প্রতিমূর্তি। বাস্তব-অবাস্তব জিনিস আর জীবের সঙ্গে মিলিয়ে তৈরি হয়েছে ওগুলো। ক্যাচিনা নানারকম আছে, যেমন, মেঘ-ক্যাচিনা, জন্তু-ক্যাচিনা, উদ্ভিদ আর পাখি-ক্যাচিনা। কল্পিত ভয়াবহ দৈত্যদানবের ক্যাচিনাও আছে অনেক।
জরুরী যা যা জানার, কিশোরের কথামত বই পড়ে সব জেনে নিল রবিন। কিন্তু বইয়ের কোথাও কাচিনার অভিশাপের কথা লেখা নেই। কিচ্ছু না।
যাত্রার আগের দিন আরেকটা চিঠি এল কিশোরের নামে।
অ্যারিজোনা থেকেই! ভুরু কোঁচকাল কিশোর। খাম ছিঁড়ে চিঠি খুলল। কাগজের কোনায় বড় করে একটা ক্যাচিনা পুতুল আঁকা, পিঠে তীর বিদ্ধ। তার তলায় কয়েকটা শব্দ, খবরের কাগজ কেটে অক্ষরগুলো নিয়ে আঠা দিয়ে পর পর সেঁটে দেয়া হয়েছে, দাড়ি-কমা কিছু নেই:
কিশোর পাশা
অ্যারিজোনা থেকে দূরে থাকবে।
এয়ারপোর্ট টারমিনাল বিল্ডিঙ থেকে বেরোতেই যেন মুখে আগুনের ছ্যাকা দিল রোদ।
খাইছে! বলে উঠল মুসা। বিকেলেই এত কড়া! দুপুরে কি অবস্থা?

বুঝবে কালই, বলল জিনা। বিমান বন্দর থেকে বন্ধুদের এগিয়ে নিতে এসেছে। তবে ভাল জিনিসও অনেক আছে। একটু পরেই দেখতে পাবে লেবু বাগান। যা মিষ্টি গন্ধ!

একটা স্টেশন ওয়াগনের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক তরুণ, ওদের দেখে সোজা হলো। মাথায় লম্বা কালো চুলের বোঝা, নীল চোখ। বয়েস বিশের বেশি না।

টনি, পরিচয় করিয়ে দিল জিনা। চাচার র‍্যাঞ্চে কাজ করে।...টনি, ওরা তিন গোয়েন্দা। ওদের কথাই বলেছিলাম।

হাউ ডু ইউ ডু-র পালা শেষ হলো। গাড়িতে চড়ল সবাই। টনি। বসল চালকের আসনে।

জিনা, কিশোর বলল, তোমার চেহারাই বলছে, কিছু একটা গোলমাল হয়েছে? ঘটনাটা কি?

চাচা, বিষণ্ন কণ্ঠে বলল জিনা, হাসপাতালে। গতরাতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

ক্যাচিনার অভিশাপ, গাড়ি চালাতে চালাতে বলল টনি। আগে কিছুটা সন্দেহ ছিল, কিন্তু এ-ঘটনার পর আর অবিশ্বাস করতে পারছি না।

কিসের অবিশ্বাস? কিশোরের প্রশ্ন।

ভূত নাকি? জিজ্ঞেস করল মুসা।

আরে না, ভূতফুত কিছু না, মাথা নাড়ল জিনা। পাহাড়ের ওপর আগুন দেখেছে।

ভ্রুকুটি করল কিশোর। খুলে বলল।

গতরাতে আমরা ঘুমিয়ে পড়ার পর ঘটেছে ঘটনাটা, ঝাড়া দিয়ে মুখের ওপর থেকে তামাটে চুলের গোছা সরাল জিনা। মরুভূমির রোদে পুড়ে গাঢ় হয়ে গেছে চামড়ার রঙ। চাচার নাকি ঘুম আসছিল না। ছাতে গিয়েছিল হাঁটাহাঁটি করতে। হঠাৎ পাহাড়ে উজ্জ্বল আলো দেখতে পেল।

আলো না বলে বরং বলল আগুন, শুধরে দিল টনি। আগুন। জ্বেলে সঙ্কেত দিয়েছে, কোন সন্দেহ নেই।

জোরে নিঃশ্বাস ফেলল জিনা। গতরাতে পূর্ণিমা ছিল, তাই ঘরের আলো সব নিভিয়ে দিয়েছিল চাচা। আলো দেখে ছাত থেকে নেমে বাইরে বেরোচ্ছিল। হলঘর দিয়ে যাওয়ার সময় দেখতে পেল ক্যাচিনাটাকে...

শুধু ক্যাচিনা নয়, ক্যাচিনা ভূতটাকে, আবার শুধরে দিল টনি। বিমান বন্দর ছাড়িয়ে শহরে ঢুকেছে গাড়ি, রাস্তার দিকে মনোযোগ দিতে হচ্ছে তাকে।

কি দেখেছে কে জানে, নাকমুখ বিকৃত করে বলল জিনা। আলো ছিল না। অন্ধকারে সিঁড়িতে কিসে যেন পা বেধে গিয়ে-কার্পেটেই হবে হয়তো, আছাড় খেয়ে পড়েছে। হলরুমে সিঁড়ির গোড়ায় পেয়েছি তাকে।

মাথা ঝাঁকাল টনি। হ্যাঁ। সিঁড়ি থেকে পড়েছে। কব্জি ভেঙেছে, গোড়ালি মচকেছে। ডাক্তার বলল, ভাল হতে হপ্তাখানেক লাগবে।
সমবেদনা জানাল মুসা আর রবিন, কিন্তু কিশোর চুপ। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কয়েকবার। আচ্ছা, ওই ক্যাচিনা ভূতটাকে কি আগেও দেখা গেছে?
কেউ কেউ নাকি দেখেছে, জিনা জবাব দিল। আমি দেখিনি।
উইলসন আংকেল বিশ্বাস করেন?
না।
ওই ভূতের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি তথ্য কে দিতে পারবে?
এক মুহূর্ত চুপ রইল জিনা। বোধহয় জুলিয়ান। দিনরাত টই টই করে ঘুরে বেড়ায় পাহাড়ে, মরুভূমিতে।
জুলিয়ান?
ভিকিখালার ভাইপো। নিজের কাছে নিয়ে এসেছে খালা। তার স্বামী, মানে আঙ্কেলও চলে এসেছে তার কাছে। আঙ্কেল স্কুল-মাস্টার। জুলিয়ানকে পড়ানোর ভার নিয়েছে। আশা করছে, বসন্তের শেষে স্কুল খুললেই ভর্তি করে দেবে।
কদ্দিন হলো এসেছে?
এই মাস দুয়েক। ভিকিখালার ভাই ভিয়েতনামে চলে গিয়েছিল, বিয়ে করেছিল ওখানেই। জুলিয়ানের মা ভিয়েতনামী মহিলা। ভালই ছিল তারা, কিন্তু হঠাৎ কার অ্যাকসিডেন্টে মারা গেল জুলিয়ানের বাবা।
আহ্‌হা! আফসোস করল মুসা। চুকচুক করল জিভ দিয়ে।
তারপর? জিজ্ঞেস করল রবিন।
বিদেশীকে বিয়ে করায় জুলিয়ানের মায়ের ওপর তার আত্মীয় স্বজনরা চটা ছিল। জুলিয়ানের বাবা মারা গেলে আবার বিয়ে করতে বাধ্য করল মহিলাকে। সত্বাপ ভাল চোখে দেখল না ছেলেটাকে। শেষে ভিকিখালার কাছে চিঠি লিখল মহিলা। ওই এক ফুফু ছাড়া বাপের কুলের আর কোন আত্মীয় নেই জুলিয়ানের।
বয়েস কত ওর? জানতে চাইল কিশোর।
বারো, জবাব দিল টনি। কণ্ঠে বিরক্তির ছোঁয়া।
জিনাও বিরক্ত হলো। তুমি ওকে দেখতে পারো না তাই এমন করো। ও তোমার কি ক্ষতি করেছে?
ক্ষতি কি আর আমার করে? করছে তো তোমাদের। মিস্টার উইলসনের দুর্ঘটনার জন্যে ও-ই দায়ী, কাচিনা নয়।
মানে? রহস্যময় চিঠিটার কথা ভাবল কিশোর।
মিস্টার উইলসন হলে নেমেছিলেন বাইরে বেরোনোর জন্যে, আগুন দেখে। আর ওই আগুনের জন্যে ছেলেটা দায়ী। দুটো বড় ক্যাকটাস আর একটা প্যালো

ভারডে গাছ ইতিমধ্যেই পুড়িয়ে ছাই করেছে।
সেটা তোমার অনুমান, প্রতিবাদ করল জিনা। আগুন যে জুলিয়ান লাগিয়েছে, তুমি শিওর হয়ে বলতে পারবে?
দ্বিধা করল টনি। এ ছাড়া আর কে লাগাবে? সারাক্ষণ র‍্যাঞ্চের চারপাশে ছোঁক ছোঁক করে বেড়ায়, আগুন জ্বালে...
আমি বিশ্বাস করি না। ভিকিখালাও না।
কিন্তু আগুন তো একবার সে লাগিয়েছিল, নাকি?
তা লাগিয়েছিল, তবে সেটা এমন কোন ব্যাপার না। কিশোরের দিকে ফিরল জিনা। এ দেশের লোক আর তাদের আচার-আচরণ সম্পর্কে জানতে খুব আগ্রহী জুলিয়ান। হাজার হোক, বাপের কুলের লোকদের কথা কে না জানতে চায়? সিনেমা আর টেলিভিশন থেকে নানারকম আইডিয়া নেয় ও। একটা পুরানো ফিল্মই তার মাথায় ঢুকিয়েছে স্মোক সিগন্যালের ব্যাপারটা। পাহাড়ের ওপর চড়ে ধোয়ার সিগন্যাল দিতে গিয়েছিল, একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে...এ রকম আর কখনও করবে না, কথা দিয়েছে।
তোমার চাচা যে আলো দেখল, ওটা কিসের আলো?
জানি না।
হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে দেখতে গিয়েছিলাম, জিনার কথার পিঠে বলল টনি। আগুনের কোন চিহ্ন দেখলাম না। মরুভূমিতে হয় এ রকম। জ্বলে ছাই হয়ে যায় জিনিস, বাতাসে বালি উড়িয়ে এনে তার ওপর ফেলে ঢেকে দেয় সব নিশানা। চাঁদের আলোর কারসাজিও হতে পারে। মনে ভূতের ভাবনা থাকলে কত কিছুই তো দেখে মানুষ, জিনা বলল।
জুলিয়ানের তাহলে বদনাম হয়ে গেছে খুব, না? আনমনে বলল কিশোর।
হ্যাঁ। ও আসার পর থেকেই অদ্ভুত কিছু কাণ্ড ঘটেছে। কয়েক জায়গায় আগুন লেগেছে। ভূতটাও ঘনঘন দেখা দিচ্ছে। কিশোর, আমি বলছি ছেলেটা নির্দোষ। অনুরোধের সুরে বলল জিনা, তুমি ওর বদনাম ঘোচাও।
আমি? ভুরু কোঁচকাল কিশোর। কিভাবে? অকাজগুলো যদি সত্যি সত্যি করে থাকে সে? আগুন লাগিয়ে থাকে?
শহর থেকে বেরিয়ে এসেছে গাড়ি। পথের দু-ধারে পামের সারি, তার ওপাশে খানিক পর পরই লেবু বাগান। সেদিকে চেয়ে মাথা নাড়ল জিনা, ও করেনি। তুমি তদন্ত করলেই বুঝতে পারবে। কিছু একটা রহস্য রয়েছে লস্ট ভ্যালি রিসোর্টে। কিশোরের দিকে ফিরল। জুলিয়ান স্বীকার করেছে, সে একবার আগুন জ্বেলেছে সিগন্যাল দেয়া প্র্যাকটিস করার জন্যে। কিন্তু রাতে গেট খুলে রাখা, ঘোড়ার বাধন খুলে ওগুলোকে ছেড়ে দেয়া, ও সব শয়তানীর কোনটাই সে করেনি। ভিকিখালা

তার কথা বিশ্বাস করে, আমিও করি। অনেক রকমে চেষ্টা করেছে ভিকিখালার স্বামী; ভয় দেখিয়ে বলেছে, মিথ্যে কথা বললে আবার তাকে ভিয়েতনামে তার মায়ের কাছে পাঠিয়ে দেবে। কেঁদে ফেলেছে জুলিয়ান। কসম খেয়ে বলেছে, সে ওসব কিছুই করেনি।

ঠিক আছে, দেখা যাক, নিচের ঠোঁটে জোরে একবার চিমটি কাটল কিশোর। আগে ভেবেছিল, একটা রহস্য, এখন দেখা যাচ্ছে। দুটো। অ্যারিজোনা মরুভূমিতে ছুটি ভালই কাটবে মনে হচ্ছে।

র‍্যাঞ্চ আর কদ্দূর? প্রসঙ্গ পরিবর্তনের জন্যে বলল মুসা।

দূর আছে এখনও, জানাল টনি। ওই যে, দূরে, সুপারস্টিশন মাউনটেইন, পুবে দেখাল সে। মরুর বুক থেকে উঠে গেছে উঁচু গিরিশৃঙ্গ।

নীল চুড়া এক পায়ে দাঁড়িয়ে, সব কিছু ছাড়িয়ে, মনে হয় সাদা মেঘ ফুঁড়ে যায়, একেবারে উড়ে যায়, আকাশের কোণটিতে। কোথা পাবে পাখা সে...

হেই, কি বিড়বিড় করছ? কনুই দিয়ে তো লাগাল মুসা।

বাধা পেয়ে থেমে গেল কিশোর। অ্যাঁ! ও, না, একটা বাংলা কবিতা অ্যাডাপ্ট করছিলাম।

আচ্ছা, সুপারস্টিশন মাউনটেইনের বাংলা কি হয়?

কুসংস্কার পর্বত। উদ্ভট নাম।

আর লস্ট ভ্যালি? রবিন জিজ্ঞেস করল।

হারানো উপত্যকা।

জিনা, রসিকতার সুরে বলল মুসা, কুসংস্কার পর্বতের হারানো উপত্যকায় পোড়ো খনিটনি আছে নাকি, ওই যে, টুইন লেকসের মৃত্যুখনির মত? রহস্যটা জমে তাহলে ভাল।

আছে, লস্ট ডাচম্যান মাইন, হাসল টনি। অ্যাপাচি জাংশনে গেলেই দেখবে, টুরিস্টদের কাছে ম্যাপ বিক্রি করছে ফেরিয়ালারা, ওখানে যাওয়ার।

পথে পড়বে নাকি? জিজ্ঞেস করল রবিন।

হ্যাঁ। ছোট একটা টাউন। তার পরেই আমাদের র‍্যাঞ্চ।

আরিব্বাবা, কত দূরে চললাম! মুসা বলল।

তাতে কি? টিপ্পনী কাটল জিনা। আমরা সব্বাই ঘিরে রাখব। তোমাকে, ক্যাচিনা যাতে তোমাকে ধরতে না পারে।

আমি কি ভয় পাই নাকি? বললাম, সভ্য জগৎ থেকে কত দূরে চলে এসেছি... একেবারে ওয়াইল্ড ওয়েস্ট...

বুনো পশ্চিম, বাংলায় বিড়বিড় করল কিশোর।

প্রথম প্রথম এসে আমারও খারাপ লাগত, বলল জিনা। এখন তো আর এ জায়গা ছেড়ে যেতেই মন চায় না। আহ, কমলা বাগান। এসে পড়েছে! কি সুন্দর গন্ধ!
মরুর হালকা বাসন্তী বাতাসকে ভারি করে তুলেছে কমলা ফুলের মিষ্টি সুবাস।
জোরে শ্বাস টেনে গন্ধ নিল কিশোর। আউফ, সত্যি চমৎকার!
এটাকে চমৎকার বলছ, আরও আগে এলে বুঝতে, চমৎকার কাকে বলে, বলল টনি। ফুল তো এখন অনেক কম, মৌসুম প্রায় শেষ। ভরা। মৌসুমে রাশি রাশি ফুল ফোটে, কমলা আর পাকা আঙুরের গন্ধে মৌ মৌ করে বাতাস। আমাদের র‍্যাঞ্চেও আছে কিছু গাছ। ফলও ধরেছে। পাকা আঙুর আর কমলা নিজেরাই ছিঁড়ে নিয়ে খেতে পারবে।
খাইছে! তাই নাকি? তর সইছে না আর মুসার। তা, ভাই, তাড়াতাড়ি করো। দিলে এমন এক কথা শুনিয়ে, ধৈর্য রাখতে পারছি না। আর।
অধৈর্য করে দেয়ার আরও অনেক কিছু আছে, মুসা আমান, হেসে বলল জিনা। ভিকিখালা তো তোমাকে চেনে, তোমরা আসার সংবাদ শুনেই খাবার বানাতে লেগে গেছে। আধমণী একখান ভুড়ি তৈরি করে। দিয়ে তারপর তোমাকে রকি বীচে ফেরত পাঠাবে এবার।
পথের একটা বাঁক ঘুরল স্টেশন ওয়াগন। গাড়িটাকে টনি দেখল আগে, তারপর রবিন; চেঁচিয়ে উঠল, আরে আরে, কানা নাকি!
উল্টো দিক থেকে নাক সোজা করে গুঁতো লাগাতে ছুটে আসছে। একটা কার।
সাঁই করে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে পাকা রাস্তার পাশের মাটিতে গাড়ি নামিয়ে আনল টনি। অসমতল জায়গায় পড়ে নাচতে শুরু করল স্টেশন ওয়াগন, প্রচণ্ড ঝাঁকুনি। নানারকম সুরে চেঁচামেচি জুড়ল আরোহীরা। আতঙ্কিত চোখে তাকাল ঢালের দিকে। কঠিন পাথুরে মাটির ঢাল নেমে গেছে প্রায় দশ-বারো ফুট, তারপর শুরু হয়েছে মাঠ, তাতে বড় বড় কাটাঝোঁপ।
রুখতে পারল না টনি, ঢালে নেমে গেল গাড়ির সামনের চাকা। এরপর আর আটকানোর উপায় নেই, ব্রেক করলে উল্টে যাবে।
লাফাতে লাফাতে মাঠে নামল গাড়ি, ঝোঁপঝাড় ভেঙে এসে থামল। ইঞ্জিন গেল বন্ধ হয়ে। হুইল শক্ত করে চেপে ধরে আছে এখনও টনি, আটকে রাখা নিঃশ্বাস ছাড়ল শব্দ করে। ব্যাটা মনে হয় গলা পর্যন্ত টেনেছে। এভাবে গাড়ি চালায় কেউ?
মুসার বাহু খামচে ধরে রেখেছিল জিনা, আস্তে করে ছেড়ে দিল।
বাপরে বাপ, বাঘের নখ; না না, বাঘিনীর! রক্ত বের করে ফেলেছে, বাহু ডলছে মুসা। তা, টনি, এখানে লোকে এভাবেই গাড়ি চালায় নাকি, হে?
ইচ্ছে করে করেছে শয়তানিটা, গম্ভীর হয়ে আছে কিশোর। ঠেলে ফেলে দিতে চেয়েছিল আমাদের। অ্যাক্সিডেন্ট করাতে চেয়েছিল। রহস্যময় চিঠিটা ফালতু

শাসানী বলে আর মনে হচ্ছে না এখন।
আমারও তাই মনে হলো, একমত হলো রবিন। কিন্তু কেন?
ক্যাচিনা রহস্যের সঙ্গে কোন যোগাযোগ আছে হয়তো, চিন্তিত দেখাচ্ছে কিশোরকে।
ফিরে চাইল টনি। লাইসেন্স নাম্বার দেখেছ?
এত তাড়াতাড়ি ঘটেছে ঘটনা, দেখার সময়ই পায়নি কেউ।
হুঁ, স্টার্টারের চাবিতে হাত দিল টনি। এখন এটার ইঞ্জিন চালু হলেই বাঁচি।
কয়েকবারের চেষ্টায় চালু হলো ইঞ্জিন। ঝোঁপঝাড়ের কিনার দিয়ে গাড়ি চালাল সে। কিছুদূর এগোনোর পর মাঠের সঙ্গে এক সমতলে এসে গেল পথ। রাস্তায় উঠল গাড়ি।
স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল আরোহীরা।
মেসা ছাড়িয়ে এল ওরা। পাতলা হয়ে এসেছে, পথের দু-ধারের ঝোঁপ। ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বাড়িঘর। নির্মেঘ নীল আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে উঁচু উঁচু স্যাগুয়ারো ক্যাকটাস। বিচিত্র ডালপাতা। বসন্ত, তাই ফুল ফুটেছে। ডালের মাথায় মাখনরঙা ফুলের মুকুট।
অ্যাপাচি জাংশন পেরোল। সরু হয়ে এল পথ।
হাত তুলে দূরে বাড়িটা দেখাল জিনা।
একেবারে তো দুর্গ, মুসা বলল।
হাসল জিনা। প্রথমবার দেখে আমিও তাই বলেছিলাম।
দুর্গের বাড়া, বলল টনি। কয়েক ফুট পুরু দেয়াল। এভাবে বানানোর কারণ আছে। ইনডিয়ানদের রাজত্ব ছিল তখন এখানে। নিরাপত্তা চেয়েছিলেন মিস্টার লেমিল।
দূর থেকে দেখলে মনে হয় পাহাড়েরই অংশ, রবিনের মন্তব্য।
সুপারস্টিশন থেকে এসেছে বেশির ভাগ পাথর। বাইরেটা যেমন আছে তেমনি রেখে দিয়েছেন মিস্টার উইলসন, কিছুই বদলাননি। পুরানো গন্ধটা রাখতে চেয়েছেন আরকি। টুরিস্ট অ্যাট্রাকশন বাড়বে।
ফ্যানটাসটিক! মুগ্ধ হয়ে দেখছে মুসা। এরকম বিল্ডিঙ আছে, ভাবিনি।
অন্য বাড়িগুলো কোনটা কি? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
ডানের ছোটটা আস্তাবল, বলল জিনা, ওই যে পাশেই কোরাল। উল্টোদিকের ছোট ছোট বাড়িগুলো বাড়তি বাংলো। লোক বেশি হয়ে গেলে ওখানে জায়গা হবে। মেইন হাউসের পেছনে বিশাল স্নানের ঘর আছে, সুইমিং পুল আছে। কাছাকাছি টেনিস কোর্ট, র‍্যাকেটবল কোর্ট তৈরি হচ্ছে। দম নিয়ে বলল, অনেক কিছুই তৈরি বাকি এখনও।
হুঁ, খুব বড় কাজ হাতে নিয়েছেন, মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

তোমার চাচাকে সাহায্য করার কে কে আছে?
ভিকিখালা আর তার স্বামী, মিস্টার ডিউক। উনি আছে, প্রায় সব কাজই দেখাশোনা করে। আর আছে ডক্টর জিংম্যান, হাসল জিনা। ডক্টর জিংম্যান আমাদের সবচেয়ে নিকট প্রতিবেশী। বাড়ি ওই-ই দিকে, পর্বতের দিকে হাত তুলে দেখাল সে। খুব সাহায্য করে চাচাকে।
দশ-পনেরোজন মেহমানকে এখনই জায়গা দিতে পারি আমরা, জানাল টনি। বাংলোগুলো হয়ে গেলে আরও বিশ-বাইশজনকে দিতে পারব।
আসলে হচ্ছেটা কি এখানে? জিজ্ঞেস করল রবিন। সরু পথের দুই ধারে ফ্যাকাসে সবুজ গাছগুলো ছোট ছোট হলুদ ফুলে বোঝাই, সেদিকে চেয়ে আছে সে। লোক দেখানো…মানে ডিউড র‍্যাঞ্চ, নাকি সত্যি সত্যি র‍্যাঞ্চ এটা?
তারমানে র‍্যাঞ্চ সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা আছে তোমাদের, ভাল, মাথা কাত করল টনি। এটাকে র‍্যাঞ্চ না বলে হেলথ রিসোর্ট বলা উচিত। মিস্টার উইলসন চান, বদ্ধ জায়গায় থাকতে থাকতে যারা বিরক্ত হয়ে গেছেন, তারা এখানে এসে খোলা হাওয়ায় একটু দম নেবেন, সেই সঙ্গে কিছুটা ব্যায়াম, কিছুটা বিশ্রাম আর খাওয়া-দাওয়াটা ঠিকমত করবেন। তাজা হয়ে ফিরে যাবেন আবার শহরে।
ঠিকমত খাওয়া? শঙ্কিত হলো মুসা। ডায়েট কন্ট্রোলের ব্যাপার। স্যাপার না তো?
আরে না, হাসল জিনা, তার হাসিতে যোগ দিল সবাই। ওজন কমানোর কোন ব্যাপার নেই। ভিকিখালার পাল্লায় পড়ে বরং তালপাতার সেপাইরা নাদুস নুদুস হয়ে ফিরে যাবে। তবে কেউ যদি ভুড়িটুরি কমাতে চায়, তাহলেও অসুবিধে নেই। ওই কাজেও ভিকিখালা ওস্তাদ। নাচ, ঘোড়ায় চড়া, সাঁতার
সব কিছুরই ব্যবস্থা থাকবে এখানে।
শুনতে ভাল লাগছে, বলল কিশোর। টুরিস্ট আকর্ষণের চমৎকার ব্যবস্থা। সাধারণ রিসোর্টের চেয়ে আলাদা।
হাসি ফুটেই মিলিয়ে গেল জিনার ঠোঁটে। যদি ক্যাচিনার অভিশাপ থেকে মুক্তি মেলে। ভূতের উপদ্রব ঘটতে থাকলে একজন লোকও আসবে না।
ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে কি বলল টনি, বোঝা গেল না। রাস্তা শেষ, ড্রাইভওয়েতে পড়েছে গাড়ি। গাড়িপথের কাজ পুরোপুরি শেষ হয়নি। এখনও, এবড়োখেবড়ো হয়ে আছে। এগিয়ে গেছে পুরানো বাড়িটার দিকে। মেসকিট ঝোঁপ আর ক্যাকটাস ঘন হয়ে জন্মেছে সামনের দিকে। গাড়িপথ ধরে বাড়ির পাশ দিয়ে গিয়ে মোড় নিতেই সামনের দৃশ্য দেখে প্রায় চমকে গেল তিন গোয়েন্দা।
পেছনে রুক্ষ মরুর বিশাল বিস্তার, তাতে পুষ্পশূন্য ধূলিধূসরিত ক্যাকটাস, মাঝে পাতাবাহারের নিচু বেড়া। বেড়ার এপাশে সবুজের সমারোহ, ঝিক করে চোখে লাগে। ঘন সবুজ রসাল ঘাসে ঢাকা লন, রঙিন ফুলের ঝাড়, কমলা লেবুর

বাগান। কমলার গন্ধ ভুরভুর করছে। গরম বাতাসে। বিরাট বাগানের ঠিক মাঝখানে সুইমিং পুল, স্ফটিকের মত স্বচ্ছ পানিতে আকাশ দেখা যায়, মনে হয় পানির রঙই বুঝি ঘন নীল। তার পাশে ধবধবে সাদা একটা বাড়ি। সব কিছুই সাজানো গোছানো, যেন ছবি। এখনও নাকি পুরোপুরি তৈরিই হয়নি। হওয়ার পর কি হবে ভেবে অবাক হলো ওরা।

আরিব্বাবা, দারুণ! সহজে প্রশংসা করে না যে কিশোর পাশা, তার মুখ দিয়েও বেরিয়ে গেল এই কথা।

পছন্দ হয়েছে, না? হেসে বলল টনি। তারমানে সফল হয়েছি। আমরা। দর্শককে চমকে দিতে পেরেছি।

রূপকথার রাজ্য মনে হয়, বিড়বিড় করল রবিন।

মরুভূমিতে মরূদ্যান, মুসা বলল।

গাড়ি রাখল টনি। নামল সবাই।

সাঁতারের পোশাক এনে তো ভালই করেছি দেখা যায়, সুইমিং পুলটার দিকে লোভাতুর নয়নে তাকিয়ে আছে মুসা। কি, রবিন, খুব তো হাসাহাসি করেছিলে, মরুভূমিতে ব্যাদিং সুট দিয়ে কি করব বলে বলে; এখন?

জিনা, টনি বলল, তুমি ওদের নিয়ে এসো। আমি ভিকি আন্টিকে খবর দিচ্ছি। দুই হাতে বিশাল দুই সুটকেস তুলে নিয়ে বাড়ির দিকে এগোল সে।

ওদিকে আরও গোটা তিনেক বাংলো বানানোর ইচ্ছে আছে চাচার, মরুভূমির দিকে দেখিয়ে বলল জিনা। আরও ছয়জনের জায়গা হবে তাহলে।

ভালই প্ল্যান করেছেন তিনি, দেখতে দেখতে বলল কিশোর। লোকে ভাববে মরুভূমিতে যাচ্ছে, দেখবে শুধু বালি আর বালি। এসে যাবে চমকে, আমাদের মত। মরুভূমিও আছে, আবার সবুজও আছে। কষ্ট করতে হবে এটা ধরে নিয়েই আসবে, এসে পাবে এই আরাম। ফলে আরামটা আরও বেশি মনে হবে।

ইচ্ছে করলে ঘোড়ায় চড়ে চলে যাওয়া যায় পর্বতের ওদিকে, জিনা বলল। চাইলে ওখানে রাত কাটানো যায়। আহ, কি যে মজা! আমি একবার গিয়েছিলাম। রাতে আগুনের কিনারে শুয়ে মনে হলো, দেড়শো বছর পিছিয়ে চলে গেছি সেই বুনো পশ্চিমে... দরজা খুলতে দেখে থেমে গেল সে।

ভিকি বেরিয়ে ছুটে এল দু-হাত বাগিয়ে। তোমরা এসেছ। যাক, নিশ্চিন্ত হলাম। সূক্ষ্ম একটা দুশ্চিন্তার ছায়া দেখা গেল তার চেহারায়।

কোনরকম ভূমিকায় না গিয়ে সরাসরি প্রশ্ন করল কিশোর, কি হয়েছে, খালা? খারাপ কিছু?

খানিক আগে ডাক্তার এসেছিল, জানতে, জুলিয়ান একটা অ্যাপলুসা নিয়ে এসেছে কিনা।

কী? ভুরু কোঁচকাল জিনা।
অস্বস্তি ফুটল ভিকির চোখে। ডেনিংদের আস্তাবলে নাকি একটা ঘোড়া পাওয়া যাচ্ছে না। কে জানি জিংম্যানকে বলেছে, একটা মাদী ঘোড়াকে টেনে আনতে দেখা গেছে একটা ছেলেকে। এদিক-ওদিক তাকাল। সাদাকালো পিন্টো ঘোড়ায় চেপেছে ছেলেটা।
ওটায় চড়ে এখানে এসেছিল নাকি?
ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল ভিকি। বাড়িই আসেনি সারাদিন। গতরাতে মিস্টার উইলসন হাত-পা ভাঙায় ভীষণ ঘাবড়ে গেছে সে। মনমরা হয়ে আছে তারপর থেকে। সকালে খেয়ে সেই যে বেরিয়েছে, আর দেখিনি তাকে।
কোথায় দেখা গেছে তাকে, জিংম্যান কিছু বলেছে?
মাথা নাড়ল ভিকি।
ডিনারের দেরি আছে। মেহমানদের দেখিয়ে বলল জিনা, ওদেরকে ওদের ঘরে দিয়ে আসি। তারপর দেখি, আমি আর টনি খুঁজতে বেরোব। তুমি কিছু ভেব না, খালা। ওই চেরিই একমাত্র সাদাকালো পিন্টো ঘোড়া না এখানে, আরও আছে। আর জুলিয়ানের বয়েসের ছেলেও আছে। অন্য কাউকেও দেখে থাকতে পারে ওই লোক।
হাসল ভিকি, কিন্তু ভাবনার কালো ছায়া দূর হলো না চেহারা থেকে।
সাদাকালো ঘোড়ায় চড়ে আসতে দেখা গেল একটা ছেলেকে। দড়িতে বেঁধে টেনে আনছে একটা ছাইরঙ মাদী অ্যাপলুসা ঘোড়া, পেছনটা ভারি সুন্দর, সাদার ওপর ছাই রঙের ফোঁটা। চকচকে চামড়া থেকে যেন তেল চুঁইয়ে পড়ছে।
অ্যাই, ফুপু, দূর থেকেই ডেকে বলল ছেলেটা, দেখো, কি এনেছি। মরুভূমিতে ঘুরছিল, ধরে নিয়ে এলাম। সুন্দর, না?
জুলিয়ান, কেঁদে ফেলবে যেন ভিকি, কেন…
হাত তুলে ভিকিকে চুপ করাল কিশোর। জুলিয়ান আরও কাছে এলে জিজ্ঞেস করল, মরুভূমিতে পেয়েছ? এগিয়ে গেল সে।
লাজুক হাসি হাসল জুলিয়ান, অনেকটা মেয়েলি চেহারা। অ, তোমরা এসে পড়েছ। তোমাদের কথা শুনেছি ফুপুর কাছে। তুমি নিশ্চয় কিশোর পাশা!
হ্যাঁ। আর ও…
বোলো না, বোলো না। শুনে শুনে মুখস্থ হয়ে গেছে। ও মুসা আমান, আর ও রবিন মিলফোর্ড।…হা, কি যেন বলছিলে…মরুভূমিতে পেয়েছি নাকি ঘোড়াটাকে? হ্যাঁ, পেয়েছি। ছাড়া পেয়ে ঘুরছিল। ডাকতেই কাছে চলে এল। বড় রাস্তায় চলে গেলে তো আর পাওয়া যেত না, ডাকলেই যখন কাছে যায়, কে না কে ধরে নিয়ে যেত। আমি নিয়ে এলাম, ভাল হলো না?

নিয়ে সোজা আস্তাবলে গেলে ভাল করতে, জিনা বলল। যাকগে, এসেছ এসেছ, এখন চলে যাও। আমি ফোন করে জানিয়ে দিচ্ছি ওদেরকে, তুমি ঘোড়াটা খুঁজে পেয়েছ।
আচ্ছা, মাথা কাত করে সায় জানাল জুলিয়ান। পিন্টোর মুখ ঘুরিয়ে অ্যাপলুসাটাকে টেনে নিয়ে চলে গেল।
সেদিকে চেয়ে অস্বস্তিভরে মাথা নাড়ল ভিকি। ঠিক ওকে চোর ভাববে ওরা! তিন গোয়েন্দার দিকে ফিরল সে। কি যে করব, বুঝি না! একটা সমস্যা! এসেই এসব ঝামেলা দেখে নিশ্চয় বিরক্ত হচ্ছ। এসো, ঘরে এসো।
পাথরের বাড়িটার ছায়ায় এসে অকারণেই গায়ে কাঁটা দিল কিশোরের। অথচ বাতাস গরম এখানেও। অবচেতন মন বলছে, হুঁশিয়ার! বিপদ আসছে!
বিশাল বাড়ির ভেতরটাও চমকে দেয়ার মত। পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকে এগোলে সামনে পড়বে মস্ত এক ঘর, সাজানো-গোছানো সোফা আর চেয়ার, বসে কথা বলার জন্যে। এক কোণে একটা টেলিভিশন সেট। পেছনের দ্বিতীয় দরজা দিয়ে ঢুকলে, অতি-আধুনিক রান্নাঘর। ওরা ঢুকল সেখানেই। বাতাসে খাবারের লোভনীয় গন্ধ।
নাক কুঁচকে গন্ধ শুকল মুসা। খাইছে! কমলা ফুলের গন্ধের চেয়ে ভাল।
ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই হয়ে যাবে, ভিকি বলল। রাধছিলাম, এই সময় এল ডাক্তার।
তুমি লেগে যাও আবার, খালা, জিনা বলল। জিংম্যানের সঙ্গে আমি কথা বলব। ডেনিংদেরও ফোন করব।
আচ্ছা। চুলার দিকে এগোল ভিকি।
তিন গোয়েন্দাকে নিয়ে খোলামেলা একটা ডাইনিং রুমে ঢুকল জিনা। অন্যান্য ঘরের মতই এটাও বিরাট। চার কিংবা ছয় চেয়ারের অনেকগুলো খাবার টেবিল। কিশোর আন্দাজ করল, জায়গা যা আছে, তাতে এর ডবল চেয়ার-টেবিল জায়গা হবে। ছোট ছোট ইনডিয়ান কম্বল আর চাদর দিয়ে দেয়াল সাজানো। বেশ কয়েকটা পেইন্টিং রয়েছে, সবই মরুভূমির দৃশ্য। ইনডিয়ান ঝুড়িতে কায়দা করে সাজানো রয়েছে শুকনো ফুল, পাপড়ি শুকিয়ে গেলেও ঝরে যায়নি। ইচ্ছে করেই পুরানো ওয়েস্টার্ন পরিবেশ গড়ে তোলা হয়েছে।
এসো, তোমাদের ঘর দেখিয়ে দিই, জিনা বলল। তারপর জুলিয়ানের ব্যাপারটা দেখতে হবে। ভাবছি, বিকেলটা তোমাদের সঙ্গে কাটাব...
তোমার কি মনে হয়, জিনা? প্রশ্ন করল কিশোর। জুলিয়ান ঘোড়াটা চুরি করে এনেছে?
সে কথা ভাবতেও খারাপ লাগে, ঘুরিয়ে জবাব দিল জিনা। কি আর বলব?, ভিকিখালার কাছে শুনলাম, ভালই কাটছিল এখানে তাদের। জুলিয়ান ঘোড়ায়

চড়া শেখার পর থেকেই নানারকম গোলমাল…
আমার কাছে কিন্তু বেশ চালাক ছেলে মনে হলো, রবিন বলল।
ইংরেজি তো ভাল বলে। এখানে এসে এত তাড়াতাড়িই শিখে ফেলল?
ওর মা ইংরেজি জানে। সেজন্যেই শিখতে পেরেছে। বাবা তো মারা গেছে ওর তিন বছর বয়েসের সময়। বাবার চেহারাই ভালভাবে মনে করতে পারে না।
ডাইনিং রুম থেকে ওদেরকে আরেকটা হলরুমে নিয়ে এল জিনা।
আরে! ওগুলো ক্যাচিনা? অবাক হয়েছে মুসা। সাজানো দেয়ালের দিকে চেয়ে আছে সে।
চাচার প্রাইভেট গ্যালারি এটা, হেসে বলল জিনা। এবং আমাদের ঘরোয়া ভূতের বাসস্থান।
এসব কিচ্ছা নিশ্চয় বিশ্বাস করো না তুমি? বলে উঠল কেউ।
ফিরে তাকাল সবাই। উল্টোদিকের একটা দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকছে। লম্বা, বলিষ্ঠদেহী এক লোক।
ও, ডাক্তার আঙ্কেল, এসে পড়েছেন, বলল জিনা। আপনার কথাই ভাবছিলাম। ফোন করতাম। জুলিয়ানের ঘোড়া নিয়ে আসার সংবাদ সংক্ষেপে জানাল ডাক্তারকে।
ঠিক আছে, ডাক্তার বলল, তোমার আর ফোন করার দরকার নেই। ডেনিংদের আমিই জানিয়ে দেব।
এতক্ষণে যেন তিন গোয়েন্দার ওপর চোখ পড়ল ডাক্তারের।
পরিচয় করিয়ে দিল জিনা।
অ, তোমরাই তাহলে সেই বিখ্যাত তিন গোয়েন্দা। কিশোরের দিকে ফিরল জিংম্যান। ভিকি আর জিনার ধারণা, তুমি এলে ওই ভূত রহস্যের সমাধান হবেই হবে।
হাসল শুধু কিশোর, কিছু বলল না।
তা তো হবেই, জোর গলায় বলল জিনা। কিশোর পাশার কাছাকাছি থাকলে ভূতের আরামের দিন শেষ।
বাড়িয়ে বলছ, বলল কিশোর। পারব কিনা জানি না, তবে ভূত তাড়ানোর যথাসাধ্য চেষ্টা করব আমরা। বদনাম যে কোন রিসোর্টের জন্যে মারাত্মক।
আমিও, তো সে কথাই বলি, সঙ্গে সঙ্গে কথাটা ধরল ডাক্তার।
ওই ছেলেটাকে নিয়েই যত ভয়। যে হারে গোলমাল পাকাচ্ছে…জিনা, তোমার চাচার স্বার্থেই বলি, ছেলেটা ওরকম করতে থাকলে কিন্তু সাংঘাতিক বদনাম হয়ে যাবে। আর পড়শীদের সঙ্গে তোমার চাচার সম্পর্ক ভাল না থাকলে, এই রিসোর্ট চালাতে পারবে না।

জুলিয়ানের কথা বলছেন তো? কিন্তু ওর বয়েসী একটা ছেলে কি আর এমন গোলমাল পাকাবে, যে সবাই অস্থির হয়ে থাকবে? জল জুলিয়ানের লজ্জিত হাসি, বড়বড় বাদামী চোখ আর ঘোড়ার পিঠে
গুলমাল পাকবে জড়সড় হয়ে বসে থাকার দৃশ্য কল্পনা করল কিশোর। নাহ, ওই ছেলে খারাপ কিছু করবে বলে ভাবা যায় না।
যা করছে তা-ই যথেষ্ট, গম্ভীর হয়ে বলল ডাক্তার। অ্যাপলুসাটার অনেক দাম। শুধু চুরিই নয়, আরও অনেক শয়তানী সে করেছে। এ-যাবৎ তো শুধু গাছ জ্বালিয়েছে, কোনদিন গোলাঘর আর খড়ের গাদায় আগুন লাগায় কে জানে। না, জিনা, হেসে উড়িয়ে দেয়ার কোন মানে হয় না। এসব ব্যাপার সিরিয়াসলি নেয়া উচিত।
ডাক্তারের কণ্ঠস্বরে অবাক হলো জিনা। কিছু বলতে যাচ্ছিল, এই সময় ঘরে ঢুকল টনি। এই যে, ডাক্তার আঙ্কেল, আপনাকেই খুঁজছি।
র‍্যাঞ্চ সংক্রান্ত কাজের কথায় মশগুল হলো দু-জনে।
দেয়ালের ছবিগুলোর দিকে ঘুরল জিনা। তিন গোয়েন্দাকে নিয়ে এগোল। খুব সুন্দর, না? কেউ কেউ পরামর্শ দিয়েছে ওগুলো ফেলে দিতে। তাহলে নাকি ভূত চলে যাবে।
মাথা খারাপ, বলল রবিন। রিআল আর্ট ওগুলো।
কি, ক্যাচিনা? জিজ্ঞেস করল কিশোর। দেখে তো কিছু বোঝা যায় না।
লাল, সাদা আর হলুদে আঁকা একটা ছবি দেখিয়ে জিনা বলল, ওটা মেঘ-ক্যাচিনা। ওই যে, পালকের পাখার মত মনে হচ্ছে, ওটা ঈগল-ক্যাচিনা। এই যে, সাদা রোমশ, এটা ভালুক-কাচিনা। নীল মুখোশ আর সাদা কিম্ভুত শরীর দেখিয়ে বলল, প্রিকলি-পার ক্যাকটাস ক্যাচিনা। কয়েকটা অদ্ভুত ছবি দেখাল, ওগুলো কি, কেউ বুঝতে পারেনি। চেনা যায় না।
হুঁ, অচেনা ছবিগুলো দেখতে দেখতে বলল রবিন, টুরিস্টরা পছন্দ করবে।
আমারও তাই মনে হয়। হাসল জিনা। আচ্ছা, বলো এখন, কে কোথায় থাকবে? এ ঘরের পাশেই দুটো ঘর আছে। ওখানে থাকলে যখন খুশি এসে ছবিগুলো দেখতে পারবে। ঘর আছে দুটো, কোনটাতেই দু-জনের বেশি জায়গা হবে না। একলা কে শুতে চাও?
আমিই থাকি, কি বলো? মুসা আর রবিনের দিকে তাকাল কিশোর।
থাকো। হাত নাড়ল মুসা। আমি বাপু ভূতের ঘরের কাছে একলা থাকতে পারব না।
দুটো ঘর থেকেই দরজা দিয়ে হলঘরে ঢোকা যায়।
বাড়ির সামনের অংশ ছেড়ে দিতে হয়েছে লবি আর অফিসের জন্যে, জিনা জানাল। তাই সমস্ত বেডরুমের দরজা হলের দিকে করা। হয়েছে। আমার আর

টনির ঘর তোমাদের ঘরের কাছেই। চাচার ঘরও। সব কিছু ঠিকঠাক হলে এ ঘর মেহমানদের ছেড়ে দিয়ে চাচা চলে যাবে ওপরে।
ভিকিখালারা কোথায় থাকছে?
আপাতত দোতলায়, আঙুল তুলে মাথার ওপরের ছাত দেখাল জিনা।
ভূতটাকে কোন্ জায়গায় দেখেছেন তোমার চাচা?
এ ঘরেই। প্রথমে ভাবল চোরটোর কিছু, ধরার জন্যে দৌড় দিতে গিয়ে কার্পেটে পা বেধে খেল আছাড়।...ভূতটাকে মিলিয়ে যেতে দেখল ওই ছবিটার ভেতর... নাম-না-জানা একটা ক্যাচিনা দেখাল জিনা।
স্থির চোখে ছবিটার দিকে চেয়ে রইল কিশোর। যেন ছবির মুখোশে ঢাকা মূর্তিটা মূল্যবান তথ্য জানাবে তাকে।
কিন্তু আগের মতই রইল ছবিটা, দুর্বোধ্য। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল কিশোর। চলল, ঘর দেখাও। হাতমুখ ধুয়ে রেডি হইগে। ভিকিখালা ডাকলে...
না, অত তাড়াহুড়ো নেই। রান্না শেষ হতে সময় লাগবে। ইচ্ছে করলে ছোট্ট একটা নিদ্রাও দিয়ে নিতে পারো।
আরে না, এখন কি ঘুমায়, তাড়াতাড়ি বলল মুসা। পেট ঠাণ্ডা না করলে ঘুম আসবে না।
ছেলেদের সুটকেস আর অন্যান্য মালপত্র সব একই ঘরে রেখেছে টনি। সুটকেসের হাতলে এয়ারলাইনসের নাম ছাপা ট্যাগ লাগানো, ট্যাগের উল্টোপিঠে যাত্রীর নাম, পাসপোর্ট নম্বর।
নিজের সুটকেসটা তুলে নিয়ে এল কিশোর। ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল। সুটকেসের খোপ থেকে চাবি বের করে তালায় ঢুকিয়ে মোচড় দিল। খোলা!
তালা লাগাতে ভুলে গিয়েছিল?–নিজেকেই প্রশ্ন করল সে। রওনা হওয়ার আগে তাড়াহুড়ো করেছে, ঠিক, তবু তালা না লাগিয়ে..সুটকেস খুলে কাপড় বের করতে শুরু করল। কোটা কোথায় রেখেছিল, মনে। করার চেষ্টা করছে। ঠিকমত আছে তো সব? নাকি ঘাটাঘাটি হয়েছে?
মনে হলো ঠিকই আছে।
কিন্তু নতুন কেনা শার্টটা টান দিতেই ভেতরে কি যেন নড়ে উঠল। হাত সরিয়ে নিল ঝট করে। ভাঁজ করা শার্টের এক কোনা দুই আঙুলে আলতো করে ধরে তুলে একটা হ্যাঁঙার দিয়ে খোঁচা দিল ফুলে থাকা জায়গায়। আরও জোরে নড়ে উঠল জায়গাটা। ভেতর থেকে টুপ করে মাটিতে খসে পড়ল কি যেন।
হাঁ হয়ে গেল কিশোর। বড় বড় হয়ে গেল চোখ। বড় বাঁচা বেঁচে গেছে!
প্রায় আড়াই ইঞ্চি লম্বা এক কাঁকড়াবিছে! ভীষণ ভঙ্গিতে নাড়ছে। বাঁকানো লেজটা-ডগায় বেরিয়ে আছে মারাত্মক বিষাক্ত হুল।

বোবা হয়ে কুৎসিত জীবটার দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। কিলবিল করে এগিয়ে আসছে ওটা। হঠাৎ যেন সংবিৎ ফিরে পেল সে। পায়ে শক্ত সোলের জুতো, লাফ দিয়ে গিয়ে মাড়িয়ে ভর্তা করে ফেলল বিছেটাকে।
সুটকেসে এল কিভাবে? বিড়বিড় করল আপনমনে। রকি বীচ থেকে সঙ্গে আসেনি, শিওর।
লেজ ধরে থেঁতলানো দেহটা তুলে নিয়ে ফেলে দিল ওয়েস্টপেপার বাস্কেটে।
ভাবছে, এয়ারপোর্টে কোনভাবে ঢুকল, নাকি এখানে আসার পর রহস্যময় চিঠিটার সঙ্গে কোন সম্পর্ক আছে?
তাই যদি হয়ে থাকে, তাহলে ইচ্ছে করেই সুটকেসে ঢুকিয়ে দিয়েছে কেউ। কে ঢোকাল? সেই ড্রাইভারটা, যে অ্যাক্সিডেন্ট করতে চেয়েছিল? চিঠিটাও কি ওই ড্রাইভারই পাঠিয়েছে?
একটা ব্যাপার পরিষ্কার, কেউ একজন চাইছে না, ভূত-রহস্যের তদন্ত হোক। শুরু থেকেই সে জানে-ভিকিখালা চিঠি দেয়ার সময় থেকেই, তিন গোয়েন্দাকে দাওয়াত করে আনা হচ্ছে তদন্ত করার জন্যে। রহস্যের কিনারা হলে নিশ্চয় তার কোন অসুবিধে আছে। তাই ঠেকিয়ে রাখতে চাইছে?
কিন্তু অসুবিধেটা কি? যা-ই হোক, হুঁশিয়ার থাকতে হবে, নিজেকে বলল কিশোর। কাপড় পাল্টাতে শুরু করল।
ডিনার শেষে রান্নাঘরের লাগোয়া বৈঠকখানায় বসল ছেলেরা। জিনা আর টনিও রয়েছে সঙ্গে।
কাঁকড়াবিছের কথা শুনে দু-জনের কেউই অবাক হলো না।
এখন তো নেইই, বলল টনি। বাড়িটাতে যখন প্রথম ঢুকলাম তখন এলে বুঝতে। যেখানেই হাত দিতাম, বিছে বেরোত। মেরে সাফ করেছি। তবু, সকালবেলা না দেখে জুতোয় পা ঢুকিও না।
বাপরে, মুসা বলল। রাতে কম্বলের মধ্যে ঢুকবে না তো?
ঘরে থাকলে ঢুকতেও পারে, হাসল টনি। তবে মনে হয় নেই। গত হপ্তায় আরেকবার ঘর ঝাড়া দিয়েছি।
তাহলে কিশোরের সুটকেসে এল কোত্থেকে?
বোধহয় বাইরে থেকে।
ঠিক, আমিও একমত, আঙুল তুলল কিশোর, বাইরে থেকেই এসেছে। তবে, নিজে নিজে ঢোকেনি। ঢোকানো হয়েছে।
মানে? ভুরু কোঁচকাল টনি।
মানে সুটকেস তালা দেয়া ছিল। পরে খোলা পেয়েছি। বিছেটাকে ঢুকিয়ে রেখে তালা আটকানোর কথা মনে ছিল না বোধহয়, আর, আড়চোখে টনির দিকে

তাকাল কিশোর।
কে ঢোকাতে যাবে? কেন?
এই চিঠিটা দেখলেই কিছুটা আন্দাজ করতে পারবে, কেন ঢুকিয়েছে, এক লাইনের চিঠিটা বের করে দিল কিশোর। তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ করছে টনিকে।
হাসি হাসি মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল টনির। হু! অ্যাক্সিডেন্টও তখন ইচ্ছে করে ঘটাতে চেয়েছে।
তাই কি মনে হয় না?
জবাব দিল না টনি।
সারাদিন অনেক ধকল গেছে তিন গোয়েন্দার ওপর দিয়ে। ভ্রমণের পরিশ্রম আর উত্তেজনা চাপ দিতে আরম্ভ করেছে শরীরের ওপর। ক্লান্তি বোধ করছে ওরা। তাড়াতাড়ি গিয়ে শুয়ে পড়ার তাগিদ অনুভব করছে। তিনজনেই।
খানিকক্ষণ চুপ করে রইল সবাই। অবশেষে জিনা বলল, ভাবছি, এখানকার কয়েকজন বন্ধুকে দাওয়াত করব কাল। আজ গিয়ে ঘরেই শোও, কাল মরুভূমিতে রাত কাটাব। আগুনের পাশে। আস্ত ভেড়া রোস্ট হবে...
তাই নাকি? সোফার হাতলে চাপড় মারল মুসা। দারুণ হবে।
যদি অবশ্য কাঁকড়াবিছে না থাকে ওখানে, রবিন যোগ করল।
থাকুক, রসিকতা করল মুসা। বিছেকেই কাবাব বানিয়ে খেয়ে ফেলব।
তা অবশ্য তুমি পারো, হাসন রবিন।
জিনাও হাসল। যাও, তাগাদা দিল সে, আর বসে থেকে লাভ নেই। সকাল সকাল গিয়ে শুয়ে পড়ো।
খুশি হয়েই উঠে পড়ল তিন গোয়েন্দা।
কিন্তু প্রচণ্ড ক্লান্তি সত্ত্বেও বিছানায় শুয়ে ঘুম এল না কিশোরের। ঘরের একটিমাত্র জানালা, চাঁদের আলো এসে পড়েছে ঘরে। জানালার লাগোয়া প্যালো ভারডে গাছটা কেমন ভূতুড়ে লাগছে ফুটফুটে জ্যোৎস্নায়। জুলিয়ানের সঙ্গে আর দেখা হয়নি, কিন্তু খানিক আগে গলা শুনেছে তার। আচ্ছা, ওইটুকুন ছেলে এত্তসব গোলমাল পাকিয়েছে? নাহ, বিশ্বাস হয় না। কিন্তু ওর সঙ্গে শত্রুতা করেই বা কার কি লাভ? আগুন লাগানো, ঘোড়া চুরির দায় ছেলেটার ওপর কেন চাপাতে চাইবে?
ক্যাচিনা পেইন্টিংগুলোও অস্থির করে তুলেছে তার মনকে। সুন্দর। এ ধরনের রিসোর্টের জন্যে মানানসই। কিন্তু বড় বেশি বিষণ্ন। মন খারাপ করে দেয়। ঘরের পরিবেশই কেমন যেন বদলে দিয়েছে। ওখানে ভূত আছে বললে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছে বলতে পারবে না কিশোর। চোখ মেলে জানালার দিকে চেয়েই বুঝল, অনেক সময় পেরিয়েছে। সরে চলে গেছে। চাঁদ, জ্যোত্স আর ঘরে আসছে না এখন। কেন হঠাৎ ঘুম ভাঙল? দীর্ঘ এক মুহূর্ত চুপচাপ পড়ে রইল সে, তারপর আবার শুনল শব্দটা। ও, এ জন্যেই ভেঙেছে! ঘুমের মধ্যেও ওই শব্দ কানে ঢুকেছে। হলরুমে বিচিত্র শব্দ।

আস্তে করে উঠে বসে অভ্যাস মাফিক পা ঢুকিয়ে দিল, জুতোতে। দিয়েই চমকে উঠল, টনি না বলেছিল ভালমত না দেখে না ঢোকাতে! স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল পরক্ষণেই, না, নেই। বিছে-টিছে কিছু লাগল না পায়ে। পা টিপে টিপে এগোল দরজার দিকে। নিঃশব্দে খুলল। দু-দিকে ছড়ানো হলরুম, জানালা দিয়ে ঘরে এসে পড়েছে চাঁদের আলো। তাতে জানালার কাছে অন্ধকার কিছুটা কেটেছে বটে, কিন্তু আসবাবপত্রের আশপাশে, দেয়ালের ধারে, আর ঘরের কোণে চাপ চাপ অন্ধকার।

দেয়ালের ছায়া থেকে বেরোল ওটা। বেগুনি আলোর একটা ঘূর্ণিমত, পাক খেতে খেতে এগোচ্ছে কিশোরের দিকে। ঘরের মাঝামাঝি এসে থমকে গেল। অদ্ভুত সব রূপ নিতে লাগল। একবার। মনে হলো কোন মহিলার ছায়া, তারপর পুতুল, পরক্ষণেই আবার গাছ কিংবা ভালুক, সবশেষে হয়ে গেল আকাশের ভাসমান মেঘের মত। তবে রঙের কোন পরিবর্তন হলো না কখনওই। অদ্ভুত একটা আওয়াজ হচ্ছে, বোধহয় আজব জিনিসটাই করছে বিচিত্র গান। বিটকেলে সুর। কথা কিছুই বোঝা যায় না।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে কিশোর। কি করবে বুঝতে পারছে না। এই সময় সিঁড়িতে শোনা গেল পদশব্দ। নেমে আসছে কেউ। ক্লিক করে অন হলো সুইচ, আলো জ্বলল।

ম্লান হলো বেগুনি আলো, দেয়ালের দিকে ছুটে গিয়ে চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কি, কিশোর? জিজ্ঞেস করল ভিকি। সুইচবোর্ডের কাছে দাঁড়িয়ে আছে অবাক হয়ে।

দেখলেন না?

বেগুনি আলোর মত কি যেন চোখে পড়ল। ভালমত দেখিনি।

রান্নাঘরে চলুন না? এখানে কথা বললে অন্যরাও জেগে যাবে। জাগিয়ে লাভ নেই। ঘুমাক।

বেশ, চলো। : রান্নাঘরে ঢুকে ভিকি বলল, চা খাবে? এক ধরনের ভেষজ সুগন্ধী দিয়ে চা বানাতে শিখেছি, ইনডিয়ানরা বানায়। খেয়ে দেখো, ভাল লাগবে। যেদিন ঘুম আসতে চায় না, বানিয়ে খাই।

বানান। একটা চেয়ারে বসল কিশোর। খালা, বোধহয় ক্যাচিনা ভূতটাকেই দেখলাম।
অবাক হলো না ভিকি। যেন এটাই স্বাভাবিক, এমন ভঙ্গিতে মাথা ঝকাল। দু-কাপ চা বানিয়ে এনে রাখল টেবিলে। হাতে বানানো কয়েকটা বিস্কুট দিল একটা প্লেটে করে।
চায়ে চুমুক দিল কিশোর। বাহ্, সত্যিই তো! দারুণ সুগন্ধ।
ভূতটাকে দেখেছ তাহলে?
হ্যাঁ। আপনি দেখেছেন?
আবার মাথা ঝাঁকাল ভিকি, দেখেছি। আরও অনেকেই নাকি দেখেছে। লোকে বলে বহুদিন ধরে আছে এটা এ-বাড়িতে। একেক সময় একেক রূপে দেখা দেয়, পূর্ণিমার সময়।
ভয় পান না?
মাথা নাড়ল ভিকি। কারও কোন ক্ষতি তো করে না। ভয় পাব কেন? আমার আশঙ্কা অন্যখানে। গুজব ছড়িয়ে গেলে টুরিস্টরা আসবে না।
এ বাড়িতে আস্তানা গেড়েছে কেন বলতে পারেন?
ঘন ঘন কয়েকবার কাপে চুমুক দিল ভিকি। এ বাড়ি যে বানিয়েছে, তারই প্রেতাত্মা হয়তো ওটা। স্বাভাবিক মৃত্যু তো হয়নি বেচারার।
কেন, কি হয়েছিল?
সিঁড়ি থেকে পড়ে মরেছে।
খুলেই বলুন না।
ওর নাম ছিল ডানকান লেমিল। ভাল আর্টিস্ট ছিল। এখানকার সমস্ত, কাচিনা সে-ই এঁকেছিল। শোনা যায়, লেমিল নাকি হোপি ইনডিয়ানদের কাছ থেকে খুব মূল্যবান একটা জিনিস চুরি করেছিল, লুকিয়েছিল এনে এই বাড়িতে। ইনডিয়ানদের সর্দার এসে জিনিসটা ফেরত চাইল, দিতে রাজি হলো না লেমিল। ভয় দেখাল সর্দার, না দিলে পুড়িয়ে মারবে। কিন্তু দিল না লেমিল। সে সময় তার ছবির এক ভক্ত ছিল এ বাড়িতে। যেদিন সর্দার শাসিয়ে গেল তার পরদিন সকালে সিঁড়ির গোড়ায় মৃত পাওয়া গেল লেমিলকে। শরীরের কোথাও কোন ক্ষত নেই। তার ভক্তকেও খুঁজে পাওয়া গেল না, একেবারে গায়েব। লেমিল কিভাবে মরল সেটা এক রহস্য। কেউ বলে ইনডিয়ানদের ভয়ে হার্টফেল করে মরেছে, কেউ বলে তার ভক্তই তাকে সিঁড়ি থেকে ধাক্কা দিয়ে মেরে ফেলে রেখে পালিয়েছে। কোনটা ঠিক কে জানে! কোনটাই প্রমাণিত হয়নি।
হুঁ, তারপর?

তারপর আর কি? ভূতের গল্প চালু হলো। লেমিলের মৃত্যুর জন্যে ভূতকে দায়ী করল কেউ।
ঠাণ্ডা হয়ে আসা বাকি চা-টুকু দুই ঢোকে শেষ করে পিরিচে কাপটা নামিয়ে রাখল কিশোর। কি জাতের ভূত? ক্যাচিনা?
হতে পারে। আমরা আসার পর থেকে তো ক্যাচিনাই দেখা যাচ্ছে, অন্য কিছু না।
চুপ করে ভাবল কিশোর। আচ্ছা, অভিশাপ যে আছে, কিসের অভিশাপ?
ইনডিয়ানদের। লেমিলের মৃত্যুর জন্যে শেষ পর্যন্ত ইনডিয়ান সর্দারকে দায়ী করে বসল এখানকার কিছু র‍্যাঞ্চার। রেগে গিয়ে দেশছাড়া করে ছাড়ল সর্দারকে। পালিয়ে মেকসিকোয় চলে যেতে বাধ্য হলো সে। বিদেশ-বিভুঁইয়ে গিয়ে একা একা খুব কষ্ট পেয়ে মরেছে বেচারা। তার স্ত্রী অনেক কেঁদেছে। লেমিলকে অভিশাপ দিয়েছে।
সেজন্যেই ক্যাচিনা ভূত এসে আস্তানা গেড়েছে এখানে?
মাথা নাড়ল ভিকি। জানি না। শুধু সর্দারই নয়, আরও কিছু হোমরা চোমরা ইনডিয়ানও বিপদে পড়ে গিয়েছিল। কেউ লজ্জায় আত্মহত্যা করেছে, কেউ সর্দারের মত দেশছাড়া হয়েছে। তারাও
অভিশাপ দিয়েছে লেমিলকে।
কিন্তু শুধু এই বাড়িতেই কেন ভূতের আনাগোনা?।
কারণ এই বাড়িতেই অপঘাতে মরেছে লেমিল, এই বাড়িতেই জিনিসটা লুকিয়েছিল সে, এবং তার মৃত্যুর পরও আর ওটা খুঁজে পাওয়া যায়নি।
তার মানে, কিশোরের ভুরুজোড়া সামান্য কাছাকাছি হলো, বলতে চাইছেন, জিনিসটা এখনও এ বাড়িতেই আছে?
লোকের তো তাই বিশ্বাস, ভিকি বলল। দু-চারজন বাদে। তারা বলে ভক্ত ব্যাটাই লেমিলকে খুন করে জিনিসটা নিয়ে পালিয়েছে।
অসম্ভব না। নাকে বালিশ চাপা দিয়ে দম বন্ধ করে মারলে ক্ষত থাকে না, বলল কিশোর। তা জিনিসটা কি? কোন ধারণা আছে?
মূল্যবান কোন পাথর-টাতর হবে।
পাওয়া গেলই না, না? চিন্তিত ভঙ্গিতে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর।
না। লেমিল মারা যাওয়ার পর এই বাড়ির ভেতরে-বাইরে তন্ন তন্ন করে খুঁজছে লোকে। পায়নি।...আরেক কাপ চা দেব?
না, মাথা নাড়ল কিশোর। যাক, অনেক কিছু জানা গেল আপনার কাছে।
আমি চাই রহস্যটার একটা সমাধান হোক, যাতে রিসোর্টটা ঠিকমত চলে। মিস্টার উইলসনের কাছে অনেক দিন আছি। ভাল লোক, তার কোন ক্ষতি হোক চাই না।
বিষণ্ন শোনাল মহিলার কণ্ঠ, আর, প্লীজ, জুলিয়ানের বদনাম যদি একটু ঘোচাতে

পারো। বিশ্বাস করো, ও খুব ভাল ছেলে। ওকে এখান থেকে বের করে দিলে আমার খুব কষ্ট লাগবে। বাপ নেই ছেলেটার, এতিম, সেজন্যেই তো পরের দয়া চাইতে এসেছে… গলা ধরে এল ভিকির। ছলছল করে উঠল চোখ।
তাড়াতাড়ি হাত তুলল কিশোর। আহাহা, এত অস্থির হওয়ার কি। আছে? সাধ্যমত চেষ্টা করব আমরা।
উঠল কিশোর। শূন্য, নীরব হলরুম দিয়ে ফিরে এল আবার নিজের ঘরে।
পরদিন ঘুম ভাঙতে অনেক বেলা হলো। হাতমুখ ধুয়ে জিনসের প্যান্ট আর গাঢ় লাল ঝলমলে সিল্কের শার্ট পড়ল, এই ওয়েস্টার্ন অঞ্চলের মানানসই পোশাক। বেরোল।
পেছনের বাগানে বসে চা খাচ্ছে মুসা, রবিন আর জিনা। টেবিলে পড়ে আছে শূন্য প্লেটগুলো, নাস্তা শেষ।
আরিব্বাপ! কিশোর পাশা দ্য গানম্যান, দেখেই বলে উঠল মুসা। ভুরু নাচাল।তা, মিয়া, কোমরে পিস্তল কই?
হাসল সবাই।
মুসার পায়ের কাছে শুয়ে ছিল কুকুরটা, হাসাহাসি শুনে উঠে বসল। কৌতূহলী চোখে তাকাল কিশোরের দিকে।
আরে, বাঘাটা না? কিশোর বলল। জনির সেই শিকারী কুকুর, টাইগার।
হ্যাঁ, জিনা বলল। ভিকিখালা এমন খাওয়ানো খাওয়ায়, চুরি তো দূরের কথা, অন্য কেউ সেধে দিলেও এখন আর কিছু খেতে চায় না। ভাল হয়ে গেছে।…আমাদের খুব খিদে পেয়েছিল, থাকতে পারলাম না, খেয়ে নিয়েছি। শুনলাম, কাল অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থেকেছ-ভিকিখালা বলল-তাই আর ডাকলাম না।
ভাল করেছ, বসতে বসতে বলল কিশোর। কি ঘটেছিল, বলেছে? রাতের বেলা হলরুমের আবছা আলো-আঁধারিতে যা যা ঘটেছে এখন নিজেরই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে না সে-সব। রাতে চাঁদের আলোয় পরিবেশ ছিল এক রকম, এখন উজ্জ্বল সূর্যালোকে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম হয়ে গেছে। কড়া রোদ, কমলা ফুলে মৌমাছির গুঞ্জন, চোখ ধাঁধানো আলোয় বসে রাতের ব্যাপারটাকে স্বপ্ন মনে হচ্ছে এখন।
শুধু বলল, রবিন জানাল, রাতে নাকি হলরুমে কি দেখেছ তুমি। রান্নাঘরে বসে চা খেয়েছ, ভিকিখালার সঙ্গে অনেক আলাপ-আলোচনা করেছ।
ভূত দেখেছ নাকি? জিজ্ঞেস করল জিনা।
চারটে ডিমের ওমলেট আর বড় এক গেলাস কমলালেবুর রস নিয়ে হাজির হলো ভিকি, কিশোরের জন্যে। দিয়ে চলে গেল।

খেতে খেতে গতরাতের কথা সব জানাল কিশোর। শেষে বলল, প্রথমে ভেবেছিলাম চোর। তারপর দেখলাম ওটাকে। বিচিত্র আওয়াজ। হেঁড়ে গলায় ইনডিয়ানদের গান গাইল, কিছুই বুঝলাম না।
ইনডিয়ান গান? রবিনের চোখে বিস্ময়।
তা-ই তো মনে হলো।
তোমার সাহস আছে কিশোর, মুসা বলল। আমি হলে যেতাম। আর ভূত দেখার পর দাঁড়িয়ে থাকা তো অসম্ভব ছিল।
কি বুঝলে? জিজ্ঞেস করল জিনা।
ভিকির কাছে শোনা গল্পটা আবার শোনাল কিশোর।
মাথা নোয়াল জিনা। ক্যাচিনার অভিশাপের কথা আমিও শুনেছি। সেটা বড় কথা নয়। আসল কথা হলো, ওই ভূত তাড়াতে হবে বাড়ি থেকে। নইলে উইলসন চাচার লালবাতি জ্বলবে। তিক্ত শোনাল জিনার কণ্ঠ, গতবছর বেচে না দিয়ে ভুলই করেছে। ডাক্তার জিংম্যান কিনতে চেয়েছিল।
তাই নাকি? চিবানো থামিয়ে জিনার দিকে তাকাল কিশোর। আগে বলোনি তো! সবাই যেখানে ভূতের ভয়ে কাবু, সেখানে কিনতে চায় কোন সাহসে?
বলার মত কিছু না। বাড়িটা চায় না, শুধু খেতখামার! অনেক গরু আছে তার, আরও বাড়াতে চায়। চেয়েছিল, তবে এখন চাচা বেচতে চাইলেও ডাক্তার কিনবে কিনা সন্দেহ। আর কিনলেও অনেক কম দাম দিতে চাইবে। তার মানে, রিসোর্ট চালাতে না পারলে চাচার অবস্থা কাহিল। টুইন লেকসের সব কিছু বেচে দিয়ে এসেছে, সেই টাকা আর জমানো যা ছিল সবই খরচ করেছে এই রিসোর্টের পেছনে। বেশির ভাগ টাকাই গেছে বাড়িটা সারাতে। ওটাই যদি কেউ কিনতে না চায়, শুধু জমিনের জন্যে আর কত দাম পাবে?
ভারি পরিবেশ হালকা করার জন্যে হাসল মুসা। তোমার চাচার কিচ্ছু হবে না, দেখো। আমরা তিন গোয়েন্দা এসে পড়েছি না? পালাতে দিশে পাবে না ক্যাচিনা ভূতের বাচ্চা।
শুধু রবিন হাসল।
নীরবে খেয়ে চলেছে কিশোর। ভূত-টুতে বিশ্বাস করে না সে। কিন্তু গতরাতে যা দেখেছে, সেটাকে চোখের ভুল বলেও উড়িয়ে দিতে পারছে না।
তো, আজ সকালটা কি করে কাটাতে চাও? জিজ্ঞেস করল জিনা। মেহমানরা আসবে বিকেলে। তারপর সুপারস্টিশনে রওনা হব আমরা। ভিকিখালা আর ডিউক আঙ্কেলও সঙ্গে যাবে বলেছে।
হুম্। ভালই জমবে।...আচ্ছা, শোনো, জুলিয়ান কোথায়? ওর সঙ্গে কথা বলা দরকার।

ও তো নেই। সেই ভোরেই বেরিয়ে গেছে। আমি ঘুম থেকে ওঠার আগেই। ভেবেছিলাম, বিকেলে ওকেও সঙ্গে নেব।
শূন্য প্লেটটা ঠেলে দিয়ে গেলাস তুলে নিল কিশোর। জিনার দিকে তাকাল। কোথায় গেছে?
বলে যায়নি। ভিকিখালা বলল, সকালে উঠে পিন্টো ঘোড়াটা নিয়ে বেরিয়ে গেছে, মরুভূমিতেই বোধহয়। জন্তু-জানোয়ারের প্রতি ভীষণ আগ্রহ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেয় ওসব দেখে দেখে। আগে এসে আমাকে বলত কি কি দেখেছে... থামল জিনা। ইদানীং আর বলে না, আগুন লাগানোর পর থেকে। এড়িয়ে চলে।
কোন্ কোন্ জায়গায় আগুন লেগেছে, দেখা যাবে? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
যাবে না কেন? ওই পাহাড়টা, হাত তুলে দেখাল জিনা। ওই যে, আস্তাবল থেকে মাইলখানেক পুবে, টিলাটক্কর দেখা যাচ্ছে না পাহাড়ের ওপরে? ওখানে। স্মোক সিগন্যাল প্র্যাকটিস করছিল।
আর বাকিগুলো?
প্রথমটার আধা মাইল দক্ষিণে দুটো পাহাড়ের ঢাল নিচে একসঙ্গে মিশেছে। পাহাড়ের চূড়ায় উঠলে তারপর দেখতে পাবে। পোড়া স্যাগুয়ারো গাছ।
তারমানে দুটো জায়গায়ই হেঁটে যাওয়া যাবে? রবিন বলল।
মাথা ঝাঁকাল জিনা। আমিই নিয়ে যেতাম, কিন্তু আজ পারছি না। মেহমানরা আসবে, খাবার লাগবে। ভিকিখালাকে সাহায্য করব। টনি জীপ নিয়ে গেছে ওদের দাওয়াত করতে। নইলে সে যেতে পারত।
আমরা একাই পারব, মুসা বলল।
কিভাবে যেতে হবে ভালমত জেনে নিয়ে রওনা হলো তিন গোয়েন্দা। আস্তাবলের দিকে হাঁটতে শুরু করল। সঙ্গে নিয়েছে কুকুরটাকে। কিছুদূর এগিয়েই দেখতে পেল, মরুভূমি মোটেই মরু নয়, তাতে প্রাণের ছড়াছড়ি। দিন কয়েক আগে বৃষ্টি হয়েছে, তরতর করে বেড়ে উঠেছে লম্বা ঘাসের গুচ্ছ, সবুজ হয়েছে। ঢেউ খেলানো পাহাড়ী ঢালে জন্মে রয়েছে নানা রকম গাছ, ফুল ফুটেছে। হলুদ, লাল, নীল, সাদা ফুলের ছড়াছড়ি, আর কি তার রঙ!
ওউফ, চোখ জুড়িয়ে যায়, চলতে চলতে বলল রবিন।: মরুভূমি যে এত সুন্দর, বইয়েই পড়েছি শুধু এতদিন। পড়ে বিশ্বাস হয়নি।
বিশাল এক খরগোশ দেখে থমকে দাঁড়াল টাইগার। তাড়া করবে কিনা সিদ্ধান্ত নেয়ার আগেই দুই লাফে গিয়ে পিপের মত মোটা দুটো ব্যারেল ক্যাকটাসের আড়ালে লুকাল খরগোশটা।
ঘেউ ঘেউ করে উঠল টাইগার, তাড়া করতে চাইল। গৃলার বেল্ট টেনে ধরে ধমক দিল মুসা।

কুকুরের ডাকে চমকে গিয়ে ঝোঁপ থেকে বেরোল একটা পাখি। দৌড় দিল। ঘাসের গুচ্ছের পাশ কাটিয়ে ছুটে চলল তীব্র গতিতে।
রোড রানার, বলল রবিন।
দূরে গিয়ে থামল পাখিটা। কালো পালকে ঢাকা মাথা তুলে ফিরে তাকাল এদিকে। লম্বা কালো লেজে আঁকুনি তুলে আবার ছুটল। একটা আজব ক্যাকটাসের আড়ালে গিয়ে লুকাল। বানরের লেজের মত বাকা। উদ্ভিদটা, তাতে লাল ফুল ফুটেছে।
উড়তে পারে না ওই পাখি? জিজ্ঞেস করল মুসা।
গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে আবার ছুটল রোড রানার।
পারে। তবে দৌড়াতেই পছন্দ করে। ছোটে কি জোরে দেখছ না?
মানুষের সাড়া পেয়ে সামনের একটা ঝোঁপ থেকে আতঙ্কিত চিৎকার করে উড়াল দিল এক জোড়া কোয়েল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবার মাটিতে নামল। ঝোঁপের ভেতর থেকে বেরোল ডজনখানেক বাচ্চা, মুরগীর বাচ্চার মত দেখতে। হলদে আর বাদামী পালকের ছোট ছোট বল যেন। চিক, চিক করছে। ঘাসের বীজ খুঁটে খেতে শুরু করল। গলা তুলে সতর্ক চোখে এদিকে চেয়ে রইল মা-বাবা, বিপদ বুঝলে হুশিয়ার করবে ছানাদের।
ছুটে গিয়ে ধরার জন্যে পাগল হয়ে উঠল টাইগার। কষে এক থাপ্পড় লাগাল মুসা। চুপ! ছিলি তো চোরের শাগরেদ। ভাল হবি কোত্থেকে? আমার সঙ্গে থাকলে বাপু তেড়িবেড়ি চলবে না। কান টেনে ছিঁড়ে ফেলব।
শান্ত হলো টাইগার। পেছনের দুই পায়ের ফাঁকে ঢুকিয়ে ফেলল লেজ।
পাখিগুলো যাতে ভয় না পায়, সেজন্যে ওগুলোর অনেক দূর দিয়ে ঘুরে এগোল ওরা।
পাহাড়ের ওপরে উঠে আগুন জ্বালানোর চিহ্ন চোখে পড়ল। বেশ কিছু শুকনো ডালপালা পড়ে আছে, আধপোড়া। কয়েকটা পোড়া ম্যাচের কাঠি পাওয়া গেল আশপাশে। ডালপালাগুলোর বেশির ভাগই বালি চাপা দেয়া।
আগুন নেভানোর চেষ্টা হয়েছিল, পোড়া ডালগুলো দেখাল কিশোর।
জুলিয়ান বোধহয় বালি ঢাকা দিয়েই ভেবেছে আগুন নিভেছে। সে চলে যাওয়ার পর আবার জ্বলে উঠেছে।
নেভানোর চেষ্টা তো অন্তত করেছে, মুসা বলল, তারমানে আগুন ছড়াক, এটা ইচ্ছে ছিল না।
জ্বালিয়ে ফেলে রেখে গেলেও কিছু হত না, রবিন বলল। আশপাশে তো কিছু নেই। ধরবে কিসে? বালি তো আর জ্বলে না যে আগুন ছড়াবে।
চলো, অন্য জায়গায় যাই, হাত তুলে দক্ষিণে দেখাল কিশোর।

পাহাড়ের শিরদাঁড়া ধরে চলল ওরা। খানিক দূর এগিয়ে নিচে দেখিয়ে মুসা বলল, ওই যে। পোড়া ক্যাকটাস।
ঢাল বেয়ে নিচে নামল ওরা। ওধার থেকে উঠে গেছে পাশের পাহাড়ের আরেকটা ঢাল। খড়খড়ে রুক্ষ মাটি, পাথরের ছড়াছড়ি। এখানে-ওখানে জন্মে আছে প্রিকলি-পার ক্যাকটাস, খালি কাটা, হুকের মত কাপড়ে গেঁথে গিয়ে টেনে ধরতে চায়।
দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী পথকে তো গিরিপথ বলে, মুসা বলল, দুই ঢালের মাঝখানকে কি বলে? গিরিঢাল?
কি জানি, আনমনে মাথা চুলকাল কিশোর, মুসার কথা ঠিক কানে গেছে বলে মনে হলো না। পোড়া, মস্ত স্যাগুয়ারো ক্যাকটাস গাছটার দিকে এগোচ্ছে। তার মাথায় এখন ভাবনার তুফান।
বোধহয় শৈলশিরা, মুসার প্রশ্নের জবাবে বলল রবিন।
গাছের গোড়ায় এসে চারপাশটা ঘুরে ঘুরে দেখল কিশোর। বিড়বিড় করল, এখানে আগুন ধরিয়ে লাভটা কি? পাহাড়ের জন্যে কারও চোখে পড়বে না। সিগন্যাল দিলেই বা কি আর না দিলেই কি?
সেজন্যেই হয়তো এখানে ধরিয়েছে, অনুমান করল রবিন। দেখা যায়, এমন জায়গায় লাগিয়ে তো হেনস্তা কম হয়নি, তাই এখানে এসেছে।
মাথা ঝাঁকাল কিশোর। রবিনের কথা সমর্থন করল কিনা বোঝা গেল না। গাছের গোড়ায় পোড়া ডালপাতা খুঁজছে। কুড়িয়ে এনে জড় করে আগুন ধরানোর কোন চিহ্ন নেই। পোড়া একটা কয়লাও কোথাও পড়ে নেই, একটা ম্যাচের কাঠিও না। কোনখানে মাটিও সামান্যতম পোড়া নেই, শুধু গাছের একেবারে গোড়ায় ছাড়া। সিগন্যাল দেয়ার জন্যে ডালপালা জ্বাললে, আর সেখান থেকে এসে গাছে আগুন ধরলে, তার চিহ্ন থাকবেই। কিন্তু নেই।
দুই সহকারীর দিকে তাকাল কিশোর। কি বুঝছ?
কেউ জবাব দেয়ার আগেই বড় একটা পাথরের চাঙড়ের দিকে চেয়ে ঘড়ঘড় করে উঠল টাইগার। লম্বা লম্বা ঘাস আর শুকনো এক ধরনের ঝোঁপ জন্মে আছে পাথরটাকে ঘিরে।
কি দেখল? ভুরু কোঁচকাল রবিন।
খরগোশ-টরগোশ বোধহয়, ধমক লাগাল মুসা, এই, চুপ!
আমার ধারণা, কিশোরের প্রশ্নের জবাবে বলল রবিন, সরাসরি গাছে আগুন লাগিয়ে দেয়া হয়েছে।
কেন? মুসার জিজ্ঞাসা। একটা ক্যাকটাস গাছে আগুন লাগিয়ে কি এমন লাভ হলো কার?

কাঁধ ঝাঁকাল শুধু কিশোর, জবাব দিল না। নীরব। জোরে জোরে চিমটি কাটছে নিচের ঠোঁটে, তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে পোড়া স্যাগুয়ারোর কালো ধ্বংসাবশেষের দিকে।
ঘুরে দাঁড়াল হঠাৎ সে। চলো, আর কিছু দেখার নেই।
ভোঁতা, প্রচণ্ড শব্দ হলো, মাটির তলায় চাপা দেয়া বিস্ফোরকে বিস্ফোরণ ঘটল যেন। ঘেউ করে লাফিয়ে এসে কিশোরের গায়ে পড়ল টাইগার।
চমকে ফিরে তাকাল কিশোর। এক লাফে সরে গেল।
দুলে উঠেছে পোড়া স্যাগুয়ারোর মস্ত কাঠামো। পড়তে শুরু করল।
ধুড়ম করে পড়ল গাছটা। মুহূর্ত আগে কিশোর যেখানে ছিল ঠিক সেখানে। গোড়ায় মস্ত এক খোড়ল।
আরি, কি হলো! কাঁপছে রবিনের কণ্ঠ। কিভাবে…
টাইগার ধাক্কা না দিলে গেছিলাম, কিশোরও কাঁপছে।
একেবারে ভূতের আড্ডা! ভয়ে ভয়ে তাকাল মুসা! চলো, ভাগি।
আর কিছু করার নেই এখানে। ফিরে চলল ওরা।
র‍্যাঞ্চে এসে টনি আর জিনাকে জানাল সব।
আমারই দোষ, উনি বলল। আগেই বলা উচিত ছিল। এ রকম ঘটতে পারে ভেবে সেদিন গিয়েছিলাম কেটে ফেলতে। উইলসন আঙ্কেলের খবর শুনে তাড়াতাড়ি ফিরে এলাম, পুরোটা আর কাটা হয়নি। ভেঙে পড়বেই তো।
তোমার দোষ নেই, টনিকে আশ্বস্ত করল কিশোর। সেজন্যে পড়েনি ওটা।
তাহলে…? থমকে গেল মুসা।
গাছ পড়ার আগে ধুপ করে যে শব্দটা হয়েছিল, নিশ্চয় শুনেছ। বোমা পুঁতে রাখা হয়েছিল গাছের গোড়ায়। পাথরের চাঙড়ের কাছে ঝোঁপের মধ্যে লুকিয়ে ছিল লোকটা। ওর গায়ের গন্ধ পেয়েই তখন উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল টাইগার। সবার মুখের দিকেই তাকাল এক এক করে। বোমা ফাটানো হয়েছে ইলেকট্রনিক ব্যবস্থায়, রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে।
জিনার চোখে শঙ্কা। সেটা গোপন করার জন্যে অন্যদিকে চেয়ে বলল, যা হবার হয়েছে। করতে তো আর কিছু পারেনি তোমার। জোর করে হাসল। যাও, পুলে গিয়ে খানিকক্ষণ দাপাদাপি করে এসো। খেয়েদেয়ে বিশ্রাম নাও। রাতে জাগতে হবে।
মন্দ বলনি, সাঁতারের কথায় হাসি ফুটল মুসার মুখে।
বিকেলে ঘুম থেকে উঠে হাতমুখ ধুয়ে, কাপড় পরে ঘর থেকে বেরোল তিন গোয়েন্দা। মেহমানরা এসেছে, অপেক্ষা করছে। জিনার চেয়ে বছর দুয়েকের বড় একটা মেয়ে, নাম শীলা। অন্য চারজন ছেলে, সতেরো থেকে বিশের মধ্যে বয়েস।

পরিচয়ের পালা শেষ হলো।
ঘোড়ায় জিন পরিয়ে তৈরি রেখেছে টনি। আস্তাবলে গিয়ে যার যার ঘোড়া বেছে নিল সবাই।
টাইগারেরও সঙ্গে যাওয়ার খুব ইচ্ছে, লেজ নাড়ছে, ঘেউ ঘেউ করছে। শেকলে বাঁধা, সামনে প্রচুর খাবার থাকা সত্ত্বেও ছুঁয়ে দেখছে না। তাকে নিতে রাজি নয় ভিকি, তাই এই ব্যবস্থা করে রেখে গেছে।
রওনা হলো দলটা।
মুসার পাশে চলছে টনি। কিশোর চলে এল বিল হিগিনসের পাশে। হাসিখুশি তরুণ, মাথায় কালো চুল। অপরিচিত মানুষকে সহজে আপন করে নিতে জানে। চলতে চলতে কিশোরকে আশপাশে অনেক কিছু দেখাল সে, মরুভূমি আর পর্বত সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য জানাল।
লস্ট ডাচম্যান মাইনে গিয়েছ কখনও? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
গেছি, হাসল বিল। সাত-আট বছর বয়েসে, বাবার সঙ্গে। সোনাও পেয়েছি। না না, চমকে ওঠার কিছু নেই। খুব সামান্যই পেয়েছি। মাত্র দু-চার আউন্স।
ডাচম্যান মাইনে!
না, মাইনে পেয়েছি বলা যাবে না। সোনার ছোটখাটো দু-চারটা পকেট আর শিরা ওখানে আছে এখনও। শীতকালে বৃষ্টি হলে বন্যার পানিতে ধুয়ে চলে যায় মাটি। বেরিয়ে পড়ে একআধটা পকেট কিংবা শিরা। মাঝেসাঝে কিছু সোনা পাওয়া যায় তখন, খুবই সামান্য। এমন কিছু না।
স্বর্ণের আলোচনা শুনে পেছন থেকে এগিয়ে এল রবিন। তার পাশাপাশি এল আরেকটা ছেলে, নাম পিটার। কিছুটা লাজুক স্বভাবের। হেসে বলল, থাকো কিছুদিন এখানে, একদিন নিয়ে যাব খনি দেখাতে। চাই কি, ভাগ্য ভাল হলে সোনার তাল কিংবা নুড়ি পেয়েও যেতে পারো।
জিনাও এগিয়ে এল। সোনার লোভ না দেখিয়ে কিশোরকে রহস্যের লোভ দেখাও, হাসল সে। বলো না, লস্ট ডাচম্যান মাইনটা খুঁজে বের করে দিতে।
সে কি! ওটা এখনও হারানোই আছে? বিলের দিকে তাকাল। কিশোর। এই না বললে, এখানকার সবাই গেছে?
তা তো গেছেই, শীলাও হাসল। খনিটাতে যাওয়ার অন্তত পঁচিশটা ম্যাপ দিতে পারি তোমাকে, পঁচিশ রকমের, এবং সবগুলোই আসল। যেটা ধরেই যাও, খনি পাবে। তবে কেউই সঠিক বলতে পারে
আসল ডাচম্যান মাইন কোটা। এমনও হতে পারে, ওই পঁচিশটার কোনটাই মূল খনিটা নয়।
শীলা ঠিকই বলেছে, বলল আরেক তরুণ, কেন ফ্লেরেট।

হুঁ, রহস্যেরও খনি দেখছি এই এলাকা নিচের ঠোঁটে একবার চিমটি কাটল কিশোর। হাসল, কোনটা ছেড়ে কোনটার সমাধান করি?
এমনিতেই খুব জটিল একটা রয়েছে হাতে..
ভূতের রহস্য? বিল জিজ্ঞেস করল।
হ্যাঁ।
ও, তোমাদের বলা হয়নি, জিনা, বলল, কিশোর কাল রাতে ভূতটাকে দেখেছে।
রুক্ষ উঁচুনিচু পাহাড়ী পথে চলতে চলতে জমে উঠল ভূতের গল্প। রাস্তা ভাল না, কিন্তু ঘোড়াটার কারণে চলতে তেমন অসুবিধে হচ্ছে না কিশোরের। শান্ত একটা মাদী ঘোড়ায় চেপেছে সে। তবু, কয়েকটা পাহাড় ডিঙিয়ে আরেকটা পাহাড়ের ওপর থেকে নিচে যখন একটা উপত্যকা দেখতে পেল-গাছপালায় ঘেরা, ফুলে ছাওয়া, পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে ঝর্না, হাঁপ ছেড়ে যেন বাঁচল।
জায়গাটাকে উপত্যকা না বলে চওড়া একটা গিরিপথ বলাই ভাল। দুই পাশেই উঁচু পাহাড়। গিরিপথের এক মুখের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। র‍্যাঞ্চের জীপ। রান্না চড়ানো হয়ে গেছে। বাতাসে ইতিমধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে খাবারের সুবাস।
নিচে নেমে ঘোড়া থেকে নামল অশ্বারোহীরা, এগিয়ে গেল। আগুন জ্বেলে রান্না বসিয়েছে ভিকি, তাকে সাহায্য করছেন তার স্বামী স্কুলশিক্ষক ডিউক। বলিষ্ঠদেহী লোক, সুস্বাস্থ্যের কারণে একটু বেঁটে দেখায়, ইনডিয়ানদের মত কুচকুচে কালো চোখ।
আশপাশে কোথাও জুলিয়ানকে দেতে পেল না কিশোর। সে কোথায়, ভিকিখালাকে জিজ্ঞেস করতে যাবে, এই সময় গাছের ফাঁকে দেখল সাদা-কালোর ঝিলিক। বন থেকে বেরোল পিন্টো ঘোড়াটা, তাতে বসে আছে জুলিয়ান। ছেলেটাকে দেখে অস্বস্তি দূর হলো স্বামী-স্ত্রী দু-জনেরই।
এক জায়গায় বাধা হয়েছে সবগুলো ঘোড়া, জুলিয়ানও পিন্টোটা নিয়ে গেল ওখানে। কিশোর এগোল সেদিকে।
জুলিয়ানের সঙ্গে সহজ হতে সময় লাগল কিশোরের। খুবই লাজুক স্বভাবের ছেলে। দশটা প্রশ্ন করলে একটার জবাব দেয়।
কিন্তু তার ঘোড়াটার কথা তুলতেই মুখর হয়ে উঠল সে।
ও আমার, গর্বের সঙ্গে বলল জুলিয়ান, এক্কেবারে আমার। আর কারও না। উইলসন আঙ্কেলের কাছে একটা ঘোড়া চেয়েছিলাম। দিয়ে দিল। খুব সুন্দর।
চড়তেও পারো ভাল, বলল কিশোর। কে শিখিয়েছে? উইলসন আঙ্কেল?
হাতেখড়ি দিয়েছে। বাকিটা শিখিয়েছে ডিউক আঙ্কেল আর টনিভাইয়া। ওরা বলে, আমি নাকি দেখতে একেবারে ইনডিয়ানদের মত।

নানা রকম প্রশ্ন করে জুলিয়ানকে কথা বলিয়ে নিল কিশোর। তথ্য জোগাড়ের চেষ্টা করছে। সহজ হয়ে এসেছে জুলিয়ান, প্রশ্ন করলেই এখন জবাব দেয়। মিথ্যে বলছে বলে মনে হলো না, আর যদি বলেই থাকে, তাহলে মানতে হবে মস্ত অভিনেতা সে।

জন্তু-জানোয়ারের কথা উঠলে সবচেয়ে বেশি খুশি হচ্ছে জুলিয়ান। হরিণ আর শুয়োর গোষ্ঠীর প্রাণী হ্যাঁভেলিনার কথা বলতে গিয়ে চকচক করে উঠল বড় বড় চোখ। পর্বতের ভেতরে, ঝর্নার মাথায় খাড়ির ধারে, মরুভূমিতে নাকি প্রায়ই দেখে ওসব জানোয়ার।

বড় হয়ে ওসব শিকার করব আমি, বলল জুলিয়ান। উইলসন আঙ্কেল বলে, আমার বয়েসেই নাকি তীর দিয়ে হরিণ মেরেছিল সে। তীর-ধনুক আমারও আছে, কিন্তু নিশানা ঠিক না। একদিকে মারলে আরেকদিকে চলে যায়।

আঙ্কেল খুব আদর করেন তোমাকে, না?

হ্যাঁ, অনেক।

সেজন্যেই তো বলি, চুলার কাছ থেকে বললেন শিক্ষক

আঙ্কেলকে বেশি জ্বালিয়ো না। আরেকটা ব্যাপারে সাবধান করব, খবরদার, হ্যাঁভেলিনার ধারে-কাছেও যেয়ো না। লম্বা লম্বা দাঁত, যা ধার। পেট চিরে নাড়ি-ভুড়ি বের করে দেবে।

আরে, দূর, আঙ্কেল যে কি বলো। তুমি একটা আস্ত বোকা। আমি ঘোড়া থেকে নামব নাকি? পেটের নাগাল পাবে কোথায়?

জুলিয়ানের সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগছে কিশোরের, বকবক করে চলল।

খাবার তৈরি, ডাকল ভিকি। এই, তোমরা সবাই এসো।

খাবারের স্বাদ এত ভাল খুব কমই লেগেছে তিন গোয়েন্দার কাছে। মোটাতাজা কচি একটা আস্ত ভেড়ার কাবাব, ঠ্যাং ওপরে, শিকে গাঁথা অবস্থায় ঝুলছে আগুনের ওপর। মাংস কেটে প্লেটে নিয়ে তার ওপর ঢেলে দেয়া হয়েছে টমেটোর সস। সেই সঙ্গে আছে শিম, দু-ভাবে রান্না হয়েছে। আগুনের ওপর তন্দুরী রুটির মত সেঁকা, আর মেকসিকান পদ্ধতিতে চর্বি দিয়ে ভাজা। তাতে মিশিয়ে দেয়া হয়েছে পেঁয়াজ আর পনিরের কুচি। বাঁধাকপি আর আলুও আছে। মদের বালাই নেই, তার বদলে বরফ মেশানো পরিষ্কার ঠাণ্ডা পানি। সব শেষে দেয়া হবে ঘরে বানানো অ্যাভোকাডোর জেলি, তাজা কমলা এবং আঙুর।

কেমন লাগছে? ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল জিনা।

এর নাম যদি ডায়েট কন্ট্রোল হয়, সারা জীবন করতে রাজি আছি আমি, চিবাতে চিবাতে বলল মুসা।

ডায়েট কন্ট্রোল কে বলল তোমাকে? ওপাশ থেকে হাসল ভিকি। এ তো পিকনিক।

তাহলে সারাজীবন পিকনিকই করে যাব।
মুসার কথায় না হেসে পারল না কেউ।
প্রচুর হই-হুল্লোড় আর হাসি-ঠাট্টার মাঝে শেষ হলো খাওয়া।
ঘাসের ওপর চিত হয়ে শুয়ে পড়ল মুসা।
টনি আর তার বন্ধুরা গেল শুকনো কাঠ-কুটো জোগাড় করার জন্যে।
পাহাড়ী অঞ্চল, তাড়াতাড়ি ডুবে গেল সূর্য। সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার এসে যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল। অগ্নিকুণ্ড তৈরিই আছে, তাতে শুকনো লাকড়ি ফেলতেই দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন। চারপাশে গোল হয়ে বসল সবাই।
জীপ থেকে গিটার বের করে আনল টনি, বাজাতে শুরু করল। স্বপ্নিল চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে শীলা। ব্যাপারটা তিন গোয়েন্দার নজর এড়াল না। কিশোরের দিকে চেয়ে মুচকি হেসে চোখ টিপল মুসা।
বাজনার তালে তালে মাথা দোলাচ্ছে সবাই। গান শুরু করল জিনা। তার সঙ্গে গলা মেলাল শীলা আর বিল। ডিউক আর ভিকিও বাদ রইল না। রবিন শুরু করতেই তার সঙ্গে যোগ দিল মুসা।
গানটান আসে না কিশোরের, গলা মোটেই ভাল না। শুয়ে পড়ল। সে, আকাশের দিকে চোখ। তারা ঝিলমিল করছে, নির্মেঘ রাতে অনেক বড় দেখাচ্ছে তারাগুলোকে। এত কাছে লাগছে, মনে হয় হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে। এমন সুন্দর রাত খুব কমই আসে মানুষের জীবনে, ভাবল সে।
চাঁদ উঠলে রওনা হব আমরা, গানের ফাঁকে বলল টনি।
যে-পথে এসেছি সে-পথে? দু-হাত নাড়ল মুসা। তাহলে, বাবা, আমি নেই। অন্ধকারে খাদে পড়ে কোমর ভাঙতে পারব না।
না, অন্য পথে যাব, মুসার শঙ্কা দূর করল টনি। সহজ পথ।
গান-বাজনা চলছে। তল্পিতল্পা গুছিয়ে নিচ্ছে ভিকি আর তার স্বামী। জীপে তুলছে।
চাঁদ উঁকি দিল পাহাড়ের মাথায়। উঠে বসল কিশোর। এতক্ষণে খেয়াল করল, জুলিয়ান নেই। তার ঘোড়াটাও নেই। কোন্ ফাঁকে চলে গেছে।
জীপে করে রওনা হয়ে গেল স্বামী-স্ত্রী।
ছেলেমেয়েরা ঘোড়ায় চেপে চলল। র‍্যাঞ্চে ফিরে চলেছে। দ্রুত ঠাণ্ডা হচ্ছে রাতের বাতাস।
জ্যাকেট এনে ভালই করেছি, জিনে বাঁধা জ্যাকেটটা খুলে নিতে নিতে বলল রবিন।
টনি তো বললই তখন, রাতে খুব ঠাণ্ডা পড়বে, কিশোর বলল।

পাশাপাশি চলেছে তিন গোয়েন্দা, তাদের পাশে জিনা। বলল, রাতে ভীষণ ঠাণ্ডা পড়ে মরুভূমিতে। এমন, কি গরমের দিনেও শীতকালের মত ঠাণ্ডা।দিনে আবার দোজখের আগুন জ্বলে।
আর বিশেষ কোন কথা হলো না। শুকনো একটা নদীর কূল ধরে রুক্ষ পাহাড়ের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে দলটা।
গভীর চিন্তায় নিমগ্ন কিশোর। ক্যাচিনা ভূতের কথা ভাবছে, জুলিয়ানের রহস্যময় আচরণের কথা ভাবছে, এরই ফাঁকে ফাঁকে মনে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে হারানো সোনার খনির কথা, দ্য লস্ট ডাচম্যান মাইন। ঘোড়াটা যে ধীরে চলছে, খেয়াল করছে না। পেছনে পড়ল ঘোড়া, পথ থেকে সরে এল। পাহাড়ের ঢালে জন্মে থাকা রসাল সবুজ ঘাসের দিকে নজর।
হঠাৎ শোনা গেল বিচিত্র খড়খড় শব্দ। চমকে উঠে ঘুরে গেল ঘোড়া, আরেকটু হলেই পিঠ থেকে কিশোরকে ফেলে দিয়েছিল। লাগামের দুই মাথার একটা ছুটে গেল তার হাত থেকে, আরেকটা আঁকড়ে ধরে, দুই হাঁটু ঘোড়ার পেটে চেপে কুঁজো হয়ে রইল সে।
আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে গেছে ঘোড়াটা, কোন্‌দিকে যাচ্ছে হুঁশ নেই। হাজার চেষ্টা করেও তাকে পথে আনতে পারল না কিশোর।
পাহাড়ে উঠে পড়েছে ঘোড়া, ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল আরেক পাশে। নামছে না বলে পড়ছে বলাই ঠিক। আলগা পাথরের ছড়াছড়ি, পা আটকাতে পারছে না, পিছলে যাচ্ছে দ্রুত। নিচে খাদ। অন্ধকার। কতখানি গভীর, বোঝা যায় না।
আতঙ্কিত হয়ে রাশ, ছেড়ে দিয়ে জিনের শিং আঁকড়ে ধরল কিশোর। ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়লে এখন হাড়গোড় আর আস্ত থাকবে না। ভয়ে তাকাতে পারল না নিচের দিকে।
কিছুতেই পা আটকাতে পারছে না ঘোড়াটা। পিছলে পড়ছে, সেই সঙ্গে ঝুরঝুর করে পড়ছে আলগা পাথর আর বালি। পেছনে চেঁচামেচি শোনা যাচ্ছে। কিন্তু এই মুহূর্তে কোন সাহায্যই করতে পারবে না ওরা। বাঁচামরা নির্ভর করছে এখন ঘোড়ার পায়ের ওপর, কোনমতে যদি পাথরে বা মাটিতে খুর আটকায়, তাহলেই শুধু বাঁচার আশা আছে।
প্রচণ্ড ঝাঁকুনি লাগল। হাত ছুটলে ঘোড়ার মাথার ওপর দিয়ে উড়ে চলে যেত কিশোর।
থেমে গেল ঘোড়া।
জিনের শিং চেপে ধরে রেখে আস্তে মাথা তুলল কিশোর। নাহ্, থেমেছে। খাদে নেমে পড়েছে ওরা। গভীরতা একেবারেই কম খাদটার, এ যাত্রা প্রাণে বাঁচল তাই।

রাশ ধরল আবার কিশোর। ঘোড়াটার মতই ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাস ছাড়ছে। থরথর করে কাঁপছে সারা শরীর। কাঁপছে ঘোড়াটাও।
কিশোর, কিশোর? খাদের কিনার থেকে জিনার ডাক শোনা গেল। তুমি ভাল আছ?
আছি! কম্পিত কণ্ঠে জবাব দিল কিশোর। নেমে পড়ল ঘোড়া থেকে। সামনের একটা পা ঝাড়ছে ওটা। চেঁচিয়ে বলল সে, ঘোড়াটাকে দেখা দরকার। পায়ে আঘাত লেগেছে মনে হয়।
খাদের ঢালু পাড় বেয়ে নেমে এল সবাই। টর্চ জ্বালল রবিন। আরও দুটো টর্চ জ্বলে উঠল। ঘোড়াটার দিকে ছুটে এল টনি। পা পরীক্ষা করতে বসল।
কি হয়েছিল? জিনা জিজ্ঞেস করল।
র্যাটলস্নেক, জানাল কিশোর। চমকে ভয় পেয়ে ঘোড়াটা দিল দৌড়। থামাতে পারলাম না। টনির দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, কি মনে হয়? সাপে কেটেছে?
পায়ে হাত বোলাল টনি। দাগটাগ তো দেখছি না। হাঁটু গেড়ে পড়ে ছিল। আর এই যে, সামান্য চামড়া ছুলেছে। অন্য কোন জখম নেই।
কিন্তু ওটায় আর চড়া যাবে না, জিনা বলল। কারও সঙ্গে ডাবল রাইড করতে হবে।
অসুবিধে নেই, মুসা বলল। আমার সঙ্গেই যেতে পারবে ও।
বিল এগিয়ে এল। সাপটা ছিল কোথায়?
দেখিনি, মাথা নাড়ল কিশোর। খড়খড় শুনলাম।
মনে হলো উড়ে এসে পড়ল ঘোড়ার কাছে।
উড়ে! জিভ টাকরায় ঠেকিয়ে বিচিত্র শব্দ করল বিল, মাথা নাড়ল, নাহ, মানতে পারছি না। মানুষ আর ঘোড়া দেখলে সাপ বরং সরে যায়। একেবারে পায়ের তলায় না পড়লে কামড়ায় না। ওড়ার তো প্রশ্নই ওঠে না, কারণ ডানা নেই, লাফিয়ে এসে পড়তে পারে বড়জোর। ভুল দেখোনি তো? ঘোড়ার পায়ের নিচে পড়েছে আসলে, তাই না?
না।
দেখি, কেউ একটা টর্চ দাও, হাত বাড়াল বিল। আর আমার ঘোড়াটা ধরো। কোথায় সাপ, দেখে আসি।
কোমরের বেল্টে ঝোলানো টর্চটা খুলে দিল মুসা।
সাবধান, বিল, মুখ ফিরিয়ে বলল টনি। দেখেশুনে যেয়ো। মারা পড়ো না।
জবাব দিল না বিল, হাঁটতে শুরু করেছে।
ঘোড়ার পা ভালমত দেখে উঠে দাঁড়াল টনি! না, তেমন খারাপ কিছু না। বেঁচে গেছে।

তবে ভয় পেয়েছে খুব, জিনা বলল, দেখছ না, এখনও কেমন করছে? চোখ থেকে ভয় যায়নি।
অপেক্ষা করছে সবাই। সাপের গল্প শুরু করল একজন, আরেকজন যোগ দিল তার সঙ্গে, দেখতে দেখতে জমে উঠল গল্প। র‍্যাটলস্নেকের সামনে পড়েনি, এমন একজনও নেই ওখানে। সবারই কোন না কোন অভিজ্ঞতা আছে। কোনটার চেয়ে কোনটা কম রোমাঞ্চকর নয়।
বিল ফিরে এল।
কি দেখলে? তিন-চারজনে একসঙ্গে প্রশ্ন করল।
এই যে তোমার র‍্যাটলস্নেক, কিশোরের সামনে হাতের মুঠো খুলল বিল। সামান্য নড়াচড়ায়ই খড়খড় করে উঠল জিনিসটা। জোরে নিঃশ্বাস ফেলে পিছিয়ে গেল জখমী ঘোড়াটা, মাথা ঝাড়া দিয়ে টনির হাত থেকে লাগাম ছুটিয়ে পালানোর চেষ্টা করল।
কি এটা? এগিয়ে এল মুসা। এক হাতে ধরে রেখেছে ঘোড়ার লাগাম।
রবিন আর বিল, দু-জনের হাতের টর্চের আলোই পড়ল জিনিসটার। ওপর।
র্যাটলস্নেকের লেজ, জবাব দিল বিল। বেশ বড় ছিল সাপটা। মারার পর কেটে নেয়া হয়েছে এটা। টুরিস্ট স্যুভনির। পথের ওপর পড়ে ছিল।
কিন্তু...? কথাটা শেষ না করেই ঝট করে কিশোরের দিকে ফিরল জিনা, বড় বড় হয়ে গেছে চোখ। ঘোড়ার ওপর উড়ে এসে পড়েছে?
মাথা ঝাঁকাল কিশোর।
ছুঁড়ে দিয়েছে কেউ? আবছা অন্ধকার থেকে বলল টনি, চোখ দেখা গেল না তার।
কিশোর, জিনার কণ্ঠে অস্বস্তি, বুঝতে পেরেছ কি বিপদ থেকে বেঁচ্ছে? ভাগ্য ভাল, খাদটা গভীর নয়। আশপাশে গভীর খাদও আছে, ওগুলোতে পড়লে...
পড়িনি যখন, আর বলে কি লাভ? জিনাকে থামিয়ে দিল কিশোর। আমি পুরোপুরি ভাল আছি, ঘোড়াটার কেবল সামান্য ছুলেছে। এই তো, ব্যস। উপস্থিত সবাইকে সব কথা জানাতে চায় না সে, তাই আর ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করল না। কিন্তু নিজেকে প্রশ্ন করল, তাকে সরিয়ে দেয়ার আরেকটা চেষ্টা চালানো হলো। কে সেই লোক, যে চায় না রহস্যের সমাধান হোক?
জিনা, মুসা আর রবিনের মনেও একই প্রশ্ন।
সওয়ারী নিতে পারবে জখমী ঘোড়াটা, গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে শান্ত করে টনি চাপল ওটাতে। তার ঘোড়াটা দিল কিশোরকে। ধীরে ধীরে শুকনো নদীর ধার ধরে আবার চলল কাফেলা। তিন গোয়েন্দাকে সরিয়ে মাঝখানে রাখা হলো, যাতে আর কোনরকম বিপদ ঘটতে না পারে।

র‍্যাঞ্চে ফিরে গুডনাইট জানিয়ে চলে গেল মেহমানরা। জিনা আর টনি আস্তাবলে রাখতে গেল ঘোড়াগুলোকে।
হলরুমে ঢুকল তিন গোয়েন্দা। নীরবে বসে রইল অনেকক্ষণ। নিচের ঠোঁটে ঘন ঘন চিমটি কাটছে কিশোর। এখন তাকে কোন কথা জিজ্ঞেস করলেও ঠিক মত জবাব পাওয়া যাবে না।
কিন্তু অবশেষে আর থাকতে না পেরে জিজ্ঞেস করে ফেলল মুসা, ইচ্ছে করেই ছুঁড়ে দেয়া হয়েছে, তাই না, কিশোর?
উঁ!..হ্যাঁ। পাহাড়ের চূড়ায় ছিল লোকটা। আমি যখন পিছিয়ে পড়লাম, দল থেকে আলাদা হয়ে গেলাম, তখন. ছুঁড়েছে। এর অর্থ পরিষ্কার।
ক্যাচিনা ভূতের কাজ নয় তো?
দূর! হাত নাড়ল রবিন, যেন থাবা মারল বাতাসে। এখনও ভূতটুতের ওপর থেকে বিশ্বাস গেল না তোমার…
থাকে তো অনেক সময়… মিনমিন করল মুসা।
মুচকি হাসল কিশোর। ভূত যদি হয়েই থাকে, এই ক্যাচিনাটা ভাল জাতের। কাল রাতে খালি একটু নাচ দেখিয়েছে, গান শুনিয়েছে। ঘাড় মটকাতে আসা তো দূরের কথা, ভয় পাওয়ানোরও চেষ্টা করেনি।
ঠিকই বলেছ, পেছনের দরজার কাছ থেকে বলে উঠল জিনা, ফিরে এসেছে। আমি আর টনিও তাই বলছিলাম।
তোমাদের কি ধারণা? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
ভূতটা ভাল, টনি বলল, কিন্তু মানুষটা খারাপ, যে তোমাকে খুন করতে চায়। বাঁচতে চাইলে তোমার তদন্ত এবার বন্ধ করো।
বন্ধ করব কি, শুরুই তো করিনি এখনও।
হ্যাঁ, কিশোর, টনি ঠিকই বলেছে, জিনা বলল। আমার ভাল লাগছে না এসব। চিঠিটাকে গুরুত্ব দাওনি, দাওনি। কিন্তু অ্যাক্সিডেন্টের চেষ্টার পর পরই থেমে যাওয়া উচিত ছিল। তারপর বিছেটা বেরোনোর পর আমাদেরই বাধা দেয়া উচিত ছিল তোমাকে। তারপর পড়ল পোড়া গাছ, আর আজ তো একটুর জন্যে বেঁচে এলে। অনেক হয়েছে, আর এগোতে দেব না। বেড়াতে এসেছ, বেড়াও, চুটিয়ে আনন্দ করো। রহস্য-টহস্য বাদ। ছুটি শেষ হলে একসঙ্গেই ফিরে যাব আমরা রকি। বীচে।
হ্যাঁ, জিনার কথার পিঠে বলল টনি, বাদ দাও ওসব তদন্ত ফদন্ত। রিসোর্টের যা হবার হবে। তুমি ভাল থাকো।
ভুল আমারই হয়েছে, শান্তকণ্ঠে বলল কিশোর। গোয়েন্দাগিরি করতে এসেছি, ঝুঁকি তো থাকবেই। আরও সাবধান হওয়া উচিত ছিল আমার। তা না করে

একেবারে হাত-পা ছড়িয়ে গা ঢেলে দিয়ে বসে আছি। বিপদে পড়ব না তো কি হবে? ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেলে এই কাজই ছেড়ে দিতে হবে।
এই না হলে পুরুষ, তর্জনী নাচাল মুসা। মরব, সে-ও ভাল, কিন্তু গোয়েন্দাগিরি নেহি ছোড়েঙ্গা...
মুসার কথায় কান দিল না কিশোর, জিনা আর টনির দিকে চেয়ে বলল, তারমানে, বোঝা যাচ্ছে ঠিক পথেই এগোচ্ছি আমি। নইলে এত ভয় কেন? আমাকে সরাতে চায় কেন?
ঠোঁট বাঁকিয়ে, ভুরু নাচিয়ে, হাত নেড়ে বিচিত্র ভঙ্গি করল টনি। তারপর আর কিছু না বলে চলে গেল।
ভিকির তৈরি গরম চকলেট ড্রিংক খেয়ে অস্বস্তি অনেকখানি দূর হয়ে গেল কিশোরের। নিজের ঘরে এসে কাপড়-চোপড় ছেড়ে শুয়ে উঠে বসল লাগল। শব্দওল আর সঙ্গে সঙ্গেই গতরাতের সেই পড়ল। কিন্তু ঘুম এল না। মনে নানা ভাবনা, খচখচ করছে কয়েকটা প্রশ্ন। এপাশ-ওপাশ গড়াগড়ি করল কিছুক্ষণ, শেষে ধ্যাত্তোরি বলে উঠে পড়ল। বাথরুমে ঢুকে শাওয়ারের ঠাণ্ডা পানির তলায় ভিজল পুরো দশ মিনিট। গা মুছে নাইট ড্রেস পরে আবার এসে শুল বিছানায়। গায়ের ওপর কম্বল টেনে নিল।
কয়েক ঘণ্টা পর ভেঙে গেল ঘুম। কানে আসছে গতরাতের সেই অদ্ভুত কণ্ঠের দুর্বোধ্য গান। আজ আর সঙ্গে সঙ্গেই উঠল না, চুপচাপ শুয়ে গান শুনতে লাগল। শব্দগুলো বোঝার চেষ্টা করল। একটাও বুঝল না। উঠে বসল। খালি পায়েই নিঃশব্দে এগোল দরজার দিকে।
আগের দিনের জায়গায়ই ভূটাকে দেখা গেল। কিশোর অনুমান করল, ওটা মেঘ-ক্যাচিনা। কিংবা বলা যায় ধোয়া-ক্যাচিনা, রঙিন।
একই জায়গায় ভাসল কিছুক্ষণ ক্যাচিনাটা, তারপর ভেসে ভেসে এগোল দেয়ালের দিকে। আগের দিন যেখানে মিলিয়েছিল, ঠিক সেখানে পৌঁছেই অদৃশ্য হয়ে গেল। আজ ভালমত খেয়াল রাখল কিশোর-ঠিক কোথায় মিলায় ওটা।
সুইচ টিপে আলো জ্বালল। এগোল পায়ে পায়ে। বেশ বড় একটা মেঘ-ক্যাচিনা-র কাছে মিলিয়েছে ভূতটা।
আরও কাছে থেকে ছবিটাকে দেখল সে। বোঝার চেষ্টা করল। কোথাও খুঁত, কিংবা চোখে লাগে এমন কিছু দেখতে পেল না। টর্চ আর ম্যাগনিফাইং গ্লাসের সাহায্যে খুঁটিয়ে দেখলে কিছু পাওয়া যেতে পারে ভেবে, নিজের ঘরে ফিরে এল কিশোর।
হঠাৎ শোনা গেল জিনার উত্তেজিত চিত্তার, আগুন! আগুন! বাংলোয় আগুন লেগেছে!

পাজামা খোলার সময় নেই, তাড়াহুড়ো করে তার ওপরই প্যান্টি পরল কিশোর। টান দিয়ে আলনা থেকে একটা সোয়েটার নিয়ে তাতে মাথা গলাল। জুতো পরে দৌড়ে বেরোল ঘর থেকে। রবিন আর মুসাও হলে বেরিয়ে এসেছে।
কি-ক্কি হয়েছে? কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল মুসা।
চলল, দেখি, বলেই পেছনের দরজার দিকে ছুটল কিশোর।
বাইরে কনকনে ঠাণ্ডা।
থমকে দাঁড়াল তিন গোয়েন্দা।
বাড়ির সবচেয়ে কাছের বাংলোটায় আগুন লেগেছে। দাউদাউ করে জ্বলছে ছোট্ট বাড়িটা। বাগানের দুটো হোস পাইপ দিয়ে। একনাগাড়ে পানি ছিটিয়ে চলেছে টনি আর, ডিউক। কিন্তু কোন কাজই। হচ্ছে না।
দ্রুত এপাশ-ওপাশ তাকাল কিশোর। আগুনের গর্জন ছাপিয়ে · চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল, দমকলকে ফোন করা হয়েছে?
করেছি, জিনা বলল। আস্তাবলের দিক থেকে ছুটে এসেছে। তার। পেছনে ভিকি। দু-জনের হাতে ঘোড়ার দানা রাখার চটের বস্তা। আসছে। ততক্ষণে আমরা যা পারি করি।
হাত লাগাল তিন গোয়েন্দা। বস্তাগুলো নিয়ে গিয়ে সুইমিং পুলের পানিতে চুবিয়ে আনল। আগুনের শিখার ওপর ছুঁড়ে ফেলতে লাগল এক এক করে। আরও বস্তা আনতে ছুটল জিনা আর ভিকি।
মোটেও দমছে না আগুন। দ্রুত বাড়ছে, চোখের পলকে ছড়িয়ে যাচ্ছে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়।
বাংলোটা বাঁচানো সম্ভব নয় বুঝে আশপাশের বাড়িগুলোর দেয়াল, ছাত ভিজাতে শুরু করল টনি আর ডিউক। যাতে ওগুলোতেও আগুন ছড়াতে না পারে।
আগুন কি আর এত সহজে ঠেকানো যায়। বাংলোর পাশের শুকনো ঘাসে ধরল, লেগে গেল পাতাবাহারের বেড়ায়, ধরতে শুরু করল তার ওপাশের ঝোঁপঝাড়ে, বুনো ফুলের ডালপাতা আর ক্যাকটাসে। দ্রুত থামাতে না পারলে দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়বে মরুভূমিতে।
ভয়ানক এক দুঃস্বপ্ন যেন। একটা শিখা কোনমতে নিভালে আরেক জায়গায় তিনটা জ্বলে ওঠে। পাক খেয়ে খেয়ে উড়ছে ঘন কালো ধোয়া-আস্তাবলের কাছে উড়ে গেল, ভেতরে ঢুকে বিষাক্ত করে তুলল বাতাস, শ্বাস নিতে না পেরে অস্থির হয়ে পা ঠুকে চেঁচামেচি জুড়ল ঘোড়াগুলো। দৌড় দিল জিনা। আস্তাবলের ঝাঁপ খুলে দিতে হবে, তাহলে কোরালে বেরিয়ে যেতে পারবে জানোয়ারগুলো।
ঢং ঢং ঘন্টা বাজিয়ে হাজির হলো দমকল বাহিনীর ঘোট একটা
গাড়ি, ফায়ার ইঞ্জিন।

কালিঝুলিতে একাকার হয়ে গেছে তিন গোয়েন্দা, দরদর করে ঘামছে। সরে এল দূরে। তাদের সাধ্যমত করেছে। এবার দমকল বাহিনীর দায়িত্ব।
ফায়ার ইঞ্জিনের সঙ্গে লড়াই করে টিকতে পারল না আগুন, নত হয়ে এল উদ্ধত শির, গর্জন কমছে।
উত্তেজনা প্রশমিত হতেই ক্লান্তি টের পেল তিন গোয়েন্দা। ধপ করে বসে পড়ল পুলের কাছে সাজিয়ে রাখা চেয়ারে।
ধরল কিভাবে, টনি? একজন ফায়ারম্যান জিজ্ঞেস করল। হেলমেট আর ইউনিফর্ম পরে থাকায় লোকটাকে এতক্ষণ চিনতে পারেনি ছেলেরা, বিল হিগিনস-তাদের সঙ্গে পিকনিকে গিয়েছিল যে।
মাথা নাড়ল টনি। জানি না। ঘুমিয়ে ছিলাম। জিনার চিৎকারে জেগেছি।
একসঙ্গে জিনার দিকে ঘুরে গেল কয়েক জোড়া চোখ।
কেউ প্রশ্ন করার আগেই জিনা বলল, নাকে ধোঁয়া ঢুকেছিল, কিংবা পোড়া গন্ধে ঘুম ছুটে গেছিল। চোখ মেলতেই জানালায় আলো দেখলাম। উঠে দেখি, আগুন। ভয়ে আধমরা হয়ে গিয়েছিলাম। আমার মনে হয়েছিল, সারা রিসোর্টেই আগুন লেগেছে।
ও এদিক-ওদিক তাকাল বিল। পুবের আকাশ মুক্তোর মত সাদা, মরুর ভোর আসছে। পোড়া জায়গা, লন আর ঝোঁপঝাড় এখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সেদিকে চেয়ে বলল, ভাগ্য ভাল, সময়মত টের পেয়েছ। শুকিয়ে ঝনঝনে হয়ে আছে সব কিছু, আর খানিকটা সময় পেলেই জ্বালিয়ে ছারখার করে দিত।
কফি আর স্যাণ্ডউইচে চলবে তোমাদের? দরজার কাছ থেকে ডেকে জিজ্ঞেস করল ভিকি। তার পেছন থেকে বেরোল জুলিয়ান, দু হাতে দুই ট্রে।
আরে, খালা, কখন করেছ এসব? অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল জিনা।
দমকল আসতেই বুঝলাম; জবাব দিল ভিকি, আমার আর দরকার নেই এখানে। জুলিয়ানকে নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকলাম।
খুব আগ্রহের সঙ্গে প্লেট নেয়ার জন্যে হাত বাড়াল সকলেই।
দারুণ হয়েছে তো স্যাণ্ডউইচ, মুখভর্তি খাবার, দুই গাল ফুলে উঠেছে মুসার। কে বানিয়েছে?
জুলিয়ান, জানাল ভিকি।
স্যাণ্ডউইচের তারিফ করল সবাই। লাজুক হাসি ফুটল জুলিয়ানের মুখে।
ভাজা মাংসের ওপর পনিরের হালকা আস্তরের পুর দেয়া স্যাণ্ডউইচগুলো এই মুহূর্তে বেশি সুস্বাদু লাগার আরেকটা কারণ, প্রচণ্ড উত্তেজনা আর পরিশ্রমে সবাই ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত। লড়াই জেতার আনন্দ সবার মনে।

তবে জুলিয়ানের হাসি মুছে গেল খুব তাড়াতাড়ি, যখন একজন ফায়ারম্যান পোড়া বাংলোটা দেখিয়ে বলল, ওখানে আগুন ধরাটা দুর্ঘটনা নয়, টনি। বাংলোতে লোক থাকে না যে সিগারেটের আগুন থেকে ধরবে। নাকি গতরাতে তুমি ছিলে ও-ঘরে?
জোরে মাথা নাড়ল টনি। না না। ওটার কাজ তো কবেই শেষ, উইলসন আঙ্কেলের অ্যাক্সিডেন্টের আগেই। তারপর আর ওটার কাছে যাওয়ারও সময় পাইনি। অয়্যারিং বাকি ছিল, আঙ্কেল এলে করা হত, জানোই তো।
ওদের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে কিশোর। জিজ্ঞেস করল, আগুনটা লাগানো হয়েছে ভাবছেন?
কেউ কিছু বলার আগেই চেঁচিয়ে প্রতিবাদ করল জুলিয়ান, আবার যেন আমার দোষ দিয়ে বসবেন না! আমি লাগাইনি! উঠে দাঁড়িয়েছে। সে, হঠাৎ ঝাঁকুনিতে হাতের গেলাস থেকে ছলকে পড়ে গেল দুধ। আমি আগুন লাগাইনি!
কেউ কিছু বলল না।
গলা পরিষ্কার করে নিল ভিকি। কিন্তু সে কিছু বলার আগেই গেলাস রেখে দৌড় দিল জুলিয়ান। কোরাল থেকে বের করে আনল তার, সাদা-কালো পিন্টো ঘোড়াটা। জিন-লাগাম ছাড়াই তাতে চড়ে বসল, ইনডিয়ানদের মত। খালি-পিঠে বসে গলা জড়িয়ে ধরে সোজা ছুটল মরুভূমির দিকে।
ওকে কিছু বলিনি আমি, ভিকির দিকে চেয়ে অপরাধী-কণ্ঠে বলল কিশোর। যাব ওর পিছে? ফিরিয়ে আনব?
লাভ নেই, বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল ভিকি। ধরতে পারবে না।
ওকে দোষ দিয়েছ কেন ভাবল? কিশোরের দিকে তাকিয়ে নিজেকেই যেন প্রশ্নটা করল রবিন।
সবাই দেয় তো, তাই, অস্বস্তি ফুটেছে ডিউকের চোখে। সিগন্যাল দেয়ার জন্যে সেই যে পাহাড়ে একবার আগুন জ্বালল, তাতেই হলো কাল। সবাই এখন খালি তার দোষ দেয়। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না এসব জুলিয়ানের কাজ… ধরে এল গলা। মাথা ঝাঁকিয়ে যেন আবেগ তাড়ালেন। স্যাগুয়ারো ক্যাকটাস আর বেড়ায় আগুন দেয়া। এক কথা, আর বাংলোতে আগুন লাগানো সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার।
না! হঠাৎ উঠে দাঁড়াল ভিকি। মুখে বেদনার ছাপ। আমিও বিশ্বাস করি না। এ কাজ জুলিয়ান করতেই পারে না। আগুন যখন লাগল, জুলিয়ান তখন বিছানায়। না, সে করেনি…
সবাই আমরা খুব তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলছি, পরিস্থিতি সহজ করার জন্যে বলল বিল। এখনও ওখাতে ভীষণ গরম, পোড়া বাড়িটা দেখাল। কাছে যাওয়া যাবে না। বিকেলে এসে খুঁজে দেখব। কিভাবে আগুন লাগল, হয়তো বোঝা যাবে।

জুলিয়ান-প্রসঙ্গ তখনকার মত ওখানেই থেমে গেল।
কফি আর স্যাণ্ডউইচ শেষ করে, জিনিসপত্র গুছিয়ে গাড়িতে তুলে নিয়ে চলে গেল দমকল বাহিনী।
পোড়া জঞ্জাল যতখানি সম্ভব সাফ করায়, মন দিল টনি, তাকে সাহায্য করলেন ডিউক। তিন গোয়েন্দা আর জিনাও চুপ করে বসে রইল না।
দিগন্তে দেখা দিল সূর্য। রোদ এসে পড়ল, সোনালি চাদর দিয়ে যেন ঢেকে দিল সব কিছু।
ঘরের দিকে রওনা হলো ক্লান্ত কিশোর। তার সঙ্গে রবিন আর, মুসা।
গোলমালটা কোথায়? চলতে চলতে আপনমনে বিড়বিড় করল কিশোর।
কিসের গোলমাল? জিজ্ঞেস করল মুসা।
জানো, খুব খারাপ লাগছে, বন্ধুর দিকে ফিরে বলল কিশোর। আমি ভাবছি ওর দুর্নামটা ঘোচাব, আর জুলিয়ান ভাবছে উল্টো। ও ভেবেছে বাংলোয় আগুন লাগানোর জন্য দোষ দিচ্ছি ওকে আমি।
তাই কি দিচ্ছ? জিজ্ঞেস করল রবিন।
এক মুহূর্ত চুপ থেকে জবাব দিল কিশোর, না। ওর দোষ একটাই, বাড়িতে না থাকা। কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়ায় সে-ই জানে। লোকের মনে সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক।
আমারও দুঃখ হয় ছেলেটার জন্যে, গম্ভীর হয়ে বলল মুসা। বাপ নেই বেচারার, মা থেকেও নেই। ফুপুর কাছে এসে পড়ে আছে...পরের দয়ায় মানুষ হওয়ার যে কি যন্ত্রণা... হঠাৎ বদলে গেল কণ্ঠস্বর, ঝাঁঝাল গলায় বলল, কিন্তু ওকে দোষী বানিয়ে কার কি লাভ? শয়তানিগুলো করছে ওর ঘাড়ে দোষ চাপানোর জন্যে।
কে যে করছে সেটাই যদি জানতাম, বহুদূর থেকে যেন শোনা। গেল কিশোরের কণ্ঠ। তারপর ফিরে এল বাস্তবে, ঠাণ্ডা হোক, তারপর যাব। পোড়া জায়গায় হয়তো কোন সূত্র মিলবে।
যদি সূত্র থাকে, রবিন যোগ করল।
হ্যাঁ, যদি থাকে।
ঘরে এসেই বাথরুমে ঢুকল তিনজনে। ভালমত সাবান মেখে সাফ করল শরীরের কালি, ময়লা আর ঘাম। নতুন কাপড় পরে বেরোল। ভিকি আর জিনার খোঁজে চলল রান্নাঘরে।
রান্নাঘরে নয়, লবিতে পাওয়া গেল জিনাকে।
টনি কোথায়? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
শহরে গেছে, হাসপাতালে। চাচাকে জানাবে সব কথা।
জুলিয়ান ফিরেছে?

না।
গেল কই? অযথা মানুষের কথা শুনছে ছেলেটা।
হ্যাঁ, রাগে জ্বলে উঠল জিনার চোখ। শয়তানিটা করছে জানি কোন্ হারামজাদা ধরতে পারলে.. দাতে দাঁত চাপল সে।
অর্ধেক রাত ঘুম নষ্ট হয়েছে। তাই সকাল সকাল দুপুরের খাবার দিল ভিকি, যাতে খেয়েদেয়ে সবাই খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে, রাতের ঘুমটা পুষিয়ে নিতে পারে।
বিকেলে যখন ঘুম থেকে উঠল তিন গোয়েন্দা, বাইরে তখনও কড়া রোদ। ভীষণ গরম। সুইমিং পুলে এসে নামল তিনজনেই।
মুসা সাঁতার কাটছে, রবিন পানিতে একবার ডুবছে, একবার ভাসছে। কিশোর দাঁড়িয়ে আছে কোমর পানিতে। সাঁতারের ইচ্ছে বিশেষ নেই, বার বার তাকাচ্ছে পাহাড়ের দিকে। সাদা-কালো পিন্টো ঘোড়া আর ওটার সওয়ারীকে খুঁজছে তার চোখ।
মুসা আর রবিনের আগেই উঠে পড়ল পানি থেকে। তোয়ালে দিয়ে গা মুছে, কাপড় পরে এগোল পোড়া বাংলোর দিকে।
অনেক খোঁজাখুঁজি করল, কিন্তু কোন সূত্র পাওয়া গেল না। খানিক পরে বিল এল, সে-ও কিছু পেল না। নাহ্, কিছু নেই। আর কাঠ যা শুকনো, আগুন লাগলে থাকে নাকি কিছু?...কিন্তু...নাহ, শিওর হওয়া যাচ্ছে না।
ওর সঙ্গেই রয়েছে টনি। অ্যাক্সিডেন্ট কিনা জানতে চাইছ তো? মোটেই না। কোন সম্ভাবনাই নেই। উইলসন আঙ্কেলও তা-ই বলেছে। কেউ থাকে না ওখানে, সিগারেটের আগুন ফেলা হয়নি। আকাশ পরিষ্কার ছিল, বাজও পড়েনি। আর ইলেকট্রিকের তারই নেই যে ওখান থেকে আগুন লাগবে। ব্যাপার একটাই ঘটেছে, লাগিয়ে দিয়েছে কেউ।
কেন লাগাল? মিস্টার উইলসনের সঙ্গে তার কি শত্রুতা?
হয়তো সে-লোক চায় না, কিশোর জবাব দিল, এখানে রিসোর্ট গড়ে উঠুক। এছাড়া আর তো কোন কারণ দেখি না।
ঝট করে কিশোরের দিকে ফিরল টনি।
অন্য দিকে তাকাল কিশোর, পাহাড় আর মরুভূমির দিকে। দূরে দেখা গেল ঘোড়াটা। খুরের ঘায়ে ধুলোর মেঘ উড়িয়ে ছুটে আসছে।
কাছে এলে বোঝা গেল, পিন্টো ঘোড়াটাই।
আসছি, বলে সোজা আস্তাবলের দিকে রওনা হলো কিশোর। ভেতরে ঢুকে জখমী ঘোড়াটার স্টলে এসে দাঁড়াল। হাত বুলিয়ে দিল। ওটার আহত পায়ে; বিড়বিড় করে বলল, এখনও ব্যথা করছে?
আস্তাবলে ঢুকল জুলিয়ান। ঘোড়া বাঁধল।

স্টলের ওপর দিয়ে মুখ বাড়াল কিশোর। কেমন বেড়ালে? ভাল?
একবার চেয়েই মুখ ফেরাল জুলিয়ান, মাথা ঝাঁকাল শুধু।
নতুন কোন ট্র্যাক চোখে পড়েছে? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
গাড়িতে, কিংবা ঘোড়ায় চড়ে এখান থেকে ছুটে পালাচ্ছে, এমন কারও চিহ্ন?
বড় বড় চোখ দুটো ফিরল এদিকে। কেন? কণ্ঠে সন্দেহ।
বাংলোতে আগুন আপনাআপনি লাগেনি, লাগানো হয়েছে। ভাবলাম, লোকটাকে দেখে থাকতে পারো তুমি।
চুপ করে ভাবল জুলিয়ান। পাহাড়ে গিয়েছিলাম আমি। ওদিকে, কেউ থাকে না।
কিন্তু ট্র্যাক তো চোখে পড়তে পারে? পায়ের ছাপ অনুসরণ করতে ভাল লাগে না তোমার?
লাগে, ফিরে এল লাজুক হাসি। জোহান আঙ্কেল শিখিয়েছে, কিন্তু ভাল পারি না এখনও। সে পারে, সামান্য চিহ্নও তার চোখ এড়ায় না।
জোহান আঙ্কেল কে?
ওই ওদিকে থাকে। ডাক্তারের র‍্যাঞ্চের কাউবয়। তীর-ধনুকও খুব ভাল বানাতে পারে। আমাকে অনেকগুলো বানিয়ে দিয়েছে।
সুপারস্টিশনের অনেক গলিঘুপচির খোঁজ নিশ্চয় পেয়েছ তুমি, জোহান আঙ্কেলের দৌলতে?
হুঁ, মাথা কাত করল জুলিয়ান। সময় পেলেই আমাকে নিয়ে যায়।
আস্তাবল থেকে বেরোল দু-জনে।
কি কি দেখো?
অনেক কিছু। ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে যায় লোকে, পায়ে হেঁটে যায়। কেউ সোনা খুঁজতে, পুরানো খনিগুলো খোড়ে। পর্বতের গহীনে বনের কিনারে বাচ্চা নিয়ে বেরোয় কয়োটিরা। বাচ্চাকে শিকার শেখায়…
বাড়ির দিক থেকে ভিকির ডাক শুনে থেমে গেল জুলিয়ান। ফুপু ডাকছে, বলে দৌড় দিল সে।
তার পেছনে এগোল কিশোর। সে এখন নিশ্চিত, আগুন জুলিয়ান লাগায়নি। তবে সবার কাছে সেটা প্রমাণ করতে হবে। লোকে সন্দেহ করে, আড়চোখে তাকায়, নিশ্চয়ই খুব খারাপ লাগে ছেলেটার। লাগারই কথা।
সামনে এসে দাঁড়াল টনি। গম্ভীর। কি বলল?
টনির কণ্ঠস্বরে অবাক হলো কিশোর। কিসের কথা?
সারাদিন কোথায় কাটিয়েছে?
পর্বতে। কেন?

ডাক্তারের ওখান থেকে লোক এল এইমাত্র। ওদের দুটো ছাউনিতে আগুন লেগেছে। দুপুরের দিকে। ধোয়া দেখে আগুন নিভাতে গিয়ে দেখে বাঁচানোর আর কিছু নেই। পুড়ে ছাই। ওই জোহানটা হয়েছে যত নষ্টের মূল, ছেলেটাকে সে-ই প্রশ্রয় দেয়। নিজে এক শয়তান, ছেলেটাকেও শয়তান বানাচ্ছে।
কার কথা বলছ?
জুলিয়ান, আর কার।
ছাউনিতেও সে-ই আগুন লাগিয়েছে ভাবছ নাকি?
কিশোরের কথায় এমন কিছু রয়েছে, স্বর নরম করতে বাধ্য হলো টনি। ভাবতে তো খারাপই লাগছে। কিন্তু অন্য কেউ কেন ফাঁকা পড়ে থাকা ছাউনি পোড়াতে যাবে?
জুলিয়ানই বা কেন পোড়াবে?
থমকে গেল টনি। ভাবল। হয়তো ডাক্তারের ওপর রাগ। অ্যাপলুসা চুরির খবর ডাক্তার এসে দিয়েছে তো, সেজন্যে। কিংবা হয়তো ইনডিয়ান ইনডিয়ান খেলছে। খুব নির্জন এলাকা। ভেবেছে, কেউ দেখতে পাবে না।
দেখো, এ সবই অনুমান। প্রমাণ ছাড়া কাউকেই দোষী বলতে পারো না।
কিন্তু ডাক্তার জিংম্যান রেগে গেছে। মিস্টার উইলসনের খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তাছাড়া এখানে যথেষ্ট ক্ষমতা রাখে। গোয়াল আর কোরালের দরজা খুলে গরু-ঘোড়া ছেড়ে দেয়া হয়েছে এতদিন, তেমন গায়ে মাখেনি ডাক্তার, কিন্তু আগুন লাগানো সহ্য করবে না। কেউই করবে না। আর বোধহয় জুলিয়ানকে রাখা যাবে না এখানে।
কিশোরের বলে ফেলতে ইচ্ছে হলো, তুমি রাখা না রাখার কে? বলল না। ভদ্রতা বজায় রেখে জিজ্ঞেস করল, ও কোথায় যাবে?
মায়ের কাছে।
খুব রাগ হলো কিশোরের। বাচ্চা একটা ছেলের বিরুদ্ধে বড়রা এভাবে উঠে-পড়ে কেন লেগেছে? চ্যালেঞ্জ করে বসল, জুলিয়ান করছে না এসব, এবং সেটা আমি প্রমাণ করে ছাড়ব। বলে আর দাঁড়াল না।
রিসোর্টের ভেতরে, আর পাতাবাহারের বেড়ার বাইরে বাকি দিনটা সূত্র খুঁজে বেড়াল তিন গোয়েন্দা। কিছু পেল না।
পাব কি? মুসা বলল। যা ছিল আগুনে পুড়েছে। বাকি যদি বা কিছু ছিল, নষ্ট করেছে ওই দমকল। কাদা বানিয়ে দিয়েছে।
বাকিটা নষ্ট করেছি আমরা, আনমনে বলল কিশোর। গতকাল দল বেঁধে গিয়েছি, ঘোড়ার খুরের ছাপ তো আর একটা-দুটো নয়। তার ওপর রয়েছে জীপের চাকা। আজ যদি কেউ গিয়েও থাকে ওপথে, ছাপ আলাদা করে চেনার উপায় নেই।

বাড়ির কাছে চলে এল আবার ওরা।
সূর্য অস্ত যাচ্ছে। কয়েক গুণ বড় হয়ে ছায়া পড়েছে বাড়িটার। সেই ছায়ায় দাঁড়িয়ে বিচিত্র একটা অনুভূতি হলো কিশোরের, মনে হলো, আড়াল থেকে তার ওপর চোখ রাখা হচ্ছে। বাতাস গরম, তবু গায়ে কাঁটা দিল।
এতই তন্ময় হয়ে ভাবছে কিশোর, ক্যাকটাস ঝাড়ের ভেতর থেকে একটা রোডরানার বেরোনোর শব্দেও চমকে উঠল। একদিকে ছুটে পালাল পাখিটা। কাছেই লম্বা ঘাসের ভেতর ডেকে উঠল কোয়েল। কাছেই আরেকটা পাখি চেঁচিয়ে তার জবাব দিল।
কি ব্যাপার? উত্তেজিত মনে হচ্ছে পাখিগুলোকে।
ক্যাকটাসের ভেতরে নড়ে উঠল একটা ছায়া, পলকের জন্যে।
মুসার শিকারী চোখ এড়াল না সেটা। দুই ধাক্কায় দুই পাশে দাঁড়ানো কিশোর আর রবিনকে ফেলে দিয়ে নিজেও পড়ল ডাইভ দিয়ে।
ধনুকের টংকার শোনা গেল। শিস কেটে ছুটে এল কি যেন। খট করে আওয়াজ হলো। মুখ ঘুরিয়ে দেখল কিশোর, মুহূর্ত আগে সে যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, ঠিক তার পেছনের গাছটায় বিঁধেছে তীরটা। থিরথির করে কাঁপছে তীরের পালক লাগানো পুচ্ছ।
খবরদার, মাথা তুলবে না! ফিসফিসিয়ে বলল কিশোর। আস্তে আস্তে সরে যাও কোনার দিকে। ক্রল করে।
হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছে ওরা, ভয় করছে, এই বুঝি আরেকটা তীর এসে গাঁথল পিঠে।
আর কিছু ঘটল না। নিরাপদে সরে এল বাড়ির কোণে।
সাবধানে, মাথা তুলল কিশোর। স্থির চেয়ে রইল ক্যাকটাসের ঝাড়টার দিকে। কোনরকম নড়াচড়া নেই। ছোট একটা পাখি উড়ে এসে বসল একটা ডালের মায়ায়। ফুলের মধ্যে ডুবিয়ে দিল চোখা, লম্বা ঠোঁট। মধু খেতে শুরু করল।
না, নেই কেউ ওখানে, পাখিটাকে দেখতে দেখতে বলল মুসা। চলে গেছে।
পায়ে পায়ে আবার গাছটার কাছে ফিরে এল ওরা। ডাল থেকে তীরটা খুলে নিল কিশোর।
পেছনের দরজা দিয়ে রান্নাঘরে ঢুকল তিনজনে।
ভিকি রান্না করছে, একা, আর কেউ নেই ঘরে।
ফ্রিজ খুলে তিনটে লেমোনেড বের করে আনল মুসা। দুটো বোতল দু-জনের দিকে ঠেলে দিল। চেয়ার টেনে বসল তিনজনেই।
একবার মুখ ফিরিয়ে চেয়েই আবার রান্নায় মন দিল ভিকি। খুব ব্যস্ত।

এক চুমুকে অর্ধেকটা লেমোনেড শেষ করে ঠক করে বোতলটা টেবিলে নামিয়ে রাখল কিশোর।
মুসা, বড় বাঁচান বাঁচিয়েছ। আরেকটু হলেই গেছিলাম।
হাসল শুধু মুসা, কিছু বলল না।
কার শত্রু তুমি? কিশোরের দিকে চেয়ে ভুরু নাচাল রবিন।
সেটা জানতে পারলে তো রহস্যেরই সমাধান হয়ে যেত।
তন্দুর থেকে বিস্কুট বের করল ভিকি। হাত মুছে এগিয়ে এল টেবিলের কাছে। কি আলাপ করছ... টেবিলে রাখা তীরটা দেখে কুঁচকে গেল ভুরু। ওটা কোথায় পেলে?
কিশোরের মনে হলো, তীরটা ভিকির চেনা। পাল্টা প্রশ্ন করল, চেনেন নাকি?
হ্যাঁ, জবাব দিল ভিকি, জুলিয়ানের। ডাক্তারের র‍্যাঞ্চের কাউবয় বুড়ো জোহান বানিয়ে দিয়েছে। হাতে বানানো দেখছ না? পেছনের পালক লাগানো দেখেই বোঝা যায় অনেক কিছু। ইনডিয়ানদের কাছে। বানাতে শিখেছে জোহান।
হাতে বানানো যে সেটা তখনই বুঝেছি, কিশোর বলল।
পেলে কোথায়? আবার জিজ্ঞেস করল ভিকি। আবার কি ক্যাকটাস গাছে শুটিং প্র্যাকটিস করছিল নাকি?
কিশোরকে সই করে মেরেছে, রবিন বলল। ক্যাকটাস ঝাড়ের ভেতর থেকে। লোকটাকে দেখিনি। মুসা ধাক্কা দিয়ে না ফেললে তো গায়েই বিধত।
কিশোর! রক্ত সরে গেছে ভিকির মুখ থেকে। তু-তুমি নিশ্চয়। ভাবছ না... ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল সে। তীরটার দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকাল, যেন ওটা বিষাক্ত সাপ।
না, জুলিয়ান নয়, আমি শিওর। কিন্তু ওর তীর অন্যের হাতে গেল কিভাবে?
দীর্ঘশ্বাস ফেলল ভিকি। প্র্যাকটিস করতে গিয়ে কয়েকটা হারিয়েছে ঝোপে, আর ক্যাকটাসের ঝাড়ে। ডজনখানেক বানিয়ে দিয়েছিল জোহান। চারটা হারিয়েছে, আটটা থাকার কথা। কটা আছে গিয়ে দেখব?
দরকার নেই। জুলিয়ান তীর মারেনি আমাকে। মুসা আর রবিনের দিকে পর পর তাকাল কিশোর, আবার ভিকির দিকে ফিরল। আমার মনে হয়, এ কথাটা এখন কাউকে না জানানোই ভাল। চেপে যাব। জিনাকেও বলার দরকার নেই। শুনলেই রেগে হাউকাউ করে সবাইকে শোনাবে।
কিন্তু তোমার খুব বিপদ হতে পারে, কিশোর, প্রতিবাদ করল ভিকি।
তা হোক। তবু এ-রহস্যের সমাধান না করে আমি ছাড়ব না। টনি যেন এ কথা না শোনে। মিস্টার উইলসনকেও শোনানোর দরকার নেই। বাড়িতে আগুন লাগার

কথা শুনেই নিশ্চয় মন খারাপ করে আছেন। দুশ্চিন্তা আরও বাড়িয়ে লাভ নেই। শেষে সবাই মিলে আমাকে তদন্তই করতে দেবে না।
তা ঠিক, শুনলে খুব চিন্তা করবেন, মাথা দোলাল ভিকি। হাসপাতাল থেকে চলে আসতে চাইবেন। উচিত হবে না। পুরোপুরি সুস্থ হননি এখনও। কিন্তু, কিশোর, তোমারও অহেতুক ঝুঁকি নেয়ার কোন মানে হয় না। জুলিয়ানকে বরং তার মায়ের কাছেই পাঠিয়ে দেব। ধরে নেব, কপাল খারাপ ছেলেটার, থাকতে পারল না এখানে। কিংবা হয়তো আমিই এখানকার কাজ ছেড়ে দিয়ে ওকে নিয়ে শহরে চলে যাব। বাপমরা এতিম ছেলে, ফেলব কোথায়?
মায়ের কাছেও পাঠাতে হবে না, আপনাকেও কোথাও যেতে হবে না, দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করল গোয়েন্দাপ্রধান। এ-রহস্যের কিনারা আমি করবই করব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।
এক মুহূর্ত চুপ করে কিশোরের মুখের দিকে চেয়ে রইল ভিকি। বুঝল, কিছুতেই এখন আর ওকে ঠেকানো যাবে না। জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, ঠিক আছে, যা ভাল বোঝো করো। কিন্তু খুব সাবধানে থাকবে। তোমার কিছু হলে, কোনদিন আমি নিজেকে ক্ষমা করতে পারব না।
পরের দুটো দিন কিছুই ঘটল না।
অলসভাবে কাটল সময়।
অ্যাপাচি জাংশন দেখতে গেল তিন গোয়েন্দা। সঙ্গে গেল জিনা। নানারকমের দোকান আছে, ছোট ছোট জুয়েলারের দোকানই বেশি। নানারকম ইনডিয়ান অলঙ্কার রয়েছে প্রতিটি দোকানে। জিনার পছন্দে একটা করে চমৎকার বেল্ট কিনল ছেলেরা, রূপার বাকলসে একটা করে নীলকান্তমণি বসানো। যার যার বাড়ির লোকের জন্যে কিছু উপহার কিনল।
এক দোকানে একটা ক্যাচিনা পুতুল দেখে খুব পছন্দ হলো কিশোরের। বাহ, দারুণ তো! চাচীরও পছন্দ হবে। স্যুভনির হিসেবে খুব ভাল, না?
পুতুলটা বেশ চড়া দামে কিনে নিল সে। ওই দোকান থেকেই রাশেদচাচার জন্যে কিনল একটা সুন্দর ইনডিয়ান পাইপ।
জুলিয়ান, ভিকিখালা আর টনির জন্যেও একটা করে উপহার কিনল ওরা।
জিনা নিজের জন্যেও কিনল একটা রূপার চেন, লকেটের জায়গায় ছোট্ট একটা পাখি ঝুলছে। একটা কনডর। চোখ দুটো লাল পাথরের, ঝকঝক করে জ্বলছে।
চেনটা গলায় পরে বন্ধুদের দিকে ফিরল জিনা। কেমন লাগছে?
রাক্ষুসী, জবাব দিল মুসা।
কী? রেগে উঠল জিনা।

না না, ভুল করেছি, তাড়াতাড়ি হাত নাড়ল মুসা। মুচকি হেসে বলল, ওঝানী। ইনডিয়ান ওঝানী। চুলগুলোকে আরেকটু এলোমলো করো, মুখে রঙ লাগাও..
দেখো, ভাল হবে না বলছি। ভীষণ রেগে গেল জিনা। তুমি নিজে কি? তুমি তো একটা ভূত…
ঠিক বলেছ, দু-আঙুলে চুটকি বাজাল মুসা। বিকশিত হলো হাসি।
একটানে গলা থেকে চেনটা খুলে ফেলল জিনা। থাক! নেবই না!
না না, নাও, প্লীজ, হাতজোড় করে অনুরোধ করল মুসা। এমনি ঠাট্টা করছিলাম। এখানে এসে তোমার রাগ দেখিনি তো, কেমন যেন অন্য মানুষ অন্য মানুষ লাগছিল। তাই রাগিয়ে দিয়ে আসল রূপ…
হেসে ফেলল জিনা। আমি খুব বদমেজাজী, না? তাই তো এবার প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, তোমাদের কারও সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করব না।
কোন দরকার নেই, মিটিমিটি হাসছে রবিন। রাগ না থাকলে আসল জিনাকে হারাব আমরা। ভদ্র মিস জরজিনা পারকারকে চাই না, আমাদের জিনাকেই দরকার। তোমার যত খুশি দুর্ব্যবহার করো, মেজাজ দেখাও, কিছু মনে করব না।
তোমরা চেনো বলে…
যারা চেনে না তাদেরকেও বলে দেব, তোমার স্বভাবই ওরকম। বাইরে তুমি রুক্ষ হলেও ভেতরে তোমার অত্যন্ত কোমল সুন্দর একটা মন আছে। আসলে তুমি খুব ভাল মেয়ে।
হয়েছে হয়েছে, আর তেলাতে হবে না, কৃত্রিম মুখঝামটা দিল জিনা। কিন্তু ভেতরে ভেতরে এত খুশি হয়েছে, রিঙের সঙ্গে ছোট্ট শেকলে ক্যাচিনা পুতুল ঝোলানো তিনটে চাবির রিঙ কিনে ওখানেই উপহার দিয়ে ফেলল তিনজনকে।
যাক, মাঝেসাঝে ঝগড়া বাধালে লাভই, বলল মুসা।
চেনটা আবার তুমি পরো, জিনা, প্লীজ।
কি ভেবে আবার চেনটা পরল জিনা।
সত্যি, চমৎকার মানিয়েছে, বলল ইনডিয়ান সেলসগার্ল, এতক্ষণ উপভোগ করছিল ছেলেমেয়েদের ঝগড়া। কাপড়-চোপড় ঠিকমত পরালে একেবারে ইনডিয়ান বলে চালিয়ে দেয়া যাবে।
চুল যে তামাটে?
তাতে কি? কালো করে নিলেই হবে।
তা রাগ অভিমান তো অনেক হলো, হাত তুলল কিশোর। বাড়ি টাড়ি কি যাব আমরা?
ইনডিয়ান মেয়েটাকে ধন্যবাদ জানিয়ে দোকান থেকে বেরোল ওরা।
শেষ বিকেলে র‍্যাঞ্চে ফিরল।

গত দু-দিন ধরে নতুন কিছু না ঘটায় কিছুটা হতাশই হয়েছে। কিশোর। জাংশন থেকে ফেরার পথে রহস্যগুলোর কথা খালি ভেবেছে। দু-রাত ধরে কাচিনা ভূতটারও দেখা নেই।

ব্যাপারগুলো এতই খচখচ করছে মনে, পেট ভরে খেতে পারল না রাতে। তাস খেলার প্রস্তাব দিল টনি, রাজি হলো না সে। মুসা আর রবিনকে নিয়ে খেলতে বসল টনি, জিনাও এসে যোগ দিল। কয়েক মিনিট খেলা দেখে উঠে পড়ল কিশোর। চলে এল বড় হলরুমটায়, যেখানে ক্যাচিনা পেইন্টিংগুলো রয়েছে। কি এক অদৃশ্য আকর্ষণ যেন তাকে টেনে নিয়ে এল, সেই মেঘ-ক্যাচিনাটার কাছে, যেটায় ভূত ঢুকে পড়েছে বলে মনে হয়েছিল সেদিন।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল কিছুক্ষণ। ব্যতিক্রমী কিছু চোখে পড়ল না। জানালার কাছে এসে দাঁড়াল।

আকাশের কোণে মেঘ, বৃষ্টির আগমন সঙ্কেতে যেন বাতাস উত্তেজিত।

কালো আকাশ চিরে দিল নীলাভ বিদ্যুৎ, সুপারস্টিশনের উঁচু চূড়া প্রায় ছুঁয়ে তীব্র গতিতে ছুটে হারিয়ে গেল ওপাশে।

থমথমে প্রকৃতিতে আলোড়ন তুলল ভেজা ঝড়ো বাতাস। দোল খেলে গেল জানালা-দরজার সাদা পর্দায়। বহুদূরে, পর্বতের দিক থেকে ভেসে এল বজ্রপাতের চাপা গুমগুম। এরই মাঝে শোনা গেল ঘোড়ার খুরের শব্দ। আবছা আলোয় চকিতের জন্যে ঘোড়াটা চোখে পড়ল কিশোরের, ছুটে চলে যাচ্ছে-সাদা-কালো পিন্টো ঘোড়া।

মুহূর্ত দ্বিধা করেই দরজার দিকে দৌড় দিল কিশোর। বাইরে বেরিয়ে ছুটল আস্তাবলের দিকে। তুফান আসছে, এর মাঝে এই অন্ধকারে কোথায় যাচ্ছে জুলিয়ান? দেখতেই হবে। অন্য কাউকে কিছু বলে আসার সময় নেই।

অন্ধকারে, আস্তাবলের ভেতরে কিছু দেখা যায় না। দরজার ঠিক ভেতরের স্টলে যে ঘোড়াটা পেল, তাতেই চড়ে বসল। বের করে নিয়ে এল। আবছা অন্ধকারে যতখানি সম্ভব জোরে ছুটে অনুসরণ করে চলল সামনের ঘোড়াটাকে।

উপত্যকায় পৌঁছে শুকনো একটা চওড়া নালার মধ্য দিয়ে ছুটল ঘোড়া। গতি কমিয়ে সামনের ঘোড়াটা খুঁজল কিশোর, দেখল না। তারপর হঠাৎই আবার চোখে পড়ল সাদা-কালো ঝিলিক, ক্ষণিকের জন্যে। ওটাও ছুটছে নালা দিয়ে।

জুলিয়ান, শোনো! চিৎকার করে ডাকল কিশোর। জুলিয়ান!

জবাবে শুধু ঘোড়ার খুরের শব্দ।

বাতাসের বেগ বাড়ছে, ধুলো উড়ছে। তার সঙ্গে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে শুকনো পাতা আর কুটো। পড়ছে এসে চোখেমুখে, চোখ খুলে রাখা দায়। খুরের শব্দ শুনে শুনে অনেকটা অন্ধের মত ঘোড়া নিয়ে এগোচ্ছে কিশোর।

বজ্রপাতের গর্জন জোরাল হচ্ছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে ঘনঘন। অনেক সামনে ঘোড়াটাকে ক্ষণে ক্ষণে চোখে পড়ছে সেই আলোয়। আরও কয়েকবার ডাকল কিশোর, কিন্তু সাড়া দিল না পিন্টোর সওয়ারী, ফিরেও তাকাল না।
নামল বৃষ্টি। বাজ পড়ল প্রচণ্ড শব্দে, দু-ভাগ হয়ে গেল যেন আকাশটা। মুষলধারে বৃষ্টি, ফোঁটা ফোঁটা নয়, যেন পানির চাদর। থেমে যাচ্ছে ঘোড়াটা বারবার, খোৎ-খোৎ করছে, মাথা ঝাড়ছে। এই
ঝড়বৃষ্টির মধ্যে সামনে এগোতে রাজি নয় সে, ফিরে যেতে চায়। আস্তাবলের নিরাপদ শুকনো আশ্রয়ে।
ঘোড়াটাকে হাঁটতে বাধ্য করল কিশোর। রেকাবে দাঁড়িয়ে সামনে তাকাল, পানির চাদর ফুড়ে অন্ধকারে কয়েক হাতও এগোল না নজর। পিন্টোটাকে দেখা গেল না। খুরের আওয়াজও আর শোনা যাচ্ছে না এখন। ভয়ানক অস্বস্তিতে পড়ে গেল সে। নালা ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল পর্বতের আরও ভেতরে।
থেমে থেমে যাচ্ছে ঘোড়াটা। চলতে খুব অসুবিধে হচ্ছে। তোড়ে নেমে আসছে পানি, শুকনো মাটি এখন পিচ্ছিল কাদা। আরেকবার বিদ্যুৎ চমকাল। সামনের দৃশ্য দেখে কিশোরও চমকে গেল।
সামনে নালাটা মনে হলো শেষ। পিন্টো আর তার সওয়ারী অদৃশ্য। গেল কোথায়!
রাশ টেনে ঘোড়া থামিয়ে পরবর্তী বিদ্যুৎ চমকের অপেক্ষায় রইল কিশোর। ইস, বোকামি হয়ে গেছে। তাড়াহুড়োয় টর্চ আনতে মনে ছিল না।
বিদ্যুৎ চমকালে মনে হলো যেন দুপুরের আলো। স্পষ্ট চোখে পড়ল সামনের সব কিছু। সামনে নালার দুই পাড় এখানকার চেয়ে অনেক বেশি খাড়া। দুই পাশেই পাহাড়ের ঢাল, তা-ও যথেষ্ট খাড়া।
বৃষ্টি আরও বাড়ল। সামনে এগিয়ে আর লাভ হবে না, পিন্টোটাকে হারিয়েছে। হতাশ হয়ে ঘোড়াকে ওটার ইচ্ছেমত চলতে দিল সে।
গেল কোথায় পিন্টো? গভীর নালা থেকে হঠাৎ করে একেবারে উধাও তো হয়ে যেতে পারে না। ধারেকাছেই লুকিয়ে আছে কোথাও?
ছিল তো এখানেই, বিড়বিড় করে ঘোড়াটার সঙ্গে কথা বলল কিশোর। ঠিকই অনুসরণ করেছিস। তারপর?
কিশোরের কথার জবাবেই বুঝি আরেকবার ফোঁস করে উঠল ঘোড়া। হঠাৎ যেন হোঁচট খেয়ে থেমে গেল। বাঁকা হয়ে গেল পেছনদিকে। কাদামাটিতে নাল ঢুকিয়ে দিয়ে পতন রোধ করতে চাইছে। সামনে ঢাল, তারপরে তরাই।
অনেক কষ্টে পিছলে পড়া থেকে রেহাই পেল ঘোড়াটা। হাঁপ ছাড়তে যাবে এই সময় কিশোরের কানে এল একটা অদ্ভুত গমগমে আওয়াজ। বজ্রপাতের নয়। তুমুল বৃষ্টিতে ভরে গেছে নালা। পেছনে তাকিয়ে দেখল কিশোর, দুই পাড় উপচে

ভয়ঙ্কর গতিতে ছুটে আসছে পানি, ভাসিয়ে আনছে ঝড়ে উপড়ানো গাছপালা ঝোঁপঝাড়।
প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে কিশোরের নির্দেশ ছাড়াই খাড়া পাড় বেয়ে ওঠার চেষ্টা শুরু করল ঘোড়াটা। মরিয়া হয়ে উঠল। পিছল মাটি, ভিজে আলগা হয়ে আছে ওপরের অংশ। নাল গাঁথতে চাইছে না তাতে, আর গাঁথলেও খসে যাচ্ছে আলগা মাটি। বাশ বেয়ে ওঠা সেই শামুকের অবস্থা হয়েছে যেন, দুই ফুট ওঠে তো দেড় ফুট নামে।
এসে গেছে পানি। শেষ চেষ্টা বল ঘোড়াটা। পেছনের দুই পা মাটিতে গেঁথে প্রায় লাফ দিয়ে পড়ল সামনে। সামনের দুই পা পাড়ের। ওপরের মাটিতে ঠেকলে আরেক ঝাঁকিতে শরীরটা তুলে আনল ওপরে। প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে রইল কিশোর। আরেকটু হলে গিয়েছিল পিঠ থেকে পড়ে।
হুড়মুড় করে নিচ দিয়ে চলে যাচ্ছে পানি। তাতে পড়লে আর রক্ষা ছিল না। উড়ে গিয়ে পড়তে হত নিচে।
থরথর করে কাঁপছে ঘোড়া আর মানুষ, কে যে বেশি কাঁপছে বোঝা মুশকিল। ঘোড়ার গলায় গাল চেপে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে কিশোর।
নাক নামিয়ে নিজের দুই হাঁটু শুকল ঘোড়া, কেন কে জানে। ব্যথা করছে বোধহয়, কিংবা কিছু একটা হয়েছে। পাহাড়ের ঢাল আর নালার পাড়ের মাঝখান দিয়ে হাঁটতে শুরু করল।
র‍্যাঞ্চটা কোন্‌দিকে কতদূরে আছে জানে না কিশোর, ঘোড়ার ওপরই এখন ভরসা। পথ চিনে যদি বাড়ি ফিরতে পারে। কিন্তু এই অন্ধকারে ঝড়ের মাঝে চিনবে তো?
চলছে তো চলছেই, পথের যেন আর শেষ নেই। কিশোরের মনে হলো, কয়েক যুগ পর যেন হঠাৎ করে থেমে গেল বর্ষণ। পিঠে ভারি ফোঁটার অনবরত আঘাত কমে আসতে মাথা তুলল সে। ভিজে সপসপ করছে কাপড়, গায়ের সঙ্গে মিশে গেছে। কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস তীক্ষ্ণ সুচের মত মাংস ভেদ করে গিয়ে লাগছে যেন একেবারে হাড়ে। অবাক হয়ে দেখল, দ্রুত পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে আকাশ, ইতিমধ্যেই পেছনে হয়ে। গেছে অনেকখানি। মখমলের মত কালো আকাশে উজ্জ্বল তারা ঝকমক, করছে। মেঘের নামগন্ধও নেই। এসব অঞ্চলের ঝড়বৃষ্টিই এমন, এই আর্সে এই যায়।
পাহাড়ের মোড় ঘুরতেই সামনে আলো দেখা গেল, গাড়ির হেডলাইট এদিকেই আসছে। কাছে এসে ব্রেক কষল। রিসোর্টের পুরানো একটা জীপ। লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে আগে নামল টাইগার। ঘোড়র কাছে এসে ঘেউ ঘেউ আর নাচানাচি জুড়ে দিল। ছুঁতে চাইছে। কিশোরকে।

কিশোর! লাফিয়ে বেরোল মুসা। আল্লাহকে হাজার শোকর, পেলাম তোমাকে! আমরা তো ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম। কোথায় গিয়েছিলে? কি হয়েছিল?
একে একে নামল রবিন, জিনা, টনি।
কিশোরকে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামাল টনি। ঘোড়ার পেছনে চাপড় দিয়ে বলল, বাড়ি যা। অনেক কষ্ট করেছিস!
চলতে শুরু করল ঘোড়াটা।
পিন্টোটাকে নিয়ে জুলিয়ান যে কোথায় গায়েব হলো, কিশোর বলল, কিছুই বুঝলাম না।
জুলিয়ান? জিনা অবাক। ঘরেই তো দেখে এলাম ওকে। বিকেল থেকেই আছে। ওর ঘোড়াটাও আস্তাবলে। খটখটে শুকনো। শুধু তুমি যেটাকে এনেছ সেটাকেই পাওয়া যাচ্ছিল না।
কিন্তু আমি নিজের চোখে দেখলাম পিন্টোতে চড়ে যাচ্ছে, জোর প্রতিবাদ করল কিশোর। আমার সামনে সামনেই এগোল। তারপর নালার মাথা থেকে উধাও। নিচে তরাইয়েই পড়ে গেল কিনা কে জানে।
সত্যি দেখেছ? টনি জিজ্ঞেস করল।
নিশ্চয়ই।
জুলিয়ানকে?
থমকে গেল কিশোর। ঢোক গিলল। চেহারা তো দেখিনি... অনিশ্চিত কণ্ঠস্বর। তাই তো, এ যে আরেকটা ফাঁদ, ভাবিনি তো! কিন্তু কি করে জানল সে আমি ওকে অনুসরণ করব?
হয়তো একটা চান্স নিয়েছে, রবিন বলল।
তোমাকে দেখিয়ে আস্তাবল থেকে বেরিয়েছে। পিন্টো দেখে যদি পিছু নাও, এই আশায়। এবং তার ফাঁদে পা দিয়েছ তুমি।
হ্যাঁ, তা ঠিক, খানিক আগের তুফানের মতই চালু হয়ে গেছে কিশোরের ব্রেন। আমি অনুসরণ করলে, সে আমাকে নিয়ে গেছে এমন এক জায়গায়, যেখানে অন্ধকারে পড়ে মরব। কেউ কিছু সন্দেহ করত না। সবাই ভারত, একটা দুর্ঘটনা।
বাঁচিয়েছে তোমাকে ফ্রান্সিস, ঘোড়াটার কথা বলল টনি। সবচেয়ে ভালটাকেই বেছেছিলে। কয়েকবার ও আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে।
ভেজা উঁচুনিচু পথ ধরে ঝাঁকুনি খেতে খেতে ছুটে চলেছে পুরানো জীপ। কিশোর একেবারে চুপ, নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে। অন্যরাও চুপ করে রইল।
দূরে দেখা গেল র‍্যাঞ্চ হাউসের উজ্জ্বল আলো।
লস্ট ভ্যালির সামনে এসে গাড়ি রাখল উনি।
সবাই নামল।

গরম পানি দিয়ে গোসল সেরে, মাখন মেশানো এক কাপ গরম চকলেট ড্রিংক খেয়ে শুয়ে পড়ল কিশোর।
পরদিন বেলা করে ঘুম ভাঙল তার। বাইরে চমৎকার সকাল, ঝকঝকে রোদ। দেখে মনেই হয় না আগের রাতে ভয়াবহ ঝড় বয়ে গেছে।
রহস্যের সমাধানে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছে কিশোর। আর কত? কয়েকবার তার জীবনের ওপর হামলা হয়ে গেল। প্রায় প্রতিটি বারেই ভাগ্যগুণে বেঁচেছে। কোন সূত্র, কোন কূলকিনারা পাচ্ছে না সে। এ এক অদ্ভুত পরিস্থিতি। ধারেকাছেই রয়েছে শত্রু, তার ওপর চোখ রাখছে, আঘাতের পর আঘাত হানছে, অথচ সে কিছুই করতে পারছে না। কাকে সন্দেহ করবে?
সেই নালাটার কাছে আবার যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল সে। হয়তো কোন সূত্র পাওয়া যেতে পারে, যদিও এ-ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ আছে তার। তবু
জিনা, কিশোর বলল, পিন্টো ঘোড়াটার খোঁজ নাও। দেখো, আর কোন্ র‍্যাঞ্চে আছে সাদা-কালো রঙের ওই ঘোড়া। আমি আবার নালাটার কাছে যাব।... তোমরা যাবে? দুই সহকারীর দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল।
নিশ্চয় যাব, দু-জনের একই জবাব।
তবে, মুসা যোগ করল, র্যাটলস্নেক আর ঝড় থেকে দূরে থাকতে চাই।
আকাশ পরিষ্কার, বলল কিশোর। ঝড় আসবে না। আর, বেশি ঝোঁপঝাড়ের মধ্যে না-ই বা গেলাম, তাহলেই সাপের কামড় খেতে হবে না।
না গেলেই কি, কেউ ছুঁড়ে তো দিতে পারে। যাকগে, চলো, যাই আগে, যা হয় হবে।
হ্যাঁ। চলো।
দিনের বেলা উজ্জ্বল সূর্যালোকে অন্যরকম লাগল প্রকৃতি, পরিবেশ গত রাতের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। তাজা বাতাস। মরুভূমির বুনো প্রাণীরা সবাই কাজে ব্যস্ত, ঝড়ে সবারই কিছু না কিছু ক্ষতি হয়েছে, মেরামত করে নিচ্ছে সে-সব।
নালায় পানি প্রবাহের চিহ্ন স্পষ্ট, কোথাও কোথাও এখনও নরম কাদা। পলি জমেছে, কিছু জায়গায়। খড়কুটো, আগাছা, জঞ্জাল জমে রয়েছে এখানে-সেখানে। পানিতে ভেসে এসেছে, কিন্তু শেষ দিকে স্রোত কম থাকায় আর সরতে পারেনি, আটকে গেছে।
মোড় ঘুরে নালার মাথার কাছে চলে এর ওরা। বাঁয়ে তাকাল কিশোর, ছোট ছোট হয়ে এল চোখ। হু, রহস্যময় ঘোড়সওয়ারের রহস্যজনক অন্তর্ধানের জবাবটা বোধহয় মিলল, আঙুল তুলে দেখাল। সে। নালার পাড় থেকে কিছু দূরে পাহাড়ের গায়ে খুব সরু একটা গিরিপথ মত চলে গেছে। ঝড়বৃষ্টির মধ্যে...আর এত উত্তেজিত ছিলাম, কাল রাতে চোখে পড়েনি। তাই তো বলি, ব্যাটা গেল কই?
যাবে নাকি? জিজ্ঞেস করল রবিন।

এতদূর যখন এলাম, যাওয়াই তো উচিত।
ঘোড়াটা শান্ত, কথা শোনে। সরু গিরিপথে ওটাকে ঢোকার নির্দেশ দিল কিশোর। পেছনে সারি দিয়ে চলল অন্য দুটো ঘোড়া।
ধীরে ধীরে ওপরে উঠেছে গিরিপথ। ঘোড়ার নালে লেগে ঝরে পড়ছে আলগা ছোট পাথর, মাটি। গড়িয়ে গিয়ে জমা হচ্ছে নালায়।
যে কাল রাতে এখান দিয়ে গেছে, এই এলাকা তার নখদর্পণে, আশপাশের পাহাড় দেখছে কিশোর। ইচ্ছে করেই টেনে এনেছে আমাকে নালার মুখের কাছে। তারপর মারাত্মক বিপদে ঠেলে দিয়ে নির্বিঘ্নে সরে পড়েছে।
যাচ্ছি কোথায় আমরা? জিজ্ঞেস করল মুসা।
সামনে গিরিপথ শেষ। উল্টোদিকে পাহাড়ের আরেক ঢাল। গিরিপথের মুখ থেকে এঁকেবেঁকে চলে গেছে পায়েচলা আরেকটা পাহাড়ী পথ। পথের ধারে এক জায়গায় কয়েকটা চারাগাছের ছোট্ট ঝাড়। ঘন পাতা গায়ে গায়ে লেগে ছাতার মত হয়ে আছে।
সেগুলো দেখল কিশোর। আনমনে বলল, আমি যদি ঝড়ের সময় এ পথে যেতাম, বৃষ্টি নামলে অবশ্যই আশ্রয় নিতাম ওটার তলায়।
লোকটা আশ্রয় নিয়েছিল বলতে চাও? রবিন বলল।
মাথা নেড়ে বলল কিশোর, হ্যাঁ।
গাছের গোড়ায় এসে থামল ওরা। কড়া রোদেও পাতার নিচে বেশ ছায়া। গোড়ার মাটি ভেজা, কোথাও কাদা। রোদ পৌঁছতে পারেনি ওখানে। তাই শুকায়নি।
ঘোড়া থেকে নেমে রাশটা মুসার হাতে ধরিয়ে দিল কিশোর। একজোড়া পায়ের ছাপের দিকে চোখ।
ঠিকই আন্দাজ করেছ, মাটির দিকে চেয়ে আছে মুসাও।
ওদিকে দেখো, সামনে দেখাল কিশোর, পাথুরে। গেছে ওদিকেই, কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ছাপ পাওয়া যাবে না। শক্ত মাটি, পড়বেই না ছাপ।
গাছগুলোর চারপাশে ঘুরে ঘুরে দেখল সে। একটা ডালের দিকে চোখ পড়তেই স্থির হয়ে গেল। মেসকিট ঝাড়ের কাঁটায় আটকে রয়েছে লাল এক টুকরো কাপড়।
এগিয়ে গিয়ে কাপড়টা খুলে নিল কিশোর, হাসল। যাক, এদ্দিন পরে সলিড কিছু পাওয়া গেল, কণ্ঠে খুশির আমেজ। লাল শার্ট পরেছিল লোকটা। ছিঁড়ে রয়ে গেছে, ঝড়ের মধ্যে বোধহয় খেয়ালই করেনি।
দারুণ! নিজের উরুতে চাপড় দিল মুসা। এটা প্রমাণ করবে অনেক কিছু।
এত খুশি হয়ো না, হাত নাড়ল কিশোর। যত সহজ ভাবছ তত না। ঝামেলা আছে। কার শার্ট ওটা খুঁজে বের করতে হবে আগে। ছেঁড়া শার্ট তো আর দেখিয়ে বেড়াবে

না।
চুপসে গেল আবার মুসা। তাই তো, এটা ভাবিনি।
ওখানে আর কিছু পাওয়া গেল না।
চলো, বলল কিশোর, আর থেকে লাভ নেই।
রিসোর্টে ফিরে এল ওরা। কোরালে ছেড়ে দিল ঘোড়াগুলো।
জুলিয়ানের রহস্যটার সমাধান হলে বাঁচি, পেছনের বাগানের, দিকে হাঁটতে হাঁটতে বলল রবিন। আসল রহস্য তো বাকিই রয়েছে।
হ্যাঁ, ক্যাচিনা ভূত, মুসা বলল।
জুলিয়ানের রহস্যের সঙ্গে ভূত রহস্যের কোন সম্পর্ক আছে কিনা, তাই বা কি করে বলি? দেখা যাক কি হয়? বলল কিশোর।
বাইরে কাউকে দেখা গেল না, কিছুটা অবাকই হলো ওরা।
রান্নাঘরে ঢুকল। কাজ করছে ভিকি আর জিনা। জিনা একবার মুখ তুলে চেয়েই আবার নামিয়ে নিল, ভিকি তাকালই না। দু-জনেরই মুখ থমথমে।
থমথম্ভেব ব্যাপার ত ডেকে লটা যে জ
অ্যাই যে, জিনা, ডেকে বলল মুসা, সাংঘাতিক একখান সূত্র পেয়েছে কিশোর। গতরাতের লোকটা যে জুলিয়ান নয়, প্রমাণ করা যাবে।
এদিকে তাকাল ভিকি। হাসি ফুটল না মুখে। গালে পানির দাগ, অনেক কেঁদেছে বোঝা যায়।
কি ব্যাপার? জানতে চাইল কিশোর।
পেয়েছ, ভাল। কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেছে, আবার ফুঁপিয়ে। উঠল ভিকি। ছুটে চলে গেল রান্নাঘর থেকে।
কি হয়েছে? জিনাকে জিজ্ঞেস করল কিশোর।
শেরিফ এসেছিল, জিনারও চোখ ছলছল করে উঠল। ঘণ্টাখানেক আগে, জুলিয়ানকে খুঁজতে। বলল, গতকাল নাকি কিছু অলঙ্কার চুরি গেছে। আর পিন্টো ঘোড়ায় চড়ে একটা ছেলেকে ঘোরাঘুরি করতে দেখা গেছে ওই এলাকায়।
তাতেই কি প্রমাণ হয়ে গেল জুলিয়ান চুরি করেছে? শোনো, কাল রাতে আমিও একজনকে পিন্টো ঘোড়ায় চড়তে দেখেছি। আর সেটা যে জুলিয়ান নয়, তা-ও প্রমাণ করতে পারব।
হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল জিনা। কেউ বিশ্বাস করবে না তোমার কথা।
করবে না মানে? এমন একটা ভঙ্গি করল মুসা, যেন যে বিশ্বাস করবে না তাকে এখনি ধরে ধোলাই দেবে। প্রমাণ আছে আমাদের কাছে।
সেটা অন্য কেস। জুলিয়ানকে বাঁচাতে পারবে না।
কেন? ভুরু নাচাল রবিন।

চোরাই একটা বেল্টের বাকলস পাওয়া গেছে আমাদের আস্তাবলে। জুলিয়ানের স্যাডল ব্যাগে।
শুধু বাকলস? আর কিছু? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
না, আর কিছু না। শেরিফ বলল, জুলিয়ানকে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। ওকে বলতে বাধ্য করবে, চোরাই মাল কোথায় লুকিয়েছে।
বোকা নাকি সব এ দেশে? বিরক্তিতে নাক কুঁচকাল কিশোর। চিলে কান নিল বলল একজন, আর সবাই ছুটল চিলের পেছনে। শেরিফেরও তো মাথামোটা মনে হচ্ছে। কি কি অলঙ্কার চুরি গেছে?
অনেক। বেশি দামীগুলোর মধ্যে আছে দুটো হার, পাথর বসানো, একই রকম দেখতে। গোটা তিনটে ব্রেসলেট আর দুটো আঙটি।
চুরি হয়েছে কোত্থেকে?
এখান থেকে কয়েক মাইল দূরে, একটা ক্যারাভান থেকে। টুরিস্ট। ক্যারাভান নিয়ে বেড়াতে এসেছে।
কিন্তু বারো বছরের একটা ছেলে এত দামী জিনিস দিয়ে কি করবে? ওই জিনিস বিক্রি করতেও তো পারবে না। কেন করতে যাবে অহেতুক?
কিছু বলার জন্যে মুখ খুলে চুপ হয়ে গেল জিনা, বলল না।
শেরিফের কাছে বোধহয় আমাদের একবার যাওয়া দরকার, আবার বলল কিশোর। হয়তো বোঝাতে পারব গতরাতে কি ঘটছে...
টনি না ফিরলে যেতে পারছি না,. স্টেশন ওয়াগনটা নিয়ে গেছে, জিনা বলল। শেরিফ আসার আগেই গেছে শহরে।
জীপটা?
ওটা নিয়ে বাজারে গিয়েছিল ডিউক আঙ্কেল আর ভিকিখালা। শেরিফ এসে জুলিয়ানকে ধরে নিয়ে গেল। ফিরে এসে সব শুনে খালাকে নামিয়ে দিয়েই জীপ নিয়ে ছুটেছে আঙ্কেল। শেরিফের পিছু পিছু।
অফিসে ফোন করি তাহলে?
পাওয়া যাবে না, মাথা নাড়ল জিনা। অফিসে যাবে না। ক্যারাভানে যাবে শেরিফ। জুলিয়ানকে চিনতে পারে কিনা ওরা, দেখবে। বাকলসটাও দেখাবে।
ওরা চিনবে না জুলিয়ানকে, দরজার কাছ থেকে বলল ভিকি খালা। আগে কখনও দেখলে তো। সাফ বলে দেবে, জুলিয়ান চোর নয়।
নিশ্চয়ই বলবে, সান্ত্বনা দিল কিশোর, যদিও দ্বিধা আছে তার মনে। জুলিয়ান চোর হতেই পারে না।
আবার কাঁদতে শুরু করল ভিকি। ডিউকের সঙ্গে আমারও যাওয়া উচিত ছিল। কি ভুলটাই না করলাম। জোরে কেঁদে উঠল সে। বাচ্চা ছেলে, কি যে ভয় পাবে...

ধমক দিলে, উল্টো-পাল্টা কি বলে বসেহায়। হায়, ছেলেটাকে বুঝি আর বাঁচাতে পারলাম না।
অযথা অস্থির হচ্ছেন, বোঝানোর চেষ্টা করল কিশোর। দেখবেন, কিছুই হবে না ওর।
একটা চেয়ারে নেতিয়ে পড়ল ভিকি।
রবিন গিয়ে চায়ের পানি বসাল। ভিকির কাছ থেকে শেখা সুগন্ধী দেয়া চা বানিয়ে আনল। আগে ভিকিকে দিল এক কাপ।
হায় হায়, আমি কি করব রে! কপাল চাপড়াল ভিকি। ওর মায়ের কাছে আমি কি জবাব দেব?
কিছুই জবাব দিতে হবে না, জোর দিয়ে বলল কিশোর। ওকে ছাড়িয়ে নেবই আমরা। শেরিফ তো আসবে আবার। না এলে আমরাই যাব ওর কাছে। আশা করি, বোঝাতে পারব।
কান্না থামাল ভিকি। চা খেয়ে শান্ত হলো অনেকখানি। তারপর উঠে গিয়ে লাঞ্চের জোগাড় শুরু করল।
পিন্টো ঘোড়াটার খোঁজ নিয়েছে কিনা জিজ্ঞেস করল কিশোর।
নিয়েছিলাম, জানাল জিনা। ধারেকাছে যে কটা র‍্যাঞ্চ আছে, সবারই আছে পিন্টো। কাল রাতে কেউ নাকি বেরোয়নি।
বেরোলেও কি আর স্বীকার করবে? হতাশার হাসি হাসল মুসা।
হ্যাঁ, মাথা ঝাঁকাল কিশোর। ঘোড়া বেশি থাকায় কাজ জটিল হয়ে গেল আরও, আন্দাজে কাকে সন্দেহ করব?
কিছু ঢুকছে না আমার মাথায়! মাথা ঝাড়া দিল জিনা। কে বেচারাকে ফাসাতে চায়? কেন?
আজ হোক কাল হোক, জেনে যাবই সেটা, বলল কিশোর।
টেবিলে খাবার দিল ভিকি। টনি, ডিউক আর জুলিয়ানের জন্যে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল ওরা। কেউ এল না। শেষে খেতে বসে গেল। রান্না ভাল, খাবারও ভাল, কিন্তু রুচি মরে গেছে সবারই। এমনকি মুসাও বিশেষ কিছু মুখে তুলতে পারল না। ভিকি আরেক কাপ চা খেল, ব্যস।
খাওয়ার পর থালাবাসনগুলো ছেলেমেয়েরাই ধুয়ে রাখল।
আবার অপেক্ষার পালা। গড়িয়ে চলেছে মিনিটগুলো, সময় যেন। কাটতেই চায় না।
দুপুরের পর জীপের শব্দ শোনা গেল। ডিউক এসেছেন। বসার ঘরে ছুটে গেল সবাই।
জুলিয়ান কই? নিয়ে এলে না কেন? স্বামীকে ঢুকতে দেখেই চেঁচিয়ে উঠল ভিকি।

বিষণ্ন, থমথমে হয়ে আছে শিক্ষকের মুখ। শুধু কালো চোখদুটোয় বেদনা। শেরিফ নিয়ে আসবে। আমাকে চলে আসতে বলল, তোমাকে বোঝাতে।
সামান্য স্বস্তি যা ফিরে এসেছিল, দূর হয়ে গেল আবার ভিকির মুখ থেকে। ককিয়ে উঠল, বিশ্বাস করো, ডিউক, ও চুরি করেনি! করেনি!
আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসে কি এসে যায়, বলো? ওরা ওকে চিনতে পেরেছে। ক্যারাভানের কাছে নাকি ঘুরঘুর করছিল, তার কিছুক্ষণ পরেই চুরি যায় গহনাগুলো।
ঘুরঘুর করেনি, প্রতিবাদ করল ভিকি। আমাকে তো বলেছে রানুষ কিছু মুখে থালাবাসনগুগেড়িয়ে চলেছে কালই, ওপথে পাহাড়ে গিয়েছিল। আর ঘুরঘুর করলেই কি প্রমাণ হয়ে গেল সে-ই চুরি করেছে? কেউ নিতে দেখেছে?
ওর স্যাডল ব্যাগে বাকলস পাওয়া গেছে।
ছিটকে সরে এল ভিকি। কড়া চোখে তাকাল স্বামীর দিকে।
তুমিও বিশ্বাস করো এসব? জুলিয়ান গহনা চুরি করেছে?
দীর্ঘ এক মুহূর্ত স্ত্রীর চোখে চোখে তাকিয়ে রইলেন শিক্ষক। করতে তো চাই না, ভিকি। কি বলব, বলো?
কেউ আর কিছু বলার আগেই বাইরে গাড়ির শব্দ হলো। জুলিয়ানকে নিয়ে ঘরে ঢুকল শেরিফ।
ছুটে এল ছেলেটা। ফুপুকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। তাকে থামানো দূরে থাক, তার সঙ্গে যোগ দিল আরও ভিকি।
কঠোর দৃষ্টিতে তাকাল শেরিফ। জিনিসগুলো কোথায় লুকিয়ে রেখেছে বলল না, এত চেষ্টা করলাম। ওরা বলেছে, গহনাগুলো ফেরত পেলেই খুশি। চার্জ তুলে নেবে। কালই চলে যাচ্ছে ওরা। এর মাঝে বের করে দিলে বেঁচে যাবে জুলিয়ান।
কসম খোদার, ফুপু, কাঁদতে কাঁদতে বলল জুলিয়ান, আমি চুরি করিনি। কোথায় আছে জানি না।
কি করিসনি যে সে তো জানিই আমি, আরও জোরে ভাইপোকে জড়িয়ে ধরল ভিকি। চিবুক ধরে মুখটা তুলে জিজ্ঞেস করল, খিদে পেয়েছে? খেয়েছিস কিছু?
মাথা নাড়ল জুলিয়ান।
ভাল মানুষকে চোর বলে ধরে নিয়ে যায়, আর খাওয়া দেবে ওরা, শেরিফের দিকে তির্যক দৃষ্টি হেনে জুলিয়ানকে নিয়ে রান্নাঘরে চলে গেল ভিকি।
এগিয়ে গেল কিশোর। নিজের পরিচয় দিল।
গোয়েন্দা, হাহ! বিদ্রূপ ছড়িয়ে পড়ল শেরিফের মুখে।
গম্ভীর হয়ে গেল কিশোর। পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে। দিল। এই যে এটা দেখুন। তাহলেই বুঝবেন।

লস অ্যাঞ্জেলেসের পুলিশ চীফ ইয়ান ফ্লেচারের লেখা সার্টিফিকেট দেখে নরম হয়ে গেল শেরিফ।
ডোন্ট মাইণ্ড। চোর-ছ্যাচড়দের নিয়ে থাকতে থাকতে বদমেজাজী হয়ে গেছি।
শেরিফকে সব খুলে বলল কিশোর। মাঝে মাঝে কথা ধরিয়ে দিল মুসা আর রবিন। রহস্যময় চিঠিটা দেখাল কিশোর।
হুম, গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়ল শেরিফ। তো, তুমি বলছ। ছেলেটাকে কেউ ফাঁদে ফেলেছে?
তাতে কোন সন্দেহ নেই। কাল রাতে পিন্টো ঘোড়া নিয়ে এসেছিল যে লোকটা, সে-ই স্যাডল ব্যাগে বাকলস রেখে গেছে, আমি শিওর। এসেছিলই এজন্যে।
কিন্তু জুলিয়ানকে বিপদে ফেলে কার কি লাভ?
সেটাই তো বুঝতে পারছি না। তাহলে তো রহস্যেরই সমাধান হয়ে যেত এতক্ষণে।
তা ঠিক। তোমার কথায় যুক্তি আছে, কিশোর পাশা, কিন্তু ছেলেটাকে তো ছাড়তে পারি না। সন্দেহের অভিযোগে আটক করতে হয়েছে। ওরা গহনা ফেরত না পেলে, চার্জ না তুললে কিছুই করতে পারছি না।
শেরিফকে অনুরোধ করে লাভ নেই, বুঝতে পারল কিশোর। ভাবনায় পড়ে গেল। হাতে সময় আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা, এর মাঝে রহস্যের সমাধান না করতে পারলে খুব অসুবিধে হবে জুলিয়ানের।
আপনার মিসেসকে একটু ডাকুন তো, প্লীজ, ডিউকের দিকে চেয়ে বলল শেরিফ। কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করি।
উঠতে যাচ্ছিলেন শিক্ষক, হাত তুলে বাধা দিল মুসা। আপনি বসুন। আমিই যাই।
ভিকিকে ডেকে আনল মুসা।
তুমি গিয়ে রান্নাঘরে বসো, মুসাকে অনুরোধ করল শেরিফ। কেন, বুঝতে পারল মুসা। জুলিয়ানকে পাহারা দিতে বলছে।
আবার এসে রান্নাঘরে ঢুকল সে। আরে, জুলিয়ান কই? অর্ধেকটা স্যাণ্ডউইচ পড়ে আছে প্লেটে, দুধের গেলাসটায় তিন ভাগের এক ভাগ দুধ। শেষ করেনি।
ছুটে জানালার কাছে চলে এল মুসা। বাগানের শেষ মাথায় পৌঁছে গেছে জুলিয়ান, আস্তাবলের দিকে ছুটছে।
পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে মুসাও দৌড় দিল।
সে আস্তাবলের কাছে যাওয়ার আগেই ঘোড়ায় চেপে বেরিয়ে গেল জুলিয়ান।
ছুটে আস্তাবলে ঢুকল মুসা। সামনে যে ঘোড়াটা পেল সেটাতেই জিন পরিয়ে এক লাফে চড়ে বসল।
অনেক এগিয়ে গেছে পিন্টো। ওটাকে ধরা সহজ হবে না। যতটা জোরে সম্ভব ঘোড়া ছোটাল মুসা।

চলতে চলতে একটা প্রশ্ন জাগল মনে। কোথায় যাচ্ছে জুলিয়ান? দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল মুসা। জুলিয়ানকে ধরার চেষ্টা করবে না, পিছে পিছে গিয়ে দেখবে ছেলেটা কোথায় যায়।
প্রায় এক ঘণ্টা ধরে অনুসরণ করে চলল মুসা। ইতিমধ্যে দু একবার পেছনে ফিরে তাকিয়েছে জুলিয়ান। একই গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। মা ছোট ছোট পাহাড়ের সারি পেরিয়ে এল ওরা। রিসোর্টের সীমানার খুঁটি দেখা যাচ্ছে। আর কিছুদূর গেলেই শুরু হবে সুপারস্টিশন মাউন্টেইন।
পর্বতের ছায়ায় পৌঁছে ঘোড়া থেকে নামল জুলিয়ান। চারপাশে পাহাড়ে ঘেরা গোল একটা উপত্যকায় টেনে নামাল ঘোড়াটাকে। প্রচুর সবুজ ঘাস আছে ওখানে। তারপর পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল ওপরে।
জুলিয়ানের দেখাদেখি মুসাও তার ঘোড়া বাঁধল গোল উপত্যকায়। পিছু নিল।
চূড়ায় উঠে ফিরে তাকাল জুলিয়ান। ঠোঁটে আঙুল রেখে কোনরকম শব্দ না করতে ইশারা করল মুসাকে। উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল।
মানুষের কণ্ঠ কানে এল মুসার। ওপাশে নিচে কারা যেন কথা বলছে। শাবল-কোদালের আওয়াজ। মাটি খুঁড়ছে মনে হয়।
এক মুহূর্ত স্থির হয়ে থাকল মুসা, তারপর বাকি কয়েক ফুট প্রায় ছুটে পেরোল। চূড়ায় এসে হুমড়ি খেয়ে শুয়ে পড়ল জুলিয়ানের পাশে।
নিচে একটা গিরিখাদ। বড় বড় পাথরের চাঙড় পড়ে রয়েছে। ঝোঁপঝাড় আর গাছপালা এত ঘন, ভাল করে না তাকালে খাদটা চোখে পড়ে না।
দু-জন লোক কথা বলছে আর কাজ করছে। একজন লম্বা, লালচে চুল। অন্যজন তার চেয়ে বেঁটে, কালো চুল। গিরিখাদের এক দিকের দেয়াল খুঁজছে ওরা। আরেক দিকে খানিকটা উঁচুতে খোলামত জায়গায় একটা কাঠের কেবিন।
ওদের একটা ঘোড়া দেখে চমকে গেল মুসা। সাদা-কালো পিন্টো, অবিকল জুলিয়ানের ঘোড়াটার মত দেখতে।
নীরবে পরস্পরের দিকে তাকাল ওরা। আবার চোখ ফেরাল খাদের দিকে। কয়েক মিনিট দেখে জুলিয়ানকে ইশারা করল মুসা, সরে আসার জন্যে। এপাশে কয়েক ফুট নেমে এল, কথা বললে যেন লোকগুলো শুনতে না পায়।
কে ওরা? নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল মুসা।
বোধহয় প্রসপেক্টরস।
রিসোর্ট এলাকার মধ্যে? জুলিয়ানও অবাক হলো।
চারপাশে তাকিয়ে দেখল মুসা। ল্যাণ্ডমার্ক দেখা যায়। প্রথম যেদিন টনি আর জিনার সঙ্গে বেরিয়েছিল, সেদিন ওই চিহ্ন চিনিয়েছে ওরা।
হ্যাঁ, রিসোর্ট এলাকা। ওই যে চূড়াটা, ওখান পর্যন্ত সীমানা।

সোনা খুঁজছে বোধহয় ব্যাটারা, ক্লান্ত হাসি ফুটেই মিলিয়ে গেল জুলিয়ানের ঠোঁটে। পেলে তো একটা কাজের কাজই করে ফেলবে।
আগে কখনও ওদেরকে দেখেছ এখানে?
নার্ভাস ভঙ্গিতে নড়ল জুলিয়ান, চোখ সরিয়ে নিল। ঘুরিয়ে জবাব দিল, দেখতে এসেছি কয়েকবার।
ওরা দেখেছে তোমাকে? কিছু গোপন করছে জুলিয়ান, বুঝতে পারল মুসা।
এক মুহূর্ত চুপ করে রইল জুলিয়ান। একবার। এখানে না। ওদিকে আরেকটা উপত্যকা আছে, চারপাশে পাহাড়, ওখানে। ঘোড়া নিয়েই নামলাম, দেখতে গেলাম কি করছে। রেগে গেল ওরা, লম্বুটা তো গুলিই করে বসল। সরে গেছি আগেই, তাই লাগেনি। তারপর বেশ কিছুদিন আর যাইনি ওদিকে।
গুলি করেছে? বিশ্বাস করতে পারছে না মুসা।
মাথা ঝাঁকাল জুলিয়ান। আমি কিছু করিনি। খালি দেখতে গিয়েছিলাম, কসম।
আমি বিশ্বাস করছি তোমার কথা। ওদিকেও কি সোনাই খুঁজছিল?
আবার মাথা ঝাঁকাল জুলিয়ান। প্রসপেক্টররা পাহাড়ে যা করে, তা-ই করছিল। বহুবার লুকিয়ে দেখেছি।
চুপ করে কিছু ভাবল মুসা। প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল, আজ কোথায় যাচ্ছিলে? কাউকে কিছু না বলে চুরি করে যে পালিয়ে এলে?
পাতলা চোয়ালদুটো দৃঢ়বদ্ধ হলো। আবার সরিয়ে নিল চোখ। ঘুরতে যাচ্ছিলাম।
চুপ করে রইল মুসা। অপেক্ষা করছে।
পালিয়ে যাচ্ছিলাম, অবশেষে স্বীকার করল জুলিয়ান। আর। ফিরে যাব না রিসোর্টে।
সেটা কি ঠিক হবে? তোমার ফুপা-ফুপুর কথা ভাবলে না। ওরা তোমাকে কত ভালবাসে।
ফুপা আমাকে মায়ের কাছে পাঠিয়ে দেবে। ভাবছে, আমি চোর। শেরিফ বলেছে, আমি খুব খারাপ ছেলে। কসম খেয়ে বলেছি, আমি চুরি করিনি। কোত্থেকে ফিরিয়ে দেব? বড় বড় চোখ দুটোতে অশ্রু টলমল করে উঠল। হয়তো পিন্টোকেও কেড়ে নেবে আমার কাছ থেকে। এসব তো অন্যায়। ওকে কেন কেড়ে নেবে আমার কাছ থেকে, বলো? ও তো আমার, চুরি করে আনিনি।
ছেলেটার দুঃখ বুঝতে পারছে মুসা। কিন্তু পালিয়ে যে যেতে চাইছ, এতে তো সন্দেহ আরও বাড়বে ওদের। কদ্দিন ওদের চোখ এড়িয়ে বাঁচতে পারবে?
চুপ করে রইল জুলিয়ান। জবাব দিতে পারল না।
এই প্রসঙ্গ বাদ দিল মুসা। জানাল, আগের রাতে কি ঘটেছে, কি করে আরেকটা পিন্টো ঘোড়াকে অনুসরণ করে নালায় গিয়ে মরতে বসেছিল কিশোর।

গিরিখাদের পিন্টোটার কথা উল্লেখ করে জুলিয়ান বলল, বোধহয় ওটাই।
হাসল মুসা। আমারও তাই ধারণা। আচ্ছা, এখান থেকে কোথাও যায় না ওরা? সরে না?
সরে। কেন?
ওই কেবিনটায় ঢুকে দেখতে চাই। সব গোলমালের মূলে ওরা হলে, ওখানে কিছু সূত্র পাবই। আমি না বুঝলেও, কিশোরকে বললে বুঝবে, কেন তোমাকে ফাসাতে চাইছে ওরা।
এক কাজ করলেই পারি, দুষ্টু হাসি ফুটল জুলিয়ানের ভেজা চোখের তারায়। আমাকে তাড়া করুক ওরা। এই সুযোগে তুমি নেমে ঢুকে পড়ো কেবিনে।
মাথা নাড়ল মুসা। ভীষণ রিস্কি হয়ে যাবে.. কথা শেষ করতে পারল না সে, তার আগেই ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করেছে জুলিয়ান।
বাধা দেয়ার সুযোগই পেল না মুসা। এক লাফে ঘোড়ায় চড়ে ছুটল জুলিয়ান। এদিকে ফিরে হেসে হাত নাড়ল।
এ দ্বিধা করছে মুসা। কেবিনে ঢুকতে তাকে বাধ্য করল জুলিয়ান। মস্ত ঝুঁকি নিয়েছে সে, এখন আর পিছিয়ে আসা চলবে না মুসার।
আর জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলল মুসা, আবার উঠে এল চূড়ায়। উপুড় হয়ে শুয়ে তাকিয়ে রইল নিচের দিকে।
গিরিপথের মত একটা জায়গা দিয়ে ঢুকতে হয় গিরিখাদে। পথের মুখে দেখা দিল জুলিয়ান। কেউ দেখল না তাকে। তাদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে চেঁচিয়ে উঠল সে। কি বলল, স্পষ্ট বোঝা গেল না দূর থেকে। তবে চোর আর সোনা এই দুটো শব্দ কানে এল।
হাত থেকে বেলচা ফেলে কোরালের দিকে দৌড় দিল লোকদুটো। দেখতে দেখতে জিন পরিয়ে চেপে বসল ঘোড়ায়। জুলিয়ানকে তাড়া করল।
ওরা গিরিপথে অদৃশ্য হতেই উঠে পড়ল মুসা। দ্রুত গাছের আড়ালে আড়ালে নেমে চলে এল গিরিখাদের পাড়ে।
খাদের দেয়ালে অসংখ্য গর্ত, বোঝা গেল, লোকগুলোই খুঁড়েছে। ভালমত দেখার সময় নেই, একবার নজর বুলিয়েই কেবিনের কাছে চলে এল সে। নি।
দরজার কব্জায় তেল পড়েনি বহুদিন, ধাক্কা দিতেই কিচকিচ করে উঠল। ঢুকে আবার দরজা বন্ধ করে দিল মুসা। আসবাবপত্র তেমন কিছু নেই। একমাত্র জানালাটার কাছে রয়েছে একটা টেবিল আর দুটো টুল। দুটো চারপায়া, খাড়া করে ঠেস দিয়ে রাখা হয়েছে দেয়ালের সঙ্গে। আনাড়ি হাতে তৈরি একটা শেলফে রান্নার সরঞ্জাম আর খাবার। বেশির ভাগই টিনজাত খাদ্য।

দরজার পাশে পড়ে আছে একটা ট্রাংক। ওটার দিকেই এগোল মুসা। ডালা তুলেই স্থির হয়ে গেল।
এলোমেলোভাবে ফেলে রাখা, কাপড়ের ওপর পড়ে আছে। অনেকগুলো গহনা।
> কোন সন্দেহ নেই, চোরাই মাল। এগুলোই চুরি করে আনা হয়েছে ক্যারাভান থেকে। দুটো একরকম হার দেখেই বোঝা গেল সেটা। ব্রেসলেট আছে তিনটে, দুটো আঙটি এবং আরও কিছু গহনা।
সাবধানে গহনাগুলো সরিয়ে রেখে কাপড়ের তলায় খুঁজতে শুরু করল মুসা। রঙচটা জিনসের একটা প্যান্ট টান দিতেই তলায় পাওয়া গেল লাল শার্ট, পিঠের কাছে খানিকটা জায়গা ছেঁড়া, কাপড়ই নেই। ওই শার্টের ভেতরেই পেঁচানো আরও দুটো জিনিস পাওয়া গেল, একটা চিনতে পারল, আরেকটা পারল না। তবে দুটোই যে রিমোট কমাণ্ডার, এটা বুঝতে অসুবিধে হলো না।
সরুটা বোমা ফাটানোর যন্ত্র; আর চ্যাপ্টা, অপেক্ষাকৃত বড়টা কোন যন্ত্রের কমাণ্ডার, চিনল না। তবে জটিল কোন ইলেকট্রনিক যন্ত্রের হবে, সন্দেহ নেই।
তাহলে এই ব্যাপার।
বসে পড়ে ভাবতে শুরু করল মুসা। কি করবে এখন? জিনিসগুলো নিয়ে যাবে পোঁটলা বেঁধে? নাকি শুধু শার্ট আর গহনাগুলো নেবে? সিদ্ধান্ত নেয়া কঠিন। ইস্, এখন কিশোর এখানে থাকলে ভাল হত। সঠিক কাজটা করতে পারত সে।
মুসার মনে হলো, জিনিসগুলো যেখানে রয়েছে সেখানে থাকলেই ভাল। নিজের চোখে এসে দেখে যাক শেরিফ। কিন্তু আরেকটা সমস্যা আছে। জুলিয়ানকে ধরতে না পারলে হুঁশিয়ার হয়ে যাবে দুই চোর। জিনিসগুলো এখান থেকে সরিয়ে ফেলতে পারে। লোকজন নিয়ে ফিরে এসে তখন হয়তো আর কিছুই দেখাতে পারবে না মুসা। লজ্জায় পড়বে।
হঠাৎ, বাইরে শব্দ শোনা গেল। ঘোড়ার নালের শব্দ। দ্রুত এগিয়ে আসছে।
সেরেছে! লাফিয়ে উঠে জানালার কাছে ছুটে গেল মুসা। ধূলিধূসরিত জানালার নোংরা কাঁচে নাক ঠেকিয়ে বাইরে তাকাল। সর্বনাশ! লোক দু-জন ফিরে আসছে। জুলিয়ান নেই সঙ্গে।
বিপদে পড়া গেল, রিকি, লম্বা লোকটা বলল। গেল কই বিছুটা?
আস্ত কয়েটির বাচ্চা, গাল দিল বেঁটে। কি করি এখন বল তো?
কোরালের দিকে চলেছে দু-জনে। ওর কথা কেউ বিশ্বাস করবে না, বলল বটে, কিন্তু জোর নেই গলায়। সকালে নাকি শেরিফ ওকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, চুরির দায়ে। একেই বলে কপাল, চুরি করলাম আমরা, আর ফসল কিনা... হা হা করে হাসল লোকটা।

কুৎসিত হাসিতে যোগ দিল না রিকি। আরও গম্ভীর হয়ে বলল, অত হেসো না, পেক। ওই তিনটে বিচ্ছুর কথা ভুলে যেয়ো না, রকি বীচ থেকে যেগুলোকে দাওয়াত করে আনা হয়েছে। হেলাফেলা কোরো না ওদের। বসের কাছে শুনলাম, ওরা ডেঞ্জারাস। একবার যার পেছনে লেগেছে, তার সর্বনাশ করে ছেড়েছে।
কি করতে বলো তাহলে? প্রশ্ন করল পেক। বিচ্ছুটা যে আবার এসেছিল, এখানে আমাদের খুঁড়তে দেখেছে, বসকে বলব? যাব র‍্যাঞ্চে?
মাথা নাড়ল রিকি। না, আজ রাতে তো আসবেই বস এখানে, বলল না? খোঁড়া কদ্দূর হয়েছে দেখতে। সঠিক জায়গাটা খুঁজে পাইনি। আমরা এখনও।
তবে কাছাকাছি পৌঁছেছি। নুড়িদুটো পেলাম, সেটাই প্রমাণ।
সেটা আমারও মনে হচ্ছে। কবে থেকেই তো বলছি এই গর্তে এসে খুঁজতে, তুমি আর বসই তো রাজি হচ্ছিলে না। পানিতে ধুয়ে মাটি সরে গেলে শিরা থেকে গড়িয়ে পড়বে সোনার নুড়ি, এটা তো সহজ কথা। আর গড়িয়ে একটা দিকেই পড়ে জিনিস, নিচের দিকে।
সে তো আমিও জানি। আমার প্রশ্ন হলো, খনিটা আছে কোথায়? ওটা খুঁজে না পেলে এত কষ্ট সব..দাঁড়াও, আরও খুঁড়ব। আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত দেখি কি পাওয়া যায়।
খিদে পেয়েছে আমার, বলল রিকি। চলো, আগে খেয়ে নিই।
কোরালে ঘোড়া রেখে কেবিনের দিকে রওনা হলো দু-জনে। কথা বলছে এখনও। কিন্তু সে-সবে কান নেই আর মুসার। আটকা পড়েছে। বেরোতে গেলেই এখন ওদের চোখে পড়বে। দরজা ছাড়া বেরোনোরও আর কোন পথ নেই। আর খাবার বের করার জন্যে এখন ঘরে ঢুকলেই হবে সর্বনাশ।
কিছুটা এগিয়ে মোড় নিল রিকি আর পেক। খাদের দিকে চলল। ব্যাপার কি? নতুন কিছু চোখে পড়ল নাকি? ওদিকে যাচ্ছে কেন?
খানিক পরেই বোঝা গেল, কেন গেছে। ওখানেই খাবার রেখেছে, খাদের নিচে পাথরের ওপর। যাক, একটা ভয় আপাতত গেল। খাবারের জন্যে আর ঘরে ঢুকতে আসবে না ওরা।
তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে আবার বেলচা তুলে নিল দু-জনে। খুঁড়তে শুরু করল।
জানালার কাছে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল সে। ঢোকার সময় তো ঢুকেছে, এখন বেরোয় কিভাবে? দরজা কিংবা জানালা যেদিক দিয়েই বেরোক, ওদের চোখ এড়াতে পারবে না। কিন্তু এখানে কতক্ষণ বসে থাকবে? আর থাকাটাও যে নিরাপদ, তা-ও নয়। একসময় না একসময় কেবিনে ঢুকবেই ওরা, দেখে ফেলবে ওকে।

সারা ঘরে আরেকবার চোখ বোলাল মুসা। ট্রাংকের কাপড় আবার আগের মত করে ভরে গহনাগুলো রেখে দিল তার ওপর। ডালা নামিয়ে রাখল।
তারপর এসে একটা টুলে বসে ভাবতে লাগল, কিন্তু বেরোনোর কোন উপায় দেখল না।
তাহলে এ ঘরেই কোথাও লুকিয়ে থাকতে হবে। ছোট্ট ঘর। লুকানোর জায়গা নেই। কয়েকটা কম্বল অবহেলায় স্তূপ হয়ে পড়ে আছে। এককোণে। আশা হলো তার। ওগুলোর নিচে লুকালে হয়তো চোখে পড়বে না কারও। লুকিয়ে থাকবে, তারপর লোকগুলো ঘুমিয়ে পড়লে কোন এক সুযোগে বেরিয়ে যেতে পারবে।
লুকানোর জায়গার মোটামুটি একটা ব্যবস্থা করে জানালার কাছে ফিরে এল মুসা। দু-জনের কাজ দেখতে লাগল বসে বসে। আর কিছু করার নেই। অলস ভঙ্গিতে পাহাড়ের গা খুঁচিয়ে চলেছে ওরা। সোনা! হ্যাঁ, এখানকার সমস্ত গোলমালের মূলে ওই সোনার খনি।
ডাক্তার জিংম্যানের নামটা বার বার ঘুরেফিরে আসছে মনে। মিস্টার উইলসনের সম্পত্তি কেন কিনতে চেয়েছিল সে, এখন বোঝা যাচ্ছে।
এক ঘণ্টা কাটল, আরও এক ঘণ্টা। খোঁড়ায় বিরাম নেই রিকি আর পেকের। মাঝে মাঝে একটা পুরানো মেসকিটের ছায়ায় বসে জিরিয়ে নিচ্ছে। গাছটার পাশেই ছোট একটা ঝর্না। তৃষ্ণার্ত চোখে ওটার দিকে তাকাচ্ছে মুসা। গরমে, বদ্ধ এই নোংরা ঘরে বসে থেকে থেকে ভয়ানক তেষ্টা পেয়েছে তার। গলা শুকিয়ে কাঠ।
সূর্য অস্ত যাওয়ার আগের ক্ষণে লম্বা লম্বা ছায়া পড়ল উপত্যকায়। কাজ থামাল লোকগুলো। শাবল-বেলচা ফেলে দিয়ে পা বাড়াল কেবিনের দিকে।
দুরুদুরু করতে লাগল মুসার বুক। তাড়াতাড়ি উঠে এগোল লুকিয়ে পড়ার জন্যে। কম্বলের তলায় অন্ধকারে ঢুকে গেল।
ঘরে ঢুকল দুই প্রসপেক্টর। খাবারের টিন খুলতে খুলতে আলোচনা চালাল। বেশির ভাগই জুলিয়ানের কথা। ওরা অসতর্ক থেকেছে বলে বস যে ভীষণ বকবে, সেজন্যে অস্বস্তি বোধ করছে।
দম বন্ধ হয়ে আসছে মুসার, এই গরমে কম্বলের মধ্যে থাকাটা এক ভয়ানক অস্বস্তির ব্যাপার। আর যখন পারে না সে, অসহ্য হয়ে উঠেছে, তখন বেরোল লোকগুলো। সঙ্গে সঙ্গে একদিক ফাঁক করে নাকমুখ বের করে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।
বাইরে আগুন জ্বালানোর শব্দ। রান্নার ব্যবস্থা হচ্ছে। একটু পরেই শিকে গাঁথা ঝলসানো মাংসের সুগন্ধ এসে কেবিনেও ঢুকল। জিভে পানি এসে গেল মুসার, মোচড় দিয়ে উঠল পেটের ভেতর। দুপুরে প্রায় কিছুই খায়নি, প্রচণ্ড খিদে

পেয়েছে। কিন্তু করবেটা কি? বাইরে অবশ্য এখন অন্ধকার, কিন্তু তবু বেরোতে পারবে না, চোখে পড়ে যাবেই। দরজার কাছেই বসেছে ওরা।
কম্বলের তলায় অসহ্য লাগছে। ঘামছে। বেরিয়ে হাত-পা ঝাড়া দেয়ার লোভটা সামলাতে পারল না। আর বেরোতে গিয়েই বাধাল বিপত্তি। তার রাইডিং বুটে বেধে গেল কম্বলের ভেঁড়া একটা জায়গা, খেয়াল করল না সে। লাগল হ্যাঁচকা টান। হুমড়ি খেয়ে গিয়ে পড়ল একটা চারপায়ার ওপর। দড়াম করে পুরো বাড়ি কাঁপিয়ে পড়ল চারপায়াটা।
সঙ্গে সঙ্গে হই-চই শোনা গেল বাইরে। ঝটকা দিয়ে খুলে গেল। দরজা।
দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল মুসা।
লণ্ঠন হাতে ঢুকল একজন। দেখে ফেলল মুসাকে।
রিকি, হাসি হাসি গলায় পেঁচিয়ে ডাকল পেক, দেখে যাও এসে। একটা ছুঁচো।
মেরে ফেলল। মাড়িয়ে দাও পা দিয়ে…
আরে, ওই ছুচো না, মানুষ ছুঁচো। জলদি এসো।
পিকচুকল। বাহার। ঘরে ঢুকতম প্রতিবেশী এবং হুম। তো
কঙ্কার জিংম্যান। উইহকারী না এটা তো চিঠিকে
কথা শেষ হলো না তার। ঘরে ঢুকল আরেকজন। ডাক্তার জিংম্যান! উইলসনের নিকটতম প্রতিবেশী এবং বন্ধু।
পিচ্চি হোমসটার সহকারী না এটা? বলল ডাক্তার। হুম। তো, মিয়া, এখানে কি মনে করে? তোমার দোস্ত তো চিঠিকেও কেয়ার করল না, বিছেকেও ভয় পেল না। সাহস থাকা ভাল। তবে বেশি সাহস…
তিন বিচ্ছুর একটা নাকি এটা, বস? জিজ্ঞেস করল রিকি।
আবার জিজ্ঞেস করে, গাধা কোথাকার! চেনো না? তীর ছোঁড়ার সময় কি চোখ বুজে ছিলে?
হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে। এটাই তো ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল। অন্য দুটোকে। নইলে সেদিন পালের গোদাটা যেত। না মরলেও আধমরা তো হতই।
হতে তো কত কিছুই পারত, কম সুযোগ মিস করেছ? এটা করলে ওটা করলে, সব ফুস আর ফাস! নালায় টেনে আনলে, এত নিরালা জায়গা, একলা পেলে, তা-ও কিছু করতে পারলে না, কর্কশ শোনাল জিংম্যানের কণ্ঠ।
সেটা কি আমার দোষ? পানি আসা পর্যন্ত থাকলই না, উঠে চলে গেল।
যাতে না যেতে পারে সেরকম ব্যবস্থা করতে পারতে।
এত অভিযোগ শুনতে ভাল লাগল না রিকির, সে-ও রেগে গেল। আমাকে একা বলো কেন? সুযোগ তো তুমিও পেয়েছ। ধাক্কা দিতে গিয়েছিলে গাড়িকে, পেরেছ?
ঠিক নেমে চলে গেল পথের পাশে…

দূর, বিরক্ত হয়ে হাত নাড়ল পেক, শুরু করল ঝগড়া! অহেতুক তর্ক না করে এটাকে কি করব, তাই বলো।
ভুরু কুঁচকে ভাবল এক মুহূর্ত জিংম্যান। আপাতত হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখে। পরে ভেবেচিন্তে একটা দুর্ঘটনা ঘটানো যাবে। ঢুকে যখন পড়েছে, বেরোতে আর দিই কি করে? মুসার হাত চেপে ধরল সে। সহকারীদের বলল, দড়ি আনো।
লম্বা শ্বাস টানল মুসা। অপেক্ষা করছে। আড়চোখে দেখল, দরজার কাছ থেকে সরে আসছে পেক। দড়ি আনতে ঘরের কোণে গেল রিকি। এই-ই সুযোগ। চোখের পলকে বুট তুলে গায়ের জোরে লাথি মারল ডাক্তারের বা পায়ের হাটুর ওপর।
আঁউ! করে উঠল ডাক্তার। ঢিলে হয়ে গেল আঙুল।
এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিল মুসা। মাথা নিচু করে ছুটে গেল পেকের পেট সই করে। তার নিগ্রো-খুলির বদনাম আছে। রবিন তো বলে, তার মাথায় আছড়ে পাকা নারকেল ভাঙা যায়, এত শক্ত। কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়। তার মাথার গুতো যে একবার খেয়েছে, সহজে ভুলবে না।
সেই অভিজ্ঞতা পেকেরও হলো। তো খেয়ে বাপরে! বলে চেঁচিয়ে উঠে ধাক্কা খেল গিয়ে হাঁটু চেপে ধরে রাখা বসের গায়ে। তাকে নিয়ে পড়ল মেঝেতে। হাত থেকে পড়ে ভাঙল লণ্ঠন, আলো নিভে গেল।
দরজার দিকে দৌড় দিল মুসা। লাফিয়ে এসে নামল চৌকাঠের বাইরে।
ক্যাম্পফায়ারের আলোতে নাচছে ঝোঁপঝাড় আর গাছের ছায়া। দেখার সময় নেই, মাথা নিচু করে ছুটছে মুসা। ছোট ঝর্নাটার ধার দিয়ে এসে ঢুকল, একটা ঘন ঝোপে। থামল। হাপরের মত ওঠানামা করছে। বুক। ফিরে তাকাল। সাময়িক মুক্তি পেয়েছে বটে, কিন্তু এই পাহাড়ের ফাঁদ থেকে বেরোতে পারবে কিনা সন্দেহ।
বেরিয়ে এসেছে তিন বদমাশ।
গিরিপথের মুখ আটকাও! আগুনে আরও লাকড়ি ফেলো! টর্চ আনো! ওকে পালাতে দেয়া যাবে না! চিৎকার করে একের পর এক নির্দেশ দিয়ে চলল জিংম্যান।
খুব সাবধানে ঝোঁপের ভেতরে হামাগুড়ি দিয়ে এগোল মুসা। বৃষ্টিকে ধন্যবাদ, ডালপাতা ভিজিয়ে রেখেছে। শুকনো নয়, ফলে খড়খড় শব্দ হচ্ছে না। অন্ধকার সয়ে এসেছে চোখে। সামনে দেখল পাথুরে পাহাড়ের ঢাল। এগোল সেদিকে। বড় পাথরের চাঙড়ের আড়াল, নিদেনপক্ষে একটা গর্ত পেলেও লুকিয়ে পড়া যায়।
ভাগ্য ভাল বলতে হবে, দুটোই পেল একসঙ্গে। চ্যাপ্টা একটা পাথর কাত হয়ে আছে, একদিকে সামান্য উঁচু, তার নিচে পেয়ালা আকৃতির ছোট একটা গর্ত। কোনমতে জায়গা হবে শরীরটার। আর কোন বিকল্প নেই। ওর মধ্যে শরীর ঢুকিয়ে দিল সে। মাথা রইল এক পাড়ে ঠেকে, অন্য পাড়ে পা। পেছনটা গর্তের

তলায়। মাটি গরম, মরুর ঠাণ্ডা রাতে বেশ আরাম লাগল এই উষ্ণতায়। তাপমাত্রার কি দ্রুত ওঠানামা এসব অঞ্চলে, ভাবলে অবাক লাগে। এই তো, খানিক আগে গরমে কম্বলের নিচ থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে হাঁসফাঁস করছিল, আর এরই মধ্যে আবহাওয়া এতটাই শীতল হয়ে গেল, গরম এখন ভাল লাগছে।
ওকে গরুখোঁজা খুঁজছে তিনজন লোক। তাদের চেঁচামেচি আর নানারকম আওয়াজ স্পষ্ট কানে আসছে। তারপর হঠাৎ সব নীরব হয়ে গেল। বড় বেশি নীরব। কিছু একটা ঘটেছে।
আস্তে মাথা তুলল মুসা। কানে এল ঘোড়ার নালের খটাখট আর কুকুরের ঘেউ ঘেউ। তার নাম ধরে চিৎকার করে ডাকল কেউ।
কিশোর! লাফ দিয়ে গর্ত থেকে বেরিয়ে পড়ল মুসা। ছুটল আবার ঝোঁপের ভেতর দিয়ে।
সবাই এসেছে। কিশোর, রবিন, জিনা, টনি, মিস্টার ডিউক, শেরিফ, সব্বাই। টাইগারও রয়েছে ওদের সঙ্গে। কুকুরটা আগে এগিয়ে এল। লেজ নাড়তে নাড়তে চেটে দিল মুসার হাত। তাতে মন ভরল না, লাফিয়ে উঠে তার বুকে দুই পা তুলে দিয়ে গাল-নাক চাটতে শুরু করল।
আরে, থাম, থাম, আলতো ধাক্কা দিয়ে টাইগারের মুখ সরিয়ে দিল মুসা।
টনি, মিস্টার ডিউক আর শেরিফ গিয়ে ঘিরে ধরল তিন অপরাধীকে। টনির হাতে রাইফেল, শেরিফের হাতে পিস্তল।
বাঁধুন ওদের, চেঁচিয়ে বলল মুসা। পালাতে দেবেন না। যত নষ্টের মূল এই তিন ব্যাটা।
জানি, বলল কিশোর। ঘণ্টাখানেক আগে রিসোর্টে পৌচেছে। জুলিয়ান। তোমার বিপদের কথা জানাল। শেরিফকে ফোন করলাম। তারপর ছুটে এলাম এখানে।
জুলিয়ান কই?
পাহাড়ের ওপাশে, হাত তুলে দেখাল রবিন। ঘোড়াগুলো পাহারা দিচ্ছে।
শেরিফ জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছিল, মুসা?
এটা রিসোর্টের এলাকা না? পাল্টা প্রশ্ন করল মুসা।
হ্যাঁ।
তাহলে অনেকগুলো অপরাধের অভিযোগে এদের গ্রেপ্তার করতে পারেন আপনি। অনধিকার চর্চা থেকে খুনের চেষ্টা, সবই করেছে ওরা এখানে। চুরি-চামারিও করেছে।
সমস্ত প্রমাণ স্বচক্ষে দেখল শেরিফ। আর কোন আশা নেই দেখে অপরাধ স্বীকার করল ডাক্তার জিংম্যান। জানাল, জুলিয়ানকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্যেই ওরা নানারকম অন্যায় করে সেই দোষ তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছে।

জুলিয়ানের ওপর মিস্টার উইলসনকে খেপিয়ে তোলার জন্যে বাংলোতেও আগুন দিয়েছে রিকি, অবশ্যই বসের নির্দেশে।
কিশোর জিজ্ঞেস করল, ওটাই আসল লস্ট ডাচম্যান মাইন, তাই না?
হ্যাঁ, ওখানেই কোথাও আছে খনিটা, জবাব দিল টনি। ভালমত খুঁজলে বেরিয়ে পড়বে।
সোনা আছে?
থাকতে পারে। সে সম্ভাবনা আছে বলেই ঝুঁকি নিয়ে এত সব কুকর্ম করেছে ওরা, জিংম্যান আর তার দুই সহকারীকে দেখাল টনি।
এ-ব্যাপারে কিছু বলার আছে? জিংম্যানকে জিজ্ঞেস করল শেরিফ।
কি আর বলব, হতাশ কণ্ঠে বলল ডাক্তার। পাইনি কিছু। তবে। এখানেই আছে কোথাও। গত বছর দুটো নুড়ি পেয়েছিলাম, বেশ বড়। বুঝলাম, আছে কিছু এখানে। সেজন্যেই কেনার প্রস্তাব দিয়েছিলাম। আরও আগেই যদি জানতাম, তাহলে কি আর উইলসন এত দূর থেকে এসে দখল করতে পারে? আমিই তো তার আগে কিনে নিতাম।
যদি সোনা না থাকে? শিওর তো না, বলল জিনা।
তাতে কি? জায়গাটার আসল দামই দিতে চেয়েছিলাম। ঠকা হত না আমার।
জুলিয়ান না কি যেন নাম, ছেলেটার পিছে লাগা হলো কেন? জিজ্ঞেস করল শেরিফ।
আমার এই দুই গর্দভ করেছে সর্বনাশটা। ওদেরকে কতবার বলেছি, হুশিয়ার হয়ে কাজ করতে, রিসোর্টের লোকজনের ওপর চোখ রাখতে, কানই দেয়নি। ওদেরকে এখানে খুঁড়তে দেখে ফেলেছিল ছেলেটা।
দেখলে কি হয়েছে? প্রশ্ন করল কিশোর।
গিয়ে বলে দিতে পারত আমরা এখানে সোনার খোঁজ করছি। সে যাতে কিছু বলে কাউকে বিশ্বাস করাতে না পারে, সে চেষ্টা করা হয়েছে।
এখান থেকে তাড়িয়ে দিয়ে, না? এক ঘুসিতে জিংম্যানের দাঁত কয়টা ফেলে দেয়ার ইচ্ছেটা অনেক কষ্টে দমন করলেন শিক্ষক।
রিসোর্ট এলাকায় বাইরের লোককে খুঁড়তে দেখেছে। কই, কখনও বলেনি তো জুলিয়ান? জিনা অবাক।
ও ভেবেছিল ওরা প্রসপেক্টর, জবাব দিল মুসা। পাহাড়ে অনেকেই সোনা আর মূল্যবান পাথরের জন্যে ওরকম খোঁড়াখুঁড়ি করে, বিশেষ করে এই অঞ্চলে। অনেককে দেখেছে জুলিয়ান। তাছাড়া, ও জানতই না যে এটা রিসোর্টের জায়গা। সাধারণ প্রসপেক্টর মনে করেছিল রিকি আর পেককেও। তবে বদমেজাজী

প্রসপেক্টর, যারা মানুষ দেখলেই গুলি করে। সেজন্যে ওদের কাজ লুকিয়ে লুকিয়ে দেখত।
হুঁ। অপরাধ করে কেউ পার পায় না, বিড়বিড় করল শেরিফ।
এখানে আর দাঁড়িয়ে থেকে কি লাভ? চলো, সবাই। মিস্টার ডিউক, চলুন?
হ্যাঁ, চলুন। ভিকি ওদিকে অস্থির হয়ে থাকবে। দেরি দেখলে নিজেই না বেরিয়ে পড়ে…
কিশোরের পাশাপাশি চলতে চলতে বলল রবিন, আরেকটা রহস্য কিন্তু বাকি রয়ে গেল। ক্যাচিনা ভূতের রহস্য।
অ্যাঁ! ফিরে তাকাল কিশোর। ও, ওটারও সমাধান করে ফেলেছি।
এই, রবিন বলল, আমার কথা শুনছ তো?
হ্যাঁ, তোমার কথার জবাবই তো দিলাম। র‍্যাঞ্চে চলো, দেখাব। আসামী নিয়ে চলে যেতে চাইল শেরিফ, কিশোর বাধা দিল, আর একটু, শেরিফ। বেশিক্ষণ আটকাব না। আরেকটা মজার জিনিস দেখে যান।
সবাইকে নিয়ে হলরুমে এল সে, ক্যাচিনা পেইন্টিংগুলো যে ঘরে রয়েছে। চমৎকার একটা শো দেখাবে যেন, এমন ভঙ্গিতে ছোটখাটো একটা বক্তৃতা দিল। ভাল অভিনেতা সে, জমিয়ে ফেলল মুহূর্তে। আরাম করে চেয়ারে বসল সবাই। শো দেখবে।
ট্রাংকে যে দুটো কমাণ্ডার পাওয়া গেছে, তার একটা শেরিফের কাছ থেকে চেয়ে নিল কিশোর। যেটা মুসা চিনতে পারেনি।
এই যে, এবার ভূত দেখতে পাবেন, বলেই টিপে দিল কমাণ্ডারের একটা সুইচ, মেঘ-ক্যাচিনাটাকে লক্ষ্য করে।
কয়েক মুহূর্ত কিছুই ঘটল না। তারপর শুরু হলো মৃদু গুঞ্জন। বাড়ল আওয়াজ। দুর্বোধ্য ইনডিয়ান গান আরম্ভ হলো। সড়সড় করে এক পাশে কয়েক ইঞ্চি সরে গেল ফ্রেমে বাঁধানো মেঘ-ক্যাচিনার ছবিটা। কালো একটা ফোকর বেরিয়ে পড়ল।
আলো নিভিয়ে দাও, চেঁচিয়ে বলল কিশোর। জলদি!
উঠে গেল মুসা আর রবিন। পটাপট নিভে গেল সমস্ত আলো। ঘর অন্ধকার।
দেখা দিল বেগুনী আলো। মেঘের মত ভেসে ভেসে এগিয়ে এল ঘরের মাঝখানে। ঘুরে ঘুরে রূপ বদলাচ্ছে।
খানিকক্ষণ নাচ দেখিয়ে ধীরে ধীরে আবার দেয়ালের দিকে রওনা হলো ভূত, ছবিটার কাছে গিয়ে মিলিয়ে গেল।
হয়েছে। আলো জ্বেলে দাও এবার, অনুরোধ করল কিশোর।
জ্বলে উঠল আলো। সবাই একসঙ্গে কথা বলে উঠল। নানারকম প্রশ্ন। ছবিটার দিকে তাকিয়ে আছে। কালো ফোকরটা দেখা যাচ্ছে না আর, ছবিটা আগের

জায়গায় সরে এসে ঢেকে দিয়েছে।
আস্তে, আস্তে, হাত তুলল কিশোর। মুচকি হাসল। এক এক করে জিজ্ঞেস করো, নইলে কারটার জবাব দেব? রবিন, মুসা, টনি, তোমরা এসো তো। সাহায্য করো আমাকে। সব প্রশ্নের জবাব পাবে এখনই।
স্ক্রু-ড্রাইভার, হাতুড়ি, ফাইল, প্লয়ার্স নিয়ে কাজে লাগল কিশোর। ছবিটাকে খুলে আনল দেয়াল থেকে। পেছনে দেয়ালে বেশ বড় একটা চৌকোনা খোপ। তাতে কয়েকটা যন্ত্র বসানো। একটা সকলেই চিনল। ছোট একটা টেপ রেকর্ডার, বিল্ট-ইন-মাইক্রোফোন। অন্যটা বেশ বড় আর ভারি।
জিংম্যানের দিকে ফিরল কিশোর, ডাক্তার সাহেব, এটা হলোগ্রাম। প্রোজেক্টর, তাই না?
আস্তে মাথা ঝাঁকাল ডাক্তার।
এগুলো এখানে বসিয়েছিলেন কেন? ভূতের গুজব ছড়িয়ে পড়লে টুরিস্ট আসবে না, রিসোর্ট বন্ধ হয়ে যাবে, মিস্টার উইলসন সব কিছু বেচে দিয়ে চলে যেতে বাধ্য হবেন। আর আপনি কিনে নেবেন সব, এই তো ইচ্ছেটা ছিল?
আবার মাথা ঝাঁকাল জিংম্যান।
আরে, এ তো দেখছি মহা-শয়তান লোক! চোখমুখ কালো করে ফেলেছে শেরিফ। কাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করতাম এতদিন! যে হাসপাতালে ছিলে, সেখানেও শয়তানি করে এসেছ নাকি এরকম? এখন তো আমার মনে হচ্ছে, চাকরি তুমি ছেড়ে আসনি, তোমাকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। ভেবো না, খোঁজ-খবর আমি ঠিকই নের।
রাগে ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাস ছাড়ছে সে। তা, সাহেব, ওই হলোগ্রাম না কি গ্রাম, ওটাও কি হাসপাতাল থেকেই চুরি করেছ?
জবাব দিল না জিংম্যান। মুখ নিচু করে রইল।
আমার মনে হয় হাসপাতাল থেকেই এনেছে, আস্তে করে বলল কিশোর। ডাক্তার মানুষ তো। ডাক্তারদেরই জিনিস ওটা। খুব কাজে লাগে।
এবার উঠি, শেরিফ বলল!
মিস্টার ডিউক, টনি, তোমাদেরকেও একটু কষ্ট করে আমার সঙ্গে যেতে হবে, প্লীজ। তিনটে শয়তানকে একা আমি নিয়ে যেতে পারব না।
এক্ষুণি উঠি কি? লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল ভিকি। বসুন বসুন, খাবার তৈরিই রেখেছি। বেড়ে দিতে যতক্ষণ লাগে।
মুসাও উঠল। বাড়াবাড়ি সহ্য হবে না আমার, হাত নাড়ল সে, নিজেই নিতে পারব, সারাটা দিন উপোস। ওই দু-ব্যাটা যখন কাবাব বানাচ্ছিল না..আহ! সত্যি সত্যি তার জিভ থেকে গড়িয়ে পড়ল এক ফোঁটা পানি।

ভলিউম ৭ – পুরনো শত্রু – তিন গোয়েন্দা – রকিব হাসান – সেবা প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯

সবে থেমেছে স্যালভিজ ইয়ার্ডের ট্রাকটা, চেঁচিয়ে উঠলো কিশোর পাশা, চাচা, দেখো, দেখো!

বাড়িটা রকি বীচের কাছেই, রেমুডা ক্যানিয়নে। পুরনো মাল কিনতে এসেছেন রাশেদ পাশা। সঙ্গে এসেছে কিশোর আর তার বন্ধু মুসা আমান।

কী? অবাক হয়ে তাকালেন রাশেদ পাশা। কোথায়?

ওই যে, ওই তো বাড়িটার ধারে!

শেষ গোধূলি, দিনের আলো প্রায় শেষ।

কই, কি দেখেছিস, কিশোর?

খাইছে! আমিও তো কিছু দেখছি না, মুসা বললো।

চেয়ে রয়েছে কিশোর। কালো মূর্তিটা নেই। চোখের পলকে যেন বাতাসে মিলিয়ে গেছে। নাকি ছিলোই না ওখানে? চোখের ভুল? বিড়বিড় করলো, দেখেছি! কালো পোশাক পরা একটা মূর্তি!

বিরাট কাঠামোর বাড়িটার দিকে তাকালেন রাশেদ পাশা পাহাড়ী অঞ্চল। গিরিসঙ্কটের দেয়ালের ছায়ায় কেমন নিঃসঙ্গ লাগছে বাড়িটাকে। কাছেই হোট কটেজ। শান্ত, নীরব।

ছায়াটায়া দেখেছিস আর কি, বললেন চাচা।

আলোছায়ার খেলা, বললো মুসা।

আলো কোথায় দেখলে? আমি বলছি, আমি দেখেছি। মনে হলো ওই বাড়ির জানালার ভেতরে ঢুকে গেল।

দ্বিধা করলেন রাশেদ পাশা। সাধারণতঃ ভুল করে না তার ভাতিজা। বললেন, বেশ, চল, বাড়িতে ঢুকেই দেখি। প্রফেসরকে জিজ্ঞেস করলে হয়তো জানা যাবে।

রাশেদ পাশার পিছু পিছু এগোলো দুই গোয়েন্দা।

অনেক পুরনো বাড়ি। একশো বছর হতে পারে, দুশো হলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। কাঠের টাওয়ার, ছড়ানো কার্নিশ। গাড়িবারান্দার ঢেউখেলানো হাতটা ধরে রেখেছে মোটা মোটা থাম। আর রিশাল সদর দরজা।

দরজায় ধাক্কা দিলেন রাশেদ পাশা।

সাড়া দিয়ে বেরোলেন লম্বা, রোগাটে একজন মানুষ। প্রৌঢ়, কিন্তু মনে হয় বয়েস আরও বেশি, বৃদ্ধ। চোখের নিচে গভীর ছায়া। এই জুলাই মাসের গরমেও টুইডের একটা জ্যাকেট পরে রয়েছেন, তোকাল ধোয়া হয়নি কে জানে, দোমড়ানো। হাতে বিদেশী ভাষায় লেখা মোটা এক বই।

প্রফেসর হোফার? জিজ্ঞেস কলেন রাশেদ পাশা।

হাসলেন প্রফেসর। আপনি নিশ্চয়ই রাশেদ পাশা? আসুন আসুন।
বাধা দিয়ে বললেন রাশেদ পাশা, প্রফেসর সাহেব, এ-আমার ভাতিজা। ও খানিক আগে নাকি কালো, পোশাক পরা একটা লোককে আপনার জানালা দিয়ে চুতে দেখেছে।
আমার বাড়িতে? চোখ মিটমিট করলেন প্রফেসর। নিশ্চয় ভুল করেছে।
না, স্যার, জবাব দিলো কিশোর। আমি শিওর। দামী কোনো জিনিস আছে। আপনার বাড়িতে? চোরে চুরি করবে, এমন কিছু?
নাহ। কিচ্ছু নেই।...তবু তুমি যখন বলছো..ওহহো, বুঝেছি, আমার ছেলে, রিকি। কালো কাউবয় পোশাক আছে তার। আর কতোবার বুঝিয়েছি, জানালা দিয়ে ঢোকার চেয়ে দরজা দিয়ে ঢোকা অনেক ভালো। প্রফেসর হাসলেন।
মাথা ঝাঁকালেন রাশেদ পাশা। তাই বলুন।
আপনার ছেলের বয়েস কতো, স্যার? জানতে চাইলো কিশোর।
কতো আর, এই তোমাদের মতোই। তোমার মতোই লম্বা।
আমি যাকে দেখেছি, সে আরও লম্বা।
তাই? সংশয় দেখা দিলো প্রফেসরের চোখে। বেশ, এসো, দেখি কোথায় লুকিয়ে আছে তোমার চোর।
বিরাট বাড়িটার নিচতলার ঘরগুলো ঘুরিয়ে দেখালেন প্রফেসর। বেশির ভাগই খালি, বন্ধ করে রাখা হয়েছে। করি ভাষা নিয়ে গবেষণা, বিষণ্ন শোনালো তার কণ্ঠ। টাকা নেই। এতো বড় বাড়ি আর রাখার ক্ষমতা নেই আমার। এক মুহূর্ত থেমে বললেন, বাপ-দাদারা ছিলো জাহাজী, ক্যাপ্টেন। ভালো টাকা আয় করতো। কতো যে জিনিস আনতে পুব-দেশ থেকে। তারাই বানিয়েছে এই বাড়ি, টিকিয়ে রেখেছে অনেক দিন। নাবিক হলে হয়তো আমিও পারতাম। হইনি। এখন এখানে থাকি শুধু আমি আর আমার ছেলে। এক চাচাতো ভাই ছিলো আমার, সে-ও অনেকদিন হলো এ-বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। এতো বড় বাড়িতে থাকার লোক কোথায়? বন্ধই করে রাখি ঘরগুলো। কটেজটা যে দেখলেন, কেয়ারটেকার। থাকতত আগে। এখন ওটা ভাড়া দিয়েই সংসারের খরচ চালাই।
নিচতলায় চোরকে পাওয়া গেল না। ওপর তলায় উঠলো সবাই। ওপরেও নিচের মতোই অবস্থা।
ভালোমতো ঘরগুলো দেখে কিশোর স্বীকার করলো, না, চুরি করার মতো। কিছু নেই।
হতাশ মনে হচ্ছে তোমাকে? বললেন প্রফেসর।
হবেই, বললো মুসা। ভেবেছিলো কি জানি একটা রহস্য পেয়ে গেছে। পায়নি তো, তাই।

আপনার ছেলেকে দেখছি না? চিন্তিত ভঙ্গিতে বললো কিশোর। কাউকে দেখেছি, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আচ্ছা, পুরনো জিনিস বিক্রি করবেন বলে ডেকেছেন আমাদের। তার মধ্যে মূল্যবান কিছু নেই তো?
থাকলে, তো খুশিই হতাম। আছে শুধু বুড়ো ডেনবারের কিছু পুরনো জিনিস। কটেজে থাকতো। কয়েক মাস আগে মারা গেছে। থাকার মধ্যে আছে গোটা দুই সুটকেস, আর কয়েকটা ছবি, তার আঁকা। লোকটার বোধহয় দুনিয়ায় কেউ ছিলো না, অনেকটা সন্ন্যাসীর মতোই থাকতো। টাকাপয়সা ছিলো না। শেষ কমাসের ভাড়াও মিটিয়ে যেতে পারেনি। সেজন্যেই তার জিনিস বিক্রি করতে চাইছি, কটা ডলারও যদি আসে মন্দ কি?
সন্ন্যাসীদের কাছে অনেক সময় মূল্যবান জিনিস থাকে, বললো কিশোর।
কি ব্যাপার, গোয়েন্দার মতো কথা বলছো?
গোয়েন্দাই তো আমরা, মুসা বললো। কিশোর, দেখাও না।
পকেট থেকে তিন গোয়েন্দার কার্ড বের করে দিলো কিশোর।
মুচকি হেসে মাথা দোলালেন প্রফেসর। কিন্তু এখানে তদন্ত করার কিছু পাবে না। যা দেখেছো, ওটা ছায়া ছাড়া কিছু না।
ঠিক এই সময় চিৎকার শোনা গেল, চোর! চোর! বাবা, জলদি এসো!
স্থির হয়ে গেল সবাই। কান পেতে শুনলেন প্রফেসর। আরে, রিকি! সিঁড়ির দিকে দৌড় দিলেন তিনি। পেছনে ছুটলো অন্য তিনজন।
বাবা, তাড়াতাড়ি! আবার শোনা গেল চিৎকার, বাঁয়ে কটেজের দিক থেকে।

.
লন মাড়িয়ে ছুটলেন প্রফেসর হোফার। ঠিক পেছনেই রাশেদ পাশা আর মুসা। তাদের পেছনে কিশোর।
কটেজের সামনের ছোট ছাউনির নিচে পৌঁছলো ওরা। এক ধাক্কায় দরজা খুলে ছোট একটা লিভিংরুমে ঢুকলেন প্রফেসর। হাঁপাচ্ছেন। চেঁচিয়ে ডাকলেন, রিকবার!...রিকি!
এই যে এখানে, বাবা, জবাব এলো কটেজের খুদে বেডরুম থেকে।
প্রফেসর ঢুকলেন। পেছনে ঢুকলেন রাশেদ পাশা আর মুসা। লিভিংরুমের মতোই এ-ঘরেও আসবাব তেমন নেই। একটা সিঙ্গল খাট, একটা চেয়ার, আর একটা ভারি টেবিল–উল্টে পড়ে আছে। টেবিলের ওপাশে দাঁড়িয়ে গায়ের ধুলো ঝাড়ছে একটা ছেলে। রোগী টিনটিনে শরীর।
তাড়াতাড়ি তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন প্রফেসর।
আমি ঠিকই আছি, বাবা, বললো রিকি। নড়াচড়ার শব্দ শুনে ঢুকে দেখি কালো পোশাক আর, কালো মুখোশ পরা একটা লোক। আমি চেঁচিয়ে উঠতেই টেবিলটা

উল্টে আমার গায়ের ওপর ফেললো। ধাক্কা লেগে মাটিতে পড়ে গেলাম। এই সুযোগে পেছনের দরজা দিয়ে পালালো ব্যাটা।
কিশোরের কথাই ঠিক! বলে উঠলো মুসা। তবে একটা ভুল করেছে। লোকটাকে ঢুকতে নয়, বেরোতে..আরি, কিশোর গেল কই?
ফিরে এসে লিভিংরুমে ঢুকলো মুসা। ওখানেও নেই কিশোর। গেল কোথায়?
কিশোর? চিৎকার করে ডাকলেন রাশেদ পাশা।
আমাদের পেছনেই তো ছিলো, ঢোক গিললো মুসা।
ছেলের দিকে তাকালেন প্রফেসর। লোকটার হাতে কিছু ছিলো? ছুরি, পিস্তল…
দেখিনি।
হঠাৎ আরেকটা তীক্ষ্ণ চিৎকার শোনা গেল কটেজের পেছন দিক থেকে।
পাক খেয়ে ঘুরলেন প্রফেসর। নালার ওদিক থেকে! হয়তো কেউ পড়ে গেছে!
নালাটা কি খুব গভীর? শঙ্কিত হয়ে উঠেছেন রাশেদ পাশা।
মোটামুটি। পড়লে হাত-পা ভাঙতে পারে। আসুন আমার সঙ্গে।
ওদেরকে কটেজের পেছনে নিয়ে এলেন প্রফেসর। ছোট ঝোপঝাড়, মাঝে মাঝে বড় বড় গাছ। ঝোপঝাড় ভেঙে ছুটলো ওরা। নালাটার প্রান্তে এসে থমকে দাঁড়ালো। দশ ফুট মতো গভীর নালাটার দুই মাথা, বাঁক নিয়ে চোখের আড়াল হয়ে গেছে। নিচে আলগা পাথরের ছড়াছড়ি, হালকা গাছপালাও আছে।
কিশোরের চিহ্নও নেই।
দেখুন! চেঁচিয়ে উঠলো মুসা।
নিচে, ডানের কয়েকটা পাথরের ওপর কালচেমতো কি যেন লেগে রয়েছে। আলো নেই। ওপর থেকে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।
প্রায় খাড়া ঢাল বেয়ে হাঁচড়ে-পাঁচড়ে নামলো ওরা।
হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখলো মুসা। ভেজা। রক্ত! আঁতকে উঠলো সে।

.

কালো মূর্তিটা আবার চোখে পড়লো কিশোরের। কটেজের পেছন থেকে বেরিয়ে জঙ্গলের দিকে ছুটে যাচ্ছে।
কিশোর বুঝলো, লোকটাকে সে একাই দেখেছে। অন্যেরা ঢুকে গেছে কটেজে। তাদেরকে ডেকে বের করে আনতে সময় লাগবে, ততোক্ষণে বনে ঢুকে। হারিয়ে যাবে লোকটা। এক মুহূর্ত দ্বিধা করলো গোয়েন্দাপ্রধান, তারপর মোড় নিয়ে ধাওয়া করলো মূর্তিটাকে।
কিন্তু তা-ও দেরি হয়ে গেল। লোকটার চেহারা দেখতে পেলো না সে, তার আগেই ঢুকে গেল জঙ্গলে। ঝোপ মাড়ানোর শব্দ কানে আসছে। কয়েক সেকেণ্ড। পরেই

কি যেন গড়িয়ে পড়তে লাগলো, ধ্যাপ করে পাথরের ওপর পড়লো ভারি কিছু। যেন একটা বস্তা পড়েছে। পরক্ষণেই শোনা গেল তীক্ষ্ণ চিৎকার।
এক নালাটার কিনারে এসে দাঁড়ালো কিশোর। নিচে উঁকি দিলো। কোনোমতে উঠে দাঁড়িয়েছে কালো মূর্তিটা। খোঁড়াতে খোঁড়াতে দৌড় দিলো ডান দিকে, বা পায়ে চোট লেগেছে। হারিয়ে গেল মোড়ের ওপাশে।
বসে পড়লো কিশোর। পার্কের পারে বাচ্চারা যেমন করে স্লীপ করে, তেমনিভাবে পিছলে নামলো নালায়। পাথরে রক্ত দেখতে পেলো। এগিয়ে গেছে রক্তের দাগ। সাবধানে চিহ্ন ধরে ধরে এগোলো সে। বৃষ্টির সময় পাহাড় থেকে নেমে আসা পানির তীব্র স্রোতের কারণে সৃষ্টি হয়েছে এই নালা। পানি গিয়ে পড়ে ডানের একটা গর্তে, তৈরি করেছে একটা ছোট গিরিখাত, ঘন ঝোপঝাড়ে ভরা। ওটার মধ্যে কেউ লুকিয়ে বসে থাকলে ওপর থেকে দেখা যাবে না।
কিশোর ভাবলো লোকটা ওটার ভেতরেই লুকিয়েছে।
ভুল করেছে। সামনে দড়াম করে বন্ধ হলো একটা গাড়ির দরজা। এঞ্জিন গর্জে উঠলো।
ছুটতে শুরু করলো কিশোর। গিরিখাতের পাশ দিয়ে সরু পথ, সেটা দিয়ে। বেরিয়ে যাওয়া যায় মেইন রোডে।
কিশোর যখন রাস্তার ধারে পৌঁছুলো, গাড়িটা তখন আঁকাবাঁকা পথটার একটা মোড়ের কাছে চলে গেছে। হারিয়ে গেল লাল টেলাইট। শহরের দিকে চলে গেল।
রক্তের দিকে চেয়ে রয়েছে মুসা, চোখে আতঙ্ক। কানে এলো পদশব্দ, কে যেন আসছে।
রাশেদ পাশাও শুনতে পাচ্ছেন। মুসা, শুয়ে পড়ো, জলদি! সবাই...
ছায়ায় লুকিয়ে পড়তে যাবে ওরা, এই সময় দেখতে পেলো, মোড়ের ওপাশ থেকে বেরিয়ে আসছে কিশোর।
কিশোর? চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলো মুসা, কি হয়েছে?
ব্যাটাকে তাড়া করেছিলাম। ধরতে পারলাম না। পালালো।
কাজটা ভালো করোনি! গম্ভীর হয়ে বললেন রাশেদ পাশা। ছুরিটুরি যদি মেরে বসতো?
ধরতে যাইনি ওকে, চাচা। চেহারা দেখার চেষ্টা করেছি। অন্ধকারে পারলাম। গাড়ি নিয়ে এসেছিলো, পালালো।
আনমনে মাথা নাড়লেন প্রফেসর। বুঝতে পারছি না, কি নিতে এসেছিলো! আমার মনে হয়, ভুল করেছে। আশপাশে বড়লোকের বাড়ি আছে, আমাকেও বড় লোক মনে করেছে আরকি। তাই ঢুকে পড়েছে।...চলুন, মিস্টার পাশা, কাজ শেষ। করি।

কটেজে ফিরে এলো ওরা।
সুইচ টিপে আলো জ্বাললেন প্রফেসর। বেডরুমের দেয়াল-আলমারি থেকে বের করলেন চামড়ার দুটো পুরনো সুটকেস। একটার ভেতরে শুধু কাপড় চোপড় পুরনো ফ্যাশনের একটা ড্রেস সুট, ধূসর রঙের একটা ফ্লানেল কাপড়ের সুট, কয়েকটা শার্ট, টাই, আর কয়েক জোড়া মোজা। আরেকটা সুটকেসে রয়েছে ছবি আঁকার কিছু রঙ, স্টাফ করা একটা পেঁচা, গ্রীক পুরাণের দেবি ভেনাসের ছোট একটা মূর্তি, বড় একটা বিনকিউলার, আর এক বাক্স রূপার ছুরি, কাঁটাচামচ, চামচ।
সারাক্ষণ গম্ভীর হয়ে থাকতো ডেনবার, বললেন প্রফেসর। পুরনো একটা প্যান্ট আর শার্ট ছাড়া আর কিছুই পরতো না। তবে লোকটা শিক্ষিত ছিলো। আর খাওয়ার সময় এই ছুরি-চামচ ব্যবহার করতো। সাত মাস ছিলো এখানে। লনে একটা ক্যানভাসের চেয়ারে বসে থাকতো, আর ছবি আঁকতে, সর্বক্ষণ। রাতেও। বুঝলেন কিছু?
ঘরের কোণ থেকে ক্যানভাসের আবরণ সরিয়ে বিশটা ছবি বের করে। আনলেন প্রফেসর। এই কটেজ আর তার আশপাশের এলাকার দৃশ্য আঁকা হয়েছে। কোনোটা খুব কাছে থেকে-ক্লোজআপ, আর কোনোটা এতো দূরে, ঘরটা ভালোমতো বোঝাই যায় না।
মন্দ না, একবার দেখেই নজুর ফেরালেন রাশেদ পাশা। সুটকেস দুটো, বিশেষ করে রূপার জিনিসগুলো দেখে চোখ চকচক করছে তাঁর। ঠিকমতো দরদাম করে কিনতে পারলে পুরনো জিনিসে বেশ ভালো লাভ। তবে কাউকে ঠকাতে চান না তিনি, ন্যায্য দাম দেন। এগুলো বিক্রি করবেন?
হ্যাঁ। মৃত্যুর আগে আমাকে একটা ঠিকানা দিয়ে বললো ডেনবার, ওখানে। চিঠি লিখলেই আমার পাওনা টাকা পেয়ে যাবো। লিখেছি, ভাড়া বাকি আছে সে কথাও জানিয়েছি, কোনো জবাব আসেনি। কেউ খোঁজ নিতেও আসেনি। আর কতো অপেক্ষা করবো? আমার টাকার খুব দরকার?
দাম নিয়ে দর কষাকষি শুরু করলেন রাশেদ পাশা আর প্রফেসর।
রিগ ডেনবারের জিনিসগুলো দেখতে চাইলো কিশোর। একটাও দামী জিনিস নেই, যার জন্যে গাড়িওয়ালা চোর আসতে পারে।
রিকি, জিজ্ঞেস করলো গোয়েন্দাপ্রধান। মিস্টার ডেনবারের কি হয়েছিলো?
অসুখ হয়েছিলো, জানালো রিকি। ভীষণ জ্বর উঠলো। প্রলাপ বকতো, খালি ক্যানভাস আর আঁকাবাঁকা রেখা, না পথ, কি কি সব বলতো। ওর দেখাশোনা তখন আমিই করতাম। শেষে অসুখ এতো বেড়ে গেল, ডাক্তারকে খবর না দিয়ে

আর পারলাম না। ডাক্তার আসার আগেই মারা গেল বেচারা। বয়েস, হয়েছিলো, হাসপাতালে নিয়ে গেলেও বোধহয় বাঁচতো না।
চোরটা ভুলই করেছে, কি বলো, কিশোর? মুসা বললো। দামী কিছুই নেই এখানে।
আস্তে মাথা ঝোঁকালো শুধু কিশোর।
রিগ ডেনবারের জিনিসগুলো কিনে নিয়ে ট্রাকে তোলা হলো। পাহাড়ী পথ ধরে ছুটে চললো গাড়ি। একটা গিরিপথের ভেতর থেকে বেরোতেই বিড়বিড় করলো কিশোর, চোরেরা সাধারণতঃ ভুল করে না, ঘনঘন নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে সে।
কি চুরি করতে এসেছিলো সে, কোনোদিনই জানতে পারবো না আমরা, বললো.মুসা।
তাই তো দেখছি, দীর্ঘশ্বাস ফেললো কিশোর।

.

ওই ঘটনার এক হপ্তা পর, এক বিকেলে পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে কাজে ব্যস্ত দুই গোয়েন্দা। রবিনই প্রথমে গাড়িটা ঢুকতে দেখলো। হলুদ রঙের একটা মার্সিডিজ গিয়ে থামলো অফিসের সামনে।
চকচকে গাড়িটা থেকে বেরিয়ে এলো মার্জিত পোশাক পরা মাঝারি উচ্চতার একজন মানুষ। বিকেলের রোদে তার ধূসর চুল রূপালি দেখাচ্ছে। পরনে শাদা সামার সুট, সিল্কের নীল শার্ট। হাতে সরু কালো একটা বেত, আর একটা কি যেন ঝিক করে উঠলো। এক মুহূর্ত দেখলো ছেলেদের, তারপর ঘুরে রওনা হলো অফিসের দিকে।
চেয়ে রয়েছে ছেলেরা। হঠাৎ বলে উঠলো কিশোর, ওহহহ, ভুলেই গিয়েছিলাম, চাচা-চাচী কেউ নেই অফিসে। চলো, চলো।
গাড়িটার কাছাকাছি এসেছে, এই সময় খুলে গেল পেছনের দরজা। বেরিয়ে এলেন এক লম্বা মহিলা। নীলচে-ধূসর চুল। শাদা সিল্কের পোশাক পরনে। তাতে লাগানো একটা হীরার ব্রোচ। রাজকীয় ভঙ্গিতে তাকালেন ছেলেদের দিকে। মিস্টার রাশেদ পাশা আছেন?
না, ম্যাডাম, জবাব দিলো কিশোর। উনি আমার চাচা। ইয়ার্ডের ভার আমার ওপর দিয়ে গেছেন।
তাই? বয়েস তো বেশি লাগছে না। কাস্টোমার সামলাতে পারো?
পারি।
গুড, হাসলেন মহিলা। কনফিডেন্স থাকা ভালো।
আসলে, হেসে বললো রবিন। পাঁচটার পরে কাস্টোমার বেশি আসেই না।

আবার হাসলেন মহিলা। আমি একজন কাস্টোমার। আর ওই যে অফিসে ঢুকলো, ও আমার এস্টেট ম্যানেজার, ফ্রেড ব্রাউন। চলো ওখানে।
ডেস্কের ওপর ঝুঁকে কি দেখছিলো লোকটা, ছেলেদের ঢুকতে দেখে চট করে সুরে গেল। তবে ইতিমধ্যেই দেখে ফেলেছে কিশোর। ইয়ার্ডের পার্চেজ বুকটা ঘাঁটছিলো ম্যানেজার।
ফ্রেড, মহিলা বললেন। এরাই এখন দায়িত্বে আছে।
ও, ছেলেদের দিকে চেয়ে মাথা সামান্য নোয়ালো ম্যানেজার। ওরা দেখলো, ঝিক করে উঠেছিলো: যে জিনিসটা, ওটা বেতের রূপার হাতল-মুঠো করে ধরার জন্যে।
তাহলে তোমাদেরকেই বলি। প্রফেসর হোফারের কাছ থেকে কিছু জিনিস কিনে এনেছো তোমরা, মিস্টার রিগ ডেনবারের জিনিস। ওগুলো ফেরত চাইছেন আমাদের কাউন্টেস, মহিলাকে দেখালো সে। দাম অবশ্যই দেবো। যা দিয়ে কিনেছ, তার ডাবল।
দামী কিছু আছে নাকি ওগুলোর মধ্যে? জিজ্ঞেস করলো কিশোর।
দামী? তা তো আছেই। যতো ফালতু জিনিসই হোক না কেন, মৃত ভাইয়ের। জিনিস, বোনের কাছে তার দাম অসাধারণ। ও হ্যাঁ, কাউন্টেস মিস্টার ডেনবারের বোন।
ভুরু কোঁচকানো রবিন। আপনি সত্যি কাউন্টেস?
আমার মরহুম স্বামী কাউন্ট ছিলেন, হেসে বললেন মহিলা। আর ডেনবার। আমার বড় ভাই, বিশ বছরের বড়। আমাদের মধ্যে মিল ছিলো না খুব একটা। তাছাড়া ভাই ছিলো একটু অন্য রকম, খামখেয়ালী, শামুকের মতো কেমন যেন গুটিয়ে রাখতে নিজেকে। এই দেখোনা, অসুখে ভুগে বিনা চিকিৎসায় মারা গেল, একবার জানালো না পর্যন্ত আমাকে।
আফ্রিকায় ছিলাম আমরা, বুঝেছো? কাউন্টেস থামতেই বলে উঠলো তার ম্যানেজার। কাউন্টের বাড়িতে পৌঁছলো প্রফেসরের চিঠি, সেখান থেকে পাঠিয়ে দেয়া হলো আফ্রিকায়। সঙ্গে সঙ্গে ছুটলাম। তা-ও দেরি হয়ে গেল। এসে দেখি, বেচারা মানুষটার শেষ স্মৃতিগুলোও বিক্রি করে দিয়েছেন প্রফেসর। ওগুলো ফেরত পেলে খুবই খুশি হবেন কাউন্টেস।
বসুন, নিয়ে আসছি, রবিনকে নিয়ে বেরিয়ে এলো কিশোর।
একধারে কাজ করছে ইয়ার্ডের কর্মচারী দুই ব্যাভারিয়ান ভাই বোরিস আর রোভার। জিনিসগুলো খুঁজে না পেয়ে, কোথায় রাখা হয়েছে–ওদেরকে জিজ্ঞেস করলো কিশোর।
কয়েক মিনিট পর অফিসে ফিরে এলো দুই গোয়েন্দা।

সরি, বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো কিশোর। কাপড়গুলো ছাড়া আর সব বিক্রি হয়ে গেছে।
ওগুলো রেখে দাও, বললো ম্যানেজার। আর কিছুই নেই? ছবিগুলোও না?
এটাই অদ্ভুত লাগছে আমার কাছে, বললো কিশোর। কতো ভালো ভালো ছবি কিনে এনে ফেলে রাখি, পড়ে থেকে নষ্ট হয়, আর এই ছবিগুলো আনতে না আনতেই বিক্রি হয়ে গেল!
কে নিলো?
মাথা নাড়লো কিশোর। শুধু কেনার রেকর্ড রাখি আমরা, মিস্টার ব্রাউন, বিক্রির রাখি না। লোকে আসে, পছন্দ করে কিনে নিয়ে যায়। পুরনো জিনিস, গ্যারান্টি তো আর দিতে হয় না, তাই রশিদও লাগে না। আমাদের কর্মচারী বোরিস এক লোকের কাছে সবগুলো ছবি বেচে দিয়েছে। কার কাছে, কিছুতেই মনে করতে পারছে না। পারার কথাও নয় অবশ্য।
আমার কপালই বোধহয় খারাপ, হাসি চলে গেছে কাউন্টেসের মুখ থেকে।
কোনো ভাবেই কি খোঁজ বের করা যাবে না? জিজ্ঞেস করলো ম্যানেজার।
উজ্জ্বল হলো কিশোরের চোখ। চেষ্টা করে দেখতে পারি, যদি..., দ্বিধা করতে লাগলো সে।
ভ্রূকুটি করলেন মহিলা। যদি কি, ইয়াং ম্যান? বলো, বলে ফেলো।
যদি আমাদেরকে ভাড়া করেন আপনারা। আমরা গোয়েন্দা। ...এই যে, আমাদের কার্ড। পুলিশ চীফের সার্টিফিকেটও আছে আমাদের কাছে, চাইলে দেখাতে পারি।
আবার হাসি ফুটলো কাউন্টেসের মুখে। কিন্তু...
কোনো কিন্তু নেই, কাউন্টেস, বাধা দিয়ে বললো ম্যানেজার। আমরা এখানে নতুন। আর ওরা এখানে থাকে, জায়গাটায়গা চেনে। তাছাড়া গোয়েন্দা। পুলিশ চীফ সার্টিফিকেট দিয়েছে বলছে যখন, নিশ্চয় যোগ্যতা আছে ওদের। খুঁজুক না। খুঁজে বের করতে পারলে তো ভালোই।
বেশ, মাথা কাত করলেন মহিলা। তুমি যখন বলছো... ভাইয়ের আঁকা জিনিস, ওগুলো আমার চাই। দেখে তাকে মনে তো করতে পারবো।
বের করে দেবো আমরা, ম্যাডাম, কিশোর বললো।
পারবে তো?
পারবো।
গুড। তা কার্ডে তো দেখলাম তিনজনের নাম, আরেকজন কোথায়?
নেই এখন। বাড়িতে কাজটাজ করছে হয়তো। ওর নাম মুসা আমান। আমি কিশোর পাশা, আর ও রনি মিলফোর্ড।

ঠিক আছে, ভাড়া করলাম তোমাদেরকে, বললো ম্যানেজার। উপকূলের কাছে সী বীচ মোটেলটা চেনো তো? ওখানেই উঠেছি আমরা। দরকার হলে যোগাযোগ কোরো। এক হপ্তা থাকবো। তারপর ইউরোপে ফিরে যাবো। গুড লাক, বয়েজ।
গাড়িতে উঠে চলে গেল দুজনে।
কিশোর, বলে তো দিলে খুঁজে দেবে, কিন্তু কিভাবে...
থেমে গেল রবিন। কিশোর চেয়ে রয়েছে গেটের দিকে। ছোট নীল একটা সেডান ইয়ার্ডের বাইরে দাঁড়িয়েছিলো, মার্সিডিজটা বেরোতেই ওটার পিছু নিয়েছে।
আশ্চর্য! বললো গোয়েন্দাপ্রধান।
কী?
নিশ্চয় রাস্তায় দাঁড়িয়েছিলো।
অনুসরণ করছে বলছো?
কিশোর জবাব দেয়ার আগেই দেখা গেল, সাইকেল চালিয়ে গেট দিয়ে ঢুকছে রোগাটে এক কিশোর। মাথায় কালো চুল। প্রফেসর হোফারের ছেলে রিকি।
অফিসের বাইরে বেরোলো দুই গোয়েন্দা।
ওদের দেখেই চেঁচিয়ে উঠলো রিকি, এই যে! কাউন্টেস এসেছিলো?
হ্যাঁ। এইমাত্র গেল, জবাব দিলো রবিন।
ডেনবারের জিনিসগুলো দিয়ে দিয়েছো?
না, বললো কিশোর। প্রায় সবই বিক্রি হয়ে গেছে। তবে ওদেরকে কথা। দিয়েছি, খুঁজে বের করে দেবো।
হুউফ! বাঁচা যাবে তাহলে। বিকেলে আমাদের ওখানে গিয়েছিলো। বাবা। বিক্রি করে দিয়েছে শুনে কাউন্টেস যা রাগ করলো না। বাবাকে ধমকাতে শুরু করলো। বললো, চিঠি যখন দিয়েছে, আরও কিছুদিন দেখা উচিত ছিলো। মহিলাকে শান্ত করলো তার ম্যানেজার। বুঝিয়ে বললো, প্রফেসরের জানার কথা নয় যে ডেনবারের এক বোন আছেন। যাই হোক, শান্ত হলো মহিলা। তবে বাবা চিন্তায় পড়ে গেছে। তার ধারণা, জিনিসগুলো না পেলে গোলমাল কররে কাউন্টেস।
আচ্ছা, রিকি, ওরা, যখন তোমাদের বাড়ি গেল, একটা নীল সেডান দেখেছো?
নীল সেডান...? ভাবলো রিকি। হ্যাঁ, দেখেছি। মার্সিডিজটা চলা শুরু করতেই ক্যানিয়ন রোডের মোড় থেকে বেরোলো নীল গাড়িটা। ওরকম গাড়ি ওখানে কারও নেই। প্রতিবেশী যারা আছে, সবার গাড়ি চিনি আমি। থাকেই তো.। অল্প কয়েকজন। কেন?
আমিও দেখলাম গাড়িটা। মার্সিডিজকে ফলো করছে।
কাউন্টেসের ওপর নজর রাখছে? মানে স্পাইইং?

তাই তো মনে হলো, চিন্তিত দেখাচ্ছে কিশোরকে। প্রথমে একটা রহস্যময় লোক চুরি করে ঢুকলো তোমাদের ঘরে। এখন কাউন্টেসকে ফলো করছে কে জানি। এর কারণ নিশ্চয় রিগ ডেনবারের জিনিসগুলো। কোথায় যেন একটা রহস্য আছে।
দামী কিছু ছিলো নাকি ডেনবারের কাছে? প্রশ্ন করলো রবিন।
কি জানি, নথি, এখনও বুঝতে পারছি না। আগে ডেনবারের জিনিসগুলো খুঁজে বের করতে হবে, তারপর বুঝতে পারবো!
কে কিনেছে? জিজ্ঞেস করলো রিকি। জানো?
না।
তাহলে, অবাক হলো রিকি, কি করে বের করবে?
ভূত-থেকে-ভূতে।
.
ভূত-থেকে-ভূতে! হাঁ হয়ে গেল রিকি। তোমাদের পোষা নাকি? ভূত তাহলে। সত্যি আছে?
আজকাল অনেক বিজ্ঞানীও বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছেন, ভূত আছে, বললো, কিশোর। তবে আমাদের ভূত সেই ভূত নয়।
তাহলে কোন ভূত?
বাচ্চা ছেলেমেয়ের দল, হেসে বললো রবিন।
তবুও কিছুই বুঝতে পারলো না রিকি।
গাড়ির আওয়াজ শোনা গেল। ফিরে এসেছেন কিশোরের চাচা-চাচী। এবার তার ছুটি। রিকি আর রবিনকে নিয়ে হেডকোয়ার্টারে ঢুকতে চললো।
তিন গোয়েন্দার হেডকোয়ার্টার দেখে দ্বিতীয়বার হাঁ হলো রিকি। আর তৃতীয়বার হলো ভূত-থেকে-ভূতে কি, সেটা জেনে। বললো, সব্বোনাশ! কয়েক ঘন্টার মধ্যেই তো দুনিয়ার সমস্ত ছেলেমেয়ে জেনে যাবে!
না, তা জানবে না, হেসে বললো কিশোর। যেতো, যদি ভাষা সমস্যার সমাধান করা যেতো। যদি দুনিয়াময় একটা সাধারণ ভাষা চালু থাকতো। যাই হোক, রকি বীচ আর আশপাশের এলাকার ওরা খুব শীঘ্রি জেনে যাবে।
আনুমানিক কতক্ষণ? রাতে ডিনারের পর লস অ্যাঞ্জেলেসে যাবে বাবা। আমাকেও নিয়ে যাবে। খবর পাওয়া যাবে কখন?
সকালের আগে না। ডিনারের পরই বেশির ভাগ ছেলেমেয়ে বাড়ি থাকে। ফোন শুরু করবে ওরা তখনই। রাতেই জানাজানি হয়ে যাবে। খবর আসতে আসতে সকাল।
পুরস্কারের ব্যবস্থা করবো নাকি? জিজ্ঞেস করলো রবিন।

তা তো করতেই হবে, কিশোর বললো। আগে বলবো না, কি দেবো। আনুক আগে, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করবো।
রিকি চলে গেল।
প্রথমেই মুসাকে ফোন করলো কিশোর। সব কথা জানালো। বললো, মুসাও যেন তার পাঁচ বন্ধুকে ফোন করে দেয়।
সন্ধ্যা আটটার মধ্যেই রকি বীচের সমস্ত ছেলেমেয়ের জানা হয়ে গেল খবরটা।

.

পরদিন সকাল নটায়, হেডকোয়ার্টারে অপেক্ষা করছে তিন গোয়েন্দা। বার বার তাকাচ্ছে টেলিফোনের দিকে, কখন বেজে ওঠে!
অনেক আজেবাজে জিনিসের খোঁজ দেবে, বললো, কিশোর। তবে। আসলগুলোও পাওয়া যেতে পারে।
দশটা বাজলো।
ফোন বাজলো না।
কিশোরের বিশ্বাসে চিড় ধরতে শুরু করলো। মুসা উসখুস করছে। রবিন স্থির চোখে ফোনের দিকে চেয়ে আছে তো আছেই।
ঠোঁট কামড়ালো গোয়েন্দাপ্রধান। এতোক্ষণে ফোন আসা উচিত ছিলো।
দুই সুড়ঙ্গের ঢাকনায় টোকার শব্দ হলো, চমকে উঠলো তিনজনেই। একে অন্যের দিকে চাওয়া-চাওয়ি করলো ওরা। শেষে রবিন উঠে গিয়ে ঢাকনার হুক খুলে দিলো। উঠে এলো হোফার।
তোমরা এখনও এখানে বসে আছো? ভুরু কুঁচকে বললো সে। ওদিকে যে ইয়ার্ড ভরে গেছে...
ইয়ার্ড ভরে গেছে! কিশোর অবাক।
কেন, জানো না? ওদের আসতে বলোনি?
এখানে চলে এসেছে নাকি? সর্বনাশ হয়েছে। কিন্তু ওদের তো ফোন করার কথা...
কিশোর, লজ্জিত কণ্ঠে বললো মুসা, আমাদের ফোন নম্বর দিতে ভুলে গেছি। শুধু বলেছি, পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে যেন যোগাযোগ করে।
আমিও তাই করেছি, মুসার কথার প্রতিধ্বনি করলো যেন রবিন।
কিশোরের মুখও লাল হয়ে গেল। পেপারওয়েট সরিয়ে মেসেজটা টেনে নিলো, আগের দিন সন্ধ্যায় যেটা লিখেছিলো। ফোন নম্বর লেখেনি। মেসেজটা দেয়ার সময় রবিন আর মুসাও ভুলটা ধরতে পারেনি।
ভুল হয়েছে, কি আর করা? হাত নাড়লো কিশোর। চলো, বেরোই।
রিকি, ভয় ফুটেছে, মুসার চোখে, অফিসে মেরিচাচী আছে?
দেখলাম না তো। রাশেদ আংকেলকেও না। শুধু বোরিস আর রোভার।

কিশোর, করুণ হয়ে উঠেছে মুসার চেহারা। আমার না গেলে হয় না?
এমন ভাবে দম নিলো কিশোর, যেন গভীর পানিতে অনেকক্ষণের জন্যে ডুব দেবে। চারজনেও সামলাতে পারবো কিনা সন্দেহ আছে। চলো।

.

বাইরে প্রচণ্ড কোলাহল।
আল্লাহরে আল্লাহ! গুঙিয়ে উঠলো মুসা। তুমিই জানো!
আরে, এ-তো খালি আসতেই আছে! চোখ বড় বড় হয়ে গেছে রিকির।
স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর।
রবিন নীরব।
বাচ্চা ছেলেমেয়েতে ভরে গেছে ইয়ার্ডের চত্বর। কেউ দাঁড়িয়ে আছে, কেউ ছুটছে, কেউ কেউ আবার জঞ্জালের ওপর উঠে বসে আছে। চেঁচাচ্ছে সবাই। শয়ে। শয়ে, যেন পিঁপড়ের দল। ওদের মাঝখানে পড়ে যেন হাবুডুবু খাচ্ছে বিশালদেহী দুই ব্যাভারিয়ান। ইয়ার্ডের জিনিস যার যেটা খুশি তুলে নিচ্ছে বাচ্চারা, তাদের। হাত থেকে কেড়ে নিতে নিতে ক্লান্ত হয়ে গেছে দুই বেচারা! ছেলেমেয়েরা কেউ এসেছে, সাইকেলে, কেউ স্কুটারে। বেশি বয়েসী কিছু ছেলেকেও দেখা গেল, ওরা এসেছে মোটর সাইকেল নিয়ে। গোটা দুই গাড়িও আছে। রঙ মেখে সঙ সাজে যে সার্কাসের ভাড়-গাড়িদুটোরও করা হয়েছে ঠিক সেই অবস্থা। আসল রঙ আর। চেনার জো নেই এখন।
কি চাও তোমরা! আর সহ্য করতে না পেরে চেঁচিয়ে উঠলো রোভার।
কে বলেছে আসতে? চেঁচালো বোরিস।
শুরু হলো তারস্বরে চিৎকার। কারও কথা কিছু বোঝা গেল না। তাড়াতাড়ি কানে আঙুল দিলো দুই ভাই।
হঠাৎ তিন গোয়েন্দার ওপর চোখ পড়লো একটা ছেলের। চেঁচিয়ে বললো, ওই তো, ওই যে এসে গেছে!
এক মুহূর্ত দেরি করলো না আর মুসা। পাঁই করে ঘুরলো, ছুটে পালানোর জন্যে। পারলো না। চোখের পলকে ঘিরে ফেলা হলো তাদেরকে। ধাক্কা খেয়ে আরেকটু হলেই মাটিতে পড়ে যাচ্ছিলো কিশোর। ফ্যাকাশে হয়ে গেছে চেহারা।
কিশোর! ভিড়ের ভেতর থেকে শোনা গেল রবিনের চিৎকার। কিছু একটা। করো!...ভর্তা করে ফেললো...
ওদেরকে বাঁচালো রিকি। তাড়াতাড়ি একটা তেলের ড্রামের ওপর উঠে জংলী নাচ জুড়ে দিলো। সেই সঙ্গে বিচিত্র ভাষায় গান। বাচ্চাদের জর সরে গেল তার দিকে।
এই সুযোগে ঠেলা-ধাক্কা দিয়ে কয়েকজনকে সরিয়ে-কিশোরের কাছে চলে এলো মুসা। বললো, জলদি! পুরস্কারের কথা বলো! হাতে কিছু ধরিয়ে দিয়ে বিদেয়

করতে না পারলে মারা পড়বো।
কি...ক্কি দেবো... এই হৈ-চৈয়ে কিশোরের মাথায়ও কিছু ঢুকছে না। একটা পিপার মধ্যে আর্মিদের ব্যাজ আছে অনেকগুলো, অনেক পুরনো। টেক্সাসে লড়াই করেছিলো যারা...
জলদি আনো গিয়ে... বলতে বলতেই কোনোমতে এসে ড্রামের ওপর উঠলো মুসা, রিকির পাশে। হাত তুলে চেঁচিয়ে বললো, শোনো তোমরা! এই চুপ! আমার কথা শোনো! থেমে গেল কোলাহল। দারুণ একেকখান ব্যাজ পুরস্কার পাবে। সেই ওল্ড ওয়েস্টের জিনিস। আমি শিওর, তোমাদের কারও কাছে নেই একটাও। ওরকম হট্টগোল করলে কাউকে দেয়া হবে না। এদিকে মুখ করে লাইনে। দাঁড়াও। পাঁচ লাইন। যারা সুটকেস এনেছে, তারা এক লাইন করো। পেঁচা আর মূর্তিওয়ালারা আরেক লাইন। বিনকিউলারদের তিন নম্বর লাইন। চার নম্বর লাইনে দাঁড়াবে ছুরি-চামচওয়ালারা। আর শেষ লাইনটা হবে ছবিওয়ালাদের। কোনো হৈ চৈ নয়, ঠেলাঠেলি নয়। হ্যাঁ, দাঁড়িয়ে যাও। তারপর আমরা দেখবো, কে কি এনেছো।
কথা শুনলো ছেলেমেয়েরা। দ্রুত কিভাবে লাইনে দাঁড়াতে হয়, স্কুলের ট্রেনিং আছে। দেখতে দেখতে তৈরি হয়ে গেল পাঁচটা লাইন। এমনকি বেশি বয়েসী ছেলেগুলোও দাঁড়িয়ে গেল সারির পেছনে।
ব্যাজের পিপেটা নিয়ে আসতে বললো কিশোর বোরিসকে।
প্রথম লাইন থেকে শুরু করলো তিন গোয়েন্দা, তাদেরকে সাহায্য করলো, রিকি। পিপেটা নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে রইলো বোরিস আর রোভার।
কে কি এনেছে পরীক্ষা করে দেখতে লাগলো তিন গোয়েন্দা।
যে যা এনেছে, রেখে দিলো, তারপর একটা করে ব্যাজ ধরিয়ে দিলো। একেকজনের হাতে।
এক ঘন্টা পর খালি হয়ে গেল ইয়ার্ডের চত্বর। স্টাফ করা পেঁচা, পুরনো সুটকেস দুটো, আর রূপার চামচ, কাঁটা চামচ, ছুরি, সবই পাওয়া গেল। পাওয়া। গেল না শুধু ভেনাসের মূর্তিটা আর ছবিগুলো।
মূর্তিটা কোথায় আছে, একটা মেয়ে বলেছে আমাকে, রবিন বললো। ঠিকানাও বলেছে। এক মহিলার কাছে আছে ওটা। বিক্রি করবে না।
তুমি গিয়ে একবার বলে দেখো, কিশোর বললো। বুঝিয়ে বললে হয়তো বিক্রি করতেও পারে।...আর মুসা, তুমি কাউন্টেসকে ফোন করো। বলবে, কোনটা কোটা পাওয়া গেছে।
চলে গেল দুই সহকারী গোয়েন্দা।

আরেকটু হলেই মাথা খারাপ করে দিয়েছিলো, ঘাসের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে বসে পড়েছে রিকি। আরিব্বাপরে, কি কাণ্ড! তবে কাজ হয়েছে। এখন মূর্তিটা আর ছবিগুলো পেলেই…
ছবিগুলো মনে হয় শহরের বাইরে চলে গেছে, বললো কিশোর। রকি বীচে থাকলে… থেমে গেল সে। চকচকে একটা গাড়ি ঢুকছে গেট গিয়ে।
ওদের কাছে এসে ঘ্যাচ করে থামলো গাড়িটা।
দরজা খুলে বেরোলো লম্বা, লিকলিকে একটা ছেলে, তাল পাতার সেপাই। কিশোরের দিকে চেয়ে দাঁত বের করে হাসলো, হাতে একটা ছবি।

.
এটাই খুঁজছো, তাই না শার্লক পাশা? ছবিটা তুলে দেখালো ছেলেটা।
শুঁটকি! চেঁচিয়ে উঠলো কিশোর। তোমার এখানে কি?
খিকখিক করে হাসলো তিন গোয়েন্দার পুরনো শত্রু টেরিয়ার ডয়েল, ওরফে শুঁটকি টেরি। আমার প্রশ্নের জবাব দাও।
ছবিটা চিনতে পেরেছে রিকি, মুখ খুলতে যাচ্ছিলো, তার আগেই তাড়াতাড়ি বলে ফেললো কিশোর, না, বোধহয় না। কোথায় পেলে এটা, শুঁটকি?
সেটা আমার ব্যাপার।
কোথায় পেয়েছে, আমাদেরও জানা দরকার, বললো রিকি। বেচতে পারবে। কিনা বুঝতে চাই।
মানে? ফ্যাকাশে হয়ে গেল টেরিয়ার।
আমাদের এখান থেকে কেনোনি… শুরু করলো কিশোর। শেষ করলো রিকি, তারমানে কোনোখান থেকে চুরি করে এনেছে।
না! সরু হয়ে এলো টেরিয়ারের চোখের পাতা। যাক বোঝা গেল, এটাই খুঁজছিলে।
আমিও তাই ভেবেছি।
হ্যাঁ, এটাই খুঁজছি, শান্তকণ্ঠে বললো কিশোর। কিনতে চাই।
কিন্তু আমি তো বেচবো না, কুৎসিত হাসি হেসে গাড়ির দিকে এগোলো টেরিয়ার।
ওকে থামানোর আগেই গাড়িতে ঢুকে গেল। স্টার্ট নিয়ে বেরিয়ে চলে গেল। ইয়ার্ড থেকে।
অফিস থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এলো মুসা। শুঁটকির গাড়ি না?
হ্যাঁ। ডেনবারের একটা ছবি দেখাতে এসেছিলো, বললো রিকি
জিজ্ঞেস করলাম বেচবে কিনা, রাজি হলো না, কিশোর জানালো।
খাইছে! মিস্টার ব্রাউনকে তো আসতে বলে দিলাম। আসছে।
আসুক। যা পেয়েছি সেগুলোই নিয়ে যাবে।

ব্রাউনের আসার অপেক্ষায় রইলো ওরা। ইতিমধ্যে ফিরে এলো রবিন। বললো, অনেক চেষ্টা করলাম। মূর্তিটা বেচবেই না মহিলা।
মার্সিডিজ নিয়ে এলো ফ্রেড ব্রাউন। যা যা পাওয়া গেছে, ওগুলো দেখেই হাসি ছড়িয়ে পড়লো মুখে। বাহ, ভালো ডিটেকটিভ তো তোমরা। এতো তাড়াতাড়ি কাজ করে ফেলেছে।
কিন্তু মূর্তিটা আনতে পারিনি, রবিন বললো। মিসেস ওয়াগনার নামে এক মহিলার কাছে আছে, বেচতে রাজি নয়। ঠিকানা, একশো তিন নম্বর রোজাস স্ট্রীট।
টেরিয়ার ডয়েলের কথা বললো কিশোর। ছবি নিয়ে এসেছিলো, সে-কথাও জানালো।
ঠিক আছে, ঠিকানা তো পেলাম, বললো ব্রাউন। মিসেস ওযাগনারের সঙ্গে কথা বলে দেখবো। আর ছেলেটার নাম যেন কি বললে...ও, টেরিয়ার ডয়েল। রকি বীচেই থাকে। বড়লোকের ছেলে। এই তো?
হ্যাঁ, স্যার, মাথা ঝাঁকালো মুসা। সৈকতের কাছে বিরাট এক বাড়ি আছে।
তাহলে, আশা আছে ছবিগুলো জোগাড় করবে তোমরা। কাউন্টেস খুব খুশি হবেন। হাজার হোক, ভাইয়ের শেষ স্মৃতি... হ্যাঁ, এই জিনিসগুলোর দামাটা দিয়ে দিই। আর প্রত্যেকটা জিনিসের জন্যে পাঁচ ডলার করে পুরস্কা না বলি, গোয়েন্দাগিরির ফিস, হলো গিয়ে পঁচিশ ডলার। খুশি তো?
হ্যাঁ, খুব খুশি, দাঁত বের করে হাসলো মুসা।
বেশ, ব্রাউনও হাসলো। তাহলে ধরে নিচ্ছি ছবিটাও শীঘ্রি পাবো।
জিনিসগুলোর জন্যে রশিদ লিখে দিলো কিশোর। সবাই মিলে ওগুলো তুলে দিলো গাড়িতে। ছেলেদের দিকে চেয়ে সামান্য মাথা নুইয়ে, হাতের বেতটা দোলাতে দোলাতে গিয়ে গাড়িতে উঠলো ব্রাউন। চলে গেল।
রিকি বললো, আমিও যাই। বাবাকে শান্ত করি গিয়ে।

.

লাঞ্চের পর হেডকোয়ার্টারে মিলিত হলো তিন গোয়েন্দা। চিন্তিত দেখাচ্ছে। কিশোরকে। বললো, শোনো, শুঁটকি ছবিটা বেচার জন্যে আনেনি। আমাদের দেখিয়ে শিওর হয়ে গেল।
কেন? রবিনের প্রশ্ন।
জানি না। হয়তো, সে জানে অন্য ছবিগুলো কোথায় আছে। একটা ছবি দেখিয়ে শিওর হয়ে গেল। বাকিগুলোও আনবে আমাদের কাছে, একসঙ্গে বিক্রি করতে, চড়া দাম হাঁকবে। কিংবা অন্য কারো কাছে বেচবে। হতে পারে, সেই নীল সেডান গাড়িওয়ালার কাছে।
গাড়িটা কার, জানতে পারলে হতো, বিড়বিড় করলো মুসা।

সেকথা এখন ভাবছি না, বললো কিশোর। আগে কুড়িটা ছবি খুঁজে বের করা দরকার। আর সেটা করতে হলে শুঁটকির মাধ্যমেই করতে হবে।
বেশি টাকার লোভ দেখিয়ে দেখবো নাকি? পরামর্শ দিলো রবিন।
ঠিক বলেছো। তাহলেই বেচে দেরে, মুসারও তা-ই ধারণা।
টেলিফোন লাইনের সঙ্গে লাগানো স্পীকারের সুইচ অন করলো কিশোর। রিসিভার তুলে ডায়াল করলো। শুঁটকিই ধরলো ওপাশ থেকে তুলেই কড়া গলায় বললো, দেখো, শার্লকের বাচ্চা, আমাকে জ্বালিও না। আমি ব্যস্ত।
শুঁটকি, শোনো, শান্ত রইলো কিশোর। ডারল টাকা দেবো তোমাকে। ছবিটা দিয়ে দাও।
ছবি? কিসের ছবি? আকাশ থেকে পড়লো যেন টেরিয়ার, পিত্তি জ্বালানো, হাসি হাসলো।
জানো না কোনটা? রাগে চেঁচিয়ে উঠলো মুসা। একটু আগে যেটা দেখিয়ে গেছে, পচা শুঁটকি কোথাকার!!
তাই? দেখিয়ে গেছি নাকি? হি হি করে হাসলো টেরিয়ার। কই, আমার তো মনে পড়ে না। ওহহো, বুঝেছি, স্বপ্নে দেখেছো। রাখি, আঁ? গুড বাই।
কেটে গেল লাইন।
একে অন্যের দিকে তাকালো তিন গোয়েন্দা।
শয়তানটার ওপর নজর রাখতে হবে, মুসা বললো। ছায়ার মতো লেগে থাকতে হবে পেছনে।
ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেললো কিশোর। ওর গাড়ি আছে, সেকেণ্ড। আর আমাদের আছে শুধু সাইকেল। তবে, চাচার পিকআপটা নিতে পারি, বোরিসকেও ড্রাইভার বানাতে পারি। কিন্তু কোথায় যেতে বলবো? শুঁটকি কোত্থেকে ছবিগুলো এনেছে, তাই তো জানি না।
আমাদের হোমারগুলো কাজে লাগাতে পারি, মনে করিয়ে দিলো রবিন। ওর গাড়িতে লাগিয়ে দেবো। তারপর পিছু নেয়া সোজা।
তা বটে, একমত হলো কিশোর। চেষ্টা করা যেতে পারে। চলো, ওর বাড়িতে যাই। আরেকবার কথা বলে দেখি, রাজি করানো যায় কিনা। না পারলে…
কিশোর! এই কিশোর! মেরিচাচীর ডাক শোনা গেল।
খাইছে! আঁতকে উঠলো মুসা। তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে সর্বদর্শনে চোখ রাখলো। স্পষ্ট দেখতে পেলো মেরিচাচীকে। সাথে একটা লোক রয়েছে।
কে লোকটা? জিজ্ঞেস করলো কিশোর।
জিন্দেগীতে দেখিনি। বেঁটে, মোটা, কালো সুট, মাথায় হ্যাট…আর কিশোর, হাতে একটা ব্যাগের মতো। চ্যাপ্টা, বড়।

এক লাফে উঠে এসে প্রায় ধাক্কা দিয়ে মুসাকে সরিয়ে পেরিস্কোপে চোখ রাখলো কিশোর। হুমম! এরকম কেসেই ছবি রাখে লোকে! জলদি চলো।
এই যে, এসেছিস, কিশোরকে দেখে বললেন মেরিচাচী, ইনি মিস্টার জন ফেরেনটি। আর্ট ডিলার। হল্যাণ্ড থেকে এসেছেন। তোর সঙ্গে কথা বলতে চান। গত হপ্তায় কতগুলো ছবি কিনে আনলি না, ওগুলো সম্পর্কে। লোকটার দিকে ফিরলেন। আপনারা কথা বলুন। আমি যাই।
অফিসের দিকে রওনা হয়ে গেলেন মেরিচাচী।
আর্ট ডিলারের কালো চোখের দিকে তাকাতেই ভয় লাগে। অ্যামস্টারডাম থেকে এসেছি আমি, ভোঁতা কণ্ঠস্বর, রিগ ডেনবারের সঙ্গে দেখা করতে। এসে শুনলাম মরে গেছে। তারপর শুনলাম, তার ছবিগুলো খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে তিন গোয়েন্দা। এখানে তোমরা খুবই পরিচিত, ঠিকানা বের করতে মোটেই অসুবিধে হলো না। ছবিগুলো কিনতে এসেছি। পেয়েছো?
মাথা নাড়লো মুসা। না।
একটাও না? গম্ভীর হয়ে বার দুই পায়চারি করলো ফেরেনটি, তারপর জ্বলন্ত চোখে তাকালো ছেলেদের দিকে। ভালো দাম দেবো।
শুঁটকি টেরি একটা ছবি নিয়ে এসেছিলো, বলে ফেললো রবিন। কিন্তু...
ওলন্দাজ লোকটার কাঁধের ওপর দিয়ে ইয়ার্ডের গেটের দিকে তাকিয়েছিলো কিশোর, ঝট করে মাথা ফেরালো, কিন্তু ওটা আসল না। মানে রিগ ডেনবারের ছবি না।
রিগ ডেনবারের নয়?
না।
গোয়েন্দাপ্রধানের দিকে চেয়ে চোখ মিটমিট করছে রবিন আর মুসা । মিথ্যা কথা বলছে কেন? নিশ্চয় কোনো কারণ আছে। চুপ করে রইলো ওরা।
তিনজনের দিকেই একে একে তাকালো জন ফেরেনটি। মিছে কথা বলছো তো?
নাহ, মাথা নাড়লো কিশোর।
শুঁটকি টেরি না কি একটা নাম যেন বললে? ঢেঙা, পাতলা ছেলেটা?
আপনি চিনলেন কিভাবে? অবাক হলো মুসা।
প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে ফেরেনটি বললো, পরিবারটা ধনী, না? আর্ট কালেকশন আছে? ছবি কেনে?
কিছু তো বোধহয় আছেই, রবিন শিওর না।
আসলে, শুঁটকি টেরিকে আমরা ভালোমতো চিনিই না, স্যার। এখানকার ছেলেরা শুঁটকি শুঁটকি করে তো, তাই আমরাও বলছি। কোথায় থাকে, তা-ও জানি না।

নির্জলা মিথ্যেগুলো এমনভাবে বলে গেল কিশোর, মুসা আর রবিনেরই বিশ্বাস করে ফেলতে ইচ্ছে হলো।
তারমানে আমাকে সাহায্য করবে না? কড়া চোখে তাকালো ফেরেনটি।
করতে পারলে তো খুশিই হতাম, স্যার।
হু। বেশ, যদি ছবিগুলো তোমাদের হাতে আসে, আমাকে মোটেলে ফোন করো। প্যারাডাইজ মোটেল। ঠিক আছে? মনে রেখো, ভালো দাম দেবো।
মাথা ঝোঁকালো কিশোর।
ঘুরে হাঁটতে শুরু করলো ফেরেনটি। অল্প অল্প খোঁড়াচ্ছে। চেয়ে রয়েছে রবিন আর মুসা।
কিশোর! লোকটা দূরে সরে গেলে বললো রবিন। দেখেছো…
হ্যাঁ, আগেই খেয়াল করেছি। পাথরের ওপর পড়ে লেগে থাকতে পারে।
ওকেই তাড়া করেছিলাম সেদিন?
এজন্যেই মিছে কথা বলেছো? মুসা বললো।
হ্যাঁ, সেটা একটা কারণ।
আরেকটা? জানতে চাইলো রবিন।
ওর গাড়ি। এখনও খেয়াল করোনি?
জাঙ্কইয়ার্ডের বাইরে গেটের ধারে পার্ক করা ছোট নীল সেডানটাতে উঠছে ফেরেনটি। স্টার্ট নিয়ে চলে গেল।
কাউন্টেসের গাড়ির পিছু নিয়েছিলো ওটাই! চেঁচিয়ে উঠলো মুসা।
আর আমি কিনা শুঁটকির কথা সব বলে দিলাম! ছবির কথাও! কপালে হাত রাখলো রবিন।
না, তেমন কিছু বলোনি, সান্ত্বনা দিলো কিশোর। আমার ধারণা, শুঁটকির ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়েই এসেছে ফেরেনটি। কাজেই তাড়াতাড়ি করতে হবে। আমাদের। ওর আগেই গিয়ে শুঁটকিকে ধরতে হবে।
দেরি করছি কেন তাহলে? চলো চলো, তাড়া দিলো মুসা।
কিন্তু আমি তো এখন যেতে পারছি না, রবিন বললো। বাড়িতে কাজ আছে। মা যেতে বলে দিয়েছে।
খানিকক্ষণ চিন্তা করে কিশোর বললো, যাও। হোমিং ট্রান্সমিটার নিয়ে আমরা যাচ্ছি। তোমার কাজ শেষ হলে রিসিভারটা নিয়ে চলে যেও ওখানে। দেরি হবে?
না না, তা হবে না।
বেশ, এসো তাহলে।
.

সৈকতের ধারে অনেকগুলো বাড়ি। সরু একটা পথের ধারে রেডউডে তৈরি বিশাল বাড়িটা ডয়েলদের। রাস্তা থেকে সরু একটা গলি বেরিয়ে ওদেরটা, আর আরেকটা বাড়ির মাঝখান দিয়ে চলে গেছে। পথের ধারে, বাড়িগুলোর আশপাশে, সব জায়গায়ই পামের সারি আর হিবিসকাসের ঘন ঝড়।
বড় একটা ঝাড়ের ধারে সাইকেল থেকে নামলো মুসা আর কিশোর। ওখান থেকে ডয়েলদের বাড়িতে ঢোকার দুটো গেট দেখা যায়–সামনের বড়টা, আর এক পাশের ছোট একটা। গ্যারেজের দরজাও দেখা যায়। টেরিয়ারের স্পোর্টস কারটা ভেতরেই রয়েছে।
আগে ওর সঙ্গে কথা বলি। সাইকেল ঠেলে নিয়ে এগোলো কিশোর। পাশে চললো মুসা।
ডাক শুনে দোতলার একটা জানালা খুলে মুখ বের করলো টেরিয়ার। আরে, শার্লকের বাচ্চারা যে! তা কি মনে করে? পুরনো শত্রু
ছবিটা কিনতে এসেছি, শুঁটকি, বললো মুসা।
হেসে উঠলো টেরিয়ার। কান পাতলো। ভালো শুনি না। কি করতে এসেছো? নাচতে?–
ছবিটা এখনও তোমার কাছেই আছে, শুঁটকি, কিশোর বললো। আমি জানি।
হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি তো সবই জানো। জলদি বেরোও। নইলে পুলিশকে ফোন করবো। বলবো, চুরি করতে ঢুকেছে।
গালিটা এসে গিয়েছিলো মুসার মুখে, অনেক কষ্টে সামলে নিলো।
ফিরে চললো দুজনে। সেই ঘন ঝাড়টার কাছে এসে সাইকেল রেখে লুকিয়ে রইলো।
সৈকতের ওদিক দিয়ে ঘুরে গিয়ে গ্যারেজে ঢুকবো, বললো কিশোর। ওর .. গাড়িতে লাগিয়ে দেবো তোমারটা। তুমি চোখ রাখ। শুঁটকিকে বেরোতে দেখলেই শিস দিয়ে হুঁশিয়ার করবে আমাকে।
ঠিক আছে।
ঝোপ থেকে বেরোনোর জন্যে ঘুরেই স্থির হয়ে গেল কিশোর। আরি! ওই লোকটা কে?
মুসাও দেখলো। ডয়েলদের বাড়ির একধারে সরু একটা পথের মোড়ে লোকটা। পরনে ইউনিফর্ম। মাথার ক্যাপটা কপালের ওপর টেনে দেয়া। চোখ আড়াল করতে চাইছে বুঝি। হাতে ভারি একটা ব্যাগটুল কিট-ওটার ভারে। কাত হয়ে হাঁটছে।
টেলিফোন মিস্ত্রী, চেপে রাখা নিঃশ্বাস আস্তে করে ছাড়লো মুসা।
ডয়েলদের বাড়িতে ঢুকে গেল লোকটা।

ভ্রূকুটি করে কিশোর বললো, লাগলো তো সেরকমই। কিন্তু…
কিন্তু কি?
না, কিছু না। নির্জন, শূন্য পথের দিকে তাকালো কিশোর। কোথায় যেন একটা ঘাপলা হচ্ছে, ঠিক বুঝতে পারছি না।
তুমি যাও। আমি কড়া নজর রাখবো।
মাথা নেড়ে বেরিয়ে এলো কিশোর।

.

ডয়েল আর তাদের প্লাশের বাড়ির মাঝখান থেকে গভীর নালা নেমে এসেছে। সৈকতে। গরমকালে এখন শুকনো। লুকিয়ে থাকার উপযুক্ত জায়গা। আর এটার ভেতর দিয়ে গ্যারেজে উঠে যাওয়াও সহজ, কারও চোখে পড়বে না।
উঠতে শুরু করলো কিশোর। টেরিয়ারকে কোথাও দেখা গেল না। হোমার ট্রান্সমিটারটা শেষবারের মতো চেক করলো সে। শক্তিশালী একটা চুম্বক লাগানো রয়েছে, গাড়ির বডিতে লাগিয়ে দিলে শত ঝাঁকুনিতেও খুলে পড়বে না।
আবার এগোতে শুরু করলো সে। কয়েক পা এগিয়েই দাঁড়িয়ে গেল। টেলিফোনের মিস্ত্রী বাড়ির চারপাশে এক চক্কর ঘুরে এখন এগিয়ে আসছে গ্যারেজের দিকে। তারটা খুঁজে বের করলো, যেখান দিয়ে মূল বাড়িতে ঢুকেছে। যন্ত্রপাতি বের করে ঝুঁকলো ওটার ওপর।
হঠাৎ বুঝে ফেললো কিশোর, গোলমালটা কোথায়। মিস্ত্রী এসেছে, কিন্তু ভ্যান গাড়ি নেই। কে কবে শুনেছে, ভ্যান ছাড়া টেলিফোন মিস্ত্রী কাজ করতে আসে? ব্যাটা ছদ্মবেশী! তারমানে হলো, হয় তার কাটছে, কিংবা তারের সঙ্গে চোরা লাইন লাগাচ্ছে, যাতে সুব কথাবার্তা চুরি করে শুনতে পারে। এখান থেকে ভালো দেখা যাচ্ছে না। হেঁটে গেলে লোকটার চোখে পড়ে যেতে পারে, তাই হামাগুড়ি দিয়ে। দ্রুত এগোলো কিশোর। কি করছে লোকটা, জানতে হবে।
চলে এলো একেবারে নালার মাথার কাছে। পরিশ্রমে হাঁপাচ্ছে। কয়েক : সেকেণ্ড চুপ করে পড়ে থেকে দম নিয়ে আস্তে মাথা তুললো।
চমকে উঠলো ভীষণ ভাবে! মিস্ত্রীর চোখে চোখ পড়ে গেছে। মাত্র ফুটখানেক তফাতে রয়েছে লোকটার মুখ। বুকের ভেতর কাঁপুনি তুলে দেয়া ভীষণ একজোড়া চোখ। কালো। জন ফেরেনটি!
হাতে মস্ত এক ছুরি!

.

ঝাড়ের ভেতরে ঘাপটি মেরে রয়েছে মুসা। টেরিয়ার কিংবা কিশোর, কারোরই দেখা নেই। রবিনও আসছে না এখনও।
মুসাআ!

সৈকতের দিক থেকে শোনা গেল চিৎকারটা।
মুসাআ! বাঁচাও!
হুড়মুড় করে ঝোপ থেকে বেরিয়ে এলো মুসা। ঘুরেই দৌড় দিলো শব্দ লক্ষ্য করে। সরু পথ ধরে ছুটে গিয়ে বাড়ির পেছনে মোড় নিতে যাবে, এলো প্রচণ্ড বাধা। খপ করে তার হাত চেপে ধরলো একটা শক্তিশালী থাবা, মুচড়ে নিয়ে গেল। পেছনে পিঠের ওপর, আরেকটা হাত চেপে ধরলো তার মুখ। যাতে চিৎকার করতে না পারে। আটকা পড়লো সে-ও।

.
ঝাড়ের কাছে সাইকেল দুটো দেখতে পেলো রবিন। কিন্তু মুসা আর কিশোর কোথায়? মুখ তুলে তাকিয়ে দেখলো, নির্জন পথ। কেউ নেই, কোনো নড়াচড়া। নেই।
হঠাৎ একটা গাড়ি স্টার্ট নেয়ার শব্দ হলো ডয়েলদের বাড়ির ধারে। দুটো বাড়ির মাঝের সুরু গলি থেকে শাঁ করে বেরিয়ে এলো নীল সেডানটা। তীক্ষ্ণ মোড় নিয়ে রাস্তায় ওঠার সময় কর্কশ আর্তনাদ তুললো টায়ার।
আর্ট ডিলারের গাড়ি! জন ফেরেনটি এখানে কি করছিলো?
বিপ বিপ বিপ বিপ! বেজে উঠলো রবিনের পকেটে রাখা রিসিভার। একটানে বের করে দেখলো কাটাটা পথের দিকে নির্দেশ করছে, ধীরে ধীরে কমে আসছে। জোরালো বিপ বিপ। কি ঘটেছে, বুঝে ফেললো সে।
হোমারটা টেরিয়ারের গাড়িতে লাগাতে পারেনি কিশোর কিংবা মুসা। ধরা। পড়েছে। তাদেরকে বন্দী করে গাড়িতে তুলে নিয়ে যাচ্ছে ফেরেনটি।
চোখের আড়ালে চলে গেছে নীল গাড়িটা। বোঝার পর আর বিন্দুমাত্র সময়। নষ্ট করলো না রবিন, সাইকেল নিয়ে ছুটলো ওটার পেছনে। চলতে চলতে উঠে এলো উপকূলের প্রধান সড়কে।
বাঁয়ে মোড় নিলো বিপ বিপ। রকি বীচের উত্তর সীমানার দিকে চলেছে নীল সেডান। ইতিমধ্যে দুই বার সংযোগ হারিয়েছে রবিন, তারপর আবার খুঁজে পেয়েছে। প্রাণপণ চেষ্টা করেও সাইকেল নিয়ে পেরে উঠছে না গাড়িটার সাথে, পারার কথাও নয়। বোধহয় ট্রাফিক পোস্টের লাল আলো জ্বলায় থামতে বাধ্য হয়েছিলো ফেরেনটি, সেই সুযোগেই দুবার কাছে চলে গিয়েছিলো রবিন।
মুহূর্তের জন্যে থামছে না সে, গতি কমাচ্ছে না।
তার পরেও তৃতীয়বার সংযোগ হারালো। নীরব হয়ে গেল রিসিভার।
উত্তেজনা আর পরিশ্রমে দরদর করে ঘামছে রবিন। বুকের খাঁচায় যেন পাগল হয়ে উঠেছে হৃৎপিণ্ডটা। কিন্তু থামলো না সে। দ্রুত প্যাডাল করে এগিয়ে চললো

কোস্ট হাইওয়ে ধরে। সামনে পাতলা হয়ে আসছে শহর, খোলা অঞ্চল দেখা যাচ্ছে।

.

টেলিফোনের তার দিয়ে হাত-পা বেঁধে, মুখে রুমাল গুঁজে মুসা আর রবিনকে গাড়ির বুটে ঢুকিয়ে দিয়েছে ফেরেনটি। হাত বেঁধে ফেলার আগেই সেই সুযোগে হোমারের সুইচটা অন করে দিতে পেরেছে কিশোর। মনে মনে এখন লাথি মারতে ইচ্ছে করছে নিজেকে, আগে আরও ভালোমতো খেয়াল করেনি বলে। ট্রেরিয়ারদের বাড়িতে ঢোকার সময়ও খুঁড়িয়ে হাঁটছিলো ফেরেনটি। তবে দূর থেকে ঠিক বোঝা যাচ্ছিলো না। ভালো করে লক্ষ্য করলে অবশ্যই বুঝতে পারতো কিশোর। আর তাহলে এখন এই বিপদে পড়তে হতো না।

পথে বার দুই থেমেছে গাড়ি।

তৃতীয়বার থামলো। এঞ্জিন বন্ধ হলো। কিশোর আন্দাজ করলো, মিনিট দশেক পেরিয়েছে।

উঠে গেল বুটের ডালা। টেনে ছেলেদেরকে বুট থেকে বের করলো ফেরেনটি। তারপর একজন একজন করে হিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে ঢোকালো ছোট মোটেলের শেষ মাথার একটা ঘরে। ইতিমধ্যে ছেলেদের সঙ্গে একটা কথাও বলেনি আর্ট ডিলার।

পাশাপাশি দুটো চেয়ারে বসিয়ে ছেলেদের মুখের রুমাল খুলে দিলো। ফেরেনটি। বড় ছুরিটা বের করে হাতে নিয়ে ছেলেদের মুখোমুখি বসলো। চোখের দৃষ্টি ভীষণ। তারপর? পুঁটকি টেরিকে চেনো না, না? ও আসল ছবি আনেনি? মিথ্যুক কোথাকার। তোমরা ওই ছবি চুরি করতে গিয়েছিলে।

চুরি বলছেন কেন? গরম হয়ে বললো মুসা। ওই ছবির আসল মালিক কাউন্টেস। তার জন্যেই কিনে আনতে গিয়েছিলাম।

তাই? কাউন্টেস আর ব্রাউনের হয়ে কাজ করছো তাহলে? কি কি বলেছে ওরা?

বলেছে কাউন্টেসের পারিবারিক জিনসগুলো উদ্ধার করতে চায়, জবাব দিলো কিশোর। সবই পেয়েছি আমরা, ছবিগুলো ছাড়া।

আবার মিথ্যে কথা। আরও কিছু জানো তোমরা। ব্রাউনের প্ল্যান কি? ওরা। আসলে কি খুঁজছে? ওদের কাছে কি মেসেজ পাঠিয়েছিলো রিগ ডেনবার?

আমরা শুধু জানি, মেজাজ দেখিয়ে বললো মুসা। আপনি সারাক্ষণ কাউন্টেসকে ফলো করেছেন। হপ্তাখানেক আগে গিয়েছিলেন প্রফেসর এলউড হোফারের বাড়িতে...।

তাড়াতাড়ি মুসাকে থামিয়ে দিয়ে কিশোর বললো, কাউন্টেসকে মেসেজ পাঠিয়েছে ডেনবার, একথা কেন মনে হলো আপনার? আর...

দেখো, আমাকে বোকা বানানোর চেষ্টা করো না, ধমক দিয়ে বললো ফেরেনটি। মুসার দিকে তাকালো। এই, তুমি কি বলছিলে? প্রফেসর হোফারের বাড়িতে গিয়েছিলাম?

ঢোক গিললো মুসা। বুঝতে পেরেছ, কিশোর চায় না, কথাটা ভাঙুক। হপ্তাখানেক আগে রেমুডা ক্যানিয়নে প্রফেসরের বাড়িতে চোর ঢুকেছিলো, একথা ফেরেনটিকে জানাতে চায় না।

মুসাকে চুপ করে থাকতে দেখে ভয়াল ভঙ্গিতে ছুরিটা নাচালো ওলন্দাজ।

ইয়ে মানে, ছুরিটার দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিলো মুসা, কাউন্টেস আর ফ্রেড ব্রাউন যেদিন প্রফেসরের বাড়িতে প্রথম, গেছে, আপনিও সেদিন গিয়েছিলেন।

জ্বলন্ত চোখে ছেলেদের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ ফেরেনটি। না। সেকথা বলতে চাওনি। কাউন্টেস এখানে আসার আগেই কেউ একজন গিয়েছিলো প্রফেসরের বাড়িতে। তোমাদের ধারণা, সেই লোকটি আমি। কেন?

চুপ করে রইলো দুজনেই।

তারমানে, আবার বললো ফেরেনটি। বলবে না, ডেনবার কি মেসেজ পাঠিয়েছিলো? প্রফেসর হোফার আর তার ছেলের সঙ্গে অনেক কথা বলেছো তোমরা। ওরা কিছু জানায়নি? ওদেরকেও কোনো ইঙ্গিত দিয়ে যায়নি বুড়ো, ডেনবার?

কিসের ইঙ্গিত, স্যার? মোলায়েম কণ্ঠে প্রশ্ন করলো কিশোর।

আবার দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো ফেরেনটি। বাহ! আমি ভেবেছিলাম, তোমরা বোকা। কি করছো, জানো না। উঠে দাঁড়ালো সে। দেখে যা মনে হয়, তার চেয়ে অনেক বেশি চালাক তোমরা। অনেক কিছু জানো, তাই না?

ভুরু কুঁচকে তাকালো ফেরেনটি। শক্ত করে চেপে ধরলো ছুরির হাতল।

.

অনিশ্চয়তায় ভুগছে রবিন। এগিয়ে চলেছে কোস্ট রোড ধরে। ভাবছে, গাড়িটা কি খুঁজে পাবে? আরও এগিয়ে যাবে, নাকি কোথাও থেমে পুলিশের চীফ ইয়ান ফ্লেচারকে ফোন করবে?

অনেক ভেবে শেষে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তই নিলো সে।

চলে এলো শহরের উত্তর প্রান্তে। মোটেলগুলো শুরু হয়েছে এখান থেকে। গভীর আগ্রহে কান পেতে রেখেছে, যাতে রিসিভারের সামান্যতম বিপ শব্দও মিস না করে। নীল সেডানটাকে খুঁজছে দুই চোখ।

.

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ঘরের ভেতরে পায়চারি করছে ফেরেনটি। ছুরিটা হাতেই রয়েছে। মিনিট দশেক কাটলো। ভাবেসাবে মনে হয়, মনস্থির করতে পারছে না সে।

হঠাৎ ফিরলো। তোমাদেরকে কি করি, তোমরাই বলো? আমার কাজে বাধা দিয়েছে, ছেড়ে দিলে আরও দেবে।
মিনমিন করে জিজ্ঞেস করলো কিশোর, রিগ ডেনবারের কাছে কি মূল্যবান কিছু...
এই সময় বাজলো টেলিফোন। ঝটকা দিয়ে ঘুরলো আর্ট ডিলার। এমনভাবে। তাকালো যন্ত্রটার দিকে যেন ওটা একটা বিষাক্ত সাপ। ছেলেদের দিকে একবার ফিরে চেয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল ফোনের কাছে। রিসিভার তুলে কানে ঠেকালো।
হ্যাঁ হ্যাঁ, উজ্জ্বল হলো ফেরেনটির চোখ। কি? একটা ছেলে?... টেরিয়ার?...হ্যাঁ, চিনি ওকে।...না না, এখানে পাঠানোর দরকার নেই। আমিই অফিসে আসছি। রিসিভার রেখে ফিরে চাইলো। টেরিয়ার ডয়েল–যাকে তোমরা চেনোই না–দেখা করতে এসেছে আমার সঙ্গে! কি বুঝলে?
গোঁ গোঁ করে উঠলো মুসা। তখনই বলেছি, শুঁটকি ব্যাটা কোনো তালে। আছে!
ওকে বিশ্বাস করলে জ্বল করবেন, মিস্টার ফেরেনটি, বললো কিশোর।
তোমাদেরকেও তো বিশ্বাস করতে পারছি না, কাটা জবাব দিলো আর্ট ডিলার। আবার ছেলেদের মুখে রুমাল গুঁজে দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল।
বাঁধন খোলার আপ্রাণ চেষ্টা করলো দুই গোয়েন্দা। অবধা। খোলী তো দুরের কথা, ঢিলই করতে পারলো না, বরং আরও কেটে বসলো তার। হতাশ হয়ে চেয়ারে গা এলিয়ে দিলো।
হঠাৎ আবার খুলে গেল দরজা।
হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে রবিন!
দ্রুত এসে দুজনের বাঁধন খুলে দিলো সে। মুখের রুমাল নিজেরাই খুললো ওরা।
রবিন! বলে উঠলো মুসা। বাঁচালে ভাই। এলে কিভাবে...
হোমারটাকে ফলো করলাম কিছুক্ষণ। তারপর সিগন্যাল হারিয়ে গেল। না থেমে এগিয়ে এলাম কোস্ট রোড ধরে। কোনো সাড়া নেই রিসিভারে। প্রায় ফিরেই যাচ্ছিলাম, এই সময় মনে পড়লো, ফেরেনটি বলেছিলো সে প্যারাডাইজ মোটেলে উঠেছে। চলে এলাম।
খুব ভালো করেছে, প্রশংসা করলো কিশোর। চলো, ভাগি।
কিন্তু শুঁটকি? মনে করিয়ে দিলো মুসা। ওই ব্যাটা এখন মোটেলের অফিসে...
হেসে উঠলো রবিন। শুঁটকি আসবে কোত্থেকে? আমিই মোটেলের রিসিপশনিস্ট সেজে ফোন করেছিলাম। গলাটা ধরতে পারেনি ফেরেনটি। অভিনয় করা সোজা, তাই না কিশোর?

যারা জানে তাদের কাছে সোজাই, বললো কিশোর। বেরোও এখন। সামনের দরজা। কুইক!
বেরিয়ে এলো ওরা। কাউকে দেখা গেল না। তিনজনেই দৌড় দিলো রবিনের সাইকেলের দিকে।
মুসা, তুমি চালাও, বললো কিশোর। আমি পেছনে বসছি। রবিন সামনে বসুক। তোমার একটু কষ্ট হবে আরকি..জলদি!
বড় জোর বিশ গজ এসেছে ওরা, এই সময় পেছনে শোনা গেল উত্তেজিত চিৎকার। যে ঘরটা থেকে বেরিয়ে এসেছে ওরা, ওটার সামনের দরজায় দাঁড়িয়ে। জোরে জোরে হাত নাড়ছে ফেরেনটি। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে লাফিয়ে নামলো দরজার নিচে, দৌড় দিলো। বুঝলো, এভাবে খুঁড়িয়ে দৌড়ে পারবে না সাইকেলের সঙ্গে। ঘুরে আবার ছুটলো মোটেলের দিকে।
গাড়ি আনতে যাচ্ছে! বললো কিশোর। লুকাতে হবে। আশেপাশে তাকালো সে। কোনো জায়গা দেখলো না।
প্যাডালে পায়ের চাপ আরও বাড়ালো মুসা। ভারি বোঝা নিয়েও শাঁই শাঁই করে ছুটেছে।
আরে এতো তাড়াহুড়োর দরকার নেই বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়নি রবিন। আসতে পারবে না। ওর গাড়ির ইগনিশনের তার একটাও নেই। সব ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি।
তুমি আজ যা দেখালে না, নথি, এতোক্ষণে হাসি ফুটলো কিশোরের মুখে। মুসা, গতি কমিও না, চালিয়ে যাও…
হু, চালিয়ে যাও, মুখ ভেঙুচালো মুসা। এক সাইকেলে তিনজন, বললেই হলো…
কি করবো, ভাই? তুমি তো তা-ও পারছো, আমি আর রবিন তো চালাতেই পারবো না।
কয়েক মিনিট পর হাইওয়েতে একটা খালি ট্রাক থামালো ওরা। ড্রাইভারকে অনুরোধ করতে সে ওদেরকে সাইকেল সহ তুলে নিলো পেছনে।
শহরে ফিরে এলো তিন গোয়েন্দা। টেরিয়ারদের বাড়ির কাছে গিয়ে ঝোপের আড়াল থেকে যার যার সাইকেল বের করে নিলো মুসা আর কিশোর।
স্যালভিজ ইয়ার্ডে ফিরে, খাওয়া-দাওয়া সেরে আবার হেডকোয়ার্টারে ঢুকলো তিনজনে।
জটিল এক রহস্য দানা বাঁধছে, নিচের ঠোঁটে চিমটি কেটে বললো কিশোর। ফেরেনটির ধারণা, মূল্যবান কোনো জিনিস ছিলো ডেনবারের কাছে। কিভাবে। পেতে হবে, মেসেজ রেখে গেছে। কাউন্টেস আর ব্রাউনের সঙ্গে কথা বলা দরকার।
ফোনে কয়েকবার চেষ্টা করলো কিশোর। কেউ ধরলো না।

সকালে আবার চেষ্টা করবো, বললো গোয়েন্দাপ্রধান। তবে তার আগে রিগ ডেনবারের সম্পর্কে ভালোমতো খোঁজখবর নেয়া দরকার। লোকটা কে ছিলো, কি। করতো..রবিন, কাল সকালে লাইব্রেরিতে বইপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করে দেখো। বলা যায় না, কিছু বেরিয়েও পড়তে পারে!

.

তাকের দিকে চেয়েই অবাক হয়ে গেল রবিন। আর্টের ওপর লেখা মোটা মোটা বইগুলো বেশির ভাগই নেই। সরে এলো ওখান থেকে।

ভুরু কোঁচকালেন লাইব্রেরিয়ান মিস হকিনস। কি হয়েছে, রবিন?

আর্টের রেফারেন্স বইগুলো নেই। কে নিলো?

একজন লোক, ছোট পড়ার ঘরটায় নিয়ে গিয়ে পড়ছে। লাইব্রেরি খোলার সঙ্গে সঙ্গে ঢুকেছে। এখনও বেরোয়নি। কালও এসেছিলো। কেন, কোনো বই তোমার দরকার? গিয়ে বলবো দিতে?

না, থ্যাংক ইউ। আমিই যাচ্ছি।

ছোট ঘরটায় ঢুকলো রবিন। পেছন ফিরে বসে আছে লোকটা। টেবিলে একগাদা বই। আরেকটা বইয়ের জন্যে হাত বাড়াতেই মুখটা দেখতে পেলো সে। চমকে উঠলো। প্রফেসর এলউড হোফার।

দ্রুত বেরিয়ে এলো রবিন। ঝড়ের গতিতে ভাবনা চলেছে মাথায়। আর্টের বই পড়ছেন ভাষাবিদ প্রফেসর! উত্তেজিত হয়ে উঠলো সে। চেয়ার টেনে নিয়ে এমন একটা জায়গায় বসলো, যেখান থেকে দরজা দিয়ে প্রফেসরকে দেখতে পায়। কি পড়ছেন তিনি? ইস্, যদি দেখা যেতো!–

অবশেষে উঠলেন প্রফেসর। বেরিয়ে গেলেন। রবিন ভাবলো, তাঁকে অনুসরণ করবে? না, তাতে বিশেষ লাভ হবে না। নিশ্চয় এখন বাড়ি ফিরবেন তিনি। তার চেয়ে যে কাজ করতে এসেছে সে, সেটাই করে যাবে। রেফারেন্স বইতে রিগ ডেনবারের সম্পর্কে কি লেখা আছে, দেখবে।

.

প্রফেসর হোফার!

হ্যাঁ, কিশোর, বললো রবিন। আর্টের যে কটা বই আছে ওখানে, সব ঘেঁটেছেন।

খাইছে! মুসা বললো। হঠাৎ করে আর্টের বইয়ের ওপর এই আগ্রহ, * কেন?

হেডকোয়ার্টারে আলোচনায় বসেছে তিন গোয়েন্দা।

আচ্ছা, প্রফেসরের কথা আপাতত থাক, বললো গোয়েন্দাপ্রধান। তো, রেফারেন্স বইতে রিগ ডেনবারের কথা কিছুই লেখা নেই?

না, একটা শব্দও না।

অন্য কোনো বইতে থাকতে পারে। তবে বোঝা যাচ্ছে, তেমন বিখ্যাত কেউ নয়। তাহলে বড় বড় বই সবগুলোতেই থাকতো।
বড়ই যদি না হবে, ওর, ছবির জন্যে পাগল হয়ে গেছে কেন জন ফেরেনটি? মুসার প্রশ্ন।
এমনও হতে পারে, রবিন বললো। আসলে ছবি খুঁজছে না লোকটা। ছবির ছুতোয় অন্য কিছু খুঁজছে। জিনিসটা কী, হয়তো কাউন্টেস আর তার ম্যানেজারও জানে।
মাথা ঝোঁকালো কিশোর। যুক্তি আছে তোমার কথায়। হয়তো সেই জিনিসটাই সেদিন নিতে এসেছিলো কালো পোশাক পরা লোকটা। আগেই, যাতে আর কেউ পেয়ে না যায়। কিন্তু পায়নি। ডেনবারের জিনিসগুলো আমাদের কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন প্রফেসর, আমরা বেচে দিয়েছি অন্যের কাছে। সেটার খোঁজ এখনও চালিয়ে যাচ্ছে লোকটা।
জন ফেরেনটির মতো, বলে উঠলো মুসা।
আমার এখন অবাক লাগছে, রবিন বললো। হঠাৎ করে আর্টের ওপর। আগ্রহী হয়ে উঠলেন কেন ল্যাংগোয়েজের প্রফেসর?
নাক চুলকালো কিশোর। বোধহয় মেসেজ। মেসেজের কথা বলেছে। ফেরেনটি। হয়তো মৃত্যুর আগে কোনো মেসেজ রেখে গেছে ডেনবার। রিকি, বলেছে প্রলাপ বকেছে। সেই প্রলাপের মধ্যেই কোনো মূল্যবান তথ্য দিয়ে গেছে হয়তো লোকটা।
এবং সেটা প্রফেসর জানেন, কিন্তু কাউন্টেস নয়?
আমার তাই মনে হচ্ছে, নথি। চলো, রেমুডা ক্যানিয়ন থেকে ঘুরে আসি।
আমার বাবা! শুনে রিকিও অবাক। বাবা আর্টের বই ঘেঁটেছেন?
লনের মধ্যে ছায়ায় বসে কথা বলছে চার কিশোর।
ছবির কথা কি খুব বেশি বলাবলি করতো ডেনবার? জিজ্ঞেস করলো গোয়েন্দাপ্রধান।
নাহ্। আমাকে ছবি আঁকা শেখানোর চেষ্টা করেছে। চেষ্টা করেছি, পারিনি। একবার একটা অদ্ভুত কথা বলেছিলো। সে নাকি দুনিয়ার সব চেয়ে দামী পেইন্টার। কিন্তু কেউ জানে না সেকথা। বলেই হেসে উঠেছিলো।
এতে কিছু বোঝা যায় না, মন্তব্য করলো মুসা।
না, তা যায় না, কিশোরও একমত।
রিকি বললো, কি যে ঘটছে, কিছুই বুঝতে পারছি না। এতোগুলো মাস একা এখানে থাকলে রিগ ডেনবার, কেউ দেখাও করতে আসেনি তার সঙ্গে। কিন্তু যেই মারা গেল, অমনি একের পর এক আসতে লাগলো, আগ্রহী হয়ে উঠলো। কতোজন।...ও হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি, এখন ঘরে বাবার সঙ্গে কথা বলছেন কাউন্টেস আর ব্রাউন।

আবিষ্কার করে ফেলেছে নাকি কিছু?
চলো না, দেখি, প্রস্তাব দিলো কিশোর।
ম্যানটলপিসে হেলান দিয়ে রয়েছেন প্রফেসর। কাউন্টেস আর তাঁর ম্যানেজারের মুখোমুখি।
ছেলেদের দেখে হাসলেন কাউন্টেস। এই যে, গোয়েন্দার দল এসে পড়েছে। কাজ চালিয়ে যাচ্ছো তো?
যাচ্ছি, তবে ছবিগুলো এখনও পাইনি, ম্যাডাম, জবাব দিলো কিশোর। আচ্ছা, একটা কথা বলতে পারেন? আপনার ভাই কি কখনও কোনো ছবি কাউকে দেখিয়েছেন? কিংবা বিক্রি করেছেন?
না, কে কিনবে তার ছবি? একেবারেই নবিস। তবু, ওর ছবিগুলো আমার চাই। ওই যে বলেছি, ভাইয়ের স্মৃতি। তোমরা তদন্ত চালিয়ে যাও, খুঁজে বের করো। ওগুলো।
করবো। যদি আমাদের আগেই কেউ হাতিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়।
কেউ? অবাক মনে হলো ম্যানেজারকে।
জন ফরেনটি নামে এক লোক। আর্ট ডিলার বলে পরিচয় দিয়েছে। আপনাদেরকে অনুসরণ করে। ছবিগুলো চায়।
নীল গাড়ি নিয়ে কিভাবে পিছে লেগে থাকে ফেরেনটি, ছেলেদেরকে কি করে বন্দি করে নিয়ে গিয়েছিলো, জানালো কিশোর। শুনে শিউরে উঠলেন কাউন্টেস। সর্বনাশ! অল্পের জন্যে বেঁচেছে। আরও সাবধানে থাকা উচিত তোমাদের। কিন্তু বুঝতে পারছি না, আমার ভাইয়ের ব্যাপারে তার এতো আগ্রহ কেন। আসলে কি মাকেও ভৰিম কিনুই পেলাম না। তাহলে কি চায়? ছবি, না অন্য কিছু?
কি জানি, হয়তো ছবিই। আজ প্রফেসর সাহেব লাইব্রেরিতে গিয়েছিলেন। আর্টের বই ঘাটতে।
সবাই তাকালো প্রফেসরের মুখের দিকে। রিকির চোখে অস্বস্তি। ক্ষণিকের জন্যে জ্বলে উঠলো ম্যানেজারের চোখের তারা। সত্যি সত্যি কিছু জানেন আপনি? মাথা ঝাঁকালো সে, নেচে উঠলো রূপালি চুল।
না। স্রেফ কৌতূহল। ডেনবারের ব্যাপারে লোকের এই হঠাৎ আগ্রহ আমাকেও ভাবিয়ে তুলেছে। তাই ভাবলাম, দেখিই না গিয়ে, লোকটা বিখ্যাত কেউ ছিলো কিনা। কিছুই পেলাম না। তাতে কৌতূহল আরও বেড়েছে আমার। সেদিন সেই কালো পোশাক পরা লোকটা তাহলে কি খুঁজতে এসেছিলো?
স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন কাউন্টেস। চোর এসেছিলো? মানে, আমরা এখানে আসার আগেই? নিশ্চয় আমার ভাইয়ের কোনো জিনিস চুরি করতে চেয়েছিলো?

আপনারা আসার এক হপ্তা আগে এসেছিলো, জানালো রবিন। কি যে খুঁজতে এসেছিলো সে-ই জানে।
আই সী, বলেই ম্যানেজারের দিকে তাকালেন কাউন্টেস।
ওই ফেরেনটিটা না তো? তাড়াতাড়ি বললো ম্যানেজার। মিস্টার ডেনবারের জিনিসের ওপর তারই তো বেশি আগ্রহ দেখা যাচ্ছে।
নিশ্চয়ই! বলে উঠলো মুসা।
স্যার, প্রফেসরের দিকে চেয়ে বললো কিশোর। রিকি, তোমাকেও বলছি। ফেরেনটির ধারণা, মৃত্যুর আগে মিস্টার ডেনবার কোনো মেসেজ রেখে গেছেন। আপনারা বলেছেন, জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকেছেন তিনি। উল্টোপাল্টা কথা বলেছেন। কিছু কি বোঝাতে চেয়েছিলেন?
ভাবলেন প্রফেসর। তারপর মাথা দোলালেন, হতে পারে, কিশোর। অনর্গল কথা বলে চলেছিলো। এখন মনে হচ্ছে, প্রলাপ ছাড়াও বোধহয় আরও কিছু ছিলো তার কথায়। তবে তখন কিছু বুঝিনি, এখনও না। এই যেমন ধরো, বলেছে... আঁকাবাঁকা ভুল, ক্যানভাস। পেইনটিংস শব্দটা অনেকবার বলেছে। ...আর বলেছে মাস্টারস। আমি বেশি যাইনি ওর কাছে, তবে রিকি প্রায় সারাক্ষণই ছিলো। তুমি আর কিছু শুনেছো, রিকি?
মাথা নাড়লো রিকি। ঠিক মনে করতে পারছি না। আসলে প্রলাপই বকেছে। বলেছেঃ ওদের বলল, ওদের বলো...আঁকা...আঁকা যখন বাঁকা...ভুল মনে হবে মাস্টার...আমার পেইনটিংস...আমার ক্যানভাস ক্যানভাস থেকে আঁকা বাঁকা... বিব্বলো...ভুল। বার বার এইসব কথা বলেছে। একই রকম শব্দ, হেরফের ছিলো না।
কিছুক্ষণ নীরবতা। সবাই ভাবছে, শব্দগুলোর মানে কি? মুখ দেখেই অনুমান করা যায়, কেউ কিছু বুঝতে পারছে না। এমনকি কিশোরের দৃষ্টিও শূন্য।
মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না আমি, বললো ম্যানেজার।
বোঝার কথাও নয়, দীর্ঘশ্বাস ফেললেন কাউন্টেস। প্রলাপের কি আর কোনো অর্থ থাকে?
স্যার, প্রফেসরকে জিজ্ঞেস করলো কিশোর। মিস্টার ডেনবার কি তাঁর সমস্ত জিনিস কটেজেই রাখতেন?
আমার তো তা-ই বিশ্বাস।
মাথা ঝোঁকালো কিশোর। হু। আমরা তাহলে যাই। আমার এখনও মনে হয়, ছবিগুলো সব কোথায় আছে টেরিয়ার জানে।
বার বার ছেলেদেরকে হুঁশিয়ার করলেন কাউন্টেস। তারপর বললেন, কোনো সমস্যা হলেই সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জানাবে।

সায় জানিয়ে বেরিয়ে এলো তিন গোয়েন্দা। সাইকেলে চড়ে বসলো। আগে আগে চলেছে কিশোর। নালার মুখের কাছে এসেই এখান থেকে প্রফেসরের বাড়িটা দেখা যায় না–মোড় নিলো বায়ে, হঠাৎ। অবাক হলো দুই সহকারী।
কোথায় যাচ্ছি? জানতে চাইলো রবিন।
আমি এখন শিওর, প্রলাপের মাধ্যমে কোনো মেসেজ দিতে চেয়েছিলো। ডেনবার, বললো কিশোর। কী, এখনও বুঝতে পারছি না। লোকটা কটেজ থেকে লন, আর লন থেকে কটেজ, এছাড়া আর কোথাও যেতো না। অন্তত যেতে দেখা যায়নি। তাহলে মূল্যবান কিছু যদি থাকেই, ওই কটেজেই রেখে গেছে।
সাইকেল রেখে নালায় নেমে তার ভেতর দিয়ে এগোলো ওরা। চলে এলো কটেজের পেছনে। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ। নীরব বাড়িটার আশপাশে কাউকে চোখে পড়লো না। পা টিপে টিপে এসে ভেতরে ঢুকলো ওরা। কোনখান। থেকে খোঁজা শুরু করবে, ভাবছে কিশোর, এই সময় বাইরে শোনা গেল পদশব্দ।
কুইক! ফিসফিসিয়ে বললো কিশোর। লুকাও।
বেডরুম থেকে দেখলো ওরা, কটেজে ঢুকেছে রিকি। কোনোদিকে খেয়াল, নেই, সোজা এগিয়ে গেল লিভিংরুমের এক কোণে। আঁলগা একটা বোর্ড সরিয়ে, আরও ঝুঁকে হাত ঢুকিয়ে দিলো মেঝের নিচে।
নিঃশব্দে পেছনে এসে দাঁড়ালো তিন গোয়েন্দা।
তাহলে তুমি জানো, কি লুকিয়েছিলো ডেনবার? শান্ত কণ্ঠে বললো কিশোর।
.
হুফ! স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো রিকি। তোমরা। বুকে কাঁপুনি তুলে দিয়েছে।
তোমার হাতে কি? জিজ্ঞেস করলো মুসা।
দেখালো রিকি। পুরনো আমলের বড় একটা চাবি। প্রশ্ন করলো, তোমরা এখানে কি করছো? ভাবছো, এই কটেজেই কিছু লুকিয়েছে ডেনবার?
তোমার কি মনে হয়? পাল্টা প্রশ্ন করলো কিশোর।
আমারও তা-ই মনে হয়। তোমরা চলে যাওয়ার পর হঠাৎ মনে পড়লো কথাটা, ছুটে চলে এলাম। বাবা এখনও ওই দুজনের সঙ্গে কথা বলছে।
কি মনে পড়লো? জানতে চাইলো রবিন।
মাঝে মাঝে অ্যাডোবে যেতে ডেনবার। ক্যানিয়নের ওধারে। ছবিগুলো, ওখানেই রাখতো। ঘরটা খালি থাকে, তালা দিয়ে রাখে বাবা, যাতে কেউ ঢুকে নষ্ট করতে না পারে। ঐতিহাসিক মূল্য আছে ওটার। তবে, বুড়ো ডেনবার ঢুকতো
আমিই তাকে চাবি এনে দিয়েছিলাম।
এটাই কি সেই চাবি? জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

হ্যাঁ। বাবা মেহমানদের সঙ্গে কথা বলছে। তোমরাও, চলে গেলে। ভাবলাম, এইই সুযোগ। অ্যাডোবে গিয়ে খুঁজে দেখি।
ভালোই হলো। চলো, আমরাও যাই।
বাইরে বিকেলের রোদ। তিন গোয়েন্দাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো রিকি। পথ থেকে দূরে নালার ধার দিয়ে হাঁটছে ওরা। হোফার হাউসকে দূর দিয়ে ঘিরে এগিয়ে গেছে নালাটা, তারপর হঠাৎ করেই তীক্ষ্ণ মোড় নিয়ে ঢুকে পড়েছে একটা গিরিসঙ্কটে।
কিছুক্ষণ পর বাঁয়ে ঘুরলো রিকি। ঘন ঝোপের ধার দিয়ে চললো। পেছনে তিন গোয়েন্দা।
আরও সামনে ঘন ঝোপঝাড়, মোটা মোটা লতা। ওগুলোর ভেতর দিয়ে পথ করে হাঁটাই মুশকিল। তবে পথ একটা করাই আছে, রিকি সঙ্গে না এলে খুঁজে পেতো না তিন গোয়েন্দা। ঝোপের ভেতর থেকে বেরোতেই দেখা গেল বনের মাঝে একটা খোলা জায়গা। একধারে শক্ত হয়ে আছে কাদার স্তূপ। আরেকধারে। একটা ছোট কুঁড়ে। কাঠের নিচু ছাত, খড়খড়ি লাগানো জানালা। রোদে শুকানো ইঁট দিয়ে তৈরি। নীরব, নিঃসঙ্গ। এটাই অ্যাডোব।
এই ক্যানিয়নের প্রথম মালিক এক স্প্যানিশ। সে-ই বানিয়েছিলো ওই কুঁড়েটা, জানালো রিকি। দেড়শো বছরেরও বেশি আগে। ভেতরে শুধু একটা ফায়ারপ্লেস আছে। বাথরুমও নেই।
এই চাবি দিয়ে তালা খুললো রিকি। মোটা তক্তার পাল্লা, তাতে লোহার পাত লাগানো। পাতের এক মাথা গোল করে চৌকাঠে লাগানো মোটা লোহার বাকা শলায় বসিয়ে দেয়া হয়েছে, এই প্রাচীন কজার ওপরই খেলে পাল্লাদুটো।
ঠিকই বলেছে রিকি। তিন গোয়েন্দা ঢুকে দেখলো, ভেতরে প্রায় কিছুই নেই। কাঠের মেঝেতে পুরু হয়ে জমেছে ধুলো আর কাঁচা ইটের গুঁড়ো। দুটো ঘর। দুটোই ছোট। একটাকে বোধহয় বসার ঘর হিসেবে ব্যবহার করা হতো, আরেকটা শোবার ঘর–ওটার সংলগ্ন রান্নাঘর। জানালার পাল্লাগুলো বাইরের দিকে খোলে। ফাঁকফোকর দিয়ে চুঁইয়ে ঢুকছে ম্লান আলো। ঘরের ভেতর বেশ ঠাণ্ডা।
খাইছে! বলে উঠলো মুসা। দেয়াল কি পুরুরে বাবা। তিন ফুটের কম হবে না।
অ্যাডোব এভাবেই তৈরি হতো, রবিন বললো আগুনে-পোড়া ইটের মতো শক্ত হয় না রোদে পোড়া ইট। ফলে বড় আর পুরু করে বানাতে হতো, যাতে দেয়াল তৈরি করলে ভার রাখতে পারে।
মুসা, রবিনের কথা শেষ হলে কিশোর বললো, রান্নাঘরটায় খোজো। রবিন, তুমি খোজো শোবার ঘরে। আমি আর রিকি খুঁজছি বসার ঘরটায়।

অব্যবহৃত অনেক ক্যানভাস দেখতে পেলো কিশোর। রঙ পাতলা করার তেলের টিনও আছে। কিন্তু কোনো ছবি নেই। অলংকরণ করা একটা সোনালি ফ্রেম রয়েছে। সেটার দিকে চেয়ে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটলো সে। আনমনে বললো, এটাকে খালি রেখেছিলো কেন ডেনবার?

এটাতে আরেকজনের আঁকা একটা ছবি ছিলো, বললো রিকি। নকল ছবি। ডেনবার বলতো, প্রিন্ট। বলতো, প্রিন্ট মোটেই পছন্দ করে না সে, তাই খুলে ফেলে দিয়েছিলো।

কিন্তু ফ্রেমটা ফেলেনি। ডিজাইনগুলো দেখেছো?

আঁকাবাকা! কিশোর, এটার কথা বলেনি তো?

রিকির কথা যেন শুনতেই পেলো না গোয়েন্দাপ্রধান। বেশ পুরু। ভেতরে অনেক কিছুই লুকিয়ে রাখা সম্ভব।

ফ্রেমটা ভালোমতো পরীক্ষা করে দেখলো দুজনে। জোড়াগুলো দেখলো। আঁকাবাঁকা অলংকরণগুলোতে আঙুল চালিয়ে, টিপেটুপে দেখলো। অবশেষে মাথা নাড়লো কিশোর, না, নেই কিছু। তাহলে কোথায় কি আছে?

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলো মুসা। পেলাম না। কিছু থেকে থাকলে, দেয়ালের মধ্যে লুকানো রয়েছে।

আমরাও কিছু পাইনি, জানালো রিকি।

এই, দেখে যাও! শোবার ঘর থেকে রবিনের ডাক শোনা গেল। এইযে, এখানে।

এক কোণে ফেলে রাখা জীর্ণ মলিন একটা বিছানার গদির কাছে দাঁড়িয়ে আছে সে। খোলের কাপড়ে তির্যক রেখা আঁকা ডিজাইন। আমার বিশ্বাস, এটার ভেতরে কিছু আছে। ফুলে থাকা একটা জায়গা দেখালো।

টিপে দেখলো মুসা। খাইছে! নিশ্চয় পাথর। রত্ন! অনেকগুলো।

কাটো কাটো, জলদি কাটো, বললো কিশোর।

পকেট থেকে পেন্সিল কাটার ছোট ছুরি বের করে গদির ওই জায়গাটা কাটলো মুসা। চারপাশ থেকে বুকে এসেছে অন্যরা। মাথা ঠুকাঠুকি হয়ে যাচ্ছে। গোল গোল পাথরের মতোই কতগুলো জিনিস বেরোলো।

কি ওগুলো? রিকির কণ্ঠে বিস্ময়।

কোনো মেঠো ইঁদুর কিংবা কাঠবেড়ালির রত্ন, নিরাশ হয়ে বললো কিশোর।

মানে?

দেখছো না? একর আর পাইন নাট।

ওক আর পাইনের ফলগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলো ওরা। প্রথম হাসলো। মুসা। হ্ হুঁহ হাসি থেকে বাড়তে বাড়তে একেবারে অট্টহাসি। সংক্রামিত হলো অন্যদের

মাঝেও। হাসতে হাসতে চোখে পানি এসে গেল ওদের। একজন কোনোমতে থামলে অন্যদের হাসি দেখে আবার হেসে উঠছে।
এই হাসির জন্যেই টের পেলো না, বসার ঘরে যাওয়ার দরজাটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। যখন পেলো, দেরি হয়ে গেছে।
হাসি থামিয়ে দরজার দিকে চেয়ে বললো মুসা, আরে...?
কথা শেষ হলো না। দরজার ওপাশে খসখস শব্দ। খিল লাগানোর আওয়াজও শোনা গেল।
এই, কে? চেঁচিয়ে উঠলো রিকি। কে তুমি? কে?
খোলো খোলো, দরজা খোলো! রবিন বললো।
পাল্লার ওপর গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো মুসা। জোরে ঠেলা দিয়ে বললো, এই, বন্ধ করছো কেন?
থামো তোমরা, বললো কিশোর।
চুপ করলে অন্যেরা। বসার ঘরে নড়াচড়া করছে কেউ। জিনিসপত্র নাড়ছে। দরজায় টোকা দেয়ার শব্দ। আছড়ে ভাঙছে ছবি আঁকার ফ্রেম, ছুঁড়ে ফেলছে তেল আর রঙের কৌটা, টিন।
খুঁজছে ব্যাটা, ফিসফিস করে বললো কিশোর।
আরও কয়েক মিনিট ধরে চললো বিচিত্র শব্দ। ক্ষণিকের জন্যে নীরবতা। বাইরের দরজা বন্ধ হলো, তালা লাগানোর আওয়াজও বোঝা গেল।
সর্বনাশ হয়েছে! গুঙিয়ে উঠলো রিকি। তালায় চাবি লাগিয়ে রেখে এসেছিলাম!

.

শোবার ঘরে একটা মাত্র জানালা। পুরু কাঠের শক্ত পাল্লা। খুলে যাতে কেউ ভেতরে ঢুকতে না পারে সেজন্যে মোটা তক্তা আর পেরেক দিয়ে বাইরে থেকে শক্ত করে বন্ধ করে দিয়েছেন রিকির বাবা। খুলতে হলে ছেনি-হাতুড়ি লাগবে।
বাইরে রাত নেমেছে। পাল্লার ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো আসছে ঘরে।
কয়েক ঘন্টা হলো আটকে রয়েছে ছেলেরা। চেঁচিয়ে গলা ব্যথা করে ফেলেছে। কিন্তু কে শুনবে? হোফার হাউস থেকে অনেক দূরে এই অ্যাডোব। চেঁচামেচি করে লাভ হবে না বুঝে বেরোনোর অনেক চেষ্টা করেছে, ছেলেরা। সুবিধে করতে পারেনি। ভীষণ পুরু দেয়াল। মুসার পকেট নাইফ কিংবা কিশোরের আটলার সুইস নাইফ দিয়ে খুঁচিয়ে দেখেছে, প্রায় দাগই ফেলতে পারেনি। দেয়ালে। বুঝেছে, বেশি চাপাচাপি করতে গেলে অযথা ছুরির ফলাই ভাঙবে, দেয়ালে গর্ত হবে না। দরজা খুলতে পারেনি, জানালা তো নয়ই। ঘরের মেঝেতে লাথি মেরে বুঝেছে, নিচে ফাঁপা, বোধহয় বেসমেন্ট আছে। কিন্তু ওখানে নামার পথ খুঁজে পায়নি।

হতাশ হয়ে এখন বসে রয়েছে পুরনো গদিটার ওপর। ডিনারের সময় হয়ে গেছে, আফসোস করে বললো মুসা।
আর ডিনার! জোরে নিঃশ্বাস ফেললো রবিন। কাল সকালের নাস্তা করতে পারবো কিনা সন্দেহ। আটকা পড়লাম ভালোমতোই।
রিকি বললো, বাবা আমাকে না দেখলে খুঁজবে। খুঁজে বের করবে।
কি করে জানবে, এখানে এসেছো? প্রায়ই আলো নাকি? জানেন তোমার বাবা?
না।
তাহলে কেন এখানে খুঁজতে আসবেন?
আবার নীরবতা।
কিছুক্ষণ পর কি মনে হতে উঠলো মুসা। একদিকে দেয়ালের কোণ ঘেঁষে তৈরি করা হয়েছে একটা দেয়াল আলমারি। সেটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। কয়েকবার পা ঠুকলো মেঝেতে। বেসমেন্টে নামতে পারলে হতো। হয়তো বেরোনোর পথ পাওয়া যাবে। কিন্তু নামি কিভাবে?
রিকিও গিয়ে মুসার পাশে দাঁড়ালো। অ্যাডোবের নিচে যে ভাড়ার ঘর আছে, জানতামই না। কেন বানালো বুঝতে পারছি না! বিড়বিড় করলো আপনমনে, ক্যালিফোর্নিয়ায় এসব বানায় না লোকে!
না, তা বানায় না, বললো কিশোর। আর এরকম পুরনো অ্যাডোবের নিচে তো নয়ই। এক মুহূর্ত ভাবলো। তারপর লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো, উত্তেজিত। এখন অ্যাডোবের নিচে ভাড়ার বানায় না। কিন্তু যখন আমেরিকান আর স্প্যানিশরা শত্রু ছিলো? পালানোর জন্যে মাটির নিচে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে রাখতো। নিশ্চয় এটার তলায়ও ওরকম কিছু আছে। আবছা আলোয় পুরো ঘরে আরেকবার চোখ বোলালো সে। বিড়বিড় করলো, নামার পট। কোথায়?... আলমারিটার দিকে তাকিয়ে রইলো এক মুহূর্ত। ওটার নিচে...
কিশোরের কথা শেষ হওয়ার আগেই হুমড়ি খেয়ে বসে পড়লো রবিন আর মুসা। হাত দিয়ে মুছে ফেললো পুরু ধুলো আর ইট-মাটির গুঁড়ো। একটা চিড়মতো দেখা গেল। ওটার মধ্যে ছুরির ফলা ঢুকিয়ে নেড়েচেড়ে, চাপ দিয়ে দেখলো মুসা। এই, নড়ছে! চেঁচিয়ে উঠলো সে।
রবিন আর সে মিলে টেনে তুললো একটা তক্তা। নিচেও ধুলো আর মাটির পুরু আস্তরণ। ওগুলো সরাতে বেরিয়ে পড়লো একটা ট্র্যাপড়োর, লোহার মরচে ধরা বড় আঙটা লাগানো। আঙটাটা চেপে ধরে টান দিতেই উঠে এলো। ট্র্যাপোডোর। ফোকরের তলায় ঘন অন্ধকার। কিছুই দেখা যায় না।
দেখা যায় না, অস্বস্তিতে ভরা রবিনের কণ্ঠ।
নাহ, বললো রিকি। খালি অন্ধকার।

সুড়ঙ্গ থাক আর যা-ই থাক, আমি নামছি না ওখানে, সাফ বলে দিলো মুসা।
বেশ, থাকো, বললো কিশোর। ফেরেনটির হাতের ছুরির কথা মনে আছে? রাতের বেলা খুন করতে আসতে পারে।
ভয় দেখাচ্ছো? আসুক ছুরি নিয়ে। দরকার হয় লড়াই করবো। কিন্তু আমি ওই অন্ধকারে নামছি না। শুনেছি স্প্যানিশ ভূতগুলো সবচেয়ে পাজি।
অন্য সময় হলে হেসে ফেলতো সবাই, এখন হাসলো না।
ইস, একটা টর্চও যদি থাকতো! জিভ দিয়ে চুক চুক করলো কিশোর। কিন্তু কেউ একজনকে তো নামতেই হবে।
ভয়ঙ্কর লাগছে কালো গহ্বরটা, যেন কোনো দানবের হাঁ করা মুখ।
বেশ, আমিই যাচ্ছি, অসাধারণ দুঃসাহস দেখিয়ে বসলো রবিন। কেউ বাধা দেয়ার আগেই গুড বাই বলে পা নামিয়ে দিলো ফোকরের ভেতরে। দুই হাতে কিনার ধরে রেখে ঝুলে রইলো এক মুহূর্ত। তারপর ঢিল করে দিলো আঙুলগুলো।
পড়তে লাগলো নিচে। কালো অন্ধকার গ্রাস করলো যেন তাকে।

.

কালো মুখটা দিয়ে নিচে উঁকি দিলো অন্য তিনজন।
রবিন? ডাকলো মুসা।
ভালোই আছি আমি, জবাব এলো নিচে থেকে। সুড়ঙ্গই। বালি আর ইটের ঔড়োয় ভরা। কিছু দেখতে পাচ্ছি না। হাত বাড়ালে দেয়াল হাতে লাগছে। এক মিনিট দাঁড়াও, আরও ভালোমতো দেখে নিই।
নিচে নড়াচড়া শোনা গেল। ছেলেদের মনে হলো কয়েক ঘন্টা পেরিয়েছে, আসলে পেরোলো মাত্র কয়েকটা মিনিট। আবার শোনা গেল রবিনের কণ্ঠ, একদিকে ছয় ফুট গেছে, বোধহয় লিভিংরুমের তলায়। ওখানে আরেকটা ট্র্যাপডোর আছে। অনেক টেনেটুনে দেখলাম, খুলতে পারলাম না। ওটা খোলা গেলে হয়তো বেরোনো যাবে।
কিশোর, মুসার কণ্ঠে অস্বস্তি। সুড়ঙ্গটা কোথায় গেছে কি করে জানবো?
হারিয়ে যেতে পারি, বললো রিকি।
ঠোঁট কামড়ালো কিশোর। ডেকে জিজ্ঞেস করলো, রবিন? বাতাস কেমন ওখানে?
ভালোই। শ্বাস নিতে অসুবিধে হচ্ছে না। তবে স্থির হয়ে আছে।
কালো অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে দ্বিধা করছে গোয়েন্দাপ্রাধান! কোথায় গেছে সুড়ঙ্গটা? বলা যায় না, কি হবে! সাংঘাতিক বিপদে পড়তে পারি, বললো সে। মারাও যেতে পারি। কিন্তু এখানে বসে থাকার কোনো মানে হয় না। চেষ্টা করে দেখা দরকার। যে আটকে রেখে গেছে আমাদের, তার উদ্দেশ্যও জানি না। হয়তো ফিরে আসবে ছুরি নিয়ে…

আমি নামছি, কিশোরের কথা শেষ হওয়ার আগেই বলে উঠলো মুসা। রবিনের মতো একই কায়দায় নেমে গেল।
তার পরে গেল রিকি। সব শেষে কিশোর।
একে অন্যের দিকে তাকানোর চেষ্টা করলো ওরা। এভোই অন্ধকার, কিছু দেখতে পেলো না। ঠাণ্ডাও বেশ। বেশিক্ষণ এখানে থাকতে হলে শীতেই কাবু হয়ে যাবে।
চলো, এতোক্ষণ ভয় পাচ্ছিলো বটে, কিন্তু সময়মতো ভয়ডর, সব চলে গেল মুসার, নেতা হয়ে গেল। আমি আগে যাচ্ছি। কিশোর, তুমি আমার পেছনে থাকো। রবিন, রিকি, তোমরা কিছুটা দূরে থাকো। যদি খাদেটাদে পড়েই যাই, তোমরা অন্তত… কথা শেষ করলো না সে।
ট্রাপডোরটা খোলা গেল না। উল্টোদিকে আরেকটা সুড়ঙ্গ আছে। সেটা ধরেই এগোনোর সিদ্ধান্ত নিলো মুসা। গাঢ় অন্ধকারে খুব সাবধানে এক পা এক পা করে আগে বাড়লো। ধীরে ধীরে নিচু হয়ে আসছে ছাত। ঝুঁকতে ঝুঁকতে শেষে বাঁকা হয়ে গেল, কুঁজো মানুষের মতো।
মনে তো হয় সোজাই গেছে, বললো, মুসা। ঠিক বুঝতে পারছি না।
এগিয়ে চলেছে ওরা।
প্রতিটি পা মেপে মেপে ফেলছে মুসা। ফেলার আগে দেখে নিচ্ছে সামনে মাটি আছে, নাকি শূন্য। কথা বলছে না কেউ। গভীর অন্ধকার আর ভীষণ নীরবতা– চেপে ধরছে যেন ওদেরকে।
মুসা, এক সময় বললো কিশোর। কি যেন নড়ছে।
জমে গেল চারজনেই।
বাতাস! বলে উঠলো রবিন। বাতাস নড়ছে।
আবার এগোলো মুসা। গতি সামান্য বাড়ালো। সামনে একটা মোড়।
মোড় ঘুরতেই মনে হলো, সামনে অন্ধকার কিছুটা ফিকে হয়ে আছে।
সুড়ঙ্গমুখ! আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলো মুসা।
আর বিশ কদম এগিয়েই খোলা আকাশের নিচে বেরিয়ে এলো ওরা। হাসলো একে অন্যের দিকে চেয়ে। এখন নিরাপদ। বন্ধ কারাগার, ভয়াবহ অন্ধকার থেকে যুক্তি মিলেছে শেষ অবধি। ওই অন্ধকারের পর জ্যোৎস্নাকে মনে হলো উজ্জ্বল সূর্যের আলো।
নালাটায় বেরিয়েছি, চারপাশে দেখে বললো রিকি।
নালার ভাটিতে রয়েছে ওরা। উজানের দিকটা উঠে গেছে অনেক ওপরে। যেখান দিয়ে বেরিয়েছে ওরা, সেটাকে দেখে মনে হয় কালো একটা সাধারণ গর্ত, ঝোপঝাড়ে ছাওয়া। সুড়ঙ্গমুখ যে, বোঝার উপায় নেই।
চলো, বলে পা বাড়াতে গিয়েই থেমে গেল কিশোর।

মাত্র দশ গজ দূরে ধুপ করে নালায় পড়লো কে যেন! অসাবধানে পা বাড়াতে গিয়েই বোধহয় পড়েছি। বাবারে! বলে চেঁচিয়ে উঠলো।
কে? বলে এগিয়ে গেল মুসা।
হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালো লোকটা। চাঁদের আলোয় তার চেহারা দেখে যেন ভূত দেখার মতো চমকে উঠলো মুসা। ঘুরেই দিলো দৌড়। চেঁচিয়ে বললো, পালাও, পালাও! জন ফেরেনটি…
অন্যেরাও দৌড়াতে শুরু করলো মুসার পেছনে।
এই শোনো, থামো থামো।
কিন্তু কে শোনে ডাক? ছুটছে তো ছুটছেই ওরা। পেছনে আসছে ফেরেনটি। পাথরে লেগে তার জুতোর শব্দ হচ্ছে। থামলো তো না-ই, গতি আরও বাড়িয়ে দিলো ছেলেরা।
জলদি করো! বললো মুসা। সাইকেলের কাছে।
মোড় ঘুরতেই হঠাৎ সামনে পড়লো আরেকজন। মুসার হাত চেপে ধরলো। ঝাড়া দিয়ে চুটিয়ে নিয়ে চিৎকার করে বললো সে, খবরদার, কেউ থেমো না! ধরতে যেন না পারে! উত্তেজনায় মানুষটার মুখের দিকেও তাকালো না, হাত। ছাড়িয়ে নিয়েই আবার দৌড়।
এই রিকি! আমি!
আরি, বাবা!
থেমে গেল ছেলেরা।
হাঁপাতে হাঁপাতে মুসা বললো, ফেরেনটি তাড়া করেছে আমাদের।
অ্যাডোবে আটকে রেখেছিলো, জানালো রিকি।
ভাগ্যিস গোপন সুড়ঙ্গটা পেয়ে গেলাম, যোগ করলো রবিন। নইলে এখনও ওখানেই আটকে থাকতাম।
নালার ভাটির দিকে তাকালেন প্রফেসর। কই, কাউকে তো দেখছি না।
ছেলেরাও ফিরে তাকালো। সত্যি, কেউ নেই। শুধু নীরব চাঁদের আলো।
ছিলো তো বললো কিশোর। সংক্ষেপে জানালো অ্যাডোবে ঢোকার পর কি কি ঘটেছে।
হুঁ, মাথা দোলালেন প্রফেসর। কটেজেও আবার কে জানি ঢুকেছিলো। ফেরেনটিই হবে।
হবে কি বলছো, বাবা, নিশ্চয় সে-ই ঢুকেছিলো। আমাদের আটকে রেখে কটেজে গিয়েছিলা। ওখানে খুঁজেছে। কিছু না পেয়ে আবার রওনা হয়েছে অ্যাডভাবে। ল্যাঙড়া তো। পড়ে গিয়েছিলো নালায়। ওখানে আমাদের দেখেই তাড়া করেছে।

ভালো বিপদেই পড়েছিল, বললেন প্রফেসর। কিন্তু ওই ফেরেনটিটা এদিকে এতো ঘুরঘুর করছে কেন? কি চায়?
বাড়িতে বলে যায়নি। ফলে, রাত করে বাড়ি ফেরার জন্যে, আর দুশ্চিন্তায় রাখার কারণে বকা খেতে হলো তিনজনকেই।
পরদিন আবার হেডকোয়ার্টারে মিলিত হলো তিন গোয়েন্দা।
মুসা ঢুকে দেখলো, চেয়ারে নেতিয়ে রয়েছে কিশোর আর রবিন।
কি ব্যাপার? ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করলো গোয়েন্দাসহকারী। মানুষ মরেছে। নাকি?
এতো দেরি করলে যে? জোর নেই কিশোরের কণ্ঠে।
ধপ করে বসে পড়ে মুসা বললো, কাল রাতে যে দেরি করেছি, তার, শাস্তি। সকালে পুরো বাগানের ঘাস কাটিয়ে ছাড়লো মা। তা তোমাদের কি। হয়েছে?
ফ্রেড ব্রাউন আমাদের বরখাস্ত করেছে, বিষণ কণ্ঠে জবাব দিলো রবিন।
দীর্ঘশ্বাস ফেললো কিশোর। কয়েক মিনিট আগে ফোন করেছিলো। কাল রাতে অ্যাডোবে কি কি ঘটেছিলো, তাকে জানিয়েছেন মিস্টার হোফার। শুনে, ম্যানেজার বললো, কাজটা আমাদের জন্যে বিপজ্জনক হয়ে যাচ্ছে। ফলে, আর কাজ করতে আমাদেরকে বারণ করে দিয়েছে। ছোটখাটো একটা বোনাসও, পাঠিয়েছে।
খাইছে! অন্য দুজনের মতোই মুসাও নেতিয়ে গেল। গোয়েন্দাগিরিতে আমাদের প্রথম ব্যর্থতা!
এবং এতো কষ্টের পর, গুঙিয়ে উঠলো কিশোর। অথচ রহস্যগুলোও এখনও জট পাকিয়েই রইলো!
এবং ওই জট জটই থেকে যাবে, বললো রবিন।–
চুপ হয়ে গেল গোয়েন্দাপ্রধান। বহুদূরে চলে গেছে যেন তার মন, ট্রেলারের গণ্ডিতে নেই।
আর থাকতে না পেরে বলে উঠলো মুসা, রবিন, পিঠ সোজা করো। আমাদের কিশোর মিয়া এতো সহজে ছাড়ার পাত্র না। দেখছে না, ফন্দি আঁটছে।
তিন গোয়েন্দা ব্যর্থ হতে পারে না, বাস্তবে ফিরে এলো যেন কিশোর। এই রহস্যের সমাধান আমরা করবোই।
কিভাবে? বললো রবিন।
রিগ ডেনবারের প্রলাপের মানে বুঝতে পারলেই এই রহস্যের সমাধান হয়ে যাবে।
কি দরকার কিশোর? মাথা নাড়লো মুসা, নাহয় ছেড়েই দিলাম একটা কেস, ব্রাউন ঠিকই বলেছে, বড় বেশি বিপজ্জনক…

বিপদে আগেও পড়েছি আমরা, মুসাকে থামিয়ে দিলো কিশোর। এখন, এসো, ডেনবারের কথাগুলোর মানে বের করার চেষ্টা করি। টেবিলে দুই কনুই রেখে সামনে ঝুঁকলো সে। এক নম্বরঃ বুড়ো ডেনবারের কাছে দামী কিছু একটা ছিলোই। দুইঃ সেই কথাটা একাধিক লোক জানে। তিনঃ বিশটা ছবির মধ্যে কোনো সূত্র লুকানো রয়েছে। এবং চার নম্বরঃ প্রলাপের মধ্যেই রয়েছে কোনো জরুরী মেসেজ। আবার চেয়ারে হেলান দিলো গোয়েন্দাপ্রধান। এখন ওই প্রলাপগুলোর রহস্য ভেদ করতে হবে আগে। যদি সত্যি বলা হয়ে থাকে।
রিকি আর তার বাবা মিছে কথা বলেছে, ভাবছো? রবিন বললো।
প্রফেসরের টাকা দরকার, ঘুরিয়ে জবাব দিলো কিশোর। ডেনবারের কাছে টাকা পান তিনি। আগাগোড়াই হয়তো জেনে এসেছেন, বুড়োর কাছে মূল্যবান কোনো জিনিস আছে। কিংবা হয়তো আন্দাজ করেছেন, যেদিন পয়লাবার চোর ঢুকলো তাঁর ঘরে।
আমার বিশ্বাস হয় না রিকি মিছে কথা বলেছে, মাথা নাড়লো মুসা।
বেশ, বললো কিশোর, ধরে নিলাম, বলেনি। তাহলে ডেনবারের শেষ কথাগুলোর অর্থ উদ্ধার করা যাক। রিকি আর প্রফেসর যা যা বলেছেন, সব লিখে রেখেছি আমি। একটা কাগজ বের করে টেবিলে রাখলো সে। প্রফেসরের কথামতো ডেনবার বলেছেঃ পেইনটিংস, আঁকাবাঁকা, ভুল, ক্যানভাস আর মাস্টারস। ডেনবারের কাছে কাছে থাকায় আরও বেশি শুনেছে রিকি। সে বলেছেঃ ওদের বলো..আঁকা যখন বাঁকা:..ভুল মনে হবে মাষ্টার:..আমার পেইনটিংস ..আমার ক্যানভাস...ক্যানভাস থেকে আঁকাবাঁকা: বি-ব্বলো..ভুল। মোটামুটি এই কথাগুলোই বার বার বলেছে।
মাথা চুলকালো মুসা। ওদের বলল, একথার মানে বোঝা যায়, কাউকে বলার কথা বলছে। আঁকা যখন বাঁকা আর ভুল মনে হবে বলে বোধহয় দিক-নির্দেশ করতে চেয়েছে। কোনো একটা পথ ভুল। তাহলে কোনটা ঠিক?
হ্যাঁ, মাথা ঝোঁকালো কিশোর। এটা একটা জরুরী প্রশ্ন।
মানে কি? প্রশ্ন করলো রবিন।
জানি না। আরও একটা শব্দ বুঝতে পারছি না, বি-ব্বলো মানে কি?
তোতলামি, বললো মুসা। স্রেফ তোতলামি। প্রলাপ বকার সময় উচ্চারণে। ভুল করেছে। বলতে চেয়েছে বলো, মানে ওদের বলল।
তা হতে পারে।
লেখাগুলো পড়লো রবিন। মাস্টার আর পেইনটিংসের মানে হলো, ডেনবার ভেবেছে তার ছবিগুলো মাস্টার পীস। আর আমার ক্যানভাস, ক্যানভাস থেকে আঁকাবাঁকা, এসব কথা বলতেই পারে যে কোনো আর্টিস্ট।

মুসা বললো, ফেরেনটিও হয়তো ভেবেছে, ছবিগুলো ভালো।
টেবিলে চাপড় মারলো রবিন। ঠিক বলেছো! ডেনবার হয়তো আসলেই ভালো আর্টিস্ট ছিলো। বড় আর্টিস্ট, কিন্তু খামখেয়ালী। তাই তার ছবি কাউকে দেখায়নি, কিংবা বিক্রি করেনি। হয়তো ফেরেনটি ভাবছে, ছবিগুলো পেলে অনেক দামে এখন বিক্রি করা যাবে।
এ-সবই হতে পারে, সন্তুষ্ট হতে পারছে না কিশোর। কিন্তু ডেনবারের মেসেজটা কি? বলেছে, ওদের বলো। কাদেরকে বলতে বলেছে?
কাউন্টেস আর ফ্রেড ব্রাউনকে, বললো মুসা।
ব্রাউনের কথা কেন বলবে? ওই লোক তো কাউন্টেসের সাধারণ একজন কর্মচারী। কেন তাকে বোনের সঙ্গে মেশাতে যাবে? বললেই পারতো, আমার বোনকে বলো। তারমানে একাধিক জনকে জানাতে চেয়েছে। কোনো দলের কথা বলেছে।
দল!
চোর-ডাকাতের দল হওয়াও অসম্ভব নয়। প্রফেসরের বাড়ির সীমানার বাইরে কোথাও যেতো না ডেনবার। ধরে নেয়া যায় না, সে ওখানে কারও ভয়ে লুকিয়ে ছিলো?
তাহলে কি ফেরেনটিও ওই দলের কেউ? চোরাই মাল খুঁজতে এসেছে?
সে-রাতে আমাদের অ্যাডোবে আটকে রেখে খোঁজাখুঁজি করার এটাই সম্ভাব্য ব্যাখ্যা, বললো কিশোর। আর রবিন যে বলেছে, ডেনবারের ছবিগুলো দামী ছিলো, তা নয়। তাহলে ফেরেনটি অ্যাডোবে গিয়ে জিনিসপত্র ভাঙতো না, বরং ছবিগুলো খুঁজে বের করার দিকেই নজর দিতো বেশি। দ্বিধা ফুটলো তার চেহারায়।
কি হলো, কিশোর? অবাক হলো রবিন।
শিওর না, ধীরে ধীরে বললো গোয়েন্দাপ্রধান। কাল রাতে অ্যাডোবে...নালায় কি যেন একটা ভুল কোথায় যেন কিছু গোলমাল ঠিক ধরতে পারিনি, এখনও পারছি না।
কই, কাল রাতে আমার তো কোনো গোলমাল মনে হয়নি? বললো মুসা।
কি জানি! যাকগে, পরে ভাববো। এখন একবার গিয়ে ফ্রেড ব্রাউনের সঙ্গে দেখা করা দরকার। আমি আর মুসা যাবো।
আর আমি? জানতে চাইলো রবিন।
আরেকবার যাও শুঁটকির কাছে। ছবিটা কোথায় পেয়েছে, জানার চেষ্টা করো।
.

রকি বীচের মাইল খানেক দক্ষিণে প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে তৈরি হয়েছে অভিজাত বিলাসবহুল মোটেল সী বীচ। বাইরে সাইকেল পার্ক করে চকচকে সুসজ্জিত প্রধান প্রবেশপথের দিকে এগোলো দুই গোয়েন্দা। হলরুমে ঢুকলো। রিসিপশন ডেস্কে বসে রয়েছে লম্বা, বদ-চেহারার এক লোক। ছেলেদের দিকে সন্দিগ্ধ চোখে তাকালো। জিজ্ঞেস করলো, কি চাই?

নার্ভাস হয়ে গেল মুসা। কিন্তু কিশোর এতো সহজে দমবার পাত্র নয়। মাথা সোজা করে কেউকেটা একটা ভাব করে, ইংরেজিতে বিদেশী টান এনে, গম্ভীর ভঙ্গিতে বললো, কাউন্টেসের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি আমরা। আমি কিশোর পাশা দ্য ফোর্থ। আর ইনি মিস্টার মুসা আমান। মশিয়ে ব্রাউনকে খবর পাঠান, আমরা এসেছি।

অনেক কষ্টে হাসি দমন করলো মুসা।

কিন্তু লোকটা কিশোরের এই অভিনয় ধরতে পারলো না। দ্বিধা করছে। ভাবছে, ছেলেটাও কোনো হবুকাউন্ট নয় তো?

কিংবা, ক্লার্ককে দ্বিধা করতে দেখে বললো কিশোর। আরেক কাজ করতে পারেন। আপনার কাজ সহজ করে দিচ্ছি। নাম্বার বলুন, আমরা নিজেরাই গিয়ে দেখা করছি। .

ইয়ে, নাক চুলকালো ক্লার্ক। ইয়ে...মিস্টার, ব্রাউন উঠেছেন দশ নম্বর কটেজে। পোর্টারকে ডাকছি...

দরকার নেই, হাত নাড়লো কিশোর। আমরাই খুঁজে নেবো। এসো, আমান।

রাজকীয় চালে হেঁটে হল পেরোলো গোয়েন্দাপ্রধান, একটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলো মোটেলের চমৎকার চত্বরে। ক্লার্কের চোখের আড়ালে এসেই আবার স্বাভাবিক হলো কিশোর। হেসে বললো, দশ নম্বরটা সম্ভবতঃ বাঁয়ে। ...ওই যে, সিরিয়াল নম্বরের সাইন।

এরকম করতে গিয়ে কোনদিন যে কি বিপদে পড়বে, বললো মুসা। মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেবে তখন।

আরে রাখো তোমার বিপদ। ধরতে পারলে তবে তো? আর এসব দামী জায়গার ব্যাপার-স্যাপারই আলাদা। হোমড়া-চোমড়ারা আসে। পান থেকে চুন খসলেই তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে দেবে। ফলে ভয়ে ভয়ে থাকে কর্মচারীরা, সন্দেহে ভোগে। ওদেরকে ধোকা দেয়া তাই সহজ।

এই লেকচারের পর আর কথা চলে না। চুপ হয়ে গেল মুসা।

সরু পথ, দুধারে চিরসবুজ গাছ আর লতার ঝড়। সুইমিং পুলের কাছ থেকে হাসি, কথার আওয়াজ ভেসে আসছে।

পথটা ধরে এগোলো দুই গোয়েন্দা। কিছু দূর এগোতেই এক ধার থেকে শুরু হলো কটেজের সারি।
নয় নম্বর, এক সময় বললো কিশোর। পরেরটাই দশ নম্বর হবে। ওই পাম গাছটার ওধারে বোধহয়।
গাছের মোটা গুঁড়িটা ঘুরে এসেই থমকে গেল দুজনে। দশ নম্বর কটেজের জানালায় দাঁড়িয়ে ভেতরে উঁকি দিয়ে আছে একজন। একটানে মুসাকে নিয়ে আবার গাছের আড়ালে সরে এলো কিশোর। কয়েক সেকেণ্ড জানালার কাছে দাঁড়িয়ে থেকে ঘুরে দরজার কাছে চলে গেল চোরটা। দরজা খোলার চেষ্টা করলো।
কিশোর! বলে উঠলো মুসা। ব্যাটা…
ঝট করে ফিরে তাকালো চোর।
শুঁটকি টেরি?-মুসার কথাটা শেষ করলো কিশোর।
ক্ষণিকের জন্যে হাঁ হয়ে গেল টেরিয়ার। দুই গোয়েন্দাকে ছুটে আসতে দেখে। ঘুরেই দিলো দৌড়। হুড়মুড় করে গিয়ে ঢুকলো ঝাড়ের মধ্যে।
ধরো, ধরো ব্যাটাকে? চেঁচিয়ে বললো কিশোর।
পামের সারি আর হিবিসকাসের ঝাড়ের পাশ দিয়ে এঁকেবেঁকে দৌড়াচ্ছে টেরিয়ার। পেছনে মূসা। কিশোর বুঝলো, ওভাবে দৌড়ে শুঁটকিকে ধরা যাবে না। একটা শর্টকাট বেছে নিয়ে দৌড় দিলো আরেক দিক দিয়ে। টেরিয়ারের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছে। পুলের ধার দিয়ে চলে যেতে চায় মেইন গেটের কাছে।
সোজা পুলের দিকে ছুটলো কিশোর। চোখ মুসা আর টেরিয়ারের দিকে। ফলে গায়ের ওপর গিয়ে পড়ার আগে লোকটাকে দেখতে পেলো না।
পেটে গুঁতো খেয়ে গাউক করে উঠলো লোকটা। ফিরে চেয়ে দেখলো কিশোর, ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রয়েছে রূপালি-চুল এস্টেট ম্যানেজার।
কিশোর! কি করছে এখানে? এভাবে দৌড়াচ্ছো কেন?
শুঁটকি টেরি, স্যার, হাঁপাতে হাঁপাতে বললো কিশোর। টেরিয়ার ডয়েল। আপনার ঘরে ঢোকার চেষ্টা করছিলো। মুসা গেছে পেছনে। আমি এদিক দিয়ে ঘুরে গিয়ে ধরতে চেয়েছিলাম…
টেরিয়ার ডয়েল? মানে, যে ছেলেটার কাছে মিস্টার ডেনবারের একটা ছবি আছে?
হ্যাঁ, স্যার। মুসা ধরতে পারলে…
পারলো না। ফিরে এলো মুসা। পালালো ব্যাটা। …সরি..
পালালো, না? ভ্রূকুটি করলো ম্যানেজার। ও আমার কটেজে ঢুকতে চেয়েছে কেন?

সেটা তো আমারও প্রশ্ন, কিশোর বললো। মিস্টার ডেনবারের জিনিসগুলো কি কটেজেই রেখেছেন, স্যার? আমরা যেগুলো খুঁজে বের করে দিয়েছি?
হ্যাঁ। কিন্তু ওগুলো দিয়ে টেরিয়ার কি করবে? একটা পেঁচা... পুলের ধারের চত্বরের দিকে চোখ পড়তে থেমে গেল ম্যানেজার। কাউন্টেস ডাকছেন। বোধহয় কথা বলতে চান।
চত্বরে পাতা রয়েছে অনেকগুলো চেয়ার-টেবিল। তার একটাতে বসে রয়েছেন কাউন্টেস। তিনজনে এগোললা সেদিকে।
কি হয়েছে? উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করলেন কাউন্টেস।
ছেলেদেরকে বসতে ইশারা করে, সংক্ষেপে কাউন্টেসকে সব কথা জানালো ম্যানেজার। আবার ফিরলো ওদের দিকে। তোমরা নিশ্চয় টেরিয়ারকে ধরতে এখানে আসোনি?
না, স্যার, বললো মুসা। আপনাদের অনুমতি নিতে এসেছি, আমরা ছবি খোঁজার কাজটা চালিয়ে যেতে চাই...
তাহলে তো ভালোই হতো। কিন্তু...
কিছু ব্যাপার আছে, স্যার, তাড়াতাড়ি বললো কিশোর। খুলে বললো ওদের অনুমানের কথাঃ রিগ ডেনবারের কাছে কোনো মূল্যবান জিনিস ছিলো। কথাটা অন্য কেউ জানে। হারানো ছবিগুলোর সঙ্গে ওই জিনিসের কোনো যোগাযোগ। রয়েছে। আর, ডেনবারের প্রলাপ শুধুই প্রলাপ নয়, তার মধ্যে মেসেজ রেখে গেছে। শেষে বললো, এর দুটো মানে হতে পারে, স্যার। হয় সত্যি মিস্টার ডেনবার খুব ভালো আর্টিস্ট ছিলেন, তাঁর ছবিগুলোর দাম অনেক, এবং সেটা জানে। জন ফেরেনটি। নয়তো মিস্টার ডেনবার কোনো খারাপ কাজে জড়িয়ে পড়েছিলেন। এই যেমন চুরি-ডাকাতি, কিংবা চোরাচালানী...
কি বলছো? হাত নাড়লো ম্যানেজার। কাউন্টেসের ভাই চোর? বুঝেশুনে কথা বলা উচিত।
কিন্তু একটা কথা ঠিকই বলেছে, কাউন্টেস বললেন, জন ফেরেনটিকে ভালো লোক মনে হয় না। কিছু খুঁজছে বোঝা যায়।
আপনার ভাই তার দলের লোকও হতে পারে, ম্যাডাম, বললো কিশোর।
হুম! কাউন্টেসের দিকে তাকালো একবার ব্রাউন। কে জানে, হতেও পারে। খেয়ালী লোক ছিলেন, তো। হয়তো কোনোভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন।...তোমরা তাহলে আর এসবে যেও না। বিপদে পড়বে। এখন, পুলিশকে জানাবো...
কিন্তু, স্যার, আমরা...
আর কোনো কিন্তু নেই। জেনেশুনে বিপদে ফেলতে পারি না আমরা তোমাদেরকে। যাও, বাড়ি যাও।

.
দরজার কাছে আটকালো দুজনকে ডোরম্যান। জিজ্ঞেস করলো, তোমরা দুজন গোয়েন্দা?
ঢোক গিললো মুসা। আমরা…
আহ! গোয়েন্দা কিনা বলো। হ্যাঁ, কিংবা না।
হ্যাঁ।
এসো আমার সঙ্গে।
পরস্পরের দিকে তাকালো কিশোর আর মুসা। আড়চোখে দেখলো, চোখ গরম করে ওদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে বদ-চেহারার রিসিপশনিস্ট। হলের প্রতিটি দরজায় লোক, পোর্টার আর ম্যাসেঞ্জার বয়, সবাই চেয়ে রয়েছে দুজনের দিকে। যেন চোর আটকেছে।
একটা দরজা দিয়ে ছোট একটা ঘরে দুজনকে নিয়ে এলো ডোরম্যান। তারপর দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বেরিয়ে গেল।
কাউন্টেস বসে আছেন। কথা আছে তোমাদের সঙ্গে। ওভাবে মন খারাপ করে চলে যাচ্ছিলে…
তারমানে কাজটা চালিয়ে যেতে বলছেন! উত্তেজনা চাপতে পারলো না মুসা।
আপনার ম্যানেজার মত বদলেছেন তাহলে? বললো কিশোর।
না। ও চায় না, তোমরা কাজ করো। তবে আমার বিশ্বাস, তোমরা পারবে।
হ্যাঁ, পারবো, দৃঢ়কণ্ঠে বললো কিশোর।
পুলিশ চীফ সার্টিফিকেট দিয়েছেন তোমাদের, সেকথা ভুলিনি আমি। কাজ করার অনুমতি দিতে পারি, তবে আমাকে কথা দিতে হবে, সাবধানে থাকবে তোমরা। কোনও বিপদ ঘটাবে না।
নিশ্চয়ই না, কিছু না ভেবেই বলে ফেললো মুসা।
গুড। আমার ভাই কি করছিলো, জানা দরকার।
নিজে হয়তো খারাপ লোক ছিলেন না তিনি, কিশোর বললো। কিন্তু তাঁকে হয়তো কোন খারাপ কাজ করতে বাধ্য করা হয়েছে
সেটাই জানতে চাই।
কাউন্টেস, একটা কথা বলবেন? যে জিনিসগুলো খুঁজে দিয়েছি, ওগুলোর মাঝে সত্যি কি কোনো মূল্যবান কিছু আছে?
নেই। তোমার কি মনে হয়? জিনিসটা কি?
এখনও জানি না।
কিন্তু তোমার বিশ্বাস, আমার ভাই কিছু লুকিয়ে রেখে গেছে। কোথায় রেখেছে, সে-কথাও জানিয়ে গেছে?

তাতে কোনো সন্দেহ নেই।
বেশ। পারলে খুঁজে বের করো জিনিসটা। আর জন ফেরেনটির ব্যাপারে সাবধান। অযথা ঝুঁকি নিও না। কিছু জানতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে এসে জানাবে। আমাকে। যাও এখন। গুড বাই।

.

হেডকোয়ার্টারে ঢুকে দেখলো দুজনে, রবিন বসে আছে। ওদের দেখেই চেঁচিয়ে উঠলো, খবর আছে!
আমাদের কাছেও আছে! বসতে বসতে বললো মুসা।
কোত্থেকে জানি এলো শুঁটকি, মনে হলো ভূতের তাড়া খেয়ে এসেছে! ঘরে গিয়ে যে ঢুকলো, আর বেরোলো না।
ওর সঙ্গে, তাহলে কথা হয়নি? জানতে চাইলো কিশোর।
না। গিয়ে পেলাম না। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে যখন ফিরে আসবো ভাবছি, দেখি আসছে। আমার দিকে চাইলো না।...তবে ওদের মালীর সঙ্গে অনেক কথা বলেছি। জেনেছি, কোথায় কাজ নিয়েছে পুঁটকি।
শুঁটকি ব্যাটা আবার কাজ নিলো কোথায়? তার চাকরির কি দরকার? অবাক হলো মুসা।
কোথায়? জিজ্ঞেস করলো কিশোর।
মিস্টার নরম্যান গালিভারের অ্যাসিসট্যান্ট।
আরও অবাক হলো মুসা। মিস্টার নরম্যান গালিভার! আর্টিস্ট...
বিখ্যাত আর্টিস্ট। চকচক করে উঠলো কিশোরের চোখ। এই রকি বীচেই যিনি থাকেন!
বিশাল একটা বাড়িতে থাকেন, বললো রবিন। স্টুডিওটা আলাদা, তবে বাড়ির লাগোয়া। আমরা ছবি খুঁজছি, আর শুঁটকি আর্টিস্টের ওখানে চাকরি করে, কেমন যেন কাকতালীয় ব্যাপার মনে হয় না?
হয়, মাথা ঝোঁকালো কিশোর। খুব বেশি কাকতালীয়ই মনে হয়। জলদি চলো। লাঞ্চ সেরেই মিস্টার গালিভারের সঙ্গে দেখা করতে যাবো।

.

লোহার উঁচু গেটের বাইরে সাইকেল রাখলো তিন গোয়েন্দা। বিরাট এলাকার ভেতরে দুর্গের মতো মস্ত এক বাড়ির চূড়া চোখে পড়ছে, ঘন গাছপালার জঙ্গলের মাথার ওপর দিয়ে। বিকেলের রোদে আসল বনের মতোই লাগছে দেখতে। গেটটা খোলা। কাউকে চোখে পড়লো না।
চলো, ঢুকে পড়ি, বললো মুসা।

ভেতরে ঢুকলো ওরা। আঁকাবাঁকা সরু একটা পথ চলে গেছে বনের ভেতর দিয়ে। সবে পা বাড়িয়েছে এগোনোর জন্যে, ঠিক এই সময় ভেসে এলো তীক্ষ্ণ এক চিৎকার। যেন তীব্র ব্যথায় চিৎকার করে উঠেছে কোনো মেয়েলোক কিংবা বাচ্চা ছেলে!
কী? ফিসফিস করে বললো রবিন।
ভূত না তো! ভয় পেয়ে গেছে মুসা। চলো, ভাগি!
আবার শোনা গেল চিৎকারটা। বাঁয়ে।
কেউ বিপদে পড়েছে!!
চলো তো, দেখি, কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে বললো কিশোর। খবরদার শব্দ করবে না!
পথ থেকে সরে গাছের আড়ালে এগোলো ওরা।
শোনা গেল আবার রক্ত-পানি-করা চিৎকার। ঠিক সামনে। দুহাতে ঠেলে : কয়েকটা পাতা সরালো কিশোর। একটুখানি ভোলা জায়গা! ওখানে বসে রয়েছে। একটা ভয়ানক জানোয়ার। চোখ এদিকেই।
স্তব্ধ হয়ে সবুজ চোখজোড়ার দিকে তাকিয়ে রইলো ছেলেরা।
তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠলো জীবটা। দেখালো মারাত্মক শ্বদন্ত।
চিতাবাঘ! গলা কাঁপছে কিশোরের। দৌড় দাও! কুইক!
না! মানা করলো মুসা। বাঘটার চোখে চোখে তাকিয়ে রয়েছে। যেখানে রয়েছে দাঁড়িয়ে থাকে। দৌড় দিলেই এসে ধরবে।
হ্যাঁ, দাঁড়িয়ে থাকো। একেবারে চুপ, পেছন থেকে বলে উঠলো আরেকটা কণ্ঠ। দৌড় দিলেই মরবে।
ঝট করে ফিরে তাকালো তিনজনে।
বিশালদেহী এক লোক, যেন একটা গ্রিজলি ভালুক। লাল দাড়ি, লাল ঘন চুল। চোখে আগুন। হাতে একটা বল্লম, ঝকঝকে ফলাটা তিন ফুটের কম হবে না।
পাথর হয়ে গেল যেন তিন গোয়েন্দা। পালানোর পথ নেই। সামনে চিতাবাঘ, পেছনে বল্লম-হাতে এক ভালুক!
বিকট গর্জন করে ওদের দিকে লাফ দিলো চিতাটা।

.

মাঝপথে অদৃশ্য কোননা দেয়ালে বাড়ি খেয়ে যেন থেমে গেল চিতাবাঘ, ধুপ করে পড়লো মাটিতে। নাকে মুখে ব্যথা পেয়েছে। আহত কুকুরের মতো একবার কুঁইকুই করে আবার ফিরে গিয়ে বসলো আগের জায়গায়। সবুজ চোখ জ্বলছে। ছেলেদের ধরতে না পেরে রেগে গেছে।
কি-ক্কিভাবে, গলা এতো কাঁপছে, কথাই বলতে পারছে না রবিন।

হাত বাড়ালো মুসা। পাতার ওপাশে, মাত্র ফুটখানেক দূরে ঠেকে গেল হাত। কাঁচ! কাঁচের খাঁচায় ভরে রাখা হয়েছে। এতো ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, দেখিইনি। পুরো খোলা জায়গাটাই একটা বিশাল কাঁচের খাঁচা!
বুঝেছো তাহলে, বললেন লাল-দাড়িওয়ালা লোকটা। তোমাদের কি ধারণা, চিতাবাঘ ছেড়ে রাখবো মানুষের ঘাড় মটকানোর জন্যে?
না,না, মিনমিন করে বললো কিশোর, তা কেন…
রবিন জিজ্ঞেস করলো, ওটাকে কাঁচের খাঁচায় ভরেছেন কেন, স্যার?
নাহলে স্টাডি করবো কিভাবে? কি করে হাঁটে ওটা, পেশী নাড়ায়, হাঁ। করে…না দেখলে আঁকবো কিভাবে? জ্যান্ত হবে ছবি?
আপনিই আর্টিস্ট! এতোক্ষণে বুঝলো কিশোর। মিস্টার নরম্যান গালিভার, বিখ্যাত…
চিতাবাঘের ছবি আঁকবেন, বললো রবিন।
হ্যাঁ, আঁকবো। আফ্রিকান অনেক কিছুর ছবিই আমি এঁকেছি। ওসব কথা থাক। বল্লমটা নাড়লেন গালিভার। এটা দেখো। আফ্রিকান মাসাই উপজাতির লোকেরা এ-জিনিস দিয়ে সিংহ মারে। ছেলেদের সই করে তুললেন অস্ত্রটা। আরও অনেক কিছু মারা যায়। এই যেমন ধরো, মানুষ। বলো এখন, আমার স্টুডিওতে ঢুকেছো কেন? চুরি করার জন্যে?
আমরা চোর নই, মেজাজ দেখিয়ে বললো মুসা। কেউ তাকে চোর বললে সাংঘাতিক রেগে যায়।
বাহ, রাগও আছে। তাহলে চুপি চুপি আমার বাড়িতে ঢোকার কারণ?
আমরা, স্যার, ডিটেকটিভ, জবাব দিলো কিশোর। কথা বলতে এসেছি। আপনার অ্যাসিসটেন্ট টেরিয়ার ডয়েল…
টেরিয়ার? ওই শয়তানটার সঙ্গে সম্পর্ক? হুঁ তোমরাও বাজে ছেলে। যাও, আগে বাড়ো। পুলিশে দেবো তোমাদের, হাতের বল্লম নাচালেন আর্টিস্ট।
দুর্গের ভেতরে বড় একটা ঘরে ছেলেদের নিয়ে এলেন। শেলফ ভরতি বই। কেমন বিষণ্ন পরিবেশ।
পুলিশকে ফোন করবেন তো, স্যার? কিশোর বললো। চীফ ইয়ান ফ্লেচারকে চান।
কেন?
আমাদের নাম বললেই উনি চিনতে পারবেন। তিন গোয়েন্দার একটা কার্ড, সেই সঙ্গে পুলিশ চীফের সার্টিফিকেটটা বের করে বাড়িয়ে দিলো কিশোর।
সইটা তো আসলই লাগছে। চীফেরই সই কি করে জানবো?
করুন না, তাঁকে ফোন করুন। নইলে আরেক কাজ করতে পারেন। আর্টিস্ট যখন, নিশ্চয় মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফারের সঙ্গে পরিচয় আছে…

ফিল্ম প্রডিউসার? ডিরেক্টর?
হ্যাঁ।
সে-ও তোমাদের চেনে নাকি? এইবার সত্যি সত্যি বিপদে পড়লে, ইয়াং ম্যান। মিছে কথা এবার ফাঁস হবে, বলতে বলতে রিসিভারের দিকে হাত বাড়ালেন গালিভার। কানে ঠেকিয়ে ডায়াল করলেন। কে? ডেভিস? আমি নরম্যান। তিনটে ছেলে চুরি করে ঢুকেছে আমার বাড়িতে, বলছে তিন গোয়েন্দা...কি বললে?...হা হা, ওরকমই চেহারা..তাই নাকি?...ভেরি গুড। আচ্ছা, রাখি। গুড বাই। রিসিভার নামিয়ে রেখে ফিরে চেয়ে হাসলেন আর্টিস্ট। নাহ, ফাসাতে পারলাম না তোমাদের। বল্লমটা নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখলেন ঘরের কোণে। তা এখানে কি রহস্যের খোঁজে এসেছো?
মনে হলো পাহারায় ছিলেন, ঘুরিয়ে কথা বললো কিশোর। নিশ্চয় চোর টোরের খোঁজে। জ্বালাতন করছিলো বুঝি?
হ্যাঁ।
ছবি চোর?
তুমি কি করে জানলে? ঠিক চুরি নয়। আমাকে না জানিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো, আবার রেখে গেছে। সেজন্যেই তাড়িয়েছি ওকে। তবে আসল রহস্য সেটা নয়। ইদানীং কিছু ভূতুড়ে ছবির পাল্লায় পড়েছি।
ভূতুড়ে! আঁতকে উঠলো মুসা।
এছাড়া আর কি বলবো? আমার স্টুডিও এই খানিক দূরেই। কাল-পরশু দুদিনই ঘটেছে ঘটনাটা। সকালে কাজ করতে গিয়ে দেখি সরে রয়েছে ছবিগুলো। যেখানে রেখেছিলাম, সেখানে নেই, অন্য জায়গায়। আরও কিছু জিনিসপত্রও অবশ্য নড়েছে। তবে কিছু চুরি যায়নি।
যে ছবিগুলো নড়ে, ওগুলো কি ওই ছবিটার সঙ্গের? যেটা নিয়ে গিয়ে আবার ফিরিয়ে দিয়েছে টেরিয়ার? জিজ্ঞেস করলো কিশোর।
হ্যাঁ। একটা জাঙ্কইয়ার্ড থেকে কিনেছিলাম।
তাহলে ভূতের ব্যাখ্যা বোধহয় দিতে পারি। রিগ ডেনবার, কাউন্টেস, ফ্রেড ব্রাউন আর জন ফেরেনটির কথা বললো কিশোর। কয়েক দিনে যা যা ঘটেছে, তা ও বললো। সবশেষে বললো, তাহলে বুঝতেই পারছেন, ছবিগুলো পরীক্ষা করে দেখার জন্যেই কেউ ঢুকেছিলো আপনার স্টুডিওতে।
না, পারছি না, মাথা নাড়লেন গালিভার। নাড়াচাড়া করা হয়েছে রাতের ও বেলা। আর রাতে, স্টুডিওর জানালা সব বন্ধ করে দিই আমি। দরজায় তালা লাগিয়ে রাখি।
.

চোর ঢোকার কোনো পথই রাখি না, আবার বললেন গালিভার। দেখতে চাও?
তিনজনেই জানালো, চায়।
চিতার খাঁচার পাশ কাটিয়ে, সরু বুনোপথের ভেতর দিয়ে আরেকটা পাথরের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো ওরা। জানালায় মোটা মোটা লোহার শিক। দরজার পাল্লা লোহার। বিরাট তালা লাগানো। ওটা খুলতে দক্ষ তালার মিস্ত্রীরও অন্তত একটি ঘন্টা ব্যয় হবে।
কাছে গিয়ে ভালোমতো তালাটা দেখলো কিশোর। কোনো দাগ নেই, সামান্যতম আঁচড়ও নেই। তার মানে জোর করে ভোলা হয়নি তালা।
চাবি দিয়ে তালা খুললেন আর্টিস্ট।
ভেতরে ঢুকলো সবাই।
দরজার কব্জা ভেতরের দিকে, ওগুলোতেও কোনো দাগ নেই। আর, বাইরে থেকে ওই কজা ভাঙা অসম্ভব। ঘরের দরজাও ওই একটাই।
বেশ বড় ঘর। সাজানো স্টুডিও। যা যা জিনিস দরকার, সব আছে। তাক আছে অনেকগুলো, তাকে ছবি আঁকার সরঞ্জাম সাজিয়ে রাখা হয়েছে। দুটো জানালা, পাল্লাগুলো ভেতরের দিকে খোলে। একটা স্কাইলাইট দিয়ে আলো আসছে, ওটা খোলেই না। কোনো ফায়ার প্রেস নেই, স্টোভ নেই। এদিকের দেয়ালে ছোট একটা একজস্ট ফ্যান লাগানো, লম্বা কর্ড, সকেটে ঢোকানো প্লগ। পাথরের নিরেট মেঝে, তলায় বেসমেন্ট বা কোনো ধরনের পাতালঘর নেই। দেয়াল বা মেঝের কোথাও একটা ফোকর নেই যে চোর ঢুকবে।
ভূতেই তো নাড়ায় দেখছি! বিড়বিড় করলো মুসা।
ছবিগুলো কোথায়? জিজ্ঞেস করলো কিশোর।
ওই তো, র‍্যাকে, হাত তুলে দেখালেন গালিভার।
দেখতে পারি?
নিশ্চয়। দেখো।
সাবধানে ছবিগুলো নামালো কিশোর। বিশটা ছবিই আছে। এক এক করে পাশাপাশি সাজালো সে। ওই তাকে কেন রেখেছেন, স্যার? ওখানে তো সব বাতিল ক্যানভাস দেখছি।
বাতিলই তো। এগুলোও বাতিল বলেই কিনেছি। এগুলোর ওপর নতুন ছবি আঁকার জন্যে। অনেক আর্টিস্টই তাই করে।
হ্যাঁ, তা করে। তাহলে আপনার ধারণা, এই ছবিগুলো কোনো কাজের নয়?
আমার কাছে তো নয়। রিগ ডেনবারের নামও শুনিনি কোনোদিন। তবে, আঁকার হাত ছিলো লোকটার। ভাবতে অবাকই লাগে, লোকটা বিখ্যাত হলো না কেন? কেন তার নাম কেউ জানলো না?

ছবি কখনও বেচেনি তো, তাই, মুসা বললো।
হতে পারে। তবে দুনিয়া যে একজন ভালো আর্টিস্টকে হারালো, একথা মানতেই হবে। কিন্তু
আপনার কাছে এগুলোর দাম নেই, কিশোর বললো। কিন্তু অন্য কারো কাছে হয়তো আছে? অনেক দাম দিয়ে কিনতে চায়? হতে পারে না এরকম?
পারে, চিন্তিত ভঙ্গিতে ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে রয়েছেন গালিভার। তবে সন্দেহ আছে। সেরকম বুঝলে আমিও নষ্ট করবো না। এই ছবিগুলো তেমন ভালো না, ঠিক, কিন্তু লোকটার হাত ছিলো অসাধারণ,। ইচ্ছে করলে অনেক কিছু করতে পারতো সে। এই দেখো না, বিশটা ছবি বিশ রকম ভাবে এঁকেছে। যেন। বিশজনের আঁকা। এই গুণটা অনেক বড় আর্টিস্টেরও থাকে না। ফলে একঘেয়ে হয়ে যায় তাদের ছবি।
তাহলে এই ছবিগুলোকে খারাপ বলছেন কেন? প্রশ্ন করলো রবিন।
কারণ, এগুলোতে কেমন যেন নকল, নকল একটা ভাব। অন্য আর্টিস্টের স্টাইল চুরি করেছে ডেনবার, তার সঙ্গে নিজের কিছু মিশিয়েছে, পুরোপুরি নিজস্ব নয়। অ্যাডাপটেশন বলতে পারো।
গভীর মনোযোগে ছবিগুলো দেখছে কিশোর। ফ্রেম নেই, সাধারণ কাঠে। ক্যানভাসটা ছড়িয়ে আটকে নিয়ে ছবি আঁকা হয়েছে।
এগুলোতে কিছু লুকানো নেই, মুসা বললো। আর ছবিতে কোনো মেসেজও নেই।
না, নেই, বললো কিশোর। চেয়েই রয়েছে ছবিগুলোর দিকে। প্রত্যেকটা ছবি যেন রেমুডা ক্যানিয়নের কটেজের প্রতিবিম্ব। কিন্তু একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছো? প্রত্যেকটাতে সিরিয়াল নম্বর দেয়া আছে।
তাই তো! ভুরু কোঁচকালো মুসা। কিশোর বলার আগে নজরে পড়লো না। কেন? একেই বলে সূক্ষ্ম দৃষ্টি। রবিন দেখলো। গালিভারও দেখলেন নম্বরগুলো।
ক্রমিক নম্বর অনুসারে ছবিগুলো পর পর সাজালো কিশোর। এক নম্বরটায়। ক্লোজ-আপ, সবচেয়ে বড়, পরেরগুলোয় ধীরে ধীরে ছোট হয়ে গেছে। শেষ ছবিটায় এতো ছোট, ঘরের চেহারা অস্পষ্ট, প্রায় বোঝাই যায় না।
তো, কি বোঝা যাচ্ছে? ভুরু নাচালো মুসা।
আমি কিছু বুঝছি না, রবিন বললো।
ভালো করে দেখো, বললো কিশোর। ধীরে ধীরে ছোট করে ফেলা হয়েছে কটেজটাকে, সঙ্কুচিত। গাছপালা, পাথর, ক্যানভাসের চেয়ার, ডোরাকাটা ছাউনি, সব কিছুর আকার একই রকম রেখেছে, শুধু ছোট করেছে ঘরটাকে। এই যে দেখো না, শেষটায় ছাউনিটা ছাড়া ঘরের আর কিছুই বোঝা যায় না।
বেশ, দেখলাম। কিন্তু তাতে কি? বললো মুসা।

ভূতুড়ে ছবির সঙ্গে যোগ হলো সঙ্কুচিত ছবির রহস্য, হাসলেন আর্টিস্ট। ঠেলা সামলাও এখন।
কিছু থাকলে এই ছবিগুলোতেই আছে, আনমনে বললো কিশোর। রাতের বেলা চোর এসে এজন্যেই এগুলোকে নাড়াচাড়া করে।
এখানে কেউ ঢুকতে পারে না, কিশোর। জোর দিয়ে বললেন গালিভার।
কিন্তু ছবি তো আর আপনাআপনি নড়তে পারে না। ভূত বলেও কিছু নেই। লম্বা একটা বেঞ্চের ওপর বসে পড়লো কিশোর, পুরো বেঞ্চটাই ঢেকে রাখা হয়েছে। বড় একটা কম্বল দিয়ে। স্টুডিওর ভেতরে চোখ বোলালো সে।
গালিভার বসলেন একটা কাউচে। রবিন আর মুসা বসলো দুটো আর্মচেয়ারে।
চোর কে জানতে পারলে হতো, নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটলো কিশোর। তাহলে হয়তো বুঝতাম, ছবিগুলো তার কেন দরকার?
জানার উপায় কি? জিজ্ঞেস করলো মুসা।
উঠে, স্টুডিওর একমাত্র দেয়াল আলমারিটার দিকে এগিয়ে গেল গোয়েন্দা প্রধান। পাল্লা খুললো। আলমারির ওপর দিকে দুটো তাক। নিচের অংশটা বড়। ওপরের তাকে আর নিচে সাজানো রয়েছে রঙের কৌটা, ব্রাশ, ছবি আঁকার অন্যান্য সরঞ্জাম। পেছনে নিরেট পাথরের দেয়াল। ফিরে তাকালো সে। জানার একটাই উপায়। আমাদের কাউকে লুকিয়ে থাকতে হবে এখানে।
বেশ, বললেন গালিভার, আমিই থাকবো।
না, আপনি থাকলে হবে না। দরজা-জানালা বন্ধ করে চোরকে দেখিয়ে বেরিয়ে যেতে হবে আপনাকে। নইলে সে আসবেই না।
তাহলে কে থাকবে?
আমাদের একজন। মুসা, তুমি থাকবে। আপত্তি আছে?
না। তোমরা কি করবে?
আমাদের অন্য কাজ আছে। ভয় পাবে না তো?
ভূত হলে পাবো। আর চোর এলে তো ধরে কিলই শুরু করবো। ভয় কিসের?
হেসে উঠলো কিশোর আর রবিন। এমনকি আর্টিস্টও লাল দাড়ি নাচিয়ে হাহ হাহ করে হাসলেন। ভূত হলেও ভয় নেই। বাইরেই লুকিয়ে থাকবো আমরা। তোমার চিৎকার শুনলেই এসে পড়বো।
কিভাবে পাহারা দেয়া হবে, তার একটা ছক তৈরি করে সবাইকে শোনালো কিশোর। তারপর দুই সহকারীকে নিয়ে বেরিয়ে এলো স্টুডিও থেকে। বাড়ি ফিরে চললো।
তাড়াতাড়ি ডিনার সেরে আবার গালিভারের বাড়িতে রওনা হলো কিশোর আর মুসা। রবিন আসতে পারলো না, জরুরী কাজে তাকে ডেকে নিয়ে গেছেন মা। ঘন

বনের ভেতর দিয়ে নীরবে এগিয়ে চললো দুজনে। থামলো এসে স্টুডিওর সামনে। চুপ করে বসে রইলো কিছুক্ষণ। সন্দেহজনক আঁওয়াজের আশায় কান পেতে রইলো। কিছু শোনা গেল না। মুসার গায়ে কনুই দিয়ে গুঁতো দিলো কিশোর।
ঝোপ থেকে বেরিয়ে এক ছুটে খোলা দরজা দিয়ে স্টুডিওতে ঢুকে পড়লো মুসা। আলমারির ভেতর লুকিয়ে বসলো। পাল্লা ফাঁক করে রাখলো কয়েক ইঞ্চি। যাতে ঘরের ভেতর চোর ঢুকলে দেখতে পায়।
সূর্য ডোবার আগে আগে শব্দ করে জানালা বন্ধ করলেন গালিভার। বাইরে বেরিয়ে দরজায় তালা দিলেন। রোজকার মতোই। তারপর চললেন বাড়ির দিকে।
বাইরে রাত নামছে। আলমারির ভেতরে কি আর আরাম করে বসা যায়? বেকায়দা অবস্থায়ই রয়েছে মুসা। এভাবে বেশিক্ষণ থাকলে হাত-পায়ে খিল ধরে যাবে, নিদেনপক্ষে ঝিঁঝি যে ধরবে, তাতে তার কোনো সন্দেহ নেই।
এক ঘন্টা পেরোলো।
কিছুই ঘটলো না। আলমারিতে বসে থাকতে খুব খারাপ লাগছে মুসার। বদ্ধ ঘর, গরম হয়ে উঠছে। আলমারির ভেতরে গুমোট আরও বেশি। বাইরের খোলা বাতাসে কিশোর আর গালিভার বেশ আরামে রয়েছে ভেবে কষ্ট যেন বেড়ে গেল। তার। অবশ হয়ে আসছে পা।
খিদে পেলো তার। সঙ্গে করে স্যাণ্ডউইচ নিয়ে এসেছে। বের করে খেতে শুরু করলো।
পেরোলো আরও এক ঘন্টা।

.

ঝোপের ভেতর আলোআঁধারি সৃষ্টি করেছে উজ্জ্বল জ্যোৎস্না। ঘাপটি বসে দরজার দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর আর গালিভার।
দশটা বাজলো। ইতিমধ্যে কাউকে দেখা গেল না। নীরব স্টুডিও।
অস্বাভাবিক কিছু ঘটছে না। খাঁচার ভেতরে চিতাবাঘটার পদচারণা, মাঝে মাঝে চাপা গোঙানি। পোকামাকড়ের ডাক আর নিশাচর ছোট ঘোট জীবের আনাগোনা ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই।
একভাবে বসে থেকে পা ব্যথা হয়ে গেছে। এক পা থেকে আরেক পায়ে শরীরের ভার বদল করলো কিশোর।
কিছুই ঘটছে না।
ঘুম তাড়ানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছে মুসা। এই বেকায়দা অবস্থা আর অসহ্য গরমেও চোখের পাতা ভারি হয়ে আসছে তার। কেমন যেন শূন্য লাগছে মাথার ভেতরটা। এমন তো হয় না। এতে খারাপ লাগছে কেন?

কিছুতেই খুলে রাখতে পারছে না চোখের পাতা। দুবার ঢলে পড়লো তন্দ্রায়। তৃতীয়বার দীর্ঘ তন্দ্রা থেকে চমকে জেগে উঠে মাথা ঝাড়া দিলো। হঠাৎ বুঝতে পারলো, এরকম লাগার কারণটা।
বাষ্প!
আলমারি ভরা রঙ, রঙ গোলানোর তেল আর অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য। ভ্যাপসা গরমে ওগুলো থেকে বাষ্প বেরোচ্ছে, বিষাক্ত করে তুলছে আলমারির বাতাস। আর সেই বাতাস ফুসফুঁসে ঢোকাতেই এই অস্বাভাবিক তন্দ্রা।
ভাবতে ভাবতেই আবার ঘুমিয়ে পড়লো মুসা। কতোক্ষণ পরে জানে না, চোখ মেললো। ঘোলাটে হয়ে আছে মাথার ভেতর, ফলে দৃষ্টি অস্বচ্ছ।
ঘরের ভেতরে ঢুকেছে কিছু একটা! স্কাইলাইট দিয়ে চাঁদের আলো আসছে, সেই আলোয় দেখা যাচ্ছে বটে ওটাকে, কিন্তু স্পষ্ট নয়।
মাথা ঝাড়া দিলো মুসা। সে-কি জেগে আছে? নাকি এখনও ঘুমিয়ে? আশ্চর্য এক ধরনের অনুভূতি! ঘন তরলের মাঝে সাঁতার কাটছে যেন তার মন। কিছুতেই পরিষ্কার হচ্ছে না। এই
স্টুডিওর ভেতরে নড়ছে কিছু। চাঁদের আলোয় হালকা একটা কি যেন, ভেসে বেড়াচ্ছে! কাঁপা কাঁপা একটা মূর্তি নিচু হয়ে যেন তুলে নিলো একটা ছবি, ভাসতে ভাসতে এগিয়ে গেল জানালার কাছে, পলকে বাতাসে মিলিয়ে গেল যেন ছবিটা!
ভূতুড়ে মুর্তিটা দাঁড়িয়েই রয়েছে জানালার কাছে। নড়ে না আর। যুগ যুগ বুঝি পেরিয়ে যাচ্ছে। কিছু একটা করা দরকার। কিন্তু পুরোপুরি সজাগই হতে পারছে না মুসা, ভয়াবহ এক দুঃস্বপ্ন, একটা ঘোরের মধ্যে রয়েছে যেন।
আবার ছবিগুলোর কাছে ফিরে এলো মূর্তিটা। নিচু হয়ে তুলে নিলো আরেকটা ছবি। আবার গেল জানালার কাছে। গায়ের হয়ে গেল ছবিটা।
দাঁড়ানোর চেষ্টা করলো মুসা। পা নড়তে চাইছে না।
তার দিকে ভেসে আসছে মূর্তিটা।
গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠতে চাইলো মুসা।

.

চাপা চিৎকার শুনতে পেলো কিশোর আর গালিভার। স্টুডিওর ভেতর থেকে এসেছে।
লাফ দিয়ে উঠে দরজার দিকে দৌড় দিলো দুজনে।
তাড়াতাড়ি তালা খুললেন গালিভার।
বাইরের আলোর তুলনায় ঘরের ভেতরে অন্ধকার। দরজার পাশেই সুইচ, বোর্ড। আলো জ্বেলে দিলো কিশোর।
শুন্য ঘর।

আলমারির কাছে ছুটে গেল দুজনে। মেঝেতে বসে রয়েছে মুসা। মাথা ঝুলে পড়েছে বুকের ওপর। সাড়া পেয়ে অনেক কষ্টে সোজা করলো। চোখে উদভ্রান্ত দৃষ্টি।
সর্বনাশ! সলভেন্ট আর থিনারের বাষ্প! চেঁচিয়ে উঠলেন আর্টিস্ট। ধরো। ধরো, বের করো ওকে।
টেনে আলমারি থেকে বের করা হলো মুসাকে। দাঁড়াতে পারছে না। অসাড় হয়ে গেছে পা।
বগলের নিচে ধরে জোর করে তাকে দাঁড় করালো দুজনে মিলে। হাঁটানোর চেষ্টা করলো। ধীরে ধীরে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক হয়ে এলো, দাঁড়াতে পারলো মুসা। জোরে নিঃশ্বাস ফেললো।
কি হয়েছিলো? জিজ্ঞেস করলো কিশোর।
ভালোই ছিলাম, ক্লান্ত কণ্ঠে বললো মুসা, কখন জানি ঘুম এসে গেল! চোখ খুলে রাখতে পারলাম না কিছুতেই। তার ঘোরেই দেখলাম ভূতটাকে...
আরি! চেঁচিয়ে উঠলো কিশোর। জানালার দিকে চেয়ে আছে।
একদিকের জানালার নিচে পড়ে রয়েছে ডেনবারের একটা ছবি। জানালার পাল্লা খোলা!
বললাম না, ভূত! কেঁপে উঠলো মুসা। দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। ধপ করে, বসে পড়লো কম্বলে ঢাকা বেঞ্চটার ওপর। ধীরে ধীরে জানালো, কি করে ছবি সরিয়েছে ভূতটা।
নিশ্চয় কেউ ঢুকেছিলো, বললো কিশোর।
আমিও তো তা-ই বলছি ভূত!
আরে দূর! হাত নাড়লো কিশোর। তুমি তো ছিলে আধাবেহুশ হয়ে। মানুষটাকেই ভূত ভেবেছে।
তাহলে মানুষটা কোথায়? দাড়ি নাচালেন গালিভার। ঢুকলো কিভাবে? ওই জানালা দিয়ে কেউ ঢুকতে পারবে না।
অন্য কোনো পথ দিয়ে ঢুকেছে। হঠাৎ চকচক করে উঠলো চোখ। ওই যে, ওই দেখুন!
তাকালো মুসা আর গালিভার। একজস্ট ফ্যানটা যেখানে ছিলো, সেখানেই এখন একটা চৌকোণা ফোকর। ফ্যানটা নেই। টানটান হয়ে রয়েছে তার, প্লগটা : সকেটেই ঢোকানো।
এগিয়ে গিয়ে তার ধরে আস্তে টানলো কিশোর। বাইরের দেয়ালে ঘষা লেগে মৃদু শব্দ হলো। ফ্যানের স্ক্রু ঢিল করে রাখা হয়েছিলো, মিস্টার গালিভার। বাইরে

থেকে সহজেই খুলে ফেলেছে ভূতটা। ফোকরের ভেতর দিয়ে টেনে নিয়ে গিয়ে ঝুলিয়ে রেখেছে কর্ডে।
কিন্তু কিশোর, প্রতিবাদ করলো মুসা, গর্তটা দেখছো না কতো ছোট? বড়; জোর একফুট বাই, একফুট। ওখান দিয়ে মানুষ ঢুকতে পারবে না।
পারবে, যদি তোমার মতো শরীর বড় না হয়। এমন কেউ ঢুকেছে, যার শরীর খুব সরু।
হাঁ করে ফোকরটার দিকে চেয়ে আছেন আর্টিস্ট। মাথা নাড়ছেন আস্তে আস্তে, বিহ্বল হয়ে গেছেন যেন।
এখন আরেকটা কথা, তর্জনী নাড়লো কিশোর। মুসা চেঁচিয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আমরা এসে ঢুকেছি। এতো তাড়াতাড়ি পালাতে পারেনি চোর।
ঘরের চারপাশে চোখ বোলালেন গালিভার। তাহলে গেল কোথায়? এখানে, তো নেই।
কই? জিজ্ঞেস করলো মুসা।
মুসার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো কিশোর।
কি হলো?
জানি, কোথায় আছে, শান্তকণ্ঠে বললো কিশোর।
কোথায়?
ওর ওপরই বসে আছে।
ছিটকে সরে এলো মুসা, যেন বোলতায় হুল ফুটিয়েছে। বড় বড় চোখ করে তাকালো কম্বলে ঢাকা বেঞ্চটার দিকে।
ভারি গলায় ডাকলো কিশোর, এই, বেরিয়ে এসো। আমি জানি, তুমি আছো ওখানে।
এক মুহূর্ত নীরবতা। তারপর নড়ে উঠলো কম্বল। উঁকি দিলো একটা মুখ
চোখ মিটমিট করলেন গালিভার।
শুঁটকি! চেঁচিয়ে উঠলো মুসা।
.
ঘরের কোণে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে রয়েছে টেরিয়ার। চেহারা ফ্যাকাশে। মোটা একটা ডাণ্ডা নিয়ে তার কাছে দাঁড়িয়ে আছে মুসা। উঠলেই মারবে বাড়ি।
ওখানে ঢুকেছে, কি করে বুঝলে? জিজ্ঞেস করলেন গালিভার।
কম্বলটা সরানো দেখলাম, জবাব দিলো কিশোর। বিকেলে অন্যরকমভাবে রাখা ছিলো।
টেরিয়ারের দিকে ঘুরলেন গালিভার। শেষ পর্যন্ত চুরি করতে ঢুকেছো?
আমাকে বরখাস্ত করলেন কেন? তেজ দেখিয়ে বললো টেরিয়ার।

তাই বলে চুরি করবে? আর বরখাস্ত কি অন্যায়ভাবে করেছি? আমাকে না। জানিয়ে ছবি নিয়ে গেলে…
ফেরত দিয়েছি আবার। মেরে তো দিইনি।
ওই ছবি তোমার কি দরকার? এতো আগ্রহ কেন?
সেকথা আপনাকে বলতে যাবো কেন?
জানালা দিয়ে পাচার করতে চেয়েছো, বললো কিশোর। কার কাছে? ছবিগুলো নিয়ে সে কি করবে?
আমি কিচ্ছু বলবো না।
লোকটা কি জন ফেরেনটি? ডাণ্ডা নাচালো মুসা।
আড়চোখে ডাণ্ডার দিকে তাকালো টেরিয়ার। নামই শুনিনি।
দেখো ছোকরা, ধৈর্য হারালেন গালিভার।.বেশি বাড়াবাড়ি কোরো না। চুরি করতে ঢুকেছো, হাতেনাতে ধরা পড়েছে। পুলিশকে ফোন…
পু-পুলিশ! আঁতকে উঠলো টেরিয়ার। দোহাই আপনার, ফোন করবেন না। বাবা তাহলে মেরে ফেলবে…
খবরদার! জানালার বাইরে থেকে বলে উঠলো একটা চাপা কণ্ঠ, কেউ নড়বে না। আমার হাতে পিস্তল আছে। টেরিয়ার, জলদি বেরোও।
কণ্ঠস্বরটা চেনা গেল, না, বিকৃত।
নড়লো না কেউ, শুধু টেরিয়ার উঠে দাঁড়ালো। ছুটে বেরিয়ে গেল। ঝনঝন। করে বন্ধ হয়ে গেল লোহার দরজা।
গেল! চেঁচিয়ে উঠলো মুসা। এতো কষ্ট সব বিফল।
যাবে কোথায়? সান্ত্বনা দিলেন গালিভার। দরকার হলে পুলিশকে জানাবো। বাড়ি থেকে গিয়ে ধরে আনবে।
চোর কে, সেটা জানা গেল, বললো কিশোর। আরও বোঝা গেল, কারও সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করছে টেরিয়ার। কিন্তু কার সঙ্গে, কেন, করছে জানি না। ডেনবারের ছবি দিয়ে ওই লোকটা কি করবে?
চুরির উদ্দেশ্য ছিলো না, জানালার নিচের ছবিটা দেখিয়ে বললো মুসা। শুঁটকি দিয়েছে, লোকটা নিয়ে আবার ফিরিয়ে দিয়েছে। সেটা আরেক রহস্য!
ছবিটা তুলে আনলো কিশোর। মাথা নেড়ে বললো, কোনো মেসেজ আছে। কিনা বোঝা যাচ্ছে নাঃ স্যার, দেখুন তো! এই কোণটা ভিজে লাগছে!
ভেজা? ছুঁয়ে দেখলেন গালিভার। তাই তো। রিটাচ করেছে।
কেন করলো? মুসাও ছুঁয়ে দেখলো।
ভিজে কোণটা ডলে দেখলেন গালিভার। নিচে অন্য কোনো ছবি আঁকা রয়েছে কিনা দেখেছে হয়তো। তারপর আবার রঙ দিয়ে রিটাচ করে আগের মতো করে

রেখেছে।
ছবিটার দিক থেকে চোখ সরালো না কিশোর। বিড়বিড় করলো, অন্য কোনো ছবি...! ঝট করে মুখ তুললো। স্যার, টেলিফোন কোথায়? এখুনি। দরকার। জরুরী!

.

আধ ঘন্টা পর। বাড়ির সদর দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন গালিভার, কিশোর আর। মুসা। রিকিকে সঙ্গে নিয়ে গাড়িতে করে এলেন প্রফেসর হোফার।
আর্টিস্টের সঙ্গে প্রফেসরের পরিচয় করিয়ে দিলো কিশোর।
কি হয়েছে, কিশোর? জানতে চাইলো রিকি।
চলো, স্টুডিওতে। বলছি।
ডেনবারের ছবিগুলো দেখেই চিনতে পারলেন প্রফেসর আর তাঁর ছেলে।
পেয়ে গেছো? চেঁচিয়ে উঠলো রিকি।
কাউন্টেসকে জানিয়েছো? জিজ্ঞেস করলেন- প্রফেসর। শুনে খুশি হবেন।
এখনও জানাইনি, জবাব দিলো কিশোর। আপনাদের ফোন করেছি, তার কারণ, আমার ধারণা ছবিগুলো খুবই মূল্যবান। অনেকেই চাইবে।
চাইবে? মুসার কণ্ঠে সন্দেহ।
হ্যাঁ। রিকি, অ্যাডোবের। সেই সোনালি ফ্রেমটা...বলেছিলে, একসময় ওটাতে একটা ছবি লাগানো ছিলো।
সোনালি ফ্রেম! প্রফেসর বললেন। কই, ওরকম ফ্রেম লাগানো কোনো ছবি দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না? ছেলের দিকে তাকালেন প্রফেসর।
বাবা, রিকি বললো, রিগ ডেনবার যখন প্রথম আমাদের বাড়িতে এলো, একদিন হঠাৎ করেই দেখে ফেললাম। চমকে গেল, বুড়ো। জানালো, ওটা নাকি একটা ইমিটেশন, প্রিন্ট, ফেলে দেবে। তারপর আর একবারও দেখিনি। ফ্রেমটাই। শুধু পড়ে ছিলো অ্যাডোবে।
ছবিটা কেমন ছিলো? জিজ্ঞেস করলো কিশোর।
মাথা চুলকালো রিকি। এই, পাহাড়-পর্বত, ঘোড়া, পাম গাছ, ঘাসের কুঁড়ের সামনে কয়েকজন প্রায় উলঙ্গ মানুষ...পাহাড়ের রঙ বেগুনী, ঘোড়াগুলো নীল, পাম গাছ হলুদ, আর মানুষগুলো লাল
কী! চেঁচিয়ে উঠলেন–গালিভার। চকচক করছে চোখ। সত্যি ওরকম ছিলো?
হ্যাঁ। উল্টোপাল্টা রঙ।
ছবিটা চিনতে পেরেছেন, স্যার? কিশোর বললো।
এক মিনিট! তাড়াতাড়ি গিয়ে তাক থেকে বিরাট একটা বই নামালেন আর্টিস্ট। দ্রুত পাতা উল্টে এক জায়গায় এসে থামলেন। এই যে। রিকি, এরকম ছিলো

ছবিটা?
একনজর দেখেই বলে উঠলো রিকি, হ্যাঁ, অবিকল এরকম।
কি জিনিস দেখেছো তুমি জানো না, রিকি! ওটা বিখ্যাত এক ফেঞ্চ আর্টিস্ট ফ্র্যাঙ্কোই ফরচুনার্দ-এর আঁকা। একটা মাস্টার পীস। জার্মানরা দেখতে পারতো না তাঁকে। ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তাঁর আঁকা যতো ছবি পেয়েছে নষ্ট করে দিয়েছে নাৎসী সৈন্যরা। কি বলবো তোমাদেরকে, ছবির জগতে এ-এক অসামান্য। ক্ষতি..., মুখের ভাব দেখে মনে হলো কেঁদে ফেলবেন বুঝি শিল্পী। যা-ই হোক, একটা ছবিও যদি অন্তত পাওয়া যায়..রিকি, কি বলেছিলো ডেনবার? প্রিন্ট? কিন্তু ওই ছবিটার তো কোনো প্রিন্ট হয়েছিলো বলে জানি না!
তাহলে ওটা আসল, বললো কিশোর। কোনোভাবে বুড়ো ডেনবারের হাতে এসে পড়েছিলো?
খাইছে! গালিভারের দিকে তাকালো মুসা। দাম আন্দাজ কতো হতে পারে?
অনেক, অনেক টাকা। এসব জিনিসের দাম কতো উঠবে, আন্দাজ করা মুশকিল। কিশোর, তুমি সত্যি ভাবছো...
ভাবছি না, স্যার। আমি শিওর। প্রলাপ বকার সময় মাস্টার শব্দটা বলেছে। ডেনবার। তারমানে বলতে চেয়েছে মাস্টার পীস। অর্থাৎ ছবিটা আসল। আমার মনে হয়, ওই বিশটা ছবির কোনোটার নিচে লুকানো
কিশোরের কথা শেষ হওয়ার আগেই ঘুরে দাঁড়ালেন গালিভার। সলভেন্ট নরম কাপড় আর আরও কিছু সরঞ্জাম নিয়ে কাজে বসে গেলেন। একটা একটা করে ছবি নিয়ে খুব সাবধানে ঘষে দেখলেন, কোণের দিকটায়। তারপর আবার আগের মত রিটাচ করে রাখলেন।
আধ ঘন্টা পর নিরাশ হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। না, নেই। কিশোর, তোমার ভুল হয়েছে। আসল ছবিটা নেই।
ঠোঁট কামড়ালো কিশোর। ভুল আমি করিনি, স্যার। এগুলোর নিচে যখন নেই, নিশ্চয় অন্য কোথাও আছে। আর এই ছবিগুলো তার চাবিকাঠি, আমার তা-ই বিশ্বাস।
এগিয়ে এলেন প্রফেসর। অনেক রাত হয়েছে। ছবিগুলো আমি নিয়ে যাই। কাল কাউন্টেসকে দিয়ে দেবো। আপনার যা খরচ হয়েছে, সেটা আমি দিয়ে দেবো, মিস্টার গালিভার। :
প্রফেসরের গাড়িতে ছবিগুলো তুলে দিতে সাহায্য করলো ছেলেরা।
প্রফেসর আর রিকি চলে গেলে গোয়েন্দাদের বললেন :গালিভার, তোমরা এখানেই থেকে যাও। এতো রাতে আর গিয়ে কাজ নেই। বাড়িতে ফোন করে দাও।

এক মুহূর্ত চুপ থেকে বললেন, কাল সকালে দেখবো, শুঁটকির ব্যাপারে কি। করা যায়।

.

পরদিন সকালে। হেডকোয়ার্টারে বসে আছে কিশোর আর রবিন।

আমারও মনে হয়, রবিন বললো। আসল ছবিটা পায়নি ডেনবার। আমিও যতোদূর জানি, ফরচুনার্দের সব ছবি নষ্ট করে ফেলেছিলো নাৎসীরা।

কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ওই একটা ছবি নষ্ট করতে পারেনি। ডেনবারের হাতে পড়েছিলো। রিকি দেখে ফেলেছিলো। তাকে মিথ্যে বলেছে বুড়ো, বলেছে ওটা প্রিন্ট। তারপর, যখন অসুখে পড়লো, ঘোরের মধ্যেই একটা মেসেজ রেখে যাওয়ার চেষ্টা করলো। জানাতে. চাইলো, ছবিটা কোথায় লুকিয়েছে। কাগজের পাতাটা আবার বের করলো কিশোর। আঁকাবাঁকা বলে দিক নির্দেশ করতে চেয়েছে বুড়ো, বুঝলাম। কিন্তু ভুল মনে হবে বলে কি বোঝাতে চেয়েছে? ভুল : কিছু খুঁজতে বলেছে হয়তো। এমন কিছু দেখে যা মনে হয়, হয়তো আসলে তা নয় ওটা।

ভুলভাবে কিছু করা হয়েছে বলছো?

তা-ই। মাস্টার মানে মাস্টার পীস। আমার ছবি, আমার ক্যানভাস, আর ক্যানভাস থেকে আঁকাবাঁকা, এই কথাগুলো বলে নিশ্চয় বোঝাতে চেয়েছে তাঁর কুড়িটা ছবির মধ্যেই রয়েছে ধাঁধার সূত্র। ওই ছবিগুলোই বলে দেবে কোথায় রয়েছে আসল ছবিটা।

তাহলে সূত্রটা কি?

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো কিশোর। সেটাই তো বুঝতে পারছি না। সব চেয়ে বেশি যেটা চোখে লেগেছে, ছবিগুলোতে কটেজটার আকার। ধীরে ধীরে ছোট করে ফেলা হয়েছে। অথচ আশপাশে আর যা যা রয়েছে, সব কিছুর আকার একই রেখেছে। কেন?

ভাবছে রবিন। কিছু বুঝতে পারছে না।

মুসা আসুক, বললো কিশোর। দেখি, শুঁটকি ওদেরকে কি বলে?

ও-ব্যাটা বলবে?

মিস্টার গালিভার সঙ্গে গেছেন তো। পুলিশের ভয় দেখালে হয়তো বলবে।

আমার মনে হয় না।

সেটা মুসা এলেই জানা যাবে।...আচ্ছা, রবিন, আরেকটা কথা মনে আছে। তোমার? রিকিকে নাকি বলেছিলো ডেনবারঃ আমি দুনিয়ার সব চেয়ে দামী আর্টিস্ট! কিন্তু কেউ সেটা জানে না। তারপর হেসে উঠেছিলো বুড়ো। কেন হাসলো? কি বোঝাতে চেয়েছিলো?

হয়তো মাস্টার পীসটা তার কাছে ছিলো বলে…
ভেবেছি সেকথা। কিন্তু তার কথার ধরনে তো মনে হয়, নিজের ছবিগুলোর কথাই বলেছে সে। ওগুলো অনেক দামী, এবং কেউ সেটা জানে না।
কিশোর, মেসেজটা কার জন্যে রেখে গিয়েছিলো…
ট্রেলারের নিচে শব্দ হলো। দুই সুড়ঙ্গের ঢাকনা উঠে গেল। ভেতরে ঢুকলো। মুসা। দুই বন্ধুর দিকে চেয়ে মাথা নাড়লো। পাওয়া যায়নি। পুঁটকি গায়েব। কাল রাতে বাড়ি ফেরেনি। তার মায়ের ধারণা, শুঁটকিকে কিডন্যাপ করা হয়েছে।
কিডন্যাপ! ভুরু কোঁচকালো রবিন।
কে করেছে? জিজ্ঞেস করলো কিশোর।
শুঁটকির মা জানে না। বললো, তাদের বাড়ির আশপাশে নাকি একটা নীল সেডানকে ঘুরঘুর করতে দেখেছে। আর ওই গাড়ির লোকটার সঙ্গে কথা বলেছে শুঁটকি।
জন ফেরেনটি! বললো কিশোর।
শুঁটকির মা আরও বললো, ওদের টেলিফোন লাইনও নাকি ট্যাপ করা হয়েছে। সেটা তো আমরাই করতে দেখেছি।
হ্যাঁ, মাথা ঝোঁকালো কিশোর। নিচের ঠোঁটে জোরে জোরে চিমটি কাটলো কয়েকবার। ওর কিডন্যাপ হওয়াটা একটা কথাই প্রমাণ করে, শুঁটকি অনেক কিছু জানে। তাই তাকে ধরে নিয়ে গেছে। কাউকে যাতে কিছু বলতে না পারে।
মেরে না ফেলে! বললো রবিন।
ফেলতেও পারে! ওর জন্যে আমাদের কিছু করার নেই। সেটা পুলিশ দেখবে। চলো এখন, রেমুডা ক্যানিয়নে যাবো।
.
সাইকেল চালাতে চালাতে জানালো মুসা, শুঁটকিকে বাড়িতে না পেয়ে থানায় গেছেন মিস্টার গালিভার। রাতে তার স্টুডিওতে যেসব ঘটনা ঘটেছে, জানানোর জন্যে। শুঁটকির বাবাও নাকি গেছে পুলিশের কাছে, ছেলে নিখোঁজ হয়েছে সেকথা জানাতে।
ক্যানিয়নে পৌঁছলো তিন গোয়েন্দা।
কটেজের চত্বরে দাঁড়িয়ে ছিলো রিকি, ওদেরকে দেখে দৌড়ে এলো। উত্তেজিত। বললো, জানো, আজ সকালেও কে জানি এসে কটেজে ঢুকেছিলো! তছনছ করে দিয়ে গেছে।
ছবিগুলো কটেজে রেখেছিলে? জিজ্ঞেস করলো কিশোর।
না, আমাদের ঘরে। সকালে কাউন্টেসকে ফোন করার চেষ্টা করেছে বাবা, পায়নি। তারা নাকি বাইরে গেছে। শেষে, বাবা গাড়ি নিয়ে নিজেই গেছে। মোটেলে বসে

থাকবে। কাউন্টেস ফিরলেই তাকে ধরবে, জানাবে ছবিগুলোর কথা।
সকালে কাউকে দেখেছো এখানে?
হ্যাঁ। গ্যারেজের কাছে। পলকের জন্যে দেখেছি, চিনতে পারিনি। ছুটে চলে গেল নালার দিকে। তারপরই গিয়ে দেখলাম কটেজের ওই অবস্থা।
গ্যারেজের আশপাশে দেখেছো? মুসা জিজ্ঞেস করলো।
না।
চলো, দেখি গিয়ে, বললো রবিন।
অনেক খুঁজলো ওরা, কিছু পেলো না। কিছুটা নিরাশ হয়েই এসে দাঁড়ালো। গ্যারেজের সামনে।
কোনো চিহ্ন রেখে যায়নি ব্যাটা, হাত নাড়লো রবিন।
না, বললো কিশোর। এমনকি পায়ের ছাপও না। চলো, কটেজে। দেখি...
মৃদু একটা শব্দ শোনা গেল। একে অন্যের দিকে তাকালো ওরা। সকালের রোদ এসে পড়েছে চোখেমুখে। অদ্ভুত শব্দ! গোঙানির মতো। যেন গলা টিপে ধরা হয়েছে।
কী?... বললো রিকি।
শ শ শ! তাকে থামিয়ে দিলো কিশোর।
আবার হলো শব্দটা। কাছেই কোথাও।
কান খাড়া করলো মুসা। অন্য তিনজনের চেয়ে তার শ্রবণশক্তি জোরালো। গ্যারেজের ভেতরে! বলেই দৌড় দিলো, দরজার দিকে। কিন্তু দরজা বন্ধ। তালা। লাগানো।
চেঁচিয়ে বললো রিকি, এসো, আরেকটা দরজা আছে পাশে।
এই দরজাটাতেও ভারি তালা আটকানো।
এটাও তো বন্ধ! জিজ্ঞেস করলো রবিন, চাবি আছে?
আছে... বলতে বলতেই দরজার পাশের একটা খোপ থেকে চাবি বের করলো রিকি। তালাটা খুললো।
হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকলো চারজনে। প্রথমে কিছু চোখে পড়লো না, দরজার কাছে ফেলে রাখা কয়েকটা যন্ত্রপাতি আর কাঠ ছাড়া।
কোণের কাছে নড়ে উঠলো কি যেন। গোঁ গোঁ করলো।
ছুটে গেল ওরা।
শুঁটকি! চমকে উঠলো রবিন।
হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখা হয়েছে। মুখে রুমাল গোঁজা। গোঙানো ছাড়া আর কোনো শব্দ করতে পারছে না। বাঁধন খুলে দিতে উঠে বসলো টেরিয়ার।
কি হয়েছিলো, শুঁটকি? পাশে বসে জিজ্ঞেস করলো মুসা।

কেঁপে উঠলো টেরিয়ার। বাঁধনের জায়গাগুলো ডলছে। তো-তোমরা আমাকে বাঁচালে...! গলা ভীষণ কাঁপছে ওর। সরি! তোমাদেরকে সব সময় শত্রু ভাবি...
তা তো ভাবোই, মুসা বললো। এখান থেকে বেরিয়েই আবারও ভাবতে শুরু করবে। সরি-ফরি বাদ দাও। কি হয়েছিলো, তা-ই বলো।
সারা রাত ছিলে কোথায়? এখানেই? প্রশ্ন করলো কিশোর।
না, বললো টেরিয়ার। আমাকে নিয়ে এলো। হাত-পা বাঁধলো। ওদিকে একটা নালার কাছে। না দেখে নালার পাড়ে গিয়েছিলাম। নেমে এসে আমাকে বাঁধলো সে। খুব একচোট হেসে বললো, সবাই নাকি একবার করে পড়েছে ওই নালায়। আমার দুঃখ পাওয়ার কিছু নেই।
তা পড়েছে! মাথা দোলালো কিশোর। অকস্মাৎ গম্ভীর হয়ে গেছে।
সারা রাত নালার মধ্যে ফেলে রাখলো, আবার বলে চললো টেরিয়ার। সকালে এনে ঢোকালো এখানে। বাইরে থেকে তালা দিয়ে চলে গেল। কিছুক্ষণ আগে অনেক শব্দ শুনলাম। ভয়ে রা করিনি। ভেবেছি, ও-ই আবার এসেছে। তারপর শুনলাম তোমাদের গলা..তখন চিৎকার করার চেষ্টা করলাম...
খুব ভালো করেছো, টিটকারির ভঙ্গিতে বললো মুসা। কেন, দোস্তের সঙ্গে তো খুব ভাব হয়ে গিয়েছিলো। ধরে বাধলো কেন...
আহ্, মুসা, এখন ওসব কথা রাখো তো, বাধা দিয়ে বললো কিশোর। তা শুঁটকি, লোকটা...
দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল খোলা দরজাটা। তালা লাগানোর শব্দ হলো। জানালাশূন্য অন্ধকার গ্যারেজে বন্দি হলো এখন পাঁচজন।
চেঁচিয়ে ডাকলো রিকি।
কেউ সাড়া দিলো না।
ছুটে গিয়ে সামনের দরজার ফোকরে চোখ রাখলো কিশোর। কে দরজা বন্ধ করলো, দেখতে চায়। রিকি, রবিন, আর মুসাও ছুটোছুটি করে গিয়ে যে যেখানে পারলো, চোখ রাখলো।
আমি দেখছি! বলে উঠলো রিকি। পাশের দরজাটার ফ্রেমের ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে আছে সে।
দরজাটার পাশে ফাঁকফোকর আরও আছে। ওগুলোতে চোখ রাখলো তিন গোয়েন্দা। সকালের রোদে স্পষ্ট দেখা গেল লোকটাকে। বেঁটে, ভারি শরীর। এদিকেই ভুরু কুঁচকে চেয়ে রয়েছে ওলন্দাজ আর্ট ডিলার, জন ফেরেনটি।
মিস্টার ফেরেটি, চেঁচিয়ে বললো রিকি। আমাদের ছেড়ে দিন!
আমরা জানি, আপনি কি খুঁজছেন! বললো রবিন।

গ্যারেজের দিকে চেয়ে থেকে ভুরু আরও বেশি কুঁচকে গেল লোকটার। থাকো, ওখানেই! আমি... ঝট করে ঘুরলো ফেরেনটি। খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলে গেল গ্যারেজের পেছনে একটা ঝোপের আড়ালে।
পুরো এক মিনিট আর কিছু ঘটলো না।
তারপর শোনা গেল পায়ের আওয়াজ। এগিয়ে আসতে দেখা গেল আরেকজনকে। ফ্রেড ব্রাউন।
মিস্টার ব্রাউন! গলা ফাটিয়ে চিৎকার করলো মুসা। জন ফেরেনটি, আছে ওখানে! সাবধান!
গ্যারেজের দিকে চেয়ে রইলো এস্টেট ম্যানেজার।
পেছনে! ঝোপের ভেতরে! চেঁচিয়ে বললো রবিন।
ঝোপের দিকে ফিরলো ব্রাউন।
আমাদের আটকে রেখে গেছে, রিকি বললো। তালাটা খুলুন।
দরজার কাছে এগিয়ে এলো ম্যানেজার। জিজ্ঞেস করলো, ফেরেনটি কি একা?
হ্যাঁ, জবাব দিলো মুসা। মিস্টার ব্রাউন, আমাদের সঙ্গে শুঁটকিও আছে।
টেরিয়ার? আই সী। ছেলেটাকে বিশ্বাস কোরো না, বুঝেছো? নানারকম কথা বলবে। পাজি ছেলে।
ঠিক বলেছেন, একমত হলো মুসা।
দরজার তালা পরীক্ষা করলো ব্রাউন। এটা তো বন্ধ।
চাবি আমার কাছে, রিকি বললো। দরজার নিচ দিয়ে ঠেলে দিচ্ছি। খুলে দিন।
কিশোর...! বলতে গেল টেরিয়ার।
চুপ! ধমক দিয়ে তাকে থামিয়ে দিলো কিশোর।
চাবিটা দেয়ার জন্যে নিচু হতে গিয়ে জোরে ধাক্কা খেলো রিকি, কিশোরের। গায়ে। তাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেল সে। ঠনন করে ধাতব শব্দ হলো। চেঁচিয়ে উঠলো, হায়, হায়!
কি হলো? জিজ্ঞেস করলো ব্রাউন।
চাবিটা পড়ে গেছে। যা অন্ধকার, কিছু দেখতে পাচ্ছি না।
খোজো! খুঁজে বের করা। তাড়াতাড়ি!
খুঁজতে শুরু করলো রিকি, রবিন আর মুসা। ঘরের কোণে আগের জায়গাতেই বসে রয়েছে টেরিয়ার। রিকির গায়ে ধাক্কা লাগানোর পর থেকে চুপ হয়ে আছে। কিশোর, বিন্দুমাত্র নড়েনি।
চাৰিটা খুঁজছে তিনজনে। পাচ্ছে না, আফসোস করছে।
একটা গাড়ি আসছে, হঠাৎ বললো কিশোর।

দরজার ফোকরে চোখ রাখলো সবাই, টেরিয়ার বাদে। সে বসেই রয়েছে। ঘুরে। গ্যারেজের সামনের দিকে চেয়ে রয়েছে ব্রাউন।
না দেখলেও বুঝতে পারলো ছেলেরা, গাড়িটা গিয়ে থামলো মূল বাড়ির ড্রাইভওয়েতে।
দৌড় দিলো ম্যানেজার। হারিয়ে গেল নালার দিকে।
নিশ্চয় ফেরেনটিকে দেখেছে! বললো রিকি।
হ্যাঁ, হ্যাঁ! চেঁচিয়ে উঠলো মুসা।
ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসছে ফেরেনটি। হাতে পিস্তল। দৌড় দিলো। নালার দিকে, ব্রাউন যেদিকে গেছে।

.

ফেরেনটিও অদৃশ্য হয়ে গেল। কয়েক সেকেণ্ড পর প্রফেসর হোফার আর কাউন্টেসকে আসতে দেখা গেল কটেজের দিকে।
বাবা! চেঁচিয়ে ডাকলো রিকি।
পাঁই করে ঘুরলেন প্রফেসর। রিকি? কোথায়?
গ্যারেজে, বাবা! আটকে রাখা হয়েছে!
দ্রুত গ্যারেজের দিকে এগিয়ে এলেন দুজনে। সামনের দরজার চাবি প্রফেসরের কাছে, তালা খুলে বের করলেন ছেলেদের। কে তালা দিলো?
জন ফেরেনটি, জানালো মুসা। মিস্টার ব্রাউন বের করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু রিকি চাবিটা হারিয়ে ফেললো। তারপর ম্যানেজারকে তাড়া করলো ফেরেনটি। পিস্তল নিয়ে।।
ব্রাউন এখানে এসেছিলো? অবাক মনে হলো কাউন্টেসকে। ফেরেনটিও?
কেন, আপনি জানেন না? জিজ্ঞেস করলো কিশোর। বলে আসেনি?
ইয়ে…কাল বিকেল থেকেই ম্যানেজারকে পাচ্ছি না। রাতে মোটেলে ছিলো! সেকথাই বললাম তখন প্রফেসর হোফারকে। আমাকে কিছুই বলে যায়নি।
প্রফেসর বললেন, কাল নাকি ফেরেনটির নীল সেডানটা মোটেলের কাছে দেখা গেছে, কাউন্টেস বললেন।
পিস্তল নিয়ে তাড়া করেছে ফেরেনটি, উদ্বিগ্ন গলায় রিকি বললো, আমাদের যাওয়া দরকার। ম্যানেজারকে বাঁচানো দরকার।
কোনো দরকার নেই, সবাইকে অবাক করে দিলো কিশোর। ইচ্ছে করেই তখন ধাক্কা দিয়েছিলাম তোমাকে। চাবিটা হাত থেকে ফেলে দেয়ার জন্যে। টেরিয়ারের দিকে ঘুরলো সে। এখন তুমি নিরাপদ। সব কথা খুলে বলতে পারো। কে কিডন্যাপ করেছিলো? কার হয়ে কাজ করছিলে?
অবশ্যই জন ফেরেনটি, বললো মুসা।

না, ফেরেনটি নয়, মাথা নাড়লো গোয়েন্দাপ্রধান।
তুমি ঠিকই আন্দাজ করেছে, কিশোর। শুকনো ঠোঁট চাটলো টেরিয়ার। ফেরেনটি নয়। ফ্রেড ব্রাউন। সেদিন তোমাদেরকে ছবিটা দেখিয়ে বাড়ি ফিরতেই আমার সঙ্গে দেখা করলো। রাতে গালিভারের স্টুডিও থেকে ছবি বের করে দেয়ার জন্যে আমাকে রাজি করালো।
আমিও তা-ই সন্দেহ করেছি, বললো কিশোর। তখন ব্রাউনকে চাবি দিলে গ্যারেজে ঢুকে আমাদেরকে কি করতো কে জানে! গ্যারেজেই বরং নিরাপদ থেকেছি আমরা।
তুমি শিওর, কিশোর? বললেন কাউন্টেস।
হ্যাঁ। টেরিয়ার তো নিজেই স্বীকার করছে। এরপর আর সন্দেহ কিসের? নিজেই ভেবে দেখুন না আপনি। বিপজ্জনক বলে আমাদেরকে কাজ করতে। মানা করে দিলো। বললো, পুলিশকে জানাবে সব কথা। জানিয়েছে?
না, জানায়নি।
কেন জানালো না? কারণ, কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বের করে ফেলবে। পুলিশ। আমরাও বের করে ফেলতে পারি, এটা বুঝেই আমাদেরকেও থামিয়ে রাখতে চেয়েছে। বলে চললো কিশোর, সেদিন শুঁটকি গিয়েছিলো-মোটেলে। কটেজে উঁকিঝুঁকি মারছিলো। আমরা ভাবলাম, ভেতরে ঢোকার জন্যে অমন করছে। আসলে তা নয়। গিয়েছিলো ব্রাউনের সঙ্গে দেখা করতে। তাকেই খুঁজছিলো। এখন বুঝতে পারছি।
অনেক দেরিতে বুঝেছে, নিরাপত্তা পেয়ে আবার আগের খোলসে ঢুকেছে টেরিয়ার। খিকখিক করে গা-জ্বালানো হাসি হাসলো। তারমানে যতোটা ভাবো, ততোটা চালাক তোমরা নও।
তার কথায় কান দিলো না কিশোর। আমার বিশ্বাস, ম্যাডাম, সেই মহিলার কাছে যায়ইনি ব্রাউন। ভেনাসের মূর্তি তার দরকারই ছিলো না। প্রয়োজন ছিলো। ছবিগুলোর।
কি জানি, বলতে পারবো না। হয়তো যায়নি। জিজ্ঞেস করিনি আর।
না, যায়নি। আপনার ভাইয়ের শেষ স্মৃতির চেয়ে ছবিগুলোর প্রয়োজন ছিলো তার অনেক বেশি। মিস্টার ডেনবারের প্রলাপের কথা রিকির মুখে শুনেছে ব্রাউন, বুঝে গেছে, ছবিগুলোতেই রয়েছে চাবিকাঠি।
কিসের চাবিকাঠি?
ফ্র্যাঙ্কোই ফরচুনার্দের মাস্টার পীস কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন আপনার ভাই।
কিন্তু, কিশোর, প্রফেসর বললেন, ব্রাউন কি করে জানলো, ডেনবারের কাছে একটা মাস্টার পীস আছে? কাউন্টেস তো জানেন না। তিনি জানেন না, অথচ

তার। ম্যানেজার জানবে…
অদ্ভুত, তাই না, স্যার? ঠিকই ধরেছেন। মনে হয় কাউন্টেসকে ধোকা দিয়েছে ম্যানেজার। আমি এখন শিওর, ফেরেনটি আমাদেরকে অ্যাডোবে আটকায়নি। কালো পোশাক পরে সেদিন যে লোকটা আপনার বাড়িতে ঢুকেছিলো, সে-ও ফেরেনটি নয়।
কিন্তু ব্রাউন কি করে জানলো, একটা মাস্টার পীস আছে আমার ভাইয়ের কাছে?
শুরু থেকেই জানতো, ম্যাডাম, রহস্যময় কণ্ঠে বললো কিশোর। মিস্টার ডেনবার বলেছিলেনঃ বি-ধ্বলো। শুনলে মনে হবে, জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকার সময় কথা জড়িয়ে গেছে, তোতলামি, আসলে তা নয়। বি-ব্বলো মানে হলো, বি কে বলো, অর্থাৎ ব্রাউনকে বলো। কারণ, ব্রাউন ছিলো তার পার্টনার।
পার্টনার! আঁতকে উঠলেন যেন কাউন্টেস। কিসের পার্টনার? কোনো। অপরাধের?
হ্যাঁ। ছবির ব্যাপারেই কোনো কিছু। কী, এখনও শিওর নই, তবে খারাপ। কিছু। জানতে পারলে পুলিশে ধরবে…
তাহলে এখুনি পুলিশে ফোন করা উচিত, বলে উঠলেন কাউন্টেস। ফ্রেডকে পালাতে দেয়া যাবে না।
আমি যাচ্ছি, বললেন প্রফেসর, পুলিশকে ফোন করতে।
চলুন, আমরাও যাই, কিশোর বললো। দেখি আরেকবার ছবিগুলো, ধাঁধার সমাধান করা যায় কিনা।

২১.

বাড়িতে ঢুকে প্রফেসর গেলেন পুলিশকে ফোন করতে। ছেলেদের সঙ্গে কাউন্টেস এসে ঢুকলেন লিভিং-রুমে, যেখানে কুড়িটা ছবি রাখা হয়েছে।
ক্রমিক নম্বর অনুসারে সাজিয়ে রেখেছে রিকি, বোঝার চেষ্টা করেছে।
কি ছবিগুলোর দিকে আবার তাকালো কিশোর। সেই একই রকম, কটেজটা ছাড়া আর কোনো কিছুতে কোনো পরিবর্তন নেই।
ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে চোখ মিটমিট করছেন কাউন্টেস। মৃত ভাইয়ের জিনিস দেখেই বোধহয় অস্বস্তি বোধ করছেন, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। দারুণ। এঁকেছে? ধীরে ধীরে ছোট হয়ে গেছে বাড়িটা যেন…
হ্যাঁ, মাথা ঝাঁকালো কিশোর, ক্রমান্বয়ে ছোট হয়েছে। অসাধারণ হাত ছিলো আপনার ভাইয়ের। এভাবে আঁকা সোজা কথা নয়।
কি বলছে ছবিগুলো, কিশোর? মুসা কিছুই বুঝতে পারছে না।
দেখো সবাই ভালো করে, গোয়েন্দাপ্রধান বললো। কারো চোখে কোনো খটকা লাগলে বলবে। আমিও দেখছি।

সবাই দেখছে। সেই একই অবস্থা। গাছপালার আকার এক, কটেজের ক্যানভাসের ছাউনির আকার এক, শুধু ছোট হয়েছে বাড়িটা..
রিকি বললো, মনে হচ্ছে যেন একটা মাইক্রোস্কোপ..না না, টেলিস্কোপের। ভেতর দিয়ে চেয়ে আছি..মানে বোঝাতে পারছি না.কোনো যন্ত্রের ভেতর দিয়ে ফোকাসিং:..
ফোকাসিং? ধীরে ধীরে বললো কিশোর।
রিকি কি বলতে চায় বুঝেছি আমি, রবিন বললো। কটেজের ওপর নজর আকৃষ্ট রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। মোটা কোনো নলের ভেতর দিয়ে তাকালে যেমন যে কোনো একটা জিনিস বা বিশেষ জায়গার ওপর দৃষ্টি সীমাবদ্ধ থাকে…
খাইছে! আস্তে মাথা নাড়লো মুসা। সবাই গ্রীক বলতে আরম্ভ করেছে!
হঠাৎ বড় বড় হয়ে গেল কিশোরের চোখ। দ্রুত এক ছবি থেকে আরেক ছবিতে নজর সরাতে লাগলো। পকেট থেকে বের করলো কাগজটা, যেটাতে লিখে রেখেছে শব্দগুলো। একবার কাগজের দিকে তাকায়, আরেকবার ছবির দিকে। এরকম করলো কয়েকবার। উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। আনমনে বিড়বিড় শুরু। করলো, বি-ধ্বলো, মানে ব্রাউনকে বলো।…আমার ছবি আর মাস্টার মানেঃ আমার। আঁকা ছবির মাঝে লুকিয়ে রয়েছে মাস্টার পীস কোথায় রয়েছে তার সংকেত। কাগজটা ভাঁজ করে পকেটে ভরলো আবার। ভুল মনে হবে মানে, ভুল জায়গায়। দেখো। অর্থাৎ, এমন জায়গায়, যেখানে সহজেই চোখ যায় অথচ চোখে পড়েও পড়ে না জিনিসটা। আবারও বলেছেঃ আমার ক্যানভাস, আর ক্যানভাস থেকে আঁকাবাঁকা:.., মুখ তুলে তাকালো গোয়েন্দাপ্রধান। কিছু বুঝতে পারছো? ছবিগুলোর দিকে তাকাও।
সবাই তাকালো। বুঝতে পারলো না কিছু।
সব শেষ ছবিটা, বুঝিয়ে বললো কিশোর। কটেজটা ছোট, কিন্তু বড় বেশি বেমানান লাগছে…
ছাউনিটা! চেঁচিয়ে উঠলো রবিন। অসংখ্য তালি!
ডোরাকাটা ছাউনি! রিকি বললো।
ক্যানভাসের ছাউনি! মুসাও বুঝে ফেলেছে।
এবং তার মধ্যে আঁকাবাঁকা ডোরাও আছে, বললো কিশোর। আঁকা যখন বাঁকা, কিংবা বলা যায় ভুল দিকে আঁকা! চলো চলো, কুইক!
এক ছুটে ঘর থেকে বেরোলো ছেলেরা। চুপ করে ছিলো টেরিয়ার, কিন্তু সে-ও বেরোলো সঙ্গে। লনের ওপর দিয়ে দৌড় দিলো ওরা। ওদের পেছনে রয়েছেন কাউন্টেস।

ছাউনির নিচে এসে ওপরে তাকালো কিশোর। অন্যেরাও। নানারকম তালির মাঝে চারকোণা টুকরো ক্যানভাসের একটা তালি লাগানো রয়েছে ডোরাকাটা ক্যানভাসের ছাউনিটাতে। টুকরোটার ডোরাগুলো আঁকাবাঁকা, মূল ক্যানভাসের ডোরার সঙ্গে মিল নেই।
দৌড়ে গিয়ে গ্যারেজ থেকে একটা মই বের করে আনলো মুসা আর রিকি।
মই বেয়ে উঠে গেল মুসা। পকেট থেকে ছোট ছুরি বের করে টুকরোটার জোড়ার সেলাই কাটলো। খুলে এলো ওটা। হাতে নিয়ে কিশোরের দিকে ছুঁড়ে দিলো।
আনমনে টুকরোটাকে রোল পাকাতে পাকাতে ওপর দিকে তাকালো কিশোর। ওটা যেখানে ছিলো, সেখানে আরেক টুকরো ক্যানভাস। অথচ থাকার কথা মূল, ক্যানূভাসে ছিদ্র কিংবা ছেঁড়াটেড়া কোনো কিছু। ছাউনি নষ্ট হলেই শুধু তালি লাগানোর কথা। কিন্তু
দ্বিতীয় টুকরোটার চার কোনায় শুধু চারটে সেলাই। সাবধানে কেটে নামালো মুসা। মূল ছাউনি বেরিয়ে পড়লো, কিন্তু জায়গাটা অক্ষত। টুকরোটা হাতে নিয়ে। নেমে এলো সে।
চোখ ধাঁধিয়ে দিলো যেন উজ্জ্বল রঙ। ক্যানভাসের উল্টো পিঠে আঁকা রয়েছে অসামান্য একটা ছবি। বেগুনী পর্বত, নীল ঘোড়া, হলুদ পাম গাছ আর লাল মানুষ। ফ্রাঙ্কোই ফরচুনার্দের হারানো সেই মাস্টার পীস!
চলো, ঘরের ভেতরে নিয়ে চলো, বললো কিশোর।
কটেজে ঢুকে ছবিটা টেবিলে বিছানো হলো।
আলতো করে ছুঁয়ে দেখলেন কাউন্টেস, যেন ভয়, ঘষা লাগলে রঙ উঠে যাবে। বিড়বিড় করলেন। সাত রাজার ধন মিলবে এটা দিয়ে।...আমার বেচারা ভাইটা কি করে পেলো এই জিনিস?
ম্যাডাম..., বাধা পেয়ে থেমে গেল কিশোর।
প্রফেসর হোফার ঢুকলেন। পুলিশ আসছে। ইয়ান ফ্লেচার...আরি! কোথায় পেলে ওটা!
জানানো হলো প্রফেসরকে।
কাজই করেছে একটা, কিশোর, বললেন তিনি। কে ভেবেছিলো ক্যানভাসের তালির তলায় থাকবে ওরকম একটা জিনিস? চমৎকার জায়গায় লুকিয়েছে। ওয়াটারপ্রুফ, নিরাপদ, আর সব সময় ডেনবারের হাতের কাছেই ছিলো। যাক, পাওয়া গেছে ভালো। গুটিয়ে ফেলো। ওভাবে ভোলা রাখলে নষ্ট হয়ে যেতে পারে।
খুব সাবধানে ছবিটাকে রোল করলো রবিন আর মুসা। কিশোরের হাতে দিলো।
বিষণ্ন হয়ে আছে টেরিয়ার। তাকে কোনো কাজই করতে দেয়া হচ্ছে না। যেন একঘরে করে রাখা হয়েছে।

কাউন্টেস, হাসলেন প্রফেসর, আইনতঃ ছবিটার মালিক এখন আপনি। তবে, আগে জানতে হবে, চোরাই মাল কিনা ওটা। আপনার ভাই কোনোখান থেকে চুরি করে এনেছিলো কিনা।
চুরি? আমার ভাই চোর ছিলো!
না, বললো কিশোর। আমার মনে হয় না ওটা চোরাই। তবে…
দীর্ঘ ছায়া পড়লো ঘরের ভেতরে। দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে লোকটা, হাতে পিস্তল। হেসে বললো, তবে আমি এখন ওটা চুরি করবো। কিংবা বলতে পারো, ডাকাতি করবো।
ফ্রেড ব্রাউন। পিস্তলের কুৎসিত নলের মুখটা ছেলেদের দিকে ফেরানো।
তুমি যে এতোবড় শয়তান, জানতাম না। দাঁতে দাঁত চাপলেন কাউন্টেস। এসব করে পার পাবে না।
তা পাবো, হাসি মুছলো না ব্রাউনের মুখ থেকে। বাধা দেয়ার চেষ্টা করবেন না, ম্যাডাম। খুব খারাপ হবে। লোভাতুর চোখে কিশোরের হাতের দিকে তাকালো সে। অনেক ধন্যবাদ তোমাকে, কিশোর। অনেক চেষ্টা করেছি। ধাঁধার সমাধান আমি করতে পারিনি। তুমি… চুপ হয়ে গেল ব্রাউন। কান পাতলো। একদিকে।
সবাই শুনতে পেলো। পুলিশের সাইরেনের শব্দ।
পিস্তল নাচালো ব্রাউন। হাসি হাসি ভাবটা চলে গেছে চেহারা থেকে, সেই জায়গা দখল করেছে উদ্বেগ। দাও, জলদি দাও!
দ্বিধা করছে কিশোর।
দাও বলছি! চেঁচিয়ে উঠলো ব্রাউন।
দিয়ে দাও, কিশোর, প্রফেসর বললেন।
জলদি! গর্জে উঠলো ব্রাউন।
ঢোক গিললো কিশোর। বাড়িয়ে দিলো একটা ক্যানভাসের রোল। প্রায় ছো দিয়ে ওটা টেনে নিয়ে আরেকবার পিস্তল নাড়লো ব্রাউন। পিছাতে পিছাতে বেরিয়ে .. চলে গেল।
সবাই ছুটে গেল জানালার কাছে।
ওকে থামান! চেঁচিয়ে উঠলেন কাউন্টেস।
কে থামাতে যাবে পিস্তলধারী একটা ভয়ানক লোককে? সবাই দেখলো, লন পেরিয়ে ছুটে গিয়ে একটা ঝোপের আড়ালে হারিয়ে গেল ব্রাউন। খানিক পরেই দেখা গেল, হলুদ মার্সিডিজটা ছুটে যাচ্ছে ক্যানিয়নের মেইন রোড ধরে।
এগিয়ে আসছে পুলিশের সাইরেন।
পুলিশ ধরবে ব্যাটাকে, বললেন প্রফেসর।

না, মাথা নাড়লো কিশোর। নীল সেডান হলে আটকাতো। আপনি কি আর হলুদ মার্সিডিজের কথা বলেছেন?
কিশোরের অনুমানই ঠিক। পুলিশ এলো। মার্সিডিজটাকে আটকায়নি।

.

গাড়ি থেকে নামলো পুলিশেরা। গিয়ে চীফ ইয়ান ফ্লেচারকে কটেজে নিয়ে এলেন প্রফেসর। দ্রুত জানানো হলো তাঁকে ব্রাউন পালিয়েছে।
হলুদ মার্সিডিজটা দেখলাম তো! উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন চীফ। তাড়াতাড়ি রেডিওতে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলেন তার লোকদের। পালাতে পারবে না।
যেভাবেই হোক, ধরতেই হবে ওকে, চীফ, কাউন্টেস বললেন। ও একটা ক্রিমিনাল। আমার ছবি নিয়ে পালিয়েছে।
না, নিতে পারেনি, হেসে বললো কিশোর। চীফের দিকে তাকালো, আপনার সাইরেন শুনে এতো ঘাবড়ে গেল, খুলে দেখার কথা আর ভাবেনি। যা ধরিয়ে দিয়েছি, নিয়ে পালিয়েছে। আসল ছবি এই যে, বলতে বলতে ক্যানভাসের দ্বিতীয় রোলটা খুলে আবার টেবিলে বিছালো।
ভুরু কুঁচকে সেটার দিকে তাকিয়ে রইলো ফ্লেচার। সব কথা খুলে বলা হলো। তাঁকে।
এটাই সেই হারানো ফরচুনার্দ বললো কিশোর। ব্রাউন পালিয়েছে তালি মারার একটা টুকরো নিয়ে। অতি সাধারণ ক্যানভাস। হাহ্ হাহ্!
হাসতে শুরু করলো সবাই।
গোয়েন্দাপ্রধানের পিঠ চাপড়ে দিয়ে হেসে বললেন চীফ, ব্রাউন যদি জানতে কার পাল্লায় পড়েছে? হাহ হাহ! আমাদের কিশোর পাশা…
কিন্তু আরেকটা শয়তান যে ছাড়া রয়ে গেল, বলে উঠলেন প্রফেসর। জন ফেরেনটি।
আমার মনে হয় না, ফেরেনটি আর এখন কিছু করতে পারবে, তিন গোয়েন্দার দিকে চেয়ে হাসলেন কাউন্টেস। ওদের সমস্ত প্ল্যান ভণ্ডুল করে দিয়েছো তোমরা। তুখোড় ছেলে। ভাবছি, বড় রকমের কোনো পুরস্কার দেবো তোমাদের।
তার প্রশংসায় লজ্জা পেলো রবিন আর মুসা। কিন্তু কিশোর যেন খুশি হতে পারছে না। চিন্তিত ভঙ্গিতে তাকিয়ে রয়েছে ছবিটার দিকে। কে এ
চীফ, প্রফেসর বললেন। ছবিটার মালিক এখন কে হবে? কাউন্টেসেরই তো পাওয়া উচিত। ছবিটা তাঁর ভাইয়ের ছিলো। অবশ্য যদি ডেনবার কোনোখান থেকে চুরি করে না এনে থাকে…
না, আমার ভাই চুরি করেনি। খামখেয়ালী ছিলো বটে, কিন্তু চোর ছিলো না।

ঠিকই বলেছেন, কাউন্টেসের সুরে সুর মিলিয়ে কিশোর বললো, চোরাই মাল নয় এটা।
তাহলে আর কি? কোনো মিউজিয়ামকে দান করে দেবো ছবিটা। এরকম একটা জিনিস কোনো একজনের হতে পারে না, দুনিয়ার সব মানুষের সম্পত্তি।
আগে আমাদের তদন্ত শেষ করে নিই, চীফ বললেন। যদি দেখা যায় চোরাই নয়, তাহলে অবশ্যই আপনি পাবেন। আপনার জিনিস নিয়ে তখন আপনি যা খুশি করবেন। যে কোনো মিউজিয়াম পেলে লুফে নেবে…
আরি! হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন কাউন্টেস। গ্যারেজের পেছনে! জন ফেরেনটি!
চোখের পলকে জানালার দিকে ঘুরলো সবাই। গ্যারেজের পেছনে কাউকে দেখতে পেলো না।
আমি দেখেছি, জোর দিয়ে বললেন কাউন্টেস। হাতে পিস্তল নিয়ে দাঁড়িয়েছিলো। জন ফেরেনটি। বলতে বলতেই পালিয়েছে…
পালাবে কোথায়? বলেই রেডিও তুললেন চীফ, সঙ্গে আসা লোকদেরকে নির্দেশ দিলেন পুরো বাড়ি ঘিড়ে ফেলার জন্যে। রেডিও নামিয়ে বললেন, আমি যাচ্ছি।
ফ্লেচার বেরিয়ে যেতেই কিশোর চেঁচিয়ে উঠলো, কুইক! গ্যারেজের পেছনে। চলো…ডানে ঘুরে যাবে। দরজার দিকে দৌড় দিলো সে। পেছনে চললো মুসা, রবিন, আর রিকি। টেরিয়ারও ছুটলো।
জন ফেরেনটির ছায়াও দেখা গেল না। গ্যারেজের পেছনে চীফ আর দুজন পুলিশের সঙ্গে মিলিত হলো ছেলেরা।
গেল কই? এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন চীফ।
তাই তো! ছেলেদের পেছন থেকে বলে উঠলেন প্রফেসর। কোনো ঝোপঝাড়ে…
না না, লুকানো এতো সোজা নয়া মনে হয়…
চীফ! চেঁচিয়ে উঠলো আবার কিশোর, কুইক! কটেজে চলুন। জলদি!
কি হয়েছে? কেন?
জলদি করুন, স্যার, ছুটতে শুরু করলো কিশোর।
গ্যারেজের সামনে এলে প্রথমে রবিন দেখলো ওদেরকে। দুটো মূর্তি ছুটে যাচ্ছে। ড্রাইভওয়ের দিকে। আরি আরি, ওই তো! ফেরেনটি!
কাউন্টেসকে তাড়া করেছে! রিকি বললো।
কাউন্টেসের হাতে ছবিটা! বললো মুসা।
আমাদের ফাঁকি দিয়েছে ব্যাটা! বললেন প্রফেসর। আরে, আমার গাড়ির দিকে যাচ্ছে কেন কাউন্টেস?
কাউন্টেসকে তাড়া করেছে ফেরেনটি। ছবিটা মহিলার হাতে। ছুটে যাচ্ছে প্রফেসরের গাড়ির দিকে।

পিস্তল বের করে ফেলেছেন চীফ আর তাঁর দুই সহকারী। চেঁচিয়ে উঠলেন, এই থামো, নইলে গুলি করবো। বলেই ফাঁকা আওয়াজ করলেন।
গাড়ির কাছে পৌঁছে গিয়েছিলেন কাউন্টেস, থমকে দাঁড়ালেন। পেছনে ফেরেনটিও দাঁড়িয়ে গেল।
এগিয়ে গেল সবাই।
যাক, ফেরেনটি ব্যাটাও ধরা পড়লো, বললো রবিন।
হ্যাঁ, ফিরে চেয়ে বললেন কাউন্টেস। ঘরে ঢুকে ছবিটা নিয়ে যেতে চেয়েছিলো। তুলে নিয়েই দৌড় দিলাম। অ্যারেস্ট করুন, ওকে, চীফ।
হ্যাঁ, ফ্লেচার বললেন, তোমাকে অ্যারেস্ট করা হলো, ফেরেনটি। তুমি…
না, বাধা দিলো কিশোর। মিস্টার, ফেরেনটিকে নয়। কাউন্টেসকে অ্যারেস্ট করুন।
স্তব্ধ হয়ে গেল সবাই।
যাহ, ঠাট্টা করছো তুমি, কিশোর, তরল কণ্ঠে বললেন কাউন্টেস।
মাথা নাড়লো কিশোর। না, ঠাট্টা নয়, কাউন্টেস। ছবিটা নিয়ে পালাতে চেয়েছিলেন আপনি। জানেন, যদি তদন্ত হয়; মহাবিপদে পড়বেন। এমনকি জেলেও যেতে পারেন। ছবিটা তো পাবেনই না কোনোদিন। মিস্টার ফেরেনটি আসলে আপনাকে আটকাতে চেয়েছিলেন।
কি যা তা বলছো? রেগে গেলেন কাউন্টেস।
ঠিকই বলছি। রিগ ডেনবার আপনার ভাই ছিলো না। তার দুজন সহকারী ছিলো, পার্টনার, একজন ফ্রেড ব্রাউন, আরেকজন আপনি।
তুমি জানো? অবাক হলেন ফেরেনটি। আমিও ভুল করেছি। তোমাদেরকে সহকারী করে নিলে আরও সহজে কাজ সারতে পারতাম। আসলে তোমাদেরকে আণ্ডার এস্টিমেট করেছি আমি।
ফেরেনটি আসলে কে, কিশোর? জিজ্ঞেস করলেন চীফ।
মনে হয় ওলন্দাজ পুলিশের লোক। কাউন্টেস আর ব্রাউনের পিছু নিয়ে আমেরিকায় এসেছেন…ওঁকেই জিজ্ঞেস করুন না?
মাথা, ঝোঁকালেন ফেরেনটি। ছেলেটা ঠিকই বলছে, চীফ। আমি ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চের লোক। আমস্টারডাম থেকে ওদের পিছু নিয়েছি। কয়েক বছর ধরেই চেষ্টা করছি, কিন্তু আসলটাকে ধরতে পারছিলাম না। সব চেয়ে পিচ্ছিল ছিলো ডেনবারটা। কোনো প্রমাণ রাখতো না আর পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতো, আজ এখানে, কাল ওখানে। কিশোর, তুমিও বুঝতে পেরেছে, না?
হ্যাঁ, স্যার। ওরা এই বিপাকে পড়তো না। একজন আরেকজনকে ফাঁকি দিতে গিয়েই ধরাটা পড়েছে। ব্রাউন ফাঁকি দিতে চেয়েছিলো কাউন্টেসকে। আসল ছবি

ভেবেই এই কাণ্ড করেছে ব্রাউন আর কাউন্টেস্। ব্রাউন নিয়ে গেল সাধারণ ক্যানভাস। কাউন্টেস সেকথা যখন জানলো, আমাদের সবাইকে ফাঁকি দিয়ে ছবি নিয়ে পালাতে চেয়েছিলো। আপনি চোখ না রাখলে…
হয়তো পালাতো। এখন যাবে জেলে।
আসল ছবির কথা কি যেন বললে? প্রশ্ন করলেন চীফ। এই ছবিটা কি আসল ফরচুনার্দ নয়?
না। ওটা সত্যিই ধ্বংস করে দিয়েছে নাৎসীরা। রিকির দিকে ফিরলো কিশোর। তোমার নিশ্চয় মনে আছে, ডেনবার বলেছিলোঃ দুনিয়ার সব চেয়ে দামী আর্টিস্ট সে। কিন্তু কেউ সেটা জানলো না। এক অর্থে ঠিকই বলেছে।
সত্যি, তোমার বুদ্ধি আছে, কিশোর পাশা! উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন ফেরেনটি। তুমি একেবারে জাত-গোয়েন্দা!
খুলে বলো তো, কিশোর, অধৈর্য হয়ে হাত নাড়লো মুসা।
রিগ ডেনবার খুব বড় আর্টিস্ট ছিলো। তবে আসল কাজে না গিয়ে গিয়েছিলো নকল কাজে; জালিয়াতি। টাকা রোজগারের ধান্দায়। বড় বড় আর্টিস্টের ছবি এমনভাবে নকল করতো, ধরার সাধ্য ছিলো না। তার দুই সহকারী, ব্রাউন আর কাউন্টেস সেই ছবি আসল বলে বিক্রি করতো লোকের কাছে। অনেক লোককে ঠকিয়েছে।
তাহলে কি…! অবাক হয়ে কাউন্টেসের হাতের ছবিটার দিকে তাকালেন। ফ্লেচার।
হ্যাঁ, এটাও, বললো কিশোর। রিগ ডেনবারের শেষ মাস্টার পীস। ফরচুনার্দ বলে সহজেই চালিয়ে দেয়া যাবে। অভিজ্ঞ আর্টিস্টদেরও বুঝতে কষ্ট হবে।
.
মানে! রবিনকে অবাক করে দিয়ে রেগে গেলেন মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফার। কি ভেবেছো নিজেদেরকে? তোমাদের সব কেসের কাহিনী নিয়েই কি ছবি বানাতে হবে নাকি আমাকে?
প্লীজ, স্যার, অনুনয় করলো রবিন। রিপোর্টটা পড়ে দেখুন। নিশ্চয় স্বীকার করবেন, অতি চমৎকার একটা কেস। যা দেখিয়েছে না কিশোর! অনেক কিছু জানতে পারবেন।
কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে নীরব হয়ে গেলেন বিখ্যাত চিত্রপরিচালক। তারপর বললেন, তারমানে কি তুমি বলতে চাইছে, রবিন মিলফোর্ড, যে তোমাদের কিশোর পাশা আমার চেয়ে বুদ্ধিমান?
না না, স্যার, তাড়াতাড়ি বললো রবিন। চেষ্টা করলে আপনি খুব বড় গোয়েন্দা হতে পারতেন…মানে, পারবেন…

বলছো?? আবার কিছুক্ষণ বরফ-শীতল নীরবতা। বেশ, কাল তোমাদের রিপোর্ট নিয়ে এসো আমার অফিসে। পড়ে দেখবো। আর, এক শর্তে এই কাহিনী নিয়ে ছবি করতে পারি।
বলুন, স্যার? অস্বস্তি বোধ করছে রবিন।
আমি বলে যাবো, কিভাবে কি হয়েছে। কোনো একটা পয়েন্ট যদি ভুল করি–যেটা কিশোর করেনি–শুধুমাত্র তাহলেই এই কাহিনী নিয়ে আমি ছবি বানাবো। তা নাহলে আর কোনোদিনই তোমাদের কোনো কাহিনী নিয়ে ছবি বানাবো না।
ঢোক গিললো রবিন। পরিচালকের ব্যবহারে ভীষণ অবাক হয়েছে। সাহস করে বলেই ফেললো, ঠিক আছে, স্যার। তাই হবে।
বেশ। কাল সকালে এসো আমার অফিসে, লাইন কেটে দিলেন পরিচালক।
পরদিন সময়মতো মিস্টার ক্রিস্টোফারের অফিসে গেল তিন গোয়েন্দা।
রবিনের দেয়া ফাইলটা টেনে নিলেন পরিচালক। শুরুতে কয়েক পাতা পড়লেন। তারপর ফাইল বন্ধ করে বললেন, তাহলে জন ফেরেনটি গোয়েন্দা, যাকে তোমরা ক্রিমিন্যাল ভেবেছিলে প্রথমে। আর ব্রাউন এবং কাউন্টেসই আসল। ক্রিমিন্যাল। কাউন্টেসও কাউন্টেস নয়, মিছে কথা বলেছে তোমাদের কাছে…
ওর আসল নাম মেরি গিলবার্ড… বললো মুসা।
হ্যাঁ, ফাইলে লিখেছে রবিন। মানুষ চেনা বড় কঠিন। মুখ দেখেই যদি সব মানুষকে চিনে ফেলা যেতো, কি ভালোই না হতো তাহলে! তো, ব্রাউন আর মেরি কি মুখ খুলেছে?
খুলেছে, স্যার, মুসা বললো। পুলিশের কাছে স্বীকার করেছে, অনেক বছর ধরে করছে এই জালিয়াতি ব্যবসা। অনেক টাকা কামিয়েছে। ইউরোপের বড়লোকদের কাছে বিক্রি করেছে ওসব নকল ছবি। কয়েক মাস আগে ধরা পড়ে জেল হয় দুজনের। ডেনবার পালিয়ে চলে এসেছিলো, আমেরিকায়, তার শেষ মাস্টার পীসটা নিয়ে…
থামো, হাত তুললেন পরিচালক। এবার আমি বলি। বাড়ি ভাড়া বাকি রেখে মারা গেল ডেনবার। ইউরোপে চিঠি লিখলেন প্রফেসর হোফার। ব্রাউন আর মেরি, দুজনেই তখন জেলে। প্রফেসরকে ব্রাউনের বাড়ির ঠিকানা দিয়েছিলো ডেনবার। কাজেই তাঁর চিঠি জেলখানায় পৌঁছলো না, পড়ে রইলো ব্রাউনের বাড়ির চিঠির বাক্সে। মেরির কয়েক দিন আগে–এই ধরো হপ্তাখানেক বা আরও কিছু বেশি জেল থেকে ছাড়া পেলো ব্রাউন। বাড়ি এসে প্রফেসরের চিঠি পেলো। জানলো, ডেনবার মারা গেছে। বুঝলো, ছবি জালিয়াতির ব্যবসা শেষ। আঁকবে কে? নকল। ফরচুনার্দের কথা জানা আছে ব্রাউনের। ঠিক করলো, ছবিটা বিক্রি করে একাই মেরে দেবে টাকাটা, মেরিকে ভাগ দেবে না। তাড়াতাড়ি ছুটে এলো আমেরিকায়।

ছবিটা যেদিন প্রফেসরের বাড়িতে খুঁজতে এলো, সেদিনই তোমরা গেলে পুরানো। মাল কিনতে। ভালোমতো খোঁজার সুযোগই পেলো না ব্রাউন। বরং পালাতে গিয়ে না দেখে নালায় পড়ে পায়ে ভীষণ ব্যথা পেলো। ওই অবস্থায় ছবি খুঁজে বের করতে পারবে না বুঝে আবার বাড়ি ফিরে গেল। গিয়ে দেখলো, মেরিও ছাড়া। পেয়ে গেছে। তাকে ফাঁকি দিতে পারলো না ব্রাউন। পা কিভাবে মচকেছে, বলতেই হলো। তারপর, পা ভালো হলে, দুজনে একসঙ্গে আবার এলো আমেরিকায়। কি, ঠিক বলছি তো?

ঠিকই বলছেন, স্যার, মাথা ঝোঁকালো কিশোর।

বেশ। নাটের গুরু ডেনবার ধরা পড়েনি। কাজেই জন ফেরেনটিও সন্তুষ্ট হতে পারেনি! জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পরই আবার চোখ রাখতে লাগলো মেরি আর ব্রাউনের ওপর। ওদের পিছু নিয়ে সে-ও এলো আমেরিকায়। জানলো, ডেনবার মারা গেছে। ব্রাউনের পিছু নিয়ে ডয়েলদের বাড়ি গেল। ওদের টেলিফোন লাইন। ট্যাপ করে জানলো, মিস্টার ডয়েলের কাছে ডেনবারের শেষ ছবিটা বিক্রি করতে চাইছে ব্রাউন ঠিক?

আবার মাথা ঝোঁকালো কিশোর।

আত্মবিশ্বাস বাড়লো পরিচালকের। হাসলেন। রিকি দেখে ফেলেছে। জানাজানি হয়ে যাওয়ার ভয়ে ছবিটা লুকিয়ে ফেলতে বাধ্য হয়েছিলো ডেনবার।

তারপর পড়লো অসুখে। বুঝতে পারলো আর বেশি দিন বাঁচবে না। ততোদিনে যদি জেল থেকে ছাড়া না পায় সহকারীরা? তাই তাদের জন্যে মেসেজ তৈরি করলো, কুড়িটা ছবি এঁকে। জেলে চিঠি লিখে খোলাখুলি জানানো সম্ভব ছিলো না, কারণ কর্তৃপক্ষের হাত হয়ে যায় চিঠি। তবে ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছিলো দুজনকে, চিঠিতে, যে ছবিটা লুকিয়ে রেখেছে। অসুখ বাড়লো তার। শেষ মুহূর্তে জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকার ভান করে আরও কিছু মেসেজ রেখে গেল সে।

ব্রাউন আর মেরি এসে দেখলো, ডেনবারের সমস্ত জিনিসপত্র বিক্রি করে দিয়েছে প্রফেসর হোফার। ছুটে গেল ওরা স্যালভিজ ইয়ার্ডে। ওখানে গিয়ে দেখলো, জিনিসগুলো আবার বিক্রি হয়ে গেছে। ওগুলো বের করে দেয়ার জন্যে ধরলো তোমাদেরকে। আর তোমাদের মাধ্যমেই জানলো, একটা ছবি পেয়েছে। টেরিয়ার। তার সঙ্গে যোগাযোগ করলো ব্রাউন। জানতে পারলো কোথায় আছে ছবিগুলো। চুরি করে মিস্টার গালিভারের স্টুডিওতে ঢুকতে রাজি করিয়ে ফেললো টেরিয়ারকে। সহজেই রাজি হলো ছেলেটা, কারণ, তার তখন গালিভারের ওপর জেদ, তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করেছে সেই জন্যে।

একজস্ট ফ্যানের ফোকর দিয়ে ভেতরে ঢুকতো টেরিয়ার। এক এক করে ছবি বের করে দিতে ব্রাউনকে। ব্রাউন পরীক্ষা করে দেখে আবার ফিরিয়ে দিতো,

থামলেন পরিচালক।

হ্যাঁ, বললো, কিশোর। প্রথমে আমার মতোই ব্রাউনও ভেবেছিলো ওই ছবিগুলোরই কোনোটার নিচে আঁকা আছে আসল ছবিটা!

ফলে ব্যর্থ হলো, আবার বলে চললেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। কিন্তু থামলো না ব্রাউন। খোঁজ চালিয়েই গেল। তোমাদেরকে অ্যাডোবে আটকেছিলো সে-ই। তারপর স্টুডিওতে টেরিয়ারকে তোমরা ধরে ফেললে। নিজেকে বাঁচানোর জন্যে তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে বন্দি করলো ব্রাউন। টেরিয়ারকে খুঁজতে গিয়ে তোমরাও বন্দি হলে আরেকবার, গ্যারেজে। এবার বন্দি করলো জন ফেরেনটি, তোমাদের ভালোর জন্যেই। আচ্ছা, ভালো কথা, ওর একটা পা খোঁড়া। নিশ্চয় ভেঙেছিলো?

হ্যাঁ, স্যার, বললো রবিন। অনেক বছর আগে।

মাথা ঝাঁকালেন পরিচালক। ছবিটা খুঁজে বের করে তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছো তুমি, কিশোর। কিভাবে করেছে, রিপোর্টে পড়ে ফেলেছি, কাজেই সেকথায় আর যাচ্ছি না। আসা যাক জালিয়াতির কথায়। তুমি সন্দেহ করেছে, ডেনবার আর ব্রাউন জালিয়াত। কাউন্টেসের রোলটা তখনও বুঝতে পারোনি। তবে তাকেও সন্দেহ করেছে। সেটা বোঝার জন্যেই কটেজে টেবিলের ওপর ছবি রেখে ইচ্ছে করেই বেরিয়ে গিয়েছিলে ফেরেনটিকে ধরার ছুতোয়। নইলে তোমাদের যাওয়ার তো কোনো প্রয়োজনই ছিলো না, যেখানে পুলিশ ফোর্স রয়েছে। তোমার পাতা ফাঁদে পা দিলো কাউন্টেস। ঠিক তো?

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেললো কিশোর। ঠিক।

কিন্তু, স্যার, মুসা বললো। বুড়ো ডেনবার যে জালিয়াত, কিশোর সেটা কি করে বুঝতে পারলো?

সেটা তো সহজ, মুসা আমান। ডেনবার রিকিকে বলেছে না যে সে দুনিয়ার সব চেয়ে দামী আর্টিস্ট? তাছাড়া মিস্টার গালিভারও স্বীকার করেছেন সেকথা। খুব পাকা হাত ছিলো ডেনবারের। একই দৃশ্য কুড়িবার কুড়িরকম করে আঁকা যা তা কথা নয়। এতোবড় একজন শিল্পী লোকের চোখে না পড়েই পারে না। কেন। পড়লো না তাহলে? একটাই জবাব, জালিয়াত বলে। শুধু অন্যের জিনিসই চুরি করতো, নিজের আইডিয়া থেকে আঁকা কোনো ছবিই ছিলো না তার, ওই কুড়িটা। বাদে। লোকের চোখে পড়বে কিভাবে? কি কিশোর, এভাবেই তো বুঝেছো?

হ্যাঁ, স্যার।

আর কি বাকি রইলো? রবিনের দিকে চেয়ে ভুরু নাচালেন পরিচালক। সবই বুঝতে পেরেছি, তাই না?

মুখ কালো করে ফেলেছে রবিন। তাই তো মনে হচ্ছে, স্যার।

বেশ। তো এখন জানতে পারি কি, কার কি সাজা হয়েছে?

চিত্রপরিচালকের ব্যবহার আর কথার ধরনে দুই সহকারী অবাক হলেও কিশোর হলো না। শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলো, ব্রাউনের বিরুদ্ধে দুটো কেস। আরেকবার নকল ছবি বিক্রির চেষ্টা, আর শুঁটকি টেরিকে কিডন্যাপ। কিডন্যাপিঙের জন্যে। এখানেই জেলে ভরে দিয়েছে তাকে পুলিশ। এখানকার সাজা শেষ হলে পাঠিয়ে দেবে ইউরোপে, ছবি জালিয়াতির জন্যে ওখানে আরেকবার সাজা খাটতে হবে। তাকে। মেরিকে চালান করে দেয়া হয়েছে ইউরোপে, সঙ্গে গেছেন জন ফেরেনটি। এতোদিনে সন্তুষ্ট হয়েছেন।

ছবিগুলো কি করেছে?

ডেনবারের শেষ মাস্টার পীসটা পেয়েছেন প্রফেসর হোফার। ডেনবারের কাছে টাকা পেতেন তিনি, তাই আদালত এই রায় দিয়েছে। আদালতের রায় বেরোনোর। পর তাঁর কপাল খুলে দিয়েছে পত্রিকাওয়ালারা। এতো বেশি করে লিখেছে, ছবিটা কেনার জন্যে পাগল হয়ে গেছে লোকে। অনেক দামে কিনে নিয়ে গেছে একজনে। টাকা যা পেয়েছেন, বাড়িঘর সব মেরামতের পরও বেশ কিছু রয়ে গেছে প্রফেসরের হাতে।

আর ওই কুড়িটা ছবি?

মিস্টার গালিভারকে ফেরত দেয়া হয়েছে। আইনতঃ ওগুলোর মালিক তিনিই। কারণ, তখন ন্যায্য দাম দিয়েই কিনেছিলেন। এখন অবশ্য লোকে অনেক বেশি দিতে চাইছে, কিন্তু তিনি আর বিক্রি করবেন না। ওগুলোর ওপর আর ছবিও আঁকবেন না। সাজিয়ে রেখেছেন তাঁর স্টুডিওতে।

টেরিয়ার ডয়েলের কি হয়েছে?

মিস্টার গালিভার তার বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অভিযোগ করেননি। কিন্তু শুঁটকির বাবা ভীষণ রেগেছেন। ছেলেকে পাঠিয়ে দিয়েছেন হোস্টেলে। এই ছুটির মধ্যে একা একা কাটাতে হবে বেচারাকে।

উপযুক্ত শাস্তি হয়েছে। হাত নাড়লেন তিনি, যাও, এবার ওঠো। আর কোনদিন কাহিনী আনবে না আমার কাছে, ছবি করার জন্যে...আমি খুব ব্যস্ত।

এক মিনিট, স্যার, হাত তুললো মুসা। একটা প্রশ্নের জবাব বাকি রয়ে গেছে। আমরা যখন গ্যারেজে বন্দি হলাম, কিশোর কি করে জানলো যে ফেরেনটি নয়, ব্রাউনই আসল শয়তান?

কী? মানে..., ফাইলের প্রথম দিকের কয়েকটা পাতা দ্রুত পড়ে নিলেন। আবার পরিচালক। বুঝেছি। ওই যে ডেনবার বলেছে, বি-ব্বলো, মানে, ব্রাউনকে বলো...

হয়নি স্যার, এতোক্ষণে হাসলো কিশোর। গ্যারেজে আটকা পড়ার পর। শুঁটকির একটা কথা স্ট্রাইক করেছিলো আমার মনে। তখনই বুঝেছি। শুঁটকি বলেছে,

তাকে যে বন্দি করেছে সে নাকি বলেছেঃ ওই নালায় সবাই পড়েছে একবার করে। না জেনে।
তাতে কি? ভরু কোচকালেন পরিচালক।
সেরাতে জন ফেরেনটিও পড়েছিলো নালায়, বললো কিশোর। ওই যেদিন। অ্যাডোবে আমরা…
গুঙিয়ে উঠলেন পরিচালক, হায়, হায়, ঠিকই তো! নালাটা রয়েছে ওখানে, জানলে তো আর পড়তো না ফেরেনটি। তারমানে প্রথম যেদিন গেলে হোফারের বাড়িতে, নালায় পড়েছিলো যে লোকটা সে ফেরেনটি নয়! একটাই থাকলো। জবাবঃ ফ্রেড ব্রাউন!
তাহলে হার স্বীকার করে নিচ্ছেন আপনি? হাসিতে উজ্জ্বল এখন রবিনের মুখ।
না নিয়ে আর উপায় কি? মুচকি হাসলেন পরিচালক। তবে, দুঃখ পাচ্ছি না?
কেন, কেন?
কারণ, আমি আগেই জানি সব প্রশ্নের জবাব দিতে পারবো না। শার্লক হোমস, এরকুল পোয়ারো, কিংবা কিশোর পাশারা ঝাঁকে ঝাঁকে জন্মায় না। তবু একবার চেষ্টা করে দেখলাম পারি কিনা?
এবার কিন্তু সত্যি লজ্জা দিচ্ছেন, স্যার, লাল হয়ে উঠেছে কিশোরের গাল।
খোঁচা মারতে ছাড়লো না মুসা, তাহলে, স্যার, এবার আমরা উঠি। আপনি ব্যস্ত মানুষ…
হো হো করে হেসে উঠলেন পরিচালক। নাহ, তোমরা আমার স্বভাবটাই পাল্টে দিচ্ছো, হাসতে হাসতে বললেন তিনি। কখনও হাসি না বলে যে একটা দুর্নাম ছিলো আমার, সেটা ঘুচিয়ে দিচ্ছো। কথায় বলে না, সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস…! হঠাৎ কালো হয়ে গেল তার মুখ। চোখের পলকে হাসি মুছে গেছে। দরজার দিকে তাকিয়ে আছেন কড়া চোখে।
অবাক হয়ে ফিরে তাকালো তিন গোয়েন্দা। হাতে কয়েকটা বাক্স নিয়ে ঢুকেছে খানসামা। আইসক্রীম! আগেই অর্ডার দিয়ে রেখেছেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। কতোক্ষণ পর ঢুকতে হবে, নিশ্চয় তা-ও বলে রেখেছেন।
এই প্রথম জানলো তিন গোয়েন্দাঃ শুধু বড় পরিচালকই নন মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফার, অনেক বড় অভিনেতাও, যদিও কখনও ছবিতে অভিনয় করেননি তিনি।

ভলিউম ৭ – বোম্বেটে – তিন গোয়েন্দা – রকিব হাসান – সেবা প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ১৯৮৯

ক্যারোলিন! চিৎকার করতে করতে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলেন জিনার বাবা মিস্টার পারকার। এই, ক্যারোলিন, কোথায় তুমি?

এই যে, এখানে, বেডরুম থেকে বেরিয়ে এলেন জিনার মা। ঘর সাফ করছি। … কি হলো, এতো চেঁচাচ্ছো কেন?

এই দেখো না, টেলিগ্রাম, বললেন মিস্টার পারকার। প্রফেসর কারসওয়েল। চিনেছো?

কয়েক বছর আগে যে এসেছিলো? খালি খাওয়ার কথা ভুলে যেতো, সেই লোকটা তো? স্বামীর কোটের হাতায় লেগে থাকা ময়লা ঝেড়ে দিলেন মিসেস পারকার।

ওভাবে ঝাড়ছো কেন? ভুরু কোঁচকালেন মিস্টার পারকার। আমি কি ময়লার ডিপো নাকি?…শোনো, আজ আসছে। এক হপ্তা থাকবে।

চমকে উঠলেন মিসেস পারকার। কিন্তু জিনারাও তো আসছে আজ! তুমি জানো।

অ্যাঁ, তাই তো…ভুলে গিয়েছিলাম। থাক, জিনাকে ফোন করে দাও, আগামী হপ্তায় আসতে বলো। জিনার সঙ্গে আবার কিশোর, মুসা আর রবিনও তো আসবে। না, এ-হপ্তায় ওদের আসা চলবে না। প্রফেসরের সঙ্গে আমি শান্তিতে কাজ করতে চাই। নতুন একটা আবিষ্কারের ব্যাপারে..আরে, ওভাবে তাকিয়ে আছো কেন?

তোমাদের পাগলামির জন্যে ছেলেমেয়েদের আনন্দ আমি নষ্ট করতে পারবো। ওরা আজই আসবে। হয়তো এতোক্ষণে রওনা হয়ে গেছে…এক কাজ করো। তোমার বন্ধুকেই মানা করে দাও, যেন পরে আসে।

বেশ, অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজি হলেন মিস্টার পারকার। গৃহিণীকে চটিয়ে দিয়ে পারিবারিক অশান্তি আর অসুবিধে সৃষ্টি করতে চান না। তবে, প্রফেসর খুব মাইণ্ড করবে। বন্ধুকে ফোন করার জন্যে চলে গেলেন তিনি।

বেডরুমে আবার ফিরে এলেন মিসেস পারকার। তাঁকে সাহায্য করার জন্যে একজন কাজের লোক রেখেছেন, তাঁরই বয়েসী এক মহিলা, নাম আইলিন।

সব চেয়ে বেশি অসুবিধে হবে থাকার, বললেন মিসেস পারকার।

ঘর থেকে সবই শুনেছে আইলিন। ঝুল পরিষ্কার করতে করতে মাথা নাড়লো।

ওই যে, আবার ডাকছে। তুমি কাজ করো, আমি শুনে আসি, আবার ঘর থেকে বেরোলেন জিনার মা।

স্টাডি থেকে ডাকছেন মিস্টার পারকার। সে-ঘরে ঢুকলেন জিনার মা। আবার কি হয়েছে?

এই দেখো না, কি কাণ্ড, রিসিভারটা ধরে রেখেছেন মিস্টার পারকার। প্রফেসর নাকি অনেক আগেই রওনা হয়ে গেছে। প্লেনে করে। ইংল্যাণ্ড থেকে আসতে আর কতো সময় লাগবে? আজই পৌঁছে যাবে..আর হ্যাঁ, সঙ্গে তার ছেলেকে নিয়ে আসছে!
তার ছেলে! সত্যি! আমি ওদের জায়গা দেবো কোথায়?
আর তো কোনো উপায় নেই। জিনাকেই ফোন করো। বুঝিয়ে বলো, আগামী হপ্তায় যেন আসে। নাও, ধরো, রিসিভার বাড়িয়ে দিলেন মিস্টার পারকার।
ডায়াল করলেন মিসেস পারকার। হ্যাল্লো। কে?..মিসেস পাশা?... কিশোর কোথায়?.রওনা হয়ে গেছে? কখন?..না না, এমনি। ওরা আসছে কিনা জানার জন্যে. হ্যাঁ। রাখি। গুড বাই। রিসিভার নামিয়ে রাখলেন জিনার মা। জোরে নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, রওনা হয়ে গেছে, সকালে। যে কোনো সময় এসে পড়বে। আমি এখন কি যে করি!...তোমাকে নিয়ে আর পারি না। খালি কথা ভল যাও। আর তোমার প্রফেসর বন্ধুও...
আমি কি করবো? রেগে গেলেন বদমেজাজী বিজ্ঞানী। আমি চিঠি দিয়েছি আসার জন্যে, আসছে। টেলিগ্রাম পেলাম আজ...
সেজন্যেই তো বলছি, খালি ভুলে যাও। তুমি তো জানো, ছেলেমেয়েগুলো আজ আসবে, তারপরেও চিঠি লিখতে গেলে কেন? আর লিখলেই যখনু, আগামী হপ্তায় আসতে বললে কি হতো? আসুক, আমি কিছু জানি না। থাকার ব্যবস্থা ভুমি। করবে। আর না পারলে নিজে গিয়ে শুয়ো কয়লা রাখার ঘরে...
ওসব আমি জানি না, কড়া গলায় বললেন মিস্টার পারকার। আইলিন আছে। দুজনে মিলে একটা কিছু ব্যবস্থা করো গিয়ে। আমার অনেক কাজ। এই কাজগুলো, টেবিলে রাখা কাগজের উঁচু একটা স্তূপ দেখালেন তিনি। সব পড়ে শেষ করতে হবে...যাও এখন। আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে...
তোমার যাচ্ছে! আর আমার হয়ে গেছে। আমি বলে দিচ্ছি...জানালার দিকে চোখ পড়তে হঠাৎ থেমে গেলেন মিসেস পারকার। আরি, দেখো দেখো!
দেখে মিস্টার পারকারও অবাক হলেন। বানর! ওটা এলো কোত্থেকে?
নিচতলা থেকে আইলিনের ডাক শোনা গেল। ম্যাডাম, দেখে যান...বোধহয় আপনাদের মেহমান... বানরটার দিকে হাঁ করে চেয়ে আছেন মিসেস পারকার। জানালার কাছে নাক ঘষছে ছোট্ট জীবটা, হাস্যকর শিশুসুলভ ভাবভঙ্গি। নিশ্চয়। তোমার বন্ধু! গুঙিয়ে উঠলেন তিনি। বানরটাও কি ওদের নাকি? দুম দুম করে কিল পড়লো সদর দরজায়, সারা বাড়ি কেঁপে উঠলো।
তাড়াতাড়ি নিচের তলায় ছুটে এলেন দুজনে।

হ্যাঁ, প্রফেসর কারসওয়েলই এসেছেন। সঙ্গে তাঁর ছেলে। বয়েস নয়-দশের বেশি না। বানরটা এখন বসে রয়েছে ছেলেটার কাঁধে, কখন কিভাবে নেমে এসেছে কে জানে। বানর আর তার মনিবের চেহারায় খুব একটা অমিল নেই।

এয়ারপোর্ট থেকে ট্যাক্সি নিয়ে এসেছেন প্রফেসর। ড্রাইভারের দিকে চেয়ে। বাজখাই গলায় হাঁকলেন, এই, বসে আছো কেন? ব্যাগট্যাগগুলো নামাও। হাঁ। করে কি দেখছো? মিসেস পারকারের দিকে ফিরলেন। এই যে, ম্যাডাম, ভালো। আছেন? আবার এলাম আপনাকে জ্বালাতে।...তা আপনার স্বামী কোথায়? বলতে বলতে ভেতরে ঢুকলেন তিনি। এই যে, হ্যারি। অনেক ইন্টারেস্টিং নিউজ আছে।

এগিয়ে এসে হাত মেলালেন মিস্টার পারকার। আমার কাছেও আছে। চিঠি। পেয়েই চলে এসেছো, খুব খুশি হয়েছি।

এই যে আমার ছেলে... এতো জোরে ছেলের পিঠে থাবা মারলেন প্রফেসর, আরেকটু হলেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলো ছেলেটা। নামটা যেন কি? খালি ভুলে যাই। থাক, বিরক্ত হয়ে হাত নাড়লেন কারসওয়েল। ডাক নামটাই বলি। টকার। মোটরকারের মা আর ট-এর পরে র-টা বাদ দিয়ে দিয়েছি। নিজেকে সারাক্ষণ মোটর গাড়ি ভাবে সে, আর বেশি কথা বলে, সে-জন্যেই এই নাম রেখেছি। হাহ হাহ হা!...আরে, নটি গেল কোথায়? দুষ্ট, দুষ্ট, ভীষণ দুষ্ট, তাই। টকারই ওর নাম রেখেছে টি। আরে গেল কোথায় বানরটা?

বোবা হয়ে গেছেন যেন মিসেস পারকার। একনাগাড়ে কথা বলে চলেছেন। প্রফেসর কারসওয়েল। কাউকে কিছু বলার সুযোগ দিচ্ছেন না। বানরটাকে দেখা গেল একটা স্ট্যাণ্ডের উপর হ্যাট রাখার স্ট্যাণ্ড–আগায় চড়ে বসে প্রাণপণে দোলাচ্ছে; যেন প্রতিজ্ঞা করেছে সবগুলো হ্যাট মাটিতে না ফেলে ছাড়বে না।

এ-তো সার্কাস বানিয়ে ফেলবে!..হতাশ হয়ে ভাবলেন মিসেস পারকার– আমি এখন কি যে করি! ঘরগুলোও পরিষ্কার হয়নি ঠিকমতো। দুপুরের খাবারেরই বা কি হবে? ইতিমধ্যে ছেলেমেয়েগুলোও যদি এসে যায়...আর বানরটা যা শুরু করেছে! হ্যাটগুলো ফেলে এখন গিয়ে বসেছে হলের বড় আয়নাটার সামনে। নিজেকেই মুখ ভেঙচাচ্ছে।

সবার সঙ্গে কিভাবে যে লিভিংরুমে ঢুকলেন মিসেস পারকার, বলতে পারবেন, না মিস্টার পারকার ছুটে গিয়ে স্টাডি থেকে একগাদা কাগজ এনে টেবিলে বিছিয়ে বসে পড়লেন ওখানেই। আলোচনার জন্যে। এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করতে চান না।

এখানে নয়! এতোক্ষণে মুখ খুললেন মিসেস পারকার, কঠিন কণ্ঠে বললেন, তোমার স্টাডিতে যাও।...আইলিন, প্রফেসর সাহেবের মালপত্রগুলো গেস্টরুমে।

দিয়ে এসো। ছেলেটা এঘরেই থাকবে, সোফায় শোয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। যাও, জলদি রেখে এসো।
বানরটার কি হবে? আড়চোখে ওটার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলো আইলিন। ওটারও কি বিছানা…
ও আমার সঙ্গেই থাকবে, বয়েস আর শরীরের তুলনায় অস্বাভাবিক জোরালো কণ্ঠ ছেলেটার। হঠাৎ লাফিয়ে উঠে সিঁড়ির দিকে দিলো দৌড়। বিচিত্র শব্দ করছে।
অবাক হয়ে বললেন মিসেস পারকার, কি হলো? পেট ব্যথা?
না না, বললেন তার বাবা। ওসব কিছু না। বললাম না, মোটরগাড়ির পাগল। নিজেকে মোটরগাড়ি ভাবে। দৌড়ায় আর এঞ্জিনের শব্দ করে।
আমি একটা গাড়ি, জাগুয়ার কার। সিঁড়ির মাথা থেকে চেঁচিয়ে জবাব দিলো। টকার। এঞ্জিনের শব্দ শুনছেন না? হি-র-র-র-র-র!…এই নটি, জলদি আয়। গাড়িতে চড়বি না?
প্রায় চোখের পলকে সিঁড়ি পেরিয়ে লাফ দিয়ে গিয়ে মনিবের কাঁধে চড়ে চুল খামচে ধরলো নটি। তীক্ষ্ণ কিচমিচ করে উঠলো। ছুটলো জাগুয়ার। প্রচণ্ড গতিতে বেডরুমের ভেতর থেকে ঘুরে এলো একবার, মাঝে মাঝে বিকট শব্দে হর্ন দিচ্ছে।
সব সময় ওরকম করে? প্রফেসরের দিকে চেয়ে বললেন মিসেস পারকার। কাজ করেন কিভাবে?
না, অসুবিধে হয় না, জানালেন প্রফেসর। বাগানে একটা সাউণ্ডপ্রফ ঘর বানিয়ে নিয়েছি। হ্যারি, তোমার স্টাডিও সাউণ্ড প্রুফ, না?
না, ভাই, জাগুয়ারের শব্দ সইতে না পেরে কানে আঙুল দিলেন মিস্টার পারকার। ছেলে একখান কারসওয়েলের! দুই মিনিটে পাগল করে দেবে সুস্থ মানুষকে! এক হপ্তা কাটবে কি করে? তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, চলো, স্টাডিতে চলো।
স্টাডিতে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন দুই বিজ্ঞানী। কিন্তু বৃথা। এ-বাড়ির এমন কোনো দরজা নেই, যা ওই হর্নের শব্দ ঠেকাতে পারে।
ব্যাগ-সুটকেস নিয়ে কুলাতে পারছে না আইলিন। সারা বছরের জন্যে যেন চলে এসেছেন প্রফেসর, এতো মালপত্র এনেছেন। কোনো হোটেলে গিয়ে উঠলো না কেন?–সেগুলোর দিকে চেয়ে থেকে ভাবছেন মিসেস পারকার। জিনারাও এলো বলে। আর সঙ্গে রাফিয়ানকে না নিয়ে আসবে না জিনা। এতগুলো প্রাণী থাকার জায়গা কোথায় করবেন তিনি?
.

বাস থেকে নেমেই চারটে সাইকেল ভাড়া করলো জিনা। এক হপ্তা থাকবে। বাড়িতে। ততোদিন ঘোরাঘুরির জন্যে সাইকেল দরকার। ক্যারিয়ারে মালপত্র তুলে নিয়ে সাইকেলে চেপে গোবেল ভিলার উদ্দেশে চললো চারজনে। পাশে পাশে। দৌড়ে চললো রাফিয়ান।

দারুণ হবে, না! প্যাড়াল ঘোরাতে ঘোরাতে বললো মুসা। দোতলার জানালা দিয়ে সাগরের দিকে চেয়ে থাকা, খোলা সাগর, খোলা আকাশ! জিনা, এবারও কি তোমার দ্বীপে পিকনিক করতে যাবে?

দেখি, বললো জিনা। এখন গিয়ে বোধহয় সুবিধে হবে না, বৃষ্টির দিন তো। যখন তখন নামবে, দ্বীপে আরাম পাবো না।

বাড়িতেই বা মন্দ কি? রবিন বললো। আর ক্যারোলিন আন্টিও যা ভালো …বেশি হৈ-চৈ করবো না আমরা, আংকেলকে ডিস্টার্ব না করলেই হবে। তাহলেই আর চটবেন না।

আমার মনে হয় না বাবার হাতে এখন কোনো জরুরী কাজ আছে, বললো জিনা।

থাকতেও পারে, বললো কিশোর। চুপচাপ বসে থাকতে হলেই মরেছি। কিছু একটা কাজ না পেলে শুধু সাগর আর আকাশ দেখে কি করে কাটাবো?

কি কাজের কথা বলছে কিশোর, বুঝতে পারলো অন্য তিনজন। রহস্য কিংবা অ্যাডভেঞ্চার। কিশোর পাশার নেশা।

এগিয়ে চলেছে ওরা।

একপাশে সাগর, ঘন নীল একটা বিশাল আয়না যেন, চকচক করছে উজ্জ্বল রোদে।

সত্যি তুমি লাকি, জিনা, সেদিকে চেয়ে মুসা বললো। এতো সুন্দর জায়গায় বাড়ি…

হাসলো শুধু জিনা।

ওই যে, তোমাদের বাড়ির চিমনি, কিছুক্ষণ পর আবার বললো মুসা। ধোয়া উড়ছে! নিশ্চয় রান্নাঘরের। আমরা এতোগুলো মানুষ যাচ্ছি, দুপুরের রান্না চড়িয়েছেন ক্যারোলিন আন্টি…আহ, মনে হচ্ছে এখান থেকেই সুগন্ধ পাচ্ছি!

গতি বাড়িয়ে দিলো সে।

তার কাণ্ড দেখে হেসে উঠলো সবাই।

গোবেল ভিলার পেছনের গেটে এসে সাইকেল থেকে নামলো চারজন। গ্যারেজের পাশের ছাউনিতে নিয়ে গিয়ে রাখলো সাইকেলগুলো। তারপর চিৎকার করতে করতে দৌড় দিলো জিনা, মা, মাআ, আমরা এসে গেছি! কোথায় তুমি? মা?

পাশে ছুটছে তিন গোয়েন্দা।

হঠাৎ খপ করে জিনার হাত চেপে ধরলো রবিন। জিনা, দেখো! ওই যে, জানালায়!
আরে, বানর এলো কোত্থেকে!...এই এই, রাফি, যাবি না! খবরদার!...আয়, আয় বলছি!
কিন্তু রাফিয়ানকে থামানো গেল না। জানালার কাঁচে নাক ঠেকিয়ে রাখা ছোট্ট জীবটাকে চিনতে পারছে না কুকুরটা। ওটা কি ছোট কোনো কুকুর? নাকি অদ্ভুত কোনো বেড়াল? যা-ই হোক, তাড়াবে ওটাকে, বাড়িছাড়া করে ছাড়বে। গলা। ফাটিয়ে ঘেউ ঘেউ করে দরজার দিকে দৌড় দিলো সে। বেরিয়ে আসছিলো টকার, বিশাল কুকুরের ধাক্কা খেয়ে উল্টে পড়ে গেল। আতঙ্কিত হয়ে বানরটা লাফ দিয়ে। গিয়ে ধরলো দেয়ালে ঝোলানো একটা ছবির ফ্রেম, কিনার ধরে ঝুলে রইলো।
এই কুত্তা! হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে দাঁড়ালো টকার। আমার নটিকে বি না! খবরদার বলে দিচ্ছি! বলেই ঠাস করে এক চড় মারলো রাফিয়ানের নাকেমুখে।
ছুটে গিয়ে দ্বিগুণ জোরে ছেলেটার গালে চড় মারলো জিনা। চেঁচিয়ে বললো, শয়তান ছেলে কোথাকার! এত্তোবড় সাহস! আমার রাফির গায়ে হাত দিস! ওটা কি, ওই বাঁদরটা?
মনিবের দুরবস্থা দেখে আরও ঘাবড়ে গেল বানরটা। ছবি ধরে ঝুলে থেকে বিচিত্র কিচির মিচির জুড়ে দিলো। হট্টগোল শুনে দোতলা থেকে নেমে এলো আইলিন। জিনা কিংবা তিন গোয়েন্দাকে আগে দেখেনি সে, তবে বলে দিতে হলো না ওরা কারা। চিনতে পারলো। বললো, কি হয়েছে, জিনা? বানরটা কি করেছে?...আরে এই রাফি, থাম! বাড়ি মাথায় করে ফেলেছিস তো! এই ছেলে, তুমি কাঁদছো কেন? তোমার বানরকে খেয়ে ফেলছে নাকি?
কে বললো কাঁদছি? তেজের সঙ্গে জবাব দিলো টকার। দুহাতে চোখ ডলছে। নটি, নেমে আয়। আয় বলছি.. হারামজাদা কুত্তা খালি ছুঁয়ে দেখুক না তোকে...
না না, কিছু করবে না, এগিয়ে এসে অভয় দিয়ে বললো কিশোর। তুমি তোমার বানরটাকে নামাও। ছবিটা ফেলে দেবে তো।
জিভ টাকরায় লাগিয়ে চুকচুক করে ডাকলো টকার। ছবি ছেড়ে দিয়ে তার কাঁধে লাফিয়ে নামলো নটি। গলা জড়িয়ে ধরে কুকুরটার দিকে চেয়ে কিচমিচ করে। উঠলো। ভয় যাচ্ছে না।
এই রাফি, ধমক দিলো মুসা। ওটা তোর সমান হলো নাকি? থাম।
ওকে ধমকাচ্ছো কেন? জিনার চোখে আগুন জ্বলছে। ঠিকই তো করছে ও। কে না কে এসে বাড়িতে ঢুকে বসে আছে!...এই ছেলে, কে তুমি?
বলবো না! রাগে গটমট করে বেরিয়ে গেল টকার।

আপনি নিশ্চয় আইলিন? আমি মুসা আমান। ছেলেটা কে?
মিস্টার পারকারের বন্ধু, প্রফেসর কারসওয়েলের ছেলে। আজই এসেছে। আগামী হপ্তায় আসার কথা ছিলো, আগেই এসে বসে আছে।
এখানে থাকবে নাকি? আঁতকে উঠলো জিনা। বাবার তো নেইই, মারও আক্কেল নেই! জানে না, আমরা আসছি? জায়গা দিলো কেন?
থামো, জিনা, হাত তুললো কিশোর। শান্ত হও। আগে শুনিই না সব কথা। হয়তো কোনো ভুল হয়েছে...
হ্যাঁ, ভুলই, বললো আইলিন। মিস্টার পারকার ভুলেই গেছেন, তোমরা আসছে। বন্ধুকে আসার জন্যে চিঠি লিখে দিয়েছেন। বন্ধুও চিঠি পেয়ে আর এক মুহূর্ত দেরি করেননি, এক হপ্তা আগেই চলে এসেছেন। সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন ছেলেকে, তার সঙ্গে আবার একটা বানর। জিনার মা তো ভীষণ দুশ্চিন্তায় পড়েছেন। এতোগুলো মানুষের থাকার জায়গা করবেন কোথায়? প্রফেসর নাহয় গেস্টরুমে থাকলেন, তাঁর ছেলে সোফায়। কিন্তু তোমরা
আমি ওসব বুঝি না, সব শুনে রাগ আরও বাড়লো জিনার। এখুনি গিয়ে মাকে বলছি...
পাগলামি করো না, জিনা, বিরক্ত হয়ে বললো কিশোর। ব্যবস্থা একটা হবেই। তোমার রাগ সামলাও।
হ্যাঁ, ব্যবস্থা করা হচ্ছে, বললো আইলিন। চিলেকোঠায় দুটো ম্যাট্রেস। বিছিয়ে দেবো, তোমরা তিনজন থাকতে পারবে, তিন গোয়েন্দার দিকে আঙুল নাড়লো সে। কিন্তু যা ধুলো জমেছে, সাফ করতে লাগবে একদিন...বাতাসও খুব। বেশি। ঝড় এলে আর উপায় নেই। ঠাণ্ডায়...
তাতে কিছু হবে না, হাত নেড়ে বললো কিশোর। ধুলো আমরাই সাফ করে নিতে পারবো। আর ঠাণ্ডার সময় কম্বল গায়ে দিয়ে শুয়ে থাকবো, আরামই লাগবে।
আন্টি কই? মেজাজ নিশ্চয়ই খারাপ?
হবে না? তিনি বলেই সামলে নিয়েছেন। অন্য কেউ হলে...আর প্রফেসরেরই কেমন আক্কেল? অন্যের বাড়িতে এমনভাবে ঢুকে পড়লেন, যেন তাঁর নিজের বাড়ি। মালপত্র দিয়েই, বোঝাই করে ফেলেছেন ঘর। তার ওপর আবার একটা আজব ছেলে আর বানর! আমি যখন থালাবাসন ধুই, কেমন জুলজুল করে চেয়ে থাকে ওটা, মনে হয় এসে আমার সঙ্গে সে-ও হাত লাগাতে চায়।
রান্নাঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন জিনার মা। এই যে, এসে পড়েছে, হেসে বললেন। রাফির ডাক শুনলাম। রাফি, দেখে চমকে যাবি, একটা বানর। এসেছে।
চমকে গেছে এসেই, মুখ কালো করে বললো জিনা। মা, তুমি জানো আমরা আসছি। তার পরেও কি করে ওদের জায়গা দিলে?

আহ, জিনা, কি শুরু করলে? তাড়াতাড়ি বললো কিশোর। তুমি এমন করতে থাকলে আমরা চলেই যাবো।...আন্টি, আপনি কিছু ভাববেন না। দরকার হলে দ্বীপে গিয়ে থাকবো আমরা...

তুমি খুব ভালো ছেলে, কিশোর, হাসলেন মিসেস পারকার। অস্বস্তি দূর। হলো চেহারা থেকে। প্রফেসর না এলে কোনো অসুবিধে হতো না তোমাদের, জানোই তো। আর যেমন প্রফেসর কারসওয়েল, তেমনি তোমার আংকেল। দুজনেই এমন ভুলো মন। সারাদিন না খেয়ে থাকলেও মনে করতে পারবে না। ভাববে, হায় হায়, পেটে মোচড় দেয় কেন!

হেসে উঠলো সবাই।

সে হঠাৎ দরজার দিকে ঘুরে ঘেউ ঘেউ শুরু করলো রাফিয়ান। আবার বানরটার গন্ধ পেয়েছে। কিচমিচ শুনে ছুটে গেল। কী, বাদরের বাচ্চা, আমাকে গাল দেয়! এতোবড় সাহস! আজ তোর একদিন কি আমার একদিন! এমনি ভাবসাব। কুকুরটার।

সিঁড়ির রেলিঙে বানরটা বসে আছে। রাফিকে দেখেই নাচতে শুরু করলো, মুখ ভেঙচাচ্ছে।

লাফ দিয়ে সিঁড়িতে উঠলো রাফিয়ান। কিন্তু বানরটাকে ধরতে পারলো না। তাতে রাগ গেল আরও বেড়ে। তারস্বরে চেঁচাতে লাগলো।

ঝটকা দিয়ে খুলে গেল স্টাডির দরজা। গটমট করে বেরিয়ে এলেন দুই প্রফেসর। রাগে চোখমুখ লাল।

কী, হয়েছে কি! চেঁচিয়ে উঠলেন মিস্টার পারকার। শান্তিতে কাজ করতে পারবো না নাকি?

না না, পারবে পারবে, বললেন বটে মিসেস পারকার, কিন্তু পরিষ্কার বুঝতে পারছেন, সারাদিনই ঘটতে থাকবে এ-ধরনের ঘটনা। বানরটাকে নতুন দেখেছে তো, সহ্য করতে পারছে না এখনও রাফি। ঠিক হয়ে যাবে সব। যাও, কাজ করোগে। দরজাটা বন্ধ করে দিও। আমি দেখবো, আর যেন গোলমাল করতে না পারে।

ঘাউ-ঘাউ করে চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করছে রাফিয়ান। চোখে পড়লো প্রফেসরকে। নতুন লোক দেখে সমস্ত রাগ গিয়ে পড়লো তার ওপর। সিঁড়ি থেকে নেমে তেড়ে এলো।

এক দৌড়ে গিয়ে স্টাডিতে ঢুকে পড়লেন কারসওয়েল।

হাসি থামাতে পারলো না ছেলেরা। বিশেষ করে মুসা। হাসতে হাসতে চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে গেল তার।

জিনা, কুত্তাটাকে থামা! গর্জে উঠলেন মিস্টার পারকার। নইলে দেবো বিদেয় করে! বলে আর দাঁড়ালেন না। চলে গেলেন কাজের ঘরে।
উঁহ, দেবো বিদেয় করে! পেছন থেকে মুখ ভেঙচে বললো জিনা। ভাগ্যিস তার বাবা শুনতে পাননি। মা, বাবাকে হুঁশিয়ার করে দিও। রাফি চলে গেলে আমিও যেদিকে দুচোখ যায় চলে যাবো।..আরি, বানরটার কাণ্ড দেখো! আরে ঘড়ির ওপর বসেছে তো! নষ্ট না করে দেয়!..বিদেয় করবে, বললেই হলো। কেন, রাফিকে কেন, ওই বাঁদরের বাচ্চাটাকে দেখে না?

.

কাজে হাত দিলো তিন গোয়েন্দা। টেনেহিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে চিলেকোঠায় তুললো দুটো পুরনো ম্যাট্রেস। ঠাণ্ডা বাতাস! কিন্তু কি করার আছে? বাইরে তাঁবুতে থাকলে ঠাণ্ডা আরও বেশি লাগবে।
গাল ফুলিয়েই রেখেছে জিনা।
ওরকম করে রাখলে শেষে আবার নামাতে পারবে না, ঠাট্টা করলো মুসা। ফুলেই থাকবে। হাসো, হাসো। তোমার মায়ের কথা একবার ভাবো? আমাদের চেয়ে তাঁর অবস্থা বহুত খারাপ। কি চিন্তায়ই না পড়েছেন!
আসলেই মিসেস পারকারের অবস্থা কাহিল। নয়জন লোকের খাবার জোগাড় করা, সহজ ব্যাপার নয়। রান্নাঘর থেকে আর বেরানোর জো নেই বেচারি আইলিনের। ছেলেমেয়েরা ঘরের কাজে সাহায্য করলো। সাইকেল নিয়ে বাজারে গেল বাজার করে আনতে।
ওই টকারটা কিছু করে না কেন? পরের দিন রাগ করে বললো জিনা।
করে না কে বললো? ওই তো করছে, হেসে বাগানের দিকে দেখালো রবিন।
বাগানময় ছুটে বেড়াচ্ছে ছেলেটা। ভীষণ শব্দ করছে।
এই টকার, চুপ করবে? ডেকে বললো জিনা। তোমার বাবার কাজে। অসুবিধে হচ্ছে...
তুমি চুপ করো! ধমক দিয়ে বললো টকার। দেখছো না আমি এখন বেন্টলি কার হয়েছি? ভারি শক্তিশালী এঞ্জিন। আর এই দেখো, ব্রেক করলে কেমন। নিঃশব্দে থেমে যায়, একটুও ঝাঁকুনি লাগে না। আর দেখো... বলেই জোরে পোঁ পোঁ করে হর্ন বাজালো দুবার। দারুণ, তাই না?
খুলে গেল স্টাডিরুমের জানালা। দেখা গেল দুই বিজ্ঞানীর ক্রুদ্ধ মুখ।
এই টকার, কি হচ্ছে? রেগেমেগে বললেন কারসওয়েল। এতো হৈ-চৈ কিসের? চুপ করে থাকতে পারো না?
বেন্টলি গাড়ি কিছুতেই নিঃশব্দে চলতে পারে না, বোঝানোর চেষ্টা করলো। টকার। কিন্তু কিছুতেই বুঝতে চাইলেন না বোকা মানুষ দুজন। শেষে একটা মিনি-

কার হওয়ার অনুমতি চাইলো সে। এই দেখো না, বাবা, কেমন আস্তে শব্দ করে, ছুটতে ছুটতে শব্দ করে দেখালো টকার। ধরতে গেলে কোনো শব্দই নেই...।
দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল জানালা।
দরজা খোলা পেয়ে সোজা রান্নাঘরে ঢুকে পড়লো মিনি-কার। জানালো, খুব খিদে পেয়েছে। খাবার পাওয়া যাবে কি?
গাড়িটাড়িকে খাওয়াই না আমি, জবাব দিয়ে দিলো আইলিন। এখানে পেট্রল নেই। যাও, ভাগো।
এঞ্জিনের মৃদু গুঞ্জন তুলে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলো মিনিকার, যাত্রী খুঁজতে লাগলো। জানালার চৌকাঠে বসে আছে নটি, ডাকতেই লাফ দিয়ে গিয়ে চড়ে বসলো দুপেয়ে গাড়ির কাঁধে। গাড়ির চুল খামচে ধরে রইলো, যাতে ঝাঁকুনি লাগলে, পড়ে না যায়।
সারা বাগানে চক্কর দিতে লাগলো গাড়ি। মাঝে মাঝেই তীক্ষ্ণ হর্ন বেজে ওঠে।
আজব ছেলে। আইলিনের দিকে চেয়ে বললেন মিসেস পারকার। ভালোই লাগছে ওকে। এই ঝামেলা না থাকলে বসে বসে দেখতাম আর কি করে? গাড়ির এমন পাগল...
তার পরদিন থেকে শুরু হলো বৃষ্টি। বাইরে বেরোতে পারে না টকার। ঘরের ভতরেই গাড়ি চালাতে শুরু করলো। প্রায় পাগল করে তুললো ঘরের সবাইকে।
দেখো, বিশ বারের মাথায় আর সইতে না পেরে ধমক দিলো আইলিন। তুমি মরিস মাইনর, স্টিন, কনসাল, নাকি রোলস, কিছু শুনতে চাই না আমি। আর রান্নাঘরে ঢুকবে না, ব্যস। রোলস রয়েসের মতো গাড়ির লজ্জা করে না, রুটি চুরি করে?
রোলসের কি দোষ? প্রতিবাদ করলো টকার। পেট্রল পায় না, কিছু খেয়ে। তো বাঁচতে হবে তাকে? চলতে তো হবে? আর খালি আমাকে বকেন কেন? নটি আপেল চুরি করছে, তাকে যে কিছু বলেন না?
আবার ঢুকেছে নাকি? আঁতকে উঠে দৌড় দিলো আইলিন। বলি, দরজাটা কে খুলেছে? কে?
রাফিয়ান, নির্দ্বিধায় বলে দিলো টকার।
এই, এই শয়তান, বেরো বেরো! ভাঁড়ারে ঢুকে চেঁচাতে লাগলো আইলিন। বানরটাকে বের করে দিয়ে বেরিয়ে এলো। রাফি খোলেনি। ও খুব ভালো, তোমার বানরটার মতো চোর না।
নটিও খুব ভালো।
ভালো, না? রাফি ওকে ধরতে পারলে দেখাবে মজা। আজ যা একখান কাজ করে এসেছে নানটি। রাফি খুব রেগে আছে।
কি করেছে, নটি?

কি করেছে? রাফির বাসন থেকে হাড় চুরি করে ফেলে দিয়েছে। ঘাউ করে তেড়ে এসেছিলো রাফি। ধরতে পারেনি, তাই বেঁচে গেছে বানরটা। আরেকটু হলেই আজ লেজ হারাতে হতো। কামড়ে ছিঁড়ে নিতে রাফি।

শঙ্কিত হলো টকার। কণ্ঠস্বর নরম করে বললো, আপনারা কেউ ওকে দেখতে পারেন না। অথচ নটি কতো ভালো। দেখেন না, কেমন বেজার হয়ে বসে আছে?

এক কোণে জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে ছোট্ট বানরটা। এক হাত মাথায় রেখে আরেক হাতে মুখ ঢেকেছে। বাদামী একটা চোখ চেয়ে রয়েছে আঙুলের ফাঁক দিয়ে, বিষণ্ন, যেন নীরবে কাঁদছে।

আরে, আবার ন্যাকামিও জানে! হেসে ফেললো আইলিন। এই নে, একটা। বিস্কুট নে। খবরদার, আর কখনও চুরি করবি না।

চোখের পলকে বিষণ্নতা দূর হয়ে গেল বানরটার। লাফ দিয়ে এসে ছোঁ মেরে প্রায় কেড়ে নিলো বিস্কুটটা। ছুটে গেল দরজার দিকে।

দরজা বন্ধ। এগিয়ে গিয়ে খুলে দিলো টকার। সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে ঢুকলো রাফিয়ান। নাক উঁচু। চুলায় চড়ানো গরম স্যুপের মিষ্টি গন্ধ শুকছে।

তড়াক করে এক লাফে গিয়ে একটা চেয়ারের ওপর উঠলো নটি। ভয়ে গুঙিয়ে উঠলো। যেন বিশাল কুকুরটার কাছে মাপ চাইছে।

এক কান খাড়া করলো রাফিয়ান, নাড়লো। বানরটার ভাষা যেন বুঝতে পারছে। ফিরে তাকালো।

এক অদ্ভুত কাণ্ড করলো বানরটা। আইলিনকে সাংঘাতিক অবাক করে দিয়ে বিস্কুটটা বাড়িয়ে ধরলো রাফিয়ানের দিকে। নিচু স্বরে কিচমিচ করছে।

দীর্ঘ এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলো কুকুরটা। তারপর এগিয়ে গিয়ে মুখে নিলো বিস্কুটটা। দুই চিবান দিয়েই কোৎ করে গিলে ফেললো।

আশ্চর্য! আনমনে বিড়বিড় করলো আইলিন। কি বুদ্ধি! সকাল বেলা হাড় চুরি করেছে। অপরাধ করে ফেলেছে। বিস্কুট দিয়ে এখন মাপ চেয়ে নিচ্ছে।

লম্বা জিভ বের করে ঠোঁট চাটলো রাফিয়ান। তারপর হঠাৎ আগ বাড়িয়ে নটির খুদে, নাকটা চেটে দিলো। হয়ে গেল ভাব।

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না আইলিন। জিনাকে খবরটা জানানোর জন্যে দোতলায় ছুটলো।

শুনে জিনা বিশ্বাসই করতে চাইলো না। আইলিনের চাপাচাপিতে শেষে নিচে নেমে এলো।

নটি তখন রাফিয়ানের পিঠে উঠে ঘোড়া চড়ছে। আর আনন্দে হাততালি দিয়ে চেঁচাচ্ছে টকার। আরো, আরো জোরে হাঁট, রাফি। রেসের ঘোড়ার মতো ছুটতে পারিস না...

না-আ! চিৎকার করে উঠলো জিনা। এই রাফি, থাম! বানরটাকে নামা পিঠ থেকে। গাধা হয়ে গেছিস নাকি?
পিঠ থেকে নেমে রাফিয়ানের পায়ের ফাঁকে গিয়ে ঢুকলো বানরটা। ভয়ে ভয়ে তাকালো জিনার দিকে।
রাফিয়ান বুঝতে পারলো, তার মনিব রেগে গেছে। জিনার দিকে চেয়ে বিচিত্র মুখভঙ্গি করলো, যেন হাসলো। তারপর আলতো করে চেটে দিলো বানরটার মাথা। যেন বলতে চাইছে, ভয় নেইরে! আমার মনিবকে বাইরে থেকেই ভয় লাগে। ভেতরটা ওর বড় ভালো।
চোখে পানি এসে গেল আইলিনের। তার মনে হলো, রাফিয়ানের মতো ভালো কুকুর আর দুনিয়ায় নেই। বললো, দেখলে, জিনা, কতো বড় হৃদয় ওর! বানরটার সঙ্গে দোস্তি করেছে বলে ওকে আর কিছু বোলো না।
বলবো, কে বললো আপনাকে? সত্যি সত্যি অবাক মনে হলো জিনাকে। রাফির মতো ভালো কুকুর সারা পৃথিবীতে আর একটিও নেই। এগিয়ে গিয়ে হাত। বুলিয়ে দিতে লাগলো ওটার মাথায়।
জিনার হাত চেটে দিলো রাফিয়ান। নটির দিকে তাকালো। মনের ভাব, আর ভয় নেই। এবার সবাই আমরা বন্ধু হয়ে গেলাম।
এক কোণে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে, টকার। জিনার ভয়ে। কিন্তু কুকুরটার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দেখে ভয় কাটলো তার, হাসলো। এতো জোরে লরির
এঞ্জিনের মতো গর্জে উঠলো, চমকে গেল সবাই। ভেঁপু বাজালো জোরে। অর্থাৎঃ. সরো, সরো, আমি এখন ছুটতে শুরু করবো।
আরে থামো, থামো! তাড়াতাড়ি বাধা দিলো আইলিন।
চুপ, বোকা ছেলে, বললো জিনা।
হুফ! রাফিয়ান বললো।
এভাবে ভেঁপু বাজালে এখুনি এসে হাজির হবেন দুই প্রফেসর, আইলিন। বললো। এই ছেলে, শান্ত কিছু হতে পারো না? এই যেমন ধরো, সাইকেল?
কথাটা মনে ধরলো টকারের। সাইকেলের চাকার মৃদু হিসহিস আওয়াজ তুলে রান্নাঘর থেকে ছুটে হলে বেরোলো। তারপর বেল বাজালো টিংটিং করে। শব্দটা এতোই নিখুঁত আর বাস্তব মনে হলো, মিসেস পারকার ভাবলেন, কেউ বুঝি। এসেছে। কে এসেছে, দেখার জন্যে বেরিয়ে এলেন তিনি।
প্রায় একই সময়ে খুলে গেল স্টাডির দরজা। বেরিয়ে এলেন দুই বিজ্ঞানী। টকারকে ধরে ঝাঁকাতে শুরু করলেন কারসওয়েল। পকেট থেকে ছিটকে বেরিয়ে গিয়ে মেঝেতে পড়লো দুটো পেন্সিল।
চেঁচাতে লাগলো টকার। গলা ফাটিয়ে। আর তার গলার যা জোর!

চেঁচামেচি শুনে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলো জিনা। চিলেকোঠা থেকে তিন। গোয়েন্দা। আইলিনও বেরোলো, আরেকটু হলেই ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিলো রান্নাঘরের দরজার কাছে দাঁড়ানো মিসেস পারকারকে।
ব্যাপার দেখে আর হাসি চাপতে পারলো না জিনা। তার রাগ যেমন বেশি, হাসিও বেশি। হাসতে শুরু করলে থামতে চায় না। হো হো করে হাসছে।
কিন্তু জিনার মতো মজা পেলেন না দুই প্রফেসর। বরং বিরক্তিতে কুঁচকে গেল ভুরু।
এই মেয়ে! রাগে জ্বলছে মিস্টার পারকারের চোখ। কি হয়েছে? এতো হাসির কি হয়েছে, শুনি? ছেলেটাকে আরও আসকারা দিচ্ছো? পেয়েছে কি? জানো না, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ করছি আমরা? দুনিয়ার মানুষের কতো উপকার হবে, আমরা সফল হলে! ক্যারোলিন, বের করো ওদের। আর সহ্য করবো না। যেখানে খুশি যাক। শুনেছো? যেখানে খুশি!
গটগট করে হেঁটে গিয়ে স্টাডিতে ঢুকলেন তিনি।
টকারকে ছেড়ে কারসওয়েলও তাঁর পিছু নিলেন।
দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

.

ঘটনার আকস্মিকতায় বোবা হয়ে গেছেন মিসেস পারকার। কি করবেন এখন? ওই বিজ্ঞানীগুলো যে কি! সারা দুনিয়ার মানুষের শান্তির জন্যে, সুখের জন্যে, ওদের চোখে ঘুম নেই, দুশ্চিন্তার অন্ত নেই, অথচ নিজের ঘরের লোকের সুখের কথা একবারও যদি ভাবে!
জিনার গোমড়া মুখের দিকে চেয়ে হাসলেন তিনি। হাত ধরে টানলেন, আয়, লিভিংরুমে। একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। এভাবে চলতে পারে না। তোর বাবা সত্যি একটা জরুরী কাজে ব্যস্ত, এ-সময় তাকে ডিসটার্ব করা ঠিক হচ্ছে না।
ছেলেমেয়েদেরকে নিয়ে লিভিংরুমে ঢুকলেন তিনি। আইলিন সঙ্গে এলো। রাফিয়ানও এলো পিছু পিছু। নটিকে দেখা যাচ্ছে না। ভয় পেয়ে গিয়ে কোথাও লুকিয়েছে।
সোফায় বুসলো সবাই। রাফিয়ান গিয়ে ঢুকলো একটা টেবিলের তলায়, সামনের দুই পা ছড়িয়ে দিয়ে তার ওপর থুতনি রাখলো।
আলোচনা শুরু হলো।
মা, জিনা বললো। এটা আমাদের বাড়ি। কেন এখান থেকে যাবো...
হয়েছে হয়েছে, হাত তুললেন মা। তুইও যেমন, তোর বাপও তেমন। কথায় কথায় রেগে যাস, আবার ঠাণ্ডা হতেও সময় লাগে না। আমার হয়েছে যতো জ্বালা..যাকগে, এখন একটা উপায় বের করা দরকার।

আসলে, এখান থেকে আমাদের এখন চলে যাওয়া উচিত, বললো। কিশোর।
এক কাজ করলেই পারি, মুসা বললো। গোবেল দ্বীপে...
হা, গোবেল দ্বীপ, রবিনও সায় জানালো।
কিন্তু মিসেস পারকার মাথা নাড়লেন। না, এখন আবহাওয়া ভালো না। বৃষ্টির যা মতিগতি, চলতেই থাকবে। ঝড়ও আসতে পারে। এই সময় দ্বীপে গিয়ে, বৃষ্টিতে ভিজে শেষে অসুখ বাধাবে।
তাহলে তোমার কি পরামর্শ? জিনার রাগ যাচ্ছে না।
খাইছে! বলে উঠলো মুসা। ওই বানরটা কি শুরু করেছে? থামাও না ওকে।
কি দরকার? টকার বললো। আগুন খোঁচাচ্ছে, খোঁচাক। ঠাণ্ডা লাগছে হয়তো ওর।
আবার একটা ঝামেলা বাধাবে, দ্রুত গিয়ে বানরটার হাত থেকে আগুন খোঁচানোর লোহার দণ্ডটা কেড়ে নিলো আইলিন। এই নটি, ঘরে আগুন লাগাতে। চাস? যা, সর।
এই জন্যেই নাম হয়েছে বান্দর, বিমল হাসিতে ঝকঝকে শাদা দাঁত বেরিয়ে গেল মুসার।
বেশ, আবার শুরু করলো জিনা। দ্বীপে যেতে মানা করছে। এখানেও থাকতে দেবে না। যাবো কোথায়? আমি কোনো হোটেলে-টোটেলে যেতে পারবো না বাপু, আগেই বলে দিলাম।
নীরবতা। সমস্যাটা কঠিন।
আমি জানি, কোথায় যাবো! চেঁচিয়ে উঠলো টকার।
বেহেশতটা কোথায় শুনি? ভুরু নাচালো জিনা।
লাইট-হাউস, সবাইকে অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে থাকতে দেখে মাথা ঝোঁকালো টকার। হ্যাঁ, আমার লাইট-হাউস। এমন করে তাকাচ্ছো কেন? লাইট হাউস চেনো না নাকি?
দেখো, টকার, শান্তকণ্ঠে রবিন বললো, এটা মজা করার সময় নয়।
মজা করছি না। বিশ্বাস না হলে বাবাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করে দেখো।
কিন্তু টকার, মিসেস পারকার হাসলেন। তোমার বয়েসী কেউ লাইট হাউসের মালিক হতে পারে না, তাই না?
আমি হয়েছি, রেগে উঠলো টকার। শান্তিতে কাজ করার জন্যে বাবা ওটা কিনেছিলো। কিছুদিন কাজও করেছিলো। আমি গিয়েছিলাম সঙ্গে। আহ, কি সুন্দর জায়গা! বাতাস আর বাতাস, আর সারাক্ষণ ঢেউ!
সেটা তো তোমার বাবার, কিশোর বললো। তোমার না।

কেন নয়? আমি চাইলে কেন দেবে না? তার আর দরকার নেই ওটা। কারও কাছে বিক্রিও করতে পারেনি। আমিও ওটা নেয়ার জন্যে পাগল হয়ে গেলাম। ব্যস, দিয়ে দিলো।
খাইছে! জিনার আছে দ্বীপ, টকারের লাইট-হাউস। ভাবছি, আমার একটা আগ্নেয়গিরি কিংবা মরুভূমি থাকলে ভালো হতো।
মুসার কথায় হেসে উঠলো সবাই।
জিনার রাগ শেষ। চোখ চকচক করছে। তোমার লাইট-হাউসটা কোথায়?
আমাদের বাড়ি থেকে দশ মাইল দূরে, পশ্চিমে। বিশাল, জানো? পুরনো ল্যাম্পটা এখনও আছে, তবে এখন আর জ্বালানো হয় না।
কেন হয় না? প্রশ্ন করলো মুসা।
ওই লাইট-হাউস বাতিল করে দেয়া হয়েছে। ভালো জায়গায় নুতন. আরেকটা বানানো হয়েছে, আধুনিক, ওটাই এখন জাহাজকে সাবধান করে দেয়। পুরনোটা বেচে দেয়া হয়েছে সে-জন্যেই। বাবার জন্যে জায়গাটা চমৎকার। কেউ ডিসটার্ব করতে পারে না। তবু রেগে গেছে বাবা, সী-গালদের ওপর। পাখিগুলো নাকি বেশি শব্দ করে। আমার কিন্তু খুব ভালো লাগে। বাবা বলে, সী-গালেরা। বেড়ালের মতো মিউমিউ করে, তার কাজের ক্ষতি করে...
তা তো বুঝলাম, টকারকে থামিয়ে দিয়ে বললেন মিসেস পারকার। খুব ভালো জায়গা। কিন্তু ওটা লণ্ডনে, এখন যেতে পারবে না। আমাদের সমস্যার। সমাধান হচ্ছে না।
আমার খুব যেতে ইচ্ছে করছে, মা, আবদার ধরলো জিনা। বাবাকে বলেই। দেখো না।
বললেই হবে নাকি? এখানেই আবহাওয়া খারাপ, ওখানে নিশ্চয় আরও বেশি খারাপ। তাছাড়া প্রফেসর কারসওয়েল চলে এসেছেন এখানে, তিনি বাড়িতে থাকলে না হয় এক কথা ছিলো...পরে কোনো এক সময় যাস। আপাততঃ এখানেই কোথাও ব্যবস্থা করতে হবে...
একটা জায়গা আছে, বলে উঠলো আইলিন। অবশ্য যদি এখন খালি পাওয়া যায়।
সব কটা চোখ ঘুরে গেল তার দিকে।
মিসেস লিয়ারি এলমস-এর কটেজ, আবার বললো আইলিন। ভাড়া দেয়। খাবারও ভালো।
হু, নাম শুনেছি, বললেন মিসেস পারকার। কাছেই কোথায় যেন। যাইনি। কখনও।
হা। বড় জোর দুই কিলোমিটার এখান থেকে।
যোগাযোগ করতে হবে কিভাবে?

ফোন নম্বর জানি আমি।
তাহলে একটা রিঙ করো না, প্লীজ। দেখো, খালি আছে কিনা।
টেলিফোন করলো আইলিন। টুরিস্ট সীজন নয়, খালিই আছে কটেজ। ভাড়া করে ফেলা হলো।
ফিরে এসে বসতে বসতে বললো আইলিন, ভালো জায়গা। তোমাদের খুব পছন্দ হবে। ওটার আশপাশে পুরনো অনেক ভাঙা দুর্গ আছে...
তাই নাকি! লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো টকার। দুর্গ দেখতে আমার খুব ভালো লাগে। পুরনো হলে তো আরও বেশি। সেই আনন্দেই সে একটা রেসিং-কার হয়ে গেল, ছুটতে শুরু করলো তীব্র গতিতে, সেই সঙ্গে এঞ্জিনের বিকট শব্দ।
ঘুমিয়ে পড়েছিলো, চমকে জেগে উঠে টেবিলের নিচ থেকে বেরিয়ে ঘেউ ঘেউ জুড়ে দিলো রাফিয়ান। বানরটাও তীক্ষ্ণ কিচির-মিচির শুরু করলো।
আরে থামো, থামো! তাড়াতাড়ি উঠে টকারকে থামাতে ছুটে গেলেন, মিসেস পারকার। তোমার এঞ্জিন বন্ধ করো। নইলে এখুনি আবার বেরিয়ে আসবে ওরা!
দুই কিলোমিটার, সাইকেলে করে মাত্র কয়েক মিনিটের পথ। লিয়ারির কটেজটা খুব সুন্দর। শাদা রঙ বাড়িটার, জানালার পাল্লা সবুজ। গাছপালা, ফুলের বাগান, আর ঝোপঝাড়ে ঘেরা। বাগানটা ছাড়া বাকি সব গাছপালাকে বুনো মনে হয়, নিয়মিত সাফ না করায় জঙ্গল হয়ে গেছে। না, জায়গাটা ভালো, ছেলেমেয়েদের পছন্দ হলো।
তাছাড়া খুব নীরব, বললো রবিন। ভালো লাগে। পড়ালেখার জন্যে এরচে। ভালো জায়গা আর হয় না।
শুব্দ শুনে দরজায় এসে দাঁড়ালো মোটাসোটা, মাঝবয়েসী এক মহিলা, মুখে হাসি।এই যে, এসে পড়েছো তোমরা। এসো এসো, চা তৈরিই করে রেখেছি। ভাবলাম, সাইকেলে করে আসছো, নিশ্চয় খিদে লাগবে।– বাহ্, এই তো চাই! ভাবলো মুসা। না চাইতেই যদি এভাবে খাবার পাওয়া যায়...হেসে বললো সে, আসছি, এক মিনিট। সাইকেলগুলো রেখে আসি। এ হাতমুখ ধুয়ে, চা খেয়ে মালপত্র খুলে গোছাতে চললো ওরা। মাল বেশি নেই। সাইকেলের ক্যারিয়ারে করে যা যা আনতে পেরেছে। খুলে গোছাতে সময় লাগলো না। কাজ শেষ করে বাগানে বেরোলো ওরা। ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলো।
ভালোই লাগবে এখানে, জিনা বললো। জংলা জায়গা। তাছাড়া আমাদের বাড়িও কাছে। ইচ্ছে করলেই গিয়ে নৌকা বের করে নিয়ে দ্বীপে চলে যেতে পিরবো।
ঠিক বলেছো, মুসা একমত হলো। আবহাওয়া ভালো থাকলে সাগরে গিয়ে সাঁতারও কাটা যাবে।

আর মিসেস লিয়ারিকেও আমার পছন্দ হয়েছে। নরম মেজাজ। আমার বাবার মতো বদমেজাজী নয়। এখানে শান্তিতেই থাকতে পারবো আমরা।
খোলা জায়গা পেয়ে টকারেরও সুবিধে হলো। ইচ্ছেমতো গাড়ি চালাতে শুরু করলো সে। যাত্রী হলো নটি। মজা পেয়ে পেছন পেছন ছুটে বেড়াতে লাগলো। রাফিয়ান।
সেদিন বিকেলে ঘরে বসে আলোচনা করে ঠিক করলো ওরা, পরের কয়েকটা দিন কি কি করবে।
পরের দিন থেকে সাঁতার কাটলো ওরা, আশপাশের নির্জন এলাকায় পিকনিক করলো, বাগানে খেললো, যার যা খুশি ইচ্ছে মতো করলো। সবাই খুশি, একমাত্র কিশোর ছাড়া। তার মনের মতো কাজ পায়নি। আশা করেছিলো, যে-রকম জায়গা, একটা না একটা রহস্য পেয়ে যাবেই। চুটিয়ে মাথা খাটাতে পারবে। নিরাশ হতে হয়েছে তাকে। এখন পর্যন্ত কিছুই পায়নি। দিন দুই পরে আরও খারাপ হলো অবস্থা। নামলো মন-খারাপ-করে-দেয়া বৃষ্টি। ঝমঝম ঝমঝম ঝরছে তো ঝরছেই। থামার আর নাম নেই। সেই সঙ্গে ঠাণ্ডা ঝড়ো বাতাস যেন হাড় কাঁপিয়ে দেয়।
ঘরের মধ্যে আর কি খেলা যায়? ইনডোর গেম যা যা আছে, দাবা, কেরম, কোনোটাই ভালো লাগে না ওদের। টকারেরও না। সে গাড়ি হতে পারলে খুশি। কিন্তু জায়গা কম। ছোট বারান্দায় যতোটা ছোটাছুটি করতে পারলো করলো, তারপর বিরক্ত হয়ে সে-ও এসে বসে পড়লো ঘরে।
ঘরের কোণে আগুনের কাছে পড়ে পড়ে ঘুমায় রাফিয়ান, বানরটা মাঝে মাঝে গিয়ে তার লেজ থেকে উকুণ বেছে দেয়। কখনও সিলিং ফ্যান ধরে দোল খায়, কখনও বা চুপটি করে জানালার ধারে বসে থাকে, গালে হাত দিয়ে গম্ভীর হয়ে।
কিশোরও বেশির ভাগ সময়ই জানালার ধারে বসে থাকে। বাইরের বৃষ্টি দেখে। মাঝেসাঝে ভারি গলায় কবিতা আবৃত্তি করে।
সেদিনও করছিলোঃ গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা, কূলে একা বসে আছি নাহি ভরসা...
পাশে বসে আছে রবিন আর মুসা। ওরা এখন বাংলা অনেকটা বোঝে, বলতেও পারে কিছু কিছু।
কিসের নাহি ভরসা কিশোর মিয়া? ভুরু নাচিয়ে হেসে জিজ্ঞেস করলো মুসা।
আর কিসের? জবাবটা দিলো রবিন। রহস্যের।...আরে, এতো মন খারাপ করছো কেন? পাবে, পাবে, নিশ্চয় পেয়ে যাবে এই দুনিয়ায় রহস্যের অভাব নেই।
যা জঙ্গল, আর পোড়ো বাড়ি আছে আশপাশে, মুসা বললো। গুপ্তধনের খোঁজ পেয়ে গেলেও হতো। অন্তত একটা ম্যাপ-ট্যাপ...

চেষ্টা করলে হয়তো গুপ্তধনই পেতে পারো, পেছন থেকে বলে উঠলো লিয়ারি।
ফিরে তাকালো তিন গোয়েন্দা।
মিটিমিটি হাসছে মহিলা। বললো, দাঁড়াও, চা নিয়ে আসি। তারপর বলবো।
সেইদিন লিয়ারির আরেক পরিচয় পেলো ছেলেরা। মহিলা বর্ন স্টোরি টেলার, একেবারে জাত গল্প বলিয়ে। এতো সুন্দর করে গুছিয়ে বলে, না শুনে। উপায় নেই।
একঘেয়ে ভাব অনেকটা কাটলো ছেলেমেয়েদের। খাওয়ার সময় খায়, আর বাকি সময় বসে বসে গল্প শোনে।
বাইরে বৃষ্টির থামাথামি নেই। পড়েই চলেছে। কখনও অঝোর বর্ষণ, কখনও গুঁড়ি গুঁড়ি। মাঝেমাঝে ধেয়ে আসে ঝড়ো হাওয়া, টালির চালের ফাঁকে ঢুকে বিচিত্র শব্দ তোলে।
জানালার ধারে বসে সোয়েটার বুনতে বুনতে গল্প করছে সেদিন লিয়ারি। হঠাৎ বাইরে চেয়ে কি দেখলো। মুখ ফিরিয়ে হেসে বললো, যাক, আর ঘরে বসে থাকতে হবে না। বেরোতে পারবে। মেঘ কাটছে। বৃষ্টি থামলে কোথায় ঘুরতে গেলে ভালো হবে, সেটাও বলে দিতে পারি। রহস্যময় হাসি ফুটলো তার মুখে।
.
আরে তাই তো! আকাশের দিকে চেয়ে বললো কিশোর। খেয়ালই করিনি।...তা মিসেস এলমস, কোথায় গেলে ভালো হবে?
কয়েক দিনে কিশোরের স্বভাব অনেকখানিই জানা হয়ে গেছে লিয়ারির। বুঝে গেছে, ছেলেটা কি চায়? ওই যে সেদিন গুপ্তধনের কথা আলোচনা করছিলে, ওয়ালটার ম্যানরের কথা বললাম। ওখানেই যাও। রাস্তায় নেমে বাঁয়ে মোড় নেবে। ছোট একটা পাহাড়ের ওপর...
হা হা, দেখেছি, বলে উঠলো রবিন। আসার দিন
হ্যাঁ, ওটাই।
সেদিন কিন্তু সব কথা বলেননি, কিশোর ধরলো। খালি গুপ্তধনের গুজবের কথাই বলেছেন। ওই দুর্গ কাদের, ওয়ালটাররা কে ছিলো, কিছুই বলেননি।
তাহলে তো চা দরকার। বসো, নিয়ে আসি।
দাঁড়ান, আমিও আসছি, উঠে দাঁড়ালো রবিন। আপনাকে সাহায্য করবো।
কয়েক মিনিটের মধ্যেই ফিরে এলো দুজনে। লিয়ারির হাতে চায়ের সরঞ্জাম। রবিনের হাতে ইয়া বড় এক কেক।
খাবারের গন্ধে চোখ মেললো রাফিয়ান। উঠে পায়ে পায়ে এগিয়ে এলো।
ফ্যানের একটা পাখা ধরে ঝুলছিলো নটি, ঝুপ করে লাফ দিয়ে পড়লো ঠিক কুকুরটার পিঠে।

ওদের দিকে দুই টুকরো কেক ছুঁড়ে দিলো লিয়ারি। চায়ের কাপে ঘনঘন চুমুক দিলো কয়েকবার। তারপর কাপটা প্লেটে নামিয়ে রেখে বললো, হ্যাঁ, ওয়ালটার দের শরীরে রয়েছে জলদস্যুর রক্ত…

এই এক কথায়ই শ্রোতাদের আকৃষ্ট করে ফেললো লিয়ারি। ওদেরকে আগ্রহী করে বসিয়ে রেখে কাপের বাকি চা-টুকু শেষ করলো। বললো, তোমরা খাচ্ছো না কেন? খাও খাও, আমি বলিহামফ্রে ডেভিড ওয়ালটার ছিলো দুর্ধর্ষ জলদস্যু। সে-ই বানিয়েছিলো ওই দুর্গ। লোকটা ছিলো ওলন্দাজ। তার জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠেছিলেন ইংল্যাণ্ডের তৎকালীন রাজা। শেষে বিশাল এক নৌবাহিনী পাঠালেন। হামফ্রেকে ধরার জন্যে। মাঝ সাগরে প্রচণ্ড লড়াই হলো। একে একে ধ্বংস করে। দেয়া হলো হামফ্রের সমস্ত জাহাজ। তার বেশির ভাগ সঙ্গীসাথীই মারা পড়লো। কিন্তু তাকে ধরতে পারলো না নেভি। একটা জাহাজ নিয়ে কোনোমতে পালিয়ে বাঁচলো সে, সোজা চলে এলো আমেরিকায়। ওই একটা জাহাজেও ধনরত্ন কম। ছিলো না। ডাকাতি ছেড়ে দিয়ে বিরাট এক দুর্গ বানিয়ে বাস করতে লাগলো হামফ্রে। নিরাপদেই কাটিয়ে গেল জীবনের শেষ কটা দিন। ও হ্যাঁ, এখানে এসে বিয়ে করেছিলো সে। তাদেরই বংশধর এখানকার ডেভিড ওয়ালটার, ডাক্তার। হয়েছে। ডাক্তারের বউ বিদেশী, এক আইরিশ মহিলা, নরিলি। ছেলেপুলে হয়নি। ডাক্তারের বড় এক ভাই ছিলো, মারা গেছে, এক ছেলে রেখে গেছে। নাম, ড্যানি। ওই ছেলেই একদিন এতোবড় সম্পত্তির মালিক হবে। ড্যানির বাবা ছিলো। আর্কিটেক্ট, লণ্ডনে বিরাট বাড়ি করেছে, অনেক টাকার মালিক। ড্যানি আর তার চাচা-চাচী, ওখানেই থাকে বেশি, এখানে প্রায় আসেই না। এলেও দুচারদিন থেকে আবার চলে যায়। দেশ তো আসলে ওদের ওটা-ই।

এলে কি ওই পোড়ো বাড়িতেই থাকে নাকি? জিজ্ঞেস করলো জিনা।

আরে না না, ওখানে থাকবে কি? দুর্গটার একটা ঘরের ছাতও অবশিষ্ট নেই, সব ভেঙে পড়েছে। কাছেই আরেকটা সুন্দর বাড়ি বানিয়ে নিয়েছে ডাক্তার, চমৎকার একটা পার্কের কাছে। বাংলোটার নাম দিয়েছেঃ ওয়ালটার লজ।

ও, দেখেছি তো সেদিন বাড়িটা, মুসা বললো। দুর্গের কাছে গেলেই দেখা যায়।

হ্যাঁ। ওয়ালটার ম্যানর, ওয়ালটার লজ, পার্ক, ওয়ালটার উড, আর ওদিককার প্রায় সমস্ত জায়গাই ওদের। আমার এই কটেজটাও…

কি বললেন? ভুরু কোচকালো কিশোর। আপনার মানে লিয়ারি কটেজও ওয়ালটারদের জায়গার মাঝেই?

আগে ছিলো। এখন আলাদা। আমার স্বামীর দাদা, মানে আমার দাদা-শ্বশুর চাকরি করতো ওয়ালটারদের এস্টেটে। এই জায়গাটা তাকে দান করে দিয়েছে ডাক্তারের দাদা।

ভাঙা দুর্গ দেখার ইচ্ছে নেই আমার, জিনা বললো। ওরকম দুর্গ আমার নিজেরই একটা আছে, এক্কেবারে আস্ত এক দ্বীপ সহ। ভাঙা দেয়াল ছাড়া দেখার আর কি আছে?
পাহাড়ে চড়লেই সাগর দেখতে পাবে। তোমরা যেদিকে সাঁতার কাটতে গেছে, তার উল্টো দিকে। ওখানে সৈকত নেই, সাঁতার কাটতে পারবে না। নামতেই পারবে না। খাড়া পাহাড়, নিচে পাথরের ছড়াছড়ি, ঢেউ আছড়ে পড়ে। মাথা ঘুরে যদি নিচে পড়ো, ছাতু হয়ে যাবে। কাজেই, হুঁশিয়ার থাকবে।
সাগর অনেক দেখেছি। আর কি আছে?
ওয়ালটার উড়। বন। ভেতরে ঝর্না আছে একটা, অনেক বুনো ফুল আছে।
আর? জিনার মনে হলো, আসল কথাটা বলছে না মহিলা।
আর। হাসলো লিয়ারি। আর আছে একটা অনেক পুরনো কবরস্থান, একেবারে প্রাগৈতিহাসিক কালের। গুহামানবের অনেক কঙ্কাল পাওয়া গেছে। তার ওপরই নতুন কবর বানিয়ে নিয়েছিলো হামফ্রে ওয়ালটার। জলদস্যু ছিলো তো, মন-মানসিকতাই ছিলো অন্যরকম। নইলে বাপু, এতো জায়গা থাকতে পুরনো ওই কবরের ওপর আরেক কবর বানানো কেন?
টিউমিউল্যাস! বিড়বিড় করলো কিশোর।
টিউ..কী? বুঝতে পারলো না মুসা।
টিউমিউল্যাস। বুঝিয়ে বললো গোয়েন্দাপ্রধান, ওই ধরনের কবরস্থানকে বলে টিউমিউল্যাস।

.

বৃষ্টি থামলো বটে, কিন্তু মেঘ পুরোপুরি কাটেনি। আকাশের মুখ থমথমে। যে কোনো মুহূর্তে ঝরঝর করে শুরু হতে পারে আবার।
নামলে নামুক, জিনা বললো। আর বসে থাকতে পারবো না। বসে থেকে থেকে হাতে-পায়ে খিল ধরে গেছে। একটু ঝাড়া দিয়ে না এলে আর বাঁচবো না।
রেইনকোট পরে বেরোলো ওরা।
রাফিয়ান আর নটির কৃত্রিম কোট দরকার নেই, প্রাকৃতিক আসল রোমশ কোটই আছে। কাজেই পানিকে ওদের বিশেষ ভয় নেই। ভিজলে, জোরে ঝাড়া দিলেই গা থেকে ঝরে যাবে পানি।
ছেলেমেয়েরা চললো পায়ে হেঁটে, নটি চললো রাফিয়ানের পিঠে সওয়ার হয়ে। গলায় গলায় ভাব এখন দুটোতে, মাঝে মাঝে খাবার নিয়ে যদিও লেগে যায় ঝগড়া।
দুর্গের কাছে চলে এলো ওরা। ভেঙেচুরে রয়েছে শত শত বছরের পুরনো দেয়াল, ছাতের চিহ্নও নেই।

দূর, মন খারাপ করে দেয়। বিড়বিড় করলো রবিন।
পুরনো দুর্গের সেলার দেখার খুব ইচ্ছে আমার, টুকার বললো। কিন্তু নামবো কোনখান দিয়ে? পথ তো দেখছি না।
শুধুই ধ্বংসস্তূপ। পুরোপুরি ঢেকে দেয়ার পায়তারা কষছে যেন ঘন ঘাস আর লতার দঙ্গল।
দেখার কিছুই নেই, মুসা বললো।
হ্যাঁ, খামোকাই এলাম। আকাশের দিকে তাকালো কিশোর। জলদি চলো। নামলো বলে।
কয়েক পা এগোতে না এগোতেই আবার বৃষ্টি পড়তে শুরু করলো। দৌড়ে চললো ওরা। কিন্তু রেইনকোটেও মানলো না। কটেজে ফিরতে ফিরতে ভিজে চুপচুপে হয়ে গেল সবাই।
পরের দিনও একই অবস্থা। সকাল থেকে বৃষ্টি। বিকেলের দিকে ধরে এলো। মেঘের ফাঁকে উঁকি দিলো সূর্য।
কিশোর প্রস্তাব দিলো, চলো, বেরোনো যাক।
সবাই রাজি। বেরিয়ে এলো পেছনের বাগানে। বাগানের পরে খানিকটা জংলা জায়গা। কয়েকটা আপেল গাছ আছে, আর আছে অনেক পুরনো বিশাল এক ওক গাছ। সব ভেজা। তার মধ্যেই ঘোরাঘুরি করতে লাগলো ওরা। ঘরে বসে থাকার চাইতে এটা অনেক ভালো মনে হলো।
রাফিয়ান আর নটির আনন্দের সীমা নেই। ছুটোছুটি করে খেলছে।
ভেজা ঘাস বেশিক্ষণ ভালো লাগলো না বানরটার। দুই লাফে গিয়ে উঠলো, ওকের একটা নিচু ডালে। তারপর তরতর করে উঠে গেল মগডালে।
মেঘের আড়ালে ঢুকলো আবার সূর্য।
নটি, এই নটি, নেমে আয়, ডাকলো টকার।
নামতে চাইলো না বানরটা। ওপরে থেকেই চেঁচিয়ে জবাব দিলো, ইঁক! ইঁক!
হুফ! হুফ! করে রাফিয়ানও ওকে নামার জন্যে ডাকলো।
কানেই নিলো না নটি। অনেক দিন পর ঘর থেকে ছাড়া পেয়ে গাছে চড়েছে বানর, নামতে কি আর ইচ্ছে করে? ওদিকে বৃষ্টিও প্রায় এসে যাচ্ছে।
ইতিমধ্যে দুবার-ঘর থেকে বেরিয়ে চা খাওয়ার জন্যে তাগাদা দিয়ে গেছে লিয়ারি।
এই নটি, নামলি না! রেগে গিয়ে ধমক দিলো টকার।
চলো, আমরা হাঁটতে শুরু করি, জিনা বললো। আপনিই নেমে আসবে।
ফোঁটা পড়তে শুরু করলো। থেকে থেকে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। নামলো না বানরটা।
না নামলে থাক ওখানে, হাত নেড়ে বললো টকার। আমরা চলে যাচ্ছি…

তার কথা শেষ হলো না। প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে নামলো। ঝমঝম করে বৃষ্টি।
চমকে উঠলো বানরটা। আর এক মুহূর্ত দেরি করলো না। নামতে শুরু করলো। ওকে ধরার জন্যে হাত বাড়িয়ে দিলো টকার। লাফ দিলো নটি। কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে টকারের হাতে না পড়ে পড়লো গিয়ে ভেজা ঘাসে। নিচে পানি, ওপরে পানি, এই অবস্থায় হতবুদ্ধি হয়েই বোধহয় মাথা গোঁজার জন্যে সোজা লতানো ঝোপের দিকে দৌড় দিলো ওটা।
আরে ধরো, ধরো! চেঁচিয়ে উঠলো টকার।
বৃষ্টির মাঝে বানরটাকে ধরার জন্যে পেছনে ছুটলো সবাই। রাফিয়ান ভাবলো, এটা একটা নতুন ধরনের খেলা। দৌড়ে গেল নটির কাছে। লাফ দিয়ে তার পিঠে উঠে বসলো বানরটা। আর সওয়ারির আদেশেই যেন সোজা, গিয়ে ঝোপের মধ্যে ঢুকলো কুকুরটা।
ধমক দিয়ে রাফিয়ানকে ডাকতে যাবে জিনা, এই সময় হাত তুলে দেখালো, রবিন। আমার মনে হয় ওখানে যাচ্ছে।
জংলা জায়গাটার ওধারে একটা পুরনো ছাউনি। কাজের জায়গা, কিন্তু কেউ কাজ করে না এখন ওখানে। অব্যবহৃত পড়ে রয়েছে অনেকদিন।
দৌড়ে এসে ছাউনিতে ঢুকলো ওরা। রবিনের অনুমান ঠিকই। নটিকে নিয়ে ওখানেই এসেছে রাফিয়ান। কুকুরটার গলা জড়িয়ে ধরে রেখেছে বানরটা, ঠাণ্ডায়। কিংবা ভয়ে যে কারণেই হোক, কাঁপছে। মনিবকে দেখে লাফিয়ে এসে উঠলো তার কাঁধে।
কালো আকাশটাকে চিরে দিলো যেন বিদ্যুতের শিখা। ভীষণ শব্দে বাজ পড়লো। আবার, তারপর আবার।
খাইছে! বলে উঠলো মুসা। ঝড়ই শুরু হলো দেখছি।
হ্যাঁ, মনে হয় একেবারে মাথার ওপর বাজ পড়ছে, বললো জিনা।
আর বাড়ছেই, কান পেতে ঝড়ের আওয়াজ শুনছে রবিন। এগিয়ে আসছে। বোধহয় সাগরের দিক থেকে…
হঠাৎ উজ্জ্বল নীল আলোয় আলোকিত হয়ে গেল দশদিক। ছাউনির নিচে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে এলো ছেলেরা। আলোর প্রায় পর পরই বাজ পড়লো। এতো জোরে আওয়াজ হলো, মনে হলো কানের পর্দা ফেটে গেল ওদের, থরথর করে কেঁপে উঠলো মাটি। চেঁচালো রাফেয়ান। চি-চি করলো বানরটা।
কটেজের ওপর পড়েছে! চোখ বড় বড় হয়ে গেছে টকারের। হায় হায়, বেচারি লিয়ারি…

চুপ! থামিয়ে দিলো তাকে কিশোর। কটেজে নয়। ওই দেখো, ওক গাছটা... দেখেছো?
ঘন বৃষ্টির মাঝ দিয়েও দেখা গেল। দেখলো সবাই। একটু আগের সুন্দর ওঁক গাছটা আর নেই, দাঁড়িয়ে আছে শুধু ওটার পোড়া কালো কাণ্ড, ধোয়া বেরোচ্ছে।
আল্লাহরে! কি সর্বনাশ! আঁতকে উঠে বললো মুসা। কয়েক মিনিট আগে...
নটি ছিলো ওটার ডালে..., বললো টকার।
আর আমরা সবাই ছিলাম ওটার তলায়! জিনা শেষ করলো কথাটা।

.
ধীরে ধীরে দূরে সরে গেল বাজের শব্দ। বিদ্যুতের ঝিলিকও কমলো। থেমে আসছে ঝড়।
শোনা গেল লিয়ারির ভয়ার্ত ডাক, কিশোর! জিনা! কোথায় তোমরা?
আমরা ভালোই আছি, চেঁচিয়ে জবাব দিলো কিশোর। আপনি বেরোবেন। না। আমি আসছি। অন্যদেরকে ছাউনিতে থাকতে বলে বেরিয়ে গেল সে। এক ছুটে গিয়ে ঢুকলো কটেজে।
দশ মিনিট পর ফিরে এলো আবার। প্লাস্টিকের ব্যাগে ভরে শুকনো সোয়েটার। নিয়ে এসেছে সবার জন্যে। আর এনেছে বড় একটা ঝুড়ি। তাতে স্যাণ্ডউইচের প্যাকেট, মস্ত এক চকোলেট কেক, বড় এক ফ্লাস্ক কোকা।
এই না হলে তুমি আমার ভাই! বন্ধুর কাঁধে হাত রেখে হেসে বললো মুসা।
হয়েছে হয়েছে, এসো এখন শেষ করে ফেলা যাক। খুব খিদে পেয়েছে।
তোমারই যখন খিদে, আমার অবস্থা বোঝো!
হেসে উঠলো সবাই।
দেখতে দেখতে শেষ হয়ে গেল সমস্ত খাবার। একটা কণাও অবশিষ্ট থাকলো না। এমনকি মাটিতে যা পড়লো, তা-ও না। চেটেপুটে শেষ করলো রাফিয়ান আর নটি।
বৃষ্টি থেমেছে।
রবিন বললো, চলো তো, কাছে গিয়ে দেখি গাছটার অবস্থা।
ছাউনি থেকে বেরোলো সবাই। হঠাৎ করেই দেখা দিলো সূর্য। মেঘ তাড়িয়ে নিয়ে চলে গেছে ঝড়ো বাতাস।
ইস, এতো সুন্দর গাছটা গেল? আফসোস করে বললো জিনা।
হ্যাঁ, আনমনে বিড়বিড় করলো কিশোর। লিয়ারি বললো না সেদিন, গাছটা অনেক পুরনো। হামফ্রে ওয়ালটার যখন এসেছিলো, তখনও ছিলো।
আরও কাছে এগিয়ে গেল ওরা। গাছটার চারপাশের গোড়ার মাটি যেন খুবলে তুলে ফেলেছে কোনো দানব। গর্ত হয়ে গেছে। একটা পরিখার মাঝখানে দাঁড়িয়ে।

রয়েছে যেন এখন পোড়া কাণ্ডটা।
কাণ্ড দেখেছো, কতো বড় গর্ত? টকার বললো। বাজের এতো জোর!
খেলাচ্ছলে লাফ দিয়ে গর্তে নামলো নটি। কি একটা জিনিস কৌতূহল জাগিয়েছে তার। সরু সরু আঙুল দিয়ে মাটি খুঁড়তে শুরু করলো। দেখাদেখি রাফিয়ানও গিয়ে নামলো, মাটি খোঁড়ায় সাহায্য করলো বানরটাকে।
পোকা খুঁজছে, হেসে বললো টকার।
ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে কিশোর। গম্ভীর। আরও ভালোমতো দেখার জন্যে গর্তের কিনারে গিয়ে কুঁকলো। কঠিন কিছু একটাতে কুকুরটার নখ লেগে শব্দ হয়েছে। কি ওটা? বললো, এই রাফি, খোড়। আরও খোড়।
হঠাৎ প্রায় একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো সবাই। বেরিয়ে পড়েছে রঙচটা, মরচে পড়া একটা ধাতব বাক্স।
কি ওটা? মুসার প্রশ্ন।
হয়তো গুপ্তধন, রসিকতা করে হাসলো রবিন।
হু, গুপ্তধন পাওয়া এতোই সহজ! জিনা বললো।
কিশোর ততোক্ষণে নেমে পড়েছে গর্তে। মাটি সরিয়ে বাক্সটা তুলে আনার চেষ্টা করছে।
ওভাবে পারবে না, মুসা বললো। দাঁড়াও, খন্তা-টন্তা কিছু একটা নিয়ে। আসি। এক দৌড়ে গিয়ে কটেজ থেকে একটা শাবল নিয়ে এলো সে। দুজুনে মিলে খুঁড়ে তুলে আনলো বাক্সটা।
তালা আছে, কিন্তু এতো পুরনো, মরচে পড়ে একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। শাবল দিয়ে এক বাড়ি মারলো মুসা। হুক ভেঙে তালাটা খুলে,ড়ে গেল।
ডালা তুললো কিশোর।
হাঁ হয়ে গেল সবাই।
সত্যি গুপ্তধন! সোনার মোহর আর নানারকম অলংকার।
চোখ ডলো কেউ, কেউ চিমটি কাটলো নিজের হাতে। না, জেগেই তো আছে, স্বপ্ন দেখছে না। তারমানে আসলেই গুপ্তধন পেয়েছে। গুপ্তধন পাওয়া নতুন। কোনো ব্যাপার নয় ওদের জন্যে, আগেও অনেক বার পেয়েছে। তবে এভাবে নয়, অনেক খুঁজতে হয়েছে। এই
বিশ্বাস হচ্ছে না এখনও আমার, বিড়বিড় করলো রবিন।
অনেক কিছুই ঘটে এই পৃথিবীতে, নিচের ঠোঁটে চিমটি কেটে বললো কিশোর, যার কোনো ব্যাখ্যা দেয়া যায় না।...্যাকগে, পেয়েছি এ-তো আর মিছে। কথা নয়। চলো, এগুলো কটেজে নিয়ে যাই। কার জিনিস, হয়তো লিয়ারি বলতে পারবে।
বাক্সটা নিয়ে এলো ওরা। রান্নাঘরের টেবিলে রেখে খুললো।

একবার অকিয়েই স্তব্ধ হয়ে গেল লিয়ারি। অনেকক্ষণ পর কথা ফুটলো মুখে, গুজব তাহলে মিথ্যে নয়! সত্যিই গুপ্তধন লুকিয়ে রেখে গেছে হামফ্রে ওয়ালটার।
সেদিন তো বললেনই লুকিয়েছে, কিশোর বললো।
বলেছিলামঃ লোকে বলে। বিশ্বাস করতাম না। এখন তো নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছি…
কিন্তু লুকালো কেন?
স্বভাব, জবাবটা দিলো রবিন। জলদস্যুরা ধনরত্ন লুকাতে অভ্যস্ত ছিলো, হয়তো সে-কারণেই নিরাপদ জায়গায় এসেও নিশ্চিত হতে পারেনি হামফ্রে। ওয়ালটার। কিছুটা লুকিয়ে রেখেছিলো ওই ওক গাছের তলায়।
কি জানি। হতেও পারে, অনিশ্চিত ভঙ্গিতে হাত নাড়লো কিশোর।
এসো না, কি কি আছে দেখি? একটা লিস্ট তৈরি করে ফেলি, প্রস্তাব দিলো টকার। গুপ্তধনের গল্প শুধু বইয়েই পড়েছে এতোদিন, চোখে দেখেনি।
অন্যদেরও মনে ধরলো কথাটা। অনেকদিন পর একটা নতুন ধরনের কাজ পাওয়া গেছে।
বাক্সে রয়েছেঃ ছয়শো সোনার মোহর, পান্না খচিত এক সেট গহনা, হীরা আর নীলকান্ত মণি বসানো একটা ব্রেসলেট, বিশাল একটা রুবি পাথর, একটা টায়রা, একটা হীরার লকেট, অনেকগুলো আঙটি আর কানের দুল,–প্রায় সবগুলোতেই মূল্যবান পাথর বসানো। বড় বড় মুক্তো আছে অনেকগুলো, গোটা তিনেক সোনার ব্রেসলেট, তিনটে সোনার চেন, দুটো সোনার ঘড়ি (বন্ধ হয়ে আছে), চারটে সোনার বড় বড় মেডেল। আর আছে হাতির দাঁতে খোদাই করা দুটো প্রতিকৃতিঃ একটা পুরুষের, আরেকটা মহিলার। পুরুষেরটার নিচে নাম লেখা রয়েছে হামফ্রে ডেভিড ওয়ালটার। আর মহিলাটার নিচে টেরিলিন ওয়ালটার।
হামফ্রের স্ত্রীর নাম কি ছিলো, জানেন? জিজ্ঞেস করলো কিশোর।
টেরিলিন…
হু। তারমানে গুপ্তধন হামফ্রেই লুকিয়েছিলো। এই প্রতিকৃতি দুটোই তার প্রমাণ।
কি করবে এখন এগুলো? রবিন জানতে চাইলো।
জবাব না দিয়ে লিয়ারির দিকে তাকালো কিশোর। ডাক্তার ওয়ালটার এখন। কোথায়? এখানে, না লণ্ডনে?
ঠিক বলতে পারবো না, বৃষ্টির জন্যে বেরোতেই তো পারি না, বললো লিয়ারি। তবে সেদিন মুদির বৌ বলছিলো, এখানে নেই। দুচার দিনের মধ্যে আসবে। তারমানে আজ কিংবা কাল আসবে।
জানালার বাইরে তাকালো কিশোর। বৃষ্টি বোধহয় আর আসবে না। বন্ধুদের দিকে ফিরলো। একবার গেলে কেমন হয়? ওয়ালটার লজে? ডাক্তার থাকলে তাঁকে

জানাবো খবরটা। এসে নিয়ে যাবেন। আইনতঃ জিনিসগুলো এখন তাঁরই পাওনা। চলো, মুসা রাজি। হেঁটে, না সাইকেলে?
সাইকেল।
দ্রুত প্যাড়াল করে চললো ওরা। অনেক দিন ঘরে বন্দি হয়ে থাকার পর। মুক্তির আনন্দ, তার ওপর গুপ্তধন পাওয়ার উত্তেজনা, টগবগ করে ফুটছে যেন শরীর রক্ত। টকারের সাইকেল নেই, সে বসেছে মুসার সাইকেলের ক্যারিয়ারে।
নটি চলেছে রাফিয়ানের পিঠে সওয়ার হয়ে।
অবশেষে দূর হয়ে গেছে মেঘ। কড়া রোদে ভেজা মাটি থেকে বাষ্প উঠছে। গাছপালা ঘন সবুজ, এক কণা বালি নেই, ধুয়েমুছে সব সাফ হয়ে গেছে।
দেখতে দেখতে চললো ওরা।

.

ভাঙা দুর্গের পাশ দিয়ে পথ চোখে পড়লো ওয়ালটার লজের শাদা, দেয়াল। প্রায় বর্গাকার চমৎকার একটা বাংলো। বেগুনী উইসট্যারিয়া আর অন্যান্য লতায়, ছেয়ে রয়েছে। সুন্দর ছিমছাম বাগানে নানারকম ফুলের ঝাড়, বেড, সবুজ ঘাসে ঢাকা লন।
গেটের কাছে এসে সাইকেল থেকে নামলো ওরা। পাল্লার লোহার শিকের ফাঁক দিয়ে ভেতরে তাকালো। বাগানে কাজ করছে একটা লোক।
গেটের পাশে লাগানো ঘন্টা বাজানোর শেকল ধরে টানলো কিশোর।
ঘন্টার শব্দে ফিরে তাকালো লোকটা। খোয়া বিছানো পথে জুতোর মচমচ শব্দ তুলে এগিয়ে এলো গেটের কাছে। মাঝবয়েসী, মাথায় পাতলা চুল, ধূসর। গোলগাল মুখে পাতলা ঠোঁটজোড়া বড় বেশি বেমানান। চেহারায় বিরক্তি। পরনে, কর্ডের প্যান্ট-ময়লা, মাটি লেগে রয়েছে। গায়ে নীল ওভারঅল। গভীর কণ্ঠে। জিজ্ঞেস করলো, কি চাই?
ডাক্তার ওয়ালটার আছেন? ভদ্রভাবে জিজ্ঞেস করলো কিশোর।
জবাব দিলো না লোকটা। এক এক করে তাকালো পাঁচজনের মুখের দিকে। তারপর বললো, আজেবাজে ছেলেমেয়ের সঙ্গে কথা বলেন না তিনি।
কথা বলার জন্যে মুখ খুলেও থেমে গেল কিশোর।
লোকটা বললো, তোমাদের মতো কেউ যাতে ঢুকতে না পারে, সেদিকে কড়া। নজর রাখতে বলা হয়েছে আমাকে।
রাগে-লাল হয়ে গেল জিনার মুখ। এমনিতেই ধৈর্য তার কম। ঝাঝালো কণ্ঠে বললো, দেখুন, বড় বড় কথা বলবেন না। আজেবাজে ছেলেমেয়ে নই আমরা। আপনাকেই বরং বাজে লোক মনে হচ্ছে আমার। যান, গিয়ে বলুন, জরুরী কথা। বলতে এসেছি তাঁর সঙ্গে।

আরও গম্ভীর হয়ে গেল কেয়ারটেকার। তারপর হঠাৎ হাসতে আরম্ভ করলো। জরুরী, না? হাহ্ হাহ্ হা! তা জরুরী ব্যাপারটা কি জানতে পারি, ম্যাডাম?
দেখুন, শীতল কণ্ঠে বললো কিশোর। ওর নাম জরজিনা পারকার। প্রফেসর হ্যারিসন পারকারের নাম নিশ্চয় শুনেছেন, বিখ্যাত বিজ্ঞানী, তাঁর মেয়ে। কাজেই বুঝতে পারছেন, আজেবাজে কেউ নই আমরা। এখন দয়া করে গিয়ে যদি ডাক্তার সাহেবকে খবর দেন, খুশি হবো।
দ্বিধা ফুটলো লোকটার চোখে।
যান, মুসা বললো। গিয়ে বলুন, জরুরী কথা আছে। তাঁরই লাভ।
হ্যাঁ, মুসার কথার পিঠে বলে উঠলো টকার। তাঁর জন্যে সুখবর। গুপ্তধন পাওয়া গেছে।
এই, তুমি চুপ করো তো! ধমক দিয়ে টকারকে থামিয়ে দিলো কিশোর।
গুপ্তধন? ভুরু কোঁচকালো কেয়ারটেকার। তারপর হা-হা করে হাসলো। এই গপ্পোই শোনাতে এসেছো নাকি? নিশ্চয় বলবে, মিস্টার হামফ্রে ওয়ালটারের গুপ্তধন খুঁজে পেয়েছো তোমরা?
কড়া গলায় জিনা বললো, আপনার সঙ্গে আমাদের কোনো কথা নেই! যা বলছি করুন। ডাক্তার ওয়ালটারকে খবর দিন, চাকরিটা না খোয়াতে চাইলে। জলদি করুন।
থাকলে তো খবর দেবো, সামান্য নরম হলো কেয়ারটেকার। বাড়ি নেই। আজ সকালেই আসার কথা ছিলো। বৃষ্টির জন্যেই হয়তো আসতে পারেননি। আকাশ ভালো থাকলে রাতে চলে আসতে পারেন, কিংবা, কাল কিংবা পরশু...ঠিক নেই। আমাকেই খুলে বলো সব। এলে তাঁকে জানিয়ে দেবো।
কর্কশ ব্যবহার অনেক কোমল হয়ে গেছে লোকটার। কিন্তু তবু কেউই তাকে পছন্দ করতে পারলো না। এমনকি রাফিয়ানও না। শিকের ফাঁক দিয়ে মুখ ঢুকিয়ে। তার জুতো শুকলো, তারপর মৃদু গররর করে উঠলো।
সরি, বললো কিশোর। ডাক্তার সাহেবকে ছাড়া আর কাউকে বলা যাবে না। কাল আবার আসবো আমরা।
না না, দরকার কি? এসে হয়তো পেলে না, খামোকা কষ্ট করবে। তারচে এক কাজ করো, ঠিকানা রেখে যাও। সাহেব এলেই তোমাদেরকে খবর দেবো।
আবার বোকামি করে বসলো টকার। বলে ফেললো, লিয়ারি কটেজ, চেনেন নিশ্চয়?
চিনি, চিনি, হেসে বললো লোকটা। ওদিক দিয়েই তো রোজ বাজারে যাই। ঠিক আছে, মিস্টার ওয়াল্টার এলে একটা নোট ফেলে যাবোখন তোমাদের লেটার বক্সে।

লোকটার হাসি মোটেও পছন্দ হলো না মুসার। ফেরার পথে বললো, শয়তান লোক। দেখলে, গুপ্তধনের নাম শুনেই কেমন বদলে গেল?
তা না-ও হতে পারে। মিস্টার পারকারের নাম শুনেও বদলাতে পারে, রবিন বললো। আর চেহারা দেখে মানুষ বিচার করা যায় না। মুখে কড়া, মনটা হয়তো নরম।
তুমি নিজে নরম তো, তাই সবাইকে ওরকম ভাবো, বললো জিনা। আমি মুসার সঙ্গে একমত। আস্ত শয়তান লোক। হারামী নাম্বার ওয়ান। এই কিশোর, তুমি কি বলো?
আমারও ভালো লাগেনি।
আমারও না, টকার বললো। গুপ্তধনের কথা বলে বোকামি করিনি তো?
বোকামিই করেছে। আর ঠিকানা দিয়ে করেছো গাধামি। আগ বাড়িয়ে আর কথা বলতে যাবে না কক্ষণো। তোমাকে বলেছি না, আমরা গোয়েন্দা। গোয়েন্দাগিরিতে সব সময় ভেবেচিন্তে কথা বলতে হয়…
কিন্তু অসুবিধে কি হবে?
গুপ্তধনের লোভে আমাদের পেছনে লাগতে পারে। ঠিকানাও বলে দিয়ে এসেছো…
তাই তো! ভুলই হয়ে গেছে…
যা হবার হয়ে গেছে। এখন আর ভেবে লাভ নেই। দেখা যাক কি হয়। হয়তো লোকটা বিশ্বাসই করেনি আমাদের কথা।
লিয়ারি জানালো ওদেরকে, লোকটার নাম ডেনার। ডাক্তার ওয়ালটারের বাড়িতে মালীর কাজ থেকে শুরু করে কেয়ারটেকারের কাজ, সবই সে করে। ডেনার ভালো কি মন্দ, বলতে পারলো না। কারণ, বোঝার উপায় নেই। মোটেই নাকি মিশুক না লোকটা।
পরদিন সকালে ডেনার কখন এলো লিয়ারি কটেজে কেউই জানলো না। কিন্তু নাস্তার টেবিলেই পাওয়া গেল তার নোট। একটা খামে ভরে চিঠির বাক্সে ফেলে গেছে। লিয়ারি এনে দিলো ছেলেদের।
নোটে লেখাঃ জরুরী কাজে আটকে পড়েছেন ডাক্তার ওয়ালটার। তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে পারছে না বলে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। আজ দুপুরের দিকে তোমাদের সঙ্গে দেখা করবে তার ভাইপো ড্যানি ওয়ালটার। জিনিসগুলো তার। হাতে দিয়ে দেয়ার জন্যে অনুরোধ করেছেন ডাক্তার ওয়ালটার।
নিচে ডেনারের সই।
রেগে গিয়ে জিনা বললো, নিজে একটা নোট পর্যন্ত লিখতে পারলো না, এতোই জরুরী কাজে ব্যস্ত? ওই ডেনার ব্যাটা তাকে কি বলেছে, কে জানে! আসলে

আমাদের কথা বিশ্বাস করেনি ওরা।
ওদেরই বা দোষ কি? কিশোর বললো। আমাকে বললে আমিও বিশ্বাস করতাম না। নিজের চোখে দেখেছি, বলেই না..তবে ওরকম ভাবে হঠাৎ গুপ্তধন পেয়ে যাওয়ার অনেক কাহিনী জানি আমি।
আমিও জানি, রবিন বললো। বইয়ে পড়েছি। রেফারেন্স বইতেও আছে কিছু কিছু ঘটনার উল্লেখ।
বিশ্বাস করেনি, মুখ ভর্তি খাবার চিবাতে চিবাতে বললো মুসা, তো কি হয়েছে? করবে। যখন বাক্সটা নিয়ে গিয়ে তার সামনে ফেলবে তার ভাতিজা।
ড্যানি আসবে দুপুর নাগাদ। ততোক্ষণ আর কটেজের কাছ থেকে দূরে যেতে, পারছে না ছেলেমেয়েরা। রোদ উঠেছে। বাগানে আর পেছনের জঙ্গলে ঘোরাঘুরি করেই কাটালো ওরা।
দুপুরের আগেই এলো ড্যানি। ছাউনিতে বসে গল্প করছিলো তখন ওরা। মোটর সাইকেলের আওয়াজ শুনে ছুটে গেল।
গেটের বাইরে মোটর সাইকেল থেকে নামলো ছেলেটা। লম্বা, হালকা, কালো চুল। বয়েস আঠারো মতো হবে। বেল বাজালো।
গেট খোলার জন্যে একসাথে এগোলো পাঁচজনে।
তোমরাই গিয়েছিলে, না? বললো আগন্তুক। আমি ড্যানি ওয়ালটার। ডেনার বললো, কয়েকটা বাচ্চা দেখা করতে এসেছিলো জরুরী কথা বলতে
ছেলেটার ওপর বিতৃষ্ণা জাগলো কিশোরের। এমন ভঙ্গিতে বাচ্চা কথাটা বললো, যেন সে নিজে একজন বুড়ো মানুষ। তাছাড়া তার তীক্ষ্ণ উঁচু পর্দার কণ্ঠস্বরও পছন্দ করার মতো নয়। .
হ্যাঁ, আমরাই গিয়েছিলাম, নিষেধ মনে থাকলো না টকারের। আগ বাড়িয়ে কথা বলতে গেল আবার। আপনাদের পারিবারিক গুপ্তধন পেয়েছি।
চমৎকার। চাচা দেখলে খুশি হবে। চলো তো দেখি, কি পেয়েছো?
লিভিংরুমে নিয়ে আসা হলো ড্যানিকে। নিজের ঘরের খাটের নিচ থেকে বড় একটা সুটকেস বের করে আনলো কিশোর, তাকে সাহায্য করলো মুসা। টেবিলের ওপর রেখে বাক্সের ডালা তুললো।
দেখে বিস্ময়ে শিস দিয়ে উঠলো ড্যানি। দারুণ তো! সত্যি সত্যি পেয়েছে। দেখা যাচ্ছে!
চিন্তিত ভঙ্গিতে তার দিকে চেয়ে রয়েছে কিশোর। লিয়ারি বলেছে, ডাক্তার ওয়ালটার নাকি খুব ভদ্রলোক। তাহলে তার ভাইপো এরকম কেন? কেমন যেন গোয়ার, দুর্বিনীত। ব্যবহারও ভালো না। জলদস্যু হামফ্রের স্বভাব পেয়েছে নাকি?

ঠিক আছে, নিয়ে যাচ্ছি, বলতে বলতে বাক্সের ডালা নামালো ড্যানি। সুটকেস বন্ধ করলো। তারপর হাতল ধরে তুলে নিলো। সুটকেসটা যে অন্যের, এ কথাটাও যেন ভুলে গেল।
এক মিনিট, ড্যানির পথরোধ করলো কিশোর। নোট লিখেছে ডেনার, সইও তার। মিস্টার ওয়ালটার লেখেননি। না লিখুন, ডেনারের কথাই নাহয় বিশ্বাস করলাম। কিন্তু আপনি যে ড্যানি ওয়ালটার, তার প্রমাণ কি? কিভাবে বুঝবো?
হ্যাঁ, ঠিক, এগিয়ে এলো জিনা। প্রমাণ করুন, যে আপনি ড্যানি ওয়ালটার। মোটর সাইকেল এনেছেন। নিশ্চয় ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে। দেখান।
ফ্যাকাশে হয়ে গেল ড্যানি। জ্বলন্ত চোখে তাকালো জিনা আর কিশোরের। দিকে। মানে! আমাকে সন্দেহ করছো? ডাক্তার ওয়ালটারের ভাতিজাকে?
না, শিওর হতে চাইছি, দরজার দিকে এগিয়ে গেল, মুসা। প্রমাণ করার মতো কিছু সঙ্গে না থাকলে চলে যান। গিয়ে নিয়ে আসুন। আমাদেরকে বিশ্বাস। করাতে পারলে তারপর পাবেন সুটকেস।
বেশ, যাচ্ছি।
আগে সুটকেসটা রাখুন, বেশ উপভোগ করছে টকার। মোটর সাইকেলের এঞ্জিনের মতো একবার গোঁ গোঁ করে উঠে বললো, যান। পঞ্চাশ মাইল বেগে ছুটে চলে যাবেন। কতোক্ষণ আর লাগবে?
কিন্তু সুটকেস রাখলো না, ড্যানি। হঠাৎ দৌড় দিলো দরজার দিকে। পাথরের। দেয়ালের মতো তার সামনে দাঁড়িয়ে গেল তিন গোয়েন্দা আর জিনা। পেছন থেকে তার জ্যাকেট খামচে ধরলো টকার।
ঝাড়া দিয়ে টকারের হাত ছাড়িয়ে ভোলা জানালার দিকে ছুটলো ড্যানি।
বাঘের মতো লাফ দিয়ে গিয়ে পড়লো রাফিয়ান। কামড়ে ধরলো ড্যানির চামড়ার জ্যাকেটের ঝুল। দুই পা তুলে দিলো গায়ের ওপর।
হাত থেকে সুটকেস ছেড়ে দিলো নকল ড্যানি–কারোই আর বুঝতে বাকি নেই এখন, সে আসল ড্যানি নয়। জ্যাকেটটা ছাড়ানোর চেষ্টা করলো। টেনে বের করে নিলো কুকুরটার দাঁতের ফাঁক থেকে।
আবার কামড় দিলো রাফিয়ান। নকল ড্যানির জিনসের প্যান্টের পেছনে। হ্যাঁচকা টানে ছিঁড়ে ফেললো খানিকটা, কাপড় তো বটেই, সেই সঙ্গে কিছুটা চামড়াও। ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠলো ছেলেটা। আবার দরজার দিকে দৌড় দিলো।
সুটকেস ফেলে দিয়েছে। আর আটকানোর কোনো মানে নেই। পথ ছেড়ে দিলো ছেলেরা।
পিছন দিকটা চেপে ধরে বারান্দা পেরিয়ে লাফ দিয়ে বাগানে পড়লো নকল ড্যানি। ইতিমধ্যে আরেক কাণ্ড হয়েছে। নটি ভেবেছে, সবাই কিছু না কিছু করেছে,

তারও কিছু একটা করা দরকার। ড্যানি ঘর থেকে বেরোনোর আগেই গিয়ে লাফিয়ে উঠেছে তার কাঁধে, ঝাঁকড়া চুল খামচে ধরেছে। এখন হ্যাঁচকা টান মারছে।
দৌড়াবে, পাছা ডলবে, নাকি কাঁধ থেকে বানর ফেলবে? মহা মুশকিলে পড়ে, গেছে নকল ড্যানি। দুহাতে ধরে অনেক কষ্টে টেনে বানরটাকে নামিয়ে আনলো কাঁধ থেকে, ছুঁড়ে ফেলে দিলো। দেখে টকার গেল রেগে। লাফ দিয়ে বাগানে নেমে ইয়া বড় এক ঢিল তুলে নিয়ে ধা করে ছুঁড়ে মারলো। ধ্যাপ করে গিয়ে লাগলো সেটা ড্যানির পিঠে। ওরে বাবারে, গেছিরে! বলে আরও জোরে দিলো দৌড়। কিন্তু তার দুর্ভাগ্য তখনও শেষ হয়নি। বিশাল এক লরির মতো গর্জন তুলে তার পেছনে ছুটলো টকার।
গাড়ির আওয়াজ শুনে আরও ভড়কে গেল বেচারা ড্যানি। ভাবলো, গাড়ি নিয়ে তাকে তাড়া করেছে কেউ। পেছনে ফিরে তাকানোরও সাহস হলো না। এক লাফে গিয়ে চড়লো মোটর সাইকেলে। এঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে শাঁ করে চলে গেল।
হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়লো ছেলেমেয়েরা।
মুসা তো একেবারে বাগানে চিত হয়ে শুয়ে পড়েছে। পেট চেপে ধরে হাসছে। হাসি কিছুটা কমলে বললো, আঙ্কেল থাকলে...হাহ হা...আর আসবে না...রাফি ওর পাছার চামড়া...! আবার হেসে উঠলো হো-হো করে।
হাসাহাসি চললো আরও কিছুক্ষণ।
অবশেষে হাসি থামিয়ে কিশোর বললো, স্রেফ ধাপ্পা দিয়ে নিয়ে যেতে এসেছিলো...
সে-তো বোঝাই গেল, বললো রবিন। নিশ্চয় ডেনারের কাজ।
তাতে কোনো সন্দেহ আছে কি? আমরা যে গুপ্তধন পেয়েছি, একমাত্র সে-ই জানে...
আর লিয়ারি, মনে করিয়ে দিলো জিনা।
আরে না, প্রতিবাদ করলো মুসা। গলা কেটে ফেললেও লিয়ারি কিছু করবে। না। ভালো রান্না খেয়ে খেয়ে মহিলার ভক্ত হয়ে গেছে সে। সব শয়তানী ডেনারের।
এখন তাহলে আমরা কি করব? জিজ্ঞেস করলো রবিন। আবার যাবো ওয়ালটার লজে? দেখবো ডাক্তার ওয়ালটার এসেছেন কিনা?
তা-ই বোধহয় করতে হবে, কিশোর বললো। লিয়ারি বাজার থেকে আসুক। তাকে সব বলি। দেখি কি রিঅ্যাকশন হয়? তারপর খেয়েদেয়ে বেরোবো।
লিয়ারির অকৃত্রিম বিস্ময় দেখে বোঝা গেল, সে এই ধাপ্পাবাজিতে জড়িত নেই।
লাঞ্চের পর সাইকেল নিয়ে আবার ওয়ালটার লজে চললো ওরা।

আগের দিনের মতোই গেট বন্ধ। তবে আজ বাগানে কাউকে দেখা গেল না, ডেনারকেও না। বাংলোর দরজা-জানালাও সব বন্ধ। বেল বাজালো কিশোর। কয়েকবার। কিন্তু সাড়া পাওয়া গেল না। মনে হচ্ছে, কেউ নেই বাড়িতে।
আরও কয়েক মিনিট গেটের কাছে দাঁড়িয়ে দুইলো ওরা। বেল বাজালো। জবাব মিললো না।
নেই কেউ বাড়িতে, মুসা বললো।
হুঁ, রবিন একমত হলো তার সঙ্গে। ডাক্তার ওয়ালটারও ফেরেননি। কিন্তু, ডেনার গেল কোথায়?
কিশোরের দিকে তাকালো জিনা। কিশোর, এখন কি বরবো?
নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছিলো কিশোর। আঁ? ফিরে তাকালো। এখন? শেরিফকে জানাতে হবে। তবে আগে গিয়ে গুপ্তধনগুলো নিরাপদ কোথাও লুকিয়ে ফেলতে হবে। চলো, জলদি চলো।
কিশোরের এই তাড়াতাড়ি করার কারণ বুঝতে পারলো না অন্যেরা। তবে কোনো প্রশ্নও করলো না। ফিরে চললো লিয়ারি কটেজে।

.

কটেজে ফিরে গুপ্তধনগুলো দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো কিশোর। যেন আশা করেছিলৈ, ফিরে এসে আর দেখতে পাবে না, তার আগেই ডাকাতি হয়ে যাবে।
লিয়ারিও ভীষণ উদ্বিগ্ন। ছেলেদের দেখেই বলে উঠলো, ডাক্তার এসেছেন?
না, জানালো কিশোর।
তাহলে তো মুশকিল হয়ে গেল। এতো টাকার জিনিস ঘরে রাখতে আর সাহস হচ্ছে না। কিছু একটা করা দরকার।
আমিও তাই ভাবছি। শেরিফকে খবর দেয়া দরকার।
কি করে দেবে? তাহলে যেতে হবে কাউকে।
কেন, টেলিফোন?
নষ্ট। তারটার ছিঁড়েছে বোধহয় কোনো জায়গায় ঝড়ে। বাজারে গিয়েছিলাম যে, তখনই মিস্ত্রীকে খবর দিয়ে এসেছি। চলে আসবে।
হুঁ! তাহলে শেরিফের অফিসে গিয়েই খবর দিতে হবে। তবে তার আগে কোথাও লুকিয়ে ফেলতে হবে এগুলো, গুপ্তধনের সুটকেসটা দেখালো কিশোর।
কিন্তু কোথায় লুকানো যায়? চিলেকোঠার কথা ভাবলে প্রথমে। ওখানে গিয়ে দেখা গেল, জায়গা নেই।
মুসা পরামর্শ দিলো, একটা ট্রাংকে ভরে তালা দিয়ে রাখলে কেমন হয়? কিশোর রাজি হলো না। তার ধারণা, ওখানেই প্রথম খুঁজবে চোরেরা। শেষে সেলারে লুকিয়ে রাখবে ঠিক করলো ওরা। সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলো মাটির নিচের ঘরে।

পুরনো আমলের একটা বয়লার পড়ে আছে। বাতিল। এখন আর কাজ হয় না। ওটা দিয়ে। তার মধ্যে লুকানোর কথা বললো রবিন। দেখা গেল, বয়লারের মুখটা খুব ছোট। বাক্সটা ঢুকবে না তার মধ্যে।
ঘরের একধারে পড়ে রয়েছে একগাদা বস্তা। তুড়ি বাজিয়ে কিশোর বললো, পেয়েছি। ওখানে লুকাবো।
কোথায়? অবাক হয়ে জানতে চাইলো মুসা।
ওই যে, ওই বস্তাগুলোর তলায়। তার ওপর পুরনো একটা ময়লা চাদর ফেলে রাখবো। ব্যস, তাহলেই হবে। চোরেরা ভাবতেই পারবে না এতো দামী জিনিস ওরকম সাধারণ জায়গায় লুকানো হয়েছে।
আর থাকতে না পেরে জিজ্ঞেস করলো টকার, আচ্ছা, এতো ঝামেলা কেন। করতে যাচ্ছো? চোর কি আসবেই?
সেই সম্ভাবনাই বেশি! ধাক্কা দিয়ে নিতে আসার সাহসূ যখন করেছে, চুরি করা তো আরও সোজা।
খুব সাবধানে একটা একটা করে বস্তা তুলে পাশে নামিয়ে রাখলো কিশোর। কয়েকটা বস্তা সরানোর পর সুটকেসটা রাখ। বাকি বস্তাগুলোর ওপর। তারপর নামিয়ে রাখা বস্তাগুলো তুলে আবার আগের মতো সাজিয়ে দিলো সুটকেসটার ওপর। তার ওপর বিছিয়ে দিলো একটা পুরনো চাদর, এলোমেলোভাবে। যেন অনেকদিন থেকেই ওটা ওভাবে পড়ে আছে।
ঘরের আরেক ধারে পুরনো, একটা ভাঙা খাট ফেলে রাখা হয়েছে। কি ভেবে, ওই খাটটা তুলে এনে বস্তাগুলোর ওপর রাখতে বললো কিশোর।
ধরাধরি করে খাটটা তুলে এনে বস্তার দিকের দেয়াল ঘেঁষে রাখলো ওরা। ঢাকা পড়ে গেল বস্তাগুলো,। খাটের নিচ দিয়ে উঁকি না দিলে আর চোখে পড়ে না।
যাক, আপাতত নিরাপদ, হাত ঝাড়তে ঝাড়তে বললো কিশোর।
তো, শেরিফকে কি আজই খবর দিতে হবে? জিনা জিজ্ঞেস করলো।
হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি করা উচিত! অযথা ঝুঁকি নেয়ার কোনো মানে হয় না। কেন, তুমি যাবে নাকি?
নাহয় গেলামই।
কিন্তু সেলার থেকে বেরিয়েই বেরোনোর আশা বাদ দিলো ওরা। আবার কালো মেঘে ঢেকে গেছে আকাশ। দেখে বিশ্বাসই হতে চায় না, এই কিছুক্ষণ আগেও ঝকঝকে রোদ ছিলো।
কি আর করা? ঘরে বসেই কাটাতে হলো।
বিকেলের দিকে বৃষ্টি আরও বাড়লো। সাঁঝ হলো, রাত নামলো। আমার কোনো লক্ষণ নেই।

সারা রাত পালা করে পাহারা দিলো ওরা। এরকম দুর্যোগের রাতেই চোর ডাকাত আসার সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু তাদের ধারণা ভুল হলো। কেউ এলো না। নিরাপদেই কেটে গেল রাতটা।
পরদিন সকালে আবার রোদ উঠলো।
নাস্তা সেরেই বেরিয়ে পড়বে ঠিক করলো ওরা। জিনা আর রবিন যাবে শেরিফকে খবর দিতে। কিশোর আর মুসা যাবে আবার ওয়ালটার লজে, ডাক্তার। এসেছেন কিনা খোঁজ নেয়ার জন্যে। আর টকার থাকবে কটেজে, লিয়ারির সঙ্গে। বাড়ি পাহারা দেবে। চোর-ডাকাত এলে ছুটে গিয়ে খবর দেবে কিশোর আর মুসাকে।
প্রথমে ঘরে থাকতে রাজি হলো না টুকার।
তাকে বোঝালো মুসা। শেষে বললো, তোমার গাড়ি চালানোর এই তো। সুযোগ। সোজা রেসিং-কার হয়ে ছুটে যাবে। তাছাড়া রাফিয়ান আর নটি থাকছে। নকল ড্যানির কি অবস্থা করেছিলো, ভুলে গেছো?
হাসি ফুটলো টকারের মুখে।
বেরিয়ে পড়লো ওরা যার যার মতো।
ওয়ালটার লজে চললো কিশোর আর মুসা। গিয়ে দেখা গেল, আগের দিনের মতোই জানালা-দরজা বন্ধ। ডেনারও নেই বাগানে। বেল বাজালো, কিন্তু সাড়া পাওয়া গেল না। খানিকটা নিরাশ হয়েই কটেজে ফিরে এলো দুজনে।
ওখানেও কোনো রকম অঘটন ঘটেনি। দ্বিধায় পড়ে গেল কিশোর। তবে কি তার সন্দেহ অমূলক? গুপ্তধন চুরি করার আর কোনো চেষ্টা হবে না?
কিছুক্ষণ পরেই পিকাপ নিয়ে এলেন শেরিফ। সঙ্গে রবিন আর জিনা। তাদের সাইকেলগুলো পিকাপের পেছনে তুলে নিয়ে এসেছে।
গাড়ি থেকে নামলেন শেরিফ লিউবার্তো জিংকোনাইশান। তিন গোয়েন্দার পরিচিত। (সাগর সৈকত দ্রষ্টব্য) হেসে এগিয়ে এসে হাত মেলালেন কিশোর আর মুসার সঙ্গে। বললেন, কি ব্যাপার? তোমরা যেখানেই যাও, গুপ্তধন চলে আসে নাকি তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে?
কিশোরও হাসলো। সে-রকমই তো লাগে। চলুন, দেখাবো।
বারান্দায় বেরিয়ে এসেছে লিয়ারি। জিজ্ঞেস করলো, কেমন আছেন, শেরিফ?
ভালো। আপনি?
ভালো। যান, দেখুন গিয়ে। আমি চা করে ফেলছি। না খেয়ে যাবেন না কিন্তু, বলেই তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের দিকে চলে গেল লিয়ারি।
সিঁড়ি বেয়ে আগে আগে নামলো কিশোর। নেমেই চিৎকার করে উঠলো।
কি হলো! হুড়মুড় করে নেমে এলো অন্যেরা। চমকে গেল কিশোরের মতোই। খাটটা সরানো। কাত হয়ে পড়ে আছে বস্তার প। চাদরটা ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে।

একধারে। সুটকেসটা নেই।
ভুরু কুঁচকে রেখেছেন শেরিফ। শিওর, ওখানেই রেখেছিলে?
নিশ্চয়ই! মুসা বললো। অনেক কষ্ট করেছি লুকিয়ে রাখতে।
স্থির দাঁড়িয়ে রয়েছে কিশোর। ভাবছে। কিন্তু ঢুকলো কিভাবে? বিড়বিড় করলো আনমনে। পাথরের দেয়াল...লিয়ারি বলেছিলো, আগে নাকি হান্টিং লজ। ছিলো এটা। সেই বাড়ি ভেঙে তার ওপর তৈরি হয়েছে লিয়ারি কটেজ। সেলারের দরজায় নিজের হাতে তালা লাগিয়েছি আমি, নিজের হাতে খুলোম। তাহলে?
ওই জানালা দিয়ে নয় তো? দেয়ালের অনেক ওপরের ছোট জানালাটা। দেখালো রবিন। ওটা দিয়েই ঘরে আলো আসে।
না। ওটা দিয়ে বড় মানুষ কেউ ঢুকতে পারবে না। বাচ্চাটাচ্চা, টকারের মতো হলে কিন্তু এতো ভারি একটা সুটকেস নিয়ে ওখানে উঠতে পারবে না টকারের মতো কেউ। বড় মানুষ হলেও মইয়ের দরকার হবে।
দা মিস্টরি অভ দা লকড় রুম! চেঁচিয়ে উঠলো টকার। একটা গোয়েন্দা, গল্পের বইয়ের নাম। পড়েছে সে। প্রায় ওটার মতোই কাণ্ড হয়েছে এখানেও। ঢোকার পথ নেই। তাহলে সুটকেস নিয়ে গায়েব হলো কিভাবে?
দরজা-জানালা সব পরীক্ষা করে দেখলেন শেরিফ। ভেঙে ঢোকার কোনো চিহ্ন নেই।
ওপরে উঠে এলো সবাই।
শুনে, আরেকটু হলেই হাত থেকে চায়ের কাপ ফেলে দিয়েছিলো লিয়ারি। ছলকে খানিকটা চা পড়ে গেল মেঝেতে।
প্রথম থেকে সব বলো তো আবার, শুনি, সোফায় বসে বললেন শেরিফ।
গোড়া থেকে আবার বলা হলো তাকে।
হুঁ, চা শেষ করে কাপটা ঠক করে নামিয়ে রাখলেন টেবিলে। ওই ডেনার ব্যাটাকেই গিয়ে ধরতে হবে। জানতে হবে, কাকে পাঠিয়েছিলো ড্যানির পরিচয়। দিয়ে।

.

সরাসরি সব অস্বীকার করলো ডেনার-সে কিছুই জানে না। এমনকি নোটটাও নাকি সে লেখেনি। সেটা প্রমাণও করা গেল না। কারণ, হাতের লেখা মিললো না। মহাধড়িবাজ লোক। নিশ্চয় অন্য কাউকে দিয়ে লিখিয়েছে, হতে পারে নকল ড্যানিকে দিয়েই। তাকে ধরা গেল না। হয়তো লুকিয়ে আছে কোথাও, কিংবা পালিয়ে গেছে। মোট কথা, ডেনারের মুখ থেকে কিছুই বের করা গেল না। তাকে, ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন শেরিফ। দোষী প্রমাণ করতে না পারলে আটকে রাখবেন কিভাবে?

হতাশ হয়ে কটেজে ফিরে এলো ছেলেরা। কিশোর নিশ্চিত, কাজটা ডেনারই করেছে। দুপুরের খাওয়া শেষে আলোচনায় বসলো সবাই।
মিটিঙে সিদ্ধান্ত নেয়া হলো, তদন্ত চালিয়ে যাবে ওরা।
সেলারে চলো, বললো কিশোর। আরেকবার খুঁজে দেখি, কোনো সূত্র। পাওয়া যায় কিনা।
ওখানে গিয়ে আর কি দেখবো? মুসা বললো। তখন আমরা সবাই দেখেছি। শেরিফ দেখেছেন। থাকলে কি পাওয়া যেতো না?
দেখেছি। তবে একটা জায়গা বাকি রয়ে গেছে। মনে পড়েছে আমার।
অবাক হয়ে বললো মুসা, কোথায়?
চলো। দেখাবো।
আবার সেলারে নামলো ওরা।
ঢুকেই জিজ্ঞেস করলো মুসা, কোথায়?
ওই যে, হাত তুলে দেখালো কিশোর।
ওগুলো তো বস্তা! ধাক্কা লেগে পড়েছে।
হ্যাঁ, বস্তা। তবে ধাক্কা নয়, বরং বলা ভালো, ঠেলা দিয়ে ফেলেছে।
ঠেলা তো পরে দিয়েছে। ঢুকলো কোনখান...
সেটাই তো দেখতে এলাম। বস্তাগুলোর দিকে এগিয়ে গেল কিশোর। দ্রুত সরাতে শুরু করলো।
গোপন পথ-টথ আছে ভাবছো নাকি? পাশে এসে দাঁড়িয়েছে রবিন।
হ্যাঁ।
রবিন আর মুসাও হাত লাগালো। দেখতে দেখতে সরিয়ে ফেললো সমস্ত বস্তা। কিন্তু কোথায় গুপ্তপথ? কোনো চিহ্নই নেই। নিরেট পাথরের দেয়াল যেন ব্যঙ্গ করে হাসছে ওদের দিকে চেয়ে।
দেয়ালটার দিকে তাকিয়ে রইলো কিশোর। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটলো দুবার।
এবার কি বলবে? মুসা বললো।
এখনও বলবো গুপ্তপথ আছে। নইলে ঢোকার আর কোনো উপায় নেই। এসো, খুঁজে দেখি। বসে পড়ে দেয়ালে হাত রাখলো কিশোর। হাত বুলিয়ে দেখতে লাগলো, কোথাও বাধে কিনা, পাথরের কোনো কিনার বেরিয়ে আছে কিনা।
নেই। অন্যান্য খাঁজগুলোর মতোই বস্তার পেছনের চৌকোণা বড় পাথরটার কিনারে খাজ। অন্যগুলোর সঙ্গে কোনো তফাত নেই।
এই, এসো তো, ডাকলো কিশোর। সবাই ধাক্কা দাও।
জোরে ধাক্কা দিতেই সরে গেল পাথরটা, দরজার পাল্লার মতো বেরিয়ে পড়লো। কালো সুড়ঙ্গমুখ। টকার ধাক্কা দিচ্ছিলো এক কিনারে, আরেকটু হলেই হুমড়ি

খেয়ে পড়েছিলো সুড়ঙ্গের মধ্যে, যেভাবে হঠাৎ সরেছে পাথরটা।
তাহলে আমিই ঠিক! এতোক্ষণে হাসি ফুটলো গোয়েন্দাপ্রধানের মুখে। পুরনো এলাকা এটা, বাড়িঘর বেশির ভাগই পুরনো আমলের। আর এটা তো সবচেয়ে পুরনোগুলোর একটা। তখন লোকে এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়িতে সুড়ঙ্গ-যোগাযোগ রাখতো। বিশেষ করে হামফ্রে ওয়ালটারের মতো লোকেরা। আমার বিশ্বাস, এই সুড়ঙ্গ চলে গেছে একেবারে দুর্গটার নিচে। আর গেছে। ওয়ালটার লজের নিচ দিয়ে, কিংবা পাশ দিয়ে। এটা জানে ডেনার। রাতে এই পথ। দিয়েই চুরি করতে এসেছিলো। আর এমনি কপাল, একেবারে তার পথের মুখেই জিনিসগুলো রেখে দিলাম। আমি একটা গর্দভ! আরও ভালোমতো ভাবা উচিত ছিলো।
এখানে সুড়ঙ্গ রয়েছে জানার কথা নয় তোমার, রবিন বললো। একটা কথা ঠিকই বলেছে। ডেনারই কাজটা করেছে। ওয়ালটারদের ওখানে অনেক দিন কাজ করছে সে, সব কিছু তার চেনা, জানা। সুড়ঙ্গ যে আছে, জানে।
তাহলে এখনও দাঁড়িয়ে আছি কেন আমরা? বলে উঠলো মুসা। চলো না যাই। ও-ব্যাটা যেখান দিয়ে এসে নিয়ে গেছে, ওখান দিয়ে গিয়ে আমরা আবার ফেরত নিয়ে আসি।
গেলেই তো আর হলো না, জিনা বললো। নিয়ে গিয়ে কোথায় লুকিয়েছে কি করে জানবো? তবে, এই সুড়ঙ্গ কোথায় গেছে দেখতে আপত্তি নেই আমার।
বললে হয়তো যেতে দেবে না, তাই লিয়ারিকে কিছু জানালো না ওরা। ঘরে গিয়ে টর্চ নিয়ে এলো। ঢুকে পড়লো সুড়ঙ্গে।
গুপ্তদরজার কয়েক কদম পরেই সিঁড়ি পাওয়া গেল, নিচে নেমে গেছে। ওটা। দিয়ে নেমে সরু একটা গলিপথ পাওয়া গেল, দুধারে পাথরের দেয়াল, মাথার ওপরে পাথরের ছাত, মানুষের তৈরি।
এগিয়ে চলেছে ওরা। মনে হচ্ছে, ধীরে ধীরে নেমে গেছে পথটা। তবে এতো নিচেও পানি নেই, শুকনো।
আগে আগে চলেছে মুসা। হঠাৎ টর্চ নিভিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। তার গায়ের ওপর। এসে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়লো কিশোর। কি হলো?
শ শ শ! একটা শব্দ শুনলাম!
কয়েক মিনিট চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো ওরা। কিছুই ঘটলো না। কিন্তু মুসা যখন শুনেছে বলেছে, নিশ্চয় শুনেছে, ভুল হতে পারে না। তার শ্রবণশক্তি খুবই প্রখর।
চোখে সয়ে এলো অন্ধকার। সামনে আবছা আলো পড়লো এখন।
খোলা! বললো টকার। সুড়ঙ্গ শেষ নাকি…
চুপ? তাকে থামিয়ে দিলো কিশোর।

আরও কিছুক্ষণ পঁড়িয়ে থাকার পরও কিছুই ঘটলো না দেখে আবার এগোলো ওরা। খুব সাবধানে, পা টিপে টিপে। শুরুতে যেমন নেমেছিলো, এখন আবার উঠে যাচ্ছে পথটা। শেষ মাথায় পৌঁছে গেল। সুড়ঙ্গমুখ ঘিরে ঘন হয়ে জন্মেছে লতাপাতা, ঝোপ। ওগুলোর ফাঁক দিয়ে চোখে পড়লো উজ্জ্বল রোদ।
সাবধানে মাথা উঁচু করলো মুসা। আরি, ওয়ালটার লজ! ফিসফিস করে। বললো সে। ওই যে, বাংলোটা দেখতে পাচ্ছি।
পেছন থেকে কিশোরও মাথা উঁচু করে দেখলো।
এবার কি করবো? জানতে চাইলো মুসা। বেরোবো?
এক মিনিট, বললো কিশোর। দরজা-জানালা তো বন্ধ দেখা যাচ্ছে, অন্তত এদিকেরগুলো। দেখি, কেউ বেরোয় কিনা।
আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে, সুড়ঙ্গের ভেতর থেকে বললো টকার। বেরোও।
তার কথার জবাব দিলো না কেউ।
পুরো এক মিনিট চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে কিশোর বললো, হ্যাঁ, এবার বেরোনো যায়। শব্দ করবে না। ডেনার দেখে ফেললে হুঁশিয়ার হয়ে যাবে। বলা যায় না, বিপদেও ফেলে দিতে পারে।
বেরিয়ে এলো সবাই।
পুরো এলাকাটাই নির্জন, লাগছে। সুড়ঙ্গমুখের কাছে ঝোপের ভেতরে বসে রইলো ওরা। সময় কাটছে খুব ধীরে। কিশোর ভাবছে, নিশ্চয় গাছপালা পরিষ্কার করার সময় কোনোভাবে এই সুড়ঙ্গমুখ আবিষ্কার করে ফেলেছে ডেনার। হয়তো ডাক্তার ওয়ালটারও এ-সম্পর্কে কিছু জানেন না।
আরও কিছুক্ষণ কাটলো।
ঝোপ থেকে বেরোনোর নির্দেশ দিলো কিশোর।
বাড়িটার দিকে এগোলো ওরা। শান্ত, যেন ঘুমিয়ে রয়েছে বাংলো।
নেই কেউ, টকার বললো।
আস্তে বলো, বললো কিশোর। শুনে ফেলবে।
যদি থাকে, বললো জিনা।
থাকতেও পারে।
বাংলোর ধার ঘুরে একপাশে চলে এলো ওরা। খানিক দূরে. একটা ছোট। কটেজ দেখা গেল।
নিশ্চয় ওখানে থাকে ডেনার, কটেজটা দেখিয়ে বললো রবিন।
চলো, গিয়ে দেখি, কিশোর বললো। আছে কিনা।
কী? মুসার প্রশ্ন। গুপ্তধনগুলো?

না, ডেনার। আমার মনে হয় না। গুপ্তধন ঘরে রাখবে। ভয় আছে না? শেরিফ যদি গিয়ে খোঁজাখুঁজি করে?
যাবো? যদি দেখে ফেলে? দ্বিধা করছে মুসা।
নাথিং ভেনচার, নাথিং উইন। এরকম কাজ আর আগে কখনও করেনি টকার, খুব মজা পাচ্ছে। এর তুলনায় গাড়ি হওয়াটা অনেক পানসে মনে হচ্ছে এখন তার কাছে।
ঠিক, সায়, জানিয়ে বললো কিশোর। ঝুঁকি না নিলে জিতবো কিভাবে? আর, ফরচুন ফোভাব দা বোল্ড।
হয়েছে হয়েছে, দুহাত তুললো মুসা। ওসব তত্ত্বকথা শুনতে ভাল্লাগে না। চলো যাই।
কটেজের পেছনের ছোট বাগানে চলে এলো ওরা, বিন্দুমাত্র শব্দ করলো না। রাফিয়ানও একেবারে চুপ। টকারের কাঁধে বসা নটিও। কিভাবে যেন বুঝে গেছে, এখন জরুরী অবস্থা।
উঁকি দিয়ে দেখে এলো রবিন। ডেনার ব্যাটা আছে ঘরে! আরও একজন। আছে। কোন
দেখি তো, এগিয়ে গেল মুসা। কয়েক কদম এগিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে। এগোলো। থামলো গিয়ে নিচতলার একটা জানালার নিচে। তারপর ধীরে, খুব ধীরে মাথা তুললো।
অন্যেরাও একইরকম ভাবে গিয়ে থামলো তার পাশে। এক এক করে মাথা তুলতে লাগলো। ঘামছে দরদর করে, যতোটা না পরিশ্রমে, তার চেয়ে বেশি উত্তেজনায়। গরম তেমন নেই। ঝোপ থেকে যখন বেরিয়েছিলো; কড়া রোদ ছিলো। এখন নেই। যেন চোখের পলকে কোথা থেকে এসে উদয় হয়েছে কালো মেঘ, ঢেকে দিচ্ছে সূর্য।
বাইরের আলোর তুলনায় ঘরের ভেতরে অন্ধকার। আবছামতো দেখা যাচ্ছে দুজন মানুষকে। তবে ওদের চিনতে কোনো অসুবিধে হলো না ছেলেদের।
একজন ডেনার। অন্যজন সেই কালো-চুল তরুণ, নকল ড্যানি। একটা টেবিলের দুধারে বসেছে দুজনে। টেবিলের ওপর দুই বোতল বিয়ার। শান্ত কণ্ঠে কথা বলছে। নিজেদের আলোচনায় এতোই মগ্ন, ওদেরকে যে দেখছে পাঁচজোড়া চোখ, খেয়ালই করলো না।

.

আসার সময়, শেরিফের একজন লোককেও দেখোনি? আশ্চর্য! বললো ডেনার। এই একটু আগে এসেছিলো ওরা, কটেজে খুঁজে দেখতে। গাধার দল। খালিহাতে ফিরে গেছে। ওদের বোকামি দেখে হাসি পেয়েছিলো আমার।

চাচা, তুমি একটা জিনিয়াস, হেসে বললো তরুণ। নিশ্চয় তাজ্জব করে দিয়েছে ওদের। ওরা কল্পনাও করতে পারবে না, কোথায় লুকিয়েছো।

না তা পারবে না। তোমাকে তো আগেই বলেছি, কিছু করতে পারবে না।

তবে, এজন্যে ছেলেগুলোকেও ধন্যবাদ দেয়া দরকার। ওরাই তো খুঁজে পেয়েছে। আর এমন জায়গায় নিয়ে লুকিয়েছে...হাহ হাহ হা! যা-ই বলো, সেলারে না রেখে ঘরে রাখলে কিন্তু বের করে আনা মুশকিল হতো। বিচ্ছু একেকটা। সঙ্গে। বাঘের মতো এক কুত্তা। বানরটাও আস্ত বাঁদর। এক মুহূর্ত চুপ করলো। খুলে দেখেছো নাকি?

দেখেছি। চমকে গিয়েছিলাম একেবারে। এতো দামী দামী সব জিনিস।

কিন্তু চাচা, ওসব জিনিস বেচবে কোথায়? যে দেখবে সে-ই সন্দেহ করবে।

তুই কি ভাবছিস সেকথা ভাবিনি? ব্যবস্থাও করে ফেলেছি। হলিউডে একটা লোক আছে, চোরাই মালের ব্যবসা করে। তার নাম লিংকার। আমার পুরনো দোস্ত। ওর কাছে নিয়ে গেলেই ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তবে তাড়াহুড়ো নেই। আর তাড়াহুড়ো করা উচিতও হবে না। শেরিফ কিছুদিন কড়া নজর রাখবে আমার ওপর। পরিস্থিতি এখন গরম, ঠাণ্ডা হয়ে নিক, তারপর ধীরেসুস্থে তুলে নেবো। এখন যেখানে আছে সেখানেই নিরাপদ, থাক।

সফল হবো তো, চাচা?

এখনও তোর সন্দেহ আছে নাকি, ডজ?

এরপর আর বিশেষ কোনো কথা হলো না। নীরবে বিয়ার খেয়ে চললো দুজনে। এক সময় উঠে বেরিয়ে গেল ডজ। মোটর সাইকেলের এঞ্জিন স্টার্ট নেয়ার। শব্দ হলো। পথের দিকে আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল আওয়াজ।

মাথা নিচু করে ফেললো ছেলেরা। একে অন্যের দিকে তাকালো। অল্প সময়ে অনেক কথা জেনে ফেলেছে। শেরিফ এসেছিলেন, ডেনারের কটেজ খুঁজে বিফল হয়ে ফিরে গেছেন, কিছু পাওয়া যায়নি। আর ড্যানি সেজে যে গিয়েছিলো, তার আসল নাম ডজ, ডেনারের ভাইপো। চাচা-ভাতিজা মিলে গুপ্তধনগুলো চুরি করেছে। তৃতীয় আরেক লোক, লিংকারের মাধ্যমে ওগুলো বিক্রি করবে। তবে সেটা কয়েকদিন পর। তারমানে গোয়েন্দাদের হাতে সময় আছে। খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে পারবে।

কিন্তু আসল কথাটাই জানা যায়নি। ডেনবার একবারও বলেনি, গুপ্তধনগুলো কোথায় লুকিয়েছে।

আর এখানে থেকে কোনো লাভ নেই। ডেনার দেখে ফেললে বিপদে পড়বে। লিয়ারি কটেজে ফিরে চললো ওরা।

ওয়ালটার লজের সীমানার বাইরে চলে এলো।

ডাক্তার ওয়ালটার থাকলে সুবিধে হতো এখন, জিনা বললো। আজকালের মধ্যে চলে এলেও ইতো। তাকে বলতে পারতাম।
কি আর হতো? রবিন হাত নাড়লো। যা জেনেছি, শেরিফকে গিয়েও তো বলা যায়। কিন্তু লাভটা কি হবে?
ঠিকই বলেছো, চিন্তিত মনে হচ্ছে গোয়েন্দাপ্রধানকে। বড় জোর আবার ধরে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করবেন ডেনারকে। ডেনার অস্বীকার করবে। তাতে আরও ক্ষতি হবে। আবারও হুঁশিয়ার হয়ে যাবে সে। গুপ্তধন নিয়ে পালিয়ে যাবে। নাহ, খুঁজে বের করার চেষ্টা আমাদেরকেই করতে হবে।...আমার ধারণা, ওয়ালটার লজের কাছাকাছি কোথাও লুকানো হয়েছে ওগুলো। বেশি দূরে রাখেনি ডেনার। আর এ-রকম সাধারণ চোরেরা যা করে, তা-ই করবে। মাঝে মাঝেই দেখতে যাবে, ঠিকমতো আছে কিনা জিনিসগুলো। এখন আমাদের প্রধান কাজ হলো ওঁর ওপর চোখ রাখা। ও-ই পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে আমাদেকে।
বেশ,মুসা বললো। কাল থেকে তাহলে তা-ই করা যাবে।
পরদিনও ডাক্তার ওয়ালটার ফিরলেন না। তিনি থাকলে সুবিধে হতো, ছেলেদের। তার অনুমতি নিয়ে সহজেই খুঁজতে পারতো ওয়ালটার লজ.আর আশপাশের এলাকায়। অনধিকার প্রবেশের দায় এড়াতে পারতো।
ওয়ালটার লজে ঢুকলো না ওরা। ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পালা করে চোখ রাখতে লাগলো ডেনারের কটেজের ওপর। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত রাখে, রাতে বাদ।
কিন্তু লোকটার দৈনন্দিন কাজ বড় একঘেয়ে। ওয়ালটার লজের সীমানার বাইরেই যায় না, শুধু বাজার করা ছাড়া। হয় ঘরে বসে থাকে, নয়তো বাগানের লতাপাতা ঘাস সাফ করে।
দুদিন কাটলো এভাবে।
কিশোর এখন বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছে, কটেজের ভেতরে বা বাইরে খুব কাছেই কোথাও গুপ্তধন লুকিয়েছে ডেনার। শেরিফের লোক জায়গামতো খুঁজতে পারেনি, তাই পায়নি।
কিশোরের সঙ্গে একমত হলো অন্যেরাও। নইলে কটেজ থেকে দূরে পারতপক্ষে যায় না কেন ডেনার? আসলে, কুকুর যেমন হাড় পাহারা দেয়, লোকটাও জিনিসগুলো পাহারা দিচ্ছে কাছে কাছে থেকে।
নাহ্, এভাবে চলতে পারে না, তৃতীয়দিন বললো কিশোর।
কিছু একটা করা দরকার। আজ ডেনার, বাজারে গেলেই ঢুকবো। আমরা আবার তার কটেজে খুঁজে দেখবো।
যদি ধরা পড়ি? মুসা প্রশ্ন তুললো।

পড়লে কি করবে? সে নিজেই এখন শেরিফের ভয়ে অস্থির। বেশি বাড়াবাড়ি করলে বলবো, আমরা সব জানি। চুপ হয়ে যাবে।
বললো বটে কিশোর, কিন্তু কথাটা তার নিজেরই পছন্দ হলো না। সত্যি কি চুপ হবে? ওরকম একজন লোক, এতোগুলো দামী জিনিসের জন্যে বেপরোয়া হয়ে উঠতে পারে। হয়তো আগ্নেয়াস্ত্র রয়েছে তার কাছে, কে জানে!
কিন্তু পরিকল্পনায় অটল রইলো কিশোর।
সুযোগ মিললো সেদিন বিকেলেই। ওয়ালটার লজের এক প্রান্তের লনের ঘাস ছাঁটতে গেল ডেনার। অনেকক্ষণ লাগবে কাজ করতে। সোজা তার কটেজের দিকে এগিয়ে গেল ছেলেমেয়েরা।
ঢুকতে অসুবিধে হলো না। নিচতলার একটা জানালা খোলা। চৌকাঠ ডিঙিয়ে টপাটপ ভেতরে ঢুকে পড়লো ওরা।
অনেক খোঁজাখুঁজি করলো। কিছুই পেলো না।
জোরে নিঃশ্বাস ফেলে বললো মুসা, পাবো কি? শেরিফের লোকেরা ট্রেনিং পাওয়া, চোরাই জিনিস কিভাবে খুঁজতে হয় ভালো করেই জানে। তারা যখন পায়নি, আমাদের আশা করাটাই বোকামি হয়েছে।
কিশোর, রবিন জিজ্ঞেস করলো। কিছু বলবে?
আমার এখনও বিশ্বাস, ধারেকাছেই কোথাও রয়েছে ওগুলো। কটেজের ওধারে ছোট ছোট দুটো ঘর আছে না, ওগুলোতেও খুঁজতে হবে...
থেমে গেল কিশোর। পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে।
নিশ্চয়ই ডেনার! কাঁপা গলায় বললো জিনা।
উঁকি দিয়ে দেখার জন্যে পা বাড়ালো টকার, তাকে আটকালো কিশোর। দ্রুত। একবার সারা ঘরে চোখ বোলালো, ওদের কোনো চিহ্ন ফেলে যাচ্ছে কিনা। দেখলো। তারপর সবাইকে নিয়ে আবার নিঃশব্দে জানালা দিয়ে বেরিয়ে এলো বাইরে।
ওরা বেরোতে আর সামান্য, দেরি করলেই ধরা পড়ে যেতো। ডেনারই আসছে।
ফেরার পথে ছোট একটা পশুচারণভূমিতে, একটা ওক গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিতে বসলো ওরা।
নিরাশ হলে চলবে না, বললো কিশোর। কাল আবার খুঁজতে যাবো। আমি শিওর, দুর্গ আর লজের তলায় আরও সুড়ঙ্গ আছে। ওরকম কোনোটাতেই গুপ্তধন লুকিয়েছে ডেনার।
পরদিন আবার গেল ওরা। ওয়ালটার লজে পাতাবাহারের বেড়া ছাঁটতে ব্যস্ত ডেনার। সেদিন আর তার কটেজে ঢুকলো না ওরা। বাগান, আর বাগানের কাছের। ছড়ানো চত্বরে খুঁজতে লাগলো। একটা ছাউনি দেখা গেল, সামনের

দিকে দেয়াল নেই। খোলা। ওটা লুকানোর জায়গা নয়। তবু তার ভেতরে খুঁজে দেখা হলো।
ছাউনি থেকে বেরিয়ে আরেকটা ছোট ছাউনিমতো দেখতে পেলো। ভেতরে পাথরে তৈরি কাপড় ধোয়ার জায়গা। জায়গাটাকে ঘিরে দেয়া হয়েছে ফুটখানেক উঁচু পাথরের দেয়াল দিয়ে।
পায়ে পায়ে সেদিকে এগোলো কিশোর। প্রত্যেকটা পাথর খুঁটিয়ে দেখলো। তারপর হাত নেড়ে ডাকলো, এই দেখে যাও।
প্রায় ছুটে এলো সবাই।
এই পাথরটা সরাতে হবে।
নিচে কিছু আছে ভাবছো? জিজ্ঞেস করলো মুসা।
দেখাই যাক না সরিয়ে।
সবাই হাত লাগালো। সহজেই সরিয়ে ফেললো পাথরটা। পুরনো মরচে ধরা, একটা হ্যাঁণ্ডেল দেখা গেল। ওটা ধরে টানতেই কাজ করলো পুরনো মেকানিজম, কাপড় ধোয়ার জায়গাটার ওপর থেকে সরে গেল একটা বড় পাথর। বেরিয়ে পড়লো একটা গহ্বর। আরেকটা সুড়ঙ্গমুখ? নাকি কুয়া? কিন্তু কুয়ার ওপর এই বিশেষ ব্যবস্থায় ঢাকনা লাগাতে যাবে কেন?
নিশ্চয় সুড়ঙ্গ, অন্ধকারে গর্তটার ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখলো কিশোর। চলো, নেমে দেখি।
দরকার পড়তে পারে। তাই টর্চ সঙ্গেই এনেছে ওরা।
হ্যাঁ, সুড়ঙ্গই। সিঁড়িও আছে। একে একে নেমে পড়লো সবাই। রাফিয়ান নামলো জিনার পেছনে। কিশোর রয়েছে আগে।
সিঁড়ির পাশে দেয়ালে একটা লেভার দেখা গেল। কিসের লেভার? ওপরের পাথরের ঢাকনাটা নিচ থেকে বন্ধ করার?–ভাবলো কিশোর। চাপ দিলো। সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল ওপরের ঢাকনা। উল্টো দিকে চাপ দিতেই খুলে গেল আবার।
ঠিক এই সময় শোনা গেল ভারি জুতোর আওয়াজ। এদিকেই আসছে।
তাড়াতাড়ি লেভার চেপে আবার ঢাকনা বন্ধ করে দিলো কিশোর। নিশ্চয় ডেনার। আমাদের দেখেছে বলে মনে হয় না। এখন এখানে এসে না ঢুকলেই বাঁচি।
ডেনারের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলো না ওরা। সে দেখে ফেলবে, আগেই লুকানোর একটা জায়গা খুঁজে বের করার জন্যে সুড়ঙ্গ ধরে আগে বড়িলো, দ্রুত।
দুরুদুরু করছে সবার বুক। কিশোরের পেছনে রয়েছে রবিন, তার পেছনে টকার আর তার কাঁধে নটি। মুসা রয়েছে তার পেছনে। সবার পেছন জিনা আর রাফিয়ান।

অসমতল, এবড়ো-খেবড়ো মেঝে। মাঝে মাঝে চোখা পাথর বেরিয়ে আছে। সাবধানে এগোতে হচ্ছে, নইলে হোঁচট খেয়ে পড়ার সম্ভাবনা।
সামনে মোড় নিয়েছে সুড়ঙ্গ। ওখানে এসে থামলো ওরা। কান পাতলো। ।
না, কিছু শোনা যাচ্ছে না, জোরে কথা বলতে ভয় পাচ্ছে মুসা। নীরব সুড়ঙ্গের দেয়ালে প্রতিহত হয়ে ফিসফিসানিই হয়ে উঠলো অনেক জোরালো।
কিন্তু মুসার সঙ্গে একমত হতে পারলো না যেন রাফিয়ান। কান খাড়া করে রেখেছে। মৃদু গরগর করছে।
রাফিয়ানই ঠিক। অতি মৃদু একটা শব্দ কানে এলো ওদের।
পাথর সরাচ্ছে! বলে উঠলো টকার।
জলদি! বলেই প্রায় দৌড় দিলো কিশোর।
এখানে ডেনার তাদেরকে দেখে ফেললে কি করবে বলা যায় না। হয়তো কিছুই করবে না, কিন্তু সন্দিহান হয়ে উঠবে। তাহলেও ওদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। গুপ্তধন সরিয়ে ফেলবে ডেনার–যদি এই সুড়ঙ্গের কোথাও থেকে থাকে। হয়তো নিয়ে পালাতেও পারে আগেভাগেই।
সকলের পাশ কাটিয়ে আগে চলে এলো রাফিয়ান। মাটিতে গন্ধ শুকে এঁকে এগোলো। কোনো বিপদ থাকলে তার নাকে ধরা পড়বে।
পেছনে এগিয়ে আসছে ভারি জুতোর শব্দ। দ্রুত। এই সুড়ঙ্গ ডেনারের চেনা, কাজেই তাড়াতাড়ি চলতে তার কোনো দ্বিধা নেই। অসুবিধেও হচ্ছে না। এই হারে এগিয়ে এলে কিছুক্ষণের মধ্যেই ওদের কাছে চলে আসবে।
হঠাৎ থেমে গেল গোয়েন্দারা। ছোট গোল একটা গুহায় ঢুকেছে। মেঝেতে পাথরের ছড়াছড়ি। গুহার অন্য ধারের দেয়ালের ওপাশে আবার রয়েছে সুড়ঙ্গ। মাঝখানের পথ রুদ্ধ। লোহার পাল্লা, মোটা মোটা শিক।
পেছনে যাওয়ার উপায় নেই, সামনেও দরজা বন্ধ। ফাঁদে আটকা পড়লো ওঁরা!
গোঁ গোঁ করে উঠলো রাফিয়ান। পাগলের মতো এদিক ওদিক তাকালো টকার, জিনা আর মুসা। লুকানোর জায়গা খুঁজছে। রবিনের স্নায়ুর জোর ওদের চেয়ে বেশি। আর কিশোর একেবারে শান্ত। সহজে মাথা গরম হয় না তার। একগাদা পুরনো বস্তা অযতে ফেলে রাখা হয়েছে এককোণে, সেদিকে তাকিয়ে রয়েছে সে।
কুইক! বললো আচমকা। ওগুলোর তলায়ই লুকাতে হবে।
ছুটে গেল সবাই। রাফিয়ানকে শুইয়ে বস্তা দিয়ে ঢেকে দিলো জিনা। এক এক করে সবাই শুয়ে পড়লো, গায়ের ওপর টেনে দিলো বস্তা। চুপ করে অনড় পড়ে রইলো। পারলে নিঃশ্বাসও বন্ধ করে রাখতে চায়। টর্চ নিভিয়ে দিয়েছে। ফলে গাঢ় অন্ধকার গুহার ভেতরে।

স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে ডেনারের জুতোর শব্দ। খানিক পরেই গুহায় ঢুকলো। বস্তার তলা থেকেও তার হাতের লণ্ঠনের আলো দেখতে পেলো ওরা।
এদিকে তাকাবে না তো ব্যাটা! মুসা ভাবলো। তাহলে যা থাকে কপালে, পাথর দিয়ে মারবো মাথায় বাড়ি!
তবে বাড়ি আর মারতে হলো না তাকে। হয় এদিকে তাকালোই না ডেনার, কিংবা তাকালেও বুঝলো না যে কেউ লুকিয়ে রয়েছে।
থেমে গেল পায়ের শব্দ। নিশ্চয় পাল্লার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ডেনার। আপন, মনেই কথা বললো, বুদ্ধি ছিলো হামফ্রে ব্যাটার। এমনভাবে লাগিয়েছে, বোঝার উপায় নেই। হা-হাহ!
ক্লিক করে শব্দ হলো। ছেলেরা বুঝলো, দরজা খুলছে ডেনার। কিচকিচ আওয়াজ হলো, খুব সামান্য। কজাগুলোয় তেল দিয়ে রেখেছে হয়তো ডেনার।
আস্তে করে বস্তার একটা কোণ তুলে তাকালো কিশোর। এদিকে পেছন করে রয়েছে কেয়ারটেকার। পাল্লা খুলে গেছে। লণ্ঠন হাতে সুড়ঙ্গের ভেতরে ঢুকে গেল লোকটা।
এবার কি করবো? ফিসফিসিয়ে বললো মুসা। উঠে দৌড় দেবো?
না, নিষেধ করলো কিশোর। কাছেই রয়েছে ডেনার। শুনে ফেলবে। কান। পেতে শুনলো এক মুহূর্ত। আমার মনে হয়, গুপ্তধনগুলো দেখতে গেছে সে। দেখে চলে যাবে। তখন আমরা গিয়ে খুঁজে বের করে ফেলবো।
কিন্তু ডেনার আর আসে না।
ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে ওরা। পুরনো বস্তা, ধুলোময়লার নিচে শ্বাস নিতেও কষ্ট হয়। সময় যেন আর কাটতে চাইছে না। দুত্তোর! বলে উঠে পড়তে যাচ্ছিলো। মুসা, এই সময় শোনা গেল পাল্লা খোলার শব্দ।
নিজে নিজে কথা বলতে বলতে বেরিয়ে এলো ডেনার। হাহ হা, কি চমৎকার! সোনার মোহর! বড় লোক হয়ে যাবে তুমি, মিস্টার ডেনার। হোহ হহ!!
ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল তার পায়ের আওয়াজ।
আরও কয়েক মিনিট অপেক্ষা করলো কিশোর। তারপর বস্তা সরিয়ে উঠে বসলো। শুনলে তো কি বললো? সোনার মোহর। এখানেই কোথাও লুকিয়েছে।
বস্তার নিচ থেকে বেরিয়ে এলো সবাই। মুখে কাপড়ে লেগে থাকা ধুলো ঝাড়লো। বার কয়েক লাফঝাঁপ দিয়ে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করে নিলো। রাফিয়ান। বানরটাও নাচলো তার সঙ্গে।
এই, থামাও ওকে, টকারকে বললো কিশোর। বেশি শব্দ করছে। কোত্থেকে আবার শুনে ফেলে ডেনার...হ্যাঁ, যা বলছিলাম, এখানেই আছি। ওটার ভেতরে, পাল্লাটা দেখালো সে। লেভার-টেভার কিছু নিশ্চয় আছে।

খুঁজতে শুরু করলো সবাই।
রবিনের আঙুলে লাগলো জিনিসটা। গোল একটা বোতামের মতো, পাল্লার পাশেই। জোরে চাপ দিতেই কিচকিচ করে খুলে গেল পাল্লাটা।
পাল্লার পরে সুড়ঙ্গ আর বেশি নেই। শেষ মাথায় খোলা। না, ঠিক খোলাও বলা চলে না। গোল মুখটা শেষ হয়েছে একটা কুয়ার দেয়ালে। বোধহয় মাঝামাঝি জায়গায়। ওপরের দিকে অনেক খানি উঠে গেছে সিলিণ্ডারের মতো গোল দেয়াল, নিচেও নেমে গেছে। কয়েক ফুট নিচে পানি।
কুয়া আর পাল্লার মাঝেই কোথাও লুকিয়েছে, মুসা বললো। এসো, খুঁজি।
নিরাশ হতে হলো। যদিও সুড়ঙ্গের কোনো গর্ত, খাজ, ফাটল বাদ দিলো না। কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না গুপ্তধনের বাক্সটা।;
কোথায় রাখলো? বিড়বিড় করলো রবিন। দেখবো নাকি আরেকবার খুঁজে?
খোঁজা হলো আরেকবার। পাওয়া তো গেলই না, বরং একটা বিপদ বাধিয়ে বসলো টকার। হোঁচট খেয়ে গিয়ে পড়লো; পাল্লার ওপর। ধাক্কা লেগে বন্ধ হয়ে গেল ওটা। এহহে, দিলাম তো সর্বনাশ করে!
গুপ্তধন খোঁজা বাদ দিয়ে এখন পাল্লা খোলা নিয়েই ব্যস্ত হলো সবাই। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও এপাশে কোনো বোতাম বা লেভার পাওয়া গেল না। নেইই। বোধহয়। শিক ধরে জোরে টানাটানি করে দেখলো। নড়লোও না মজবুত পাল্লা। শিরের ভেতর দিয়ে হাত ঢুকিয়ে দিলো মুসা–তার হাত আর সবার চেয়ে লম্বা পাল্লার পাশের বোতামটা ধরার চেষ্টা করলো। নাগাল পেলো না। শেষে শিকের ফাঁক দিয়ে নটিকে ওপাশে ঠেলে বের করে দিলো টকার। ইশারায় বোঝালো, কি করে বোতামটা টিপতে হবে।
নির্দেশ মতোই কাজ করলো বানরটা। কিন্তু তার শক্তিতে কুলালো না। টিপে নামাতে পারলো না বোতাম।
আরেকবার শিক ধরে টানা হলো, ঝাঁকি দিয়ে দেখা হলো, বৃথা চেষ্টা। বন্ধই রইলো পাল্লা।
হয়েছে, আর, শক্তি খরচ করে লাভ নেই, অবশেষে বললো কিশোর। খুলবে।
ভালো জায়গায়ই আটকা পড়লাম! বললো মুসা। কেউ জানে না আমরা। এখানে আছি। সাহায্য করতে পারবে না।
নিচের ঠোঁটে জোরে জোরে কয়েকবার চিমটি কাটলো কিশোর। তারপর ঘুরে এগিয়ে চললো কুয়ার দিকে। সুড়ঙ্গের মুখে এসে থামলো। ঝুঁকে টর্চের আলো ফেললো পানিতে। কালো পানি। বোঝা গেল না, কতোখানি গভীর। যতোখানিই হোক, ওখান দিয়ে বেরোনোর পথ নিশ্চয় নেই। ওপর দিকে টর্চের মুখ ঘোরালো। দেখা গেল না কিছু। শেষ মাথায় পৌঁছলোই না ছোট টর্চের আলোকরশ্মি। নিভিয়ে

দিলো টর্চ। দাঁড়িয়ে রইলো চুপচাপ। চোখে অন্ধকার সয়ে এলে দেখলো, অনেক ওপরে আবছামতো আলো দেখা যাচ্ছে।
গুড, বললো সে। কুয়ার মাথায় ঢাকনা, ফাঁক দিয়ে আলো আসছে। উঠে যেতে পারলে, হয়তো ঠেলে সরিয়ে ফেলা যাবে।
কিভাবে উঠবো? গলা কাঁপছে টকারের। ভীষণ ভয় পেয়েছে। জীবনে এরকম অবস্থায় আর পড়েনি। নিজেকে দোষারোপ করছে মনে মনে।
কিভাবে যাবো? বলতে বলতেই আবার টর্চ জ্বাললো কিশোর। কুয়ার দেয়ালে আলো ফেলে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখলো। ওই যে, লোহার আঙটা লাগানো, রয়েছে। ওঠানামা করার জন্যেই। একধরনের মই। বেয়ে উঠে যাবো।
যদি খসে পড়ে যায়? জিনা বললো।
পানিতে পড়বো। তাতে মরবো না। এখানে বসে থেকে তো লাভ নেই। চেষ্টা করা দরকার।
দাঁড়াও, মুসা বললো। আমি আগে দেখি। আমার ভার সইলে সবারই সইবে। একটা আঙটা ধরে হ্যাঁচকা টান দিলো সে। কিছু হলো না। ঝুলে পড়লো। তাতেও কিছু হলো না। খুব শক্ত করে গাঁথা হয়েছে পাথরের দেয়ালে।
আঙটা ধরে ধরে বেয়ে উঠে যেতে লাগলো মুসা। নিচ থেকে আলো ধরে রাখলো অন্যেরা। ওপরে উঠে দেখলো কাঠের ঢাকনা দিয়ে বন্ধ করা হয়েছে কুয়ার মুখ। নিচ থেকে হাত বাড়িয়ে ঠেলা দিতেই নড়ে উঠলো। সরিয়ে ফেলতে পারলো সহজেই।
বেরিয়ে এলো মুসা। ওয়ালটার লজের বাগানে বেরিয়েছে। একপলক দেখেই চিনলো জায়গাটা। কাছেই দেখা গেল সেই ঝোপটা, যার ভেতরে রয়েছে আরেকটা সুড়ঙ্গমুখ, যেটা দিয়ে সেদিন বেরিয়েছিলো।
কুয়ার দেয়ালে হাতের ভর রেখে ঝুঁকে ডাকলো, এই, উঠে এসো তোমরা।
এক এক করে উঠে এলো টকার-কাঁধে নটি, জিনা, রবিন, কিশোর। রাফিয়ান রয়ে গেছে নিচে। সে মই বাইতে পারে না। এতো ভারি, তাকে বয়ে আনাও সম্ভব হয়নি।
নিচে চেয়ে চেঁচিয়ে জিনা বললো, রাফি, তুই থাক ওখানে। আমরা দড়ি নিয়ে আসছি।
ঘাউ করে জবাব দিলো রাফিয়ান।
ডেনারকে কোথাও দেখা গেল না। লজের একটা ছাউনির ভেতরেই পাওয়া। গেল দড়ির বাণ্ডিল।
ওটার একমাথা কোমরে বেঁধে আবার নিচে নেমে গেল মুসা। রাফিয়ানের কোমরে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বেঁধে দিয়ে উঠে এলো। তারপর সবাই মিলে দড়ি টেনে তুলে

আনলো ভারি কুকুরটাকে।
কুণ্ডলি পাকিয়ে দড়িটা আবার আগের জায়গায় আগের মতো করে রেখে দিয়ে কটেজে ফিরে চললো ওরা।
অনেক কিছু দেখেছে, অনেক কষ্ট করেছে, কিন্তু গুপ্তধন পাওয়া যায়নি। আরও খুঁজতে হবে। কাজটা পরের দিনের জন্যে স্থগিত রাখা হলো। কিশোরের। এখনও ধারণা, কুয়ার কাছাকাছিই কোথাও আছে ওগুলো। সুড়ঙ্গে নেই, এ ব্যাপারে শিওর। তাহলে কোথায়? পানিতে নয় তো!
দিনের বেলা যাওয়া আর ঠিক হবে না। ডেনারের চোখে পড়ে যেতে পারে। সন্ধ্যার পর বেরোনোর সিদ্ধান্ত নিলো সে। কাজেই, রাতের খাওয়া শেষ করেই সাইকেল বের করলো। লিয়ারিকে বললো, ঘুরতে যাচ্ছে। এ ওয়ালটার লজে পৌঁছে পাশের ছোট গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকলো। সাইকেলগুলো ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে সোজা চললো কুয়ার পাড়ে। সঙ্গে করে আজ বড় টর্চ এনেছে, আর শক্ত মোটা দড়ি।
দড়ির একমাথা কোমরে পেঁচিয়ে বাঁধলো কিশোর। কোনোরকম ঝুঁকি নিতে চায় না। বলা যায় না, পুরনো আঙটা বেশি ব্যবহারে খসে যেতে পারে। দড়ির। আরেক মাথা বাঁধলো একটা গাছের সঙ্গে। তারপর সবাইকে ওপরে থাকতে বলে নামতে শুরু করলো।
পানির কাছাকাছি এসে থামলো। পকেট থেকে একটা পাথর বের করে ছেড়ে দিলো। টুপ করে ডুবে গেল পাথরটা। পাথরের সঙ্গে সুতো বাঁধা। খুব সামান্যই ছাড়তে হলো। তারমানে পানি বেশি নেই।
গুড! আনমনে বললো কিশোর! আঙটা ধরে ধরে আবার নামতে শুরু করলো। পানির নিচে তিন আঙটা নামতেই হাতে লাগলো কি যেন। ধরে দেখলো, দড়ি। পানিতে তার কোমর পর্যন্ত ডুবেছে। ওই অবস্থায় থেকেই এক হাতে টান দিলো দড়িতে। ভারি লাগলো। টেনে তুলতে লাগলো।
দড়ির মাথা বাঁধা বাক্সটা একনজর দেখেই চিনতে পারলো। তার অনুমান। ঠিক। পানিতেই লুকিয়ে রেখেছে।
নিচে থেকেই চেঁচিয়ে বললো কিশোর, এইই, পেয়েছি! পেয়েছি!
ওপর থেকে শোনা গেল উল্লসিত চিৎকার।
উঠে আসছি, আবার বললো কিশোর।
উঠতে উঠতে মাঝপথে এসে একবার রাফিয়ানের উত্তেজিত চিৎকার শুনতে পেলো কিশোর। ছেলেদের আনন্দে যোগ দিয়েছে হয়তো কুকুরটা, ভাবলো সে। এক হাতে বাক্স নিয়ে আঙটার মই বেয়ে উঠতে পারবে না। তাই কোমরের দড়ি খুলে বাক্সের দড়ির সঙ্গে বেঁধে রেখে এসেছে। ওপরে উঠে টেনে তুলবে।

কুয়ার বাইরে মাথা তুলেই স্থির হয়ে গেল কিশোর। ও, এজন্যেই হঠাৎ সবাই এতো চুপচাপ হয়ে গিয়েছে। পাশাপাশি এক সারিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে মুসা, রবিন, টকার, জিনা। রাফিয়ানের কলার চেপে ধরে রেখেছে জিনা। নটি চুপ করে বসে। আছে টকারের কাঁধে। ওদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রয়েছে ডেনার আর তার ভাইপো ডজ। ডেনারের হাতে একটা দোনলা শটগান।

.

উঠে এসো! কড়া গলায় আদেশ দিলো ডেনার।

মুসার পাশে এসে দাঁড়ালো কিশোর।

দড়ি ধরে টেনে দেখলো ভজ। ভারি লাগলো। চাচা, বাক্সটা মনে হচ্ছে ঠিকই আছে। ওটার সঙ্গে বেঁধে রেখে এসেছে। ভারি বজ্জাত ছেলে।

আমাদের ছাড়বে না ওরা, ভাবলো কিশোর, নিজের অজান্তেই কেঁপে উঠলো। একবার। ছাড়লেই গিয়ে যদি শেরিফকে বলে দিই? আর তাই তো করবো!

তার দিকে ফিরলো রবিন। সে-ও একই কথা ভাবছে। আমাদেরকে এখন কি, করবে ওরা? মেরে কুয়ায় ফেলে দিলে কেউ খুঁজে পাবে না।

অনেক দেরিতে আফসোস হলো কিশোরের, বাড়াবাড়িটা সে-ই বেশি। করেছে। অন্যদের বিপদে ফেলার জন্যে সে-ই দায়ী।

চাপা গলায় গর্জাতে শুরু করলো রাফিয়ান।

চুপ, রাফি! তাড়াতাড়ি কুকুরটার মাথায় চাপড় দিয়ে তাকে শান্ত করার চেষ্টা করলো জিনা। ভয়, যদি রেগে গিয়ে গুলি করে ডেনার?

কথা মানলো রাফিয়ান।

গায়ে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে এলো ছেলেরা।

ঠিকই আছে, চাচা, বাক্সটা কিছুদূর তুলে টর্চের আলো ফেলে দেখে বললো ডজ। খোলার সময় পায়নি মনে হচ্ছে। আবার বাক্সটা পানিতে নামিয়ে ওপর থেকে দড়ি কেটে দিলো সে। ঘুরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো, বিচ্ছুগুলোকে কি করা? ছেড়ে দেয়া তো যাবে না।

না। সর্বনাশ করে ফেলবে তাহলে। প্ল্যান বদলাতে হবে আমাদের। ওদের সরিয়ে দিয়ে…

সরিয়ে দিয়ে মানে? বন্দি করে রেখে?

থরথর করে কাঁপছে টকার তাকে সাহস দিয়ে মুসা বললো, আরে ভয়ের কি আছে? ব্যাটারা ছিঁচকে চোর, ডাকাত হওয়ার সাহস নেই।

এই, চুপ! ধমক দিলো ডেনার। বন্দুকটা ওদের দিকে ধরে রেখে ভাইপোর সঙ্গে আলোচনা শুরু করলো।

আমি বলি কি, চলো আজই পালিয়ে যাই, পরামর্শ দিলো ডজ।

তা করা যাবে না। লিংকার এখন হলিউডে নেই। আসবে আরও দুদিন পর, খবর নিয়েছিলাম। এই বিচ্ছগুলো দেখে ফেলায়ই যতো গণ্ডগোল হলো। হলিউডে। মাল দিয়েই পালাতে হবে। নইলে ধরে ফেলবে পুলিশ। ..

দুদিন এখানে বসে থাকলেও ধরে ফেলবে। এগুলোকে ছাড়লেই সোজা চলে যাবে শেরিফের কাছে।

ছাড়ছে কে? আটকে রাখবো।

কিন্তু কোথায়? রাতে ওরা না ফিরলেই হৈ-চৈ শুরু করবে লিয়ারি। শেরিফ খুঁজতে আসবে এখানে। তোমার কটেজে রাখা যাবে না, বাংলোতেও না। তাছাড়া ডাক্তাররাও এসে পড়তে পারে যে কোনো দিন।

চুপ করে আছে ডেনার। ভাবছে।

চাচা, পেয়েছি। তুড়ি বাজিয়ে বলে উঠলো ডজ। সেদিন মোটর সাইকেল নিয়ে ঘুরছিলাম। সী-বীচ থেকে কিছু দূরে একটা ছোট দ্বীপ দেখেছি। দেখেই বোঝা যায়, লোক থাকে না-ওখানে। ভাঙাচোরা দুর্গও আছে। এদেরকে ওখানে নিয়ে গিয়ে রেখে আসতে পারি। কিছু খাবার আর কম্বল দিয়ে এলেই হবে. মরবে না। তারপর লিংকার এলে মাল নিয়ে চলে যাবো আমরা। যাওয়ার আগে ফোন করে লিয়ারিকে বলে যাবো, ওরা কোথায় আছে। আইডিয়াটা কেমন?

ভালো, একমত হলো ডেনার। ওয়ালটারদের বোটটা নিয়েই যেতে পারবো। চলো। এই, এসো তোমরা।

আদেশ পালন করা ছাড়া উপায় নেই। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দৌড় দেয়ার কথা ভাবলো কিশোর; সঙ্গে সঙ্গেই বাতিল করে দিলো চিন্তাটা। বেপরোয়া হয়ে আছে এখন ডেনার। নির্দ্বিধায় গুলি চালাবে।

চলতে চলতে থেমে গেল ডেনার। ডিজ, ভুল করছি না তো? হুট করে কিছু করা উচিত হবে না। চলো, কটেজে চলো আগে। আরও ভেবে দেখি, কি করা যায়...

ছেলেদেরকে কটেজে নিয়ে আসা হলো। দরজা-জানালা সব বন্ধ করে দিয়ে আলোচনায় বসলো চাচা-ভাতিজা।

প্রথমেই ধরো লিয়ারির কথা, ডেনার বললো। রাতে ছেলেদের ফিরতে না দেখলেই অস্থির হয়ে উঠবে। শিওর, শেরিফকে ফোন করবে।

ঠিকই বলেছো, মাথা ঝাঁকালো ডজ। তাহলে?

বুড়িটাকে বোঝাতে হবে, ছেলেদের কোনো বিপদ হয়নি। ইয়ে করো, দড়ি দিয়ে ওদের হাত পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলো আগে।

বন্দুক ধরে রইলো ডেনার, দ্রুত কাজ সারলো ডজ। রাগে দাঁতে দাঁত চাপলো জিনা, গালও দিলো। কিন্তু ডজ শুধু হাসলো। কেয়ারই করলো না।

ইহ, ধরে রাখতে রাখতে হাত ব্যথা হয়ে গেছে, বন্দুকটা নামালো ডেনার। নাও, এটা ধরো। আমি আসছি।
কোথায় যাচ্ছো?
লিয়ারিকে ফোন করে আসি। বলবো, আমি পারকার। ছেলেমেয়েরা বাড়িতে এসেছে, থাকবে দুতিন দিন।
ঠোঁট কামড়ালো কিশোর। কোনো রকম ফাঁক রাখছে না ডেনার ব্যাটা!
পাগল হয়েছে? ডজ বললো। তোমার গলা চিনে ফেলবে না? বুড়িটা এতো বোকা না।
না, চিনবে না। রুমাল দিয়ে রিসিভার ঢেকে নেবো। দুএক বার খুকখুক করে কাশবো। তাহলেই বুঝবে, ঠাণ্ডা লেগেছে। গলা অন্যরকম হয়ে গেছে। আমি আসলে পারকারই, আর কেউ নই, হাহ হাহ হা!
হেহ হেহ হে! রেগে গিয়ে মুখ ভেঙুচালো জিনা। রাফিয়ান ঘেউ করে উঠতেই বললো, এই, চুপ!
ওদের দিকে ফিরেও তাকালো না চাচা-ভাতিজা।
ভালোই বুদ্ধি করেছে, চাচা, বললো ডজ। কাজ হবে
তাড়াতাড়িই ফিরে এলো ডেনার। হয়েছে, ভাইপোর দিকে চেয়ে হাসলো। চলো, বেরোও ওদের নিয়ে। নৌকায়।
খাবার-টাবার আনোনি?
না। দরকার মনে করিনি। আরেকটা কথা ভেবেছি আমি। দূর থেকে দেখে তোমার মনে হয়েছে দ্বীপটাতে লোক থাকে না। ধরে নিলাম থাকে না। কিন্তু কারও পিকনিকে যেতে বাধা কোথায়? কিংবা দিনের বেলা জেলেরা যদি খুব কাছাকাছি চলে যায়? তারমানে ওপরে রাখা যাবে না ওদের। ভাঙা দুর্গ আছে বললে না? মাটির তলায় নিশ্চয় সেলার-টেলার কিছু আছে...
কিংবা ডানজন।
তাহলে তো আরও ভালো। ভরে রাখবো ওখানে। বাইরে থাকছে না, ঠাণ্ডা লাগবে না, কাজেই কম্বলের দরকার নেই। আর খাবার-পানি ছাড়াই আটচল্লিশ ঘণ্টা বাঁচতে পারে মানুষ, বলে আবার হাহ্ হাহ্ করে হাসলো সে। হয়েছে, চলো এবার।
সাগর পারে নিয়ে আসা হলো ওদের। ওয়ালটারদের বোট হাউসে ছোট একটা মোটর লঞ্চে এনে তোলা হলো। এঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে লঞ্চটা বোট হাউস থেকে বের করলো ডজ।
জিনার মুখে রহস্যময় হাসি দেখতে পেলো কিশোর, কিন্তু কোনো প্রশ্ন করলো।
খুব শিগগিরই অবশ্য জিনার হাসি মুছে গেল। তীর থেকে অনেক দূরে চলে এসেছে তখন লঞ্চ। কিনারে দাঁড়িয়ে আছে রাফিয়ান। সাবধান হওয়ার

সামান্যতম সুযোগ না দিয়ে হঠাৎ এক ধাক্কায় তাকে পানিতে ফেলে দিলো ডজ। চেঁচিয়ে উঠলো জিনা।
খিকখিক করে হাসলো ডজ। তারপর একটানে টকারের কাঁধ থেকে বানর টাকে তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিলো পানিতে।
এই হারামীর বাচ্চা! ভীষণ রাগে গাল দিয়ে উঠলো জিনা। এটা কি করেছিস। ভালো চাইলে জলদি তুলে আন!
না আনলে কি করবে? হাসতে হাসতে বললো ডজ। না ফেলে উপায় ছিলো। ঘাউ ঘাউ করে চেঁচাতো কুত্তাটা। জেলেরা শুনে ফেললে মুশকিলে পড়তাম। আর ওই বাঁদুরটাকে ট্রেনিং দেয়া আছে কিনা কে জানে? হয়তো তোমাদের বাঁধন খুলে দিতো। ওসব শয়তান জানোয়ার মরে যাওয়াই ভালো।
মরা তো উচিত তোর মতো হারামী জানোয়ারের, ফুঁসে উঠলো জিনা। কুকুর আর বানর তো তোর চেয়ে অনেক ভালো। দুটোকে ফেলে দেয়া হয়েছে, সে-জন্যে ভাবছে না সে, রাফিয়ান ডুবে মরবে না। খুব ভালো সাঁতার জানে। নটিও মরবে না। রাফিয়ানই তাকে বাঁচাবে। ভাবছে অন্য কারণে। পিছন পিছন আসছে কুকুরটা, মনিবকে সাহায্য করার জন্যে। এভাবে দ্রুত সাঁতরে এলে ক্লান্ত হয়ে পড়বে। তখন বিপদ ঘটতেও পারে।
একটা দাঁড় তুলে নিয়ে রাফিয়ানকে শাসালো ডেনার। তা-ও আসছে দেখে শেষে বন্দুক তুলে নিলো।
চেঁচিয়ে বললো জিনা, এই রাফি, যা যা, চলে যা!
চাঁদের আলোয় চোখ দেখা যাচ্ছে কুকুরটার। বিষণ্ন দৃষ্টি। থেমে গেল।
পানি এলো জিনার চোখে। অথচ সহজে কাঁদতে দেখা যায় না তাকে।
হাত বাঁধা না থাকলে এই মুহূর্তে বন্দুক কেন, কামান দেখিয়েও ঠেকানো যেতো না মুসাকে। ঝাঁপিয়ে পড়ে টুটি টিপে ধরতো ডজের। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে ফেললো সে, প্রতিশোধ নেবো আমি, উজ! তোকেও যদি না চুবাই, তো আমার নাম মুসা আমান নয়!
টকার কাঁদছে।
রবিন চুপ।
কিশোরও চুপ, পাথরের মতো নিথর। বোঝাই যায়, ঝড়ের গতিতে ভাবনা চলেছে তার ক্ষুরধার মস্তিষ্কে।
কিছুক্ষণ পর দ্বীপের কিনারে এসে ভিড়লো বোট। জিনার রহস্যময় হাসির কারণ বোঝা গেল। দ্বীপটা গোবেল দ্বীপ, বন্দিদের অতি পরিচিত, টকার ছাড়া। জিনা হেসেছিলো, সে বুঝতে পেরেছিলো এই দ্বীপেই নিয়ে আসা হবে তাদ্দেরকে।

আশপাশে কয়েক মাইলের মধ্যে আর কোনো দ্বীপ নেই, যেটা মূল ভূখণ্ড থেকে দেখা যায়।
বন্দিদের নামার আদেশ দিলো ডেনার। নিয়ে আসা হলো ভাঙা দুর্গের চত্বরে। সেখানে বন্দুক ধরে বসে রইলো ডেনার। ডজ গেল মাটির নিচে ঘর-টর আছে কিনা দেখতে।
প্রায় আধ ঘন্টা পর ফিরে এলো ডজ। ঘর পেয়েছে।
দুর্গের নিচে ডানজনে নিয়ে আসা হলো বন্দিদের। যে ঘরটায় আনলো, সেখানে এর আগেই একাধিকবার এসেছে জিনা আর তিন গোয়েন্দা।
ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে টর্চের আলো ফেলে ঘরটা দেখলো ডেনার। সন্তুষ্ট হয়ে বললো, চমৎকার জায়গা। থাকো এখানেই দুদিন। অন্ধকারে শুয়ে-বসে কাটিয়ে দিতে পারবে। গলা ফাটিয়ে চিল্লালেও কেউ শুনবে না, কেউ দেখতে আসবে না। তাতে শিক্ষা হবে। অন্যের ব্যাপারে নাক গলাবে না জীবনে...
নাক তো তোরা গলাচ্ছিস, শয়তানের বাচ্চা! আবার গলি দিয়ে উঠলো, জিনা।
দুদিন খেতে না পেলেই এই তেজ চলে যাবে, শান্তকণ্ঠে বললো ডেনার। ডজ, চলো। আবার আসতে হবে এখানে।
নতুন কোনো আইডিয়া
হ্যাঁ। এই ছেলেগুলো যখন খুঁজে পেয়েছে, ভালোমতো খুঁজলে শেরিফও পেয়ে যেতে পারে। লিয়ারিকে ফোন করে এসেছি বটে, কিন্তু বলা যায় না কি ঘটবে। পারকার ফোন করতে পারে লিয়ারির কাছে, ছেলেমেয়েরা কেমন আছে জানার জন্যে। গোলমাল শুরু হবে তখন। বাক্সটা কুয়ায় রাখা আর ঠিক না। তার। চেয়ে এই দ্বীপ অনেক বেশি নিরাপদ, এখানেই এনে রাখবো। তারপর লিংকার এলে তুলে নিয়ে চলে যাবো।
.
বেরিয়ে গেল দুই শয়তান।
গাধা, ব্যাটারা! হেসে উঠলো মুসা। রাফিয়ানের চিল্লানী থামিয়েছে, অথচ আমাদেরকে বললো গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে। আরে হারামজাদারা, পাঁচজনের চিৎকার তো একটা কুকুরের চেয়ে অনেক বেশি হবে। যাকগে, ভালোই হয়েছে। আর এতোই আত্মবিশ্বাস, সব আলোচনা করেছে আমাদের সামনে। বাক্সটা যে এনে রাখবে, সে-কথাও।
ওরা জানে, আমরা এখান থেকে বেরোতে পারবো না, বিষণ্ন কণ্ঠে বললো টকার। যখন বেরোবো তখন ওরা পগার পার। ইস্, এতো শক্ত করে বেঁধেছে, হাত ঝিমঝিম করছে, আমার।

জিনার রাগ কমেনি। বসে বসে ফুঁসছে। কে বললো বেরোতে পারবো না? রাফিয়ানকে ফেলে দিয়ে মনে করেছে বেঁচে গেল। ব্যাটারা জানেই না, আরামসে সাঁতরে গিয়ে তীরে উঠবে রাফি। আর এই দ্বীপটা যে আমার, তা-ও জানে না।
কিশোর কোনো কথা বললো না। চুপচাপ উঠে চলে গেল দেয়ালের কাছে। বেরিয়ে থাকা একটা চোখা পাথরে ঘষতে শুরু করলো হাতের দড়ি। চামড়া ছিললো, রক্ত বেরোলো, তবু থামলো না। বাঁধন-মুক্ত হতেই হবে।
দেখাদেখি অন্যেরা উঠে এসে একই ভাবে পাথরে দড়ি ঘষতে লাগলো।
কতোক্ষণ লাগলো বলতে পারবে না, তবে, অবশেষে সফল হলো ওরা। প্রায়। একই সঙ্গে কিশোর আর মুসার দড়ি ছিঁড়ে গেল। তারপর অন্যদের বাঁধন খুলে দেয়াটা কিছুই না।
ডানজন থেকে বোরোনোর পথ ভালোমতোই জানা আছে ওদের। সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলো। বড় একটা পাথর চাপা দিয়ে সিঁড়ির মুখ বন্ধ, ওভাবেই বন্ধ করার ব্যবস্থা, জানে ওরা। কয়েকবার ওই পাথর সরিয়ে ঢুকেছে, বেরিয়েছে। নিচে থেকে সবাই মিলে ঠেলে সরাতে অসুবিধে হলো না।
বাইরে বেরিয়ে এলো ওরা। খোলা আকাশের নিচে।
পূর্ব দিগন্তে আলো ফুটেছে। জেগে উঠেছে দাঁড়কাকের দল। তাদের কর্কশ চিৎকারে কান ঝালাপালা। এতোক্ষণে হাসি ফুটলো জিনার মুখে। ওদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো সে। হাততালি দিয়ে বললো, আরে, দেখো দেখো, রাফি! ঠিক বুঝে গেছে কোথায় আছি আমরা।
বেশ দূরে রয়েছে এখনও রাফিয়ান। ঢেউয়ের ওঠানামার ফাঁকে ফাঁকে শুধু তার মাথাটা দেখা যাচ্ছে। একা নয়। পিঠে বসে আছে নটি। দেখে, আনন্দে ধেইধেই করে নাচতে আরম্ভ করলো টকার।
সূর্য উঠলো। ভোরের কাঁচা রোদে ঝিলমিল করে উঠলো সাগর, পানি তো নয়, যেন তরল সোনা।
তীরে পৌঁছলো রাফিয়ান।
হুল্লোড় করে ছুটে গেল ছেলেমেয়েরা।
ঝাড়া দিয়ে গা থেকে পানি ঝাড়ছে রাফিয়ান আর নটি। কুকুরটাকে জড়িয়ে ধরলো জিনা। টকার কোলে তুলে নিলো বানরটাকে।
রাফি, আদর করতে করতে বললো জিনা। কিছু ভাবিস না। তোকে কষ্ট দিয়েছে তো, ভেবেছে পার পেয়ে যাবে। ব্যাটারা আসবে আবার। যতো খুশি। কামড়াস তখন, কিছু বলবো না।
টকার বললো নটিকে, হ্যাঁ, চুল ছিঁড়ে দিস। কামড়ে কান কেটে ফেলিস। আমিও মানা করবো না।

ওদের কথাবার্তা শুনে হাসতে শুরু করলো মুসা। তার হাসি সংক্রামিত হলো সবার মাঝে। হো হো করে হাসলো সবাই। কাছেই বসে কৌতূহলী চোখে দেখছিলো একটা কাক। সম্মিলিত হাসির শব্দে চমকে উড়ে গেল কা-কা করে। ব্যস, শুরু হয়ে গেল তুমুল কা কা। ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে আসতে লাগলো কাকেরা।
এখানে আর দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই, কিশোর বললো। বাক্সটা খুঁজে বের করতে হবে। চলো, দেখি।
বেশি খুঁজতে হলো না। চত্বরের একধারের মাটিতে দাগ দেখতে পেলো রবিন। সদ্য খোঁড়া হয়েছে। রাফি আর নটিকে লাগিয়ে দিতেই খুঁড়ে বের করে ফেললো বাক্সটা। আধ হাত মাটির তলায় লুকিয়েই নিশ্চিন্তে ফিরে গেছে ডেনার আর তার ভাইপো। গর্তের কিনারে একটা কাঠিও পুঁতে রেখে গেছে, চিহ্ন, যাতে পরে এসে চিনতে পারে।
চলো, নিচে ভাঁড়ারে লুকিয়ে ফেলি, বললো কিশোর।
ডানজনের পাশেই ছোট একটা ঘরকে ভাড়ার বানিয়ে নিয়েছে জিনা। কিছু টিনের খাবার, চিনি, লবণ আর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সব সময় জমা রাখে। ওখানে। যাতে দ্বীপে এলে দরকারের সময় কাজে লাগে। ওখানেই এনে গুপ্তধনগুলো লুকিয়ে রাখলো ওরা।
তুরুপের তাস এখন ছেলেদের হাতে। বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেয়েছে। গুপ্তধনগুলো আবার উদ্ধার করেছে। আর রয়েছেও ধরতে গেলে একেবারে নিজেদের বাড়িতে। ইচ্ছে করলেই যে কোনো সময় তীরে ফিরে যেতে পারে। কিন্তু আপাতত যাওয়ার ইচ্ছে নেই।
কিশোর, ব্যাটাদের শায়েস্তা করা দরকার, জিনা বললো। কিভাবে করা যায়?
সেটা পরেও আলোচনা করতে পারবো, বলে উঠলো মুসা। পেটের মধ্যে ছুঁচো নাচছে। আগে ওটাকে দাঁড়িয়ে নিই।
ভাঁড়ারের আলমারি থেকে দুধ, চকোলেট, কোকা বের করা হলো। রুটি নেই, তবে বিস্কুট আছে অনেক। স্টোভ বের করলো রবিন। বললো, মুসা, টকার, দৌড়ে গিয়ে পানি নিয়ে এসো।
নাস্তা ভালোই হলো। বিস্কুট আর চকোলেটের সঙ্গে গরম গরম কোকা মেশানো দুধ। খেয়েদেয়ে শান্ত হয়ে এরপর আলোচনায় বসলো ওরা।
দ্বীপে থাকাটা কিছু না, বললো রবিন। দুই তিন দিন সহজেই কাটিয়ে দিতে পারবো। তবে, কেরি আন্টিকে একটা খবর দেয়া দরকার, যে আমরা ভালোই আছি।
সেটাও কোনো সমস্যা নয়, জিনা বললো। সিঁতরে চলে যেতে পারবো।

আরে কি বলো? বুকে চাপড় দিয়ে বললো গোয়েন্দাসহকারী। এই মুসা আমান থাকতে তুমি কষ্ট করবে কেন? আমিই যাবো।
আর খবর না দিলেই বা কি? মুচকি হাসলো কিশোর। ব্যাটাদের আগে শিক্ষা দিয়ে নিই। তারপর একবারেই সকলে মিলে যাবো দ্বীপে।
মানে? চকচক করছে টকারের চোখ। ভয়-ডর সব চলে গেছে। বরং মজা পাচ্ছে এখন।
মানে হলো, ডেনার, ডজ আর তাদের দোস্ত লিংকার এখানে এলে দেখবে, তাদের জন্যে ফাঁদ পাতা রয়েছে। এরকম কিছু ঘটতে পারে, আশাঁই করবে না। ওরা, তাই সোজা এসে আমাদের ফাঁদে পা দেবে। এখন আমাদের ভাবতে হবে, ফাঁদটা কী হবে।
হেসে উঠলো মুসা। উরুতে চাপড় দিয়ে বললো, দারুণ আইডিয়া। খুব ভালো হবে। ব্যাটাদের চেহারাটা তখন যা দেখতে লাগবে না!
হ্যাঁ, একেবারে চমকে যাবে, বললো রবিন। কল্পনাও করবে না, আমরা ছাড়া পেয়ে গেছি। খেয়েদেয়ে রীতিমতো আরামেই আছি…
আর রাফি আর নুটিও বেঁচে আছে, যোগ করলো টকার।
সেই সঙ্গে গুপ্তধন গায়েব, আনন্দে দাঁত বের করে হাসলো জিনা।
এখন একটা ছক করে ফেলা দরকার, কিশোর বললো। কড়া নজর রাখবো আমরা, পালা করে। ওরা যেন আগে আমাদেরকে দেখে না ফেলে সেই ব্যবস্থা করতে হবে।
কিভাবে কি করবে, ঠিক করা হলো। আরও কিছু কাজ করলো, তাতেই যেন। উড়ে চলে গেল সকালটা। লাঞ্চের আয়োজন করলো রবিন আর জিনা। টিনজাত সেদ্ধ সীম আর ভাজা মাংস আছে। ওগুলো বের করে গরম করলো। টিনের সংরক্ষিত কিছু ফলও বের করলো। এক প্যাকেট লেমোনেড ক্রিস্টাল আছে। ওগুলো থেকে কিছু নিয়ে ঝর্নার পানিতে মেশাতেই তৈরি হয়ে গেল লেমোনেড। পেটে হাত বোলাতে বোলাতে মুসা বললো, জিনা, কসম খোদার, এরপর ঝগড়া লেগে, যদি তুমি আমার মাথার চুল সব ছিঁড়ে ফেলো, কোনোদিন কিছু বলবো না।
তোমার চুল থাকলে তো ছিড়বো? সব তো কোঁকড়া তার, খুলি কামড়ে রয়েছে।
তাহলে অন্য কিছু করো। এই যেমন, চিমটি কাটা, কিল মারা। চাইলে হাত কামড়েও দিতে পারো
আমি কি রাফি নাকি, যে কামড়াবো?
রাফি না হও, ওর ঘনিষ্ঠ দোস্ত তো… দোস্ত তো তুমিও…
বাকযুদ্ধে কিছুতেই জিনাকে ঘায়েল করতে পারলো না মুসা। হাসলো সবাই। টকার বেশি হাসছে। এ-রকম রোমাঞ্চের স্বাদ জীবনে এই প্রথম পাচ্ছে। এ-রকম।

অ্যাডভেঞ্চারও কপালে জোটেনি কখনও। খুব ভালো লাগছে তার। গাড়ি হওয়ার কথা ভুলেই গেছে। ওটা এখন তার কাছে মনে হচ্ছে ফালতু।
খাওয়ার পর একটা, উঁচু জায়গা বেছে নিয়ে পাহারায় বসলো ওরা। ওখান থেকে সাগরের অনেকখানি দেখা যায়। কেউ এলে ওদের চোখ এড়িয়ে আসতে। পারবে না।
সাঁঝ হলো। নামলো অন্ধকার রাত। বেশ কিছু কম্বলও রাখা আছে, পলিথিন দিয়ে মুড়ে রেখেছে জিনা। খুলে নিয়ে আসা হলো ওগুলো। আকাশে মেঘ নেই, কিন্তু বাতাস কনকনে ঠাণ্ডা। দুর্গের যে একটিমাত্র ঘর আছে, যেটার ওপরে ছাত, তাতে ঢুকে শুয়ে পড়লো. সবাই, একজন বাদে। সে পাহারায় রইলো উঁচু জায়গাটায়। কয়েক ঘন্টা পাহারা দিয়ে এসে আরেকজনকে তুলে দেবে ঘুম থেকে।
প্রথম পাহারায় রয়েছে জিনা। পাশে রাফিয়ান। যেখানে বসেছে, তার খানিক দূর দিয়ে সরু পথ নেমে গেছে দ্বীপের ছোট সৈকতে।
জিনার পরে পাহারা দিলো মুসা। তারপর কিশোর। সব শেষে রবিন। কিন্তু চোরেরা এলো না।
পরের দিনও সারাটা দিন সাগরের দিকে চোখ রাখলো ওরা।
সেদিন সন্ধ্যার পর প্রথম পাহারায় বসলো টকার। বয়েস কম, এধরনের কাজে অভিজ্ঞতা নেই, তাই প্রথমে রাজি হতে চায়নি কিশোর। কিন্তু মুখ কালো করে যখন টকার বললো-ছোট বলে আমাকে অবহেলা করছে–আর রাজি না। হয়ে পারলো না গোয়েন্দাপ্রধান। বললো, বেশ থাকো। তবে চোখ খোলা রাখবে। খবরদার, ঘুমোবে না।
ঘুমালো না টকার। তার সঙ্গে রয়েছে নটি আর রাফিয়ান। বিপদের গন্ধ পেলে সাবধান করে দেবে তাকে।
আটটা বাজলো, নটা। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো টকার, এই, জলদি এসো! একটা মোটর বোট!
ছুটে এলো সবাই। দেখল।
হু, ওরাই, বললো কিশোর। গুড!
এসো দোস্তরা, এসো, হাত নেড়ে ডাকলো মুসা। এসে দেখো, ধান-দুর্বা সাজিয়ে রেখেছি তোমাদের জন্যে।

.

হ্যাঁ, ডেনার আর ডজই। সঙ্গে আরেকজন লোক, মোটা, বেঁটে, নিশ্চয় লিংকার। পাহাড়ের চূড়ায় উপুড় হয়ে শুয়ে তাকিয়ে আছে ছেলেরা। চাঁদ উঠছে, ফিকে হয়ে আসছে অন্ধকার, ফলে দেখতে অসুবিধে হচ্ছে না ওদের।

ভালো জায়গাতেই লুকিয়েছো দেখা যাচ্ছে, কর্কশ কণ্ঠে বললো লিংকার, ওর। গলাটা খসখসে। চট করে বের করে ফেলো। নিয়ে কেটে পড়ি।
আমি যাচ্ছি, ডজের হাতে টর্চ। চাচা, ছেলেমেয়েগুলোকে কি করবো? দুদিন অন্ধকারে থেকে, না খেয়ে, আমার মনে হয় কাবু হয়ে গেছে।
ওদেরকে? গুরত্বই দিলো না ডেনার। থাকুক। আমরা নিরাপদে বেরিয়ে যাই আগে। তারপর একটা ফোন করে দেবো মেয়েটার বাপের কাছে। আরও কিছুক্ষণ থাকুক, শিক্ষা হোক কিছুটা। অনেক উৎপাত করেছে।
উৎপাত তো কিছুই করিনি, উৎপাত দেখবে এখন, মনে মনে বললো মুসা। এই শুরু হলো। ছোট একটা পাথর তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারলো। নিখুঁত নিশানা। ডেনারের মাথায় গিয়ে পড়লো পাথরটা।
উফ! করে উঠে চাঁদিতে হাত রাখলো ডেনার। কি পড়লো?
ও কিছু না, ছোট পাথর, বললো তার ভাতিজা। পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়েছে। খামোকা চিল্লাচ্ছো।
কয়েক পা এগিয়েই দড়াম করে আছাড় খেলো সে। পাথরে বাড়ি লেগে চুরমার হয়ে গেল টর্চের কাঁচ।
কি হলো? চেঁচিয়ে বললো তার চাচা।
কিসে যেন পা পড়লো। পিছলে গেল।
দেখে চলতে পারো না? কিসে পিছলালো?
কি জানি!
কিসে পিছলেছে বলে দিতে ইচ্ছে হলো মুসার। কুকর্মটা সে-ই করেছে। পাথুরে পথের ওপর রান্নার তেল ঢেলে পিছলা করে দিয়েছে। তাতে পা পড়লেই দড়াম।
উঠে এগোলো আবার ডজ। পেছনে এলো তার চাচা। ওই জায়গাটাতে আসতেই ভাতিজার চেয়ে জোরে আছাড় খেলো। তাকে তুলতে এসে ডেনারের গায়ের ওপরই পড়লো লিংকার।
জোরে জোরে হাসলো ডজ। অন্যকে বলার বেলায় তো খুব তোমরা দেখে। চলতে পারো না?
গালাগাল করতে করতে উঠে দাঁড়ালো দুজনে। খাড়াই বেয়ে উঠে আসতে লাগলো আবার।
তেলের ওপর পা পড়ে আরেক জায়গায় আবার আছাড় খেলো ডজ। তার চাচাও। কিছু দূর এগিয়ে আবার।
হাসতে হাসতে দুর্গের ঘরে ফিরে এলো ছেলেরা।
চত্বরে পৌঁছলো তিন চোর।

ওই যে, ওখানে, সদ্য খোঁড়া গর্তের ধারে কাঠিটা দেখিয়ে বললো ডেনার। ডজ, খোড়ো।
খালি হাতেই ওপরের আলগা মাটি খুঁড়ে সরিয়ে ফেললো ডজ। এই যে, বলতে বলতে টেনে তুললো একটা প্রাস্টিকের ব্যাগ। ভেতর থেকে বের করলো ভারি বাক্সটা.। লিংকারের দিকে বাড়িয়ে দিলো, এই যে, নিন।
বাক্সটা মাটিতে রেখে বসে পড়লো লিংকার। ডালা তুলে চেঁচিয়ে উঠলো। সোনার মোহর আর অলঙ্কার কোথায়? এ তো মস্ত এক সী-গালের কঙ্কাল, আর পাথর! রাগে গর্জে উঠলো, এই তোমাদের গুপ্তধন!
টর্চের আলোয় বাক্সের জিনিসগুলোর দিকে বোবা হয়ে চেয়ে আছে ডেনার। ডজও হাঁ হয়ে গেছে।
ঠিক এই সময় লাফ দিয়ে ডেনারের কাঁধে নামলো ছোট একটা জীব। দোল খেয়ে বাহুতে নেমে ছোঁ মেরে টর্চটা কেড়ে নিয়েই দিলো দৌড়।
কী ওটা? চিৎকার করে বললো ডেনার। বানর না? এখানে বানর এলো কোত্থেকে…আরে ডজ, হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছিস কি? ধর না!
বানরটার পেছনে দৌড় দিলো ডজ।
কিছুদূর এগিয়ে থেমে ফিরে তাকালো নটি। যেন ডজের কাছে আসার অপেক্ষা করছে। তারপর ঘুরে আবার ছুটলো। উজকে টেনে নিয়ে চললো ভাঙা দুর্গের ধ্বংসস্তূপের দিকে। ঢুকে পড়লো একটা দরজা দিয়ে।
সোজা তার পেছনে ছুটে এলো ডজ। দরজায় পেতে রাখা ফাঁদ দেখতে পেলো না। আড়াআড়ি ভাবে একটা শক্ত দড়ি বেঁধে রাখা হয়েছে। তাতে পা বেধে উড়ে গিয়ে ধুড়ুস করে পড়লো। কাদায় পড়া মাছের মতো কঠিন মেঝেতে পিছলে গেল দেহটা। বিশাল এক পাথরে বাড়ি লাগলো মাথা। প্রচণ্ড আঘাতে সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারালো সে।
নিঃশব্দে তাকে তুলে নিয়ে একটা অন্ধকার কোণে সরে গেল ছেলেরা। দ্রুত হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখলো একটা দেয়ালের আড়ালে।
বাইরে দাঁড়িয়ে আছে ডেনার আর লিংকার। অবাক হয়ে ভাবছে, ডজ এখনও আসছে না কেন? হঠাৎ ডজের বিকৃত জোরালো চিৎকার কানে এলো, চাচা, চাচা, মেরে ফেললো। বাঁচাও, চাচা!
পাকা অভিনেতা কিশোরের কণ্ঠস্বর ধরতেই পারলো না ডেনার, ভাবলো, ডজই বুঝি চিৎকার করছে। লিংকারকে বললো, তুমি দাঁড়াও এখানে। আমি দেখি কি হয়েছে?
দৌড়ে এলো ডেনার। ভাতিজার মতোই দড়িতে পা বেধে খেলো আছাড়। ভারি শরীর ময়দার বস্তার মতো পড়লো। একটা পা বেকায়দা ভাবে মুচড়ে গিয়ে।

পড়লো পেটের তলায়। গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, গেছিরে, মরে গেছি! হায় হায় রে, আমার পা শেষ। এক্কেবারে ভেঙে গেছে!
অন্ধকারে দাঁড়িয়ে নীরব হাসিতে ফেটে পড়লো ছেলেমেয়েরা।
দুটো বেকার, ফিসফিসিয়ে বললো কিশোর। টকার, দাও নটিকে লেলিয়ে।
বানরটাকে নির্দেশ দিয়ে ছেড়ে দিলো টকার।
হুফ! করে উঠলো রাফিয়ান। সে-ও কিছু করার অনুমতি চাইছে জিনার কাছে।
যা। যা ইচ্ছে কর গিয়ে, খুশিমনে অনুমতি দিয়ে দিলো জিনা।
জিনার কথা শেষ হওয়ার আগেই ছুটলো রাফিয়ান।
ডেনারকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসছিলো লিংকার। দরজার কাছে পৌঁছার। আগেই দেখলো, বিরাট এক জীব মস্ত একটা ছায়ার মতো ছুটে আসছে তার ওপর আঁপিয়ে পড়ার জন্যে।
আর কি দাঁড়ায় চোরাই মালের ব্যবসায়ী? ভারি শরীর নিয়ে এমনভাবে ঘুরলো, যেন পালকের মতো হালকা। দিগগজ দৌড়-বিদদের সমস্ত রেকর্ড ভঙ্গ করে ছুটলো প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে। সামনে একটা গাছ দেখে চোখের পলকে তাতে চড়ে বসলো।
নিচে থেকে ঘেউ ঘেউ করতে লাগলো রাফিয়ান, লাফঝাঁপ দিতে লাগলো। লিংকারকে ধরতে না পারায় ভীষণ খেপে গেছে।
গাছে উঠে যখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো লিংকার, এলো আরেক বিপদ। ঝুপ করে তার কাঁধের ওপর লাফিয়ে পড়লো একটা বানর। চুল, খামচে ধরে কামড় বসালো কানে।
ওরে বাবারে, খেয়ে ফেললো রে! বলে চেঁচিয়ে বানরটাকে সরাতে গিয়ে ডাল থেকে ছুটে গেল হাত। ওপর থেকে পড়লো আবার নিচে, একেবারে রাফিয়ানের মুখের কাছে। আচ্ছামতো কয়েকটা কামড় খেয়ে হাঁচড়ে-পাঁচড়ে আবার উঠলো গিয়ে গাছে।
হাসতে হাসতে বেরিয়ে এলো ছেলেমেয়েরা। বানরটাকে ডেকে নামালো। টকার। গলার বেল্ট ধরে জোর করে টেনে রাফিয়ানকে সরালো জিনা।
বোটে চলো সবাই, আদেশ দিলো কিশোর। কুইক!
ঢালু পথ বেয়ে দৌড় দিলো সবাই। টকারের কাঁধে নটি। মুসার কাঁধে গুপ্তধনের ব্যাগ। কোথায় তেল ফেলেছে, জানা আছে ওদের। ওগুলো এড়িয়ে গেল, আছাড় খেতে হলো না। এক এক করে লাফিয়ে উঠলো, বোটে। গাছের দিকে ফিরে জোরে আরেকবার ঘেউ ঘেউ করে রাফিয়ানও উঠে পড়লো।
এঞ্জিন স্টার্ট দিলো মুসা। জিনা ধরলো হুইল। তিন মিনিট পর খোলা সাগরে বেরিয়ে এলো ওয়ালটারদের মোটর বোট। ছুটলো মূল ভূখণ্ডের দিকে।

দূর থেকেই গোবেল ভিলায় আলো দেখা গেল, স্টাডিরুমে।
দুই প্রফেসর নিশ্চয় মাথার ঘাম বের করে ফেলছেন, হেসে বললো মুসা। আমাদের এই অবস্থায় দেখলে কি যে…
জিনা, বাধা দিয়ে বললো কিশোর। আগে শেরিফের ওখানে যাও।
বোটের মুখ ঘুরিয়ে দিলো জিনা।
ছেলেমেয়েদের দেখে অবাক হলেন শেরিফ আর তার ডেপুটি। সব কথা। শুনলেন। গুপ্তধনগুলো রেখে দিলেন নিরাপদ জায়গায়।
মনে হলো ডাক্তার ওয়ালটার এসেছেন, বললেন শেরিফ। একটু আগে ওপথেই আসছিলাম। বাড়িতে আলো দেখলাম।
শেরিফের অফিসে বসেই লিয়ারিকে টেলিফোন করলো কিশোর। মিসেস পারকারকে ফোন করে সংক্ষেপে সব কথা জানালো। শেরিফ ফোন করলে ডাক্তার ওয়ালটারকে। তারপর নিজেদের লঞ্চ আর লোকজন নিয়ে দ্বীপে চললেন চোরগুলোকে ধরে আনার জন্যে। ছেলেমেয়েরাও চললো সঙ্গে।
তিন চোরকে নিয়ে ফিরে এসে ওরা দেখলো, শেরিফের অফিসে বসে আছেন ডাক্তার ওয়ালটার আর তার মিসেস। ছেলেদের মুখে গুপ্তধনের গল্প শুনে তো অবাক।
ডজকে হাজতে ভরা হলো। মাথার একপাশ গোল আলুর মতো ফুলে আছে। ডেনার পায়ের ব্যথায় ককাচ্ছে। লিংকারের সারা গায়ে কামড় আর আঁচড়ের ক্ষত; রক্তাক্ত। দুজনকে কড়া পাহারায় পুলিশ হাসপাতালে পাঠিয়ে দিলেন শেরিফ।
আর এই সময় এসে অফিসের সামনে থামলো আরেকটা গাড়ি। নামলেন মিসেস পারকার আর দুই বিজ্ঞানী।
অফিসে ঢুকেই জিনার দিকে চেয়ে ভুরু কুঁচকে বলে উঠলেন মিস্টার পারকার,, তোমাদের জ্বালায় শান্তিতে কাজ করার জো নেই। কেন জড়ালে এসবে?
আহ, তুমি থামো তো, মৃদু ধমক দিলেম মিসেস পারকার। ঠিকই তো করেছে। চোখের সামনে অন্যায় ঘটতে দেখেও পালিয়ে আসবে নাকি?
কিন্তু মারাও যেতে পারতো, বললেন প্রফেসর কারসওয়েল।
যায়নি যখন আর বলে লাভ কি? টকারকে কাছে টানলেন মিসেস পারকার। কেমন ছিলি? খুব কষ্ট হয়েছিলো?
আরে না, কি যে বলো, আন্টি, মাথা নেড়ে বললো টকার। দারুণ মজা পেয়েছি। বাবা, তোমাকে আর জ্বালাবো না। গাড়ি হতে আর ভালো লাগে না এখন আমার। গোয়েন্দা হবো।

গোয়েন্দা হয়ে করবিটা কি শুনি? বললেন কারসওয়েল। হলে বিজ্ঞানী হবি।...এই হ্যারি, চলো চলো, পরীক্ষাটা শেষ করে ফেলি। এরা ভালোই আছে।
চলো।
অফিস থেকে বেরিয়ে গেলেন দুই বিজ্ঞানী।
লিয়ারিও এসে হাজির হলো। জানালো, ছেলেদের–বিশেষ করে মুসার জন্যে তৈরি হয়ে পড়ে আছে বিশাল এক ফুট কেক।
পরদিন লাঞ্চে দাওয়াত করলেন সবাইকে মিসেস ওয়ালটার। লিয়ারি, পারকার দম্পতি, প্রফেসর কারসওয়েল, শেরিফ, আর ছেলেমেয়েদেরকে তো অবশ্যই।
দাওয়াতে গেল সবাই। চমৎকার খাওয়া-দাওয়া হলো। ছেলেমেয়েদের সবাইকে একটা করে সোনার মোহর উপহার দিলেন ওয়ালটার, স্যুভনির হিসেবে রেখে দেয়ার জন্যে। বাকি গুপ্তধনগুলো রাখবেন না, জানালেন। ডাকাতি করে। এনেছিলো তাঁর পূর্বপুরুষ। ওসব লুটের মাল রাখতে চান না তিনি। দান করে দেবেন কোনো রিসার্চ সেন্টারে। মানুষের উপকারে লাগবে ওই গুপ্তধন বিক্রির টাকা।

ভলিউম ৭ – ভূতুড়ে সুড়ঙ্গ – তিন গোয়েন্দা – রকিব হাসান – সেবা প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ১৯৮৯

গোধূলি বেলায় উপত্যকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়লো অদ্ভুত গোঙানি!

ওই, ফিসফিস করে বললো মুসা আমান। শুরু হলো আবার!

হারভে র‍্যাঞ্চের কাছে একটা উঁচু শৈলশিরার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে তিন গোয়েন্দা। কয়েক শো ফুট দূরে প্রশান্ত মহাসাগরের তটরেখা।

আবার শোনা গেল গোঙানি। যেন কোনো দানবের দীর্ঘশ্বাস, লম্বিত, কাঁপা, ভয়াল।

ঠাণ্ডা শিহরণ বয়ে গেল মুসার শিরদাঁড়া বেয়ে। কাজে আসে না বলে দোষ দেয়া যায় না র‍্যাঞ্চের শ্রমিকদের।

হয়তো লাইটহাউস থেকে আসছে, নিচু কণ্ঠে বললো রবিন। আসার পথে যেটা দেখে এলাম। ফগহর্ন।

মাথা নাড়লো কিশোর। আমার তা মনে হয় না। ফগহর্নের শব্দ ওরকম নয়। তাছাড়া এখন কুয়াশা নেই, ফগহর্ন বাজাবে কেন?

তাহলে কি…, বলতে গিয়ে থেমে গেল রবিন।

কিশোর তার জায়গায় নেই। উঠে শৈলশিরার ডান পাশ ধরে ছুটতে শুরু করেছে। তাকে অনুসরণ করলো দুই সহকারী গোয়েন্দা। পর্বতের ওধারে হারিয়ে গেছে সূর্য, আবছা বেগুনী আলো এখন উপত্যকায়।

পঞ্চাশ গজমতো এসে থেমে গেল গোয়েন্দাপ্রধান। আবার সেই গোঙানি। কানের পেছনে হাত রেখে ভালো করে শুনলো শব্দটা।

চোখ বড় বড় করে মুসা বললো, কিশোর, কি করবো?

জবাব দিলো না কিশোর। হঠাৎ ঘুরে হাঁটতে শুরু করলো, উল্টোদিকে একশো গজ দূরে এসে থামলো।

এই কাজই করবো নাকি খালি আমরা। পাশে এসে বললো রবিন। পাহাড়ের ওপরে খালি হাঁটাচলা? গোয়েন্দাপ্রধানের কাণ্ড দেখে মুসার মতোই সেও অবাক হয়েছে।

এবারও জবাব দিলো না কিশোর। কান পেতে শুনলো গোঙানির আওয়াজ। শব্দটা থেমে যাওয়ার পর ঘুরলো রবিনের দিকে। বললো, না, নথি, পরীক্ষাটা শেষ করলাম।

কিসের পরীক্ষা? জিজ্ঞেস করলো মুসা। হাঁটলাম আর দৌড়ালাম তো শুধু, আর কি করলাম?

বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে শব্দটা শুনলাম, ব্যাখ্যা করলো কিশোর। মনে মনে জ্যামিতি..মানে, কতগুলো কল্পিত রেখা এঁকেছি। শব্দটা কোত্থেকে আসে তার

একটা ধারণা নেয়ার চেষ্টা করেছি। রেখা এঁকেছি মোট তিনটে। যেখানে সবগুলো এক জায়গায় ক্রস করেছে, শব্দটা সেখান থেকেই আসে।
বুঝে ফেললো রবিন। ঠিক বলেছে ও, মুসা। একে বলে ট্রাইঅ্যাঙ্গুলেশন। এঞ্জিনিয়াররা হরদম এই পদ্ধতি কাজে লাগায়।
বুঝেছো তাহলে, বললো কিশোর। নিখুঁত ভাবে করতে পারিনি। তবে আমাদের উদ্দেশ্য সফল হবে।
কিসের উদ্দেশ্য? কিশোরের সহজ ইংরেজিও এখন হীব্রু ভাষা বলে মনে হচ্ছে মুসার কাছে। কি বের করতে চাইছো?
শব্দটা কোথা থেকে আসে। পর্বতের ওই গুহা থেকে। হেনরি ফিগারোর গুহা।
এটা তো জানিই আমরা, নিরাশ মনে হলো মুসাকে। মিস্টার হারভেই বলেছেন।
মাথা নাড়লো আবার কিশোর। তাতে কি হয়েছে? ভালো গোয়েন্দা কক্ষণো অন্যের কথায় নির্ভর করে না। নিজে তদন্ত করে যাচাই করে দেখে। অন্যের চোখে দেখা আর নিজের চোখে দেখার মাঝে অনেক ফারাক। গাল চুলকে নিলো। শিওর হলাম, শব্দটা হেনরি ফিগারোর গুহা থেকেই আসে। এখন জানতে হবে গোঙানিটা কিসের, আর…
তাকে থামিয়ে দিলো সেই বিচিত্র আওয়াজ। ঘন ছায়া নামছে উপত্যকায়। গুঁড়ি মেরে যেন এগিয়ে আসছে অন্ধকারের দানব। শব্দটা শুনে এইবার গোয়েন্দা প্রধানও কেঁপে উঠলো।
ঢোক গিললো মুসা। খাইছে, কিশোর! মিস্টার হারভে আর শেরিফ গুহাটা তন্নতন্ন করে খুঁজেছেন। কিছু পাননি।
হয়তো কোনো ধরনের জানোয়ার, রবিন বললো।
জানোয়ারের মতো কি লাগছে? প্রশ্ন করলো কিশোর। আর, মি হারভে বা শেরিফ কোনো অস্বাভাবিক জন্তুর পায়ের ছাপও পাননি। ভালো করেহ জানো, ওঁরা দুজনেই অভিজ্ঞ শিকারী, দক্ষ ট্র্যাকার।
অস্বাভাবিক জন্তু? অস্বস্তি বোধ করছে মুসা।
এমন কোনো জন্তু, যার নাম শুনেনি মানুষ। মুসার দিকে তাকালো গোয়েন্দাপ্রধান, চোখে আলো ঝিলিক দিয়ে উঠলো। কে জানে, হেনরি ফিগারোও এসবের কারণ হতে পারে!
আঁতকে উঠলো মুসা। আল্লাহরে! বলো কি, কিশোর? ভূত-টুত তো বিশ্বাস করি না আমরা, করি?
তুমি করো, হাসলো কিশোর। কিন্তু ভূতের কথা বলছি না আমি।
তাই তো বললে। হেনরি ফিগারো মারা গেছে একশো বছর আগে, প্রতিবাদ করলো রবিন। তার ভূত না হলে আর কি?

জবাব দেয়ার সুযোগই পেলো না কিশোর। ঠিক ওই সময় উপত্যকা ছাড়িয়ে ওপাশের আকাশ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো লাল আলোয়। প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে থরথর করে কেঁপে উঠলো যেন সমস্ত এলাকা।
কী, কিশোর? জিজ্ঞেস করলো রবিন।
মাথা নাড়লো কিশোর। জানি না।
বিস্ফোরণের আওয়াজ পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি তুলে মিলিয়ে গেল ধীরে ধীরে। একে অন্যের দিকে তাকালো তিন কিশোর।
নার্ভাস ভঙ্গিতে আঙুল মটকালো. রবিন। বোধহয় নেভি! ওই যে যাদের নৌবহর দেখলাম। নিশ্চয় চ্যানেল আইল্যাণ্ডস-এ প্র্যাকটিস করছে।
নিষ্প্রাণ হাসি হাসলো মুসা। ঠিকই বলেছো। বছরে দুবার এখানে এসে প্র্যাকটিস করে ওরা। খবরের কাগজে পড়েছি। নির্জন দ্বীপগুলোয় আস্তানা গেড়ে গোলাগুলির মহড়া চালায়।
হা, কিশোর বললো। কালকের পেপারেও ছিলো। নাইট ফায়ারিং, প্র্যাকটিস। চলো, র‍্যাঞ্চে। এই উপত্যকার কথা আরও জানতে হবে।
দ্বিতীয়বার বলতে হলো না রবিন আর মুসাকে। পেছনে, পাহাড়ের নিচে রেখে এসেছে সাইকেল, সেদিকে রওনা হলো।
হঠাৎ, উপত্যকার এক প্রান্ত থেকে শোনা গেল.পাথর পড়ার ভারি শব্দ, সেই সাথে তীক্ষ্ণ আর্তনাদ।

.
শব্দটা মিলিয়ে গেল গোঙানি উপত্যকার-মোনিং ভ্যালির বাংলা নাম রেখেছে কিশোর– ওপর দিয়ে।
ওটা তো গুহা থেকে আসেনি! বলে উঠলো মুসা।
না। একমত হলো কিশোর। মানুষের চিৎকার!
বিপদে পড়েছে, যোগ করলো রবিন। চলো তো দেখি।
তটরেখা আর পর্বতের মাঝের উপত্যকা থেকে এসেছে শব্দটা। পর্বতের নাম ডেভিল মাউনটেইন, কারণ, দুদিকের দুটো চূড়া দূর থেকে দেখায় কল্পিত শয়তানের শিঙের মতো।
দৌড় দিলো তিন গোয়েন্দা। ওপর থেকে গড়িয়ে পড়ে অনেকগুলো পাথর। জমা হয়েছে পাহাড়ের গোড়ায়, ধুলো উড়ছে এখনও।
আআহ! যন্ত্রণায় কাতরালো কেউ।
সবার আগে লোকটার পাশে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসলো মুসা। ধূসর চুল মানুষটার, কোমরের নিচের অংশ পাথরের তলায়। ব্যথায় মুখ বিকৃত। চুপ করে। শুয়ে থাকুন, বলে কিশোরের দিকে ফিরলো মুসা। মনে হচ্ছে পা-টা ভেঙেছে।

লোকটার পরনে পুরনো কাউবয় পোশাক। দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথা সহ্য করছে। কোনোমতে বললো, আ-আমি হারভে র‍্যাঞ্চে কাজ করি। মিস্টার হারভেকে গিয়ে বলো, কাউকে এখানে পাঠিয়ে দিতে। প্লীজ!
হতবাক হয়ে পরস্পরের দিকে তাকালো তিন গোয়েন্দা। আরেকটা দুর্ঘটনা! আহত হলো মিস্টার হারভের আরেকজন শ্রমিক!

.
হারভে দম্পতির সঙ্গে দুই হপ্তার ছুটি কাটাতে র‍্যাঞ্চে এসেছিলো মুসা। র‍্যাঞ্চটার নতুন মালিক মিস্টার হারভে। বিখ্যাত একজন রোডিয়ো-রাইডার, মুসার বাবা। মিস্টার রাফাত আমানের সঙ্গে অনেকগুলো ওয়েস্টার্ন ছবিতে কাজ করেছেন। জন্তুজানোয়ার, বিশেষ করে ঘোড়ার খেলা দেখাতেন। সেই কাজ ছেড়ে জমানো টাকা দিয়ে কিছুদিন আগে এই র‍্যাঞ্চ কিনে শেষ জীবনটা কাটাতে এসেছেন এখানে। নষ্ট হয়ে যাওয়া পুরনো র‍্যাঞ্চটার মেরামত সবে শেষ করে এনেছেন, এই সময় শুরু হলো গণ্ডগোল।
মোনিং ভ্যালির নামকরণ হয়েছে প্রাচীন ইণ্ডিয়ানদের একটা রোমাঞ্চকর লোককাহিনী আর পুরনো স্প্যানিশ ঔপনিবেশিকদের নিষ্ঠুরতার ইতিহাসের ওপর ভিত্তি করে। গুজব রটতে শুরু করেছে এখনঃ পঞ্চাশ বছর নীরব থাকার পর আবার জেগে উঠেছে মোনিং ভ্যালি, গোঙাতে আরম্ভ করেছে। র‍্যাঞ্চ শ্রমিকদের তাড়ানোর জন্যে যেন গোঙানিই যথেষ্ট নয়, তাই ঘটতে শুরু করেছে দুর্ঘটনা।
প্রথম দুর্ঘটনাটা ঘটে কিছু দিন আগে। দুজন শ্রমিক ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিলো মোনিং ভ্যালির কাছ দিয়ে। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। হঠাৎ এক অদ্ভুত গোঙানি শুনে চমকে উঠলো তাদের ঘোড়া, ভয় পেয়ে লাফিয়ে উঠে দিলো দৌড়। এর জন্যে তৈরি ছিলো না লোক দুজন। ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেল। একজনের হাত ভাঙলো, আরেকজনের হাড়গোড় ঠিক থাকলেও শরীরের নানা জায়গা ছিলেছুলে গেল। দুজনেই র‍্যাঞ্চে ফিরে এলো। জানালো, ভূতের উপদ্রব শুরু হয়েছে। উপত্যকায়। তার কয়েকদিন পরে, কোনো কারণ ছাড়াই রাত দুপুরে উন্মাদ হয়ে গেল যেন র‍্যাঞ্চের গরুর পাল। নানারকম অঘটন ঘটিয়ে ছাড়লো। তারপর এক সন্ধ্যায় উপত্যকার ওদিকে বেড়াতে গিয়ে নাকি বিরাট এক দানব দেখে এলো আরেক শ্রমিক। কসম খেয়ে বললো, ডেভিল মাউনটেইনের গোড়ায় হেনরি ফিগারোর গুহা থেকে বেরিয়েছে দানবটা। তার দিন কয়েক পরে, কাউকে কিছু না। জানিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল দুজন শ্রমিক। খোঁজ নিয়ে এসে শেরিফ জানালেন, তাদেরকে সানতা কারলায় দেখা গেছে, কিন্তু অনেক শ্রমিকই বিশ্বাস করলো না। তার কথা।

দিন কয়েক র‍্যাঞ্চে থেকেই মুসা বুঝে গেল, ভীষণ দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছেন। হারভে দম্পতি। ফিগারোর গুহায় অনেক খোঁজাখুঁজি করা হয়েছে, রহস্যময় কিছুই পাওয়া যায়নি, রহস্যেরও সমাধান হয়নি। ইণ্ডিয়ান লোককাহিনী আর ভূতের পেছনে তাড়া করার উপায় নেই, কাজেই কোনো সাহায্য করতে পারলেন না। শেরিফ। তিনি, এবং হারভে দুজনেই বিশ্বাস করেন, ভূত-ফুত সব বাজে কথা, নিশ্চয় কোনো সহজ ব্যাখ্যা আছে এসবের। কিন্তু বুঝতে পারছেন না, সেটা কী।
কিশোরকে ছাড়া হবে না, বুঝে, হারভে দম্পতির অনুমতি নিয়ে তাকে আর রবিনকে আসার জন্যে খবর পাঠালো মুসা। বাড়িতে জরুরি কাজ ফেলে ছুটে এসেছে দুজনে। এরকম একটা রহস্যের কথা শোনার পর কি আর স্বস্তিতে কাজ করা যায়? অন্তত কিশোর পাশার পক্ষে সম্ভব নয়। আর মুসা নেই, কিশোর থাকবে না, একলা কি আর মন টেকে রবিনের? গোল্লায় যাক জরুরি কাজ, বলে সোজা। রওনা হয়ে পড়লো দুজনে।
ক্যালিফোরনিয়া উপকূলে রকি বীচ থেকে একশো মাইল উত্তরে, আর। আধুনিক হলিডে রিসোর্ট সানতা কারলার মাইল দশেক দূরে এই হারভে র‍্যাঞ্চ। পার্বত্য অঞ্চল। বড় বড় পাহাড়-পর্বত, গুহা, গভীর গিরিখাত, অসংখ্য উপত্যকা আর একধারে প্রশান্ত মহাসাগর এখানে। মুসা এসেছিলো চুটিয়ে ঘোড়ায় চড়তে, সাঁতার কাটতে আর মাছ ধরতে কোনোটাই করা হলো না। জড়িয়ে পড়লো। জটিল রহস্যে, দুই দোস্তকেও ডেকে আনলো।
ভূতের আসর হয়েছে এই উপত্যকায়, বিড়বিড় করলো আহত লোকটা। আসাই উচিত হয়নি…ওই গোঙানি, গোঙানিই যতো নষ্টের মূল!
না, দৃঢ় কণ্ঠে বললো কিশোর। নেভির ফায়ারিঙের শব্দে কেঁপে উঠে ওই পাথরের ধস নেমেছে।
আমি বলছি সেই গোঙানি!
ওসব কথা পরে হবে, বললো মুসা। কিশোর, আগে…
তার কথা শেষ হলো না। কাছেই ডেকে উঠলো ঘোড়া। ফিরে চেয়ে দেখলো ছেলেরা, তিনজন ঘোড়সওয়ার এগিয়ে আসছে। তাদের একজন রাশ ধরে টেনে আনছে চতুর্থ আরেকটা ঘোড়াকে-পিঠে আরোহী নেই; যে লোকটা পড়ে ব্যথা পেয়েছে বোধহয় তারই ঘোড়া। দলের আগে আগে রয়েছেন মিস্টার হারভে।
তোমরা এখানে? কাছে এসে ঘোড়া থেকে নামতে নামতে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।
লম্বা, ইস্পাতকঠিন দেহ, গায়ে উজ্জ্বল লাল শার্ট, পরনে রঙচটা নীল জিনসের প্যান্ট, পায়ে হাই-হীল কাউবয় বুট। রোদেপোড়া তামাটে চামড়া। চেহারায় উৎকণ্ঠার ছাপ।
আহত লোকটাকে কিভাবে পেয়েছে জানালো ছেলেরা।

বেশি ব্যথা পেয়েছো, পোরটিকো? লোকটার পাশে হাঁটু গেড়ে বসলেন মিস্টার হারভে।
হাড্ডি ভেঙে গেছে! বললো পোরটিকো। সব ওই ভূতের কারবার.. গুহার ভূত! আমি আর এখানে থাকছি না!
আমার ধারণা, কিশোর বললো। ফায়ারিঙের শব্দে ধস নেমেছে।
সেটা সম্ভব, মাথা দোলালেন মিস্টার হারভে।
আহত লোকটার গায়ের ওপর থেকে পাথর সরিয়ে ফেলা হলো। দুজন লোক গিয়ে র‍্যাঞ্চের ট্রাক নিয়ে এলো। সাবধানে তাতে তোলা হলো পোরটিকোকে। তারপর রওনা হলো সানতা কারলায়, হাসপাতালে।
তিন গোয়েন্দা ফিরে চললো তাদের সাইকেলের কাছে।
র‍্যাঞ্চ হাউসে পৌঁছতে পৌঁছতে পুরোপুরি আঁধার হয়ে গেল। মোট পাঁচটা বাড়িঃ শ্রমিকদের থাকার জন্যে একটা বাংকহাউস, একটা বড় গোলাঘর, একটা ছোট গোলাঘর, একটা রান্নাঘর, আরেকটা মূল বাড়ি। ওই বাড়িটা দোতলা। কাঠের বড় বড় বীম রয়েছে, অ্যাডোব আছে, আর বাড়ি ঘিরে রয়েছে চওড়া, ছাউনিওয়ালা বারান্দা। দিনের বেলায়ও সেখানে ছায়া থাকে, ঠাণ্ডা থাকে। জানালার যেখানেই সুযোগ পেয়েছে লতিয়ে উঠেছে আঙুর লতা। বাড়ির চারপাশে রক্তলাল বোগানভিলিয়ার ছড়াছড়ি। পাঁচটা বাড়ির চারপাশে তৈরি হয়েছে বেড়া দেয়া কয়েকটা কোরাল।
রান্নাঘরের কাছে লোকের হোট ঘোট জটলা। দুর্ঘটনার কথা আলোচনা, করছে। নিচু কণ্ঠ, চেহারায়.ভয় আর রাগের মিলিত ছাপ।
মূল বাড়িতে ঢুকতে যাবে, অন্ধকার থেকে শোনা গেল ভারি, খসখসে একটা কণ্ঠ। কোথায় ছিলে তোমরা? জানতে চাইছে র‍্যাঞ্চের ফোরম্যান ডেভিড কোহেন।
বারান্দায় মৃদু নড়াচড়া। আলোয় বেরিয়ে এলো কোহেন। দেহের তুলনায়। মুখটা ছোট, খাড়া নাক, রোদে পোড়া চামড়া। গেছিলে কোথায়? আবার জিজ্ঞেস করলো সে। জায়গা ভালো না। হারিয়ে যেতে যদি?
পাহাড়-পর্বত অনেক দেখা আছে আমাদের, মিস্টার কোহেন, জবাব দিলো কিশোর। ভাববেন না।
আরেক কদম এগোলো ফোরম্যান। তোমরা কি করতে গিয়েছে, শুনলাম। গোঙায় কিসে, জানতে। দেখো, জায়গাটা ভালো না। বাচ্চাদের জন্যে আরও খারাপ। ওই গুহার ধারেকাছে যাবে না।
ছেলেরা কিছু বলার আগেই বাড়ির একটা দরজা খুলে গেল। বেরিয়ে এলেন ছোটখাটো একজন মহিলা। ধূসর চুল। রোদে পুড়ে তামাটে হয়েছে এককালের লালচে চামড়া। গালের গোলাপি আভাও আর নেই এখন, হাত-পায়ের মতোই।

তামাটে। কি আজেবাজে বকছো, ডেভিড? ধমক দিয়ে বললেন মিসেস হারভে। ওরা বাচ্চা নয়। আমার বিশ্বাস, অনেকের চেয়ে বুদ্ধিশুদ্ধিও বেশিই রাখে।
মোনিং ভ্যালি ভালো জায়গা নয়, মিনমিন করে বললো কোহেন।
তুমিই তো বাচ্চা ছেলের মতো কথা বলছো। ভূতের ভয়ে কাবু। গুহাটাকে ভয় পাও!
ভয় পাই না আমি! আরেক দিকে মুখ ফিরিয়ে বললো কোহেন। তবে সত্যকে কিছু না বলে উড়িয়ে দেয়া যায় না। সারা জীবন এখানে কাটালাম, জানেনই। সেই ছোট বেলা থেকে শুনে আসছি মোনিং ভ্যালির গল্প। তখন বিশ্বাস করতাম না, এখন করি।
যত্তোসব ফালতু কথা! কুসংস্কার! বললেন বটে মিসেস; কিন্তু গলায় জোর। নেই। বোঝা যাচ্ছে, তিনিও শিওর নন। কণ্ঠের উৎকণ্ঠা ঢাকতে পারলেন না।
কিশোর জিজ্ঞেস করলো, মিস্টার কোহেন, গোঙানির কারণটা বলতে পারবেন?
দ্বিধা করলো ফোরম্যান। না। কেউ জানে না। আমিও অনেক খুঁজেছি, কিছু পাইনি। মানে. দেখিনি! শেষ শব্দটার ওপর বিশেষ জোর দিলো সে। আবছা অন্ধকারে চকচক করে উঠলো তার চোখ। ইণ্ডিয়ানরা বলে কেউ নাকি দেখতে পায় না। ভূ..., শুধরে নিয়ে বললো। বুড়ো মানুষটাকে!

.

ডেভিড! চেঁচিয়ে উঠলেন মিসেস হারভে।
পরোয়া করলো না. কোহেন। আমি ওই গল্প বিশ্বাস করি না। কিন্তু আজব ঘটনা তো ঘটছে গুহায়। অস্বীকার করতে পারেন? আবার গোঙাতে শুরু করেছে। গুহাটা, কেউ জানে না, কেন। কেউ কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারছে না। বুড়ো মানুষটা না হলে আর কে?
বলে আর দাঁড়ালো না ফোরম্যান। বারান্দা থেকে নেমে সোজা বাংকহাউসের দিকে হাঁটা দিলো।
সেদিকে তাকিয়ে রইলেন মিসেস হারভে। সবার মনেই ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছে! ডেভিডের মতো সাহসী লোক আমি কমই দেখেছি, তারই যখন এই অবস্থা... ওরকম করে কখনও কথা বলেনি।
আমাদেরকে বুড়ো মানুষটার কথা শোনালো কেন? চিন্তিত ভঙ্গিতে বললো। কিশোর।
জোর করে উৎকণ্ঠা ঝেড়ে ফেলে হাসলেন মিসেস হারভে। বোধহয় ও টায়ারড। সারাদিন এতো বেশি পরিশ্রম করতে হয়.. তো, তোমাদের খিদে পায়নি? দুধ আর বিস্কুট চলবে?
নিশ্চয়ই, তাড়াতাড়ি বলে উঠলো মুসা।

আরামদায়ক লিভিংরুমে বসে খাচ্ছে ছেলেরা। সুদৃশ্য ইনডিয়ান কার্পেটে ঢাকা মেঝে, পুরনো আমলের আসবাবপত্র। মস্ত এক ফায়ারপ্লেস এক দিকের দেয়ালের প্রায় সবটা জুড়ে রয়েছে। দেয়ালে দেয়ালে শোভা পাচ্ছে শিকার করা হরিণ, ভালুক আর পার্বত্য সিংহের মাথা।
ওই বুড়ো মানুষটা কে? মিসেস হারভেকে জিজ্ঞেস করলো কিশোর। আরেকটা বিস্কুট তুলে নিলো।
ও কিছু না। ইনডিয়ানদের উপকথা। অনেক আগে স্প্যানিশরা যখন এলো, তখনকার ইনডিয়ানদের মাঝে একটা গল্প চালু ছিলো। ডেভিল মাউনটেইনের গভীরে একটা খাড়িতে নাকি কালো, চকচকে, একটা দানব থাকে।
চোখ মিটমিট করলো মুসা। কোহেন যে বললো: কেউ দেখেনি? দেখেই যদি থাকবে, জানলো কি করে কালো আর চকচকে! আর দানবকে মানুষই বা বলা কেন?
তাহলেই বোঝো, হাসলেন মিসেস হারভে। কোনো যুক্তি নেই। গল্প গল্পই।
দানবকে মানুষ বলে বোধহয় শ্রদ্ধা করে, কিশোর বললো। বাংলাদেশে সুন্দরবনের বাঘকে স্থানীয় লোকেরা সম্মান করে বলে বড় মিয়া। ভয়ে। তাদের বিশ্বাস, ওরকম করে ডাকলে বাঘ তাদের কিছু বলবে না! ওসব কুসংস্কার। যারা বলে তাদের কেউ কি বাঘের পেটে যায় না?
আগের কথার খেই ধরে রবিন জিজ্ঞেস করলো, স্প্যানিয়ার্ডরা কি বলতো?
অনেক আগের কথা তো, বললেন মিসেস হারভে। তখনকার। স্প্যানিয়ার্ডরাও ওই ইনডিয়ানদের চেয়ে কিছু কম ছিলো না, কুসংস্কার ছিলো ওদের মাঝেও। মুখে বলতো বিশ্বাস করে না, কিন্তু উপত্যকার ধারেকাছেও যেতো না। হেনরি ফিগারো অবশ্য ওসব পরোয়া করতো না। সে গুহার ভেতরেও ঢুকতো।
হেনরি ফিগারোর সম্পর্কে কিছু বলতে পারবেন? অনুরোধ করলো কিশোর।
এই সময় ঘরে ঢুকলেন মিস্টার হারভে। সঙ্গে বেঁটে, রোগাটে একজন লোক। চোখে ভারি পাওয়ারের চশমা। ছেলেরা আগেই পরিচিত হয়েছে তার সঙ্গে। প্রফেসর হারকসন। তিনিও এই র‍্যাঞ্চে মেহমান।
এই যে, ছেলেরা, বললেন প্রফেসর। শুনলাম রহস্যময় মোনিং ভ্যালিতে গিয়েছিলে।
রহস্য না কচু! মুখ বাঁকালেন মিস্টার হারভে। অতি সাধারণ ঘটনাগুলোকে বাড়িয়ে দেখছে সবাই। কোনো র‍্যাঞ্চে কি দুর্ঘটনা ঘটে না, ওরকম হাত-পা ভাঙে না?
কথাটা তুমি ঠিকই বলেছো, প্রফেসর বললেন। আসলে, অশিক্ষিত তো ওরা। ভাবছে, না জানি কি! ভয় পেয়ে গেছে।

কারণটা জানলেই ওদের এই ভয় ভেঙে যেতো। আজকের ঘটনায় আরও লোক হারাবো, চলে যাবে। কোনো কিছুর লোভ দেখিয়েই ধরে রাখতে পারবো না। ছেলেগুলোও বুঝতে পারছে, ভূতের কাণ্ড নয়। নেভির গানফায়ারিঙের জন্যেই ধস নেমেছে। অথচ বোকা:গাধাগুলোকে বোঝানো যাচ্ছে না। আমি শিওর, সহজ কোনো ব্যাখ্যা আছে ওই গোঙানির।
সেটা কি? প্রশ্ন করলেন মিসেস হারভে।
নাক টানলেন মিস্টার হারভে। পুরনো সুড়ঙ্গগুলোর ভেতর দিয়ে জোরে বাতাস বয়ে যাওয়ার সময় ওরকম শব্দ হয়।
হাতের বিস্কুটটা খেয়ে শেষ করলো কিশোর। আপনি আর শেরিফ নাকি ঢুকেছিলেন গুহায়? ভালোমতো দেখেছিলেন?
এমাথা-ওমাথা কিছুই বাকি রাখিনি। ভূমিকম্পে ধস নেমে কিছু কিছু সুড়ঙ্গ বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু যেগুলোতে ঢোকা যায়, সব কটাতে ঢুকেছি।
নতুন কোনো অদল-বদল চোখে পড়েছে?
অদল-বদল? ভ্রূকুটি করলেন মিস্টার হারভে। না তো। কি বোঝাতে চাইছো?
গোঙানি শুরু হয়েছে মাত্র এক মাস আগে থেকে। পঞ্চাশ বছর পর। বাতাসের কারণেই যদি হয়ে থাকবে, এতোদিন বন্ধ থাকলো কেন? হতে পারে, সুড়ঙ্গের ভেতরে কিছু একটা বদলে দেয়া হয়েছে, যার ফলে আবার শুরু হয়েছে শব্দ।
ভালো বলেছো তো! নাকের ডগায় নেমে আসা চশমাটা ঠেলে পেছনে সরালেন প্রফেসর। চমৎকার যুক্তি! রক, বুদ্ধি আছে ছেলেগুলোর। মনে হচ্ছে এ রহস্যের সমাধান করেই ফেলবে।
একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছেন, আওয়াজটা সন্ধ্যায় হয় কিংবা রাতে হয়, দিনের বেলা হয় না। কেন? তারমানে শুধু বাতাস নয়, আরও কোনো ব্যাপার আছে। আরেকটা ব্যাপার, গত এক মাসে রাতে যতো দিন ঝড়ো বাতাস বয়েছে, রোজই কি ওই শব্দ শোনা গেছে?
না, যায়নি, আগ্রহী হয়ে উঠছেন মিস্টার হারভে। ঠিকই বলেছো। শুধু বাতাসের কারণে হলে, বাতাস বইলেই ওই শব্দ হতো। তা যখন হয় না, আরও কোনো কারণ নিশ্চয় আছে।
হেসে বললেন প্রফেসর, কি জানি, হয়তো হেনরি ফিগারোই এর জন্যে দায়ী। রাতে ঘোড়ায় চড়ে ঘুরতে বেরোয়।
ঢোক গিললো মুসা। আপনিও বলছেন, স্যার? কিশোরও একথা বলেছে।
ভূত বিশ্বাস করো নাকি তুমি, ইয়াং ম্যান? কিশোরকে জিজ্ঞেস করলেন প্রফেসর।
না, মাথা নাড়লো কিশোর।

আমিও না, বললেন প্রফেসর। অনেকের ধারণা, বিশেষ করে এখানকার স্প্যানিশদের, দরকারের সময় নিশ্চয় বেরিয়ে আসবে হেনরি ফিগারো। অনেক রিসার্চ করেছি আমি। জোর গলায় বলতে পারবো না যে সে বেরোবে।
রিসার্চ?
উনি ইতিহাসের প্রফেসর, বুঝিয়ে বললেন মিসেস হারভে। সানতা কারলায় বছরখানেক যাবত আছেন, ক্যালিফোর্নিয়ার ইতিহাস নিয়ে স্পেশাল রিসার্চ করছেন। স্বামীকে দেখিয়ে বললেন, ওর ধারণা, মোনিং ভ্যালির রহস্য ভেদ করতে পারবেন প্রফেসর।
যদিও এখনও কিছুই করতে পারিনি, স্বীকার করলেন প্রফেসর। হেনরি। ফিগারোর কথা শুনতে চাও? ওর চমকপ্রদ জীবন নিয়ে একটা বই লিখছি আমি।
শোনালে তো খুবই ভালো হয়, স্যার! সামনে ঝুঁকে বসলো রবিন।
আমিও শুনতে চাই, কিশোর বললো।
চেয়ারে হেলান দিয়ে আরাম করে বসলেন প্রফেসর। শোনালেন হেনরি ফিগারোর বিখ্যাত অ্যাডভেঞ্চারের রোমাঞ্চকর কাহিনীঃ
ক্যালিফোর্নিয়ার শুরুতে আজকের এই হারভে র‍্যাঞ্চছিলো র‍্যাঞ্চো ফিগারোর একটা অংশ। স্প্যানিশ সেটলাররা তখন সবে আসতে শুরু করেছে এই অঞ্চলে। সবার আগে এসেছিলো ফিগারো পরিবার, স্পেনের রাজার কাছ থেকে জমির দখল সত্ত্ব নিয়ে। বিশাল এলাকা জুড়ে বসেছিলো তারা। আমেরিকার পূর্বাঞ্চলে তখন ইংরেজদের ভিড়, দলে দলে এসে উপনিবেশ গড়ছে। ক্যালিফোর্নিয়ায় স্প্যানিশরা তেমন করে দল বেঁধে আসেনি; আসতো একজন, দুজন করে। ফলে কয়েক পুরুষ ধরে র‍্যাঞ্চো ফিগারোর সীমানার কোনো রদবদল হলো না।
তারপর হঠাৎ করেই পুব থেকে সেটলাররা দলে দলে আসতে শুরু করলো ক্যালিফোর্নিয়ায়। আস্তে আস্তে হাতছাড়া হতে লাগলো ফিগারোদের জমি, জবর দখল হয়ে যেতে লাগলো। মেকসিকো যুদ্ধের পর ক্যালিফোর্নিয়া যোগ হয়ে গেল যুক্তরাজ্যের সঙ্গে। তখন আরও বেশি আমেরিকান সেটলার চলে এলো এই এলাকায়, বিশেষ করে ১৮৪৯ সালের ঐতিহাসিক গোল্ড রাশ-এর পর। ১৯০০ সাল নাগাদ ফিগারোদের প্রায় সমস্ত জমিই হাতছাড়া হয়ে গেল, শুধু ছোট একটা অংশ বাদে, তার মধ্যে পড়লো হারভে র‍্যাঞ্চ আর ওই অভিশপ্ত মোনিং ভ্যালি।
ফিগারোদের শেষ বংশধরের নাম হেনরি ফিগারো। দুর্ধর্ষ, দুঃসাহসী, বেপরোয়া এক তরুণ, আমেরিকানদের দুচোখে দেখতে পারতো না। তাদেরকে চোর-ডাকাত মনে করতো। ফিগারোদের টাকার গরমও আর নেই তখন, ক্ষমতাও শেষ। প্রতিশোধের আগুন সব সময় দাউদাউ করে জ্বলতো তরুণ, হেনরির মনে। ভাবতো, যে করেই হোক আবার তার পূর্বপুরুষদের সম্পত্তি নিজের দখলে।

আনবে। বেশ কিছু পুরনো স্প্যানিশ আর মেকসিকান পরিবার তখনও ছিলো ক্যালিফোর্নিয়ায়, তাদেরকে দলে টানার চেষ্টা করলো সে.। আমেরিকানদের বিরোধিতা করে হয়ে গেল আউট-ল, পর্বতের গভীরে ঘাঁটি করলো। স্প্যানিশদের কাছে হয়ে গেল এক নতুন রবিন হুড, আর আমেরিকানদের কাছে ডাকাত।
তাকে ধরার জন্যে অনেক চেষ্টা করলো আমেরিকানরা, পারলো না। এই অঞ্চলের পাহাড়-পর্বত সব চেনা হেনরির, কোথায় কখন লুকিয়ে থাকে বুঝতেই পারলো না কেউ। তার বিরুদ্ধে অভিযোগঃ করের টাকা চুরি, ট্যাক্স কালেকটরদের ভয় দেখিয়ে মেরে-পিটে তাড়িয়ে দেয়া, আমেরিকান সরকারের বিভিন্ন অফিসে চড়াও হয়ে তাদের টাকা লুটপাট, স্প্যানিশ-ভাষী ক্যালিফোর্নিয়ানদের সাহায্য করা আর আমেরিকানদের আতঙ্কিত করে রাখা।
তবে, বছর দুই পরে ১৯০৮ সালে সানতা কারলার শেরিফের হাতে ধরা পড়ে গেল সে। বেঁধে নিয়ে যাওয়া হলো তাকে আদালতে। বিচারে ফাসীর আদেশ হলো। তার। স্প্যানিশ-ভাষীরা বলে বিচারের নামে প্রহসন হয়েছে। যা-ই হোক, ফাঁসীর দুই দিন আগে কয়েকজন বন্ধুর সহায়তায় দিনের আলোয় সবার চোখের সামনে দিয়ে পালিয়ে গেল হেনরি। আদালতের ছাতে উঠে, লাফিয়ে পাশের আরেকটা ছাতে গিয়ে পড়লো। সেখান থেকে লাফ দিয়ে নামলো তার বিখ্যাত কালো ঘোড়ার। পিঠে-ঘোড়াটাকে তার জন্যেই দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিলো সেখানে।
পালানোর সময় গুলিতে আহত হলো হেনরি। পেছনে তাড়া করে এলো শেরিফ আর তার দলবল। সোজা পর্বতের দিকে ছুটলো হেনরি, মোনিং ভ্যালিতে গিয়ে ঢুকে পড়লো একটা গুহায়। শেরিফের জানামতে যতোগুলো সুড়ঙ্গমুখ ছিলো, ওই গুহা থেকে বেরোনোর, সব বন্ধ করে দেয়া হলো। ভেতরে ঢুকলো না কেউ, কিংবা ঢোকার সাহস করলো না। বাইরে পাহারায় রইলো। শেরিফ মনে করলো, হেনরি আহত, ক্ষতের যন্ত্রণা তো আছেই, তার ওপর ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাহিল হয়ে এক সময় না এক সময় নিশ্চয় বেরিয়ে আসবে।
দিনের পর দিন বসে রইলো ওরা, হেনরি বেরোলো না। সারাক্ষণ গুহার ভেতর থেকে একটা অদ্ভুত গোঙানি কানে এসেছে ওদের। অবশেষে তার লোকদের গুহায় ঢোকার আদেশ দিলো শেরিফ। নিজেও ঢুকলো। গুহা আর যতোগুলো সুড়ঙ্গ চোখে পড়লো সবগুলোতে খুঁজলো, চার দিন ধরে, হেনরিকে পেলো না। বেরিয়ে এসে আশপাশের এলাকায় তন্নতন্ন করে খুঁজলো। কিন্তু কিছুই পেলো না। না জীবন্ত হেনরি, না তার লাশ, না তার কাপড়-চোপড়। ঘোড়া, পিস্তল, টাকা, কিচ্ছু পেলো না।
এরপর আর কেউ দেখেনি হেনরিকে। কেউ কেউ বলে, তাকে পালাতে সাহায্য করেছিলো তার প্রেমিকা নোরিটা। গোপন সুড়ঙ্গ পথে গুহায় ঢুকে বের করে নিয়ে

এসেছিলো আহত মানুষটাকে। দুজনেই পালিয়ে চলে গেছে দক্ষিণ আমেরিকায়। আবার কেউ বলে, তার স্প্যানিশ-ভাষী বন্ধুরা তাকে বের করে এনে। বছরের পর বছর ধরে তাদের র‍্যাঞ্চে লুকিয়ে রেখেছিলো, আজি এখানে কাল ওখানে করে করে।
তবে বেশির ভাগেরই ধারণা, গুহা থেকে বেরোয়নি হেনরি। এমন জায়গায় লুকিয়েছিলো, আমেরিকানরা খুঁজেই পায়নি। তারপর থেকে অনেক বছর পর্যন্ত, ওই এলাকায় কোনো চুরি-ডাকাতি বা খুনখারাপ হলে আর আসামী ধরা না পড়লে সব দোষ চাপিয়ে দেয়া হতো হেনরির ঘাড়ে। অন্ধকার রাতে নাকি তার কালো ঘোড়ায় চড়ে ঘুরতে বেরোয় সে। যে গুহাটায় থাকতো, সব সময় সেটার ভেতর থেকে শোনা যেতো বিচিত্র গোঙানির আওয়াজ।
তারপর, উপসংহার টানলেন প্রফেসর। হঠাৎ একদিন বন্ধ হয়ে গেল, গোঙানি। স্প্যানিশ-ভাষীরা বলে, এখনও নাকি ওই গুহার ভেতরেই রয়েছে হেনরি ফিগারো। তাদের বিশেষ প্রয়োজনের সময় নিশ্চয় বেরিয়ে আসবে।
খাইছে! বলে উঠলো মুসা। এখনও আছে!
কি করে থাকে? রবিনের জিজ্ঞাসা।
দেখো, বললেন প্রফেসর। অনেক রিসার্চ করেছি আমি, অনেক খোঁজখবর করেছি হেনরি ফিগারোর। অনেক কিছু জেনেছি। তার মধ্যে ভুল তথ্যও অনেক আছে। এই যেমন ধরো, ওর যতো পুরনো ছবি আছে, সবগুলোতে দেখা যায়। পিস্তলের খাপ কোমরের ডান দিকে ঝোলানো, অথচ আমি শিওর সে বাইয়া।
চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা ঝোঁকালো কিশোর। কিংবদন্তীতে অনেক সময়ই ভুল। তথ্য থাকে। বিশেষ করে এধরনের বিখ্যাত মানুষদের সম্পর্কে।
ঠিক বলেছো, তর্জনী নাচালেন প্রফেসর। অফিশিয়াল রেকর্ড বলে, পালানোর দিনই রাতে গুহার ভেতরে মারা গিয়েছে হেনরি। ভালোমতো খুঁটিয়ে পড়েছি আমি সমস্ত রেকর্ড, গবেষণা করেছি। পরিষ্কার বুঝেছি গুলির আঘাত মারাত্মক ছিলো না। তখন তার বয়েস ছিলো আঠারো বছর। কাজেই, এখনও তার বেঁচে থাকাটা অসম্ভব কিছু নয়!

.

কি বাজে বকছো! প্রায় ফেটে পড়লেন মিস্টার হারভে। তারমানে একশোর কাছাকাছি তার বয়েস। ওরকম বয়সের একজন লোক ওভাবে ঘোড়ায় চড়ে বেড়ায় কি করে?
পারে, পারে, শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন প্রফেসর। শুনলে অবাক হবে, রাশিয়ার দক্ষিণ অঞ্চলে, ককেসাস পর্বতমালার উপজাতীয় লোকেরা একশো বছর বয়েসেও ঘোড়ায় চড়ে, লড়াই করে।

তা ঠিক, স্যার,বললো কিশোর।
কিংবা এমনও হতে পারে, বললেন প্রফেসর। হেনরির কোনো বংশধর আছে। ছেলে, কিংবা নাতি। হেনরির ইচ্ছা পূরণ করতে এসেছে।
কিছুটা বিমনা মনে হলো মিস্টার হারভেকে। হ্যাঁ, তা হতে পারে। আমাদের। আগে যারা ছিলো, তারা মোনিং ভ্যালির কাছে যেতো না। কিন্তু আমি ঠিক করেছি ওখানে একটা কোরাল বানাবো। হয়তো হেনরির ছেলে বা নাতি চায় না গুহার ঐতিহ্য নষ্ট হোক।
হ্যাঁ, এটাই জবাব! চেঁচিয়ে উঠলেন মিসেস হারভে। রক, মনে আছে, র‍্যাঞ্চের পুরনো কয়েকজন মেকসিকান শ্রমিক বিরক্ত হয়েছিলো? কাজ ছেড়ে চলে গিয়েছিলো। তারা চায়নি; মোনিং ভ্যালিতে কোরাল উঠুক। তারপর থেকেই তো, শুরু হলো গোঙানি।
মনে আছে। ওরাই প্রথম গেছে। কালই দেখা করবো আমি শেরিফের সাথে। হেনরির কোনো বংশধর আছে কিনা খোঁজখবর নিতে বলবো।
একটা ছবি দেখাচ্ছি, পকেট থেকে ছোট একটা ফটোগ্রাফ বের করে দিলেন। প্রফেসর।
হাতে হাতে ঘুরতে লাগলো ছবিটা। ছিপছিপে এক তরুণের ছবি। কালো চোখের তারায় যেন আগুনের ঝিলিক, গর্বিত মুখ। চওড়া কানা আর উঁচু চূড়ওয়ালা, কালো ভ্যাকুয়েরো সমব্রেরো হ্যাট মাথায়। গায়ে খাটো কালো। জ্যাকেটের নিচে কালো উঁচু কলারের শার্ট, পরনে কালো আঁটো প্যান্ট, নিচের দিকটা ছড়ানো। পায়ে কালো চকচকে পয়েন্টেড বুট। ক্যামেরায় তোলা জীবন্ত হেনরির ছবি নয়, একটা পেইন্টিঙের ফটোগ্রাফ।
সব সময়ই কি কালো পরতো? জানতে চাইলো রবিন।
সব সময়, জবাব দিলেন প্রফেসর। শোকের চিহ্ন। তার পরিবার আর দেশের জন্যে শোক করতো।
চোরের আবার দেশপ্রেম! সাধারণ একটা ডাকাত ছাড়া আর কিছুই ছিলো না। ব্যাটা, ক্ষোভ ঢেকে রাখতে পারলেন না আমেরিকান র‍্যাঞ্চার। বলেই বুঝলেন, কথাটা খারাপ হয়ে গেছে। হেসে সামাল দিলেন। বসে বসে কিচ্ছা শুনলে র‍্যাঞ্চ চলবে না, অনেক কাজ আছে আমার। আজ রাতেই সেগুলো সারতে হবে। ছেলেদের দিকে তাকালেন। তোমরা নিশ্চয় খুব টায়ারড। কাল খাটাবো তোমাদেরকে। মুসার বাবা বলে দিয়েছে, কি করে র‍্যাঞ্চ চালাতে হয় তার ছেলেকে যেন শিখিয়ে দিই।
মোটেই টায়ারড নই আমি, তাড়াতাড়ি বললো কিশোর। তোমরা?
আমিও না, রবিন বললো।

আমিও না, প্রতিধ্বনি করলো যেন মুসা।
সবে তো সন্ধ্যা হয়েছে, বললো কিশোর। আকাশও ভালো। সুন্দর রাত। র‍্যাঞ্চের আশপাশে ঘুরে দেখতে চাই। রাতের বেলা নাকি এখানকার সৈকতে নানা রকম সামুদ্রিক জীব উঠে আসে। দেখার সুযোগ কে ছাড়ে?
রাতের বেলা..., মিসেস হারভে ঠিক মেনে নিতে পারছেন না।
নিশ্চয়ই, তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন মিস্টার হারভে। দেখতে এসেছে, দেখবে। ঘুমিয়ে কাটানোর জন্যে তো নিজের বাড়িই আছে, র‍্যাঞ্চে কেন?
বেশ, অনিচ্ছা সত্ত্বেও বললেন মিসেস হারভে। তবে দশটার বেশি দেরি। করবে না। খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠি আমরা এখানে।
আর এক মুহূর্ত দেরি করলো না ওখানে তিন গোয়েন্দা। বেরিয়ে এলো।
বাইরে বেরিয়েই নির্দেশ দিলো কিশোর, মুসা, গোলাঘর থেকে এক বাণ্ডিল দড়ি নিয়ে এসো। রবিন, তুমি গিয়ে আমাদের চক আর টর্চ আনো। আমি সাইকেলগুলো পরীক্ষা করে দেখি, কোনো গোলমাল আছে কিনা।
গুহায় যাচ্ছি নাকি আমরা? জিজ্ঞেস করলো রবিন।
হ্যাঁ। গোঙানির রহস্য ভেদ করতে হলে গোঙানি উপত্যকায়ই যেতে হবে।
গুহায় ঢুকবে? শুকনো গলায় বললো মুসা। এই রাতে না গিয়ে দিনে গেলে হতো না?
না। রাতের বেলায়ই গোঙানি শোনা যায়। আর গুহার ভেতরে দিন-রাতের তফাৎ কি? সব সময়ই অন্ধকার, এক রকম। আজ গোঙাতে শুরু করেছে গুহাটা, কাল হয়তো থেমে যাবে। তারপর আবার কয় দিন অপেক্ষা করতে হবে ঠিক আছে? যাও।
কয়েক মিনিট পর সাইকেল চালিয়ে র‍্যাঞ্চের গেট দিয়ে বেরিয়ে এলো তিন কিশোর। মুসার সাইকেলের ক্যারিয়ারে দড়ির বাণ্ডিল। সরু একটা কাঁচা রাস্তা ধরে চললো ওরা।
র‍্যাঞ্চটা সাগরের কিনারে বটে, কিন্তু বেরোলেই সাগর চোখে পড়ে না। কয়েক মাইল পর্যন্ত আড়াল করে রেখেছে উপকূলের পাহাড়। চাঁদ উঠেছে। জ্যোৎস্নায় নীরব প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে যেন পাথুরে পাহাড়ের উঁচু চূড়াগুলো। সবুজ ওক গাছগুলোকে এখন দেখাচ্ছে ফ্যাকাশে শাদা, কেমন যেন। ভূতুড়ে। সাইকেল চালাতে চালাতে ছেলেদের কানে এলো বিচিত্র শব্দ, চারণক্ষেত্রে অস্থির হয়ে উঠেছে গরুর পাল। নাক দিয়ে শব্দ করছে ঘোড়া, চঞ্চল।
হঠাৎ, কোনো রকম জানান না দিয়েই শুরু হলো গোঙানি, ছড়িয়ে পড়লো সারা উপত্যকায়।
চমকে উঠলো রবিন আর মুসা।

গুড, বললো কিশোর। থামেনি। আজ চলবে মনে হচ্ছে।
নীরবে সাইকেল থেকে নামলো তিনজনে, স্ট্যাণ্ডে তুললো। উঁচু শৈলশিরায় উঠে তাকালো চন্দ্রালোকিত উপত্যকার ওধারে হেনরি ফিগারোর কালো গুহামুখের দিকে।
কিশোর, বলে উঠলো রবিন। কি যেন নড়ছে!
আমি খুটখাট শুনছি, মুসা বললো।
হ্যাঁ, মাথা দোলালো কিশোর। আসলে কল্পনা করছে। এরকম জায়গায় এই পরিবেশে স্বাভাবিক জিনিসকেও অস্বাভাবিক লাগাটা স্বাভাবিক, শুরু হলো তার লেকচার। অতি সাধারণ জিনিসও চমকে দেবে। আতঙ্কিত করে তুলবে। ওসব আলোচনা এখন থাক। রবিন, টর্চগুলো আরেকবার পরীক্ষা করো।
পরীক্ষা করলো রবিন। দড়ির বাণ্ডিলে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে কাঁধে ঝোলালো মুসা। যার যার চক নিয়ে পকেটে ভরলো। কিশোরের শাদা চক, মুসার নীল, রবিনের সবুজ।
এসব এলাকার পুরনো গুহাগুলো খুব বিপজ্জনক, বললো কিশোর। সুড়ঙ্গের কোথায় যে চোরাখাদ লুকিয়ে থাকে বোঝা মুশকিল। পা ফেলেছে কি ধপাস, এক্কেবারে তলায়। দড়ি ছাড়া তোলা প্রায় অসম্ভব। সেজন্যেই দড়ি নিয়েছি।
চক দিয়ে চিহ্ন আঁকতে আঁকতে যাবো? জিজ্ঞেস করলো রবিন।
নিশ্চয়।
চলো। গেলে আর দেরি করে লাভ নেই।
হ্যাঁ, চলো।
ঢাল বেয়ে নিচে নামতে শুরু করলো ওরা, উপত্যকায়।
আবার সেই অদ্ভুত গোঙানি ঢেউ তুললো যেন রাতের শান্ত নীরবতায়।
গুহার কাছাকাছি চলে এলো ওরা। এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস এসে গায়ে। লাগলো। হাঁ করে থাকা কালো সুড়ঙ্গমুখের কাছে এসে টর্চ জ্বাললো কিশোর, ঠিক এই সময় কানে এলো চাপা শব্দ।
কিসের? চেঁচিয়ে উঠলো রবিন।
বাড়ছে শব্দটা, জোরালো হচ্ছে। উপত্যকার চারপাশেই ঘিরে আছে পাহাড়, সেগুলোতে বাড়ি খেয়ে প্রতিধ্বনি তুললো। ফলে বোঝা গেল না ঠিক কোনখান থেকে আসছে। মনে হচ্ছে, চার পাশ থেকেই হচ্ছে শব্দ।
ওই দেখো! ওপর দিকে হাত তুলে জোরে চিৎকার করে উঠলো মুলা।
ডেভিল মাউনটেইনের ওপর থেকে ঢাল বেয়ে নেমে আসছে বিশাল এক পাথর, ওটার ধাক্কায় ঝুরঝুর করে বৃষ্টির মতো ঝরতে আরম্ভ করেছে অসংখ্য ছোট পাথর।

সরো! আবার চেঁচিয়ে উঠলো মুসা।
পাথরটা ওদের ওপরই পড়বে মনে হচ্ছে। এক লাফে পাশে সরে গেল রবিন।
কিশোর দাঁড়িয়েই রইলো, যেন জমে গেছে। চেয়ে রয়েছে পাথরটার দিকে। তার ওপরেই এসে পড়বে।

.

ঝাঁপ দিলো মুসা। কিশোরকে নিয়ে গড়িয়ে পড়লো মাটিতে। ধুড়ুম করে পড়লো। পাথরটা। গুহামুখের কাছ থেকে সরতে আর এক মুহূর্ত দেরি হলেই ভর্তা হয়ে যেতো গোয়েন্দাপ্রধান।
এই, এই তোমাদের কিছু হয়েছে? উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো রবিন।
না, আমার কিছু হয়নি, উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে জবাব দিলো মুসা। কিশোর?
খুব ধীরে ধীরে উঠলো কিশোর। কাপড় থেকে ধুলো ঝাড়লো। চোখ দেখে মনে হচ্ছে যেন এ-জগতে নেই সে। গভীর ভাবনায় ডুবে গেছে। নড়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিলাম বিড়বিড় করে বললো। হয় এরকম। আশ্চর্য এক মানসিক প্রতিক্রিয়া। সাময়িক ভাবে পঙ্গু করে দেয় শরীরকে। শিকার ধরার আগে ছোট ছোট জানোয়ারকে এভাবেই সম্মোহিত করে ফেলে বিশাল সাপ…
আরে ধ্যাত্তোর! রাখো তোমার লেকচার! অধৈর্য হয়ে হাত নাড়লো মুসা। বলি, ঠিকঠাক আছে? না ভেঙেছে কিছু?
ফিরেও তাকালো না কিশোর। চাঁদের আলোয় আলোকিত ডেভিল মাউনটেইনের ওপর দিকে চেয়ে রয়েছে, চোখে পলক পড়ছে না। দেখে মনে হচ্ছে অনেক আলগা পাথর আছে ওখানে, আনমনে বললো সে। পাহাড়ের ঢালও খটখটে শুকনো। এখানে ওভাবে পাথর গড়িয়ে পড়া স্বাভাবিক। বহু জায়গার পাথরই বোধহয় আলগা করে দিয়েছে নেভির কামান।
তিনজনেই এগোলো বিশাল পাথরটার দিকে। সুড়ঙ্গমুখের কয়েক গজ দূরে। মাটিতে বসে গেছে।
দেখো, দাগ; পাথরটা দেখিয়ে বললো রবিন। কিশোর, কেউ ঠেলে ফেলেনি তো?
কিছু দাগ আছে, ভালোমতো পাথরটা দেখে সোজা হলো কিশোর। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।
পড়ার সময় ঘষা খেয়েছে, মুসা বললো। দাগ তো হবেই।
ওপরে কিন্তু কাউকে দেখিনি আমরা, বললো রবিন।
মাথা ঝাঁকালো কিশোর। দেখিনি। দেখা দিতে চায়নি বলেই হয়তো। দেখিনি।
ফিরে গিয়ে দেখবো নাকি আবার? জিজ্ঞেস করলো মুসা।
না। আরও সাবধান থাকতে হবে আমাদের। গুহার ভেতরে অবশ্য সে-ভয় নেই। অন্তত মাথার ওপর পাথর খসে পড়বে না।

গুহায় ঢুকলো তিনজনে। কিশোর আগে আগে রয়েছে। দেয়ালে আশ্চর্যবোধক আর একটা তীর চিহ্ন আঁকলো রবিন। সুড়ঙ্গমুখের কাছেই।
টর্চের আলোয় দেখা গেল, লম্বা অন্ধকার একটা সুড়ঙ্গ সোজা ঢুকে গেছে। ডেভিল মাউনটেইনের গভীরে। মসৃণ দেয়াল। ছাত মুসার মাথার চেয়ে সামান্য উঁচুতে। কিশোর আর রবিন তার চেয়ে বেঁটে, ফলে হাঁটতে অসুবিধে হলো না কারোই।
চল্লিশ ফুট মতো সোজা এগিয়ে গেল পথটা। শেষ মাথায় বিরাট এক গুহা।
ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আলো ফেলে দেখলো ছেলেরা। যেমন বড় ঘর, তেমনি উঁচু তার ছাত। আবছা দেখা যাচ্ছে ওপাশের দেয়াল।
আরিব্বাবা! বললো রবিন। এতো বড় গুহা আর দেখিনি। কেমন যেন শূন্য, দূরাগত শোনালো তার কথাগুলো।
হাল্লো! চেঁচিয়ে বললো মুসা।
হাল্লো.. হাল্লো…হাল্লো-ও-ও-ও-ও-ও! প্রতিধ্বনি হলো।
হেসে উঠলো মুসা। রবিনও। মজা পেয়ে দুজনেই হাল্লো হাল্লো শুরু করলো। গুহাটাও যেন রসিকতা শুরু করলো তাদের সঙ্গে।
কিশোর ওদের সঙ্গে যোগ দিলো না। টর্চের আলোয় গভীর মনোযোগে কি যেন দেখছে। ডাকলো, এই, দেখে যাও।
ওদের বায়ে, দেয়ালে কালো একটা ছোট ফোকর। আরেকটা সুড়ঙ্গমুখ। ওরকম আরও অনেকগুলো ফোকর দেখতে পেলো ওরা। কমপক্ষে দশটা সুড়ঙ্গ ঢুকেছে গিয়ে পর্বতের ভেতরে।
খাইছে! বলে উঠলো মুসা। কোনটা দিয়ে যাবো?
সব কটা ফোকরই প্রায় একরকম। মুসার সমান উঁচু, চার ফুট চওড়া।
ভ্রূকুটি করলো কিশোর। মনে হচ্ছে সারা পর্বতের তলায়ই ছড়িয়ে আছে সুড়ঙ্গ।
এ-জন্যেই বোধহয় ফিগারোকে খুঁজে পায়নি শেরিফ। এতো সুড়ঙ্গ, কয়টাতে খুঁজবে? ওরা একদিকে গেলে ফিগারো আরেক দিকে সরে গেছে। লুকিয়ে থেকেছে।
হতে পারে।
এই গুহা আর সুড়ঙ্গ তৈরি হলো কিভাবে? অবাক হয়ে দেখছে মুসা।
পানি, বললো রবিন। বইয়ে পড়েছি। নানারকম পাথর দিয়ে তৈরি হয় এসব পর্বত। কিছু পাথর শক্ত, কিছু নরম। পানিতে ক্ষয় হয়ে, কিংবা গলে গিয়ে ধুয়ে চলে যায় নরম পাথরগুলো, শক্তগুলো থেকে যায়। ফাঁকগুলোতে তৈরি হয়েছে সুড়ঙ্গ। কোটি কোটি বছর লেগেছে এসব হতে। অনেক অনেক আগে এই এলাকার বেশির ভাগ অঞ্চলই পানির তলায় ছিলো।

তবে সব সুড়ঙ্গই যে প্রাকৃতিক, কিশোর বললো। তা নয়। মানুষেও বানিয়েছে কিছু। হয়তো হেনরি ফিগারোর লোকেরা।
কিংবা মাইনাররা। সোনার লোভে খুঁড়েছে।
এক ফোকর থেকে আরেক ফোকরে আলো সরাচ্ছে মুসা। কোনটা থেকে শুরু করবো?
সবগুলো দেখতে হলে তো কয়েক মাস লেগে যাবে।
কাজেই সবগুলোতে দেখা যাবে না, বললো কিশোর। শুধু যেটা থেকে গোঙানি আসে সেটায়। প্রত্যেকটা ফোকরের কাছে গিয়ে কান পাতবো। যেটা থেকে শোনা যাবে...
কিশোর! বাধা দিলো রবিন। একটা ব্যাপার খেয়াল করেনি? গুহায় ঢোকার পর থেকে আর শুনছি না!
স্থির দাঁড়িয়ে কান পেতে রইলো তিনজনে। রবিন ঠিকই বলেছে। কবরের নীরবতা গুহার মধ্যে। কোনো শব্দ নেই।
এর মানে কি? মুসার কণ্ঠে অস্বস্তি।
এর পর আরও দশ মিনিট পেরিয়ে গেল। গোঙানি শোনা গেল না।
পাথর পড়ার পর থেকেই আর আওয়াজটা শুনিনি, রবিন বললো।
হ্যাঁ, বললো কিশোর। এতো বেশি উত্তেজিত ছিলাম, খেয়ালই করিনি কখন থেমে গেছে।
কি করবো এখন? মুসার প্রশ্ন।
শুরু হতে পারে আবার, আশা করলো কিশোর। মিস্টার হারভে বলেছেন আওয়াজটা অনিয়মিত, নির্দিষ্ট সময় পর পর শুরু হয় না। না হোক, ইতিমধ্যে যে কটা সুড়ঙ্গ পারি দেখে ফেলি আমরা। ১৭৬
মুসা আর রবিন রাজি। এই দুঃসহ অন্ধকারে শুধু শুধু দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে যা-ই হোক কিছু একটা করা ভালো। একটা সুড়ঙ্গে ঢোকার আগে চক দিয়ে দেয়ালে চিহ্ন এঁকে দিলো রবিন।
সাবধানে এগোলো ওরা। অন্ধকারের কালো চাদর ফুঁড়ে বেরোচ্ছে যৈন টর্চের আলো। তিরিশ ফুট মতো এগিয়েই শেষ হয়ে গেল সুড়ঙ্গটা। সামনে দেয়াল নয়, পাথর পড়ে বন্ধ হয়েছে।
গুহায় ফিরে এলো ওরা।
পাশাপাশি চারটে সুড়ঙ্গে ঢুকে দেখলো। ঢোকার আগে অবশ্যই মুখের কাছে চক দিয়ে চিহ্ন এঁকে রাখলো। কোনোটা দিয়েই বেশি দূরে এগোতে পারলো না। পাথর পড়ে পথ বন্ধ।

অযথা সময় নষ্ট করছি, অবশেষে বললো কিশোর। এক কাজ করা যাক। তিনজনে একসঙ্গে না ঢুকে আলাদা আলাদা সুড়ঙ্গে ঢুকি। তাতে সময় বাঁচবে, দেখাও হবে বেশি। ভোলা সুড়ঙ্গ যে-ই দেখতে পাবো, ফিরে এসে অপেক্ষা করবো। এখানে অন্য দুজনের জন্যে।
তিনজনে ঢুকে পড়লো তিনটে সুড়ঙ্গে।
কিশোর যেটাতে ঢুকলো, শুরুতে সেটা প্রাকৃতিকই মনে হলো। অল্প কিছু দূর। পর্যন্ত তারপর চোখে পড়লো কড়ি-বরগা আর থাম। মাইন শ্যাফট। খনির কাজে খোঁড়া হয়েছিলো। সাবধানে এগিয়ে গেল আরও কয়েক গজ।
হঠাৎ থমকে দাঁড়াতে হলো। সামনে বন্ধ। পাথরের স্তূপ। পড়ে থাকা একটা পাথর দৃষ্টি আকর্ষণ করলো তার। এখানকার অন্যান্য পাথরের চেয়ে আলাদা। তুলে নিয়ে ওটা পকেটে রেখে দিলো, পরে ভালোমতো দেখার জন্যে।
এই সময় শোনা গেল মুসার চিৎকার। কিশোর! রবিন! জলদি এসো!

.

সুড়ঙ্গ পেরিয়ে রবিন তখন আরেকটা গুহায় ঢুকেছে। এটাও প্রথম গুহাটার মতোই। হাঁ করে তাকিয়ে দেখছে। এটাতেও প্রথমটার মতোই অসংখ্য সুড়ঙ্গমুখ। ফেরার জন্যে সবে ঘুরেছে, এই সময় কানে এলো মুসার চিৎকার। দিলো দৌড়।
কিশোরও দৌড় দিয়েছে। আচমকা অন্ধকার থেকে কি যেন একটা এসে পড়লো তার ওপর। চিত হয়ে পাথুরে মেঝেতে পড়ে গেল সে। তার গলায় খামচি মারার চেষ্টা করলো কয়েকটা আঙুল।
বাঁচাও! বাঁচাও! আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠলো একটা কণ্ঠ।
রবিন! আরে আমি, কিশোর।
ঢিল হলো আঙুলগুলো। একে অন্যের ওপর টর্চের আলো ফেললো ওরা।
আমি ভাবছিলাম, কিসের গায়ে জানি পড়লাম! বললো রবিন।
আমিও তাই ভেবেছি। মুসার চিৎকারে চমকে গিয়ে…চলো, চলো।
মুসা যে-সুড়ঙ্গে ঢুকেছে সেটাতে ঢুকলো দুজনে। এ-পর্যন্ত যে-কটাতে ঢুকেছে ওরা, সবগুলোর চেয়ে এটা লম্বা মনে হলো। সামনে টর্চের আলো নাচছে। মুসার হাতে।
এই যে, আমি এখানে, ডাকলো সে।
আরেকটা বড় গুহায় এসে ঢুকলো কিশোর আর রবিন। মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে মুসা। চেহারা ফ্যাকাশে। টর্চের আলো ফেলেছে বা দেয়ালে।
ওখানে…ওখানে কি যেন দেখলাম! কালো! চকচকে!
রবিন আর কিশোর আলো ফেললো। কিছুই দেখলো না।

আমি শিওর দেখেছি, জোর দিয়ে বললো মুসা। ঢুকে প্রথমে আওয়াজ শুনলাম। লাইট ফেলে দেখি..ওটা! ওই দেয়ালের কাছে। বিরাট। হাত থেকে টর্চ পড়ে গিয়েছিলো আমার। আবার তুলে আলো ফেলে দেখলাম, নেই!
সন্দেহ জাগলো রবিনের। কল্পনা করেছে। বেশি নার্ভাস হলে হয় এরকম। আলাদা হওয়া উচিত হয়নি আমাদের।
দেয়ালটার কাছে এগিয়ে গেল কিশোর। নিচু হয়ে কি দেখলো। মুসা ভুল দেখেনি, রবিন। দেখে যাও।
দ্রুত এগিয়ে গেল রবিন আর মুসা। পাথুরে মেঝেতে বড় বড় দুটো দাগ। পায়ের ছাপ। টর্চের আলোয় চকচক করছে।
কি…, কেঁপে গেল রবিনের গলা। কি ওগুলো, কিশোর?
ভেজা ভেজা লাগছে, জবাব দিলো কিশোর। পানি।
খাইছে! জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট ভেজালো মুসা।
সমস্ত মেঝেটায় আলো ফেলে ফেলে দেখলো কিশোর। আর ছাপ নেই। ছাতে আলো ফেললো। খটখটে শুকনো।
পানির চিহ্নও তো দেখছি না। এলো কোত্থেকে? বললো সে। মুসা ঠিকই বলেছে। কিছু একটা দাঁড়িয়ে ছিলো ওখানে। ভেজা ছাপ রেখে গেছে।
এতো বড়? রবিন বললো। দু-তিন ফুটের কম লম্বা হবে না।
বড়, ভেজা, চকচকে। দেখে মনে হয়…
দানবের! কিশোরকে কথা শেষ করতে দিলো না মুসা।
বুড়ো মানুষটা! বললো রবিন।
পরস্পরের দিকে তাকালো ওরা। চোখে অস্বস্তি। দানবে বিশ্বাস করে না, কিন্তু তাহলে ছাপগুলো কার?
তীব্র আলো এসে পড়লো তিনজনের গায়ে। পাথরের মূর্তি হয়ে গেল যেন ওরা।
আলোর পেছনে থেকে শোনা গেল খসখসে কণ্ঠ, কি, হচ্ছে কি এখানে?
ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো একটা মূর্তি। সামান্য কুঁজো, বাঁকা পিঠ। শাদা। ধবধবে লম্বা চুল-দাড়ি, উসকো-খুসকো, বহুদিন ওগুলোতে চিরুনি কিংবা নাপিতের কাঁচি লাগেনি।
হাতে লম্বা নলওয়ালা পুরনো আমলের রাইফেল।
কালো সুড়ঙ্গমুখগুলোর দিকে ইঙ্গিত করলো বুড়ো মানুষটা।
অনেক ভেতরে ঢুকেছে ওগুলো, ভাঙা ভাঙা কণ্ঠস্বর। সহজেই হারিয়ে যাবে ওর মধ্যে ঢুকলে।
দুষ্টুমি করে একটা লাল চোখ টিপলো বুড়ো। চিনি তো জায়গাগুলো, ভালো করেই চিনি। পঞ্চাশ বছর ধরে আছি, মুণ্ডু কাটা যায়নি একবারও। শত্রুর সঙ্গে কতো

লড়াই করলাম।
মুণ্ডু কাটা যায়নি? চোখ মিটমিট করলো মুসা। ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে লড়াই, করেছেন? এখানে?
রাইফেলটা নাড়লো বুড়ো। ইনজুনস! ইনজুনসদের অনেক গল্প শোনাতে পারি তোমাদেরকে। সারা জীবন ওদের সাথে এখানে কাটালাম। লোক ভালো ওরা, তবে খুব খারাপ শত্রু। দুবার মুৎ প্রায় গিয়েছিলো আমার। ইউটি আর অ্যাপাচিদের দেশে গিয়ে। ভীষণ পাজি ওই অ্যাপাচিরা। কোনোমতে পালিয়ে বেঁচেছি।
এখন আর এখানে কোনো ইনডিয়ান নেই, স্যার, ভদ্রভাবে বললো কিশোর। আর আমরাও সুড়ঙ্গে ঢুকে হারাবো না।
কিশোরের ওপর স্থির হলো বুড়োর দৃষ্টি, যেন এই প্রথম তার ওপর চোখ পড়লো। এখন? না, এখন আর ইনজুনসরা নেই। তা তোমরা কি পাগল? এই গুহায় ঢুকতে সাহস করেছো? নতুন নাকি? কণ্ঠস্বর অনেকটা স্বাভাবিক হয়েছে। চোখের বন্য দৃষ্টিও কোমল হয়েছে।
রবিন জবাব দিলো, হ্যাঁ, স্যার, রকি বীচ থেকে।
মিস্টার হারভের র‍্যাঞ্চে উঠেছি, মিস্টার..? জিজ্ঞাসু চোখে লোকটার দিকে। তাকালো কিশোর।
ডিন মারটিন, নাম বললো বুড়ো। ডিন বলে ডাকবে আমাকে। তো, হারভের ওখানে, আঁ? ভালো লোক ওরা। বাইরে দিয়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ চিৎকার। শুনলাম। তোমাদেরই কেউ?
হ্যাঁ, স্যার, বললো কিশোর। তবে হারিয়ে গিয়ে সাহায্যের জন্যে চেঁচাইনি। নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন দেয়ালে, দাগ দিতে দিতে এসেছি।
তাই? বুদ্ধি আছে। আরও একশো বছর আগে জন্মানো উচিত ছিলো। তোমাদের, আরামে কাটাতে পারতে। তা এখানে কি করছো?
কিসে গোঙায় দেখতে এসেছি, রবিন বললো।
আমরা ঢুকতেই থেমে গেল, বললো মুসা।
হঠাৎ কুঁকড়ে গেল লোকটা। চোখে ভয় ফুটলো ৭ পরিবর্তনটা এতোই প্রকট, ছেলেদের মনে হলো অন্য একজন মানুষের দিকে তাকিয়ে আছে এখন। আগের বুড়ো নয়। গোঙানি, না? তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে কণ্ঠস্বর। লোকে বলে, হেনরি ফিগারো ফিরে এসেছে। আমি বিশ্বাস করি না। গোঙান ওই ভদ্রলোক, বুড়ো মানুষটা। বুঝেছো? থামলো এক মুহূর্ত। ভয়ে ভয়ে তাকালো এদিক-ওদিক। শ্বেতাঙ্গরা এই এলাকায় আসার আগে থেকেই আছেন তিনি। সময়, বা বয়েস তাঁর কাছে কিছুই নয়। তিনি আছেন, থাকবেন। বাঁচতে চাইলে, তাঁকে রাগাতে না চাইলে আর

কক্ষণো এখানে ঢুকো না। আমি ঢুকি বটে, কিন্তু গোঙানির কারণ। জানার চেষ্টা করি না। শেরিফ আর তার লোকেরাও তাঁকে ভয় পেতো। ওদের সবাইকেই ধরেছেন তিনি! ঢুকতে বারণ করে দেবে। এখানকার শেরিফও যেন না ঢোকে। ঢুকলে সবাইকে ধরবেন তিনি, কাউকে ছাড়বেন না।
ভীত চোখে কিশোরের দিকে তাকালো রবিন আর মুসা। কিন্তু সে তাকালো। না। চেয়ে আছে বুড়োর দিকে। ভাবছে কি যেন। তাঁকে আপনি কখনও দেখেছেন, মিস্টার মারটিন? বুড়ো মানুষটাকে? এই গুহায়?
তাঁকে? দ্রুত চারপাশে তাকালো মারটিন। এসো আমার সঙ্গে, বাইরে দিয়ে আসি। খবরদার, এখানে ঢুকে আর কখনও চিল্লাবে না। তিনি সহ্য করবেন না।
মাথা কাত করলো কিশোর হা, বেরোনো যায় এখন কি অনেক কিছুই দেখলাম। আপনি ঠিকই বলেছেন। এখানে সহজেই হারিয়ে যাওয়া যায়।
বৈদ্যুতিক লণ্ঠনটা তুলে নিলো বুড়ো। ছেলেদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এলো গুহার বাইরে, উপত্যকায়। সঙ্গে সঙ্গে চললো, একেবারে সাইকেলের কাছে পৌঁছে দেবে। কান খাড়া রেখেছে কিশোর। কিন্তু গোঙানি আর শোনা গেল না।
ডিন মারটিনকে ধন্যবাদ দিলো ছেলেরা, গুড নাইট জানালো।
তোমরা খুব ভালো ছেলে, চালাক, বললো মারটিন। তবে বুড়ো মানুষটা তোমাদের চেয়ে, চালাক, সবার চেয়েই চালাক। তোমরা সাবধানে থাকবে। হারভেকেও হুঁশিয়ার করে দেবে। বলবে, বুড়ো মানুষটা সবার ওপরই চোখ রাখছেন। খনখনে হাসি হাসলো সে।
চাঁদের আলোয় কাঁচা সড়ক ধরে সাইকেল চালিয়ে চলেছে তিন গোয়েন্দা। এখনও যেন কানে বাজছে বুড়োর হাসি। হঠাৎ থেমে গেল কিশোর।
ধাঁই করে হ্যাণ্ডেল আরেক দিকে ঘুরিয়ে দিলো মুসা, অল্পের জন্যে কিশোরের সাইকেলের ওপর পড়লো না।
রবিনও ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষলো। কি ব্যাপার?
কাজ শেষ হয়নি এখনও, বলতে বলতেই আবার সাইকেল ঘোরালো কিশোর।
র‍্যাঞ্চে ফিরে গেলেই ভালো, বললো রবিন।
আমিও তাই বলি, তাড়াতাড়ি বললো মুসা।
কোনো কাজে হাত দিলে শেষ না করে ছাড়ে না তিন গোয়েন্দা, ঘোষণা করলো যেন কিশোর।
কিন্তু ভোটে হেরে যাবে, রবিন বললো। দুজন আর একজন।।
ঠেকানো গেল না কিশোরকে। প্যাডেল ঘোরাতে শুরু করেছে।
দীর্ঘ এক মুহূর্ত সেদিকে তাকিয়ে রইলো দুই সহকারী গোয়েন্দা। তারপর নীরবে অনুসরণ করলো। জোরে জোরে প্যাডেল করে চলে এলো কিশোরের পাশে।

পথের মোড়ে ছায়ায় এসে থামলো কিশোর। ভালো করে দেখে বললো, অল ক্লীয়ার। এসো।
এবার কি করতে হবে? জিজ্ঞেস করলো রবিন।
আপাতত সাইকেলগুলো লুকাতে হবে। তারপর হেঁটে যাবো। চুপে চুপে।
চুপে চুপে হেঁটে কোথায় যাবো? জানতে চাইলো মুসা।
একটু আগে দেখলাম, এই পথটা ডেভিল মাউনটেইনের পাশ ঘুরে সাগরের দিকে গেছে। সাগরের দিক থেকে ঢোকার আর কোনো পথ আছে কিনা দেখবো।
পাহাড়ের ছায়া পথের ওপর। কিশোরের পিছু পিছু চললো রবিন আর মুসা। চাঁদের আলোয় পাহাড় আর পাথরের বিচিত্র সব ছায়া পড়েছে উপত্যকায়, দেখলে কেমন যেন গা ছমছম করে। পথের ধারে কখনও গাছপালা, কখনও পাথরের চাঁই। কখনও বা সরু গিরিপথের মধ্যে দিয়ে এগিয়েছে পথটা।
তিনটা প্রশ্ন, হাঁটতে হাঁটতে বললো কিশোর। আমরা ঢোকার পরই কেন বন্ধ হয়ে গেল গোঙানি? বাতাস তো আগাগোড়া একই রকম বইছে। তারমানে শুধু বাতাসের কারণে হয় না শব্দ।
অন্য কিছু? রবিন বললো।
হ্যাঁ।
কী? জানতে চাইলো মুসা।
আমাদের ওপর চোখ রেখেছে এমন কিছু কিংবা কেউ। দ্বিতীয় প্রশ্ন, ডিন মারটিন আমাদেরকে গুহা থেকে বের করে দেয়ার জন্যে এতো ব্যস্ত হলো কেন?
বার বার তার বদলে যাওয়া ভালো লাগেনি। শেষ দিকে কেঁপে গেল রবিনের গলা।
হ্যাঁ,আনমনা হয়ে গেল কিশোর, ক্ষণিকের জন্যে। এক আজব বুড়ো! মনে হলো, দুজন ভিন্ন লোক ভিন্ন সময়ে বাস করছে। অভিনয়ই করলো কিনা কে জানে!
আমাদের ভালোই হয়তো চেয়েছে, তাই বের করে দিয়েছে, মুসা বললো। দেখলে না, বুড়ো মানুষের কথা বলার সময় কেমন ভয় ফুটলো চোখে। দানবটাকে দেখেছেও বোধহয়।
হয়তো। তিন নম্বর প্রশ্নটা হলো, কালো চকচকে যে জিনিসটা তুমি দেখলে। কি দেখেছো? কোনো সন্দেহ নেই আমার, পানিতে ভিজে ছিলো বলেই ছাপগুলো পড়েছে। পর্বতের ভেতরে কোথাও হ্রদ-টদ কিংবা খাড়ি যেমন থাকতে পারে, তেমনি পারে সাগর থেকে গুহায় ঢোকার কোনো গোপন পথ। সেটাই দেখতে চলেছি।
আর কিছু দূর এগোতেই সামনে লোহার গেট চোখে পড়লো। পথটা ওখানে। শেষ। তার পরে পাহাড়ের প্রায় খাড়া ঢাল বেয়ে ডানে-বাঁয়ে নেমে গেছে দুটো সরু

পথ। অনেক নিচে ঢেউয়ের ফেনা শাদা রেখা সৃষ্টি করেছে চাঁদের আলোয়। গেট ডিঙিয়ে এসে পাড়ের ওপরে দাঁড়িয়ে নিচে তাকালো ছেলেরা।
ডালে যাবো, গুহাটা ওদিকেই, বললো কিশোর। পর্বতারোহীদের মতো। কোমরে দড়ি বেঁধে নেবো।-মুসা, তুমি আগে যাবে, আমি থাকবো পেছনে। সারি দিয়ে এগোবো। পথ যেখানে বেশি খারাপ একজন একজন করে পেরোবো। প্ল পিছলালেও অন্য দুজনে যাতে তাকে টেনে তুলতে পারি।
দ্রুতহাতে কোমরে দড়ি বেঁধে নিলো ওরা। সরু পথ ধরে আগে আগে চললো মুসা। নিচে বড় বড় পাথরে আছড়ে ভাঙছে ঢেউ। কালো, পাথরগুলো রুপোলি দেখাচ্ছে জ্যোৎস্নায়। মাঝে মাঝে পথ এতো নিচে নেমে যাচ্ছে, আছড়ে ভাঙা ঢেউয়ের পানির ছিটে এসে ভিজিয়ে দিচ্ছে ওদেরকে। তিনবার থামতে হলো। পথ এতো খারাপ ওসব জায়গায়, একজন একজন করে পেরোতে হলো।
শেষ দিকে প্রায় খাড়া ভাবে সোজাসুজি নেমে গেছে পথটা। নিচে ছোট এক টুকরো সৈকত, ঝকঝকে শাদা বালি। এখন নির্জন। তবে লোকজন যে আসে, সাঁতার কাটে, পিকনিক করে, তার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। বিয়ারের খালি টিন, ফান্টা-কোকাকোলার বোতল, খাবারের বাক্স পড়ে আছে এদিক-ওদিক।
ভালোমতো চোখ রাখবে, বললো কিশোর। ফোকর-টোকর থাকতে পারে।
ঢালের গোড়ার কাছটায় ঘন হয়ে জন্মে আছে ঝোপঝাড়। মাঝে মাঝে বড় জাতের গাছ, কোনো কারণে বেড়ে ওঠা ব্যাহত হয়েছে ওগুলোর। ফাঁকে ফাঁকে বড় বড় পাথরের চাই।
টর্চের আলো ফেলে দেখছে ওরা। বিশেষ করে চাঁইগুলোর পেছনে।
আমার মনে হয় না এখানে কিছু আছে, মুসা বললো।
তাহলে কোথায় আছে? প্রশ্ন করলো রবিন।
কি জানি! কেউ তো বলেনি, এদিকেও সুড়ঙ্গমুখ আছে। আমরা আন্দাজ করছি। থেকে থাকলেও খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে।
থাকলে কাছাকাছিই কোথাও আছে। কারণ, পথটা শেষ হয়েছে এখানেই। ৪. ঠিকই বলেছো, মুখ খুললো কিশোর। রবিন, তুমি আমার সাথে এসো। ডান দিকে খুঁজবো। মুসা, তুমি বয়ে যাও।
পানির কিনারের পাথরগুলো পিচ্ছিল হয়ে আছে শ্যাওলায়। তাতে কামড়ে রয়েছে অসংখ্য শামুক-গুগলি। ওগুলোর ওপর দিয়ে হাঁটার সময় খুব সাবধান হতে হচ্ছে রবিন আর কিশোরকে।
অবশেষে এমন একটা জায়গায় এসে থামলো, আর এগোনোর উপায় নেই। তাহলে পানিতে নামতে হবে। হতাশ হয়ে ঘুরতে যাবে এই সময় শোনা গেল মুসার চিৎকার। এই, পেয়েছি!

ভেজা পাথরগুলো কোনোমতে পেরিয়ে এসে সৈকতে নেমেই দৌড় দিলো রবিন আর কিশোর। বাঁ দিকের প্রায় শেষ মাথায় চ্যাপ্টা বড় একটা পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে আছে মুসা। মস্ত দুটো পাথরের চাঁইয়ের মাঝে টর্চের আলো ফেলেছে। ছোট একটা মুখ, পানি থেকে বড়জোর ফুট খানেক ওপরে।
এই, শুনছো? কান পাতলো মুসা। আবার শুরু হয়েছে।
অন্য দুজনও শুনলো।
গোঙানিটা আসছে খোলা সুড়ঙ্গমুখ দিয়ে। মৃদু শব্দ, যেন পর্বতের অনেক, গভীর থেকে আসছে।
আরেকটু এগিয়ে মুখের ভেতরে আলো ফেললো মুসা। কালো, ভেজা, সরু পথ। সোজা চলে গেছে সুড়ঙ্গ, শেষ কোথায় বোঝা যাচ্ছে না।

.

খাইছে রে! কি অন্ধকার! বললো মুসা।
কিছু দূর গিয়েই বোধহয় শেষ হয়ে গেছে, রবিন অনুমান করলো।
না দৃঢ় কণ্ঠে বললো কিশোর। নিশ্চয় ওই গুহায় যাওয়া যায় এটা দিয়ে। নইলে গোঙানি শুনতে পেতাম না।
দেখে কিন্তু তা মনে হয় না, মুসার কণ্ঠে সন্দেহ।
ঝুঁকে ভেতরে তাকালো কিশোর। ঢোকা যাবে। সাবধান থাকতে হবে। আরকি। রবিন, তুমি যাও। যে রকম সরু ওটা, তোমার জন্যেই সহজ। কোমরে। দড়ি বেঁধে নামো, আমরা দড়ি ধরে রাখছি।
আমি? একা! তিনজনে একসাথে যাওয়া যায় না?
বোকামি হবে। এরকম অচেনা সুড়ঙ্গে একলা গেলেই ভালো। আমরা বাইরে থাকছি। তুমি কোনো বিপদে পড়লে দড়ি ধরে টেনে বের করে আনতে পারবো। তিনজন একসাথে বিপদে পড়লে তিনজনেই মরবো।
হ্যাঁ, সিনেমায় দেখেছি, মুসা বললো। ওই যে, জেলখানা থেকে পালায়, ওসব ছবিতে। অচেনা সুড়ঙ্গে আগে একজনকে পাঠায়। ও গিয়ে দড়িতে একবার হ্যাঁচকা টান দিলে বাইরের ওরা বোঝে, বিপদে পড়েছে, কিংবা নিরাপদ নয়; তাড়াতাড়ি দড়ি ট্রেনে লোকটাকে বের করে নিয়ে আসে।
তুমিও একবারই টেনো, রবিনকে বললো কিশোর। টেনে বের করে নিয়ে আসবো।
অনিচ্ছা সত্ত্বেও কোমরে শক্ত করে দড়ি বেঁধে নেমে পড়লো রবিন। হামাগুড়ি দিয়ে এগোলো।
ভেতরে খুব ঠাণ্ডা। অন্ধকার তো বটেই। ছাত এতো নিচু, উঠে দাঁড়াতে পারবে না। দেয়াল ভেজা, সবুজ শ্যাওলায় পিচ্ছিল। চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে একটা জন্তুর

মতো এগিয়ে চললো সে, সাবধানে, ইঞ্চি ইঞ্চি করে। অনেক কাকড়া আছে ভেতরে। টর্চের আলো পড়লেই বিচিত্র ভঙ্গিতে দাঁড়া নেড়ে তাড়াহুড়ো করে গিয়ে ঢুকছে ভেজা পাথরের আড়ালে।
তিরিশ ফুট মতো এগিয়ে হঠাৎ ওপরে উঠে গেছে ছাত। উঠে দাঁড়ালো রবিন। সামনে এখনও ভোলা সুড়ঙ্গ। বাধা নেই। ছাত উঁচু হয়েছে, দেয়াল দুদিকে সরে গিয়ে মাঝখানটা চওড়া হয়েছে, কোণাকুণি উঠে গেছে পথটা। ভেজা, নয় আর, শুকনো।
কিশোর! মুসা! চেঁচিয়ে বললো সে। ঠিকই আছে সব। এসো।
ওরা দুজনও তার পাশে এসে দাঁড়ালো।
বেশ শুকনো তো এখানে, বললো মুসা।
জোয়ারের পানি উঠতে পারে না, তাই, কিশোর বললো।
এগিয়ে চললো ওরা। প্রতি দশ ফুট পর পর চিহ্ন আঁকছে কিশোর। চল্লিশ ফুট পর, বড় একটা গুহা পাওয়া গেল। দেয়ালে এতো বেশি ফোকর, যেন মৌমাছির বিরাট এক বাসা। কোনটা দিয়ে ঢুকবে?
পরস্পরের দিকে তাকালো ওরা।
আবার সেই সমস্যা, মুসা বললো।
পাহাড়টার তলায় সুড়ঙ্গ ছাড়া যেন আর কিছু নেই, নিরাশ হয়ে মাথা নাড়লো রবিন। কোনটায় ঢুকবো?
গুহা, কিংবা ফোকরগুলোর দিকে বিশেষ নজর নেই কিশোরের। কান পেতে রয়েছে। শব্দ কই?
তাই তো! মুসার দিকে চেয়ে ভুরু নাচালো রবিন। নেই!
না, নেই! মুসাও মাথা নাড়লো।
আমি সুড়ঙ্গে ঢোকার পর থেকেই কিন্তু শুনিনি, রবিন বললো।
চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা ঝোঁকালো কিশোর। আমরা ঢুকলেই বন্ধ হয়ে যায়। আশ্চর্য! একবার নয়, দুবার ঘটলো একই ঘটনা। কাকতালীয় আর বলা যায় না।
কি বলতে চাইছো? অবাক মনে হলো মুসাকে। আমরা ঢুকলেই কিছু একটা গড়বড় হয়ে যাচ্ছে? তাতে থেমে যাচ্ছে গোঙানি?
হতে পারে।
আরও একটা ব্যাপার হতে পারে, বললো রবিন। ফুকলেই আমাদের কাউকে দেখে ফেলছে। নিজেই প্রশ্ন তুললো আবার, কিন্তু কিভাবে?
মাথা নাড়লো কিশোর। বুঝতে পারছি না। হয়তো…
শোনা গেল শব্দটা। মৃদু, বহুদূর থেকে আসছে। ঘোড়ার খুরের খটাখট।
ঘোড়া! চেঁচিয়ে উঠলো রবিন।

মাথা ঘুরিয়ে শুনছে কিশোর। গুহার দেয়ালের ভেতর দিয়ে যেন আসছে শব্দটা। মনে হচ্ছে…পর্বতের অনেক গভীর থেকে আসছে!
রবিন বললো, হেনরি ফিগারোর গুহা থেকে…
উঁহু! ওটা এখন আমাদের বাঁয়ে। সোজাসুজি ঢুকেছি আমরা, পাহাড়ের দিকে মুখ করে আছি। তুমি যেদিকের কথা বলছো, সেদিকে কোনো সুড়ঙ্গ নেই, দেখো।
সব চেয়ে ভালো হয়, এখান থেকে বেরিয়ে চলে গেলে, মুসা বলে উঠলো।
চলো, বেরিয়েই যাই। সেই ভালো।
পেছন ফিরে প্রায় দৌড়ে চললো ওরা। সুড়ঙ্গের সরু মাথাটার কাছে আগে পৌঁছলো মুসা। হামাগুড়ি দিয়ে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব এগোলো। পেছনে রবিন আর কিশোর।
বেরিয়ে এলো সুড়ঙ্গ থেকে।
এখন কি করবো? জিজ্ঞেস করলো রবিন।
এক রাতে যথেষ্ট হয়েছে, জবাব দিলো কিশোর। র‍্যাঞ্চে ফিরে যাবো।
দুই সহকারীর মনের কথা বলেছে গোয়েন্দাপ্রধান। সানন্দে ফিরে চললো ওরা। কোমড়ে দড়ি বেঁধে উঠে চললো বিপজ্জনক পাহাড়ী পথ বেয়ে। নিরাপদেই উঠে এলো ওপরে।
আগে রয়েছে কিশোর। গেটের কাছে এসে থমকে দাঁড়ালো কিশোর। তার পিঠের ওপর এসে পড়লো মুসা। কি ব্যাপার?
জবাব দিলো না কিশোর। চেয়ে রয়েছে ডেভিল মাউনটেইনের দুই চূড়ার দিকে, একই রকম দেখতে চূড়া দুটো, যেন জমজ।
কি হয়েছে? ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলো রবিন।
ধীরে ধীরে বললো কিশোর, কি যেন নড়তে দেখলাম ওখানে…
শোনা গেল ঘোড়ার খুরের শব্দ। খটখট খটাখট খট-খট…
আবার! গুঙিয়ে উঠলো রবিন।
গুহার মধ্যে এই শব্দই শুনেছিলাম না? মুসা বললো।
তাই তো মনে হয়, বললো কিশোর। পাহাড়ের কোনো ফাটল দিয়ে ঢুকেছিলো শব্দটা।
গেটের কাছে একটা ঘন ঝোপে লুকিয়ে পড়লো ওরা।
এগিয়ে আসছে খুরের আওয়াজ। বড় একটা কালো ঘোড়া দেখা গেল, পর্বতের ঢালের পথ ধরে। দুলকি চালে চলে গেল ছেলেদের কয়েক ফুট দূর দিয়ে।
মানুষ কই? রবিনের প্রশ্ন।
ধরবো নাকি? মুসা বললো।
না। ঘোড়াটার দিকে চেয়ে রয়েছে কিশোর। দেখি, কি করে?

ঝোপের ভেতরেই বসে আছে ওরা।
হঠাৎ আঙুল তুলে দেখালো মুসা। ঢাল বেয়ে দ্রুত নেমে আসছে একজন, মানুষ। কাছে এলে চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখলো ওরা। লম্বা, বাদামী চামড়া, চোখা নাক। ডান গালে একটা কাটা দাগ। বা চোখের ওপর কালো পট্টি।
পট্টিটা দেখলে? ফিসফিসিয়ে বললো মুসা।
আর গালের কাটা, যোগ করলো রবিন।
আমি দেখেছি ওর স্যুট, কিশোর বললো। বিজনেস স্যুট। মনে হলো কোটের নিচে পিস্তলও আছে।
এবার তাহলে যেতে পারি আমরা? মুসা বললো।
হ্যাঁ। দারুণ কাটলো সময়।
সাইকেলের কাছে আসতে আসতে বার বার পেছনে ফিরে তাকালো ওরা। কিন্তু আর কিছু চোখে পড়লো না।
তবে, সাইকেল চালিয়ে মোনিং ভ্যালি পেরোনোর সময় আবার রাতের নীরবতা ভাঙলো সেই আজব গোঙানি।

.

চোখেমুখে রোদ লাগতে ঘুম ভাঙলো মুসার। চোখ মেলে তাকালো। অপরিচিত লাগলো ঘরটা। কোথায় রয়েছে? বাইরে ঘোড়া নাক টানলো, একটা গরু হাম্বা করে উঠলো। মনে পড়লো তার, হারভে র‍্যাঞ্চের দোতলায় একটা বেডরুমে শুয়েছে। ওপরের বাংক থেকে ঝুঁকে নিচে তাকালো, কিশোরের বাংকের দিকে। সে কি করছে দেখার জন্যে। গোয়েন্দাপ্রধান নেই।
এক লাফে উঠে বসতে গিয়ে ছাতে আথা ঠুকে গেল মুসার। উফ করে উঠলো।
ওধারের বাংক থেকে সাড়া দিলো রবিন। হাত তুলে জানালা দেখালো।
জানালার কাছে বুদ্ধদেবের মতো আসন করে বসেছে কিশোর, গায়ে ওরকমই একটা চাদর জড়ানো। তার সামনে মেঝেতে বিছানো কাগজের বড় একটা শীট, ওটার ওপর চারটে বই। পেন্সিল দিয়ে অনেকগুলো লাইন টেনেছে কাগজটাতে।
হাঁ করে চেয়ে রইলো মুসা। বুঝতে পারলো, বই দিয়ে মোনিং ভ্যালির একটা মডেল বানিয়েছে কিশোর। পেন্সিল দিয়ে এঁকেছে সুড়ঙ্গমুখ।
এক ঘন্টা ধরে বসে আছে ওভাবে, রবিন জানালো।
খাইছে! দশ মিনিটও পারবো না আমি! মাঝে মাঝে তাদের তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি। বন্ধুটির আচার-আচরণ খুবই অবাক করে মুসা আর রবিনকে।
ধ্যান ভাঙলো অবশেষে। কথা বললো কিশোর পাশা। গোঙানি উপত্যকার সঠিক টপোগ্রাফিকেল অ্যারেঞ্জমেন্ট নির্ণয়ের চেষ্টা করলাম। জায়গাটার ফিজিকাল প্যাটার্নের মধ্যেই রয়েছে রহস্যের চাবিকাঠি।

গ্রীক বললে!
ও বোঝাতে চাইলো, বুঝিয়ে দিলো রবিন। জায়গাটার গঠনের ওপর নির্ভর করছে রহস্যের সমাধান।
এরকম সহজ করে বললেই পারতো।
মুসার কথায় কান দিলো না কিশোর। গোঙানি উপত্যকার আসল রহস্য, আমরা ঢুকলেই কেন ওটার গোঙানি বন্ধ হয়ে যায়? কাল রাতে দুবার ঘটেছে। ঘটনাটা। অথচ আমরা ফেরার সময়ও আবার শুরু হলো, একটা খবরের কাগজ দেখালো। নতুন করে গোঙানি শুরু হওয়ার রিপোর্ট বেরিয়েছে এটাতে। শেরিফের সাক্ষাৎকার নিয়েছে। শেরিফ বলেছেন, কারণটা জানা যাচ্ছে না তার আরেকটা কারণ, কেউ গুহায় ঢুকলেই নাকি ওই আওয়াজ বন্ধ হয়ে যায়। কাগজটা নামিয়ে, রাখতে রাখতে বললো, আমি এখনও শিওর, কাকতালীয় কোনো ব্যাপার নয় ওটা।
হয়তো তোমার অনুমানই ঠিক, রবিন বললো। এমনভাবে ঘটেছে, যেন। আমাদের ওপর কেউ চোখ রেখেছিলো।
তো, তোমার মডেল কিভাবে সাহায্য করছে আমাদের? জিজ্ঞেস করলো মুসা।
বই দিয়ে বানানো মডেলটার দিকে তাকালো কিশোর। কাল রাতে যতো জায়গায় গিয়েছি, সবগুলো জায়গায় চিহ্ন দিয়েছি এখানে। দুবার দুদিক দিয়ে ঢুকেছি, দুবারই গোঙানি বন্ধ হয়ে গেছে। রবিন ঠিকই বললো, যেন আমাদের ওপর কেউ চোখ রেখেছিলো।
মাথা ঝাঁকালো রবিন। আমরা ঢাকার আগেই দেখে ফেলছিলো আমাদের।
হ্যাঁ। আর এই মডেলটা বানিয়ে বুঝলাম, যতো জায়গায়ই গিয়েছি আমরা, আমাদের দেখেছে। ডেভিল মাউনটেইনের চূড়া থেকে।
তাহলে তো হয়েই গেল, বললো মুসা। মিস্টার হারভেকে গিয়ে বলবো একথা। চূড়া থেকে ধরে ফেলা হবে লোকটাকে।
না, মুসা, মাথা নাড়লো কিশোর। লোকটাকে ধরা এতো সহজ নয়। ওপর থেকে দেখে সে। ধরতে আসছে বুঝতে পারলেই পালাবে।
তাহলে…, শুরু করলো রবিন।
কিভাবে…, একই সময় বললো মুসা।
নজর রাখবো আমরা, নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটলো কিশোর। গুহায় আসলে কি ঘটছে জানার চেষ্টা করবো। তারপর জানাবো সবাইকে।
গুহায় কি ঘটছে কিছুই জানি না আমরা, মুসা বললো। জানি?
না। তবে একটা প্ল্যান করেছি আমি। একটা সূত্র পেয়েছি।
পেয়েছো? কি?

কাল রাতে গুহার ভেতর এটা পেয়েছি, বলে পাথরের টুকরোটা বের করে। দেখালো কিশোর। একসময় খুনিতে ঢোকার পথ ছিলো ওই সুড়ঙ্গ। পাথর পড়ে। যেখানে বন্ধ হয়েছে, ওখানে পেয়েছি।
বাংক থেকে নেমে গিয়ে পাথরটা হাতে নিলো রবি দেখলো। তুলে দিলো। মুসার হাতে।
কি এটা, কিশোর? মুসা বুঝতে পারছে না। আমার কাছে তো পিছলা একটা পাথর ছাড়া আর কিছুই মনে হচ্ছে না।
জানালার কাঁচে ঘষা দাও ওটা দিয়ে।
কী? আরও অবাক মুসা। তাতে কি হবে…
দিয়েই দেখো না।
বাংক থেকে নেমে গিয়ে কাঁচে ঘষা দিলো মুসা। কেটে গেল কাঁচ। শিস দিয়ে উঠলো মুসা।
কিশোর! চেঁচিয়ে বললো রবিন। তারমানে…
হীরা, কথাটা শেষ করে দিলো কিশোর। হ্যাঁ, আমার তাই মনে হয়। আনকাট ডায়মণ্ড। বড় বটে, কিন্তু জাত ভালো নয়, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল স্টোন সম্ভবত। তবে এটা হীরা।
হেনরি ফিগারোর গুহাটা হীরার খনি? পাথরটা নিজের চোখে দেখেও বিশ্বাস। করতে পারছে না রবিন। এখানে, এই ক্যালিফোর্নিয়ায়?
গুজব তো রয়েছে। হয়তো…
বাধা পেয়ে থেমে গেল কিশোর। দরজায় থাবা দিয়ে জোরে জোরে ডাকলেন। মিসেস হারভে, এই ছেলেরা, জলদি ওঠো। নাস্তা দেয়া হয়েছে।
খাবারের কথা শুনে পেট মোচড় দিয়ে উঠলো। এতোক্ষণ বুঝতেই পারেনি। ওরা, কতোটা খিদে পেয়েছে। কাপড় পরে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই চলে এলো। র‍্যাঞ্চের বিরাট রান্নাঘরে। ওদের দিকে চেয়ে হাসলেন মিস্টার হারভে আর প্রফেসর হারকসন।
বাহ্, মন্তব্য করলেন প্রফেসর। মোনিং ভ্যালির রহস্যও দেখি তোমাদের খিদে কমাতে পারেনি।
বড় বড় পাত্রে করে খাবার এনে রাখছেন মিসেস হারভে।
খাওয়া শুরু করলো ছেলেরা।
কাজটাজ করবে কিছু আজ? জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার হারভে।
নিশ্চয় করবে, ওদের হয়ে জবাব দিলেন মিসেস হারভে। উত্তরের মাঠে যাবে না খড় কাটতে? ওদেরও নিয়ে যাও।

ভালো বলেছো। খড় কাটা শেষ হলে ম্যাভারিক জড়ো করবো. সাহায্য করতে পারবে।
র‍্যাঞ্চ জীবনের ওপর মোটামুটি পড়াশোনা আছে রবিনের। ম্যাভারিক মানে জানে। পশুর মূল পাল হতে সরে যাওয়া গরু ছাগল-ভেড়াকে বলে ম্যাভারিক।
তো, কাল রাতে সৈকতে কেমন লাগলো? জিজ্ঞেস করলেন প্রফেসর। কি কি দেখলে?
চমৎকার, জবাব দিলো কিশোর। এক আজব বুড়োর সঙ্গে দেখা হলো। নাম বললো ডিন মারটিন। লোকটা কে, স্যার?
ডিন মারটিন আর তার বন্ধু কার্ল বেইরি ছিলো প্রসপেকটরস, বললেন মিস্টার হারভে। যৌবনে সমস্ত পশ্চিম ছুঁড়ে বেরিয়েছে সোনা রূপা আর হীরার সন্ধানে।
অনেক বছর আগে, এখানে এসেছিলো দুজনে, মিসেস হারভে বললেন। তখন গুজব ছিলো, এই অঞ্চলে সোনা পাওয়া গিয়েছে। আসলে যায়নি, কিন্তু ডিন। আর কার্ল আশা ছাড়েনি। খোঁজ চালিয়েই যাচ্ছে। পর্বতের ঢালে একটা ছাউনি তুলে থাকে। তাদের ঘরে কারও যাওয়া পছন্দ করে না। মাঝে মাঝে র‍্যাঞ্চের কাজকর্ম করে দিয়ে তার বিনিময়ে খাবার নেয় আমাদের কাছ থেকে।
এখানে ওদেরকে সবাই চেনে, জানালেন প্রফেসর।
অনেক গল্প জানে মারটিন, আর বলতেও পারে, হাসলেন মিস্টার হারভে। খেয়ালি লোক,গল্পগুলোও বেশির ভাগ বানানো কিংবা রঙ চটানো। যেমন, শুরুতেই বলবে, ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে ফাঁইট করেছিলো। কিন্তু আমার সন্দেহ আছে।
মিথ্যে বলে? মুখ ভরতি খাবার চিবাতে চিবাতে বললো মুসা।
মিস্টার হারভে জবাব দেয়ার আগেই ঝটকা দিয়ে পেছনের দরজা খুলে গেল। ঘরে ঢুকলো ফোরম্যান ডেভিড কোহেন। থমথমে চেহারা। বললো, পেদ্রো পড়ে ছিলো মোনিং ভ্যালিতে।
পেদ্রো? উদ্বিগ্ন হলেন মিস্টার হারভে।
কাল রাতে ঘোড়া থেকে পড়ে গেছে। সারারাত ওখানেই পড়ে ছিলো।
কেমন আছে ও? মিসেস হারভেও উদ্বিগ্ন হলেন।
ডাক্তার বললো ঠিক হয়ে যাবে। সানতা কারলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।
এখুনি যাচ্ছি দেখতে! লাফ দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠলেন মিস্টার হারভে।
শ্রমিকেরা ভীষণ ভয় পেয়েছে, জানালো কোহেন। আরও দুজন বলেছিলো, এখানে আর কাজ করবে না। পেদ্রো বলেছে, মোনিং ভ্যালিতে নাকি কি নড়তে দেখে দেখার জন্যে যায়। হঠাৎ গোঙানি শুনে ভয় পেয়ে যায় ঘোড়াটা। পেদ্রোকে পিঠ থেকে ফেলে দিয়ে ছুটে পালায়। সারা শরীর জখম হয়েছে বেচারার গোড়ালি মচকে গেছে।

পরস্পরের দিকে তাকালেন মিস্টার এবং মিসেস, চোখে চোখে কথা হয়ে গেল।
কিশোর জিজ্ঞেস করলো, ঘোড়াটা কি কালো? রড়?
হ্যাঁ, মাথা ঝাঁকালো ফোরম্যান। নাম ব্ল্যাকি। খুব ভালো জানোয়ার। আজ সকালে কোরালে ফিরেছে। একা। তখনই.পেদ্রোর খোঁজ শুরু করলাম।
কেন, কাল রাতে তোমরা ঘোড়াটাকে দেখেছিলে? তীক্ষ্ণ হলো মিস্টার হারভের দৃষ্টি।
হ্যাঁ, স্যার। পিঠে লোক ছিলো না।
র‍্যাঞ্চের নিয়ম জানো? আরোহী ছাড়া কোনো ঘোড়া দেখলেই সঙ্গে সঙ্গে এসে রিপোর্ট করতে হয়। তোমাদের তা-ই করা উচিত ছিলো। তাহলে কাল রাতেই পেদ্রোকে হাসপাতালে পাঠানো যেতো।
নিয়মটা জানতাম না, স্যার। তা-ও এসে জানাতাম, যদি খালি ঘোড়া দেখতাম। ওটার পেছনে একজন লোককে দৌড়ে যেতে দেখেছি। ভাবলাম, ওই লোকটাই বুঝি ঘোড়ার সওয়ারি। লম্বা, ডান গালে কাটা দাগ, চোখে পটি।
ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন মিস্টার হারভে। ওরকম চেহারার কাউকে তো চিনি।
লম্বা, চোখে পট্টি? ভুরু কোঁচকালেন প্রফেসর। শুনে সুবিধের লোক মনে হচ্ছে না। তবে নিশ্চয় হেনরি ফিগারো নয়। ফিগারো লম্বা নয়, আর চোখে পট্টিও লাগাতো না।
দরজার দিকে এগোলেন মিস্টার হারভে। ডেভিড; শ্রমিকদের গিয়ে ঠাণ্ডা করো। পেদ্রোকে দেখে উত্তরের মাঠে চলে আসবো আমি। আর লোকটার কথাও জানিয়ে আসবো শেরিফকে।
স্যার, উঠে দাঁড়ালো কিশোর। শহরে গেলে আমাকেও নিয়ে যান। রকি বীচে যাবো।
কেন, কিশোর? মিসেস হারভে বললেন, আজই যাবে কেন? আর কটা। দিন থাকো না।
চলে আসবো আবার। আমাদের ডুবুরির পোশাকগুলো আনতে যাবো। কাল রাতে সৈকতের ওদিকে কয়েকটা স্পট দেখেছি। ভালো ভালো অনেক নমুনা পাওয়া যাবে, বুঝেছি। ইসকুলের ম্যারিন বায়োলজিতে ভালো নম্বর তুলতে পারবো।
হাঁ করে ওর দিকে চেয়ে রয়েছে রবিন আর মুসা। ম্যারিন বায়োলজি ওন্দের বিষয় নয়। কিন্তু কিছু বললো না। কোনো কারণ ছাড়া যে মিথ্যে বলে না কিশোর, জানা হয়ে গেছে এতোদিনে।
কিন্তু রকি বীচে তো আজ যেতে পারবো না…
যেতে হবে না, স্যার। আমি বাসে চলে যাবো।

বেশ। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও।
রবিন আর মুসার দিকে চেয়ে হাসলেন মিসেস হারভে। পালের গোদাই তো চলে গেল। সময় কাটাবে কি করে? যে ঝামেলা বাধলো, মিস্টার হারভে আজ র‍্যাঞ্চের কাজ দেখানোর সময় পাবেন না।
দেখি, ব্যবস্থা একটা করে নেবো সময় কাটানোর, রবিন বললো।
দুই সহকারীকে ইশারা করে বেডরুমে চলে এলো কিশোর। রবিন আর মুসা। এলে বললো, আমি চলে গেলে তোমরাও সানতা কারলায় যাবে। বড় দেখে এক ডজন মোম কিনবে। আর তিনটে মেকসিকান সমব্রেরো হ্যাট। কোথায় যাচ্ছো। জানতে চাইলে মিসেস হারভেকে যা হোক একটা কিছু বলে দেবে।
হ্যাট দিয়ে কি হবে? জিজ্ঞেস করলো মুসা।
দরকার আছে, এখন বলার সময় নেই। রবিন তারপর পাবলিক লাইব্রেরিতে যাবে। ডেভিল মাউনটেইন আর মোনিং ভ্যালির সমস্ত ইতিহাস জানার চেষ্টা করবে।
ঠিক আছে, জানলাম। কিন্তু তুমি রকি বীচে যাচ্ছো কেন?
বললাম না, স্কুবা ইকুইপমেন্ট আনতে। তোমাদেরগুলোও নিয়ে আসবো। আর লজ অ্যাঞ্জেলেসে গহনার দোকানে গিয়ে দেখিয়ে আনবো হীরাটা।
নিচে থেকে ডাকলেন মিস্টার হারভে, কিশোর, তোমার হয়েছে?
দ্রুত নেমে এলো তিনজনে। পিকআপ ট্রাকে মিস্টার হারভের পাশে ব্যাগ নিয়ে উঠে বসলো কিশোর। ওর চলে যাওয়া দেখছে রবিন আর মুসা। ডুবুরির। পোশাক দিয়ে কি করবে গোয়েন্দাপ্রধান, কিছুই বুঝতে পারছে না দুজনে।
যেচে এসে রান্নাঘরে মিসেস হারভেকে সাহায্য করলো রবিন। ঘন্টাখানেকের মধ্যেই মহিলাটি পটিয়ে তার লাইব্রেরি কার্ডটা ধার নিয়ে নিলো। তারপর বেরিয়ে এসে সাইকেল নিয়ে সানতা কারলায় চললো সে আর মুসা।
দেখো, সাবধানে যেও! পেছন থেকে ডেকে বললেন মিসেস হারভে।
মহিলা সত্যি খুব ভালো, চলতে চলতে বললো মুসা।
হ্যাঁ, হাসলো রবিন। জোর করে খাবার তুলে দেন তো পাতে...
আরে না, সেজন্যে না। আসলেই ভালো...
কথা বলতে বলতে চলেছে দুজনে। উপত্যকার ভেতর দিয়ে পাহাড়ের গা ঘেঁষে, কখনও বা দূর দিয়ে ঘুরে গেছে পথ। তিন দিক থেকে ঘিরে রয়েছে দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার বাদামী পর্বতের সারি, আরেক ধারে সাগর। কড়া রোদ। সাগরের তীরে বাতাস বেশ ঠাণ্ডা, সরে গেলেই ভীষণ গরম। প্রতিটি পাহাড়ের চূড়া খটখটে শুকনো, আর্দ্রতার লেশমাত্র নেই। সানতা-কারলা নদীর ওপরে চওড়া ব্রীজ। নিচে

নদীর বুকে শাদা বালি, পানি নেই। গরমে শুকিয়ে গেছে। ভেজা মৌসুমে কিছু কিছু তৃণলতা জন্মেছিলো, জীবন ধারণের প্রচণ্ড চেষ্টায় সেগুলো এখন ধুকছে।
ধীরে ধীরে উঠে চলেছে পথ। স্যান মেটিও গিরিপথে ঢুকলো ওরা। দুর্গম পথ, মাঝে মাঝে তীক্ষ্ণ মোড়। চালানোর চেয়ে সাইকেল ঠেলে নেয়া সহজ। তা-ই করলো দুজনে। বাঁয়ে পর্বতের খাড়া ঢাল, ডানে হাঁ করে রয়েছে যেন কালো। গিরিখাত। মাথার ওপরে গনগনে সূর্য।
অনেকক্ষণ পর ঘামতে ঘামতে গিরিপথের বাইরে বেরিয়ে এলো ওরা।
খাইছে! দেখো দেখো! চেঁচিয়ে উঠলো মুসা।
থমকে দাঁড়ালো রবিন। বিপুল বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলো সামনের দিকে।
এ-রকম দৃশ্য খুব কমই দেখেছে ওরা। ক্রমশ ঢালু হয়ে নেমে গেছে পর্বতের ঢাল, ছোট একটা পাহাড়ের গোড়ায় গিয়ে মিশেছে। তার ওপারে ছড়ানো তৃণভূমি, ঘন নীল প্রশান্ত মহাসাগরকে গিয়ে ছুঁয়েছে। এক ধারে সানতা কারলা শহর, ঝলমল করছে রোদে। দূর থেকে ঘরগুলোকে দেখাচ্ছে বিশাল এক সবুজ চাঁদরের মাঝে দেশলাইয়ের রঙিন বাক্সের মতো। সাগরের পানিতে নানারকম জাহাজ, নৌকা চলাচল করছে। আর, বহুদুরে, পার্বত্য চ্যানেল আইল্যাণ্ডস যেন ভেসে আছে। সাগরের ওপর।
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে দুজনে। পেছনে শোনা গেল ঘোড়ার খুরের আওয়াজ। প্রায় একই সঙ্গে ঘুরলো ওরা। জোরে ছুটে আসছে মস্ত এক কালো ঘোড়া। রূপার কাজ করা লাগাম, চ্যারো জিনটাতেও রূপার কাজ। জিনের ধাতব পোমেল হর্ন-এ রোদ চমকাচ্ছে।
পাথর হয়ে গেছে যেন ছেলেরা। পা নড়াতে পারছে না। ওদের দিকেই ছুটে আসছে ঘৌড়াটা। পিঠে আসীন ঘোড়সওয়ারের ছোট্ট শরীর, মাথায় কালো সমব্রেরো হ্যাট, কালো চোখের নিচে নাক-মুখ ঢাকা কালো কাপড়ে, গায়ে কালো খাটো জ্যাকেট, পরনে কালো আঁটো প্যান্টের নিচের ঢোলা অংশ উড়ছে চকচকে বুটের ওপর। হাতের পুরনো পিস্তলটা তাক করে ধরেছে ছেলেদের দিকে।
হেনরি ফিগারো!

.
অনেক দেরিতে আতঙ্কিত ছেলেদুটোকে চোখে পড়লো যেন ঘোড়াটার। হঠাৎ ব্রেক, কষে থামলো, সামনের দুই পা শূন্যে তুলে তীক্ষ্ণ ডাক ছাড়লো।
ঘোড়াটাকে সামলালো আরোহী। হাতের পিস্তল নাচিয়ে ছেলেদের বললো, ভিভা ফিয়েসতা! একটানে নামিয়ে দিলো মুখের কালো কাপড়। এক কিশোর, দুষ্টুমি ভরা চেহারা। ফিয়েসতা দেখতে এসেছো? এসো। বলেই ঘোড়ার লাগাম; ধরে টানলো। খটাখট করে চললো হাইওয়ে ধরে, সানতা কারলার দিকে।

কি বললো ব্যাটা? সেদিকে তাকিয়ে বললো মুসা।

ভিভা ফিয়েস্তা। ওই তোমরা ঈদ মোবারক বলো না, অনেকটা ওরকম। আজ বোধহয় সানতা কারলায় ফিয়েসতা হচ্ছে। ভালোই হলো। অনেক দিন থেকে দেখার শখ।

ফিয়েসতার জন্যে ওরকম পোশাক পরেছে! গুঙিয়ে উঠলো মুসা। তাদেরই বয়েসী একটা ছেলে এভাবে ভয় পাইয়ে দিয়ে গেল, মেনে নিতে পারছে না।

ফিয়েসতায় গেলে ওরকম অন্তত আরও দশটা হেনরি ফিগারোকে দেখতে পাবে, বাজি ধরে বলতে পারি।

থাকুক। কোনো কানাগলিতে ওদের সামনে পড়তে চাই না আমি।

আবার সাইকেলে চাপলো ওরা। নেমে চললো আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথ ধরে। প্যাডাল ঘোরানোর দরকারই পড়লো না। তীব্র গতিতে নেমে চলে এলো শহরের কিনারে। পাহাড় ওখানে শেষ।

প্যাডাল করে চললো ওরা। দুধারে বাড়িঘর, গলফ খেলার মাঠ, বড় বড় সপিং সেন্টার।

পথে একটা লোককে জিজ্ঞেস করে জানা গেল, লাইব্রেরিটা শহরতলীতে। চলে এলো ওরা ওখানে। সাইকেল পার্ক করার নির্দিষ্ট জায়গা আছে। ওখানে রেখে হেঁটে এগোলো সানতা কারলার প্রধান সড়ক ইউনিয়ন স্ট্রীট ধরে। বেশি দূর যেতে পারলো না। ব্যারিয়ার দিয়ে বুক করে দিয়েছে পুলিশ, ফিয়েসতা প্যারেডের জন্যে। ব্যারিয়ারের ওধারে ইতিমধ্যেই সারি দিয়ে দাঁড়াতে শুরু করেছে লোকে, প্যারেডে অংশ নিতে এসেছে যারা। বেশির ভাগেরই পরনে পুরনো আমলের স্প্যানিশ পোশাক, চোখ ধাঁধানো রঙ। আনন্দঘন পরিবেশ। ও তাড়াতাড়ি কেনাকাটা সেরে নিলো দুই গোয়েন্দা। পথের ধারে ছোট একটা দোকানেই পাওয়া গেল মোম আর খড়ের তৈরি সমব্রেরো হ্যাট। তারপর ছুটে এলো আবার পথের মোড়ে, ব্যারিয়ারের কাছে, প্যারেড দেখার জন্যে।

শুরু হলো প্যারেড। ধিড়িম ধিডিম বেজে উঠলো ড্রাম, সেই সাথে পাল্লা দিলো যেন ট্রাম্পেটের কড়া, মিষ্টি চিৎকার।

ব্যাণ্ডের পর এলো ফ্লোট। ফুলে ফুলে সাজানো। সুন্দরী মেয়েরা রয়েছে তাতে, আর নানারকম বিচিত্র পোশাক পরা পুরুষ। ক্যালিফোর্নিয়ার ইতিহাসের এক অসাধারণ মুহূর্ত তুলে ধরা হয়েছে ফ্লোটগুলোতে। প্রথম ফ্লোটটা তৈরি হয়েছে ফাদার জুনিপাররা সেরা-র সম্মানে। ক্যালিফোর্নিয়া উপকূলে পুরনো যতোগুলো চমৎকার মিশন রয়েছে, তার বেশির ভাগেরই প্রতিষ্ঠাতা এই মহৎ ফ্রানসিসকান মিশনারি। আরেকটাতে দেখানো হয়েছে, মেকসিকানদের কাছ থেকে সানতা কারলা দখলের পর সেখানে আমেরিকান পতাকা উত্তোলন করছেন জন, সি.

ফ্রেমন্ট। আরেকটাতে রয়েছে হেনরি ফিগারো (এই রকম চরিত্রের একজন লোক সত্যি ছিলেন। তাঁর নাম জ্যাসপার ওরটেগা জেসাস ডি ডেলগাডো ওয়াই ক্যাবরিলো)। পাঁচজন সেজেছে হেনরি ফিগারোর সাজে, তার মাঝে সেই ছেলেটাকেও দেখতে পেলো দুই গোয়েন্দা, গিরিপথে যে তাদেরকে চমকে দিয়েছিলো।
এলো অশ্বারোহী মাউন্টেড পুলিশ বাহিনী। ঘোড়াগুলো অপূর্ব। ওরকম একটা ঘোড়ার মালিক হতে না পারায় আফসোস হলো মুসার। প্যালোমিনো জাতের, প্রায় সোনালি গায়ের রঙ, যেন তেল চুঁইয়ে পড়ছে শরীর থেকে।
তাদের পেছনে এলো পুরনো আমলের ঘোড়ায়-টানা গাড়ির বহর, ওয়াগন, স্টেজকোচ, এইসব। সব শেষের ফ্লোটটা গোল্ড রাশ (স্বর্ণ-সন্ধান) যুগের প্রতিচ্ছবি।
মুসার হাত খামচে ধরলো রবিন। দেখো দেখো।
পাশের দুজন লোককে দেখালো সে। একটা খচ্চরের পাশে হাটছে। জানোয়ারটার পিঠে চাপিয়েছে খাবার, বেলচা, গাঁইতি, আর খনি খোঁড়ার অন্যান্য সরঞ্জাম। দুজনের একজনকে চেনে ওরাঃ বুড়ো ডিন মারটিন।
আরেকজন নিশ্চয় তার দোস্ত, মুসা বললো। কার্ল বেইরি।
এই ফ্লোটটা দেখে বেশ মজা পেলো জনতা। এমনভাবে সেজেছে মারটিন আর বেইরি, একেবারে আসল প্রসপেকটরের মতো দেখাচ্ছে। খনিতে কাজ করার উপযোগী.পুরনো পোশাকে বালি লেগে রয়েছে, যেন এই মাত্র বেরিয়ে এসেছে গর্ত থেকে। মাথা উঁচু করে আগে আগে হাঁটছে মারটিন, সামান্য খোঁড়াচ্ছে, বাতাসে উড়ছে তার শাদা লম্বা দাড়ি। পেছনে বেইরি। লম্বা, রোগাটে, বয়স মারটিনের। মতোই, তবে দাড়ির বদলে তার রয়েছে শাদা মস্ত গোঁফ।
ব্যাণ্ড বাজছে, ফ্লোট চলেছে শহরের প্রধান সড়ক ধরে। তাদের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে জনতা। হাসি-আনন্দে মুখর। এতোই তন্ময় হয়ে দেখছে দুই গোয়েন্দা, লাইব্রেরিতে যাওয়ার কথাই ভুলে গেল। একটা লোকের ওপর চোখ পড়তে চমকে উঠলো মুসা। ফিসফিস করে বললো, রবিন!
রবিনও দেখলো। কয়েক ফুট দূরে সেই লোকটা। লম্বা, গালে কাটা দাগ, চোখের ওপর পট্টি। প্যারেডে মনোযোগ নেই তার। উসখুস করছে। তারপর যেই একটু ফাঁক পেলো, ইউনিয়ন স্ট্রীট পেরিয়ে দ্রুত চলে গেল ওপাশে।
এসো, বলেই তার পেছনে ছুটলো রবিন।
বিশ ফুট দূরে দেখা গেল লোকটাকে। দ্রুতপায়ে হাঁটছে। মাঝে মাঝে থেমে সামনের কি যেন দেখছে।
কারও কিছু নিয়েছে, রবিন বললো।

কার?
দেখছি না। তুমি দেখছো কাউকে?
চোখের ওপর হাত এনে রোদ আড়াল করে, মাথা উঁচু করে দেখলো মুসা।, কাউকে দেখছি না।
লাইব্রেরির চত্বরে পৌঁছলো লোকটা। দরজার দিকে এগোলো।
ওখানে ঢুকছে কেন? অবাক হলো রবিন।
উঁচু ডাবল ডোর দিয়ে ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল লোকটা। পেছনে ছুটে গেল ছেলেরা। ভেতরে ঢুকেই থেমে গেল ফিয়েসতার দিনে আজ লাইব্রেরি প্রায় নির্জন। অথচ লোকটাকে চোখে পড়লো না।
বিরাট হলঘর। অসংখ্য বুকশেলফের মাঝে মাঝে হাঁটাচলার জন্যে ফাঁক.। ওখানে সেই লোকটা। বাইরে বেরোনোর দুটো দরজা দিয়েই বেরিয়ে দেখলো ওরা। দুটো গলি, কোনোটাতেই দেখা গেল না লোকটাকে।
পালিয়েছে, হতাশ হয়ে বললো মুসা।
আগেই বোঝা উচিত ছিলো আমাদের। তাহলে একজন পেছন দিয়ে যেতে পারতাম, আরেকজন সামনে দিয়ে।
চোর গেলে বুদ্ধি বাড়ে। এখন আর ভেবে লাভ নেই। চলো, তোমার রিসার্চ সেরে নাও।
আবার লাইব্রেরিতে ঢুকলো দুজনে। লাইব্রেরিয়ানকে জিজ্ঞেস করলো রবিন, লোকাল হিস্টরির বইগুলো কোনখানে পাওয়া যাবে। হলের পাশের ছোট একটা ঘর দেখিয়ে দিলেন মহিলা। জানালেন, ক্যালিফোর্নিয়ার ইতিহাসের ওপর স্পেশাল কিছু বইও আছে ওখানে।
ছোট ঘরটায় সবে ঢুকেছে দুজনে, একটা হাত পড়লো মুসার কাঁধে। বাহ, আমাদের গোয়েন্দারা দেখছি!
পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন প্রফেসর হারকসন। ভারি পাওয়ারের কাঁচের ওপাশে একটা চোখ টিপলেন। বিশেষ কিছু জানতে এসেছো?
হ্যাঁ, স্যার, জবাব দিলো মুসা। মোনিং ভ্যালি সম্পর্কে।
গুড, গুড, উৎসাহ দিলেন প্রফেসর। আমিও সেজন্যেই এসেছি। সুবিধে হলো না। সত্যিকার ইতিহাস বলতে কিছু নেই, অধিকাংশই উপকথা, রূপকথা কিংবা কিংবদন্তী। …তারপর, ফিয়েসতায় গিয়েছিলে?
গিয়েছিলাম! যা সুন্দর সুন্দর ঘোড়া না?
অতি চমৎকার একটা উৎসব।…যাই। এখানে বসে থেকে আর লাভ নেই। তা, যাচ্ছ কিভাবে?
সাইকেল নিয়ে এসেছি, স্যার, রবিন জানালো।

বেশ। দেখা হবে, চলি, বলে ঘুরলেন প্রফেসর।
স্যার? এক মুহূর্ত দ্বিধা করে জিজ্ঞেসই করে ফেললো রবিন, একটা লোককে দেখেছেন? চোখে কালো পট্টি?
মাথা নাড়লেন প্রফেসর। না তো। কাল রাতে যাকে দেখেছিলে?
হ্যাঁ, মুসা বললো।
এখানে, এই শহরে? চিন্তিত মনে হলো প্রফেসরকে। না, দেখিনি।
প্রফেসর বেরিয়ে গেলে, কাজে বসলো দুই গোয়েন্দা। গোটা চারেক বই পেলো, যেগুলোতে মোনিং ভ্যালির উল্লেখ আছে। তবে নতুন কিছু জানা গেল না। শেষে ছোট আরেকটা বই খুঁজে পেলো রবিন। পাতাগুলো, হলদে হয়ে এসেছে, কুঁচকানো। তাতে রয়েছে উপত্যকাটার পুরো ইতিহাস, একেবারে ১৯৪১ সাল। পর্যন্ত। ভুল তাকে ভুল জায়গায় ছিলো বইটা, সে-কারণেই বোধহয় খুঁজে পাননি প্রফেসর।
মিসেস হারভের কার্ড দেখিয়ে বইটা ধার নিলো রবিন। বাইরে বিকেলের রোদ তখনও বেশ চড়া, প্যারেড মাত্র. শেষ হয়েছে। এদিক ওদিক চলে যাচ্ছে লোকেরা। মোম, বই আর হ্যাঁটের প্যাকেট সাইকেলের ক্যারিয়ারে রেখে চড়ে বসলো দুই গোয়েন্দা। র‍্যাঞ্চে ফিরে চললো।
নামার সময় তো আরামেই নেমেছে, ওঠার সময় কষ্ট হলো। শেষে গিরিপথের কাছাকাছি এসে আর পারলো না। সাইকেল থেকে নেমে ঠেলে নিয়ে উঠতে লাগলো।
কিছুদূর উঠে বিশ্রাম নিতে বসলো। তাকালো চ্যানেল আইল্যাণ্ডস-এর দিকে। আলো কম। দূরে এখন আবছা দেখা যাচ্ছে দ্বীপগুলো।
ইস, যদি যেতে পারতাম ওখানে! মুসা বললো।
শুনেছি, ওখানেও তৃণভূমি আছে। কাউবয়েরা গরু চরায়।
দ্বীপের কিনারে নোঙর করে আছে নেভির নৌ-বহর।
সানতা কারলার দিক থেকে একটা গাড়ি আসছে। শব্দ কানে এলো ছেলেদের, ফিরলো না, ওরা তাকিয়ে রয়েছে সাগরের দিকে। হঠাৎ সতর্ক হয়ে উঠলো। প্রচণ্ড গতিতে আসছে গাড়িটা।
লাফিয়ে উঠে চরকির মতো পাক খেয়ে ঘুরলো দুজনে। গাড়ির দুই চাকা রাস্তায়, দুই চাকা রাস্তার বাইরে। সোজা তাদের দিকেই আসছে।
এক ধাক্কায় রবিনকে সরিয়ে দিয়ে নিজেও সরে গেল মুসা। ধাঁ করে তাদের পাশ দিয়ে চলে গেল গাড়িটা, নাক ঘুরিয়ে উঠে পড়লো রাস্তায়। চলে যাচ্ছে।
গা বাঁচাতে গিয়ে বেশি সরে গেছে দুজনে। ঢালের কিনারে। তাল সামলাতে পারলো না। পিছলে, গড়িয়ে পড়তে লাগলো ঢাল বেয়ে। নিচে গভীর খাদ।

.
গড়িয়ে পড়ছে মুসা। চোখা পাথর আর কাঁটাগাছে লেগে কেটেছিলে যাচ্ছে চামড়া। পাগলের মতো থাবা মারছে, আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করছে গাছের গোড়া, পাথর। হাত পিছলে যাচ্ছে। গাছ যেটাও বা ধরতে পারছে, তার ভর রাখার মতো শক্ত নয়, উপড়ে যাচ্ছে। আর ফুট চারেক পরেই ঢাল শেষ, তার পরে শূন্যতা। বাঁকা হয়ে থাকা বড় একটা গাছের ওপর আছড়ে পড়লো সে, সঙ্গে সঙ্গে জড়িয়ে ধরলো গাছের কাণ্ড। হউফ করে নিঃশ্বাস ছাড়লো।
দীর্ঘ এক মুহূর্ত গাছ ধরে ঝুলে রইলো সে। জোরে জোরে শ্বাস নিলো। তারপর লক্ষ্য করলো, সে একা। চেঁচিয়ে ডাকলো, রবিন!
সাড়া নেই। নিচে নিঃসীম কালো খাদ হাঁ করে রয়েছে।
রবিন! আরও জোরে ডাকলো।
বাঁয়ে মৃদু নড়াচড়া। ঘন ঝোপের ভেতর থেকে উঁকি দিলো রবিনের মুখ। আমি..আমি ভালোই আছি। দুর্বল কণ্ঠস্বর। কার্নিশের মতো বেরিয়ে আছে...কিন্তু পা নাড়াতে পারছি না!
চেষ্টা করো। খুব আস্তে।
অপেক্ষা করছে মুসা।
নড়ছে ঝোপটা। আবার শোনা গেল রবিনের কণ্ঠ, হ্যাঁ, পারছি এবার। ভাঙেনি। গায়ের নিচে বেকায়দা ভাবে চাপা পড়েছিলো। ব্যথা করছে খুব।
ক্রল করে উঠতে পারবে?
জানি না। ওপর দিকে তাকাতেই ভয় লাগছে, যা খাড়া!
পড়লে একেবারে... কেঁপে উঠলো মুসার গলা, কথাটা শেষ হলো না।
চেঁচালে কেমন হয়? কেউ না কেউ শুনতে পাবে।
শুরু করো। কিন্তু চিৎকার, বেরোলো না মুসার গলা দিয়ে, শুধু খসখস শব্দ। আসলে চিৎকার করলোই না। সবে মুখ খুলেছে, এই সময় ওপরে ঢালের কিনারে দেখতে পেলো একটা মুখ। নিচে উঁকি মারছে। গালে কাটা দাগ, চোখে পট্টি।
পুরো দশ সেকেণ্ড চোখে চোখে তাকিয়ে রইলো দুজনে। তারপর সরে গেল। মুখটা। দৌড়ে যাওয়া পদশব্দ, গাড়ির এঞ্জিন স্টার্ট নেয়ার আওয়াজ, মেটাল। বাধানো পথে টায়ারের তীক্ষ্ণ আর্তনাদ। চলে গেল গাড়িটা।
ওটার এঞ্জিনের আওয়াজ মিলাতে না মিলাতেই অন্য গাড়ির শব্দ শোনা গেল।
চেঁচাও! বলেই গলা ফাটিয়ে চিৎকার শুরু করলো মুসা।
পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হলো দুজনের চিৎকার। ওপরে ব্রেক কষার শব্দ হলো। ভারি জুতোর আওয়াজ। দুটো মুখ উঁকি দিলো ঢালের কিনারে।

খানিক পরেই নেমে এলো মোটা দড়ি। কোমরে কয়েক প্যাঁচ দিয়ে মাথাটা শক্ত করে ধরে রাখলো মুসা। টেনে ওপরে তুলে নেয়া হলো তাকে।
রবিনও উঠে এলো। ভাঙা পা-টা দেখলো ভালো করে। মনে হলো, চমকেছে। দড়ি ফেলেছে যে লোকটা, সে ট্রাক ড্রাইভার। জানালো, হারভে র‍্যাঞ্চের দিকেই যাচ্ছে। ছেলেরা কোথায় যাবে শুনে নিজে থেকেই লিফট দেয়ার কথা। বললো। মিনিট পনেরো পরে সাইকেল সহ র‍্যাঞ্চের গেটে নামিয়ে দিয়ে গেল তাদেরকে। ড্রাইভারকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়ে, হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে ভেতরে ঢুকলো ওরা।
ঘর থেকে বেরিয়ে দুজনকে দেখে থমকে গেলেন মিসেস হারভে। সর্বনাশ! কি হয়েছে? এরকম অবস্থা কেন?
বলতে গিয়ে পায়ে রবিনের আলতো লাথি খেয়ে চুপ হয়ে গেল গলা।
বেশি তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে সাইকেল থেকে পড়েছি, রবিন বললো। ঢলে গড়িয়ে পড়লাম, গিরিপথের কাছে। পায়ে ব্যথা পেয়েছি। একজন ট্রাক ড্রাইভার তুলে এনে নামিয়ে দিয়ে গেল।
দেখি, পা-টা? এগিয়ে এলেন মিসেস হারভে।
র‍্যাঞ্চের মহিলারা সাধারণত নার্সিঙের কাজে ওস্তাদ, এসব শিখতে হয়। তাদের। মিসেস হারভেও ব্যতিক্রম নন। টিপেটুপে দেখে বললেন, সামান্য মচকেছে। ডাক্তার কিংবা ওষুধ লাগবে না, তবে অনেকক্ষণ বিশ্রাম নিতে হবে রবিনকে। বারান্দায় একটা চেয়ারে তাকে বসিয়ে দিয়ে গিয়ে লেমোনেড নিয়ে এলেন।
মুসা আমান, তুমি কাজ করতে যাও, বললেন তিনি। মিস্টার হারভে এখনও ফেরেননি। সামনের কোরালের ঘোড়াগুলোকে খড় খাওয়াও গিয়ে।
যাচ্ছি।
চেয়ারে পা তুলে দিয়ে, আরাম করে ছায়ায় বসে লেমোনেড খেতে খেতে মুসার দিকে চেয়ে হাসছে রবিন। রোদের মধ্যে কাজ করে ঘেমে সারা হচ্ছে গোয়েন্দাসহকারী। রবিনের হাসি দেখলো, কিন্তু মন খারাপ করলো না। কাজ করতে ভালোই লাগছে তার। পেশীতে জোর বাড়ছে।
সাপারের আগে পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডের পুরনো ট্রাকটা এসে থামলো র‍্যাঞ্চ হাউসের বাইরে। ড্রাইভিং সীটে বোরিস, পাশে বসে আছে কিশোর। নামলো সে। মালপত্র নামাতে তাকে সাহায্য করলো মুসা। স্কুবা ইকুইপমেন্টগুলো ছাড়াও ছোট আরেকটা রহস্যময় প্যাকেট রয়েছে, ভেতরে কি বুঝতে পারলো না সে। গোলাঘরে রাখা হলো মালগুলো।
বোরিস না খেয়ে যেতে পারবে না, বলে দিলেন মিসেস হারভে।

বিশালদেহী ব্যাভারিয়ান লোকটার চওড়া কাঁধ আর হাতের পেশীর দিকে মুগ্ধ চোখে তাকালেন মিস্টার হারভে। ভাবলেন, এরকম একজন লোক র‍্যাঞ্চে থাকলে খুব সাহায্য হতো।
র‍্যাঞ্চে কাজ করতে আপনার কেমন লাগে, বোরিস? জিজ্ঞেস করলেন। তিনি। আপনাকে পেলে দশজনকে ছেড়ে দিতে পারতাম।
আপনাদের লোক দরকার, কিশোর গিয়ে বলেছে, জানালো বোরিস। কয়েক হপ্তার জন্যে আমাকে, আর আমার ভাই রোভারকে এখানে কাজ করতে দিতে রাজি আছেন মিস্টার রাশেদ পাশা।
তাকে ধন্যবাদ দিয়ে মিস্টার হারভে বললেন, তার বোধহয় দরকার হবে না। গোলমালটা সাময়িক, শীঘ্রি সব ঠিক হয়ে যাবে। পেদ্রো বলেছে সে ভয় পায়নি। হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে শ্রমিকদের বোঝাবে বলে দিয়েছে।
তাই বলেছে বুঝি? খুব ভালো, বললেন মিসেস হারভে।
মুখ কালো করে ফেললেন মিস্টার হারভে। কিন্তু ওর ফিরতে সময় লাগবে। আর এর মাঝে আবার কোনো অঘটন ঘটে গেলে কাউকে রাখা যাবে না। শেরিফও কিছু করতে পারেনি। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, হেনরি ফিগারোর কোনো ছেলেটেলে ছিলো না। পট্টিওয়ালা লোকটা কে, তা-ও জানতে পারেনি।
এতো উতলা হচ্ছো কেন? সান্ত্বনা দিলেন প্রফেসর। ব্যাখ্যা একটা নিশ্চয় পাওয়া যাবে। আসল কারণটা জেনে ওদেরকে জানাতে পারলেই ভয় দূর হয়ে যাবে। টাইম লাগবে আরকি; এই যা।
জানা যে যাবে, এ-ব্যাপারে শিওর হতে পারলেও হতো, বললেন মিস্টার হারভে।
আলোচনা চললো।
খাওয়া শেষ করে বিদায় নিয়ে ট্রাকে গিয়ে উঠলো বোরিস।
প্রফেসরও বেরোলেন। ইউনিভারসিটিতে যাবেন, একটা ক্লাস নিতে হবে। মিস্টার হারভের অনেক কাজ জমে রয়েছে র‍্যাঞ্চে। তিনিও গেলেন।
তিন গোয়েন্দা চলে এলো নিজেদের বেডরুমে।
দরজা বন্ধ করলো রবিন।
এখন কি করা? কিশোরকে জিজ্ঞেস করলো মুসা।
পাথরটা কি হীরা? জানতে চাইলো রবিন।
হাসলো কিশোর। হীরাই। ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডায়মণ্ড। দাম খুবই কম। কোথায় পেয়েছি শুনে চোখ কপালে তুললল লস অ্যাঞ্জেলেসের এক ডায়মণ্ড এক্সপার্ট।
বিশ্বাসই করতে চায় না। ওর ধারণা, ওটা আফ্রিকান পাথর। কয়েকটা টেস্ট করবে। রেখে দিয়েছে পাথরটা। বলেছে, টেস্ট সেরেই এখানে ফোন করবে।
খাইছে!

মোম আর হ্যাট এনেছো?
এনেছি, বললো মুসা।
আর মোনিং ভ্যালির ওপরে লেখা একটা বই, রবিন বললো।
সানতা কারলায় যাওয়ার শুরু থেকে সমস্ত ঘটনা কিশোরকে জানালো। দুজনে।
গাড়িটার নম্বর দেখেছো?
সময় পেলাম কোথায়? মুসা বললো। তবে নম্বর প্লেটটা দেখেছি এক পলক, নীল আর শাদা।
হুমম। মনে হচ্ছে নেভাডার রেজিস্ট্রেশন। গাল-কাটা লোকটা এসে তাকিয়েছিলো তোমার দিকে, না?
আমরা মরেছি কিনা দেখতে এসেছিলো হারামজাদা, রেগে গেল মুসা। মেরে ফেলতো। অন্যান্য গাড়ি আসতে দেখে পালিয়েছে।
হয়তো নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটলো কিশোর। শহরে প্রফেসরের সঙ্গেও দেখা হয়েছে, না?
ডিন মারটিন আর কার্ল বেইরির সঙ্গেও। তিনজনই গিয়েছিলো, রবিন মনে করিয়ে দিলো।
গিরিপথটা এখান থেকে দূরে নয়, যুক্তি দেখালো কিশোর। র‍্যাঞ্চের কেউ গাড়ি নিয়ে চলে যেতে পারে, তাতে কয়েক মিনিটের বেশি লাগবে না।
তা ঠিক।
তবু, নেভাডার লাইসেন্স প্লেট, আরেকবার ঠোঁটে চিমটি কাটলো কিশোর। এখানে কারও গাড়ি…সবারই ক্যালিফোর্নিয়ার রেজিস্ট্রেশন।
আমাদের অচেনা কারও কথা বলছো? মুসার প্রশ্ন।
হতেও পারে, বললো রবিন। পট্টিওয়ালাকেই তো আমরা চিনি না।
হু, মাথা দোলালো কিশোর। চলো, কাজ শুরু করি। আমি চট করে বইটা উল্টে নিই। তোমরা গিয়ে স্কুবা ইকুইপমেন্টগুলো চেক করো। ট্যাংকগুলো কোনো কিছুতেই জড়িয়ে নেবে, যাতে দেখে কেউ চিনতে না পারে। সাইকেলের ক্যারিয়ারে তুলে নিও। মোমের প্যাকেট, হ্যাট, আর আমি যে পোঁটলাটা এনেছি, ওটাও নিও।
তোমার উদ্দেশ্যটা কি?
যেতে যেতে বলবো। হাতঘড়ি দেখলো কিশোর। জলদি করতে হবে। নইলে সূর্য ডোবার আগে মোনিং ভ্যালিতে পৌঁছুতে পারবো না। আজ রাতেই হয়তো রহস্যের সমাধান করে ফেলতে পারবো।
আধঘন্টা পর গোলাঘরে ঢুকলো কিশোর। হাতের বইটা নাড়লো। জবাব বোধহয় পেয়েছি, ঘোষণা করলো সে। এতে বলছে, পঞ্চাশ বছর আগে ডেভিল

মাউনটেইনে খনির বেশির ভাগ শ্যাফট বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। সোনাদানা কিছু। পায়নি, তাই বন্ধ করেছে। সেই সময়ই বন্ধ হয়ে যায় গোঙানি।
তারমানে ওগুলোর কোনোটা নতুন করে ভোলা হয়েছে? রবিন বললো। আর ওটা দিয়ে বাতাস পাস করে বলেই শব্দ হয়।
সে-রকমই তো মনে হয়। তবে প্রশ্ন আছে। যাকগে, তোমরা রেডি?
রেডি, বললো মুসা।
বেশ। হ্যাট পরো। আমাকে একটা দাও। পরে এখান থেকে বেরোবো।
চটের বস্তায় ট্যাংকগুলো জড়িয়ে নিয়েছে। হ্যাট পরে মালপত্র নিয়ে বেরোলো তিন গোয়েন্দা। সাইকেলে চাপলো। ক্যারিয়ারে ভারি বোঝা, ঝাঁকুনি লাগলেই মাতালের মতো টলছে, বেশ কায়দা করে ব্যালান্স রাখতে হচ্ছে। সাবধানে হ্যাণ্ডেল ধরে রেখে প্যাডাল ঘোরালো ওরা।
ব্যথায় আঁউক করে উঠলো রবিন।
কি হলো? পায়ে খুব লাগছে? জিজ্ঞেস করলো মুসা।
মাথা ঝাঁকালো রবিন। কিশোর, তোমরা যাও। আমি বোধহয় পারবো না। থেকেই যাই।
চিন্তিত ভঙ্গিতে তার দিকে তাকালো কিশোর। না থাকতে হবে না, রবিন। তোমার ওই মচকানো পা সুবিধেই করে দিলো। ফাঁকি দেয়া সহজ হবে।
ফাঁকি? ভুরু কোঁচকানো মুসা।
ওই যে মিলিটারি ক্লাসিক পদ্ধতিঃ ক্যাম্পের আগুন আর গাছের কাণ্ড, দেখতে লাগে কামানের মতো, খুব সহজ ব্যাখ্যা দিলো কিশোর, যার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারলো না মুসা। রবিন, তোমার ইকুইপমেন্ট খুলে রেখে এসো। বোঝ না থাকলে সাইকেল চালাতে কষ্ট হবে না।
চেষ্টা করে দেখলো রবিন। চালাতে পারলো। গেটের দিকে এগোলো তিনজনে। বারান্দা থেকে হাত নাড়লেন মিসেস হারভে। বেশি দেরি করো না কিন্তু। সাবধান থেকো।
র‍্যাঞ্চের বাইরে এসেই মুখ ঘোরালো ওরা, মোনিং ভ্যালির দিকে চললল। সেই লোহার গেটটার কাছে পৌঁছে থামলো। সাইকেল আর মালপত্র লুকানো ঘন ঝোপের ভেতরে।
শোনো, কিশোর বললো। গুহায় ঢুকবো আমরা। এমনভাবে, যাতে কেউ দেখে না ফেলে।
বুঝলাম, কান চুলকালো মুসা। গোঙানি-ব্যাটাকে অবাক করে দেবো।
ঠিক। আমার ধারণা, এই মুহূর্তে তীক্ষ্ণ নজর রাখা হচ্ছে আমাদের ওপর।
কি করে ফাঁকি দেবো ওকে? রবিনের প্রশ্ন।

পানির নিচ দিয়ে যাবো। ইকুইপমেন্টগুলো কেন আনলাম? হিসেব করে দেখেছি, এখন জোয়ার। সৈকত আর গুহামুখটা পানির তলায়।
তাতে কি ওরা দেখবে না?
দাঁত বের করে হাসলো গোয়েন্দাপ্রধান। ডিকয় পদ্ধতির নাম শুনেছো? তা-ই ব্যবহার করবো। আর্মিরা ব্যবহার করে। রাতে ক্যাম্পের আগুন জ্বেলে রেখে অন্ধকারে চুপি চুপি কেটে পড়ে।
তোমার কথাবার্তা..
মুসাকে কথা শেষ করতে দিলো না কিশোর। ডেভিল মাউনটেইনের চূড়ায় বসে বাঁ-দিকের পথের নিচের অংশ দেখা যায় না, বুঝতে পেরেছি। ওখান দিয়েই নামবো।
গেট ডিঙালো ওরা। তারপর বাঁয়ের পথ ধরে চললো। চূড়াটা চোখের আড়াল হতেই বললো কিশোর, থামো। কাঁধ থেকে বোঝা নামালো। খুলতে শুরু করলো রহস্যময় পোঁটলাটা।
আরি! এ-তো দেখি খালি পুরনো কাপড়? মুসা বললো।
এরকম কাপড়ই তো পরে আছি আমরা! রবিনও অবাক।
সে-জন্যেই তো এনেছি। ভেতরে লতাপাতা ঢুকিয়ে মানুষ বানাবো। নাও, শুরু করো। তারপর শুইয়ে রাখবো।
দেখতে দেখতে দুটো ডামি তৈরি হয়ে গেল। মুসা আর কিশোরের
গলার ওপর সমব্রেরো ফেলে রাখলে মনে হবে মাথায় পরেছে! ধীরে ধীরে। বুঝতে পারছে মুসা।
হ্যাঁ, বললো কিশোর। দূরে, পাহাড়ের চূড়া থেকে তা-ই মনে হবে। রবিন। থাকছে এখানে। মাঝেসাঝে নড়াচড়া করবে। ওখান থেকে যে চোখ রাখছে, সে ভাববে আমরাই। সন্দেহ করবে না।
ডামিগুলো পথের ওপর রাখা হলো। পাশে বসে রইলো রবিন। পর্বতের চূড়া থেকে যে-ই থাকুক, মনে করবে, তিনিটে ছেলে ঢালের কিনারে হেলান দিয়ে বসে সাগর দেখছে।
ঢালের আড়ালে থেকে সরু পথ বেয়ে নিচের সৈকতে নামতে লাগলো, কিশোর আর মুসা। নিচে একটা সুবিধেজনক জায়গায় এসে ডুবুরির পোশাক পরে নিলো। পিঠে বাঁধলো এয়ার-ট্যাংক।
ঢেউয়ের জোর আজ কম, বললো কিশোর। সাঁতরাতে সুবিধেই হবে। আমাদের।
পাঁচ মিনিটের বেশি লাগবে না, বললো দক্ষ সাঁতারু মুসা। ডুবুরির পোশাক পরে পানির তলায় ডুব দেয়া তার ভারি পছন্দ।
আমার আরেকটু বেশি লাগতে পারে।

এখন কথা হলো, নিচ দিয়ে পুরোটা পথ যাওয়া যাবে কিনা।
অসুবিধে নেই। ভেসে উঠবো। ডিকয় সাজিয়ে দিয়ে এসেছি। এদিকে নজর রাখার কথা ভাববে না কেউ।
ব্রীদিং টিউব ঠিক করে, মুখে মাউথপীস এঁটে পানির দিকে চললো ওরা। পানিতে নেমে হারিয়ে গেল ঢেউয়ের তলায়।
কব্জিতে বাঁধা কম্পাস দেখে দেখে এগিয়ে চলেছে কিশোর। পেছনে মুসা। শুধু সাঁতরানো ছাড়া আর কিছু করতে হচ্ছে না তাকে, ফলে পাথরের খাঁজে, আশেপাশে সাগর-জীবনের ওপর নজর দিতে পারছে।
ছুটাছুটি করছে নানারকম মাছ। একটা হ্যাঁলিবাট, পাথরের রঙের সঙ্গে মিশে ছিলো। মুসা দেখতে পায়নি। প্রায় হাত দিয়ে ফেলেছে পাথরে, এই সময় ছিটকে উঠলো মাছটা, চমকে দিলো তাকে। তারপর রাজকীয় ভঙ্গিতে সাঁতরে চলে গেল।
মিনিট দুই পর থেমে মুখ ফেরালো কিশোর। ইশারায় হাতঘড়ি দেখিয়ে, গুহার দিকে দেখালো। বুঝলো মুসা। তার মানে এবার গুহার দিকে ফেরার নির্দেশ দিচ্ছে গোয়েন্দাপ্রধান।
আবার আগে চললো কিশোর। তার একেবারে গায়ের কাছে রয়েছে মুসা। তাই, কিশোর যখন হঠাৎ থেমে গেল, তার পায়ের ওপর এসে ধাক্কা খেলো সে।
অবাক হয়েছে মুসা। মাউথপীসের মধ্যেই গুঙিয়ে উঠলো। কেন ওভাবে থেমে গেল কিশোর? ইশারায় বাঁয়ে দেখালো গোয়েন্দাপ্রধান।
কিশোরের হঠাৎ থেমে যাওয়ার কারণ বুঝতে পারলো মুসা। বড় জোর তিরিশ ফুট দূরে কালো কি যেন একটা নড়ছে। বড়, লম্বা, কালো একটা সিগারের মতো দেখতে। হাঙর হতে পারে, কিংবা খুনী তিমি।
ধক করে উঠলো মুসার বুক। তবে ঘাবড়ালো না। ড্রাইভিঙের বিশেষ ট্রেনিং রয়েছে ওদের, দক্ষ ওস্তাদের কাছে শিক্ষা নিয়েছে। হাঙর হলে কি করতে হবে জানা আছে। অস্বাভাবিক যে কোনো নড়াচড়া দৃষ্টি আকর্ষণ করে হাঙরের, দেখতে ছুটে আসে। ছুরি বের করলো দুজনেই। যতোটা সম্ভব কম নড়াচড়া করে সরে যেতে লাগলো পাথরের কাছে, নিরাপদ কোনো খাজ দেখলে তার মধ্যে ঢুকে যাবে।
ছায়াটার ওপর থেকে ক্ষণিকের জন্যে চোখ সরাচ্ছে না মুসা। না, হাঙর বলে তো মনে হচ্ছে না? পেট মোচড়ানি নেই, শরীরের কোথাও সামান্যতম বাঁকা হচ্ছে না, সোজাসুজি এগিয়ে চলেছে। সাধারণ হাঙরের তুলনায় বড়। আবার খুনী তিমির চেয়ে ছোট।
মুসার কাঁধ ছুঁয়ে ইঙ্গিতে হাঙর কিনা জিজ্ঞেস করলো কিশোর। মাথা নাড়লো, মুসা। দুজনেই দেখলো, ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে ছায়াটা, মিলিয়ে গেল গভীর

পানির দিকে।
আবার সাঁতরে চললো দুজনে। পানির নিচে পাথরের ছড়াছড়ি আর ঢেউই বলে দিলো ওদেরকে, পাহাড়ের গোড়ায় পৌঁছে গেছে। সাবধানে ভেসে উঠলো। মাত্র কয়েক ফুট দূরে সুড়ঙ্গমুখটা।
মাউথপীস খুলেই আগে জিজ্ঞেস করলো কিশোর, কি ছিলো ওটা?
বুঝলাম না। হাঙর না, তিমি না, কোনো জীবের মতোই লাগলো না। কিশোর, আমার ভয় লাগছে। গিয়ে বোধহয় শেরিফকে সব জানানো উচিত।
ভয় কি? ছায়াটা তো চলেই গেছে। দুজনেই যখন দেখেছি, চোখের ভুল। হতে পারে না। আর চোখের ভুল যখন নয়, ওটা ভূতপ্রেতও কিছু নয়।
কিন্তু..., বলতে দ্বিধা করছে মুসা।
দেখো, বোঝালো কিশোর। এতোটা এসে ফিরে যাওয়ার কোনো মানে হয়, না। দড়ি বেঁধে নিলো কোমরে। একটা মাথা মুসার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললো, ধরে রাখো। আমি ঢুকছি।
ডুব দিলো আবার কিশোর।
সূর্য ডোবে ডোবে। গোধূলির ছায়া নামছে। দড়ি ধরে দাঁড়িয়ে রইলো মুসা। দুটো হ্যাঁচকা টান পড়তেই মুখে মাউথপীস লাগিয়ে সে-ও ডুব দিয়ে এগিয়ে গেল। কালো মুখটার দিকে।
ঢেউ কম, ফলে ফেনাও কম। স্রোত নেই। ওয়াটারপ্রুফ ফ্ল্যাশলাইট জ্বাললো সে। ঢুকে পড়লো সুড়ঙ্গে। হাত-পায়ে ভর দিয়ে এগোনোর চেয়ে সাঁতরে চলা অনেক সহজ। দ্রুত কমে আসছে পানির গভীরতা। চওড়া জায়গাটায় চলে এলো, যেখান থেকে বাঁকা হয়ে উঠে গেছে সুড়ঙ্গ। কিশোর দাঁড়িয়ে আছে। তার পাশে চলে এলো মুসা। বড় গুহাটায় ঢুকলো দুজনে।
গোঙানি শোনা গেল।
হাসি ফুটলো গোয়েন্দাপ্রধানের মুখে। গুহার ভেতরে ঢুকে গেছে ওরা, অথচ গোঙানি বন্ধ হয়নি।
খাইছে! ফিসফিস করে বললো মুসা। ফাঁকিটা ঠিকই দিয়ে দিলাম। ঢুকতে দেখেনি আমাদের।
তাই তো মনে হচ্ছে।
দ্রুতহাতে ডুবুরির পোশাক খুলে ফেললো দুজনে। পানি নিরোধক বাক্স থেকে মোম আর দেশলাই বের করে দুটো মোমবাতি ধরালো কিশোর। একটা দিলো মুসার হাতে। বললো, প্রতিটা সুড়ঙ্গের মুখের কাছে ধরবো এগুলো। শিখা যদি কাঁপে, বা কাত হয়ে যায়, বুঝবো বাতাস বইছে। আর না নড়লে বইছে না, তারমানে ওই সুড়ঙ্গ বন্ধ। সেটাতে ঢুকুবোই না। অনেক সময় বাঁচবে তাতে।

দারুণ বুদ্ধি করেছো!
একে একে সুড়ঙ্গমুখগুলো পরীক্ষা করতে লাগলো ওরা। একটা মুখের কাছে। বাতি ধরতে সামান্য কাঁপলো শিখা। কিন্তু সন্তুষ্ট হতে পারলো না কিশোর। সরে এলো আরেকটা মুখের কাছে।
হঠাৎ একটা মুখের কাছে বাতি ধরতেই টান মেরে যেন শিখাটাকে ভেতরে ঢুকিয়ে নিতে চাইলো অদৃশ্য শক্তি, নিভেই গেল বাতিটা।
পেয়েছি, কিশোর! চেঁচিয়ে উঠলো মুসা।
আস্তে! কাছেপিঠে কেউ থাকতে পারে।
কান পতলো দুজনেই। পুরো আধ মিনিট স্তব্ধ নীরবতা। চেঁচিয়ে উঠেছে বলে মনে মনে নিজেকে বেশ কয়েকটা লাথি মারলো মুসা। তারপর আবার শোনা গেল গোঙানি, মৃদু, কিন্তু স্পষ্ট।
যেটার মুখের কাছে আলো নিভেছে ওই সুড়ঙ্গ দিয়েই আসছে মনে হলো। পকেট থেকে শাদা চক বের করে সুড়ঙ্গমুখের দেয়ালের পাশে একটা আশ্চর্যবোধক চিহ্ন আঁকলো কিশোর। টর্চ বের করে জ্বেলে ঢুকে পড়লো সুড়ঙ্গটায়।

.

ডামিগুলোর পাশে বসেই রয়েছে রবিন। পশ্চিম দিগন্তে ধীরে ধীরে সাগরের পানিতে তলিয়ে গেল যেন কমলা রঙের সূর্যটা। বেগুনী-লাল গোধূলির রঙ আকাশে, ছায়া পড়েছে সাগরে। আহত পা-টা সাবধানে নাড়লো সে।
আধ ঘন্টা যাবৎ বসে বসে নিজে নিজেই বকবক করছে। তার মনে হচ্ছে, তীক্ষ্ণ চোখে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে কে যেন। অদ্ভুত অনুভূতি। স্রেফ কল্পনা বলে জোর করে তাড়ানোর চেষ্টা করলো অনুভূতিটা, পারলো না।
অন্য দিকে মন সরানোর জন্যে মোনিং ভ্যালির ওপরে লেখা বইটা পড়তে আরম্ভ করলো। মাইন শ্যাফট বন্ধ করে দেয়ার অংশটা পড়তে পড়তে খাড়া হয়ে গেল পিঠ। আনমনে বিড়বিড় করলো, সর্বনাশ!
ডিন মারটিন আর কার্ল বেইরির কথা লেখা রয়েছে। ডেভিল মাউনটেইনের পাশে একটা পাহাড়ের ঢালে বাসা বানিয়ে থাকে দুজনে। খনির শ্যাফট বন্ধ করে দেয়ার পরে সব শ্রমিকেরা চলে গেলেও ওরা রয়ে গেল। সোনা আর হীরা খোঁজার জন্যে।
ভুরু কোঁচকালো রবিন। তাড়াহুড়ো করে পড়েছে কিশোর, বইয়ের এখান পর্যন্ত আসেনি। তাহলে নিশ্চয় জানতো ডেভিল মাউনটেইনে হীরা আছে, একথা বিশ্বাস করে মারটিন।
ঘনায়মান অন্ধকারে উদ্বেগ বাড়লো রবিনের। ডিন মারটিন সেদিন মিথ্যে বলেছে তাদের সঙ্গে। বলেছে গুহার বাইরে দিয়ে যাওয়ার সময় ভেতরে আওয়াজ শুনে

দেখতে এসেছে। সেটা সম্ভব নয়। দূরত্ব অনেক বেশি ছিলো। আসলে গুহার ভেতরেই কোনো একটা সুড়ঙ্গে বা অন্য কোথাও ছিলো বুড়ো।
দ্রুত মনস্থির করে নিলো রবিন। ঢালের আড়ালে নেমে এসে পড়ে থাকা বাকি কাপড়গুলো দিয়ে আরেকটা ডামি বানালো। ওটা নিয়ে ক্রল করে এগোলো। অন্য দুটোর কাছে এনে বসিয়ে দিলো ওটাকে। আশা করলো, অন্ধকারে কিছু বুঝতে পারবে না যে চোখ রেখেছে ওগুলোরে ওপর। আবার খানিক দূর নেমে ঝোপের আড়ালে আড়ালে পাড়ে উঠলো আরেক জায়গা দিয়ে। পথের অনেক দূর দিয়ে ঘুরে রওনা হলো ব্যাঞ্চের দিকে। মিস্টার হারভেকে জানাতে হবে সব কথা... ভীষণ বিপদে পড়তে যাচ্ছে কিশোর আর মুসা।
আহত পা নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলেছে রবিন, যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব। সাইকেল বের করার ঝুঁকি নেয়নি, তাহলে চূড়ার ওপরের লোকটার চোখে পড়ে। যাওয়ার সম্ভাবনা। একশো গজও যেতে পারলো না, গাড়ির এঞ্জিনের শব্দ কানে এলো। কাঁচা রাস্তা ধরে গতি কমিয়ে এগিয়ে আসছে গাড়িটা, হেডলাইট নিভানো। একটা পাথরের আড়ালে লুকিয়ে পড়লো রবিন। তার কাছ থেকে পঞ্চাশ ফুট দূরে থামলো গাড়িটা।
একটা লোক নেমে প্রায় ছুটে চললো পর্বতের দিকে। পরনে কালো পোশাক। দেখতে দেখতে হারিয়ে গেল অন্ধকারে।
গুড়ি মেরে এগিয়ে গাড়ির পেছনে চলে এলো রবিন। দেখলো, নেভাডার নম্বর প্লেট লাগানো।

.

পর্বতের গভীরে গোঙানি লক্ষ্য করে এগিয়ে চলেছে মুসা আর কিশোর। প্রথম সুড়ঙ্গ পেরিয়ে আরেকটা গুহায় ঢুকলো। আবার মোমবাতি ব্যবহার করলো। এভাবে চলে তৃতীয় গুহাটায় এসে ঢুকলো। যে কটা গুহায় ঢুকেছে এ-পর্যন্ত, তার মধ্যে এটা ছোট। এটাতে তিনটা সুড়ঙ্গ পাওয়া গেল, যেগুলো দিয়ে জোরালো বাতাস বয়। আলাদা আলাদা না গিয়ে একসাথে থাকার সিদ্ধান্ত নিলো কিশোর।
প্রথম সুড়ঙ্গটা বেশ কিছু দূর এগিয়ে হঠাৎ তীক্ষ্ণ মোড় নিলো।
সাগরের দিকে গেছে, বললো মুসা। গন্ধ শুকছে বাতাসে।
তাহলে আর এগোনোর দরকার নেই। আমি শিওর, গোঙানিটা আসে উপত্যকার দিক থেকে। কম্পাস দেখলো। পুব, কিংবা উত্তর-পুবে যাওয়া উচিত।
এটা তো গেছে দক্ষিণ-পশ্চিমে।
ফিরে এসে দ্বিতীয় সুড়ঙ্গটায় ঢুকে এগোলো। কিছু দূর এগিয়েই দক্ষিণ পশ্চিমে মোড় নিলো এটাও। আবার ফিরে আসতে হলো ছোট গুহায়।
অধৈর্য হয়ে উঠেছে মুসা। কিশোর, এই গোলক-ধাঁধায় কি কেবল ঘুরেই মরবো?

মনে হয়, ঠিক পথেই এগোচ্ছি আমরা। যতই পুবে সরছি গোঙানি বাড়ছে।
অনিচ্ছা সত্ত্বেও তৃতীয় সুড়ঙ্গে ঢুকলো মুসা। বাতাস জোরালো, আওয়াজও বাড়ছে। সোজা পুবে এগিয়েছে পথটা। এক জায়গায় এসে থেমে গেল দুজনেই। বায়ের দেয়ালে মস্ত গোল ফোকর। এই সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে চলে গেছে আরেকটা সুড়ঙ্গ।
খাইছে! এই প্রথম একটা সাইড টানেল দেখলাম।
হ্যাঁ, আলো ফেলে দেখছে কিশোর। এটা মানুষের তৈরি। মাইন শ্যাফট। বন্ধ করা হয়নি। দেখো দেখো!
বাতাসে বাইরের দিকে কাত হয়ে যাচ্ছে তার হাতের মোমের শিখা। এর অর্থ কি? উত্তেজিত হয়ে উঠেছে কণ্ঠ। সাইড টানেলটা থেকে আরেকটা সুড়ঙ্গ বেরিয়েছে। নিশ্চয় খনিতে ঢোকার পুরনো কোনো পথ নতুন করে খোলা হয়েছে।
তাহলে শেরিফ কেন খুঁজে পেলেন না? কিংবা মিস্টার হারভে?
বলতে পারবো না, মুসা, মাথা নাড়লো কিশোর। কিন্তু... হঠাৎ বড় বড় হয়ে গেল চোখ।
শব্দটা মুসার কানেও আসছে। মাটি কোপানো হচ্ছে।
এসো, ফিসফিস করে বলে পাশের সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়লো কিশোর।
মুসাও অনুসরণ করতে যাবে, এই সময় পেছনে শুনতে পেলো পায়ের। আওয়াজ। কিশোর...? বলেই চুপ হয়ে গেল।
পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে হালকা-পাতলা একজন মানুষ। কালো জ্বলন্ত মে। কালো সমব্রেরো, কালো জ্যাকেট, কালো শার্ট, কালো প্যান্ট, কালো জুতো পোশাক পরা ঠিক এই তরুণটির ছবিই সেদিন দেখিয়েছিলেন প্রফেসর হারকসন।
হেনরি ফিগারো! বাঁ হাতে পিস্তল।

.

মুসার দিকে পিস্তল উদ্যত রেখে বাঁ হাতে বাতাসে থাবা মারলো যেন ফিগারো।
চুপ থাকতে বলছে আমাদেরকে, কাঁপা কণ্ঠে বললো কিশোর।
মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানালো লোকটা। ওর তরুণ চেহারায় কোনো ভাবান্তর। নেই। পিস্তল নেড়ে ইশারা করলো ওর সঙ্গে যাওয়ার জন্যে, খানিক আগে ওরা যেদিক থেকে এসেছে তার উল্টো দিকে।
উপায় নেই। আদেশ মানতে বাধ্য হলো দুই গোয়েন্দা। আরেকটা গুহায় এসে, ঢুকলো। ডানে যাওয়ার ইঙ্গিত করলো ফিগাররা।
হাঁটছে তো হাঁটছেই। এই সুড়ঙ্গ থেকে সেই সুড়ঙ্গে, তারপর আরেক সুড়ঙ্গে, মাঝে মাঝে গুহা। মনে হলো যুগ যুগ পেরিয়ে যাচ্ছে, অথচ হাতঘড়িতে দেখলো মুসা, মাত্র পাঁচ মিনিট পেরিয়েছে।

থামো! পেছন থেকে বললো ফিগারো। এই প্রথম মুখ খুললল সে। কেমন যেন, ভোঁতা, শূন্য কণ্ঠস্বর। আরেকটা গুহায় ঢুকেছে ওরা।
থামলো ছেলেরা। যতোগুলো গুহায় ঢুকেছে, তার মধ্যে সব চেয়ে ছোট এটা। বাতাস ভ্যাপসা।
ওদিকে! দেয়ালের খুব সরু একটা সুড়ঙ্গমুখ দেখিয়ে বললো লোকটা।
বিষণ্ন দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে তাকালো দুই গোয়েন্দা। কিছুই করার নেই। ঢুকলো সুড়ঙ্গে। পেছনে ফিগারো। দশ কদম এগিয়ে দেখলো সামনে পাথর পড়ে পথ রুদ্ধ। ফিরে তাকালো দুজনে।
পাথরে তৈরি যেন ফিগারোর মুখ, কোনো পরিবর্তন নেই। পিস্তল নেড়ে, বাঁয়ের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ানোর নির্দেশ দিলো ওদেরকে। তারপর ঝুঁকে ইস্পাতের একটা ডাণ্ডা তুলে নিয়ে চাড় দিয়ে বড় একটা পাথর ঠেলে সরালো। ডাকলো, এসো!
ফোকরের কাছে এসে ওপাশে উঁকি দিলো মুসা। অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়লো, না। টর্চ জ্বালতে যাবে, এই সময় পেছন থেকে প্রচণ্ড এক ধাক্কায় হুমড়ি খেয়ে এসে পড়লো ফোকরের ভেতরে, পাথুরে মেঝেতে। তার গায়ের ওপর এসে পড়লো আরেকটা দেহ। পেছনে পাথর লাগিয়ে আবার বন্ধ করে দেয়া হলো ফোকর। ঘন কালো অন্ধকারে হতভম্ব হয়ে গেল সে।
মুসা? পাশ থেকে ডাকলো কিশোর।
আছি। তবে না থাকলেই খুশি হতাম।
কবর দিয়ে গেল আমাদেরকে।
দিলো। এখন মরবো, আর কী!

.

মোনিং ভ্যালির ধার ঘেঁষে র‍্যাঞ্চের দিকে এগিয়ে চলেছে রবিন। পেছনে, যেন তাকে টিটকারি মারতেই গুঙিয়ে চলেছে গুহাটা।
কিশোরের ফন্দি কাজে লেগেছে, ভাবলো সে। এতোক্ষণে গুহায় ঢুকে গেছে। ওরা, অথচ আওয়াজ বন্ধ হয়নি। তবে খুশি হতে পারছে না রবিন। বইটা পড়ার পর থেকেই দুশ্চিন্তা হচ্ছে, সফল হতে পারবে না কিশোর। ওই গোঙানির সঙ্গে মারটিন আর বেইরির কোনো সম্পর্ক থাকলে বিপদে পড়বে কিশোর-মুসা।
তারপর রয়েছে সেই লোকটা, যার গাড়ির রেজিস্ট্রেশন নেভাডায়। কে সে? লোকটা চলে যাওয়ার পরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেছে রবিন, কিন্তু সে ফেরেনি। কিশোর আর মুসার বিপদের ভাবনা না থাকলে আরও অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারতো।
মোনিং ভ্যালিকে অনেক পেছনে ফেলে এসে তারপর পথে ওঠার ঝুঁকি নিলো রবিন। পথ ভালো হওয়ায় চলার গতিও বাড়াতে পারলো। যতোই আগে বাড়ছে,

পেছনে কমে আসছে গোঙানি। তারপর কানে এলো এঞ্জিনের শব্দ।
কাছেই একটা ঝোপ দেখে তাড়াতাড়ি গিয়ে ওটার ভেতরে লুকালো রবিন।
সামনে দিয়ে ছুটে চলে গেল গাড়িটা। চালকের মুখ দেখতে পেলো না, স্টিয়ারিং হুইলের ওপর নামিয়ে রেখেছে। তবে মাথার সমব্রেরো চিনতে পারলো। আর গাড়ির নম্বর প্লেট, নেভাডার।

ব্যাপার কি? এতো তাড়াহুড়ো কেন লোকটার? পাহাড়ের ভেতরে কি করে এসেছে? একটা অশুভ চিন্তা বার বার মাথা তুলতে চাইছে, জোর করে দাবিয়ে। রাখছে ওটাকে রবিন। ঝোপ থেকে বেরিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতেই দৌড় দিলো র‍্যাঞ্চের দিকে।
লোকটাকে দেখতে পেলো না। পাশ থেকে হঠাৎ করেই এসে দাঁড়িয়েছে পথে! তার গায়ের ওপর দিয়ে পড়লো রবিন। আঁউক করে উঠলো। কঠিন হাত কাধ চেপে ধরলো তার।
মুখ তুললো রবিন। সেই লোকটা! গালে কাটা দাগ। চোখের ওপর পট্টি।
.
অন্ধকারে বসে রয়েছে মুসা আর কিশোর। মাঝে মাঝে এখনও কানে আসছে। গোঙানি, দূর থেকে, মৃদু।
দেখছো কিছু? ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলো মুসা।
কিচ্ছু না। আমরা পাগল হয়ে যাচ্ছি..., পাগলের মতোই হা হা করে হেসে উঠলো কিশোর।
হাসির কি দেখলে?
হাসবো না? বদ্ধ জায়গায় বসে আছি, অথচ কেউ শুনে ফেলবে সেই ভয়ে ফিসফিস করে কথা বলছি। সঙ্গে টর্চ রয়েছে, জ্বালছি না। মাথা খারাপ হয়নি তো কি?
টর্চ জ্বেলে একে অন্যের দিকে চেয়ে হাসলো। কেমন বোকা বোকা, দেখালো দুজনের হাসিই। তারপর দেয়ালে আলো ফেললো মুসা।
বেরোবে কিভাবে? প্রশ্ন করলো সে।
ঠেলেঠুলে দেখবো প্রথমে পাথরটা সরানো যায় কিনা, সহজে হাল ছাড়ে না। কিশোর। ফিগারোকে দেখে তো মনে হলো না তার গায়ে তেমন জোর আছে। অথচ সহজেই সরালো।
ঠেলা দিয়ে দেখলো মুসা। নড়লো না পাথর। কিশোরও হাত লাগালো। গায়ের জোরে ঠেলা দিলো দুজনে। নড়লো না পাথরটা। হাঁপাতে হাঁপাতে সরে এলো ওরা।
বাইরে থেকে কিছু দিয়ে আটকে দিয়েছে, কিশোর বললো। ঠেলে লাভ হবে

তাহলে আর কি? দারুণ একখান কর্ম করে গেছে! ব্যাটা কি আসলেই হেনরি। ফিগারো? প্রফেসর হারকসনের তো ধারণা, ফিগারো বেঁচে আছে।
হয়তো আছে। তবে দেখে ওকে ফিগারোর মতো লাগলো না। ভুলে যাচ্ছো, ওর বয়স এখন প্রায় একশো হওয়ার কথা। অথচ যে আমাদেরকে আটকে গেল, সে একেবারে তরুণ, যেন সেই ঊনিশ শো আট সালের ফিগারো।
তাই তো!
তাছাড়া, লক্ষ্য করেছে, তার চেহারার কোনো রকম পরিবর্তন হয়নি? কথা বলার সময় মুখ নড়ে না, কাপে না, এরকম মানুষ দেখেছো কখনও?
দেখিনি। কিন্তু…
ব্যাটা মুখোশ পরে এসেছিলো। রবারের ওরকম মুখোশ কিনতে পাওয়া যায়, পরলে আসলের মতোই দেখায়। কথাও বলেছে সে খুব কম। হয়তো ভয়, গলা চিনে ফেলবো আমরা।
আমি চিনতে পারিনি। তুমি?
আমিও না। তবে একটা ব্যাপার শিওর, আমাদের ক্ষতি করার ইচ্ছে ছিল না। তাহলে এখানে আটকে রেখে যেতো না।
নেই মানে কি বলছো? জ্যান্ত কবর দিয়ে রেখে গেছে, এরচে বেশি আর কি করবে?
আরও অনেক কিছুই করতে পারতো। এখানে আমরা মরবো না। আগে হোক পরে হোক, আমাদেরকে খুঁজে বের করা হবেই। এবং এটা সে জানে। বাতাস আছে এখানে। দম বন্ধ হয়ে মরছি না। কোনো কারণে কিছুক্ষণের জন্যে আটকে দিয়েছে আমাদেরকে, যাতে কাজ সারতে পারে। কাজেই খুব তাড়াতাড়ি বেরোতে হবে আমাদেরকে।
পারবো? তার চেয়ে চুপ করে বসেই থাকি। কেউ এসে খুঁজে বের করুক।
রহস্যের সামাধান করতে চাইলে আজ রাতের মধ্যেই করতে হবে। বসে থাকলে অনেক দেরি হয়ে যাবে। যেদিক দিয়ে ঢুকেছি সেদিক দিয়ে বেরোতে পারবো না, অন্য দিক দিয়েই চেষ্টা করে দেখি। এসো।
সরু পথে কিশোরকে অনুসরণ করলো মুসা। চলেছে তো চলেছেই, সুড়ঙ্গ আর শেষ হয় না। অন্য কোনো সুড়ঙ্গও বেরোয়নি ওটা থেকে। ওদের মনে হলো মাইলের পর মাইল পেরিয়ে এসেছে। হঠাৎ, থমকে দাঁড়ালো ওরা। সামনেও পথ রুদ্ধ, পাথর পড়ে।
খাইছে! এবার? এবার কি করবো?
এরকম ভাবে আটকা পড়বো ভাবিনি, এই প্রথম সামান্য উদ্বিগ্ন মনে হলো গোয়েন্দপ্রাধানকে। ঝুঁকে পাথরগুলো ভালো করে দেখলো সে। উত্তেজিত হয়ে

উঠলো। মুসা, এই বড় পাথরটা সরানো হয়েছিলো!
ঝুঁকে মুসাও দেখলো। মেঝেতে ঘষার দাগ রয়েছে। একমত হলো কিশোরের সঙ্গে। দুজনে মিলে আবার পাথরটা সরানোর চেষ্টা করলো। পারলো না। গর্তের মুখে এমনভাবে বসানো, হাত দিয়ে চেপে ধরার উপায় নেই, জোর পাওয়া যায় না, ফলে টেনে বের করা যায় না।
এই সুড়ঙ্গ নিশ্চয় লোকটার চেনা, চারপাশে আলো ফেলে দেখছে কিশোর। ঢোকে, বেরোয়। নিশ্চয় কোনো ডাণ্ডা-টাপ্পা দিয়ে চাড় দিয়ে...ওই যে, ডাণ্ডাটা। ওই তো, দেয়ালের ধারে।
তুলে আনলো মুসা। ডাণ্ডার মাথাটা চ্যাপ্টা, অনেকটা শাবলের মতো। গর্তের মুখে বসানো পাথরের ফাঁকে সহজেই ঢুকে গেল চ্যাপ্টা মাথাটা। জোরে চাড় দিতেই খুলে এলো পাথর। বেরিয়ে পড়লো কালো ফোকর। হাঁটু গেড়ে বসে : ওপাশে আলো ফেললো কিশোর। আরেকটা গুহা মনে হচ্ছে।
হামাগুড়ি দিয়ে গুহাটায় ঢুকে পড়লো দুজনে। সামনের দিকে আলো ফেলেই স্থির হয়ে গেল।
গুহার মাঝখানে বিরাট এক খাড়ি!

.
টর্চের আলোয় চিকচিক করছে খুঁড়ির কালো পানি।
ঢোক গিললো মুসা। এখানেই তো বাস করেন বুড়ো মানুষটা!
তার কথা যেন কানেই ঢুকলো না কিশোরের। তাহলে পুকুর একটা সত্যিই। আছে। ইণ্ডিয়ানদের কথাই ঠিক।
চলো, ভাগি!
খাড়ি আছে বলেই যে বুড়ো মানুষটাও থাকবে, এমন কোনো কথা নেই।
একটা কথা যখন সত্যি হয়েছে, আরেকটাও হতে পারে। কে জানে, অনেক দিন ধরে হয়তো আটকা পড়ে আছেন জনাব বুড়ো মানুষটা। হয়তো সাংঘাতিক খিদে পেয়েছে তাঁর। ধরতে পারলে কোৎ করে গিলে ফেলবেন আমাদেরকে।
গুহার দেয়ালে আরেকবার আলো ফেলে দেখলো কিশোর। অনেকগুলো সুড়ঙ্গমুখ রয়েছে। দেখি, বেরোনোর পথ মেলে কিনা। মোম জ্বালো।
দুটো মুখ পরীক্ষা করা হলো। আরেকটা মুখ দেখতে এগোচ্ছে মুসা, কিশোরের ডাকে চমকে ফিরে তাকালো। প্রথমে কিছুই চোখে পড়লো না।
ওই যে দেখো..., ফিসফিস করে বললো কিশোর। ওই যে...
মুসাও দেখলো। খানিক আগে দ্বিতীয় যে সুড়ঙ্গটা পরীক্ষা করেছে, তার ভেতরে একটা খাজের মধ্যে বসে রয়েছে একটা ছোট্ট মানুষ। কালো পোশাক। কালো

সমব্রেরো। কালো বুট। হাতে পুরনো আমলের একটা পিস্তল। তাদের দিকে তাকিয়ে যেন হাসছে।
পিস্তল ধরে রাখা হাতটা জীবন্ত নয়, আঙুলের শাচটা হাড় শুধু, তাতে মাংস নেই। কঙ্কাল!
আল্লাহরে! বলে চেঁচিয়ে উঠলো মুসা। ঘুরে দিলো দৌড়। যে সুড়ঙ্গ দিয়ে গুহায় ঢুকেছে, আবার গিয়ে ঢুকলো ওটাতে।
কিশোরও ছুটলো তার পেছনে। ডাকলো, আরে থামো থামো, শোনো! কোথায় যাচ্ছো?
থামলো মুসা। মাথায় হাত দিয়ে ধপ করে বসে পড়লো মেঝেতে।
কিশোরও বসলো তার পাশে। বেশি আতঙ্কিত হলে মাথার ঠিক থাকে না, ঠিকমতো কাজ করতে পারে না ব্রেন। এ-ধরনের পরিবেশে এই পরিস্থিতিতে এরকম হওয়াটাই অবশ্য স্বাভাবিক। স্নায়ুকে উত্তেজিত করে নার্ভাস করে দেয় মানুষকে। অথচ, ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখো, ওটা অতি সাধারণ একটা কঙ্কাল..
দুর! অধৈর্য হয়ে হাত নাড়লো মুসা। তোমার লেকচার থামাবে দয়া করে?
ওই কঙ্কালটা পরীক্ষা করে দেখা দরকার।
পারলে করোগে তুমি। আমি যাচ্ছি না। বললো বটে মুসা, কিন্তু কিশোর রওনা হতেই উঠে সুড়সুড় করে চললো তার পেছনে, যেন দেহের সঙ্গে ছায়া।
দ্বিতীয় সুড়ঙ্গে ঢুকলো দুজনে।
সমব্রেরোটায় আঙুল ছোঁয়ালো কিশোর, ঝুরঝুর করে ভেঙে পড়লো ওটা।
খাইছে! সাহস বাড়লো মুসার। কালো জ্যাকেটটা ধরতে গেল। পোড়া কাগজের ছাইয়ের মতো কাপড়ের ওই অংশটা ঝরে পড়ে গেল কঙ্কালের শরীর থেকে। পিস্তল ধরা আঙুলগুলোতে হাত বোলাতে গেল সে। খসে পড়লো হাড়, খটাং করে পাথুরে মেঝেতে পড়লো পিস্তলটা। দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়ে অস্বাভাবিক শব্দ হলো। চমকে, লাফিয়ে সরে এলো মুসা।
ঝুঁকে দেখছে কিশোর। অনেক পুরনো কঙ্কাল..ওই পিস্তলটাও...মুসা, আর কোনো সন্দেহ নেই।
কিসের সন্দেহ?
কঙ্কালটা হেনরি ফিগারোর। আসলে ফিগারো, তার কথা বিচিত্র প্রতিধ্বনি তুললো গুহার উঁচু ছাতে বাড়ি খেয়ে। যেন বহু দূর থেকে আসা কোনো ভূতুড়ে কণ্ঠস্বর।
আসল ফিগারো? তারমানে এতোগুলো বছর এখানেই ছিলো সে, অথচ কেউ দেখেনি?

তাই তো মনে হয়। যে রাতে এই গুহায় ঢুকেছিলো, হয়তো সে-রাতেই মারা গিয়েছিলো হতভাগ্য মানুষটা, বিষণ্ন শোনালো কিশোরের কণ্ঠ। কেউ ভাবতেই পারেনি তার আঘাতটা ছিলো মারাত্মক। তবে, সেকালে এমন সব আঘাত, এমন সব রোগে মানুষ মারা যেতো, যেগুলোকে আজকাল কেয়ারই করি না আমরা। মেডিক্যাল সাইন্সের অসাধারণ উ...

সে-রাতেই মারা গেছে কি করে বুঝলে? বাধা দিয়ে বললো মুসা। এমনও হতে পারে, অনেক দিন বেঁচে ছিলো ফিগারো। এখানেই বাস করেছে। তারপর একদিন মারা গেছে।

মাথা নাড়লো কিশোর। না, আমার তা মনে হয় না। দেখো, কঙ্কালটার ধারেকাছে কোনো খারারের চিহ্ন নেই। পানিও খেতে পারেনি বেচারা। গিয়ে টেস্ট করে দেখতে পারো, পুকুরের পানি নোনা।

অন্য কোথাও বসে খেয়েছে হয়তো।

হয়তো। কিন্তু তাহলে কি কারণে মারা গেল? কেউ হামলা চালিয়ে মেরে রেখে গেলে তারও চিহ্ন থাকতো। ধস্তাধস্তি কিংবা অন্য কিছু...অন্তত আরও দুয়েকটা কঙ্কাল পড়ে থাকতো।

হ্যাঁ, তোমার কথায় যুক্তি আছে।

আরেকটা ব্যাপার, কঙ্কালটার অবস্থান দেখো। মৃত্যুর আগে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসেছিলো। হাতে পিস্তল, তারমানে আশঙ্কা করছিলো আক্রমণ আসতে পারে। শত্রুকে পাল্টা আঘাত হানার জন্যে তৈরি হয়েছিলো। দেখি, পিস্তলটা তোলো তো।

তুলে দেখলো মুসা। ভরা ম্যাগাজিন। একটা গুলিও খরচ হয়নি।

তারমানে শত্রু আসেনি। কেউ তাকে খুঁজে পায়নি। আর ওই আঘাতের কারণেই মারা গেছে বেচারা। একটা ব্যাপার পরিষ্কার হলো, শেরিফ আর তার লোকদের চেয়ে এসব গুহাসুড়ঙ্গ অনেক বেশি চিনতো ফিগারো।

না চিনলেই বোধহয় ভালো হতো। ধরা পড়তো, তার জখমের চিকিৎসা। হতো।

কি হতো তাতে? চিকিৎসা করে ভালো করে নিয়ে গিয়েফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিতো। তার চেয়ে এই তো ভালো হলো। কিংবদন্তী হয়ে গেল হেনরি ফিগারো, তার অনুসারীদের কাছে হিরো হয়ে গেল।

তা হলো...

আর ওই কিংবদন্তী এখন কাজে লাগাচ্ছে কেউ একজন। ভয় দেখায়। যাতে গুহার কাছে কেউ না আসে। প্রশ্ন হলো, কেন?

হয়তো র‍্যাঞ্চ থেকে ভাগাতে চায় মিস্টার হারভেকে।

মনে হয় না। অন্য কোনো কারণ আছে। ভেবে দেখো, মিস্টার হারভেকে তাড়াতে চাইলে তিনি আসার পর পরই ভয় দেখাতো। অথচ গোঙানিটা শুরু হয়েছে মাত্র এক মাস আগে, তিনি আসার অনেক পরে।

ঠিক বলেছো। আরেকটা ব্যাপার, কিশোর, উত্তেজিত হয়ে উঠলো মুসা। আজকের আগে আর কেউ কেন হেনরি ফিগারোকে দেখলো না? মানে জ্যান্ত ফিগারোকে, আমরা যাকে দেখেছি? শেরিফ আর মিস্টার হারভে যখন ঢুকলেন, তখন দেখা দিলো না কেন?

জানি না। তবে আজই প্রথম লোক ঢোকার পরে থামলো না গোঙানি। আজ রাতে ফাঁকি দিয়ে ঢুকে পড়েছি আমরা, গোঙানি থামেনি, ফিগারোও দেখা দিয়েছে। অবশ্যই নকল ফিগারো। তারমানে এই দাঁড়াচ্ছে, তাকে দেখতে পেয়েছিই গোঙানি থামেনি বলে।

মানে?

বলতে পারবো না, মুসা। তবে শিওর হলাম, শুধু প্রাকৃতিকূ কারণে গোঙায় না গুহাটা, আরও কোনো ব্যাপার আছে। কিছুক্ষণ আগে খোঁড়ার শব্দ শুনেছিলাম ৩ না? কে কি খুঁড়ছিলো দেখা দরকার।

তাই তো! ভুলেই গিয়েছিলাম। তোমার কি মনে হয়? সত্যি সত্যি হীরার খনি আছে এখানে?

খুঁড়ছে যখন, কোনো একটা ব্যাপার নিশ্চয় আছে, ঘুরিয়ে জবাব দিলো কিশোর। চলো, মিস্টার হারভেকে গিয়ে জানাই।

ভ্রূকুটি করলো কিশোর। রহস্যের সমাধান নিজে করতে না পেরে অন্য কারও সাহায্য চাওয়ার পক্ষপাতি নয় গোয়েন্দাপ্রধান। তবু কিছু কিছু বিশেষ সময়ে যখন তিন গোয়েন্দার জন্যে বিপজ্জনক হয়ে ওঠে কাজ করা, সাহায্য নিতেই হয়।

কথাটা, বলেছো ঠিকই। বেশ, চলো পিস্তলটা হাতে রাখো। দেখি, বেরোনোর পথ পাই কিনা?

আবার মোম জ্বেলে সুড়ঙ্গমুখ পরীক্ষা করতে লাগলো ওরা।

হঠাৎ পানিতে মৃদু আলোড়ন হলো, ঢেউ উঠলো। ভেসে উঠছে কি যেন!

পাঁই করে ঘুরে আলো ফেললো কিশোর। ধক করে উঠলো-বুক। কালো চকচকে একটা দেহ ভেসে উঠেছে।

হাঁ হয়ে গেল দুই গোয়েন্দা।

চকচকে কালো জীবটা উঠে আসছে খাড়ির পাড়ে। পানি ঝড়ছে পিচ্ছিল চামড়া থেকে।

.

তোমরা এখানে কি করছো? জিজ্ঞেস করলো জীবটা।

মানুষ! পরনে কালো রবারের ওয়েট-স্যুট, পায়ে সুইম ফিন, পিঠে বাঁধা ডাবল এয়ার ট্যাংক।
ফোঁস করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো মুসা।
বদলে গেল কিশোরের চেহারা। গম্ভীর কণ্ঠে অনেকটা বড়দের মতো করে পাল্টা প্রশ্ন করলো, আপনি এখানে কি করছেন, স্যার?...আমরা অনুমতি নিয়েই এসেছি, র‍্যাঞ্চের মালিকের কাছ থেকে। আপনি এসেছেন পানির তলা দিয়ে, কোনো গোপন পথে। অনধিকার প্রবেশ করেছেন।
মুখোশ খুললো লোকটা। সুন্দর চেহারা। সোনালি চুল। হাসলো কিশোরের দিকে তাকিয়ে। তারপর পিঠের এয়ার-ট্যাংক খুলে নামিয়ে রাখলো মাটিতে।
খোকা, এমনভাবে কথা বলছো যেন নেভির অ্যাডমিরাল। অনুমতি নিয়ে এসেছে কিনা সেকথা জিজ্ঞেস করিনি। আমি অবাক হচ্ছি, এই রাত দুপুরে হেনরি ফিগারোর গুহায় কি-জন্যে ঢুকেছো?
অ্যাডমিরাল? লোকটার কথার জবাব দিলো না কিশোর। নিশ্চয়ই! আপনি ফ্রগম্যান, না? নেভির লোক। চ্যানেল আইল্যাণ্ডস-এ নোঙর করেছে আপনাদের নৌ-বহর।
হ্যাঁ। একটা গোপন মিশনে এসেছি আমরা এখানে। আশা করি আমার সঙ্গে। দেখা হয়ে যাওয়ার কথাটা গোপনই রাখবে। অস্বাভাবিক কিছু দেখেছো এদিককার পানিতে?
না, জবাব দিলো মুসা।
না বলতে গিয়েও থেমে গেল কিশোর। মনে পড়ে গেল পানিতে দেখা সেই অদ্ভুত জীবটার কথা। দেখেছি, স্যার। তিমিও না, হাঙরও না..
হ্যাঁ হ্যাঁ, মুসারও মনে পড়লো। আকারটা অনেকটা সিগারের মতো। সাগরের দিকে চলে গেল।
সাবমেরিন, মুসা! চেঁচিয়ে উঠলো কিশোর। এখন বুঝতে পারছি। ওটা একটা মিজেট সাবমেরিন, বামন ডুবোজাহাজ। সে-জুন্যেই শক্ত হয়ে ছিলো, চলার সময় শরীর বাকেনি। কিন্তু এঞ্জিনের শব্দ শুনলাম না কেন? পানির নিচে তো শব্দ অনেক দূর পর্যন্ত ছড়ায়।
কালো হয়ে গেল ফ্রগম্যানের মুখ। ব্যাপারটা খুব সিরিয়াস, বুঝেছো? টপ সিক্রেট, ওই যে এঞ্জিনের শব্দ হয় না। তোমাদেরকে বোধহয় আটকাতেই হচ্ছে।
আটকাবেন? প্রতিধ্বনি করলো যেন মুসা।
নীরবে চলে, আনমনে বিড়বিড় করলো কিশোর। তারমানে সোনার সিসটেম ধরতে পারে না ওটার অস্তিত্ব। মুসা, টপ সিক্রেট তো হবেই। ফ্রগম্যানের দিকে ফিরে বললো, আমাদের আটকানোর দরকার নেই, মিস্টার

ক্রুগার, নাম বললো লোকটা। কমাণ্ডার ক্রুগার। সরি, আটকাতেই হচ্ছে। অ্যাডমিরালকে জানাবো। ছেড়ে দিলে কোনো অসুবিধে হবে না বুঝলে, তিনি ছেড়ে দেবেন।
বোদ্ধা মানুষের মতো মাথা ঝোঁকালো কিশোর। যেন কমাণ্ডারের কথা মেনে নিলো। আমার নাম কিশোর পাশা। ও আমার বন্ধু মুসা আমান। ড্রাইভিং বেল্টে ঝোলানো একটা পানিরোধক পাত্রের মুখ খুলে তাতে হাত ঢুকিয়ে বের করে আনলো একটা খাম। তার ভেতর থেকে বের করলো একটা কার্ড আর একটা সার্টিফিকেট। বাড়িয়ে দিয়ে বললো, পড়ে দেখুন। বুঝতে পারবেন।
কার্ডটা তিন গোয়েন্দার। আর সার্টিফিকেটটা লস অ্যাঞ্জেলেসের পুলিশ চীফ ইয়ান ফ্লেচারের।
পড়লো ক্রুগার।
একটা জরুরী কেসে জড়িয়ে পড়েছি আমরা, জানালো কিশোর। এই গুহায় ঢুকেছি সে-জন্যেই। আমি শিওর, কমাণ্ডার সাহেব, আপনার অ্যাডমিরাল আমাদেরকে সাহায্য করার কথাই বলবেন আপনাকে।
দ্বিধা করছে ক্রুগার। ছেলেটাকে মিথ্যুক মনে হচ্ছে না। কথাবার্তায় ওজন আছে, আর অপূর্ব সুন্দর কালো চোখ দুটোর পেছনে নিশ্চয় কাজ করছে ক্ষুরধার একটা ব্রেন। সার্টিফিকেটটা আসলই মনে হচ্ছে।
এক কাজ করুন না, পরামর্শ দিলো কিশোর। আপনার জাহাজের সঙ্গে যোগাযোগ করে বলুন, চীফ ইয়ান ফ্লেচারকে একটা ফোন করতে। জিজ্ঞেস করতে বলুন তিন গোয়েন্দার কথা। আর কোনো সন্দেহ থাকবে না আপনার।
কিশোর, এখান থেকে উনি কি করে যোগাযোগ করবেন?
এটাও জানো না। জাহাজের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা থাকে ফ্রগম্যানদের! সঙ্গে লং রেঞ্জ রেডিও থাকে।
হাসলো কমাণ্ডার। সাংঘাতিক চালাক ছেলে তুমি। বেশ, বসো এখানে। আমি আসছি। বসে থাকো চুপ করে।
গুহার অন্ধকার কোণে চলে গেল ক্রুগার। কৌতূহলী চোখে সেদিকে তাকিয়ে রইলো ছেলেরা, তবে দেখতে পেলো না কমাণ্ডার কি করছে।
অবশেষে হাসিমুখে ফিরে এলো কমাণ্ডার। সিকিউরিটি খোঁজ নিয়েছে। তোমাদেরকে আটকাতে হবে না।
এতো তাড়াতাড়ি জেনে ফেললেন? মুসা অবাক।
দরকারের সময় এর চেয়ে তাড়াতাড়ি করতে হয় আমাদেরকে।
মিস্টার কমাণ্ডার, কিশোর বললো। আমাদের ব্যাপারে তো অনেক খোঁজ খবর নিলেন। এবার আমি আপনাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?

আমাকে? হেসে মাথা নাড়লো কমাণ্ডার। সরি, ইয়াংম্যান। জবাব দিতে পারবো না। টপ সিক্রেট…
আপনার কাজের কথা জিজ্ঞেস করবো না, স্যার। আমি এই গুহার ব্যাপারে কিছু তথ্য জানতে চাই। কাল রাতে আপনিই কি এসেছিলেন? যাকে দেখে। ফেলেছিলো আমার এই বন্ধুটি?
আমি না। আমার এক কলিগ গিয়ে রিপোর্ট করেছে, তাকে নাকি কে দেখে ফেলেছে।
যাক, বললো মুসা। একটা রহস্যের সমাধান হলো।
আরেকটা কথা, আঙুল তুললো কিশোর। আপনারা কি গুহার ভেতরে কিছু পরিবর্তন করেছেন? মানে, কোনো সুড়ঙ্গের মুখ খুলেছেন, কিংবা নতুন কোনো গুহা খুঁড়েছেন?
না।
এমন কিছু করেছেন, যাতে গোঙানো শুরু করেছে একটা গুহা?
মোটেই না। ওই গোঙানি শুনে আমরাও অবাক হয়েছি। এই এলাকায় নতুন এসেছি আমরা, আর এই গুহায়ও ঢুকেছি মাত্র কয়েকবার। ভেবেছি, সব সময়ই বুঝি ওরকম গোঙায় গুহাটা।
আর, নিশ্চয় আপনাদের ওপর আদেশ রয়েছে, অলক্ষ্যে কাজ করার? আই মীন, কেউ যেন আপনাদের দেখে না ফেলে?
নিশ্চয়ই। তবে তোমরা ছাড়া এখানে আর কেউ দেখেনি আমাদের।
আপনারা দেখেছেন আর কাউকে, এ গুহায়?
মাথা নাড়লো কমাণ্ডার। না। বললামই তো, কেউ যাতে না দেখে ফেলে সেভাবেই থাকি আমরা।
বুঝেছি, হতাশ মনে হলো কিশোরকে।
সেটা বুঝতে পারলো ক্রুগার। আর কোনো প্রশ্নের জবাব যাতে না দিতে হয় সে-জন্যে তাড়াতাড়ি বললো, তোমরা কি পথ হারিয়েছো? সাহায্য লাগবে?
হ্যাঁ, জবাব দিলো মুসা। বেরোনোর চেষ্টাই করছিলাম। এই সময় আপনি এলেন।
চলো, পথ দেখিয়ে দিই। মনে রাখবে, আমাদেরকে যে দেখেছো, সাবমেরিন দেখেছো, কথাটা কাউকে বলবে না। মুখ একেবারে বন্ধ। ও কে?
ও কে, বলুলো মুসা।
বলবো না, স্যার, বিশ্বাস করতে পারেন, কিশোর বললো।
এসো আমার সাথে।
একটা সুড়ঙ্গ ধরে আগে আগে চললো কমাণ্ডার। পেছনে দুই গোয়েন্দা। কয়েকটা গুহা, সুড়ঙ্গ, শাখাসুড়ঙ্গ পার হয়ে এসে ঢুকলো একটা বড় গুহায়। এটা সেই গুহা,

যেখানে আগের রাতে আরেকজন ফ্রগম্যানকে দেখেছিলো মুসা।
আশা করি এবার বেরোতে পারবে?
পারবো, স্যার। থ্যাংক ইউ, বললো কিশোর।
হাসলো ক্রুগার। গুড লাক। বলে একটা সুড়ঙ্গে ঢুকে হারিয়ে গেল।
বেরোনোর জন্যে পা বাড়ালো মুসা।
কিশোর নড়লো না। তার চোখের দিকে চেয়ে গুঙিয়ে উঠলো মুসা, না না, বলো না। আর পারবো না…
মুসা, এখন আমি আরও শিওর হয়েছি, রহস্যের সমাধান আজ রাতের মধ্যেই করতে হবে। নকল ফিগারো জানে, আমরা বেরিয়ে যেতে পারবোই। তার মানে সে তাড়াহুড়ো করবে। আসলে, আমাদেরকে কয়েক ঘন্টা আটকে রাখতে চেয়েছে, যাতে কাজ সেরে নিরাপদে পালিয়ে যেতে পারে।
আমি ওর পথের কাঁটা হতে চাই না।
এই আমাদের সুযোগ, মুসা, বোঝানোর চেষ্টা করলো কিশোর। লোকটা আমাদের আটকে রেখে ভাবছে, আর কোনো বাধা নেই। ফলে তেমন সাবধান হবে না। আমাদের জানতেই হবে কে কি খুঁড়ছিলো, আর কেন গোঙায় গুহাটা?
বেশ, জানবো। চলো, গিয়ে মিস্টার হরভেকে বলে লোকজন নিয়ে আসি।
গুহা থেকে বেরোলেই দেখে ফেলবে আমাদেরকে। হয়তো আর যেতেই দেবে না। তাছাড়া হাতে সময়ও নেই। যা করার জলদি করতে হবে।
কি করবো? কোনদিকে কোথায় ঢুকবো তাই তো জানি না।
পথ বের করে নেবো। আমরা এখন জানি ওই খোঁড়ার সঙ্গে গোঙানির সম্পর্ক আছে।
কিভাবে বুঝলে?
শেরিফ, মিস্টার হারভে, কিংবা খবরের কাগজে কোথাও কোনো রকম খোঁড়াখুঁড়ির উল্লেখ নেই। তারমানে যে খুঁড়ছে, ব্যাপারটা গোপন রেখেছে। কোনো একটা চালাকি করে। যখনই খুঁড়তে আসে, গোঙানিটা শুরু হয়। তারমানে দুটো ব্যাপারের মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে।
বেশ, তা নাহয় হলো। এখন আমরা কি করছি?
এখন তোমার অসাধারণ ক্ষমতাটা ব্যবহার করো। অন্ধকারেও যেভাবে পথ। খুঁজে পাও। ওটা ব্যবহার করে সাইড টানেলটা খুঁজে বের করো।
মাথা ঝোঁকালো মুসা। গভীর ভাবে ভাবলো কিছুক্ষণ। তারপর বললো, কিশোর, মনে হয় উত্তর-পশ্চিমে যেতে হবে আমাদের।
কম্পাস দেখলো কিশোর। বায়ে হাত তুলে বললো, ওদিকে।
চলো।

আবার নোম জ্বালানো হলো। মুসার অনুমান ঠিক। সুড়ঙ্গমুখে মোম ধরতেই কাত হয়ে গেল শিখা।
উত্তর-পশ্চিমে এগিয়ে চলেছে দুজনে। শোনা গেল আওয়াজটা।
গোঙানি! ফিসফিস করে বললো মুসা।
বন্ধ হয়নি।
কাছে এসে গেছি।
একটা সাইড টানেলের মুখ দেখা গেল। ওটার কাছে মোম ধরতেই প্রায় নিভে যাওয়ার উপক্রম হলো বাতি, গোঙানিও জোরালো। ঢুকে পড়লো ওরা ওটাতে। ছোট সুড়ঙ্গ। বেরিয়ে এলো একটা ছোট গুহায়।
কিশোর, কোথায় এসেছি জানি।
মোম নিভাও, ফিসফিস করে বললো কিশোর। টর্চ জ্বালবো।
টর্চের মুখে হাত চাপা দিলো দুজনেই, ফলে খুব সামান্য আলো বেরোলো, মৃদু এটা আভা ছড়িয়ে পড়লো মাত্র। ওই আলোতেই পথ দেখে দেখে সেই সুড়ঙ্গে ঢুকলো মুসা, যেটা থেকে তাদের ধরে নিয়ে গিয়েছিলো নকল ফিগারো।
জোরালো হচ্ছে গোঙানির আওয়াজ।
চলে এলো আরেকটা সাইড টানেলের মুখে, আরেকবার এসেছিলো ওখানে। শোনা গেল খোঁড়ার শব্দ।
আছে! ফিসফিসিয়ে বললো মুসা।
এসো!
নিঃশব্দে শাখা-সুড়ঙ্গ ধরে এগোলো দুজনে। লম্বা, সোজাসুজি এগিয়েছে পথ। কিছুদূর এগিয়ে আলো দেখতে পেলো। থামতে ইশারা করলো কিশোর।
সুড়ঙ্গের পাশের দেয়ালে একটা মাইন শ্যাফটের ভেতর দিয়ে আলো আসছে। মুখের কাছে স্তূপ হয়ে আছে মাটি আর পাথর। খোঁড়ার শব্দ আসছে ওই গর্তের ভেতর থেকেই।
খুব সাবধানে এগিয়ে ভেতরে উঁকি দিলো ছেলেরা। উজ্জ্বল আলো চোখ ধাধিয়ে দিলো তাদের। থেমে থেমে হয় গোঙানির শব্দ। থেমে গিয়েছিলো, হঠাৎ এসে যেন কানে ঝাপটা মারলো, এতো জোরে, মনে হলো কানের পর্দা ফেটে যাবে। প্রতিধ্বনি তুলতে তুলতে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল আবার।
কানে হাত চাপা দিয়ে রেখেছে মুসা।
ওর হাত ধরে টানলো কিশোর, দেখো!
চোখে সয়ে এসেছে আলো। দেখলো, ঝুঁকে রয়েছে একটা লোক। হাতে বেলচা।
ঢোক গিললো মুসা।

সোজা হলো মূর্তিটা। বেলচা ফেলে দিয়ে একটা গাঁইতি তুলে নিলো। স্পষ্ট দেখা গেল তার চেহারা। শাদা চুল, শাদা দাড়ি।
বুড়ো ডিন মারটিন!

.

চুপচাপ দাঁড়িয়ে বুড়োর কাজ দেখছে দুই গোয়েন্দা। কয়েক মিনিট পর পরই কানে আঙুল দিতে হচ্ছে, গোঙানির আওয়াজের জন্যে। কিন্তু শব্দটা যেন শুনতেই পাচ্ছে না বুড়ো। একমনে গাঁইতি চালিয়ে যাচ্ছে। গর্ত করছে একটা দেয়ালের গোড়ায়।
মনে হয় আরেকটা পাথর ধস? কিশোর বলুলো।
বড় ধস।
ধসটা নতুন।
কুপিয়ে চলেছে বুড়ো। তার শক্তি দেখে অবাক হতে হয়। এই বয়েসের একজন মানুষের এতো ক্ষমতা! কিছুক্ষণ কুপিয়ে গাইতি ফেলে আবার বেলচা তুলে নিলো সে।
কিশোর! ওর চোখ দেখলে?
দেখেছে কিশোরও। কেমন যেন বুনো দৃষ্টি। আগের রাতে বুড়ো মানুষটার কথা বলার সময়ও ওর চোখ ওরকম হয়ে গিয়েছিলো।
স্বর্ণ-জ্বর!
কি বললে? বুঝতে পারলো না মুসা।
গোল্ড ফিভার। কিংবা এক্ষেত্রে বলতে পারো ডায়মণ্ড ফিভার। বইয়ে পড়েছি, প্রসপেক্টররা ওরকমই হয়ে যায় মাঝে মাঝে, যখন মনে করে কাছেই রয়েছে মূল্যবান ধাতু কিংবা পাথর। ওই সময় কোনো বাধাকেই বাধা মনে করে না ওরা।
খাইছে!
বেলচা দিয়ে খোঁড়া পার্থর আর মাটি সরিয়ে কোপানোর জন্যে আবার গাইতি তুলে নিলো মারটিন। তারপর আবার বেলচা, আবার গাইতি। মাঝেসাঝে থেমে কি যেন দেখছে, হেসে উঠছে আপনমনে। কেমন যেন বন্য হাসি। বাইরে বেরিয়ে লোকের সামনে ওরকম করে হাসলে ধরে নিয়ে গিয়ে সোজা পাগলা গারদে ভরে দেবে।
বেলচা থামিয়ে বসে পড়লো আবার মারটিন। আলগা পাথর আর মাটিতে আঙুল চালালো। শক্ত হয়ে গেল শরীর। কি যেন একটা হাতে নিয়ে দেখলো। লণ্ঠনের আলোয়। চকচক করে উঠলো চোখ। মাটিতে ফেলে রাখা একটা চামড়ার। ব্যাগ তুলে নিয়ে তাতে ভরে ফেললো জিনিসটা।
হীরা? মুসা বললো।

মনে হয়।
ফিসফিসিয়ে কথা বলছে দুজনে। এতই ব্যস্ত বুড়ো, ওদের কথা কানেই। যাচ্ছে না।
হীরার খনি পেলো শেষতক?
পাথরের ধসটার দিকে চেয়ে রয়েছে কিশোর। ভাবছে। দেখে তো সে-রকমই লাগছে। কিন্তু... কি আর কোনো কিন্তু নেই। হীরার খনিই পেয়েছে। আইনতঃ ওগুলোর মালিক এখন মিস্টার হারভে। তাই চুরি করে টোকে বুড়ো। রাতে আসে, কাউকে জানাতে চায় না। ভয় দেখিয়ে দূরে রাখে সবাইকে।
হয়তো। এখন আমি জানতে চাই, গুহাটা গোঙায় কেন?
হা। এবং কেন বন্ধ হয়ে যায়।
মিস্টার হারভে আর শেরিফ নিশ্চয় এই শ্যাফট দেখেছেন। শুধু দেখেননি বুড়ো মারটিনকে মাটি খুঁড়তে।
কিছু বলার জন্যে মুখ খুলতে যাবে মুসা এই সময় গুহার ভেতরে ঘন্টা বাজতে শুরু করলো।
বিদ্যুৎ খেলে যেন মারটিনের শরীরে হাত থেকে বেলচা ফেলে লাফ দিয়ে, লণ্ঠনটার কাছে চলে এলো। বাতির পাশে ছোট একটা বাক্স। ঝুঁকে কি যেন করলো সে। বন্ধ হয়ে গেল ঘন্টাধ্বনি। তারপর লণ্ঠন আর চামড়ার ব্যাগটা তুলে নিয়ে ছুটে এলো শ্যাফট দিয়ে।
কুইক! পালাও! বলে উঠলো কিশোর।
শ্যাফটের গোড়ায় জমে থাকা মাটি আর পাথরের আড়ালে লুকিয়ে পড়লো ওরা। বাইরে বেরোলো মারটিন। সুড়ঙ্গমুখের কাছে লণ্ঠন আর, ব্যাগটা নামিয়ে, রাখলো।
আবার শুরু হলো গোঙানি।
তবে শেষ হতে পারলো না। মাঝপথেই বন্ধ হয়ে গেল। বিশাল একটা পাথর গড়িয়ে এনে শ্যাফটের মুখে ফেললো মারটিন। দেখে মনে হবে এখন, বহুদিন ধরে পাথরটা ওখানে ওভাবেই রয়েছে। ওটা সুড়ঙ্গমুখে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল; গোঙানি।
পাথর দিয়েই... ফিসফিস করলো মুসাণ
হ্যাঁ। গোঙায় বাতাসের কারণে। শ্যাফটের মুখে পাথর চাপা দিলেই বন্ধ হয়ে যায়। আর ঘন্টাটা সঙ্কেত। চূড়ায় বসে যে চোখ রাখছে সে বাজিয়েছে। মনে হয়। কেউ গুহায় ঢুকতে আসছে।
অস্থির ভাবে সুড়ঙ্গে পায়চারি শুরু করলো বুড়ো। বিড়বিড় করছে। ছেলেরা যেখানে লুকিয়ে রয়েছে, সেদিকে চোখ তুলে তাকালো না একবারও। হঠাৎ করেই

নিভিয়ে দিলো বাতিটা। মুহূর্তের জন্যে নীরব হয়ে গেল অন্ধকার সুড়ঙ্গ। তারপর। শুরু হলো বিড়বিড়ানি। আবার পায়চারি শুরু করেছে মারটিন।
অনেক প্রশ্ন ভিড় করছে মুসার মনে। নকল ফিগারো আসলে কে? এই রহস্যে কোথায় ফিট করছে সে? কিশোর কি তখন…
মুসা? কানের কাছে মুখ, ঠেকিয়ে বললো কিশোর। কে জানি আসছে!
ভাবনায় ডুবে না থাকলে কিশোরের আগেই শব্দটা কানে আসতো মুসার। শুনতে পেলো এখন। খানিক পরেই দেখলো নেচে নেচে এগিয়ে আসছে আলো।
কার্ল? মারটিন জিজ্ঞেস করলো।
হ্যাঁ, জবাব এলো আলোর পেছন থেকে। দুজন আসছে গুহায় ঢুকতে। চলো, ভাগি।
লণ্ঠন জ্বাললো মারটিন।
স্কুপের আড়ালে গুটিশুটি হয়ে বসে রইলো ছেলেরা। পারলে পাথরের সঙ্গে এক হয়ে যেতে চায়। মাত্র দশ ফুট দূরে দাঁড়িয়ে আছে লোক দুজন।
গুহায় ঢুকবে কি করে বুঝলে? মারটিন বললো।
ঢুকবে। দুদিন ধরে গুহাটার কাছে বড় বেশি ঘোরাঘুরি করছে লোকে।
আর দুচার দিন সময় পেলেই হতো। কাজ শেষ করে ফেলতে পারতাম। খুব। হুঁশিয়ার থাকতে হবে। তীরে এসে তরী ডোবাতে চাই না। চলো, বেরিয়ে যাই।
হ্যাঁ, চলো।
বোঝা গেল, কার্ল বেইরিই চূড়ায় বসে পাহারা দিচ্ছেলো। ঘন্টা বাজিয়ে সঙ্কেত দিয়ে কোনো গোপন পথে দ্রুত নেমে চলে এসেছে।
সূড়ঙ্গমুখ থেকে পাথর সরিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল দুজনে, ভেতর থেকে আবার টেনে জায়গামতো লাগিয়ে দিলো পাথরটা। এরপর শুধু স্তব্ধ নীরবতা, আর গাঢ় অন্ধকার।
গেল কোন দিক দিয়ে? মুসার প্রশ্ন।
নিশ্চয় গুহা থেকে কোনো পথ পর্বতের বাইরে বেরিয়েছে। থাকতেই হবে। নইলে বাতাস ঢুকে শব্দ করতে পারতো না। হয়তো পুরনো কোনো শ্যাফট, বন্ধ করে দেয়া হয়েছিলো, নতুন করে খোলা হয়েছে। ওই দুই প্রসপেক্টরের কাজ।
তাহলে মিস্টার হারভে আর শেরিফ জানেন না কেন? কেন বুঝতে পারলেন না?
তাঁরা যখন ঢোকেন, হয়তো বন্ধ থাকে। পর্বতের চূড়া থেকে নামারও কোনো গোপন পথ আছে, ভেতর দিয়ে। গোপন পথ আরও কতো আছে কে জানে! যাকগে। আমাদের যাওয়ার সময় হলো।
চলো।

টর্চের আলোয় পথ দেখে সেই বড় গুহাটায় ফিরে এলো দুজনে। আগের রাতে প্রথম যেটাতে ঢুকেছিলো।
সুড়ঙ্গ দিয়ে বেরিয়ে এলো বাইরে। পাশের ছায়া থেকে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে। পড়লো কে যেন। কঠিন থাবায় চেপে ধরলো মুসার হাত। ধরেছি! কর্কশ। কণ্ঠস্বর।
ঝট করে মুসার হাতের টর্চ উঠে গেল ওপর দিকে, লোকটার মুখে ফেলেই চমকে গেল। গালে কাটা দাগ, চোখে পড়ি। চেঁচিয়ে উঠলো, কিশোর, পালাও!
জ্বলে উঠলো আরেকটা টর্চ। আরেকজনের হাতে।
চুপ! একেবারে চুপ! কড়া গলায় আদেশ দিলো পট্টিওয়ালা। নড়লেই মরবে।
কিছু করার সাহস হবে না আপনার, মরিয়া হয়ে বললো কিশোর। ভালো চাইলে ছেড়ে দিন। আশপাশে আমাদের লোক আছে।
হেসে উঠলো পট্টি। ধাপ্পা দিতে চাইছো? ভালো। তা এসো না, বসে দুটো কথা বলি।
কিছু বলবে না, কিশোর! চেঁচিয়ে বললো মুসা।
দ্বিতীয়জন কথা বলে উঠলো। পরিচিত কণ্ঠ। অসুবিধে নেই। বলতে পারো। মিস্টার হারলিং একজন ডিটেকটিভ। চমকে দিয়ে একটু মজা করলেন তোমাদের সঙ্গে।
রবিন! দুই বন্ধুকে অবাক করে দিয়ে হাসিমুখে আলোর সামনে এসে দাঁড়ালো। বই পড়ার পরে কিভাবে সাহায্যের জন্যে ছুটেছে, জানালো সে। শেষে বললো, গাড়িটা চলে যেতেই ছুটলাম আবার। গিয়ে পড়লাম মিস্টার হারলিঙের হাতে।
ড্যাম হারলিং নাম জানালেন ডিটেকটিভ। একটা বীমা কোম্পানির হয়ে কাজ করছি। রবিন বললো তোমাদের কথা। সোজা চলে এলাম এখানে। সাহায্য আনার জন্যে র‍্যাঞ্চে গিয়ে আর সময় নষ্ট করতে চাইলাম না।
মিস্টার হারলিংও ভেবেছেন, তোমরা বিপদে পড়বে, রবিন বললো।
হ্যাঁ। যাদের পিছু নিয়েছে, ওরা ডেঞ্জারাস লোক।
তাহলে আপনি মিস্টার হারলিং, গোয়েন্দা, অবশেষে মুখ খুললো কিশোর। সংক্ষেপে জানালো গুহায় কি কি দেখেছে, কিছু কিছু কথা বাদ দিয়ে।
মাথা ঝাঁকালেন হারলিং। বললাম না, আমাদের দেখে ফেলেছে। দেখুক। বেশি দূর যেতে পারবে না। আর ওই ব্যাগের মধ্যে হীরাই রেখেছে, যেগুলোর পেছনে লেগেছি আমি।
কিসের হীরা?? মুসা জিজ্ঞেস করলো।
ওগুলো খুঁজে বের করতেই এসেছি আমি, বুঝিয়ে বললেন হারলিং। ধুরন্ধর। এক রত্নচোরের পেছনে লেগেছি আমি। অনেকগুলো হীরা চুরি করেছে সে। ওর

আসল নাম কেউ জানে না, বাড়ি কোথায়, তা-ও না। ছদ্মনাম স্যাড সাইপ্রেস। সারা ইউরোপের সব দেশের পুলিশ ওকে খুঁজছে। ওর পিছু নিয়ে এক হপ্তা আগে এসে পৌঁছেছি সানতা কারলায়। ওখানেই শুনলাম মোনিং ভ্যালির কথা। চট করে। মনে হলো, লুকিয়ে থাকার জন্যে এতো ভালো জায়গা আর হয় না। সাইপ্রেস হয়তো এখানেই লুকিয়েছে। দেখতে চলে এলাম।
ওর পিছু নিয়ে এসেছেন মানে? ওকে আসতে দেখেছেন?
দেখবো কি? ওর আসল চেহারা দেখতে কেমন তাই তো জানি না। পাঁচ বছর আগে ইউরোপ থেকে পালিয়েছে, পুলিশের তাড়া খেয়ে। ওখানকার পুলিশের ধারণা, আমেরিকায় চলে এসেছে সাইপ্রেস। নতুন কোনো ছদ্মবেশ নিয়েছে। ছদ্মবেশ ধরতে আর অভিনয় করায় ওস্তাদ সে। সেজন্যেই তাকে ধরা মুশকিল। বোঝাই যায় না কিছু।
নিচের ঠোঁটে বার দুই চিমটি কাটলো কিশোর। নিশ্চয় আপনার কোম্পানির বীমা করা কিছু হীরা চুরি করে পালিয়েছে?
হা। বছরখানেক আগে। ইউরোপ থেকে পালিয়ে আসার পর অনেক দিন চুপ করে ছিলো, তারপর ওই প্রথম চুরিটা করলো। চার বছর ওর খোঁজ না পেয়ে পুলিশ ভেবেছিলো চুরি করা ছেড়ে দিয়েছে সাইপ্রেস, কিংবা মারা গেছে। কিন্তু হীরা চুরির আলামত দেখেই ইন্টারপোল বলে দিলো, ওটা সাইপ্রেসের কাজ। ওরা শিওর, ও ছাড়া আর কেউ নয়।
দা মোডাস অপার‍্যানডি, মানে, অপারেশনের পদ্ধতি খুব গুরুত্বপূর্ণ। ব্যাপার, একমত হলো কিশোর। ওর বলার ধরন রহস্যময় মনে হলো মুসার কাছে। বড় বড় অপরাধীদের নিজস্ব কিছু পদ্ধতি আছে, আর সে-কারণেই ধরা পড়ে। পদ্ধতি কিছুতেই বদলাতে পারে না ওরা। বেশি অভিজ্ঞ যারা, তারা খুব সামান্য নড়চড় করতে পারে। পুরোটা পারে না।
ঠিকই বলেছো, বললেন হারলিং। চার বছর চুপ করে ছিলো। কারণ নতুন দেশে নতুন বেশে নিজেকে মানিয়ে নিচ্ছিলো। তারপর সুযোগ বুঝে করে বসলো হাত সাফাই।
নতুন কি ছদ্মবেশ নিয়েছে, আন্দাজ করতে পেরেছেন? জিজ্ঞেস করলো রবিন। র‍্যাঞ্চের কেউ নয় তো?
হতে পারে। আমি জানলাম কিভাবে জানো? দুটো হীরা বিক্রি করেছে সে। প্রথমটা করেছে নেভাডার রিলোতে, আর দ্বিতীয়টা এখানে।
নেভাডা!
আপনার গাড়িতে তো নেভাডার প্লেট লাগানো। আমাদেরকে ধাক্কা দিয়ে পাহাড়ের ওপর থেকে ফেলে দিতে চেয়েছিলেন, বললো মুসা।

না, আমি না। নেভাডার প্লেট লাগানো অন্য কেউ হবে। সানতা কারলা থেকে মোনিং ভ্যালিতে যাচ্ছিলাম, দেখি পথের ওপর সাইকেল পড়ে রয়েছে। সন্দেহ হলো। তাই নেমে এসে দেখছিলাম। তারপর দেখলাম, আরও লোকজন আসছে। ভাবলাম, ওরা তোমাদের তুলে নিতে পারবে। আমার পরিচয় তখন তোমাদের কাছে ফাঁস করতে চাইনি। তুলে আনলেই তো জিজ্ঞেস করতে, আমি কে? অনেক কষ্টে সাইপ্রেসের চিহ্ন খুঁজে পেয়েছি, সামান্য কারণে সেটা ভণ্ডুল করতে চাইনি। বুঝতেই পারছো, সাইপ্রেসের মতো একজন চালাক লোক নিশ্চয় টের পেয়ে গেছে তার পেছনে চর লেগেছে। হয়তো নেভাডাতে আমাকে দেখেও ফেলেছে সে। তাই আমিও ছদ্মবেশ নিলাম। চোখের ওপর কালো পট্টি লাগালাম, গালে কাটা দাগ বানালাম। তারপর এসেছি সানতা কারলায়। এতো কিছু করেও তাকে ধোকা দিতে পেরেছি কিনা কে জানে? বুঝে গিয়ে মনে মনে হয়তো হাসছে। সাইপ্রেস।
এ-জন্যেই লুকোচুরি খেলছেন? মানে, এরকম একটা...?
হ্যাঁ, রবিন কি বলতে চাইছে বুঝতে পারলেন হারলিং। সাইপ্রেসের নজর এড়িয়ে থাকতে চাইছি।
ওদের কথায় তেমন মন নেই, অন্ধকার গুহার দিকে তাকিয়ে নিচের ঠোঁটে চিমটি কেটে চলেছে গোয়েন্দাপ্রধান। হঠাৎ ঝিক করে উঠলো তার চোখের তারা, কেউ দেখতে পেলো না। ফিরলো। হীরাগুলো স্পেশাল কিছু, তাই না, মিস্টার হারলিং?
অবাক হলেন হারলিং। কি বোঝাতে চাইছে ছেলেটা? বললেন, আঁ! হ্যাঁ। কোনো জুয়েলারি কোম্পানি কিংবা দোকান থেকে চুরি হয়নি। হয়েছে স্যান ফ্রান্সিসকোর একটা মিউজিয়ম থেকে। আর ওগুলো...
রাফ ডায়মণ্ডস! বাক্যটা শেষ করে দিলো কিশোর।আকাটা হীরা। খনি। থেকে যে অবস্থায় তোলা হয়েছিলো সেভাবেই রেখে দিয়েছিলো। ঠিক? আর ওগুলো ছিলো ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডায়মণ্ড।
তুমি জানলে কিভাবে? সবগুলোই রাফ, তবে সব ইণ্ডাস্ট্রিয়াল নয়। মিউজিয়মে ডায়মণ্ড শো চলছিলো। দুনিয়ার অনেক দেশ থেকে হীরা. এনে রাখা হয়েছিলো মানুষকে দেখানোর জন্যে। কেন জানি না, বোধহয় রাফ ডায়মণ্ড বলেই, আর দেখতে সাধারণ পাথরের মতো বলেই বোধহয় বিশেষ গুরুত্ব দেয়নি কর্তৃপক্ষ। সাইপ্রেসের চুরি করতে কোনো অসুবিধেই হয়নি, কারণ, পাহারা তেমন। কড়াকড়ি ছিলো না। কিন্তু তুমি এতো কথা জানলে কি করে?
ওরকম একটা পাথর এখানকার গুহায় পেয়েছি আমি। বাকিগুলো খুঁজে বের করছে মারটিন আর বেইরি। সব বোধহয় পায়নি এখনও। ওদের ব্যাগ থেকেই হয়তো কোনোভাবে শ্যাফটের মুখে পড়ে গিয়েছিলো পাথরটা। ..
তাহলে সত্যি সত্যি গুহায় আছে পাথরগুলো!

আনমনে মাথা দোলালো কিশোর। আমার বিশ্বাস, চুরি করার পরই এনে এখানে পাথরগুলো লুকিয়েছে আপনার সাইপ্রেস। অপেক্ষা করেছে পরিস্থিতি ঠাণ্ডা হওয়ার জন্যে। তার প্ল্যানমতোই হতো সব, মাঝখান থেকে মারটিন আর বেইরি বাগড়া না দিলে। বহু বছর ধরে এখানে সোনা আর হীরা খুঁজছে ওরা, সাইপ্রেসের পাথরগুলো পেয়ে ভেবেছে বুঝি খনিই পাওয়া গেছে।

কিন্তু এই এলাকায় কোনো হীরার খনি নেই!

নেই। কিন্তু ওদের দুজনকে বোঝায় কে? তাদের বিশ্বাস, আছে। পাথরগুলো পেয়ে সেই বিশ্বাস আরও জোরালো হলো।

তা ঠিক। কিন্তু একই জায়গায় পাথর জড়ো হয়ে পড়ে থাকতে দেখে ওদের সন্দেহ হয়নি? খনিতে ওভাবে পাথর থাকে না।

পেলে, হতো। তবে মনে হয় না এক জায়গায় পেয়েছে। ভালো করেই জানেন, স্যান অ্যানড্রিয়াস ফল্টের ওপর রয়েছে এই জায়গা। ফলে ওপরের মাটি খালি সরে যায়, আর ভূমিকম্প হয়,। গত কয়েক বছরে বড় ভূমিকম্প অবশ্য হয়নি। এখানে, তবে ছোট ছোট প্রায়ই হয়। গুহার ভেতরে ঢুকলেই তার প্রমাণ মেলে। যেখানে সেখানে পাথরের ধস।

তাতে কি? জানতে চাইলো মুসা।

তাতে? আমার মনে হয়, মাসখানেক আগে ছোট একটা ভূমিকম্প পাথরগুলোর অবস্থান নড়িয়ে দিয়েছিলো। ঝাঁকুনিতে ছড়িয়ে গিয়েছিলো। ফলে এক জায়গায় পায়নি মারটিন। ভেবেছে, খনিই আবিষ্কার করে বসেছে।

খাইছে! ভূমিকম্পের ঝাঁকুনি ছড়ায়, তা কি সম্ভব?

সম্ভব, জবাব দিলেন হারলিং। হয় এরকম। আলগা মাটি সরে সরে যায় তো। আমি আরেকটা কথা ভাবছি এখন। হয়তো সাইপ্রেসকে খামোকা দোষ। দিচ্ছি। পাথরগুলো হয়তো ও চুরি করেনি, করেছে মারটিন আর বেইরি। এখানে এনে লুকিয়েছিলো, এখন তুলে নিচ্ছে।

কিন্তু, মিস্টার হারলিং, রবিন ধরলো কথাটা। ওরা দুজনে এখানে অনেক বছর ধরে আছে। সবাই চেনে। পাঁচ বছর নয়, আরও অনেক আগে এসেছে ওরা।

হাসলেন হারলিং। আগেই বলেছি, সব রকম ছদ্মবেশ ধরায় ওস্তাদ সাইপ্রেস। হতে পারে, ওদেরই একজন সে। দুই বুড়োর কোনো একজনকে সরিয়ে দিয়ে। নিজে সেই ছদ্মবেশ ধরে এখানে আরামসে লুকিয়ে রয়েছে পাঁচ বছর ধরে।

হ্যাঁ, এটা হতে পারে!

বোঝার উপায় এখন একটাই। গুহায় ঢুকে খুঁজে বের করতে হবে ওদেরকে। এক কাজ করো। একজন, র‍্যাঞ্চে চলে যাও। শেরিফকে গিয়ে নিয়ে এসো। ইতিমধ্যে আমরা গুহায় ঢুকে মারটিন আর বেইরিকে আটকানোর চেষ্টা করি।

মুসা, তুমি যাও, কিশোর বললো।
ক্ষুব্ধ হলো মুসা। এতো কষ্ট করলাম। এখন নাটকের শেষ দৃশ্যে এসে আমাকে তাড়াতে চাইছো?
-তুমিই যাও, মুসা, হারলিং বললেন। রবিনের পা ভালো না। তাড়াতাড়ি করতে পারবে না। আর কিশোরকে আমার দরকার। টীম ওয়ার্ক করছো তোমরা। যে যেটা ভালো পারবে সেটাই তো করা উচিত।
আর প্রতিবাদ করলো না মুসা। তবে খুশিও হতে পারলো না। নীরবে সরে গেল সেখান থেকে।

.
মারটিন যে গুহাটা খুঁড়ছিলো, ওটার শ্যাফটের মুখের কাছে এসে দাঁড়ালো রবিন, কিশোর আর হারলিং। পাথরটা সরিয়ে ভেতরে আগে ঢুকলেন ডিটেকটিভ।
ছোট গুহাটা শূন্য। ওপাশের দেয়ালে দেখা গেল সুড়ঙ্গমুখ, বোঝা গেল, ওটা দিয়েই পালিয়েছে মারটিন আর বেইরি। মানুষের তৈরি আরেকটা মাইন শ্যাফট, ঢালু হয়ে উঠে গেছে ওপর দিকে। পিস্তল বের করে নিয়ে আগে আগে চললেন হারলিং। পেছনে চক দিয়ে দেয়ালের গায়ে আশ্চর্যবোধক চিহ্ন আঁকতে আঁকতে চললো কিশোর।
মনে হচ্ছে উত্তরের শৈলশিরার দিকে চলেছি আমরা, রবিন বললো। বইয়ে লেখা আছে, ওদিকেই ছাউনি বানিয়ে থাকে মারটিন আর বেইরি।
হবে হয়তো, বললো কিশোর। ছাউনির মেঝে থেকেই হয়তো কোনো সুড়ঙ্গ খুঁড়ে নিয়েছে, কিংবা খোঁড়া ছিলো, সেটা দিয়েই ঢোকে খনিতে। ফলে তাদেরকে ঢুকতে-বেরোতে দেখে না কেউ।
থেমে গেলেন হারলিং। সামনে পথ বন্ধ। পাথরের স্তূপের গোড়ায় অসংখ্য পায়ের ছাপ। নিচু হয়ে বড় একটা পাথর ছুঁয়ে দেখলেন তিনি। জোরে ঠেলা দিতেই নড়ে উঠলো পাথরটা। সরাতেই বেরিয়ে পড়লো ফোকর। আর দুটো পাথর। সরাতে ঢোকার জায়গা হয়ে গেল।
হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে গেলেন ডিটেকটিভ। তাঁর পা দুটো অদৃশ্য হয়ে গেলে বসে পড়ে ওপাশে উঁকি দিলো দুই গোয়েন্দা। ওরাও ঢুকে পড়লো ভেতরে। বেরিয়ে এলো বাইরে। খোলা আকাশের নিচে। চারপাশে ঘন ঝোপঝাড়, গাছপালা। রবিনের অনুমান ঠিকই। ডেভিল মাউনটেইনের উত্তরের শৈলশিরাই এটা।
ঝোপের ভেতরে এই ছোট্ট মুখ কারো নজরে পড়বে না, হারলিং বললেন। এসো, যাই। আমার পেছনে থাকবে তোমরা।
এক পাশে সাগর, আরেক পাশে উপত্যকা। মাঝখানে এই শৈলশিরা। ওটার ওপর দিয়ে সাবধানে এগোলো তিনজনে। খানিক পরেই ছোট একটা কুঁড়ে চোখে

পড়লো, আলো আসছে ভেতর থেকে। পা টিপে টিপে জানালার কাছে এসে উঁকি দিলেন ডিটেকটিভ। রবিন আর কিশোরও মাথা তুললো।
পুরনো একটা টেবিলের দুপাশে বসে রয়েছে মারটিন আর বেইরি। টেবিলের ওপর পাথরের ছোট একটা স্তূপ।

.

পিস্তল হাতে ভেতরে ঢুকে পড়লেন হারলিং। খবরদার, নড়বে না কেউ!
প্রায় অর্ধেক উঠে পড়েছিলো বেইরি, ধীরে ধীরে বসে পড়লো আবার চেয়ারে। জ্বলন্ত চোখে তাকালো হারলিঙের দিকে।
ছেলেদের দিকে চেয়ে মারটিন বললো, কার্ল, তোমাকে আগেই বলেছিলাম, বিচ্ছুগুলোর ব্যাপারে সাবধান হওয়া দরকার, শোনোনি…
ভুলই করেছি, বিড়বিড় করলো বেইরি।
কি চাই? ডিটেকটিভের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলো মারটিন। পাথরগুলো? এগুলো আমাদের। খনিটা আমরা আবিষ্কার করেছি…।
কে করতে বলেছে তোমাদের? অন্যের জায়গায় রাতে চুরি করে যে মাটি খোড়ো, সেটাই তো একটা অন্যায়। তার ওপর পাথর রাখতে চাইছে। কতোখানি। বেআইনী কাজ করেছো, বুঝতে পারছো সেটা?
না, বুঝি না, গোয়ারের মতো বললো মারটিন। বুঝি না, বোঝার চেষ্টাও করি না। বিশ বছর ধরে ওই পাহাড়ের তলায় খুঁড়েছি আমরা, মাথার ঘাম পায়ে। ফেলেছি, তার কোনো দাম নেই?
থাকতো, যদি সত্যি সত্যি খনি পেতেন আপনারা, রবিন বললো। আর খনি। থেকে পাথর তুলে আনতেন। তাহলে মিস্টার হারভে নিশ্চয় একটা ভাগ দিতেন আপনাদেরকে।
খনি পাইনি তো কি পেয়েছি? পাথরগুলো এলো কোত্থেকে তাহলে?
খনি যে নয়, খুব ভালো করেই জানেন আপনারা, মিস্টার মারটিন, এই প্রথম কথা বললো কিশোর। এতোক্ষণ ঘরের জিনিসপত্র দেখেছে। একটা ছোট রেডিও, বুককেসে কয়েকটা বই, এক কোণে কয়েকটা পুরনো খবরের কাগজ।. একটা কাগজ এখন তার হাতে।
ঝট করে কিশোরের দিকে ফিরলো চারজোড়া চোখ।
কি বলছো তুমি, কিশোর? প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো রবিন। কি করে বুঝলে?
ওখানে গোটা চারেক বই আছে, বুককেসটা দেখিয়ে বললো কিশোর। নতুন কেনা হয়েছে, হীরার খনির ওপর লেখা। আর এই পত্রিকাটায়, হাতের কাগজটা নাড়লো, স্যান ফ্রানসিসকো মিউজিয়মে হীরা ডাকাতির কথা লেখা আছে। এক বছরের পুরনো এটা। খবরটায় দাগ দিয়ে রেখেছে পেন্সিল দিয়ে।

মারটিন আর বেইরির দিকে চেয়ে ভুরু নাচালেন হারলিং। কী, কিছু বলবে?
কি আর বলবো? দীর্ঘশ্বাস ফেললো মারটিন। ঠিকই বলেছে ছেলেটা। জানি, ওটা হীরার খনি নয়। এ-অঞ্চলে কোথাও নেই ওরকম খনি।
দুটো পাথর পেয়েছিলাম, বেইরি জানালো। ভাবলাম বুঝি খনিই পেয়েছি। হীরার খনি সম্পর্কে ভালোমতো জানার জন্যে বইগুলো কিনে এনেছে ডিন। বই। পড়ে বুঝলাম, পাথরগুলো আফ্রিকান। তখন লাইব্রেরিতে গিয়ে খুঁজে বের করলাম পত্রিকাটা; কোথায় কবে ডাকাতি হয়েছে জানলাম। বুঝে ফেললাম, ডাকাতি করে এনে পাথরগুলো এখানে রেখে যাওয়া হয়েছে।
বেইরি থামতেই মারটিন বললো, যেহেতু চুরির মাল, ভাবলাম, পেয়েছি যখন আমরাই রেখে দেবো। চোরটা বাদে আর কেউ জানছে না এ-খবর। দুটো পাওয়ার। পর আরও খুঁড়তে লাগলাম। তারপর আর কি? দেখতেই পাচ্ছো এখানে..।
তবে খুঁড়তে গিয়ে একটা গণ্ডগোল হয়ে গেল, মারটিনের কথার খেই ধরলো। বেইরি। একটা বন্ধ সুড়ঙ্গ খুলে দিলাম, আবার গোঙাতে শুরু করলো গুহাটা। ভেবেছিলাম, ভালোই হলো, ভয়ে কাছে আসবে না কেউ। নিরাপদে কাজ করতে পারবো। কিন্তু মিস্টার হারভে আর শেরিফ দেখতে এলেন। তদন্ত শুরু করলেন। বাধ্য হয়ে ঘন্টার ব্যবস্থা করলাম। ডিন যখন খুঁড়তো, পাহাড়ের চূড়ায় বসে আমি চোখ রাখতাম। কাউকে আসতে দেখলেই ঘন্টা বাজিয়ে সতর্ক করে দিতাম ডিনকে।
হাসলো মারটিন। ভালোই চলছিলো। এই ছেলেগুলোকেও ভয় দেখিয়ে একবার তাড়িয়েছি। কিন্তু আজ যে কিভাবে ঢুকে পড়লো...এই, কিভাবে ঢুকলে? কার্ল দেখলো না কেন?
জানালো কিশোর।
শুনে মুখ কালো করে ফেললো বেইরি। কিন্তু মারটিন হাসলো। চালাক ছেলে!
গম্ভীর হয়ে হারলিং বললেন, এতে হাসির কিছু নেই। চোরাই মাল চুরি করাও সমান অপরাধ।
চুরি করেছি কে বললো? খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে গেছি।
অ্যাক্সিডেন্টগুলো করালেন কেন? গরম হয়ে বললো রবিন। পাথর ফেলে আমাদেরকেও তো মেরে ফেলতে চেয়েছিলেন।
দেখো, প্রায় সবগুলোই অ্যাক্সিডেন্ট ছিলো ওগুলো, ইচ্ছে করে ঘটানো হয়নি, বললো বেইরি। ওরকম পাথর ধসে পড়ে এখানে যখন-তখন। তাছাড়া গোঙানি শুনে নার্ভাস হয়ে যায় লোকে, অসাবধান হয়ে নিজেরাই দুর্ঘটনা ঘটিয়ে বসে। তবে, তোমাদের ওপর যেটা পড়তে যাচ্ছিলো, সেটা আমার দোষ। পাথরটা

আলগা হয়ে ছিলো। তোমাদের ওপর চোখ রাখতে রাখতে এগোচ্ছিলাম। হোঁচট খেয়ে পড়লাম ওটার ওপর। ঠেলা লেগে গড়িয়ে পড়লো পাথরটা। বিশ্বাস করো, ইচ্ছে করে ফেলিনি।
কঠিন হলো হারলিঙের চোখ। গাধার মতো কাজ করেছে তোমরা! বলে, পাথরগুলো নিয়ে আবার চামড়ার ব্যাগে ভরতে শুরু করলেন। চেয়ে রয়েছে দুই বুড়ো। চোখের সামনে হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। এতোগুলো দামী পাথর, কিন্তু কিছুই বললো না। হারলিং বলছেন, আসল চোরটাকে ধরতে যেতে হবে এখন..
মিস্টার হারলিং, বাধা দিয়ে বললো কিশোর, চোরটার কথা ভেবেছি আমি.. সে জানে, মিস্টার মারটিন আর বেইরি খুঁড়ে বের করছে পাথরগুলো। ওগুলো নেয়ার জন্যে ফিরে আসবে…
পেছন থেকে কথা বলে উঠলো একটা চাপা, ভোতা কণ্ঠ, ঠিকই বলেছো তুমি। আমি এসেছি।
চমকে ফিরে তাকালো সবাই। দোড়গোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে নকল ফিগারো। মুখে মুখোশ। হাতে পুরনো আমলের পিস্তল।
নড়ো না কেউ, ঘরের সবাইকে সাবধান করলেন হারলিং। সাইপ্রেস ভয়ানক পাজী লোক। টেবিলে রাখা তাঁর পিস্তলটার দিকে আড়চোখে তাকালেন।
পিস্তল নাচালো নকল, ফিগাররা। না না, হারলিং, বোকামি করো না। পিস্তলের আশা ছাড়ো। যাও, দেয়ালের কাছে গিয়ে দাঁড়াও সবাই।
আদেশ পালিত হলো।
এই যে, তুমি, রবিনকে বললো নকল ফিগারো। ঘরের কোণে দড়ি আছে, দেখোএনে হারলিংকে বাঁধো শক্ত করে। জলদি!
রবিনকে দ্বিধা করতে দেখে হারলিং বললেন, যা বলছে করো।
দড়ি এনে হারলিঙের হাত-পা বাঁধলো রবিন। তাকে সরে যাওয়ার ইশারা করে নিজে এসে বাঁধন পরীক্ষা করে দেখলো সাইপ্রেস। সন্তুষ্ট হয়ে পিছিয়ে গেল দুই পা।
এখন দুজনে মিলে দুই বুড়োকে বাঁধো।
মারটিন আর বেইরিকে বাঁধলো দুই গোয়েন্দা। তারপর সাইপ্রেসের আদেশে কিশোরকে বাঁধলো রবিন। রবিনকে বাঁধলো, সাইপ্রেস নিজে। বাঁধা শেষ করে গিয়ে পাথরগুলো তুলে ব্যাগে ভরলো। খসখসে কণ্ঠে বললো, তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ। পাথরগুলো রেডি করে রেখেছো আমার জন্যে। ভূমিকম্পে ছড়িয়ে গিয়েছিলো। খুঁড়ে বের করা অনেক কষ্ট। কড়া নজর রেখেছিলাম অবশ্যই। এতো কষ্ট করে চুরি করে এনে হারাতে চায় কেউ? খিকখিক করে হাসলো চোরটা। তবে তোমরা তিন বিচ্ছু বড় জ্বালান জ্বালিয়েছে। স্কুবা ইকুইপমেন্টগুলো আনতে

দেখেই বুঝেছি, কি করতে যাচ্ছে। তার ওপর পিছে লেগে ছিলো হারলিং। ভয়ই। পেয়ে গিয়েছিলাম। পাথরগুলো না হারাই! চলি। গুড বাই। বেরিয়ে গেল সে।
গুঙিয়ে উঠলো কিশোর। আমি একটা গাধা! আমাদেরকে ধরে যখন সুড়ঙ্গে আটকালো, তখনই বোঝা উচিত ছিলো আমার, খুঁড়ে পাথর বের করার ব্যাপারটা সে জানে। আমাদের যেখান থেকে ধরে এনেছে, স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিলো খোঁড়ার শব্দ। হুঁশিয়ার হওয়া উচিত ছিলো আমার। কেন ভাবলাম না, ব্যাটা আমাদের ওপর চোখ রেখেছে?
দুঃখ করো না, সান্ত্বনা দিলেন হারলিং। চমৎকার ভাবে এই রহস্যের সমাধান করেছে। গাধা তো আসলে আমি। কেন বুঝলাম না, মারটিন আর বেইরিকে ব্যবহার করছে সাইপ্রেস?
হু, দীর্ঘশ্বাস ফেললো রবিন। কিশোরের অনুমানই ঠিক। চোরটা সত্যি। ফিরে এলো।
কিশোর সন্তুষ্ট হতে পারছে না। ভিলেনের চেহারাই যদি দেখা না গেল, রহস্যের এমন কিনারা করে লাভটা কি? পালিয়ে গেল। দেখতে কেমন। কোনোদিনই হয়তো জানবো না। মিস্টার হারলিংকেও আবার নতুন করে মরা। মাছের মতো হাঁ হয়ে গেল হঠাৎ তার মুখ।
কিশোর? ডাকলো রবিন।
কিশোর, হারলিং জিজ্ঞেস করলেন। কি হয়েছে?
চোখ মিটমিট করলো কিশোর। বহুদুর থেকে ফিরে এলো যেন। বাঁধন খুলতে হবে! ছাড়া পেতে হবে আমাদের! চেঁচিয়ে বললো সে। জলদি! নইলে ব্যাটাকে ধরতে পারবো না!
বিষণ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন হারলিং। বৃথা চেষ্টা, কিশোর। লাভ হবে না। ও এতোক্ষণে অনেক দূরে চলে গেছে।
মনে হয় না…
বাইরে ঘোড়ার খুরের শব্দ হলো। খানিক পরেই ঝটকা দিয়ে খুলে গেল। দরজা। বিশালদেহী একজন লোক ঘরে ঢুকলেন, দুই গোয়েন্দা আগে দেখেনি। তাঁকে। ভুরু কুঁচকে তাকালেন পাঁচ বন্দির দিকে। কি ব্যাপার? গমগম করে। উঠলো ভারি কণ্ঠস্বর।
স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো দুই গোয়েন্দা। দুটো পরিচিত চেহারা চোখে পড়লো। তাদের। মুসা, আর মিসেস হারভে।

.

বিশালদেহী মানুষটা সানতা কারলা কাউন্টির শেরিফ। মারাত্মক ঝুঁকি নিয়েছে বলে তিন গোয়েন্দার ওপর রেগে গেলেন। এমন একটা ভয়ানক চোরের পেছনে

লাগতে কে বলেছে তোমাদেরকে।
ওই গুহায় আটকে যদি মেরে ফেলতো! বললেন মিসেস হারভে। ভাগ্যিস, দেয়ালে চিহ্নগুলো দেখতে পেয়েছিলো মুসা। নইলে তো জানাই যেতো না তোমাদেরকে কোথায় বেঁধে রেখেছে।
চুপ করে রইলো রবিন।
সরি, স্যার, শেরিফের দিকে চেয়ে বললো কিশোর। আগে আপনাকে জানানোর সুযোগই পাইনি। তাছাড়া মিস্টার হারলিঙের দেখা পেয়ে গেলাম। তিনি অভিজ্ঞ গোয়েন্দা। এলাম সঙ্গে সঙ্গে। চোরটা যে ওভাবে আমাদেরকে চমকে দেবে, ভাবতেই পারিনি।
তা ঠিকই বলেছে ওশেরিফ, হারলিং বললেন। গুহায় যে ডেঞ্জারাস এক ক্রিমিন্যালও ঢুকতো, জানতো না, ওরা। ওরা ঢুকেছিলো নিছক কৌতূহলের বশে, কিসে গোঙায় জানার জন্যে। সেকথা মিস্টার হারভেও জানেন।
যুতসই কোনো জবাব খুঁজে না পেয়ে আরও রেগে গেলেন শেরিফ। হারলিঙের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে শুধু ঘোঁৎঘোৎ করলেন।
আপনি যা-ই বলুন, শেরিফ, আবার বললেন হারলিং। কাজ দেখিয়েছে বটে ছেলেগুলো। বড়রা যা পারেনি, ওরকম একটা রহস্যের সমাধান করে দিয়েছে।
হাসলেন মিসেস হারভে। বড় হলে অনেক বড় গোয়েন্দা হবে ওরা।
তা হবে, এই প্রথম শেরিফের মুখে হাসি ফুটলো। আমরা যা পারিনি...কিন্তু চোরটা যে পালালো! তাকে ধরি কিভাবে?
আমার মনে হয় না পালিয়েছে, বোমা ফাটালো যেন কিশোর। একসঙ্গে তার দিকে ঘুরে গেল সবগুলো চোখ। চেষ্টা করলে এখনও ধরা যায়।
যায়?
অন্য সবাই কোথায়, স্যার? জিজ্ঞেস করলো কিশোর।
অন্য সবাই? র‍্যাঞ্চের লোকদের কথা বলছো তো? তোমাদের খুঁজতে বেরিয়েছে, জবাব দিলেন শেরিফ। কয়েকজনকে নিয়ে হারভে গেছে সৈকতে। আরও কয়েকজনকে নিয়ে কোহেন আর প্রফেসর গেছেন ডেভিল মাউনটেইনের ওপাশে।
ওদের সঙ্গে কোথায় আপনার দেখা হবে?
কেন? র‍্যাঞ্চে।
জলদি চলুন তাহলে।
ভ্রূকুটি করলেন শেরিফ। যা বলার বলে ফেলো না এখানেই।
মাথা নাড়লো কিশোর। একদম সময় নেই, স্যার। বলতে অনেক সময় লাগবে।.জলদি চলুন, চোরটাকে ধরতে চাইলে।

ওর কথা শুনুন, শেরিফ, হারলিং বললেন। ওর ওপর ভক্তি এসে গেছে। আমার। সত্যি ধরে ফেলবে চোরটাকে। চলুন চলুন।
বেশ, দরজার দিকে এগোলেন শেরিফ।
শেরিফের দুজন ডেপুটি পাহারায় রয়েছে পাহাড়ের গোড়ায়। তাদের দুটো ঘোড়ায় উঠলো রবিন আর মুসা। আর শেরিফের সঙ্গে কিশোর। রুক্ষ তরাই অঞ্চল, এবড়োখেবড়ো। কঁকুনির চোটে ঘোড়ার পিঠে বসে থাকাই দায়।
র‍্যাঞ্চের কাছে চলে এলো ওরা। কাউকে চোখে পড়লো না।
এবার বলো, শেরিফ বললেন। কাকে ধরতে হবে?
ঠোঁট কামড়ালো কিশোর। আসবে, স্যার, শিওর আসবে। এলেই ধরতে হবে। আমাদেরকে খোঁজার ভান করে না পেয়ে ফিরে আসবে। ওত পেতে থাকবো আমরা। এলেই ধরবো।
ঘোড়া থেকে নামলেন শেরিফ। কিশোরকে নামতে সাহায্য করলেন। এবার খুলে বলো সব।
স্যার, কিশোর বললো। কেবিনে কিছু বেফাঁস কথা বলে ফেলেছে চোরটা...
র‍্যাঞ্চ হাউসের পাশ থেকে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেরিয়ে এলেন প্রফেসর হারকসন। এই যে, শেরিফ, খুঁজে পেয়েছেন তাহলে। ভেরি গুড। তোমরা ছেলেরা খুব একচোট দেখিয়েছো। ভুগিয়ে ছেড়েছো। নার্ভাস ভঙ্গিতে হাসলেন তিনি। যা চোখ পাথর।দেখতে পাইনি, কি করে যেন লেগে, কেটে গেল। ফিরে এসে ব্যাণ্ডেজ না বেঁধে আর পারলাম না।
সময় মতোই এসেছেন, প্রফেসর, শেরিফ বললেন। কিশোর পাশা এখন একটা গল্প শোনাবে আমাদের।
শান্ত কণ্ঠে কিশোর বললো, গল্প শোনানোর আর দরকার নেই, স্যার। প্রফেসরের দেহ তল্লাশি করলেই হীরাগুলো পেয়ে যাবেন। আবার হাতছাড়া করেছে বলে মনে হয় না। ওকে যে সন্দেহ করেছি, কল্পনাও করেনি নিশ্চয়। তাই এক না, মিস্টার স্যাড সাইপ্রেস?
সাইপ্রেস! শেরিফ অবাক।
ছদ্মনাম। ওর ব্যাণ্ডেজ খুলে দেখুন, হীরাগুলো পেয়ে যাবেন।
ঘুরে দৌড় দিলো প্রফেসর হারকসন, ওরফে স্যাড সাইপ্রেস। কিন্তু পালাবে কোথায়? শেরিফ আর তার দুই সহকারীর কাছে পিস্তল রয়েছে। সহজেই ধরে ফেলা হলো চোরটাকে।

.

ব্যাণ্ডেজের ভেতরই পাওয়া গেল তাহলে, বললেন বিখ্যাত চিত্রপরিচালক মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফার।

হ্যাঁ, স্যার, কিশোর বললো। দৌড়ে গিয়ে গাড়িতে ওঠার চেষ্টা করেছিলো। সাইপ্রেস। নেভাডার লাইসেন্স প্লেট লাগানো ওটাতে। দুটো গাড়ি ছিলো তার। নেভাডার প্লেট লাগানোটা লুকিয়ে রাখতো মোনিং ভ্যালির একটা গিরিপথে, ওদিকে যেতে না কেউ। তাই কারও চোখে পড়েনি গাড়িটা। হেনরি ফিগারোর পোশাক আর মুখোশটা রাখতো গাড়ির মধ্যে।

হুঁ, বিশাল ডেস্কের ওপাশে বসে আস্তে মাথা দোলালেন পরিচালক। ভীষণ চালাক। ...যা-ই হোক, দুই বোকা বুড়োর কি খবর? মারটিন আর বেইরি?

হাসলো রবিন। ওরা বার বার কসম খেয়ে বলেছে, হীরাগুলো ফিরিয়ে দিতো। ওদের কথা বিশ্বাস করেননি শেরিফ। র‍্যাঞ্চের লোকদের ভয় দেখিয়েছে। বলে নালিশ করতে পারতেন মিস্টার হারভে। করেননি। তিনি মাফ করে দিয়েছেন দুই বুড়োকে। ফলে শেরিফও ছেড়ে দিয়েছেন তাদেরকে।

কিশোর, জানতে চাইলেন পরিচালক। কি করে বুঝলে, হেনরি ফিগারো, প্রফেসর হারকসন আর স্যাড সাইপ্রেস একই লোক?

সামনে ঝুঁকলো কিশোর। শুরু থেকেই প্রফেসরের ভাবভঙ্গি ভালো লাগেনি। আমার, খটকা লেগেছে। কয়েকবার ভেবেওছি, ও-ই হয়তো নকল হেনরি ফিগারো।

কিন্তু শিওর হলে কি করে, ও-ই স্যাড সাইপ্রেস?

কেবিনে বন্দি করার পর একটা কথা বলেছিলো, তাতেই...

দ্রুত আরেকবার রবিনের লেখা ফাইলের পাতা ওল্টালেন পরিচালক। তারপর মুখ তুললেন। কই, বিশেষ কিছু তো বলেনি সে?

কম বলেছে। তবে যা বলেছে, ধরা পড়ার জন্যে যথেষ্ট। আমাদের স্কুবা, ইকুইপমেন্টগুলো আনতে নাকি দেখেছে। কে দেখে থাকতে পারে? এমন কেউ, যে র‍্যাঞ্চে থাকে। তারপর রয়েছে তার কণ্ঠস্বর। অভিনয় করে অন্যরকম করার। চেষ্টা করেছে বটে; কিন্তু গলার স্বর, কথা বলার ধরন বদলালেই বা কতোটা: বদলাতে পারে একজন মানুষ? দুয়ে দুয়ে চার মিলিয়ে ফেলতে শুরু করলাম, থামলো কিশোর। গাল চুলকালো। সে আরও বললো, হারলিং পিছু লাগাতে ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলো। ওই কথা থেকে দুটো সূত্র পেলাম। এক, নকল ফিগারো জানে। হারলিং কে। দুই, হারলিং যে তার খুব কাছাকাছি এসে গেছে, সেটাও জানে।

নিশ্চয়ই! একমত হলেন পরিচালক। হারলিং তোমাদেরকে বলেছে, স্যাড সাইপ্রেস তাকে চেনে। অথচ হারলিংকে তোমরা ছাড়া র‍্যাঞ্চের আর কেউ দেখেনি। তোমরা র‍্যাঞ্চের লোকের কাছে তার চেহারার বর্ণনা দিয়েছে। শুনেই হুঁশিয়ার হয়ে গেছে সাইপ্রেস, তোমাদের কথা থেকেই বুঝে গেছে চোখে পট্টি লাগিয়ে হারলিংই ছদ্মবেশ নিয়েছে।

ঠিক তাই, স্যার।
কিন্তু, তোমাদের কথা তো র‍্যাঞ্চের আরও লোকে শুনেছে। তাদেরকে সন্দেহ। না করে শুধু প্রফেসরের ওপর নজর গেল কেন তোমার?
ওর পিস্তলটা, স্যার।
পিস্তল? বুঝতে পারছেন না পরিচালক। এমন কি বিশেষত্ব আছে ওটার…
ওটার কিছু নেই, স্যার, তাড়াতাড়ি বললো কিশোর। ওটাকে যেভাবে ধরা হয়েছে…মানে, আমি বলতে চাইছি, নকল ফিগারো বাঁ হাতে ধরেছিলো পিস্তলটা। হোলস্টার পরেছিলো বাঁ দিকে। অথচ কোনো বইতে উল্লেখ নেই যে আসল হেনরি ফিগারো বাইয়া ছিলো। তার ছবিতেও হোলস্টার ডান দিকে ঝোলানো দেখেছি। গুহায় তার কঙ্কাল পেয়েছি, তখনও ডান হাতে ধরা ছিলো পিস্তলটা…
এহহে! নিজের ওপরই বিরক্ত হলেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। এই সহজ কথাটা একবারও ভাবলাম না! বইতে উল্লেখ নেই, ছবিতে রয়েছে হেনরি ফিগারোর ডান পাশে হোলস্টার। শুধু প্রফেসর হারকসনের বক্তব্য, ফিগারো ছিলো বাইয়া। নিজের ফঁদে নিজেই পড়েছে।
হ্যাঁ, হাসলো কিশোর। স্যাড সাইপ্রেস কিন্তু আসলেই ইতিহাসের প্রফেসর, স্যার। ইউরোপ থেকে পালিয়ে এসে ক্যালিফোর্নিয়ায় লুকিয়েছে। ক্যালিফোর্নিয়ার। ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করেছে, তাই বিন্দুমাত্র সন্দেহ করতে পারেনি কেউ। হেনরি ফিগারোর ওপর একটা বইও লিখতে আরম্ভ করেছিলো, তাতে বলেছে, ফিগারো ছিলো বাঁইয়া। নিজেকে ফিগারো বলে চালিয়ে দেয়ার পরিকল্পনা ছিলো আগে থেকেই, তাই বাঁইয়ার ব্যাপারটা প্রতিষ্ঠিত করে ফেলতে চেয়েছিলো।
চেয়ারে হেলান দিলেন পরিচালক। খুব জটিল একটা রহস্যের সমাধান করেছে এবার। অথচ সূত্র বলতে প্রায় কিছুই ছিলো না তোমাদের হাতে। শুধু বাইয়ার ব্যাপারটা দিয়েই…নাহ, ইউ আর অ্যা জিনিয়াস, ইয়াং ম্যান!
মিস্টার ক্রিস্টোফারের মতো মানুষের প্রশংসা পাওয়া যা-তা কথা নয়। গর্বে ফুলে উঠলো গোয়েন্দাদের বুক। মুসার দিকে চেয়ে ইশারা করলো কিশোর।
বাক্সটা এতোক্ষণ কোলের ওপর রেখে দিয়েছিলো মুসা। তুলে টেবিলের ওপর দিয়ে ঠেলে দিলো। নিন, স্যার। আপনাকে প্রেজেন্ট করলাম।
কী?
খুলেই দেখুন।
বাক্সটা খুলে ভেতরের জিনিসটা বের করলেন পরিচালক। দীর্ঘ এক মুহূর্ত স্থির তাকিয়ে রইলেন ওটার দিকে। আনমনে বিড়বিড় করলেন, হেনরি ফিগারোর পিস্তল!

হ্যাঁ, স্যার। মিস্টার হারভে আমাদেরকে উপহার দিয়েছেন, আমরা দিলাম আপনাকে, রবিন বললো। আপনার ব্যক্তিগত জাদুঘরে রেখে দেবেন। আর মোনিং ভ্যালির ওপরে ছবি করলে, তাতেও ব্যবহার করতে পারবেন।
থ্যাংক ইউ, মাই বয়েজ! থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ!
পিস্তলটা উল্টেপাল্টে দেখে টেবিলে রেখে দিলেন পরিচালক। সরাসরি তাকালেন কিশোরের চোখের দিকে। মিটিমিটি হাসছেন। আচ্ছা, ওই বুড়ো মানুষটার ব্যাপারে কি মনে হয় তোমার? ওটাই কি হেনরি ফিগারোকে মেরেছিলো?
পলকে বদলে গেল কিশোরের চেহারা। দৃষ্টি চলে গেল যেন বহুদূরে। আপনি তো জানেন, স্যার, কিংবদন্তী শুধু শুধু তৈরি হয় না। পেছনে কোনো না কোনো কারণ থাকেই। হয়তো ওরকম কোনো কিছু একটা ছিলো গুহার ভেতরের খাড়িতে। হয়তো লক নেস মনস্টারের মতো কোনো দানব। ভাবছি, সময় করতে পারলে গিয়ে আরেকবার ঢুকবো গুহাটায়। দানব-রহস্যের সমাধান করার চেষ্টা করবো।
খাইছে! তাড়াতাড়ি দুই হাত নাড়লো মুসা। গেলে তুমি যাও। আমি বাবা ওর মধ্যে নেই।
হেসে উঠলো সবাই।

ভলিউম ০০৯ – কানা বেড়াল – তিন গোয়েন্দা – রকিব হাসান
প্রথম প্রকাশঃ এপ্রিল ১৯৯০

কাজে ব্যস্ত কিশোর পাশা আর মুসা আমান, এই সময় বড় বড় দুটো কাঠের গামলা নিয়ে তিন গোয়েন্দার ব্যক্তিগত ওয়ার্কশপে ঢুকলেন রাশেদ পাশা। ছেলেদের সামনে এনে মাটিতে রাখলেন ওগুলো। কোমরে হাত দিয়ে বললেন, কাজ নিয়ে এলাম। রঙ করতে হবে। লাল, নীল আর সাদা ডোরা।

ওই গামলায় রঙ? অবাক হলো মুসা।

এখন? হাতের স্ক্রু-ড্রাইভার নেড়ে বললো কিশোর।

তিন গোয়েন্দার জন্য একটা কি-জানি-যন্ত্র বানাচ্ছে কিশোর, ওয়ার্কবেঞ্চে রাখা ইলেকট্রনিক যন্ত্রগুলো দেখিয়ে বললো মুসা।

নতুন আবিষ্কার? আগ্রহী হলেন রাশেদ পাশা, ক্ষণিকের জন্যে ভুলে গেলেন গামলার কথা।

কি জানি? হাত নাড়লো মুসা। আমাকে কিছু বলে নাকি? আমি তো শুধু ওর ফাইফরমাশ খাটছি।

পরে করলে হয় না, চাচা? কিশোর জিজ্ঞেস করলো।

না, আজ রাতেই দরকার। ঠিক আছে, তোমরা না পারলে বোরিস আর রোভারকে গিয়ে বলি, মিটিমিটি হাসি রাশেদ পাশার চোখের তারায়। কিন্তু তাহলে গামলাগুলো ডেলিভারিও দেবে ওরাই।

সতর্ক হয়ে উঠলো কিশোর। মানে?

রাশেদচাচার সারা মুখে হাসি ছড়ালো। ধরো, ওই গামলাগুলোকে সিংহের আসন বানানো হলো। কেমন হবে?

হ্যাঁ, মাথা ঝাঁকালো মুসা, সিংহেরা শুধু এই তালেই আছে। কখন লাল-নীল চেয়ারে বসবে।

কিশোর হাসছে না। চোখ উজ্জ্বল। ঠিক বলেছো, চাচা, খুব ভালো হয়। উপুড় করে বসালে চমৎকার সীট হবে সিংহের…তবে অবশ্যই সার্কাসে!

খাইছে! সার্কাস! হাসি মুছে গেল মুসার মুখ থেকে। গামলা-ডেলিভারি দিতে গেলে সার্কাসের ভেতরটা ঘুরিয়ে দেখাবে আমাদেরকে?

ঠিক সার্কাস নয়, হাসিমুখে খবর জানালেন রাশেদ পাশা। কারনিভল। আমাদের দেশের মেলা আরকি। নানা রকমের খেলা, আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা আছে। কাল রাতে এসে আস্তানা গেড়েছে রকি বীচে। সিংহ বসার বেদীগুলো নাকি পুড়ে গেছে। মুশকিলে পড়েছে বেচারা লায়ন ট্রেনার। কিসে বসিয়ে সিংহের খেলা দেখায়? অনেক খুঁজেও ওরকম বেদী কোনোখানে পেলো না, শেষে আমাদের ফোন করলো, পুরনো বেদী-টেদী যদি থাকে। নেই, বলেছি। শেষে আমিই পরামর্শ

দিয়েছি, গামলা দিয়ে আসন বানানো সম্ভব, কথা থামিয়ে বিশাল গোঁফের কোণ ধরে টানলেন তিনি। ওগুলো পেলে খুব উপকার হবে ওদের। হয়তো ঘুরিয়ে দেখাতেও পারে।
কিশোর! প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো মুসা। তাহলে আর দেরি করছি কেন আমরা? রঙ আনো। আমি স্প্রে গান রেডি করছি।
আধ ঘন্টার মধ্যেই রঙ হয়ে গেল। শুকাতে সময় লাগবে। এই সুযোগে সাইকেল নিয়ে রবিনকে খবর দিতে চললো মুসা, রকি বীচ পাবলিক লাইব্রেরিতে, যেখানে পার্টটাইম চাকরি করে রবিন মিলফোর্ড। শুনে, রবিনও উত্তেজিত। সময় আর কাটে না, কখন অফিস ছুটি হবে। ছুটির পর আর এক মুহূর্ত দেরি করলো না। সাইকেল নিয়ে ছুটলো স্যালভিজ ইয়ার্ডে।
তাড়াতাড়ি মুখে কিছু গুঁজে রাতের খাওয়া শেষ করলো তিন গোয়েন্দা। সাড়ে সাতটা নাগাদ বেরিয়ে পড়লো। গামলা দুটো বেঁধেছে কিশোর আর মুসার সাইকেলের ক্যারিয়ারে।
দূর থেকেই চোখে পড়লো কারনিভলের আলো। একটা পরিত্যক্ত পার্কের পাশে অসংখ্য তাঁবু আর কাঠের ছোট ছোট খুপড়ি। সাময়িক তারের বেড়া, যাওয়ার সময় আবার তুলে নিয়ে চলে যাবে। জোরে জোরে বাজনা বাজছে মানুষকে আকৃষ্ট করার জন্যে। ঘুরছে শূন্য নাগরদোলা। একটা পথের মাথায় দাঁড়িয়ে আছে দুজন ভাঁড়।
লায়ন ট্রেনারের তাঁবু খুঁজে বের করতে অসুবিধে হলো না। লাল কাপড়ে সাদা অক্ষরে লিখে বিজ্ঞাপন টানানো হয়েছেঃ কিং–দুনিয়ার সবচেয়ে বুদ্ধিমান সিংহ। তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে লম্বা একজন লোক, পরনে গাঢ় নীল পোশাক, পায়ে চকচকে বুট; ওদের দেখে এগিয়ে এলো। গোঁফে তা দিয়ে বললো, এসে গেছো! দেখি? ভালো হয়েছে তো?
পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ড কখনও বাজে মাল সাপ্লাই দেয় না, কিশোর বললো।
বাহ, হেসে উঠলো লোকটা। একেবারে বারকারদের মতো কথা বলছে, ইয়াং ম্যান।
বারকার কি, স্যার? জিজ্ঞেস করলো মুসা।
আন্দাজ করো তো, মিটিমিটি হাসছে লোকটা।
বাজি রেখে বলতে পারি, আমাদের কিশোর জানে, ঘোষণা করলো রবিন।
তাকে নিরাশ করলো না গোয়েন্দাপ্রধান। বারকার হলো, যে সার্কাস কিং কারনিভলের বাইরে দাঁড়িয়ে দর্শকদের জানায়, ভেতরে কি মজার মজার ব্যাপার। হচ্ছে। এটা এক ধরনের বিজ্ঞাপন, পুরনো।

জানো তাহলে, লোকটা বললো। আরও নাম আছে ওদের। কেউ বলে স্পাইলার, কেউ পিচম্যান। যতোই বোঝাও বারকারদের, লাভ হবে না, বাড়িয়ে বলবেই। আসলে ওটাই ওদের কাজ। তবে খুব ভালো আর অভিজ্ঞ বারকারের। মিথ্যে বলার প্রয়োজন পড়ে না, সত্যি কথা বলেই দর্শক আকৃষ্ট করতে পারে। এই আমাদের বারকারের কথাই ধরো না, কিঙের কথা এক বর্ণ বাড়িয়ে বলবে না সে। অথচ যা বলবে তাতেই লোকে দেখার জন্যে পাগল হয়ে উঠবে। সিংহকে ট্র্যাপিজের খেল দেখাতে দেখেছো কখনও?
খাইছে! চোখ বড় বড় হয়ে গেল মুসার। সিংহ আবার ট্র্যাপিজে উঠতে পারে নাকি?
আমাদেরটা পারে। বিশ্বাস না হলে নিজের চোখেই দেখবে। আর ঘন্টাখানেকের মধ্যেই ফার্স্ট শো শুরু হবে। এসো, তোমরা আমার মেহমান। টিকেট লাগবে না।... ও, আমি মারকাস। মারকাস দ্য হারকিউলিস।
বাইরে চেঁচিয়ে চলেছে বারকার। ইতিমধ্যেই দর্শক জমেছে কয়েকজন।
নাগরদোলায় চড়লো তিন গোয়েন্দা। কয়েক চক্কর ঘুরে নেমে এলো। ব্রাস রিঙের কাছে এসে ছোঁয়ার চেষ্টা করলো। রবিন আর কিশোর ব্যর্থ হলো, মুসা। পারলো একবার। ভাড়ের ভাড়ামি দেখলো কিছুক্ষণ, তারপর চললো গেম বুদের। দিকে, যেখানে ডার্ট ছেঁড়া, রিং নিক্ষেপ আর রাইফেল শুটিঙের প্রতিযোগিতা হয়। ই আমার মনে হয় ফাঁকিবাজি আছে, খানিকক্ষণ দেখে বললো রবিন। দেখছো
কি সহজেই জায়গামতো লাগিয়ে দিচ্ছে।
না, মাথা নাড়লো কিশোর। মারতে মারতে ওস্তাদ হয়ে গেছে ওরা। হিসেব করে, মারে...
তার কথা শেষ হলো না। চিৎকার শোনা গেল, ফাঁকিবাজ! দাও, দাও ওটা! আমি পুরস্কার পেয়েছি!
চেঁচাচ্ছে লম্বা এক প্রৌঢ়, মাথায় ব্লাউচ হ্যাট। পুরু গোঁফ। চোখে কালো কাঁচের চশমা। অন্ধকার হয়ে আসছে, এ-সময় সাধারণত ওরকম চশমা পরে না। লোকে। শুটিং গ্যালারির দায়িত্বে এক সোনালি চুল কিশোর, তাকেই গালিগালাজ করছে লোকটা। ছেলেটার হাতে একটা স্টাফ করা জানোয়ার। হঠাৎ ওটা কেড়ে নিয়ে তিন গোয়েন্দার দিকে দৌড়ে এলো প্রৌঢ়।
চেঁচিয়ে উঠলো সোনালি চুল ছেলেটা, ধরো, ধরো ওকে! চোর, চোর!

.

ছেলেটার চিৎকারে পেছনে তাকাতে গিয়ে সোজা এসে কিশোরের গায়ের ওপর পড়লো লোকটা। তাল সামলাতে না পেরে তাকে নিয়ে পড়লো মাটিতে।
আঁউউ করে উঠলো কিশোর।

ছুটাছুটি শুরু করলো কয়েকজন দর্শক। দৌড়ে এলো প্রহরী।
এই, এই, থামো! কালো চশমাওয়ালাকে বললো এক প্রহরী।
উঠে দাঁড়িয়েছে লোকটা। জানোয়ারটা বগলের তলায় চেপে রেখে কিশোরকে ধরলো। আরেক হাতে বেরিয়ে এসেছে একটা লম্বা ছুরি। কর্কশ কণ্ঠে হুমকি দিলো, খবরদার, কাছে আসবে না! কিশোরকে টেনে নিয়ে চললো গেটের দিকে।
বোকা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে রবিন আর মুসা। চোরটাকে ধরার জন্যে এগোলো দুই প্রহরী। ওদেরকে দেখে ফেললো সে। ক্ষণিকের জন্যে অসতর্ক হলো, মুহূর্তটার সদ্ব্যবহার করলো কিশোর। ঝাড়া দিয়ে লোকটার হাত থেকে ছুটে দিলো দৌড়। গাল দিয়ে উঠে তাকে ধরার জন্যে হাত বাড়ালো সে, ধরতে পারলো না। কিশোরের কাঁধে বাড়ি লেগে হাত থেকে ছুটে গেল ছুরিটা। উড়ে গিয়ে পড়লো মাটিতে।
তোলার সময় নেই বুঝে সে-চেষ্টা করলো না চোরটা। বগলের জানোয়ার টাকে হাতে নিয়ে ঝেড়ে দৌড় দিলো গেটের দিকে।
প্রহরীরা পিছু নিলো। ছেলেরাও ছুটলো ওদের পেছনে। ঘুরে সাগরের ধার দিয়ে দৌড়াতে লাগলো লোকটা। উঁচু কাঠের বেড়ার এক ফাঁক দিয়ে ঢুকে গেল পরিত্যক্ত পার্কের ভেতরে।
পিস্তল বের করলো দুই প্রহরী। ইশারায় ছেলেদেরকে আসতে বারণ করে নিজেরা সাবধানে ঢুকলো পার্কের ভেতরে। আর ফেরার নাম নেই। অধৈর্য হয়ে উঠলো কিশোর। বললো, নিশ্চয় কিছু হয়েছে। চলো তো দেখি!
বেড়ার ধার ঘুরেই থেমে গেল আবার। প্রহরীরা দাঁড়িয়ে আছে। চোরটা নেই।
ঘাসে ঢাকা ছোট্ট একটুকরো খোলা জায়গা। ডানে উঁচু বেড়া, বাঁয়ে মহাসাগর। পানিতে গিয়ে নেমেছে বেড়ার একমাথা। বেড়ার ওই অংশ কাঠের বদলে চোখা শিকের তৈরি। ওরা যেদিক দিয়ে ঢুকেছে, একমাত্র সেদিকটাই খোলা।
গেল কোনখান দিয়ে! বিড়বিড় করলো এক প্রহরী।
সাঁতরে যায়নি তো? রবিন বললো।
না। তাহলে দেখে ফেলতাম।
কিন্তু এখানেই তো ঢুকতে দেখলাম, ভোঁতা গলায় কিশোর বললো।
চারপাশে দেখতে দেখতে আচমকা চেঁচিয়ে উঠলো মুসা। দেখো! এগিয়ে। গিয়ে কি একটা জিনিস কুড়িয়ে নিলো। সবাই দেখলো, সেই স্টাফ করা জানোয়ারটা, যেটা নিয়ে পালাচ্ছিলো চোর। তারমানে ব্যাটা এখানে এসেছিলো।
নিয়ে পালাতে অসুবিধে হচ্ছিলো বোধহয়, রবিন মন্তব্য করলো। ফেলে। গেছে।
কিন্তু পালালো কিভাবে?
নিশ্চয় বেড়ায় কোনো ফাঁকফোকর আছে, বললো আরেক প্রহরী।

কিংবা দরজা, বললো দ্বিতীয় প্রহরী।
বেড়ার নিচে সুড়ঙ্গও থাকতে পারে, মুসার অনুমান। বেড়ার একমাথা থেকে আরেকমাথা ভালোমতো খুঁজে দেখলো ওরা। মানুষ পালাতে পারে, এরকম কোনো গুপ্তপথই দেখলো না।
নাহ, কিচ্ছু নেই, আনমনে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটলো কিশোর।
ব্যাটার নিশ্চয় পাখা গজিয়েছে, এক প্রহরী বললো। উড়ে যাওয়া ছাড়া তো আর কোনো পথ দেখি না।
তাই তো, বললো দ্বিতীয় প্রহরী। বারো ফটু উঁচু বেড়া। ওড়া ছাড়া উপায় কী?
চিন্তিত ভঙ্গিতে বেড়ার ওপরের দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। সাঁতরে যায়নি বলছেন। বেড়ার নিচে সুড়ঙ্গ নেই। মানুষের পাখা গজানোও সম্ভব নয়। বেড়া পেরোনোর একটাই পথ, ডিঙিয়ে যাওয়া।
মাথা খারাপ! বললো প্রথম প্রহরী। ওই বেড়া ডিঙাবে কি করে?
কিশোর, মুসাও বললো। কিভাবে? বেয়ে ওঠা অসম্ভব।
আমিও তাই বলি, একমত হলো রবিন।
যাওয়ার আর যখন কোনো পথ নেই, অসম্ভবকেই কোনোভাবে সম্ভব করেছে, কিশোর বললো। এছাড়া বিশ্বাস যোগ্য আর কি ব্যাখ্যা আছে?
আর কোনো ব্যাখ্যা দিতে না পেরে এক প্রহরী বললো, চলে যখন গেছে, ওটা নিয়ে ভেবে আর লাভ নেই। আমাদের জিনিস তো ফেলে গেছে। চলো, যাই। জানোয়ারটার জন্যে মুসার দিকে হাত বাড়ালো সে।
বেড়ার দিকে তখন তাকিয়ে আছে কিশোর। প্রহরীর দিকে ফিলো। গ্যালারিতেই যাচ্ছি। আমরাই নিয়ে যাই।
তাহলে তো ভালোই হয়। আমাদের সময় বাঁচে। নিয়ে যাও। আমরা থানায় যাচ্ছি ডায়েরী করাতে।
প্রহরীরা চলে গেল।
গ্যালারির দিকে হাঁটতে হাঁটতে মুসা বললো, গ্যালারিতে কেন আবার? শুটিং। করে পুরস্কার নিতে?
চেষ্টা করতে দোষ কি? তবে সেজন্যে যাচ্ছি না। যাচ্ছি, সোনালি চুল ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করতে, জিনিসটা কেন ছিনিয়ে নিচ্ছিলো চোর, মুসার হাতের জানোয়াটার দিকে ইঙ্গিত করলো কিশোর।
এই প্রথম ওটাকে ভালো করে দেখার সুযোগ পেলো তিন গোয়েন্দা। স্টাফ করা একটা বেড়াল, লাল-কালো ডোরা। পা-গুলো বিচিত্র ভঙ্গিতে বাঁকানো, শরীরটাও। হা করা মুখে সাদা ধারালো দাঁত। এক কান খাড়া, আরেক কনি নিচে নামানো।

একটা মাত্র চোখ, লাল, আরেকটা কানা। গলায় পাথর বসানো লাল। কলার। এরকম অদ্ভুত বেড়াল জীবনে এই প্রথম দেখছে ওরা।
এই জিনিস চাইছিলো কেন লোকটা? কিশোরের প্রশ্ন। দেখে তো দামি কিছু মনে হয় না।
হয়তো স্টাফ করা জানোয়ার সংগ্রহের বাতিক আছে, রবিন বললো। পছন্দের জিনিস জোগাড়ের জন্যে চুরি করতেও দ্বিধা করে না অনেকে।
কিন্তু তাই বলে স্টাফ করা বেড়াল? মুসা মানতে পারলো না। তা-ও আবার কারনিভলের শুটিং গ্যালারি থেকে? কতো আর দাম ওটার, বলো?
দামের ব্যাপারে মাথা ঘামায় না ওরা, কিশোর বললো। কোটিপতি লোকও চুরি করে। কিন্তু আমাদের এই চোরটাকে সেরকম, কেউ মনে হলো না। কে জানে, হয়তো হেরে গিয়ে জেদের বশেই করেছে কাজটা।
হেরে গেলেও অবশ্য আমি করতাম না। তবে, আমাকে ঠকানোর চেষ্টা করলে অন্য কথা.....
শুটিং গ্যালারিতে ঢুকলো ওরা। কাউন্টারের ওপাশ থেকে হেসে সাগত জানালো ওদেরকে সোনালি-চুল ছেলেটা। কি সাংঘাতিক! চোরটাকে ধরেছে? জিজ্ঞেস করলো সে।
পালিয়েছে, হাতের বেড়ালটা দেখালো মুসা। এটা ফেলে। যার জিনিস তাকে ফিরিয়ে দিলো সে।
যাবে কোথায়? পুলিশ ধরে ফেলবে, বলতে বলতে রেগে গেল ছেলেটা। পাঁচটা হাঁসের মাত্র তিনটা ফেলেছে, অথচ বলে কিনা আমি ঠকিয়েছি, আবার.. হাসলো সে। আমি রবি কনর। এই বুঁদ আমার। তোমরা কি এ-লাইনের?
চোখ মিটমিট করলো রবিন। মানে?
ও বলতে চাইছে, কিশোর বুঝিয়ে দিলো, আমরাও ওর মতো কারনিভল কিংবা সার্কাসের লোক কিনা।...না, রবি, আমরা অন্য কাজ করি। রকি বীচেই থাকি। আমি কিশোর পাশা...ও মুসা, আমান...আর ও হলো রবিন মিলফোর্ড। তিনজনে একই ইস্কুলে একই ক্লাসে পড়ি, বন্ধু।
খুব খুশি হলাম, তারপর গর্বিত ভঙ্গিতে যোগ করলো সোনালি-চুল, আমি কিন্তু এ-লাইনের ফুল অপারেটর। পাঙ্ক কিংবা রাফনেক নই।
কি বললো ও? কিশোরের দিকে চেয়ে ভুরু নাচালো মুসা। ভিনগ্রহের ভাষা?
না, এই গ্রহেরই। পাঙ্ক হলো কারনিভলের শিক্ষানবিস, আর রাফনেক শ্রমিক গগাছের লোক। রবি, তোমার বয়েসে ফুল অপারেটর হওয়া একটু অস্বাভাবিক না?

এই কারনিভলের মালিক আমার বাবা তো, বলেই বুঝলো বোকামি হয়ে গেছে, কথা ঘুরিয়ে ফেললো রবি। বাবা বলে, যেকোনো কারনিভলে ফুল অপারেটরের কাজ চালাতে পারবো আমি। তা তোমরা খেলবে নাকি? পুরস্কার জিততে চাও?
ওই কানা বেড়ালটা জিততে চাই আমি, মুসা বললো।
বাহ্, ভালো নাম দিয়ে ফেলেছো তো! কানা বেড়াল…হাহ্ হাহ্!
যাও না, দেখো চেষ্টা করে, কিশোর বললো মুসাকে। রবি, বেড়ালটা পুরস্কারের জন্যে তো?
হাসলো রবি। নিশ্চয়। তবে পাঁচ গুলিতে পাঁচটা হসিই ফেলতে হবে। আমি নাম দিয়েছিলাম বাকা বেড়াল, কিন্তু কানা বেড়াল শুনতে ভাল্লাগছে। ঠিক আছে, কানা বেড়ালই সই। ওটা ফার্স্ট প্রাইজ। জেতা কঠিন। তা-ও জিতে নিয়ে গেছে লোকে, চারটে। আর মাত্র একটাই আছে।
বেশ, পঞ্চমটা আমি জিতবো, সদম্ভে ঘোষণা করলো মুসা। এগিয়ে গিয়ে কাউন্টারের সঙ্গে শেকল দিয়ে বাঁধা রাইফেলটা তুলে নিলো।
দাঁড়াও, দাঁড়াও! হাত নাড়লো রবি। প্রায় লাফ দিয়ে এসে দাঁড়ালো কাছে।

.

কী? সচকিত হলো মুসা।
পয়সা, হেসে, খাঁটি পেশাদারি ভঙ্গিতে হাত বাড়ালো রবি। আগে পয়সাটা দিয়ে নাও।
এরকম করেই কথা বলো নাকি তুমি? রবিনও অবাক হয়েছে।
পকেট থেকে পয়সা বের করে দিলো মুসা। সেটা হাতে নিয়ে রবি বললো, বাবা বলে, আমার রক্তেই রয়েছে কারনিভল। জাত কারমিভল-ম্যান।
রাইফেল কাঁধে ঠেকিয়ে নিশানা করলো মুসা। সাবধানে টিপলো ট্রিগার পড়ে গেল একটা খেলনা হাঁস। পর পর গুলি করে আরও দুটো ফেলে দিলো।
বাহ, ভালো হাত তো তোমার, হাততালি দিলো রবি। সাবধান। এখনও দুটো বাকি।
আবার গুলি করলো মুসা। ফেলে দিলো চতুর্থটা।
আরি! মুসাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করার জন্যে বললো রবি, ঘাবড়ে দিয়ে তার হাত কাপিয়ে দিতে চায়। সত্যি জাত কারনিভল-ম্যান, ভুল বলে না তার বাবা। সাংঘাতিক তো! তবে শেষটা ফেলা খুব কঠিন। ভালো মতো সই করো।
রবির উদ্দেশ্য বুঝে কিশোর বললো, কাকে কি বলছো, রবি? আফ্রিকায়। সিংহ শিকারে যাওয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছে ও, উড়ন্ত ঘুঘু ফেলে দেয়, আর এ-তো। কিছুই না। মারো, মুসা, ফেলে দাও। বেড়ালটা আমাদের দরকার।
ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে রবি। বুঝতে পারছে, বিফল হয়েছে সে। স্থির। হয়ে আছে মুসার হাত, রাইফেল ধরা আঙুলগুলো নিথর। ট্রিগারে আলতো চাপ।

পড়ে গেল পঞ্চম হাঁসটাও।
জিতেছি! চেঁচিয়ে উঠলো মুসা। গলা কাঁপছে। ভেতরে ভেতরে প্রচণ্ড উত্তেজিত, গুলি করার সময় অনেক কষ্টে চেপে রেখেছিলো।
দারুণ দেখিয়েছো, মুসা, গোয়েন্দা-সহকারীর পিঠ চাপড়ে দিলো রবি। চমৎকার নিশানা। বেড়ালটা তার হাতে দিতে দিতে বললো, এই নাও, ফার্স্ট প্রাইজ শেষ। নতুন কোনো পুরস্কারের ব্যবস্থা করতে হবে। অ্যানটিক কয়েকটা ছুরি আছে, ওয়েস্টান কাউবয়রা ব্যবহার করতো।
চোখ চকচক করে উঠলো কিশোরের। ছুরি তার খুব পছন্দ। ওয়েস্টান কাউবয়দের জিনিস শুনে লোভ সামলাতে পারলো না। তাড়াতাড়ি পয়সা বের করে দিলো রবির হাতে। রাইফেল তুলে নিলো।
পাঁচটা ফেলতে হবে কিন্তু, মনে করিয়ে দিলো রবি।
পর পর দুটো হাঁস ফেললো কিশোর। পরের তিনটে মিস করলো। একবারের বেশি সুযোগ দেয়ার নিয়ম নেই, মুখ কালো করে সরে দাঁড়ালো সে।
আমি দেখি তো, রবিন এগিয়ে এলো। পয়সা দিয়ে রাইফেল তুলে নিলো। ছুরিটা পেলে কিশোরকে উপহার দেবে।
সে-ও দুটোর বেশি ফেলতে পারলো না।
ইতিমধ্যে জমে উঠছে কারনিভল, ভিড় বাড়ছে। শুটিং গ্যালারিতেও বেশ লোক জমেছে।
তিন গোয়েন্দাকে অনুরোধ করলো রবি, তোমরা একটু থাকবে এখানে? আমি চট করে গিয়ে ছুরিগুলো নিয়ে আসি। এই কাছেই আছে।
তিনজনকেই থাকতে হবে? মুসা বললো।
কেন, আসতে চাও? বেশ, এসো। ইচ্ছে করলে আরও একজন আসতে পারো। এখানে একজন থাকলেই চলবে।
রবিন, তুমি যাও, কিশোর বললো। আমি থাকি।
গ্যালারির পেছনে দুই গোয়েন্দাকে নিয়ে এলো রবি। কারনিভলের মূল এলাকার চেয়ে আলো এখানে কম। ছোট একটা ব্যাগেজ ট্রেলার দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। কাছেই রাখি, কারণ জানালো রবি, চোরের ভয়ে। সুযোগ পেলেই এটা ওটা। নিয়ে চলে যায়। তাই চোখে চোখে রাখতে হয়।
ঢাকনা খুলে ভেতর থেকে একটা পোটলা বের করলো রবি। সেটা থেকে ছুরির বাক্স বের করে রবিনের হাতে দিলো, ধরো, আমি ঢাকনা, হঠাৎ থেমে গেল সে। মুসার পেছনে তাকিয়ে আছে, চোখ বড় বড়। কি সাংঘাতিক! একদম চুপ! নড়বে না কেউ! ফিসফিসিয়ে বললো।

ভ্রূকুটি করলো রবিন। বোকা বানানোর চেষ্টা কোরো না, রবি। ওসব। কারনিভলের কায়দা…
চুপ! রবির কণ্ঠে, ভয় মেশানো উত্তেজনা। আস্তে, খুব আস্তে ঘোরো। কিং!
স্থির হয়ে গেল দুই গোয়েন্দা। ঢোক গিললো মুসা। ধীরে ধীরে ঘুরলো দুজনেই। শুটিং গ্যালারির পরে আরেকটা বুদ, কোনো ধরনের খেলা দেখামোর জায়গা। কারনিভলে ঢোকার মূল গলিপথ থেকে দেখা যায় না ওই বুদের পেছনটা। মাঝে ঘাসে ঢাকা একটুকরো ভোলা জায়গা। সেখানে, ছেলেদের কাছ থেকে বড় জোর বিশ ফুট দূরে দাঁড়িয়ে আছে কালো কেশরওয়ালা এক মস্ত সিংহ।
.
শুটিং গ্যালারির দিকে পিছিয়ে যাও, নিচু গলায় বললো রবি। তাড়াহুড়ো করবে না। বুনো নয় কিং, পোষা, ট্রেনিং পাওয়া। কিন্তু চমকে গেলে বিপদ বাধাবে। বুদে ঢুকতে পারলেই আমরা নিরাপদ। ফোন আছে ওখানে, সাহায্য চাইতে পারবো।
ছেলেরা ছাড়া আর কারও চোখে পড়েনি এখনও সিংহটা। জুলজুলে হলুদ চোখ। হা করে বিকট হলদে দাঁত দেখালো। ঝাঁকি দিলো রোমশ কালো লেজের ডগা।
না, রবি, মুসার কণ্ঠ কাঁপছে। রাস্তার দিকে চলে যেতে পারে সিংহটা।
কিন্তু আর কি করবো? মারকাস ছাড়া সামলাতে পারবে না ওকে।
সিংহের চোখে চোখ রাখলো মুসা। ফিসফিসিয়ে বললো, তুমি রবিনকে নিয়ে। চলে যাও। জানোয়ার সামলানোর অভিজ্ঞতা আছে আমার, দেখি চেষ্টা করে। তুমি গিয়ে মারকাসকে পাঠাও।
মুসাআ! বন্ধুকে বিপদে ফেলে যেতে চাইছে না রবিন।
তার কণ্ঠ শুনে মৃদু গর্জন করে উঠলো সিংহটা।
জলদি যাও! ফিসফিসিয়ে জরুরী কণ্ঠে বললো মুসা। তাকিয়ে আছে সিংহের দিকে।
পিছাতে শুরু করলো রবিন আর রবি। ওদের দিকে চেয়ে এক কদম আগে বাড়লো সিংহ। খাঁচা থেকে বেরিয়ে দ্বিধায় পড়ে গেছে, অস্বস্তিতেও বোধহয়। শান্ত, দৃঢ়কণ্ঠে আদেশ দিলো মুসা, থামো, কিং। শোও…শুয়ে পড়ো।
চট করে ফিরে তাকালো সিংহ। পা বাড়াতে গিয়ে থেমে গেল। হলুদ চোখে সতর্কতা।
এই তো, লক্ষী ছেলে, লক্ষ্মী কিং।
ধীরে ধীরে লেজ দোলাচ্ছে সিংহ। অচেনা একটা ছেলের মুখে নিজের নাম আর আদেশ শুনে অবাক হয়েছে যেন। কোনো দিকেই তাকালো না মুসা। ক্ষণিকের জন্যেও চোখ সরালো না সিংহের, চোখ থেকে। আবার বললো, শোও…শুয়ে পড়ো, কিং।

এক মুহূর্ত বিরতি দিয়ে গলা সামান্য চড়িয়ে শেষবার আদেশ দিলো, শোও, কিং! কথা শোনো!
চাবুকের মতো লেজ আছড়ালো সিংহ। আশোঁপাশে তাকিয়ে কী যেন বোঝার চেষ্টা করলো, তারপর ধপ করে গড়িয়ে পড়লো ঘাসের ওপর। বিশাল মাথা তুলে বেড়ালের মতো তাকালো মুসার দিকে, ঘড়ঘড় শুরু করবে বুঝি এখুনি।
গুড, কিং।
হঠাৎ পেছনে কথা সোনা গেল। লম্বা পায়ে মুসার পাশ দিয়ে সিংহের দিকে। এগিয়ে গেল মারকাস। হাতে একটা বেত আর একটা শেকল। মোলায়েম গলায় কথা বলতে বলতে যাচ্ছে, খানিক আগে মুসা যেরকম করে বলেছিলো। বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে কেশরে ঢাকা মোটা গলাটায় শেকল পরিয়ে দিলো। তারপর টানতে টানতে নিয়ে চললো খাঁচার দিকে। সিংহটাও প্রতিবাদ করলো না, শান্ত সুবোধ প্রভুভক্ত কুকুরের মতো চলেছে পিছে পিছে।
ঢোক গিললো মুসা। উত্তেজনা প্রশমিত হতেই ফ্যাকাসে হয়ে গেল মুখ। বিড়বিড় করলো, খাইছে!
পাশে এসে দাঁড়ালো রবিন, কিশোর আর রবি।
দারুণ দেখিয়েছো! রবি বললো।
সত্যিই দারুণ, সেকেণ্ড! এভাবে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা সাধারণত করে না গোয়েন্দাপ্রধান, লোকের দোষই বেশি দেখে। আর খুঁতখুঁত করে। কিং যে ছুটেছে, কেউ জানে না। একটা দুর্ঘটনা বাঁচিয়েছো।
এতো প্রশংসায় লজ্জা পেলো মুসা। জবাব দেয়ার আগেই দেখলো ফিরে আসছে মারকাস দ্য হারকিউলিস। কাছে এসে শক্ত করে চেপে ধরলো মুসার কাধ। খুব, খুবই সাহসী তুমি, ইয়াং ম্যান। বলা যায় দুঃসাহসই দেখিয়ে ফেলেছে। এমনিতে কিং শান্ত, কিন্তু লোকে ভয় পেয়ে হৈ-চৈ শুরু করলে ঘাবড়ে যেতো সে। বিপদ ঘটতো।
আরও অস্বস্তিতে পড়লো মুসা, কোনোমতে হাসলো। আমি জানতাম, স্যার, ও পোষা। নইলে কখন, ভাগতাম।
তবু আমি বলবো দুঃসাহস দেখিয়েছো। খাঁচার ভেতর সিংহ দেখেই কতোজনে ভয় পেয়ে যায়। তিন গোয়েন্দার দিকে চেয়ে চোখ নাচালো লায়ন। ট্রেনার। কিঙের খেলা দেখবে?
দেখাবেন? উৎসাহে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো মুসা। কখন?
কয়েক মিনিটের মধ্যেই খেলা শুরু হবে।
নিজের তাঁবুতে ফিরে চললো মারকাস। এখানে আরও কিছুক্ষণ কাটিয়ে, রবি ফিরে গেল তার নিজের বুদে। শুটিং গ্যালারিতে তখন রীতিমতো ভিড় জমেছে।

সিংহের খেলা যে তাঁবুতে দেখানো হবে সেদিকে রওনা হলো তিন গোয়েন্দা। পথে দেখা গেল, দর্শক জমিয়ে ফেলেছে দুই ভাড়। একজন বেঁটে, মোটা। আরেকজন লম্বা, পাতলা নাক, বিষণ্ন চেহারা, সাদা রঙ মেখে আরও বিষণ্ন করে ফেলেছে। ভবঘুরে সেজেছে সে। ঢোলা প্যান্টের পায়ের কাছটা বেঁধেছে দড়ি দিয়ে। তার সঙ্গী হাসিখুশি। নানারকম শারীরিক কসরত দেখাচ্ছে, ডিমে তা-দেয়া। মুরগীর মতো বিচিত্র শব্দ করছে গলা দিয়ে।

বিষণ্ন চোখে সঙ্গীর খেলা দেখছে লম্বা ভড়, তাকে অনুসরণের চেষ্টা করে ব্যর্থ হচ্ছে। করুণ করে ফেলছে চেহারা। আবার চেষ্টা করছে, আবার বিফল হচ্ছে। বিষণা থেকে বিষণ্নতর হয়ে যাচ্ছে চেহারা। তার এই কাণ্ড দেখে দর্শকরা হেসে অস্থির। শেষে, কঠিন একটা খেলা দেখাতে গিয়ে ইচ্ছে করেই ব্যর্থ হয়ে হাত-পা ছড়িয়ে চিত হয়ে পড়লো বেঁটে ভাড়। অবশেষে হাসি ফুটলো লম্বার মুখে।

চমৎকার অভিনয়, কিশোর বললো। সে নিজে ভালো অভিনেতা, তিন বছর বয়েসেই অভিনয় করেছে টেলিভিশনে। ফলে কারও ভালো অভিনয় দেখলে ভালো লাগে তার।

সিংহের তাঁবুর দিকে চললো আবার ওরা। তাঁবুর এধারে পর্দা দিয়ে আলাদা। করা। এপাশে দর্শকদের দাঁড়ানোর জায়গা। বড় একটা খাঁচা, মাঝে শিকের আলগা বেড়া দিয়ে আলাদা করা। ভেতরে সেই গামলা: দুটো, পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ড থেকে রঙ করে আনা হয়েছে যেগুলো। খাঁচার ছাত থেকে ঝুলছে একটা ট্রাপিজ।

ছেলেরা তাঁবুতে ঢোকার পর পরই পর্দার ওপাশ থেকে বেরিয়ে এলো। মারকাস। দর্শকদের উদ্দেশ্যে বাউ করে গিয়ে খাঁচায় ঢুকলো। মাঝের বেড়াটা সরিয়ে দিয়ে ইঙ্গিতে ডাকলো। ভয়ঙ্কর বুনো গর্জন করতে করতে খাঁচার এধারে চলে এলো কিং। চক্কর দিতে লাগলো খাঁচার স্বল্প পরিসরে, চোখমুখ পাকিয়ে এসে থাবা মেরে মারকাসকে ধরার চেষ্টা করতে লাগলো।

হাসলো ছেলেরা। বুঝতে পারছে, সিংহটাও অভিনয় করছে ট্রেনারের সঙ্গে। লাফালো, গড়াগড়ি দিলো, নাচের ভঙ্গিতে পা ফেললো, ডিগবাজি খেলো, সব শেষে লাফিয়ে উঠলো ঝুলন্ত ট্র্যাপিজে। চোখ কপালে তুলে দিলো দর্শকদের।

আরিব্বাপরে! মুসা বললো। কতো কি করছে! আমি তো শুধু ওকে শুইয়েছি।

খুব ভালো খেলা দেখাচ্ছে, তাই না, কিশোর? বলে, পাশে দাঁড়ানো কিশোরকে কনুই দিয়ে গুঁতো মারতে গেল রবিন, কাত হয়ে গেল একপাশে। কারো গায়ে লাগলো না তার কনুই। কিশোর নেই ওখানে।

গেল কই? খোঁজ, খেজ। গোয়েন্দাপ্রধানের দেখা মিললো সিংহের খাঁচার পেছনে, কখন গেছে ওখানে খেয়ালই করেনি দুই সহকারী।

এখানে কি, কিশোর? জানতে চাইলো রবিন।
মুখে কিছু না বলে আঙুল তুলে ট্রেলারটা দেখালো কিশোর, তাঁবুর ভেতরেই থাকে ওটা, পর্দার অন্যপাশে। সিংহের ঘর। খেলা দেখানোর সময় খাঁচায় ঢেকে সিংহটা, অন্য সময় থাকে ট্রেলারটাতে ট্রেলার আর খাঁচা একসঙ্গে যুক্ত, মাঝে শিকের বেড়া। বেড়া সরিয়ে দিলেই ট্রেলার থেকে খাঁচায় চলে আসতে পারে ওটা, বাইরে দিয়ে আসার দরকার হয় না। ট্রেলারের দরজায় বড় তালা লাগানো থাকে। কড়া দেখালো কিশোর। ভালো করে দেখো, বুঝবে, গম্ভীর কণ্ঠে বললো সে। জোর করে খোলা হয়েছে। ইচ্ছে করেই কেউ ছেড়ে দিয়েছিলো কিংকে।

.

তখন থেকেই ভাবছিলাম, বেরোলো কি করে সিংহটা? বললো কিশোর। তাঁবুতে ঢুকে মনে হলো, যাই, দেখিই না। দেখলাম। কিন্তু কথা হলো, মারকাসের অগোচরে কে ছাড়লো কিংকে? তালাটা তুলে দেখালো সে। এই দেখো, চাবির ফুটোর চারধারে আঁচড়ের দাগ, নতুন। বেশিক্ষণ হয়নি খুলেছে।
তুমি শিওর, কিশোর? বিশ্বাস হচ্ছে না, কিন্তু কিশোরের কথা অবিশ্বাসও করতে পারছে না রবিন।
মাথা ঝাঁকালো কিশোর।
কে করলো কাজটা? মুসার প্রশ্ন।
তিনজনেই ভাবছে, এই সময় পর্দার ওপাশে জোর হাততালি শোনা গেল। খেলা শেষ। লাফাতে লাফাতে এসে ট্রেলারে ঢুকলো কিং।
উন্মাদের কাজ, রবিন বললো।
সিংহটার দিকে চিন্তিত ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে কিশোর। উন্মাদ? আমার তা মনে হয় না। নিশ্চয় কোনো কারণ আছে।
যেমন? মুসা জানতে চাইলো।
হতে পারে, দর্শককে ভয় দেখিয়ে কারনিভল করা কিংবা সিংহ পাকড়াও করে হিরো সাজার ইচ্ছে। কিংবা লোকের নজর আরেকদিকে সরিয়ে দিয়ে ফাঁকতালে কোনো জরুরী কাজ সেরে ফেলা।
কিন্তু তেমন তো কিছু ঘটেনি, মুসা বললো।
হিরো সাজতেও আসেনি কেউ, বললো রবিন।
আসার সময়ই হয়তো দেয়নি মুসা। অথবা যে কাজটা সারতে চেয়েছিলো। সেই লোক, সেটার সুযোগ দেয়নি। থামিয়ে দিয়েছে সিংহটাকে।
কারনিভল বন্ধ করতে চাইবে কেন কেউ? নিজেকেই যেন প্রশ্ন করলো রবিন। লোকের মারাত্মক ক্ষতি করে? সিংহ ছেড়ে দেয়া ছাড়া কি আর উপায় ছিলো না?
জানি না, বিড়বিড় করলো কিশোর।

কে করেছে ভাবছো? কারনিভলের কেউ?
মনে হয়। একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছো, ট্রেলারের কাছ থেকে বেশ দূরে চলে গিয়েছিলো? যেন, পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো তাকে সেখানে।
মারকাস? জবাবটা নিজেই দিয়ে দিলো মুসা, না, সে নয়। তালা জোর করে খোলার দরকার হতো না তার। নিশ্চয় চাবি আছে।
ধোঁকা দেয়ার জন্যে করতে পারে। রবি গিয়ে বলার পর তবে তার টনক, নড়লো। আরও আগে খোঁজ করলো না কেন সিংহটার? বিশেষ করে, কয়েক মিনিট পরেই যখন খেলা দেখানোর কথা?
জবাব খুঁজে পেলো না দুই সহকারী।
ভ্রূকুটি করে কিশোর বললো আবার, সমস্যাটা হলো, প্রায় কিছুই জানি না আমরা এখনও। কে, কেন করেছে আন্দাজই করতে পারছি না। তবে…
তবে কী? বাধা দিয়ে বললো মুসা। রহস্য মনে করছো নাকি এটাকে? তদন্ত করার কথা ভাবছো?
হ্যাঁ, ভাবছি…, শুরু করেই থেমে গেল সে। ঠোঁটে আঙুল রেখে কথা বলতে নিষেধ করলো। বুড়ো আঙুল নেড়ে দেখালো তাঁবুর পেছন দিকে।
বিশাল একজন মানুষের ছায়া পড়েছে তাঁবুর দেয়ালে। চওড়া কাঁধ। কেমন হেলে রয়েছে মাথাটা, তাঁবুর গায়ে কান ঠেকিয়ে ভেতরের কথা শুনছে যেন। ছায়া দেখে মনে হয় না গায়ে কাপড় আছে।
জলদি বেরোও, ফিসফিস করে বললো কিশোর।
তাঁবুর পেছন দিয়ে পথ নেই। সামনে দিয়েই বেরোলো ওরা। ঘুরে তাড়াতাড়ি চলে এলো তাঁবুর এক কোণে, পেছনে কে আছে দেখার জন্যে।
কেউ নেই।
পালিয়েছে, রবিন বললো।
এই সময় পেছনে শোনা গেল পায়ের শব্দ। এই যে, কানের কাছে গমগম করে উঠলো ভারি কণ্ঠ, তোমরা এখানে কি করছো?
চমকে উঠলো তিনজনেই। ঢোক গিললো মুসা। ফিরে তাকিয়ে দেখলো বিশালদেহী একজন মানুষ। কালো চোখ। কাঁধে ফেলা লম্বা, ভারি একটা হাতুড়ি।
আ-আ-আমরা…, তোতলাতে শুরু করলো মুসা।
রবি এসে দাঁড়ালো মানুষটার পেছনে। তিন গোয়েন্দাকে দেখে উজ্জ্বল হলো: চোখ। বাবা খুঁজে পেলো তাহলে তোমাদের।
তোমার বাবা? আবার ঢোক গিললো মুসা।
হ্যাঁ, খোকা, হাসি ফুটলো তার মুখে, হাতুড়িটা নামিয়ে রাখলেন মাটিতে, হাতল ধরে রেখেছেন। ধন্যবাদ জানানোর জন্যে খুঁজছিলাম তোমাদের। কিংকে সামলে

মহা-অঘটন থেকে বাঁচিয়েছো। রাফনেকদের সাহায্য করছিলাম, তাই তখন আমাকে খুঁজে পায়নি রবি।
তোমাদেরকে পুরস্কার দিতে চায় বাবা, রবি বললো।
পুরস্কারের কথায় কানা বেড়ালটার কথা মনে পড়লো মুসার। খাইছে! আমার। বেড়াল! দ্রুত চারপাশে তাকালো সে, বেড়ালটা খুঁজলো। নেই।
বেড়াল? অবাক হলেন মিস্টার কনর।
শুটিং গ্যালারিতে পুরস্কার পেয়েছিলো, বাবা, রবি জানালো। ফার্স্ট প্রাইজ।
সিংহের তাঁবুতে ফেলে এসেছে হয়তো, মুসাকে বললো রবিন।
কিন্তু তাঁবুতে তন্নতন্ন করে খুঁজেও বেড়ালটা পাওয়া গেল না। শুটিং . গ্যালারিতে চললো সবাই। সেখানেও নেই ওটা। এমনকি মুসা যেখানে কিংকে শুইয়েছে সেখানেও নেই।
ছিলো তো, কোথায় রেখেছে, মনে করতে পারছে না মুসা, আমার হাতেই ছিলো। সিংহটাকে যখন দেখলাম, তখনও ছিলো। ভয়ে হয়তো হাত থেকে ছেড়ে দিয়েছি, কেউ তুলে নিয়ে গেছে।
নীরবে ভাবছিলো কিশোর। কড়ে আঙুল কামড়াচ্ছিল। দাঁতের ফাঁক থেকে সরিয়ে নিয়ে বললো, মনে করতে পারছো না?
আস্তে মাথা নাড়লো মুসা।
এতো মন খারাপ করছো কেন? মিস্টার কনর বললেন। আরেকটা পুরস্কার দেবো। বেড়ালের চেয়ে ভালো কিছু।
আর চেপে রাখতে পারলো না কিশোর। বলে ফেললো, মিস্টার কনর, আপনার কারনিভলে কোনো গোলমাল চলছে?
গোলমাল? কালো চোখের তারা স্থির নিবদ্ধ হলো কিশোরের ওপর। কেন, একথা কেন?
এই সিংহের তাঁবুতে আমরা কথা বলছিলাম। এই সময় তার পেছনে একটা লোকের ছায়া দেখলাম, মনে হলো আমাদের কথা আড়িপেতে শুনছে সে।
তোমাদের কথা আড়িপেতে শুনেছে? ভুরু কোঁচকালেন তিনি। তারপর, হেসে উঠলেন। ভুল করেছো। কিং তোমাদের ঘাবড়ে দিয়েছে। ভয় পেলে হয় ওরকম। উল্টোপাল্টা দেখে লোকে, শোনে
জানি, বাধা দিয়ে বললো কিশোর। কিন্তু ব্যাপারটা আমাদের কল্পনা নয়। তিনজনেই দেখেছি। আর কিংও নিজে থেকে ছাড়া পায়নি, ট্রেলারের দরজা খুলে। দেয়া হয়েছিলো।
কি যেন ভাবলেন মিস্টার কারসন। এসো, আমার ট্রেলারে। শো দেখানোর জায়গা থেকে খানিক দূরে মাঠের মধ্যে পার্ক করা রয়েছে কারনিভলের লোকদের ট্রাক,

ট্রেলার, কার। একটা ট্রাকের পেছনে লাগানো ট্রেলারে থাকে বাপ-ছেলে, মিস্টার কনর- আর রবি। ট্রেলারের ভেতরে দুটো বাংক, কয়েকটা চেয়ার, একটা ডেস্ক– তাতে কাগজপত্র ছড়ানো, ছোট একটা আলমারি, বড় ঝুড়িতে নানারকম বাতিল জিনিস ছেঁড়া স্টাফ করা একটা কুকুর, একটা বেড়াল, কিছু ভাঙা পুতুল।
বাতিল মাল কিনে সারিয়ে নিই আমি, গর্বের সঙ্গে বললো রবি। পরে পুরস্কার দিই।
বসো, ছেলেদের বললেন কনর। সব খুলে বলো আমাকে।
বলার তেমন কিছু নেই, স্যার, কিশোর বললো। তবে কিংকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে, এটা ঠিক। জোর করে তালা খোলার চিহ্ন আছে।
এমনভাবে কথা বলছে, যেন অভিজ্ঞ গোয়েন্দা, হাসলেন মিস্টার কনর।
গোয়েন্দাই, স্যার, পকেট থেকে তিন গোয়েন্দার কার্ড বের করে দিলো কিশোর। অনেক জটিল রহস্যের সমাধান করেছি আমরা।
কার্ডটা পড়ে মাথা দোলালেন কনর। ভালো। মজার হবি…
ঠিক হবি নয়, স্যার, আমরা সিরিয়াস। বলে পকেট থেকে বের করে দিলো আরেকটা কাগজ, পুলিশ চীফ ইয়ান ফ্লেচারের দেয়া সার্টিফিকেট।
সেটাও পড়লেন কনর। হু, আসল গোয়েন্দা বলেই মনে হচ্ছে। পুলিশ তো আর মিছে কথা বলবে না। সে যাই হোক, ইয়াং ম্যান, এখানে কোনো কেস নেই। তোমাদের জন্যে। কোনো রহস্য নেই। তুমি ভুল করেছে।
কিশোর পাশা ভুল করে না, স্যার, ঘোষণা করলো রবিন।
ওরকম জোর দিয়ে কিছু বলা যায় না, হেসে বললেন কনর। বলতে পারো, সাধারণত ভুল করে না। একেবারেই ভুল করে না, এটা হতে পারে না। মানুষ মাত্রেই ভুল করে।
কিন্তু, বাবা…, বলতে গিয়ে বাধা পেলো রবি।
কনর বললেন, থামো, রবি, অনেক হয়েছে। ওসব কথা আর শুনতে চাই না, উঠে দাঁড়ালেন তিনি। কিশোর ভুল করেছে। তবে আমাদের অনেক উপকার করেছে ওরা, পুরস্কার একটা অবশ্যই দিতে হয়। কারনিভলের তিনটে ফ্রি পাস। তিনটে কার্ড বের করে দিলেন তিন গোয়েন্দার হাতে। কী, খুশি হয়েছে তো?
নিশ্চয়, বললো বটে, হাসি দেখা গেল না গোয়েন্দাপ্রধানের মুখে।
আরি! দরজার দিকে হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠলো রবিন।
সবাই তাকালো। পেছনের দরজার পর্দায় মস্ত ছায়া পড়েছে। লম্বা এলোমেলো চুল, চাপ দাড়ি, পেশীবহুল চওড়া কাঁধ।
ওই যে ছায়া! দাঁতের ফাঁক দিয়ে হিসহিস শব্দ বেরোলো মুসার।
ডাকলেন কনর।

ঘরে ঢুকলো একজন লোক। হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে রইলো ছেলেরা। স্বাভাবিক উচ্চতা, কিন্তু দেখার মতো মাংসপেশী। ঠেলে ফুলে উঠেছে নগ্ন কাঁধের। পেশী। পরনে কালো-সোনালি রঙের আটো পাজামা, গায়ের সঙ্গে মিশে রয়েছে। পায়ে চকচকে বুট। কালো অগোছালো চুল-দাড়ি কেমন যেন বন্য করে তুলেছে। চেহারাটাকে।

ও আমাদের স্ট্রং ম্যান, পরিচয় করিয়ে দিলেন কনর, ওয়ালশ কোহেন। একটা রহস্যের তাহলে সমাধান হয়ে গেল, বয়েজ। কারনিভলে, একজন মানুষ। নানারকম কাজ করে, কোহেনও ব্যতিক্রম নয়। সে আমাদের সিকিউরিটি ইনচার্জ। তোমাদের ঘোরাফেরা দেখে নিশ্চয় সন্দেহ হয়েছিল তার, চুপ করে গিয়ে। দেখে এসেছে কি করছো।

ঠিকই বলেছেন, স্বীকার করলো কোহেন। মোটা, ভারি গলা।

মাথা ঝোকালেন কনর। তো, ছেলেরা, কোহেনের সঙ্গে আমার জরুরী কথা আছে। রবিরও শুটিং গ্যালারিতে যাওয়া দরকার। তোমরা ঘোরো গিয়ে, যা ইচ্ছে দেখো। ফ্রি পাস আছে, কোথাও পয়সা দিতে হবে না।

থ্যাংক ইউ, স্যার, শান্তকণ্ঠে বললো কিশোর। ইশারায় রবিন আর মুসাকে। আসতে বলে পা বাড়ালো দরজার দিকে। বাইরে বেরিয়ে সোজা চলে এলো। ট্রেলারের পেছনে।

কি করছো? রবিন জিজ্ঞেস করলো।

আমি শিওর, কিছু একটা ঘটছে এখানে, নিচু গলায় বললো কিশোর। কোহেনকে সন্দেহ হচ্ছে আমার। প্রহরীর মতো লাগে না। এমনভাবে তাঁবুর কাছে আড়ি পেতে ছিলো, যেন চোর। আর রবিও কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো, তার বাবা থামিয়ে দিয়েছেন। কাজেই জানালার কাছে দাঁড়িয়ে শুনবো কি হচ্ছে।

সরো! বলতে বলতেই দুজনকে ঠেলে আড়ালে নিয়ে এলো মুসা।

ট্রেলার থেকে নেমে দ্রুত গ্যালারির দিকে চলে গেল রবি, কোনোদিকে তাকালো না। পা টিপে টিপে, জানালার কাছে এসে দাঁড়ালো ছেলেরা।

কোহেনের ভারি গলা শোনা গেল, কিংও. ছুটলো। এরপর কি ঘটবে, কনর? হয়তো শেষ পর্যন্ত বেতনই দিতে পারবেন না আমাদের।

আগামী হপ্তায়ই বেতন পাবে। এতো চিন্তা করো না।

আপনাকে আর কি বলবো? জানেনই কারনিভলের লোকেরা কুসংস্কারে। বিশ্বাসী। আজকের শো তেমন জমছে না। আরও অঘটন ঘটবে।

কোহেন, শোনো। তুমি...।

ভেতরে পায়ের শব্দ। ছেলেদের মাথার ওপরে বন্ধ হয়ে গেল জানালা। আর কথা শোনা গেল না। দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই। সরে চলে এলো তিন গোয়েন্দা।

সত্যিই গণ্ডগোল, বলে উঠলো মুসা। কিন্তু আমরা কি করতে পারি? মিস্টার। কনর আমাদের পাত্তাই দিলেন না।
কিশোর চিন্তিত। রবিকেও কিছু বলতে দিলো না। যাকগে, পাস আছে। আমাদের। নজর রাখতে পারবো। রবিন, কাল লাইব্রেরিতে গিয়ে পত্রিকা ঘাটবে। দেখবে, অন্যান্য শহরে কারনির্ভুলটা কেমন জমিয়ে এসেছে। গত কয়েক দিনের কাগজ দেখলেই চলবে। কাল ভাৰবো, কি করা যায়।

.

সেরাতে ভালো ঘুম হলো না মুসার। মনে ভাবনা। তিন গোয়েন্দাকে তদন্ত করতে দেয়ার জন্যে কিভাবে রাজি করানো যায় মিস্টার কনরকে? সকাল পর্যন্ত ভেবেও কোনো উপায় বের করতে পারলো না। শেষে চেষ্টা ক্ষান্ত দিলো। রবিন কিংবা কিশোর উপায় বের করে ফেলবে। নাস্তার টেবিলে এসে দেখলো খাওয়ার শেষ পর্যায়ে রয়েছেন মিস্টার আমান।
বাবা, এতো তাড়াতাড়ি উঠেছে আজ? মুসা জিজ্ঞেস করলো।
হ্যাঁ, ডেভিস ক্রিস্টোফার ডেকেছেন। নতুন একটা ছবি করবেন। জরুরী কাজ নাকি আছে, কফির কাপে লম্বা চুমুক দিলেন। কিন্তু এদিকে যে একটা গোলমাল হয়ে গেল।
কী?
তোমার মাকে কাল রাতে কথা দিয়েছি, আজ বাগান সাফ করে দেবো। তোমার তো স্কুল ছুটি, কাজও নেই। দাও না আমার কাজটা করে।
মনে মনে গুঙিয়ে উঠলো মুসা। মুখে বললো,.বেশ, দেবো।
লাঞ্চের আগে বেরোতে পারলো না। বাগান সাফ করে, দুপুরের খাওয়া খেয়ে, সাইকেল নিয়ে স্যালভিজ ইয়ার্ডে চললো মুসা। হেডকোয়ার্টারে পৌঁছে দেখলো, কিশোর ডেস্কেই রয়েছে।
কোনো উপায় বের করতে পারলে? ভূমিকা নেই, সরাসরি জিজ্ঞাসা।
নাহ, ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেললো মুসা। তুমি?
আমিও না, মুখ গোমড়া করে রেখেছে কিশোর। দেখি, রবিন কি জেনে আসে। তার জন্যেই বসে আছি।
বাইরে আওয়াজ শুনে গিয়ে সর্ব-দর্শনে চোখ রাখলো কিশোর। পেরিস্কোপটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একটা বিশেষ অবস্থানে আনতেই ইয়ার্ডের অনেকখানি দেখা গেল।
ওই, এসে গেছে।
একটু পরেই ট্র্যাপডোরে টোকা পড়লো। ঢাকনা তুলে উঠে এলো রবিন। হাতে নোটবুক, ভীষণ উত্তেজিত।
রবিনের মুখ দেখেই আন্দাজ করা গেল, খবর আছে।

সারাটা সকাল খরচ হয়েছে আমার, রবিন, বললো। কারনিভলে গুরুত্ব নেই, ফলে খবর থাকলেও কাগজের চিপায়-চাপায় থাকে। একগাদা কাগজ ওল্টাতে হয়েছে আমার।
কি জানলে? কিশোর জিজ্ঞেস করলো।
নোটবুক খুললো রবিন। তিন হপ্তা আগে ভেনচুরায় পনি রাইড হারিয়েছে কারনিভল। খাদ্যে বিষক্রিয়ায় মারা গেছে ওদের তিনটে খেলুড়ে পনি ঘোড়া। তারপর, তিন দিন আগে স্যান মেটিওর উত্তরে একটা জায়গায় থাকার সময় আগুন লেগেছে। তিনটে তাঁবু পুড়েছে আগুনখেকোর তাঁবু, সিংহের তাঁবু, আর শুটিং গ্যালারির খানিকটা নেহাত কপালগুণে সময়মতো নেভাতে পেরেছে।
সিংহের তাঁবু? কপাল কুচকে গেছে মুসার। একখানে দুবার অঘটন?
কাকতালীয় ব্যাপারও হতে পারে, কিশোর বললো। ঝট করে সিদ্ধান্তে চলে আসা ঠিক নয়। তবে ইন্টারেসটিং মনে হচ্ছে। যদি পনি রাইডও ওই একই কারনিভলের হয়।
কোন কারনিভল, পেপারে কিছু লেখেনি, রবিন বললো।
কাল রাতে আমি ও কিছু বইপত্র ঘেঁটেছি, সার্কাসের ওপর লেখা, বললো। কিশোর। চাচার বই। জানোই তো সার্কাসে কি-রকম আগ্রহ তার। বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে একবার সার্কাসের দলে ভর্তিও হয়েছিলো। একটা বইতে পেলাম, অনেক কুসংস্কার আছে সার্কাসের লোকের। পুরনো প্রবাদ আছেঃ কোনো সার্কাসে দুর্ঘটনা ঘটতে শুরু করলে পর পর তিনবার ঘটবে। ঘটবেই। সুতরাং, কিঙের বেরিয়ে যাওয়াটা তৃতীয় দুর্ঘটনা বলা যায়।
তুমি বিশ্বাস করো এসব? রীতিমতো অবাক হলো মুসা।
আমার করা না করায় কিছু এসে যায় না, সেকেণ্ড। সার্কাসের লোকে করে। আরও কিছু বইয়ের লিস্ট দিয়েছে চাচা, তার কাছে ওগুলো নেই। ফলে সকালে লস অ্যাঞ্জেলেসে যেতে হলো, লাইব্রেরিতে। অনেক বই ঘেটেছি। জেনেছি, সার্কাসে কি। কি খেলা থাকে, কোন পদে কি রকম লোক থাকে। আশ্চর্য কি জানো, কোথাও স্ট্রং ম্যানের উল্লেখ নেই।
তাহলে কোহেন? প্রশ্ন তুললো মুসা।
কি জানি। হতে পারে নতুন সৃষ্টি করা হয়েছে। কিংবা তার দেশের সার্কাসে। ওরকম, পদ আছে। লোকটা বিদেশী। আরেকটা ব্যাপার সহজেই চোখে পড়ে, তার। আচার-আচরণ সন্দেহজনক। ঝিক করে উঠলো কিশোরের চোখের তারা। তুড়ি বাজালো। পেয়েছি।
কি পেয়েছো?? একসঙ্গে প্রশ্ন করলো দুই সহকারী।
কারনিভলে তদন্ত করার উপায়। জড়িয়ে নিতে হবে।

কিভাবে? রবিন জানতে চাইলো
বলছি, মন দিয়ে শোনো…

.
কয়েক মিনিট পর সর্ব-দর্শনে চোখ রাখলো মুসা। হঠাৎ বললো, আসছে! আমি যাই।
তিন গোয়েন্দার ব্যক্তিগত ওয়ার্কশপের বাইরে রবির সঙ্গে দেখা করলো মুসা। ফোন করে তাকে আসতে বলেছে কিশোর।
কি ব্যাপার, মুসা? হাসলো সোনালি-চুল ছেলেটা। জরুরী তলব?
ভাবলাম, আমাদের গোপন হেডকোয়ার্টার দেখাই। হাজার হোক, তিনটে ফ্রি পাস পেয়েছি তোমাদের কাছে। চক্ষুলজ্জা বলেও তো একটা জিনিস আছে। কি করে কাজ করি আমরা, দেখবে এসো।
দুই সুড়ঙ্গ দিয়ে রবিকে হেডকোয়ার্টারে নিয়ে এলো মুসা।
কি সাংঘাতিক! কি জায়গা বানিয়ে রেখেছো জঞ্জালের তলায়!
চোখ বড় বড় করে দেখলো রবিঃ মাইক্রোস্কোপ, টেলিফোন, পেরিস্কোপ, ওয়াকি-টকি, ফাঁইলিং কেবিনেট, মেটাল ডিটেকটর, তাক বোঝাই বই আর ট্রফি, আর আরও নানা রকম জিনিস যেগুলোর নামই জানে না সে। রবিন আর কিশোর কাজে ব্যস্ত, ঘরে যে লোক ঢুকেছে টেরই পায়নি যেন। একজনও চোখ তুললো না। আতশ কাঁচ দিয়ে একটা তালা পরীক্ষা করছে কিশোর। আলোকিত কাঁচের তলায় রেখে কি যেন দেখছে রবিন।
ওদের কাজে ব্যাঘাত না ঘটিয়ে নিচু গলায় বললো মুসা, রবি, তোমাদের কারনিভলে গোলমাল হচ্ছে। সেটারই তদন্ত করছি।
কি করে জানলে? অসম্ভব!
তোমার কাছে কঠিন লাগছে, রবি, ভারিক্কি চালে বললো মুসা। আমাদের কাছে কিছু না। বিজ্ঞান আর আমাদের অভিজ্ঞতাই সেটা সম্ভব করেছে।
হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো কিশোর। বুঝলাম। কিংকে ছেড়ে দেয়েছিলো একজন। পেশাদার অপরাধী, রবি যে আছে ঘরে দেখতেই পায়নি যেন। কোনো সন্দেহ নেই। তালাটার বাইরের প্যাটার্ন দেখলাম, টাইপ-সেভেন পিক-লক। সিংহের খাঁচায়ও একই তালা। নিশ্চয় গোলমাল পাকানোর জন্যেই খুলে দেয়া হয়েছিলো।
বোকা হয়ে দাঁড়িয়ে শুনছে রবি, অর্ধেক কথা বুঝতে পারছে না। আরও তাজ্জব হওয়া বাকি আছে তার। কিশোর থামতেই রবিন শুরু করলো, হুঁ, বোঝাই যাচ্ছে, তিন হপ্তা আগে তিনটে ঘোড়া মরে যাওয়াতেই পনি রাইড খেলাটা বন্ধ। করতে হয়েছে। তারপর পুড়লো তবু, শুটিং গ্যালারির ক্ষতি হলো। নতুন তবু কিনতে,

গ্যালারি মেরামত করতে অবশ্যই টাকা নষ্ট হয়েছে। বেকায়দায় পড়ে গেছেন মিস্টার কনর। বেতন দিতে পারছেন না।
রবিকে না দেখার অভিনয় চালিয়ে গেল কিশোর। মাথা ঝাঁকিয়ে রবিনের কথার সমর্থন জানালো। জিজ্ঞেস করলো, কর্মীদের কথা কি কি জানলে?
স্ট্রং ম্যান কোহেন কারনিভলে আগে কখনও কাজ করেনি, রেকর্ড নেই। আমার বিশ্বাস, লোকটা ভণ্ড।
ভাব দেখে মনে হলো, বাজ পড়েছে রবির মাথায়। ঝুলে গেছে নিচের : চোয়াল। আর চুপ থাকতে পারলো না। এসব কথা কে বলেছে তোমাদের?
ফিরে তাকালো কিশোর আর রবিন। রবিকে দেখে যেন অবাক হয়েছে।
আরে, রবি, কখন এলে? কিশোর বললো।
নিশ্চয় কেউ বলেছে তোমাদেরকে এসব কথা! প্রশ্নের জবাব না দিয়ে গরম হয়ে বললো রবি।
না, রবি, মাথা নাড়লো কিশোর। আমরা গোয়েন্দা। তদন্ত করে জেনেছি। তারমানে, সত্যি জেনেছি?
মাথা ঝোঁকালো রবি। হ্যাঁ, প্রত্যেকটা বর্ণ। এমনকি কোহেনের কথাও। ছদ্মনামে ঢুকেছে। টাকার দরকার, তাই একটা পদ তৈরি করে নিয়ে কারনিভলে কাজ করতে এসেছে। সার্কাসের চেয়ে কারনিভলের আয় কম, বেতনও কম, তারপরেও এসেছে। আমাদের এখানে যে কাজ করছে, পরিচিত কাউকে জানতে দিতে চায় না। আমরাও ওর আসল নাম জানি না। তবে স্ট্রং ম্যান হিসেবে খুব ভালো, একথা বলা যায়।
তা হতে পারে। কিন্তু, রবি, তোমাদের কারনিভলে যে গোলমাল করছে। কেউ, এটা তো ঠিক? কে করছে, সেটা বের করতে চাই আমরা। যদি তোমার। বাবা অনুমতি দেন।
এক এক করে তিন গোয়েন্দার মুখের দিকে তাকালো রবি। আগে বলো, কি করে জানলে? যাদু বিশ্বাস করি না আমি।
ভূতে বলেছে, রহস্যময় হাসি হাসলো কিশোর। খুলে বললো, কিভাবে জেনেছে।
রবিন আর মুসার মুখেও হাসি.। রবিকে তাজ্জব করে দিতে পারার আনন্দে।..
দারুণ হে! সত্যি তোমরা জাতগোয়েন্দা! না বলে পারলো না রবি। কারনিভলের গণ্ডগোলের হোতা কে, বের করতে পারবে তোমরা। কিন্তু বাবাকে। নিয়েই মুশকিল। বাইরের সাহায্য নিতে রাজি হবে না।
তাহলে খুব শীঘ্রি কারনিভল খোয়াতে হবে তাকে, কিশোর বললো।
বুঝি, বিমর্ষ হলো রবি। আগামী হপ্তায় বেতন দিতে না পারলে…,.থেমে গেল সে। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো। বেশ, বাবা না নিলে না নিক, আমি নেবো তোমাদের

সাহায্য। আমি জানি কি কারণে বাবাকে কারনিভল খোয়াতে বাধ্য করা হচ্ছে। আমার জন্যে!

.

আমার নানী, রবি বললো। বাবাকে দেখতে পারে না, বিষণ্ন হয়ে গেল। খুব ছোটবেলায় মা মরেছে আমার। অ্যাকসিডেন্ট। মায়ের স্নেহ পাওয়ারও সুযোগ। হয়নি আমার... গলা ধরে এলো তার।

দুঃখ করো না, রবি, সান্তনা দিলো কিশোর। তোমার বাবা আছে, আমার তো তা-ও নেই। দুজনেই মারা গেছে মোটর দুর্ঘটনায়।

এক মুহূর্ত অস্বস্তিকর নীরবতার পর রবি বললো, নানী বাবাকে দেখতে পারতো না, তার কারনিভলও পছন্দ করতো না। মা বাবাকে বিয়ে করুক, এটাও চায়নি। তাই বাবাকে দূষতে লাগলো নানী। বাবার জন্যেই নাকি মারা গেছে তার মেয়ে। বললো, কারনিভলে থাকা হতে পারে না আমার। মা মারা যাওয়ায় খুব দুঃখ পেয়েছিলো বাবা, কাজকর্ম ঠিকমতো করতো না, ফলে কারনিভলের অবস্থা শোচনীয় হয়ে গেল। নানী চাইলো আমি তার কাছে থাকি। মোটামুটি ধনীই বলা যায় তাকে। তা ছাড়া বাবা এক জায়গায় থাকতে পারে না, ব্যবসার খাতিরে যাযাবরের মতো ঘুরে বেড়াতে হয়। ছায়া নামলো রবির চেহারায়। যতোই বড় হলাম, নানীর ওপর বিতৃষ্ণা বাড়লো আমার। খারাপ নয় মহিলা, আমাকে অনেক আদর করে, কিন্তু আমি দেখতে পারি না। একটাই কারণ, দুনিয়ার সব কিছুতেই তার ভয়, আমাকে বাইরে বেরোতে দিতো না, কিছু করতে দিতো না। আমার ইচ্ছে বাবার কাছে কারনিভলে চলে যাই। নানী যেতে দেয় না। শেষে এ-বছরের গোড়ার দিকে পালিয়ে চলে এলাম বাবার কাছে। কি সাংঘাতিক, পাগলের মতো ছুটে এলো নানী। বাবাকে ভয় দেখালো, কেস করে দেবে। বাবা বললোঃ ঠিক আছে, রবি যদি যেতে চায়, আমার কোনো আপত্তি নেই, নিয়ে যান। আমি যেতে চাইলাম না। আইনত নানীও কিছু করতে না পেরে ফিরে গেল।

শাসিয়ে-টাসিয়ে গেছেন? জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

হ্যাঁ। বাবাকে বলে গেছে, আমাকে কিছুতেই কারনিভলে থাকতে দেবে না। মায়ের মতো মরতে দেবে না আমাকে। কোর্টে গিয়ে নালিশ করবে, আমার খাওয়া-পরা জোটানোর সাধ্য নেই বাবার। নানীর ভয়েই অনেকটা পালিয়ে ক্যালিফোর্নিয়ায় চলে এসেছে বাবা। প্রাণপণে খাটছে টাকা রোজগারের জন্যে, যাতে আদালতে নানীর নালিশ না টেকে। কিন্তু যে-হারে অ্যাকসিডেন্ট হচ্ছে, কারনিভলই খোয়াতে হবে বাবাকে!

তুমি সত্যি বিশ্বাস করো, তোমার নানী এসব করাচ্ছেন।

জানি না, কিশোর, ধীরে ধীরে বললো রবি, নানী করাচ্ছে ভাবতেও খারাপ লাগে আমার। বাবাকে দেখতে পারে না, কিন্তু আমাকে তো ভীষণ আদর করে। নানী ছাড়া বাবার শত্রু আর কে থাকবে, বলো?

একটা ব্যাপার পরিষ্কার, তোমার ক্ষতি চান না তোমার নানী। কিশোর যুক্তি দেখালো, দুর্ঘটনায় তোমারও ক্ষতি হতে পারতো। তিনিই যদি করাবেন, এসব কথা কি তিনি ভাবেননি? নিচের ঠোঁটে একবার চিমটি কাটলো সে। রবি, আমার বিশ্বাস, এরকম কিছু তিনি করাতে পারেন না। হয়তো অন্য শত্রু আছে তোমার বাবার, যার কথা তুমি জানো না। কার্নিভল ধ্বংস করার পেছনে অন্য কারণ থাকতে পারে।

কে করছে জানি না, কিশোর। তবে একথা ঠিক, শীঘ্রি তাকে ঠেকাতে না পারলে বাবাকে শেষ করে দেবে। ঐ তৃতীয় দুর্ঘটনার আশঙ্কায় আতঙ্কিত হয়ে আছে কারনিভলের সবাই।

ততীয়টা তো ঘটেই গেছে? অবাক হলো কিশোর।

মাথা নাড়লো রবি। না, কিরে বেরিয়ে যাওয়াটাকে দুর্ঘটনা ধরছে না ওরা। কারণ তাতে কারও কোনো ক্ষতি হয়নি। ক্ষতি নাহলে দুর্ঘটনা ধরা হয় না। কাজেই তৃতীয়টার অপেক্ষায় আছে।

খুব খারাপ কথা, রবিন বললো। সর্বনাশ হয়ে যাবে তো। আতঙ্ক নার্ভাস করে ফেলে মানুষকে, আর নার্ভাস হলে দুর্ঘটনা বেশি ঘটায় মানুষ।

একমত হলো কিশোর। এবং এসবের মূলে সার্কাসের লোকের কুসংস্কার। লোকে যেটার ভয় বেশি করবে, সেটাই বেশি ঘটবে।

কিন্তু রবিদের কারনিভলে তো অন্য ব্যাপার ঘটছে, মুসা মনে করিয়ে দিলো। আপনা-আপনি ঘটছে না। ঘটানো হচ্ছে।

সেটাই শিওর হওয়া দরকার, সেকেণ্ড, কিশোর বললো। একটা ব্যাপার মনে খচখচ করছে, কিঙের ছাড়া পাওয়াটা অন্য দুটো দুর্ঘটনার মতো নয়। প্যাটার্ন মিলছে না। ওদুটো ঘটার সময় কারনিভল খোলা ছিলো না। দর্শকদের ক্ষতি হওয়ার ভয় ছিলো না।

তাহলে এটা হয়তো আসলেই দুর্ঘটনা?

না। ছেড়েই দেয়া হয়েছে, জোর দিয়ে বললো গোয়েন্দাপ্রধান। কারনিভলে। যাওয়া দরকার রবি; এখন তো বন্ধ, আমরা ঢুকতে পারবো?

নিশ্চয় পারবে। আমি সবাইকে বলবো, রিহারস্যাল দেখতে এসেছে। তোমাদের কথা সবাই জানে এখন। বিশেষ করে মুসার কথা। কোনো অসুবিধে হবে না।

কি খুঁজবো আমরা, কিশোর? মুসার প্রশ্ন।

বলতে পারবো না। কড়া নজর রাখার চেষ্টা করবো, যাতে আরেকটা দুর্ঘটনা। ঠেকানো যায়। সাবধান থাকতে হবে আমাদের…, থেমে গেল হঠাৎ।
মেরিচাচী ডাকছেন। দ্রুত গিয়ে সর্ব-দর্শনে চোখ রাখলো মুসা।
রবিন, আবার ডাকলেন তিনি, জলদি বেরিয়ে এসো। তোমার মা ফোন করেছেন। ডাক্তারের কাছে নাকি যাবার কথা?
হায়, হায়, ডেন্টিস্ট। গুঙিয়ে উঠলো রবিন। ভুলেই গিয়েছিলাম!
ভ্রূকুটি করলো কিশোর। কাজে বাধা পড়লে রাগ লাগে তার। মেনে নিতে পারে না। জোরে নিঃশ্বাস ফেলে হাত নেড়ে বললো, কি আর করবে, নথি, যাও। তোমার জন্যে আমাদের বসে থাকা উচিত হবে না। আমি আর মুসা যাচ্ছি। সময়। নষ্ট হলে কখন কি করে বসে…ও হ্যাঁ, একটা দিনিজসপ্রে নিয়ে যাও। যোগাযোগ রাখতে পারবে আমাদের সঙ্গে।
কী সপ্রে! প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো মুসা।
দিনিজসপ্রে, শান্তকণ্ঠে বললো কিশোর। দিক-নির্দেশক ও জরুরী-সংকেত প্রেরক, সংক্ষেপে বাংলায় দিনিজসপ্রে, গর্বের হাসি হাসলো সে। কাল যেটা বানানো শুরু করেছিলাম তোমাকে নিয়ে, মাঝপথে তো চাচা এসে গামলা রঙ করতে দিলো। আজ সকালে বানিয়ে ফেলেছি। তবে মাত্র দুটো। আপাতত তাতেই চলবে। একটা রবিন নিয়ে যাক, আরেকটা আমরা নেবো। সুবিধে হবে। ওয়াকি টকি দেখলেই লোকে চিনে ফেলে। এটা দেখবেও না, আর দেখলেও সহজে চিনবে না।
ওই যন্ত্র দিয়ে কি হয়, কিশোর? জানতে চাইলো রবি।
ওটা? একধরনের হোমার বলতে পারো। নিজস্ব কিছু আবিষ্কার ঢুকিয়েছি ওটাতে। হোমার আমরা আগেও বানিয়েছি, ব্যবহার করেছি, তবে এখনকারটা আরও আধুনিক সুযোগ-সুবিধে বেশি। প্রথমেই ধরো, সিগন্যাল পাঠাবে এটা। শব্দ করবে। আরেকটা হোমার নিয়ে যতোই কাছে যাবে, বাড়বে শব্দ। একটা ডায়াল আছে, তাতে দিক-নির্দেশক কাটা আছে, যেদিক থেকে শব্দ আসবে সেদিকে ঘুরে যাকে কাটাটা। প্রতিটি দিনিজসপ্রেতে গ্রাহক আর প্রেরক, দুধরনের যন্ত্রই আছে। জরুরী অবস্থার জন্যে ছোট্ট একটা লাল আলোর ব্যবস্থা আছে এতে। সুইচ টেপার ঝামেলা নেই, ভয়েস অপারেটেড মুখে বললেই কাজ শুরু করবে। ধরো, আমাদের মধ্যে কেউ বিপদে পড়লো। আর কিছু করার দরকার নেই, শুধু বলতে হবে সাহায্য। ব্যস, অমনি অন্যদের দিনিজসপ্রের লাল আলো জ্বলতে নিভতে শুরু করবে, এক মুহূর্ত থেমে দম নিলো কিশোর। সব চেয়ে বড় সুবিধে, খুদে এই হোমারটা পকেটেই জায়গা হয়ে যাবে।

বিস্ময় চাপা দিতে পারলো না রবি। চেঁচিয়ে উঠলো, কি সাংঘাতিক, খুব কঠিন করে কথা বলো তুমি, কিশোর! …আর…আর, দুনিয়ার সব কিছুই করতে পারো, তাই না? সব কিছুতেই বিশেষজ্ঞ।
ইয়ে, রবি…, প্রশংসায় খুশি হয় কিশোর। কিন্তু এতো বেশি প্রশংসা করেছে রবি, কিশোর পাশাকেও লজ্জায় ফেলে দিয়েছে, সব কিছু পারা তো একজন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। অনেক কিছুই করার চেষ্টা করি আরকি। গোয়েন্দাগিরিতে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার চেষ্টা করি। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, আমাদের হোমারের সঙ্কেত শুধু আমাদের হোমারই ধরতে পারবে, অন্য কোনো যন্ত্র নয়। রেঞ্জ তিন মাইল।
ডাক পড়লো আবার।এই, রবিন, কোথায়? বেরোচ্ছো না? মেরিচাচী অধৈর্য হয়ে উঠেছেন। তুমি এসো। আমি অফিসে যাচ্ছি।
দাও, কোথায় তোমার দিনিজসপ্রে, কিশোরকে বললো রবিন। যতো তাড়াতাড়ি পারি ডাক্তার দেখিয়েই কারনিভলে চলে যাবো আমি।
বাইরে বেরিয়ে, অফিসে মেরিচাচীকে বলে সাইকেল নিয়ে রওনা হয়ে গেল রবিন। মুসা আর কিশোরও সাইকেল বের করলো। রবি সাইকেল নিয়েই এসেছে। তিনজনে চললো কারনিভলে।
খানিক আগেও রোদ ছিলো, এখন মেঘলা বাতাস। বাতাস বাড়ছে। দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ায় না হলে এই সেপ্টেম্বরের গোড়াতেই বৃষ্টি আশা করা যেতো। এখানে এখন বৃষ্টির সম্ভাবনা কম, কিন্তু সূর্যের মুখ ঢেকে দিয়েছে মেঘ। মন খারাপ-করা আলো।
কারনিভলের কাছে পৌঁছে সাইকেল থেকে নামলো কিশোর। অন্য দুজন। থামতে বললো, রবি, তুমি আগে যাও, আমাদের সাথে গেলে সন্দেহ করতে পারে। শুটিং গ্যালারির আশোঁপাশে কড়া নুজব রাখবে। মুসা মাঠের ওদিকে গিয়ে কর্মীদের রিহারস্যাল দেখবে, ওপাশটায় চোখ রাখবে। আমি টহল দেবো বুঁদ আর তাঁবু গুলোর কাছে। সন্দেহজনক সামান্যতম ব্যাপারও যেন চোখ না এড়ায়। ঠিক আছে?
রবি আর মুসা, দুজনেই মাথা ঝাঁকালো।

.

ডেন্টিস্টের ওখানে পৌঁছে দেখলো রবিন, রোগীর লাইন। তার ডাক চলে গেছে। কাজেই অপেক্ষা করতে হলো। অযথা বসে থাকা স্বভাব নয় তার। সামনের টেবিলে রাখা পত্র-পত্রিকা ঘাটতে লাগলো।
ম্যাগাজিন ওল্টানো শেষ করে দৈনিক পত্রিকা ধরলো। স্থানীয় পত্রিকা। রকি বীচ থেকে বেরোয়। কিং-এর ছাড়া পাওয়ার খবর আছে কিনা খুঁজলো। কোনোটাতে

নেই। তবে কারনিভল সম্পর্কে একটা প্রতিবেদন লিখেছে একটা পত্রিকা। বলা যায় এক ধরনের বিজ্ঞাপনঃ কারনিভলটা কতো ভালো, কতো কিছু দেখার আছে এতে, কতো মজা পাওয়া যাবে, এসব। এতো ছোট আর সাধারণ খবর নিয়ে এই বাড়াবাড়ি কেবল ছোট পত্র-পত্রিকাতেই সম্ভব। বিরক্ত হয়ে পত্রিকাটা রেখে দিয়ে আরেকটা তুলে নিলো সে। ওল্টাতেই ছোট বিজ্ঞাপনটা চোখে পড়লো। আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপনঃ

কানা বেড়াল আবশ্যক

বাচ্চাদের খেলাঘরের জন্য স্টাফ করা বেড়াল চাই।
লাল-কালো ডোরাকাটা হতে হবে, শরীরটা কিম্ভুত রকমের বাঁকা
এক চোখো, গলায় লাল কলার। ওরকম প্রতিটি বেড়ালের জন্যে
১০০ (একশো) ডলার দেয়া হবে।
অতি-সত্বর যোগাযোগ করুনঃ
রকি বীচ, ৫-১২৩৪।

নাড়ির গতি বেড়ে গেল রবিনের। ঠিক এরকম একটা বেড়াল নিয়েই কারনিভলে গোলমাল করেছিলো চোর, পুরস্কার পেয়েও হারিয়েছে মুসা। বিজ্ঞাপন ছিঁড়ে নিয়ে গিয়ে সোজা ডেন্টিস্টের চেম্বারে ঢুকলো রবিন। চেঁচিয়ে বললো, ডাক্তার সাহেব, আজ আমার দাঁত দেখানোর দরকার নেই! আরেকদিন! বলেই
বেরিয়ে এলো হতভম্ব ডেন্টিস্টের ঘর থেকে। সাইকেলের দিকে দৌড় দিলো।

.

মেঘাচ্ছন্ন ধূসর বিকেল একদম ভালো লাগে না মুসার। উত্তেজনা আছে বলেই তেমন খেয়াল করছে না এখন। একটা ঘন্টা যে কোন দিক দিয়ে কেটে গেছে, বলতেই পারবে না। মাঠের এখানে ওখানে ঘুরছে। রিহারস্যাল দেখছে কর্মীদের। নতুন একটা ভাঁড়ামি প্র্যাকটিস করছে দুই ভাঁড়। বেঁটে লোকটার হাতে একটা খাটো ঝাড়ু, লম্বার হাতে একটা ছোট বালতি। বেঁটে ভাড় ঝাড়ু দিয়ে ময়লা তুলে বালতিতে রাখছে, সেটা তুলে নিয়ে তার পেছন পেছন যাচ্ছে লম্বা। কিছু ময়লা জমলেই তার ভারে বালতির তলা খসে যাচ্ছে। বিশেষ কায়দায় আবার তলাটা লাগিয়ে ময়লাগুলো কুড়িয়ে রাখছে লম্বা। তোলার চেষ্টা করলেই আবার। খসে পড়ছে। ক্রমেই বিষণ্ন হচ্ছে তার চেহারা, আর বেঁটে লোকটা হাসছে। লম্বার দুর্গতি দেখে যেন খুব মজা পাচ্ছে বেঁটে।

তলোয়ারের মাথায় আটকানো তুলোর দলায় আগুন লাগিয়ে নির্দ্বিধায় মুখে পুড়ছে আগুনখেকো। চোখ বড় বড় করে দিচ্ছে মুসার। প্রতিবারেই সে ভাবছে, এইবার লোকটার মুখ পুড়বেই। কিন্তু পোড়ে না।

ভার উত্তোলন, আর মোটা বই টেনে ছেঁড়ার প্র্যাকটিস করছে স্ট্রং ম্যান কোহেন। তাকে সন্দেহ, তাই তার কাছেই বেশি সময় ব্যয় করছে মুসা। সন্দেহজনক কিছুই করছে না লোকটা।
সিংহের খাঁচায় কিংকে নতুন একটা খেলা শেখাচ্ছে মারকাস দ্য হারকিউলিস।
এই দুটো উঁচু খুঁটিতে বাঁধা তারের ওপর ভারসাম্য বজায়ের রোমাঞ্চকর খেলা খেলছে দুজন দড়াবাজ।
সবই দেখছে মুসা। এমন ভাব করছে, যেন শুধু ওসব দেখার জন্যেই এসেছে সে। কিছুই ঘটলো না মাঠে।
বুদ আর তাঁবুগুলোতে ঘোরাঘুরি করছে কিশোর। রাফনেক আর বুঁদ অপারেটররা রাতের জন্যে সেট সাজাচ্ছে, নষ্ট জিনিস মেরামত করছে। কোনো বুদ। কিংবা তাঁবুই বাদ দিলো না সে, কোনো কোনোটাতে কয়েকবার করে ঢুকলো। কিন্তু সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়লো না। ঘূর্ণমান নাগরদোলা দেখার জন্যে থেমেছে, এই সময় সেখানে এলো রবি। শুটিং গ্যালারিতে কাজ শেষ করে এসেছে।
নাগরদোলাটা টেস্ট করবে না, রবি? স্তব্ধ বিশাল চাকাটা দেখালো কিশোর, কাঠের ঘোড়াগুলো ঢেকে রাখা হয়েছে ক্যানভাস দিয়ে।
চালাতে অনেক খরচ। কারনিভল খোলার আগে চালু করি, একটা মাত্র টেস্ট রান দিয়েই চড়ার জন্যে ছেড়ে দিই।
ওটার জন্যে নিশ্চয় মেকানিক আছে? কিংবা অপারেটর?
আছে। বাবা নিজেই।
চিন্তিত দেখালো কিশোরকে। বিড়বিড় করে কি বললো সে-ই বুঝলো।
কিশোর, রবি বললো। রবিন এসে পড়েছে।
সাইকেল চালিয়ে মুসার কাছে গেল প্রথমে রবিন, তারপর দুজনে মিলে এলো কিশোরদের কাছে। এসেই বললো রবিন, কিশোর, কানা বেড়ালটা চাইছে!
কোনটা? আমরা যেটা হারিয়েছি? রবিনের মতোই চেঁচিয়ে বললো মুসা।
আমার মনে হয় না ওটা হারিয়েছে, গলা আরও চড়ালো রবিন। পকেট থেকে ছেঁড়া বিজ্ঞাপনটা বের করলো। চুরি হয়েছে! কিশোর, দেখো।
গোয়েন্দাপ্রধানকে ঘিরে দাঁড়ালো সবাই। পড়তে পড়তে চোখ উজ্জ্বল হলো। কিশোরের। নিশ্চয় মুসার কানাটার মতো। রবি, ওরকম বেড়াল মোট কটা পেয়েছিলে?
পাঁচটা। রকি বীচেই ছেড়েছি ওগুলো। মুসাকে দিয়েছিলাম শেষটা।
হুমম্, মাথা দোলালো কিশোর, প্রথমবারে চেষ্টা করেছিলো, নিতে পারেনি। দ্বিতীয়বারে সফল হয়েছে। হুঁ, মিলতে শুরু করেছে।

কী? রবিন জিজ্ঞেস করলো।
কানা বেড়ালটা কারও দরকার, নথি। হয়তো পাঁচটাই দরকার। কিংকে ছেড়ে দেয়ার কারণ বোঝা যাচ্ছে।
কি কারণ? মুসা জানতে চাইলো।
আমাদের নজর অন্যদিকে সরানোর জন্যে। প্রথমবার বেড়ালটা নিতে না পেরে পালিয়ে গিয়েছিলো লোকটা, সেই গোঁফ আর কালো চশমাঅলা। তারপর। ঘুরে এসে আবার ঢুকেছে শুটিং গ্যালারিতে, মুসাকে পুরস্কার জিততে দেখেছে। বুদ্ধি করে ফেলেছে তখনই। গিয়ে কিংকে বের করেছে। তোমরা বেরোতেই ওকে নিয়ে গিয়ে ঠেলে দিয়েছে তোমাদের সামনে। উদ্দেশ্য সফল হয়েছে তার। দুজন গেছে মারকাসকে খবর দিতে। মুসা বেড়াল ফেলে সিংহ সামলাতে ব্যস্ত। সেই সুযোগে ওটা তুলে নিয়ে চলে গেছে চোরটা।
খাইছে, কিশোর, নিশ্চয় দামি কিছু আছে বেড়ালটার ভেতর।
থাকার সম্ভাবনা বেশি, একমত হলো কিশোর। রবি, বেড়ালটার কোনো বিশেষত্ব আছে?
জানি না।
নিচের ঠোঁটে দুবার চিমটি কাটলো কিশোর। ভাবছে। অধীর হয়ে আছে অন্যেরা। ঠোঁট কামড়ালো একবার, সে, বললো, হতে পারে কোনো খেপাটে, সংগ্রহ করে রাখতে চাইছে তার সংগ্রহশালার জন্যে, বিজ্ঞাপন সে-ই দিয়েছে। : কিংবা হয়তো বিশেষ কিছু রয়েছে ওই বেড়ালগুলোর মধ্যে…
কাকাতুয়াগুলোর যেমন ছিলো? বলে উঠলো রবিন। ওই যে, তোতলা কাকাতুয়া…
হ্যাঁ, মাথা ঝোঁকালো কিশোর। দামি কিছু থাকতে পারে।…রবি, কারনিভল নিয়ে মেকসিকোতে গিয়েছিলে তোমরা? কিংবা সীমান্তের কাছে?
না, কিশোর। শুধু ক্যালিফোর্নিয়া।
মেকসিকোতে গেলে কি হতো? রবিন জানতে চাইলো।
স্মাগলিঙের কথা ভাবছি আমি, নথি। ওরকম জিনিসের ভেতর মাল লুকায়। চোরাচালানীরা, পুলিশের চোখ ফাঁকি দেয়ার জন্যে। রবি, বেড়ালগুলো কোত্থেকে কিনেছো?
শিকাগো। এক প্রাইজ সাপ্লাইয়ারের কাছ থেকে কিনেছে বাবা।
গাল চুলকালো কিশোর। যা-ই হোক; বেড়ালগুলোর বিশেষত্ব আছে। রবি, কাল রকি বীচে তোমাদের তৃতীয় দিন ছিলো, না? .
হ্যাঁ। মাত্র দুটো শো দিয়েছি। স্যান মেটিওতে দুই শো দেখিয়ে রাতারাতিই চলে এসেছি এখানে।

বেড়ালগুলো কবে থেকে দিতে শুরু করেছো?
এখানে এসে, পয়লা শো থেকেই। শেষটা দিয়েছি কাল রাতে, মুসাকে। সেটা পঞ্চম বেড়াল।
প্রথম রাতেই চারটে দিয়ে দিলে কেন? চারজনেই ফার্স্ট হলো?
কড়াকড়ি কম করেছিলাম সেরাতে। চারটে হাঁস ফেলতে পারলেই ফার্স্ট ধরেছিলাম। বিজ্ঞাপনের জন্যে করেছিলাম এটা। লোকে বাড়ি গিয়ে বলাবলি করবে, প্রাইজ দেখাবে। তাতে আরও বেশি লোক আসবে পরের শো-তে।
ফার্স্ট প্রাইজ কি শুধু বেড়ালই দিয়েছো?
এখানে এসে প্রথম শো-তে বেড়াল।
কাল দেখলাম, একটা ট্রেলারে রাখো প্রাইজগুলো। নিরাপদ?
সব সময় তালা দিয়ে রাখি। শো যখন বন্ধ থাকে, ট্রেলারটা এনে আমাদের, ট্রাকের সঙ্গে আটকে রাখি। বার্গলার অ্যালার্ম আছে, চুরির চেষ্টা হলেই বেজে, ওঠে। কতোবার যে ওটা চুরি ঠেকিয়েছে। বেশির ভাগই ছোট ছেলেমেয়ে। ট্রাকের কাছে এসে ঘুরঘুর করে, পুরস্কারের জিনিসগুলো খুব লোভনীয় ওদের কাছে। শো যখন চলে, ট্রেলারটা এনে বুদের পেছনে রাখি, তখনও তালা লাগিয়ে।
বোঝা যাচ্ছে, তোমাদের চোখ এড়িয়ে ট্রেলার থেকে বেড়াল চুরি করা খুব কঠিন।
হ্যাঁ। তালা ভাঙ্গা সহজ, কিন্তু জিনিস নিয়ে পালানো কঠিন। তালা ভেঙে জিনিস বের করে নিয়ে দৌড় দিতে দিতে দেখে ফেলবো।
হ্যাঁ, বললো গোয়েন্দাপ্রধান। দুই সহকারী যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, তীব্র গতিতে ঘুরছে তার মগজের বুদ্ধির চাকাগুলো। তাহলে, পাঁচটা কানা বেড়াল নিয়ে, স্যান মেটিও থেকে রওনা হয়েছিলে। সোজা এসেছে এখানে। স্যান মেটিও আর রকি বীচের মাঝে বেড়ালগুলো চুরি করা কঠিন ছিলো। এখানে এসেও ট্রেলার থেকে চুরি করতে পারেনি, কারণ, সেটাও কঠিন। চোখে পড়ার ভয়। এখানে শো করে প্রথমেই চারটে বেড়াল দিয়ে দিলে। বাকি থাকলো একটা। সেটা ছিনিয়ে নিতে চাইলো গোঁফওয়ালা, কালো চশমা পরা বুড়ো। ব্যর্থ হলো। মুসা পেয়ে গেল। বেড়ালটা। কিং ছাড়া পেলো, মুসা বেড়াল হারালো। এখন পেপারে বিজ্ঞাপনঃ ওরকম বেড়াল চায়।
সবই বুঝলাম। কিন্তু কেন চায়? কি মানে এসবের?
গোয়েন্দাপ্রধানের চোখে অদ্ভুত চাহনি। কিশোর পাশার এই চাহনির অর্থ। জানা আছে তার দুই সহকারীর-রহস্যের সমাধান করে ফেলেছে সে, কিংবা জরুরী কোনো তথ্য আবিষ্কার করেছে। তর্জনী নাচালো কিশোর। কাল রাতের আগে বেড়ালগুলো ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা হয়নি। দুটো সম্ভাবনা, স্পষ্ট হয়ে উঠছে তাতে।

চকচক করছে তার চোখ। হঠাৎ করে দামি হয়েছে ওগুলো। আর যার কাছে দামি, সে এই কারনিভলেরই কেউ।

কিন্তু, কিশোর, প্রতিবাদ জানালো রবি, ওরকম চেহারার কেউ নেই কারনিভলে। ছদ্মবেশ নেয়া সহজ ব্যাপার। পুরু গোঁফ, হ্যাট টেনে দিয়েছে, যাতে চেহারাটা ভালোমতো দেখা না যায়। তার ওপর কালো চশমা। আবছা আলোয়। আসল চেহারা বোঝা মুশকিল।

কারনিভলের লোক হলে ওভাবে নিতে আসবে কেন? প্রশ্ন তুললো মুসা। ট্রেলার থেকেই তো নিয়ে নিতে পারতো।

হ্যাঁ, তাই তো, রবিনও মুসার সঙ্গে সুর মেলালো। এতো চালাকির দরকার কি. ছিলো তার? কোনো এক ফাঁকে ট্রেলার থেকেই নিয়ে নিতে পারত। রবি খেয়ালই করতো না।

ট্রেলার থেকে নেয়ার চেষ্টা করেনি বলেই আমার সন্দেহ বেড়েছে, কিশোর জবাব দিলো। বাইরের কেউ হলে সে-চেষ্টাই কুরতো প্রথমে। কঠিন বুঝলেও করতো। আর চিনে ফেলবে, এই ভয়ও করতো না।

তাহলে?

ওই যে বললাম, কারনিভলেরই কেউ। তার জানা আছে, ট্রেলার থেকে নেয়া। প্রায় অসম্ভব। দেখে ফেললে মুশকিলে পড়বে, জবাবদিহি করতে হবে রবির বাবার। কাছে। সব চেয়ে বড় কথা, ওই বেড়ালসহ ধরা পড়লে অনেকেরই সন্দেহ হবে। ওগুলোতে দামি কিছু আছে।

ঠিক তাই। কানা বেড়ালের ওপর কারো নজর পড়ুক এটাই চায়নি সে। ভেতরের লোক নিলে স্পষ্ট হবে, জিনিসটা দামি। বাইরের কেউ নিলে, কাল। যেভাবে ছিনিয়ে নিতে চাইলো, মনে হবে লোকটা পাগল। কিংবা খেপাটে, সংগ্রহকারী। আর যা-ই ভাবুক, চোর ভাববে না কেউ।

কি সাংঘাতিক! ঊরুতে চাপড় মারলো রবি। হয়তো ঠিকই বলেছো। সন্দেহ যাচ্ছে না তার। মেনে নিতে পারছে না।

আমি জানি আমি ঠিক বলছি, ঠোঁটের এক কোণ কুঁচকালো কিশোর। শিওর হচ্ছি লোকটার অপেক্ষার ধরন দেখে। কাল রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করেছে সে, চুরি। করার জন্যে। কারনিভলের লোক বলেই সাবধান হতে হয়েছে তাকে, আর কারনিভলের লোক বলেই সময় নষ্ট করার ঝুঁকি নিতে পেরেছে। ঠিক সময়টা বেছে নিয়েছে, যখন বেড়াল করলে কারও সন্দেহ পড়বে না তার ওপর। কারনিভলের কারও পক্ষেই শুধু রবির ওপর সারাক্ষণ চোখ রাখা সম্ভব, ঝোপ বুঝে কোপ মারা সম্ভব। তবে কোপ মারতে বেশি দেরি করে ফেলেছে।

এই না বললে ঠিক সময়? মুসা ধরলো কথাটা।
কাজটা করেছে ঠিক সময়ই, তবে বেশি দেরি করেছে আরকি।
বুঝলাম না।
বুঝলে না? রকি বীচে আসার আগে বেড়ালগুলোকে ফার্স্ট প্রাইজ হিসেবে চালানোর কথা ভাবেনি রবি। আর কিছু না পেয়েই ওগুলোকে চালিয়েছে। পয়লা রাতেই পার করে দিয়েছে চারটে। তাতে চমকে গেছে চোরটা। সে ভাবেওনি এরকম কিছু একটা করে বসবে রবি। চারটে চলে যাওয়ার পর আর ঝুঁকি নিতে চায়নি চোর, তাড়াহুড়ো করেছে, যাতে পঞ্চমটাও হাতছাড়া না হয়ে যায়। দেরি করে করেছে বললাম এই জন্যে, আগের দিন চেষ্টা করলে চারটে না হোক, অন্তত আরও দুএকটা বেড়াল সে হাতাতে পারতো। পঞ্চমটাও ছুটে যাচ্ছে দেখে। বেপরোয়া হয়ে ওঠে সে, সিংহ ছাড়তেও দ্বিধা করেনি।
মুসার কাছে কিংকে নিয়ে যেতে হয়েছে, রবি বললো। যদি সত্যিই নিয়ে গিয়ে থাকে। আর তা করতে হলে করেছে এমন কেউ, যাকে কিং চেনে।
মারাত্মক ঝুঁকি নিয়েছে, সন্দেহ নেই, কিশোর বললো। তবে সফল হয়েছে। একটা বেড়াল অন্তত নিতে পেরেছে। এখন বিজ্ঞাপন দিয়েছে বাকিগুলোর জন্যে। হয় মুসার বেড়ালটা সঠিক বেড়াল নয়, যেটা সে খুঁজছে, নয়তো সবগুলোই তার দরকার।
মাথা দোলালো রবিন। হ্যাঁ, মনে হচ্ছে তোমার কথাই ঠিক। হঠাৎ করে। বেড়ালগুলো দামি হয়ে উঠেছে, একথা বললে কেন?
কারণ, স্যান মেটিওতে আগুন লাগার আগে ওগুলো নেয়ার চেষ্টা করা হয়নি। হতে পারে, আগুন লাগানোই হয়েছে বেড়ালগুলো নেয়ার জন্যে। পারেনি। রবি, স্যান মেটিওতে শুটিঙের সময় বের করেছিলে ওগুলো?
কয়েকটা। এমনি লোককে দেখানোর জন্যে। শো-কেসে সাজিয়ে রেখে ছিলাম। প্রাইজ দেয়ার ইচ্ছে ছিলো না।
কিশোর, রবিন বললো। তুমি বললে সুযোগের অপেক্ষায় ছিলো চোর। স্যান মেটিওতেই যদি নেয়ার চেষ্টা করে থাকে, তোমার যুক্তি গোলমাল হয়ে যাচ্ছে না?
মোটেই না। আমি বলেছি, ঠিক সময়ের অপেক্ষায় ছিলো সে। হয়তো স্যান মেটিওতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে আরেকটা ভালো সুযোগের জন্যে বসেছিলো। তবে। আগুন লাগার অন্য কারণও থাকতে পারে। সেই কারণটাই জানার চেষ্টা করবো। জানতে হবে, কেন, কে চায় কানা বেড়ালগুলো?
কি করে সেটা জানবো? মুসার প্রশ্ন।
ভাবলো কিশোর। তুমি থাকবে। এমন কোথাও, যেখানে বসে কারনিভল থেকে কে কে বেরোয় সব দেখতে পাবে। তোমাকে যেন না দেখে।

আমার ওপরই এই গুরুদায়িত্ব?
আবারও বলছি, চোর এই কারনিভলেরই লোক, মুসার কথা কানে তুললো কিশোর। একশো ডলার কম না, লোকে সাড়া দেবেই। বেড়াল আনার জন্যে বেরোতেই হবে চোরকে। অবশ্য তার কোনো সহকারী না থাকলে। নেই বলেই মনে হয় আমার। একাই করছে যা করার। সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়তে পারে। তোমার। রবিন, দিনিজসপ্রেটা দিয়ে দাও ওকে। আমারটা আমার কাছেই থাক।
যাচ্ছো নাকি কোথাও? রবি জিজ্ঞেস করলো। আমি আসবো?
তা আসতে পারো। জলদি জলদি করতে হবে আমাদের।
কোথায় যাচ্ছো তোমরা? আমাকে একা ফেলে? প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো মুসা।
তার প্রশ্নের জবাব দেয়ার প্রয়োজন মনে করলো না কেউ। ছুটতে শুরু করেছে। সাইকেলের দিকে। করুণ চোখে ওদের যাওয়া দেখলো মুসা। তারপর ঘুরলো। শেষ বিকেল। আরও মলিন হয়েছে ধূসর আলো। লুকানোর জায়গা খুঁজতে শুরু করলো সে। পরিত্যক্ত পার্কের একটা উঁচু বেড়ার ওপর চোখ পড়লো, কারনিভলের প্রবেশপথ থেকে বিশ গজমতো দূরে।
বেড়ার জায়গায় জায়গায় এখানে ফুটো, ফোকর। পুরনো, বিশাল নাগরদোলার ভারি স্তম্ভগুলোর মাথা বেড়া ছাড়িয়ে উঠে গেছে। ওখানে লুকানোই সব চেয়ে সুবিধেজনক মনে হলো মুসার। চট করে একবার চারপাশে চোখ বুলিয়ে নিলো সে। কেউ তাকিয়ে নেই তার দিকে, সবাই যার যার কাজে ব্যস্ত। আস্তে আস্তে বেড়ার কাছে সরে এলো সে।
কেউ দেখছে না তাকে, আরেকবার চেয়ে নিশ্চিত হয়ে নিয়ে বেড়ার একটা। ফোকরে মাথা ঢুকিয়ে দিলো সে। অন্যপাশে চলে এলো। নাগরদোলার স্তম্ভের মাঝের ফ্রেম বেয়ে উঠতে শুরু করলো। এমন একখানে এসে থামলো, যেখান থেকে কারনিভলের প্রবেশ পথ পরিষ্কার দেখা যায়।
মোটা একটা লোহার ডাণ্ডার ওপর পা ঝুলিয়ে বসলো সে। গা ছমছমে অনুভূতি। চারপাশের বিষণ্নতা যেন হা করে গিলতে আসছে তাকে। ঠাণ্ডা বাতাসে বিচিত্র ক্যাচকোচ আওয়াজ করছে ভাঙা, পুরনো কাঠের কাঠামো, নীরব শূন্যতা সইতে না পেরে যেন গুঙিয়ে উঠছে মাঝে মাঝে, সেই সঙ্গে মিলিত হচ্ছে জোর বাতাসের দীর্ঘশ্বাস। মুসার মনে হলো, উঁচু ওই বেড়াটা ওপাশের জীবন্ত পৃথিবী থেকে আলাদা করে দিয়েছে তাকে।
মাথার অনেক ওপরে উঠে গেছে স্তম্ভগুলো, কালচে ধূসর আকাশ ছুঁড়ে বেরিয়ে যাওয়ার হুমকি দিচ্ছে যেন। স্তম্ভ আর বেড়ার মাঝের পোড়ো ফান হাউসটাকে কেমন ভূতুড়ে লাগছে। ওটার প্রবেশ পথ দেখে মনে হয়, মস্ত দৈত্যের হাঁ করা মুখে রঙ মাখিয়ে দিয়েছে। কেউ হাসছে নীরব হাসি। ডানে, সাগরের ধারে লাশ হয়ে

পড়ে আছে বুঝি টানেল অভ লাভ। মানুষের তৈরি ওই সুড়ঙ্গের দেয়ালে অসংখ্য ফোকর। সরু মুখের কাছে গড়িয়ে যাচ্ছে ছোট ছোট ঢেউ, একসময় ওখানে বাধা থাকতো অনেক নৌকা, টিকেট কেটে লোকে চড়তো ওগুলোতে, ঘুরে আসতো সাগর থেকে।

বড় একা লাগছে মুসার। সতর্ক হয়ে উঠলো হঠাৎ। কারনিভলের গেট দিয়ে। লম্বা লম্বা পায়ে বেরিয়ে যাচ্ছে একজন। রকি বীচের বাণিজ্যিক এলাকার দিকে চলে গেল লোকটা। চেনা চেনা লাগলো তাকে। পরনে ধোপদুরস্ত শহুরে পোশাক, দূর থেকে ম্লান আলোয় চিনতে পারলো না লোকটাকে মুসা।

কোহেন না তো? চওড়া কাঁধই তো, নাকি? দাড়িও আছে না মুখে? তবে এলোমেলো লম্বা চুল দেখা গেল না, হ্যাঁটের জন্যেই বোধহয়। পরনে কালো সোনালি পাজামাও নেই, কাজেই শিওর হতে পারলো না মুসা।

খানিক পরেই আরেকজনকে বেরোতে দেখা গেল। লম্বা। ওকেও চেনা চেনা লাগলো, কিন্তু চিনতে পারলো না মুসা। সান্ধ্য পোশাক পরে মারকাস দ্য হারকিউলিস গেল না তো?

দমে গেল মুসা। পঞ্চাশ-ষাট গজ অনেক দূর। এতো দূরে বসা উচিত হয়নি। পোশাক বদলে বেরোলে এখান থেকে দেখে কারনিভলের একজন কর্মীকেও চিনতে পারবে না সে। স্থান নির্বাচন যে ভুল হয়ে গেছে, নিশ্চিত হলো আরও দুজন বেরোনোর পর। তৃতীয়জনও লম্বা, মনে হলো বয়স্ক, ধূসর চুল। চতুর্থজনকে চিনতে পারলো শুধু মাথার টাকের জন্যে, আগুন খেকো। তবে চতুর্থ লোকটার ব্যাপারেও কিছুটা সন্দেহ রয়ে গেল। টাকমাথা আর কি কেউ থাকতে পারে না?

নেমে, জায়গা বদল করে বসবে কিনা ভাবতে ভাবতেই আরও অনেকে। বেরিয়ে গেল। নিশ্চয় রিহারস্যালের সময় শেষ। বাইরে বেরোচ্ছে তাই কারনিভলের লোকেরা। ওদেরকে চিনতে পারলেও খুব একটা লাভ হতো না, বুঝতে পারলো মুসা। অনেকেই তো বেরোচ্ছে। কজনকে সন্দেহ করবে?

অবশেষে সত্যি সত্যি একজনকে চিনতে পারলো। মিস্টার কনর। দ্রুত হেঁটে গিয়ে একটা ছোট গাড়িতে উঠে চলে গেলেন।

নড়েচড়ে বসলো মুসা। ভাবছে। নামবে? গিয়ে খুঁজে বের করবে বন্ধুদের? নাকি যেখানে আছে, বসে থাকবে আরও কিছুক্ষণ?

সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না।

বাতাস বাড়ছে। সেই সঙ্গে বাড়ছে পুরনো নাগরদোলার ক্যাঁচকোঁচ আর গোঙানি।

.

আগে আগে চলেছে কিশোর। দুই সঙ্গীকে নিয়ে যাচ্ছে স্যালভিজ ইয়ার্ডে।

ইয়ার্ডে ঢুকে, ওদেরকে দাঁড়াতে বলে সাইকেল রেখে গিয়ে জঞ্জালের গাদায়। ঢুকলো সে।
সাইকেলে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে জঞ্জালের ভেতর জিনিসপত্র ঘাঁটা আর ছুঁড়ে ফেলার আওয়াজ শুনতে লাগলো ররিন আর রবি।
করছেটা কি? রবি বুঝতে পারছে না।
জানি না, রবিনও পারছে না। আগে থেকে কিছু বলতে চায় না কিশোর, স্বভাব। কাজ শেষ করে তারপর বলে। কি করছে সে-ই জানে।
দুড়ুম-দাড়ুম আওয়াজ হচ্ছে জঞ্জালের গাদায়। রেগে গিয়ে সব যেন ছুঁড়ে ফেলছে কিশোর। অবশেষে শোনা গেল উল্লসিত চিৎকার, হাসিমুখে বেরিয়ে এলো সে-। হাতে একটা অদ্ভুত জিনিস। ওখান থেকেই চেঁচিয়ে বললো, জানতাম পাবো। পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে সব মেলে।
কিশোর কাছে এলে জিনিসটা চিনতে পারলো অন্য দুজন। স্টাফ করা একটা বেড়াল। সাদার ওপর কালো ফোঁটা। তিনটে পা ছিঁড়ে ঝুলছে, একটা নেই-ই। একটা চোখ খসে পড়েছে। চামড়া ফেটে ভেতরের তুলা-ছোবড়া সব বেরিয়ে পড়েছে।
এটা দিয়ে কি হবে? রবি জিজ্ঞেস করলো!
বিজ্ঞাপনের জবাব দেবো, হাসি-চওড়া হলো কিশোরের।
কিন্তু ওটা তো কানা বেড়ালের মতো না! হাত নাড়লো রবিন।
না তো কি হয়েছে? হয়ে যাবে। এসো।
দুই সুড়ঙ্গ দিয়ে হেডকোয়ার্টারে ঢুকলো ওরা। ছোট একটা ওয়ার্কবেঞ্চে বসলো কিশোর। ফিরে চেয়ে বললো, রবিন, ফোন করে জিজ্ঞেস করো তো, কোথায় যেতে হবে।
রবিন রিসিভার তোলার আগেই কাজে হাত দিলো কিশোর। রঙ, ব্রাশ, সুই সুতো, কাপড়, তুলা, তার, আর দ্রুত রঙ শুকানোর কেমিক্যাল বের করলো। তিনটে পা মেরামত করে সেলাই করলো জায়গামতো, নতুন আরেকটা পা বানিয়ে লাগালো, শরীরের ছেঁড়া জায়গা সেলাই করলো। টিপে, চেপে বাঁকা করলো বেড়ালটাকে। পা-গুলো বকিয়ে দিলো। তারপর রঙ করতে শুরু করলো।
ফোন শেষ করে ফিরে এলো রবিন।
কি বললো? মুখ তুললো না কিশোর, বেড়ালের গায়ে ব্রাশ ঘষছে।
একটা আনসারিং সার্ভিসের নাম্বার ওটা, রবিন জানালো। তেত্রিশ স্যান। রোকুইওয়েতে যেতে বললো। এখান থেকে মাত্র দশ বুক দূরে।
গুড। অনেক সময় আছে। অ্যানসারিং সার্ভিসের সাহায্য নিয়েছে, তার কারণ, বিজ্ঞাপন দেয়ার সময় লোকটার কোনো ঠিকানা ছিলো না।

আধ ঘন্টা পর সন্তুষ্ট হয়ে ব্রাশ রাখলো কিশোর। একটা কলারে লাল রঙ করে পরিয়ে দিলো বেড়ালের গলায়। ব্যস, হয়েছে, লাল-কালো ডোরাকাটা কানা। বেড়াল। পা ঠিকমতো বাকা হয়েছে তো? হয়েছে। তবু, চোখ থাকলে চিনে। ফেলবে। কাজ চালানো যাবে আশা করি।
আমার কাছেও রবির বেড়ালের মতো লাগছে না, রবিন বললো।
না লাগুক। গিয়ে অন্তত দেখাতে পারবো, বেড়াল এনেছি।
পনেরো মিনিট পর, ৩৩ স্যান রোকুই ওয়ে-র সীমানায় পাম গাছের একটা জটলায় ঢুকলো তিন কিশোর। ইটের তৈরি ছোট একটা বাড়ি, রাস্তা থেকে দূরে। রঙচটা একটা সাইনবোর্ড বুঝিয়ে দিলো, একসময় ওটা এক ঘড়ি মেরামতকারীর অফিস-কাম-বাড়ি ছিলো। মেঘলা বিকেলে অস্বাভাবিক নির্জন লাগছে বাড়িটা। জানালায় পর্দা নেই, ভেতরে আলো জ্বলছে না।
তবে রাস্তা নির্জন নয়। দলে দলে আসছে ছেলেমেয়েরা। হাতে, বগলের তলায় স্টাফ করা বেড়াল। নানা জাতের, নানা রঙের, নানা ধরনের। যার কাছে যা আছে, নিয়ে এসেছে, বিজ্ঞাপনের সঙ্গে মিলুক না মিলুক। একশো ডলার অনেক টাকা, বিক্রির জন্যে সবাই উদ্বিগ্ন।
বেশির ভাগই তো মেলে না, রবিন বললো। তবু এনেছে।
লোকে কিছু না দিয়েই টাকা নিতে চায়, তিক্তকণ্ঠে বললো রবি। শুটিং গ্যালারি চালাই তো, লোকের স্বভাব-চরিত্র আমার জানা।
ওরা ভাবছে, কিশোর বললো। ওদেরটা পছন্দ হয়ে যেতেও পারে। হলেই কড়কড়া একশো ডলার। একটার দামও দশের বেশি হবে না, নব্বই ডলারই লাভ।
এই সময় নীল একটা গাড়ি ঢুকলো বাড়ির আঙিনায়, ঘুরে চলে গেল ওপাশে। গাড়ি থেকে নেমে দ্রুত হেঁটে গিয়ে দরজার সামনে দাঁড়ালো একজন লোক। দূর। থেকে তার চেহারা ভালোমতো দেখলো না ছেলেরা, চিনতে পারলো না।
দরজার তালা খুলে ভেতরে ঢুকলো লোকটা। হুড়মুড় করে ঢুকতে শুরু করলো। ছেলেমেয়ের দল।
গাছের আড়ালে হুমড়ি খেয়ে থাকতে থাকতে উত্তেজিত হলো রবি। আমরা কি করবো, কিশোর?
নীল গাড়িটা চিনেছো? জবাব না দিয়ে প্রশ্ন করলো কিশোর।
আরেকবার তীক্ষ্ণ চোখে দেখলো রবি। না। আগে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। কারনিভলের সবার গাড়িই এরচে বড়, ট্রেলার টানতে হয় তো!
বেশ, মাথা কাত করলো কিশোর। আমরা দুজন এখানে থাকছি। বেড়াল নিয়ে রবিন যাক। কয়েক মিনিট পর আমরা একজন গিয়ে কাছে থেকে দেখবো গাড়িটা। হুশিয়ার থাকতে হবে আমাদের, যাতে দেখে না ফেলে। চোরটা যাতে

বুঝতে না পারে কেউ তাকে সন্দেহ করেছে, পিছু নিয়েছে। কারনিভলের লোক, হলে তোমাকে চিনবেই।
আমি গিয়ে কি কি করবো? রবিন জিজ্ঞেস করলো।
বেড়াল বিক্রির চেষ্টা করবে। হয়তো কিনবে না সে। না কিনুক। তোমার। আসল কাজ হবে, তার চেহারা দেখে আসা। জেনে আসা, বেড়াল নিয়ে কি করে সে।
বেশ, যাচ্ছি, আবার সাইকেলে চাপলো রবিন।
বেড়ালটা বগলে চেপে, সাইকেল চালিয়ে এসে বাড়ির দরজায় থামলো সে। সাইকেল স্ট্যাণ্ডে তুলে মিশে গেল ছেলেমেয়েদের স্রোতে। = বড় একটা হলঘরে ঢুকলো। বাচ্চারা গিজগিজ করছে ওখানে। আসবাব। বলতে কয়েকটা কাঠের চেয়ার, আর একটা লম্বা টেবিল। টেবিলের ওপাশে বসে আছে একজন মানুষ, চেয়ার-টেবিলের বেড়ার ওপাশে আত্মগোপন করতে চাইছে। যেন। এক এক করে বেড়াল নিয়ে পরীক্ষা করছে। ও
দুঃখিত, বললো সে। এই তিনটে চলবে না। খসখসে কণ্ঠস্বর। বিজ্ঞাপনেই বলেছি কেমন বেড়াল চাই।...না, তোমার ওটাও চলবে না, সরি।
আরেকটা বেড়াল নিয়ে এগিয়ে গেল একটা ছেলে। হাত বাড়িয়ে বেড়ালটা প্রায় কেড়ে নিলো লোকটা। ওরকম জিনিসই পুরস্কার জিতে আবার হারিয়েছে মুসা। লোকটার বাহুতে একটা টাট্টু আঁকা দেখলো রবিন, পালতোলা একটা জাহাজের ছবি, স্পষ্ট।
গুড, লোকটা বললো। এই জিনিসই চাই। এই নাও তোমার একশো ডলার।
রবিনের কানে ঢুকছে না যেন কথা। ভাবছে, ওই লোকটা কি কারনিভলের কেউ?, তাহলে নিশ্চয় চিনতে পারবে রবি। ওই টাট্টু তার চোখে না পড়ার কথা নয়। বাদামী চামড়ার লোক, সোজা তাকালো রবিনের দিকে। এই, এই ছেলে, তুমি। দেখি এদিকে এসো, তো।
চমকে গেল রবিন। তাকে কি সন্দেহ করলো লোকটা? দুরুদুরু বুকে এগিয়ে গিয়ে বেড়ালটা রাখলো টেবিলে। ওটার দিকে একবার চেয়েই হাসলো লোকটা। হু, মেরামত করা হয়েছে। মন্দ না। আমার বাচ্চারা পছন্দ করবে। এই নাও, তোমার টাকা।
থ হয়ে গেল রবিন। হাত বাড়িয়ে নিলো একশো ডলার, বিশ্বাস করতে পারছে না। চেয়ে আছে লোকটার দিকে। কিন্তু লোকটা গুরুত্ব দিলো না তাকে। আরেকটা ছেলের দিকে তাকালো।
টেবিলের কাছ থেকে সরে এলো রবিন। দেখলো, টেবিলের ধারে মেঝেতে বেড়ালের স্তূপ। তারটা সরিয়ে রাখা হয়েছে একপাশে। ওটার সঙ্গে ওরকম আরও

একটা। খানিক দূরে রাখা আরও দুটো, মুসা যেটা পুরস্কার পেয়েছিলো অবিকল সেরকম।
ধীরে ধীরে পাতলা হয়ে আসছে ভিড়। অস্বস্তি লাগছে রবিনের। বেরিয়ে যাবে, না থাকবে?- কিছুই তো জানা হলো না এখনও, যায় কি করে? আবার থাকলেও যদি সন্দেহ করে লোকটা? ঝুঁকি নেয়াই ঠিক করলো সে। থাকবে আরও কিছুক্ষণ।
দেখো, খোকা, ওরকম বেড়াল চাইনি আমি, নাছোড়বান্দা একটা ছেলেকে বোঝাচ্ছে লোকটা। দেখতে পাচ্ছি তোমারটা ভালো, কিন্তু আমি অন্য জিনিস চাই। বাচ্চাকে বড়দিনের উপহার দেবো। আমার পছন্দ না হলে দিই কি করে, তুমিই বলো? ছেলেটাকে চওড়া হাসি উপহার দিলো সে। হাত নাড়তে আবার পাল-তোলা-জাহাজটা চোখে পড়লো রবিনের।
কি জিনিস চান, বুঝতে পারছি, ছেলেটা বললো। ওই দুটোর মতো তো? একটার খবর আপনাকে দিতে পারি। আমার বন্ধু ডিক ট্যানারের কাছে আছে। কারনিভলে পুরস্কার পেয়েছে।
তাই? ভুরু কুঁচকে গেল লোকটার, ঠোঁট সামান্য ফাঁক। নিশ্চয় আমার বিজ্ঞাপন দেখেনি। আমার হাতেও আর সময় নেই, শুধু আজকের দিনটাই।
গিয়ে তাহলে কথা বলুন ওর সাথে, ছেলেটা বললো। আমাদের বাড়ির কাছেই থাকে। টোয়েন্টি ফোর কেলহ্যাম স্ট্রীট।
এহহে, দেরি হয়ে গেল, হঠাৎ যেন তাড়াহুড়া বেড়ে গেল লোকটার। ক্ষণিকের জন্যে তাকালো রবিনের দিকে। জ্বলে উঠলো না? নাকি চোখের ভুল? ঠিক বুঝতে পারলো না রবিন। অল্প কয়েকটা ছেলে রয়েছে আর ঘরে। ওরা যতোক্ষণ থাকে, সে-ও থাকবে, সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো।
আরেকটা ছেলের কাছে একটা লাল-কালো ডোরাকাটা কানা বেড়াল কিনলো লোকটা। আর কারও কাছে নেই ওরকম বেড়াল। হাত নেড়ে সবাইকে বেরিয়ে যেতে বললো লোকটা। বাধ্য হয়ে বেরিয়ে আসতে হলো রবিনকে। সাইকেল নিয়ে তাড়াতাড়ি চললো পাম গাছগুলোর কাছে।
অনেকক্ষণ থাকলে, রবি বললো।
জানার চেষ্টা করলাম, হাত দিয়ে কপালের ঘাম মুছলো রবিন। লোকটা লম্বা, বাদামী চামড়া, বাহুতে একটা পাল-তোলা-জাহাজের টাট্টু। কারনিভলের কেউ?
পাল-তোলা-জাহাজ? চিবুক ডললো রবি। না, ওরকম কেউ তো নেই। কয়েকজন রাফনেকের হাতে টাট্টু আছে, তবে জাহাজ নয়। আর চেহারাও...নাহ, মেলে না কারও সাথে।
চিন্তিত লাগছে কিশোরকে। কারনিভলে হয়তো লুকিয়ে রাখে, বললো সে। আর মেকআপ নিয়ে মুখের রঙ বদলানোও কিছু না। রবিন, রবি গিয়ে ওর গাড়িটা

দেখে এসেছে। কোনো সূত্র পায়নি। লাইসেন্দ্র নম্বর লিখে নিয়েছি।
আসল কথাটাই বলিনি এখনও, কিশোর। ও আমাদের বেড়াল কিনেছে।
বাড়ি পড়লো যেন কিশোরের মাথায়। কিনেছে! নকলটা!
পকেট থেকে একশো ডলার বের করে দেখালো রবিন। এই যে, টাকা। ওরকম দেখতে আরও চারটে কিনেছে। তারমধ্যে তিনটে আসল মনে হলো।
তোমাকে চিনেছে?
কি করে? আগে কখনও দেখা হয়নি তো।
কাল রাতের চোরটাই না তো? নিজেকেই করলো প্রশ্নটা। যদি সে হয়, আর তোমাকে চিনে থাকে, তাহলে আমাদের বোকা বানানোর জন্যেই কিনেছে বেড়ালটা।
আসল তাহলে তিনটে পেয়েছে? রবি বললো।
আরও একটার খোঁজ দিলো একটা ছেলে। কারনিভলে নাকি পুরস্কার পেয়েছে। থাকে চব্বিশ নম্বর কেলহ্যাম স্ট্রীটে। নাম ডিক ট্যানার।
এটাই আসল খবর, রবিন! চুটকি বাজালো কিশোর। তিনটে কিনেছে, আমার ধারণা, চার নম্বরটাও কিনতে যাবে। আমরাও যাবো ডিকের বাড়িতে। তার আগে দেখি বেড়াল তিনটে নিয়ে লোকটা কি করে...
কিশোর, বলে উঠলো রবি। শেষে যে ছেলেটা ঢুকেছিলো, সে-ও বেরোচ্ছে।
ছেলেটার বগলে একটা সাদা বেড়াল। বিক্রি করতে পারেনি। লোকটাকেও দেখা গেল দরজায়। আর কেউ আসছে কিনা বোধহয় দেখতে বেরিয়েছে। নির্জন। পথে চোখ বোলালো, তারপর ঢুকে গেল আবার ভেতরে।
এসো, বলে, উঠে দাঁড়ালো কিশোর।
কালচে হয়ে আসছে ধূসর গোধূলি। পা টিপে টিপে বাড়িটার কাছে চলে এলো ওরা। সাবধানে মাথা তুলে লিভিং রুমের জানালা দিয়ে সাবধানে ভেতরে তাকালো।
আগের জায়গাতেই বসা লোকটা। সামনে টেবিলে রেখেছে এখন তিনটে কানা বেড়াল, যেগুলো মুসারটার মতো দেখতে। একটা বেড়াল হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে শুরু করলো।
হ্যাঁ, ওগুলোই পুরস্কার দিয়েছি, ফিসফিসিয়ে বললো রবি।
ওই যে, দুটো ফেলে রেখেছে, কিশোর বললো। কোণের দিকে দেখো।
রবি আর রবিনও দেখলো। দুটোই নকল। তার একটা রবিন নিয়ে গিয়েছিল।
ফেলে দিয়েছে, আবার বললো কিশোর। তারমানে তোমারগুলোই চায়, রবি।
শশশ! হুঁশিয়ার করলো রবিন।

তৃতীয় বেড়ালটাও দেখা শেষ করেছে লোকটা। রেখে দিয়েছে টেবিলে। হাতে বেরিয়ে এসেছে ইয়া বড় এক ছুরি।

.

নড়তে ভুলে গেছে যেন ছেলেরা। ছুরিহাতে উঠে দাঁড়িয়েছে লোকটা। আচমকা, একটা বেড়াল টেনে নিয়ে পোঁচ মারলো। চিরে ফেললো পেট। দ্বিতীয়টার চিরলো। তৃতীয়টারও। তারপর টেনে টেনে বের করতে লাগলো ভেতরের তুলা, ছোবরা, কাঠের গুঁড়ো। সমস্ত কিছু ছড়াতে লাগলো টেবিলে। ছোবড়া আর তুলার। ভেতর খুঁজতে লাগলো কি যেন।

জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ছে। ছুরিটা টেবিলে ফেলে হতাশ ভঙ্গিতে বসে পড়লো চেয়ারে। কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ছেঁড়া বেড়ালগুলোর দিকে, পারলে চোখের আগুনেই ভস্ম করে ফেলে।

পায়নি, ফিসফিস করে বললো রবিন।

না, কিশোর বললো। ডিকেরটার ভেতরে থাকতে পারে। চলো, চলো, ও বেরোবে! কুইক!

লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে লোকটা। হাত বাড়ালো চেয়ারে রাখা হ্যাঁটের দিকে।

কাছেই হিবিসকাসের গোটা তিনেক ঘন ঝোপ। ওগুলোর ভেতরে এসে প্রায়। হুমড়ি খেয়ে পড়লো তিনজনে। বেরিয়ে, দরজা লাগিয়ে দ্রুত পায়ে এগিয়ে এলো। লোকটা। ঝোপের দিকে চোখ তুলে তাকালো না। লম্বা পা ফেলে হারিয়ে গেলে বাড়ির আড়ালে। গাড়ির দরজা বন্ধ করার শব্দ হলো। স্টার্ট নিলো, ইঞ্জিন। শা করে ছুটে বেরিয়ে গেল নীল গাড়িটা।

বেড়াল নিতে যাচ্ছে! রবিন বললো।

চলো, আমরাও যাই, বললো রবি।

আমাদের সাইকেল, ওর গাড়ি। আর কেলহ্যাম স্ট্রীট এখান থেকে পাঁচ মাইল। তোমাদের কারনিভলের কাছাকাছি।

হতাশ দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে তাকালো ওরা।

কিছুই করতে পারছি না আমরা! গুঙিয়ে উঠলো রবিন। কিশোর, কিছু একটা করো!

কি করবো? ঝোপ থেকে বেরোলো কিশোর। থমথমে চেহারা। বাড়িটার দিকে চেয়ে হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। পারবো হয়তো! দেখো দেখো, টেলিফোনের তার! বলতে বলতেই দৌড় দিলো সে। দরজা দিয়ে ঢুকতে পারলো না। তালা লাগানো।

জানালা! চেঁচিয়ে উঠলো রবি।

লিভিং রুমের জানালার পাল্লায় ঠেলা দিতেই খুলে গেল। এক এক করে। চৌকাঠে উঠে টপাটপ ভেতরে লাফিয়ে পড়লো তিনজনে।
ফোনটা কোথায় দেখো! তাগাদা দিলো কিশোর। সবখানে খোজো!
ওই যে, কিশোর, হাত তুলে দেখালো রবি। ওই যে, ঘরের কোণে মেঝেতে রেখে দিয়েছে।
ছুটে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসলো কিশোর। ছোঁ মেরে রিসিভার তুলে কানে ঠেকালো। আস্তে করে আবার ক্রেডলে রেখে দিয়ে মাথা নাড়লো। নষ্টহ্! ফেস করে ছাড়লো ফুসফুঁসে চেপে রাখা বাতাস।
হলো না তাহলে? রবিন বললো।
জানি না, নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটলো কিশোর। সাইকেল নিয়ে যেতে পারি-লাভ হবে বলে মনে হয় না। বাড়িতে লোক না থাকলে অবশ্য…
না থাকলে কি বসে থাকবে মনে করেছো? তালা ভেঙে ঢুকে নিয়ে যাবে।
কাছেপিঠে পাবলিক টেলিফোন নেই? রবি জিজ্ঞেস করলো।
গুঙিয়ে উঠলো কিশোর। তাই তো! আমার মগজ ভোঁতা…, কথা শেষ না করেই থেমে গেল।
বাইরে পায়ের শব্দ, এগিয়ে আসছে। তাড়াতাড়ি গিয়ে জানালা দিয়ে উঁকি দিলো রবিন। ঝট করে মাথা নুইয়ে ফেললো আবার। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে এসে জানালো, লোকটা ফিরে এসেছে!
চলো বেরিয়ে যাই, উদ্বিগ্ন হয়ে বললো রবি।
সময় নেই, মৃদু কাঁপছে রবিনের কণ্ঠ।
আঙুল তুলে দরজা দেখালো কিশোর, পেছনের ঘরে ঢোকার। দৌড়ে গিয়ে ঢোকার সময় ধাক্কাধাক্কি লাগিয়ে দিলো ওরা। আগে ঢুকলো রবি, পেছনে রবিন, সবার শেষে কিশোর। ছোট ঘর। আসবাবপত্র কিছু নেই। জানালায় খড়খড়ির। জন্যে আলো আসতে পারছে না। তাড়াতাড়ি দরজাটা লাগিয়ে দিয়ে ওটা ঘেঁষে। দাঁড়ালো ওরা।
লিভিং রুমের দরজা খোলার শব্দ হলো, বন্ধ হলো।
দীর্ঘ নীরবতা।
তারপর ছেলেদের চমকে দিয়ে খলখল করে হেসে উঠলো লোকটা। খসখসে গলায় বললো, খুব চালাক, না? অতি চালাকের গলায় দড়ি, ভুলে গেছো!
একে অন্যের দিকে তাকালো ওরা।
আবার শোনা গেল হাসি। তিন-তিনটে মাথা জানালায়, ভেবেছো দেখিনি? আরও সাবধানে উঁকি দেয়া উচিত ছিলো। তোমাদের অনেক আগে দুনিয়ায়। এসেছি, বাছারা, চোখ পেকেছে, কান পেকেছে। তিন বুদু, বোকামির শাস্তি পাবে এখন।

দরজায় তালা লাগানোর শব্দ হলো। তারপর আরেকটা ভারি ধাতব শব্দ, লোহার দণ্ড আড়াআড়ি ফেলে পাল্লা আটকানো হয়েছে, যাতে তালা ভাঙলেও দরজা খুলতে না পারে। নাও, থাকো এখন, বললো খসখসে কণ্ঠ। একটা কথা মনে রেখো। আর আমার ধারেকাছে আসবে না। হাসলো না আর। দূরে সরে গেল পদশব্দ। দড়াম করে বন্ধ হলো সামনের দরজা। ভারি নীরবতা যেন চেপে বসলো ছোট্ট বাড়িটার ওপর।
জানালা, বললো কিশোর। গিয়ে খড়খড়ি তুলেই থমকে গেল। শিক লাগানো। বিড়বিড় করলো, নিশ্চয় এটা ঘড়ি মেকারের স্টোররুম ছিলো!
জানালা খুলে চেঁচাই, রবিন বললো।
গলা ফাটিয়ে চেঁচালো ওরা। কেউ শুনলো না। কেউ এলো না। রাস্তা অনেক দূরে, বাড়িঘর আরও দূরে। ওদের চিৎকার কারও কানে গেল না। কয়েক মিনিট পর পা ছড়িয়ে মেঝেতেই বসে পড়লো রবি। জানালা খোলায় ঘরে আলো এসেছে। এই প্রথম. চোখে পড়লো আরেকটা দরজা।
ছুটে গেল কিশোর। লাভ হলো না। ওটাও শক্ত করে আটকানো, তালা দেয়া।
আমাদের দৌড় এখানেই শেষ, হতাশ কণ্ঠে বললো রবি। বেড়ালটা নিয়ে যাবে সে। আটকাতে পারবে না।
এখনও আশা আছে, বলে উঠলো কিশোর। দিনিজসপ্রে! মুসা আমাদের বিপদ সঙ্কেত পাবে।
পকেট থেকে খুদে হোমারটা বের করলো গোয়েন্দাপ্রধান। মুখের কাছে এনে জোরে জোরে বললো, সাহায্য! সাহায্য!
খুব মৃদু গুঞ্জন শুরু করলো যন্ত্রটা।
লাল আলো জ্বলবে এখন মুসার হোমারে, বললো কিশোর। সত্যিই শুনবে তো– তিনজনে একই কথা ভাবছে। সাহায্য করতে আসবে ওদেরকে?

.

ডাণ্ডার ওপরই বসে আছে মুসা। পর্বত থেকে আসা কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস সুচের মতো বিধছে চামড়ায়। কাপ তুলে দিচ্ছে গায়ে। আকাশ মেঘলা থাকায় সন্ধ্যার আগেই সন্ধ্যা নামছে। প্রবেশ পথের লোকজন এখন শুধু ছায়া।
যারা যারা বেরিয়েছে, তাদের একজনকেও ফিরতে দেখেনি। অথচ কারনিভলে শো শুরু হতে আর মাত্র ঘন্টাখানেক বাকি। গেল কোথায় সবাই? কিশোর, রবিন আর রবিই বা কোথায় গেল? কারনিভল খোলার আগেই তো রবির ফেরার কথা। কিশোর বা রবিনেরও এতো দেরি করার কথা নয়, অন্তত একটা মেসেজ তো পাঠানো উচিত ছিলো।
উদ্বিগ্ন হলো মুসা।

মাঝে মাঝে কিশোর এমন আচরণ করে, না, রাগ লাগে তার। কোথায় যাচ্ছে, বলে গেলে কি ক্ষতি হতো বাবা? না, সব কাজ শেষ করে, সফল হয়ে এসে তারপর বলা! যত্তোসব! তার এসব নাটকীয়তার কারণে আগে অনেকবার বিপদে পড়েছে তিন গোয়েন্দা, তা-ও স্বভাব বদলাতে পারে না। গিয়ে খোঁজ করবে?
করাই উচিত। মাটিতে নামলো মুসা। ফান হাউসের বিশাল মুখটা তার দিকে চেয়ে যেন ব্যঙ্গ করে হাসছে এই ভর সন্ধেবেলা। দ্রুত ওটার পাশ কাটিয়ে এসে মাথা গলিয়ে দিলো বেড়ার ফোকরে।
কারনিভলে নাগরদোলার ঘোড়াগুলোর ক্যানভাস সরানো হয়েছে। বাজনা বাজছে। বুদে পাওয়া গেল না রবিকে। ঠোঁট কামড়ালো মুসা। কোথায় গেছে? কানা বেড়াল কেনার বিজ্ঞাপন দিয়েছে যে, তার বাড়িতে দুজনকে নিয়ে যায়নি তো কিশোর? কিন্তু তাহলেও কি এতো দেরি করার কথা?
হয়তো জরুরী কোনো কাজে আটকে গেছে, মনকে বোঝালো মুসা। আসবে। কারনিভল খোলার আগেই চলে আসবে। আর এসেই প্রথমে মুসাকে খুঁজবে, তার রিপোর্ট শুনতে চাইবে। তাকে না পেলে চিন্তা করবে...
এই সময় মনে পড়লো হোমারটার কথা। পকেটেই তো রয়েছে। বিপদে পড়লে জরুরী সঙ্কেত পাঠাবে কিশোর।
তাড়াতাড়ি পকেট থেকে যন্ত্রটা বের করলো মুসা। নাহ, নীরব। লাল আলোও জ্বলছে না।
.
মেঝেতে বসে মুখ তুলে গোয়েন্দাপ্রধানের দিকে তাকালো রবি। সিগন্যাল কতদূর। যাবে, কিশোর?
তিন মাইল, বলেই আরেকবার গুঙিয়ে উঠলো কিশোর। উঁহুহু, কারনিভল এখান থেকে পাঁচ মাইল। মুসা আমাদের সঙ্কেত পাবে না।
আবার একে অন্যের দিকে তাকালো ওরা।
আবার চেঁচালে কেমন হয়? রবিন পরামর্শ দিলো। কেউ না কেউ, একসময় না একসময় আমাদের চিৎকার শুনতে পাবেই।
যদি ততোক্ষণ গলায় জোর থাকে আমাদের, বললো কিশোর। শোনো, বেরোনোর উপায় আমাদেরকেই করতে হবে। বিশেষজ্ঞরা বলেন, এমন কোনো ঘর নেই, চেষ্টা করলে যেটা থেকে বেরোনো যায় না। কোথাও না কোথাও দুর্বলতা, থাকেই। সেটা পাই কিনা, খুঁজে দেখি।
কিন্তু কোথায় খুঁজবো? রবি বললো।
হয়তো কিছু একটা মিস করেছি আমরা। রবিন, দেয়ালগুলো দেখো তুমি। পাইপ গেছে যেখান দিয়ে, সেসব জায়গা ভালোমতো দেখবে। আমি জানালাগুলো

দেখছি। রবি, তুমি দরজা দেখো। কোণের আলমারিটাও বাদ দেবে না।
নতুন উদ্যমে কাজে লাগলো ওরা।
কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই আবার দমে গেল রবি। দরজাগুলো আগের মতোই লাগলো তার কাছে, কোথাও দুর্বলতা পেলো না। দেয়ালে কিছু পেলো না রবিন।
থামলে কেন? চালিয়ে যাও, উৎসাহ দিলো কিশোর। চালিয়ে যাও। কিছু না। কিছু পাওয়া যাবেই।
জানালার প্রতিটি ইঞ্চি পরখ করছে গোয়েন্দাপ্রধান। চার হাতপায়ে ভর দিয়ে এখন দেয়ালের নিচের অংশ দেখছে রবিন।
আলমারির ভেতরে খুঁজছে রবি। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো, দেখে যাও! দেখে যাও! হাতে একপাতা টাইপ করা কাগজ, আলমারিতে পেয়েছে। কারভিলের ইটিনর্যারি। কোথায় কোথায় যাবে, কোনখান থেকে কোনখানে, সেই তালিকা। আমাদেরটার। ক্যালিফোর্নিয়ার পুরো শিডিউল রয়েছে।
তাহলে এই লোকটা তোমাদের কারনিভলেই কেউ, নিজের যুক্তির স্বপক্ষে প্রমাণ পেয়ে খুশি হলো কিশোর।
কিংবা ওদের কারনিভলকে অনুসরণ করছে, অন্য যুক্তি দেখালো রবিন।
রবি, জিজ্ঞেস করলো কিশোর। লোকটার গলা চিনেছো? কথা যে বললো, চেনা চেনা লাগলো?
না কখনও শুনিনি।
মিনিটখানেক চুপ করে রইলো কিশোর, ভাবলো। গলাও হয়তো নকল। করেছে। খসখসে ভাবটা কেমন যেন মেকি।
রবি আর রবিন দুজনেই গিয়ে আলমারিতে খুঁজতে লাগলো আবার। কয়েকটা তাকে মলাটের বাক্স আর পুরনো হার্ডবোর্ড বোঝাই। এক তাকে অদ্ভুত একটা পোশাক পেয়ে টেনে বের করলো রবিন। দেখো তো, এটা কি? আমি চিনতে পারলাম না।
কালো কাপড়ে তৈরি, আলখেল্লার মতো একটা পোশাক, তবে ঢোলা নয়, আঁটো। কাঁধের সঙ্গে জোড়া দেয়া হুড–তাতে মাথা, কান, গাল সব ঢেকে যায়, শুধু মুখের সামনের দিকটা খোলা থাকে।
ভুরু কোঁচকালো কিশোর। কারনিভলের পোশাক-টোশাক না তো? রবি?
অবাক হয়ে পোশাকটা দেখছে রবি। নীরবে-এগিয়ে এসে হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলো। ইতিমধ্যে তাক থেকে একজোড়া জুতো বের করলো। রবিন। ওগুলো অদ্ভুত। কালো ক্যানভাসে তৈরি, রবারের সোল। তলাটা বিচিত্র, অনেকটা সাকশন কাপের মতো দেখতে।
দেখে আরও অবাক হলো রবি।

কি, চিনেছো? কিশোর জিজ্ঞেস করলো।
মাথা নাড়লো রবি। আমাদের কারনিভলে কেউ পরে না, কিন্তু, আবার মাথা নাড়লো সে। বলতে দ্বিধা করছে। ঠিক শিওর না, তবে যদূর মনে পড়ে, মাছিমানব টিটানভ পরতো ওরকম পোশাক।
কী মানব? রবিন অবাক।
মাছিমানব। আমি তখন ছোট, নানীর কাছে থাকি। শিকাগোর এক ছোট সার্কাসে পার্টটাইম কাজ করতো বাবা। টিটানভ শো দেখাতো তখন ওই সার্কাসে। তার শো আমি দেখেছি। বেশিদিন থাকতে পারেনি ওখানে। চুরির দায়ে চাকরি যায়। পরে শুনেছি, জেলে গেছে। হয়তো আবারও চুরি করে ধরা পড়েছিলো পুলিশের হাতে।
জেল! কিশোর বললো। টাট্টু আঁকা লোকটার সঙ্গে তার চেহারার মিল আছে?
চেহারা মনে নেই। তবে বয়েসের মিল আছে। মাছিমানবের পোশাক ছাড়া দেখিনি তো কখনও..
এই পোশাকটা কি ঠিক ওরকম?
হ্যাঁ। জুতোগুলোও। এরকম জুতো ছাড়া খেলা দেখাতে পারে না। মাছিমানবেরা। তলায় সাকশন কাপ দেখছে না, উঁচু দেয়াল বেয়ে উঠতে কাজে লাগে। প্রায় যে-কোনো দেয়াল…
কিন্তু রবির কথাই কানে ঢুকছে না কিশোরের। আনমনে বিড়বিড় করলো, সেদিনের সেই বুড়ো চোর…পার্ক থেকে গায়েব হয়ে গেল…উঁচু বেড়া ডিঙিয়ে… তুড়ি বাজালো। ঠিক! মাছিমানবের পক্ষেই সম্ভব!
জন্তুজানোয়ারও সামলাতে পারতো টিটানভ, আরেকটা জরুরী তথ্য জানালো রবি। সিংহও।
জলদি বেরোতে হবে এখান থেকে! মাথা ঝাড়া দিলো কিশোর। নইলে বেড়ালটা হাতিয়ে নিয়ে যাবে চলে। আর ধরা যাবে না। চেঁচাও, চেঁচাও! ফাটিয়ে ফেলো গলা!
জানালার কাছে সমবেত হয়ে আবার চিৎকার শুরু করলো ওরা।

.

ইস, এখনও আসছে না কেন কিশোররা? উৎকণ্ঠা বাড়ছে মুসার। শেষে আর থাকতে না পেরে মনস্থির করে ফেললো, খুঁজতেই বেরোবে।
আধঘন্টা পর সাইকেল চালিয়ে স্যালভিজ ইয়ার্ডে ঢুকলো সে। সন্ধ্যা ঘনিয়েছে। বোরিসকে দেখা গেল, ছোট ট্রাকটা থেকে মাল নামাচ্ছে। নামানো প্রায়। শেষ।
সাইকেল থেকে না নেমেই জিজ্ঞেস করলো মুসা, বোরিসভাই, কিশোর আর রবিনকে দেখেছেন?
না তো! সারাদিনই দেখিনি। কিছু হয়েছে?

বুঝতে পারছি না। আমি…
মুসা, হাত তুললো বোরিস। কিসের আওয়াজ? ভোমরা ঢুকেছে নাকি তোমার পকেটে?
উত্তেজিত না থাকলে আগেই খেয়াল করতো মুসা। বোলতায় কামড়ালো যেন তাকে। ঝট করে পকেটে হাত ঢুকিয়ে বের করে আনলো যন্ত্রটা। সিগন্যাল! চেঁচিয়ে উঠলো সে, বোরিসভাই, বিপদে পড়েছে ওরা! জলদি চলুন।
একটাও প্রশ্ন করলো না আর বোরিস। প্রায় লাফিয়ে গিয়ে উঠলো ট্রাকের ড্রাইভিং সীটে। সাইকেল রেখে মুসা গিয়ে বসলো তার পাশে। ইয়ার্ডের গেট দিয়ে। ছুটে বেরোলো ট্রাক।
মুসার হাতে হোমার। দিকনির্দেশ করছে কাঁটা। পথ বাতলে দিতে লাগলো বোরিসকে, বায়ে, বোরিসভাই…আবার বায়ে…এবার সোজা…
পথের ওপর বোরিসের দৃষ্টি, মুসার নজর যন্ত্রের ডায়ালে। উড়ে যেতে পারলে যন্ত্রের কাটা একদিকেই নির্দেশ করতো। যেহেতু মাটি দিয়ে যেতে হচ্ছে, পথ সরাসরি যায়নি, ঘোরাঘুরি হচ্ছে, ফলে কাটাও একবার ডানে, একবার বায়ে সরছে।
বলে যাচ্ছে মুসা, ডানে, বোরিসভাই–বাঁয়ে…আবার বায়ে…এবার ডানে!
ধীরে ধীরে বাড়ছে যন্ত্রের শব্দ।
এখানেই! মুসা বললো। কাছাকাছিই হবে কোথাও!
নির্জন একটা পথে এসে পড়েছে ট্রাক। এই সন্ধেবেলা একটা লোককেও দেখা গেল না রাস্তায়। ধীরে চালাচ্ছে এখন বোরিস। মুসার নজর পথের দুপাশে। কাউকে দেখলো না, কোনো নড়াচড়া নেই। আবার তাকালো কাঁটার দিকে।
ডানে, বোরিসভাই। এখানেই আছে কোথাও।
কিছু তো দেখছি না, মুসা! উদ্বেগে ভরা বোরিসের কণ্ঠ।
দাঁড়ান, দাঁড়ান! চেঁচিয়ে উঠলো মুসা। পিছে, পেছনে যান! বেশি এগিয়ে। গেছি!
ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষলো বোরিস। ট্রাকটা পুরোপুরি নিশ্চল হওয়ার আগেই ব্যাক-গীয়ার দিলো। বিকট শব্দে প্রতিবাদ জানালো ইঞ্জিন, পিছাতে শুরু করলো গাড়ি।
পথ থেকে দূরে ছোট হঁটের বাড়িটা দেখালো মুসা। বোরিসভাই, আমার মনে হয় ওখানে।
গাড়ি পার্ক করে লাফ দিয়ে নামলো বোরিস। মুসাও নামলো। বাড়িটার দিকে দৌড় দিলো দুজনে।

.

কয়েক মিনিট পর, হাসিমুখে বেরিয়ে এলো কিশোর, রবিন আর রবি। দরজা ভেঙে ফেলেছে বোরিস আর মুসা মিলে।

খাইছে! হেসে বললো মুসা। কিশোর, তোমার দিনি…দিনি…
দিনিজসপ্রে।
হ্যাঁ। দিনি…দিনি… বাংলা শব্দটা কিছুতেই উচ্চারণ করতে না পেরে রেগে গেল মুসা।
ধ্যাত্তোর, নিকুচি করি দিনিফিনির! সহজ নাম রাখো।…হ্যাঁ, যা বলছিলাম, হোমারটা সত্যি কাজে লাগলো। এতো তাড়াতাড়ি…
এই, কে তোমরা! ধমকের সুরে বলে উঠলো কেউ।
ফিরে তাকালো ওরা। রাস্তার দিক থেকে আসছে ছোটখাটো একজন মানুষ। কাছে এসে আবার ধমক দিলো, এখানে কি? হায় হায়রে,আমার দরজা-টরজা সব ভেঙে ফেলেছে! আদালতে পাঠাবো আমি তোমাদেরকে! জেলের ভাত খাওয়াবো!
লোকটার মুখোমুখি হলো কিশোর। শান্তকণ্ঠে বললো, সরি স্যার, ইচ্ছে করে ভাঙিনি। একটা বাজে লোক আমাদের এখানে এনে বন্দি করেছিলো। বাইরে থেকে। তালা লাগিয়ে চলে গেল। বহুত চিল্লাচিল্লি করেছি, কেউ শোনেনি। লোকটার হাতে টাট্টু আঁকা, পাল-তোলা-জাহাজের ছবি, কালো চামড়া। কোন দেশী, বলতে পারবো না। চেনেন? আপনার ভাড়াটে?
আটকে রেখেছে? টাট্টু? কি বলছো তুমি, ছেলে? বৃদ্ধ বললো। আজ সকালে এক ভদ্রলোককে ভাড়া দিয়েছি। দেখে তো সহজ-সরল মানী লোক মনে হলো। বুড়ো মানুষ। কোথায় নাকি সেলসম্যানের চাকরি করে। টাট্ট তো দেখিনি! যা-ই হোক, ব্যাপারটা রহস্যময় মনে হচ্ছে। পুলিশে রিপোর্ট করবো আমি।
হ্যাঁ, তাই করুন, স্যার। পুলিশকেই জানানো দরকার। দেরি না করে এখুনি। যান, প্লীজ।
মাথা ঝাঁকালো লোকটা। দ্বিধা করলো, ঘুরে আবার ফিরে চাইলো, তারপর আবার ঘুরে হাঁটতে শুরু করলো রাস্তার দিকে।
লোকটা কিছুদূর এগিয়ে গেলে কিশোর বললো, চলো, আমরাও যাই। তাড়াতাড়ি করলে এখনও হয়তো ধরা যায় ব্যাটাকে। বোরিসভাই, চব্বিশ নম্বর। কেলহ্যাম স্ট্রীট। কুইক!
.
সাগরের ধারে পুরনো, বড় বড় সব বাড়ি। পথের দুধারে গাছপালা, কড়া রোদেও নিশ্চয় ছায়া থাকে। নীল গাড়িটা দেখলো না ছেলেরা।
জানতাম, ব্যাটাকে ধরা যাবে না, নিরাশ কণ্ঠে বললো মুসা।
হ্যাঁ, অনেক দেরি করিয়ে দিলো, সুর মেলালো মুসা।

কোনো কারণে ওর দেরি হলেই বাঁচি, আশা করলো, কিশোর। পথের। মাথায়, ওই বাড়িটাই বোধহয় চব্বিশ নম্বর। ইস, অন্ধকারও হয়ে যাচ্ছে। যান। এগোন।
তিনতলা সাদা একটা বাড়ি। চারপাশে বড় বড় গাছ। বাগানে ফুলের বেড। ড্রাইভওয়েতে একটা গাড়ি, সেই নীল গাড়িটা নয়। মোড় নিয়ে সেদিকে চললো। বোরিস, এই সময় আলো জ্বললো বাড়ির ভেতরে।
এইমাত্র এলো? কিশোর তাকিয়ে আছে সেদিকে, লোকজন কে আছে দেখতে চায়। এর
বাড়ির সামনে এনে গাড়ি রাখলো বোরিস।
মহিলাকণ্ঠের চিৎকার শোনা গেল বাড়ির ভেতর থেকে, চোর! চোর। ধরো! ধরো!
এক ঝটকায় ট্রাকের দরজা খুলে লাফিয়ে নামলো বোরিস।
ছেলেরাও নামলো হুড়াহুড়ি করে। মুসা চেঁচিয়ে বললো, নিশ্চয় টাট্টুওলা!
দৌড় দিয়েছে বোরিস.। পেছনে ছেলেরা ছুটলো।
একনাগাড়ে চেঁচিয়ে চলেছেন মহিলা।
দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে যেন দাঁড়িয়ে গেল মুসা। হাত তুলে দেখালো বাড়ির একপাশে। আবছা অন্ধকারে সবাই দেখলো, খাড়া দেয়াল বেয়ে নেমে আসছে। একজন মানুষ। কি ধরে নামছে, সে-ই জানে। কয়েক ফুট বাকি থাকতে লাফিয়ে পড়লো মাটিতে, জানালা দিয়ে আসা আলোর মাঝে। কোনো ভুল নেই, সেই লোকটা। বগলে লাল-কালো ডোরাকাটা কানা বেড়াল।
ও-ব্যাটাই! চেঁচালো রবিন। বেড়ালটা পেয়ে গেছে।
ধরো, ধরো চোরটাকে! রাগে চিৎকার করে উঠলো রবি।
রবির গলা শুনে ফিরে তাকালো লোকটা। ছেলেদের দেখলো, বোরিসকে দেখলো, তারপর ঘুরে দিলো দৌড়। একদৌড়ে গিয়ে ঢুকে গেল বাড়ির পেছনে গাছপালার ভেতরে।
খেপা ষাঁড়ের মতো গোঁ গোঁ করতে করতে পিছু নিলো বোরিস। কিন্তু বিশালদেহী ব্যাভারিয়ানের তুলনায় লোকটা অনেক দ্রুতগতি। বোরিস আর ছেলেরা গাছের জটলার ভেতরে থাকতেই রাস্তায় উঠে গেল সে।
বোরিসকে ছাড়িয়ে গেল মুসা, রাস্তায় উঠলো। পেছনে হাঁপাতে হাঁপাতে আসছে অন্যেরা। সবাই দেখলো, রাস্তার পাশে রাখা নীল গাড়িটাতে উঠলো চোর। ইঞ্জিন স্টার্ট নিলো, শাঁ করে বেরিয়ে গেল গাড়ি।
নাহ, পারলাম না! দাঁড়িয়ে পড়লো মুসা।
গেল! পাশে এসে দাঁড়ালো রবি।
যাবে কোথায়? আশা ছাড়তে পারছে না রবিন। লাইসেন্স নম্বর আছে, পুলিশ খুঁজে বের করে ফেলবে।

তাতে সময় লাগবে, নথি, গোয়েন্দাপ্রধানের কণ্ঠে হতাশার সুর। তবে তাড়াতাড়িতে কোনো সূত্র ফেলে গিয়ে থাকতে পারে। চলো, বাড়ির ভেতরে চলো। দেখি খুঁজে। ৩

বাড়ির কাছে এসে দেখলো, সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে আছেন একজন সুন্দরী মহিলা, পেছনে একটা ছেলে। দলটাকে দেখে সতর্ক হলেন তিনি, চোখে সন্দেহ। চোরটাকে চেনো তোমরা?

চিনি, ম্যাডাম, কিশোর বললো। পাজী লোক। এ-বাড়িতে আসবে, জানতাম। তাই পিছে পিছে এসেছি। দেরি না হলে…

তোমরা চোর ধরতে এসেছো? বিশ্বাস করতে পারছেন না মহিলা। ওরকম। একটা ক্রিমিন্যালকে? তোমরা তো ছেলেমানুষ।

কালো হয়ে গেল কিশোরের চেহারা। এই ছেলেমানুষ কথাটা শুনলে মেজাজ খারাপ হয়ে যায় তার। বয়েস কম হলেই যেন বুদ্ধিশুদ্ধি থাকতে নেই, ক্ষমতা থাকতে পারে না, অবহেলার যোগ্য। আমরা ছেলেমানুষ সন্দেহ নেই, ম্যাডাম, ইচ্ছে থাকলেও কণ্ঠের ঝাঁঝ পুরোপুরি চাপতে পারলো না সে। কিন্তু অনেক বুড়ো মানুষের চেয়ে আমরা অভিজ্ঞ, অন্তত চোর ধরার ব্যাপারে। শুধু চোর নয়, ঝানু। ঝানু ডাকাত, ধরেছি। …আপনি নিশ্চয় মিসেস ট্যানার?

তুমি কি করে নাম জানলে? মহিলা অবাক।

চোরটা যে এখানেই আসবে, জানতাম, মহিলার প্রশ্নের জবাব দেয়ার প্রয়োজন মনে করলো না কিশোর। তার কপাল ভালো, আটকে ফেলেছিলো আমাদেরকে। এখানে এসে ওকে পাবো, তা-ই আশা করিনি। তা আপনি বোধহয়। এই এলেন?

হ্যাঁ, ডিককে নিয়ে বাইরে বেরিয়েছিলাম। কয়েক মিনিট আগে এসেছি। এসেই ওপরে চলে গেল সে। গিয়েই চিৎকার শুরু করলো।

দশ-এগারোর বেশি না ছেলেটার বয়েস। বললো, চিৎকার করবো না তো কি। সিঁড়িতে দেখি চোরটা, ঘাপটি মেরে ছিলো। আমাকে দেখেই নেমে এসে আমার হাত থেকে বেড়ালটা কেড়ে নিলো!

ওটা নিয়েই বেরিয়েছিলে নাকি? জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

হ্যাঁ। পুরস্কার পেয়েছি তো, বন্ধুদের দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলাম।

এই জন্যেই। বোঝা গেল, মাথা দোলালো কিশোর। এজন্যেই এতো দেরি করেছে। খুঁজেছে, বেড়ালটা পায়নি। বসেছিলো। যেই তোমার হাতে দেখেছে, খাবলা মেরে নিয়ে পালিয়েছে।

ডিকের হাত থেকে নিয়ে নামছিলো, আমাকে দেখে আবার উঠে গেছে, মিসেস ট্যানার বললেন। বোধহয় দোতলার জানালা দিয়ে বেরিয়েছে।

বেরিয়ে দেয়াল বেয়ে নেমেছে, মুসা বললো।

মাছিমানবের মতো, যোগ করলো রবিন।
ডিক, জিজ্ঞেস করলো কিশোর। বেড়ালটার ভেতরে কিছু পেয়েছো? ছিলো?
কি করে জানবো? আমি কি খুলেছি নাকি?
কথাটা ঠিক। কেন খুলতে যাবে ডিক?
যা দরকার, নিয়ে পালিয়েছে, আফসোস করলো রবিন। আর শয়তানটাকে খুঁজে পাবো না।
লাইসেন্স নম্বর তো আছে, মুসা বললো। পাবো না কেন?
পেতে সময় লাগবে, মুসা,একই কথা আরেকবার বললো কিশোর। এখন…
এখন আর আমাদের কিছু করার নেই, বাধা দিয়ে বললো বোরিস। পুলিশকে ফোন করো।
পুলিশকে? কিশোরের ইচ্ছে নেই। কিন্তু বোরিসভাই…
কোনো কিন্তু নয়। এখুনি যাও, ফোন করো। লোকটা আস্ত বদমাশ। কখন যে কি করে বসে ঠিক নেই। পুলিশকে অবশ্যই জানানো দরকার।
রবিনও বোরিসের সঙ্গে একমত হয়ে বললো, ঠিকই, কিশোর, এখন আর। আমাদের কিছু করার নেই।
করো না, মুসাও বললো। মিস্টার ফ্লেচারকেই ফোন করে সব কথা বলো।
দীর্ঘশ্বাস ফেললো কিশোর। ঝুলে পড়লো কাধ। বেশ, হাতের তালু চুলকালো সে। মিসেস ট্যানার, আপনার ফোনটা ব্যবহার করা যাবে?
নিশ্চয়। করো।
দল বেঁধে ঘরে ঢুকলো সবাই। কিশোরই ফোন করলো থানায়। পুলিশ চীফ, ইয়ান ফ্লেচারকে পাওয়া গেল। শুনে বললেন, আসছেন। লাইন কেটে রিসিভার হাতে রেখেই রবিনকে বললো কিশোর, এক কাজ করো না। তোমার বাবাকে, ফোন করে জিজ্ঞেস করো, কারনিভলের কোনো কর্মচারী অনুপস্থিত কিনা।
অনুপস্থিত? কি সাংঘাতিক, কিশোর, তোমাকে আগেই বলেছি, ওরকম টাই ওলা কেউ নেই আমাদের কারনিভলে।
ছদ্মবেশ নেয়া কঠিন কিছু না। হাতের টাট্টু ঢেকে রাখাও সহজ।
হু। ঠিক আছে, করছি। বাবাকে পাওয়া মুশকিল হবে। শো-এর সময় এখন, নিশ্চয় খুব ব্যস্ত। তবু, দেখি।
হ্যাঁ, দেখো, রবিন বললো।
ডায়াল করে রিসিভার কানে ধরে রইলো রবি। ওপাশে রিঙ হয়েই চলেছে, ধরছে না কেউ। বললাম না পাওয়া যাবে না। অফিসে নেই। বক্স অফিসে বলে দেখি, ডেকে আনতে পারে কিনা।

পুলিশের সাইরেন শোনা গেল। রিসিভার তখনও কানেই ঠেকিয়ে রেখেছে। রবি। বাড়ির বাইরে এসে থামলো গাড়ি। কয়েকজন পুলিশ নিয়ে ঢুকলেন ইয়ান ফ্লেচার।
সংক্ষেপে তাকে সব জানালো ছেলেরা।
যাক, নম্বর রেখে কাজের কাজ করেছে, চীফ বললেন। পাওয়া যাবে। তা, বেড়ালগুলো কেন চায়, বুঝেছো?
না, স্যার, রবিন বললো।
ভেতরে দামি কিছু থাকতে পারে, বললো মুসা। কিশোরের ধারণা, স্মাগলিং কেস।
মাথা ঝোঁকালেন চীফ। অসম্ভব না। ঠিক আছে, সীমান্ত রক্ষীদের হুশিয়ার করে দিচ্ছি, নীল গাড়িটা আর কানা বেড়াল দেখলেই যেন আটকায়, বলেই বেরিয়ে গেলেন তিনি।
তখনও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে রবি।
কিশোর চুপ করে আছে। বেড়ালের ভেতর কি আছে, জানার আগেই পুলিশ ডাকতে হলো বলে তার মন খারাপ। পুলিশকে সব জানিয়ে চমকে দেয়া আর হলো না। এতো দেরি লাগছে? ...রেখো না, চেষ্টা করো।
আবার ডায়াল করলো রবি।
কিছুক্ষণ পর ফিরে এলেন ফ্লেচার। আগের চেয়ে গম্ভীর। কিসে হাত দিয়েছো, জানো না তোমরা। খবর নিতে গিয়ে জানলাম, ওরকম একটা লোক, হাতে টাট্টু আঁকা, গত হপ্তায় ব্যাংক ডাকাতি করে পালিয়েছে। সাত লাখ ডলার। নিয়ে গেছে।
নিশ্চয় স্যান মেটিওতে, তাই না, স্যার? ইয়ান ফ্লেচার বলার আগেই বলে। ফেললো কিশোর।
তুমি কি করে জানলে? কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইলেন চীফ।
কারনিভলে আগুন, স্যার। স্যান মেটিওতে লেগেছিলো। আমার স্থির বিশ্বাস, ওই বেড়াল-চোর রবিদের কারনিভলের কেউ। ডাকাতির পর আগুন লাগার জন্যে সে-ই দায়ী।
তুমি শিওর?
শিওর। কাকতালীয় ঘটনা এতো বেশি ঘটতে পারে না। আপনি কারনিভলে গিয়ে...
পেয়েছি, কিশোর, বলে উঠলো রবি। বাবাকে পেয়েছি।
বাবার সঙ্গে কথা বলছে রবি, চুপ করে শুনছে সবাই। কি জবাব আসে শোনার জন্যে অধীর। একজন পুলিশ এসে ডাকতে আবার বেরিয়ে গেলেন চীফ।
হ্যাঁ, বাবা, কি সাংঘাতিক, রবি বলছে। আমি দুঃখিত, বাবা। সবাই আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি এখুনি আসছি, রিসিভার রেখে দিয়ে কিশোরের দিকে ফিরলো সে। বাবা

বলছে আমি ছাড়া সবাই আছে এখন। শো শুরু হয়েছে। এক্ষুণি যেতে হচ্ছে আমাকে। গিয়ে খাওয়ার সময়ও পাবো না, গ্যালারিতে ঢুকতে হবে।
খাওয়ার কথায় চমকে উঠলো মুসা। খাইছে রে খাইছে! এতোক্ষণ না খেয়ে আছি! মনেই ছিলো না। হায় হায় হায়, নাড়ি তো সব হজম।
কিশোর ছাড়া সবাই হাসলো। সে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন।
ফিরে এলেন চীফ। জানালেন, গাড়িটা পাওয়া গেছে। এখান থেকে মাত্র চার ব্লক দূরে, রাস্তার পাশে বেড়ালটাও ছিলো গাড়িতে। পেট কাটা, ভেতরে কিছু নেই। ঘাসের ওপর চাকার দাগ। হয় চোরটা আরেকটা গাড়ি রেখে এসেছিলো ওখানে, নয়তো অন্য কোনো গাড়ি এসে নিয়ে গেছে। মনে হচ্ছে, যা দরকার, পেয়ে গেছে। যতো তাড়াতাড়ি পারে রকি বীচ থেকে পালানোর চেষ্টা করবে এখন। তবে পুলিশও সতর্ক, পালাতে দেবে না। ধরা পড়বেই। সময় লাগবে আরকি, কিশোরের দিকে তাকালেন। তোমাদের আর কিছু করার নেই। বাড়ি চলে যাও।

.

পরদিন রবিন বা মুসা, দুজনের কেউই বেরোতে পারলো না। বাড়িতে জরুরী কাজ, ব্যস্ত থাকতে হলো। কাজ করলো বটে, কিন্তু মন পড়ে রইলো ইয়ার্ডে। চোরটাকে ধরতে পারেনি, সেটা একটা ব্যাপার। তার ওপর কয়েকবার ফোন করেও কিশোরকে পায়নি। সে নেই।
ডিনারের সময় অন্যমনস্ক হয়ে রইলো রবিন।
হেসে বললেন তার বাবা, চীফের কাছে শুনলাম, একটা ডাকাতকে ধরতে ধরতেও নাকি ধরতে পারোনি।
জানতামই না যে ও ডাকাত, বাবা। কারনিভলের একটা ছেলেকে সাহায্য করতে গিয়েছিলাম। কেঁচো খুঁড়তে বেরোলো সাপ।
পারলে মানুষকে সাহায্য করা উচিত। ঠিকই করেছ।
ডাকাতটার আর কোনো খোঁজ পাওয়া গেছে, বাবা? চীফ কিছু বললেন?
ধরতে পারেনি এখনও। পুলিশ সতর্ক রয়েছে।
এই খবরে খুশি হতে পারলো না রবিন। খাওয়া শেষ করে বেরিয়ে পড়লো, ইয়ার্ডে যাবে। ভাবছে, এই প্রথম একটা কেসে সফল হতে পারলো না তিন গোয়েন্দা।
হেডকোয়ার্টারে পাওয়া গেল কিশোরকে। সামনে একগাদা খবরের কাগজ, পড়ছে, মাঝে মাঝে নোট নিচ্ছে।
কি করছো? রবিন জিজ্ঞেস করলো।
মাথা নাড়লো গোয়েন্দাপ্রধান, বোঝালো এখন কথা বলতে চায় না। কিছুটা বিরক্ত হয়েই কয়েকটা শামুক আর ঝিনুক দেখতে লাগলো রবিন, স্কিন ডাইভিঙের। সময় ওগুলো তুলে এনেছে ওরাই। সময় কাটে না। শেষে গিয়ে চোখ

রাখলো সর্ব দর্শনে। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে স্যালভিজ ইয়ার্ডটাই দেখতে শুরু করলো। রোদেলা দিন ছিলো, গোধূলি তাই যেতে দেরি করছে এখনও।
ট্রাক বোঝাই করে মাল এনেছেন রাশেদ আঙ্কেল, রবিন জানালো।
আনমনে ঘোঁৎ করলো একবার কিশোর। পড়া বাদ দিয়ে চোখ বন্ধ করে। ভাবনায় ডুবে গেল।
আবার সর্ব-দর্শনে চোখ রাখলো রবিন। কিছুক্ষণ পর বললো, মুসা আসছে।
এবার ঘোঁৎও করলো না কিশোর।
ট্রাপডোর দিয়ে উঠে এসে দীর্ঘ এক মুহূর্ত কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইলো মুসা। রবিনের দিকে চেয়ে ভুরু নাচালো, কি করছে?
আমাকে জিজ্ঞেস করছো কেন? দেখছো না?
এতো খবরের কাগজ কেন? আবারও রবিনকেই জিজ্ঞেস করলো মুসা। টাট্টুওলার জন্যে বিজ্ঞাপন দেবে নাকি পেপারে?একটা টুলে বসলো।
চোখ মেললো কিশোর, হাসলো। তার আর দরকার হবে না, সেকেণ্ড। লোকটা কোথায় আছে, জানি।
জানো? চেঁচিয়ে উঠলো রবিন। কোথায়?
যেখানে ছিলো, সেখানেই। রকি বীচে। কারনিভলে।
বাবা বললো, লোকটাকে নাকি ছয় জায়গায় দেখা গেছে? চীফ নাকি বলেছেন তাকে।
আসলে সাত জায়গায় হবে।
আরমানে তুমি ভুল করছে। এখানে নেই সে।
পত্রিকাগুলো ভালোমতো দেখে, তবেই বলছি। সাতজন লোক সাত জায়গায় দেখেছে লোকটাকে, দুশো মাইলের ব্যবধানে। সে-কারণেই বলা যায়, কেউই দেখেনি তাকে। ওরা মিথ্যে বলেছে।
মাথা আঁকিয়ে রবিন বললো, তোমার কথা বুঝতে পারছি। কিন্তু সে যে এখানেই আছে, এ-ব্যাপারে শিওর হলে কি করে?
উঠে ছোট ঘরটায় পায়চারি শুরু করলো কিশোর। ওই ব্যাংক ডাকাতির ওপর লেখা যতোগুলো খবর বেরিয়েছে, সব পড়লাম। তিনটে কাগজে লিখেছে, স্যান মেটিওর দুটোয়, আর লস অ্যাঞ্জেলেসের একটাতে। আজ সকালে স্যান মেটিওতে গিয়েছিলাম।
কোথায় গিয়েছিলে? লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো মুসা।
স্যান মেটিওতে, হাসলো কিশোর। তোমরা তখন ব্যস্ত। একজন ঘর পরিষ্কার করছিলে, আরেকজন বাগান সাফ…আমারটাও কাজই, তবে অন্যরকম। পুরনো মাল কিনতে পাঠালো চাচা, বোরিস আর রোভারকে সঙ্গে দিয়ে…

দীর্ঘশ্বাস ফেললো মুসা। ধপ করে বসে পড়লো আবার টুলে। কিছু মানুষের। কপালই থাকে ভালো। কাজের মাঝেও আনন্দ। আর আমি শালার কপালপোড়া, সেদিন করলাম বাগান সাফ, আজ করতে হলো ঘরবাড়ি পরিষ্কার, নাক দিয়ে বিচিত্র শব্দ করে ক্ষোভ প্রকাশ করলো সে। ওই করে করেই মরবো।
ডাকাতির ব্যাপারে কি জানলে, কিশোর? রবিন জিজ্ঞেস করলো।
অনেক কিছু। কারনিভলে শুক্রবার রাতে আগুন লেগেছে। সেদিন, স্যান। মেটিওতে ব্যাংক খোলা ছিলো বিকেল ছটা পর্যন্ত। আর যেহেতু উইকএণ্ড, কারনিভল শুরু হয়েছিলো নির্দিষ্ট সময়ের আগেই। তাছাড়া সেদিন ওখানে কারনিভলের শেষ দিন। রাতেই স্যান মেটিও ছাড়ার কথা, রকি বীচে এসে খোলার কথা শনিবারে।
খাইছে! ডাকাতটা কারনিভলের লোক হলে মহা সুযোগ।
হ্যাঁ, সুযোগটা নিয়েছিলো সে। আগাগোড়া কালো পোশাক, মাথায় কালো হুড, পায়ে কালো টেনিস শু পরে ডাকাতি করতে গিয়েছিলো।
মাছিমানব টিটানভ! রবিন বললো।
মাথা নেড়ে সায় জানালো কিশোর। অনেকেই তার হাত দেখতে পেয়েছে। শার্টের হাতা গুটিয়ে কনুইর ওপর তুলে রেখেছিলো।
নিশ্চয় টাট্টুও দেখেছে লোকে।
হ্যাঁ। ছটা বাজার পাঁচ মিনিট আগে ব্যাংকে ঢুকলো সে। একজন গার্ডকে ধরে নিয়ে ভল্টে ঢুকলো। ওকে জিম্মি করেই বেরিয়ে এলো টাকা নিয়ে। তারপর মাথায় বাড়ি মেরে লোকটাকে বেহুশ করে ব্যাংকের পেছনের গলি দিয়ে দিলো দৌড়। সে দৌড় দিতেই ব্যাংকের ঘন্টি বাজিয়ে দেয়া হলো। কয়েক মিনিটেই পৌঁছে গেল পুলিশ।
ডাকাতটাকে নিশ্চয় ধরতে পারেনি? মুসা বললো।
না, পারেনি। কি করে যে পালালো, সেটাই বুঝতে পারেনি কেউ। গলিটায়। তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে পুলিশ। অন্ধগলি ওটা, একদিক খোলা। তিনদিকে তিনটা বিরাট উঁচু বাড়ি, সব জানালা বন্ধ। গলি থেকে যে বাড়িতে ঢুকবে সে উপায়ও ছিলো না। ভোলা মুখ দিয়ে ঢুকেছে পুলিশ। সেদিক দিয়েও যেতে পারেনি। ডাকাতটা। অথচ, গায়েব।
পার্ক থেকে যেভাবে গায়েব হয়েছিলো, বিড়বিড় করলো রবিন।
দেয়াল বেয়ে উঠেছে, বললো মুসা। মাছিমানব।
আমার তাই ধারণা, নিচের ঠোঁটে টান দিয়ে ছেড়ে দিলো কিশোর। দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়লো খবর। কারনিভলের বাইরে তখন পাহারায় ছিলো একজন। পুলিশ। ডাকাতির খবর সে-ও শুনেছে। কারনিভলে ঢোকার জন্যে হুড়োহুড়ি

করছে লোকে, ওদেরকে শান্ত করার জন্যে এগিয়ে গেল সে। লোকের ধাক্কায় পড়ে গেল একজুন, কোট গেল উল্টে। তার কালো শার্ট দেখে ফেললো পুলিশ। সন্দেহ হলো। গিয়ে লোকটার হাত ধরে হ্যাঁচকা টানে কোটের হাতা নামিয়ে দিলো। দেখে ফেললো টাট্টু...
কাকতালীয় হয়ে গেল না? মুসা বললো। লোকটার পড়ে যাওয়া। আর পড়বি তো পড় একেবারে পুলিশের সামনে।
হ্যাঁ, হয়েছে। তবে এটা নতুন কিছু না। অনেক বড় বড় রহস্য সমাধান। হয়েছে এরকম কাকতালীয় ঘটনা থেকে। বলা যায়, অপরাধীদের দুর্ভাগ্যই এসব। যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই রাত হয়, প্রবাদটা তো আর খামোকা হয়নি। যাই হোক, ভিড়ের মধ্যে লোকটাকে আটকাতে পারলো না পুলিশ। এক ঝাড়া মেরে হাত ছাড়িয়ে দৌড় দিলো। কাছেই আরেকজন পুলিশ ছিলো, চেঁচিয়ে সাহায্যের জন্যে তাকে ডাকলো প্রথমজন। খবর পেয়ে আরও পুলিশ ছুটে এলো। ঘিরে ফেলা। হলো পুরো এলাকা। নিশ্চিত হলো, ডাকাতটাকে ধরে ফেলবেই। কিন্তু
আগুন লেগে গেল! বলে উঠলো রবিন।
হ্যাঁ। ডাকাত ধরার চেয়ে আগুন নেভাননা জরুরী। সেদিকে নজর দিলো পুলিশ। আগুন নেভার পর আবার ডাকাত খুঁজতে লাগলো। কিন্তু পেলো না। না। ডাকাত, না টাকা।
কোথায় গেল? রবিনের প্রশ্ন।
যাবে আবার কোথায়? কারনিভলেই ছিলো। ভালো করেই জানে সে, পুলিশের চোখ ফাঁকি দেয়ার জন্যে ওটাই সব চেয়ে নিরাপদ জায়গা। স্যান মেটিও থেকে বেরিয়ে আসার জন্যেও। সেসব বুঝে, ভেবেচিন্তেই প্ল্যান করেছে সে। কখন। ডাকাতি করবে, কোনদিক দিয়ে পালিয়ে এসে কোথায় লুকোবে, সবু। সহজ, নিরাপদ পরিকল্পনা।
কিন্তু পুলিশ দেখে ফেলায়, বললো রবিন। অসুবিধায় পড়লো ডাকাতটা। আগুন লাগিয়ে দিলো, সবার নজর সেদিকে ঘুরিয়ে দেয়ার জন্যে। এই সুযোগে ছদ্মবেশ খুলে বেরিয়ে এলো সে।
তারমানে, মুসা বললো। আমরাও সেদিন ওকে ছদ্মবেশেই দেখেছি?
তাই তো মনে হয়, বললো কিশোর। মুখে রঙ লাগিয়েছিলো, কিংবা প্লাস্টিকের মুখোশ। চুলেও রঙ করেছিলো নিশ্চয়। হয়তো নাকটাও আলগা। হাতে নকল টাট্টু।
হু, মাথা দোলালো মুসা। ওরকম একটা ছবি সবার চোখেই পড়ে।
সবাইকে দেখানোর জন্যেই লাগিয়েছে। আসল হলে কিছুতেই দেখাতো না, বরং লুকানোর আপ্রাণ চেষ্টা করতো। আমার বিশ্বাস, লোকটার বয়েস বেশি না, টাট্টুও

নেই। নিশ্চয় মাছিমানব টিটানভ। কারনিভলের অভিজ্ঞ কর্মী বলেই মিস্টার কনরকে বোকা বানাতে পেরেছে।
কিন্তু মাছিমানবের খেলা তো দেখায় না।
অন্য খেলা দেখাচ্ছে।
কিন্তু তাকে চিনতে পারছেন না কেন, মিস্টার কনর?
হয়তো কাছে থেকে দেখেননি আগে। তাছাড়া অনেক দিন জেলে ছিলো টিটানভ। এতোদিনেও চেহারা বদলায়নি, এটা জোর করে বলা যায় না। তার ওপর হয়তো এমন কোনো সাজ নিয়েছে, যাতে চেহারার আরও পরিবর্তন হয়। এসব করতে কোনো অসুবিধে হয় না তার। কারনিভলে প্রত্যেক কর্মীরই আলাদা। ট্রেলার আছে।
বুঝলাম, হাত তুললো মুসা। আচ্ছা, বেড়ালগুলো কেন দরকার তার? ভেতরে টাকা রেখেছিলো?
সেটা তো সম্ভবই না। এতো টাকা, জায়গাই হবে না। তবে, টাকাগুলো কোথায় লুকিয়েছে, সেই নির্দেশ রয়েছে হয়তো। কিংবা লকার-টকারের চাবি।
হু, রবিন বললো। তা-ই করেছে। আগুন লাগানোর পরই কাজটা করেছে। যাতে তাকে সার্চ করা হলেও পুলিশ কিছু না পায়।
আমারও তাই মনে হচ্ছে, একমত হলো মুসা।
বেড়াল নিয়ে তো যথেষ্ট হাঙ্গামা করলো। টাকাগুলো বের করবে কখন? এখনি বের করে নিয়ে পালাবে, নাকি আরও কিছুদিন থাকবে কারনিভলে?
থাকাটাই তো স্বাভাবিক, কিশোর বললো। ওখানেই নিরাপদ। আমি হলে তা-ই ভাবতাম–যদি বুঝতাম আমার চেহারা চিনছে না কেউ, আমাকে ডাকাত বলে সন্দেহ করছে না। পুলিশ কড়া নজর রেখেছে। হুট করে কেউ এখন কারনিভল ছাড়লেই তাকে সন্দেহ কররে। নাহ, সে বেরোবে না। রকি বীচে থাকতে কিছুতেই নয়।
তো, আমাদের এখন কি করা? মুসা জিজ্ঞেস করলো। কারনিভলে আর যাবো-টাবো?
হ্যাঁ, যাবো। চলো।
দুই সুড়ঙ্গ দিয়ে বেরোলো ওরা। সাইকেল নিয়ে রওনা হলো কারনিভলে। সাঁঝ হয়েছে তখন। পর্বতের দিক থেকে আসা বাতাসের বেগ বাড়ছে।
কারনিভলের কাছে এসে গেটের বাইরে সাইকেল পার্ক করলো তিন গোয়েন্দা। লোক ঢুকতে আরম্ভ করেছে। তাদের সঙ্গে মিশে গেল ওরাও।
হঠাৎ শোনা গেল চিৎকার। এদিক ওদিক দৌড় দিলো কেউ, কেউ ছুটে গেল সামনে।

কারনিভলে কিছু হয়েছে! চেঁচিয়ে বললো মুসা।
অ্যাকসিডেন্ট! বলে উঠলো রবিন।
দৌড়াতে শুরু করেছে ততোক্ষণে কিশোর।

.

ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এলো তিন গোয়েন্দা। কাত হয়ে মাটিতে পড়ে আছে নাগরদোলাটা। চেঁচিয়ে রাফনেকদের আদেশ নির্দেশ দিচ্ছেন মিস্টার কনর।
রবিকেও পাওয়া গেল সেখানে।
কি হয়েছে, রবি? মুসা জিজ্ঞেস করলো।
জানি না, ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললো রবি। ঘুরছিলো। সওয়ারি নিতে তৈরি, হঠাৎ ইঞ্জিন থেকে ধোঁয়া বেরোতে শুরু করলো। কাত হয়ে পড়ে গেল দোলাটা। তিনটে ঘোড়া ভেঙেছে, দেখো।
নাগরদোলাটা আবার খাড়া করার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে রাফনেকরা। ভাঙা ঘোড়াগুলো মেরামতে ব্যস্ত কয়েকজন। ইঞ্জিন পরীক্ষা করছেন মিস্টার কনর।
কয়েকজন কর্মী এসে ঘিরে দাঁড়ালো তাঁকে। উঠে দাঁড়িয়ে কপালের ঘাম। মুছলেন তিনি।
আর কতো অ্যাকসিডেন্ট দেখবো, কনর? কড়া গলায় জিজ্ঞেস করলো কোহেন।
আপনার যন্ত্রপাতিই খারাপ হয়ে গেছে, বললো মারকাস দ্য হারকিউলিস। আমরা ভয় পেতে শুরু করেছি।
যন্ত্রপাতি যে খারাপ হয়নি, কনর বললেন। ভালো করেই জানো।
নাগরদোলা অতো সহজে ভাঙে না, বিষণ্ন কণ্ঠে বললো সদাবিষঃ লম্বা ভড়। এটা আগাম হুঁশিয়ারি! আনলাকি শো। অবশ্যই বন্ধ করে দেয়া উচিত।
হ্যাঁ, আনলাকি শো! আগুনখেকোও একমত। হয়তো কিঙের ছাড়া পাওয়াটাও দুর্ঘটনাই ছিলো। তাহলে আরও তিনটে দুর্ঘটনার শুরু হলো।
গুঞ্জন উঠলো কর্মীদের মাঝে। কেউ মাথা ঝাঁকালো, কেউ দোলালো।
বন্ধই করে দেয়া উচিত, মিস্টার কনর, বললো এক দড়াবাজ।
বড় জোর আজকের রাতটা চালাতে পারেন, লম্বা ভাড় বললো। তারপর আর একটা শো-ও নয়।
চালাবেন কি করে? কোহেন জানতে চাইলো। নাগরদোলা না চললে তো আমাদের বেতনই দিতে পারবেন না…
অসহায় ভঙ্গিতে হাত নাড়লেন কনর। কাজ করতে করতে উঠে এসে জরুরী গলায় তাকে কি বললো একজন রাফনেক। কনরের উদ্বিগ্ন চেহারায় হাসি

ফুটলো। আধঘন্টার মধ্যেই ঠিক হয়ে যাবে নাগরদোলা। একটা বিয়ারিং ভেঙেছে, আর কিছু না। যাও, যার যার কাজে যাও।
আরও খারাপ অ্যাকসিডেন্ট হবে, আমি জানি, বিড়বিড় করলো লম্বা ভাঁড়।.
তবে বেশির ভাগ কর্মীর মুখেই হাসি ফুটলো আবার। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে চলে গেল যার যার বুদের দিকে, কোহেন ছাড়া।
শো দেখানো বিপজ্জনক হয়ে উঠছে, কনর, বললো স্ট্রংম্যান। এতো অ্যাকসিডেন্ট! শো বন্ধ করে দেয়া উচিত, বলে আর দাঁড়ালো না।
চেয়ে রইলেন কনর। চোখ ফেরালেন ছেলেদের দিকে। উৎকণ্ঠা ঢাকতে পারছেন না, ঢাকার চেষ্টাও করলেন না। তার ভবিষ্যৎ, তাঁর ছেলের ভবিষ্যৎ, সব নির্ভর করছে এই কারনিভলের ওপর।
কাজ করবে ওরা, বাবা? রবি জিজ্ঞেস করলো।
করবে। বেশি আশা করে না কারনিভলের লোকে। গণ্ডগোলের কথা সহজে। ভুলে যায়। আর কোনো দুর্ঘটনা না ঘটলেই হলো।
নাগরদোলাটা ঠিক হবে?
হবে, গম্ভীর হয়ে গেলেন। সে-জন্যে ভাবি না আমি। ভয় পাচ্ছি অন্য কারণে। মেকানিক বললো, বিয়ারিঙে শক্ত কিছু ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছিলো। কয়েকটা বল্টু আলগা করে দিয়েছিলো। ঘোরার সময় বিয়ারিঙ আটকে যাওয়ায় প্রচণ্ড চাপে ছিঁড়ে গেছে বল্টুগুলো।
স্যাবোটাজ! রবিন বলে উঠলো।
হ্যাঁ। ঠিকই আন্দাজ করেছিলে তোমরা, গোলমাল চলছে এই কারনিভলে। কেউ ধ্বংস করে দিতে চাইছে।
না, স্যার, কিশোর বললো। কারনিভলের ক্ষতি করার জন্যে করছে না ডাকাতটা।
ডাকাত? মানে ব্যাংক ডাকাত? কিশোরের দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কনর। স্যান মেটিওতে যে ডাকাতি হয়েছিলো?
হ্যাঁ। আপনার কারনিভলেরই লোক সে।
জ্বলে উঠলেন মিস্টার কনর। বুঝে শুনে কথা বলো, ছেলে! পুলিশ অনেক খোঁজাখুঁজি করেছে, পায়নি।
আপনার কারনিভলের লোক বলেই তো পায়নি। আগুন লাগিয়ে সবার নজর অন্যদিকে সরিয়ে দিয়েছে। পুলিশকে তো ফাঁকি দিয়েছেই, সেই সুযোগে ছদ্মবেশ খুলেছে, কানা বেড়ালের ভেতরেও কিছু লুকিয়েছে।
তুমি ভুল করছো, কিশোর। ওই চেহারার কেউ নেই এখানে। ওরকম টাট্টু কারও হাতে নেই।
কি করে বুঝবেন? বলে ফেললো মুসা। ছদ্মবেশে থাকে। হাতের টাট্টাও নকল।

নীরবে তিন গোয়েন্দার ওপর চোখ বোলালেন কনর। হ্যাঁ, সেটা সম্ভব। কিন্তু কে...।
আমি জানি, বাধা দিয়ে বললো কিশোর। আমি শিওর, ডাকাতটা মাছিমানব টিটানভ।
টিটানভ? কি বলছো!
ঠিকই বলছি। ওর পালানোর ধরন, আলমারিতে পাওয়া কাপড়, সবই প্রমাণ করে লোকটা ওই মাছিমানব...
না, কিশোর, হাত তুলে তাকে থামালেন কনর। টিটানভ নয়। তোমার কথায় যুক্তি আছে, স্বীকার করছি। কিন্তু পুলিশের মুখে সব শোনার পর আমার প্রথমেই মনে হয়েছিলো ওর কথা। আমিও ভেবেছি, এই কারনিভলে লুকিয়ে আছে। সে, আমি চিনতে পারছি না। কারনিভলের পোশাক পরা থাকলে, সাজ ধরে থাকলে চেনা কঠিন। তাই সবাইকে পোশাক ছাড়া দেখেছি। টিটানভের মতো। লাগেনি কাউকে।
দে-দেখেছেন..., তোতলাতে শুরু করলো কিশোর।
দেখেছি। বেশির ভাগই ওরা বয়স্ক। আরেকটা কথা, কারনিভলে ডাকাত থাকলে আগুন লাগা আর কিঙের ছাড়া পাওয়ার ব্যাপারটা নাহয় বোঝা গেল, কিন্তু পনি রাইডের কথা কি বলবে? আর এখন এই নাগরদোলা নষ্ট করা?
দমে গেছে কিশোর। মনে তো হচ্ছে গোলমাল পাকানোর জন্যে।
ঠিক তাই। গোলমাল পাকিয়ে কারনিভলের সর্বনাশ করে দিতে চায়, বলতে দ্বিধা করছেন কনর। শেষে বলেই ফেললেন, হয়তো এর মূলে রবির নানী। ডাকাতটাই কানা বেড়ালের পেছনে লেগেছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে সে বাইরের লোক। যা চাইছিলো, পেয়ে গেছে, আর এখানে আসার দরকার নেই তার। নাগরদোলা নষ্ট করায় তার হাত নেই।
হতে পারে, মুসা বললো।
তবু, চোখ খোলা রাখতে বলবো তোমাদের। আর কোনো দুর্ঘটনা যাতে ঘটাতে না পারে কেউ। আমার কাজ আছে। যাও, তোমরা গিয়ে কারনিভল দেখো, নজরও রাখো। খুব সাবধানে থাকবে।
থাকবো, কথা দিলো রবি।
হাসলেন কনর।
সরে এলো ছেলেরা। নিচের ঠোঁট কামড়ালো কিশোর। বললো, আমি এখনও বিশ্বাস করি, আমার অনুমানই ঠিক। .
কিন্তু মিস্টার কনরের কথায়ও যুক্তি আছে, রবিন বললো। নাগরদোলা নষ্ট করার কোনো কারণই নেই ডাকাতটার।
এতোক্ষণে হয়তো বহুদূরে পালিয়েছে সে, বললো রবি।

আমার মনে হয় না, জোর দিয়ে বললো কিশোর। এখানেই আছে এখনও। কারনিভল বন্ধ করে দেয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে, যাতে অন্য কর্মীদের ভিড়ে মিশে যেতে পারে সে, যাওয়ার সময় কারো সন্দেহ না হয়।
পরিস্থিতি শান্ত হওয়ার জন্যে অপেক্ষা করবে না? প্রশ্ন তুললো রবি।
হয়তো করবে। আচ্ছা, ঠিক করে বলো তো পাঁচটাই বেড়াল ছিলো তো? না আরও বেশি?
পাঁচটাই।
বুঝতে পারছি না..., আনমনে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটলো কিশোর। বেড়ালের ভেতর থেকে পড়ে-উড়ে যায়নি তো? হয়তো বেড়ালের ভেতরে পায়নি। তাহলে নিশ্চয় গিয়ে ট্রেলারটায় খুঁজবে, যেটাতে বেড়ালগুলো রাখা ছিলো! রবি, কোথায় ট্রেলারটা?
যেখানে এখন থাকার কথা। শুটিং গ্যালারির কাছে। সারাক্ষণ যাতে চোখ রাখতে পারি।
কিন্তু এখন রাখছ না! চেঁচিয়ে উঠলো কিশোর। রাখতে পারোনি, কারণ, নাগরদোলাটা পড়ে যাওয়ায় দেখতে চলে এসেছে!
খাইছে! চমকে উঠলো মুসা। আরেকবার!
কেন নয়? এরকম করে দুবার সফল হয়েছে আগে। দোলাটার ক্ষতি সামান্য। কারনিভল বন্ধের চেষ্টায় থাকলে ওটা একেবারে বিকল করে দিতো। জলদি, শুটিং গ্যালারিতে। কুইক! বলতে বলতেই দৌড় দিলো সে।
দর্শকের ভিড় বেড়েছে।
তাদের পাশ কাটিয়ে গ্যালারির পেছনে চলে এলো ছেলেরা। আলো এখানে কম, ছায়া বেশি। কিন্তু দেখতে অসুবিধে হলোনা, মাটিতে ছড়িয়ে আছে পুতুল, খেলনা, পুরস্কারের নানা জিনিস।
আরি, ভেঙে ফেলেছে? আঁতকে উঠলো রবি।
দেখো দেখো! হাত তুললো রবিন।
চারজনেই দেখলো, ট্রেলারের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো একটা মূর্তি। দৌড় দিলো অন্ধকারের দিকে। খোলা জায়গার পরে একসারি তাঁবু পেরিয়ে, বেড়ার ফোকর গলে পার্কে ঢুকে যাওয়ার ইচ্ছে।
ধরো ব্যাটাকে! বলেই পেছনে ছুটলো মুসা।
.
বেড়ার ওপাশে চলে গেল চোরটা।
এক এক করে ফোকর গলে ছেলেরাও চলে এলো। ছায়ায় ঢাকা নীরব পার্ক। চাঁদ উঠছে। পর্বতের দিক থেকে আসা বাতাসের জোর বেড়েছে আরও। ঝুঁকি দিয়ে

কাঁপিয়ে দিচ্ছে পুরনো, নড়বড়ে নাগরদোলার স্তম্ভগুলোকে, ক্যাঁচকোঁচ করছে ওগুলো, নিষ্প্রাণ গোঙানি।
কই? নিচু কণ্ঠে বললো রবিন। গেল কই!
চুপ, ফিসফিসিয়ে বললো কিশোর। শোনো।
বেড়ার ছায়ায় গা ঢেকে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। মেরামত করা নাগরদোলার শব্দ হচ্ছে ভীষণ, বহুদূর থেকে শোনা যাবে। পার্কের অন্ধকার ছায়া থেকে কাউকে বেরোতে দেখা গেল না, কেউ নড়লো না। বায়ে, টানেল অভ লাভ-এ ছলাত-ছল করে আছড়ে পড়ছে পানি। মাঝে সাঝে মৃদু হুটোপুটির শব্দ, নিশ্চয় ইঁদুর। এছাড়া আর কোনো আওয়াজ নেই।
বেশিদূর যেতে পারেনি, কিশোর বললো। ভাগ হয়ে খুঁজবো আমরা। নাগরদোলা ঘুরে আমি আর মুসা যাবো ডানে। রবিন, তুমি আর রবি যাও বুয়ে।
এই লোকটাই ডাকাত? রবি প্রশ্ন করলো।
মনে হয়। বেড়ালের ভেতর পায়নি, তাই ট্রেলারে খুঁজছিলো। পেয়ে গিয়ে থাকলেও এখন মহাবিপজ্জনক। সাবধান, ধরার চেষ্টা করবে না। পিছে পিছে গিয়ে শুধু দেখবে, কোথায় যায়।
বাঁয়ে সুড়ঙ্গের দিকে চলে গেল রবি আর রবিন। মুসা আর কিশোর এগোলো ফান হাউসের হাসিমুখের দিকে।
হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল মুসা। কিশোর, শব্দ শুনলাম!
স্তম্ভগুলোর নিচে অন্ধকার। সেখান থেকেই এলো শব্দটা। আবার। কাঠের ওপর ভারি জুতোরঘষা লাগার মতো। তারপর, দ্রুত দূরে সরে গেল চাপা পদশব্দ।
দেখেছি, ফিসফিসিয়ে বললো মুসা। ফান হাউসে ঢুকলো।
কে, চিনেছো?
না।
জলদি চলো। বেরোনোর আরও পথ থাকতে পারে।
মুসা দেখেছে, ছায়ায় ছায়ায় ঘুরে গিয়ে ঢুকছে লোকটা। ওরা যেখানে রয়েছে, সেখান থেকে ফান হাউসের মুখ পর্যন্ত একটুকরো খোলা জায়গা, চাঁদের আলোয় আলোকিত। একছুটে জায়গাটা পেরোলো ওরা। ভেতরে ঢুকে কান পাতলো। সরু বারান্দার মতো একটা জায়গা। ছাতের ফুটো দিয়ে আলো আসছে, অন্ধকার কাটেনি তাতে।
সামনে ছাড়া পথ নেই, কিশোর।
মুসার কথার সমর্থনেই যেন মচমচ শোনা গেল। তার পরেই ধুপ, সবশেষে তীক্ষ্ণ চিৎকার। গড়িয়ে পড়ে কাঠের দেয়ালে ধাক্কা খেয়েছে যেন ময়দার বস্তা। আবার শোনা গেল মচমচ, আবার ধুপ, তারপর নীরবতা।

অস্বস্তিতে পড়েছে দুই গোয়েন্দা। পা টিপে টিপে এগোলো আবছা অন্ধকারের ভেতর দিয়ে। একটা দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো।

সাবধানে খুলবে, কথা শেষ করতে পারলো না গোয়েন্দাপ্রধান। মচমচ করে সামনে ঝুঁকে গেল বারান্দাটা। কাত হয়ে গেছে মেঝে। চিত হয়ে পড়লো দুজনে, গড়াতে শুরু করলো।

পাগলের মতো হাত বাড়াচ্ছে ওরা, ধরার মতো যদি কিছু মেলে। কিছুই নেই।

ধুপ করে কাঠের দেয়ালে বাড়ি খেলো মুসা। আঁউক করে উঠলো। পরক্ষণেই তার গায়ের ওপর এসে পড়লো কিশোর।

হাত-পা ছুঁড়ে কোনোমতে উঠে বসলো দুজনেই। হতবাক হয়ে দেখলো, কাত হয়ে যাওয়া মেঝে উঠে যাচ্ছে আবার। জায়গামতো লেগে ছাত হয়ে গেল। মাথার ওপর।

পুরো মেঝেটা কাত হয়ে গিয়েছিলো! বিশ্বাস করতে পারছে না মুসা। নিশ্চয় কোনো কিছুর ওপর ব্যালান্স করা। একটা বিশেষ জায়গায় এসে কেউ দাঁড়ালেই কাত হয়ে যায়।

হ্যাঁ, অনেকটা টেকির মতো। ফান হাউসের মজার কৌশল। ডাকাতটাও নিশ্চয় আমাদের মতোই পড়েছে। গেল কোথায়?

পথ একটাই।

ঘরের দেয়ালে একটা বড় ফোকর দেখা যাচ্ছে। পাইপের মুখের মতো।

হামাগুড়ি দিয়ে ওটার দিকে এগোলো মুসা।

খেয়াল রেখো, পেছন থেকে কিশোর বললো। ওর মধ্যেও কৌশল থাকতে পারে।

ছোট সুড়ঙ্গ। আরেকটা ঘরে বেরিয়ে এলো ওরা। ছাতের ফাটল দিয়ে আলো আসছে।

ছাতই তো! নাকি মেঝে? অবাক হয়ে ভাবলো মুসা। কিশোওওওর! কেঁপে উঠলো গলা।

আবছা আলোয় মনে হলো ওদের, একটা উল্টে থাকা ঘরে রয়েছে। ছাত নিচে, মেঝে ওপরে। মেঝেতে রাখা চেয়ার, টেবিল, কার্পেট, সব উল্টো হয়ে আছে মাথার ওপরে। ওদের পায়ের কাছ থেকে সামান্য দূরে উল্টো হয়ে রয়েছে। একটা ঝাড়বাতি, বাল্ব নেই। দেয়ালে ঝুলছে ছবি, উল্টো।

ফিসফিস করলো বিস্মিত কিশোর, আরেকটা কৌশল, মুসা। আলো থাকলে আরও ভালোমতো দেখা যেতো।

আমরা সত্যি উল্টো হয়ে নেই তো? মুসার সন্দেহ যাচ্ছে না।

না।...ওই যে, আরেকটা সুড়ঙ্গমুখ। এসো।

প্রথমটার চেয়ে এটা লম্বা। নড়েচড়ে, দোল খায়। ওরা বুঝলো, একসময় ওটাকে ঘোরানোর ব্যবস্থা ছিলো। এখন ঘোরে না যদিও, স্থিরও থাকে না। একজায়গায়। আরেক মাথায় বেরিয়ে, নামার সময় আরেকটু হলেই পড়ে। গিয়েছিলো কিশোর। সোজা হয়েই বললো, শুনছো?

সামনে কোনোখান থেকে আসছে শব্দটা, হালকা পা ফেলছে কেউ। ওদিকে! ফিসফিসিয়ে বললো মুসা, পর মুহূর্তেই চেঁচিয়ে উঠলো, ওরিবাবারে...!

লম্বা-চওড়ায় আগেরটার চেয়ে বড় এই ঘর। ছাতে অসংখ্য গর্ত, ফাটল, বেশ ভালো আলো আসছে। মুসার মনে হলো গভীর সব ছায়া নড়ছে। কিন্তু ছায়ার। কারণে ভয় পায়নি সে। যা দেখালো, সেটা দেখে কিশোরও ঢোক গিললো।

ডানে দেয়ালের কাছে নড়ছে একটা অদ্ভুত মূর্তি। সোজা তাকিয়ে আছে ছেলেদের দিকে। লম্বা, পাকাটির মতো:শরীর, তার ওপর বিশাল এক মাথা। হাত দুটো সরু সরু, যেন মাকড়সার শুড়। কিভূত এক মানব-সর্প যেন, ভাসছে রুপালি চাঁদের আলোয়।

কী-কী ওটা, কি-কিশোর! কাছে ঘেঁষে এলো মুসা। ভূউত না তো?

আরেকবার ঢোক গিললো কিশোর। আ-আমি জানি নাঃ..আমি..., হঠাৎ হাসতে শুরু করলো সে। মুসা, ও কিছু না। আয়না। আয়না ঘরে ঢুকেছি আমরা। বিভিন্ন ভঙ্গিতে সাজিয়ে রাখা হয়েছে বাকা আয়নাগুলো।

আয়না? তাহলে পায়ের আওয়াজ শুনলাম কেন?

আমি.... শুরু করেই বাধা পেলো কিশোর।

ও-ওটাও কি আয়না? জোরে বলতে ভয় পাচ্ছে মুসা

নাক বরাবর সামনে, আয়না থেকে দূরে দাঁড়িয়ে আছে একটা মূর্তি। কান। পেতে রয়েছে যেন। চওড়া কাধ কোমর পর্যন্ত নগ্ন, লম্বা অগোছালো কালো চুল, কালো দাড়ি, চাঁদের আলোয় বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

কোহেন! যথাসাধ্য চেষ্টা করেও কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রাখতে পারলো না মুসা। শুনে ফেললো কোহেন। পাঁই করে ঘুরলো। এই, এই, বেরিয়ে এসো।

মুসার বাহু আঁকড়ে ধরলো কিশোর। ফিসফিস করে বললো, কথা বলবে না। আমাদের দেখেনি।

গর্জে উঠলো আবার কোহেন। এই, কথা শুনছি। বেরোও। বেরিয়ে এসো।

ওই যে, দরজা! দেখালো মুসা।

অনেকগুলো আয়নার মাঝে দরজাটা। কিশোরের হাত ধরে ওটা দিয়ে ঢুকে পড়লো মুসা। সরু একটা গলিপথে ঢুকলো ওরা, ছাত নেই। দশ কদম মতে গিয়ে দুভাগ হয়ে গেছে পথ। পেছনে কোহেনের কণ্ঠ আর পায়ের আওয়াজ শোনা গেল, দরজাটা দেখে ফেলেছে সে।

বাঁয়েরটা দিয়ে, কিশোর, তাড়া দিলো মুসা। জলদি!
আগে আগে চলেছে গোয়েন্দা-সহকারী। প্রতি দশ কদম পর পরই দুভাগ হয়ে যাচ্ছে পথ। প্রতিবারেই বাঁয়ের পথ ধরছে সে। পেছনে লেগে রয়েছে কোহেন, পায়ের শব্দেই বোঝা যায়।
অবশেষে আরেকটা দরজা পাওয়া গেল। ধাক্কা দিয়ে পাল্লা খুলে একটা ঘরে ঢুকলো ছেলেরা। তাজ্জব হয়ে গেল। আবার সেই আয়না ঘরে ফিরে এসেছে।
মরীচিকা! বিমূঢ়ের মতো বললো কিশোর। ফান হাউসের আরেক মজা! ছাগল বানিয়ে ছেড়েছে আমাদের, গলায় রশি দিয়ে একই জায়গায় ঘুরিয়েছে!
কোহেনও তো এসে পড়লো! গুঙিয়ে উঠলো মুসা।
ঠোঁট কামড়ালো কিশোর। উপায় একটা নিশ্চয় আছে। আবার ওই দরজা দিয়ে ঢুকবো। এবার আর বয়ে যাবো না। ডানে।
আয়নাগুলোর মাঝের দরজা দিয়ে আবার সরু গলিতে ঢুকলো দুজনে। দশ কদম এগিয়ে সরে গেল ডানের পথটায়। পদশব্দ এখনও অনুসরণ করছে ওদের। পেছনে তাকানোর সময় নেই। ছুটছে তো ছুটছেই ওরা। ধীরে ধীরে কমে এলো পেছনের আওয়াজ, মিলিয়ে গেল একসময়। সামনে দেখা গেল একটা ডাবল ডোর। দ্বিধার সময় নেই। ঠেলে পাল্লা খুলে ফেললো মুসা।
দরজার অন্যপাশে বেরিয়ে এলো দুজনে। খোলা আকাশের নিচে ব্রেরিয়ে। এসেছে। একপাশে ফান হাউস, আরেক পাশে টানেল অভ লাভ-এর প্রবেশ পথ।
আহ, বাঁচলাম! জোরে নিঃশ্বাস ফেললো মুসা।
হ্যাঁ, হাঁপাতে হাঁপাতে বললো কিশোর। কাজও হয়েছে। লোকটাকে চিনতে পেরেছি। গিয়ে এখন মিস্টার কনরকে বলতে পারবো, কোহেন…
মড়মড় করে ভেঙে গেল পুরনো পচা কাঠ। ফান হাউসের দেয়াল ফুড়ে বেরোলো ব্যায়ামপুষ্ট শক্তিশালী বলিষ্ঠ দেহটা। চাঁদের আলোয় বন্য হয়ে উঠেছে। চোখজোড়া, জ্বলছে। কোহেন!

.

ছায়ার ভেতরে হুমড়ি খেয়ে আছে দুই গোয়েন্দা। শ্বাস ফেলতে ভয় পাচ্ছে। তাকিয়ে আছে কোহেনের দিকে।
এখনও দেখেনি, কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব খাদে নামিয়ে বললো কিশোর। তবে দেখে ফেলবে।
বেড়ার কাছেও যেতে পারবো না, মুসা বললো। পথ আগলে রয়েছে। কিন্তু যেতে না পারলে…
টানেল অভ লাভ। চলো।

কি হামাগুড়ি দিয়ে এগোলো ওরা। ছায়ার অভাব নেই। লম্বা হয়ে পড়েছে। নাগরদোলার স্তম্ভগুলোর ছায়া। ওগুলোর মধ্যে রইলো ওরা, কোনো অবস্থাতেই আলোয় বেরোলো না। কোহেনের অলক্ষ্যে সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়লো।
আর আসছে না, মুসা বললো।
আসবে। ও জানে, আমরা ওকে দেখে ফেলেছি। আমাদের মুখ বন্ধ করার চেষ্টা করবেই। টানেল থেকে বেরোনোর আরেকটা পথ বের করতে হবে আমাদের।
সরু খাল কেটে সুড়ঙ্গের ভেতরে পানি ঢোকানোর ব্যবস্থা হয়েছে। তরল সীসার মতো লাগছে ওই পানিকে। কিনার দিয়ে গেছে পথ। সেই পথ ধরে হেঁটে চললো দুজনে। অনেকখানি ভেতরে ঢুকে সরু একটা কাঠের পুল পাওয়া গেল। শেষ মাথায় কাঠের জেটি। একসময় অনেক নৌকা থাকতো ওখানে, এখন আছে শুধু একটা পুরনো দাঁড়টানা নৌকা।
কিশোর, মুখে বাতাস লাগছে।
লাগবেই। সামনে বোধহয় ভোলা। নিশ্চয় সাগর।
কাঠের ওপর চাপ পড়ার মচমচ শব্দ হলো। নরম সোলের জুতো পরা পায়ের চাপ। কেউ আসছে।
নড়ড়া মা! হুঁশিয়ার করলো কিশোর। একদম চুপ।
সরু পুলের ওপর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো দুজনে। অনেক ওপরে ছাতের একটা ফোকর দিয়ে চুঁইয়ে আসছে চাঁদের আলো, নড়াচড়া ওখানেই দেখা গেল।
উল্টোদিক দিয়ে নেমে আসবে! মুসা বললো।
ফিরে যাবো? নিজেকেই প্রশ্ন করলো কিশোর।
ওপরে ছায়ামূর্তিটাকে নড়তে দেখা গেল। পিস্তল কক করার নির্ভুল শব্দ কানে এলো দুজনের। আস্তে কিশোরের কাঁধে হাত রাখলো মুসা।
ফিরে গিয়ে বাঁচতে পারবো না, কিশোর বললো। যেদিক দিয়েই বেরোই, চাঁদের আলোয় দেখে ফেলবেই।
ওদের কাছাকাছিই রয়েছে নৌকাটা, জেটির সঙ্গে বাঁধা। সামনের দিকে ছড়িয়ে ফেলে রাখা হয়েছে মোটা ক্যানভাস। নিঃশব্দে পা টিপে টিপে এগোলো ওরা। নৌকায় উঠলো। গায়ের ওপর টেনে দিলো ক্যানভাসটা। অন্ধকারে পড়ে রইলো চুপচাপ, নিঃশ্বাস ফেলতেও ভয়।
সময় যাচ্ছে। মিনিটের পর মিনিট।
পুলে হালকা পায়ের আওয়াজ হলো। কাঠের সঙ্গে ধাতব কিছুর ঘসা লাগলো যেন, দেয়ালে লেগেছে বোধহয় লোকটার হাতের পিস্তল।
তারপর অনেক্ষণ আর কোনো শব্দ নেই।
পূর্ণ নীরবতা।

খালের পানিতে দুলছে নৌকা। ঘষা খাচ্ছে জেটির সঙ্গে।
আবার নড়লো লোকটা। ছেলেদের প্রায় মাথার ওপর চলে এলো জুতোর চাপা শব্দ। জোরে জোরে কয়েকবার নাড়া খেলো নৌকা, যেন ধরে কঁকিয়ে দেয়া হচ্ছে। থেমে গেল একসময়। তারপর শুধুই দুলুনি।
ক্যানভাসের নিচে গুটিসুটি হয়ে থাকা ছাড়া আর কিছু করার নেই।
আরও কয়েক মিনিট পেরোলো। নৌকার গায়ে ঢেউয়ের ছলাত-ছল ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই।
চলে গেছে! ফিসফিসিয়ে বললো মুসা।
জবাব দিলো না কিশোর।
আরও কিছুক্ষণ পর আচমকা চেঁচিয়ে উঠলো, মুসা, জলদি কারনিভলে ফিরে যেতে হবে। রহস্যের সমাধান হয়ে গেছে!
কোহেন?
হ্যাঁ, সে তাড়া করাতেই..ডাকাতটা কি খুঁজেছে, এবং সেটা কোথায় আছে, জানি এখন।
ও পায়নি?
না, সবাই আমরা ভুল জায়গায়…
ভীষণ দুলে উঠলো নৌকা। ধার খামচে ধরলো কিশোর। ক্যানভাসের তলায় ঝট করে উঠে বসলো মুসা। কান পেতে শুনছে। বললো, কিশোর, বড় বেশি দুলছে না? ঘষার শব্দও পাচ্ছি না আর। কি হয়েছে? ক্যানভাস তোলো তো।
দুজনে ঠেলে সরালো ক্যানভাসের চাদর। মুখে আঘাত হানলো বাতাস। উঠে দাঁড়াতে গিয়ে চিত হয়ে পড়লো কিশোর, নৌকার দুলুনিতে।
খোলা সাগরে চলে এসেছি! চেঁচিয়ে উঠলো মুসা। চারপাশে দেখছে।
পরিত্যক্ত পার্কের কালো ছায়াগুলো এখন অনেক পেছনে, ছোট হয়ে আসছে, কারনিভলের আলোকসজ্জা।
নৌকা বাঁধার দড়িটা দেখলো কিশোর। কেটে দিয়েছে! পুলে উঠে দড়ি কেটে দিয়ে চলে গেছে ব্যাটা।
এখন ভাটা, পানির দিকে তাকিয়ে আছে মুসা। স্রোতে পড়েছে নৌকা। দেখছো, কি জোরে ভেসে যাচ্ছি?
জলদি ফেরাও, মুসা!
কি করে? দাঁড় নেই, মোটর নেই। সাঁতরে যে যাবো, তারও উপায় নেই। যা স্রোত আর ঢেউ, সাহস হচ্ছে না।
হুঁ। তুমি না পারলে আমি পারবো? নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটলো কিশোর। এক কাজ করা যায়। সিগন্যাল।

পকেট থেকে হোমারটা বের করলো কিশোর। কয়েকবার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিলো। নৌকার তলায় পানি জমে আছে, তাতে ভিজে গেছে পকেট, পকেটে রাখা যন্ত্রটা। হবে না, হতাশ ভঙ্গিতে হাত নাড়লো কিশোর। নষ্ট হয়ে গেছে।
সাহায্যের জন্যে চিৎকার শুরু করলো দুজনে। কিন্তু বাতাসের শব্দে হারিয়ে গেল চিৎকার। তীর থেকে অনেক সরে এসেছে। চারপাশে থৈ থৈ করছে সাগরের কালো পানি। একটা নৌকা চোখে পড়লো না। তীরের আলো এখন দূরে। বড় বড় ঢেউ ভাঙছে নৌকার গায়ে, কিনার দিয়ে ভেতরে ঢুকছে, ছিটে লেগে ভিজছে শরীর।
নৌকার তলায় ঝনঝন করছে দুটো টিনের পাত্র, গায়ে গায়ে বাড়ি লেগে। পানি সেঁচার জন্যে রাখা হয়েছে ওগুলো। একটা তুলে নিলো মুসা। আরেকটা কিশোরকে নিতে বলে সেঁচতে শুরু করলো নৌকায় জমা পানি।
যে ভাবেই হোক, কিশোরকে বললো। ফিরে যেতেই হবে আমাদের।
পারবো না। যা স্রোত। বাতাস অবশ্য বিপরীত দিক থেকে বইছে, অনেক খানি ঠেকিয়ে রাখছে নৌকাটাকে। স্রোতের টানে নইলে এতোক্ষণে আরও দূরে। ভেসে যেতো। বার দুই পাত্র বোঝাই করে ছপাত ছপাত করে পানি ফেললো। মুসা। দাঁড় ছাড়া হবে না, থেমে গেল সে। কিশোরের দিকে তাকালো।
মুসার কাঁধের ওপর দিয়ে সামনে তাকিয়ে আছে গোয়েন্দাপ্রধান। মুসা! ওটা।
ঝট করে ঘুরে চাইলো মুসা।
সামনে বিশাল এক কালো ছায়া। সাগরের নিচ থেকে উঠছে যেন, মাথা তুলেছে ওদের মাথা ছাড়িয়ে অনেক ওপরে।

.

ঘুরে, যেখান থেকে শুরু করেছিলো, সেখানে এসে দাঁড়ালো আবার রবি আর রবিন। কিশোর বা মুসাকে দেখলো না।
রবি, কিছু হয়েছে, চারপাশে দেখতে দেখতে বললো রবিন। এখানেই তো ওদের আসার কথা।
দেখো! ফান হাউসের দেয়ালে বড় একটা ফোকর দেখালো রবি। নতুন হয়েছে গর্তটা। আমি শিওর।
জ্যোৎস্নায় আরও বিষণ্ন লাগছে পরিত্যক্ত পার্কটা।
চেঁচিয়ে ডাকলো রবিন, কিশোওর! মুসাআ!
কে জানি আসছে! বলে উঠলো রবি।
ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ এসে থামলো বেড়ার ওপাশে, ফোকর গলে ভেতরে ঢুকলো দুজন লোক।
তোমার বাবা, রবি।

কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার কনর, কি ব্যাপার?
আমাদের কিছু হয়নি, বাবা, আমরা ঠিকই আছি। মুসা আর কিশোরকে পাচ্ছি না। আমার ট্রেলারে কি জানি খুঁজছিলো একটা লোক। তাকে তাড়া করে এলাম এখানে। দুভাগ হয়ে খুঁজতে গেলাম। আমি আর রবিন একদিকে, কিশোর আর মুসা আরেকদিকে। তারপর আর ওদের খবর নেই।
কোহেন তাহলে ঠিকই বলেছে!
মিস্টার কনরের পেছনে এসে দাঁড়ালো দাড়িওয়ালা স্ট্রংম্যান। চাঁদের আলোয় চকচক করছে তার ঘামে ভেজা নয় কাধ, আর কালো বুট। বললো, আমিও দেখেছি, রবির ট্রেলারে খুঁজছে। পিছে পিছে ছুটে এলাম এখানে। ফান হাউসে ঢুকে গায়েব হয়ে গেল ব্যাটা।
মুসা আর কিশোরকে দেখেননি? রবিন জিজ্ঞেস করলো।
না তো।
রবি, কনর বললেন। দৌড়ে যাও তো। বাতি নিয়ে এসো। কয়েকজন রাফনেককে আসতে বলবে।
ছুটে চলে গেল রবি।
রবিন আর কোহেনকে নিয়ে পরিত্যক্ত পার্কে খুঁজতে শুরু করলেন কনর। মুসা আর কিশোরকে পাওয়া গেল না।
বাতি আর রাফনেকদের নিয়ে এলো রবি। শক্তিশালী বৈদ্যুতিক লণ্ঠন নিয়ে খুঁজতে বেরোলেন কনর। কোহেন আর রাফনেকদের সঙ্গে নিলেন। ফান হাউসের বাইরে দাঁড়াতে বলে গেলেন রবিন আর রবিকে।
রবি, রবিন বললো। কোহেনও নাকি ট্রেলারের কাছে লোকটাকে দেখেছে। আমরা তাহলে দুজনকে না দেখে একজনকে দেখলাম কেন?
বুঝতে পারছি না, রবিন। দেখা তো উচিত ছিলো।
আমার মনে হয় না দুজন। কোহেনকেই তাড়া করেছি।
কোহেনই ডাকাত?
মাথা আঁকালো রবিন। প্রথম থেকেই ওকে কিশোরের সন্দেহ। তোমরা ওর আসল নাম জানো না। আড়িপাতা স্বভাব। আমাদের ওপর চোখ রাখে। কারনিভল। বন্ধ করার জন্যে বোঝায় তোমার বাবাকে। কিশোর আর মুসাকে সে-ই আটকে রেখে এখন ধোকা দিতে চাইছে, আমাদের। চলো, দেখি তোমার বাবা কি করছে*ন*?
দ্রুত ফান হাউসের দিকে চললো ওরা। ফাঁকফোকর দিয়ে বেরোচ্ছে লণ্ঠনের আলো। ঢোকার মুখেই দেখা হয়ে গেল কনরের সঙ্গে, বেরিয়ে আসছেন।
নাহ, কোনো চিহ্নই নেই, কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বললেন তিনি। যেন বাতাসে মিলিয়ে গেছে!

কোহেন আমাদের বোকা বানিয়েছে, স্যার, আঁঝালো কণ্ঠে বললো রবিন। ও-ই ডাকাত। মুসা আর কিশোর কোথায়, জানে।
কোহেন? কি বলছো? কী প্রমাণ আছে?
আমি শিওর, রবির ট্রেলারের কাছে সে একাই ছিলো। তাকেই তাড়া করেছিলাম আমরা।
দ্বিধা করলেন কনর। এটা তো প্রমাণ হলো না। ভুলে যেও না, কোহেন আমাদের সিকিউরিটি ইনচার্জ। সবখানে চোখ রাখা তার দায়িত্ব। কিন্তু তোমাকেও অবিশ্বাস করতে পারছি না। দাঁড়াও, কোহেনকে জিজ্ঞেস করি।
আবার গিয়ে ফান হাউসে ঢুকলেন তিনি।
বাইরে অপেক্ষা করছে ছেলেরা। অস্বস্তি বোধ করছে। এক এক করে দশ মিনিট পেরোলো। অন্ধকারে পায়চারি শুরু করলো রবিন। সে কি ভুল করেছে?
ফিরে এলেন কনর। থমথমে চেহারা। ফান হাউসে নেই কোহেন! রাফনেকদের নাকি বলে গেছে, কারনিভলে যাচ্ছে। কই, আমাকে তো বললো না! বলতে পারতো। চলো, দেখি।
তাড়াতাড়ি কারনিভলে ফিরে এলো ওরা। কোহেনকে তার তাঁবুতে পাওয়া গেল না, ট্রেলারেও নেই। কেউ তাকে দেখেনি। মুসা আর কিশোরকেও না।
এবার তো আর পুলিশের কাছে না গিয়ে উপায় নেই, শঙ্কিত হয়ে বললেন মিস্টার কনর।

.

কালো ছায়াটার দিকে হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠলো মুসা, কিশোর, ওটা অ্যানাপামু আইল্যাণ্ড! আশেঁপাশের সবচেয়ে ছোট দ্বীপ। তীর থেকে মাইলখানেকও হবে না। ওটাতে উঠতে পারলেও হয়।
পারবো। ওদিকেই তো ভেসে যাচ্ছি।
নৌকার ধার খামচে ধরে বসে রইলো দুজনে। কাছে আসছে দ্বীপটা। খাড়া পাড়, গাছপালা আর পাথর চোখে পড়ছে এখন। পাড়ের নিচে সাদা ফেনার রেখা।
ওইই, ওখানে সৈকত, বাঁয়ে দেখালো মুসা। মনে হয়..., কথা শেষ না করেই ডাইভ দিয়ে পানিতে পড়লো সে। নৌকার পেছনে ধরে *ঠেলে*, সাঁতরে নিয়ে চললো তীরের দিকে। অসংখ্য ছোট-বড় পাথর মাথা তুলে রেখেছে এখানে। সেখানে। সেগুলোর ফাঁক দিয়ে নৌকাটাকে ঠেলে নিয়ে এলো তীরের কাছে।
অল্প পানিতে নেমে পড়লো কিশোর। দুজনে মিলে টেনেহিঁচড়ে এনে শুকনোয় তুললো নৌকা।
যাক, বাঁচলাম! বালিতে বসে পড়লো মুসা।

কিশোর বসলো তার পাশে। বাঁচলাম আর কই? দ্বীপান্তরে পাঠানো হয়েছে আমাদের। মুসা, এখুনি ফিরে যেতে হবে, নইলে ডাকাতটাকে আটকাতে পারবো না।
বেশি বড় না, দেখছো? কিশোরের কথায় কান নেই মুসার, দ্বীপ দেখছে। ছোট। মানুষজন কিছু নেই। খালি গাছ আর পাথর। কালকের আগে যেতে পারবো না এই দ্বীপ থেকে, তা-ও কপাল ভালো হলে। যদি ধার দিয়ে কোনো নৌকা-টৌকা যায়।
কাল অনেক দেরি হয়ে যাবে। এখানকার প্রায় সব দ্বীপেই ইমারজেন্সি শেল্টার আছে শুনেছি। এটাতেও থাকতে পারে। চলো তো দেখি, কোথায়?
আগে আগে চললো মুসা। বেশি খুঁজতে হলো না। ছোট একটা কেবিন পাওয়া গেল। ভেতরে একটা কাঠের টেবিল, কয়েকটা চেয়ার আর বাঙ্ক। একটা স্টোভ আর টিনজাত কিছু খাবারও সংরক্ষিত আছে। কেবিনের পেছনে একটা ছাউনি। তাতে রয়েছে দুটো ছোট নৌকার মাস্তুল, হাতলশুদ্ধ একটা ছোট হাল, দড়ির বাণ্ডিল, বোর্ড, আর নৌকার জন্যে দরকার আরও কিছু টুকিটাকি জিনিস। হাতুড়ি আর পেরেকও আছে।
রেডিও নিই, কিশোর, মুসা বললো। যে-আশায় এসেছে। কাল সকাল পর্যন্ত থাকতেই হচ্ছে আমাদের। যদি তার আগে কেউ উদ্ধার না করে।
জবাব দিলো না কিশোর। ছাউনির জিনিসগুলোর দিকে তাকিয়ে কি ভাবছে।
মুসা, হঠাৎ বললো সে। পাল হলে তো আমাদের নৌকাটাকে চালানো যায়, তাই না?
যায়। পাল আর হাল থাকলে।
মাস্তুল আর হাল তো এখানেই আছে। নৌকায় আছে ক্যানভাস। পাল তৈরি করা যায়।
বেশি বড় মাস্তুল, বিশেষ ভরসা করতে পারছে না মুসা। স্টেপিং থাকলেও লাগানো যাবে কিনা সন্দেহ।
স্টেপিং?
কিশোর পাশাও তাহলে অনেক কিছু জানে না, হাসলো মুসা। বিদ্যে ঝাড়ার দুর্লভ একটা সুযোগ পেলো। সকেট আর সাপোর্টিং ফ্রেমে মাস্তুল আটকানোর ব্যবস্থাকে নাবিকরা বলে স্টেপিং। মাস্তুলের গোড়া তো কোথাও আটকাতে হয়, নাকি?
এখানে দুটো বুম দেখতে পাচ্ছি। ওগুলোর একটা দিয়ে স্টেপ বানানো যায় না?
নাক চুলকালো মুসা। হয়তো যায়। সীটের মধ্যে গর্ত করে ঢুকিয়ে দিতে পারলে বোর্ড তো আছেই। টুলবক্সে করাত আর বাটালি থাকলে বানিয়ে ফেলা। যাবে। না না, কিশোর, হবে না, ভুলে গিয়েছিলাম!

কেন হবে না?
কীলই নেই নৌকাটার, তিক্তকণ্ঠে বললো মুসা। সেন্টারবোর্ড, সাইডবোর্ড, কিছু নেই। পালে বাতাস ধাক্কা দিলেই নৌকা উল্টে যাবে। আর যদি নেহায়েত কপালগুণে না-ও ওল্টায়, চালানো যাবে না। কিছুতেই সোজা চালানো যাবে না নৌকা।
ধপ করে বসে পড়লো কিশোর। আঙুল কামড়াতে শুরু করলো। তাকিয়ে আছে মাস্তুল আর বুমগুলোর দিকে। খানিক পরে বললো, মুসা, মাস্তুলগুলো ভাসবে?
ভাসতে পারে। কেন, মাস্তুলে চড়ে বাড়ি যাবার কথা ভাবছো নাকি?
মুসার রসিকতায় কান দিলো না কিশোর। মাস্তুলের সঙ্গে যদি পেরেক মেরে বোর্ড লাগিয়ে দিই? বোর্ডের আরেক ধারে পেরেক মেরে লাগিয়ে দিই নৌকার সঙ্গে, তাহলে…
খাইছে, কিশোর, খাইছে! চটাস করে নিজের উরুতে চাটি মারলো মুসা। বাজিমাত করে ফেলেছো! হবে, কাজ হবে এতে! আর যেতে তো হবে মাত্র এক মাইল। বাতাসের গতি ঠিক থাকলে ভারসাম্য বজায় থাকবে নৌকার। চমৎকার!
তাহলে আর দেরি কেন? উঠে পড়লো কিশোর। এসো, চটপট সেরে ফেলি।

.

চীফ ইয়ান ফ্লেচারকে সব কথা যে বলেছে রবিন, সে-ও প্রায় দুই ঘন্টা হয়ে গেছে। খুজতে বেরিয়েছে পুলিশ। কিন্তু এখনও কিশোর, মুসা কিংবা কোহেনের হদিস করতে পারেনি। কারনিভলের ভেতরে-বাইরে অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন চীফ। শো চলছে। উপভোগ করছে দর্শকরা। বুঝতেই পারছে না, সাংঘাতিক ব্যাপার। ঘটে গেছে ভেতরে ভেতরে। উক্তণ্ঠিত হয়ে আছেন মিস্টার কনর, রবি আর রবিন।
তোমার ধারণা কোহেনই ব্যাংক ডাকাত? আরেকবার রবিনকে জিজ্ঞেস করলেন চীফ।
হ্যাঁ।
রকি বীচ থেকে পালালো কিনা বুঝতে পারছি না। অনেকেই দেখেছে বলেছে, অথচ কেউ দেখেনি।
কিশোরও তাই মনে করে।
ওর মনে করার যথেষ্ট কারণ নিশ্চয় আছে। ফালতু কথা বলে না কিশোর।
ওর অনুমান, ডাকাতটা এখনও তার জিনিস খুঁজে পায়নি। আর আমা অনুমান, কোহেনই রবির ট্রেলার ঘেঁটেছে তখন। তারমানে সে-ই ডাকাত লুকানো জিনিস খুঁজছিলো।
হ্যাঁ, হতে পারে।

লোকটা অদ্ভুত, মিস্টার কনর বললেন। সব সময় আলাদা আলাদা থেকেছে আমাদের কাছ থেকে। কারও সঙ্গে মিশতে পারেনি।
হুঁ, চোয়াল শক্ত করে ফেললেন চীফ। খুঁজে বের করবোই তাকে।
দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে পুলিশ, আর কনরের রাফনেকরা। চষে ফেলছে পুরো এলাকা। খোলা অঞ্চল, কারনিভলের তাঁবু, বুদ, ট্রেলার, ট্রাক, কিছু বাদ রাখছে না। সব কটা গাড়ি আর ট্রাক যথাস্থানে দাঁড়িয়ে আছে, কোনোটা নিখোঁজ হয়নি।
কয়েকবার করে পরিত্যক্ত পার্কটায় খুঁজতে গেল ওরা, সাগরের ধারে খুঁজলো। এমনকি কারনিভলের কাছাকাছি পথ, অলি-গুলি-ঘুপচি, বাড়িঘরেও খুঁজে দেখলো।
পেরোলো আরও এক ঘন্টা। তিনজনের একজনকেও পাওয়া গেল না।
এবার সত্যি চিন্তা লাগছে! চীফ বললেন। গেল কোথায়? ওই পার্কটাতেই সূত্র মিলবে। আমিও একবার গিয়ে দেখি।
রাফনেকদের নিয়ে কয়েকজন পুলিশ তখনও পার্কে খুঁজছে। চীফ কাছে যেতে যেতেই চিৎকার শোনা গেল।
ওই যে, প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন ফ্লেচার। নিশ্চয় কিছু পেয়েছে। বেড়ার ফোকর গলে দ্রুত পার্কে ঢুকলেন তিনি। পেছনে ঢুকলেন কনর আর দুই কিশোর। পানির কিনারে জটলা করছে পুলিশ আর রাফনেকরা। কাকে যেন ধরেছে।
ছুটে গেলেন চীফ। জিজ্ঞেস করলেন, ছেলেদের পাওয়া গেছে?
না, চীফ, একজন পুলিশ বললো। একে পেয়েছি।
ঝাড়া দিয়ে হাত ছাড়িয়ে এগিয়ে এলো কোহেন। আমাকে এভাবে ধরেছে কেন, জিজ্ঞেস করুন তো? আমি কি চোর নাকি?
আগে বলো তুমি এখানে কি করছো? কঠিন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন কনর।
সেটা আমার ব্যাপার।
আর চুপ থাকতে পারলো না রবিন। ও-ই ডাকাত! ওকে জিজ্ঞেস করুন, মুসা আর কিশোরকে কি করেছে!
ডাকাত? গর্জে উঠলো কোহেন। আমি ডাকাত নই, গাধা কোথাকার। ডাকাতটাকে তাড়া করেছিলাম। বলেছিই তো।
গত তিন ঘন্টা তাহলে কি করছিলেন? প্রশ্ন করলেন চীফ। আমরা খুঁজতে খুঁজতে হয়রান। কোথায় ছিলেন?
ডাকাতটাকে খুঁজতে এসেছি। আমার সন্দেহ...
মিথ্যে বলছে ও! রাগে চেঁচিয়ে উঠলো রবিন। ওর দাড়িও নকল।

কোহেন সরে যাওয়ার আগেই হাত বাড়িয়ে তার দাড়ি চেপে ধরলেন চীফ। হ্যাঁচকা টান দিতেই খুলে চলে এলো আলগা দাড়ি। সবাই তাকিয়ে রইলো লোকটার দিকে।
বেশ, কোহেন বললো। নাহয় নকলই হলো। তাতে কি? নিজে নিজেই টেনে খুলে ফেলতে লাগলো আলগা চুল, গালের জড়ুল। বেরিয়ে এলো খাটো করে ছাটা চুল, চেহারার বুনো ভাব দূর হয়ে গেল, ভদ্র চেহারার এক তরুণে পরিণত হলো স্ট্রংম্যান। কারনিভলে সবাই চোখে পড়ার মতো পোশাক পরে। মেকাপ নেয়। চুল-দাড়ি আর জড়ুল ছাড়া স্ট্রংম্যানকে লোকে পছন্দ করবে কেন!
কিন্তু আমাকেও তুমি ধোকা দিয়েছে, কোহেন, কনর বললেন। ওসব পরেই চাকরি নিতে এসেছিলে। বুঝিয়েছে, ওগুলো আসল।
মস্ত থাবা নাড়লো স্ট্রংম্যান। আগে সার্কাসে কাজ করেছি, বলেছি আপনাকে। সার্কাস থেকে কারনিভলে আসে না কেউ। কারনিভল থেকেই সার্কাসে যায়, ভালো করেই জানেন। সম্মান খোয়াতে চায় কে? তাই চেহারা লুকিয়ে রেখেছি।
ও স্ট্রংম্যানই নয়, বলে উঠলো রবি। তাই না, বাবা? নিশ্চয় মাছিমানব টিটানভ।
না, ও টিটানভ নয়।
কিন্তু মিথ্যে বলছে, সন্দেহ নেই! রবিন বললো।
কাঁধ ঝাঁকালো স্ট্রংম্যান, ফুলে উঠলো কাঁধের পেশী। তাই নাকি, খোকা? তাহলে... সাগরের দিকে চোখ পড়তে থেমে গেল সে। আরে...?
চীফ, দেখুন, দেখুন, চিৎকার করে বললো একজন পুলিশ।
সাগরের দিকে তাকালো সবাই। কালো পানি চিকচিক করছে চাঁদের আলোয়। এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখলো ওরা বিচিত্র একটা নৌকা এগিয়ে আসছে পাল তুলে। একপাশে কাত হয়ে আছে নৌকাটা, চ্যাপ্টা কি যেন একটা আটকে রয়েছে একধারে, বোঝা যায় না। আরও কাছে এলে চেনা গেল আরোহীদের, মুসা আর কিশোর।
ওরাই! বলে দৌড় দিলো রবিন।
কিশোওর! মুসাআ! চেঁচিয়ে উঠে রবিও দৌড়ালো।
নৌকা তীরে ভিড়তেই লাফিয়ে নেমে ছুটে এলো দুই গোয়েন্দা। কয়েক মিনিটেই অন্যদের জানা হয়ে গেল, দুজনের সাগর-অভিযানের কাহিনী।
ওটায় চড়ে এসেছো? বিশ্বাস করতে পারছেন না যেন চীফ।
দেখলেনই তো, হেসে বললো কিশোর। মুসা খুব বড় নাবিক। চলুন, কারনিভলে। ডাকাতটা কি খুঁজছিলো, জানি। আমার ধারণা, এখনও পায়নি ওটা।
আর পাবেও না, রবিন বললো। ডাকাতটা ধরা পড়েছে। কোহেনকে দেখালো সে।
না, কোহেন ডাকাত নয়।

গোঁ গোঁ করে বললো কোহেন, সেকথাই তো বলছি ওদের এতোক্ষণ। বিশ্বাসই করে না।
ছদ্মবেশে ঢুকেছে ও, কিশোর, কনর বললেন। রবির ট্রেলার ঘাটতে দেখেছো ওকেই।
না, স্যার, শান্ত, দৃঢ়কণ্ঠে বললো, গোয়েন্দাপ্রধান। নৌকার ক্যানভাসের নিচে লুকিয়ে থাকার সময় বুঝেছি লোক একজন নয়, দুজন। ডাকাতকে তাড়া করেছে কোহেন। ফান হাউসে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলাম আমরা, মনে করেছে আমরাই বুঝি ডাকাত।
কি করে বুঝলে? চীফ জিজ্ঞেস করলেন।
আমাদের দেখেছে বলে চিৎকার করছিলো। যে তাড়া করে সে-ই ওভাবে। চেঁচায়, যাকে তাড়া করা হয়, সে নয়। আসল ডাকাতটা বরং লুকিয়েই থেকেছে আমাদের কাছ থেকে।
হ্যাঁ, যুক্তি আছে। কিন্তু…
তাছাড়া, চীফকে কথা শেষ করতে দিলো না কিশোর, কোহেনের কোমর পর্যন্ত নগ্ন, কোনো কাপড় ছিলো না। শুধু আঁটো পাজামা। হাত খালি। পিস্তল আর ছুরি লুকিয়ে রাখার জায়গাই নেই। অথচ, নৌকার দড়ি কেটে আমাদের ভাসিয়ে দিয়েছিলো, যে লোকটা, তার কাছে ছুরিও ছিলো, পিস্তলও।
ছেলেটা আপনাদের চেয়ে অনেক চালাক, আন্তরিক প্রশংসা করলো স্ট্রংম্যান।
আরও একটা ব্যাপার, কিশোর বললো। রকম পায়ের আওয়াজ শুনেছি। ভারি বুট আর রাবার সোল নরম জুতো। কোহেনের পায়ে বুট, তারমানে ডাকাতটার নরম জুতো ছিলো।
হেসে উঠলো কোহেন। নিন, এবার হলো তো। আমি যে ডাকাত নই, দিলো। প্রমাণ করে।
তবে আপনিও দুধে ধোয়া নন, মিস্টার কোহেন, তাকে ধরলো এবার কিশোর। ছদ্মবেশে ছিলেন, এটা তো ঠিক। কিছু একটা গোপন করে রেখেছেন সবার কাছ থেকে। নিশ্চয় কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে ঢুকেছেন কারনিভলে। আশা করি, চীফের কাছে বলবেন কারণটা। স্ট্রংম্যানের দিকে চেয়ে ঠাণ্ডা হাসি হাসলো সে।
ভুরু কুঁচকে কোহেনের দিকে তাকালেন চীফ।
জোরে নিঃশ্বাস ফেলে হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গি করলো কোহেন। তুমি সাংঘাতিক চালাক, কিশোর পাশা। দেখে কিন্তু মনেই হয় না। ধরা যখন পড়েছি, না বলে আর উপায় কি? সত্যিই স্ট্রংম্যান ছিলাম আমি, সার্কাসে, কয়েক বছর আগে ছেড়ে দিয়েছি। গোয়েন্দাগিরিতে বেজায় শখ, তাই শখের গোয়েন্দা হয়েছি চাকরি ছাড়ার পর। আমার আসল নাম ডেনমার বোলার। রবির নানী ভাড়া করেছে

আমাকে নাতির ওপর চোখ রাখার জন্যে। মহিলা জানতে চান, কারনিভল সত্যি সত্যি পছন্দ করে কিনা রবি। আর তার কাজে বিপদের সম্ভাবনা কতটা।
দুর্ঘটনাগুলো তাহলে তুমি ঘটাওনি? কঠোর হয়ে উঠেছে কনরের দৃষ্টি।
না। তবে ঘটাতে উদ্বিগ্ন হয়েছি। আপনাকে বার বার কারনিভল বন্ধ করতে অনুরোধ করেছি সেজন্যেই। রবির জন্যে ভয় হচ্ছিলো। ওর কোনো ক্ষতি হলে। ওর নানী আমাকে আস্ত রাখতো না। তাছাড়া, এটাও বুঝতে চাইছিলাম. ওগুলো আসলেই দুর্ঘটনা কিনা?
রবিকে নিরাপদে রাখতে চাইছিলে?
হ্যাঁ, কনর। সেই দায়িত্বই দেয়া হয়েছে আমাকে।
ভ্রূকুটি করলো কিশোর। চমৎকার, মিস্টার কোহেন। নাকি, মিস্টার বোলার? যা-ই হোক, সব কথা বলেননি। আরও কিছু আছে। রবিকে দেখা আপনার দায়িত্ব, তার ট্রেলার দেখা নয়। ওখানে গিয়েছিলেন কেন? নিশ্চয় সন্দেহ করেছিলেন, ডাকাতটা ওখানে খুঁজতে যাবে। ডাকাতের পেছনে কেন লেগেছেন?
দীর্ঘ এক মুহূর্ত চুপ করে রইলো কোহেন, ওরফে বোলার। তারপর মাথা ঝাঁকালো। নাহ, তোমাকে ফাঁকি দেয়া মুশকিল। ঠিকই ধরেছো, স্যান মেটিওতেই বুঝেছি, ডাকাতটা কারনিভলেরই লোক। আমি গোয়েন্দা। পেশাদারী একটা মনোভাব রয়েছে। আশা করেছি, ডাকাতটাকে ধরতে পারলে আমার সুনাম বেড়ে যাবে রাতারাতি। কাজেই তদন্ত শুরু করলাম। কিন্তু অনেক খুঁজেও পেলাম না, ডাকাতটার চেহারার সঙ্গে কারনিভলের কারও চেহারা মেলে না। তারপর কানা বেড়াল চুরি গেল। বুঝলাম, ওগুলোর ভেতরেই জরুরী কিছু লুকিয়েছে ডাকাতটা। থেমে হাত নাড়লো সে। কিন্তু বেড়ালের ভেতরে সে নিজেই খুঁজে পেলো না।
কি সাংঘাতিক! বলে উঠলো রবি। নিশ্চয় ভেতর থেকে পড়ে গেছে।
তার কথায় সায় জানাতে পারলো না কিশোর। আমার তা মনে হয় না, বললো সে। বেড়ালের ভেতরেই রয়েছে এখনও।

.

কিন্তু কিশোর, প্রতিবাদ করলো রবি। আমার পাঁচটা বেড়ালই ছিলো। ডাকাতটা সবগুলো নিয়ে গেছে।
না, রবি, তুমিও ভুল করছো। আসলে বেড়াল ছিলো ছটা। আমরা দেখেছি।
দেখেছি? হাঁ হয়ে গেছে মুসা। কোথায়?
কোথায়, কিশোর? রবিন জানতে চাইলো।
ধরতে গেলে আমাদের নাকের নিচে। সেজন্যেই দেখেও দেখিনি। রবিদের ট্রেলারে উঠেছিলাম, মনে আছে? ভাঙা, নষ্ট…

পুরস্কার! চেঁচিয়ে উঠলো রবি। মেরামত করার জন্যে রেখেছি ঝুড়িতে। আরেকটা কানা বেড়াল আছে ওখানে! স্যান মেটিওয় পুড়ে গিয়েছিলো।
তারমানে আগুন লাগার সময় শুটিং গ্যালারিতে ছিলো ওটা, বললো কিশোর। ওটাতেই জিনিসটা লুকিয়েছিলো ডাকাত। আগুনে বেড়ালটা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় রবি নিয়ে গিয়ে ঝুড়িতে ফেলে রেখেছে। সেকথা ভাবেইনি ডাকাতটা, তার নিশ্চয় জানা ছিলো না, বেড়াল ছটা আছে। নৌকায় সময় পেয়েছি ভাবার। আমাদের ভাসিয়ে দেয়াটা একটা কথাই প্রমাণ করে, যা খুঁজছে তখনও পায়নি সে। আমরা তার কাজে বাগড়া দেবো বলেই সরিয়ে দিতে চেয়েছে। অনেক ভাবলাম, কোথায় থাকতে পারে জরুরী জিনিস? হঠাৎ মনে পড়লো, ঝুড়িতে ফেলে রাখা বেড়ালটার কথা।
খাইছে! কিশোর, একবারও ভাবিনি আমরা।
আমিও না, তিক্তকণ্ঠে বললো রবি। অথচ আমার হাতের কাছেই রয়েছে।
ডাকাতটাও ভাবেনি, হেসে বললেন চীফ। খুব ভালো কাজ দেখিয়েছো, কিশোর। তোমাকে আমার জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে পেলে খুশিই হবো। করবে চাকরিটা? অনারারি পোস্ট।
মৃদু হেসে প্রশ্ন এড়িয়ে গেল কিশোর। বললো, যখন বুঝলাম...! থেমে গেল সে। সতর্ক হয়ে উঠেছে। তাড়াতাড়ি চারপাশে দেখলো। চীফ! কে যেন গেল?
অন্ধকার ছায়ার দিকে তাকিয়ে আছে মুসা। আমিও শুনলাম!
কে গেল? এদিক ওদিক তাকালেন চীফ।
কি জানি, স্যার! বললো একজন পুলিশ। আমরা তো সবাই আছি।
কে যেন দাঁড়িয়েছিলো আমার পেছনে, একজন রাফকে বললো, মনে করতে পারছি না।
চেঁচিয়ে উঠলো রবিন, কোহেন কোথায়?
আশেপাশে কোথাও নেই কোহেন।
জলদি চলুন, কিশোর বললো। কুইক। ছয় নম্বর বেড়ালটার কথা জেনে গেছে!
ছুটতে ছুটতে বেড়ার কাছে চলে এলো সবাই। ফোকর গলে ঢুকলো। কারনিভলের সীমানায়। কিছু দর্শক রয়েছে এখনও। কৌতূহলী হয়ে তাকালো ওরা ছুটন্ত দলটার দিকে।
ছুটে ট্রেলারে ঢুকলো রবি। পরক্ষণেই বেরিয়ে এসে হাত ঝাড়া দিলো। নেই! বেড়ালটা নেই!
সব পথ বন্ধ করে দাও! আদেশ দিলেন চীফ।
খোঁজো, খোঁজো! কনর বললেন। সমস্ত কারনিভল চষে ফেলো!
তাড়াহুড়া করে চলে গেল পুলিশ আর রাফনেকরা।

আর পালাতে পারবে না, চীফ বললেন।
চীফ, কোহেনই নিয়েছে? মুসা জিজ্ঞেস করলো।
বুঝতে পারছি না। একের পর এক মিথ্যে বলে যাচ্ছিলো!
নানী গোয়েন্দা ভাড়া করেনি, রবি বললো। করেছে একটা ডাকাতকে।
অনেক শখের গোয়েন্দাকেই নষ্ট হতে দেখেছি আমি, চীফ বললেন। ক্রিমিনালদের সঙ্গে মেশার সুযোগ বেশি ওদের। খারাপ হতে সময় লাগে না। হতে পারে, ডাকাতটার সঙ্গে হাত মিলিয়েছে কোহেনও।
কোহেন না হলে আর কে, স্যার? মুসার প্রশ্ন। তাকে তো আমরা চিনি না। ধরবো কিভাবে? বেড়ালটা জাস্ট লুকিয়ে ফেলবে। ব্যস, আর চেনা যাবে না। তাকে।
বেড়ালটা নিয়ে প্রমাণ করে দিলো, সে আছে। পালাতে আর দেবো না। যেভাবেই হোক, ধরবোই। কিশোর…আরে, কিশোর গেল কোথায়?
কোন ফাঁকে চলে গেছে কিশোর, কেউ খেয়াল করেনি।
কিশোর? মুসা ডাকলো।
কিশোর? কোথায় তুমি? জোরে ডাকলেন চীফ।
জবাব নেই।
আমাদের সঙ্গে কি এসেছিলো এখানে? মনে করতে পারছে না রবিন।
পার্ক থেকে বেরোনোর আগে পর্যন্ত ছিলো, কনর বললেন।
বেশিদূরে যেতে পারেনি, চীফ বললেন। কাছাকাছিই থাকবে।
যদি ডাকাতটার পিছু নেয়? মুসার গলা কাঁপছে।
শান্ত হও, মুসা, কনর বললেন। চলো, খুঁজি।
এক এক করে সমস্ত ট্রাক আর ট্রেলার খুঁজলো ওরা। তারপর চলে এলো যেখানে শো চলছে সেখানে। পনেরো মিনিট খোঁজাখুঁজি করে না পেয়ে এলো শুটিং গ্যালারির পাশের চওড়া পথটায়। সেখানেও নেই কিশোর।
শো শেষ, কনর বললেন। দেখি ওদেরকে জিজ্ঞেস করে, কিশোরকে দেখেছে কিনা।
বেরোনোর সব পথ বন্ধ, চীফ বললেন। বেড়ার কাছেও লোক আছে। ওদের ফাঁকি দিয়ে পার্কে ঢুকতে পারবে না। ভেতরেই আছে কিশোর।
মারকাস দ্য হারকিউলিসের তাঁবুর কাছে কর্মীদের ডেকে জড়ো করালেন কনর। পুলিশ দেখে অস্বস্তি বোধ করছে অনেকেই। কিশোরকে দেখেছে কিনা জিজ্ঞেস করা হলো।
আমি দেখিনি, অস্বস্তিতে নাক কুঁচকালো লায়ন ট্রেনার।
আগুনখেকো আর দড়াবাজরা মাথা নাড়লো। বিচিত্র ভঙ্গিতে দুই লাফ দিলো খাটো ভাড়, এখনও অভিনয় করছে। হাত তুলে দেখালো বিষণ্ন লম্বা ভাঁড়কে।

ভাঙা ঝাড়ু দিয়ে তলাহীন বালতিতে ময়লা তোলার অভিনয় করলো লম্বা। কিন্তু হাসাতে পারলো না কাউকে। হাসার সময় নয় এটা।
মনে হয় আমি দেখেছি, কেঁদে ফেলবে যেন লম্বা। তাঁবুর পেছনে।
দেখেছো? কাটা কাটা শোনালো চীফের কথা। কার সঙ্গে? কোন তাঁবুর। পেছনে?
জানি না, বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো লম্বা। মনে করতে না পারায় বড় দুঃখ পেয়েছে যেন।
হাতে ভর দিয়ে উল্টো হয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে পড়ে গেল বেঁটে। তিড়িং তিড়িং করে আবার দুই লাফ দিলো লম্বাকে ঘিরে।
গুঙিয়ে উঠলো রবিন। কিশোরকে ধরে নিয়ে গেছে! আমি জানি!
হ্যাঁ, মুসাও প্রায় ককিয়ে উঠলো। জিম্মি করার অভ্যেস তো আছেই। ডাকাতটার!
শান্ত হও, শান্ত হও, বললেন বটে, কিন্তু চীফ নিজের উদ্বেগই ঢাকতে পারলেন না।
যাবে কোথায়? ধূরে নিয়ে গিয়ে বাঁচতে পারবে না।
ধরেই যদি নিয়ে থাকে, প্রশ্ন তুললো রবি। এখনও বেরিয়ে আসছে না। কেন? জিম্মি তো আছেই।
তা-ও তো কথা। বুঝতে পারছি না কিছু।
লম্বা ভাঁড় বলে উঠলো, জিম্মি? মনে পড়েছে। লোকটা পার্কের বেড়ার দিকে দৌড়াচ্ছিলো, ছেলেটাও। ধরে নিলো কিনা বুঝলাম না।
সাগরের দিকে? অবাক হলেন চীফ।
নিশ্চয় সাঁতরে পালানোর চেষ্টা করবে, বললেন কনর। পাহারা পরে বসিয়েছি আমরা, তার আগেই নিশ্চয় বেরিয়ে গেছে।
ইতিমধ্যে দৌড় দিয়েছে মুসা আর রবি। চীফ আর কনরও পিছু নিলেন। কিন্তু রবিন নড়লো না। মাটির দিকে চেয়ে আছে। চীফ! ডাকলো সে। দেখে যান।
ফিরে এলো চারজনেই। আঙুল তুলে দেখালো রবিন। মাটিতে মস্ত এক প্রশ্নবোধক চিহ্ন আঁকা।
খাটো ভাঁড় তখনও লম্বাকে ঘিরে নাচছে। বুড়ো আঙুল নেড়ে বার বার দেখাচ্ছে লম্বা ভাঁড়কে।

.

আমাদের সাঙ্কেতিক চিহ্ন! বিড়বিড় করলো মুসা। দুই ভাড়ের দিকে তাকালো একবার।
নিশ্চয় কিশোর, বললো রবিন। আমাদের…, বলতে বলতে *থে*মে গেল। সে। খাটো ভাড়ের দিকে তাকিয়ে আছে স্থির দৃষ্টিতে। চীফ…!
এবারেও রবিনের কথা শেষ হলো না। হঠাৎ ঢোলা জামার পকেট থেকে লম্বা ভঁড়ের হাতে বেরিয়ে এলো একটা পিস্তল। সেটা তাক করে কোনো কথা না বলে।

ধীরে ধীরে পিছিয়ে যেতে শুরু করলো প্রধান প্রবেশ পথের দিকে। রঙ করা ফ্যাকাসে-সাদা চেহারায় ধকধক করে জ্বলছে কালো চোখের তারা।
খবরদার, কেউ নড়বে না! সতর্ক করলেন চীফ। যেতে দাও।
অসহায় হয়ে তাকিয়ে আছে ছেলেরা, চীফ নিজে, এবং মিস্টার কনর। চলে যাচ্ছে লোকটা। গেটের কাছে প্রায় পৌঁছে গেছে, হঠাৎ একটা বুদের আড়াল থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এলো আরেকজন। লম্বা ভড় কিছু করার আগেই তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।
কোহেন। পিস্তল ঘোরানোর চেষ্টা করলো লম্বা, পারলো না। লোহার মতো কঠিন আঙুল কব্জি চেপে ধরলো তার। সেই আঙুল ছাড়ানোর সাধ্য হলো না তার, হাত থেকে খসে পড়লো পিস্তল। স্ট্রংম্যানের কবলে পড়ে একেবারে অসহায় হয়ে গেল লম্বা।
যাক, ব্যাটাকে ধরলাম শেষ পর্যন্ত। খুশি হয়ে বললো কোহেন।
নিজের লোকদের ডাকলেন চীফ। ছুটে এলো তারা। শো শেষ হলেও দর্শকরা সব বেরিয়ে যায়নি, ভিড় জমাতে লাগলো। দুজন পুলিশ গেল ভাঁড়কে ধরতে, অন্যেরা লোক সরানোয় ব্যস্ত হলো।
হেসে বললো, কোহেন, গিয়ে ঘাপটি মেরে ছিলাম। জানতাম, আজ বেরোবেই ব্যাটা। কিন্তু ভাঁড়ের ভেতর থেকে যে বেরোবে, কল্পনাও করিনি।
লাফালাফি থামিয়ে দিয়েছে খাটো ভড়। চুল, মুখোশ সব টেনে টেনে খুললো। হাসিমুখে বললো কিশোর, ভাড় সাজার ইচ্ছে আমার অনেকদিনের।
কয়েক সেকেণ্ড স্তব্ধ হয়ে রইলেন চীফ। তারপর কথা ফুটলো মুখে, খুলে বলো সব। কি করে বুঝলে, লম্বুই ডাকাত? আর ভাড় সাজতেই বা গেলে কেন?
বলছি, শুরু করলো কিশোর। লোকটা আমাদের অলক্ষ্যে পার্ক থেকে সরে আসার পরই বুঝেছি, ছয় নম্বর বেড়ালটা নিতে গেছে। আমরা পৌঁছার আগেই বের করে নিয়ে লুকিয়ে ফেলবে। তারপর তাকে চেনা খুব মুশকিল হয়ে যাবে। তাই আপনাদের সঙ্গে না গিয়ে অন্যদিকে গেলাম। বুঝেছি, বেড়ালটা নিয়েই মিশে যাবে লোকের ভিড়ে। যেখানে তাকে চেনা সহজ হবে না।
ওরকম জায়গা কোনটা? দড়াবাজদের তাঁবু। ওরা তখনও খেলা দেখাচ্ছে। ওদিকে পা বাড়াতে যাবো, দেখি ট্রেলারের দিক থেকে একটা লোক দৌড়ে আসছে। চিনলাম। লম্বা ভাঁড়। দৌড়াতে দৌড়াতেই জিনিসটা ঢুকিয়ে ফেললো ঢোলা পাজামার ভেতরে। আমাকে ওখানে ওই অবস্থায় দেখে ফেললে নিশ্চয় চিনে। ফেলতো। তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়লাম কাছের তাঁবুটাতে। ঢুকেই চমকে গেলাম। ঢুকেছি ভাঁড়দের তাঁবুতেই।

খাইছে! আঁতকে উঠলো মুসা। যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই রাত... একেবারে বাঘের ঘরে ঢুকে গিয়েছিলে!
মাথা ঝোঁকালো কিশোর। ভয় পেয়েছি খুব। দ্রুত ভাবছি, কি করা যায়। শো দেখানোর অন্যান্য তাঁবুর মতোই ওটারও দুটো অংশ। পেছনের অংশে থাকে অভিনেতাদের মেকাপের সরঞ্জাম, যারা ট্রেলারে মেকাপ নেয় না তাদের জন্যে, জানোই। সোজা ঢুকে পড়লাম সেখানে। বাইরে তার পায়ের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। তখন। যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে। পেছনে ঢুকবে কিনা, জানি না। ঢুকতেও পারে...
কি সাংঘাতিক! চোখ বড় বড় হয়ে গেছে রবির। ভালো ফাঁদে পড়েছিলে! ছুরি-টুরি মেরে বসতে পারতো।
পারতো, সায় জানালো কিশোর। ভয় তো পেয়েছি সেকারণেই। দেখি, খাটো ভাঁড়ের সাজপোশাক পড়ে আছে। খেলা শেষ। সাজপোশাক খুলে রেখে গেছে সে। বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে পরে ফেললাম। ভাগ্যিস, গায়ে লেগেছে। মুখোশ পরাও শেষ করলাম, এই সময় লম্বু ঢুকলো। আমাকে চিনতে পারলো না। অনুরোধ করতে লাগলো, দড়াবাজদের তাঁবুতে গিয়ে আরেকবার যেন খেলা। দেখাই। খেলা দেখানোর নেশায় নাকি পেয়েছে তাকে। আমি তো বিশ্বাস করিইনি, খাটো ভাড়ও করতো কিনা কে জানে। আসলে তখন মরিয়া হয়ে উঠেছে। লম্বু মিয়া। পুলিশকে ফাঁকি দেয়ার জন্যে। বেড়ালটা নিয়ে নিরাপদে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগের জন্যে। প্রথমে চেয়েছিলো, বেড়ালের ভেতর যে সে জিনিস। লুকিয়েছে, এটা কেউ না জানুক। পরে দেখলো, সবাই জেনেই গেছে। আর চালাকি করে লাভ নেই। কোনোমতে বেড়ালটা নিয়ে পালিয়ে যেতে পারলেই তখন হাঁপ ছাড়ে।–
হু, বুঝলাম, বললেন চীফ। কিন্তু বাইরে বেরিয়ে, আমাদের কাছে এসে কেন বললে না, লম্বুই ডাকাত? ভাঁড়ামির কি দরকার ছিলো?
আমি জানতাম, স্যার, ওর কাছে পিস্তল আছে। আমার ভয় ছিলো, সরাসরি আপনাকে বললে বেপরোয়া হয়ে উঠবে সে। পিস্তল বের করে যথেচ্ছা গুলি চালাতে শুরু করলেও অবাক হতাম না। তাতে মারাত্মক কিছু ঘটে যেতে পারতো। তাই চাইছিলাম, ওকে না জানিয়ে কোনোভাবে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে। বোঝাতে চাইছিলাম, আমি আসলে খাটো ভাড় নই। তা-ও যখন বুঝলেন না, মাটিতে প্রশ্নবোধক আঁকলাম। রবিনের চোখে পড়েছিলো বলেই...।
হ্যাঁ, আরেকটু হলেই দিয়েছিলাম কাচিয়ে, স্বীকার করলেন চীফ। যাক, ভালোয় ভালোয় সব শেষ হলো। বেড়ালটা কোথায়?
ওর পাজামার ভেতরে, লম্বা ভাঁড়কে দেখালো কিশোর।

অস্বাভাবিক ঢোলা পাজামার ভেতর থেকে বের করা হলো বেড়ালটা। ওটার। ভেতর থেকে বেরোলো ছোট একটুকরো কার্ডবোর্ড।
লেফট-লাগেজ টিকেট! টুকরোটা হাতে নিয়ে বিড়বিড় করলেন চীফ। টাকাগুলো নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রেখেছে ওখানে। আরেকটা রহস্যের সমাধান। হলো। এখন দেখা যাক, ভঁড়ের আড়ালে লুকিয়ে আছেন কোন মহাজন।
ভাঁড়ের পরচুলা আর উইগ নিজের হাতে খুললেন চীফ। পিছিয়ে গেলেন এক পা। বোকা হয়ে গেছেন যেন।
ভাঁড়ের মুখোশের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে সাদা-চুল এক বৃদ্ধ। বয়েস পঁয়ষট্টির কম নয়।
ও…ও ডাকাত নয়! মাথা নাড়ছেন চীফ। ও নয়!
আমিও তাই বলতে চাইছিলাম, কনর বললেন। ডাকাতি করার বয়েসই নেই। আর যা-ই করুক, বয়েস কেউ লুকাতে পারে না। আর দেয়াল বেয়ে ওঠাও তার কর্ম নয়।
আমি ডাকাত নই, দীর্ঘশ্বাস ফেললো ভাড়, গোবেচারা চেহারা। দশ হাজার ডলারের লোভ দেখিয়ে আমাকে দিয়ে ট্রেলার থেকে বেড়ালটা চুরি করিয়েছে। পিস্তলটা ও-ই দিয়েছে। কি করে ব্যবহার করতে হয়, তাই জানি না। আপনাদের ভয় দেখিয়ে খুব অন্যায় করেছি। আ-আমাকে…আমাকে মাপ করে দিন।
কে ভাড়া করেছে? চীফ জিজ্ঞেস করলেন।
আড়চোখে কোহেনের দিকে তাকালো ভড়। বললো, কোহেন। আমাকে দশ হাজার ডলার দেবে বলেছে।
লাল হয়ে গেল স্ট্রংম্যান। চেঁচিয়ে উঠলো, মিথ্যে কথা? ব্যাটা মিথ্যুক! আমি… আমি…
আমি সত্যি বলছি, জোর গলায় বললো ভাঁড়। আমাকে ফাঁসিয়ে দিয়ে ও এখন স্বীকার করতে চাইছে না।
কোনো কথা বলছে না কিশোর। স্থির চোখে তাকিয়ে আছে ভাঁড়ের হাতের দিকে। হাসি ফুটলো মুখে। আমাদের বুড়ো ভাঁড়ই মিথ্যে কথা বলছে, চীফ।
কি করে বুঝলে?
ও মোটেও বুড়ো না।
অ্যাঁ? কি বলছো? বিশ্বাস হচ্ছে না মুসার।
হ্যাঁ, সেকেণ্ড। আমরা ভেবেছি, ছদ্মবেশ পরে গিয়ে ডাকাতি করেছে বাদামী চামড়ার লোকটা। আসলে পরে গিয়ে নয়, খুলে গিয়ে করেছে। প্রথম দিন বেড়াল চুরি করার সময় অবশ্য আরেকটা ছদ্মবেশ পরেছিলো। তবে কারনিভলে সব সময়ই ছিলো বুড়ো মানুষের ছদ্মবেশে।

ছাড়া পাওয়ার জন্যে জোরাজুরি শুরু করলো ভাড়, কিন্তু দুজন পুলিশ তাকে দুদিক থেকে চেপে ধরে রাখলো। চুল ধরে টানলেন চীফ, মুখোশ খোলার চেষ্টা করলেন। চুলও খুললো না, মুখের ভাঁজ পড়া চামড়াও আগের মতো রইলো।
ভালো করে দেখলেন আবার চীফ। লোকটার গলার কাছে সূক্ষ্ম একটা দাগ দেখতে পেলেন। নখ দিয়ে খুটে বুঝলেন আলগা। আঙুল ঢুকিয়ে জোরে ওপর দিকে টানতেই খুলে চলে এলো প্লাস্টিকের মুখোশ গলা, মুখ, চুল, সব একটাতে। আলগা কিছু নয়।
বেরিয়ে পড়লো আরেক চেহারা। বাদামী চামড়া।
টিটানভ! সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারলেন কনর। মাছিমানব থেকে ব্যাংক ডাকাত!
টাট্টু কোথায়, দেখুন তো? মুসা বললো।
পাওয়া যাবে না, বললো কিশোর। ওটা আলগা। সময়মতো লাগিয়ে নিতো।
জাহান্নামে যাও; বিচ্ছু কোথাকার! হিসিয়ে উঠলো টিটানভ। হাঁদা ছেলে!
বিচ্ছু ঠিকই, টিটানভ, কঠিন হাসি ফুটলো চীফের ঠোঁটে। তবে হাঁদা বলতে পারবে না। তোমাকেই বরং হাঁদা, গাধা, সব বানিয়ে ছেড়েছে। কিশোরের দিকে ফিরলেন। অনেক প্রশ্নের জবাবই তো দিলে, কিশোর। আর একটা প্রশ্ন। কি করে বুঝলে, ওর মুখে মুখোশ? টেনেও তো কিছু বোঝা যাচ্ছিলো না।
অতি-ধূর্ত অপরাধীও কিছু না কিছু ভুল করেই ফেলে, স্যার। আপনি খুব ভালো করেই জানেন। এই লোকও হাত ঢাকতে ভুলে গিয়েছিলো। বোধহয় তাড়াহুড়োয়। সবসময় তো দস্তানা পরেই থাকতো, দেখেছি। কোথায় খুলে রেখেছিলেন, টিটানভ? পার্কে? আমাদের নৌকার দড়িকাটার সময়? নাকি বেড়ালটা চুরির সময়? . জবাব দিলো না মাছিমানব। ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিলো আরেকদিকে। তার হাতের দিকে এখন সবার চোখ। বাদামী চামড়া সবাই দেখতে পাচ্ছে।
হাঁদা আমাকে বলতে পারো, টিটানভ, বিরক্ত কণ্ঠে বললেন চীফ। চোখ ভোঁতা হয়ে গেছে আমার। নইলে এটা দেখলাম না!
হাসলো কিশোর। নাটকীয় ভঙ্গিতে বললো, সহজ ব্যাপারগুলোই সহজে, চোখ এড়িয়ে যায়।

.

পরদিন, কেসের রিপোর্ট ফাইল নিয়ে বিখ্যাত পরিচালক ডেভিস ক্রিস্টোফারের অফিসে ঢুকলো তিন গোয়েন্দা।
মন দিয়ে ফাইলটা পড়লেন পরিচালক। মুখ তুলে বললেন, চমৎকার কাহিনী। ভালো ছবি হবে।...এখন, কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দাও তো। কারনিভলে ঢুকলো কেন টিটানভ? ব্যাংক ডাকাতির পরিকল্পনা আগেই ছিলো?

ওহিওতে ডাকাতির অপরাধে খুঁজছিলো তাকে পুলিশ, রবিন জানালো। কারনিভলে ঢুকে তাই লুকিয়ে থাকতে চেয়েছে।

আরও একটা কারণ আছে, বললো কিশোর। সে শুনেছে, কারনিভল নিয়ে ক্যালিফোর্নিয়ায় আসবেন মিস্টার কনর। দলে ঢুকতে পারলে পুলিশের চোখ এড়িয়ে সহজে বেড়িয়ে আসতে পারবে টিটানভ। ভাঁড়ের ছদ্মবেশে ঢুকে পড়েছে। কারনিভলে কাজের অভিজ্ঞতা তার আগে থেকেই ছিলো। ভাঁড়ের অভিনয় করতে কোনো অসুবিধে হয়নি। স্যান মেটিওতে আসার পর ব্যাংক ডাকাতির চিন্তা ঢুকলো মাথায়।

বুদ্ধিমান ডাকাত, চিন্তিত ভঙ্গিতে বললেন পরিচালক। ডাকাতি করে টাকা নিয়ে গিয়ে লেফট-লাগেজে রাখলো। ভাঁড়ের ছদ্মবেশে আরেকবার ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে গেল পুলিশকে।

রকি বীচ থেকেও বেরিয়ে যেতো। শুধু যদি জানতো, বেড়াল পাঁচটা নয়, ছটা।

হু। চুপ করে ভাবলেন কিছুক্ষণ পরিচালক। জিজ্ঞেস করলেন, রবি কি বাবার কাছেই থাকবে ঠিক করেছে? নাকি নানীর কাছে চলে যাবে?

বাবার কাছেই থাকবে, মুসা বললো। কোহেন, মানে বোলার রিপোর্ট করেছে তার নানীর কাছে, কারনিভলে ভয়ের কিছু নেই। নিরাপদেই থাকবে রবি। তাছাড়া কাজটা সে পছন্দ করে।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও মেনে নিয়েছেন মহিলা, যোগ করলো কিশোর। ছেলে বাবার কাছে থাকলেই ভালো।

বোলার কি চলে গেছে?

না, রবিন বললো। কারনিভলেই রয়ে গেছে, সিকিউরিটি ইনচার্জ হিসেবে। গোয়েন্দাগিরি করেছে বটে কিছুদিন, কাজটী তার ভালো লাগেনি।

হুঁ। সব কাজ সবার জন্যে নয়। ঘড়ি দেখলেন পরিচালক, মুখে না বলেও বুঝিয়ে দিলেন হাতে সময় কম। আর একটা প্রশ্ন, তারপরেই তোমাদের ছেড়ে দেবো। ওই পনি রাইডের ব্যাপারটা কি? কে বিষ খাওয়ালো ঘোড়াগুলোকে?

ওটা সত্যিই দুর্ঘটনা। খাবারে বিষক্রিয়া।

ও। মিস্টার কনরের ভাগ্য খারাপ। ভালো ঘোড়াগুলো মরে গেল। ভড়ও কমে গেল একজন। আরেকটা বড় আকর্ষণ গেল তাঁর কারনিভলের।

রকি বীচে যতোদিন থাকবেন উনি, ভাঁড়ের অসুবিধে হবে না তার, হেসে বললো মুসা। কিশোর কথা দিয়েছে, ভাঁড়ের অভিনয় সে-ই করবে। কাল যা দেখিয়েছে না, স্যার, কি বলবো। অন্য সময় হলে হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যেতো আমার।

তাই নাকি, তাই নাকি? আরও গম্ভীর হয়ে গেলেন সদাগম্ভীর পরিচালক। সময় করতে পারলে যাবো দেখতে। দেখি, কিছুক্ষণ হেসে মনটা হালকা করে আসতে পারি কিনা।

ভলিউম ৯ – ঘড়ির গোলমাল – তিন গোয়েন্দা – রকিব হাসান – সেবা প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ: মার্চ, ১৯৯০

ঘড়ির ভেতর থেকে শোনা গেল চিৎকার!

আতঙ্কিত কণ্ঠ। শুরু হলো মৃদু ভাবে, জোড়ালো হতে লাগলো, তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর। কিশোর পাশার মনে হলো, কানের পর্দা ছিঁড়ে যাবে। শিরশির করে উঠলো শিড়দাঁড়া। জীবনে যতো ভয়ঙ্কর চিৎকার শুনেছে সে, তার মধ্যে এটা অন্যতম।

পুরনো চেহারার একটা ঘড়ি, বিদ্যুতে চলে। চলে কিনা সেটা দেখার জন্যেই প্লাগটা সকেটে ঢুকিয়েছিলো, সঙ্গে সঙ্গে ওই চিৎকার। কর্ড ধরে একটানে প্লাগটা বের করে আনলো সকেট থেকে। থেমে গেল। চিৎকার। হাঁপ ছাড়লো সে।

পেছনে শোনা গেল পদশব্দ। পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে কাজ করছিলো তার দুই সহকারী, মুসা আমান আর রবিন মিলফোর্ড, পাশে এসে যেন ব্রেক কষে দাঁড়ালো।

কি হয়েছে? জিজ্ঞেস করলো রবিন। কে, চিৎকার করলো?

খাইছে! মুসা বললো, উদ্বিগ্ন। কিশোর, ব্যথাট্যাথা পেয়েছো?

মাথা নাড়লো গোয়েন্দাপ্রধান। শোনো, অস্বাভাবিক শব্দ। বলেই আবার প্লগ ঢোকালো সকেটে। বাতাসে ছড়িয়ে পড়লো রক্ত-পানি-করা চিৎকার। টেনে প্লাগ খুলে চিৎকার থামালো।

মারছে? অস্বস্তিতে হাত নাড়লো মুসা। একে শুধু অস্বাভাবিক বলছো কেন? নিশ্চয় ঘড়ির ভূত!

হ্যাঁ, সত্যি অস্বাভাবিক, গোয়েন্দাপ্রধানের সঙ্গে একমত হলো রবিন। ঘড়ি এরকম চিৎকার করে বলে শুনিনি। দেখো, সুইচ টিপলে পাখা গজিয়ে না উড়ে চুলে যায়

হাতে নিয়ে উল্টেপাল্টে ঘড়িটা দেখছে কিশোর। সন্তুষ্ট হয়ে বললো, মম!

হুম্ কি? এই, কী? ভুরু নাচালো মুসা।

অ্যালার্মের লিভারটা অন করা, জানালো কিশোর। দেখি অফ করে আবার প্লগ ঢুকিয়ে... বলতে বলতেই প্লাগটা সকেটে ঢোকালো। আর চিৎকার করলো না। মৃদু গুঞ্জন তুলে চলতে শুরু করলো ঘড়ি।

দেখি এবার অন করে, আবার বললো সে। লিভার অন করতেই চিৎকার করে উঠলো ঘড়ি, তাড়াতাড়ি অফ করে দিলো কিশোর। যাক, একটা রহস্যের সমাধান হলো। ঘন্টা বাজানোর বদলে চিৎকার করে এই ঘড়িটা।

রহস্য দেখলে কোথায় এতে? জিজ্ঞেস করলো মুসা।

ঘড়ি চিৎকার করে, এটা রহস্য নয়? কিশোরের হয়ে জবাব দিলো রবিন। আর, কেন চিৎকার করে সেটাও বোঝা গেল।

কেন নয়, সুধরে দিলো কিশোর। বলো, কখন। অ্যালার্ম লিবার সেট করলে চিৎকার করে। কেন করে, সেই রহস্যের সমাধান এখনও হয়নি।
তারমানে, তদন্ত? মুসা বললো। একটা ঘড়ির ব্যাপারে কি তদন্ত করবে? প্রশ্ন করবে ওটাকে? জবাব না দিলে চাপাচাপি করবে?
মুসার কথায় কান দিলো না কিশোর। বললো, কেন চিৎকার করে বোঝার চেষ্টা করবো। নিশ্চয় কোনো কারণ আছে।
আগ্রহী মনে হলো রবিনকে। কিন্তু শুরুটা করবে কিভাবে?
জবাব না দিয়ে টুলকিটের জন্যে হাত বাড়ালো কিশোর। তিন গোয়েন্দার ব্যক্তিগত ওয়ার্কশপে রয়েছে ওরা। কিট থেকে একটা স্ক্রু-ড্রাইভার বের করে ঘড়ির পেছনের কভার খুলতে শুরু করলো। খুলে, এক নজর দেখেই আবার বললো, হুমম!
আবার হুমম কেন? মুসার প্রশ্ন।
স্ক্রু-ড্রাইভারের মাথা নেড়ে ঘড়ির ভেতরে দেখালো কিশোর। যন্ত্রপাতির মাঝে বসানো আধুলির সমান গোল একটা ডিস্ক। চিৎকারের এটাই কারণ। অ্যালার্ম বেলের বদলে এটা বসিয়ে দিয়েছে কেউ।
কেন? রবিনের প্রশ্ন।
সেটাই তো রহস্য। জানতে হবে কে করেছে কাজটা।
কিভাবে? মুসা জিজ্ঞেস করলো।
দূর, নিরাশ ভঙ্গিতে হাত নাড়লো কিশোর। গোয়েন্দা কোনোদিনই হতে পারবে না তুমি। ভাবতেই জানো না ঠিকমতো…
দাঁড়াও দাঁড়াও, বলি। প্রথমে জানতে হবে ঘড়িটা কোত্থেকে এসেছে।
হ্যাঁ, এই তো মাথা খুলছে।
পুরনো জঞ্জালের মাঝে পেয়েছে। তারমানে রাশেদ আংকেল ওটা কিনে এনেছেন। হয়তো বলতে পারবেন কোন জায়গা থেকে কিনেছেন।
রোজই তো কতো মাল কেনেন, রবিনের কণ্ঠে সন্দেহ। তাঁর মনে আছে?
থাকতে পারে। জঞ্জালের মাঝে পেয়েছি, কথাটা ঠিক নয়। আধ ঘন্টা আগে একটা বাক্স আমার হাতে দিয়েছে চাচা। পেয়েছি ওটার ভেতরেই। আরও কি কি যেন আছে। দেখি।
বেঞ্চের ওপর রাখা একটা শক্ত মলাটের বাক্স। ভেতর থেকে বেরোলো একটা স্টাফ করা পেঁচা-পালক বেশির ভাগই খসে গেছে। পুরনো একটা কাপড় ঝাড়ার ব্রাশ পাওয়া গেল। আরও আছে একটা ভাঙা টেবিল-ল্যাম্পের অর্ধেকটা, চলটা ওঠা একটা ফুলদানী, দুটো বইয়ের দুমড়ানো প্লাস্টিক-কভার, আর আরও কিছু টুকিটাকি। প্রায় সবগুলো জিনিসই বাতিল, ব্যবহারের অযোগ্য।

দেখে তো মনে হয় ঘর পরিষ্কার করেছিলো কেউ, কিশোর বলল। বাক্সে ভরে ডাস্টবিনে ফেলে দিয়েছিলো। বেকার বা ভিখিরি কেউ সেটা কুড়িয়ে নিয়ে বিক্রি করেছে পুরনো মালের দোকানে, সেখান থেকে কিনে এনেছে চাচা।
কেন যে কিনলেন? অবাক লাগছে মুসার। ঘড়িটা ছাড়া তো আর সবই বেকার। কোনো কাজে লাগবে না। তবে ঘড়ি বটে একখান। ভাবো একবার, সকালে অ্যালার্মের বদলে ওই ভূতুরে চিৎকার শুনে জেগে ওঠার কথা
হুমম! তৃতীয়বার বললো কিশোর। ভালো না। খুব খারাপ। কাউকে ভয় পাওয়ানোর জন্যে যথেষ্ট। হার্টের অবস্থা খারাপ হলে মারাও যেতে পারে। মেরে ফেলতে চাইলে শুধু তার বেডরুমে ঘড়িটা রেখে দিয়ে এলেই হলো। সহজেই খুন, অথচ কেউ কিছু সন্দেহ করতে পারবে না।
বলো কি! ভুরু কোঁচকালো রবিন। ওরকম কিছুই হলো নাকি?
জানি না। শুধু সম্ভাবনার কথা বলছি। চলো, চাচাকে জিজ্ঞেস করি ঘড়ি কোথায় পেলো?
ওয়ার্কশপ থেকে বেরিয়ে অফিসের দিকে চললো ওরা। কাজে ব্যস্ত ইয়ার্ডের দুই কর্মচারী বোরিস আর রোভার। কয়েকটা পুরনো আসবাবপত্র দেখছিলেন রাশেদ পাশা, ডাক শুনে ফিরে তাকালেন। ছেলেদের মুখ দেখেই বুঝলেন, প্রশ্ন। আছে। মিটিমিটি হেসে, মস্ত গোঁফে তা দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তারপর, ত্রিরত্ন, ব্যাপার কি? খুব উত্তেজিত মনে হচ্ছে।
চাচা, ঘড়িটা দেখালো কিশোর। এটা কোত্থেকে আনলে? একটু আগে যে বাক্সটা দিলে, তার মধ্যে পেয়েছি।
পেয়েছি মাগনা। ফাও বলতে পারো। এটার মধ্যে ছিলো, পুরনো একটা আলমারি দেখালেন তিনি। হলিউডের এক পুরনো মালের দোকান থেকে কিনেছি।
কোন দোকান? মালিকের নাম?
নাম, ডেরিক। অনেক মাল কিনেছি আজ। এক ট্রাক দিয়ে গেছে। আরও এক ট্রাক নিয়ে আসবে। তখন জিজ্ঞেস করো…
এই সময় গেটে শোনা গেল এঞ্জিনের শব্দ। ফিরে তাকাল চারজনে। একটা পিকআপ ঢুকছে। বলে উঠলেন রাশেদ পাশা, ওই যে, এসে গেছে।
আসবাবপত্রের স্তূপের কাছে এসে থামলো গাড়ি। ওভারঅল পরা একজন লোক নেমে এলো, খোঁচা খোঁচা দাড়ি।
এসেছো, বললেন রাশেদ পাশা।
হ্যাঁ, কাছে এসে দাঁড়ালো ডেরিক। নিয়ে এলাম তোমার সব মাল। কপাল ভালো তোমার, রাশেদ, ভালো মাল পেয়েছো, ধরতে গেলে বিনে পয়সায়। কিছু কিছু তো একেবারে নতুন…

আরে দূর! বাতাসে থাবা মারলেন রাশেদ পাশা। বাড়িয়ে বলার স্বভাব তোমার গেল না। এগুলো নতুন? আমি বলে কিনছি...যাক, যা আছে, আছে। কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। দশ ডলার দেবো সবগুলোর জন্যে। ও কে?
দাও। কি আর করা? টাকার খুব ঠেকা, নইলে একশোর কমে দিতাম না...
মেরি আছে অফিসে। ওর কাছ থেকে টাকা নিয়ে যাও। ও, এক মিনিট, এ আমার ভাতিজা, কিশোর। তোমাকে কি জানি জিজ্ঞেস করবে।
জলদি বলে ফেলো, খোকা। তাড়া আছে আমার, বললো ডেরিক।
একটা বাক্সের কথা জানতে চাই, কিশোর বললো। আপনার দেয়া এই আলমারিতে পাওয়া গেছে। বাক্সের ভেতরে এই ঘড়িটা ছিলো। কার কাছ থেকে কিনেছেন, মনে আছে?
ঘড়ি? বিষণ্ন হাসি হাসলো ডেরিক। হপ্তায় ওরকম কয়েক ডজন ঘড়ি বেচতে আনে আমার কাছে। বেশির ভাগই অচল। কিনি, কোনোটা বিক্রি হয়, কোনোটা ফেলে দিই।
একটা বাক্সের মধ্যে ছিলো এটা, রবিন বললো। ভেতরে একটা স্টাফ করা পেঁচাও...
ও, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। স্টাফ করা পেঁচা খুব কমই পাই, সেজন্যেই মনে আছে। কিন্তু কার কাছ থেকে যেন কিনলাম...কার কাছ..নাহ, সরি, মনে করতে। পারছি না, মাথা নাড়লো ডেরিক। প্রায় হপ্তা দুই আগের কথা। মনে নেই। হাজার লোকে বেচতে আনে, কজনের কথা মনে রাখবো?

.

ব্যস, গেল এই কেস, মুসা বললো। ঘড়িটা কোত্থেকে এসেছে তা-ই জানি না, রহস্যের কিনারা করবো কি? কিশোর?
ওয়ার্কশপে ফিরে এসেছে তিনজনে। অন্যমনস্ক হয়ে বাক্সটা নাড়াচাড়া করছিলো কিশোর, মুখ ফিরিয়ে তাকালো, উঁ?...মাঝে মাঝে বাক্সের গায়ে ঠিকানা লেখা থাকে। কোথায় পাঠানো হবে, সেই ঠিকানা।
আমার কাছে মুদী দোকানের বাক্সের মতো লাগছে, রবিন বললো।
আমার কাছেও। কিন্তু ঠিকানা লেখা নেই।
সেই কথাই তো বলছি, আগের কথার খেই ধরলো মুসা। এই কেসের সমাধান আমাদের সাধ্যের বাইরে। ...রবিন, কি ওটা?
ছাপার মেশিনটার নিচ থেকে চার কোনা এক টুকরো কাগজ তুলে নিয়েছে। রবিন। কিশোরকে দেখিয়ে বললো, বাক্স থেকে পড়লো।
মুদী দোকানের মালের লিস্টি হবে হয়তো, মুসা বললো।
কিন্তু তার কথা ঠিক নয়। কাগজটায় লেখা রয়েছেঃ

ডীয়ার মিলার
আস্ক রোবিড়
আস্ক বারকেন
আস্ক জেলডা
দেন অ্যাক্ট। দ্য রেজাল্ট উইল সারপ্রাইজ ঈভন ইউ।
জোরে জোরে পড়লো রবিন। চেঁচিয়ে উঠলো, আশ্চর্য! কি মানে এর?
প্রিয় মিলার, বিড়বিড় করে বললো কিশোর। রোবিডকে জিজ্ঞেস করো। বারকেনকে জিজ্ঞেস করো। জেলভাকে জিজ্ঞেস করো। তারপর কাজে নামো। ফলাফল দেখে তুমি পর্যন্ত চমকে যাবে।
আরে সে তো বুঝলাম। কিন্তু এসব কথার মানে কি?
আরেকটা রহস্য। নিশ্চয় চেঁচানো ঘড়ির সঙ্গে যোগাযোগ আছে।
ঘড়ির সঙ্গে যোগাযোগ, কিভাবে বুঝলে?
তাই তো হওয়ার কথা। দুই ইঞ্চি বাই চার ইঞ্চি মাপে কাটা হয়েছে। পেছনে দেখো।
এই যে এখানটায়। কি দেখছো?
শুকনো আঠা।
রাইট। তারমানে এই কাগজটা কোনো কিছুতে সাঁটানো ছিলো। ঘড়িটা উল্টে তলা দেখালো সে। এই যে দেখো, এখানেও শুকনো আঠা। আগেই লক্ষ। করেছি। মাপ দেখে আন্দাজ করতে কষ্ট হয় না, এই কাগজ এখানেই লাগানো। ছিলো। বেশি নাড়াচাড়ায় খুলে পড়ে গেছে।
কিন্তু ওরকম একটা কাগজ কেন ওখানে সাঁটতে যাবে? মুসার জিজ্ঞাসা। কে? ওই লেখার মানেই বা কি? মাথামুণ্ডু তো কিছুই বোঝা যায় না।
এতো সহজেই বোঝা গেলে কোনো রহস্যই আর রহস্য থাকতো না।
তা ঠিক। লাভের মধ্যে শুধু আরও একটা রহস্য যোগ হলো, ঘড়ির চেঁচানোর সঙ্গে। আমরা যে অন্ধকারে ছিলাম, সেখানেই রয়েছি। বরং বলা যায় অন্ধকার আরও ঘন হয়েছে। এখন কি করবে?
চেঁছে ঘড়ির নিচ থেকে আঠা তুলবো। কি যেন খোদাই করা রয়েছে। বেশি ছোট, বুঝতে পারছি না। ম্যাগনিফাইং গ্লাস দরকার। চলো, হেডকোয়ার্টারে চলো।
দুই সুড়ঙ্গ দিয়ে হেডকোয়ার্টারে ঢুকলো ওরা। ডেস্কের ওপাশে বসে মাথার ওপরের উজ্জ্বল আলো জ্বেলে দিলো কিশোর। ড্রয়ার থেকে ম্যাগনিফাইং গ্লাস আর ছুরি বের করে কাজে লাগলো। ছুরি দিয়ে চেঁছে আঠা তুলে, খোদাই করা লেখা। পড়ে মাথা ঝোঁকালো নীরবে। রবিনের দিকে ঠেলে দিলো ঘড়ি আর গ্লাস।
রবিনও পড়লো। খুব খুদে অক্ষরে লেখা রয়েছেঃ ডি. টেমপার। মুখ তুলে জিজ্ঞেস করলো, মানে কি? কারও নাম?

বলছি এখুনি, বলে, মুসার দিকে তাকালো কিশোর। মুসা, টেলিফোন গাইডটা দেখি তো, প্লীজ।
পাতা উল্টে চললো গোয়েন্দাপ্রধান। কিছুক্ষণ পর চেঁচিয়ে উঠলো খুশি হয়ে, এই দেখো!
দুই সহকারীও দেখলো, ছোট একটা বিজ্ঞাপন, ঘড়ির দোকানের। ইংরেজিতে লেখা রয়েছেঃ ডি, টেমপার–ঘড়ি মেরামতকারী-অস্বাভাবিক কাজ আমাদের বিশেষত্ব। নিচে হলিউডের ঠিকানা আর টেলিফোন নম্বর লেখা।
মেকাররা অনেক সময়, বললো কিশোর। ঘড়িতে সাঙ্কেতিক চিহ্ন বা নম্বর বসিয়ে দেয়। যাতে পরে আবার চিনতে পারে ওটা কার কাজ। ধোপার দোকানে কাপড়ে যেমন চিহ্ন দেয়। এক ধাপ এগোলাম আমরা। অ্যালার্ম সিসটেম খুলে ডিস্ক কে ঢুকিয়েছে ঘড়িতে, এটা জানলাম। পরের ধাপ, গিয়ে মিস্টার টেমপারকে জিজ্ঞেস করা, কে ঘড়িটা মেরামত করতে দিয়েছিল।

.
হলিউড বুলভারের একটা গলির ভেতর পাওয়া গেল টেমপারের দোকানটা। গলিতে ঢোকে না বিশাল রোলস রয়েস, যেটাতে চড়ে এসেছে তিন গোয়েন্দা। গাড়িটা গলির মুখে রেখে হেঁটে রওনা হলো ওরা। ড্রাইভিং সিটে বসে রইলো ইংরেজ শোফার হ্যানসন।
ধুলোয় ধূসর, জানালার কাঁচের ওপাশে নামটা কোনোমতে পড়া যায়ঃ ডি, টেমপার–ঘড়ি মেরামতকারী। সোনালি রঙের অক্ষরগুলো মলিন হয়ে এসেছে। ভেতরের তাকে অসংখ্য ঘড়ি, ছোট-বড় নতুন-পুরনো, নানা ধরনের নানা আকারের। দরজায় এসে দাঁড়ালো তিন গোয়েন্দা। ওরা ভেতরে পা রাখতেই লম্বা একটা ঘড়ির নিচের কাঠের দরজা খুলে গেল, মার্চ করে বোলো এক খেলনা। সৈনিক, বিউগল বাজিয়ে সময় ঘোষণা করে আবার ঢুকে গেল তার কুঠুরিতে। বন্ধ হয়ে গেল দরজা।
খাইছে! তাজ্জব হয়ে গেছে মুসা। কী কাণ্ড! তবে, চিৎকারের চেয়ে অনেক ভালো।
চলো, মিস্টার টেমপারের সঙ্গে কথা বলা যায় কিনা দেখি। বললো কিশোর।
ঘরে অনেক ঘড়ি, অনেক রকম আওয়াজ। মনে হচ্ছে হাজার হাজার মৌমাছি গুঞ্জন তুলেছে একসঙ্গে।
চামড়ার অ্যাপ্রন পরা ছোটখাটো একজন মানুষ এগিয়ে এলো। চকচকে কালো চোখের ওপরে সাদা ভুরু, যেন দুটো ছোট ছোট ঝোপ। খুশি খুশি কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, কি চাই? ঘড়ি মেরামত করাবে? নাকি অদ্ভুত কিছু লাগাবে?

না, স্যার, বিনীত কণ্ঠে জবাব দিলো কিশোর, ওসব নয়। একটা ঘড়ির ব্যাপারে জানতে এসেছি। ব্যাগ খুলে ওটা বের করে কাউন্টারের ওপর দিয়ে ঠেলে দিলো সে।
ঘড়িটা দেখলো টেমপার। হুঁ, বেশ পুরনো। দাম কম। এটা মেরামত করে পোষাবে না।
মেরামত করতে আনিনি, স্যার। কিছু মনে না করলে প্রাগটা লাগান।
শ্রাগ করলো ছোট মানুষটা। সকেটে প্লাগ ঢোকালো। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠলো ঘড়ি। তাড়াহুড়ো করে লিভারটা অফ করে দিলো মেকানিক। ঘড়িটা হাতে নিয়ে পেছনে দেখলো সে। হাসলো। হুঁ, চিনতে পারছি। আমিই লাগিয়েছিলাম। খুব জটিল কাজ।
আপনিই তাহলে চিৎকার শিখিয়েছেন এটাকে? মুসা বললো।
হ্যাঁ। আমি বলেই পেরেছি...যাকগে, কি জন্যে এসেছো? খারাপ হয়ে গেছে?
না, স্যার, কিশোর বললো। রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়েছি এটা। কার জিনিস জানি না। নিচে আপনার নাম দেখলাম। ভাবলাম, মালিকের নাম বলতে পারবেন। তার জিনিস তাকে ফিরিয়ে দেবো।
তাই? দ্বিধা করছে টেমপার। কাস্টোমারের নাম গোপন রাখি আমরা। অনেক সময়...
মুফতে দেয়ার ইচ্ছে আমাদের নেই, স্যার, বাধা দিয়ে বললো রবিন। এরকম একটা জিনিস, নিশ্চয় খুব শখের। ফিরিয়ে দিলে হয়তো পুরস্কার দেবেন তিনি...
হাত তুললো টেমপার। বুঝতে পেরেছি। ঠিকই বলেছো, জিনিসটা তার শখের। ঘড়ি জোগাড়ের হবি আছে লোকটার। নাম ক্লক।
ক্লক! একই সঙ্গে বলে উঠলো রবিন আর মুসা।
নাম তো তা-ই বলেছে লোকটা। আমার বিশ্বাস, ওটা তার বানানো নাম। আসল নাম অন্য কিছু। নানা রকম ঘড়ি এনেছে আমার কাছে, বিচিত্র সব, ফরমায়েশ। কোনোটাকে দিয়ে চিৎকার করাতে হবে, কোনোটাকে হাসাতে হবে, কোনোটাকে...
আমার কাছেও আসল নাম মনে হচ্ছে না, টেমপারকে থামিয়ে দিলো। কিশোর। নিশ্চয় ঠিকানা দিয়েছে? বলবেন, প্লীজ? আমরা নিজেই নিয়ে যাবো তার কাছে।
ঠিকানা তো দেয়নি, শুধু ফোন নম্বর। বলে, কাউন্টারের নিচের একটা তাক থেকে মোটা এক রেকর্ড বুক বের করলো টেমপার। পাতা উল্টে এক জায়গায় এসে থামলো। হ্যাঁ, লিখে নাও। এইচ. ক্লক। নম্বর...
নোটবুক বের করে দ্রুত নম্বরটা লিখে নিলো রবিন।

চলবে তো এতে? টেমপার জিজ্ঞেস করলো। অবশ্য আর কিছু জানতেও পারবো না। জানি না। আর হ্যাঁ, ঘড়ির কাজ করাতে হলে নিশ্চিন্তে চলে এসো। যে-কোনো রকম কাজ।...তোমাদের আর কিছু বলার না থাকলে কিছু মনে কোরো না, আমার কাজ পড়ে আছে...
নিশ্চয়, নিশ্চয়, বললো কিশোর। অনেক ধন্যবাদ, স্যার, আপনাকে।
দোকান থেকে বেরিয়ে সঙ্গীদের বললো, আরেক ধাপ এগোনো গেল। এবার ফোন করতে হবে জনাব ঘড়িকে। মোড়ের বুঁদ থেকেই করি, চলো।
কি বলবে? কিশোর বুদে ঢোকার আগে জিজ্ঞেস করলো মুসা।
ঠিকানা জোগাড়ের চেষ্টা করবো, বলে ঢুকে গেল কিশোর।
মুসা আর রবিনও ঢুকলো। জায়গা কম, গাদাগাদি করে দাঁড়ালো ওরা। মুদ্রা ফেলে ডায়াল করলো কিশোর। ওপাশে রিসিভার তুললো, এক মহিলা।
গুড আফটারনুন, গলাটাকে ভারি করে তুললো কিশোর, বড়দের মতো। দক্ষ অভিনেতা সে, ভালো পারে এসব কাজ। টেলিফোন কোম্পানি থেকে বলছি। ক্রসড সার্কিটের গোলমাল হচ্ছে।
ক্রসড সার্কিট? বুঝলাম না, জবাব এলো।
আমরা কমপ্লেন পেয়েছি, আপনার সেকশনে নাকি বেশি বেশি রঙ নাম্বার হচ্ছে। দয়া করে যদি ঠিকানাটা বলেন? সার্কিট চেক করবো।
ঠিকানা? নিশ্চয়। একশো বারো ফ্র্যাঙ্কলিন স্ট্রীট। কিন্তু বুঝতে পারছি না... কথা শেষ করতে পারলো না মহিলা, তার আগেই শোনা গেল চিৎকার। বয়স্ক কোনো মানুষ আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠেছে। যেন জবাই করার জন্যে চেপে ধরা হয়েছে তাকে। হাত থেকে রিসিভার ছেড়ে দিলো কিশোর।

.

হ্যানসন, এই ব্লকটাই মনে হচ্ছে, বললো কিশোর। আস্তে চালান। নম্বরগুলো দেখি।
ফ্র্যাঙ্কলিন স্ট্রীট ধরে ধীরে চালালো হ্যানসন। পুরনো এলাকা। এককালের বিশাল বাড়িগুলো এখন মলিন, বিবর্ণ।
ওই যে! চেঁচিয়ে বললো মুসা।
বাঁকের কাছে গাড়ি রাখলো হ্যানসন। নেমে হেঁটে চললো তিন গোয়েন্দা। আশপাশে চোখ রাখছে। নির্জন লাগছে বাড়িটা, জানালার সমস্ত পর্দা টানা। সামনের দরজায় ছোট্ট সিঁড়ি, মাত্র দুটো ধাপ। তাতে উঠে ঘন্টা বাজালো কিশোর। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো। আবার বেল বাজাতে যাবে, এই সময় নড়ে উঠলো দরজা। সামান্য ফাঁক হলো। উঁকি দিলো এক মহিলার মুখ। বয়েস তেমন। বেশি না। তবে খুব ক্লান্ত আর বিষণ্ন দেখাচ্ছে।

মাপ করবেন, কিশোর বললো। মিস্টার ক্লকের সঙ্গে দেখা হবে?
মিস্টার ক্লক? অবাক হলো যেন মহিলা। ওই নামে তো এখানে কেউ থাকে না।
নামটা বোধহয় আসল নয়, সেজন্যে চিনতে পারছেন না। তিনি ঘড়ি পছন্দ করেন। এখানেই তো থাকার কথা। কিংবা হয়তো থাকতেন।
ঘড়ি? তুমি মনে হয় মিস্টার রোজারের কথা বলছে। কিন্তু মিস্টার রোজার…
বলো না! বলো না! পেছন থেকে চেঁচিয়ে উঠলো একটা ছেলে। বয়েস। ওদেরই মতো হবে। কালো চুল। মহিলাকে ঠেলে সরিয়ে পাশে এসে দাঁড়ালো। ভ্রূকুটি করলো গোয়েন্দাদের দিকে চেয়ে। কথাই বলো না ওদের সাথে, মা। দরজা লাগিয়ে দাও। কেন এসেছে ওরা এখানে?
শোন, টিম, মহিলা বললো। এভাবে কথা বলতে নেই। ছেলেগুলোকে তো ভালোই মনে হচ্ছে আমার। মিস্টার রোজারের খোঁজ করতে এসেছে, দোষটা কোথায়?
একটু আগে কি মিস্টার রোজারই চিৎকার করেছিলেন? ফস করে জিজ্ঞেস করে বসলো কিশোর।
কড়া চোখে তাকালো টিম। হ্যাঁ, সে-ই! গলা চড়ালো সে। ওটা তার মরণ চিৎকার, মরে যাচ্ছিলো!যাও, ভাগো এখন আমাদের অনেক কাজ। ওকে মাটি দিতে হবে।
দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিলো ছেলেটা।
শুনলে তো? চাপা গলায় বললো মুসা। লোকটাকে খুন করে এখন কবর দেয়ার কথা ভাবছে।
পুলিশ ডাকা দরকার, বললে রবিন।
আরও পরে, কিশোর বললো। আগে সব কথা জেনে নিই। বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা করি।
দরজা ভেঙে ঢুকবে নাকি?
না, মাথা নাড়লো গোয়েন্দাপ্রধান। ওরাই ঢুকতে দেবে। জানালা দিয়ে উঁকি মারছে টিম… বেলপুশ টিপে ধরলো সে। ধরেই রাখলো, যতক্ষণ না, ঝটকা দিয়ে আবার খুললো দরজা।
ভাগতে বললাম না! গর্জে উঠলো টিম। কেন বিরক্ত করছো?
বিরক্ত করলাম কোথায়? নিরীহ কণ্ঠে বললো কিশোর। আমরা একটা রহস্যের তদন্ত করছি, তোমাদের সাহায্য দরকার। এই যে আমাদের কার্ড।
কার্ডটা পড়ে ভুরু কোঁচকালো টিম।
ব্যাগ থেকে চেঁচানো ঘড়িটা বের করে টিমের হাতে দিলো কিশোর।
কৌতূহল ফুটলো টিমের চোখে। এটাতে রহস্যের কি আছে?
ইলেকট্রিক সকেট কোথায়? কি রহস্য, দেখাচ্ছি, বলতে বলতেই ঘরের ভেতর পা ঢুকিয়ে দিলো কিশোর। বাধা দিতে গিয়েও কি ভেবে সরে দাঁড়ালো। টিম। একটা

হলঘর, আবছা অন্ধকার। একপাশ থেকে দোতলায় সিঁড়ি উঠে গেছে। আরেক পাশে বিরাট এক গ্র্যাণ্ডফাদার ক্লক, টিকটিক কানে না এলে চোখে, পড়তো না গোয়েন্দাদের। ঘড়ির পাশে টেবিলে টেলিফোন।
রহস্যময় মিস্টার রোজারের লাশ খুঁজছে মুসা আর রবিনের চোখ, দেখতে পেলো না। ঘড়িটার পাশে দেয়ালে সুইচবোর্ডে সকেট দেখে, সেদিকে এগোলো কিশোর। হাতের ঘড়িটা টেবিলে রেখে, সকেটে প্রায় ঢুকিয়ে লিভার অন করতেই চেঁচিয়ে উঠলো ঘড়ি। প্রতিধ্বনিত হলো বদ্ধ ঘরে। রোম, খাড়া হয়ে গেল দুই সহকারী গোয়েন্দার।
শুনলে তো, প্রাগটা খুলে নিয়ে বললো কিশোর। রহস্যময় না ঘড়িটা?
না, মোটেই অবাক হয়নি টিম। যে কেউ ওরকম চেঁচানি ঢোকাতে পারে, ঘড়িতে। দাঁড়াও, দেখাচ্ছি। গ্র্যাণ্ডফাদার ক্লকের পেছন থেকে একটা কর্ড বের করে প্লাগটা সকেটে ঢোকালো সে। শোনা গেল মোটা গলায় আতঙ্কিত চিৎকার, জবাই করার জন্যে চেপে ধরা হয়েছে যেন।
কিশোরের সন্দেহ নেই, ফোনে এই চিৎকারই শুনেছে।
দ্রুত ঘরে এসে ঢুকলো মহিলা। টিম, দোহাই লাগে তোর... ছেলেদের ওপর চোখ পড়তে থেমে গেল। ও, ঢুকতে দিয়েছে তোমাদেরকে? টিম, হঠাৎ মত বদলালি যে? ওরাও একটা চেঁচানো ঘড়ি নিয়ে এসেছে, সকেট থেকে প্লাগ খুলে ফেলেছে টিম। ছোট। আগে আর দেখিনি। আমার বিশ্বাস ওটা মিস্টার রোজারেরই। টেবিলে রাখা ঘড়িটা মা-কে দেখালো সে।
মাথা নাড়লো টিমের মা। আমিও দেখিনি। কি করে বুঝলি, ওটা মিস্টার। রোজারের?
বুঝেছি। ঘড়িতে চিৎকার ঢোকানোর বুদ্ধি আর কারও মাথায় আসবে না।
না, তা আসবে না, আবার মাথা নাড়লো মহিলা। ছেলেগুলো পেলো কোথায় এটা, বলেছে?
জিজ্ঞেস করিনি এখনও। পরিচয় দিয়েছে, ওরা গোয়েন্দা। ভাবছি, কথা বলবো ওদের সঙ্গে। মিস্টার রোজারের ঘড়িটা নিয়ে এসেছে যখন। একটা দরজা খুলে ইশারায় ভেতরে যেতে বললো তিন গোয়েন্দাকে।
বড় একটা লাইব্রেরি। এক পাশের দেয়ালে ঝোলানো ফ্রেমে বাধা কয়েকটা তৈলচিত্র। আরেক পাশে বিরাট এক আয়না। বাকি দুদিকের দেয়ালে অসংখ্য তাক, বইয়ে ঠাসা। র‍্যাক আছে অনেকগুলো।
লাইব্রেরিতে বই থাকবে, সেটা স্বাভাবিক, কিন্তু ওদেরকে অবাক করলো ঘড়ি। ছোট বড় নানারকম ঘড়ি রয়েছে ঘরটায়। মেঝেতে, টেবিলে, তাকে, দেয়ালে। নতুন-পুরনো, ছোট-বড়, দামী-কমদামী। তবে সব কটারই একটা বিশেষত্ব আছে,

সবগুলোই বিদ্যুতে চলে। ফলে টিকটিক আওয়াজ না করে তুলেছে গুঞ্জন, যেন শত শত মৌমাছিকে কয়েদ করে রাখা হয়েছে ঘরটায়।
কি দেখছো? গোয়েন্দাদের তাজ্জব করে দিয়ে আনন্দ পাচ্ছে টিম। শুনলে আরও অবাক হবে, এর প্রত্যেকটা ঘড়িই চেঁচাতে পারে।

.

চিৎকারে ভরে গেল যেন ঘরটা।
শুরু হলো শিশুর তীক্ষ্ণ চিৎকার দিয়ে। তারপর গর্জাতে লাগলো একজন রেগে যাওয়া মানুষ। তৃতীয়টা বন্য, হিংস্র চিতাবাঘ। তারপর চারদিক থেকে শুরু হলো চিৎকার, কান্না, ফোপানি, গজানি, ফোঁসফোসানি-মানুষেরও, জানোয়ারেরও।
লম্বা একটা কাউচে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসেছে তিন গোয়েন্দা। শিউরে উঠছে ক্ষণে ক্ষণে।
একটা ডেস্কের ওপাশে বসে একের পর এক সুইচ টিপছে টিম। দাঁত বের করে হাসছে মেহমানদের দিকে চেয়ে। অবশেষে সব কটা সুইচ অফ করে দিলো। সে। নীরব হয়ে গেল ঘর।
জীবনে কখনও শুনেছো এরকম? বললো টিম।
ঘরটা কি সাউণ্ডপ্রফ? প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো কিশোর। এতোক্ষণে নিশ্চয় পুলিশকে ফোন করে দিয়েছে প্রতিবেশীরা।
অবশ্যই সাউণ্ডপ্রুফ। এটা মিস্টার রোজারের চেঁচানো ঘর। রাতে এখানে বসে। চেঁচানো শুনতেন...মানে... থেমে গেল টিম।
মিস্টার রোজারের কিছু হয়েছে?
কেন? হবে কেন?
ওই যে, শুনতেন বললে। তারপর থেমে গেলে। ভাবলাম, কিছু হয়েছে।
চলে গেছে, ব্যস। তাতে তোমাদের কি?
আমাদের? না, কিছু না। চেঁচানো ঘড়ি দিয়ে শুরু করেছিলাম। ঢুকলাম। চেঁচানো ঘরে। এখন শুনছি এর মালিকই গায়েব। রহস্য জটিল হচ্ছে আরকি। আচ্ছা, বলতে পারো, কেন এতোগুলো ঘড়িতে চিৎকার ঢোকালেন তিনি? কিছু তো বুঝতে পারছি না।
এতে আর বোঝাবুঝির কি আছে? বলে উঠলো মুসা। মাথায় ছিট ছিলো আরকি। নইলে রাতে একলা বসে চেঁচামেচি শোনে কেউ?
এটা তাঁর হবি ছিলো, মিস্টার রোজারের পক্ষ নিলো টিম। অনেক হবিরই কোনো অর্থ থাকে না। তোমাদেরটার আছে?
আছে, মাথা কাত করলো কিশোর। রহস্যের সমাধান করা। এই যেমন, ঘড়ি-রহস্যের সমাধান করতে এসেছি।

আমি তো বলছি, এতে কোনো রহস্য নেই!
তাহলে ওরকম আচরণ করছো কেন? এমন ভাব করছে, যেন দুনিয়ার সবাইকে ঘৃণা করো। খুলে বলছো না কেন? সব শুনলে হয়তো সাহায্য করতে পারবো।
তোমরা কি সাহায্য করবে? জ্বলে উঠলো টিম। আর আমিও অদ্ভুত আচরণ করছি না। তোমরাই বরং করছে। এখন যাও, ওঠো। একা থাকতে দাও আমাকে প্রায় ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিলো সে। পথ দেখো! আর কখনও আসবে না…
আরি!
দরজায় দেখা দিলো একজন লোক। তেমন লম্বা নয়, কিন্তু কাধ খুব চওড়া। তিন গোয়েন্দার দিকে চেয়ে ভুরু কোঁচকালো। কারা ওরা, টিম? বন্ধু নিয়ে এসেছো খেলতে, গোলমাল করতে, আমাকে বিরক্ত করতে? বলে দিয়েছি না, হৈ চৈ আমি একদম পছন্দ করি না?
হৈ-চৈ করছি না আমরা, মিস্টার লারমার, গম্ভীর হয়ে বললো টিম। আর শব্দ তো বাইরে যায় না। এই ঘর সাউণ্ডপ্রুফ। আপনার অসুবিধে-..
হাত নেড়ে তাকে থামিয়ে দিলো লারমার। দীর্ঘ এক মুহূর্ত স্থির তাকিয়ে রইলো তিন গোয়েন্দার দিকে, যেন তাদের চেহারা মনে গেঁথে নিলো। বললো, যাচ্ছি। তোমার মায়ের সঙ্গে কথা বলা দরকার।
দুপদাপ করে পায়ের শব্দ হলো দোতলার সিঁড়িতে।
কাউকে তোমাদের বাড়িতে আনলে তার কি? লারমারের ব্যবহারে কিছুটা অবাকই হয়েছে রবিন। বাড়িটা তোমাদের, তাই না?
না, মিস্টার রোজারের। আমার মা তার হাউসকীপার। তিনি চলে যাওয়ার পর ওপর তলার ঘরগুলো লারমারকে ভাড়া দিয়ে কোনোমতে সংসার চালাচ্ছে মা। যাও, এখন যাও তোমরা। ঝামেলাতেই ফেলেছো…
যাচ্ছি। সহকারীদের দিকে ফিরে বললো কিশোর, চলো যাই। টিমকে বললো, অনেক ধন্যবাদ, টিম, ঘড়িগুলো দেখানোর জন্যে।
হলে ফিরে টেবিল থেকে ঘড়িটা তুলে নিয়ে ব্যাগে ভরলো কিশোর। বেরিয়ে চলে এলো রোলস রয়েসটা যেখানে পার্ক করা আছে।
দূর, কোনো লাভ হলো না, গাড়িতে উঠে বললো মুসা। ঘড়ি জোগাড়ের নেশা আছে লোকটার। ব্যস, রহস্য ওই পর্যন্তই।
হুঁ, বলে কি বোঝাতে চাইলো কিশোর, বোঝা গেল না। হ্যানসনকে বললো, হলিউডে এলামই যখন, মিস্টার ক্রিস্টোফারের অফিসে একবার ঢু মেরে যাই। কি বলেন?
নিশ্চয়ই, বলে এঞ্জিন স্টার্ট দিলো হ্যানসন।
দাঁড়ান, দাঁড়ান! বলে উঠলো রবিন।

সবাই দেখলো, টিম দৌড়ে আসছে। পাশের জানালা নামিয়ে দিলো মুসা। কাছে এসে হাঁপাতে লাগলো ছেলেটা। যাক, ধরতে পেরেছি...দেখো, সত্যি আমার সাহায্য দরকার। থেমে দম নিলো সে। আমার বাবা জেলে, কোনো অপরাধ না করেই। তাকে যদি নিরপরাধ প্রমাণ করতে পারতে, বড় উপকার হবে।
গাড়িতে ওঠো, দরজা খুলে দিয়ে ডাকলো কিশোর। খুলে বলো সব বুঝে দেখি সাহায্য করতে পারবো কিনা।
পেছনের সিটে চাপাচাপি করে বসলো চার কিশোর। অল্প কথায় সব জানালো টিম। বছর তিনেক আগে স্ত্রী আর ছেলেকে নিয়ে, এসে থাকার জন্যে মিস্টার রোজারের বাড়িতে উঠেছিলো তার বাবা বেকার ডেলটন। বীমা কোম্পানির সেলসম্যানের কাজ করতো। সামান্য আয়ে সংসার চলতো না। তাই বাধ্য হয়ে মিস্টার রোজারের হাউসকীপারের চাকরি নিয়েছিলো টিমের মা। বাড়ির পেছনে ছোট একটা অ্যাপার্টমেন্ট হাউসও বিনা ভাড়ায় পেয়েছিল থাকার জন্যে।
ভালোই কাটছিলো। তারপর, মাস ছয়েক আগে বেভারলি হিল-এ এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে চুরি হলো। তিনটে দামী, ছবি। কিভাবে ঢুকেছিলো চোর, জানতে পারেনি পুলিশ। অনুমান করছে, হয় সরু জানালা দিয়ে, জোরজার করে ঢুকেছে, কিংবা নকল চাবি বানিয়ে নিয়েছে। খোঁজ নিয়ে জানলো ওরা, চুরির হপ্তা দুই আগে ওই বাড়িতে গিয়েছিলো ডেলটন। মালিকের একটা পলিসি করানোর জন্যে। ছবিগুলো দেখেছে।
শুধু ওই বাড়িতে যাওয়ার অপরাধেই ডেলটনের অ্যাপার্টমেন্টে এসে ছবি খুঁজেছে পুলিশ। রান্নাঘরে পেয়েছে চোরাই মাল। ধরে নিয়ে গিয়ে পাঁচ বছরের জন্যে জেলে ঢুকিয়ে দিয়েছে। মাস তিনেক আগে বিচার শেষ হয়েছে তার। অনেক মিনতি করেছে ডেলটন, কসম খেয়েছে। বলেছে, সে চুরি করেনি।- ছবি চেনে না। দামী কিনা বলতেই পারবে না। তাছাড়া দুজনের আয়ে সংসার চলে যাচ্ছিলো। ভালোমতোই, চুরি কেন করতে যাবে? কিন্তু জুরিরা শুনলো না সে কথা।
বিশ্বাস করো, শেষে বললো টিম, বাবা চুরি করেনি। আমার বাবা চোর নয়। হলে আমি আর মা জানতাম। পুলিশের ধারণা, এই এলাকায় গত দশ বছর ধরে যতো ছবি চুরি হয়েছে, সবগুলোর সঙ্গে জড়িত রয়েছে বাবা। বীমার দালাল, লোকের বাড়িতে ঢোকা তার জন্যে সহজ। থেমে দম নিলো সে। তারপর হঠাৎ কিশোরের হাত চেপে ধরে বললো, তোমাদের ভাড়া করতে চাই। আমাকে সাহায্য করো। ব্যাংকে পনেরো ডলার জমিয়েছি আমি, তোমাদের দেবো। এর। বেশি দিতে পারবো না, নেই আমার কাছে। আমার বাবাকে নির্দোষ প্রমাণ করে দাও, প্লীজ!।
চোখ মিটমিট করলো কিশোর, চিন্তিত। রবিন আর মুসার চোখে শূন্য দৃষ্টি। না জেনেশুনে ভালোমতো সাক্ষী-প্রমাণ না নিয়ে কি আর একটা লোককে জেলে

ঢুকিয়েছে পুলিশ?
কাজটা খুব কঠিন, টিম, বোঝানোর চেষ্টা করলো কিশোর। তবু, সাধ্যমতো চেষ্টা করবো।
কঠিন, সে-তো, জানিই। সহজ হলে কি আর গোয়েন্দার সাহায্য লাগতো?
নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর। আচ্ছা, একটা কথা বলো তো, ছবিগুলো তোমাদের রান্নাঘরে গেল কি করে?
বলতে পারবো না। মিস্টার রোজারের কাছে অনেকে আসতো। তাদের কেউ রেখে যেতে পারে। কিংবা বাবার কোনো শত্রু।
দরজায় তালা লাগানো থাকতো না? রবিন জিজ্ঞেস করলো।
থাকলেই বা কি? পুরনো দরজা, পুরনো তালা। সহজেই খোলা যায়। তাছাড়া এমন দামী কিছু থাকে না রান্নাঘরে, যে সাবধান থাকবো।
হুমম্। নিচের ঠোঁটে চিমটি কেটেই চলেছে গোয়েন্দাপ্রধান।
মিস্টার রোজারই চুরি করেননি তো? মুসা বললো। চুরি করে এনে হয়তো তোমাদের রান্নাঘরে লুকিয়েছিলেন। ওটাই সহজ জায়গা।
টিম জবাব দেয়ার আগেই কিশোর বললো, মিস্টার রোজারকে সন্দেহ করেছিলো পুলিশ?
মাথা নাড়লো টিম। মিস্টার রোজার ওরকম কাজ করতেই পারেন না। আমাদের পছন্দ করতেন। তাছাড়া, ছবিগুলো যেরাতে চুরি হয়েছে, সেরাতে ঘরে ছিলেন তিনি।
কিছু মনে কোরো না, বললো কিশোর। গোয়েন্দাগিরিতে কাউকেই সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দিতে নেই। তাই জিজ্ঞেস করলাম। একটা ব্যাপার অদ্ভুত লাগছে আমার।
অদ্ভুত? রবিন ফিরে তাকালো।
তদন্ত শুরু করলাম চেঁচানো ঘড়ির। এখন দেখছি ছবি চুরির কেস। কি যেন একটা যোগাযোগ রয়েছে।
তা কি করে হয়? প্রশ্ন তুললো মুসা।
বুঝতে পারছি না। টিম, মিস্টার রোজারের কথা সব খুলে বলবে? রবিন, নোট নাও।
বেশি কিছু জানাতে পারলো না টিম। বেঁটে, মোটা, হাসিখুশি মানুষ মিস্টার রোজার। অনেক টাকার মালিক। ডেলটনদের ধারণা বছর কয়েক আগে হঠাৎ ওগুলো কারও কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন রোজার। অনেক লোক যাতায়াত করতো তার কাছে। ওদেরকে দেখে অনুমান করতে কষ্ট হয়নি,

একসময় অভিনেতা ছিলেন রোজার, কিংবা থিয়েটারের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তবে তিনি সেকথা কখনও ডেলটনদের বলেননি।
টিমের বাবা চোর, একথা রোজারও মানতে পারেননি। নিজের খরচে উকিল রেখে দিয়েছিলেন। কিন্তু বাঁচাতে পারলেন না ডেলটনকে। এতেই বোধহয় মন খারাপ হয়ে যায় তার। বেকার ডেলটন জেলে যাওয়ার পর পরই বিদেশে চলে গেলেন তিনি। বলে গেলেন, হাওয়া বদলাতে যাচ্ছেন। বাড়িটা দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়ে গেলেন টিমের মায়ের ওপর।
সঙ্গে শুধু দুটো সুটকেস নিয়ে সেই যে গেছেন রোজার, গেছেনই, আর কোনো খোঁজ নেই তার। একটা চিঠিও লেখেননি। যাওয়ার পর কিছুদিন বন্ধুরা এসেছে। দেখা করতে, না পেয়ে ফিরে গেছে। ওদের আসাও বন্ধ হয়ে গেছে এখন।
টিমের মাকে কিছু টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন রোজার। এক সময় শেষ হয়ে গেল সেই টাকা। ঠিক এই সময় ভাড়া বাড়ির খোঁজে এসে হাজির হলো লারমার। টাকা নেই, খাবে কি? অগত্যা লারমারকে বাড়ি ভাড়া দিয়ে দিলো মিসেস ডেলটন। লারমারের শর্ত, তাকে নিরিবিলিতে থাকতে দিতে হবে, আর কোনোরকম হৈ-চৈ করা চলবে না বাড়িতে।
ব্যস, এইই জানি, টিম বললো। কিছুক্ষণ উসখুস করলো সে। তারপর বললো, দেখো, শুরুতে তোমাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছি, কিছু মনে রেখো না। ফোনে মা যখন তোমাদের সঙ্গে কথা বলছিলো, তখন আমিই ঘড়িটার চিৎকার চালু করে দিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, খবরের কাগজের লোক ওদের দেখতে পারি না আমি। কাজের কাজ কিছু করতে পারে না, খালি...যাক ওসব কথা। তোমরা কিছু মনে রেখো না। আমার মনের অবস্থা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো।
পারছি, মাথা ঝোঁকালো কিশোর। তোমার সমস্যাটা নিয়ে ভাববো। কিছু বুঝতে পারলে, জানাবো।
টিমকে গুডবাই জানালো তিন গোয়েন্দা। গাড়ি থেকে নেমে চলে গেল টিম।
আবার এঞ্জিন স্টার্ট দিলো হ্যানসন। কিশোরকে জিজ্ঞেস করলো, মিস্টার ক্রিস্টোফারের ওখানেই যাবো?
চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা কাত করলো কিশোর। যান। ওখানেই তো যেতে চাইছিলাম আমরা। এখন তো যাওয়াই দরকার। রোজার অভিনেতা হলে হয়তো তাকে চিনতে পারবেন মিস্টার ক্রিস্টোফার।
কয়েক মিনিটেই প্যাসিফিক স্টুডিওর গেটে পৌঁছে গেল গাড়ি। আরও কয়েক মিনিট পর বিখ্যাত চিত্রপরিচালক ডেভিস ক্রিস্টোফারের অফিসে ঢুকলো তিন গোয়েন্দা।

এই যে, ছেলেরা, বিশাল ডেস্কের ওপর থেকে বললেন পরিচালক। হঠাৎ? নতুন কোনো কেস?
হ্যাঁ, স্যার, কিশোর বললো। গোলমেলে ঘড়ির তদন্ত শুরু করেছিলাম…
প্রথম দুটো শব্দ বাংলা বলেছে কিশোর, বুঝতে পারলেন না পরিচালক। ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন, কিসের তদন্ত বললে?
গোলমেলে ঘড়ি, স্যার। স্ক্রীমিং ক্লক।
কীই! স্ক্রীমিং ক্লক! ভুরু আরও কুঁচকে গেছে তাঁর, রীতিমতো অবাক হয়েছেন। অনেক বছর কোনো খোঁজ নেই। কি হয়েছিলো তার?

.

তার? বিস্ময়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো কিশোর। স্ক্রীমিং ক্লক নামে কোনো মানুষ আছে?
ওটা তার ডাকনাম, জানালেন পরিচালক। ওর আসল নাম হ্যারিসন ক্লক। চেঁচাতো তো, সেজন্যেই লোকে নাম রেখেছিলো স্ক্রীমিং ক্লক। স্ক্রীমার ছিলো সে।
স্ক্রীমার? বুঝতে পারছে না কিশোর।
কিশোর পাশাও তাহলে অনেক কিছু জানে না, মুচকি হাসলেন পরিচালক। চেঁচানোকে পেশা হিসেবে নিয়েছিলো হ্যারি। রহস্যময় কণ্ঠে বললেন তিনি।
বুঝিয়ে বলবেন, স্যার, প্লীজ!
অনেক বছর আগে, টেলিভিশন তখনও এতো উন্নত হয়নি। রেডিওর চলই ছিলো বেশি। রেডিওতে তখন নাটক শুনতো লোকে। রহস্য গল্প নিয়েও নাটক হতো। লোকে পছন্দও করতে খুব। একবার তো মনে আছে আমার, শুধু রহস্য গল্প নিয়েই এক হপ্তায় হয়েছিলো পঁয়তিরিশটা নাটক। আজকাল টেলিভিশনে যেমন উপভোগ করো তোমরা, আমরা করতাম রেডিওতে শুনে। রোমাঞ্চিত হতাম।
সে-সব নাটকে কণ্ঠ দিতে হতো অনেককে। বিশেষ সাউণ্ড ইফেক্টের জন্যে চেঁচানোর দরকার পড়তো। শুনে যতো সহজ মনে হচ্ছে, কাজটা মোটেও ততো সহজ নয়। এটাও একটা আর্ট। এর জন্যে অভিজ্ঞতা, দক্ষতা সব কিছুরই প্রয়োজন আছে। খুব ভালো শিল্পী ছিলো হ্যারি। পরিচালকদের কাছে তাই তার কদরও ছিলো খুব।
আমার দুটো ছবিতে তাকে দিয়ে কাজ করিয়েছি আমি। চিৎকারে তার জুড়ি নেই। শিশু, মহিলা, পুরুষের কণ্ঠ তো বটেই, নানারকম জন্তুজানোয়ারের ডাকও সে নিখুঁত নকল করতে পারে।
সময় বদলালো। টেলিভিশন জনপ্রিয় হলো। রেডিওর কদর আর রইলো না। ফলে হ্যারিসন ক্লকের মতো লোকদের দামও কমতে লাগলো। বছর কয়েক

আগে। আমার দুটো ছবিতে কাজ করার পর গায়েব হয়ে গেল হ্যারি। আর কোনো খোঁজ পাইনি। তার ব্যাপারেই তদন্ত করছো?
কি জানি, হতেও পারে, বললো কিশোর। তবে আপাতত একটা স্ক্রীমিং ক্লকের তদন্ত করছি আমরা। ব্যাগ থেকে ঘড়িটা বের করে টেবিলে রাখলো সে। ওটা হাতে আসার পর থেকে যা যা ঘটেছে, খুলে বললো।
আশ্চর্য! গম্ভীর হয়ে মাথা দোলালেন পরিচালক
শুনে তো হ্যারিসন ক্লকের মতোই লাগছে, রোজারকে। ক্লক বেঁটে ছিলো। হালকা-পাতলা। রোজার বেঁটে, মোটা। তবে পাতলা মানুষ মোটা হতে সময় লাগে না। আরেকটা ব্যাপার, রেডিওতে আয় কমে গিয়েছিলো, কিন্তু শেষ দিকে কি করে যেন হঠাৎ বড়লোক হয়ে গিয়েছিলো হ্যারি। আনমনে প্রশ্ন করলেন নিজেকেই, কিন্তু নাম বদলাবে কেন?
পেইন্টিঙের ব্যাপারে কি তার আগ্রহ ছিলো, স্যার? রবিন জিজ্ঞেস করলো।
জানি না। অনেক অভিনেতারই অবশ্য থাকে। ক্লকের ছিলো বলে শুনিনি।
থ্যাংক ইউ, স্যার, উঠে দাঁড়ালো কিশোর। অন্য দুজনও উঠলো। অনেক, মূল্যবান তথ্য জানালেন। এসব নিয়ে ভাবতে হবে।
পরিচালকের অফিস থেকে বেরিয়ে এলো ওরা।
রকি বীচে, পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে ওদের নামিয়ে দিয়ে গাড়ি নিয়ে চলে গেল। হ্যানসন।
গেটের ভেতরে ঢুকেই থমকে গেল কিশোর। পেছনে প্রায় তার গায়ের ওপর এসে পড়লো অন্য দুজন। কতগুলো আসবাবপত্রের ওপাশ থেকে বেরিয়ে এসেছে একজন মানুষ।
হাই, ছেলেরা, এগিয়ে এলো সে। চিনতে পারছো?
পারছে। মাত্র ঘন্টাখানেক আগে ওকে দেখেছে রোজারের বাড়িতে।
একটা ঘড়ি আছে তোমার কাছে, কিশোরের দিকে চেয়ে বললো লারমার। ওটা আমার জিনিস।
হাতের ব্যাগটা পেছনে নিয়ে গেল কিশোর।
লাফিয়ে এগিয়ে এলো লারমার। আমার জিনিস আমাকে দিচ্ছো না কেন? জলদি দাও। নইলে…
কিশোর আর লারমারের মাঝে এসে দেয়ালের মতো দাঁড়িয়ে গেল মুসা। কিছুই করতে পারবেন না আপনি, মিস্টার। ওটা আপনার জিনিস হলে নিশ্চয়ই দেবো। কিন্তু প্রমাণ করতে হবে…।
এক ধাক্কায় মুসাকে সামনে থেকে সরিয়ে দিলো লোকটা। গায়ে মোষের। জোর, এতোটা আশা করেনি গোয়েন্দা-সহকারী। ইদানীং কারাত শিখছে সে, সেই

ভরসায়ই সামনে এসেছিলো। হাল ছাড়লো না। কিশোরের হাত থেকে ব্যাগটা কেড়ে নেয়ার চেষ্টা চালালো লারমার। জাপানী জুজিৎসুর কায়দায় তার কব্জি চেপে। ধরলো মুসা।
সেই একই কায়দায় চোখের পলকে হাত ছাড়িয়ে নিলো লারমার। বুঝতেই পারলো না মুসা, কখন ঘুরে গেছে সে, তার পিঠ এখন লোকটার দিকে। শার্টের কলার ধরে তুলে তাকে প্রায় ছুঁড়ে ফেলে দিলো লারমার। আবার কিশোরের হাত থেকে ব্যাগ কেড়ে নিতে গেল।
এই মিস্টার! মস্ত থাবা পড়লো লারমারের কাঁধে, যেন ভালুকের থাবা। তিন। গোয়েন্দাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে বিশালদেহী ব্যাভারিয়ান, বোরিস। হচ্ছে কী?
ফিরে তাকালো লারমার। আমার জিনিস চুরি করেছে। ওটা ফেরত চাই।
ব্যাগ ছাড়ুন, শান্ত কণ্ঠে বললো বোরিস।
তোমার কথায়, না? ভালুক কোথাকার! বলেই ধাঁ করে হাত চালালো বোরিসের গলা সই করে, কারাতের কায়দায়।
গলাটা সরিয়ে নিলো শুধু বোরিস। কারাত-ফারাতের ধার দিয়েও গেল না। লারমারের হাতটা ধরে হ্যাঁচকা টানে আরও কাছে নিয়ে এলো। তারপর দুহাতে ধরে তাকে তুলে নিলো মাথার ওপর, টারজানের মতো। জনি ওয়াইসমুলারকে বোরিসের খুব পছন্দ, সুযোগ পেলেই তাঁকে অনুকরণের চেষ্টা করে। কিশোর, কি করবো ব্যাটাকে? আছাড় মেরে কোমর ভাঙবো, না পুলিশ ডাকবে?
না, ওসব কিছু না, দ্রুত ভাবনা চলেছে গোয়েন্দাপ্রধানের মাথায়। পুলিশকে ডেকে এনে উন্মেও হতে পারে, হয়তো লারমার প্রমাণ করে দেবে ঘড়িটা তারই। তাহলে জটিল একটা রহস্য হাতছাড়া হয়ে যাবে। মাপ করে দিন ওকে।
লারমারকে বুকের কাছে নামিয়ে এনে হাত থেকে ছেড়ে দিলো বোরিস। গমের বস্তার মতো দড়াম করে মাটিতে পড়লো লোকটা। কোমরে হাত দিয়ে কোনোমতে উঠে দাঁড়ালো। মুসার গা-জ্বালানো হি-হি হাসি উপেক্ষা করে চিবিয়ে চিবিয়ে বললো, বেশ, দেখে নেবো আমি!....
হাত বাড়ালো বোরিস। তাহলে হয়ে যাক না এখুনি আরেকবার...
ঝট করে পিছিয়ে গেল লারমার। কিশোরের দিকে ফিরলো। পস্তাবে, মনে রেখো! আমি...আমি... কথা শেষ না করেই গটমট করে হেঁটে চলে গেল সে।

.

পরদিন হেডকোয়ার্টারে আলোচনায় বসলো তিন গোয়েন্দা। টিমও রয়েছে।
সকালে লারমার চলে যাওয়ার পর টিমকে ফোন করেছিলো কিশোর। কথায় কথায় জেনেছে, ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে তার, পুরনো একটা গাড়িও আছে।

গাড়িটা তার বাবার। চাইলে ওটা কাজে লাগাতে পারে তিন গোয়েন্দা। গাড়ি নিয়ে। ওকে আসতে বলেছিলো সে।
তারপর, রবিন; তোমার খবর বলো, সামনে ঝুঁকলো কিশোর।
লস অ্যাঞ্জেলেসের একটা বড় খবরের কাগজে কাজ করেন রবিনের বাবা। তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলো সে, রেকর্ড রুমে পুরনো কাগজ ঘেঁটে দেখার জন্যে, অবশ্যই কিশোরের পরামর্শে। পকেট থেকে কয়েক পাতা কাগজ বের করে ভাঁজ খুলে টেবিলে বিছালো রবিন।
টিমের বাবা বেকার ডেলটনের সম্পর্কে নতুন তেমন কিছুই জানতে পারেনি। পুলিশ অনেক চেষ্টা করেছে। দশ বছর ধরে হলিউড আর লস অ্যাঞ্জেলেসে যতো ছবি চুরি হয়েছে, সবগুলোর সঙ্গে ডেলটন জড়িত ছিলো, একথা, তার মুখ দিয়ে বের করাতে চেয়েছে। কিন্তু বেকার ডেলটনের এক কথাঃ সে চোর নয়। ছবির ব্যাপারে কিছুই বোঝে না। এসব কথা সঙ্গীদের জানিয়ে টিমের দিকে ফিরলো রবিন। জিজ্ঞেস করলো, তোমরা স্যান ফ্রান্সিসকোয় থাকতেই অনেকগুলো চুরি হয়েছে, তাই না?
হ্যাঁ। ছয় বছর আগে হলিউডে এসেছি আমরা। চুরি হচ্ছে আরও বছর চারেক আগে থেকেই। এতেই বোঝা যায়, আমার বাবা নির্দোষ।
চুরিগুলো একটা দলই করছে কিনা সেটা বুঝতে হবে আগে, কিশোর বললো। রবিন, দশ বছরে কটা ছবি চুরি হয়েছে?
বেশি দামী ছবি মোট বারোটা। প্রতিটি ক্ষেত্রেই জানালা কিংবা দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকেছে চোর, ফ্রেম থেকে কেটে ছবি বের করে নিয়ে চলে গেছে। পুলিশের ধারণা, ওগুলো ধনী দক্ষিণ আমেরিকানদের কাছে বিক্রি করে দেয়া হয়েছে। লুকিয়ে রাখবে ওরা, কাউকে দেখাবে না। জেনেশুনেই চোর ও-ধরনের লোকের কাছে বিক্রি করেছে।
যাতে কেউ কখনও খুঁজে না পায় ওগুলো?
হ্যাঁ। টিমদের রান্নাঘরেরগুলোও নিখোঁজ হততা, সময় মতো পুলিশ ওখানে না। গেলে।
দাম কেমন হবে বারোটা ছবির?
সঠিক বলা যাবে না। ছবি বিশেষজ্ঞদের আন্দাজ, নীলামে এক কোটি ডলারে উঠতে পারে।
খাইছে! চোখ বড় বড় হয়ে গেল মুসার। এত দাম!
মাথা ঝাঁকালো রবিন।
এখন প্রশ্ন হলো, টিমদের রান্নাঘরে এলো কিভাবে তিনটে ছবি? বললো কিশোর। প্রশ্ন অবশ্য আরও আছে। কে চুরি করেছে? মিস্টার রোজার ওরফে ক্লক হাওয়া

বদল করতে গিয়ে কেন গায়েব হয়ে গেলেন? আর এটাই বা কোত্থেকে এলো? টেবিলে রাখা ঘড়িটা ছুঁলো সে। কোনো না কোনোভাবে এটার মূল্য আছে। নইলে ছিনিয়ে নেয়ার জন্যে খেপে যেতো না লারমার।
ওকে বলাটাই আমার অন্যায় হয়েছে, কোলের ওপর রাখা দুই হাতের দিকে তাকিয়ে বললো টিম। মুখ তুললো। কি করবো, বলো? এমনভাবে শাসাতে লাগলো মাকে...তোমাদের কথা জিজ্ঞেস করলো। শেষে বলতে বাধ্য হলাম, একটা ঘড়ি এনেছো তোমরা। কার্ডটা দেখাতেই আর দেরি করলো না। ছোঁ মেরে আমার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে ছুটলো।
ভাগ্যিস তখন ইয়ার্ডে ছিলো বোরিস। আচ্ছা, টিম, লারমার যে তোমাদের বাড়িতে থাকে, সন্দেহজনক আচরণ কিছু করে-টরে?
মাঝে মাঝে রাতে উঠে বাড়ির চারপাশে ঘুরে বেড়ায়! মা কারণ জিজ্ঞেস করেছিলো। জবাব দিয়েছে, সে লেখক। রাতে প্রটের কথা ভাবতে ভাবতে মাথ গরম হয়ে যায়, বাইরে বেরিয়ে ঠাণ্ডা করে। এক রাতে শুনলাম, দেয়ালে হাতুড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে বাড়ি দিচ্ছে। গিয়ে দেখলাম। মনে হলো, কিছু খুঁজছে।
হুমম! নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটলো কিশোর। একটা সন্দেহ জাগছে, তবে ভুলও হতে পারে। যাকগে, ওসব পরে। আগের কাজ আগে। বুঝতে পারছি না, পুলিশ যে চুরির সমাধান করতে পারেনি, সেটা আমরা কি করে করবো? ঘড়ি ধরেই এগিয়ে দেখা যাক।
তাতে আমার কি লাভ হবে? হাত নাড়লো টিম। বাবা রয়েছে জেলে, আর তোমরা করতে চাইছে ঘড়ির তদন্ত...
কোনোখান থেকে শুরু করতে হবে তো? অনেকগুলো রহস্য জমা হয়েছে।– আমার বিশ্বাস, ঘড়িটার সঙ্গে ওগুলোর কোনো যোগাযোগ আছে।
বেশ, খুশি হতে পারছে না টিম, করো। কিন্তু কি করে বুঝবে ওটা কোত্থেকে এসেছে?
তলায় একটা কাগজ লাগানো ছিলো, মেসেজ। ড্রয়ার খুলে একটা গোপন কুঠুরি থেকে ছোট কাগজটা বের করলো কিশোর। জোরে জোরে পড়ে শোনালো টিমকে।
কাদের নাম? মুসার প্রশ্ন। কারা ওরা? কি করে খুঁজে বের করবো? আর যদি পাই-ই, কি কথা জিজ্ঞেস করবো ওদের?
দাঁড়াও। এক আঙুল তুললো কিশোর, একবারে একটা প্রশ্ন। মিলারের কাছে লেখা হয়েছে মেসেজটা। আগে তার ঠিকানা বের করা যাক।
কিভাবে?

ঠাণ্ডা মাথায় ভাবো। ভাবলেই বুঝতে পারবে। মিলার নিশ্চয় রোজারের বন্ধু, নইলে তার কাছে লিখতো না। হাত বাড়ালো কিশোর, টিম, অ্যাড্রেসবুক পেয়েছো?

না। অনেক খুঁজেছি। একটা লিস্ট পেয়েছি শুধু, ড্রয়ারে অনেক কাগজের মধ্যে গোঁজা। ওদেরকে ক্রিস্টমাস কার্ড পাঠিয়েছিলেন মিস্টার রোজার। এই যে।

ভাঁজ করা কাগজটা খুলে টেবিলে বিছিয়ে হাত দিয়ে ডলে সমান করলো কিশোর। গুড। মনে হচ্ছে এতেই চলবে। অনেক নাম-ঠিকানা আছে।

নাম আর ঠিকানাগুলো পরিষ্কার ভাবে টাইপ করা রয়েছে কাগজটায়। হেনরি মিলার একজনই পাওয়া গেল। জেনি রোবিডও একজন, উত্তর হলিউডের ঠিকানা। তবে বারকেন দুজন, একজন জেসিয়াস বারকেন, আরেকজন হিরাম বারকেন। দুজনেই প্যাসাডোনার কাছে থাকেন। জেলড়াও দুজন–জেলডা ডেনমার আর জেলডা ট্রিক্সটার। দুজন থাকেন দুই জায়গায়।

নামগুলোর পাশে টিক চিহ্ন দিলো কিশোর। বললো, ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। সবাই। দুদলে ভাগ হয়ে দেখা করতে যাবো আমরা। রবিন, তুমি টিমের সঙ্গে যাবে। মিলার আর মিস রোবিডকে খুঁজে বের করবে। একই দিকে থাকে দুজনে, সুবিধে হবে তোমাদের। রোলস রয়েসটা নিয়ে আমি আর মুসা যাবো অন্য দুজনকে খুঁজতে। ঠিক আছে?

কিন্তু দেখা হলে কি জিজ্ঞেস করবো?

মিলারকে জিজ্ঞেস করবে, মিস্টার ক্লক ঘড়িটা তার কাছে পাঠিয়েছিলেন কিনা? আর নিচে লাগানো মেসেজটা দেখেছেন কিনা। ঘড়িটা বরং নিয়ে যাও সাথে করে। দেখালে হয়তো সহজে চিনতে পারবেন উনি।

বেশ, নিলাম। আর মিস রোবিডকে?

তার কাছে রোজার কোনো মেসেজ পাঠিয়েছে কিনা জিজ্ঞেস করবে। বলবে, মেসেজটা তোমাকে জেনে নেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন ক্লক। প্রয়োজন হলে ঘড়িটা মিস রোবিডকেও দেখাবে।

তা নাহয় দেখালাম। কিন্তু তুমি? তোমার ঘড়ি দরকার হবে না?

অবিকল এক রকম দেখতে আরেকটা ঘড়ি নিয়ে যাবো আমি। এমনও হতে পারে দেখানোর দরকারই হবে না। তবু, বলা যায় না। ওরকম ঘড়ি আরেকটা জোগাড় করে রেখেছি আমি।

এখুনি রওনা হবো?

তোমাদের গাড়ি আছে। চলে যেতে পারো। আমাদের বসতে হবে। হ্যানসন। গাড়ি নিয়ে এলে, তারপর…

কিশোর, হাত তুললো মুসা। একটা খুব জরুরী কথা ভুলে বসে আছে। এখুনি রওনা হতে পারি না আমরা।
কেন? অবাক হলো কিশোর।
কারণ, গম্ভীর হয়ে জবাব দিলো মুসা, এখন লাঞ্চের সময়।
.
এখানেই কোথাও হবে, মোড়ে মোড়ে লাগানো রোড-নম্বরগুলো দেখছে রবিন। হ্যাঁ, ওই যে, মিস্টার মিলার ওই গলিতেই থাকেন।
পথের মোড়ে পুরনো সেডান গাড়িটা পার্ক করলো টিম। দুজনেই নামলো গাড়ি থেকে।
বাপরে, বিরাট বড়লোক, পাথর বসানো ড্রাইভওয়ে ধরে হাঁটতে হাঁটতে বললো টিম। বাড়ি দেখেছো কত বড়!
মাথা ঝাঁকালো রবিন। হাতে ব্যাগ। বেল বাজাতে গিয়ে অবাক হয়ে ভাবলো রবিন, এই বাড়ি থেকেই ঘড়িটা বেরিয়েছে?
দরজা খুলে দিলো এক মহিলা। ভুরু কুঁচকে তাকালো ওদের দিকে। মাঝবয়েসী, মনে হচ্ছে, কোনো কারণে উত্তেজিত হয়ে আছে। কি চাই? কড়া গলায় বললেন। চাঁদা? কবার দেবো?
না, ম্যাডাম, ভদ্র কণ্ঠে বললো রবিন, চাঁদা চাইতে আসিনি। মিস্টার মিলারের সঙ্গে দেখা করতে চাই, প্লীজ।
হবে না। উনি অসুস্থ। কয়েক মাস হলো হাসপাতালে রয়েছেন।
ওহ, সরি। তাই নাকি? দ্রুত ভাবছে রবিন। মিস্টার মিলার যদি কয়েক মাস ধরে হাসপাতালেই থেকে থাকেন, তিনি নিশ্চয় ঘড়িটা ফেলেননি। জিজ্ঞেস করলো, তার পুরো নাম কি হেনরি মিলার?
তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রবিনকে দেখছেন মহিলা। বোধহয় আন্দাজ করতে চাইছেন, ছেলেটা ভালো না মন্দ–মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেবেন কিনা। ভালোই মনে হলো হয়তো, তাই জবাব দিলেন, হ্যাঁ। কেন? কোনো রকম…
না না, কোনো রকম অসৎ উদ্দেশ্য নেই আমাদের, তাড়াতাড়ি বললো রবিন। মিসেস মিলার। আপনিই নিশ্চয় মিসেস মিলার। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, একটা ব্যাপারে তদন্ত করতে এসেছি আমরা। ব্যাগ থেকে ঘড়ি খুলে দেখালো। এই যে, এটা।
আবার ওটা! চেঁচিয়ে উঠলেন মহিলা। ওরকম বিচ্ছিরি একটা জিনিস আমার স্বামীর কাছে পাঠিয়েছে। ভাবো একবার, তার অসুখের সময়। ভাগ্যিস চিৎকার শোনেনি। তাহলে নির্ঘাত হার্টফেল করতো। আমি সুস্থ মানুষ, আমিই মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলাম আরেকটু হলে!

চকিতে দৃষ্টি বিনিময় করলো রবিন আর টিম। ঠিক জায়গাতেই এসেছে।
নিশ্চয় মিস্টার ক্লক পাঠিয়েছেন? জিজ্ঞেস করলো রবিন।
হ্যারিসন ক্লক! ও আবার ভদ্রলোক নাকি? ভেবে দেখো, অসুস্থ একজন মানুষকে ওরকম উপহার পাঠায়? কিসের সুবাদে? না, ওরা একসঙ্গে কাজ করতো একসময়। আমার স্বামী রেডিওর জন্যে রহস্য নাটক লিখতো। ঘড়িটা পেয়ে প্রথমে কিছু মনে করিনি! কিন্তু প্রাগ লাগিয়ে চিৎকার শুনে...ও মাগো! শিউরে উঠলেন মিসেস মিলার। সোজা নিয়ে গিয়ে ময়লার বাক্সে ফেলে দিয়ে এলাম। তোমরা ওখান থেকে কুড়িয়ে এনেছো নাকি?
না। এক বাতিল মালের দোকান থেকে কেনা হয়েছে। নিচে একটা মেসেজ ছিলো, দেখেছেন?
মেসেজ? নুকুটি করলেন মহিলা। না, দেখিনি। পাওয়ার পরদিনই ফেলে দিয়েছি। ঘড়িটার সঙ্গে ছোট একটা চিঠিও পাঠিয়েছিলো। ওটাও ফেলে দিয়েছি।
কি লেখা ছিলো মনে আছে? ব্যাপারটা জরুরী।
ছিলো?...ছিলো, ঘড়িটা কাজে লাগালে নাকি অনেক টাকার মাল পাবে। মাথামুণ্ড কিছু বুঝিনি। রসিকতার আর সময় পেলো না লোকটা। এদিকে আমার। স্বামী হাসপাতালে মরে, টাকার অভাব, এই সময় কোনো ভালো মানুষ ওসব কথা লেখে? বুঝলাম না, এভাবে আমাদের ভয় পাইয়ে দিয়ে কি আনন্দ সে পেতে চেয়েছে। থেমে আবার ভ্রূকুটি করলেন মিসেস মিলার। কিন্তু তোমার এসব জানার কি দরকার? ঘড়ি নিয়ে তোমার এতো আগ্রহ কেন?
দরকার আছে, ম্যাডাম। মিস্টার ক্লক নিখোঁজ হয়েছেন। তাঁকে খোঁজা হচ্ছে। হয়তো এই ঘড়িতেই রয়েছে সূত্র। কোত্থেকে ওটা পাঠানো হয়েছে, কিছু বুঝতে পেরেছেন?
না। অবাকই লেগেছে। হ্যারিসন ক্লক যে নিখোঁজ হয়েছে, খবরটা আমিও শুনেছি। ভাবছি...এহহে ফোন বাজছে। যাই। যা যা জানি, সব বলেছি তোমাদেরকে। গুডবাই, বয়েজ।
দরজা বন্ধ হয়ে গেল।
টিমের দিকে ঘুরলো রবিন। হও আরও গোয়েন্দা! ভিখিরির মতো বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে..যত্তোসব! তিক্ত কণ্ঠে বললো সে। তেমন কিছু জানাও গেল না। শুধু জানলাম, মিস্টার ক্লক ঘড়িটা পাঠিয়েছিলো। ওটা অসুস্থ মিলারের হাতে পড়েনি। মিসেস মিলার পেয়ে ফেলে দিয়েছেন। মেসেজের মানে বুঝলাম না।
এই, গোয়েন্দাগিরিতে মজা পাচ্ছে টিম, অপমান গায়েই মাখেনি, এখানে। দাঁড়িয়ে না থেকে, চলো না মিস জেনি রোবিডের ওখানে যাই। তিনি হয়তো কিছু বলতে পারবেন।

কিন্তু মিস রোবিডও বিশেষ কিছু জানাতে পারলেন না। উত্তর হলিউডের উডল্যাণ্ড হিল-এ ছোট্ট একটা বাড়িতে থাকেন তিনি। নানা রকম গাছের ঝোপ আর ঘন কলা ঝাড়ের ওপাশে কটেজটা খুঁজে বের করতে বেগ পেতে হলো ওদের। হালকা-পাতলা মানুষ। রবিনের মনে হলো, কথা বলার সময় পাখির মতো কিচিরমিচির করেন। ধূসর চুল, চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা, পোশাক-আশাকে মনে হয় এইমাত্র বেরিয়ে এলেন রূপকথার জগত থেকে।

দুজনকে আদর করে ডেকে নিয়ে গিয়ে বসালেন লিভিং-রুমে! সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন আর সুদৃশ্য কুশনে বোঝাই ঘরটা দেখে রবিনের মনে হলো, এখানে কিছু রাখলে জীবনেও আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। রবিনের প্রশ্ন শুনেই চশমা কপালের ওপর ঠেলে তুলে দিয়ে ডেস্কের ভেতর খুঁজতে শুরু করলেন তিনি, আর পাখি-কণ্ঠে একনাগারে কিচির-মিচির করে চললেন, ভাবতেই পারিনি ওটার জন্যে কেউ আসবে। মেসেজটা নিতে। আমি ভেবেছি রসিকতা, মিস্টার কুকের রসিকতা। খুব রসিক লোক, স্টুডিওতে সবাইকে মাতিয়ে রাখতো। আমিও তখন। রেডিওতে কাজ করতাম। একদিন গায়েব হয়ে গেল ক্লক। আর কোনো হদিস পেলাম না। তারপর হঠাৎ ওই চিঠি। সঙ্গে আরেকটা ছোট, কাগজ, মেসেজ। চিঠিতে বলেছে, কেউ মেসেজ নিতে এলে যেন দিয়ে দেয়া হয়। অবশ্যই, যদি ঘড়ির কথা বলে। আরে, রাখলাম কোথায়? চশমাটাও তো পাচ্ছি না। দেখবো কিভাবে?

চশমা কোথায় আছে, বললো রবিন। তাড়াতাড়ি আবার ওটা নাকের ওপর। টেনে নামালেন মিস রোবিড়। ড্রয়ারের ছোট একটা খোপে ঢুকে গেল হাত, বেরিয়ে আসতে দেখা গেল দুআঙুলে ধরে রেখেছেন একটা খাম। এই যে। আমি জানি ওখানে রেখেছি। যাবে কোথায়? এই তো, পেলাম। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, হ্যারিসন ক্লকের কথা। রসিক লোক ছিলো। ভালো লোক। আমার বন্ধু। কিন্তু ওর কণ্ঠ নিশ্চয় রেডিওতে শোনোনি তোমরা?

না, ম্যাডাম, শুনিনি। তবে রসিকতা নিয়েই তদন্ত করছি আমরা। জানতে চাই, তিনি কি বলতে চেয়েছেন। মেসেজটার জন্যে অনেক, অনেক ধন্যবাদ।

আরে না না, এর জন্যে আবার ধন্যবাদ কেন? যখন খুশি চলে আসবে। তোমরা, আমার সাধ্যমতো সাহায্য করবো। হাজার হোক, ক্লকের রসিকতা নিয়ে। গবেষণা করছো। ওর সঙ্গে দেখা হলে আমার কথা বোলো। যা দারুণ চিৎকার। করতে পারতো না.ও! ওর চিৎকার শোনার জন্যে লোকে সব কাজ বাদ দিয়ে। রেডিওর সামনে বসে থাকতো। একটা নাটকের কথা তো বিশেষভাবে মনে আছে। হেনরি মিলারের আ স্ক্রীম অ্যাট মিডনাইট গল্পের ওপর ভিত্তি করে। কি চমৎকার ভয় যে পাওয়াত না, কি বলবো! আর মিলারও লেখক বটে! ধাঁধা, সূত্র, রহস্যে তার জুড়ি

নেই। খুউব বুদ্ধি। ওহহো, ভুলেই গিয়েছি। তোমাদেরকে চা খেতেই তো বললাম না? খাবে না? আচ্ছা, ঠিক আছে, আরেক সময় এলে খেও। যাবে? তাড়াহুড়ো বেশি? বেশ, যাও। বাচ্চাদের স্বভাবই ওরকম। সব কিছুতেই তাড়া।
বাইরে বেরিয়ে হাঁপ ছাড়লো দুই কিশোর।
মেরে ফেলেছিলো আরেকটু হলে। গাড়িতে উঠে হাসলো টিম। এতো বকতে পারে! থামে না। তবে কাজ হয়েছে। কি লেখা আছে মেসেজে, দেখি?
খাম খুলে একটা কাগজের টুকরো বের করলো রবিন। আগ্রহে ঝুঁকে এলো। টিম। হাঁ করে তাকিয়ে আছে দুজনে।
লেখা রয়েছেঃ
ইটস কোয়ায়েট দেয়ার ঈভ ইন আ রিকেন।
জাস্ট আ ওয়ার্ড অভ অ্যাডভাইস, পোলাইটলি গিভেন।
ওল্ড ইংলিশ বোম্যান লাভড ইট।
বিগার দ্যান আ রেইনড্রপ; স্মলার দ্যান অ্যান ওশন।
আয়্যাম ফোর। হাউ ওল্ড আর ইউ?
ইট সিটস অন আ শেলফ লাইক আ ওয়েল-ফেড-এলফ।
সর্বনাশ! মগজ ঘোলা করে দেবে! গুঙিয়ে উঠলো টিম। মানে কি এগুলোর?

.

প্যাসাডেনায় গিয়ে সঠিক জেলডাকে খুঁজে বের করলো কিশোর আর মুসা। তিনি জেলডা ডেনমোর। ভীষণ মোটা। মুসার মনে হলো, পাকা একটা মিষ্টি কুমড়ো। রেডিওতে কাজ করতেন, এখন অবসর নিয়েছেন।
বেড়াল পোষেন মিসেস ডেনমোর, অনেক বেড়াল। সব সিয়ামিজ। ছেলেদের যেখানে বসালেন, সারা ঘরেই বেড়াল গিজগিজ করছে। তার চেয়ারের দুই হাতায় বসেছে দুটো, দুটোর গায়েই হাত বুলিয়ে আদর করছেন তিনি।
কিশোরের প্রশ্নের জবাবে বললেন, হ্যাঁ, চিনি তাকে। তাহলে তোমাদেরকেই মেসেজটা দিতে অনুরোধ করেছে?
মিস্টার ক্লক মেসেজ পাঠিয়েছেন? এড়িয়ে গিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলো কিশোর। কখন?
হপ্তা দুই আগে। সঙ্গে একটা চিঠি। লিখেছে, কেউ নিতে এলে যেন তাকে দিয়ে দিই। সামনে থেকে একটা বেড়াল সরিয়ে ড্রয়ার খুললেন মিসেস, ডেনমোর, খাম বের করে দিলেন কিশোরের হাতে। কি করছে এখন ক্লক? ওর সঙ্গে দেখা নেই অনেকদিন। রেডিও থেকে কাজ চলে যাওয়ার আগে বেশ টাকার টানাটানিতে পড়েছিলো বেচারা। নতুন কোনো কাজও পাচ্ছিলো না। রেডিও জনপ্রিয়তা হারানোতে অনেক স্ক্রীমারই পথে বসলো।

তার সম্পর্কে আমরাও খুব একটা জানি না। কয়েক মাস আগে কোথায় যেন। চলে গেছেন।
অন্য কেউ হলে অবাক হতাম। তবে ব্লকের পক্ষে সবই সম্ভব। আজব লোক। কখন যে কি ভাবে, কি করে বসে, ঠিকঠিকানা নেই। নানা পেশার লোকের সঙ্গে পরিচয় ছিলো তার, ঘনিষ্ঠতা ছিলো। চোর, ডাকাত, জুয়াড়ীরাও ছিলো তার বন্ধু।
তাই নাকি? থ্যাংক ইউ, মিসেস ডেনমোর। আজ তাহলে উঠি। মুসা, চলো যাই। আরও কাজ আছে।
মহিলাকে তাঁর বেড়ালের পালের মধ্যে রেখে বেরিয়ে এলো দুই গোয়েন্দা। গাড়িতে অপেক্ষা করছে হ্যানসন।
মেসেজটা দেখি? হাত বাড়ালো মুসা।
গাড়িতে চলো আগে।
গাড়িতে উঠে খাম খুললো কিশোর। ছোট এক টুকরো কাগজ বের করলো। কতগুলো নম্বর লেখা রয়েছে শুধু তাতে। এরকমঃ
৩-২৭৪-৩৬৫-১৯৪৮-১২৭-১১১৫-৯১০১-২৫-১৬ ৪৫-৩৭৯৮-৯৮২০-১৩৫৮৪-৯
আরও আছে নম্বর। সবই প্রথমগুলোর মতো অর্থহীন, প্রথম দৃষ্টিতে তা-ই মনে হলো।
খাইছে! চেঁচিয়ে উঠলো মুসা। কি অঙ্ক?
অঙ্ক না. মাথা নাড়লো কিশোর। কোনো ধরনের সঙ্কেত। পরে চেষ্টা করবো। কাগজটা ভাঁজ করে পকেটে রেখে দিলো সে। এখন বারকেনকে খুঁজে এক বের করা দরকার।
কোথায় যেতে হবে, বলা হলো হ্যানসনকে। ছুটে চললো রোলস রয়েস।
গম্ভীর হয়ে বসে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর। নীরব।
মুসাও ভাবছে। ভাবছে, অগ্রগতি কি কিছু হয়েছে? এক মেসেজে তো রয়েছে দুর্বোধ্য সংখ্যা, আরেক মেসেজে কি আছে?
পুরনো একটা এলাকায় একটা বাড়ির সামনে এনে গাড়ি থামালো হ্যানসন। মুসা আর কিশোর নেমে হেঁটে এগোলো।
বেল বাজালো কিশোর।
দরজা খুলে দিলো একজন লোক। বড়জোর কিশোরের সমান লম্বা, তার মতোই পাতলা। দুই পায়ের মাঝে ফাঁক অনেক বেশি, দুদিকে ধনুকের মতো বেঁকে রয়েছে। কি চাই?
আচ্ছা, লোকটার কড়া দৃষ্টি উপেক্ষা করে বললো কিশোর। এটা কি মিস্টার জেসিয়াস বারকেনের বাড়ি?
কি দরকার তাকে?

জিজ্ঞেস করতাম, মিস্টার হ্যারিসন ক্লককে চেনেন কিনা।
ক্লক? কে বললো আমি তাকে চিনি? জীবনে ওই নামও শুনিনি। যাও, ভাগো।
এক মিনিট, বারকেন, পেছন থেকে বললো একটা ভদ্র কণ্ঠ। দেখা দিলো লম্বা চেহারার এক লোক। চকচকে কালো চুল ব্যাকব্রাশ করা। কথায় স্প্যানিশ টান।
ক্লককে খুঁজছো কেন? মুসা আর কিশোরকে জিজ্ঞেস করলো। গোয়েন্দা নও তো? হাসলো।
সত্যি বলতে কি... আরম্ভ করেও কিশোরের কনুইয়ের গুতো খেয়ে থেমে গেল মুসা।
মিস্টার ক্লকের পাঠানো কয়েকটা মেসেজ খুঁজছি আমরা, বললো কিশোর। তার রেখে যাওয়া কয়েকটা ঠিকানা পেয়েছি। মিস্টার বারকেনের নামও আছে...
ইনটারেসটিং, বললো লম্বা লোকটা। এসো, ভেতরে এস। মনে হচ্ছে তোমাদের সাহায্য করতে পারবো। আমার বন্ধুর হয়ে মাপ চেয়ে নিচ্ছি, বারকেনের কাঁধে হাত রেখে বললো।
দুজনকে অনুসরণ করে একটা অগোছালো লিভিং রুমে ঢুকলো কিশোর আর মুসা।
দেখো, মারকো, গোঁ গোঁ করে বললো বারকেন। আমার এসব ভাল্লাগছে। কি করছো, কিছুই বুঝতে পারছি না।
চুপ থাকো, ধমক দিলো মারকো। কিশোরের দিকে চেয়ে বললো, শোনো, ক্লক নিখোঁজ হওয়ায় আমরা খুব চিন্তায় আছি। বারকেনের কাছে আজব একটা মেসেজ নাকি পাঠিয়েছে। মনে হচ্ছে তোমরা ব্যাপারটা জানো। জানো, ক্লক কোথায়?
না, স্যার, জবাব দিলো কিশোর। তবে আমরা মেসেজগুলো খুঁজে বের করার চেষ্টা চালাচ্ছি, এটা ঠিক। প্রথমে অদ্ভুত একটা ঘড়ি হাতে এলো:..
ঘড়ি? সঙ্গে আছে?
ব্যাগ খুলে নকল ঘড়িটা বের করলো কিশোর। এই যে, স্যার।
হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ঘড়িটা দেখলো মারকো। অতি সাধারণ। হ্যাঁ, এরার মেসেজের কথা বলো। কি কি জেনেছো?
মেসেজে জেলডা আর বারকেনকে জিজ্ঞেস করতে বলা হয়েছে। কিন্তু কি জিজ্ঞেস করতে হবে, বলেনি। জেল ডেনমোরকে খুঁজে বের করেছি আমরা, তার কাছে একটা মেসেজ পাঠিয়েছেন মিস্টার ক্লক। সেখান থেকেই এলাম। ক্লকের ক্রিস্টমাস কার্ডে মিস্টার জেসিয়াস বারকেনের নাম-ঠিকানা দেখলাম তো। মিস্টার বারকেন, আমাদের জন্যে কোনো মেসেজ পাঠানো হয়েছে?

মেসেজ একটা পেয়েছে বটে, জবাবটা দিলো মারকো। সাথের চিঠিতে লিখেছে, ওটা ডেলিভারি দেয়ার আগে অন্য মেসেজগুলো যেন দেখে নেয়া হয়। দেখি তো, জেলডার মেসেজটা? হাত বাড়ালো সে।
কিন্তু… দ্বিধা করছে কিশোর। পকেট থেকে বের করলো সংখ্যা লেখা কাগজটা।
দেখলো মারকো। শুধুই তো নম্বর! হতাশ মনে হলো তাকে। কোড-টোড হতে পারে। মানে কি?
জানি না। আরেকটা মেসেজ দেখলে হয়তো বোঝা যাবে। মিস্টার বারকেনের মেসেজ।
হয়তো। বেশ, সব দায়িত্ব এখন আমার। এই ঘড়ি আর মেসেজগুলো তোমাদের জন্যে নয়, তোমাদের কাছে পাঠানো হয়নি। আর কোনো মেসেজ থাকলে দিয়ে দাও। আমিই সব সামলাবো।
আর নেই, সামান্য ফ্যাকাসে হয়ে গেছে কিশোরের চেহারা। লম্বা লোকটার হাব-ভাব ভালো ঠেকছে না তার। দেখুন, ঘড়ি আর মেসেজ দিয়ে দিন, প্লীজ। ওগুলো আমাদের। আমরা তদন্ত…
চুপ! খেঁকিয়ে উঠলো মারকো। ডিংগো, ধরো ব্যাটাদের। দেখি, কোথায়। কি লুকিয়ে রেখেছে!
চোখের পলকে পেছন থেকে মুসার গলা জড়িয়ে ধরলো জেসিয়াস বারকেন ওরফে ডিংগো। বেঁটে, হাড্ডি সর্ব, রগ বের হওয়া প্যাকাটির মতো হাতে যে এতো জোর, ভাবতেও পারেনি গোয়েন্দা-সহকারী।

.

ঠিক ওই সময়, অনেক দূরে রবিন আর টিমও পড়েছে গোলমালে।
বাড়ি ফিরে চলেছে ওরা। রকি বীচের মাইলখানেক দূরে সান্তা মনিকা পর্বতের ভেতর দিয়ে চলে গেছে পথ। ওখানটায় এসে পেছনের গাড়িটা লক্ষ্য করলো রবিন। ঘন নীল শরীর, সাদা ছাত। দেখেছে আরও আগেই, গুরুত্ব দেয়নি। হঠাৎ গতি বাড়িয়ে দ্রুত ছুটে আসছে।
টিম! উত্তেজিত কণ্ঠে বললো রবিন। মনে হয় পিছু নিয়েছে। ধরতে আসছে এখন।
পারলে ধরুক, বলতে বলতেই গ্যাস প্যাডালে পায়ের চাপ বাড়িয়ে দিলো টিম।
লাফ দিয়ে আগে বাড়লো পুরনো গাড়িটা। শাঁ করে একটা মোড় পেরিয়ে তীব্র গতিতে নেমে চললো ঢালু পথ বেয়ে।
আবার পেছনে তাকালো রবিন। নীল গাড়িটাও গতি বাড়িয়েছে। দ্রুত কমছে দূরত্ব। ইতিমধ্যেই একশো গজের ভেতরে এসে গেছে।

প্যাডালে পায়ের চাপ আরও বাড়ালো টিম। মারাত্মক গতিবেগ। কিন্তু তার পরেও ছাড়াতে পারছে না নীল গাড়িটাকে, এগিয়েই আসছে, কমছে মাঝখানের ফাঁক।
আরেকটা তীক্ষ্ণ মোড় নিলো টিম। আরেকটু হলেই পথের ধার দিয়ে খাদে পড়ে গিয়েছিলো সেডান। কোনোমতে সোজা করে আবার পথের ওপর নিয়ে এলো। ওটাকে। মুখ থেকে রক্ত সরে গেছে। ভালোমতো চালাতে শিখিনি এখনও। আর যা রাস্তা খালি মোড়…নাহ, পারলাম না। ধরে ফেলবে।
হাল ছেড়ো না, সাহস দিলো রবিন। রকি বীচে ঢুকলে তখন আর আসতে। সাহস করবে না।
চেষ্টা করছি। সাইড দেবো না। আগে যেতে না পারলে থামাতে পারবে না আমাদের।
গতি কমিয়ে পথের মাঝ দিয়ে গাড়ি চালালো টিম।
ফিরে চেয়ে আছে রবিন। এদিক ওদিক সরে পাশ কাটানোর চেষ্টা করছে নীল গাড়িটা। স্টীয়ারিঙে ঝুঁকে থাকা মানুষটাকে পরিচিত লাগছে, কিন্তু চিনতে পারছে না।
নির্জন পথ ধরে ছুটে চলেছে দুটো গাড়ি। সামনে পথের ওপর একটা ছোট গর্ত দেখে এড়াতে গেল টিম, এই সুযোগে পাশে চলে এলো পেছনের গাড়িটা। সরতে সরতে সেডানটাকে নিয়ে এলো একেবারে পথের ধারে। আর সরার জায়গা। নেই। ধাক্কা লাগলেই এখন পড়ে যাবে খাদে।
থামতেই হবে! চেঁচিয়ে বললো টিম। কায়দা করে ফেলেছে হারামজাদা!
গ্যাস প্যাডাল থেকে পা সরিয়ে ব্রেক চাপলো সে। সেডানটা থামতে শুরু করতেই পাশের গাড়িটাও গতি কমালো।
কালো চশমা পরা লোকটার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রয়েছে রবিন। চেনার চেষ্টা করছে। কোথায় দেখেছে কিছুতেই মনে করতে পারলো না।
থেমে গেল সেডান। পাশে থামলো নীল গাড়ি। হঠাৎ আবার খেপা ঘোড়ার মতো লাফিয়ে আগে বাড়লো, শাঁ শাঁ করে ছুটে হারিয়ে গেল পথের বাঁকে।
তাজ্জব কাণ্ড! অবাক হয়েছে টিম। পিছু নিলো, থামলো, এখন পালালো…
বুঝতে পারলো কারণটা। পেছনে শোনা যাচ্ছে সাইরেনের শব্দ। এগিয়ে। আসছে দ্রুত। কিছুক্ষণ পরে ঘ্যাঁচ করে এসে পাশে থামলো একটা পুলিশের গাড়ি। নেমে ওদের দিকে এগিয়ে এলো একজন অফিসার, বর্ষার মেঘলা আকাশের মতো থমথমে চেহারা। হাত বাড়ালো, দেখি লাইসেন্স!
ধরে রাখো, ছেড়ো না, আদেশ দিলো মারকো।
মুসার হাত মুচড়ে পিঠের ওপর নিয়ে এসেছে ডিংগো।

টেবিল থেকে একটা কাগজ কাটার ছুরি তুলে নিয়ে কিশোরের বুকে ঠেকিয়েছে মারকো। ভয়ানক কণ্ঠে বললো, দাও, যতোগুলো মেসেজ আছে।
চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে কিশোর। মুসা দেখতে পাচ্ছে না তাকে। সে চুপ, থাকলো না। ছাড়া পাওয়ার চেষ্টা চালিয়েই যাচ্ছে। কারাতের স্কুলে শিখেছে, কি করে কব্জি ছাড়াতে হয়। হঠাৎ মাছের মতো মোচড় দিয়ে উঠলো তার শরীরটা। সোজা হয়ে গেল হাত। সামনের দিকে ঝটকা দিয়ে ঝুঁকে গেল মাথা। কিছু বুঝে ওঠার আগেই মুসার পিঠের ওপর দিয়ে উড়ে চলে গেল ডিংগো। বাড়ি খেলো মারকোর গায়ে। তাকে নিয়ে দড়াম করে পড়লো মাটিতে।
জলদি ভাগো! চেঁচিয়ে উঠলো কিশোর। মেঝেতে মাথা ঠুকে গেছে মারকোর, চিত হয়ে আছে। তার বুকের ওপর চেপে রয়েছে ডিংগো। দুজনেরই হতবিহ্বল অবস্থা। মারকোর হাত থেকে মেসেজটা টেনে নিয়ে দরজার দিকে দৌড় দিলো কিশোর। একই সময়ে দরজায় পৌঁছলে মুসা। ধাক্কা লেগে গেল দুজনের।
ঘড়ি! চিৎকার করে বললো মুসা। ফেলে এসেছো!
থাকুক, থামলো না কিশোর। ওটা লাগবে না।
হাঁপাতে হাঁপাতে এসে গাড়িতে উঠলো ওরা। কিশোর বললো, হ্যানসন, গাড়ি ছাড়ুন, কুইক!
তিন গোয়েন্দার সঙ্গে অনেক দিনের পরিচয় হ্যাঁনসনের, জানে এই সব জরুরী মুহূর্তে কি করতে হয়। বিন্দুমাত্র দেরি করলো না সে, প্রশ্ন করলো না, ছেড়ে দিলো গাড়ি।
আরি, কিশোর, বলে উঠলো মুসা। মেসেজটা তো ছিঁড়ে ফেলেছো!
হাতের দিকে তাকালো কিশোর। তাই তো! অর্ধেকটা ছিঁড়ে নিয়ে এসেছে। বাকি অর্ধেক নিশ্চয় রয়ে গেছে মারকোর হাঙে।
গেল! নিরাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো মুসা।
ফিরে গিয়ে নিয়ে আসবো নাকি? নিজেকেই যেন প্রশ্ন করলো কিশোর।
আবার! আর পারবো না। একবারই ছাড়া পেয়েছি অনেক কষ্টে।
নাহ, গিয়েও আর লাভ নেই। এতোক্ষণ নিশ্চয় বাকি অর্ধেক লুকিয়ে ফেলেছে। মারকো। জিজ্ঞেস করলে স্রেফ অস্বীকার করবে।
আর কোথাও যাবো? জিজ্ঞেস করলো হ্যানসন। নাকি সোজা ইয়ার্ডে?
না, যাবো বললো কিশোর। ভুল বারকেনের ওখানে গিয়েছিলাম আমরা জেসিয়াস নয়, আমাদের দরকার হিরাম বারকেনকে, এখন বুঝতে পারছি। ঠিকানা বলে সিটে হেলান দিলো সে।
আচ্ছা, কিশোর, মুসা বললো। মেসেজের জন্যে এতো আগ্রহ কেন। ব্যাটাদের?

বুঝতে পারছি না। মিস্টার কুকের ব্যাপারে এমন কিছু জানে হয়তো, যা আমরা জানি না। মেসেজগুলোকে মূল্যবান ভাবছে। কেন ভাবছে, সেটা আমাদের জানতে হবে।
কিভাবে?
মেসেজের মর্ম উদ্ধার করে।
যদি পারা যায়! নিষ্প্রাণ হাসি হাসলো মুসা। ততদিনে চুল-দাড়ি পেকে সব সাদা হয়ে যাবে আমাদের, মরার সময় হয়ে যাবে। তাছাড়া পুরো মেসেজটা থাকলেও এক কথা ছিলো, ছিঁড়ে তো এনেছে মাত্র অর্ধেকটা।
চেষ্টা তো করতে হবে, বলে চুপ হয়ে গেল কিশোর।
গাড়ি থামলো। বোধহয় এই জায়গাই, হ্যানসন বললো। এবার কোনো বিপদ আশা করছেন? আমি আসবো?
না। বিপদে পড়লে জোরে জোরে চিল্লাবো। মুসা, এসো যাই।
স্প্যানিশ ধাঁচের ছোট্ট সুন্দর একটা বাড়ি, বাগানে ঘেরা। গোলাপের যত্ন করছেন এক বৃদ্ধ। পায়ের শব্দে মুখ ফিরিয়ে তাকালেন।
মিস্টার হিরাম বারকেন? জিজ্ঞেস করলো কিশোর।
মাথা ঝাঁকালেন বৃদ্ধ। হ্যাঁ, আমি। হাতের দস্তানা খুলতে খুলতে জিজ্ঞেস করলেন, কি চাও? অটোগ্রাফ? মৃদু হাসলেন তিনি। বহু বছর পরে আবার অটোগ্রাফ…আ স্ক্রীম অ্যাট মিডনাইট-এ গোয়েন্দার অভিনয় করার পর কতো লোক যে এসেছিলোনাটকটা নিশ্চয় শোননি? নাকি?
না, স্যার। খুব জমজমাট নাটক হয়েছিলো, তাই না?
খালি জমজমাট! রোম খাড়া করে দিয়েছিলো কতো লোকের। আর চেঁচাতেও পারতো বটে হ্যারি ক্লক। হ্যারি আর হেনরি, দুজনে মিলেই লিখেছিলো। হ্যারির পুট, আর হেনরির কলম। ঘুরিয়ে, পেঁচিয়ে এমন এক কাহিনী দাঁড় করিয়েছিলো…যাকগে, ওসব পুরনো ইতিহাস। তা, তোমাদের অটোগ্রাফ… খাতার জন্যে হাত বাড়ালেন মিস্টার বারকেন।
অটোগ্রাফ নয়, স্যার…
তাহলে কি? কিছুটা নিরাশই মনে হলো ভদ্রলোককে, তবে হাসি মলিন হলো না। চাদা? নাকি নতুন ম্যাগাজিনে বিজ্ঞাপন?
না, ওসব না, স্যার। মেসেজ। মিস্টার কুকের মেসেজ।
ও, মেসেজ! উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন আবার বারকেন। নিশ্চয়। বহুদিন ক্লকের কোনো খবর নেই, বছর বছর ক্রিস্টমাস কার্ড ছাড়া। এই প্রথম এলো চিঠি। এসো, ঘরে এসো, দেখি খুঁজে পাই কিনা।

চমৎকার সাজানো গোছানো একটা ঘরে ওদেরকে নিয়ে এলেন বারকেন। সবার আগে চোখে পড়ে পুরনো স্টাইলের বিশাল এক টেপ রেকর্ডার। শেলফে সাজানো সারি সারি টেপের বাক্স।
ডেস্কের ড্রয়ার থেকে একটা খাম বের করলেন তিনি। এই যে। খুলে পড়েছি। সেই পুরনো হ্যারিসন কুক, দুর্বোধ্য সব কথাবার্তা। একটা শব্দও বুঝিনি।
মেসেজটা হাতে নিলো কিশোর। ঝুঁকে এলো মুসা। লেখা রয়েছেঃ
টেক ওয়ান লিলি; কিল মাই ফ্রেণ্ড এলি।
পজিটিভলি নাম্বার ওয়ান।
টেক আ ব্রুম অ্যাণ্ড সোয়্যাট আ বী।
হোয়াট ইউ ডু উইদ ক্লথস, অলমোস্ট।
নট মাদার, নট সিসটার, নট ব্রাদার; বাট পারহ্যাপস ফাদার।
হাইমস? হামস? হোমস? অলমোস্ট, নট কোয়াইট।
খাইছে! এটা কবিতা না, দাঁত ভাঙার মেশিন?
কিংবা মাথা ভাঙার হাতুড়ি, হেসে বললেন বারকেন। মানে বোঝার অনেক চেষ্টা করেছি, বিরক্ত হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছি শেষে। যতদূর জানি, এলি নামে হ্যারির কোনো বন্ধু ছিলনা। অথচ পড়ে মনে হয়, বন্ধু এলিকে খুন করে তার, বুকে একটা পদ্ম রেখে দেয়ার কথা ভাবছে, তাই না? শব্দ করে হাসলেন। সাথে একটা নোটও লিখে দিয়েছে। কেউ নিতে এলে যেন মেসেজটা তাকে দিয়ে দিই। ও, ভালো কথা, তোমাদের পরিচয়ই জানা হলো না এখনও।
নিশ্চয়ই, পকেট থেকে কার্ড বের করে দিলো কিশোর।
কার্ডটা পড়লেন মিস্টার বারকেন। হাত মেলালেন দুই গোয়েন্দার সঙ্গে। তোমরা গোয়েন্দা জেনে খুশি হলাম। একটা কথা, হ্যারির ব্যাপারে যখন আগ্রহ, নিশ্চয় তার দুএকটা নাটক শুনতে চাইবে? মানে, নাটকে তার চিৎকার। আজকালকার ছেলে তোমরা, টেলিভিশন দেখে অভ্যাস। রেডিওতে নাটকের মজা যে কী, জানো না। শুনবে? ওই যে টেপগুলো দেখছো, অনেক নাটক রেকর্ড করা আছে ওগুলোতে। আমার অভিনয় করা সমস্ত নাটক। প্রত্যেকটাতে আছে হ্যারিসন ক্লকের কণ্ঠ।
লোভ হলো দুই গোয়েন্দার। রেডিওর নাটকের কথা অনেক শুনেছে ওরা। রাশেদ পাশাও মাঝে মাঝেই বলেন। সময় থাকলে এই সুযোগ ছাড়তো না, কিন্তু। এখন মোটেই সময় নেই ওদের। মিস্টার বারকেনকে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে, শুড় বাই জানিয়ে মেসেজটা নিয়ে বেরিয়ে এলো ওরা। গাড়িতে এসে উঠলো।
হ্যানসনকে ইয়ার্ডে ফিরে যেতে বলে মুসার দিকে তাকালো কিশোর। টিম। আর রবিন কি করেছে কে জানে। সবগুলো মেসেজ একসাথে পেলে সমাধান। করতে

সুবিধে হতে গিয়ে এখন ওদেরকে হেডকোয়ার্টারে পেলেই হয়। আর
হেডকোয়ার্টারেই রয়েছে তখন রবিন আর টিম, তবে তিন গোয়েন্দার নয়, পুলিশ হেডকোয়ার্টারে। নতুন ডিউটি অফিসার রবিনকে চেনে না। দুজনকে নিয়ে ঢুকলো চীফের অফিসে। বয়সের কোন
আরে, রবিন তুমি? বলে উঠলেন ইয়ান ফ্লেচার।
চীফকে দেখে হাঁপ ছাড়লো রবিন। হ্যাঁ, স্যার, ধরে আনা হয়েছে।
কি করেছিল?
কি করেছিলো, জানালো ডিউটি অফিসার।
সরি, রবিন, তোমাদের কাছ থেকে এটা আশা করিনি, আন্তরিক দুঃখিত মনে হলো ফ্লেচারকে। খুব অন্যায় করেছে। এতো জোরে গাড়ি চালানো। অন্যের তো বটেই, নিজেরও ক্ষতি হতে পারতো।
ইচ্ছে করে করিনি, স্যার। আমাদের তাড়া করা হয়েছিলো। আরেকটা গাড়ি। ধরে ফেলেছিলো আমাদের। সময়মতো ইনি না গেলে, ডিউটি অফিসারকে দেখালো রবিন। কিছু একটা করতে আমাদের।
তাড়া করেছিলো? হাসি ফুটলো চীফের মুখে। নতুন কোনো কেস-টেস?
হ্যাঁ, স্যার, একটা চেঁচানো ঘড়ি।
বলে চেঁচানো ঘড়ি! আশ্চর্য তো! ঘড়ি আবার চেঁচায় কিভাবে?
আমাদের গাড়িতেই আছে, স্যার। বললে এনে দেখাতে পারি।
অফিসারের দিকে চেয়ে ইঙ্গিত করলেন ফ্লেচার। যাও ওদের সঙ্গে। নিয়ে এসো।
ফিরে এলো খানিক পরে। খালি হাতে। মাথা নাড়লো অফিসার, নেই। ঘড়ি নেই। ওরা বলছে একটা ব্যাগ ছিলো সেটাও দেখলাম না।
আমার বিশ্বাস, স্যার, মুখ কালো হয়ে আছে রবিনের, চুরি করে নিয়ে গেছে!
.
এতো দেরি করছে কেন ওরা? মুসা বললো।
মিস্টার বারকেনের কাছে পাওয়া মেসেজটা টেবিলে রেখে ঝুঁকে দেখছিলো কিশোর, সোজা হয়ে তাকালো। যাই, দেখি, আসছে কিনা।
সর্ব-দর্শনে গিয়ে চোখ রাখলো সে। জানালো, টিমের গাড়ি সবে ঢুকেছে ইয়ার্ডে। .
কিছুক্ষণ পর সাঙ্কেতিক টোকা পড়লো দুই সুড়ঙ্গের দরজায়।ট্র্যাপোর খুলে দিলো মুসা। উঠে এলো রবিন আর টিম। ক্লান্ত, বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে ওদের।
মেসেজ পেয়েছো? জিজ্ঞেস করলো।
হ্যাঁ, তা পেয়েছি, বসতে বসতে বললো রবিন। কিচ্ছু বোঝা যায় না।
দেখি? হাত বাড়ালো কিশোর। ঘড়িটা কই?
নেই।

নেই মানে? তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে গোয়েন্দাপ্রধানের দৃষ্টি। হারিয়ে ফেলেছো?
চুরি হয়ে গেছে, টিম জানালো, পুলিশ স্টেশনের বাইরে গাড়ি পার্ক করেছিলাম...
পুলিশ স্টেশন? মুসার প্রশ্ন। সেখানে কি করছিলে? ডাকাতে ধরেছিলো নাকি?
বেশি জোরে চালাচ্ছিলাম বলে পুলিশে ধরেছিলো। আগেই পিছু নিয়েছিলো একটা গাড়ি, পাহাড়ের মাঝামাঝি আসতেই ভাড়া করলো। ছুটলাম...
কি হয়েছিলো, জানানো হলো মুসা আর কিশোরকে।
ছেড়ে দিলেন আমাদেরকে চীফ, বলা শেষ করলো রবিন। বলে দিয়েছেন, জরুরী কিছু জানলে, কিংবা বিপদের সম্ভাবনা দেখলেই যেন তাকে জানাই।
হুঁ, আনমনে মাথা ঝোঁকালো কিশোর। জানানোর সময় এখনও হয়নি। কিছুই জানি না এখনও। পুলিশ বিশ্বাস করবে না, হাসবে। ভাববে, হ্যারিসন। ক্লকের রসিকতা। সাহায্য তো পাবোই না, বরং বেকায়দায় পড়ে যেতে পারি।
মারকো আর ডিংগোর কথা বললো কিশোর, মাঝে মাঝে কথা যোগ করলো মুসা।
তাহলে বুঝতেই পারছো, কিশোর বললো! মেসেজ আর ঘড়ির ব্যাপারে ইনটারেস্ট আছে আরও অনেকের। হতে পারে, তোমাদেরকে যে তাড়া করেছে, সে-ই ঘড়িটা চুরি করেছে। পুলিশের সাইরেন শুনে পালিয়ে গিয়ে লুকিয়ে ছিলো কোথাও, তারপর সুযোগ বুঝে গিয়ে হাজির হয়েছে থানার কাছে। কেউ নেই দেখে টুক করে তোমাদের গাড়ি থেকে ব্যাগটা তুলে নিয়ে গেছে।
কিন্তু সেই লোকটা কে? রবিন বললো। ঘড়ি আর মেসেজের ব্যাপারে এতো আগ্রহ কেন?
লারমারের কথা ভুলে গেছো? সে জানে ঘড়ির কথা। আরও কাউকে বলে থাকতে পারে। এক কান দুকান হতে হতে দশ কান হতে বাধা কোথায়? না। জেনে ভুল করে মারকো আর ডিংগোকেও অনেক কথাই বলে এসেছি আমরা। ঘড়ি আর মেসেজ তো বটেই, আমরা কি করছি, সেটাও জেনে গেছে ওরা।
দূর, আমার এসব ভাল্লাগছে না! বাতাসে থাবা মারলো মুসা। তা রবিনের মেসেজে কি লেখা? প্রলাপ-ই?
রবিনের আনা মেসেজটা টেবিলে রাখলো কিশোর। প্রলাপ নয়। তবে একই রকম কঠিন।
কেন ভণিতা করছো? গুঙিয়ে উঠলো মুসা। এটাকে শুধু কঠিন বলে? হাতুড়ি, বলো, হাতুড়ি, মাথায় লাগলেই খুলি খতম, মগজ ঘোলা।
হয়নি, হাসলো কিশোর। হাতুড়ি নয়। ডাবল ব্যারেল শটগান। মাথায় লাগলে খুলি, মগজ সব উড়ে যাবে। এবার খুশি তো?
হ্যাঁ, এইবার ঠিক বলেছো, খুশি হয়ে মাথা দোলালো মুসা।

কাজের কথায় আসি এবার। দেখা যাক, শটগানের ভেতর থেকে কিছু। বেরোয় কিনা। রবিন, মিস্টার মিলার আর মিস রোবিডের সাথে যা যা কথা হয়েছে, সব খুলে বলল। কিছু বাদ দেবে না।
বলতে থাকলো রবিন। কিশোর শুনছে, চুপচাপ, কোনো প্রশ্ন নেই। নোট করে নিচ্ছে মনের খাতায়। রবিনের কথা শেষ হলে বিড়বিড় করলো আনমনে, তাহলে, মিস্টার মিলার হাসপাতালে, অসুস্থ। মিস্টার ক্লক তাঁর কাছেই ঘড়িটা পাঠিয়েছিলেন, মেসেজগুলো জোগাড় করে রহস্যের সমাধানের জন্যে। এখন প্রশ্ন হলো, সমাধান করলে কি বেরোবে?
নিশ্চয় এমন কিছু, যাতে চমকে যাবেন মিস্টার মিলার, রবিন বললো। ঘড়ির নিচে লাগানো মেসেজে তো তাই বলা হয়েছে।
হয়েছে। কিন্তু কি দেখে চমকাবে? কি ঘটবে? সেটাই বুঝতে হবে এখন আমাদের। দেখি চেষ্টা করে, মেসেজগুলোর মানে বুঝতে পারি কিনা।
টেবিলে রাখা মেসেজটার দিক থেকে চোখ ফেরালো টিম। মেসেজ?? নিঃসন্দেহ হতে পারছে না সে। একে মেসেজ বলছো? কোনো ধরনের কোড?
তাছাড়া আর কি? জবাব দিলো কিশোর। মিস্টার ক্লক আর মিস্টার মিলার, দুজনেই রহস্য ভালোবাসেন। ধাঁধা পছন্দ করেন। এমনও হতে পারে; কথাগুলোর মানে জানা আছে মিস্টার মিলারের, আর সেজন্যেই ওভাবে লিখেছেন মিস্টার ক্লক। নিজেরা ঠিকই বুঝতে পারবেন, অথচ অন্য কেউ পারবে না।
তোমার কি মনে হয়? হাত নাড়লো মুসা। তুমি পারবে?
আমার তো মনে হচ্ছে ক্রসওয়ার্ড পাজলস জাতীয় কিছু। প্রতিটি লাইনে একটি করে বিশেষ শব্দ পাওয়া যাবে, ছয় লাইনে ছয়টা। আর ছয়টা শব্দ দিয়ে হবে একটা বাক্য, যেটার মানে বোঝা যাবে সহজেই।
তাহলে তৈরি করে ফেলো বাক্যটা। প্রথম লাইন থেকেই শুরু করো। বলা হচ্ছে, হারিকেনের সময়ও শান্ত থাকে। হারিকেনের সময় কোন জায়গাটা সব চেয়ে শান্ত থাকে?
আমি জানি, বলে উঠলো টিম। স্টর্ম সেলার। ঝড়ের সময় যেখানে গিয়ে আশ্রয় নেয় মানুষ।
তার চেয়েও নিরাপদ ব্যাংকের ভল্ট, তিক্ত কণ্ঠে বললো রবিন।
কি জানি, নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটলো কিশোর, ভল্ট হতেও পারে। আসলেই তো নিরাপদ! এখানে দামী জিনিসের আভাস যখন পাওয়া যাচ্ছে।
দূর, হেঁয়ালি করে কথা বলো না তো! রেগে গেল মুসা।
হেঁয়ালি কোথায়? দামী জিনিস না হলে মেসেজগুলোর জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে কেন কিছু লোক? আর দামী জিনিস ব্যাংকের ভল্টেই সব চেয়ে নিরাপদ। এবার

দুনম্বর লাইনঃ জাস্ট আ ওয়ার্ড অভ অ্যাডভাইস, পোলাইটলি গিভেন। এখানে একটা শব্দই বিশেষভাবে চোখে লাগে, অ্যাডভাইস! মানে, উপদেশ। অ্যাডভাইসের আর কি কি মনে হয়? প্রতিশব্দ? মুসা, প্লীজ, ডিকশনারীটা দেবে?
বইয়ের তাক থেকে ডিকশনারী এনে দিলো মুসা।
নীরবে পাতা ওল্টালো কিশোর। এই যে, অ্যাডভাইসের প্রতিশব্দ, ওপিনিয়ন! দেখা যাক, মেলে কিনা? ব্যাংক ভল্ট…ওপিনিয়ন.. নাহ্, ঠিক হচ্ছে না।
তা তো হচ্ছেই না, জোর দিয়ে বললো মুসা। ভদ্র ভাষায় আমার পরামর্শ হলো…
মুসাআ! হাত তুললো কিশোর।
কড়া চোখে তার দিকে তাকালো মুসা। থামবো? কেন? আমার পরামর্শ…
তাকে অবাক করে দিয়ে তুড়ি বাজালো হঠাৎ কিশোর। ঠিক বলেছো! পরামর্শ! বলছে পোলাইটলি গিভেন অ্যাডভাইস। পরামর্শও এক ধরনের উপদেশ, ভদ্রভাবে দেয়া উপদেশ। মুসা, দিয়েছ সমাধান করে লাইনটার।
চোখ মিটমিট করছে গোয়েন্দা-সহকারী। যতোটা ভেবেছি, ততোটা কঠিন নয় তাহলে! আশ্চর্য!…কিন্তু আমি এখনও ব্যাংক ভল্টের সঙ্গে পরামর্শ মেলাতে পারছি না।
আমিও না। দেখি, বাকি শব্দগুলো বের করলে মেলে কিনা।
তিন নম্বর লাইন হলো, রবিন বললো, ওল্ড ইংলিশ বোম্যান লাভড ইট। কি ভালোবাসতো? বোম্যানরা একটা জিনিসই ভালোবাসে, সেটা তীর-ধনুক। সে ইংরেজই হোক, আর অন্য দেশীই হোক, আগের দিনেরই হোক, বা এখনকারই হোক।
বোম্যানের আরেকটা মানে যদি করা হয়? ভুরু কুঁচকে, মাথা নেড়ে বললো কিশোর। যদি ধরা হয়, তীরন্দাজ? তাহলে তো যুদ্ধও ভালোবাসবে।
ব্যাংক ভল্ট…পরামর্শ…তীরন্দাজ! চেঁচিয়ে উঠলো টিম, আরো ঘোল্য হয়ে। যাচ্ছে মগজ! মাথাটা এবার সত্যি খারাপ হবে!
কি জানি, ভ্রূকুটি করলো কিশোর। কিন্তু…
বাধা পড়লো কথায়। বাইরে থেকে শোনা গেল মেরিচাচীর কণ্ঠ, ডাকছেন। কিশোওর! কোথায় তোরা? খাবার ঠাণ্ডা হয়ে গেল।
চমৎকার! টেবিলে চাপড় মারলো মুসা। এই হলো গিয়ে একটা কথার মতো কথা। চুলোয় যাক মেসেজ। চলো খেয়ে নিই আগে।
টিমকে খেয়ে যাবার অনুরোধ করলো কিশোর। রাজি হলো না সে। বললো তাকে তাড়াতাড়ি যেতে বলে দিয়েছে মা। আরেকদিন খাবে।
ঠিক আছে, যাও তাহলে, কিশোর বললো। যোগাযোগ রাখবো। আর হ্যাঁ, লারমারের ওপর চোখ রেখো। বলা যায় না, সে-ই হয়তো তোমাদের পিছু।

নিয়েছিলো। ঘড়ি চুরি করেছে।
রাখবো, ঘাড় নাড়লো টিম। লোকটাকে আমিও পছন্দ করি না। দেখলেই মনে হয়, কিছু একটা শয়তানীর তালে আছে।
মুখ খুলতে যাচ্ছিলো কিশোর, বাধা পড়লো আবার। টেলিফোন বাজছে। রিসিভার তুলে নিলো। তিন গোয়েন্দা। কিশোর পাশা বলছি।
হাল্লো। কণ্ঠটা প্রথমে চিনতে পরলো না কিশোর। হিরাম বারকেন। হ্যারিসন ক্লকের মেসেজ নিতে আজ বিকেলে এসেছিলে আমার বাড়িতে।
হ্যাঁ, স্যার!
তখন থেকেই ভাবছি তোমাদের জানাবো কিনা। তোমরা যাওয়ার পর একটা ঘটনা ঘটেছে।
ঘটনা?
আরেকজন এসেছিলো মেসেজ চাইতে। লম্বা, কালো চুল, দক্ষিণ আমেরিকার লোক বলে মনে হলো। সঙ্গে তার এক বন্ধু, বেঁটে। বললো, ক্লক নাকি ওদের পাঠিয়েছে।
নিশ্চয় মেসেজ দিতে পারেননি। আমাদেরকেই তো দিয়ে দিয়েছেন।
না, পারিনি। ওরা চাপাচাপি করতে লাগলো কাকে দিয়েছি বলার জন্যে। তোমাদের কার্ড দেখিয়ে দিয়েছি ওদের। নাম ঠিকানা লিখে নিলো। তারপর থেকেই ভাবছি, কাজটা কি উচিত হলো? ওদের ভালো লোক মনে হয়নি আমার, বিশেষ করে লম্বাটাকে। মারকো। এতো বেশি ভদ্র, বিনয়...
দিয়ে দিয়েছেন ঠিকানা, কি আর করা। যাকগে, যা হবার হবে। কষ্ট করে আবার আমাদের ফোন করবেন, অনেক ধন্যবাদ।
লাইন কেটে গেল। রিসিভার রেখে বন্ধুদের দিকে তাকালো কিশোর। মারকো আর ডিংগো এখন আমাদের নাম-ঠিকানা জানে। লারমার জানে। তিনজনেই ঘড়িটা চায়, মেসেজগুলো চায়। লারমার ঘড়িচোর না হলে, অন্য আরেকটা দল আছে। সবাই ইনটারেসটেড। লোক কেউই সুবিধের নয় ওরা। আমাদের বিপদটা বুঝতে পারছো আশা করি?

.
পরদিন সকালে স্যালভিজ ইয়ার্ডে যাওয়ার জন্যে তাড়াহুড়ো করে নাস্তা সারছে রবিন, এই সময় এলো ফোন। লাইব্রেরিয়ান ফোন করেছেন, যেখানে সে পার্টটাইম চাকরি করে। কয়েক ঘন্টা কাজ করে দেয়ার অনুরোধ জানালেন।
সেদিন রবিনের অফ ডে, ইচ্ছে করলে মানা করে দিতে পারে। ইয়ার্ডে রহস্যময় মেসেজ নিয়ে গবেষণা করবে কিশোর আর, মুসা, একথা ভেবে একবার ভাবলো

না-ই করে দেয়। শেষে ভাবলো, হয়তো জরুরী দরকার, নয়তো কোনো কারণে আটকে গেছেন লাইব্রেরিয়ান। বললো, বিশ মিনিটের মধ্যে হাজির হবে।
নাস্তা সেরে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়লো রবিন। লাইব্রেরিতে এসে জানলো, অ্যাসিসট্যান্ট লাইব্রেরিয়ানের শরীর খারাপ, আসতে পারবেন না।
দুপুর পর্যন্ত কাজে ব্যস্ত রইলো রবিন। বিকেলটাও তাকে থেকে যেতে বললেন লাইব্রেরিয়ান। কি আর করা। থেকে গেল। সঙ্গে আনা স্যাণ্ডউইস দিয়ে খাওয়া সেরে রেফারেন্স বই খুলে বসলো।
প্রথমেই হারিকেনের ওপর লেখা অধ্যায়টা খুললো। রহস্যময় মেসেজে রয়েছে হারিকেনের উল্লেখ। পড়তে পড়তে একসময় উত্তেজিত হয়ে উঠলো সে, নোট লিখে রাখলো। তারপর বের করলো মধ্যযুগীয় ইংরেজ তীরন্দাজদের ওপর লেখা অধ্যায়। আবার উত্তেজিত হয়ে নোট লিখলো নোটবইয়ে। এরপর পড়লো সাগরের ওপর লেখা লেখাটা। কারণ মেসেজে ওশন শব্দটা রয়েছে। নোট করার মতো কিছু পেলো না এখানে। লাঞ্চের সময় শেষ। বই বন্ধ করে উঠে গেল কাজ করার জন্যে।
পাঁচটার আগে ছাড়া পেলো না রবিন। লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে সাইকেলে চেপে সোজা চললো স্যালভিজ ইয়ার্ডে। দুপুরে বিশেষ কথাগুলো জানার পর থেকে এতোক্ষণ উত্তেজনা চেপে রাখতে খুব কষ্ট হয়েছে তার। এখন আর তর সইছে না। ইয়ার্ডে ঢুকে বুঝলো, সকালে না এসে ভালোই করেছে। সারাটা দিন মুসা আর কিশোরকে গাধার খাটুনি খাটতে হয়েছে। কয়েক ট্রাক মাল কিনে এনেছেন রাশেদ পাশা। সেগুলো গোছানো তখনও শেষ করতে পারেনি।
উফফ, মরে গেছি, রবিনকে দেখেই বলে উঠলো কিশোর। সকালে মুসা। এলো। সবে হেডকোয়ার্টারে ঢুকবো ঢুকবো করছি, এই সময় চাচা নিয়ে এলো মালগুলো। বোরিস আর রোভারেরও অবস্থা কাহিল আজ।
টিমের কোনো খবর আছে? জিজ্ঞেস করলো রবিন।
ফোন করেছিলো। কাল যাওয়ার পরই নাকি লারমার ধরে জিজ্ঞেস করেছে, এতোক্ষণ কোথায় কি করেছে টিম। ভয়ে বলে দিতে বাধ্য হয়েছে সে। এখানে যা যা শুনে গেছে সব। শুনে নাকি আরও রেগে গেছে লারমার।
রাগলো কেন?
জানে না।
মেসেজগুলো আমাদের হাতে পড়েছে জেনেই হয়তো রেগেছে। আমরা সাবধান করে ফেললে হয়তো তার কোনো অসুবিধে হবে। নোটবই বের করলো রবিন। কিশোর, কি জেনেছি জানো...

আরে, রবিন এসে গেছো? পেছন থেকে বলে উঠলেন মেরিচাচী, কখন। এসেছেন বুঝতেই পারেনি ওরা। ছিলে কোথায়? নিশ্চয় লাইব্রেরিতে। যাক, এসেছো ভালো হয়েছে। নাও, বলতে বলতে ইয়া বড় এক খাতা তার হাতে গুঁজে দিলেন তিনি। মালের লিস্টটা করে ফেলো তো। ভুলটুল কোরো না। আমি যাই, রাতের খাবার লাগবে এতোগুলো লোকের…

এক মুহূর্ত আর দাঁড়ালেন না তিনি। ছেলেদেরকে কোনোরকম প্রতিবাদের। সুযোগ না দিয়ে তাড়াতাড়ি কেটে পড়লেন সেখান থেকে।

নাও, শুরু করো, দুহাত নাড়লো মুসা। আমরা তো মরেছি। তুমি আর বাদ থাকো কেন?

বলো, খাতাটা খুলে কলম নিয়ে তৈরি হলো রবিন।

একটা রকিং চেয়ার, মুসা বললো।

একটা রকিং—চেয়ার। তারপর?

এক সেট বাগান করার যন্ত্রপাতি। মরচে পড়া

এক সেট…বাগান…করার…যন্ত্রপাতি…

আরও এক ঘন্টা কাজ চললো। ক্লান্ত হয়ে ওখানে ঘাসের ওপর বসে পড়লো কিশোর। মুসা শুয়েই পড়লো। রবিন বসলো ওদের পাশে। তার আবিষ্কারের কথা জানানোর জন্যে নোটবই বের করলো আবার। এই শোনো, মেসেজটার মানে বের করতে হবে না?

আমি আর আজ ওসবে নেই, জোরে হাত নাড়লো মুসা। তোমরা পারলে করোগে। আমার একটা আঙুল নড়ানোরও ক্ষমতা নেই।

আমিও ঠিকমতো ভাবতে পারবো না এখন, কিশোর বললো। যা করার কাল সকালে করবো।

কিন্তু কয়েকটা সূত্র পেয়েছি আমি, বললো রবিন। অন্তত দুটো লাইনের সমাধান তো হবেই। মিলে যায়…

সূত্র? বাতাসে খামচি মারলো মুসা। শব্দটাই শুনিনি কখনও।

আচ্ছা, এক কাজ করা যাক না, মুসাকে বললো কিশোর। ওর কথাগুলো তো শুনতে পারি আমরা। তাতে কোনো কষ্ট হবে না। রবিন, বলো, শুনি।

হারিকেনের ওপর একটা লেখা পড়লাম দুপুরে। লিখেছে, হারিকেনের সব চেয়ে নিরাপদ জায়গা হলো ওটার কেন্দ্র। একেবারে শান্ত। অথচ ওই জায়গাকে কেন্দ্র করেই চারপাশে ঘন্টায় একশো মাইল বেগে বইতে থাকে ঝড়।

থামলে কেন? বলে যাও।

হারিকেনের ওই কেন্দ্রকে বলা হয় আই, বাংলায় চোখ। কিছু বুঝলে? আই-এর উচ্চারণ আই, অর্থাৎ আমির মতো। এবং এই আই হলো মেসেজের পয়লা শব্দ।

আমি এখন পয়লা শব্দ যেটা শুনতে চাই, সেটা খাবার, বিষণ্ন ভঙ্গিতে পেটে হাত বোলালো মুসা।
রবিন, মুসার কথায় কান দিলো না কিশোর, সোজা হয়ে গেছে পিঠ। ঠিক বলেছো! আর কি জেনেছো?
বোম্যান। আগের দিনে ইংরেজ তীরন্দাজরা তীর বানাতে ইউ গাছ দিয়ে…
ইউ গাছ? ফোড়ন কাটলো মুসা। গ্রীক দেবতারা দিয়ে যেতো নাকি? নামও তো শুনিনি।
কটা গাছের নামই বা তুমি জানো? ইউ হলো একজাতের চিরশ্যামল গাছ। বানান, ওয়াই-ই-ডাবলিউ। উচ্চারণ ওয়াই-ও-ইউ দিয়ে তৈরি শব্দ ইউ-এর মতো।
ইউ, মানে তুমি, বিড়বিড় করলো কিশোর। হাতের তালুতে চাপড় মারলো। সে। রবিন, ঠিকই বলেছো। আরেকটা শব্দ পাওয়া গেল .চলো, হেডকোয়ার্টারে। খাবার রেডি হতে দেরি আছে। ততোক্ষণে মানেগুলো বের করে ফেলি।
কাল করলে হতো না? মিনমিন করে বললো মুসা। কিন্তু কিশোর আর রবিন রওনা হতেই সে-ও চললো পিছু পিছু।
পাঁচ মিনিট পর ডেস্ক ঘিরে বসলো তিন গোয়েন্দা।
হ্যাঁ, তাহলে কি পাওয়া গেল? শুরু করলো কিশোর। প্রথম লাইনঃ ইটস কোয়ায়েট দেয়ার ঈভন ইন আ হারিকেন। ধরলাম এই লাইন দিয়ে আই বোঝানো হয়েছে। শব্দটা লিখে নিলো একটা কাগজে। দ্বিতীয় লাইনঃ জাস্ট আ ওয়ার্ড অভ অ্যাডভাইস, পোলাইটলি গিভেন। পরামর্শ বলতে চেয়েছে। কাগজে লিখলো ইংরেজিতে, সাজেশন। এখন তৃতীয় লাইনের ওল্ড ইংলিশ বোম্যান লাভড ইট দিয়ে যদি হয় ইউ… প্রথম দুটো শব্দের পাশাপাশি লিখলো এই শব্দটাও। তাহলে হলোঃ আই সাজেশন ইউনাহ, হলো না। তার চেয়ে বলিঃ আই সাজেস্ট ইউ…।
আই সাজেস্ট ইউ, চেঁচিয়ে উঠলো মুসা। ক্লান্তি আর ক্ষুধার কথা ভুলে গেছে। বেমালুম, হচ্ছে, কিশোর, হচ্ছে! খাইছে, পরের শব্দটা কি? ক
বিগার দ্যান আ রেইনড্রপ; স্মলার দ্যান অ্যান ওশন। জলরাশি বোঝাতে চেয়েছে মনে হয়। জলরাশি তো কত রকমই আছে, নদী-নালা খাল-বিল, পুকুর, হ্রদ, সাগর…
দাঁড়াও, দাঁড়াও, হাত তুললো রবিন। বলেছে, বৃষ্টির ফোঁটার চেয়ে বড়, মহাসাগরের চেয়ে ছোট, সাগরই ধরে নিলাম। কি দাঁড়ালো? সাগর। সী। এস-ই এ, কিন্তু উচ্চারণ এস-ডাবল-ই, সী-এর মতো…
সী, মানে দেখা, বলতে বলতে শব্দটা লিখে নিলো কিশোর।
এখন পাঁচ নম্বর, রবিন বললো। আয়্যাম ফোর। হাউ ওল্ড আর ইউ? হ্যাঁ, এটা বেশ কঠিন। কি বোঝাতে চেয়েছে?

আমার বয়েস চার। তোমার কতো?
এটা তো বাংলা মানে হলো। কিন্তু ইংরেজি শব্দটা কি?
ওই আগের লাইনগুলোর মতোই ঘুরিয়ে বলেছে। বর্ণমালার চার নম্বর। অক্ষরটার কথা বলেনি তো?
চার নম্বরটা কি? উত্তেজিত কণ্ঠে বললো মুসা। বেশ মজা পাচ্ছে এখন। ডি। তাতে কি?
তাতে? অনেকে ডি-এর উচ্চারণ দি-এর মতো করে। যদি ধরি টি-এইচ-ই, দি, বা দা, বা দ্য, লিখে ফেললো শব্দটা, তাহলে মেলে। আর মাত্র একটা শব্দ বের করতে পারলেই ইট সিটস অন আ শেলফ লাইক আ ওয়েল-ফেড-এলফ। কি বোঝা যায়? দুই সহকারীর দিকে তাকালো গোয়েন্দাপ্রধান।
ই-এল-এফ, এল মানে তো হলো একজাতের ভূত, রবিন বললো।
শেলফে ভূতের মতো কি বসে থাকে? মুসার প্রশ্ন। ছারপোকা? তেলাপোকা? টিকটিকি…
এলফ শব্দটাও ব্যবহার করেছে দ্বিধায় ফেলার জন্যে, বললো কিশোর। রবিন, লাইব্রেরিতে শেলফের দিকে তাকালেই কি চোখে পড়ে? এফের মতো বেঁটে মোটা মোটা ভূত…
মোটা মোটা বই! উত্তেজনায় লাফ দিয়ে টুল থেকে উঠে পড়লো রবিন।
হ্যাঁ, বই।
আর ওয়েল-ফেড, মানে পেট-পুরে-খাওয়া বলে বোঝাতে চেয়েছে অক্ষরে বোঝাই..ঠিক, বই-ই। আর কোনো সন্দেহ নেই।
শব্দটা লিখে নিয়ে বললো কিশোর, তাহলে, ছয়টা শব্দ দিয়ে একটা পুরো লাইন হলো। আই সাজেস্ট ইউ সী দা বুক।
বাহ্, চমৎকার, চুটকি বাজালো মুসা। খুব সহজ এর মানে। বইতে কিছু দেখার পরামর্শ দিচ্ছে। কিন্তু কি দেখবো? কোন বইতে দেখবো? আর দেখার পর ওটা দিয়ে কি করবো?
জানা যাবে। আরও দুটো মেসেজ আছে। ওগুলোর মানে বের করতে পারলেই…
কিশোওর! মুসাআ! বাইরে থেকে ডাক শোনা গেল মেরিচাচীর। এইমাত্র দেখলাম এখানে…কোথায় গিয়ে ঢুকলি?।
দূর, এতো তাড়াতাড়ি সেরে ফেললো? বিরক্ত কণ্ঠে বললো কিশোর। অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠে দাঁড়ালো। আজ আর হচ্ছে না। কাল সকালে চেষ্টা করবো। চলো।

.

খেতে খেতে আলোচনা চললো।
বইটা কি বই? একই প্রশ্ন আবার করলো মুসা। বাইবেল?

মনে হয় না, মাথা নাড়লো কিশোর। বড় একটা মাংসের বড়া নিজের প্লেটে তুলে নিয়ে ছুরি দিয়ে কাটতে কাটতে বললো, আন্দাজে কিছু বলে লাভ নেই। কাল অন্য মেসেজগুলোর মানে বের করতে পারলেই…

কী বলছিস তোরা? মুখ তুললেন রাশেদ পাশা। নতুন কোনো কেস পেয়েছিস নাকি?

কতগুলো অদ্ভুত মেসেজ পেয়েছি, চাচা। তোমার আনা ওই চেঁচানো ঘড়িটা দিয়েই শুরু। একটা মেসেজের মানে অবশ্য বের করে ফেলেছি…

এই বকবক না করে চুপচাপ খা তো! ধমক লাগালেন মেরিচাচী। এই বেশি ভেবে ভেবেই অকালে পাগল হবি। কতোবার বলেছি, এতো ভাববি না। সারা দিন গতর খাটাবি, পেট ভরে খাবি, রাতে নাক ডেকে ঘুমাবি। শরীর-মন দুটোই ভালো থাকবে, বাচবিও বেশি দিন। বড় করে এক টুকরো কেক কেটে মুসার পাতে দিতে দিতে বললেন, এই ছেলেটাই ভালো। খেতে পারে, খাটতেও পারে, কথা বলে। কম…

হেসে ফেললো কিশোর। তা ঠিক। বেশি খেলে ঘুম তো আসবেই। এই এখন আমার যেমন আসছে। আজ মেরে ফেলেছো, চাচী। সারা শরীর ব্যথা হয়ে। গেছে।

আরে না, কি যে বলো? মেরিচাচীর পক্ষ নিলো মুসা। বেশি খেলে ঘুম আসবে কেন? বলতে না বলতেই মস্ত এক হাই তুললো সে।

রবিন আর রাশেদ পাশাও হাসতে শুরু করলেন। চেষ্টা করেও গম্ভীর হয়ে থাকতে পারলেন না মেরিচাচী।

খাওয়ার পর বারান্দায় বেরোলো তিন গোয়েন্দা।

আবার যাবে নাকি হেডকোয়ার্টারে? রবিন জিজ্ঞেস করলো।

না, আজ আর না, বললো কিশোর। কাল সকালে।

বিদায় নিয়ে সাইকেলে চাপলো মুসা আর রবিন। রওনা হলো যার যার বাড়ি। দুটো ব্লক একসাথে এসে আলাদা হয়ে দুজনে চললো দুদিকে খেয়াল করলো, ইয়ার্ডের গেট থেকেই ওদের পিছু নিয়েছিলো একটা ছোট ডেলিভারি ভ্যান। এখন অনুসরণ করছে রবিনকে।

দুই বন্ধুকে বিদায় দিয়ে কিশোর ঢুকেছে রান্নাঘরে। টেবিল সাফ করে বাসন পেয়ালা ধুতে সাহায্য করেছে চাচীকে। একের পর এক হাই তুলছে।

দেখে মেরিচাচী বললেন, যা, তুই ঘুমোতে যা। আমি একাই পারবো।

সোজা নিজের ঘরে এসে কাপড় ছেড়ে শুয়ে পড়লো কিশোর। ভেবেছিলো, শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়বে। এতো ক্লান্তিতেও ঘুম এলো না। মনে এসে ভিড় জমালো হাজারো ভাবনা। কি আছে মেসেজগুলোতে?

আই সাজেস্ট ইউ সী দা বুক। কি বই? দ্বিতীয় মেসেজে কি আছে জবাবটা? : ভাবনা যতো বাড়ছে, দূর হয়ে যাচ্ছে ঘুম। না, হবে না। দ্বিতীয় মেসেজটার সমাধান না করে ঘুমোতে পারবে না। উঠে বসলো সে।
আবার কাপড় পরে নেমে এলো নিচতলায়। চাচা-চাচী টেলিভিশন দেখছিলেন, অবাক হয়ে তাকালেন।
কি-রে, কিশোর, মেরিচাচী জিজ্ঞেস করলেন। ঘুমোসনি?
ঘুম আসছে না। কতগুলো বাজে ভাবনা ঢুকেছে মাথায়। জঞ্জালের মধ্যে ফেলে দিয়ে আসি ওগুলো। নইলে ঘুমোতে পারবো না।
তোর মাথা সত্যি খারাপ হয়ে গেছে...।
মেরিচাচীর কথা শেষ হওয়ার আগেই বেরিয়ে এলো কিশোর। বারান্দা থেকে নেমে রওনা হলো ওয়ার্কশপের দিকে। মেইন গেট বন্ধ। চলে এলো বেড়ার কাছে। একটা বিশেষ জায়গায় আঙুলের চাপ দিতেই নিঃশব্দে উঠে গেল দুটো সবুজ বোর্ড। হেডকোয়ার্টারে ঢোকার অনেকগুলো গোপন পথের এটা আরেকটা, সবুজ ফটক এক। বেরিয়ে পড়েছে সরু প্রবেশ পথ? ওখান দিয়ে ঢুকলো ওয়ার্কশপে। তারপর দুই সুড়ঙ্গের মুখের ঢাকনা সরিয়ে পাইপের ভেতর দিয়ে চলে এলো মোবাইল হোমে। অফিসে ঢুকলো।
মাথার ওপরের আলোটা জ্বেলে দিয়ে ডেস্কের ড্রয়ার থেকে বের করলো মেসেজগুলো। সে আর মুসা গিয়ে মিস্টার হিরাম বারকেনের কাছ থেকে যেটা এনেছে, সেটা নিয়ে বসলো।
বার বার পড়লো লেখাগুলো। সেই সাথে চলেছে গভীর ভাবনা। ধীরে ধীরে আসতে আরম্ভ করেছে ধারণাগুলো। প্রথম মেসেজটা সমাধান করতে পারায়, দ্বিতীয়টা সহজ হয়ে গেল। সঠিক পথ দেখালো ওকে প্রথমটা-ই।
প্রথম লাইনের শুরুতে একটা ফুল নেয়ার জন্যে বলা হচ্ছে। কাগজে লিখলো। সেঃ টেইকওয়ান লিলি। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো লেখাটার দিকে। এলিকে মেরে ফেলতে বলা হয়েছে। কিভাবে? হঠাৎ বুঝে ফেললো। ওয়ান লিলি-র ওয়ান এর প্রথম দুটো অক্ষর আর লিলি-র শেষ দুটো অক্ষর বাদ দিলেই হয়ে যায় ই-এল আই, এলি। এলিকে মারতে বলা হয়েছে। দুটো শব্দের মাঝের তিনটে, অক্ষর কেটে দিলো সে। বাকি চারটে অক্ষর একসাথে করতেই হয়ে গেল ওনলি।
ওনলি! একা একাই চেঁচিয়ে উঠলো কিশোর। পেয়েছি! এবার দ্বিতীয় লাইন। বলছেঃ পজিটিভলি নাম্বার ওয়ান।
প্রথম মেসেজটায় আয়্যাম ফোর বলে ডি বুঝিয়েছে। এটাতেও হয়তো ওয়ান বলে আ বোঝাতে চেয়েছে। ওনলির পাশে লিখলো আ। তার মনে হলো, তৃতীয় লাইনে ব্রম শব্দটার ওপর জোর দেয়া হয়েছে। কারণ, ঝাড়ু নিয়ে মৌমাছি তাড়াতে বলা

হয়েছে। তারমানে ঝাড়ুটাই এখানে প্রধান। বী মানে মৌমাছি, ইংরেজি দ্বিতীয় অক্ষরের উচ্চারণও বী বী-টাকেই তাড়াতে বলা হয়েছে। ব্রম থেকে বী বাদ দিলে হলো রুম।

ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে কিশোর। অনর্গল কথা বলছে নিজের সঙ্গে। জোরে জোরে। একা গভীর মনোযোগের কাজ করার সময় এরকম করে মাঝে মাঝে।

এরপর আসছে, বললো সে। হোয়াট ইউ ডু উইদ ক্লথস, অলমোস্ট। কাপড় দিয়ে কি করি আমরা? পরি। পরা ইংরেজি, ওয়্যার। বানান, ডাবুলিউ-ই-এ আর। ওনলি আ রুম-এর সঙ্গে ওয়্যার মেলে না। তাহলে কি মেলে? আরেকটা ওয়্যার, কিংবা হোয়্যার। উচ্চারণ প্রায় একই, কিন্তু বানান আর মানে আলাদা। লিখে ফেললো প্রথম তিনটে শব্দের পাশেঃ ডাবলিউ-এইচ-ই-আর-ঈ। বললো, তাহলে দাঁড়ালো, ওনলি আ রুম হোয়্যার: হ্যাঁ, পরিষ্কার হচ্ছে আস্তে আস্তে।

পাঁচ নম্বর লাইনের মানে বের করা এতো সহজ হলো না। লাইনটার মানে, মা-ও নয়, বোন-ও নয়, ভাই-ও নয়, বাবা হতে পারে। ফাদার বসালে কিছু হয় না। ড্যাড, পপ বসিয়েও হলো না। পরিবারের প্রধান যদি ধরা হয় ফাদারকে? হেড অভ দা ফ্যামিলি? নাহ, হচ্ছে না।

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে শুরু করলো সে। কি বলতে চাইছে? ফাদার ক্রিসমাস? না। ফাদার টাইম? আঁ, ফাদার টাইম! ঘড়ি নিয়ে কারবার যখন... ঠিক, ফাদার টাইম!

দ্রুত লিখে ফেললো ওনলি আ রুম হোয়্যার-এর পাশে ফাদার টাইম। বাকি। রইলো মাত্র একটা লাইন। ফাদার টাইম, অর্থাৎ বাবা ঘড়ি কি করে? সময় দেয়। আর কি করে। শব্দ করে। কিভাবে? মেকানিক্যাল হলে টিকটিক, ইলেকট্রিকে চললে গুঞ্জন না, ঠিক গুঞ্জনও বলা যায় না। আসলে শব্দটা সঠিক ভাবে বোঝানোর কোনো উপায় নেই। সেকথা বলাও হয়েছে, অলমোস্ট, নট কোয়াইট। তাহলে, গুঞ্জন ইংরেজি হলো হামস। লিখে ফেললো শব্দটা, হামস।

পুরো লাইনটা হলোঃ ওনলি আ রুম হোয়্যার ফাদার টাইমস হামস।

হ্যাঁ, ঠিক আছে, আপনমনে মাথা দোলালো কিশোর। শুধু একটা ঘর, যেখানে বাবা ঘড়ি গুঞ্জন করে। কথা হলো, কোথায় গুঞ্জন করে? ওই মুহূর্তে একটা ঘরের কথাই মনে হলো তার। মিস্টার ক্লকের সেই সাউণ্ডপ্রুফ ঘরটা, যেখানে অসংখ্য ঘড়ি রয়েছে। তবে মেসেজ থেকে বোঝা গেল না, কোন বইয়ের ঘড়ির গোলমাল কথা বলা হয়েছে। যাবে, পাওয়া যাবে, নিজেকে আশ্বস্ত করলো সে। ছেঁড়া মেসেজটা বের করলো। নম্বরগুলোর দিকে তাকিয়ে ভাবলো কিছুক্ষণ। প্রথম লাইনে রয়েছেঃ ৩-২৭৪-৩৬৫-১৯৪৮-১২৭-১১১৫-৯

কি বোঝাতে চায়? বইটার ব্যাপারে কিছু? কোনো বিশেষ বইয়ের সাহায্যে কোড মেসেজ তৈরি করা যুদ্ধের সময় বেশ জনপ্রিয় ছিলো, এখনও গুপ্তচর মহলে এর ব্যবহার আছে। বইয়ের পাতা থেকে শব্দ বাছাই করে লাইন তৈরি করে। প্রেরক। কোন পাতার কোন লাইনের কোন শব্দটি নিয়েছে, গুনে নম্বর লিখে দেয়। প্রাপক সেটা খুঁজে বের করে বুঝে নেয় মেসেজের মানে। সহজ কোড, কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নিরাপদ। কারণ, অন্য কারও হাতে পড়লেও তার বোঝার উপায় নেই, কোন বই থেকে নেয়া হয়েছে। সেটা জানে শুধু প্রেরক আর প্রাপক।
সুতরাং কিশোরের জন্যেও বইয়ের নাম জানাটা খুব জরুরী। কিভাবে জানা যাবে? আর বইটা পেলেও কি আধখানা মেসেজ থেকে পুরো লাইনটা বোঝা সম্ভব?
বড় করে হাই তুললো সে। ঘুম পেয়েছে। থাক, আজ রাতের জন্যে যথেষ্ট। হয়েছে। কাল সকালে উঠে আবার চেষ্টা করা যাবে, ভেবে, মেসেজগুলো আবার। ড্রয়ারে ঢুকিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ালো কিশোর। ট্র্যাপডোরের দিকে এগোতে যাবে, এই সময় বাজলো টেলিফোন।
এতো রাতে কে! অবাক হলো সে। তুলে নিলো রিসিভার। তিন গোয়েন্দা। কিশোর পাশা বলছি।
অন্য পাশের কণ্ঠটা শুনে স্থির হয়ে গেল সে। জমে গেছে যেন বরফের মতো।

.

এগিয়ে চলেছে রবিন। পেছনে এঞ্জিনের শব্দ শুনছে, কিন্তু ফিরে তাকানোর কথা ভাবলো না একবারও। রাস্তায় গাড়ি থাকতেই পারে।
এক জায়গায় রাস্তার ধারে কোনো বাড়ি-ঘর নেই, খালি জায়গা। ঠিক ওখানটায় এসে পেছন থেকে শা করে সামনে চলে এলো ভ্যানটা, রবিনের পথরোধ করে ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষলো।
লাফিয়ে বেরোলো এক কিশোর। রবিন!
অবাক হয়ে ব্রেক চাপলো রবিন। টিম! উত্তেজিত। সাইকেল থেকে নেমে ঠেলে নিয়ে তার দিকে এগোলো রবিন। কি ব্যাপার, টিম? কিছু হয়েছে?
পেছনের দরজা খুলে লাফ দিয়ে নামলো ছোটখাটো একজন মানুষ। হয়নি, তবে আমাদের কথা না শুনলে অনেক কিছুই হবে, কড়া গলায় বললো সে। খবরদার, পালানোর চেষ্টা কোরো না।
সরি, রবিন, অস্বস্তিতে গলা কাঁপছে টিমের। তোমার কাছে নিয়ে আসতে বললো ওরা। মাকে ঘরে তালা আটকে রেখে এসেছে।
হয়েছে হয়েছে, অতো ব্যাখ্যা করতে হবে না, ধমক দিলো লোকটা। এই, তোমার সাইকেল ছাড়ো। ওঠো গাড়িতে।

চট করে চারপাশে চোখ বোলালো একবার রবিন। নির্জন পথ। সাহায্যের জন্যে যে ডাকবে, সে উপায় নেই। দৌড় দিয়েও সুবিধে করতে পারবে না। সহজেই ধরে ফেলবে তাকে।
হ্যান্ডেল ধরে সাইকেলটা কেড়ে নেয়া হলো তার কাছ থেকে। পিঠে জোরে এক ধাক্কা দিয়ে লোকটা বললো, দাঁড়িয়ে আছো কেন? জলদি ওঠো। টিম, তুমিও।
গাড়িতে আলো নেই। অন্ধকারে উঠে বসলো রবিন। তার পাশে টিম। সাইকেলটা ভ্যানে তুলে দরজা বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দিলো লোকটা। বন্দি হলো দুই কিশোর।
আমাদের ক্ষতি করবে না বলেছে, নিচু কণ্ঠে বললো টিম। ওরা শুধু তথ্য চায়। ঘড়ি আর মেসেজগুলো সম্পর্কে। আমি তেমন কিছু বলতে পারিনি, তাই তোমাদের কাছে নিয়ে আসতে বাধ্য করলো। বললো, তোমাদের যে-কোনো একজনকে হলেই চলবে। ইয়ার্ডের ওপর অনেকক্ষণ থেকেই চোখ রাখছিলো। তুমি আর মুসা বেরোতেই পিছু নিলো।
মৃদু ঝাঁকুনি খেতে খেতে ছুটছে ভ্যান। গন্তব্য দুজনের কাছেই অজানা।
কারা ওরা? জিজ্ঞেস করলো রবিন।
একজন, লারমার। আরও দুজন আছে। বেঁটে লোকটার নাম ডিংগো। আর লম্বা আরেকজন আছে, নাম মারকো।
ডিংগো আর মারকো! ওরা দুজনই কাল কিশোরদেরকে ধরেছিলো। একটা মেসেজের অর্ধেকটা ছিঁড়ে রেখে দিয়েছে।
হ্যাঁ, ওরাই। কটা মেসেজ, মানে কী, জানতে চায়। মূল্যবান কোনো জিনিসের ইঙ্গিত রয়েছে মেসেজে। ওদের ধারণা, জিনিসটা কি, কোথায় লুকানো আছে জানি আমরা।
কে বললো আমরা জানি? কিশোরের অনুমান, দামী জিনিস আছে, ব্যস।
আজ বিকেলে ডিংগো আর মারকো এসেছে লারমারের সঙ্গে দেখা করতে। অনেকক্ষণ কথা বলেছে। তারপর এসে ধরলো আমাকে, যা যা জানি বলার জন্যে। বলতে বাধ্য করলো। সরি, রবিন, না বলে উপায় ছিলো না। খুব শয়তান লোক। আমাকে মেরে ফেললেও বলতাম না, কিন্তু মার ওপর অত্যাচার করার ভয়। দেখালো…
আরে না না, তোমার দুঃখিত হওয়ার কিছু নেই। আমি হলেও তা-ই করতাম। তোমার মাকে তালা দিয়ে রেখেছে বললে না?
হ্যাঁ, আমরা যে বাড়িতে থাকি, মানে মিস্টার ক্লকের বাড়িতে। এরাও ক্লক ক্লকই করছিলো। আড়ি পেতে শুনেছি ওদের কথা। লারমার বললো, সে এই বাড়িতে উঠেছে গোপন জায়গা খুঁজতে। এমন একটা জায়গা, যেখানে দামী জিনিস

লুকানো থাকতে পারে। রবিন, প্লীজ, তুমি যা জানো বলে দিও। নইলে আমার মাকে ছাড়বে না। বলবে তো?
মুশকিল কি জানো, আমি নিজেই কিছু জানি না, সত্যি কথাই বললো রবিন। একটা মেসেজের সমাধান করেছি। তাতে বলা হয়েছে বইটা দেখতে। কোন বই, জানি না। তাই তিনি কোন
বলতে না পারলে খুব রেগে যাবে ওরা, শঙ্কিত হয়ে উঠলো টিম। ওরা ধরেই নিয়েছে, তোমরা মেসেজের সমাধান করে ফেলেছো। তোমাদের সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়েছে। জেনেছে, আগেও অনেক জটিল রহস্যের সমাধান তোমরা করেছে।
সমাধান আসলে কিশোর করেছে, ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেললো রবিন। ওদেরকে বিশ্বাস করাতে হবে, সত্যিই আমি কিছু জানি না। তাহলেই হয়তো ছেড়ে দেবে। আটকে রেখে তো লাভ নেই, অযথা ঝামেলা বাড়াতে চাইবে না। ওরা।
ওই আশা মনে নিয়েই নীরব হলো দুজনে। ভ্যান চলেছে। মোড় নিচ্ছে মাঝে মাঝে। বুঝতে পারলো না ওরা যাচ্ছে কোনদিকে। দীর্ঘ কয়েক যুগ পরে যেন অরশেষে থামলো গাড়ি। বড় একটা দরজা খোলার শব্দ কানে এলো। ঝনঝন করে উঠে গেল স্পিঙ লাগানো দরজা, বোধহয় কোনো গ্যারেজের। আবার চললো ভ্যান, কয়েক ফুট এগিয়ে থামলো। পেছনে দরজা নামিয়ে দেয়ার শব্দ। ভ্যানের দরজার তালা খুললো খাটো লোকটা, ডিংগো।
নামো, দুজনেই, আদেশ দিলো সে। ভালো চাইলে চুপচাপ থাকবে। নইলে কপালে দুঃখ আছে।
রবিন আগে নামলো, পেছনে টিম। কংক্রীটের মেঝে। চারপাশে চোখ বোলালো রবিন। গ্যারেজই, বড় একটা ডাবল-গ্যারেজ। দরজা নামানো। দুপাশে দুটো জানালা, পর্দা টানা, পাল্লা বন্ধ কিনা বোঝা গেল না। মাথার ওপরে একটা বাল্ব জ্বলছে। আর কোনো গাড়ি নেই। একটা গাড়িই বোধহয় রাখা হয়, কারণ আরেকটা গাড়ির জায়গাকে ওয়ার্কশপ হিসেবে ব্যবহার করে–জিনিসপত্র দেখেই বোঝা যাচ্ছে। একটা ওয়ার্কবেঞ্চ, একটা ব্রোল্যাম্প আর কিছু যন্ত্রপাতি আছে।
বেঞ্চের পাশে কয়েকটা চেয়ার। সেগুলো দেখিয়ে ডিংগো বললো, যাও, বসো। মুখে কুৎসিত হাসি। আরামেই বসো, কষ্ট করার দরকার নেই।
রবিন আর টিম বসলো।
নগ্ন আলোয় ফ্যাকাসে লাগছে লারমারের লম্বা মুখটা, চোখ আর নাকের নিচে অদ্ভুত ছায়া কেমন যেন কিম্ভুত করে তুলেছে চেহারাটাকে। এগিয়ে এলো দুই, কদম। তার পেছনে ভ্যান থেকে নেমে হাসিমুখে এগোলো লম্বা লোকটা, মারকো।
দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধো, ডিংগোকে আদেশ দিলো লারমার। তারপর কথা।

বেঞ্চের ওপর থেকে দড়ি এনে রবিন আর টিমকে চেয়ারের সঙ্গে পেঁচিয়ে বাঁধলো ডিংগো।
একটা চেয়ার টেনে ওদের মুখোমুখি বসলো লারমার। সাগর কলার মতো মোটা এক সিগার ধরিয়ে আরাম করে টান দিলো কয়েকটা। মুখ-ভর্তি ধোয়া নিয়ে। ফুঁ দিয়ে ছাড়লো দুই বন্দির মুখে। ফিকফিফ করে হাসলো শয়তানী হাসি। তামাক পছন্দ না, না? তোমার বয়েসে আমি অবশ্য খুবই পছন্দ করতাম। কি স্বাদ যে মিস করছো, বুঝতে পারছে না।
স্বাদের দরকার নেই আমার, গম্ভীর হয়ে বললো রবিন। ফুসফুস কালি করার। কোনো ইচ্ছে নেই।
ভালো কথা। বোঝা গেল, নিজের জন্যে মায়াদর আছে। প্রশ্নের জবাব তাহলে সরাসরিই দেবে আশা করি। সিগারে আরেকটা লম্বা টান দিলো সে। হ্যাঁ, টিম নিশ্চয় সব জানিয়েছে?
বলেছে, মেসেজের মানে আপনারা জানতে চান, গলা কাঁপছে রবিনের।
হ্যাঁ, ঠিকই বলেছে। দামী কিছু জিনিস কোথাও লুকানো আছে। মেসেজে আছে ইঙ্গিত। জানতে চাই, সেটা কোথায়। ভুরু কুঁচকে বিকট করে তুললো চেহারাটা। বদলে গেল কণ্ঠস্বর, মেসেজগুলো কিভাবে পেয়েছো, জানি। চেঁচানো ঘড়িটা পেয়ে, হ্যারিসন ক্লকের কথা জেনে গেছো তোমরা। ঠিক গিয়ে খুঁজে বের করেছো হেনরি মিলারকে, তার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে এসেছে। আরও দুজনের কাছ থেকে দুটো মেসেজ এনেছো। রবিনের চোখে চোখে তাকালো। এখন বলে ফেলো, কি লেখা আছে ওগুলোতে।
আর হ্যাঁ, রবিন জবাব দেয়ার আগেই মারকো বললো, আমি জানতে চাই, হেনরি মিলারের কাছে ওই চেঁচানো ঘড়িটা পাঠানোরই বা কি অর্থ? ভিন্ন ভিন্ন লোকের কাছে কেন পাঠিয়েছে মেসেজগুলো? কি খেলায় মেতেছে হ্যারিসন ক্লক?
ক্লক কি খেলায় মেতেছে, সেটা ও জানবে কি করে? ডিংগো বললো। ক্লকের পেটে খালি শয়তানী বুদ্ধি, কথা পর্যন্ত সোজা করে বলে না। কেন করেছে এসব, একমাত্র ও-ই বলতে পারবে। আর যেহেতু ওকে পাওয়া যাচ্ছে না...
জানাও যাবে না, বাক্যটা শেষ করে দিলো লারমার। ওসব জানার দরকারও নেই আমাদের। মাল কোথায় লুকানো আছে, এটা জানলেই আমি খুশি। নাও খোকা, শুরু করো। মেসেজে কি বলেছে?
জোরে ঢোক গিললো রবিন। ইয়ে, একটা মেসেজের মানে বের করেছি আমরা। লিখেছেঃ আই সাজেস্ট ইউ সী দা বুক। ব্যস। এই একটা লাইনই।
আই সাজেস্ট ইউ সী দা বুক! ঠোঁট কামড়ালো লারমার। কি বই?
জানি না, বলেনি।

দ্বিতীয়টায় নিশ্চয় বলেছে, অধৈর্য হয়ে উঠছে লারমার। কি লিখেছে?
জানি না, আবার ঢোক গিললো রবিন। মানে করার সময়ই পাইনি। ক্লান্ত ছিলাম। আগামী কাল করবো ভেবেছি।
দেখো, ছেলে! কঠোর কণ্ঠে বললো লারমার, মিথ্যে বলো না! দ্বিতীয় মেসেজে কি লিখেছে জলদি বলো!
সত্যি বলছি আমি জানি না। ওটা নিয়ে ভাবিইনি। কাল সকালের জন্যে রেখে দিয়েছি।
সত্যি কথাই বলছে মনে হয়, মারকো বললো।
হয়তো, নিশ্চিত হতে পারছে না লারমার। বেশ, ধরে নিলাম, দ্বিতীয়টার মানে জানো না। তৃতীয়টার? ওটা তো জানো? ওই যে, শুধু নম্বর লেখা আছে যেটায়।
অর্ধেকটা আমার কাছে, মারকো ছিঁড়ে রেখে দিয়েছিলো। পকেট থেকে ছেঁড়া কাগজটা বের করে রবিনের নাকের কাছে নাড়লো। কি মানে এসব নম্বরের?
আমি বলতে পারবো না, মাথা নাড়লো রবিন। কিশোর হয়তো পারবে।
ভীষণ হয়ে উঠলো লারমারের কুৎসিত চেহারা। তবে, নিশ্চিত হলো, রবিন। মিথ্যে বলছে না।
তার মানে আরও অপেক্ষা করতে হবে আমাদের, মারকো বললো। সেটা করতে তো আপত্তি ছিলো না, কিন্তু অসুবিধে আছে। ছেলেগুলো বুঝে ফেললেই পুলিশের কাছে যাবে, তাদের নিয়ে যাবে লুকানোর জায়গাটায়। আমাদের আর কিছুই করার থাকবে না তখন। কাজেই দেরি করা যাচ্ছে না। তো, কী করা?
কি আর? খেপা কুকুরের মতো ঘড়ঘড় করে উঠলো লারমার। এখুনি অন্য মেসেজগুলো নিয়ে নিতে হবে। কয়েকটা বাচ্চা ছেলে মানে বের করতে পারলে আমরা কেন পারবো না? ওগুলো লাগবে। এই ছেলে, কার কাছে মেসেজগুলো?
কিশোরের কাছে, জবাব দিলো রবিন। ও এখন ঘুমোচ্ছে।
ঘুমোলে চলবে না, জাগতে হবে। ওকে ফোন করে বলো, মেসেজগুলো নিয়ে। যেন এখানে চলে আসে। আমরা সবাই মিলে সমাধান করবো।
বললেই কি আসবে? প্রশ্ন তুললো মারকো।
বন্ধুকে ভালোবাসে ও, তাই না? রবিনের দিকে চেয়ে ভ্রূকুটি করলো লারমার। ওর কোনো ক্ষতি নিশ্চয় চায় না। আমরা বললে খুশি হয়েই মেসেজগুলো নিয়ে হাজির হবে। তুমি কি বলো, ছেলে?
আমি কি করে জানবো? হতাশ হয়েছে রবিন। সে ভেবেছিলো, মেসেজের মানে জেনে না বললে তাদেরকে ছেড়ে দেবে লারমার। ছাড়লো তো না-ই, বরং কিশোরকে আনানোরও মতলব করেছে ব্যাটারা।

আমি জানি, লারমার বললো। সে আসবে। এক কাজ করো, প্রথমে তোমার বাড়িতে ফোন করো। বাবা-মাকে জানিয়ে দাও, জরুরী কাজে আটকা পড়েছে, রাতে বাড়ি ফিরবে না। কিশোরের ওখানে থাকবে। চিন্তা যাতে না করে। তারপর ফোন করো তোমার কোকড়াচুলো বন্ধুকে। আমাদের নির্দেশ জানিয়ে দাও।
ডিংগো, ফোনটা দাও ওকে, মারকো বললো। হাত খুলে দাও।
ওয়ার্কবেঞ্চের ওপর রাখা যন্ত্রটা তুলে এনে রবিনের কোলে রাখলো ডিংগো। নাও, ধরো।
আমি পারবো না, মরিয়া হয়ে বললো রবিন। কাউকে ফোন করবো না। আমি। যা যা জানি সব বলেছি...এখন...এখন... শুকনো ঠোঁট চাটলো সে। আবার এসব করতে বলছেন!
ডিংগো, ইঙ্গিতে ওয়ার্কবেঞ্চটা দেখালো লারমার। ব্রোল্যাম্পটা জ্বেলে আমার হাতে দাও তো।
কথামতো কাজ করলো ডিংগো।
ব্লোল্যাম্পটা শক্ত করে ধরলো লারমার। হিসহিস শব্দে জ্বলছে উজ্জ্বল হলুদ আগুনের শিখা। ধীরে ধীরে সামনে বাড়ালো ওটা সে। মুখে তাপ লাগছে রবিনের। চোখ বন্ধ করে ফেললো।
কি হলো? রিসিভার তোলো, বললো লারমার।
বাড়িতে নাহয় বললাম, মিনমিন করে বললো রবিন। কিন্তু কিশোরকে ওকে কোথায় পাবো?
হেডকোয়ার্টারে।
বললাম না, ও এখন ঘরে ঘুমোচ্ছ।
তাহলে ঘরেও করবে। আর একটি কথাও নয়। তোলো, রিসিভার ভোলো পাঁচ সেকেণ্ড সময় দিচ্ছি। তারপর প্রথমে চুলে লাগাবো আগুন।
কিশোর, মহাবিপদে পড়েছি! টেলিফোনে ভেসে এলো রবিনের কণ্ঠ। তোমার সাহায্য লাগবে!
হয়েছে কি? উদ্বিগ্ন হলো কিশোর।
মিস্টার লারমার, মারকো আর ডিংগো ধরে নিয়ে এসেছে আমাকে টিমকেও।
কিভাবে কি ঘটেছে, জানালো রবিন। শেষে বললো, মাকে বলে দিয়েছি আজ রাতে তোমার সঙ্গে থাকবো। মিস্টার লারমারের ইচ্ছে, তুমি মেরিচাচীকে বলে আসো, আমার সঙ্গে থাকবে। কেউ কিছু সন্দেহ যেন করতে না পারে। হুমকি দিচ্ছেন, কথামতো কাজ না করলে নাকি খুব খারাপ হবে আমাদের। থামলো এক মুহূর্ত। তবে, মেসেজগুলো যদি আনো, আর কাউকে কিছু না বললো, তাহলে

ছেড়ে দেবেন কথা দিয়েছেন। কিশোর, কি ভাবছো? কথা শুনবে? আমার পরামর্শ, শুনে না, পুলিশকে…
চটাস করে চড় পড়লো। আঁউ করে উঠলো রবিন। ভেসে এলো লারমারের কর্কশ কণ্ঠ, শোনো ছেলে, বন্ধুকে বাঁচাতে চাইলে, তার অঙ্গহানী করাতে না চাইলে, যা বলেছি করবে। মেসেজগুলো নিয়ে জাঙ্কইয়ার্ডের গেটে দাঁড়িয়ে থাকবে। ঠিক আধ ঘন্টা সময় পাবে। ইতিমধ্যে পৌঁছে যাবে আমার ভ্যান। তুলে আনবে তোমাকে। খবরদার, কাউকে কিছু বলতে পারবে না। বুঝেছো? কথা না শুনলে প্রথমে তোমার বন্ধুর দুটো কাটা আঙুল উপহার পাবে, তারপর একটা কান, তারপর…
ঠিক আছে, মিস্টার লারমার, বাধা দিয়ে বললো কিশোর। আমি আসছি। গেটে দাঁড়িয়ে থাকবো। গাড়ি পাঠান।
এই তো বুদ্ধিমান ছেলে। কিশোরের মনে হলো আনন্দে ঘোৎ ঘোঁৎ করলো একটা শুয়োর। লাইন কেটে দিয়ে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটলো একবার। মুসাকে ডাকবে? না; থাক। অযথা তাকে এসবে জড়িয়ে লাভ নেই। লারমারকে ঠিক বিশ্বাস করা যাচ্ছে না। কি করবে, বোঝার উপায় নেই। হয়তো মিথ্যে হুমকি দেয়নি। মেসেজগুলো চাইছে। দিয়ে দিলেই যদি ঝামেলা চুকে যায়, দেয়াই উচিত। মানে তো জানা-ই হয়ে গেছে দুটোর।
তিনটে মেসেজই-ছেঁড়াটা সহ-গুছিয়ে শার্টের পকেটে নিলো কিশোর। ট্র্যাপড়োরের দিকে এগোতে গিয়ে আবার থামলো। সাবধান হতে দোষ কি? ফিরে এসে একটা কাগজে নোট লিখলোঃ ঘড়ির ঘরে খোঁজ করো আমাদেরকে। তার স্থির বিশ্বাস, ওর ঘরেই রয়েছে সমস্ত রহস্যের চাবিকাঠি; কাগজটা পেপার ওয়েইট চাপা দিয়ে এসে নামলো দুই সুড়ঙ্গে।
হামাগুড়ি দিয়ে পাইপ বেয়ে চলে এলো মুখের কাছে। মুখ বের করে দেখলো আশপাশটা। কারও থাকার কথা নয় এখন এখানে, তবু দেখলো। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় হুঁশিয়ার করছে, তাকে। পাইপ থেকে বেরিয়ে হেঁটে গেল সবুজ ফটক এক-এর দিকে।
সবে পৌঁছেছে, খুলবে, এই সময় ছায়া থেকে বেরিয়ে এলো একটা ছায়ামূর্তি। জঞ্জালের সাথে মিশে ছিলো।
পাঁই করে ঘুরেই সুড়ঙ্গের দিকে দৌড় দিলো কিশোর। কিন্তু লোকটার সঙ্গে পারলো না। ছুটে এসে পেছন থেকে জাপটে ধরলো তাকে। মুখ চেপে ধরলো কঠিন থাবা, যেন লোহার সাঁড়াশি। কানের কাছে কথা বললো হাসি হাসি একটা কণ্ঠ, তারপর? আবার আমাদের দেখা হলো। এবং এইবার আমিই জিতবো।

কথায় ফরাসী টান। চিনতে পারলো কিশোর। শোঁপা! ইউরোপের কুখ্যাত ইন্টারন্যাশনাল আর্ট থিফ। আরেকবার ওর সঙ্গে প্রতিযোগিতা হয়েছিলো তিন গোয়েন্দার, ওকে ভুলবে না কিশোর। তাকে আর মুসাকে আটকে ছিলো ভয়াবহ গোরস্থানে, প্রচণ্ড কুয়াশার মধ্যে, মনে পড়তে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো।
তাহলে আবার বললো শোঁপা, চিনতে পেরেছে। সেবারেই বুঝেছো, বেশি। চালাকি পছন্দ করি না আমি। কিছুক্ষণের জন্যে ছাড়তে পারি এখন, কথা বলবো। চেঁচাতে পারবে না। চেঁচালে নিজেই ক্ষতি করবে। বিশ্বাস করো কথাটা।
বিশ্বাস করলো কিশোর। কোনোমতে মাথা ঝাঁকালো।
মুখ থেকে হাত সরালো শোঁপা। তারা, আর দূর থেকে আসা ইলেকট্রিক বাল্বের আবছা আলোয় লোকটার মুখের আদল দেখতে পেলো কিশোর। হাসিটাও চেনা পেল।
খুব অবাক হয়েছে না? শোঁপা বললো। কেন, একবারও মনে পড়েনি আমার কথা? এক মিলিয়ন ডলারের চোরাই ছবি, অথচ শোঁপা তার কাছে থাকবে না, এটা কোনো কথা হলো?
চোরাই ছবি? চমকে গেল কিশোর। সেটাই খুঁজছেন নাকি?
কেন, তুমি জানো না? কণ্ঠেই প্রকাশ পেয়ে গেল, বিস্মিত হয়েছে শোঁপা। পাঁচটা চমৎকার ছবি, দশ লাখ ডলার দাম, বছর দুই আগে চুরি গিয়ে এখনও নখোঁজ হয়ে আছে। সেগুলো খুঁজতেই এসেছি আমি। তুমি নিশ্চয় জানো, না। জানার ভান করছে। নইলে কিসের তদন্ত করছো কদিন ধরে?
মিথ্যে বলবো না, একটা চেঁচানো ঘড়ির রহস্য ভেদের চেষ্টা করছি। কিছু সূত্র হাতে এসেছে। বুঝতে পারছিলাম, মূল্যবান কোনো জিনিসের সাথে এর সম্পর্ক আছে। কি জিনিস, জানতাম না।
ঘড়ি? হ্যাঁ, জিনিসটা আমাকে অবাক করেছে। টুকরো টুকরো করে…
আপনি চুরি করেছেন? কাল আপনিই রবিন আর টিমকে তাড়া করেছিলেন?
আমিই করেছি। তোমাদের পেছনেও লোক লাগিয়েছিলাম, কিন্তু গাধাগুলো লেগে থাকতে পারলো না, হারিয়ে ফেললো। গাড়ি রেখে তোমার বন্ধুরা থানার ভেতরে ঢুকলো। এই সুযোগে নিয়ে গেছি ঘড়িটা। সমস্ত যন্ত্রপাতি খুলে ফেলেছি। কোনো সূত্র পেলাম না। আমি ভেবেছি, খোদাই করে কোথাও কিছু লেখা আছে। তুমি নিশ্চয় কিছু পেয়েছো। তোমার যা ব্রেন আর চোখ, নজর এড়াতেই পারে না। কি পেয়েছো?
আপনাকে কেন বলবো? জানেন, আমি চেঁচালে এখুনি ছুটে আসবে বোরিস আর রোভার। ওদের একজনের সঙ্গেই পারবেন না আপনি। ধরে থানায় নিয়ে যাওয়াটা কোনো ব্যাপারই না।

শব্দ করে হাসলো শোঁপা। ভালো, খুব ভালো। তোমার মতো সাহসী ছেলেদের পছন্দ করি আমি। কিন্তু তুমিই বা কি করে ভাবলে, আমি একা এসেছি? ইচ্ছে করলে আমিও তোমাকে…যাকগে, হুমকি দিয়ে লাভ নেই। আমি তোমাকে একটা অফার দিচ্ছি, বিনিময়ে কিছু চাইবো। আমি তোমাকে সাহায্য করবো, তুমিও আমাকে করবে।

আমাকে কি সাহায্য করবেন?

ক্লকের বাড়ির যে ছেলেটার সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব হয়েছে, টিমের কথা বলছি। ওর বাবা জেলে। তাকে নির্দোষ প্রমাণ করতে সাহায্য করবো তোমাকে। আমি ছবিগুলো নিয়ে যাবো, তুমি মানুষটাকে জেল থেকে বের করে আনবে। নাকি, রাজি নও??

দ্রুত ভাবছে কিশোর। মাথা আঁকালো। বেশ, করবো। যদি আপনি কথা রাখেন। আরও একটা কাজ করতে হবে আপনাকে।

কী?

সব কথা খুলে বললো কিশোর। রবিন আর টিম এখন কোথায় কি অবস্থায় আছে, আধ ঘন্টার মধ্যে ভ্যান আসবে ইয়ার্ডের গেটে তাকে তুলে নেয়ার জন্যে, নিয়ে যাবে লারমার, মারকো আর ডিংগো যেখানে দুই কিশোরকে আটকে রেখেছে, সেখানে।

ফরাসী ভাষায় কি যেন বললো- শোঁপা। ইংরেজিতে বললো, ওই গাধাগুলো! এতোখানি এগিয়ে যাবে, ভাবিনি। ভেবেছিলাম, ওরা কিছু বোঝার আগেই ছবিগুলো বের করে নিয়ে হাওয়া হয়ে যাবো।

ওদের কথাও জানেন আপনি? অবাক হয়ে বললো কিশোর।

জানি না মানে! শুনলে অবাক হবে, আরও অনেক কিছু জানি আমি। দুসপ্তা ধরে আছি এই শহরে, সূত্র খুঁজছি। তদন্তের নিজস্ব কায়দা আছে আমার। এখানকার অনেক চোর-ডাকাত আর অপরাধীর টেলিফোন লাইন টেপ করে রেখেছি আমি, ওদের গোপন আলোচনা শুনি। ঠিক আছে, তোমার বন্ধুদের মুক্তিরও ব্যবস্থা করবো। ছবিগুলো বের করে নিয়ে চলে যাবো আজ রাতেই। কাল এ-সময়ে থাকবো পাঁচ হাজার মাইল দূরে। হ্যাঁ, ওরা যেভাবে বলেছে, সেভাবেই কাজ করে যাও। গেটে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকো। গাড়ি এসে যেখানে নিয়ে যায়, যাও. লোকজন নিয়ে তোমাদের পেছনেই থাকবো আমি। কিচ্ছু ভেবো না, যা করার আমিই করবো!

কি করবেন?

সেটা তোমার জানার দরকার নেই।

শোঁপাকে বিশ্বাস করা ছাড়া উপায় নেই। সবুজ ফটক এক দিয়ে বেরিয়ে ঘরের দিকে চললো কিশোর। চেঁচানো ঘড়ির ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছে বলে নিজেকেই গাল দিচ্ছে এখন। রবিন আর টিমকে মুক্ত করতে পারবে তো ফরাসীটা? পারবে, আশা করলো সে।

বসার ঘরে ঢুকে দেখলো, চাচা-চাচী তখনও টেলিভিশন দেখছেন। বললো, রবিন ফোন করেছে। রাতটা ওদের বাড়িতেই কাটাবে। এরকম মাঝে মাঝেই গিয়ে থাকে কিশোর। অমত করলেন না রাশেদ পাশা। মেরিচাচীও কিছু বললেন না। অনুমতি নিয়ে নিজের ঘরে চলে এলো সে। গরম জ্যাকেট পড়লো।

আবার নিচতলায় নেমে, চাচা-চাচীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাইরে বেরোলো কিশোর। গেটের দিকে এগোলো।

ওখানে তার জন্যে অপেক্ষা করছে শোঁপা। এগিয়ে এসে কিশোরের কাঁধে হাত রেখে বললো, একটুও চিন্তা কোরো না। সব ঠিক হয়ে যাবে। গাড়ি এলে। সোজা উঠে পড়বে। ওদের যাতে কোনো সন্দেহ না হয়। বুঝেছো?

বলে আর দাঁড়ালো না শোঁপা। ঘুরে হাঁটতে শুরু করলো। মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

গাড়িটা কোথায়, দেখতে পেলো না কিশোর। ইয়ার্ডের আরেক পাশে হয়তো লুকিয়ে রাখা হয়েছে।

দাঁড়িয়ে আছে কিশোর। অন্ধকার খুব বেশি। আর নীরব। কেঁপে উঠলো একবার সে, ঠাণ্ডায় নয়।

হেডলাইট দেখা গেল। ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে একটা ছোট ভ্যান। কিশোরের পাশে এসে দাঁড়ালো। ঝটকা দিয়ে খুললো দরজা। মুখ বের করলো। ডিংগো।

আছো, খসখসে কণ্ঠস্বর। এসো, ওঠো।

.

হলিউডের দিকে চলেছে গাড়ি। চালাচ্ছে মারকো। ডিংগো আর মারকোর মাঝে গাদাগাদি করে বসেছে কিশোর।

মেসেজগুলো নিয়েছে তো? একসময় জিজ্ঞেস করলো মারকো।

নিয়েছি, শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলো কিশোর।

গুড, বললো ডিংগো। আরি, মারকো?

রীয়ার-ভিউ মিররের দিকে তাকিয়ে আছে মারকো। দেখেছ, মনে হয় ফলো কুরছে।

ফলো! চেঁচিয়ে উঠলো ডিংগো। খপ করে চেপে ধরলো কিশোরের হাত। এই ছেলে, পুলিশকে…

না, স্যার, তাড়াতাড়ি বললো কিশোর। আতঙ্কিত। সবটা অভিনয় নয়। শোঁপার গাড়িটা দেখে ফেলেছে ওরা। সত্যি সত্যি বিপদ হতে পারে এবার।

পুলিশ নয়? কঠিন কণ্ঠে বললো মারকো। তাহলে কে? কি হলো, কথা বলছো না কেন? কে?
আমি কি করে জানবো? পুলিশকে বলিনি। কাউকেই জানাইনি আমি।
কে তাহলে?
মেসেজের কথা জানে এমন কেউ হতে পারে। কাল ঘড়িটা চুরি হয়ে গেছে, টিমের গাড়ি থেকে। আমরা তো ভেবেছি আপনারা নিয়েছেন।
আমরা নিইনি।
তাহলে ওই লোকটাই নিয়েছে, বুড়ো আঙুল দিয়ে ইঙ্গিত করলো কিশোর। আমার ওপর চোখ রেখেছিলো হয়তো। এখন পিছে পিছে আসছে। কোথায় যাচ্ছি দেখতে চায়।
হ্যাঁ, তা হতে পারে, মাথা দোলালো ডিংগো। ঘড়ি খোয়া যাওয়ার কথা লারমারকে বলেছে টিম। তার মানে মিথ্যে বলেনি। মালের পেছনে আরও লোক লেগেছে। মারকো, জলদি খসাও।
খসাচ্ছি। দেখি কততক্ষণ লেগে থাকতে পারে।
আরও মিনিট দুই একই গতিতে গাড়ি চালালো মারকো। ফ্রীওয়ের কাছে এসে, হঠাৎ গতি বাড়িয়ে দিলো, পলকে ফ্রীওয়েতে উঠে ঢুকে গেল গাড়ির ভিড়ে। দেখতে দেখতে চলে এলো অনেকগুলো গাড়ির মাঝামাঝি। তীব্র গতিতে ছুটে চলেছে গাড়িগুলো, হলিউডের দিকে।
লস অ্যাঞ্জেলেস আর হলিউডের মাঝে বিছিয়ে রয়েছে যেন ফ্রীওয়ের জাল, নানাদিক থেকে বেরিয়ে একটার সঙ্গে আরেকটা মিশেছে অসংখ্য পথ, আশপাশের সমস্ত এলাকার সঙ্গে লস অ্যাঞ্জেলেস শহরের যোগাযোগ রক্ষা করেছে। সারাটা দিন আর রাতেরও বেশির ভাগ সময় অগুণতি গাড়ি চলাচল করে ওসব পথে। রাতের এই সময়েও সিক্স লেন হাইওয়ের একটা লেন ফাঁকা নেই। নানারকম গাড়ি আর ট্রাক ছুটে চলেছে ভীষণ গতিতে।
অ্যাক্সেলারেটরে পায়ের চাপ বাড়িয়ে পাশে সরতে শুরু করলো মারকো, গাড়ির ভিড় থেকে বের করে আনতে চায় ভ্যান। মিনিট দুয়েক পর পেছনের গাড়িটা আর দেখা গেল না, হারিয়ে গেছে বোধহয় বড় বড় কয়েকটা ট্রাকের পেছনে। সন্তুষ্ট হতে পারলো না মারকো। আরও দশ মিনিট ধরে কয়েকবার করে গাড়ির ভিড়ে ঢুকলো আর বেরোলো। শেষে আউটার লেনে বেরিয়ে শা করে মোড় নিয়ে নেমে এলো একটা একক্সিট র‍্যাম্প-এ-হাইওয়ে থেকে বেরোনোর মুখ।
নিচের সিটি স্ট্রীটে নেমে গতি কমালো মারকো। তাকালো রীয়ার-ভিউ মিররের দিকে। এতোক্ষণে সন্তুষ্ট হলো। নেই।

স্বাভাবিক গতিতে চলছে এখন ভ্যান। মনে মনে দমে গেছে কিশোর। শোঁপার ওপর ভরসা করেছিলো সে। কিন্তু মারকোর সাথে পারেনি শোঁপার ড্রাইভার, সাহায্যের আশাও শেষ।
কিছুক্ষণ পর দুটো বাড়ির মাঝের গলিপথে ঢুকলো ভ্যান। মোড় নিয়ে ঢুকলো। একটা ড্রাইভওয়েতে। বড় একটা গ্যারেজের সামনে এসে দাঁড়ালো। একবার হর্ন বাজালো মারকো। মুহূর্ত পরেই গ্যারেজের একটা দরজা উঠে গেল। ভ্যান ভেতরে ঢুকতেই নেমে গেল আবার।
একপাশের দরজা খুলে মারকো নামলো। আরেক পাশেরটা খুলে কিশোরকে নিয়ে নামলো ডিংগো।
লারমারকে দেখতে পেলো কিশোর। তার পেছনে বসে আছে রবিন আর টিম, চেয়ারের সঙ্গে বাঁধা।
কোনো অসুবিধে হয়েছিলো? জিজ্ঞেস করলো লারমার। দেরি করে ফেলেছো।
একটা গাড়ি পিছু নিয়েছিলো, মারকো জানালো। ওটাকে খসাতে সময় লাগলো। ছেলেটা বলছে পুলিশ নয়। ঘড়ি-চোরটা হতে পারে। কাল টিমের বাড়ি থেকে নাকি নিয়ে গিয়েছিলো।
আসেনি, ভালোমতো দেখেছো তো?
মাথা ঝাঁকালো মারকো।
গুড। কড়া চোখে কিশোরের দিকে তাকালো লারমার। কোনো চালাকি টালাকি করলে বুঝবে মজা। তো, মেসেজগুলো এনেছো তো? হাত বাড়ালো। দেখি?
পকেট হাতড়ে একটা কাগজ বের করলো কিশোর। এই যে, মিস্টার লারমার, পয়লা মেসেজটা।
হাতে নিয়ে পড়লো লারমার। কিশোরের লেখা কাগজঃ আই সাজেস্ট ইউ সী দা বুক। হ্যাঁ, তোমার বন্ধু বলেছে-এটার কথা। কি বই?
জানি না।
দ্বিতীয় মেসেজে কিছু বলেনি?
এই যে, স্যার, নিয়ে এসেছি। নিজের চোখেই দেখুন।
ওনলি আ রুম হোয়্যার ফাদার টাইম হামস! মানে কি?
বোধহয় মিস্টার ক্লকের ঘড়ি-ঘরের কথা বলেছে। সেখানে অসংখ্য ঘড়ি, সারাক্ষণ গুঞ্জন করছে।
হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিকই বলেছো। তা-ই বুঝিয়েছে। কিন্তু তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি ঘরটা, কিছুই পাইনি। দেখি, তৃতীয় মেসেজের অর্ধেকটা আছে আমার কাছে, পকেট থেকে ছেঁড়া কাগজটা বের করলো লারমার।
কিশোরও পকেটে হাত ঢোকালো।

এই সময় ঘটলো ঘটনা। ঝনঝন করে ভাঙলো দুপাশের জানালার কাঁচ। ঝটকা দিয়ে পাল্লা খুলে গেল। পর মুহূর্তেই হ্যাঁচকা টানে পর্দা সরলো। জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে দুজন নীল পোশাক পরা লোক, হাতে অটোমেটিক পিস্তল।
হাত তোলো! লারমার, মারকো আর ডিংগোকে আদেশ দিলো একজন পুলিশ। কুইক!
পুলিশ! চেঁচিয়ে উঠলো ডিংগো।
বিড়বিড় করে স্প্যানিশ ভাষায় কি বললো মারকো, বোঝা গেল না।
চুপ! ধমকে উঠলো আরেকজন পুলিশ। জলদি হাত তোলো। পালাতে পারবে না। যা বলছি করো।
ধীরে ধীরে হাত তুললো ডিংগো আর মারকো। লারমার পিছিয়ে গেল ওয়ার্কবেঞ্চের কাছে। মনে হলো, কিছু একটা অস্ত্র খুঁজছে।
কিন্তু পুলিশের নজর আছে ওর ওপর। চিৎকার করে উঠলো প্রথম লোকটা, এই, কি করছো? হাত তুলতে বললাম না?…আরে, পুড়ছে কী!
মেসেজগুলো পুড়ছে! চেঁচিয়ে বললো কিশোর।
বেঞ্চের ওপর ব্রোল্যাম্পটা জ্বলছে, তার শিখাতেই কাগজগুলো পোড়াচ্ছে লারমার। দেখতে দেখতে পুড়ে ছাই হয়ে গেল ওগুলো।
নাও, করো এবার সমাধান, দাঁত বের করে হাসলো লারমার।
প্রথম দুটো মনে আছে আমার, পুলিশের দিকে তাকিয়ে বললো কিশোর। কিন্তু তিন নম্বরটা…, হাত ওল্টালো সে। নাহ, ক্লক কি বোঝাতে চেয়েছে, জানবো না!
কেন, মগজ খাটাও, হেসে উঠলো লারমার। ডিংগো আর মারকোর দিকে চেয়ে হাসি মুছে গেল। গাধা কোথাকার! হিসিয়ে উঠলো সে। খসিয়ে দিয়ে না এসেছিলে! এই বিচ্ছু ছেলেটা টেক্কা মেরে দিলো তোমাদের ওপর। পুলিশকে ঠিকই খবর দিয়ে এসেছে। আর তোমরা… রাগে বাক্যটা শেষ করতে পারলো না সে, দাঁতে দাঁত চাপলো।
বিশ্বাস করুন, পুলিশকে কিচ্ছু বলিনি আমি, লারমারের মতোই অবাক হয়েছে কিশোরও। কি করে ঘটলো এটা, বুঝতে পারছে না।
পিস্তল ধরে রাখো, মিক, একজন পুলিশ আরেকজনকে বলে সরে গেল জানালার কাছ থেকে। ঘুরে গিয়ে তুলে দিলো গ্যারেজের দরজা। ঘরে ঢুকলো, ততীয় আরেকজন। পেছনে আবার নামিয়ে দেয়া হলো দরজা।
ছায়া থেকে আলোয় এসে দাঁড়ালো লোকটা। হাসি হাসি মুখ। বললো, বাহ, চমৎকার। সব কিছু কন্ট্রোলে এসে গেছে।
কপাল কুঁচকে ফেললো কিশোর। কোনোমতে শুধু বললো, মিস্টার শোঁপা! বুঝতে পারছে না, পুলিশের সঙ্গে চোরের খাতির হলো কিভাবে।

.
হ্যাঁ, আমি, বললো শোঁপা। বিখ্যাত আর্ট থিফ, তিন মহাদেশের পুলিশ যার জ্বালায় অস্থির। লারমারের দিকে তাকালো। কি করে ভাবলে, তোমাদের মতো তিনটে শুয়োপোকা আমাকে টেক্কা দিয়ে বেরিয়ে যাবে?
মনে হলো, লারমারও শোঁপার নাম শুনেছে। কালো হয়ে গেছে মুখ, চোখে অস্বস্তি। দুই সহকারীর মতোই নীরব। কিছু করার নেই। পরিস্থিতি আয়ত্তের। বাইরে চলে গেছে।
কিন্তু...কিন্তু... বুঝতে পারছে না কিশোর। আপনাকে খসিয়ে দিয়েছিলো ওরা। আমি নিজেও দেখেছি, আপনার গাড়িটা দেখা যায়নি। চিনে এলেন কি করে?
যে পেশায় আছি, সাবধান তো হতেই হয় আমাকে, তাই না, হালকা গলায় বললো শোঁপা। এগিয়ে এসে কিশোরের জ্যাকেটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে ঘোট, চ্যাপ্টা একটা জিনিস বের করলো। এটা ইলেকট্রনিক সিগন্যালিং ডিভাইস। ইয়ার্ডে তোমার সঙ্গে কথা বলার সময় এক ফাঁকে ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম। আমার গাড়িতে রেডিও রিসিভার আছে। তোমার পকেটে যন্ত্রটা একনাগাড়ে সঙ্কেত দিয়ে, যাচ্ছিলো। কাজেই, ফ্রীওয়েতে গাড়ি দেখে অনুসরণ করতে হয়নি আমাকে। পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম কখন কোন দিকে যাচ্ছে ভ্যান। তোমরা গ্যারেজে ঢোকার কয়েক মিনিট পরেই চলে এলাম আমরাও। তারপর আর কি? আমার দুজন সহকারীকে পাঠালাম কাজ শেষ করতে।
মিস্টার শোঁপা! কথা বললো রবিন। চেয়ারে বাধা, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে। রয়েছে লোকটার দিকে। কাল আপনিই আমাদের গাড়ির পিছু নিয়েছিলেন, না? ঘড়ি চুরি করেছেন।
বাউয়ের কায়দায় মাথা নোয়ালো শোঁপা। সরি, বয়, আমিই। তবে তোমাদের কোনো ক্ষতি করার ইচ্ছে ছিলো না। বরং সাহায্যই করতে চেয়েছি, যাতে কাজে আরও তাড়াতাড়ি সফল হও। সে যাক, সময় খুব কম। নইলে আরও কথা বলতাম তোমাদের সঙ্গে, ভালোই লাগছে। হাজার হোক, পুরনো বন্ধু, হাসলো সে। সহকারীদের দিকে চেয়ে বললো, দাঁড়িয়ে আছো কেন? হাতকড়া লাগাও।
গ্যারেজের মাঝখানে ইস্পাতের একটা খুঁটি বসানো রয়েছে, ছাতের ভার রাখার জন্যে। পিস্তলের মুখে তিন চোরকে ওই খুঁটির কাছে নিয়ে গেল দুই পুলিশ। তিনজনকে মুখোমুখি দাঁড় করালো। তিন জোড়া হাতকড়া দিয়ে একজনের ডান হাতের সঙ্গে আরেকজনের বা হাত বেঁধে দিলো। খুঁটিটাকে কেন্দ্র করে ঘুরতে পারবে ওরা এখন। বসতে পারবে, দাঁড়াতেও পারবে, কিন্তু যেতে পারবে না কোথাও।

বাহ, ভালো বুদ্ধি করেছে, প্রশংসা করলো শ্রোপা। এবার যাওয়া দরকার। কাজ পড়ে আছে।
এক মিনিট, শোঁপা, লারমার বললো। এক সাথে কাজ করলেও তো পারি, আমরা। সুবিধে হয় তাহলে। জিনিসগুলো তাড়াতাড়ি খুঁজে বের করতে পারবো। কি বলো?
কি সুবিধে হবে? লারমারের কথায় গুরুত্বই দিলো না শোঁপা। তোমরা যতোখানি জানো, আমিও জানি। আমাকে ফাঁকি দিয়ে একাই মেরে দিতে। চেয়েছিলে। মারো এখন। তোমাদের সাথে কাজ করার কোনো দরকারই এখন। আমার নেই। দেখতেই পাচ্ছো, পুলিশ আমার সঙ্গে রয়েছে। নীল পোশাক পরা। দুজনকে বললো, ছেলেগুলোকে খোলো। হ্যারি ক্লকের বাড়িতে যেতে হবে: আবার।
কিছুক্ষণ পর গ্যারেজ থেকে বেরিয়ে এলো তিনজন লোক, আর তিন। কিশোর। কালো একটা সেডান গাড়িতে চড়ে স্বাভাবিক গতিতে এগিয়ে চললো হলিউডের রাস্তা ধরে।
আপনমনেই হাসলো শোঁপা।
কি ভাবছো? পাশে বসা কিশোরকে জিজ্ঞেস করলো সে। নিশ্চয় আশা ছেড়ে দিয়েছিলে। আমার গাড়িটা হারিয়ে যেতে দেখে।
হ্যাঁ, তা দিয়েছিলাম, স্বীকার করলো কিশোর। চমকে গিয়েছিলাম জানালায়। পুলিশ দেখে। সত্যি বলবো? অসমাপ্ত কাজ পছন্দ নয় আমার। সব শেষ করে গিয়ে পুলিশ ডাকার আলাদা মজা...
জোরে হেসে উঠলো শোঁপা। পুলিশ, না? ভেবো না, তোমার মজা নষ্ট হয়নি। ওরা পুলিশ নয়। পুলিশের পোশাক পরে আছে। পুরনো কাপড়ের দোকান থেকে ওরকম ইউনিফর্ম সহজেই জোগাড় করা যায় আজকাল সেই যে প্রবাদ। আছে নাঃ বাইরের চেহারা দেখে ভুলো না। হাহ্ হাহ্ হা!
ঢোক গিললো কিশোর। তেতো হয়ে গেল মন। তাকে কেউ বোকা বানিয়ে আনন্দ পাক, এটা সহ্য করতে পারে না সে। শোঁপার প্রতি তার বিদ্বেষ বাড়লো।
টিম, গায়ের সঙ্গে চেপে বসা টিমকে বললো কিশোর। মিস্টার শোঁপার সঙ্গে চুক্তি হয়েছে আমার। তোমাকে আর রবিনকে মুক্ত করবেন। তার কথা তিনি রেখেছেন। আরও একটা কাজ করার কথা দিয়েছেন তিনি, তোমার বাবাকে নির্দোষ প্রমাণ করবেন।
করবেন? প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো টিম। ইস্, কি ভালোই না হতো!
ভেবো না, শোঁপা বললো, হয়ে যাবে। আমি যখন হাত দিয়েছি...শোঁপার জন্যে কঠিন কিছুই নেই। হ্যাঁ, কিছু কথা তোমাদের জানানো দরকার। কিশোর, নিশ্চয় আন্দাজ করতে পারছো, হ্যারি কুক ভালো লোক ছিলো না। বাইরে অভিনেতার

খোলস, আসলে ছিলো চোরের সর্দার। দামী দামী ছবি চুরি করে সেগুলো ধনী ক্রেতার কাছে বিক্রি করা ছিলো তার দলের কাজ।
হুঁ, সে-জন্যেই, বলে উঠলো রবিন, নাম পাল্টে রহস্যময় আচরণ করতো ক্লক। চোর ছিলো, বলেই। চুরি করে এনে রান্নাঘরে ছবিগুলো তাহলে সে-ই লুকিয়েছিলো।
চুরি হয়তো সে করেনি, অন্য কেউ করে এনে তার হাতে দিয়েছে। অনেক সহকারী ছিলো তার। ডিংগো তাদের একজন। আগে জকি ছিলো। জকি মানে, জানো তো? রেসের ঘোড়ার পেশাদার ঘোড়সওয়ার। ডিংগোর আরও সহকর্মী ছিলো। সব কজন অসৎ। ফলে মাঠ থেকে বের করে দেয়া হলো ওদেরকে। ছোট হালকা শরীর, জানালা দিয়ে সহজেই ঢুকতে পারে। তাই ওদেরকে বেছে নিলো ক্লক। ছবি চুরি করে এনে ক্লকের কাছে দিতো ওরা। ক্লক সেগুলো নিয়ে গিয়ে বিক্রি করতো ধনী দক্ষিণ আমেরিকানদের কাছে। যাদের কাছে বেচতো, তারাও লোক সুবিধের না।
বছর দুই আগে কয়েকটা ছবি চুরি করার পর বেশি গোলমাল শুরু করলো পুলিশ। ওগুলো পাচার করার সুযোগ পেলো না ক্লক। যার কাছে বিক্রি করার কথা, ছিলো, সেই লোকটা জড়িয়ে পড়লো রাজনৈতিক গণ্ডগোলে, ধরে তাকে জেলে। ভরে দিলো তার দেশের সরকার। ছবিগুলো লুকিয়ে ফেলতে বাধ্য হলো ক্লক। ইচ্ছে ছিলো, সময় সুযোগমতো পরে কারো কাছে বিক্রি করবে। ইতিমধ্যে ঠাণ্ডা হয়ে আসবে পরিস্থিতি।
ডিংগো আর মারকোর টাকা দরকার। কয়েক দিন পর আরও তিনটে ছবি চুরি করে আনলো ওরা। আগেরগুলোই বিক্রি করতে পারেনি ক্লক, আরও তিনটে নিয়ে কি করবে? কিন্তু সে-কথা শুনতে চাইলো না দুই চোর। ওরা চাপাচাপি শুরু করলো টাকার জন্যে। ক্লককে বললো, টাকা দিতে না পারলে ছবিগুলো ফেরত দিয়ে দিক। আগের পাঁচটা ছবি লুকিয়ে ফেলেছে ক্লক, বের করতে চাইলো না। দশ লাখ ডলারের মাল, কে হাতে পেয়ে ফেরত দিতে চায়?
একটা রফা হয়তো হয়ে যেতো, কিন্তু কাকতালীয় একটা ব্যাপার ভণ্ডুল করে দিলো ক্লকের সমস্ত পরিকল্পনা। পুলিশের চোখ পড়লো টিমের বাবার ওপর। শেষ তিনটে ছবি চুরির ব্যাপারে তাকে সন্দেহ করে বসলো ওরা। এটা বুঝতে পেরে এক চাল চাললো ক্লক। ছবিগুলো লুকিয়ে রাখলো রান্নাঘরে। যাতে ওগুলো খুঁজে পায় পুলিশ, দোষ চাপে গিয়ে বেকার ডেলটনের ঘাড়ে।
আ-আমার বাবাকে ফাঁসিয়েছে! ক্লঅক! তিক্ত কণ্ঠে বললো টিম, বিশ্বাস করতে পারছে না। অথচ আমি আর মা ভাবতাম কতো ভালো মানুষ!

এই দুনিয়ায় লোক চেনা মুশকিল! হ্যাঁ, তোমার বাবাকে ক্লকই ফাঁসিয়েছে। এর কিছুদিন পরই রহস্যজনক ভাবে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। আমার বিশ্বাস, টাকার জন্যে চাপ দিচ্ছিলো ডিংগো, মারকো আর লারমার। দিতে পারেনি বলেই পালিয়েছিলো ক্লক। দক্ষিণ আমেরিকাতে লুকিয়েছিলো। পুলিশ আর সহকারীদের চোখে ধুলো দিলেও আমাকে ফাঁকি দিতে পারেনি। দুনিয়ার সব জায়গায় লোক আছে আমার।

যোগাযোগ করলাম ওর সাথে। চুক্তিতে আসতে চাইলাম। ঘঘাড়েল লোক, কিছুতেই রাজি হলো না। রাগ করে চলে এলাম। নিজেই খুঁজে বের করার চেষ্টা, করলাম ছবিগুলো। কিছু দিন পর অসুখে পড়লো ক্লক। ডাক্তার বলে দিলো, বাঁচবে না। লোকের মুখে শুনলাম, টিমের বাবার জন্যে অনুতপ্ত সে। তাদের জন্যে কিছু করতে চায়। অদ্ভুত কতগুলো মেসেজ লিখে কয়েকজন বন্ধুর কাছে পাঠালো। সেই সাথে একটা আজব চেঁচানো ঘড়ি। এর কিছু দিন পর মারা গেল সে।

ঘড়ি আর মেসেজগুলো কেন পাঠালো, জানেন? রবিন জিজ্ঞেস করলো। তার চেয়ে পুলিশের কাছে একটা চিঠি লিখে সব বলে দিলেই কি ভালো হতো না? নির্দোষ জানলে টিমের বাবাকে ছেড়ে দিতে পুলিশ, হয়তো বিনা দোষে জেলে পাঠানোর জন্যে ক্ষতিপূরণও দিতো।

আসলে ক্লক লোকটাই ছিলো জটিল। সহজ কাজ সহজভাবে না করে খালি প্যাঁচের মধ্যে যেতো। তবে কেন করেছে, তারও নিশ্চয় কোনো কারণ আছে। সবগুলো মেসেজের সমাধান হলেই বুঝতে পারবো।

মেসেজ তো পুড়িয়ে ফেলেছে, মনে করিয়ে দিলো কিশোর। মানে আর বের করবেন কিভাবে?

কেন, মনে নেই? একবার পড়লেই তো সব মনে থাকে তোমার, উৎকণ্ঠা। চাপা দিতে পারলো না শোঁপা, প্রকাশ পেয়ে গেল কণ্ঠস্বরে।

প্রথম দুটো মনে আছে, কিন্তু তৃতীয়টার মানেই বের করতে পারিনি। অর্ধেকটা আমার কাছে, বাকি অর্ধেক লারমারের...প্রথম মেসেজটাতে লিখেছেঃ আই সাজেস্ট ইউ সী দা বুক। দ্বিতীয়টাতেঃ ওনলি আ রুম হোয়্যার ফাদার টাইম হামস।

বই? কিসের বই? ঘড়ি কোন ঘরে গুঞ্জন করে, সেটা বোঝা সহজ। জানি আমরা। আমার মনে হয়, ওই ঘরটায় গেলেই সব রহস্যের সমাধান হয়ে যাবে।

মোড়ের কাছে গাড়ি রাখতে বললো শোঁপা।

নেমে সবাই হেঁটে চললো ক্লকের বাড়ির দিকে। ওদেরকে বাড়ির ভেতরে নিয়ে এসে মায়ের খোঁজে চললো টিম। মাআ! মাআ! বলে ডাকলো।

ভাঁড়ার ঘর থেকে শব্দ শোনা গেল। দরজায় জোরে জোরে কিল মারছে।
দরজার বাইরের হুড়কো খুলে দিলো, টিম। সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা খুলে বেরিয়ে এলো তার মা। তুই এসেছিস, টিম! ওই শয়তান লারমার আর সঙ্গীরা! আটকে ফেললো ভাঁড়ারে.. .আরে, পুলিশ নিয়ে এসেছিস দেখি। ভালোই হয়েছে। এখুনি ব্যাটাদের অ্যারেস্ট করতে বল।
ওদের ব্যবস্থা হয়েছে, ম্যাডাম, টিমের মায়ের সামনে এসে ফরাসী কায়দায় বাউ করলো শোঁপা। আপনাদের ভালো চাই।
মা, ইনি মিস্টার শোঁপা। বলছেন, বাবা নাকি নির্দোষ।
তাই নাকি? ইনি জানেন আমার স্বামী নিরপরাধ?
জানি, ম্যাডাম। তবে সেটা পুলিশের কাছে প্রমাণ করতে হরে। আর সেই প্রমাণ রয়েছে মিস্টার ক্লকের ঘরে। ও, ক্লক কে জানেন না বোধহয়। রোজার, জেমস রোজার। তার আরেক নাম হ্যারিসন ক্লক। লাইব্রেরির কিছু জিনিস নষ্ট করতে হতে পারে, সবই আপনাদের ভালোর জন্যে। আপত্তি আছে?
আপত্তি! মোটেই না। তবু টিমের বাবাকে ছাড়িয়ে আনুন।
থ্যাংক ইউ। আপনি এখানেই থাকুন। রবিন, টিম, তোমরাও থাকো। আমরা ঢুকি। শোনো, কারো সাথে যোগাযোগ করবে না। ফোন এলে ধরবে না। ঠিক আছে?
ধরবো না, টিমের মা বললো। ছেলেদের নিয়ে রান্নাঘরে যাচ্ছি আমি। খেয়েছি সেই কখন। খিদেয় পেট জ্বলছে। আপনারা যান, মিস্টার শোঁপা।
মহিলাকে আরেকবার ধন্যবাদ দিয়ে কিশোরের দিকে ফিরলো শোঁপা। চলো, পথ দেখাও।

.

ঐদিকে যখন মহা-উত্তেজনা, মুসা ওদিকে ড্রইং রুমে বাবার সঙ্গে বসে টেলিভিশন দেখছে। চোখই শুধু রয়েছে পর্দায়, মন বসাতে পারছে না। হ্যারিসন ব্লক আর তার আজব ঘড়ির কথা ভাবছে।
বাবা, জিজ্ঞেস করলো মুসা, হ্যারিসন ক্লকের নাম শুনেছো? রেডিওতে নাটক করতো। নানারকম চিৎকার করতো আরকি।
হ্যারিসন ক্লক? চিনি। তেমন পরিচয় ছিলো না। গোটা দুই ছবির শুটিং করার সময় দেখা হয়েছে তার সঙ্গে। চেঁচাতে পারতো! রক্ত ঠাণ্ডা করে দিতো। একেবারে। পুরানো একটা নাটকে এক কাণ্ড করেছিলো সে।
কাণ্ড! আনমনে হাত বাড়িয়ে সামনের টেবিলে রাখা প্লেট থেকে কয়েকটা পোট্যাটো চিপসতুলে মুখে পুরলো মুসা। কি কাণ্ড, বাবা?
অ্যাঁ? মুসার কথায় মন নেই বাবার। ওয়েস্টার্ন ছবি হচ্ছে টিভিতে। কাহিনীতে গতি এসেছে।

আরার একই প্রশ্ন করলো মুসা।
পর্দা থেকে চোখ না সরিয়ে অনেকটা অন্যমনস্ক হয়েই জবাব দিলেন মিস্টার আমান।
চোখ মিটমিট করলো মুসা। তার বাবা এখন যে তথ্যটা জানালেন, নিশ্চয় জানে না কিশোর। মেলাতে পারছে না মুসা, কিন্তু মনে হচ্ছে, কোথায় একটা যোগসূত্র রয়েছে। কিশোর হয়তো বুঝবে। ডাকবে নাকি? বলবে? তথ্য মূল্যবান হলে, কাঁচা ঘুম থেকে ডেকে তুললেও কিছু মনে করবে না কিশোর।
দ্বিধা করছে মুসা। এই সময় বলে উঠলেন মিস্টার আমান, অনেক রাত হয়েছে। যাও, ঘুমাতে যাও।
যাচ্ছি।
সিঁড়ির গোড়ায় পৌঁছতে না পৌঁছতেই হাই উঠতে আরম্ভ করলো তার। ভাবলো, থাক এখন। সকালে জানালেই হবে কিশোরকে।

.
লাইব্রেরিতে ঢুকেই কাজে লাগলো শোঁপা, মুহূর্ত সময় নষ্ট করলো না। দুই সহকারীকে দরজা-জানালার সমস্ত পর্দা টেনে দিতে বলে, নিজে গিয়ে আলো জ্বাললো। চোখ বোলালো সারা ঘরে।
শত শত বই, নিজে নিজেই কথা বলতে লাগলো। তিনটা পেইনটিং, বাজে। বড় একটা আয়না। অনেক ঘড়ি। দেয়ালে কতগুলো খোপ, বহু জিনিস রাখা যাবে। মেসেজে বলেছে, বইয়ে দেখার জন্যে। দ্বিতীয়টাতে বলেছে, ঘড়ির ঘরে খুঁজতে। তৃতীয়টায় বলেছে…কিশোর, দেখি তো তোমার অর্ধেকটা।
বের করে দিলো কিশোর।
নম্বরগুলো দেখতে দেখতে ভুরু কুঁচকে গেল শোঁপার। কোন পাতা, আর কতো নম্বর শব্দ, সেটা বোঝাতে চেয়েছে। বইটা পেলে কয়েক মিনিটের ব্যাপার। কিন্তু কোন বই? কিশোর, কোন্ বইয়ের কথা বলেছে?
বুঝতে পারছি না। বইটা হয়তো এ-ঘরেই আছে।
হুঁ, আমারও তা-ই মনে হয়। এসো না কয়েকটা খুঁজে দেখি।
কাছের তাকটা থেকে তিন-চারটে বই নামিয়ে উল্টে-পাল্টে দেখলো শোঁপা। তারপর আবার তুলে রেখে দিলো।
না, কিছুই বোঝা যায় না। এতো বই, কটা দেখবো? পুরো মেসেজটা থাকলে… তোমার মাথাটা খাটাও তো কিশোর। পারলে তুমিই পারবে।
নিচের ঠোঁটে জোরে জোরে চিমটি কাটতে আরম্ভ করলো কিশোর।
মিস্টার শোঁপা… কিছুক্ষণ পর বললো সে।
হ্যাঁ?

মেসেজগুলো হেনরি মিলারের জন্যে পাঠানো হয়েছিলো। তিনি হয়তো সমাধান করতে পারবেন। অন্তত কোনো সূত্র-টুত্র তো দিতে পারবেনই। নিশ্চয় বইটার নামও জানেন।
ঠিক বলেছো, তুড়ি বাজালো শোঁপা। ফোন করে জিজ্ঞেস করো।
কিন্তু তিনি তো হাসপাতালে।
অ্যাঁ! তাহলে? ঝুলে পড়লো শোঁপার চোয়াল, আর কোনো উপায়?
তার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করতে পারি। জানতেও পারেন।
যাও। জলদি করো।
রবিনকে দিয়ে বরং করাই। তার সঙ্গে মহিলার পরিচয় আছে, কথা হয়েছে।
মিসেস ডেলটনের সঙ্গে বসে তখন চা খাচ্ছে রবিন আর টিম।
কি হলো, কিশোর? কিছু পেয়েছো? রবিন জিজ্ঞেস করলো।
নাহ্। তোমাকে একটা কাজ করতে হবে, কি করতে হবে বুঝিয়ে বললো। কিশোর। হলঘরে গিয়ে ডিরেক্টরি থেকে মিস্টার মিলারের নম্বর বের করে ডায়াল করলো রবিন। ফোন ধরলেন মিসেস মিলার, গলা শুনেই চিনতে পারলো সে। মেসেজের কথা বলে, বইটার কথা জিজ্ঞেস করলো। তিনি কি কিছু বলতে পারবেন?
ওপাশে কয়েক সেকেণ্ড নীরবতা, বোধহয় ভাবছেন মহিলা। তারপর বললেন, একটা বইয়ের নাম খুব মনে পড়ছে। বইয়ের কাহিনী ক্লকের, লিখেছে হেনরি। এতো বেশি আলোচিত হয়েছে, স্পষ্ট মনে আছে নামটা। আ স্ক্রীম অ্যাট মিডনাইট। চলবে?
নিশ্চয়! টেলিফোনেই চেঁচিয়ে উঠলো রবিন। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ! রিসিভার রেখে খবরটা জানালো কিশোরকে।
চরকির মতো পাক খেয়ে ঘুরেই লাইব্রেরিতে ছুটলো কিশোর। পেছনে দৌড় দিলো শোঁপা। ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিলো।
বিভিন্ন তাকে মিনিট দুই খোঁজাখুঁজি করে বইটা বের করলো শোঁপা। এই যে, আ স্ক্রীম অ্যাট মিডনাইট, বাই হ্যারিসন ক্লক অ্যাণ্ড হেনরি মিলার। কপাল। খুলছে। মেসেজটা কোথায়? ছেঁড়াটা..হ্যাঁ, দেখি...তিন নম্বর পৃষ্ঠা, সাতাশ নম্বর শব্দ-কাগজ-কলম নাও...
দ্রত পাতা উল্টে তিন নম্বর পৃষ্ঠায় থামলো শোঁপা। শব্দটা লেখো...স্ট্যাণ্ড... তারপর হলো গিয়ে...
একের পর এক শব্দ বলছে শোঁপা, কিশোর লিখে নিচ্ছে।
শেষ হয়ে গেল মেসেজ। বইটা বন্ধ করে শোঁপা বললো, ব্যস, এইই। পড় তো, কি হয়েছে?

পড়লো কিশোর, স্ট্যাণ্ড ইন দা মিডল অভ দা রুম অ্যাট ওয়ান মিনিট টু মিডনাইট। হ্যাভ টু ডিটেকটিভস অ্যাণ্ড টু রিপোর্টারস উইদ ইউ। হোল্ড হ্যাঁণ্ডস, মেকিং আ সার্কল; অ্যাণ্ড কীপ অ্যাবসলুটলি সাইলেন্ট ফর ওয়ান মিনিট। অ্যাট মিডনাইট এক্সাক্টলি থেমে গেল সে। আর নেই।

ইসসি, আসল জায়গায় ছিঁড়ে ফেলেছে হারামজাদা! ঠিক মাঝরাতে কি ঘটবে? কি ঘটতে পারে? জানার কোনো উপায় নেই! মেসেজ পুড়িয়ে ফেলেছে। ক্লক মৃত। কে বলতে পারবে? জোরে নিঃশ্বাস ফেললো। অসাধারণ ধূর্ত ছিলো। লোকটা, ক্ষুরধার বুদ্ধি। ঠিক তার মতো করে কে ভাবতে পারবে?...এখন এক কাজ করা যায়। আরও ভালোমতো খুঁজতে হবে এঘরে। দরকার হলে দেয়াল ভেঙে ফেলবো। কিন্তু যদি এঘরে লুকানো না থাকে?

তাহলে আর জানা যাবে না কোনোদিন, চিন্তিত ভঙ্গিতে বললো কিশোর। হঠাৎ হাত তুললো, মিস্টার শোঁপা, দেয়ালের ওই ছবিগুলো নয় তো! আসল ছবির ওপর নতুন করে আঁকা...

না, এতো সহজের মধ্যে যাবে না ক্লক। তবু, দেখি।

একটা ছবি নামিয়ে প্রথমে খালি চোখে পরীক্ষা করে দেখলো শোঁপা। কিছু বোঝা গেল না। পকেটনাইফ বের করে ক্যানভাসের এক কোণায় রঙ চেঁছে তুলে ফেললো।

না, একেবারেই বাজে জিনিস, ঠোঁট বাঁকালো সে। বইয়েই খুঁজতে হবে। লুকানো চাবি-টাবিও রেখে যেতে পারে। এক ধার থেকে সব বই দেখবো।

দাঁড়ান! একটা বুদ্ধি এসেছে মাথায়।

কী?

মেসেজের বাকিটা উদ্ধার করতে পারবো মনে হচ্ছে।

কিভাবে!

বই থেকে শব্দ বাছাই করে মেসেজ তৈরির সময় অনেকেই শব্দের তলায় দাগ দিয়ে রাখে। সুবিধে হয়। মিস্টার ক্লকও ওরকম কিছু করে থাকলে...

আরি, খেয়াল করলাম না তো দাগ আছে কিনা! দেখি আবার? তাড়াতাড়ি আবার বইটা খুলে দেখলো শোঁপা। ঠিক! ঠিকই বলেছো তুমি। দাগ দিয়েছে। পেন্সিলের হালকা দাগ, এতো আবছা, প্রায় চোখে পড়ে না। দেখো।

বইটা হাতে নিয়ে এক এক করে পাতা ওল্টাতে শুরু করলো কিশোর, খুব ধীরে। মনোযোগ দিয়ে দেখছে প্রতিটি পাতার প্রতিটি লাইন। এবার কাগজ-কলম। নিয়েছে শোঁপা। অবশেষে একটা পাতায় থেমে একটা শব্দ বললো কিশোর। লিখে নিলো শোঁপা।

মোটা বই। অপরিসীম ধৈর্যের পরিচয় দিতে হলো কিশোরকে। দিলো। এসব কাজে কষ্ট করতে তার কোনো আপত্তি থাকে না।
শেষ পাতাটাও ওল্টানো শেষ হলো। আর শব্দ নেই। বই বন্ধ করলো কিশোর।
শেষ, না? শোঁপা বললো। প্রথম থেকে পড়ি। স্ট্যাণ্ড ইন দা মিডল অভ দা রুম অ্যাট ওয়ান মিনিট টু মিডনাইট। হ্যাভ টু ডিটেকটিভস অ্যাণ্ড টু রিপোর্টারস উইদ ইউ। হোল্ড হ্যাঁণ্ডস, মেকিং আ সার্কল, অ্যাণ্ড কীপ অ্যাবসলুটলি সাইলেন্ট ফর ওয়ান মিনিট। অ্যাট মিডনাইট এক্সাক্টলি দা অ্যালার্ম অভ দা স্ক্রীমিং ক্লক হুইচ আই সেন্ট ইউ শুড গো অফ। হ্যাভ ইট সেট অ্যাট ফুল ভলিউম। লেট দা স্ক্রীম কনটিনিউ আনটিল মাই হাইডিং প্লেস ইজ আনকাভারড।
পড়া শেষ করে মুখ তুলে তাকালো শোঁপা। কিছু বুঝলে?
ভুরু কুঁচকে ভাবছিলো কিশোর, দাঁত দিয়ে নখ কাটছে, শোঁপার প্রশ্নে মুখ। তুললো। উঁম?
আবার একই প্রশ্ন করলো শোঁপা, কিছু বুঝলে?
মানে তো সহজ, মুখ থেকে আঙুল সরালো কিশোর। মাঝরাতের এক মিনিট আগে, অর্থাৎ এগারোটা উনষাট মিনিটে ঘরের ঠিক মাঝখানে দাঁড়াতে বলা হয়েছে। দাঁড়ালাম। দুজন গোয়েন্দা আর দুজন সাংবাদিককে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে। গোয়েন্দা পাবো, কিন্তু সাংবাদিক আনা সম্ভব না। নাকি?
না, সম্ভব না, মাথা নাড়লো শোঁপা।
তারপর বলছে, হাত ধরাধরি করে একটা চক্র তৈরি করে নীরবে অপেক্ষা। করতে। আসলে নীরবে অপেক্ষা করাটাই আসল কথা, হাত ধরাধরিটা কোন ব্যাপার নয়। ওরা বেশি নাটকীয়তা, নাটকের লোক তো, সেজন্যেই ওরকম করতে বলেছে। না করলেও হয়তো চলবে। বলছে, ঠিক বারোটায় বাজবে অ্যালার্ম ক্লক, যেটা হেনরি মিলারের কাছে পাঠিয়েছিলো। বাজবে মানে চিৎকার করে উঠবে আর কি। এই রাত বারোটার ব্যাপারটারও কোনো মানে নেই, আমার বিশ্বাস। এটাও নাটকীয়তা, রহস্য গল্পের রহস্য বাড়ানোর হাস্যকর প্রচেষ্টা-ঠিক রাত বারোটা, কিংবা মধ্যরাত, যেন সন্ধ্যা আটটা কিংবা ভোর চারটেয় হলে রহস্য জমে না। যত্তোসব! হ্যাঁ, যা বলা হয়েছে, ঘড়ি তো চিৎকার করবে, ভলিউম পুরো বাড়িয়ে দিতে হবে ওটার। চিৎকার করিয়ে যেতে হবে যততক্ষণ না ক্লকের গোপন জায়গা বেরিয়ে পড়ে।
তোমার ধারণা, চেঁচানো ঘরিটাতেই রয়েছে রহস্যের চাবিকাঠি?
সরাসরি জবাব দিলো না কিশোর। ঘুরিয়ে বললো, হতে পারে, এমন কোনো মেকানিজম রয়েছে গোপন জায়গাটায়, চিৎকারের শব্দে সক্রিয় হয়ে উঠবে। সরে যাবে কোনো লুকানো প্যানেল-ট্যানেল বা দরজা। শব্দের সাহায্যে তালা খোলা

তো আজকাল কোনো ব্যাপারই নয়। কিছু তালা আছে, আপনি ভালো করেই জানেন, মালিককে কাছে গিয়ে শুধু বলতে হয় খোলো, ব্যস, খুলে যায়। মিস্টার ক্লকের কণ্ঠস্বরও বোধহয় ওরকম কিছুই করবে।
হ্যাঁ, এটা সম্ভব, মাথা দোলালো শোঁপা। শব্দের সাহায্যে অনেক তালা খুলেছি আমি।
ঘড়িটা কোথায়? নিয়ে আসুন, চেষ্টা করে দেখি।
নেই। নষ্ট করে ফেলেছি।
নষ্ট করে ফেলেছেন!
হ্যাঁ, বললাম না, খুলে ফেলেছি। যন্ত্রপাতি কোথায় যে কোনটা ফেলেছি...মাঝে মাঝে এমন গাধামো করি না..অন্য কি করা যায়, বল।
আর কি করবেন? হতাশ ভঙ্গিতে দুহাত নাড়লো কিশোর। হবে না।
হতেই হবে! দরকার হলে ঘর ভেঙে ফেলবো আমি। এক সহকারীর দিকে ফিরে আদেশ দিলো, বিল, যন্ত্রপাতি। কুইক!

.

লাইব্রেরি বলে আর চেনা যায় না এখন ঘরটাকে। হাতুড়ি, বাটালি, ড্রিল মেশিন, কুড়াল আর শাবল নিয়ে আক্রমণ করেছিলো শোঁপার লোকেরা। প্রথমেই তাক থেকে সমস্ত বই নামিয়ে মেঝেতে স্তূপ করেছে। তারপর নামিয়েছে ছবিগুলো আর আয়না। দেয়ালের এক ধার থেকে খোঁজা আরম্ভ করেছে, ফাপা জায়গা, কিংবা গোপন ফোকর আছে কিনা দেখেছে। দেয়ালের কয়েকটা তাকও ভেঙে টেনেটুনে নামিয়েছে। ধারণা ছিলো, লুকানো দরজা-টরজা বা দেয়াল আলমারি থাকতে পারে। ছাতও বাদ রাখেনি। অনেক জায়গার আস্তরণ খসিয়ে ফেলেছে। মোট কথা, ধসিয়ে দেয়াটা বাকি রেখেছে শুধু।
কিন্তু নিরাশ হতে হয়েছে ওদেরকে, ব্যর্থ হয়েছে চেষ্টা। কিছুই পায়নি। কিচ্ছু। লুকানো ফোকর, দরজা, কিংবা দেয়াল আলমারির চিহ্নও নেই। ছবি লুকিয়ে রাখার মতো কোনো জায়গা-ই নেই।
প্রচণ্ড হতাশা রাগিয়ে দিয়েছে শোঁপাকে।
শেষ পর্যন্ত পারলাম না, আঁ! কপালের ঘাম মুছলো সে। হেরে গেলাম। ক্লকের কাছে? বিশ্বাসই করতে পারছি না! কোথায় লুকালো? কোথায়?
তার মানে টিমের বাবাকে নির্দোষ প্রমাণ করতে পারছেন না? কিশোর প্রশ্ন করলো।
ছবিগুলো না পেলে কি করে করি? তোমার চোখের সামনেই তো খোঁজা হলো।...
আর কোনো উপায়? বুদ্ধি-টুদ্ধি কিছু?

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে শুরু করলো কিশোর। আনমনে মাথা দোলালো কিছুক্ষণ। মিস্টার শোঁপা, বাঁ হাতের তালুর দিকে তাকিয়ে আছে সে। ঘড়ি নষ্ট হয়েছে বটে। কিন্তু চিৎকারটা বোধহয় হয়নি।
মানে? দুই লাফে কাছে চলে এলো শোঁপা।
চেয়ারে হেলান দিয়ে কয়েক সেকেণ্ড পা দোলালো কিশোর। ধীরে ধীরে বললো, মিস্টার শোঁপা, হিরাম বারকেনের কাছে অনেকগুলো টেপ আছে। রেডিওর নাটক রেকর্ড করে রেখেছেন। হ্যারিসন কক যতগুলোতে কণ্ঠ দিয়েছে, সব। তার মধ্যে আ স্ক্রীম অ্যাট মিডনাইটও নিশ্চয় আছে। ঘড়ির মধ্যে যে চিৎকারটা ঢুকিয়ে দিয়েছিলো, সেটা কোনো নাটকেরও হতে পারে। মানে, ওরকম ভাবে চিৎকার করেছিলো হয়তো কোনো নাটকে। তাহলে টেপ বাজালেই সেই চিৎকার পেয়ে যাবো আমরা। এখন, মিস্টার বারকেন দয়া করে টেপগুলো আর রেকর্ডারটা দিলেই হয়। ঘড়ি আর দরকার হবে না আমাদের।
এখুনি, এক্ষুণি ফোন করো তাকে! চেঁচিয়ে উঠলো শোঁপা। দপদপ করে লাফাচ্ছে কপালের একটা শিরা। সময় খুব কম।
হলঘরে এসে বারকেনকে ফোন করলো কিশোর।
শুনে প্রথমে অবাক হলেন বারকেন। বুঝিয়ে বললো কিশোর।
হ্যাঁ, এবার বুঝেছি, বললেন তিনি। কোন চিৎকারটার কথা বলেছো, তা-ও বুঝেছি। ঠিক যেটা চাইছো, সেটাই দিতে পারবো। ওই চিৎকারই বিখ্যাত করেছিলো হ্যারিকে। আমি টেপটা বের করে রাখছি। মেশিনও রেডি রাখবো। এসে নিয়ে যাও। তবে কথা দিতে হবে, পরে সমস্ত ঘটনা আমাকে খুলে বলবে। রহস্যটা দারুণ ইনটারেসর্টিং।
কথা দিলো কিশোর। বললো, একজন লোক পাঠাচ্ছে, টেপ আর রেকর্ডার আনার জন্যে।
রান্নাঘর থেকে এসে রবিন, টিম আর মিসেস ডেলটনও কিশোরের কথা শুনছিলো। তার সঙ্গে লাইব্রেরিতে চললো। ঘরটার অবস্থা দেখে চমকে গেল ওরা।
হায় হায়, করেছে কি? মাথায় হাত দিলো রবিন। একেবারে লণ্ডভণ্ড...তা, কিছু পেলে?
এখনও পাইনি, কিশোর বললো।
বাড়ি ভাঙার চেষ্টা হয়েছিলো নাকি! মিসেস ডেলটনের চোখ বড় বড় হয়ে গেছে। এই কাণ্ড করবে জানলে কক্ষণো খোঁজার অনুমতি দিতাম না।
আপনার স্বামীকে বাঁচানোর চেষ্টাই করছি আমরা, মিসেস ডেলটন, শোঁপা বললো। প্রমাণ খুঁজছি। নির্দোষ যে, এটা প্রমাণ করতে হবে আদালতে। আর

খুঁজতে মানা করছেন?
নষ্ট যা করার তো করেই ফেলেছেন। আর বাকিই বা আছে কি। খুঁজুন। দেখুন, প্রমাণ বেরোয় কিনা।
না, আর-কিছু ভাঙবো না। হলে এখন ভালোভাবেই হবে। তবে এই-ই শেষ চেষ্টা।
আপাতত আর কিছু করার নেই। টেপ আর রেকর্ডার এলে তারপর যা করার করবে। কাজেই বসে থাকতে হলো। গাড়ি নিয়ে মিক গেছে ওগুলো আনার জন্যে।
ঘন্টাখানেক পর ফিরলো সে। ভারি মেশিনটা নামিয়ে রাখতে রাখতে বললো, আরিব্বাপরে, দশ মন হবে! টেপ ঢুকিয়েই দিয়েছে এর মধ্যে। শুধু চালালেই হবে এখন।
কিশোর, শোঁপা বললো, চালাতে পারবে এটা?
পারবো। উঠে এসে চামড়ার বাক্স থেকে মেশিনটা বের করলো কিশোর। সকেটে প্লগ ঢুকিয়ে কানেকশন দিলো। ভুল হয়ে গেছে। এতোক্ষণ শুধু শুধু বসে না থেকে ঘরটা গুছিয়ে ফেলতে পারতাম। ঠিক আগের মতো হবে না, যতোটা পারা যায় আরকি। ছবিগুলো জায়গা মতো ঝোলাতে হবে, আয়নাটা আগের জায়গায়। বইগুলো তাকে।
প্রতিবাদ করতে গিয়েও কি ভেবে থেমে গেল শোঁপা। সঙ্গীদের নির্দেশ দিলো কাজ করার।
আয়নাটা লাগালো ওরা। ছবিগুলো ঝোলালো। বই যতোগুলো সম্ভব, তুলে সাজিয়ে রাখলো তাকে, আর বুকশেলফে।
উহ্, অনেক সময় নষ্ট হয়েছে। নাও, শুরু করো, কিশোরকে বললো শোঁপা। দেখো, কিছু হয় কিনা।
টেপ চালু করে দিলো কিশোর। ভলিউম কমিয়ে রেখেছে। বসে থাকেনি সে। টেপটা চালিয়ে সেই জায়গায় নিয়ে এসেছে, যেখান থেকে শুরু হয়েছে চিৎকার। ওয়াইও করে সামান্য পিছিয়ে নিয়ে আবার প্লে-এর বোতামটা টিপে দিলো। বললো, সবাই চুপ, প্লীজ। একটুও শব্দ করবেন না।
সবাই নীরব হতেই ভলিউম বাড়িয়ে দিলো কিশোর।
নারী-পুরুষের কিছু সংলাপের পর চিৎকারটা হলো। তীক্ষ্ণ, কাঁপা কাঁপা, ভয়ঙ্কর। বদ্ধঘরে প্রতিধ্বনি তুললো। শেষ হলো ধীর লয়ে।
সবাই অধীর হয়ে আছে। ভাবছে, দেয়ালের কোথাও কোনো গোপন ফোকরের দরজা খুলে যাবে, কিংবা দেয়ালের কোনো জায়গায় ফাঁক দেখা দেবে। আরব্য উপন্যাসের আলিবাবার গুহার মতো।
সে-রকম কিছু ঘটলো না।

জানতাম, হবে না! উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো, ধপ করে আবার বসে পড়লো শোঁপা। ঘাড় ডলছে। ওরকম কিছু থাকলে আগেই পেয়ে যেতাম। তেমন। জায়গা নেই এঘরে। ছবিগুলোও নেই।
আমার মনে হয়, আছে, হঠাৎ-আগ্রহে সামনে ঝুঁকে পড়লো কিশোর। একটা পরিবর্তন চোখে পড়েছে তার। বুঝতে পারছে, কোথায় লুকানো রয়েছে ছবিগুলো। আবার করে দেখি, বললো সে। ভলিউম বোধহয় আরও বাড়াতে হবে।
ভলিউম পুরো বাড়িয়ে দিলো কিশোর। টেপ রিওয়াইণ্ড করে প্লে-বাটন টিপলো।
ভীষণ চিৎকার যেন চিরে দিলো কানের পর্দা। চড়ছে...চড়ছে...চড়ছে..কানে আঙুল দিতে হলো সবাইকে।
এই সময় ঘটলো ঘটনাটা।
ভেঙে চুরচুর হয়ে গেল বড় আয়নাটা। ঝুরঝুর করে মেঝেতে ঝরে পড়লো কাঁচ। মাত্র এক সেকেণ্ডেই ফ্রেমে আটকানো কয়েকটা ছোট টুকরো ছাড়া আর সব পড়ে গেল।
আয়নার জায়গায় এখন দেখা যাচ্ছে উজ্জ্বল রঙের একটা ছবি। ওদের চোখের সামনেই গোল হয়ে মুড়ে মেঝেতে পড়ে গেল ওটা। পেছনে আরেকটা। ওটাও পড়লো। তার পেছনে আরও একটা। পর পর পাঁচটা ছবি পড়লো কাঁচের টুকরোর ওপর। ফ্রেমের পেছনের শক্ত পর্দা আর আয়নার মাঝখানে রাখা হয়েছিলো। ছবিগুলো।
অবশেষে বোঝা গেল চেঁচানো ঘড়িতে অ্যালার্মের জায়গায় চিৎকারের ডিস্ক লাগানোর কারণ।
ছুটে গেল শোঁপা। কাঁচের পরোয়া করলো না, মাড়িয়ে গিয়ে নিচু হয়ে তুলে নিলো একটা ছবি। কালোর পটভূমিকায় ঝলমল করে উঠলো গাঢ় লাল, নীল, সবুজ। এগুলোই! হ্যাঁ, এগুলোই! ফিসফিস করছে সে, যেন জোরে কথা বললে কাঁচের মতোই ছবিগুলোও চুরমার হয়ে যাবে। দশ লাখ ডলার..পেলাম...
ঝটকা দিয়ে খুলে গেল লাইব্রেরির ভেজানো দরজা। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে আদেশ এলো, খবরদার, নড়বে না! হাত তোলো!
এক মুহূর্ত স্তব্ধ নীরবতা।
দরজার দিকে ঘুরে গেল সাত জোড়া চোখ।
দরজা জুড়ে দাঁড়িয়েছে দুজন পুলিশ। হাতে উদ্যত, রিভলভার। তাদের পেছনে উঁকি দিচ্ছে পুলিশ চীফ ইয়ান ফ্লেচারের মুখ। তার পেছনে মুসার বাবা মিস্টার রাফাত আমান। দুজন পুলিশের মাঝের ফাঁক বেড়ে গেল, ঠেলে সরিয়ে দেয়া হয়েছে তাদের। সেখানে দেখা দিলো আরেকটা মুখ। মাথার খুলি কামড়ে রয়েছে

যেন বাঁকা তারের মতো চুল, খাটো করে ছটা। কুচকুচে কালো মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত, ছবিগুলোর মতোই ঝলমল করছে ঝকঝকে সাদা দাঁত।
খাইছে, কিশোর, বলে উঠলো মুসা আমান। এক্কেরারে সময়মতো হাজির হয়ে গেছি, না? তা ঠিকঠাক আছো তো তোমরা? ঘুমোতে গিয়েছিলাম, বুঝলে। ঘুম এলো না। কেন যেন খালি দুশ্চিন্তা হচ্ছিলো তোমাদের জন্যে। তাছাড়া বাবা। একটা কথা বলেছে, খচখচ করছিলো মনে। তোমাকে বলার জন্যে অস্থির হয়ে উঠলাম। সকালের জন্যে আর বসে থাকতে পারলাম না। উঠে ফোন করলাম। তোমাদের বাড়িতে। শুনলাম রবিনদের বাড়ি গেছে। করলাম ওদের ওখানে। রবিনের মা বললো, রবিন তোমাদের ওখানে গেছে। ভাবলাম, হেডকোয়ার্টারে আছো। ফোন করলাম। ধরলো না, কেউ। সন্দেহ হলো। ছুটে গেলাম ওখানে। টেবিলের ওপর পেলাম তোমার নোট। ফোন করলাম এখানে। অনেকক্ষণ চেষ্টা করেছি। কেউ ধরলো না। তাড়াতাড়ি বাড়ি গিয়ে বাবাকে বললাম। তাকে নিয়ে। সোজা ছুটলাম থানায়। তারপর আর কি। পুলিশ নিয়ে চলে এলাম।
ঘরে ঢুকলেন ইয়ান ফ্লেচার। এগিয়ে এসে শোঁপার হাত থেকে নিয়ে নিলেন। ছবিটা। সাবধানে রাখলেন টেবিলে। একবার দেখেই মাথা নাড়লেন, চিনেছি। থানায় ফটো পাঠানো হয়েছিলো এটার। বছর দুই আগে এক গ্যালারি থেকে চুরি.: গিয়েছিলো। কিশোরের দিকে ফিরলেন। কালই বুঝেছি, ডেঞ্জারাস কোনো কেসে জড়িয়েছে। থানার কাছেই টিমের গাড়ি থেকে ঘড়ি চুরি হয়ে গেল! ভাগ্যিস মুসা। গিয়েছিলো, সময়মতো আসতে পেরেছি।
শোঁপার দিকে তাকালো কিশোর। ধরা পড়েছে, অথচ বিন্দুমাত্র উদ্বেগ নেই চেহারায়। শান্ত। হাসছে। ফ্লেচারের অনুমতি নিয়ে হাত নামালো। সিগার বের করে ধরালো। ধোয়া ছেড়ে বললো, চীফ, অ্যারেস্ট তো করলেন। কিন্তু আমার অপরাধ জানতে পারি?
সেটা আবার বলতে হবে নাকি? মেজাজ দেখিয়ে বললেন চীফ। চোরাই মাল সহ হাতেনাতে ধরেছি। তাছাড়া অন্যের ঘরে বেআইনী ভাবে ঢুকে মালপত্র নষ্ট...
তাই? চীফকে থামিয়ে দিলো শোঁপা। জোরে জোরে দুবার টান দিলো সিগারে। সেটা আঙুলের ফাঁকে নিয়ে ওপরের দিকে মুখ করে হালকা ধোয়ার মেঘ সৃষ্টি করতে করতে বললো, অযথা লজ্জায় পড়তে যাবেন না, প্লীজ। খবরের কাগজ ওলারা আপনার চাকরি খেয়ে ছাড়বে। আর যদি কপাল গুণে চাকরিটা বেঁচেই যায়, অজাগা-কুজাগায় ট্রান্সফার এড়াতে পারবেন না। আমি বেআইনী কিছুই করিনি। কতগুলো চোরাই ছবি খুঁজে বের করতে এসেছি। যে-কেউ সেটা করতে পারে, পেলে পুলিশের হাতে তুলে দিয়ে বাহবা নিতে পারে। আমিও শুধু তা-ই

করেছি। এই ছেলেগুলোকে জিজ্ঞেস করুন, কিশোর, রবিন আর টিমকে দেখালো সে। ওরা সাক্ষী। জিজ্ঞেস করুন, ওরাও আমার সঙ্গে খুঁজেছে কিনা?
কিন্তু মালপত্র নষ্ট..., খানিক আগের গলার জোর হারিয়েছেন ক্যাপ্টেন।
অনুমতি নিয়েই করেছি। মালিকের অবর্তমানে এই বাড়ি দেখাশোনার ভার রয়েছে এই মহিলার ওপর, টিমের মাকে দেখালো শোঁপা। তাকে বার বার জিজ্ঞেস করেছি আমি, খুঁজবো কিনা। ছবিগুলো পাওয়া গেছে। আপনারা এসেছেন। দয়া করে নিয়ে যেতে পারেন ওগুলো। আপনারা না এলে আমি নিজে গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসতাম। বিমল হাসি ছড়িয়ে পড়লো চিত্র-চোরের চেহারায়।
কিন্তু..কিন্তু কথা খুঁজে পাচ্ছেন না চীফ।
কিন্তুর কি আছে? জিজ্ঞেস করুন। সাক্ষীরা তো এখানেই আছে। ওরা মিথ্যে বলরে না। কিশোর, বলো না, আমি সত্যি বলছি, না মিথ্যে?
চোখ মিটমিট করলো কিশোর। অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলতে হলো, হ্যাঁ, স্যার, মিস্টার শোঁপা ঠিকই বলছেন। চোরাই ছবি খুঁজে বের করতে আমরাও সাহায্য করেছি তাকে।
কিন্তু ও ফেরত দিতো না! রাগে চেঁচিয়ে উঠলেন ফ্লেচার। অসহায় ভঙ্গিতে থাবা মারলেন নিজের উরুতে। কিছুতেই দিতো না। নিয়ে পালিয়ে যেতো।
সেটা আপনার ধারণা, শান্তকণ্ঠে বললো শোঁপা। প্রমাণ করতে পারবেন তো, আমি এখন যাই। জরুরী কাজ আছে। আর যদি অ্যারেস্ট করে নিয়ে যেতে চান, নিতে পারেন। নিজেরই ক্ষতি করবেন শুধু শুধু।
দুই সহকারীকে হাত নামানোর ইঙ্গিত করলো শোঁপা। চলো! এখানে আর আমাদের দরকার নেই।
দাঁড়াও! চেঁচিয়ে উঠলো একজন পুলিশ। এতো সহজে ছাড়া পাবে না। পুলিশের পোশাক পরার অপরাধে ওই দুজনকে ধরতে পারি আমরা।
পারেন নাকি? হাই তুললো শোঁপা, যেন ঘুম ঠেকিয়ে রাখতে পারছে না। এই বিল, এদিকে এসো। ওনাকে দেখাও মনোগ্রামগুলো...
এন,ওয়াই-পি-ডি! অবাক হলেন চীফ।
হ্যাঁ, স্যার, বিনীত কণ্ঠে বললো শোঁপা। নিউ ইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্ট। এটা একটা নিছক রসিকতা। ওরা দুজনেই অভিনেতা, ভাড়া করেছি ছবিগুলো খোঁজায় সাহায্য করতে। জানেনই তো, নিউ ইয়র্ক এখান থেকে তিন হাজার মাইল দূরে, এই শহরে ওখানকার পুলিশের কাজ করার অধিকার নেই। করতে হলে আপনাদের অনুমতি নিয়ে করতে হবে। কাজেই, লস অ্যাঞ্জেলেসে নিউ ইয়র্ক পুলিশের ব্যাজ পরাটা বেআইনী কিছু নয়, আসলে কোনো ব্যাপারই নয় ওটা। ওরা নিউ ইয়র্কের আসল পুলিশ হলে অনুমতি না নেয়ার জন্যে আটকাতে

পারতেন। আপনারা। অভিনয়ের জন্যে পারেন না। তা-ও পারতেন, যদি পুলিশের পোশাক পরে ধাপ্পা দিয়ে কারো কোনো ক্ষতি করতো। কিছুই করেনি ওরা।
ঢোক গিললো কিশোর। আরেকবার গাধা মনে হলো নিজেকে। অন্যদের, মতো সে-ও ঠকেছে, দুজনকে লস অ্যাঞ্জেলেসের পুলিশ মনে করে।
এই, চলো,,সহকারীদের বলে দরজার দিকে রওনা হলো শোঁপা।
বাঘের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন সেদিকে ক্যাপ্টেন। শক্ত হয়ে গেছে হাতের মুঠো।
দরজার কাছে গিয়ে ঘুরলো শোঁপা। হাসি হাসি মুখ করে বললো, কিশোর, চলি। তোমার সাথে কাজ করার মজাই আলাদা। আগেও বলেছি, আবার বলছি, আমার দলে চলে এসো। তোমার বুদ্ধি আর আমার অভিজ্ঞতা একসাথে হলে দুনিয়ার কোনো বাধাই বাধা থাকবে না আমাদের জন্যে। আসবে?
আপনি বরং আরেক কাজ করুন না, পাল্টা প্রস্তাব দিলো কিশোর। চুরি ছেড়ে গোয়েন্দা হয়ে যান। আমাদের সঙ্গে হাত মেলান। দুনিয়ার সব না হোক, কিছু চোর অন্তত চুরি ছাড়তে বাধ্য হবে। কিংবা হাজতে ঢুকবে।
স্থির দৃষ্টিতে এক মুহূর্ত কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইলো শোঁপা। তারপর হাসলো। এ-কারণেই তোমাকে আমার পছন্দ, ইয়াং ম্যান। আই লাইক ইউ। চলি, আবার দেখা হবে।
আমার সঙ্গেও তোমার দেখা হবে, শোঁপা, কঠিন কণ্ঠে বললেন ফ্লেচার। কথা দিচ্ছি, এবারের মতো আর বোকামি করবো না তখন। অসময়ে হাজির হবো
তার দিকে চেয়ে সামান্য মাথা নুইয়ে, হেসে বেরিয়ে গেল শোঁপা।

.

চেঁচানো ঘড়ির কেসের বিবরণ লিখে শেষ করেছে রবিন। উপসংহারে লিখলোঃ
দক্ষিণ আমেরিকায় খোঁজ নিয়েছে পুলিশ। সত্যিই মারা গেছে হ্যারিসন ব্লক।
সেই গ্যারেজ থেকে ধরা হয়েছে ডিংগো, মারকো, আর লারমারকে। তেমনি। হাতকড়া পরা অবস্থায়ই ছিলো ওরা, ছুটতে পারেনি। নিজেদের অপরাধ স্বীকার করেছে। ব্লকই ছবিগুলো রান্নাঘরে লুকিয়েছিলো টিমের বাবাকে ফাঁসানোর জন্যে, এই জবানবন্দীও দিয়েছে আদালতে। জেল থেকে মুক্তি পেয়েছে বেকার ডেলটন।
আ স্ক্রীম অ্যাট মিডনাইট নাটকে চিৎকার করেছে ব্লক, সেই চিৎকারই ডিস্কে রেকর্ড করে ঘড়িতে ঢুকিয়েছে। নাটকটিতে একটা দৃশ্য ছিলো, চিকারের শব্দে চুরচুর হয়ে ভেঙে গেছে একটা আয়না। ছবি লুকানোর ক্ষেত্রে ওই কায়দাটাকেই কাজে লাগিয়েছে ধড়িবাজ ব্লক। তার জানা ছিলো, বিশেষ পরিবেশে, বিশেষ শব্দ তরঙ্গের জোরালো ধাক্কা সইতে পারে না পাতলা কাঁচ, ভেঙে যায়।

সেদিন রাতে, নাটকের ওই দৃশ্যটার কথাই বলেছিলেন মিস্টার রাফাত আমান। শুনে, মুসার মনে হয়, তথ্যটা জরুরী, কিশোরকে জানানো দরকার।

.

থুতনিতে কলমের মাথা ঠেকিয়ে কিছুক্ষণ ভাবলো রবিন। আর কোনো পয়েন্ট আছে? না, সবই লেখা হয়েছে। কিছু বাকি নেই। ফাইলটা বন্ধ করে, ফিতে বেঁধে, সযত্নে রেখে দিলো ফাইলিং কেবিনেটে। আগামী দিন এটা নিয়ে যাবে বিখ্যাত চিত্রপরিচালক মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফারের অফিসে দেখা করার জন্যে।

ভলিউম ৯ – পোচার – তিন গোয়েন্দা – রকিব হাসান – সেবা প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি, ১৯৯০

মাউনটেইনস অভ দা মুন! বিড়বিড় করলো কিশোর পাশা, উত্তেজনায় মৃদু কাঁপছে কণ্ঠ।

বাংলায় কি হয়? জিজ্ঞেস করলো রবিন। চাঁদের পাহাড়?

কিংবা চন্দ্রপর্বত! বললো গোয়েন্দাপ্রধান।

নামের মতোই সুন্দর পাহাড়টা, মুসা বললো। নিচের পর্বতশ্রেণীর দিকে তাকিয়ে আছে সে।

দক্ষিণ-পুবে উড়ে চলেছে ছোট্ট বিমান। গন্তব্য, টিসাভো। লোকে বলে রহস্য আর খুনের খুনি টিসাভো। আফ্রিকার বৃহত্তম ন্যাশনাল পার্ক, যেখানে জন্তুজানোয়ারেরা নিরাপদে থাকার কথা, কিন্তু থাকতে পারে না। পোচার, অর্থাৎ চোরাশিকারীরা বেআইনীভাবে মেরে শেষ করছে হাতি, গণ্ডার, জিরাফ, জলহস্তী আর অন্যান্য প্রাণী। তাদের ঠেকানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছেন গেম ওয়ারডেন ডেভিড টমসন মুসার বাবার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু, কিন্তু পারছেন না। আর পারবেনই বা কি করে? আট হাজার বর্গমাইল বুনো অঞ্চলের কোথায় যে লুকিয়ে থাকে পোচাররা, খুঁজে বের করা কি সহজ কথা?

প্লেন চালাচ্ছেন টমসন। কপালে, গভীর ভাঁজ পড়েছে, ভাবছেন। কন্ট্রোলে। হাত। নিচে একে একে সরে গেল ভিকটোরিয়া হ্রদ, নীল নদের উৎপত্তিস্থল, সিংহের জন্যে বিখ্যাত বিশাল সেরেংগেটি অঞ্চল, তুষারের মুকুট পরা মাউন্ট কিলিমানজারো...খেয়ালই করছেন না যেন তিনি। তার মন পড়ে আছে আরও দূরের সেই রক্তাক্ত এলাকায়, যেখানে মাঝে মাঝেই চোখে পড়বে রক্ত, আতঙ্ক, অত্যাচার আর মৃত্যুর রোমহর্ষক দৃশ্য।

এক অসম লড়াই, আনমনে বললেন তিনি। শত্রুরা দলে এতো ভারি, কিছুতেই পারছি না। মাত্র দশ জন লোক আমার পোচারদের তুলনায় নগণ্য। কি করে পারবো? এক জায়গা থেকে খেদাই তো পরদিনই আরেক জায়গায় গিয়ে শুরু করে। নাহ, আর পারা যায় না।

কজন গেছে আপনার? কিশোর জিজ্ঞেস করলো।

বাইশ জন ছিলো। বারো জনকে মেরে ফেলেছে।

তীর দিয়ে?

হ্যাঁ। বিষ মাখানো তীর। পোচারদের সবার কাছে অস্ত্র আছে; তীর-ধনুক, বল্লম, ছুরি, কারো কারো কাছে পুরনো মাসকেট রাইফেল। আমার দুজন লোক ওদের ফাঁদে আটকা পড়েছিলো, জানোয়ার ধরার জন্যে পেতে রাখা ফাঁদ। মাসখানেক পরে ওভাবেই পেয়েছি, শুধু দুটো কঙ্কাল।

খাইছে! আঁতকে উঠলো মুসা। কঙ্কাল?
হ্যাঁ। আর কিছুই অবশিষ্ট ছিলো না।
নিশ্চয় পানির অভাবে মরেছে? অনুমানে বললো রবিন। তারপর হায়েনারা এসে খেয়ে ফেলেছে…
আটকা পড়া জীবকে অসহায় দেখলে মরার অপেক্ষা করে না হায়েনারা। আমার বিশ্বাস, জ্যান্তই খেয়ে ফেলেছে।
শিউরে উঠলো রবিন। মুখ কালো হয়ে গেল। মুসার মুখও থমথমে। আফ্রিকায়, তার নিজের মহাদেশে বেড়াতে আসার কথাটা ভাবতে ভালো লাগছে না আর এখন। চট করে তাকালো একবার কিশোরদের দিকে। গোয়েন্দাপ্রধানকেও চিন্তিত দেখাচ্ছে। তাকিয়ে আছে নিচের দিকে।
এবারের ছুটিতে আফ্রিকায় বেড়াতে আসার প্রস্তাবটা মুসার। রবিন আর কিশোরও শুনেই রাজি। তিনজনে মিলে অনেক বলেকয়ে রাজি করিয়েছে মুসার বাবা মিস্টার রাফাত আমানকে। তিনি সর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। ডেভিড টমসনের সঙ্গে যোগাযোগ করে বলেছেন, ছেলেদের পাঠাতে চান। তিন গোয়েন্দার সংক্ষিপ্ত পরিচয়ও জানিয়েছেন বন্ধুকে। বন্ধুর অনুরোধ এড়াতে পারেননি। ওয়ারডেন, কিংবা এড়াতে চানওনি হয়তো, তাই তিন কিশোরকে কিছুদিন মেহমান রাখতে রাজি হয়ে জবাব দিয়েছেন চিঠির।
ছেলেদের মনমরা হয়ে যেতে দেখে হাসলেন ওয়ারডেন। কি ব্যাপার, ভয় পেয়ে গেলে নাকি?
না না, তাড়াতাড়ি বললো কিশোর। ভয় পাবো কেন? বিপদকে ভয় পাই না আমরা।
রাফাতও তাই লিখেছে। তোমরা ভীষণ সাহসী। আমাজানের গহীন জঙ্গল থেকেও জন্তুজানোয়ার ধরে নিয়ে এসেছিলে। এসব শুনেই রাজি হয়েছি। নইলে যেখানে পোচার আছে, আসতে বলতাম না। পোচার মানেই তো বিপদ।
দশজন আছে তো, মুসা বললো। এখন ধরে নিতে পারেন তেরো জন। আমরাও আছি আপনার সঙ্গে। ওই পোচার ব্যাটাদের একটা ব্যবস্থা না করে আমরাও আমেরিকায় ফিরছি না।
দেশপ্রেম?
দেশপ্রেমিক, বুনো পশু-পাখি-প্রেমিক, অন্যায়-বিরোধী, যা খুশি বলতে পারেন। কিন্তু টিসাভোর ওই পোচারগুলোকে খতম না করে আমি মুসা আমান অন্তত ফিরছি না।
এক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে নিগ্রো ছেলেটার দিকে তাকিয়ে রইলেন টমসন। তারপর মাথা নাড়লেন, তোমার বাবা মিথ্যে লেখেননি। সত্যি তোমরা ভালো ছেলে।

থ্যাঙ্ক ইউ, স্যার, কিশোর বললো।
ওই যে, তুষারে ঢাকা পর্বতের একটা ধার দেখিয়ে বললেন ওয়ারডেন। ওই টিসাভো।
চমৎকার দৃশ্য! কে ভাববে, ওরকম একটা জায়গায় সারাক্ষণ চলে মৃত্যুর আনাগোনা? সবুজ বন, দিগন্ত বিস্তৃত তৃণভূমি, নিঝুম পাহাড়, রূপালি নদী, শান্ত হ্রদ, উজ্জ্বল রোদ, নিবিড় ছায়া-সবকিছু মিলিয়ে তিন গোয়েন্দার মনে হলো যেন পৃথিবীর কোনো জায়গা নয় ওটা।
সুন্দরের পুজারি কিশোর পাশার স্বপ্নিল চোখ দুটো আরও গাঢ় হয়ে উঠলো। ভাবছে, বাংলাদেশেও কি এতো সুন্দর জায়গা আছে?
আল্লাহরে! এ-তো বেহেশত! প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো মুসা।
হ্যাঁ, মাথা দোলালো রবিন। সুন্দর জায়গা পৃথিবীর সবখানেই আছে। আমাদের আয়ারল্যাণ্ডেও আছে।
আছে, একমত হলেন ইংরেজ ওয়ারডেন। এবং সব জায়গাতেই শয়তানও আছে। ওরা না থাকলে…এই টিসাভোর কথাই ধরো, পোচারগুলো না থাকলে সত্যি স্বর্গ বলা যেতো জায়গাটাকে। জানোয়ারের নিরাপদ বাসভূমি, টুরিস্টদের আনন্দ। ওই যে নদীটা, একটা জায়গায় বেশি ছড়ানো দেখছো, ওখানে একটা আণ্ডারওয়াটার অভজারভেটরি আছে। ওখান থেকে নদীর নিচের দৃশ্য দেখা যায়। এখন আর সুন্দর কিছু দেখবে না, পোচাররা সর্বনাশ করে দিয়েছে। ডজন ডজন জলহস্তী মেরে… দৃশ্যটা কল্পনা করে চেহারা বিকৃত করে ফেললেন তিনি।
মেরে ফেলে ওদের কি লাভ? জানতে চাইলো মুসা।
ওদের যা দরকার নিয়ে চলে গেছে। জলহস্তীর একেকটা মাথার দাম চার পাঁচ হাজার ডলার। চামড়ার দামও অনেক। মাথা কেটে, চামড়া ছিলে, ধড়টা। ফেলে রেখে গেছে।
নরপিশাচের দল! দাঁতে দাঁত চাপলো কিশোর। খেতে যদি, তা-ও এক কথা ছিল, শুধু কিছু টাকার জন্যে এভাবে খুন করে জানোয়ারগুলোকে!
ওদের পিশাচ বললে কম বলা হয়, টমসন বললেন। জানোয়ারের ব্যবসা করে কোটিপতি হয়ে, গেল একেকজন মানুষের জন্যে শিকার নিষিদ্ধ নয়, কোনোকালেই ছিলো না। আদিম যুগেও শিকার করতো মানুষ, মাংসের জন্যে, খেয়ে বাঁচার তাগিদে। আফ্রিকায় এখনও অনেক উপজাতি আছে, শিকার না পেলে যারা না খেয়ে মরবে। তাদের শিকারে কিছু হয় না, জন্তুজানোয়ারের বংশ। লোপ পাওয়ার কোনো আশঙ্কা নেই। বড় একটা হরিণ মারতে পারলে এক-গা লোকের খাওয়া হয়ে যায়। আর ঘরে খাবার থাকলে অহেতুক জানোয়ারও মারে না তারা। কিন্তু ওই পোচাররা তো তা করে না। পালে পালে মারে। যতো বেশি।

মারতে পারবে, ততোই পয়সা। জানোয়ার খুন করার জন্যে রীতিমতো আর্মি বানিয়ে নিয়েছে ওরা, থামলেন ওয়ারডেন। তারপর বললেন, টিসাভোর পোচারদের সর্দারের নাম লঙ জন সিলভার। অবশ্যই ছদ্মনাম। ট্রেজার আইল্যাণ্ডের সেই কুখ্যাত জলদস্যু সিলভারের নাম নিয়েছে। তফাত শুধু স্টিভেনসনের ডাকাতটা লুট করতে সোনার মোহর, আমাদের ডাকাতটা করে জানোয়ারের দাঁত-মাথা-হাড়-চামড়া।
সিলভারের আসল পরিচয় জানেন? জিজ্ঞেস করলো কিশোর।
না। পরিচয় তো দুরের কথা, তার আসল চেহারাই নাকি কেউ দেখেনি। বিদেশী, না আফ্রিকান, তা-ও জানি না। আশা করি, এই রহস্যের সমাধান তোমরা করতে পারবে।
চেষ্টা করবো।
মোমবাসা থেকে জাহাজে করে পৃথিবীর বড় বড় শহরে পাচার হয়ে যাচ্ছে অসংখ্য জলহস্তীর মাথা, গাদা গাদা হাতির দাঁত, গণ্ডারের শিং; চিতাবাঘ, বানর, পাইথনের চামড়া। মাঝেসাঝে কিছু কিছু মাল আটক করা হয়, দুএকটা চুনোপুটি ধরাও পড়ে, কিন্তু আসল লোকটার পাত্তাও পাওয়া যায় না। যাদেরকে ধরা হয়, তারাও কিছু বলতে পারে না। হয়তো সে মোমবাসার কোনো ধনী ব্যবসায়ী, কিংবা এ-দেশের কোনো উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসার আর্মি গড়তে তাই তার। সুবিধে হয়েছে। তবে সবই অনুমান। তাকে না ধরা পর্যন্ত কোনো কিছুই শিওর হয়ে বলা যাবে না।

.

বিমানটা জার্মানীর তৈরি, চার সীটের একটা স্টর্ক বিমান। ডুয়্যাল কনট্রোল। জয়স্টিকের এক মাথা ধরে রেখেছেন টমসন। আরেক মাথা কো-পাইলটের সীটে বসা মুসার দুই হাঁটুর ফাঁকে। সতৃষ্ণ নয়নে বার বার ওটার দিকে তাকাচ্ছে মুসা, চেপে ধরার ইচ্ছেটা অনেক কষ্টে রোধ করছে। চালাতে পারবে কিনা সন্দেহ আছে। তার। কিছু দিন ধরে প্লেন চালানো শিখছে সে। ওগুলো সব আমেরিকান প্লেন, এটা জার্মান। ইনস্ট্রমেন্ট প্যানেলের সমস্ত যন্ত্রপাতির তলায় আর মিটারের লেখা জার্মান ভাষায়, বেশির ভাগই পড়তে পারে না। তাছাড়া যন্ত্রপাতিগুলোও কেমন যেন এলোমেলো, আমেরিকানগুলোর সঙ্গে মিল কম। পারবে, ভাবলো মুসা, সময় লাগবে আরকি। প্র্যাকটিস করতে হবে।
ওই যে উঁচু পাহাড়টা, দেখালেন ওয়ারডেন। চোখা চূড়া।
হ্যাঁ, দেখছি, মুসা বললো। ওপরে প্যাভিলিয়ন মতো কি যেন।
প্যাভিলিয়নই। তাতে টেলিস্কোপ বসানো। একে আমরা বলি পোচারস লুকআউট। ওই টেলিস্কোপ দিয়ে সারাক্ষণ নজর রাখে রেঞ্জাররা, পোচার আছে কিনা দেখে।

কতদূর দেখা যায় ওখান থেকে? মুসার পেছনের সীট থেকে জিজ্ঞেস করলো রবিন।

বেশি না, জবাব দিলেন টমসন। মাত্র কয়েক মাইল। আরও বেশি যেতো, বন আর পাহাড়ের জন্যে পারা যায় না। চোখের সামনে বাধা হয়ে যায়। না হলেও বা আর কতদূর দেখতাম? আট হাজার মাইল এলাকা, পুরোটা দেখতে হলে কয়েক শো লুকআউট দরকার। সেটা অসম্ভব। অতো জোগান দিতে পারবে না। সরকার। লোকই দিতে পারে না। ছিলো বাইশ জন, বারো জন শেষ। এরপর কতো লেখালেখি করছি, লোকের জন্যে। অবশেষে রাজি হয়েছে। কাল-পরশু আরও বিশ-তিরিশজন পাবো আশা করি।

পাহারা দেয়া হয় তাহলে কি করে? পেছন থেকে জানতে চাইলো কিশোর। প্লেন নিয়ে ঘোরেন সারাদিন?

সারাদিন হয় না। শুধু আমি চালাতে পারি এটা। পোচার দেখা ছাড়াও আরও অনেক কাজ আছে আমার। তবু সময় পেলেই উড়ি।...আমাদের ক্যাম্প দেখা যাচ্ছে। পোচারস লুকআউটের ওপাশে।

সামনে মাইল পাঁচেক দূরে কতগুলো কেবিন দেখা গেল, কুঁড়ে বলাই ভালো। খড়ের চালা, বাঁশের বেড়া। ওটাই তাহলে বিখ্যাত কিতানি সাফারি লজ! অবাক হলো তিন গোয়েন্দা। টুরিস্ট মৌসুমে এখানেই এসে দলে দলে ভিড় জমায়। ইউরোপ-আমেরিকার লোকেরা! আর দশটা খুদে আফ্রিকান গ্রামের সঙ্গে বিশেষ, তফাত নেই ক্যাম্পটার।

চঞ্চল হয়ে ঘুরছে মুসার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। বায়ে হাত তুলে জিজ্ঞেস করলো, ওটা কি?

একবার চেয়েই শাঁ করে প্লেনের মুখ ঘুরিয়ে দিলেন ওয়ারডেন। উড়ে চললেন সেদিকে। তুমি খুব ভালো রেঞ্জার হতে পারবে, মুসা। চোখ আছে। ওটাটাপ লাইন।

ট্র্যাপ-লাইন?

আমি জানি ট্র্যাপ-লাইন কি, রবিন জবাব দিলো। পোচারদের পাতা ফাঁদের। সারি।

হ্যাঁ, ঠিকই বলেছে, টমসন বললেন।

দেখে তো বেড়া মনে হচ্ছে, বললো কিশোর।

বেড়া-ই। কাঁটা ঝোপ আর বাঁশ দিয়ে বানায় পোচাররা। পঞ্চাশ গজ থেকে শুরু করে এক মাইল, দুমাইল পর্যন্ত লম্বা করে। এটা মাইল খানেকের কম হবে না। মাঝে ফাঁকগুলো দেখছে না, প্রত্যেকটা ফাঁকে একটা করে ফাঁদ পাতা আছে।

জানোয়ার ধরা পড়ে কি করে? মুসা জিজ্ঞেস করলো।

ধরো, তুমি একটা জানোয়ার। চরে খেতে খেতে চলে এলে বেড়ার কাছে। ওপাশে যাওয়ার ইচ্ছে হলে কি করবে? এতো লম্বা বেড়া ঘুরে যাবে না নিশ্চয়। উঁচু,

লাফিয়ে যাওয়াও কঠিন। তার চেয়ে সহজ কাজটাই করবে, ফাঁক দিয়ে বেরোনোর চেষ্টা করবে। এমন ভাবে বেরোতে চাইবে, যাতে বেড়ার কাটা তোমার গায়ে না লাগে। জায়গা মতো লাগানো আছে তারের ফাঁস। মাথা দিয়ে ঢুকে আটকে যাবে তোমার গলায়। ভয় পেয়ে তখন টানাটানি শুরু করবে, সেটাই স্বাভাবিক। খুলবে না ফাঁস, আরও চেপে বসবে গলায়, চামড়া কেটে মাংসে বসে যাবে। রক্তের গন্ধে ছুটে আসবে মাংসাশী জানোয়ার। জ্যান্তই ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে।

খেয়েই যদি ফেললো আমাকে পোচাররা, আর কি পাবে?

পাবে, পাবে। তুমি হাতি হলে ওরা তোমার দাঁত পাবে, পায়ের পাতা পাবে ওয়েইস্ট-পেপার বাস্কেট বানানোর জন্যে। লেজ দিয়ে বানাবে মাছি তাড়ানোর। ঝড়ন। হায়েনারাও ওসব খায় না; ফেলে যায়। গণ্ডার কিংবা অন্য জানোয়ার। হলেও অসুবিধে নেই। পোচারদের জিনিস পোচাররা পেয়েই যায়।

দ্রুত নামছে প্লেন।

কি করবেন? জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

পোচারদের ভয় দেখাবো। বোঝাবো, ওদের আড্ডা দেখে ফেলেছি। অনেক সময় ভয় পেয়ে সরে যায় ওরা, দলে লোক কম থাকলে। বেশি থাকলে অবশ্য। আক্রমণ করে বসে। ভালো করেই জানে ওরা, রেঞ্জার মাত্র হাতে গোণা কয়েকজন আমাদের। তবে আরও যে আসছে, সেকথা এখনও জানে না। ওরা এলে, রাস্তা দিয়ে দল বেধে এসে ধরবো ব্যাটাদের।

আরও নিচে নামলো বিমান। ঠিক বেড়ার ওপর দিয়ে উড়ে গেলেন টমসন। দেখা গেল, প্রায় প্রতিটি ফাঁকেই আটকা পড়েছে জানোয়ার। কোনোটা ছাড়া পাওয়ার জন্যে ছটফট করছে, কোনোটা লুটিয়ে রয়েছে মাটিতে, প্রাণহীন, নিথর। বেড়ার দুপাশে ঘোরাঘুরি করছে, মারামারি কামড়া-কামড়ি করছে শবভোজী প্রাণীর দল-হায়েনা, শিয়াল, বুনো কুকুর, শকুন। প্লেনের শব্দ ছাপিয়ে কানে। আসছে ওদের চিৎকার।

একশো চল্লিশ থেকে শুধু তিরিশ মাইলে গতিবেগ নামিয়ে আনলেন টমসন। গাছের জটলার ভেতরে কয়েকটা খড়ের ছাউনি চোখে পড়লো। পোচারদের অস্থায়ী আস্তানা। মাটির পঞ্চাশ ফুট ওপর দিয়ে সেদিকে উড়ে গেল বিমান।

এতোগুলো আছে ভাবিনি! বিড়বিড় করলেন ওয়ারডেন।

হঠাৎ বনের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো একঝক কালো মানুষ। হাতে তীর ধনুক আর বল্লম। প্লেন সই করে ছুঁড়ে মারলো। যদিও একটাও লাগলো না, বিমানের গায়ে।

বিশেষ কাজের জন্যে তৈরি করা হয়েছে এই প্লেন। সীটের নিচে পায়ের কাছে অ্যালুমিনিয়মের চাঁদরের পরিবর্তে লাগানো হয়েছে শক্ত প্লাস্টিক, যাতে নিচের সব কিছু পরিষ্কার দেখা যায়। সবই দেখতে পাচ্ছে ওরা।
আবার পোচারদের ওপর দিয়ে উড়ে গেল বিমান। ছুটে এলো আরও এক ঝাঁক তীর। একটা কনুই জানালার বাইরে রেখেছিলেন টমসন, ঝটকা দিয়ে নিয়ে এলেন ভেতরে। ভীষণ চমকে গেছেন। অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এলো মুখ থেকে। জয়স্টিক চেপে ধরলেন। দ্রুত উঁচু হয়ে গেল বিমানের নাক। সোজা ছুটলো। কিতানি সাফারি লজের দিকে।

.

পাশে বসে মুসা দেখতে পেলো না, তার পেছনে বসে রবিনও না। কিন্তু পেছনে বসা কিশোর ঠিকই দেখলো। কালো ছোট একটা তীর বিধে রয়েছে টমসনের বাহুতে। মাংস এফোঁড়-ওফোঁড় করে বেরিয়ে আছে তীরের চোখা মাথা।
মুসাআ! চেঁচিয়ে উঠলো কিশোর। উনি, উনি তীর খেয়েছেন…
পাশে কাত হয়ে তীরটা দেখতে পেলো মুসা। ওরা ভয় পাবে বলে দেখাতে চাননি ওয়ারডেন, লুকিয়ে ফেলেছিলেন। শান্ত কণ্ঠে বললেন, কিচ্ছু ভেবো না। ঘুমিয়ে পড়ার আগেই ক্যাম্পে পৌঁছে যাবো।
বিষ আছে না? অন্য দুজনের মতোই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে রবিন।
বোধহয়।
তীরের মাথাটা ভালো করে দেখলো মুসা। মারাত্মক বিষাক্ত অ্যাকোক্যানূথেরা গাছের কালো আঠা আঠা রস মাখিয়ে নেয় জংলীরা, শুনেছে সে। তীরের মাথায় সে-রকম কিছু চোখে পড়লো না। কই, বিষ তো নেই। শুধু রক্ত।
ওখানে তো দেখবে না। ও-জায়গায় লাগায় না ওরা।
কেন?
নিজেদের গায়ে লাগার ভয়ে। পিঠের তূণে তীর নিয়ে ঝোপঝাড়ে চলাফেরা করে, দৌড়ায়। হোঁচট খেয়ে পড়ে। তখন যে-কোনো সময় তীরের খোঁচা লাগতে পারে। যার সঙ্গে থাকে তার গায়েও, যারা সাথে থাকে তাদের গায়েও। নিজেদের বিষে নিজেরাই মরবে।
তাহলে কোথায় লাগায়?
ডাণ্ডায়। তীরের মাথার ঠিক পেছনে।
সর্বনাশ! ওই জায়গাটাই তো ঢুকে আছে আপনার হাতে। বের করে ফেলা। যায় না?
তা যায়। কিন্তু নাগালই তো পাবে না, ঠিকই বলেছেন টমসন। তার আর কো-পাইলটের মাঝের সীটে দুই ফুট ব্যবধান। আহত হাতটা রয়েছে আরও দূরে।

ওখানে পৌঁছতে হলে যন্ত্রপাতির ওপরে ঝুঁকে হাত বাড়াতে হবে, মুসাকে, প্লেন নিয়ন্ত্রণ করা মুশকিল হয়ে পড়বে। রবিন রয়েছে আরও দূরে, তার পক্ষে আরও কঠিন।
আমি পারবো, কিশোর বললো। বলুন, কি করতে হবে।
এক মুহূর্ত ভাবলেন- টমসন। টেনে বের করতে পারবে না, ফলা আটকে যাবে। দেখো, মাথাটা ভাঙতে পারো কিনা।
পাইলটের সীটের ওপর দিয়ে ঝুঁকে এক হাতে তীরের মাথা, অন্য হাতে ডাণ্ডাটা চেপে ধরলো কিশোর। চাপ দিলো। আরে! যা ভেবেছিলো তা তো নয়। যথেষ্ট শক্ত। আরও জোরে চাপ দিলো সে। রক্তে মাখামাখি হয়ে গেল হাত, পিছলে যাচ্ছে। ধরে রাখতে পারছে না। ঘামতে শুরু করেছে দরদর করে। না, গরমে নয়, টমসনের কি রকম কষ্ট হচ্ছে সেকথা ভেবে। নিশ্চয় ভীষণ ব্যথা পাচ্ছেন। কিন্তু টু শব্দ করলেন না তিনি।
মট করে ভাঙলো অবশেষে। আলাদা হয়ে গেল তীরের মাথা। এবারের কাজ আরও জটিল। তাড়াতাড়ি ডাণ্ডাটা বের করে আনা।
ভাণ্ডা ধরে হ্যাঁচকা টান মারলো কিশোর। খুললো না ওটা।
রক্তাক্ত হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছে রবিনের দিকে ফিরলো। কিশোর। দেখো তো, ওঁর হাতটা ধরতে পারো, কিনা? নাগাল পাবে?
উঠে চেষ্টা করে দেখলো রবিন। প্লেনের ভেতরে জায়গাই নেই। পারলো না।
আবার একা কিশোরকেই চেষ্টা করতে হলো। ডাণ্ডাটা ধরে দাঁতে দাতে চেপে আবার মারলো টান। কন্ট্রোলের ওপর থেকে হাত নড়ে গেল টমসনের। দুলে উঠলো প্লেন। কিন্তু যেখানের ডাণ্ডা সেখানেই রইলো। তাড়াতাড়ি প্লেনটাকে সামলালেন তিনি।
হাড়ে আটকে গেল না তো? গলা কাঁপছে রবিনের। দেখো আরেকবার টেনে।
মুসার আশা ছিলো, বড় হয়ে সার্জন হবে, এখানেই বাদ দিয়ে দিলো সেই ভাবনাটা। মানুষের এসব কষ্ট দেখলে সহ্য হয় না তার।
তৃতীয়বার টান দিলো কিশোর। লাভ হলো না। শেষে মরিয়া হয়ে ডাণ্ডাটা ধরে ওপরে-নিচে করে, আশেপাশে নেড়ে ছিদ্রটা বড় করতে লাগলো। মানুষটাকে কতোখানি ব্যথা দিচ্ছে কল্পনা করে তার নিজেরই বুক ধড়ফড় শুরু হয়েছে। শেষ। পর্যন্ত আরেকবার ধরে গায়ের জোরে দিলো টান, ছাড়লো না, টানতে লাগলো।
খুলে এলো ডাণ্ডাটা।
মুখ খুললেন টমসন। কিশোর ভাবলো বজ্জাত ছেলে বলে তাকে গাল দেবেন ওয়ারড়েন। কিন্তু শান্ত কণ্ঠে বললেন শুধু তিনি, গুড বয়!

ধপ করে সীটে এলিয়ে পড়লো কিশোর। হাঁপাচ্ছে, ঘামছে। কেনিয়ার প্রচণ্ড গরম তো আছেই, সেই সাথে ভয়ানক উত্তেজনা। চোখের সামনে ডাণ্ডাটা তুলে। দেখলো সে। ভাঙার মাথার কাছে লেগে রয়েছে লাল রক্ত আর কালো বিষ।
কিন্তু এতো কষ্ট করে তীরটা খুলে লাভ হবে তো? ওয়ারডেন কি বাঁচবেন? বিষ যা ঢোকার তা তো ঢুকেই গেছে রক্তে। সবই নির্ভর করে এখন তার দেহের প্রতিরোধ ক্ষমতার ওপর। এই বিষে শিশুরা কয়েক মিনিটেই মরে যায়। মহিলারা টেকে বড় জোর বিশ মিনিট। তবে, কিশোর শুনেছে, লড়াই করতে গিয়ে শত্রুর তীর খেয়ে দুই ঘন্টা বেহুশ হয়ে ছিলো একজন আফ্রিকান যোদ্ধা, তারপর ধীরে ধীরে সেরে উঠেছে।
আরও একটা ব্যাপার, বিষটা কতোখানি নতুন তার ওপরও নির্ভর করে অনেক কিছু। পুরনো হলে, ধুলো-ময়লা বেশি লেগে থাকলে কার্যক্ষমতা কমে যাবে অনেকখানি। মনে মনে প্রার্থনা করলো কিশোর, খোদা, তা-ই যেন হয়!
জয়স্টিকের ওপর ঢলে পড়লেন ওয়ারডেন। সঙ্গে সঙ্গে গোঁত্তা খেয়ে নাক পোচার নামিয়ে ফেললো বিমান, ধেয়ে চললো মাটির দিকে।
নিজের হাঁটুর ফাঁকে জয়স্টিকের আরেকটা অংশ ধরে জোরসে টান দিলো মুসা, সরাতে পারলো না। বেজায় ভারি টমসন। ভয়ঙ্কর গতিতে এগিয়ে আসছে। যেন ধরণী। চেঁচিয়ে উঠলো সে, জলদি সরাও ওকে!
নিচের দিকে ঝুঁকে গেছে বিমান। এই অবস্থায় কিশোর আর রবিনও সোজা হতে পারছে না। তাড়াতাড়ি সীটবেল্ট বেঁধে নিলো দুজনে। টমসনের কাধ ধরে টেনে সূরানোর চেষ্টা করলো কিশোর। রবিনের নাগালের মধ্যেই আসছে না তেমন, তবু কোনোমতে ওয়ারডেনের শার্টের কলার খামচে ধরে টানলো। মুসা চুপ। করে নেই; সে টেনে ধরে রেখেছে জয়স্টিক।
আস্তে আস্তে বেহুঁশ টমসনকে টেনে তুললো কিশোর আর রবিন।
দ্রুত এগিয়ে আসছে একটা লম্বা ক্যাপোক গাছ। চোখ বন্ধ করে স্টিকে টান মারলো মুসা। ভাবছে, গাছের সঙ্গে বাড়ি লাগলে মরতে কি খুব কষ্ট হবে? বাড়ি লাগলো না। শেষ মুহূর্তে শ করে গাছের ওপর দিয়ে বেরিয়ে এলো প্লেন।
ধরে না রাখলে আবার হেলে পড়ে যাবেন টমসন। দুদিক থেকে তাকে ধরে রেখেছে কিশোর আর রবিন। মুসা প্লেন সামলাতে ব্যস্ত। তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে ইনস্ট্রমেন্ট প্যানেলের দিকে। গিজমোটা কোথায়, যেটা ব্রেক নিয়ন্ত্রণ করে? জার্মান বিমানের ফুট প্যাডাল কি কি কাজ করে? চাপ দিতে গিয়েও পা সরিয়ে আনলো সে, সাহস হলো না। উড়ে চলা সহজ, কিন্তু ওঠানো নামানো খুব কঠিন কাজ। পারবে? নামাতে পারবে? এছাড়া আর কোনো উপায়ও নেই। ওদের।

চারজনের জীবন নির্ভর করছে এখন তার হাতে। যা করে আল্লাহ! ভেবে, তৈরি হয়ে গেল ল্যাণ্ডিঙের জন্যে।
ল্যাণ্ডিংফীল্ডটা খুঁজলো তার চোখ। সারি সারি কেবিন দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু অ্যাসফল্টে বাঁধানো কোনো রানওয়ে চোখে পড়লো না। অবশেষে উইণ্ড-সকটা দেখতে পেলো। উড়ে গেল সেদিকে। রানওয়ে নেই। ঘাসে ঢাকা লম্বা এক চিলতে জমি। ওটাতেই বোধহয় নামানো হয় এই প্লেন।
যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়া শুরু করলো সে। কয়েক মিনিটেই অনেকখানি বুঝে ফেললো, কোনটা কি কাজ করে। ক্যাম্পের ওপর চক্কর দিলো একবার। উড়ে গেল আবার মাঠের দিকে। মনে মনে আন্দাজ করে নিলো কোন জায়গাটায় নামালে গাছের গায়ে ধাক্কা লাগবে না।
প্লেনের নাক নিচু করে ল্যাণ্ডি করতে যাবে, এই সময় এয়ারস্ট্রিপের ঘাসের মধ্যে একটা নড়াচড়া চোখে পড়লো। হলুদ আর কালো রঙের কি যেন। নড়ে উঠলো আবার। কী, বোঝা গেল। সিংহের একটা পরিবার।
রোদ পোহাচ্ছে ওরা। প্লেনের আওয়াজে কর্ণপাত করছে না। মুসার জানা। আছে, প্লেন, রেলগাড়ি, মোটরগাড়ির আওয়াজকে ভয় করে না সিংহ, বিশেষ করে ন্যাশনাল পার্কের জানোয়ারগুলো। ওসব যানবাহন দেখতে দেখতে গা সওয়া হয়ে গেছে ওদের।
সিংহগুলোর জন্যে প্লেন নামানো যাবে না, ল্যাণ্ডিঙের পথ জুড়ে রয়েছে ওগুলো। কখন যাবে না যাবে তারও ঠিক নেই। দেরিও করা যাচ্ছে না। টমসনের। অবস্থা খুব খারাপ। তাড়াতাড়ি কিছু একটা করতে হবে, তাড়াতে হবে। সিংহগুলোকে।
প্রায় ডাইভ দিয়ে ওগুলোর বিশ ফুটের মধ্যে চলে এলো বিমান নিয়ে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে আরাম করে শুয়ে-বসে আছে ওরা ঘাসের মধ্যে। অল্প বয়েসীগুলো অলস চোখে তাকালো প্লেনের দিকে, বয়স্কগুলো চোখই মেললো না। কালো কেশরওয়ালা বিশাল এক পশুরাজ চিত হয়ে আছে, বাঁকা করে চার পা তুলে রেখেছে আকাশের দিকে।
মারাত্মক ঝুঁকি নিয়ে মাটির একেবারে কাছাকাছি, সিংহগুলোর ওপরে চলে এলো মুসা। থ্রটল পুরোপুরি খুলে রেখেছে। প্রচণ্ড গর্জন করছে এঞ্জিন। এইবার একটা সিংহীর টনক নড়লো। বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে আর এখানে থাকা নিরাপদ মনে। করলো না। প্লেনের দিকে চেয়ে একবার মুখ ভেংচে উঠে দাঁড়ালো, তার শাবকগুলোকে জড়ো করে হেলেদুলে এগিয়ে চললো কয়েকটা গাছের দিকে।
আবার ফিরে এলো মুসা।
বিরক্ত হয়ে চোখ মেললো বুড়ো সিংহটা। বিকট হাঁ করে হুঙ্কার ছাড়লো একবার। দূর, এখানে ঘুমানো যায় নাকি? যত্তোসব! এরকম একটা ভাব করে। উঠে

দাঁড়ালো। রওনা হলো সিংহীটা যেদিকে গেছে সেদিকে। পরিবারের অন্যেরাও আর থাকলো না ওখানে। বুড়োর পেছন পেছন চললো।
ল্যাণ্ড করার জন্যে তৈরি হলো মুসা। প্রথমবার মাটিতে চাকা ছোঁয়াতে গিয়েও আবার তুলে ফেললো। সাহস হচ্ছে না। যদি ঝাঁকুনিতে ভেঙে পড়ে? দ্বিতীয়বারেও, পারলো না। তৃতীয়বারে আর ভাবলো না।
জোর ঝাঁকুনি লাগলো, তবে ভাঙলো না বিমান। মোটামুটি ভালোই ল্যাণ্ড করেছে। ঝাঁকুনি খেতে খেতে ট্যাক্সিইং করে ছুটলো। খানিক দূর এগিয়ে বিশাল এক গাছের মাত্র কয়েক ফুট দূরে আরেকবার জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে দাঁড়ালো বিমান, এঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেছে।

.

মরার মতো এলিয়ে পড়েছেন টমসন। নাড়ি দেখলো কিশোর। খুব মৃদু চলছে। আশা আছে এখনও। তিনজনে মিলে ধরাধরি করে মাটিতে নামালো তাঁকে। কুঁড়ে থেকে বেরিয়ে দৌড়ে এলো একটা লোক। কুচকুচে কালো এক নিগ্রো। পরনে হালকা রঙের ইউনিফর্ম। মাথায় মিলিটারিদের মতো ক্যাপ, ওটার পেছনে ঝুলছে পাতলা কাপড়ের কেপি, ঘাড় ঢেকে দিয়েছে–পোকামাকড়ের জ্বালাতন থেকে বাঁচার ব্যবস্থা। তিন গোয়েন্দার বুঝতে অসুবিধে হলো না, লোকটা একজন রেঞ্জার।
কি হয়েছে? ভাঙা ইংরেজিতে বলতে বলতে অচেতন দেহটার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো সে।
বিষ মাখানো তীর, জানালো কিশোর।
ওয়ারডেনের বুকে কান রাখলো রেঞ্জার। মরেনি। জজের কাছে নিয়ে যাবো। ঠিক করে দেবেন।
জজ দিয়ে কি হবে? ডাক্তার দরকার।
জজই ডাক্তার। ভালো করে ফেলবেন।
জজের ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন করার প্রয়োজন মনে করলো না কিশোর। পকেট থেকে রুমাল বের করে বাধলো টমসনের হাতে, ক্ষতের কিছুটা ওপরে।
ওয়ারডেনকে বয়ে নিয়ে আসা হলো মূল কেবিনটাতে। ভেতরে কয়েকটা ভালো চেয়ার আছে, আর একটা বড় ডেস্ক। এই কেবিনেই ঘুমান তিনি, অফিসও এটাই। বিছানায় শোয়ানো হলো তাকে। হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকলেন ছোটখাটো একজন মানুষ।
এই যে, জজ এসেছেন, রেঞ্জার বললো। তিনি ঠিক করে দেবেন।
চেহারা আর চামড়ার রঙ দেখেই বোঝা গেল জজের বাড়ি এশিয়ায়, সম্ভবত ভারতে। অ্যাকসিডেন্ট? জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

সংক্ষেপে জানালো রবিন।
আমি না থাকলে তো সর্বনাশ হতো, জজ বললেন। ভাগ্যিস এসে পড়েছিলাম। যাকগে, আর কোনো ভয় নেই। সব ঠিক হয়ে যাবে।
চুপচাপ জজকে দেখছে কিশোর। তার মনে হলো, টমসনের ভয়ানক বিপদে জজ মোটেও উদ্বিগ্ন নন। বরং যেন কিছুটা খুশিই লাগছে তাঁকে। কি জানি, হয়তো ওরকম হাসিখুশি স্বভাবই লোকটার। কিংবা হয়তো বুঝতে পারছেন, ভয়ের কিছু নেই, সেরে উঠবেন ওয়ারডেন।
প্রথমেই হাত থেকে দ্রুত রুমালটা খুলে ফেলে দিলেন তিনি।
এটা কি করলেন? বলে উঠলো কিশোর। রক্তে বিষ আরও বেশি ঢুকে যাবে না?
যা গেছে তা গেছেই, শান্ত কণ্ঠে বললেন জজ। আরও যাতে যেতে পারে সে-জন্যে খুলোম। এক জায়গায় আটকে রাখার চেয়ে সমস্ত সিসটেমে বিষ ছড়িয়ে দেয়াটাই ভালো। অ্যাকশন কমে যায় তাতে। বিশেষ করে অ্যাকোকেনথেরার।
এরকম থিওরি জীবনেও শোনেনি কিশোর। ভাবলো, কি জানি, এখানকার বিষের ব্যাপারে নিশ্চয় জজ সাহেব তার চেয়ে ভালো বোঝেন। তর্ক করলো না। বললো, ডিসটিলড ওয়াটার দিয়ে ধুয়ে নিলে ভালো হতো না?
খারাপ হবে আরও, খোকা, ধৈর্য ধরে ছেলেকে বোঝাচ্ছেন যেন অভিজ্ঞ পিতা। ওসব বোয়ামোছা বাদ দিয়ে আগে ইনজেকশন দিতে হবে। বিষের প্রতিষেধক।
অ্যামোনিয়াম কারবোনেট?
সরু হয়ে গেল জজের চোখ। ওই কিশোর ছেলেটা এতো কিছু জানে দেখে। অবাক হয়েছেন, যেন, কিছুটা অস্বস্তিও ফুটলো বুঝি চোখের তারায়। পরক্ষণেই মিষ্টি হাসি ছড়িয়ে পড়লো মুখে, দূর হয়ে গেল অস্বস্তি। এইবার ঠিক বলেছো। দেখি, ডিসপেনসারিতে আছে কিনা।
ওঘর থেকে বেরিয়ে, বারান্দা দিয়ে গিয়ে আরেকটা ঘরে ঢুকলেন জজ। কৌতূহলী হয়ে তার পিছু নিলো কিশোর। সময় মতোই গিয়ে ঢুকলো ডিসপেনসারিতে। দেখলো, তাকের সামনের সারি থেকে একটা বোতল তুলে নিয়ে সবগুলো সারির পেছনে রেখে দিচ্ছেন তিনি, এমন জায়গায়, সহজে যাতে চোখে পড়ে। পায়ের শব্দে ফিরে তাকালেন। অ্যামোনিয়াম নেই। পেলে ভালো। হতো। নেই যখন, কি আর করা? কোরামিনই দিতে হবে। হার্ট স্টিমুল্যান্ট। হৃৎপিণ্ডটাকে চাঙ্গা করে তুলতে হবে এখন।
একমত হলো কিশোর। জজের ওপর ভক্তি ফিরে এলো আবার! কোরামিন। খুঁজতে সাহায্য করলো তাকে।
কিশোর! ও কিশোর! রবিনের ডাক শোনা গেল। জলদি এসো! নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে!

বেডরুমে ছুটে গেল কিশোর।
কাগজের মতো সাদা হয়ে গেছে ওয়ারডেনের চেহারা। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। দ্রুত গিয়ে তার মুখে মুখ লাগিয়ে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়া হলো কিঞ্জ হাতে ঘরে ঢুকশোর। উরুতে দ্বির, কালচে বাদাগেই হঠাৎ চালাতে শুরু করলো সে।
চালিয়ে গেল, যতোক্ষণ না আপনাআপনি শ্বাস নিতে পারলেন টমসন। হৃৎপিণ্ডে উত্তেজক কিছু ঢোকাতে না পারলে থেমে যাবে আবার শিগগিরই। জজের হলো কি? সিরিঞ্জে কোরামিন ভরতে পারলেন না এখনও?
সিরিঞ্জ হাতে ঘরে ঢুকলেন জজ। টমসনের পাশে বসে সুচ লাগালেন ক্ষতে। ওখানে কে?–ভাবলো কিশোর। উরুতে দিলে ভালো হতো না? তারপর চোখ পড়লো সিরিঞ্জের ভেতরের তরল পাদর্থের ওপর, কালচে বাদামী।
আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে গেল কিশোর। সুচ ঢোকানোর আগেই হঠাৎ জজের কব্জি চেপে ধরলো। কপাল কুঁচকে তার দিকে তাকালেন জজ।
মাপ করবেন, স্যার, হাত ধরে রেখেই বললো কিশোর।
বোধহয় ভুল হয়েছে আপনার। রঙটা দেখুন। কোরামিন নয়, বরং অ্যাকোকেনথেরার মতোই লাগছে।
সিরিঞ্জের দিকে তাকালো জজ, আঁতকে উঠলো। তাই তো! ঠিকই তো বলেছো। সর্বনাশ করে দিয়েছিলাম আরেকটু হলেই। পাশাপাশি দুটো বোতল ছিলো। তাড়াহুড়োয় কোরামিন ভরতে যেয়ে ভুলে আরেকটা ভরে ফেলেছি।
প্রায় জোর করে সিরিঞ্জটা জজের আঙুলের ফাঁক থেকে বের করে নিয়ে ডিসপেনসারিতে রওনা হলো কিশোর। লোকটার ডাক্তারি বিদ্যার ওপর ভরসা নেই আর তার, সন্দেহ জাগছে। তবে ডিসপেনসারিতে ঢুকে সন্দেহ দূর হয়ে গেল। মিথ্যে বলেননি জজ। মাঝের তাকে পাশাপাশি দুটো বোতল রাখা আছে, একটাতে লেবেল লাগানো রয়েছে কোরামিন, আরেকটাতে অ্যাকো। ওভাবে রাখাটা স্বাভাবিক। কারণ একটার পর পরই আরেকটা ব্যবহার হয়। রেঞ্জাররা যখন বড় কোনো জানোয়ার ধরে, চিকিৎসা করার জন্যে, ওটাকে বেহুশ করে নিতে হয়। আগে। হাতি-গণ্ডার-জিরাফ-সিংহ কোনোটাই সচেতন অবস্থায় চিকিৎসা নিতে রাজি নয়। খুব সামান্য পরিমাণ অ্যাকোনাইট ঢুকিয়ে দেয়া হয় জানোয়ারের রক্তে। ডাটের সাহায্যে। তাতে বেহুশ হয়ে যায় জীবটা। পরে কোরামিন দিয়ে ওটাকে আবার সুস্থ করে তোলা হয়।
জজের ওপর থেকে সন্দেহ চলে গেল কিশোরের। একজন ভদ্রলোককে সন্দেহ করেছিলো বলে লজ্জা লাগলো এখন। বিষ ভরা সিরিঞ্জটা ভেঙে ফেলে দিয়ে নতুন আরেকটা সিরিঞ্জ বের করে তাতে কোরামিন ভরে নিলো। ফিরে এসে

জজকে অনুরোধ করলো, আমি পুশ করি, স্যার? পারবো, ফার্স্ট এইডের ট্রেনিং আছে আমার।
নীরবে মাথা কাত করলেন জজ। সরে জায়গা করে দিলেন।
টমসনের উরুতে ইনজেকশন দিলো কিশোর। তারপর নাড়ি ধরে বসে রইলো চুপ করে। শ্বাস আর বন্ধ হলো না তার। তবে নাড়ির গতিও বাড়ছে না, খুব ক্ষীণ। আধ ঘন্টা পর বাড়তে শুরু করলো। এতো দ্রুত, প্যালপিটেশন শুরু হয়ে গেল। ভালো লক্ষণ নয় এটা। ঘাবড়ে গেল সে। জজকে বললো সেকথা।
পায়চারি করতে করতে থমকে দাঁড়ালেন জজ। বললেন, ভয় নেই, ঠিক হয়ে। যাবে। ওরকমই হয়।
তা-ই হলো। ধীরে ধীরে কমে আবার স্বাভাবিক হয়ে এলো নাড়ির গতি।
সেকথা জানাতেই ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়লেন জজ। ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেললেন। উদ্বেগ চলে গেল চেহারা থেকে। বললেন, ওকে হারালে মস্ত ক্ষতি হয়ে যাবে আমাদের। ওর মতো লোক এখন দরকার, বেচারা। জানোয়ারগুলোকে বাঁচানোর জন্যে। পোচাররা শেষ করে ফেলবে সব। ওদের জ্বালায় অস্থির হয়ে আছি…ও হ্যাঁ, জানো না বোধহয়, আফ্রিকান ওয়াইল্ড লাইফ সোসাইটির আমি একজন ডিরেক্টর। ব্যাটাদের ধরতে পারলে, দাঁত কিড়মিড় করলেন তিনি। আর যদি কোর্টে আমার সামনে পাই! এমন শাস্তি দেবো…কি যে কষ্ট দিয়ে মারে জানোয়ারগুলোকে, না দেখলে বুঝবে না! চোখের কোণে পানি টলমল করে উঠলো তার। তাকালেন ওয়ারডেনের দিকে। ও শুধু আমার বন্ধু না, ভাইয়ের মতো। ও না বাচলে… গলা ধরে এলো তার। পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখ মুছলেন।
কারও দুঃখ সইতে পারে না মুসা। তার চোখেও পানি এসে গেল। রবিন নীরব। শুধু কিশোরের কোনো ভাবান্তর নেই। চুপচাপ তাকিয়ে আছে জজের। দিকে। চিন্তিত।

.

নড়ে উঠলেন টমসন। দুই লাফে গিয়ে কিশোরকে সরিয়ে পাশে বসে পড়লেন জজ। ওয়ারডেনের হাত তুলে নাড়ি টিপে ধরলেন।
চোখ মেলতেই উদ্বিগ্ন, অশ্রুভেজা একটা প্রিয় মুখ দেখতে পেলেন টমসন। উষ্ণ আন্তরিক চাপ অনুভব করলেন হাতে। চুপ করে পড়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর কথা বললেন। দুর্বল কণ্ঠই বুঝিয়ে দিলো কতোখানি নরম হয়ে গেছে তার। শক্তিশালী শরীরটা। থ্যাঙ্ক ইউ.. তুমি যে কতো উপকার করলে আমার! ছেলেদের ওপর নজর পড়তে বললেন, পরিচয় হয়েছে?

না, বললেন জজ। তোমাকে নিয়েই তো কাটলো। সময় আর পেলাম কই?। পোচার।
তাহলে তিন গোয়েন্দার সঙ্গে হাত মেলাও। ও কিশোর পাশা—মুসা আমান: রবিন মিলফোর্ড। ছেলেরা, এ হলো গিয়ে আমার প্রিয় বন্ধু জজ নির্মল। পাণ্ডা। এবার নিয়ে কয়েকবার প্রাণ বাঁচালো আমার। তুমি না থাকলে, নির্মল…
আরে রাখো তো ওসব কথা, বন্ধুকে থামিয়ে দিলেন জজ পাণ্ডা। মোলায়েম কণ্ঠে বললেন, এমন কোনো কঠিন কাজ ছিলো না। অবশ্য জানা থাকলে সব। সহজই মনে হয়। একটা কোরামিন ইঞ্জেকশন, ব্যস।
অনেক কিছু জানে ও, ছেলেদের কাছে বন্ধুর প্রশংসা করলেন ওয়ারডেন। কিভাবে কি করেছে ভালোমতো দেখেছো তো? শিখে রাখলে কাজ দেবে।
হ্যাঁ, তা দেখেছি, জবাব দিলো কিশোর। খুব কাছে থেকেই দেখেছি, জিভের ডগায় এসে গিয়েছিলো, না দেখলে এতোক্ষণে মরে যেতেন আপনি, কিন্তু বললো না। তাড়াহুড়োয় ওরকম ভুল করতেই পারে লোকে, জজ সাহেব তো আর ডাক্তার নন। ডাক্তাররাও ভুল ওষুধ দিয়ে রোগী মেরে ফেলে অনেক সময়। তাছাড়া। মিস্টার টমসনকে খুন করে তার কি লাভ?
তবে, খুন করার ইচ্ছে থাকলে মস্ত একটা সুযোগ গেছে। ক্ষতের মধ্যে রয়েছে। অ্যাকো বিষ, রক্তে ছড়িয়ে পড়েছে। আরও খানিকটা ইনজেক্ট করে ঢুকিয়ে দিলে কেউ ধরতে পারতো না, এমনকি ময়না তদন্তেও ফারাকটা বোঝা যেতো না। দূর, কি আজেবাজে কথা ভাবছে! নিজেকে ধমক দিয়ে জোর করে ভাবনাটা মন থেকে সরিয়ে দিলো কিশোর। ওই তো বসে আছেন হাসিখুশি ছোট্ট মানুষটা, নিষ্পাপ চেহারা, বন্ধুর জন্যে জান কোরবান।
শুনে খুশি হবে, নির্যাল, ওয়ারডেনের গলার জোর কিছুটা বেড়েছে। ছেলেগুলোর সুনাম আছে আমেরিকায়। এই বয়েসেই তুখোড় গোয়েন্দা হয়ে। গেছে। এমনকি পুলিশের চীফ পর্যন্ত ওদেরকে সার্টিফিকেট দিয়ে দিয়েছে। বেড়াতে এসেছে এখানে। খুব রেগেছে পোচারদের কথা শুনে। আমাদের সাহায্য করবে কথা দিয়েছে।
আচ্ছা! তাই নাকি? মিষ্টি করে হাসলেন জজ। খুব ভালো কথা। তবে ছেলেরা, সাবধান করে দিচ্ছি। এটা আমেরিকা নয়। আর হারানো আঙটি কিংবা বাচ্চার পুতুল খুঁজে দেয়ার ব্যাপারও নয়। এখানে একদল খুনীকে নিয়ে কারবার। এই তো, একটু আগেই তো দেখলে, ওয়ারডেনকেই শেষ করে দিচ্ছিলো।
নির্মল, এতো ছোট করে দেখোনা ওদের। অনেক অভিজ্ঞতা আছে, খুনে বদমাশও ধরেনি তা নয়। আমাজানের গভীর জঙ্গল থেকেও ঘুরে এসেছে ওরা, নরমুণ্ড

শিকারীদের খপ্পর থেকে পালিয়ে এসেছে, ধরে নিয়ে এসেছে অনেক দুর্লভ, ভয়ঙ্কর জানোয়ার।
কিন্তু তবু, নরম গলায় প্রতিবাদ করলেন জজ। পোচারদের সঙ্গে কারও তুলনা হয় না।
সেটা ঠিক। তবে আমরা নরম হয়ে আছি লোকবল নেই বলে। কাল থেকে বোধহয় আর থাকবে না।
কেন?
আরও জনা তিরিশেক রেঞ্জার আসছে।
কখন?
আশা করছি কাল দুপুরে।
হঠাৎ কি মনে পড়তে যেন চমকে উঠলেন জজ। হায় হায়, অনেক দেরি হয়ে গেছে। জরুরী কাজ আছে, ভুলেই গেছি। নাইরোবিতে যাচ্ছিলাম। ভাবলাম, পথেই যখন পড়লো দেখা করে যাই। মনে হয় তোমার ভাগ্যই আমাকে এখানে নিয়ে এসেছিলো। যাকগে, উঠি, নইলে রাতের আগে পৌঁছতে পারবো না। ও, আসল। কথাটাই এখনও জানা হয়নি। তীরটা কোন জায়গায় খেলে?:
পশ্চিমে ক্যাম্প করেছে ব্যাটারা। এখান থেকে মাইল সাতেক হবে।
তাহলে তো কাছেই। লোকও যখন পাচ্ছো, আশা করি ধরে ফেলতে পারবে। তোমাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম, বয়েজ। আবার সাবধান করছি। মনে। রেখো, এটা আমেরিকার আধুনিক শহর নয়, বলে, আবার একটা মিষ্টি হাসি উপহার দিয়ে বেরিয়ে গেলেন জজ।
দিন একটা গেল বটে তোমাদের! জোরে নিঃশ্বাস ফেললেন জজ। আমার জন্যে আর ভেবো না, ঠিক হয়ে যাবো। যাও, গিয়ে বিশ্রাম নাও। তিন নম্বর ব্যাণ্ডায় তোমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। কিছু দরকার হলে যে-কোনো একজন রেঞ্জারকে ডেকে বলো। ওদেরকে নির্দেশ দেয়া আছে।
কেবিন থেকে বেরিয়ে দেখলো ওরা, একটা গাড়ি চলে যাচ্ছে। নিশ্চয় জজ নির্মল পাণ্ডার গাড়ি। ভুরু কুঁচকে তাকালো কিশোর। ওদিকে যাচ্ছে কেন? নাইরোবির সড়ক তো উত্তরে। ওটা যাচ্ছে পশ্চিম দিকে!
পড়ন্ত বেলার রোদ লাগছে চোখেমুখে। চোখ ছোট ছোট করে গাড়িটার দিকে তাকিয়ে রইলো ওরা, যতোক্ষণ না ওটা ছায়াঢাকা বুনোপথে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে, গেল।
খাইছে! বলে উঠলো মুসা। ওদিকে গেল কেন? নাইরোবি তো ওদিকে গেল কেন? নাইরোবি তো ওদিকে নয়।
লোকটার আচরণ ভারি অদ্ভুত লেগেছে আমার, রবিন বললো।

কিশোর কিছু বললো না। ঘন ঘন চিমটি কাটছে নিচের ঠোঁটে। পোচার
***
কেবিন, বা কটেজের আফ্রিকান নাম, ব্যাণ্ডা। তিন নম্বর ব্যাণ্ডায় বেশ বড় একটা লিভিংরুম আছে, বড় বড় চেয়ারে আরাম করে বসা যায়। ওপর দিকে তাকালেই চোখে পড়বে খড়ের চালায় অসংখ্য টিকটিকি, মাছি পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়ছে, ধরে খেয়ে ফেলছে। পাশেই বেডরুম, তাতে তিনটে বিছানা পাতা। গোসলখানা আছে, ভাড়ার ঘর আছে। সব চেয়ে লোভনীয় মনে হলো ওদের কাছে, রেলিঙে ঘেরা বেশ ছড়ানো একটা বারান্দা। ডাইনিং টেবিল আছে ওখানে, আর কিছু ক্যাম্প চেয়ার বসে বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায়। জন্তুজানোয়ার আর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে পারবে। যতো খুশি।

তিরিশ ফুট দূরে আলাদা একটা কুঁড়েতে রান্নাঘর বানানো হয়েছে। একটা আফ্রিকান ছেলে দৌড়ে এসে জিজ্ঞেস করলো, খাবার লাগবে কিনা। হাসি এসে গেল মুসার।

খোলা জায়গায় বসে খাওয়া আর চমৎকার প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখা চললো একই সঙ্গে। সবুজ উপত্যকার পরে লাল পাহাড়, দূরে নীলকিলিমানজারো পর্বতের উনিশ হাজার ফুট উঁচু তুষারে ঢাকা চূড়া।

উপত্যকা থেকে রোদ চলে গেছে। নামছে গোধূলির আবছা অন্ধকার। কিন্তু সূর্য যে একেবারে ডুবে যায়নি, কিলিমানজারোর চকচকে চূড়ার দিকে তাকালেই বোঝা যায়। সাদা তুষার এখন গাঢ় লাল। সূর্য যতোই দিগন্তের নিচে হারিয়ে যেতে লাগলো, ফ্যাকাসে হয়ে গেল লাল রঙ, শেষে আর কিছুই থাকলো না। ঝুপ করে হঠাৎ যেন নেমে এলো অন্ধকারের চাদর। আকাশে ফুটলো বড় বড় উজ্জ্বল তারা।

দূরে দূরে ছিলো এতোক্ষণ জন্তুজানোয়ারেরা,রাত নামতেই খাবারের গন্ধে আর পানির লোভে পায়ে পায়ে এসে হাজির হলো অনেকে।

বসে বসে কিছুক্ষণ দেখলো ছেলেরা। সারা দিন প্রচণ্ড পরিশ্রম গেছে। ঘুমে জড়িয়ে এলো চোখ। বসে থাকতে পারলো না আর। উঠে, শুতে চললো।

ওদের মনে হলো, সবে শুয়েছে এই সময় দরজায় থাবা দিয়ে জাগিয়ে দেয়া। হয়েছে। চোখ মেলে দেখলো, বাইরে অন্ধকার কেটে গেছে। খোলা জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে ভোরের ধূসর আকাশ।

দরজা খুলে ঘরে ঢুকলেন টমসন। সকালের পেট্রলে যেতে চাও? জানোয়ার দেখার এটাই সবচেয়ে ভালো সময়।

ওয়ারডেনকে দেখে অবাক হলো তিন গোয়েন্দা। অসামান্য ক্ষমতা তাঁর শরীরের। এতো বড় একটা ধকলের পর এতো তাড়াতাড়ি সামলে নিলেন!

আপনার হাত কেমন? ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হাতের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলো কিশোর।
ভালোই। এই যে, নাড়তে পারছি। কপাল ভালো, মাংসে গেঁথে ছিলো। তীরটা, হাড়-টাড়ে লাগেনি। কদিনেই ভালো হয়ে যাবে। ওঠো, উঠে কাপড় পরে নাও। আমি কফির কথা বলছি।
হাতমুখ ধুয়ে কাপড় পরে বারান্দায় এসে দেখলো ওরা, টেবিলে বড় এক পাত্র কফি আর কয়েকটা কাপ সাজানো। বাইরে এখনও কুয়াশা। কিলিমানজারোর নিচের অংশটা দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু রোদ পড়ে চকচক করছে চূড়া। কাঁচা রোদে এখন হয়ে গেছে সোনালি। ভাসছে যেন কুয়াশার ওপর। দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। তিন গোয়েন্দা।
মুসাকে ঘন ঘন রান্নাঘরের দিকে তাকাতে দেখে হেসে ফেললেন টমসন। এখানে অন্যরকম নিয়ম আমাদের। ভোর বেলা অলস হয়ে থাকে জানোয়ারের: দল, বেশির ভাগই বাইরে থাকে। টুরিস্টদেরকে তাই এই সময়ই দেখানোর জন্যে নিয়ে যাওয়া হয়। শুধু কফি খেয়েই চলে যাই। নটার দিকে ফিরে এসে নাস্তা।
টুরিস্ট কই? রবিন জিজ্ঞেস করলো। আর কাউকে তো দেখছি না। ওই ব্যাণ্ডাগুলো সব খালি নাকি?
হ্যাঁ, জানালেন ওয়ারডেন। এখন টুরিস্ট সীজন নয়। তবে আগে এসময়ও কিছু কিছু আসতো। এখন সীজনের সময়ও আসে না, পোচারদের জ্বালায়। শয়তানগুলোকে দমাতে না পারলে কেনিয়া সরকারের একটা বড় ইনকাম নষ্ট হয়ে যাবে।
কফি খেয়ে এসে ওয়ারডেনের ল্যাণ্ড রোভারে উঠলো সবাই। আধ মাইল এগোতেই দেখা গেল, সামনে পথ রুদ্ধ। এক পাল মোষ দাঁড়িয়ে আছে। শখানেকের কম হবে না। বিশাল কালো শরীর, মস্ত শিং।
গাড়ি থামিয়ে দিলেন টমসন। ভেতর দিয়ে যাওয়া যাবে না।
দলের সব চেয়ে বড় মোষটা শিং বাগিয়ে তেড়ে এলো, থেমে গেল গাড়ির বিশ ফুট দূরে। ভয়ানক ভঙ্গিতে শিং নেড়ে হুমকি দিলো।
ব্যাটা দলের সর্দার, নিচু কণ্ঠে বললেন টসমন। বিপদ বুঝলেই হামলা চালাবে। চোখের পলকে সব কটা এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে আমাদের ওপর।
খাইছে! তাহলে? কুঁকড়ে গেল মুসা।
বসে থাকতে হবে আমাদের। ওরা চলে গেলে তারপর এগোবো।
মাটিতে পা ঠুকে কিছুক্ষণ ফোঁস ফোঁস করলো মোষটা। প্রতিপক্ষকে লড়াই ঘোষণা করতে না দেখে যেন নিরাশ হয়েই ফিরে চললল। কয়েক কদম গিয়ে ফিরে চেয়ে বিচিত্র একটা শব্দ করলো, যেন ভীতুর ডিম বলে ব্যঙ্গ করলো।

তারপর গিয়ে ঢুকলো পালের মধ্যে। উত্তেজিত হয়ে সর্দারের হাবভাব লক্ষ্য করছিলো দলটা, ভাটা পড়লো উত্তেজনায়। কেউ মুখ নামিয়ে ঘাস ছিঁড়তে শুরু করলো, কেউ বা বাচ্চার পরিচর্যায় মন দিলো। কয়েক মিনিট ওভাবেই কাটানোর পর রওনা হলো দলটা। হারিয়ে গেল বনের ভেতরে।

আবার চললল ল্যাণ্ডরোভার। পোচারস লুকআউটে চলে যাবো, বললেন ওয়ারডেন।

খোলা জায়গা পেরিয়ে বনে এসে ঢুকলো গাড়ি। জঙ্গল এখানে পাতলা, ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে গাছপালা। অ্যাকেইশাঁই বেশি। কাঁটা ঝোপঝাড় রয়েছে। অনেক। ওগুলোর ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছে হাটবীস্ট, ওয়াটারবাক, জেরিনুক, আর হাই-জাম্প লং-জাম্প দুটোতেই ওস্তাদ সুন্দর ইমপালা হরিণ। ঘোৎ ঘোঁৎ করে পথের ওপর এসে পড়ছে বনের ভাড় নামে পরিচিত শুয়োর, ওয়ার্টহগ। গাড়ি দেখে চমকে উঠে হাস্যকর ভঙ্গিতে শরীর মাথা নাচিয়ে গিয়ে আবার ঢুকে পড়ছে। বড় একটা গাছের মাথায় বসে থাকতে দেখা গেল এক ঝাঁক বেবুনকে। গাড়িটা নিচ দিয়ে যাওয়ার সময় কুকুরের মতো দাঁত ভেঙচে অনেকটা কুকুরের মতোই ঘেউ ঘেউ করে উঠলো।

এক জায়গায় দেখা গেল, গাছের ডাল-পাতা ভেঙে ভেঙে খাচ্ছে ডজনখানেক ছোট-বড় হাতি। একেবারে পাশ দিয়ে গেল গাড়িটা, ফিরেও তাকালো না ওরা। নিজের কাজে ব্যস্ত।

নানারকম জানোয়ার আর পাখি দেখতে দেখতে চলেছে ওরা। শটাশট ক্যামেরার শাটার টিপছে মুসা, যা দেখছে তারই ছবি তুলছে। কিশোরও তুলছে, তবে বেছে বেছে।

বন থেকে বেরিয়ে, উপত্যকা পেরিয়ে পাহাড়ের গোড়ায় পৌঁছলো ল্যাণ্ডরোভার। পাহাড়ী পথ বেয়ে উঠে এলো ওপরে, পোচারস লুকআউটে। টেলিস্কোপ চোখে লাগিয়ে যন্ত্রটার মতোই স্থির হয়ে আছে একজন রেঞ্জার। টমসন ডাকতে ফিরে চেয়ে স্যালুট করলো।

কিছু দেখা যাচ্ছে? জিজ্ঞেস করলেন ওয়ারডেন।

তেমন কিছু না। শুধু শকুন।

টেলিস্কোপে চোখ রেখে দেখলেন টমসন। সরে জায়গা করে দিলেন, ছেলেদের জন্যে। ওরাও একে একে দেখলো। বনের কিনারে আকাশে চক্কর মারছে কয়েকটা শকুন। মরা দেখতে পেলে যেমন করে।

পোচার আছে? কিশোর জিজ্ঞেস করলো।

মনে হয় না। আমাদের লজ থেকে জায়গাটা মাত্র দুমাইল। এতো কাছে আসার সাহস করবে না ব্যাটারা। তবু চলো, গিয়ে দেখি।

গাড়ি চলে গেল ওখানে। ছোট ছোট কয়েকটা গাছের গোড়ায় পড়ে আছে বিরাট একটা দেহ। ধারেকাছে পোচারদের ছায়াও নেই। ওরা গাড়ি থেকে নেমে এগোতেই ডানা জাপটে উড়ে গেল কয়েকটা শকুন।
গণ্ডার, বললেন টমসন।
মৃত জানোয়ারটার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো ওরা। পেটে পিপার মুখের সমান বড় এক ফোকর। ভেতরে নাড়িভুড়ি কিছু নেই, সব সাফ করে খেয়ে ফেলেছে। দুর্গন্ধে পাক দিয়ে ওঠে পেটের ভেতর। সইতে না পেরে নাকে রুমাল চাপা দিলো মুসা। রবিন তো ওয়াক থু করে বমিই করতে বসে গেল।
উঁকি দিয়ে গর্তের ভেতরে দেখলো কিশোর। বিড় বিড় করলো, বেচারা! কি করে মরলো? অসুখে?
তাই হবে হয়তো, মুসা বললো।
তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে গণ্ডারটার মাথার দিকে তাকিয়ে আছেন টমসন। ভুল করেছি আমি, বললেন তিনি। ভেবেছিলাম, পোচাররা এতো কাছে আসার সাহস পাবে না, ভুল বলেছি। দেখো, শিং নেই। কেটে নিয়ে গেছে। গণ্ডারের শিং খায় না। কোনো জানোয়ার। তার মানে পোচাররা নিয়ে গেছে। ওরাই মেরেছে এটাকে, গলার কাছে একটা ক্ষত দেখালেন। দেখো, বল্লম দিয়ে মেরেছে।
ইস, পিশাচ নাকি ওরা! গণ্ডারটার ক্ষতবিক্ষত লাশের দিকে তাকাতে পারছে না রবিন।
এটা আর এমন কি? ওদের নিষ্ঠুরতা তো দেখোইনি। চলো, দেখাবো।
কয়েক মিনিট গাড়ি চালিয়ে একটা জায়গায় এসে থামলেন টমসন। এই যে, টিসাভো নদী।
কোনো নদী চোখে পড়লো না ছেলেদের। শুধু কালো রুক্ষ একটা ছোট পাহাড়।
কই, নদী কোথায়? জিজ্ঞেস করলো মুসা।
নদীর ওপর দিয়ে হেঁটেছে কখনও? মুসার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বললেন ওয়ারডেন, হাসছেন মিটিমিটি। না হাঁটলে এটাই সুযোগ। হেঁটে নাও।
কালো পাথরে উপত্যকার ওপর দিয়ে ছেলেদের নিয়ে চললেন তিনি। একখানে থেমে জোরে লাথি দিলেন মাটিতে। ফাপা আওয়াজ হলো।
লাভার স্তর মনে হচ্ছে? কিশোর বললো।
লাভ-ই। আদিমকালে কোনো সময় কিলিমানজারো থেকে নেমে এসে ঢেকে দিয়েছে নদীটা। আমাদের পায়ের নিচেই বইছে ওটা। ভাটির দিকে যাচ্ছি আমরা।
যতোই এগোচ্ছে, কানে আসছে একটা ঝিরঝির শব্দ। বাড়ছে শব্দটা। শেষে, একটা টিলা ঘুরে এসে দেখতে পেলো, টিলার গোড়ার বিশাল ফোকর থেকে সগর্জনে ছিটকে বেরোচ্ছে তীব্রস্রোতা পাহাড়ী নদীর পানি। অতিকায় এক ড্রেনের

মুখ দিয়ে বেরোচ্ছে যেন। নিচে যেখানে পড়ছে, বড় একটা দীঘি তৈরি করেছে। সেখানে, কিংবা বলা যায় ছোট হ্রদ। হ্রদ থেকে বেরিয়ে উপত্যকা ধরে একেবেকে বয়ে গেছে সরু নদী।
এর নাম মিজিমা স্প্রিং। স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ থাকে পানি, ওয়ারডেন বললেন। কিন্তু এখন পানি পরিষ্কার নয়। লালচে বাদামী, দুর্গন্ধ হয়ে আছে।
এতোক্ষণ নদীর ওপর দিয়ে এসেছো, বললেন তিনি। এবার তলায় নিয়ে যাবো।
ছেলেদের নিয়ে একটা ঝোপের ভেতরে ঢুকলেন টমসন। মাটিতে একটা গর্ত দেখা গেল। ওটা দিয়ে ঢুকে, ঢালু সুড়ঙ্গ বেয়ে একটা প্রাকৃতিক গুহায় এসে ঢুকলো। ওরা। গুহাটাকে কেটে ঘরের মতো বানিয়ে নেয়া হয়েছে। আণ্ডারওয়াটার। অভজারভেটরি, নদীর তলার দৃশ্য দেখার জন্যে। জানালার ভেতর দিয়ে নদীর। নিচটা দেখা গেল পরিষ্কার। পানির ওপরে রোদ ঝলমল করছে, নিচেও আসছে। আলো।
জানালার কাছে নাক ঠেকালো তিন গোয়েন্দা। বাইরের দৃশ্য দেখে গা গুলিয়ে। উঠলো। অসংখ্য জলহস্তী, নদীর তলায় চরে বেড়াচ্ছে না আর ওগুলো, জলজ ঘাস ছিঁড়ে খাচ্ছে না, মরে ফুলে ঢোল হয়ে আছে। মরা লাশের স্তূপ, কোনো কোনোটা বেশি ফুলে গিয়ে ভেসে উঠেছে ওপরে। মারাত্মক ক্ষতগুলো থেকে এখনও রক্ত চুঁইয়ে বেরিয়ে মিশে যাচ্ছে পানির সঙ্গে। লেজ কাটা। জায়গায় জায়গায় চামড়া ছিলে নেয়া হয়েছে। বড় বড় শ্বদন্তগুলো সব উপড়ে তুলে নিয়ে গেছে পোচাররা। কিছু জানোয়ারের মাথা কেটে নিয়ে গেছে, বিশেষ করে মাদীগুলোর।
কয়েকটা শিশু জলহস্তী এখনও জীবিত, ক্ষুধায় কাহিল হয়ে বার বার গিয়ে নাক ঘষছে মৃত মায়ের গায়ে। অবোধ শিশুগুলো বুঝতে পারছে না, আর কোনোদিন জাগবে না মা, আদর করে গা চেটে দিয়ে দুধ খাওয়াবে না।
বড় বড় কুমির দল বেঁধে এসে মহানন্দে জলহস্তীর মাংস ছিঁড়ে খাচ্ছে। বুড়ো মাংসে অরুচি ধরে যাওয়াতেই বোধহয় কোনো কোনোটা মরা হাতি বাদ দিয়ে শিশু হাতির নধর কচি মাংস দিয়ে নাস্তা সারছে। বিরাট হাঁ একেকটার, আর ইয়া বড় বড় দাঁত। দেখলে গায়ে কাঁটা দেয়। মাঝে মাঝে লড়াই লেগে যাচ্ছে পছন্দসই মাংসের মালিকানা নিয়ে, শক্তিশালী লেজের জোরালো ঝাপটায় আলোড়িত হচ্ছে পানি। শুধু কুমিরই না, শয়ে শয়ে মাংসাশী মাছও গপ গপ করে গিলছে জলহস্তীর মাংস।
বেশিক্ষণ এই দৃশ্য দেখা যায় না। জানালার কাছ থেকে সরে এলো ছেলেরা। নীরবে ফিরে চললো ওয়ারডেনের পিছু পিছু। রবিন নীরব। কিশোরের চেহারা থমথমে। মুসার চোখে পানি। পোচার ধরতে টমসনকে সাহায্য করবে কথা

দিয়েছিলো ওরা। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলো এখন, দলের, সবকটার হাতে হাতকড়া না পরিয়ে টিসাভো থেকে যাবে না।
নটার মধ্যেই লজে ফিরে এলো। নাস্তা করতে বসলো, কিন্তু রুচি নষ্ট হয়ে গেছে। মুসাও তেমন গিলতে পারছে না। বার বার চোখের সামনে ভাসছে অসহায় বাচ্চাগুলোর চেহারা।

.

সেদিনই বেলা বারোটার দিকে এলো তিরিশ জন লোক, লরিতে করে। তাদের স্বাগত জানালেন টমসন। দমে গেলেন মনে মনে। ট্রেইনড রেঞ্জার নয় একজনও। কুলিকামিন গোছের লোক। একজন ট্র্যাকার, আর দুতিন জন পেশাদার শিকারী আছে, এককালে শ্বেতাঙ্গ শিকারীর সহকারী ছিলো ওরা, পয়সার বিনিময়ে টুরিস্টদের নিয়ে সাফারিতে যেতো। কি আর করা? নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো, ভেবে নিজেকে প্রবোধ দিলেন ওয়ারডেন।
ব্যাণ্ডার পেছনে তাবু খাঁটিয়ে তিরিশ জন লোকের থাকার ব্যবস্থা হলো। খাবার এনে দিলো লজের বাবুর্চিরা।
খেতে খেতে ওদের সঙ্গে আলোচনা চললো। কাজটা কি, জেনেশুনেই এসেছে ওরা। মাসাই উপজাতির লোক, নেহায়েত মাংসের দরকার না হলে কখনও শিকার করে না। পোচারদের ঘৃণা করে। টিসাভোতে ওদের নিষ্ঠুর অত্যাচারের কাহিনী শুনে জ্বলে উঠলো সবাই। চেঁচাতে শুরু করলো, এক্ষুণি চলুন! কল্লা আলাদা করে ফেলবো ব্যাটাদের! খুন করে ফেলবো!
বুঝিয়ে শুনিয়ে ওদের শান্ত করলেন ওয়ারডেন। বললেন, ব্যাটাদের খুন। করতে পারলে আমিও খুশি হতাম। কিন্তু করা যাবে না। মানুষ খুনের অপরাধে আমাদেরকেই জেলে যেতে হবে তাহলে।
তো কি করবো? এমনি এমনি ছেড়ে দেবো শয়তানগুলোকে? রেগে উঠলো বিশালদেহী এক মাসাই, যেন একটা দৈত্য। ট্র্যাকারের কাজ করেছে অনেক দিন। নাম মুগামবি।
ছাড়বো কেন? ধরে নিয়ে যাবো কোর্টে। ব্যস, আমাদের কাজ শেষ। এরপর ওদেরকে জেলে পাঠানোর দায়িত্ব জজ সাহেবের।
কিন্তু ধরবোটা কিভাবে? পায়ে গুলি করে?
না, বন্দুক নেয়া যাবে না সঙ্গে। উত্তেজনার সময় মাথা ঠিক থাকবে না। পায়ে না করে যদি মাথায় কিংবা বুকে গুলি করে বসে কেউ?
বুঝতে পারছেন না, ওদের সঙ্গে বিষাক্ত তীর আছে, বল্লম আছে। আমরা না মারলেও আমাদেরকে ছাড়বে না ওরা। ঠিক খুন করবে।

তা করবে, স্বীকার করলেন ওয়ারডেন। সেজন্যেই ওদেরকে ধরা খুব বিপজ্জনক হবে। জানোয়ারেরও অধম ওরা।
হাসি মুছে গেছে মাসাইদের মুখ থেকে। খালি হাতে সিংহ ধরতে রাজি আছে ওরা, কিন্তু পোচার নয়।
দেখ, ওদের মনের কথা বুঝতে পেরে বললেন টমসন। নিজেদের ইচ্ছেয়। এসেছে তোমরা, কাজ করলে পয়সা পাবে, এই শর্তে। যার পয়সার দরকার, যাবে আমার সঙ্গে, যার দরকার নেই, যাবে না। জোর করবো না কাউকে। ধরতে পারলে ধরবো, না পারলে ফিরে আসবো। পুলিশকে জানাবো। যা করার করবে। ওরা। আমি বন্দুক সাথে নিয়ে গিয়ে খুনের আসামী হতে রাজি নই।
নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছিলো কিশোর। হাত তুললো, স্যার, তীর-ধনুক আর বল্লমও কি নেয়া যাবে না?
না। কারণ ওসব দিয়েও মানুষ খুন করা যায়। মারাত্মক অস্ত্র।
তাহলে, এমন কোনো অস্ত্র যদি নেয়া হয় সঙ্গে, যেটা অবশ্যই মারাত্মক, কিন্তু ব্যবহারের ওপর নির্ভর করে কততখানি মারাত্মক হবে?
ভুরু কোঁচকালেন ওয়ারডেন। কি বলতে চাইছো?
হাসলো কিশোর। জানোয়ার ধরার অস্ত্র।
খুলে বলো। মনে হচ্ছে কোনো একটা প্ল্যান করেছো তুমি।
খুলে বললো কিশোর।
.
কয়েক মিনিট পর যখন রওনা হলো দলটা, দেখা গেল একজন মাসাইও বাদ পড়েনি। সবাই এসেছে। আর এসেছে টমসনের পাঁচজন রেঞ্জার। অন্য পাঁচজন। ক্যাম্পে নেই, ডিউটিতে গেছে পার্কের বিভিন্ন জায়গায়, পোচার খোঁজার জন্যে।
তবে পাঁচজন রেঞ্জারের জায়গা দখল করার মতো পোচার-শিকারী, একটা আছে দলে। মানুষ নয়, কুকুর। মিশ্র রক্ত ওর ধমনীতে। মা, এক শ্বেতাঙ্গ শিকারীর অ্যালসেশিয়ান; বাবা, আফ্রিকার জঙ্গলের ভয়ঙ্করতম শিকারী হিংস্র বুনো কুকুর। বনের মধ্যে অসহায় অবস্থায় বাচ্চাটা কুড়িয়ে পেয়েছিলো সাফারিম্যান কালিমবো, নিয়ে এসে যত্ন করে বড় করে তুলেছে, নাম রেখেছে সিমবা, অর্থাৎ সিংহ। গায়ে গতরে সিংহের সমান না হলেও হিংস্রতায় যে পশুরাজকে ছাড়িয়ে যাবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই মুসার। দেখেই সিমবাকে ভালোবেসে ফেলেছে সে, মনে মনে। আফসোস করছে, ইস, ওরকম একটা কুকুর যদি থাকতো তার!
পশ্চিমে এগিয়ে চলেছে জীপ, ভ্যান,ট্রাক আর লরির লম্বা মিছিলটা।
একেবারে সামনের ল্যাণ্ড-রোভারে রয়েছেন ওয়ারডেন, গাড়ি চালাচ্ছেন, পাশে কিশোর। মুসা আর রবিন বসেছে পেছনে।

এমনও হতে পারে, টমসন বললেন। লাগতেই আসবে না ওরা। এতোগুলো গাড়ি দেখলেই ভয়ে পালাবে।
ওরা পালাক, এটা নিশ্চয় চান না আপনি? কিশোর বললো। ওদের ধরতে চান।
চাইলেই তো আর হবে না। ওদেরকেও এগিয়ে আসতে হবে।
আপনার কি মনে হয়, সত্যি পালাবে?
নির্ভর করে। নেতা না থাকলে পালাবে। আর, সিলভার যদি সাথে থাকে, উত্তেজিত করে ওদেরকে, সাহস দেয়, তাহলে আক্রমণ করবে।
আরে, তাই তো! কিশোর ভুলেই গিয়েছিলো সিলভারের কথা।
ওই পালের গোদাটাকে ধরতে না পারলে হাজার পোঠর ধরেও লাভ হবে না, আবার বললেন টমসন। এক জায়গা থেকে তাড়ালে আরেক জায়গায় গিয়ে। পোচিং শুরু করবে।
হুঁ! মাতা দোলালো কিশোর।
আরও কয়েক মিনিট চলার পর গাড়ি থামাতে বললো সে। রবিন আর মুসাকে নিয়ে নেমে গিয়ে উঠলো সাপ্লাই ভ্যানে। আবার চললো মিছিল।
ক্যাম্প থেকে কয়েক ডজন ডার্ট নিয়ে আসা হয়েছে, ওগুলোতে ওষুধ ভরতে হবে। ডার্টগুলো দেখে মনেই হয় না, হাতিকে ঘুম পাড়িয়ে দিতে পারে নিমেষে। আট ইঞ্চি লম্বা, কড়ে আঙুলের মতো মোটা। এক মাথায় ইঞ্জেকশনের সুচের মতো, সুচ, তবে আরও খাটো। আরেক মাথায় হালকা এক গুচ্ছ পালক বাধা, ভারসাম্য বজায় রেখে যাতে নিশানা মতো গিয়ে আঘাত হানতে পারে ডার্ট সেজন্যে।
বার বার এপাশে ওপাশে মোড় নিচ্ছে গাড়ি, ভীষণ ঝাঁকুনি। জানালা দিয়ে মুখ বের করে দেখলো কিশোর। পথ ছেড়ে বিপথে নেমেছে ভ্যান, কিংবা বলা ভালো উঠেছে। চাকার নিচে ছোট ছোট টিলা-টক্কর। আশেপাশের কোনো কোনোটা বেশ বড়,পনেরো-বিশ ফুট উঁচু। উইয়ের ঢিবি। ছোটগুলোর ওপর দিয়ে চলেছে গাড়ি, বড়গুলোর পাশ কাটাচ্ছে।
ঢিবিগুলো পেরিয়ে এসে গাড়ি থামলো। সামনে পাঁচশো গজ মতো দূরে পোচারদের বেড়া। বেড়া থেকে দূরে গাড়ি থামানোর কারণ আছে। পোচাররা থাকলে তীর ছুঁড়তে পারে। বেশি কাছে গেলে গায়ে লাগবে তীর, ঝুঁকি নেয়ার। মানে হয় না। তাই দূরেই রেখেছেন ওয়ারডেন।
এসো, জলদি হাত লাগাও, দুই সহকারীকে বললো গোয়েন্দপ্রধান। প্রাস্টিকের ব্যাগ খুলে ভ্যানের মেঝেতে ঢাললো ডার্টগুলো। বড় একটা শিশি বের করলো, তার মধ্যে পানির মতো পাতলা সাদাটে ওষুধ।
জিনিসটা কি? মুসা জিজ্ঞেস করলো। অ্যাকোর রঙ তো কালো—

এটা সেরনিল, মাসকিউলার অ্যানাসথেটিক। জানোয়ার ধরার জন্যে ব্যবহার হয়। রক্তে ঢুকলেই ঘুমিয়ে যায়।
দ্রুত ডার্টে ওষুধ ভরে নিতে লাগলো ওরা। ভরা শেষ করে তিনটে চামড়ার বাকেটে ডাটগুলো নিয়ে, নামলো ভ্যান থেকে। চলে এলো ল্যাণ্ড-রোভারের পাশে।
পোচারদের দেখা নেই। বেড়ার ওপাশে ওদের কুঁড়েগুলো আছে। আর আছে। বেড়ার ফাঁকে ফাঁদে আটকা পড়া অসহায় জানোয়ারের দল। যন্ত্রণা আর আতঙ্কে চিৎকার করছে।
মাসাইরা সবাই নেমে এসেছে। তাদের মাঝে ডার্ট বিলি করে দিলেন ওয়ারডেন আর তিন গোয়েন্দা। বেড়ার দিকে মুখ করে পাশাপাশি এক সারিতে রাখা হয়েছে গাড়িগুলো। ওগুলোর সামনে লাইন দিয়ে দাঁড়ালো ঘুম-যোদ্ধারা। ডার্ট ছোঁড়ার জন্যে নিশপিশ করছে হাত। কিন্তু শত্রু কই? অধৈর্য হয়ে আগে বাড়লো কয়েকজন মাসাই।
এই, থামো! চেঁচিয়ে বললেন ওয়ারডেন। কোথায় যাচ্ছো? পিছাও।
আরে, দেখো দেখো, হাত তুললো মুসা। এহহে, সরে গেল! বেড়ার ফাঁক দিয়ে মাথা বের করেছিলো। কালো চাপদাড়ি।
কাউকে দেখলো না রবিন। কিশোরও না। সিলভার না তো?–ভাবলো সে। মুসা যখন বলছে দেখেছে, নিশ্চয় দেখেছে। তার কান আর চোখের ওপর পুরোপুরি। ভরসা করা যায়।
দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে বিরক্ত হয়ে উঠেছে সবাই, কিন্তু কাউকে এগোতে দিলেন না ওয়ারডেন। কে জানে বেড়ার ওপাশে ঘাপটি মেরে আছে কিনা পোচাররা।
হঠাৎ তারস্বরে ঘেউ ঘেউ শুরু করলো সিমবা। ঝাড়া দিয়ে কালিমবোর হাত থেকে গলার বেল্ট ছাড়িয়ে ছুটে যাওয়ার জন্যে জোরাজুরি করতে লাগলো। ফাঁদে পড়ার ভয় আছে, ছাড়লো না তাকে তার মালিক।
অবশেষে, এক ফাঁকে দেখা দিলো একটা কালো মাথা। আরেক ফাঁকে আরেকটা। তারপর আরেকটা।
ব্যাটারা দেখছিলো আমাদের, রবিন বললো। বোঝার চেষ্টা করছিলো আমারদের উদ্দেশ্য।
হ্যাঁ, মাথা ঝাঁকালো কিশোর। নিরাপদ বুঝে এখন বেরিয়ে এসেছে।
ঠিকই বলেছে দুজনে। লুকিয়ে থেকে দেখছিলো পোচাররা। রাইফেল নেই। দেখে সাহস পেয়ে বেরিয়ে এসেছে এখন। মুমূর্ষ জানোয়ারগুলোর আশপাশ দিয়ে পা টিপে টিপে বেরোলো ওরা। হাতে তীর-ধনুক, পিঠে বাঁধা বল্লম। ফলায় বিষ মাখানো, সন্দেহ নেই। বেড়ার এপাশে, এসে সারি দিয়ে দাঁড়ালো ওরাও। জনা পঞ্চাশের কম না।

এমনভাবে চেয়ে আছে পোচাররা, যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। গাধা। নাকি! ক্যাম্প থেকে এসেছে শত্রু এলাকায়, অথচ সঙ্গে রাইফেল-বন্দুক কিচ্ছু নেই, শুধু ছোট ছোট কয়েকটা লাঠির মতো জিনিস। উপজাতীয় আধা-জঙলী ওরা, এ ধরনের আধুনিক ডার্টগান দেখেনি জীবনে, অস্ত্রগুলোর মাহাত্ম জানে না। একজন তো হেসেই ফেললো। ব্যস, সংক্রামিত হয়ে গেল হাসিটা। হাসতে শুরু করলো সবাই। আর সে-কি হাসি! হাসতে হাসতে বাঁকা হয়ে গেল সবাই, উরুতে চাপড় মারছে ঠাস ঠাস করে। শেষে উলুকের মতো নাচতে আরম্ভ করলো। তীর ছুঁড়লো। কয়েকজন। পাঁচশো গজ অনেক দূর, নিশানায় পৌঁছার বহু আগেই মাটিতে পড়ে গেল সেগুলো।

তীর-ধনুক আর বল্লম তুলে, শরীর সামান্য কুঁজো করে, এক পা এক পা করে এগোতে শুরু করলো পোচাররা। দেখে দেখে সাবধানে পা ফেলছে। নইলে নিজেদের পাতা ফাঁদে নিজেরাই আটকাবে। লম্বা ঘাসের ভেতরে পেতে রাখা হয়েছে ওসব ফাঁদ।

রেডি থাকো, বললেন ওয়ারডেন। আমি না বললে ফায়ার করবে না কেউ।

মাসাইদের অনেকে, ইংরেজি বোঝে না। দেশীয় ভাষায় সেটা অনুবাদ করে বললো মুগামবি।

বেড়ার ওপাশ থেকে আদেশ শোনা গেল। এগোতে বলছে পোচারদের। আড়াল থেকে বেরিয়ে একটা ফাঁকে এসে দাঁড়ালো সে। দলের আর সবার মতো শুধু নেংটি পরা আধা-উলঙ্গ নয়। গায়ে বুশ জ্যাকেট, পরনে সাফারি ট্রাউজারস। দাড়িতে ঢাকা মুখ, চামড়ার রঙেই বোঝা যায় আফ্রিকান নয় লোকটা।

ওই যে, চেঁচিয়ে উঠলো মুসা। বলেছিলাম না। নিশ্চয় সিলভার।

আস্ত হারামী, রবিন বললো। নিজে পেছনে থেকে দলের লোক পাঠিয়েছে। মরলে ওরা মরবে, তার কি?

আবার আদেশ দিলো লোকটা। যাদের হাতে ধনুক ছিলো, তাড়াতাড়ি কাঁধে ঝুলিয়ে খুলে নিলো পিঠে বাঁধা বল্লম।

বল্লম নিচ্ছে কেন? রবিনের প্রশ্ন।

তীর দিয়ে লঙ রেঞ্জে লড়াই করে, ওয়ারডেন জবাব দিলেন। কাছে থেকে বলুম বেশি মারাত্মক। ওরা মনে করেছে আমরা নিরস্ত্র, তাই কাছে এসে খুঁচিয়ে মারতে চাইছে। জানোয়ার মেরে সাহস এত বেড়েছে, মানুষ মারতেও আর দ্বিধা নেই এখন। হুঁশিয়ার থাকবে। বল্লমের মাথায়ও বিষ লাগায়।

টমসনের দিকে তাকিয়ে আছে মাসাইরা। কখন তিনি আদেশ দেন। কিন্তু চুপ করে রইলেন তিনি। বিশ ফুটের মধ্যে চলে এলো পোচাররা।

রেডি! চেঁচিয়ে বললেন ওয়ারডেন।

ডার্ট তুললো সবাই। নিজেদের কাছেই হাস্যকর লাগছে তাদের এই অস্ত্র, পোচাররা তো হাসবেই। আট ফুট লম্বা বিষাক্ত বল্লমের বিরুদ্ধে কয়েক ইঞ্চি লম্বা কতগুলো খাটো লাঠি! তবে, উগাণ্ডা কিংবা কঙ্গোর লোক হলে হাসতো না ওরা, ঠিকই বুঝতে বল্লমের চেয়ে কতো বেশি মারাত্মক লাঠিগুলো। কেনিয়ায় এই অস্ত্র এখনও সাধারণ মানুষের কাছে অপরিচিত।

ভাবতে অবাক লাগছে কিশোরের, ডার্টগান কি সিলভারও চেনে না? নাকি দূর থেকে বুঝতে পারছে না?

দূর থেকে প্রথমে চিনতে পারেনি, বোঝা গেল। হঠাৎ চেঁচিয়ে কি বলতে শুরু করলো সে। সোয়াহিলি ভাষা। মুগামবি অনুবাদ করে বললো, চিনে ফেলেছে। ওদের ফিরে যেতে বলছে সে।

চিনতে অনেক দেরি করে ফেলেছে সিলভার। লড়াইয়ের উন্মাদনা রক্তে নাচন তুলেছে তখন পোচারদের, নেতার কথা শুনলো না। বিজয় তো অনিবার্য, কেন ফিরে যাবে? ফিরেও তাকালো না ওরা। বল্লম বাগিয়ে হুল্লোড় করে ছুটে এলো।

ফায়ার! আদেশ দিলেন ওয়ারডেন।

চোখের পলকে ছুটে গেল একঝাঁক খুদে-বর্শা। কালো দেহগুলোতে বিধে গেল ইঞ্জেকশনের সুচ, চোখের পলকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ওষুধ ঢুকিয়ে দিলো শরীরে।

চমকে গেল পোচাররা। ওরা ভাবলো, অ্যাকো। টান দিয়ে দিয়ে শরীর থেকে খুলে ফেলতে লাগলো ডার্টগুলো। সুচের মাথা থেকে টপটপ করে ঝরছে সাদা তরল। অ্যাকোর রঙ কালচে বাদামী, এটার রঙ সাদা, তারমানে অ্যাকো নয়। আতঙ্ক দূর তো হলোই না, আরও বাড়লো ওদের। ভাবলো, অ্যাকোর চেয়েও খারাপ কোনো বিষ। ভয়েই পড়ে গেল কয়েকজন, মাটিতে পড়ে হাত-পা ছুঁড়তে শুরু করলো।

অ্যাকোর চেয়ে অনেক দ্রুত কাজ করলো সেরনিল। অবশ করে দিলো। মাংসপেশী। ক্ষণিক আগের শক্তিশালী পাগুলো গেল দুর্বল হয়ে, শরীরের ভার রাখতে পারছে না আর। ভয়ে যারা পড়েছিলো, তারা বেহুশ হলো। যারা দাঁড়িয়ে ছিলো, টলে উঠে ধড়াস ধড়াস করে পড়তে লাগলো কাটা কলা গাছের মতো। আর যারা ডার্ট খেয়ে দৌড় দিয়েছিলো, তারাও বাঁচতে পাড়লো না, হুমড়ি খেয়ে পড়লো এক এক করে। কয়েকজন পড়লো সত্যিকার বিপদে। এলোপাতাড়ি দিশেহারা হয়ে ছোটার সময় মনেই রইলো না, ফাঁদ পাতা আছে। ধরা পড়লো ওই ফাঁদে। ভীষণ দুঃসাহসী কয়েকজন ভাবলো এমনিতেওঁ মরেছি, ওমনিতেও, এগিয়ে এসে বল্লম দিয়ে খোঁচা মেরে তিনজন মাসাইকে আহত করে দিলো বেহুশ হওয়ার আগে।

যেমন শুরু হয়েছিলো তেমনি প্রায় হঠাৎ করেই শেষ হয়ে গেল লড়াই। ঘাসের ওপর লুটিয়ে আছে অসংখ্য কালো দেহ। ফাঁদে আটকা পড়েছে যারা, তারাও

গোঙাচ্ছে না ব্যথায়, গভীর ঘুমে অচেতন।
তোলো সব কটাকে, ওয়ারডেন আদেশ দিলেন। খাঁচায় ভরো।
পার্কের এক জায়গা থেকে অনেক সময় আরেক জায়গায় জানোয়ার স্থানান্তরের প্রয়োজন পড়ে, তখন ওসব খাঁচা ব্যবহার হয়। এতো বড় খাঁচা আছে, জিরাফকেও ভরে রাখা যায়। পাওয়ারওয়াগনে করে বয়ে নেয়া হয় সেসব খাঁচা। কিশোরের বুদ্ধিতেই কয়েকটা ওয়াগন নিয়ে আসা হয়েছে সঙ্গে করে, একটাতে হাতির খাঁচা। খুশি হয়েই অচেতন দেহগুলোকে বয়ে এনে খাঁচায় ভরতে লাগলো। মাসাইরা।
ছোট জানোয়ারের ফাঁদে যারা ধরা পড়েছে তাদেরকে ছাড়ানো কঠিন হলো না, মুশকিল হলো হাতি আর সিংহের ফাঁদে যারা আটকেছে। পায়ে কেটে বসেছে। ইস্পাতের দাঁত।
ওরকম একটা ফাঁদের কাছে গিয়ে হাত নেড়ে ডাকলেন ওয়ারডেন তিন গোয়েন্দাকে।
কাছে গিয়ে দাঁড়ালো ওরা।
আমাদের দুজন রেঞ্জার এরকম ফাঁদেই আটকে মরেছে? ওয়ারডেন। বললেন। বোঝো এখন কারণটা। নিশ্চয় ভেবে অবাক হয়েছে, কেন ওরা নিজেদের ছাড়াতে পারেনি। মানুষের শরীরে দুটো চমৎকার টুলস আছে, হাত।
জানোয়ারের নেই। দেখি তো, ফাঁদ থেকে খোলো তো লোকটাকে।
কিশোর চেষ্টা করে বিফল হলো। রবিন গেলই না। শার্টের হাতা গুটিয়ে ব্যায়াম পুষ্ট পেশল বাহু বের করে বীর-বীক্রমে এগোলো মুসা আমান, ভাবখানা– এটা একটা কাজ হলো নাকি? ফাঁদের দুটো চোয়াল দুই হাতে ধরে টান দিলো। নড়লোও না ওগুলো। জোর বাড়ালো সে, কপালে ঘাম জমলো, চামড়া ফেটে বেরিয়ে আসবে যেন হাতের পেশী। শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে ফোঁস করে মুখ দিয়ে বাতাস ছাড়লো। খাইছে! সাঙ্ঘাতিক শক্ত!
হ্যাঁ, মাথা দোলালেন টমসন। হাতিও পা ছাড়াতে পারে না। খালি হাতে খোলা যাবে না, যন্ত্র লাগবে।
কিশোর তাকিয়ে আছে ফাঁদ বাঁধার শেকলটার দিকে। দশ ফুট লম্বা লোহার শেকল, এক মাথা ফাঁদের সঙ্গে আটকানো, আরেক মাথা লোহার গজালের সঙ্গে। গজালটা মাটিতে পুঁতে দেয়া হয়েছে।
কি ভাবছো বুঝতে পারছি, হেসে বললেন ওয়ারডেন। রেঞ্জাররা ওই খুটি টেনে তুললো না কেন, এই তো? তাহলে ফাঁদ নিয়েই খোঁড়াতে খোঁড়াতে গিয়ে গাড়িতে উঠতে পারতো। তোমার তো দুটো পা-ই ভালো। যাও, দেখো ওপড়াতে পারো কিনা।

টানতে টানতে নীল হয়ে গেল কিশোরের মুখ। তার সঙ্গে গিয়ে মুসাও হাত লাগালো। দুজনে মিলে টেনেও নাড়তে পারলো না গজালটা। পোঁতা হয়েছে উইয়ের ঢিবিতে। গোলমাল শুনে বিরক্ত হয়েই যেন কি হচ্ছে দেখতে বেরোলো উইয়েরা।

পারবে না, মাথা নাড়লেন টমসন। খামোকা কষ্ট করছে। তিন ফুট লম্বা একেকটা। বড় হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে বসানো হয়েছে। উইয়ের ঢিবিগুলো দেখতে দেখা যাচ্ছে মাটি, আসলে সিমেন্টের মতো শক্ত। হাতির পায়ে শেকল বেঁধে দিয়ে দেখো, তারও টেনে তুলতে কষ্ট হবে। আর ফাঁদে আটকা থাকলে তো পারেই না, ভীষণ ব্যথা লাগে পায়ে। যাও, সাপ্লাই ভ্যান থেকে শাবল নিয়ে এসো। চাড় মেরে খুলতে হবে।

গিয়ে শাবল আনলো মুসা।

দাঁতের ফাঁকে শাবল ঢুকিয়ে চাড় দিয়ে চোয়াল দুটো ফাঁক করলেন টমসন। বেচারা লোকটার রক্তাক্ত পা-টা বের করে আনা হলো। মাংস কেটে হাড়ে গিয়ে বসেছিলো দাঁত। তাড়াতাড়ি অ্যানটিসেপটিক আর ব্যাণ্ডেজ এনে, ক্ষত পরিষ্কার করে বেঁধে দিতে লাগলো কিশোর।

.

আরি! বেড়ার দিকে তাকিয়ে আছে রবিন। দাড়িওয়ালা কোথায়?

প্রচণ্ড উত্তেজনায় সিলভারের কথা ভুলে গিয়েছিলো সবাই।

হাঁটু গেড়ে বসে কিশোরের ব্যাণ্ডেজ বাঁধা দেখছিলো মুসা, লাফ দিয়ে উঠে। দাঁড়ালো। চেঁচিয়ে ডাকলো, মুগামবি, কালিমবো, জলদি এসো। সিমবাকে নিয়ে এসো।

আগে আগে ছুটলো ট্র্যাকার মুগামবি, লম্বা ঘাস এড়িয়ে থাকছে যতোটা সম্ভব, যাতে ফাঁদে পা না পড়ে। তার পেছনে রইলো অন্যেরা।

বেড়ার একটা ফাঁক দিয়ে আরেক পাশে চলে এলো। কেউ নেই।

কুঁড়েগুলোতে দেখো, বলেই একটা কুঁড়ের দিকে দৌড় দিলো মুসা।

সব কটা কুঁড়েতে খুঁজে এলো সে আর কালিমবো। ফিরে এসে দেখলো, এক জায়গায় মাটিতে ঝুঁকে কি যেন দেখছে মুগামবি।

মাটিতে পায়ের ছাপের ছড়াছড়ি, পোচারদের নগ্ন পা। পাঁচটা করে আঙুলের ছাপ স্পষ্ট। ওগুলোর মাঝে এক সারি ছাপ আছে, যেগুলোর আঙুল নেই।

বুট, মুগামবি বললো। দাড়িওয়ালাটা। বুট পরেছিলো। ধরে ফেলা যাবে।

বুটের ছাপ অনুসরণ করে চললো ট্র্যাকার। বারো-তেরো কদম এগিয়েই দাঁড়িয়ে গেল। চোখে বিস্ময়। ছাপ নেই আর। আচমকা যেন বাতাসে মিলিয়ে গেছে বুটধারী। গাছে চড়লো নাকি?

ওপরে তাকালো মুগামবি। নেই। একটা নিচু ডালও নেই, যেটাতে উঠতে পারবে বুট পরা লোকটা।
মহা শয়তান, বাতাসে থাবা মারলো মুগামবি। বুট খুলে নিয়েছে। কেউ যাতে পিছু নিতে না পারে।
এখানেও পায়ের ছাপ অনেক আছে, বুট পরা একটাও নেই, সব নগ্ন। সিলভারের ছাপ কোনটা এখন আর বোঝার উপায় নেই।
সিমবা! তুড়ি বাজালো মুসা। কুকুরটাকে দিয়ে চেষ্টা করালে কেমন হয়?
ডেকে সিমবাকে সেই জায়গাটায় নিয়ে গেল কালিমবো, বুটের ছাপ যেখান থেকে শুরু হয়েছে। শুকতে বললো। কথা বুঝলো বুদ্ধিমান কুকুরটা। নাক নিচু করে বুটের ছাপ শুকলো কয়েকবার, ওপরে মাথা তুলে গন্ধ নিলো বাতাসে। ছাপ অনুসরণ করে চলে এলো যেখানে বুটের চিহ্ন শেষ হয়েছে। থেমে ওপরের দিকে নাক তুলে আবার গন্ধ শুকলো। মৃদু ঘড়ঘড় আওয়াজ বেরোচ্ছে গলা থেকে।
টমসনও এসে দাঁড়িয়েছেন। বললেন, কুকুরটা চালাক বটে। কিন্তু বুট আর। খালি পায়ের ছাপ আলাদা করে চিনতে পারবে না।
দেখুন না কি করে? হেসে বললো কালিমবো।
ফিরে গিয়ে আবার শুরুর জায়গায় বুটের ছাপ শুকলো সিমবা। তারপর আশপাশের অন্য ছাপগুলো.। আশা-নিরাশায় দুলছে মুসার মন। সবই নির্ভর করছে এখন ছাপগুলো নতুন না পুরনো তার ওপর। নতুন হলে চামড়ার গন্ধে ঢাকা পড়ে যাবে লোকটার ঘামের গন্ধ। কিন্তু যদি পুরনো হয়, এই গরমে ঘামে ভিজে গন্ধ হয়ে যাবে জুতোর চামড়া, তীব্র সেই গন্ধ কিছুতেই ফাঁকি দিতে পারবে না কুকুরের প্রখর ঘ্রাণশক্তিকে।
হলোও তাই। খেঁকিয়ে উঠলো সিমবা। আবার নাক নামিয়ে বুটের ছাপ। শুকলো। তারপর জোরে ঘেউ করে উঠে দৌড়ে এলো বুটের ছাপ যেখানে শেষ হয়েছে তার কাছে। কয়েকটা নগ্ন পায়ের ছাপ শুকলো। একটার কাছে এসে আরেকবার চেঁচিয়ে উঠে দিলো দৌড়। কয়েক পা গিয়ে আবার শুকলো। চললো আবার।
পেয়েছে! বাচ্চা ছেলের মতো হাততালি দিয়ে উঠলো মুসা। পেয়ে গেছে। সে-ও ছুটলো কুকুরটার পেছনে।
কিন্তু লোকটা বোকা নয়। মাসাইদের সঙ্গে কুকুর আছে, নিশ্চয় দেখেছে। কিছু দূর গিয়ে আরেক ফন্দি করেছে ধোকা দেয়ার জন্যে। নিজের রক্তের ওপর পড়ে রয়েছে একটা মরা মোষ। সোজা গিয়ে সেই রক্তে পা ভিজিয়েছে সিলভার। পচা রক্তের গন্ধে ঢাকতে চেয়েছে নিজের গায়ের গন্ধ। মোষটার চারপাশে ঘুরেছে কয়েকবার, যততক্ষণ না পা থেকে রক্ত মুছে গেছে, বালি লেগেছে পায়ে। তারপর

অন্য আরও অনেক চাপের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলে গেছে। এখন বের করবে কি করে সিমবা?
নিরাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন ওয়ারডেন।
কিন্তু কালিমবোর বিশ্বাস আছে তার কুকুরের ওপর?
ছাপ চিনতে বেশ দেরি হলো সিমবার। বিচিত্র ভঙ্গিতে মাথা ঝাড়ছে, যেন শিওর নয় সে।
তবে এখন তাকে সাহায্য করতে পারলো আরেক ওস্তাদ। পিছিয়ে গিয়ে সিলভারের খালি পায়ের ছাপ ভালো মতো দেখলো মুগামবি। মাপ নিলো। এগিয়ে এসে রক্তে ভেজা ছাপ মাপলো। বেরিয়ে যাওয়া ছাপগুলো থেকে ঠিক বের করে ফেললো, কোনটা দাড়িওয়ালার ছাপ। সিমবা যে জোড়া বেছে নিয়েছে, ওগুলোই।
গুড, বললো মুগামবি। আঙুলগুলো একটার সঙ্গে আরেকটা চেপে রয়েছে... বুট...যা সিমবা, এগো।
চেয়ে রয়েছে...বুট বলে কি বোঝালো? জিজ্ঞেস করলো মুসা।
বুটের জন্যে ওরকম হয়েছে বললো, হাঁটতে হাঁটতে জবাব দিলেন টমসন। সব সময় কেউ শক্ত বুট পরে থাকলে পায়ের আঙুল পাশাপাশি চেপে মাঝের ফাঁক কমে যায়। আর যারা সব সময় খালি পায়ে হাঁটে তাদের আঙুল ছড়িয়ে যায়, বড় হয়ে যায় ফাঁক।
কিছু দূর গিয়ে আবার নতুন কায়দা করেছে সিলভার। মোড় নিয়ে এগিয়ে সোজা নেমে গেছে টিসাভো নদীতে।
হতাশ হয়ে গর্জে উঠলো সিমবা। অ্যালসেশিয়ানের ডাকের সঙ্গে মিল নেই, একেবারে বুনো কুকুরের চিৎকার। আফ্রিকার তৃণভূমিতে, জঙ্গলে ওই ডাক অহরহ শোনা যায়।
আর হবে না, মুগামবিও হাল ছেড়ে দিলো। সরাসরি ওপারে গিয়ে নিশ্চয় ওঠেনি। হয় উজানে গেছে, নয়ত ভাটিতে। সাঁতরে ভাটিতে যাওয়ারই বেশি সুবিধে। অনেক দূর গিয়ে ওপারে কোনো ঝোপের ভেতর দিয়ে উঠে গেছে। হাজার খুঁজলেও পাওয়া যাবে না আর। আমি শিওর, ঘাসের ওপর উঠেছে সে। আর যা গরম। ঘাসের ওপর পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শুকিয়ে গেছে পানি। ব্যাটা গেছে। অনেকক্ষণ হয়েছে। আমরা যেতে যেতে ছাপের কোনো চিহ্নই থাকবে না।

.

সাতচল্লিশ জন. ঘুমন্ত পোচারকে মরা মাছের মতো গাদাগাদি করে ভরা হলো। হাতির খাঁচার মধ্যে। অন্তত আরও ঘন্টা চারেক ঘুমিয়ে থাকবে ওরা, একশো

তিরিশ মাইল পেরিয়ে মোমবাসা যাওয়ার জন্যে যথেষ্ট সময়। ওখানে জেলখানায় ঘুম ভাঙবে ওদের।
জেল-ওয়ারডেনের কাছে একটা নোট লিখে দিলেন টমসনঃ পোচিঙের অপরাধে সাতচল্লিশ জন পোচারকে ধরে পাঠালাম, বিচারের জন্যে। একজন রেঞ্জারের হাতে নোটটা দিয়ে ওয়াগনের সঙ্গে যেতে বললেন।
অন্যদের থাকতে হবে, অনেক কাজ পড়ে আছে। শখানেকের বেশি। জানোয়ার আটকা পড়ে আছে ফাঁদে, যেগুলো এখনও মরেনি, ছাড়াতে হবে।
মরা কিংবা মুমূর্ষ জানোয়ারগুলোকে মাছির মতো হেঁকে ধরেছে শকুনের দল। মানুষ কাছে যেতেই উড়ে গেল। হায়েনা আর শেয়ালের পালও সরে গেল, একেবারে গেল না অবশ্য, মানুষ চলে গেলেই আবার আসবে।
ছাড়া পাওয়ার জন্যে ছটফট করছে কিছু কিছু জানোয়ার। তাতে গলায় আরও চেপে বসছে তারের ফাঁস, ধারালো ছুরির মতো চামড়া কেটে ঢুকে যাচ্ছে মাংসের গভীরে। রক্ত ঝরছে। এভাবে বেশিক্ষণ টানাটানি করতে থাকলে আপনা-আপনি। জবাই হয়ে যাবে।
বাঁচার সম্ভাবনা আছে এমন কিছু জীবকে মারাত্মক ঝুঁকি নিয়ে ফাঁস-মুক্ত করলো মাসাইরা। যেগুলোর জখম কম, ছাড়া পেয়েই ছুটে পালালো। বেশি জখমিগুলোকে লরিতে তুলে নেয়া হলো, হাসপাতালে নিয়ে যাবে।
প্রতিটি ফাঁস কেটে দেয়া হলো, নষ্ট করা হলো মাটিতে পেতে রাখা ফাঁদ।
কুঁড়েগুলোর কি হবে? কিশোর জিজ্ঞেস.করলো।
বেড়া, কুঁড়ে, সব পুড়িয়ে দেবো, বললেন ওয়ারডেন। এ আগুন লাগানো হলো বেড়ায়। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো এক মাইল লম্বা শুকনো কাঁটালতা। জিনিসপত্র সব বের করে এরপর কুঁড়েগুলোতেও আগুন, লাগানো হলো। মনে হচ্ছে যেন দাবানল লেগেছে।
জিনিসগুলো আলাদা আলাদা জায়গায় জড়ো করা হয়েছে।
জীবনে দেখিনি এরকম কাণ্ড! আনমনে বিড়বিড় করতে করতে মাথা নাড়লো। রবিন। চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রয়েছে প্রায় তিনশো হাতির পায়ের দিকে। ফুটখানেক ওপর থেকে কেটে নেয়া হয়েছে, মাঝের হাড়মাংস সব ফেলে দিয়ে ওয়েইস্ট-পেপার বাস্কেট বানানো হবে।
আরেক জায়গায় স্তূপ করে রাখা হয়েছে অসংখ্য চিতাবাঘের মাথা। প্রতিটি মাথা কয়েক হাজার ডলারে বিকোবে। ইউরোপ-আমেরিকা থেকে সাফারিতে আসে। লোকে। তাদের মাঝে অনেক ধনী মানুষ থাকে, যার চিতাবাঘ শিকার করে মাথা। নিয়ে গিয়ে নিজের বাড়ির ড্রইংরুমে সাজাতে চায়। চিতাবাঘ নিশাচর জীব, অসাধারণ ধূর্ত, দক্ষ শিকারীর পক্ষেও শিকার করা কঠিন। আনাড়ি টুরিস্ট সেটা

পারে না। কয়েক রাত গাছের ডালে কিংবা মাচায় কাটিয়েই বিরক্ত হয়ে যায়। শেষে সহজ কাজটাই করে। সোজা গিয়ে নাইরোবি থেকে একটা মাথা কিনে নিয়ে বাড়ি ফেরে, হয়তো বাহাদুরি দেখিয়ে বলে আমি মেরেছি। কে দেখতে আসছে, সে সত্যি কথা বলছে না মিথ্যে?

চিতাবাঘের মাথার পাশে জমানো হয়েছে চিতার চামড়া। সোফার কাভার হবে হয়তো ওগুলো দিয়ে, কিংবা ডিভানের পায়ের কাছের কার্পেট। শান্ত, ন্দ্র, মিষ্টি যে মহিলাটি ঘর সাজাবেন ওগুলো দিয়ে, এয়ারগান দিয়ে শিকার করা চড়ুই পাখি ছেলের হাতে দেখলে শিউরে ওঠেন যিনি, মুহূর্তের জন্যেও ভাববেন না, শুধু তাঁর ড্রইংরুমের শোভা বাড়ানোর জন্যেই অকালে প্রাণ দিতে হয়েছে কতগুলো অপূর্ব সুন্দর জানোয়ারকে।

ওগুলো কি? কয়েকটা কাঠের পাত্রে রাখা অদ্ভুত কিছু বাঁকা বাঁকা চুল দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলো মুসা।

মনে হয় হাতির চোখের পাপড়ি, জবাব দিলো রবিন।

দূর, কি বলো? ওসব দিয়ে কি করবে?

করবে বলেই তো নিয়েছে।

কি হয়?

আসলে হয়তো হয় না কিছুই, সুযোগ পেয়ে বিদ্যে ঝাড়তে শুরু করলো। বইয়ের পোকা শ্রীমান রবিন মিলফোর্ড, ওরফে চলমান জ্ঞানকোষ। সব কুসংস্কার। কিন্তু সিঙ্গাপুরে এর দারুণ চাহিদা। কুসংস্কারে বিশ্বাসী লোকেরা মনে করে, যার কাছে যতোটা হাতির চোখে পাপড়ি থাকবে, সে ততোটা ছেলেপুলের বাপ হবে। নানারকম অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারীও নাকি ওই চুল। বইয়ে পড়েছি, একজন পিগমী রাজা নাকি বায়ান্ন শো পাউণ্ড দামের হাতির দাঁত দিয়ে ফেলেছিলো শুধু একটি মাত্র পাপড়ি জোগাড়ের জন্যে। অ্যারাবিয়ানদের অনেকের কাছেও এর যথেষ্ট কদর। তাদের বিশ্বাস, ওই পাপড়ি দিয়ে মালা বানিয়ে গলায় ঝোলালে রাইফেলের গুলি লাগে না শরীরে, কাছে এসেও পাশ কাটিয়ে আরেক দিকে চলে যায়।

বাহ, দারুণ বর্ম তো!

মালমশলা তো হাতের কাছেই আছে, হেসে বললেন ওয়ারডেন। বানিয়ে ঝুলিয়ে ফেলো না একটা। তীর লাগবে না আর শরীরে।

ওদের মতো বলদ নাকি আমি? মুখ বাঁকালো মুসা।

তার কথার ধরনে হা-হা করে হেসে ফেললেন টমসন।

কতগুলো গণ্ডারের শিং দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলো মুসা, রবিন, এগুলো দিয়ে কি হয়? পুড়িয়ে গুঁড়ো করে ফেলে গণ্ডারের মতো শিং গজায় নাকি ব্যাটাদের মাথায়?

শত্রুকে গুঁতোতে পারে?
ওর কথায় ওয়ারডেন তো হাসছেনই, কিশোর আর রবিনও হাসতে শুরু করলো। হাসতে হাসতেই রবিন বললো, এগুলোর বেশি ভক্ত চীনারা। গুড়ো করে। চায়ের সঙ্গে মিশিয়ে খায়।
কেন, পাগলামি সারানোর জন্যে?
না, শক্তিশালী হওয়ার জন্যে। গায়ে নাকি গণ্ডারের জোর আসে, বুকে সিংহের সাহস।
হয়?
মনের জোর বাড়ে হয়তো। মানসিক ব্যাপার। কিন্তু ওদের ওই বিশ্বাসের কারণে সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে গণ্ডারের। ইনডিয়ান গণ্ডার তো শেষই করে দিয়েছে। চীনারা, এ-হারে মারা পড়তে থাকলে আফ্রিকান গণ্ডারও শীঘ্রি খতম হয়ে যাবে। শেষে চিড়িয়াখানা ছাড়া আর কোথাও দেখা যাবে না ওদের।
পুড়ে ছাই হলো বেড়া আর ঘাসের কুঁড়েগুলো।
ট্রাকে তোলা হলো সস্ত হাতির দাঁত, লেজ, চোখের পাপড়ি, পায়ের পাতা, জলহস্তীর দাঁত আর চর্বি, জিরাফের লেজ, পেছনের পায়ের শিরা, সিংহের মাথা আর চর্বি, চিতাবাঘের মাথা, চিতার চামড়া, অ্যানটিলোপ আর গ্যাজেল হরিণের শিং, কুমির আর অজগরের চামড়া, ইগ্রেট, ফ্ল্যামিংগো, উটপাখি আর লম্বা-গলা। ধবল-বকের পালক; আরও নানা রকম জানোয়ারের শরীরের বিভিন্ন অংশ। তারের ফাঁস আর নষ্ট ফাঁদগুলোও তুলে নেয়া হলো। নইলে অন্য পোচাররা এসে ওগুলো আবার কাজে লাগাবে।
কি হবে ওসব দিয়ে? কিশোর জিজ্ঞেস করলো। বিক্রি করবেন?
না, বললেন ওয়ারডেন। নিরীহ পশুর রক্তে ভেজা ওই টাকা আমাদের চাই না। তার চেয়ে নিয়ে গিয়ে কোনো মিউজিয়মে রাখার ব্যবস্থা করবো। লোকে দেখবে। পোচারদের ওপর রাগ হবে তাদের, পোচিঙের বিরুদ্ধে তৈরি হবে শক্তিশালী জনমত। প্রতিবাদের ঝড় উঠবে।
লজে ফিরে এলো গাড়ির মিছিল। ওয়ারডেনের ব্যাণ্ডায় ঢুকলেন টমসন, সাথে তিন গোয়েন্দা। হাসিমুখে তাদের স্বাগত জানালেন জজ নির্মল পাণ্ডা। মুখে। মোলায়েম হাসি।
তুমি! চেঁচিয়ে উঠলেন টমসন। দেখা হয়ে ভালোই হলো। নাইরোবিতে ঠিকঠাক মতো গিয়েছিলে তো?
হ্যাঁ। মোমবাসায় ফিরে যাচ্ছি। ভাবলাম, দেখেই যাই পোচারদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে কতোটা লাভ হলো।

লাভ মানে! বললে বিশ্বাস করবে না, সাতচল্লিশ জনকে ধরে পাঠিয়েছি মোমবাসা জেলে। কাল সকালে হাজির করবে তোমার কোর্টে।
তাই নাকি, তাই নাকি? ভারি আনন্দের কথা, জজের কণ্ঠ শুনে রবিনের মনে হলো, আনন্দে ঘড়ঘড় করছে যেন বেড়াল। হাতে পেয়ে নিই আগে, উচিত শিক্ষা। দেবব ব্যাটাদের। পোচিঙের নাম ভুলিয়ে ছাড়বো। সর্দারটাকে ধরেছো?
সিলভার? নাহ। পালিয়ে গেল।
হায় হায়, করলে কি? আসল বদমাশটাকেই ধরতে পারলে না। গিয়ে তো। আরেক জায়গায় দল বানাবে, আর জানোয়ার মারা শুরু করবে। পালালো। কিভাবে?
ভীষণ চালাক, ব্যাটা। দলের লোকদের আগে বাড়তে বলে নিজে রইলো। পেছনে। দলের লোক যখন হেরে গেল, আমরা ওদেরকে ধরায় ব্যস্ত, সেই সুযোগে পালালো। কুকুর নিয়ে অনেক খুঁজলাম। পেলাম না। নদীতে নেমে গায়েব হয়ে গেছে।
কুকুরটার দিকে তাকালেন জজ। বাহু, ভারি সুন্দর কুকুর। একেবারে বাঘের বাচ্চা। এটাকে ফাঁকি দিয়েছে সিলভার? হাত বাড়িয়ে মাথায় চাপড় দিতে গেলেন তিনি।
অপরিচিত লোককে পছন্দ করতে পারলো না সিমবা। মৃদু ঘড়ঘড় করে। পিছিয়ে গেল। দাঁড়িয়ে গেল ঘাড়ের রোম। চোখ দেখে মনে হলো এখুনি ঝাঁপিয়ে পড়বে। তাড়াতাড়ি ওর কলার চেপে ধরলো মুসা। কি জানি কেন, শুরু থেকেই তাকে পছন্দ করে ফেলেছে সিমবা। কালিমবোর মতোই মুসার কথাও শোনে।
আরও দুচারটে কথা বলে বিদায় নিয়ে বেরোলেন জজ। তাকে এগিয়ে দিতে চললেন ওয়ারডেন, পিছু নিলো তিন গোয়েন্দা।
তীক্ষ্ণ চোখে জজ সাহেবের গাড়িটা দেখছে কিশোর। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে। আকাশ থেকেই দেখেছে নাইরোবি যাওয়ার কাঁচা সড়কটা লাল মাটিতে ঢাকা। গাড়ি চললেই লাল ধুলো ওড়ে। জমার কথা লাল ধুলো, অথচ তার গাড়িটাতে পড়ে আছে সাদা ধুলোর হালকা আস্তরণ। বলেই ফেললো,গাড়িটা পরিষ্কার পরিষ্কার লাগছে? লাল ধুলোয় ঢেকে থাকার কথা।
অবাক হলেন জজ। সামান্য ওপরে উঠে গেল একটা ভুরু। তারপর হেসে ফেললেন। ও, হ্যাঁ হ্যাঁ, ভুলেই গিয়েছিলাম তোমরা গোয়েন্দা। তা বলেছো ঠিকই, ওই রাস্তায় একবার গেলেই লালে লাল। ফেরার সময় এতো ময়লা হয়ে গেল, শেষে পরিষ্কার না করিয়ে আর পারলাম না। পার্কে ঢোকার মুখেই পেট্রোল স্টেশনটা, ওখানে ওয়াশ করিয়েছি, আবার হাসলেন। আর কোনো প্রশ্ন?
না, লজ্জিত মনে হলো গোয়েন্দাপ্রধানকে। অভিনয় কিনা বোঝা গেল না।

জজ সাহেবও মাইও করেননি তার কথায়, অন্তত তার চেহারা দেখে তা-ই মনে হলো। ওয়ারডেনকে বললেন, চলি, ডেভিড। সাবধানে থাকবে, ওই পোচার হারামজাদাগুলোর কথা কিছুই বলা যায় না। কখন আবার লুকিয়ে-চুরিয়ে তীর মেরে বসে, তিন কিশোরকে বললেন। গোয়েন্দারা, আশা করি সিলভারকে ধরে ফেলতে পারবে। চলি, গুড বাই।

কি ভাবছো, কিশোর? পরদিন সকালে নাস্তার টেবিলে বসে জিজ্ঞেস করলেন ওয়ারডেন।

খাচ্ছে না কিশোর, বসে বসে ভাবছে। ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে কফি। মুসা আর। রবিনের সঙ্গে এতোক্ষণ কথা বলেছেন তিনি, তাদের আলোচনায় যোগ দেয়নি সে।

মুখ তুলে হাসলো কিশোর। অ্যাঁ?

বলবে আমাকে?

দ্বিধা করলো কিশোর। ইয়ে...আপনার বন্ধু...জজ নির্মল পাণ্ডা। খুব বিশ্বাস করেন তাকে, না?

করি, স্বীকার করলেন টমসন। যখন-তখন অযাচিত ভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। আমার অনেক উপকার করেছে। এই তো, গত পরশুই তো আমার প্রাণ বাঁচালো। তোমরা দেখেছো।

উনি..., বলতে গিয়ে কিশোরের চোখের দিকে চেয়ে থেমে গেল রবিন। আরেকটু হলেই বলে ফেলেছিলো বাঁচাননি, বরং আমরা না থাকলে খুন। করতেন।

আর, একটা ব্যাপারে আমাদের খুব মিল, বলে চললেন ওয়ারডেন। পোচার। আমিও ওদের দেখতে পারি না, সে-ও পারে না। ওকে না পেলে যে কি করতাম... আমি ওদেরকে ধরতে পারি, কিন্তু শাস্তি দেয়ার ক্ষমতা আমার নেই। শাস্তি দেয় নির্মল। সে ওদেরকে ফাইন করে, জেলে পাঠায়। পোচিঙের বিরুদ্ধে আইন খুব কড়া। কঠিন শাস্তি হয়, অনেক দিন জেল।

শাস্তি দেন তো ঠিকমতো?

বলে তো দেয়। আর বলে যখন, নিশ্চয়ই দেয়।

বিচারের সময় কখনও কোর্টে ছিলেন?

না, এতো বেশি ব্যস্ত থাকি, যেতে পারিনি। তবে আমার যাওয়ার দরকার নেই। আমার কাজ আমি করি, ওর কাজ ও।

ডিম ভাজার প্লেটটা টেনে নিলো কিশোর। নীরবে খেলো কয়েক মিনিট। হঠাৎ বললো, ভেরি ইনটারেস্টিং! জজ সাহেবের কথা বলছি, ভারি মজার মানুষ। তার কাজ দেখতে খুব ইচ্ছে হচ্ছে। আজ অনেক লোকের বিচার করবেন। গিয়ে দেখতে পারবো?

আমি যেতে পারবো না, মাথা নাড়লেন টমসন। তবে ইচ্ছে করলে তোমরা যেতে পারো। কিন্তু যাবে কিভাবে? যেতে-আসতে প্রায় আড়াইশো মাইল, পথও খুব খারাপ। এখানে আমি ছাড়া এখন আর কেউ নেই যে গাড়ি চালাতে-জানে, নিয়ে যাবে, তোমাদেরকে।...একটা কাজ করলে অবশ্য পারো। মুসা বেশ ভালো। পাইলট, সেদিন স্টর্কটাকে যেভাবে সামলেছে শুনলাম। প্লেন নিয়ে যেতে পারো। বসো, আসছি।

ডেস্ক থেকে একটা ম্যাপ বের করে নিয়ে এলেন তিনি। এই যে মোমবাসা..আর এই এখানে আমাদের লজ। জানো নিশ্চয়, শহরটা গড়ে উঠেছে। একটা দ্বীপের ওপর। মেন ল্যাণ্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে কজওয়ের সাহায্যে। এই এখানটায় হলো ল্যাণ্ডিংফীল্ড, পেন্সিল দিয়ে একটা গোল দাগ দিলেন টমসন। প্লেন রেখে ট্যাক্সি নিয়ে আদালতে চলে যেও এই এখানটায়। আদালত, আরেকটা চিহ্ন আঁকলেন তিনি।

লাইসেন্স লাগবে না? রবিন জিজ্ঞেস করলো। মুসার তো প্লেন চালানোর লাইসেন্স নেই।

বলে দেবো শিক্ষানবীস। একটা চিঠি লিখে দেবো, এয়ারপোর্টের ম্যানেজারকে দেখিও, অসুবিধে হবে না, মুসার দিকে ফিরলেন ওয়ারডেন। চলো, আরও প্র্যাকটিস করে নাও।

এয়ারস্ট্রিপে এসে প্রথমে বিমানটায় তেল ভরলেন তিনি। দুই ডানার ট্যাঙ্ক তো বোঝাই করলেনই, পেছনের ইমারজেন্সি ট্যাঙ্কও ভরে দিলেন। বিমানের ভেতরের একটা হ্যাঁণ্ডপাম্প দেখালেন তিন গোয়েন্দাকে, প্রয়োজন হলে ওই পাম্পের সাহায্যে পেছনের ট্যাঙ্ক থেকে ডানায় তেল সরিয়ে আনা যায়।

ককপিটের যন্ত্রপাতিতে লেখা জার্মান শব্দগুলো পড়ে পড়ে বুঝিয়ে দিলেন। কোনটা কোন যন্ত্র, কিভাবে কাজ করে।

যাও, উড়ে এসো খানিকক্ষণ, মুসাকে বললেন তিনি। ওঠা আর নামাটাই আসল, ভালোমতো প্র্যাকটিস দরকার।

পাইলটের সীটে উঠে বসলো মুসা,। রবিন আর কিশোরকে মানা করলো, তোমরা এখন না। আগে আমি দেখে আসি উড়ে। কেন, আমাদের নিয়ে পোচার প্র্যাকটিস হবে না? রবিন বললো।

হবে, ঝকঝকে সাদা দাঁত বের করে হাসলো মুসা। তবে, অ্যাক্সিডেন্ট করে মরলে আমি বরং একাই মরি। তিনজন একসাথে মরে লাভ কি? কি বলো, কিশোর মিয়া? তুমি যেমন একা বুদ্ধির প্র্যাকটিস করো, আমিও এখন ফ্লাইং প্র্যাকটিস করি, নাকি?

সুযোগ পেয়ে খুব একহাত নিচ্ছে তাকে মুসা, বুঝে মুখ গোমড়া করে সরে এলো কিশোর। রবিন তর্ক করতে লাগলো।
মুসা ঠিকই বলেছে, পক্ষ নিলেন ওয়ারডেন। মরবে না ও, হাসলেন তিনি। অপরিচিত একটা মেশিনকে যেভাবে সামলেছে, শুনে অবাকই লেগেছে আমার। একেবারে জাত-বৈমানিক। ভবিষ্যতে ভালো পাইলট হবে...।
তাহলে আর আমাদের যেতে অসুবিধে কি? ফস করে বললো রবিন।
তবু, তার কথা কানে তুললেন না টমসন। ঝুঁকি নিয়ে লাভ নেই। অ্যাক্সিডেন্টের কথা কিছু বলা যায় না, কিশোর আর রবিনের দিকে চেয়ে আবার হাসলেন। একজন জাত-বৈমানিকের সঙ্গে সঙ্গে হাত-পা ভেঙে অকেজো হয়ে থাকুক একজন জাত-গোয়েন্দা আর একজন জাত-গবেষক, তা-ও চাই না।
হাসি ফুটলো গোয়েন্দাপ্রধান আর নথি-গবেষকের মুখে।
তাহলে আসি, হাত তুলে বিদায়ী ভঙ্গিতে সালাম জানালো মুসা, করুণ করে। তোলার চেষ্টা করলো মুখটাকে। কিন্তু অভিনেতা নয় সে, হাসি ঢাকতে পারলো না।
পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ফিরে আসবো। যদি ভুলভাল বোতাম টিপে না বসি।
উইণ্ড-সকের দিকে তাকালো সে। সামনের বড় বড় গাছগুলোর দিকে চেয়ে। দমে গেল। সময় মতো উড়াল দিতে পারবে ওগুলোর মাথার ওপর দিয়ে! পারবে, পারবে, নিজেকে বোঝালো সে। মন শক্ত করে স্টার্ট দিলো এঞ্জিন। বুস্টার পাম্প পরীক্ষা করে দেখলো। তারপর অপেক্ষা করতে লাগলো অয়েল টেম্পারেচার বাড়ার জন্যে।
থ্রটল দিতেই ট্যাক্সিইং করে চললো প্লেন। গতি বাড়তে চাইছে না। দাঁতে দাঁত চেপে রেখেছে মুসা, যেন তাতেই শক্তি পাবে এঞ্জিন। আফসোস করছে, ইস, ঘাসের না হয়ে যদি অ্যাসফল্টে বাঁধানো হতো স্ট্রিপটা! দুলছে প্লেন, ঝাঁকুনি খাচ্ছে, তবে গতি বাড়ছে দ্রুত।
কন্ট্রোলে নড়াচড়া করছে মুসার হাত। ঘাসের ওপর ভেসে উঠলো প্লেন।
তীব্র গতিতে ধেয়ে আসছে বড় বড় গাছগুলো। আড়াআড়ি বইছে বাতাস, ঠেলে নিয়ে যেতে চাইছে ডানে। প্লেনটা ছোট, ডানার দৈর্ঘ্য মাত্র উনচল্লিশ ফুট, অথচ এটার তুলনায়ও এয়ারস্ট্রিপটা সরু। প্লেন একটু এদিক ওদিক সরলেই বিপদ। লেগে যাবে গাছের সঙ্গে।
শেষ মুহূর্তে ঝটকা দিয়ে নাক অনেকখানি উঁচু করে ফেললো বিমান। উড়ে বেরিয়ে গেল গাছের মাথার সামান্য ওপর দিয়ে। হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো কিশোর বৈমানিক। আনমনেই হাসলো দাঁত বের করে। ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এলো স্নায়ু।
গাছপালার ওপরে কিছুক্ষণ চক্কর দিয়ে বেড়ালো মুসা। শাঁ করে উড়ে গেল দুই বন্ধু আর ওয়ারডেনের মাথার ওপর দিয়ে। ওরা হাঁ করে তাকিয়ে আছে ওপর

দিকে। হাত নাড়লো সে।
হয়ে গেছে। ওড়াটা কোনো কঠিন ব্যাপার নয়। এবার নিরাপদে নামতে পারলেই, ব্যস। পরশু জানতো না স্টর্কের ব্রেক কোথায়, আজ জানে। গাছ পেরিয়ে এসে নাক নামিয়ে দিলো বিমানের। ঝরা পাতার মতো যেন ঝরে পড়তে লাগলো বিমানটা, অন্তত তার তা-ই মনে হলো। ঘাস ছুঁলো চাকা। ব্রেক চাপলো সে।
ঝাঁকুনি এড়াতে পারলো না। এই নিয়ে যতোবার ল্যাণ্ড করেছে সে, যতো প্লেন, কোনোটাই মসৃণ ভাবে নামতে পারেনি। তার মানে ওই কাজটাই বেশি কঠিন। দক্ষ পাইলটের বাহাদুরিই ওখানটায়।
ট্যাক্সিইং করে আগের জায়গায় এসে থামলো বিমান। বাবল খুলে বেরিয়ে এলো মুসা।
চমৎকার! প্রশংসা করলেন টমসন। সত্যি, খুব ভালো উড়তে পারবে তুমি।
থ্যাঙ্ক ইউ, স্যার।
মোমবাসায় যাওয়ার জন্যে তৈরি হয়ে প্লেনে চড়লো তিন গোয়েন্দা। এবার আর বিমান ওড়াতে কোনো অসুবিধে হলো না মুসার। ছহাজার ফুট ওপর দিয়ে টিসাভো নদী বরাবর এগিয়ে চললো পুবমুখো।
টিসাভো রেল স্টেশন পেরিয়ে ডানে মোড় নিলো। ম্যাপ দেখে দেখে বলে দিচ্ছে কিশোর, কোন দিকে যেতে হবে। নিচে এক পাশে লাল সড়ক, আরেক পাশে রেল লাইন।
এই সেই জায়গা, জ্ঞানকোষের পাতা খুললো যেন রবিন। অনেক রক্ত লেগে আছে ওই রেললাইনে। অনেক বছর আগের কথা। খবরের কাগজের পাতা খুললেই নাকি তখন দেখা যেতো সেই রোমাঞ্চকর হেডলাইনঃ আবার আঘাত হেনেছে টিসাভোর মানুষখেকো! ভয়ানক কতগুলো সিংহ মানুষখেকো হয়ে উঠেছিলো, রোজই ধরে নিয়ে যেতে রেললাইনের শ্রমিকদের। ওগুলোর যন্ত্রণায় রাতে ঘরেও থাকতে পারতো না শ্রমিকরা। বেড়া ভেঙে ঢুকে ধরে নিয়ে যেতো ভয়াবহ সিংহের দল। শেষে…
বাঁয়ে গ্যালানা নদীর চকচকে রূপালী রূপ দেখে স্তব্ধ হয়ে গেল রবিন। চোখ। বড় বড় করে দেখছে। সবুজ চাঁদরের ওপর অবহেলায় আঁকাবাঁকা হয়ে পড়ে থাকা একটা ফিতে যেন। সেই ভারত মহাসাগরে গিয়ে পড়েছে নদীটা, জানে সে। উত্তরে শত শত মাইল জুড়ে বিছিয়ে রয়েছে টিসাভো পার্কের বুনো প্রান্তর, মাঝে মাঝে ঠেলে উঠেছে লাল পাহাড়।
চোখে পড়লো লুগার্ডস ফল। জলপ্রপাতের নিচে যেন টগবগ করে ফুটছে পানি, পুরু হয়ে জমেছে সাদা ফেনা, অপরূপ লাগছে সকালের আলোয়। প্রপাতের পানি জমে এক জায়গায় একটা পুকুরমতো সৃষ্টি হয়েছে, তার পাড়ে ভিড় করেছে।

হাতি, গণ্ডার, জিরাফ। আশপাশে ছোট ছোট আরও অনেক ডোবা আছে, ওগুলোর পাড়ে নানারকম জন্তুজানোয়ারের ভিড়, পানি খেতে এসেছে। পাশের সবুজ তৃণভূমিতে চরছে মোষ, জেব্রা আর ওয়াইল্ডবীস্টের দল। ঝোপের কিনারে উঁকিঝুঁকি মারতে দেখা গেল একটা সিংহ পরিবারকে, শিকার ধরবে বোঝা যাচ্ছে। চিতাবাঘ একটাও চোখে পড়লো না। নিশাচর জীব ওরা, রাতে বেরিয়ে শিকার করে, দিনে ঘুমিয়ে থাকে পাহাড়ের গুহায়, কিংবা গভীর বনের অন্ধকারে।
এক গুচ্ছ গাছের ভেতর থেকে হালকা ধোয়া উঠতে দেখা গেল।
পোচারদের ক্যাম্প? কিশোর বললো।
দেখো দেখো, ওই যে ট্র্যাপ-লাইন! চেঁচিয়ে উঠলো মুসা। বেড়া বানিয়ে ফাঁদ পেতেছে পোচাররা, সেদিকে তাকিয়ে আছে সে। খাইছে। পাঁচ মাইলের কম হবে না।
জোরে জোরে হিসেব শুরু করলো কিশোর, তারমানে ছাব্বিশ হাজার ফুট। প্রতি পাঁচ ফুট পর পর যদি একটা করে ফাঁদ পাতা হয়, তাহলে কম করে হলেও পাঁচশো ফাঁদ। এর অর্ধেক ফাঁদেও যদি জানোয়ার ধরা পড়ে...সর্বনাশ...! থেমে গেল সে।
অর্ধেক হবে কেন? রবিন বললো। কাল যেটা নষ্ট করলাম আমরা, কোনো ফাঁকই বাদ ছিলো না। প্রত্যেকটাতে জানোয়ার পড়েছিলো। প্রতি হপ্তায় একবার করে ফাঁদ পরিষ্কার করে নতুন করে পাতে ব্যাটারা। তারমানে মাসে দুহাজার! মাহ, আমার বিশ্বাস হচ্ছেনা!
আর মনে রেখো, কিশোর বললো। বেড়া এই একটা নয়। এর চেয়ে অনেক বড় বড় ফাঁদ পাতা রয়েছে পূর্ব আফ্রিকার নানান জায়গায়...ওয়ারডেন কি বললেন, শোনোনি?
সহজ পথ। ম্যাপ দেখার প্রয়োজনই পড়ছে না। রেলপথ, সড়কপথ দুটোই গেছে মোমবাসায়। ওগুলো ধরে উড়লেই হলো।
অবশেষে সাগর চোখে পড়লো। ভারত মহাসাগরের মাঝে যেন মূল্যবান ঝকঝকে পাথরের মতো ফুটে রয়েছে প্রবাল দীপগুলো, সব চেয়ে বড়টার নাম মোমবাসা।
শহরের আট মাইল দূরে এয়ারফীল্ড। প্লেন থেকে নেমে ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করলো তিন গোয়েন্দা। টমসনের চিঠি দেখালো।
এয়ারফীল্ড থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি নিয়ে আদালতে রওনা হলো ওরা।
কি জানি কি মনে হলো, বিচারকক্ষে ঢোকার আগে ডাবলডোরের ফাঁক দিয়ে ভেতরে তাকালো কিশোর।
ঘরের শেষ মাথায়, উঁচু মঞ্চের ওপর ডেস্কের ওপাশে বসে আছেন জজ নির্মল পাণ্ডা। তাকে এখন আর ছোট লাগছে না। পরনের কালো আলখেল্লা আভিজাত্য

এনেছে। তার সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়েছে সাতচল্লিশ জন পোচারকে। ঘরের। বাকি অংশে সারি সারি চেয়ারে বসে আছে অনেক দর্শক। কোনো জুরি নেই, বাদী পক্ষের উকিল নেই, আসামী পক্ষেরও না। সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী এখানে। একজন লোক, জজ সাহেব। বাদী পক্ষ সব অসহায় জানোয়ার, তাদের হয়ে কে আর ওকালতি করবে? :

জজ যেন আমাদের দেখতে না পান, ফিসফিসিয়ে বন্ধুদের বললো গোয়েন্দাপ্রাধান। মাথা নিচু রেখে চট করে ঢুকে পড়বে। ও-কে?

নীরবে ঢুকে গেল তিন গোয়েন্দা। চোখের পলকে মিশে গেল চেয়ারের পেছনে দাঁড়ানো জনতার ভিড়ে।

পোচারদের ভাষা বোঝেন না বোধহয় জজ। একজন দোভাষী রেখেছেন। জজের প্রশ্নের জবাবে একজন পোচার যা বললো, সেটা ইংরেজিতে অনুবাদ করে। জানালো দোভাষী, ও বলছে, খুব গরীব লোক। আট ছেলেমেয়ে। আরও চারজন আসছে।

চারজন আসছে।

হ্যাঁ। ওর চার স্ত্রী।

ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলেন জজ। ব্যাটা বুঝতে পারছে, আমি ওকে দশ বছরের জেল দিতে পারি?

পারছে।

বেশ, ভুল যখন বুঝতে পারছে, অনুশোচনা হচ্ছে, মাপ করে দেয়া গেল। তাকে। ষোলোজনের ভরণ-পোষণ করতেই ব্যাটার মাথা খারাপ হয়ে যাবে। জ্বালিয়ে খাক করে ফেলবে তাকে চার স্ত্রী মিলে। জেলের চেয়ে সেটা বড় শাস্তি।

হেসে উঠলো জনতা। ঠিকই বলেছেন জজ, রসিক লোক।

কেস ডিসমিসড, রায় দিলেন বিচারক।

তাঁর এই বদান্যতায় সবাই খুশি হতে পারলো না। কিশোরের পাশে দাঁড়ানো এক আফ্রিকান তরুণ নিচু কণ্ঠে বিড়বিড় করলো, এভাবে পোচিং বন্ধ করতে পারবে নাকি!

মাথা নাড়লো কিশোর, লোকটার সঙ্গে একমত। প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে এতো কষ্ট করে লোকগুলোকে ধরা হলো এতো সহজে ছেড়ে দেয়ার জন্যে।

আরেকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছেন জজ, তুমি জানো না, জানোয়ার মারা অন্যায়?

না, দোভাষীর মুখে জবাব দিলো লোকটা। আমার গায়ের লোকেরা সব সময়ই জানোয়ার মারে, না হলে খাবে কি? যুগ যুগ ধরে শিকার চলে আসছে। আমাদের

সমাজে, এটা আমাদের প্রথা। আমাদের বাবারা শিকার করেছে, তাদের বাবারা করেছে, তাদের বাবারা করেছে, তাদের বাবারা করেছে, তাদের বাবারা…
আরে থামো, থামো, হাত তুললেন জজ। যাই হোক; ঠিকই বলেছো তুমি। যুগ যুগ ধরে যে নিয়ম তোমার রক্তে মিশে আছে, সেটা আর ভাঙবে কি করে? কেস ডিসমিসড!
পরের লোকটা আরেক কৈফিয়ত দিলো। বললো, আমি খুব ভালো মানুষ, মন নরম। জানোয়ার মারতে একটুও ভাল্লাগে না আমার। কিন্তু সিলভার বাধ্য করে, না মেরে কি করবো?
বিষণ্ন হয়ে গেল জজের চেহারা। মাথা নেড়ে সহানুভূতি জানিয়ে বললেন, তাই তো, কি করবে? ওরকম একটা খুনীর বিরুদ্ধে-নিজের ইচ্ছেয় সত্যি মারো না তো?
না।
সিলভারটা একটা আস্ত শয়তান। ওকে নিশ্চয় খুব ভয় করো?
আমরা সবাই করি।
গুড। মানে…, চট করে জনতার দিকে তাকালেন জজ। তুমি নিজের ইচ্ছেয় করো না তো, সে জন্যে গুড বললাম। যে অপরাধ মন থেকে করোনি, সেটার শাস্তি দিই কি করে? আর কোনদিন করো না। কেস ডিসমিসড।
পরের লোকটা কেন জানোয়ার মারে, জিজ্ঞেস করলে জানালো, তার কিছু ছাগল আছে। মেরে শেষ করে বুনো জানোয়ারে। ছাগল বাঁচাতেই জানোয়ার মারে সে।
কি জানোয়ার মারো?
এই গণ্ডার, জিরাফ, হাতি, জলহস্তী, জেব্রা, হরিণ…।
তাই নাকি? তাহলে আর কি শাস্তি দিই তোমাকে? নিজের ছাগল বাঁচাতে যেকেউই জানোয়ার মারবে, বলে ঘোষণা করলেন জজ। কেস ডিসমিসড।
কিশোরের গায়ে কনুই দিয়ে গুতো মারলো আফ্রিকান তরুণ। রাগে গজগজ করলো; যেসব জানোয়ারের নাম বললো, সব কটা ঘাস খায়, নাকের কাছে এসে বসে থাকলেও ছাগল মারবে না। পুরো ব্যাপারটাই প্রহসন।
ঝটকা দিয়ে ঘুরে বেরিয়ে গেল সে।

.

ছেলেরাও বিরক্ত হয়ে গেছে। তবু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সাতচল্লিশ জন পোচারের, হাস্যকর কৈফিয়ত আর জজের খোঁড়া যুক্তি শুনলো। বার বার কেস ডিসমিসড শুনতে ভালো লাগে না, এটা তিনিও বোঝেন, আর সে জন্যেই কয়েকজনকে শাস্তি দিলেন।
একজনকে জেল দেয়া হলো। না, দশ বছরের নয়, মোটে তিন দিন। রায় শুনে দাঁত বের করে হাসলো লোকটা। জেলে আরাম করে বিশ্রাম নিতে পারবে তিন

দিন, আর ভালো খাবার পাবে, বাড়িতে ওরকম খাবার পায় না।
আরেকজনের তরমুজ খেত আছে জানালো। তাকে জরিমানা করা হলো। একটা তরমুজ।
অন্য একজনের আছে মুরগীর খামার। তাকে দিতে হবে দুটো ডিম, জরিমানা।
তবে বেশির ভাগই বেকসুর খালাস পেয়ে গেল।
জজের অলক্ষ্যেই আবার বিচার-কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলো তিন গোয়েন্দা। রাগে, ক্ষোভে গম্ভীর হয়ে আছে তিনজনেই।
প্রাণের পরোয়া করলাম না, বাইরে বেরিয়েই ফেটে পড়লো রবিন। আর কিনা এভাবে ছেড়ে দিলো! ধরে এনে তাহলে লাভটা হলো কি?
ব্যাটা আরও ক্ষতি করে দিলো, মুসা সব চেয়ে বেশি রেগেছে। পোচার হারামজাদারা বুঝে গেল, ধরা পড়লেও কিচ্ছু হবে না। বেপরোয়া হয়ে উঠবে এখন ওরা আরও।
কিন্তু জজের ব্যাপারটা কি, বল তো কিশোর? রবিন বললো। এত বড় বড় কথা বলে এলো আমাদের কাছে, পোচারদের হেন করবে, তেন করবে। জন্তুজানোয়ারের কথা বলতে বলতে কেঁদে ফেললো। সব কি তবে মিস্টার টমসনকে ধোঁকা দেয়ার জন্যে? আমার কথা বুঝতে পারছো? আমার বিশ্বাস, সিলভারের সঙ্গে যোগসাজশ আছে তার। লাভের বখরা।
মাথা নাড়লো কিশোর। বুঝতে পারছি না। লোকটাকে দেখে মনে হয় না খারাপ। সিলভারের মতো বাজে লোকের সঙ্গে নাহ, বিশ্বাস হয় না। আরেকটা কথা ভাবছি। মায়াদরদ দেখিয়ে শয়তানকে পথে আনার চেষ্টা করছেন হয়তো...
গোড়ার ডিম করছেন! বুড়ো আঙুল নাচালো মুসা। হাজী মোহাম্মদ মহসীন সেজেছেন! শয়তান কোথাকার!
আহাআ, ভদ্রলোক সম্পর্কে ওভাবে কথা বলা উচিত না।
পথের পাশ দিয়ে ধীরে ধীরে হাঁটছে ওরা। তিনজনেই নীরব। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর।
দেখো, হঠাৎ বলে উঠলো মুসা। তোমার ডিটেকটিভ ব্রেন এখন কোথায়? কাজ করছে না কেন? আমি বলছি, ব্যাটা একটা শয়তান। সিলভারের দোস্ত। ওর মুখোশটা খুলে দেয়া উচিত আমাদের।
মৃদু হাসলো শুধু কিশোর, কিছু বললো না। তার মনে হচ্ছে, মুসার অনুমান ঠিক নয়। অন্য কোনো ব্যাখ্যা আছে জজের এই রহস্যময় আচরণের। সিলভারের দোস্ত নয় লোকটা।
উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরতে ঘুরতে মেন রোড থেকে সরে এলো ওরা। বড় বড় সুন্দর অট্টালিকাগুলো পেছনে পড়লো। ঢুকলো এসে পুরনো শহরের এক সরু গলিতে,

আরবদের বসবাস বেশি শহরের এদিকটায়। দোকানগুলোর দরজা খোলা, কিন্তু শো-কেস বা জিনিসপত্র কিছু চোখে পড়ছে না। দরজার পরেই অন্ধকার, যেন অজগরের হাঁ, তার পরে রহস্যময় এক জগৎ, কি আছে বোঝার উপায় নেই। কিছু দোকানের ভেতর থেকে আসছে ফল আর সজির গন্ধ, কোনো কোনোটা থেকে মাংসের। একটা দোকানের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় অদ্ভুত গন্ধ পেলো মুসা, লোহা, তার, তেলের–হার্ডওয়্যারের দোকানে যেমন থাকে। সে কথা জানালো দুই বন্ধুকে।
পরামর্শ করে দোকানটায় ঢুকলো তিনজনে। ঢুকেই একটা ধাক্কা খেলো যেন। দেয়ালে, মাটিতে যেখানেই চোখ পড়লো, দেখা গেল রাশি রাশি ফাঁদ, জানোয়ার ধরার জন্যে যতো রকম থাকতে পারে। তারের ফাঁস থেকে শুরু করে সব।
কোণের বিষণ্ন অন্ধকার থেকে হাত ডলতে ডলতে বেরিয়ে এলো লম্বা-নাক এক আরব। কি, ফাঁদের ব্যাপারে আগ্রহ?
খুউব, জবাব দিলো কিশোর। পোচারদের কাছে বিক্রি করেন, না?
মাথা ঝোঁকালো দোকানদার।
কাজটা বেআইনী হয়ে গেল না?
আইন? হা-হা করে হাসলো লোকটা। এই দেশে আবার আইন আছে নাকি? এখানে আইনের কথা যারা বলে তারাই বেআইনী লোক। যাকগে। তোমরা কে? কোনো দল-টল পোষো?
দল?
শিকারীর দল, শিকারী। আইনের লোকদের পোচার। সিলভারের মতো দল।
সিলভারকে চেনেন নাকি?
চিনি না মানে? ও আমার সবচে বড় কাস্টোমার। একেবারে এক হাজারের কম কেনে না।
কতো করে পড়ে দাম?
আড়াই গজী তারের ফাঁস আধ ডলার করে। ওই হিসেবে যতো বড় নাও। তবে একসঙ্গে অনেক নিলে কিছু কম হবে, পাইকারী।
আচ্ছা, বুঝলাম। এখন বলুন, এক হাজার ফাঁস যদি নিই, কততগুলো জানোয়ার ধরতে পারবো?
সেটা সীজনের ওপর নির্ভর করে। আর তাছাড়া একেক শিকারীর একেক রকম হিসাব। সিলভার বলে, জানুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত প্রতি ফাসে হপ্তায়। একটা করে জানোয়ার, মাসে চার। তার মানে, হাজার ফাসে আটাশ হাজার, সাত মাসে। শুকনোর সময়, মানে আগস্ট থেকে অক্টোবরে মাসে একটা। তিন মাসে ধরো আরও তিন হাজার। মাইগ্রেশন সীজনে সবচে বেশি। মাসে দশটা। নভেম্বর, আর

ডিসেম্বর শুধু এই দুমাসেই ধরা পড়ে বিশ হাজার। সব মিলিয়ে বছরে হলো গিয়ে একান্ন হাজার।
ভালো ব্যবসা!
খুব ভালো। এদেশের সবচে বড় ব্যবসা।
সবচে বড় শয়তানী! রাগ চাপতে না পেরে ফস করে বলে বসলো মুসা। কিশোরের আরও কিছু জানার ছিলো, দিলো সব ভণ্ডুল করে। জানোয়ারদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখেছো মিয়া, ফাঁসে গলা ঢোকাতে কেমন লাগে?
ক্ষণিকের জন্যে থ হয়ে গেল আরবটা। মানে... মানে...তোমরা জন্তু প্রেমিক! রাগে বেগুনী হয়ে উঠলো চোহারা। হায় হায়, কতো কথা বলে ফেলেছি! এই, বেরোও বেরোও আমার দোকান থেকে! নইলে...
নইলে কি করবে? হাতা গোটাতে শুরু করলো মুসা। আফ্রিকায় এসে যেন জোর বেড়ে গেছে তার, যদিও বাড়ি এখান থেকে অনেক দূরে।
ঝগড়া বাড়তে দিলো না কিশোর আর রবিন। দুজনে মিলে টেনে দোকান থেকে বের করে নিয়ে এলো মুসাকে।
রাস্তাটা ধরে আবার এগোলো ওরা। আরেকটা দোকানের সামনে থমকে দাঁড়ালো কিশোর, তীব্র বোটকা গন্ধ আসছে ভেতর থেকে। ওই গন্ধ তিনজনেরই পরিচিত। মনে করিয়ে দিলো. পোচারদের ক্যাম্পের কথা। কাঁচা চামড়ার স্তূপ, কাটা মাথা...
এই দোকানেও ঢুকলো ওরা। মস্ত ঘর, এক মাথা থেকে আরেক মাথা দেখা যায় না ভালো মতো। মেঝে থেকে ছাত পর্যন্ত স্তূপ করে রাখা হয়েছে নানা জানোয়ারের শরীরের বিভিন্ন অংশ। সিংহ, চিতাবাঘ, চিতা, জিরাফ, মহিষ, জেব্রা, ওয়াইল্ডবীস্ট, গণ্ডার, জলহস্তী আর হরিণের মাথা, হাতির পায়ে তৈরি ময়লা ফেলার ঝুড়ি আর ছাতা রাখার স্ট্যাণ্ড; হাতির দাঁত, গণ্ডারের শিং, সব জাতের বানরের স্টাফ করা দেহ, বিরাট হাতি থেকে খুদে বুশ-বেবি পর্যন্ত প্রায় সব জানোয়ারের চামড়া; আর আরও নানারকম জিনিস।
মালিকের চেহারা দেখেই বোঝা গেল, সে ভারতীয়।
ছোট টমি হরিণের ডালপালা ছড়ানো শিংওয়ালা সুন্দর একটা মাথা তুলে নিলো কিশোর। জিজ্ঞেস করলো, কতো?
কটা চাই?
এটার দাম কতো?
সরি, ইয়াং ম্যান, একটা করে বেচি না। পাইকরী। এটা পাইকারী দোকান।
অ। তা পাইকারী কি হিসেবে? ডজন, শ, নাকি হাজার?
হাসলো দোকানদার। না, ভাই, এতো কম না। সবচেয়ে কম, দশ হাজার। আসলে, জাহাজ হিসেবে বিক্রি করি আমরা। এক জাহাজ এতো, দুই জাহাজ এতো,

এভাবে। এই তো, কাল সকালেই তিন জাহাজ মাল চালান দিলাম। আজ সকালেই ছেড়ে যাওয়ার কথা ওগুলোর।
কোত্থেকে? আই মীন, কোন বন্দর থেকে?
ওল্ড হারবার।
দেখুন, আমরা এখানে নতুন। মোমবাসা দেখতে এসেছি। চিনিটিনি না কিছু..।
সোজা চলে যাও। বন্দরটা এই পথের শেষ মাথায়।

.

দ্বীপের উত্তর-পূর্ব কোণে, প্রবালের দেয়াল ঘেরা একটা বেসিন মতো জায়গায় তৈরি হয়েছিলো মোমবাসার ওল্ড হারবার বা পুরনো বন্দর। গা ঘেষাঘেষি করে নোঙর করে আছে অসংখ্য আরব ডাউ। বড় বড় এই জাহাজগুলোর পেছনে পুরনো ধাচের উঁচু মঞ্চ দেখলে জলদস্যু আমলের কথা মনে পড়ে। কোন-কোনটা ছাড়ার জন্যে তৈরি, দেখলেই বোঝা যায়। বিশাল ল্যাটিন পাল তুলে দেয়া হয়েছে, পতপত করছে বাতাসে।
ছাড়তে প্রস্তুত, ওরকম ডাউগুলোর সবচেয়ে বড়টার গ্যাঙওয়েতে দাঁড়িয়ে আছে বাদামী-চামড়ার এক আরব। চেহারা, পোশাক-আশাকে ছেলেদের মনে হলো, কবর থেকে উঠে এসেছে বুঝি সেই তিনশো বছর আগের কোনো জলদস্যু সর্দার। কাছে গিয়ে দাঁড়ালো তিন গোয়েন্দা। কিশোর জিজ্ঞেস করলো, আপনিই বোধহয় এই জাহাজের ক্যাপ্টেন?
মাথা ঝাঁকালো লোকটা।
অভিনয় শুরু হয়ে গেল। অলসভঙ্গিতে দুলছে জাহাজের মস্ত পাল, সেদিকে চেয়ে বিস্ময়ে বড় বড়, হলো কিশোরের চোখ। কাঁধ থেকে ক্যামেরা নামিয়ে অনুরোধ করলো, ছবি তুলি?
নীরবে মাথা কাত করলো ক্যাপ্টেন।
ছবি তুললো কিশোর। জিজ্ঞেস করলো, কোথায় যাবেন?
বমবাই।
বোম্বে? ভালো। খুব সুন্দর আপনার জাহাজটা। পাল আরও সুন্দর। এখান থেকে সুবিধে হচ্ছে না। ডেকে উঠে যদি তুলি, কিছু মনে করবেন?..
হাত নেড়ে ডেক দেখিয়ে দিলো ক্যাপ্টেন, অর্থাৎ যাও। লোকটা যদি মত বদলায়, এই ভয়ে এক মুহূর্ত দেরি করলো না কিশোর। মুসা আর রবিনকে নিয়ে ডেকে উঠে এলো। আরও দুটো ছবি তুলে ফিরে চেয়ে দেখলো, পাশে এসে দাঁড়িয়েছে ক্যাপ্টেন। চট করে তারও একটা ছবি তুলে নিলো। হাসিতে বিগলিত হলো লোকটার মুখ, গোয়েন্দাপ্রধানের মনে হলো, হাসিটাও জলদস্যুদের মতো।
বোম্বেতে কি নিয়ে যাচ্ছেন? জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

সত্যি কথা শুনবে, আশা করেনি সে। কিন্তু লুকোছাপার ধার দিয়েও গেল না ক্যাপ্টেন। বোঝা গেল, গুপ্তচর, সাদা পোশাকে পুলিশ কিংবা কাস্টমের লোকের ভয় করছে না। ভয় করার কারণই নেই হয়তো। চলো, দেখাচ্ছি।
টান দিয়ে একটা তারপুলিনের কোণা তুললো ক্যাপ্টেন। ফাঁক দিয়ে দেখা গেল নিচের ডেক। খোলে বোঝাই হয়ে আছে জন্তুজানোয়ারের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, খানিক আগে দোকানটায় যা দেখে এসেছে তিন গোয়েন্দা, সেসব জিনিস। গর্বের হাসি ফুটলো জলদস্যুর মুখে। দারুণ, না?
জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলো কিশোর, কতোগুলো আছে এখানে? পোচার।
দেখতে হবে, বলে, গিয়ে বিল অভ লেডিং বের করে আনলো লোকটা। কোন জানোয়ারের কয়টা অঙ্গ আছে, কত টাকার জিনিস, সব লেখা আছে। হিসেব করে জানালো সে, অন্তত এক লাখ আশি হাজার জানোয়ার মেরে জোগাড় করতে হয়েছে ওগুলো।
স্তব্ধ হয়ে গেল তিন গোয়েন্দা। যে তিনটা জাহাজ ছেড়ে যাওয়ার কথা, তার একটাতেই আছে ওই পরিমাণ মাল! কি হারে জানোয়ার মারা হচ্ছে, ভেবে এই গরমের মাঝেও গায়ে কাটা দিয়ে উঠলো কিশোরের, শীত শীত লাগলো।

.

কিছুই বুঝতে পারছি না, মাথা নাড়লেন ওয়ারডেন, তিন গোয়েন্দার রিপোর্ট শুনে। নির্মল ওরকম করলো কেন? আসলে ওর মনটা বেশি নরম, কারো কষ্ট সইতে পারে না। না জানোয়ারের, না মানুষের। জজ না হয়ে ঋষি হওয়া উচিত ছিলো তার। দেখি, দেখা হলে জিজ্ঞেস করবো, বলে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন। তিনি। মুসা, আরেকবার কষ্ট করতে হবে তোমাকে। প্লেনে করে দুটো যাত্রীকে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে। ইচ্ছে করলে তোমরাও যেতে পারো, রবিন আর কিশোরের দিকে ইঙ্গিত করলেন।
আবার প্লেন নিয়ে বেরোতে পারবে শুনে খুব খুশি মুসা। জিজ্ঞেস করলো, যাত্রীরা কে?
এসো, দেখাচ্ছি।

.

জানোয়ারের হাসপাতালে তিন গোয়েন্দাকে নিয়ে এলেন টমসন। ঘড়ঘড়, গোঁ গোঁ, ঘোৎ ঘোৎ, চি চি, কিউ কিউ আর আরও নানা রকম বিচিত্র শব্দ হচ্ছে হাসপাতালে। রোগী নানা ধরনের আফ্রিকান জন্তুজানোয়ার।
আফ্রিকার সুন্দরতম বানরের সঙ্গে পরিচিত হও, হেসে নাটকীয় ভঙ্গিতে বললেন ওয়ারডেন। ইনি মিস্টার কোলোবাস।

বানরটা সত্যি খুব সুন্দর। কোলোবাস মাংকি আগেও চিড়িয়াখানায় দেখেছে। তিন গোয়েন্দা, তবে ওগুলো কোনোটাই এটার মতো সুন্দর নয়। বন থেকে সদ্য এসেছে তো। সব জীবই তার প্রিয় প্রাকৃতিক পরিবেশে অন্যরকম থাকে। কুচকুচে কালোর মাঝে তুষার-শুভ্র ছোপ যেন ফুটে রয়েছে। পিঠের নিচে, পেটের সামান্য ওপরে আর মুখমণ্ডলে ওই সাদা রঙ। লেজের ডগায় ফোলা রোমগুলোও সাদা।
সাংঘাতিক সুন্দর তো! অবাক হয়ে দেখছে রবিন।
হ্যাঁ, মাথা ঝোঁকালেন টমসন। আর এ-কারণেই মরতে হচ্ছে এগুলোকে। খুব চাহিদা, মহিলাদের পোশাক তৈরি হয়। দামও অনেক বেশি। ফলে পোচাররা লেগে আছে পেছনে। কোলোবাসের বংশ নির্বংশ করার প্রতিজ্ঞা করেছে যেন। অনেক কমে গেছে ওরা, খুব সামান্যই আছে আর। শীঘ্রি পোচিং থামাতে না পারলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, ডোডো পাখির মতো নামটাই শুধু অবশিষ্ট থাকবে।
কি একখান লেজ! মুগ্ধ চোখে দেখছে মুসা। এতো লম্বা কেন? অন্য বানরের তো এতো বড় না।
হ্যাঁ, বড়ই। বত্রিশ ইঞ্চি বানরের চল্লিশ ইঞ্চি লেজ। কেন লম্বা, বলতে পারবো না। প্রকৃতির খেয়াল, নিশ্চয় কোনো কারণ আছে।
তা কোথায় নিয়ে যেতে হবে এটাকে?
যেখানে বেশি নিরাপদ। এখানকার বনে ছাড়লে আবার পোচারদের খপ্পরে পড়ার ভয় আছে। আর এই অঞ্চল কোলোবাসের বাড়িও নয়। কি করে এদিকে এসে পড়লো কে জানে। উঁচু অঞ্চলে এদের বাস, বিশেষ করে অ্যাবেরডেয়ার পার্বত্য এলাকায়। বড় বড় গাছ আছে ওখানে, বাতাসে সব সময় শীতের আমেজ-বড় বড় বোম দেখছো না? চির-শীতের দেশে থাকার জন্যে ওগুলো, দরকার। ওখানেই নিয়ে গিয়ে যদি রেখে আসো, ভালো হয়।
যাবো, বলতে এক মুহূর্ত দেরি করলো না গোয়েন্দা-সহকারী। কিন্তু মিস্টার কোলোবাস যেতে রাজি হবেন তো?
না হওয়ার কোনো কারণ নেই। ফাঁসে আটকেছিলো, গলা কেটেছে। শুকিয়ে গেছে এখন।
প্রেনের ভেতর থাকবে শান্ত হয়ে?
কি জানি। তোমাদের বিশ্বাস করতে পারলে গোলমাল না-ও করতে পারে। আমাজান থেকে জানোয়ার ধরে এনেছো, কি করে সামলাতে হয় নিশ্চয় ভালো জানো। এটাকেও না পারার কোনো কারণ দেখি না।
সুন্দর মুখটা কাত করে, বড় বড় কোমল বাদামী চোখ মেলে তিন কিশোরকে, দেখছে বানরটা। দাড়ি চুলকালো। গাল আর থুতনির লম্বা সাদা রোমগুলোকে দাড়ির মতোই দেখতে লাগে। চাপদাড়ি।

খাইছে! চেঁচিয়ে উঠলো মুসা। বুড়ো আঙুল কই? কেটে ফেলেছে নাকি?
না, বিদ্যে ঝাড়ার সুযোগ পেয়ে গেল রবিন। কাটেনি। কোলোবাসের থাকেই না। ভাবো একবার, বুড়ো আঙুল ছাড়া জিনিসপত্র ধরার কথা? কঠিন না? খুব কঠিন। আমার তো বিশ্বাস মানুষের বুড়ো আঙুল না থাকলে আজকের এই মানব সভ্যতাই গড়ে উঠতে পারতো না।
একেবারে ভুল বলোনি, রবিনের সঙ্গে একমত হলেন ওয়ারডেন। এসো, তোমাদের আরেক যাত্রীকে দেখবে।
ওদেরকে একটা খাঁচার কাছে নিয়ে এলেন তিনি। ভেতরে খচ্চরের সমান একটা জীব। দেখতে মোটেও খচ্চরের মতো নয়।
ইনি আফ্রিকার সব চেয়ে দুর্লভ প্রাণীদের একজন, তর্জনী তুলে জানোয়ারটার দিকে বাতাসে খোঁচা মারলেন ওয়ারডেন। মিস্টার ওকাপি।..
বিচিত্র জীব। একই অঙ্গে নানা রঙের বাহার। যেন হাতের কাছে যতগুলো রঙ পেয়েছেন শিল্পী তুলিতে লাগিয়ে সবগুলোর পরশ বুলিয়েছেন। হলুদ, লাল, পিঙ্গল, কালো, সাদা, কালচে নীল, মেরুন, কালচে-বাদামী, মাখন, কমলা, বেগুনী, সমস্ত রঙ খুব নিখুঁতভাবে লাগানো হয়েছে চকচকে নরম চামড়াটাতে।
আর একটাতেই কয়েক জানোয়ারের মিশ্রণ। মাথায় জিরাফের খাটো শিং, গায়ে জেব্রার ভোরাকাটা, বুনন কুকুরের বড় ছড়ানো কান, আর অ্যানটিলোপ হরিণের মতো সরু পায়ের খুরের ওপরে সাদা রোমশ মোজা। ও, জিভটাও অন্য জানোয়ারের, অ্যান্ট-ঈটার বা পিঁপড়ে-খেকোর। ফুটখানেক লম্বা লিকলিকে ওই জিভ দিয়ে সহজেই কানের গোড়া আর পেছনটা চুলকাতে পারে।
কোলোবাসের মতোই এটাও এখানে এসেছে অন্য জায়গা থেকে, ওয়ারডেন। বললেন। এখানকার বনে ছাড়লে মারা পড়বে। এরা থাকে উত্তর কঙ্গোর গহীন অন্ধকার জঙ্গলে। মাত্র তিরাশি বছর আগে এর নাম জেনেছে. শ্বেতাঙ্গরা। পিগমীরা। বহু আগে থেকেই জানতো, কথায় কথায় বলে দিয়েছিলো শ্বেতাঙ্গ শিকারীকে। কেউ বিশ্বাস করেনি তখন। তারপর যখন দেখে ফেললো; আর কোনো সন্দেহ রইলো না। কে জানে, আরও কতো জানোয়ার লুকিয়ে আছে ওসব জঙ্গলে, যার কথা শুনিইনি এখনও আমরা! ওকাপিটার দিকে আবার হাত তুললেন তিনি। এরা খুব লাজুক। মানুষের সামনে বেরোয় না, সাড়া পেলেই লুকিয়ে পড়ে আরও গভীর: বনে। ওভাবেই লুকিয়ে থেকেছে তিন কোটি বছর ধরে।
কপাল কুঁচকে ফেললো মুসা। তিইন কোওটি!
হ্যাঁ, উনি ঠিকই বলেছেন, জ্ঞান বিতরণ শুরু করলো আবার রবিন। অনেক পুরনো ওরা, একেবারে খান্দানী বংশ। বিজ্ঞানীরা বলেন লিভিং ফসিল,..

জ্যান্ত জীবাশ্ম, বিড়বিড় করলো কিশোর।
কি বললে? ভুরু কোঁচকালেন টমসন।
না, লিভিং ফসিলের বাংলা বললো, আগের কথার খেই ধরলো রবিন। সেই তিন কোটি বছর আগে জন্মেছিলো ওকাপির প্রথম পূর্বপুরুষ। আরও অনেক জানোয়ারই জন্মেছিলো সেই আদিম পৃথিবীতে। অনেকেরই পরিবর্তন হয়েছে, হয়। ছোট হয়েছে, নয়তো বড়। অনেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, আজ আর বেঁচে নেই .. একটাও। কিন্তু ওকাপি রয়ে গেছে, তখন যেমন ছিলো এখনও তেমনি। তবে পোচারদের পোচিং না থামালে আর বেশি দিন থাকবে বলে মনে হয় না।
না, ভাই, মরার দরকার নেই, মিস্টার ওকাপির দিকে চেয়ে হাত নাড়লো মুসা। দোয়া করি, আরও তিন কোটি বছর বেঁচে থাকো, ওয়ারডেনের দিকে ফিরলো। তা এই বিশেষ ভদ্রলোক কোথাকার বাসিন্দা? কোথায় রেখে আসতে হবে?
হেসে ফেললেন টমসন। ইনি যে কোথাকার, কি করে বলি? অবাকই লাগছে আমার, এলো কি করে এখানে? কঙ্গোতে নিয়ে গিয়ে ফেলতে পারলেই ভালো। হতো; সেটা সম্ভব না। আরেক জায়গায় অবশ্য রাখা যায়, ওখানে পোচারদের হাত পড়েনি এখনও। আরও কিছু দিন পড়বে বলেও মনে হয় না।
কোথায়? আগ্রহ দেখালো কিশোর।
ভিক্টোরিয়া হ্রদের একটা বড় দ্বীপে। রুবনডো-র নাম শুনেছো? পঞ্চান্ন একর জায়গা নিয়ে গভীর বন, ওকাপিরা যেরকম পছন্দ করে। ওটা একটা নিরাপদ গেম স্যাংচুয়ারি, কড়া পাহারা। তাছাড়া চারপাশে পানি, যখন-তখন ঝড় ওঠে। ক্যানু নিয়ে যেতেই পারবে না.পোচাররা, ডুবে মরবে। তবে বলা যায় না, কোন দিন জাহাজ নিয়ে গিয়ে হাজির হবে। তবে ততোদিন নিরাপদেই থাকবে ওখানকার জন্তুজানোয়ার। এয়ারফীল্ড নেই দ্বীপটায়। মেন ল্যাণ্ডে নামতে হবে তোমাদের, তারপর বোট ভাড়া করে নিয়ে যেতে হবে। কি মনে হয়, পারবে?
ভেলায় করে আমাজানের জঙ্গল থেকে জাগুয়ার আর অ্যানাকোণ্ডা নিয়ে এলাম, মুসা বললো। আর এটা তো কোনো ব্যাপারই না। নিশ্চয় পারবো। কতো আর সময় লাগবে? ফেরিতে করে বড় জোর এক-দুই ঘন্টা।
হাসলেন টমসন। দুনিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম হ্রদ, লেক ভিক্টোরিয়া। দ্বীপে যেতে কমপক্ষে পনেরো ঘন্টা লাগবে। আর ওই পনেরো ঘন্টায় অন্তত পাঁচটা ঝড়ের কবলে যদি না পড়েছে, তো নাম বদলে ফেলবো আমার। ভেবে দেখো, ঝুঁকিটা নেবে?
কৌতূহল আরও বাড়িয়ে দিলেন আমাদের, কিশোর বললো। এরপর আর না গিয়ে পারা যায় না। হ্রদটা দেখতেই হবে।
হ্যাঁ, দেখতেই হবে, সুর মেলালো রবিন।

বেশ, চলো অফিসে, বলে ঘুরে হাঁটতে শুরু করলেন ওয়ারডেন।

.

এই যে, অ্যাবারডেয়ার, টেবিলে বিছানো পূর্ব আফ্রিকার ম্যাপের এক জায়গায়, আঙুল রাখলেন টমসন। এই হলো নাইরোবি, এর উত্তরে। নাইয়েরিতে নামবে তোমরা, তারপর গরুর গাড়িতে করে যাবে ট্রীটপস-এ। নাম শুনেছো?

মাথা ঝাঁকালো বইয়ের পোকা রবিন। নিশ্চয়ই। দানবীয় ক্যাপ চেস্টনাট গাছের ওপরে তৈরি হোটেলটার কথা বলছেন তো?

ওখানকার বেশির ভাগ গাছই দানবীয়। কোলোবাসের খুব পছন্দ। রাতে গাছের ওপরের বাড়িতে কাটাবে। পরদিন প্লেন নিয়ে চলে যাবে দক্ষিণ-পশ্চিমে, তিনশো মাইল দূরের মুয়ানজায়। এই যে, এখানে। পাশে এটা লেক ভিক্টোরিয়া। আর এই হলো রুবনডো দ্বীপ, সরাসরি গেলে একশো মাইল।

কখন রওনা হচ্ছি আমরা? মুসা জিজ্ঞেস করলো।

এখন বেরোলে রাতের আগেই পৌঁছে যাবে ট্রীটপসে।

চলো, যাই, বন্ধুদের বললো কিশোর।

যাত্রীদের জায়গা করার জন্যে পেছনের দুটো সীট খুলে ফেলতে হলো। বাঁশের খাঁচায় ভরে, পাঁচজন লোকে বয়ে নিয়ে গিয়ে মিস্টার ওকাপিকে প্লেনে তুললো।

বেশি ভারি হয়ে যাবে না? মুসা জানতে চাইলো।

না, বললেন ওয়ারডেন। আড়াইশো হর্সপাওয়ারের এঞ্জিন। আড়াই টন ওজন তুলতে পারে। ওকাপিটা কোয়ার্টার টনের বেশি হবে না।

তিন কোটি বছরের বনেদি জীবৃটা জীবনে কখনও বিমানে ওঠেনি, মোটেও পছন্দ করতে পারলো না ওই বদ্ধ পরিবেশ। উদ্বিগ্ন ঘোড়ার মতো চি-চি করে প্রতিবাদ জানাতে লাগলো। শক্ত মাথা দিয়ে জোরে জোরে বাড়ি মারলো খাঁচার বেড়ায়। গোয়েন্দাদের ভয় হলো, ভেঙে না যায়।

কচি পাতাওয়ালা একটা গাছের ডাল ভেঙে এনে খাঁচার ওপরে রেখে দিলেন। টমসন, আড়াআড়ি বাধা বাঁশের কঞ্চির ফাঁক দিয়ে পাতাগুলো ঝুলে রইলো ভেতরে। সঙ্গে সঙ্গে বারো ইঞ্চি লম্বা ফিতের মতো জিভটা বের করে পাতায় পেঁচিয়ে শক্ত দাঁতের আওতায় টেনে নিয়ে এলো মিস্টার ওকাপি। যতোক্ষণ ওই লোভনীয় খাবার মাথার ওপর থাকবে, কোনো গোলমাল করবে না সে আর।

শান্ত স্বভাবের মিস্টার কোলোবাসের জন্যে খাঁচার, প্রয়োজন হলো না। বুদ্ধিমান জীব, ফলে কৌতূহল তার জন্মগত। প্রথমেই কন্ট্রোল প্যানেলের। যন্ত্রপাতিগুলো ধরে ধরে দেখলো, তারপর চড়ে বসলো মুসার কাঁধে, সেখান থেকে এক লাফে গিয়ে উঠলো ওকাপির খাঁচার ওপর। ওখানে বসেই গম্ভীর হয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চোখ বোলালো পুরো কেবিনটায়। মুসার পাশে গাদাগাদি করে উঠে।

বসলো রবিন আর কিশোর। ওড়ার সময় বসতে কষ্ট হবে না তেমন, অসুবিধে হবে ওঠা আর নামার সময় সীটবেল্ট বাঁধা নিয়ে। শেষে একটা বেল্টই ঘুরিয়ে এনে দুজনের পেটের ওপর বাঁধলো। এঞ্জিন স্টার্ট দিলো মুসা। লাফিয়ে এসে তার কাঁধে চাপলো মিস্টার কোলোবাস। চালাতে অসুবিধে হবে কিশোর পাইলটের, তাই ওটাকে সরিয়ে দিলো কাধ থেকে। কিন্তু কিভাবে আকাশে ওঠে প্লেন, দেখবেই। যেন বানরটা, অগত্যা কিশোর আর রবিনের কাঁধে ভাগাভাগি করে বসলো।

স্টর্ক নিয়ে ওঠা-নামা করতে করতে হাত অনেক পেকে গেছে মূসার। ভারি বোঝা নিয়েও সহজে উঠে গেল গাছের মাথায়।

উত্তর-পশ্চিমে নাইরোবির দিকে চলে যাওয়া লাল সড়কের ওপর দিয়ে উড়ে চললো বিমান। কিছু দূর এগিয়ে মোড় নিলো উত্তরে মাউন্ট কেনিয়ার সতেরো হাজার ফুট উঁচু চোখ ধাঁধানো চূড়ার দিকে। পেছন থেকে বইছে বাতাস। গতি বেড়ে গেল বিমানের। প্রায় আড়াই ঘন্টার পথ তিনশো মাইল, পাড়ি দিয়ে এলো দুঘন্টায়। নামলো অ্যাবারডেয়ারে, বনের কিনারে একটা ছোট ল্যাণ্ডিংফীল্ডে।

কিভাবে কি করতে হবে সব ভালোমতো বুঝিয়ে দিয়েছেন মিস্টার টমসন। সেই মতোই কাজ করলো তিন গোয়েন্দা। প্লেন থেকে নেমে যেতে হবে আউটস্প্যান হোটেলে। গেম রিজার্ভে টুকে ট্রীটপসে রাত কাটানোর অনুমতি নিতে হবে ওখান থেকে।

সবে বিমানের চাকা মাটি ছুঁয়েছে, প্রায় ছুটে এসে হাজির হলো হোটেলের শ্বেতাঙ্গ শিকারী-কাম-পথপ্রদর্শক। ছেলেদের কাছে নিজের পরিচয় দিলো কল মী। হাঙ্গার, অর্থাৎ আমাকে হাঙ্গার নামে ডেকো। মিস্টার-ফিস্টার বলার ঝামেলা করতে হবে না, সে-কথাও ঘোষণা করে দিলো মুক্তকণ্ঠে।

বিমানেই রেখে যাওয়া হলো ওকাপিটাকে। ঝামেলা করবে না। প্রচুর রসালো খাবার ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে খাঁচার ওপর। রাতের খাবারের পরও প্রচুর অবশিষ্ট থাকবে, নাস্তা সারতে পারবে।

ওকে নিয়ে ভেবো না, বললো হাঙ্গার। কি নাম যেন বললে? ও, মিস্টার ওকাপি। হ্যাঁ, ওকে দেখার লোক আছে হোটেলে। এখন দয়া করে আমার জীপে ওঠো, খুশি হবো।

হাঙ্গারকে খুশি করলো তিন গোয়েন্দা। মুসার কাঁধে চড়ে বসলো মিস্টার কোলোবাস। কিছু মনে করলো না গোয়েন্দা-সহকারী। বনের ভেতর দিয়ে চলে গেছে কাঁচা সড়ক, জায়গায় জায়গায় কাদা। তিন মাইল ওই বুনোপথ পেরিয়ে শেষ মাথায় পৌঁছলো গাড়ি। তারপর থেকে শুরু হয়েছে দানবীয় গাছের জঙ্গল, মাথার অনেক ওপরে খাড়া উঠে গেছে টাওয়ারের মতো।

হাঁটতে হবে এবার, জানালো হাঙ্গার। বেশি না, এই কোয়ার্টার মাইল।

মৌন হয়ে থাকা বিশাল দানবগুলোর ফাঁক দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে গেছে খুব সরু পায়েচলা পথ। ধীরে ধীরে উত্তেজিত হয়ে উঠছে বানরটা। বড় বড় গাছগুলো হাতছানি দিয়ে ডাকছে যেন তাকে, খাসা বাড়ি হবে এখানে। মাউন্ট কেনিয়ার তুষার ছুঁয়ে নেমে আসা বাতাস কনকনে ঠাণ্ডা। কোলোবাসের উপযুক্ত জায়গা। এটা।

মই কিসের ওটা? গাছের গায়ে বড় বড় পেরেক দিয়ে আটকে রাখা লম্বা মই দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলো কিশোর। আরে, আরও আছে দেখছি।

এখুনি বুঝতে পারবে, গম্ভীর হয়ে গেছে হাঙ্গার। ওই মই বেয়ে ওঠো, জলদি!

কেন? রবিনের প্রশ্ন।

আহ, কথা বাড়িও না! যা বলছি করো।

আগে আগে উঠতে শুরু করলো মুসা, গলা জড়িয়ে ধরে রইলো বানরটা। তার পেছনে রবিন, কিশোর, সবার শেষে হাঙ্গার। বনের ভেতরে প্রচণ্ড শব্দ হচ্ছে, ভেঙেচুরে মারিয়ে একাকার করে ফেলছে যেন গাছপালা। শোনা গেল হাতির গুরুগম্ভীর চিৎকার। হুড়মুড় করে বেরিয়ে এলো গাছের আড়াল থেকে, পথের ওপরে।

আরও ওপরে ওঠো! চেঁচিয়ে বললো হাঙ্গার।

শেষ মাথায় উঠে গেল মুসা। মইটা অনেক লম্বা। সবার নিচে থাকা হাঙ্গারের পা-ও শুড় বাড়িয়ে ধরতে পারবে না হাতি। সে চেষ্টা অবশ্য করলোও না ওরা।

বুঝতে পারলে তো এখন, কেন এই মই? বললো হাঙ্গার। জন্তুজানোয়ারে বোঝাই এই বন। যখন তখন বেরিয়ে আসে পথের ওপর। এখানে একটা কথা প্রচলিত আছেঃ গণ্ডার আর মোষ হলে আট ফুট, হাতি হলে আঠারো ফুট। তার মানে কোন জানোয়ার আসছে সেটা বুঝে নিয়ে তার নাগালের বাইরে যেতে হলে ততোখানি উঠতে হবে।

পার্কের মধ্যেও বুনো-হয়ে আছে নাকি? মানুষের ক্ষতি করে? কিশোর জিজ্ঞেস করলো।

পার্ক কি আর পোষ মানানোর জন্যে? নিরাপদে রাখার জন্যে। বুনোই তো থাকবে। তবে মানুষ দেখতে দেখতে গা সওয়া হয়ে যায় ওগুলোর, না খোঁচালে সহজে ক্ষতি করে না। তবুও, ঝুঁকি না নেয়াই উচিত। হাতি-গণ্ডার-মোষের মেজাজ-মর্জি বোঝা মুশকিল। আর আহত হলে তো সর্বনাশ। দেখা মাত্র মারতে আসবে।

এখন কি করবো?

জাস্ট ওয়েইট। অপেক্ষা।

কতক্ষণ?

পাঁচ মিনিট হতে পারে, পাঁচ ঘন্টাও লাগতে পারে। আমরা তাড়াহুড়ো করলে কিছু হবে না। ওদের যখন ইচ্ছে যাবে।
অপেক্ষা করার জায়গাটা সুবিধের নয়, ভাবলো মুসা। মই আঁকড়ে ধরে থাকা, তার ওপর কাঁধে রয়েছে এক বানর।
বিন্দুমাত্র তাড়া নেই হাতিগুলোর। অলস ভঙ্গিতে ডালপাতা ভেঙে ভেঙে খাচ্ছে। চারা গাছ ওপড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে ওপরে তাকিয়ে দেখছে, মানুষগুলো আগের জায়গাতেই আছে কিনা।
অস্থির হয়ে উঠছে মিস্টার কোলোবাস। বার বার ওপরে তাকাচ্ছে। মুসার মনে হলো, ওপরে জীবন্ত কিছু আছে, ওটাই বানরটার আকর্ষণ। সে-ও তাকালো। প্রথমে কিছু দেখলো না, তারপর মগডালে পাতার আড়ালে মৃদু নড়াচড়া চোখে। পড়লো।
মুখটা দেখতে পেলো আরও পরে। কপাল-কান-মাথা সব কালো; কপালের নিচটা, গাল, থুতনি সাদা। নিশ্চয় কোলোবাস। আরেকটু মুখ বের করলো ওপরের বানরটা। কিচির-মিচির করে ডাকলো মিস্টার কোলোবাসকে, ওটার কাছে যাওয়ার জন্যে।
অন্যেরাও লক্ষ্য করেছে ব্যাপারটা।
দেবো নাকি ছেড়ে? মুসা জিজ্ঞেস করলো।
দাও, হাঙ্গার বললো.। কোলোবাসের জন্যে ভালো জায়গা। তাছাড়া মিস ভাকছেন। মিস্টারের অনাদর হবে বলে মনে হয় না।
মিস, না মিসেস? দাঁত বের করে হাসলো মুসা।
এখন তো মিসই মনে হচ্ছে। মিস্টার গেলে পরে মিসেস হবেন আরকি।
বানরটাকে ভালোবেসে ফেলেছে মুসা। ছাড়তে কষ্টই হলো। তবু, তার কাছে থাকার চেয়ে বনে অনেক ভালো থাকবে ভেবে মন শক্ত করলো। ওটার গায়ে হাত রেখে তারপর ডালে চাপড় মেরে দেখিয়ে বললো, যা, যা।
লাফ দিয়ে গিয়ে ডালটায় বসলো মিস্টার কোলোবাস। ফিরে তাকালো মুসার দিকে তাকিয়ে রইলো চিন্তিত চোখে। মনস্থির করে নিয়ে ঘুরলো। লাফিয়ে ধরে ফেললো ওপরের আরেকটা ডাল। সে-ডাল থেকে আরেক ডাল. করে করে উঠে গেল ওপরে। পাতার আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো আরও কয়েকটা বানর। আশ্চর্য দক্ষতায় লুকিয়ে ছিলো এতোক্ষণ। মেহমানকে স্বাগত জানাতেই যেন সম্মিলিত কিচির-মিচির জুড়ে দিলো। যাক, মিস্টার কোলোবাসকে সাদরেই গ্রহণ করেছে, তবে হয়তো মিস কোলোবাসের বদান্যতায়।
আরে, কেঁদে ফেলছো কেন? মুসার দিকে চেয়ে বললো হাঙ্গার। মন খারাপ করো না। আবার দেখতে পাবে ওকে।ট্রীটপস লেকে রোজ রাতে পানি খেতে যায়

কোলোবাসেরা।
রওনা হয়ে গেল হাতিরা। বনের ভেতর মিলিয়ে গেল,ওদের শব্দ। মই থেকে নেমে আবার ট্রীটপসের দিকে চললো চারজনে।
গাছের ফাঁক দিয়ে চোখে পড়লো ট্রীটপস। অদ্ভুত দৃশ্য! মনে হচ্ছে যেন শূন্যে ভেসে রয়েছে একটা বড় বাড়ি। মাটি থেকে পঞ্চাশ ফুট ওপরে, দুলছে। বাতাসে গাছের ডাল দোলে, সেই সাথে বাড়িটাও। আরও কাছে এগিয়ে দেখা গেল ওটার ভিত-ডালপালা। দরজা থেকে নেমে এসেছে বিচিত্র কাঠের সিঁড়ি।
একটা হ্রদের দিকে মুখ করে আছে বাড়িটা। ছোট হ্রদ, তীরে ঘন বন। এই বিখ্যাত জায়গাটার কথা অনেক শুনেছে তিন গোয়েন্দা। রাতের বেলা বন থেকে বেরিয়ে হ্রদে পানি খেতে আসে অনেক রকম জানোয়ার। আরও একটা আকর্ষণ আছে ওগুলোর, হ্রদের আশেপাশে লবণের গর্ত। হোটেলের ব্যালকনি থেকে হ্রদ আর গর্তগুলো পরিষ্কার দেখা যায়। চুপ করে থাকলে, কোনো রকম শব্দ না করলে নিচের অনেক আশ্চর্য দৃশ্য দেখা যায় ওখানে বসে।
অনেক বিখ্যাত লোক রাত কাটিয়ে গেছেন ওই হোটেলে, রবিন বললো।
জানি, বললো কিশোর। রানী এলিজাবেথও নাকি এসেছিলেন।
তখনও তিনি রানী হননি, শাহজাদী ছিলেন। ওই হোটেলে থাকার সময়ই রাতে খবর এলো, তার বাবা মারা গেছেন, সিংহাসনে বসতে হবে এবার তাকে।
রাজা ফিলিপ আসেননি? মুসা প্রশ্ন করলো।
কয়েকবার, জবাব দিলো হাঙ্গার। আফ্রিকান ওয়াইল্ড লাইফ রক্ষায় তার দান অপরিসীম। অনেক কিছু করেছেন তিনি এখানকার বুনো জানোয়ারের জন্যে।... এসো, ওপরে উঠি।
সিঁড়ির নিচে জালে ঘেরা একটা ছোট জায়গায় গিয়ে ঢুকলো ওরা। অনেকটা টেলিফোন বুদের মতো, তবে ছাত নেই। সিঁড়ির নিচের ধাপটা বারো ফুট ওপরে। অবাক হয়ে ভাবলো তিন গোয়েন্দা, ওখানে উঠবে কি করে। একটা বোতাম টিপলো হাজার। হড়হড় করে নেমে এলো সিঁড়িটা, ঘেরা জায়গার ভেতরে। তাতে তিন গোয়েন্দাকে তুলে দিয়ে হাজারও উঠলো। আরেকটা বোতাম টিপতেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে ওপরে উঠতে লাগলো সিঁড়ি, বন্দর ছাড়ার আগে জাহাজের সিঁড়ি যেভাবে টেনে তুলে নেয়া হয় অনেকটা তেমনি ভাবে।
এই ব্যবস্থা কেন? জানতে চাইলো রবিন। জানোয়ারের ভয়ে?
হ্যাঁ, হাঙ্গার বললো। বড় জানোয়ার এসে ভেঙে ফেলতে পারে। কিংবা ওপরে উঠে গিয়ে মহা অনর্থ ঘটাতে পারে চিতাবাঘ। সেজন্যেই ওগুলোর নাগালের বাইরে তুলে রাখা হয় সিঁড়ি।
দুর্গের ড্রব্রিজের মতো, বিড়বিড় করলো কিশোর।

গাছের মাথার সুরক্ষিত দুর্গের দোরগোড়ায় পৌঁছলো ওরা।
ভেতরে ঢুকে ম্যানেজারের সঙ্গে তিন গোয়েন্দার পরিচয় করিয়ে দিলো হাঙ্গার।
হোটেল হিসেবে খুবই হোট ট্রীটপস মাত্র বারোজন মেম্বারের জায়গা হয়, কিন্তু গাছের মাথার বাড়ি হিসেবে আবার অনেক বড়। ডাল দুললেই বাড়ি দোলে। এমনকি কোনো লোক যদি জোরে হাঁটে, কিংবা আস্তেও লাফ দেয়, কেঁপে ওঠে গোটা বাড়ি।
ছেলেদের ঘরের বাইরে একটা ব্যালকনি। ওখানে বসে হ্রদের একপাশ স্পষ্ট দেখা যায়।ট্রীটপসের ছাতে যাওয়ার সিঁড়িও আছে। ওখান থেকে নিচে চারপাশেই। নজর চলে।

.
এখানে যেন শুধুই ফিসফিসানী। নোটিশ লেখা রয়েছে, জোরালো শব্দ করে যাতে জন্তুজানোয়ারকে বিরক্ত না করা হয়। ফলে স্বাভাবিক ভাবে কথা বলছে না কেউ। মেহমানরা ফিসফিস করছে, ফিসফিস করছে হোটেলের পরিদর্শক, চাকর-বাকর সবাই। সবার পায়ে রবার সোলের জুতো। এটা নিয়ম। মেহমানদের কারও ওরকম জুতো না থাকলে হোটেল থেকে কিনে নিয়ে পরতে হবে, চামড়ার জুতো পরে মচমচ করা চলবে না।
একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না, মুসা বললো। আমাদের কথা নাহয় না শুনলো, গন্ধ তো পাবে? ওগুলোর কাছ থেকে মাত্র পঞ্চাশ ফুট ওপরে রয়েছি আমরা।
পঞ্চাশ ফুট কেন, সিকি মাইল দূরে থাকলেও পেতো, জবাব দিলো হাঙ্গার। যদি নিচে থাকতাম আমরা, ওদের নাকের লেভেলে। কিন্তু এতো ওপরে রয়েছি, আমাদের গায়ের গন্ধ নিচে নামতে পারছে না, তার আগেই সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বাতাস, ওদের মাথার অনেক ওপর দিয়ে। আমরা আছি এটা বুঝতে পারবে শুধু শব্দ করলেই। সে-কারণে সর্দি লাগা কোনো লোকের এখানে আসা বারণ। একটা কাশি শুনলেই চোখের পলকে জঙ্গলে পালাবে সমস্ত জানোয়ার। পরে ফিরে আসবে। অবশ্য। জায়গাটাকে ওরা ভালোবাসে। হ্রদের ধারে কাদামাটিতে লবণের ছড়াছড়ি। পানি তো বটেই, লবণ ও খেতে আসে।
ডাইনিং রুমের লম্বা টেবিলে চমৎকার ডিনার দেয়া হলো। পেট পুরে খেলো সবাই। তারপর নিঃশব্দে ব্যালকনিতে চলে এলো বারোজন মেহমান। তাকিয়ে রইলো নিচের দিকে। পরনে ভারি পোশাক ওদের, ঠাণ্ডা যাতে না লাগে। কেউ কেউ তো বিছানা থেকে কম্বল এনে গায়ে জড়িয়েছে। সমুদ্র সমতলের সাত হাজার ফুট ওপরে রয়েছে, কনকনে শীত এখানে।
রাতের অন্ধকারে ঢাকা পড়লো নিচের দৃশ্য। জ্বলে উঠলো শক্তিশালী ফ্লাডলাইট। হ্রদের পাড়ের অনেকখানি জুড়ে ছড়িয়ে পড়লো আলো। জানোয়ারেরা এই

আলোতে অভ্যস্ত, বোঝা গেল। দুটো শুয়োর; একটা ওয়াটহগ, আর একটা ওয়াটারবাক এসে ইতিমধ্যেই হাজির হয়েছে। আলোর দিকে চোখ তুলে তাকালো একবার। অবাক হলো না তেমন। হয়তো ভাবছে, এটাও খুদে কোনো সূর্য। আলোর জন্যে ব্যালকনিটা দেখতে পেলো না, ফলে ঘাবড়ালো না, লবণ খোঁটায় মন দিলো।

চারটে গণ্ডার বেরিয়ে এলো বন থেকে। এসেই লবণাক্ত কাদা চাটতে শুরু করলো। একটু পরেই লেগে গেল ঝগড়া, সব চেয়ে ভালো জায়গাটার দখল নিয়ে। এ-ওকে ধাক্কা মারছে, রেগে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করছে শুয়োরের মতো, তবে শুয়োরের। চেয়ে ওদের গলার জোর অনেক বেশি আকারটাও তো দেখতে হবে। কানগুলো। বার বার এদিক-ওদিক নাড়ছে, অনেকটা রাডারের মতো, সন্দেহজনক সামান্যতম শব্দ পেলেই ছুটে পালাবে।

কাশির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারে হোটেল কর্তৃপক্ষ, কিন্তু ভোলা জায়গায় মশার বিরুদ্ধে কি করবে? মিনি জেট প্লেনের মতো বোঁ বোঁ করে সোজা এসে কিশোরের নাক দিয়ে ঢুকে পড়লো একটা। আর কি থাকা যায়। গায়ের জোরে হ্যাচচো করে উঠলো সে।

দুপদাপ করে ছুটে পালালো জানোয়ারের দল। নিমেষে হ্রদের তীর খালি।

তবে, বেশিক্ষণ লাগলো না, পায়ে পায়ে আবার ফিরে আসতে শুরু করলো। গোটা চারেক গণ্ডারও এলো আবার, বোধহয় আগেরগুলোই কিংবা অন্য জানোয়ার। একটার পেছনে আরেকটা সারি দিয়ে এলো, নাক দিয়ে বিচিত্র শব্দ করছে, কয়লার রেল-এঞ্জিনের মতো।

তারপর এলো হাতি। বিরাট বিরাট দানব একেকটা। দল বেঁধে নেমে গেল পানিতে। শুড় দিয়ে নিজের গায়ে, একে-অন্যকে পানি ছিটালো কিছুক্ষণ, ধুয়ে গেল ধূসর-কালো চামড়ায় লেগে থাকা ধুলো-ময়লা। পানি থেকে উঠে এলো ওরা। গণ্ডারের পায়ের চাপে ছোট ঘোট গর্ত হয়ে গেছে নরম পারে, পানি ঠেলে উঠছে। ওগুলোতে শুড়ের ডগা ডুবিয়ে দিলো হাতিরা, লবণ সংগ্রহ করে মুখে পাচার করতে লাগলো। মাঝে মাঝে কুতকুতে চোখ মেলে তাকাচ্ছে ফ্লাডলাইটের দিকে। ওই তাকানো পর্যন্তই, চাঁদ কিংবা সুরুজ মনে করেই হয়তো গুরুত্ব দিচ্ছে না। কি ভাবছে ওরাই জানে।

গণ্ডারের মতো বদমেজাজী নয় হাতি। অন্তত নিজেদের মধ্যে অযথা লড়াই করছে না। শান্তভাবে লবণ খাচ্ছে। কোনো শিশু কিংবা অল্পবয়েসী হাতি এসে বড়টার গর্তে শুড় ডোবানোর সঙ্গে সঙ্গে নিজের ঔড় তুলে নিয়ে ওটাকে জায়গা দিয়ে দিচ্ছে বড়টা। নিজে খুঁজে নিচ্ছে অন্য গর্ত।

ভয়ঙ্কর চেহারার পাঁচটা মোষ বেরিয়ে এলো। গণ্ডারের চেয়েও বদমেজাজী। এসেই জায়গার দখল নিয়ে লেগে গেল নিজেরা, সেই ক্ষোভ অন্যের ওপর গড়াতে দেরি হলো না। গণ্ডার আর মোষে লড়াই বেধে গেল দেখতে দেখতে। শিংয়ের। সঙ্গে শিংয়ের ঠোকাঠুকি, রাগতঃ, ঘোঁৎ ঘোৎ, খুরের দাপাদাপি চললো কয়েক মিনিট। গায়ে পড়ে হাতিদের সঙ্গে গিয়ে লাগলো দুই জাতের বদমেজাজী। কতো আর সওয়া যায়? রাগলো হাতিরাও। মোষগুলোকে পিটুনি লাগালো প্রথমে। ওগুলো পিছু হটে যেতেই গণ্ডারের পিঠে মোটা চাবুকের মতো আছড়ে পড়তে লাগলো শুড়। কিছুক্ষণ গাঁইগুই করে সরে যেতে বাধ্য হলো ওরাও। এই বিরক্তিকর যুদ্ধের পর আর খাওয়া, খেলা কোনোটাই জমে না। হাতিগুলোও চলে গেল।

বন থেকে বেরিয়ে এসে পানি খেতে নামলো একটা জিরাফ। সামনের পা। অনেক বেশি লম্বা, প্রকৃতিই গড়েছে ওদের ওরকম করে, গলা তুলে উঁচু ডাল থেকে পাতা ছিঁড়ে খাওয়ার সুবিধের জন্যে। একসাথে দুটো সুবিধে তো আর দেয়া যায় না, গলা নামিয়ে পানি খেতে তাই অসুবিধে হয় জিরাফের। সামনের দুই পা অনেক ছড়িয়ে ফাঁক করে মুখ দিয়ে পানির নাগাল পেতে হয়।

জানোয়ারের ভিড় লেগেছে হ্রদের তীরে। অনেক ধরনের হরিণ এসেছে : ইমপালা, টমি, গ্র্যান্ট, কুডু, ওয়াটারবাক, ক্লিপস্প্রিঙ্গার।

মুসার গায়ে কনুই দিয়ে আলতো গুতো দিলো রবিন, নীরবে হাত তুলে দেখালো একদিকে।

বনের কিনারে একটা গাছের ডালে জমায়েত হয়েছে অনেকগুলো কোলোবাস বানর। সতর্ক চোখে আলোর উৎসের দিকে তাকাচ্ছে। দ্বিধা করলো কিছুক্ষণ, তারপর দোল খেয়ে মাটিতে নামলো দলপতি। টুপটাপ করে লাফিয়ে পড়তে লাগলো অন্যগুলো। দল বেঁধে এগোলো পানির দিকে। প্রাকৃতিক পরিবেশে অপূর্ব সুন্দর লাগছে প্রাণীগুলোকে। তীব্র আলোয় চকচক করছে কালো-সাদা রোম। মহিলারা যে পছন্দ করে, খামোকা নয়। আর তাদের পছন্দের কারণে প্রতি মাসে জীবন দিতে হচ্ছে দশ হাজার করে কোলোবাসকে।

দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করলো মুসা। মিস্টার কোলোবাসও কি আছে দলে? দূর থেকে বোঝা যাচ্ছে না। হাঙ্গারের কাছ থেকে একটা বিনকিউলার চেয়ে নিলো সে।

হ্যাঁ, আছে। গলার ওই ফাসের দাগ কোনো দিন মুছবার নয়। নতুন বন্ধুদের সঙ্গে খুব সুখেই আছে মনে হয় বানরটা। বুকের কোথায় যেন খচ করে উঠলো মুসার। একেই কি বলে জেলাসি? লজ্জিত হলো মনে মনে। তার কাছে থাকলে মিস্টার কোলোবাস অনেক আদর পেতো, সন্দেহ নেই, কিন্তু ওই স্বাধীনতা কি পেতো? হোক না একটা বানর, ওটার স্বাধীনতা কেড়ে নেয়ার কি অধিকার আছে তার?

তাকে যদি কেউ খাঁচায় পুরে ভালো ভালো খাবার দিতো...আর ভাবতে পারলো না মুসা।
অনেক রাত পর্যন্ত বসে থাকলো মেহমানরা। তারপর একে একে উঠে চলে গেল যার যার ঘরে। তিন গোয়েন্দাও ঘুমাতে চললো।
ফ্যানটাসটিক আইডিয়া! সকালে নাস্তা খেতে খেতে হাঙ্গারকে বললো কিশোর। হ্রদের ধারে গাছের ওপর হোটেল বানানো!
একমত হলো পথপ্রদর্শক। হ্যাঁ, এর জন্যে কল্পনাশক্তি দরকার। বেরিয়েছিলো এক ভদ্রমহিলার মাথা থেকে। তাঁর নাম লেডি বেটি ওয়াকার। অনেক দিন আগে ন্যাশনাল পার্কে বেড়াতে এসেছিলেন। বিখ্যাত ক্লাসিক সুইস। ফ্যামিলি রবিনসনের খুব ভক্ত ছিলেন তিনি। সেই বই পড়া থাকায়ই গাছের ওপর বাড়ি বানানোর আইডিয়া ঢোকে তাঁর মাথায়। বেড়াতে এসে বন্ধুদের বলেছিলেন সেকথা। শুনে তো হেসেই খুন ওরা। কিন্তু লেডি ওয়াকার দমলেন না। বানিয়ে দেখিয়ে দিলেন।
একটা কাজের কাজই করেছেন তিনি, রবিন বললো। তার সৌজন্যেই কাল রাতে ওই চমৎকার দৃশ্য দেখার সুযোগ পেলাম।
তা তো পেলাম, শূন্য প্লেটটা ঠেলে সরালো মুসা। আমি ভাবছি আজকের কথা। সামনে খুব কঠিন কাজ পড়ে আছে।
প্লেনে ফিরে দেখা গেল, খাঁচার মধ্যে আরামে পাতার নাস্তা চিবুচ্ছে মিস্টার ওকাপি। হাজারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বিমানে চড়লো তিন গোয়েন্দা।
সিংহের জন্যে বিখ্যাত সেরেঙ্গেটি প্লেইন-এর ওপর দিয়ে মুয়ানজার দিকে, উড়ে চলেছে বিমান। দুই ঘন্টা পর নামলো ভিক্টোরিয়া হ্রদের দক্ষিণ পারে।
বন্দরে এসে ভালো কোনো বোট পেলো না তিন গোয়েন্দা। অনেক চেষ্টার পর একটা নৌকা মিললো, নড়বড়ে ভেলাই বলা চলে ওটাকে। এককালে নদীতে ফেরী পারাপার করতো। একটিমাত্র আউটবোর্ড মোটর, বহু পুরনো, প্রচণ্ড আওয়াজ। অগত্যা ওটা নিয়েই রুবনডো আইল্যাণ্ডে চললো ওরা। ওয়ারডেন টমসন বলে দিয়েছেন, যেতে পনেরো ঘন্টা লাগবে, আর ওই সময়ে ঝড় আসবে অন্তত পাঁচবার। ভুল করেছেন তিনি। একটা ঝড়ই এলো, কিন্তু টিকে রইলো পনেরো ঘন্টারও বেশি।
বিশাল হ্রদ। উত্তর তীর থেকে দক্ষিণ তীরের দূরত্ব আড়াইশো মাইল। ঝড় এলো উত্তর থেকে, পুরো হ্রদটা পাড়ি দিয়ে বয়ে চললো দক্ষিণে। বড় বড় ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে ভেলার ওপর। ভিজিয়ে চুপচুপে করে দিচ্ছে যাত্রীদের।
বিমান-যাত্রা নির্বিবাদে সহ্য করেছে মিস্টার ওকাপি, নৌ-যাত্রা মোটেই পছন্দ করতে পারলো না। নানারকম বিচিত্র শব্দ করে প্রতিবাদ জানিয়েই চলেছে।

অভ্যাস নেই, ভেলার দুলুনি সইতে পারলো না বেশিক্ষণ, বমি শুরু করলো। পেট থেকে বেরিয়ে এলো সমস্ত পাতা। ভেলার পাটাতনের কাঠামোতে শক্ত করে বাঁধা রয়েছে খাঁচাটা, এতো মচমচ করছে, গোয়েন্দারা আশঙ্কা করছে খুলে, ভেঙে না। চলে যায়।

আর শুধু ঝড়ই নয়, ভিক্টোরিয়ার আরও দুর্নাম আছে। না না, মহারানী ভিক্টোরিয়া নন-যার নামে নাম রাখা হয়েছে এই অগাধ জলরাশির, ভিক্টোরিয়া। হ্রদের কথা হচ্ছে। মাঝে মাঝেই এর নিচে রয়েছে বালির চরা, পানির সমতলের ঠিক নিচে। ওগুলোতে আটকে যাচ্ছে ভেলা। ঢেউ তখন উপকারই করছে। আটকে থাকতে দিচ্ছে না। তবে সব সময় সেটা পারছে না। তখন ব্যাক গীয়ার দিয়ে পিছিয়ে আনতে হচ্ছে ভেলা। কখনও কখনও শুধু এঞ্জিনের জোরে কুলাচ্ছে না, চরায় নেমে ঠেলা লাগাতে হচ্ছে তিন গোয়েন্দাকে। একবার তো ওরকম ঠেলা লাগাতে গিয়ে রবিন পড়লো বিপদে, আরেকটু হলেই ভেসে গিয়েছিলো গভীর পানিতে, তাহলে আর বাঁচতো না। সবে চরায় নেমেছে ওরা, ছয় ফুট উঁচু এক ঢেউ এসে ধাক্কা দিয়ে চিত করে ফেলে দিলো ওকে। ভাগ্যিস মুসার হাত ধরে রেখেছিলো। সে আর কিশোর মিলে টেনে-হিঁচড়ে সোজা করলো রবিনকে।

বিপদ আরও আছে। কুমির আর জলহস্তী। অগুনতি। কিলবিল করছে যেন হ্রদের পানিতে, বিশেষ করে ইয়া বড় বড় কুমির। মাঝে মাঝে ঘ্যাঁশশ করে ঘষা লাগায় ভেলার নিচে, যেন গাছের গুঁড়ি একেকটা। উল্টে দেয়ার চেষ্টা করে। না পারলে পাশে ভেসে ওঠে। অসতর্ক আরোহী পেলে লেজের বাড়ি মেরে ফেলে দিতে পানিতে, তারপর, গাঁপ!

জলহস্তীর ভয় আপাতত তেমন নেই। ঝড়ের দাপটে পানিতে থাকতে পারছে না ওরা, গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে হ্রদের মাঝে মাঝে জেগে ওঠা দ্বীপে। ওরকম একটা দ্বীপের কিনার দিয়ে চলার সময় ধুড়ুম করে হঠাৎ কিসের সঙ্গে যেন বাড়ি লাগলো। ভেলার। মুহূর্ত পরেই দেখা গেল, এক পাশ ঠেলে উঠছে ওপর দিকে। নিচে থেকে কিসে যেন ঠেলে কাত করে যাত্রীদের ফেলে দেয়ার চেষ্টা করছে। সুবিধে করতে না পেরে বেরিয়ে এলো ওটা। বিরাট এক মদ্দা হিপো, মানে জলহস্তী। বিরাট হাঁ করে মোটা মোটা দাঁত দেখিয়ে ভেঙচি কাটলো, তারপর বন্ধ করলো। এমন বিকট শব্দ হলো, মনে হলো সিন্দুকের ডালা পড়েছে। একটা বলে সুবিধে করতে পারেনি, ওটার একটা সহকারী থাকলেই দিয়েছিলো ভেলীর সর্বনাশ করে।

দিনটা কাটলো কোনোমতে, এলো অন্ধকার রাত। বুনো হ্রদে উত্তাল ঝড়ের মাঝে শুরু হলো যেন ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন। প্রাণের আশা ছেড়ে দিয়েছে তিন গোয়েন্দা, এই সময়, বহু যুগ পরে যেন চোখে পড়লো দূরে ক্ষীণ আলো, সেই সঙ্গে জাগলো।

আশার আলো। রুবনডো আইল্যাণ্ড! ক্ষণিকের জন্যে দেখা গেল আলোটা, তারপরেই মুষলধারে বৃষ্টি আর কুয়াশার মাঝে হারিয়ে গেল। শুধু আন্দাজের ওপর ভেলা চালাচ্ছে চালক। এই হ্রদের সঙ্গে তার ঘনিষ্ট পরিচয় না থাকলে অনেক আগেই হাল ছেড়ে দিতো।
কিছুক্ষণ পর আবার দেখা গেল আলো।ঠিক সময়মতো। আরেকটু হলেই পাশ দিয়ে সরে চলে গিয়েছিলো ভেলা। এমনিতেই অনেকখানি বিপথে সরে গেছে।
যা-ই হোক, দুর্গম নৌ-যাত্রার অবসান ঘটলো অবশেষে। দ্বীপের কিনারে ছোট একটা খাড়িতে ঢুকলো ভেলা। বাতাস তেমন ঢুকতে পারে না এখানে, ফলে ঢেউও খোলা হ্রদের তুলনায় অনেক কম। চেঁচিয়ে ডাকলো চালক।
সাড়া এলো তীর থেকে।
কাছে এসে দাঁড়ালেন এখানকার ওয়ারডেন। নাম জানালেন, অরিফিয়ানো ডেল মারটিগা হিসটো। হেসে বললেন, খুব লম্বা নাম, না? তোমাদের এতো কষ্ট। করতে হবে না। শুধু অরিফ বললেই চলবে, খাঁচাটা নামাতে সাহায্য করলেন তিনি। জিজ্ঞেস করলেন, কি নিয়ে এসেছো?
একটা ওকাপি।
সেটা বুঝতেই পারছি। মিস্টার, না মিসেস?
প্রশ্নটা অদ্ভুত মনে হলো তিন গোয়েন্দার কাছে। পুরুষ না মাদী, তাতে কি এসে যায়?
মিস্টার,জবাব দিলো কিশোর।
গুড। এই দ্বীপে আর একটা মাত্র ওকাপি আছে, মিসেস। বংশবৃদ্ধির চান্স হলো। খুব দুর্লভ জানোয়ার, ওকাপির কথা বলছি। দাঁড়াও, আসছি।
দৌড়ে ছোট কেবিনে গিয়ে ঢুকলেন ওয়ারডেন। ফিরে এলেন একটা বড় তোয়ালে নিয়ে। ভিজে একেবারে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে গোয়েন্দাদের, ওরা ভাবলো ওদের জন্যে এনেছেন। তা নয়। খাঁচার দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়লেন তিনি। মোলায়েম হাতে ওকাপিটার গা মুছতে শুরু করলেন।
একেবারে জামাই আদর। ওকাপির গায়ের প্রতিটি ইঞ্চি যত্ন করে মুছলেন মিস্টার হিসটো, ওটার ঠাণ্ডা শরীর গরম করলেন। ব্যস, হয়েছে, আর ঠাণ্ডা লাগার ভয় নেই।
খাওয়ার কি ব্যবস্থা? মুসা জিজ্ঞেস করলো।
আছে। বনের মধ্যে ঢুকলেই পেয়ে যাবে। যেদিকে ফিরবে সেদিকেই খাবার। পানির তো অভাবই নেই...।
তাহলে কি এখন শুধু ছেড়ে দিলেই হবে? বাধা দিয়ে বললো রবিন।

সেটাই উচিত। নিজের দায়িত্ব নিজেই নেয়া ভালো। এই দ্বীপে ওর কোনো শত্রু নেই। সিংহ, চিতাবাঘ, পোচার, কিচ্ছু না।
বড় জানোয়ার নেই? কিশোর জানতে চাইলো।
আছে। নিরাপদে রাখার জন্যে গণ্ডারের মতো বড় জানোয়ারও তুলে আনা হয়েছে। তবে মাংসাশী কাউকেই আনা হয়নি। ফলে তৃণভোজীদের বেহেশত হয়ে দাঁড়িয়েছে রুবনড়ডা দ্বীপ।
গা গরম হয়েছে। খাঁচার দরজা খোলা। দীর্ঘ দিন বন্দি থাকতে থাকতে হাঁফিয়ে উঠেছে, তাই সুযোগ পেয়ে আর দেরি করলো না মিস্টার ওকাপি। খাঁচা থেকে বেরিয়ে রওনা হয়ে গেল তার সবুজ বেহেশতের দিকে।
আমি কিন্তু ওটার খাবারের কথা বলিনি, আবার বললো মুসা। আমার পেটে এখন ছুঁচোর বেহেশত। সেই যে কবে কোন কালে খেয়েছি মনেই নেই। নাড়িভুড়ি সব হজম। পেটের চামড়াটাই আছে যা শুধু এখন....।
হো হো করে হেসে উঠলেন মিস্টার অরিফিয়ানো ডেল মারটিগা হিসটো। আরে তাই তো! ওকাপিটাকে পেয়ে ভুলেই গিয়েছিলাম..চলো, চলো!
.
গা মুছে, আগুনে হাত-পা সেঁকে গরম হয়ে খাবার খেতে খেতে মাঝরাত পেরোলো।
শোয়ার পর মিনিট খানেকের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লো মুসা। রবিন দুই মিনিট। কিন্তু কিশোর জেগে রইলো আরও কিছুক্ষণ। ফেরার কথা ভাবছে। সাংঘাতিক ওই হ্রদের পানিতে আবার পনেরো ঘন্টা কাটানোর কথা ভাবতেই হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যেতে চাইছে তার। তারপর রয়েছে দুই ঘন্টার বিমানযাত্রা। কাল রাতের আগে কিছুতেই টিসাভোয় ফিরতে পারবে না। আর অন্ধকারে সরু ওই ল্যাণ্ডিং স্ট্রিপে প্লেন নামাতে পারবে মুসা?
কখন যে ঘুমিয়ে পড়লো কিশোর, বলতে পারবে না। ঘুম ভাঙলো ডিম আর মাংস ভাজার চমৎকার সুগন্ধে।
নাস্তার টেবিলে সুখবর দিলেন ওয়ারডেন। বললেন, আমাদের লঞ্চে মুয়ানজায় যেতে পারবে। তাতে মাত্র সাত ঘন্টা লাগবে, অর্ধেকের বেশি সময় বাঁচবে তোমাদের। তবে একটা শর্ত আছে।
কী? আগ্রহে খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে কিশোর। ভাবতেই পারেনি, এরকম একটা সুবিধে পাবে। ওই ভেলায় আর পা রাখতে চায় না সে, লঞ্চে করে যাওয়ার জন্যে যে-কোন শর্তে রাজি।
তোমাদের প্লেনে করে টিসাভোয় লিফট দিতে হবে আমাকে, ওয়ারডেন বললেন। টমসনের সঙ্গে কিছু জরুরী আলোচনা আছে। রুবনড়ডায় চারটে গণ্ডার চালান

দেয়ার ব্যাপারে।
ফেরার পথেও ঝড় এলো কয়েকবার। তবু, ভেলার তুলনায় লঞ্চে করে যাওয়াটাকে মনে হলো আনন্দভ্রমণ। দুপুরের পর বিমানে চড়লো ওরা। উড়ে চললো রহস্যময় সেরেঙ্গেটি প্লেইন-এর ওপর দিয়ে।
একটা জিনিস দেখাবো তোমাদেরকে, হিসটো বললেন। ওই যে কাটা দাগটা দেখছো, ওর ওপর দিয়ে যাও।
লম্বা গভীর একটা খাত, অনেকটা গিরিখাতের মতো দেখতে। ওটার ওপর দিয়ে উড়ে চললো মুসা।
কি যেন মনে করার চেষ্টা করছে রবিন। বললো, ওলডুভাই গর্জ না ওটা?
অবাক হয়ে তার দিকে তাকালেন ওয়ারডেন। ডক্টর লীকি-র নাম তাহলে শুনেছো?
শুনেছে কিশোরও।
এঁকেবেঁকে গেছে গর্জ, ঠিক ওটার ওপর দিয়ে এঁকেবেঁকে বিমান চালালো মুসা। হঠাৎ একটা তীক্ষ্ণ বাঁক ঘুরে অন্যপাশে আসতেই লোকগুলোকে দেখা গেল, ফাটলের তলায় খুঁড়ছে। এঞ্জিনের শব্দে মুখ তুলে তাকালো। হাত নাড়লো, ওয়ারডেনও হাত নেড়ে জবাব দিলেন। দেখতে দেখতে ওদেরকে পেছনে ফেলে এলো বিমান।
মুসা এই গর্জের নাম শোনেনি। জিজ্ঞেস করলো, কি দেখাবেন বলেছিলেন?
দেখলে না? ওয়ারডেন বললেন। মাটি খুঁড়ছে।
সেটা এমন কি স্পেশাল ব্যাপার হলো?
ও, ওলডুভাইয়ের নাম তাহলে শোননি তুমি? অনেক বছর আগে ডক্টর লীকি বিশ লক্ষ বছরের পুরনো আদিম মানুষের হাড় খুঁজে পেয়েছিলেন ওখানে। সারা পৃথিবীতে সাড়া পড়ে গিয়েছিলো তখন। তার পর থেকেই লেগে আছে বিজ্ঞানীরা। আরও পুরনো ফসিল পাওয়া যায় কিনা খুঁজছে।
অ, আদিম মানুষের ব্যাপারে আগ্রহ নেই মুসার। প্লেন ঘোরানো?
ঘোরাও।
পৃথিবীর বৃহত্তম জ্বালামুখ দেখালেন ছেলেদেরকে ওয়ারডেন। অদ্ভুত নাম মুখটার, নৃগোবরাংগোররা। বহু দিন আগেই মরে গেছে আগ্নেয়গিরিটা। জ্বালামুখে চারপাশের দেয়াল আড়াই হাজার ফুট উঁচু। দেয়ালের গোড়া থেকে শুরু হয়েছে ঘন সবুজের রাজত্ব, ছড়িয়ে গেছে দেড়শো বর্গমাইল। ঘন বনের মাঝে মাঝে বিস্তীর্ণ। তৃণভূমি, কোথাও বা নীল হ্রদ। জন্তুজানোয়ারে বোঝাই এই এলাকা।
অনেক জানোয়ার দেখা যাচ্ছে, কিশোর বললো।
কি কি জানোয়ার? জিজ্ঞেস করলো মুসা।

চলো, নিজের চোখেই দেখবে, ওয়ারডেন বললেন। নিচে দিয়ে ওড়ো।
সিংহ, হাতি, গণ্ডার অনেক দেখা গেল। তৃণভূমিতে চরছে হাজার হাজার গরু-ছাগল-মোষ। পোষা। মাঝে মাঝে লাঠি হাতে লম্বা মাসাই রাখালদের দেখেই সেটা বোঝা যায়।
জ্বালামুখ পেছনে ফেলে এলো ওরা। সামনে দেখা গেল বিশাল এক হ্রদ, ওটার নাম লেক মনিয়ারা, জানালেন ওয়ারডেন। হ্রদের পানি নীল নয়, কালোও নয়, আশ্চর্য লাল! কাছে আসার পর বোঝা গেল কারণটা। কোটি কোটি ফ্ল্যামিংগো ভাসছে, সাঁতার কাটছে হ্রদের পানিতে এত ঘন হয়ে, দূর থেকে আলাদা করে চেনা যায় না, মনে হয় হ্রদের পানিই বুঝি লাল।
এতো পাখি থাকে কি করে একখানে! বিশ্বাস করতে পারছে না মুসা।
থাকে যেমন, মরেও, ওয়ারডেন বললেন। আগে এতো মরতো না, ইদানীং শুরু হয়েছে। কেন যেন হ্রদের পানি অতিরিক্ত লবণাক্ত হয়ে যাচ্ছে। এতে লবণ, পাখিগুলোর পায়ে দানা জমে যায়। জমে জমে তিন-চার ইঞ্চি পুরু হয়ে গেলে পা বেজায় ভারি হয়ে যায়, তখন আর উড়তে পারে না ফ্ল্যামিংগো। এই হ্রদে এখন আর ওদের খাবার নেই। অন্য জায়গা থেকে খেয়ে আসতে হয়। উড়তে না পারলে যেতেও পারে না, না খেয়ে মরে।
ফিরে আসে কেন?
হয়তো বাপ-দাদার ভিটে ছেড়ে যেতে মন চায় না, রসিকতা করলো রবিন।
আসলেও কিন্তু তাই, ওয়ারডেন বললেন। আদিম কোনো প্রবৃত্তি কাজ করছে পাখিগুলোর রক্তে তাই লেক মনিয়ারায় ফিরে ফিরে আসে।
ওদের বাঁচানোর কোনো উপায় নেই? জানতে চাইলো কিশোর।
বাঁচাতে হলে হ্রদের পানির লবণ কমাতে হবে, সেটা সম্ভব নয়। ওই যে, ছেলেগুলোকে দেখছো, ওরা বাঁচানোর চেষ্টা করছে। হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে পা থেকে লবণ ভেঙে দিচ্ছে, যাতে উড়ে যেতে পারে।
যাক, আফ্রিকান ছেলেরা তাহলে সচেতন হয়েছে, খুশি হলো মুসা। বুড়োগুলোর মাথা থেকে শয়তান নামলেই এখন বেঁচে যেতো অনেক জানোয়ার।
মাউন্ট কিলিমানজারোর ওপর দিয়ে আসার সময় এক ঝলক বরফ-শীতল বাতাস এসে লাগলো গায়ে। সরে আসতেই আবার গরম বাতাস। চোখে পড়লো টিসাভো ন্যাশনাল পার্ক।
অফিসেই আছেন ওয়ারডেন টমসন। হিসটোকে দেখে লাফিয়ে উঠলেন। আন্তরিক শুভেচ্ছা জানালেন একে অন্যকে।
নিরাপদে ওকাপি আর বানরটাকে রেখে এসেছে, টমসনকে শুধু একথা জানিয়ে ব্যান্ডায় রওনা হলো তিন গোয়েন্দা। গোসল সেরে এসে পরে সব কথা। খুলে

বলবে।
দরজার নিচে ফেলে রাখা কাগজটা আগে রবিনের চোখে পড়লো। নিচু হয়ে। তুলে নিলো। ভঁজ খুলে পড়লো। গম্ভীর হয়ে গেল চেহারা। কিশোরের হাতে তুলে দিতে দিতে বললো, হুমকি দিয়েছে।
জোরে জোরে পড়লো কিশোরঃ : বাড়ি যাও, বিচ্ছুরা। দ্বিতীয়বার আর সাবধান করবো না। নইলে মরবে, জানোয়ারগুলোর মতো। মনে রেখো, দুনিয়ায় এখনো এমন কিছু জায়গা রয়েছে, যেখানে মানুষের ট্রফি সাজিয়ে রাখা হয়।
–এল জে এস।
এল জে এস মানে কি? মুসা বললো। লঙ জন সিলভার?
তাছাড়া আর কে? চিন্তিত দেখাচ্ছে গোয়েন্দাপ্রধানকে।
ফালতু হুমকি না তো?
মনে হয় না। সে সিরিয়াস লোক। যা বলেছে করবে। আর শুধু সে কেন? কোটি কোটি ডলার কামানোর জন্যে দুনিয়ার অনেক লোকই মানুষ খুন করতে দ্বিধা করবে না।
তাহলে? বাড়ি ফিরে যাচ্ছি?
মাথা খারাপ। একটা শয়তানের শাসানিতে ভয়ে পালাবো? অসম্ভব। সিলভারকে ব্রোঞ্জ বানিয়ে ছাড়বো আমি, দাঁতে দাঁত চাপলো কিশোর।
আমিও, দৃঢ় কণ্ঠে বললো মুসা। টিসাভো থেকে পোচার উচ্ছেদ না করে যাচ্ছি না আমি।
কিন্তু ব্যাটাকে ধরি কিভাবে? প্রশ্ন রাখলো রবিন।
দেখা যাক, কিশোর বললো। বুদ্ধি একটা বের করতে হবে। পাঁচ মাইল লম্বা যে ট্র্যাপ-লাইনটা দেখেছিলাম, কাল সকালে যাবো ওখানে। এবার আর পোচার নয়, সিলভারকে ধরার দিকে নজর দেবো।

.

সেরাতে গাড়ির শব্দে ঘুম ভেঙে গেল কিশোরের। বিশেষ গুরুত্ব দিলো না। ভোর রাতে আবার ঘুম ভাঙলো, শুনলো, চলে যাচ্ছে গাড়িটা।
সকালে নাস্তার পর ট্র্যাপ-লাইনে যাবার জন্যে তৈরি হলো গোয়েন্দারা। সঙ্গে যাবে ওয়ারডেনের কয়েকজন রেঞ্জার আর তিরিশজন মাসাই। হিসটোর সঙ্গে জরুরী কাজ আছে টমসনের, তিনি যেতে পারছেন না। তবে অসুবিধে নেই, রেঞ্জারদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে দিলেন তিনি, কিশোরের কথা যেন মেনে চলে।
ট্র্যাপ-লাইনের মাইল খানেকের মধ্যে থামলো গাড়ির মিছিল।
সাপ্লাই ভ্যানে টিয়ার গ্যাসের ক্যানূ আছে, মাসাইদের বললো কিশোর। সবাই একটা করে নিয়ে এসো, কিভাবে কি করতে হবে বুঝিয়ে দিলো সে।

আবার এগোলো গাড়ির মিছিল।ট্রাপ-লাইনের কয়েক শো গজ দূরে এসে থামলো, আগের বার এক মাইল লম্বা লাইনটার সামনে যেভাবে দাঁড়িয়েছিলো, সেভাবে। পোচারদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে জোরে জোরে হর্ন বাজাতে লাগলো। লাইনের ফাঁকে উঁকিঝুঁকি মারতে শুরু করলো কালো কালো মুখ। বারোজন মাসাইকে নিয়ে, ঘুরে, পোচারদের ক্যাম্পের পেছনের বনে গিয়ে ঢুকলো কিশোর। রবিন আর মুসাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে এসেছে।

আগের বারের কৌশল এবারেও করতে পারে সিলভার। দলের পেছনে নিরাপদ জায়গায় থাকতে পারে। যদি দেখে পোচাররা হেরে যাচ্ছে, চুরি করে পালানোর চেষ্টা করবে আগের বারের মতোই। বনের ভেতর দিয়ে ছাড়া অলক্ষ্যে। যাওয়ার জায়গা নেই, তাই এখানে চলে এসেছে কিশোর।

মাসাইদের নিরস্ত্র হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সাহস পেয়ে গেল পোচাররা। তীর ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগিয়ে গেল। বাধা আসছে না দেখে সাহস আরও বাড়লো। মাসাইদের টিটকারি মারতে মারতে এগুলো বল্লম হাতে।

ইঙ্গিতের জন্যে বার বার মুসার দিকে তাকাচ্ছে মাসাইরা।

পোচাররা পঞ্চাশ ফুটের মধ্যে চলে এলে প্রথম ক্যানূটা ছুঁড়ে মারলো মুসা। মারো! বলে রবিনও তার হাতেরটা ছুঁড়লো।

উড়ে গেল এক ঝক ক্যান। জন্তু-খুনীদের সামনের শক্ত মাটিতে পড়ে ফাটলো একের পর এক। চোখের পলকে ওদেরকে ছেয়ে ফেললো হলদে-সাদা ধোয়া। কাশতে শুরু করলো পোচাররা। দম বন্ধ হয়ে আসছে, শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। আতঙ্কে গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে শুরু করলো কেউ কেউ, লুটিয়ে পড়লো মাটিতে। লম্বা ঘাসে নাক গুঁজে ধোয়া থেকে বাঁচতে চাইলো। কয়েকজন টলতে টলতে ছুট দিলো কুঁড়ের দিকে।

ঠিক এই সময় বন থেকে বেরিয়ে উল্টো দিক থেকে ছুটে এলো কিশোর। সিলভারকে খুঁজতে লাগলো। কোথাও দেখা গেল না তাকে। মাটিতে বুটের ছাপও নেই। আধ ঘন্টা ধরে খোঁজাখুঁজি করেও তার কোনো চিহ্ন পাওয়া গেল না।

ইতিমধ্যে উঠে দাঁড়িয়েছে কিছু পোচার, কিন্তু চোখে ভীষণ জ্বালা। পানি গড়াচ্ছে। দেখতে পারছে না ঠিকমতো। লড়াইয়ের উদ্যম একেবারেই তিরোহিত হয়েছে। ঘিরে ফেলা হলো ওদের।

মোমবাসায় জেলে গিয়ে কটা দিন সুখে কাটিয়ে আসার ইচ্ছে যাদের ছিলো, হতাশ হতে হলো তাদেরকে।

গাঁয়ে ফিরে যেতে বলুন ওদের, মুগামবিকে বললো কিশোর। হুঁশিয়ার করে দিন, আবার জানোয়ার মারতে এসে ধরা পড়লে কপালে অনেক দুঃখ আছে।

পোচাররা চলে গেল।

ফাঁদে আটকা পড়া জানোয়ারগুলোর মাঝে যেগুলো তখনও বেঁচে রয়েছে, ছেড়ে দেয়া হলো। বেশি জখমীগুলোকে গাড়িতে তুলে নেয়া হলো চিকিৎসার জন্যে। আর যেগুলো মরে গেছে তো গেছেই। সমস্ত ফাঁস, ফাঁদ তুলে নেয়া হলো।
সব কটা কুঁড়ে আর পাঁচ মাইল লম্বা, ঘাসের বেড়া পুড়িয়ে ছাই করে দেয়া। হলো।
লজে ফিরে এলো গাড়ির মিছিল। সব কথা টমসনকে জানালো তিন গোয়েন্দা। সিলভারকে পায়নি বলে দুঃখ করলো অনেক।
মন খারাপ করো না, সান্তনা দিলেন ওয়ারডেন। ব্যাটাদের অনেক ক্ষতি করে দিয়ে এসেছে। ভয় পাইয়ে দিয়েছে। কম করোনি। যাবে কোথায় সিলভার? আজ হোক কাল হোক, ধরা তাকে পড়তেই হবে। ও, ভালো কথা, জজ নির্মল পাণ্ডা তোমাদের গুড লাক জানিয়েছেন।
কোথায় উনি? জিজ্ঞেস করলো কিশোর।
তখন বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। কাল রাতে এসেছিলো, ভোরে চলে গেছে তাড়াহুড়ো করে। জরুরী কাজ নাকি আছে।
আমরা যে আজ পোচার ঠেঙাতে যাবো, সেকথা বলেছিলেন ওকে?
নিশ্চয়। পোচারদের ব্যাপারে সব সময় তার আগ্রহ।
দ্বিধা করে শেষে বলেই ফেললো কিশোর, স্যার, জজ সাহেব আপনার ঘনিষ্ঠ। বন্ধু। কথাটা কিভাবে নেবেন জানি না। একটা প্রশ্ন জাগছে আমার মনে, উনি কি সত্যি আমাদের পক্ষে না বিপক্ষে?
খুব অবাক হলেন ওয়ারডেন। ভুরু কুঁচকে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে রইলেন কিশোরের দিকে। দেখোএমন একজন লোককে সন্দেহ করছো, যাকে কোনো মতেই অবিশ্বাস করা উচিত না। এদেশে পোচিঙের বিরুদ্ধে যারা সব চেয়ে বেশি শোরগোল তুলেছেন, জজ সাহেব তাঁদের একজন। জন্তুজানোয়ারের জন্যে নিবেদিত প্রাণ। আমাদের বিপক্ষে যাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। এই সেদিনও তোমাদের সামনেই আমার প্রাণ বাঁচালো।
শুধু মুখে মুখেই জানোয়ারকে ভালোবাসার কথা বলে? না করেও কিছু?
অবশ্যই করে।
ডেস্কের ড্রয়ার খুলে একটা চেক বের করলেন টমসন। টেবিলের ওপর রেখে কিশোরের দিকে ঠেলে দিয়ে বললেন, এই দেখো, কাল রাতে দিয়েছে। ওর সময়। নেই। আমাকে ওয়াইল্ডলাইফ সোসাইটিতে পাঠিয়ে দেয়ার অনুরোধ করেছে।
দুহাজার পাউণ্ডের চেক।
এবার বুঝলে তো? কিশোরকে নীরব দেখে আবার বললেন ওয়ারডেন। শুধু কথা নয়, কাজেও করে দেখায়। এদেশে একজন জজের বেতন আর কতো বলো?

তার থেকে জমিয়ে দুহাজার পাউণ্ড জন্তুজানোয়ারের উপকারের জন্যে দান। করা…না,কিশোর, নির্মল সত্যি মহৎ।
কি জানি, স্যার, সন্দেহ গেল না কিশোরের। হয়তো আমিই লোক চিনতে ভুল করেছি। সাধারণত এমন ভুল হয় না আমার।
ভুল মানুষেরই হয়, কথাটা সামান্য রুক্ষই শোনালো।
ব্যানডায় ফিরে এলো কিশোর। মুসা আর রবিনকে জানালো যা যা কথা হয়েছে।
কি জানি, হয়তো সত্যি ভুল করেছো, মুসা বললো। লোকটাকে দেখে কিন্তু খারাপ মনে হয় না।
না, ভুল আমি করিনি, জোর দিয়ে বললো কিশোর। অসম্ভব ধড়িবাজ লোক ওই জজ।
তাহলে টাকা যে দিলো? রবিন বললো।
সেটা তো খুব সহজ একটা ব্যাপার। ওই ধ্যাটা কি আর জজের বেতন দিয়ে চলে? কোটিপতির সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। টাকার অভাব আছে নাকি? ওর কাছে দুহাজার পাউণ্ড কিচ্ছু না। কিন্তু দান করে ওয়ারডেনের চোখে ভেলকি লাগিয়ে দিয়েছে। আমি শিওর, সিলভারের সঙ্গে সম্পর্ক আছে ওর।
সেটা নাহয় আমরা বিশ্বাস করলাম, ওয়ারডেনকে কিছুতেই বিশ্বাস করাতে পারবে না। করাতে হলে জোরালো প্রমাণ দরকার।
সেটাই জোগাড় করতে হবে আমাদের, যেভাবে হোক।
কিন্তু কিভাবে? মুসা প্রশ্ন করলো।
জানি না এখনও, নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটলো একবার গোয়েন্দাপ্রধান। আজকে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছে? সিলভারকে পোচারদের কুঁড়েতে পাওয়া যায়নি। কেন? কারণ, আগেই তাকে সাবধান করে দেয়া হয়েছে। আমরা আজ পোচার ধরতে যাবো, একথা কাল রাতে জজকে বলেছেন টমসন। খুব ভোরে উঠে চলে গেল সে। কোথায়? নিশ্চয় পোচারদের ক্যাম্পে, সিলভারকে বলার জন্যে, হাতের উল্টো পিঠ কপালে ঘষলো কিশোর। তবে সবই আমার অনুমান। আদালতে টেকে, এমন প্রমাণ জোগাড় করতে হবে?
তাহলে সেই চেষ্টাই করা যাক, মুসা বললো। এখানে বসে থেকে সেটা হবে। না নিশ্চয়!

.

পোচারদের আরেকটা ক্যাম্প আবিষ্কার করেছে তিন গোয়েন্দা।
পাহাড় আর উপত্যকার ওপর দিয়ে চক্কর মারছে মুসা। বিনকিউলার চোখে লাগিয়ে তন্নতন্ন করে নিচের এলাকা খুঁজছে কিশোর, মাঝে মাঝে যন্ত্রটা তুলে

দিচ্ছে রবিনের হাতে। আরেকটা ট্র্যাপ-লাইন খুঁজছে ওরা। লাইন থাকলে পোচার থাকরে, পোচার থাকলে সিলভারকে পাওয়ার সম্ভাবনা।
লাইন দেখা গেল না। শুধু কয়েকটা ঘাসের কুঁড়ে। মানুষ চোখে পড়লো না। আশেপাশে মাইলের পর মাইল জুড়ে একই অবস্থা, নির্জন।
ভয় পেয়ে চলে গেছে হয়তো, রবিন বললো।
আমার মনে হয় না, মাথা নাড়লো কিশোর। বনে গিয়ে লুকিয়েছে বড় জোর। মুসা, ওই ডোবাটার কাছে যাও তো।
জানোয়ার গিজগিজ করছে ডোবার পাড়ে; হাতি, গণ্ডার, জেব্রা, হরিণ; দিবাচর আফ্রিকান যতো প্রাণী আছে, প্রায় সব। শুধু পোচার বাদে।
হঠাৎ, ফোয়ারার মতো ছিটকে উঠলো ডোবার পানি, তারপর কাদা, সব শেষে ধোয়া। কানে এলো বিস্ফোরণের শব্দ। বাতাস অস্থির হয়ে যাওয়ায় সাঙ্ঘাতিক দুলে উঠলো বিমান। ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল ছোট ছোট জানোয়ার, বড়গুলো সুতো-ছেঁড়া গ্যাস-বেলুনের মতো লাফিয়ে উঠলো শূন্যে। মুহূর্ত আগে যে জায়গাটা স্বর্গ ছিলো ওদের জন্যে, সেটা হয়ে গেল নরক। শত শত জীবের গোরস্থান।
খাইছে! চেঁচিয়ে উঠলো মুসা। ডিনামাইট!
কিছুই বললো না কিশোর। নীরবে মাথা দোলালো শুধু।
বন থেকে পিলপিল করে বেরিয়ে আসতে লাগলো পোচারের দল। জখমী বড়। জানোয়ারগুলোকে বল্লম দিয়ে খুঁচিয়ে মারতে শুরু করলো। ছোট ছোট জানোয়ারের মাথা, লেজ, আর দরকারী অঙ্গ কেটে নিতে লাগলো জীবন্ত অবস্থায়ই। রোমহর্ষক দৃশ্য!
উত্তেজনায় প্রথমে প্লেনটা দেখতে পায়নি পোচাররা, খেয়াল করতেই লুকিয়ে পড়ার জন্যে দৌড় দিলো বনের দিকে। তাড়াতাড়ি লজে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিলো মুসাকে কিশোর।
ওয়ারডেনকে পাওয়া গেল না, জরুরী কাজে বেরিয়েছেন হিসটোকে নিয়ে। দেরি করলো না কিশোর। যতো দ্রুত পারলো, মাসাইদের নিয়ে ফিরে এলো সেই ডোবাটার ধারে।
কিন্তু, এতো তাড়াতাড়ি করেও কিছু করতে পারলো না। অনেক সময় গেছে। ইতিমধ্যে যা যা নেয়ার, নিয়ে কেটে পড়েছে পোচাররা। ডোবার ধারে জন্তুজানোয়ারের খণ্ডিত, ক্ষত-বিক্ষত লাশ ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না। পানিতেও অসংখ্য মৃতদেহ। তুলে না ফেললে পচে নষ্ট হবে ডোবার পানি। ওই পানি খেয়ে মড়ক লাগবে জানোয়ারের, পালে পালে মরবে।
কাজে লেগে পড়লো রেঞ্জার আর মাসাইরা। অমানুষিক পরিশ্রম করে সমস্ত মৃতদেহ তুলে আনলো পানি থেকে। ডাঙায় ফেলে রাখলে অসুবিধে নেই। খেয়ে

সাফ করে ফেলবে শবভোজী প্রাণীরা। পরদিন সকালে এলে হাড় ছাড়া আর কিছুই দেখা যাবে না।
সন্ধ্যার পর লজে ফিরলো দলটা। ভীষণ ক্লান্ত। পেটে খিদে। মেজাজ খারাপ।

.

পরদিন সকালে আবার বিমান নিয়ে বেরোলো গোয়েন্দারা। সরে এলো উত্তরে, চল্লিশ মাইল দূরে...পঞ্চাশ ...ষাট...ডানে খানিকটা মোড় নিয়ে পেরিয়ে এলো। আরো দশ মাইল। চোখে পড়লো ধোঁয়া।
কাছে গিয়ে যা দেখলো, নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলো না। বেশ কিছুটা জায়গা ঘিরে শুকনো ঘাসে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়েছে। জ্বলছে দাউ দাউ করে। আগুনের বৃত্তের মাঝে পাগলের মতো ছোটাছুটি করছে অনেকগুলো হাতি। বেরোনোর পথ পাচ্ছে না।
পোচাররা রয়েছে নিরাপদ দূরত্বে।
বারো ফুট লম্বা হাতিঘাসের জঙ্গলে নিশ্চিন্তে চরছিলো হাতিগুলো। ভাবতেই পারেনি ওদের ওপর নেমে আসবে নির্মম মৃত্যুর করাল থাবা, জীবন্ত পুড়ে কাবাব হবে। বড় বড় কয়েকটা জানোয়ার মরিয়া হয়ে ছুটলো আগুনের ভেতর দিয়েই। ফলে মৃত্যু হলো আরও নির্মম, আরও যন্ত্রণাদায়ক। আগুনের বাইরে বেরিয়ে অদ্ভুত ভাবে নাচতে শুরু করলো, উন্মাদ হয়ে গেছে যেন। আসলে, পায়ের পাতা পুড়ে গেছে ওগুলোর। মাটিতে পা রাখতে পারছে না। সেই সাথে রয়েছে শরীরের অন্য জায়গা পুড়ে যাওয়ার জ্বালা। মরবে ওগুলো, জানা কথা। বৃত্তের ভেতরে থাকলেই বরং ভালো ছিলো, তাড়াতাড়ি মরতো। পোড়া পায়ের পাতা নিয়ে হাঁটতে পারবে না। খাবার, বিশেষ করে পানির অভাবে কাহিল হবে। অসহায় শিকারে পরিণত হবে হায়েনা, কিংবা হিংস্র পোচারের।
নগ্ন কালো পিশাচগুলোর মাঝে আরেকটা দাড়িওয়ালা পিশাচকে দেখা গেল, গায়ে বুশ জ্যাকেট, পরনে সাফারি ট্রাউজার।
সিলভার! হাত তুলে দেখালো রবিন।
শাঁ করে আরও কাছে বিমান নিয়ে গেল মুসা, নিচে নামলো। শব্দ শুনে ওপর দিকে চেয়ে হাসলো সিলভার, হাত নাড়লো।
শয়তান! দাঁতে দাঁত পিষলো মুসা। ব্যাটা জানে, এখন আমরা কিছু করতে পারবো না। লজে গিয়ে দলবল নিয়ে আসতে আসতে চলে যাবে।
চলো, জলদি ফিরে চললা, কুইক! তাড়া দিলো কিশোর। দেখিই না এসে, কিছু করা যায় কিনা?
কিছুই করা গেল না। চলে গেছে পোচাররা। তাড়াহুড়োয় যা যা নিতে পেরেছে; নিয়ে গেছে। লেজ, পায়ের পাতা, চোখের পাপড়ি, কান। তবে সব চেয়ে দামী

জিনিসটাই ফেলে যেতে হয়েছে। দাঁত।
হাতির দাঁত খুলে নেয়া খুবই কঠিন কাজ। হাড় আর মাংসে শক্ত হয়ে লেগে থাকে, যেন সিমেন্টে গাঁথা। কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে কেটে বের করতেও কষ্ট হয়। সহজ উপায় হলো, লাশটা ফেলে রাখা। পচে গলে মাংস খসে গেলে তখন। নেড়েচেড়ে গোড়া থেকে খুলে নেয়া যায় দাঁত। কিন্তু তার জন্যে অনেক সময় দরকার।
.
এরপর থেকে যেন বাতাসে মিলিয়ে গেল সিলভার আর তার খুনীর দল। পাহাড়, জঙ্গল, তৃণভূমির ওপর চক্কর দিয়ে দিয়ে ফিরলো গোয়েন্দারা। কিন্তু কিছুই দেখলো না আর। ঘাসের কুঁড়ে নেই, ট্র্যাপ-লাইন নেই, ডিনামাইট ফাটলো না, আগুন লাগলো না।
পোচিং ছেড়ে দিলো নাকি ব্যাটারা? অবাকই হয়েছে রবিন। ভয় পেলো শেষমেষ!
ইবলিস কি আর শয়তানী ছাড়ে? প্লেন চালাতে চালাতে মন্তব্য করলো মুসা। লুকিয়েছে আরকি। হয়তো কিছুদিনের জন্যে গিয়ে গর্তে ঢুকেছে।
গভীর ভাবনায় ডুবে ছিলো কিশোর। ঝট করে মাথা ফেরালো। কি বললে? গর্ত? তুড়ি বাজালো। ঠিক বলেছো! নিশ্চয় গর্তেই লুকিয়েছে। কোথায় যেন পড়েছি, হাতি ধরার জন্যে গর্ত খুঁড়ে রাখে, পিগমিরা। ওপরটা ঢেকে রাখে ডালপাতা দিয়ে। না দেখে হাতি গিয়ে পড়ে সেই গর্তে। ওপর থেকে তখন বড় বড় পাথর ছুঁড়ে আর বল্লম দিয়ে খুঁচিয়ে সেটাকে মেরে খেয়ে ফেলে।
একেবারে আদিম পদ্ধতি, বিড়বিড় করলো রবিন। প্রাগৈতিহাসিক মানুষও ওভাবে ম্যামথ শিকার করতো।
আরও একটা কাজ করে পিগমিরা, রবিনের কথা যেন শুনতেই পায়নি গোয়েন্দাপ্রধান। জরুরী মুহূর্তে ওই গর্তকে বাংকার হিসেবেও ব্যবহার করে।
তারমানে, মুসা বললো। তুমি বলতে চাইছো, পোচাররাও হাতি ধরার গর্তকে বাংকার হিসেবে ব্যবহার করছে?
হ্যাঁ! আজ আর বেলা নেই। কাল সকালে এসে খুঁজবো।
লজে ফিরে দেখলো ওরা, জজ নির্মল পাণ্ডা হাজির।
এই যেছেলেরা, দেখেই হাসিমুখে বলে উঠলেন তিনি। খুঁজে পেয়েছো?
এখনও পাইনি। তবে পাবো, গম্ভীর হয়ে জবাব দিলো কিশোর।
যাবে কোথায় শুয়োরের বাচ্চা? ইচ্ছে করেই গালিটা দিলো মুসা। আড়চোখে তাকালো জজের দিকে।
আমি হলে হাল ছেড়ে দিতাম, হাসি বিন্দুমাত্র মলিন হলো না জজের। তোমরাও ছাড়বে। এখনও বুঝতে পারছে না তো। আমরা কি আর কম চেষ্টা করেছি, কম খুঁজেছি? পাইনি। দেখো, চেষ্টা করে দেখো। পেলে তো ভালোই।

কিশোরের মনে হলো, জজের কথাবার্তা আর হাসির পেছনে কি যেন একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত রয়েছে। রাগে মুসার মতোই গাল দিয়ে উঠতে যাচ্ছিলো, অনেক কষ্টে সামলালো নিজেকে। শান্তকণ্ঠে বললো, আপনার মহানুভবতার কথা বলেছেন আমাকে মিস্টার টমসন। ওয়াইল্ডলাইফ সোসাইটিকে নাকি অনেক টাকা দান করেছেন।

বিগলিত হলো জজের হাসি, হাত নাড়লো বিনীত ভঙ্গিতে। ও কিছু না.। নেই তো, দেবো কোত্থেকে? ইচ্ছে করে দুনিয়ার সমস্ত ধন এনে লাগাই অসহায় অবলা জানোয়ারগুলোর উপকারে। কিন্তু কয় পয়সা আর বেতন পাই বলো? তা থেকেই কষ্টেসৃষ্টে জমিয়ে যা পেরেছি দিয়েছি।

খুব ভালো, খুব ভালো, আপনার অনেক দয়া। তবে ইচ্ছে করলে অনেক বেশি টাকা কামাতে পারেন। এদেশের অনেক জজ সাহেবই সেটা করছেন।

মানে? কালো হয়ে গেল জজের মুখ। হাসি উধাও।

ধরুন–মানে, আমি কল্পনা করতে বলছি আরকি আপনাকে আপনি মোটেই সৎ লোক নন। ভদ্রলোক নন, নিতান্তই ছোটলোক। পোচারদের সঙ্গে আপনার যোগসাজশ আছে। পোচারদের ধরে আপনার কোর্টে পাঠালে নানারকম অজুহাত দেখিয়ে বেশির ভাগকেই ছেড়ে দেন, অল্প কয়েকজনকে লোক দেখানো শাস্তি দেন, এই দুচার দিনের জন্যে। শহরে যতো বড় বড় অন্যায় ঘটে, সব দেখেও না, দেখার ভান করেন। কেন করেন? দুহাত ভরে টাকা দেয়া হয় আপনাকে, বিনিময়ে। কালো টাকার পাহাড় জমিয়ে ফেলছেন। অথচ এমন ভাব করে থাকেন, যেন আপনার মতো সৎ লোক আর হয় না, সবার জন্যে দরদ উথলে পড়ে। মাঝে মাঝেই টাকা দান করেন ওয়াইল্ডলাইফ সোসাইটিতে, যাতে আপনার ওপর সন্দেহ না পড়ে কারও।

রাগে লাল হয়ে গেছে জজের মুখ। মোলায়েম দৃষ্টি আর মোলায়েম নেই, যেন ইস্পাতের তলোয়ারের ধারালো ফলার চোখা মাথা। কিশোরের হৃৎপিণ্ডে বেঁধার চেষ্টা করছে। জোর করে শুকনো হাসি ফোঁটালেন মুখে। খুব কল্পনাপ্রবণ ছেলে তুমি। আমার মতো নিরীহ, জানোয়ার, দরজার দিকে চোখ পড়তে থেমে গেলেন।

খোলা দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে সিমবা। মুসাকে খুঁজতেই এসেছিলো বোধহয়, জজ সাহেবকে দেখে রেগে গেছে। দাঁতমুখ খিঁচিয়ে চেয়ে আছে তার দিকে। চাপা ঘড়ঘড় করতে করতে ঘরে ঢুকলো।

কি ভেবে জ্বলে উঠলো কিশোরের চোখ। দুই সহকারীকে বললো, চলো, যাই।

অবাক হলো রবিন আর মুসা, কিন্তু কিছু বললো না। কিশোরের এই অদ্ভুত ব্যবহারের নিশ্চয় কোনো কারণ আছে। পিছু পিছু বেরিয়ে এলো ওরা।

ঠোঁটে আঙুল রেখে ওদেরকে চুপ থাকতে বলে জানালার কাছে গিয়ে ঘরের ভেতরে উঁকি দিলো কিশোর।
বাঘের দৃষ্টিতে কুকুরটার দিকে তাকিয়ে আছেন জজ। দরজার মুখে বসে, আছে ওটা। জোরে জোরে হাত নেড়ে ওটাকে ভাগার নির্দেশ দিলেন। নড়লো না সিমরা। গোঁ গোঁ করে উঠলো। দাঁত খিচালো আরেকবার! টেবিলে জোরে কিল মারলেন জজ। তারপর ছুটে গিয়ে ধা করে এক লাথি মারলেন কুকুরটার গলায়। আর যায় কোথায়। গাউক করে এসে তার বুকে দুপা তুলে দিলো সিমবা। টুটি কামড়ে ধরতে গেল। চোখের পলকে ছুরি বেরিয়ে এলো নিরীহ জজের হাতে। শিকারী কুকুরের বংশধর সিমবা, অসাধারণ ক্ষিপ্র। পেটে ছুরি বেঁধার আগেই লাফ দিয়ে সরে গেল। পরমুহূর্তে কামড়ে ধরলো জজের ছুরি ধরা হাত। ছুরিটা ফেলার পর তবে ছাড়লো।
হেরে গিয়ে ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়লেন জজ। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে পুরো এক মিনিট চাপা গলায় গর্জালো বুনো-কুকুরের বাচ্চা, তারপর বেরিয়ে গেল।
জানালার কাছ থেকে সরে এলো তিন গোয়েন্দা। মুসাকে দেখে আবার তার কাছে চলে এলো সিমবা।
ব্যানডায় ফিরে বললো কিশোর, এই তাহলে নিরীহ জন্তু-প্রেমিক!
এতো সুন্দর একটা কুকুরের সঙ্গে এরকম ব্যবহার করে, মুসা বললো। ব্যাটা মানুষ নাকি?
তোমার কথাই ঠিক, কিশোর, রবিন বললো। জজ নির্মল পাণ্ডা লোক ভালো নয়।
কিন্তু কে বিশ্বাস করবে আমাদের কথা? ভুরু নাচালো গোয়েন্দাপ্রধান। প্রমাণ লাগবে। প্রমাণ!

.

আমার মনে হয় এখানেই আছে গর্তগুলো।
নিচের দিকে তাকিয়ে রয়েছে মুসা, কন্ট্রোলে হাত। গর্ত চোখে পড়ছে না। তবে অনেক জায়গার ঝোপঝাড় কাটা, নিচে মাটি দেখা যায় না, ডালপাতা আর ঘাস বিছিয়ে আছে। কাছাকাছি রয়েছে বাওবাব গাছের ছোট জঙ্গল। অনেক ওপর থেকে মনে হয়, পেট ফেটে নাড়ীভুড়ি বেরিয়ে থাকা মরা জলহস্তী। মোটা, পেট ফোলা, বাকলও জলহস্তীর চামড়ার মতো দেখতে।
আশেপাশে কোথাও পোচারদের একটা কুঁড়ে চোখে পড়লো না। জনমানবের ছায়াও নেই। গর্ত থাকলে ঝোপঝাড়গুলোর মাঝেই আছে, নিচে লুকিয়ে রয়েছে পোচাররা।

নিচে না নামলে বোঝা যাবে না, কিশোর বললো। লজে ফিরে চলো। লোক নিয়ে আসবো।
আরও মিনিট দশেক ঠিকমতোই চললো বিমান। তারপর শুরু করলো গোলমাল। নাচছে, দুলছে, কাত হয়ে যাচ্ছে থেকে থেকে। পাড় মাতাল হয়ে গেছে। যেন।
ব্যাপার কি? বুঝতে পারছে না রবিন। পকেট?
নাহ, উঁকি দিয়ে বিমানের শরীরের বাইরের অংশ দেখার চেষ্টা করছে কিশোর। এয়ার পকেট নয়। তাছাড়া এখানে থাকার কোনো কারণ দেখছি না। অন্য কিছু হয়েছে।
সেটা কী? মুসা, কন্ট্রোলে কোনো গণ্ডগোল?
কি জানি। আমি কোথাও নড়চড় করিনি।
কিন্তু কিছু একটা তো হয়েছে!
ভীত ঘোড়ার মতো নাচতে শুরু করেছে এখন প্লেন।
ওই দেখো, চেঁচিয়ে বললো কিশোর। ডানের ডানাটা কেমন ঝুলে যাচ্ছে!
থরথর করে কাঁপছে ডানাটা, ঝরা পাতার মতো খসে উড়েই যাবে বুঝি যে কোনো মুহূর্তে।
বিমানের নাক সোজা রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করছে মুসা, সম্ভব হচ্ছে না। কথাই শুনতে চাইছে না যেন ওটা। উঁচু একটা ক্যোাক গাছের ওপর দিয়ে শা করে বেরিয়ে এলো, আর সামান্য নিচে নামলেই বাড়ি লেগে ছাতু হয়ে যেতো। বেড়ে গেছে দুলুনি।
কিছুতেই সামলাতে পারছি না, মুসার গলা কাঁপছে। ক্র্যাশ করবেই। তৈরি থাকো তোমরা। দরকার হলে লাফিয়ে পড়তে হবে।
বিমানের নাক নিচের দিকে। ধাক্কা লাগানোর জন্যে দ্রুত ধেয়ে আসছে যেন। মাটি। ইগনিশন অফ করে দিলো মুসা। এঞ্জিন বন্ধ, নিজের ইচ্ছেয় ছুটছে বিমান। চাকা লাগলো মাটিতে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি…তীক্ষ্ণ একটা শব্দ, ছিঁড়ে পড়ে গেল ডান ডানা…বড় একটা উইয়ের ঢিবিতে তো লাগিয়ে স্থির হয়ে গেল প্লেন।
যাক, বাঁচলাম! ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়লো মুসা।
বাঁচার কি হলো? চেঁচিয়ে বললো রবিন।
আগুন লাগেনি। মরিনি আমরা। বাঁচলাম না?
বাঁচলাম বলা যাবে না এখনও। বেঁচে নামলাম। লজে ফিরে যেতে না পারলে..এই কিশোর, কি ভাবছো? কিছু বলছো না কেন?
উ! ফিরে তাকালো কিশোর। কি বলবো? ডানা ছেঁড়ার ব্যাপারটা মোটেই স্বাভাবিক নয়। কেন ছিড়বে?..চলো, নেমে দেখি।

পঞ্চাশ ফুটু পেছনে পড়ে আছে ডানাটা। কাছে গিয়ে দাঁড়ালো তিন গোয়েন্দা। ভালোমতো পরীক্ষা করে দেখলো কিশোর। বিড়বিড় করলো আনমনে, আপনা-আপনি ছেঁড়েনি। ছেঁড়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
মানে! অবাক হয়ে গোয়েন্দাপ্রধানের দিকে তাকালো দুই সহকারী।
বুঝতে পারছো না? এই দাগটা দেখো। স্বাভাবিক ভাবে ছিড়লে এটা অন্য রকম হতো, এতো নিখুঁত, সোজা নয়। করাত দিয়ে কেটে দুর্বল করে রাখা। হয়েছিলো ডানার গোড়া, যাতে কিছুক্ষণ ওড়ার পরই ভেঙে পড়ে। সম্মানিত বোধ করছি, তিক্ত কণ্ঠ, বিরক্তিতে কুঁচকে গেছে মুখ। কেউ একজন আমাদের ইমপরট্যান্ট লোক ভাবতে আরম্ভ করেছে। তার পাকা ধানে যাতে মই দিতে না পারি সে-জন্যে খুন করতে চেয়েছে।
ছড়ে যাওয়া কনুই ডলছে রবিন। বাঁ হাঁটুতে হাত বোলাছে মুসা। টিপ দিয়েই উহ করে উঠলো।
কি হয়েছে? জিজ্ঞেস করলো কিশোর।
না, কিছু না। নামার সময় বাড়ি লেগেছে হয়তো। ফুলে গেছে। তো, এখন কি করা? প্লেনে তো রেডিও নেই। আগুন জ্বেলে সংকেত দেবো?
লাভ হবে না। লজ এখান থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে। এতো দূর থেকে কেউ দেখবে না। বরং যারা দেখবে, তারা পোচার। ছুটে আসবে। মরিনি দেখে খুশিই হবে। ওদেরকে জ্বালানোর শোধ তুলবে আমাদের ওপর।
তাহলে কি করবো? রবিন বললো। এখানেই বসে থাকবো? আমাদেরকে ফিরতে না দেখে খুজতে আসবে ওয়ারডেনের লোক।
আসবে বলতে পারি না, তবে খুঁজতে বেরোবে। একশো মাইল বুনো এলাকায় আমাদের খুঁজে বের করতে ওদের কহপ্তা লাগবে কে জানে! যখন পাবে, কঙ্কাল ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। একটাই উপায় আছে এখন। হেঁটে লজে চলে যাওয়া।
ব্যাগ-ট্যাগগুলো নেয়ার জন্যে প্লেনে ফিরে চললো ওরা। কিশোর লক্ষ্য করলো, সাংঘাতিক খোঁড়াচ্ছে মুসা। আরি, তোমার পায়ের অবস্থা তো খুব খারাপ। ভাঙেনি তো?
না।
কিন্তু পঞ্চাশ মাইল হাঁটতে তুমি পারবে না।
পারবো, পারবো। চলোই না।
কি করে পারবে? পঞ্চাশ ফুটই তো. পারছে না। বেশি চাপাচাপি করলে আরও ফুলবে। বয়ে নিতে হবে শেষে। তোমাকে বয়ে নেয়া আমার আর রবিনের কম্মো নয়।

তাহলে?
তুমি আর রবিন প্লেনেই থেকে যাও। আমি একাই যেতে পারবো।
আরে দূর, কি যে বলো। রবিনকে তুমি নিয়ে যাও। আমি একলা থাকতে পারবো। প্লেনে বসে বসে জাস্ট ঘুমাবো, হাসলো মুসা, তাতে যন্ত্রণার ছাপ।
না, আমি একা যাবো। প্লেনটাকে দেখার জন্যেও এখানে কাউকে থাকা দরকার। জখমী পা নিয়ে তুমি কিছু করতে পারবে না। রবিনকে থাকতেই হচ্ছে।
প্লেনটাকে দেখার আর কি আছে? আফ্রিকান জানোয়ারে প্লেন খায় না।
খায়। পোচাররা এসে দামী যন্ত্রপাতি নষ্ট করতে পারে। হাতি আর গণ্ডারও কৌতূহলী হতে পারে। কিছুদিন আগে মারকিনস-এ একটা বিমান পড়েছিলো, মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিলো ওটাকে গণ্ডারে। হায়েনারা আরও এক কাটি বাড়া। রবার ওদের খুব প্রিয়, টায়ার খেয়ে ফেলে। আহত না হলেও বিমানটাকে বাঁচানোর জন্যে কাউকে এখানে থাকতে হতো।
ঠিক আছে, বললো অনিচ্ছুক মুসা। থাকবো। হারামি পা-টা ব্যথা পাওয়ার আর সময় পেলো না।
বেশিক্ষণ থাকতে হবে না তোমাদের, কম্পাস, ম্যাপ আর ওয়াটার বটল গুছিয়ে নিতে নিতে হাসলো কিশোর। মাত্র তো পঞ্চাশ মাইল। সকাল-বিকাল তোমার সঙ্গে দৌড়ে দৌড়ে আজকাল ভালোই হাঁটতে পারি আমি, জানো। বারো-চোদ্দ ঘন্টার বেশি লাগবে না। তারপর ট্রাক নিয়ে ফিরে আসতে, ধরো, আরও দুই ঘন্টা। আমার বিশ্বাস, ওই মোল ঘন্টা বেঁচে থাকতে পারবে তোমরা।
কিন্তু, বিকেল হয়ে গেল, রবিন বললো। রাতে হাটবে? কাল সকালে গেলে হতো না?
রাতে হাঁটাই সুবিধে, আবহাওয়া ঠাণ্ডা। চাঁদও থাকবে। ভেবো না, আমি ঠিকই চলে যাবো। হুঁশিয়ার থেকো। সকালে ফিরে আসছি আমি।
কাউকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ঘুরলো কিশোর। পেছন থেকে ডেকে বললো মুসা, এই শোনো, ভালো দেখে কয়েকটা স্যাণ্ডউইচ নিয়ে এসো। সারারাত হায়েনা তাড়িয়ে সকালে আমি নিজেও হায়েনা হয়ে যাবো।
হেসে উঠলো তিনজনেই।

.

বেলা ডুবতেই ঠাণ্ডা হয়ে এলো গরম বাতাস। বন থেকে বেরিয়ে আসতে লাগলো। নিশাচর জানোয়ারেরা। প্রায় সবাই আগ্রহ দেখালো প্লেনটার প্রতি। পায়ে পায়ে এসে জমা হতে লাগলো–কেউ বসলো, কেউ দাঁড়িয়ে রইলো, চারপাশ ঘিরে। ভীতু যারা, দূরে রইলো। সাহসীরা এগিয়ে এলো। বেশি সাহসী কেউ কেউ এসে বিমানে উঠে সঙ্গী হতে চাইলো দুই গোয়েন্দার। ডানায় চড়ে বসলো বেবুনের দল।

জানালায় নাক ঠেকিয়ে কৌতূহলী দৃষ্টিতে ভেতরে উঁকিঝুঁকি মারতে লাগলো ভারভেট মাংকি।

চারটে গণ্ডার এসে হাজির হলো প্লেনের কাছে। বার কয়েক নাক টানলো, ঘোৎ ঘোঁৎ করলো। তেড়ে এলো একটা। কিন্তু আজব জানোয়ারটাকে নীরব। দেখে মাঝপথে থেমে আবার ফিরে গেল সঙ্গীদের কাছে। ব্যাটাকে নিয়ে কি করা। যায়, সেই আলোচনা চালালো যেন।

গণ্ডারগুলো যেন বোঝাতে চাইছে, তাদের এলাকায় থাকার কোনো অধিকার নেই এই আজব জন্তুটার। মাথা নুইয়ে শিং বাগিয়ে তেড়ে এলো একসঙ্গে। স্টর্কটাকে ধ্বংস করার জন্যে একটা গণ্ডারই যথেষ্ট। সেই জায়গায় চারটে মিলে কি করতে পারবে, ভাবতেই গলা শুকিয়ে গেল দুই গোয়েন্দার। আতঙ্কিত চোখে তাকিয়ে রইলো ওরা। প্লেন থেকে লাফিয়ে নেমে দৌড় দেয়ার ইচ্ছেটা দমন করলো অনেক কষ্টে।

গণ্ডারগুলো কাছে এসে গেছে, এই সময় সংবিৎ ফিরলো যেন মুসার। উঠে দাঁড়িয়ে হাত তালি দিয়ে জোরে জোরে চেঁচাতে শুরু করলো। রবিনও যোগ দিলো তার সঙ্গে।

থমকে গেল চার-দানব। ওরা বোধহয় মনে করলো, আজব জীবটাই বিচিত্র চিৎকার করছে। দ্বিধায় পড়ে গেল। একে আক্রমণ করা উচিত হবে কিনা ঠিক করতে পারছে না। ঘেৎ ঘোৎ করে ফিরে গেল আগের জায়গায়, আবার আলোচনা শুরু করলো।

গণ্ডারের মতো বদমেজাজী জানোয়ার আলোচনা করে একবার যে একমত হয়েছিলো, সে-ই বেশি। দ্বিতীয়বার আর পারলো না। তর্কাতর্কি করে নিজেরাই পোচার। লেগে গেল শেষে। প্রচণ্ড মারপিটের পর একেকটা চলে গেল একেক দিকে। হাঁপ ছাড়লো রবিন আর মুসা।

তীক্ষ্ণ নজর রেখে বিমানটার চারপাশে ঘুরছে গ্যাজেল হরিণ আর জিরাফ। ইমপালা হরিণেরা পেয়ে গেছে আরেক মজা। লাফিয়ে প্লেনের কে কতো ওপর দিয়ে যেতে পারে সেই প্রতিযোগিতায় মেতেছে যেন। আড়াল থেকে বিদ্যুতের মতো বেরিয়ে এসে একটা হরিণের ওপর পড়লো চিতাবাঘ, মট করে ঘাড় ভেঙে ফেললো বেচারা প্রাণীটার।

সাঁঝের বাতাস চিরে দিলো একটা তীক্ষ্ণ চিত্তার। মুসা ভাবলো, মদ্দা হাতি। কিন্তু রবিনের জানা আছে ওটা কিসের ডাক, চিড়িয়াখানায় শুনেছে। ওরকম চিৎকার করতে পারে কোন প্রাণী, সেটা বইয়েও পড়েছে। গেছো হাইর্যাক্স। মাত্র ফুটখানেক লম্বা একটা নিশাচর জীব।

টুপ করে ঝরে গেল যেন গোধূলির শেষ আলোটুকুও। চাঁদ উঠতে সময় লাগবে। ঘন ছায়া নেমেছে বন, পাহাড় আর তৃণভূমি জুড়ে। কিলিমানজারোর তুষারে ছাওয়া চূড়াটাও ঢাকা পড়েছে অন্ধকারে। নীলচে-কালো আকাশের পটভূমিকায় এখন মস্ত এক ম্লান-ধূসর ছায়ামাত্র ওটা।

.

ঘুমানোর চেষ্টা করলো মুসা।

দূর! বিরক্ত হয়ে হাল ছেড়ে দিলো। এরকম একটা সীটে ঘুমানো যায় নাকি? পা বাকা করে রাখতে হচ্ছে, তাতে ব্যথা আরও বেশি করছে। জানোয়ারের ভয় ইতিমধ্যে অনেকখানি কেটে গেছে। প্লেনের ডানার নিচে নরম ঘাসের বিছানা যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। আমন্ত্রণ উপেক্ষা করতে পারলো না গোয়েন্দা-সহকারী। ঝুঁকি নিয়েও নামলো নিচে।

ডানার নিচে ছায়া ছায়া অন্ধকার, উজ্জ্বল জ্যোৎস্নার মাঝে বেশ প্রকট। ওখানেই গিয়ে শুয়ে পড়লো সে। আশা করলো, এখানে চোখ পড়বে না হাতি, গণ্ডার কিংবা মোষের।

তবে আরেকটা মহা-বিপজ্জনক প্রাণীর কথা বেমালুম ভুলে গেল সে। সর্বনেশে পিঁপড়ে।

খবর পৌঁছে গেল পিপিলিকার রাজত্বে। দল বেঁধে পিলপিল করে এসে হাজির। হলো ওরা। আরামেই ঘুমিয়ে ছিলো মুসা, কুট করে কামড় লাগলো আহত পায়ে। পাত্তা দিলো না। ভাবলো, যন্ত্রণার পরিবর্তন ঘটছে। হাতে-পায়ে-গলায়-মুখে। একসাথে আরও কয়েকটা কামড় লাগতেই চোখ মেললো। দেরি করে ফেলেছে বেশ।

বুকের ওপর ঢলে পড়েছিলো রবিনের মাথা। চিৎকার শুনে ঝট করে সোজা হলো। দেখলো, উন্মাদ-নৃত্য জুড়েছে মুসা আমান। শরীরের যেখানে-সেখানে। চাপড় মারছে, টেনে ছিঁড়ে খুলে ফেলার চেষ্টা করছে গায়ের কাপড়। গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে।

আমাজানের জঙ্গলের কথা মনে পড়ে গেল রবিনের। কিছু কিছু মানুষ আছে, যাদের গায়ের গন্ধ আকৃষ্ট করে পোকামাকড়কে, এসে চড়াও হয়। ওখানেও মুসার ওপর চড়াও হয়েছিলো পিঁপড়েরা, এমনকি রক্তচোষা বাদুড় এসেও আগে ধরেছিলো মুসাকেই।

কিভাবে বন্ধুকে সাহায্য করবে, সিদ্ধান্ত নেয়ার আগেই মুসার সাহায্যে এগিয়ে। এলো একটা বিচিত্র প্রাণী। পরোক্ষে মুসাকে সাহায্য করলেও, প্রত্যক্ষভাবে আসলে নিজেকেই সাহায্য করতে এসেছে। অনেক নাম ওটারঃ কেউ বলে অ্যান্ট-ঈটার, কেউ অ্যান্ট-বীয়ার, কেউ বা ডাকে আর ডু ভার ক, অর্থাৎ গর্তের শুয়োর

বলে। তবে অ্যান্ট-ঈটার বা পিঁপড়েখেকো নামটাই বেশি মানানসই, কারণ, পিঁপড়ে খাওয়ার সুযোগ মিললে আর ছেড়ে কথা কয় না। সারা দিন গর্তে পড়ে ঘুমায়, রাতে বেরোয় খাবারের সন্ধানে। মুসার ভাগ্য ভালো, কাছাকাছিই ছিলো ওটা।

এগিয়ে এলো চার ফুট লম্বা জীবটা। ওজন একশো চল্লিশ পাউণ্ড মতো হবে। ভালুকের মতো থাবা, তাতে বড় বড় বাকা নখ–উইয়ের ঢিবি চেরার জন্যে, ক্যাঙারুর মতো লেজ, গাধার কান আর শুয়োরের মুখ নিয়ে ওকাপির চেয়ে কম। বিচিত্র নয় জনাব আবু ডু ভার।

কাছে এসেই কাজে লেগে গেল পিঁপড়েখেকো। আঠারো ইঞ্চি লম্বা জিভ বের। করে প্রায় ছেকে নিতে শুরু করলো, যেন পিঁপড়ের দলকে। আমাজানের জঙ্গলে এরকম জীবকে রীতিমতো লড়াই করে পরাজিত করেছে মুসা, এদের সম্পর্কে ভয় নেই তার। সোজা গিয়ে দাঁড়ালো ওটার জিভের কাছে। মাটি থেকে তোলার চেয়ে চামড়া থেকে নেয়া সহজ, কাজেই, সহজ কাজটাই আগে করলো ওটা। জামাকাপড় সব খুলে একেবারে দিগম্বর হয়ে গেছে সহকারী গোয়েন্দা, রবিনকে আরেক দিকে তাকিয়ে থাকার অনুরোধ করছে বার বার।

কিন্তু চাঁদের আলো নির্লজ্জের মতো তাকিয়ে আছে মুসার কালো নগ্ন দেহের দিকে, মুহূর্তের জন্যে মুখ ফেরানোর নাম নেই। নিজের দিকে চেয়ে নিজেরই হাসি পেলো মুসার। পিঁপড়ে নেই আর শরীরে। হেসে উঠলো জোরে। প্লেনে বসা রবিনও হেসে ফেললো। এতোক্ষণ উত্তেজনায় খেয়ালই করেনি পিঁপড়েখেকো, মানুষের শরীর চাটছে। হাসির শব্দে যেন হুশ হলো। বড় বড় কয়েক লাফ দিয়ে। সরে গেল দূরে, সন্দিগ্ধ চোখে মুসার দিকে আরেকবার তাকিয়ে আবার পিঁপড়ে খাওয়ায় মন দিলো।

কাপড়চোপড় পরে ফেলল এবার, আরেক দিকে চেয়েই বললো রবিন। পরে জলদি উঠে এসো। যতদূর জানি, অ্যান্ট-বীয়ার সিংহের খুব প্রিয় খাবার।

মুহূর্ত দেরি করলো না মুসা। প্যান্টটা পায়ে গলিয়ে কোমরে বোতাম আঁটলো। বাকি কাপড়গুলো হাতে নিয়ে উঠে এলো ওপরে। আহত পা নিয়ে কষ্ট হলো, তাকে সাহায্য করলো রবিন।

ঠিকই, পিঁপড়েখেকোর গন্ধ পেয়ে কোথা থেকে এসে হাজির হয়েছে একটা সিংহ। চাঁদের আলোয় বিশাল ছায়া পড়েছে ওটার। লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লো। তারপর ছায়ার মতোই নীরবে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসতে লাগলো, থেমে গেল। প্লেনের ডানার নিচে, ছায়ায়। ধক ধক করে জ্বলছে চোখ, দৃষ্টি পিঁপড়েখেকোটার ওপর নিবদ্ধ।

সিংহ তার খাবার ধরবে, এটাই স্বাভাবিক। অন্য সময় হলে হয়তো কিছু বলতো না মুসা, কিন্তু এখন পিঁপড়েখেকোটা ঋণী করে ফেলেছে তাকে। ঋণ শোধ করার জন্যে নিজের বিপদ উপেক্ষা করলো সে, হাত তালি দিয়ে জোরে চেঁচিয়ে সাবধান করে দিলো জীবটাকে।
রাগে গর্জে উঠলো সিংহটা। ছুটে গেল শিকারের দিকে।
ততোক্ষণে হুশিয়ার হয়ে গেছে পিঁপড়েখেকো। অবিশ্বাস্য একটা কাণ্ড করলো। ছুটে পালানোর চেষ্টাও করলো না, করলেও সিংহের সঙ্গে দৌড়ে পারতো না। দুই থাবা দিয়ে নরম মাটি খুঁড়তে শুরু করলো। এতো দ্রুত, যেন আশ্চর্য ক্ষমতাশালী একটা খোঁড়ার-যন্ত্র। সিংহটা ওটার কাছে গিয়ে পৌঁছার আগেই খোঁড়া হয়ে গেল গর্ত, ভেতরে ঢুকে পড়লো জানোয়ারটা। মুসা আর রবিন দেখতে পাচ্ছে না এখন, অনুমান করলো নিশ্চয় খোঁড়ার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে ওটা। লম্বা সুড়ঙ্গ বানিয়ে চলে যাবে সিংহের নাগালের বাইরে।
ওদের অনুমান ঠিক। গর্তের মুখে নাক নামিয়ে শুকলো সিংহ। আরেকবার গর্জন করলো। নিরাশ হয়ে সরে এলো গর্তের কাছ থেকে। মুখ তুলে তাকালো। প্লেনের দিকে।
দুরুদুরু করে উঠলো দুই গোয়েন্দার বুক। এবার? কি ভাবছে ব্যাটা?
.
ভালো ঘুম কি আর হয়? দুবার হায়েনার ডাকে চমকে জেগে উঠলো দুজনে।, প্লেনের নিচে এসে, হুটোপুটি লাগিয়েছে ওগুলো। টায়ার কামড়াতে শুরু করেছে। চেঁচিয়ে, বিমানের গায়ে বাড়ি দিয়ে ওগুলোকে তাড়ালো ওরা। আবার তন্দ্রায় ঢলে পড়লো।
ঘুমের ঘোরে দুঃস্বপ্ন দেখলো মুসা। ভয়ানক এক গণ্ডার আক্রমণ করেছে তাকে। মাটিতে পেড়ে ফেলে শিং দিয়ে তোচ্ছে বুকে। চিৎকার করে জেগে উঠলো সে। দেখলো, সকাল হয়ে গেছে। বুকে হাত রেখে ঠেলছে কিশোর। ষোল ঘন্টার আগেই ফিরে এসেছে।
আরে, এই মিয়া, ওঠো, হেসে বললো কিশোর। কতো ঘুমাবে? এই নাও তোমার স্যাণ্ডউইচ।
রবিন আগেই জেগেছে।
মুসা দেখলো, প্লেনের পেছনে গাড়ির মিছিল। ওয়ারডন টমসন এসেছেন, সঙ্গে এসেছে তার তিনজন রেঞ্জার আর তিরিশজন মাসাই।
খেয়ে নাও জলদি, দুই বন্ধুকে তাড়া দিলো কিশোর। পোচার ব্যাটাদের ধরতে যেতে হবে।
প্লেনটা? স্যাণ্ডউইচ চিবাতে চিবাতে জিজ্ঞেস করলো মুসা। কিভাবে নেয়া হবে?

নাইরোবিতে মেকানিকের জন্যে তার পাঠিয়ে দিয়েছেন ওয়ারডেন। প্লেনের ভাবনা এখন আর আমাদের নয়। গিয়ে গর্তগুলো খুঁজে বের করতে হবে।
বিশ মাইল দূরে সেই বাওবাব ওরফে জলহস্তী গাছের জঙ্গল। আগের দিনের মতোই নির্জন। হঠাৎ, চাপা একটা শব্দ শোনা গেল। মানুষের কণ্ঠস্বর। মনে হলো, মাটির নিচ থেকে আসছে।
ঝোপঝাড়ের মাঝে ফাঁকা জায়গাগুলো দেখে মাসাইরা জানালো, হাতি ধরার ফাঁদই তৈরি করা হয়েছে ওসব জায়গায়। ওপরের ডালপাতা সরানো বিপজ্জনক। পোচাররা নিচে থেকে থাকলে, সরানোমাত্র তীর ছুঁড়তে পারে।
উবু হয়ে শুয়ে সাবধানে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেল কয়েকজন মাসাই। একটা গর্তের কিনারে পৌঁছে আলগা ডালপাতা ধরে টেনে সরালো, ফাঁক করে উঁকি দিলো নিচে। কোনো তীর কিংবা বল্লম ছুটে এলো না ওদের দিকে। সামনে মুখ বাড়িয়ে আরও ভালোমতো দেখলো। কেউ নেই।
এক এক করে সবগুলো গর্ত দেখা হলো। কোনোটাতেই মানুষ নেই। কিন্তু মানুষের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে।
ভয় পেয়ে গেল মুসা। খাইছে! ভূত নাকিরে বাবা! নির্ভীক বৈমানিকের এহেন উক্তি শুনে না হেসে পারলেন না ওয়ারডেন।
কিশোর নীরব। কান পেতে শুনছে। কোনো সন্দেহ নেই, মানুষেরই কণ্ঠস্বর। গর্তে নেই, ঝোপের ভেতরে নেই আসছে কোথা থেকে তাহলে? চিন্তিত ভঙ্গিতে বাওবার গাছগুলোর দিকে তাকালো সে। ওগুলোতেও ঘন ডালপাতা নেই, যার আড়ালে লুকিয়ে থাকতে পারে মানুষ। তাহলে?
পায়ে পায়ে একটা গাছের কাছে চলে এলো গোয়েন্দাপ্রধান। থেমে গেল কথা বলা, আর কোনো শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। মাসাইরাও নীরব। একটা মোটা গাছের চারপাশে ঘুরে এলো সে, নেই কেউ।
হতাশ হয়ে প্রায় হাল ছেড়ে দিতে যাচ্ছিলো কিশোর, হঠাৎ পেছনে ফিসফিস করে বলে উঠলো রবিন, কিশোর, এক মিনিট। আমার মনে হয় ব্যাটারা এখানেই আছে।
আছে? কোথায়?
কোনো রহস্যের সমাধান করে ফেলতে পারলে, সেটা রবিন। আর মুসা না। বুঝলে তাদের দিকে যেভাবে চেয়ে মিটিমিটি হাসে কিশোর, এখন ঠিক তা-ই করলো রবিন। নাটকীয় ভঙ্গিতে বললো, অনুমান করো।
তার চেয়ে কেউ বেশি জানুক, এটা সইতে পারে না কিশোর। ভোঁতা কণ্ঠে বললো, জানি না…না না, দাঁড়াও! তুড়ি বাজালো। বুঝেছি!
কোথায়? মুসাও এসে দাঁড়িয়েছে পাশে।

এই গাছগুলোর কাণ্ড কতো মোটা দেখেছো? মুসাকে বললো রবিন। পাশ ফুটের বেশি উঁচু হয় না বাওবাব, কিন্তু পাশে বাড়ে। বেঁটে, অসম্ভব মোটা মানুষের মতো কুৎসিত হয়ে যায়। পেটের বেড় হয়ে যায়, ষাট ফুটের ওপর।. এই যে, এগুলোর বেড় আরও বেশি মনে হচ্ছে। নিশ্চয় অনেক পুরনো, পাঁচশো থেকে হাজার বছরের, সেজন্যেই এতো মোটা। মজা হলো, পাশে যতো বাড়তে থাকে, পুরনো বাওবাবের ভেতরটা ততো ফোপরা হয়ে যায়। একেবারে খালি কোঠা। বিশজন মানুষ অনায়াসে থাকতে পারে।
কিন্তু ঢুকলো কোন দিক দিয়ে? গাছগুলোর ওপরে-নিচে আবার তাকালো। মুসা। ফোকর-টোকর তো দেখছি না।
ডাল যেখান থেকে ছড়িয়েছে।
ঢোকার মুখ ওখানে? হাত তুলে একটা গাছ দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলো মুসা। গাছটার ডালগুলো ছড়িয়েছে মাটির বারো ফুট ওপর থেকে। রবিন জবাব দেয়ার আগেই হাত নেড়ে মুগামবিকে ডাকলো সে।
কাছে এসে দাঁড়ালো বিশালদেহী মাসাই। তার কাঁধে চড়ে একটা ডাল ধরে ফেললো মুসা। পায়ের ব্যথা অনেক কম, নাড়াচাড়া করলেও আর তেমন লাগে না। এখন। ডালে উঠে লম্বা হয়ে শুয়ে ক্রল করে নিচের দিকে এগোলো। সবগুলো ডাল যেখানে মিলিত হয়েছে, ঠিক তার মাঝখানে বড় একটা কালো ফোকর। ওটার কাছে এসে সাবধানে মুখ বাড়ালো সে, নিচে উঁকি দিলো।
আশা করেছিলো, তীর ছুটে আসবে একঝাঁক।
কিছুই এলো না। ভেতরের বিষণ ছায়ায় দেখা গেল অনেকগুলো কালো মুখ। ওপর দিকে চেয়ে আছে। দুষ্টুমি করতে গিয়ে ধরা পড়লে বাচ্চা ছেলে যেরকম করে, অনেকটা সেরকম ভাবসাব।
সরে এসে আবার মুগামবির কাঁধে নামলো মুসা। সেখান থেকে মাটিতে।
গাছের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে লাগলো পোচাররা। টপাটপ লাফিয়ে। পড়লো মাটিতে। খালি হাতে বেরিয়েছে, অস্ত্রশস্ত্র সব রেখে এসেছে। গাছের ভেতরে। আক্রমণের ইচ্ছে নেই, পালানোরও নয়। সম্পূর্ণ পরাজিত, আত্মসমর্পণ করতে বেরিয়েছে।
এগিয়ে এলেন ওয়ারডেন। বললেন, মুগামবি, জিজ্ঞেস কর তো, এতো ভালো হয়ে গেল কেন হঠাৎ?
সোয়াহিলি ভাষায় জিজ্ঞেস করলো মুগামবি। জবাব দিলো নেতা গোছের একজন পোচার। ইংরেজিতে অনুবাদ করে শোনালো সেটা মাসাইদের সর্দার, ওরা আর লড়াই করতে চায় না। একাজ ছেড়ে দিতে চায়।
কেন?

অনেক কষ্ট করে ফাঁদ পাতে ওরা, কুঁড়ে বানায়। বার বার আমরা গিয়ে নষ্ট করে দিই। গত কিছু দিন ধরে একটা ফাঁদ থেকেও কিছু আয় করতে পারেনি। ওরা। খালি সিলভারের ধমক-ধামক শুনেছে। ওদের সঙ্গে তার চুক্তি, মাল দেবে, টাকা নেবে। দিতেও পারেনি, নিতেও পারেনি। অহেতুক গাধার খাটনি খাটতে আর রাজি নয় ওরা।

নেতা গোছের লোকটা অন্যান্য গাছের দিকে চেয়ে জোরে জোরে কি বললো।

আরও কয়েকটা গাছ থেকে বেরিয়ে এলো অনেক পোচার। একটা গাছ থেকে কয়েকজন পোচারের সঙ্গে বেরোলো স্বয়ং লঙ জুন সিলভার, কিন্তু সে আত্মসমর্পণ করবে না। দুই হাতে দুই রিভলভার, দাড়িতে ময়লা, রাগে দুদিকে সরে গেছে। ঠোঁটের দুই কোণ। চেঁচিয়ে লড়াই করার আদেশ দিলো. পোচারদের। ওরা, কথা। শুনছে না, দেখে লাফাতে শুরু করলো। রিভলভার তুলে গুলি ছুড়লো আকাশে। তারপরও শুনছে না দেখে কেউ বাধা দেয়ার আগেই গুলি করে মেরে ফেললো একটা লোককে। বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছে যেন।

এবার নড়লো পোচাররা। তবে মাসাইদের বিরুদ্ধে নয়। চারপাশ থেকে ঘিরে ফেললো তাদের নিজের নেতাকেই। গুলিতে আহত হলো আরও কয়েকজন। পরোয়া করলো না। সিলভারের হাত থেকে রিভলভার কেড়ে নিয়ে কিল-ঘুসি মারতে মারতে মাটিতে শুইয়ে ফেললো তাকে। টমসন আর মাসাইরা বাধা না দিলে মেরেই ফেলতো লোকটাকে।

ওঠো, আদেশ দিলেন ওয়ারডেন।

কম্পিত পায়ে উঠে দাঁড়ালো সিলভার। বিড়বিড় করে গাল দিচ্ছে। চোখ লাল। তিন গোয়েন্দার দিকে চোখ পড়তে আর সামলাতে পারলো না নিজেকে। ঘুসি পাকিয়ে ছুটে এলো ওদের দিকে।

খানিক দূরে বসে উৎসুক চোখে গণ্ডগোল দেখছিলো সিমবা। নিজে কিছু, করার সুযোগ পাচ্ছিলো না। এইবার পেলো। বাপ-দাদার অনুকরণে হিংস্র গর্জন ছেড়ে ধেয়ে এলো তীব্র গতিতে। সিলভারের বুকে দুপা তুলে দিয়ে গলায় কামড় বসাতে গেল।

কিছুই বললো না মুগামবি। কিন্তু বাধা দিতে ছুটে গেল মুসা। না না, সিমবা! সি-ম-বাআ! ওটার কলার চেপে ধরে টান দিলো।

ভীষণ রেগেছে আজ বুনো কুকুরের বংশধর। ঝাড়া দিয়ে মুসার হাত থেকে বেল্ট ছাড়িয়ে নিয়ে আবার কামড় বসাতে গেল। ধস্তাধস্তি করতে করতে মাটিতে চিত হয়ে পড়লো সিলভার। লম্বা হয়ে তার গায়ের ওপর সেটে এলো সিমবা, শিকারকে পাকড়াও করে খুন করার আগে যেভাবে চেপে ধরে বুনো কুকুর, তেমনিভাবে।

এই বার এসে হাত লাগালো মুগামবি। অনেক কসরত করে টেনে সরালো কুকুরটাকে। এখন আদরে কাজ হবে না, জানা আছে তার, ঠাস ঠাস করে কষে দুই থাপ্পড় লাগালো সিমবার মাথার দুই পাশে। শান্ত হলো কুকুরটা।
কোনোমতে উঠে বসলো সিলভার। টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালো। ডলছে আহত জায়গাগুলো।
তোমার খেল খতম, সিলভার, ওয়ারডেন বললেন। অনেক জ্বালান। জ্বালিয়েছো..ভাগ্যিস তিন গোয়েন্দাকে পেয়েছিলাম...
আমার কচুটাও করতে পারবে না তুমি, বুড়ো আঙুল দেখালো সিলভার, তেজ কমেনি। অনেক টাকা আছে আমার। টাকার জোরে পার পেয়ে যাবো।
আদালতে গিয়ে জজ নির্মল পাণ্ডাকে বলো সেকথা। তোমার ছাল ছাড়িয়ে নেবে। জানোয়ার তো মেরেছোই, সেই সঙ্গে মানুষ খুনও করেছো। তোমাকে ফাঁসিতে ঝোলাবে নির্মল। দুনিয়ার সব টাকা দিলেও তার হাত থেকে নিস্তার পাবে না।
জোরে হেসে উঠলো সিলভার।
তার হাসি শুনে আবার রেগে গেল সিমবা। ঝাড়া দিয়ে বেল্ট ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটে যেতে চাইলো। কিন্তু মুগামবির সঙ্গে পারলো না।
এখনও পাণ্ডা পাণ্ডা করছেন, স্যার? গম্ভীর হয়ে ওয়ারডেকে বললো। কিশোর। কথা শুনেও কিছু বুঝতে পারছেন না? অনেকখানি বদলে ফেলেছে বটে চেহারা, কণ্ঠস্বর কিন্তু পুরোপুরি ঢাকতে পারেনি। এতোদিনের বন্ধু আপনার, এতো ঘনিষ্ঠতা, তা-ও চিনতে পারছেন না?
অবাক হয়ে কিশোরের দিকে তাকালেন টমসন। কি বলছো?
ঠিকই বলছি, সিলভার কিছু বুঝে ওঠার আগেই হাত বাড়িয়ে তার দাড়ি ধরে হ্যাঁচকা টান মারলো কিশোর। খুলে এলো নকল দাড়ি বেরিয়ে পড়লো জজ নির্মল পাণ্ডার মুখ।
স্তব্ধ হয়ে গেলেন ওয়ারডেন। কথা সরছে না মুখে।
হা হা করে হাসলো জজ। কেন ঘাবড়াইনি বুঝতে পারছো তো? আমি জজ, আদালতে আমার বিচার আমিই করবো। তুমি একটা আস্ত গাধা, ওয়ারডেন। হাহ হাহ হা!
হাত-পা বাঁধা অবস্থায় নাইরোবি পুলিশের হাতে পড়ার পরই শুধু নরম হলো জজ নির্মল পাণ্ডা, যখন দেখলো ঘুষ খায় না, এমন লোকও আছে। কোটি কোটি টাকার লোভ দেখিয়েও যাকে দিয়ে অন্যায় করানো যায় না। ওখানকার জজকে কিনতে পারলো না সে। যাবজ্জীবন জেল হয়ে গেল। অন্যায়ভাবে অর্জিত তার সমস্ত টাকা, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে দান করে দেয়া হলো আফ্রিকান ওয়াইল্ডলাইফ সোসাইটিকে।

নিজের মুখে সব কুকর্মের কথা স্বীকার করেছে নির্মল পাণ্ডা, তবু যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না ওয়ারডেন টমসন। ওরকম নিরীহ চেহারার হাসিখুশি একজন ভদ্রলোক এতো খারাপ হতে পারে, কল্পনাই করেননি তিনি কোনোদিন। সব। চেয়ে বেশি দুঃখ পেয়েছেন, একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে হারিয়েছেন বলে, অন্তত তিনি নিজে জজ নির্মল পাণ্ডাকে বন্ধু হিসেবেই নিয়েছিলেন।

.

ফেরার দিন এলো তিন গোয়েন্দার। স্টর্ক বিমানটা ঠিক হয়ে গেছে। তাতে চড়েই, নাইরোবি যাবে ওরা। সেখান থেকে জেট লাইনারে চড়ে আমেরিকায়।

ওয়ারডেন টমসন যেতে পারবেন না ওদের সঙ্গে। জরুরী কাজ আছে। তাছাড়া জায়গাও নাকি হবে না বিমানটায়। কেন হবে না, বুঝতে পারলো না তিন গোয়েন্দা। প্রশ্ন করেও কোনো জবাব মিললো না, শুধু রহস্যময় ভঙ্গিতে হাসলেন তিনি।

নির্দিষ্ট দিনে বিমানটায় উঠলো তিন গোয়েন্দা, পাইলটের সীটে অবশ্যই মুসা আমান। উঠেই অবাক হয়ে গেল। তার পেছনের সীটের পায়ের কাছে আরাম করে শুয়ে ছিলো বুনো কুকুরের বংশধর, সাড়া পেয়ে লাফিয়ে উঠে বসলো সীটে। মৃদু গাউ করে উঠলো। স, আরি, তুই! চেঁচিয়ে উঠলো মুসা। তুই এখানে কি করছিস? যা যা, নাম। আমরা চলে যাচ্ছি।

না, ও-ও যাচ্ছে তোমাদের সঙ্গে, নিচে থেকে হাসিমুখে বললেন ওয়ারডেন। পাশে দাঁড়ানো মুগামবির দিকে একবার চেয়ে আবার ফিরলেন কিশোর বৈমানিকের দিকে। আমার তরফ থেকে, মুগামবির তরফ থেকে, আফ্রিকান ওয়াইল্ডলাইফ সোসাইটির তরফ থেকে তিন গোয়েন্দাকে উপহার। অনেক করেছো তোমরা। উপহার দিয়ে সেই ঋণ শোধ করা যাবে না। এই সামান্য উপহারটুকু নিলে আমরা সবাই খুশি হবো।

কিন্তু মুগামবির প্রিয়..., বলতে গিয়ে বাধা পেলো মুসা।

ও-ই তো প্রস্তাবটা দিয়েছিলো আমাকে, বললেন টমসন। তুমি যে সিমবাকে ভালোবেসে ফেলেছো, তোমাকেও কুকুরটা ভালোবেসেছে, এটা ওর নজর এড়ায়নি...

কিন্তু, তবু...

তুমি ওটা নাও, মুসা, এবার বাধা দিলো মুগামবি। না নিলেই বরং আমি। দুঃখ পাবো। বুনো কুকুর অনেক আছে এখানে, দরকার হলে সহজেই আরেকটা বাচ্চা আমি জোগাড় করে নিতে পারবো। জন্তুজানোয়ারের প্রতি তোমার। ভালোবাসায় আমি মুগ্ধ। তোমার মতো ছেলেরা যখন জন্মাচ্ছে, বুঝতে পারছি, সুদিন আসছে আফ্রিকার, চোখ মুছলো মাসাই-সর্দার। কিশোর, রবিন, তোমরাও জন্মভূমির

গর্ব। শুধু যার যার দেশেরই নও, সারা দুনিয়ার গর্ব তোমরা। দোয়া করি, বখে যাওয়া কিশোররা তোমাদের দেখে শিখুক, ভালো হোক, মানুষ হোক…
তাজ্জব হয়ে গেল তিন গোয়েন্দা, অশিক্ষিত এক মাসাইয়ের দেশপ্রেম দেখে, নীতিবাক্য শুনে, অনেক বড় বড় শিক্ষিত মানুষও এভাবে গুছিয়ে বলতে পারবে না।
নরম কথা শুনলে মুসার চোখে পানি এসে যায়। এখনও তার ব্যতিক্রম হলো। না। আপনার জন্যেও গর্ববোধ করছি আমি, মিস্টার মুগামবি। থ্যাঙ্ক ইউ।
হাসি ফুটলো মাসাইয়ের কালো চোখের তারায়। সিমবার দিকে তাকালো, যা বাবা, ভালো থাকিস। বন্ধুর কথা শুনবি সব সময়, গোলমাল করবি না।
রবিন, কিশোরও মুগামবি আর টমসনকে ধন্যবাদ দিলো।
এই চিঠিটা নিয়ে যাও, কিশোরের হাতে একটা খাম দিলেন ওয়ারডেন। এয়ারপোর্ট ম্যানেজারকে দিও। স্টর্কটীকে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা তিনি। করবেন..আর হ্যাঁ, আমার ব্যানড়া সব সময় তোমাদের জন্যে খোলা রইলো। সুযোগ পেলেই বেড়াতে চলে এসো। যাও, উইশ ইউ গুড লাক।
সিমবাও যেন ভাবলো, গুড লাক জানানো দরকার নতুন মনিবকে। পেছন থেকে মুসার গাল, কান চেটে দিলো। হেসে উঠলো সবাই। তরল হয়ে গেল পরিবেশ। হাসিমুখে স্টর্কের এঞ্জিন স্টার্ট দিলো মুসা আমান।

ভলিউম ১০ – অথৈ সাগর ১ (প্রথম খণ্ড) – তিন গোয়েন্দা – রকিব হাসান – সেবা প্রকাশনী

দেয়ালে ঝোলানো বিশাল একটা ম্যাপ দেখছিলেন মুসার বাবা রাফাত আমান, প্রশান্ত মহাসাগরের, শব্দ শুনে ফিরে তাকালেন।

ও, এসে গেছ, তিন গোয়েন্দার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছেন তিনি। মাত্র আধ ঘন্টা আগে মুসাকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছিলেন কিশোর আর রবিনকে, হাজির হয়ে গেছে। কোন রকম ভূমিকা না করে ছুঁড়ে দিলেন যেন প্রশ্নটা, দক্ষিণ সাগরে যেতে চাও?

বাবাআ! প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মুসা। সত্যি বলছ!

মাথা ঝাঁকালেন রাফাত আমান। বললেন, আমাজান থেকে জন্তুজানোয়ার ধরে এনে ভালই কামিয়েছি, জানোই তো। আবার কিছু অর্ডার পাওয়া গেছে। ডেভিড লিসটারের নাম শুনেছ?

শুনেছি। ইস্পাতের ব্যবসা করে কোটিপতি হয়েছেন, কিশোর জবাব দিল।

কিন্তু লোহালক্কড় বাদ দিয়ে হঠাৎ জানোয়ার কেনার শখ হল কেন তার?

নিজের বাড়িতে একটা প্রাইভেট অ্যাকোয়ারিয়াম করেছেন। সাত সাগরের আজব আজব সব জীব এনে ওখানে জিয়াতে চান। আন্দাজ কর তো, কি কি চান?

সী লায়ন, রবিন বলল।

না। জায়ান্ট অক্টোপাস।

হাসি হাসি মুখটা নিমেষে গম্ভীর হয়ে গেল কিশোরের। তিরিশ ফুট লম্বা ওই দানব! কি করে ধরব? অসম্ভবকে সম্ভব করতে বলছেন তিনি।

শুধু তাই না, টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন রাফাত আমানু। প্যাডে পেন্সিল দিয়ে লিখে রেখেছেন নামগুলো। পড়লেন, একটা টাইগার শার্ক চান— বাঘা হাঙর। আরও চান একটা গারনারড, একটা এ্যাম্পাস, একটা সাগরের গিরগিটি, একটা ডুগং, একটা কংগার ইল—বিশাল বান মাছ, ছবি দেখেছ নিশ্চয়; দানবীয় ঝিনুক একটা চান, ওই যে, যেগুলো মানুষের পা আঁকড়ে ধরলে আর ছাড়ানোর সাধ্য হয় না, প্রায়ই ধরে ডুবুরিদের, অনেক ডুবুরি ছুটতে না পেরে ডুবে মারা যায়। একটা ম্যানটা বা সাগরের বাদুড়ও চান…

খাইছে! শুনেছি ওগুলো জেলেদের নৌকা ডুবিয়ে দেয়, হাঁ হয়ে গেছে মুসা। কিভাবে…

একটা সী সেন্টিপেড বা সাগরের শতপদী, বলে যাচ্ছেন রাফাত আমান, ছেলের কথা যেন কানেই যায়নি, একটা করাত মাছ, একটা তলোয়ার মাছ, একটা রাক্ষুসে স্কুইড…হ্যাঁ, যোগ করলেন তিনি। কিশোরের চোখ বড় বড় হয়ে গেছে

দেখে মজা পাচ্ছেন, খুদে যে জীবগুলো সচরাচর দেখ, ওগুলো নয়, চল্লিশ ফুট লম্বাগুলো, শুড়ের মাথায় বাসনের সমান বড় সাকশন কাপ থাকে, পনেরো ইঞ্চি লম্বা চোখ...ওগুলোর হারামিপনায় বিরক্ত হয়ে চমৎকার একটা নাম দিয়েছে। জেলেরা, প্রশান্ত মহাসাগরের দুঃস্বপ্ন।
ফাটা বেলুনের মত চুপসে গেছে ছেলেরা। নিছক আনন্দ ভ্রমণে যাচ্ছে না। ওরা।
কিশোর জিজ্ঞেস করল, ধরতে তো পারব না, জানি। ধরা যাক, ধরলাম। এতগুলো দানবকে বাড়ি আনব কি করে?
একটা স্কুনার ভাড়া করবে, যেটাতে বড় বড় দুতিনটে ট্যাংক আঁটে। ধরে ধরে রাখবে ওগুলোতে। তারপর মালবাহী জাহাজে তুলে দেবে। চলে আসবে, আর কি।
দানব ধরার কথা ভুলে গিয়ে প্রায় নাচতে আরম্ভ করল মুসা। খুশিতে। আহ, কি মজা! নিজের জাহাজে পাল তুলে দিয়ে ভেসে পড়ব সাগরে...
অত খুশি হয়ো না, বাধা দিয়ে বললেন তার বাবা। ইয়ট নিয়ে যাচ্ছ না। একটা ফিশিং বোট ভাড়া করবে, মাঝিমাল্লা নেবে দক্ষ দেখে, সাগর আর মাছ ধরায় যাদের জ্ঞান আছে। লিসটারের অর্ডারগুলো তো ধরবেই, এ ছাড়াও বিচিত্র যা-ই দেখবে, ধরার চেষ্টা করবে, যেগুলোর চাহিদা আছে পাবলিক অ্যাকোয়ারিয়ামে।
জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন তিনি। চুপ করে কি ভাবলেন। আবার তাকালেন ছেলেদের দিকে। পারলে আমিও যেতাম, এতবড় একটা সুযোগ...কিন্তু উপায় নেই। হাতে অনেক কাজ। মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফার একটা ছবি করছেন। আমাকে ছাড়তেই চান না, পারলে সারাক্ষণ আটকে রাখেন স্টুডিওতে।
আবার জানালার বাইরে তাকালেন তিনি।
কখন রওনা হচ্ছি আমরা? কিশোর জিজ্ঞেস করল।
যত তাড়াতাড়ি পার, বলে কিশোরের দিকে তাকালেন। আর হ্যাঁ, আজই গিয়ে একবার প্রফেসর এনথনি ইস্টউডের সঙ্গে দেখা কোরো। আগেই বলে রেখেছেন, ওদিকে যদি তোমাদের পাঠাই, তাকে যেন জানাই। তোমাদের কথা সব জানেন তিনি।...তাঁকে চেন?
চিনি, রবিন বলল।
গুড। একটা গোপন কাজ বোধহয় দেবেন তোমাদেরকে। মুক্তো-টুক্তোর ব্যাপারে কিছু হবে।
দরজাটা বন্ধ করে দাও, প্রফেসর ইস্টউড বললেন। কেউ শুনে ফেলতে পারে।
দরজা বন্ধ করে দিয়ে এসে কিশোর আর রবিনের পাশে বসল মুসা।
ডেস্কের ওপাশ থেকে পুরো ঘরে চোখ বোলালেন প্রফেসর, যেন ভয়, দেয়ালগুলোরও কান আছে। কান অনেকগুলো আছে দেয়ালে, তবে ওগুলো

বধির এখন, শোনে না। বিশিষ্ট জীববিজ্ঞানীকে ঘিরে রেখেছে অসংখ্য মৃত জীবের লাশ, স্টাফ করা, দেয়ালে গাঁথা তাকে সাজিয়ে রাখা হয়েছে চমৎকারভাবে। ঘরের মেঝে থেকে ছাত পর্যন্ত তাক, সব বোঝাই। উত্তর সমুদ্রের পাখি অ্যাক, পেঙ্গুইন, টার্ন, সামুদ্রিক চাঁদ মাছ, ময়ূর মাছ, সাগর-কই, টিউনা, মুলেট, ঋষি কাঁকড়া, জেলিফিশ, পুফার, পোয়পোয়েজ, শজারু মাছ আর আরও নানারকম সামুদ্রিক প্রাণী।

সাগরের প্রাণীর ওপর গবেষণা করছেন ডক্টর এথনি ইস্টউড। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান। ন্যাশনাল ওশেনোগ্রাফিক ইন্সটিটিউটের নির্বাহী সচিব। সাগর চেনেন তিনি। সাগরের মাছ চেনেন। আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, নরওয়ের বড় বড় মাছ ব্যবসায়ীরা অনেক কাজ আদায় করে নিয়েছে তাঁর কাছ থেকে, কিছু বিনে পয়সায়, কিছু টাকার বিনিময়ে, মূল্যবান তথ্য কিনে নিয়েছে। তাদের দেয়া সেই টাকাতেই পুরানো বিশাল এই প্রাসাদটা কিনে মস্ত ল্যাবরেটরি বানিয়ে নিয়েছেন। প্রায়, প্রতিটি ঘরেই নানা আকারের নানা ধরনের ট্যাংক রয়েছে, ওগুলো নানা রকম মাছের আঁতুড় ঘর।

মাথা সামান্য নোয়ালেন ধূসর-চুল প্রফেসর, যাতে ট্রাইফোকাল লেন্সের ভেতর। দিয়ে ভালমত দেখতে পারেন কিশোর অতিথিদের।

আমান বলল, প্রশান্ত মহাসাগরে নাকি বেড়াতে যাচ্ছ তোমরা, হাসলেন প্রফেসর। কিছু সামুদ্রিক জীব ধরারও চেষ্টা করবে। খুব কঠিন আর বিপজ্জনক কাজ। বয়েস কম তোমাদের। পারবে?

পারব, স্যার, গভীর আত্মবিশ্বাস ফুটে বেরোলো কিশোরের কণ্ঠে। আমাজানের জঙ্গলে গিয়ে ভয়ঙ্কর অ্যানাকোণ্ডা আর মারাত্মক হিংস্র জাগুয়ার ধরে এনেছি এই আমরা তিনজন। ভীষণ অরণ্যে সেই রোমাঞ্চকর অভিযানের কাহিনী সংক্ষেপে তাঁকে বলল সে।

বেশ, চিন্তিত ভঙ্গিতে বললেন প্রফেসর। আমানকে আমি বহু বছর ধরে চিনি। তার ওপর আস্থা আছে আমার। তোমাদের কথা বলেছে আমাকে। বয়েস এত কম হবে ভাবিনি...্যাকগে, সে যখন বলেছে, ঠিকই বলেছে। ফিল্ম ডিরেক্টর ডেভিস ক্রিস্টোফারকে ফোন করেছিলাম, সে-ও শতমুখে প্রশংসা করল তোমাদের। ওর মত লোককে অবিশ্বাস করতে পারি না। শোন, হাইলি কনফিডেনশিয়াল একটা ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করব এখন। ডেনজারাস! দুবার মরতে মরতে বেঁচেছি এর জন্যে। তিনবার আমার এই ঘরে হানা দিয়েছে চোর, ফাইলপত্র তছনছ করেছে, রাতের বেলা। খুঁজে পায়নি অবশ্য, কারণ কোন কাগজে লিখিনি ওই তথ্য, লেখা আছে এখানে, নিজের কপালে টোকা দিলেন তিনি।

তোমাদের জানাব সেকথা, বললেন তিনি। জানলেই বিপদ, জীবন বিপন্ন হবার ভয় আছে। যতক্ষণ না জানছ, ভাল আছ। সে-তথ্যের জন্যে হয়ত অত্যাচার করে তিলে তিলে মারা হবে তোমাদের। ভেবে দেখ এখন, ঝুঁকি নেবে কিনা? একে একে তিনজনের মুখের দিকে তাকালেন প্রফেসর।
আড়চোখে একবার দুই বন্ধুর মুখের দিকে তাকাল গোয়েন্দাপ্রদান। রবিন স্তব্ধ, মুসার চেহারা ফ্যাকাসে। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল কিশোর। শান্তকণ্ঠে বলল, সব খুলে বলুন।
দীর্ঘ এক মুহূর্ত কিশোরের চোখে চোখে তাকিয়ে রইলেন প্রফেসর। তারপর হাসি ফুটল মুখে। নাহ, আণ্ডার এস্টিমেট করেছিলাম তোমাদের, কম বয়েসী বলে ভুল করেছি। আমান আর ক্রিস্টোফার ঠিকই বলেছে। মনে হচ্ছে পারবে তোমরা।
ডেস্কের ড্রয়ার থেকে একটা ম্যাপ বের করে টেবিলে বিছালেন তিনি। মেরুদণ্ডে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল কিশোরের। জলদস্যুর গুপ্তধন? সাগরের কোন দুর্গম এলাকায় সেই ধন নিয়ে ডুবে গেছে কোন স্প্যানিশ জাহাজ? ম্যাপটা কি তারই নকশা?
সামনে ঝুঁকে ম্যাপটা দেখল সে। ও, না, নকশা নয়। ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক কোম্পানির করা একটা ম্যাপ, পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের, হাওয়াই থেকে তাইওয়ান পর্যন্ত আঁকা রয়েছে। ম্যাপটা বেশ বড় আর আধুনিক, ছোট ছোট অসংখ্য দ্বীপ দেখানো রয়েছে, যেগুলো সাধারণ ম্যাপে থাকে না।
চেয়ার থেকে কিছুটা উঠে রবিনও দেখল। কয়েকটা দ্বীপের নাম জানে, হাওয়াই, তাহিতি, সামোয়া, ফিজি। বেশির ভাগই জানে না, বিশেষ করে লাল পেন্সিল দিয়ে গোল দাগ দেয়াগুলো, প্রফেসর দিয়েছেন। যেমন, পোনাপে,ট্রাক, ইয়্যাপ, ওলোল, লোস্যাপ, প্যাকিন, পিনজিল্যাপ। অদ্ভুত আরও কিছু নাম রয়েছে, কতগুলোর নাম উচ্চারণ করাই কঠিন।
কয়েকটা দ্বীপ ঘিরে রয়েছে গোল একটি মাত্র দাগ। সেটাতে পেন্সিল ঠকে প্রফেসর বললেন, এই যে জায়গাটা, একে বলে প্রশান্ত মহাসাগরের অন্ধ অঞ্চল। এখানে রয়েছে পঁচিশ হাজারের মত প্রায় অচেনা দ্বীপ। জাপানীরা দখল করে রেখেছিল এগুলো, বহুবছর বাইরের কোন জাহাজকেই ঘেঁষতে দেয়নি এই এলাকায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এগুলোর হাতে গোনা কয়েকটা দ্বীপে লড়াই হয়েছিল ওদের, মিত্রবাহিনীর সঙ্গে। জাপান হেরে যায়। দ্বীপগুলো দেখাশোনার ভার এখন আমেরিকার ওপর। কয়েকটা দ্বীপে আমেরিকান নৌবাহিনীর ঘাঁটি স্থাপিত হয়েছে। হারানো পৃথিবীই বলা চলে অঞ্চলটাকে।
তবে ওই হারানো পৃথিবীই আমার জন্যে স্বর্গ, তোমাদের জন্যেও হবে, কারণ, দুর্লভ জলজ জীব ধরতে যাচ্ছ তোমরা। আমার কাছে প্রিয় হবার আরেকটা বড়

কারণ, ওখানেই রয়েছে আমার মুক্তার খামার।
মুক্তা! চেঁচিয়ে উঠল মুসা।
আস্তে বল, চট করে ঘরের চারপাশে চোখ বোলালেন প্রফেসর, কেউ শুনে ফেলল কিনা দেখলেন বোধহয়। পেন্সিলের মাথা রাখলেন পোনাপে নামের দ্বীপটার ওপর। এটার উত্তরে—ঠিক কত দূরে বলতে পারব না ছোট একটা অ্যাটুল। আছে। কেউ থাকে না ওখানে। এত ছোট, ম্যাপে দেখানোরও প্রয়োজন বোধ করেনি। জাহাজ চলাচলের পথ থেকে দূরে, কাজেই নটিক্যাল চার্টেও দেখায়নি। নাম ছিল না। সুতরাং নাম একটা আমিই রেখেছি, পার্ল ল্যাগুন। ওই ল্যাগুনে গবেষণা চালিয়েছিলাম কিছুদিন।
পৃথিবীর সব চেয়ে সুন্দর মুক্তা ফলানো হয় পারশিয়ান গালফ-এ। বছর পাচেক আগে ওই গালফ থেকে বিশ হাজার ঝিনুক সংগ্রহ করে পার্ল ল্যাগুনে নিয়ে যাই আমি, প্রাকৃতিক পরিবেশে ওই ঝিনুক থেকে কি-রকম মুক্তা হয় দেখার জন্যে। ওই ঝিনুকের জন্যে প্রচুর খাবারও নিয়ে যাই। পারশিয়ান গালফ-এর পরিবেশ সৃষ্টি করতে চেয়েছি পার্ল ল্যাগুনে। আমার বিশ্বাস ছিল, ওখানেই ওই ঝিনুকের চাষ সফল হলে আরও অনেক জায়গায় করা সম্ভব হবে।
আমার পরীক্ষা সফল হয়েছে কিনা দেখার সময় হয়েছে এখন। সময়ের অভাবে যেতে পারছি না আমি, খরচ দিয়ে যে কাউকে পাঠাব, সে সামর্থ্যও নেই। তোমরা যখন ওদিকেই যাচ্ছ, পারলে একবার পার্ল ল্যাগুনে যেও, আমার ঝিনুক খেত থেকে কিছু নমুনা নিয়ে এস। তোমরা যেখানে যাবে, তার থেকে কিছুটা দূরেই হবে ল্যাগুনটা। তবে ওইটুকু যেতে আসতে যা খরচ লাগে, সেটা আমি দিতে পারব।
পারবে যেতে?
শুনে তো ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে, কিশোর বলল। কিভাবে যেতে হবে? কি কি চিহ্ন দেখে বুঝব ওটা পার্ল ল্যান?
বলছি। এটাই আমার সিক্রেট। চারপাশে চোখ বোলালেন আবার। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন কিশোরের দিকে। কেউ শুনে ফেলছে না তো? আমার কেন জানি মনে হচ্ছে, শুনছে!
আমার অবশ্য তা মনে হচ্ছে না, হাসল কিশোর। তবে বলাও যায় না। যেভাবে জিনিসপত্র গাদাগাদি করে রেখেছেন, বাগ লুকানো থাকতেও পারে। খুঁজে বের করা মুশকিল। স্টাফ করা প্রাণীগুলো দেখাল। ওগুলোর কোনটার ভেতরও থাকতে পারে।
কিশোরের হাসিটা ফিরিয়ে দিতে দিতে চেয়ারে হেলান দিলেন প্রফেসর। যাকগে, অত ভেবে লাভ নেই। আমিও বোধহয় বেশি বেশি কল্পনা করছি। ভয় পাচ্ছি। ভয় পাওয়ার কারণও অবশ্য আছে। হুমকি দিয়ে উড়ো চিঠি আসা, রাতে

ল্যাবরেটরিতে চোর ঢোকা.হ্যাঁ, কি যেন বললে? বাগ? এক ধরনের প্রেরক যন্ত্র, স্যার। স্পাইরা বলে বাগ।
অ। পুরানো ডিকটোগ্রাফের মত জিনিস। ওকথা আমিও ভেবেছি। অনেক খোঁজাখুঁজি করেছি, পাইনি। থাকলে থাকবে, কি আর করা? যা যা বলেছি তোমাদের, সবই হয়ত শুনে ফেলেছে ব্যাটারা। শুনুর্ক। আসল কথাটা আর শুনতে দিচ্ছি না।
প্যাড থেকে একটানে ফড়ৎ করে একটা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে পেন্সিল দিয়ে লিখলেনঃ নর্থ ল্যাটিচিউড ১১.৩৪। ইস্ট লংগিচিউড ১৫৮.১২।
কাগজটা ঠেলে দিলেন ছেলেদের দিকে।
এই প্রথম এটা লেখা হল, বললেন তিনি। এবং আশা করি এই শেষ। মুখস্থ করে নাও। এই অবস্থানে রয়েছে পার্ল ল্যাগুন। কখনও কোন কাগজে লিখবে না, কারও সামনে ঘুণাক্ষরেও উচ্চারণ করবে না।
একবার পড়েই মুখস্থ হয়ে গেল কিশোরের, অসাধারণ তার স্মৃতিশক্তি। কয়েক বার পড়ে রবিনেরও মুখস্থ হল। সময় লাগল মুসার। মনে মনে পড়েই চলেছেঃ উত্তরে ল্যাটিচিউড এগারো ডিগ্রি চৌত্রিশ মিনিট। পূর্বে লংগিচিউড একশো আটান্ন ডিগ্রি বারো মিনিট।
মুখস্থ হয়েছে কিনা, জিজ্ঞেস করলেন প্রফেসর। তিনজনেই মাথা ঝাঁকাতে কাগজটা টেনে নিয়ে উল্টোপিঠে একটা নকশা একে বোঝালেন, এই হল ল্যাগুন। এদিকটা উত্তর। এইখানে রয়েছে ঝিনুকের খেত। ল্যাগুনের উত্তর-পূর্ব কোণে পেন্সিলের মাথা রাখলেন তিনি। দেখে নাও ভাল করে।
নকশাটা মনে গেঁথে নিতে লাগল কিশোর।
হয়েছে? জিজ্ঞেস করলেন প্রফেসর।
মাথা ঝাঁকাল কিশোর।
ম্যাচের কাঠি জ্বেলে কাগজটার এক কোণে আগুন ধরালেন প্রফেসর। পুড়ে ছাই হয়ে গেল পুরোটা কাগজ। সেটা হাতের তালুতে রেখে আঙুল দিয়ে টিপে টিপে মিহি গুঁড়ো করে ফেললেন। তারপর উঠে গিয়ে হাত ধুলেন বেসিনে। ছাইগুলো পানির সঙ্গে মিশে চলে গেল নর্দমায়।
প্রফেসরের বাড়ি থেকে বেরোল তিন গোয়েন্দা। বাইরে ইয়ার্ডের পুরানো ছোট ট্রাক নিয়ে অপেক্ষা করছে বোরিস। ওটাতে করেই এসেছে ছেলেরা।
ট্রাকে ওঠার সময় খেয়াল করল কিশোর, পাশের বাড়ি থেকে তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে এল একজন লোক। তার চেহারা দেখতে পেল না সে। মনে রাখার মত তেমন কোন বিশেষত্বও নেই শরীরের, শুধু পিঠ সামান্য কুঁজো হাঁটার কারণেও এমনটা হতে পারে। সোজা গিয়ে কালো একটা সেডান গাড়িতে উঠল লোকটা।

লোকটাকে লক্ষ্যই করত না কিশোর, যদি না প্রফেসরের সাবধানবাণী মন জুড়ে থাকত তার—ডেনজারাস! তিনবার মরতে মরতে বেঁচেছি...অত্যাচার করে তিলে তিলে মারা হবে তোমাদের-তার মনেও সন্দেহ ঢুকিয়ে দিয়েছেন প্রফেসর।
সারাটা পথ চুপ করে রইল কিশোর। একটা কথাও বলল না। স্যালভিজ ইয়ার্ডে পৌঁছল ট্রাক। মোড় নিয়ে গেটে ঢুকছে, এই সময় কালো সেডানটা চোখে পড়ল ওর, রাস্তা দিয়ে চলে যাচ্ছে। অস্ফুট একটা শব্দ করে উঠল সে।
কি হল? অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল মুসা।
উ! না, কিছু না, হাসল কিশোর। প্রফেসরের সন্দেহ রোগে আমাকেও ধরেছে। কালো একটা গাড়ি দেখলাম, কিন্তু তাতে কি? প্রশ্নটা যেন নিজেকেই করল সে। কালো সেডান আমেরিকায় অনেক আছে, রকি বীচেও।
মনকে বোঝানোর চেষ্টা করল বটে গোয়েন্দাপ্রধান, কিন্তু দুশ্চিন্তা দূর করতে পারল না। হয়ত ওদেরকে প্রফেসরের বাড়িতে ঢুকতে দেখেছে চোরদের কেউ, বেরোতে দেখেছে। ঘরে বাগ লুকিয়ে রেখে তাদের কথাও শুনেছে। আর তা হয়ে থাকলে, প্রফেসরের শত্রু এখন ওদেরও শত্রু হয়ে গেল। কালো গাড়িতে করে ট্রাকের পিছু পিছু এসে জেনে গেল, ওরা কোথায় থাকে।
এরপর কি করবে লোকটা? হয়ত...
দূর! কি আবোল-তাবল ভাবছে? এত হয়ত হয়ত করছে কেন? নিজেকে ধমক লাগাল কিশোর। মন থেকে সমস্ত সন্দেহ আর দুশ্চিন্তা ঝেড়ে বিদেয় করার চেষ্টা করল।
রাজহংসীর মত ভেসে চলেছে মর্নিং স্টার কিশোর বাংলা নাম রেখেছে শুকতারা। ঘোষণা করে দিয়েছে, যতদিন স্কুনারটা তাদের অধিকারে থাকবে, শুকতারা বলেই ডাকবে ওটাকে। রবিন আর মুসা আপত্তি করেনি। ক্যাপ্টেন কিছুক্ষণ গাঁইগুই করে শেষে মেনে নিয়েছে। কিশোর বুঝিয়ে দিয়েছে তাকে, যেহেতু.জাহাজটা ভাড়া নিয়েছে ওরা, ওটার ওপর সর্বময় কর্তৃত্ব এখন ওদের।
দুরন্ত গতিতে ছোটার জন্যেই যেন জন্ম হয়েছিল জাহাজটার। সমকক্ষ টিউনা শিকারি আর কোন জাহাজই পারে না শুকতারার সঙ্গে, মাছ নিয়ে বন্দরে ফেরার প্রতিযোগিতায় হেরে যায়। তিনকোনা মারকোনি পালের কারণেই গতি এত বেড়েছে এটার। এ ধরনের পাল কুনারে সাধারণত দেখা যায় না, সম্ভ্রান্ত রেসিং ইয়টগুলোতেই লাগানো হয়। কিন্তু শুকতারা সাধারণ স্কুনার নয়। বোট রেসেও অংশগ্রহণ করেছে। তিনটে পাল ছাড়াও রয়েছে অকজিলারি ইঞ্জিন, বাতাস পড়ে গেল, কিংবা সরু চ্যানেলের ভেতর দিয়ে চলার সময় ওই ইঞ্জিন ব্যবহার হয়সাধারণত পাল যেখানে কাজ করে না। কিন্তু বাতাস থাকলে, আর তিনটে পালেই হাওয়া লাগলে যে গতি পায়, ইঞ্জিনের পুরো ক্ষমতা নিংড়েও তার অর্ধেক

হবে না। এই তো এখনই সতেরো নট গতিতে ছুটছে, অথচ যেন গায়েই লাগছে না ওর।

ডেকে দাঁড়িয়ে আছে তিন গোয়েন্দা। এরকম একটা জাহাজের সাময়িক মালিক হতে পেরে গর্বে ফুলে উঠেছে বুক। নৌকা-জাহাজ সম্পর্কে মুসার জ্ঞান বেশি, স্কুনারটা সে-ই পছন্দ করেছে। টাকা এসেছে তার বাবার পকেট থেকে অর্ধেক, বাকিটা কিশোরের চাচা রাশেদ পাশার কাছ থেকে। দুজনে শেয়ারে ব্যবসা করে, জন্তুজানোয়ার ধরে বিক্রি করার, স্কুনারটার মালিক ক্যাপ্টেন ইজরা কলিগ। জাতে জেলে, দক্ষ নাবিক, ক্যাপ্টেন উপাধিটা নিজেই নিজের নামের আগে বসিয়ে নিয়েছে।

শুকতারাতেই আছে সে। ক্যাপ্টেন হিসেবে এসেছে, তার জন্যে আলাদা পয়সা দিতে হবে। ষাট ফুটি একটা জাহাজ সামলানো এমনকি মুসার পক্ষেও সবসময় সম্ভব না। তাছাড়া যাচ্ছে ওরা অচেনা সমুদ্রে, দক্ষ একজন নাবিকের দরকার আছে। জাহাজের মাঝি-মাল্লা রয়েছে আরও দুজন, দুজনেই তরুণ। একজনের নাম জামবু, ডাকনাম না ছদ্মনাম কে জানে, আসল নাম বলতে নারাজ। রোদে-পোড়া শরীর, কর্কশ চেহারার মতই যেন চরিত্রটাও। আরেকজন বাদামি চামড়ার এক দানব, নাম কুমালো, বাড়ি দক্ষিণ সাগরের ছোট্ট এক দ্বীপে, রায়াটি। এক বাণিজ্যিক জাহাজের চড়ে এসেছিল আমেরিকায়, স্যান ফ্রান্সিসকোয় নেমেছিল। ঘুরেছে অনেক শহর, স্বপ্ন ভঙ্গ হয়েছে, স্বর্গ খুঁজে পায়নি শ্বেতাঙ্গদের দেশে, অথচ গল্প অনেক শুনেছিল। তাই প্রথম সুযোগেই ফিরে চলেছে আবার নিজের দেশে। স্কুনারটা পলিনেশিয়ান দ্বীপপুঞ্জের দিকে যাবে শুনেই আর দ্বিরুক্তি করেনি, মাল্লার চাকরি নিয়ে উঠে পড়েছে।

সামনের ডেকের নিচে ছোট্ট কেবিনে গাদাগাদি করে ঘুমাতে হবে তিন নাবিককে। তিন গোয়েন্দার থাকার জায়গা আরও কম, পেছনের ডেকের নিচে। জায়গা অনেকই ছিল, ছেড়ে দিতে হয়েছে বিশাল ট্যাংকগুলোর জন্যে, যেগুলোতে, জলজ প্রাণী জিয়ানো হবে। দুটো কেবিনের মাঝামাঝি বসানো হয়েছে ওগুলো।

খুদে গ্যালিটাকে ব্যবহার করা হবে রান্নাঘর হিসেবে। একটা প্রাইমাস স্টোভ আছে। স্টোররুমে আর একরত্তি জায়গা নেই, খাবারের বাক্স, বস্তা, টিনে বোঝাই। আছে মাছ আর অন্যান্য জানোয়ার ধরার নানারকম সরঞ্জাম–জাল, হারপুন, বড়শি, সুতা, আরও অনেক কিছু।

তিনটে মাস্তুলের বড়টাতে, অর্থাৎ প্রধান মাস্তুলের অনেক ওপরে লাগানো রয়েছে একটা মাচামত, ক্রোজ-নেস্ট, কিশোর বলে কাকের বাসা। ওখানে উঠে বসে চোখ রাখা যায় দূরে, শিকার খুঁজে বের করা সহজ হয়। সামনের গলুইয়ে রয়েছে পুলটি– লম্বা একটা তক্তা ঠেলে বেরিয়ে গেছে কয়েক ফুট সামনে, লোহার মোটা

পাত দিয়ে ওটাকে জায়গামত ধরে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অনেক ফিশিং বোটেই থাকে ওরকম পুলপিট। হারপুন হাতে ওটার মাথায় গিয়ে দাঁড়ায় শিকারি, পানিতে মাছের খোঁজ করে। চোখে পড়লেই পলকে ছুঁড়ে মারে হারপুন, গেঁথে তোলে মাছ। ওখানে দাঁড়ালে রোমাঞ্চকর অনুভূতি হয়, আশ্চর্য এক ভাল লাগা। মাথার ওপরে খোলা আকাশ, পায়ের তলায় ছুটন্ত সাগর, মাঝে একটা তক্তা ছাড়া আর কিছু নেই। পানির অনেক নিচে দৃষ্টি যায় এখানে দাঁড়ালে, স্পষ্ট চোখে পড়ে সাগর-জীবন।

পালা করে কয়েকবারই পুলপিটে দাঁড়িয়েছে তিন গোয়েন্দা। অবাক হয়ে ভেবেছে, কি জানি কি চোখে পড়ে যায়? অচেনা কিছু দেখা যেতেই পারে। কারণ প্রফেসর ইস্টউড বলেছেন, প্রশান্ত মহাসাগরে যত প্রাণী আছে, তার অর্ধেকের বেশি হয়ত এখনও অপিরিচিত মানুষের কাছে। মানুষ জানেই না, আছে ওগুলো।

বিশাল এই জলাশয়ের সব চেয়ে বেশি যেখানটায় চওড়া, এগারো হাজার মাইল; গড় গভীরতা তিন মাইল, কোন কোন জায়গা আরও বেশি, ছয়টা গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়ন একসাথে জোড়া দিয়ে ডোবালেও ডুবে যাবে। লক্ষ লক্ষ দ্বীপ রয়েছে এর বুকে, নামকরণ হয়েছে মাত্র তিন হাজারের। মহাসমুদ্রের এই অসীম জলরাশি কত হাজারো রহস্য এখনও লুকিয়ে রেখেছে বিজ্ঞান আর মানুষের অগোচরে, কে জানে!

হুইল ধরেছে ক্যাপ্টেন ইজরা কলিগ। ছোট নীল চোখে শেয়ালের ধূর্ততা। রোদে পোড়া, বৃষ্টিতে ভেজা মুখের বাদামি চামড়া দেখে আর বোঝার উপায় নেই মূল রঙ কি ছিল। মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে বিনাকল-এ রাখা কম্পাসের দিকে।

এই রকম বাতাস থাকলে সহজেই পোনাপের পাশ কাটাতে পারব, একসময় বলল কলিগ।

কেন, বাতাস গোলমাল করার সম্ভাবনা আছে নাকি? কিশোর জিজ্ঞেস করল।

আছে। একটা অশ্ব অক্ষাংশ। বাতাসের মতিগতি বোঝা মুশকিল। এরকম থাকে না। হাওয়াই ছাড়ানোর পর নিশ্চিন্ত। বাতাস মোটামুটি এক থাকে ওখানে, দুর্ঘটনার ভয় কম।

দুর্ঘটনা? পায়ে পায়ে সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে রবিন, কথা শোনার জন্যে। কি দুর্ঘটনা?

হারিক্যান। সর্বনাশ করে ছাড়ে।

এখন কি হারিক্যানের মৌসুম নাকি? মুসা জিজ্ঞেস করল।

হ্যাঁ। থাক, ওসব অলক্ষুণে কথা বলার দরকার নেই। হয়ত কিছুই ঘটবে। কিশোরের মুখের ওপর তীক্ষ্ণ শেয়াল-দৃষ্টি নাচাল কলিগ। এত টাকা খরচ, এত সাজসরঞ্জাম...ওদিকে কি দরকার? শুধুই জানোয়ার ধরা, না অন্য কিছু?

হঠাৎ সন্দেহ হল কিশোরের। তথ্য জানতে চাইছে ক্যাপ্টেন? নাকি জানতে চাওয়ার ভান করছে শুধু, যা জানার জেনে ফেলেছে ইতিমধ্যেই? তাকে তো বলা হয়েছে, জলজ জানোয়ার ধরতে যাচ্ছে ওরা। তাহলে হঠাৎ এই প্রশ্ন কেন? মুক্তা খেতের কথা জানে নাকি লোকটা?

জবাব দিল না কিশোর। সরে এল ওখান থেকে। জাহাজের পালে হাওয়া লাগার পর থেকে যে ভাল লাগাটা ছিল, দূর হয়ে গেছে, মনের কোণে ভারি হয়ে উঠছে সন্দেহের কালো মেঘ।

প্রায় ভুলেই গিয়েছিল কালো সেডানের সেই লোকটার কথা। বাড়ি থেকে বন্দর পর্যন্ত কেউ তাদেরকে অনুসরণ করেনি। জাহাজ খোলা সাগরে বেরিয়ে আসার পর সে মনে করেছিল, শয়তানকে পিছে ফেলে এসেছে। সামনে শুধুই আনন্দ, আর রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চার।

এখন মনে হল, ভুল করেছে। নতুন করে তাকে ভাবিয়ে তুলল ক্যাপ্টেন ইজরা কলিগ। জামবুকে সন্দেহ করল, লোকটা কেন আসল নাম বলতে চায় না? সন্দেহ হল কুমালোকে, লোকটা কি সত্যিই দেশে ফিরে যাওয়ার জন্যে শুকতারায় উঠেছে? নাকি দক্ষিণ সাগরে ওদের সঙ্গে চলেছে প্রফেসরের মুক্তা খেতের সন্ধানে? কাকে ছেড়ে কাকে সন্দেহ করবে বুঝতে পারছে না সে। জামবু আর কুমালো, দুজনকেই চাকরি দিয়েছে ইজরা কলিগ। তিনজনই কি একদলে?

কি হল? ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল মুসা।

হাসল কিশোর। তার সন্দেহের কথা বলে এখনই দুই সহকারীকে ঘাবড়ে দিতে চায় না। না, কিছু না...ঝড়ের কথা শুনে ভাবছি...ওই দেখ, মেঘ।

বিশেষ সুবিধের লাগছে না, আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল রবিন। মাথার ওপর দিয়ে উড়ে চলেছে একটুকরো কালো মেঘ। নামবেই বোধহয়। তার কথা শেষ হতে না হতেই ঝরঝর করে ঝরে পড়ল কফোঁটা। বোঝা যায়, আরও ঝরবে।

বৃষ্টি! চেঁচিয়ে উঠল মুসা। তারমানে গোসল। খাইছে, গায়ে যা গন্ধ হয়ে গেছে না। বাড়ি থেকে বেরোনোর পর আর গা ধোঁয়ার সুযোগ পাইনি।

ছুটে কেবিনে চলে গেল সে। খানিক পরেই বেরিয়ে এল কাপড় খুলে, পরনে শুধু একটা জাঙ্গিয়া। হাতে সাবান।

বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়তে লাগল। শরীর ভিজিয়ে নিয়ে সাবান দিয়ে জোরে জোরে গা ঘষতে শুরু করল মুসা। সাদা ফেনায় ঢেকে ফেলল পা থেকে মাথা পর্যন্ত। ইতিমধ্যে কমে গেছে বৃষ্টি। আবার নামার অপেক্ষা করতে লাগল সে উৎকণ্ঠিত হয়ে। চোখ বোজা। দেখতে পেল না, মাথার ওপর থেকে সরে গেছে। মেঘের টুকরোটা। একটা ফোঁটাও পড়ছে না আর।

সাবানের ফেনার একটা স্তম্ভ হয়ে যেন দাঁড়িয়ে আছে মুসা। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে। তার দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে হাসছে কিশোর আর রবিন। কলিগও তাকিয়ে আছে, মজা পাচ্ছে।
আরেকটু মজা করার লোভ ছাড়তে পারল না রবিন। হঠাৎ উত্তেজিত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল, মুসা, দেখ দেখ!
কি হয়েছে দেখার জন্যে চোখ মেলল মুসা। প্রায় সাথেসাথেই বন্ধ করে ফেলল আবার। চোখে সাবান ঢুকে জ্বলুনি শুরু হল। চেঁচাতে শুরু করল সে, ওরে বাবারে, গেছি! এই এই, আমাকে এক বালতি পানি এনে দাও না কেউ! অ্যাই...।
কেউ পানি আনতে গেল কিনা দেখারও উপায় নেই। সহ্য করতে পারল না আর মুসা। সোজা ছুটে গেল রেলিঙের কিনারে। থমকে দাঁড়াল এক মুহূর্ত। তারপরই রেলিঙ টপকে মাথা নিচু করে ঝাপ দিল সাগরে।
ধুয়ে গেল সাবান। একটু আগে বৃষ্টি হয়েছে, পানি বেশ ঠাণ্ডা। কয়েক মুহূর্ত দাপাদাপি করল মুসা। তারপর ওপরে তাকিয়ে রবিনের উদ্বিগ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, থ্যাঙ্ক ইউ, রবিন। পানিতে নামার সাহস করতে পারছিলাম না, নামিয়ে দিয়ে ডর ভেঙেছ। চমৎকার পানি। এই কিশোর, নামবে নাকি?
না, হাত নাড়ল কিশোর। উঠে এস, জলদি। বড় বড় হাঙর থাকে এসব অঞ্চলে।
থাকুকগে। হাঙরকে ভয় পাই না আমি।
হাসল কিশোর। মুসার সাগরপ্রীতির কথা জানা আছে তার। হঠাৎ চোখ বড় বড় করে অভিনয় শুরু করল, ও, জানো না বুঝি? সাগরের পানিতেও ভূত থাকে। ওদের বলে খ্যাংড়া ভূত...
ঠিক এই সময় বোধহয় পায়ে একটা মাছের বাড়ি লাগল, গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল মুসা, ওরে বাবারে! খেয়ে ফেলল রে! খ্যা-খ্যা-এ্যাংড়া ভূত...জলদি একটা দড়ি দাও! তোল আমাকে!
রাত নেমেছে সাগরে। ডেকে বসে পড়ছে রবিন আর কিশোর। মাছের আলোয়। একধারে বসে আকাশের তারা গুনছে মুসা।
ছোট একটা ট্যাংকের দুধারে বসেছে কিশোর আর রবিন। ট্যাংকের পানিতে সাঁতার কাটছে মাছটা, গা থেকে উজ্জ্বল আলো বেরোচ্ছে, চল্লিশ ওয়াট বাল্বের সমান আলো।
কি, পেয়েছ? মুখ তুলে জিজ্ঞেস করল রবিন। নাম আছে?
আছে, হাতের ম্যানুয়েলটা নেড়ে বলল কিশোর। লণ্ঠন মাছ। বেশ মানিয়ে নাম রেখেছে।
মাছটার শরীরের দুধারে দুই সারি আলো, যেন খুদে একটা স্টিমারের আলোকিত জানালা। পিঠের ঘন কাটার ফাঁকে ফাঁকেও রয়েছে আলো.। নাগাড়ে জ্বলছে,

মিটমিটও করছে না। তবে লেজের আলোগুলো স্থির নয়, জ্বলছে-নিভছে, জ্বলছে-নিভছে।
মাছটা ধরেছে কিশোর। ঘন্টাখানেক আগে পুলপিটে দাঁড়িয়েছিল জাল হাতে। পুলপিটের লোহার রেলিঙে হেলান দিয়ে তাকিয়েছিল নিচে, তন্ময় হয়ে দেখছিল নিচের জলজ জীবন। পায়ের তলায় মাত্র কয়েক ফুট নিচে ছুটন্ত সাগর। হঠাৎ দেখেছে আজব আলো। চোখের পলকে লাঠিতে বাঁধা জালটা ডুবিয়ে দিয়েছে পানিতে। চামচ দিয়ে শুরুয়া থেকে গোশতের টুকরো তোলার মত করে জালে করে তুলে এনেছে মাছটা।
এই আলো দিয়ে কি করে ওরা? জিজ্ঞেস করল মুসা। আকর্ষণীয় আলোচনা শুরু হয়েছে, কাজেই তারা গোনা বাদ।
গভীর পানির মাছ এটা, ম্যানুয়েল পড়ে জেনেছে কিশোর। শুধু রাতের বেলা ওপরে ওঠে। দিনে থাকে গভীর পানিতে, অন্ধকারে। সাগরের ওই অতোখানি গভীরে চিরকাল অমাবস্যার অন্ধকার। কাজেই ওখানে যারা বাস করে তাদের আলো দরকার হয়, এই আলোক মাছের মত।
কেন? পানিতে তো রোদের আলো ঢোকে। দিনের বেলা যতবার ডুব দিয়েছি, আলো দেখেছি। অন্ধকার তো ছিল না?
সূর্যের আলো পানিতে হাজার ফুটের বেশি নামতে পারে না, বিদ্যে ঝাড়তে আরম্ভ করল বইয়ের পোকা রবিন। তুমি আর কয় ফুট নাম? বেশি গভীরে নামতে চাইলে, মানে ডীপ-সী ডাইভিঙের সময় আলাদা আলো নিয়ে যেতে হয় সঙ্গে করে। পানির মাইলখানেক নিচে থেকে শুরু হয় অন্ধকারের রাজত্ব, ঘোর কালো অন্ধকার, ওই যে কিশোর বলল, অমাবস্যা। হেসে যোগ করল, শোনের ভূতের মতই ওখানে আলো বয়ে বেড়ায় মাছেরা।
গায়ে কাঁটা দিল মুসার। খানিকটা সরে বসল দুই বন্ধুর কাছাকাছি। লেজের আলো জ্বলে-নেভে কেন?
বোধহয় শত্রুকে ঠেকানোর জন্যে, কিশোর বলল। তোমার চোখে হঠাৎ টর্চের আলো ফেললে কি হয়? অন্ধ হয়ে যাও না? ঠিক তেমনি। শত্রুর চোখে আলো ফেলে তাকে কিছুক্ষণের জন্যে অন্ধ করে দেয় আলোক মাছ। ওই সুযোগে পালায়।
মম, খুব চালাক ব্যাটারা।
নানারকম জাল বেঁধে রাখা হয় জাহাজের পেছনে। কখনও ওপরের পানি থেকে মাছ ঘেঁকে তোলার জাল, কখনও গভীর পানি থেকে মাছ ধরার উপযোগী জাল। তাতে প্রতিদিনই ধরা পড়ে নানারকম মজার মজার জীব, মাছ।

গভীর পানির ছোট ছোট জীবগুলোকে ধরে ছোট একটা অ্যাকোয়ারিয়ামে আলাদা করে রেখে দেয় কিশোর।
দাঁড়াও, মজা দেখি, বলে ছোট একটা জাল দিয়ে আলোক মাছটাকে তুলে অ্যাকোয়ারিয়ামে ফেলল সে। সঙ্গে সঙ্গে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হল। তেড়ে এল ওটার চেয়ে বড় প্রজাতির আরেকটা আলোক মাছ, ওটার গায়েও আলো আছে। পাখাগুলোতেও আলো। এমনকি লম্বা লম্বা গোঁফগুলো থেকেও উজ্জ্বল দ্যুতি বেরোচ্ছে।
এটার নাম রাখেকো, কিশোর বলল।
দেখেই বোঝা যায়, জীবনে অনেক তারা গিলেছে, মন্তব্য করল মুসা। তাকিয়ে আছে ট্যাংকের দিকে। জলদি লণ্ঠন বের না করলে একেও খাবে।
লণ্ঠনটাকে প্রায় ধরে ফেলেছে তারাখেকো, এই সময় ওটার চোখের কাছে লেজ নাড়ল লণ্ঠন। দপদপ করে বার কয়েক আলো জ্বলল-নিভল। ধাধিয়ে দিল তারাখেকোর চোখ। দ্বিধায় পড়ে গেল বড় মাছটা। এই সুযোগে ট্যাংকের একেবারে কোনায় চলে গেল ছোটটা, লুকানোর চেষ্টা করছে।
ট্যাংকে আরও অনেক মাছ আছে। কোনটার সবুজ আলো, কোনটার হলুদ, কোনটার লাল। একটার মাথা থেকে বাঁকা হয়ে ঝুলছে সরু একটা আঁকশি, মাথায় খুদে একটা বাল্ব, জ্বলছে।
কিন্তু একটা মাছের কোন আলো নেই, অথচ গভীর পানিতে বাস। ম্যানুয়েল পড়ে জেনেছে কিশোর, ওটা চির অন্ধ। কাজেই কোথায় যাচ্ছে দেখার জন্যে আলো দরকার হয় না, অন্ধ মানুষের মত লাঠি দিয়ে দেখে দেখে চলে। তবে মানুষের হাতে থাকে একটা লাঠি, আর এটার শরীরে রয়েছে বিশটা। লম্বা লম্বা, ছড়িয়ে রয়েছে চারপাশে। এগুলো দিয়ে মাছটা বোঝে কে কোথায় রয়েছে, কি করছে। চলার পথে কারও সঙ্গে ধাক্কা লাগায় না, বুঝতে পারে কোথায় রয়েছে খাবার, কোথায় শত্রু।
কিছু কিছু মাছের নাম ম্যানুয়েলেও নেই। একটা খাতায় ওগুলোর ছবি এঁকে রাখে কিশোর, পাশে নোট লেখে। বাড়িতে ফিরে লাইব্রেরিতে গিয়ে বই ঘেঁটে দেখবে, ওগুলোর উল্লেখ আছে কিনা। না থাকলে বুঝবে, তিন গোয়েন্দাই ওগুলোর আবিষ্কারক। হয়ত ওদের নামেই নাম রাখা হবে মাছগুলোর, কে জানে!
রোমাঞ্চিত হল গোয়েন্দাপ্রধান। ওরা আবিষ্কারক? বিশ্বাসই হতে চায় না। তবে ব্যাপারটা অসম্ভব নয়। উনিশশো একান্ন সালে বিকিনি অ্যাটলের কাছে মাছের ওপর গবেষণা চালিয়েছিল স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউশন। চারশো একাশি প্রজাতির মাছের নমুনা সংগ্রহ করেছিল ওরা, তার মধ্যে উনআশিটাই নতুন।

তারমানে প্রতি ছটায় একটা। ইস, এখনও যদি তাই হত! ট্যাংকের প্রতি ছটা মাছের একটা…
ধুম করে একটা শব্দে চমকে উঠল কিশোর, ছিন্ন হয়ে গেল ভাবনা। মাথার ওপরে মাস্তুলের গায়ে বাড়ি খেয়ে শব্দটা হয়েছে, ডেকে পড়ল কি যেন। ধুম ধুম করে আরও দুবার শব্দ হল।
উড়ুক্কু মাছ! চেঁচিয়ে উঠল সে। ট্যাংকে রাখা লণ্ঠন মাছের আলো গিয়ে পড়েছে সাদা পালে। ওই আলো দেখেই আকৃষ্ট হয়েছে উড়ুক্কু মাছ। উড়ে আসছে। আলো দেখে ছুটে আসা পতঙ্গের মত।
দাঁড়াও, ধরছি ব্যাটাদের! মাস্তুলের গায়ে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল মুসা। কালো একটা জিনিস ছুটে আসছে। বেসবলের মত খপ করে ধরল ওটাকে। আওয়াজ শুনে ডেকে উঠে এসেছে কুমালো। তার হাতে মাছটা তুলে দিল সে। একইভাবে আরেকটা মাছ ধরল মুসা। তারপর আরেকটা। চমৎকার! সকালের নাস্তা ভালই। জমবে। উড়ুক্কু মাছের স্বাদ ভাল।
একটার পর একটা ধরছে মুসা। এই সময় উড়ে এল যেগুলো ধরেছে তার চেয়ে বড় একটা কিছু। মিস করল মুসা, কারণ শেষ মুহূর্তে গতি পরিবর্তন করেছে ওটা। ধ্যাপ করে পেটে এসে গুতো মারল। মনে হল, যেন হাতুড়ি দিয়ে বাড়ি মেরেছে। সামনের দিকে বাঁকা হয়ে গেল তার শরীর। ডেকে হুমড়ি খেয়ে পড়ল সে। পেট চেপে ধরেছে দুহাতে, প্রচণ্ড ব্যথা।
তাড়াতাড়ি ট্যাংকের ঢাকনা লাগিয়ে দিল কিশোর। ঢেকে দিল আলোক মাছের আলো, যাতে আর কেউ আকৃষ্ট না হয়। ফিরে এসে ঝুঁকল মুসার ওপর।
বিড়বিড় করছে মুসা, আল্লাহ্, মেরে ফেলেছে…।
মুসার পেটের কাছে বড় একটা পাথরের মত জীবকে পড়ে থাকতে দেখল কিশোর। টর্চের আলো ফেলল ওটার ওপর। মাছই। যেন বিচিত্র বর্ম পরে রয়েছে।
গারনারড, বলল সে। ফ্লাইং গারনারড! মুসা, তোমার কপাল ভাল, বেঁচে গেছ।
এই মাছের অনেক গল্প পড়েছে কিশোর। রাতের বেলা হুইল ধরে থাকা নাবিকের কপালে এসে বাড়ি খায় এই মাছ। প্রচণ্ড আঘাতে বেহুশ হয়ে যায় নাবিক, মারাও যায় কখনও কখনও।
রক্ত পড়ছে মুসার পেট থেকে। শার্টের বোতাম খুলে দেখা গেল, গারনারডের ছুরির মত ধারালো আঁশ কাপড় কেটে চামড়ায় আঁচড় দিয়েছে।
আলাদা একটা ট্যাংকে গারনারডকে রেখে দিয়ে এল কিশোর। তারপর সে আর রবিন মিলে মুসার সেবা করতে বসল। অ্যান্টিসেপটিক দিয়ে ক্ষত পরিষ্কার করে তাতে মলম লাগিয়ে দিল।
উঠে দাঁড়াল মুসা। তিনজনে মিলে নতুন প্রাণীটাকে দেখতে গেল।

মিস্টার লিসটারের খুব পছন্দ হবে, খুশি হয়ে বলল কিশোর। আস্ত একটা ভড়। উড়তে পারে, সাঁতরাতে পারে, এমন কি হাঁটতেও পারে।
সত্যি, ট্যাংকের তলায় হেঁটে বেড়াচ্ছে গারনারড। পেটের নিচের দুটো পাখনাকে ব্যবহার করছে পায়ের মত। কয়েকটা শান্ত কদম ফেলেই কুইক মার্চ শুরু করে। তারপর ডাবল মার্চ, তারপর একেবারে দৌড়। দৌড়ানোর সময় সামনে লতা-টতা পড়লে একটা পাকে নিমেষে হাত বানিয়ে ঠেলে সরিয়ে দেয় লতাটা। খাবার দেখলে থমকে দাঁড়ায়। ঠোকর দিয়ে তুলে নিয়ে গল্প করে গিলে ফেলে।
কাণ্ড দেখে হেসে উঠল মুসা, পরক্ষণেই আউক! করে চেপে ধরল পেট। হাসতে গিয়ে ব্যথা লেগেছে। সামলে নিয়ে বলল, একেবারে সার্কাসের ভাড়। ঠিকই বলেছ, লিসটারের পছন্দ হবে। তবে ট্যাংকের মুখ ভোলা রাখলে কাঁদতেও দেরি হবে না, উড়ে এসে যখন পেটে গুতো লাগাবে। পেটে হাত রাখল সে। আল্লায় না করুক, আমার অবস্থা না হোক ভদ্রলোকের। কিন্তু যদি হয়, আল্লাহ্, আমি যেন তখন থাকতে পারি ওখানে।
বাদুড়! বাদুড়! পরদিন সকালে কাকের বাসা থেকে চেঁচিয়ে উঠল রবিন। গ্যারেজের দরজার সমান একেকটা!
।রবিন মিথ্যে বলে না, তবু বিশ্বাস করতে পারল না মুসা। বাদুড় পানিতে সাঁতার কাটে না। আর গ্যারেজের দরজার সমান বড়ও হয় না। কিন্তু রেলিঙের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখে বিশ্বাস করতে বাধ্য হল। বিশাল কালো ডানা নেড়ে শূন্যে লাফিয়ে উঠছে প্রাণীটা, আবার ঝুপ করে পড়ছে পানিতে।
ঘোষকের পদটা দেয়া হয়েছে রবিনকে। দিনের বেশির ভাগ সময়ই কাকের বাসায় বসে থাকে, চোখ রাখে সাগরের দিকে। আকর্ষণীয় কোন প্রাণী দেখলেই চিৎকার করে জানায়। সঙ্গে সঙ্গে মুখ ঘুরিয়ে সেদিকে ছোটে জাহাজ। কাছে গিয়ে, যদি দেখা যায়, ধরার উপযোগী, তাহলে ধরার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়।
হাত তুলে যেদিকে দেখাচ্ছে রবিন, সেদিকে জাহাজের মুখ ঘোরাল কলিগ। বিনকিউলার নিয়ে ছুটে এল কিশোর। মুসা তো বিশ্বাস করতে পারেনি না দেখে, দেখেও করতে পারল না। কী ওগুলো? জিজ্ঞেস করল ক্যাপ্টেনকে।
সাগরের বাদুড়। জেলেরা বলে শয়তান মাছ।
কালো একঝাঁক দানব খেলা জুড়েছে পানিতে। দেখেই বুঝল কিশোর, এই জিনিসই চান লিসটার, তার চাহিদার তালিকায় রয়েছে এর নাম। ম্যানটা। আরেকটা নাম আছে এগুলোর, জায়ান্ট রে।
কিন্তু ধরবে কিভাবে? ট্যাংকে জায়গা হবে?
কাছে গিয়ে দেখা গেল, খেলছে না ম্যানটাগুলো। মাছ ধরে খাচ্ছে। কাছের বিশেষ একটা ম্যানটার ওপর নজর দিল ওরা। কাত হয়ে একটা সাঁতার কাটছে পানিতে,

একটা ডানা পানির ওপরে, আরেকটা নিচে। এক ডানার মাথা থেকে আরেক ডানার মাথা বিশ ফুটের কম না। মাথা থেকে লেজের ডগা আঠারো ফুট। একঝাঁক মুলেটকে তাড়া করেছে ওটা।
মুখের দুপাশে দুটো লম্বা চ্যাপটা ডানার মত, কিংবা হাতও বলা যায়। ওগুলো দিয়ে মাছ ধরে ধরে ঠেলে দিচ্ছে মুখের ভেতর।
আর কি একখান মুখ! চার ফুট চওড়া। দুটো মানুষকে এক লোকমায় ঢুকিয়ে ফেলতে পারবে মুখের ভেতর।
কিন্তু কিশোর জানে, জায়ান্ট রে মানুষখেকো নয়। মাছই পছন্দ।
মানুষ খায় না বলেই যে নিরীহ, তা নয়। ভীষণ বিপজ্জনক। শোনা যায়, শূন্যে লাফিয়ে উঠে ডানা ছড়িয়ে ঝাঁপ দিয়ে এসে পড়ে নৌকার ওপর। দুই টনী দেহটা দিয়ে চেপে, বাড়ি মেরে গুড়িয়ে দেয় নৌকা, মেরে ফেলে আরোহীদের। চাবুকের মত লেজের বাড়ি ছুরির মত কেটে বসে চামড়ায়। কোন কোন সময় শূন্যে না উঠে নিঃশব্দে নৌকার তলায় চলে আসে ম্যানটা, তারপর ভেসে উঠে নৌকা উল্টে দেয়। আরোহীরা পড়ে গেলে ওদের মাঝে দাপাদাপি করতে থাকে। এতে মারা যায় মানুষ। যাদের ভাগ্য ভাল তারা জখম হয়।
মানুষকে ভয় করে না এরা। হয়ত ভয় করার মত বুদ্ধিই নেই। কিংবা হয়ত নিজের ক্ষমতার ওপর প্রচণ্ড বিশ্বাস। কখনও কখনও নৌকার সঙ্গে সঙ্গে মাইলের পর মাইল সাঁতরে চলে যায়, সামনে আসে, পেছনে যায়, পাশে সাঁতরায়, মাঝে মাঝে লাফিয়ে চলে যায় নৌকার একপাশ থেকে আরেক পাশে, আরোহীদের মাথার ওপর দিয়ে। দাড়ের বাড়ি যেন ওদের গায়েই লাগে না, ব্যথা পায় বলে মনে হয় না।
জাহাজ থেকে একবার একজন লোক একেবারে ম্যানটার মুখের ভেতর পড়ে গিয়েছিল। মানুষের স্বাদ মোটেও পছন্দ হয়নি ওটার, থুথু করে ছিটিয়ে ফেলেছিল। দানবটার নিচের পাটির দাঁতে লেগে চামড়া ছড়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন ক্ষতি হয়নি লোকটার।
জাহাজের মুখ ঘুরিয়ে পালে হাওয়া লাগানো কমালো কলিগ। ধীরে ধীরে ভেসে এসে থামল ম্যানটার ঝাঁকের ভেতর। ঝুলে পড়েছে পাল, পতপত করছে অলস ভঙ্গিতে। দুপাশে পানিতে উঠছে নামছে বড় বড় কালো ডানা। জাহাজটার সান্নিধ্য যেন পছন্দ হয়েছে দানবগুলোর। সঙ্গ ভালবাসে ওরা। সেজন্যেই দলবেঁধে থাকে অনেক সময়। গুনে ফেলল কিশোর। মোট আটাশটা ম্যানটা।
কিশোরের বিস্ময় দেখে হাসল কলিগ। তারপর? কাছে তো এলাম, এখন কি করা?
একটাকে জ্যান্ত ধরতে চাই।

খেত খোত করে নাক টানল ক্যাপ্টেন। তা পারবে না। মেরে হয়ত ভোলা যায়, জ্যান্ত ধরতে পারবে না। হারপুন বের করতে বলব?
না। কিশোর চেঁচিয়ে আদেশ দিতে আরম্ভ করল বড়দের মত করে, মুসা, কুমালো, জলদি নিচে থেকে বড় জালটা নিয়ে এস। জামবু, ডিঙি নামাও। ক্যাপ্টেন, জাহাজ সোজা রাখুন, নড়েচড়ে না যেন।
ভুরু কুঁচকে ফেলল কলিগ। কি করতে চাও?
বড় দেখে একটাকে ধরব। জালের একমাথা জাহাজে বেঁধে, আরেক মাথা। ডিঙিতে ধরে রেখে বেড় দেব।
পাগল..., থেমে গেল ক্যাপ্টেন। তার কথা শোনার জন্যে ওখানে দাঁড়িয়ে নেই কিশোর। বিড়বিড় করল সে, ছেলেটার মাথা খারাপ!
ভারি জালের একমাথা শক্ত করে বাঁধা হল জাহাজের ক্যাপস্ট্যানের সঙ্গে। জালের বাকি অংশ ডিঙিতে ফেলে তাতে উঠে বসল কিশোর, মুসা আর কুমালো। দাঁড় বেয়ে সরে যেতে লাগল জাহাজের কাছ থেকে, ধীরে ধীরে পানিতে পড়ছে জাল।
জালটা যখন পুরোপুরি পড়ে সারল, ডিঙি তখন জাহাজ থেকে পঞ্চাশ ফুট দূরে। জালের আরেক মাথা শক্ত করে বেঁধে ফেলা হল ডিঙির ছোট একটা খুঁটির সঙ্গে, নোঙরের দড়ি বাঁধা হয় যেটাতে।
চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে জালে এসে ঠেকল বড় একটা ম্যানটা, ওটাকে নিশানা করেই ফেলা হয়েছে জাল। এরপর যা ঘটল এমনটি ঘটবে কল্পনাও করতে পারেনি কেউ।
ঘুরে এল ম্যানটা। নৌকাটাকে দেখলই না যেন। কাছে থেকে আরও বড় আরও ভয়ঙ্কর মনে হল ওটাকে। পানি থেকে উঠে রয়েছে জালের ওপরের অংশ।
কি করে যেন বুঝে গেল শয়তান মাছ, বাধা আছে সামনে। গতি কমাল না, বরং বাড়িয়ে দিল। বাড়ছে, বাড়ছে...স্পীডবোটের মত শা শা করে ছুটছে পানি কেটে। তারপর হঠাৎ লাফ দিল শূন্যে। নিখুঁতভাবে জালটাকে পেরিয়ে গেল দশ ফুট ওপর দিয়ে। মনে হল, ঝড়ে উড়ে গিয়ে পড়ল একটা গ্যারেজের দরজা। বুমম করে বিকট শব্দ হল পানিতে পড়ার, যেন নেভির পাঁচ ইঞ্চি কামান থেকে গোলাবর্ষণ করা হয়েছে।
পানিতে পড়েই আবার ছুটতে শুরু করল ম্যানটা, নতুন একটা চক্র রচনা করছে। তার উত্তেজনা সংক্রমিত হল অন্য দানবগুলোর মাঝেও, একের পর এক শূন্যে লাফিয়ে উঠতে লাগল ওগুলো, পানিতে পড়ছে প্রচণ্ড শব্দ তুলে। পড়েই, ডিগবাজি খেয়ে চিত হয়ে যাচ্ছে কোন কোনটা, রোদে ঝিক করে উঠছে সাদা পেট।

কৌতূহলী হয়ে উঠেছে নৌকাটাকে দেখে, দেখতে আসছে কাছে থেকে।
ব্যাটারা দল বেঁধে হামলা চালাবে! চেঁচিয়ে উঠল মুসা।
ক্যাপ্টেনের কথা বিশ্বাস করতে শুরু করেছে কিশোর। বন্ধ উন্মাদই কেবল ডিঙি নিয়ে আটাশটা শয়তান মাছের ঝাঁকে নামার কথা ভাববে। কিংবা বোকা লোকে, জায়ান্ট রে সম্পর্কে যার কোন জ্ঞান নেই।
আরেকটা ম্যানটা এগোচ্ছে জালের দিকে। কাছাকাছি গিয়ে লাফিয়ে না পেরিয়ে শাঁ করে মোড় নিয়ে সোজা ছুটে আসতে লাগল নৌকার দিকে। হঠাৎ বুঝি চোখে পড়ল সামনের ডিঙিটাকে। লাফ দিল শূন্যে।
আরোহীদের চোখের সামনে থেকে সূর্য আড়াল করে দিল যেন একটুকরো কালো মেঘ। মাথা নিচু করে ফেলেছে কিশোর। ভাবছে, এখুনি বিশাল বপু নিয়ে ঘাড়ের ওপর এসে পড়বে দানবটা। মুসাও মাথা নুইয়ে ফেলেছে। শুধু কুমালো পাটাতনের ওপরে বসে আছে হাসিমুখে, শান্ত। কারণটা বোঝা গেল। ডিঙিতে পড়ল না ম্যানটা। উড়ে গিয়ে পড়ল আরেকপাশে পানিতে। চাবুকের মত লেজটা বাড়ি লাগল নৌকার পাশে, গভীর একটা ক্ষত করে দিল।
কাছে এসে গভীর আগ্রহে নৌকাটাকে দেখছে আরেকটা শয়তান মাছ। আস্তে ডানা তুলে ছুঁয়ে দেখল, তাতেই থরথর করে কেঁপে উঠল ডিঙি। জোরে বাড়ি দিলে কি হত কে জানে! হঠাৎ ছুটতে শুরু করল, ঘুরে এগিয়ে যাচ্ছে জালের দিকে।
পেয়েছি ব্যাটাকে! চিৎকার করে বলল কিশোর।
যদি নতুন কোন কাণ্ড না করে, মাথা তুলল মুসা।
আমার মনে হয় শুধু এগোতেই পারে ওরা, পিছাতে পারে না।
পিছানোর কোন লক্ষণও দেখাল না ম্যানটা। তবে জালের কাছে গিয়ে মসৃণ ভঙ্গিতে তুলে ফেলল একটা ডানা, তারপর আরেকটা, নিখুঁত ভাবে জাল এড়াল। কিন্তু লেজটা বাঁধল বিপত্তি। জালের খোপে ঢুকে গেল। লেজের ডগায় বসানো কাঁটাগুলো আটকে গেল বড়শির মত।
বাও! চেঁচিয়ে উঠল কিশোর।
ঝপাত করে পানিতে পড়ল দুই জোড়া দাঁড়। প্রাণপণে বেয়ে চলল মুসা আর কুমালো, জাহাজের দিকে ছুটল ডিঙি নিয়ে। দানবটার ওপর দ্রুত চেপে আসতে লাগল জাল।
কিন্তু এত সহজে ধরা দেয়ার পাত্র নয় শয়তান মাছ। দাপাদাপি শুরু করল। সে তো আর চুনোপুঁটি নয়, পানির মহারাজ। তার দাপাদাপিতে ফুলেফেঁপে উঠল পানি, প্রচণ্ড ঘূর্ণি, অসংখ্য ফোয়ারা, ভিজিয়ে চুপচুপে করে দিল ডিঙির তিন

আরোহীকে। দেখতে দেখতে পানিতে ভরে গেল ডিঙির খোল ডুবে যাওয়ার হুমকি দিচ্ছে এখন খুদে নৌকা।
ভাগ্য ভাল, বুদ্ধি করে নৌকার সঙ্গে জাল বাধা হয়েছিল। ধরে রাখলে সর্বনাশ হত। হ্যাঁচকা টান লেগে একবার এদিকে ঘুরছে ডিঙি, আবার ওদিকে। কয়েকবার কাত হয়েও সোজা হয়ে গেল। আর সামান্য কাত হলেই যেত উল্টে।
অবশেষে জাহাজের কাছাকাছি চলে এল নৌকা। রেলিঙে ঝুঁকে দাঁড়িয়েছে ক্যাপ্টেন, চোখ বড় বড়, কোটর থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসবে বুঝি। জালের দড়িটা দাও আমার হাতে! চেঁচিয়ে বলল সে। কুইক!।
ডিঙির সঙ্গে বাঁধা দড়িটা খুলে ছুঁড়ে দিল কিশোর। খপ করে ধরল ক্যাপ্টেন। তাড়াতাড়ি নিয়ে গিয়ে পেঁচিয়ে ফেলল ক্যাপস্ট্যানে।
জালের দুই মাথা-ই এখন শক্ত করে বাঁধা হয়েছে ক্যাপস্ট্যানের সঙ্গে। আটকা পড়েছে দানবটা, পালানোর পথ বন্ধ।
কারগো বুমটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সরিয়ে আনছে জামবু। প্রধান মাস্তুলের সঙ্গে লাগানো রয়েছে ওটা, এক মাথায় একটা বড় আঁকশি লাগানো। আঁকশিটা জালে আটকে দিল কিশোর।
চাল হয়ে গেল ইঞ্জিন। আঁকশিটা ওপরে উঠতে লাগল, সেই সাথে টেনে তুলতে লাগল জাল।
হাততালি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল কাকের বাসায় বসা রবিন। তার সঙ্গে গলা মেলাল বোটের আরোহীরা। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি খুশি হওয়া উচিত হয়নি ওদের। জালের মধ্যে ভীষণ দাপাদাপি শুরু করেছে ম্যানটা, এখন আর খেলাচ্ছলে নয়, মুক্তির জন্যে। ডানা ঝাড়ছে, লেজ দিয়ে বাড়ি মারার চেষ্টা করছে। শপাং করে এসে বোটে লাগল লেজের বাড়ি। নৌকার যেখানে লাগল, গুড়িয়ে গেল ডিমের খোসার মত।
কখন পানিতে পড়ল, বুঝতেও পারল না মুসা। মাথা তুলে চেয়ে দেখল, তার পাশেই হাবুডুবু খাচ্ছে কিশোর। দ্রুত ওকে টেনে নিয়ে সাঁতরে ম্যাটার কাছ থেকে সরে এল সে। ওপর থেকে দড়ি ছুঁড়ে দিল কলিগ। সেটা ধরে বেয়ে ডেকে উঠে এল দুজনে।
এতক্ষণে কুমালোকে দেখতে পেল ওরা। শয়তান মাছের লেজের বাড়ি খেয়ে বোধহয় বেহুঁশই হয়ে গেছে বেচারা। ভাসছে। রক্ত বেরোচ্ছে ক্ষত থেকে। ইতিমধ্যেই রক্তের গন্ধ পেয়ে গেছে হাঙরেরা, দূরে ভেসে উঠেছে ওদের পিঠের পাখনা। পানি কেটে ছুটে আসছে তীব্র গতিতে।
একটানে কোমরের খাপ থেকে বড় ছুরি বের করল মুসা।
বাধা দিল ক্যাপ্টেন, যেও না! বাঁচাতে পারবে না।

দূর, মরুক না ডুবে, ঘৃণায় মুখ বাঁকাল জামবু। একটা কানাকার জন্যে মরবে নাকি গিয়ে?
দ্বিধা যাও বা সামান্য ছিল মুসার, জামবুর কথায় একেবারে দূর হয়ে গেল। রাগে জ্বলে উঠল সে। ডাইভ দিয়ে পড়ল রক্তাক্ত সাগরে। দড়িটা নিতে ভুলল না। ওটার মাথা কুমালোর বুকে পেঁচিয়ে বাঁধল।
হাজির হয়ে গেল একটা হাঙর। হাত লম্বা করে ছুরিটা সোজা করে ধরে রাখল মুসা। পাশ দিয়ে ছুটে যাওয়ার সময় লাগল হাঙরের শরীরে। ওটার ঘাড়ের নিচ থেকে লেজের কাছাকাছি লম্বা হয়ে ফেড়ে গেল গভীরভাবে। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল। খাবি খেতে খেতে দৌড় দিল একদিকে, যন্ত্রণায় শরীর মোচড়াচ্ছে। মানুষের দিক থেকে নজর সরে গেল অন্যান্য হাঙরগুলোর। ছুটে গেল জাতভায়ের মাংস ছিঁড়ে খাওয়ার জন্যে।
দড়ি ধরে টেনে তুলে নেয়া হল কুমালোকে। পানিতে অপেক্ষা করছে মুসা, আবার দড়িটা এলে তারপর উঠবে। চোখ হাঙরগুলোর দিকে। কয়েক গজ দূরে আহত হাঙরের গা থেকে মাংস খুলে নিচ্ছে অন্যগুলো। দেখতে দেখতে শেষ করে ফেলবে।
মুসার মনে হল, কয়েক যুগ পরে তার পাশে এসে পড়ল দড়িটা। সঙ্গে সঙ্গে ধরল। টেনে তুলে নেয়া হল ওকেও।
একবার মাত্র চোখ খুলল কুমালো, মুসাকে ধন্যবাদ জানানোর জন্যে, তারপরই মুদে ফেলল। পড়ে রইল মড়ার মত। কাকের বাসা থেকে নেমে এসেছে রবিন। সে আর কিশোর মিলে কুমালোর জখম ধুয়ে মুছে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিতে লাগল।
গেল একটা চমৎকার ডিঙি, পানির দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ক্যাপ্টেন। জালের মধ্যে এখনও দাপাচ্ছে ম্যানটা। পানিতে আলোড়ন তুলেছে। তাতে ডুবছে ভাসছে নৌকার ভাঙা কাঠগুলো। নৌকা ভাঙার সমস্ত ঝাল গিয়ে ওটার ওপর পড়ল কলিগের। চেঁচিয়ে বলল, তোলো ব্যাটাকে! যেন তুললেই বেত দিয়ে পেটানো শুরু করবে।
উঠে যাচ্ছে জাল। ওপরে, আরও ওপরে। কামড়ে কয়েক জায়গায় জাল কেটে ফেলেছে শয়তান মাছ। এছাড়া আর কোন ক্ষতি করতে পারেনি সাংঘাতিক শক্ত জালটার। দানব ধরার জন্যেই যেন তৈরি হয়েছে ওটা। জালটাকে নামিয়ে আনা হল ট্যাংকের মুখের কাছে।
ট্যাংকের দিকে তাকিয়ে মনে মনে আন্দাজ করে ফেলল কিশোর। নাহ, অসুবিধে কিছুটা হলেও জায়গা হয়ে যাবে ম্যানটার। সত্যিই হয়ে গেল। কিন্তু নতুন বাড়ি মোটেও পছন্দ হল না শয়তান মাছের। আবার শুরু করল দাপাদাপি। ছিটিয়ে সমস্ত পানি ফেলে দিতে লাগল বাইরে। চালু করে দেয়া হল পাম্প, পালি, ভরতে

লাগল ট্যাংকে। বড় ঢাকনাটা লাগিয়ে দেয়া হল, যাতে লাফিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতে না পারে অতিকায় প্রাণীটা।
ট্যাংকের দেয়ালে মোটা কাচে ঢাকা জানালা রয়েছে। সবাই হুড়াহুড়ি করে এসে চোখ রাখল তাতে, ভেতরে শয়তান মাছ কি করে দেখার জন্যে।
শান্ত হয়ে গেছে জায়ান্ট রে। ট্যাংকের তলায় বিছিয়ে রয়েছে মস্ত এক কালো চাঁদরের মত। জালটা এখনও জড়ানোই রয়েছে শরীরে।
খুলবে কি করে ওটা? রবিন জিজ্ঞেস করল।
দানবটার সঙ্গে আরেকবার ধস্তাধস্তি করার কোন ইচ্ছেই নেই কিশোরের। বলল, থাক, জালের মধ্যেই। বের করতে সুবিধে হবে। আশা করি দিন দুয়েকের মধ্যেই হনুলুলু পৌঁছবে। তখন কোন একটা মালবাহী স্টীমারে তুলে দেব, লস অ্যাঞ্জেলেসে পৌঁছে দেবে। ট্যাংকটা দরকার আমাদের। আরেকজনের জন্যে খালি করতে হবে।
কার জন্যে? অক্টোপাস?
হয়ত। মুসা, জনাব শয়তানের বাবুর্চি নিযুক্ত করা হল তোমাকে। জন্তুজানোয়ারকে খাওয়ানোর ব্যাপারটা তুমিই ভাল বোঝ। যত পার মাছ খাওয়াবে।
ডিঙি তো নেই, মাছ ধরব কিভাবে? বলেই উজ্জ্বল হয়ে উঠল মুসার চোখের তারা। আছে, উপায় আছে!
কিভাবে? রবিন জানতে চাইল। রাতেই দেখবে।
রাতে, ডেকে বসে পালের ওপর টর্চের আলো ফেলে রাখল মুসা। আলো দেখে পাগল হয়ে গেল যেন উড়ুক্কু মাছের দল। একের পর এক এসে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল মাস্তুলে, পালে। বাড়ি খেয়ে অবশ হয়ে পড়ল কোনটা, কোনটা পাল থেকে গড়িয়ে পড়ল ডেকে। জমাতে শুরু করল মুসা আর কুমালো। মজা পেয়ে রবিন আর কিশোরও হাত লাগাল। দেখতে দেখতে মাছের ছোটখাট একটা স্তূপ দিয়ে ফেলল।
নিশ্চিন্ত হল তিন গোয়েন্দা। খাবারের অভাব হবে না জনাব শয়তানের।
স্বর্গ যে বলে, ভুল বলে না! হাঁ করে তাকিয়ে আছে কিশোর। সৌন্দর্য যেন গিলছে। স্বপ্নিল হয়ে উঠেছে সুন্দর চোখের তারা। ডায়মণ্ড হেড ঘুরে এসেছে। শুকতারা, ওয়াইকিকির ধবধবে সাদা সৈকতের পাশ কাটাচ্ছে। সবুজ নারকেল গুচ্ছ মাথা দোলাচ্ছে বাতাসে। ফুলে ফুলে ছেয়ে আছে জানা-অজানা অসংখ্য গাছ। ঘন। নীল সাগরের পানিতে সার্ফিং করছে সাফাররা। সাবোর্ডে টান টান হয়ে আছে। ওদের বাদামি শরীর। বিশালদেহী একেকজন।
হনুলুলু বন্দরে নোঙর ফেলল শুকতারা।

স্বপ্নের জগতে চলে এসেছে যেন ছেলেরা। পৃথিবীতে এত সুন্দর জায়গা থাকতে পারে, ভাবেইনি। কিন্তু বেশিক্ষণ থাকতে পারল না ওই স্বর্গে। বড় দেখে ট্যাংক কিনল, তাতে ম্যানটাটাকে ভরে তুলে দিল লস অ্যাঞ্জেলেসগামী একটা স্টীমারে।
হাওয়াইকে যে এত ভাল বলছে ছেলেরা, এটা পছন্দ হল না কুমালোর। কথায় কথায় জানিয়ে দিল, তার বাড়ি যে দ্বীপে, সেটা আরও অনেক ভাল। ছেলেরা যখন বিশ্বাস করতে চাইল না, বিশেষ করে মুসা, রেগে গেল সে। বলল, দাঁড়াও না, গিয়ে নাও আগে। ওখানকার প্রবাল অ্যাটল দেখলে চোখ ফেরাতে পারবে না। ওরকম কোথায় পাবে তোমাদের এই হাওয়াই? চওড়া বাদামি কাঁধ ঝাঁকিয়ে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে হাওয়াইকে বুড়ো আঙুল দেখল দক্ষিণ দ্বীপবাসী।
।নতুন আরেকটা ডিঙি কিনে তোলা হল স্কুনারে। তারপর আবার রওনা হল শুকতারা।
মারশাল দ্বীপপুঞ্জের ছোট-বড় অসংখ্য দ্বীপের কাছাকাছি এসে তাজ্জব হয়ে গেল ছেলেরা। জলজ জীবের ছড়াছড়ি এখানকার পানিতে। তাকালেই চোখে পড়ে। জাহাজের পেছন পেছন দল বেঁধে আসছে ডলফিন। শাঁ করে জাহাজের পাশ কাটিয়ে ছুটে যাচ্ছে। ফিরে আসছে আবার। লং জাম্প দিচ্ছে, হাই জাম্প দিচ্ছে, যেন একেকটা ভড়।
মস্ত এক স্পার্ম তিমি পুরো একটা দিন সঙ্গী হয়ে রইল শুকতারার।
আরেক দিন এল একটা হোয়েল শার্ক বা তিমি-হাঙর, জাতে ওটা হাঙরই, কিন্তু তিমির মত বড়। কুৎসিত চেহারা হলেও জীবটা নিরীহ, সমগোত্রের অন্যান্য প্রজাতির মত রক্তপিশাচ নয়। খেলার ছলে মাঝে মাঝেই এসে ধাক্কা মারল জাহাজের গায়ে।
রবিন জানে, জীবটা নিরীহ। ক্যাপ্টেন কলিগও বার বার বলেছে একথা। কিন্তু চেহারা এমনই বাজে তিমি-হাঙরের, ভুলতে পারেনি সে। রাতে দুঃস্বপ্ন দেখেছে। আতঙ্কে চেঁচাতে শুরু করল ঘুমের মধ্যে। জেগে উঠে দেখল ঘামে ভিজে গেছে সারা শরীর। বদ্ধ কেবিনে দম বন্ধ হয়ে এল তার। খোলা বাতাসে নিঃশ্বাস নেয়ার জন্যে উঠে এল ডেকে।
রেলিঙে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রাতের সাগর দেখছে মুসা। ফিরে তাকাল। কি হল, ঘুম আসছে না?
এসেছিল, হেসে বলল রবিন। তিমি-হাঙরে গিলতে এল, তাই জেগে উঠে পালিয়ে এসেছি।
চকচক করছে রাতের সাগর, যেন একটা রূপালি চাদর। এর কারণ কোটি কোটি প্ল্যাঙ্কটনের সমষ্টি, ওগুলোর শরীর থেকে বিচ্ছুরিত হয় একধরনের উজ্জ্বল আভা।...

জাহাজের পেছনে জাল বাধাই রয়েছে। তাতে ধরা পড়ছে নানারকম বিচিত্র প্রাণী। বদমেজাজী একটা কংগার ইল ধরা পড়ল অবশেষে। তারপর একটা তলোয়ার মাছ।
মাছটাকে নিয়ে সমস্যা হল। ওপরের ঠোঁটে লাগানো মারাত্মক তলোয়ারের জন্যেই মাছটার এই নামকরণএই অস্ত্র দিয়ে ইচ্ছে করলে এক খোঁচায় নৌকার তলা এফোঁড় ওফোড় করে দিতে পারে প্রাণীটা।
ধরার পর যথারীতি নিয়ে ট্যাংকে রাখা হল তলোয়ারকে। কিন্তু এক ঘন্টা যেতে না যেতেই জেল থেকে ছাড়া পাবার প্রয়াসে ট্যাংকের দেয়াল ফুটো করে দিল ওটা। সব পানি পড়ে যেতে লাগল। পানি শেষ হয়ে যাওয়ার পর চোখে পড়ল ব্যাপারটা। শুকনো ট্যাংকের তলায় পড়ে খাবি খাচ্ছে তখন বন্দি। তাড়াতাড়ি পাম্প ছেড়ে আবার পানি ভরে বাঁচানো হল তাকে। ফুটোটাও বন্ধ করা হল অনেক। চেষ্টা করে। কিন্তু আবার ঘটতে পারে ওরকম ঘটনা। কি করা যায়?
বুদ্ধিটা বাতলাল রবিন। বক্সিং গ্লাভস পরিয়ে দিলে কেমন হয়?
ইদানীং বক্সিং প্র্যাকটিস করছে মুসা। কয়েক জোড়া গ্লাভস কিনেছে। একজোড়া অন্তত সঙ্গে নিয়ে যায় যেখানেই যায়।
কেবিনে গিয়ে গ্লাভস বের করে আনল মুসা। রবিন আনল একটা থিমবল।
মুচকি হেসে ঠাট্টার সুরে বলল জামবু, এসব দিয়ে ওই তলোয়ার ঠেকাবে নাকি?
জবাব দিল না কেউ।
থিমবলটা বেশ বড়, নাবিকরা ব্যবহার করে এই জিনিস। দরজিরাও আঙুলে পরে, তবে ওগুলো ছোট। তলোয়ার মাছের তলোয়ারটা শক্ত করে চেপে ধরতে বলল রবিন। মুসা ধরলে, থিমবলটা তলোয়ারের মাথায় পরিয়ে দিল সে। গ্লাভস পরাল তার ওপর। তলোয়ারের মাথায় ছুরি দিয়ে ছোট একটা খাজ কেটে গ্লাভসের ফিতে শক্ত করে গিঁট দিয়ে বাঁধল। ব্যস, আর ছুটবে না গ্লাভস।
কয়েকবার ঝাড়া দিয়ে অস্বস্তিকর এই জিনিস খুলে ফেলার চেষ্টা করল। তলোয়ার। ব্যর্থ হয়ে শেষে খোঁচা মারতে শুরু করল ট্যাংকের দেয়ালে। লাভ হল না।
এতে আরও রেগে গেল তলোয়ার। চারশো পাউণ্ড শরীরটা নিয়ে বার বার গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল ট্যাংকের দেয়ালে। আঘাতের পর আঘাত হানল তলোয়ার দিয়ে। কিন্তু আগায় গ্লাভস আর থিমবল নিয়ে অস্ত্র এখন বাতিল। দূর, মরুকগে, বলেই যেন সরে এল তলোয়ার। নতুন মাছ ছাড়া হয়েছে ট্যাংকে। মহানন্দে সদ্ব্যবহার শুরু করল সেগুলোর।
ডাঙা! ডাঙা! কাকের বাসা থেকে চেঁচিয়ে বলল কুমালো।
কপালে হাত রেখে ভালমত তাকাল কলিগ। হ্যাঁ, ডাঙাই মনে হচ্ছে।

তাকিয়ে তাকিয়ে চোখ ব্যথা করে ফেলল তিন গোয়েন্দা, কিন্তু ডাঙা চোখে পড়ল না ওদের। দেখল অদ্ভুত এক দৃশ্য। একেবারে দিগন্তরেখার কাছে সবুজ, উজ্জ্বল একটুকরো মেঘ। না, মেঘ বলা বোধহয় ঠিক না, বরং বলা উচিত উজ্জ্বল একধরনের সবুজ আভা।

সূর্যোদয় কিংবা সূর্যাস্তের কালে অনেক সময় সবুজ আভা চোখে পড়ে সাগরের আকাশে, কিন্তু এই মাঝ সকালে ওই সবুজ রঙ কিসের?

যেন জ্বলছে রঙটা। একবার মনে হচ্ছে সবুজ আগুনের শিখা, একবার সবুজ মেঘ, তারপর আবার সবুজ পানির ঢেউ। গায়েব হয়ে যাচ্ছে, ফিরে আসছে আবার আগের চেয়ে উজ্জ্বল হয়ে।

ব্যাপারটা কি! তাজ্জব হয়ে দেখছে কিশোর। বুঝতে পারছে না।

কাকের বাসা থেকে নেমে এসেছে কুমালো। কিশোরের বিস্ময় দেখে হাসল। ওটা বিকিনি অ্যাটল। দেখা যাচ্ছে না এখনও, আকাশের ওই সবুজ রঙ দেখে বুঝেছি। জ্বলছে কেন? আলোর কারসাজি। ধবধবে সাদা বালিতে ঢাকা ওখানকার ল্যাগুনের তলা। রঙিন প্রবাল আছে অনেক। পানির গভীরতাও মাঝে মাঝে খুব কম। সব কিছু মিলিয়ে ওখানকার পানির রঙ হয়ে গেছে হালকা সবুজ, ওটারই ছাপ পড়েছে আকাশে। মরীচিকাও বলতে পার। দ্বীপটা দেখার আগে অন্তত ছসাত ঘন্টা ধরে দেখা যাবে ওই মরীচিকা।

শেষ বিকেলে দিগন্তে উদয় হল বিকিনি। নারকেল বীথির মাথা দেখা যাচ্ছে শুধু, নিচটা এখনও অদৃশ্য। এগিয়ে চলেছে জাহাজ। রেলিঙে দাঁড়িয়ে অ্যাটলের সৌন্দর্য দুচোখ দিয়ে পান করছে যেন তিন গোয়েন্দা। এই প্রথম দেখছে প্রবাল অ্যাটল।

দূর থেকে মনে হয়, মুক্তার একটা হার যেন অযত্নে ফেলে রাখা হয়েছে নীল চাঁদরের বিছানায়। ওটা আর কিছু না, ল্যাগুনকে ঘিরে রাখা বিশাল প্রবাল প্রাচীর। সগর্জনে দেয়ালে আছড়ে পড়ে সাদা ফেনা সৃষ্টি করেছে ঢেউ, কিন্তু দেয়ালের ভেতরে ঢোকার অধিকার আদায় করতে পারছে না কিছুতেই। ভেতরের পানি শান্ত, স্থির, আকাশের রঙের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ক্ষণে ক্ষণে রঙ বদলাচ্ছে। সাগরের মধ্যিখানে যেন দেয়ালে ঘেরা এক মস্ত হ্রদ। কলিগ জানাল ল্যাগুনটা বিরাট, বিশ মাইল চওড়া।

এতবড় প্রাচীরটার স্রষ্টা প্রবাল নামের এক অতি ক্ষুদ্র কীট। বীজ, ফল, উদ্ভিদের চারা ভেসে ভেসে গিয়ে ঠেকেছে ওই প্রাচীরে, আটকে গেছে পচা প্রবাল আর বালিতে। ফলে যেখানে সেখানে গজিয়ে উঠেছে মোহনীয় সবুজ দ্বীপ। সাদা প্রবাল পাথরের মাঝে ফুটে উঠেছে সবুজ।

এসব দ্বীপের কোনটা খুবই ছোট, বড় জোর ওদের স্কুনারটার সমান। কোন কোনটা আবার বেশ বড়, মাইলখানেক লম্বা। তবে চওড়ায় অনেক কম। সব চেয়ে বড়টাও মাত্র কয়েকশো গজ।

তিনটে জায়গায় ফাঁক আছে দেয়ালে। ওগুলো দিয়ে জাহাজ ঢোকানো সম্ভব। দক্ষিণ-পুবের পথটার দিকে এগিয়ে গেল শুকতারা। ভালই চলছিল, হঠাৎ পড়ে গেল বাতাস। ঘুরে গেল জাহাজের নাক। পাশ থেকে ভয়ঙ্কর আঘাত হানতে শুরু করল ঢেউ। ভীমগর্জনে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে গায়ে। দেয়ালের ফাঁক দিয়ে তীব্র গতিতে ঢুকছে জোয়ারের পানি। পরস্পর বিরোধী স্রোতের মাঝে পড়ে প্রায় নাকানিচোবানি খেতে শুরু করল জাহাজটা।

অভিজ্ঞ নাবিক ক্যাপ্টেন কলিগ। দক্ষ হাতে জাহাজের হুইল ধরে ফাঁক দিয়ে ঢুকিয়ে দিল শুকতারাকে। পরিশ্রম করতে হল অনেক, কিন্তু নিরাপদেই অবশেষে জাহাজটাকে নিয়ে এল ল্যাগুনের ভেতরে। শান্ত নিথর পানিকে মনে হচ্ছে এক বিশাল সবুজ আয়না। নারকেল গাছে ছাওয়া ছোট্ট একটা দ্বীপের সাদা সৈকত থেকে একরশি দূরে নোঙর ফেলা হল।

গভীর মনোযোগে ক্যাপ্টেনের চার্ট দেখছে কিশোর। ম্যাপে দেখা যাচ্ছে, এই প্রবাল প্রাচীরে দ্বীপ মোট বিশটা। সব চেয়ে কাছেরটার নাম এনিও। তারপরে রয়েছে বিকিনি, অ্যাওমোয়েন, ন্যামু, রুকোজি, এনিরিকু। আরেকটা আছে, নাম উচ্চারণ করতে গেলে চোয়াল ভাঙার অবস্থা—ভোকোরোরাইওরো।

উত্তর-পূর্ব কোণে একটা ক্রসচিহ্ন। ম্যাপে দেখানো ল্যাগুনের ওই জায়গায় আঙুল রেখে কিশোর জিজ্ঞেস করল, এখানে কি?

আণবিক বোমার পরীক্ষা হত ওখানে, জবাব দিল ক্যাপ্টেন। রেডিও অ্যাকটিভিটির ভয় নেই?

নাহ, এখন আর নেই। শেষ পরীক্ষা হয়েছে ঊনিশশো ছেচল্লিশ সালে। তেজস্ক্রিয়তায় ছেয়ে গিয়েছিল তখন সবকিছু, মাটিতে, নারকেলে, এমনকি মাছেও। অনেক পরে বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে ঘোষণা দিয়েছেন, তেজস্ক্রিয়তা কমে গেছে। এখন আর মানুষের জন্যে তেমন ভয় নেই, যদি বেশিদিন না থাকে এখানে।

স্থানীয় অধিবাসীদের কি হল? পরীক্ষার আগে নিশ্চয় ছিল ওরা?

ছিল, একশো পঁষট্টি জন। তাদের রাজার নাম জুডা। রংগারিক আইল্যাণ্ডে সরিয়ে দেয়া হয়েছিল ওদের, এখান থেকে একশো তিরিশ মাইল পুবে।

কাজটা উচিত করেনি। বাপদাদার জায়গা থেকে তাদেরকে সরিয়ে দিয়ে। নতুন জায়গায় গিয়ে মানিয়ে নিতে নিশ্চয় খুব কষ্ট হয়েছে।

খুর। মানাতে পারেনি শেষ পর্যন্ত। রংগারিকে মাছ নেই, ফলের গাছও খুব কম। শেষে বাধ্য হয়ে আমেরিকান নেভির কাছে আবেদন করেছে রাজা, তাদের খাবার ব্যবস্থা করার জন্যে। তাই ওখান থেকেও সরাতে হয়েছে ওদেরকে, উজিলং আইল্যাণ্ডে।

এখন তাহলে ওখানেই আছে?

আছে। তবে সুখী নয়। তাদের শত শত বছরের পুরানো জীবনধারা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। উজিলাংও এখানকার তুলনায় ভাল না। খাবারের জন্যে তাদের নির্ভর করতে হয় আমেরিকান নেভির ওপর। ফলে জীবনের ওপরই ঘেন্না ধরে গেছে ওদের।

দুঃখজনক। বিশ্বযুদ্ধের সময় অনেকেই অনেক শয়তানী করেছে। এখনও কি কোন পরীক্ষা চলছে নাকি এখানে?

বলা কঠিন। তবে এখন বেশি পরীক্ষা চলছে এনিউইটক অ্যাটলে, এখান থেকে দুশো মাইল পশ্চিমে। ওটার পাশ দিয়েই যাব আমরা।

ওখানকার আদিবাসীদেরও নিশ্চয় দেয়া হয়েছে?

হয়েছে। একশো সাতচল্লিশ জন। নীল চোখের চারপাশে রোদে পোড়া চামড়া হাসিতে বঁচকে গেল ক্যাপ্টেনের। আরি, কেঁদে ফেলবে নাকি! সাধারণ কয়েকটা কানাকা। সব সময়ই শাসন করা হয়েছে ওদের, ভবিষ্যতেও করা হবে।

ভারতবর্ষ আর আফ্রিকায় ইংরেজ শাসনের ইতিহাস মনে পড়ল কিশোরের। কঠিন একটা কথা চলে এসেছিল মুখে, অনেক কষ্টে সামলাল।

ডিঙি নামিয়ে তীরে উঠল সবাই। অনেক দিন পর পায়ের তলায় মাটি বেশ ভাল লাগল। দ্বীপ না বলে ওটাকে চমৎকার একটা বাগান বলা উচিত। তেজস্ক্রিয়ায় কোন এক সময়ে গাছপালার ক্ষতি হয়ে থাকলেও এখন তার চিহ্ন নেই। মানুষের ভয়াবহ আঘাত সামলে নিয়েছে প্রকৃতি।

পুরো দ্বীপটা ঘুরে আসতে মাত্র আধঘন্টা সময় লাগল। রাতে খাবার খেল অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসে। কিশোর লক্ষ্য করল, বারবার সৈকতে চলে যাচ্ছে কুমালো, কি জানি, বোধহয় ল্যাগুনে রাতের স্তব্ধ আকাশ ভাল লাগছে। গত কয়দিনে লোকটার প্রতি একটা মায়া জন্মে গেছে তার। শান্ত, হাসিখুশি। সাহস, ধৈর্য, সবই আছে লোকটার। স্কুনার চালানো দেখেই বোঝা যায় জাত নাবিক। পছন্দের জায়গায় এসে কেমন লাগছে এখন তার?– খুব জানতে ইচ্ছে হল কিশোরের।

আগুনের ধার থেকে উঠে সৈকতে রওনা হল সে। একটা নারকেল গাছে হেলান দিয়ে ল্যাগুনের দিকে তাকিয়ে আছে কুমালো। পাশে এসে দাঁড়াল কিশোর, কিন্তু নীরবতা ভাঙতে ইচ্ছে হল না। চুপ করে রইল।

ল্যাগুনটা এখন কালো। দিনে ছিল সবুজ, এখনকালো আয়নার মত। তাতে আকাশের প্রতিবিম্ব। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে নীলচে-সাদা অভিজিৎ নক্ষত্র, হলদে স্বাতীনক্ষত্র, আগুন-লাল অ্যানটারিস। কয়েক ঘন্টার মধ্যেই উঠবে সাদার্ন ক্রস, রকিবীচের চেয়ে অনেক বেশি স্পষ্ট দেখা যাবে এখানে, কারণ বিষুবরেখার কয়েক ডিগ্রি উত্তরে রয়েছে এই বিকিনি।

প্রবাল প্রাচীরে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের চাপা গর্জন ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। ল্যাগুনের ওপাশে অন্যান্য দ্বীপগুলো সব অন্ধকার।

আমার বাবা একবার এসেছিল এখানে, বহুদিন আগে, কথা বলল কুমালো। শুনেছি, তখন মানুষ থাকত এখানে। দ্বীপে আনন্দ ছিল। এখন নেই।

নিশ্চয় অ্যাটম বোম...

হ্যাঁ...

পাশাপাশি বসল ওরা। এই সময় মুসা আর রবিনও এসে বসল ওখানে।

কুমালো, কিশোর বলল। এত ভাল ইংরেজি কোথায় শিখলে তুমি? এদিকের লোকে তো ভাল ইংরেজি জানে না শুনেছি।

হাসল কুমালো। তারার আবছা আলোতেও চকচক করে উঠল তার সাদা দাঁত। আমার ইংরেজি তোমার পছন্দ হয়েছে? খুশি হলাম। এক আমেরিকান মিশনারি মহিলার কাছে লেখাপড়া শিখেছি। খুব ভাল মানুষ ছিলেন তিনি। যত্ন করে কত কিছু শিখিয়েছেন আমার দেশের লোককে। ভাল বিদেশী খুব কমই যায় ওখানে।

কুমালো কি বলতে চায়, বুঝল কিশোর। ইউরোপিয়ান আর আমেরিকানরা আগে দক্ষিণ সাগরের দ্বীপগুলোতে আসত নারকেলের ছোবড়া আর মুক্তার লোভে, করুণা খুব কমই মিলত তাদের কাছে। স্থানীয় অধিবাসীদের মাঝে ওরা ছড়িয়েছে মারাত্মক রোগ, শিখিয়েছে কড়া মদে নেশা করা, খুন করেছে পাইকারি হারে, নির্মমভাবে, কারণ ওদের হাতে ছিল আগ্নেয়াস্ত্র।

গত কয়েক দিনে একটা ব্যাপারে শিওর হয়ে গেছে সে, ক্যাপ্টেন আর জামবু দেখতে পারে না কুমালোকে। তারমানে ওদের দলে নেই লোকটা। তথ্য বের করার জন্যে বলল, কুমালো, তোমার দেশের কথা বল।

শুনবে! অবাক মনে হল দ্বীপের বাসিন্দা মানুষটাকে। আমাদের কথা শুনবে তুমি? বল, রবিন বলল।

অনেক কথাই বলল কুমালো। ওদের সমাজের অনেক কিছু জানল ছেলেরা। বন্ধুত্ব পাতানোর অদ্ভুত একটা রীতি রয়েছে ওখানকার দ্বীপগুলোতে। বন্ধুকে বন্ধু বলে না ওরা, বলে রক্তে-পাতানো-ভাই। এক বন্ধুর জন্যে আরেক বন্ধু নির্দ্বিধায় জীবন দিয়ে দিতে প্রস্তুত।

শুনতে শুনতে হঠাৎ বলে উঠল মুসা, কুমালো, আমার সঙ্গে নাম বিনিময় করবে তুমি?
আবেগে গলা রুদ্ধ হয়ে এল কুমালোর। তারার আলোয় দেখা গেল তার বাদামি গালে চিকচিক করছে পানির ধারা, দুগাল বেয়ে নেমেছে অশ্রু। আচমকা বিশাল দুই থাবার মধ্যে চেপে ধরল মুসার একটা হাত। নিশ্চয় করব, মুসা! আমার হৃদয়ে আমি এখন মুসা, তোমার হৃদয়ে তুমি কুমালো। তুমি আমার রক্তেপাতানো-ভাই। একজনের জন্যে আরেকজন দরকার হলে জীবন দিয়ে দেব আমরা। ইতিমধ্যেই সেটা তুমি করতে চেয়েছে নিজের জীবনের পরোয়া না করে হাঙরের মুখ থেকে বাঁচিয়ে এনেছ আমাকে।
কয়েক দিন সাগরে কাটিয়েও আশ মিটিয়ে সাঁতার কাটতে পারেনি সাগরপাগল মুসা আমান। প্রথম সুযোগটা পেয়েই তার সদ্ব্যবহার করতে ছাড়ল না। পরদিন সকালে জামাকাপড় খুলে ডাইভ দিয়ে পড়ল পানিতে।
দেখে হাসল রবিন আর কিশোর কুমালো, জামবু আর ক্যাপ্টেনকে নিয়ে প্রবাল প্রাচীরের কিনার ধরে হেঁটে চলল ওরা।
চলতে চলতে থেকে থেকেই দাঁড়িয়ে যাচ্ছে কিশোর। উঁকি দিয়ে দেখছে পানিতে। ধরার মত কিছু মেলে কিনা দেখছে। অল্প পানিতে একটা অক্টোপাসের বাচ্চা চোখে পড়ল। আরেকটা। তারপর আরেকটা। খুব ছোট ছোট, বাসনের সমান। কয়েকটা ধরল কুমালো। জানাল, খেতে নাকি দারুণ লাগে, বিশেষ করে অক্টোপাসের শুড়ের কাবাব।
মুসা ওদিকে শুরু করেছে তুমুল দাপাদাপি। ডুবছে, ভাসছে। দেখলে এখন মনে হবে পানিরই ছেলে সে, পানিতে তার ঘর। কয়েকবার ডুবে, ভেসে শরীরটাকে গরম করে নিয়ে সাঁতরে চলে এল অপেক্ষাকৃত গভীর পানিতে। খাড়া ডুব দিয়ে চলে এল বারো-তেরো ফুট নিচে। চোখ দিয়ে যেন গিলছে প্রবালের। অপূর্ব রূপ। পানির নিচ দিয়েই সাঁতরে চলে এল দেয়ালের কাছে। ভাসল। লম্বা দম। নিয়ে আবার ডুব দিল।
দেয়ালের এক জায়গায় একটা ফোকর চোখে পড়ল। ঢুকে পড়ল ওটার ভেতরে। একটা সুড়ঙ্গ। ওই সুড়ঙ্গ দিয়ে সাঁতরে চলে এল পানির তলার একটা গুহায়। সূর্যের আলো এসে পড়েছে প্রবালের গায়ে, প্রতিফলিত হয়ে মিষ্টি কোমল নীল আলোয় ভরিয়ে দিয়েছে গুহাটা। এই সৌন্দর্য বর্ণনা করা কঠিন, যেন এক পরীর রাজ্যে চলে এসেছে সে। অসাধারণ শিল্পীর পরিচয় রেখেছে এখানে। প্রবালকীট। দেয়াল জুড়ে ছড়িয়ে দিয়েছে ওদের রঙিন শিল্পকর্ম। শুধু রঙ আর রঙ, নীলসাদা, গোলাপী, সবুজ, চোখ জুড়িয়ে যায়।

দম ফুরিয়ে আসছে। পরীর বাগান দেখার জন্যে আর বেশিক্ষণ থাকতে পারবে না মুসা। সাঁতরে বেরিয়ে আসতে যাবে, এই সময় লক্ষ্য করল, ছাতটা পানির ওপরে। মাঝে ফাঁকা। তারমানে বাতাস আছে। না-ও থাকতে পারে, একথাটা একবারও মনে এল না তার। ভুস করে মাথা তুলল। ফাঁক বেশি না। কাঁধ পর্যন্ত ভাসাতে পারল সে।

হঠাৎ একটা দুষ্টবুদ্ধি মাথাচাড়া দিল মনে। যদি এখন না ফেরে, দেরি করে যায়, কি ঘটবে? সবাই তাকে ডুব দিতে দেখেছে। ভেসে না উঠলে ওরা ভাববে ডুবে মরেছে সে। পানিতে নেমে খোঁজাখুঁজি করবে তাকে। তবে পাওয়ার আশা কম। কারণ সে রয়েছে গুহার ভেতরে।

ওরা যখন তাকে মৃত ধরে নিয়ে হাহুতাশ শুরু করবে, তখন ভাসবে সে। বুঝতে পারবে, সত্যি সত্যি সে মারা গেলে কিশোর, রবিন, কুমালো কে কতটা শোক করবে।

নাক উঁচু করে ভেসে আছে মুসা। সহজেই শ্বাস নিতে পারছে। তারমানে প্রবালের মাঝে সূক্ষ্ম ছিদ্র রয়েছে, অনেকটা স্পঞ্জের মত, সেই ছিদ্রপথে গুহায়। ঢুকছে বাতাস।

ওপরে চেঁচামেচি শুরু হল, গুহায় থেকেই শুনতে পাচ্ছে মুসা। পানিতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ার শব্দ হল।

দশ মিনিটের মাথায় লম্বা দম নিয়ে ডুব দিল সে। বেরিয়ে এল গুহা থেকে। ভাসল না। ডুব সাঁতার দিয়ে সরে এল প্রায় বিশ গজ দূরে। পানির কিনারে ওখানে জন্মে আছে একগুচ্ছ নারকেল গাছ। আস্তে পানি থেকে উঠে ওটার ভেতরে ঢুকে বসে রইল সে।

কানে এল কিশোরের কথা, কি করে যে গিয়ে ওর বাবাকে বলব! হায় হায়রে, কেন যেতে দিলাম! কেন মানা করলাম না!

ক্যাপ্টেন বলল, বেচারা! ছেলেটা ভাল ছিল। সত্যি দুঃখ হচ্ছে ওর জন্যে।

রবিন বলল, কেঁদে কেঁদেই মরে যাবে ওর মা!

আমাদের তিন গোয়েন্দাগিরি এখানেই শেষ! আফসোস করল কিশোর। মুসাকে ছাড়া কিছুই করতে পারব না আমরা।

জামবুও দুঃখ প্রকাশ করল। আন্তরিক কিনা বোঝা গেল না যদিও।

কুমালো নেই ওখানে। খানিক পরে উঠে এল পানি থেকে। বিড়বিড় করে প্রার্থনা করছে, মিশনারি মহিলার কাছেই শিখেছে নিশ্চয়। কিশোরের কাঁধে হাত রেখে কাঁদো কাঁদো গলায় সান্ত্বনা দিল, দুঃখ কোরো না। যে মরে গেছে, তার জন্যে আফসোস করতে নেই, তাহলে তার আত্মার অকল্যাণ হয়, পাখিকে শেখানো বুলি ঝাড়ছে যেন। আবার ওর সঙ্গে দেখা হবে আমাদের। স্বর্গে...

আর থাকতে পারল না মুসা। হো হো করে হেসে উঠল। বেরিয়ে এল নারকেল গাছের আড়াল থেকে।
স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সবাই। কুমালো হাসল। রবিনও। কিশোর গম্ভীর। শুধু বলল, কাজটা ভাল করনি।
ছিলে কোথায় এতক্ষণ? রবিন জিজ্ঞেস করল। গাছের আড়ালেই?
না, কয়েক মিনিট ধরে আছি। এর আগে পানিতেই ছিলাম।
এতক্ষণ?
বিশ্বাস না হলে আবার দেখ। প্রমাণ করে দিচ্ছি। যতক্ষণ বল ততোক্ষণ পারব।
ডাইভ দিয়ে পানিতে পড়ল মুসা।
আবার গুহায় ঢুকল। মোটা সাপের মত কি যেন একটা পড়ে আছে মেঝেতে। ওটার আরেক মাথা গিয়ে ঢুকেছে গুহার দেয়ালে একটা কালো বড় ফোকরে। শ্বাস নেয়ার জন্যে ভেসে উঠল সে। দম নিয়ে সাপের মত জিনিসটা ভালমত দেখার জন্যে আবার ডুব দিল সে। পরিষ্কার দেখা যায় না। কারণ একটা জিনিসেরই একেক জায়গায় একেক রকম রঙ। পটভূমি, অর্থাৎ যেটার ওপর পড়ে আছে তার যে-রকম রঙ ঠিক সে-রকম। যেখানে প্রবালের রঙ লাল, সেখানে ওটাও লাল, যেখানে নীল সেখানে নীল, সাদা হলে সাদা, কালো জায়গা কালো।
এইসময় একই রকম আরেকটা সাপ চোখে পড়ল তার। তারপর আরও দুটো। সব কটাই গিয়ে ঢুকেছে সেই কালো ফোকরে।
কি আছে কালো গর্তটার ভেতরে? আরও কাছে গিয়ে দেখার পর নজরে পড়ল। কালো গর্তের মতই কালো একটা জিনিসের অর্ধেক বেরিয়ে আছে ফোকরের বাইরে, বাকি অর্ধেক ভেতরে। ফোলা একটা বস্তার মত। দুটো চোখও লাগানো বস্তার গায়ে। ছোট ছোট চোখ, শয়তানি ভরা তির্যক চাহনি, তার দিকেই তাকিয়ে আছে।
ব্যাপারটা বোধগম্য হতেই ভয়ের ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল তার মেরুদণ্ড বেয়ে। আশেপাশের রঙের সঙ্গে রঙ মিলিয়ে ঘাপটি মেরে রয়েছে ওটা, শিকারের জন্যে ওত পেতেছে। বিশাল এক অক্টোপাস!
অবাক নয় সে, আতঙ্কিত। বোঝা উচিত ছিল, অল্প পানিতে যখন অসংখ্য বাচ্চা রয়েছে, বুড়োটাও রয়েছে কাছাকাছি কোথাও। কল্পনাই করেনি গুহার মধ্যে বসে আছে ওটা।
আস্তে ভেসে উঠে ফুসফুস ভর্তি করে বাতাস নিল মুসা। জানে, সময়মত বেরোতে না পারলে, জানোয়ারটার সঙ্গে হাতাহাতি লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়লে অক্সিজেন দরকার হবে। পানিতে সামান্যতম আলোড়ন না তুলে আবার ডুব দিল সে। সোজা

এগোল সুড়ঙ্গের দিকে। সরে যাচ্ছে...যাচ্ছে...আর একবার পা নাড়া, তাহলেই ঢুকে যাবে সুড়ঙ্গে...
ঠিক এই সময় আলতো করে তার গোড়ালি জড়িয়ে ধরল কোন কিছু। খুব দ্রভাবে টেনে নেয়া হতে লাগল তাকে গুহার ভেতরে। ছাড়ানোর জন্যে ঝাড়া মারল সে, ছুটতে পারল না। ধরেছে নরমভাবে, কিন্তু বাঁধন ভীষণ শক্ত।
ছুরির জন্যে হাত বাড়াল মুসা। ধক করে উঠল বুক। নেই! মনে পড়ল, প্যান্টের বেল্টে আটকানো রয়েছে ছুরির খাপ, কাপড় খোলার সময় ওটা খুলে রেখে এসেছে সৈকতে।
দুহাতে ধরে তঁড়টা ছাড়ানোর চেষ্টা করল সে। চ্যাপ্টা হুঁড়, পেটের দুই কিনারে দুই সারি সাকশন কাপ। চামড়া থেকে ওগুলোর তীব্র আকর্ষণ ছুটানোর সাধ্য তার হল না। বরং টের পেল, আরেক হুঁড় দিয়ে আরেক পা জড়িয়ে ধরা হচ্ছে, তৃতীয় আরেকটা ঔড় খুঁয়োপোকার মত তিরতির করে হেঁটে যাচ্ছে কাঁধের ওপর দিয়ে।
সাহায্যের জন্যে চিৎকার শুরু করল মুসা। এখন হয়ত তার মাথার ওপরেই রয়েছে সবাই, তার বেরোনোর অপেক্ষা করছে, তাকিয়ে আছে পানির দিকে। তার ডাক ওদের কানে গেলে নিশ্চয় দেখতে আসবে।
চিৎকার করায় অতি মূল্যবান অক্সিজেনের অনেকটাই বেরিয়ে গেল ফুসফুস থেকে। আর আধ মিনিটের মধ্যে যদি দম নিতে না পারে, জ্ঞান হারাবে। শুড় ছাড়ানোর চেষ্টা বাদ দিয়ে প্রাণপণে গুহার ওপরে ভেসে উঠতে চাইল সে। দেয়ালের গা থেকে বেরিয়ে থাকা প্রবাল ধরে ধরে টেনে তোলার চেষ্টা করল শরীরটা।
ভারি একটা শুড়ের চাপ রয়েছে কাধে। ওটা কিছুতেই সরাতে পারল না সে। শেষে মরিয়া হয়ে কাধ নিচু করে চোখা প্রবালে ঘষা মারল শুড়টা।
গুঙিয়ে উঠল অক্টোপাস, একেবারে মানুষের মত। কাঁধের ওপর শুড়ের চাপ কমার সঙ্গে সঙ্গে ঝাড়া দিয়ে ওটাকে নামিয়ে দিল মুসা দুই পায়ের বাঁধন আগের মতই রয়েছে। তবু কাধ থেকে শুড়টা সরাতে পারায় ভেসে উঠে দম নেয়া সম্ভব হল।
তারপর শুরু করল চিৎকার। গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে লাগল, কিশোর! রবিইন! দোহাই তোমাদের! আমাকে বের কর! অক্টোপাসে ধরেছে!... কুমালোওওও...
চেঁচিয়ে গলার রগ ফুলিয়ে ফেলল সে। কোন সাড়া এল না।
ব্যাপারটা বুঝতে পেরে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যেতে চাইল তার, ভয়ে। রসিকতা করেছে ওদের সঙ্গে একটু আগে। ওরা হয়ত ভাবছে আবার নতুন কোন রসিকতা। মনে পড়ল সেই মেষ পালকের কথা। বাঘ এসেছে! বাঘ এসেছে! বলে

অযথা। চেঁচিয়ে সত্যি সত্যি বাঘ যখন এল কেউ এল না তাকে সাহায্য করতে পায়ে টান লাগল।
কিশোওর! দোহাই তোমাদের! প্রায় কেঁদে ফেলল মুসা। আল্লার কসম, অক্টোপাস...
কথা শেষ করার আগেই টান মেরে পানির তলায় নিয়ে গেল তাকে জীবটা। এগিয়ে এল বাকি গুঁড়গুলোও। এক এক করে জড়িয়ে ধরতে লাগল কাঁধ, বুক, পেট।
আমাজানের জঙ্গলের বোয়া-কনসট্রিকটরের কথা মনে পড়ল। ভয়ঙ্কর সাপ। একেকটা শুড়কে একেকটা সাপ বলে মনে হল এখন, তারমানে মোট আটটা সাপ। একযোগে আক্রমণ করেছে। শক্ত হচ্ছে চাপ, আগের মত আলতো ভাব আর নেই। পেট বসে যাচ্ছে চাপের চোটে, হাঁসাস করছে ফুসফুস, পাগল হয়ে এলোপাতাড়ি বাড়ি মারছে হৃৎপিণ্ড।
ছায়া নামল এই সময় গুহার ভেতরে, সূর্যকে মেঘে ঢেকে দেয়ায় রোদ পড়ে গেল যেন। তারমানে সুড়ঙ্গে ঢুকেছে কেউ, আলো আসায় বাধা পড়েছে। আশার আলো জ্বলল মুসার মনে। নিশ্চয় কুমালো! অনেক কষ্টে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল, সে, কে এসেছে দেখার জন্যে। কুমালো নয়, সুড়ঙ্গমুখে দেখা দিল মস্ত এক হাঙ্গরের মাথা, টাইগার শার্ক। রক্তের গন্ধ পেয়ে গেছে সাগরের কসাই। প্রবালের ঘষায় মুসার শরীরের কয়েক জায়গা কেটে রক্ত বেরোচ্ছে।
অনাহূত আগন্তুককে দেখেই রেগে লাল হল অক্টোপাস। ঢিল হল শুড়ের বাঁধন। সত্যি সত্যি লাল রঙ এখন শরীরের।
এমনিতেই ফোলা ঢোল, পানি টেনে নিয়ে আরও ফুলে পিপা হয়ে যেতে লাগল বস্তার মত শরীরটা। হঠাৎ বেরিয়ে গেল টেনে নেয়া সমস্ত পানি, শত্রুর দিকে টর্পেডোর মত ছুটে গেল অক্টোপাস। এত জোরে গেল, ওটার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হেরে গেল মুসার দৃষ্টি।
জেট প্লেন বা রকেটের সঙ্গেই শুধু তুলনা করা চলে ওই গতিকে। ব্যতিক্রম শুধু, ওগুলোর পেছনের ফুটো দিয়ে বেরোয় গ্যাস, আর এটার বেরোল পানি। শুড়গুলো লম্বা হয়ে ছুটে গেল বস্তাশরীরের পেছনে, যেন ধূমকেতুর পেছনে তার ছড়ানো ফোলা লেজ।
আটটা শুড়ের শতশত সাকশন কাপ দিয়ে কষে চড় লাগাল অক্টোপাস বেহায়া মাছের গায়ে যত্রতত্র। ব্যাটা, আমার শিকার ছিনিয়ে নিতে আস! এত্তো সাহস! বেরিয়ে গেল হাঙর। ছাড়ল না অক্টোপাস। সুড়ঙ্গের বাইরে বেরিয়েই রুখে দাঁড়াল বাঘা হাঙরের বাচ্চা, সে-ও কম শক্তিশালী নয়। গুহার ভেতরে জায়গা কম, নড়তে চড়তে অসুবিধে, তাই বের করে নিয়ে গেছে অক্টোপাসটাকে।

সুড়ঙ্গের এপাশে থেকে ওপাশে ভয়ঙ্কর লড়াইয়ের বিশেষ কিছু দেখতে পাচ্ছে মুসা, পলকের জন্যে মাঝে মাঝে শুধু চোখে পড়ছে পাখনা কিংবা শুড় নড়ানো। দৃষ্টি আরও অচল হয়ে গেল, যখন কালির থলে থেকে একরাশ কালো কালি ছুঁড়ে মারল অক্টোপাস। পানিতে কালো মেঘের মত ছড়িয়ে পড়ল কালি।

এখন বাইরে বেরোনো আত্মহত্যার সামিল। দুরুদুরু বুকে অপেক্ষা করছে মুসা। প্রার্থনা করছেঃ আল্লাহ্, সরে যাক ব্যাটারা, খালি একটু দূরে সরুক! আমি বেরোতে পারলেই হয়! আল্লাহ...

আবার চেঁচাতে শুরু করল সে। কাছাকাছি কি কেউ নেই নাকি? ভয়াবহ লড়াই চোখে পড়ছে না কারও? পানিতে ওই আলোড়ন দেখতে পাচ্ছে না?

পানিতে এখন কালি গোলা। কিছু দেখতে পাচ্ছে না মুসা। দানব দুটো আছে না গেছে, বোঝার উপায় নেই।

ঠিক করল সে, ঝুঁকি নেবে। লম্বা দম নিয়ে ডুব দিল। কিন্তু ফিরে এসে ভেসে উঠতে বাধা হল আবার। কারণ, সুড়ঙ্গমুখে চকিতের জন্যে আবছাভাবে চোখে পড়েছে বস্তা-শরীরের মুখ। ওপাশের কালো মেঘের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে।

একা। তাড়িয়ে দিয়ে এসেছে শত্রুকে। আট পায়ে ভর দিয়ে বিচিত্র ভঙ্গিতে হাঁটছে গুহার মেঝেতে, বিরাট এক মাকড়সার মত।

শিকারের দিকে তাকিয়ে নাচ জুড়েছে যেন। আটকা পড়া ইঁদুরকে ধরার আগে ঠিক এরকম ভাবভঙ্গিই করে বেড়াল। সারা শরীরে ওটার এখন রামধনুর সাত রঙ। কুমালো আর কলিগের কাছে জেনেছে মুসা, খুব বেশি রাগলে শরীরের রঙ ওরকম হয়ে যায় অক্টোপাসের।

আবেগ বোঝার ক্ষমতা আছে এদের। বাচ্চাকে কাছে টেনে আদর করে, শত্রু দেখলে খেপে যায়। মাছের চেয়ে অক্টোপাসের মগজ অনেক উন্নত। মানুষের মত চোখ, আর শেয়ালের মত ধূর্ত।

আবার ফুলতে শুরু করেছে ওটা। আবার চিৎকার করে সাহায্যের আবেদন জানাল মুসা। বুঝতে পারছে, সময় ঘনিয়ে এসেছে। আর বড় জোর কয়েক সেকেণ্ড।

তীব্র গতিতে পানি বেরোতে লাগল বস্তার ভেতর থেকে। ছুটে এল অক্টোপাস। জড়িয়ে ধরল শিকারকে।

অন্য কেউ হলে হয়ত হাল ছেড়ে দিত এতক্ষণে, কিন্তু মুসা ছাড়ার পাত্র নয়। মরতে হলে লড়াই করে মরবে। দ্রুত ভাবনা চলেছে মাথায়। অক্টোপাসের ব্যাপারে আর কি কি বলেছিল কুমালো? সাগরের এই আতঙ্ককে খালি হাতে লড়াই করেই অনেক সময় হারিয়ে দেয় দ্বীপবাসীরা। দুই চোখের মাঝখানে রয়েছে এদের সব

চেয়ে দুর্বল জায়গা, একটা বিশেষ নার্ভ সেন্টার। ওখানে আঘাত লাগলে অবশ হয়ে যায় অক্টোপাসের শরীর।
আশা হল মুসার। শুধু হারানোই নয়, এই দানবটাকে জ্যান্তই ধরে নিয়ে যেতে পারবে হয়ত সে। বড় একটা অক্টোপাস চেয়েছেন মিস্টার লিসটার। কিশোরও খুশি হবে, মুসার ওপর থেকে রাগ কমবে তার।
প্রবাল আঁকড়ে ধরে পানির ওপরে মাথা তুলে রাখল মুসা, যতক্ষণ পারল। শ্বাস টানল জোরে জোরে। তারপর এক হ্যাঁচকা টানে পানির নিচে নামিয়ে নেয়া হল তাকে। কিন্তু এখন আর আগের মত আতঙ্কিত নয় মুসা। ফুসফুসে বাতাস ভর্তি, মনে দুর্জয় সাহস। এখন তাকে দেখলে ভাবতেই পারবে না কেউ, এই সেই মুসা আমান, ভূতের নাম শুনলেই যে ভয়ে কাবু হয়ে যায়। শরীর থেকে শুড় ছাড়ানোর জন্যে এখন আর ধস্তাধস্তি করছে না সে। কাজ হয় না, তাতে শক্তিই খরচ হয় অহেতুক।
ধীরে ধীরে তাকে কাছে টেনে নিচ্ছে অক্টোপাস। শয়তানি ভরা চোখ দুটোর কাছে, আরও কাছে। আফ্রিকায় রেগে যাওয়া গণ্ডার দেখেছে মুসা। গণ্ডারের কুতকুতে চোখের চাহনির সঙ্গে অক্টোপাসের চাহনির অনেক মিল।
এতক্ষণ বস্তা-শরীরের ভেতরে লুকিয়ে ছিল অক্টোপাসের চোয়াল দুটো। বেরিয়ে এল এখন। তোতাপাখির ঠোঁটের মত বাঁকা, কিন্তু অনেক অনেক বড়। প্রচণ্ড শক্তি ওই চোয়ালের, এক চাপ দিয়ে পাকা নারিকেল গুঁড়িয়ে ফেলতে পারে। মুসার মাথাটা গুড়ো করতেও এক চাপের বেশি লাগবে না।
তবু নড়ছে না মুসা।
এমন ভাব দেখাচ্ছে, দুর্বল হয়ে গিয়ে নড়াচড়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে সে। দানবটাকে বোঝাতে হবে, হাল ছেড়ে দিয়েছে। ততো শক্ত করে আর তাকে, ধরেনি অক্টোপাসটা, ধরার দরকার মনে করছে না। এটার ওপর এত বল প্রয়োগ করে লাভ নেই। খাবারকে আস্তে আস্তে মুখের কাছে নিয়ে যাচ্ছে শুড়গুলো।
দম ফুরিয়ে এসেছে মুসার। বাতাসের জন্যে আকুলি বিকুলি করছে ফুসফুস। কিন্তু চুপ করে রইল সে। জায়গাটা কোথায়? কুমালো বলেছে, দুচোখের মাঝখানে, শরীরের সমস্ত স্নায়ু ওখানে এক জায়গায় মিলিত হয়ে একটা গুটি তৈরি করেছে, মটরদানার সমান।
হ্যাঁ, আছে, ওই তো! উঁচু হয়ে আছে, ছোট্ট ফেঁড়ার মত। মন শক্ত করল মুসা। তার চোখের দিকে তাকিয়ে আছে কুতকুতে চোখ দুটো। তার মনের কথা বুঝে ফেলছে না তো? পেশী ঢিল করে দিল সে।
অক্টোপাসটাও চাপ আরও কমাল। এইই সুযোগ। হঠাৎ সামনে ঝাঁপ দিল সে। দানবটার মাথা খামচে ধরে কামড় বসালো ফোঁড়াটায়।

যন্ত্রণায় মানুষের মত গুঙিয়ে উঠল অক্টোপাস। দুর্বল ভঙ্গিতে শরীর ঝাঁকিয়ে ছাড়া পাওয়ার চেষ্টা করল। কালি দিয়ে কালো করে ফেলল পানি। নিয়ন্ত্রণ হারাল সাকশন কাপগুলো। মুসার শরীর থেকে খসে পড়ল সব কটা শুড়।
কামড় ছাড়ল না মুসা। চাপ দিল আরেকটু জোরে। আবার গুঙিয়ে উঠল অক্টোপাস। ধস্তাধস্তি একেবারে বন্ধ হয়ে গেল।
আর থাকতে পারছে না মুসা। এখুনি দম নিতে না পারলে ফেটে যাবে যেন ফুসফুস। অক্টোপাসটাকে ছেড়ে পানির ওপর ভেসে উঠল সে। কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ ভেসে থেকে বিশ্রাম নিল। নিচে, পানিতে নিথর হয়ে ঝুলে রয়েছে দানবটা।
মরে গেল নাকি ব্যাটা! শঙ্কিত হল মুসা। কুমালো বলেছে, জোরে এক কামড় দিয়েই মেরে ফেলা যায় এতবড় দানবকেও। বিন্দুমাত্র নড়ছে না ওটা। মরেই গেছে। বোধহয়!
দম নিয়ে ডুব দিল মুসা। একটা শুড় ধরে অক্টোপাসটাকে টেনে নিয়ে চলল গুহার বাইরে। শুড়-টুড় মিলিয়ে আকারে বিশাল হলেও ওজন ততটা নয়। তাছাড়া পানির নিচে হওয়ায় ভার আরও কমে গেছে। হাড়ও নেই শরীরে, শুধু ঠোঁটটা ছাড়া।
গুহার বাইরে বেরিয়ে তবে স্বস্তি। উজ্জ্বল রোদে আলোকিতপানি। পৃথিবীটাকে আর এত সুন্দর মনে হয়নি কখনও মুসার। আধ ঘন্টা আগে যা ছিল, তার চেয়ে অনেক জ্ঞানী মনে হচ্ছে এখন নিজেকে। কারণ খানিক আগে মৃত্যুর করাল রূপ দেখে এসেছে সে। বুঝেছে, মৃত্যু কত ভয়ঙ্কর, বেঁচে থাকা কতটা আনন্দের।
পানির ওপরে মাথা তুলল সে। ধারেকাছে কেউ নেই। সবাই দূরে। চেঁচিয়ে ডাকল সে। ফিরে তাকাল ওরা। দুহাতে তুলে ধরে একটা শুড় নাচাল মুসা। থমকে দাঁড়াল সবাই, তারপরই দৌড় দিল এদিকে।
সর্বনাশ! চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। কাকে ধরেছ! মরা নাকি?
মনে হয় না। জাহাজে তোলা যায় কিভাবে?
তুলো না তুলো না, তাড়াতাড়ি হাত নাড়ল কুমালো। পানির ওপরে তুললে রোদ লাগলেই মরে যাবে।
নৌকা আনতে গেল কুমালো। এই সময়ে সবাইকে তার কাহিনী শোনাতে লাগল মুসা। শুনতে শুনতে ফ্যাকাসে হয়ে গেল কিশোর আর রবিনের চেহারা। আর জামবুর চোখ যেন ছিটকে বেরিয়ে আসবে কোটর থেকে।
যাক, খুশি হলাম, ক্যাপ্টেন কলিগ বলল। দুষ্টুমি করে বটে। সাহসও আছে। এরকম ছেলেই আমার পছন্দ।

দাড় বেয়ে নৌকা নিয়ে হাজির হল কুমালো। বলল, শুড় ধরে বসে থাক কোয়। টেনে নিয়ে যাব। দেখ, পানির ওপরে না ভেসে ওঠে।
জাহাজের কিনারে ভিড়ল নৌকা। দড়ি নামিয়ে পেঁচিয়ে বাঁধা হল তুলতুলে শরীরটা। তারপর যত তাড়াতাড়ি পারা গেল চালান করে দেয়া হল ট্যাংকে, যতটা সল্ক রোদ বাঁচিয়ে।
ট্যাংকটা ছোট হয়ে গেল অক্টোপাসের জন্যে। শরীরটা ঠিকই আঁটে, গুঁড়গুলো। বেশি লম্বা। সোজা করা যায় না ট্যাংকের ভেতরে। বারো ফুট লম্বা একেকটা।
কুমালো বলল, সোজা করার দরকার নেই। করে না সাধারণত। গুটিয়ে রাখতে পছন্দ করে।
হুঁশ ফিরছে দানবের। আলো দেখা দিল চোখ দুটোয়। শুরু হল সারা শরীরে রঙের খেলা। কিলবিল করে উঠল শুড়গুলো।
পানি খেয়ে ফুলছে বস্তা-শরীর। হঠাৎ লাফ দিল ওটা, বাড়ি খেল গিয়ে আরেক পাশের দেয়ালে। আবার লাফ দিল আরেক পাশে, বাড়ি খেল এবারও। বুঝল আটকা পড়েছে। ট্যাংকের ভেতরে ছোটাছুটি শুরু করল পাগলের মত প্রচণ্ড রাগে শেষে শুড় কামড়াতে শুরু করল।
বেশি রেগে গেলে ওরকম করে ওরা, কলিগ জানাল ধরা পড়লে কামড়ে নিজের শুড়ই খেয়ে ফেলে। শুড়-ছাড়া-অক্টোপাস বেচতে পারবে কাস্টোমারের কাছে?
শঙ্কিত হয়ে পড়ল কিশোর আর মুসা। এত কষ্ট করে ধরে এনে তাহলে লাভটা কি, শুড়ই যদি খেয়ে ফেলে?
সমস্যার সমাধান করে দিল কুমালো। বড় দেখে একটা লোহার ড্রাম এনে রাখল ট্যাংকের ভেতর, কাত করে। খোলা মুখটা রইল অক্টোপাশের দিকে।
নিমেষে রাগ দূর হয়ে গেল দানবটার। সুড়ুৎ করে গিয়ে ঢুকে পড়ল ড্রামের ভেতরে। শুড়গুলো ভেতরে গুটিয়ে নিল, যতটা জায়গা হল।
সাগরের নিচে, কুমালো বলল। অন্ধকার গর্তে বাস করে ওরা। গর্তে ঢুকলে নিরাপদ মনে করে। আর গণ্ডগোল করবে না। বাড়ি পেয়ে গেছে।
ভোর থেকেই উত্তেজিত হয়ে আছে শুকতারার যাত্রীরা। অস্বস্তিতে ভুগছে।
বিকিনি ছেড়েছে শুকতারা। এগিয়ে চলেছে পোনাপের দিকে। চমৎকার হাওয়া লাগছে পালে, সাগর শান্ত, অস্বস্তি বোধ করার কারণ নেই। তবুও করছে
ওরা,কারণ, বাতাস গরম। অসহ্য। বাষ্প মিশে রয়েছে যেন বাতাসের সঙ্গে।
নিষ্প্রাণ এই বাতাসে শ্বাস নিয়েও শান্তি নেই। বমি বমি লাগে। আকাশও নীল নয়। কেমন যেন কালচে-সাদা।
একই সাথে একটা বিশেষ কিছুর রঙ কালো আর সাদা হতে পারে না, অথচ আকাশের বেলায় তাই হয়েছে। ফ্যাকাসে কালো অন্ধকার ধীরে ধীরে চেপে

আসছে যেন জাহাজের ওপর, মলিন করে দিয়েছে সবার মুখ। বেলা বাজে বারোটা, অথচ দেখে মনে হয় কাকডাকা ভোর।
বিনাকলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে কিশোর। হাতে সেক্সট্যান্ট। দুপুরের রীডিং নেয়ার চেষ্টা করছে। তাহলে নটিক্যাল অ্যালম্যানাকের সাহায্য নিয়ে জাহাজের অবস্থান নির্ণয় করতে পারবে।
খুব আগ্রহ নিয়ে ক্যাপ্টেন কলিগের কাছে নেভিগেশন শিখছে কিশোর। যেকোন কাজ জানা থাকলে অনেক সুবিধে। আর এটা জানা তো এখন তিন গোয়েন্দার জন্যে বিশেষ জরুরি, কারণ, প্রফেসর ইস্টউডের গোপন মুক্তার খামারে যেতে হবে। কখন কি ঘটে যায়, ঠিক আছে?
মনে যেন জুলজুলে অক্ষরে লেখা হয়ে আছে পজিশনটাঃ নর্থ ল্যাটিচিউড এগারো ডিগ্রি চৌত্রিশ মিনিট, ইস্ট লংগিচিউড একশো আটান্ন ডিগ্রি বারো মিনিট।
একটা সমস্যার সমাধান এখনও করতে পারেনি সে। আসল অবস্থানের কথা কাউকে না জানিয়ে কি করে সেখানে পৌঁছবে? সঙ্গে যে-ই যাক, জেনে যাবে, জামবু, কুমালো, কলিগ, তিনজনেই।
কুমালোকে বিশ্বাস করা যায়। কিন্তু ক্যাপ্টেন আর জামবুকে? প্রফেসরকে হুমকি দিয়েছে যারা, চুরি করে ল্যাবরেটরিতে ঢুকেছে, তাদের সঙ্গে কি যোগাযোগ আছে দুজনের? কি করে জানা যাবে? ওদের কিছু কিছু মন্তব্য সন্দেহ জাগিয়েছে তার মনে।
পার্ল অ্যাটলে ওরা তিন গোয়েন্দার সঙ্গে না গেলেই খুশি হত সে। কিন্তু ওদেরকে ছাড়া, কিংবা দক্ষ অন্য কোন নাবিকের সহায়তা ছাড়া যেতে পারবে না কিছুতেই।
পারবে, যদি সে নিজে নাবিক হতে পারে, নেভিগেশন শিখে নিতে পারে। সূর্য, তারা, আর ক্রনোমিটারের সাহায্যে জাহাজের গতিপথ নির্ধারণ করা জানতে হবে। হিসেবে সামান্যতম ভুল করা চলবে না। তাহলেই চলে যাবে একদিক থেকে আরেক দিকে, আসল জায়গায় যাওয়া আর হবে না।
বুদ্ধি আছে তার। চেষ্টা করলে শিখতে পারবে না তা নয়, বরং অন্য অনেকের চেয়ে দ্রুতই পারবে। কিন্তু আরও একটা সমস্যা রয়ে যায়, কলিগ আর জামবুকে কোথায় নামিয়ে রেখে যাবে? কিভাবে? কি বলে বোঝাবে...
ভাবনায় বাধা দিল কলিগ, কি ভাবছ?
সূর্যটা ধরতে পারছি না ঠিকমত।
ওপরে তাকাল কলিগ। সূর্য যেখানে থাকার কথা, সেখানে শুধু একটা সাদাটে আভা। আকাশের কালো ভূতুড়ে মুখটা অন্ধকার হচ্ছে আরও।

ব্যারোমিটার দেখল ক্যাপ্টেন। সাধারণত তিরিশের ওপরে থাকে, এখন উনত্রিশের কাছাকাছি নেমে এসেছে।
মনে হচ্ছে, বড় রকমের বাড়ি খাব, চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কলিগ। মন্তব্যটা অদ্ভুত লাগল কিশোরের কাছে। তার ধারণা ছিল বাতাস বাড়বে, তা হয়ে কমছে। খুব সামান্য, ঝিরঝির করে আসে, যায়, আসে, যায়। স্কুলে পড়েছে পাল। প্রায় বন্ধই হয়ে গেছে হাওয়া।
ঘটনাটা কি? কেবিন থেকে বেরিয়ে এসেছে মুসা। ঘুমাচ্ছিল। আগের দিন অক্টোপাসের সঙ্গে লড়াইয়ের পর বিশ্রাম দিচ্ছিল শরীরটাকে। সারা গায়ে চাকা চাকা দাগ, অক্টোপাসের সাকশন কাপের শোষণের স্বাক্ষর। শ্বাসই নিতে পারছি না!
বিশাল এক কম্বল ছড়িয়ে দিয়ে যেন চেপে ধরা হয়েছে শুকতারার যাত্রীদের, শ্বাসরুদ্ধ করে মারার পায়তারা চলছে।
হারিক্যান! ঘোষণা করল কলিগ। কুমালো, আলগা যা যা আছে, শক্ত করে বাঁধ। জামবু, পাল খোল। প্রধান মাস্তুলের নিচে গিয়ে দাঁড়াল সে। আরে, বাবা, একটু জলদি কর না! হাত চালাও। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল সে, তিন গোয়েন্দার দিকে চেয়ে। এই তোমরাও এস, ধর, ধর! আর সময় নেই!
তাড়াহুড়ো করে নামাতে গিয়ে, পুলিতে দড়ি পেঁচিয়ে আটকে গেল একটা পালের ওপরের দিকটা।
ইসসিরে, আর সময় পেল না আটকানোর! উঠে গিয়ে এখন খুলতে হবে, উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে ক্যাপ্টেন। মাল্লাদের দিকে তাকাল। কুমালো আর জামবু দুজনেই ব্যস্ত। সে নিজে বয়স্ক লোক, ভারি শরীর, মাস্তুল বেয়ে এত ওপরে উঠতে পারবে না। মুসা পারবে, কিন্তু ঘষা লাগলেই চাকা দাগগুলোতে ব্যথা পায়।
এক মুহূর্ত দ্বিধা করল রবিন। সারা দিনে কয়েকবার করে কাকের বাসায় উঠে উঠে মাস্তুল বাওয়া অভ্যাস হয়ে গেছে তার। বেয়ে উঠতে শুরু করল আরেকবার। নিচের দিকের ক্রসট্রীগুলো পেরিয়ে উঠল কাকের বাসায়। জিরানোর সময় নেই। উঠে গেল আগায়। পুলি থেকে দড়ির জট ছাড়িয়ে দিতেই হড় হড় করে নামতে শুরু করল পাল।
ডেকে তখন তুমুল ব্যস্ততা। দড়ি দিয়ে হ্যাচের মুখগুলো বেঁধে ফেলেছে কুমালো, ডিঙি বাঁধছে। অক্টোপাসের ট্যাংকটা জায়গামত আটকে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে জাহাজের দুলুনির সময় না নড়ে! ছোটবড় সব কটা ট্যাংকের ঢাকনা শক্ত করে লাগাতে হবে। ইচ্ছে করলে খুবই দ্রুত কাজ করতে পারে জামবু, কিন্তু তাকে কেউ কিছু করার আদেশ দিলেই চিটাগুড়ের মত আঠা হয়ে যায় যেন তার শরীর, নড়তেই চায় না আর। কয়েকটা পাল গুটিয়ে নিয়ে নিচের তলায় রাখতে

এল। স্টোররুমে ঢুকেই যেন আর কাজ পেল না, এই জরুরি মুহূর্তে মদ খাবার ইচ্ছে হল।
ইঞ্জিন স্টার্ট দিল ক্যাপ্টেন। বিপদের মুখোমুখি হওয়ার জন্যে সবরকমে তৈরি করছে জাহাজটাকে।
পালে হাওয়া লাগলে সহজেই সাড়া দেয় শুকতারা, কিন্তু ইঞ্জিনের সঙ্গে সমঝোতা হতে সময় লাগল। সাড়া দিতে সবে শুরু করেছে। ঠিক এই সময় এল ঝড়।
মাস্তুলের ওপরে থেকে আসতে দেখল প্রথম রবিন। ডেকে নামার সুযোগ পেল না। কাকের বাসায় মাস্তুল আঁকড়ে বসে থাকতে বাধ্য হল সে।
বিশাল এক ঢেউ, তার মাথা ছাড়িয়ে উঠে গেছে অনেক ওপরে। একটা মাত্র ঢেউ, আসার কোন ইঙ্গিতই দেয়নি, জন্মাল কখন তা-ও বোঝা যায়নি। হঠাৎ চোখে পড়ল ঢেউটা, পাহাড়ের মত দাঁড়িয়ে গেছে। হাঁ করে তাকিয়ে রইল রবিন। ঢেউয়ের চূড়ায় সাদা ফেনা নাচছে। দেখে মনে হচ্ছে সাগরের সঙ্গেও কোন সম্পর্ক নেই ঢেউটার, পানি আর আকাশের মাঝে শূন্যে ঝুলে ঝুলে ছুটে আসছে শুকতারাকে গুঁড়িয়ে দেয়ার জন্যে।
ঢেউয়ের দিকে পাশ ফিরিয়ে আছে জাহাজ। ধীরে ধীরে চড়তে শুরু করল পাহাড়ে। পানির ঢলে পড়ে কাত হয়ে যাচ্ছে। এত বেশি কাত হয়ে গেল মাস্তুল, নিচে তাকিয়ে ডেক দেখতে পেল না রবিন, চোখে পড়ল আয়নার মত চকচকে সাগর।
হাত ছেড়ে লাফিয়ে পড়বে পানিতে? তার মনে হল, এই ঢেউয়ের সঙ্গে পাল্লা দেয়ার সাধ্য দুনিয়ার কোন জাহাজের নেই, এখুনি উল্টে যাবে শুকতারা। তখন আর মুক্তির উপায় থাকবে না। পানির তলায় চলে যাবে সে।
কিন্তু কি ভেবে শেষ পর্যন্ত ছাড়ল না রবিন। কুঁচকে ফেলল নাকমুখ, যখন ঢেউয়ের চূড়াটাকে তার ওপর ভেঙে পড়তে দেখল। পনি এরকম আঘাত করতে পারে, জানতই না সে। মনে হল কঠিন কিছু দিয়ে বাড়ি মারা হয়েছে তাকে। পানির চাপে কাকের বাসার রেলিঙ আর মাস্তুলের সঙ্গে এমনভাবে আটকে গেল, চাইলেও এখন আর নিজেকে ছোটাতে পারবে না।
ফুসফুসের সমস্ত বাতাস নিঙড়ে বের করে নিয়ে গেছে যেন পানি। হাঁ করে দম টানতে গিয়ে নাকমুখ দিয়ে ঢুকল নোনা পানি। নিঃশেষ হয়ে আসছে শক্তি। পুরো ব্যাপারটাই কেমন অবাস্তব লাগছে। ডেকের চল্লিশ ফুট ওপরে বসে থেকে পানিতে ডুবল কিভাবে?
কিশোর কই? আর মুসা? ডেক থেকে ধুয়ে নিয়ে গেছে ওদেরকে পানি? এই তাহলে হারিক্যান! মাস্তুলটা আবার সোজা হয়েছে বলে মনে হল। নিচে তাকাল সে। ডেকটা যেখানে থাকার কথা সেখানে শুধু পানির ঘূর্ণি।

সরে গেল পানি। লাফ দিয়ে আবার বেরিয়ে এল যেন ডেকটা। কিশোর আর মুসাকে দেখা গেল। দুই মাস্তুলের সঙ্গে যার যার শরীর বেঁধে নিয়েছে। মরে গেছে বেঁচে আছে বোঝার জো নেই। তবে আছে জাহাজেই, সাগরে ভেসে যায়নি, এটুক নিশ্চিত হওয়া গেল। ককপিটের মেঝেতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে ক্যাপ্টেন। মহাপ্লাবনের ভেতর থেকে যেন একটা সীমাছের মত বেরিয়ে এল কুমালো। এগিয়ে গেল হালের দিকে, জখমী হালটাকে মেরামত করার জন্যে।

জামবুর ছায়াও চোখে পড়ল না।

কিন্তু জামবু আছে। মাত্র চুমুক দিয়েছে বোতলে। পানীয়টা পেটে গিয়েও সারতে পারেনি, মাথায় লাগল প্রচণ্ড বাড়ি। তুলে নিয়ে বাল্কহেডের গায়ে ছুঁড়ে মারল যেন তাকে কেউ। গায়ের ওপর এসে পড়ল, বাক্স, টিন, বস্তা আর আরও নানারকম জিনিস। একটা ময়দার বস্তা ছিঁড়ে গিয়ে ময়দায় মাখামাখি হয়ে গেল তার সমস্ত শরীর। জিনিসপত্রের স্তূপের নিচে, দেয়ালে উপুড় হয়ে পড়েছে সে, মাথা ঠেকে আছে ছাতের সঙ্গে। খানিক পরে গড়িয়ে সরে গেল জিনিসগুলো, মুহূর্ত পরেই ফিরে এল আবার দ্বিগুণ বেগে, বাড়ি মেরে, চাপ দিয়ে, নীল করে দিল তাকে।

অনেক কষ্টে চার হাতপায়ে ভর দিয়ে টেনে তুলল শরীরটা। হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। শক্ত হয়ে লেগে গেছে পাল্লা। খুলতে পারল না। তালা। লাগেনি। তালা নেই-ই, লাগবে কি করে? কিন্তু তবু খুলতে পারল না। দরজার ওপাশে প্রচণ্ড গর্জন।

বাতাস তাহলে এল অবশেষে। এমনভাবে ঠেলে ধরে রেখেছে পাল্লা, যেন পেরেক দিয়ে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে ওটাকে। কাত হয়ে আছে ঘরটা। দেয়ালে দাঁড়িয়ে দরজা খোলার আপ্রাণ চেষ্টা চালাল জামবু।

জিনিসপত্র ওড়াউড়ি থেমেছে। এখন বাইরে বেরোনো গাধামি হয়ে যাবে, ভাবল সে। এখানেই আরাম করে বসে থাকতে পারে, শুয়েও থাকতে পারে ইচ্ছে হলে। কাজ যা করার অন্যেরাই করুক না, সে কেন অযথা খাটতে যাবে? দরজাটা আটকে গেছে, বেরোতে পারেনি, এটা তার দোষ নয়। দরজা খোলার। চেষ্টা বাদ দিয়ে এসে শুয়ে পড়ল দেয়ালে।

বাইরে তখন প্রচণ্ড ঝড়। মস্ত ঢেউটা সরে যাওয়ার পর, বাতাস আসার আগে, মাঝখানে একটু সময় পেয়েছে রবিন। নেমে চলে এসেছে কাকের বাসা থেকে। কাত হয়ে শুয়ে আছে যেন শুকতারা, বাতাসের দিকে পিঠ দিয়ে। কাত হয়ে আছে ডেক, টিনের ঘরে চালার মত। গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে না। যেন শক্তহাতে ধরে রাখা হয়েছে জাহাজটাকে। পানি আগের মতই মর্সণ। তবে বাতাস আসার পর থাকবে এরকম। লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

প্রাণপণে লড়ে চলেছে দুর্বল ইঞ্জিন। ঢেউয়ের চূড়া পেরিয়ে এসে আরেক পাশের ঢালে রয়েছে এখন জাহাজ। নিচ দিয়ে ঢেউটা গড়িয়ে সরে যাওয়ার পর সোজা হল। কিন্তু হয়েও সারতে পারল না, ঝাপটা মারল বাতাস।
রবিনের মনে হল, বাতাস নয়, ইটের দেয়াল এসে ধাক্কা মারল তাকে। বাতাসের মুখোমুখি হয়ে আছে সে। আপনাআপনি বুজে গেছে চোখের পাতা, জোর করে বাতাস ঢুকে গেছে ফুসফুসে, ফোলাতে ফোলাতে যেন ফাটিয়ে ফেলবে। এখনই মাস্তুলের সঙ্গে নিজেকে বেঁধে ফেলতে না পারলে একটা পাতার মত উড়িয়ে নিয়ে যাবে তাকে হাওয়া। শুধু হাত দিয়ে মাস্তুল আঁকড়ে ধরে রেখে বাঁচতে পারবে না।
ঝড় আরও দেখেছে সে, কিন্তু এমন অবস্থা দেখেনি। হারিক্যান নামটা কোথা থেকে এসেছে, জানে। বই পড়ে জেনেছে। নামটা এসেছে মধ্য আমেরিকার ইনডিয়ানদের বজ-বিদ্যুতের অপদেবতা হারাকান থেকে। এই একই ঝড়কে প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিম অঞ্চলের লোকেরা বলে টাইফুন, নামটার উৎপত্তি চীনা শব্দ টাইফুং, অর্থাৎ প্রচণ্ড বাতাস থেকে। আরও অনেক নাম আছে এই ঝড়ের। কেউ বলে চাব্যাসকো, কেউ সিক্লোন, কেউ হারাকান। বলে টরবেলিনো, টরমেনটা, কিংবা ট্রপিক্যাল। কিন্তু যে যে নামেই ডাকুক, একবার যে এর মধ্যে পড়েছে, জীবনে ভুলবে না আর।
মাস্তুলের একদিক থেকে ঘুরে আরেক দিকে চলে এল রবিন। শ্বাস নিতে কষ্ট হল এভাবেও।
জাহাজের সামনের পাটাতনে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল পানি। সেখান থেকে খানিকটা খাবলা মেরে তুলে পেছনে ছিটিয়ে দিল বাতাস। তালু ছড়িয়ে হাত বাড়িয়ে বাতাসের জোর পরীক্ষা করতে গিয়েছিল রবিন, প্রচণ্ড ঝটকায় হাত সরে গেল পেছনে। হাতের তালুতে পানির কণা সুচের মত এসে বিঁধে রক্তাক্ত করে ফেলল চামড়া। অবশ হয়ে গেল হাতটা, যেন ইলেকট্রিক শক খেয়েছে। আন্দাজ করল সে, ঘন্টায় দেড়শো মাইলের কম হবে না বাতাসের গতিবেগ।
বিশাল ঢেউটা যাওয়ার পর যে শান্ত হয়ে গিয়েছিল সাগর, এই বাতাসে সেটা আর থাকতে দিল না। জ্যান্ত হয়ে উঠল যেন পানি। লাফিয়ে উঠতে লাগল বড় বড় ঢেউ। কয়েক মুহূর্ত শান্ত হয়ে ছিল জাহাজটা, এখন পাগলের মত নাচতে শুরু, করল ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গে। ঢেউয়ের মাথায় ওঠার সময় ওঠে নাক উঁচু করে, নামার। সময় নামে নিচু করে, বিপজ্জনক ভঙ্গিতে।
ভাগ্যিস সময়মত মাস্তুলের সঙ্গে শরীরটা পেঁচিয়ে বেঁধে ফেলেছিল পালের দড়ি দিয়ে! আরও দুটো মাস্তুলে বাঁধা অবস্থায় মুখ গুঁজে রয়েছে কিশোর আর মুসা। কুমালো মুক্তই রয়েছে, জাহাজের সঙ্গে তাল রেখে একবার এদিকে কাত হয়ে। যাচ্ছে, একবার ওদিকে, বাতাসে ঝুলন্ত ডালে আঁকড়ে বানর যে-রকম করে ঠিক

তেমনি। ককপিটের মেঝেতে শুয়ে আছে ক্যাপ্টেন, এক হাতে আঁকড়ে ধরে রেখেছে হুইলের নিচের দিকের একটা স্পেক। জামবু নেই। নিশ্চয় নিচের মালপত্র সামলাতে ব্যস্ত, ভাবল রবিন।

কিন্তু মাল নয়, নিজেকেই এখন আর সামলাতে পারছে না জামবু। ভেবেছিল আরাম করে শুয়ে থাকবে। ঝড় বাড়তেই বুঝল, মস্ত ভুল করে ফেলেছে। সাগর যেন বল খেলতে শুরু করল তাকে নিয়ে। দেয়াল থেকে একবার মেঝেতে ছুঁড়ে মারে, আবার মেঝে থেকে দেয়ালে। ঘরের একপাশে একটা বাংক আছে। কোনমতে হাঁচড়ে-পাঁচড়ে গিয়ে উঠল ওটাতে। ধার খামচে ধরে উপুড় হল। ভাবল, যাক বাঁচা গেল। কিন্তু বাঁচতে পারল না। ওটাও ছুঁড়ে মারল তাকে। আরও দুঃখ যোগ হল তার কপালে, জীবন্ত হয়ে উঠল যেন মালপত্রগুলো। সে যেদিকে যায়, ওগুলোও ছুটে যায় সেদিকে, কে কত জোরে এসে তার গায়ে লাগতে পারে সেই প্রতিযোগিতায় মেতেছে যেন।

আতঙ্কে, ব্যথায় প্রায় মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার অবস্থা হল জামবুর। মেঝেটা আরেকবার সোজা হতেই ঝাঁপিয়ে এসে দরজায় পড়ল সে। পাল্লা খোলার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠল। জোরে জোরে ধাক্কা মারতে লাগল কাঁধ দিয়ে। ব্যথাই পেল শুধু কাঁধে, পাল্লার কিছু করতে পারল না। আগের মতই অনড় রইল ওটা।

উড়ে এসে মাথায় লাগছে নানারকম বাক্স, টিন। পাগলের মত দরজায় কিল মারতে মারতে গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে শুরু করল সে। ঝড়ের এই ভয়াবহ শব্দের মাঝে তার ডাক কারও কানে পৌঁছবে না, বুঝল। বড় একটা বাক্স তুলে গায়ের জোরে ছুঁড়ে মারল দরজায়। কিন্তু অন্যপাশে বাতাসের হাত আরও শক্ত, বিন্দুমাত্র নড়তে দিল না পাল্লাটাকে। ভাল জেলখানাতেই আটকে পড়েছে সে!

ভীষণ অনুশোচনা হল তার, কাঁদতে শুরু করল। জোরে জোরে বলতে লাগল, এখান থেকে যদি জীবন্ত বেরোতে পারে, মদ খাওয়া ছেড়ে দেবে, জীবনে আর বোতল ছুঁয়ে দেখবে না। আর কখনও কাজে ফাঁকি দেয়ার চেষ্টা করবে না। খারাপ কাজ করবে না। একেবারে ভাল হয়ে যাবে, দুধে ধোঁয়া, বিমল, পরিষ্কার।

যেন তার ডাক শুনতে পেলেন ঈশ্বর, করুণা করলেন ক্ষণিকের জন্যে। ঝটকা দিয়ে হঠাৎ খুলে গেল পাল্লা। ওটার ওপরই কাত হয়ে হেলান দিয়ে ছিল জামবু, পড়ে গেল করিডরে। জোর বাতাসে পেছনে আবার দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল পাল্লা। মালপত্রের মার খাওয়া থেকে বাঁচল অন্তত সে।

উপুড় হয়ে পড়ে থেকে খুব অল্প সময়েই প্রতিজ্ঞা ভুলে গেল জামবু। কাজ করে মরুকগে কুমালো, তার কি? সুবিধেমত একটা জায়গা বেছে নিয়ে কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়ে পড়ল। অনেক ধকল গেছে, জিরিয়ে নেয়া দরকার।

একটানা বাতাস বওয়া বন্ধ হল, থেকে থেকে আসছে এখন ঝাপটা। কমছে বাড়ছে, কমছে বাড়ছে, এরকম করতে করতে থেমেই গেল একেবারে। কানফাটা গর্জনের পর এই স্তব্ধ নীরবতা আরও ভয়ঙ্কর মনে হল রবিনের। ছেড়া ছেড়া মেঘগুলো অদৃশ্য হয়ে গিয়ে ফুটে বেরোলো নীল আকাশ।
আল্লাহ্, বাঁচলাম! চেঁচিয়ে বলল মুসা। গেছে মরার তুফান!
রবিনের তা মনে হল না।
কলিগ বলল, অর্ধেকটা গেছে।
পানির ঘূর্ণির মতই পাক খেয়ে খেয়ে চলে হারিক্যানের বাতাস। একশো থেকে দুশো মাইল গতিতে। ঘোরার গতি প্রচণ্ড, কিন্তু সরার গতি খুব কম, বড় জোর ঘন্টায় বারো মাইল।
এই ঘূর্ণির মাঝখানে রয়েছে ঝড়ের চোখ, খুব শান্ত, বাতাস প্রায় থাকেই না কেন্দ্রবিন্দুতে।
বেশি হলে আধ ঘন্টা, ক্যাপ্টেন বলল। তারপরই অন্যপাশের দেখা পাব আমরা।
যার যার বাঁধন খুলে কুমালোর কাজে সাহায্য করতে গেল তিন গোয়েন্দা। জাহাজের ভেতরে বাইরে সব তছনছ করে দিয়েছে ঝড়। আরেকটু হলেই দড়ি ছিঁড়ে সাগরে পড়ে যেত ডিঙিটা, কোনমতে আটকে আছে।
কাজ করতে করতে ঘামছে ওরা। বাতাস খুব পাতলা, গরম, শ্বাস নিতে কষ্ট হয়।
ঝড় নেই, তবুও জাহাজটা এত দুলছে কেন প্রথমে বুঝতে পারল না কিশোর। ঝড় যখন ছিল, তখনকার চেয়ে বড় আর এলোমেলো ঢেউ এখন সাগরে। আসলে তখন বাতাসের গতি একটা বিশেষ দিকে ছিল, নিয়ন্ত্রণ ছিল পানির ওপর। এখন নেই। ফলে উত্তাল হয়ে উঠেছে পানি, যেন যা-ইচ্ছে-করার খেলায় মেতেছে। লাফিয়ে উঠছে ঢেউ, পঞ্চাশ ফুট, ষাট ফুট ওপরে গিয়ে ফাটছে, ঝরে পড়ছে। ফোয়ারার মত। যেন পানির নিচে জাহাজ বিধ্বংসী টর্পেডো ফাটানো হচ্ছে একের পর এক।
চারদিকে দাপাদাপি করছে পানি, ঢেউ আছড়ে ভাঙছে ঢেউয়ের ওপর, সৃষ্টি করছে হাজারো ফোয়ারা, অসংখ্য জলপ্রপাত।
পানির এই অস্থিরতার কারণও এখানে বাতাস নেই বলে। প্রচণ্ড গতিতে। চরকির মত পাক খেয়ে বাতাস ঘুরতে ঘুরতে মাঝখানে সৃষ্টি করেছে ফাঁপা শূন্যতা। বাতাসের চক্র ভেদ করে বেরোতে পারছে না ঢেউ, ফলে সবদিক থেকে ধেয়ে আসছে কেন্দ্রের দিকে, মহা-অনর্থ বাধিয়েছে এসে এই শূন্যস্থানে।
বড় যাত্রীবাহী জাহাজ কিংবা মালবাহী স্টীমার হলে এই অত্যাচার সহ্য করতে পারত না, ঠাই নিত গিয়ে এতক্ষণে সাগর দেবতার ভঁড়ারে। শুকতারা ছোট বলেই

পারছে। এ-ধরনের আবহাওয়া সহ্য করার ক্ষমতা বড়গুলোর চেয়ে ছোট জলযানগুলোর বেশি।
প্রথম কারণ, স্কুনারটা কাঠের তৈরি। কাঠ পানিতে ভাসে, ইস্পাত ভাসে না। বড় যে-কোন একটা ঢেউয়ের মাথায় উঠে যেতে পারছে ছোট বলে। বড়গুলো পারে না, ওগুলোর নিচে পড়ে একাধিক ঢেউ। ঢেউয়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মাথায় চড়ে বসতে পারে না, ফলে মার হজম করতে হয়। ভয়ঙ্কর চাপে বেঁকেচুরে ফেটে যায় খোল। – শাঁ করে একবার ঢেউ-পর্বতের চূড়ায় উঠে যাচ্ছে শুকতারা, তীব্র গতিতে আবার নামছে অন্ধকার উপত্যকায়। এদিকে কাত হচ্ছে, ওদিকে কাত হচ্ছে, দুলছে, গড়াচ্ছে, কিন্তু ডুবছে না, ভেসে রয়েছে কোনমতে।
শত শত পাখি এসে ঢুকেছে,এই কেন্দ্রবিন্দুতে। নাগালের মধ্যে যতগুলোকে। পেয়েছে, ঝেটিয়ে সব নিয়ে এসেছে যেন বাতাস। নুড়ি, বুবি, গাল, ডানা কাপাতে কাপাতে এসে বসছে ডেকে, ওপর থেকে খসে পড়ছে যেন। ডিঙির ওপরে এসে ঠাই নিল দুটো মস্ত ফ্রিগেট পাখি। শুধু পাখিই না, পাখাওয়ালা আরও জীব এসেছে, হাজারে হাজারে পতঙ্গ প্রজাপতি, মথ, মাছি, মৌমাছি, বোলতা, ঘাসফড়িং। ঝাকে ঝাকে এসে ছেয়ে ফেলছে মাস্তুল, পালের দড়ি। হাতে লাগছে, মুখে লাগছে, কানের কাছে ঘ্যান ঘ্যান করছে বিচিত্র সুরে।
উত্তর-পুবমুখো এগোচ্ছে জাহাজ। হঠাৎ ওটার নাক দক্ষিণ-পশ্চিমে ঘুরিয়ে ফেলল ক্যাপ্টেন।
এরকম করলেন কেন? কিশোর জিজ্ঞেস করল।
করলাম, যাতে ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে এগোতে পারে।
ঝড়টা এল আবার, আচমকা। আরেকটু হলেই উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল কিশোরকে। আবার শুরু হল বাতাসের গর্জন। হাতে মুখে বিধছে পানির কণা। অদৃশ্য হয়ে গেছে নীল আকাশ, মাথার ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে যেন কালো ভূতুড়ে অন্ধকার।
আগের বারের চেয়ে ঢেউগুলো, এখন ছোট, মাস্তুল ছাড়িয়ে যাচ্ছে না। ভয়ঙ্কর কোন উদ্দেশ্য নিয়েই বুঝি ছুটে চলেছে একদিকে।...
একটা ব্যাপার পরিষ্কার, হারিক্যানের প্রথম আঘাতের চেয়ে দ্বিতীয়টা খারাপ : হবে।বাতাস এবং ঢেউ, দুটোরই জোর বেশি। উধাও হয়ে গেল পাখি আর পতঙ্গ, যেন ভেল্কিবাজি। টুকরো টুকরো হয়ে গেল মাস্তুল, পাল যে কটা ঝুলছিল, ছিঁড়ে ফালাফালা। বুমটা ভেঙে বিপজ্জনক ভঙ্গিতে ঝুলতে লাগল ডেকের ওপর।
ভাঙা মাস্তুলের গোড়ায় নিজেদেরকে বাঁধার সাহস আর হল না তিন গোয়েন্দার। কুমালোর পদ্ধতি অনুকরণ করে টিকে রইল কোনমতে। জামবু কোথায় ভেবে অবাক হচ্ছে।

জাহাজটাকে দুদিক থেকে ধরে ভীষণ ভাবে আঁকাচ্ছে যেন কোন দানব। মড়মড় করে শব্দ হল পেছনে, টিল হয়ে গেল ক্যাপ্টেনের হাতের হুইল।
হালটা গেল! চিৎকার করে বলল কলিগ।
বাতাসের দিকে পেছন করে আর থাকতে পারল না শুকতারা। নিজের নিয়ন্ত্রণ শেষ। বাতাস এখন যেদিকে ঘোরাচ্ছে সেদিকেই ঘুরতে বাধ্য হচ্ছে। টেউয়ের তাথৈ নাচের মাঝে পড়ে বাদামের খোসার মত দুলতে লাগল, অসহায়।
প্রতিবার গড়ানোর সময় কয়েক টন করে পানি বয়ে যাচ্ছে ডেকের উপর দিয়ে, নিচে নামার পথ বেয়ে নেমে চলে যাচ্ছে খোলে।
পাম্প চালু করে দিয়েছে ক্যাপ্টেন, কিন্তু সেঁচে সারতে পারছে না। কুলিয়ে উঠতে পারছে না পাম্প, ফলে জমে যাচ্ছে পানি।
ঘুমিয়ে পড়েছিল জামবু। নাকে পানি ঢুকতে জাগল। দেখল, নোনা পানিতে। ডুবে আছে সে, ফুসফুসে ঢুকতে শুরু করেছে পানি। তড়াক করে লাফিয়ে উঠে ছুটল। হাঁসফাঁস করছে, কাশছে। কত তাড়াতাড়ি এখন ডেকে উঠবে কেবল সেই চেষ্টা।
প্রকৃতিও যেন খেলতে আরম্ভ করেছে দুষ্ট জামবুকে নিয়ে। ডেকে উঠেও সারতে পারল না সে, প্রচণ্ড এক ঢেউ এসে তাকে ভাসিয়ে নিল রেলিঙের দিকে।
পড়ে গেল! পড়ে গেল! চিৎকার করে উঠল ক্যাপ্টেন।
চিৎকারটা সবে বেরিয়েছে তার মুখ থেকে, এই সময় ফিরতি আরেকটা ঢেউ আবার জামবুকে এনে ডেকে আগের জায়গায় ফেলল। তার বোকা-হয়ে-যাওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল ছেলেরা।
জলদি উঠে ধর কোন কিছু, তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল ক্যাপ্টেন। নইলে আবার নিয়ে যাবে। সাগরে পড়লে আর উঠতে হবে না।
জামবুর দিকে বেশিক্ষণ নজর দেয়ার সময় কারও নেই। খুনী বাতাস পলিনেশিয়ানরা বলে হারিক্যানকে—শুকতারাকে খুন করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে যেন।
ভীষণ ভাবে দুলে উঠল জাহাজ। গোড়া থেকে মড়মড় করে ভাঙল প্রধান মাস্তুল। দড়িদড়ায় আটকে থাকায় পানিতে পড়ল না, ওটার ভারে বাঁ পাশে কাত হয়ে গেল জাহাজ। কয়েক মুহূর্ত পরে সামনের মাস্তুলটা ভাঙল, ডিঙির ওপর পড়ে গুঁড়িয়ে দিল ডিঙিটাকে।
আনন্দ ভ্রমণ শেষ। এখন আর জাহাজ বলা যাবে না শুকতারাকে, জাহাজের ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়েছে। যাত্রীরা প্রাণে বাঁচবে কিনা এখন তার আর বিন্দুমাত্র নিশ্চয়তা নেই।
নোঙর ফেলো, নোঙর! চেঁচিয়ে উঠল কলিগ।

থোলের মধ্যে পানি। প্রতিটি ঢেউ এখন গড়িয়ে যাচ্ছে জাহাজের ওপর দিয়ে। কাটা ঘায়ে নুনের ছিটের মত যোগ হল এর সঙ্গে বৃষ্টি। এক ফোঁটা দুফোঁটা নয়, মুষলধারে। অবিশ্বাস্য রকমের বড় বড় ফোঁটা।

এতক্ষণে বিশ্বাস করল কিশোর, হারিক্যানের ভয়াবহতা আর বৃষ্টি সম্পর্কে যা শুনেছে, সব সত্যি। হারিক্যানের সময় ফিলিপাইনে মাত্র চারদিনে যা বৃষ্টিপাত হয়, তা ইউনাইটেড স্টেটস-এর পুরো এক বছরের বৃষ্টিপাতের সমান।

এই বৃষ্টির চেয়ে মাথার ওপর ঢেউ ভেঙে পড়া অনেক আরামের ছিল।

কোথাও গিয়ে মাথা গোঁজার সময় নেই, উপায়ও নেই। এক্ষুনি নোঙর ফেলতে না পারলে বাঁচানো যাবে না জাহাজটাকে। কিন্তু কিশোর বুঝতে পারল না এই গভীর পানিতে নোঙর ফেলবে কি করে?

বাতলে দিল ক্যাপ্টেন। কুমালোকে নিয়ে কাজে লেগে গেল ছেলেরা। ছোট মাস্তুলটাকে টেনে-হিঁচড়ে প্রধান মাস্তুলের কাছে নিয়ে গিয়ে এক করে পেঁচিয়ে বাঁধল। তারপর দুটোর মাঝামাঝি জায়গায় শক্ত দড়ি বেঁধে দড়ির, আরেক মাথা বাঁধল গলুইয়ের কাছে নোঙর বাধার খুঁটিতে। যেসব দড়িতে মাস্তুলগুলো আটকে রয়েছে ওগুলো কেটে দিতেই পিছলে গিয়ে পানিতে পড়ল মাস্তুল দুটো। সোজা হয়ে গেল জাহাজ।

আরেকটা ব্যাপার ঘটল। ভারি মাস্তুলগুলো ডুবে ডুবে ভেসে রয়েছে পানিতে। বাতাস লাগছে না, ঘোরাতেও পারছে না ওগুলোকে, কিন্তু জাহাজটাকে ধাক্কা দিয়ে সহজেই ঘুরিয়ে ফেলছে। নোঙরের কাজ করছে এখন মাস্তুল দুটো। টান লেগে জাহাজের মুখ ঘুরে গেল বাতাসের দিকে, ঢেউয়ের মুখোমুখি। ফলে বাতাসের চাপ যেমন কমল অনেকখানি, ঢেউয়ের আঘাতও। দুপাশ দিয়ে কেটে বেরিয়ে যাচ্ছে। বাতাস আর ঢেউ দুটোই।

আরও একটি ঘন্টা ঝড়ের সঙ্গে প্রাণপণে ঝুঝলো ছোট্ট জাহাজটা। কোনমতে ভেসে রইল পানির ওপরে।

তারপর যেমন হঠাৎ এসেছিল তেমনি গর্জন করতে করতে পেছনে সরে গেল ঝড়।

আবার দেখা দিল নীল আকাশ। বেরিয়ে এল সূর্য। বারো নট গতিতে পশ্চিমে সরে যাচ্ছে বাতাসের প্রচণ্ড ঘূর্ণি।

ঝড় সরে যাওয়ার পর আরও ফুসে উঠল সাগর, বাতাসের চাপ হঠাৎ কমে যাওয়ার প্রতিক্রিয়া। তারপর শান্ত হয়ে এল আস্তে আস্তে। ঢেউ আছে, তবে ছোট, ডেকের ওপরে আর উঠতে পারছে না, পানিও ঢুকছে না আর কোলে। জিততে শুরু করেছে পাম্প। আগেরমত ভেসে উঠছে জাহাজ।

হাঁপ ছেড়ে বাঁচল জাহাজের ছজন মানুষ। মনে মনে ধন্যবাদ দিল ঈশ্বরকে, যারা ঈশ্বরে বিশ্বাসী।
ট্যাংকগুলোর অবস্থা দেখতে গেল কিশোর। সব কটার ঢাকনা লাগানো রয়েছে। পানি কানায় কানায় ভরা। ফলে কোন ক্ষতি হয়নি ভেতরের অধিবাসীদের। আনন্দেই আছে, এতবড় একটা ঝড় যে গেল যেন বুঝতেই পারেনি।
মাস্তুলগুলোর কি হবে? ক্যাপ্টেনকে জিজ্ঞেস করল কিশোর। ফেলে দিয়ে যাব?
না। পোনাপতে গিয়ে ঠিকঠাক করে আবার লাগাব।
কাজ চালানোর মত মেরামত হল হালটা। কিন্তু পাল আর তোলা গেল না। ছোট্ট ইঞ্জিনের ক্ষমতা নিঙড়ে, ভারি দুটো মাস্তুল পেছনে টানতে টানতে, ধুকে ধুকে পোনাপের দিকে এগিয়ে চলল শুকতারা।
প্রায় অচেনা-সাগরে এসে পড়েছে এখন জাহাজ। ক্যাপ্টেন কলিগও এখানে আসেনি কখনও। কোন জাহাজ চোখে পড়ল না, জাহাজপথ এখান থেকে অনেক দূরে, উত্তরে এবং দক্ষিণে।
দুটো বিশ্বযুদ্ধের মাঝামাঝি সময়টা এই অঞ্চল জাপানের দখলে ছিল। অন্য কোন দেশের জাহাজকে ঢুকতে দিত না এখানে। জাপান ছাড়া বাইরের দুনিয়ার আর কারও সঙ্গে যোগাযোগ ছিল না এখানকার আড়াই হাজার অধিবাসীর। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এখানে আসত অন্য দেশের অভিযাত্রীরা।
অবস্থা এখনও প্রায় সেই একই রকম রয়েছে, কর্তৃত্ব হাতবদল হয়েছে মাত্র। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে, ইউনাইটেড নেশনসের হয়ে দ্বীপগুলো শাসন করছে এখন ইউনাইটেড স্টেটস।
আমেরিকান নৌবাহিনীর যেসব লোক কর্মরত রয়েছে এখানে, তাদের মনে হয়, পৃথিবীতে নয়, অন্য কোন গ্রহে বন্দি জীবনযাপন করছে। জীবনে কোন উত্তেজনা নেই, নতুনত্ব নেই, কাজেই ভাঙাচোরা শুকতারা আর এর অধিবাসীদের দেখে স্বাভাবিকভাবেই উত্তেজনা সৃষ্টি হল তাদের মাঝে। পোনাপেতে অতিথির আগমন! অতিথিরাও উত্তেজিত, বিস্মিত। ভাঙা জাহাজ থেকে মাটিতে পা রাখার জন্যে যেন আর তর সইছে না। এত সুন্দর দ্বীপ আর দেখেনি ওরা।
আরিব্বাবা, এত সুন্দর! মুগ্ধ বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। সাদা সৈকত, নীল ল্যাগুন, আর সবুজে ছাওয়া আকাশচুম্বী পর্বত। মনে হয় ছবি। পর্বতের ঢালে – সাজিয়ে রাখা হয়েছে যেন নারকেলগুচ্ছ, ডালা ছড়ানো আমগাছ, বিশাল বট আর অন্যান্য শত শত জাতের গাছপালা, ফলের ভারে নুয়ে পড়েছে, ছেয়ে আছে ফুলে ফুলে। ঠিকই নাম রেখেছিল প্রাচীন স্পেনের নাবিকেরা–বাগানদ্বীপ।
দক্ষিণ সাগরের নিচু প্রবাল অ্যাটলগুলোতে বৃষ্টিপাত প্রায় হয়ই না, অথচ পোনাপের আবহাওয়া এর উল্টো। প্রচুর বৃষ্টি হয়। ঝড়বাদলকে স্বাগত জানিয়ে

ডেকে আনে পর্বতের উঁচু উঁচু চূড়াগুলো। এই যে এখন, চারপাশে ঝকঝকে রোদ, এই এখনও টটল নামের চূড়াটার ওপর জমে রয়েছে কালো মেঘ, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে থেকে থেকে।
খাইছে! ছিটকে বেরিয়ে আসবে যেন মুসার চোখ।
খালি যে তাহিতি আর সামোয়ার কথা বলে লোকে, রবিন বলল। এর চেয়ে ভাল?
ধারেকাছে আসতে পারবে না, ক্যাপ্টেন বলল। ওই দুটো দ্বীপ দেখেছে সে।
তাহলে এটার কথা বেশি শোনা যায় না কেন?
লোকে বেশি আসতে পারে না বলে।
আরি, একেবারে দেখি জিবরালটার! বলে উঠল মুসা।
হ্যাঁ, একেবারে জিবরালটারের মতই। চার্ট বলছে, ওটার নাম রক অভ চোকাচ। বন্দরের ওপরে নশো ফুট উচু হয়ে আছে। ব্যাসল্টের পাহাড়, ঢল এত খাড়া, দুঃসাহসী পর্বতারোহীও ওঠার আগে দশবার দ্বিধা করবে।
প্রবাল প্রাচীরের একটা ফাঁকের ভেতর দিয়ে এগিয়ে গেল শুকতারা। দ্বীপের সৌন্দর্য যেন চুইয়ে এসে পড়েছে ল্যাগুনেও। তীরের খুব বেশি কাছে যাওয়া গেল না, বিপজ্জনক চড়ার জন্যে। দশ ফ্যাদম পানিতে নোঙর ফেলল ক্যাপ্টেন।...
কিছু মাছধরা নৌকা আর নেভির বিশেষ জলযান ছাড়া কোন জাহাজ নেই বন্দরে। বিমান একটা দেখা গেল, ক্যাটালিনা বিমান, ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে রয়েছে যেন।
দ্বীপের একাংশে গড়ে উঠেছে শহর। সেদিক থেকে বেরিয়ে এগিয়ে এল একটা লঞ্চ। শুকতারার পাশে এসে থামল। লঞ্চ থেকে জাহাজের ডেকে নামল একজন সুদর্শন তরুণ নেভাল অফিসার। পরিচয় দিল, কমাণ্ডার ফেলিক্স ম্যাকগয়ার, পোনাপের ডেপুটি মিলিটারি গভর্নর।
হারিক্যানের স্বাদ তাহলে ভালই পেয়েছেন, বলল অফিসার।
শেষ করে দিয়েছে একেবারে, স্বীকার করল ক্যাপ্টেন। আপনাদের ওপর দিয়েই গেছে নাকি?
না, ভাগ্য ভাল, উত্তর দিয়ে সরে গেছে। কিন্তু আমাদের একটা সাপ্লাই শিপ পড়েছিল ওটার পথে।
তারপর?
ডুবে গেছে। পুরো পাঁচ হাজার টন। আপনাদের এই বাদামের খোসাটা বাঁচল কিভাবে? আশ্চর্য!
গর্বিত ভঙ্গিতে শুকতারার ওপর চোখ বোলাল ক্যাপ্টেন। ছোট জাহাজ তো, তাই। তবে খুব মজবুত। এখানে মেরামত করানোর জায়গা আছে?
আছে। শিপইয়ার্ড।

নিশ্চয় কাগজপত্র দেখতে চাইবেন, বলতে বলতে বের করল কলিগ। পোর্ট চার্জ কত?
হেসে উঠল কমাণ্ডার। লাগবে না। লোকজন খুব একটা আসে না আমাদের এখানে, তাই পোর্ট চার্জ নিয়েও ভাবি না। ছমাসের মধ্যে বাইরের লোক এই আপনারাই এলেন। তা থাকবেন কদ্দিন?।
ও বলতে পারবে, কিশোরকে দেখিয়ে দিল কলিগ। কিশোর পাশা। এই অভিযানের লীডার।
বেশি দিন না, কিশোর বলল। মিস্টার কলিগ তাঁর জাহাজ মেরামত করুন। আমরা শুধু শুধু বসে থেকে আর কি করব? একটা মোটর-বোট ভাড়া করে আশেপাশের যে কটা দ্বীপ পারি, ঘুরে দেখে আসব।
এক মুহূর্ত নীরবতা। আরও বিস্তারিত শোনার জন্যে অপেক্ষা করছে। ম্যাকগয়ার। কিন্তু প্রফেসরের মুক্তাদ্বীপের কথা সবার সামনে কমাণ্ডারকে বলার ইচ্ছে নেই কিশোরের।
বেশ, ম্যাকগয়ার বলল। বোট একটা ঠিক করে দেব। এখন নিশ্চয় তীরে যেতে চাও। উঠে পড়ো আমার লঞ্চে, কে কে যাবে।
ক্যাপ্টেন, রবিন, মুসা আর কুমালো উঠল লঞ্চে। কিশোর উঠতে যাবে, এই সময় কলিগ বলে উঠল, জামবু কই?
দেখি, ডেকে আনি।
ফোরক্যাসলে তাকে পেল না কিশোর। স্টোররুম খুঁজতে গেল। সেখানেও দেখল না। খসখস শব্দ কানে আসতে গিয়ে একটানে খুলল কেবিনের দরজা, যেটাতে ওরা তিনজন থাকে।
ওই তো জামবু। কিশোরের নোটবুক আর ফাইলপত্রের পাতা ওল্টাচ্ছে। এই, কি করছ? তীক্ষ্ণকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল কিশোর।
না, কিছু না, ভোঁতা গলায় জবাব দিয়ে, কিশোরকে প্রায় ঠেলে সরিয়ে। কেবিন থেকে বেরোলো জামবু। সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল ডেকে। একটা কথা বলল না। চুপচাপ গিয়ে উঠল লঞ্চে।
চিন্তিত হয়ে পড়েছে কিশোর। নিশ্চয় মুক্তাদ্বীপের কথা জানে লোকটা, তার কাগজপত্র ঘেঁটে দেখতে চাইছিল কোন তথ্য আছে কিনা। তারমানে প্রফেসর ইস্টউডের প্রাণনাশের হুমকি যারা দিয়েছে, তাদেরই চর জামবু। শুকতারায় উঠেছে
তথ্য জোগাড়ের উদ্দেশ্যে।
যা হবার হয়ে গেছে, লঞ্চে আর কিছু বলল না কিশোর। তবে মনে মনে ঠিক করে ফেলেছে, মুক্তাদ্বীপে তাদের সঙ্গে আর যে-ই যাক, জামবু অন্তত যাচ্ছে না।

এমনকি শুকতারা, যখন আবার পাল তুলবে দেশে ফেরার জন্যে, তাতেও মান্না হিসেবে আর নেয়া হবে না লোকটাকে।
দ্বীপটাতে তিরিশ বছর রাজত্বের স্বাক্ষর ভালমতই রেখে গেছে জাপানীরা। পোনাপের বেশিরভাগ স্টোর আর বাড়িঘর তৈরি হয়েছে জাপানী কায়দায়, ওরাই তৈরি করে রেখে গিয়েছে। শহরের বাইরে পাতা দিয়েঙ্কুঁড়ে তুলেছে স্থানীয় অধিবাসীরা।
একটা টিলার মাথায় চমৎকার একটা জাপানী বাংলোতে অভিযাত্রীদের নিয়ে এল কমাণ্ডার। টিলাটার এক ধার খাড়া নেমে গেছে সাগরে। বন্দর চোখে পড়ে ওখান থেকে, দেখা যায় বন্দরের ওপাশের বিশাল উঁচু রক অভ চোকাচ।
এটা তোমাদের বাড়ি,ম্যাকগয়ার বলল। যতদিন মন চায় থাক।
হলুদ মাদুরে এতে খুব আরাম। শুয়ে শুয়েই চোখে পড়ে নীল ল্যাগুনের এখানে ওখানে খুদে খুদে দ্বীপ, সাদা পালতোলা মাছ ধরা নৌকা। দেখা যায়, কয়েক হাজার ফুট উঁচু পর্বতের ওপর থেকে ঝরে পড়া রূপালি জলপ্রপাত।
বেহেশতই এটা, কি বল, কিশোর? মুসা বলল।
কিন্তু তার কথা কিশোরের কানে ঢুকল কিনা বোঝা গেল না। না বলে আবার কোথায় গায়েব হয়ে গেছে জামবু।
শহরে মাত্র একটা বিজনেস স্ট্রীট। কাজেই পোস্ট এক্সচেঞ্জটা খুঁজে পেতে অসুবিধে হল না জামবুর।
ভেতরে ঢুকে এমন ভাব করল, যেন এখানে তার সঙ্গে কারও দেখা করার কথা। বিশালদহৌ এক লোক এগিয়ে এল, পিঠটা সামান্য কুঁজো। হাসল না। হাত বাড়িয়ে দিল না। রূঢ়কণ্ঠে বলল, এতক্ষণে এলে? জাহাজটা সেই কখন ঢুকতে দেখলাম। আধ ঘন্টা ধরে দাঁড়িয়ে আছি: এখানে। চোখে সন্দেহ নিয়ে আড়চোখে তাকাল একবার ক্লার্কের দিকে। বেরোও। এখানে কথা বলা যাবে না।
মেইন রোড ধরে এগোল ওরা। পয়লা মোড়টাতেই ঘুরে নেমে পড়ল একটা গলিতে। এঁকেবেঁকে পাহাড়ের দিকে চলে গেছে পথটা, পাতার কুঁড়েগুলোর মাঝখান দিয়ে। প্রতিটি বাড়িতেই বাগান আছে। বাতাসে ফুলের সুবাস, জ্যাসমিন, ফ্র্যাঙ্গিপ্যানি, সিন্যামোন, আর আল্পও নানা জাতের ফুল। বিশাল একটা রুটিফল গাছের নিচ দিয়ে চলল দুজনে, ফুটবলের সমান বড় বড় ফল ধরে আছে গাছটাতে। পথে ওরকম আরও ডজন খানেক গাছ পড়ল। আরও নানারকম উদ্ভিদ। একটা বোটানিকেল গার্ডেনে এসে হাজির হয়েছে যেন।
গাছপালার সঙ্গে পাল্লা দিয়েই যেন বাড়ে এখানকার মানুষগুলো। পুরুষেরা ছয় ফুটের বেশি লম্বা, পেশিবহুল শরীর, বাদামি চামড়া। মেয়েরাও কম লম্বা নয়। খোঁপায় সাদা ফুল গোঁজা, কিংবা মালা জড়ানো। হাসিখুশি মোটাসোটা শিশু

তাদের কোলে। রাস্তার ওপর বসে আছে একটা সুন্দর বাচ্চা। বিশালদেহী লোকটার দিকে চেয়ে ফোকলা হাসি হাসল।
পা দিয়ে ঠেলে, প্রায় লাথি মেরেই বাচ্চাটাকে পাশের ঝোপে ফেলে দিল লোকটা। চিৎকার করে কেঁদে উঠল বাচ্চাটা।
অস্বস্তি বোধ করছে জামবু। লোকটা ভীষণ বদমেজাজী। ভয়ই পাচ্ছে এখন। যা বলতে এসেছে, সেটা শুনে মোটেই খুশি হবে না ও। কারণ খুশি করার মত কোন তথ্য জানতে পারেনি সে।
ইউরোপিয়ান স্টাইলে তৈরি একটা বাড়ির বাগানে ঢুকল ওরা। লেবু, কমলা, ডালিম, ম্যাংগোস্টীন আর পিকক পাম নামে একজাতের তাল জাতীয় গাছ প্রচুর জন্মে আছে।
ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলল লোকটা। জামবুকে নিয়ে এল একটা ঘরে। ছাতা পড়া দেয়াল। তাড়াহুড়ো করে এসে ঢুকল দুজন পোনাপিয়ান চাকর। চেয়ার সাজিয়ে দিল মেয়েটা। পুরুষটা ভাঙা ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল, প্রভু কি খেতে ইচ্ছে করেন।
বেরো এখান থেকে! গর্জে উঠল লোকটা। দুজনেই যা! বলেই ঘাড় ধরে ধাক্কা মারল মেয়েটাকে। হুমড়ি খেয়ে গিয়ে পড়ল সে তার সঙ্গীর, পিঠে। পেছন ফিরেও তাকাল না আর ওরা। দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল লোকটা।
নোঙরা ছুঁচোর দল! খেপা কুকুরের মত দাঁত খিচাল সে। বাদামী চামড়ার নিকুচি করি! আমাকে দায়িত্ব দিলে কবে দ্বীপ থেকে ঝেটিয়ে খেদাতাম ব্যাটাদের!
একটা চেয়ারে জামুবকে বসার ইঙ্গিত করে তার মুখখামুখি আরেক চেয়ারে। বসল লোকটা। সামনে ঝুঁকল। দুজনের চোখের দূরত্ব এখন মাত্র দুই ফুট। তার বাঁকা পিঠ দেখে মনে হয়, শিকারের ওপর ঝাঁপ দিতে তৈরি হচ্ছে সিংহ।
অল রাইট। বলে ফেলো এবার! ঘেঁকিয়ে উঠল লোকটা। অবস্থান জানতে পেরেছ?
শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে যেন জামবুর। যত দেরি করে বলা যায়, ততই ভাল। বড় শক্ত কাজ দিয়েছেন আমাকে। কত চেষ্টা করলাম। যখনি ওরা কথা বলেছে, আড়ি পেতেছি। দ্বীপটা সম্পর্কে একটা কথা বলেনি। ওদের জিনিসপত্র…
অতো কথা শুনতে চাই না। দ্বীপটা কোথায় জেনেছ? জেনেছি বলব না, তবে…।
কথা শেষ করতে পারল না জামবু। বিশাল মুঠোর এক ঘুসি এসে লাগল মুখে। ঝটকা দিয়ে ঘুরে গেল মাথা, চেয়ার উল্টে ধুড়ুম করে মেঝেতে পড়ল সে। কাঁপতে কাঁপতে উঠে বসল, রক্তাক্ত নাক চেপে ধরেছে।
এর জন্যে….এর জন্যে ভুগতে হবে তোমাকে ডেংগু…

ভয় দেখাচ্ছিস? কাছে এসে দাঁড়াল ডেংগু ! জামবুর মনে হল বিশাল এক পাহাড় এসে দাঁড়িয়েছে তার মাথার ওপর। পাহাড়টার হাত রিভলভারের বাঁটে।
আমি…আমি কিছু ভেবে বলিনি, মিস্টার পারভি!
খটাস করে জামবুর কানে পিস্তলের বাটের বাড়ি পড়ল। চুপ, ব্যাটা! খবরদার, আর কখনও আমার নাম মুখে আনবি না। আমি চাই না, এখানে কেউ আমাকে চিনে ফেলুক।
চিনবে না? সবাই তো জানে আপনি অনেক বড় মুক্তা ব্যবসায়ী, সুলু সাগরের থারসডে আইল্যাণ্ড থেকে এসেছেন।
ওখানে জানে, এখানে না। মুক্তার কথা ভাবেই না কেউ এখানে।
বেশ, ডেংগু পারভি নন আপনি। বিষুব অঞ্চলের দক্ষিণ থেকে আসেননি, মুক্তা ব্যবসায়ী নন। তাহলে কে আপনি?
সোজা হল লোকটা। ধুর্ত এক চিলতে হাসি ঠোঁটে ফুটেই মিলিয়ে গেল। আমি? কিছু যদি মনে না কর, তাহলে আমি রেভারেণ্ড হেনরি রাইডার ভিশন। আমেরিকায় গো-ইয়ে-ফোর্থ গির্জার পাদ্রী ছিলাম। এখন মিশনারি। সুদুর এই দ্বীপে উড়ে এসেছি এখানকার অসভ্য মানুষগুলোর মনে ঈশ্বরের আলো জ্বালাতে।
গুঙিয়ে উঠল জামবু। আপনার যা ভাবসাব, কি করে বিশ্বাস করাবেন আপনি মিশনারি? দুদুটো খুনের অপরাধে আপনাকে খুঁজছে পুলিশ। ধরতে পারলেই আবার নিয়ে গিয়ে জেলে ঢোকাবে।
ধরতে পারলে তবে তো। আর বিশ্বাস কিভাবে করাব বলছ? শুনলে অবাক হবে, দোস্ত, আমার বাবা সত্যিই পাদ্রী-ছিল। সানডে ইস্কুলে পড়ালেখা করতে বাধ্য করা হয়েছে আমাকে। বাইবেল আমার মুখস্থ, গড়গড় করে বলে যেতে পারি। মাঝে মাঝে উচ্চারণে গোলমাল করে ফেলি বটে, কিন্তু এখানে কে সেটা বুঝবে? জেলখানার পাদ্রীই ধরতে পারেনি।
কিন্তু এই ছদ্মবেশ কেন?
ডেংগুর হাসি দূর হয়ে গেল। কেন সেটা আবার জিজ্ঞেস করছ? গর্জে উঠল সে। গোড়া থেকেই আমার সন্দেহ ছিল, তোমাকে দিয়ে হবে না এই কাজ। মনে মনে তৈরিই ছিলাম, কি করতে হবে।
ছেলেগুলোকে ফাঁকি দেবেন?
নিশ্চয়ই। কয়েকটা বাচ্চা ছেলে, আমার মত একজন ভদ্রলোককে পেলে খুশিই হবে। ভুলিয়ে ভালিয়ে কথা ঠিকই আদায় করে ফেলব। ইতিমধ্যেই অবশ্য অনেক কিছু জেনে গেছি। বাগ লুকিয়ে রেখেছিলাম প্রফেসরের ল্যাবরেটরিতে। প্রত্যেকটা কথা শুনেছি। প্রফেসর ব্যাটা খুব চালাক। দ্বীপটার অবস্থানের কথা

মুখে কিছু বলেনি। ছেলেগুলো বেরিয়ে যাওয়ার পর ওদের পিছু নিয়ে স্যালভিজ ইয়ার্ডটাও চিনে এসেছি। তবে তাতে তেমন কোন কাজ হয়নি। এক মুহূর্ত থামল সে। কাজ করতে পারার কথা ছিল তোমার। এত পথ একসঙ্গে এসেছ। কিন্তু বুদ্ধ তো, পারবে কি করে।
রিভলভারটা আবার শোল্ডার হোলস্টারে ঢুকিয়ে রাখল ডেংগু। জামবুকে দরজা দেখিয়ে বলল, যেতে পার এবার। আমার অনেক সময় নষ্ট করেছ।
কিন্তু জামবু নড়ল না। কথা ভুলে যাচ্ছেন না আপনি?
কথা? কিসের কথা?
আমার টাকা?
কুকুরের মত ঠোঁট ভেঙুচাল ডেংগু। আবার টাকা! কাজটা কি করেছ শুনি? কিছুই জানতে পারোনি, উল্টো ছেলেগুলোর সন্দেহ জাগিয়ে দিয়ে এসেছ। তোমার বরং এখন আমাকে ক্ষতিপূরণ দেয়ার কথা। যাও ভাগো। নইলে ঘাড় মটকে দেব।
যাচ্ছি, নাকী সুরে বলে দরজার দিকে এগোল জামবু। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে অনেকটা নিরাপদ বোধ করল, বলল, এর জন্যে ভুগতে হবে তোমাকে, ডেংগু, কপালে দুঃখ আছে। তোমার সমস্ত জারিজুরি ফাঁস না করে দিয়েছি তো আমার নাম জামবু নয়। এখুনি আমি ছেলেগুলোকে গিয়ে সব বলে দেব।
কালো হয়ে গেল ডেংগুর মুখ। হাত চলে গেল রিভলভারের বাটে। কিন্তু বের করতে গিয়েও করল না। দ্রুত ভাবনা চলেছে মাথায়। জামবু ঠিকই বলেছে, তার সমস্ত জারিজুরি খতম করে দিতে পারে। ওকে থামাতে হবে। কিন্তু কিভাবে? এই দিনের বেলা খুন্ন করা চলবে না। গুলির শব্দ অনেকের কানে যাবে এখানে গুলি করলে। টাকা দিয়ে দেবে? তাহলেও শয়তানটার মুখ বন্ধ করা যাবে কিনা সন্দেহ। আরও টাকার জন্যে চাপ দেবে, শুরু করবে ব্ল্যাকমেইল। না, অন্য কোন ভাল ব্যবস্থা করতে হবে।
চেহারাটা স্বাভাবিক রাখল ডেংগু। শোনো, এদিকে এস। বুঝতে পেরেছি, দুর্ব্যবহার করে ফেলেছি তোমার সঙ্গে। তোমার সাধ্যমত করেছ, ছেলেগুলো মুখ না খুললে তুমি কি করবে? এরচে বেশি অন্য কেউ হলেও করতে পারত না। ঠিক আছে, টাকা আমি তোমাকে দেব। গলাটা শুকিয়ে গেছে। চল, কোথাও বসে ভিজিয়ে নেয়া যাক।
ডেংগুর এই হঠাৎ পবিবর্তনে সন্দেহ হল জামবুর। কিন্তু টাকা আর মদের লোভও সামলাতে পারল না। লোকটার সঙ্গে চলল সে।
আবার মেইন স্ট্রীটে ফিরে এল ওরা। টিলাটার দিকে এগোচ্ছে ডেংগু, যেটাতে ছেলেরা উঠেছে। অস্বস্তি বোধ করতে লাগল জামবু।

কিন্তু বাংলো পর্যন্ত গেল না ডেংগু। তার আগেই রাস্তা পেরিয়ে ছোট একটা লিকার শপের দিকে এগোল।
একটা গাছের নিচে জটলা করছে কয়েকজন পোনাপিয়ান জেলে, মাছ ধরে ক্লান্ত হয়ে এখন বিশ্রাম নিতে এসেছে। তাদের ঠেলে সরিয়ে দোকানের দরজার দিকে এগোল ডেংগু। জামবুকে নিয়ে ভেতরে ঢুকল। রোগাটে একজন শ্বেতাঙ্গ বসে আছে কাউন্টারের ওপাশে।
তাকে বলল ডেংগু, বিল, ও আমার বন্ধু, জামরুকে দেখাল সে। এইমাত্র এল। গলা ভেজানো দরকার। বেশি করে দিতে হবে।
নিশ্চয়, বিল বলল। হতচ্ছাড়া এই দেশে তো কেউ আসে না। বন্ধু এসেছে, তোমার কেমন খুশি লাগছে, বুঝতেই পারছি। দেব, যত চাও।
আনন্দ করতে চাই আজ, জানালার বাইরে তাকাল ডেংগু। মন খুলে। আর পার্টি ছাড়া আনন্দ হয় না। লোক আর পাব কোথায়? জামবু, ওই ব্যাটাদেরই গিয়ে ডেকে আনে।
না না, ওদের নয়, তাড়াতাড়ি বাধা দিল বিল। বাদামিদের মদ খাওয়া এখানে বেআইনী।
আরে রাখ তোমার আইন! পকেট থেকে একতাড়া নোট বের করে বিলের নাকের কাছে নাড়ল। এই যে আইন। জামবু, যাও, ডেকে আনো।
কানাকাগুলোকে মদ খাওয়ানোর কোন ইচ্ছেই নেই জামবুর। কিন্তু ডেংগুর যদি পয়সা বেশি হয়ে যায় তার কি? দরজায় বেরিয়ে হাত তুলে ডাকল লোকগুলোকে। অদৃশ্য গেলাস ঠোঁটের কাছে নিয়ে মদ খাওয়ার ভঙ্গি করল।
একবারই যথেষ্ট। হুল্লোড় করে ছুটে এল জেলেরা।
মদ তো নয়, পোনাপিয়ানদের জন্যে ডিনামাইট। ওসব ছাড়াই ওদের শান্ত রাখা মুশকিল, যোদ্ধার রক্ত ওদের শরীরে, পূর্বপুরুষেরা ছিল দারুণ লড়ুয়ে, কথায় কথায় লেগে যেত। মদ পেটে পড়লে যেন উন্মাদ হয়ে যায়। এই জন্যেই ওদের কাছে মদ বিক্রি নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে।
একটা কাজ করতে পারি আমি, বিল বলল। মদ তোমার কাছে বিক্রি করব। তোমার জিনিস তুমি কাকে দেবে, সেটা তোমার ব্যাপার।
ঠিক আছে। খুব কড়া দেখে দাও।...জামবু, এই নাও টাকা, বিশ ডলার তার হাতে গুঁজে দিল ডেংগু। যত খুশি মদ কিনে খাওয়াও বন্ধুদের। টাকা লাগে আরও দেব।
টাকাটা বিলকে দিল জামবু।
ও-কে। এই রসিদটা সই কতো, মেমোবুকটা ঠেলে দিল বিল।
কেন?

নিয়ম। এখানে মদ কিনলে সই করতে হয়। কার কাছে বিক্রি করলাম পুলিশ জানতে চাইবে।
মদ খাওয়ার জন্যে অস্থির হয়ে গেছে জামবু। কিছুই না ভেবে সই করে দিল।
ফিরে চেয়ে দেখল, ডেংগু নেই, কোন্ ফাঁকে চলে গেছে।
ঘন্টা দুয়েক পর তুমুল হই-হট্টগোল কানে এল তিন গোয়েন্দার। প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখায় ব্যাঘাত ঘটল ওদের।
ক্যাপ্টেন কলিগ জাহাজে ফিরে গেছে। কুমালো রান্নাঘরে ব্যস্ত।
কুমালো, ডেকে বলল কিশোর। বাইরে গিয়ে দেখ তো কি হয়েছে।
বেরিয়ে গেল কুমালো। খানিক পরেই হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এল। দাঙ্গা লেগেছে...-জামবুকে পুলিসে ধরেছে...।
হুড়াহুড়ি করে রাস্তায় বেরোল তিন গোয়েন্দা।
এদিক ওদিক দৌড় দিয়েছে জনাবারো পোনাপিয়ান, মাতাল বোঝাই যায়। ছুরি মারামারি করেছে দুজনে, শরীর জখম, রক্ত ঝরছে। রাস্তার অনেক নিচে জামবুকে ধরেছে দুজন নেভাল পুলিশ।
পথের একপাশে দাঁড়িয়ে আছে লম্বা এক লোক, পিঠ সামান্য কুঁজো। হাতে কাল একটা বই।
ছেলেরা এগোল। তাদেরকে দেখে এগিয়ে এল লোকটা। দুর্ভাগ্য, বলল সে। ভারি দুর্ভাগ্য ওদের। করুণার দৃষ্টিতে তাকাল মাতালগুলোর দিকে।
কি হয়েছে? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
ওই জাহাজীটা মদ খাইয়েছে ওদের। বেআইনী, ভীষণ বেআইনী! ঈশ্বর তো নিষিদ্ধ করেছেনই, মানুষও করেছে এখানে। বাইরে থেকে আসে শয়তান, এখানকার নিস্পাপ সরল লোকগুলোর সর্বনাশ করে।
জামবুর দিকে তাকাল কিশোর। পুলিশে খবর দিল কে?
আমি দিয়েছি। এখানকার নাগরিক এবং মিশনারি হিসেবে এটাকে আমার কর্তব্য মনে করেছি।
কিশোর লক্ষ্য করল, লোকটার হাতের ছোট বইটা বাইবেল। ভাবল, পোনাপিয়ানদের সৌভাগ্য, এরকম একজন মানুষ পেয়েছে তাদের মাঝে।
কি শাস্তি হবে?
বেশি না, জোরে নিঃশ্বাস ফেলল মিশনারি। এই বড় জোর মাস দুই জেল। তারপর বের করে দেবে দ্বীপ থেকে। দেশে পাঠিয়ে দেবে।
জামবুর জন্যে সুপারিশ করতে যাবে কিনা ভাবল কিশোর। শেষে ভাবল, থাক, এই ভাল হয়েছে। শয়তানির শাস্তি হয়েছে, তার পথের কাঁটাও দূর হয়েছে। জাহাজে তুললে আবার লাগত ওর বিরুদ্ধে, প্রফেসরের গোপন দ্বীপের খবর

জানার চেষ্টা চালাত। আরও কি কি করত কে জানে! জেনেশুনে বিপদ সঙ্গে নেয়ার কোন মানে হয় না। জেলে আটকে থাকলে তার আর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। সৌভাগ্যই বলতে হবে।
জেলটা কি খুব খারাপ?
মোটেই না। খাবে আর ঘুমাবে, ব্যস। ওরকম একটা শয়তানের জন্যে বরং বেশি ভাল।
হাত বাড়িয়ে দিল কিশোর। আমি কিশোর পাশা। ও আমার বন্ধু মুসা আমান, আর ও রবিন মিলফোর্ড। আজই এলাম, একটা জাহাজ নিয়ে। শুকমর্নিং স্টার। হারিক্যান একেবারে গুড়িয়ে দিয়েছে জাহাজটাকে।
তাই! আহা! আফসোস করল আগন্তুক। ধরল কিশোরের হাত। আমি হেনরি। রেভারেণ্ড হেনরি রাইডার ভিশন। রবিন আর মুসার সঙ্গেও হাত মেলাল সে।
পোনাপেতে কোন গির্জায় আছেন?
না। আমিও এসেছি এই কদিন আগে। এসে দেখি-গির্জা, পাদ্রী সবই আছে এখানে। ছোট এলাকা। কত আর পাদ্রী লাগে? ভাবছি, আশেপাশের অন্যান্য দ্বীপগুলোতে ঘুরব। ঈশ্বরের নাম যারা শোনেনি, সেইসব হতভাগ্যদের শোনাব তার কথা। যাব কিভাবে সেটা ভাবছি এখন।
বোট ভাড়া করবেন?
না। অত টাকা নেই আমার কাছে। দেখি, ওদিকে কোন বোট যায় কিনা। যাত্রী হয়ে যাব। আশা করি আমার অনুরোধ ফেলতে পারবে না কোন দ্রলোকের ছেলে।
কোন দিকে যাওয়ার ইচ্ছে?
উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম, যেদিকে খুশি। দ্বীপ আর তাতে মানুষ থাকলেই হল, যারা ঈশ্বরের নাম শোনেনি।...ও, আমার কথাই তো শুধু বকবক করে যাচ্ছি। তোমাদের কথা বল। পোনাপেতেই থাকবে?
না, বলল কিশোর। আশেপাশের দ্বীপ দেখার ইচ্ছে আমারও আছে। সুযোগ যখন পেয়েছি, ঘুরে দেখব। আবার কখন সুযোগ হয় না হয়, আদৌ হবে কিনা তাই বা কে জানে। মিশনারিকে যাত্রী হিসেরে নেয়ার আমন্ত্রণ জানাতে গিয়েও জানাল না সে, থেমে গেল ঠিক মুহূর্তে। সাবধান করল তার খুঁতখুঁতে সতর্ক মন। অচেনা একজন লোক...ভাবল, দেখাই যাক না লোকটা নিজে থেকে কিছু বলে কিনা?
কিন্তু বলল না মিশনারি। বরং চুড়ান্ত ভদ্রতা আর সৌজন্য বোধেরই পরিচয় দিল। ঈশ্বর তোমাদের সহায় হোন। দোয়া করি, ভালভাবে, সুস্থ শরীরে ফিরে আস আবার পোনাপেতে। ওহহহ, আমার দেরি হয়ে গেল। অসহায় একটা লোককে

বিনায় ফেলে এসেছি। বড় গরিব বেচারা। কঠিন অসুখ হয়েছে। একে একে তিনজনের সঙ্গে হাত মেলাল সে। ঘুরে রওনা হয়ে গেল।
নাহ, লোকটা ভালই, ভাবল কিশোর। আমরা সেদিকেই যাব শুনেও কিছু বললেন না, ইনিয়ে বিনিয়েও একবার জানালেন না তিনি যেতে আগ্রহী। আর কথাবার্তায় বেশ শিক্ষিত লোক মনে হল। সত্যিকার মিশনারিদের মতই কথা বলেন, অভিনয় বলে মনে হল না। যথেষ্ট স্মার্ট। তবে মানুষটার চোখ দুটো পছন্দ হয়নি তার, মনে হয় কি যেন গোপন করতে চায় ওই চোখ! তবে সেটা তেমন অস্বাভাবিক নয়। কত লোকের সঙ্গে মিশতে হয় মিশনারিদের, কত রকম জায়গায় যেতে হয়, বুদ্ধিমান না হলে চলবে কেন? সে শুনেছে, অনেক মিশনারিই ঘর তৈরি করতে জানে, চাষ করে ফসল ফলাতে পারে, ভাল ব্যবসা-বাণিজ্য জানে, ইঞ্জিন আর চিকিৎসাবিদ্যায়ও গভীর জ্ঞান আছে। এই ভদ্রলোককে দেখে মনে হল, ওসব – তো জানেনই, আরও বেশি কিছু জানেন। এমন একজন মানুষকে সঙ্গে নিতে পারলে খুশিই হত সে। দেখা যাক, সময় তো আছে। দ্রলোক সম্পর্কে আরও ভালমত খোঁজখবর নিতে হবে।
হাঁটতে হাঁটতে ডেংগু ভাবছে, ছেলেটা সাংঘাতিক চালাক। ওকে টোপ গেলানো কঠিন হবে। ওর মনে সামান্যতম সন্দেহ জাগালেই ভেস্তে যাবে সব। জামবু নয় ও। জামবুকে তো সহজেই জায়গা মত পাঠিয়ে দেয়া গেছে, আর কোন গোলমাল করতে পারবে না। এক সমস্যা তো গেছে, দেখা দিয়েছে আরেক
সমস্যা, কিশোর ছেলেটাকে কি করে পটানো যায়?
ডেংগু ভাবছে, ওই, ছেলের কাছ থেকে মুক্তাদ্বীপের অবস্থান জানতে পারবে।। পেটে বোমা মারলেও মুখ খুলবে না সে। জানতে হলে তার সঙ্গে ওই দ্বীপে যেতে হবে। তারপর কোনভাবে ছেলেগুলোকেও সরিয়ে দিতে হবে পথ থেকে। কিছু একটা ঘটাতে হবে ওদের। পুলিশ যাতে সন্দেহ করতে না পারে, ভাবে নিছক দুর্ঘটনা। তারপর মুক্তা তোলার একটা জাহাজ নিয়ে মুক্তাদ্বীপে চলে যাবে সে, তুলে আনবে সমস্ত ঝিনুক, মুক্তাগুলো বিক্রি করবে নিউ ইয়র্ক আর লণ্ডনের মুক্তা ব্যবসায়ীদের কাছে। ওই দুই শহরের অনেক জুয়েলারকে সে চেনে। দক্ষিণ সাগর থেকে মুক্তা এনে ওদের কাছেই বিক্রি করত,যখন মুক্তার ব্যবসা করত সে। অনেক আগেই প্রফেসর ইস্টউডের মুক্তার খামারের কথা কানে এসেছে তার, যখন সে সেলিবিসে ছিল। তখন পোনাপে যাবার পথে রসদ জোগাড়ের জন্যে ওখানে থেমেছিল প্রফেসরের জাহাজ। তাতে পারশিয়ান গালফ থেকে আনা নমুনাগুলো ছিল। সবুই জানা আছে তার, শুধু একটা কথা ছাড়া, একটা তথ্য– পার্ল ল্যাগুনের অবস্থান।

সেটাও জানতে পারবে, যদি কিশোর পাশা তাকে সঙ্গে নিতে রাজি হয়। জোর করে কিছু করা যাবে না। তাকে কি সহায়তা করবে ছেলেটা? না করার কোন কারণ নেই। শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত একজন মিশনারিকে সঙ্গে নিতে অরাজি হবে কেন?
একটা বোট জোগাড় করেছি তোমাদের জন্যে।
পরদিন সকালে দেখা করতে এসে ছেলেদেরকে সুসংবাদটা জানাল কমাণ্ডার ম্যাকগয়ার। সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে আরও দুজন তরুণ অফিসারকে। পরিচয় করিয়ে দিল, লেফটেন্যান্ট ওলসেন আর লেফটেন্যান্ট ফিশার।
বোটটা বেশি বড় না, কমাণ্ডার বলল। তিরিশ ফুট।
যথেষ্ট বড়, কিশোর বলল। চলবে। কি ইঞ্জিন?
ইঞ্জিন খুব ভাল। হ্যাকাটা মোটর, জাপানী। অনেক পুরানো জিনিস যদিও, তবে খুব নির্ভরশীল। জাপানীরা এনেছিল বোটটা, বোনিটো মাছ ধরার জন্যে। এখন আমেরিকান নেভির দখলে। অনেক বছর ধরে পড়ে আছে। খুব অল্প দামেই পেয়ে যাবে।
জায়গাটায়গা কেমন আছে?
চার বাংকের কেবিন আছে একটা। গ্যালি আছে। আর আছে প্রচুর বোটকা গন্ধ।
হাসল কিশোর। নেব ওটা।
ক্যাপ্টেন হয়ে কে যাচ্ছে? কলিগকে জিজ্ঞেস করল ম্যাকগয়ার। আপনিই নিশ্চয়?
।না, আমাকে এখানে থাকতে হবে। সামনে না থাকলে ঠিকমত ঠিক হবে না। শুকতারা। কিশোর ভাল নাবিক হয়ে গেছে, একাই যেতে পারবে।
নতুন দৃষ্টিতে কিশোরের দিকে তাকাল ম্যাকগয়ার। অভিযাত্রী...জীববিজ্ঞানী এখন নাবিক। এই বয়েসেই এত কিছু শিখে ফেলেছ...হবে, তোমার উন্নতি হবে জীবনে।
লাল হয়ে গেল কিশোর। খোলাখুলি প্রশংসায় খুশিও হয়, অস্বস্তিও বোধ করে। বলল, আপনার যা বয়েস, স্যার, কমাণ্ডার হয়ে বসে আছেন। নিশ্চয় আমার চেয়ে কম বয়েসেই সাগরে ভেসেছিলেন?
হাহ হাহ করে হাসল কমাণ্ডার। ধরেছ ঠিকই। বারো বছর বয়েসেই নৌকা নিয়ে পাড়ি দিয়েছি পাঁচশো মাইল, একা।
সেই তুলনায় আমি তো অনেক বড়। ক্যাপ্টেন কলিগ আমার ওস্তাদ, নেভিগেশন ভালই শিখিয়েছেন। সুযোগ যখন পাওয়া গেল, দেখি একবার বেরিয়ে, একা কতটা কি করতে পারি।
পারবে পারবে, সাহস দিল কমাণ্ডার। কাজটা মোটেই কঠিন না। কেবল সাহস দরকার। আর মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। থুতনি চুলকালো সে। পুলিশ তোমার একটা ক্ষতিই করে দিল। একজন মাল্লা কমিয়ে দিল।

কিশোর বুঝল, জামবুর কথা বলছে ম্যাকগয়ার। বলল, না, না, তাতে কিছু। এমনিতেও ওকে আমি নিতাম না। ওকে দিয়ে কোন কাজ হয় না।
আমিও আর নেব না, ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলল কলিগ। কেন যে ব্যাটাকে নিয়েছিলাম, সেটাই বুঝতে পারছি না এখন। জোরাল সুপারিশ নিয়ে হাজির হল। পরে বুঝলাম ব্যাটা একটা আস্ত শয়তান। কাজকর্ম কিছু করতে চায় না, মহা ফাঁকিবাজ। আর খালি থাকে গোলমাল পাকানোর তালে।
তাই? ম্যাকগয়ার বলল, শোধরানোর ভাল জায়গায়ই গিয়েছে তাহলে। এখানে নেমেই শুরু করেছিল গোলমাল। নেটিভদের ডেকে মদ খাইয়েছে। মারামারি বাধিয়েছে। মদের ব্যাপারে এখানে খুব কড়াকড়ি আইন মিশনারি যখন আমাদেরকে ব্যাপারটা জানালেন...
রহস্যময় পাদ্রীর ব্যাপারে খোঁজ নেয়ার এই সুযোগ হাতছাড়া করল না কিশোর। মিস্টার ভিশনের কথা বলছেন? পাদ্রী বললেন, অল্পদিন হল এসেছেন পোনাপেতে। আপনারা কতখানি জানেন তাঁর সম্পর্কে?
খুব বেশি কিছু না। আমেরিকা থেকে প্লেনে করে এসেছে এই হপ্তাখানেক আগে। ক্যালিফোর্নিয়ার কি এক সংস্থার প্রতিনিধি দুক্ষিণ সাগরের অনেক অঞ্চলই খুব ভাল চেনেন। পোনাপের আশেপাশের দ্বীপগুলোতে যাওয়ার জন্যে এটা বোট খুঁজছেন। ভাড়া নেয়ার সামর্থ্য নেই, যাত্রী হিসেবে যেতে চান, আই মীন, ফ্রি রাইড। মানুষকে খুব ভালবাসেন। স্থানীয় অধিবাসীদের ভালর জন্যে জীবন দিতে রাজি।
একমত হল কলিগ। ঠিকই বলেছেন। কাল যা করেছেন, সেটাই তো এর প্রমাণ। নইলে কোন কানাকা কোথায় মদ খেয়ে মরছে, তার বলার কি দরকার?
ইচ্ছে করলে পোনাপেতেই থাকতে পারতেন, ওলসেন বলল। ভাল জায়গা। তবু থাকতে চাইছেন না। তিনি যেতে চান এমন সব দ্বীপে, যেখানে খুব কষ্টে আছে লোকে। তাদের ভাল করতে চান। না, এমন যার মন, তিনি খারাপ হতেই পারেন না। খুব ভাল মানুষ।
ওরকম লোক আমাদের এখানেও দরকার, ফিশার বলল।
ভাবল কিশোর, যদি বানিয়েই থাকেন, শুধু তাকেই বোকা বানাননি রেভারেন্ট হেনরি রাইডার ভিশন, বানিয়েছেন আরও তিনজন বুদ্ধিমান লোককে। মিশনারি হয় অসাধারণ ধূর্ত, তাদের চারজনের চেয়ে বুদ্ধিমান, নয়ত সত্যিই তিনি পাদ্রী– অভিনয় করেননি। লোকটাকে সন্দেহ করছে বলে খারাপই লাগছে তার।
ম্যাকগয়ার বলল, নেটিভদের ওলসেন আর ফিশারও খুব ভালবাসে। সাধারণ লোক নয় ওরা, সরাসরি নেভিতে চলে আসেনি। ওলসেন ছিল স্কুল টিচার,

ফিশার ডাক্তার। ওরা এসেছেই এখানে নেটিভদের সাহায্য করতে। যাতে শিক্ষিত, স্বাস্থ্যবান হয়ে গড়ে ওঠে পোনাপিয়ানদের পরের জেনারেশনটা।
রাক্ষসের মত গিলছে ওরা, ওলসেন বলল। লেখাপড়ার কথা বলছি। শেখার জন্যে যেন হাঁ করে আছে।
রোগশোক কেমন এখানে? ফিশারকে জিজ্ঞেস করল কিশোর।
আছে মন্দ না। আগে অত ছিল না। বিদেশীরা, বিশেষ করে শ্বেতাঙ্গরা এনে ছড়িয়েছে।
হুঁ, বহুদেশে গিয়েই এই সর্বনাশ করেছে শ্বেতাঙ্গরা, কিশোর বলল।
মাথা ঝাঁকাল ডাক্তার। হ্যাঁ, আমিও শ্বেতাঙ্গ, কিন্তু সত্যি কথা স্বীকার করতে লজ্জা নেই। প্রায় দেড়শো বছর আগে এখানে যক্ষ্মার জীবাণু নিয়ে এসেছিল স্প্যানিশরা। আশি বছর আগে ইয়্যাপে কুষ্ঠ আমদানী করেছিল এক জার্মান রেডিও অপারেটর। পালাউতে আমাশার বীজ নিয়ে গিয়েছিল ইংরেজ বণিকেরা। আমেরিকানরা এনেছে হাম, বসন্ত আর আরও মারাত্মক কিছু রোগ। এসব রোগে ভোগেনি কখনও এখানকার অধিবাসীরা, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নেই শরীরের। ফলে মশামাছির মত মরতে লাগল। দেখতে দেখতে ইয়্যাপের জনসংখ্যা তেরো থেকে চার হাজারে নেমে গেল। কুসাই দ্বীপে ছিল দুজাহার লোক। এল আমেরিকান তিমি শিকারিরা, দিল রোগ ছড়িয়ে। লোকসংখ্যা দুহাজার থেকে নামিয়ে দিল দুশোতে। ম্যারিনা দ্বীপপুঞ্জে ছিল এক লাখ, হয়ে গেল তিন হাজার।
এখনও মরছে?
না। উপকারটা জাপানীরাই করেছে, মৃত্যু রোধ করেছে। ওদেরকে ধন্যবাদ জানাতে কার্পণ্য করব না আমি। ভাল ভাল ডাক্তার নিয়ে এসে হাসপাতাল গড়েছিল। তবে এখন স্বাস্থ্য ব্যবস্থা অনেক ভাল, অনেক উন্নতি করেছি আমরা। প্রতিটি দ্বীপেই এখন আস্তে আস্তে লোকসংখ্যা বাড়ছে।
দ্বীপের মানুষগুলোর জন্যে দুঃখ হল কিশোরের। ওদের জন্যে কিছু করতে ইচ্ছে হল। কিন্তু কি করতে পারবে সে? কি ক্ষমতা আছে? আছে, অতি সামান্য হলেও আছে, পরোক্ষভাবে। মিশনারি ভদ্রলোককে তার বোটে যাত্রী হিসেরে নিতে পারে, নামিয়ে দিতে পারে তিনি যে দ্বীপে নামতে চান। মনস্থির করে ফেলল গোয়েন্দাপ্রধান, সঙ্গে নেবে পাদ্রী সাহেবকে।
অনেক পেছনে পড়ে থাকল পোনাপে। মেঘে ঘেরা উঁচু টটলম চুড়াটাও চোখে পড়ছে না আর এখন।
যেদিকেই তাকানো যায়, আকাশ নীল। সাগর শান্ত। ভাল এগোচ্ছে মোটরবোট। আশেপাশে খেলে বেড়াচ্ছে ডলফিন। উড়ুক্কু মাছের ছড়ানো ডানায় রোদের চমক।

এই বোটটার নাম রেখেছে কিশোর মেঘনা। আগে জাপানী নাম ছিল কিকু, জাপানী এই শব্দটার মানে ক্রিসেনথিমাম। কেনার পর নামটা বদলে ফেলেছে সে। জন্মের সময় নিশ্চয় ফুলের মতই সুন্দর ছিল বোটটা, এখনও তার কিছুটা অবশিষ্ট রয়েছে। তবে নতুনের সেই সুগন্ধ আর নেই। এখন আছে বোঁটকা গন্ধ, সামুদ্রিক মাছের তীব্র আঁশটে গন্ধ যা কখনও কোন কিছুতেই দূর হবার নয়। এর ডেক আর কিনারে অসংখ্য বোনিটোর কাটার দাগ। আর রয়েছে তলোয়ার মাছের তলোয়ার, ব্যারাকুড়ার দাঁত আর হাঙরের সিরিশ কাগজের মত খসখসে চামড়ার স্বাক্ষর।

বোটের সবাই সুখী। গ্যালিতে দাঁড়িয়ে পলিনেশিয়ান গানের সুর গুন গুন করছে কুমালো। গলুইয়ের কাছে খালি হাতে উড়ুক্কু মাছ ধরার চেষ্টা করছে মুসা। রেলিঙের কাছে গালে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে তন্ময় হয়ে সাগর দেখছে রনি- নই ধরেছে কিশোর। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলের কড়া রোদ অনেকখানি মোলায়েম হয়েছে। সাগরের শীতল বাতাসের পরশে।

বোটে সব চেয়ে সুখী ব্যক্তি এখন রেবারেণ্ড হেনরি রাইডার ভিশন। কোন কারণ ছাড়াই একটু পর পর হেসে উঠছেন দরাজ গলায়।

ভালই আছেন, স্যার, আপনি, কিশোর বলল। চিন্তা নাই ভাবনা নাই...

কি সাংঘাতিক এক রসিকতা যেন করে ফেলেছে কিশোর। হাসতে আরম্ভ করল মিশনারি। হাসতে হাসতে পানি চলে এল চোখে। হাসব না...হাসব না বলছ... কল্পনা করতে পার? যেখানে যেতে চাই ঠিক সেখানে নিয়ে চলেছ... থেমে গেল সময়মত। তোমার জন্যেই পারলাম...

না না, এ-আর এমন কি? বাধা দিয়ে বলল কিশোর।

এমন কি মানে! তুমি বুঝতে পারছ না ইয়াং ম্যান, আমার জন্যে এটা কতখানি। কোন ধারণাই নেই তোমার, হাহ, হাহ। অবশেষে যাচ্ছি সেখানে, বাদামি ভেড়াদের এলাকায়...খুশি হব না? এর চেয়ে বেশি আর কি চাওয়ার আছে ঈশ্বরের কাছে?

লোকটার কথাবার্তা অদ্ভুত লাগল কিশোরের। কোথায় যেন একটা অমিল রয়ে গেছে! পাদ্রীর হাসিটাও যেন কেমন! ভাল লাগে না।

না লাগুক। ভাবনাটা দূর করে দিতে চাইল কিশোর। সবার হাসিই যে সবার ভাল লাগতে হবে এমন কোন কথা নেই।

পাদ্রী সাহেব কি করে-হাসেন, কথা বলেন, সেসব নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই তার। ওর কাজ, তাঁকে এমন কোন দ্বীপে নামিয়ে দেয়া, যেখানে তিনি দ্বীপবাসীদের সাহায্য করতে পারবেন। চার্টে দেখা যাচ্ছে ওরকম দুটো দ্বীপ, পার্ল ল্যাগুনে যাবার পথেই পড়ে।

দুপুর। চারপাশে ফথাও ডাঙার চিহ্ন চোখে পড়ছে না। পাল নেই, জাহাজ নেই, এমনকি স্টীমারের ধোঁয়াও নেই কোনখানে। যেদিকে চোখ যায় শুধু পানি আর পানি। সূর্য ঠিক মাথার ওপরে। কোন দিক থেকে এসেছে ওরা, কোন দিকে চলেছে, কিছুই বোঝার উপায় নেই এখন কম্পাস ছাড়া।
ভোমার হিসেবে ভুল না হলেই বাঁচি, কিশোরকে বলল মুসা। একটু এদিক ওদিক হলেই এখন সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে।
সেটা কিশোরও বুঝতে পারছে। সেক্সট্যান্ট আর ক্রোনোমিটার বের করল। লগবুকের রীডিং দেখল, উত্তর-পশ্চিমে চলেছে। এখন যেভাবে চলেছে, সেরকম চলতে পারলে সহজেই পার্ল ল্যাগুনে পৌঁছানো যাবে।
কিন্তু কিশোর জানে, ব্যাপারটা অত সোজা নয়। পথভ্রষ্ট করে দিতে পারে বাতাস। তাছাড়া উত্তর নিরক্ষীয় স্রোতের কাছাকাছি হচ্ছে এখন ওরা। আগে থেকে বোঝার উপায় নেই ওই স্রোতের শক্তি কতখানি। কোন দিকে যে বইছে, সেটাও সঠিক বলা যায় না। মোটামুটি জানা আছে, ঝোঁকটা পশ্চিমমুখী।
বিশাল এই জলরাশির মাঝে খুদে একটা দ্বীপ খুঁজে বের করা খড়ের গাদায় সুচ খোঁজার চেয়েও কঠিন মনে হচ্ছে এখন কিশোরের কাছে। মহাসাগর আর আকাশের অসীমতার মাঝে নিজেদেরকে বড় ক্ষুদ্র আর নগণ্য লাগছে। চার্ট বলছে, পানির গভীরতা ওখানে তিন মাইল। সাগরের তলায় ওখানে রয়েছে অসংখ্য ডুবো-পাহাড় আর উপত্যকা।
লগবুক দেখে বারবার হিসেব মিলাল কিশোর। দেখল, কোথাও ভুল হল কিনা।
রাতের বেলা সেদিন ভালই থাকল আবহাওয়া। আকাশ পরিষ্কার। তারা দেখা যায়, কাজেই যাত্রাপথ ঠিক করতে অসুবিধে হল না। কিশোর, মুসা আর কুমালো পালা করে হুইল ধরছে। রবিন বোট চালাতে জানে না, কাজেই তার হাতে হুইল ছাড়তে ভরসা পেল না কেউ। অনেকক্ষণ ডেকে বসে থেকে, গল্প করে মাঝরাতের দিকে ঘুমাতে গেল সে। মিশনারি বলল, নৌ-বিদ্যার কিছুই জানে না। বসে থেকে আর কি করবে? সারাটা রাত কেবিনের বাংকে কাটাল সে।
পরদিন সূর্য ওঠার পর কিছুটা অশান্ত হল সাগর। বোটও স্থির থাকতে পারল স্বাভাবিকভাবেই, দুলছে, গড়াচ্ছে। নাস্তা তেরি করে আনল কুমালো। ডেকে খেতে বসল সবাই। মিস্টার ভিশন জানাল, শরীর খারাপ লাগছে তার, সীসিকনেস। কাজেই তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে আবার গিয়ে ঢুকল কেবিনে।
কিছুক্ষণ পর লগবুকটা নিতে কেবিনে এল কিশোর। দেখে, বইটা খুলে তার ওপর ঝুঁকে রয়েছে মিশনারি। রীডিং টুকে নিচ্ছে একটা কাগজে।
এদিকে পেছন করে আছে লোকটা। পিঠটা বেঁকে রয়েছে, যেন একটা পিপা। হঠাৎ টের পেল, ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে কেউ। তাড়াতাড়ি পিঠটাকে আরও কুঁজো

করে আড়াল করতে চাইল তার কাজ, কাগজের টুকরোটা রেখে দিল পকেটে।
ফিরে চেয়ে হাসল লোকুটা। লগবুকটা দেখছিলাম। ভারি ইনটারেসটিং। না বলেই হাত দিলাম, কিছু মনে করেছ?
না না, মনে করার কি আছে, বলল কিশোর। তাকিয়ে রয়েছে বাঁকা পিঠটার দিকে। কি যেন লুকিয়ে রেখেছে ওই কুঁজ! কোথায় দেখেছে ওই পিঠ?
মনে পড়ল। ঠিক এই রকম একটা পিঠ দেখেছে, প্রফেসরের বাড়ি থেকে সেদিন বেরিয়ে আসার সময়। কালো গাড়িতে চড়েছিল যে লোকটা। তারপর ট্রাকের পিছে পিছে আসতে দেখেছে, লোকটাকে স্পষ্ট দেখেনি, তবে গাড়িটা দেখেছে।
এরকম কুঁজ আরও মানুষের থাকতে পারে। শুধু এই একটা কারণ নিয়ে সন্দেহ করার কিছু নেই, করতও না কিশোর, কাকতলীয় বলেই ধরে নিত। কিন্তু চুরি করে লগবুকের রীডিং দেখা, নকল করা, কাগজের টুকরো লুকিয়ে ফেলার চেষ্টা, সন্দেহ বাড়িয়ে দিল তার। প্রফেসরের ভয় ছিল তাঁর ঘরে বাগ লুকিয়ে রাখা হয়েছে, তাদের কথা কেউ আড়িপেতে শুনে ফেলছে। আশঙ্কা অমূলক ছিল না তার। সত্যি শুনেছে। সব শুনেছে, শুধু জানতে পারেনি মুক্তাদ্বীপের অবস্থান। তার পর সেই লোক, কিংবা তার কোন সহকারী মিশনারির ছদ্মবেশে উড়ে এসেছে পোনাপেতে। চালাকি করে উঠে পড়েছে বোটে, তাদের সঙ্গে চলেছে এখন। লগ দেখে জেনে নেবে, দ্বীপটা কোথায়। তারপর যখন খুশি চলে আসতে পারবে এখানে।
ডেকে ফিরে এল কিশোর। মুসাকে সরিয়ে দিয়ে হুইল ধরল। এত সহজে মিশনারির ফাঁদে পড়ল বলে লাথি মারতে ইচ্ছে করছে নিজেকে। মিশনারি! নেটিভদের সাহায্য করতে যাচ্ছে! শয়তান কোথাকার! ভুল যা করার তো করে ফেলেছে, এখন এটাকে শোধরানোর চেষ্টা করতে হবে।
বুঝতে পারছে, পাকা অপরাধীর কবলে পড়েছে। বলা যায় না, স্বার্থ সিদ্ধির জন্যে খুন করতেও হয়ত দ্বিধা করবে না লোকটা। এসেছে যখন, মুক্তাদ্বীপের
অবস্থান জানার চেষ্টা করবেই, যেভাবেই হোক।
কি হয়েছে, কিশোর? রবিন জিজ্ঞেস করল। ঘামছ কেন? গরম তো তেমন নেই।
ঠাণ্ডা রয়েছে রবিন আর মুসা, ঠাণ্ডাই থাক, ভাবল কিশোর। এখন সব বলে ওদেরকেও দুশ্চিন্তায় ফেলে লাভ নেই। এমনও হতে পারে; মিশনারি সত্যি মিশনারি। কৌতূহলের বশেই দেখেছে লগবুকটা।
যদিও সেটা হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। তাহলে জানাজানি হয়ে গেলে আরও খারাপ হবে। লোকটা যদি বুঝে ফেলে তাকে সন্দেহ করা হয়েছে, তাহলে আরও সতর্ক হয়ে যাবে। হয়ত নির্দিষ্ট সময়ের আগেই চূড়ান্ত কিছু করে বসবে। তাতে ক্ষতি ছাড়া ভাল হবে না। তার চেয়ে বরং ওকে ভাবতে দেয়া উচিত, তার কাজ

পরিকল্পনা মাফিকই এগোচ্ছে। কুমালো, মুসা আর রবিনকে জানালে ওরা কিশোরের মত শান্ত থাকতে পারবে না। এমন কিছু করে বসবে, যাতে মিশনারি টের পেয়ে যাবে, তার ছদ্মবেশ ফাঁস হয়ে গেছে।
আমাকেই ওর ওপর চোখ রাখতে হবে, ভাবল কিশোর। কিছুতেই ভাবতে দেয়া চলবে না যে আমি ওকে সন্দেহ করেছি। আর ওকে ফাঁকি দেয়ার একটা উপায় খুঁজে বের করতে হবে।
ঘন্টার পর ঘন্টা সমস্যাটা নিয়ে ভাবল আর ঘামল কিশোর। তারপর, পরের নতুন রীডিংটা ঠিক করার আগেই চট করে সমাধানটা এসে গেল মাথায়।
বোটের পজিশন ঠিক করল একরকম, লগে লিখল আরেক রকম। দশ মিনিট করে বাদ দিয়ে দিল।
পরের বার রীডিং ঠিক করার সময় বাদ দিল বিশ মিনিট, তার পরের বার তিদিশ মিনিট, এবং তার পরের বার চল্লিশ মিনিট। এভাবেই বাদ দিতে থাকল, যতবার পজিশন ঠিক করল নতুন করে। লগবুকে বাড়তেই থাকল ভুলের মাত্রা। কিন্তু কিশোরের জানা আছে, কতটা বাদ দিয়েছে, কাজেই সঠিক পথ নির্ণয় করতে তার কোন অসুবিধে হল না।
কেবিনেই ফেলে রাখল লগবুক। দেখে দেখে রীডিং নকল করার প্রচুর সুযোগ এবং সময় দিল ভিশনকে।
এক মিনিট ল্যাটিচিউড সমান এক সামুদ্রিক মাইল ধরা হয়। দশ মিনিট মানে দশ মাইল। কিশোর যতটা সরিয়েছে, তাতে করে আবার এসে ওই রীডিং দিয়ে দ্বীপটা কিছুতেই খুঁজে পাবে না মিশনারি।
লোকটা যদি মুক্তাচোরই হয়ে থাকে, কোন সন্দেহ নেই, ফিরে গিয়ে মুক্তা তোলার জন্যে বড়সড় জাহাজ আর ডুবুরি নিয়ে ফিরে আসবে। তখন যেন কিছুতেই দ্বীপটা খুঁজে না পায়, সেই ব্যবস্থাই করেছে কিশোর। আসল রীডিং দিয়েই দ্বীপটা খুঁজে পাওয়া কঠিন, আর এত বড় ভুল দিয়ে তো অসম্ভব।
পরদিন দিগন্তে কয়েকটা নারকেল গাছের মাথা চোখে পড়ল। ধীরে ধীরে ফুটে উঠল একটা দ্বীপের অবয়ব। কিশোর জানে, ওটা মুক্তাদ্বীপ নয়। কাজেই শান্ত রইল সে। কিন্তু বড় বড় হয়ে উঠল নকল মিশনারির চোখ।
এখানেই নামবে? জিজ্ঞেস করল মিশনারি।
না, কিশোর বলল। আপনি নামবেন নিশ্চয়? অনেক নৌকা দেখছি। নিশ্চয় অনেক মানুষ আছে এখানে, ঈশ্বরের বাণী শোনাতে পারবেন।
কিন্তু আগ্রহী হল না মিশনারি। বলল, না, আরও সামনে যেতে চাই। পোনাপে থেকে এ-জায়গা বেশি দূরে নয়, হয়ত ওখানকার মিশনারিরাই চলে আসে এখানে। আমি যেতে চাই এমন জায়গায়, সভ্য মানুষের নামও শোনেনি যারা।

বিকেলে আরেকটা দ্বীপ দেখা গেল। মিশনারি যখন শুনল, কিশোররা এখানেও থামবে না, নামতে রাজি হল না সে। আরও সামনে যেতে চায়।
একটা ব্যাপার লক্ষ্য করল কিশোর, পোনাপে থেকে যতই দূরে সরে আসছে, চার্ট ততই গোলমেলে হয়ে যাচ্ছে। অনেক কিছুই মিলছে না। কোন কোন দ্বীপের চিহ্নের পাশে লেখা রয়েছে পি. ডি. অর্থাৎ, পজিশন ডাউটফুল (অবস্থান সন্দেহজনক)। খুদে খুদে অনেক দ্বীপ দেখা গেল, যেগুলো দেখানই হয়নি চার্টে। কিংবা চার্টে আছে, এমন অনেক দ্বীপ খুঁজে পাওয়া গেল না। বোঝা গেল, অনেকটা আন্দাজের ওপরই তৈরি হয়েছে চার্টটা। যে করেছে তার কাছেও প্রশান্ত মহাসাগরের এই অচেনা অঞ্চল অচেনাই থেকে গেছে। এ-যেন এক হারানো পৃথিবী।
নানারকম সমস্যায় না ভুগলে এখানে কিছুদিনের জন্যে হারিয়ে যেতে আপত্তি ছিল না কিশোরের। তার মাথা জুড়ে রয়েছে এখন জটিল সব অঙ্ক। মিশনারির ভয়ে কাগজ-কলমের সাহায্য নিতে পারছে না। একটু ভুলচুক হয়ে গেলে কি সর্বনাশ হয়ে যাবে আন্দাজ করতে পারছে। কঠিন হিসেব আর জ্যামিতির বোঝায় এখন ভারাক্রান্ত হয়ে আছে তার মগজ। এইভাবে মনে মনে হিসেব করে কতটা কি করতে পারবে? ভুল ইতিমধ্যেই হয়ে যায়নি তো? পারবে ঠিক জায়গায় পৌঁছাতে? তার মনে হল, পারলে, সেটা অলৌকিক ব্যাপার হয়ে যাবে।
সারাক্ষণ মনে বাজছে একশো আটান্ন ডিগ্রি বারো মিনিট পুব, এগারো ডিগ্রি চৌত্রিশ মিনিট উত্তর। তার ভয় হচ্ছে, ঘুমের ঘোরে না জোরে জোরে বলে ফেলে। মাত্র চারফুট দূরে বাংকে ঘুমায় ভিশন। তার কানে কথাগুলো চলে যাবেই। তাহলেই সব শেষ, এত কষ্টের কোন মানে থাকবে না আর।
উজ্জ্বল তারার আলোয় আরেকটা রাত বোট চালানো হল। পরদিন সকালে সূর্য উঠল। হুইল ধরে আছে মুসা। গলুইয়ের কাছ থেকে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, রবিন, ডাঙাআ, ডাঙা দেখা যাচ্ছে!
হয়েছে,কেবিনে থেকে ভাবল কিশোর। দেখে ফেলেছে! তাড়াতাড়ি বাংক থেকে নেমে ডেকে বেরিয়ে এল সে। তার পিছে পিছেই বেরোল মিশনারি।
সামনে, সাগরের মাঝে যেন শুয়ে রয়েছে প্রবাল প্রাচীরের একটা আঙটি। একটা সবুজ ল্যাগুনকে ঘিরে রেখেছে। দুটো জায়গায় চওড়া হয়ে গিয়ে বীপ সৃষ্টি করেছে প্রাচীরটা, তবে ওগুলোতে উদ্ভিদ প্রায় নেই। ছিল, এখন নেই। এরকম দৃশ্য আসার সময় আরও কয়েকটা দ্বীপে দেখে এসেছে ওরা। এর জন্যে দায়ী হারিক্যান। নষ্ট করে দিয়েছে সব। আর এই দ্বীপ দুটোকে যেন একেবারে ধ্বংস করে দিয়েছে। মুচড়ে ছিঁড়ে নিয়ে গেছে নারকেল গাছের মাথা, গোড়া থেকে আটদশ ফুট উঁচু কাণ্ডগুলো শুধু রেখে গেছে।

উত্তেজনায় কাঁপছে কিশোরের বুক। ঠিক জায়গাতেই এসেছে? ভুল করেনি তো? যন্ত্রপাতি নিয়ে বসল। ভালমত দেখেটেখে হিসেব বের করল। না, ঠিকই তো আছে। মগজে যা লেখা হয়ে আছে সেই একই রীডিং, একশো আটান্ন ডিগ্রি বারো মিনিট পুব, এগারো ডিগ্রি চৌত্রিশ মিনিট উত্তর।
তাহলে এটাই সেই পার্ল ল্যাগুন! মুক্তাদ্বীপ!
নব্বই মিনিট করে বাদ দিয়ে লগবুকে রীডিং লিখল সে: পার্ল ল্যান পাওয়া গেল। একশো ছাপ্পান্ন ডিগ্রি বেয়াল্লিশ মিনিট পুব, দশ ডিগ্রি চার মিনিট উত্তর।
যাও ব্যাটা, এবার লিখে নাও গিয়ে কাগজে, মনে মনে হাসল কিশোর। আবার যদি আস, দেখবে দ্বীপটা নেই। কিংবা যদি কোনটা থাকেও সেটা এই দ্বীপ নয়। পশ্চিমে সরবে নব্বই মাইল, দক্ষিণেও সরবে নব্বই মাইল। তুমি তো তুমি, ব্যাটা, দুনিয়ার অভিজ্ঞতম নাবিকও এই রীডিং দিয়ে পার্ল ল্যাগুন খুঁজে বের করতে পারবে না।
ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল কিশোর, ভিশন যে নাবিক নয় এই জন্যে। ডেকের ওপরে চলাফেরার ভঙ্গিই বুঝিয়ে দেয় লোকটা জাহাজী নয়। সাগরে বড় ঢেউ উঠলে, জাহাজ বেশি দুললে ক্ষুধা নষ্ট হয়ে যায় তার। ইঞ্জিন চালাতে আর হুইল ধরতে পারে বটে, কয়েকবার দেখলে আনাড়ি লোকও সেটা পারবে। এমন কোন কঠিন ব্যাপার নয়। সেক্সট্যান্ট বোজার চেষ্টা করেছিল একবার, উল্টো করে ধরেছিল যন্ত্রটাকে, দেখেছে কিশোর। নটিক্যাল অ্যালমানাকে হাত দেয়নি একবারও। পুরোপুরি নির্ভর করে বসে আছে কিশোরের করা হিসেবের ওপর।
যাও, ভালমত দেখে নাও পার্ল ল্যাগুন, মনে মনে ভিশনকে বলল কিশোর। জীবনে আর দেখার সুযোগ তো পাবে না।
ল্যাগুনটাকে চক্কর দাও, হুইল ধরে থাকা মুসাকে বলল কিশোর। দেয়ালের বেশি কাছে যেয়ো না।
মাইলখানেকের বেশি হবে অ্যাটটার বেড়। পশ্চিম দিক দিয়ে ল্যাগুনে ঢোকার বেশ সুন্দর একটা পথ আছে। পুরো এক চক্কর ঘুরে এসে ওখান দিয়ে ঢুকতে শুরু করল মুসা। বেশ কায়দা করে ঢেউয়ের মাথায় চড়ে চড়ে বোটটাকে ঢুকিয়ে ফেলল ভেতরে। ওখানটায় পানি খুব কম। ছয় থেকে বারো ফুটের মধ্যে। পরিষ্কার সবুজ পানির ভেতর দিয়ে তলা দেখা যাচ্ছে। প্রবালের স্বর্গ যেন জায়গাটা। রামধনুর সাত রঙ নিয়ে তৈরি হয়েছে নানা ধরনের নানা আকারের প্রবাল-দুর্গ।
পানির নিচে পরীর রাজ্য, প্রাচীরের ওপরে হারিক্যানের ধ্বংসলীলা, একটার সঙ্গে আরেকটার কোন মিল নেই। বড় বেশি চোখে বাজে। খুদে দ্বীপ দুটোর দিকে তাকালেই একটা ধাক্কা খেতে হয়।

খাইছে! এখানে আটকা পড়তে চাই না আমি কিছুতেই! গায়ে কাঁটা দিল মুসার। তুফানে করেছে কি দৈখ! আমার তো মনে হয় ইঁদুরও বাঁচেনি। পার্ল ল্যাগুন, না? মুক্তাদ্বীপ? তার চেয়ে বল মৃত্যু দ্বীপ কিংবা ক্ষুধার দ্বীপ।
কিশোরের নির্দেশে নোঙর ফেল কুমালো। ভালমত দেখে জায়গা নির্বাচন করেছে গোয়েন্দাপ্রধান। উঁচু হয়ে এখানে উঠে গেছে প্রাচীরের কাঁধ, ফলে ল্যাগুনের উত্তর অংশটা চোখে পড়ে না। ভেসে ভেসে দেয়ালের কয়েক ফুটের মধ্যে চলে এল বোট, তারপর শেকলে টান লেগে আটকে গেল, আর সরতে পারবে না, ঘষাও লাগবে না ধারাল প্রবালের গায়ে।
তীরে নামব আমরা, ভিশনকে বলল কিশোর। আপনি নিশ্চয় নামবেন না। মানুষ নেই। ঈশ্বরের বাণী কাকে শোনাবেন? বোটেই থাকুন। নাকি মাছকে শোনানোর ইচ্ছে আছে?
কিশোরের রসিকতায় হাসল মিশনারি। বলল, না না, আমি থাকি। তোমর যাও। এখানে নেমে কোন লাভ নেই এখন আমার।
তার শেষ কথাটা রহস্যময়। কিশোর বুঝলেও, অন্য তিনজন এর মানে বুঝল না।
বোট থেকে আগে নামল কুমালো। ওখানে পানি এক ফুটেরও কম। ছপা ছপাৎ করে পানি ভেঙে শুকনোয় উঠল ওরা। এগিয়ে চলল উত্তরে। খুব তাড়াতাড়িই বোটটাকে ওদের দৃষ্টির আড়াল করে দিল দেয়াল।
পশ্চিমের দেয়াল ধরে ধরে চলে এল ওরা একটা চওড়া জায়গায়, যেখানে সৃষ্টি হয়েছে দুটো দ্বীপের একটা, ল্যাগুনের উত্তর-পশ্চিম কোণ এটা। তারপর বোতলের গলার মত সরু হয়ে গেছে দেয়ালটা, গিয়ে মিশেছে আরেকটা দ্বীপের সঙ্গে। ওটা উত্তর-পূর্ব কোণে।
ওখানেই কোথাও আছে, কিশোর বলল। প্রফেসর বলেছিলেন দ্বীপের উত্তরপূর্ব কোণে।
দ্বিতীয় দ্বীপটা চওড়ায় কয়েকশো গজ। ঝোপঝাড় ছিল, একসময়, ছিঁড়ে, উপড়ে নিয়ে গেছে ঝড়। পুরো দ্বীপটাই বোধহয় পানির নিচে চলে গিয়েছিল। নারকেলের কাণ্ডগুলো দেখে মনে হয় কবরের ওপর স্মৃতিস্তম্ভ। উপড়ানো কিছু কাণ্ড পড়ে আছে এখনও, তবে বেশিরভাগই ভেসে গেছে।
হাঁটতে অসুবিধে হচ্ছে। দেয়ালের ওপর জমে রয়েছে প্রবালের স্তূপ, কোন কোনটা দশ ফুট উঁচু। হোঁচট খেয়ে পড়লে চিরে ফালাফালা হয়ে যাবে হাঁটু আর হাতের চামড়া, এত ধার ওসব প্রবাল।
দ্বীপের পাশে ল্যাগুনে গভীর একটা খাঁড়ি রয়েছে, তিনদিক থেকে এমনভাবে ঘেরা মনে হয় একটা খুদে উপসাগর। তলা অস্পষ্ট, কারণ পানি ওখানে দশ

ফ্যাদমের বেশি। চওড়ায় প্রায় একশো গজ। দেখলেই মনে হয় কি যেন এক রহস্য লুকিয়ে রেখেছে গভীর এই খড়িটা।
ভাগ্যিস কুমালোকে সঙ্গে এনেছিলাম, মুসা বলল। এত নিচে নামতে পারব আমি। কিশোর, তুমি?
কি যে বল না ছাই। তুমি না পারলে আমি পারব?
নামার জন্যে কাপড় খুলতে গেল কুমালো, তাকে থামাল কিশোর, রাখ, কথা আছে। এই, বস এখানে সবাই।
মিশনারিকে সন্দেহ করছে, একথা সঙ্গীদেরকে জানাল কিশোর।
সন্দেহ আমারও হয়েছে,কুমালো বলল। অনেক মিশনারি দেখেছি আমি। কারও স্বভাবই ওর মত ছিল না। লোকটাকে একটুও পছন্দ হয় না আমার।
আমারও না, রবিন বলল। চল, গিয়ে তাকে চ্যালেঞ্জ করি। ৫ লিখুলি জিজ্ঞেস করি, আসলে সে কে?
না, উচিত হবে না, কিশোর বলল। পিস্তল-টিস্তল থাকতে। পরে। থাকুক। আমাদেরকে খুন করার সাহস নিশ্চয় হবে না।
কিছুই বলা যায় না। হয়ত অনেক টাকার মুক্তো রয়েছে এই উপ...হ্যাঁ, উপসাগরই বলি, খাড়ি শুনতে ভাল্লাগে না। লক্ষ, হয়ত কোটি টাকারও হতে পারে। এত টাকার জিনিস পাওয়ার জন্যে খুন করতে দ্বিধা করবে না অনেকেই। আর মনে রেখ, এটা রকি বীচ নয়, পথের মোড়ে মোড়ে পুলিশ নেই। বেআইনী কাজ চলছে কিনা দেখতে আসছে না কেউ। এখানে অন্যায় করে পার পেয়ে যাওয়া সহজ। কাজেই, লোকটাকে খেপানো উচিত হবে না। এক এক করে সবার মুখের দিকে তাকাল কিশোর। যেমন ভাবে চলছি আমরা, তেমনি চলব। বুঝতে দেব না যে ওকে সন্দেহ করেছি। এমন কোন আচরণ করবে না, যাতে ব্যাপারটা তার কাছে ফাঁস হয়ে যায়। ঠিক আছে?
মাথা ঝাঁকাল তিনজনেই।
গুড। কুমালো, এবার নামতে পার। দেখা যাক, কি আছে উপসাগরের তলায়।
(দ্বিতীয় খণ্ডে সমাপ্য)

ভলিউম ১০ – অথৈ সাগর ২ (দ্বিতীয় খণ্ড) – তিন গোয়েন্দা – রকিব হাসান – সেবা প্রকাশনী

কাপড় খুলল কুমালো। লম্বা, শক্ত, বাদামী শরীর, যেন নারকেলের কাণ্ড। দেয়ালের গা থেকে উপসাগরের ওপর বেরিয়ে থাকা একটা পাথরে গিয়ে দাঁড়াল। পরনে সাঁতারের পোশাক বলতে কিছু নেই, হাতে শুধু দস্তানা। ধারাল প্রবাল থেকে তার আঙুল বাঁচাবে ওগুলো। খসখসে খোসাওয়ালা ঝিনুক খামচে ধরে তুলতে সুবিধে হবে।

ডুব দেয়ার জন্যে তৈরি হতে লাগল সে। ডুবুরিরা এই পদ্ধতিটাকে বলে টেকিং দ্য উইণ্ড বা বাতাস নেয়া। দম নিতে আরম্ভ করল সে, একটা থেকে আরেকটা আরও ভারি, আরও লম্বা। ঠেলে, জোর করে বাতাস ঢোকাচ্ছে ফুসফুসে। সেই বাতাস আটকে রাখতে বাধ্য করল ফুসফুসকে।

তারপর আস্তে করে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল পানিতে। ঝাঁপ দিল না বলে আলগোছে শরীরটাকে ছেড়ে দিল বলা ভাল। মাথা নিচু করে ডাইভ দেয়নি। সোজা হয়ে পড়েছে। পা নিচের দিকে দিয়ে নেমে যাচ্ছে খাড়া।

এভাবে নেমে গেল দশ ফুট। তারপর ডিগবাজি খেয়ে ঘুরিয়ে ফেলল শরীরটা, এবার মাথা নিচে পা ওপরে। একই সঙ্গে হাত পা নাড়ছে, কাছিমের মত।

পানির নিচে সাঁতারের অনেক দৃশ্য দেখছে মুসা, সে নিজেও ভাল সাঁতারু। কিন্তু এরকম দৃশ্য কখনও দেখেনি। ডুবুরির পোশাক ছাড়া তিরিশ ফুট নিচে নামতে পারলেই ধন্য হয়ে যায় ইউরোপিয়ান কিংবা আমেরিকান সাঁতারুরা। চ্যাম্পিয়ন হয়ে যায়। ওই গভীরতায়ই পানির প্রচণ্ড চাপ পড়ে শরীরের ওপর। নিচের পানি ওপরের দিকে ঠেলতে থাকে, পারলে গ্যাসভর্তি বোতলের মুখের কর্কের মত ফটাস করে ছুঁড়ে মারতে চায়।

কিন্তু কুমালো পরোয়াই করল না চাপের। নেমে যাচ্ছে...চল্লিশ ফুট...পঞ্চাশ ... ষাট।

আমার বিশ্বাস, এর ডবল নিচে নামতে পারবে ও, কিশোর বলল। সাঁতার জানে বটে পলিনেশিয়ানরা।

হ্যাঁ, যোগ করল রবিন। বয়েস দুবছর হওয়ার আগেই সাঁতার শিখে ফেলে। হাঁটা শেখার আগে সাঁতার শেখে অনেক পলিনেশিয়ান শিশু। ডাঙা আর পানি ওদের কাছে সমান। উভচর। সীল, কাছিম, ব্যাঙ, বীবরের মত।

আবছা দেখতে পাচ্ছে তিন গোয়েন্দা, থেমেছে কুমালো। প্রবাল আঁকড়ে ধরে যেন ঝুলে রয়েছে, পা ওপরের দিকে। হাতের জোরে টেনে শরীরটাকে নামাল খানিকটা, ছেড়ে দিল, তারপর ধরল আরেক জায়গার প্রবাল। এরকম করল

কয়েক বার। মনে হচ্ছে, হাতের ওপর ভর দিয়ে সাগরের তলায় হেঁটে বেড়াচ্ছে সে।
তারপর কালো কিছু একটা আঁকড়ে ধরে মাথা ঘোরাল, তীব্র গতিতে উঠতে শুরু করল ওপরে। ভুস করে ভেসে উঠল তার মাথা, শরীর, কোমর পর্যন্ত, আবার ডুবল, ভাসল, ডুবল, ভাসল, পরিষ্কার করে নিল মাথার ভেতরটা। হাত বাড়িয়ে ধরল পাথরের কিনার, যেটা থেকে লাফ দিয়েছিল।
হিসহিস করে তার ফুসফুস থেকে বেরোচ্ছে চেপে রাখা বাতাস। ব্যবহৃত বাতাস বেরিয়ে যাওয়ার পর বুক ভরে টেনে নিল বিশুদ্ধ বাতাস। চেহারায় যন্ত্রণার ছাপ, ছেলেদের কথা যেন কানে ঢুকছে না।
ধীরে ধীরে ঢিল হয়ে এল শরীর। স্বভাবিক হল চেহারা। ওপরের দিকে তাকিয়ে হাসল সে। তার বাড়ানো হাতটা চেপে ধরে তাকে টেনে ওপরে তুলল ছেলেরা।
হাতের কালো বস্তুটা পাথরে রাখল কুমালো।
আনন্দে চিৎকার করে উঠল মুসা। মনে মনে ভাগ্যকে ধন্যবাদ জানাল কিশোর, সঠিক দ্বীপটা খুঁজে পাওয়ায়। উপসাগরটা খুঁজে পেয়েছে ওরা, পেয়েছে প্রফেসর ইস্টউডের মুক্তার খামার। নিশ্চিত হওয়ার কারণ আছে। এসব অঞ্চলের ঝিনুক সাধারণত এতবড় হয় না, বাইরে থেকে বীজ আনার ফলেই হয়েছে।
এরকম আর আছে? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
মাথা ঝাঁকাল কুমালো। বিছিয়ে আছে তলায়। সেজন্যেই ওপর থেকে কালো লাগে। একটার গায়ে আরেকটা লেগে রয়েছে। শয়ে শয়ে।
উত্তেজনায় প্রায় নাচতে শুরু করল মুসা। তারমানে শত শত মুক্তা!
না, শান্তকণ্ঠে বলল কুমালো। সব ঝিনুকে মুক্তা থাকে না। একটা মুক্তার জন্যেই হয়ত একশো ঝিনুক খুলতে হবে।
হ্যাঁ, সে-রকমই হবার কথা, একমত হল রবিন। তবে এখানে একটু অন্য রকম হতে পারে। বিশেষ ব্যবস্থায় ঝিনুকের চাষ করেছেন প্রফেসর।
দেখা যাক তাহলে এটাতে কিছু আছে কিনা, বলতে বলতে কোমর থেকে ছুরি খুলল মুসা। ঝিনুকটা নিয়ে চাড় মেরে খোলা দুটো খোলার চেষ্টা করতে। লাগল। অনেক চেষ্টা করল, ঘামতে শুরু করল সে, কিন্তু ঝিনুক আর খুলতে পারল না।
এভাবে পারবে না, কায়দা আছে,কুমালো হাত বাড়াল। দেখি, দাও আমার কাছে। চাড় দিয়ে ডালা খোলার বদলে ছুরির ফলাটা সে ঢুকিয়ে দিল দুই ডালার মাঝের ফাঁক দিয়ে, যতখানি যায়, কেটে ফেলল খোলাকে চাপ দিয়ে বন্ধ করে রাখে যে মাংসপেশি, সেটা। পেশি কেটে যেতেই ঝটকা দিয়ে খুলে গেল ডানা দুটো।
মুসার হাতে ঝিনুকটা দিল কুমালো। নাও, এবার খুঁজে দেখ। থাকলে কিনারের মাংসের ভেতরেই থাকবে।

ভীষণ উত্তেজিত হয়ে, কাঁপা হাতে মুক্তা খুঁজল মুসা। পেল না। হতাশ হল খুব। কিন্তু হাল ছাড়ল না। আরও ভেতরেও থাকতে পারে, কে জানে। অনেক খুঁজল সে। ঝিনুকের আঠাল পিচ্ছিল মাংস আর দেহযন্ত্রের কোনা কিছুই বাদ দিল না। কিন্তু মুক্তা মিলল না।

ধুত্তোর, খামোকা ঘাটলাম! বিরক্ত হয়ে প্রবালের একটা স্তূপের ওপাশে ঝিনুকটা ছুঁড়ে মারল মুসা। অন্য পাশে গিয়ে শক্ত কিছুতে লাগার বদলে লাগল নরম কিছুতে, বিচিত্র একটা শব্দ শোনা গেল। লাফ দিয়ে উঠে স্কুপের কাছে দৌড়ে এল মুসা। আবিষ্কার করল রেভারেণ্ড হেনরি রাইডার ভিশনকে। মুখ থেকে ঝিনুকের রস আর মাংস মুছছে লোকটা।

গর্জে উঠে কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল ভিশন। মনে পড়ল, মিশনারির ওরকম রাগ করা উচিত না, মুখ খারাপ তো দূরের কথা। মুখের ভাব স্বাভাবিক রেখে হাসার চেষ্টা করল।

আপনি এখানে কি করছেন? মুসা জানতে চাইল।

প্রশ্নের জবাব দিতে পারল না ভিশন। বেরিয়ে এল স্তূপের ওপাশ থেকে। কিশোর, রবিন আর কুমালোও এসে দাঁড়িয়েছে। ওদের দিকে চেয়ে হাসল। কান। থেকে গড়িয়ে পড়ছে ঝিনুকের রস।

তোমাদের জন্যে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলাম, বলল সে। তাই আর থাকতে না পেরে দেখতে এসেছি কি করছ।

আপনি আমাদের ওপর স্পাইগিরি করছিলেন! গরম হয়ে বলল মুসা।

শান্ত দৃষ্টিতে মুসার দিকে তাকাল ভিশন। মাই বয়, তোমার মনে রাখা উচিত, দ্র আচরণ ঈশ্বর পছন্দ করেন।

পাক-পবিত্র থাকাও ঈশ্বর পছন্দ করেন, মুসা বলল। যান, মুখ ধুয়ে পাকসাফ হোন।

কিশোরের দিকে চেয়ে অভিযোগের সুরে বলল ভিশন, দেখ, তোমার বন্ধু দুর্ব্যবহার করছে। তোমার কিছু বলা উচিত।

নিশ্চয় বলব, তবে আপনাকে। ও ভুল বলেনি, আপনি সত্যি স্পাইগিরি করছিলেন আমাদের ওপর। আড়ালে থেকে চোখ রাখছিলেন।

ভুল করছ, মাই সান, ভুল করছ। আর তোমাদেরই বা দোষ দিই কিভাবে? রক্ত গরম, মাথা গরম করার বয়েস তো এটাই। যাকগে, আমি কিছু মনে করিনি তোমাদের কথায়। মিশনারি যখন হয়েছি, মাপ করতেই হবে মানুষকে, বলতে বলতে কিশোরের কাঁধে হাত রাখল ভিশন।

ঝাড়া দিয়ে হাতটা কাঁধ থেকে ফেলে দিল কিশোর। হয়েছে, ওসব ভণিতা রাখুন। আপনি মিশনারি নন। বেঈমান, দুমুখো সাপ।

বুঝতে পারছি, রেগেছ,ধৈর্য হারাল না মিশনারি। কিন্তু কেন এই ক্ষোভ জানতে পারি? সব খুলে বল আমাকে, বুঝে দেখি ভুল বোঝাবুঝিটা কোত্থেকে হল?
ক্ষণিকের জন্যে দ্বিধায় পড়ে গেল কিশোর। ভুল করেনি তো? লোকটা কি সত্যিই মিশনারি? ধৈর্য তো সে-রকমই, শান্তও রয়েছে। রেগে না গিয়ে বরং বোঝানর চেষ্টা করছে।
ফাঁদে ফেলার জন্যে হঠাৎ বলল কিশোর, প্রফেসর ইস্টউডের নাম নিশ্চয় শুনেছেন?
সামান্যতম চমকাল না ভিশন। মনে করার চেষ্টা চালাচ্ছে যেন। ইস্টউড... মাথা নাড়ল। না, মনে পড়ছে না। বোধহয় শুনিনি।
অ, তাহলে তো তাঁর ল্যাবরেটরিতে বাগও আপনি লুকাননি। তার সঙ্গে আমাদের কি কি কথা হয়েছে শোনেননি। জানেন না আমাদের এই দ্বীপে আসার কারণ। কালো সেডানে করে আমাদের পিছু নেননি। স্যালভিজ ইয়ার্ডটাও চেনেন।
না, তাই না?
কি বলছ কিছুই বুঝতে পারছি না, গলার জোর কিছুটা হারিয়েছে ভিশন। ঝিনুকের একটুকরো মাংস খসে পড়ল লম্বা নাক থেকে।
বুঝিয়ে দিচ্ছি। জামবুকে আপনিই শুকতারায় তুলে দিয়েছিলেন পার্ল ল্যাগুনের অবস্থান জানার জন্যে। আপনার নির্দেশেই আমার কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করেছে সে। মিশনারির ছদ্মবেশে আমাদের ভুলিয়ে বোটে উঠেছেন জামবু যে কাজ করতে পারেনি, সেটা করার জন্যে। লগবুক থেকে রিডিং নকল করেছেন। পথে এত দ্বীপ পড়ল কোনটাতেই নামেননি, পছন্দ হয়নি আপনার। হবে কি ভাবে? নামার উদ্দেশ্যে তো আসেননি। মানুষের ভালবাসা না ছাই, আসলে এসেছেন মুক্তোর খোঁজে।
ধপ করে একটা নারকেলের গুড়ির ওপর বসে পড়ল মিশনারি। হতাশ ভঙ্গিতে দুহাত ছড়াল। সামনে ঝুঁকল চওড়া কাঁধ। রাগে কালো হয়ে গেছে মুখ। তবে সামলে নিল।
বেশ, বলল সে। বুঝতে পারছি, খেলা খতম। অতিরিক্ত চালাক তুমি। ফাঁকি দিয়ে আর লাভ হবে না, গিলবে না তুমি।
ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইল কিশোর।
হ্যাঁ, আবার বলল ভিশন। তোমাকে ফাঁকি দেয়া যাবে না। বড় বেশি চালাক। তোমার বিরুদ্ধে না গিয়ে পক্ষেই থাকতে চাই।
সেটা সম্ভব নয়।
কেন নয়? স্বীকার করছি, আমি মিশনারি নই। ছদ্মবেশ নিয়েছি, অভিনয় করেছি। তার মানে এই নয় যে তোমাদের ক্ষতি করতে চেয়েছি।

কি চেয়েছেন তাহলে? মুক্তো চুরি করতে?
চুরি বলছ কেন? শব্দটা পছন্দ হল না ভিশনের। এই মুক্তোর খেত কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, এই দ্বীপটার মালিকও প্রফেসর নয়। এমনকি আমেরিকান সরকারও এটার মালিকানা দাবি করতে পারবে না। এটা কারও জায়গা নয়, তারমানে সবার। আমি সেই সবার একজন। তোমরাও। এই ল্যাগুন, যা যা আছে এখানে, সব কিছুর মালিক সবাই। আমাদের সবারই অধিকার রয়েছে এতে।
তারমানে আপনি বলতে চাইছেন, এত খাটাখাটনি করে, টাকা খরচ করে, প্রফেসর যে মুক্তোর খামার করেছেন...
প্রফেসরটা একটা গাধা। মানুষকে অতিরিক্ত বিশ্বাস করে। নিজের ভাল বোঝার অধিকার রয়েছে মানুষের এটা যেন জানেই না। আমি তার মত বোকা নই। কাজেই নিজের ভালমন্দ অবশ্যই বুঝব। তোমাদের কাছে আর লুকিয়ে লাভ নেই, আমার নাম ভিশন নয়, ডেংগু পারভি। আমি মুক্তা ব্যবসায়ী। দক্ষিণ সাগরে খুচরা মুক্তা ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে কিনে নিয়ে যাই নিউ ইয়র্ক, লণ্ডন, প্যারিসে। বিক্রি করি। মুক্তা চিনি আমি। আমার সাহায্য নিলে লাভ ছাড়া ক্ষতি হবে না তোমাদের। আমি যে দামে বিক্রি করতে পারব, তার চার ভাগের এক ভাগ দামেও তোমরা পারবে না। একটা রফায় আসতে পারি আমরা, ফিফটি-ফিফটি শেয়ার। কি, রাজি?
আপনার কথা শেষ হয়েছে? তাহলে যেতে পারেন।
হাসি ফুটল ডেংগুর ঠোঁটে। কাঁধের হোলস্টার থেকে রিভলভার বের করল। আমার সম্পর্কে অনেক কিছুই জেনেছ তোমরা, ভারি গলায় বলল সে। আরও একটা কথা জেনে রাখতে পার, মুক্তো অনেক দামি জিনিস। এরচে অনেক কম দামি জিনিসের জন্যে মানুষ খুন করেছি আমি।
কিশোর, মুসা বলে উঠল, ভয় দেখাচ্ছে ব্যাটা। রাজি হয়ো না। কচুটাও করতে পারবে না।
জ্বলে উঠল ডেংগুর চোখ। এই নিগ্রোর বাচ্চা, চুপ! আরেকটা কথা বললে জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলব। তোকে কথা বলতে কে বলেছে? চুপ করে বোস ওখানে। জলদি! এই, তোমরাও বস।
শুনো না, কিশোর, ওর কথা শুনো না, চেঁচিয়ে উঠল মুসা। দেখি হারামজাদা কি করে...
গর্জে উঠল রিভলভার। দুবার গুলি করল ডেংগু। একটা বুলেট মুসার প্রায় কান ছুঁয়ে গেল। আরেকটা গেল কিশোরের মাথার ওপর দিয়ে। পাথরে লেগে পিছলে গেল বুলেট, শিস কেটে চলে গেল পানির ওপর দিয়ে। প্রতিধ্বনি তুলল ল্যাগুনের

অন্যপাশে প্রবালের দেয়ালে। চিৎকার করে নারকেলের কাণ্ড থেকে উড়ে গেল একটা নিঃসঙ্গ গাংচিল।
মিথ্যে হুমকি দিচ্ছে না লোকটা, বুঝতে পারল কিশোর। যেখানে বসতে বলা হয়েছে, বসে পড়ল। হাত ধরে টেনে বসাল মুসাকে। রবিনকে কিছু বলতে হল না, আপনাআপনি বসে পড়ল।
নিরস্ত্র কয়েকজন মানুষকে রিভলভারের ভয় দেখাচ্ছেন, রবিন বলল। লজ্জা করে না আপনার?
মানুষ কোথায়? কয়েকটা পুঁচকে বাঁচাল ছোঁড়া, হাহ হা। আর তোমাদের কাবু করতে অস্ত্র লাগে নাকি? খালি হাতেই টেনে টেনে ছিড়তে পারি ইচ্ছে করলে। কিন্তু কে কষ্ট করতে যায়? আর রিভলভার তোমাদের ভয়ে বের করিনি, করেছি ওই দানবটার জন্যে। এই দানব, কানাকার বাচ্চা কানাকা, এদিকে আয়। বোস। রিভলভার নেড়ে কুমালোকে ডাকল ডেংগু।
কুমালোকে দলে টানার কথা ভাবছেন নাকি? কিশোর বলল। অযথা মুখ খরচ করবেন। লাভ হবে না।
টেনে টেনে হাসল ডেংগু। এমন কোন কানাকা দেখিনি আমি, টাকা দিয়ে যাকে গোলাম বানানো যায় না। কুমালো, আমার চাকরি করবি তুই। ডুবুরি। অনেক টাকা দেব তোকে। জীবনে, এত টাকা চোখেও দেখিসনি। যা, কাজ শুরু করে দে। পানিতে নাম।
ধীরে ধীরে হাসি ফুটল কুমালোর সুন্দর মুখে। ভুল করছেন, মিস্টার ডেংগু, মোলায়েম স্বরে বলল সে। নাম শুনেই বুঝতে পারছি অস্ট্রেলিয়া, কিংবা নিউ গিনির কোন জঙ্গলে আপনার বাড়ি। টাকা দিয়ে স্বদেশী কোন জংলী ভাইকে গিয়ে কিনুন। রায়াটিয়ার মানুষ গোলাম হয় না।
যা বলছি কর! বেঁকিয়ে উঠল ডেংগু। নইলে মগজ বের করে দেব!
কিশোরের দিকে তাকাল কুমালো। আবার ফিরল ডেংগুর দিকে। বেশ। কত দেবেন?
এই তো পথে আসছিস। গোলাম আবার হবি না। তোদের চিনি না আমি? যা তুলবি তার পাঁচ ভাগের একভাগ।
চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল কুমালো। আমার দস্তানা। আপনার পেছনের ওই পাথরের কাছে...
পেছন ফিরল ডেংগু।
বসা থেকে উঠে পড়ল মুসা।
ঝট করে আবার এদিকে ফিরল ডেংগু। কুমালোর দিকে রিভলভার নেড়ে বলল, যা, তুই নিয়ে আয়।

পাশ দিয়ে চলে গেল কুমালো। সামান্য পাশে ঘুরে একসঙ্গে তিন কিশোর আর তার ওপর নজর রাখল ডেংগু।
নড়ে উঠল কিশোর। মুহূর্তের জন্যে শুধু নজর ফেরাল ডেংগু, এটুকুই যথেষ্ট। বাঘের মত লাফিয়ে এসে তার ওপর পড়ল কুমালো। বাহু দিয়ে পেঁচিয়ে ধরল গলা। আরেক হাতে কব্জি চেপে ধরে রিভলভারটা হাত থেকে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করল।
এগিয়ে এল তিন গোয়েন্দা।
ডেংগুর গায়ে মোষের জোর। হাত থেকে রিভলভার ছাড়ল না। কিশোরকে নিশানা করল।
সর, সরে যাও! চিৎকার করে বলল কুমালো। কিছুতেই পিস্তলের নল ঘোরাতে পারছে না।
গর্জে উঠল রিভলভার। আগেরবার গুলি করেছিল মারধান করার জন্যে। এবার করেছে মারার জন্যে। শেষ মুহূর্তে কুমালোর হ্যাঁচকা টানে লক্ষ্যভ্রষ্ট হল গুলি।
সামনে চলে এল মুসা। ঘুসি মারল ডেংগুর মুখে।
ভীষণ শক্তিশালী বার ভেতর থেকে রিভলভারটা বের করার প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছে কুমালো। পারছে না। নলের মুখ আস্তে আস্তে ঘুরে যাচ্ছে মুসার পেটের দিকে। এখন একটাই কাজ করার আছে কুমালোর, মুসাকে বাঁচাতে হলে। সামনে চলে আসা। নিজের শরীর দিয়ে মুসাকে আড়াল করা। ঠিক তা-ই করল সে। ডেংগুও ট্রিগারে চাপ দিল, সে-ও চলে এল নলের সামনে। গুলি খেয়ে পড়ে গেল মাটিতে।
হাঁটু গেড়ে বন্ধুর পাশে বসে পড়ল মুসা। মনে পড়ল বিকিনির সেই রাতের কথা। সৈকতে বসে কথা দিয়েছিল ওরা, একে অন্যের জন্যে জীবন দিয়ে দেবে। নাম বদল করেছিল। কুমালো বন্ধুত্বের মান রেখেছে।
ডেংগুর সোলার প্রেক্সাসে ঘুসি মারছিল কিশোর। কিছুই হয়নি দানবটার। বরং কিশোরই হাতে ব্যথা পেয়েছে। তার মনে হয়েছে, ঘুসি মেরেছে একতাল রবারের ওপর। ঘুসাঘুসি বাদ দিয়ে বসল কুমালোর পাশে।
এই সুযোগে ছুটে চলে গেল ডেংগু।
পিছু নিতে যাচ্ছিল মুসা, হাত ধরে তাকে থামাল কিশোর। পরে। ওর কথা। পরে ভাবা যাবে। আগে কুমালোর ব্যবস্থা করা দরকার।
কি করব?নাড়ি দেখছে রবিন। চলছে এখনও। কুমালোর ডান হাঁটুর ইঞ্চি দশেক ওপর থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।
চোখ বুজে পড়ে আছে কুমালো।

ক্ষতটা পরীক্ষা করল কিশোর। দুটো গর্ত। বুলেট ঢোকার একটা, অন্যটা বেরোনোর। যেটা দিয়ে ঢুকেছে, ওটার মুখের চারপাশে পুড়ে গেছে চামড়া। খুব কাছে থেকে গুলি করলে হয় এরকম, বারুদের আগুনে পুড়ে যায়।
বুলেটটা বোধহয় হাড়ে লাগেনি, মাংস ফুঁড়ে বেরিয়ে গেছে। ভাগ্য ভাল, শিরা হেঁড়েনি। রক্ত বেরোচ্ছে, তবে কম।
শার্টের কাপড় ছিঁড়ে ল্যাগুন থেকে ভিজিয়ে আনল রবিন। মুছে দিতে লাগল ক্ষত।
পেনিসিলিন দরকার, কিশোর বলল। কিংবা সালফা পাউডার।
দুটোই আছে বোটে, বলল রবিন। নিয়ে আসব গিয়ে?
না। ওকেই নিয়ে যেতে হবে বোটে। বাংকে শুইয়ে দিতে হবে। কিন্তু, নেয়াই হয়ে যাবে মুশকিল। মুসা, তুমি বরং গিয়ে বোটটা কাছে নিয়ে এস। দাঁড়াও দাঁড়াও, ইঞ্জিনের শব্দ...
ঠিকই শুনেছে সে। চালু হয়েছে বোটের ইঞ্জিন। ডেংগুই বোধহয় নিয়ে আসছে, রবিন বলল। অনুশোচনা হয়েছে তাহলে।
প্রাচীরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল বোটটা। ল্যাগুন পেরিয়ে এসে ঢুকল উপসাগরে। ইতিমধ্যে নিজের শার্ট দিয়ে পেঁচিয়ে কুমোোর জখমের ওপরে টর্নিকেট বেঁধে ফেলেছে কিশোর। তার জানা আছে পনেরো মিনিট পর পর ঢিল দিয়ে আবার বাঁধতে হবে।
ডেংগু বোটটা নিয়ে আসছে বলে তার ওপর থেকে রাগ অনেকখানি কমল কিশোরের। মুসা, ওকে দেখিয়ে দাও কোন জায়গায় বোট রাখবে।
ইঞ্জিন থেমে গেছে। মুখ তুলে তাকাল কিশোর। অবাক হল। তীর থেকে এখনও একশো ফুট দূরে রয়েছে বোটটা।
এই-ই, আরেকটু সামনে আনতে হবে, চেঁচিয়ে হাত নেড়ে বলল মুসা।
জবাবে খিকখিক হাসি শোনা গেল। হুইল মোরাল ডেংগু। বোটের নাক ঘুরে গেল আরেক দিকে।
ভুল করছ, বাবা, হেসে বলল ডেংগু। তীরে ভেড়ানর জন্যে আনিনি। যাবার আগে শুধু কয়েকটা কথা বলতে এলাম তোমাদের সঙ্গে।
বোকা হয়ে গেল কিশোর।
হাঁ করে ডেংগুর দিকে তাকিয়ে আছে তিনজনে।
যাবার আগে মানে? কিশোর বলল। কি বলতে চাইছেন? গলা কাঁপছে তার।
বুঝলে না? একটা প্রস্তাব দিয়েছিলাম, মানতে পারনি। কাজেই একাই যেতে হচ্ছে আমাকে। সোজা পোনাপেতে চলে যাব। একটা জাহাজ আর ডুবুরি ভাড়া করে নিয়ে ফিরে আসব।
পারবেন না। নেভিগেশনের কিছু জানেন না।

তাতে কি? পোনালে অনেক বড় দ্বীপ। সোজা দক্ষিণে চলতে থাকব। এক সময় না এক সময় পেয়েই যাব দ্বীপটা।
কিন্তু কুমালোকে ডাক্তার দেখানো দরকার। এখানে থাকলে ও মরে যাবে। এভাবে একজন মানুষ মরবে, ভাবছেন না সে কথা?
কেন ভাবব? ও তো একটা কানাকা।
বলেন কি! এরকম একটা জায়গায়...,হারিক্যানে ধ্বংস হয়ে যাওয়া দ্বীপটার ওপর চোখ বুলিয়ে আতঙ্কিত হল কিশোর। এখানে ফেলে যেতে পারেন না আমাদেরকে। আপনি ফেরা পর্যন্ত বাচব না। কোন খাবার নেই। একটা কাঁকড়াও দেখিনি এতক্ষণে। ছায়া নেই, উড়ে যে বানাব তারও উপায় দেখি না। পানি নেই। পিপাসায়ইরে যাব। আর এতগুলো খুনের দায়ে সারা জীবন জল খাটতে হবে আপনাকে।
একবার খেটেছি, ডেংগু বলল। আর ঢাকার ইচ্ছে নেই ওখানে। এজন্যেই গুলি করে মারলাম না তোমাদের। যদি কেউ তোমাদের কথা জিজ্ঞেস করে-করবে বলে মনে হয় না—যদি করেই, বলব আমি না ফেরাতক দ্বীপে থাকবে ঠিক করেছিলে তোমরা। বাঁচতে পারনি, কোন কারণে মরে গেহ, তার আমি কি করব?
থ্রটলের দিকে হাত বাড়াল ডেংগু।
দাঁড়ান! মরিয়া হয়ে বলল কিশোর। একটা কথা অত রাখুন। ফার্স্ট এইড কিট থেকে পেনিসিলিনের টিউব আর সালফার কৌটাটা দিয়ে যান। কাছে আসার দরকার নেই। ছুঁড়ে মারুন।
হেসে উঠল ডেংগু। ওগুলো আমারও দরকার হতে পারে, খোকা। দূর যাত্রায় যাচ্ছি তো। কখন কি ঘটে যায়, বলা যায় না। তখন পাব কোথায়? চলি। গুড় বাই।
হালকা বাতাস ঠেলে বোটটাকে অনেকটা কাছে নিয়ে এসেছে। হঠাৎ দৌড়ে গিয়ে পানিতে ঝাঁপ দিল মুসা। জোরে সাঁতরে চল বোটের দিকে। দেখাদেখি কিশোরও গিয়ে পানিতে পড়ল। প্রথমবারের চেষ্টায় ইঞ্জিন স্টার্ট না নিলে হয়ত বোটটাকে ধরে ফেলতে পারবে ওরা। খালি হাতে পারবে না ডেংগুর সঙ্গে, পারেনি চারজনে মিলেও, তার ওপর ওর কাছে রয়েছে রিভলভার। কি করে কাবু করবে এত শক্তিশালী শত্রুকে, একবারও ভাবল না ওরা।
চালু হয়ে গেল ইঞ্জিন। ঘুরতে শুরু করে প্রপেলার। খুব ধীরে গতি নিতে লাগল ভারি বোটটা। একসময় আশা হল ছেলেদের, ধরে ফেলতে পারবে। কিন্তু পরক্ষণেই গতি বাড়ল, ওদের চেয়ে দ্রুত চলতে শুরু করল ওটা।
আর চেষ্টা করে লাভ নেই, থেমে গেল কিশোর আর মুসা। তাকিয়ে রয়েছে বোটের দিকে।

ল্যাগুনের প্রবেশমুখের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ওটা। দেয়ালের কাঁধের ওপাশে হারিয়ে যাবার আগের মুহূর্তে ওদের দিকে ফিরে হাত নাড়ল ডেংগু।
আর কিছু দেখার নেই। শুধু বোটের রেখে যাওয়া ঢেউ ছাড়া। চিৎকার করে উঠল সেই গাংচিলটা। ওই একটা পাখি ছাড়া জীবন্ত আর কোন প্রাণী যেন রেখে যায়নি রিক্যান।
আর কি করব! চল, বলে তীরের দিকে সাঁতরাতে শুরু করল কিশোর।
আস্তে আস্তে সাঁতরে তীরে ফিরে এল ওরা। ডাঙায় উঠে এসে ধপ করে প্রায় গড়িয়ে পড়ল কুমালোর পাশে।
দীর্ঘ একটা মুহূর্ত নীরবে একে অন্যের দিকে তাকিয়ে রইল তিন গোয়েন্দা। যা ঘটে গেছে, বিশ্বাস করতে পারছে না এখনও। রুক্ষ প্রবালের স্কুপের ওপর ঘুরে এল ওদের দৃষ্টি।
হঠাৎ হাসতে শুরু করল মুসা। হতাশার দুর্বল হাসি। রবিনসন ক্রুসসা পড়ার পর কতবার ভেবেছি, ইস, ওরকম কোন দ্বীপে গিয়ে যদি থাকতে পারতাম, কি মজা হত। কিন্তু মরুভূমির চেয়ে খারাপ এরকম একটা জাগায় আটকা পড়ব, কল্পনাও করিনি কোনদিন!
নড়েচড়ে গুঙিয়ে উঠল কুমালো। যন্ত্রণার ছাপ চেহারায়, ভাঁজ পড়ল কপালে। চোখ মেলল সে। একে একে দেখল কিশোর, রবিন আর মুসার মুখ। কি ঘটেছিল, মনে পড়ল সব।
সরি, বেহুশ হয়ে গিয়েছিলাম, উঠে বসার চেষ্টা করল কুমালো। পারল না। চিত হয়ে শুয়ে পড়ল আবার। বিকৃত করে ফেলেছে চেহারা।
চুপচাপ শুয়ে থাক, কিশোর বলল।
জোর করে মুখে হাসি ফোঁটাল কুমালো। কি কি ঘটেছে আমি ঘুমানোর সময়? দারুণ কিছু মিস করেছি?
না, তেমন কিছু না। শুধু ডেংগুকে বিদায় জানাতে বাধ্য হয়েছি আমরা। বিদায়? চলে গেছে, বোট নিয়ে। পোনাপে থেকে জাহাজ আর ডুবুরি নিয়ে আসবে।
বড় বড় হয়ে গেল কুমালের চোখ। বিশ্বাস করেছ ওর কথা? ফাঁকি দিয়েছে সে, ধাপ্পা দিয়েছে। ভয় দেখিয়ে তোমাদেরকে দিয়ে কাজ আদায় করতে চেয়েছে। দেখ, রাতের আগেই ফিরে আসবে আবার। আমাদেরকে এই অবস্থায় এখানে ফেলে যেতে পারে না সে।
আল্লাহ করুক, তাই যেন হয়, আশা করল মুসা।
কিন্তু যদি সত্যিই চলে গিয়ে থাকে, তাহলে পোনাপেতে পৌঁছতে অন্তত তিন দিন লেগে যাবে তার। জাহাজ আর ডুবুরি জোগাড় করতে কম করে হলেও এক হপ্তা। ভাল ডুবুরি মেলানো খুব কঠিন। দুই তিন হপ্তাও লাগতে পারে। তারপর আরও

তিন-চার দিন লাগবে এখানে আসতে। তিন হপ্তায় এখানে আমাদের কি হবে বুঝতে পারছে না সে?
না পারার কোন কারণ নেই, কিশোর বলল। তবে ও-ব্যাপারে মাথাব্যথা নেই তার।
এক হপ্তাও যদি লাগে আসতে, নিঃসঙ্গ পাথরগুলোর দিকে তাকাল কুমালো, কড়া রোদে যেন ঝলসাচ্ছে ওগুলো। গেছি আমরা। জানো কেন মানুষ নেই এটাতে?
না। কেন?
কারণ এখানে মানুষ বাস কতে পারবে না। কেউ কখনও চেষ্টা করেছে বলেও মনে হয় না। জীবন ধারণের জন্যে প্রয়োজনীয় জিনিস এখানে নেই। যা-ও বা কিছু ছিল, সব ধ্বংস হয়ে গেছে হারিক্যানে। এমনকি এখন পাখি পর্যন্ত থাকতে পারবে না এখানে। ল্যানে মাছ দেখিনি। মুসা যে নাম রেখেছে, মরা দ্বীপ, ঠিকই রেখেছে। এখানে থাকলে ক্ষুধায় ধুকে ধুকে মরতে হবে।
চোখ বুজে চুপচাপ যন্ত্রণা সহ্য করল কিছুক্ষণ কুমালো। তারপর আবার চেয়ে, হাসল। ওভাবে বলা উচিত হয়নি আমার। আসলে দুর্বল হয়ে পড়েছি তো, আবোলতাবোল...ভেব না, উপায় বের করেই ফেলব আমরা। বেঁচে যাব। কষ্ট করতে হবে আরকি, অনেক খাটতে হবে। এভাবে এখন শুয়ে থাকলে চলবে না আমার, জোর করে উঠে বসল কুমালো।
শুয়ে থাক! তীক্ষ্ণ হল কিশোরের কণ্ঠ। এই দেখ, কি কাণ্ড করেছ! আবার রক্ত বেরোতে শুরু করেছে। কোন ওষুধ নেই আমাদের কাছে।
কে বলল নেই? দুর্বল কণ্ঠে বলল কুমালো। ওষুধের বাক্সের ওপরই তো শুয়ে আছি। একটা নারকেলের কাণ্ডে মাথা রেখেছে সে।
এটা দিয়ে কি হবে?
দুরি দিয়ে বাকলটা চাছো। পাউডারের মত বেরোবে। ওগুলো জখমে লাগিয়ে। দাও। অ্যাসট্রিনজেন্ট, রক্ত পড়া বন্ধ করবে।
পচন ধরাবে না তো আবার?
আরে না না, যে কড়া রোদ। টেরিলাইজ করে দিয়েছে। একেবারে জীবাণুমুক্ত।
পলিনেশিয়ানদের ভেষজ জ্ঞানের কথা শুনেছে কিশোর। লতাপাতা, ঘাস, শেকড়, আর গাছপালা থেকে ওষুধ তৈরি করতে নাকি ওরা ওস্তাদ। অনেক জটিল রোগের সার্থক চিকিৎসা করে ফেলে। কিন্তু শুকনো নারকেলের কাণ্ডও যে ওষুধ হিসেবে ব্যবহার হয়, ভাবতে পারেনি।
তর্ক করল না সে। ছুরি দিয়ে চাছতে আরম্ভ করল। পাউডার জমল। ওগুলো নিয়ে জখমে রেখে শার্ট ছিঁড়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল।

কুমালোর কপালে হাত দিয়ে দেখল রবিন। গরম। জ্বর উঠছে। অল্পক্ষণেই অস্থির হয়ে গেল কুমালো।
ছায়া দরকার, মুসাকে বলল কিশোর। ছায়ায় নিয়ে রাখতে হবে এখন ওকে।
যতদূর চোখ যায়, পুরো চীফটায় চোখ বোলাল ওরা। ছায়া নেই কোথাও। ওদের দিকে তাকিয়ে ব্যঙ্গ করছে যেন শুধু রুক্ষ পাথর।
এক জায়গায় কাছাকাছি হয়ে জন্মেছিল কিছু নারকেল গাছ, কাণ্ডগুলো দাঁড়িয়ে রয়েছে এখন। সামান্য ছায়া আছে ওখানে। সেখানেই কুমালোকে শুইয়ে দিল। ওরা। এমন কিছু ছায়া নয়, রোদের আঁচ ঠেকাতে পারছে না, তবু নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল। সূর্য সরার সাথে সাথে ছায়া সরছে, কুমালোকেও সরাতে হচ্ছে।
এভাবে হবে না, কিশোর বলল। ছাউনি-টাউনি একটা কিছু তৈরি করতেই হবে।
তিক্ত হাসল মুসা। কোন ভরসা নেই।
কিন্তু নেই বলে বসে থাকল না। পুরো দ্বীপটায় খুঁজে দেখতে চলল ছাউনি বানান মত কিছু পাওয়া যায় কিনা।
বিড়বিড় করে কথা বলতে লাগল কুমালো। শোনার জন্যে প্রায় তার মুখের কাছে কান নিয়ে যেতে হল কিশোর আর রবিনকে।
কুমালো বলছে, কিশোর, আমার কথায় দুশ্চিন্তা কোরো না। বাড়িয়েই বলেছি। কোন না কোনভাবে টিকে যাবই আমরা। বেশিদিন তো নয়। এক কি দুহপ্তা, বড়জোর তিন। ডেংগু আসবে। আসতেই হবে তাকে। মুক্তার লোতে। সে
এলে অবশ্য আশা নেই আমাদের, কোন জাহাজ আসে না এদিকে। অসুবিধে নেই। ডেংগুই আসবে। আর আসতে কষ্ট হবে না তার, দ্বীপটার অবস্থান তো জানাই আছে।
া, কুমালো, কিশোর বলল। এখন ঘুমানর চেষ্টা কর তো একটু।
ওদেরকে ভয় পাওয়াতে চাইল না কিশোর। সে কেবল একলা জানে, ডেংগু কখনও ফিরে আসবে না। আসতে পারবে না।
বোটে লগবুক আছে। সেটার রীডিং অনুসরণ করবে ডেংগু। তাকে ফকি দিতে চেয়েছিল কিশোর। কিন্তু নিজের পাতা ফাঁদে নিজেই পড়েছে এখন। শুধু সে
একা নয়, আরও তিনজনকে নিয়ে পড়েছে।
লগবুকের রীডিং অনুসরণ করে একশো মাইল দূরে চলে যাবে ডেংগু। কিছুতেই বুঝতে পারবে না পার্ল ল্যাগুন কোথায় আছে। হয়ত খুঁজবে। যথাসাধ্য চেষ্টা করবে দ্বীপটা খুঁজে বের করার। পাওয়ার সম্ভাবনা হাজারে এক, হয়ত বা লাখে। মাসের পর মাস, সারা বছর ধরে খুঁজলেও হয়ত বের করতে পারবে না। কয়েক মাইলের মধ্যে চলে এলেও চোখে পড়বে না, কারণ দ্বীপটা সমুদ্র সমতল থেকে

মাত্র দশ ফুট উঁচু, তা-ও যেখানটায় সবচেয়ে বেশি। গাছপালা নেই। পানি থেকে আলাদা করে দ্বীপটাকে চেনা খুব কঠিন। সঠিক রীডিং জানা থাকলেই শুধু খুঁজে বের করা সম্ভব।
আর যদিও বা অলৌকিক ভাবে বছরখানেক পরে ডেংগু খুঁজে পায় দ্বীপটা, ওদের লাভ কি তাতে? সে এসে দেখবে, চারটে ঝকঝকে কঙ্কাল পড়ে রয়েছে প্রবাল পাথরের মাঝে, অবশ্যই যদি ঝড়ের সময় পানিতে ভাসিয়ে না নিয়ে যায় লাশগুলো।
ডেংগু হয়ত ওদেরকে মরার জন্যে রেখে যায়নি। খানিকটা শাস্তি দিতে চেয়েছে। এটা ভেবেই ফেলে গেছে, আবার তে; আসছেই, ততদিন মরবে না ওরা। কিন্তু কিশোর যা করে রেখেছে, সময় মত কিছুতেই আসতে পারবে না ডেংগু।
রবিন আর মুসা জানলে কি বলবে? কুমালোও কি তাকেই দোষারোপ করবে তাদের মৃত্যুর জন্যে? মুখে হয়ত কেউই কিছু বলবে না, কিশোরের মানসি যন্ত্রণা বাড়াতে চাইবে না, কিন্তু মনে মনে? না খেয়ে মরার জন্যে কি দোষ দেবে না তাকে? আচ্ছা, না খেয়ে, পিপাসায় ধুকে ধুকে মরতে কতটা কষ্ট হবে? খুব বেশি?
আপাতত কাউকে কিছু না বলার সিদ্ধান্ত নিল কিশোর ! শুনলে মনমরা হয়ে পড়বে মুসা আর রবিন, একেবারে নিরাশ হয়ে যাবে। কুমালোর সেবাযতের দিকে আর মন দেয়ার প্রয়োজন বোধ করবে না।
ভয়ঙ্কর ভাবনাগুলো জোর করে মন থেকে বিদেয় করল কিশোর কুমালোর সেবায় মন দিল। রক্তপাত বন্ধ হয়েছে। কাজ করেছে টোটকা ওষুধ। সাবধানে টর্নিকেটটা খুলতে লাগল কিশোর। বেশিক্ষণ বেঁধে রাখা ঠিক না, গ্যাংগ্রিন হয়ে যেতে পারে। টনিকেটটা খোলার পরেও রক্ত বেরোল না। নারকেল-বাকলের পাউডারের ওপর শ্রদ্ধা জন্মাল কিশোরের। এত ভাল অ্যাসট্রিনজেন্ট এই জিনিস, কনাই করতে পারবে না অনেকে।
হেঁড়া শার্টটা নিয়ে গিয়ে পানিতে ভেজাল কিশোর। চিপে বাতাসে ছড়িয়ে নাড়ল, যাতে ঠাণ্ডা হয়। তারপর এনে রাখল কুমালোর কপালে। ভীষণ জ্বর। কি হচ্ছে না হচ্ছে জানতেই পারল না বেচারা।
রবিন সাহায্য করছে কিশোরকে।
মুসা বিশেষ সুবিধে করতে পারছে না। এসব দ্বীপে ছাউনির চালা বলতে একমাত্র নারকেল পাতা। একসময় অনেকই ছিল, এখন একটাও নেই। ঝড়ে ছিঁড়ে যেগুলো পড়েছিল, সেগুলোকেও ভাসিয়ে নিয়ে গেছে ঢেউ।
পাথরের খাঁজে খুঁজে আটকে রয়েছে কিছু ভাঙা কাণ্ড। কয়েকটা মাথা আছে। তাতে ডালও রয়েছে, তবে একটাও পাতা মেই। যেন ছুরি দিয়ে চেঁছে নিয়ে গেছে। বাতাস। হারিকানের এই প্রচণ্ড ক্ষমতা না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন।

নারকেল পাতা পাওয়া যাবে না, নিশ্চিত হয়ে গেল সে। তাহলে আর কি আছে? কি দিয়ে ছাউনি হবে? চোখ বন্ধ করে ভাবতে লাগল। ভাবনার একাগ্রতার জন্যে চোখের পাতা বোজেনি, বুজেছে রোদের মধ্যে চোখ মেলে রাখতে কষ্ট হচ্ছে বলে। প্যানডানাস পাতা দিয়ে ছাউনি বানায় দ্বীপবাসীরা, ট্যারো পাতা দিয়েও হয়। কলাপাতা পেলেও সাময়িক কাজ চালানো যায়। জাহাজডুবি হয়ে নির্জন দ্বীপে উঠে খুব আরামে থাকে নাবিকেরা, এরকম অনেক গল্প পড়েছে সে। তবে ওদের কেউই কোন মরা দ্বীপে ওঠে না। নানারকম রসাল ফলের গাছ থাকে, সুন্দর পাখি থাকে, হরিণ থাকে, মিষ্টি পানির ঝর্না থাকে ওসব দ্বীপে। বাঁচতে অসুবিধে হয় না মানুষের।

ওরকম একটা দ্বীপে আটকে গেলে কিছুই মনে করত না মুসা। হাত বাড়ালেই পেয়ে যেত পাকা কলা, ছিঁড়ে নিতে পারত রুটিফল, বুনো কমলা, আম, পেঁপে, পেয়ারা, আঙর। ল্যাগুন থাকত মাছে বোঝাই। সৈকত থাকত সাদা বালির, জোয়ারের পানি তাতে এনে ফেলত মোটা মোটা চিংড়ি। আর এত বেশি পাখি থাকত, খালি হাতেই ধরে ফেলা যেত ওগুলো, কারণ মানুষকে ভয় পায় না ওরা, আগে মানুষ দেখেনি তো কখনও। দ্বীপের কিনারে পাহাড়ে থাকত অগণিত পাখির বাসা, তাতে ডিম। পাহাড়ি ঝর্নায় আশ মিটিয়ে গোসল করত, নারকেলের মিষ্টি পানি খেত, থাকত বাঁশের তৈরি সুন্দর কুঁড়েতে। রাতে ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় মাথা দোলাত নারকেল গাছ, রহস্যময় সরসর শব্দ তুলত বাঁশের কঞ্চি, সবুজ বন থেকে ভেসে আসত নিশাচর পাখির ঘুমপাড়ানি ডাক...

চোখ মেলতে বাধ্য, হল মুসা। ঘাড়ের চামড়া যেন পুড়ে যাচ্ছে রোদে। সাদা পাথরে রোদ প্রতিফলিত হয়ে চোখে এসে লাগতে গুঙিয়ে উঠল সে। তাকানই যায় না।

পাথরের দিক থেকে চোখ সরাতেই চোখে পড়ল ওটা। মস্ত দুটো পাথরের খাঁজে কি যেন একটা পড়ে আছে, পানির, কিনারে। ধড়াস করে উঠল তার বুক। নৌকা না তো! দেখে তো মনে হয় নৌকাই উল্টে পড়ে আছে। হয়ত ঝড়ে ভেসে এসে ঠেকেছে ওখানে!

উত্তেজনায় বুকের খাঁচায় দাপাদাপি শুরু করে দিল হৃৎপিণ্ডটা। আশার আলো জ্বলল মনে। নৌকা হলে এই মৃত্যুদ্বীপ থেকে বেরোতে পারবে। প্রবালের চোখা, ধারাল বাধা অমান্য করে দৌড় দিল সে।

নাহ্, নৌকা নয়! বিশাল এক মাছ। পেট আকাশের দিকে, মরে ঠাণ্ডা হয়ে আছে। পুরো তিরিশ ফুট লম্বা।

চামড়ার রঙ বাদামী, তাতে সাদা ফুটকি। কুৎসিত মুখ, ব্যাঙের মুখের মত অনেকটা। মুখের তুলনায় ছোট দুটো চোখ।

তিরিশ ফুট শরীরের তুলনায়ও মুখের হাঁ বিশাল। চার ফুট চওড়া। দুই কশ বেয়ে লালা গড়িয়ে পড়ছে এখনও, যেন শ্যাওলা লেগে আছে।
এত বড় আর কুৎসিত মাছ দেখলে প্রথমেই মনে হবে ওটা মানুষখেকো ভয়ঙ্কর হিংস্রজীব। কিন্তু মুসা জানে, এই মাছ একেবারেই নিরীহ, যদিও হিংস্রতম প্রজাতিরই বংশধর এটা। মাছের মধ্যে সব চেয়ে বড় মাছ, নাম হোয়েল শার্ক বা তিমি-হাঙর। এখানে যেটা পড়ে আছে সেটা ছোট, এর দ্বিগুণ বড়ও হয় এ মাছ। হাঙর গোষ্ঠির প্রাণী, অথচ ছোট জাতভাইদের মত রক্তলোলুপ নয়। খুব ছোট ছোট জলজ জীব খেয়ে বেঁচে থাকে। ওসব জীবের কোন কোনটা এত ছোট, খালি চোখে দেখা যায় না, অণুবীক্ষণ যন্ত্র লাগে।
নিরাশ হয়ে ফিরে এল মুসা। বন্ধুদের জানাল, ঘর বানানর মত কিছুই পাওয়া যায়নি। মাছটার কথাও বলল।
দাঁড়াও দাঁড়াও, হাত তুলল রবিন। বইয়ে পড়েছি, সাইবেরিয়ার আমুর নদীর ধারেও মানুষ বাস করে। এমন কোন গাছপালা নেই ওখানে, যা দিয়ে ঘর বানানো যায়। তাই মাছের চামড়া দিয়ে ঘর বানায় লোকে।
হেসে উঠল মুসা। ওসব সীল-টীলের চামড়া দিয়ে বানায় আরকি। হাঙরের চামড়া দিয়ে কে বানাতে যাবে?
দোষ কি? বলল কিশোর। চল তো দেখি। আমার মনে হয় ব্যবস্থা একটা হয়ে গেল।
দানব মাছটাকে দেখতে এল ওরা।
আহা, কি সুন্দর মুখ, মুখ বাঁকিয়ে কিশোর বলল। সারা প্রশান্ত মহাসাগরে এত সরল মুখ আর নেই। মাছটার চামড়ায় হাত বোলাল সে। সিরিসের মত খসখসে। কাটা সহজ হবে না। তবে ছুরিটুরি ভালই আছে আমাদের। পেটের চামড়াটা তুলে নেব আমরা। মুসা, তুমি গলার কাছ থেকে শুরু কর। রবিন, তুমি লেজের কাছে, পাখনার ওপর থেকে। আমি পেটের দুই পাশ থেকে চিরছি।
ভীষণ শক্ত চামড়া। এমন সব জায়গা আছে, ছুরিই বসতে চায় না। সেসব জায়গায় প্রবাল পাথর দিয়ে ছুরির বাটে বাড়ি মেরে ফলা ঢোকাতে হচ্ছে।
দরদর করে ঘামছে কিশোর। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বলল, কেটে ছাড়াতে পারলে ভালই হবে। যা শক্ত, নারকেল পাতার চেয়ে অনেক বেশি টেকসই হবে, একেবারে ক্যানভাস। অ্যাসবেসটসের চেয়েও বেশি টেকসই হবে।
অত টেকার দরকার নেই আমাদের, রবিন বলল। আরও অনেক কম টিকলেও চলবে। দুতিন হপ্তার বেশি তো থাকছি না আমরা এই দ্বীপে।

খচ করে কাটা বিঁধল যেন কিশোরের মনে। ওরা এখনও জানে না, কোনদিনই আর ফিরবে না ডেংগু। বলে দেবে? জানাতেই যখন হবে, দেরি করে লাভ কি? শুনে আগে থেকেই মনকে শক্ত করুক।
নিশ্চয়! হালকা গলায় বলল কিশোর। কিন্তু ধর, আর ফিরল না। তাহলে?
থেমে গেল মুসার ছুরি। আমাদের তাহলে কি হবে ভেবেছ?
কি আর হবে, বলল রবিন। মরব।
না, এত সহজে মরছি না, কিশোর বলল। বেঁচে যাবই। কোন না কোন উপায় নিশ্চয় হয়ে যাবে। চুপ করে না থেকে এখন যা করছি করি। এই, মুসা, ওই কোনাটা ভালমত ছাড়াও। বাপরে বাপ, কি মোটা চামড়া!
হাসল মুসা। গণ্ডারেরও এত মোটা কিনা সন্দেহ।
দুই ঘন্টা কঠোর পরিশ্রমের পর দম নেয়ার জন্যে থামল ওরা। চামড়া অর্ধেক ছাড়িয়েছে। এমনিতেই সাংঘাতিক দুর্গন্ধ ছিল, চামড়া ছাড়ার পর অসহ্য হয়ে উঠেছে। মাথায় যেন গরম হাতুড়ি পিটছে সূর্য। রোদের তেজ এড়ানর জন্যে চোখের পাতা প্রায় বুজে রেখেছে ওরা। শার্টের হাতা দিয়ে মুখ মুছল মুসা। টর্নিকেট, ব্যাণ্ডেজ, আর কপালে পট্টি দিতেই শেষ হয়েছে কিশোরের শার্ট। মুসারটার না দিয়েই মুখ মুছল।
এক গ্লাস পানি যদি পেতাম, মুসা বলল।
তাই তো! চমকে উঠল কিশোর। একবারও মনে হয়নি ও-কথা! ছাউনির চেয়েও বেশি দরকার পানি, খাবারের চেয়েও। থাক, কাজকর্ম এখন বাদ। বাকিটা কালও সারতে পারব। এখন চল, কুমালো কেমন আছে, দেখে, পানির খোঁজ করি।
ঘুমিয়ে আছে কুমালো। গায়ের ওপর থেকে সরে গেছে গাছের ছায়া। ধরাধরি করে তাকে সরাল কিশোর আর মুসা। পট্টি শুকিয়ে গেছে, ভিজিয়ে এনে আবার ওটা কপালে রাখল রবিন।
তারপর শুরু হল পানির খোঁজ। পানি পাওয়া যাবেই, জোর গলায় একথা একে অন্যকে শুনিয়ে রওনা হল ওরা। কিন্তু মনে মনে প্রত্যেকেই জানে, পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। রুক্ষ এই রোদেপোড়া প্রবালদ্বীপে কোথায় থাকবে মিষ্টি পানি?
হারিক্যানের সময় প্রচুর বৃষ্টি হয়েছে, কিশোর বলল। পাথরের মাঝে বড় গর্তটর্ত থাকলে আটকে থাকার কথা। রোদে নিশ্চয় সব শুকিয়ে যায়নি এখনও।
তীরের কাছে পাওয়া গেল একটা গর্ত, বেশ বড় গামলার মত। তাতে কিছু পানি আটকে রয়েছে। তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে আঁজলা ভরে তুলে মুখে দিল মুসা। থু থু করে ফেলে দিল পরক্ষণেই।
দূর! লবণ!

বৃষ্টির পানি নয়, ঝড়ের সময় সাগরের পানিই উঠেছিল এখানে। আরও কিছু গর্ত পাওয়া গেল, তাতে পানির দাগ আছে, পানি নেই। শুকিয়ে গেছে অনেক আগেই।
নারকেল গাছের গোড়াগুলোয় খুঁজে দেখল কিশোর।
নিশ্চয় ফল ছিল গাছে, রবিন বলল।
এক আধটা নারকেল পেলেও আপাতত চলত, বলল মুসা।
হ্যাঁ, কিশোর বলল। পানি তো হতই। খাবারও।
নারকেলের মিষ্টি পানি আর শাঁসের কথা ভেবে জিভে জল এল তিনজনেরই।
অনেক খুঁজল ওরা। কিন্তু একটা নারকেলও মিলল না।
মুশকিল হয়েছে কি, কিশোর বলল। নারকেল পানিতে ভাসে। ঝড়ের সময় যা পড়েছিল সব ভাসিয়ে নিয়ে গেছে ঢেউ।
তাহলে? ভুরু নাচাল মুসা। এবার কি করব?
খুঁড়ব, বলে সৈকতের দিকে রওনা হল কিশোর। ভাটার সময় ল্যাগুনের পানি নেমে গেলে নাকি অনেক সময় কিনারে মাটির তলায় মিষ্টি পানি পাওয়া যায়। আচ্ছা, এই জায়গাটা কেমন মনে হয় তোমাদের? পা দিয়ে দেখাল সে, ঠিক এই পর্যন্ত ওঠে পানি। পা আরেকটু নিচের দিকে সরাল, এখানটায়?
আমার কাছে পাগলামি মনে হচ্ছে, বলল মুসা। নোনা পানির নিচে আবার মিষ্টি পানি থাকে কি করে?
কি করে থাকে, জানি না, রবিন বলল। তবে আমিও পড়েছি। আমার মনে হয় বিচিত্র কোন প্রাকৃতিক কারণে বৃষ্টির পানি জমেটমে থাকে আরকি।
বেশ, খুঁড়ি তাহলে, বলে চ্যাপ্টা একটা পাথর তুলে নিয়ে ওটাকে বেলচা বানিয়ে বালি খুঁড়তে শুরু করল মুসা।
তিন ফুট খোঁড়ার পর কিশোর বলল, এবার থাম। দেখা যাক কি ঘটে?
চুইয়ে পানি উঠতে শুরু করল গর্তে। দেখতে দেখতে ভরে গেল তিন চার ইঞ্চি।
মিষ্টি পানি? মুসার জিজ্ঞাসা।
কি জানি, বলল কিশোর। আশা করছি। অনেক অ্যাটলেই ঘটে এটা। জাহাজডুবি হয়ে নাবিকেরা দ্বীপে ওঠার পর এমনি করে পানি বের করেই খেয়ে বেঁচেছে, শুনেছি।
দীর্ঘদিন বৃষ্টি না হলেও?
তা বলতে পারব না।
আমি পড়েছি, রবিন বলল। বষ্টি না হলেও পাওয়া যায়। সাগরের পানিই বালির স্তর ভেদ করে ওঠার সময় ফিলটার হয়ে যায়। লবণ অনেকখানি নষ্ট হয়ে যায় তাতে। আর বৃষ্টি হলে তো কথাই নেই। পাথর আর বালির ফাঁকফোকর দিয়ে চলে

যায় তলায়, জমা হয়ে থাকে।...হ্যাঁ, যথেষ্ট উঠেছে। এবার খেয়ে দেখ। সাবধান, বেশি নেড় না। নোনা পানির চেয়ে মিষ্টি পানি হালকা, থাকলে ওপরেই থাকবে।
খানিকটা পানি তুলে মুখে দিল মুসা। তারপর আরও দুই আঁজলা তুলে গিলে ফেলল। মাথা দুলিয়ে বলল, লবণ আছে, তবে ততটা নয়। সাগরের পানির চেয়ে কম।
খানিকটা তুলে কিশোরও মুখে দিল। হতাশ মনে হল তাকে। মুখ থেকে ফেলে দিয়ে বলল, খেয়ো না আর, ভাল না। পেটে সহ্য হবে না।
কিশোরের না বললেও চলত। কপাল টিপে ধরল মুসা। ওয়াক ওয়াক শুরু করল। মোচড় দিচ্ছে পেট। হড়হড় করে বমি করে ফেলল। সকালে নাস্তা যা খেয়েছিল বেরিয়ে গেল সব।
রাগ করে কিশোর আর রবিনের দিকে তাকাল। ধেত্তের তোমাদের মিষ্টি পানি! বইয়ে কি সত্যি কথা লেখে নাকি? ব্যাটারা জানে না শোনে না...মরা দ্বীপে কখনও আটকা পড়েছিল ওরা যে জানবে?
তা হয়ত পড়েনি, স্বীকার করল কিশোর। কিন্তু ইউ এস নেভির সারভাইভাল বুক-এও একথাই লিখেছে, আমরা যা করলাম ওরকম করেই পানি বের করতে বলেছে।
তাহলে বেরোল না কেন?
হয়ত এখানকার বালি মোটা বেশি, লবণ ঠিকমত ফিল্টার করতে পারে না। কিংবা হয়ত খুব বেশি বৃষ্টি হয়নি এখানে। আর হলেও হয়ত ফাঁকফোকর দিয়ে অনেক নিচে নেমে গেছে।
অত সব হয়ত হয়ত শুনে তো লাভ নেই। সত্যি সত্যি হয় ওরকম কিছু কর।
মুসা, শান্তকণ্ঠে বলল কিশোর। তোমার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি। কিন্তু ভুলে যাচ্ছ, এই দ্বীপে তুমি শুধু একাই তৃষ্ণার্ত নও।
চুপ হয়ে গেল মুসা।
থেমে থাকল না ওরা। চলল পানির ক্লান্তিকর খোঁজে। হাঁটতে হাঁটতে চলে এল প্রাচীরের সব চেয়ে সরু জায়গাটায়, এক দ্বীপ থেকে আরেক দ্বীপে যাবার সেতু তৈরি করেছে যেটা। দেয়ালের একপাশে সারাক্ষণ আছড়ে পড়ে সাদা ফেনা সৃষ্টি করছে সাগরের ঢেউ, আরেক পাশে নীল ল্যাগুনের সাদা সৈকত ঢালু হয়ে নেমে গেছে পানিতে। কাঁচের মত মসৃণ ল্যাগুনের পানি। এখানটায় গভীরতা বারো ফুটের বেশি নয়। নিচে যেন গজিয়ে উঠেছে এক পরীর, শহর, তাতে গাঢ় লাল প্রাসাদ, স্তম্ভ, প্যাগোডা, মিনার, সবই রয়েছে, তৈরি করেছে খুদে প্রবাল-কীট।
অতি চমৎকার দৃশ্য, মন ভরে যেত যদি গরম, ক্লান্তি, চোখ জ্বলা, এবং খাবার আর পানির ভাবনা ভুলে থাকা যেত। কিন্তু তা থাকা সম্ভব নয়।

সেতুর ওপাশেই আবার চওড়া হতে শুরু করেছে দেয়াল। ঘন্টাখানেক ধরে অন্য দ্বীপটায় খোঁজাখুঁজি করল ওরা। পানি পাওয়া গেল না। পাথরের খাঁজে, গর্তে পানি জমে রয়েছে, সবই নোনা। নারকেলের গোড়া আছে, কাণ্ড আছে, কোনটারই মাথা নেই, ফলে পাতা বা ফলও নেই। কোন কোন গুঁড়ির মাঝে গর্ত হয়ে আছে, ওগুলোতেও জমে-থাকা পানির খোঁজ করল ওরা। পেল না। শুকিয়ে গেছে।

অবশেষে পাওয়া গেল একটা নারকেল! আটকে রয়েছে পাথরের খাঁজে। ঢেউও ভাসিয়ে নিতে ব্যর্থ হয়েছে।

উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে ছোবড়া ছাড়াল ওরা। মাথার ওপরের দিকে ফাটা। ফাঁকের ভেতরে ছুরি ঢুকিয়ে চাড় দিয়ে ওপরের অংশটা তুলে ফেলল কিশোর। ভেতরের জিনিস দেখে গুঙিয়ে উঠল তিনজনেই।

খাইছে! বিলাপ শুরু করবে যেন মুসা। এক্কেবারে পচা!

ফাটা দিয়ে মালার ভেতরে নোনা পানি ঢুকে নারকেলের পানি আর শাঁসের সর্বনাশ করে দিয়েছে।

ছুরি দিয়ে খুঁচিয়ে শাস ফেলে মালা পরিষ্কার করতে করতে কিশোর বলল, যাক, একটা কাপ পাওয়া গেল।

লাভ কি? বলল রবিন, কি রাখব এটাতে?

দেখা যাক। কিছু না কিছু পাওয়া যাবেই।

খোঁজ চালিয়েই গেল ওরা। পশ্চিম দিগন্তে হেলে পড়েছে সূর্য। খাবার লাগবে, জানান দিল ওদের পেট, পানির তাগাদা দিতে শুরু করল।

এই যে পানি! হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল কিশোর।

কি পেয়েছে দেখার জন্যে তাড়াতাড়ি কুঁকে এল রবিন আর মুসা। পাথরের ফাঁকে মাটিতে শেকড় গেড়ে আছে চ্যাপ্টা এক ধরনের উদ্ভিদ।

হুঁহ, পানি! হতাশ হল মুসা।

মুসার কথায় কান দিল না কিশোর। নরম একটা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে মুখে পুরে চিবাতে শুরু করল। ঠাণ্ডা রসে ভরা পাতাটা। শুকনো মুখ আর খসখসে জিভে ভিজে পরশ বোলাল। হাসি ফুটল তার মুখে।

একটা পাতা ছিঁড়ে মুসাও মুখে পুরল। বলল, হুঁ, ভালই। কিন্তু আর হেঁড়ার জন্যে হাত বাড়াল না।

রবিনও ছিঁড়ল একটা। বেশি না। তিনজনের মনেই এক ভাবনা। গাছটা তুলে নিয়ে যেতে হবে তাদের দ্বীপে। ওদেরই যখন এত পিপাসা, আহত কুমালোর নিশ্চয় আরও অনেক বেশি।

ভীষণ অস্থির হয়ে পড়েছে কুমালো। চোখ মেলল। জ্বরে লাল টকটকে।

সামান্য পানি নিয়ে এসেছি, কুমালো, কিশোর বলল। তবে এই পানি গিলতে পারবে না, চিবাতে হবে। তোমরা একে কি বল, জানি না, বইয়ে এর নাম পড়েছি পিগউইড।
পার্সলেইনও বলে অনেকে, রবিন বলল।
নাম যা-ই হোক খুব আগ্রহের সঙ্গে গাছটা নিল কুমালো। পাতাগুলো চিবিয়ে শেষ করল। তারপর একে একে শেষ করল কাণ্ড আর শেকড়ের রস।
দারুণ, বলল সে। নিশ্চয় আরও অনেক আছে। খেয়েছ তো?
মাথা কাত করল মুসা।
সরি, কিশোর বলল। আর কোন খাবার-টাবার দিতে পারব না তোমাকে।
কুমালো হাসল। পানিই দরকার ছিল আমার। পেয়েছি। এখন ঘুমাতে পারব, বলেই চোখ মুদল সে।
আরও পিগউইডের সন্ধান করল কিশোর। পেল না। পাতার দুএক ফোঁটা রস পিপাসা না কমিয়ে বরং বাড়িয়েই দিয়েছে। খুনী সূর্যটাকে দিগন্তের ওপাশে হারিয়ে যেতে দেখে আন্তরিক খুশি হল সে। স্বাগত জানাল রাতকে। ভেবে শঙ্কিত হল, ভয়ঙ্কর দিন আসবে কয়েক ঘন্টা পরেই, আরেকটা, তারপর আরেকটা... আসতেই থাকবে একের পর এক, যতক্ষণ না ক্ষুধায় পিপাসায় মারা যাচ্ছে ওরা...
এভাবে মরতে চায় না কিশোর। কিন্তু বাঁচতে হলে পানি চাই। এক নম্বর সমস্যা এখন পানি। কোথায় পাওয়া যাবে? ভাবতে বসল সে। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে ঘন ঘন। হঠাৎ পাথরে হাত পড়তে চমকে উঠল। ভেজা ভেজা!
শিশির! শিশির পড়ছে। সন্ধ্যার ছায়া নামতেই হালকা বাষ্প জমেছে ল্যাগুনের ওপরে। যদি কোনভাবে ধরা যেত ওই শিশির...
শুনেছে, পলিনেশিয়ানরা শিশির ধরার কায়দা জানে। মনে করতে পারছে না কিভাবে। কুমালো হয়ত জানে, কিন্তু ও ঘুমাচ্ছে, এখন জাগানো উচিত হবে না।
ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছে রবিন আর মুসা। কিন্তু কিশোরের চোখে ঘুম এল। শুয়ে গড়াগড়ি করল কিছুক্ষণ। তারপর উঠে পড়ল। একটা ব্যবস্থা করতেই হবে।
ল্যাগুনের সৈকতে চলে এল সে। বালিতে একটা ছোট গর্ত করল। তলায় রাখল নারকেলের মালাটা। গর্তের মুখ ঢেকে দিল কাপড় দিয়ে, শার্ট ঘেঁড়া কাপড়, যেটা দিয়ে কুমালোর মাথায় পট্টি দিয়েছিল। ঠাণ্ডা এখন বাতাস, পট্টির আর দরকার নেই। নারকেলের মালার মুখে কাপড়টার যে গোল অংশটুকু পড়েছে, তার ঠিক মাঝখানে একটা ফুটো করল। তারপর গর্তটা ঢেকে দিতে লাগল পাথর দিয়ে। ছোট ছোট পাথরের তিন ফুট উঁচু একটা পিরামিড তৈরি করে ফেলল গর্তের ওপরে।

উদ্দেশ্যঃ পাথরে ধরা পড়বে শিশির। ভিজবে। তারপর আরও শিশির পড়ে পাথরের ফাঁক দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে নামবে নিচে, শার্টের কাপড়ে জমা হবে, সেখান থেকে ফোঁটা ফোঁটা পড়বে মালায়। সকাল নাগাদ একমালা পরিষ্কার পানি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

ফিরে এসে দেখল সে, রবিন আর মুসা কুমালোর পাশে মড়ার মত ঘুমোচ্ছে। কিশোরও শুয়ে পড়ল আবার, মাথার নিচে দিল প্রবালের বালিশ।

কিন্তু ঘুমাতে পারল না। জীবন বাঁচানোর জন্যে অতি প্রয়োজনীয় তিনটে শব্দ শুধু ঘুরছে মাথায়—পানি, খাবার, ছাউনি।

বাড়িতে নিঝঝাট জীবন জাপনের কথা ভাবল সে। নরম বিছানা, মাথার ওপরে ছাত। পানির ভাবনা নেই। বিছানা থেকে নেমে কয়েক পা গিয়ে ট্যাপের মুখ ঘোরালেই হল। খিদে পেলে শুধু ফ্রিজের ডালা খোলা, ব্যস...।

বাড়িতে জীবন এত সহজ, যারা থাকে ধরে নেয় এত সহজেই কাটে জীবন, সব জায়গায়। কষ্ট যে করতে হয় অনেক জায়গায়, বোঝেই না যেন। তাই অচেনা সঙ্কটময় কোন জায়গায় গিয়ে পড়লে ভাবে, এই বুঝি মরলাম! ওখানেও যে বাঁচা সম্ভব, বিশ্বাসই করতে চায় না।

ওর গলা শুকিয়ে খসখসে সিরিশ কাগজ হয়ে গেছে। পেট যেন শূন্য একটা ড্রাম। তন্দ্রা নামল চোখে। স্বপ্নে দেখল বৃষ্টি। চমকে জেগে গেল সে। তাকাল আকাশের দিকে।

মেঘশূন্য আকাশ। বড়বড় একেকটা উজ্জ্বল তারা যেন খুদে খুদে সূর্য, কিশোরের মনে হল ওগুলোর তাপ এসে লাগছে তার গায়ে। ছায়াপথটাকে দেখে মনে হচ্ছে লম্বা পথের ওপর ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে কাচের গুঁড়ো।

এরকম রাত বিকিনিতেও কাটিয়েছে। রাতের বেলা ছোট জীবের হুটোপুটি শুনেছে ঝোপের ভেতরে। এখানে এই মৃত্যুদ্বীপে ওরকম কিছু নেই, একেবারে নীরব, শুধু দেয়ালে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের বিচিত্র গুমরানি ছাড়া। বাতাসে ভেসে আসছে মৃত্যুর গন্ধ, দ্বীপের ওপাশ থেকে, পচা হাঙরের।

আবার অস্থির ঘুম নামল কিশোরের চোখে।

কাক-ভোরের ফ্যাকাসে আলোয় ঘুম ভাঙল তার। পিঠে আর শরীরের এখানে ওখানে ব্যথা। চোখা প্রবালের খোঁচা যেখানে যেখানে লেগেছে সবখানে। বাতাস খুব ঠাণ্ডা, পরিস্কার। ঘুমানর আগে যতটা ক্ষুধা আর তৃষ্ণা ছিল, ততটা নেই। খারাপ লক্ষণ। তারমানে দেহের যন্ত্রপাতিগুলো অবশ হয়ে আসছে।

তবে তাজা বাতাস নতুন উদ্দীপনা সঞ্চার করল তার মধ্যে। যেভাবেই হোক, যে-কোন উপায়েই হোক, এই মৃত্যুদ্বীপকে পরাজিত করবে ওরা, সেই সাথে পরাজিত করবে ডেংগু পারভিকে। মনে পড়ল একটা কবিতার দুটো চরণঃ

দি মরনিংস ডিউ পার্লড
অলস রাইট উইথ দ্য ওয়ার্ল্ড।
খুশি মনে উঠে সৈকতে চলল সে। দেখার জন্যে, তার শিশির-ধরা-ফাঁদে কতখানি শিশির আটকা পড়েছে।
পানি জমেছে মালার অর্ধেকের কম। আরও বেশি পড়বে আশা করেছিল সে। শিশির বোধহয় হালকা ছিল। যাকগে, যা পড়েছে তাই লাভ। অতি মূল্যবান তরলটুকু নিয়ে ক্যাম্পে ফিরল সে।
কুমালো নড়াচড়া করছে। চোখ মেলে তাকাচ্ছে ও, তবে কেমন যেন হতবুদ্ধি একটা ভাব। তার মাথাটা তুলে ধরে অর্ধেকটা পানি গলায় ঢেলে দিল কিশোর। বাকি অর্ধেক মুসার হাতে দিয়ে বলল, তোমরা দুজনে ভাগাভাগি করে খেয়ে ফেল।
হাই তুলতে তুলতে উঠে বসেছে রবিন।
মালাটা মুসার হাতে ধরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। চলে এল মরা হাঙরটার কাছে। চামড়া ছিলতে শুরু করল। আর খামিক পরেই উঠবে মারাত্মক রোদ, তার আগেই যদি একটা ছাউনির ব্যবস্থা করা যায়, বেঁচে যাবে।
মালার তলায় জমা পানিটুকুর দিকে তাকিয়ে আছে মুসা। মুখ বাড়িয়ে রবিনও দেখল। চোখে চোখে কথা হয়ে গেল দুজনের। ওই দুই চুমুক পানিই এখন ওদের কাছে লক্ষ টাকার চেয়ে দামি। মুসা ভাবছে কুমালোর কথা, রবিনও।
গোঙাচ্ছে কুমালো। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে কপালে। রোদ ওঠার আগেই যদি এই অবস্থা হয়, উঠলে পরে কি হবে? পানি খেল না মুসা। রবিনের দিকে বাড়িয়ে ধরল। মাথা নাড়ল রবিন। হাসল দুজনেই। কুমালোর মাথাটা উঁচু করে বাকি পানিটুকু তার মুখে ঢেলে দিল মুসা।
কিশোরকে সাহায্য করতে চলল দুই সহকারী গোয়েন্দা।
চামড়া পুরোপুরি ছাড়ার আগেই উঠল লাল সূর্য, দিগন্তে উঁকি দিয়েই যেন আগুন ছড়াতে শুরু করল।
চামড়া ছাড়ানো শেষ হল অবশেষে। বিশ ফুট লম্বা আট ফুট চওড়া বেশ চমৎকার একটা টুকরো। ভেতরের দিকে লেগে থাকা মাংসের টুকরোগুলো সযতে, সাফ করে ফেলল ওরা। চামড়াটা টান টান করে মাটিতে বিছিয়ে দেখল কাজ কেমন হয়েছে।
ভাল বুদ্ধি বের করেছিলে, রবিন, কিশোর বলল।
ঘর তো বানায় বললে মাছের চামড়া দিয়ে, মুসা বলল রবিনকে। কি করে বানায়? সাইবেরিয়ায় বললে, না?

হ্যাঁ। মাছ-তাতার বলে ওদেরকে। মাছ খায়, মাছের চামড়া দিয়ে জুতা আর পোশাক বানায়, ঘর বানায়। মাটিতে খুঁটি গেড়ে তার ওপর চামড়া ছড়িয়ে দেয়। যদি দেখতে যাও, বহুদূর থেকেই ওদের গ্রামের গন্ধ নাকে আসবে তোমার।
জানি, কি বলতে চাইছ, নাক কুঁচকাল মুসা।
হাঙরের চামড়ার অবশ্য এতটা গন্ধ বেরোবে না, কিশোর বলল। রোদে শুকিয়ে যাবার পর। তবে মাছটার গন্ধ আর সইতে পারছি না। এটাকে গড়িয়ে নামিয়ে দিতে পারলে হয়। জোয়ারে ভেসে চলে যাবে।
প্রচণ্ড পরিশ্রমের পর ভারি লাশটাকে পানির কিনারে নিয়ে যেতে পারল ওরা।
মাংসের পাহাড়, পচা দেহটার দিকে তাকিয়ে বলল মুসা।
অথচ এমনি কপাল আমাদের, একটা টুকরো মুখে দিতে পারব না।
বেশি পচে গেছে, কিশোর বলল। খেলে পেটে অসুখ করে মরবে।
সুতরাং, সাগরের নাস্তার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে বিষাক্ত খাবারের দিকে পিঠ ফেরাল ওরা। হাঙরের চামড়াটা টানতে টানতে নিয়ে ফিরে এল ক্যাম্পে।
ঘর বানানয় মনোযোগ দিল ওরা। কি করে বানানো যায়? পেরেক নেই, বল্ট নেই, স্ক্রু নেই, নেই কড়িকাঠ, তক্তা, খুঁটি। ঘর বানাতে যা যা জিনিস প্রয়োজন, তার কোনটাই নেই।
শুধু আছে একটা চামড়া, মুসা বলল। চালা বানানো যাবে। দেয়াল হবে কি দিয়ে? পাথর জড়ো করব?
প্রথমে দরকার লগি, বলল কিশোর। আর গোটা দুই খুঁটি। ওই নারকেলের কাণ্ডটা দিয়ে লগির কাজ চলবে।
আরেকটা কাণ্ড কেটেই তো দুটো খুঁটি বানানো যাবে, রবিন বলল। কিংবা আরও এক কাজ করা যায়। নারকেলের অনেক কাণ্ড দাঁড়িয়ে আছে। পাশাপাশি দুটোকে পালা হিসেবে ব্যবহার করতে পারি।
নারকেল কাণ্ডের অভাব নেই। আট ফুট উঁচু দুটো কাণ্ড বেছে নিল ওরা, একটা থেকে আরেকটার দূরত্ব বারো ফুট। ছুরি দিয়ে ওগুলোর মাথায় গভীর খাঁজ কাটল। তার পর ফেঁড়ে যাওয়া আরেকটা কাণ্ডকে কেটে এনে তুলে দিল ওই দুটোর ওপর, কড়িকাঠ হয়ে গেল।
বাবা, দারুণ চালা, মুসা বলল। তাবু হয়ে গেল একেবারে।
হ্যাঁ, মাথা ঝাঁকাল রবিন। অনেক পলিনেশিয়ানই এরকম কুঁড়েতে থাকে। দ্বীপে থাকার সময় জাপানীরাও হরদম বানাত।
কড়িকাঠের ওপর চামড়াটা ঝুলিয়ে দিল ওরা, দড়িতে চাদর ঝোলানর মত করে। দশ ফুট করে হল একেকদিকে। এরপর দেয়াল তৈরির পালা। প্রবালের চ্যাপ্টা টুকরো এনে একটার ওপর আরেকটা রেখে দুই পাশে চার ফুট উঁচু দুটো দেয়াল

তুলল। চামড়ার দুই প্রান্ত বিছিয়ে দিল ওগুলোর ওপর। তার ওপর আরও পাথর রেখে আটকে দিল, যাতে ছুটতে না পারে। ব্যস, হয়ে গেল ঢালু ছাউনি। রোদ তো আটকাবেই, বৃষ্টি হলেও গড়িয়ে পড়ে যাবে ঢাল বেয়ে।
পাথর দিয়ে অন্য দুপাশের দেয়ালও তুলে দিল ওরা। চারটে বড় বড় ফোকর রাখল, ওগুলো দরজা।
শেষ হল ঘর তৈরি। এমন কুঁড়ে আর কেউ কখনও দেখেছে কিনা সন্দেহ। মুসার দৃঢ় বিশ্বাস, মাছ-তাতারেরাও দেখেনি এই জিনিস।
কুমালোকে ঘরের ভেতর নিয়ে আসা হল। শোয়ানো হল প্রবালের মেঝেতে সব চেয়ে কম খসখসে জায়গায়। নিঃশ্বাস ফেলা দেখেই বোঝা গেল অন্ধকার। ঠাণ্ডায় এসে আরাম লাগছে তার। তিন ফুট চওড়া প্রবালের দেয়াল পুরোপুরি ঠেকিয়ে দিয়েছে রোদ। চালাটাও চমৎকার, অন্তত নারকেল পাতার ছাউনি আর ক্যানভাসের চেয়ে ভাল। কুঁড়ে কিছুটা নিচু হয়ে গেল, তবে একদিক দিয়ে সেটা বরং ভালই, ঝড়ের সময় বাতাসে উড়িয়ে নেয়ার সম্ভাবনা কম।
লম্বা হয়েছে যথেষ্ট। চারজনের জন্যে বেশ বড়। গা ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকতে হবে না।
বৃষ্টির দিনে রান্নাও করতে পারব এর ভেতর, কিশোর বলল।
যদি বৃষ্টি হয়, বলল মুসা। রান্না করার মত কিছু পাওয়া যায়। আর যদি আগুন জ্বালাতে পারি।
ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার কিশোর। এইসব যদির সমাধান করতে হবে আমাদের। বৃষ্টি ঝরাতে পারব না, কাজেই পানি জোগাড়ের অন্য ব্যবস্থা করতে হবে। হয়ে যাবে। ভাবতে হবে আর কি। গুইজি লতা থেকে পানি পাওয়া যায়, কিন্তু এই দ্বীপে ওই গাছ নেই। ব্যারেল ক্যাকটাসে পানি পাওয়া যায়, এখানে তাও নেই। প্যানডানাসের খোঁজ করলে কেমন হয়? এখানকার মত খারাপ জায়গায়ও জন্মায় ওগুলো। পানি থাকে ওতে। চল, খুঁজে দেখি।
খুব উৎসাহের সঙ্গে রওনা হল ওরা, যদিও জানে, প্যানভানাস পাওয়ার আশা তেমন নেই।
একটা পাথর তুলে মুসার হাতে দিতে দিতে কিশোর বলল, এটা চোষ। লালা গড়াতে থাকবে। মনে হবে পানি খাচ্ছ।
বাকি দিনটা খুঁজে বেড়াল ওরা। প্যানডানাসও পেল না, পানি আছে ওরকম কিছুই না। চাঁদের পিঠের মতই মরা যেন এই দ্বীপ।
সেরাতে আবার শিশির ধরা ফাঁদ পাতল কিশোর। কিন্তু পাতার খানিক পরেই এল জোরাল বাতাস, বাষ্প জমতেই পারল না। সকালে শূন্য পাওয়া গেল মালাটা। এমনকি রোগীর জন্যেও এক ফোঁটা পানি মিলল না।

কুমালোর বিহ্বল ভাব কেটে গেছে। ফলে পায়ের অসহ্য ব্যথা টের পাচ্ছে। প্রচণ্ড পিপাসা। তবে জ্বর চলে গেছে। গাল আর কপালে হাত দিলে এখন আগের মত গরম লাগে না। তার সঙ্গে পানির সমস্যা নিয়ে আলোচনা করল কিশোর। পানির জন্যে কি কি করেছে, সব জানাল। তারপর বলল, তুমি নিশ্চয় কোন উপায় বাতলাতে পারবে?
না, কুমালো বলল। এর বেশি আমিও কিছু করতে পারতাম না। ওই পিগউইড খুঁজে বের করা, তারপর মালা পেতে শিশির ধরা...।
জীবনে এতটা বোকা মনে হয়নি নিজেকে, বিড়বিড় করল কিশোর। অসহায়...
কিশোরের বিধ্বস্ত চেহারার দিকে তাকাল কুমালো। দুশ্চিন্তা কাবু করে ফেলেছে তোমাকে। একটা কথা বললে শুনবে?
কী?
সাঁতার কাটতে চলে যাও তোমরা। আমার দেশের লোকের বিশ্বাস, কোন ব্যাপার যখন খুব জটিল হয়ে যায়, কিছুতেই কিনারা না হয়, ওটার দিক থেকে তখন মুখ ফিরিয়ে নেয়া উচিত। গিয়ে খেলাধুলা করা উচিত কিছুক্ষণ। এতে শরীরের অস্থিরতা কমে, চিন্তার ক্ষমতা বাড়ে।
বেশ, ডাক্তার কুমালো, তুমি যখন বলছ, যাচ্ছি, শুকনো হাসল কিশোর।
তবে আমার মনে হয় সময়ই নষ্ট হবে অযথা।
আমার কাছে পরামর্শটা ভালই লাগছে, মুসা বলল। বাতাস আছে। পানিও বেশ ঠাণ্ডা। আরামই লাগবে।
রবিন কিছু বলল না। তবে কিশোর আর মুসা উঠতেই সে-ও পিছে পিছে চলল।
সাগরের কিনারে চলে এল ওরা। ল্যাগুনের চেয়ে এদিকটায় ঠাণ্ডা বেশি। ঝাঁপিয়ে পড়ল ঢেউয়ের ওপর। ধীরে ধীরে ঢালু হয়ে যায়নি দেয়ালটা, সৈকত নেই, একবারেই ঝপ করে নেমে গেছে গভীর পানিতে। তিনটে সীল মাছের মত খেলতে শুরু করল ওরা। ডুব দিচ্ছে, সাঁতার কাটছে, দাপাদাপি করছে। কচুপাতার পানির মত পিছলৈ ধুয়ে চলে গেল যেন তাদের সমস্ত উদ্বেগ।
ধরতে পারবে না আমাকে, মুসাকে চ্যালেঞ্জ করল কিশোর।
পারলে কি দেবে?
এই দ্বীপটা।
এই মরা দ্বীপ কে নেয়? তবু আমি ধরছি তোমাকে। কয়েক গজও যেতে পারল না কিশোর, তার আগেই তাকে ধরে ফেলল মুসা। ভেসে উঠে হাসতে হাসতে বলল, কি, রবিন মিয়া, তুমি চ্যালেঞ্জ করবে নাকি?
মাথা নাড়ল রবিন, না বাবা, পারব না, খামোকা মুখ খরচ করে লাভ নেই।
ডুব দাও,মুসাকে বলল কিশোর। আমি ধরব।

পারবে না জানে, তবু মুসার দ্রুত নেমে যাওয়া ছায়াটাকে লক্ষ্য করে ডুবে চলল কিশোর।
বিশ ফুট মত নেমে থামল মুসা। দেয়ালের ধার ধরে ডুব-সাঁতার দিয়ে চল। তার পিছে তেড়ে এল কিশোর।
দেয়ালের বোতলের মুখের মত জায়গাটায় এসে, যেখানে চওড়া হতে আরম্ভ করেছে দেয়াল, হঠাৎ মুখে ঠাণ্ডা পানি লাগল মুসার। বেশি ঠাণ্ডা।
মনে হল, ঠাণ্ডা পানির একটা ডুবো-প্রবাহ দেয়ালের গা থেকে বেরিয়ে এসে সাগরে পড়ছে। সামনে এগোতেই আবার গরম পানিতে পড়ল সে।
ঠাণ্ডা পানি কিশোরের শরীরেও লাগল। সঙ্গে সঙ্গে ভেসে উঠতে শুরু করল সে। দম প্রায় ফুরিয়ে এসেছে মুসার, সে-ও উঠতে লাগল।
রবিন দেখল, ভুস জুস করে ভেসে উঠল দুটো মাথা। সাঁতরে কাছে আসতে লাগল সে।
ঝাড়া দিয়ে চুল আর মুখ থেকে পানি ফেলে কিশোর বলল, মুসা, কিছু টের পেয়েছি। ঠাণ্ডা পানি। মনে হল দ্বীপের ভেতর থেকেই আসছে।
এর মানে বুঝতে পারছ?
না তো!
এর মানে পরিষ্কার পানি! বাজি ধরে বলতে পারি আমি।
ধরলে হারবে, আরকি।
কাছে চলে এল রবিন। জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে। তাকে বলল কিশোর। শুনে তার সঙ্গে একমত হল রবিন। নিশ্চয় মিষ্টি পানি! ইস, একটা বোতল পেলে হত! চল, ডুব দিয়ে হাঁ করে মুখে নিই।
ডুব দিল কিশোর। ঠাণ্ডা পানিতে মাথা ঢুকতেই স্রোতের দিকে ফিরে মুখ হাঁ করল। সঙ্গে সঙ্গে মুখে ঢুকল পানি। পরিষ্কার, মিষ্টি! গিলে নিয়ে আবার হাঁ করল। আবার গিলে আবার হাঁ। পানি মুখে নিয়ে ভেসে উঠল ওপরে। তার পাশে ভাসল মুসা।
রবিইন, চেঁচিয়ে উঠল গোয়েন্দা সহকারী। সত্যি মিষ্টি!
খুশিতে দাঁত বেরিয়ে পড়ল কিশোরের। বলল, যাক, অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে। রবিন, মুসার সঙ্গে গিয়ে তুমিও খেয়ে এস।
ওরা দুজনে আবার ভাসলে বলল কিশোর, তোমরা এখানে থাক। নিশানা রাখ। আমি গিয়ে মালাটা নিয়ে আসি।
দশ মিনিটের মধ্যেই নারকেলের মালা নিয়ে ফিরে এল সে। কিন্তু মুখ তো নেই, মুসা বলল। ডোবালেই নোনা পানিতে ভরে যাবে। মিষ্টি পানি ভরবে কিভাবে?
পরা যাবে, বলল রবিন। কায়দা আছে।

হ্যাঁ, বলে ডুব দিল কিশোর। নোনা পানিতে ভরে গল মালা। ঠাণ্ডা পানিতে পৌঁছে মালাটা উপুড় করল সে। ভেতরে হাত ঢুকিয়ে পাম্প করার মত কয়েকবার ওপরে নিচে করল আঙুলগুলো। চাপ লেগে বেরিয়ে গেল নোনাপানি, আর ঢুকতে পারল না, কারণ মিষ্টি পানির চেয়ে ভারি। সেই জায়গা দখল করল মিষ্টি পানি। মালাটাকে কয়েকবার ওপরে-নিচে করে, পানি ঢুকিয়ে, বের করে নিশ্চিত হয়ে নিল। সে, যে আর এক ফোঁটা নোনা পানিও নেই। তারপর মালা ভর্তি মিষ্টি পানি নিয়ে, মালার মুখ হাত দিয়ে চেপে ধরে ভেসে উঠতে শুরু করল ওপরে।
দেয়ালের ওপরে উঠে পা দোলাচ্ছে রবিন। পাশে বসে আছে মুসা। হাত বাড়িয়ে মালাটা নিল কিশোরের হাত থেকে। ঠোঁটে লাগাতে গেল। বাধা দিল কিশোর, না না, আর খেয়ো না। দুতিন দিনের শুকনো পেট, বেশি সইতে পারবে না। যা খেয়েছ খেয়েছ। আবার পরে। এটা কুমালোর জন্যে নিয়ে যাই।
পানির নিচের ঝর্না থেকে কুমালোর জন্যে পানি নিয়ে এল ছেলেরা। দেখে, পানি এসে গেল আহত রোগীর চোখে। দুহাতে মালাটা ধরে একচুমুক খেয়ে নামিয়ে রাখল পাশে, ধরে রাখল যাতে গড়িয়ে না পড়ে যায়। বলল, জীবনে আর কোন জিনিস এত মজা লাগেনি।
যাক, দুটো দরকারি জিনিস পাওয়া গেল, বলল কিশোর। ঘর এবং পানি। কিন্তু পেট বলছে খাবার ছাড়া আর বেশিক্ষণ থাকতে পারবে না।
গুঙিয়ে উঠল মুসা, ঠিক বলেছ! আহারে, দুদিন ধরে যে কি কষ্টে রয়েছে বেচারা, পেটে হাত বোলাল সে।
হেসে উঠল সবাই।
দীর্ঘশ্বাস ফেলে কুমালো বলল, এসব কাজ আমারই করার কথা। অথচ আমি একটা মরা কাঠ হয়ে পড়ে আছি এখানে, তোমরা কষ্ট করে মরছ।
হাত নাড়ল কিশোর। বাদ দাও এসব কথা।
হ্যাঁ, তোমারও এখন খাবার দরকার, মুসা বলল। আমাদের চেয়ে বেশি দরকার তোমার। কিশোর, দেরি করে লাভ কি? চল, যাই।
পানি খেয়ে শরীর কিছুটা ঠাণ্ডা হয়েছে। ছাউনির ছায়া ছেড়ে রোদে বেরোতে ইচ্ছে হচ্ছে না কিশোরের। কিন্তু বসে থাকলে চলবে না।
রবিন বলল, খোঁজাখুঁজি তো দুদিন ধরেই করলাম। কিছু থাকলে চোখে পড়ত না? কি পাওয়া যাবে এই হতচ্ছাড়া দ্বীপে?
একটা ব্যাপার চোখ এড়িয়ে গেছে তোমাদের, কুমালো বলল। একটা ভাল লক্ষণ। ওই পাখিটা, গাংচিল। রয়ে গেছে দ্বীপে। খাবার না থাকলে কিছুতেই থাকত না।
প্রথমে আমিও তাই ভেবেছি, কুমালো, কিশোর বলল। শুনে নিরাশ হবে হয়ত। চলে গেছে ওটা। কাল রাতে।

দীর্ঘ একটা নীরব মুহূর্ত, কেউ কথা বলল না। প্রচণ্ড হতাশা যেন চেপে ধরেছে সবাইকে। পানি শক্তি জুগিয়েছে বটে, অন্য দিকে পেটকেও চাঙা করেছে। খাবার চাইছে এখন ওটা।
হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল কিলোর। বলল, এভাবে বসে থাকলে কিছুই হত না। পানি আর ঘর তো পেয়েছি। খাবারও পাব। ওঠ, এস তোমরা। প্রমাণ করে দেব, পাখি ব্যাটা ভুল করেছে।
ক্ষুধা তীক্ষ্ণ করে দিয়েছে ওদের চোখ। মিহি দাঁতের চিরুনি দিয়ে উকুন বাছার মত করে দ্বীপটায় খুঁজতে লাগল খাবার। অতি ছোট বস্তুও এখন চোখ এড়াবে না।
ওল্টানো যায় এরকম আলগা পাথর যে কটা পেল, সব উল্টে উল্টে দেখল তলায় কি আছে। প্রায় চষে ফেলল বালির সৈকত।
কিন্তু নিরাশ হতে হল।
তিন ঘন্টা খোঁজার পর ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ল মুসা। শেষে একটা নারকেলের, কাণ্ডে মাথা রেখে একেবারে শুয়েই পড়ল। একটা আঙুল নাড়তে ইচ্ছে করছে না আর।
খুব মৃদু একটা শব্দ কানে এল, নড়াচড়ার। মনে হল কাটার ভেতরে। কিশোর আর রবিনকে ডাকল সে। কাছে এলে কিশোরকে বলল, কান রেখে দেখ।...কিছু শুনছ?।
কান ঠেকিয়ে রেখেই বলল কিশোর, ভেতরে জ্যান্ত কিছু আছে। ছুরি দিয়ে কেটে বের করা যাবে।
কাটা কাটতে শুরু করল ওরা। পচে নরম হয়ে গেছে। ভেতরের জিনিস দেখে মুখ বিকৃত করে ফেলল রবিন। মোটা মোটা শুয়ালোকার মত কতগুলো জীব।
পোকা! কিশোর বলল। সাদা গোবরেপোকার শুককীট। মুসা, ভর পকেটে। আর আছে কিনা দেখি।
খাবে ওগুলো! রবিনের প্রশ্ন।
প্রাণ তো বাঁচাতে হবে, জবাব দিল কিশোর। নাক টিপে ধরে তেতো ওষুধ খায় না রোগী?
মোট চোদ্দটা পোকা পেল ওরা। সেগুলো দেখাতে নিয়ে গেল কমালোকে।
বিষাক্ত? সন্দেহের চোখে পোকাগুলোর দিকে তাকাচ্ছে রবিন।
মোটেই না, মাথা নাড়ল কুমালো। ভিটামিনে ভরা।
রাঁধা যায় না?
যায়। আগুন তো নেই, রোদে ঝলসেই কাজটা সেরে নিতে হবে। অন্ধকারে থাকে এগুলো, শরীর খুব নরম। গরম পাথরে রেখে রোদে দাও, সেদ্ধ হয়ে যাবে।

ঘিনঘিনে লাগলেও ঝলসানো পুঁয়াপোকার স্বাদ খুব একটা খারাপ লাগল না ছেলেদের কাছে। দুই দিনের খিদে পেটে, যা খাবে এখন তাই ভাল লাগার কথা!
এগুলো যেখানে পেয়েছ, কুমালো বলল। সেখানে উইপোকাও থাকতে পারে। পচা কাঠে বাসা বানায় ওরা।
কুমানোর অনুমান সত্যি। ওই কাণ্ডটারই আরেক প্রান্তে একটা উইয়ের বাসা খুঁজে পেল ছেলেরা। এই পোকার আরেক নাম সাদা পিপড়ে। বেশ মোটা, নরম। রোদ সইতে পারে না। তাড়াহুড়ো করে গাছের ভেতরের সুড়ঙ্গে ঢুকে বাঁচতে চাইল। কিন্তু যেতে দেয়া হল না। রবিনও হাত লাগাল এখন। পোকাগুলোকে বের করে করে রাখল গরম পাথরে। চোখের পলকে কুঁকড়ে, মরে গেল ওগুলো। ধীরে ধীরে সেদ্ধ হল।
আবার কিছু খাওয়া জুটল অভিযাত্রীদের।
হেসে বলল মুসা, বাড়ি গিয়ে মাকে যদি বলি শুঁয়াপোকা আর উই বেঁধে দাও, কি করবে আল্লাই জানে।
আবার খুঁজল ওরা। আর কিছু বেরোল না।
সূর্য ডোবার আগে ডুব দিয়ে গিয়ে পানি তুলে আনল মুসা। মনে হল, আগের মত জোর আর নেই স্রোতের। কিশোরকে জানাল সেকথা।
নিশ্চয় বৃষ্টি, আন্দাজ করল গোয়েন্দাপ্রধান। কয়েক দিন আগে ঝড়ের সময় যে বৃষ্টি পড়েছিল, সেটাই মাটির তলায় জমা হয়েছিল, ফাঁক দিয়ে বেরোতে শুরু করেছে। পানি কমে আসছে, তাই স্রোতের জোরও কমছে। আবার বৃষ্টি না হলে শেষ হয়ে যাবে একসময়। মনে মনে উদ্বিগ্ন হলেও আশঙ্কার কথা কাউকে জানাল, না সে।
পানিতে মাছ নিশ্চয় আছে, কিশোর বলল। ধরি কিভাবে?
জোর আলোচনা চলল। মাছ ধরা যায় কি উপায়ে? সুতো নেই, বড়শি নেই, ছিপ নেই, টোপ নেই, জাল নেই, বর্শা নেই। কি দিয়ে ধরবে?
কুমালো সুস্থ স্বাভাবিক থাকলে একটা জবাব বের করা যেত। কিন্তু রোগে ভুগে ভীষণ ক্লান্ত সে, ঘুমোচ্ছে। সমস্যাটা নিয়ে প্রায় ধস্তাধস্তি শুরু করে দিল তিন গোয়েন্দা। হাই তুলল মুসা। ঘুম পেয়েছে।
একটা ফাদ বানানো যায়, কিশোর প্রস্তাব দিল। অবশ্য যদি একটা বাক্স বা ঝুড়িটুড়ি পাওয়া যায়। কিন্তু নেই, আবার হাই তুলল মুসা, হাত চাপা দিল মুখে। কাজেই ফাঁদ তৈরি হচ্ছে না। আর কোন উপায়ও নেই...
নিশ্চয় আছে! চেঁচিয়ে বলে, একলাফে উঠে কুঁড়ে থেকে বেরিয়ে গেল কিশোর। রবিনও বেরোল। ঘুমজড়িত চোখে তাদের পিছু নিল মুসা, কি করে কিশোর দেখার জন্যে কৌতূহল হচ্ছে।

সূর্য ডুবে গেছে। যাই যাই করে এখনও রয়ে গেছে গোধূলির কিছু আলো। সাগরের পারে এসে পাথর জড়ো করতে শুরু করল কিশোর।
দয়া করে বলবে, কি করছ? আর থাকতে না পেরে জিজ্ঞেস করল মুসা।
ফাঁদ তৈরি করছি, পাথরের ফাঁদ। এটাই উপযুক্ত সময়, জোয়ার এখন সবে আসতে শুরু করেছে। পাথর গায়ে গায়ে লাগিয়ে একটা গোল দেয়াল তৈরি করব। জোয়ারে ডুবে যাবে ওটা। যখন পানি নেমে যাবে, হয়ত একআধটা মাছ আটকে থাকতেও পারে ওর ভেতর।
খাইছে। ঠিকই তো বলেছ! তুড়ি বাজাল মুসা। ঘুম দূর হয়ে গেছে। কিশোর আর রবিনের সঙ্গে সে-ও দেয়াল তৈরিতে হাত লাগাল। দেয়ালটা ছড়িয়ে নিয়ে গেল পানি পর্যন্ত, যাতে জোয়ার চলে যাওয়ার পরেও তাতে চিকচিকে পানি থাকে।
শেষ হল দেয়াল। তিন ফুট উঁচু, বিশ ফুট চওড়া।
হিসেব করে বের করল কিশোর, মাঝরাতের দিকে ডুবে যাবে দেয়াল, ভোরে সূর্য ওঠার আগে আবার বেরিয়ে আসবে। ভেতরে পানি থাকবে তখনও।
পরদিন সকালে রোদের বর্শাগুলো যখন সবে ছড়াতে শুরু করেছে সূর্য, দুএকটা ঢুকে পড়েছে মাছের চামড়ার তাঁবুতে, ঘুম ভাঙল মুসার। শুয়াপোকা আর উই হজম করে ফেলেছে পেট, নতুন খাবার চাইছে। কিশোর আর রবিনকে ডাকল, এই ওঠ ওঠ! আলসে হয়ে গেছে সব। চল, গিয়ে দেখি কি মাছ পড়ল।
ফাঁদের তলায় নেমে গেছে পানি। অল্প পানিতে ছোটাছুটি করছে কয়েকটা বিচিত্র ছোট জীব, বেরোনর পথ খুঁজছে। খুব সুন্দর একটা মাছ দেখা গেল, গায়ের রঙ সবুজে সোনালিতে মেশানো, তার ওপর লাল আর নীলের হালকা ভোরা। তিনজনেই চিনতে পারল ওটাকে, অ্যাঞ্জেল ফিশ। আরও দুটো মাছ আছে, অ্যাঞ্জেলের মত এত সুন্দর নয়, তবে খেতে চমৎকার। একটা বাচ্চা ব্যারাকুড়া, আরেকটা মুলেট। বিষাক্ত একটা স্করপিয়ন ফিশও আছে। ওটার কাছেও গেল না তিন গোয়েন্দা। পানিতেই রইল ওটা। পরের বার জোয়ার এলে বেরিয়ে যেতে পারবে, যদি ততোক্ষণ বেঁচে থাকে।
মোচার মত দেখতে একটা তারা মাছ দেখে ধরতে গেল মুসা, থামাল রবিন। খবরদার! মারাত্মক বিষ ওগুলোর কাঁটায়। হাতে ফুটলে প্রথমে হাত ফুলে যাবে। তারপর ফুলবে শরীর। শেষে হৃৎপিণ্ড থেমে গিয়ে মারা যাবে।
সরে এল মুসা। তারা মাছের ধারেকাছে গেল না আর।
খাবার উপযোগী মাছগুলো ধরে নিয়ে মহানন্দে ঘরে ফিরল তিন গোয়েন্দা। ওগুলো দেখে কুমালোও খুশি হল।
কাঁচাই খেতে হবে, সে বলল। খারাপ লাগবে না। তবে বেঁধে নিতে পারলে ভাল হত। কিন্তু কি করব? গায়ে তো জোর নেই, মলে আগুন জ্বালাতে পারতাম।

দেখি, আমি চেষ্টা করে, বলল কিশোর। তবে বিশেষ ভরসা পেল না। আমাজনের জঙ্গলে ভাসমান দ্বীপে আগুন জ্বালাতে গিয়ে বুঝেছে কাজটা কত কঠিন।
প্রথমেই দরকার শুকনো খড়কুটো। সেটা জোগাড় করা যাবে, নারকেলের কাণ্ড থেকে। ভেতরের কিছু ছোবড়া কেটে নিলেই হবে। তারপর লাগবে কাঠের গুঁড়ো। আর শক্ত শক্ত কয়েকটা কাঠি।
ছোবড়া জোগাড় হল। গুড়োও পাওয়া গেল বাকল চেঁছে। বাকি রইল কাঠি।
কাঠি লাগবে, কিশোর বলল। শক্ত এবং হালকা।
আগের দিন সৈকতে একটা গাছের ডাল পড়ে থাকতে দেখেছিল রবিন। ঢেউয়ে ভেসে এসে আটকা পড়েছে। ছুটে গিয়ে কাঠি কেটে নিয়ে এল সে।
বেশ হালকা কাঠি। খটখটে শুকনো। কিভাবে কি করবে? মুসা জানতে চাইল।
সোজা একটা কাঠিকে সুন্দর করে কেটে ঘোট করল কিশোর। এক মাথা, চোখা করল। বাকলের একটা টুকরো কেটে মাঝখানে ছোট একটা গোল খাঁজ করল। তারমধ্যে রাখল বাকলের গুড়ো। চারপাশে ছড়িয়ে দিল ছোবড়া। তারপর ছোট কাঠির চোখা মাথাটা খাঁজে রেখে দুহাতের তালুতে চেপে ধরে ডলতে শুরু করল, ডাল ঘুটনি দিয়ে ডাল ঘোটা হয় যেভাবে।
দ্রুত থেকে দ্রুততর হল হাত। হাতের জোর ঠিক রাখতে হবে, বাড়াতে হবে গতি, তাহলেই কেবল আসবে সাফল্য। টপ টপ করে ঘাম ঝরতে লাগল তার কপাল থেকে। বাকলের খাঁজটাকে গভীর করে বসে যাচ্ছে কাঠির চোখা মাথা। চারপাশে ছিটকে পড়ছে বাকলের গুড়ো।
আরও জোরে ডলতে লাগল কিশোর। ধোঁয়া বেরোতে শুরু করল ছোবড়া থেকে। তারপর দপ করে জ্বলে উঠল আগুনের একটা শিখা।
পেটের ওপর ভর দিয়ে শুয়ে পড়েছে মুসা। মুখ নামিয়ে আস্তে আস্তে ফু দিল। আগুনে। তার ওপর আরও কিছু ছোড়া আর শুকনোবার্কলের কুটো রাখল মুসা। উজ্জ্বল হয়ে জ্বলতে লাগল আগুন।
কাঠিটা সরিয়ে এনেছে কিশোর। হউফ! করে জোরে নিঃশ্বাস ফেলে হাতের। উল্টো পিঠ দিয়ে ঘাম মুছল কপালের। বলল, ইস, এভাবে কষ্ট করে আগুন ধরানো..ম্যাচ থাকলে কত সহজ হত।
দ্রুত মাছগুলোর চামড়া পরিষ্কার করে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলল ওরা। লম্বা লম্বা কাঠিতে গেঁথে ধরল আগুনের ওপর।
মাছের কাবাব দিয়ে চমৎকার নাস্তা হল সেদিন। কিছুই অবশিষ্ট রাখল না। কাঁটায় লেগে থাকা, মাংসগুলো পর্যন্ত চেটেপুটে সাফ করে ফেলল। সেই সঙ্গে রয়েছে ডুবো ঝর্নার মিষ্টি পানি। আয়েশ করে ঢেকুর তুলল সবাই। ভুলে গেল। প্রথম তিন দিনের আতঙ্ককর পরিস্থিতির কথা। মৃত্যুদ্বীপকে জয় করেছে ওরা।

আশা করা যাচ্ছে, রবিন বলল। ডেংগু আসাতক বেঁচে থাকতে পারব আমরা। একটা কাঠিতে ছুরি দিয়ে গোল গোল খাজ কাটছে সে, তিনটা কেটে ফেলেছে, আরেকটা কাটছে।
কি করছ? মুসা জিজ্ঞেস করল।
দিনের হিসেব রাখছি। কাঠিটা যেরকম লম্বা, তাতে চোদ্দটা খাজ কাটা যাবে। আমার বিশ্বাস, ততদিনে মোটর বোটটাকে দেখতে পাব। ইস, কি যে আনন্দের দিন হবে সেদিনটা!
রবিন, কিশোর বলল। কয়েকটা কথা বলার সময় এসেছে। তোমাদের জানিয়ে রাখা উচিত মনে করছি। একদিন খুব ঝামেলা গেছে, দুশ্চিন্তায় ছিলাম, আরও বেশি চিন্তায় পড়ে যাবে বলে বলিনি। ডেংগুর আশা ছাড়তে হবে আমাদের। দ্বীপ থেকে বেরোতে হলে ভেলা তৈরি করতে হবে।
রবিন, মুসা, কুমালো, তিনজনেই অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে কিশোরের দিকে।
ভেলা? মুসা বলল। ভেলা কি দরকার? বোটই যখন পাব?
না, বোট আসছে না, ভুল রীডিং লিখে ডেংগুকে কিভাবে ফাঁকি দিয়েছে, খুলে বলল কিশোর। কাজেই বুঝতেই পারছ, নিজের পায়ে কিভাবে কুড়োল মেরেছি।
তা মেরেছ, মাথা দোলাল মুসা।
না, ঠিকই করেছ তুমি, কুমালো বলল। এছাড়া আর কি করতে পারতে? তুমি তো আর জানতে না এখানে এনে আমাদেরকে আটকাৰে ডেংগু। তুমি করেছ, যাতে মুক্তা চুরি করতে না পারে সে। প্রফেসরের সম্পদ রক্ষা করেছ। এটা তোমার দায়িত্ব ছিল। আর এত ভাবনার কিছু নেই। খাবার আর পানি যখন পাওয়া গেছে, বেরিয়েও যেতে পারব আমরা। ভেলা বানাতে পারবে। নারকেলের অনেক কাণ্ড আছে।
কিন্তু শুধু কাণ্ড দিয়েই হবে না, রবিন বল। বাধব কি দিয়ে ওগুলোকে? পেরেক নেই, স্ক্রু, বল্টু, দড়ি কিচ্ছু নেই। কুমালোর জবাবের জন্যে অপেক্ষা করল
সে। তাছাড়া আসল কাজই এখনও বাকি রয়ে গেছে, যে জন্যে আমরা এলাম এখানে, আটকা পড়লাম। মুক্তো ভোলা। কিছু নমুনা নিয়ে গিয়ে তাঁকে দেখাতে হবে। মুক্তো তোলার জন্যে এত নিচে ডুব দেবে কে? তুমি তো অসুস্থ।
কাজটা আমাদেরকেই করতে হবে আরকি, কিশোর বলল।
হাঁ হয়ে গেল রবিন। ষাট ফুট! তিরিশের বেশি আমি পারব না। পঁয়তাল্লিশের বেশি মুসাও পারবে কিনা সন্দেহ।
হাসল মুসা। ওর এই হাসির অর্থ বুঝল কিশোর। ব্যাপারটাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়ে ফেলেছে গোয়েন্দা সহকারী। আর একবার যখন নিয়েছে, সহজে ক্ষান্ত হবে না।

খানিক পরেই তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেল মুসা। পিছে পিছে রওনা হল কিশোর আর রবিন।
ল্যাগুনের পাড়ে এসে কাপড় খুলে পানিতে নামল মুসা। ডাইভিং প্র্যাকটিস শুরু করল।
ডুব দিয়ে নেমে গেল অনেক নিচে। কিছুক্ষণ পর ভেসে উঠে ফোঁস্‌স্‌ করে বাতাস ছাড়ল মুখ দিয়ে।
দম নেয়ার পর বলল, তিরিশ ফুটের বেশি নেমেছি। পানি খালি ঠেলে রাখে। পায়ে দুটো লোহার জুতো পরতে পারলে কাজ হত। টেনে নামাত।
বিকেলে দোকান থেকে এনে দেবখন, হেসে বলল রবিন। আপাতত একটা পাথর দিয়ে কাজ চালাও।
হ্যাঁ, তাই করতে হবে।
একটা পাথর বেছে নিল মুসা, তার মাথার দ্বিগুণ। ওটা দুহাতে ধরে মাথা নিচু করে ডুব দিল। ভারের কারণে প্রথমে বেশ দ্রুত নেমে চলল, আস্তে আস্তে কমে এল গতি। কিন্তু তলায় নামতে পারল। এক হাতে পাথরটাকে বুকের সঙ্গে আঁকড়ে ধরে আরেক হাতে একটা ঝিনুক তুলে নিল। তারপর ছেড়ে দিল পাথরটা। সঙ্গে সঙ্গে তীরবেগে তাকে ঠেলে তুলতে লাগল পানি।
বিশাল বাদামী ঝিনুকটা তীরে ছুঁড়ে মারল সে।
পানির তলায় বেশিক্ষণ থাকেনি, বিশ সেকেণ্ড। ফলে পানির চাপ তেমন প্রতিক্রিয়া করল না শরীরে।
বাপরে বাপ, পিষে মেরে ফেলতে চায়! শ্বাস নিতে নিতে বলল সে। এভাবে একটা একটা করে ঝিনুক তুলতে হলে এক মুক্তা পেতেই এক বচ্ছর লাগবে।
একটা ঝুড়ি হলে…। কিশোরের কথায় বাধা দিল মুসা, কোথায় পাবে?
জানি না। চল, কুমালোকে জিজ্ঞেস করি।
কুমালোকে সমস্যাটার কথা বলতে পড়ে থাকা নারকেল কাণ্ডের মাথার দিকে তাকাল সে। বলল, নারকেল গাছের মাথায় শক্ত আঁশে তৈরি এক ধরনের জাল থাকে। চেষ্টা করলে ওগুলো দিয়ে একটা থলে বানানো যায়।
দূর! বলে মাথা নাড়ল মুসা।
তবে নারকেলের জাল বা কাপড় পাওয়া গেল। গাছের মাথার কাছে ডালের গোড়ায় জড়িয়ে থাকে এই জাল। বেশ শক্ত। ডালের গোড়ার ফুটখানেক ওপর থেকে ডালপাতা সব মুড়িয়ে নিয়ে গেছে ঝড়। তবে গোড়া যেটুকু আছে, তাতে পাওয়া গেল ওই জাল। ছুরি দিয়ে কয়েক টুকরো কেটে নিয়ে ওই জালের সুতো দিয়েই সেলাই করে থলে তৈরি হয়ে গেল।
আচ্ছা, এই জিনিস দিয়ে কাপড় হয় না? রবিন বলল।

হয়ত হয়, আনমনে বলল কিশোর চামড়ায় ঘষা লাগবে। আরাম পাব না। তবে দিনের বেলা গায়ে দিয়ে রাখলে রোদ বাঁচবে কিছুটা।
কড়া রোদ সাদা প্রবালে প্রতিফলিত হয়ে এসে গায়ে লেগে চামড়ায় যেন ছ্যাকা দেয়। ফোঁসকা পড়ে যাওয়ার অবস্থা।
নারকেলের কাপড় দিয়ে শার্ট, কিংবা বলা ভাল গায়ের কিশোর। গায়ে দিয়ে দেখল, ভালই, রোদ অনেকখানি ঠেকায়।
সানগ্লাস দরকার আমার, মুসা বলল। চোখের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে রোদ। এভাবে রোদের দিকে সারাক্ষণ চেয়ে থাকতে হলে অন্ধ হয়ে যাব।
ঠিকই বলেছে ও। এসব ছায়াশূন্য দ্বীপে আটকা পড়া অনেক নাবিকই অন্ধ হয়ে গেছে রোদের কারণে।
জালের বুনন কোথাও মোটা, কোথাও মিহি। ওরকম মিহি কাপড়ের ফালি কেটে চোখে বেঁধে নিল সে। খুদে ফাঁক দিয়ে তাকাল। আরে! কাজ হচ্ছে। রোদ আর ততটা লাগে না চোখে। যদিও দেখা যায় কম। তাতে কি? কাজ চললেই হল।
যাক, আরামই লাগছে, কিশোর বলল।
তা তো লাগছে, বলল মুসা। কিন্তু আমাকেও কি তোমার মতই কিত লাগছে?
হ্যাঁ, লাগছে, হেসে বলল রবিন। একেবারে নারকেল গাছের ভূত। হাসতে শুরু করল তিনজনেই।
চল, কুমালোকে দেখাই, প্রস্তাব দিল মুসা।
পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকল ওরা। তবু সামান্য শব্দ হয়ে গেল। তন্দ্রায় দুলছিল কুমালো, হঠাৎ জেগে তিনটে কিম্ভুত মুখোশ পরা মূর্তিকে দেখে চমকে চিৎকার করে উঠল। তারপর চিনতে পারল ওদেরকে। কাপড়, চশমা, আর থলের প্রশংসা করল।
কি জানি, মাথা চুলকাল সে। সন্দেহ হচ্ছে, তোমাদের গায়েও পলিনেশিয়ান রক্ত বইছে কিনা। নইলে এভাবে নকল কর কিভাবে? যা-ই পাচ্ছ, ঠিক কাজে লাগিয়ে ফেলছ।
খুশি হয়ে আবার উপসাগরের ধারে ফিরে এল ওরা। কুমালোর প্রশংসা অনেক উৎসাহ জোগাল ওদের।
এখন, পলিনেশিয়ানদের মত ডুব দিতে পারলেই হয়, বলল কিশোর। তাহলে কিছু মুক্তো তুলতে পারব।
কিন্তু কাজটা মোটেই সহজ নয়। পাথর নিয়ে কয়েকবার চেষ্টা করে দেখল কিশোর, তলায় পৌঁছতে পারল না। তবে প্রতিবারেই আগের চেয়ে বেশি নিচে নামতে পারছে। বুঝল, আস্তে আস্তে অভ্যাস হয়ে যাবে। পুরো ব্যাপারটাই অভ্যাসের।

ব্যাগ কোমরে বেঁধে নিচে নেমে গেল মুসা। ঝিনুক কুড়িয়ে থলেতে ভরে উঠে আসার সময় খেয়াল করল, ভারি হয়ে গেছে। টেনে রাখছে নিচের দিকে। বেশি, জোরাজুরি করলে থলে ফেটে সব পড়ে যাওয়ারও ভয় রয়েছে। শেষে মাত্র তিনটে ঝিনুক নিয়ে উঠে আসতে হল তাকে।
আসলে একটা দাড়ি দরকার আমাদের, মুসা বলল। ব্যাগ বেঁধে দেব। টেনে তোলা যাবে।
ঠিকই বলেছ, একমত হল কিশোর। ভেলা তৈরির জন্যেও দড়ি দরকার। কিন্তু এই পাথরের রাজ্যে পাই কোথায়?
দড়ি খুঁজে অনেকটা সময় কাটাল ওরা। কুমালোর কাছে জেনেছে, ছোবড়া দিয়ে দড়ি তৈরি করে পলিনেশিয়ানরা। কিন্তু পেয়েছে মাত্র একটা নারকেল, ওটা দিয়ে আর কত লম্বা দড়ি হবে।
লিয়ান লতা দিয়ে দড়ির কাজ চালানো যায়। কিন্তু এই দ্বীপে তেমন কোন লতাই নেই।
আমাজানের জঙ্গলে ওরা দেখেছে, বোয়া সাপের চামড়া দিয়ে দড়ি বানায় ওখানকার জংলীরা। অ্যানকোণ্ডা সাপের চামড়া দিয়েও হয়। কিন্তু প্রবাল অ্যাটলে সাপ থাকে না, না ছোট, না বড়। সাগরের সাপ অবশ্য আছে, তবে এই ল্যাগুনে একটাও দেখতে পেল না ওরা।
দড়ি না পেলেও খাবার পেল। একটা শসা নিয়ে ঘরে ফিরল বিকেলে।
কুমালো চমকে যাবে, হাসতে হাসতে বলল মুসা। কে ভাবতে পেরেছিল প্রবালের বাগানে শসা পেয়ে যাব?
এই বিশেষ শসাটা কোন সজি নয়, কোন বাগানেও জননি। এটা একটা জলজ প্রাণী, নাম সী কিউকামবার বা সাগরের শসা। চীনাদের খুব প্রিয় খাবার।
ল্যাগুনের প্রবালের একটা তাকে ওটাকে পড়ে থাকতে দেখেছে ছেলেরা। বিশাল এক শসার মতই দেখতে, গায়ে শসার মতই শুয়া রয়েছে, চামড়ায় চাকা চাকা দাগ। বেশ মোটা, আর ফুটখানেক লম্বা। তবে পানির ওপরে তোলার পর চুপসে অর্ধেক হয়ে গেল।
এই জীবটাও বিষ ছড়াতে পারে, সেই বিষ চোখে লাগলে অন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। কাজেই ছুরি দিয়ে গেঁথে সাবধানে তুলেছে ওটাকে মুসা। রেখে দিয়েছে গরম পাথরের ওপর। মরে যাওয়ার পর ক্যাম্পে এনেছে।
কুমালোর নির্দেশ মত লম্বালম্বি চিরে পাঁচটা ফালি করল ওটাকে কিশোর। ঝলসে নিল আগুনে। চেহারাটা কুৎসিত, কিন্তু খেতে চমৎকার লাগল সাগর-শসার মাংস।

সেরাতে দুঃস্বপ্ন দেখল মুসা। ঘুমের মধ্যেই চেঁচাতে শুরু করল, ওরে বাবারে! কানা হয়ে গেলামরে! সাগর-শসার বিষ লেগেছে!
ঠেলা দিয়ে তাকে জাগাল কিশোর। এই মুসা, চেঁচানি থামাও। দুঃস্বপ্ন দেখছ।
আর ঘুম এল না মুসার। হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল ছাউনি থেকে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। দেখতে পাচ্ছে সবাই, তারমানে অন্ধ হয়নি। আসলেই দুঃস্বপ্ন ছিল ওটা।
কালো কালো মূর্তির মত তার চারপাশে দাঁড়িয়ে আছে নারকেলের কাণ্ডগুলো।
তারার ঘড়ি দেখে অনুমান করল, ভোর তিনটে বাজে। ল্যাগুনের শান্ত পানিতে সাদার্ন ক্রসের উজ্জ্বল প্রতিবিধ ঝিলমিল করছে।
ল্যাগুনের ধারে পায়চারি শুরু করল সে, উত্তেজনা কমানোর উদ্দেশ্যে। তারপর সরে এল সাগরের ধারে। সাগরও নীরব। ঢেউ নেই। জোয়ার নামছে।
অলস ভঙ্গিতে হেঁটে এগোল সে ফাঁদে কি পড়েছে দেখার জন্যে। কিনারে। এসে ভেতরে তাকাল। ভীষণ চমকে উঠল সে। জীবনে এরকম দৃশ্য দেখেনি। বিশাল দুটো চোখ তাকিয়ে রয়েছে তার দিকে।
বাসনের সমান বড় একেকটা। তার মনে হল, কোন জীবন্ত প্রাণী নয়, প্রাণীর ওরকম চোখ থাকতে পারে না। সত্যি সত্যি দেখছে, না সে এখনও ঘুমিয়েই রয়েছে? আরেকটা দুঃস্বপ্ন দেখছে।
কেমন যেন ভূতুড়ে সবুজ রঙ চোখগুলোর, জ্বলছে। মনে হয় কাচের ওপাশে বৈদ্যুতিক বাতি বসানো। ট্রাফিকের সিগন্যাল বাতি যেন বলছে যাও। যাওয়ার ইহেও হল মুসার। কিন্তু পা কথা শুনতে চাইছে না।
হঠাৎ প্রচণ্ড আলোড়ন উঠল পানিতে, বিরাট কিছু একটা রয়েছে। দুটো সবুজ গোলক ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে লাগল মুসার দিকে।
চিৎকার করে উঠল সে। তবু দৌড় দিতে পারল না। চোখ দুটো যেন সম্মোহিত করে ফেলেছে তাকে, মাটির সঙ্গে আঠা দিয়ে জুড়ে দিয়েছে পা। স্বপ্নে যেরকম হয়, ইচ্ছে থাকলেও দৌড় দিতে পারে না মানুষ। সে-কারণেই তার মনে হচ্ছে, আবারও দুঃস্বপ্ন দেখছে।
পায়ের শব্দ শোনা গেল। পাশে এসে দাঁড়াল কিশোর। জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে?
চিৎকার করছ
কেন?
তারপর সে-ও দেখল ওগুলো। মুসার মতই বিশ্বাস করতে পারছে না।
চোখের মতই তো লাগছে, রবিন বলল।
কিন্তু এত বড়? বলল মুসা। নাকি প্ল্যাঙ্কটন জমে আছে কে জানে!

পাগল নাকি? কিশোর বলল। প্ল্যাঙ্কটন কখনও ওভাবে গোল হয়ে জমে সাঁতরাতে পারে না। ওগুলো চোখই। আরিব্বাপরে, কত বড় একেকটা!
যেন ম্যানহোলের ঢাকনা! ভূত না তো! বলতে বলতে পিছিয়ে গেল মুসা। ফাদের ভেতর পড়ে যাবার ভয়েই বুঝি। হুঁশিয়ার! ব্যাটা আসছে!
ঝটকা দিয়ে সামনে এগোল ওটা।
চমকে পিছিয়ে গেল তিন গোয়েন্দা।
ওটার নড়াচড়ায় কয়েক টন পানি বেরিয়ে গেল ফাদের ভেতর থেকে। কালো কালো বিশাল কয়েকটি সাপ কিলবিক করে শূন্যে উঠল, আবার ঝপাত করে পড়ল পানিতে।
জায়ান্ট স্কুইড! আচমকা চেঁচিয়ে উঠল রবিন। ভাল করে দেখার জন্যে আগে বাড়ল। একটা সাপ তার দিকে এগোতেই তাড়াতাড়ি পিছিয়ে এল আবার।
ফোয়ারার মত ছিটকে এল তরল পদার্থ। ভিজে গেল তিন গোয়েন্দা।
পানি ছিটিয়ে ভেজাচ্ছে, মুসা বলল। ব্যাটা খেলছে আমাদের সঙ্গে।
পানি না, কালি,রবিন বলল। সাবধান, চোখে যেন না লাগে।
আরও দূরে সরে এল ওরা।
এ-জন্যেই ওদেরকে বলে কালি-কলম মাছ, বিড়বিড় করল কিশোর।
হ্যাঁ, বিদ্যে ঝাড়ার সুযোগ পেয়ে গেছে রবিন। খুব ঘন কালি, লেখা যায়। একজন অভিযাত্রী একবার ওই কালি দিয়ে লগবুক লিখেছিল।
দাপাদাপি তো করছে খুব, মুসা বলল। ঘাড়ের ওপর এসে না পড়ে।
মনে হয় না। ডাঙায় উঠতে পারে না ওরা।
সাগরে তো নামতে পারে?
কিভাবে নামতে হবে জানলে তো সহজেই পারত। কিন্তু যেমন বড় তেমনি বোকা। এরকম ফাঁদে নিশ্চয় আর কখনও পড়েনি। বেরোতে পারবে না।
ধরে নিয়ে যেতে পারলে হত, চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। এরকম একটা স্কুইডই চেয়েছেন মিস্টার লিসটার।
কিন্তু এই জীবটা তিনি পাচ্ছেন না, বলল রবিন। আশা করা যায়, স্কুনার নিয়ে ফেরার পথে ধরতে পারব একটা। হামবোল্ড কারেন্টে অনেক পাওয়া যায় এগুলো?
দক্ষিণ আমেরিকার উপকূল ঘেঁষে যে স্রোতটা এসেছে, তার কথা বলছ?
হ্যাঁ। মনে আছে তোমার ওই বইটার কথা, ছয়জন তরুণ বিজ্ঞানী বালসা গাছের ভেলায় চড়ে পাড়ি জমিয়েছিলেন সাগরে? পেরু থেকে রওনা হয়েছিলেন তারা, ওই স্রোতে ভেলা ভাসিয়ে দক্ষিণসাগরের দ্বীপে এসেছিলেন। অসংখ্য স্কুইড

দেখেছিলেন তাঁরা। রাতের বেলা ভেসে উঠত ওগুলো, দিনে তলিয়ে যেত গভীর পানিতে।
সবুজ আলো দুটোর উজ্জ্বলতা এখন কমছে বাড়ছে, যেন ভেতরের বিদ্যুৎ উৎপাদক যন্ত্র ভোল্টেজ একবার বাড়াচ্ছে একবার কমাচ্ছে।
গায়ে কাঁটা দিল মুসার। খাইছে! ব্যাটা চোখের পাতা ফেলে না কেন একবারও? গুহার ভেতরে অষ্টাপদী জীবটার সঙ্গে লড়াইয়ের কথা মনে পড়ল তার। ওটার চোখেও এরকম শয়তানী ছিল, তবে আরও ছোট চোখ, আর দেখতে মানুষের চোখের মত। এটার মত উজ্জ্বলতাও ছিল না ওগুলোয় মাথা দোলাল সে, হুঁ, অক্টোপাস আর স্কুইডের মাঝে ফারাকটা এখন বুঝতে পারছি। মাঝে মাঝেই ভাবতাম তফাৎটা কোথায়?
অনেক তফাৎ, রবিন বলল। এটার চোখ বাসনের মত, অক্টোপাসের চোখ থিমবলের মত। অক্টোপাসের শরীর একটা আস্ত ফোলা ব্যাগ, আর এটার হল টরপেডোর মত। চলেও ওরকম ভাবেই। শুঁড় দশটা। দুটো শুঁড় আরগুলোর চেয়ে অনেক বেশি লম্বা। ওঁড়ে কাপের মত বসানো রয়েছে, তবে অক্টোপাসের মত সাকশন কাপ নয়, এগুলোতে রয়েছে ধারাল দাঁত। মারাত্মক। ইস্পাতের তার কেটে ফেলতে পারে।
যাহ্, বাড়িয়ে বলছ।
এক বর্ণও না। আমেরিকান মিউজিয়ম অভ নেচারাল হিস্টরির কয়েকজন বিজ্ঞানী একবার এক অভিযানে বেরিয়েছিলেন। বড় মাছ ধরার জন্যে তাঁরা ব্যবহার করছিলেন ইস্পাতের তার। সেই তার কেটে দিয়েছে স্কুইডের সাত। কাজেই সাবধান। অবশ্য যদি নিজেকে ইস্পাতের চেয়ে শক্ত মনে কর, তাহলে আলাদা কথা।
ভোর এল। অন্ধকার তাড়ানর জন্যে উঠেপড়ে লাগল ধূসর আলো। দানবটাকে স্পষ্ট দেখা গেল এখন। পুরো ফাঁদটা জুড়ে রয়েছে। শরীরের জন্য, শুড়ের জায়গা হচ্ছে না ভেতরে। পাথরের ওপর দিয়ে এসে শুকনোয় বিছিয়ে আছে ওগুলো।
ক্ষণে ক্ষণে রঙ বদলাচ্ছে টর্পেডোর মত শরীরটা। কালো থেকে বাদামী, বাদামী থেকে তামাটে, তামাটে থেকে ফ্যাকাসে সাদা।
গোল চোখের ব্যাস একফুট। রাতের চেয়ে এখন আরও ভয়ঙ্কর লাগছে। ফসফরাসের সবুজ আলো মিলিয়ে গেছে এখন, চোখ দুটোকে লাগছে এখন কালো, দুটো গর্তের মত, যেন যে কোন মুহূর্তে ভেতর থেকে বেরিয়ে আসবে আতঙ্ককর কিছু। তীব্র ঘৃণা নিয়ে তাকিয়ে আছে ছেলেদের দিকে। স্থির ওই চোখের দিকে
তাকিয়ে নিজেদেরকে বড় ক্ষুদ্র আর অসহায় মনে হল তিন গোয়েন্দার।

প্রশান্ত মহাসাগরের দুঃস্বপ্ন! বিড়বিড় করল কিশোর। একেবারে মানানসই।
জোয়ার এখনও পুরোপুরি নামেনি। ফাঁদের মধ্যে পানি রয়েছে। আবার জোয়ার এলে সহজেই বেরিয়ে যেতে পারবে স্কুইডটা। ততক্ষণ টিকতে পারলে হয়। আটকা পড়েছে পাথরের ফাদে। একেবারে নেমে যাবে পানি। রোদ উঠবে।
তখন কি করবে? ভাবসাবে মনে হচ্ছে বিপদ এখনও বুঝতে পারেনি ওটা।
ফাঁদের ভেতরে পানি কুচকুচে কালো, স্কুইডের কালি মেশানো। শরীরের ভেতরের থলে বোঝাই করে পানি টানছে, তীব্র গতিতে ছুঁড়ে মারছে আবার, উল্টোদিকে ছুটে যেতে চাইছে রকেটের মত, পারছে না পাথরের দেয়ালের জন্যে। ঠেকে রয়েছে।
আরিব্বাবারে, কত্তো বড়! গাল ফুলিয়ে বলল মুসা। শরীরটাই বিশ ফুট হবে।ড় আরও বিশ ফুট।
তু এটাকে ছোটই বলা চলে, রবিন বলল। বেয়াল্লিশ ফুট লম্বা উড়ওয়ালা স্কুইডও ধরা পড়েছে। শার্ম তিমির সঙ্গে অনেক সময় লড়াই বাধে স্কুইডের। একবার ওরকম এক লড়াই দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল একদল বৈজ্ঞানিক অভিযাত্রীর। লড়াইয়ে তিমিটা হেরে গিয়েছিল।
কিশোর ঠিকই বলেছে, মুসা বলল। এটাকে ধরে নিয়ে যেতে পারলে ভাল পয়সা মিলত। কিন্তু পারব না। হাতে পেয়েও ছেড়ে দিতে হচ্ছে।
জীবটার দিকে তাকিয়ে চুপচাপ ভাবছিল আর নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছিল কিশোর। বলল, এটাকে কাজে লাগাতে পারি আমরা। দড়ি বানাতে পারি।
দড়ি? হাহ, পাগল হয়ে গেছ তুমি। এটা দিয়ে দড়ি বানাবে কি করে?
ড়গুলো দিয়ে। ফালি করে কেটে নিলে খুব শক্ত দড়ি হবে, চামড়ার ফালির মত।
ঘোঁৎ করে উঠল মুসা, বিশ্বাস করতে পারছে না।
কেন পারব না? কিশোরের কণ্ঠে দৃঢ় আত্মবিশ্বাস। বোয়াকনসট্রিকটর আর অ্যানাকোন্ডার চামড়া দিয়ে যদি দড়ি হয় স্কুইডের বঁড় দিয়ে কেন হবে না? মালয়েশিয়ায় অজগর দিয়েও দড়ি বানায় লোকে। ওগুলো এত টেকসই, আসবাবপত্র মোড়ানর কাজে ব্যবহার করে, লস অ্যাঞ্জেলেসের বড় বড় অনেক দোকানে দেখতে পাবে। আমার তো বিশ্বাস, এই ঔড় দিয়ে সাপের দড়ির চেয়ে শক্ত দড়ি হবে।
…বেশ, তা নাহয় হল, কিন্তু কাটতে যাচ্ছে কে? বললেই তো খসিয়ে দিয়ে দেবে না স্কুইড। আমি ওই শুড়ের ধারেকাছে যেতে চাই না। রেগে আগুন হয়ে শেষে আমাকে দিয়েই নাস্তাটা সেরে ফেলবেন মহামান্য কালির মহাজন।
সূর্য উঠল। রোদ চড়তে লাগল। গরম সইতে না পেরে অস্থির হয়ে উঠল দানবটা, রাগ বাড়ছে। মেরু অঞ্চলের ঠাণ্ডা পানি ওদের পছন্দ, হামরোল্ড স্রোতের কনকনে

ঠাণ্ডা পানিতে ভেসে চলে আসে বলে নিরক্ষীয় অঞ্চলের গরম টের পায় না। দিনের বেলা ওই স্রোতের মধ্যেই থাকে। রাতে আবহাওয়া খুব ঠাণ্ডা হলে স্রোত ছেড়ে উঠে আসে ওপরে, আলো ফোঁটার আগেই ডুবে যায় আবার। রোদ ভীষণ অপছন্দ।

কড়া রোদে অস্থির হয়ে অল্প পানিতে সাংঘাতিক দাপাদাপি শুরু করল ওটা। শুঁড় দিয়ে চাবুকের মত বাড়ি মারতে লাগল দেয়ালের বাইরে মাটিতে, ধারাল দাঁতের আঁচড়ে গভীর ক্ষত হয়ে গেল শক্ত প্রবাল পাথরে।

হঠাৎ এক লাফ দিয়ে উঠে গেল ছয় ফুট। চাবুকের মতই শাঁই শাঁই শুঁড় চালাল বাতাসে। লাফিয়ে সরে এল রবিন আর মুসা। কিশোর সরে সারতে পারল না। পাথরে হোঁচট খেয়ে গেল পড়ে।

শাঁ করে এসে তার কোমর জড়িয়ে ধরল একটা ভয়াবহ ভঁড়। নারকেল কাপড়ের পোশাক কেটে চামড়ায় বসে যেতে লাগল তীক্ষ্ণধার দাঁত।

বড় একটা পাথর দিয়ে উঁড়টায় পাগলের মত বাড়ি মারতে শুরু করল মুসা। কুমালো! কুমালো! বলে গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে লাগল রবিন।

ধীরে ধীরে কিশোরকে মুখের কাছে টেনে নিচ্ছে প্রকাণ্ড শুঁড়টা। ঈগল-চঞ্চর, মত ঠোঁটটা ফাঁক হয়ে বেরিয়ে পড়ল একসারি করাতে-দাঁত। দুই হাতে একটা পাথর আঁকড়ে ধরে রাখার চেষ্টা করছে কিশোর। পারছে না। টানের চোটে হাত ছুটে গেল পাথর থেকে। ধরল আরেকটা পাথর। হ্যাঁচকা টানে ওটা থেকেও তার হাত ছুটিয়ে নিল স্কুইডের গুঁড়।

তিন-হাতে পায়ে ভর দিয়ে আহত পা-টা টানতে টানতে তাঁবু থেকে বেরোল কুমালো।

কুমালে, জলদি! চেঁচিয়ে বলল রবিন। তার ধারণা, স্কুইডকে ঠেকার নিশ্চয় কোন উপায় জানে পলিনেশিয়ানরা।

পাথর দিয়ে বাড়ির পর বাড়ি মারছে মুসা। যেন রবারে লাগছে পাথর, কিছুই হচ্ছে না গুঁড়টার। শেষে পাথরটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কিশোরের দুহাত চেপে ধরল। শুরু হল যেন স্কুইডে আর মানুষের দড়ি টানাটানি।

দুজনে মিলেও থামাতে পারল না খুঁড়টাকে। হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চলেছে স্কুইড। আর মাত্র কয়েক ফুট তফাতে রয়েছে অপেক্ষমাণ ঠোঁট।

মুসা, খবরদার! সাবধান করল রবিন। আরেকটা ঔড় এগিয়ে আসছে মুসাকে ধরার জন্যে, সে দেখতে পায়নি। রবিনের চিৎকার শুনে লাফ দিয়ে সরে গেল একপাশে।

অবশেষে পৌঁছে গেল কুমালো। বড় একটা পাথর তুলে নিয়ে ভাল পা-টায় ভর দিয়ে দাঁড়াল। গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে ছুঁড়ে মারল পাথরটা। পাথর আর বর্শা

ছুঁড়ে মাছ মারায় ওস্তাদ পলিনেশিয়ানরা। হাতের নিশানা খুব ভাল। আহত, অসুস্থ অবস্থায়ও কুমালোর লক্ষ্য ফসকাল না। দুর্বল অবশ্যই, কিন্তু এই জরুরি মুহূর্তে কোথা থেকে যেন অসুরের বল এসে গেছে তার গায়ে।
উড়ে এসে পাথরটা ঢুকল দানবের ঠোঁটে, চোয়ালে এমন শক্ত হয়ে আটকে গেল, কিছুতেই খুলতে পারল না স্কুইড।
একমুখ পাথর নিয়ে মানুষ খাওয়ার আশা ছাড়তে বাধ্য হল কালির মহাজন। কিন্তু ওঁড়ের বাঁধন আলগা করল না। যেন প্রতিজ্ঞা করেছে, আচ্ছামত শাস্তি দিয়ে ছাড়বে ব্যাটাদের।
জলদি কর, রবিন, ওই লাকড়িটা দাও আমার হাতে! চিৎকার করে বলল কুমালো।
ছুটে গিয়ে নারকেল কাণ্ডের একটা ফাড়া লাকড়ি এনে কুমালোর হাতে দিল রবিন।
ধর আমাকে নিয়ে যাও ওটার কাছে!
কুমালোকে স্কুইডটার কাছে আসতে সাহায্য করল রবিন। পায়ের ব্যথার পরোয়াই করল না পলিনেশিয়ান। ধা করে বাড়ি মারল স্কুইডের মাথায়, মগজ ভর্তা করে দেয়ার জন্যে।
যন্ত্রণায় ভীষণ ভাবে কেঁপে উঠল স্কুইডের শরীর। লাফ দিয়ে উড়টা উঠে গেল ওপরে, ঢিল হয়ে গেল বাঁধন। ধপ করে মাটিতে খসে পড়ল কিশোর। ঝাড়া লেগে চিত হয়ে পড়েছে মুসা, আগেই।
মাটিতে আছড়াতে শুরু করল গুঁড়গুলো, মুমূর্ষ সাপের মত মোচড় খাচ্ছে। ধীরে ধীরে কমে এল নড়াচড়া, নিথর হয়ে গেল।
কিশোরকে তুলে বসাল রবিন আর মুসা। তার জখম পরীক্ষা করল। রক্তাক্ত শরীর। অনেক জায়গায় কেটেছে, রক্ত ঝরছে ওগুলো থেকে।
ঠিকই, আছি আমি, বলল কিশোর। হাত-পা ভাঙেনি। কাটাও তেমন বেশি নয়, শুধু আঁচড় লেগেছে। কুমালোকে তোল। ওর অবস্থা কাহিল।
কুমালোর দুই বগলের তলায় ক্রাচ হয়ে তাকে ধরে ধরে তাঁবুতে নিয়ে এল মুসা আর রবিন। একেবারে নেতিয়ে পড়ল বেচারা। সারাদিন পায়ের অসহ্য যন্ত্রণায় কষ্ট পেল।
কুমালোকে ঘরে রেখে মরা দানবটার কাছে ফিরে এল তিন গোয়েন্দা। পাথরটা আটকে রয়েছে স্কুইডের ঠোঁটে। যে ঔড়টা তাকে ধরেছিল সেটার দিকে চেয়ে শিউরে উঠল কিশোর। আতঙ্ক উত্তেজনায় দুর্বল হয়ে পড়েছে শরীর, মাথা ঘুরছে, ঘোলা দেখছে চোখে।

এরকম একটা প্রাণীকে মেরে ফেললাম, আফসোস করে বলল কিশোর। জ্যান্ত নিতে পারলে কাজ হত।
না মারলে তুমি বাঁচতে না এতক্ষণ, মুসা বলল। তাছাড়া ভেলা বানাতে দড়ি দরকার। ভেলা না হলে বেঁচে ফিরতে পারব না আমরা এখান থেকে।
তা ঠিক। বসে থাকলে চলবে না। জোয়ার আসার আগে কাজ শেষ করে ফেলতে হবে। নইলে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে এটাকে।
চামড়া খুবই শক্ত। কয়েক ঘন্টা কঠোর পরিশ্রম করে বঁড়গুলো আলাদা করল ওরা। টেনে নিয়ে গিয়ে পাথরের ওপর বিছিয়ে দিল রোদে শুকানর জন্যে।
কাল কাটব, কিশোর বলল। জোয়ার এসেছে। ভেসে ওঠা লাশটাকে টানতে শুরু করেছে পানি।
নিয়ে যাক, নাকি? জিজ্ঞেস করল মুসা। না স্কুইডের মাংসও খাওয়া যায়? কেটে রাখব খানিকটা?
আমার মনে হয় না সুবিধে হবে, রবিন বলল। পুবদেশীর অবশ্য বাচ্চা স্কুইডের মাংস খুবই পছন্দ করে। তবে এই বুড়ো দাদাকে ওরাও গিলতে পারবে কিনা সন্দেহ। চিবানই যাবে না রবারের মত মাংস।
ভেসে যাওয়ার আগে আরেকটা জিনিস রাখতে হবে আমাদের, বলল কিশোর। কাজে লাগবে।
একটা পাথর তুলে নিয়ে গিয়ে স্কুইডের ঠোঁটে বাড়ি মারতে শুরু করল সে। পিটিয়ে ভেঙে ফেলল একটা অংশ। শক্ত এই জিনিসটা দেখতে অনেকটা কুড়ালের মত, কুড়ালের ফলার মতই ধার। নারকেল কাণ্ডের একটা খাটো লাকড়ি নিয়ে হাতল বানাল কিশোর। শুঁড় থেকে সরু চামড়ার একটা ফালি কেটে হাতলের সঙ্গে বাঁধল ভাঙা ঠোঁটটা।
দেখতে হয়ত তেমন সুন্দর না, হাত ঘুরিয়ে বাতাসে কোপ মারল সে। তবে চমৎকার একটা কুড়াল পেয়ে গেলাম। ভেলা বানাতে খুব কাজ দেবে।
পরদিন জায়ান্ট স্কুইডের শুঁড় কেটে লম্বা লম্বা ফালি করল ওরা। চেঁছে ফেলে দিল চামড়ার ভেতরের মাংস। কড়া রোদে খুব তাড়াতাড়ি শুকিয়ে গেল চামড়া।
ট্যান করার দরকার আছে? মুসা জিজ্ঞেস করল।
কয়েক বছর যদি রাখতে চাইতাম, তাহলে করতাম, জবাব দিল কিশার। আমাদের এত বেশি দিন রাখার দরকার নেই। কয়েক হপ্তায় নষ্ট না হলেই হল।
অদ্ভুত, না? সুইডের চামড়া দিয়ে দড়ি...হাহ, হাই।
অদ্ভুত হবে কেন? ভুরু নাচাল রবিন। অন্য জীবের মত এটাও তো জীব। কিসের চামড়া ব্যবহার করে না লোকে? ক্যাঙারু, ওয়ালাবি, মোষ, উটপাখি, হরিণ, গুইসাপ, অ্যালিগেটর, হাঙর, সীল, ওয়ালরাস, কোনটা বাদ দেয়? বিশ্বাস করবে,

জংলী নরখাদকরা আজও মানুষের চামড়া দিয়ে তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বানায়?.
বিশ ফুট লম্বা চারটে ফালি জোড়া দিয়ে বড় একটা দড়ি হল, উপসাগরের তলায় পৌঁছেও আরও থাকে। দড়ির এক মাথায় নারকেল কাপড়ের থলে বেঁধে ডুব দেয়ার জন্যে প্রস্তুত হল ওরা।
আমিই আগে যাই, মুসা বলল।
একহাতে পাথর আঁকড়ে আরেক হাতে ব্যাগ নিয়ে পানিতে নামল সে। ওপর থেকে কিশোর আর রবিন দেখল কঁপা কাঁপা একটা ছায়া নেমে যাচ্ছে, নামার সময় পানিতে ঢেউ উঠেছে, সে জন্যেই ওরকম দেখা যাচ্ছে মুসাকে।
পা নিচের দিকে রাখতে কষ্ট হচ্ছে মুসার। ঠেলে উল্টে ফেলতে চাইছে পানি। শেষে দুপা দিয়ে পাথরটা চেপে ধরল। এবার আর মাথা ওপরের দিকে রাখতে অসুবিধে হল না।
ভয়ঙ্কর চাপ পড়ছে দেহের ওপর। জড়িয়ে ধরে চেপে চ্যাপ্টা করে দিতে চাইছে যেন বিশাল কোন দৈত্য। এই চাপের মধ্যে ফুসফুসের বাতাস আটকে রাখতেই হিমশিম খাচ্ছে।
নিচে নেমে খামচি দিয়ে দিয়ে ঝিনুক তুলে ব্যাগে ভরতে লাগল। ঝিনুকের খোলা খসখসে, কাঁটা কাঁটাও রয়েছে কোন কোনটাতে। কুমালোর দস্তানা দুটো পরে আসা উচিত ছিল, ভাবল সে। খোঁচা লেগে রক্তাক্ত হয়ে যাচ্ছে আঙুল। যদি কাছাকাছি হাঙর থাকে, তাহলে বিপদ হবে। তবে ল্যানের ভেতর এ-পর্যন্ত কোন হাঙর দেখেনি। কিন্তু বাইরে থেকে আসতে কতক্ষণ?
থলেতে অন্তত পনেরোটা ঝিনুক জায়গা হবে। একের পর এক তুলে ভরতে লাগল সে। গোনার অবকাশ নেই। প্রচণ্ড এই চাপের মধ্যে কতক্ষণ থাকতে পারবে? এখনই মনে হচ্ছে, আধ ঘন্টা পেরিয়ে গেছে।
থলেটা ভরে ফেলে রেখে ওপরে উঠতে শুরু করল সে।
ওপরে ভাসলে হাত বাড়িয়ে তাকে টেনে তুলল কিশোর আর রবিন। জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছে মুসা, শিস দেয়ার মত শব্দ বেরোচ্ছে নাকের ফুটো থেকে। শরীর মোচড়াচ্ছে যন্ত্রণায়। খি ধরেছে মাংসপেশিতে। ফুলে উঠেছে গলা আর হাতের রগ। থরথর করে কাঁপছে ম্যালেরিয়া রোগীর মত। এই কড়া রোদের মাঝেও শীত করছে।
উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল রবিন আর কিশোর।
অনেক বেশি থেকে নিচে, কিশোর বলল। প্রায় দুই মিনিট। পলিনেশিয়ানদের কাছাকাছি। ওদের ওস্তাদ ডুবুরিরাও তিন মিনিটের বেশি পারে না।

উঠে বসল মুসা। আমার কিছু হয়নি, খসখসে কণ্ঠে বলল সে। ব্যাগটা তোল। দেখি, কি আছে।
দড়ি টেনে থলেটা তুলে আনা হল। পানির ওপরে তোলার আগে ওটার তলা দুহাত দিয়ে ধরল রবিন, যাতে ফেটে না যায়। সৈকতে ঢালা হল ঝিনুকগুলো। পনেরোটা। বড় বড়, কালো।
ভেতরে কি আছে দেখার জন্যে তর সইছে না ওদের। একের পর এক ঝিনুক খুলে মুক্তা খুঁজল! একটাও পেল না।
নিরাশ দৃষ্টিতে উপসাগরের, কালো পানির দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল মুসা। আবার যেতে হবে, তাই না!
হবে। কতবার যে যাওয়া লাগে, কে জানে! ঠিক আছে, আমি এবার চেষ্টা করে দেখি, বলল কিশোর।
দস্তানা পরে নাও,হাতের আঙুল দেখাল মুসা। দেখ, কি অবস্থা হয়েছে।
কুমালোর দস্তানা জোড়া নিয়ে এল কিশোর। তারপর থলে আর পাথর নিয়ে নেমে পড়ল পানিতে। পা নিচে রাখার চেষ্টা করল না সে। মাথা নিচের দিকে করে ঝিনুক তুলতে শুরু করল, পা দুটো ওপরে দুলছে সাগরের শ্যাওলার মত।
ঝিনুক ভরা শেষ করে ওপরে উঠতে লাগল। ধীরে ধীরে, সময় নিয়ে, চাপের সঙ্গে শরীর সইয়ে। কিন্তু তারপরেও তাকে যখন ডাঙায় টেনে তোলা হল, সটান চিত হয়ে শুয়ে পড়ল। ফোঁটা ফোঁটা রক্ত বেরোতে শুরু করল নাক-কান-মুখ দিয়ে। হাপরের মত ওঠানামা করছে বুক।
আ-আমি…তোমার মত… হাঁপাতে হাঁপাতে বলল সে। তোমার মত উভচর নই…
আবার টেনে তোলা হল থলেটা।
ঝিনুক খুলতে শুরু করল তিনজনে। এক এক করে খুলে ফেলল বারোটা, কিছু নেই।
তেরো নম্বরটা খুলতে খুলতে মুসা বলল, আনলাকি থারটিন। এটাতে তো থাকবেই না। বলেই দিল ছুরি ঢুকিয়ে। ডালা খুলে মাংসের ভেতরে আঙুল ঢুকিয়েই স্থির হয়ে গেল। গোল গোল হয়ে গেছে চোখ, ঝুলে পড়েছে নিচের চোয়াল। দ্রুত হয়ে গেল নিঃশ্বাস।
খাইছে! পেয়েছি!
দুআঙুলে টিপে ধরে জিনিসটা বের করে আনল মুসা। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কারও মুখে কথা ফুটল না। স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রয়েছে ওটার দিকে।
ইয়া আল্লাহ! অবশেষে ফিসফিসিয়ে বলল মুসা। এত দেখি ফুটবলের সমান!
ফুটবলের সমান অবশ্যই নয়, তবে মারবেলের সমান। মিউজিয়মে মুক্তা দেখেছে ওরা, ওগুলোর কোনটাই এর অর্ধেক বড় নয়। চমৎকার আকৃতি। একদিকে কাত

করে ধরলে হয়ে যায় সাদা, আরেক দিকে ধরলে মনে হয় স্বচ্ছ, আকাশ আর ল্যাগুনের রঙে রঞ্জিত হয়ে যায়। পাথর নয়, যেন জীবন্ত।
কিশোরের হাতের তালুতে মুক্তাটা ফেলে দিল মুসা। আরও অবাক হল কিশোর। এত ভারি! তারমানে খুব ভাল জাতের মুক্তা। দুআঙুলে ধরে ঘুরিয়ে
ফিরিয়ে দেখতে লাগল। সূক্ষ্মতম দাগও নেই।
আরেক হাত দিয়ে রোদ আড়াল করল কিশোর। তার পরেও জ্বলছে মুক্তাটা, তবে এখন আর সূর্যের মত নয়, চাঁদের মত।
আনমনে বিড়বিড় করল বিস্মিত রবিন, প্রফেসর দেখলেও চমকে যাবেন!
তারমানে তার পরীক্ষা সফল হয়েছে, মুসা বলল।
নিশ্চয় হয়েছে। তবে তাঁকে দেখাতে নিয়ে যাওয়াটাই মুশকিল। হারিয়ে যেতে পারে। চুরি হতে পারে। পোনাপেতে গেলে ডেংগু ব্যাটা আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারে, অবশ্য যদি কোনদিন যেতে পারি।
যা, ঝুঁকি আছে, হাসি ফুটল কিশোরের মুখে। রতের মালিক হওয়ার এই এক অসুবিধে। সব সময় চিন্তা, কখন কি হয়ে যায়। চল, কুমালোকে দেখাই।
তাবুর অন্ধকারেও মুক্তার আগুন নিভল না। কুমালোর চোখের সামনে জিনিসটা তুলে ধরল কিশোর। শিস দিয়ে উঠল পলিনেশিয়ান। এত সুন্দর জিন্দেগিতে দেখিনি। আমাদের এদিকে এতবড় মুক্ত পাওয়া যায় না। তবে অন্যখান থেকে এনে বীজ ছড়ালে যে হয়, এটা প্রমাণ করে দিলেন তোমাদের প্রফেসর। দেখি, মালাটা দাও তো। পানি আছে না?
মালার পানিতে মুক্তাটা ফেলে দিল কুমালো। খুব দ্রুত তলিয়ে গেল ওটা। ভাল ওজন।
তোমার কাছেই থাক, কিশোর বলল। আমরা নানারকম কাজ করি, হারিয়ে ফেলতে পারি। ওটা সঙ্গে রাখলে কোন কাজই করতে পারব না।
মাপ চাই ভাই! আমি পারব না। ওটার ভাবনায় ঘুমাতে পারব না সারারাত। তুমিই রাখ।
অনিচ্ছা সত্তেও মুক্তাটা নিয়ে প্যান্টের পকেটে রাখল কিশোর। তবে রাখার আগে নারকেলের ছোবড়ায় ভালমত জড়িয়ে নিল, যাতে পকেট থেকে ফসকে পড়তে না পারে। মুক্তার উত্তাপ নেই, তবু তার মনে হল জ্বলন্ত একটা কয়লার টুকরো রয়েছে পকেটে, চামড়ায় হ্যাঁকা দিচ্ছে। মুক্তা তো পেল না, রাতদিন সব সময়ের জন্যে একটা দুর্ভাবনার ডিপো জোগাড় করল যেন।
যা হবার হবে, জোরে নিঃশ্বাস ফেলে বলল সে। চল, কাজে যাই। একটায় সন্তুষ্ট হবেন না প্রফেসর। আরও কয়েকটা লাগবে।

দিনটা শেষ হওয়ার আগেই সেদিন আরও দুটো মুক্তা যোগ হল প্রথমটার সঙ্গে। দ্বিতীয়টা কিছু ছোট, তৃতীয়টা আরও বড়।
তোমাদের আসা সার্থক হল, বলল কুমালো। মুক্তা পেলে। নিশ্চিন্ত হলে এতদিনে।
নিশ্চিন্ত? মুখ বাঁকাল কিশোর। দুশ্চিন্তার কারখানা তৈরি করলাম বরং। এগুলো প্রফেসরের হাতে তুলে দেয়ার আগে আর স্বস্তি নেই আমার কপালে।
সে-রাতে কিশোর দেখল দুঃস্বপ্ন। দেখল, ওদের ভেলা উল্টে গেছে। গভীর পানিতে তলিয়ে যাচ্ছে সে। তার প্যান্টটা কামড়ে ছিঁড়ে খুলে নিয়ে যাচ্ছে একটা হাঙর। হাঙরের মুখটা ডেংগুর মত। মুখে শয়তানী হাসি। হাঙরের আবার হাতও আছে, সেই হাতে তিনটে মুক্তা।
জেগে গেল সে। ঘামে ভিজে গেছে শরীর। চট করে হাত চলে গেল প্যান্টের পকেটে। না, হারায়নি, আছে মুক্তাগুলো।
ভেলা তৈরি শুরু হল। ল্যাগুনের দিকে ঢালু হয়ে আছে জায়গাটা। ইচ্ছে করেই এই স্থান নির্বাচন করেছে ওরা। চারজনকে বয়ে নেয়ার উপযোগী ভেলা বেশ ভারি হবে, বয়ে নিয়ে গিয়ে পানিতে নামাতে পারবে না। জায়গা ঢালু হলে ঠেলে নামাতে সুবিধে হবে।
তারপরেও বাড়িতে সতর্কতা গ্রহণ করল কিশোর। কয়েকটা কাণ্ডকে পানির সঙ্গে আড়াআড়ি করে রাখল ডাঙায়। এগুলোর ওপর ভেলাটা তৈরি করে গড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলবে পানিতে। খুঁটি গেড়ে আটকে দিল রোলারগুলোকে, যাতে আপনাআপনি গড়িয়ে যেতে না পারে।
পনেরো থেকে বিশ ফুট লম্বা সাতটা কাণ্ড এনে রাখা হল রোলারের ওপর। লম্বাগুলো রাখা হল মাঝখানে, বেড়ে থাকা অংশটা গলুইয়ের কাজ করবে। পাশেরগুলোর মধ্যে যে কটা মাপে বড় হয়ে গেল, ছোট করে কেটে সমান করে ফেলা হল। খুব কাজ দিল কুড়ালটা, ওটা ছাড়া কাটতে পারত না।
চামড়ার ফিতে দিয়ে একটার সঙ্গে আরেকটা বাঁধা হল কাণ্ডগুলো।
বাঁধা শেষ করে সব দিক থেকে খুঁটিয়ে দেখল কতটা কি হয়েছে।
জাহাজের মতই আকার, বলল কিশোল রোদ থেকে বাঁচার জন্যে একটা কেবিন লাগবে। পালও দরকার।
হেসে উঠল মুসা। কি দিয়ে বানাবে? প্রবাল পাথর?
হেস না হেস না, মাথা নাড়ল রবিন। হাঙরের চামড়া দিয়েই ঘরের চাল হয়ে যাবে। পালও। হতাশ হয়ে পড়ল পরক্ষণে। কিন্তু পাল তুলতে হলে মাস্তুল চাই। কি দিয়ে বানাব? নারকেলের কাণ্ড বেশি ভারি। দাঁড় করানো যাবে না।
যাবে, কিশোর বলল। পরিশ্রম করতে হবে আরকি।

স্কুইডের ঠোঁটের কুড়াল আর ধারাল প্রবালের সাহায্যে কাণ্ড ফাড়তে লেগে গেল ওরা। অনেক ঘাম ঝরানর পর কাণ্ড কেটে বের করল আঠারো ফুট লম্বা একটা দণ্ড। ছুরি দিয়ে টেছে মসৃণ করতে লাগল।
তার পরেও খসখসে রয়েই গেল, সোজা হয়নি ঠিকমত। কিন্তু এটা পেয়েই খুশিতে নাচতে বাকি রাখল ছেলেরা।
ভেলার গলুইয়ের কাছে গর্ত করে ফেলল একটা। তাতে বসিয়ে দিল মাল।
কেবিন আর পাল বানানো যাবে পরেও। এখনই দ্বীপ ছাড়তে তৈরি নয় ওরা, কাজেই ঘরটার প্রয়োজন আছে।
ভেলা বানাতে লেগেছে তিন দিন। রসদ জোগাড় করতে আরও সময় লাগল।
প্রথমেই জরুরি হল পানি। ডুবোঝনাটা প্রায় ফুরিয়ে এসেছে, স্রোতের জোর নেই বললেই চলে। ঝিরঝির করে বেরোয় এখন। যত তাড়াতাড়ি পারা যায় এখন ওগুলো তুলে জমিয়ে ফেলা উচিত। দিনের মধ্যে অসংখ্য বার পালা করে ডুব দিল তিনজনে। প্রতিবারেই তুলে আনল একমালা করে পানি। আগের মত মিষ্টি নেই আঁর, নোনা পানি মিশে যাচ্ছে, যদিও খুব সামান্য।
কুমানোর সঙ্গে পরামর্শ করল কিশোর। পানি বয়ে নিই কি করে? এখন তো পাথরের গর্তে জমিয়েছি। গর্তটা তো আর তুলে নেয়া যাবে না। আর মালাও মোটে একটা। একমালা পানিতে কিছুই হবে না।
ভুরু কোঁচকাল কুমালো। হা, সমস্যাই। আমাদের জেলেরা ছাগলের চামড়া দিয়ে ব্যাগ বানিয়ে নেয়। একটা ডলফিন-টলফিন পেলেও চলত।
দেখা যাক ফাঁদে পড়ে কিনা। কিন্তু আপাতত সমস্যার সমাধান করি কিভাবে? পাথরের গর্তে পানি বেশিক্ষণ থাকবে না, রোদে উড়ে যাবে। ঢাকনা দিয়ে রাখলে থাকবে?।
থাকবে। নারকেলের লাকড়ি গর্তের ওপরে সাজিয়ে তার ওপর পাথর চাপা দিয়ে রাখগে। বলে ছুরি নিয়ে কাজ করতে লাগল কুমালো। ছেলেরা কাজ করেছে একদিন, সে-ও বসে থাকেনি। দুটো ক্রাচ বানিয়ে ফেলেছে। এখন বানাচ্ছে ভেলার জন্যে দাঁড়। বলল, নারকেল দিয়ে কত কিছুই করলাম। ঘর বানালাম, কাপড় বানালাম, ভেলা বানালাম...পানি রাখার পাত্রও বানানো যায়। তবে খুব কঠিন হবে। একটা টুকরো কেটে খোড়ল করে নিতে হবে...
পারব! তুড়ি বাজিয়ে চেঁচিয়ে বলল কিশোর। খোড়ল হুয়ে আছে ওরকম কিছু একটা বেছে নিলেই তো পারি আমরা।
অবাক হয়ে কিশোরের দিকে তাকাল কুমালো।
অন্য দ্বীপটায়, বলল কিশোর। কাল কয়েকটা বাঁশের টুকরো দেখে এলাম। নিশ্চয় ঝড়ে উপড়ে গিয়েছিল, অন্য দ্বীপ থেকে ঢেউয়ে ভেসে এসে ঠেকেছে...

তাহলে তো আর কোন ভাবনাই নেই।
কতটা লম্বা?
আট-দশ ফুট।
ছয় ফুট করে কেটে নাওগে।
কাটতে অসুবিধে হল না। তবে আরেকটা সমস্যা দেখা দিল। ফুটখানেক পর পরই বাশে একটা করে গাঁট, ওগুলো বন্ধ। ছিদ্র না করতে পারলে লাভ হবে না। করবে কি দিয়ে?
সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল একটা তলোয়ার মাছ। নিজের জীবন দিয়ে বাঁচিয়ে দিল চারজন মানুষকে। ফাদে ধরা পড়ল ওটা। চমৎকার মাংস, কয়েক দিনের খাবারের ব্যবস্থা হয়ে গেল। ওটার তলোয়ার তিন ফুট লম্বা। একটা বাঁশের লাঠির মাথায় তলোয়ারটা বেঁধে লম্বা করে নিয়ে বর্শা বানিয়ে ফেলল মুসা। বাঁশের গাঁট ছিদ্র করার কাজে লাগল সেটা।
সাংঘাতিক শক্ত তলোয়ার মাছের তলোয়ার। একবার একটা মাছ তলোয়ার দিয়ে পালাউ ল্যাগুনে একটা মোটর বোটের তলা ফুড়ে দিয়েছিল। শুধু তাই না, বোটের তলা ফুটো করে ধাতব পেট্রল ট্যাঙ্কে ঢুকে গিয়েছিল ওটার চোখা তলোয়ারের মাথা।
ছয় ফুট লম্বা তিনটে বাঁশের বোতল তৈরি হয়ে গেল। পানি বয়ে নেয়ার আর ভাবনা নেই। বোতলগুলোতে পানি ভরে নিয়ে কাণ্ড-কাটা ছিপি দিয়ে বন্ধ করে দেয়া হল ওগুলোর মুখ।
যাক, পানির অভাবে আর মরছি না, বলল কিশোর।
ঢেউয়ে ভেসে এসে যে শুধু পাকা বাশ ঠেকেছে তাই না, চারাও জল বাঁশের। আগে থেকেই ছিল ওগুলো দ্বীপে। ঝড়ে উপড়ে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল ঝাড়টা। কিছু শেকড়-বাকড় রয়ে গিয়েছিল, হয়ত ওগুলো থেকেই চারা গজিয়েছে। দিনে প্রায় এক ফুট করে বাড়ছে ওগুলো। বাঁশের কেঁাড় খুব ভাল তরকারি। নরম থাকতে থাকতেই ওগুলো কেটে নেয়া হল। ভেলায় করে পাড়ি জমানর সময় খাওয়া যাবে।
বাহ, এখন আমাদের সুদিন, হাসতে হাসতে বলল মুসা। যখন নামলাম, ছিল মরুভূমি। এখন দেখি সব রকমের খাবার জোগাতে আরম্ভ করেছে দ্বীপটা।
রান্নার পাত্রও জোগাল ওদেরকে বাঁশ। ভেতরে পানি ভরে ফুটানো যায়। বাঁশটা পোড়ে না। শুধু তাই না, বাঁশের ভেতর ভরে খাবারও নেয়া যাবে।
তলোয়ার মাছের মাংস ফালি করে কেটে রোদে শুকাল ওরা। নোনাও করা যায়, কিন্তু পদ্ধতিটা জানে না ছেলেরা। কুমালো বলে দিল। সাগরের নোনা পানি এনে রেখে দিতে হবে পাথরের গর্তে। রোদে বাম্প হয়ে উড়ে যাবে পানি। নিচে জমে

থাকবে লবণের হালকা আস্তর। লবণও পাওয়া গেল, নোনাও করা গেল মাছের মাংস।
মুক্তার জন্যে ঝিনুক তুলেছে ওরা। কুমালোর দেখাদেখি ঝিনুকের মাংস খেতে আরম্ভ করেছে। স্বাদ না থাকুক, প্রোটিন তো পাওয়া যায়, জীবন বাঁচে। কিন্তু বড় বেশি পচনশীল। একটু রোদেই পচতে শুরু করে। অনেক কায়দা-টায়দা করে শুকিয়ে নিল কিছু ঝিনুকের মাংস। বাঁশে ভরে রাখল। সাগর পাড়ির সময় নেহায়েত ঠেকায় না পড়লে খাবে না।
সাগরের শ্যাওলা তুলেও শুকিয়ে সংরক্ষণ করা হল খাবার হিসেবে।
এই জিনিস কে খায়? নাক কুঁচকাল রবিন। একেবারে শুকনো খড়।
কুমালো জানাল, স্বাদ যা-ই হোক, ভিটামিন আছে। প্রাচ্যের লোকেরা নাকি বেশ পছন্দ করে।
ফিরে আসতে শুরু করেছে পাখিরা। ইতিমধ্যেই চলে এসেছে কিছু। তার মধ্যে রয়েছে ভাড় নামে পরিচিত মেগাপড় পাখি। ওড়ার গতি খুবই সুখ, পাথরের ওপর দিয়ে হাঁটতেও পারে না ভালমত। মানুষকেও ভয় করতে শেখেনি। দুটো পাথর নিয়ে ঠুকতে শুরু করল কুমালো। আজব কোন কারণে ওই শব্দ শুনে লাফাতে লাফাতে দৌড়ে এল পাখিটা।
সহজেই ওটাকে ধরে ফেলল সে। পালক ছাড়িয়ে, কেটে, আগুনে ঝলসে
ওটাকে রেখে দেয়া হল ভেলায় খাবার জন্যে।
আঁচড়ানর শব্দে একরাতে ঘুম ভেঙে গেল মুসার। কী, দেখার জন্যে হামাগুড়ি দিয়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল সে। বিরাট একটা গোল পাথর বুকে হেঁটে চলেছে। পানির দিকে। চমকে উঠল সে। প্রথমেই মনে হল, ভূত! চেঁচিয়ে উঠতে যাবে, এই সময় চিনে ফেলল, কচ্ছপ। সাগরের কাছিম। বিশাল। দুশো পাউণ্ড খুব ভাল মাংসের ভাঁড়ার। নিশ্চয় ডিম পাড়ার জন্যে তীরে উঠেছিল, আঁচড়ের শব্দের ব্যাখ্যা এটাই।
এতগুলো মাংস ল্যানে হারিয়ে যেতে দেয়া যায় না। দৌড় দিল মুসা। আঁপিয়ে এসে পড়ল কাছিমের পিঠে। পাত্তাই দিল না জীবটা। আগের মতই গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে চলেছে। পাথরের খাঁজে পা ঢুকিয়ে দিয়ে ওটাকে আটকানর চেষ্টা করল সে। টেনে সহজেই তার পা ছাড়িয়ে নিল ওটা।
লাফিয়ে পিঠ থেকে নেমে পড়ল মুসা। উল্টে ফেলার চেষ্টা করল ওটাকে। বেজায় ভারি। একার সাধ্যে কুলাল না। সাহায্যের জন্যে চিৎকার শুরু করল।
কিশোর আর রবিন বেরিয়ে এসে সাহায্য করার আগেই ল্যাগুনের পানিতে নেমে পড়ল কাছিমটা।

কিন্তু এত সহজে ছাড়ার পাত্র নয় মুসা। কাছিমের পিঠে চড়ে বসল। টেলিভিশনে দেখেছে, কিভাবে পলিনেশিয়ান ছেলেরা কাছিমের পিঠে চড়ে পানিতে ঘুরে বেড়ায়।
গলাটা যেন রাবারের তৈরি। তার ঠিক নিচে শক্ত খোলার কিনার আঁকড়ে ধরল সে। চিত হয়ে গিয়ে শরীরের ভার দিয়ে উল্টে ফেলার চেষ্টা করল ওটাকে।
ওল্টাল না কাছিমটা, তবে ডুবও দিতে পারল না। সাঁতরে চলল ওপর দিয়ে।
সোজা এগিয়ে চলেছে সরু চ্যানেলের দিকে, যেখান দিয়ে সাগরে বেরোনো যায়। দ্রুত ভাবনা চলেছে মুসার মাথায়। সাগরে বেরিয়ে গেলে আর কিছু করতে পারবে না। যা করার এখনই করতে হবে। কি করবে? পেছনের একটা পা চেপে ধরবে? তাহলে হয়ত সাঁতরাতে অসুবিধে হবে কাছিমের।
পাশে কাত হয়ে হাত বাড়িয়ে পেছনের ডান পা-টা চেপে ধরল সে। ধরে রাখল শক্ত করে যাতে নাড়তে না পারে কাছিমটা।
অন্য তিনটা পা ব্যবহার করছে ওটা। ফলে সামনের দিকে না এগিয়ে এক জায়গায় ঘুরতে শুরু করল কাছিম। মুখটা সৈকতের দিকে ফিরতেই পা ছেড়ে দিল মুসা। সঙ্গে সঙ্গে ওই পা ব্যবহার শুরু করল জীবটা। এগিয়ে চলেছে এখন সৈকতের দিকে।
রবিন আর কিশোরকে দেখতে পাচ্ছে মুসা, কুমালোকেও। হৈ চৈ শুনে। বেরিয়েছে।
দাঁড়াও, মাংস নিয়ে আসছি, চেঁচিয়ে বলল গোয়েন্দা সহকারী।
কিন্তু সাগরের কাছিমও, সহজে পরাস্ত হতে চাইল না। মুসাকে পিঠ থেকে ফেলে দেয়ার সব রকম চেষ্টা চালাল। একবার এদিকে ঘুরে যাচ্ছে, আরেকবার ওদিকে। বার বার পেছনের পা চেপে ধরে ওটাকে সঠিক দিকে এগোতে বাধ্য করছে মুসা। এরকম করতে গিয়ে একসময় হাত ছুটে গেল গলার কাছ থেকে। ব্যস, চোখের পলকে ডুব দিল কাছিম। এক ডুবে নেমে এল ছয়-সাত ফুট। গলা চেপে ধরে টেনে আবার ওটাকে ওপরে উঠতে বাধ্য করল মুসা।
সৈকতের ধারে চলে এল কাছিমটা। পানিতে নেমে মুসাকে সাহায্য করল রবিন আর কিশোর কুমালোও করল, যতটা পারল। আরেকটু হলেই তার ভাল পা-টায় কামড়ে দিয়েছিল কাছিম। দাঁত বসাতে পারলে এক কামড়ে অনেকখানি মাংস তুলে ফেলত।
রাখ, করছি ব্যবস্থা, ছুরি বের করল কিশোর।
মাথা ঝাঁকাতে শুরু করল কাছিমটা। অনেক বয়েস হয়েছে। রবারের মত চামড়ায় ভাঁজ। মনে হচ্ছে যেন রেগে গিয়ে মাথা নাড়ছে একজন বুড়ো মানুষ।

মের না, দাদাকে মের না। বাধা দিল রবিন। জ্যান্ত রাখব ওটাকে। ভেলায় করে আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাব। তাজা মাংসের দরকার হলে তখন জবাই করতে পারব।
ঠিক, একমত হল কুমালো। একটা কাঠি দিয়ে বালিতে খোঁচা মারছে। তবে ওটা দাদা নয়, দাদী। এই যে দেখ, ডিম পেড়ে রেখে গেছে।
ফুটখানেক গভীর একটা গর্তে প্রায় একশো ডিম পেড়েছে কাছিমটা।
সবাই মিলে টেনেটুনে কাছিমটাকে ডাঙায় তুলল। তারপর ঠেলে চিত করে ফেলল। আর সোজাও হতে পারবে না, পালাতেও পারবে না।
হাসিমুখে ডিমগুলোর দিকে এগিয়ে গেল মুসা। একটা ডিম তুলে নিল। ড্রারে, অবাক কাণ্ড! ভেবেছিল, মুরগী কিংবা হাঁসের ডিমের খোসার মতই শক্ত হবে, তা নয়। নরম, রবারের বলের মত।
ভাঙব কিভাবে? কুমালোক জিজ্ঞেস করল সে।
দাঁত দিয়ে এক জায়গায় কেটে ফেল। কাটা জায়গা মুখে লাগিয়ে চাপ দাও, ভেতরের জিনিস মুখে ঢুকে যাবে। কাঁচা খাওয়া যায়। তবে সিদ্ধ করে নিলে বেশি মজা লাগবে। এগুলোও নিয়ে যেতে পারব ভেলায় করে।
দাদীমাকে তুলে এনে একটা নারকেল কাণ্ডের সঙ্গে গলায় দড়ি দিয়ে বাঁধল ছেলেরা।
ভোর হল। আলোচনা করে একমত হল অভিযাত্রীরা, যথেষ্ট খাবার জোগাড় করা গেছে। এবার রওনা হওয়া যায়।
তাঁবুর ওপর থেকে হাঙরের চামড়াটা নামিয়ে দুই টকুরো করল ওরা। একটা দিয়ে পাল হবে, আরেকটা দিয়ে কুঁড়ের চালা।
পাল তোলার কাছি হিসেবে ব্যবহার করা হল স্কুইডের চামড়া। বাঁশ পেয়েছে, কাজেই পাল বানাতে অসুবিধে হল না।
কেবিনটা অতি সাধারণ। তিনটে বাঁশের টুকরো কেড়ে ধনুকের মত বাঁকা করে আটকে দেয়া হল ভেলায়। ফাঁক ফাঁক করে বসানো হয়েছে ধনুক তিনটে। তার ওপর ছড়িয়ে দেয়া হল চামড়াটা। কোণাগুলো বেঁধে দেয়া হল চামড়ার দড়ি দিয়ে, যাতে বাতাসে উড়ে যেতে না পারে। নৌকার ছইয়ের মতই দেখতে হল জিনিসটা। পাঁচ ফুট চওড়া, তিন ফুট উঁচু। নিচু হওয়ায় সুবিধে, ঝড়ো বাতাসেও উড়িয়ে নেবে না সহজে। লম্বায় হয়েছে আট ফুট। চারজনের জায়গা হয়ে যাবে। আর যেহেতু সামনে পেছনে খোলা, গলুইয়ে চোখ রাখতেও অসুবিধে নেই।
ডিমগুলো সিদ্ধ করে নেয়া হল। তারপর দাদীমাকে ভেলায় তুলে মাস্তুলের সঙ্গে বাঁধা হল শক্ত করে, ছুটতে পারবে না।

যাবার জন্যে তৈরি সবাই। বিষণ্ন চোখে পরিত্যক্ত ঘরটার দিকে তাকাল ওরা, পুরো দুটো হপ্তা কাটিয়েছে এখানে। ফেলে যেতে এখন মায়া লাগছে। ভেলায় চড়ে সাগরে পাড়ি দেয়ার অনিশ্চয়তায় কাঁপছে বুক।
ঢেউ আর বাতাসের করুণার ওপর নির্ভর করতে হবে ওদের। যাওয়ার চেষ্টা করবে দক্ষিণে। কিন্তু সহজেই পথ ভুল করতে পারে। ঘুরে যেতে পারে উত্তর, পুব কিংবা পশ্চিমে। বাতাসের চাপ কতক্ষণ সহ্য করতে পারবে ওদের পলকা পাল কে জানে! আর দাঁড়ও তেমন মজবুত নয়। স্রোতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে টিকবে?
চেঁচামেচি করে আর গান গেয়ে ভয় ভুলে থাকার চেষ্টা করল ওরা।
ভেলাটার একটা নাম রাখা দরকার, রবিন বলল। কি নাম, বলত?
কিশোর, তুমি বল, মুসা বলল।
আশা। কারণ এখন আশা ছাড়া আর কি করতে পারি আমরা।
ল্যাগুনে ভেলা ভাসাল চার নাবিক। চড়ে বসল তাতে। দাঁড় বেয়ে এগিয়ে চলল চ্যানেলের দিকে।
বাহ, ভালই তো ভাসছে,মন্দব্য করল কুমালো।
নাকও সোজা রাখছে, বলল কিশোর। নারকেল গাছের সরল মসৃণ কাণ্ডকে আরেকবার ধন্যবাদ জানাল সে। বেশ সোজা হয়েছে। কাত হয়ে যাবার প্রবণতা নেই।
নাহ, সত্যিই ভাল হয়েছে, দাঁড় বাইতে বাইতে বলল মুসা।
পাল নামিয়ে রাখা হয়েছে। চ্যানেল পেরোনর পর তারপর তোলা হবে। দাঁড় বেয়ে ভারি ভেলাটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে যথেষ্ট পরিশ্রম হল চারজনের।
পনেরো মিনিট পর অবশেষে বের করে আনা হল ওটাকে। ভোলা সাগরে বেরোনর আনন্দেই যেন ঢেউয়ের বুকে দুলে দুলে নাচতে আরম্ভ করল আশা।
যাত্রার প্রথম দুদিন এত নির্বিঘ্নে কাটল, যাত্রা শুরুর আশঙ্কার আর বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট রইল না অভিযাত্রীদের মাঝে।
বাতাসের গতি অপরিবর্তিত রইল, উত্তর-পুব দিক থেকে বইছে, ওরা চলেছে সোজা দক্ষিণে। এই গতি অব্যাহত রাখতে পারলে দিন কয়েকই পোনাপেতে পৌঁছে যাবে ওরা। আর কোন কারণে যদি দ্বীপটার কাছ থেকে সরে আসে, তাহলেও ভাবনা নেই, সীমার রুটে গিয়ে পড়বে। মারশাল আইল্যাণ্ড থেকে কুসাই, ট্রাক, পোনাপে আর ইয়্যাপেতে জাহাজ চলাচল করে। কোন না কোন জাহাজের দেখা পাবেই। কারণ ওই পথ ধরে অনেক মাছধরা জাহাজও চলাচল করে।
দিনের বেলা সূর্য ওদের কম্পাস, রাতে তারা। দাঁড় দিয়ে হলের কাজ চালায়। পালা করে ডিউটি দেয়। ক্রোনোমিটার নেই, সময়ও নির্ধারণ করে সূর্য আর তারা দেখে।

প্রতিটি কাণ্ডের ফাঁক দিয়েই ছলকে ওঠে পানি, ফলে সারাক্ষণই কিছুটা ভেজা থাকতে হচ্ছে ওদেরকে। তবে গরমের মধ্যে ওই ভিজে থাকাটা বরং আরামদায়ক। দিনের বেলা কড়া রোদ। অসুবিধে হয় না ওদের। সহ্য না হলে ঢুকে বসে থাকে ছইয়ের ভেতর।

বাঁশের বোতলে পানি ভরা আছে। নিচ থেকে ছলকে ওঠা, সাগরের পানি সারাক্ষণ ভিজিয়ে রাখছে বাঁশগুলোকে, ফলে ভেতরের পানি বেশ ঠাণ্ডা থাকছে। খাবার দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। তবে ভাবনা নেই, দাদীমা আছে। আর তেমন ঠেকায় পড়লে মাছও ধরতে পারবে।

ভেলার আশেপাশে খেলে বেড়ায় ডলফিনের দল। শরীরের রঙ উজ্জ্বল নীল কিংবা সবুজ, পাখনার রঙ হলুদ-রোদ লাগলে সোনালিই মনে হয়। ক্যামেলিয়ন। আর অক্টোপাসের মতই রঙ বদলাতে পারে ওরা। মাঝে মাঝেই হয়ে যায় চকচকে তামাটে। লাফালাফি করতে গিয়ে সেদিন ভেলায় এসে পড়ল একটা। আর নামতে পারল না। মৃত্যুর পর রঙ বদলে ধূসর-রূপালি হয়ে গেল, তার ওপর কালো কালো। দাগ।

তিন দিনের দিন আশাকে পরীক্ষা করতে এল মস্ত এক তিমি। সোজা এগিয়ে এল ভেলার দিকে, থেকে থেকেই ফোঁস ফোঁস করে পানির ফোয়ারা ছিটাল মাথার ওপরের ফুটো দিয়ে। ভয়ে প্রায় দম আটকে বসে রইল অভিযাত্রীরা। ইচ্ছে করলেই ভেলার বারোটা বাজিয়ে দিতে পারে ষাটফুটি দানবটা।

লেজের মাত্র একটা ঝাপটা, বলল উদ্বিগ্ন ররিন। ব্যস, তারপরেই আশা একেবারে নিরাশা।

ভেলাটাকে ঘিরে দুবার চক্কর মারল তিমি। তারপর লেজটাকে খাড়া ওপরের দিকে তুলে দিল ডুব। লেজ ডুবে যাওয়ার সময় এত বেশি পানি ছিটাল, অভিযাত্রীদের মনে হল এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল তাদের ওপর।

প্রচণ্ড আলোড়ন উঠল পানিতে। ভীষণ কেঁপে উঠল ভেলা, দুলতে শুরু করল।

সর্বনাশ! চেঁচিয়ে উঠল মুসা। গোড়ালির ওপরে পানি উঠে গেছে। এই গেলাম!

তবে নৌকার তুলনায় একটা বিশেষ সুবিধে রয়েছে ভেলার। তলা নেই, কাজেই পানি জমা হয় না, ওপর দিয়ে গড়িয়ে চলে গেল, কিছু নেমে গেল ফাঁক দিয়ে।

ভেলার নিচ দিয়ে পেরিয়ে গিয়ে আবার ভউস করে আসল তিমি, আরেকবার নাকানি-চোবানি খাওয়াল ভেলাটাকে। কাঁধের ধাক্কায় আরেকটু হলেই ছিঁড়ে ফেলেছিল পাশের একটা কাণ্ডের বাঁধন।

আরও কিছুক্ষণ অভিযাত্রীদের আশঙ্কার মধ্যে রেখে অবশেষে ডু আর ভাসল না। দেখা দিল না আর একবারও।

তিমির কাঁধের ধাক্কায় ঢিল হয়ে গেছে কাণ্ডটার বাঁধন। তাড়াতাড়ি আবার সেটাকে শক্ত করল ওরা।
সেদিন সকাল থেকেই বাতাস পড়ে গেছে। ঝিরঝিরে বাতাসে পালের কোনা দুপাত ছপাত করে বাড়ি খাচ্ছে মাস্তুলের সঙ্গে। ঢেউ নেই। বাতাস না থাকায় দশগুণ বেশি হয়ে গেছে রোদের তেজ। সাগর যেন একটা মসৃণ চকচকে আয়না।
আনমনে মাথা নেড়ে বিড়বিড় করল কুমালো, ব্যাপার সুবিধের মনে হচ্ছে। হঠাৎ এরকম বাতাস পড়ে যাওয়ার মানে বিপদ।
কিন্তু আকাশে মেঘ নেই। শুধু পুবদিকে বহুদূরে কালো একটা স্তম্ভের মত দেখা যাচ্ছে, পানিতে দাঁড়িয়ে আছে যেন আকাশে মাথা তুলে।
খানিক পরে উত্তরে দেখা দিল ওরকম আরেকটা।
জলস্তম্ভ, কুমালো বলল। প্রশান্ত মহাসাগরের এদিকটায় খুব বেশি দেখা যায় ওগুলো।
বিপজ্জনক? মুসা জানতে চাইল।
কখনও কখনও, জবাবটা দিল রবিন। ডাঙায় যেমন বালির ঘূর্ণি ওঠে, অনেকটা ওরকম। তবে পানিরগুলো অনেক বড়, উদ্বিগ্ন চোখে দিগন্তের দিকে তাকিয়ে আছে সে। এই ছোট ছোটগুলো আগাম সঙ্কেত, বুঝিয়ে দিচ্ছে বড়টাও আসবে। টর্নেডোর মতই। বলা যায়, সাগরের টর্নেডো।
ডাঙার টর্নেডো তো ঘরবাড়িই উড়িয়ে নিয়ে যায়, কিশোর বলল।
যায়, বলল কুমালো। সাগরেরগুলোও কম না। একটু পরেই দেখতে পাবে। উত্তর-পূর্ব দিকে তাকিয়ে আছে সে।
তার দৃষ্টি অনুসরণ করে অন্যরাও তাকাল।
তাদের চোখের সামনেই জমে উঠল কালো মেঘ, তিন হাজার ফুট উঁচুতে। এমন ভাবে দোমড়াচ্ছে মোড়াচ্ছে, যেন জীবন্ত এক দানব। ওটা থেকে স্কুলে রয়েছে লম্বা একটা লেজের মত।
পলিনেশিয়ানরা এর নাম দিয়েছে আকাশের দানব। এ-সম্পর্কে অনেক কুসংস্কার আছে ওদের।
কালো জমাট বাঁধা মেঘটার মাঝে ঝিলিক দিচ্ছে বিদ্যুৎ।
হ্যারিক্যানের মত খারাপ নয় নিশ্চয়, আশা করল মুসা।
আরও বেশি খারাপও হতে পারে, কুমালো বলল। তবে থাকে না বেশিক্ষণ। আর হারিনের মত এত জায়গা জুড়ে আসে না। হারিক্যান আসে পাচ-ছয়শো মাইল জুড়ে, আর এটা বড়জোড় দুতিন হাজার ফুট। তবে ছোট হলে হবে কি, ভয়ঙ্কর আঘাত হানতে পারে। আমাকে জিজ্ঞেস করলে বলব এরচে হারিক্যান ভাল।

কিছু একটা করার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে কিশোর। সরে যেতে পারি না, আমরা? এখানে থেকে কি ওটার খাবলা খেয়ে মরব? বলেই ছপাত করে দাঁড় ফেলল পানিতে।
অযথা শক্তি খরচ কোরো না। কোন দিক দিয়ে যে যাবে কিছুই বলা যায় না। দাঁড় বেয়ে সরে বাঁচতে গিয়ে হয়ত আরও ভেতরেই পড়ব। চুপচাপ এখন বসে বসে শুধু আশা করা ছাড়া আর কিছু করার নেই।
প্রতিমুহূর্তে লম্বা হচ্ছে দানবটার লেজ। এখন দেখে মনে হচ্ছে লম্বা ঔড় বাড়িয়ে দিয়ে সাগর ছোঁয়ার চেষ্টা করছে কোন অতিকায় অক্টোপাস।
আশ্চর্য রকম স্তব্ধ হয়ে আছে বাতাস। নড়ে না চড়ে না, একদম স্থির। অথচ কানে আসছে ছুটন্ত বাতাসের ভয়ঙ্কর গর্জন।
শুঁড়টা সাগর ছুঁয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আলোড়ন উঠল ওখানকার পানিতে। শাঁ শাঁ করে শূন্যে উঠে যেতে লাগল পানি, ফোয়ারার মত।
ঘূর্ণি জেগেছে পানিতে। বাতাসের পাকের টানে ওপরের দিকে উঠে যাচ্ছে পানি, মনে হচ্ছে, পানির মোটা একটা স্তম্ভ রচনা করছে। প্রচণ্ড বাতাস বইছে ওখানে, অথচ ভেলার কাছে একরত্তি নেই। একটা নিঃশ্বাস পর্যন্ত ফেলছে না, এখানে বাতাস।
ডাঙার টর্নেভোরও এই একই ধর্ম। একটা বাড়ি হয়ত উড়িয়ে নিয়ে গেল খড়কুটোর মত, ঠিক দশ ফুট দূরেই আরেকটা ঘর রইল একেবারে অক্ষত।
আমাদের কাছে আসবে না, বলল সে।
হয়ত, বলল বটে, তবে ততটা আশাবাদী হতে পারল না কুমালো।
পাল নামিয়ে ফেলব?
লাভ হবে না। নিতে চাইলে নিয়ে যাবেই। নামিয়ে রাখলেও নেবে, উঠিয়ে রাখলেও নেবে।
দানবটার দয়ার ওপর পুরোপুরি নির্ভর করতে হবে, এই ভাবনাটাই অস্বস্তিকর। কিছু একটা করতে পারলে এতটা খারাপ লাগত না। হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে হবে। কিছুই করার নেই।
দেখার মত দৃশ্য। তিন হাজার ফুট উঁচু এক পানির স্তম্ভ। মাথাটা গোল হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে মেঘের মত, নিচটা শ আকৃতির। মাঝখানে সরু একটা স্তম্ভ যোগাযোগ রক্ষা করেছে দুটোর।
গতিবেগ দুশো মাইলের কম, না! চেঁচিয়ে বলল কিশোর। কিন্তু বাতাসের প্রচণ্ড গর্জনে ঢাকা পড়ে গেল তার কথা।
ঘুরে ঘুরে ছুটে আসছে শুটা। একবার এদিকে সরে যাচ্ছে, একবার ওদিকে। কোনদিকে যাবে যেন মনস্থির করতে পারছে না।

রোদের মধ্যে উড়ছিল একটা গাংচিল। হঠাৎ হ্যাঁচকা টানে ওটাকে ভেতরে নিয়ে গেল পানির স্তম্ভ, চোখের পলকে কোথায় যে হারিয়ে গেল ওটা, বোঝাই গেল না।
সরে যেতে যেতেও হঠাৎ গতিপথ বদল করে কাছে চলে এল দানবটা। একটানে যেন ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে গেল ভেলার ছাউনি আর পাল। ডেকে উপুড় হয়ে পড়ে কাণ্ড আঁকড়ে ধরে রইল অভিযাত্রীরা।
মলিন হয়ে এল দিবালোক। চোখের সামনে শুধু পানি আর পানি। কানফাটা গর্জন। কানে আঙুল ঢোকাতে বাধ্য হল ওরা। বনবন করে ঘুরতে শুরু করেছে ভেলাটা।
হ্যাঁচকা টানে ছিঁড়ে গেল দাদীমার বাঁধন। চোখের পলকে সাগরে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল কাছিমটা।
চোখ বন্ধ করে পড়ে রইল অভিযাত্রীরা।
তারপর কোথা দিয়ে যে কি ঘটে গেল, বুঝতেই পারল না ওরা। হঠাৎ নিজেদেরকে আবিষ্কার করল পানির মাঝে। চারপাশে পানি, ওপরে পানি, নিচে পানি। মাথার ওপরে একটা হাঙরকে দেখতে পেল খাবি খাচ্ছে। তবে কি ডুবে গেছে ওরা?
হঠাৎ কাত হয়ে গেল ভেলাটা। মুহূর্ত পরে কিশোর দেখল, সে একা একটা কাণ্ড আঁকড়ে ধরে আছে, অন্যেরা নেই। ভেলাটাও নেই।
আরও কয়েক সেকেণ্ড পর দেখল, সাগরে ভাসছে সে। সরে যাচ্ছে দানবটা। কি ঘটেছিল বুঝতে পারল। ওদের ওপর সরাসরি এসে পড়েনি জলস্তম্ভ, পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। যাবার সময় টান দিয়ে তুলে নিয়েছিল ভেলাটাকে। হাঙরটাকে আসলে সাগরের তলায় নয়, পানির স্তম্ভের মাঝে দেখতে পেয়েছে সে। :
সাগরের পানি স্থির। দূরে সরে গেছে পানির স্তম্ভটা। একশো ফুট দূরে একটা বাদামী মাথা ভেসে উঠতে দেখা গেল। খানিক দূরে আরেকটা মাথা।
কুমালোও! রবিইন! চেঁচিয়ে ডাকল কিশোর। মুসা কোথায়?
তোমার পেছনে, জবাব দিল রবিন।
পেছনে ফিরে তাকাল কিশোর। চল্লিশ ফুট দূরে ভাসছে মুসা। আরেকটা কাণ্ড আঁকড়ে ধরে রেখেছে।
কাছাকাছি হল চারজনে। দুটো কাণ্ডকে একসঙ্গে করে হেঁড়া দড়ির টুকরো যে কটা পাওয়া গেল, সেগুলো দিয়ে পেঁচিয়ে বাঁধল।
তারপর, বাকি কাণ্ডগুলো পাওয়া যায় কিনা খোঁজাখুঁজি শুরু করল।
তিন গোয়েন্দার সঙ্গে কুমালোও যোগ দিল। ভেলাটা যে জায়গায় ধ্বংস হয়েছে, সে জায়গাটা আন্দাজ করে নিয়ে চারপাশে তল্লাশি চালাল ওরা। কিন্তু আর একটা কাণ্ডও পাওয়া গেল না। কে জানে, হয়ত টেনে ওগুলোকে মাথার ওপরে তুলে নিয়ে চলে গেছে জলস্তম্ভ। দূরে কোথাও নিয়ে গিয়ে ফেলবে। মোট কথা,

ওগুলো পাওয়ার আর কোন আশা নেই। যে দুটো পাওয়া গেছে, ওগুলোতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে।
রোদ নেই আর এখন। মাথার ওপরে কালো মেঘ। থেকে থেকে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। ঘন ঘন বাজ পড়তে শুরু করল। আকাশের দানব চলে গেছে, এবার আসবে বোধহয় ঝড়।
মেঘের মধ্যে যেন বোমা ফাটাতে শুরু করল বজ। নামল বৃষ্টি, মুষলধারে। তবে বেশিক্ষণ রইল না। জোরাল হল ওপরের বাতাস, উড়িয়ে নিয়ে গেল মেঘ।
বৃষ্টি থামলে আরও কিছুক্ষণ কাণ্ডগুলো খুঁজল অভিযাত্রীরা। পেল না। শেষে দুটো কাণ্ডের ওপর উঠেই কোনমতে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। চারজনের ভার বাইতে পারল না দুটো কাণ্ড, ডুবতে শুরু করল।
নেমে গেল মুসা। কাণ্ড ধরে ঝুলে রইল পানিতে। অন্যেরাও নেমে পড়ল। তার মত একই ভাবে ধরে ভেসে রইল। ঢেউ ভাঙছে মাথার ওপর। শ্বাস নিতে অসুবিধে হচ্ছে। পানি ঢুকে যেতে চায় নাকের ভেতর।
আশা এখন নিরাশায় পরিণত হয়েছে। বাঁশের বোতল আর খাবারগুলো গেছে ! পাল নেই, দাঁড় নেই, ছাউনি নেই, এমনকি নারকেল কাপড়ের পোশাকগুলোও নেই যে রোদ থেকে গায়ের চামড়া আর চোখ বাঁচাবে। দুটো মাত্র কাণ্ড, চারজনের ভর রাখতে পারে না, উঠে বসারও উপায় নেই। অস্ত্র বলতে আছে শুধু একটা করে ছুরি।
বার বার মুখ নামিয়ে পানির তলায় দেখছে রবিন। হাঙরের ভয় করছে। যেকোন মুহূর্তে হাজির হয়ে যেতে পারে ওগুলো। মুখ তুলে পানির ওপরেও খুঁজছে হাঙরের পিঠের পাখা, দূর থেকে পানি কেটে আসছে কিনা দেখছে।
তোমাদের কেমন লাগছে, জানি না, বলল সে। আমার অবস্থা কাহিল।
আহত পায়ের যন্ত্রণা অগ্রাহ্য করে হাসল কুমালো। বলল, এক কাজ কর। ভেলায় উঠে জিরিয়ে নাও খানিকক্ষণ। একজনের ভার সহজেই রাখতে পারবে এটা।
কুমালোর কথামত দুই কাণ্ডের ভেলায় উঠে চিত হয়ে শুয়ে পড়ল রবিন। খুবই বেকায়দা অবস্থা, কিন্তু এটাকেই মনে হল এখন গদির বিছানা।
অত ভাবনার কিছু নেই, শান্তকণ্ঠে বলল কুমালো। এখনও বেঁচে রয়েছি, আমরা! দুটো কাণ্ড আছে। চারটে প্যান্ট আছে। তিনটে ছুরি আছে। আর আছে তিনটে মুক্তো…..
চট করে পকেটের ওপর হাত বোলাল কিশোর। বলল, আছে।
বেশ। তাহলে ওগুলো জায়গামত পৌঁছে দেয়া এখন আমাদের দায়িত্ব। এক কাজ করতে হবে। ভেলায় উঠে একজন করে জিরাব আমরা। অন্য তিনজনে পেছন থেকে ঠেলে নিয়ে এগোব। সোজা দক্ষিণে। ঠিক আছে?

এতে খুব একটা লার্জ হবে বলে মনে হল না কারও কাছেই। তবু, চুপচাপ একজায়গায় ভেসে থেকে মরার চেয়ে কিছু করা ভাল। কুমালোর কথা মতই কাজ শুরু করল ওরা।
খুবই ধীর গতিতে আবার দক্ষিণে এগিয়ে চলল দুই কাণ্ডের আশা।
পালা করে ভেলায় উঠে বিশ্রাম নেয় ওরা। শক্ত কাণ্ডের ওপর শুয়ে থাকা, মুখের ওপর ঢেউ ভেঙে পড়া, মোটেই আরামদায়ক নয়। ঘন্টাখানেক পর সাগরে নেমে বরং আরামই লাগে।
আবার অনেকক্ষণ ধরে সাঁতার কেটে ভেলায় উঠতে পারলে সেটাও খানিকটা স্বস্তি।
তবে যতই সময় কাটতে লাগল এই আরাম আর স্বস্তি কোনটাই থাকল না।
দিনটা তো কাটল যেমন তেমন, রাতটা বড় বেশি দীর্ঘ মনে হল। ঘুমানো অসম্ভব! সারাক্ষণ জেগে থাকা, সতর্ক থাকা, ঢেউ এসে নাকে ঢোকে কিনা সে। খেয়াল রাখা, এক মহা বিরক্তিকর ব্যাপার। তন্দ্রা এলে, সামান্য অসতর্ক হলেই নাকেমুখে ঢুকে প্রায় শ্বাসরুদ্ধ করে দিতে চায় পানি।
তার ওপর রয়েছে জলজ জীবের ভয়। আতঙ্কিত করে রেখেছে ওদের। চেনাঅচেনা অদ্ভুত সব প্রাণী নিচ থেকে উঠে আসছে আজব ভেলাটাকে পরীক্ষা করে দেখতে। সাগরে এত প্রাণী আর কখনও দেখেনি ওরা।
সাগরে অবশ্য এত প্রাণীরই বাস। কিন্তু জাহাজে কিংবা নৌকায় থেকে সেগুলো খুব কমই দেখা যায়। ওপর থেকে বড়জোড় কিছু ডলফিন আর উড়ুক্কু মাছ, ব্যস। গভীর পানির জীবেরা দানবীয় জলযানের কাছে আসতেই ভয় পায়।
এমনকি দুই কাণ্ডের প্রায় ডুবো ডুবো ভেলার চেয়ে সাত কাণ্ডের ভাসমান। ভেলাটাও অনেক বেশি ভয়াল ছিল ওগুলোর কাছে। এ দুটোকে নিজেদের মতই কোন প্রাণী ভাবল বোধহয় মাছেরা, তাই দেখতে এল।
নিচে তাকালেই দেখা যায় অসংখ্য আলো। যেন ওপরের তারাজ্বলা আকাশের মতই নিচেও আরেকটা আকাশ রয়েছে।
বেশি দেখছে মুসা। ওই যে গেল একটা লণ্ঠন মাছ।...একটা তারাখেকো।... খাইছে! ওটা কি?
বিশাল দুটো চোখ অলস ভঙ্গিতে অনুসরণ করে চলেছে ভেলাটাকে। প্রায় এক ফুট ব্যাস, জ্বলছে, হলদে-সবুজ আলো।
ওটা আমাদের পুরানো দোস্ত, কিশোর বলল। জায়ান্ট স্কুইড।
কেঁপে উঠল রবিন। ও দোস্ত হতে যাবে কেন! শুঁড় বাড়িয়ে ধরবে না তো ব্যাটা?
ধরতেই পারে,মুসা বলল। থাক, এসব অলক্ষুণে কথা বল না। বল, ও খুব ভাল মানুষ, এখুনি চলে যাবে। বলে ভেলায় ঠেলার জোর কিছুটা বাড়াল সে।

পেছনে পড়ল চোখ দুটো।
উদয় হল আরও বিচিত্র একটা জীব। স্কুইডের চোখের মতই অনেকটা, জ্বলন্ত, আরও অনেক বড়। ওটার ব্যাস আট ফুটের কম না। রূপালি আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। ভেলার একেবারে নিচে চলে এল ওটা। ছয় ফুট নিচ দিয়ে অনুসরণ করে চলল। মস্ত এক পূর্ণিমার চাঁদ যেন।
বোবা হয়ে গেছে যেন ছেলেরা। মুসার বাহুতে হাত রাখল কুমালো। কাপছে মুসা। অন্য দুজনের অবস্থাও ভাল নয়। চোখই যার এতবড়, সেই দানবটা কত বড়!
চোখ নয় ওটা, কুমালো বলল। ওটা চন্দ্র মাছ। চাঁদের মতই গোল আর জ্বলে তো, সেজন্যে ওই নাম।
গোল মাছ? মুসা বলল। যাহ, বানিয়ে বলছ, আমরা যাতে ভয় পাই।
না, বানিয়ে বলছি না। মাথাটা দেখতে পাচ্ছি আমরা।
তাহলে বাকি শরীরটা কোথায়?
বাকি কোন শরীর নেই। মাথা ছাড়া আর কিছু নেই ওটার। সেজন্যেই অনেকে বলে মাথা মাছ। আরও একটা নাম আছে ওটার, সূর্য মাছ। দিনের বেলা, প্রায়ই ভেসে থেকে রোদ পোয়ায় তো।
মাথা ছাড়া আর কিছু নেই? বিশ্বাস করতে পারছে না মুসা।
থাকে, ছোট বেলায়। লেজ। ধীরে ধীরে খসে যায় ব্যাঙের পোনার মত। আসলে মাথা ঠিক নয় ওটা, পুরো শরীরটাই। ওটার ভেতরেই রয়েছে ওর পেট আর শরীরের অন্যান্য যন্ত্রপাতি। সাঁতার কাটার জন্যে পাখনাও আছে।
বেশ বড়। ওজন নিশ্চয় টনখানেকের কম না।
হ্যাঁ। আরও বড় হয়। মাঝে মাঝে ক্যানুর তলা ঠেকে যায় পানির নিচে ভেসে থাকা মাথা মাছের গায়ে। মনে হয় ডুবো চরায় লেগেছে।
কয়েক মিনিট ধরে ভেলাটাকে অনুসরণ করল সাগরের চাঁদ। ওটা থাকতে থাকতেই এল চারটে সাপের মত জীব। রক্ত ঠাণ্ডা করে দেয়া চেহারা। ওগুলোর আলো নেই, চাঁদ মাছের আলোয় দেখা গেল কুৎসিত ভঙ্গিতে শরীর মোচড়াচ্ছে। আট-দশ ফুট লম্বা, মানুষের উরুর সমান মোটা।
সাপ নাকিরে বাবা? মুসা বলল।
না, মোরে, ছুরি বের করল কুমালো। এক ধরনের বান মাছ। এ-ব্যাটাদের ব্যাপারে হুঁশিয়ার। সব খায়। মানুষের মাংসেও অরুচি নেই।
হারামী জীব! বিড়বিড় করে বলল কিশোর।
হ্যাঁ, রবিন বলল। বইয়ে পড়েছি, প্রাচীন রোমানরা নাকি মোরে ইল পুষত, এক পুকুরে অনেকগুলো। রোজ সকালে ওগুলোর নাস্তার জন্যে জ্যান্ত মানুষ ফেলে দিত পুকুরে। যুদ্ধবন্দী কিংবা গোলামদের।

হাতে ছুরি নিয়ে সতর্ক দৃষ্টিতে পানির নিচে তাকিয়ে আছে কুমালো। আমরা ওদেরকে বলি ক্যামিচিক। অর্থাৎ ভয়ানক জীব। ব্যাটারা উভচর। গাছ বেয়ে ওপরে উঠে সাপের মত ওত পেতে থাকে। নিচে দিয়ে শিকার গেলে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ওপর। পোনাপৈতে একবার একজনকে কামড়ে দিয়েছিল একটা মোরে। সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নেয়ার পরেও বাঁচেনি লোকটা, দুদিন পর মারা যায়।
ভেলার নিচ দিয়ে কয়েকবার আসা-যাওয়া করল ওগুলো। কুমালোর মত মুসাও ছুরি বের করে তৈরি হয়ে আছে।
ভেলায় এসে উঠবে না তো? জিজ্ঞেস করল সে।
উঠতেও পারে। অনেক সময় নৌকায়ই উঠে পড়ে চুরি করে। ওঠার সময় লেজটাকে কাজে লাগায় ওরা। দুনিয়ার বেশির ভাগ প্রাণীই আক্রান্ত না হলে হামলা করে না। কিন্তু মোরের ওসব দ্রতা নেই। অযথাই লাগতে আসে। এক ইঞ্চি লম্বা দাঁতের সারি, ছুরির মাথার মত চোখা আর ধারাল।
ছুরির বাঁট শক্ত করে চেপে ধরল মুসা। আসুক। প্রথম যে ব্যাটা আসবে, মুণ্ড কেটে ফেলব।
তাতে আরও খারাপ হবে। রক্তের গন্ধে হাজির হয়ে যাবে হাঙর। তাছাড়া ঘাড়ের চামড়া সাংঘাতিক শক্ত ওগুলোর। সহজে কাটবে না। তবে লেজের চামড়া নরম।
চলে গেল একটা বান। খানিক পরেই আলতো ছোঁয়া লাগল মুসার পিঠে। সে ঘাড় ফেরার আগেই ছুরির বাঁট দিয়ে গায়ের জোরে বাড়ি মারল কুমালো।
যাক, বলল সে। এই একটা আর জ্বালাতে আসবে না।
মুহূর্ত পরেই এল আরেকটা। মুসার প্রায় মুখে লেজ বুলিয়ে গেল। তার দিকেই বানগুলোর নজর কেন, বোঝা গেল না। পিঁপড়েরাও তার প্রতিই বেশি আকৃষ্ট হয়। আমাজানের জঙ্গল আর আফ্রিকাতেও সেই প্রমাণ পাওয়া গেছে। এখন শুরু করেছে। বান মাছগুলো। কাণ্ডের ওপর দিয়ে সাপের মত গড়িয়ে এল লেজ, আলতো ছোঁয়া লাগল মুসার মুখে। তারপরই উঠে এল মোটা শরীরটা, কুৎসিত মুখটা এগিয়ে আসছে নিঃশব্দে। হাঁ করা চোয়ালে তীক্ষ্ণ দত। তারার আলোয় অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কুমালোর মতই ছুরি দিয়ে লেজে বাড়ি মারল মুসা। যন্ত্রণায় মোচড় দিয়ে উঠল বানের শরীর, লাফ দিয়ে নেমে গেল পানিতে।
চন্দ্র মাছের কাছে আর কোন সর্পিল ছায়াকে চোখে পড়ল না।
দুর্বল লাগছে মুসার। বান মাছগুলো আতঙ্কিত করে দিয়েছে তাকে, কাহিল। লাগছে সে-জন্যেই। ভেলায় উঠে শুয়ে পড়ল। ঘুম এসে গেল সঙ্গে সঙ্গে, কিন্তু পরমুহূর্তেই জেগে উঠল নাকে-মুখে পানি ঢুকে যাওয়ায়।
সবাই বুঝল, এখন ঘুমাতে না পারলে হয়ত মাথাই খারাপ হয়ে যাবে মুসার।
ওঠ, উঠে বস, কুমালো বলল। ঘোর। আমার কাঁধে মাথা রাখ...হ্যাঁ, ঘুমাও এবার।

তর্ক করতেও ইচ্ছে হল না মুসার। কুমালোর কাঁধে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল। ঢেউ এখন আর তার নাক ছুঁতে পারছে না।
বাতাস বাড়ছে। শীত করতে লাগল ওদের। ভোরের দিকে অসহ্য হয়ে উঠল ঠাণ্ডা। দিগন্তে সূর্যের আগমনে তাই খুশি হল খুব। তরে ঘন্টাখানেকও লাগল না, দূর হয়ে গেল খুশি। ভাবল, এর চেয়ে ঠাণ্ডা রাতই আরামের ছিল।
ঘুমিয়ে বেশ ঝরঝরে হয়েছে মুসার শরীর। ফলে ক্ষুধাও লেগেছে, পিপাসাও। অনন্যরা ঘুমাতে পারেনি, ফলে এই অসুবিধেটা দেখা দেয়নি এখনও।
তবে ক্ষুধার কথাটা কাউকে বলল না সে।
নিজের হাতের তালু দেখল, অন্যদেরগুলোও দেখল। নোনা পানিতে ভিজে কুঁচকে গেছে চামড়া।
।মরেছি, বলল মুসা। চামড়ার যা অবস্থা, আর বেশিক্ষণ এই অবস্থা চললে খসে যাবে। রসিকতা করল, দাও দাও, কোল্ড ক্রীমের কৌটাটা দাও।
অন্যেরা ক্লান্ত। কাজেই ভেলার বড় মোটরটা হল এখন মুসা। জোরে জোরে ঠেলতে লাগল। আশা তাদেরকে নিরাশ করবে বলেই মনে হচ্ছে।
বেলা যতই বাড়ল, বাড়ল ক্ষুধা আর পিপাসা, সবারই। পানিতে থাকায় একটা উপকার হয়েছে, রোমকূপ দিয়ে আর্দ্রতা ঢুকছে, ফলে দ্রুত পানিশূন্যতার হাত থেকে রেহাই পেয়েছে শরীর। ডাঙায়থাকলে আরও অনেক আগেই প্রচণ্ড পিপাসা পেত। এখানে ধীরে ধীরে আসছে পিপাসা, কিন্তু আসছে তো। রাত নাগাদ এত বেড়ে গেল, এখন যদি কেউ বলে এক গেলাস পরিষ্কার পানি দেবে, বিনিময়ে মুক্তা তিনটে দিয়ে দিতে হবে, সামান্যতম দ্বিধা করবে না কিশোর।
এই রাতে নিজেকে বালিস বানানর প্রস্তাব দিল মুসা। সবাই তার কাঁধে পালা করে মাথা রেখে ঘুমিয়ে নিক। প্রথমে ঘুমাল রবিন। তারপর কুমালো। সব শেষে কিশোর। শেষ দিকে নিজের চোখও আর খুলে রাখতে পারল না মুসা। কুমালে আর রবিন ভেলা ঠেলছে। কাণ্ড ধরে ভেসে রয়েছে সে। কাঁধের ওপর কিশোরের মাথা।
ঘুমিয়ে পড়ল মুসা। প্রায় একই সঙ্গে চমকে জেগে উঠল সে আর কিশোর। দুজনেই নাকেমুখে পানি ঢুকে গেছে। কাশতে আরম্ভ করল।
পরদিন সকালে কোথা থেকে এসে হাজির হল একঝাঁক বোনিটো। ভেলার সঙ্গে সঙ্গে চলল। বার বার ছোঁ মারল অভিযাত্রীরা, কিন্তু একটাকেও ধরতে পারল না।
বড়শির সুতো বানাতে পারলে কাজ হত, কাণ্ডের দিকে তাকিয়ে বলল। কুমালো।
নারকেলের ছোবড়া দিয়ে তো বানানো যায়। কাণ্ডের আঁশ দিয়েও বোধহয় হবে।
দিনের অনেকটা সময় ব্যয় করল ওরা আঁশ বার করতে। জোড়া দিয়ে, পাকিয়ে তৈরি করে ফেলল একটা সুতো, যদিও মাত্র পাঁচ ফুট লম্বা। তবে শক্ত। বাকল

কেটে একটা বড়শি বানাল কুমালো। সুতোর মাথায় বাঁধল সেটা। কিন্তু টোপ নেই। টোপ ছাড়াই বড়শিটাকে পানিতে ঝুলিয়ে রাখল ওরা। আশা করছে, যদি কোন একটা বোকা বোনিটো খাবার মনে করে গিলে ফেলে?
চলে গেল বোনিটোর ঝাক। অন্যান্য মাছ এল গেল, বড়শির দিকে নজর দিল কেউ।
আরেকটা ভয়ঙ্কর রাত পেরোল, কাটল দুঃসহ দিন। নোনা পানিতে ভিজে আর কাণ্ডের সঙ্গে ঘষা লেগে ঘা দেখা দিতে লাগল শরীরে। পা ফুলে যাচ্ছে। একধরনের ঝিনঝিনে অনুভূতি। লাল লাল দাগ পড়ছে, কোথাও কোথাও ফোসকা।
এই অবস্থাকে বলে ইমারসন ফুট, কিশোর বলল। এরপর দেখা দেবে ফোঁড়া। নোনা পানির ফোঁড়া।
রোদে পুড়ে গেছে চামড়া। টকটকে লাল হয়ে উঠেছে চোখ, ভীষণ জ্বালা করছে। পানির অভাবে শুকিয়ে ঠোঁট ফেটে গেছে। ফুলে উঠেছে জিভ, মুখগহ্বর ভরে দিয়েছে যেন। কথা বলতে অসুবিধে হয়। নোনাপানি দিয়েই গরগরা করল মুসা, গিলেও ফেলল খানিকটা।
সাবধান, হুঁশিয়ার করল কিশোর। পেটে খুব সামান্য গেলে ক্ষতি নেই। কিন্তু একবার খাওয়া শুরু করলে আর লোভ সামলাতে পারবে না।
শরীরের লবণ দরকার হয়, প্রতিবাদের সুরে বলল মুসা। খেলে ক্ষতিটা কি বুঝি না।
বেশি খেলে প্রথমে জ্ঞান হারাবে, রবিন বলল। তারপর দুটো ব্যাপার ঘটতে পারে। হুঁশ ফিরে পাবে, তবে মাথায় গণ্ডগোল হয়ে যাবে। কিংবা একেবারেই আর ফিরবে না।
তাতেই বা কি? তিক্তকণ্ঠে বলল মুসা। এমনিতেই পাগল হব, কিংবা মরব। তারচে খেয়েই মরি। কপালে হাত রেখে সামনে তাকাল সে। পাগল বোধহয় হতেই শুরু করেছি। নানারকম গোলমেলে জিনিস দেখছি।
কি দেখছ? মেঘ করেছে। মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। ওই তো, দক্ষিণ-পশ্চিমে দেখাল সে। আমি জানি, চোখের ভুল...
ভুল নয়! চেঁচিয়ে উঠল রবিন। সত্যি বৃষ্টি হচ্ছে, আধ মাইল দূরেও হবে না। চল চল, জলদি চল!
চারজনে মিলে ঠেলতে শুরু করল ভেলাটাকে। দ্রুত সাঁতরে চলল মেঘের দিকে। কিন্তু হতাশ হতে হল ওদেরকে। ওরাও পৌঁছে সারল, বৃষ্টি থেমে গেল। হেসে উঠল রোদ, যেন ব্যঙ্গ করল অভিযাত্রীদের।

দেখ দেখ, ওই যে আরেকখানে হচ্ছে? রবিন দেখাল এবার। সিকি মাইল পশ্চিমে। কাছেই, ওটাতে সময়মত পৌঁছানো যাবে এই আশায় ভেলা ঠেলে নিয়ে চলল ওরা। হালকা বাতাসে ভেসে এসেছে একটুকরো কালো মেঘ, ওটা থেকেই। বৃষ্টি পড়ছে।

সাঁতরে চলেছে ওরা। মেঘটাকেও ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বাতাস। ওরা যতই জোরে সাঁতরায়, বাতাসও ততই জোরে বয়। যেন খেলা জুড়েছে ওদের সঙ্গে। ওরা ক্লান্ত হয়ে পড়ছে, কিন্তু বাতাসের ক্লান্তি নেই। তবু আশা ছাড়তে পারল না ওরা। : অবশেষে ঝরে ঝরে শেষ হয়ে গেল মেঘটা। রোদ দেখে বিশ্বাস করার উপায় নেই কয়েক মিনিট আগেও কেঁপে বৃষ্টি হচ্ছিল ওখানে।

কি মনে হয়? মুসা জিজ্ঞেস করল। সবই কি আমাদের কল্পনা?

নিশ্চয় না, বলল কিশোর। আমরা সবাই দেখেছি, তাই না? কেউ জবাব দিল না দেখে কুমালোকে বলল, কথা বলছ না কেন? দেখিনি?

মনে তো হল..., দ্বিধা করছে কুমালো। আসলে, কোন কিছুকেই আর বিশ্বাস করতে পারছি না।

এই যে আরেক কাণ্ড, এটাকেও বিশ্বাস করতে পারছি না! চেঁচিয়ে উঠল মুসা। অথচ হাতে লাগছে। ধরতেও পারছি। বড়শিটা বেঁধে রাখা হয়েছে কাণ্ডের সঙ্গে, তাতে আটকা পড়েছে একটা অ্যালবাকোর মাছ। মাছটা তুলে দেখাল সে। কালো, চকচকে শরীর। বেশি বড় না, মাত্র দেড় ফুট। তবে বেশ মোটাসোটা, ভাল মাংস।

ছুরি নিয়ে ক্ষুধার্ত হায়েনার মত মাছটাকে আক্রমণ করল ওরা। দেখতে দেখতে কাঁটাগুলো ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকল না। ছোট একটা টুকরো সরিয়ে রাখল কুমালো, বড়শির টোপের জন্যে।

অনেকটা সুস্থ বোধ করল ওরা, পিপাসাও কমল সামান্য। অ্যালবাকোরের রসাল মাংসে পানি আছে। তবে একেকজনের ভাগে যেটুকু পানি পড়ল, বড় এক চামচের বেশি না।

বড়শিতে টোপ দেয়ায় তাড়াতাড়িই আকৃষ্ট হল শিকার, একটা বাচ্চা করাত মাছ। ধরা পড়ার পর আর রেহাই নেই, তুলে ওটাকে যত দ্রুত পারল সাবাড় করে দেয়া হল, টোপের জন্যে খানিকটা মাংস রেখে।

শিশু করাত যেখানে আছে, ধাড়িও থাকতে পারে। একটু পরেই দেখা গেল। ওটাকে। আলোড়ন তুলল পানিতে।

ওই দে! কুমালোকে দেখাল মুসা।

ছোট মাছের ঝাঁককে আক্রমণ করেছে বিশাল এক করাত মাছ। যোলো ফুটের কম হবে না। করাত দিয়ে দুটুকরো করে ফেলছে মাছগুলোকে, তারপর গপাগপ

গিলছে। মারাত্মক ওদের করাত। তিমিকেও ছেড়ে কথা কয় না। অনেক সময় হারেও তিমি।
বিশাল করাতের কাছ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করল ওরা। কাটা মাছের টুকরো ভেসে উঠছে পানিতে। নিয়ে আসছে ওগুলো মুসা আর কুমালো। জমাচ্ছে জেলার ওপর।
রক্তের গন্ধে এসে হাজির হল মস্ত এক টাইগার শার্ক। কাটা মাছগুলো খেতে শুরু করল।
এটা মোটেই পছন্দ হল না করাত মাছের। সোজা গিয়ে করাত চালিয়ে দিল হাঙরের গায়ে। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোল হাঙরের। পালাবে না পাল্টা আক্রমণ করবে ঠিক করতে পারছে না যেন।
দশ মিনিটের মধ্যে হাজির হয়ে যাবে হাঙরের পাল, শঙ্কিত হয়ে বলল কুমালো। চল, এখানে থাকা আর নিরাপদ না।
ভেলা ঠেলে তাড়াতাড়ি ওখান থেকে সরে এল ওরা। পেছনে তাকিয়ে দেখল, খানিক আগে যেখানে ছিল ওরা সেখানকার পানি যেন টগবগ করে ফুটছে। অসংখ্য হাঙর এসে হাজির হয়েছে। রক্তাক্ত হয়ে গেছে পানি।
আরও দূরে সরে এল ওরা। তারপর কাঁচা মাছ খাওয়ায় মন দিল।
বড় উপকার করল করাতটা, চিবাতে চিবাতে বলল মুসা। নাহ, ততটা দুর্ভাগা নই আমরা। কপাল মাঝে মাঝেই ভাল হয়ে যায়।
কিন্তু তারপর যতই সময় গেল কপাল আবার খারাপ হতে লাগল। মাছ আর চোখেই পড়ে না এখন। শুধু জেলিফিশ। ঘন হয়ে ছড়িয়ে আছে মাইলের পর মাইল জুড়ে। খুব সাবধানে চলতে হচ্ছে ওগুলোর ভেতর দিয়ে। জেলিফিশের শুড়ে মারাত্মক বিষ। বড় বড় মাছকেও অবশ করে ফেলে।
জেলিফিশের সব চেয়ে খারাপ প্রজাতিগুলোর একটা সী ব্লাবার। লাল রঙ, সাত ফুট পুরু, একেকটা শুঁড় একশো ফুট লম্বা। সাঁতার কাটার সময় সাঁতারুর শরীরে অনেক সময় জড়িয়ে যায় ওই শুঁড়, বিষাক্ত হুল ফুটতে থাকে চামড়ায়। তখন অন্যের সাহায্য ছাড়া ওই শুঁড় খোলা তার পক্ষে প্রায় অসম্ভব।
কম-বেশি হুল অভিযাত্রীদের সবার শরীরেই ফুটল। জেলিফিশের এলাকা থেকে সরে আসার পরেও অনেকক্ষণ থাকল ওই হুলের জ্বালা। আশার গায়ে লেগে আছে থিকথিকে জেলির মত জিনিস, জেলিফিশের গা থেকে লেগেছে, ওগুলোও বিষাক্ত।
পরদিন দেখা গেল একটা পাখি। মৃত্যুদ্বীপ থেকে আসার পর এই প্রথম পাখি চোখে পড়ল ওদের। কিছুক্ষণ পর উড়ে এল আরও অনেক পাখি, নডি, বুবি। পাক খেয়ে খেয়ে উড়তে লাগল ভেলাটাকে ঘিরে।

এরমানে, কুমালো বলল। ডাঙা দূরে নয়।
রক্তলাল উৎসুক চোখ মেলে ডাঙা খুঁজল চারজোড়া চোখ। কিন্তু দিগন্তের কোথাও নারকেল গাছের একটা মাথাও চোখে পড়ল না।
কোন কিছুই আর ভাল লাগছে না এখন ওদের। সব কিছুতেই বিরক্তি। এমন কি নিজেদের সান্নিধ্যও খারাপ লাগছে, সইতে পারছে না একে অন্যকে। বুঝতে পারছে কিশোর, এই অবস্থা আর দুদিন চললেই পাগল হয়ে যাবে সবাই।
মুসা বলল, রবিনকে একই ভেলায় আর সইতে পারছে না সে। রবিন ঘোষণা করে দিল, হাতের কাছে কিছু একটা পেলেই মুসার মুখে ছুঁড়ে মারবে ওটা।
প্রত্যেকেই ভাবছে, সে ছাড়া বাকি তিনজন পাগল। আবোল-তাবোল কথা বলছে। দেশী ভাষায় অনর্গল বকবক করে যাচ্ছে কুমালো। কিশোর বলল, আর পানিতে থাকছি না আমি। এবার সৈকতে উঠব।
হেসে উঠল মুসা। ডুব দিয়ে কিশোরের পা টেনে ধরে তাকে ডুবিয়ে রাখল কিছুক্ষণ। ভেসে উঠে হা হা করে হেসে বলল, কেমন উঠলে সৈকতে? দিলাম তো ঠেকিয়ে।
মেঘ দেখতে পেল কিশোর। অথচ মেঘের চিহ্নও নেই কোথাও। তারপর দেখল নারকেল গাছের মাথা। সবুজ গাছপালায় ছাওয়া দ্বীপ। পাহাড়ের ওপর থেকে বনের মাথায় ঝরে পড়ছে জলপ্রপাত।
খেয়ালই করল না ওরা, কখন বাতাসের বেগ বাড়ল, কালো মেঘ জমল, ফুঁসে উঠল সাগর। বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি শুরু হল। ওপরের দিকে হা করে পানি খাওয়ার কথাও মনে এল না কারও। তবু করল, শরীরের স্বাভাবিক তাগিদেই বোধহয়। অনেক দিন পর পাকস্থলীতে ঢুকল মিষ্টি পানি।
কুঁসে উঠল সাগর। ছোট্ট ভেলাটাকে ঠেলে নিয়ে চলল দক্ষিণ-পশ্চিমে। নিজেদের অজান্তেই অনেকটা, কাণ্ডগুলো আঁকড়ে ধরে রইল ওরা।
ঝড়ের অন্ধকার মিশে গেল রাতের অন্ধকারের সঙ্গে। ঘোরের মধ্যে থেকে যেন কিশোরের কানে আসছে বাতাসের গর্জন, অনুভব করছে ঢেউয়ের দোলা।
তারপর শুনতে পেল আরেকটা গর্জন। বাতাসের নয়। তীরে ঢেউ আছড়ে পড়ার।
বিচিত্র কাণ্ড শুরু করেছে ভেলাটা। কিসের টানে যেন দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে, ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসছে আবার, আবার এগোচ্ছে...
কয়েকবার এরকম করে হঠাৎ টান লেগে ছিঁড়ে গেল বাঁধন। আলাদা হয়ে গেল দুটো কাণ্ড। আর আঁকড়ে ধরে রাখতে পারল না কিশোর। ডুবতে শুরু করল। পায়ের তলায় ঠেকল মাটি!
ধাক্কা দিয়ে আবার তাকে ভাসিয়ে ফেলল ঢেউ। আবার ভোবাল। আবার ভাসাল। অবশেষে দেখল, কোমর পানিতে দাঁড়িয়ে আছে সে।

হ্যাঁচকা টানে তাকে চিত করে ফেলল আবার পানি। টেনে নিয়ে গিয়ে ছুঁড়ে ফেলল বালিতে।
হাঁচড়ে-পাঁচড়ে আরও কিছুদূর উঠে গেল কিশোর। ঢেউ পৌঁছতে পারছে না এখানে। চিত হয়ে শুয়ে পড়ল বালিতে।
তারপর শুধুই অন্ধকার।
চোখ মেলে একটা বাদামী মুখ দেখতে পেল কিশোর। কালো খোঁপায় লাল হিবিসকাস গোঁজা। হাতে একটা কচি ডাব। কাত করে ধরল তার ঠোঁটের কাছে।
ঠাণ্ডা মিষ্টি পানি পড়ল হাঁ করা মুখের ভেতর। ফোলা জিভের জন্যে গিলতে কষ্ট হল তার। কোনমতে গিলে নিল কয়েক ঢোক।
সূর্য উঠেছে, কিন্তু রোদ লাগছে না তার গায়ে। সে শুয়ে আছে ঘুন নারকেল কুঞ্জের ছায়ায়। ফলে বোঝাই গাছগুলো। বাতাসে ভেসে আসছে ফুলের সুবাস।
তার পাশেই শুয়ে আছে রবিন, মুসা আর কুমালো। তাদের সেবাযত্ন করছে আরও কয়েকটা মেয়ে। গাছপালার ভেতরে কয়েকজন পুরুষকে দেখা যাচ্ছে। এতই দুর্বল হয়ে পড়েছে কিশোর, আবার চোখ বুজে ফেলল। বয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাকে, টের পাচ্ছে। আস্তে শুইয়ে দেয়া হল। কানে আসছে অনেক কণ্ঠস্বর। কাঠের ধোঁয়া আর খাবারের জিভে-পানি-আসা গন্ধ নাকে এল।
চোখ মেলল আবার কিশোর। গাঁয়ের একটা কুঁড়ের বারান্দায় শুইয়ে দেয়া হয়েছে তাকে। বেড়া বেয়ে ছাতে উঠে গেছে লতা, নানা রঙের ফুল ফুটে আছে। বড় বড় আম গাছে আম ধরে আছে, ফলের ভারে নুয়ে পড়েছে ডাল।
বারান্দায় ভিড় করে আছে অনেকগুলো বাদামী মুখ। কৌতূহলী দৃষ্টিতে, তাকিয়ে আছে অভিযাত্রীদের দিকে।
তার ওপর ঝুঁকল একটা মুখ, সেই মেয়েটা। হাসল কিশোর। কাঠের একটা পাত্র থেকে কাঠের চামচ দিয়ে খাবার নিয়ে বাড়িয়ে ধরল। কিশোর হাঁ করতেই ঢেলে দিল তার মুখে। রুটিফল, কলা আর নারকেল দিয়ে বানানো এক ধরনের মণ্ডের মত খাবার।
খুব ধীরে ধীরে গিলতে লাগল কিশোর।
পাশে এসে তার মাদুরের ওপর বসল এক বৃদ্ধ। তাকে অবাক করে দিয়ে ইংরেজিতে কথা বলে উঠল, আমি নুলামা। এ-গাঁয়ের মোড়ল। অনেক ভুগেছ তোমরা। আমাদের এখানে যখন আসতে পেরেছ, আর ভাবনা নেই। খেয়েদেয়ে ঘুম দাও। সব ঠিক হয়ে যাবে।
.
আবার যখন চোখ মেলল কিশোর, দেখল গাছপালার লম্বা ছায়া পড়েছে। নিশ্চয় শেষ বিকেল। শান্ত স্নিগ্ধ গাঁয়ের দিকে চোখ বোলাল সে। নির্দিষ্ট কোন রাস্তা নেই।

গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে কুঁড়েগুলো।
গাছে গাছে ছেয়ে রয়েছে! আম তো আছেই। আছে রুটিফল, কলা, কমলা, লেবু, নারকেল, ডুমুর, পেঁপে, তুঁত। ফলে ফলে বোঝাই।
আর আছে ফুল। নানা জাতের অর্কিড আঁকড়ে রয়েছে গাছের ডাল, কাণ্ড। বুগেনভিলিয়া, হিবিসকাস আর কনভলভুলাসের বাগানে যেন বসন্ত এসেছে।
সচল রঙেরও অভাব নেই এখানে। গাছে গাছে উড়ছে আর কর্কশ চিল্কার করছে লাল-সবুজ কাকাতুয়া। ঝিম মেরে বসে রয়েছে ঘন নীল মাছরাঙা। পড়ন্ত রোদে চিকচিক করছে ঘুঘুর পালক। আরও অনেক পাখি আছে, বেশির ভাগের নামই জানে না সে। বিচিত্র ওগুলোর রঙঃ লাল, সবুজ, কালো, সাদা, নীল, হলুদ।
পাখির ডাকে মুখরিত হয়ে আছে গ্রামটা। তার সঙ্গে তাল মিলিয়েছে যেন লোকের মৃদু আলাপ। কাছেই কোথাও গিটার বাজিয়ে গান গাইছে কারা যেন।
ফিরে তাকাল কিশোর কুমালো, মুসা আঃ রবিনেরও ঘুম ভেঙেছে। উঠে বসেছে। অবাক হয়ে দেখছে, কান পেতে শুনছে।
স্বপ্ন দেখছি, তাই না? মুসা বলল।
হয়ত, বলল কিশোর। ঘুম ভাঙলে হয়ত দেখব এসব কিছুই নেই। নারকেলের কাণ্ড আঁকড়ে ধরে সাগরে ভাসছি...
ঘরের ভেতরে কথা শোনা গেল। কয়েকটা মেয়ে আর একজন বয়স্ক মহিলা বেরিয়ে এল পানি আর খাবারের পাত্র নিয়ে। সেগুলো রাখল অভিযাত্রীদের সামনে। নানারকমের মাছ, কবুতরের রোস্ট, মিষ্টি আলু সেদ্ধ আর একঝুড়ি ফল।
ওরা খাবার সময় কাছে এসে বসল বৃদ্ধ মোড়ল। হাসি হাসি মুখ।
এ-জায়গাটার নাম কি? খেতে খেতে জিজ্ঞেস করল কিশোর। জিভের ফোলা আর এখন নেই।
কুয়াক ট্রাক দ্বীপপুঞ্জের একটা দ্বীপ।
ট্রাক, যাকে দক্ষিণ সাগরের স্বর্গ বলা হয়। এর নাম অনেক শুনেছে কিশোর। বিশাল এক ল্যানকে ঘিরে রেখেছে একশো চল্লিশ মাইল লম্বা প্রবালের দেয়াল।
দেয়ালের ভেতরে ল্যাগুনের বুকে গজিয়ে উঠেছে দুশো পঁয়তাল্লিশটা দ্বীপ।
এই দ্বীপটা কি ল্যাগুনের মধ্যে?
না। দেয়ালের ওপর। ওই যে, ওদিকে সাগর। আর এদিকে ল্যাগুন।
আমেরিকান নেভির লোক আছে এখানে?
মূল দ্বীপটাতে আছে। সকালে গিয়েছিলাম তোমাদের খবর জানাতে। সঙ্গে সঙ্গেই আসতে চাইছিল ওরা, আমি বারণ করেছি। বলেছি কাল সকালে যেন আসে, ততক্ষণ আমার মেহমান হয়ে থাকবে তোমরা। ওরা বলল, পোনাপে থেকে নাকি বোট নিয়ে বেরিয়েছিলে তোমরা, তারপর নিখোঁজ হয়েছ। কাল নেভির একটা

হসপিটাল শিপ যাবে পোনাপে আর মার্শাল দ্বীপে, ইচ্ছে করলে ওটায় করে যেতে পার। হাসল বৃদ্ধ। কিংবা থেকেও যেতে পার এখানে, যতদিন ইচ্ছে। আমরা খুর খুশি হব।
চোখে পানি এসে গেল কিশোরের। আপনাদের দয়ার কথা কোনদিন ভুলব না। থাকতে পারলে খুশিই হতাম। কিন্তু পোনাপেতে জরুরি কাজ আছে। আমাদের।
পরদিন সকালে ক্যানুতে করে ট্রাকের মূল দ্বীপে পৌঁছে দেয়া হল অভিযাত্রীদের। হসপিটাল শিপটা আধুনিক যন্ত্রপাতি সজ্জিত একটা সত্যিকারের হাসপাতাল। এক্স-রে মেশিন আছে, চিকিৎসার জন্যে প্রয়োজনীয় অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি আছে, আছে ফার্মেসী, ল্যাবরেটরি। দ্বীপ থেকে দ্বীপে ঘুরে বেড়ায়, অসুস্থের সেবা করে, দেশী মেয়েদেরকে নার্সের ট্রেনিং দেয়।
ধবধবে সাদা বিছানায় শোয়ানো হল অভিযাত্রীদের। চিকিৎসা শুরু হয়ে গেল সাথে সাথেই। কুমালোর জখম দেখে ডাক্তার বললেন, ঘা প্রায় শুকিয়ে এসেছে।
তিন দিন পর পোনাপেতে পৌঁছল জাহাজটা। রেডিওতে আগেই খবর পাঠানো হয়েছে। তৈরিই হয়ে ছিল কমাণ্ডার ফেলিকস ম্যাকগয়ার। জাহাজের নোঙর পড়তে
পড়তেই ওটার গায়ে এসে ঘেঁষল তার বোট।
অভিযাত্রীদের সঙ্গে দেখা হতেই প্রশ্ন শুরু করল, কোথায় ছিলে তোমরা? কি হয়েছিল? অ্যাটলে থেকে গেলে কেন? কেন ফিরলে না বোটে করে?
হেসে উঠল কিশোর। আহা, একটা করে প্রশ্ন করুন। নইলে জবাব দিই কি করে? আচ্ছা, আগে বলুন, ডেংগু ফিরেছে?
ডেংগু? ডেংগুটা আবার কে?
ওহহো, ভুলেই গিয়েছিলাম। আপনি তো আবার তাকে চেনেন রেভারেণ্ড হেনরি রাইডার ভিশন নামে।
ওঁকে উদ্ধার করেছে একটা মাছধরা নৌকো। বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছেন। খাবার পানি সব ফুরিয়ে গিয়েছিল, পরে সাগরের পানি খেয়েছেন। তাতেই মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। একটু সুস্থ হলে তোমাদের কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম। বললেন, তোমরা নাকি ইচ্ছে করেই অ্যাটলে থেকে গেছ। তিনি আবার ফিরে গেলে তারপর আসবে।
সব মিথ্যে কথা, কিশোর বলল। কুমালোকে গুলি করেছে। আমাদের ওখানে ফেলে রেখে এসেছে মরার জন্যে। ওই লোক মিশনারি নয়, মুক্তো ব্যবসায়ী। আর তার নামও রাইডার ভিশন নয়, ডেংগু পারভি। ওই অ্যাটলে একটা মুক্তোর খামার আছে। ওটাই লুট করতে চেয়েছিল সে।
হাঁ করে তাকিয়ে রইল ম্যাকগয়ার। তাই নাকি? আশ্চর্য!

এখন কোথায় সে? এখানেই?
না। বড় একটা বোট ভাড়া করে, মাঝিমাল্লা নিয়ে আবার বেরিয়েছে। আমরা তো ভাবলাম তোমাদের আনতে গেছে। পরে যখন শুনলাম, তোমরা প্রায় মরতে মরতে, এসে ট্রাক দ্বীপে উঠেছ, শুনে তো চমকে গেলাম।
গেছে কতদিন হল?
এই হপ্তাখানেক। কখন ফিরবে বলেনি। আবোলতাবোল কথা বলছিল। সে নাকি রামধনুর দেশ থেকে সোনার সিন্দুক তুলে আনতে যাচ্ছে। এখনও নব্বই ভাগ পাগল। একটা লগবুক সারাক্ষণ বগল তলায় চেপে রাখত, কাউকে ছুঁতেও দিত।
না। কেউ দেখার কথা বললেই খেপে যেত। কোন জায়গায় যাচ্ছে, অবস্থান জানতে চেয়েছিলাম আমরা, বলেনি। ভাল নেভিগেশন জানে, এরকম একজন পলিনেশিয়ানকে নিয়ে গেছে। এক মুহূর্ত থেমে বলল ম্যাকগয়ার, এখন বুঝতে পারছি কোথায় গেছে। অ্যাটলেই যাবে।
ওখানে কোনদিনই পৌঁছতে পারবে না। হাসল কিশোর। আমি চাইছি, আমরা থাকতে থাকতেই ফিরে আসুক। গরুর হাড়িড কোপানর কুড়াল নিয়ে ওর জন্যে তৈরি থাকব আমি।
হেসে বলল ম্যাকগয়ার, তোমাকে আর কিছুই করতে হবে না। এবার ফিরলেই জেলে ঢুকতে হবে তাকে।
কিন্তু কিশোর আর ম্যাকগয়ার দুজনেরই হিসেবে ভুল হয়েছে। কুড়ালের কোপও খেতে হল না ডেংগুকে, জেলেও ঢুকতে হল না।
সেই বাড়িটাতেই উঠল অভিযাত্রীরা, পোনাপেতে, এসে প্রথম যেটায় উঠেছিল। ক্যাপ্টেন ইজরা কলিগ জানাল, মেরামত হয়ে গেছে শুকতারা।
একেবারে আগের মত, বলল সে।
মাছটাছগুলো কেমন আছে? জানতে চাইল কিশোর।
ভাল। তবে অক্টোপাসটা বেশ জ্বালায়। একদিন তো বেরিয়ে পড়েছিল ট্যাঙ্ক থেকে। মাকড়সার মত হেঁটে হেঁটে উঠে চলে এসেছিল ডেকে, আরেকটু হলেই সাগরে নেমে যেত। লোকজন ডেকে অনেক কষ্টে তারপর ধরেছি।
বাড়িতে একটা লম্বা রেডিওগ্রাম পাঠাল কিশোর। আর অনেক টাকার বীমা করে ছোট একটা প্যাকেট পার্সেল করে পাঠাল প্রফেসর এনথনি ইস্টউডের নামে।
মুক্তাগুলো হাত বদল করে অবশেষে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।
জামবুর ব্যাপারে খোঁজখবর নিল তিন গোয়েন্দা। জেলেই রয়েছে এখনও। কিশোরের মনে হল, যথেষ্ট সাজা হয়েছে বেচারার। ম্যাকগয়ারকে অনুরোধ করল, তাকে মুক্তি দিতে।

মুক্তি পেল জামবু। একেবারেই অকৃতজ্ঞ লোকটা। কিশোরকে একটি বারও ধন্যবাদ জানাল না। দ্বীপেও থাকল না আর। আমেরিকাগামী যে জাহাজটা প্রথম ধরতে পারল, তাতেই মালা হিসেবে নাম লিখিয়ে পাড়ি জমাল দেশের উদ্দেশে।
ডেংগুর ফেরার অপেক্ষায় উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল তিন গোয়েন্দা। রিডিঙে ভুল রয়েছে, পার্ল ল্যাগুন খুঁজে বের করতে পারবে না সে। কিন্তু সত্যিই কি পারবে না? খুঁজতে খুঁজতে যদি পেয়ে যায়! কে জানে, হয়ত এখন ল্যাগুনে মুক্তো ভোলায় ব্যস্ত তার লোকেরা। একবার ওখানে গিয়ে পৌঁছতে পারলে একটা, ঝিনুকও রাখবে না ডেংগু, সব তুলে ফেলবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই কিশোরের। তারপর ওগুলো থেকে মুক্তা বের করে নিয়ে চলে যাবে। পোনাপেতে আর কোনদিনই ফিরবে না।
কারণ, দ্বীপে ছেলেদেরকে না পেয়ে তাদের লাশ না দেখে, সন্দেহ হবেই ডেংগুর। ভাববে, যে ভাবেই হোক পোনাপেতে ফিরে এসেছে ওরা। স্বভাবতই
এদিকে ঘেঁষতে চাইবে না সে সমস্ত মুক্তা নিয়ে একেবারে নিখোঁজ হয়ে যাবে।
প্রফেসরকে তখন কি জবাব দেবে কিশোর? স্বীকার করতেই হবে দোষটা তার। ডেংগুর ফাঁকিবাজি ধরতে পারেনি। তাকে বোটে তুলে সঙ্গে করে নিয়ে গেছে। নিয়ে গিয়ে একেবারে দেখিয়ে দিয়েছে আসল জায়গা।
আমি একটা গর্দভ! আস্ত গাধা! কথাটা মনে পড়লেই নিজেকে গাল দেয়। কিশোর। এই যেমন এখন দিচ্ছে। অস্থির হয়ে গড়াগড়ি শুরু করল মাদুরে। ঘুম পালিয়েছে। আর এভাবে বসে থাকা যায় না। কিছু একটা করা দরকার। অন্তত গিয়ে দেখা দরকার, অ্যাটলে সত্যি সত্যি যেতে পেরেছে কিনা ডেংগু।
পরদিন ভোরে ঘুম ভাঙতেই বন্দরে রওনা হল কিশোর, ক্যাপ্টেন কলিগকে। বলার জন্যে, ওরা আবার পার্ল ল্যাগুনে যাবে। পুব দিগন্তে তখন সবে উঁকি দিয়েছে সূর্য। বন্দরে এসে দেখল সে, একটা বোট এসে নোঙর করেছে ডকের
শখানেক গজ দূরে। নৌকা নামিয়ে তাতে নামল কয়েকজন পলিনেশিয়ান আর একজন শ্বেতাঙ্গ।
ধক করে উঠল কিশোরের বুক। দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করল। কে লোকটা? ডেংগু? সত্যি দেখছে, না কল্পনা।
নৌকাটা আরও কাছে এলে ভালমত দেখা গেল নোকটাকে। ডেংগুই।
দুরুদুরু করছে কিশোরের বুক। ডেংগু নিশ্চয় অ্যাটলটা খুঁজে পায়নি। তাহলে ফিরত না। কিশোরকে দেখলে কি কররে এখন? রাগের মাথায় গুলি করে বসবে? পালাবে নাকি? গিয়ে ম্যাকগয়ারকে খবর দেবে?
কিন্তু কোনটাই করল না কিশোর। দাঁড়িয়ে রইল স্থাণুর মত।

তীরে পৌঁছে গেল নৌকা। ডকে উঠল ডেংগু। মাতালের মত টলছে। চোখে বন্য দৃষ্টি। খোঁচা খোঁচা দাড়ি। উসকো খুসকো চুল এসে পড়েছে কানের ওপর। পিঠের কুঁজটা আরও প্রকট। ঝুলে পড়ছে কাঁধ, ফলে হাত দুটো অস্বাভাবিক লম্বা লাগছে।
তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল কিশোর, চমকে দেয়ার জন্যে।
ডেংগু দাঁড়াল।
এই যে, ডেংগু, কিশোর বলল। চিনতে পারছ আমাকে?
এক মুহূর্ত চেয়ে রইল ডেংগু। তারপর ঘুরে হাঁটতে শুরু করল। যেন চিনতেই পারেনি।
পলিনেশিয়ান একটা লোকের হাতে সেক্সট্যান্ট, বোধহয় সে-ই নেভিগেটর। বলল, পুরোপুরি মাথা খারাপ হয়ে গেছে।
কি হয়েছিল? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
লগবুকের রীডিং দেখে একটা দ্বীপ খুঁজেছে। তার ধারণা, ওই দ্বীপে অনেক মুক্তা আছে। রীডিং মত ওখানে গিয়ে দেখা গেল, কোন দ্বীপ নেই, শুধু পানি। আশেপাশে কয়েক মাইলের মধ্যে কোন দ্বীপ পাওয়া গেল না। মাথায় আগেই গোলমাল হয়ে ছিল, এই ঘটনার পর একেবারে পাগল হয়ে গেল। কি আর করা। বাধ্য হয়ে ফিরে এসেছি।
ডকের শেষপ্রান্তে হৈ-হট্টগোল শোনা গেল। কি হয়েছে দেখার জন্যে ফিরে। তাকাল কিশোর। দুজন মিলিটারি পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু করেছে ডেংগু। হাত ছাড়াতে পারল না। টেনেহিঁচড়ে তাকে নিয়ে গেল ওরা।
লোকটার জন্যে এখন দুঃখই হল কিশোরের।
জেলে নয়, শেষ পর্যন্ত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল ডেংগুকে। এখানে রোগ না সারলে পাঠিয়ে দেয়া হবে স্যান ফ্রানসিসকোর কোন মেনটাল ইন্সটিটিউশনে।
রেডিওতে সেদিনই একটা মেসেজ এল কিশোরের নামে। ম্যাকগয়ারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল ক্যাপ্টেন কলিগ, মেসেজটা নিয়ে এসেছে।
কেবিনে রবিন, মুসা, কুমালো সবাই আছে।
খামটা ছিঁড়ল কিশোর। জোরে জোরে পড়ল :
ভাল কাজ দেখিয়েছ তোমরা। জানোয়ারগুলো পেয়েছি, চমৎকার। খুব খুশি হয়েছে লিসটার। বাকি যা আছে কারগো স্টীমারে তুলে দাও। পার্সেল পেয়েছেন ইস্টউড, তোমাদের অনেক প্রশংসা করেছেন। আর দেরি কর না। যত তাড়াতাড়ি পার, বাড়ি ফিরে এস।
তোমার চাচা, রাশেদ পাশা।

ভলিউম ১০ – খোঁড়া গোয়েন্দা – তিন গোয়েন্দা – রকিব হাসান – সেবা প্রকাশনী
ইস, কি বৃষ্টিরে বাবা! বলল, রেনকোট পরা মহিলা।
এক ঝলক ঝড়ো হাওয়া হয়ে গেল, উইলশায়ার বুলভারের ওপর দিয়ে। টান দিয়ে কেড়ে নিতে চাইল মহিলার ছাতা, পারল না। কিন্তু পুরোপুরি উল্টে গেল ছাতাটা, মট মট করে ভাঙল তিনচারটা শিকের জোড়া। ধেয়ে গেল বাতাস, ঝাপটা মেরে বৃষ্টি দিয়ে ভিজিয়ে দিল জানালার কাচ।
বাস স্টপ-এ দাঁড়ানো রবিনের মনে হল, ছাতাটার জন্যে চিৎকার করে কাঁদরে মহিলা। চেয়ে আছে দোমড়ানো কাপড়ের দিকে। রবিনের দিকে এমন ভঙ্গিতে তাকাল, যেন সব দোষ তার। তারপর, হঠাৎ হাসল মহিলা। আক্কেল হয়েছে আমার। ময়লা ফেলার ড্রামে ছুঁড়ে ফেলে দিল বাতিল ছাতাটা। ক্যালিফোর্নিয়ার বৃষ্টি কেমন জানি না আমি? কেন বেরোলাম? বাস স্টপ লেখা সাইনবোর্ডের পাশের বেঞ্চে বসে পড়ল সে।
ভেজা ঠাণ্ডা কাঁপুনি তুলল শরীরে, কাঁধ বাঁকা করে ফেলল রবিন। এপ্রিলে এরকম বৃষ্টি আর দেখেনি কখনও। ঈস্টার মানডের দিন, সন্ধ্যা প্রায় ছটা বাজে। ঠাণ্ডা তো আছেই, ঝড়ো আবহাওয়ার কারণে অসময়েই অন্ধকার হয়ে এসেছে। সান্তা মনিকায় যাওয়ার জন্যে বেরিয়েছিল সে, মা পাঠিয়েছেন একটা ফ্যাব্রিক স্টোর থেকে পোশাকের নতুন ডিজাইন আনার জন্যে। স্কুল ছুটি। এরকম আবহাওয়া থাকলে মাঠে মারা যাবে ছুটিটা। বাসের অপেক্ষায় থাকতে থাকতে অস্থির হয়ে উঠেছে সে।
ওই দেখ, আসছে মানুষটা, মহিলা বলল। আহারে, চোখে দেখে না।
পথের দিকে তাকাল রবিন। বৃষ্টির শব্দকে ছাপিয়ে কানে এল লোকটার লাঠি ঠোকার ঠক ঠক। আরেক হাতে মগু, তাতে পয়সা।
বেচারা! আফসোস করল মহিলা। অন্ধ হওয়ার যে কি জ্বালা। প্রায়ই দেখি। কদিন হল এসেছে। রোজ ভাবি, কিছু পয়সা দেব।
পার্স খুলে ভেতরে হাতড়াতে শুরু করল, মহিলা। কাছে এল লোকটা। রবিন দেখল, পাতলা শরীর তার, সামান্য বাঁকা হয়ে হাঁটে। কানের কাছে তুলে দিয়েছে কোটের কলার। ভুরুর ওপর টেনে দিয়েছে কাপড়ের টুপি। চোখে কাল চশমা। উইন্ডব্রেকারের বুকের কাছে মলাটে লেখা রয়েছেঃ অন্ধকে দয়া করুন। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করবেন। ভিজে যাতে লেখাটা নষ্ট না হয় সেজন্যে মলাটটা মুড়ে রেখেছে প্লাস্টিক দিয়ে।
ইস, কি জঘন্য আবহাওয়া, মহিলা বলল। রাতও হয়ে এল। উঠে দাঁড়িয়ে হাতের মুদ্রাটা ফেলে দিল অন্ধের মগে।

গলা থেকে বিচিত্র একটা শব্দ বেরোল লোকটার। লাঠি ঠুকে ঠুকে পরীক্ষা করছে কোথায় কি আছে। বেঞ্চটা কোথায়, আন্দাজ করে নিয়ে বসে পড়ল।
রবিন আর মহিলা দুজনেই এক মুহূর্ত দেখল লোকটাকে। তারপর ফিরল রাস্তার ওপাশে ব্যাংকের আলোকিত জানালার দিকে।
ঝাড়ু দেয়ার পর মোছার কাজ সবে শেষ করেছে ব্যাংকের ঝাড়ুদার। চকচক করছে সব কাউন্টার। চেয়ারগুলো সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছে জায়গামত। ঝাড়ুদার মোট দুজন। একজনের গায়ে ওভারঅল, লম্বা এলোমেলো ধূসর চুল। সে পুরুষ। আরেকজন মহিলা, সে বেঁটে, মোটা। দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে ওরা। ওখান থেকে লবি ধরে অফিস বিল্ডিঙে যাওয়া যায়।
হাতে চাবির গোছা নিয়ে তাড়াহুড়ো করে ব্যাংকের পেছন দিক থেকে এল সিকিউরিটি ম্যান। ব্যাংকের দরজার কাচ লাগানো পাল্লা খুলে দিল, ঝাড়ুদারদের বেরোনোর জন্যে। দুচারটা কথা বলল ওদের সঙ্গে।
লবি পেরিয়ে গিয়ে এলিভেটরে ঢুকল দুই ঝাড়ুদার। আবার অন্ধের দিকে ফিরল রবিন। টুপির নিচ দিয়ে বেরিয়ে আছে ধূসর চুল। গালে অযত্নে বড় হওয়া দাড়ি। চওড়া কুৎসিত একটা কাটা দাগ গালের ওপর থেকে ঢুকে গেছে দাড়ির ভেতর। বড় রকমের দুর্ঘটনা ঘটেছিল নিশ্চয়, ভাবল রবিন, আর বোধহয় তাতেই দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছে লোকটা।
সামনে বাঁকা হয়ে উঠতে গেল লোকটা। পা বেঁধে গেল লাঠিতে। আধ-বসা অবস্থায়ই শরীরটা ঝাঁকুনি দিয়ে কাত হয়ে গেল একপাশে।
আরি! লাফ দিয়ে এগোল মহিলা। লোকটার হাত চেপে ধরল, যাতে পড়ে যায়। হাত থেকে মগ ছুটে গেল লোকটার। মাটিতে পড়ল। ঝনঝন করে সমস্ত পয়সা ছড়িয়ে পড়ল এদিক ওদিক।
আমার পয়সা! প্রায় কেঁদে উঠল অন্ধ।
দিচ্ছি দিচ্ছি, তুলে দিচ্ছি, তাড়াতাড়ি বলল মহিলা। আপনি বসে থাকুন।
ভেজা চত্বর থেকে মুদ্রাগুলো কুড়াতে শুরু করল মহিলা। খাজ আর পানি নিষ্কাশনের ড্রেনগুলোতে খুঁজতে গেল রবিন। ময়লা ফেলার ড্রামের কাছে মগটা গিয়ে পড়েছে, তুলে এনে তাতে মুদ্রাগুলো ফেলল মহিলা।
সব পাওয়া গেছে? ককিয়ে উঠল লোকটা, আমার সারাদিনের কামাই!
তিনটে মুদ্রা পেয়েছে রবিন, সেগুলো মগে ফেলে বলল, মনে হয় না আর আছে।
মগটা অন্ধের হাতে ধরিয়ে দিল মহিলা। হাতের তালুতে ঢেলে পয়সাগুলোয়। আঙুল বোলাতে লাগল লোকটা, সব আছে কিনা বোঝার চেষ্টা করছে। আগের মতই বিচিত্র একটা শব্দ করে বলল, হ্যাঁ, ঠিকই আছে।
বাস ধরবেন? মহিলা জিজ্ঞেস করল। ওই যে, আসছে।

নাহ্। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, ম্যাডাম। আমি এই কাছেই থাকি।
রাস্তার ওপাশে তাকাল রবিন। আবার ফিরে এসেছে ঝাড়ুদার লোকটা। ব্যাংকের দরজায় খটখট করছে। হাতে চাবির গোছা নিয়ে পেছন থেকে এল গার্ড। রজা খুলে দিল। সংক্ষিপ্ত কথা হল দুজনের মাঝে। তারপর ব্যাংকে ঢুকল ঝাড়ুদার।
উঠে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে চত্বর ধরে রওনা হল অন্ধ।
আহা বেচারা! জিভ দিয়ে চুকচুক করল মহিলা। কতদূর যেতে হবে কে মানে।
এই যে, শুনুন, রবিন ডাকল। এই সাহেব।
শুনল না লোকটা। লাঠি ঠুকতে ঠকতে চলেছে।, এইই! গলা চড়াল রবিন। এগিয়ে গিয়ে চত্বর থেকে একটা মানিব্যাগ কুড়িয়ে নিল।
ততক্ষণে একটা সাইড স্ট্রীটের কাছে পৌঁছে গেছে লোকটা। লাঠির ডগা ঠুকে অনুমান করল কোথায় রয়েছে, তারপর নেমে গেল সাইড স্ট্রীটে। হেডলাইটের আলো পড়ল তার গায়ে। বেশ জোরে ছুটে আসছে একটা গাড়ি। স্টপ সাইন দেখে ব্রেক কষল, চাকা পিছলে গেল ভেজা পথে। প্রায় একই সঙ্গে চিৎকার করে উঠল রবিন আর মহিলা। আবার জোরে ব্রেক কষল কারের ড্রাইভার, কিইইচ করে আর্তনাদ করে উঠল টায়ার। পাশ কাটাতে চাইল। সরতে গিয়েও পারল না লোকটা। ধাক্কা দিয়ে তাকে রাস্তায় ফেলে দিল গাড়িটা।
থেমে গেছে গাড়ি। লাফিয়ে বেরিয়ে এল ড্রাইভার। দৌড় দিয়েছে রবিন, মহিলাও ছুটে আসছে তার পেছনে। পড়ে থাকা লোকটার ওপর একসাথে এসে ঝুঁকল তিনজনে।
হাঁটু গেড়ে পাশে বসে লোকটার হাত ধরার চেষ্টা করল ড্রাইভার।
নাআআ! চেঁচিয়ে উঠল অন্ধ। ঘুসি মারল। ঝটকা দিয়ে মুখ সরিয়ে ফেলল ড্রাইভার।
আ-আমার চশমা! রাস্তা হাতড়াচ্ছে অন্ধ।
কালো চশমাটা তুলে নিল মহিলা। ভাঙেনি। ধরিয়ে দিল অন্ধের হাতে।
চশমা পরে লাঠি খুঁজতে শুরু করল অন্ধ।
গাড়ির ড্রাইভার এক যুবক। হেডলাইটের আলোয় তার মুখের দিকে তাকাল রবিন,ফ্যাকাসে হয়ে গেছে চেহারা, ভয়ে। লাঠিটা তুলে রাখল সে অন্ধের হাতের তালুতে।
লাঠিতে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল অন্ধ। মাথা নাড়ল, বঁকি দিল, হাঁটতে পারবে কিনা বোধহয় আন্দাজ করে নিল, এগোতে শুরু করল আবার সাইড স্ট্রীট ধরে। এখন খোঁড়াচ্ছে। পা ফেলেই গুঙিয়ে উঠছে ব্যথায়।
এই মিস্টার, শুনুন, ডাকল ড্রাইভার।
পুলিশকে ফোন করা দরকার, মহিলা বলল। লোকটা অনেক ব্যথা পেয়েছে।

চলার গতি বাড়িয়ে দিয়েছে অন্ধ। লাঠি ঠুকছে, খোঁড়াচ্ছে, গোঙাচ্ছে, কিন্তু হাঁটছে আগের চেয়ে জোরে।
দৌড় দিল রবিন। থামতে বলছে।
একসারি দোকানের ওপাশে একটা গলিতে ঢুকে পড়ল লোকটা। পিছু নিল রবিন। এত অন্ধকার, প্রায় কিছুই দেখা যায় না। সামনে হাত বাড়িয়ে যেন বাতাস হাতড়ে হাতড়ে রবিনও এগোল অনেকটা অন্ধের মতই। বেশ কিছুটা দূরে একটা বাড়ির পেছনের দরজার ওপরে বাল্ব জ্বলছে। তলায় একটা ময়লা ফেলার ড্রাম। মলাটের একটা বাক্স পড়ে আছে ড্রামের পাশে, ভিজে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। আরেকটা রাস্তা চোখে পড়ল রবিনের। ঘুরে আরেকদিক দিয়ে গিয়ে উইলশায়ার বুলভারে উঠেছে।
কিন্তু অন্ধকে দেখতে পেল না। বাতাসে মিলিয়ে গেছে যেন।
অন্ধ না-ও হতে পারে, রবিন বলল। চোখে না দেখলে এত তাড়াতাড়ি পালাল কি করে?
কেউ কেউ পারে, বলল কিশোর। চোখ হারালে কানের ক্ষমতা বেড়ে যায়। প্রায় চোখওয়ালা লোকের মতই চলতে পারে তখন। চোখওয়ালাদের অন্ধকারে চলতে অসুবিধে, অন্ধের সেই অসুবিধেও নেই।
পরদিন সকালে, পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে আগের দিন সন্ধ্যার কথা আলোচনা করছে তিন গোয়েন্দা। বৃষ্টি শেষ। উজ্জ্বল, পরিষ্কার সকাল। যে মানিব্যাগটা কুড়িয়ে পেয়েছিল রবিন, সেটা পড়ে আছে ওঅর্কশপের ওঅর্কবেঞ্চের ওপর।
ধরে নিলাম অন্ধ নয়। তাহলেও দৌড় দেবে কেন? রবিনের প্রশ্ন। এমন ভাব দেখাল, যেন আমাদের ভয় পেয়েছে। এক মুহূর্ত ভাবল সে। সবাই বোধহয় কাল বোকামি করেছি আমরা। গলি থেকে ফিরে এসে দেখি মহিলা চলে গেছে। বাস আসতেই হয়ত উঠে পড়েছে। কারের ড্রাইভার তখনও দাঁড়িয়ে ছিল। অন্ধকে পাইনি, একথা জানাতেই গাড়িতে উঠে চলে গেল। হাতে মানিব্যাগটা নিয়ে গাধার মত দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। একবারও মনে হয়নি, আমার নাম, অন্ধ লোকটার নাম তাকে জানিয়ে রাখা উচিত ছিল।
একে বোকামি বলা যায় না, কিশোর বলল। ওরকম জরুরি পরিস্থিতিতে অনেকেই অমন করবে।
কাজ করতে করতে রবিনের কথা শুনছে সে। হপ্তাখানেক আগে পুরানো একটা নষ্ট টেলিভিশন সেট কিনে এনেছিলেন রাশেদ পাশা, সেটা মেরামত করছে। বাতিল পার্টসগুলো বদলে নতুন লাগাচ্ছে। কদিন ধরেই করছে কাজটা, এখন শেষবারের মত ফাইন টিউনিং করে সকেটে ঢোকাল প্লগ।
সুইচ অন করতেই মৃদু গুঞ্জন শোনা গেল। হুঁ, ঠিক হয়েছে মনে হয়।

হবেই, হেসে বলল মুসা। কার হাত লেগেছে দেখতে হবে না।
জবাব না দিয়ে একটা নবে মোচড় দিল গোয়েন্দা প্রধান। পুরানো যন্ত্রপাতি মেরামতের হৰি আছে কিশোরের, অসাধারণ মেধার পরিচয় দেয়। তিনটে মিনি ওয়্যারলেস সেট বানিয়েছে, যেগুলো অনেক কাজে লাগে তিন গোয়েন্দার। ওঅর্কশপের এক কোণে দাঁড়ানো ছাপার মেশিনটাও বাতিল হিসেবে কিনে আনা হয়েছিল, সারিয়ে নেয়ার পর এখন দিব্যি কাজ চলে। হেডকোয়ার্টারের ছাতে লাগানো পেরিস্কোপ সর্বদর্শন তৈরির কৃতিত্বও অনেকখানিই তার। ট্রেলারে ঢোকার গোপনপথগুলোর পরিকল্পনাও সে-ই করেছে।
মনে হচ্ছে, আবার বলল মুসা। হেডকোয়ার্টারের জন্যে একটা টিভিও হয়ে গেল আমাদের।
তাঁর কথায় বাধা দিল টেলিভিশনের ঘোষকঃ ...সকালের খবর নিয়ে। উপস্থিত হচ্ছি আপনাদের সামনে।
সংবাদ-পাঠকের ছবি ফুটল পর্দায়। গুড মর্নিং জানিয়ে শুরু করল। প্রথমেই জানাল ঝড়ের খবর। প্রশান্ত মহাসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপটি বিশেষ কোন ক্ষতি না করে লস অ্যাঞ্জেলেস আর দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়া থেকে দূরে সরে গেছে। তবু আগামী কিছুদিন আবহাওয়া অস্থির থাকবে।
...ম্যালিবুর পাহাড়ে ধস নেমেছে, বলে চলেছে সংবাদ পাঠক। কাদাপানিতে একাকার হয়ে গেছে বিগ টুজুংগা ক্যানিয়ন। ময়লা সাফ করতে ব্যস্ত এখন ওখানকার অধিবাসীরা।
এক দুঃসাহসী ডাকাতি সংঘটিত হয়েছে সান্তা মনিকার খ্রিফট অ্যাণ্ড সেভিংস কোম্পানিতে। ঝাড়ুদারের ছদ্মবেশে কাল সন্ধ্যায় ব্যাংকে ঢুকে বসেছিল ডাকাত। ব্যাংকের সিকিউরিটি গার্ডকে বোর্ড রুমে আটকে রেখে অপেক্ষা করছিল ওরা। আজ সকালে আটটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে টাইম লক খুলে দেয়া হয়, কর্মীদের ঢোকার জন্যে, ব্যাংকের একজিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট মার্ক জনসনকে ভল্ট খুলতে বাধ্য করে ওরা। নগদ প্রায় আড়াই লক্ষ ডলার আর সেফ-ডিপোজিট বক্সে রাখা দামি মালামালসহ নিরাপদেই পালিয়ে গেছে ডাকাতেরা। আমাদের সাংবাদিকেরা চলে গেছে ঘটনাস্থলে। দুপুরের খবরে বিস্তারিত জানাতে পারব আশা করি।
সুইচ অফ করে দিল কিশোর।
সর্বনাশ! প্রায় চেঁচিয়ে উঠল রবিন। দি সান্তা মনিকা খ্রিফট অ্যাণ্ড সেভিংস! ওখানেই তো ছিলাম কাল সন্ধ্যায়, অন্ধ লোকটা রাস্তা পেরোচ্ছিল... থেমে গেল সে। উত্তেজিত। কিশোর, একটা ডাকাতকে বোধহয় দেখেছি!
রবিনের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করছে অন্য দুজন।

হ্যাঁ, দেখেছি। বাস স্টপ থেকে ব্যাংকের ভেতরটা দেখা যাচ্ছিল। ঝাড়ুদার দুজন বেরিয়ে গিয়ে এলিভেটরে উঠল, একজন পুরুষ, একজন মহিলা। কিছুক্ষণ পর লোকটা এসে খটখট করলে দরজা খুলে দেয় সিকিউরিটি গার্ড।
ফিরে এল? জিজ্ঞেস করল কিশোর। সেই ঝাড়ুদার লোকটাই?
মনে তো হল... সেরকমই লাগল..., সন্দেহ জাগল রবিনের চোখে। নাহ, শিওর না।...হাত থেকে মগ ফেলে দিল অন্ধ, পয়সাগুলো সব ছড়িয়ে পড়ল। আমি আর মহিলা কুড়িয়ে তুলে মগটা দিলাম লোকটার হাতে, তখন ব্যাংকের দরজায় দাঁড়াতে দেখলাম ঝাড়ুদারকে।
তারমানে অন্য লোকও হতে পারে?
কি বুদ্ধি করেছে ব্যাটারা! খাইছে! মুসা বলল। ঝাড়ুমোছা শেষ করে ওপরতলায় চলে গেল ঝাড়ুদারেরা। তখন লোকটার ছদ্মবেশে অন্য কেউ এসে দরজায় দাঁড়ালো। সিকিউরিটি ম্যান দরজা খুলে দিল। তারপর তাকেই আটকে রেখে ডাকাতেরা ব্যাংকটাকে একেবারে নিজের বাড়ি বানিয়ে ফেলল। অ্যালার্ম বাজল না। আরামসে কাটিয়ে দিল সারাটা রাত, পরদিন সকালে কর্মচারীরা আসার, অপেক্ষায় রইল।
রবিন, ঝাড়ুদার লোকটা কোত্থেকে এসেছিল দেখেছ? কিশোর জানতে চাইল। এলিভেটর থেকে বেরিয়ে লবি দিয়ে, নাকি রাস্তা থেকে?
মাথা নাড়ল রবিন। দেখিনি। দরজায় দাঁড়ানো দেখলাম। ভেবেছি, এলিভেটর থেকে নেমেই বুঝি এসেছে। এখন মনে হচ্ছে, রাস্তা থেকেও এসে থাকতে পারে। আমার ধারণা, ঝাড়ুদারদের কেউ নয়।
চমৎকার, খুশি হল কিশোর। ভাবনার খোরাক পাওয়া গেল। ওঅর্কবেঞ্চে পড়ে থাকা মানিব্যাগটা তুলে নিল। তুমি বললে, রাস্তা ধরে এসেছিল অন্ধ লোকটা। মগটা ফেলল এমন সময়, যখন ঝাড়ুদার আসছে। ওর পয়সা কুড়াতে ব্যস্ত হলে তোমরা, অবশ্যই মাথা নুইয়ে রাখতে হয়েছে। মাটি থেকে কিছু তুলতে গেলে নোয়াতেই হবে। তোমরা পয়সা কুড়ানোয় ব্যস্ত, ডাকাতটা ঠিক সেই সময় এল। কিছু বুঝতে পারছ।
ঢোক গিলল রবিন। অন্ধও ডাকাতের দলের!
মানিব্যাগটা উল্টেপাল্টে দেখছে কিশোর। সুন্দর। উটপাখির চামড়ায় তৈরি। নেইম্যান-মারকাস কোম্পানির জিনিস। শহরের সব চেয়ে দামি স্টোরগুলোর একটা।
এটা তো খেয়াল করিনি, রবিন বলল। আমি শুধু দেখেছি, ভিখিরি লোকটার কোন টেলিফোন আছে কিনা। যাতে ফোন করে তার ব্যাগটা ফিরিয়ে দিতে পারি।
নেই।

ব্যাগটার ভেতরে কি আছে বের করতে লাগল কিশোর। একটা ক্রেডিট কার্ড, নগদ বিশ ডলার, একটা টেমপোরারি ড্রাইভিং লাইসেন্স। অন্ধ এক ভিখিরি ড্রাইভিং লাইসেন্স দিয়ে কি করে?
মাথা ঝাঁকাল রবিন। ঠিক। অন্ধ নয় লোকটা। ভিখিরিও নয়।
ভিকটর সাইমন, লাইসেন্সে লেখা নামটা পড়ল কিশোর। একশো বিরাশি সাইপ্রেস ড্রাইভ ক্যানিয়ন। ম্যালিবু।
সুন্দর জায়গা, মুসা বলল। ওখানে থাকে। খুব ধনী ভিখিরি মনে হচ্ছে।
অন্ধের ঠিকানা না-ও হতে পারে এটা, বলল কিশোর। হয়ত সে পকেটমার, চুরি করেছে। কিংবা পথে-টথে পেয়েছে কোথাও। রবিন, টেলিফোন ডিরেক্টরিতে, ভিকটর সাইমনের নাম আছে?
খুঁজেছি। পাইনি।
উঠে দাঁড়াল কিলোর। ব্যাগটা নাড়তে নাড়তে বলল, এটার ব্যাপারে আগ্রহী হবে পুলিশ। হয়ত, এই ব্যাগ ফেলে যাওয়াটা তেমন কিছু নয়। অন্ধের তাড়াহুড়ো করে পালিয়ে যাওয়াটাও কিছু মিন করে না। আর সাইপ্রেস ক্যানিয়নও এখান থেকে দূরে নয়। পুলিশকে জানানোর আগে ওখানে গিয়ে একবার খোঁজ করা দরকার, কি বল?
নিশ্চয়ই, রবিন একমত।
সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল তিন গোয়েন্দা। প্যাসিফিক কোস্ট হাইওয়ে ধরে চলল উত্তরে, ম্যালিবুর দিকে। বিখ্যাত বীচ কমিউনিটির প্রধান বাজার এলাকা পেরোল আধ ঘন্টার মধ্যেই।
সরু একটা পথ সাইপ্রেস ক্যানিয়ন ড্রাইভ, কোস্ট হাইওয়ে থেকে বেরিয়ে এঁকেবেঁকে সরে গেছে দুশো মিটার। তারপর হাইওয়ের সঙ্গে প্রায় সামান্তরালে এগিয়েছে। ওটা ধরে সাইকেল চালাতে চালাতে হাইওয়ের যানবাহনের শব্দ কানে আসছে ছেলেদের। বায়ে গাছের ফাঁকে ফাঁকে চোখে পড়ছে সমুদ্র। ডানে পাহাড়ের ঢাল নেমে গিয়ে পথ পেরিয়ে আবার উঠেছে ওপাশে। পর্বতের চূড়ার ওপরে ঝকঝকে আকাশ ঘন নীল।
এখানে কেউ থাকে বলে তো মনে হয় না, কাদাভরা পথ ধরে বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর বলল রবিন। একটা বাড়িও দেখলাম না। লাইসেন্সের ঠিকানাটাও নকল না তো?
জমাট বাঁধছে রহস্য, গোয়েন্দাপ্রধানের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে মুচকি হাসল মুসা। অন্ধের কি দরকার ড্রাইভিং লাইসেন্স? তা-ও ভিখিরি। তার পরেও আবার নকল।

হঠাৎ ঝুপ করে যেন নিচে পড়ে গেছে পথটা। জায়গাটাকে দেখে মনে হয় পাহাড়কে আঙুল দিয়ে টিপে ওখানটায় বসিয়ে দিয়েছে কোন মহাদানব। সরু একটা নহর বইছে ওখানে। খাদের মত জায়গাটার ওপাশ থেকে আবার উঠে গেছে পথ। ওখানে উঠে থামল ছেলেরা। সামনে একটা গিরিখাত। শুকনো মৌসুমে। বোধহয় শুকনোই থাকে, কিন্তু এখন বাদামী ঘোলাটে পানির তীব্র স্রোত বইছে। পথের বাঁয়ে গিরিখাতের একেবারে ধার ঘেঁষে পুরানো একটা গোলাবাড়ি জাতীয় বাড়ি, দোতলায় বড় বড় জানালা। ছাঁইচে লাগানো একসারির টিউব লাইট। এক প্রান্তে বড় করে সাইনবোর্ড লেখাঃ নুমেরি ইন।
নুমেরির সরাইখানা, বাংলায় বিড়বিড় করল কিশোর।
রেস্টুরেন্ট মনে হচ্ছে? রবিন বলল।
পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে লাইসেন্সে লেখা ঠিকানাটা দেখল আবার কিশোর। একশো বিরাশি নম্বর। হ্যাঁ, ঠিকই আছে। ওই যে, নতুন মেইলবক্সটার নম্বর লেখা রয়েছে।
পেছনে গাড়ির শব্দ শোনা গেল। নিচু জায়গায় জমে থাকা পানি ছিটিয়ে এল একটা লাল স্পোর্টস কার? গাড়ির চালক হালকা পাতলা, ধূসর চুল, বিষণ্ন চেহারা, ছেলেদেরকে যেন চোখেই পড়ল না। মুমেরিজ ইন-এর কঁচা চত্বরে কাদা জমে আছে। সেখানে গিয়ে থামল গাড়ি। নেমে একটা লাঠি বের করল চালক। তাতে ভর দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে উঠল বাড়ির সিঁড়িতে। প্রায় ভাঙা একটা স্ক্রীন ডোর টান দিয়ে খুলে চলে গেল ওপাশে, পেছনে বন্ধ হয়ে গেল পাল্লা।
খোঁড়া! ফিসফিসিয়ে বলল মুসা। কাল রাতে খোঁড়াতে দেখেছ না লোকটাকে?
অ্যাক্সিডেন্টের পর। গাড়ির ধাক্কায় পায়ে আঘাত লেগেছিল হয়ত। এই লোকটা কি ওই লোকটার মত? কিশোর জিজ্ঞেস করল। দেখতে?
শ্রাগ করল রবিন। সাইজটাইজ তো একই রকম। বয়েসও এক। একজনের সঙ্গে আরেকজনের এরকম মিল থাকতেই পারে।
বেশ। আমি যাচ্ছি।
গিয়ে কি করবে? মুসা বলল। হ্যামবার্গার কিনবে?
পাওয়া গেলে। কিংবা ঠিকানা জিজ্ঞেস করব। আসলে জানার চেষ্টা করব লোকটা কে? রবিন, লুকিয়ে পড়। তোমাকে চিনে ফেলতে পারে। গণ্ডগোল করতে পারে।
আমিও থাকি, মুসা বলল। গণ্ডগোল করে যারা, তাদের পছন্দ করি না। আমি।
ভয় পাও? হাসল রবিন।
না। বুড়ো হয়ে স্বাভাবিক মৃত্যু আমার কাম্য।

বাহ্, ভাল কথা শিখেছ আজকাল, কিশোরও হাসল। রাস্তার ধারে দুই বন্ধুকে রেখে সাইকেল ঠেলতে ঠেলতে চলে এল চত্বরে। দেয়ালে ওটা ঠেস দিয়ে রেখে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল বারান্দায়। ছোট বারান্দা পেরিয়ে এসে দাঁড়াল স্ক্রীন ডোরের সামনে। হাতল ধরে টানতেই খুলে গেল পাল্লা।
ভেতরে আবছা অন্ধকার। পালিশ করা শক্ত কাঠের মেঝে, গাঢ় রঙের কাঠের প্যানেলিং। নাক বরাবর সামনে চওড়া দরজার ওপাশে বিশাল একটা ঘর, শূন্য। ওটার সামনের দেয়াল পুরোটাই জানালা। বাইরের গাছপালা, রোদে আলোকিত সাগর, সব চোখে পড়ে। কিশোর অনুমান করল, একসময় ওটা রেস্টুরেন্টের মেইন ডাইনিং রুম ছিল। বোঝা যায়, রেস্টুরেন্ট আর নয় এখন বাড়িটা।
প্রশস্ত একটা প্যাসেজওয়েতে দাঁড়িয়ে আছে সে, যেটাকে বড় ঘরটার লবি বলা চলে। লবির প্রান্তে ছড়ানো একটা জায়গায় অবহেলায় পড়ে রয়েছে কফি বানানোর সরঞ্জাম, কাঠের কাউন্টার, টুল, বুদ, ধুলোয় ঢাকা। কফি শপ ছিল ওটা এককালে। ডানের দেয়ালে দেখা যাচ্ছে বেশ কয়েকটা দরজা। নানারকম বাক্স স্তূপ হয়ে আছে কফি শপ আর লবিতে। বড় ঘরটার কাঠের মেঝেতে রয়েছে আরও কিছু বাক্স। একটা বাক্স খোলা।
ধীরে ধীরে এগোল কিশোর। ডাক দিতে যাবে এই সময় কানে এল ক্রেডল থেকে রিসিভার ওঠানোর শব্দ। স্থির দাঁড়িয়ে কান পাতল। বড় ঘরটায় কেউ রয়েছে, দেখতে পাচ্ছে না সে, টেলিফোন করছে।
কথা শোনা গেল, ভিকটর বলছি।
এক মুহূর্ত নীরবতার পর আবার কথা, হ্যাঁ, জানি, দামি। দাম বেশি তো হবেই, এটা একটা কথা হল নাকি। খরচ করতে রাজি আছি আমি। ঠিক এই সময় কিশোরের পিঠে শক্ত কিছু চেপে ধরা হল।
স্বর্গে যাওয়ার ইচ্ছে না থাকলে নড়ো না, পেছন থেকে ভাঙা ইংরেজিতে বলল কেউ। দুটুকরো করে ফেলব।
মাথার ওপর হাত তুলল কিশোর। ঘাড়ের কাছে শিরশির করছে। আমি... আমি...।
চুপ কর, শান্তকণ্ঠে আদেশ হল।
কাঠের মেঝেতে পায়ের শব্দ। চওড়া দরজায় দেখা দিলেন ধূসর চুল মানুষটা। হাতের লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে মাথা সামান্য কাত করে তাকালেন কিশোরের দিকে। ভুরু কোঁচকানো। কি হয়েছে, কিম? ছেলেটা কে? ...
ভ্রূকুটি করল কিশোর। লোকটাকে কোথায় দেখেছে। কণ্ঠস্বর, ওভাবে মাথা কাত করে কথা বলার ভঙ্গি...কোথায় দেখেছে? কবে?

চুরি করে ঢুকেছে এখানে, জবাব দিল কিম। এখানে দাঁড়িয়ে আড়িপেতে, আপনার কথা শুনছিল।
আমি শুধু ঠিকানা জানতে এসেছি, নিরীহ কণ্ঠে বলল কিশোর। সাইনবোর্ড দেখলাম, মুমেরিজ ইন। রেস্টুরেন্ট, তাই না? চুরি করে ঢুকিনি। দরজা খোলাই ছিল।
ছিল, হাসলেন তিনি। লাঠিতে ভর দিয়ে দিয়ে এগিয়ে এলেন কাছে। রেস্টুরেন্ট ছিল আগে। তা দরজা খোলা ছিল, না?
রক্তিম গাল তার। চোখা পাতলা নাক। রোদে পোড়া মুখের চামড়া। কালচেধূসর ঘন ভুরুর নিচে চোখ দুটো নীল। রিল্যাক্স, ইয়াং ফ্রেণ্ড, ভয়ের কিছু নেই। ইচ্ছে করলেও কিম তোমাকে গুলি করতে পারবে না।
সাবধানে হাত নামাল কিশোর। ফিরে তাকাল কিমের দিকে।
তুমি মনে কুরেছিলে পিস্তল ঠেকিয়েছি, নিজের চালাকিতে খুব সন্তুষ্ট কিম। বাড়ি এশিয়ায়, চেহারা দেখেই বোঝা যায়। কিশোরের সমান লম্বা, স্বাস্থ্যও প্রায় তার মতই, মুখের চামড়া মসৃণ। হাতে একটা কাঠের চামচ, সেটাই ঠেকিয়ে রেখেছে কিশোরের পিঠে। দেখলে তো, পিস্তল নয়। টেলিভিশন দেখে শিখেছি।
ও নিসান জাং কিম, ভিয়েতনামে বাড়ি। পরিচয় দিলেন ধূসর-চুল দ্রলোক। অল্প দিন হল এসেছে এদেশে। সুযোগ পেলেই টেলিভিশনের সামনে। গিয়ে বসে, ইংরেজি শেখার চেষ্টা করে। এখন তো দেখি আরও অনেক কিছুই। শিখছে।
বাউ করল ভিয়েতনামী। ওপর তলায় আটকা পড়লে কি করতে হবে জান? কিশোরকে বলল সে। বিছানার চাদর ছিঁড়ে পাকিয়েলড়ি বানাতে হবে। সেটা বেয়ে নেমে গেলেই হল। আর যদি বিছানা না-ই পাও, নাগালের মধ্যে পাইপ পেয়েই যাবে।
আরেকবার বাউ করে কফি শপের দিকে চলে গেল কিম। কৌতূহলী চোখে সেদিকে তাকিয়ে রইল কিশোর।
কি যেন শুধু জানতে এসেছিলে? জিজ্ঞেস করলেন ভদ্রলোক।
আঁ, ও! ও, হ্যাঁ...এদিকে একটা নদী আছে। নদীর ওপারেও কি আছে রাস্তাটা? নদী পেরোনোর ব্যবস্থা আছে?
রাস্তা এপারেই শেষ। আর নদী পেলে কোথায়, ওটা তো গিরিখাত। এখন পেরোনোর চেষ্টাও কর না, নির্ঘাত মরবে। যা স্রোত।
অ, আনমনে বলল কিশোর, কথা শুনছে বলে মনে হল না। লবির কোণে রাখা একটা বাক্সের দিকে চেয়ে আছে। ওটার ওপরে ছটা বই, একই বইয়ের ছটা কপি। কালো মলাটের ওপর উজ্জ্বল লাল রঙে লেখা নাম। কভারের ছবি-নীল পায়রার বুকে ছুরি বিদ্ধ। বইটার নাম বু পিজিয়ন।

ভিকটর সাইমন! হঠাৎ বলে উঠল কিশোর। এগিয়ে গিয়ে একটা বই তুলে পেছনটা উল্টে দেখল। পেছনের কভারে একটা ফটোগ্রাফ।
এ-তো আপনার ছবি! বলল সে। আপনিই ভিকটর সাইমন। টেলিভিশনে দেখেছি আপনাকে।
দেখতে পার। কয়েকবার সাক্ষাৎকার দিয়েছি।
ব্লু পিজিয়ন পড়েছি আমি, নিজের কানেই অদ্ভুত লাগছে কিশোরের কণ্ঠস্বর। ভীষণ উত্তেজিত। সাংঘাতিক বই! দারুণ লেখা! কিলারস গেমও পড়েছি। মিস্টার সাইমন, আপনার তো ব্যাংক ডাকাতির দরকার পড়ে না!
করেছি ভাবছ নাকি! হাসলেন সাইমন। নদীর খোঁজ নিতে এখানে আসনি তুমি। কেন এসেছ?
লাল হল কিশোরর গাল। আমি...আমি...সরি, মিস্টার সাইমন, মিথ্যে কথা বলেছি। আপনার মানিব্যাগ হারানো গেছে?
তাকিয়ে আছেন সাইমন। জ্যাকেটের পকেটে হাত ঢোকালেন। চাপড় দিয়ে দেখলেন অন্যান্য পকেটগুলো। আরে! নেই তো। তুমি পেয়েছ?
রবিন পেয়েছে, আমার বন্ধু! সংক্ষেপে সব জানাল কিশোর।
আশ্চর্য! একেবারে ডেভিস ক্রিস্টোফারের সিনেমার মত। ...কি ব্যাপার? হাসছ যে?
উনি আমাদের বন্ধু, স্যার। আমাদের কেসের কাহিনী লেখে রবিন, গল্প ভাল হলে সেটা দিয়ে ছবি করে ফেলেন মিস্টার ক্রিস্টোফার।
কি ধরনের কেস? আর তোমার বন্ধু রনি এখন কোথায়?
রাস্তায়। নিয়ে আসছি। ছুটে ঘর থেকে চত্বরে বেরোল কিশোর। পার্কিং লটে এসে হাত নেড়ে ডাকল, এই, তোমরা এস। কাছে এল দুই সহকারী গোয়েন্দা।
কি ব্যাপার? জিজ্ঞেস করল রবিন। মিস্টার ভিকটর সাইমন। জান তিনি কে? পরস্পরের দিকে তাকাল মুসা আর রবিন। মাথা নাড়ল মুসা। জানি না।
হাসল কিশোর। বু পিজিয়নের লেখক। কিলারস গেম, শক ট্রিটমেন্টও তিনিই লিখেছেন। টিভিতে দেখাল না তাঁর সাক্ষাৎকার? একটা বই সিনেমাও হতে, যাচ্ছে, কিলারস গেম।
ও, হ্যাঁ, মাথা দোলাল মুসা। মনে পড়েছে। কিলারস গেম-এর কথা সেদিন বাবা আলোচনা করছিল। ইনিই ভিকটর সাইমন?
হ্যাঁ, কণ্ঠের উত্তেজনা যায়নি এখনও কিশোরের। নিউ ইয়র্ক সিটিতে গোয়েন্দা ছিলেন তিনি অনেকদিন, রিপোর্টেও থেকেছেন। প্লেন চালাতে গিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট করেছিলেন। একটা পা ভেঙে গিয়েছিল। পা সারার জন্যে ঘরে বসে থাকতে হয় অনেকদিন। তখনই ঠিক করলেন, বই লিখবেন। নিজের জীবনের

অভিজ্ঞতা নিয়ে লিখেও ফেললেন শক ট্রিটমেন্ট। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বেস্টসেলার হয়ে গেল বইটা। এই সেই ভিকটর সাইমন, গোয়েন্দা-কাম-লেখক। চল, চল, দেখা করবে না তার সঙ্গে? রবিন, মানিব্যাগটা আছে তো?
তোমাকেই তো দিয়েছিলাম, রবিন বলল। ভুলে গেছ?
আঁ, ও তাই তো, নিজের পকেট চাপড়াল কিশোর। আছে। চল।
লেখকের সঙ্গে দুই সহকারীর পরিচয় করিয়ে দিল গোয়েন্দাপ্রধান। ওদেরকে বড় জানালাওয়ালা ঘরটায় নিয়ে এলেন সাইমন। কয়েকটা ফোল্ডিং চেয়ার দেখিয়ে বসতে বললেন। একটা টেবিল ঘিরে রাখা হয়েছে চেয়ারগুলো। টেবিলটার ওপরের অংশ কাচের তৈরি। টেবিল, চেয়ার, টেলিফোনটা ছাড়া আর কোন আসবাবপত্র নেই ঘরে।
মাত্র গত হপ্তায় এসে উঠেছি, জানালেন সাইমন। আমি আর কিম।
এখানে থাকবেন? মুসা জিজ্ঞেস করল।
হ্যাঁ। খোঁড়াতে খোঁড়াতে লবিতে গিয়ে কিমকে ডাকলেন তিনি।
কফির সরঞ্জাম নিয়ে এল ভিয়েতনামী। তাকে জিজ্ঞেস করলেন লেখক, ছেলেদের জন্যে কিছু আছে ফ্রিজে?
লেমোনেড। একেবারে খাঁটি জিনিস, নেচারাল ফ্লেভার।
হাসল কিশোর। নেচারাল ফ্লেভার শব্দটাও নিশ্চয় টেলিভিশন থেকে শিখেছে কিম, লেমোনেডের বিজ্ঞাপন দেখে।
লেমোনেড চলবে? ছেলেদের জিজ্ঞেস করলেন সাইমন। মাথা ঝাঁকাল তিনজনে।
রান্নাঘরে চলে গেল কিম। বাড়ির একেবারে দূরতম কোণে রান্নাঘরটা, কফি শপ ছাড়িয়ে ওপাশে।
বিজ্ঞাপনগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে দেখে ও, হেসে বললেন লেখক। স্বাস্থ্য সম্পর্কিত আলোচনাগুলো শোনে। ইস্, খাবার যা এনে হাজির করে না, ভয়ঙ্কর।
পুরানো রেস্টুরেন্টের কথা তুললেন এরপর সাইমন। কি করে এখানে এলেন, এটাকে মেরামত করে কি করবেন, এসব। বসবাসের যোগ্য সুন্দর একটা বাড়ি বানানোর ইচ্ছে আছে তাঁর। বললেন, কফি শপটাকে করব ডাইনিং রুম। লবির একধারে একটা স্টোর আছে, ওটাকে কিমের বেডরুম বানানো হবে। আর ওর বাথরুমটা করব ওই যে ওই ওদিকে, সিঁড়ির নিচে।
লবির দেয়াল ঘেঁষে উঠে যাওয়া সিঁড়িটা দেখল ছেলেরা। সিঁড়ির মাথায় একটা গ্যালারি, অনেক বড়। ওখান থেকে এ ঘর দেখা যায়, যেখানে ওরা বসেছে। ঘরটার ছাত অনেক ওপরে, প্রায় দোতলার সমান উচুতে। এই ঘরটাই বাড়ির প্রায় অর্ধেক। বাকি অর্ধেকের নিচের তলায় রয়েছে লবি, স্টোররুম, কফি শপ,

রান্নাঘর। আর ওগুলোর ওপরে রয়েছে দোতলার অন্যান্য ঘর, সবগুলোর দরজা দিয়েই গ্যালারিতে আসা যায়।
অনেক কিছুই ভেঙেচুরে গেছে, সাইমন বললেন। তবে কাঠামোটা অত্যন্ত মজবুত, আর্কিটেক্ট আর একজন বিল্ডিং কন্ট্রাকটরকে দেখিয়ে তবেই কিনেছি। সাগরের ধারে এরকম জায়গায় এত বড় বাড়ি কিনতে খরচ কত পড়েছে কল্পনা করতে পার?
নিশ্চয় অনেক, কিশোর বলল।
মাথা ঝাঁকালেন লেখক। আরও অনেক খরচ আছে। তবে মেরামত হয়ে গেলে দেখার মত বাড়ি হবে। এত বড়, উঁচু একটা ঘর পেয়েছি। সাগর দেখা যায়। ছাতে একটা ফুটোও নেই। থাকলে এরকম জায়গায়ই থাকা উচিত। অথচ তেইশটা বছর কি এক খুপরিতে যে কাটিয়েছি, ব্রুকলিনের এক অ্যাপার্টমেন্ট হাউসে। বৃষ্টি হলেই ছাত দিয়ে পানি পড়ত। সব সময় হাতের কাছে কয়েকটা বালতি রাখতে হত, বৃষ্টি নামলেই ফুটোর তলায় বসানোর জন্যে।
হাসলেন সাইমন। কেউ কেউ যে বলে ধনী হওয়ার চেয়ে গরিব থাকা ভাল, ওগুলো গাধা। আরে ব্যাটা পয়সাই যদি না থাকল আরামে থাকবি কি করে?
লেমোনেড নিয়ে হাজির হল কিম। মানিব্যাগটা বের করে কাচের সুন্দর টেবিলটায় রাখল কিশোর।
তুলে নিলেন সাইমন। অন্ধ ভিখিরি ফেলে গেছে, না? টাকার ঠেকা নেই ওর, মনে হচ্ছে। একটা পয়সাও খরচ করেনি।
কিন্তু সে ভিক্ষে করছিল, রবিন বলল। হাতে টিনের মগ। তাতে পয়সা।
চিন্তিত দেখাল তাঁকে। পেল কি করে ব্যাগটা? যদি অন্ধই হবে...।
ঠিক বলেছেন, স্যার, কিশোর বলল। চোখে দেখে না, রাস্তায় পড়া থাকলে দেখল কি করে? তবে, ব্যাগটার ওপর লাঠি লাগলে বোঝার কথা...এটা কোথায় রেখেছিলেন?
পেশাদারি গন্ধ পাচ্ছি তোমার কথায়? এখুনি নোটবুক আর পেন্সিল বের করবে না তো? ও, কেসের কথা বললে না তখন? কি কেস? গোয়েন্দাগিরির তালিম নিচ্ছ নাকি?
তালিম নয়, গোয়েন্দাই আমরা, বলতে বলতে পকেট থেকে কার্ড বের করে দিল কিশোর।
কার্ডটা দেখে আনমনে মাথা দোলালেন সাইমন। ইউ। ভাল।
সামনে ঝুঁকল রবিন। আমরা সন্দেহ করছি, ব্যাংক ডাকাতির সঙ্গে অন্ধ ভিখিরির সম্পর্ক আছে। কাল কি সান্তা মনিকায় গিয়েছিলেন আপনি? ওখানেই কোথাও মানিব্যাগটা ফেলেছেন? নাকি আপনার পকেট মেরে দিয়েছে?

না, চেয়ারে হেলান দিলেন লেখক। কাল সকালেও এটা আমার পকেটে ছিল। মনে আছে। বাড়ি থেকে বেরোচ্ছিলাম, তখন দেখেছি। তারপর আর এটার খোঁজ করিনি। তোমরা মনে করালে। মনে হয় নিকারোদের ওখানেই কোথাও ফেলেছি। কাল ওখানে ছাড়া আর কোথাও যাইনি। কি করে পড়ল জানি না। ভিড়ের মধ্যে যাইনি, কারও সঙ্গে ধাক্কাও লাগেনি, পকেটমারা গেল কখন? কোন অন্ধকেও দেখিনি, তাহলে মনে থাকত।

নিকারো? মুসা বলল। উপকূলের ওদিকে না? শখের মাছশিকারিদের নৌকা ভাড়া দেয় যারা? নিকারোজ অ্যাণ্ড কোং?

মাথা ঝোঁকালেন সাইমন। আমার স্পীডবোট ওখানেই রাখি। এখান থেকে সর চেয়ে কাছের ম্যারিনা ওটাই। বোট নিয়ে বেরোনোর দরকার হলে ওদের ওখানে চলে যাই। মিসেস নিকারোর ওখানে চাকরি করে দুটো ছেলে। নৌকায় করে আমাকে বয়ার কাছে নিয়ে যায়, ওখানেই আমার বোট বাঁধা থাকে। কাল বোটে করে কিছুক্ষণ হাওয়া খেয়ে এসেছি। পকেট থেকে ব্যাগটা কোনভাবে পড়ে গিয়ে থাকতে পারে। পার্কিং লটে, কিংবা ডকের কাছে।

এবং অন্ধ সেটা কুড়িয়ে নিয়েছে, মুসা বলল।

ওটা নিয়ে তারপর চলে গেছে সান্তা মনিকায়, রবিন বলল। ঠিক সময়ে গিয়ে হাজির হয়েছে বাস স্টপে, ঝাড়ুদারের ছদ্মবেশে যখন ডাকাত ঢুকেছে ব্যাংকে। মগ ফেলাটা তার একটা ছুতোই, যাতে আমরা পয়সা কুড়ানোয় ব্যস্ত থাকি, ব্যাংকের দিকে চোখ না দিতে পারি।

না-ও হতে পারে, বললেন সাইমন। ভিজে পিচ্ছিল হয়ে গিয়েছিল মগটা, হাত থেকে সত্যি হয়ত ছুটে গিয়েছিল, অভিনয় নয়। মপ ফেলার মধ্যে তেমন কোন গুরুত্ব দেখি না।

চলে যাওয়ার সময় ব্যাগটা পড়ে গিয়েছিল, কিশোর বলল। রবিন সেটা পেয়ে তাকে ফিরিয়ে দিতে যাচ্ছিল, এই সময় একটা গাড়ি এসে ধাক্কা মেরে ফেলে দিল লোকটাকে।

অস্বাভাবিক নয়। অন্যের জিনিস তার কাছে ছিল, সেটা পড়ল আরেকজনের কাছে। যদি তাকে চোর মনে করে বসে? যদি পুলিশ এসে ধরে, জিজ্ঞেস করে কি করে পেল সে? ভয় পাওয়া স্বাভাবিক। তাড়াহুড়ো করে ছুটে চলে যাচ্ছিল হয়ত সে-কারণেই। মগ পড়া, মানিব্যাগ পড়া, পালিয়ে যাওয়া, কোনটাই প্রমাণ করে না সে ডাকাতির সঙ্গে জড়িত। কিন্তু এসব কথা পুলিশকে গিয়ে জানাচ্ছ না কেন? ইচ্ছে করলে আমার নামও বলতে পার ওদের। পুলিশকে সাহায্য করতে পারলে খুশিই হব।

যাব, হতাশ মনে হল কিশোরকে। আপনি ঠিকই বলেছেন, অন্ধ ভিখিরির ব্যাপারটা কাকতালীয়ও হতে পারে। আমার দুঃখ, কেসটা শুরু হওয়ার আগেই শেষ হয়ে গেল।
তাই? শোন, কষ্ট করে ব্যাগটা নিয়ে আসায় খুব খুশি হয়েছি।
না না, কষ্ট আর কি? তাড়াতাড়ি বলল মুসা।
লেখককে ব্যাগ থেকে নোট বের করতে দেখে হাত নাড়ল রবিন, না না, আমাদেরকে কিছু দেবেন না, প্লীজ।
তাহলে কি পুরস্কার দেয়া যায়? জিজ্ঞেস করলেন সাইমন। আমার বোটে চড়ে হাওয়া খেতে যাবে? পরের বার যখন যাব আমি?
খালি জানাবেন, আনন্দে দাঁত বেরিয়ে পড়েছে মুসার। আধ ঘন্টার মধ্যে হাজির হয়ে যাব।
বেশ, তোমাদের ফোন নাম্বার দাও।
বাড়ির ফোন নাম্বার জানাল মুসা। রবিন আর কিশোরও জানাল যার যারটা।
বারান্দায় ওদেরকে এগিয়ে দিয়ে গেলেন গোয়েন্দা-কাম-লেখক। ওরা সাইকেলে উঠে রওনা হওয়ার পরও দাঁড়িয়ে রইলেন।
দারুণ লোক, মুসা বলল।
হ্যাঁ, একমত হল কিশোর। আমাদের দেখে খুব খুশি হয়েছেন। লোকটাকে নিঃসঙ্গ মনে হল। ক্যালিফোর্নিয়ায় কেমন লাগছে কে জানে, নিউ ইয়র্ক থেকে এসেছেন তো?
মুখ খুলতে যাচ্ছিল রবিন, একটা গাড়ি দেখে থেমে গেল। বাদামি রঙের একটা। সেডান। ওদের পাশ কাটিয়ে গিয়ে মিস্টার সাইমনের বাড়ির সামনের চত্বর থামল। গাড়ি থেকে নেমে বারান্দায় উঠল একজন বয়স্ক লোক, সাইমন তখনও ওখানে দাঁড়িয়ে আছেন।
কি কথা হল, শোনা গেল না।
দুজনে ঢুকে গেলেন ভেতরে।
কিশোর, রবিন বলল। কেসটা বোধহয় শেষ হয়নি।
কেন? মুসার প্রশ্ন।
সিকিউরিটি ম্যান। যে ব্যাংকে ডাকাতি হয়েছে ওটার সিকিউরিটি গার্ড, ওকেই দেখেছি কাল সন্ধ্যায়। এই লোক মিস্টার সাইমনের বাড়িতে কেন?
বুঝতে পারছি না! কিশোর বলল। ভিকটর সাইমনের টাকার অভাব হবার কথা নয়। তাঁর সব বই বেস্টসেলার।
কিন্তু ব্যাংক ডাকাতিতে যদি জড়িতই না হবেন, প্রশ্ন তুলল রবিন।
সিকিউরিটি গার্ড এখানে কেন?

জানি না।
বিকেলের শুরু। হেডকোয়ার্টারে আলোচনায় বসেছে তিন গোয়েন্দা। ওরা সাইপ্রেস ক্যানিয়ন ড্রাইভে থাকতে থাকতেই আবার ফিরে গেছে সিকিউরিটি ম্যান। সেই কথাই আলোচনা করছে এখন।
কাল রাতে অন্ধ লোকটা খুঁড়িয়েছে, রবিন বলল। মিস্টার সাইমনও খোঁড়ান।
অন্ধ লোকটা কি অ্যাক্সিডেন্টের আগে খুঁড়িয়েছিল? কিশোর জিজ্ঞেস করল।
খেয়াল করিনি।
খোঁড়ানোর ব্যাপারটা হয়ত কাকতালীয়, বলল মুসা। মানিব্যাগ পাওয়াটাও। মিস্টার সাইমনের বাড়িতে গার্ডের যাওয়াটাকেও যদি সেরকম কিছু ধরা যায়, অনেকগুলো কাকতালীয় ব্যাপার হয়ে গেল না?
পুলিশের কাছে যাচ্ছি না কেন আমরা? রবিন বলল। মিস্টার সাইমনও তাই বললেন। ডাকাতিতে জড়িত থাকলে বলতেন কি?
অনেক অপরাধী বলে ওরকম, বলল মুসা। নিজেকে নির্দোষ বোঝানোর জন্যে।
পুলিশ আমাদের কথা বিশ্বাস করবে না, কিশোর বলল। অন্তত মিস্টার সাইমনের ব্যাপারে। আমি নিজেই বিশ্বাস করতে পারছি না। তার যে সুনাম, এই জিনিস নষ্ট করতে চাইবে না কোন সুস্থ মস্তিষ্কের লোক। তবে মনে হচ্ছে এই ডাকাতির সঙ্গে কিছু একটা যোগাযোগ রয়েছে তাঁর। মিস্টার রোজার হয়ত আমাদের সাহায্য করতে পারবেন।
মিস্টার রোজার? চিনতে পারল না রবিন।
ডেস্কে রাখা একটা খবরের কাগজ টেনে নিল কিশোর। সান্তা মনিকা ইভনিং আউটলুকের একটা সংখ্যা। সেদিনই বেরিয়েছে। বাড়ি ফেরার পথে নাস্তা খেতে থেমেছিল তিন গোয়েন্দা, তখন পত্রিকাটা কিনেছে সে।
ব্যাংকের সিকিউরিটি গার্ডের নাম ড্যানি রোজার, জানাল কিশোর। এই পত্রিকায় লিখেছে। টেলিফোন ডিরেক্টরির জন্যে হাত বাড়াল সে। অল্পক্ষণেই পেয়ে গেল যা খুঁজছে।
ম। একজন ড্যানি রোজারের নাম আছে। তিনশ বারো ডলফিন কোর্টে থাকে। সৈকতের ধারে।
কিশোওর! বাইরে থেকে ডাক শোনা গেল। আরে এই কিশোর, কোথায়
তুই?
দীর্ঘশ্বাস ফেলল কিশোর। চাচী। সেই সকালের পর থেকে আর আমাকে দেখেনি তো। অস্থির। কত খাবার আর কাজ জমিয়ে রেখেছে কে জানে!
আমার মা-ও নিশ্চয় রেগে ভোম, বলল মুসা। বহুত কাজ ছিল। ফেলে রেখে পালিয়েছি। গেলেই এখন ঘর মোছাবে কিংবা বাগানের ঘাস কাটাবে।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম, কিশোর বলল। আমরা মিস্টার রোজারের সঙ্গে দেখা করব। সম্ভব হলে আজ বিকেলেই। তোমরা আসতে পারবে? রকি বীচ মার্কেটে, সন্ধ্যা সাতটায়। ওখান থেকে যাব তার বাড়িতে।
পারব মনে হয়, জবাব দিল মুসা।
আমিও পারব, হেসে বলল রবিন। কাল তো আর ইস্কুল নেই যে পড়া লাগবে। সন্ধ্যায় দেখা হবে।
ট্রেলার থেকে বেরিয়ে এল ওরা।
বিকেলটা স্যালভিজ ইয়ার্ডে কাজ করতে হল কিশোরকে। সকাল সকাল রাতের খাওয়া সেরে সাইকেল নিয়ে বেরোল।
সাতটার পাঁচ মিনিট আগে এল মুসা আর রবিন। সান্তা মনিকায় চলল তিনজনে।
পথের শেষ মাথায় ছোট ছোট কয়েকটা বাড়ির একধারে খুঁজে পাওয়া গেল তিনশ বারো নাম্বার। রাস্তার নাম ডলফিন কোর্ট। ড্রাইভওয়েতে দাঁড়িয়ে আছে বাদামি সেডান, সকালে যেটা দেখেছিল ছেলেরা। বাড়ির সামনের দিকে অন্ধকার, পেছনের একটা জানালায় আলো দেখা যাচ্ছে। সাইকেল রেখে গিয়ে জানালা দিয়ে উঁকি দিল ওরা। ওটা রান্নাঘর।
লোকটা আছে। একা। জানালার ধারে বসে আছে। সামনে একগাদা খবরের কাগজ। হাতের কাছে টেলিফোন। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে টেবিলক্লথের দিকে। সকালের চেয়ে বয়স্ক লাগছে এখন তাকে। চুল পাতলা। চোখের নিচে কালি।
চুপচাপ দেখল ছেলেরা। তারপর ঘুরে, সামনের দরজায় বেল বাজাতে চলল কিশোর।
ড্রাইওয়েতে পথ রোধ করল পিস্তলধারী এক লোক। কি চাই?
তাদের দিকে নিশানা করেনি পিস্তল, শান্ত, সংযত কণ্ঠ। শঙ্কিত হল কিশোর। লোকটার ঠাণ্ডা ভাবভঙ্গি দেখেই বুঝল, বিপজ্জনক লোক। চোখে সানগ্লাস।
হাত নেড়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল মুসা, চুপ! বলে তাকে থামিয়ে দিল লোকটা।
জানালা খুলে গেলু। মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করল রোজার, রক, কে?
পিস্তল নেড়ে রক বলল, এই ছেলেগুলো চুরি করে জানালা দিয়ে দেখছিল।
হুঁ? অবাক মনে হল রোজারকে। কিছুটা কৌতূহলী। আবার বলল,? এবার সতর্ক।
ঘরে ঢোক, আদেশ দিল পিস্তলধারী। ওদিকে। হ্যাঁ, হাঁট।
আবার রান্নাঘরের পেছনে নিয়ে আসা হল ওদেরকে। পেছনের দরজা দিয়ে ঢোকানো হল।
এসব কি? রোজার জিজ্ঞেস করল। সকালে তিনটে ছেলের কথা বলেছিলেন মিস্টার সাইমন। তোমরাই দেখা করতে গিয়েছিলে, না? তোমাদেরকে পথেও

দেখেছি আমি।
হ্যাঁ, মিস্টার রোজার, জবাব দিল কিশোর।
বস, চেয়ার টেনে দিল রোজার।
ঘটনাটা কি, ড্যানি? জানতে চাইল রক। ওরা কারা?
এখনও জানি না। তোমার পিস্তল সরাও। ভয় লাগে, কখন গুলি ছুটে যায়।
দ্বিধা করল রক। তারপর পাজামার নিচের দিক তুলে, হাঁটুর নিচে বাঁধা, হোলস্টারে ঢুকিয়ে রাখল পিস্তলটা।
চোখ মিটমিট করল মুসা। কিছু বলল না। টেবিলের কাছে বসেছে ওরা।
মিস্টার সাইমন বললেন, রোজার বলল। তোমাদের একজন নাকি এই সন্দেহজনক লোককে ব্যাংকের কাছে দেখেছ।
ঘটনাটা কি, খুলে বলবে? প্রায় চেঁচিয়ে উঠল রক।
ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল রোজার। খবর শোননি? আজ সকালে ব্যাংকে ডাকাতি হয়েছে।
ডাকাতি? কই, শুনিনি তো। কি করে ঘটল? এই ছেলেগুলো কে? কিছুই বুঝতে পারছি না।
দ্রুত, সংক্ষেপে সব জানাল রোজার শেষে বলল, আর আমি গাধাই ব্যাটাদের ঢুকতে দিয়েছি। পুলিশের সন্দেহ, আমিও জড়িত। করবেই, আমি যেমন গর্দভ। ভাল করে তাকালাম না কেন তার মুখের দিকে? তাহলেই তো চিনতে পারতাম।
উকিলের কাছে যাও, রক বলল। ব্যবস্থা একটা করে দেবে। তুমি অপরাধী না হলে জোর করে তো পুলিস কিছু করতে পারবে না। কিন্তু এই ছেলেগুলো কেন এসেছে? জানালা দিয়ে উঁকি মারছিল কেন?
গম্ভীর হয়ে গেল রোজার। নিশ্চয় ওরাওঁ সন্দেহ করছে। কিশোরের দিকে কাত হল সে। প্রথমে ভাবলাম, মিস্টার সাইমন সাহায্য করতে পারবেন। গত হপ্তায় টিভিতে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন তিনি। একটা মূল্যবান কথা বলেছিলেন তখন। বলেছিলেন, মাঝে মাঝে নিরপরাধ লোক অহেতুক বিপদে পড়ে, কারণ, ভুল সময়ে ভুল জায়গায় হাজির থাকে তারা। সোজা কথা কপাল খারাপ। আমার বেলায়ও তাই হয়েছে। মিস্টার সাইমনের কথা মনে পড়ল। ব্যাংকের একজন। সেক্রেটারিও তার কাছে যাবার পরামর্শ দিয়েছে আমাকে। ডাউনটাউন ক্রেডিট রিপোর্টিং সার্ভিস থেকে ঠিকানা জোগাড় করে দিয়েছে। টেলিফোন ডিরেক্টরিতে নাম নেই তার। আমার বিশ্বাস, অনেক বিখ্যাত লোকেরই থাকে না। দেখা করতে গেলাম...।
একেবারে বক্তৃতা শুরু করেছ, বাধা দিয়ে বলল রক। মিস্টার সাইমন কে, সেটাই তো জানি না।

কেশে গলা পরিষ্কার করল কিশোর। তিনি একজন লেখক। শখের গোয়েন্দা। আজ সকালে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তার একটা মানিব্যাগ ব্যাংকের বাইরে রাস্তায় এক লোক ফেলে যায়, সেটা কুড়িয়ে পায় রবিন মিলফোর্ড, রবিনকে দেখাল সে।
ডাকাতটাকে দরজা খটখট করতে দেখেছি আমি, মিস্টার রোজার, রবিন বলল। তালা খুলে আপনি তাকে ঢুকতে দিয়েছেন।
আজ সকালে মিস্টার সাইমনের বাড়ি থেকে ফেরার পথে, মুসা বলল। আপনাকে যেতে দেখেছি। সন্দেহ হয়েছে। ভেবেছি, সাইমনের সঙ্গে আপনার কোন যোগাযোগ আছে। ডাকাতির সঙ্গে...। থেমে গেল সে। সরি, খোলাখুলি। বলে ফেললাম।
আমি শুধু তাঁর সাহায্য চাইতে গিয়েছিলাম, রোজার বলল। কিন্তু তাঁর এখন সময় নেই। নতুন একটা বই লেখায় হাত দিয়েছেন। লস অ্যাঞ্জেলেসের কয়েকজন প্রাইভেট ডিটেকটিভের নাম-ঠিকানা দিয়েছেন। পরামর্শ দিয়েছেন, গোয়েন্দার চেয়ে এখন উকিলের সঙ্গে দেখা করা আমার জন্যে জরুরি। বিকেলে কয়েকজনকে ফোন করেছি। ফিস জান? পিলে চমকে গেছে আমার। গোয়েন্দার ফিস্ আরও বেশি। কোনটার খরচ জোগানোরই সাধ্য আমার নেই।
চেয়ারে সোজা হয়ে বসল কিশোর। মিস্টার রোজার, আগে আপনার ওপর সন্দেহ ছিল আমার। এখন নেই। আপনাকে সাহায্য করতে পারব। আমরা গোয়েন্দা।
পকেট থেকে কার্ড বের করে দিল সে।
তোমরা ছেলেমানুষ...।
বাধা দিয়ে বলল কিশোর, বয়েস কম হতে পারে, কিন্তু সত্যিই আমরা গোয়েন্দা। পুলিশ পারেনি, এমন অনেক জটিল রহস্যের সমাধান আমরা করেছি, বিশ্বাস না হলে পুলিশ চীফ ইয়ান ফ্লেচারকে ফোন করুন। মিস্টার রোজার, আমি বুঝতে পারছি আপনি ডাকাতিতে জড়িত নন।
রবিন আর মুসাও একমত হয়ে মাথা ঝাঁকাল।
মিস্টার রোজার, আবার বলল কিশোর। আপনি ইচ্ছে করলে আমাদের সাহায্য নিতে পারেন।
দ্বিধায় পড়ে গেছে সিকিউরিটি ম্যান। কিন্তু তোমাদের বয়েস এত কম!
এটা কি কোন বাধা?
অস্বস্তিতে নড়েচড়ে বসল রোজার, আঙুল মটকাল। কি জানি। সত্যিকার গোয়েন্দা সংস্থাকেই ভাড়া করা উচিত...কিন্তু...কিন্তু..।
তাতে কত খরচ লাগবে ভেবে দেখেছ? রক বলল।

টেবিলের কাছে একটা চেয়ারে বসেছে সে, রোজারের চেয়ে বয়েস কম। জানালা দিয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আছে। ভ্রূকুটি করল। আঙুল চালিয়ে ব্যাকব্রাশ করল সোজা সুন্দর চুল। সানগ্লাস খুলে নিয়ে রাখল জ্যাকেটের পকেটে। তারপর বলল, এত ভাবছ কেন বুঝতে পারছি না। তোমাকে অপরাধী বলতে হলে, আগে প্রমাণ জোগাড় করতে হবে পুলিশকে।
আমিই তো আমাকে অপরাধী মনে করছি। নিজের হাতে চাবি দিয়ে তালা খুলে ডাকাত ঢুকতে দিয়েছি।
এ-জন্যে তোমাকে জেলে পাঠাতে পারবে না পুলিশ। আর এতই যদি ভাবনা, এই ছেলেগুলোকেই ভাড়া কর। কেন যেন মনে হচ্ছে আমার, ওরা তোমাকে সাহায্য করতে পারবে। কি করে করবে, জানি না।
সাধ্যমত চেষ্টা করব আমরা,কথা দিয়ে ফেলল মুসা।
যেচে পড়ে আমার উপকার করতে চাইছ তোমরা, রোজার বলল। আজকাল কজন করে এরকম? বেশ…করলাম ভাড়া। নেব তোমাদের সাহায্য। তবে বেশি পয়সা দিতে পারব না, আগেই বলে দিচ্ছি।
শখে গোয়েন্দাগিরি করি আমরা, মিস্টার রোজার, রবিন বলল। পয়সা নিই, না।
খুব খারাপ অবস্থা আমার! রোজার বলল। প্রাস্টিকের টেবিলক্লথের ডিজাইনে আঙুল বোলাচ্ছে। উদ্বিগ্ন ভঙ্গিতে তাকাল তিন গোয়েন্দার দিকে। এই ডাকাতি কেসের মীমাংসা যতদিন না হবে, আমাকে কাজে যেতে মানা করে দিয়েছে ওরা। মুখ ফুটে ডাকাত বলে না, তবু বুঝতে তো পারি। আচ্ছা, তোমরাই বল, আমাকে কি ডাকাত মনে হয়? আমার ঘর দেখে মনে হয় এটা ডাকাতের আড্ডা?
ডাকাত কি না বোঝার জন্যেই যেন রোজারের দিকে তাকাল ছেলেরা, রান্নাঘরে চোখ বোলাল আরেকবার। হাসল কিশোর। না, লোকটাকে ডাকাত কিংবা ডাকাতের সহযোগী ভাবতে পারছে না সে। আর ঘরটাকেও ডাকাতের ঘর বলে মনে হচ্ছে না।
হায়, হায়! চেঁচিয়ে উঠল রক, আমার মাল ! মুদী…।
তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে গেল সে। দড়াম করে বন্ধ হল পেছনের দরজার পাল্লা।
গোড়া থেকেই শুরু হোক, কি বলেন, মিস্টার রোজার? কিশোর বলল। সব খুলে বলুন আমাদের। নুতন কিছু হয়ত বেরিয়েও যেতে পারে। এমন কিছু, যা আগে আপনার মনে দাগ কাটেনি।
নিরাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল রোজার। মিস্টার সাইমন বলেছেন, কোন অ্যালিবাই না থাকলে, দোষী প্রমাণ করা যত সহজ, নির্দোষ প্রমাণ করা তারচে অনেক কঠিন।

আপনার কি সত্যিই কোন অ্যালিবাই নেই? ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখুন। আপনি ডাকাতদের একজন হলে, গত কয়েক দিনে আপনার বেশ কিছুটা সময় আলাপ-আলোচনা আর পরিকল্পনায় ব্যয় হওয়ার কথা। অন্য ডাকাতদের সঙ্গে চেনা-পরিচয় করতেও সময় লাগে। গত দুই হপ্তা আপনি কি কি করেছেন, মনে আছে? বলতে পারবেন ঠিকমত?

বিষণ্ন হয়ে মাথা নাড়ল রোজার।

আপনার বন্ধু রকের কথা বলুন। এখানেই থাকেন? তিনি কি বলতে পারবেন, গত কিছুদিন আপনি কোথায় কোথায় গিয়েছেন, কি কি করেছেন?

আবার মাথা নাড়ল রোজার। এখানেই থাকে রক, তবে বাড়িতে বেশি সময় থাকে না। সিসটেম টি এক্স ফোর-এর ফিল্ড রিপ্রেজেন্ট্যাটিভ সে। ওটা একটা কম্পিউটার কোম্পানি। নানা অফিসে যায় সে, বোঝানোর চেষ্টা করে কম্পিউটার দিয়ে কাজের কত সুবিধে। বিজ্ঞাপন করে আরকি। গত পুরোটা হপ্তা, এমনকি উইকএণ্ডেও বাইরে ছিল রক। ফ্রেজনোর একটা ফার্ম টি এক্স বিলিং সিসটেম কিনছে, তাদের সঙ্গেই কাজ করেছে ওই কদিন। ফিরেছে এই খানিক আগে। আজকাল বাড়িতে ফিরেও খুব একটা কথা বলে না আমার সাথে। তবে টি এক্স ফোর-এ যখন একসঙ্গে কাজ করতাম, অবস্থা অন্যরকম ছিল তখন।

আপনি টি এক্স ফোর-এ কাজ করতেন?

করতাম। আগে ওটার নাম ছিল রিং-বার অফিস মেশিন কোম্পানি, পরে হাত বদল হয়, নামও। গর্বের আভাস দেখা গেল রোজারের চেহারায়, রিং-বারদের ওখানে তিরিশ বছরের বেশি চাকরি করেছি আমি। প্রথমে ছিলাম ওদের ডাক বিভাগে, তারপর চলে গেলাম ক্রয় বিভাগে। ধীরে ধীরে চাকরিতে উন্নতি হল। ডিপার্টমেন্টের বারোজনের মধ্যে আমি হলাম দ্বিতীয়, অর্থাৎ বিভাগীয় প্রধানের পরেই আমার স্থান। সে-সময় আমার ছেলেরা বড় হচ্ছে। বাসা ভাল, ছেলেরা আরামেই থাকত। বাসা বদলের দরকার হয়নি।

উঠে লিভিং রুমে চলে গেল রোজার। ফিরে এল একটা বাঁধানো ফটোগ্রাফ নিয়ে। তাতে তার যুবক বয়েসের ছবি, ঘন কালো চুল। পাশে দাঁড়ানো গোলগাল, চেহারার মোটামুটি সুন্দরী এক মহিলা। দুজনের পাশে দাঁড়ানো দুটো বাচ্চা।

আমার স্ত্রী, নীনা, মহিলার ছবির ওপর আঙুল রেখে বলল রোজার। বিশ্বযুদ্ধের কিছুদিন পর বিয়ে করেছিলাম আমরা। হার্টফেল করে মারা গেছে বছর কয়েক আগে... গলা ধরে এল তার।

সমবেদনা জানাল কিশোর।

বড় এলা লাগে এখন, রোজার বলল। বাচ্চারাও বড় হয়ে যার যার মত চলে গেছে। সানিডেল-এর এক ইলেকট্রোনিক কোম্পানিতে চাকরি করে ছেলেটা,

প্রোডাকশন কো-অরডিনেটর। মেয়েটা বিয়ে করেছে। স্বামী কাজ করে বীমা কোম্পানিতে। বেকারসফিল্ডে থাকে, দুটো বাচ্চা।
ভাল আছে দুজনেই। কিন্তু আমার কাছ থেকে অনেক দূরে। আরও কাছাকছি থাকত যদি! ওরা চলে গেল, খালি হয়ে গেল বাড়িটা। একা একা খুব খারাপ লাগত। শেষে আরেকজনকে ভাড়া দেব ঠিক করলাম। কিছু পয়সাও আসবে, সঙ্গীও পাব। রককে বললাম। বলতেই রাজি হয়ে গেল সে। উঠে এল এখানে...।
দরজা খুলে গেল। একটা থলেতে কতগুলো প্যাকেট নিয়ে ঢুকল রক। থলে থেকে খুলে প্যাকেটগুলো গুছিয়ে রাখতে লাগল রেফ্রিজারেটরে।
কাল রাতে কি কি ঘটেছে, খুলে বলবেন? অনুরোধ করল কিশোর।
বেশ, যদি তাতে কোন কাজ হয়, বলছি। অস্বাভাবিক কিছু মনে হয়নি প্রথমে। প্রায় বছরখানেক ধরে চাকরি করছি ব্যাংকে। দুপুরে যাই, দুচারটা টুকিটাকি কাজ সারি, তেমন ইমপরট্যান্ট কিছু নয়। কাজটা নিয়েছিই আসলে সময় কাটে না বলে...টি এক্স ফোর থেকে রিটায়ার করার পর। নইলে কম্পিউটার কোম্পানির একজন অফিসার ব্যাংকের দারোয়ান হয়?
যা-ই হোক, অফিস ছুটি হওয়ার পর ঝাড়ুদার আসে, আমি দেখাশোনা করি। বেশিক্ষণ লাগে না ওদের। ছটার মধ্যে সেরে ফেলে। ওরা বেরিয়ে গেলে তালা লাগাই, আরেকবার চেক করে দেখি সব ঠিক আছে কিনা। তারপর বাড়ি যাই। নাইট গার্ড নেই ওই ব্যাংকের ভল্টে টাইম লক লাগানো, কাজেই গার্ডের দরকার পড়ে না। জোর করে কেউ খুলতে গেলেই পুলিশ স্টেশনে অ্যালার্ম বেজে উঠবে।
সেজন্যেই আপনাকে আটক করেছিল ডাকাতেরা, রবিন বলল। নইলে টাইম লকের জন্যে কিছু করতে পারত না ওরা। ভেতরে ঢুকলেই, ঘন্টা।
হ্যাঁ। তিনজন এসেছিল, টাইম লক সিসটেমের কথা ভাল করেই জানত। নিশ্চয় কোথাও লুকিয়ে থেকে চোখ রাখছিল। ঝাড়ুদারেরা কাজ শেষ করে বেরিয়ে গিয়ে এলিভেটরে উঠল। তারপর এল এক ডাকাত। দরজা ধাক্কা দিল। লবিতে তখন আলো খুব সামান্য। দেখলাম ওভারঅল পরা একজন দাঁড়িয়ে আছে, টুপির নিচে ধূসর চুল। টুপিটা চোখের ওপর টানা। ভাবলাম জ্যাকই বুঝি ফিরে এসেছে। কোন দরকারে। দরজা খুললাম। ও ভেতরে ঢোকার পর চিনলাম, জ্যাক নয়। হাতে পিস্তল। আর কিছু করার নেই তখন আমার।
ওর পর পরই ঢুকল আরও দুজন। মাথায় পরচুলা, নকল দাড়ি, নকল গোঁফ। ব্যের্ড রুমে ঢুকতে বাধ্য করল আমাকে। রাস্তা থেকে ঘরটা দেখা যায় না। আমাকে সরিারাত আটকে রাখল। ভল্টের ধারেকাছেও ঘেষল না। সকালে স্টাফরা আসতে লাগল। একজন করে ঢোকে, আর ধরে এনে তাকে বোর্ডরুমে আটকায়। তারপর এলেন মার্ক জনসন, ভল্টের লক কম্বিনেশন তিনি জানেন। বোঝা গেল,

ডাকাতেরা তাকে চেনে টাইম লক অফ করিয়ে ভল্ট খুলতে তাকে বাধ্য করল ওরা।
মুসার পাশের চেয়ারে এসে বসল রক রেনাল্ড। নিশ্চয় তোমার ওপর চোখ রেখেছে কেউ। ব্যাংকের কাছাকাছিই থাকে সে, বা থাকত। কিংবা তোমার পরিচিত কেউ।
পরিচিত কেউ হলে চিনতাম, রোজার বলল। তিনজনের একজনকেও চিনি। দেখিইনি কখনও।
উঠে গিয়ে চলায় কেটলি বসাল রক। আমাদের পড়শীদের কেউও হতে পারে। নিশ্চয় ছদ্মবেশে গিয়েছিল। পড়শীদের ওপর চোখ রাখতে বল ছেলেগুলোকে।
রাখাটা কি জরুরি?
সামনে ঝুঁকল কিশোর। পড়শী কিংবা বন্ধু-বান্ধবকে সন্দেহ করা কঠিন। কিন্তু মিস্টার রোজার, বোঝা যাচ্ছে, ডাকাতেরা আপনাকে চেনে, ব্যাংকে আপনার কখন কি কাজ ভালমত জানে। গত কদিন ধরে কেউ নজর রেখেছে আপনার ওপর, টের পেয়েছেন? আপনার কাজকর্ম সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন কেউ?
না, একেবারে মুষড়ে পড়েছে রোজার।
কেটলিতে কফি ফুটছে। একটা কাপে ইনসট্যান্ট কফি রেখে তাতে গরম পানি ঢালল রক। টেবিলের কাছে বসে চুমুক দিল কাপে। কিশোরের দিক থেকে রোজারের দিকে ফিরল, আবার তাকাল কিশোরের দিকে।
আপনাকে নির্দোষ প্রমাণ করতে হলে আসল অপরাধীকে খুঁজে বের করতে হবে আগে, কিশোর বলল। সেজন্যে সূত্র দরকার।
সূত্র? সূত্র কোথায় পাবে?
জানি না। তবে আশা করছি, পাওয়া যাবে। এখন এ-ব্যাপারে আলোচনা করছি না আপনার সঙ্গে। তদন্ত চালিয়ে যাব আমরা। দুএক দিনের মধ্যেই খবর জানাব আপনাকে। ইতিমধ্যে, অস্বাভাবিক কোন কিছু আপনার চোখে পড়লে জানাবেন। আমাদের কার্ডের পেছনে টেলিফোন নাম্বার আছে।
জানাব।
বেরিয়ে এল ছেলেরা। পেছনে দরজা বন্ধ হয়ে গেলে রবিন বলল, সূত্র? ওই মানিব্যাগের কথা ভাবছ?
খুবই সামান্য, তবু সূত্র তো বটে, জবাব দিল কিশোর। আপাতত ওটা ধরেই তদন্ত চালাতে হবে আমাদের। আর একটা ব্যাপারে শিওর হয়ে গেলাম, রোজার কিংবা মিস্টার সাইমন অপরাধী নন। তবে, অন্ধ লোকটা ডাকাতদের কেউ হলে, মানিব্যাগ ধরে তদন্ত করে লাভ হবে না আমাদের।

হোক বা না হোক, হাত নাড়ল মুসা। কথায় কথায় পিস্তল বের করে, এমন – লোকের সামনে না পড়লেই আমি খুশি।
পরদিন সকাল নটায় রকি বীচ ছাড়ল রবিন মিলফোর্ড। কোস্ট হাইওয়ে ধরে সাইকেল চালাল দক্ষিণে, সান্তা মনিকায় যাবে। থিফট অ্যাণ্ড সেভিংস কোম্পানির আশেপাশের স্টোরগুলোতে খোঁজখবর নেবে অন্ধ লোকটার, আর এসেছে কিনা জিজ্ঞেস করবে। তারপর আবার রকি বীচে ফিরে যাবে লাইব্রেরিতে, যেখানে পার্টটাইম চাকরি করে।
রবিনকে চলে যেতে দেখল কিশোর আর মুসা। তারপর ওরা রওনা হল উত্তরে। সাড়ে নটা নাগাদ ম্যালিবু ছাড়ল। শহরের পর থেকে উঠে গেছে পাহাড়ী পথ, পাহাড়ের পিঠের ওপাশ থেকে আবার ঢালু হয়ে নেমেছে। নিকারো অ্যাণ্ড কোম্পানিটা ওখানেই।
জেটির কাছে এসে থামল ওরা। হাইওয়ে ধরে যাবার সময় হাজারবার দেখেছে এই জায়গা ওরা। এর আগে কখনোই নজর দেয়নি তেমন। কিছু ক্যাম্প দেখা যাচ্ছে একধারে। পথের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে কয়েকটা ভ্যান। জেটির দক্ষিণে সৈকতের এক প্রান্তে মাছ ধরছে কিছু লোক, তাদের মাঝে মহিলাও আছে কয়েকজন। এই ঠান্ডার মাঝেও ওয়েটসুট পরে ঢেউয়ের ওপরে সার্ফিং করছে কিছু লোক।
চমৎকার ঢেউ আজ, মুসা বলল। সে নিজে খুব ভাল সাফার, লোকগুলোকে দেখে সার্ফবোর্ড নিয়ে তারও সাগরে নামতে ইচ্ছে করছে।
কিন্তু ওসবে বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই কিশোরের। সে তাকিয়ে আছে জেটিতে বাঁধা একটা ফিশিং বোটের দিকে। ছোট্ট নাম বোটটার, টিনা। পনেরো মিটার লম্বা। পাইলটের জন্যে হুইল-হাউস আছে, যারা মাছ ধরবে তাদের জন্যে খোলা ডেক। ডেকের হ্যাচ খোলা। নীল উইণ্ডব্রেকার পরা এক তরুণ ঝুঁকে ইঞ্জিনে কি যেন করছে।
বোটটার উল্টোদিকে, জেটির উত্তরে একটা ভেলা বাধা রয়েছে, গ্যাংওয়ে দিয়ে তাতে নামার ব্যবস্থা। ভেলার সঙ্গে বাঁধা একটা দাঁড়টানা নৌকা। জেটি থেকে দূরে গভীর পানিতে ভাসছে বয়ায় বাঁধা সাদা একটা সুন্দর মোটরবোট। ককপিট ঢেকে রাখা হয়েছে তেরপল দিয়ে।
নিশ্চয় ওটাইমিস্টার সাইমনের বোট, কিশোর বলল।
হুঁম, সার্ফারদের ওপর থেকে চোখ সরাচ্ছে না মুসা।
তুমি থাক এখানে। সাইকেল দেখ।
হুঁম। হাসল কিশোর। রাস্তা পেরোল।

রাস্তা থেকে একটা ড্রাইভওয়ে সোজা নেমে গেছে জেটিতে। বাঁয়ে একটা ছোট পার্কিং লট, শূন্য, একটা গাড়িও নেই। ডানে আরেকটা ড্রাইভওয়ে চলে গেছে একটা বাড়ি পর্যন্ত। টালির মত করে লাগানো কাঠের হাত বাড়িটার, ধূসর রঙ বিবর্ণ হয়ে এসেছে। কাঠের দেয়াল সাদা রঙের। কারপোর্টে দাঁড়িয়ে আছে। একটা স্টেশন ওয়াগন।

বাড়ি আর জেটির মাঝামাঝি ছোট একটা কেবিন। তিন দিকে বড় বড় জানালা, আর একদিকে দরজা, ডকের দিকে ফেরানো। ওটা অফিস। জানালা দিয়ে কিশোর দেখল, ভেতরে বসা ধূসর-চুল কালো পোশাক পরা এক মহিলা হিসেবের খাতা দেখছে। কাছেই বসা এক তরুণী, কোঁকড়া লাল চুল, টেলিফোনে কথা বলছে।

অফিসের কাছে এসে কাচের এপাশ থেকে তরুণীর দিকে চেয়ে হাসল কিশোর, তারপর দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল।

অফিসে নোনা পানি, রবারের বুট, সাগরের শ্যাওলা আর ছত্রাকের মিশ্র গন্ধ। একধারে দেয়াল ঘেঁষে রাখা একটা কাঠের বেঞ্চ। ওটার সামনে টেবিলে রাখা মাছ-ধরার ওপর লেখা ছোট ছোট পুস্তিকা। চ্যানেল আইল্যাণ্ডস, আর উপকূলের কাছাকাছি কোথায় কোথায় ভাল বেড়ানোর জায়গা আছে, মাছ ধরা যাবে, তারও উল্লেখ রয়েছে ওগুলোতে।

হাত দিয়ে মাউথপিস ঢেকে কিশোরকে বলল তরুণী, এক মিনিট।

আমার তাড়াহুড়ো নেই,কিশোর জানাল।

মুখ তুলে তাকাল বয়স্ক মহিলা। অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। কেন যেন ভয় লাগে ওই চোখের দিকে তাকালে। কালো চোখের তারা স্থির, কিশোরের মনে হল তার মনের, কথা সব পড়ে ফেলছে মহিলা। আনমনা হাসি। একবার তাকিয়েই আবার খাতায় চোখ ফেরাল সে।

অস্বস্তি বোধ করছে কিশোর। ফিরে চাইল ডকের দিকে। টিনার ইঞ্জিন পরীক্ষা শেষ করেছে উণ্ডব্রেকার পরা তরুণ। হ্যাচ লাগিয়ে ডেকের কিনারে এসে লাফ দিয়ে নামল জেটিতে। শিস দিতে দিতে এগিয়ে এল অফিসের দিকে।

ও-কে, কথা বলছে লাল-চুল তরুণী। তাহলে শনিবার দিন। তেতাল্লিশ। আরও বেশি হলে জানাবেন, ঠিক আছে? রিসিভার রেখে এগিয়ে আসা তরুণকে দেখল এক মুহূর্ত। তারপর ফিরল কিশোরের দিকে। কি সাহায্য করতে পারি?

একটা মানিব্যাগ পেয়েছেন? কোন রকম ভূমিকা করল না কিশোর। কেউ দিয়ে গেছে আপনাদের কাছে? মিস্টার সাইমন তার মানিব্যাগ হারিয়েছেন, দুএক দিন আগে।

মিস্টার সাইমন? এসেছিলেন নাকি? কই, দেখিনি তো। উইণ্ডব্রেকার পরা লোকটাকে ঘরে ঢুকতে দেখে জিজ্ঞেস করল মেয়েটা, বিল, মিস্টার সাইমনকে নিয়ে গিয়েছিলে? নৌকাটায় খুঁজে দেখ তো আছে কিনা।
নেই, জবাব দিল তরুণ। দুদিন আগে এসেছিলেন। বোটে তুলে দিয়ে এসেছিলাম, তারপর আবার ডকে ফিরিয়ে এনেছি। নৌকায় মানিব্যাগ পড়লে অবশ্যই দেখতাম।
কিশোরের দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচাল সে, মিস্টার সাইমন এলেন না কেন? টেলিফোনও তো করতে পারতেন?
উনি ব্যস্ত। গত দুদিনে আরও দুজায়গায় গিয়েছেন। কোথায়, ফেলেছেন মনে করতে পারছেন না। তাঁকে বলেছি, আমি খুঁজে দেখব। ফোন করেননি তার কারণ, ফোন করলে পাত্তা দেয় না লোকে। দায়সারা গোছের একটা জবাব দিয়ে রেখে দেয়।
অন্ধ এক ভিখিরিকে দেখেছেন মিস্টার সাইমন, সবে বানিয়ে বলতে যাচ্ছিল কিশোর, বলে উঠল বয়স্ক মহিলা, মানিব্যাগের কথা জিজ্ঞেস করছ? আশ্চর্য! কাল রাতে মানিব্যাগ স্বপ্নে দেখেছি আমি।
তরুণী হাসল। আমার শাশুড়ি খুধ আজব মানুষ। তার স্বপ্ন প্রায়ই ফলে যায়। ভয়ঙ্কর মহিলা।
স্বপ্ন দেখলেই ভয়ঙ্কর হয়ে যায় নাকি মানুষ? মহিলার কথায় বিদেশী টান, রেগে যাওয়ায় জোরাল হল। তোমাদেরকে কতবার বলেছি, স্বপ্ন দেখলে ভয় পাই আমি। কাল রাতে দেখলাম, আজব একটা লোক এল। মাটি থেকে একটা মানিব্যাগ কুড়িয়ে নিয়ে চট করে পকেটে রেখে দিল।
লোকটা অদ্ভুত। ধূসর চুল, মৃত্যুর আগে আমার কাসটে লিনির যেমন ছিল। তবে কাসটেলিনির মত ছোট আর বুড়ো নয় লোকটা। বয়েস আরও কম, চোখে কালো চশমা। মুখে কাটা দাগ, মনে হয় কেউ কেটে দিয়েছে ছুরি দিয়ে। হাতের লাঠি অন্ধের মত ঠকঠক করছিল। বুঝতে পারছিল আমি ওকে দেখছি। আমার জন্যে ও বিপজ্জনক, আমি জানি। সাংঘাতিক এক দুঃস্বপ্ন, অথচ কত বাস্তব। তরুণীর দিকে তাকাল মহিলা। খুব ভাবনা হচ্ছে আমার, এলসি।
বিচিত্র একটা শব্দ, কিশোরের মনে হল লোকটার গলা চেপে ধরা হয়েছে। ফিরে তাকাল সে। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে বিল। মৃদু কাপছে।
কি হল, বিল? এলসি জিজ্ঞেস করল। ওরকম চেহারার কাউকে চেন নাকি?
না না, আমি চিনব কোত্থেকে? কথাটা বেশ জোরেই বলে ফেলল বিল মিসেস নিকারো এমন ভাবে বলে না, যেন একেবারে সত্যি সত্যি দেখেছে।
তোমার কথা বুঝতে পারছি।

এক মুহূর্ত কেউ কিছু বলল না। তারপর দুই মহিলাকেই ধন্যবাদ জানিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে এল কিশোর। রাস্তা পেরিয়ে দ্রুত চলে এল মুসার কাছে। তখনও স্বপ্নিল চোখে সাফারদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে গোয়েন্দা সহকারী।
মনে হয় আসল জায়গায় ঢিল মেরেছি! কিশোর জানাল। অফিসের বৃদ্ধা মহিলা মিসেস নিকারো। আর তরুণী তার ছেলের বৌ। সে বলল, তার শাশুড়ির স্বপ্ন নাকি সব ফলে যায়।
তারমানে বলতে চাইছ, ঘটনা ঘটার আগেই সেটা স্বপ্নে দেখে মহিলা?
হয়ত। যা ঘটে গেছে, সেটাও বোধহয় দেখে। এবার দেখেছে, একটা, মানিব্যাগ কুড়িয়ে নিয়ে পকেটে রাখছে এক লোক, অন্ধ, হাতে লাঠি। গালে কাটা দাগ। লোকটা নাকি মহিলার জন্যে বিপজ্জনক।
যাহ্, বানিয়ে বলছ!
মোটেও না। মহিলা যা বলল, তা-ই বললাম। ভয় পাচ্ছে। ভয় ওই লোকটাও পেয়েছে, উইণ্ডব্রেকার পরা, খানিক আগে ইঞ্জিনে কাজ করছিল যে। মহিলার স্বপ্নের কথা শুনেই আঁতকে উঠেছে। নিশ্চয় অন্ধ লোকটার কথা কিছু জানে সে। এবং সেটা প্রকাশ করতে চায় না। আমাদের এই রহস্যের সঙ্গে সম্পর্ক আছে তার।
মুসা নিজেই প্রস্তাব দিল, জেটির কাছে থেকে বিলের ওপর নজর রাখবে। বলল, যদি কিছু করে, দেখতে পারব। তোমাকে চিনে ফেলেছে সে। আমাকে চেনে না, কাজেই কাছাকাছি থাকা সহজ হবে। খেয়ালই করবে না।
খুব সাবধান, সতর্ক করল কিশোর।
থাকব।
সাইকেল নিয়ে রওনা হয়ে গেল কিশোর। রাস্তা পেরিয়ে সৈকতের দিকে চলল মুসা। তাপর সাইকেল ঘুরিয়ে চলে এল একটা খিলানের নিচে, পানির কিনারে। খিলানের সঙ্গে শেকল পেঁচিয়ে তালা দিয়ে রাখল সাইকেল। ভাবসাব এমন, যেন নিকারোদের ব্যাপারে কোন আগ্রহই নেই। যে-ই দেখুক, ভাববে, সাইকেল রাখার নিরাপদ জায়গা খুঁজছে।
সৈকত ধরে কিছুদূর এগোল সে, কয়েকজন মাছশিকারির পাশ কাটাল। তারপর একটা শুকনো জায়গা বেছে বসে পড়ল বালিতে। চোখ রাখল টিনার ওপর। আবার বোটে উঠেছে বিল। পেতল ঘষছে।।
সুন্দর কাটছে সকালটা। খিলানের কাছে সৈকতে খেলতে এল একদল ছেলেমেয়ে। ওদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে ফেলল মুসা। কথায় কথায় জানল, ওরা কাছাকাছিই থাকে। আরও জানল, হাইওয়ের ধারে ছোট একটা বাড়িতে বাস করে বিল। আরও দুজন বন্ধু থাকে তার সাথে। বিদেশী ভাষায় কথা বলে।

সহজেই এত তথ্য জানতে পেরে খুশি হল মুসা। ভাবল, কিশোরও এরচেয়ে বেশি কিছু করতে পারত না।
কাছের একটা ছোট বাজার থেকে স্যাণ্ডউইচ কিনে লাঞ্চ সারল মুসা। আবার ফিরে এসে বসল আগের জায়গায়। দুপুর গড়িয়ে বিকেল পাঁচটা বাজল। পাঁচটার সামান্য পরে জেটি থেকে রাস্তায় গিয়ে উঠল বিল। পিছু নিল মুসা।
রাস্তার দিকে মুখ করে আছে ছোট কটেজটা। পুরানো। দেখে মনে হয় ধসে পড়বে যে-কোন সময়। বালিতে অসংখ্য খুঁটি গাড়া, তার ওপর রয়েছে বাড়িটার পেছনের ভার। ঢুকে গেল লোকটা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুসা ভাবতে লাগল, এবার কি করবে? কি করে জানবে বিলের সঙ্গে অন্ধ ভিক্ষুকের কি সম্পর্ক?
পুরানো একটা ট্রাক বিকট গর্জন তুলে ছুটে এল হাইওয়ে ধরে। কটেজের কাছে এসে থামল। নামল এক যুবক। হাত নেড়ে ড্রাইভারকে ধন্যবাদ জানিয়ে, রাস্তা পেরিয়ে গিয়ে ঢুকল বাড়িতে।ট্রাক চলে গেল নিজের পথে।
কয়েক মিনিট পর এল তৃতীয় আরেকজন, সে-ও যুবক। পুরানো একটা বুইক চালিয়ে। বাড়ির পাশে ঘাসে ঢাকা একটুকরো সমতল জমিতে গাড়িটা পার্ক করে রেখে গিয়ে বাড়িতে ঢুকল সে, দড়াম করে বন্ধ করল সামনের দরজা।
সৈকতে মাছশিকারির সংখ্যা কমে এসেছে। পশ্চিমে ডুব দেয়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে যেন সূর্য। মুসা ঠিক করল, আর দশ মিনিট, তারপর বাড়ি রওনা হবে।
কথাটা ভেবে সে শেষও করতে পারল না, খুলে গেল কটেজের দরজা। তিনজনেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে হাইওয়ে ধরে এগোল। পিছু নিল মুসা। নিকারোদের বাড়ি পেরোল তিন যুবক, উঠতে শুরু করল আঁকাবাঁকা একটা ড্রাইভওয়ে ধরে। চূড়ায় একটা বাড়ি, সাগরের দিকে মুখ। সাইনবোর্ড রয়েছেঃ প্যাসিফিক মোটেল।
প্রায় চূড়ার কাছে পৌঁছে গেছে তিনজন, এই সময় একটা গাড়ি এসে মোড় নিয়ে মোটেলের ড্রাইভওয়ে ধরে উঠতে শুরু করল। ওটার পর পরই এল আরেকটা গাড়ি, প্রথমটাকে অনুসরণ করল। তারপর এল আরেকটা, দাঁড়িয়ে গেল পথের ধারে। তৃতীয় গাড়ি থেকে একজন মহিলা আর একজন পুরুষ নেমে ড্রাইভওয়ে ধরে হেঁটে উঠতে লাগল। ঠিক তাদের পেছনেই এল মোটরসাইকেল আরোহী দই তরুণ, ইঞ্জিনের প্রচণ্ড গর্জন তুলে উঠে চলল ড্রাইভওয়ে দিয়ে।
দেখছে আর ভাবছে মুসা, অবাক হওয়ার মত কিছু আছে কি? যখন এক ভ্যান বোঝাই তরুণ তরুণী এসে হাজির হল, সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল সে, এবার কিছু একটা করা দরকার। ছোট একটা সেডান এসে রাস্তার পাশে থামতেই হাইওয়ে পেরোল সে। গাড়ি থেকে নামল মাঝবয়েসী এক দম্পতি। তাদের সঙ্গে দুটো ছেলে, তেরো থেকে পনেরোর মধ্যে ওদের বয়েস। দম্পতির পেছনে হেঁটে চলল ছেলেদুটো। ওদের কয়েক গজ পেছনে রইল মুসা।

পরিবারটার পিছু পিছু চূড়ায় উঠে এল সে। ঘুরে এগোল মোটেলের পেছনে পার্কিং লট আর সুইমিং পুলের ধার দিয়ে। পেছন দিকের সব দরজা খোলা। ওদের মাথার ওপরে বাড়ির ছাঁইচে ইতিমধ্যেই হেসে উঠেছে উজ্জ্বল আলো। পুলের চারপাশে আর পার্কিং লটের কালো রঙ করা চত্বরের কিছুটা জুড়ে সাজানো হয়েছে ফোল্ডিং চেয়ার। পুল থেকে দূরে একটা খোলা জায়গায় রয়েছে বিল আর তার দুই বন্ধু, তাদের সামনে মস্ত ইজেলে বিশাল তিনটে ফটোগ্রাফি। সাদা-কালো একটা ছবিতে দেখা যাচ্ছে সাদা-চুল একজন মানুষ, পরনে নানারকম কাজ করা ইউনিফর্ম। আরেকটা রঙিন ছবি, একটা শহরের ওপর পড়েছে সোনালি উজ্জ্বল রোদ। তৃতীয় ছবিটা দেখে চমকে গেল মুসা। এটাও একজন লোকের, ধূসর চুল, গালে কাটা দাগ, চোখে কালো চশমা। রবিনের অন্ধ ভিখারির প্রতিকৃতি।

অস্বস্তি লাগছে মুসার। এখানে তার কোন অধিকার নেই। পালিয়ে যাওয়ার জোর ইচ্ছেটা দমন করল কিশোরের কথা ভেবে, কিশোর অসন্তুষ্ট হবে। নিশ্চয় কোন ধরনের সভার আয়োজন হয়েছে এখানে, যাতে অন্ধ লোকটার কথা আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আর এই সভায় টিকেটের প্রয়োজন নেই, যে খুশি আসতে পারে, মুসার অন্তত তা-ই মনে হল। তার দিকে তাকাচ্ছেও না কেউ। সন্দেহজনক কিছু না করলে তাকাবে বলেও বোধহয় না।

একটা চেয়ারে বসে পড়ল সে। পাশে এসে বসল মোটাসোটা এক লোক। ওপরে ওঠার পরিশ্রমে বেজায় হাপাচ্ছে। তার দিকে চেয়ে খাতির-জুমানো-হাসি হাসল মুসা।

আরও লোক আসছে। সব চেয়ার ভরে গেল। এরপরও যারা এল, মোটেলের সিঁড়িতে, সুইমিং পুলের ধারের দেয়ালে উঠে বসতে লাগল। মোটেলের ভেতরে কোন আলো নেই। ব্যাপার কি?-ভাবল মুসা। গরমের সময় ছাড়া এই মোটেল, খোলে না নাকি?

অন্ধকার হয়ে আসছে, এই সময় একটা টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল বিল। ছবিগুলোর সামনে রাখা হয়েছে টেবিলটা। মোটেলের অফিসের পেছন থেকে মার্চ করে এগিয়ে এল তার এক বন্ধু, হাতে নীল মখমলের পতাকা, সোনালি বর্ডার, মাঝে একগুচ্ছ সনালি ওকপাতা।

গান শুরু করল এক মহিলা। যোগ দিল আরেক মহিলা। তাদের সঙ্গে গলা মেলাল এক লোক। তারপর একে একে সবাই। উঠে দাঁড়িয়ে গাইছে। মুসাও গাওয়ার ভান করছে। সুরটা তার অপরিচিত, কখনও শোনেনি। লড়াইয়ের গানের মত মনে হল তার। শেষ হল গান। গুঞ্জন শুরু হল। কেশে উঠল মুসা। চেয়ারে বসার মচমচ। টেবিলের সামনে থেকে সরে এল বিল।

তার জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল এক স্প্যানিশ ভদ্রলোক, বৃদ্ধ। দেশী ভাষায় কথা শুরু করল। মনে মনে গুঙিয়ে উঠল মুসা। স্প্যানিশ বোঝে না সে।
মোলায়েম ভঙ্গিতে আরম্ভ করেছিল, ধীরে ধীরে গলার জোর বাড়ল বক্তার। মুঠো তুলে আঁকাতে লাগল, যেন শাসাচ্ছে উপস্থিত জনতাকে। কিংবা এই মোটেলের সীমানার বাইরে কোন জনগোষ্ঠীকে।
বক্তৃতা শেষ হতেই তুমুল করতালি আর চিৎকার করে তাকে সমর্থন করল জনতা। তারপর বক্তৃতার জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল অল্পবয়েসী এক মহিলা, মাথায় লম্বা সোনালি চুল। জনতার দিকে মুখ করে চেঁচিয়ে কিছু বলল, মুসার মনে হল, শ্লোগান। আবার হাততালি, চিৎকার, শিস। মাটিতে পা ঠুকল কেউ কেউ।
মহিলা হাত তুলতেই চুপ হয়ে গেল জনতা। কথা শুরু করল সে। ভাষা না বুঝলেও মুসার অনুমান করতে কষ্ট হল না, জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তৃতা চলছে। ফ্লাডলাইটের আলোয় জ্বলছে, যেন বক্তার-চোখ। মাঝে মাঝেই হাত তুলে ইঙ্গিত করছে অন্ধ লোকটার ছবির দিকে, হুল্লোড় করে উঠছে জনতা।
বক্তৃতা শেষ হলে আবার কোলাহল। মহিলা সরল। আবার সে-জায়গায় এসে দাঁড়াল বিল। ধীরে ধীরে চুপ হয়ে গেল জনতা। তারপর, মুসাকে আতঙ্কিত করে দিয়ে লোক বাছাই করতে আরম্ভ করল সে, যাদেরকে বক্তৃতা দিতে হবে। যাদেরকে ইশারা করল, এক এক করে বক্তব্য রাখল তারা। প্রথম সারি থেকে বলল একজন লোক, তারপর মাঝখান থেকে এক মহিলা, শেষে সিঁড়িতে বসে থাকা এক কিশোর। স্প্যানিশ ছাড়া আর কিছু বলছে না। কি বলল তিনজুনে, এক বর্ণ বুঝতে পারল না মুসা।
হঠাৎ মুসার দিকে হাত তুলল বিল। সব কটা চোখ ঘুরে গেল তার দিকে।
মাথা নাড়ল মুসা। কিন্তু তাকে ঠেলে তুলে দিল পাশে বসা মোটা ভদ্রলোক।
দুঃস্বপ্ন দেখছে যেন মুসা। ভাবনাও চলছে না আর, জমে গেছে যেন মগজ।
কিছু বলল বিল। হেসে উঠল জনতা,। ওদের মুখের দিকে তাকাল সে। সবাই তাকিয়ে আছে তার দিকে, অপেক্ষা করছে।
দৌড়ে পালাতে ইচ্ছে করছে তার। দ্রুত তাকাল এদিক ওদিক। চেয়ারগুলোর পাশ দিয়ে গিয়ে ড্রাইভওয়েতেও পৌঁছতে পারবে না, তার আগেই ধরা পড়ে যাবে। সে গুপ্তচর, এটা যদি বুঝে যায় ওরা…
মোলায়েম গলায় কিছু বলল পাশে বসা ভদ্রলোক। প্রশ্ন করল? নাকি হুমকি?
আচমকা গলা চেপে ধরল মুসা। হাঁ করে বিচিত্র একটা শব্দ করল। মাথা নাড়ল জোরে জোরে।
ও! বলল পাশে বসা লোকটা। ল্যারিনজাইটিস!

মাথা ঝাঁকাল মুসা, জোর করে হাসল। আবার হেসে উঠল জনতা। হাঁপ ছেড়ে বাঁচল সে, বসে পড়ল। তার পিঠ চাপড়ে সহানুভূতি জানাল ভদ্রলোক। অন্যদিকে চোখ ফেরাল জনতা। আরেকজন লোকের দিকে হাত তুলল বিল। সেই লোকটা উঠে কিছু বলল।

বক্তৃতার পালা শেষ। একটা ঝুড়ি নিয়ে এগোল বিল আর তার এক বন্ধু, দুজনে দুদিকে ধরেছে। এগোল সারির ভেতর দিয়ে। থামছে প্রতিটি লোকের সামনে। উঠে দাঁড়িয়ে জ্বালাময়ী কণ্ঠে জনতাকে কি সব বলছে সেই অল্পবয়েসী মহিলা। বোধহয় মুক্ত হস্তে দান করার অনুরোধ জানাচ্ছে।

মুসার সামনে যখন এল ঝুড়িটা, অনেক টাকা জমে গেছে। সে-ও ফেলল একটা ডলার। ড্রাইভওয়ে থেকে চেঁচিয়ে কি যেন বলল একজন। চোখের পলকে কোথাও উধাও হয়ে গেল ঝুড়ি।

দেখতে দেখতে জনতার সামনে দুটো গিটার আর একটা অ্যাকর্ডিয়ন নিয়ে দাঁড়িয়ে গেল বিল আর তার দুই বন্ধু। গিটারে টোকা দিল বিল। বেজে উঠল অ্যাকর্ডিয়ন। মিষ্টি সুরে গান ধরল অল্পবয়েসী মহিলা।

তার সঙ্গে গলা মেলাল অনেকে। আঞ্চলিক গান, সুরে বোঝা যায়।

মোটর সাইকেলের ইঞ্জিনের শব্দ কানে এল। ফিরে চেয়ে মুসা দেখল, উঠে এসেছে একজন পুলিশ, হাইওয়ে পেট্রলম্যান।

হাত নাড়ল গায়িকা। থেমে গেল সঙ্গীত।

মোটর সাইকেল স্ট্যাণ্ডে তুলে চেয়ারগুলোর পাশ দিয়ে ঘুরে গিয়ে টেবিলের কাছে দাঁড়াল পুলিশ অফিসার। হাত তুলে বলল, সরি, বাধা দিলাম। কিছু মনে করবেন না। আপনাদের লীডার কে?

আমি, বিল বলল। কি ব্যাপার, অফিসার? রিহারসালের অনুমতি নিয়েই এসেছি মিস্টার বারকেনস্টিনের কাছ থেকে।

বারকেনস্টিন? অফিসের দিকে তাকাল অফিসার। মোটেলের মালিক?

হ্যাঁ। কমুনিটি রুম ভাড়া নিয়েছি। রসিদ দেখতে চান?

না, বিশ্বাস করছি। কিন্তু ওটা তো কমুনিটি রুম নয়। তাছাড়া বারকেনস্টিন বলেনি জায়গাটা নিরাপদ নয়? মোটেল বন্ধ কেন, জানেন? এর নিচের মাটি আলগা, অতিবৃষ্টিতে এরকম হয়েছে। যে কোন সময় ধস নামতে পারে। আসলে কি করছেন এখানে, বলুন তো? এত লোক কেন?

নিস্পাপ হাসি ফুটল বিলের ঠোঁটে। একটা গানের দল গঠন করেছি আমরা, কান্ট্রি সং ফেডারেশন। রিহারসাল দিচ্ছি, কলিসিয়ামে সাতাশতম কান্ট্রি মিউজিক জাম্বোরিতে প্রতিযোগিতা করব।

জনতার ওপর চোখ বোলাল অফিসার। এত লোক? সবাই...সবাই যাবেন প্রতিযোগিতা করতে?
অ্যামেচারদেরই প্রতিযোগিতা হয় ওখানে, ধৈর্যের সঙ্গে জবাব দিল বিল। লোক কম-বেশির প্রশ্ন নেই। আপনি বলছেন ধস নামবে, মিস্টার বারকেনস্টিন তো তা বললেন না। তিনি বলেছেন ঠিকই আছে। তাছাড় এখন আর রিহারসাল ক্যান্সেল করা যাবে না। দূর থেকে এসেছে ওরা, এমন কি ল্যাগুনা থেকেও এসেছে অনেকে। ভোলা জায়গায়ই তো প্র্যাকটিস করছি। মোটেল যদি বসেও যায়, আমাদের কিছু হবে না।
সেটা আপনি বলছেন। আপনার কথায় তো আর হবে না, গলা চড়াল অফিসার। জনতার দিকে ফিরল, সরি, আপনাদের চলে যেতে হবে এখান থেকে। যত তাড়াতাড়ি পারেন। সাংঘাতিক বিপদ হতে পারে। তাড়াহুড়ো করবেন না। আস্তে আস্তে শৃঙ্খলা বজায় রেখে নেমে যান। যান, উঠুন। না না, চেয়ার গোটানোর দরকার নেই। যেমন আছে থাক।
অফিসারের কথা মানল জনতা। উচ্ছল হল না। শান্ত হয়ে সারি দিয়ে নেমে যেতে শুরু করল। ড্রাইভওয়ে দিয়ে নামার সময় মুসার কানে এল, বিল বলছে, এত তাড়াহুড়ো করছেন কেন? যাচ্ছি তো। গিটারটা তো নিতে দেবেন?
কি যে করছে ওরা আল্লাই জানে, মুসা বলল। তবে বাজি রেখে বলতে পারি, ফোক সং-টং সব বাজে কথা।
পরদিন সকালে হেডকোয়ার্টারে মেঝেতে হাত-পা ছড়িয়ে বসে আছে ও।
বাজিতে হেরেও যেতে পার, বলল কিশোর। সামনে ডেস্কের ওপর রাখা লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমস-এর একটা সংখ্যা। সাতাশ তারিখে কলিসিয়ামে সত্যিই মিউজিক জাম্বোরি হচ্ছে।
রবিন বসেছে টুলে। আগের দিন সান্তা মনিকায় গিয়ে অন্ধ লোকটা সম্পর্কে খোঁড়া গোয়েন্দা কিছুই জানতে পারেনি সে। কোলের ওপর বিছানো একটা ওয়ার্ল্ড ম্যাপ, পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে মুসা আর কিশোরের আলোচনা শুনছে।
এই শোন, হঠাৎ মুখ তুলল রবিন। মুসা, তুমি কাল যে পতাকা দেখে এসেছ, ওটা মেকসিকান নয়। মেকসিকান পতাকা লাল, সাদা আর সবুজ। ওটা স্প্যানিশও নয়, এমনকি সেন্ট্রাল আমেরিকার কোন দেশেরও নয়।
হয়ত দেশের পতাকা নয় ওটা, বলল কিশোর। কোন সংগঠনের ব্যানার হতে পারে।
আবার ম্যাপের পাতায় মনোনিবেশ করল রবিন। খানিক পরে চেঁচিয়ে উঠল, মেসাডিওরো!
কী? মুসা অবাক। কি বললে?

মেসা ডিওরো। দক্ষিণ আমেরিকার একটা ছোট্ট রাজ্য। এই যে, দেখ ম্যাপটা। পাশে আরও দুটো ম্যাপ। একটা সবুজ, মাঝখানে স্টেট-এর সীল, আরেকটা নীল, মাঝে একগুচ্ছ সোনালি ওকপাতা। সবুজ রঙেরটা দেশের অফিশিয়াল ফ্ল্যাগ, আর নীলটার নিচে লেখা রয়েছে ওল্ড রিপাবলিক। নোট লেখা রয়েছে, দেশের কিছু কিছু অঞ্চলে নীল পতাকাটাকে বিশেষ ছুটির দিনে এখনও ব্যবহার করে রক্ষণশীল গোষ্ঠী। দুই বন্ধুর দিকে তাকাল একবার রবিন, আবার মুখ নামাল ম্যাপের দিকে। প্রশান্ত মহাসাগরের তীরেই অবস্থিত মেসা ডিওরো। বন্দর আছে। কফি আর পশম রপ্তানি করে। রাজধানীটাও একটা বন্দর, নাম ক্যাবো ডি র্যাযোন। এর দক্ষিণের উঁচু অঞ্চলে বার্লির চাষ হয়। লোক সংখ্যা পঁয়ত্রিশ লাখ।
তাই? মুসা বলল। আর কিছু?
ম্যাপ বইতে বেশি তথ্য থাকে না। যা দিয়েছে এইই বেশি, তা-ও ভাল ম্যাপ বলে।
মম, মাথা দোলাল কিশোর। মুসা, কাল যেটা দেখে এসেছ সেটাও বোধহয় কোন ধরনের সাংগঠনিক দল। দেশের কোন কাজের জন্যে টাকা সংগ্রহ করছে। কিন্তু নেতা সুবিধের নয়। পুলিশকে মিথ্যে কথা বলেছে। বোঝাই যায়। নইলে পুলিশ আসায় সতর্ক হয়ে যেত না। তাছাড়া, মিসেস নিকারো অন্ধ লোকটাকে স্বপ্নে দেখার কথা বলায় চমকে উঠেছে বিল। মুসার দিকে চেয়ে ভুরু নাচাল সে। কাল রাতে আসলে কি করছিল ওরা? ওদের সঙ্গে কি ব্যাংক ডাকাতির কোন সম্পর্ক আছে, না সভা করাটা ভিন্ন আরেক রহস্য? একটা ব্যাপার পরিষ্কার, সভা করার আসল কারণ পুলিশকে জানতে দিতে চায়নি ওরা।
চায়নি বলেই যে অপরাধ করেছে, সেটা না-ও হতে পারে, বলল রবিন। তবে ব্যাপারটা অদ্ভুত। পুলিশ জানলে অসুবিধে হবে মনে করে, অথচ কোনরকম গোপনীয়তার আশ্রয় নেয়নি। সোজা গিয়ে বসে পড়েছে মুসা, কেউ বাধা দেয়নি।
ভ্রূকুটি করল কিশোর। নিচের ঠোঁট ধরে জোরে টান দিয়ে ছেড়ে দিল। এর অর্থ, প্রশ্নের উত্তর জানার চেষ্টায় পুরোদমে চালু করে দিয়েছে মগজ।
এমনও হতে পারে, আমি যার ছবি দেখেছি, মুসা বলল। রবিন সেই লোককে দেখেনি। দুজনই অন্ধ, তবে আলাদা লোক।
বেশি কাকতালীয়, বলল কিশোর। তুমি যার ছবি দেখেছ তার গালেও কাটা দাগ। মিসেস নিকারো স্বপ্নে দেখা লোকটার চেহারার বর্ণনা দিতে চমকে উঠেছে। বিল, তারমানে ওই লোক তার পরিচিত। আর পরিচিত লোকটা ছবির লোক ছাড়া
আর কে? কিন্তু মেসা ডিওরোর সঙ্গে ওদের কি সম্পর্ক? ব্যাংক ডাকাতি কি ওরাই করেছে?
হতে পারে বিল বিদেশী এজেন্ট, আর অন্ধ লোকটা তার কনট্যাক্ট, মুসা বলল। স্পাই হলে পুলিশের কাছে অবশ্যই নিজের পরিচয় গোপন রাখার চেষ্টা করবে।

গায়ক সেজে বসাটা বিচিত্র কিছু নয়।
টেলিভিশন খুব বেশি দেখ তুমি, বলল রবিন।
গল্পের চেয়েও আশ্চর্য ঘটনা ঘটে বাস্তবে, কিশোর বলল। বিলের ব্যাপারে প্রায় কিছুই জানি না আমরা এখনও। কাজেই কি যে ঘটছে অনুমান করা মুশকিল। তবে, মেসা ডিওরো সম্পর্কে আরও তথ্য জানতে হবে আমাদের।
ঘড়ি দেখল রবিন। দশটায় লাইব্রেরিতে যেতে হবে। বইপত্র ঘেঁটে দেখব তখন।
কিশোওর! মেরিচাচীর ডাক শোনা গেল। এইই কিশোওর।
হাসল মুসা। যাও, আজও কাজ চাপাবে ঘাড়ে।
দুই সুড়ঙ্গ দিয়ে বেরিয়ে এল ওরা।
ওঅর্কশপের বাইরেই অপেক্ষা করছেন মেরিচাচী। দেখেই বলে উঠলেন, এই কিশোর, ডাকলে জবাব দিস না কেনরে? বলেই তাড়াতাড়ি স্বর নরম করে ফেললেন, ওই যে, বোরিস ডাকছে তোকে। মাল তুলবে। মুসা, বাবা, তুমিও একটু যাও, সাহায্য কর ওদের। ওই দেখ না, কি সব জিনিস নিয়ে এসেছে তোমার আংকেল। কতগুলো ভাঙা চেয়ার-টেবিল। কখন যে কোত্থেকে কি নিয়ে আসে …।
আনুক না, অসুবিধে কি? কিশোর বলল। বিক্রি তো হয়ে যায়।
তা যায়। তোর চাচার চেয়েও বোকা লোক আছে দুনিয়ায়। এই তো, কাল এক মহিলা ওগুলোর অর্ডার দিয়ে গেল। আজ আবার পৌঁছে দিতে হবে। সান্তা মনিকার ডেলটন অ্যাভেন্যুতে নাকি একটা বাচ্চাদের স্কুল খুলবে। খুলুক, আরও বেশি করে খুলুক, আমাদের ভালইআরে, রবিন, তুমি কোথায় যাও?
চাকরি, তাড়াতাড়ি জবাব দিল রবিন। আর দশ মিনিট সময় আছে।
তাহলে দেরি করছ কেন? কখনও কাজে ফাঁকি দেয়ার চেষ্টা করবে না। অফিসে লেট করে যাওয়া কোনমতেই উচিত নয়। যাও, যাও।
মাল তুলতে বেশিক্ষণ লাগল না। ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে কিশোর, সে আর সুজাও যাবে সান্তা মনিকায়।
চাচীকে রাজি করাতে কষ্ট হল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই দক্ষিণে রওনা হল ট্রাক।
সাগরের ধারে একটা সাইড স্ট্রীটের পাশে নার্সারি স্কুলটা। ট্রাক রাখল বোরিস। ওখান থেকেই দেখা যায় ওশেন ফ্রন্ট সিনিয়র সিটিজেন সেন্টারটা। একতলা একটা বাড়ি, চারপাশে লন, বসার জন্যে বেঞ্চ আছে। চারজন বৃদ্ধ এক জায়গায় বসে তাস খেলছে। কাছেই আরেকজন লাঠিতে ভর দিয়ে খেলা দেখছে। চোখে-মুখে হতাশার ছাপ স্পষ্ট। দেখে দুঃখ হল কিশোরের। লোকটা আর কেউ নয়, ড্যানি রোজার।
সারারাত ঘুমায়নি মনে হয়, মুসা বলল।

মাথা ঝাঁকাল কিশোর।
ওই চারজন তাকে এড়িয়ে যাচ্ছে না?
তাই তো মনে হচ্ছে। কারও ওপর সন্দেহ ঝুলে থাকাটা এজন্যেই খুব খারাপ। এসপার-ওসপার হয়ে যাওয়া ভাল।
লোকটাকে চেন নাকি? জিজ্ঞেস করল বোরিস।
আমাদের মক্কেল। তাহলে আর ওর ভাবনা নেই, হাত ঝাড়ল বোরিস। সব ঠিক হয়ে যাবে।
ট্রাক থেকে নেমে স্কুলের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল বোরিস। বেল টিপল। মুসা তাকিয়ে আছে সেন্টারের দিকে, হঠাৎ আরি! বলে উঠল।
কি হল? কিশোর জানতে চাইল।
ওই মেয়েটা, বলতে বলতে মাথা নুইয়ে ফেলল মুসা। যাতে তাকে দেখতে পায়।
ফুটপাত ধরে সুন্দরী এক মেয়েকে হাঁটতে দেখল কিশোর। অল্প বয়েস। মাথায় লম্বা সোনালি চুল, হাঁটার তালে তালে নাচছে। পরনে স্ন্যাকস আর গায়ে বেঢপ এক সোয়েটার। পাশে পাশে প্রায় দৌড়ে চলেছে একটা সেইন্ট বার্নার্ড কুকুর, হাঁ করা মুখ, জিভ বেরিয়ে পড়েছে।
কে? চেন নাকি?
কাল মীটিঙে ছিল, মুসা বলল। বক্তৃতা দিয়েছে। জন তার সমর্থন পেয়েছে খুব।
হুঁম! সোজা হয়ে বসল কিশোর। তীক্ষ্ণ হল দৃষ্টি। খুঁটিয়ে দেখছে মেয়েটাকে। বাহ্, খুব ভাল তো…মিস্টার রোজারের কাছে যাচ্ছে…আরে, হাতও মেলাচ্ছে দেখি।
কীই? মাথা তুলল মুসা।
কুকুরের শেকল ছেড়ে দিয়ে রোজারের দুই কাঁধে হাত রাখল মেয়েটা। উষ্ণ হেসে চুমু খেল লোকটার গালে।
খুশি মনে হল রোজারকে।, খাইছে! রোজার, ব্যাংক ডাকাতি, প্যাসিফিকে মোটেলের সভা, মিস্টার সাইমনের মানিব্যাগ, অন্ধ লোক, সবই দেখি একই সুতোয় গাঁথা!
সুতো কি ওই মেয়েটা?
নিশ্চয়ই, মুসা বলল। খুব সহজ ব্যাপার। ওই গায়ক গোষ্ঠীর সদস্য মেয়েটা। রোজারকেও চেনে বোঝা যাচ্ছে। তার কাছ থেকে ব্যাংকের খবরাখবর ওই মেয়েই নিয়েছে। অন্ধটা হল ডাকাত দলের সর্দার। ব্যাংকে যে তিনজন ঢুকেছিল, তাদের মধ্যে মেয়েটাও থাকতে পারে। ছদ্মবেশ নিয়েছিল। তাই চিনতে পারেনি রোজার। কিংবা হয়ত শুধু ইনফর্মারের কাজই করেছে মেয়েটা।

হতেও পারে, আনমনা হয়ে গেছে কিশোর। কিন্তু সভার অন্য লোকগুলো কারা? সবাই ডাকাত হতে পারে না।
ওরা…ওরা। জবাব দিতে পারল না মুসা। ওরা হয়ত নির্দোষ। ডাকাতগুলো ওদের ব্যবহার করছে…
কি কাজে ব্যবহার করছে বলতে না পেরে চুপ হয়ে গেল সে।
আড়াই লাখ ডলারে হল না, আরও টাকা দরকার? একেবারে চাঁদা তুলতে শুরু করল? নিজেকেই প্রশ্ন করল কিশোর।
হ্যাঁ, কেমন জানি ব্যাপারটা!
কিন্তু মেয়েটার সঙ্গে রোজারের পরিচয় হল কিভাবে? দেখি, একলা পেলে জিজ্ঞেস করব।
হাসছে মেয়েটা। হিবিসকাস ঝোপের সঙ্গে শেকল জড়িয়ে ফেলেছে তার কুকুর, ছুটতে পারছে না, তাই দেখেই হাসি।
তুমি থাক, কিশোর বলল। মেয়েটার পিছু নেব আমি। দেখব, কোথায় যায়। মাথা নোয়াও, মাথা নোয়াও। এদিকেই আসছে।
মেঝেতে বসে পড়ল মুসা। শুনতে পেল, মেয়েটা বলছে, আয়, আয়, আর জ্বালাসনে। আবার ওদিকে ফেরে!
জুতোর গোড়ালির খটাখট আওয়াজ তুলে ট্রাকের পাশ দিয়ে চলে গেল মেয়েটা।
আস্তে দরজা খুলে নেমে গেল কিশোর।
পথের শেষ মাথায় পৌঁছে ডানে মোড় নিল মেয়েটা। চোখের আড়াল হয়ে গেল।
দ্রুত পা চালাল কিশোর। মোড় ঘুরতেই আবার দেখল ওকে, পুরানো একটা অ্যাপার্টমেন্ট হাউসে ঢুকছে।
ধীরে এগোল কিশোর। একটা সুইমিং পুলকে তিনদিক থেকে ঘিরে রেখেছে বাড়িটা। চতুর্থ দিকে সাদা রঙ করা লোহার বেড়া। মেয়েটাকে দেখা যাচ্ছে না। তবে একটা দরজা খোলা দেখতে পেল। বেড়ার বাইরে দাঁড়িয়ে দ্বিধা করছে।
কিশোর, এই সময় দরজা দিয়ে ছুটে বেরোল সেইন্ট বার্নার্ড।
টিমি, জলদি আয়! টিমি, এই টিমি!
ছুটে গিয়ে পুলের এক প্রান্তে একটা ফুলের বেডের ওপর বসল কুকুরটা।
আরে এই শয়তান, জলদি আয়! বাড়িওলি দেখলে আমাকে সুদ্ধ বের করবে।
গেট খুলে চত্বরে ঢুকল কিশোর। গেটের পাশের মেইলবক্সের দিকে তাকিয়ে রইল চিন্তিত ভঙ্গিতে।
কাউকে খুঁজছ? মেয়েটা জিজ্ঞেস করল।
না, মানে…না, যেন বলতে ভয় পাচ্ছে। ইয়ে…।
কি?

সান্তা মনিকা ইভনিং আউটলুক। গ্রাহক হবেন?
সরি। কাগজ পড়ার সময় নেই আমার।
পকেট থেকে ছোট প্যাড আর পেন্সিল বের করল কিশোর। রাখুন না? না হয় খালি রোববারেরটাই রাখুন?
থ্যাংকস। লাগবে না।
ও, খুব হতাশ মনে হল কিশোরকে। আজকাল কাগজই রাখতে চায় না লোকে। পড়ে না।
দিনকাল খুব খারাপ তো। বাঁচার তাগিদেই হিমশিম খেতে হয়, পড়ার সময় কোথায়, হাসল মেয়েটা। কুকুরটা এসে বসল তার পায়ের কাছে। তো, কি পাবে? একশোজনকে গ্রাহক করতে পারলে একটা সাইকেল পুরস্কার?
একজনই পারি না, একশো পাব কোথায়? আপনার কি মনে হয়? এবাড়িতে আর কেউ হবে?
বাড়িতে তো এখন কেউ নেই। সবাই কাজে গেছে। বিষ্যুৎবার তো।
ও, ঠোঁটের এক কোণ ঝুলে পড়ল কিশোরের। হতাশ ভঙ্গিতে বসে পড়ল পুলের কিনারে রাখা একটা চেয়ারে। লোকের কাছে জিনিস বিক্রি যে কত কঠিন... আপনি...আপনি...।
কি ব্যাপার? কি হয়েছে তোমার?
না না, কিছু হয়নি। আমাকে...এক গেলাস পানি খাওয়াতে পারেন?
হেসে উঠল মেয়েটা। পারব না কেন? বস। নিয়ে আসছি।
খোলা দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকল ও, কুকুরটা গেল পেছনে। খানিক পরেই একটা জগ আর গেলাস নিয়ে বেরোল মেয়েটা, দরজা বন্ধ করে কুকুরটাকে আটকে রাখল ভেতরে।
কাছে এসে বলল, পাজি কুকুর। কিছুতেই সামলাতে পারি না।
মেয়েটাকে ধন্যবাদ জানিয়ে গেলাসে চুমুক দিল কিশোর। ওর পাশে আরেকটা চেয়ারে বসল মেয়েটা, রোদ লাগে, তাই মুখ ফিরিয়ে রাখল।
রাতে চেষ্টা করা উচিত তোমার। তখন বাসায় থাকে লোকে।
তাই তো মনে হচ্ছে, চেহারাটাকে বোকা বোকা করে তুলল কিশোর। আচ্ছা, এখন কি কেউ নেই? আপনি তো আছেন। দিনে আর কেউ থাকে না?
থাকে, মাঝেসাঝে।
ও। আপনি কাজ করেন না?
করি। এখন করছি না।
ও। কেন, চাকরি চলে গেছে?

না, তা যায়নি। সিনেমায় কাজ করি তো, নির্দিষ্ট কোন টাইম নেই। মেকাপের কাজ। যখন শুটিং চলে, যাই, যখন চলে না, যাই না।
মাথা ঝাঁকাল কিশোর। আমার একজন বন্ধু আছে। তার বাবাও ছবিতে কাজ করেন। স্পেশাল ইফেক্ট বিশেষজ্ঞ।
কি নাম? হয়ত চিনব।
আমান। মিস্টার রাফাত আমান।
মাথা নাড়ল মেয়েটা। না, ওই নামে কাউকে চিনি না। উনি হয়ত অন্য স্টুডিওতে কাজ করেন। স্পেশাল ইফেক্টের লোকদের দাম আছে। একেকবার ভাবি, মেকাপ ছেড়ে ওই লাইনে চলে যাব কিনা। আবার ভাবি, না, মেকাপ মন্দ কি? তবে ইচ্ছে করলে মেকাপ করার পরেও স্পেশাল ইফেক্ট শেখার সময় পাব।
ইস্কুল-টিস্কুলে যান?
না, লেখাপড়ার ইস্কুলে যাই না। তবে অভিনয় শিখতে যাই। মিখাইল পালোসকির ওখানে। একদিন না একদিন সিনেমায় অভিনয়ের চান্স পাবই।
মাথা ঝোকাল কিশোর। ঘুম ঘুম চোখ। অনেকেই অভিনয় শিখতে চায়। তবে মেকাপ শেখা আরও সাংঘাতিক। গত হপ্তায় একটা ছবি দেখলাম। ওই যে, মন্দির থেকে মূর্তি চুরি করে লোকটা। দেবতার অভিশাপ লাগে তার ওপর।
ওরকম ছবি অনেক আছে। তা অভিশাপে কি হয়? সে-ও পাথর হয়ে যায়?
না না, তাহলে তো ভালই হত। সাপ হয়ে যায়। মুখটা মানুষেরই থাকে।
অ, স্নেকম্যান ছবির কথা বলছ। ভালই। ওটার মেকাপম্যানকে চিনি, নিরো বেকারো। গুণী লোক। অ্যাকাডেমি পুরস্কারই পেয়ে যাবে কোনদিন।
আপনি কোন স্পেশাল মেকাপ করেছেন? মানে রক্তচোষা মানুষ-বাদুড়, মায়ানেকড়ে...
নাহ, আমি জোয়ান লোককে বয়স্ক বানাই বেশি। কঠিন না কাজটা। দৈত্যদানব বা মায়ানেকড়ে বানাইনি কখনও।
তাই? আচ্ছা, কাটাকুটির দাগ বানাতে পারেন? ওই যে, অনেক ভিলেন আছে না, মুখে কাটা দাগ থাকে?
শ্রাগ করল মেয়েটা। সময় লাগে অনেক সময় দিলে অনেক কিছুই করা যায়। শুধু, মেকাপ করে বুড়োকে জোয়ান বানানো যায় না। চিহ্ন থাকবেই। পুরোপুরি লুকানো সম্ভব না। এই কিছুটা তাজা করা যায় আরকি। দেখ না, যত নামকরা অভিনেতাই হোক, বুড়ো হয়ে গেলে তাকে দিয়ে আর রোমান্টিক নায়কের অভিনয় করানো যায় না।
কথার ফাঁকে ফাঁকে গেলাসে চুমুক দিয়েছে কিশোর। পানি প্রায় শেষ। আরেক গেলাস চাইতে পারে। কিন্তু দরকার কি? আর তেমন কিছু জানার নেই। এক

ঢোকে বাকি পানিটুকু শেষ করে গেলাসটা পাশের টেবিলে রেখে দিল।
অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।
আর দেব?
না, লাগবে না। মিস্টার আমানকে আপনার কথা বুলব। বলা যায় না, কোন ছবিতে একসঙ্গে কাজ করতেও পারেন দুজনে।
ভালই হবে।
ও, এতক্ষণ কথা বললাম, আপনার নামটাই জানা হল না।
সিনথিয়া ব্যানালিস। ডাক নাম সিনথি।
ও-কে। পানি খাইয়েছেন, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।
গেট দিয়ে বেরিয়ে নার্সারি স্কুলের দিকে রওনা হল কিশোর। মনে মনে খুশি। বোকার অভিনয় করে অনেক কথাই জেনে এসেছে। কিন্তু মোড় নিয়ে ডেলটন অ্যাভেন্যুতে পড়েই গুঙিয়ে উঠল।
ট্রাকটা নেই। চলে গেছে মুসা আর বোরিস, বোধহয় তার দেরি দেখেই।
দূর! দেরি করতে বলা উচিত ছিল, জোরে জোরে বলল সে। বাস ছাড়া আর উপায় নেই।
উইলশায়ারের দিকে রওনা হল সে। হাঁটতে হাঁটতেই একটা সন্দেহ মাথা চাড়া দিল তার মনে।
ডেস্কের ওপাশ থেকে দুই বন্ধুর দিকে তাকাল কিশোর। লাঞ্চের পর হেডকোয়ার্টারে আলোচনায় বসেছে। সিনথিয়ার সঙ্গে কি কি কথা হয়েছে, জানিয়েছে দুজনকে।
ধর, কিশোর বলল। অন্ধ ভিক্ষুকটা যদি পুরুষ না হয়ে মেয়েমানুষ হয়?
এক মুহূর্ত ভাবল রবিন। মাথা নাড়ল। আমার মনে হয় না।
কিন্তু হতে তো পারে? সিনথি মেকাপ আর্টিস্ট। রোজারের সাথে পরিচয় আছে। মুসা, তোমার কথাই হয়ত ঠিক। সিনথির সঙ্গে ওই ডাকাতি, অন্ধ ভিখিরি আর মীটিঙের সঙ্গে কোন যোগাযোগ আছে।
ওই লোকটা সিনথি নয়, জোর দিয়ে বলল রবিন। খুব কাছে থেকে দেখেছি অন্ধকে। খোঁচা খোঁচা দাড়ি ছিল। দু-দিন শেভ করেনি। মেকাপ করে ওরকম দাড়ি বানানো সম্ভব?
হুঁম্‌ম্‌! হতাশ হল কিশোর। যা-ই হোক, রোজারের কাছ থেকে ব্যাংকের খবর জানাটা তো কঠিন না, চেনা যখন। তারপর অন্ধ গালকাটাকে...।
কাটাটা নকল, রবিন বলল।
ভুরু কোঁচকাল কিশোর। লাইব্রেরিতে জেনে এসেছ নাকি?

হ্যাঁ, কোলের ওপর ফেলে রাখা বড় খামটা হাতে নিল। কয়েকটা ম্যাগাজিন বের করল ওটা থেকে। মেসা ডিওরো একটা দেশ বটে। ছোট, মাত্র পনেরো হাজার বর্গমাইল, লোক সংখ্যা চল্লিশ লাখের কম, কিন্তু গণ্ডগোল কম নয়। একটা ম্যাগাজিন খুলল সে। ওয়ার্ল্ড অ্যাফেয়ার্স পত্রিকায় কয়েক বছর আগে একটা আর্টিকেল বেরিয়েছিল। সেটারই সারমর্ম তুলে দেয়া হয়েছে এই ম্যাগাজিনে। দেশটার ইতিহাস অনেকখানি জানা যায় শুধু এটুকু পড়লেই। একসময় স্প্যানিশ কলোনি ছিল ওখানে। তারপর আঠারশো পনেরো সালে ওদেশী জমিদারেরা একজোট হয়ে উৎখাত করল ওখানকার বিদেশী সরকারকে। নতুন প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করে নর্জুন সংবিধান চালু করল।
ভাল করেছে, মুসা বলল। কিন্তু এর সঙ্গে অন্ধ আর ডাকাতের কি সম্পর্ক?
হয়ত কিছুই না। আমি ব্যাকগ্রাউণ্ড বলছি। তারপর আঠারশো বাহাত্তর সালে একটা বিদ্রোহ হয়। অনেক লোক মারা যায়। মরছে এখনও।
রবিনের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর।
খাইছে! চেঁচিয়ে উঠল মুসা। আঠারশো বাহাত্তরে শুরু হয়ে এখনও চলছে? তুমি বানিয়ে বলছ।
আমাকে বলতে দাও, হাত তুলল রবিন। অনেকটা ফরাসী বিপ্লবের মত। ঊনিশশো সতেরো সালে রাশিয়ায়ও হয়েছিল এরকম। মেসা ডিওরোর জমিদারেরা ভয়ানক দুর্নীতি শুরু করল। দিনকে দিন বড়লোক হতে লাগল ওরা, গরিব হল আরও গরিব। তাদেরকে কিছুই দিত না ধনীরা। অথচ এসব জমির মালিক একসময় ওই গরিবেরাই ছিল। ওরা জাতে ইনডিয়ান।
অবশেষে হুয়ান করুসসা নামে এক ইনডিয়ান একটা দল গঠন করল। বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে লাগল দেশের এখানে সেখানে। গরিবের অধিকার আদায়ের কথা বলল। তাকে ধরে জেলে পাঠিয়ে দিল কর্তৃপক্ষ।
বিপ্লবের কথা বলছিলে তুমি, মনে করিয়ে দিল কিশোর।
সেকথাই তো বলছি। সাংঘাতিক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে ততদিনে কসো। তাকে জেলে ভরায় লোকে গেল আরও খেপে। দলে দলে রাজধানীতে এসে চড়াও হল ওরা, জেল থেকে বের করে আনল করসোকে। প্রেসিডেন্ট অ্যারতোরো রডরিগেজকে ধরে ফাঁসি দিয়ে দিল। প্রেসিডেন্টের ছেলে অ্যানাসত্যাসিও রডরিগেজ পাল্টা আক্রমণ চালাল। অনেক রক্তক্ষয় হল, কয়েকবার সরকার বদল হল। অবেশেষে কসোই হল প্রেসিডেন্ট। অ্যানাসত্যাসিও পালিয়ে গেল মেকসিকো সিটিতে।
ওখানে ব্যাপারটা শেষ হয়ে গেলেই ভাল হত, বলে যাচ্ছে রবিন। কিন্তু অ্যানাসত্যাসিও পরাজয় মেনে নিতে পারল না, রাজ্যহারা রাজার মত গুমড়াতে

লাগল। কিন্তু কিছু করার ছিল না তার। জমিদাররা যারা বেঁচে রইল, তারাও পালিয়ে আসতে লাগল মেকসিকোয়, কারণ মেসা ডিওরোতে তাদের টেকা মুশকিল হয়ে উঠেছিল। শ্রমিকেরা সংখ্যা গরিষ্ঠ। ভোট দিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে। ধনীদেরকে বাধ্য করেছে বেশি ট্যাক্স দিতে।

হুঁ, বুঝতে পারছি শোচনীয় হয়ে পড়েছিল জমিদারদের অবস্থা,মুসা বলল।

খুবই শোচনীয়। একজোট হল আবার জমিদারেরা। পুরানো দিনের কথা মনে করে আফসোস করত তারা। বলত, আহা, কি সব দিনই না ছিল। প্রেসিডেন্ট অ্যারতোররার সময়। ওরা গঠন করল আরেকটা দল, দেশের মধ্যে থেকেই, নাম দিল সোলজার্স অভ দ্য রিপাবলিক। প্রতিজ্ঞা করল, তারা জিততে পারলে অ্যানাসত্যাসিওকে এনে প্রেসিডেন্ট করবে। পুরানো পতাকাই ব্যবহার করল ওরা, নীলের মাঝে সোনালি ওকপাতা। হুয়ান করুসসা নতুন পতাকা চালু করেছে, সবুজের মাঝে নীল।

ভ্রূকুটি করল কিশোর। কিন্তু এসব তো ঘটেছে একশো বছরেরও বেশি আগে। আমাদের মক্কেলের সঙ্গে মেসা ডিওরোর রাজনীতির কি সম্পর্ক? নাকি এখনও সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে জমিদারেরা? আগের প্রেসিডেন্টের ছেলের তো। এতদিনে মরে ভূত হয়ে যাওয়ার কথা।

তাই তো গেছে। এখন সংগ্রাম চালাচ্ছে অ্যানাসত্যাসিওর নাতি, ফেলিপ রডরিগেজ। মেকসিকো সিটিতেই বাস করে। সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছে ফেলিপ, কবে দেশে ফিরে গিয়ে সিংহাসনে বসবে, যে দেশকে সে চোখেই দেখেনি কখনও। অনেক গুপ্তচর আছে তার, দেশের খবরাখবর এনে দেয়।

আশ্চর্য তো! মুসা বলল। তিন পুরুষ পরে এখনও প্রসিডেন্ট হওয়ার শখ?

শখ হলে আর কি করা। তবে কথাটা সত্যি। ওয়ার্ল্ড অ্যাফেয়ার্স বলছে সোলজার্স, অভ দ্য রিপাবলিক দলটা বেআইনী নয় মেসা ডিওরোতে। দলের সদস্যরা রিপাবলিকান বলে পরিচয় দেয় নিজেদের। রোববারে জমায়েত হয়ে বিবৃতি-টিবৃতি দেয়।

বিরোধীরা কেয়ারও করে না। রিপাবলিকানদের কেউ কেউ চায় বর্তমান প্রেসিডেন্টকে উৎখাত করতে। ওরা আবার আরেকটা বিশেষ নাম নিয়েছে, ফ্রিডম ব্রিগেড। ওদেরকে স্বীকৃতি দেয়ার প্রশ্নই ওঠে না, রাষ্ট্র, ওদেরকে আউট ল ঘোষণা করেছে। দাঙ্গা-হাঙ্গামা করে ওরা, কিডন্যাপ করে, বোমাবাজি করে। বেশি বাড়াবাড়ি শুরু করলে পুলিশ বাধা দেয়। পুলিশের তাড়া খেয়ে দেশ ছাড়তে বাধ্য হয় অনেকে, পালিয়ে আসে মেকসিকো কিংবা আমেরিকায়।

তারমানে, ঢোক গিলল মুসা। কাল রাতে টেরোরিস্টদের সভায় যোগ দিয়েছিলাম? সন্ত্রাসবাদী? সব্বোনাশ!

হতে পারে, না-ও হতে পারে। মেসা ডিওরোর লোক অনেক আছে আমেরিকায়। সোলজার্স অভ দ্য রিপাবলিকের একদল সন্ত্রাস পছন্দ করে, আরেক দল করে না। তবে দুই দলই চায় ফেলিপ প্রেসিডেন্ট হোক। টাকা সংগ্রহ করে, দলের জন্যে।

চমৎকার!

সে যা হোক, এই তো গেল মেসা ডিওরোর রক্তক্ষয়ী ইতিহাসের কাহিনী। এখন আসা যাক অন্ধের কথায় পুলিশের নাম শুনেই সে-রাতে ভয়ে পালাল অন্ধ। মিসেস নিকারোর স্বপ্নের কথা শুনে চমকে উঠল বিল। তুমি কাল রাতে দেখে এলে তার ছবি। বোঝাই যায়, ছবির ওই লোককে নেতা বানিয়েই মীটিং করছিল ওরা।

ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টালো রবিন। এই দেখ, তুলে দেখাল সে, বেশ বড় একটা ছবি। কালো চশমা, গালে কাটা দাগ। মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, বক্তৃতার ভঙ্গিতে হাত তোলা। মুখ দেখেই বোঝা যায়, ছবিটা তোলার সময় চেঁচিয়ে কথা বলছিল। মুসা, এই ছবিটাই দেখেছিলে?

হ্যাঁ, এটাই। অবিকল এক চেহারা।

আমিও এই চেহারাই দেখেছি, তবে একেই কিনা জানি না। এর নাম লুই প্যাসক্যাল ডোমিনিগেজ ডি অ্যাট্রানটো। একসময় ফেলিপ রডরিগেজের সহযোগী ছিল। এ-ব্যাটা টেরোরিস্ট। মেসা ডিওরোতে বোমা মেরে চোদ্দটা বাচ্চাকে খুন করেছে একবার, স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী। দোষ চাপিয়েছে সরকারের ঘাড়ে। তার যুক্তি, শয়তান সরকার চেয়ার দখল করে আছে বলেই তাকে টেরোরিস্ট হতে হয়েছে, আর সে টেরোরিস্ট হয়েছে বলেই বাচ্চাগুলো মরেছে।

আস্ত ফ্যানাটিক, অনেকক্ষণ পর কথা বলল কিশোর। কিন্তু তুমি যাকে দেখেছ, সে আর এই ছবির লোক এক ময় বলে সন্দেহ করছ কেন?

কারণ অ্যাট্রানটো মৃত। মারা গেছে কয়েক বছর হল। কিছুক্ষণ নীরবতার পর জোরে নিঃশ্বাস ফেলল মুসা। যদি সে মৃতই হয়।

তাকে কথা শেষ করতে দিল না কিশোর। কিন্তু চেহারা তো অবিকল এক। রবিন, অ্যাট্রানটো কি অন্ধ ছিল?

হ্যাঁ। এক ওয়্যারহাউসে আগুন লাগাতে গিয়ে হয়েছিল। নিজের আগুনে নিজেই। এতেই হিরো হয়ে যায় সে।

তাহলে অন্ধ ভিক্ষুক আর অ্যাট্রানটোর চেহারা এক, চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। শুধু মেকাপ আর একটা কালো চশমা দরকার, কাউকে অ্যাট্রানটো বানানোর জন্যে। আমি ভাবছি, এসবের পেছনে সিনথিয়ার হাত নেই তো? কিন্তু কেন কেউ ওই ছদ্মবেশ নেবে? কি লাভ তার? কেউ...।

ফোন বাজল। বাধা পেয়ে বিরক্ত চোখে তাকাল কিশোর। তারপর তুলে নিল রিসিভার। হ্যালো...ও, মিস্টার রোজার!
এক মিনিট চুপচাপ শুনল সে। তারপর বলল, হুঁ, কিছু বোঝা যাচ্ছে না। তবে এড়িয়ে যাওয়ার মত নয়। যদি বলেন, আসতে পারি। এমনিতেও আপনার সঙ্গে কথা আছে।
আরেক মিনিট শুনল। বলল, হ্যাঁ। আসতে আধ ঘন্টা লাগবে।
রিসিভার রেখে দিল কিশোর। আবার রোজারকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। খুব মুষড়ে পড়েছে। দেখি, যাই, কি বলে? সিনথিয়ার কথাও জিজ্ঞেস করতে হবে। দুই সহকারীর দিকে তাকাল সে। মেয়েটার ওপর নজরও রাখতে হবে আমাদের। বিলের দলের সঙ্গে যোগাযোগ আছে কিনা জানা দরকার।
আমার দিকে চেয়ে লাভ নেই, মাথা নাড়ল মুসা। মা-র কড়া আদেশ, বিকেলের মধ্যে লনের ঘাস কেটে সাফ করতে হবে। আর আমাদের বাগানে যা ঘাসরে, ভাই, জানই তো। এক হপ্তায় ছইঞ্চি হয়ে যায়, আরও পেয়েছে বৃষ্টি। থামল এক মুহূর্ত। তাছাড়া, মেয়েটা আমাকে চিনে ফেলার ভয় আছে।
রবিন? সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল কিশোর।
আমি পারব। বিকেলে কাজ নেই।
হুঁশিয়ার, সাবধান করে দিল মুসা। বোমা মেরে যারা শিশু খুন করতে পারে, তাদেরকে বিশ্বাস নেই। জানোয়ারেরও অধম।
আধ ঘন্টা পর রোজারের দরজায় টোকা দিল কিশোর। খুলে দিল রক রেনাল্ড। গলাবন্ধ কালো শার্ট গায়ে, চোখে সানগ্লাস।
ও, তুমি, রক বলল। আমাদের মহাগোয়েন্দা। কিছু জেনে এসেছ? রোজার খুশি হবে তো?
রেগে গেল কিশোর। কিছু বলল না। ঝকঝকে পরিষ্কার লিভিং রুম পেরিয়ে রান্নাঘরে এসে ঢুকল। জানালার ধারে সেই একই জায়গায় চেয়ারে বসে আছে রোজার, হাতে কফির কাপ। তার সামনাসামনি বসল কিশোর। কফি খাবে কিনা জিজ্ঞেস করল রক।
কফি খাই না, ভদ্রভাবে বলল সে।
নিশ্চয়, রক বলল। ভুলেই গিয়েছিলাম, আমেরিকান ছেলেরা কফি খায় না। তোমাকে কিন্তু আমেরিকান লাগছে না।
আঙুরের রস মেশানো সোডা আছে, রোজার বলল। খাবে?
কিছুই লাগবে না আমার, ধন্যবাদ। লাঞ্চ সেরেই চলে এসেছি।
আমি জানতাম বাচ্চারা খাওয়া পেলেই খায়, পেটে জায়গা থাক আর না থাক, বলল রক। তুমি কি আলাদা? স্বাস্থ্য দেখে অবশ্য মনে হয় না, খাওয়ার প্রতি

তেমন টান আছে।
অনেক কষ্টে চেহারা স্বাভাবিক রাখল কিশোর।
খাও না কেন? এই বয়সেই ডায়েট কন্টোল?
জবাব দিল না কিশোর। আরেক দিকে মুখ ফিরিয়ে রইল।
স্টোভের কাছে ফিরে গেল রক। কেটলিতে পানি ফুটছে। কাপে ইনসট্যান্ট কফি বানিয়ে নিয়ে এসে বসল দুজনের কাছে। টেবিলে রাখা চিনির পাত্র থেকে চিনি নিয়ে কাপে মিশাল।
তারপর, কি খবর নিয়ে এলে? জিজ্ঞেস করল সে।
এই আরকি, কিশোর বলল। তেমন কিছু না।
তেমন কিছু পেলে কি করতে?
অবশ্যই পুলিশকে জানাতাম। –
হ্যাঁ, সেটাই উচিত। কফি শেষ করে উঠে গিয়ে কাপটা সিংকে ভেজাল রক। বেরিয়ে গেল। ড্রাইভওয়েতে একটা গাড়ি স্টার্ট নেয়ার শব্দ হল। রান্নাঘরের জানালার পাশ দিয়ে ছুটে গেল একটা নতুন মডেলের স্পোর্টস কার।
বিমর্ষ হয়ে আছে রোজার।
পুলিশ এসে দোষী বলেনি তো আপনাকে? কিশোর জিজ্ঞেস করল।
মাথা নাড়ল রোজার। নাহ, তবে একই গল্প তিনবার বলিয়েছে আমাকে দিয়ে। কিশোরের দিকে তাকাল সে। ওরা চাইছে আমি একটা ভুল করে বসি। কিন্তু আমি…আমি ভুল করছি না।
সত্যি যা ঘটেছে, তা হাজারবার বললেও ভুল হওয়ার কথা নয়। মিস্টার রোজার, আপনার দুশ্চিন্তার কোন কারণ আছে বলে আমি মনে করি না। আপনি একটা দুর্ঘটনার শিকার মাত্র। পুলিশও নিশ্চয় বুঝতে পারছে। আপনার জায়গায় অন্য কোন গার্ড থাকলেও একই ব্যাপার ঘটতে পারত। ডাকাতেরা যে মারধর করেনি, এইই বেশি।
না, তা করেনি। বরং বলা যায় দ্র ব্যবহারই করেছে। বিশেষ করে যে লোকটা কথা বলছিল।
কান খাড়া করে ফেলল কিশোর। কথা কি শুধু একজনই বলেছে?
হ্যাঁ, ঝাড়ুদারের ছদ্মবেশে যে এসেছিল।
সব কথা? আর কেউ কিছু বলেনি?
না, কিছু বলেনি।
পুরো একটা রাত তিনজন লোকের সঙ্গে কাটালেন, দুজন কোন কথাই বলল?
না।
একটা বর্ণও না?

না। তুমি বলায় এখন আমার কাছেও অদ্ভুত মনে হচ্ছে ব্যাপারটা।
হুম। ডাকাতদের কেউ কি মেয়েলোক ছিল? বোঝা গেছে?
মেয়েলোক! তা হতেও পারে। তিনজনেই প্রায় একই রকম লম্বা। পাঁচ ফুট সাতের মত। ঢোলা শার্ট আর ওভারঅল, পরে এসেছিল। হাতে গ্লাভস। মুখে এত কিছু লাগিয়েছিল, কে যে পুরুষ আর কে মেয়ে বোঝাই যায়নি। দুজন পরেছিল সানগ্লাস, আয়নার মত কাচ, চোখ দেখা যায়নি। একজনের দাড়ি ছিল, আমার মনে হয় নকল। আরেকজনের লাল পরচুলা, লাল গোঁফ। ভুরু এত মোটা, প্রায় চোখের ওপর এসে ঝুলে পড়েছিল।
যে কথা বলছে তার কথায় বিদেশী টান ছিল? বয়েস কম, না বেশি?
বুড়ো মানুষের গলা নকল করছিল। আমার বিশ্বাস, সে অল্পবয়েসী। বিশতিরিশের বেশি না। না, কথায় টান ছিল না।
আবার হুম্! বলে চুপ করে কিছুক্ষণ ভাবল কিশোর। তারপর বলল, মিস্টার রোজার, আপনি নিকারো অ্যাণ্ড কোম্পানিটা চেনেন? ফিশিং কোম্পানি। বোটও ভাড়া দেয়। ম্যালিবুর পরে ওদের ডক।
চিনি। আমার ছেলেকে নিয়ে মাঝে মাঝে মাছ ধরতে যেতাম, তখনও সে বিয়ে করেনি। মিসেস নিকারোকেও চিনি। এককালে সুন্দরী ছিল মহিলা। তার ছেলের বৌ এলসিকেও চিনি। মেয়েটা আইরিশ। সে-ও, সুন্দরী। খুব অল্পবয়েসে স্বামী মারা গেছে। বোট অ্যাক্সিডেন্ট। সেদিন এলসিই বোট চালাচ্ছিল। লাইসেন্স আছে তার।
ওদের ওখানে বিল নামে একটা লোক কাজ করে।
করে নাকি? আমরা যখন যেতাম, তখন ওই নামে কেউ ছিল না। জিম না কি যেন, এরকমই নাম ছিল একটা ছোকরার। ঘন ঘন লোক বদলায় হয়ত ওরা।
ইদানীং কখনও গিয়েছেন?
না।
তাহলে বিলকে চিনবেন না। অন্ধের ব্যাপারে কিছু জানেন?
অন্ধ? শূন্য দৃষ্টি ফুটল রোজারের চোখে। লোক?
হ্যাঁ। ডাকাতরা যখন ঢোকে, ওকেও দেখা গেছে ব্যাংকের কাছাকাছি। গালে কাটা দাগ। চোখে কালো চশমা। লাঠি ঠুকতে ঠুকতে এসেছিল।
মাথা নাড়ল রোজার। বলতে পারব না।
আজ সকালে একটা মেয়েকে দেখলাম, আপনি যখন তাস খেলা দেখছিলেন? মেয়েটা কে?
সিনথিয়া ব্যানালিস? তুমি জানলে কি করে?
আপনার সঙ্গে কথা বলতে দেখেছি।

কি হয়েছে তাতে? একটা মেয়ের বয়েসী মেয়ে কি কোন বুড়োর সঙ্গে কথা বলতে পারে না?
পারে, আমি সেকথা বলছি না। গোয়েন্দাদের কোন কিছুই উপেক্ষা করতে নেই। সিনথিয়ার সঙ্গে আপনার কেমন পরিচয়?
দেখা হলে কথা বলি। সময় পেলেই কুকুর নিয়ে বেরোয়, হাঁটাহাঁটি করে। মনে হয় কোন সিনেমা কোম্পানিতে কাজ করে। ভাল মেয়ে। দেখা হলে দাঁড়াবেই। দুচারটা কথা না বলে যাবে না।
আপনি ব্যাংকে চাকরি করেন, একথা জানে?
কি জানি। বলেও থাকতে পারি। কোন তথ্য জানতে চেয়েছে কিনা এটাই তো জানতে চাইছ? চায়নি। জাস্ট কথা বলে।
অ। তা আরও বন্ধু নিশ্চয় আছে আপনার। তাদের সঙ্গে আলোচনা করেন? ব্যাংকের কাজকর্ম সম্পর্কে?
করি। তবে কেউ এ নিয়ে ইন্টারেস্টেড হয়েছে বলে মনে করতে পারছি না।
রক রেনাল্ড?
ও নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত, এসব ফালতু আলোচনার সময় কই? বাইরে বাইরেই থাকে বেশি। এখানে যখন থাকে, তখনও কথা বিশেষ হয় না। খাওয়ার সময় খায়, বাকি সময় ঘরে দরজা আটকে বসে থাকে। মিথ্যে কথা বলছি না। ওর দরজার তালা দেখবে?
দরকার নেই, উঠে দাঁড়াল কিশোর। হতাশ হবেন না, মিস্টার রোজার। পুলিশ ঘন ঘন আসে, বার বার একই কথা জিজ্ঞেস করে, তার কারণ, ওদের ধারণা আপনি কোন জরুরি তথ্য জানাতে ভুলে যাচ্ছেন। কয়েক বার বললে হয়ত মনে পড়বে, এই আরকি।
জবাব দিল না রোজার।
সাড়ে চারটা নাগাদ ইয়ার্ডে ফিরে এল কিশোর। গেট দিয়ে না ঢুকে চলে এল বেড়ার পেছনে, যেখানে ছবিতে আঁকা একটা মাছ মাথা তুলে একটা জাহাজকে দেখছে। মাছের চোখ টিপল সে। ওপরে উঠে গেল দুটো বোর্ড। বেরিয়ে পড়ল প্রবেশ পথ, তিন গোয়েন্দার কয়েকটা গোপন পথের একটা। এটার নাম সবুজ ফটক এক।
ওখান দিয়ে ঢুকে আউটডোর ওঅর্কশপে এসে ঢুকল কিশোর। মুসার সাইকেলটা আছে। মুচকি হেসে নামিয়ে দিল আবার বোর্ড দুটো।
এই সময় কানে এল শব্দটা। কাপড়ের মৃদু খসখস আর নিঃশ্বাস ফেলার আওয়াজ।
ঝট করে ফিরে তাকাল সে।

দাঁড়িয়ে রয়েছে অন্ধ ভিক্ষুক! মাথা সামান্য কাত করে রেখেছে, গালের কাটা, দাগটা কিশোরের দিকে। খোঁচা খোঁচা দাড়ি এখন নেই। লাঠিও নেই হাতে। কাটা দাগের কারণে ভয়ঙ্কর লাগছে মুখটা।
একটা হার্টবিট মিস হয়ে গেল কিশোরের। তারই মত লোকটাও স্থির হয়ে আছে। শ্বাস টানল কিশোর, নড়ে উঠল লোকটা। আরেকটু কাত করল মাথা, চমুকে গেছে বোঝা যায়। হাতে কি যেন আছে, তার ওপর আঙুলগুলো শক্ত হল।
হঠাৎ মাইকেলের হ্যাণ্ডেল ছেড়ে দিয়ে ঝাঁপ দিল কিশোর। চেপে ধরল লোকটার হাত।
চেঁচিয়ে উঠে ঝাড়া মেরে হাত ছাড়ানোর চেষ্টা করল লোকটা।
ছাড়ল না কিশোর, প্রাণপণে আঁকড়ে ধরেছে। কব্জিতে মোচড় দিতে লাগল দুহাতে। লোকটার আঙুল খুলে গেল, মাটিতে পড়ে গেল হাতের জিনিস।
গায়ের জোরে ঝাড়া দিয়ে হাত ছাড়াল লোকটা। তারপর হামলা চালাল। প্রচণ্ড ঘুসি এসে লাগল কিশোরের চোয়ালে। চোখে সর্ষে ফুল দেখল সে। বো করে চক্কর দিয়ে উঠল মাথা। অবশ হয়ে গেল দেহ।
খুব সামান্য সময়ের জন্যে জ্ঞান হারাল কিশোর। চোখ মেলে দেখল, তাকে ডিঙিয়ে যাচ্ছে লোকটা। পৌঁছে গেল সবুজ ফটক এক-এর কাছে। ওপরে উঠল বোর্ড দুটো, আবার নামল। বেরিয়ে গেছে অন্ধ ভিক্ষুক।
মাটিতে বসে আছে কিশোর। অল্প অল্প মাথা ঘুরছে এখনও। দৃষ্টি পরিষ্কার হতেই লোকটার ফেলে যাওয়া জিনিসটার ওপর চোখ পড়ল। ওঅর্কবেঞ্চের নিচে। প্লাস্টিকের বাক্স, একপাশে কিছু ছিদ্র।
ইনটারেসটিং, বলল সে। যেন তার কথার জবাবেই দুই সুড়ঙ্গের ঢাকনা সরিয়ে উঁকি দিল মুসা। জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপার? কি বলছ?
মেহমান এসেছিল, বলে হামাগুড়ি দিয়ে চলে এল জিনিসটা তোলার জন্যে। হাতে নিয়ে দেখতে দেখতে বলল, কোন ধরনের শ্রবণ যন্ত্র। একধরনের খুদে মইক্রোফোন, স্পাইরা বলে বাগ। পত্রিকায় ছবি দেখেছি। অন্ধ লোকটা এসেছিল, বুঝলে, মোটেই অন্ধের মত আচরণ করেনি। মনে হয় ওঅর্কশপে মাইক্রোফোন লাগানোর জন্যে এসেছিল।
কানা ফকিরটা? কিশোরের হাত থেকে যন্ত্রটা নিয়ে দেখতে লাগল মুসা। কেন লাগাবে? আমাদের খোঁজই বা পেল কিভাবে? চারপাশে তাকাল সে, যেন এখনও এখানেই কোথাও লুকিয়ে রয়েছে লোকটা। আশ্চর্য!
ওঅর্কবেঞ্চের কাছে চেয়ারে বসল কিশোর। মুসার হাত থেকে যন্ত্রটা নিয়ে পেনোইফ দিয়ে খুলল। যা বলেছি। মিনিয়েচার ব্রডকাস্টিং ইউনিট। রেঞ্জ বড় জোর কোয়ার্টার মাইল।

এখন চালু নেই তো? আমরা যা বলছি, সব শুনে ফেলছে না তো ব্যাটা?
ছুরির মাথা দিয়ে খুঁচিয়ে ছোট ছোট কয়েকটা পার্টস খুলে ফেলল কিশোর। বাক্সটা বন্ধ করতে করতে বলল, এবার পারলে শুনুক। পুরো এক মিনিট নীরবে ভাবল সে, তারপর মুসার দিকে তাকাল। স্যালভিজ ইয়ার্ডে কতক্ষণ আগে ঢুকেছ?
মিনিট বিশেক।
সবুজ ফটক এক দিয়ে?
হ্যাঁ।
গম্ভীর হয়ে গেল কিশোর। তোমার পিছে পিছেই এসেছে ব্যাটা। মনে হল।
কি করে?
কাল রাতে মীটিঙেই হয়ত তোমার ওপর নজর পড়েছে। অনুসরণ করে এসেছে এখানে। কিংবা আমাদের দুজনকেই দেখেছে নিকারোদের ওখানে। কিংবা তিনজনকে, মিস্টার রোজারের বাড়িতে। যেভাবেই হোক, গত তিন দিনে কোন এক সময় তার চোখে পড়েছি আমরা, বা আমাদের কেউ। ভাবছি, আর একআধটা বাগ লুকিয়ে রেখে যায়নি তো?
আবার চারপাশে তাকাল মুসা, যেন তাকালেই যন্ত্রটা চোখে পড়বে। তারপর খুঁজতে শুরু করল দুজনে। পাওয়া গেল না। জিনিস নড়াচড়া করা হয়েছে, এমন কোন চিহ্নও নেই। আগের মতই আছে ওঅর্কশপকে ঘিরে রাখা জঞ্জাল।
অস্বস্তিতে পড়ে গেছে মুসা। বাড়ি থেকে এসেছি আমি। আমাকে অনুসরণ করলে…আচ্ছা, আমাদের বাড়ির ওপর চোখ রাখেনি তো?
মনে হয় না। ইয়ার্ডের ওপর চোখ রাখলেই যথেষ্ট।
হাতুড়ি আর পেরেক বের করে সবুজ ফটক, এক-এর বোর্ড দুটো সাময়িকভাবে আটকে দিতে চলল কিলোর। এই সময় এল রবিন। তিনজনে মিলে আটকে দিল ফটকটা। তারপর হেডকোয়ার্টারে ঢুকল।
ইন্টারেস্টিং নিউজ আছে, রবিন বলল। বিল এসেছিল সিনথিয়ার সঙ্গে দেখা করতে। চেহারা দেখে চিনেছি, তোমার বর্ণনার সাথে মিলে যায়। পুলের পাড়ে দাঁড়িয়ে বেশ কিছুক্ষণ চেঁচাল দুজনে, তর্কাতর্কি করল। স্প্যানিশ ভাষায়।
ঠিক? ভুরু কোঁচকাল মুসা।
মাথা ঝাঁকাল রবিন। বেশি চেঁচাল মেয়েটাই। কিছু একটা বোঝনোর চেষ্টা করেছে বিল, শুনতে চায়নি সিনথিয়া। শেষে লোকটাও গেল রেগে। চেঁচামেচি শুনে পাশের বাড়ির এক মহিলা বেরোল, গলিতে দাঁড়িয়ে ওদের কথা শুনল খানিকক্ষণ। তারপর পুলিশ ডাকার হুমকি দিল।

আর থাকতে সাহস করল না লোকটা। সে চলে যেতেই ঘরে ঢুকে হ্যাণ্ডব্যাগ নিয়ে এল সিনথিয়া। কয়েক মিনিট পরে দেখলাম একটা গাড়ি চালিয়ে চলে যাচ্ছে। আরও আধ ঘন্টা দাঁড়িয়ে রইলাম। আসছে না দেখে চলে এসেছি।
হুঁম! মাথা দোলাল কিশোর। কি নিয়ে ঝগড়া করল কে জানে। যাকগে। এখন দেখি, আমরা কতটা এগিয়েছি? টেবিলে কনুই রেখে সামনে ঝুঁকল সে। অন্ধ ফকির ডাকাতিতে জড়িত, এটা বলা যায় এখন। বিল জড়িত, তার দুই বন্ধু জড়িত। বিল আর মিস্টার রোজারের সঙ্গে যোগাযোগ আছে সিনথিয়ার। যেহেতু সে মেকাপ আর্টিস্ট, সন্দেহ করতে বাধা কোথায় সে-ই মেকাপ করে কাউকে অ্যাট্রানটো বানিয়েছে? সে নিজেও পুরুষ সেজে ডাকাতিতে গিয়ে থাকতে পারে। রোজার বলেছে, তিনজন ডাকাতের মাত্র একজন কথা বলেছে, অন্য দুজন। কিছুই বলেনি।
মেয়েলি গলা চিনে যাবে, এই ভয়ে? মুসার প্রশ্ন।
হতে পারে। কিংবা ওরা ইংরেজি জানে না। স্প্যানিশ বললে ধরা পড়ার ভয় আছে। হয়ত মেসা ডিওরোর নাগরিক ওরা।
বিলের দুই বন্ধুও হতে পারে, বলল মুসা। কোত্থেকে এসেছে ওরা, বলতে পারব না। স্প্যানিশ বলেছিল। হয়ত ইংরেজি জানেই না।
বিল জানে। দুটো ভাষাই জানে চমৎকার। ওদের সম্পর্কে ভালমত খোঁজখবর করা দরকার। রবিন, নিকারোদের ওখানে এখন একমাত্র তোমাকেই কেউ চেনে না। জেটির কাছে গিয়ে চোখ রাখবে। পারবে তো?
পারব।
আমি যাব সিনথিয়াদের ওখানে। মুসা, তুমি হেডকোয়ার্টারেই থাক। কানাটা আবার আসতে পারে। নাম তো জানি না ব্যাটার, কানা না হলেও কানা বলতে হচ্ছে।
গালকাটাও বলা যায়, মুসা বলল। যদিও সত্যি কাটা কিনা বলা মুশকিল। এলে কি করব? পুলিশকে ফোন করব?
পারলে অবশ্যই করবে। খুব সাবধানে থাকবে। আমাদের ঠিকানা জেনে গেছে সে। হয়ত জানে, কিংবা আন্দাজ করেছে আমরা কি করছি। একবার পালিয়েছে বটে, আবার না-ও পালাতে পারে। বাগের বদলে বোমা ফেলে গেলে সর্বনাশ!
মজার কাজ করছেন, রবিন বলল।
জেটির কিনারে দাঁড়িয়ে আছে সে। শুক্রবারের সকাল। জোয়ার নেমে গেছে। বিল রয়েছে টিনার ডেকে, হুইলহাউসের দেয়াল রঙ করছে। জবাব দিল না লোকটা। এমনকি মুখ তুলেও তাকাল না।

গত বছর আমাদের বাড়ি রঙ করা হয়েছিল, আবার বলল রবিন। মিস্ত্রিদের সাহায্য করেছিলাম। জানালার চৌকাঠগুলো রঙ করেছিলাম আমি।
ফিরে তাকাল বিল। হাতের ব্রাশের দিকে তাকাল একবার। হুইল হাউসের কাছ থেকে সরে এসে ওটা বাড়িয়ে দিল রবিনের দিকে।
লাফ দিয়ে ডেকে উঠল রবিন। হেসে ব্রাশটা নিয়ে রঙ.শুরু করল। তার কাজ দেখছে বিল।
কয়েক মিনিট নীরবে ব্রাশ ঘষল রবিন। তারপর বলল, বাহ, বোটে রঙ করা তো আরও মজার।
ঘোঁৎ করল শুধু বিল।
একবার বোটে করে বেড়াতে গিয়েছিলাম, রবিন বলল। বন্ধুর চাচার সঙ্গে। কি যে দারুণ লাগছিল না। হঠাৎ ঝড় এসে সব মজা নষ্ট করল। বানিয়ে বানিয়ে সমুদ্র যাত্রার রোমাঞ্চকর এক গল্প বলতে লাগল সে। বিল না হাসা পর্যন্ত বলেই গেল।
হ্যাঁ, একে বলে সী-সিকনেস, বলল বিল। বমি আর পেসাব-পায়খানা করে সব নষ্ট করে ফেলে। আমার অবশ্য কখনও ওরকম হয়নি।
বিলও একটা ভয়াবহ ঝড়ের গল্প শোনাল। শুনে অবাক হওয়ার ভান করল রবিন। যেন সমুদ্র সম্পর্কে কোন জ্ঞানই নেই এমন ভাব করে নানারকম প্রশ্ন করল। কিন্তু দরকারি কিছু জানার আগেই জেটিতে এসে দাঁড়াল দুজন লোক। স্প্যানিশ ভাষায় ডাকল। ফিরে তাকাল বিল। রবিনের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে একজন ইশারা করল বিলকে, নেমে গেল সে। হাঁটতে হাঁটতে দূরে চলে গেল।
কথা বলছে তিনজনে। এতদূর থেকে শোনা যায় না। কিন্তু ওদের ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করল রবিন। হাত তুলে তীরের দিকে দেখাল একজন। আরেকজন দেখাল উত্তরে, যেন বোঝাচ্ছে ওদিক থেকে উপকূল ধরে কিছু আসছে। শ্রাগ করল বিল। হাত তুলে ঝাঁকাল একজন। অন্যজন ঘড়ি দেখিয়ে জরুরি কিছু বলল বিলকে।
অবশেষে ঘুরে দাঁড়াল বিল। অন্য দুজন হাঁটতে লাগল পুরানো একটা ছোট কেবিনের দিকে। রবিন অনুমান করল, ওরাই বিলের রুমমেট।
রবিনের কাজের প্রশংসা করল বিল।
দারুণ স্প্যানিশ বলেন তো আপনি, রবিন বলল। আপনার বন্ধুরাও।
আমার সেকেণ্ড ল্যাংগুয়েজ। আমার বন্ধুরা এসেছে দক্ষিণ আমেরিকা থেকে, ভাল ইংরেজি বলতে পারে না। তাই ওদের সঙ্গে স্প্যানিশই বলতে হয়।
পার্কিং লটের কাছে বাড়িটা থেকে মিসেস নিকারোকে বেরোতে দেখল রবিন। হাতের ট্রেতে একটা থার্মোস জগ আর কয়েকটা কাপ। বাড়ি আর ছোট অফিসটার মাঝামাঝি পৌঁছে এদিকে ফিরে তাকাল মহিলা। রবিনের হাতে ব্রাশ

দেখেই বুঝে থমকে দাঁড়াল এক মুহূর্ত। প্রায় তিরিশ মিটার দূর থেকেও মহিলার চেহারার উত্তেজনা নজর এড়াল না রবিনের।
কয়েক সেকেণ্ড পর গিয়ে অফিসে ঢুকল মিসেস নিকারো। একটু পরেই অফিস থেকে বেরিয়ে জেটির দিকে এগিয়ে এল এলসি। গায়ে নীল ওঅর্ক শার্ট, গলার কাছটায় খোলা। একটা নীল-সাদা রুমাল বাঁধা গলায়। পরনে রঙচটা জিনস, পায়ে মলিন স্নিকার। রেগে আছে মনে হল।
রঙ তো তোমার করার কথা, কাছে এসে বলল এলসি। গলা চড়াল না বটে, তবে কণ্ঠে ঝাঁঝ ঠিকই প্রকাশ পেল।
ছেলেটা সাহায্য করতে চাইল, তাই, মিনমিন করে বলল বিল। রঙ করতে নাকি ভাল লাগে।
ঠিকই, ম্যাডাম, খুব ভাল লাগে আমার।
বেশ, যা করেছ করেছ, বাকিটা বিল করবে। আমার শাশুড়ি দেখা করতে। বলেছে তোমাকে।
আমাকে? নিজের বুকে হাত রাখল রবিন।
অফিসে আছে, অফিসটা দেখাল এলসি। তোমাকে ডেকে নিয়ে যেতে বলল। ব্রাশটা দিয়ে চলে এস। বিল, শোন, বেশি দেরি কর না। লারমারদের ওখানে গিয়ে তেল আনতে হবে আমাদের। তেতাল্লিশজন লোক আসবে কাল সকালে, সাতটায়। সময় বেশি নেই হাতে। সব রেডি রাখতে হবে।
আচ্ছা, বলে জোরে জোরে ব্রাশ ঘষতে আরম্ভ করল বিল।
হাসল রবিন। বুঝল, আদেশ দিতে এবং সেটা মানাতে পছন্দ করে এলসি নিকারো। আগে আগে প্রায় লাফাতে লাফাতে চলল সে, হাঁটার তালে তালে নাচছে লাল চুল। পিছে চলল রবিন। ওরা ঢোকার আগেই দরজায় এসে দাঁড়াল মিসেস নিকারো।
বাড়িতে যাচ্ছি, বউকে বলল মহিলা। রবিনের দিকে ইশারা করে বলল, ইয়াং ম্যান, তুমি এস আমার সঙ্গে।
চলল রবিন। অবাক হয়ে ভাবছে, ঘটনাটা কি? লিভিং রুমে নিয়ে এল তাকে মহিলা। বিদেশী গন্ধ যেন সব কিছুতেই লেগে রয়েছে, এমনকি পিঠ উঁচু আর্মচেয়ার আর লম্বা, বিচ্ছিরি দেখতে সোফাগুলোতেও।
বস, একটা চেয়ার দেখিয়ে বলল মহিলা।
দুজনেই বসল। মিসেস নিকারোর পরনে কালো পোশাক। কোলের ওপর ভাঁজ করে রাখল হাত। রবিনের দিকে তাকাল। চোখের সে-তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সইতে পারল না রবিন, মুখ ফেরাল।
তোমাকে আগে দেখেছি, মহিলা বলল।

আ-আমার মনে হয় না।
না হলে কি হবে, আমি দেখেছি। স্বপ্নে। বাস্তবে দেখব ভাবিনি।
জবাব আশা করছে মিসেস নিকারো। কিন্তু কি জবাব দেবে রবিন? কথা হারিয়ে ফেলেছে যেন। খানিক পর জোর করে মুখ দিয়ে যা বের করল, সেটা কাশি আর কোলাব্যাঙের ঘড়ঘড়ানির মিশ্রণ। কেশে গলা পরিষ্কার করে বলল, আমি...আমি শুধু সাহায্য করছিলাম...আগে আর কক্ষণও এখানে আসিনি...। থেমে গেল সে।
মিসেস নিকারো ভুল করছে, একথা প্রমাণ করে তার মনে কষ্ট দেয়ার ইচ্ছে নেই রবিনের কিন্তু মহিলা ভয় পাইয়ে দিয়েছে তাকে। বিশ্বের এই আধুনিকতম শহরে এই শতাব্দিতে যেন মানায় না মহিলাকে। তার জন্মানো উচিত ছিল পৌরাণিক আমলে, গুহায় বসে লোকের ভূত-ভবিষ্যৎ বলত আর তাদেরকে হুঁশিয়ার করত।
ঘরটা গরম। তবু শীত শীত লাগল রবিনের।
হাত কোলের ওপর রেখেই সামনে ঝুঁকল মহিলা। মুখে বয়েসের ভাঁজগুলো স্পষ্ট হল আরও। এখানে থাকার কথা নয় তোমার। নিশ্চয় কোন উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছ। সেটা কী?
কো-ক্কোন উদ্দেশ্য নিয়ে নয়, জোরে কথা বলতে ভয় পাচ্ছে রবিন। এমনি... এমনি এসেছি...সময় কাটাতে...। চোখ সরিয়ে নিল আরেকদিকে। ভয়, মহিলা তার মনের কথা পড়ে ফেলবে।
বিপদের মধ্যে রয়েছ তুমি চলে যাও। আর কখনও এখানে আসবে না। আমার কথা না শুনলে বড় বিপদে পড়বে। সাংঘাতিক দুর্ঘটনা ঘটবে। আমার স্বপ্নে ভয়াবহ ঝড়ের মধ্যে দেখেছি তোমাকে। প্রচণ্ড শব্দ হল। ঝড়ের কেন্দ্র থেকে নিচে পড়তে লাগলে তুমি, নিচে, নিচে, আরও নিচে...ফাঁক হয়ে গেল ধরণী, তলিয়ে গেলে তুমি।
হাত কাঁপছে রবিনের। শান্ত করার চেষ্টা করল। কিশোরের মুখে শুনেছে, মহিলার স্বপ্ন নাকি ফলে যায়। কিশোরও অবশ্য শুনেছে অন্যের মুখে। ধরণী ফাঁক হয়ে গেল বলে কি বোঝাতে চাইল? ভূমিকম্প? তাহলে আর হুঁশিয়ার করে লাভ কি? শুধু জেটিতে না এলেই কি ভূমিকম্প থেকে বেঁচে যাবে রবিন?
ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল মহিলা, যেন ফুঁসে উঠল একটা সাপ। নিশ্চয় ভাবছ আমি পাগল। তোমাকে বলা হয়ত উচিত হয়নি। ফিরে গিয়ে ছেলেমেয়ের দল নিয়ে আসবে হয়ত, পাগলি বুড়ি; ডাইনী বুড়ি, ইটালিয়ান ভূত বলে খেপাবে আমাকে। কিন্তু সত্যি বলছি, তোমাকে স্বপ্নে দেখেছি আমি। তোমার মৃত্যুর সময় ওখানে হাজির ছিলাম!
সামনের দরজা খুলে গেল। ঘরে ঢুকল এক ঝলক বিশুদ্ধ হাওয়া। কাছে এসে দুজনের মুখের দিকে তাকাল এলসি। জোর করে হাসল। কি ব্যাপার? নিশ্চয়

আরেকটা দুঃস্বপ্ন, নাকি?
যদি হয়, কি করবে? ভুরু কোঁচকাল বৃদ্ধা। রবিনের হাঁটু ছুঁল। আমি বুঝেছি, এই ছেলেটা ভাল, পরিশ্রমী। সেজন্যেই চলে যেতে বলছি। ওর ভাল চাইছি বলে। নইলে আমার কি ঠেকা? উঠে দাঁড়াল মিসেস নিকারো। যাই। অনেক কাজ। বিকেলেই মেহমান আসছে। সব কিছু গুছিয়ে রাখতে না পারলে...।
তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে গেল মিসেস নিকারো।
তোমার কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো? এলসি জিজ্ঞেস করল।
না, ঠিক আছি। থ্যাংক ইউ।
ঘরটা আর সহ্য করতে পারছে না রবিন। মনে হল, তার গায়ের চামড়ায় কিলবিল করছে হাজারখানেক শুয়োপোকা। দমকা হাওয়ার মত ঘর থেকে বেরিয়ে এল সে।
সৈকত ধরে এগিয়ে আসছে বিলের দুই বন্ধু। এখনও হুইলহাউস রঙ করার্য ব্যস্ত বিল। বিশ মিনিট আগে সব কিছু যেমন দেখে গিয়েছিল রবিন, তেমনি রয়েছে, শুধু বদলে গছে তার মন। বিপদ আসছে! হুঁশিয়ার করে দিয়েছে তাকে মিসেস নিকারো।
হাইওয়ের একশো মিটার ভাটিতে একটা খুদে শপিং প্রাজা। একটা ছোট মার্কেট, একটা পোবাখানা আর একটা রীয়্যাল-এস্টেট অফিসও দেখতে পেল রবিন। মার্কেটের সামনে টেলিফোন বুদ। গিয়ে তিন গোয়েন্দার হেডকোয়ার্টারে ফোন করল সে।
সঙ্গে সঙ্গে ধরল মুসা। রবিনের গলা শুনে বলল, ভল আছ?
ভালই। মিসেস নিকারোর সঙ্গে কথা হয়েছে আমার, সব খুলে বলল রবিন।
দীর্ঘ এক মুহূর্ত নীরবতা। তারপর মুসা বলল, রবিন, ব্যাপার সুবিধের মনে হচ্ছে না। তুমি চলে এস। একা আসতে পারবে? না আমি আব?
দরকার নেই। স্বপ্ন স্বপ্নই, মুসাকে নয়, নিজেকে বোঝাল রবিন।
আসবে না? খুব সাবধানে থাকবে তাহলে, বুঝেছ?
থাকব। এখন আসা ঠিক হবে না। কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে এখানে। বিলের দুই দোস্তের কথা মনে আছে না? ওরা ঘোরাঘুরি করছে ডকের কাছে। কোন কারণে উত্তেজিত।
হাইওয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে এল একটা পিকআপ ট্রাক। নিকারোদের ড্রাইভওয়ে ধরে গিয়ে থামল পার্কিং লটে খাকি পোশাক পরা লম্বা এক লোক নেমে এগিয়ে গেল জেটির দিকে।
ফোনের কাছে থাক, বলে লাইন কেটে দিল রবিন।

হাইওয়ের ধারে গাড়ি জমছে-ক্যাম্পারদের ভ্যান, কার এ-সবই বেশি। ওগুলোকে এক পাশে, জেটিকে অন্য পাশে রেখে মাঝখান দিয়ে এগোল রবিন।
টিনার কাছে দাঁড়িয়ে আছে বিলের দুই বন্ধু। ওদের কাছে এগিয়ে গেল লম্বা লোকটা। ওদের কথা শোনার জন্যে থামল রবিন। রেগে গেছে বিল, তার হাত নাড়া দেখেই বোঝা যায়।
একটা ভ্যানের পাশ ঘুরে বালিতে নামল রবিন, সৈকত ধরে এগোল জেটির দিকে। চলে এল একটা খিলানের নিচে, খেয়াল করল না লোকগুলো। খিলানের সঙ্গে বাঁধা রয়েছে তার সাইকেল। সেদিকে একবার তাকিয়েই হাঁটা দিল পানির দিকে।
পানির কিনারে পৌঁছে থামল। কান পাতল কথা শোনার জন্যে। চারজনের গলাই শুনতে পাচ্ছে, বুঝতে পারল না.কিছু। এখনও অনেক দূরে। ওদের কথার চেয়ে ঢেউ ভাঙার শব্দ এখানে জোরাল।
ভ্রূকুটি করল রবিন। কাছে গিয়ে কি কোন লাভ হবে? ওরা স্প্যানিশ বললে কিছু বুঝতে পারবে না সে।
জেটিতে পায়ের শব্দ শোনা গেল। এগিয়ে আসছে লোকগুলো। হাঁটছে, কথা বলার জন্যে থামছে। বলা শেষ করে আবার হাঁটছে। কাছে, আরও কাছে, একেবারে রবিনের মাথার ওপরে চলে এল ওরা। জেটির নিচ দিয়ে ওদেরকে অনুসরণ করে চলল সে। বালিতে হাঁটছে, ফলে পায়ের শব্দ হচ্ছে না তার।
ওকে, মাইস, বিলের গলা। দাঁড়িয়ে পড়েছে। বুঝলাম। টাকা না দেখে কিছু করবে না তুমি। আমরাও মাল দেখতে চাই। ভাল হতে হবে।
গুড, নিশ্চয় মাইস, কারণ কথায় কোনরকম টান নেই। কিন্তু তোমরা কি পারবে? দেখে তো মনে হচ্ছে না। তোমাদের সঙ্গে কথাই বা বলছি কেন? আমি জিনোর সঙ্গে দেখা করতে চাই। লেনদেনটা তার সঙ্গে হওয়াই বোধহয় ভাল।
আমি জিনোর প্রতিনিধি, বিল বলল। বেশ, কিছু অগ্রিমের ব্যবস্থা নাহয় করি।
কর। কত দেবে।
চার ভাগের এক ভাগ। মাল বুঝে পেয়ে তারপর বাকিটা দেব।
অর্ধেক অগ্রিম, ভোতা গলায় বলল মাইস। বদলে গেছে কণ্ঠস্বর। বাকিটা নেব মাল ডেলিভারি দিয়ে। নো অগ্রিম, নো মাল। তোমাদের কাছে বেচার এত ঠেকা নেই আমার, ভাল করেই জান। কেনার অনেক মক্কেল আছে।
কিছুক্ষণ চুপচাপ। অবশেষে বিল বলল, বেশ, অর্ধেকই দেব। কিন্তু বাকি টাকা পাবে মাল আমাদের হাতে আসার পর। প্যাসিফিক স্টেটসে চলে যাও, ওখানেই থাকবে। টাকা জোগাড় করেই খবর দেব।
এখানে থাকলে ক্ষতি কি? এসব ছোটাছুটি ভাল্লাগছে না আমার।

অসুবিধে আছে। টাকা জোগাড় করতে সময় লাগবে। মিসেস নিকারোও পছন্দ করবে না তোমার সঙ্গে আমাকে দেখলে। তার ধারণা, আমি খালি কাজে ফাঁকি দেয়ার তালে থাকি। যা বলছি তা-ই কর।
আবার চুপচাপ। রবিন অনুমান করল, অফিসের দিকে তাকিয়ে আছে মাইস। আর কোন সন্দেহ নেই, অফিস থেকে তার ওপর নজর রাখছে এলসি নিকারো।
ঠিক আছে, রাজি হল মাইস। এখানে আসাটাই বোধহয় উচিত হয়নি আমার। আমি তোমার অপেক্ষায় থাকব। বেশি দেরি করবে না, তাহলে পস্তাবে। আমার চেয়ে তোমাদের ঠেকা বেশি, মনে রাখবে কথাটা।
চলে গেল মাইস। কথা শুরু করল বিল আর তার দুই বন্ধু। এবার ইংরেজি নয়, স্প্যানিশ। বোধহয় মাইসের সঙ্গে কি কথা হয়েছে, সেটাই বলছে বিল। শুনে রেগে গেল দুই বন্ধু, তাদের কণ্ঠস্বরেই বোঝা গেল।
হালকা পদশব্দ শোনা গেল। কে ওই লোকটা? কড়া গলায় জিজ্ঞেস করল এলসি।
ওই একটা ফিশিং ক্লাবের মালিক, জবাব দিল বিল। রাস্তা থেকে নাকি বোটটা দেখেছে, টিনাকে। জানতে চাইল ভাড়া পাওয়া যাবে কিনা।
এরপর কেউ বোট ভাড়া চাইতে এলে সোজা আমার কাছে পাঠাবে।
আচ্ছা।
যাও, লাঞ্চ সেরে এস। একটার মধ্যে আসবে। তারপর পেট্রল আনতে যাব। আর তোমার দুই দোস্তকে ঘরে থাকতে বলবে, বুঝেছ? সারাক্ষণ এখানে ঘুরঘুর করে কেন? যত্তোসব!
আচ্ছা, বলব।
ওরা চলে যাওয়ার পরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল রবিন। ভাবছে, প্যাসিফিক স্টেটসটা কোথায়? শহর? নামও শোনেনি কোনদিন। আবার এসে টেলিফোন বুদে ঢুকল সে। ডিরেক্টরিতে ওরকম কোন শহরের নাম খুঁজে পেল না। তবে পি-এর সারিতে পাওয়া গেল একটা কোম্পানির নাম, প্যাসিফিক স্টেটস মুভিং অ্যাণ্ড স্টোরেজ কোম্পানি, অক্সনার্ডের ওয়েস্ট অ্যালবার্ট রোড-এ। ওই নাম্বারে ফোন করে মিস্টার মাইসকে চাইল।
একটা লোক জানাল, তিনি নেই এখন। এলে কিছু বলব? না। আবার ফোন করব আমি।
লাইন কেটে দিল রবিন। হেডকোয়ার্টারে করতে যাবে, এই সময় দেখল মার্কেট থেকে বেরিয়ে আসছে একটা লোক। গাড়ির দিকে এগোচ্ছে। বুদ থেকে বেরিয়ে তাড়াহুড়ো করে ওর দিকে এগোল রবিন।
আরে, রবিন, এখানে কি?

লোকটা রবিনদের প্রতিবেশী, ওদের বাড়ির উল্টোদিকে থাকে, রাস্তার অন্যপাড়ে, মিস্টার ওয়াগনার। এই এমনি এলাম, জবাব দিল রবিন। মাছধরা দেখতে। আগামী হপ্তায় ভাবছি আমিও আসব ধরতে, বাবার সঙ্গে।
অ, চারপাশে তাকাল ওয়াগনার। সাইকেল এনেছ?।
মাথা নাড়ল রবিন। না। এক বন্ধু লিফট দিয়েছে। প্রয়োজনের সময় কিশোরের মত মিথ্যে বলতে পারে না সে, তবু চেষ্টা করে মাঝে মাঝে। গোয়েন্দাগিরিতে মিথ্যে বলতেই হয়, উপায় নেই। আপনি উত্তরে যাবেন, না?
হ্যাঁ। কি করে বুঝলে? এমনি, আন্দাজ করলাম।
ক্যারপিনটেরিয়ায় যাচ্ছি, বোনকে দেখতে।
আমিও ভাবছিলাম ওখানেই যাবেন। অক্সনার্ডে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল অসুবিধে হবে নিতে?
না না, অসুবিধে কিসের? একাই যাচ্ছি। কিন্তু আজ তো আমি ফিরব না। একা বাড়ি যাবে কিভাবে?
বাসে চলে যাব। এখন নিতে আপনার অসুবিধে না হলেই হয়।
ওয়াগনারের ছোট সেডানে প্যাসেঞ্জার সিটে উঠে বসল রবিন।
রাস্তার মোড়ে বসে আছে কিশোর। অ্যাপার্টমেন্ট হাউসটার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে ক্লান্ত, বিরক্ত হয়ে পড়েছে সে। সিনথিয়াকে গ্রাহক বানানোর চেষ্টা করেছে। আরেকবার। সকাল নটায়। আগের বার তো অন্তত কথা বলেছিল, এবার তা-ও বলল না।
ফিরে এসে পথের মোড়ে বসেছে কিশোর। দেখেছে, ময়লা কতগুলো কাপড় নিয়ে বাড়ির পেছনের একটা ঘরে গিয়ে ঢুকেছে সিনথিয়া, কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে এসেছে ধোঁয়া, ইস্তিরি করা কয়েকটা কাপড় নিয়ে। এখন পুলের কিনারে বসে বসে নখের পরিচর্যা করছে। আবার মেয়েটার সঙ্গে কথা বলতে খুব ইচ্ছে করছে কিশোরের। ছুতো দরকার। বলবে নাকি গিয়ে অর্ডার বুক হারিয়ে ফেলেছে, খুঁজতে এসেছে? উঠে পড়ল সে। রাস্তা পেরোল। কিন্তু বাড়ির গেটে পৌঁছেই থমকে গেল। লম্বা কর্ড লাগানো একটা টেলিফোন বের করে এনে সিনথিয়া কথা বলছে, লোরিনা নামে একটা মেয়ের সঙ্গে।
দূর, অভিনয় একদম ভাল না, সিনথিয়া বলছে। তবে শুনলাম ইফেক্ট নাকি সাংঘাতিক। স্পেসশিপটা ফাটার সময় নাকি দর্শকের কাপ তুলে দেয়। ফোন করেছি, ওরা বলল দুটোয় শো। যাওয়ার আগে একআধটা স্যাণ্ডউইচ খেয়ে নিলে। কেমন হয়?
ফিরল কিশোর। সিনেমায় যাবে সিনথিয়া। পিছু নিয়ে গিয়ে লাভ নেই, অযথা বসে থাকতে হবে হলের বাইরে। সে তো কিছুই করতে পারল না, রবিন কি করছে?

কিছু করতে পারছে? রোজারকে আদৌ কোন সাহায্য করতে পারবে তো ওরা? বিল আর দুই বন্ধু-ই কি ডাকাত? কিভাবে প্রমাণ করা যাবে? এসব কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ টেলিভিশনে দেখানো একটা সিনেমার কথা মনে পড়ে গেল কিশোরের। তাড়াতাড়ি সাইকেলে উঠে ফিরে চলল ইয়ার্ডে।
হেডকোয়ার্টারেই রয়েছে মুসা। ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছে অলস ভঙ্গিতে। বসে থাকতে থাকতে বিরক্ত হয়ে গেছে। কিশোরকে দেখে বলল, যাক, এলে। আর ভাল্লাগছিল না একা একা। হ্যাঁ, রবিন ফোন করেছিল।
তাই? কি বলল? তার মনে হয়েছে, কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে নিকারোদের ওখানে। বিলের দুই বন্ধু ডক এলাকায় ঘুরঘুর করছে। উত্তেজিত। আর মিসেস নিকারো নাকি স্বপ্নে দেখেছে রবিনকে। স্বপ্ন-বৃত্তান্ত জানাল মুসা।
উত্তেজিত হয়ে উঠল কিশোর। কতক্ষণ আগে করেছে?
এই আধ ঘন্টা। কিছু বেশিও হতে পারে। আমি বললাম চলে আসতে। ও রাজি হল না।
মাথা দোলাল কিশোর। শোন, আমিও যাচ্ছি ওখানে। ওই তিনজনের ছবি তোলার চেষ্টা করব। রোজারকে দেখালে হয়ত চিনতে পারবে।
ডার্করুম থেকে একটা ক্যামেরা বের করে আনল কিশোর, টেলিফটো লেন্স লাগানো। ফোনের কাছে থাকবে।
আধ ঘন্টা পর নিকারোদের ওখানে পৌঁছল সে। টিনা নেই। কাচেঘেরা ছোট অফিসটা শূন্য। এলসি বা মিসেস নিকারো, কাউকে দেখা যাচ্ছে না।
খিলানে বাঁধা রবিনের সাইকেলটা দেখতে পেল সে। তারটাও নিয়ে বাঁধল ওখানে। সৈকতে মানুষ আছে। কেউ হাঁটু পানিতে দাঁড়িয়ে ঢেউয়ের মধ্যে মাছ ধরছে। কুকুর নিয়ে খেলছে একটা বাচ্চা। কিন্তু রবিন নেই। পার্কিং লটে চলে এল সে। সেখানেও কেউ নেই। একটা স্টেশন ওয়াগন দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল নিকারোদের বাড়ির কাছে।
দরজার সামনে এসে দাঁড়াল কিশোর। বেল বাজানোর আগেই খুলে গেল পাল্লা। দাঁড়িয়ে আছে মিসেস নিকারো। অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে তাকাল তার দিকে।
মিসেস নিকারো, আমার বন্ধুকে দেখেছেন? কিশোর জিজ্ঞেস করল।
তোমার বন্ধু?
সকালে আপনি তার সঙ্গে কথা বলেছেন। তাকে নাকি স্বপ্নে দেখেছেন।
অ, ওই ছেলেটা। সে তোমার বন্ধু। বোঝা উচিত ছিল আমার। এমন ভাবে তাকাল মহিলা, যেন রাগ করেছে, কিন্তু কিশোর বুঝতে পারল আসলে রাগেনি।
খিলানের নিচে ওর সাইকেলটা বাঁধা দেখলাম, ওকে দেখছি না। গেল কোথায়? আপনার বউমার সঙ্গে বোটে করে যায়নি তো কোথাও?

মাথা নাড়ল মিসেস নিকারো। না। এলসি গেছে বিলের সঙ্গে, টিনাকে নিয়ে। আর কাউকে দেখিনি বোটে।
তাহলে গেল কোথায়!
জানি না, বলতে বলতে পিছিয়ে গিয়ে পাল্লা পুরো খুলে দিল মহিলা। খারাপ কিছু একটা ঘটবে, বুঝতে পারছি। আমার স্বপ্ন মিথ্যে হয় না। এস, ভেতরে এস।
রবিনের বিপদের আশঙ্কায় শঙ্কিত হল কিশোর।
স্টোরেজ কোম্পানির দিকে এগোচ্ছে রবিন। এলাকাটা নির্জন। শেকলের তৈরি উঁচু বেড়া। বিল্ডিংটায় কোন জানালা দেখা যাচ্ছে না। কাদামাথা কয়েকটা সাদা রঙের মুভিং ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে। গেট থেকে সোজা চলে গেছে ড্রাইভওয়ে, এবড়োখেবড়ো, জায়গায় জায়গায় গর্ত, পানি জমে আছে। গেট বন্ধ।
কাউকে চোখে পড়ছে না। বাইরে থেকে কোম্পানি-এলাকার চারদিকে চক্কর দিতে শুরু করল রবিন। ঘাস জন্মে আছে জায়গায় জায়গায়। বাড়ির একধারে ভাঙা বাক্স আর বাতিল কাগজের স্তূপ। ভ্যান গাড়িগুলোর জন্যে পেছনদিকটা ঠিকমত দেখতে পাচ্ছে না। চত্বরের ভেতরে কোথাও থেকে গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে।
দাঁড়িয়ে কান পাতল সে। কথা বোঝা যাচ্ছে না। বেড়ার ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে একটা গাড়ি, ওটার দিকে তাকিয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল। ডানে বাঁয়ে তাকিয়ে, লম্বা দম নিয়ে উঠতে শুরু করল বেড়া বেয়ে ওপরে উঠে বেড়া ডিঙিয়ে নামল ভ্যানের ছাতে।
ছাতের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে রইল কয়েক সেকেণ্ড। দম নিয়ে, উঠল। মুখ বাড়িয়ে উঁকি দিল চত্বরের দিকে।
সময় মত শুকায় না, বলল একজন। না শুকাক, বলল আরেকটা কণ্ঠ। এভাবেই নেব।
রবিন যেটার ছাতে রয়েছে, ওটার কাছাকাছি আরেকটা ভ্যান। মাঝে ফাঁক সামান্য। উঠে এক লাফে চলে এল দ্বিতীয় ভ্যানের ছাতে। পায়ে স্নিকার থাকায় শব্দ হল না। হামাগুড়ি দিয়ে এগোল। উঁকি দিতেই চোখে পড়ল লোকদুটোকে। তার দিকে পেছন, তাকিয়ে রয়েছে চকচকে রঙ করা সাদা একটা ট্রাকের দিকে। উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল আবার রবিন, সাবধানে মুখ তুলে দেখতে লাগল।
ও-কে, ডিক, বলল একজন। চিনতে পারল রবিন, মাইস। কোমরে হাত দিয়ে, মাথা একপাশে কাত করে দেখছে লোকটা। ভাল কাজ দেখিয়েছ।
বিচিত্র একটা শব্দ করল শুধু ডিক, কথা বলল না। এক হাতে রঙের টিন, আরেক হাতে ছোট ব্রাশ। বাতাসে রঙের কড়া গন্ধ। নতুন করে নাম লেখা হয়েছে সাদা

ট্রাকটায়। প্যাসিফিক স্টোরেজ কোম্পানির নাম বদলে লেখা হয়েছেঃ রিচার্ডসনস মেরিটাইম সাপ্লাইজ।
আপনমনেই হাসল রবিন। ছদ্মবেশী ট্রাক।
ব্রাশ নেড়ে ট্রাকটার দিকে ইঙ্গিত করল ডিক। এত কষ্টের দরকার ছিল?
কোন ঝুঁকি নিতে চাই না, জবাব দিল মাইস। এ-ধরনের গাড়ি নিকারোদের ওখানে দেখলেই লোকে ভুরু কুঁচকে তাকাবে।
ঘুরল মাইস। হেঁটে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল জানালা-বিহীন বিরাট বাড়িটার ভেতরে। মুহূর্ত পরে তার সঙ্গীও পিছু নিল। কিছুক্ষণ কংক্রিটের মেঝেতে শুধু কাঠ ঘষার শব্দ কানে এল রবিনের। অবশেষে আবার বেরোল মাইস। একটা ডোলিতে করে তিনটে কাঠের বাক্স নিয়ে আসছে। ট্রাকের দিকে এগোল।
ডিক বেরোল আরেকটা ডোলি নিয়ে। তাতেও একই রকম বাক্স। মাইসের মত নিরাপদে যেতে পারল সে, দুই মিটার যেতে না যেতেই গর্তে পড়ল ডোলি। ঝাঁকুনি লেগে মাটিতে পড়ে খুলে গেল একটা বাক্স। ছড়িয়ে পড়ল ডজনখানেক ছোট ছোট বাক্স।
অ্যাই, কি করছ! চিৎকার করে বলল মাইস।
ঠিক আছে ঠিক আছে, তুলে ফেলছি।
ছোট বাক্সগুলো কুড়িয়ে আবার বড় বাক্সটায় ভরল ডিকু। ডোলিতে তুলল। মাটিতে পড়ে ছোট বাক্সও দুএকটা খুলে গিয়েছিল। ভেতরের জিনিস ছিটকে পড়েছে মাটিতে। ওপর থেকে রবিন দেখলেও ডিক বা মাইস কেউই খেয়াল করেনি। দম বন্ধ করে পড়ে রইল সে, উত্তেজনায় দুরুদুরু করছে বুক ট্রাকে মাল তুলে আরও আনার জন্যে আবার বাড়িটাতে গিয়ে ঢুকল দুজনে। কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে এল।
প্রায় আধ ঘন্টা ধরে মাল বোঝাই করল ওরা। নানারকম বাক্স। কোনটা কাঠের, কোনটা ঢেউ খেলানো মলাটের। কোনটা এত ভারি, দুজনে ধরে তুলতেও কষ্ট হল। মাল তোলা হলে ট্রাকের দরজা বন্ধ করে হুড়কো লাগিয়ে দিল শক্ত করে।
ইহ্, মেলা পরিশ্রম, কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বলল ডিক। আরেকজন লোক আনলে পারতাম।
না, এইই ভাল হয়েছে। কষ্ট একটু বেশি হয়েছে, তবে সাক্ষী থাকল না।
আবার বাড়িতে গিয়ে ঢুকল ওরা। অপেক্ষা করছে রবিন। পাঁচ মিনিট গেল... দশ...বেরোচ্ছে না একজনও। অনুমান করল সে, ট্রাক নিয়ে ওই দুজনের কেউ যাবে না।
হামাগুড়ি দিয়ে ভ্যানের সামনের দিকে চলে এল রবিন। নিঃশব্দে হুডের ওপর নামল, সেখান থেকে মাটিতে। দ্রুত এগোল যেখানে জিনিসগুলো পড়ে আছে।

ঘাসের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে সামান্য খুঁজতেই হাতে লাগল একটা। তুলে দৈখেই চমকে উঠল। বুলেট!
মৃদু একটা শব্দ হল, বোধহয় নিঃশ্বাসের। নীরবতার মাঝে কান এড়াল না রবিনের। ফিরে তাকিয়েই স্থির হয়ে গেল, যেন জমাট বরফ। ঢোক গেলার চেষ্টা করল, গলা শুকিয়ে কাঠ। এমনকি ভয়ে যে কাপবে, সেই শক্তিও নেই যেন।
তার দিকে তাকিয়ে আছে ভয়ঙ্কর এক কুকুর! ডোবারম্যান পিনশার! কুকুর গোষ্ঠীর হিংস্রতম প্রাণীগুলোর একটা। মাত্র তিন মিটার দূরে। কুচকুচে কালো চোখের তারা স্থির হয়ে আছে রবিনের ওপর, কান খাড়া। ঘেউ ঘেউ করছে না। দৃষ্টি দিয়ে ঘায়েলের চেষ্টা করছে যেন অনধিকার প্রবেশকারীকে।
অ্যাইই! ফিসফিসিয়ে বলল রবিন, কুকুর! লক্ষ্মী কুকুর!
খুব ধীরে ধীরে নড়ল সে। সোজা হল। পিছাল এক পা।
ওপরে ঠোঁট উঠে গেল কুকুরটার। ভীষণ দাঁত বের করে ভেঙচি কাটল নীরবে। ধীরে ধীরে গলার গভীর থেকে বেরোল অতিচাপা গর্জন।
অ্যাইই! বলল রবিন।
গর্জন জোরাল হল। আগে রাড়ল কিছুটা। তারপর দাঁড়িয়ে গেল।
আর নড়ল না রবিন। ওটা প্রহরী কুকুর, বুঝল। সে নড়লে কুকুরটা নড়বে, না নড়লে নড়বে না। আসল উদ্দেশ্য, আটকে রাখা। প্রয়োজন হলে সারাদিন একই ভাবে দাঁড়িয়ে কিংবা বসে থাকবে ডোবারম্যানের বংশধর!
ধরা পড়ে গেছে রবিন!
ঘরের ভেতর খাবারের চমৎকার গন্ধ, বিশেষ করে পনির আর টোম্যাটো সস। অন্য সময় হলে অবশ্যই ভাল লাগত কিশোরের, এখন লাগছে না। লিভিং রুমে বসে মিসেস নিকারোর স্বপ্ন বিবরণ শুনছে।
একঘেয়ে কণ্ঠে বলেই চলেছে মহিলা।
ভুরু কোঁচকাল কিলোর। বাধা দিয়ে বলল, আপনার স্বপ্ন কি সব সময়ই সত্যি হয়?
না, বেশির ভাগই সাধারণ স্বপ্ন, পুরানো স্মৃতি। তবে কিছু আছে ভিন্ন। হয়ত এমন কাউকে দেখলাম, যাকে জীবনেও দেখিনি। জেগে উঠে কোথাও না কোথাও দেখা হয়ে যায় তার সঙ্গে। দুঃস্বপ্ন...।
বেশি দেখেন?
না না, হাসল মিসেস নিকারো। ভাল স্বপ্নও দেখি। একদিন দেখলাম সুন্দর লাল চুলওয়ালা একটা মেয়ে। পরে তাকেই বিয়ে করে আনল আমার ছেলে। এলসির কথা বলছি...।

পারিবারিক ইতিহাসে ঢুকে যাচ্ছে মহিলা, বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি আগের প্রসঙ্গে ফিরে এল কিশোর, বিলের কথা বললেন। আপনার আত্মীয়?
না। তবে ছেলেটা ভালই। ওই যে, রাস্তার ধারের পুরানো, কটেজটায় থাকে। ওর দুই বন্ধুও থাকে, ওরা দক্ষিণ আমেরিকার লোক। ওর বেশিরভাগ বন্ধুই ওই দেশের। আসে, বেকার থাকে যতদিন ওর সঙ্গেই থাকে, চাকরি-টাকরি পেলে চলে যায়। আমার মনে হয় বিলের বাবা ছিল সাউথ আমেরিকান। সেই সূত্র ধরেই চলে আসে দেশের লোক। আর উদ্দেশ্য ছাড়া কেউ আসে না, ভ্রূকুটি করল মহিলা। এই যেমন তুমি। মানিব্যাগ খুঁজতে আসনি তখন, তাই না? তোমার বন্ধু ও মাছধরা দেখতে আসেনি, নজর রাখতে এসেছিল। সোজা কথা, স্পাইগিরি, ঠিক না? আর বিল? কিছু একটা করতে যাচ্ছে সে, যা আমরা জানি না। কিছু একটা গোপন করছে, আমার আর এলসির কাছে।
কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে, সেটা আমিও বুঝতে পারছি, বলল কিশোর। কিন্তু কি ঘটবে, জানি না। আচ্ছা, মিসেস নিকারো, একটা অন্ধ লোককে স্বপ্ন দেখেছেন বলেছেন। তারপর কি বাস্তবেও দেখেছেন ওকে?
না।
কিন্তু রবিন দেখেছে। আমিও।
পকেট থেকে তিন গোয়েন্দার একটা কার্ড বের করে দিল কিশোর। ওকে দেখলে দয়া করে এই নাম্বারে একটা ফোন করবেন? আমি না থাকলেও যে-ই থাকুক, শুধু মেসেজটা দিয়ে দেবেন।
দেব।
আপনার ফোনটা ব্যবহার করতে পারি?
হলরুমের দিকে ইঙ্গিত করল মহিলা। উঠে গিয়ে হেডকোয়ার্টারে ফোন করল কিশোর। রিসিভার তুলেই মুসা বলল, কিশোর, রবিন ফোন করেছিল। তুমি বেরোনোর পর পরই। অক্সনার্ডে গেছে। নতুন আরেকটা নাম বলল, মাইস। রবিনের বিশ্বাস, ওই লোকটাও এই রহস্যের সঙ্গে জড়িত। বিকেলেই আবার ফোন করবে বলেছে।
সাইকেল ফেলে গেছে। আমি তো ভয় পাচ্ছিলাম, কোন বিপদে না পড়ল।
না। ভালই আছে। তুমি কোত্থেকে?
মিসেস নিকারোর ঘর থেকে। কিছুক্ষণ পরে আসব। লাইন কেটে দিল কিশোর। পাশে এসে দাঁড়িয়েছে মহিলা। বলল, তোমার বন্ধু তাহলে ভালই আছে?
কিশোর হাসল। হ্যাঁ। অক্সনার্ড থেকে ফোন করেছিল। একটা কাজে গেছে ওখানে।

ভাল। যাক, শুনে স্বস্তি পেলাম। নিশ্চিন্তে এখন মেহমানদারি করতে যেতে পারি। তোমারও নিশ্চয় কাজ আছে। সাবধানে থাকবে।
থাকবে, কথা দিয়ে বেরিয়ে এল কিশোর। চলল বিলের কটেজের দিকে।
বসে অপেক্ষা করার উপযাগী ভাল একটা জায়গা পছন্দ করল সে। আরাম করে বসল, হাতে ক্যামেরা। এক ঘন্টা পেরিয়ে যাওয়ার পর এল পুরানেট্রাকটা। রাস্তার পাশে নামিয়ে দিল বিলের এক বন্ধুকে।
ক্যামেরা তুলল কিশোর। ক্লিক করে উঠল শাটার। লোকটা কটেজে ঢুকতে ঢুকতে তার মোট ছয়টা ছবি তুলে ফেলল সে।। আবার অপেক্ষার পালা। সাগরের দিকে চেয়ে টিনাকে আসতে দেখে হাসি ফুটল মুখে। ডকে পৌঁছল বোট। বাঁধা হল ওটাকে। দুজন নামল। বিল আর এলসি। বিলের জন্যে ভাবনা নেই, এক সময় না একসময় সামনে দিয়ে যেতেই হবে তাকে, কটেজে ঢুকতে হলে। তার দ্বিতীয় বন্ধুর ছবি তোলাটা এখন জরুরি।
কাটছে অপেক্ষার দীর্ঘ মুহূর্তগুলো। সৈকত আর সাগরের ওপর উড়ছে সীগাল, মাঝেমাঝে ডাইভ দিয়ে পড়ছে পানিতে, ঠোঁটে মাছ চেপে ধরে উড়াল দিচ্ছে, উড়তে উড়তেই গিলে নিচ্ছে মাছটা। বাঁ দিকে নিকারোদের ড্রাইভওয়ে, একআধটা গাড়ি এসে ঢুকছে, কিছুক্ষণ থাকছে, আবার চলে যাচ্ছে। বাড়িটার জন্যে অফিস চোখে পড়ছে না কিশোরের, তবে এলসি ভেতরেই রয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। বিলও নিশ্চয় অফিসেই।
ডানে সৈকতের দিকে চোখ ফেরাল কিশোর। পানির কিনারে ছিপ হাতে ব্যস্ত সৌখিন মাছশিকারিরা। হাতে একটা মেটাল ডিটেক্টর নিয়ে সৈকত ধরে হাঁটছে একজন লোক। সাফাররা বসে আছে ভাল ঢেউয়ের আশায়। দিগন্তে দানা বাঁধছে মেঘ, ইতিমধ্যেই ঠাণ্ডা হয়ে পড়েছে বাতাস। সকালটা ছিল সুন্দর, দিনটাও ভালই গেছে, শেষ হবে ঝড়বাদলের মধ্যে দিয়ে বোঝা যায়।
কটেজ থেকে বেরিয়ে, রাস্তা পেরিয়ে জেটির দিকে এগোল বিলের বন্ধু।
ঘড়ি দেখল কিশোর। প্রায় তিনটে। সকালেই রবিন দেখেছে তৃতীয় লোকটাকে। গেল কোথায়?
নিকারোদের বাড়ির দিকে তাকাল কিশোর। হঠাৎ মনে পড়ল, একটা স্টেশন ওয়াগন দেখেছিল ওখানে। এখন নেই। গেল কখন? পাখি, মেঘ, ঢেউ আর বাতাস যেন সম্মোহিত করে রেখেছিল তাকে, গাড়িটাকে যেতেও দেখেনি, ইঞ্জিনের শব্দও শোনেনি।
উঠল সে। হাঁটতে শুরু করল রাস্তা ধরে। ড্রাইভওয়ের উল্টো দিকে এসেই দেখতে পেল অফিসে নেই এলসি। মিসেস নিকারোর চেয়ারে বসে ডেস্কে পা তুলে দিয়ে আয়েশ করছে বিল। সিগারেট টানছে, ধোঁয়া ছাড়ছে ছাতের দিকে। ডেস্কের ওপর

আসন-পিড়ি হয়ে বসেছে তার বন্ধু। ভাবসাব দেখে মনে হয় গল্প শোনাচ্ছে বিলকে। মাঝে মাঝে হাত নেড়ে কিছু বোঝানোর চেষ্টা করছে।
কিন্তু এলসি গেল কোথায়? বাড়িতে, শাশুড়ির সঙ্গে রয়েছে? বিল আর তার বন্ধুকে এখন ওই অবস্থায় দেখলে কি করবে মেয়েটা, ভেবে হাসি পেল কিশোরের।
ভালমত খেয়াল করতে বাড়িটাও শূন্য মনে হল। জানালার পাল্লাগুলো বন্ধ, পর্দা টানা। এই সময় ড্রাইভওয়েতে ঢুকল একটা গাড়ি, বাড়ির সামনে গিয়ে থামল। গাড়ি থেকে নামল সাদা-চুল এক বৃদ্ধা, বোধহয় মিসেস নিকারোর মেহমান, হাতে একটা প্যাকেট। দরজায় গিয়ে বেল বাজাল। কেউ বেরোল না। মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে থেকে আবার বেল বাজাল বৃদ্ধা। সাড়া না পেয়ে চলল অফিসের দিকে।
দেখতে পেয়েছে বিল। উঠে দাঁড়াল। তার বন্ধু আগের মতই বসে রয়েছে।
বিলের সঙ্গে কি কথা হল বৃদ্ধার। তারপর একটুকরো কাগজে কিছু লিখে ভঁজ করে দিল বিলের হাতে। ফিরে এল গাড়ির কাছে। রেগেছে খুব।
গাড়িটা চলে গেলে আবার চেয়ারে বসল বিল। ভাঁজ করা কাগজটা দলেমুচড়ে ফেলে দিল ময়লা ফেলার ঝুড়িতে।
হেসে উঠল তার বন্ধু।
এবার সতর্ক হল কিশোর। ঘুরে হাঁটতে শুরু করল উল্টো দিকে। চলে এল এমন একটা জায়গায়, যেখান থেকে বাড়িটার জন্যে অফিস দেখা যায় না। তারমানে অফিস থেকে এখন কেউ দেখতে পাবে না তাকে। রাস্তা পেরিয়ে দ্রুত বাড়িটার দিকে এগোল সে।
রান্নাঘরের দরজার পাশে একটা জানালা, ছিটকানি খোলা। টান দিতেই পাল্লা খুলে গেল। ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দরজার নব নাগাল পাওয়া গেল, মোচড় দিতেই কট করে খুলে গেল তালা। ঘরে ঢুকে আস্তে লাগিয়ে দিল পাল্লাটা, তালা খোলাই রাখল। তাড়াহুড়ো করে বেরোনোর দরকার হতে পারে।
রান্নাঘরের ভেতরটা প্রমোট। খাবারের গন্ধে বাতাস ভারি। স্টোভে বসানো পাত্রে সুপ তৈরি হচ্ছে। গরম রোস্ট ঠাণ্ডা হয়নি এখনও। সালাদের সজি কেটে রাখা হয়েছে।
নিঃশব্দে ডাইনিং রুমে চলে এল কিশোর। টেবিলে বাসনপেয়ালা সাজানো, তিনজনের জন্যে। পর্দা টেনে দেয়ায় ঘরের ভেতর আবছা অন্ধকার। লিভিং রুমেও একই অবস্থা। বাতাসে খাবারের গন্ধের পাশাপাশি ঝাঁঝালো আরেকটা গন্ধ। কিছুক্ষণ আগে এই গন্ধ ছিল না, সে যখন কথা বলছিল মিসেস নিকারোর সঙ্গে। একটা সিগারেটের পোড়া টুকরো চোখে পড়ল, পা দিয়ে পিষে নেভানো হয়েছে।

সিঁড়ির গোড়ায় এসে দাঁড়াল কিশোর। আস্তে ডাকল। জবাব নেই। গলা আরেকটু চড়িয়ে ডাকল, মিসেস নিকারো? আছেন? আমি, কিশোর।
সাড়া নেই। সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে এল কিশোর।
বেডরুমের জানালার খড়খড়ি ভোলা। আলো আসছে। বড় বড় কাঠের আসবাব এঘরে। একটা দেরাজ বোঝাই ছবি। হলরুমে ঢুকল সে। এঘরের আসবাবগুলো সাদা দেয়ালে টাঙানো রঙিন ফটোগ্রাফ। ঘরটায় খোঁজাখুজি করছে কিশোর, এই সময় বাজল টেলিফোন। রীতিমত চমকে উঠল সে। ফোনটা একটা টেবিলে রাখা। জানালা দিয়ে উঁকি দিল অফিসের দিকে।
অফিসের সেটটার দিকে তাকিয়ে আছে বিল। দ্বিধা করছে মনে হয়।
আবার রিঙ হল।
রিসিভার তুলল বিল। সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল বেডরুমের ফোনের রিঙ। হাসল কিশোর। এটা অফিসের ফোনের এক্সটেনশন। আস্তে রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল সে।
সি, বলল বিল।
স্প্যানিশ ভাষা। কিছু কিছু বোঝে কিশোর। রিসিভার জোরে কানে চেপে ধরে যতটা সম্ভব বোঝার চেষ্টা করছে।
ওপাশের লোকটা নিজের নাম বলল জিনো। বলল, মাইসের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে। টাকার কথা কি যেন বলল। নিকারোর নাম বলল, তারপর বলল কিশোরের নাম! মনে করিয়ে দিল, রোজারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল কিশোর পাশা, সেখানে মিসেস নিকারো আর অন্ধ লোকটার কথা আলোচনা করেছে। বিলকে হুঁশিয়ার থাকতে বলল। বিল জবাব দিল, থাকবে। জানাল, সে আর পেক সব নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছে। পেক বোধহয় অফিসে বসা লোকটার নাম, আন্দাজ করল কিশোর। আরও কয়েকটা কথা বলে লাইন কেটে দিল জিনো।
রিসিভার রেখে আবার জানালা দিয়ে উঁকি দিল কিশোর। অফিসের বাইরে। বেরোল বিল। সৈকতে চোখ বোলাল একবার। তারপর ফিরে চেয়ে ডাকল বন্ধুকে।
সে বেরোল, ইশারায় কটেজটা দেখাল।
কটেজের দিকে হাঁটতে শুরু করল পেক।
নিকারোদের বাড়ির দিকে ফিরল বিল। কৌতূহলী হয়ে উঠেছে যেন হঠাৎ করেই। পায়ে পায়ে রওনা হল এদিকে।.
চট করে সরে এল কিশোর। নিশ্চয় রিসিভার রাখার শব্দ পেয়েছে বিল। নইলে সন্দেহ হল কেন?

সিঁড়িতে উঠে থামল পায়ের শব্দ। তালায় চাবি ঢোকানো হল। পৌঁছে গেছে বিল। যে-কোন মুহূর্তে উঠে আসবে ওপরে। নিচে নামার আর সময় নেই। ধরা পড়ে যাবে কিশোর, তারপর...।
তারপর-কি?
বেডরুমের লাগোয়া বাথরুম আছে। টিপ টিপ করে পানি পড়ার শব্দ আসছে ভেতর থেকে।
সামনের দরজা খোলার মৃদু আওয়াজ হল।
তিন লাফে ঘর পেরিয়ে আরেক ঘরে চলে এল কিশোর। বাথরুমে ঢুকে শাওয়ার ছেড়ে দিল। ফিরে এল বেডরুমে। খাটের নিচে ক্যামেরাটা লুকিয়ে রেখে নিজে এসে লুকাল দরজার আড়ালে।
দুপদাপ করে সিঁড়ি বেয়ে উঠল বিল। হ্যাঁচকা টান দিয়ে খুলল বেডরুমের দরজা। দাঁড়িয়ে রইল এক মুহূর্ত, বাথরুমের দিকে চেয়ে। তারপর এগিয়ে গেল সেদিকে।
মুহূর্ত সময় নষ্ট করল না কিশোর। দরজার আড়াল থেকে বেরিয়েই দিল দৌড়। সিঁড়ি বেয়ে নামার সময় শুনল বিলের চিৎকার। ফিরেও তাকাল না। নিচে নেমে, রান্নাঘরের দরজা খুলেই একলাফে একেবারে বাইরে।
একছুটে নিকারোদের সীমানা পেরিয়ে গিয়ে হাইওয়েতে উঠল কিশোর। লুকাতে হলে, বিলের হাত থেকে বাঁচতে হলে তাড়াতাড়ি কোথাও লুকিয়ে পড়তে হবে। কিন্তু কোথায়?
পথের একপাশে দাঁড়িয়ে আছে একটা গাড়ি, কোন ক্যাম্পারের হবে। পেছনের দরজা খোলা। গাড়ির গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে আছে ক্যাম্পারের মালিক। কাগজের তোয়ালে দিয়ে হাত মুছছে।
বিন্দুমাত্র দ্বিধা করল না কিশোর। নিঃশব্দে উঠে পড়ল গাড়িতে। কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়ে পড়ল মেঝেয়, কতগুলো ঝিনুকের ঝুড়ির পাশে। গায়ের ওপর টেনে দিল একটা পুরানো তেরপল। খানিক পরেই দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল ক্যাম্পারের দরজা। ইঞ্জিন স্টার্ট নিল।
চলতে শুরু করল গাড়ি। শখানেক মিটার দক্ষিণে এগিয়ে, পুরো ঘুরে আবার উত্তরে রওনা হল। গতি বাড়ছে। তেরপল সরিয়ে উঠে বসল কিশোর, জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। নিকারোদের সীমানা পার হওয়ার সময় বিলকে দেখতে পেল সে। রাস্তার এমাথা থেকে ওমাথায় চোখ বোলাচ্ছে লোকটা। হাতের মুঠো শক্ত। অবাক।
হেসে উঠল কিশোর।
নিকারোদের ডক আর অক্সনার্ডের মাঝামাঝি এসে প্রথমবারের মত থামল ক্যাম্পার, ট্রাফিক সিগন্যাল দেখে। এই অপেক্ষাতেই ছিল কিশোর। গাড়ির গতি

কমে আসতেই খুলে ফেলল পেছনের দরজা, থামার সঙ্গে সঙ্গে নেমে পড়ল। হাঁটা দিল মোড়ের দিকে।
দশ মিনিটে পৌঁছে গেল একটা বাস টার্মিনালে। সান্তা মনিকার বাস এল, উঠে পড়ল তাতে।
দক্ষিণে ছুটেছে বাস। ভাবছে কিশোর। বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই আর, বিল নজর রাখে রোজারের ওপর। কিশোরের সাথে কি কি কথা হয়েছে রোজারের, সব জানে। কিন্তু কিভাবে? নিশ্চয় কারও কাছে বলেছে রোজার। কার কাছে? সিনথিয়া?
নিকারোদের ডক পার হচ্ছে বাস। পার্কিং লটে কেউ নেই। অফিসটা নির্জন। বিল আর তার বন্ধু গেল কোথায়? এলসি আর তার শাশুড়িই বা কোথায়? ওদের নিরুদ্দেশ হওয়ার পেছনে বিলের হাত নেই তো? ...আরও নানারকম প্রশ্ন ভিড় করে এল কিশোরের মনে। হঠাৎ শঙ্কিত হয়ে উঠল সে। রোজার কি নিরাপদ?
সান্তা মনিকায় বাস থামতে প্রথম নামল কিশোর, নামল না বলে দরজা দিয়ে ছিটকে বেরোল বলা যায়। মোড়ের কাছ থেকে ট্যাক্সি নিয়ে চলল ডলফিন কোর্টে।
চারটে চল্লিশ মিনিটে রোজারের দোড়গোড়ায় কিশোরকে নামিয়ে দিল ট্যাক্সি। বেল বাজাল। রোজারকে দরজা খুলে দিতে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সে।
কি ব্যাপার? এত উত্তেজিত? কোন খবর আছে নাকি? জিজ্ঞেস করল রোজার।
আছে। রোজারের পিছু পিছু রান্নাঘরে এসে বসল কিশোর। বসেই জিজ্ঞেস করল, মিস্টার রোজার, কাল আমি যাওয়ার পর কার সঙ্গে কথা বলেছেন?
কথা বলেছি! কই, কারও সঙ্গে না তো। ঘর থেকেই বেরোইনি।
তাহলে কেউ ফোন করেছিল। কিংবা আপনার ঘরে এসেছিল। যার সঙ্গে বলেছেন।
না, কেউ ফোনও করেনি; আসেওনি। আমার অত বন্ধুবান্ধব নেই। কেন? খুব জরুরি। ভাবুন, মিস্টার রোজার। ভাল করে ভেবে দেখুন। কাল বিকেলে অন্ধ ভিখিরি আর নিকারোদের কথা আলোচনা করেছিলাম। নিশ্চয় সেসব কথা কারও কাছে বলেছেন। জিনো নামে কাউকে চেনেন?
ভাবল রোজার। মাথা নাড়ল, না, চিনি না। কেউ আসেনি এখানে, রক ছাড়া। তাকেও কিছু বলিনি। রাতে ফিরেই ওপরে চলে গেল। ঘরে ঢুকে তালা লাগিয়ে দিল।
আজ সকালে?
না, আজ সকালেও না। শুধু কেমন আছ, ভাল, ওই পর্যন্তই।

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। শূন্য চোখে চিনির পাত্রটার দিকে তাকিয়ে জোরে জোরে চিমটি কাটল নিচের ঠোঁটে। রক রেনান্ডের কথা ভাবছে। কালো গলাবন্ধ শার্ট, কালো চশমা। অদ্ভুত! আনমনে বলল সে।
কি বললে?
আচ্ছা, আপনার পড়শীদের সম্পর্কে কি ভাবে রক?
কি আর ভাববে? খুব সাধারণ লোক।
সে নিজে খুব অসাধারণ, না?
শ্রাগ করল রোজার।
আবার চিনির পাত্রের দিকে তাকাল কিশোর। আচ্ছা, কবে থেকে কফিতে চিনি খাওয়া আরম্ভ করেছে রক? আচমকা প্রশ্নটা যেন ছুঁড়ে দিল সে। সব সময় খায় না, তাই না? সেরাতে প্রথম যেদিন এলাম আমরা, শুধু কালো কফিই খেয়েছে, চিনি ছাড়া।
আঁ...হ্যাঁ, তা ঠিক। এই দুএকদিন আগে থেকে চিনি খাওয়া আরম্ভ করেছে। চিনি খেলে নাকি দ্রুত শক্তি পায় সে।
চকচক করছে কিশোরের চোখ। টেনে নিল পাত্রটা। চিনির ভেতরে আঙুল ঢুকিয়ে দিল। উজ্জ্বল হল চেহারা। আস্তে করে বের করে আনল প্লাস্টিকের একটা বাক্স, একপাশে ছোট ছোট ছিদ্র।
জিনিসটার দিকে তাকিয়ে আছে রোজার। ওটা কি?
একধরনের শ্রবণ-যন্ত্র, মিস্টার রোজার, স্পাইরা বলে বাগ। রকের কথা বলার প্রয়োজন ছিল না আপনার সঙ্গে। চিনির পাত্রে এই জিনিস ঢুকিয়ে টেবিলে রেখে গেছে। আমাদের কথা সব শুনেছে সে। উঠে টেলিফোনের দিকে এগোল কিশোর। টি এক্স ফোর-এ কাজ করেছেন। নিশ্চয় নাম্বার জানেন।
নাম্বার বলল রোজার। ডায়াল করল কিশোর। রিসিভার কানে ধরে রেখে ঘড়ি দেখল। চারটে ঊনষাট। ওপাশে রিসিভার ভোলা হলে রক রেনাল্ডকে চাইল সে। ওরা জানাল ওই নামে ওখানে কেউ কাজ করে না।
কিন্তু টি এক্স ফোরেই তো কাজ করতেন মিস্টার রেনাল্ড। চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন?
সেটা আমি বলতে পারব না, জবাব এল। সোমবার সকালে যোগাযোগ করলে হয়ত অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিপার্টমেন্ট জানাতে পারবে।
অপারেটরকে ধন্যবাদ দিয়ে রিসিভার রেখে দিল কিশোর। ওখানে কাজ করে? রোজার অবাক। বুঝতে পারছি না! করার তো কথা। এই তো সেদিন ফ্রেজনোতে গেল একটা বিশেষ কাজ নিয়ে।

যথেষ্ট সন্দেহ আছে আমার। এগিয়ে গিয়ে টান দিয়ে রেফ্রিজারেটরের দরজা খুলল কিশোর। কয়েক দিন আগে যেসব খাবারের প্যাকেট রেখেছিল, সেগুলো নেই। এককোণে যেন অসহায় হয়ে পড়ে রয়েছে শুধু একটা আইসক্রীমের প্যাকেট। দরজা বন্ধ করতে করতে বলল সে, এখানেই ছিল।
কী?
না, কিছু না। আমি শিওর না। বোধহয় দেরিই করে ফেললাম। মিস্টার রোজার, রক ঘরে তালা দিয়ে রাখে বললেন না?
হ্যাঁ। একা থাকতে ভালবাসে সে।
ওর ঘরটা দেখতে চাই আমি। এক্ষুনি।
গ্যারেজ থেকে ধরাধরি করে একটা মই নিয়ে এল দুজনে। লাগাল রকের ঘরের জান্নালায়। জানালা খোলা, কাজেই ঢুকতে অসুবিধে হল না কিশোরের।
প্রথমেই চোখ পড়ল, ড্রেসারের ওপর রাখা একটা রেকর্ডিং সিসটেমের ওপর। যন্ত্রে লাগানো টেপটা রিউণ্ড করে প্লে করল সে। এইমাত্র রোজারের সঙ্গে রান্নাঘরে বসে যা যা বলেছে, সব রেকর্ড হয়ে আছে। এমনকি রেফ্রিজারেটরের দরজা খোলার শব্দও স্পষ্ট।
মুচকি হাসল কিশোর। মুছে ফেলল সমস্ত রেকর্ডিং। তারপর টেপটা আবার শুরুতে এনে রেখে, ঘর দেখায় মন দিল। সব কেমন যেন খালি খালি। ডেস্কে চিঠির খাম বা পোস্টকার্ড নেই, বেডসাইড টেবিলে বই নেই। দেয়ালে ছবি নেই, টবে গাছ নেই। দেখে মনে হয়, মানুষই থাকে না এখানে।
ক্লোজেট খুলে দেখল। কিছু জ্যাকেট, শার্ট আর স্ল্যাকস আছে, পকেটগুলো খালি। ড্রেসারের ড্রয়ারে দেখা গেল আণ্ডারওয়্যার, মোজা, গেঞ্জি।
একেবারে নিচের ড্রয়ারে ভঁজ করা সোয়েটারের মধ্যে পাওয়া গেল একটা ছুরি। চামড়ার চমৎকার একটা খাপে ভরা। তীক্ষ্ণ ধার। পেন্সিল কাটা থেকে শুরু করে থ্রোইং নাইফ হিসেবে ব্যবহার, সব কিছু চলতে পারে।
যেখানে পেয়েছে সেখানেই ছুরিটা রেখে দিল সে। জানালা দিয়ে বেরিয়ে মই বেয়ে নিচে নেমে এল আবার। কি কি দেখেছে, জানাল রোজারকে। শেষে বলল, ছুরিটাও বোধহয় তার পিস্তলের মত করেই পায়ে বাঁধে।
মাথা নাড়ল রোজার, বিশ্বাসই করতে পারছে না। নানা জায়গায় ঘোরাঘুরি করে, আত্মরক্ষার জন্যে পিস্তল রাখে সঙ্গে, আমাকে বলেছে একথা। কিন্তু ছুরি দিয়ে করে কি? ক্যাম্পিঙে যায় না, কিছু না। অবসর সময়ে ঘুমানো আর টিভি দেখা ছাড়া আর কিছু করে না।
দেখিয়ে করে না আরকি। যা করে, গোপনে। রান্নাঘরে চিনির পাত্রে বাগ লুকায়। ফ্রিজে মূল্যবান জিনিস রাখে। আপনার ফ্রিজে কিছু লুকিয়ে রেখেছিল।

ফ্রিজে আর কি রাখবে, খাবার ছাড়া?
খাবার নয়, টাকা রেখেছিল। ব্যাংক থেকে ডাকাতি করে আনা টাকা, খাবারের প্যাকেটে মুড়ে।
অসম্ভব। খাবারই রাখে সে। একেকবারে অনেক খাবার এনে জমিয়ে রাখে। খাবার হাতের কাছে থাকলে নাকি ভরসা পায় সে। ওই ফ্রিজটা আমি ব্যবহারই করি না, সে-ই করে। খাবার রাখে বটে, কিন্তু ঘরে খায় না। অদ্ভুত স্বভাব।
হুম। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। ঘরে যদি না-ই খায়, ফ্রিজের খাবারগুলো যায় কোথায়? বের করে নিতে দেখেছেন?
কি জানি, অত খেয়াল করে কে...তবে টাকার প্যাকেট এনে রাখে না ফ্রিজে। অনেকদিন ধরেই প্যাকেট রাখছে। তারমানে কি বলতে চাইছ এতদিন ধরেই ডাকাতি করছে সে! আমার বিশ্বাস হয় না। রক ওরকম লোক নয়।
টাকা না রাখলে মাদক রাখে। বিলের সঙ্গে তো সম্পর্ক আছেই। নিকারোদের বোট ব্যবহার করে মাদক চোরাচালানের কাজে, টিনাকে। গভীর সাগরে গিয়ে জাহাজ থেকে আনে মালের প্যাকেট, কিংবা চলে যায় বাজা ক্যালিফোর্নিয়ায়। কিংবা হয়ত মানুষ চোরাচালানের ব্যবসা করে ওরা। বেআইনীভাবে মানুষ পাচার করে...। থেমে গেল। না, তাহলে ফ্রিজে কি রাখে? এখনও নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না কিছু।
পুলিশকে জানাবে?
এখন জানিয়ে লাভ নেই। কিছু প্রমাণ করতে পারব না।
এই প্রথম রাগ দেখা দিল রোজারের চেহারায়। তাহলে, কি করবে? আমি কোন সাহায্য করতে পারব?
পারবেন। আগে একটা টেলিফোন করা দরকার। আপনার ঘরে যেটা আছে সেটা ব্যবহার করব না। প্রতিবেশীদের কারও ঘর থেকে করা যাবে?
যাবে।
তাহলে চলুন। যেতে যেতে বলছি আমার প্ল্যান।
পাশের বাড়ির দরজায় এসে বেল টিপল রোজার। বেরোল, এক মহিলা। তাকে বলল সে, নিজের টেলিফোন খারাপ, একটা ফোন করতে চায়।
হেডকোয়ার্টারে ফোন করল কিশোর। ডলফিন কোর্ট আর সেকেণ্ড স্ট্রীটটা যেখানে মিশেছে, সেখানে আসতে বলল মুসাকে।
বিশ মিনিট, মুসা বলল।
এসে আমাদেরকে না পেলে আবার হেডকোয়ার্টারে ফিরে যাবে। আমার ফোনের অপেক্ষায় থাকবে।

রোজারের রান্নাঘরে আবার ফিরে এল দুজনে। চিনির পাত্রে আগের মত বাগটা ঢুকিয়ে রাখল কিশোর। মিস্টার রোজার, জোরে জোরে বলল সে, চোখ টিপল রোজারের দিকে তাকিয়ে। নিশ্চয় অধৈর্য হয়ে উঠেছেন। তবে শীঘ্রি নতুন। খবর জানাতে পারব আশা করি। এলসি নিকারোর কাছ থেকে অবশেষে কথা আদায় করা যাবে, বুঝতে পারছি। এই একটু আগে থানায় গিয়েছিল মুসা, চীফ ইয়ান ফ্লেচারের সঙ্গে দেখা করতে। মুসা থানায় থাকতে থাকতেই ফোন করেছিল এলসি। দেখা করতে গেছেন চীফ।
কিন্তু মিসেস নিকারোর সঙ্গে ডাকাতির সম্পর্ক কি? রোজার জিজ্ঞেস করল।
আছে, যোগাযোগ আছে, আমি শিওর। রকি বীচ পুলিশ স্টেশনে আমাদেরকে যেতে বলেছে মুসা। তার ধারণা, এলসি ক্লিারোকে থানায় নিয়ে আসবেন চীফ।
বস। আমার জ্যাকেট নিয়ে আসছি।
খট করে সুইচ টিপে রান্নাঘরের লাইট নেভাল কিশোর। বেরিয়ে এসে দুজনে উঠল রোজারের হোট গাড়িতে। ড্রাইভওয়ে থেকে বেরিয়ে মস্ত একটা উইলো গাছের নিচে গাড়ি রাখল রোজার। অপেক্ষা করতে লাগল ওরা।
সাইকেল নিয়ে হাজির হল মুসা। হেডলাইট জ্বালল-নিভাল রোজার, সঙ্কেত দিল কোথায় আছে ওরা। একটা ঝোপের ভেতরে সাইকেল লুকিয়ে গাড়ির কাছে এল মুসা। উঠে বসল পেছনের সিটে। জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে?
রককে সন্দেহ করে, জানাল কিশোর। চিনির পাত্রে বাগ পাওয়া গেছে, রকের ঘরে রেকর্ডারে তাদের কথাবার্তা রেকর্ড হয়েছে, এসব কথাও বলল। ভয়েসঅ্যাকটিভেটেড রেকর্ডার, কথা শুনলেই চালু হয়ে যায় রেকর্ডিং সিসটেম। শেষে জিজ্ঞেস করল, কিছু মনে পড়ে?
অন্ধ! উত্তেজিত কণ্ঠে প্রায় চেঁচিয়ে বলল মুসা। খাইছে! বাগ লাগাতে গিয়েছিল স্যালভিজ ইয়ার্ডে! রক ব্যাটাই...।
হতে পারে, বলল কিশোর।
নিচু স্বরে কথা বলতে লাগল দুজনে। নিকারোদের ওখানে যা যা ঘটেছে, মুসাকে জানাচ্ছে কিশোর।
অন্ধকার হয়ে গেছে। বিকেল থেকেই আসি আসি করছিল বৃষ্টি, পড়তে শুরু করল এখন। সেকেণ্ড স্ট্রীট আর ডলফিন কোর্টে যানবাহন প্রায় নেই বললেই চলে। ছটার কিছু পরে মোড়ে দেখা দিল রকের গাড়ি। ড্রাইভওয়ে ধরে গিয়ে থামল বাড়ির সামনে। গাড়ি থেকে নামল সে। একটু পরেই জ্বলে উঠল রান্নাঘরের আলো। তারপর সামনের ঘরে আলো জ্বলল।
আমাকে খুঁজছে, রোজার বলল। এসময় ঘর থেকে বেরোই না, কদিন ধরে।
দোতলায়ও আলো জ্বলল, রকের বেডরুমে।

আর বেশিক্ষণ লাগবে না, হাসি হাসি গলায় বলল রোজার।
সব কটা ঘরের আলো জ্বালিয়ে রেখেই সামনের দরজা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে এল রক। দৌড়ে লন পেরিয়ে গিয়ে উঠল গাড়িতে। গর্জে উঠল ইঞ্জিন। কয়েক সেকেণ্ড পরেই ওদের পাশ দিয়ে শাঁ করে বেরিয়ে গেল গাড়িটা।
রোজারও ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে ফেলেছে। পিছু নিল। সেকেণ্ড স্ট্রীট পেরিয়ে বেরিয়ে এল ওশন অ্যাভেন্যুতে। ছুটে চলল কোস্ট হাইওয়ে ধরে।
নিকায়রোদের ওখানে যাচ্ছে, কিশোর বলল।
দূরত্ব বজায় রেখে অনুসরণ করছে রোজার। মাঝখানে ঢুকে গেল আরেকটা গাড়ি। ভালই হল, রোজারের গাড়িটাকে লক্ষ্য করবে না আর রক। অঝোর বৃষ্টির মাঝে উত্তরে ছুটে চলেছে ওরা। পারলে গাড়ির গতি পুরোটাই বাড়িয়ে দিত রক, বোঝা যাচ্ছে, পুলিশের ভয়ে বাড়াচ্ছে না। অহেতুক ঝামেলায় পড়তে চায় না এখন। ম্যালিবুতে ঢুকে গতি কমাল কিছুটা, তারপর আবার বাড়াল।
মিস্টার রোজার, কিশোর জিজ্ঞেস করল। জিনো নামে কাউকে চেনেন না?
না। রকের মিডলনেমের আদ্যাক্ষর অবশ্য জি, কিন্তু তাতে কি জিনো বোঝায়? কি জানি, মানায় না। স্প্যানিশ আর ইটালিয়ানরা ওরকম নাম রাখে।
গন্তব্যস্থল দেখা যাচ্ছে। গতি কমাল রোজার। যানবাহন খুব কম রাস্তায়। ডকে দাঁড়ানো সাদা একটা ট্রাক আবছামত দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ ব্রেক কষল রক। ডানে মোড় নিয়ে মোটেলের ড্রাইভওয়ে ধরে উঠে যেতে শুরু করল।
মোটেল! চেঁচিয়ে উঠল মুসা। গাড়ি থামিয়ে দিয়েছে রোজার। কিশোর, ওখানেই আছে এলসি নিকারো আর তার শাশুড়ি।
তাই তো! আমারও বোঝা উচিত ছিল। মিস্টার রোজার, আপনি এখানেই থাকুন। পনেরো মিনিটের মধ্যে আমরা না ফিরলে পুলিশকে ফোন করবেন।
আচ্ছা। সাবধানে থাকবে।
গাড়ি থেকে নামল দুই গোয়েন্দা। ওপর দিকে তাকাল। পাহাড়ের চূড়ায় অন্ধকার একটা ছায়ামাত্র এখন মোটেলটা। নিঃশব্দে ড্রাইভ বেয়ে উঠতে শুরু করল ওরা। তুমুল বৃষ্টি বাঁচাতে পিঠ বাঁকা করে রেখেছে। মোটেলের চওড়া চত্বরে পৌঁছে কিশোরের হাত খামচে ধরল মুসা। ওই যে, রকের গাড়ি, ফিসফিসিয়ে বলল সে।
কিন্তু ব্যাটা গেল কই?
মোটেলের ভেতরে হয়ত।
পুলের পাশ কাটাল ওরা! সাগর এখন মোটেলের অন্যপাশে। সাগরের মাঝামাঝি রয়েছে মোটেলটা। ফলে ঝড়ো হাওয়া আর তেমন আঘাত হানতে পারছে না ওদের গায়ে। বৃষ্টির ফোঁটা চকচক করছে ম্লান আলোয়।

হাত তুলে দেখাল কিশোর। একধারে একটা জানালায় আলো, খুবই সামান্যভারি পর্দার ওপাশে নিশ্চয় ল্যাম্প জ্বলছে।
পা টিপে টিপে জানালার কাছে এসে কান পাতল ওরা, ভেতরে কথা হয় কিনা শোনার জন্যে।
হঠাৎ পেছনে শোনা গেল আরেকটা শব্দ বাতাস আর বৃষ্টির আওয়াজ ছাড়াও।
পেছনে ফিরে চাইল কিশোর।
চুপ! ধমক দিল রক রেনাল্ড। হাতে পিস্তল। একদম নড়বে না।
চিৎকার করে ডাকল মোটেলের দিকে চেয়ে।
মোটেলের দরজা খুলে গেল। বাইরে এসে পড়ল ভেতরের আলো। বেরিয়ে এল বিলের আরেক রুমমেট, যাকে সারা বিকেল দেখা যায়নি। তার হাতেও পিস্তল। –
হাঁট! দুই গোয়েন্দাকে আদেশ দিল বুক।
ঘরে ঢুকল কিশোর আর মুসা। বাতাসে কড়া তামাকের ঝাঁঝাল গন্ধ। পিঠখাড়া একটা চেয়ারে বসা এলসি নিকারো, হাতলের সঙ্গে হাত বাঁধা। রাগে মুখ লাল।
বিছানার কাছে একটা আর্মচেয়ারে বসিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে তার শাশুড়িকে।
রক ঢুকল ভেতরে। দরদর করে পানি ঝরছে গা থেকে। দরজাটা বন্ধ করে দিল বিলের রুমমেট।
হাই! বলে উঠল একটা পরিচিত কণ্ঠ।
ঘরের অন্ধকার কোণে, দরজার পাশে আরেকটা চেয়ারে বসে আছে রবিন। বেঁধে রাখা হয়েছে তাকেও।
ব্যাগটা দেখে ফেলেছিলে, তাই না? রক বলল। আমাকে ফাঁকি দিতে চেয়েছ।
আপনিও ফাঁকি দিয়ে আমাদেরকে এখানে নিয়ে এসেছেন, বলল কিশোর।
তাকে আর মুসাকেও চেয়ারে বসানো হয়েছে। বেঁধেছে বিলের রুমমেট, তার নাম এতক্ষণে জানা হয়ে গেছে ওদের, পিনটো।
রোজার কোথায়? রক জিজ্ঞেস করল। রাস্তায়?
জবাব দিল না কিশোর।
হাসল রক। বেশিক্ষণ বসিয়ে রাখব না ওকে। পিস্তলটা পকেটে রেখে স্প্যানিশে পিনটোকে কি বলল সে।
দরজায় থাবা পড়ল। পাল্লা ঠেলে ভেতরে ঢুকল বিল। মুসা আর কিশোরকে দেখে থমকে দাঁড়াল, চোখে বিস্ময়। এরা এখানে কিভাবে? এটা তো রীতিমত বিচ্ছু, কিশোরকে দেখল সে। আটকে রাখ, দেখ পালাতে না পারে। রককে বলল
সে, আমি এসেছি পিনটোকে নিতে। বোট রেডি। মাল তোল প্রায় শেষ। মাইস। চলে যাবে এখুনি।

পাশে বসা কিশোরকে ফিসফিস করে জানাল রবিন, অক্সনার্ডের একটা মুভিং কোম্পানির মালিক মাইস। বিকেলে লুকিয়ে থেকে দেখেছি, ট্রাকে মাল তুলেছে ও আর আরেকটা লোক। তোলার সময় একটা বাক্স পড়ে খুলে গিয়েছিল। ভেতরে বুলেটের বাক্স।
অ্যামুনিশন! প্রায় চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। নিশ্চয় রাইফেলও আছে। রকের দিকে তাকাল সে। আমি ভেবেছিলাম ড্রাগস। টিনার সাহায্যে মাদকদ্রব্য চোরাচালান করে বিল আর তার দোস্তেরা।
অসম্ভব! চিৎকার করে উঠল এলসি। আমাকে না নিয়ে বোট নড়ানোরও সাহস করেনি কখনও। তুমি ভুল করছ।
বিল হাসল। এবার নেব, মিসেস নিকারো। এবার আর বোটে থাকছেন না আপনি।
অস্ত্র তুলবেন বোটে, কিশোর বলল। সেজন্যেই ডাকাতি করেছেন তিন বন্ধু মিলে, অস্ত্র কেনার টাকা চাই তো? চালান দেবেন মেসা ডিওরোতে, নিরীহ মানুষ মারার জন্যে।
গর্বের ভঙ্গিতে মাথা তুলল বিল। অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের লড়াই হবে।
নিরস্ত্র মানুষকে গুলি করাকে কি লড়াই বলে নাকি?
কাদের নিরস্ত্র বলছ? রেগে উঠল বিল। মেসা ডিওরের সিভিল গার্ডদের? অন্যের জমি কেড়ে নিতে দস্যুদের সাহায্য করেছে যারা?
ওর কথা শুনছ কেন, বিল? রক বলল। যা খুশি বলুক না। আমাদের কাজ আমরা করব।
আপনিই কানা ফকির সেজেছিলেন,রককে বলল কিশোর। ছদ্মবেশে চোখ রেখেছেন ব্যাংকের ওপর। রোজার যাতে চিনতে না পারে। টাইম লকের কথা জানতেন আপনি। রোজারের ডিউটি জানতেন। তবে বেশি লোভী আপনি। ডাকাতির আগের দিন মিস্টার সাইমনের মানিব্যাগটা পড়ে থাকতে দেখে লোভ সামলাতে পারেননি। তুলে পকেটে ভরে ফেলেছিলেন, আর সেটাই ভেস্তে দিল আপনাদের পরিকল্পনা। তাড়াহুড়োয় পালাতে গিয়ে কোনভাবে ফেলে দিয়েছিলেন। পকেট থেকে।
আ-আমি, তাড়াতাড়ি বলল রক। আসলে...যার ব্যাগ তাকে ফিরিয়ে দেয়ার জন্যেই তুলেছিলাম।
বিলের দিকে তাকাল পেক, তারপর রকের দিকে। স্প্যানিশ ভাষায় কি বলল। তাকে চুপ থাকতে ইশারা করল বিল। রকের দিকে ফিরে কড়া গলায় বলল, ছেলেটা যা বলছে সত্যি? সামান্য একটা ব্যাগের জন্যে...
বাধা দিয়ে বলল রক, ওর কথা বিশ্বাস কোরো না। তুলে পকেটে রেখেছিলাম। ভেবেছি, ডাকবাক্সে ফেলে দেব। পরে ভুলে গেছি, আর ফেলতে মনে ছিল না।

ওসব নিয়ে তর্ক করে এখন লাভ নেই।
আমাকে বললে না কেন তুমি? চেঁচিয়ে উঠল বিল। মিস্টার সাইমনকে দিয়ে দিতাম। ওই ব্যাগ নিয়েই তো যত গোলমাল। ছেলেগুলো এসে হাজির হয়েছে!
বলছি তো, মনে ছিল না! তাছাড়া এটা কোন ব্যাপার নাকি? এদেশ থেকে চলেই তো যাচ্ছ তুমি। আর ছেলেগুলোর ব্যবস্থা আমি করব।
মিস্টার রোজারের বাড়ি ছাড়ছেন না আপনি, তাই না? বলল কিশোর। কেন, আন্দাজ করতে পারছি। এদেশেই থাকবেন, ডাকাতির টাকা ভোগ করতে হবে তো। রিপাবলিকানদের সব টাকা দেবেন না আপনি।
আবার রকের দিকে তাকাল বিল। ফ্যাকাসে হয়ে গেল রকের মুখ।
কি বলছে ছেলেটা? রকের দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচাল বিল।
সব টাকা অস্ত্র কিনতেই খরচ হয়ে গেছে, বিলের চোখের দিকে তাকাতে পারছে না রক। জান তুমি, বিলানো।
আমি শুধু জানি দুলাখ ডলার খরচ হয়েছে। অর্ধেকটা আজ বিকেলে মাইসকে দিয়েছ তুমি, বাকিটা আমি দিয়েছি। আর টাকা কই? বলেছ, রডরিগেজকে পাঠিয়েছ। তোমার চেহারা দেখে তো তা মনে হচ্ছে না। মিথ্যে কথা বলেছ তুমি। বিশ্বাস করে তোমার কাছে রেখেছিলাম। টাকা কি করেছ?
আমি কি করব? যা যা করতে বলেছ, করেছি...।
আজ রাতে তুমিও যাচ্ছ আমাদের সঙ্গে, কঠিন গলায় বলল বিল। মেকসিকো সিটিতে গিয়ে রডরিগেজের অ্যাসিসটেন্টকে আমাদের সামনে বলবে যে তুমি তার হাতে টাকা দিয়েছ। দরকার হলে মেসা ডিওরোতে নিয়ে যাব, তোমাকে...
কি যা-তা বলছ! আজ রাতে যে যেতে পারব না, ভাল করেই জান। এখানে জরুরি কাজ রয়েছে আমার। মিশন এখনও শেষ হয়নি।
মিস্টার রোজারের বাড়িতে এখনও পঞ্চাশ হাজার ডলার রয়েছে, শান্তকণ্ঠে বলল কিশোর।
এই ছেলে, চুপ কর! মিথ্যুক কোথাকার! কিশোরকে ধমক দিয়ে মিসেস নিকারোর দিকে ফিরল রক। এই বুড়ি, তুমিই এসব কথা বলেছ ছেলেটাকে। নিশ্চয় বলেছ স্বপ্নে দেখেছ তুমি, আর ছেলেটাও...।
মিসেস নিকারো কিছু বলেনি আমাকে, প্রতিবাদ করল কিশোর। টাকাটা কোথায় আছে, তা-ও বলে দিতে পারি। মিস্টার রোজারের ফ্রিজে একটা আইসক্রীমের প্যাকেটে...।
ঠাস করে কিশোরের গালে চড় মারল রক।
মাথা নাড়তে নাড়তে বিল বলল, বোকামি করে ফেলেছ তুমি, রক। তোমাকে যেতেই হচ্ছে আমাদের সঙ্গে। যা করলে না...।

ঝট করে পিস্তল বেরিয়ে এল রকের হাতে।
ছেলেটা তাহলে সত্যিই বলেছে, চকচকে নলটার দিকে তাকিয়ে বলল বিল।
পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল পিনটো, তার কথা ভুলেই গিয়েছিল রক। নড়ে উঠল সে। এত দ্রুত, গুলি করারও সময় পেল না রক। ঘাড়ে এসে লাগল কারাতের কোপ। একবার মাত্র চিৎকার করল রক, হাত থেকে খসে পড়ল পিস্তল, টলে উঠে মেঝেতে পড়ে গেল সে।
পিস্তলটা তুলে রকের দিকে তাক করল বিল।
গুঙিয়ে উঠল রক। ঘাড়ে হাত ডলতে ডলতে উঠে বসল। কলার চেপে ধরে তাকে টেনে তুলল পিনটো। টানতে টানতে নিয়ে গেল বাইরে। বিল গেল পেছনে।
ঝমঝম করে একনাগাড়ে বৃষ্টি পড়ছে মোটেলের ছাতে। টানাটানি করে বাঁধন খোলার চেষ্টা করল এলসি।
আটকে রাখার চেষ্টা করলাম ওদেরকে, যতক্ষণ পারলাম, কিশোর বলল। পনেরো মিনিট সময় দিয়ে এসেছিলাম মিস্টার রোজারকে। নিশ্চয় পুলিশকে খবর দিয়েছে। পালাতে পারবে না ওরা, তার আগেই পৌঁছে যাবে পুলিশ।
আমি ভাবছি অন্য কথা, গম্ভীর কণ্ঠে বলল মিসেস নিকারো। পুলিশের আগেই অন্য কিছু আসবে। আমরা এঘর থেকে বেরোনোর আগেই।
কি? বলেই চমকে উঠল এলসি। একটা শব্দ! ঝড়-বৃষ্টির নয়। মনে হল, শব্দটা এসেছে মাটির নিচ থেকে। বিচিত্র এক ধরনের গোঙানি। কাছেই কোথাও ঝনঝন করে কাচ ভাঙল জানালার।
মাই গড! চেঁচিয়ে উঠল এলসি।
আমার স্বপ্ন! ফিসফিসিয়ে বলল, মিসেস নিকারো। বলেছিলাম না বিপদ! ভয়ানক বিপদ আসছে! হুঁশিয়ার করেছিলাম ছেলেটাকে, শুনল না! রবিনের উদ্দেশে বলল সে। চোখ মুদে বিড়বিড় শুরু করল ইটালিয়ান ভাষায়, প্রার্থনা করছে।
মড়মড় করে উঠল কাঠ। আবার কাচ ভাঙল। থরথর করে কাঁপছে বাড়িটা। ভূমিকম্পের মতই, কিন্তু ভূমিকম্প নয়-ভাবল রবিন। ইঞ্চি ইঞ্চি করে পিছলে সরে যাচ্ছে মোটেলের নিচের মাটি।
দুলে উঠল ঘরটা।
মেঝেতে পড়ে ল্যাম্প ভাঙল, ইলেকট্রিকের তার ছিঁড়ে গেল, ফুলিঙ্গের ফুলঝুরি ছিটাচ্ছে।
আগুন যেন না ধরে! ঈশ্বর! প্রার্থনা করছে এলসি। আগুন ধরতে দিয়ো না!
আরও ফুলঝুরি ছিটল কয়েক সেকেণ্ড, তীব্র নীলচে সাদা আলো ঝিলিক দিল। তারপর অন্ধকার। কাঠের গোঙানি বাড়ছে। রোম-খাড়া-করা কিচকিচ আওয়াজ

তুলে কাঠের শরীর থেকে বেরিয়ে আসছে জোড়ার পেরেকগুলো।
ভীষণ ভাবে দুলে উঠল আরেকবার ঘরটা। চেঁচিয়ে উঠল মিসেস নিকারো।
বাঁচাও! আল্লা! চিৎকার শুরু করল মুসা। এই কেউ শুনছ? বাঁচাও!
কেউ জবাব দিল না। সাহায্য করতে এল না কেউ।
আর বাঁচব না! এলসি বলল। পাহাড়টাই ধসে যাবে রে, আর বাঁচব না...!
তার কথা শেষ হওয়ার আগেই হড়কে আরও দুই মিটার সরে গেল বাড়িটা। অন্ধকারে এদিক ওদিক ছিটকে পড়ল চেয়ারগুলো। মুসা গিয়ে পড়ল বিছানার ওপর, কিশোরের চেয়ারটা গেল কাত হয়ে।
মিসেস নিকারো? চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর, আপনি ঠিক আছেন?
আমাকে জিজ্ঞেস করছ? এই অবস্থায় ভাল থাকা যায়? এলসি, তুমি কোথায়?
মেঝেতে।
পুলিশ আসবেই, কিশোর বলল। নিশ্চয় খবর দিয়েছে মিস্টার রোজার। রবিন, ভাল আছ? মুসা, কোথায় তুমি?
আছি, গলা কাঁপছে রবিনের।
আমি এখানে, জবাব দিল মুসা।
অপেক্ষা করছে ওরা। শুনছে। জলস্রোতের শব্দ কানে এল, ছাত থেকে বৃষ্টির পানি গড়িয়ে পড়ার আওয়াজ নয়। বেকায়দা ভঙ্গিতে কাত হয়ে আছে কিশোর। হাত ব্যথা করছে, বাধা জায়গাগুলোতে। কাদা আর রাসায়নিক পদার্থের ভেজা ভেজা একটা গন্ধ আসছে। আতঙ্কিত হয়ে পড়ল সে। বুঝতে পারল, ভেঙে যাচ্ছে। সুইমিং পুলের পাড়। হাজার হাজার গ্যালন পানি এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে ওদের ওপর, কুটোর মত ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।
খাইছে! পানি আসছে কোত্থেকে! অন্ধকারে শোনা গেল মুসার গলা।
কিশোরের মত এলসিও বুঝে গেছে কারণটা। সাহায্যের জন্যে চেঁচাতে শুরু করল আবার।
এইবার জবাব মিলল।
ওখানে! চিৎকার করে বলল একটা কণ্ঠ। ওরা ওখানে!
দরজা খোলার চেষ্টা করল কেউ। কিন্তু আটকে গেছে ওটা। ভয়ঙ্কর আরেক দুলুনি। পুলের দিকে মুখ করা জানালাগুলো ভেঙে কাচের গুঁড়ো ছড়িয়ে পড়ল মেঝেতে। আলো দেখা গেল। টর্চ হাতে ঘোরাঘুরি করছে দুজন লোক। হইচই করছে। কলকল করে পানি ঢুকতে আরম্ভ করল ঘরে। ভাঙা জানালার সামনে দেখা গেল একটা মুখ।
মিসেস নিকারোকে আগে তুলুন, চেঁচিয়ে বলল কিশোর। মিসেস নিকারো!

জানালা দিয়ে ঢুকল একজন পুলিশ। তার পেছনেই একজন ফায়ারম্যান। টর্চের আলোয় বন্দিদের অবস্থা দেখে আঁতকে উঠল সে, সর্বনাশ...!
চোখের পলকে এসে মিসেস নিকারো আর এলসিকে তুলে নিল দুজনে, বাঁধা অবস্থায়। গলা ফাটিয়ে এখনও ঈশ্বরকে ডেকে চলেছে দুই মহিলা। আরও লোক ঢুকল ঘরে। তিন গোয়েন্দাকেও বের করা হল। বাঁধন কেটে দেয়া হল সকলের। একটা মুহূর্ত আর দেরি করল না কেউ। নামতে শুরু করল পাহাড় থেকে। বার বার হোঁচট খেয়ে, পিছলে পড়ে, অনেক কষ্টে অবশেষে হাইওয়েতে নেমে এল ওরা।
সেখানে গাড়ির ভিড়, অনেক ইঞ্জিনের গুঞ্জন। সার্চলাইটের আলো যেন ঝাড়ু দিয়ে ফিরছে সমস্ত পাহাড়টাকে।
বলেছিলাম না, ওখানেই আছে! ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসতে লাগল রোজার। কাছে এসে কিশোরের হাত ধরে প্রায় নাচতে শুরু করল। আমি বলেছি ওদের, তোমরা ওখানে। যাক বাঁচা গেল। থ্যাঙ্ক গড!
আরি, আমার বোট! হঠাৎ চিৎকার করে বলল মিসেস নিকারো।
বাড়িটা অন্ধকার, অফিসটাও। জেটির ধারে সাদা ট্রাকটা এখন নেই। একশো মিটার দূরে দেখা গেল ছুটন্ত আলো, টিনার।
ডাকাত! ডাকাতেরা আমার বোট নিয়ে গেল? চেঁচিয়ে বলল এলসি। যদি মনে করে থাকে। বাক্যটা শেষ করল না সে। দৌড় দিল জেটির দিকে।
এস! বলেই রবিনের হাত ধরে টানল মুসা। ছুটল এলসির পেছনে।
মিস্টার রোজার, কিশোর বলল। পুলিশকে বলুন কোস্ট গার্ডককে জানাতে। বোটের লোকগুলো আর্মস স্মাগল করছে।
তুমি যাও, মিসেস নিকারো বলল। আমি বলছি সব।
মাথা নেড়ে সায় জানিয়ে কিশোরও দৌড় দিল।
ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলে অফিসে ঢুকল এলসি। টান মেরে খুলল একটা ড্রয়ার। একটা চাবি তুলে নিয়ে মুসাকে বলল অফিসের পেছনের লকার থেকে দুটো দাঁড় নিয়ে আসতে।
হাইওয়েতে হট্টগোল শুরু হল। গর্জে উঠল একটা বড় ট্রাকের ইঞ্জিন। বিকট শব্দ করে আছড়ে পড়ে ভাঙল মোটেলটা, ভাঙা টুকরো-টাকরা ছিটকে গেল এদিক ওদিক। বাড়ি-ভাঙা জিনিসপত্রে বোঝাই হয়ে গেল রাস্তার একপাশের অর্ধেকটা। ভেঙে গেছে সুইমিং পুলের পাড়, ঢাল বেয়ে গড়িয়ে এল কাদা মেশানো পানির স্রোত। বান ডাকল যেন পথের ওপর।
সেদিকে চেয়ে মাত্র একটা মুহূর্ত নষ্ট করল এলসি। তারপর ঘুরেই দৌড় দিল বৃষ্টিভেজা ডকের দিকে। পেছনে তিন গোয়েন্দা।

সাইমনের স্পীডবোটটা নেব আমরা, এলসি বলল। টিনার চেয়ে স্পীড বেশি ওটার।
জেটিতে বাঁধা রয়েছে একটা দাড়টানা নৌকা। লাফ দিয়ে তাতে উঠল এলসি। দুলে উঠল নৌকাটা। তিন গোয়েন্দাও উঠল। দড়ি কেটে দিল কিশোর। ছপাৎ করে পানিতে দাঁড় ফেলল মুসা।
আরে, টিনার আলো কই! এলসি বলল। দেখা যাচ্ছে না আর।
উপকূল ধরে যাচ্ছে। মোড় নিয়েছে বোধহয়, বলল কিশোর।
সারেঙও না সারেঙের জাতও না বিল। পাথরে ধাক্কা লাগিয়ে বোটটা ডোবাবে আজ!
স্পীডবোটের গায়ে লাগল নৌকা। টান দিয়ে ককপিটের তেরপল সরাল ওরা। এলসি উঠল, আগে। তারপর মুসা আর রবিন। ইতিমধ্যে বয়ার সঙ্গে নৌকাটা বেঁধে ফেলেছে কিশোর। খুক করে ছোট্ট কাশি দিয়েই স্টার্ট হয়ে গেল চমৎকার ইঞ্জিন। ছুটল বোট।
বৃষ্টির বিরাম নেই। বাতাসাওও পাল্লা দিয়ে চলেছে। বড় বড় ঢেউ। বোটের তলায় চাপড় মেরে যেন কামানের গর্জন তুলছে। অভিজ্ঞ দক্ষ হাতে হুইল ধরেছে এলসি। গাদাগাদি করে বসে বোটের ধার আঁকড়ে ধরে রেখেছে ছেলেরা, যাতে ঝাঁকুনির চোটে উড়ে গিয়ে না পড়ে সাগরে।
আলোটা প্রথম রবিনের চোখে পড়ল। দূরে চলে গেছে। অস্পষ্ট। হাত তুলে বলল, ওই যায়!
বোটের গতি আরও বাড়িয়ে দিল এলসি। উত্তাল এই সাগরে মস্ত ঝুঁকি নিয়েছে।
হঠাৎ জ্বলে ওঠা উজ্জ্বল আলো ক্ষণিকের জন্যে যেন অন্ধ করে দিল ওদের। উত্তেজনায় এতক্ষণ খেয়াল করেনি, এখন কানে আসছে হেলিকপ্টারের রোটরে ক্যাট-ক্যাট-ক্যাট-ক্যাট। গাঢ় অন্ধকারে চাদর ফুড়ে কালো পানিতে বদমাশদের খুঁজে বেড়াচ্ছে সার্চলাইট।
কোস্ট গার্ড! এলসি বলল।
নিভিয়ে ফেলা হয়েছে টিনার আলো। কালো আকাশের পটভূমিতে কালচে একটা ছায়ার মত এখন চোখে পড়ছে ওটা। কাছে চলে এসেছে স্পীডবোট। আবছামত দেখা যাচ্ছে চলার পথে টিনার রেখে যাওয়া ফেনিল জলরেখা।
এহ্‌হে! চেঁচিয়ে উঠল এলসি। গভীর সাগরের দিকে চলে যাচ্ছে। শয়তানের দল! বেরিয়ে যাবে!
একবারে হুইলের পুরো অর্ধেকটা ঘুরিয়ে দিল সে। মোড় নিতে গিয়ে বিপজ্জনক ভঙ্গিতে কাত হয়ে গেল স্পীডবোট। গোঁ গোঁ করে তীব্র প্রতিবাদ জানাল ইঞ্জিন।

টিনার জলরেখা ধরে ছুটল লাফিয়ে লাফিয়ে। দেখতে দেখতে চলে এল বোটটার পাশে। রাইফেলের শব্দ শোনা গেল, স্পীডবোটকে সই করে গুলি আরম্ভ করেছে। ইতরের বাচ্চা! গাল দিল এলসি।
সামনে চলে এল স্পীডবোট। শাঁ করে বেরিয়ে গেল বোটের নাকের ডগা দিয়ে। ধাক্কা বাঁচাতে গিয়ে বোটেরও নাক ঘুরিয়ে ফেলতে হল। কাত হয়ে যাচ্ছে। উল্টে যাওয়ার ভয়ে সঙ্গে সঙ্গে কমিয়ে দেয়া হল গতি।
আবার গুলির শব্দ। এবারও ব্যর্থ হল নিশানা। বোটের কাছে পানিতে পড়ল বুলেট।
এই সময় খোলা সাগরের দিক থেকে ফিরে এল হেলিকপ্টার। ওটার শক্তিশালী নীলচে-সাদা আলো যেন বিদ্ধ করল টিনাকে।
পেয়েছে এতক্ষণে! স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। তাকাল তীরের দিকে। ওখানকার আলোগুলো বেশি কাছে মনে হচ্ছে এখন।
কিন্তু কোস্ট গার্ডদের কাটারটা কই? জাহাজটাকে দেখার জন্যে এদিক ওদিক তাকাল এলসি।
টিনার গতি আবার বেড়েছে। একেবেঁকে ছুটছে, যেন জোঁকের মত লেগে থাকা হেলিকপ্টারের আলোকরশ্মি ঝেড়ে ফেলতে চাইছে গা থেকে। তীরের দিকে গিয়ে বাঁচতে পারবে না, বুঝে গেছে, আবার মুখ ঘোরাল খোলা সাগরের দিকে।
হা-হা করে হেসে উঠল এলসি। আবার স্পীডবোটটাকে নিয়ে এল টিনার গলুইয়ের সামনে। ধাক্কা লাগার ভয়ে আবার গতি কমাতে বাধ্য হল বোটের সারেঙ।
বাঁয়ে দেখল কিশোর, মাথায় ফেনার মুকুট পরে তাথৈ নৃত্য জুড়েছে ঢেউ। ভীমগতিতে ধেয়ে আসছে বিশাল এক ঢেউ, যেন ছোটখাট এক পাহাড়।
হুঁশিয়ার! চেঁচিয়ে উঠল মুসা।
বনবন করে স্টিয়ারিং ঘোরাল এলসি। কাত হয়ে উল্টে যাওয়ার অবস্থা হল স্পীডবোটটার। পানির পাহাড়ের প্রায় গা ছুঁয়ে বেরিয়ে চলে এল কোনমতে।
টিনা পারল না। গা বাঁচাতে গিয়ে পাশে কাটল। চোখা পাথরে ঘষা লেগে ছিঁড়ে রয়ে গেল অর্ধেকটা তলা। কাঠ ভাঙার মড়মড় তো নয়, মুসার মনে হল বোটটার অন্তিম আর্তনাদ। লাফ দিয়ে পানির ওপরে উঠে গেল টিনা, ঝপাং করে পড়ল আবার। চেঁচাতে শুরু করল আরোহীরা। লকলক করে উঠল কমলা-আগুনের জিভ।
হায় হায়, আগুন লেগে গেছে! ককিয়ে উঠল এলসি।
কাত হয়ে ভাসছে এখন টিনা, ডুবে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ছে আগুন। এলসি কাঁদছে। আগুনের আলোয় দেখা গেল, তার

দুগালে অশ্রুধারা। কাঁদতে কাঁদতে বলল, নিশ্চয় ফুয়েল লাইন ফেটে গেছে!
টিনার ডেক থেকে সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ল একজন, তারপর আরেকজন। শেষে আরও দুজন।
নোঙরটা তুলে নাও একজনে, কঠিন কণ্ঠে বলল এলসি। বিন্দুমাত্র মায়া করবে না। আমাদের বোটে যেন উঠতে না পারে।
পারবে না, ম্যাডাম, কথা দিল মুসা। দুহাতে ধরে তুলে নিয়েছে ভারি নোঙরটা।
স্পীডবোটের দিকে সাঁতরে আসতে দেখা গেল একজনকে। সিটের নিচে লাইফজ্যাকেট আছে, আবার বলল এলসি। বের কর ওগুলো।
রবিন আর কিশোর মিলে বের করল। একটা জ্যাকেট ছুঁড়ে দিল কিশোর। ওটা ধরে সাঁতরে আরও কাছে চলে এল বিল, স্পীডবোটে ওঠার ইচ্ছে। বাড়ি মারার জন্যে নোঙর তুলল মুসা। থেমে গেল বিল। আর কাছে আসার চেষ্টা করল না। অন্য তিনজনও স্পীডবোট থেকে দূরে রইল। একটা করে জ্যাকেট ছুঁড়ে দিল সবাইকে কিশোর।
লম্বা একটা দড়ি খুঁজে বের করল রবিন। বোটের সঙ্গে একমাথা বেঁধে দড়িটা ছুঁড়ে দিল পানিতে। যাতে ওটা ধরে ভাসতে পারে বিল আর তার তিন সঙ্গী।
দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন। গ্রাস করে নিয়েছে পুরো বোটটাকেই। আলোয় আলোকিত করে ফেলেছে সাগরের একটা অংশ। বিস্ফোরণের বিকট শব্দ, উড়ে চলে গেল বোটের একাংশ, বাকিটা টুপ করে ডুবে গেল পাথরের মত।
অবশেষে এল কোস্ট গার্ডদের জাহাজ। তখনও দুর্ঘটনার জায়গায়ই অপেক্ষা করছে স্পীডবোট। দড়ি ধরে ঢেউয়ের মধ্যে খাবি খাচ্ছে চার ডাকাত। টিনা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।
এক হপ্তা পর। আবার উত্তরে চলেছে তিন গোয়েন্দা। মোড় নিয়ে সাইপ্রেস ক্যানিয়ন ড্রাইভে নামল তিনটে সাইকেল। নুমেরিজ ইন-এ পৌঁছে দেখল, ওদেরই অপেক্ষা করছেন মিস্টার ভিকটর সাইমন। সাগরের দিকে মুখ করা মস্ত ঘরটায় বসে আছেন তিনি। কাচের টেবিলে খাবার সাজিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কিম, হাসি হাসি চেহারা। ছেলেদের দেখেই ঘোষণা করল, আজ সব আমেরিকান খাবার। গুবারের পানাট-বাটার-মার্শম্যালো-ফ্লাফ স্যাণ্ডউইচ। রসাল ফ্র্যাঙ্কফর্টারস। বার্গার অন সানশাইন ব্র্যান বান, আর পিকি পিকল টেস্ট-ট্রিট রেলিশ। বলে চওড়া হাসি উপহার দিয়ে বাউ করে বেরিয়ে গেল ভিয়েতনামী।
দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মিস্টার সাইমন। ব্র্যাণ্ড নেম বলে টিভিতে বিজ্ঞাপন না দিলে বাজারে গিয়ে মনে হয় খাবারই কিনতে পারত না কিম।
খাবারগুলো দেখে কিন্তু ভালই মনে হচ্ছে, রবিন বলল।

ভ্রূকুটি করলেন লেখক। পানাট-বাটার-মার্শম্যালো-ফ্লাফ স্যাণ্ডউইচ খেতে পারবে তুমি?
দ্বিধায় পড়ে গেল রবিন। জানি না। তবে ফ্র্যাঙ্কফুর্টার খেতে পারব।
বাকিগুলোও না পারার কোন কারণ নেই, মুসা বলল। অবশ্যই যদি শুয়োরের মাংস না থাকে।
শুরু করে দাও তাহলে, বললেন সাইমন।
দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যেতে লাগল হ্যামবার্গার আর ফ্রাঙ্কফুর্টারগুলো। কিন্তু স্যাণ্ডউইচগুলো ছুঁয়েও দেখল না কেউ। সন্দেহের চোখে বার বার ওগুলোর দিকে তাকাচ্ছে মুসা। বলল, কয়েকটা খেয়ে দেখলে কেমন হয়? কিমের কথায় মনে হল, ওগুলোতেই বেশি আগ্রহ তার। না খেলে দুঃখ পাবে বেচারা।
পেলে আর কি করা? তাকে বুঝতে হবে, স্বাদ পায় বলেই খায় লোকে। বিস্বাদ হলে খেতে পারত না। প্রাণ বাঁচানোর জন্যে ওষুধ দরকার, কিন্তু সহজে খেতে চায় কেউ? হাত নাড়লেন সাইমন। খাবারের আলোচনা থাক। কেসের কথা বল। কয়েকবার ফোন করেছি এলসিকে, জবাবই দিতে চায় না। মেজাজ তেতে তার চুলের মতই লাল হয়ে আছে। বিলের কথা শুনলেই তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে।
এত রাগ নিশ্চয় টিনার জন্যে? মুসা বলল।
না। পুলিশ বিলের গায়ে তাকে হাত লাগাতে দেয়নি বলে।
হাসল কিশোর। বড় বাঁচা বেঁচে গেছে বিল। নাক-মুখের চামড়া আর থাকত তাহলে। যা বড় বড় নখ দেখেছি এলসির হাতে।
রাগে অন্ধ হয়ে আছে মেয়েটা। ভাগ্যিস টিনার বীমা করা আছে। নইলে আত্মহত্যাই করে বসত। তোমাদের তদন্তের কথা খুলে বলবে, প্লীজ? খবরের কাগজে যা যা জেনেছি, তাতে সন্তুষ্ট হতে পারছি না। জীবনভর গোয়েন্দাগিরি করে করে স্বভাব খারাপ হয়ে গেছে, খুঁটিনাটি না জানলে এখন আর ভাল লাগে না। খালি খুঁতখুঁত করে মন।
কেস রিপোর্ট পড়তে চান? রবিনের হাতে বড় একটা খাম, সেটা দেখিয়ে, জিজ্ঞেস করল। মিস্টার ক্রিস্টোফারের অফিসে গিয়েছিলাম। তিনি নেই। দেশের বাইরে গেছেন। এলে তারপর দেব। ইচ্ছে করলে পড়তে পারেন।
চাই মানে? হাত বাড়ালেন সাইমন। দেখি।
নীরব হয়ে গেল ঘরটা। কোস্ট হাইওয়েতে শোনা যাচ্ছে যানবাহনের শব্দ। পাতার পর পাতা উল্টে চলেছেন সাইমন, গভীর মনোযোগে পড়ছেন। পড়া শেষ করে তাকালেন সাগরের দিকে। বললেন, অনেক সময় ছোটখাটো ব্যাপারই মানুষের সর্বনাশ করে ছাড়ে। রক ওই মানিব্যাগের লোভটা না করলেই আর ধরা পড়ত না।

ধরা পড়ায় অবশ্য ভালই হয়েছে। অনেক লোকের জীবন বেঁচেছে। অস্ত্রগুলো নিয়ে যেতে পারলে কত লোক যে মারা যেত জানতেই পারতাম না কোনদিন।
মাথা ঝাঁকাল কিশোর। বিলের মত মানুষ মেসা ডিওরোতে আরও আছে। আমরা শুধু অস্ত্রের একটা চালান বন্ধ করতে পেরেছি।
রোজারের কি খবর? সন্দেহমুক্ত হয়েছে নিশ্চয়? কাগজে তো কিছু লেখেনি।
হয়েছে। পুলিশের কাছে মুখ খুলেছে বিল আর তার সঙ্গীরা। গুপ্তচরগিরি আর দূতিয়ালী করত রক। বিলের গ্রুপের মত অনেক গ্রুপ আছে রিপাবলিকানদের। নেতাদের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করত রক, এনে রাখত মিস্টার রোজারের ফ্রিজে। তারপর মাসে একবার প্লেনে করে যেত মেকসিকো সিটিতে, রডরিগেজদের কারও হাতে সেই টাকা দিয়ে আসত। সব না। কিছু কিছু করে রেখে দিত নিজের জন্যে, বুঝতে পারেনি কেউ।
রকই জিনো, তাই না?
হ্যাঁ। রক জিনিমুর রেনাল্ড। মায়ের দেশ মেসা ডিওরো। বাপের নাম রেনাল্ড, আমেরিকান। রকের নানার নামও ছিল জিনিসুর, রিপাবলিকানদের একজন বড়সড় নেতা ছিলেন। রকের মা-ও ছিলেন বড় নেত্রী। মায়ের মৃত্যুর পর রক যোগ দেয় রিপাবলিকানদের দলে।
হুঁ। আচ্ছা, কি করে বুঝলে, ব্যাংক ডাকাতির কিছু টাকা রেখে দিয়েছে সে?
বুঝিনি, আন্দাজেই বলে ফেলেছিলাম। কিছু একটা বলে দেরি করাতে চাইছিলাম ওদের, তাই বিলের মনে সন্দেহ ঢোকানোর চেষ্টা করেছিলাম, মুসল কিশোর। কাজে লেগে গেল ফন্দিটা।
অন্ধ কে সেজেছিল? নিশ্চয় রক?
হ্যাঁ, জবাব দিল রবিন। তার গাড়ির ট্রাংকে উইগ আর মেকাপের সরঞ্জাম পেয়েছে পুলিশ। অ্যাট্রানটো সেজে ডাকাতি করতে যাওয়াটাকে বেশ একটা রোমাঞ্চকর ব্যাপার মনে করেছিল রক।
হাসলেন সাইমন। ওদের পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ার মূলে ওই রক। মাইসের কথা বল। মুভিং কোম্পানিটা একটা ভাঁওতা, তাই না? আসলে ব্যবসা করত বেআইনী অস্ত্রের?
হ্যাঁ, জবাব দিল মুসা। গা ঢাকা দিয়েছে মাইস। চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ, এখনও ধরতে পারেনি।
এখন আসল কথাটা বল। সিনথিয়া ব্যানালিসের সঙ্গে এসবের কি সম্পর্ক?
কোন সম্পর্ক নেই। তার বাড়ি মেসা ডিওরোতে, বিলকে চেনে, ব্যস। রিপাবলিকানদের সাপোর্ট করে, তবে টেরোরিস্টদের নয়।
বিলের সঙ্গে ঝগড়া লাগল কি নিয়ে?

তাকে নিজের দলে ঢোকাতে চাইছিল বিল। সিনথিয়া রাজি হয়নি।
ভাল করেছে, খামটা রবিনের হাতে ফিরিয়ে দিলেন সাইমন। ভাল কাজ দেখিয়েছ তোমরা। আচ্ছা, তোমাদের এই গল্প নিয়ে যদি একটা বই লিখে ফেলি, আপত্তি আছে?
আমাদের নেই, বলল কিশোর। তবে মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফারকে জিজ্ঞেস করতে হবে। আমার মনে হয় রাজি হবেন তিনি। আপনি বই লিখে দিলে ছবি। বানাতে সুবিধে হবে তার।
হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। সে-ই ভাল। আগে তাকে জিজ্ঞেস করে নাও, গাল চুলকালেন লেখক। তা আমার সঙ্গে সাগরে বেড়াতে যাচ্ছ কবে?
ছিপ নেবেন তো, স্যার? মুসা জিজ্ঞেস করল।
নিশ্চয়ই।
হাসি ছড়িয়ে পড়ল মুসার সারা মুখে। তাহলে যখন বলবেন তখনই।

ভলিউম ১০ – বাক্সটা প্রয়োজন – তিন গোয়েন্দা – রকিব হাসান – সেবা প্রকাশনী

বাবারে! বলে উঠল রবিন মিলফোর্ড। একেবারে আসল মালয়ী কিরিচ!

কিশোর পাশা আর মুসা আমানকে জিনিসটা দেখাল সে। চোখ চকচক করছে। বাড়ি থেকে মাইল কয়েক দূরের এক রোড সাইড মিউজিয়মে রয়েছে ওরা। আঙুল দিয়ে কিরিচের ধার পরখ করল মুসা।

বিজ্ঞের ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল কিশোর। প্রাচীন আমলে ঈস্ট ইণ্ডিজ থেকে অনেক জাহাজ আসত ক্যালিফোর্নিয়ায়, বলল সে। এই মিউজিয়মের বহু জিনিস এসেছে প্রাচ্য থেকে। নীরবে তার লেকচার শুনতে লাগল দুই সহকারী।

এই, কি বকবক শুরু করেছিস ওখানে? ঘরের আরেক প্রান্ত থেকে ধমক লাগালেন মেরিচাচী। সুযোগ পেলেই বক্তৃতা..আয়, এখানে সায়। ট্রাকে মাল তুলতে হবে না?

আসছি, বলে দুই সহকারীর মুচকি হাসি উপেক্ষা করে এগিয়ে গেল কিশোর।

বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে মিউজিয়মটা। জিনিসপত্র সব বিক্রি করে দিচ্ছে। সেগুলোই কিনতে এসেছেন মেরিচাচী। সাহায্য করার জন্যে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন তিন গোয়েন্দাকে। বড়দিনের ছুটির এই প্রথম দিনেই এরকম বিপদে পড়বে, ভাবতে পারেনি ওরা। তাহলে দূরে দূরে থাকত। অন্তত সকালবেলাটা মেরিচাচীর সামনে না পড়লেই চলত।

কি আর করবে? দীর্ঘশ্বাস ফেলে কাজে হাত লাগাল ওরা। এক এক করে জিনিস বয়ে নিয়ে গিয়ে দিতে লাগল ইয়ার্ডের কর্মচারী, বিশালদেহী ব্যাভারিয়ান বোরিসকে। সে ওগুলো ট্রাকে তুলতে লাগল। ছেলেদের মনের অবস্থা বুঝে আপনমনেই হাসল সে, মৃদু শিস দিতে শুরু করল।

জিনিসপত্র বুঝে নিতে গেলেন মেরিচাচী, মিউজিয়মের মালিক মিস্টার ব্যানারের কাছে।

ওখানকার কাজ শেষ করে আবার আগের জায়গায় ফিরে এলেন মেরিচাচী, ছেলেদের কাজ তদারক করতে। কয়েকটা বাক্স বাঁধায় হাত লাগালেন। মিস্টার ব্যানার গেলেন সামনের হলে, একজন লোকের সঙ্গে কথা বলার জন্যে, এইমাত্র এসেছে লোকটা।

খানিক পরেই মেরিচাচী আর ছেলেদের কানে এল একটা উত্তেজিত কাকে কি কথা দিয়েছেন সে-পরোয়া আমি থোড়াই করি!

শান্তকণ্ঠে বললেন মিস্টার ব্যানার, দেখুন...।

তাকে কথা শেষ করতে দিল না লোকটা। দেখাদেখির কিছু নেই! ওটা এখুনি চাই আমার।

মিউজিয়মের জিনিস নিয়েই কথা কাটাকাটি হচ্ছে, বুঝতে পারলেন মেরিচাচী। তাড়াতাড়ি এগোলেন-হলের দিকে। পেছনে চলল তিন গোয়েন্দা।
ব্যানার বলছেন, সরি, মিস্টার, সব বিক্রি হয়ে গেছে। এখন আর কিছু করার নেই।
সেগুন কাঠের একটা বাক্সের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। তামার কারুকাজ করা বাক্স। ওটার অন্যপাশে দাঁড়িয়ে আছে খাটো একজন মানুষ। মুখে কালো চাপদাড়ি। রোদেপোড়া কুঁচকানো চামড়া। কোটরে বসা ঘন কালো চোখ। গালে দুটো গভীর কাটা দাগ ঢুকে গেছে দাড়ির ভেতরে। পোশাক দেখে অনুমান করতে কষ্ট হয় না, লোকটা সদাগরী জাহাজের নাবিক।
জ্বলন্ত চোখে মিস্টার ব্যানারের দিকে চেয়ে প্রায় গর্জে উঠল সে, দেখুন, এই বাক্স আমার। আমি এটা ফেরত চাই। হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি...।
ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল মিউজিয়ম-মালিকের। শুনুন মিস্টার, আমি...।
মিস্টার মিস্টার করছেন কেন? আমার একটা নাম আছে। টিক বানাউ। লোকে নাম রেখেছে পানির পোকা, লোকটা জানাল গর্বের সঙ্গেই। অনেক পথ বয়ে এনেছি ওই বাক্স। ওটাতে বিপদ আছে, বুঝেছেন, বিপদ, ছেলেদের দিকে চোখ পড়তে বিড়বিড় করে কি বলল টিক, কে জানে, বোধহয় গালই দিল। ধমকে উঠল, এই, তোমাদের এখানে কি? সর, যাও, ভাগ। এই বেটি, তুমিও যাও?
চট করে মেরিচাচীর দিকে তাকাল একবার কিশোর। হাসি চাপতে কষ্ট হল।
রাগে টকটকে লাল হয়ে গেল মেরিচাচীর মুখ। কি, দাড়িওলা ছাগল! ভদ্রতা ভুলে চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি। আমি বেটি, না! দেখাচ্ছি মজা! এই কিশোর, বোরিসকে ডাক তো...! কথা আটকে গেল তাঁর।
মহিলা এত রেগে যাবেন, কল্পনাও করেনি নাবিক। তাছাড়া কাজের পোশাক পরে এসেছেন মেরিচাচী, টিক মনে করেছে, কাজের লোক–টোকই হবে। এখন বুঝল, ভুল করে ফেলেছে।
ভুল করেছেন আপনি, মিস্টার পানির পোকা, লোকটার ব্যবহারে ব্যানারও রেগেছেন। একজন মহিলাকে অপমান করেছেন। জানেন উনি কে? রকি বীচের সব চেয়ে বড় স্যালভিজ ইয়ার্ডের মালিক। এখানকার সমস্ত জিনিসপত্র, ওই বাক্স, সবই কিনেছেন।
চোখ মিটমিট করল নাবিক। আমি...আমি দুঃখিত, ম্যাডাম। মেজাজ ঠিক রাখতে পারিনি। পানিতে পানিতে থাকি তো, ভদ্রতা আর কোথায় শিখব, বলুন? তাছাড়া অনেক দিন ধরে এই বাক্সটা খুঁজছি, আজ হঠাৎ পেয়ে গিয়ে মাথার ঠিক ছিল না।
লোকটা নরম হয়ে মাপ চাইতে মেরিচাচীও লজ্জিত হলেন। ছেলেরা বাক্সটা ঘিরে দাঁড়িয়েছে। হাত বুলিয়ে দেখছে। বললেন, এটা আপনার হলে এখানে এল

কিভাবে?
চুরি গিয়েছিল, ম্যাডাম। এক হারামজাদা চুরি করেছিল আমার জাহাজ থেকে। হপ্তা দুই আগে স্যান ফ্রান্সিসকোয় ভিড়েছিল, তখন। নিয়ে গিয়ে বেচে দেয় সেকেণ্ডহ্যাণ্ড মাল বেচে ওরকম এক দোকানির কাছে। দোকানি সোজা পাঠিয়ে দিয়েছে এখানে। খোঁজ করতে করতে আমিও চলে এসেছি।
কিন্তু..।
মেরিচাচীর কথার মাঝখানে বলে উঠল রবিন, এই নামটা কার? ডালা তুলে ফেলেছে ওরা। ভেতরের দিকে লেখা লিটল মারমেইড নামটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, আপনার জাহাজের, মিস্টার বানা?
না, থোকা, টিক বলল। অনেক পুরানো বাক্স এটা। আমার হাতে পড়ার আগে কম করে হলেও পঞ্চাশ জনের হাত ঘুরে এসেছে। সিঙ্গাপুরে যখন বাক্সটা কিনলাম, তখনই ওই নাম দেখেছি।
ব্যানার জানালেন, গতকাল পেয়েছি এটা, মিসেস পাশা। মরিস ডিলম্যানকে বলে রেখেছিলাম, মিউজিয়মে রাখার মত জিনিস পেলেই যেন পাঠায়। পাঠিয়ে দিয়েছে। ব্যবসা যে ছেড়ে দিচ্ছি, একথা আর জানানো হয়নি ওকে।
ন্যায্য দাম দিতে রাজি আছি আমি, টিক বানাউ বলল।
বেশ, বললেন মেরিচাচী। ধরে নিলাম, জিনিসটা আপনার। মিস্টার ব্যানার কিনেছেন, তারপর আমার কাছে।
কথা শেষ করতে পারলেন না এবারেও।
বিচিত্র খড়খড় শব্দ হল।
কী...? বলতে গিয়ে থেমে গেল রবিন।
কট করে আরেকটা শব্দ হয়েছে।
ঝিক করে উঠল জিনিসটা। ডালার ওপর ঝুঁকে ছিল কিশোর, তার কানের পাশ দিয়ে শাঁ করে গিয়ে দেয়ালে বিধল একটা ছুরি।
দীর্ঘ একটা মুহূর্ত পাথর হয়ে রইল যেন সবাই। দেয়ালে থিরথির করে কাঁপছে। ছুরির হাতল।
কিশোরের কাছে ছুটে গেলেন মেরিচাচী। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রায় ককিয়ে উঠলেন, এই, লাগেনি তো কোথাও! কিশোর?
মাথা নাড়ল কিশোর। দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না যেন, ধপ করে গিয়ে বসে পড়ল একটা পুরানো বেঞ্চে। বড় বাঁচা বেঁচেছে। অল্পের জন্যে চোখে লাগেনি ছুরিটা।
কে ছুঁড়ল? পাগলের মত এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন ব্যানার।
আ-আমার দিকে তাকাচ্ছেন কেন? এক পা পিছিয়ে গেল টিক।
কে-কে-কেউ ছুঁড়েনি! তোতলাতে শুরু করল রবিন। বাক্স থেকে বেরিয়েছে।

কাছে এসে ভেতরে তাকালেন ব্যানার। গড! ভেতরে গোপন খোপ খুলে গেছে! নিশ্চয় কোথাও হাত দিয়ে ফেলেছিলে, রবিনকে বলল। কোন গোপন সুইচ-টুইচে।...
হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়, বলল রবিন। গোপন খোপেই ছিল ছুরিটা। খোপের ঢাকনা খুলতেই স্প্রিং ছুটে গেছে। বুবি ট্র্যাপ!
খাইছে! মুসা বলল। খোপ যে খুলবে...।
শাসানোনার ভঙ্গিতে টিক বানাউয়ের দিকে এগোলেন মেরিচাচী। যদি এটা আপনার কাজ হয়ে থাকে...।
বুবি ট্রাপ কাকে বলে তা-ই জানি না আমি! আবার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল নাবিকের।
না, আপনি করেননি একাজ! কিশোর বলল। মুখে রঙ ফিরতে শুরু করেছে ওর। উঠে গিয়ে দেয়াল থেকে খুলে নিল ছুরিটা। প্রাচ্যের জিনিস এটা। যতদূর মনে হয়, পূর্ব ভারতীয়। বাজি রেখে বলতে পারি, শত বছর আগে ওই ফাঁদ পেতে রেখেছিল কোন জলদস্যু!
খাইছে!
জলদস্যু? রবিন বলল।
কিশোরের চোখ চকচক করছে। ছুরিটা নিয়ে বাক্সের কাছে ফিরে এল সে। গোপন খোপটা পরীক্ষা করতে লাগল। মাথা ঝাঁকাল সন্তুষ্ট হয়ে। বললাম না? স্প্রিং, হুড়কো, সব হাতে বানানো। মরচে পড়েছে। অনেক পুরানো। দামি জিনিস চোর-ডাকাতের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে এরকম ফাঁদ পাতা হত সেকালে। জাভা আর মালয়ের জলদস্যুরা এসব কাজে ওস্তাদ ছিল।
সবার চোখ ঘুরে গেল টিক বানাউয়ের দিকে।
না-না, তাড়াতাড়ি দুহাত নাড়ল পানির পোকা। আমি ওসব দেশের লোক নই। তবে জাভায় ছিলাম অনেকদিন। কোন জলদস্যুর সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই।
গুঙিয়ে উঠল মুসা। জাভা জায়গাটা যে কোথায়, তা-ই আমি জানি না।
ইন্দোনেশিয়ার একটা বড় দ্বীপ, বলল কিশোর। কাছাকাছি আরও দ্বীপ আছে। সুমাত্রা, নিউ গিনি, বোর্নিও, সেলিবিস, এবং আরও হাজারও ছোট-বড় দ্বীপ। এখন ইন্দোনেশিয়া স্বাধীন, কিন্তু আগে ওলন্দাজ কলোনি ছিল ওখানে। ছোট ছোট শত শত রাজ্য ছিল, ওগুলোকে বলা হত সালতানাত, শাসনকারীদের বলা হত সুলতান। বেশির ভাগই ডাকাত ছিল ওরা।
ব্ল্যাকবিয়ার্ডের মত? জানতে চাইল মুসা। পাল তোলা জাহাজ, ভারি কামান, কালো পতাকায় মানুষের খুলি আর হাড়ের ছবি...।

না, ঠিক ওরকম নয়। এসব ছিল পশ্চিমা জলদস্যদের নিশানা। ব্ল্যাকবিয়ার্ড ছিল ইংরেজ। ঈস্ট ইনডিয়ান জলদস্যুদের বড় জাহাজ ছিল না, জলি রজার পতাকা ছিল না, কামানও ছিল খুব কম। ছোট দ্বীপগুলোতে থাকত ওরা। ইউরোপিয়ান কিংবা আমেরিকান জাহাজ দেখলেই তেড়ে এসে চড়াও হত।
পশ্চিমা জাহাজগুলো তখন ওসব অঞ্চলে যেত মশলা, টিন, চা আর চীন থেকে সিল্ক আনার জন্যে। নানারকম চমকপ্রদ জিনিস নিয়ে য়েত ব্যবসা করার জন্যে, আর নিত ব্যাগভর্তি সোনা-রূপা। অস্ত্রশস্ত্রও নিত। সেসব ছিনিয়ে নেয়ার জন্যেই হামলা চালাত জলদস্যুরা। তবে সব সময়ই হেরে আসত না পশ্চিমারা। পাল্টা হামলা চালাত। অনেক সময় তো ঘরে ঢুকে গিয়ে শেষ করে দিয়ে আসত জলদস্যুদের।
তারমানে এদেশীরাও কম ডাকাত ছিল না, হেসে বলল রবিন। তো, তোমার কি ধারণা? ওই অঞ্চল থেকেই এসেছে এই বুবি ট্র্যাপ?
ধারণা নয়, আমি শিওর, চিন্তিত ভঙ্গিতে গাল চুলকাল কিশোর। শোনা, যায়, এখনও নাকি কিছু জলদস্যু আছে কোন কোন দ্বীপে।
কিশোর, দেখ! চেঁচিয়ে উঠল মুসা। বাক্সের ভেতর ছোট একটা জিনিস পেয়ে তুলে দেখাল, আঙটি! খোপটাতে ছিল।
আর কিছু আছে? রবিন জিজ্ঞেস করল।
ঠেলে মুসাকে সরিয়ে বাক্সের ওপর ঝুঁকল টিক। দেখি তো। ঘোড়ার ডিম আর কিছু নেই।
মুসার হাত থেকে আঙটিটা নিল কিশোর। নিখুঁত, সূক্ষ্ম খোদাই। সোনার হতে পারে, কিংবা তামার, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। মাঝখানে লাল একটা পাথর বসানো। খাঁটি, কিশোর? মুসা জানতে চাইল।
বুঝতে পারছি না। হতে পারে। খাঁটি সোনার অলঙ্কার যেমন পরত ওখানকার লোকে মেকিও পরত। সোনার রঙ করা, কিন্তু সোনা নয়। ওসব দিয়ে ইউরোপিয়ানরাই বেশি ঠকাত দেশী লোকদের।
আঙটির জন্যে হাত বাড়াল টিক। আসলই হোক আর নকলই হোক, ওট আমার জিনিস, থোকা। বাক্সটা যেহেতু আমার, ভেতরের সব কিছুই আমার। দাম বল। আমার বাক্স আমি নিয়ে যাই।
দেখি আগে, কি কি আছে, মেরিচাচী বললেন। তারপর বলছি...
বাধা দিল কিশোর, চাচী, বাক্সটা কার, কিভাবে জানছি আমরা। নাম -তে আর লেখা নেই। ওরকম গপ্পো যে-কেউ এসে শোনাতে পারে।
আমাকে মিথ্যুক বলছ, ছেলে? খেপা ষাঁড়ের মত গোঁ গোঁ করে উঠল টিক।

বেশ, প্রমাণ করুন যে আপনি সত্যি বলছেন। কাগজ-টাগজ দেখান। কা; কাছ থেকে কিনেছেন, লিখিত আছে? নইলে এমন কাউকে গিয়ে নিয়ে আসুন, যে সাক্ষী দেবে এটা আপনার। বলবে, জাহাজে আপনার কাছে ছিল।
সবাই বলবে। আমার সঙ্গে যেসব নাবিক আছে, সব্বাই। এখন আমার জিনিস...।
ঠিক আছে, কিশোর বলল। বাক্সটা আমরা রেখে দেব। কারও কাছে বেচব। আপনি গিয়ে লোক নিয়ে আসুন। এক হপ্তা রেখে দেব আমরা। বাক্স ছাড়া ওই কটা দিন নিশ্চয় আপনার অসুবিধে হবে না?
হ্যাঁ, ভাল কথা বলেছ, মিস্টার ব্যানার বললেন। টিক বানাউয়ের চোখ জ্বলছে। যথেষ্ট হয়েছে। এত ভাল কথা লাগবে না। আমার। যা দরকার, সেটা নিয়ে তবেই যাব এখান থেকে, কেউ ঠেকাতে পারবে ন। কিশোরের দিকে এগোল। দাও দিখি আঙটিটা।
দরজার দিকে পিছাতে শুরু করল কিশোর।
এই, শুনুন, বাধা দিতে চাইলেন মেরিচাচী।
চুপ! বলে তাকে থামিয়ে দিল নাবিক।
বিশাল ছায়া পড়ল দরজায়। ঘরে ঢুকল ব্যাভারিয়ান। এই, কাকে ধমক দিলে? শান্তকণ্ঠে বলল সে। ম্যাডামকে? যাও, পায়ে ধরে মাপ চাও।
জোর করে বাক্সটা নিয়ে যেতে চাইছে! চেঁচিয়ে জানাল রবিন।
তাই নাকি?
ধরুন ওকে, বোরিস ভাই, কিশোর বলল।
ধরছি।
বোরিসকে দেখেই থমকে গিয়েছিল টিক। এগোতে দেখে মিস্টার ব্যানারের আড়ালে চলে গেল। শেষে বিপদ বুঝে এক ধাক্কায় মিউজিয়ম-মালিককে বোরিসের গায়ের ওপর ফেলে দরজার দিকে দিল দৌড়।
ধরুন, ধরুন! চেঁচিয়ে উঠল মুসা।
চিত হয়ে পড়ে গেছে বোরিস। তার গায়ের ওপর পড়েছেন বেচারা ব্যানার। জট ছাড়িয়ে দুজনে যখন উঠে দাঁড়াল, বেরিয়ে গেছে টিক। মিউজিয়মের পেছনে গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ হল। ছুটে বাইরে বেরোল ছেলেরা। দেখল, ধুলো উড়িয়ে চলে যাচ্ছে একটা গাড়ি। কোস্ট হাইওয়ে ধরে ছুটে হারিয়ে গেল পাহাড়ের মোড়ে।
ঝামেলা গেল, হাত ঝাড়লেন মেরিচাচী। কাজ সেরে ফেলা দরকার। দাঁড়িয়ে থেক না। মালগুলো তুলে ফেল। ...
বুঝতে পারছি না, রবিন বলল। বাক্সটার কী প্রয়োজন তার? এত আগ্রহ কেন?
সুন্দর দেখেছে তো, মেরিচাচী বললেন। ফাঁকি দিয়ে নিতে চেয়েছিল আরকি। যাও যাও, কাজ সেরে ফেল। একবারে শেষ হবে না মাল, আবার আসতে হবে।

ঘন্টাখানেক পর মালের ছোটখাটো একটা পাহাড় তৈরি হল ট্রাকের পেছনে। সামনে উঠে বসলেন মেরিচাচী আর বোরিস। পেছনে ছেলেদেরকে উঠতে সাহায্য করলেন ব্যানার।
মিস্টার ব্যানার, ভুরু কুঁচকে রেখেছে কিশোর। আপনি বললেন স্যান ফ্রান্সিসকোর মরিস ডিলম্যান বাক্সটা পাঠিয়েছে আপনার কাছে?
হ্যাঁ। স্থানীয় লোকের আগ্রহ রয়েছে জাহাজটার ওপর। একশো বছর আগে রকি বীচের কাছেই ডুবেছিল লিটল মারমেইড। মাঝে মাঝেই ওটার জিনিসপত্র বেরিয়ে আসে লোকের হাতে, আমার সামনে পড়লে কিনি...মানে, কিনতাম। এখন আর কিনব না।
নিশ্চয়। এখন আর কি দরকার, কিশোর বলল। হ্যাঁ, একশো নয়, কিছু কম। আঠারশো চুরানব্বই সালে ডুবেছিল জাহাজটা।
ছুটে চলেছে ট্রাক। ভাবনায় ডুবে আছে কিশোর। রবিন আর কিশোর কথা বলছে, দুপাশের দৃশ্য দেখছে।
ইয়ার্ডে পৌঁছল ট্রাক।
মুসা বলল, কিশোর, ফলো করা হয়েছে আমাদের। সবুজ একটা ফোক্সওয়াগেন। সারা পথ পিছে পিছে এসেছে।
লাফিয়ে ট্রাক থেকে নামল তিন গোয়েন্দা। ছুটে গেল গেটের কাছে। পথের পাশে দাঁড়িয়ে আছে সবুজ ফোক্সওয়াগেন। কিন্তু ভেতরে কে আছে, ছেলেরা সেটা দেখার আগেই স্টার্ট নিয়ে টায়ারের তীক্ষ্ণ আর্তনাদ তুলে পথে উঠল গাড়ি, মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল।
খাইছে! টিক বানাউ?
হতে পারে, কিশোর বলল। কিন্তু মিউজিয়ম থেকে তো উল্টোদিকে গিয়েছিল সে, এদিকে নয়। আমাদের পিছু নিল কিভাবে?
বাক্সটার ব্যাপারে আরও আগ্রহী লোক আছে হয়ত, রবিন বলল।
কিংবা হয়ত লিটল মারমেইডের ধ্বংসাবশেষের ব্যাপারে আগ্রহী। রহস্যের গন্ধ পেয়েছে কিশোর পাশা, উত্তেজনায় ফেটে পড়বে যেন। তিন গোয়েন্দার জন্যে আরেকটা কেস। আমরা এখন...
তোরা এখনও এখানে? পেছন থেকে ওদেরকে চমকে দিলেন মেরিচাচী। ট্রাকের মাল নামাবি কখন? জলদি কর, জলদি কর।
ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে গিয়ে মাল নামানোয় হাত লাগাল ছেলেরা। পুরানো বাক্সের রহস্য সমাধান আপাতত বাদ।
মাল নামাতে নামাতে দুপুর। তদারকি রেখে যেতে পারছিলেন না মেরিচাচী, নামানো শেষ হলে রান্নাঘরে চললেন খাবার তৈরি করতে। এই সুযোগে ছেলেরা

ফিরে এল পুরানো বাক্সের কাছে।
হেডকোয়ার্টারে নিয়ে পরীক্ষা করতে হবে, কিশোর বলল। তোমরা দুজনে আন। আমি যাই, কাজ আছে। কাউকে প্রতিবাদ করার সুযোগ না দিয়ে ছুটে চলে গেল সে।
ভারি বাক্সটার কাছে দাঁড়িয়ে আনমনে মাথা নাড়ল মুসা। তারপর ফুসফুসে চেপে রাখা বাতাস ছেড়ে কুঁকল বাক্সটা তোলার জন্যে।
কোনমতে বাক্সটা বয়ে এনে তিন গোয়েন্দার ব্যক্তিগত ওয়ার্কশপের কোণে ধপ করে নামিয়ে রাখল দুজনে।
দুই সুড়ঙ্গ দিয়ে ঢুকবে না, মোটা পাইপটার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল মুসা।
হুঁ, মাথা দোলাল রবিন। সব আমাদের মাপের। বড় কিছু হলেই আর ঢোকানো যায় না।
সমস্যাটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে দুজনে, এই সময় দুই সুড়ঙ্গের মুখ দিয়ে বেরোল কিশোর।
হুমম! পাইপের মুখের দিকে একবার, আরেকবার বাক্সটার দিকে তাকাচ্ছে গোয়েন্দাপ্রধান। সহজ তিন দিয়ে ঢুকতে পারে, কি বল?
ট্রেলারে, অর্থাৎ হেডকোয়ার্টারে ঢোকার সব চেয়ে সহজ পথ হল সহজ তিন। ফ্রেম সহ একটা ওক কাঠের দরজা রয়েছে জঞ্জালের ভেতর। মরচে ধরা চাবি লুকানো থাকে একটা খোলে। সেটা দিয়ে দরজার পুরানো তালা খুললেই বেরিয়ে পড়ে সরু গলিপথ। পথটা চলে গেছে ট্রেলারের মূল দরজা অবধি।
চেষ্টা করার আগে, রবিন প্রস্তাব দিল। ট্রেলারের দরজার মাপ নেয়া দরকার।
হ্যাঁ, কিশোর বলল। ও, একটা কথা, সমস্তটাই টিক বানাউয়ের বানানো। গপ্পো, বুঝে ফেলেছি আমি।
বুঝে ফেলেছ! মুসা অবাক। কি করে বুঝলে?
মরিস ডিলম্যানের দোকানে ফোন করেছিলাম। কোন নাবিকের কাছ থেকে বাক্সটা কেনেনি সে। কিনেছে সান্তা বারবারার আরেক সেকেণ্ডহ্যাণ্ড দোকান থেকে। সেই দোকানদার কিনেছে ছয় মাস আগে এক মহিলার কাছ থেকে।
খাইছে! টিক ব্যাটা তো তাহলে নাবিকও নয়, নাকি?
হলে অবাক হব না। নাবিকের ওরকম পুরানো পোশাক জোগাড় করা মোটেই কঠিন নয়। হয়ত ওসব পরে এসে আমাদের ধোকা দিতে চেয়েছে। কাঁচা কাজ। এত ভারি পোশাক পরার মত শীত নয় এখন।
টিক কল্পনাও করেনি, আমাদের সঙ্গে তার টক্কর লাগবে, রবিন বলল।
না, তা করেনি, স্বীকার করল কিশোর। যাই হোক, একটা কথা ঠিক বলেছে টিক। গতকাল ডিলম্যানের দোকানে গিয়েছিল সে। আরেকটা গল্প শুনিয়েছে। বলেছে,

তার বোন বাক্সটা বিক্রি করে দিয়েছে। সে তখন বাড়ি ছিল না। ফিরে এসে জেনেছে। এখন বাক্সটা ফেরত চায়।
গল্প বদলাল কেন? মুসার প্রশ্ন।
হয়ত ভেবেছে, তার নাবিকের গল্প শুনে গলে যাব আমরা, বাক্সটা দিয়ে দেব তাড়াতাড়ি। বাক্সটা কেন চায়, সেকথা গোপন রাখতে চেয়েছে সবার কাছেই। তবে, ডিলম্যানের কাছে বলা তার গল্প একটা জিনিস বোধহয় প্রমাণ করে, যে মহিলা ছয় মাস আগে বাক্সটা বিক্রি করেছে, তাকে চেনে টিক। হয়ত বাক্স বিক্রির কথা জেনেছে ইদানীং, বেশিদিন হয়নি। আগে জানলে আগেই খোঁজ করত ওটার।
তাই তো! আচ্ছা, একটা কথা বল, এত চাইছে কেন বাক্সটা? খালি বাক্স, তেমন কিছু তো নেই।
শুধু আঙটিটা ছাড়া, মুসা বলল। তা-ও, এটাও মনে হয় তেমন দামি নয়।
আর আঙটিটার কথা টিক বানাউ জানত কিনা, সন্দেহ আছে, রবিন যোগ করল। বাক্সে মূল্যবান কিছু আছে ভেবেছে হয়ত।
কিংবা হতে পারে, কিশোর বলল। লিটল মারমেইড থেকে এসেছে বলেই বাক্সটা দামি। হোক না ভাঙা জাহাজের বাক্স।
তোমার কি মনে হয়? জাহাজটার ব্যাপারে সে আগ্রহী? রবিন বলল। ওটাতেই কিছু আছে?
কি জানি। শোন, আঙটি আর ছুরিটা ছাড়া তো আর কিছু নেই বাক্সটায়। তার পরেও কেন ওটা চাইছে, জানতে হলে, আমার মনে হয় লিটল মারমেইডের ইতিহাস জানা দরকার।
হিসটোরিক্যাল সোসাইটির কিছু জানা থাকতে পারে, রবিন বলল।
মুসার মন খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু আমি যেতে পারব না। মার সঙ্গে বাজারে যেতে হবে। ওখান থেকে ফিরে বাড়িতে কাজ করতে হবে, বাবা বলে দিয়েছে।
আর, আমাকে আবার যেতে হবে মিউজিয়মে, বলল কিশোর। রবিন, তোমাকে একাই যেতে হচ্ছে।
যেতে হলে যাব। আমার অসুবিধে নেই, রবিন জানাল। লাইব্রেরিতে ঢুকে বই পড়া আর গবেষণামূলক কাজে আনন্দই পায় সে।
খানিক পরেই মেরিচাচীর ডাক শোনা গেল। খাবারের জন্যে ডাকছেন।
সাইকেলে করে রকি বীচ হিসটোরিক্যাল সোসাইটিতে পৌঁছুঁতে তিনটের ওপরে বেজে গেল। ভেতরে ঢুকতে ধূসর-চুল এক মহিলা মুখ তুলে তাকিয়ে হাসলেন রবিনের দিকে চেয়ে।
কি জানতে চায়, জানাল রবিন।

লিটল মারমেইড? মহিলা বললেন। নিশ্চয় শুনেছি। এক সময় বেশ আলোড়ন তুলেছিল জাহাজটা। গুজব রয়েছে, গুপ্তধন নাকি আছে ওটাতে।
গুপ্তধন?
সোনার মোহর, অলঙ্কার, এসব, হাসলেন মহিলা। লিটল মারমেইডে পাওয়া কিছু জিনিস আছে আমাদের কাছে। দেখবে?
অবশ্যই দেখবে, জানাল রবিন। উত্তেজিত হয়ে উঠল সে। কজা লাগানো একটা ফাইল বক্স বের করলেন মহিলা।
বাক্সটা নিয়ে প্রায় দৌড়ে এসে পড়ার ঘরে ঢুকল রবিন। সে একা, আর কেউ নেই ওখানে। লম্বা টেবিলের সামনে বসে বাক্সটা খুলল।
ভেতরের জিনিস দেখে অবাক হল সে। কাগজ, পুস্তিকা, ছোট বই, খবরের কাগজের কাটিং, ম্যাগাজিনের আর্টিক্যাল গাদাগাদি করে রাখা। অগোছাল, একটা কাগজ তুলতে যাবে, এই সময় ঘাড়ের ওপরে কথা শোনা গেল, পড়তে সারাদিন লেগে যাবে।
চমকে ফিরে তাকিয়ে রবিন দেখল, ছোটখাটো একজন মানুষ। পরনে পুরানো ফ্যাশনের কালো সুট, ওয়েস্টকোট, আর সোনার চেনওয়ালা ঘড়ি। গোলগাল লাল চেহারা, চোখে রিমলেস চশমা।
আমি হিস্টোরিক্যাল সোসাইটির প্রফেসর হারম্যান কেইন, জানালেন তিনি। মিসেস ডেভিড তোমার আগ্রহের কথা বলল। লোকের, বিশেষ করে তোমার মত কমবয়েসীদের কৌতূহল মেটাতে ভালবাসি আমরা। আমাকে প্রশ্ন করতে পার। হয়ত পড়ার ঝামেলা থেকে বাচবে।
লিটল মারমেইডের কথা কিছু জানেন, স্যার? জিজ্ঞেস করল রবিন।
নিশ্চয় জানি। আমি এখানে এসেছি, বেশিদিন হয়নি। তবে আমার এক সহকর্মী ওই জাহাজটার ওপর একটা পুস্তিকা লিখেছে। সেটা পড়েই জেনেছি। কি কি জানতে চাও তুমি, বল তো?
আমি জানি, লিটল মারমেইড একটা স্কয়ার-রিগার জাতের বড়সড় জাহাজ, রবিন বলল। আঠারশো চুরানব্বইয়ে ডুবেছিল রকি বীচের কাছে। গুজব আছে, গুপ্তধন পাওয়া যাবে জাহাজটাতে। ঠিক?
হাসলেন প্রফেসর। আগের দিনে যত জাহাজ ডুবেছে, খোঁজ করলে জানবে, সবগুলোতেই গুপ্তধন পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, মানে গুজব রয়েছে। তবে সময়টা ঠিকই জান। রবিনের পাশের চেয়ারে বসলেন তিনি। তিন মাস্তুলের জাহাজ লিটল মারমেইড। স্কটল্যাণ্ডের গ্লাসগো থেকে ঈস্ট ইণ্ডিজে গিয়ে মশলা আর টিনের ব্যবসা করত। ব্যবসার জন্যেই এসেছিল স্যান ফ্রান্সিসকোয়। তারপর দক্ষিণে কেপ হর্নের দিকে রওনা হয়, সেখান থেকে স্কটল্যাণ্ডে ফিরে যেত। যাওয়া

আর হল না, ঝড়ের কবলে পড়ল। আঠারশো চুরানব্বইর ডিসেম্বরে রাতের বেলা তীরের কাছাকাছি প্রবালপ্রাচীরে ধাক্কা খেল ওটা।
ভয়ানক ঝড় বইছিল। বেঁচেছিল হাতে গোনা কয়েকজন। নাবিকেরা জাহাজ থেকে নেমে নৌকায় করে তীরে ওঠার চেষ্টা করেছিল, পারেনি। বেঁচেছে তারাই, যারা জাহাজ থেকে নামেনি, কিংবা নামতে পারেনি। ধাক্কা খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ডুবে যায়নি জাহাজটা, টিকেছিল ভোর পর্যন্ত। ডোবার আগে পর্যন্ত ওটাতে ছিল ক্যাপ্টেন।
গুপ্তধন ছিল না?
আমার সন্দেহ আছে। অল্প পানিতে ডুবেছে জাহাজটা। ডুবুরিরা বহুবার খুঁজেছে ওটাতে। একশো বছরের মধ্যে অনেকবার। এখনও মাঝেসাঝে কেউ কেউ গিয়ে খোঁজ করে। সে আমলের কয়েকটা মুদ্রা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায়নি ওটাতে। মাথা নাড়লেন প্রফেসর। না, ইয়াং ম্যান, লিটল মারমেইডে গুপ্তধন নেই। তবে গুজবটা সম্ভবত ছড়িয়েছে তার পরের আরেকটা দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে।
আরেকটা! তাড়াতাড়ি ঘুরে বসল রবিন, প্রফেসরের দিকে মুখ করে।
রকি বীচের কাছেই বাস করছিল লিটল মারমেইডের বেঁচে যাওয়া একজন স্কটিশ নাবিক বাওরাড ডাই। আঠারশো ছিয়ানব্বই সালে চারজন লোকের হাতে খুন হয় সে। পসি করে খোঁজা হয় ওই চারজনকে। তারাও মারা পড়ে পসিদের হাতে, মুখ খোলার আগেই। ফলে জানা যায়নি, ডাইকে কেন খুন করেছিল ওরা। চারজনের একজন, লিটল মারমেইডের ক্যাপ্টেন। সে কারণেই লোকের সন্দেহ, কোন জিনিসের পেছনে লেগেছিল ক্যাপ্টেন, যা জাহাজ থেকে সরিয়ে ফেলেছিল ডাই। তারপর থেকে কতজন যে কতবার গিয়ে জাহাজটাতে খুঁজেছে। আশপাশের তীরভূমি, ডাইয়ের বাড়ি আর চারপাশের প্রতিটি ইঞ্চি জায়গা তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে। কিছুই পায়নি।
অনেক নাবিকের মত, বাওরাড ডাইও জার্নাল রাখত। পরে, তার বংশধররাই সেই জার্নালটা আমাদের সোসাইটিকে দান করেছে, পুস্তিকাটা লেখার সময় কাজে লাগবে বলে। ওই জার্নাল, আঠারশো ছিয়ানব্বই সালে তৎকালীন শেরিফও পড়েছিল। বাইরের লোকে তো বটেই, ডাইয়ের বংশধরেরাও সন্দেহ করে, গুপ্তধন আছে। তারাও অনেক খোঁজাখুঁজি করেছে। পায়নি। জার্নালটাতে গুপ্তধনের কোন উল্লেখ নেই।
ভ্রূকুটি করল রবিন। আপনার কি মনে হয়, স্যার? ঈস্ট ইণ্ডিজ থেকে আনা কোন দামি জিনিস?
গুজব তো তাই বলে। জলদস্যুর সম্পদ। কেন? ও-ব্যাপারে তুমি কিছু জান নাকি?

ইয়ে, না, স্যার, আমতা আমতা করল রবিন। নিছক আগ্রহ। আই সী। হাসলেন প্রফেসর কেইন। কেন আগ্রহ, জানতে পারি?
আমরা....আমরা, স্যার....ওই স্কুলের ব্যাপার আরকি। বড়দিনের ছুটি তো। স্কুলের ম্যাগাজিনে গবেষণামূলক একটা লেখা লিখতে চাই।
ভাল, খুশি হলেন প্রফেসর। খুব ভাল। স্যার, জার্নাল আর পুস্তিকাটা দেখতে পারি? রিমলেস গ্লাসের ওপাশে হাসি ফুটল প্রফেসরের চোখের তারায়। স্কুলের ম্যাগাজিনের জন্যে, না? নিশ্চয়। দেখ, কিছু আবিষ্কার করতে পার কিনা। তাহলে পুস্তিকার নতুন সংস্করণে তোমার নামও উঠে যাবে।
হাসিমুখে বেরিয়ে গেলেন প্রফেসর। ফিরে এলেন কয়েক মিনিট পর। সঙ্গে এসেছেন মিসেস ডেভিড। হাতে একটা পাতলা পাণ্ডুলিপি-লিটল মারমেইডের ওপর লেখা স্তিকার, আর অয়েলস্কিনে বাঁধানো একটা নোটবুক নিয়ে পড়তে আরম্ভ করল রবিন।
সন্ধ্যার একটু আগে সাইকেল চালিয়ে ফিরে এল স্যালভিজ ইয়ার্ডে। পেছন দিকে বেড়ার পঞ্চাশ ফুট দূরে সাইকেল থেকে নামল। উনিশশো ছয় সালে স্যান ফ্রান্সিসকোতে এক মহাঅগ্নিকাণ্ডের ছবি আঁকা রয়েছে বেড়ার গায়ে। দাউ দাউ করে বাড়ি জ্বলছে। সেদিকে তাকিয়ে বিষণ্ন ভঙ্গিতে বসে আছে একটা কুকুর। এগিয়ে এসে কুকুরের একমাত্র চোখে টিপ দিল সে। বেরিয়ে পড়ল একটা ছোট ফোকর। তার ভেতরে হাত ঢুকিয়ে লেভার চাপতেই সরে গেল বেড়ার তিনটে তক্তা। তিন গোয়েন্দার এই গোপন প্রবেশ পথের নাম লাল কুকুর চার। সাইকেল নিয়ে ভেতরে ঢুকল রবিন।
জঞ্জালের তলা দিয়ে গেছে পথ। হামাগুড়ি দিয়ে সেই পথ ধরে গেলে ট্রেলারে ঢোকা যায়। হেডকোয়ার্টারে ঢোকার আগে ওয়ার্কশপটা দেখার সিদ্ধান্ত নিল সে। কিছুদূর এগিয়ে দেখল মেইন গেট দিয়ে সাইকেল চালিয়ে ইয়ার্ডে ঢুকছে মুসা আমান।
সারাটা বিকেল খাঁটিয়ে মেরেছে আমাকে! রবিনকে দেখে প্রায় গুঙিয়ে উঠল মুসা। ছুটি, হ্যাঁহ! এরচে স্কুলই ভাল ছিল।
আউটডোর ওয়ার্কশপে এসে ঢুকল দুজনে। ওখানে পাওয়া গেল কিশোরকে। ওয়ার্কবেঞ্চের ওপর একটা বাতি রেখে বাক্সটা পরীক্ষা করছে। হিসটোরিক্যাল সোসাইটিতে কি জেনেছে রবিন, বলার জন্যে মুখ খুলতেই হাত নেড়ে তাকে থামিয়ে দিল গোয়েন্দাপ্রধান। এক মিনিট। উত্তেজিত কণ্ঠ। আবার দেখলাম বাক্সটা। কি পেয়েছি, দেখ।
অয়েলস্কিনে মোড়া একটা নোটবুক দেখাল কিশোর। সোসাইটিতে যে-রকম দেখে এসেছে রবিন, সে-রকম, তবে আরও পাতলা। হাত বাড়াল সে।

কথা বলে উঠল একটা খসখসে কণ্ঠ, ওয়ার্কশপে ঢোকার দরজায় দাঁড়িয়ে। ওটা আমাকে দাও!।
ছেলেদের দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে আছে পানির পোকা টিক বানাউ।
লাফিয়ে উঠল কিশোর। পিছিয়ে গেল জঞ্জালের কাছে। বরফের মত জমে গেছে যেন মুসা আর রবিন।
পায়ে পায়ে কিশোরের দিকে এগোল টিক। বইটা শক্ত করে বুকের ওপর চেপে ধরেছে কিশোর। মুসা! চেঁচিয়ে উঠল সে। পরিকল্পনা এক!
পাই করে অন্য দুজনের দিকে ঘুরল টিক। খবরদার! কোন চালাকি নয়!
দাড়িওয়ালা নাবিকের কঠিন দৃষ্টি বর্শার ফলার মত বিদ্ধ করছে যেন দুই সহকারী গোয়েন্দাকে। ঢোক গিলল দুজনেই। ওদেরকে ভয় দেখাতে পেরে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল টিক। দাও, বইটা। নিয়ে যাব।
আপনি এক নম্বরের মিথ্যুক! বলে, পাশে সরতে আরম্ভ করল কিশোর। এবং চোর!
হেসে উঠল টিক। ভুল বললে, থোকা। ডাকাত। ছিনিয়ে নিতে এসেছি যে। আর আমার খারাপের দেখেছ কি? দরকার পড়লে…, বাক্যটা শেষ করল না সে। দাও, বইটা।
সরেই যাচ্ছে কিশোর। সঙ্গে সঙ্গে এগোচ্ছে টিক। জঞ্জালের একটা বিশেষ স্কুপের কাছে চলে এল লোকটা। খেয়াল করল না, তার পেছনে চলে গেছে রবিন আর মুসা।
এইবার! চেঁচিয়ে উঠল কিশোর।
নিচু হয়ে স্কুপের নিচ থেকে একটানে দুটো তক্তা বের করে ফেলল রবিন আর মুসা। ফিরে তাকাল টিক। কিন্তু দেরি করে ফেলেছে।
লাফ দিয়ে সরে গেছে রবিন আর মুসা। টিকের গায়ের ওপর ভেঙে পড়ল জঞ্জালের স্তূপ-তত্ত্বা, খাটের স্প্রিং, ভাঙা চেয়ার, ছেড়া কার্পেট। লাথি মেরে, দুহাতে ঠেলে ওসব সরিয়ে বেরোনোর চেষ্টা করছে সে।
দাঁত বের করে হাসছে রবিন আর মুসা।
দাঁড়িয়ে আছ কেন? কিশোর বলল। জলদি দৌড় দাও!
ছড়িয়ে পড়া জঞ্জাল এড়িয়ে লাফিয়ে বেরিয়ে এল ওরা। ছুটল ইয়ার্ডের অফিসের দিকে। ট্রাকে মাল তুলছে বোরিস। তখনও জঞ্জাল সরিয়ে বেরোতে ব্যস্ত টিক, আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।
বোরিস ভাই! চিল্কার করে ডাকল মুসা। ওয়ার্কশপে চোর ঢুকেছে! ধরুন ওকে!
তাই নাকি? হাতের ভাঙা চেয়ারটা মাটিতে ফেলে দিল বোরিস। চল তো দেখি।

ওয়ার্কশপে চলল আবার ওরা। আওয়াজ থেমে গেছে। ছুটে বেরোল একজন মানুষ, দৌড় দিল পেছনের বেড়ার দিকে।
ওই যে! বলেই মুসাও দৌড়াল পেছনে।
রবিন বলল, কি জানি নিয়ে যাচ্ছে! হাতে....বোধহয় নোটবুক! কিশোর, কখন ফেললে?
খাইছে! গুঙিয়ে উঠল মুসা।
যাবে কোথায়? দৌড়াতে দৌড়াতে বলল বোরিস। ধরে ফেলব।
নাহ্, আর পারব না, থেমে গেল কিশোর। হাঁপাচ্ছে। নিশ্চয় তোমাদের কাউকে ঢুকতে দেখেছে লাল কুকুর চার দিয়ে। বেরিয়ে যাবে।
অন্য তিনজন থামল না। তাড়া করে গেল। কিন্তু লাল কুকুর চার দিয়ে বেরিয়ে দেখল পথ নির্জন। টিক বানাউয়ের ছায়াও নেই।
আরে, ওই তো! হাত নাড়ল মুসা। সবুজ ফোক্সওয়াগেন।
স্বল্প আলোকিত পথ ধরে ছুটে গেল গাড়িটা। দেখতে দেখতে পৌঁছে গেল পথের মোড়ে।
গেল পালিয়ে ব্যাটাআ! হাত ঝাড়ল রবিন। ধরতে পারলে আজ...! কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়েছে বোরিস।
আফসোস করতে করতে ফিরে এল ওরা। ছেলেরা ঢুকল ওয়ার্কশপে। বোরিস চলে গেল তার কাজে।
ছড়িয়ে পড়া জঞ্জালের দিকে তাকিয়ে মুখ বাঁকাল ছেলেরা, তেতো হয়ে গেল মন। আবার ওগুলো তুলে যথাস্থানে গুছিয়ে রাখা...দূর! কিন্তু কি আর করা? রাখতেই হবে।
কাজই বাড়ল শুধু, তিক্ত কণ্ঠে বলল মুসা। না পারলাম টিক ব্যাটাকে আটকাতে, না পারলাম বইটা রাখতে।
হাসল কিশোর। শার্টের বুকের কাছে হাত ঢুকিয়ে গেঞ্জির ভেতর থেকে বের করে আনল ভাজ করা একমুঠো কাগজ। অয়েলস্কিনের খাপটা নেই।
নোটবুক, জানাল সে। পাতাগুলো খুলে গেছে। পরিকল্পনা এক বলে আমি চিৎকার করতেই টিক তোমাদের দিকে ফিরেছিল। ওই সুযোগে একটানে পাতাগুলো বের করে গেঞ্জির ভেতরে ভরেছি। খাপটা ফেলে দিয়েছি মাটিতে। জিনিসটা খুব ভারি। না খুললে বুঝবে না, ভেতরে কিছু নেই। সেই ফাঁকিতেই পড়েছে টিক। তাড়াহুড়োয় খোলারও সময় পায়নি। জাস্ট তুলে নিয়ে দৌড়।
মুসার মুখে হাসি ছড়াল। কিশোর, তুমি একটা জিনিয়াস! নিশ্চয়ই! একমত হল রবিন।

খোলাখুলি প্রশংসায় লজ্জা পেল কিশোর। তাড়াতাড়ি বলল, যাক, একটা ব্যাপার স্পষ্ট করে দিয়ে গেল টিক।
কি করে? রবিন অবাক। কিছুই তো বলল না, খালি বইটা দাও বইটা দাও ছাড়া।
আসল কথাটাই তো বলল। কেন, বুঝতে পারছ না? আঙটি চায়নি, বাক্স চায়নি, খালি বই?
খাইছে! মুসা বলল। তাই তো। শুধু বই। নোটবুকটা।
বইটা যে বাক্সে ছিল, জানত, বলল রবিন।
কিংবা অনুমান করেছিল, কিশোর বলল। আসলে বাক্স নয়, নোটবুকটা নেয়াই উদ্দেশ্য ছিল তার। বাক্সটা কিনতে চেয়েছিল এটার জন্যেই।
নোটবুক এত দামি? কি আছে ওতে? জানতে চাইল মুসা।
পাতাগুলো তুলে ধরল কিশোর। এটা একটা জার্নাল, মুসা। একধরনের ডায়েরী। প্রতিদিনের হিসেব-নিকেশ, ঘটনার কথা লেখা হয়। আমি...
জার্নাল? বাধা দিয়ে বলল রবিন। কিশোর, আমিও একটা জার্নাল পড়ে এসেছি। লিখেছিল লিটল মারমেইডের বেঁচে যাওয়া এক নাবিক, হিসটোরিক্যাল সোসাইটিতে জেনে আসা তথ্যগুলো জানাল রবিন। বাওরাড ডাইয়ের কথা মুখেই সব বলেছেন প্রফেসর, পুস্তিকাটাতে নতুন কিছু পাইনি। তবে জাহাজটার কথা বিস্তারিত লেখা আছে। কোন জায়গায় ঝড়ের কবলে পড়েছে, কোথায় গিয়ে প্রবালপ্রাচীরে ধাক্কা খেয়েছে, ভোর পর্যন্ত কোথায় ছিল, সব। কিভাবে বেঁচে তীরে উঠেছে ডাই, পরের দুবছর কোথায় কোথায় ছিল, এসবও লিখেছে। বাড়ি তৈরির একটা সুবিধেমত জায়গার জন্যে ক্যালিফোর্নিয়ার অনেক জায়গায় ঘুরেছে সে।
গুপ্তধনের কথা কিছু লেখেনি? জিজ্ঞেস করল মুসা।
মাথা নাড়ল রবিন। এমনকি ক্যাপ্টেনের কথা, বিপদের কথা, কিছুই না। শুধু বাড়ির ব্যাপারে। সব ভোঁতা।
কিন্তু কিশোরের কাছে ব্যাপারটা ভোতা লাগল না। বলল, দেখ, জার্নালটা বাক্সের দেয়ালে লুকানো পেয়েছি। মোটা এক পরত তক্তার ওপর পাতলা আরেক পরত লাগিয়ে তৈরি দেয়াল, মাঝখানটা ফাঁপা, তার মধ্যে ছিল। ভেতরটা শুকনো রাখার জন্যেই হয়ত ওরকম করে বানিয়েছিল, যাতে পানি ঢুকতে না পারে। প্রথমে বুঝতে পারিনি। বাক্সটা ধরে যখন জোরে ঝাঁকালাম, ভেতরে শুনলাম মৃদু আওয়াজ।
তখন আরও ভালমত দেখলাম। চোখে পড়ল আলগা কাঠ। ভেতরের দেয়াল একরকম, আর বাইরেরটা আরেক। তবে রঙ, কাঠের দাগে তফাৎ খুব সামান্য। ভাল করে না দেখলে চোখেই পড়ে না। ধ্রু-ড্রাইভার দিয়ে খুঁচিয়ে চলটা তুলে

ফেললাম। তারপর পাতলা কাঠটা ফাঁক করে ফেলতে অসুবিধে হয়নি। কোটের একটা হ্যাঙার দিয়ে টেনে বের করেছি অয়েলস্কিনে মোড়া জার্নালটা।
নিশ্চয়ই কেউ লুকিয়েছিল? মুসা বলল।
মনে হয় না। দেয়ালের ওপরের দিকটা ফাঁক হয়ে গিয়েছিল হয়ত। তখন কোনভাবে জার্নালটা পড়েছে ভেতরে। নেহাত কাকতালীয় ঘটনা। তারপর আবার দেয়ালটা মেরামত করে ফেলা হয়েছে। যে করেছে, সে খেয়ালই করেনি ভেতরে একটা জিনিস রয়েছে।
কিন্তু টিক বানাউ ঠিকই আন্দাজ করেছে, ওটা ভেতরে আছে, মুসা বলল। জার্নালটা চায় সে। কেন?
রবিন, পয়লা পৃষ্ঠাটা পড,কাগজগুলো বাড়িয়ে দিল কিশোর।
বেঞ্চে রাখা আলোর কাছাকাছি পাতাগুলো নিয়ে গেল রবিন। জোরে জোরে পড়ল, বাওরাড ডাই, ফ্যানটম লেক, ক্যালিফোর্নিয়া, অক্টোবর ২৯, ১৮৯৬!
…কিশোর, ওই জার্নালটাও এই লোকই লিখেছে- যেটা পড়ে এলাম, লিটল মারমেইডের বেঁচে যাওয়া নাবিক।
ওই জার্নালের শেষ তারিখটা মনে আছে? কোন তারিখে শেষ করেছে?
এটা ঊনত্রিশে শুরু, ওটা শেষ হয়েছে আটাশ তারিখে। তারমানে ওটার পরের অংশ এটা।
এটাতে হয়ত গুপ্তধনের কথা লেখা আছে! তুড়ি বাজাল মুসা।
মাথা নাড়ল কিশোর। না; সে-রকম কিছু দেখলাম না। রবিন যেটা পড়ে এসেছে, ও-রকমই। কোথায় কোথায় গিয়েছিল ডাই, কি কি করেছে। ব্যস, এসব।
তাহলে টিক চাইছে কেন? আবার প্রশ্ন করল মুসা। সে-ও কি গুজবের পিছেই ছুটছে?
এই জার্নালই যে চাইছে, শিওর হচ্ছি কি করে? রবিন প্রশ্ন তুলল।
জবাব দিল না কিশোর। খানিক পরে চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল, রবিন, তুমি বললে, ডাই পরিবার এই কিছুদিন আগে জার্নালটা হিসটোরিক্যাল সোসাইটিকে দান করেছে?
হ্যাঁ।…তারমানে…
তারমানে কাছাকাছিই কোথাও বাস করছে ওরা। বাক্যটা শেষ করে দিল কিশোর। এস।
দুই সুড়ঙ্গে ঢুকল কিশোর। পেছনে রবিন আর মুসা।
ট্রাপচার তুলে হেডকোয়ার্টারে ঢুকল ওরা। ডেস্কে বসে টেলিফোন বুক খুলল কিশোর। এই যে, পাওয়া গেছে। মিসেস বাওরাড ডাই, চার, ফ্যান্টম লেক রোড। মুসা, ম্যাপটা, জলদি।

বিশাল ম্যাপটায় চোখ বোলাচ্ছে কিশোর। জার্নালটার জন্যে নতুন একটা খাপ বানাচ্ছে রবিন।
অবশেষে মুখ তুলল গোয়েন্দাপ্রধান। এই যে। মাইল তিনেক পুবে, পর্বতের ভেতরে, হাসল সে। কাল সাইকেল নিয়ে বেড়াতে যাব। দেখা করে আসব মিসেস ডাইয়ের সঙ্গে।
সুন্দর দিন। আবহাওয়া ঠাণ্ডা। কিন্তু সাইকেল চালিয়ে পর্বতের পাশের রাস্তায় যখন পৌঁছল তিন গোয়েন্দা। তেতে উঠেছে সূর্য।
ওই যে,। কপালের ঘাম মুছল মুসা। ফ্যান্টম লেক রোড। দেখ, সোজা পর্বতের ভেতরে ঢুকে গেছে।
আর কি খাড়া, গুঙিয়ে উঠল কিশোর চালাতে তো পারবই না, ঠেলে নিতে হবে সাইকেল। চল, কি আর করা যাবে।
ঠেলে নিয়ে উঠতে লাগল ছেলেরা। লম্বা গাছপালার ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে গেছে পাহাড়ী পথ। পথের ধারে একটা খাড়ি
ঝাপঝাড়ে বোঝাই, আশপাশে শুকনো, রুক্ষ মরূদ্যান।
এই নাম পেল কোথায়? ধূসর পর্বতের দিকে তাকিয়ে বলল রবিন। ফ্যান্টম লেক। অবাকই লাগছে। এখানকার পর্বতের মাঝে হ্রদ আছে বলে তো কখনও শুনিনি!
ভ্রূকুটি করল কিশোর। হ্যাঁ। অবাক করার মতই।
ওদিকে কয়েকটা পুকুর দেখা যাচ্ছে, মুসা বলল।
আছে। কিন্তু ওগুলোর একটার নামও ফ্যান্টম লেক নয়, বলল রবিন। আমি...।
ইঞ্জিনের শব্দ শোনা গেল। সামনে, ওপর থেকে ফ্যান্টম লেক রোড ধরে নেমে আসছে গাড়িটা। মোড় নেয়ার সময় তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ জানাচ্ছে টায়ার, শোনা যাচ্ছে, গাড়ি চোখে পড়ছে না এখনও। দেখা গেল অবশেষে। ছুটে আসছে ওদের দিকেই।
আরি! সবুজ ফোক্সওয়াগেন! চেঁচিয়ে উঠল মুসা।
টিক বানাউ! বলল রবিন।
লুকাতে হবে! কিশোর বলে উঠল। কুইক!
সাইকেল তিনটে পথের পাশে প্রায় ছুঁড়ে ফেলে হুড়মুড় করে ঝোপে ঢুকে পড়ল ওরা। পাশ দিয়ে শাঁ করে বেরিয়ে গেল গাড়িটা, কয়েক গজ এগিয়েই ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষল। এক ঝটকায় দরজা খুলে লাফিয়ে রাস্তায় নেমে ছুটে এল চালক।
এই, এই ছেলেরা, থাম!
লোকটা টিক বানাউ নয়। রোগাটে এক যুবক, পুরু গোঁফ, কালো উদাসী চুল। পরনে কালো পোশাক। এই, কি হচ্ছে? আবার চিৎকার করে বলল সে। কি করছ ওখানে...?

পিছিয়ে গেল ছেলেরা। দৌড় দাও! চেঁচিয়ে উঠল মুসা।
পথের ধার দিয়ে ছুটতে শুরু করল ওরা। পেছনে আবার চিৎকার ব পিছু নিল লোকটা।
সামনে একটা ঘন ঝোপ, পথের পাশে। আর কোন উপায় না দেখে তাতেই ঢুকে পড়ল ছেলেরা।
কে...? হাঁপাচ্ছে রবিন। কে লোকটা?
আগে পালানো দরকার, মুসা বলল। তারপর প্রশ্ন।
দাঁড়াও, বলল কিশোর। দেখি ওকে জিজ্ঞেস করে...।
এই সময় আরেকটা শব্দ শোনা গেল। ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের খটাখট। পথের ডানে বনের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একজন ঘোড়সওয়ার। হাতে লম্বা চকচকে কি যেন।
কে...ক্কে...! কথা জড়িয়ে গেল মুসার।
দেখ, দেখ! কিশোর বলল।
ওদের পাশ দিয়ে গাড়ির দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে গেল লোকটা। ততক্ষণে ঘুরে গাড়ির দিকে ছুট দিয়েছে যুবক। গাড়িতে উঠে, স্টার্ট দিয়ে, একরাশ ধুলো উড়িয়ে চলে গেল ঢালু পথ ধরে। গাড়ির পিছে পিছে কিছুদূর ছুটে গেল ঘোড়সওয়ার। ধরা যাবে না বুঝে থামল, তারপর ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে এগিয়ে আসতে লাগল ছেলেদের দিকে।
রাশে হ্যাঁচকা টান খেয়ে পেছনের পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে গেল ঘোড়াটা। বেঁটে, গাট্টাগোট্টা আরোহী কড়া চোখে তাকাল ছেলেদের দিকে। নীল চোখ, লাল মুখ। গায়ে টুইড জ্যাকেট, পরনে আঁটো পায়জামা। হাতের জিনিসটা তলোয়ার।
চুপ! ধমক দিল সে। একদম নড়বে না!
কিন্তু...! প্রতিবাদ জানাতে গেল কিশোর
চুইপ! গর্জে উঠল লোকটা। ওই চোরটার সঙ্গে তোমাদের কি সম্পর্ক?
গরম হয়ে বলল মুসা, ওর সঙ্গে আমাদের কোন সম্পক...
মিথ্যে কথাগুলো পুলিশের কাছে বল। নাও, হাঁট।
কিন্তু, স্যার, আবার শুরু করল কিশোর। আমরা...।
হাঁটতে বললাম না!
শাই করে বাতাসে তলোয়ার চালাল লোকটা। ভয়ে মাথা নিচু করে ফেলল ছেলেরা, না করলেও অবশ্য লাগত না, অনেক ওপর দিয়ে গেছে। আর প্রতিবাদ করল না। পা বাড়াল নীরবে।
দশ মিনিট পর। একটা শৈলশিরা পেরিয়ে হঠাৎ নিচে নেমে গেল আবার পাহাড়ী পথ, উপত্যকায়। ঘন গাছপালা জন্মেছে ওখানে। একেবারে তলায় ছোট একটা

পুকুর, দুটো ফুটবল মাঠের সমান। পুকুরের মাঝে উঁচু দ্বীপ, তাতে কিছু পাইন গাছ, আর লম্বা খুঁটির মাথায় একটা লণ্ঠন-একধরনের বীকন বলা যেতে পারে, আলোক-সঙ্কেত দেয়ার জন্যেই তৈরি হয়েছে বোধহয়। দ্বীপের কিনার থেকে শুরু করে খালের মধ্য দিয়ে এসে হ্রদের প্রান্ত ছুঁয়েছে এক সারি পাথর।
থমকে গেল মুসা। এ-কি? এই সেই হ্রদ?
এই, কোন কথা না, পেছনে ধমক দিল অশ্বারোহী। এগোও।
পাহাড়ী পথ ধরে নেমে চলল ছেলেরা। কড়া রোদ। ফিসফিসিয়ে মুসা বলল, হল না ছাই। ডোবাও এরচে বড়।
পথের একটা মোড় ঘুরতে নিচে একটা বাড়ি দেখা গেল। পাথরের বাড়ি, তিনতলা, উঁচু জায়গায় তৈরি করা হয়েছে। চারকোণা একটা পাথরের টাওয়ারের ওপর ব্যাটলমেন্ট, তাতে বড় বড় ছিদ্র। তীর ছুঁড়তে, কিংবা ছিদ্র দিয়ে বন্দুকের নল বের করে গুলি ছোড়ার জন্যে আগের দিনে বানানো হত ওধরনের ব্যাটলমেন্ট। দুধারে দুটো বিশেষ ধরনের জানালাও আছে, ডরমার উইনডো বলে ওগুলোকে। ঘন হয়ে জন্মানো পুরানো আঙুরলতাও বাড়ির দেয়ালের রুক্ষতা ঢাকতে পারছে না।
বাপরে! বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠেও স্বর নামিয়ে ফেলল মুসা। বাড়ি না দুর্গ রে, বাবা! ওই টাওয়ারে উঠে বহুদূরের শত্রুকেও দেখা যাবে।
হ্যাঁ, অদ্ভুতই, একমত হল কিশোর।
বাড়ির সামনে পৌঁছে ঘোড়া থেকে নামল লোকটা। আদেশ দিল, যাও, ঢোক।
বিরাট এক ঘরে ঢুকল ওরা, বাইরের হলরুম। দেয়ালের ওপর সুদৃশ্য কাঠের আস্তরণ। কারুকাজ করা পর্দা। পুরানো অস্ত্রশস্ত্র ঝোলানো। বড় একটা এল্ক হরিণের মাথাও রয়েছে। কাঠের মেঝেতে বিছানো রঙচটা কার্পেট। একসময় হয়ত দামি ছিল জিনিসগুলো, এখন পুরানো, মলিন। তলোয়ার দেখিয়ে ওদেরকে আরেকটা বড় ঘরে নিয়ে এল লোকটা, লিভিংরুম, ভারি ভারি পুরানো আসবাবপত্র আছে এটাতে। এককোণে পাথরের মস্ত ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বলছে, তাতেও ঘরের ঠাণ্ডা কাটছে না। শীত শীত একটা ভাব রয়েই গেছে।
ফায়ারপ্লেসের সামনে চেয়ারে বসে আছেন হালকাপাতলা এক মহিলা। সুন্দরী। পাশে দাঁড়ানো রবিনের বয়েসী লাল-চুল এক কিশোর। লোকটার মতই তার পরনেও আঁটো পাজামা।
ধরা পড়েছে? বলে উঠল ছেলেটা।
না, চোরটাকে ধরতে পারিনি, লালমুখো লোকটা জানাল। পালিয়েছে। এগুলোকে ধরেছি।
কাদের নিয়ে এসেছ? মহিলা বলল। কয়েকটা ছেলে...ডিনো, এরা...

ইবলিস হতে কি বয়স্ক হওয়া লাগে নাকি, ডোরিনা ডাই, ডিনো বলল। লাল-চুল ছেলেটার দিকে চেয়ে মাথা নাড়ল, পুলিশকে ফোন কর, এড। সব
শয়তানি আজই বন্ধ করব।
সতর্ক হয়ে উঠল কিশোর। ফোক্সওয়াগেনের লোকটা চুরি করে ঢুকেছিল নাকি এখানে, স্যার? কি নিয়েছে?
হেসে উঠল ডিনো। এহ্, যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না।
সত্যি আমরা কিছু জানি না, রেগে উঠল মুসা। লোকটাকেও আগে আর দেখিনি। গাড়িটা অবশ্য দেখেছি, আমাদের পিছু নিয়েছিল।
শান্তকণ্ঠে কিশোর বলল, আমরা আপনার কাছেই আসছিলাম, মিসেস ডাই। এই সময় গাড়িটা আসতে দেখলাম। গাড়ি থামিয়ে আমাদের তাড়া করল লোকটা।... আমি কিশোর পাশা, ও মুসা আমান, আর ও রবিন মিলফোর্ড। তিনজনেই রকি বীচে থাকি। আমাদের সাইকেল রাস্তায় ফেলে এসেছি। এতেই প্রমাণ হয়, আমরা ফোক্সওয়াগেনে লোকটার সঙ্গে আসিনি।
ডোরিনা! কড়া গলায় বলল ডিনো। পুলিশকে জানানো উচিত...।
থাম, ডিনো, ছেলেদের দিকে চেয়ে বললেন মহিলা। এ আমার ছেলে, এডবার ডাই। আর ও ডিনাম্যান হ্যাঙবার, আমাদের আত্মীয়। তো, কেন আসছিলে আমার কাছে?
বাক্সটার জন্যে, ম্যাডাম, জানাল রবিন।।
একটা স্যালভিজ ইয়ার্ড আছে আমাদের, বুঝিয়ে বলল কিশোর। এক মিউজিয়মে গিয়েছিলাম পুরানো মাল কিনতে। সেখানে একটা রাক্স পেয়েছি, তাতে লিটল মারমেইড জাহাজের নাম লেখা। আমরা জেনেছি, বাক্সটা আপনাদের কোন পূর্বপুরুষের ছিল। ওটা হাতে আসার পর থেকেই রহস্যময় কতগুলো ঘটনা ঘটেছে। ফোক্সওয়াগেনের লোকটা আপনার বাড়ি থেকে কি নিয়েছে, জানলে হয়ত ঘটনাগুলোর কারণ বুঝতে পারব।
দ্বিধা করলেন মিসেস ডাই। না, সে কিছু নেয়নি। এরকমই হয়, হয়ে আসছে প্রতিটি বার। চুরি করে ঢোকে, বাওরাড ডাইয়ের জিনিসপত্র ঘাটে। কখনোই কিছু নেয়নি।
কিছুই নেয়নি? হতাশ মনে হল মুসাকে।
কিশোর জিজ্ঞেস করল, ইদানীং কবার ঢুকেছে, মিসেস ডাই?
গত ছয় মাসে পাঁচবার।
সব সময় বাওরাডের জিনিসই খালি ঘাটে। বোধহয়...,এড বলল। বাওরাড আমার দাদার দাদা।

গুপ্তধন খোঁজে! এডের কথাটা শেষ করল রবিন। : মা, দেখলে! ওরাও ভাবছে, গুপ্তধনের খোজে আসে চোর। আমার কথা তো বিশ্বাস কর না।
হাসলেন মহিলা। অনেক আগেই প্রমাণ হয়ে গেছে, গুপ্তধন নেই। শুধুই গুজব।
না-ও হতে পারে, মিসেস ডাই, কিশোর বলল। টিক বানাউ আর বাক্সটার প্রতি তার আগ্রহের কথা জানাল। বাক্সে পাওয়া আঙটিটা দেখাল মহিলাকে।
হাতে নিয়ে জিনিসটা দেখলেন মিসেস ডাই। বললেন, তোমরা পেয়েছ?
দেখি তো, বোনের হাত থেকে আঙটিটা নিল ডিনো। বাহ, খুব দামি জিনিস, মুখ বাঁকাল সে। লাল কাচ আর তামা। বুড়ো ডাই এসব ফালতু জিনিস নিয়েই বাণিজ্য করতে যেত, পুবদেশের গাধাগুলোকে গিয়ে ঠকাত। তোমরাও হদা। লোকে কি আর খোঁজা বাদ রেখেছে নাকি। বুড়োর জার্নাল ঘাঁটতে ঘাঁটতে ছিঁড়ে ফেলেছে, পাতি পাতি করে খুঁজেছে জাহাজটা। কিছু পায়নি।
ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেললেন মিসেস ডাই। ডিনো ঠিকই বলেছে। গুপ্তধনের সামান্যতম ইঙ্গিত থাকলেও ওই জার্নালেই থাকত। নেই বলেই পায়নি লোকে অযথাই গুজব ছড়িয়েছে।
সবাই হয়ত ভুল জার্নালটা পড়েছে, সে-জন্যেই পায়নি। জ্যাকেটের ভেতর থেকে পাতলা জার্নালটা টেনে বের করল কিশোর।
আরেকটা জার্নাল? চেঁচিয়ে উঠল এড।
এসব কি? চালাকি হচ্ছে, না? ধমক দিল ডিনো। কিশোরের হাত থেকে জার্নালটা নিলেন মিসেস ডাই। ধীরে ধীরে কয়েক পাতা ওল্টালেন। না, ডিনো, চালাকি করছে না। বাওরাড ডাইয়ের হাতের লেখা, কোন সন্দেহ নেই। সইও এক। ছেলেদের দিকে তাকালেন। কোথায় পেয়েছ?
কোথায়, কিভাবে পেয়েছে, জানাল কিশোর। তারপর বলল, বাক্সটা যে-ই মেরামত করে থাকুক, ফাঁকের ভেতর জার্নালটা তার চোখে পড়েনি, বোঝা যায়। গোপন খোপটাও না। কারণ, ওটা খুললেই ছুরিটা বেরিয়ে যেত।
মাথা ঝাঁকালেন মিসেস ডাই। হ্যাঁ, মনে পড়েছে। বছর দুই আগে বিক্রি করে দিয়েছিলাম, আমার স্বামীর মৃত্যুর পর। অভাবে পড়ে ডাইদের আরও অনেক জিনিসই ছেড়ে দিতে হয়েছে আমাকে। এই বাড়িটা রাখাই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন। ডিনোর সাহায্য না পেলে আরও আগেই ছেড়ে দিতে হত।
ছাড়তে হবে না, ডোরিনা, ডিনো বলল। আর রূপকথা শোনারও দরকার নেই।
জার্নালে রূপকথা থাকে না, মিস্টার হ্যাঙবার, কিশোর বলল।
আমাকে শুধু ডিনো বলে ডাকলেই চলবে।... ডোরিনা যখন বলছে, জার্নালটা আসল, ধরে নিলাম আসলই। কিন্তু তাতে প্রমাণ হয় না যে গুপ্তধন আছে।
কিন্তু চিঠিটা! বলে উঠল এড।

চিঠি? সতর্ক হল কিশোর।
প্রশ্ন এড়িয়ে গেল ডিনো। সরু হয়ে এল চোখ। পড়ে দেখা দরকার। দেখি, জার্নালটা।
মায়ের হাত থেকে নিয়ে জার্নালটা দিল এড। ফায়ারপ্লেসের ধিকিধিকি আগুনের সামনে লম্বা একটা বেঞ্চে বসে পড়তে শুরু করল ডিনো। এডও বসল তার পাশে।
চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা দোলালেন মিসেস ডাই। হুঁ, দ্বিতীয় জার্নালটাও বাক্সেই থাকার কথা। আমার স্বামী বলেছে, তার দাদা নাকি প্রথম জার্নালটাও বাক্সেই পেয়েছেন। বরাবরই দাদার বিশ্বাস ছিল, গুপ্তধন আছে, আর জার্নালেই রয়েছে তার সূত্র। কিন্তু আমার শ্বশুর তা মনে করতেন না। তার ধারণা, ওটা শুধুই গুজব।
আপনার দাদা-শ্বশুর এত শিওর ছিলেন কেন? রবিন জিজ্ঞেস করল।
একটা চিঠি। আমার দাদা-শ্বশুর..., থেমে গিয়ে হাসলেন মহিলা। গোড়া থেকেই বলি। বাওরাড ডাই সম্পর্কে কতখানি জান তোমরা?
কি কি জানে, জানাল রবিন।
ও, অনেক কিছুই তো জান তাহলে। সোসাইটিকে প্রায় সবই বলেছি আমি, স্বামীর মুখে যা যা শুনেছি। অনেক ঘুরে, দেখেশুনে এই উপত্যকা পছন্দ করেছিলেন বাওরাড ডাই। তাঁর বাড়ি স্কটল্যাণ্ডের হাইল্যাণ্ডে। এখানকার সঙ্গে ওই জায়গার মিল আছে, বিশেষ করে পুকুর আর ওটার মাঝের দ্বীপটা। স্কটল্যাণ্ডে ডাইদের বাড়ি ছিল সাগরের একটা খাড়ির ধারে। খাড়িটার নাম ফ্যান্টম লক। লকের মাঝে ছিল ছোট দ্বীপ। দ্বীপ থেকে বড় বড় পাথর চলে এসেছিল তীর পর্যন্ত। এখানে পুকুরটাতে যে-রকম আছে ঠিক সে-রকম। ওগুলো দিয়ে দ্বীপে যাওয়া যেত, নাম রাখা হয়েছিল ফ্যান্টমস স্টেপস।
লক মানে কি? মুসা বলল। হ্রদ, না?
হ্যাঁ, জবাব দিল কিশোর। ফ্যান্টম লক, বা ভূতের হ্রদ, আর ফ্যান্টমস স্টেপস হল গিয়ে ভূতের সিঁড়ি। ডোরিনার দিকে তাকাল সে। তাহলে এই ব্যাপার! মিস্টার বাওরাড ডাই এখানে বাড়ি বানিয়েছেন স্কটল্যাণ্ডের বাড়ির মত করে। সেজন্যেই ক্যালিফোর্নিয়ায় বেমানান।
হ্যাঁ, কিশোর। আসল ডাই লজটা তৈরি হয়েছিল তেরশো বায়ান্ন সালে। তখন ওটার নাম ছিল ডাই ক্যাসল। চোর-ডাকাত আর বাইরের শত্রুর হামলার আশঙ্কা এত বেশি ছিল সেকালে, পয়সাওয়ালা লোকেরা দুর্গ ছাড়া থাকতে সাহস পেত না। নিরাপদ মনে করত না, এক মুহূর্ত বিরতি দিয়ে বললেন মহিলা, প্রথমে ডাই ক্যাসল ছিল শুধু একটা টাওয়ার হাউস। আস্তে আস্তে চারপাশে ঘর তৈরি হল, ঠিক এই বাড়িটার মত। সতেরশো সালের দিকে ওই টাওয়ারে অস্ত্র ধারী দারোয়ান বসানোর দিনে শেষ হয়ে এল। সে-সময় পেশা বদল করে নাবিক হল ডাইয়েরা।

তখন টাওয়ারে উঠে সাগর দেখত তাদের স্ত্রীরা, জাহাজ দেখত, স্বামীদের জাহাজের ফেরার অপেক্ষা করত।
পুরানো দিনের এসব গল্প শুনতে শুনতে অধৈর্য হয়ে উঠল মুসা। বলল, চিঠির কথা কি যেন বলছিলেন?
উপত্যকাটা পছন্দ করে বাড়ি তৈরি করলেন বাওরাড ডাই। বানাতে প্রায় দুবছর লেগেছিল। তারপর ছেলে আর স্ত্রীকে আনতে লোক পাঠালেন স্কটল্যাণ্ডে। কয়েক মাস পর ওরা যখন এসে পৌঁছল, বাওরাড তখননেই, খুন হয়েছেন। তাঁর স্ত্রী নোরিয়া একটা চিঠি খুঁজে পেলেন পুরানো একটা বেড-ওয়ারমারের ভেতরে। নোরিয়ার উদ্দেশেই লেখা।
তারমানে এমন কিছু, কিশোর বলল। যা নোরিয়া ছাড়া আর কেউ বুঝতে না পারে? বেশ খুশি মনে হল তাকে।
নোরিয়ার ছেলে তা-ই ভাবতেন। গুজব ছড়ানো শুরু হয়েছে তখন। তিনি বিশ্বাস করতেন, ওই চিঠি আর জার্নালেই রয়েছে গুপ্তধনের চাবিকাঠি। অনেক চেষ্টা করেছেন আমার দাদা-শ্বশুর। বোঝেননি কিছু।
চিঠিটা দেখা যায়? অনুরোধ করল মুসা।
নিশ্চয়ই। আমার শোবার ঘরেই রেখেছি, একটা খাতার ভেতরে।
কেন? কিশোর জিজ্ঞেস করল। খাতায় কেন? বাওরাড ডাইয়ের অন্যান্য জিনিসপত্রের সঙ্গে রাখেন না?
না।
উঠে বেরিয়ে গেলেন মিসেস ডাই। খাতাটা নিয়ে ফিরলেন। হলদে হয়ে গেছে চিঠির কাগজ।
তাতে লেখা :
নোরিয়া, ডিয়ার
শীঘ্রি এসে পৌঁছবে তুমি। ইদানীং আমার আশঙ্কা হচ্ছে, আমার ওপর চোখ রাখছে কেউ। শেষ এই জরুরি কথাগুলো বলতে হচ্ছে আমাকে, আরও অনেকেই পড়বে এই চিঠি সেকথা মনে রেখে।
তোমাকে কথা দিয়েছিলাম সোনালি সুখ উপহার দেব। তা-ই দিচ্ছি। মনে করার চেষ্টা কর, বাড়িতে আমি কি ভালবাসতাম, ভাব প্লকের গোপন রহস্যের কথা। আমার শেষ নির্দেশ অনুসরণ কর। পড়, আমার দিনগুলো কিভাবে তৈরি করেছি তোমার জন্যে। আয়নায় দেখ সেই গোপন কথা।
মুখ চাওয়াচাওয়ি করল ছেলেরা। আবার পড়ল চিঠিটা।
আমার দাদা-শশুর মনে করতেন, মিসেস ডাই বললেন। সোনালি সুখ বলে গুপ্তধন বোঝাতে চেয়েছেন বাওরাড ডাই। বাড়ির এমন কোন আয়না নেই যার

ভেতরে তিনি দেখেননি, যেটা নিয়ে গবেষণা করেননি। কিছুই যখন পেলেন না, অনুমান করলেন, জার্নালে দেখতে বলা হয়েছে। আমার দিনগুলো কিভাবে তৈরি করেছি তোমার জন্যে-এটা জার্নাল দেখার ইঙ্গিত। খুঁজলেন। কিছুই বের করতে পারলেন না।
কারণ, দ্বিতীয় জার্নালটা তিনি পাননি, কিশোর বলল। চিঠিতে বলা হয়েছেঃ শেষ নির্দেশ অনুসরণ কর। তার মানে শেষ জার্নাল দেখার কথাই, বলেছেন। চিঠি লেখার আগের দুমাসের কথা লেখা রয়েছে ওতে। ওই দুমাসে কি কি করেছিলেন বাওরাড ডাই?
নাক দিয়ে বিচিত্র শব্দ করে জার্নালটা রেখে দিল ডিনো। গুপ্তধনের কথা কিছু বলেনি। খালি বাজে বকবক-কোথায় কোথায় গিয়েছিল, নোরিয়াকে চমকে দেয়ার জন্যে কি কি বানিয়েছে, এসব কথা।
নাহ্, কোন সূত্র নেই, বুঝলে, তিন গোয়েন্দাকে বলল এড। কিছুই বুঝলাম।
আমিও বুঝিনি, স্বীকার করল কিশোর। মিসেস ডাই, বাওরাড ডাই বাড়িতে কি ভালবাসতেন, জানেন? লকের গোপন রহস্যটাই বা কি?
আমি কিছুই বলতে পারব না, কিশোর, কি ভালবাসতেন বাওরাড। তবে লকের ব্যাপারে পুরানো একটা কিংবদন্তী আছে স্কটল্যাণ্ডে, ডাইদের এলাকায়। ওদের কোন এক পূর্বপুরুষ নাকি অপঘাতে মারা যায়। তারপর মাঝে মাঝে দেখা গেছে তাকে, শীতের সকালে, কুয়াশার মধ্যে পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে নাকি চেয়ে থাকত হ্রদের দিকে। শত্রু খুঁজত। নয় শতকে ভাইকিংরা মেরে ফেলেছিল তাকে। তার নামেই নামকরণ করা হয়েছিল হ্রদের।
বাহ, চমৎকার, বলল এড। গুপ্তধনের সঙ্গে ভূতের গল্প। ভালই জমে।
টিক বানাউই সেই ভূত কিনা কে জানে, মুসা বলল।
সবুজ ফোক্সওয়াগেনের লোকটা কে? রবিনের প্রশ্ন।
আর আমাদের বাড়িতে চোর ঢোকারই বা কি ব্যাখ্যা? রবিনের কথার যেন প্রতিধ্বনি করল এড।
ডিনো নীরব হয়ে আছে।
চোর ঢোকার সম্ভবত একটাই ব্যাখ্যা, কিশোর বলল। টিক বানাউ কোনভাবে পেয়েছে চিঠিটা। পড়ে বুঝেছে, জার্নালে খোঁজার কথা বলা হয়েছে। প্রথম জার্নালের শেষ পাতার শেষ তারিখ, আর বাওরাড ডাইয়ের খুন হওয়ার মাঝের দুটো মাস ফাঁকা। অর্থাৎ জার্নাল যেদিন শেষ হয়েছে, তার দুমাস পরে মারা গেছেন বাওরাড। ওই দুই মাস কি তিনি জার্নাল লেখেননি? জার্নাল বা ডায়েরী লেখা যাদের অভ্যাস, তারা সাধারণত না লিখে পারে না। একথা জানা আছে

টিক বানাউয়ের। সন্দেহ করেছে, নিশ্চয় দ্বিতীয় আরেকটা জার্নাল আছে। আমার ধারণা, চুরি করে ডাই লজে ঢুকে সেটাই খুঁজেছে সে।
গাধা আরকি, বিড়বিড় করল ডিনো। গুপ্তধন শিকারী। হুঁহ!
গুপ্তধন শিকারী হলেই গাধা হয় না, জোর আপত্তি জানাল কিশোর। চিঠিতে কি লিখেছেন বাওরাড? শেষ এই জরুরি কথাগুলো বলতে হচ্ছে আমাকে, আরও অনেকেই পড়বে এই চিঠি সেকথা মনে রেখে। একটা ধাধা বানিয়ে রেখে গেছেন। তিনি ভেবেছিলেন, নোরিয়া সেটার সমাধান করতে পারবেন। আমার বিশ্বাস আরও বাড়ছে, এখন। নিশ্চয় গুপ্তধন লুকিয়ে রেখে গেছেন বাওরাড়। ধাঁধার সমাধান করতে পারলেই বের করা যাবে। আর সমাধানের সূত্র রয়েছে দ্বিতীয় জার্নালে।
তার সঙ্গে একমত হয়ে মাথা ঝাঁকাল রবিন, মুসা, এড।
কি জানি, কিশোর। মিসেস ডাই মানতে পারছেন না, কিন্তু, নোরিয়া যেটা – পারেননি, সেটা আর কে পারবে? তার জন্যেই তো লেখা হয়েছিল চিঠি।
আমরা চেষ্টা করে দেখতে পারি, ম্যাডাম, রবিন বলল।
অনেক জটিল ধাধার সমাধান আমরা করেছি, বলল মুসা।
রহস্যের সমাধান করাই আমাদের নেশা, ভারিক্কি চালে বলল, কিশোর। পকেট থেকে তিন গোয়েন্দার কার্ড বের করে দিল।
মায়ের কাঁধের ওপর ঝুঁকে কার্ডটা পড়ল এড, বড় বড় হয়ে গেল চোখ।
এগিয়ে এসে ডিনোও দেখল। সন্দেহ ফুটল চোখে।
কিশোর খুশি, তাদের যোগ্যতা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করা হল না দেখে। নতুন। ছেপেছে কার্ড। তাতে কোন চিহ্ন দেয়া হয়নি। দিলেই লোকের মনে প্রশ্ন জাগে, সন্দেহ প্রকাশ করে। প্রথমে কিছুদিন প্রশ্নবোধক দিয়ে চালিয়েছিল, তারপর দিয়েছে আশ্চর্যবোধক। তারপর আবার প্রশ্নবোধক। সেগুলোও শেষ হওয়ার পর নতুন কার্ড ছেপেছে। গম্ভীর হয়ে বড়দের মত করে বলল, আমরা আপনাদের সাহায্য করতে চাই।
নিশ্চয় চাই, মুসা যোগ করল।
মাকে অনুরোধ করল এড, চেষ্টা করতে দোষ কি, মা? করুক না। আমিও ওদের সাহায্য করব, যতটা পারি।
বেশ, হাসলেন মিসেস ডাই। কোন দোষ দেখি না। গুপ্তধন পেলে তো খুবই ভাল। বড় টানাটানিতে দিন কাটছে আমাদের।
হুররে! হুল্লোড় করে উঠল রবিন, মুসা আর এড।
মিসেস ডাইয়ের হাসি বিস্তৃত হল। লাঞ্চটা তাহলে এবার সেরে ফেলা যায়, কি বল? গুপ্তধন খুঁজতে হলে শরীরে বল চাই তো।

খাইছে! প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মুসা। ভুলেই গিয়েছিলাম! নিশ্চয় বলা দরকার।
ডিনোর মুখে হাসি নেই, গম্ভীর হয়ে আছে। কার্ডটা ছুঁড়ে ফেলে বলল, সব চালাকি। ডোরিনা, ছেলেগুলো মহা চালবাজ, বিশ্বাস করা উচিত হবে না।
আমার তা মনে হয় না, দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করলেন যেন মিসেস ডাই।
বেশ, যা ইচ্ছে কর! আমি এসবে নেই...! বলে রাগে দুপদাপ পা ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ডিনো।
সেদিকে তাকিয়ে ভ্রূকুটি করল কিশোর। চিন্তিত।
লাঞ্চের পর পরই বেরিয়ে গেল ডিনো। বলে গেল, পথের ধারে পাইন গাছের কিছু ডাল ছাঁটতে যাচ্ছে। ছেলেরা আর মিসেস ডাই ফিরে এলেন লিভিংরুমে। দ্বিতীয় জার্নাল থেকে সূত্র বের করায় মনোযোগ দিল।
একটা কথা মনে রাখতে হবে, বক্তৃতার ঢঙে শুরু করল কিশোর। জার্নাল ঠিক ডায়েরী নয়, কিছুটা আলাদা। নিজের চিন্তা-ভাবনা পরিকল্পনার কথা এতে লেখেননি বাওরাড, কোন ঘটনারও বিশ্লেষণ করেননি। প্রতিটি ঘটনাই খুব সংক্ষিপ্ত, এক কি দুই লাইনে শেষ। এই যেমন, আজ চত্বরে কাজ করেছি, কিংবা, একটা ঈগল দেখেছি, এরকম। জাহাজের লগবুকের মত অনেকটা।
অন্য জার্নালটাও একই রকম, রবিন বলল।
তারমানে, ঘটনার উল্লেখ খুব একটা কাজে লাগছে না আমাদের। তবে চিঠিতে বলেছেন বাওরাড, তাঁর নির্দেশ মেনে চলতে, আর শেষ দিনগুলো কিভাবে তৈরি করেছেন, সেটা মেনে চলতে। কি কি করেছেন তিনি, সেটার ওপর গুরুত্ব দিতে বলেননি নোরিয়াকে। বলেছেন, কোথায় গেছেন আর কি বানিয়েছেন, সেটা লক্ষ্য করতে।
জার্নালের দিকে তাকাল এড। হ্যাঁ, প্রথমেই রয়েছে কোথায় গিয়ে কি করেছিল। লিখেছেঃ নোরয়াকে চমকে দেয়ার পালা আজ থেকেই, কাজ শুরু করেছি। প্রথমে পাউডার গালচে গেছি লোক আর টিম্বার সুস জোগাড় করার জন্যে।
নিশ্চয় কিছু বানাতে! মুসা বলল।
মনে হয়, বলল কিশোর। তারপর কি লিখেছে, এড?
কয়েকটা পাতা ওল্টাল লাল-চুল ছেলেটা। দুহপ্তা আর তেমন কিছু নেই। শুধু ছোট ছোট নোট। তারপর একটা দ্বীপে গেছে।
মিসেস ডাই? কিশোর জিজ্ঞেস করল। নোরিয়াকে চমকে দেয়ার ব্যাপারটা কি, বলতে পারেন?
নাহ।
থাক, এ-নিয়ে পরে ভাবব। লোক এবং টিম্বার স্কুস জোগাড়। কেন? এসব এলাকায় শুনেছি, একসময় খনি ছিল। খনির লোকেরা টিম্বার সুস দিয়ে

আকরিক ছাকত। এড, ফ্যান্টম লেকের কাছে কোন খনি চেন?
না। সোনার খনির কথা বলছ?
হতে পারে, মুসা আন্দাজ করল। গোপনে কোন খনিতে কাজ চালিয়েছে বাওরাড!
;
তা পারে, বলল কিশোর। তবে আমার মনে হয় না, সেরকম কিছু বলতে চেয়েছেন তিনি। নির্দেশ অনুসরণ করতে বলেছেন। তারমানে, এমন কোথাও গিয়েছেন, যেখানে রয়েছে সূত্র। পাউডার গালচে যেতে হবে আমাদের, বুঝেছ।
পাউডার গালচ কি কাছাকাছিই নাকি? মুসা জিজ্ঞেস করল।
এড জানাল, হাইওয়ে ধরে গেলে বড়জোর এক মাইল।
আশ্চর্য, মুসা, তুমি জান না? ভুরু কোঁচকাল কিশোর। বিখ্যাত জায়গা। লোকাল হিস্টরিতে জায়গাটার নাম রয়েছে। পড়েছি...
গোস্ট টাউন! উত্তেজনায় মোর চেড়ে উঠে পড়ল রবিন। পুরানো ভূতুড়ে শহর! তাই তো বলি, নামটা চেনা চেনা লাগে কেন?
ভূ-ভূতের শহর..! ভয় দেখা দিল মুসার চোখের তারায়। আ-আমরা যাচ্ছি নাকি?
যেতে হবে, উঠে দাঁড়াল কিশোর। এখুনি।
জীর্ণ, মলিন রোড-সাইনঃ পাউডার গালচ। তীর চিহ্ন নির্দেশ করছে সরু একটা কাঁচা সড়ক। সাইকেল চালিয়ে চলল চার কিশোর। মিনিট দশেক পরেই নিচে দেখা গেল গোস্ট টাউন।
ওপর থেকে দেখার জন্যে থামল ওরা। শুকনো খাড়ির পাড়ে ছড়িয়ে রয়েছে কতগুলো পুরানো, ভাঙা ছাউনি। পথের কিনার ঘেঁষে তৈরি হয়েছিল কিছু বাড়ি, বেশির ভাগই পাথরধসে ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে। কোনমতে দাঁড়িয়ে থাকা বড় একটা বাড়ির কপালে সাইনবোর্ড রয়েছে, স্যালুন। আরেকটাতে জেনারেল স্টোর। কাত হয়ে যাওয়া একটা বাড়িতে লেখা, জেল। একটা কামারশালা আর একটা আস্তাবল আছে। পথের শেষ মাথায় পর্বতের গায়ে মস্ত এক কালো ফোকর, খনির প্রবেশ মুখ। ওই খনির জন্যেই গড়ে উঠেছিল শহরটা।
আঠারশা নব্বই সালে ফুরিয়ে আসে খনি, কিশোর বলল। চলে যেতে শুরু করে লোকে। ততদিনে খাড়িও প্রায় নষ্ট হয়ে গেছে।
গুঙিয়ে উঠল মুসা। একশো বছর পর এখানে কি খুঁজতে এসেছি আমরা, কিশোর?
জানি না, সেকেণ্ড। তবে আমি শিওর, নোরিয়াকে এখানে এসেই খুঁজতে বলেছেন বাওরাড। হয়ত এক-আধটা খবরের কাগজও বের হত তখন এখানে। খুঁজলে কয়েক সংখ্যা পাওয়াও যেতে পারে।
বলা যায় না, খবরের কাগজের মর্গও থাকতে পারে, রবিন আশা করল।

মর্গের নামে চমকে উঠল মুসা। খাইছে! যে শহরে এসেছি, আমরাও না শেষে মর্গের বাসিন্দা হই!
তার কথা কানে তুলল না কিশোর। বলল, এস, যাই।
পুরানো শহরের পাশে এসে সাইকেল থামাল ওরা। তালা দেয়া বড় একটা ফটকের সামনে। উঁচু বেড়ায় ঘেরা পুরো শহরটা
বেড়া দেখছ! এড বলল। দেখ, ওই বিল্ডিঙের লেখাটাও নতুন। কেউ এসে বাস করতে আরম্ভ করেছে নাকি আবার?
কি জানি, গাল চুলকাল কিশোর।
মিনিটখানেক অপেক্ষা করল ছেলেরা, কান পেতে রইল। কিন্তু নীরব হয়ে রইল পাউডার গালচ।
বেড়া ডিঙিয়ে ঢুকতে হবে, অবশেষে বলল কিশোর।
সাইকেল রেখে, বেড়া বেয়ে উঠতে শুরু করল ওরা। ওপাশে নেমে তাকাল ধুলো-ধূসরিত পথের দিকে।
রবিন, মুসা, কিশোর বলল। তোমরা বাঁয়ের বাড়িগুলোতে খুঁজবে। আমরা যাচ্ছি জেলখানা, আস্তাবল আর অন্য কয়েকটাবাড়ি খুঁজতে। খনির কাছে গিয়ে মিলিত হব। দেখা যাক, কিছু পাই কিনা।
মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানিয়ে জেনারেল স্টোরে গিয়ে ঢুকল রবিন আর মুসা। পা টিপে টিপে ঢুকে থামল। দুজনেই অবাক। একশো বছর আগে যেমন ছিল ঠিক তেমনই রয়েছে স্টোরটা। তাকে, তাকে মাল বোঝাই। ময়দা আর শুকনো আপেলের পিপা, লোহার নানারকম জিনিস-হাতুড়ি, বাটালি, করাত, শাবল, বেলচা, কুড়াল এসবই বেশি। চামড়ার জিন, আর আরও নানারকম জিনিস স্তূপ করে রাখা আছে মেঝেতে। দেয়ালে ঝোলানো পুরানো আমলের আগ্নেয়াস্ত্রগুলো। ম্লান আলোতেও চমকাচ্ছে। লম্বা কাউন্টারটা চকচকে পালিশ করা, পরিষ্কার।
কেউ থাকে এখানে! রবিন বলল।
কি-কিন্তু, তোতলাতে লাগল মুসা। নি-নিশ্চয় এ-যুগের কেউ নয়! জিনিসপত্র সব একশো বছর আগের মত...মানে, স্টোরটা এখন ভূতের দখলে! ভয়ে ভয়ে চারপাশে তাকাল সে। যেন আশঙ্কা করছে, হ্যাল্লো, কেমন আছ? বলে এখুনি বেরিয়ে আসবে ভূত।
রবিনেরও গা ছমছম করছে। ঢোক গিলল। হ্যাঁ, স্টোরটা যখন খোলা থাকত, এরকম সাজানোই থাকত বোধহয়। যেন...যেন এখনও খোলা...পোড়ো নয়!
মুসা, কাউন্টারে দেখছ, পুরানো ধরনের একটা হিসেবের খাতা এখনও রয়েছে, যেন বেচা-কেনা চলছে! :

খুব সাবধানে কাউন্টারের কাছে এসে দাঁড়াল দুজনে। খোলা পড়ে আছে খাতাটা। খদ্দেরের নাম লেখাঃ জিনিসের অর্ডার দিয়ে গেছে। অনেক দ্বিধা করে শেষে খাতাটায় আঙুল ছোঁয়াল রবিন। কাঁপা হাতে পাতা উল্টে চলল। নব্বইয়ের পরেও আরও কয়েক বছর টিকে ছিল এই শহর। ২৯ অক্টোবর, ১৮৯৬ সাল পাওয়া গেল। তার কাঁধের ওপর দিয়ে দেখে জোরে জোরে পড়ল মুসা, বাওরাড ডাই, ফ্যান্টম লেক-সাপোর্ট সহ ২০০ বোর্ড-ফুট মুস টিম্বার, ২ পিপা ময়দা, ১ পিপা গরুর মাংস, ৪ বাক্স শুকনো সীমের বীচি। চোখ মিটমিট করল সে। খাইছে! কত লোকের জন্যে অর্ডার দিয়েছে?

অনেক লোক ভাড়া করেছিল নিশ্চয়। শ্রমিক। তাদের খাবার লাগবে না? আর কিছু চোখে পড়ছে, মুসা? মাথা নাড়ল মুসা। দেখছি না।

স্টোরের বাইরে বেরিয়ে হাঁপ ছাড়ল দুজনে। এরপর ঢুকল স্যালুনে।

আরি, এটা তো কমুনিটি সেন্টার ছিল মনে হচ্ছে, রবিন বলল। লোকে একে অন্যের সঙ্গে দেখা করত এখানে, মেসেজ রেখে যেত। নিশ্চয় এখানে ঢুকেছিল বাওরাড।

ঘরটা বড়, অন্ধকার। পেছনে একটা দরজা, শোবার ঘরে ঢোকার জন্যে। বা ধারে কারুকাজ করা একটা পিয়ানো, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। চকচকে বারের ওপাশে সারি সারি মদের বোতল। পেছন দিকে গোল একটা টেবিলে কয়েকটা বোতল, গেলাসে ঢালা মদ, তাস ছড়িয়ে আছে, যেন এই খানিক আগে মদ খাওয়া আর তাস খেলা চলছিল।

এ-এটাও তো স্টোরের মতই, মুসার কণ্ঠে অস্বস্তি। যেন এইমাত্র ছিল খনির শ্রমিকেরা, হঠাৎ উঠে চলে গেছে।

কথা শেষ হল না তার। অনেকগুলো, কণ্ঠের মিলিত শব্দে ভরে উঠল ঘর। সীমান্ত এলাকার পুরানো গানের সুর বাজতে শুরু করল পিয়ানোতে। কিন্তু মানুষজন কাউকে চোখে পড়ল না। বোতল আর গেলাস ঠোকাঠুকির মৃদু টুংটাং পান করার শব্দ, মানুষের হুল্লোড় চলছে। পেছনে গোল টেবিলের কাছে জোরে শব্দ, আবছা একটা মূর্তি উঠে দাঁড়াল বলে মনে হল। চুপ! একচুল নড়বে না! ধমক শোনা গেল।

সামান্য স্পষ্ট হল আবছা মূর্তিটা। দেখা গেল, দুহাতে দুই পিস্তল।

ভূ-ভূত! চিৎকার করে উঠল মুসা। মেরে ফেলল রে, মেরে ফেলল! রবিন, দৌড় দাও!

দৌড়াতে গিয়ে একজন আরেকজনের ওপর এসে পড়ল। ওদের কাণ্ড দেখেই বুঝি পেছনে হো হো করে হেসে উঠল লোকেরা। বেজেই চলেছে পিয়ানো। বাইরে গরম। পরোয়াই করল না দুই গোয়েন্দা। ধুলোয় ঢাকা পথ ধরে ছুটল খনির দিকে।

খনির ভেতরে লম্বা সুড়ঙ্গটা আলোকিত। ঢালু শ্যাফট ধরে ছুটল ওরা। সামনে দেখা গেল কিশোর আর এডকে।
কিশোর! চেঁচিয়ে ডাকল মুসা। আরেকটু হলেই ভূতে...! এবারেও শেষ হল না তার কথা। দেখল, থমকে দাঁড়িয়ে গেছে কিশোর আর এড়। দৃষ্টি সামনে। কিছু একটা ওদেরকেও অবাক করেছে।
রবিন আর মুসারও কানে এল বিচিত্র শব্দ। পানি পড়ছে, মেশিন চলছে, থেকে থেকেই বন্য কণ্ঠে হেসে উহছে কোন পাগল! গুলি ফোটার বিকট আওয়াজ হল বদ্ধ সুড়ঙ্গে, কানের পাশ দিয়ে শিস কেটে বেরিয়ে গেল যেন বুলেট, গুলির শব্দ ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাল সুড়ঙ্গের ভেতর।
কি হল, কিশোর? ফিসফিসিয়ে বলল রবিন, জোরে বলতে ভয় পাচ্ছে।
ঢোক গিলল কিশোর। বুঝতে পারছি না!...ঢুকলাম...গুলি করল আমাদেরকে... লোকটা...।
লোকটাকে দেখতে পেল মুসা আর রবিন।
সুড়ঙ্গের আবছা অন্ধকারে বিশ ফুট দূরে দাঁড়িয়ে আছে। রাইফেলের নল ওদের দিকে ফেরানো। দাড়িওয়ালা এক খনি-শ্রমিক। গায়ে লাল উলের শার্ট। পরনে হরিণের চামড়ার প্যান্ট। পায়ে গোড়ালি ঢাকা উঁচু চামড়ার বুট।
চুরি করে যারা ঢোকে, তাদের কি করে তাড়াতে হয়, জানি আমরা! খসখসে গলায় বলল লোকটা। হেসে উঠল খলখল করে। হাতের রাইফেল উঁচু করে আবার ট্রিগার টিপল।
প্রচণ্ড শব্দ।
আবার গুলি করল লোকটা।
ছাই হয়ে গেছে মুসার চেহারা। আতঙ্কে চোখ বন্ধ করে ফেলেছে। ককিয়ে উঠল, আমি...আমি কি..গুলি খেয়েছি?
চোখ মেলল সে। অন্যদের অবস্থাও কমবেশি তারই মত।
মিস করেছে! রবিন বলল।
আসলে...আসলে আমাদের ভয় দেখাতে চেয়েছে, বলল এড।
আবার বুনো হাসি হেসে উঠল লোকটা। রাইফেল তুলে হুমকি দিল, চুরি করে যারা ঢোকে, তাদের কি করে তাড়াতে হয়, জানি আমরা!
আবার টিপে দিল ট্রিগার। পর পর দুটো গুলির শব্দ কাঁপন তুলল সুড়ঙ্গের দেয়ালে।
এবারও মিস করেছে! চিৎকার করে বলল এড। সাহস করে লোকটার দিকে এক পা এগোল সে। কি ব্যাপার? আমাদের...
দাঁড়াও, এড, ডাকল কিশোর। ভালমত দেখ সবাই। কি বলে শোন।

লোকটার দিকে তাকিয়ে আছে ওরা। খনির ভেতর থেকে এখনও ভেসে আসছে পানি পড়া আর মেশিন চলার আওয়াজ। দীর্ঘ এক মিনিট পর কট করে মৃদু একটা শব্দের পরই খড়খড় করে উঠল কিছু, সঙ্গে সঙ্গে বন্য হাসি হেসে রাইফেল তুলল লোকটা। একঘেয়ে কণ্ঠে বলল, চুরি করে যারা ঢোকে, তাদের কি করে তাড়াতে হয়, জানি আমরা! টিপে দিল ট্রিগার। পর পর দুবার।
ওটা নকল মানুষ! বলেই হাসতে শুরু করল কিশোর। যান্ত্রিক পুতুল। ভেতরে রেকর্ড করা ক্যাসেট ভরা। নানারকম শব্দের ব্যবস্থাও করা হয়েছে ক্যাসেটের সাহায্যেই। কায়দা করে বিশেষ বিশেষ জায়গায় বসিয়ে দিয়েছে স্পীকারগুলো।
হঠাৎ কপালে চাপড় মারল রবিন। হায় হায়রে, গাধা বানিয়ে ছেড়েছে। আমাদের! ইস আরও আগেই বোঝা উচিত ছিল। পেপারেই তো পড়েছি। পাউডার গালচের সংস্কার করে টুরিস্ট আকর্ষণের ব্যবস্থা করেছে। গড়ে তুলেছে পুরানো ওয়েস্টার্ন পরিবেশ। সেজন্যেই চারপাশে বেড়া, গেটে তালা।
হুঁ, তিক্তকণ্ঠে বলল কিশোর। ধোকা খেয়েছে বলে নিজের ওপরই বিরক্ত। আমিও পড়েছি। কিছুদিন আগে।
এগিয়ে গিয়ে পুতুলটার মুখে হাত বোলাল মুসা। স্টিক। আসল না নকল বোঝাই যায় না। স্যালুনের ভূতটাও নিশ্চয় পুতুল। খোদা, কি জিনিস বানায় ওরা আজকাল!
হ্যাঁ, ভালই বানায়। খালি কথা বললে হবে না, আরও কাজ আছে। কোন সূত্র-টুত্র পাওয়া গেছে? কাজে লাগার মত?
হিসেবের খাতাটার কথা জানাল রবিন। আর কি পরিমাণ খাবার কিনেছে বাওরাড ডাই।
একজনের জন্যেও কিনতে পারেন। শুনে কিশোর বলল, অনেক দিন কোথাও থেকে কিছু বানানোর দরকার হলে। একটা ব্যাপার বোঝা যাচ্ছে, নোরিয়াকে চমকে দেয়ার জন্যে যা বানিয়েছেন, বাওরাড, সেটা বড় রকমের কিছু। কিন্তু কি বানিয়েছেন, কোথায় বানিয়েছেন এখনও জানি না আমরা। পাতলা জার্নালটা খুলল সে। ঊনত্রিশে অক্টোবর এমন কিছু লেখা নেই, যাতে কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায়।
স্যালুনে সূত্র খোঁজার সুযোগই পাইনি,মুসা বলল।
বেশ, তাহলে আবার যাব আমরা। জার্নাল বন্ধ করল কিশোর। তারপর জেলখানায়। শেরিফের ফেলে যাওয়া রেকর্ড থাকতেও পারে। শেষে টু মারব। পত্রিকা অফিসে।
ফিরে চলল ওরা। ঢোকার সময় তাড়াহুড়োয় খেয়াল করেনি রবিন আর মুসা। এখন দেখল ভালমত। ঠেলাগাড়ি, নানারকমের যন্ত্রপাতি, আরও একটা পুতুল

কালো দাড়িওয়ালা এক খনি-শ্রমিক, হাতে গাঁইতি।
বাহ্, চমৎকার, হেসে বলল মুসা। তখন এটা দেখলেও দৌড় পেতাম...।
হাত থেকে গাইতি ফেলে দিল দাড়িওয়ালা। লাফিয়ে কিশোরের কাছে গিয়ে একটানে তার হাত থেকে জার্নালটা নিয়ে দৌড় দিল। বেরিয়ে গেল সুড়ঙ্গ থেকে।
টিক বানাউ! চেঁচিয়ে উঠল রবিন।
এতই দ্রুত ঘটে গেছে ঘটনা, ক্ষণিকের জন্যে যেন পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল ওরা। রবিন চেঁচাতেই কিশোরও চিৎকার করে উঠল, নিয়ে গেল! ধর, ধর!
ম্লান আলোকিত সুড়ঙ্গ ধরে ছুটল ওরা। বেরিয়ে এল কড়া রোদে। ভীষণ গরম।
ওই যে ব্যাটা! হাত তুলে দেখাল এড।
পথের শেষ মাথায় চলে গেছে বেঁটে নাবিক, এখনও দৌড়াচ্ছে।
থাম! এইই, থাম, চোর কোথাকার! মুসা চেঁচাল।
আরে, থামছে না তো! বলল এড। এই, এইই, থাম!
ফিরে চেয়ে হাসল টিক। তারপর ছুটে গেল স্যালুনের দিকে। এই সময় দরজায় দেখা দিল একটা আবছা মূর্তি, দুই হাতে পিস্তল।
চমকে উঠল মুসা। সেই ভূতটা...।
মূর্তিটাকে টিকও দেখেছে। সে-ও চিৎকার করে উঠল। পরক্ষণেই মোড় নিয়ে আরেকদিকে দৌড়াতে গেল। ঘোড়াকে পানি খাওয়ানোর একটা পুরানো গামলায় পা বেঁধে পড়ে গেল হুমড়ি খেয়ে। হাত থেকে উড়ে চলে গেল জার্নালটা। হচড়েপাচড়ে কোনমতে উঠে দাঁড়াল সে।
ধর ব্যাটাকে! মুসা বলল। ধর!
ফিরে তাকাল ভূত। তারপর কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করল, চোরটাকে ধরার জন্যে। পিস্তলে রোদ লেগে ঝিক করে উঠল। ধরা পড়ার জন্য দাঁড়িয়ে থাকল না টিক। বাড়িটার ধার দিয়ে আবার দৌড় দিল। বেড়ার কাছে পৌঁছে দেরি করল না এক মুহূর্ত। ওপরে চড়ে লাফ দিয়ে নামল ওপাশে। খাড়ির পাড়ে ওখানে ঘন ঝোপঝাড়, হারিয়ে যেতে অসুবিধে হবে না তার।
ভূতের কাছে ছুটে এল ছেলেরা। কালো ওয়েস্টার্ন পোশাক পরা একজন মানুষ। জার্নালটা তুলে নিল কিশোর।
এখানে কি করছ তোমরা? কৈফিয়ত তলব করল ভূতটা। জলদি সব খুলে বল।
আর ওটা দাও, জার্নালটার কথা বলল সে। নিশ্চয় এখানকার জিনিস।
না, স্যার, মোলায়েম গলায় বলল কিশোর। জানতাম না এখানে কেউ আছে। তাহলে অনুমতি নিয়েই ঢুকতাম, পাউডার গালচে বাওরাড ডাইয়ের গতিবিধির খবর নিতে এসেছে, জানাল সে। দারুণ হয়েছে আপনার ভূত ভূত খেলা! রীতিমত ভয় পাইয়ে দিয়েছেন।

ভূত হাসল। প্র্যাকটিস করছিলাম। দেখতে চাইছিলাম, কি প্রতিক্রিয়া হয় তোমাদের। আমি এখানকার কেয়ারটেকার। চোয়াল ডলল সে। বাওরাড ডাই, না? বোধহয় সাহায্য করতে পারব। পুরানো রেকর্ড আছে আমার অফিসে। বাওরাড ডাই এখানে তেমন কিছু করে থাকলে নিশ্চয় পাওয়া যাবে।
স্যালুনের ভেতর দিয়ে এসে ছোট একটা অফিসে ঢুকল ওরা। একটা ফাইলিং ক্যাবিনেট খুলল কেয়ারটেকার এখানে আছে রেকর্ড। দেখা যাক, বুড়ো বাওরাড কি করেছে।
একটা ফাইল খুলে, পড়ে, মাথা নাড়ল কেয়ারটেকার। না, তেমন কিছু নেই। শুধু দুটো রেফারেন্স। জেনারেল স্টোরে জিনিস কিনেছে, হিসেবের খাতায় তোমরা যা দেখেছ। আর দৈনিক গালচ-এ দুই লাইনের একটা নোসিশ, আঠারশো ছিয়ানব্বই সালে, কয়েকদিনের জন্যে কিছু শ্রমিক চেয়েছে। ব্যস।
এইই? নিরাশ হল মুসা। দূর! এত কষ্ট করে কোন লাভ হল না...
বাইরে ডাক শোনা গেল, এই, কোথায় গেলে তোমরা?...এড? এডবার... আই, ছেলেরা...?
ডিনো, এড বলল।
দ্রুত বেরিয়ে এল ছেলেরা। রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে ডিনো, সঙ্গে আরেক লোক। হিসটোরিক্যাল সোসাইটির সেই প্রফেসর, হারম্যান কেইন।
ছেলেদের দেখে এগিয়ে এলেন তিনি। গেটের বাইরে দেখা হল ডিনাম্যান হ্যাংবারের সঙ্গে। বললেন, তোমরা এখানে এসেছ। এসে তোমাদের সাইকেল পড়ে থাকতে দেখলাম। ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, তোমাদের কিছু হয়েছে ভেবে...।
বিনা অনুমতিতে ঢুকেছ? ডিনো বলে উঠল। জানতাম, গোলমাল বাধাবে। সেজন্যেই তাড়াতাড়ি ছুটে এসেছি।
না, কিছু হয়নি ওদের, কেয়ারটেকার বলল। তবে বেশ উত্তেজনার মধ্যে ছিল, আমাদের কাজ দেখে। তাই না, ছেলেরা? প্রফেসরকে জানাও সেকথা। খুশি হবেন। আমাদের হিসটোরিক্যাল অ্যাডভাইজার তিনি। নতুন করে আবার সব সাজাতে সাহায্য করেছেন সোসাইটি।
শুনব, শুনব সব, পরে, হাত তুললেন প্রফেসর। রিমলেস চশমার ওপাশে উজ্জ্বল হল তার চোখ। কেয়ারটেকারের উদ্দেশে হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে ছেলেদের নিয়ে রওনা হলেন ওয়েস্টার্ন শহরের পথ ধরে। বাওরাড ডাইয়ের আরেকটা জার্নাল নাকি পেয়েছ তোমরা? গুপ্তধন সত্যি আছে ভাবছ নাকি? পাওয়া গেলে কি সাংঘাতিক ব্যাপার হবে। বল, জলদি খুলে বল সব।
কিভাবে জার্নালটা পাওয়া গেছে, জানাল কিশোর। টিক বানাউয়ের কথাও বলল।

লাল হয়ে গেল প্রফেসরের লাল মুখ। ওই শয়তানটা? টিক বানাউ। ডাইয়ের গুপ্তধন চুরির মতলব করেছে? নিয়ে গিয়ে নিশ্চয় গলিয়ে ফেলবে সমস্ত সোনার অলঙ্কার। নষ্ট করে ফেলবে! মানুষ নাকি ও? এত মূল্যবান ঐতিহাসিক জিনিসপত্র নষ্ট করে! আরিব্বাপরে, ভাবতেই রোম খাড়া হয়ে যায়—ঈস্ট ইনডিয়ান জলদস্যুদের লুটের মাল! বিখ্যাত হয়ে যাবে আমাদের সোসাইটির মিউজিয়ম। তা কোন সূত্রে পেলে?

না, বেশি কিছু না, দ্বিধা করছে কিশোর। শুধু জেনেছি, স্ত্রীর জন্যে বড় কিছু একটা বানিয়ে গেছে বাওরাড ডাই।

হুঁ। এখানে নয় নিশ্চয়? ফ্যান্টম লেকে না তো? এই এলাকার অনেক জায়গাই চিনি আমি। তোমাদের চোখে না পড়লেও হয়ত আমার চোখে পড়বে।

একটা স্টেশন ওয়াগন দেখিয়ে বললেন প্রফেসর, যাও, সাইকেলগুলো আমার গাড়িতে তোল। ফ্যান্টম লেকে যাব আমরা। কিছুতেই টিক বানাউকে নিতে দেব না গুপ্তধন।

আরেক দিকে মুখ ফেরাল ডিনো। বিড়বিড় করল, আরেকটা বেকুব।

কী? কি বললেন? কথাটা শুনে ফেলেছেন প্রফেসর। বেকুব আমি, না আপনি? এসবের কি কচুটা জানেন আপনি? আপনি কোথাকার বুদ্ধিমান? এই, যাও তোমরা, সাইকেল তোল।

ডিনোর চেহারা দেখে ফিক করে হেসে ফেলল মুসা। ছুটল সাইকেল আনার জন্যে।

শেষ বিকেল। আগে আগে চলেছেন প্রফেসর, পেছনে ছেলেরা। উপত্যকার প্রতিটি ফুট পরীক্ষা করে দেখে এসেছে ওরা, ছোট পাহাড়টারও অর্ধেকটা। সম্ভাব্য সমস্ত দিক থেকে খুঁটিয়ে দেখা হয়েছে পুকুরটাকে, ফ্যান্টম লেক। উত্তেজিত প্রফেসরের সঙ্গে প্রায় দৌড়ে দৌড়ে তিনবার চক্কর দিয়েছে ওরা পুরো বাড়িটা। পরিশ্রম অনেক করেছে, কিন্তু পায়নি কিছুই।

বিশাল বাড়িটার চত্বরে এখন পড়ন্ত রোদ। সেখানে এসে জমায়েত হল সবাই। হেসে ওদের সান্ত্বনা দিলেন মিসেস ডাই। বাঁকা হাসল ডিনো, দাঁতের ফাঁকে পাইপ, ফকফক ধোঁয়া ছাড়ছে।

কিছুই পেলাম না, ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেললেন প্রফেসর। বাড়িটা ছাড়া বড় কিছু বানায়নি বাওরাড ডাই। আর এখানে খোঁজা হয়েছে প্রায় একশো বছর ধরে। মাথা নাড়লেন তিনি। স্কুস টিম্বারের চিহ্নও দেখলাম না।

হেসে উঠল ডিনো, খুব মজা পাচ্ছে যেন। বলেছিলাম না, বেকুব। তখন তো রেগে গেলেন। টিম্বার দিয়ে বুড়ো কিছু বানিয়ে থাকলেও নেই এতদিন, নষ্ট হয়ে গেছে কবেই। আর গুপ্তধন? ঘোড়ার ডিম আছে।

আছে। এবং বেরও করব আমরা! রেগে গেল শান্ত রবিন। সে-ও লোকটাকে সত্ম করতে পারছে না।
নিশ্চয়ই করবে, প্রেরণা জোগালেন মিসেস ডাই। তিরস্কারের ভঙ্গিতে তাকালেন ডিনোর দিকে। সোনার মোহর কিংবা হীরের গহনা না পেলেই বা কি? এমন কিছু পাওয়া যেতে পারে, যার ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম।
মা, এড বলল। মনে হচ্ছে গুপ্তধন আছে তুমিও বিশ্বাস কর না?
এসব কথায় কান নেই কিশোরের। বাওরাড ডাইয়ের চিঠিটা আবার পড়ছে। ইস, আর একটু যদি বুঝতে পারতাম। আমি শিওর, চাবি কোথাও আছেই। আসলে, সময় পেরিয়ে গেছে অনেক। হয়ত নষ্ট হয়ে গেছে সূত্র। তারপর যেন নিজেকেই প্রশ্ন করল, আচ্ছা, বাড়িতে কি ভালবাসতেন বাওরাড?
মাথা নাড়লেন মিসেস ডাই। তোমরা যখন পাউডার গালচে, আমিও বসে থাকিনি। নোরিয়ার অনেক চিঠি বের করে পড়েছি। আগেও পড়েছি, আবার পড়লাম। লেখা আছে অনেক কথাই। কিন্তু স্কটল্যান্ডে কি ভালবাসতেন বাওরাড, সে-সম্পর্কে তেমন কিছু নেই। হ্রদের দৃশ্য দারুণ ভালবাসতেন, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে শুধুই একথা।
ওটা এমন কোন ব্যাপার না, হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন প্রফেসর।
জটিল সমস্যা, আনমনে বলল কিশোর।
শঙ্কিত হল এড। খোঁজা বাদ দেবে না তো, কিশোর?
বাদ? মুচকি হাসল মুসা। কিশোর পাশাকে তুমি চেন না, এডবার ডাই। তদন্ত তো সবে শুরু করেছে ও।
বাদ দিলেও তোমাদের দোষ দেব না আমি, বললেন মিসেস ডাই।
বাদ দেয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না, মুখ খুলল কিশোর। প্রথম ধাপে রয়েছি আমরা, বাওরাড এখনও বলেননি কোথায় খুঁজতে হবে। জার্নালটা খুলল সে। ঊনত্রিশ অক্টোবরের পরে, যেটাতে কিছু আছে বলে মনে হচ্ছে, সেটা নভেম্বর এগার। লিখেছেনঃ সাইপ্রেসের দ্বীপে গিয়েছিলাম আজ। নৌকা বোঝাই ছিল। আরেকটু হলেই গিয়েছিল ডুবে, দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে আসা ঝড়ে, এমনই ফুসে উঠেছিল সাগর। আমার প্রস্তাবে রাজি হয়েছে দ্বীপের মালিক। দুপুরের দিকে সন্তুষ্ট হয়ে বাড়ি ফিরে এসেছি আমি। নোরিয়ার উপহারের কাজ ভালই এগোচ্ছে। মুখ তুলল গোয়েন্দাপ্রধান। পরের হপ্তায় আর বিশেষ কিছু নেই।
কিশোর, মুসা বলল। লিখেছে, নৌকা বোঝাই ছিল।
হ্যাঁ, মাথা ঝাঁকাল কিশোর। দ্বীপেই হয়ত রয়েছে জবাব। কিন্তু, বলল এড। কোথায় ওটা? এখানে সাইপ্রেসের দ্বীপ আছে বলে তো শুনিনি?
আমিও না, কিশোর বলল। মুসা, তুমি জান?

রকি বীচের আশপাশের সাগর সম্পর্কে ভাল জ্ঞান মুসার। সাগর, সাঁতার, নৌকা বাওয়া খুব পছন্দ করে। হাত বাড়িয়ে জার্নালটা নিল সে। আমার মনে হয় না ওটা আসল নাম। হয়ত কোন নামই নেই, সে-জনেই ওই নাম রেখেছে। চ্যানেল আইল্যাণ্ডস-এর বড় বড় সমস্ত দ্বীপের নাম আছে, এটার নেই যখন, নিশ্চয় খুব ছোট। উপকূলের কাছেই কোথাও হবে। নইলে সকালে গিয়ে দুপুরের আগে ফিরে আসতে পারত না বাওরাড ডাই। ব্যক্তিগত সম্পত্তি তো বললই, আর দ্বীপটায় সাইপ্রেস গাছ আছে। খুঁজে দেখা দরকার।
আমিও যাব, বলে উঠলেন প্রফেসর। ছোট একটা সেইলিং বোট আছে আমার। রকি বীচ থেকে বেশি দূরে না হলে ওটা নিয়েই যাওয়া যায়।
উঠে দাঁড়াল ডিনো। গুজব, ভূত, নাম ছাড়া দ্বীপ, একশো বছর আগে মরে যাওয়া একজন মানুষ...পাগল..সব উন্মাদ হয়ে গেছে। গটমট করে বেরিয়ে গেল স্কটসম্যান।
সেদিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লেন মিসেস ডাই, হাসলেন। প্রফেসরের দিকে চেয়ে বললেন, ওর ব্যবহারে কিছু মনে করবেন না। ও একটু বদমেজাজী। অবাস্তব কথা সইতে পারে না। তবে লোক খারাপ না, ভাল। এডের বাবা মারা যাওয়ার পর কি কষ্টে যে দিন কাটছিল আমাদের, ডিনো আসাতে খানিকটা সহজ হয়েছে। ভীষণ খাটতে পারে। আগে অবশ্য মেজাজ এত খারাপ ছিল না তার। বাইরে থেকে আসার পর এমন হয়েছে।
বাইরে? কথাটা ধরল কিশোর। দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। কোথায় গিয়েছিল?
সান্তা বারবারায়। অ্যাভোকাডো বেচতে গিয়েছিল। তিনদিন পর কাল রাতে ফিরেছে।
মেঘ জমল কিশোরের চেহারায়। ও আপনার কেমন আত্মীয়, মিসেস ডাই? মাত্র এক বছর হল এসেছে বললেন না?
স্কটল্যাণ্ড থেকে এসেছে। আমার স্বামীর দূর সম্পর্কের খালাতো ভাই, সেই সম্পর্কে আমারও। বছরখানেক আগে আমাদের এখানে বেড়াতে এসেছিল। এসে দেখে এডের বাবা নেই। সাহায্য করতে চাইল। আমার তখন অবস্থা খারাপ। রাজি হয়ে গেলাম। আমাদের জন্যে ওর খুব মায়া। এত যে খাটে, কাজের জন্যে একটা পয়সা নেয় না। থাকা আর খাওয়া, ব্যস।
উঠে দাঁড়াল কিশোর। রবিন আর মুসাকেও ওঠার ইঙ্গিত করে বলল, দেরি হয়ে গেছে। চলি, ম্যাডাম। বাড়ি যাব।
চল, পৌঁছে দেব, বললেন প্রফেসর। শাখাপথ থেকে বেরিয়ে হাইওয়েতে উঠল স্টেশন ওয়াগন।

প্রফেসর, হঠাৎ কথা বলল কিশোর। একটা ব্যাপার অবাক লাগছে। আচ্ছা বলুন তো, চিঠি আর ডাইদের সম্পর্কে এত কথা জানল কি করে টিক বানাউ?
বলতে পারব না। গুপ্তধনের জোর গুজব রয়েছে, অনেকেই জানে। কিন্তু টিক বানাউয়ের কথা যা শুনলাম, তাকে স্থানীয় লোক মনে হচ্ছে না। কে জানে, লিটল মারমেইডের বেঁচে যাওয়া অন্য কোন নাবিকের বংশধর হতে পারে। ক্যাপ্টেনের কেউ হলেও অবাক হব না।
ঠিক, রবিন বলল। এটাই ব্যাখ্যা।
হতে পারে, ধীরে ধীরে বলল কিশোর।
ডিনারের আধ ঘন্টা আগে স্যালভিজ ইয়ার্ডে ছেলেদের নামিয়ে দিয়ে গেলেন প্রফেসর।
দুই সুড়ঙ্গ দিয়ে হেডকোয়ার্টারে ঢুকল ওরা।
কিশোর, ভাবছি,মুসা বলল। ফ্যান্টম লেকেই কোন খনি রেখে যায়নি তো বাওরাড ডাই? গোপন খনি?
থাকতেও পারে। হাতে কোন প্রমাণ নেই, শিওর হই কি করে? আর স্কটল্যাণ্ডের ভূতের গুজবের সঙ্গে খনির যোগাযোগ কোথায়? কিংবা আয়নার?
রবিন মনে করিয়ে দিল, মিসেস ডাই বললেন, ভাইকিংরা আসে কিনা সেদিকে নাকি চোখ রাখে ভূত। ওই কথাটাই বোঝাতে চেয়েছে হয়ত বাওরাড। হ্রদের দিকে চেয়ে থাকা ভূত। মানে কি? পুকুরের নিচে লুকিয়ে রাখেনি তো গুপ্তধন?
রাখতে পারে, কিশোর বলল। তবে তার জন্যেও প্রমাণ চাই। নির্ভরযোগ্য সূত্র। কোথায় রেখেছে, জানতে হলে। সারা পুকুরের তলায় তো আর খোঁজা যাবে না।
থামল এক মুহূর্ত। ডিনোর কথা মিসেস ডাই কি বললেন মনে আছে?
আছে, বলল মুসা। খুব খাটতে পারে, আর খুব মায়া। কাজের বিনিময়ে একটা পয়সা নেয় না।
তবে কিছুটা বদমেজাজী, যোগ করল রবিন। চমক্কার সব লক্ষণ।
এবং, কিশোর বলল। ফ্যান্টম লেক থেকে তিনদিনের জন্যে বাইরে চলে গিয়েছিল, ফিরেছে কাল রাতে। তারমানে, গতকাল তার রকি বীচে থাকা সম্ভব, যখন টিক আমাদের ওপর হামলা চালিয়েছিল।
টিকের সঙ্গে হাত মিলিয়ে গুপ্তধন খুঁজছে ভাবছ? রবিন বলল। বাওরাডের চিঠির কথা, ফ্যান্টম লেক, মিসেস ডাই কি কি জিনিস বিক্রি করেছেন, সব জানা আছে ডিনোর।
হ্যাঁ, আছে। মুসা, আজ রাতের মধ্যে সাইপ্রেস আইল্যাণ্ডটা কোন দ্বীপ, জানার চেষ্টা করবে। কাল সকালে প্রফেসর কেইনের বোটে মিলিত হব আমরা।

ডিনারের পর চাচা-চাচীকে ঘরের কাজে সাহায্য করল কিশোর। দশটায় বাজল টেলিফোন।
মুসা করেছে। বলল, কিশোর, ওটা আসলে ক্যাবরিলো আইল্যাণ্ড। আঠারশো ছিয়ানব্বই সালে দ্বীপটা ক্যাবরিলো পরিবারের দখলে ছিল। সাইপ্রেস গাছের ছড়াছড়ি। তীর থেকে মাত্র মাইলখানেক দূরে। বন্দর থেকে মাইল দুই উত্তরে।
চমৎকার কাজ দেখিয়েছ, সেকেণ্ড! দুর্লভ প্রশংসা পেল মুসা, কিশোর পাশা সহজে কারও প্রশংসা করে না।
রিসিভার রেখে দোতলায় নিজের ঘরে চলে এল কিশোর। আলো জ্বালার আগে একবার সামনের জানালার কাছে এসে দাঁড়াল। রকি বীচে ক্রিস্টমাস লাইট দেখার জন্যে। অনেক বাড়িতেই জ্বলছে রঙিন আলো।
সরে আসতে যাবে, এই সময় আলোর একটা ঝিলিক চোখে পড়ল তার। তাকাল সেদিকে। আবার দেখা গেল আলো। অবাক হল সে। ওখানে তো কোন বাড়িঘর নেই? হঠাৎ বুঝল, তাদের স্যালভিজ ইয়ার্ডের ভেতরেই। যেখানটায় ওদের হেডকোয়ার্টার লুকানো রয়েছে জঞ্জালের তলায়।
আলোটা আসছে ট্রেলারের স্কাইলাইটের ফোকর দিয়ে!
তাড়াতাড়ি নিচে নামল কিশোর। বাইরে বেরিয়ে নিঃশব্দে এগোল। মেইন গেট বন্ধ। তালা দেয়া। মোড় নিয়ে ওয়ার্কশপের দিকে চলল সে। এখানে আরেকটা গোপন প্রবেশ পথ রয়েছে তিন গোয়েন্দার, সবুজ রঙ করা বেড়ার গায়ে দুটো আলগা বোর্ড।
সাবধানে সবুজ ফটক একের ভেতর দিয়ে ওয়ার্কশপে ঢুকল কিশোর। আলো আর চোখে পড়ছে না এখন। দুই সুড়ঙ্গের কাছেও কেউ নেই। সহজ তিন-এর সামনে থেকে খুব সতর্ক ভাবে কিছু জঞ্জাল সরাল।
পুরানো কাঠের দরজার পাল্লা ভেঙে খোলা হয়েছে। তার ওপাশে হাঁ হয়ে খুলে আছে ট্রেলারের দরজা।
হেডকোয়ার্টারে ঢুকল কিশোর। বাওরাড ডাইয়ের জার্নালটা ডেস্কের ওপরই আছে, তবে বন্ধ নয়, খোলা। তীব্র আলোর ঝিলিকের মানে বুঝে ফেলল। দরজা ভেঙে ঢুকে জার্নালটার ছবি তুলে নিয়ে গেছে কেউ। ফ্লাশগানের আলো দেখেছে সে।
সহজ তিন-এর দরজা আবার ঠিকঠাক করে লাগিয়ে ঘরে ফিরে এল কিশোর। চিন্তিত। এখন আরও একজনের জানা হয়ে গেল, কি লেখা রয়েছে বাওরাডের দ্বিতীয় জার্নালে।
রকি বীচ বন্দরের ওপর কুয়াশা যেন ঝুলে রয়েছে। সাইকেল চালিয়ে এসে দেখল তিন গোয়েন্দা, হাজির রয়েছে এড, ওদেরই অপেক্ষা করছে। সাইকেল তুলে

নিয়েছে প্রফেসরের বোটে। আঠাল ঠাণ্ডা গায়ে কাঁপুনি তুলে দিয়েছে তার।
তিন গোয়েন্দাকে দেখে হাসল এড। সারারাত ধরে ভেবেছি, বুঝেছ। আমি শিওর, নৌকা বোঝাই করে গুপ্তধনই নিয়ে গিয়েছিল বাওরাড ডাই। আমার ধারণা, আজ দ্বীপে গেলেই পেয়ে যাব।
আমি তা মনে করতে পারছি না, এড, কিশোর বলল। এত…
ইঞ্জিনের শব্দ শোনা গেল। তীরের কাছে এসে ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষল স্টেশন ওয়াগন। লাফিয়ে নেমে প্রায় ছুটে এলেন প্রফেসর। সরি, বয়েজ, দেরি হয়ে গেল। আজ সকালে একটা গণ্ডগোল হয়েছে হিসটোরিক্যাল সোসাইটিতে। লিটল মারমেইডের ফাইল চুরির চেষ্টা হয়েছিল। কালো দাড়িওয়ালা এক লোক।
টিক ব্রাউন! একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল বরিন আর মুসা।
মাথা ঝাঁকালেন প্রফেসর। আমারও তাই মনে হয়।
কিন্তু কেন? এডের জিজ্ঞাসা। লিটল মারমেইডের ইতিহাস তো সবাই জানে।
হয়ত সবার চোখেই কিছু এড়িয়ে গেছে, অনুমান করল কিশোর। স্যালভিজ ইয়ার্ডেও যে চোর এসেছিল, জানাল সবাইকে।
চমকে উঠলেন প্রফেসর, জার্নালও তাহলে পেয়ে গেছে টিক! চোরটা হয়ত ইতিমধ্যেই রওনা হয়ে গেছে, আমাদের আগেই গিয়ে হাজির হবে দ্বীপে। সাগরের ওপরের কুয়াশার দিকে তাকলেন তিনি। কিন্তু এই আবহাওয়ায় কি আমরা যেতে পারব?
মাথা ঝাঁকাল মুসা। তীরের কাছে ঘন বটে, তবে আমার ধারণা, যতই দূরে যাব পাতলা হয়ে যাবে কুয়াশা। এসময়ে এখানটায় কুয়াশা কিছু বেশিই থাকে, জানেনই তো। আর অসুবিধে কি? যথেষ্ট বড় আপনার বোট।
চল তাহলে। তাড়াতাড়ি করতে হবে।
পঁচিশ ফুট লম্বা সুন্দর একটা সেইলিং বোট। উঠল সবাই। অকজিলারি ইঞ্জিন স্টার্ট দিলেন প্রফেসর। দ্রুত তীরের কাছ থেকে সরে এল বোট। হাল ধরল মুসা, কোর্স সেট করল উত্তরে। ছেলেদের নিয়ে কেবিনে গাদাগাদি করে বসলেন প্রফেসর। প্রচণ্ড শীত। ভারি সোয়েটারেও বাগ মানছে না ডিসেম্বরের কনকনে ঠাণ্ডা।
দ্বীপটা ছোট, মুসা বলল। খুব সুন্দর। এখন পরিত্যক্ত। চমৎকার একটা গুহাও আছে।
বাতাস কম, পাল তুলে লাভ নেই। তাই ইঞ্জিনের ওপরই ভরসা করল মুসা। নিচে কেবিনেই রয়েছে অন্যেরা, তাদেরকে বলল সে, ওই যে, দেখা যাচ্ছে।
সামনে, প্রায় মাইলখানেক দূরে কুয়াশার ভেতর মাথা তুলেছে দ্বীপটা, যেন সাগর থেকে উঠে এসেছে কমলো কিম্ভুত এক দানব। আরও কাছে এগোলে চোখে

পড়ল গাছ, রাশি রাশি সাইপ্রেস। পেছনের দুটো পাহাড় চূড়ার একটাকে ছাড়িয়ে উঠেছে লম্বা চিমনি। জনহীন, পাথুরে এলাকা। তার ওপাশে আকাশ থেকে সাগরে নেমে গেছে যেন কুয়াশার ভারি চাদর।
দক্ষ হাতে হুইল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একটা খাড়ির ভেতরে বোট ঢোকাল মুসা। পুরানো কাঠের জেটিতে বাঁধল। হুড়াহুড়ি করে নামল সবাই। দেখতে লাগল জনমানবশূন্য পাথুরে দ্বীপটা। যেখানে সেখানে জন্মে রয়েছে বুড়ো সাইপ্রেস, ওগুলোর মাঝের খোলা জায়গা দখল করে নিয়েছে ঘন ঝোপঝাড়। ক্রমাগত ঝড়ো বাতাসের কারণে বিচিত্র ভঙ্গিতে বেঁকে গিয়েছে বড় বড় গাছগুলো।
সর্বনাশ! হতাশ কণ্ঠে বলল রবিন। বুড়ো বাওরাড এখানেই যদি গুপ্তধন লুকিয়ে থাকে, কি করে বের করব? যেখানে খুশি থাকতে পারে। শত বছর খোঁড়াখুঁড়ি করলেও খুঁজে পাব না।
না, রবিন, কিশোর বলল। কাল রাতে অনেক ভেবেছি এসব নিয়ে। আমার ধারণা, মাটির তলায় গুপ্তধন লুকাননি বাওরাড। কারণ, তিনি জানতেন, লিটল মারমেইডের ক্যাপ্টেন তার পিছু নিয়েছে। সদ্য খোঁড়া মাটি তার নজরে পড়ে যেতে পারে। যে কারই চোখে পড়তে পারে। তাছাড়া, তিনি চেয়েছেন, সহজেই যাতে খুঁজে বের করতে পারে নোরিয়া। মাটিতে পুঁতে রাখলে সেদিক থেকেও অসুবিধে। খুব তাড়াতাড়িই নতুন মাটি পুরানো মাটির সঙ্গে মিশে এক হয়ে যায়, আলাদা করে চেনা মুশকিল হয়ে পড়ে। মাথা নাড়ল সে। না, ওরকম জায়গায় লুকাননি। আর যেখানেই লুকিয়েছেন, স্পষ্ট চিহ্ন দিয়ে রেখেছেন, দীর্ঘদিনেও যা নষ্ট হবার নয়। কারণ তিনি শিওর ছিলেন না, ধাঁধার মানে বুঝে গুপ্তধন বের করতে কতদিন লাগবে তাঁর স্ত্রীর।
এই দ্বীপে কিছু বানিয়ে যায়নি তো বাওরাড?এড বলল। নোরিয়াকে চমকে চেয়ার জন্যে হয়তো জায়গা কিনে কিছু বানিয়েছে।
সেকথাও ভেবেছি। কাঠ দিয়ে তৈরি জিনিসের দিকে চোখ রাখতে হবে। আমাদের। আর, ডাইদের চিহ্ন বহন করে এমন কিছু।
চিঠিতে বলেছেন, তাঁর নির্দেশ অনুসরণ করতে, রবিন বলল। তার দিনগুলো কিভাবে তৈরি হয়েছে পড়ার জন্যে। ভূত আর আয়নার কথা বলেছেন। ইঙ্গিত আর চিহ্ন বোধহয় ওগুলোই।
ঠিক, একমত হল কিশোর। জার্নালে উল্লেখ আছে, এই দ্বীপের মালিকের কাছে একটা প্রস্তাব দিয়েছেন বাওরাড, হয়ত কোন জিনিস লুকানোর অনুমতি চেয়েছেন। কাজেই, ওই চিমনিওয়ালা বাড়িটা থেকে খোঁজা শুরু করব। রেকর্ড থাকতে পারে ওখানে।

পাহাড়ে চড়ল ওরা। চূড়ার কাছে একটা ছোট গুহামত রয়েছে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় তাতে আশ্রয় নেয়া চলে। কাছাকাছি খানিকটা সমতল জায়গা। বিশাল চিমনি মাথা তুলেছে ওখান থেকেই। পাথরের মস্ত ফায়ারপ্লেস আছে, পাথরের চুলা আছে, চারপাশে পাথরের ছড়াছড়ি, কিন্তু বাড়ি নেই। বড় বড় পাথরের চাঙড়, চাড় দিয়ে তুলে ফেলা হয়েছিল, বোঝা যায়, জায়গামত রেখে দেয়া হয়েছে আবার।

ওগুলো দেখে বলে উঠলেন প্রফেসর, কেউ এসে দেখে গেছে আমাদের আগেই। বেশিক্ষণ হয়নি।

অস্বস্তিতে ভুগতে শুরু করল ওরা। বার বার তাকাচ্ছে বাকাচোরা সাইপ্রেস বনের দিকে, নির্জন পাহাড়ের চূড়া আর ঢালের দিকে। কেউ নেই। শুধুই কুয়াশা, যেন ঝরে পড়ছে পুঞ্জ পুঞ্জ ধোঁয়াটে মেঘ।

দেখি তো, কি আছে ওটার তলায়, বলে একটা চাঙড়ের দিকে এগোল রবিন। সে আর মুসা মিলে সরিয়ে ফেলল ওটা। শূন্য গর্তটার দিকে তাকাল সবাই।

কিচ্ছু নেই, বলল মুসা। থাকার কথাও না অবশ্য। বিশেষ করে লোকটা এসে দেখে যাওয়ার পর।

হুঁ, মাথা দোলাল কিশোর। চুলার ভেতরেও খুঁজেছে। নিচেও। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে চারপাশ থেকে মাটি সরিয়েছে, দেখেছ।

কিন্তু খাঁড়িতে তো আর কোন নৌকা দেখলাম না। তবে ছোট একটা সৈকত আছে ওধারে।

চল, ছড়িয়ে পড়ে খোঁজা শুরু করি ওকে, প্রস্তাব দিলেন প্রফেসর। আমি মাঝে থাকছি। তোমরা চারজন চার দিকে যাও। খুব সতর্ক থাকবে। কিছু দেখলে জোরে ডাকবে।

নতুন বা আকর্ষণীয় কোন চিহ্ন দেখলেও জানাবে, কিশোর বলল। কোন গুহা, পাথরের স্তূপ, পাথরে বা পাহাড়ে খোদাই করা কোন নকশা…কি বলছি, বুঝেছ?

নার্ভাস ভঙ্গিতে মাথা দোলাল অন্য তিনজন। রওনা হয়ে গেল একেকজন একেক দিকে। কুয়াশা ঘন হতে আরম্ভ করেছে। এডের চোখে আবছা হয়ে এল মুসার মূর্তি, দ্বীপের বা ধারে চলে এসেছে সে। অন্য তিনজন কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছে না এখন কুয়াশার জন্যে।

এড এসেছে পশ্চিমধারে, পাহাড়ের গোড়ায়, দ্বীপের এই ধারটা বেশি উঁচু। বায়ে সাগরের ওপর কুয়াশা খুবই ঘন কুয়াশার একটা মেঘ ভেসে এসে ঘিরে ফেলল তাকে, ফলে মুসাকেও দেখতে পেল না আর। ভীষণ অস্বস্তি লাগছে তার, বুক কাঁপছে। দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, কান খাড়া। সামনে কিছু দেখা যায় না। অন্ধের মত পা

বাড়াতে গিয়ে পড়ে গেল সে। পাথরের ধস সৃষ্টি করে গড়িয়ে পড়তে লাগল ঢাল বেয়ে।
ব্যথা লাগতে আঁউক করে উঠল। বাড়ি লেগেছে কোন কিছুতে, পাথরেই হবে। উঠে বসল। এই সময় চোখে পড়ল ওটা।
ভূতুড়ে একটা মূর্তি, ঢালে দাঁড়িয়ে কুয়াশার মধ্যে দিয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে। কালো মূর্তি, পিঠে কুজ, ছুঁচালো কুৎসিত মুখ, বাঁকা নাক, বড় বড় চোখ।
ভূত! ভূত! চিৎকার করে উঠল এড়। বাঁচাও!
নড়ে উঠল ভূত। লম্বা হাত বাড়িয়ে দিল যেন এডকে ধরার জন্যে।
দৌড়ে এল সবাই। চোখ বন্ধ করে চিৎকার করছে এড। ইতিমধ্যে পাতলা হয়ে গেছে কুয়াশা। রবিন বলল, ভূত দেখলে কোথায়? ওটা তো গাছ।
চোখ মেলল এড। সত্যিই। কুঁজো ভূতটা একটা বাঁকা সাইপ্রেস। ডালগুলো কাণ্ডের দুপাশে এমনভাবে বেঁকে আছে, যেন হাত। তার ওপরে অনেকখানি গায়েব, ছিঁড়ে নিয়ে গেছে ঝড়। কাণ্ডের ছেড়া, মোচড়ানো অংশটাকে মাথার মত দেখাচ্ছে, তাতে বড় একটা ছিদ্র-কুয়াশার কারণে মনে হয়েছিল, চোখ নড়ছে।
গাছ! স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল এড। আমি ভেবেছি ভূত।
হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, কিশোর, ভূতই ওটা! বুঝতে পারছ না? বাওরাড ডাইয়ের চিহ্ন।
চিহ্ন? মুসা বুঝতে পারল না।
ঠিক বলেছ! কিশোরের মতই চেঁচিয়ে উঠল রবিন।
রিমলেস গ্লাসের ওপাশে সরু হল প্রফেসরের চোখ। মাই গড, কিশোর, ঠিকই বলেছ তুমি! খোঁজ, খোঁজ সবাই। গাছের চারপাশে কোন জায়গা বাদ দেবে না। গুপ্তধন এখানে থাকতে পারে।
আমি বাঁয়ে দেখছি, এড বলল।
আমি ডানে, বলল রবিন।
কিশোর, তুমি গাছে ওঠ, প্রফেসর বললেন। আমি গোড়ায় দেখছি।
অদ্ভুত গাছটার কাছে এগিয়ে গেল সবাই, একা দাঁড়িয়ে আছে মুসা। একবার ডানে তাকাচ্ছে, একবার বাঁয়ে। তারপর ঘাড় ফেরাল পেছনে। এই, শোন, আস্তে বলল সে।
তার কথা বোধহয় কারও কানে, গেল না।
এই, শুনছ, আবার বলল সে। ওখানে পাওয়া যাবে না।
থমকে গেল কিশোর। কি বললে?
মাথা নাড়ল মুসা। ওই গাছটাকে চিহ্ন বানায়নি বাওরাড।
কি বলছ? ফিরে তাকালেন প্রফেসর। কেন...

ওই যে, হাত তুলে দেখাল মুসা। কিছুটা ডানে ঢালের গায়ে আরেকটা গাছ। ওটাকে তো আরও বড় ভূত মনে হচ্ছে আমার কাছে।
আর ওই যে, পেছনে আরেকটা গাছ দেখাল সে। ওটা ভূতের দাদা।
জোরে বাতাস বইছে। দ্রুত উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে কুয়াশা। একটা পাথর সরানোর জন্যে ঝুঁকেছিলেন প্রফেসর, গুঙিয়ে উঠে সোজা হলেন। হায় হায়, সবগুলোকেই তো ভূতের মত দেখাচ্ছে!
হ্যাঁ, মুসা ঠিকই বলেছে, বিষণ্ন কণ্ঠে বলল কিশোর। এখানে কিছু পাব না। এগুলো ভূত-গাছ, কোনটাকে চিহ্ন ধরব? এরকম অনেক সাইপ্রেস আছে দ্বীপে। কুয়াশার মধ্যে বিশেষ অ্যাঙ্গেলে দাঁড়িয়ে দেখলে অসংখ্য ভূত দেখা যাবে।
আমরা হেরে গেলাম, বয়েজ, নিরাশায় জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাতে লাগলেন প্রফেসর।
যদি এই দ্বীপে গুপ্তধন, লুকানো থাকে, আশা ছাড়তে পারছে না, কিশোর। পাওয়ার আশা নেই। কিন্তু…
বাধা পড়ল কথায়। হঠাৎ গড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে ছোট বড় অনেক পাথর। ঝট করে ওপরে তাকাল সে। কুয়াশাকে ঝেটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বাতাস, অনেক দূরে দৃষ্টি চলে এখন। চূড়ার কাছে আরেকটা ভূতকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল।
আরেকটা সাইপ্রেস, হেসে উঠল এড।
কিন্তু, নিচের ঠোঁটে টান দিয়ে ছেড়ে দিল কিশোর। সাইপ্রেস পাথর ফেলতে পারে না।
গাছ না, গাছ না! চিৎকার করে উঠলেন প্রফেসর। মানুষ! এই এই, থাম! থাম!
থামল না লোকটা। হারিয়ে গেল চূড়ার ওপাশে। ছুটন্ত পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে।
জলদি এস, ব্যাটাকে ধরতে হবে, বলেই দৌড় দিলেন প্রফেসর।
তার পেছনে ঢাল বেয়ে ছুটল ছেলেরা। চূড়ায় উঠে দেখলেন, দূরে দৌড়ে চলে যাচ্ছে মূর্তিটা, ডানে, খড়ির পাশ কাটিয়ে যাওয়ার মতলব।
নিশ্চয় বোট এনেছে, হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন প্রফেসর। ধরতেই হবে।
সরাসরি গেলে পথ কিছুটা কম হয়, সোজা খাড়ির দিকে ছুটলেন তিনি। তাকে পাশ কাটাল মুসা, পেছনে এড। সবার আগে ঘড়ির কাছে পৌঁছল ওরা দুজন। কিন্তু লোকটাকে দেখা গেল না।
ওই যে, মুসা আর এডের পেছনে উঁচু জায়গায় থেকে বলল কিশোর। বায়ে। বায়ে।
ঘাঁড়ির উত্তরে একটা টিলার ওপাশে হারিয়ে যাচ্ছে মূর্তিটা। ছুটল মুসা আর এড। রবিন গেল। তার পেছনে প্রফেসর। সবার শেষে হাঁপাতে হাঁপাতে চলেছে কিশোর।
টিলার কাছে আগে পৌঁছল রবিন আর প্রফেসর। তাদের পর পরই মুসা আর এড়। টিলার নিচে ছোট্ট, সরু এক টুকরো সৈকত। সেট ধরে দৌড়ে গিয়ে

মোটরবোটে উঠল লোকটা। ইঞ্জিন স্টার্ট দিল। সরে যেতে শুরু করল বোট। ফিরে তাকাল একবার সে।
সেই লোকটা! রবিন বলল। সবুজ ফোক্সওয়াগেনে করে এসেছিল।
কালো চুল, কালো গোফওয়ালা হালকা-পাতলা লোকটার দিকে চেয়ে আছেন প্রফেসর। চিনি ওকে! ওর নাম নোবল। এই, এই থাম।
কে শোনে কথা। গতি আরও বাড়িয়ে দ্বীপের কাছ থেকে সরে যেতে লাগল -কোর্ট।
শয়তান! গর্জে উঠলেন প্রফেসর। চল, চল, আমার বোটে। আবার খাড়ির কাছে দৌড়ে চলল ওরা।
বোটের বাঁধন খুলে দিল মুসা। ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে ফেললেন ততক্ষণে প্রফেসর। খোলা সাগরের দিকে ছুটুল বোট। মোটরবোর্টটা কয়েক শো গৃজ সামনে।
ফুল স্পীড, মুসা! ধর ব্যাটাকে! প্রফেসর তাগাদা দিলেন। মোটরবোটের দিকে চেয়ে মুঠো ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললেন, ব্যাটা চোর! আসছি, দাঁড়া!
ও কে, স্যার? কিশোর জিজ্ঞেস করল।
আমার অ্যাসিসটেন্ট ছিল, খুব রেগেছেন প্রফেসর। রুক্সটন ইউনিভারসিটির গ্র্যাজুয়েট। অভাবে পড়ে এসে কাজ চাইল আমার কাছে, কাজ দিলাম। আমার ওখানেই চুরি শুরু করল। মিউজিয়মের দামি দামি জিনিস চুরি করে বিক্রি করে দিতে লাগল। অনেক বোঝালাম, শুনল না। শেষে চোরাই মালসহ ধরা পড়ে গেল জেলে।
অনেক এগিয়ে গেছে মোটরবোট, প্রায় আধ মাইল।
ধরা যাবে না, স্যার, মুসা বলল। ওটার স্পীড অনেক বেশি।
জ্বলন্ত চোখে ক্রমশ-দূরে-সরে-যাওয়া বোটটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। প্রফেসর। কিশোর, টিক বানাউ কিভাবে এত কথা জানল, এবার বোঝা যাচ্ছে। এখন মনে পড়ছে আমার, লিটল মারমেইড আর বাওরাড ডাইয়ের ব্যাপারে খুব আগ্রহী ছিল নোবল। নিশ্চয় বানাউয়ের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। জেলে গেলে কি হবে, চোর আর শোধরায় না!
নোবলই মনে হয় কাল রাতে জার্নালের ফটো তুলে এনেছে, রবিন বলল।
হ্যাঁ, মাথা ঝাঁকাল কিশোর। ওটা পড়েই দ্বীপের কথা জেনেছে। তবে পায়নি কিছু। পেলে, ওভাবে পাহাড়ের ওপরে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে চেয়ে থাকত না। নিয়ে চলে যেত।
আমাদের মতই ব্যর্থ।
নীরব হয়ে গেল সবাই। বাকি পথে গুপ্তধন নিয়ে আর একটা কথাও হল না। বন্দরে ভিড়ল, বোট। নোবলের মোটরবোট কিংবা সবুজ ফোক্সওয়াগেনের

ছায়াও দেখা গেল না কোথাও।
পুলিশকে রিপোর্ট করব, রাগ যায়নি এখনও প্রফেসরের। কাল রাতে তোমাদের অফিসে ঢুকেছিল, একথাও জানাব।
ওকে তো তখন দেখিনি, স্যার, বলল কিশোর।
কিন্তু ওকে সন্দেহ তো করছ। পুলিশকে অন্তত জানিয়ে রাখা দরকার।
কি একখান দিন গেল! কপাল ডলল মুসা। না পেলাম গুপ্তধন, না পারলাম চোর ধরতে।
আস্তে মাথা নাড়লেন প্রফেসর। হবে না, বুঝেছ, আশা করতে পারছি না আর। অনেক দেরি হয়ে গেছে…প্রায় একশো বছর, অনেক সময়।
একেবারেই এগোইনি বলা যাবে না,হাল ছাড়তে রাজি নয় কিশোর ধীর হয়ে যাচ্ছে আর কি।
ঠিক, তাড়াতাড়ি বলল এড। ভয়, পাছে না আবার গুপ্তধন খোঁজার উৎসাহ হারিয়ে ফেলে সবাই। দ্বিতীয় জার্নালটা তো রয়েছেই। আরও ভালমত পড়ে দেখতে হবে।
আমি আর যেতে পারছি না তোমাদের সঙ্গে। চেহারাই বলে দিল মন খারাপ হয়ে গেছে প্রফেসরের। কাজের অনেক ক্ষতি করেছি এমনিতেই। যা করার তোমরাই কর। খবর শোনার জন্যে অধীর হয়ে থাকব আমি।
স্টেশন ওয়াগন চালিয়ে চলে গেলেন প্রফেসর।
তিন গোয়েন্দার দিকে তাকাল এড। সে কিছু বলার আগেই মুসা বলল, কিশোর, তদন্ত চালিয়েই যাব আমরা, না?
আপাতত লাঞ্চটা সেরে নেয়া দরকার, মুখ গোমড়া করে রেখেছে কিশোর। আরও ভাবতে হবে। ফ্যান্টম লেকে গিয়ে ঠিক করব এরপর কি করা যায়।
যার যার বাড়িতে লাঞ্চ সারল ওরা। তারপর স্যালভিজ ইয়ার্ডে মিলিত হল তিন গোয়েন্দা। ট্রাক বের করে অপেক্ষা করছিল কিশোর আর বোরিস, মুসা আর রবিন এলে রওনা হল।
ডাই লজ-এর সিঁড়িতে ওদের অপেক্ষায়ই দাঁড়িয়েছিল এড, ট্রাকটা দেখে দৌড়ে এল। তার মা কোথায় জিজ্ঞেস করল কিশোর।
বাড়ির পেছনে কাঠ আর পাথরে তৈরি একটা ছাউনিতে ওদেরকে নিয়ে এল এড। লাল রঙ করা কাঠের টবে তখন একটা হিবিসকাসের বড় চারা লাগাচ্ছেন মিসেস ডাই।
ম্যাডাম, কোনরকম ভূমিকা করল না কিশোর। আমরা ভেবেছি, নৌকা বোঝাই করে মাল নিয়ে গেছেন বাওরাড। বাড়িতে গিয়ে জার্নালটা আবার পড়লাম। এখন

আমার বিশ্বাস, নেননি, আসলে দ্বীপ থেকে কিছু এনেছেন। ওখান থেকে আনা হয়েছে, এমন কোন জিনিসের কথা জানেন আপনি?
হাসলেন মহিলা। আমি কি করে জানব, কিশোর?
এই জবাবই আশা করেছিল কিশোর। ভাল করে ভেবে দেখুন। ইতিমধ্যে বাওরাডের মেসেজগুলো নিয়ে আরেকবার আলোচনা করে দেখি। পাতলা জার্নালটা খুলল সে। এই যে, একুশে নভেম্বর লেখা রয়েছে...ও হ্যাঁ, একটা ভুল করে ফেলেছিলাম আমরা। বাওরাড বলেছেন তাঁর দিনগুলো কিভাবে তৈরি করেছেন, পড়ার জন্যে, একটা বা কয়েকটা দিন নয়, সমস্ত দিন পড়ে তারপর মেসেজের মানে উদ্ধার করতে বলেছেন। তাহলে দেখা যাক, আর কোথায় কি রয়েছে। জরুরি পৃষ্ঠাগুলো শুধু পড়ব। একুশে নভেম্বরঃ ড্যানিয়েল ব্রাদার্সরা খবর পাঠিয়েছে, আমার অর্ডার তৈরি। বড় ওয়াগনটা দরকার আমার।...তার পরদিন লিখেছেনঃ অর্ডার নিয়ে রকি বীচ থেকে ফিরে এলাম। চমৎকার কাজ দেখিয়েছে ওরা। প্রতিটি পিস একেবারে মাপমত। এই দেশে এরকম জিনিস বানাতে পারবে কেউ আশা করিনি। মুখ তুলল কিশোর। বাইশে নভেম্বর তেমন কিছু নেই। তেইশে নভেম্বরঃ এলাকায় দুজন নতুন মুখকে ঘোরাঘুরি করতে দেখলাম। নাবিক ... একেবারে আটাশে নভেম্বর গিয়ে আবার জরুরি কথা আছেঃ ওরা চলে গেছে। ক্যাপ্টেনের কাছে রিপোর্ট করতেই গেল বোধহয়।
চোখ রাখা হয়েছে যে তখনই নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন, বলল রবিন।
মাথা ঝাঁকাল কিশোর। তখনকার তাঁর মনের অবস্থা আন্দাজ করতে পার? ছেলে নেই, বউ নেই, বিদেশ-বিভুঁইয়ে একা একজন মানুষ, শত্রু ঘোরাফেরা করছে... নিশ্চয় তখনই তাড়াহুড়ো করে কাজ শেষ করার কথা ভাবেন।
আর কি লিখেছে? এড জিজ্ঞেস করল।
ডিসেম্বরের পাঁচ তারিখে লিখেছেনঃ নোরিয়ার চমকে শেষ ছোঁয়া দিতে সান্তা বারবারায় গেলাম। ভাল জিনিস পেয়েছি, সস্তায়, কারণ প্রতিষ্ঠানে আগুন লেগেছিল। ওয়ান ম্যানস ট্র্যাজেডি ইজ অফেন অ্যানাদারম্যানস ফরচুন! জার্নাল বন্ধ করল কিশোর। কাল রাতে ড্যানিয়েল ব্রাদার্স-এর ব্যাপারে খোঁজ নিয়েছিলাম। রকি বীচে ইট সিমেন্টের কারবার করে। নিশ্চয় অনেক ইট কিংবা পাথর কিনেছিলেন বাওরাড। ড্যানিয়েল বিল্ডিং সাপ্লাই কোম্পানি এখনও আছে, নাতিপুতিরা কোম্পানি চালাচ্ছে। গেলে পুরানো রেকর্ড পাওয়াও যেতে পারে।
তাহলে যাচ্ছি না কেন? প্রায় চেঁচিয়ে উঠল এড।
যাব। সান্তা বারবারায়ও যেতে হবে। নোবল জার্নালের ফটো তুলে নিয়ে গেছে, সে-ও যেতে পারে ওসব জায়গায়। জলদি করতে হবে আমাদের। রবিন আর মুসা

ড্যানিয়েল কোম্পানিতে চলে যাক। আমি আর তুমি যাব সান্তা বারবারায়, বোরিস ট্রাকে করে নিয়ে যাবে আমাদের। আপনার কোন আপত্তি
আছে, মিসেস ডাই?
না, আমার আপত্তি কি? তবে একটা কাজ করে দিয়ে যাও। এই টবটা বেজায় ভারি, হিবিসকাসের টব দেখালেন মিসেস ডাই। এটা বাইরে বের করে, দিয়ে যাও। নইলে আবার ডিনোকে ডাকতে হবে, আমি একা পারব না।
সিঁড়ির একপাশে নিয়ে গিয়ে টবটা সবে বসিয়েছে ওরা, এই সময় শোনা গেল ইঞ্জিনের শব্দ। দ্রুত আসছে। প্রফেসর কেইনের স্টেশন ওয়াগন।
গাড়ি থেকে নেমে প্রায় ছুটে এলেন প্রফেসর। তোমাদের সাবধান করতে এসেছি, বয়েজ! পুলিশকে জানিয়েছিলাম। খোঁজ নিয়েছেন ইয়ান ফ্লেচার। শাস্তির মেয়াদ শেষ হয়নি নোবলের, প্যারোলে মুক্তি দেয়া হয়েছে। ডেঞ্জারাস লোক। কোন ঝুঁকি নিতে দ্বিধা করবে না সে। বুঝেছ আমার কথা?
কত দিন আগে ছাড়া পেয়েছ? কিশোর জিজ্ঞেস করল।
ছয় মাস।
ছয় মাস আগে থেকেই ডাই লজে চোর ঢুকতে আরম্ভ করেছে, না? মুসা বলে উঠল।
হ্যাঁ, মুসা, নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। ভাবছি...। হঠাৎ বড় বড় হয়ে গেল চোখ। নাক কুঁচকে বাতাস শুকছে। এই, গন্ধ পাচ্ছ?
তাই তো! মুসা বলল। ধোঁয়া। পুড়ছে কিছু।
বাড়ির পেছন থেকে! চেঁচিয়ে উঠল এড।
দৌড় দিল সবাই।
দেখল, ছাউনি থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে।
সঙ্গে সঙ্গে পকেটে খুঁজতে শুরু করল কিশোর। পেল না। প্রায় আতঙ্কিত হয়ে চিৎকার করে উঠল, হায়, হায়! জার্নালটা! টব তোলার সময় হাত থেকে রেখেছিলাম, আর আনতে মনে নেই!
পাথরের ছাউনি, পুড়বে না, শুধু কাঠগুলো ছাড়া। ভেতরে ঘন ধোঁয়া।
ফায়ার এক্সটিংগুইশারের জন্যে দৌড় দিল এড। জ্যাকেট খুলে তৈরি রইল রবিন আর মুসা। এড ফিরতেই তার সঙ্গে সাবধানে ঢুকল ভেতরে।
আলগা কাঠ রাখা ছিল, বলল এড। ওগুলোতে লেগেছে।
বাইরে দাঁড়িয়ে কিশোর, প্রফেসর আর মিসেস ডাই শুনছেন এক্সটিংগুইশারের শব্দ। জ্যাকেট দিয়ে জোরে জোরে বাড়ি মারা হচ্ছে আগুনের ওপর। কিছুক্ষণ পর ধোঁয়া পাতলা হয়ে এল। বেরিয়ে এল মুসা, মুখে বিজয়ীর হাসি। হাতে জার্নাল। জানাল, আর সামান্য দেরি হলেই যেত পুড়ে।

হাতে নিয়ে তাড়াতাড়ি পাতাগুলো উল্টে দেখল কিশোর, ঠিক আছে কিনা।
কাকে যেন দৌড়ে আসতে শের্মি গেল। ডিনো। চেঁচাচ্ছে, আর হাত তুলে দেখাচ্ছে ছাউনির পেছনটা। ওদিকে, ওদিকে…ব্যাটাকে দেখেছি আমি। এদিকেই তাকিয়ে ছিল…এই এক মিনিট আগে।
যাবে, ধরা যাবে! চেঁচিয়ে উঠলেন প্রফেসর।
চোরের পেছনে ছুটল ওরা। দৌড় দিল গাছপালার ভেতর দিয়ে। ডিনো আগে আগে। নিশ্চয় বড় রাস্তার দিকে গেছে।
বনের ভেতর একেকজন একেক দিকে ছড়িয়ে পড়ল ওরা। প্রফেসর গেলেন ডানে, ডিনো গেল সামনের দিকে। রবিন আর কিশোর সবার পেছনে। থেমে ঝোপঝাড়ে চোখ বোলাচ্ছে। ধূসর-সবুজ ঘন ওকের আড়ালে কেউ লুকিয়ে আছে কিনা দেখছে।
হঠাৎ নীরব হয়ে গেছে সব, যেন সবাই দাঁড়িয়ে কান পেতে শব্দ শোনার চেষ্টায় রত। সামনে বিড়বিড় করে গাল দিল একজন। আবার এগোল রবিন আর কিশোর, সতর্ক। গাছের আড়ালে আড়ালে চলে এল পঞ্চাশ গজ মত। মট করে কি যেন ভাঙল।
ঝট করে ঘুরল কিশোর। চিৎকার শোনা গেল ডানে। কে যেন এসে লাফিয়ে পড়ল তার ওপর। জাপটে ধরে তাকে নিয়ে পড়ল মাটিতে। – ধরেছি! ধরেছি! ব্যাটাকে ধরেছি! চেঁচাতে লাগল মুসা।
আরে এই মুসা, তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল রবিন। এই। কিশোরকে ধরেছ তো।
কী? ভাল করে তাকাল মুসা। খাইছে। আমি…. ভেবেছিলাম…শুনলাম…
সর, সর, মুসাকে ঠেলে সরিয়ে উঠল কিশোর। কাপড়ের ময়লা ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, কানা নাকি? দেখে লাফ দাওনি?
শব্দ শুনলাম। আর দেখে কে?
অমনি চোরের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়লে, হাসতে শুরু করল রবিন।
প্রফেসর, ডিনো আর এড ফিরে এসে দেখল তিনজনেই হাসছে। রিমলেস গ্লাসের ওপাশে রাগে জ্বলছে প্রফেসরের চোখ। গোল লাল মুখ আরও লাল হয়ে উঠেছে।
পালাল হারামজাদা, দাঁতে দাঁত চাপল ডিনো। টিক বানাউ ছাড়া কেউ না।
দেখলে নোবলকে দেখেছেন, প্রফেসর বললেন।
কি করে এত শিওর হচ্ছেন? নোবলকে নয়, বানাউকেই দেখেছি আমি। দাড়ি দেখলাম মনে হল…।
দাড়ি না। বোধহয় গোঁফ দেখেছেন। কালো গোঁফকে অনেক সময়…
বলে কি? গোঁফকে দাড়ি? আপনার…

মাথা খারাপ, না? রেগে উঠতে গিয়েও উঠলেন না প্রফেসর। ছেলেদেরকে অবাক করে দিয়ে নতি স্বীকার করে নিলেন। বেশ, দেখিনি যখন, জোর করে কিছু বলল না। আপনি সত্যিই লোকটাকে দেখেছেন তো?
নিশ্চয়ই। তবে চেহারাটা দেখিনি।
তাহলে, তাড়াতাড়ি বলল কিশোর। দেরি করা যায় না আর। টিক বানাউ হয়ে থাকলে, বোঝা যাচ্ছে জার্নালটা আর তার দরকার নেই। যা জানার জেনে নিয়েছে। চলুন, চলুন।
বন থেকে বেরিয়ে এল ওরা। উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করছেন মিসেস ডাই। বোরিস রয়েছে তাঁর সঙ্গে। হৈ চৈ শুনে ট্রাক ফেলে দেখতে এসেছে কি হয়েছে।
পালিয়েছে শয়তানটা, ডিনো বলল। ইস, আর একটা মিনিট আগে বেরোলেই…, কথা শেষ না করে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরল সে।
আপনি ঘরে ছিলেন, মিস্টার হ্যাংবার? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
হ্যাঁ। ধোঁয়ার গন্ধ পেয়ে বেরিয়েছি।
পুলিশকে জানানো দরকার, বললেন প্রফেসর। কাজ পড়ে আছে ওদিকে। তবু, যাবার সময় থানায় ঢু মেরে যেতে পারব।
তা-ই করবেন, ডিনো বলল। ছেলেদের দিকে তাকাল। তোমাদের ধারণাই ঠিক। আমিই ভুল করেছি। গুপ্তধন হয়ত আছে। জোরে জোরে মাথা নাড়ল সে। না থাকলেও কয়েকটা শয়তান লোক অন্তত বিশ্বাস করে বসেছে যে আছে। তোমরা আর এসবে নাক গলিয়ো না। যা করার পুলিশই করবে। তোমরা করতে গিয়ে বিপদে পড়বে খামোকা।
আমিও তাই বলি, বয়েজ, ডিনোর সঙ্গে একমত হলেন প্রফেসর।
হয়ত…, শুরু করেও বাধা পেয়ে থেমে গেলেন মিসেস ডাই।
কিছুই হবে না, ম্যাডাম, কিশোর বলল। টিক ভাবছে, যা পাওয়ার পেয়ে গেছে। আমাদের কিছু করতে আসবে না সে। আর দ্বীপ থেকে আমাদের তাড়া খেয়ে পালিয়েছে নোবল। কিছু করার ইচ্ছে থাকলে তখনই করতে পারত। আমাদের এখন প্রধান কাজ তাড়াতাড়ি গুপ্তধন খুঁজে বের করা। নইলে নিয়ে চলে যাবে ওরা।
আত্মবিশ্বাস থাকা ভাল, খোকা, ডিনো পছন্দ করতে পারছে না কিশোরের কথা। তবে বেশি থাকা ভাল না। বিপদ বাড়ে তাতে।
আমার তা মনে হয় না, দৃঢ়কণ্ঠে বলল কিশোর।
আমারও, বললেন মিসেস ডাই। তাছাড়া ওরা কচি খোকা নয়। নিজেদের, ভাল-মন্দ বোঝার বয়স হয়েছে।

প্রফেসর হাসলেন। আমারও তাই বিশ্বাস। ইতিমধ্যেই যথেষ্ট বুদ্ধি আর সাহসের পরিচয় দিয়েছে ওরা।... আমি এখন যাই। নতুন কিছু জানলে আমাকে জানিও। চলি। গুড বাই।
চলে গেলেন প্রফেসর।
যাও, গিয়ে সময় নষ্ট করে আস সবাই। আমি এসবে নেই। দেখি গিয়ে, আগুনে কি ক্ষতি করল। ছাউনিতে ঢুকল ডিনো।
ট্রাক থেকে সাইকেল নামিয়ে রওনা হয়ে গেল রবিন আর মুসা।
কিশোর আর এড ট্রাকে উঠল। চলল উত্তরে, সান্তা বারবারায়।
আরও তাড়াতাড়ি, বোরিসভাই, তাগাদা দিল কিশোর।
ভেব না, তাড়াতাড়িই পৌঁছুব। আরও বেশি তাড়াতাড়ি করতে গেলে হয়ত পৌঁছুঁতেই পারব না কোনদিন, অ্যাক্সিডেন্ট করে মরব।
নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে আবার সিটে হেলান দিল কিশোর।
বাওরাড ডাইয়ের দ্বিতীয় জার্নালটা পড়তে পড়তে মুখ তুলল এড। কিশোর, বাওরাড কোথায় গিয়েছিল, লেখা নেই। কি করে জানছি? সান্তা বারবারা ছোট না।
বোরিস হাসল। হ্যাঁ, বড় শহর।
বড় হওয়াতেই তো ভাল, বলল কিশোর। পুরানো শহর, বেশি পুরানো রেকর্ড থাকবে। একটা সূত্র রেখে গেছেন বাওরাড ডাই, সেটার সাহায্যেই খুঁজে বের করব।
সূত্র? ভুরু কেঁচকাল এড।
একটা দোকান থেকে কিছু কিনেছিল, যেটা আগুনে পুড়ে গেছে। আঠারশো ছিয়ানব্বই সালে এখনকার মত ছিল না সান্তা বারবারা, অনেক ছোট ছিল। অগ্নিকাণ্ডে দোকান পুড়ে যাওয়ার মত খবর না ছাপার কথা নয়।
বিকেলের মাঝামাঝি সান্তা বারবারার উপকণ্ঠে পৌঁছল ওরা। খবর সংগ্রহের জন্যে দ্য লা গুয়েরা প্রাজায় অবস্থিত সান-প্রেস পত্রিকার অফিসটা খুঁজে বের করল বোরিস, কিশোরের নির্দেশে। দোতলায় উঠে জনৈক মিস্টার বুল-এর সঙ্গে দেখা করার অনুরোধ জানাল রিসিপশনিস্ট। সম্পাদকের নাম বুল বটে, কিন্তু গায়েগতরে ষাঁড়ের মত নন মোটেও। ছোটখাটো একজন মানুষ, হাসিখুশি।
আঠারশো ছিয়ানব্বই? কিশোরের চাহিদা শুনে বললেন। না, আমরা তখন ছিলাম না। লোকাল একটা পত্রিকা ছিল অবশ্য। তুমি ঠিকই বলেছ, ইয়াং ম্যান, বড় রকমের একটা অগ্নিকাণ্ড ঘটেছিল ওই সময়।
রেকর্ডগুলো, স্যার, আছে আপনাদের মর্গে?

ছিল। যা পেয়েছিলাম সব এনে ফাইল করেছিলাম। কিন্তু নানারকম দুর্ঘটনায়—এই ভূমিকম্পে আর আগুনে-উনিশশোর আগের সব রেকর্ড নষ্ট হয়ে গেছে।
গুঙিয়ে উঠল কিশোর। সব রেকর্ড, স্যার?
হ্যাঁ, সরি, বলে ভাবলেন এক মুহূর্ত। তবে, আরেক জায়গায় চেষ্টা করে দেখতে পার। একজন লেখককে চিনি, ষাট বছর আগে ওই পত্রিকায় ফিচার লিখত। তার ব্যক্তিগত একটা মর্গ আছে, পুরানো খবরের কাগজ আর কাগজের অনেক কাটিং সংগ্রহে আছে। হবি। তার কাছে গিয়ে দেখতে পার।
সান্তা বারবারায় থাকেন? হাতে যেন চাঁদ পেল কিশোর।
হ্যাঁ। ছোট একটা অ্যাড্রেস ফাইল বের করলেন সম্পাদক। নাম আলফ্রেড পেরিংটন। থাকে এগারশো অ্যানাক্যাপা স্ট্রীটে। যাও, লোক ভাল। পারলে অবশ্যই সাহায্য করবেন।
লম্বা পথের মাথায় ছোট্ট একটা অ্যাড়াব হাউস, ১১০০ নম্বর, বড় একটা বাড়ির পেছনে। ট্রাকে বসে রইল বোরিস। কিশোর আর এড নেমে এগোল বাড়িটার দিকে।
হঠাৎ থমকে দাঁড়াল কিশোর। দড়াম করে দরজা লাগার আওয়াজ, তার পর পরই ছুটন্ত পদশব্দ।
কিশোর, দেখ, দেখ!
হাঁ হয়ে খুলে আছে অ্যাড়াবের দরজা। ভেতর থেকে চিৎকার শোনা গেল। এই! কে আছ? এই!
বিপদে পড়েছে, বলেই দৌড় দিল কিশোর।
চিৎকারটা বোরিসেরও কানে গেছে। লাফ দিয়ে ট্রাক থেকে নেমে দৌড়ে এল।
খোলা দরজা দিয়ে ছোট একটা লিভিংরুমে ঢুকল ওরা। বই আর ফ্রেমে বাঁধাই খবরের কাগজের সামনের পাতা সুন্দর করে সাজানো।
এই, কে? বায়ের ঘর থেকে এল চিৎকার।
ঢুকে দেখা গেল, ওটা স্টাডি। গাদা গাদা পুরানো খবরের কাগজ আর ম্যাগাজিন। ডেস্কের ওপর একটা টাইপরাইটার। পাশের বাক্সে রাখা টাইপ করা কিছু পাতা। বই লেখা চলছে বোধহয়।
মেঝেতে পড়ে আছেন এক বৃদ্ধ। মুখের কাটা থেকে রক্ত পড়ছে। ছেলেদের দিকে তাকালেন।
মাই গড! বলে তাড়াতাড়ি গিয়ে বৃদ্ধকে তুলল বোরিস। একটা ইজি-চেয়ারে শুইয়ে দিল।
এক গেলাস পানি এনে দিল এড। ঢকঢক করে সবটা পানি খেয়ে ফেললেন বৃদ্ধ। দাড়িওয়ালা এক লোক! মৃদু হাঁপাচ্ছেন তিনি। গালে কাটা দাগ, নাবিকের

জ্যাকেট… তা, তোমরা কে?
টিক বানাউ! চিৎকার করে উঠল এড়।
পরিচয় দিয়ে কিশোর বলল, মিস্টার বুল পাঠিয়েছেন, স্যার। সানপ্রেসের সম্পাদক। আপনিই তো মিস্টার আলফ্রেড পেরিংটন?
হ্যাঁ, মাথা ঝোঁকালেন বৃদ্ধ। টিক বানাউ? সে-ই হামলা করেছিল?
চেহারার বর্ণনায় তো তাই মনে হয়। কি চেয়েছিল আপনার কাছে?
লম্বা দম নিলেন পেরিংটন। তাঁর কাটা মুছে দিয়ে বোরিস জানাল, ক্ষত সামান্য।
জোর করে ঢুকে পড়ল, বৃদ্ধ বললেন। আঠারশো ছিয়ানব্বইর নভেম্বরে একটা অগ্নিকাণ্ডের কথা জানতে চাইল।
গুপ্তধন খুঁজছে ব্যাটা, রেগে গিয়ে বলল এড। লিটল মারমেইডের গুপ্তধন।
আছে নাকি?
কিছু জানেন মনে হচ্ছে?
মাথা ঝাঁকালেন পেরিংটন। অনেক গবেষণা করেছি ওটার ব্যাপারে। ওই সময়কার প্রচুর কাটিং আছে আমার মর্গে।
বানাউকে বলে দিয়েছেন, স্যার? শঙ্কিত হয়ে উঠেছে কিশোর।
কিচ্ছু বলিনি। লোকটাকে দেখেই বুঝেছি, খারাপ। বলিনি বলেই তো মারল, তারপর গিয়ে ফাইল ঘাটতে লাগল। পেয়ে গেছে মনে হয়। নিয়ে বেরিয়ে গেছে। কাটিং।
কাঁধ ঝুলে পড়ল কিশোরের। নিয়ে গেছে! কি লেখা ছিল? জরুরি কিছু?
জানি না। তবে চেষ্টা করলে হয়ত বলতে পারব।
করবেন, স্যার? এড মিনতি করল, করুন না, স্যার, প্লীজ।
আমার সমস্ত ফাইল মাইক্রোফিল্ম করে রেখেছি। দেখি, ওই বাক্সটা আন তো।
ডেস্কের ওপর থেকে লম্বা, সরু একটা বাক্স এনে দিল এড। ভেতর থেকে মাইক্রোফিল্মের একটা ছোট বাক্স বের করলেন লেখক। এই যে, আঠারশো ছিয়ানব্বই। নাও, ওই রিডিং মেশিনে লাগাও।
ভিউয়ারে চোখ রেখে পড়তে আরম্ভ করল কিশোর। ছিয়ানব্বইর সেপ্টেম্বর থেকে শুরু। এই যে! হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল গোয়েন্দাপ্রধান। নভেম্বর, পনের। ডাইক অ্যাণ্ড সনস, শিপ শ্যাওলারস। আগুনে ওদের স্টোর হাউস পুড়ে গিয়েছিল। নিশ্চয় এটাই।
শিপ শ্যাণ্ডলার কি? জিজ্ঞেস করল এড।
জাহাজের খাবার আর দরকারি জিনিসপত্র সরবরাহ করে যারা।
ডাইক অ্যাণ্ড সনস? পেরিংটন বললেন। এখনও ব্যবসা করে ওরা। বন্দরে গিয়ে খোঁজ করলেই অফিস পেয়ে যাবে।

জলদি চল তাহলে, কিশোরকে বলল এড।
আগে ডাক্তার ডাকা দরকার, বোরিস বলল।
মাথা নাড়লেন বৃদ্ধ। না না, লাগবে না, আমি ভালই আছি। ডাক্তার ডেকে নিতে পারব। তোমরা গিয়ে দাড়িওয়ালা লোকটাকে ধর। ওকে ধরতে পারলেই আমি সুস্থ হয়ে যাব। যাও, জলদি যাও।
এক মুহূর্ত দ্বিধা করল কিশোর। তারপর মিস্টার পেরিংটনের দিকে চেয়ে হেসে, মাথা নেড়ে দরজার দিকে পা বাড়াল।
সহজেই খুঁজে পেল ওরা, ডাইক অ্যাণ্ড সনসের অফিস। বন্দরের একটা সরু গলিতে, পানির ধারেই। স্বাগত জানালেন এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক, এস এস, কি চাই?
আঠারশো ছিয়ানব্বই সালের রেকর্ড আছে আপনাদের? জানার জন্যে তর। সইছে না এডের। ব্যবসার খতিয়ান? জার্নাল, কিংবা ডায়েরী?
কিশোর বলল, আমার...।
ওই দাড়িওয়ালা শয়তানটার অ্যাসিসটেন্ট নাকি? নিমেষে হাসি হাসি মুখটা কঠোর হয়ে গেছে ভদ্রলোকের। যেতে পার।
না, না, স্যার, হাত নাড়ল কিশোর। পরিচয় দিল। সংক্ষেপে জানাল কি জন্যে এসেছে।
বাওরাড ডাই? আফসোস করে বললেন ভদ্রলোক, পুরানো রেকর্ড নষ্ট হয়ে গেছে ভূমিকম্পে। দাড়িওলাকেও একথাই বলেছি।
দমে গেল কিশোর। রেকর্ড নেই! তাহলে বাওরাড ডাই কি কিনেছিলেন, কোনদিনই জানা যাবে না?
না... আচ্ছা, দাঁড়াও তো দেখি...।
প্রাইভেট লেখা একটা দরজা ঠেলে ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন দ্রলোক।
অস্থির ভাবে অপেক্ষা করছে ছেলেরা। হঠাৎ হাত তুলল এড, কিশোর?
তাড়াতাড়ি জানালার কাছে এগিয়ে গেল কিশোর, এডের পাশে। কী?
স্টোরের ওপর চোখ রাখছে মনে হয়?
কোথায়?
ওই যে, রাস্তার শেষ মাথায়। আরি, চলে গেল, একটা বিল্ডিঙের আড়ালে। আমরা যে দেখেছি বোধহয় বুঝে ফেলেছে। টিক বানাউ না তো?
ফিরে তাকাল কিশোর। ভদ্রলোক এখনও ফেরেননি। জাহাজের একটা পুরানো ঘড়ি দেখছে মন দিয়ে বোরিস। ইশারায় এডকে আসতে বলে দরজার দিকে পা বাড়াল কিশোর।
জাহাজ ঘাটের দিকে এগিয়ে চলল দুজনে। বাড়িঘরের আড়ালে আড়ালে থাকছে যতটা সম্ভব। একটা বাড়ির কোণে এসে থমকে গেল এড। কিশোর। সবুজ

ফোক্সওয়াগেন।
চওড়া রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আছে ছোট গাড়িটা। তার ওপাশে, গোঁফওয়ালা এক তরুণ তাড়াহুড়ো করে এগিয়ে যাচ্ছে একটা কাঠের বার্জের দিকে।
টিক বানাউ নয়, ফিসফিস করে বলল কিশোর। নোবল।
পানির কিনারে ভেজা বালি। বার্জের অর্ধেকটা বালিতে বসে গেছে, বাকি অর্ধেক পানিতে। অচল। ওটার অন্যপাশে হারিয়ে গেল তরুণ।
কারও সাথে দেখা করতে গেছে, অনুমান করল কিশোর।
টিক বানাউ?
চল, দেখি।
রাস্তা পেরিয়ে, সাবধানে বার্জের দিকে এগোল ওরা। কাছে এসে দাঁড়িয়ে গেল। কান পাতল, ওপাশে কি কথা হয় শোনার জন্যে। কিন্তু কিছুই শোনা গেল না।
বেশি দূরে, এড বলল। চল ঘুরে গিয়ে দেখি।
না। দেখে ফেলবে। তারচে উপরে উঠি।
বার্জের এক পাশে একটা মই লাগানো। কাত হয়ে আছে ঝর্জটা, ফলে মই বেয়ে উঠতে অসুবিধে হয়। অনেক কায়দা কসরত করে শেষ পর্যন্ত উঠল ওরা। পা টিপে টিপে এগোল ডেকের ওপর দিয়ে। অন্য ধারে যাওয়া আর হল না, তার আগেই মড়মড় করে ভাঙল প্লচা তক্তা।
হুঁক! করে উঠল কিশোর। ভেজা, নরম কিছুর ওপর পড়েছে।
পুরানো বস্তা। বস্তার ওপর পড়েছি।
মাথার ওপরে গোল ফোকর-হ্যাচের ঢাকনা ভেঙে পড়েছে ওরা, আবছা আলো আসছে সেখান দিয়ে। বার্জের খোলে পড়েছে। ভেজা, ভ্যাপসা দুর্গন্ধ। খোলের পাশেও এক জায়গায় তক্তায় ফাটল, হালকা আলো আসছে ওপথেও। মাথার ওপরের ফোকরটা বারো ফুট ওপরে।
কোন কিছুর ওপর দাঁড়াতে পারলে ধরা যেত, কিশোর বলল।
পিচ্ছিল খোলে হেঁটে বেড়াল ওরা। উঠে দাঁড়ানোর মত কিছুই চোখে পড়ল। বস্তা ছাড়া আর কিছু নেই। বাক্স, তক্তা, দড়ি, মই, কিছু না। অন্ধকার কোণে খচমচ করে নড়ছে কি যেন।
ইঁদুর, এড বলল। কিশোর, এখান থেকে বেরোনোর কোন রাস্তা নেই।
দেখি আরেকবার খুঁজে। এমাথা থেকে ওমাথা, কোথাও বাদ দেব না
পেছনের শেষ প্রান্তে এসে ছপ করে পানিতে পা দিয়ে ফেলল কিশোর। অল্প পানি জমে রয়েছে। ঢোক গিলল সে। এড, গলা কাপছে। জোয়ারের সময় পানিতে ডুবে যায় এটা।
দ্রুত আবার ফোকরটার নিচে ফিরে এল ওরা।

চেঁচাই?.এড বলল।
এই সময় ফোকর দিয়ে উঁকি দিল একটা মুখ। তরুণ। কালো গোঁফ। চেঁচিয়ে লাভ হবে না, হেসে বলল সে। শীতকালে এদিকে বড় একটা আসে না কেউ। তাছাড়া রাস্তা এখান থেকে অনেক দূরে, গাড়িঘোড়ার গোলমাল। গলা ফাটিয়ে চেঁচালেও কেউ শুনবে না। আবার-হাসল লোকটা। তার চেয়ে এক কাজ করা যাক, এস, কথা বলি।
কিশোররা যখন সান্তা বারবারায় পৌঁছেছে, প্রায় একই সময় মুসা আর রবিনও পৌঁছুল ড্যানিয়েল ব্রাদার্সদের অফিসের সামনে। একটা ট্রাকে ইট তুলছে বাদামী চামড়ার এক লোক। ছেলেরা জানাল, কি জন্যে এসেছে। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছল সে। হাসল। বিখ্যাত ড্যানিয়েল ব্রাদার্স? একজন ছিল আমার দাদার বাবা, আরেকজন চাচা। আমি ডিলিয়ানো ড্যানিয়েল। পাথরের কাজই বেশি করি আমরা। দামি জিনিস, লাভও বেশি।
আপনার বাপ-দাদাদের কথা তো তাহলে ভালই বলতে পারবেন, হেসে বলল রবিন।
নিশ্চয়। কি জানতে চাও?
আঠারশো ছিয়ানব্বই সালের বাইশে নভেম্বর, এক ওয়াগন বোঝাই মাল কিনেছিলেন স্কটল্যাণ্ডের বাওরাড ডাই। কি কিনে ছিলেন জানতে চাই।
আঠারশা ছিয়ানব্বই? চোখ কপালে তুলল ডিলিয়ানো। মানে একশো বছর আগে?
চার বছর কম,মুসা বলল।
আপনি কোন সাহায্য করতে পারবেন না, না? বলল রবিন।
একশো বছর! আবার বলল ডিলিয়ানো। নেচে উঠল কালো চোখের তারা। হাসল। পারব না কেন? পারব। এ শহরে আমাদের চেয়ে ভাল রেকর্ড কে রাখে? এস।
ছেলেদেরকে অফিসে নিয়ে এল ডিলিয়ানো। কাঠের ক্যাবিনিট খুলে পুরানো একটা ফোল্ডার বের করল, হলদে হয়ে গেছে পাতাগুলো। ধুলো ঝেড়ে ফাইল বের করে পাতা ওল্টাল কয়েকটা। হেসে মুখ তুলে তাকাল ছেলেদের দিকে। পেয়েছি। বাইশে নভেম্বর বললে না? বাওরাড ডাই। এই যে। বাওরাড ডাই, ফ্যান্টম লেক। স্পেশাল অর্ডার দিয়েছেঃ এক টন পাথর। নগদ টাকা দিয়ে কিনে নিয়ে গেছে।
এক টন? মুসা জানতে চাইল, কি পাথর?
কি পাথর, লেখা নেই। শুধু এক টন লিখেছে, আর লিখেছে, স্পেশাল অর্ডার। তবে দাম দেখে বোঝা যায় সাধারণ পাথর নয়।

স্পেশাল অর্ডার বলতে তখন কি বোঝাত? রবিন জিজ্ঞেস করল।
সাধারণ পাথর নয়, এটুক বলতে পারি, চোয়াল ডলল ডিলিয়ানো। হতে পারে স্পেশাল অর্ডারে কেটে, সাইজ করে সাপ্লাই দেয়া হত। ঘষে-মেজে পালিশ করেও পাথর সাপ্লাই দিই আমরা। আচ্ছা, নিয়ে গিয়ে সাইডওয়াক বানায়নি তো?
সাইডওয়াক?
তখনকার দিনে বড় চ্যাপ্টা পাথর দিয়েই সাইডওয়াক বানানো হত।
কি জানি, রবিন বলল। ওরকম কিছু বানিয়েছে কিনা জানি না।
পাথর দিয়ে বাড়িও বানানো হত অনেক। দেয়াল, ভিত, ফ্ল্যাগস্টোনস...কোন জায়গায় বড় পাথর, কোন জায়গায় ছোট পাথর–সাইজ জানতে চাও?
হ্যাঁ, জানলে খুব ভাল হয়।
পাহাড়ে আমাদের পুরানো আড়ত থেকে আনা হত তখন পাথর। এখন আর ওখানে তেমন নেই, ফলে লোকজনও রাখা হয় না বেশি, শুধু একজন কেয়ারটেকার আছে। একটা অফিস আছে ওখানে। পুরানো রেকর্ড থাকার কথা।
যাওয়া যাবে? আগ্রহ উত্তেজনায় কাঁপতে শুরু করল রবিন।
যাবে। ফ্যান্টম লেক থেকে বড়জোর দুমাইল। কিভাবে কোথায় যেতে হবে বলে দিল ডিলিয়ানো।
আমরা আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই না, সাফ মানা করে দিল এড। আপনি কে খুব ভাল করেই জানি।
সতর্ক হয়ে উঠল লোকটা। কি জান?
জানি, আপনি একটা চোর। সোসাইটিতে চুরি করে জেলে গেছেন, কড়া গলায় বলল কিশোর। তারপর জেল থেকে বেরিয়ে আবার শুরু করেছেন শয়তানি।
পুলিশকে জানানো হয়েছে আপনার কথা, যোগ করল এড।
ঝট করে মাথা তুলে চারপাশে তাকাল নোবল, বোধহয় পুলিশ আছে কিনা দেখল। তাকাল আবার ছেলেদের দিকে। প্রফেসরের বাচ্চা তাহলে বলে দিয়েছে তোমাদেরকে। ওটার সঙ্গে মিশলে কিভাবে?
মিশেছি, যেভাবেই হোক, কিশোর বলল। সেটা আপনাকে বলতে যাব কেন? হ্যাঁ, ভাল কথা, দ্বিতীয় জার্নালটা পোড়েনি, যেটার ছবি তুলে নিয়েছিলেন।
দ্বিধা করল নোবল। ওই স্টোরে গিয়ে কি কি জানলে?
কি করে ভাবলেন, আপনাকে বলব? ঝাঁজাল কণ্ঠে বলল এড।
গিয়ে আপনার দোস্ত টিক বানাউকে জিজ্ঞেস করছেন না কেন? কিশোর, বলল।
টিক বানাউ? ওর সম্পর্কে আবার কি জান?
জানি, দুজনেই গুপ্তধনের পিছে লেগেছেন, বলল এড। কিন্তু নিতে পারবেন, মনে রাখবেন একথা। চালাকিতে আমাদের সঙ্গে...।

চালাকি? তারমানে এখনও জান না ওগুলো কোথায় আছে? প্রফেসরও না? টিক বানাউ জানে?
কেন, সব কথা বলেনি নাকি আপনার দোস্ত? হাসল কিশোর। বন্ধুকেও ঠকানোর চেষ্টা?।
দীর্ঘ এক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকিয়ে রইল নোবল। চারজ। দেখেছি। তোমাদের অন্য দুই বন্ধু কোথায়?
জানার খুব ইচ্ছে বুঝি?ব্যঙ্গ করল এড। বলব না, কিশোর বলল।
তারমানে জরুরি কোন কাজে গেছে। নিশ্চয় ড্যানিয়েলদের স্টোন ইয়ার্ডে, তাই না?
জবাব দিল না কিশোর।
তাহলে ঠিকই বলেছি, আবার বলল নোবল। শক করে হাসল একবার। তারপর উঠে চলে গেল।
কপালই খারাপ আমাদের, দীর্ঘশ্বাস ফেলল কিশোর। তক্তার এমন জায়গায় পা দিয়েছি, একেবারে ধপাস। সাবধান থাকলেই পড়তাম না।
কিশোর! আতঙ্ক চাপতে পারল না এড। জোয়ার! জোয়ার আসছে!
শেষ বিকেলে ফ্যান্টম লেকের ডাই লজে ফিরে এল মুসা আর রবিন। সাড়া পেয়ে, বেরিয়ে এলেন মিসেস ডাই। এড আর কিশোর ফেরেনি, জানালেন। ওরা জানাল, ড্যানিয়েলদের ইয়ার্ড থেকে কি জেনে এসেছে।
এক টন স্পেশাল পাথর? আনমনে বললেন মিসেস ডাই। ঈশ্বর, কেন? এই বাড়ি তৈরির জন্যে নিশ্চয়?
না, ম্যাডাম,মুসা বলল। তখন এই বাড়ি তৈরি হয়ে গেছে।
পাথর দিয়ে আর কিছু বানানো হয়েছে, জানেন? রবিন জিজ্ঞেস করল।
ভাবলেন মিসেস ডাই। মাথা নেড়ে বললেন, না। আর কিছু না।
কিন্তু কিছু একটা নিশ্চয় বানানো হয়েছে, মুসা বলল। এমন কিছু...
ইঞ্জিনের শব্দ শোনা গেল। ওরা ভাবল ট্রাকটা, কিন্তু না। মিসেস ডাইয়ের পুরানো ফোর্ড। কাছে এসে থামল। ডিনো নামল, হাতে ছোট একটা জেনারেটর। দূর, কেউ ঠিকমত কাজ করে না এখানে, খুব বিরক্ত সে। ক মিনিটের কাজ?। অযথা এতক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখল, ছাউনিতে আগুনে পুড়ে নষ্ট হয়েছিল যন্ত্রটা, মেরামত করিয়ে এনেছে, সেকথা জানাল ছেলেদের।
ডিনো, মিসেস ডাই বললেন। বাড়ি আর ছাউনি ছাড়া পাথর দিয়ে আর কি তৈরি হয়েছে এখানে, জান? এক টন পাথর।
পাথর? ভ্রূকুটি করল ডিনো। এক টন?
ড্যানিয়েলের কাছে কি কি জেনে এসেছে, আরেকবার বলল রবিন আর মুসা।

কি জানি, আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না। আড়তে গেলে জানা যাবে বলছ?
হয়ত, রবিন বলল। কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেছে। এখন সাইকেল নিয়ে যেতে যেতে অন্ধকার হয়ে যাবে।
চল, আমি নিয়ে যাচ্ছি। ওদিকে এমনিতেও যেতাম, কাজ আছে। পথে তোমাদের নামিয়ে দিয়ে যাব। ফেরার সময় সাইকেল নিয়ে ফিরবে।
ফোর্ডের বুটে সাইকেল তুলল রবিন। মুসা ঠেলেঠুলে পেছনে, সিটের ওপর রাখল। সামনে, ডিনোর পাশে উঠে বসল দুজনে।
পুরানো আড়তের কাছে যখন পৌঁছল ওরা, তখন আলো রয়েছে। দুই গোয়েন্দাকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল ডিনো।
আড়ত মানে বিশাল এক গর্ত, কিংবা ছোটখাটো এক পুকুর বলা চলে—এক পাড় থেকে আরেক পাড়ের দৈর্ঘ্য দুশ ফুট। তলায় পানি জমে আছে। সর্বত্র মাথা তুলে রেখেছে পাথর, পড়ন্ত সূর্যের আলোয় লাল। প্রায় পুরো পাহাড়ের গা থেকেই ওখানে পাথর কেটে নেয়া হয়েছে, কোথাও সিঁড়ির মত ধাপ ধাপ হয়ে আছে, কোথাও ছড়ানো চত্বর। ওরকম একটা চত্বরের ওপর দেখা গেল একটা জীর্ণ মলিন ছাউনি, পাহাড়ের কাঁধের ওপর। ছাউনির বাইরে একটা ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে, ভেতরে আলো জ্বলছে।
কেয়ারটেকার আছে,মুসা বলল।
ছাউনির দিকে রওনা হল ওরা। খানিকটা যেতেই ভেতরের আলো নিভে গেল। বেরিয়ে এসে ট্রাকে উঠল একজন লোক।
চিৎকার করে ডাকল। ওরা, এই যে, স্যার...এই যে...।
বেশ দূরে ট্রাকটা, ইঞ্জিনও চালু করে দেয়া হয়েছে, ফলে ওদের ডাক লোকটার কানে পৌঁছল বলে মনে হল না। দৌড় দিল ওরা। কিন্তু ততক্ষণে চলতে শুরু করেছে ট্রাক।
পাহাড়ী পথ ধরে ট্রাকটা চলে যাওয়ার পর ছাউনির সামনে এসে দাঁড়াল দুজনে। দরজায় তালা দেয়া।
দূর, আরেকটু আগে এলেই হত, নিরাশ ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল মুসা।
ছাউনিটা ঘুরে দেখল রবিন। চারটে জানালা, খড়খড়ি লাগানো। বাইরে থেকে ভারি বোর্ড খাঁজে বসিয়ে, তার ওপর বার লাগিয়ে তালা দেয়ার ব্যবস্থা। ভেতরে ঢুকতে পারলে রেকর্ডগুলো দেখা যেত, বলল সে।
রবিন, মুসা ডাকল। এটা ভোলা। ঢোকা যাবে।
হুঁ। যাক, কপাল ভালই আমাদের।
জানালা দিয়ে ভেতরে ঢুকল ওরা। পুরানো কাঠের ফাইল, আসবাবপত্র। একটা কেবিনেটে লেবেল লাগানো দেখল মুসাঃ ১৮৭০-১৯০০। ওটা খুলে ভেতর থেকে

১৮৯ঙুলেখা ফাইলটা বের করল। এনে রাখল ডেস্কে।
পড়ার জন্যে ঝুঁকল রবিন।
বাইরে হালকা পায়ের শব্দ হল।
পাঁই করে ঘুরল রবিন। কে?
বন্ধ হয়ে গেল খড়খড়ি। খুঁজে বসিয়ে দেয়া হল বোর্ডটা। বার লাগানোর শব্দ শোনা গেল পরিষ্কার। তারপর দ্রুত সরে গেল পায়ের আওয়াজ।
বন্দি হল দুই গোয়েন্দা।
ফোকর দিয়ে তেরছা হয়ে রোদ এসে পড়েছে খোলে। বেশ কয়েকবার জোরে জোরে চিৎকার করে ক্ষান্ত দিয়েছে কিশোর আর এড, লাভ হয়নি। ভেজা দেয়ালে হেলান দিয়ে বসেছে এখন গলুইয়ের দিকটায়। মাঝে মাঝে শঙ্কিত চোখে তাকাচ্ছে বাড়ন্ত জোয়ারেরঞ্জলের দিকে। একটু একটু করে উঠে আসছে ওদের কাছে।
আর কতক্ষণ লাগবে, কিশোর? শান্তকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল এড।
ঘন্টা দুই। তবে ততক্ষণ থাকতে হবে না আমাদের। কেউ না কেউ এসে যাবেই।
কে আসবে? ডাকই তো কেউ শুনল না আমাদের।
আসবে। বোরিস। আমাদের না দেখলেই খোঁজা শুরু করবে।
কিন্তু আমরা এখানে আছি কি করে জানবে? কল্পনাই করবে না বার্জের মধ্যে ঢুকে বসে আছি।
আবার চেঁচাব। কেউ না কেউ শুনবেই।
হ্যাঁ, আর শুনেছে!
কিন্তু আর চেঁচানোর দরকার হল না। ডেকের ওপর ভারি জুতোর শব্দ।
কিশোর, ডাকব নাকি?
শ্‌শ্‌শ্‌! ঠোঁটে আঙুল রাখল কিশোর। শত্রু না মিত্র জানি না। আসুক আগে।
প্রায় দম বন্ধ করে কান পেতে রইল ওরা। সাবধানে ভাঙা হ্যাচের দিকে এগিয়ে আসছে পদশব্দ। থেমে গেল। দীর্ঘ নীরবতার পর ডাক শোনা গেল, কিশোর? এইই কিশোর? এজ?
বোরিস!
বোরিসভাই! গলা ফাটিয়ে চিৎকার করল কিশোর। আমরা এখানে।
তাড়াতাড়ি ফোকরের নিচে চলে এল দুজনে।
ওখান থেকে বের করুন আমাদের, এড বলল। জলদি। পানি ভরে যাচ্ছে।
দাঁড়াও। আসছি।
ডেকের ওপর দিয়ে আবার কিনারে চলে গেল পদশব্দ। কাঠ ভাঙার আওয়াজ শোনা গেল। খানিক পরেই ফিরে এল বোরিস, বার্জের কিনারে লাগানো মইটা খুলে নিয়ে এসেছে। ফোকর দিয়ে খোলে নামিয়ে দিল ওটা।

ডেকে বেরিয়ে এল দুজনে।
কত জায়গায় যে খুঁজলাম তোমাদের, বোরিস বলল। আমাকে না জানিয়ে এলে কেন?
কিশোর জিজ্ঞেস করল, আমাদের খুঁজে পেলেন কি করে?
রাস্তায় দেখলাম, আইসক্রীমের দোকানে দেখলাম, কোথাও পেলাম না। শ্যাগুলারের দোকানে ফিরে যাচ্ছি, এই সময় একটা ছেলে বলল বার্জে উঠতে দেখেছে তোমাদের। চলে এলাম।
একটা ছেলে দেখেছে আমাদের? ভুরু কোঁচকাল কিশোর।
সে আমাদের সাহায্য করল না কেন তাহলে? এউ বলল।
হ্যাঁ, চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। ছেলেটা কোথায় এখন?
চলে গেছে। আমাকে বার্জটা দেখিয়ে দিয়েই দৌড়ে চলে গেল। ওহহো, ভুলেই গেছি, মিস্টার ডাইক তাঁর বাবার সঙ্গেও কথা বলেছেন। বুড়ো থুরথুরে, এখনও বেঁচে আছেন দ্রলোক। বাওরাড ডাই কি কিনেছিল, তিনিও কিছু বলতে পারলেন না। তবে একটা সূত্র দিয়েছেন।
কী? আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল কিশোর।
বললেন, তখন যত জিনিস বিক্রি করত ডাইক কোম্পানি, পিতলের প্লেটে নিজেদের নাম খোদাই করে লাগিয়ে দিত জিনিসের ওপর।
কিশোর, এড বলল। চল, বাড়ি গিয়ে খোঁজা শুরু করি।
হ্যাঁ, জলদি করা দরকার, জরুরি কণ্ঠে বলল কিশোর। ভুলেই গেছিলাম, রবিন আর মুসা কোথায় গেছে জানে নোবল! বিপদে পড়বে ওরা!
লজের ঘরে ঘরে ক্রিস্টমাস লাইট জ্বলছে। ড্রাইভওয়েতে ট্রাক রাখল বোরিস। এক লাফে নেমে বাড়ির দিকে দৌড় দিল কিশোর আর এড। পিছে পিছে এল বোরিস। অনেক দেরি হয়ে গেছে, রাশেদ পাশাকে ফোন করে জানাবে ওরা ভাল আছে।
লিভিংরুমে দাঁড়িয়ে আছে মিসেস ডাই। ফায়ারপ্লেসে গনগন করে জ্বলছে। আগুন।
মাআ! আমাদের বাড়িতে এমন কিছু আছে, যার ওপরে পেতলের প্লেটে লেখা ডাইক অ্যাণ্ড সনস? সান্তা বারবারায় যা যা জেনে এসেছে সব মাকে জানাল এড।
ও, বাওরাড কি কিনেছেন জানতে পারনি তাহলে? ভূরু ডললেন মিসেস ডাই। পেতলের প্লেট? পুরানো অনেক জিনিসেই তো ওরকম প্লেট লাগানো আছে। তখন ওটাই চল ছিল। কিন্তু কোনটাতে ডাইক কোম্পানির নাম আছে বলে তো মনে পড়ছে না।
ভাল করে ভেবে দেখ, মা।

রবিনরা ফেরেনি? কিশোর জিজ্ঞেস করল।
ফিরেছিল। আমাকে বলেছে, ড্যানিয়েলদের ওখান থেকে এক টন পাথর – কিনেছিলেন বাওরাড। কি পাথর, কি সাইজ, দেখতে কেমন, বলতে পারেনি। তাই ডিনোর সঙ্গে ড্যানিয়েলদের পুরানো আড়তে গেছে, ওখানকার অফিসে, রেকর্ড দেখতে। কিন্তু গেছে তো অনেকক্ষণ...।
এখনও ফেরেনি? এ্যাণ্ডফাদার ক্লকটার দিকে তাকাল কিশোর। প্রায় সাতটা বাজে।
না। ডিনোও তো ফিরল না...।
বিচিত্র একটা শব্দ হল। বাড়ির পেছনে দূরে কোথাও। ফোন শেষ করে সবে ঢুকছিল বোরিস, শুনে সে-ও থমকে গেল।
তখন থেকেই শুনছি, মিসেস ডাই বললেন। এক ঘন্টা ধরে, মাঝে মাঝেই। কিসের শব্দ?
দেয়াল ভাঙছে মনে হয় কেউ, বোরিস বলল। দেয়াল?
আমাদের কাছাকাছি তো কেউ থাকে না। তবে ওদিকে...
ওদিকে কি? এড বলল। ওদিকে তো কোন দেয়াল নেই।
দেখনি হয়ত। ওদিকে একটা স্মোকহাউস আছে। বহুদিন ব্যবহার হয় না, তোমার বাবা যখন ছোট, তখন থেকেই। বলতে ভুলে গেছি...।
স্মোকহাউস? কিশোর বলল। পাথরের স্মোকহাউস?
হতে পারে। আমিও ভালমত দেখিনি। দূর থেকে দেখেছিলাম, লতা, গাছগাছড়ায় ঢেকে ফেলেছে।
বোরিসভাই, ট্রাক থেকে লণ্ঠনটা নিয়ে আসুন, কুইক।
বৈদ্যুতিক লণ্ঠনটা নিয়ে এল বোরিস। ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে ওদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন মিসেস ডাই। পথ আর নেই এখন, জঙ্গল আর আগাছার রাজত্ব। কনকনে ঠাণ্ডা পড়েছে।
আধমাইল মত গিয়ে একটা কাঠের কুঁড়ে দেখা গেল। ওটার পাশ দিয়ে চলতে চলতে মিসেস ডাই বললেন, বাওরাডের আমলে মজুরদের ঘর ছিল এটা।
স্মোকহাউসটাও কি বাওরাডই বানিয়েছিলেন? কিশোর জানতে চাইল।
জানি না, অন্ধকারে একদিকে হাত তুলে দেখালেন মিসেস ডাই। ওখানেই কোথাও আছে।
বাড়ি মারার শব্দ থেমে গেছে। রাস্তা থেকে ঘন ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে এগোল ওরা। ভাঙা ডাল, দোমড়ানো পাতা, ছেড়া তা বুঝিয়ে দিচ্ছে এখান দিয়ে গিয়েছে কেউ। শোকহাউসটা দেখা গেল। হাউস মানে ধসে পড়া পাথরের স্তূপ।
ভেঙে ফেলেছে। বলে উঠলেন মিসেস ডাই।

গুপ্তধন খুঁজেছে! উত্তেজনায় কাঁপছে এড।
নিশ্চয় নোবলের কাজ, কিশোর বলল। টিক বানাউও হয়ত ছিল সঙ্গে। সান্তা বারবারা থেকে ফিরে এসে এই কাজ করেছে। কিন্তু স্মোকহাউসের কথা কি করে জানল...?
বড় একটা হাতুড়ি কুড়িয়ে নিল বোরিস। হাতলটা এখনও গরম।
কান পেতে রইল ওরা। কোন শব্দ শোনা গেল না। লণ্ঠনের আলোয় স্মোকহাউসের পাথরগুলো দেখছে কিশোর।
নিরেট পাথর, আনমনে বিড়বিড় করল সে। ফাপা-টাপা নেই যে ভেতরে কিছু থাকবে। সবখানে মাকড়সা :কিছু টেনে নেয়ার চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না।
আলগা পাথর পা দিয়ে সরিয়ে দেখছে এড। কিশোর, লেখা!
লণ্ঠনটা কাছে নিয়ে এল বোরিস। পাথরের ওপর থেকে বালি মুছতেই স্পষ্ট হল লেখাটাঃ হুঁ, ডাই। ১৯০৫।
আমার দাদা-শ্বশুর, মিসেস ডাই বললেন। তাঁর নাম ছিল এডওয়ার্ড ডাই।
তারমানে বাওরাড বানাননি এই স্মোকহাউস, হাসল কিশোর। আপনার দাদা-শ্বশুর বানিয়েছিলেন। এখানে গুপ্তধন থাকার কথা না। চলেন, যাই।
লজে ফিরে ইয়ার্ডের ট্রাকের পাশে প্রফেসরের স্টেশন ওয়াগনটা দেখা গেল। গায়ে হালকা সুট, সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে শীতে কাঁপছেন। ইস, সাংঘাতিক শীত পড়েছে ক্যালিফোরনিয়ায়। হাসলেন। খবর কি জানতে এলাম।
গরম লিভিংরুমে আগুন আর ক্রিস্টমাস ট্রী-র সামনে বসে, সান্তা বারবারায় কি কি করে এসেছে প্রফেসরকে জানাল কিশোর।
পিতলের প্লেট? টিক আর নোবেল দুজনেই গিয়েছিল? হুমম, মাথা দোলালেন প্রফেসর। তা, পিতলের প্লেটটা পাওয়া গেছে?
না, স্যার, এড বলল। আসলে খুঁজিইনি এখনও।
মুসা আর রবিনের আসার অপেক্ষায় আছি, বলল কিশোর। কোথায়, কি জন্যে গেছে ওরা, সেকথাও জানাল প্রফেসরকে। ঘড়ির দিকে চেয়ে অস্বস্তি বাড়ল তার। ডিনো নিয়ে গেছে, না?...ওই যে, এল বোধহয়।
ফোর্ডটাই এসেছে, ইঞ্জিনের শব্দেই বোঝা গেল। হাত ডলতে ডলতে ঘরে ঢুকল ডিনো। একা।
ওরা কোথায়? জিজ্ঞেস করলেন মিসেস ডাই।
ফেরেনি এখনও? তাহলে নিশ্চয় আড়তে, যেখানে নামিয়ে দিয়েছি। এডের দিকে তাকাল ডিনো। সান্তা বারবারা থেকে কি রত্ন জোগাড় করে আনলে?
সংক্ষেপে বলল এড। শেষে বলল, প্লেটটা এখনও খুঁজতে পারিনি। নানা রকম ঝামেলা...রবিন আর মুসা আসছে না। ওদিকে মোকহাউসটা ভেঙে গুঁড়িয়ে

ফেলেছে কে জানি।
স্মোকহাউস? ও, হ্যাঁ..., ঘড়ি দেখল ডিনো। ছেলেগুলো এল না কেন এখনও? এতক্ষণ তো লাগার কথা না।
পাথরের শোকহাউস? প্রফেসর বললেন। কি করে জানল...?
প্রশ্ন শেষ হওয়ার আগেই জবাব দিল এড, রবিন আর মুসার সঙ্গে কথা বলেছে হয়ত।
কিংবা ড্যানিয়েলদের সঙ্গে নোবেলও দেখা করেছে, বলল কিশোর। নাহ, বেশি দেরি করছে। আড়তটার কথা নোবলও জেনে গেল না তো? সহজেই একজন পিছু নিতে পারে ওদের।
তা-ই করেছে। লাফ দিয়ে উঠে দরজার দিকে রওনা হয়ে গেলেন প্রফেসর। নিশ্চয় বিপদে পড়েছে ওরা। জলদি এল।
আড়তে কোথাও বাতি দেখা গেল না। শুধু তারার আলোয় আবছা মত চকচক করছে পাথরগুলো। গর্তের নিচে কালো অন্ধকার।
সাইকেল দুটো ডিনো আগে দেখল। এখানেই রেখে গিয়েছিলাম ওদের। ওরা এখানেই কোথাও আছে। নইলে সাইকেল থাকত না।
টর্চের আলোয় পাহাড়ের কাটা ধাপগুলোকে মনে হল যেন কোন দানবের সিঁড়ি। গর্তের পানিতে প্রতিফলিত হল আলো। কালো ময়লা পানির দিকে তাকিয়ে প্রফেসর বললেন, পিছলে পড়েনি তো? কণ্ঠ কেঁপে উঠল তার। তাহলে...।
থাক থাক, আর বলবেন না, ভয় পেয়েছে এড।
সিঁড়িগুলো ভালমত দেখছে কিশোর, চকের চিহ্ন খুঁজছে। কার্ডে চিহ্ন না থাকলেও তিন গোয়েন্দার নতুন চিহ্ন নির্ধারিত হয়েছে তারকা। পাওয়া গেল না।
টর্চ আর লণ্ঠন নিয়ে আশেপাশে অনেক জায়গায় খোঁজা হল। কোন চিহ্ন নেই, যেন বাতাসে মিলিয়ে গেছে দুই গোয়েন্দা। শুধু পাথরের সিঁড়ি, গর্তের পুরানো দেয়ালের ফাঁকে ফাঁকে জন্মে থাকা প্রায় বিকলাঙ্গ উদ্ভিদ, আর অসংখ্য পাথর—ছোট-বড়-মাঝারি, নানা রকমের, নানা আকারের।
অন্ধকারে হুটোপুটি করছে ছোট ছোট জীব। দুটো সাপ দেখল ওরা, এক পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে আরেক পাথরের তলায় গিয়ে লুকাল। কয়োট ডাকল দূরে। নিশাচর বড় পাখি ডানায় ভারি শব্দ তুলে উড়ে যাচ্ছে গাছ থেকে গাছে। খাবারের সন্ধানে ছায়ার মত নিঃশব্দে মাথার ওপর চক্কর মারছে দুর্দান্ত শিকারী হুতোয় পেঁচা।
রবিন আর মুসার কোন সাড়াশব্দ নেই।
আড়তের প্রায় পুরো সীমানাটাই ঘুরে এসেছে ওরা, এই সময় শোনা গেল আওয়াজ।

শুনছ! ফিসফিসিয়ে বলল বোরিস।
কাছেই হচ্ছে শব্দটা, ধাতব।
দেখা যায় কিছু? এড জিজ্ঞেস করল।
না, বললেন প্রফেসর।
আবার হল শব্দ, কাঠের সঙ্গে কাঠের ঘষা, তারপর কাঠের সঙ্গে ধাতব কিছুর।
ওই যে! নিচু কণ্ঠে বলল কিশোর। একটা ছাউনি না? মনে হয় ওখান থেকেই আসছে।
ছাউনিতে শব্দ হচ্ছে। খটখট ঝনঝন করে উঠল কি যেন, ছুট দিল কেউ। টর্চ জ্বালল ডিনো। পাতলা একটা মূর্তিকে ছুটে যেতে দেখা গেল ছাউনির কাছে পার্ক করা ছোট একটা গাড়ির দিকে।
নোবল! চেঁচিয়ে উঠলেন প্রফেসর। ধর, ধর ব্যাটাকে!
আরে, পালিয়ে যাচ্ছে তো, ধর না, গর্জে উঠল ডিনো।
এই নোবল, দাঁড়াও। থাম! প্রফেসর বললেন।
থামল না সে। পৌঁছে গেছে সবুজ ফোক্সওয়াগেনের কাছে। গাড়িতে উঠে ইঞ্জিন স্টার্ট দিল। ওটার কাছে কেউ যাওয়ার আগেই শাঁ করে বেরিয়ে গেল কাঁচা রাস্তা ধরে।
আবার পালাল! তিক্তকণ্ঠে বললেন প্রফেসর। শয়তান কোথাকার! নোবলের ব্যাপারে মাথাব্যথা নেই কিশোরের। রবিন আর মুসা কোথায়? ওদের কি করল সে?
ঢোক গিলল এড। নীরব হয়ে রইল অন্যেরা। অন্ধকারে দেখার চেষ্টা করছে কিশোর। গলা চড়িয়ে ডাকল, রবিইন! মুসাআ!
পাহাড়ের পাথুরে দেয়ালে প্রতিধ্বনি তুলল তার ডাক। কেঁপে কেঁপে সেই শব্দের রেশ মিলানোর আগেই এল জবাব, কিশোওর! আমরা এখানে-এ-এ!
ক্ষণিকের জন্যে স্থির হয়ে গেল সবাই।
আবার শোনা গেল একই কথা, কিশোর। আমরা এখানে এ-এ!
আরে দেখ, প্রফেসর বললেন। ছাউনিতে আলো।
হঠাৎ জ্বলেছে আলোটা। দরজা আর একটা জানালার আবছা কাঠামো চোখে পড়ছে। দৌড় দিল কিশোর। পেছনে অন্যেরা। দরজার কাছে এসে তালা ধরে ঝাঁকি দিল। ভেতর থেকে মুসা বলল, ডানপাশে চলে যাও। একটা জানালায় তালা নেই দেখবে।
জানালার কাছে ছুটে গেল ডিনো। বার খুলে, বোর্ড সরাল। খড়খড়ি তুলে উঁকি দিল দুই গোয়েন্দা।
খাইছে! হাসিমুখে বলল মুসা। ভেবেছিলাম আজ রাতে বেরোতে পারব।

লোকের সাড়া পেয়ে আলো নিভিয়ে দিয়েছিলাম, রবিন বলল। ভেবেছি, শত্রু। শত্রুই। দরজার তালা ভেঙে ঢোকার চেষ্টা করেছে, পারেনি। শেষে এই জানালাটা খুঁজে বের করেছে। বার খোলার আগেই বোধহয় তোমরা এসে গেলে।
নোবল শয়তানটা এসেছিল, তপ্তকণ্ঠে বললেন প্রফেসর।
ও নিশ্চয় আটকায়নি তোমাদের, ডিনো বলল। কতদূর কি হয়েছে দেখতে এসেছিল বোধহয়, আমাদের দেখে পালিয়েছে।
যাকগে। বেরিয়ে এস, বোরিস বলল।
মাথা নাড়ল রবিন। আপনারা ভেতরে আসুন। একটা সূত্র পাওয়া গেছে।
উত্তেজিত হয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল এড। তারপর কিশোর। একে একে অন্যেরাও ঢুকল। বিশাল শরীর নিয়ে ছোট জানালা দিয়ে ঢুকতে বেশ অসুবিধে হল বোরিসের।
ডেস্কের ওপর রাখা ফাইলটা দেখাল রবিন।
স্পেশাল অর্ডার নম্বর একশো তেতাল্লিশ, জোরে জোরে পড়ল কিশোর। বি. ডাইয়ের জন্যে লাগবে : দশটা স্কয়ার-কাট মনুমেন্ট স্টোনস। এ্যানিটের। দেখতে একই রকম হওয়া চাই সবগুলো। মুখ তুলল গোয়েন্দাপ্রধান। মনুমেন্ট স্টোনস?
এত বড় পাথর দিয়ে কি করেছিল বাওরাড ডাই? মুসা বলল। স্মৃতিসৌধ বানিয়েছে?
নীরবে মাথা নাড়ল শুধু কিশোর, কি বোঝাতে চাইল বোঝা গেল না।
ফ্যান্টম লেকে কোন স্মৃতিসৌধ নেই, ডিনো বলল।
কাছাকাছি অন্য কোথাও আছে? জিজ্ঞেস করলেন প্রফেসর।
কোন শহরে গিয়ে বানায়নি তো? এড বলল।
না, ধীরে ধীরে বলল কিশোর। আমি শিওর, নোরিয়ার চমক ফ্যান্টম লেকেই অপেক্ষা করছে। জার্নালের লেখার আর কোন মানে হতে পারে না।
নোরিয়ার চমক বানানোর জন্যে প্রতিবারেই বাড়ি ফিরে এসেছেন বাওরাড।
কিন্তু সেটা লুকাল কিভাবে? প্রফেসর বললেন। এমনই বুদ্ধি করে লুকিয়েছে, এত বছরেও কারও চোখে পড়ল না।
তাকালেই হয়ত দেখি, রবিন বলল। সেজন্যেই চোখে পড়ে না। চোখের সামনে যে জিনিস থাকে, সেটাই সহজে চোখে পড়ে না।
চোখে পড়ার দরকার নেই, হঠাৎ বলে উঠল মুসা। জাহান্নামে যাক গুপ্তধন। আগে খাওয়া দরকার। আমি আর সহ্য করতে পারছি না।
হেসে উঠল সবাই। ছিন্ন হল টান টান উত্তেজনা, হালকা হয়ে গেল পরিবেশ।
চল, আমাদের ওখানেই খাবে, আমন্ত্রণ জানাল এড। ফোন করে বাড়িতে জানিয়ে দিয়ো।

উত্তম প্রস্তাব, হেসে বললেন প্রফেসর। আমার মত বুড়োকে খাওয়াতেও নিশ্চয় মুখ কালো করবেন না মিসেস ডাই।
খাওয়ার পর কথা বলার জন্যে সবাই এসে বসল লিভিংরুমে।
টিক আর নোবল একসঙ্গে কাজ করছে, প্রফেসর বললেন। এখন ব্যাপারটা পরিষ্কার।
প্রমাণ করতে পারব না, স্যার চিন্তিত ভঙ্গিতে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। যাক, সেটা পরে দেখা যাবে। আগে, ধাধা রহস্যের সমাধান হয় কিনা দেখি। বোঝাই যাচ্ছে, নোরিয়ার জন্যে একটা ধাঁধা তৈরি করেছিলেন বাওরাড, চেয়েছিলেন, স্ত্রী সেটার সমাধান করুক।
একশো বছর আগে চেষ্টা করলে হয়ত করা যেত, ডিনো বলল। কিন্তু এখন সেটা অসম্ভব।
গরম হয়ে এড বলল, গুপ্তধন বেরোক, এটা তুমি চাও না নাকি, চাচা?
গাল ফুলিয়ে বলল ডিনো, বেশ, কর বের। আমি আর কোন কথা বলব না।
বাওরাড ডাইয়ের চিঠিটা কোলের ওপর বিছিয়ে পাতলা জার্নালটা খুলল কিশোর। কাছে সরে এল রবিন, মুসা আর এড।
পাউডার গালচ থেকেই শুরু করা যাক, কিশোর বলল। নূস টিম্বার আর শ্রমিকের জন্যে পাউডার গালচে গিয়েছিলেন বাওরাড। খাবার কিনেছিলেন অনেক। তাতে মনে হয়, বেশ বড়সড় কাজের পরিকল্পনা করেছিলেন।
তারপর গিয়েছিলেন ক্যাবরিলো আইল্যাণ্ডে। কোন একটা প্রস্তাব দেন দ্বীপের মালিককে, তাতে রাজি হয় সে। তারপর নৌকায় মাল বোঝাই করে ফিরে আসেন। দ্বীপ থেকে কোন জিনিস আনেন এখানে।
তার পর, ড্যানিয়েল ব্রাদার্সদের কাছ থেকে কেনেন দশটা বর্গাকৃতি মনুমেন্ট স্টোনস।
আর সব শেষে, সান্তা বারবারার ডাইক কোম্পানির কাছ থেকে এনেছিলেন কোন জিনিস। এমন কিছু, যা জাহাজে দরকার হত। কারণ, একমাত্র জাহাজের মালই সরবরাহ করে ডাইক কোম্পানি। জিনিসটা, বা জিনিসগুলোর ওপর পিতলের প্লেট লাগানো, তাতে কোম্পানির নাম খোদাই করা।
হেসে উঠল ডিনো। কথা বলবে না বলেছে বটে, কিন্তু কিশোর থামতেই প্রতিজ্ঞা ভুলে বলে উঠল, গবেষণা তো ভালই করেছ। এসব দিয়ে এখন কি ভূত ধরবে?
তার কথার জবাব দিল না কেউ। কড়া চোখে একবার ডিনোর দিকে তাকিয়ে কিশোরের দিকে ফিরলেন মিসেস ডাই। তোমরা যাওয়ার পর সারা বাড়ি খুঁজেছি আমি। পিতলের কোন প্লেটে ডাইক কোম্পানির নাম দেখলাম না। জিনিসটা কি?
আমিও জানি না, কিশোর বলল।

বড় কিছু নিশ্চয়, এড বলল।
নূস টিম্বার আর শ্রমিক দিয়ে কি করল বাওরাড? প্রফেসরের প্রশ্ন। কোথায় গেল এত কাঠ?।
আর পাথরগুলোই বা কোথায়? রবিনেরও প্রশ্ন। দশটা পাথর ছোট জিনিস না যে সহজে লুকিয়ে ফেলবে।
এইই! কি মনে হতে চেঁচিয়ে উঠল মুসা। খনির শ্রমিকেরা সব চেয়ে ভাল কি পারে? কিশোর, তুমিই বল, সহজ ব্যাখ্যাগুলোর ওপর জোর দিতে। ওরা সব চেয়ে ভাল পারে মাটি খুঁড়তে। বড় গর্ত খুঁড়ে, পাথরগুলোর ভার রাখার জন্যে টিম্বার ব্যবহার করেছে হয়ত ওরা। হয়ত মাটির তলার কোন ঘরে।
পায়চারি করছিলেন প্রফেসর, মুসার কথায় থেমে গেলেন। গর্ত? মাটির তলার ঘরে?
কেন নয়? জোর দিয়ে বলল মুসা। মাটির তলার ঘরই গুপ্তধন লুকানোর আসল জায়গা। হয়ত ডাইক কোম্পানি থেকে জাহাজের লণ্ঠন কিনে এনেছিল বাওরাড ডাই। অন্ধকার ঘরে কাজ করেছে তো, বেশি আলোর প্রয়োজন ছিল।
তাহলে ক্যাবরিলো আইল্যাণ্ড থেকে কি এনেছিলেন? ভুরু নাচাল কিশোর। তাছাড়া, মাটির তলার ঘরে রাখলে নোরিয়ার জন্যে চমক হবে না, নতুন কোন ব্যবস্থা নয় ওটা। আগে আরও অনেকেই মাটির তলার ঘরে গুপ্তধন লুকিয়েছে। নোরিয়ার চমকের ওপরই বেশি জোর দিয়েছেন বাওরাড, তারপর গুপ্তধন।
আবার পায়চারি শুরু করলেন প্রফেসর। চলে গেলেন জানালার কাছে, ডিনো যেখানে বসেছে। এ-বাড়িতে ওরকম কোন ঘরের কথা জানেন, মিস্টার হ্যাংবার?
না, কাটা জবাব। যত্তোসব।
জানালা দিয়ে পুকুরটার দিকে তাকালেন প্রফেসর, আর কালো গাছগুলোর দিকে। ঘুরলেন হঠাৎ, চোখ উজ্জ্বল। মুসা, ঠিক বলেছ তুমি! স্কটল্যাণ্ডে পাহাড়পর্বতও যেমন আছে, গুহারও অভাব নেই। মিসেস ডাই, চিঠিতে বলা হয়েছে, বাওরাড বাড়িতে কি ভালবাসত মনে করে দেখার জন্যে। যদি
…ছেলেবেলায় গুহার ভেতর খেলার কথা বলে থাকে? প্রফেসরের কথাটা যেন মুখ থেকে কেড়ে নিল কিশোর। সেল নোরিয়ার জানার কথা!
এখানেও হয়ত তেমন একটা গুহা বানিয়েছে, প্রফেসর বললেন। ক্যাবরিলো আইল্যাণ্ড থেকে নিয়ে এসেছে পুরানো স্প্যানিশ আসবাবপত্র আর গালিচা, গুহায় সাজানোর জন্যে।
আর সেই সঙ্গে একটা আয়নাও! যোগ করল রবিন।
জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাল প্রফেসর। আমার মনে হয়, এইটাই জবাব,তুড়ি বাজালেন তিনি। কায়দা করে বানিয়েছে গুহা, যাতে গুহামুখটা চোখ এড়িয়ে

যায়। আর এড়াতে দেব না। কাল সকালে উঠেই আগে গুহাটা খুঁজে বের করব।
এখনই নয় কেন? মুসা বলল। বাতি তো আছেই।
মাথা নাড়লেন প্রফেসর। যা অন্ধকার, বাতি দিয়ে বের করা যাবে না। তাছাড়া সবাই এখন ক্লান্ত। দিনের ভাল হবে।
হ্যাঁ, মিসেস ডাই বললেন। গুপ্তধন তো পালাচ্ছে না। তাড়াহুড়োর দরকার নেই।
কিন্তু নোবল আর টিক পেছনে লেগে রয়েছে, এড প্রতিবাদ করল। কখন কি করে ফেলে।
রাতে ওরাও কিছু পাবে না, প্রফেসর বললেন।
ছেলেরাও বুঝতে পারছে সেকথা। কিন্তু এত লম্বা একটা রাত অপেক্ষা করা খুব কঠিন, উত্তেজনায় ঘুমই হবে না ওদের।
তাহলে ওই কথাই রইল, তিনি বললেন। কাল সকালে সবাই মিলে খুঁজতে যাব আমরা।
সবারই মধ্যে আমি নেই, দুহাত নাড়ল ডিনো। যত্তোসব পাগলামি।
প্রফেসর চলে গেলেন।
তিন গোয়েন্দা আর বোরিস ফিরে চলল রকি বীচে।
ট্রাকের পেছনে উঠেছে ছেলেরা। কিছুক্ষণ চলল নীরব যাত্রা। তারপর কিশোর জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, বল তো, গুহার নির্দেশক কি দিয়ে দিতে পারে?
বড় পাথর, মুসা বলল।
কিংবা গাছ, বলল রবিন। ডাইদের স্কটল্যাণ্ডের বাড়িতে আছে, তেমন দেখতে কোন গাছ।
হ্যাঁ, তা হতে পারে। আয়না! চেঁচিয়ে উঠল মুসা। পাথরে লাগানো থাকতে পারে, গাছে ঝোলানো থাকতে পারে। কোন বিশেষ জায়গায় দাঁড়ালে হয়ত নোরিয়ার চোখে পড়ত।
বাড়ির জানালায় থেকে নিজেকেই প্রশ্ন করল কিশোর। নাকি লজের টাওয়ারের মাথায় দাঁড়িয়ে?
জবাব মিলল না। – রকি বীচে ঢুকল ট্রাক।
একটা কথা মেলাতে পারছি না, আনমনে বলল গোয়েন্দাপ্রধান। লকের গোপন রহস্যের কথা ভাবতে বলেছেন বাওরাড। গোপন রহস্য মানে সেই ভূত, যে লকে শত্রু ঢোকে কিনা নজর রাখে। এর সঙ্গে গুহার মিল পাচ্ছি না। গুহাটা পেলেই হয়ত মানে বোঝা যাবে, আশা করল মুসা।
হয়ত।
রবিন আর মুসাকে যার যার বাড়িতে দিয়ে এল বোরিস। তারপর ঢুকল স্যালভিজ ইয়ার্ডে।

এত বেশি উত্তেজিত হয়ে আছে কিশোর, ঘুম নেই চোখে। শেষে হলঘরে চাচা-চাচীর কাছে এসে বসল। গরম চকলেট খেতে খেতে জানাল, সারাদিন কি কি করেছে, কোথায় কোথায় গেছে। চাচা কোন মন্তব্য করলেন না। চাচী বললেন, হ্যাঁ, গুপ্তধনের সঙ্গে গুহার মিলই বেশি।
বিছানায় শুয়েও ঘুম এল না তার। উঠে গিয়ে জানালায় দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে দেখল ক্রিস্টমাসের আলো।
ঘুম থেকে হঠাৎ জেগে গেল কিশোর। তড়াক করে উঠে বসল বিছানায়। চোখ মিটমিট করল কয়েকবার। জানালায় আলো নেই, বাইরে অন্ধকার। কিন্তু ঘড়িতে দেখা যাচ্ছে, সকাল আটটা। সকাল হয়েছে ঠিকই, বৃষ্টির জন্যে আলো ফুটতে পারছে না ঠিকমত। খুব জোরেসোরে নেমেছে।
কিন্তু বৃষ্টির কথা ভাবছে না কিশোর।
বিছানায় বসেই তাকিয়ে রইল দেয়ালের দিকে। ধাধার রহস্য ভেদ করে ফেলেছে সে।
কাপড় পরে মুসা আর রবিনকে ফোন করল কিশোর। পনের মিনিটের মধ্যে ইয়ার্ডে পৌঁছতে বলল। আমি একটা গাধা! বিড়বিড় করল সে। আস্ত গর্দভ! অনেক আগেই বোঝা উচিত ছিল। এডকে ফোন করল। সে ধরতেই বলল, এড? গুপ্তধন কোথায়, জানি। গাইতি, বেলচা আর রেনকোট নিয়ে তৈরি থাক। আমরা আসছি।
নিচে নেমে তাড়াতাড়ি কিছু খেয়ে নিল। দুধের গেলাসে সবে মুখ লাগিয়েছে, এই সময় বাজল টেলিফোন। প্রফেসর কেইন।
কিশোর? গুহাটার কথা অনেক ভাবলাম। কি করে চেনা...।
গুহা-টুহা নেই, স্যার। জবাব এখন আমার জানা।
কী? এত জোরে চিৎকার করে উঠলেন -প্রফেসর, কান থেকে রিসিভার সরাতে হল কিশোরকে। গুহা নেই? তাহলে কোথায়, কিশোর? জলদি বল।
ফ্যান্টম লেকে চলে আসুন। আমরাও যাচ্ছি। ওখানেই বলব।
দশ মিনিট পরেই এসে হাজির হল রবিন আর মুসা। আগেই ট্রাক বের করে রেখেছে বোরিস। সামনের সিটে গাদাগাদি করে বসল চারজন।
বল, কিশোর, রবিন বলল।
হ্যাঁ, বল, প্রতিধ্বনি করল যেন রবিন।
মুচকি হাসল কিশোর। ঘুমিয়ে ছিলাম। রবিনের একটা কথা ভাবছিলাম ঘুমানোর আগে। সকাল বেলা হঠাৎ পরিষ্কার হয়ে গেল সব।
কি বলেছিল রবিন?
বলেছিল, কোন বিশেষ গাছ লাগিয়েছে বাওরাড। হ্যাঁ, তা-ই করছে।

গাছ? বুঝতে পারছে না মুসা।
গাছ। যেটা দেখে বাড়ির কথা নোরিয়ার মনে পড়বে ভেবেছিল বাওরাড। ক্যাবরিলো আইল্যাণ্ড নিয়ে এসেছিল ওটা, বাঁকামেরা ভূতের মত দেখতে এক সাহপ্রেস। ভূতুড়ে হ্রদে ভূত এনে লাগিয়েছিল।
তারমানে, ফ্যান্টম লেকে গিয়ে এখন পুরানো ভূতটাকে খুঁজে বের করলেই হল? রবিন বলল।
কিন্তু কোথায় খুঁজব? মুসা বলল। গাছ কি একটা দুটো? ফ্যান্টম লেকে গাছের জঙ্গল।
ভাব ভালমত, মাথা খাটাও, হাসল কিশোর। খনি-শ্রমিক, সুস, টিম্বার, পাউডার গালচ। তুমিই তো বললে, ওরা সবচেয়ে ভাল পারে মাটি খুঁড়তে। গর্ত। আর মূস টিম্বারের ব্যাপারে একটা অতি জরুরি তথ্য উপেক্ষা করে গেছি আমরা। কেন ওই জিনিস আনতে গেল বাওরাড? কেন সাধারণ তক্তা নয়, বা মাইনিং টিম্বার নয়?
কেন, বল?
কারণ, স্লূস টিম্বার বিশেষ ভাবে কাটা হয়, পানি ধরে রাখার জন্যে। চতুর বাওরাড করেছে উল্টোটা। পানি ঠেকিয়ে রাখার জন্যে ব্যবহার করেছে।
কোথায়? উত্তেজনায় প্রায় কাঁপছে রবিন।
বিরাট গর্তটায়, শ্রমিকরা যেটা খুঁড়েছে। খোঁড়ার সময় পানি ওঠে, সেটা ঠেকানোর জন্যেই ব্যবহার হয়েছে মূস টিম্বার। পাথরগুলোকে ধাপে ধাপে সাজিয়ে সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করেছে। মুসা, তোমার কথাই ঠিক। ডাইক কোম্পানি থেকে লণ্ঠনই কেনা হয়েছে।
দ্বীপটা! একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল রবিন আর মুসা।
হ্যাঁ। এটাই নোরিয়ার চমক। সবাই ভেবেছে, দ্বীপওয়ালা পুকুরটা দেখেই বাওরাড জায়গা পছন্দ করেছে, বাড়ি করেছে, স্কটল্যাণ্ডের বাড়ির মত দেখায় বলে। আসলে তা নয়। দ্বীপটা বানানো হয়েছে, স্কটল্যাণ্ডে যেটা আছে সেটার নকল।
নিশ্চয় ছোট একটা উপদ্বীপ মত ছিল প্রথমে, পুকুরে নেমে এসেছিল ওটা। সেটা কেটে মূল ভূখণ্ড থেকে আলাদা করার সময়ই ব্যবহার হয়েছে স্লুস টিম্বার, কাটা জায়গায় পাথরগুলো ফেলে আবার ছেড়ে দেয়া হয়েছে পানি। দ্বীপে একটা দণ্ডের মাথায় লণ্ঠনটা লাগিয়ে দিয়েছে বাওরাড। সাইপ্রেসটা পুঁতেছে স্কটল্যাণ্ডের ভূতের গুজব মনে করিয়ে দেয়ার জন্যে, অবশ্যই নোরিয়াকে।
বাড়িতে যা ভালবাসত বাওরাড, সেটারই একটা খুদে সংস্করণ তৈরি করেছে ফ্যান্টম লেকে। ওটাই নোরিয়ার জন্যে চমক। একটানা এতগুলো কথা বলে দম নেয়ার জন্যে থামল কিশোর। তারপর, লিটল মারমেইডের ক্যাপ্টেন আর

দোসররা যখন উদয় হল, দ্বীপটাতে গুপ্তধন লুকিয়ে ফেলল সে। সূত্র হিসেবে রেখে গেল চিঠি, আর দ্বিতীয় জার্নালটা।
বাওরাডের ধাধা, আর কিশোরের সমাধান ক্ষমতা স্তব্ধ করে দিয়েছে দুই সহকারীকে। কে বেশি চালাক? বাওরাড, না কিশোর পাশা, ভেবে ঠিক করতে পারছে না ওরা।
দ্বীপটা প্রাকৃতিক নয় কেউ বুঝতে পারেনি? অবশেষে বলল রবিন।
না। খনির শ্রমিকেরা ছিল ভাসমান, আজ এখানে কাল ওখানে। যেখানেই কাজ পেত, চলে যেত, অনেকটা যাযাবর। আমার স্থির বিশ্বাস, ওদের কাছ থেকে কেউ কোন সাহায্য পায়নি-যারা পরে গুপ্তধন খুঁজেছে। হয়ত কোন শ্রমিকেরই দেখা পায়নি তারা। বাওরাডের বংশধরেরাও ভেবেছে দ্বীপটা প্রাকৃতিক, ফলে নজর দেয়নি ওটার দিকে। শ্রমিকদের কথা ভাবতে পারেনি, কারণ, দ্বিতীয় জার্নালটাই হাতে পড়েনি কারও।
আমরা পেয়েছি! বুকে চাপড় মারল মুসা। এবার গুপ্তধনও খুঁজে বের করব।
হ্যাঁ, করব, ঘোষণা করল কিশোর।
একটা কথা এখনও বুঝতে পারছি না, কিশোর, রবিন বলল। আয়নার মধ্যে দেখ বলে কি বোঝানো হয়েছে? …
পুকুরটাকে আয়না বোঝানো হয়নি তো? বলল মুসা। পানিতেও তো প্রতিবিম্ব দেখা যায়।
ওখানে গেলেই বুঝতে পারব, কিশোর বলল। পুকুর, না…।
হঠাৎ ব্রেক কষল বোরিস। পেছনে বুকে গেল ছেলেদের মাথা। আলোচনায় এতই মগ্ন ছিল, পথের দিকে চোখ ছিল না কারও। এখন দেখল। দেখেই পাশের দরজা খুলে হুড়াহুড়ি শুরু করে দিল বেরোনোর জন্যে। বোরিস ইতিমধ্যে বেরিয়ে গেছে।
পথের আর একটা মোড় ঘুরলেই ডাই লজ। মোড়ের ওপাশে না গেলে বাড়িটা দেখা যায় না। ওখানে, পাহাড়ের পাথুরে কাধে একগুচ্ছ পাইন গাছের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রফেসরের স্টেশন ওয়াগন। ড্রাইভারের পাশের দরজা খোলা, সিটে বসে আছেন প্রফেসর। তার গায়ের ওপর প্রায় ঝুঁকে দাঁড়িয়েছে এড।
কি হয়েছে, প্রফেসর? উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল বোরিস।
নাহ, তেমন কিছু না, চোয়ালে হাত বোলালেন প্রফেসর। ছেলেদের দিকে তাকালেন। টিক বানাউ। কয়েক মিনিট আগে এসেছি, দেখি, রাস্তার ওর দাঁড়িয়ে আছে। তার সঙ্গে কথা বলতে গেলাম। কিছুই শুনল না, ঘুসি মেতে আমাকে ফেলে দিয়ে বনে ঢুকে পড়ল।
টিক বানাউ? কিশোর বলল। তাহলে এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করা যাবে। আর! এড, চল। কুইক।

বৃষ্টির মধ্যেই ওদেরকে পুকুরটার দিকে যেতে দেখলেন মিসেস ডাই। প্রফেসরের কাঁধে গাঁইতি, বেলচা। ডেকে বললেন, এড, সাবধানে থাকিস, বেশি ভিজিস না।
মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল ছেলেরা। দ্রুত ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে এসে দাঁড়াল পুকুরের পাড়ে। পানিতে পড়ে থাকা মসৃণ পাথরগুলো মৃদু চকচক করছে, এগুলো দিয়েই সিঁড়ি বানিয়েছে বাওরাড। এক সারিতে পাথরগুলোর ওপর দিয়ে। এগিয়ে চলল দলটা, দ্বীপে উঠল। পাইন গাছে ছাওয়া খুদে দ্বীপ। চওড়ায় বড়জোর শখানেক ফুট হবে। তার মধ্যেই দুটো ছোট পাহাড়, তিরিশ ফুট, আর চল্লিশ ফুট উঁচু।
গুজব রয়েছে, কিশোর বলল। পাহাড়ে দাঁড়িয়ে লেকের ওপর চোখ রাখে ভূত। কাজেই দ্বীপের ওই ওদিকটায় গাছ খুঁজতে হবে। যেহেতু পাহাড়ের ওপর দাঁড়ায় ভূত, সেহেতু ভূতের মত দেখতে গাছটাও রয়েছে কোন উঁচু জায়গায়।
ঝরঝর করে পানি গড়িয়ে পড়ছে ওদের হ্যাট, কোর্ট থেকে, গলা বেয়ে ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে পানি। দ্বীপের একেবারে প্রান্তে যে পাহাড়টা, ওটার ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল ওরা। বীকনটা রয়েছে চূড়ায়, দণ্ডের মাথায় ঝুলছে লণ্ঠন।
লণ্ঠনটা পরীক্ষা করল মুসা। চেঁচিয়ে উঠল, এই তো, আছে। পিতলের প্লেট, ডাইক কোম্পানির নাম খোদাই করা।
গাছটা খোঁজ, কিশোর বলল।
খোঁজার প্রায় দরকারই পড়ল না, তাকাতেই চোখে পড়ল। হাত তুললেন প্রফেসর। ওই তো।
বীকন থেকে পনের ফুট দূরে। বাঁকাচোরা সাইপ্রেস, ক্যাবরিলো আইল্যাণ্ডে যে-রকম দেখে এসেছে ওরা, সে-রকম। বৃষ্টির মধ্যে সত্যিই যেন একটা ভূত, কিংবা বলা উচিত ভূতুড়ে মানুষ–কিত মাথা, শুকনো লম্বা একটা হাত তুলে। রেখেছে। সাগর থেকে এসে চ্যানেলে ঢুলে পড়া ভাইকিংদের দেখাচ্ছে যেন।
দেখ, দ্বীপের যে অংশটা মূল ভূখণ্ড থেকে কেটে খাল বানানো হয়েছে সেদিকে দেখাল মুসা। পাড়ে কত বড় বড় গাছ। এজন্যেই বাড়ি থেকে সাইপ্রেসটা দেখা যায় না।
এখন যায় না, কিশোর বলল। তবে বাওরাড যখন লাগিয়েছিলেন তখন পুকুর পাড়ে গাছ এত বড় ছিল না। ছিল কিনা, তাতেও সন্দেহ আছে। তখন নিশ্চয় দেখা যেত। তবে সাইপ্রেস বাড়ে খুবই কম। একেবারে বামন-গাছ বলা চলে এগুলোকে। এক ফুট লম্বা হতেই একশো বছর লাগে।
হয়েছে, হাত নাড়ল মুসা। উদ্ভিদ বিজ্ঞানে আগ্রহ নেই আমার। কোন জায়গা থেকে খুঁড়ব? সাইপ্রেসটার চারপাশে ঘুরল রবিন। খোঁড়ার চিহ্ন নেই, কিশোর। টিক বানাউ আসেনি।

চল, মুসা, বোরিসের কাঁধ থেকে গাইতি নেয়ার জন্যে হাত বাড়াল এড গাছের গোড়ার চারপাশে...।
বাধা দিল কিশোর, না এখানে নয়।
সবগুলো চোখ একযোগে ঘুরে গেল তার দিকে।
কিন্তু চিঠিতে বলা হয়েছেঃ ভাব লকের গোপন রহস্যের কথা, প্রফেসর বললেন। তারমানে ভূত ভূতটার কাছেই দেখতে বলা হয়েছে।
চিঠিতে তো আয়নার মধ্যেও দেখতে বলা হয়েছে, মনে করিয়ে দিল কিশোর। ভূতটাকে আয়নার মধ্যে দেখতেই বলা হয়েছে, আমার বিশ্বাস।
কিন্তু এখানে আয়না কই! চারপাশে তাকাতে লাগল মুসা।
নেই। আয়না বলে আসলে আয়নার মত বোঝাতে চেয়েছে। আয়নায় প্রতিবিম্ব দেখা যায়। ওই প্রতিবিম্বকে ব্যবহার করেই হয়ত গুপ্তধন বের করতে বলেছে।
গাছটার দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। ভূত নির্দেশ করছে পুকুরের দিকে। দেখা যাক, পুকুরে ভূতের প্রতিবিম্ব, বা ছায়া দেখা যায় কিনা।
সাইপ্রেসের কাছে দাঁড়িয়ে, ওটার নির্দেশিত দিকে তাকাল ছেলেরা।
যা বৃষ্টি, রবিন বলল। কিছুই তো দেখি না।
দেখি, এড, তোমার টর্চটা, হাত বাড়াল কিশোর।
সাইপ্রেসের লম্বা বাহুটায় আড়াআড়ি ভাবে টর্চটা ধরল সে, সুইচ টিপল। বৃষ্টির চদর খুঁড়ে যেন বেরিয়ে গেল উজ্জ্বল আলোকরশ্মি। পড়ল গিয়ে সমতল একটা জায়গার ওপর, ঘন ঝোপ ওখানে। সেদিকে তাকিয়ে হঠাৎ চিৎকার করে উঠল সে, চল! জলদি চল।
প্রতিবিম্ব কোথায়...। মুসা কথা শেষ করতে পারল না।
চেঁচিয়ে উঠল গোয়েন্দাপ্রধান, প্রতিবিম্ব চুলোয় যাক, জলদি এস, বলেই ঢাল বেয়ে দৌড় দিল জায়গাটার দিকে। ঘন ঝোপঝাড়ের ভেতরে সমতল জায়গাটা এমনই, এমনিতে দেখে বোঝার কোন উপায় নেই, ওখানে মাটির নিচে কিছু লুকানো রয়েছে। এখন দেখা গেল, ডালপালা ভাঙা, মাটিতে একটা গর্ত। সদ্য খোঁড়া।
নিয়ে গেছে! কেঁদে ফেলবে যেন এড।
তোমার আগেই কেউ আন্দাজ করে ফেলেছিল, কিশোর, গুঙিয়ে উঠল মুসা।
গর্তের কিনার থেকে পিতলের একটা বোতাম কুড়িয়ে নিলেন প্রফেসর। টিক বানাউ। এজন্যেই আমাকে মেরে দৌড়ে পালিয়েছে। নিয়ে গেছে গুপ্তধন।
পুলিশকে জানানো দরকার, বলেই দৌড় দিল বোরিস।
লজে ফিরে এল ওরা। ইয়ান ফ্লেচারকে ফোন করতে বলল মিসেস ডাইকে কিশোর। প্রফেসরকে বলল, স্যার, চলুন। যেখানে আপনাকে মেরেছিল, সেখানে

ভালমত খুঁজে দেখি। কিছু ফেলেটেলে গেল কিনা। কোথায় গেছে হয়ত আন্দাজ করা যাবে।
প্রফেসরের গাড়ির কাছে খুঁজতে লাগল ওরা। মাঝে মাঝে টর্চ জ্বালছে, ভাল করে দেখার জন্যে। কিছুই পাওয়া গেল না। গাড়ি থেকে খানিক দূরে একটা জায়গা দেখালেন তিনি। কাদা হয়ে আছে, তাতে বুটের ছাপ, চলে গেছে সোজা হাইওয়ের দিকে।
জোরে নিঃশ্বাস ফেললেন প্রফেসর। নিশ্চয় গাড়ি রেখে এসেছিল। গেল বোধহয়! আর ধরা যাবে না।
বুটের ছাপগুলো পরীক্ষা করল কিশোর। ছাপগুলো তেমন দাবেনি। স্যার, ওর হাতে কিছু ছিল? দেখেছেন?
না, ছিল না। হাত খালি। গুপ্তধনগুলো নিশ্চয় গাড়িতে রেখে কিছু নিতে ফিরে এসেছিল। আফসোস করলেন, গেছে, পালিয়েছে। আর ধরা যাবে না।
হ্যাঁ-না কিছু বলল না কিশোর। আবার স্টেশন ওয়াগনের কাছে ফিরে আসতে আসতে ঝট করে মাথা তুলল। ডিনো কোথায়?
ডিনো? এড বলল। সারা সকালই দেখিনি। থাকে না কোনদিনই। মর্নিং ওয়াকে যায়।
ঝিক করে উঠল কিশোরের চোখ। এড, মাত্র একবছর হল ও এসেছে। কিভাবে এল?
কিভাবে?...জাস্ট চলে এল। স্কটল্যাণ্ডে আমাদের আত্মীয়দের কাছ থেকে একটা চিঠি নিয়ে। আমাদের পুরানো বাড়ির সবাইকে চেনে ও, পরিবারের সব কথা জানে।
ওরকম যে কেউ জেনে নিতে পারে, মুসা বলল। কিশোর, টিক বানাউয়ের সঙ্গে কাজ করছে না তো ডিনো? নাকি সে-ই টিক, ছদ্মবেশে রয়েছে?
লম্বা-চওড়া তো একই রকম, থাকতে অসুবিধে নেই। তাছাড়া, গোড়া থেকেই গুপ্তধন খোঁজায়, বাধা দিয়েছে আমাদের। দুবার আমাদের কাছ থেকে জার্নাল ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করেছে টিক, দুবারই তখন লজে অনুপস্থিত ছিল ডিনো। ভূতুড়ে শহরেও টিক বানাউ পালিয়ে যাওয়ার পর পরই এসে হাজির হয়েছিল সে।
আড়তে আমাদের নিয়ে গিয়েছিল, রবিন বলল। কাজেই জানা ছিল আমরা কোথায় গেছি। ড্যানিয়েলদের ওখানে যা যা জেনে এসেছি, ও শুনেছে আমাদের মুখে। আমাদের ছাউনিতে আটকে রেখে ফিরে এসে স্মোকহাউসটা ভাঙা সহজ ছিল তার জন্যে। তখনও জানত না সে, কোন ধরনের পাথর কিনেছিলেন বাওরাড।
কিন্তু ছাউনিতে তো শুধু নোবলকে দেখলাম, প্রফেসর বললেন।

হ্যাঁ, মাথা ঝাঁকাল কিশোর। কিন্তু নোবল দরজার তালা খোলার চেষ্টা করেছে প্রথমে। সে-ই জানালা আটকে থাকলে দরজা খুলতে যাবে কেন? তার জানাই থাকার কথা দরজা বন্ধ। আর...। কি যেন ভাবল গোয়েন্দাপ্রধান। বন্ধুদের দিকে তাকাল। লজের ছাউনিতে আগুন লাগার সময় কি কাউকে পালাতে দেখেছি আমরা?

পরস্পরের দিকে তাকাল রবিন, মুসা আর এড। কেউ দেখেনি।

আমিও দেখিনি, কিশোর বলল। আমরা ছুটে গেছি, কারণ, ডিনো আমাদের বলেছে সে চোর দেখেছে। কিন্তু সত্যি কি দেখেছে ডিনো?

তুমি কি বলতে চাইছ ডিনোই আগুন লাগিয়েছে? রবিন জিজ্ঞেস করল। টিককে দেখেছে বলে সন্দেহমুক্ত হতে চেয়েছে? কারণ সে নিজেই টিক বানাউ বলে?

এড মনে করিয়ে দিল, প্রফেসরও তো একটা লোককে দৌড়ে যেতে দেখেছেন।

এবং লোকটা নোবল, বলল কিশোর। স্যার, সত্যি কি নোবলকেই দেখেছিলেন? নাকি ভুল করে বানাউকে নোবল বলেছেন?

হতেও পারে, ধীরে ধীরে বললেন প্রফেসর। সারাক্ষণই নোবলের কথা ভাবছিলাম, তাছাড়া তাড়াহুড়া, উত্তেজনা, ভুল হতেই পারে মানুষের। ডিনো বলেছে, টিককে দেখেছে। আমার মনে হয়েছে, টিক নয়, নোবল। নী-হে, এখনও মনে হচ্ছে আমার, নোবলকেই দেখেছি।

ডিনোই চোর, বলে উঠল মুসা। ডিনোই তুলে নিয়ে গেছে...।

বৃষ্টির মধ্যে গর্জে উঠল একটা কণ্ঠ, কি নিয়ে গেছে ডিনো? রাস্তায় দাঁড়িয়ে ওদের দিকে কড়া চোখে তাকিয়ে আছে স্কটসম্যান।

আ-আপনি! ঢোক গিলল কিশোর। এতই চমকে গিয়েছে, স্টেশন ওয়াগনের হঙ-এ ভর দিয়ে নিজেকে স্থির রাখতে হল। হাত থেকে পড়ে গেল টর্চ। তোলার জন্যে ঝুঁকল।

বোরিস, আদেশ দিলেন প্রফেসর, ধর ব্যাটাকে!

সোজা হল কিশোর। চৌখে অদ্ভুত দৃষ্টি। বিস্মিত। আবার ভর দিল প্রফেসরের গাড়িতে।

না, বোরিসভাই, বলল সে। ধরার দরকার নেই। আমার ভুল হয়েছে।

কিশোরের দিকে তাকিয়ে দ্বিধা করছে বোরিস।

ওর কাছে থাক, বললেন প্রফেসর। খবরদার, যেন পালাতে না পারে। ...কিশোর, কি ভুল করেছ? ভালই তো যুক্তি দেখাচ্ছিলে, ডিনো চোর।

আড়তে ও-ই আমাদের আটকেছিল, কিশোর, মুসা জোর দিয়ে বলল।

ছাউনিতে আগুন দিয়েছে। স্মোকহাউস গুড়িয়েছে, রবিন বলল।

ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ডিনো। কী? তোমরা আমাকে...।

খপ করে ডিনোর হাত চেপে ধরল বোরিস। নড়বে না।
ছাউনি পুড়িয়েছে, তোমাদেরকে আড়তের ছাউনিতে আটকেছে, স্মোকহাউসে খুঁজেছে, গুপ্তধন খুঁজতে আমাদের বাধা দিয়েছে, সবই ঠিক। মাথা নাড়ল কিশোর, কিন্তু সে টিক বানাউ নয়। গুপ্তধনও পায়নি।
তুমি না বললে সব কিছুর মূলে টিক আর নোবল? প্রফেসর বললেন।
টিক বানাউয়ের কথা বলতে পারেন, মাথা কাত করল কিশোর। কিন্তু নোবল নয়। গুপ্তধন চায়নি সে। বরং কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের সাহায্যই করেছে। চুরি করে হেডকোয়ার্টারে ঢুকেছিল জার্নাল নিয়ে গিয়ে আমাদের থামানোর জন্যে নয়, ওটার ছবি তুলতে। এটা ঠিক, টিক আর নোবলকে কাছাকাছি থাকতে দেখেছি আমরা। থাকবেই। কারণ টিক আর আমাদেরকে অনুসরণ করেছে নোবল। সান্তা বারবারায় আমাদের সঙ্গে জরুরি আলোচনা করতে চেয়েছিল। কিন্তু আমরা তাকে বিশ্বাস করিনি, পাত্তা দিইনি, বরং পুলিশের ভয় দেখিয়েছি। এখন বোঝা যাচ্ছে, সেই ছেলেটাকে বোরিসের কাছে সে-ই পাঠিয়েছিল, আমরা বিপদে পড়েছি একথা জানাতে। আড়তে গিয়েছিল রবিন আর মুসাকে মুক্ত করতে।
তাহলে কি টিক বানাউ একা? মুসার প্রশ্ন।
হ্যাঁ, শান্তকণ্ঠে বলল কিশোর।
তোমার কথার মাথামুণ্ড কিছুই বুঝছি না, এড বলল।
টিক বানাউ লোকটা আজব। বোঝাতে চেয়েছে সে বাইরে থেকে এসেছে, এই এলাকায় নতুন, অথচ কাজেকর্মে বোঝা গেছে প্রায় সব কিছুই চেনে সে। রবিন হিসটোরিক্যাল সোসাইটি থেকে ফেরার পর পরই স্যালভিজ ইয়ার্ডে উদয় হয়েছে টিক। আমরা যেদিন ক্যাবরিলো আইল্যাণ্ডে গেছি, সেদিন হানা দিয়েছে সোসাইটিতে। কেন? পুরানো রেকর্ড জানতে, সান-প্রেস অফিসে না গিয়ে, সরাসরি চলে গেছে আলফ্রেড পেরিংটনের বাড়িতে। লেখকের খবর জানল কিভাবে?
ঠিকই তো, রবিন বলল। টিক জানল কি করে?
আলফ্রেড পেরিংটনের নাম জানে সে, রবিন, কারণ, আমাদের এই এলাকা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ টিক। প্রফেসরের দিকে তাকাল কিশোর। ভূতুড়ে শহরে টিক গায়েব হওয়ার পর শুধু ডিনোই নয়, আপনিও হাজির হয়েছিলেন। এই এলাকার লোকাল হিস্টরিতে বিশেষজ্ঞ আপনি। আপনিই টিক বানাউ, এবং আজ সকালে গুপ্তধনগুলো তুলে নিয়ে গেছেন।
হেসে উঠলেন প্রফেসর। সত্যি, কিশোর, একেবারে চমকে দিয়েছ আমাকে। ভাল অভিনয় জান।
না, অভিনয় করছি না আমি।

তাহলে ভুল করেছ। আমার সাইজ আর টিক বানাউয়ের সাইজ এক না।
লম্বায় একই। কিছু বেশি মোটা। ওটা কিছু না। নাবিকদের ভারি জ্যাকেট, পা-জ্যাকেট পরলেই আপনাকে ওরকম মোটা দেখাবে।
আজ সকালে তাহলে চুরি করলাম কখন? বিছানা থেকে উঠেই তোমাকে ফোন করেছি।
কাল সন্ধ্যায়, কিশোর বলল। মুসা যখন রাতেই গুপ্তধন খুঁজতে যাবার কথা বলল, আপনি রাজি হননি। কারণ, আমার আগেই বুঝে ফেলেছেন, কোথায় গুপ্তধন লুকানো আছে। রাতে ফিরে এসেছেন আবার। সম্ভবত, আমার মতই টর্চের সাহায্যে জায়গা আবিষ্কার করেছেন। অন্ধকার ছিল, তার ওপর বৃষ্টি। পানিতে ছায়া দেখে, সেটা কোনখানে নির্দেশ করে বোঝা সম্ভব ছিল না। তাই টর্চ ব্যবহার করেছেন। খুঁড়ে তুলতে তুলতে সকাল হয়ে গিয়েছিল। ফেরার পথে লজে ফোন বাজতে শুনলেন। আড়ি পাতলেন গিয়ে। এড তখন আমার সঙ্গে কথা বলছে।
বুঝে ফেললেন, আমি জেনে ফেলেছি কোথায় আছে গুপ্তধন। সকালে এখানে আপনার আসার কথা, যদি না আসেন সন্দেহ করব। তাই একটা চালাকি করলেন। কোথাও গিয়ে একটা ফোন করে আবার এসে এখানে গাড়িতে বসে রইলেন। ভাব দেখালেন, আহত। গল্প তৈরি করলেন, টিক বানাউ আপনাকে মেরে গুপ্তধন নিয়ে পালিয়েছে। পুলিশ রহস্যময় টিক বানাউকে খুঁজে সময় নষ্ট করবে, ঘুণাক্ষরেও, সন্দেহ করবে না আপনাকে, এটাই ভেবেছিলেন।
কাদার ওপর ওই বুটের ছাপও আপনার সৃষ্টি।
সবার চোখ এখন প্রফেসরের দিকে।
সাইরেনের শব্দ শোনা গেল। পুলিশ আসছে।
প্রমাণ করতে পারবে এসব? হেসে জিজ্ঞেস করলেন প্রফেসর।
পারব, স্যার। কারণ মস্ত একটা ভুল করে ফেলেছেন। আপনি বলেছেন, আজ সকাল আটটায় আপনি বাড়িতে ছিলেন। আমরা আসার কয়েক মিনিট আগে, এখানে এসেছেন। জোর বৃষ্টি হচ্ছিল অনেক আগে থেকেই।
বৃষ্টি? আবার হাসলেন প্রফেসর। তাতে কি...?।
আপনার গাড়ির নিচের মাটি অনেক জায়গায় শুকনো, প্রফেসরের হাসিটা ফিরিয়ে দিল কিশোর। ইঞ্জিন ঠাণ্ডা। আটটার অনেক আগে থেকেই গাড়িটা ছিল এখানে। বৃষ্টির আগে থেকে।
চোখের পলকে ঘুরে বড় রাস্তার দিকে দৌড় দিলেন প্রফেসর। কাছে এসে গেছে সাইরেন। গাছের ধার দিয়ে ছুটেছেন তিনি, আচমকা বনের ভেতর থেকে তাঁর ওপর লাফিয়ে পড়ল একটা মূর্তি। তাঁকে নিয়ে গড়িয়ে পড়ল মাটিতে। বুকে চেপে

বসল। – পৌঁছে গেল পুলিশের গাড়ি। ব্রেক কষল। লাফিয়ে নামল দুজন পুলিশ, প্রফেসর আর তাঁর হামলাকারীকে ধরে ফেলল।
বোরিস, ডিনো আর ছেলেরা দৌড়ে এল সেখানে। ভুরু কুঁচকে প্রফেসর আর নোবলের দিকে তাকিয়ে আছেন চীফ ইয়ান ফ্লেচার।
ব্যাপার কি, কিশোর? জিজ্ঞেস করলেন তিনি। এই লোকটাই কি নোবল? চোর?
হ্যাঁ, আমিই নোবল, ভেজা এলোমেলো চুল ঝাঁকাল তরুণ। কিন্তু আমি চোর নই। চোর হল গিয়ে আপনাদের এই সম্মানিত প্রফেসর।
নোবল ঠিকই বলেছে, চীফ, কিশোর বলল। প্রফেসর হারম্যান কেইনই চোর। সংক্ষেপে কয়েক কথায় সব বুঝিয়ে দিল ফ্লেচারকে। শেষে বলল, আমার মনে হয়, নোবল চোর ছিল না কখনই। গুপ্তধনের পেছনে লেগেছেন প্রফেসর, এটা জেনে গিয়েছিল হয়ত, আর প্রফেসরও বুঝেছিলেন সেকথা। তাই কায়দা করে তাকে ফাঁসিয়ে দিয়ে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিয়েছেন। পুলিশও বোকার মত নিয়ে গিয়ে বেচারাকে জেলে ভরেছে।
তুমি ঠিকই বলেছ, নোবল বলল। তখনই কসম খেয়েছি আমি, প্রতিশোধ নেব। প্রফেসরকে ধরিয়ে দেবই।
মস্ত ঝুঁকি নিয়েছ, চীফ বললেন। ওকে ধরতে না পারলে ভয়ানক বিপদে পড়তে। এমনিতেই প্যারোলে বেরিয়েছ। আবার চুরি করে লোকের বাড়িতে ঢুকেছ জানলে বড় রকমের শাস্তি হয়ে যেত। প্রফেসরের দিকে তাকিয়ে জ্বলে উঠল চোখ। প্রফেসর, জিনিসগুলো দিয়ে দিন ভালয় ভালয়। শাস্তি তাহলে কিছুটা রেয়াত হবে।
হাত নাড়লেন প্রফেসর, কাঁধ ঝাঁকালেন নিরাশ ভঙ্গিতে। মলিন হাসি হাসলেন। কি আর করা? কিশোর পাশা আমাকে এক মস্ত মার দিল। গাড়ির পেছনের সিটের নিচে লুকিয়ে রেখেছি।
গাড়িতে উঠল দুজন পুলিশ। সিট সরাতে বেরোল একটা পা-জ্যাকেট, একটা নাবিকের টুপি, কাদামাখা বুট, ভারি ট্রাউজার, আর একটা রবারের মুখোশ, তাতে টিক বানাউয়ের কালো দাড়ি আর কাটা দাগ।
ওগুলোর দিকে নজর নেই কারও। তাকিয়ে আছে সিটের নিচে রাখা চকচকে জিনিসগুলোর দিকে। আঙটি, হার, ব্রেসলেট, মূল্যবান পাথর বসানো সোনার বাটওয়ালা ছোরা, পাথর খচিত সোনার কৌটা, আর কয়েকশো সোনার মোহর। জলদস্যুদের লুটের মাল।
খাইছে! নিঃশ্বাস ভারি হয়ে গেছে মুসার। কয়েক লাখ ডলারের মাল।
ফ্যানটাসটিক! বললেন চীফ।
বিশ্বাসই হচ্ছে না! বিড়বিড় করল ডিনো।

হাসি চলে গেছে প্রফেসরের। চিৎকার করে বললেন, ওগুলো আমার, শুনছ? সব আমার। আমি চোর নই। বাওরাড ডাইই ছিল চোর। আমাদের কাছ থেকে চুরি করেছিল। আমি…আমি লিটল মারমেইডের ক্যাপ্টেনের বংশধর।
সেটা আদালত বিচার করবে, কঠিন কণ্ঠে বললেন চীফ। প্রায় একশো বছর পর আপনার দাবি প্রমাণ করতে পারবেন কিনা, সন্দেহ। ক্যাপ্টেনও নিশ্চয় চুরি করেছিল। নাহলে সাধারণ এক সওদাগরী জাহাজের ক্যাপ্টেন এত দামি মাল পেল কোথায়? লুট করেছিল কিনা তা-ই বা কে জানে? আমার রায় বলতে পারি, এখন ওই জিনিস মিসেস ডাইয়ের প্রাপ্য। ওগুলো তুলে নেয়ার দায়ে না হলেও, লোকের বাড়িতে চুরি করে ঢোকার দায়ে, লোককে মারার দায়ে, জেলে আপনাকে যেতেই হবে।
নিরপরাধ নোবলকে ফাঁসানোর বিচার হবে না? রবিন প্রশ্ন তুলল। নিশ্চয় হবে।
নিয়ে যাও, নিজের লোককে আদেশ দিলেন চীফ।
পুলিশের গাড়িতে তোলা হল প্রফেসরকে।
গুপ্তধন নেয়ার জন্যে থলে আনতে ঘরে গেল এড। কয়েক মিনিট পরেই ফিরে এল। দৌড়াতে দৌড়াতে তার পেছনে এলেন মিসেস ডাই। গুপ্তধন তাহলে মিলল! হাঁপাচ্ছেন তিনি। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছেন না।
এগুলো আমাদের, মা! চেঁচিয়ে উঠল এড। আর গরিব থাকব না আমরা।
হাসলেন মিসেস ডাই। সেটা পরে দেখা যাবে, তিন গোয়েন্দার দিকে চেয়ে বললেন। অনেক ধন্যবাদ তোমাদেরকে। তোমরা সত্যিই গোয়েন্দা, কাজের ছেলে!
হাসি ছড়িয়ে পড়ল তিন গোয়েন্দার মুখে।
কিশোর, মুসা বলল। একটা কথা বুঝতে পারছি না। ডিনো ছাউনি পোড়াতে গেল কেন? আর আমাদেরকেই বা আটকে রাখল কেন আড়তে?
ডিনোর দিকে চেয়ে হাসল কিশোর। আরেক দিকে চোখ সরিয়ে নিল টসম্যান। আমার মনে হয় ডিনো আংকেল বিয়ে করতে চায়। তার ভয়, গুপ্তধন পেয়ে ধনী হয়ে গেলে, তাকে আর বিয়ে করবেন না মিসেস ডাই।
অবাক হয়ে ডিনোর দিকে তাকালেন মিসেস ডাই।
লাল হয়ে গেল স্কটসম্যানের চেহারা।
হাসি ফুটল মিসেস ডাইয়ের মুখে। ডিনো, কখনও কিন্তু বলনি আমাকে। বুঝিইনি কিছু।
তাদের দিকে চেয়ে হেসে উঠল সবাই, এমনকি এডও।
আরও লাল হল ডিনো।
বিশাল ডেস্কে কনুই রেখে ঝুঁকে বসলেন বিখ্যাত চিত্রপরিচালক মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফার। চমকপ্রদ আরেক কাহিনী নিয়ে তাঁর অফিসে আবার এসেছে তিন

গোয়েন্দা।
প্রায় একশো বছর পর তাহলে পাওয়া গেল গুপ্তধন, বললেন তিনি। আরেকবার অসম্ভবকে সম্ভব করলে। ভাল একটা ছবি তৈরি করা যাবে। এখন বল তো, প্রফেসর কেইন কি সত্যি লিটল মারমেইডের ক্যাপ্টেনের বংশধর?
হ্যাঁ, স্যার, কিশোর জবাব দিল। ইতিহাসের প্রফেসর তিনি সত্যিই। জোয়ান বয়েসে ভাল নাবিক ছিলেন। ইতিহাস আর সাগরের নেশাই তাকে নিজের পরিবারের অতীত জানতে প্রেরণা জুগিয়েছে। জেনেছেন গুপ্তধনের কথা। সোসাইটিতে চাকরিই নিয়েছিলেন ওগুলো খুঁজতে সাহায্য হবে বলে। প্রথম জার্নালটা পড়ে বুঝেছিলেন, দ্বিতীয় আরেকটা আছে কোথাও।
ওটা খোঁজার জন্যেই বার বার চুরি করে ঢুকেছেন ডাই লজে। পাননি। শেষে খোঁজ নিতে আরম্ভ করেন, কি কি জিনিস বিক্রি করেছেন মিসেস ডাই। জেনেছেন বাক্সটার কথা। খোঁজ করতে করতে চলে আসেন মিস্টার ব্যানারের মিউজিয়মে। মিস্টার ব্যানার তাঁকে চেনেন, কাজেই ছদ্মবেশ নিতে হয়েছে। আরও একটা কারণে নিয়েছিলেন ছদ্মবেশ, যাতে কেউ বুঝতে না পারে, প্রফেসর কেইন গুপ্তধনের ব্যাপারে আগ্রহী। যাতে তাকে কেউ সন্দেহ না করে।
আমরা গুপ্তধন খোঁজা শুরু করলে সুবিধে হল তাঁর। যোগ দিলেন আমাদের দলে। টিক বানাউ নামে সত্যি সত্যি কেউ আছে, এটা বোঝানোর জন্যে মিথ্যে গল্প বানিয়ে বললেন যে সোসাইটিতে চোর ঢুকেছিল। ভুল করেছেন। আমি ঠিক বিশ্বাস করতে পারিনি। কারণ, সোসাইটিতে ঢোকার কোন কারণই নেই টিক বানাউয়ের।
বেশি চালাকি করতে গিয়েই ভুল করে বসে অপরাধীরা, মন্তব্য করলেন পরিচালক। ধরা পড়ে অনেক সময়।
প্রফেসরকে ঠিক অপরাধী বলা যায় না, স্যার, রবিন বলল। আই মীন, ক্রিমিন্যাল মাইণ্ডেড যাকে বলে আরকি। লোভে পড়েই করেছেন কাজটা। ভুল বুঝতে পেরে পরে অনুশোচনাও করেছেন অনেক। অর্ধেক মাল তাকে দিয়ে দিয়েছেন মিসেস ডাই। প্রফেসর সেগুলো দান করে দিয়েছেন সোসাইটিকে। সোসাইটি সেগুলো ব্যক্তিগত যাদুঘরে সাজিয়ে রেখেছে, লোকের দেখার জন্যে।
হুঁ। লোকের মন যে কখন কি হয়, বোঝা মুশকিল, বললেন পরিচালক। কিন্তু জেলে যাওয়া থেকে বাঁচতে পারবে না প্রফেসর।
না, তা পারবে না, কিশোর বলল। মিসেস ডাই তাঁর বিরুদ্ধে নালিশ করেননি, আমরাও না। ডাই লজে যে তিনি চুরি করে ঢুকেছেন, কোন প্রমাণ নেই। শুধু নোবলকে ফাঁসানোর অপরাধেই জেল হবে তার।

মাথা দোলালেন পরিচালক। নোবল তাহলে শুধু প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে নয়, নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্যেও প্রফেসরের পিছে লেগেছিল?
হ্যাঁ, স্যার, মুসা বলল। বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল। জার্নালের কভার নিয়ে স্যালভিজ ইয়ার্ড থেকে পালাতে দেখেছে টিক বানাউ-রূপী প্রফেসরকে। তারপর দেখেছে, শূন্য কভারটা ছুঁড়ে ফেলে দিতে। এতেই বুঝেছে, আরেকটা জানাল আছে। তখনও জানত না, ওটা আমাদের কাছে। তাই লজে গিয়েছিল খোঁজার জন্যে। ডিনো তাকে দেখে তাড়া করে।
তারপর, পরিচালক বললেন। কোনভাবে তোমাদের হাতে জার্নাল দেখে নোবল। চুরি করে হেডকোয়ার্টারে ঢুকে ছবি তুলে আনে ওটার, যাতে জানতে পারে কোথায় কি হচ্ছে। আসলে তোমাদের সাহায্য করতে চেয়েছে। কিন্তু প্রফেসরের বিরুদ্ধে বললে যদি তখন বিশ্বাস না কর এই ভয়ে বলেনি। ঠিক বলেছি না?
হ্যাঁ, স্যার, রবিন মাথা ঝাঁকাল। তার ভয় ছিল, প্রফেসরকেই শুধু বিশ্বাস করব আমরা। তাই আমাদের অনুসরণই করেছে, সামনে এসে কিছু বলেনি। প্রফেসরের বিরুদ্ধে প্রমাণ জোগাড়ের চেষ্টা করেছে।
অযথা হয়রানীর শিকার হয়েছে বেচারা, কিশোর বলল। ইয়ান ফ্লেচার বলেছেন, ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে তাকে। সোসাইটি আবার তাকে চাকরিতে বহাল করেছে।
ভাল। খুব ভাল, খুশি হলেন পরিচালক। দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকালেন তিনি, ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন ইন্টারভিউর সময় শেষ। আর বেশিক্ষণ আটকাব না তোমাদের। কিশোর, একটা ব্যাপারে খটকা লাগছে। ডিনোকে দেখে চমকে উঠে হাত থেকে টর্চ পড়ে যাবে, এত দুর্বল স্নায়ু তো তোমার নয়। অভিনয় করেছিলে, না?
ঠিকই ধরেছেন, স্যার, হাসল কিশোর। চমকে যাওয়াটা ভান। গাড়ির হুডে ভর দিয়েছি ইঞ্জিন গরম না ঠাণ্ডা বোঝার জন্যে। টর্চ ফেলেছি তোলার সময় নিচটা দেখে নিতে।
ইঞ্জিন ঠাণ্ডা হওয়াটা কোন ব্যাপার নয়, পরিচালক বললেন। বৃষ্টিতে খুব অল্প সময়েই ঠাণ্ডা হয়ে যেতে পারে।
তা পারে, স্বীকার করল কিশোর। বলেছি প্রফেসরকে ভড়কে দেয়ার জন্যে। গাড়ির নিচে দেখার আগেই বুঝে ফেলেছি, মিথ্যে কথা বলছেন তিনি। উল্টোপাল্টা কথা বলে মস্ত ভুল করেছেন।
ভ্রূকুটি করলেন পরিচালক। কথাটা কি?
ডিনো তত আগুন লাগাল ছাউনিতে। এসে আমাদেরকে বলল, টিক বানাউকে দেখেছে। আর পরে প্রফেসর বললেন নোবলকে ছুটে যেতে দেখেছেন। আসলে

কাউকে দেখেননি তিনি। তর্ক শুরু করলেন ডিনোর সঙ্গে। এমন তর্ক জুড়ে দিলেন, মনে হল তিনি শিওর, টিক বানাউ হতেই পারে না...।
নিশ্চয় পারে না, প্রফেসর ভুলটা কোথায় করেছেন, বুঝে ফেললেন পরিচালক। প্রফেসর জানে, টিক বানাউকে ডিনো দেখতেই পারে না। কারণ প্রফেসর নিজেই টিক বানাউ। কিশোর, তোমাকে ফাঁকি দেয়া বড় কঠিন।
তখন বুঝতে পারিনি, স্যার। বুঝেছি পরে, বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে প্রফেসরের সঙ্গে কথা বলছিলাম যখন। সে-সময়ও জোর করে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন, নোবলকেই দেখেছেন।
সূক্ষ্ম এক চিলতে হাসি ফুটল পরিচালকের মুখে। তো, আমাদের রোমান্টিক নায়কের খবর কি? ডিনাম্যান হাংবার?
হাসল কিশোর। স্বীকার করেছে, মিসেস ডাইকে বিয়ে করতে চায়। ধনী হয়ে গেলে তাকে আর বিয়ে করতে চাইবেন না মহিলা, সে-ভয়েই আমাদের পিছে লেগেছে, ঠেকাতে চেয়েছে। গুপ্তধনের লোভ বিন্দুমাত্র ছিল না।
মহিলা নিশ্চয় খুব সুন্দরী। তার কি মত?
ঝিলিক দিয়ে উঠল মুসার ঝকঝকে সাদা দাঁত। ভেবে দেখবেন বলেছেন।

ভলিউম ১০ – গোলাপী মুক্তো – তিন গোয়েন্দা – রকিব হাসান – সেবা প্রকাশনী

এই জিনা, মা বললেন, কি হয়েছে তোর? এরকম করছিস কেন? জিনিসপত্র গোছাতে দিবি না নাকি?

ভাল্লাগছে না কিছু!

কিছু একটা করার চেষ্টা কর গিয়ে, তাহলেই ভাল লাগবে।

কি করব? আকাশের যা অবস্থা, বাইরে বেরোতে পারলে তো। বৃষ্টি আর বৃষ্টি, জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল সে। ওই দেখ, আবার নেমেছে। জানালায় বসে যে সাগর দেখব, তারও উপায় নেই, কিচ্ছু দেখা যায় না। আমার দ্বীপটা পর্যন্ত চোখে পড়ছে না। কি যে করব।

বৃষ্টির দিন, বৃষ্টি তো হবেই, মা বললেন। অবাক করছিস তুই আমাকে, জিনা। ছুটির পয়লা দিনেই বিরক্ত হয়ে গেলি?

ছুটি শব্দটা হাসি ফোঁটাল জিনার মুখে। আবার ছেলে সাজার শখ হয়েছে তার। মাঝে মাঝেই করে এরকম। নামটা পর্যন্ত পাল্টে ফেলে তখন। জরজিনা বা জিনার বদলে তখন তাকে জর্জ বলে ডাকলেই খুশি হয়। মনমেজাজের কোন ঠিকঠিকানা নেই তার। চুল ছেটে আবার ছেলেদের মত করে ফেলেছে। আশা করছে, আবার তাকে কিছুদিন ছেলে ভাবা হবে।

হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ, ঘাড় নেড়ে বলল জিনা। ছুটির পয়লা দিনেই ওরকম বিরক্ত হওয়া উচিত না। কিন্তু হয়ে গেছি, কি করব? ভাগ্যিস বাবা আমাদেরকে নিয়ে যাবে বলেছে। এখানে থাকলে মরেই যেতাম! মাঝেমাঝেই বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে যোগ দেয়ার জন্যে বিদেশে যান মিস্টার পারকার। এবারেও যাচ্ছেন। সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছেন জিনা আর তিন গোয়েন্দাকে। মা, লণ্ডনেও কি এরকমই আবহাওয়া থাকবে?

কিছুই বলা যায় না। আরও খারাপ হতে পারে। তবে জায়গা বদল তো হবে, তাতেই আমি খুশি। কিছুদিনের জন্যে এখান থেকে ভাগা দরকার। মেয়েকে আস্তে করে দরজার দিকে ঠেলে দিলেন মা। যা, আর কিছু করতে না পারলে রাফিকে নিয়ে খেলগে। আমি ততক্ষণে গোছগাছটা সেরে ফেলি।

জিনা যেখানে যাবে, রাফিয়ানও সঙ্গে যাবে। জিনার ধারণা, দনিয়ার সব চেয়ে ভাল এবং বুদ্ধিমান কুকুরটা তার। আয়, রাফি, জিনা বলল, এখানে কিছু নেই। চল, রান্নাঘরে গিয়ে দেখি খাবার কিছু মেলে কিনা।

রান্নাঘরে কাজ করছে আইলিন। অনেক সময় কাজ বেড়ে যায়, একা সামলাতে পানে না মিসেস পারকার, তখন খবর দেন আইলিনকে। এই গাঁয়েরই মেয়ে, এসে কাজ করে দিয়ে যায়।

এই যে জিনা, আইলিন বলল। রাফিও যে। তা কি দরকারে এই আন্টির কাছে আগমন? খাবারের খোঁজে নিশ্চয়ই? একটু রাখ, হাতের কাজটা শেষ করে নিই। আপেলের জেলি বানাচ্ছি, তাড়াহুড়ো করলে নষ্ট হয়ে যাবে।
চুলায় কি? জিনা বলল। দারুণ গন্ধ বেরোচ্ছে। টেবিলে বসে পড়ল সে। মিনিট কয়েক পরেই হাজির হয়ে গেল বেশ বড় এক মগ গরম গরম কোকো, আর এক প্লেট সদ্য বানানো বনরুটি। রাফিয়ানও বাদ গেল না, তাজা, রসালো দেখে একটা হাড় দেয়া হয়েছে তাকে।
ছুটিতে বাড়ি এলে খিদে খুব বেড়ে যায়, না? হেসে বলল আইনি। বাড়বেই। হোস্টেলে কি না কি খাও, খাওয়া হয় নাকি।
পেট ভরি আরকি কোনরকমে। হোস্টেলের বাবুর্চিও রাধে, আর তুমিও রাধা। আমার তো মনে হয় দুনিয়ার সেরা বাবুর্চি তুমি, লিনুআন্টি! কিশোররাও তোমার রান্নার খুব প্রশংসা করে।
কালই তো আসছে ওরা, না? প্রশংসায় খুশি হল আইলিন। দেখি, ওদের জন্যে ভাল কিছু বানিয়ে রাখতে হবে।
হ্যাঁ, তাই কর। খাওয়ানোর সুযোগ অবশ্য এবারের ছুটিতে বেশি পাবে না।
না, তা পাব না। কাউকে তো আর রেখে যাচ্ছেন না মিস্টার পারকার।
দারুণ মজা হবে, তাই না? বন চিবাতে চিবাতে বলল জিনা। কিশোররা এখনও জানে না। ওরা আসছে, ভেবেছে এখানেই ছুটি কাটিয়ে যাবে। লণ্ডনে যাচ্ছি, সেটা জানে না। জানাইনি। সারপ্রাইজ দেব। কালই আসছে। কিন্তু ভয় লাগছে, যা পচা বৃষ্টি শুরু হয়েছে, যদি না আসে!
পরদিন বৃষ্টি থামল। আবার ফিরে এল শীতের ঠাণ্ডা, শুকনো, পরিষ্কার আবহাওয়া, বড়দিনের সময় যেরকম থাকে। সকালের বাস ধরল তিন গোয়েন্দা। এগারোটা নাগাদ পৌঁছে গেল গোবেল বীচে। খুশিতে কলরব করতে করতে এসে জিনাদের বাড়িতে ঢুকল ওরা। বসার ঘরেই রয়েছেন মিসেস পারকার।
কেমন আছেন, আন্টি? হেসে বলল কিশোর।
ভাল, কেরিআন্টি বললেন। তোমরা কেমন?
ভাল, জবাব দিল কিশোর।
ভুরু কুঁচকে জিনার দিকে তাকিয়ে রইল মুসা। এই জিনা, আবার ছেলে সেজেছ…
জিনা নয়, জর্জ বলবে, গম্ভীর হয়ে বলল জিনা।
হা-হা করে হাসল মুসা। বুঝেছি। তা কদ্দিন চলবে এটা?
যদ্দিন জর্জের ইচ্ছে হয়, রবিন বলল হেসে।
হুফ! হুফ! সায় জানাল রাফিয়ান। রবিনের হাত চেটে দিল।

ঝটকা দিয়ে খুলে গেল মিস্টার পারকারের স্টাডির দরজা। ভুরু কুঁচকে। তাকালেন ছেলেমেয়েদের দিকে। ও, এসে গেছ। এজন্যেই এত হৈ-চৈ, বলে আবার লাগিয়ে দিলেন দরজা হট্টগোল একদম সহ্য করতে পারেন না তিনি।
রাগলেন না তো! মৃদু শিস দিয়ে উঠল মুসা। আঙ্কেল বদলে গেছেন মনে হচ্ছে? যাক, ছুটিটা তাহলে ভালই কাটবে। ধমক খেতে হবে না।
হ্যাঁ, ভালই কাটবে, কিশোর বলল, কারণ এখানে থাকতে হচ্ছে না আমাদের। পত্রিকায় পড়লাম, লণ্ডনের কাছের আরেকটা শহরে স্পেস ট্রাভেলের ওপর একটা সম্মেলন হচ্ছে। আঙ্কেল নিশ্চয় দাওয়াত পেয়েছেন। জিনা যখন এত করে আমাদের আসতে বলেছে, ধরেই নেয়া যায়, কোন কারণ আছে। আর সেই কারণ একটাই হতে পারে, আমাদেরকেও সঙ্গে নেয়া হবে।
তুমি বুঝে ফেলেছ! সারপ্রাইজ দিতে না পেরে হতাশ হল জিনা।
রবিন আর মুসা অবাক হল। রবিন বলল, কই, আমাদেরকে তো কিছু। বলনি?
হাসল শুধু কিশোর। জবাব দিল না।
রাফি যাচ্ছে তো? মুসা জানতে চাইল।
নিশ্চয়ই, বলল জিনা। বাৰা ভাল করেই জানে, আমি ওকে ছাড়া কোথাও যাই না।
চল, বাগানে, ঘরে দম আটকে আসছে। কপাল ভাল আমাদের, আজ বৃষ্টি নেই।
বলা যায় না, রবিন বলল। আবার এসে যেতে পারে।
তা ওখানে গিয়ে কোথায় উঠছি, জিনা...থুড়ি জর্জ? কিশোর জানতে চাইল। হোটেলে?
দীর্ঘ একটা নীরব মুহূর্ত কিশোরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল জিনা। তারপর হাসল। থাক, জর্জ বলার দরকার নেই, তোমরা আমাকে জিনাই ডেকো।...না, হোটেলে উঠছি না আমরা। এখন ছুটির সময়, খরচ অতিরিক্ত ঘর পাওয়াও কঠিন। তাছাড়া হোটেলে কুকুর জায়গা দেয়ার নিয়মও বোধহয় নেই। সম্মেলন যেখানে হচ্ছে, সেই শহরে মার এক বোনের বাসা আছে। খালাম্মা-খালু ছুটিতে বাইরে চলে যাচ্ছেন, ফ্ল্যাটটা খালিই থাকবে। মাকে বলেছেন, ওখানে থাকতে পারব আমরা।
চমৎকার। হোটেলের চেয়ে অনেক ভাল হবে। স্বাধীনতা থাকবে।
সাগরের পাড়ে হাঁটতে বেরোল ওরা। চলল নানারকম আলোচনা। ছুটি কি করে কাটাবে সে-সম্পর্কে আলোচনাই বেশি হল। ফিরল দুপুরের খাবার সময়। মুরগীর রোস্ট করেছে আইলিন। আপেলের জেলি। মাংসের কিমা আর নানারকম শাকসবজীর পুর দেয়া স্যাণ্ডউইচ। সাগরের খোলা হাওয়া আর বৃষ্টিধোঁয়া রোদে ঘুরে খিদেও পেয়েছে ছেলেমেয়েদের। খাবারের ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল ওরা। মিনিট পনেরো মুসা তো মুখই তুলল না।

দুপুরের পরে আবার খারাপ হয়ে গেল আকাশ। মেঘে ঢাকা পড়ল সূর্য। নামল ঝমঝম বৃষ্টি। বাইরে বেরোনো বন্ধ। তবে আজ আর জিনার খারাপ লাগল না। তিন তিনজন বন্ধু এসেছে, ঘরের ভেতরেই সময় খুব ভাল কাটবে।

পরদিন সকালে রওনা হল ওরা। বাস ধরে এল এয়ারপোর্টে। সেখান থেকে বিমানে লণ্ডন। তারপর ঘন্টা দুয়েকের রেলযাত্রা। স্টেশন থেকে ট্যাক্সিতে করে এল জিনার খালার ফ্ল্যাটে।

বেশ ব্যস্ত একটা সড়কের দিকে মুখ করে রয়েছে বাড়িটা। বড় ফ্ল্যাট। কয়েকটা ঘর। মাঝে চওড়া বারান্দা। বেডরুমগুলো সব পুবমুখো, অন্যান্য বরগুলো পশ্চিমে।

বাড়িটা পছন্দ হল ছেলেমেয়েদের। ঘরের আসবাবপত্রও ভাল। আয়-রোজগার বেশ ভালই মনে হয় জিনার খালু-খালাম্মার। অন্যের ঘরে রয়েছে, এটুকু বোঝার বুদ্ধি আছে রাফিয়ানের, কাজেই জিনিসপত্র যাতে নষ্ট নাহয় সেভাবে চলাফেরা করল। বাড়িতে হলে এতক্ষণে লাফালফি করতে গিয়ে অন্তত একটা ফুলদানী তো উল্টে ফেলতোই।

নিজেদের জিনিসপত্র খুলে গুছিয়ে ফেলল ছেলেমেয়েরা। তারপর গেল মিসেস পারকার কতখানি কি করেছেন দেখার জন্যে।

তিনিও গুছিয়ে ফেলেছেন। বললেন, এখন আমাদের প্রথম কাজ হল, খাবার কিনে আনা। একসাথে দুকাজ হয়ে যাবে। খাবারও কেনা হবে, শহরও ঘোরা হবে। তোমাদের আঙ্কেল কাজ নিয়েই ব্যস্ত, তিনি যেতে পারবেন না। যেতে হবে, আমাদেরকেই।

তাতে খুশিই হল ছেলেমেয়েরা।

শহরটা আমেরিকার শহরের চেয়ে অন্যরকম, কিশোর বলল। বাস, লোকের ভিড়। বেশি গাদাগাদি মনে হয়।

সকলেই একমত হল তার সাথে।

দোকানে দোকনে ঘুরল ওরা। চলে এল কাছের বড় স্কোয়্যারটায়। বিশাল এক বাগান রয়েছে সেখানে, অনেকটা পার্কের মত, ছেলেমেয়েরা খেলছে। দিকে দিকে ছুটে যাচ্ছে বাস। এত বিভিন্ন পথে, মনে রাখতেই কষ্ট হয়, শেষ নোটবুকে লিখে নিতে লাগল রুটগুলো রবিন। খাবারের বাক্স, পোটলা নিয়ে ফ্ল্যাটে ফিরে এল ওরা। রান্নাঘরে জিনার মাকে সাহায্য করল সবাই, মিস্টার পারকার বাদে, তিনি তার কাজে ব্যস্ত। আধুনিক, সুন্দর রান্নাঘর। প্রয়োজনীয় সব জিনিস হাতের কাছে রয়েছে। কাজ করতে কোন অসুবিধে হল না।

রাতের বেলা খাবার টেবিলে সকলের সঙ্গে কথা বলার ফুরসত মিলল মিস্টার পারকারের। জানালেন, সম্মেলন যতদিন চলবে, রোজ খুব সকালে বেরিয়ে

যাবেন – তিনি, ফিরতে অনেক দেরি হবে। রাতও হয়ে যেতে পারে কোন কোনদিন।
সেটা আমি জানি, মিসেস পারকার বললেন। তোমার কাজ তুমি করে যাও, আমাদের জন্যে ভাবতে হবে না। আমাদের দিক আমরা সামলাতে পারব। রান্না করতে তো আর বেশি সময় লাগবে না। তারপর বেরিয়ে পড়ব শহর ঘুরতে। দেখার অনেক জিনিস আছে। তাছাড়া, কাগজে দেখলাম এক জায়গায় অ্যানটিক নিলাম হচ্ছে। ওখানে যাব। কিন্তু পছন্দও হয়ে যেতে পারে, কেনার ইচ্ছে আছে।
হাসল ছেলেমেয়েরা। ওরা জানে, পুরানো জিনিসের প্রতি খুব শখ মিসেস পারকারের, বিশেষ করে অ্যানটিক। বেছে বেছে দেখার মত জিনিস জোগাড় করে নিয়ে আসেন। নিলামের ব্যাপারে মায়ের যেমন আগ্রহ, মেয়ের তেমনি নিরাসক্তি। সে ভাবল–মা যাক নিলামে, আমরা চলে যাব অন্য কোথাও ঘুরতে। অনেক জায়গা আছে দেখার, যেগুলো সে দেখেনি। পরদিন সকালেই মাকে সেটা পরিষ্কার জানিয়ে দিতে হবে, ঠিক করল।
সুতরাং পরদিন সকালে নাস্তার টেবিলে বসে মাকে বলল জিনা, আমাদেরকে নিশ্চয় একা একা ঘুরতে দেবে, তাই না, মা?
দেবো, রাস্তাঘাট চেনা হয়ে যাবার পর, মেয়ের মনোভাব বুঝতে পেরে
হাসলেন মা। তবে কথা দিতে হবে, খুব সাবধানে থাকবি।
থাকব, বলতে একমুহূর্ত সময় নষ্ট করল না জিনা।
আর গোলমাল বাধাবি না। ঝগড়া করবি না কারও সঙ্গে।
করব না।
হেসে ফেলল মুসা।
এই এতে হাসির কি দেখলে রেগে গেল জিনা। হাসির কি দেখলে? খারাপ কিছু বললাম নাকি?
এই তো শুরু করে দিলি, হেসে বললেন মা। এইমাত্র না বললি ঝগড়া করবি না?
অ! লজ্জা পেল জিনা। ও এরকম করে হাসল না…আচ্ছা, আর করব না।
তাহলে তো যেতে দিতে আপত্তি নেই, মা?
না, নেই।
ছেলেমেয়েদেরকে নিয়ে বেরোলেন মিসেস পারকার। ঘুরে ঘুরে শহর দেখলেন, কেনাকাটা করলেন বড়দিনের জন্যে, উপহার কিনলেন।
পরের দিনও একইভাবে কাট।
তার পরের দিন সকালে উঠে জিনার মা বললেন, রাস্তার মোড়ে একটা সিনেমা হল আছে না? তাতে ডিজনির একটা ছবি চলছে। বিকেলে যাবি নাকি দেখতে?

আমি অবশ্য যেতে পারব না। কাল নিলাম হবে, আজই গিয়ে জিনিসগুলো দেখে আসতে হবে। পছন্দ করে রেখে আসব। চাইলে যেতে পারিস আমার সঙ্গে।
মায়ের সঙ্গেই যেতে চাইল জিনা। সিনেমা পছন্দ করে না সে তা নয়। কিন্তু হলে রাফিয়ানকে ঢুকতে দেয়া হবে না, আর ওকে ফেলে যেতে রাজি নয় সে। তাড়াতাড়ি বলল, আমি তোমার সাথে যাব। নিলাম ডাকাই দেখব।
কিশোর বলল। আমিও।
আমিও যাব, রবিন বলল।
মুসার সিনেমা দেখতে যাবারই ইচ্ছে ছিল, কিন্তু সবাই যাচ্ছে অন্যখানে, সে। একা যায় কি করে?
বেশ, মা বললেন, যাবে। কাগজে পড়লাম, এক বৃদ্ধা মহিলার মাল নিলাম। হবে। মারা গেছেন। তাঁর নাম ছিল মিস আরনিকা মেয়ারবাল। আত্মীয়স্বর্জন কেউ নেই। অনেক ভাল ভাল জিনিস আছে শুনেছি। সেল-রুমে দেখানোর জন্যে আজ ওগুলো রাখা হবে। আগ্রহী যে-কেউ গিয়ে দেখতে পারে।
সেদিন বিকেলে ট্যাক্সিতে করে রওনা হল ওরা। শহরের একপ্রান্তে বাড়িটা। দেখানোর ব্যবস্থা হয়েছে ৮ নাম্বার কামরায়। ইতিমধ্যেই ভিড় হয়ে গেছে। পুরানো আসবাবপত্র আর অন্যান্য জিনিস দেখছে। ছোটখাট কিছু জিনিস রয়েছে কাচের বাক্সে, নিশ্চয় খুব দামি ওগুলো। প্রহরী রয়েছে, যারা আসছে যাচ্ছে নজর রাখছে তাদের ওপর।
দরজার পাশে রাখা হয়েছে বাক্সগুলো। সুন্দর সুন্দর চীনা অলঙ্কার, ব্রোঞ্জের ছোট মূর্তি, হাতির দাঁতে খোদাই করা নানারকম চমৎকার জিনিস। অনেকক্ষণ ধরে পঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওগুলো দেখলেন মিসেস পারকার, ছেলেমেয়েরাও দেখল। কারোরই বুঝতে অসুবিধে হল না জিনিসগুলো অনেক দামি। তারপর ওরা চলল আসবাব দেখতে। বড়গুলোর দিকে একবার চেয়েই চোখ ফিরিয়ে নিলেন মিসেস পারকার তারপর হোট একটা আর্মচেয়ারের সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেলেন।
এই আদলের চেয়ারগুলোকে বলে টাব চেয়ার, বললেন তিনি। সুন্দর, না?
হ্যাঁ, রবিন বলল, সুন্দর।
বসতেও বোধহয় খুব আরাম,মুসা বলল। তার কথায় হেসে উঠল সবাই।
খুব দ্র হয়ে রইল রাফিয়ান। ঢোকার সময় প্রহরীরা তার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকালেও পরে নিশ্চয় তাদের মত পরিবর্তন করেছে। মুসার কথায় যেন একমত হয়েই চেয়ারটার দিকে তাকাল সে, যেন বলতে চাইছে, হা, কওলী পাকিয়ে ওয়ে ঘুমাতে বেশ আরাম লাগবে।
ওটা নেবে নাকি তুমি, মা? জিনা জিজ্ঞেস করল।
বাড়িতে সিটিং রুমে রাখলে ভালই হবে, কি বলিস? মা বললেন।

হ্যাঁ, তা লাগবে, জবাবটা দিল কিশোর।
দেখি, দামে বলে নিয়ে নেব কাল, মা বললেন।
চেয়ারটাকে কাছে থেকে আরও ভালমত দেখার ইচ্ছে মিসেস পারকারের, কিন্তু একটা লোকের জন্যে পারছেন না। ঢাকার পর থেকেই সেই যে ওটার কাছে দাঁড়িয়ে আছে তো আছেই, ঘুরেফিরে চারপাশ থেকে দেখছে। সরার নামও নেই। চেয়ারটার সামনের দিকে এসে ঘাড় কাত করে দেখতে লাগল। মখমলে মোড়া গদি, রঙ চটে গেছে। এছাড়া আর সব ভালই আছে জিনিসটার। চেয়ারের পিঠে হাত বুলিয়ে দেখল সে, হাতল দেখল, পায়া দেখল। তারপর যেন নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও সরে গেল ওখান থেকে।
এইবার মিসেস পারকারের দেখার পালা।
লোকটাকে সুবিধের লাগল না, নিচু গলায় বলল জিনা, তাই না? আমি শিওর, কাল নিলামে সে-ও আসবে। চেয়ারটা নিতে চাইবে।
জিনার অনুমান ঠিকই হল। পরদিন লংফীল্ডের সেল-রুমে পৌঁছে ওরা দেখল, লোকটা আগেই চলে এসেছে। ভিড়ের মধ্যে দেখা গেল তাকে।
ওই যে, ফিসফিসিয়ে জিনা বলল। টাব চেয়ারের আরেক ক্রেতা।
বেড়টা বেশ সাইজমত, হেসে বলল মুসা, চেয়ারটা ওরই নেয়া উচিত। বসলে মানাবে ভাল। মুখটা দেখছ? আস্ত এক কোলাব্যাঙ।
হাসি চাপল কিশোর। কিন্তু রবিন ফিক করে হেসে ফেলল। ঠিকই বলেছে মুসা। ব্যাঙই। ব্যাঙের মত চওড়া পাতলা ঠোঁট, গোল গোল চোখ যেন বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে কোটর থেকে।
ডাক শুরু হল। চড়া দামে বিক্রি হয়ে গেল কয়েকটা আসবাব। তারপর দুজন লোক চেয়ারটা ধরাধরি করে এনে রাখল মঞ্চে, যাতে সবাই দেখতে পায়। ডাক শুরুর অনুরোধ জানাল নিলামকারী।
তিরিশ পাউন্ড থেকে শুরু হল।
চল্লিশ! বলল একজন।
পয়তাল্লিশ! আরেকজন।
পঞ্চাশ! বলল অন্য আরেকজন।
দাম উঠছে। চেয়ারটার ওপর অনেকের চোখ পড়েছে বোঝা গেল। তবে পঁচাত্তরের পর দুজন বাদে সবাই চুপ হয়ে গেল। সেই দুজন হল কোলাব্যাঙ, আর মিসেস পারকার।
আশি! লোকটা বলল।
নব্বই! মিসেস পারকার বললেন।
পঁচানব্বই!

একশো!
ছেলেমেয়েরা বুঝতে পারল, এর বেশি আর দাম দেবেন না মিসেস পারকার। সামান্য একটা চেয়ারের জন্যে, অ্যানটিক মূল্য যতই থাক ওটার, একশোই যথেষ্ট। আগের রাতে জিনার বাবার সঙ্গে চেয়ারটা নিয়ে কথা হয়েছে তাঁর। ঠিক করেছেন দুজনেই, একশোর বেশি হলে নেবেন না। লোকটা কি এর বেশি দেবে? কিছু বলল না লোকটা। ভাবহে বোধহয়। কাশলো একবার।
হাতুড়ি ঠকতে শুরু করল নিলামকারী, একশো পাউও!...একশো পাউণ্ডে গেল গেল...আর কেউ কিছু বলবেন...নেই?...বেশ...ওয়ান...টু...।
ছেলেমেয়েরা জানে, লোকটা থ্রি বললেই ডাক শেষ হয়ে যাবে। তারমানে যে বেশি হেঁকেছে, জিনিসটা তার হয়ে যাবে। হাতুড়ি তুলল লোকটা। নামিয়ে আনতে শুরু করল। ঠুকবে, এবং থ্রি বলবে।
শেষ মুহর্তে হাত তুলতে আরম্ভ করল কোলাব্যাঙ। তারমানে আরও বেশি ডাকতে যাচ্ছে সে। হাতটা পুরো তুলতে পারলেই হয়ে যেত, কিন্তু সেই মুহূর্তে ভাগ্য বিরূপ হল তার। ভিড়ের মধ্যে আঁউ করে উঠল একজন লোক। পরক্ষণেই ধাক্কা খেয়ে যেন কাত হয়ে গেল মুসা, পড়ল একেবারে লোকটার ওপর। কখন তার পাশে চলে গেছে, উত্তেজনায় খেয়াল করেনি জিনা কিংবা রবিন।
ব্যাঙমুখো লোকটা আর ডাকতে পারল না, তার আগেই নিলামকারীর হাতুড়ি ঠকাস করে পড়ল টেবিলে, বলল, থ্রি!
টাব চেয়ারটার মালিক হয়ে গেলেন মিসেস পারকার। খুব খুশি হলেন জিনিসটা পেয়ে।
ভিড় থেকে বেরিয়ে এল ছেলেমেয়েরা।
হেসে মুসা বলল, আমার জন্যেই পেয়েছেন তিনি ওটা, তাই না? একেবারে সময়মত ধাক্কা মারল আমাকে পাশের লোকটা।
তুমি ওখানে গেলে কখন? জিনার চোখে সন্দেহ। কিভাবে?
গেছি। দায়সারা জবাব দিয়ে দিল মুসা।
ইচ্ছে করেই গেছো, তাই না? ভুরু কোঁচকালো রবিন।
চট করে কিশোরের দিকে তাকাল মুসা।
একসাথে গোয়েন্দাপ্রধানের দিকে ঘুরে গেল রবিন আর জিনা।
হেসে আরেক দিকে মুখ ফেরাল কিলোর।
একেবারে রামচিমটি কেটেছি, বুঝলে, হেসে বলল মুসা। পাশের লোকটাকে এমন জোরে চিমটি দিলাম, আঁউ করে উঠে ধাক্কা মারল আমাকে। সহজেই সামলে নিতে পারতাম ধাক্কাটা। কিন্তু কেন সামলাব বল?

কাজটা কিন্তু উচিত হল না, জিনা বলল। মা শুনলে রাগ করবে। চেয়ারটা নেবে না, লোকটাকে দিয়ে দেবে।
বলতে যাচ্ছে কে তাঁকে? কিশোর বলল। আমরা বলছি না। তুমি বলবে?
নাহ্, হেসে ফেলল জিনা।
হুফ! করে উঠল রাফিয়ান। যেন কথা দিল, সে-ও মুখ বন্ধ রাখবে।
মিসেস পারকার চেয়ারটা পেয়ে যাওয়ায় ছেলেমেয়েরা খুবই খুশি হল। ওরা। কথা বলছে, তিনি ওটার দাম মিটিয়ে দিয়ে এলেন। তিনি যেমন খুশি হয়েছেন, তেমনি বেজার হয়েছে ব্যাঙমুখখা। সেল-রুম অ্যাসিসটেন্টকে বললেন মিসেস পারকার, চেয়ারটা কোথায় দিয়ে আসতে হবেঃ ১৬ লাইম অ্যাভেন্য, ৩ নাম্বার ফ্ল্যাট।
এই সময় তাঁর কাছে এসে দাঁড়াল লোকটা। জোর করে মুখে হাসি টেনে বলল, বিরক্ত করতে এলাম, ম্যাডাম, কিছু মনে করবেন না। ওই চেয়ারটা সত্যিই আমার খুব পছন্দ...না না, দরকার। আপনি বিক্রি করে দিন আমার আছে। আপনি যা দিয়েছেন, তার চেয়ে অবশ্যই বেশি দেব।
লোকটার দিকে মুখ তুলে তাকালেন মিসেস পারকার। ভাল পোশাক পরেছে লোকটা, কথাবার্তাও বেশ দ্র। কিন্তু তারমাঝেও সূক্ষ্ম একটা হুমকির ভঙ্গি রয়েছে, এবং সেটা তাঁর কান এড়ালো না। এই ব্যাপারটা মোটেও পছন্দ হল না তাঁর। সরি, শীতল কণ্ঠে বললেন তিনি। চেয়ারটা আমারও খুব পছন্দ। বিক্রি করব না।
তর্ক করার চেষ্টা করল লোকটা। থামিয়ে দিলেন মিসেস পারকার। আশেপাশের লোকেরাও ধমক লাগাল লোকটাকে, চুপ করার জন্যে, নিলামের ডাক শুনতে অসুবিধে হচ্ছে। রাগে গটমট করে দরজার দিকে এগোল ব্যাঙমুখখা।
।খাইছে! মুসা বলল। লোকটা বুঝতে পারেনি, আমি ইচ্ছে করে... জিনার মায়ের দিকে তাকিয়ে থেমে গেল সে। খুব খারাপ লোক!
হ্যাঁ, আনমনে মাথা ঝাঁকালেন মিসেস পারকার। মুসার কথা বুঝতে পারেননি।
নিলাম দেখার জন্যে আরও কিছুক্ষণ থাকলেন ওখানে মিসেস পারকার। আরেকটা জিনিস পছন্দ হল তাঁর। আগের দিন ওটা চোখে পড়েনি। ছোট একটা লেখার টেবিল। ওটার জন্যে তেমন প্রতিযোগিতা হল না, সস্তায়ই কিনে ফেললেন। সেল-রুম অ্যাসিসটেন্ট জানাল, আগামী দিন জিনিসগুলো পৌঁছে দেয়া হবে ঠিকানামত।
এখানে তো নাহয় পৌঁছে দিল, জিনা বলল, কিন্তু বাড়িতে নেমে কি করে, মা?
সেটা দেখা যাবে। স্টীমারেও নেয়া যায়। প্লেনেও।
একজায়গায় ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে আর ভাল লাগছে না রাফিয়ানের। এই কোলাহল, লোকজন তার পছন্দ হচ্ছে না। তাছাড়া মঞ্চের ওপর কি ঘটছে,

তা-ও দেখতে পাচ্ছে না। উসখুস শুরু করল সে। মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে শান্ত করল জিনা।
ফ্ল্যাটে ফিরে এল ওরা। কিছু নাস্তা খেয়ে রাফিয়ানকে নিয়ে হাঁটতে বেরোল জিনা আর তিন গোয়েন্দা।
একেকজন একেক কথা বলছে। কিশোর হাঁটছে নীরবে। আনমনে নিচের ঠোঁটে চিমটিও কাটল বার দুই।
ব্যাপারটা লক্ষ্য করল রবিন। জিজ্ঞেস করল, এই কিশোর, কি ভাবছ? সেই সেল-রুম থেকেই দেখছি, বড় বেশি চুপচাপ তুমি। কি ব্যাপার?
ভাবছি ব্যাঙমুখোর কথা। চেয়ারটার জন্যে বড় বেশি আগ্রহ তার। একজন কিনে নেবার পরও সেটা বেশি দাম দিয়ে তার কাছ থেকে কিনতে চাইল। ভাবনার বিষয়, তাই না?
পরদিন সকালে দিয়ে গেল টাব, চেয়ার আর ছোট ডেস্কটা। যারা নিয়ে এসেছে, তাদেরকে বকশিশ দিতে গেলেন মিসেস পারকার। ইতিমধ্যে মালগুলো বয়ে সিটিং রুমে নিয়ে এল ছেলেমেয়েরা। ডিসেম্বরের উজ্জ্বল সূর্যালোকে ভরে গেছে ঘর। ময়লা হয়ে আছে চেয়ার, ডেস্ক, দুটোই। পরিষ্কার করতে লেগে গেল ওরা।
লোকগুলো বেরিয়ে যাওয়ার পর সবে দরজা বন্ধ করেছেন মিসেস পারকার, আবার বেজে উঠল দরজার ঘন্টা। অবাক হলেন তিনি। কারও তো আসার কথা নয়! দরজা খুললেন আরেকবার।
দাঁড়িয়ে রয়েছে কোলাব্যাঙ! আগের দিন নিলামে তার সঙ্গে যে লোকটা প্রতিযোগিতা করেছিল। মুখ খুলতে যাচ্ছিলেন তিনি, তার আগেই বলে উঠল সে, ঠিক একইরকম দ্র কণ্ঠে, প্লীজ, ম্যাডাম, আমাকে অন্তত কথা বলতে দিন। আপনাকে বার বার বিরক্ত যে করছি, তার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। সত্যি বলছি, বিশ্বাস করুন আমার কথা।
কি বলবেন বুঝতে পারলেন না মিসেস পারকার। সরে দাঁড়ালেন। ঘরে ঢুকল লোকটা। পরিচয় দিল, আমার নাম রবার্ট ম্যাকি। একটা দোকান আছে আমার, কিউরিও আর ভনির বিক্রি করি। মিমোসা অ্যাভেন্যুতে। কাল যে চেয়ারটা আপনি কিনে এনেছেন, ওটার জন্যে অনেকদিন অপেক্ষা করেছি...যার জিনিস তিনি আমার বন্ধু ছিলেন। ওই চেয়ারটা আমি তার স্মৃতি হিসেবে রেখে দিতে চাই। প্রায়ই বসতেন তিনি ওটায়। আর যে ডেটা কিনেছেন আপনি, লেখাপড়ার কাজ ওটাতেই বেশি করতেন মিস মেয়ারল। টেবিল আমার দরকার নেই, শুধু চেয়ারটা পেলেই চলবে। দেখে মনে করতে চাই তাঁর কথা।
গল্পটা আন্টিকে নাড়া দিত অবশ্যই, যদি লোকটা আন্তরিক হত, কিন্তু তার কথা আর মুখের ভাবে কোন মিল দেখলেন না তিনি।

ঠাণ্ডা গলায় বললেন মিসেস পারকার, চেয়ারটা আমার খুব পছন্দ, কালই বলেছি। আমি ওটা রাখার জন্যেই কিনেছি। আর স্মৃতির ব্যাপার তো? মিস মেয়ারবালের ব্যবহার করা আরও অনেক জিনিস আছে, ওগুলো থেকে কোন একটা বেহে কিনে রেখে দিন।
কিন্তু আমি...মানে...ওই চেয়ারটাই...ওটা আমার দরকার! ওটাই বেশি ব্যবহার করতেন কিনা মিস মেয়ারবাল... যাকগে। ভাল দাম দিতে রাজি আছি। আমি। এই ধরুন, একশো পঞ্চাশ ডলার?
খুব বিরক্ত হলেন আন্টি। কড়া গলায় জবাব দিয়ে দিলেন, দাম ডাবল করে দিলেও বেচবেন না তিনি। তারপর বললেন, ব্যাপারটা টাকার নয়, পছন্দের। আমি ওটা কোন দামেই বেচব না। ঠিক আছে?
চেয়ার ঝাড়ার জন্যে একটা ঝাড়ন আনতে রান্নাঘরে চলেছিল জিনা, যেতে হয় হলঘর পেরিয়ে, এই সময় বেল বাজিয়েছে ম্যাকি। লোকটাকে দরজায় দেখেই তাড়াতাড়ি সিটিং রুমে ফিরে এসে বন্ধুদেরকে খবর জানিয়েছে জিনা। পা টিপে টিপে তিন গোয়েন্দাও এসে দাঁড়িয়েছে তখন দরজার বাইরে। কেরিআন্টি আর লোকটার সব কথা শুনেছে।
চেয়ার বিক্রি করতে তাকে কিছুতেই রাজি করাতে পারল না লোকটা। ও চলে গেলে দরজাটা আবার ভালমত লাগিয়ে দিলেন আন্টি।
ছেলেমেয়েরা এসে ঢুকল হলঘরে।
আস্ত শয়তান! জিনা বলল। আবার এসে হজির হয়েছে চেয়ার কিনতে। ব্যাটা ঠিকানা পেল কোথায়?
ওটা কোন ব্যাপার না, মা বললেন। সেলস-রুম অ্যাসিসটেন্টদের ঠিকানা দিয়ে এসেছিলাম। ওদের কাছ থেকে জোগাড় করে নিয়েছে হয়ত।
কিংবা আপনি যে বলেছেন কাল, সেটাই হয়ত শুনেছে, কিশোর বলল। বেশ জোরেই তো বললেন।
হ্যাঁ, মুসা মাথা দোলাল, ব্যাটা শুনেছে। তারপর এসে দাঁড়িয়েছিল বাড়ির বাইরে। লোকগুলো জিনিস রেখে বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এসে বেল বাজিয়েছে।
অতি আগ্রহ, রবিন বলল। চেয়ারটা সুন্দর, সন্দেহ নেই, তবু পুরানো একটা চেয়ারের জন্যে এত আগ্রহ কেন?
ভ্রূকুটি করল কিশোর। সৃতি-ফিতি সব বাজে কথা। অন্য কারণ আছে। এমন কোন দামি চেয়ার নয় ওটা, দুর্লভও নয়। খুঁজলে ঠিক ওরকম মডেলের চেয়ার অনেক পাবে এই শহরে। মিথ্যে কথা বলছিল সে, বোঝাই গেছে। স্মৃতির জন্যে ওই চেয়ারটাই একমাত্র জিনিস নয়, আন্টি ঠিকই বলেছেন।
এর মাঝেও রহস্য খুঁজে পেলে নাকি? হাসতে হাসতে বলল মুসা। পেয়ে গেছ গন্ধ?

হ্যাঁ, পেয়েছি, বেশ জোর দিয়ে বলল কিশোর। ওই ব্যাঙমুখো লোকটাকে মোটেই ভাল লাগেনি আমার।
আমারও না, বলে বেরিয়ে গেলেন আন্টি। রান্নাঘর থেকে ব্রাশ আর একটা হোট ভ্যাকুয়াম ক্লিনার নিয়ে এলেন। এই নাও, ওগুলো পরিষ্কার করে ফেল গিয়ে। আমি রান্না করতে যাচ্ছি।
সিটিং রুমে ফিরে এল ওরা। পুরানো জিনিস সাফ করতে অভ্যস্ত তিন গোয়েন্দা, প্রায়ই একাজ করতে হয় তাদেরকে স্যালভিজ ইয়ার্ডে। জিনা পারে না এসব। করতে দিলে আরও নষ্ট করবে।
ডেস্কটায় হাত লাগাল কিশোর আর মুসা। রবিন ব্রাশ দিয়ে চেয়ারের গদির ধুলো ঝাড়তে লাগল। জিনা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে। রাফিয়ান শুয়ে আছে রোদে পিঠ দিয়ে। আয়েসী ভঙ্গিতে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে তিন গোয়েন্দার কাজ।
ধুলো বেশি নেই,ব্রাশটা রেখে দিল রবিন।
ব্যাঙটা তো বললই, জিনা বলল। বুড়ো মহিলা নাকি প্রায়ই বসতেন এই চেয়ারে। মুছে-টুছে রাখতেন আরকি।
চেয়ারের হেলানের সঙ্গে সিটটা যেখানে জোড়া দেয়া হয়েছে, ওই ফাঁক, আর হাতলের নিচের ধুলো বের করা সব চেয়ে কঠিন। ধুলো ওসব জায়গায়ই জমে।
বেশি, রবিন বলল। হাত ঢুকিয়ে দিল ফাঁকটায়। হঠাৎ স্থির হয়ে গেল সে। কিশোর, কি যেন লাগছে! কোনভাবে ঢুকে গিয়েছিল ফাঁকের মধ্যে!...না, আপনাআপনি ঢুকতে পারবে না, বেশ বড়ই লাগছে। নিশ্চয় ইচ্ছে করে ঢুকিয়ে রাখা হয়েছে ওখানে।
বকের মত গলা বাড়িয়ে এল জিনা। কি জিনিস? বের করা যায় না?
বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টার পর বের করে আনতে পারল রবিন। চ্যাপ্টা একটা বাক্স, ফ্যাকাসে নীল রঙ।
আরি, গহনার বাক্স মনে হচ্ছে! জিনা বলল।
ডেস্ক মোছা বাদ দিয়ে কাছে এসে দাঁড়াল কিশোর আর মুসা।
খোলো খোলো, জলদি! মুসা বলল।
রবিনের হাত থেকে নিয়ে বাক্সটা খুলল জিনা। মুক্তাআ! চেঁচিয়ে উঠল সে।
আশ্চর্য! বিড়বিড় করল কিশোর।
দারুণ একখান নেকলেস! মুসা বলল। কটা মুক্তো আছে?
আসল তো? রবিনের প্রশ্ন।
মনে তো হচ্ছে, জিনা বলল। চলো, মাকে দেখাই।
রান্নাঘরে ছুটে এল ওরা। পেছনে লাফাতে লাফাতে এল রাফিয়ান।
মা, মাআ! চেঁচিয়ে বলল জিনা, দেখ, কি পেয়েছি!

হাতের তালুতে হারটা রেখে আঙুল বুলিয়ে দেখছেন মিসেস পারকার। খুব অবাক হয়েছেন। হালকা গোলাপী রঙ মুক্তাগুলোর।
আসলই মনে হয়, বললেন তিনি। এক্সপার্টকে দেখাতে হবে।
আসল হলে অনেক দাম, তাই না, মা?
হ্যাঁ।
ওটার মালিক এখন কে? নিশ্চয় তুমি?
তাই তো হওয়ার কথা, জবাবটা দিল কিশোর। চেয়ারটা তিনি কিনে এনেছেন। ওটার ভেতরে বাইরে যা থাকবে, সব কিছুর মালিকই তিনি হবেন। তাছাড়ামিস মেয়ারবালের কোন আত্মীয়ও নেই যে ফিরিয়ে দেয়ার কথা ভাবা যাবে।
বাহ, তাহলে তো খুব ভাল! হাততালি দিয়ে বাচ্চা মেয়ের মত লাফিয়ে উঠল জিনা। আমি ওটা পরব, মা!
দেখি, চিন্তিত ভঙ্গিতে মা বললেন, তোর বাবা আসুক, আলাপ করে দেখি। পুলিশকে জানাতে হতে পারে। চোরাই মাল কিনা কে জানে!
আসলই হবে, কিশোর বলল। ম্যাকি সেটা জানে। আর জানে বলেই চেয়ারটা কেনার জন্যে পাগল হয়ে আছে সে। তবে চেয়ারের ভেতরেই ছিল এটা, জানা ছিল না তার, শুধু সন্দেহ ছিল। জানা থাকলে কিছুতেই আমরা কিনতে পারতাম না, অনেক বেশি দাম হেঁকে প্রথমেই নিয়ে যেত ওটা।
তা ঠিক, একমত হল রবিন। লোকটা অসৎ, মুসা মন্তব্য করল। চেহারা দেখেই বোঝা যায়।
শুধু চেহারা দেখে কারও সম্পর্কে ওরকম মন্তব্য করা ঠিক না, আন্টি বললেন। লোকটার ব্যবহার খারাপ নয়। তবে এটা ঠিক, আমারও ভাল লাগেনি ওকে ... এহহে, আলু পুড়ে যাচ্ছে...
রান্নায় মন দিলেন আবার আন্টি। ছেলেমেয়েরা ফিরে এল সিটিং রুমে। চেয়ার আর ডেক মোছা শেষ হয়নি, কাজটা সেরে ফেলতে লাগল। তবে এখন ওই গোলাপী মুক্তার কল্পা ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারছে না।
চেয়ারের মধ্যে মুক্তা লুকিয়েছে,মুসা বলল, অত কাণ্ড!
হ্যাঁ, মাথা দোলাল রবিন।
চেয়ারটার প্রতিটি ইঞ্চি পরীক্ষা করে দেখছে কিশোর। যদি আর কিছু পাওয়া যায়? কাছে দাঁড়িয়ে আছে জিনা।
কিন্তু আর কিছু পাওয়া গেল না।
ইতিমধ্যে আরেকটা আবিষ্কার করে বসল মুসা। বলে উঠল, এই দেখ দেখ, ডেস্কটার ড্রয়ার দেখিয়ে বলল সে। হোট একটা নব। কালো। সহজে চোখে পড়ে

না। বলতে বলতেই টিপে দিল ওটা। কিট করে একটা শব্দ হল। তারপর যেন পিছলে সরে গেল একটা ছোট পান্না, বেরিয়ে পড়ল গোপন খোপ।
খাইছে! চেঁচিয়ে উঠল সে। চেয়ারের ফাঁকে মুক্তা..এই গোপন খোপে টাকার তোড়া কিংবা মোহর পেলে অবাক হব না!
সবাই কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে রয়েছে পোপটার দিকে। খোপটায় খুঁজতে শুরু করেছে মুসা। কিন্তু নিরাশ হতে হল তাকে। টাকাও নেই, মোহরও নেই, আর কোন গহনাও নেই। শুধু একটা সাধারণ হলদেটে খাম।
মুসার হাত থেকে ওটা প্রায় ছিনিয়ে নিল কিশোর। ভেতর থেকে বেরোল একপাতা কাগজ। লেখাটা জোরে জোরে পড়ল সে, আমি মিস আরনিকা মেয়ারবাল, ২৮, অ্যালমণ্ড রোড, আমার একটা মুক্তার নেকলেস আমার বান্ধবী মনিকা ডিকেনসকে উপহার হিসেবে দিয়ে যাচ্ছি, আমার স্মৃতি হিসেবে। এটা আমি পেয়েছিলাম আমার খালার কাছ থেকে। দুই ছড়ায় মোট আটানববইটা মুক্তা আছে এতে…
আটানব্বই! বলে উঠল জিনা। আমরা যেটা পেয়েছি সেটার কথাই বলেছে। আটানব্বইটাই আছে। গুনে দেখেছি।
দুই ছড়া। হাঁ, ঠিকই আছে, মুসা বলল।
বিশ বছর আগে লেখা হয়েছে এই দলিল, কাগজটায় আরেকবার চোখ বলিয়ে বলল কিশোর। অথচ মিস মেয়ারবাল মারা গেছেন মাত্র কয়েকদিন আগে।
রবিন বলল, নেকলেসটার মালিক এখন তাহলে মনিকা ডিকেনস। কি করে খুঁজে বের করব তাকে?
বের করতেই হবে, যেভাবেই হোক, জিনা বলল। যেহেতু দলিল করে রেখে গেছেন মিস মেয়ারবাল, মনিকা ডিকেনসই এখন এটার আসল মালিক। বিশ বছর আগেই তিনি উইল করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর নেকলেসটা পাকেন তাঁর বান্ধবী। এতদিন ওটা টেবিলের গোপন ড্রয়ারে থেকে থেকে পুরানো হয়েছে। তিনি নিশ্চয় ভাবেননি এতদিন বাঁচবেন।
চিঠিটা আন্টিকে দেখানো দরকার, মুসা বলল।
দলিলটা পড়ে অবাক হলেন না মিসেস পারকার। তাহলে ঠিকই আন্দাজ করেছি আমি, আসল মুক্তাই। অনেক দামি জিনিস। এক মুহূর্ত ভাবলেন তিনি। আজ বিকেলেই গিয়ে একজন উকিলের সাথে দেখা করব। ওই মহিলাকে খুঁজে বের করে তার জিনিস ফিরিয়ে দেয়ার জন্যে।
উকিলের কাছে যাবেন? কিছুটা হতাশ মনে হল যেন কিশোরকে। আরেক কাজ করলেই তো পারি। ওই মহিলাকে আমরাও খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে পারি।

তার মানে গোয়েন্দাগিরি? হাসলেন কেরি আন্টি। কোন কাজ না পেয়ে বিরক্ত হয়ে গেছ নিশ্চয়।
হ্যাঁ, মা, অনুরোধ করল জিনা। উকিলের কাছে তো যে-কোন সময় যেতে পার। তারচে আমরা একবার চেষ্টা করে দেখি না। সময় কাটবে ভাল।
হ্যাঁ, আমারও তাই মত, রবিন বলল।
বেশ, তিন গোয়েন্দার ওপর ভরসা আছে আন্টির। দেখ চেষ্টা করে। তবে ঘরে রাখা ঠিক হচ্ছে কিনা বুঝতে পারছি না। এত দামি একটা জিনিস।
কেউ তো আর জানছে না ওটা আমাদের কাছে আছে, কিশোর বলল। -তা ঠিক।
উত্তেজনার মাঝে খুব দ্রুত দুপুরের খাবার শেষ হলসেদিন ছেলেমেয়েদের। তারপর আলোচনায় বসল ওরা। অবশ্যই তাদের সঙ্গে রইল রাফিয়ান।
প্রথমেই, কিশোর বলল, মনিকা ডিকেনসের নাম খুঁজতে হবে টেলিফোন বুকে।
ঠিক, বলতে বলতে মোটা ডিরেকটরিটা টেনে নিল রবিন। দেখি।
দ্রুত পাতা উল্টে চলল সে। তার কাঁধের ওপর দিয়ে বুকে এল অন্য তিনজন। ডিকেনস কয়েকটাই পেল, কিন্তু মনিকা ডিকেনস একজনও নেই।
আরেকবার দেখা যাক, মুসা পরামর্শ দিল।
দরকার নেই, কিশোর বলল। এতগুলো চোখকে ফাঁকি দিয়ে নিশ্চয় লুকিয়ে থাকেনি নামটা।
হয়ত মহিলার টেলিফোন নেই, রবিন বলল।
হতে পারে, জিনা বলল।
কিংবা এ-শহর থেকে চলে গেছে,বলল মুসা।
বিয়েও হয়ে গিয়ে থাকতে পারে, অনুমান করল রবিন। স্বামীর নাম হয়ত ডিকেনস নয়।
অথবা মিস মেয়ারবালের মত মরেও গিয়ে থাকতে পারে, ঘোষণা করল যেন কিশোর।
তাই তো, এটা তো ভেবে দেখিনি, জিনা বলল। বিশ বছর আগে উইলটা করা হয়েছে। আর এত ঘনিষ্ঠ বান্ধবী যখন, মিস মেয়ারবালের সমবয়সীও হতে পারে। তাহলে মরে যাবারই কথা।
কিন্তু সেটা জানব কিভাবে আমরা? মুসার জিজ্ঞাসা।
হুফ! রাফিয়ানও যেন একই প্রশ্ন করল।
গম্ভীর হয়ে গেল সবাই। কিশোর বাদে। কাজ জটিল হলেই তার আনন্দ। হাসিমুখে বলল, সহজেই সেরে ফেলব ভেবেছিলাম আমরা, শুধু টেলিফোন বুক দেখেই। হল না।

ইস, ঠিকানাটাও যদি লিখে রেখে যেতেন মিস মেয়ারবাল! জিনা আফসোস করল।।
নিজের কপালে টোকা দিল কিশোর। একটা বুদ্ধি এসেছে মাথায়। মিস মেয়ারবালের বাড়িতে গিয়ে দেখা যাক। খুঁজলে কিছু বেরিয়েও পড়তে পারে। তার ঠিকানা আছে দলিলে।
ঠিক বলেছ! তুড়ি বাজালমুসা। কিন্তু গিয়ে কি খুঁজব ওখানে?
মিস মেয়ারবালের পড়শী থাকতে পারে। তাকে বা তাদেরকে জিজ্ঞেস করব। ওরা হত এমন কোন সূত্র জানাতে পারে, যাতে মনিকা ডিকেনসকে খুঁজতে সুবিধে হয়।
হ্যাঁ, ভাল বলেছ, একমত হল রবিন। তা-ই করা উচিত।
জিনা খুশি হতে পারছে না। মাথা ঝাঁকিয়ে কিশোরের কথায় সায় জানাল, হ্যাঁ, বুদ্ধিটা ভাল। কিন্তু যাব কিভাবে?
কেন, বাসে, রবিন বলল। ট্রেনেও যেতে পারি। লণ্ডনের মত এই শহরেও পাতালরেল রয়েছে। ট্রেনে করে যেতে অসুবিধে কি?
আমাদের অসুবিধে নেই, জিনা বলল। কিন্তু রাফি যাবে কিভাবে? বাক্সে ভরে নেব নাকি? ওকে বাড়িতে রেখে যেতে পারব না।
তাই তো, চোয়াল স্কুলে পড়ল রবিনের। ঋড়িতে করে ছাড়া পাতালরেলে কোন জানোয়ার নেবার অনুমতি নেই। না হয় ভরলাম। কিন্তু যা ভারি ও। কতক্ষণ বয়ে নিতে পারব? কি করা যায় বলতো?
সঙ্গে সঙ্গে জবাব মিলল না। ভাবছে সবাই। বার দুই নীরবে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। উজ্জ্বল হল মুখ। ঝুড়িতে করেই যাবে। কিন্তু আমাদের বয়ে নিতে হবে না ওকে। ওর বোঝা ও-ই বইবে।
ধাঁধা বললে নাকি? মুসা ভুরু নাচাল।
মোটেও না,মাথা ঝাঁকাল কিশোর। ওঠো। রওনা হই।
কিশোরের পিছে পিছে চলল সবাই। অবাক হয়ে ভাবছে, কি করবে গোয়েন্দাপ্রধান?
রান্নাঘরে ঢুকল কিশোর। বেতের বড় একটা বাজার করার ঝুড়ি বের করল। চলো, বাই, বলল সে।
কাছের টিউব-রেল স্টেশনটায় চলে এল ওরা। শহরের একটা ম্যাপ জোগাড় করে নিতে কষ্ট হল না। অ্যালমণ্ড রোডটা কোথায় খোঁজ করল তাতে। ...
ছুরি বের করে ঝুড়ির নিচের দিকে চারটে গোল ফোকর কাটল কিশোর। তারপর ঝুড়ির মুখ খুলে ইশারা করল রাফিয়ানকে। একান্ত বাধ্য ছেলের মত ঋড়িতে ঢুকে পড়ল বুদ্ধিমান রাফিয়ান। বুড়ির আঙটা ধরল কিশোর, আরেকটা মুসা। দুজনে মিলে কুকুরটাকে বয়ে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল প্ল্যাটফর্মে।

টিকেট ক্লার্কের চোখে পড়বে না এমন একটা জায়গায় এসে নামিয়ে রাখল ঝুড়িটা। কিশোর আদেশ দিল, এবার হাঁট রাফি। দেখ চেষ্টা করে পারিস কিনা।
চার ফোকরে চার পা ঢুকিয়ে ঝুড়ি নিয়ে উঠে দাঁড়াল রাফিয়ান। হাঁটতে শুরু করল। এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে হো হো করে হেসে উঠল মুসা। তার হাসিতে যোগ দিল রবিন আর জিনা।
এই, অত হেসো না, হুঁশিয়ার করল কিশোর। স্টেশনের কেউ দেখে ফেললে মুশকিল হবে।
কুকুরের পা নিয়ে হাঁটছে একটা বুড়ি। ওই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে হাঁ করে তাকিয়ে রইল প্ল্যাটফর্মের যাত্রীরা। মুচকি হাসল কেউ কেউ।
প্ল্যাটফর্মের একধারে এসে রাফিয়ানকে বলল কিশোর, বসে থাক!
বাধ্য ছেলের মত ঝুড়ি নিয়ে বসে পড়ল কুকুরটা।
রবিন গিয়ে টিকেট কেটে আনল। এরপর ট্রেনের অপেক্ষা।
ট্রেন এল। ধরাধরি করে ঝুড়িটা তোলা হল। মুখোমুখি দুটো সিটে বসল ছেলেমেয়েরা, একেক সিটে দুজন করে।
খুব লক্ষ্মী ছেলে, রাফিয়ানের প্রশংসা করল জিনা। ওর মত কুকুরই হয় না। কেমন চুপচাপ রয়েছে। অবশ্যই লক্ষ্মী রাফিয়ান, অনেক কুকুরের চেয়ে বুদ্ধিও ধরে বেশি। তবে জাতে সে কুকুর। আর কুকুরের যা স্বভাব, বেড়াল দেখতে পারে না।
জিনা যখন তার প্রশংসা করছে, ঠিক ওই সময় বাতাসে না-পছন্দের জিনিসের গন্ধ পেয়েছে রাফিয়ান। ওই কামরারই একধারে এক মহিলা বসেছে, পায়ের কাছে একটা বেতের ঝুড়ি, মুখ বন্ধ। নড়াচড়া টের পাওয়া যাচ্ছে ওটার ভেতর। বেড়াল!
ঘাউ করে উঠল রাফিয়ান। বিকট চিৎকার। ঝুড়িতে ওকে চুপচাপ থাকতে হবে একথা আর মনে রইল না। লাফ দিয়ে উঠে বুড়ি নিয়েই ছুটল।
তুমুল কাণ্ড শুরু হয়ে গেল কামরার ভেতরে। যাত্রীরা অবাক। বুড়ি হাঁটে কি করে! তারপর ওটার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল বিশাল এক কুকুরের মুখ। ভয়ে কুঁকড়ে গেল কেউ। তবে বেশির ভাগই উপভোগ করল ব্যাপারটা। হাসিতে ফেটে পড়ল ওরা।
রাফিয়ানের কোনদিকে কান নেই। চেঁচিয়ে ডাকছে জিনা, শুনতেই পেল না। চোখের পলকে পৌঁছে গেল বেড়ালের ঝুড়ির কাছে।
ঘাউ! ঘাউ! প্রচণ্ড চিৎকার করছে নাক দিয়ে ঠেলে খোলার চেষ্টা করছে বেড়ালের বুড়ির মুখ।

মিয়াঁওও! ভেতর থেকে এল রাগতঃ প্রতিবাদ। ছিটিক হিটিক করে জোরে জোরে থুথু ছেটানোর শব্দ, তারপর তীক্ষ্ণ হিসহিস। ঝট করে বেরিয়ে এল একটা রোমশ কালো থাবা, বেরিয়ে পড়েছে ধারালো নখগুলো। আঘাত হানল রাফিয়ানের নাকে।
আঁউও! করে আর্তনাদ করে উঠল রাফিয়ান। পিছিয়ে এল। বদমেজাজী কুকুর নয় সে, বেড়াল তাড়া করে স্বভাবের কারণে, মজা করার জন্যে, মারার জন্যে নয়। কিন্তু খুড়ির ভেতরে বোকা গাধাটা তার মতলব বুঝতে পারেনি, ভয়ঙ্কর হয়ে রুখে দাঁড়িয়েছে। আরে বাবা, অন্য সময় যেমন গাছে উঠে পালিয়ে যাস, তেমনি পালিয়ে গেলেই পারতিস! যত্তোসব!
হতভম্ব হয়ে গেল রাফিয়ান। তার পিঠের ওপরে ঝুড়ির দুটো হ্যাণ্ডেল বাড়ি খাচ্ছে। নাক থেকে গড়িয়ে পড়ল দুই ফোঁটা রক্ত।
দারুণ দেখিয়েছিস, ম্যাগি! বলল বেড়ালের মনিব। খুব ভাল করেছিস। আচ্ছা শিক্ষা হয়েছে বেয়াদব কুকুরটার।
জবাবে আরেকবার হিসিয়ে উঠল ম্যাগি। যেন কুকুরটাকে ডেকে বলল, আর লাগতে আসবি আমার সাথে, কুকুর কোথাকার!
হতবাক হয়ে পড়েছে জিনাও। রাফিয়ানেরই দোষ। তাই মহিলাকে কিছু বলল না, শুধু চোখের আগুনে একবার ভ করার চেষ্টা চালাল। রাফিয়ানের কলার চেপে ধরল একহাতে, আরেকহাতে ঝুড়ির আঙটা আরেকটা আঙটা ধরতে বলল মুসাকে। বয়ে নিয়ে এল কুকুরটাকে। যার যার সিটে এসে বসল। কামরায় প্রচণ্ড হাসাহাসি চলছে। কুকুরটাকে বসতে বলার কথা পর্যন্ত ভুলে গেছে জিনা। ঝুড়ি পিঠে নিয়ে দাঁড়িয়েই আছে রাফিয়ান। বিচিত্র দৃশ্য। তাতে হাসি আরও বাড়ছে লোকের।
ছেলেমেয়েরা হাসল না। এত গোলমাল কিসের, বুঝতে পারল না রাফিয়ান।
অবশেষে যাত্রা শেষ হল।
খোলা বাতাসে বেরিয়ে এল আবার ওরা। রাফিয়ানকে ঝুড়ি থেকে বের করে স্বস্তির নিঃস্বাস ফেলল।
নিশ্চয় সামনের ওই চওড়া রাস্তাটাই অ্যালমণ্ড রোড, রবিন বলল।
২৮ নাম্বার খুঁজে বের করতে অসুবিধে হল না। অনেক পুরানো একটা বাড়ি। তবে বেশ সুরক্ষিত, নতুন রঙ করা হয়েছে। ধনী একজন ইংরেজ ভদ্রমহিলা এরকম জায়গায়ই বাস করবেন আশা করেছিল ছেলেমেয়েরা।
ঘন্টা বাজাল কিশোর। দরজা খুলে দিল এক মহিলা, বাড়ির কেয়ারটেকার, ওদের সঙ্গে হাসি মুখেই কথা বলল।

হ্যাঁ হ্যাঁ, মহিলা বলল, অত্যন্ত ভাল মানুষ ছিলেন মিস মেয়ারবাল। একাই থাকতেন। বিশেষ কেউ আসতও না তার কাছে, শুধু একজন ছাড়া। তার মতই বৃদ্ধা, মিসেস ডিকেনস। হ্যাঁ, মিস মেয়ারবালকে যেদিন কবর দেয়া হল সেদিনও এসেছিলেন মহিলা, শেষ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে…
একনাগাড়ে বলে চলেছে মহিলা, কথা যেন আর ফুরায়ই না। খানিকক্ষণ উসখুস করে শেষে তাকে থামানোর জন্যে কিশোর বলল, মিসেস ডিকেনস-এর প্রথম নামটা জানেন? মনিকা, তাই না?
মনিকা? হ্যাঁ, বোধহয়। হ্যাঁ হ্যাঁ, একবার শুনেছি বলেও মনে পড়ছে…
কোথায় থাকে জানেন? উত্তেজিত হয়ে উঠেছে মুসা।
নিশ্চয় জান। একদিন মিসেস মেয়ারবাল আমাকে বললেন, একটা জিনিস নিয়ে গিয়ে মিসেস ডিকেনসকে দিয়ে আসতে…
ঠিকানাটা বলুন, জলদি! আর ধৈর্য রাখতে পারছে না জিনা। চেঁচিয়ে উঠল।
তার কথায় থমকে গেল মহিলা। ভুরু কুঁচকে তাকাল। এখুনি যেন নিজেকে গুটিয়ে নেবে শামুকের মত। তাড়াতাড়ি সামাল দেয়ার জন্যে হাসল রবিন। ব্যাপারটা খুব জরুরি, ম্যাম, প্লীজ! মিসেস ডিকেনসকে আমাদের খুব দরকার। একমাত্র আপনিই জানাতে পারবেন তাঁর ঠিকানা।
আবার হাসি ফুটল কেয়ারটেকারের মুখে। তবে জিনার দিকে আর ফিরেও তাকাল না। বলল, দরকার, না? বেশ। লিখে নেবে নাকি? হিরনু স্ট্রীটে থাকেন তিনি। এখান থেকে বেশি দূরে নয়।
হেঁটেই যাবার সিদ্ধান্ত নিল ওরা।
ঠিকানামত আরেকটা মস্ত বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। ওটারই একটা ফ্ল্যাটে থাকেন মিসেস ডিকেনস। কিশোর বেল বাজালে দরজা খুলে দিল এক তরুণী, কোলে বাচ্চা। হেসে বলল, হাল্লো, কি করতে পারি?
কেন এসেছে জানাল কিশোর। বিষণ্ন হয়ে গেল মেয়েটা। ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে বলল, দেরি করে ফেলেছ। গত হপ্তায় মারা গেছেন তিনি। মিস মেয়ারবালের শেষ অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন, বেশি রাত করে ফেলেছিলেন। ঠাণ্ডা লেগে নিউমোনিয়ায় ধরল। আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যেই শেষ।
নীররে একে অন্যের দিকে তাকাতে লাগল ছেলেমেয়েরা। তদন্ত এখানেই শেষ। যার নামে নেকলেসটা উইল করে দিয়ে গেছেন মিস মেয়ারবাল, তিনিও আর বেঁচে নেই।
দ্রুত ভাবনা চলেছে কিশোরের মাথায়। জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, মিসেস ডিকেনসের কোন আত্মীয় স্বজন আছে, জানেন? স্বামী, কিংবা ছেলেমেয়ে?
স্বামী মারা গেছেন অনেকদিন আগেই। তবে শুনেছি, এক মেয়ে আছে।

কোথায় থাকে বলতে পারবেন?
না। এখানে মাত্র দুমাস হল এসেছি। তবে আরও ফ্ল্যাট আছে, পুরানো লোকও আছে, তারা হয়ত কিছু বলতে পারবে। একজন থাকেন মিসেস ডিকেনসের পাশের ফ্ল্যাটে, বৃদ্ধা। তিনি জানতে পারেন।
ভাবল কিশোর। সবার দরজায় টোকা দিয়ে লাভ নেই। বরং ওই বৃদ্ধাকেই জিজ্ঞেস করা যাক।
ঠিক জায়গাতেই এল সে। প্রশ্নের জবাবে বৃদ্ধা বললেন, হ্যাঁ, জানি। মনিকার মেয়ের নাম মিলি। অনেক আগে বিয়ে হয়েছে। দাওয়াতে আমিও গিয়েছিলাম।
ওখানেই আছে এখনও?
ওটা ওর শ্বশুরের বাড়ি, ভাড়া বাড়ি নয়, থাকারই তো কথা।
ঠিকানাটা জানেন? –
মনে নেই, তবে লিখে রেখেছি কোথাও। দেখি। উঠে গিয়ে একটা আলমারি খুললেন তিনি। একটা নোটবুক বের করলেন। পাতা উল্টে উল্টে একজায়গায় এসে থামলেন। হ্যাঁ, আছে। তার স্বামীর নাম রিচার্ড ব্যানার। সাত নাম্বার পার্ক অ্যাভেন্যু। এখনও আছে কিনা কে জানে...অনেকদিন মিলির কোন খবর জানি না। মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে সেই যে চলে গিয়েছিল, আর আসেনি। বড্ড জেদী মেয়ে।
নোটবুকে দ্রুত ঠিকানাটা টুকে নিল রবিন।
বৃদ্ধাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এল ওরা।
ঠিকই আছে, বাইরে বেরিয়ে জিনা বলল। মায়ের জিনিস মেয়েই পাবে। এখন পার্ক অ্যাভেনুটা খুঁজে বের করতে হবে আমাদের। কোথায় ওটা, কিশোর?
ম্যাপ দেখল কিশোর। বোট্যানিক গার্ডেনস-এর কাছে বাসে যেতে হবে।
ঝট করে রাফিয়ানের দিকে তাকাল মুসা, তারপর হাতের ঝুড়ির দিকে। হেসে বলল, রাফি, আবার ঢুকতে হবে এটাতে। খবরদার, এবার বেড়াল এসে নাকের কাছে দাঁড়ালেও কিছু করতে পারবি না।
আর কোন গোলমাল হল না। বিশ মিনিট পর নিরাপদেই বাস থেকে নামল ওরা। এসে দাঁড়াল আরেকটা বাড়ির সামনে। যেখানে বাস করে মিলি ব্যানার। এখনও করে, নাকি করত?
বাড়িতে ঢোকার মুখে একটা হলঘর। ঝাট দিচ্ছে একজন লোক। ছেলেমেয়েদের পথ আটকাল। কর্কশ গলায় জিজ্ঞেস করল, কি চাই?
এখানকার কেয়ারটেকার কে? জানতে চাইল কিশোর।
আমি। বল। লোকটা মোটেই আন্তরিক নয়।
আচ্ছা, মিসেস ব্যানার কোন ফ্ল্যাটে থাকেন, বলতে পারবেন?

মিসেস ব্যানার? তিনি তো নেই। কয়েক বছর হল অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছেন। তার স্বামী আর মেয়ের জামাইটাও মরেছে। ওই ছোকরাই গাড়ি চালাচ্ছিল। বেপরোয়া চালাত। আজকালকার ছেলেছোকরাগুলোর স্বভাবই ওরকম। সব কিছুতেই তাড়া। আমার গাড়ি থাকলে…
কেয়ারটেকারকে থামিয়ে দিল জিনা, তার মেয়ে বেঁচে আছেন? আবার বাধা দিল জিনা।
আছে। কপাল খারাপ…
কোথায় থাকেন? ঠিকানাটা বলবেন? আবার বিয়ে করেছেন?
বার বার বাধা পেয়ে মেজাজ বিগড়ে গেল কেয়ারটেকারের। কড়া গলায় বলল, আচ্ছা ছেলে তো! জিনাকে ছেলে বলে ভুল করল সে। কোন কথাই শুনতে চায় না! এই, এত তাড়া থাকলে নিজেই গিয়ে খুঁজে বের কর না। আমাকে জিজ্ঞেস করছ কেন? যাও এখন। কুত্তা ঢুকিয়েছ কেন? পায়ের ময়লা দিয়ে সারা ঘর তো দিলে নোংরা করে…
রেগে উঠতে যাচ্ছিল জিনা, তাকে থামিয়ে দেয়ার জন্যে তাড়াতাড়ি বলল কিশোর, যাচ্ছি। ওপরে গিয়ে দেখি আর কেউ কিছু জানে কিনা…
খবরদার, ওপরে যাবে না বলে দিচ্ছি! গর্জে উঠল কেয়ারটেকার। মাত্র পরিষ্কার করলাম। ময়লা করতে দেব না।
কুকুরটাকে বয়ে নিয়ে যাব আমরা, বলল মুসা।
ভালমত পা মুছে যাব, রবিন বলল।
হবে না! কেয়ারটেকার বলল। বেরোও। কোত্থেকে এক কুত্তা নিয়ে ঢুকেছে! তোমাদের সঙ্গে বকবক করে সময় নষ্ট করতে পারব না।
আর সামলানো গেল না জিনাকে। বকবক তো আপনি করলেন। সেটাই মাতে চাইছিলাম।
রেগে লাল হয়ে গেল কেয়ারটেকার। পারলে ঝাড় দিয়ে বাড়ি মারে। এটা বোধহয় আন্দাজ করে ফেলল রাফিয়ান। দাঁত খিঁচিয়ে লাফ দিয়ে সামনে এগোল। এমন জোরে ঘেউ ঘেউ করে উঠল, ভীষণ চমকে গিয়ে হাত থেকে ঝাড়ু ছেড়ে দিল কেয়ারটেকার।
রাফিয়ানের কলার টেনে ধরে থামাল জিনা। আমাদেরকে আটকানোর কোন অধিকার নেই আপনার। কার সঙ্গে দেখা করতে যাব, না যাব, সেটা আপনার ব্যাপার নয়। আর এত ধমকাচ্ছেন কেন? কি করেছি আমরা? কয়েকটা কথাই শুধু জানতে চেয়েছি।
আমি…তোমরা…, রাগ এবং একই সাথে কুকুরটার ভয়ে কথা আটকে যাচ্ছে কেয়ারটেকারের।

দেখুন, মুসা বলল, ভাল চাইলে পথ ছাড়ুন। নইলে আবার ছেড়ে দেয়া হবে ওকে, রাফিয়ানকে দেখাল সে।
আর আমার বিশ্বাস, সহজে রাগে না কিশোর, কিন্তু এই লোকটার ওপর রেগে গেছে, ওটা আপনাকে কামড়াতে পারলে খুশি হবে। কামড় খেতে চান। নাকি?
খেতে চাইল না কেয়ারটেকার। রাগে গটমট করে চলে গেল একটা দরজার দিকে। টান দিয়ে খুলে ভেতরে ঢুকল, তারপর দড়াম করে বন্ধ করে দিল পাল্লা।
হাসতে শুরু করল জিনা। যাক, ভয় তাহলে পেয়েছে। রাফিয়ানের মাথায় আলতো চাপড় দিয়ে বলল, খুব ভাল করেছিস।
এসো, বলে সিঁড়ির দিকে রওনা হল কিশোর।
দোতলায় উঠে প্রথম যে দরজাটা পড়ল, ওটার বেল বাজাল কিশোর। খুলে দিল এক অল্প বয়সী মহিলা।
গুড আফটারনুন, বিনীত কণ্ঠে বলল কিশোর। বিরক্ত করলাম আপনাকে, সরি। মিসেস ব্যানারের মেয়ের খোজে এসেছি আমরা। তিনি কি এখানে থাকেন?
ব্যানার? নাহ্, এই বুকে ওই নামে কেউ আছে বলে জানি না। তবে আমি এসেছি নতুন, এই কদিন হল।...আচ্ছা, এক কাজ কর না। পাঁচতলায় চলে যাও। একজন বুড়ো ভদ্রলোক থাকেন ওখানে, নাম মিস্টার উইলিয়ামস। গানের শিক্ষক। তিরিশ বছর ধরে আছেন ওই ফ্ল্যাটে। তিনি কিছু বলতে পারবেন।
মহিলাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আবার সিঁড়ির দিকে এগোল ওরা। পাঁচতলায় উঠে দেখতে পেল, একটা দরজায় পেতলের নেমপ্লেট লাগানো রয়েছেঃ ডেভিড উইলিয়ামস-পিয়ানো টীচার।
বেল বাজাল কিশোর। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই খুলে গেল দরজা। লম্বা এক বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে আছেন। মাথাভর্তি ঝাঁকড়া চুল, সব সাদা। হাসলেন। গুড আফটারনুন, ইয়াং ফ্রেণ্ডস, বললেন তিনি। পিয়ানো শিখতে চাও?
জ্বী না, দ্রলোকের হাসিটা ফিরিয়ে দিল কিশোর। আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে। সময় হবে?
এসো, বলে সরে দাঁড়ালেন তিনি। রাফিয়ানকে নিয়ে ঢুকবে কিনা দ্বিধা করছে জিনা, দেখে তিনি বললেন, না না, অসুবিধে নেই। নিয়েই এসো। কুকুরটা তোমার,, ইয়াং ম্যান? কেয়ারটেকারের মতই জিনাকে ছেলে বলে ভুল করেছেন মিস্টার উইলিয়ামসও। – হাসল জিনা। নিতান্তই ভদ্রলোক এই মানুষটি, তাঁকে ফাঁকি দিতে চাইল না সে। বলল, হ্যাঁ, স্যার, আমারই। আর আমি ছেলে নই, মেয়ে, জরজিনা। ওর নাম রাফিয়ান।
একে একে সকলের সঙ্গে হাত মেলালেন উইলিয়ামস। দেখাদেখি রাফিয়ানও একটা পা তুলে দিল। ভুরু কুঁচকে এক মুহূর্ত ওটার দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি।

তারপর হেসে পা ধরে ঝাঁকিয়ে দিলেন।
আসার কারণ জানাল কিশোর।
হ্যাঁ, বললেন মিস্টার উইলিয়ামস, কেয়ারটেকার ঠিকই বলেছে। ভাবলে খারাপই লাগে। খুব ভাল লোক ছিল ওরা। মিলিও মারা গেছে, তার স্বামীও। জামাইটাও বাঁচেনি। তবে মিলির মেয়ে এরিনা বেঁচে আছে। ওই গাড়িতে তখন ছিল না সে। এখানেই ওর জন্ম। ওকে পিয়ানো বাজানো শিখিয়েছিলাম আমি। খুব ভাল হাত ওর, আমার ছাত্রদের মধ্যে ওর মত কমই পেয়েছি। এখন তার বয়েস সাতাশ। আর বিয়ে-থা করেনি। আমার মতই এখন পিয়ানো বাজানো শিখিয়ে পেট চালায়। একটা মেয়ে আছে। নাম মলি।
পুরো নাম কি তার? জিজ্ঞেস করল কিশোর। মানে, স্বামীর নাম কি ছিল?
কোথায় থাকে? যোগ করল মুসা।
স্বামীর নাম ছিল কলিনস। দুই কামরার একটা ফ্ল্যাটে থাকে এরিনা, কাছেই, সাইক্যামোর রোডে।
আনন্দে উজ্জ্বল হল কিশোর গোয়েন্দাদের মুখ।
থ্যাঙ্ক ইউ ভেরিমাচ, স্যার, কিশোর বলল। আপনাকে বলতে অসুবিধে নেই, জরুরি একটা ব্যাপারে তাকে খুঁজছি। একটা খুব দামি জিনিস আছে আমাদের কাছে, ওটার মালিক এখন মিসেস কলিনস।
জিনিসটা কি জানতে চাইলেন না মিস্টার উইলিয়ামস। সত্যিই তিনি দ্রলোক। বললেন, শুনে খুশি হলাম। অনেক কষ্ট করে মেয়েটা। জিনিসটা পেলে সাহায্য হবে।
সাইক্যামোররোডটা কোথায়, স্যার? মুসা জিজ্ঞেস করল।
এই সময় ঝটকা দিয়ে দরজা খুলে ঘরে ঢুকল এক তরুণ। বয়েস আঠারো মত হবে। চমকে গিয়ে ঘেউ ঘেউ শুরু করল রাফিয়ান।
আরে আরে, এত রাগ করার কিছুই নেই, রাফিয়ানকে শান্ত করার জন্যে হাসলেন উইলিয়ামস।ও আমার নাতি, টনি। তোকে মারবে না।
সবার সঙ্গে টনির পরিচয় করিয়ে দিলেন মিস্টার উইলিয়ামস। ওদেরকে সাইক্যামোর রোড দেখিয়ে দেয়ার প্রস্তাব দিল টনি। বলল, কাছেই। চলো, দেখিয়ে দিই।
মিস্টার উইলিয়ামসকে আরেকবার ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এল ওরা। টনির সাথে চলল। ছেলেটাকে ভালই মনে হল ওদের, প্রচুর কথা বলে। বলল, তোমাদের কথা আমি শুনেছি। আমেরিকায় গিয়েছিলাম একবার, লস, অ্যাঞ্জেলেসে। তোমরা তিন গোয়েন্দা, অনেক জটিল রহস্যের সমাধান করেছ। পত্রিকায়ও অনেকবার উঠেছে, তোমাদের নাম। শেষবার বোধহয় কয়েকটা

জটিল ধাঁধার সমাধান করেছিলে, এক বুড়ো লোকের লুকিয়ে রেখে যাওয়া গুপ্তধন বের করেছিলে।
হ্যাঁ, হেসে বলল মুসা। তোমার স্মৃতিশক্তি খুব ভাল।
অনেক নাম তোমাদের লস অ্যাঞ্জেলেসে। তোমাদের নাম আরও ছড়িয়েছেন বিখ্যাত ফিল্ম প্রডিউসার ডেভিস ক্রিস্টোফার। তাই না? তা, আমাদের শহরে বেড়াতে এসেছ বুঝি? ভাল। তোমাদেরকে সব রকমের সাহায্য করব আমি। যেকোন দরকার হলেই আমাকে ডেকো। আমার বাবার গাড়ি আছে, আমাকেও চালাতে দেয়। কাগজ আছে? আমাদের টেলিফোন নাম্বার লিখে রাখো। বলতে বলতে নিজেই মানিব্যাগ থেকে একটুকরো কাগজ বের করে ফোন নাম্বার লিখে দিল টনি।
কাগজটা পকেটে রাখল কিশোর।
এরিনা কলিনসের বাড়ি দেখিয়ে দিল টনি! নতুন বন্ধুকে ধন্যবাদ এবং গুডবাই জানিয়ে বাড়িটার দিকে এগোল ওরা। টনি ফিরে চলল তার দাদার বাসায়।
মিস মেয়ারবাল বা মিসেস ডিকেনসের বাড়ির মত জমকালো নয় এই বাড়িটা। সাধারণ। সিঁড়ির গোড়ায় কাঠের বোর্ডে নামের তালিকা টাঙানো রয়েছে। তাতে দেখা গেল এরিনা কলিনস থাকে তিনতলায়। সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল ওরা। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বেল বাজাল।
জবাব এল না।
কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করে আবার বোম টিপল কিশোর। এবারও সাড়া নেই। আরেকবার টিপে নিশ্চিত হল সে, এরিনা বাড়িতে নেই।
দূর! নাকমুখ কুঁচকে মুসা বলল, আবার কাল আসতে হবে! মাথা আঁকাল কিশোর।
একটা ব্যাপারে একমত হল, সবাই, বিকেলটা মন্দ কাটেনি। বেশ উত্তেজনা গেছে। খুঁজতে হয়েছে বটে অনেক, তবে নেকলেসের আসল মালিককে শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেছে।
বাসায় ফিরে এল ওরা। কেরিআন্টিকে জানাল সব। শুনে তিনিও খুশি হলেন।
সেরাতে সকাল সকাল শুতে গেল ছেলেমেয়েরা। সারাটা বিকেল অনেক পরিশ্রম করেছে, ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ওরা।
মাঝরাতে রাফিয়ানের চাপা ঘড়ঘড় শব্দে ঘুম ভেঙে গেল জিনার। তার বিছানার পাশেই শুয়ে ছিল কুকুরটা, উঠে দাঁড়িয়েছে।
কি হয়েছে রে, রাফি! ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করল জিনা।
সিটিং রুমের দরজার দিকে মুখ করে আছে রাফিয়ান। কান খাড়া।
মৃদু শব্দটা এবার জিনার কানেও এল। সিটিং রুমে নড়াচড়া করছে কেউ।

মাথায় হাত রেখে রাফিয়ানকে শব্দ না করার ইঙ্গিত করল জিনা। তারপর পা টিপে টিপে এগোল সিটিং রুমের দিকে। ও জানে, ফ্ল্যাটে কোথাও না কোথাও বার্গলার অ্যালার্ম রয়েছেই, থাকে এসব বাড়িতে। তাহলে বেজে উঠছে না কেন? হয়ত অফ করা রয়েছে।
আস্তে দরজা ফাঁক করে উঁকি দিল জিনা। টর্চের আলো চোখে পড়ল। নড়ছে। আর ঠেকানো গেল না রাফিয়ানকে। চিৎকার করতে করতে গিয়ে ঢুকল সিটিং রুমে। বিপদের পরোয়া না করে জিনাও ঢুকল ঘরে। চেঁচাতে লাগল, চোর! চোর!
টাব চেয়ারটার কাছে ছিল লোকটা। টর্চের আলো নিচের দিকে, ফলে তার চেহারা দেখতে পেল না জিনা, শুধু আবছা একটা অবয়ব। রাফিয়ান চিৎকার করে উঠতেই ঝট করে সোজা হল সে, ফিরে তাকাল।
জিনার চোর চোর চিৎকার শুনে দিল জানালার দিকে দৌড়।
রাফি! ধর ওকে! ধর ধর! আবার চেঁচিয়ে উঠল জিনা।
মস্ত জানালা, ফ্রেঞ্চ উইনডো। খোলা। ওটার দিকেই গেল লোকটা। সে জানালা ডিঙানোর আগেই পৌঁছে গেল রাফিয়ান। পা কামড়ে ধরতে গেল। দাঁত বসে গেল প্যান্টে, পায়ে লাগল না। ঝাড়া দিয়ে সেটা ছুটিয়ে নিয়ে একলাফে ব্যালকনিতে গিয়ে পড়ল লোকটা।
ইতিমধ্যে ছুটে এসেছে তিন গোয়েন্দা। মিস্টার পারকারেরও হাঁকডাক শোনা যাচ্ছে।
জানালার কাছে ছুটে গেল কিশোর, তার পরপরই মুসা।
লোকটাকে দেখতে পেল না। অনুমান করল ওরা, নিশ্চয় লাফিয়ে পাশের বাড়ির ব্যালকনিতে গিয়ে পড়েছিল লোকটা, তারপর ফায়ার এসকেপ বেয়ে নেমে চলে গেছে।
কেরিআন্টি আর মিস্টার পারকারও সিটিং রুমে এসে ঢুকেছেন।
চোরই, জিনা বলল। চেহারা দেখিনি। কিন্তু আমি শিওর, ওই কোলাব্যাঙটাই, রবার্ট ম্যাকি। টাব চেয়ারটার ওপর ঝুঁকে খুঁজছিল।
নিশ্চয় নেকলেসটা, মুসা বলল।
হ্যাঁ, ওটাই, আর কি খুঁজবে, কিশোর বলল। ওই চেয়ারেই লুকানো আছে। ওটা, আগে থেকেই জানে ব্যাটা।
এজন্যেই চেয়ার কেনার এত আগ্রহ ওর, কেরিআন্টি বললেন।
দেখ ছেলেরা, কেশ, একটু রুক্ষ স্বরেই বললেন মিস্টার পারকার। না জেনে অযথা কারও ওপর দোষ চাপানো ঠিক নয়। তার চেহারা দেখনি, কোন প্রমাণ নেই, ম্যাগিই যে এসেছিল কি করে বুঝলে?
যুক্তি দিয়ে, শান্তকণ্ঠে বলল কিশোর।

দেখ কিশোর, তোমার বুদ্ধির ওপর আমার আস্থা আছে। তবু, সব চেয়ে বুদ্ধিমান লোকটিও ভুল করে। তোমরা যা বলছ, পুলিশ সেটা বিশ্বাস না-ও করতে পারে। ওরা প্রমাণ চাইবে, সলিড প্রমাণ। চোর ঢুকেছিল, এটুকুই বলতে পারব, ব্যস। অ্যাটেমপ্‌ড় টু বার্গলারি। পুলিশকে অবশ্যই জানাব কাল, তবে রবার্ট ম্যাকিই এসেছিল, একথা বলব না।

দ্রুত, একবার সারা ঘরে চোখ বুলিয়ে নিলেন কেরিআন্টি। জানালেন, সব ঠিকই আছে, কিছু চুরি যায়নি। জানালায় কিছু দাগ আবিষ্কার করল কিশোর, যেগুলো জোর করে খোলার ফলে হয়েছে। আর কোন সূত্র নেই। এ দিয়ে পুলিশ চোর ধরতে পারবে না যে, ভাল করেই বুঝল।

আবার শুতে গেল ছেলেমেয়েরা। জিনা, মুসা আর রবিন নিশ্চিত, রবার্ট ম্যাকিই এসেছিল। কিশোরের মনে কিছুটা সন্দেহ রয়ে গেল। সত্যি ম্যাকি? অন্য কেউ না তো?

পুলিশ কিছু করলে করুক না করলে নেই, জিনা বলল। আমরাই এর বিহিত করব।

হুফ! একমত হল রাফিয়ান।

ভাগ্যিস, রবিন বলল, আগেই পেয়ে গিয়েছিলাম নেকলেসটা। নইলে আজ নিয়ে যেতোই। আমরা জানতেও পারতাম না ওটা ছিল, চুরি গেছে। আন্টি কোথায় রেখেছে ওটা, জিনা?

দৈখলাম তো মার হাতব্যাগে রাখল। পরে সরিয়ে-টরিয়ে রেখেছে কিনা জানি না।

পরদিন সকালে যথারীতি সম্মেলনে চললেন মিস্টার পারকার। বললেন, যাবার পথে পুলিশকে জানিয়ে যাবেন।

নাস্তার টেবিলে বসে চোর আসার ব্যাপারটা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা চালাল ছেলেমেয়েরা। কেরিআন্টি রান্নাঘরে ব্যস্ত।

আমি এখনও বলছি, জিনা বলল, রবার্ট ম্যাকিই এসেছিল।

আমি অতোটা শিওর না, মাথা নাড়ল কিশোর। রাতে শুয়ে শুয়ে ভেবেছি। কিউরিও আর সুভনির বিক্রি করে ম্যাকি, ওসব জিনিসের খুব ভাল লাভ। অনেক সময় আসল দামের বহুগুণ। টাব চেয়ারটা কিনতে চাওয়ার কারণ সেটাও হতে পারে। যদি সে জানতোই, নেকলেসটা রয়েছে ওটার মধ্যে, তাহলে আরও আগেই হাতানোর চেষ্টা করল না কেন? আর সেদিন নিলাম ডাকার সময় এত কিসের দ্বিধা ছিল তার? একবারেই দুশো-তিনশো পাউণ্ড দাম হেঁকে নিয়ে নিতে পারত। আর রাতের বেলা লোকের ব্যালকনি থেকে লাফঝাপ করাও ঠিক মানায় না তাকে। পারবে বলে মনে হয় না।

তারমানে, মুসা বলল, তুমি বলতে চাইছ, অন্য কেউ জানে নেকলেসটার কথা। কে সেই লোক?
ম্যাকিকে কিন্তু খুব একটা ভাল লোকও মনে হয় না, রবিন বলল। সেটা নিশ্চয় স্বীকার করবে, কিশোর? কাল রাতের চোর সে হতেও পারে।
সে-ই! জোর দিয়ে বলল জিনা।
সে নয়, একথা কিন্তু আমি বলছি না, কিশোর বলল। আমি অন্যান্য সম্ভাবনার কথা বলছি। যুক্তি দিয়ে ঠিক মেলাতে পারছি না, এই আরকি। তাছাড়া প্রমাণ কোথায়?
হাসল জিনা। নিজের ওপর খুব বেশি আস্থা তোমার, কিশোর পাশা। প্রমাণ চাও? দেখ, বলতে বলতে প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল। টেনে বের করে বলল, এই দেখ।
ভুরু কুঁচকে জিনিসটার দিকে তাকাল কিশোর। নীল রঙের একটুকরো। কাপড়।
কাল রাতে লোকটার প্যান্ট কামড়ে ধরেছিল রাফি, জিনা বলল। ছিঁড়ে রেখে দিয়েছে। এটা প্রমাণ নয়? এতে লোকটার গায়ের গন্ধ লেগে আছে। লোকটাকে এখন সামনে পেলে চিনতে পারবে রাফি। ম্যাকির দোকানে ওকে নিয়ে যাব। ওকে দেখলেই রেগে যাবে রাফি, দেখ...
তাতেও কিছু প্রমাণ হয় না। রাফি ওকে দেখতে পারে না। রেগে তো যাবেই।
তবু, যাবই। নেকলেসটার কথা যদি জেনে থাকে সে, সহজে ক্ষান্ত হবে না।
কিন্তু ওখানে গেলেই বুঝে ফেলবে, আমরা তাকে সন্দেহ করছি, যুক্তি দেখাল রবিন। তখন তার ওপর নজর রাখা কঠিন হয়ে যাবে আমাদের জন্যে।
ও আমাদেরকে ভালমত চেনে না। চেনে? জিনা বলল। সেল-রুমে ভিড় ছিল। তাছাড়া মার সঙ্গেই কথা বলছিল সে, আমাদের দিকে বিশেষ নজর দেয়নি।
তা ঠিক, মুসা বলল। কাল রাতেও আমাদেরকে দেখেনি। আমরা আসার আগেই পালিয়েছে।
আমাদের দেখেনি, কিশোর মনে করিয়ে দিল। কিন্তু জিনাকে দেখেছে।
দেখলেও আবছাভাবে দেখেছে। আমি যেমন দেখেছি।
কিন্তু রাফি? রবিন বলল। ওকে তো দেখেছে। শুধু দেখেইনি, দাঁতের আঁচড়ও খেয়েছে নিশ্চয়।
হুফ! মাথা ঝাঁকাল রাফিয়ান।
চুপ হয়ে গেল জিনা। ভাবছে। হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল চোখ। ঝুঁকি একটা নিতেই পারি আমরা। আমি আগে রাফিকে নিয়ে দোকানে ঢুকব, তোমরা বাইরে থাকবে। যদি আমাদের চিনেই ফেলে, সন্দেহ করে, এরপর থেকে আমি আর ওর

সামনে যাব না! তোমরা তখন নজর রাখবে। কাজেই নজর রাখার অসুবিধের কথা যে বলছ, তা হবে না।
তর্ক করলে করতে পারত কিশোর, কিন্তু করল না। জিনার কথায় যুক্তি আছে। অবশ্যই।
ঘন্টাখানেক পর রওনা হল ওরা। কাপড়টা সঙ্গে নিল জিনা। মিমোসা অ্যাভেনুতে পৌঁছে আলাদা হয়ে গেল ওরা। জিনা আর রাফিয়ান চলল আগে, ছেলেরা রইল পেছনে। ম্যাকির দোকানের কয়েক দোকান আগেই থেমে গেল তিন গোয়েন্দা।
পকেট থেকে কাপড়ের টুকরোটা বের করে ভালমত শোকাল রাফিয়ানকে জিনা। তারপর তাকে নিয়ে ঢুকে পড়ল দোকানে।
দোকানেই রয়েছে ম্যাকি। জিনাকে দেখে তৈলাক্ত হাসি হেসে এগিয়ে এল। মোলায়েম গলায় জিজ্ঞেস করল, তোমার জন্যে কি করতে পারি? কিন্তু জবাব দেয়ার সময় পেল না জিনা। রাতের অতিথিকে বোধহয় চিনে ফেলেছে রাফিয়ান। ঘেউ ঘেউ শুরু করল। ছুটে যেতে চাইছে জিনার হাত থেকে। লাফিয়ে গিয়ে ম্যাকির টুটি কামড়ে ধরতে চায়।
এই, চুপ! রাফিকে ধমক লাগাল জিনা। লোকটার দিকে চেয়ে লজ্জিত কণ্ঠে বলল, সরি, এমন করছে কেন বুঝতে পারছি না। ওর স্বভাব খুব ভাল। সহজে কাউকে কামড়াতে যায় না।
ভয় দেখা দিল লোকটার চোখে। সন্দেহে রূপ নিল সেটা। জিনা নিশ্চিত হয়ে গেল, ম্যাকিই গিয়েছিল রাতে। চিনে ফেলেছে রাফিয়ান, নইলে এত উত্তেজিত হত না। আর লোকটাও, বুঝে গেছে, এই কুকুরটাই তাকে কামড়াতে চেয়েছিল।
যাও, বেরোও তোমার কুত্তা নিয়ে! ধমকে উঠল ম্যাকি। জানোয়ারটানোয়ার ঢুকতে দিই না দোকানে এজন্যেই!
কিশোরের কথা না শুনে ভুল করেছে, বুঝতে পারল এতক্ষণে জিনা। হুঁশিয়ার হয়ে গেছে ম্যাকি। ভিড়ের মধ্যে দেখেছে বটে, কিন্তু দেখেছে তো, তিন গোয়েন্দাকেও চিনে রেখেছে কি না কে জানে!
বন্ধুদের কাছে ফিরে এল সে।
খবর শুনে খুশি হল না কিশোর। সে আগেই আন্দাজ করেছে এরকম একটা কিছু ঘটতে পারে। আরেকটা ব্যাপার জিনা খেয়াল করেনি, সে বেরোনোর পর পরই দোকান বন্ধ করে দিয়েছে ম্যাকি। দরজায় বন্ধ নোটিশ ঝুলিয়ে দিয়ে তার পিছু নিয়েছে। উল্টো দিক থেকে বইছে বাতাস, ফলে তার গন্ধ পায়নি রাফিয়ান। একটা গাড়ির আড়ালে লুকিয়ে বসে এখন ওদের সব কথা শুনছে।
ঠিক আছে, কিশোর, হাত তুলে বলল জিনা, স্বীকার করছি, ওভাবে শত্রুর ঘরে ঢুকে ভুল করেছি। কিন্তু শিওর তো হওয়া গেল, নেকলেস চুরি করার জন্যে ওই

লোকটাই এসেছিল কাল রাতে। এখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, এরিনা কলিনসের জিনিস তাকে পৌঁছে দেয়া দরকার।
এখুনি যাই না কেন তাহলে? পরামর্শ দিল মুসা। গিয়ে তাকে জানাই খবরটা।
হ্যাঁ, যাওয়া যায়, রবিন বলল। আজ বাসায় পেতেও পারি।
সুতরাং আবার সাইক্যামোর রোডে চলল ওরা। বাড়িটার কাছে পৌঁছল। সদর দরজা দিয়ে ঢোকার সময় হঠাৎ কি মনে করে পেছন ফিরে তাকাল জিনা। এই! প্রায় চেঁচিয়ে উঠল সে। দেখেছি! ম্যাকিকে দেখলাম মোড়ের ওপাশে চলে যেতে!
দূর, কি যে বল না, বিশ্বাস করল না মুসা। তোমার মাথায় এখন ম্যাকি ঢুকে রয়েছে তো, যেখানে যাও সেখানেই দেখ। এসো।
এরিনা কলিনসকে পাওয়া গেল সেদিন। ঘন্টা শুনেই এসে দরজা খুলে দিল। বয়েস কম। লম্বা কালো চুল পিঠের ওপর ছড়িয়ে আছে। পাশে তার ছোট্ট মেয়েটি, মলি। সুন্দর চেহারা, তবে নাকটা সামান্য বোচা, হাসিটা খুব মিষ্টি। বয়েস বছর ছয়েকের বেশি না।
নিজেদের পরিচয় দিল কিশোর। বলল, জরুরি কথা আছে।
হাসল এরিনা। বেশি জরুরি?
হ্যাঁ।
এসো। ছেলেমেয়েদেরকে ঘরে নিয়ে গেল এরিনা। বল।
সব কথা খুলে বলতে লাগল ওরা। রাফির সঙ্গে ভাব হয়ে গেছে মলির, খানিকক্ষণ পর সে-ও ওদের কথা শোনায় মনোযোগী হল, কৌতূহল জেগেছে।
আশ্চর্য! ছেলেদের কথা শেষ হলে বলল এরিনা। অবিশ্বাস্য!
কিন্তু সত্যি, জিনা বলল। বিশ্বাস না হলে নাম্বার দিচ্ছি, ফোন করুন আমার মাকে।
টেলিফোনের কাছে উঠে গেল এরিনা। কথা বলল মিসেস পারকারের সঙ্গে। জানল, ছেলেমেয়েরা মিথ্যে বলেনি। খুশিতে আত্মহারা হয়ে গেল সে। মলিকে কোলে নিয়ে আদর করল, আন্তরিক ধন্যবাদ জানাল তিন গোয়েন্দাকে, জিনাকে, এমনকি রাফিয়ানকেও।
তোমাদেরকে বলতে অসুবিধে নেই, এরিনা বলল, সময় খুব খারাপ যাচ্ছে আমার। পিয়ানো বাজানো শিখিয়ে আর কত আয় হয় বল। কোনমতে টেনেটুনে চলে আরকি মা-মেয়ের। মিস মেয়ারবাল মস্ত উপকার করে গেলেন আমাদের।
হারটা খুব দামি, কিশোর বলল। গোলাপী মুক্তা দুর্লভ তো, দাম বেশি।
আর খুব সুন্দর, রবিন বলল। দেখলে রেখে দিতে ইচ্ছে হবে আপনার।
কিন্তু ইচ্ছে করলেও রাখতে পারব না, এরিনা বলল, কারণ আমার টাকা দরকার। তাছাড়া মিসেস পারকার একটা ভাল পরামর্শ দিলেন, বললেন, সাথে সাথে যেন

বিক্রি করে টাকাটা ক্যাশ করে ফেলি। রেখে দিলে বিপদ হতে পারে। চোরের উপদ্রব নাকি শুরু হয়েছে। খোয়া যেতে পারে।
হ্যাঁ, পারে, জিনা বলল। চলুন আমাদের সঙ্গে। এখুনি নিয়ে নেবেন।
খানিকটা মাপ চাওয়ার ভঙ্গিতেই যেন হাসল এরিনা। যেতে পারলে তো ভালই হত। কিন্তু সারাদিন ব্যস্ত থাকতে হবে আমাকে। ছাত্ররা আসবে। আজ ডেট আছে অনেকের। কাল হয়ত যেতে পারব। একমুহূর্ত থামল সে। এতই অবাক হয়েছি কথাটা শুনে, তোমার মাকে ধন্যবাদ দিতেও ভুলে গেছি, জিনা। লাইনটা লাগাও না আরেকবার।
ডায়াল করল জিনা। সাথে সাথেই ধরলেন মা। তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে এরিনা বলল কাল সে আসছে, মিসেস পারকারের কোন অসুবিধে হবে কিনা। হবে না, তিনি জানালেন। বলে দিলেন সারা সকাল বাসায়ই থাকবেন। ঠিক হল, দশটা নাগাদ যাবে এরিনা।
ফোন রেখে দিয়ে এরিনা বলল, তাহলে কাল আবার দেখা হচ্ছে। অনেক অনেক ধন্যবাদ তোমাদেরকে, অনেক কষ্ট করেছ আমার জন্যে।
কাল দেখা হবে! অনেকটা মায়ের মত করেই বলল মলি। রাফিকে ছাড়তে চাইছে না সে। ভীষণ পছন্দ করে ফেলেছে কুকুরটাকে। আর রাফিও বাচ্চা পছন্দ করে, সহজেই মন জয় করে নিতে পারে ওদের।
পরদিন সকালে মস্ত জানালার কাছে বসে পথের দিকে তাকিয়ে রইল ছেলেমেয়েরা। ২
ওই যে, আসছে, হঠাৎ বলে উঠল ওরা। মা-মেয়ে দুজনেই। নিশ্চয় বাসে এসেছে। বাস থেকে নেমে হেটে আসছে।
মেয়েটা সুন্দর, না? রবিন বলল।
মাথা ঝাঁকাল জিনা আর মুসা।
কিশোর বলল, যাই, আন্টিকে খবরটা দিই।
কিশোরের সঙ্গে জানালার কাছ থেকে সরে এল রবিন আর মুসা, কিন্তু জিনা বসেই রইল। একটা লোক দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তার।
পথের মোড়ে দেখা যাচ্ছে লোকটাকে। দাঁড়িয়ে পড়েছে। তাকিয়ে আছে এরিনার দিকে। জিনার মনে হল, মা-মেয়েকে অনুসরণ করে এসেছে লোকটা।
ভুলও হতে পারে আমার, বিড়বিড় করল সে। দূর থেকে ঠিক চিনতে পারছি না...। এগোল লোকটা। আরি! এ তো রবার্ট ম্যাকি! এই রাফি, দেখ দেখ!
জানালার কাঁচে নাক ঠেকিয়ে দেখল রাফিয়ান। চাপা গরগর করে উঠল।
কাপড় কি পরেছে দেখেছিস! যেন একটা কাকতাড়ুয়া পুতুল। লম্বা ওভারকোট, কলার তুলে দেয়া, হ্যাট টেনে নামিয়েছে কপালের ওপর..ভেবেছে আমাদের

চোখকে ফাঁকি দিতে পারবে। হুহ! ভালই ছদ্মবেশ নিয়েছে ব্যাটা!
হুফ! যেন একমত হল রাফিয়ান।
চল, ওদেরকে গিয়ে বলি। তিন গোয়েন্দাকে রান্নাঘরে পেল জিনা। উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, এই, গণ্ডগোল হয়েছে! রবার্ট ম্যাকি এরিনা কলিনসের পিছু। নিয়েছে। চলে এসেছে এখানে।
আবার কল্পনা করছ তুমি, মুসা বলল। ও কিভাবে জানবে...?
ঘন্টার শব্দে থেমে গেল সে।
দরজা খুলে দিতে ঘরে ঢুকল এরিনা আর মলি। গিয়ে ওদেরকে এগিয়ে আনলেন কেরিআন্টি। কুশল বিনিময় করলেন। তারপর ওদেরকে বসতে দিয়ে চলে গেলেন শোবার ঘরে। নীল বাক্সটা বের করে এনে তুলে দিলেন এরিনার হাতে। কাঁপা কাঁপা হাতে ঢাকনা খুলল সে। হাঁ করে তাকিয়ে রইল মুক্তাগুলোর দিকে।
অনেকক্ষণ পর কথা ফুটল তার মুখে, অপূর্ব! বড়দিনের উপহারই আমি ধরে নেব এটাকে.দাম নিশ্চয় অনেক, তাই না?
তা তো নিশ্চয়, হেসে বলল কেরিআন্টি। যাআক, বা, যার জিনিস তার হাতে তুলে দিয়ে আমি বাঁচলাম। কি টেনশনেই না ছিলাম।
টেনশন তো হবেই। এটার পেছনে লোক লেগেছে জানেন যে, মুসা বলল। মিসেস কলিনস, রাতে চোর ঢুকেছিল এ-বাড়িতে। জিনা আর রাফি ওকে তাড়িয়েছে।
তাই নাকি? অস্বস্তি দেখা দিল এরিনার চোখে। এই হারের জন্যেই এসেছিল?
তাই তো মনে হয়। আর কিসের জন্যে আসবে? ব্যাপারটা খুলে বলল মুসা। চোর কোনখান দিয়ে ঢুকল, কিভাবে চেয়ার হাতড়াল, তারপর কিভাবে তাড়া খেয়ে পালাল, সব।
আমি জানি চোরটা কে? বলে উঠল জিনা। রবার্ট ম্যাকি।
জিনা, না জেনে কারও সম্পর্কে ওভাবে কথা বলা ঠিক না, বেশ একটু কড়া গলায়ই মেয়েকে বললেন মিসেস পারকার।
মা, না জেনে বলছি না, রেগে উঠল জিনা। এইমাত্র দেখে এলাম লোকটাকে, রাস্তায়। ছদ্মবেশে মিসেস কলিনসের পিছু পিছু এসেছে।
তোমার কল্পনা, আগের কথাই বলল আবার মুসা। ও কিভাবে জানবে মিসেস কলিনস কোথায় যাচ্ছেন?
তা বলতে পারব না, হাত ওল্টাল জিনা। তবে আমাদেরকে ওখানে যেতে দেখেছে, এখন আমি শিওর, কাল ওকেই দেখেছিলাম। তারপর নিশ্চয় ও-বাড়ির ওপর চোখ রেখেছে। মিসেস কলিনস বেরোতেই তার পিছু নিয়েছে।
ফ্যাকাসে হয়ে গেল এরিনার মুখ। তাহলে ভুল দেখিনি আমি!
ভুল দেখেননি মানে? আগ্রহী হয়ে উঠল কিশোর।

আমি…ইয়ে, মানে…লম্বা ওভারকোট পরা একটা লোককে দেখেছি, বাড়ি থেকে বেরিয়ে…পিছে পিছে এল, একই বাসে চড়ল, একই স্টপেজে নামল…চেহারা দেখতে পারিনি।
মুহূর্ত দেরি করল না আর মুসা। দৌড় দিল জানালার দিকে। কিশোর গেল পিছে। ব্যালকনিতে বেরিয়ে ভালমত চোখ বোলালো রাস্তায়। কিন্তু লোকটাকে চোখে পড়ল না।
রবিন এসে দাঁড়াল পাশে।
কেউ নেই, তার দিকে ফিরে বলল কিশোর। আবার সিটিং রুমে ফিরে এল তিনজনে।
চলে গেছে লোকটা, মুসা বলল। ইচ্ছে করে পিছু নেয়নি। এদিকেই আসছিল হয়ত কোন কাজে।
এখন তা আর মনে হয় না আমার, মাথা নাড়ল কিশোর। মিসেস কলিনসকেই অনুসরণ করেছে সে। জিনা কাল দেখেছে, আজও দেখেছে। মিসেস কলিনসও দেখেছেন। চোখের ভুল আর বলা যাবে না।
ব্যাটা লুকিয়ে পড়ল নাকি কোথাও? মুসা বলল। বেরিয়ে দেখব?
না, দরকার নেই, তাড়াতাড়ি হাত নাড়লেন কেরিআন্টি। লোকটা খারাপ। শেষে কি করে বসে!
শুনুন, এরিনাকে বলল কিশোর, এখন যত তাড়াতাড়ি পারেন, গিয়ে হারটা কোন ব্যাংকের ভল্টে রেখে দিন।
তাই করতে হবে। আমি যেখানে থাকি তার কাছেই একটা ব্যাংক আছে।
তাহলে সোজা ওখানে চলে যান। একা যেতে পারবেন তো? নাকি আমরা। আসব আপনার সাথে? বলা যায় না, আপনাকে একা দেখলে ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করতে পারে ম্যাকি। তোক বেশি দেখলে সাহস, করবে না।
এলে তো ভালই হয়, খুশি হয়ে বলল এরিনা। তবে মিসেস পারকার যদি অনুমতি দেন।
গেলে যাক, আন্টি বললেন। তবে মনে হয় না কোন দরকার আছে। হাসলেন তিনি। ট্রেনে করে যান, তাতে বিপদের সম্ভাবনা থাকবে না। তাছাড়া হারটা যে আপনার কাছে আছে, তা-ও জানছে না কেউ। বিপদ ঘটবে কেন?
বাক্সটা ব্যাগে ভরল এরিনা। মিসেস পারকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে মেয়েকে নিয়ে বেরিয়ে এল। ওদের সঙ্গে চলল তিন গোয়েন্দা, জিনা আর রাফিয়ান। রাস্তায় বেরিয়ে লোকটাকে খুঁজল ওরা। কোথাও দেখা গেল না ম্যাকিকে।
পাতালরেলের একটা স্টেশন রয়েছে কাছেই। সিঁড়ি বেয়ে প্ল্যাটফর্মে নেমে এল ওরা। রাফিয়ানকে এবারও ঝুড়িতে ভরে নেয়া হচ্ছে, তবে এটা আগেরবারের

মত। আর ফোকর কাটা নয়। তাতে সুবিধের চেয়ে অসুবিধেই বেশি। এই ঝামেলা পোহাতে আর রাজি নয় কেউ।
ট্রেন আসার অপেক্ষায় নীরবে দাঁড়িয়ে রইল ওরা। উৎকণ্ঠায় ভুগছে এরিনা, কখন ব্যাংকে গিয়ে বাক্সটা রাখবে, তারপর নিশ্চিন্ত। তার আশেপাশে গোল হয়ে ঘিরে রেখেছে ছেলেমেয়েরা, বডিগার্ডের মত। মলির হাত ধরে রেখেছে রবিন। রাফিয়ানের ঝুড়ি মাটিতে নামানো।
ট্রেন এল। হাতে ব্যাগ আঁকড়ে ধরে প্ল্যাটফর্মের একেবারে কিনারে চলে এসেছে এরিনা। হঠাৎ পেছন থেকে ধেয়ে এল একটা লোক, এক থাবায় তার হাত থেকে ব্যাগটা কেড়ে নিয়ে, ধাক্কা মেরে তাকে প্রায় ফেলে দৌড় দিল। দুদিক থেকে এরিনাকে ধরে ফেলল.কিশোর আর মুসা, নইলে আরেকটু হলেই চলে যেত ট্রেনের চাকার নিচে।
যাত্রী নামছে, উঠছে, এই হুড়াহুড়ির মাঝে বেরোনোর পথের দিকে দৌড় দিল লোকটা। বেশির ভাগ মানুষই খেয়াল করল না ঘটনাটা, ট্রেনে উঠতেই ব্যস্ত ওরা। ঝুড়ির মুখ খুলে দিল জিনা। তাড়া করল লোকটাকে রাফিয়ান। পেছনে ছুটল মুসা।
দেখে মনে হয় ভবঘুরে ধরনের লোক, বুড়ো, রাফিয়ান তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তেই চিৎকার করে উঠল। পরমুহূর্তে তাকে ধরে ফেলল মুসা। কেড়ে নিল ব্যাগটা।
ডান হাতকে যেন বর্ম বানিয়ে মুখ আড়াল করতে চাইছে আতঙ্কিত লোকটা, বাঁ হাত কামড়ে ধরে ঝুলছে রাফিয়ান। এই সময় বেরিয়ে এল ষ্টেশনের একজন কর্মচারী। রাফিয়ানের কলার টেনে তাকে সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করতে করতে বলল, সর, সর বলছি! শয়তান কুত্তা! মানুষ দেখলেই কামড়াতে ইচ্ছে করে? মুসার দিকে তাকাল সে। তোমার কুকুর, না? দাঁড়াও, মজা বুঝবে। লোকের ওপর কুত্তা লেলিয়ে দাও…।
বোঝানোর চেষ্টা করল মুসা। শুনলই না লোকটা। হ্যাঁচকা টান মারল রাফিয়ানের কলার ধরে। সুযোগটা কাজে লাগাল ভবঘুরে। চোখের পলকে ছুটে গিয়ে মিশে গেল লোকের ভিড়ে। হারিয়ে গেল।
এই ছেলে, কি বলছি শুনছ? রেগে গিয়ে বলল কর্মচারী।
এই সময় এখানে এসে দাঁড়াল কিশোর, রবিন, জিনা। মেয়ের হাত ধরে এল এরিনা। এখনও কাঁপছে। মলির চোখে পানি।
আমার কুকুর ধরেছেন কেম! ছাড়ুন! রাগে চিৎকার করে উঠল জিনা। চোখের মাথা খেয়েছেন নাকি? দেখলেন না চোর ধরেছিল ও!

হ্যাঁ, ও-লোকটা আমার ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে পালাচ্ছিল, এরিনা বলল। আরেকটু হলেই দিয়েছিল আমাকে ট্রেনের নিচে ফেলে। ছেলেমেয়েগুলো না, থাকলে কুকুরটা না থাকলে, শিউরে উঠল সে, কথা শেষ করতে পারল না।
মুসার কথা কানে না তুললেও এরিনার কথা বিশ্বাস করা কর্মচারী। খুলে পড়ল নিচের চোয়াল। প্রায় তোতলাতে শুরু করল, তা-তাই নাকি, ম্যাম! আআমি কি করে জানব, বলুন...।
তাগাদা দিল কিলোর, এখানে দাঁড়িয়ে বকবক করে লাভ নেই। জলদি চলুন, আগে গিয়ে ব্যাংকে রাখুন বাটা। তারপর নিরাপদ।
আবার ঝুড়িতে ঢোকানো হল রাফিয়ানকে। ট্রেন চলে গেছে। পরের ট্রেনের জন্যে অপেক্ষা করতে হল ওদের। ট্রেনে কেউ আর কোন কথা বলল না। গন্তব্যে পৌঁছে বাইরে বেরোলো খুব সাবধানে। কিন্তু কাছেপিঠে সন্দেহজনক কাউকে চোখে পড়ল না।
কুইক! এরিনা বলল। পাশের গ্রীটেই আমার ব্যাংক।
হ্যাঁ হ্যাঁ, চলুন, জিনা বলল। আগে ব্যাংকে রাখুন হারটা। তারপর ম্যাকির ব্যবস্থা করছি।
ম্যাকি! আঁতকে উঠল এরিনা। বুড়োটাই ম্যাকি নাকি?
নিশ্চয়ই। ভবঘুরের হরবেশ নিয়েছে বটে, কিন্তু আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারেনি।
তারমানে, রবিন বলল, বাড়ি থেকে বেরোনোর পরই আমাদের পিছু নিয়েছে সে?
আমার তাই মনে হয়, কিশোর বলল। পথের ধারে একটা খবরের কাগজের দোকান আছে না, তার আড়ালেই বোধহয় লুকিয়েছিল। পোশাক-আশাক খুব একটা বদল করতে হয়নি। যাটটা মুচড়ে নষ্ট করেছে। হাতে, মুখে আর কোটে ধুলো লাগিয়েছে, যাতে মনে হয় নোংরা ভবঘুরে। সে ভেবেছিল মিসেস কলিনস একলা আসবেন, তাঁকে ফাঁকি দিতে অসুবিধে হবে না।
ধরেই তো ফেলেছিলাম, মুসা বলল। স্টেশনের ওই বলদ কর্মচারীটার জনেই পারলাম না। নইলে এতক্ষণে হাজতে ঢুকে যেত ম্যাকির বাচ্চা।
তা ঠিক, একমত হয়ে মাথা দোলাল রবিন।
ওই যে ব্যাংক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল এরিনা। তোমরা মলিকে দেখ। আমি গিয়ে ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করে ব্যবস্থা করে ফেলছি। লবিতে থেকো।
খানিক পরে নিশ্চিন্ত হয়ে বেরিয়ে এল এরিনা।
সব ভাল যার শেষ ভাল, নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল জিনা। হাসল। যাক, বাঁচা গেল।
হ্যাঁ, মাথা ঝাঁকাল মুসা। হার পেলাম, দলিল পেলাম, মালিককেও খুঁজে বের করলাম। থ্রি চিয়ার্স ফর তিন গোয়েন্দা...।

আমি আর রাফি বাদ নাকি! কোমরে হাত দিয়ে, চোখ পাকিয়ে জিনা বলল। হেসে উঠল সবাই।

.

ওরা মনে করেছিল, এখানেই এই ঘটনার ইতি। কিন্তু পরদিন সকালে অযাচিত ভাবে এল এরিনার ফোন। মা তখন বাড়ি নেই, ফোন ধরল জিনা।

হ্যালো? শোনা গেল এরিনার উত্তেজিত কণ্ঠ, কে, জিনা?...সর্বনাশ... সর্বনাশ হয়ে গেছে...

কি হয়েছে? উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল জিনা।

আজ সকালে একটা উড়ো চিঠি এসে হাজির। দরজার তলা দিয়ে ঢুকিয়ে রেখে গেছে। আমাকে হুমকি দিয়ে লিখেছেবুঝতে পারছি না কি করব!

মেরুদণ্ডে শিরশিরে অনুভূতি হল জিনার। শান্ত হোন, বলল সে, যদিও নিজেও শান্ত থাকতে পারছে না। কি লিখেছে?

লিখেছে...লিখেছে, হারটা যদি না দিই, মলিকে কিডন্যাপ করবে!

কী-করবে!

কিডন্যাপ! জিনা, আমি মনস্থির করে ফেলেছি। মলির চেয়ে হারটা বেশি। নয়। যা বলহে করব, দিয়ে দেব ওটা।

দাঁড়ান, ফোনে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল জিনা, এক মিনিট ধরুন! কিশোরকে বলছি...

পাশের ঘরে ছিল তিন গোয়েন্দা। ডাক শুনে এসে ঢুকল। দ্রুত ওদেরকে সব কথা জানাল জিনা।

ব্যাটা তো মহা পাজী! নিশ্চয়...

ম্যাকি, কিশোরের কথাটা শেষ করে দিল জিনা। কিশোর, কি করব? পুলিশকে জানাব?

দেখি, দাও আমার কাছে, জিনার হাত থেকে রিসিভার নিয়ে কানে ঠেকাল কিশোর। মিসেস কলিনস, শুনছেন? হারটা এখুনি দেবেন না। পুলিশকে জানাচ্ছি আমরা। আপনাদের অসুবিধে হবে না। নিশ্চয় ব্যবস্থা করবে পুলিশ।

না না, কিশোর, তাড়াতাড়ি বলল এরিনা, লোকটা পুলিশকে জানাতে মানা করেছে। মলিকে পাহারা দিতে আসবে পুলিশ, ছদ্মবেশে এলেও ঠিক চিনে ফেলবে ম্যাকি। পুলিশ তো আর সারাজীবন পাহারা দেবে না। ওরা চলে গেলেই আবার বিপদে পড়বে আমার মেয়ে।

দ্রুত ভাবনা চলেছে কিশোরের মাথায়। কি করবে? আরেকবার বোঝানোর চেষ্টা করল এরিনাকে, ভালমত ভেবে দেখুন। লোকটা হুমকি দিল, আর অমনি হার দিয়ে দেবেন?

কি করব, বল? লোকটা বেপরোয়া, কাল স্টেশনেই বুঝেছি। তার কথা না শুনলে যা বলছে তা করবেই। কাউকে জানাতে বারণ করেছে, তা-ও তো তোমাদের জানিয়ে ফেললাম। খুব ভয় লাগছে আমার... এক মুহূর্ত থামল এরিনা, তারপর বলল, আমি মনস্থির করে ফেলেছি। ব্যাংকে গিয়ে হারটা নিয়ে লোকট যেখানে দেখা করতে বলেছে সেখানে চলে যাব। হারের দরকার নেই আমার। মেয়ে ভাল থাকলেই ভাল।

মহিলাকে কিছুতেই বোক্কতে না পেরে কিশোর বলল, দেখুন, বলে যখন ফেলেছেন আমাদেরকে, এরকম একটা অন্যায় কিছুতেই ঘটতে দিতে পারি না। আপনি জানতে না চান, জানাবেন না, কিন্তু আমরা পুলিশকে বলবই।

না না, দোহাই তোমাদের! বিষণ্ন কণ্ঠে বলল এরিনা, ওকাজ কোরো না। পুলিশ বিশ্বাস করবে না তোমাদের কথা। শুধু একটা উড়ো চিঠি, আর কোন প্রমাণ নেই লোকটার বিরুদ্ধে। হেসেই উড়িয়ে দেবে পুলিশ, মাঝখান থেকে বিপদে পড়বে আমার মলি। বুঝি, আমার ভালই চাইছ তোমরা। থ্যাঙ্ক ইউ।

এরিনা রিসিভার রেখে দেবে বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি বলল কিশোর, মিসেস কলিনস, শুনুন। বেশ, পুলিশকে নাহয় জানালাম না। কিন্তু ঠিঠিতে কি লিখেছে আমাদেরকে খুলে বলতে তো আপত্তি নেই। কোথায় দেখা করতে বলা হয়েছে আপনাকে?

ওসব কিছু বলব না তোমাদেরকে। জানিয়েই ভুল করে ফেলেছি, ফোঁস করে নিঃশাস ফেলল এরিনা। থ্যাঙ্ক ইউ। রাখি। ডাই।

কেটে গেল লাইন।

এক এক করে সবার মুখের দিকে তাকাল কিশোর। চিন্তিত। বলল, কিছু একটা করতেই হবে আমাদের। ভয় দেখিয়ে হার নিয়ে যাবে ম্যাকি, আর আমরা চুপ করে বসে থাকব, হতেই পারে না। চল, ব্যাংকের বাইরে গিয়ে লুকিয়ে থাকি।

এরিনার ওপর নজর রাখব। তারপর আর পিছু নিয়ে দেখব কোথায় যায়।

কিভাবে? প্রশ্ন তুলল রবিন। এরিনা নিশ্চয় এতক্ষণে ব্যাংকে রওনা হয়ে গেছে। তার ফ্ল্যাট থেকে ব্যাংকটা কাহে, এখান থেকে অনেক দূরে। গিয়ে ধরতে পারব না।

হয়ত পারব, বলতে বলতে পকেট থেকে নোটবুক বের করল কিশোর। পাতা উটে বের করল টনির ফোন নাম্বার-কাগজের টুকরোটা থেকে পরে লিখে নিয়েছিল নোটবুকে। দ্রুত গিয়ে রিসিভার তুলে ডায়াল শুরু করল সে।

পাওয়া গেল টনিকে। কিশোরকে ঘিরে এল সবাই।

টনি, কিলোর বলল, আমি কিশোর পাশা, তোমার দাদার বাসায় দেখা হয়েছিল, মনে আছে? শোনো, তোমার সাহায্য দরকার। গাড়িটা নিয়ে আসতে পারবে? দশ

মিনিটের মধ্যে?...গুড। খুব জরুরি।...এলে সব বলব। ঠিকানা বলে রিসিভার নামিয়ে রাখল সে। বন্ধুদেরকে জানাল, আসছে। হয়ত ধরতে পারব এরিনাকে। মলিকে কারও কাছে রেখে আসতে হবে তার, তাতে সময় লাগবে। ব্যাংকে গিয়ে জিনিসটা বের করতেও কিছু সময় লাগবে। আশা করছি, ততোক্ষণে চলে যেতে পারব আমরা।
রাস্তায় বেরিয়ে এল ওরা। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। ঠিক দশ মিনিটের মাথায় পৌঁছে গেল টনি। ওঠো ওঠো, জলদি!
গাড়িটা বড় না, কিন্তু জায়গা হয়ে গেল সকলের।
কোথায় যেতে হবে? জানতে চাইল টনি।
বলল কিশোর।
দ্রুত ফুটল গাড়ি। ভাল চালায় টনি। রাস্তাও সব চেনা। শর্টকাটে চলল সে।
তবুও গোয়েন্দাদের মনে হল, বড় আয়ে চলছে গাড়ি। লাফ দিয়ে দিয়ে এগোচ্ছে যেন ঘড়ির কাঁটা। টনিকে সব খুলে বলল কিশোর।
ব্যাংক থেকে বেরিয়েই গেল কিনা, পেছনের সিট থেকে বলল উদ্বিগ্ন জিনা, কে জানে!
সময়মতই পৌঁছল ওরা। সবে ব্যাংকের দরজার বাইরে পা রেখেছে এরিনা। হাতে সেই ব্যাগটা, নিশ্চয় ওটার ভেতরেই রেখেছে হারের বাক্স।
সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে চত্বর পেরোল সে। রাস্তায় উঠে হনহন করে হাঁটতে লাগল। একবারও পেছনে তাকাল না
আমি ভেবেছিলাম ট্যাক্সি নেবে,মুসা বলল।
নেয়নি যখন, কিশোর বলল, বোঝাই যাচ্ছে, বেশি দূরে যাবে না। নামো নামো, হেঁটে যাব আমরাও।
গাড়ি থেকে বেরোল গোয়েন্দারা। টনিও নামল।
একসাথে থাকা ঠিক হবে না, কিশোর বলল। চোখে পড়ার ভয় আছে। টনি, তুমি আগে আগে থাক। তোমাকে চেনে না এরিনা। দেখে ফেললেও সন্দেহ করবে না।
ডানে মোড় নিয়ে বড় রাস্তায় পৌঁছে গেল এরিনা। দ্বিধা করল একমুহূর্ত। তারপর ফিরে তাকাল। তবে টনিকে ছাড়া আর কাউকে দেখতে পেল না সে। কিশোরের অনুমান ঠিক, টনিকে চিনতে পারল না সে।
নিশ্চিন্ত হয়েই যেন আবার দ্রুত হাঁটতে লাগল এরিনা। তারপর একসময় গতি কমিয়ে দিল। সময় এসে গেছে, বুঝল গোয়েন্দারা।
বেশ দূরে রয়েছে ওরা। তবু দেখতে পাচ্ছে, রাস্তার লোকের নজর নেই এরিনার দিকে। যে যার পথে চলেছে। তারমানে, ম্যাকি ওদের মাঝে নেই।

চলার গতি আরও কমালো এরিনা। এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। লোকটাকে খুঁজছে? নাকি অন্য কিছু?
হঠাৎ যেন মনস্থির করে ফেলল এরিনা। বা বগলের তলায় ছিল ব্যাগটা, ডান হাতে নিল। তারপর ছুঁড়ে দিল পথের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটা গাড়ির দিকে।
গাড়ির সামনের জানালা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল ব্যাগটা।
মুহূর্তে ঘটে গেল ঘটনাটা।
ব্যাগটা ছুঁড়ে দিয়েই চলার গতি আবার বাড়িয়ে দিল এরিনা।
সবাইকে আসতে বলে দৌড় দিল কিশোর। টনি আগেই দৌড়াতে শুরু করেছে। চোখের পলকে তার পাশে চলে গেল রাফিয়ান। অবাক হয়ে পথচারীরা তাকিয়ে আছে ওদের দিকে।
এত তাড়াহুড়ো করেও লাভ হল না।
ইঞ্জিন চালই ছিল গাড়িটার। রাস্তায় উঠেই হটতে শুরু করল।
থমকে দাঁড়াল কিশোর আর টনি দুজনেই। রাফিয়ান দাঁড়াল না। লাফ দিয়ে গিয়ে পড়ল গাড়িটার ওপর। লাভ কিছুই হল না, শুধু তার নখের সামান্য আঁচড় লাগল গাড়ির বডিতে।
দেখতে দেখতে হারিয়ে গেল গাড়িটা।
চেঁচামেচি শুনতে পেয়েছে এরিনা। ফিরে তাকিয়ে গোয়েন্দাদের দেখে অবাক। চোখ কপালে তুলে জিজ্ঞেস করল, আমাকে খুঁজে বের করলে কিভাবে?
জানাল কিশোর।
চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে এরিনার। সর্বনাশ! ও তোমাদেরকে নিশ্চয় দেখেছে…
দেখুক, দাঁতে দাঁত চাপল মুসা। ধরতে পারলে হত আজ! ব্যাটাকে…
মলিকে না আবার ধরে নিয়ে যায়…
হারটা তো দিয়েই দিয়েছেন, বেশ একটু ঝাঝের সঙ্গেই বলল জিনা। তাহলে আর নেবে কেন? অযথাই কষ্ট করলাম আমরা, মিসেস কলিনস। জিনিসটা দিলাম আপনাকে, কিন্তু রাখতে পারলেন না।
হার গেছে যাক। আমার মলির কিছু না হলেই হয়।
ব্যাটা পালাল। নিচের ঠোঁটে চিমটি কেটে আনমনে বলল কিশোর। ও-ই জিতল শেষ পর্যন্ত! দীর্ঘশ্বাস ফেলল রবিন।
ভুল হয়ে গেছে, মুখ কালো করে বলল টনি। ট্যাক্সিতে করে পিছু নিতাম, সেটাই ভাল হত।
টনির সঙ্গে এরিনার পরিচয় করিয়ে দিল কিশোর।

সামলে নিয়েছে এরিনা। সবাইকে ধন্যবাদ দিল। মাথা চাপড়ে দিল রাফিয়ানের। বলল, দেখ, কিছু মনে কোরো না তোমরা। অনেক কষ্ট করেছ আমার জন্যে। কপাল খারাপ, রাখতে পারলাম না জিনিসটা।
এত সহজে হাল ছাড়ার পাত্র নয়, কিশোর পাশা। ড্রাইভারের চেহারা দেখেছেন?
না। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ছিল। তাছাড়া এত তাড়াতাড়ি...
হুঁ, আমরাই দেরি করে ফেলেছি! মুঠো শক্ত হয়ে গেল মুসার।
আর কিশোর মনে মনে নিজেকে গালমন্দ করছে। কেন একবারও ভাবেনি, গাড়িতে করে আসতে পারে লোকটা?
আবার ফিরে এসে টনির গাড়িতে উঠল ওরা। এরিনারও জায়গা হয়ে গেল।
তাকে বাড়ি পৌঁছে দেয়ার প্রস্তাবটা টনিই দিয়েছে।
এক পড়শীর কাছে মলিকে রেখে এসেছে এরিনা। বাসার সামনে গাড়ি থামলে আরেকবার সবাইকে ধন্যবাদ জানাল সে। নামল। বলল, হারটা গেছে, যাক, কিন্তু ওটার বদৌলতে তোমাদের মত বন্ধু পেয়েছি। এটাই আমার অনেক বড় পাওয়া।
এরিনা চলে গেলে টনি বলল, চল, তোমাদেরকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি। গাড়ি চলছে। খানিক পর আবার বলল, চোরটা তাহলে পালালই শেষতক।
পালিয়ে যাবে কোথায়? দৃঢ়কণ্ঠে বলল কিশোর। আমি এর শেষ দেখে ছাড়ব। একটা বুদ্ধি এসেছে আমার মাথায়। চোরটা যদি ম্যাকি হয়ে থাকে, ধরা তাকে পড়তেই হবে।
যদি না হয়? রবিন বলল।
ওই ব্যাটাই, ফুঁসে উঠল জিনা। এরিনার কাছে হার আছে, এই খবর একমাত্র ওই শয়তানটাই জানে। হারটা ফিরিয়ে আনতেই হবে।
কিভাবে? প্রশ্ন রাখল মুসা।
হ্যাঁ, কিভাবে? টনিও জানতে চাইল। ম্যাকির বাড়িতে গিয়ে খুঁজবে নাকি?
অনেকটা সেরকমই, জবাব দিল কিশোর।
তোমার সাহস আছে, কিশোর পাশা, টনি বলল। বাঘের গুহায় গিয়ে ঢুকতে চাইছ। লোকটা ভারি বদ, তাতে কোন সন্দেহ নেই। যে লোক কিডন্যাপ করার হুমকি দিতে পারে...যাকগে। যখন যাও, আমাকে ডেকো.ওই যে, তোমাদের বাসায় এসে গেছি।
লাঞ্চের পর হইতে বেরোল গোয়েন্দারা। চলে এল স্কোয়্যারটার পাশের পার্কে। চমৎকার রোদ। এক কোণে একটা ঝাড়ের কাছে বসে আলোচনা শুরু করল ওরা।
ম্যাকির দোকানের ওপর চোখ রাখতে হবে, কিশোর বলল। খদ্দের ছাড়া আর কে কে আসে দোকানে, জানতে হবে। দরকার হলে ওর পিছু নেব। হারটা নিয়ে গিয়ে

তো আর বসে থাকবে না, বিক্রি করতে হবে।
যদি টাকা চায়, রবিন বলল।
হ্যাঁ, যদি টাকা চায়, বলল মুসা। কিশোর, শুধু দোকানের ওপর চোখ রেখে যে লাভ হবে না, সেটা ভাল করেই জানো তুমি। অন্য কোন মতলব করেছ। সেটা কি, বলবে?
দোকানে ঢোকার চেষ্টা করব।
মানে?
ভেতরে ঢুকে না খুঁজেলে কিভাবে জানব কোথায় রেখেছে হারটা?
কিন্তু আমাদেরকে এখন চেনে সে। দরজা থেকেই তাড়াবে।
সেজন্যেই তো না দেখিয়ে চুকব। চুরি করে। মুচকি হাসল কিশোর। চুরি করে আমাদের বাড়িতে ঢুকতে পেরেছে সে, আমরা কেন পারব না? তেমন বুঝলে রাতের বেলাই ঢুকব।
ভ্রূকুটি করল জিনা। না, কিশোর, মা রাতে বেরোতে দেবে না। আর যদি দেয়ও– জানতে চাইবে কোথায় যাচ্ছি।
তা তো চাইবেনই। সেজন্যেই তো কাজে নামার আগে আলোচনা করতে চাইছি ভালমত। রাতে গিয়ে সুবিধে হবে কিনা সেকথাও ভাবতে হবে। কারণ, রাতের বেলা দোকান তালা দেয়া থাকবে। নিচের ঠোঁটে একবার চিমটি কাটল কিশোর। ম্যাকি কোথায় থাকে জানি না। দোকান কথন বন্ধ করে তাও জানি না। আসলে, ওর সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানি না আমরা। জানতে হলে নজর রাখতে হবে ওর ওপর।
নজর রাখার ব্যাপারে কারোই অমত নেই।
পরের তিন দিন তা-ই করল ওরা। পালা করে। চোখ রাখল ম্যাকির দোকানের ওপর। জানা হয়ে গেল অনেক তথ্য।
পাঁচটায় দোকান বন্ধ করে, রবিন জানান।
বিক্রি বন্ধ করে আরকি, মুসা বলল। বেরোয় ছটার সময়।
ওই এক ঘন্টা হিসেব-নিকেশ করে, বলল জিনা। এখানে ওখানে ফোন করে। জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখোচ্ছ।
তারপর ছটার সময় বেরিয়ে, একটা রেস্টুরেন্টে যায়, কিশোর বলল, খাওয়ার জন্যে। থাকে একটা ফ্ল্যাটবাড়ির দোতলায়। অনেক কিছুই জানলাম। এখন কাজ শুরু করা যেতে পারে…
পরিকল্পনার কথা বন্ধুদের জল সে। দোকান বন্ধ হওয়ার আগেই ঢুকে পড়তে চায় ওখানে, লুকিয়ে বসে থাকতে চায় কোথাও। তারপর ম্যাকি বেরিয়ে গেলে জিবে হারটা। মুখ খুলতে যাচ্ছিল মুসা, হাত তুলে তাকে থামাল গোয়েন্দাপ্রধান। না না,

ভয় নেই, বিপদে পড়ব না। তোমরা বাইরেই থাকবে। দরকার পড়লে সাহায্য করতে পারবে আমাকে। আর যদি ম্যাকি ধরেই ফেলে, আমাকে, সোজা গিয়ে পুলিশকে জানাবে। ঠিক আছে?
অমত করে লাভ হবে না, বুঝতে পারল সহকারীরা। একবার যখন মনস্থির করে ফেলেছে কিশোর পাশা, আর তাকে ফেরানো যাবে না। যা ভাল বুঝবে, করবেই। কাজেই অহেতুক তর্ক করল না কেউ।
ঠিক হল, সেদিন সন্ধ্যায়ই দোকানে ঢুকবে কিশোর।
দোকান বন্ধ হওয়ার সামান্য আগে এগিয়ে গেল মুসা। সাবধানে উঁকি মেরে দেখে নিল, দোকানে কোন খদ্দের আছে কিনা। তারপর ঢুকে পড়ল ভেতরে।
কয়েক গজ দূরে একটা বিজ্ঞাপনের বোর্ডের ওপাশে লুকিয়ে বসে রইল জিনা, রবিন আর রাফিয়ান। কিশোর মুসার পেছন পেছন এসেছে। জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখতে লাগল মুসা কি করে।
স্বাভাবিক ভঙ্গিতে ম্যাকির দিকে এগোল মুসা।
তাকে দেখে ঠোঁট শক্ত হয়ে গেল লোকটার। মনে হল চিনে ফেলেছে। পরমুহূর্তে সামলে নিয়ে হাসল। বলল, গুড ইভনিং ইয়াং ম্যান। কি লাগবে?
মুসা বুঝল, তার ওপর থেকে নজর সরাবে না ম্যাকি। এটাই আশা করেছিল কিশোর।
গুড ইভনিং, ভদ্রভাবে জবাব দিল মুসা। আমার মার জন্যে একটা উপহার কিনতে এসেছি। বাহ, বেশ চমৎকার ফুল তো। দেখতে পারি? হাত তুলে ফুলের তোড়াটা দেখাল সে।
দেয়ালের তাকে সাজিয়ে রাখা হয়েছে কিছু ফুলের তোড়া। সেদিকে এগোল ম্যাকি। এইই সুযোগ, জানালা দিয়ে দেখে বুঝল কিশোর। চট করে ঢুকে পড়ল সে। মাথা নিচু করে শো-কেসের আড়ালে আড়ালে চলে গেল আরেকটা দরজার দিকে সেটা দিয়ে পাশের ঘরে ঢুকল। ম্যাকির নজর মুসার দিকে। ফলে সে তাকে দেখতে পেল না।
ঘরটায় ঢুকে চারদিকে চোখ বোলাল কিশোর। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লুকানোর একটা জায়গা খুঁজে বের করতে হবে। মুসা ওদিকে নিয়ে ফুল দরাদরি করছে, সময় দেবে কিশোরকে কিন্তু কতটা আর দিতে পারবে।
ঘরটা বেশ বড়। বাঁয়ের দেয়ালের কাছে বিশাল একটা আলমারি। আর পেছনের দেয়ালের কাছে একটা ডিভান। ঘরের মাঝখানে একটা টেবিল, কয়েকটা চেয়ার! ভান পাশের দেয়ালের কাছে...গুড! আনমনে বিড়বিড় করল সে, ওয়ারড্রোবটা বেশ বড়। লুকানো যাবে।

কোটস্ট্যাণ্ড থেকে ঝুলছে ম্যাকির কোট। তারমানে আপাতত আর ওয়ারড্রোব খুলবে না সে। ভেতরে দেখে আরও নিশ্চিত হল কিশোর। শুধু একটা রেইনকোট, আর কিছু নেই। ওটার জন্যে খুলবে না ম্যাকি। ভেতরে ঢুকে দরজা টেনে দিল সে, ওরে সামান্য ফাঁক রাখল বাতাস চলাচলের জন্যে। এখন শুধু অপেক্ষা।

খানিক পরে মুসার কথা থেকেই বোঝা গেল ফুল কিনে, দাম চুকিয়ে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে সে। দরজার ছিটকানি আটকানোর শব্দ কানে এল। তারমানে বন্ধ হয়ে গেল দোকান। দরজা লাগিয়ে ভেতরের ঘরে এসে ঢুকল ম্যাকি। দরজার ফাঁক দিয়ে কিশোর দেখল, আলমারির কাছে গেল লোকটা, খুলল, একটা বড় খাতা বের করল।

ওটা ওর অ্যাকাউন্ট বুক, বুঝতে পারল কিশোর।

আলমারির খোলা ফেলে রেখেই দোকানে গিয়ে ঢুকল আবার ম্যাকি। পরপর তিনদিন তার দোকানের ওপর চোখ রেখেছে গোয়েন্দারা, লোকটা এখন কি করছে বুঝতে অসুবিধে হল না কিশোরের। দোকানের ডেস্কে বসে দিনের বেচা-কেনার হিসেব করছে ম্যাকি। বাইরে জানালার কাছে এসে দাঁড়ালেই এখন যে কেউ তার কাজ দেখতে পাবে। দোকান বন্ধ করে যখন একবারে বেরিয়ে যায়, তখন লাগায় পুরানো ধাঁচের জানালার ধাতব পাল্লা।

লোকটা বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে খোঁজা আরম্ভ করব, ভাবল কিশোর। আলমারিটার দিকে তাকিয়ে আরেকটা কথা জাগল মনে। যদি তালা লাগিয়ে দিয়ে যায় ম্যাকি? ওটার ভেতরে আর তখন দেখতে পারবে না সে। তবে কি এখনই...

ঝুঁকিটা নিল কিশোর। হাতুড়ি পিটতে শুরু করল যেন বুকের ভেতর। আস্তে দরজা খুলে বেরিয়ে এল ওয়ারড্রোব থেকে। কান খাড়া রেখে পা টিপে টিপে এগোল আলমারির দিকে। কাছে এসে ভেতরে তাকাল। ছোট-বড় নানারকম বাক্স, গাদা গাদা খাম...আর কোণের দিকে ফ্যাকাসে নীল একটা বাক্স, হারটা যেটায় ছিল ওরকমই দেখতে। হাত বাড়াল কিশোর...

ঠিক এই সময় মচমচ করে উঠল চেয়ার। নিশ্চয় ম্যাকির। বোধহয় উঠে দাঁড়িয়েছে সে, ফিরে আসছে। তিন লাফে আবার ওয়ারড্রোবের কাছে চলে এল কিশোর। সে ঢুকে পড়ার সাথে সাথে ম্যাকিও ঢুকল ঘরে। আলমারিতে খাতাটা রেখে, ওটার দরজা খোলা রেখেই আবার চলে গেল দোকানে। জানালা লাগানোর শব্দ কানে এল।

লাগাতে বেশিক্ষণ লাগবে না। আবার আলমারির ভেতরটা দেখার সুযোগ চলে গেল। বেরোনোর সাহস করল না আর সে।

বেরোলে ভুলই করত, বুঝল খানিক পরেই। জানালা লাগিয়ে ফিরে এল ম্যাকি। ওয়ারড্রোবের দরজার ফাঁক দিয়ে কিশোর দেল, আবার আলমারির সামনে গিয়ে দাঁড়াল লোকটা।
এইবার নিশ্চয় বন্ধ করে ফেলবে, ভাবল কিশোর।
না, বন্ধ করল না। বরং ভেতরে হাত ঢুকিয়ে বের করে আনল নীল বাক্সটা। হাতে নিয়ে তাকিয়ে রইল একমুহূর্ত। তারপর খুলে বের করল টা। আঙুল বুলিয়ে দেখতে লাগল। যেন কিছুতেই চোখ সরাতে পারছে না ওটার ওপর থেকে।
হঠাৎ বেজে উঠল টেলিফোন। ঝট করে সেদিকে ফিরল ম্যাকি। তারপর তাড়াতাড়ি আবার হারটা বাক্সে ভরে আলমারিতে রেখে লাগিয়ে দিল দরজা। কিট করে তালা লেগে গেল।
গেল! ডাবল কিশোর। হারটা দেখলাম। জানি এখন কোথায় আছে, কিন্তু চেষ্টা করেও হাত লাগাতে পারব না!
শুনতে পেল ম্যাকির কণ্ঠ, টেলিফোনে কথা বলছে, হ্যালো, হেইকি? কি ব্যাপার? এই অসময়ে?...হা হা, বন্ধ করে দিয়েছি।উচিত হল না। দোকানে কাস্টোমার থাকতে পারত এখন। তাহলে আপনার সঙ্গে কথা বলতে অসুবিধে হত না? যাকগে, ভবিষ্যতে আর এভাবে ফোন করবেন না। যখন করতে বলব তখন করবেন। চালে সামান্য ভুল হলেই সব শেষ...কি বললেন?...না না, নিশ্চয়ই না। তবে সাবধানে থাকতে হবে আমাদের।...আরে বাবা, এত দামি একটা জিনিস, পেয়েছি কিনা জানার জন্যে উদ্বিগ্ন তো হবেনই। সবাই হবে। তাই বলে হুঁশিয়ার থাকতে হবে না? যা-ই হোক, এভাবে আর ফোন করবেন না। আপনার বন্ধুদেরকেও মানা করে দেবেন।
নীরবে কিছুক্ষণ ওপাশের কথা শুনল ম্যাকি, তারপর আবার বলল, শুনুন, আগেও বলেছি, আবার বলছি, মুক্তার নতুন চালান এল কিনা জানতে চাইলে সোজা চলে আসবেন। জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বললেই তো হয়ে যায়। ফোন করাটা সব সময়ই বিপজ্জনক। আপনিও তা বোঝেন, বার বার বলে দিতে হয় কেন? তো রাখি এখন। গুডবাই।
রিসিভার নামিয়ে রাখার শব্দ হল।
ওয়ারড্রোবের ভেতর দম বন্ধ করে বসে রইল কিশোর। বুঝতে পেরেছে, কতটা ভয়ঙ্কর লোকের ঘরে এসে ঢুকেছে। লোকটা শুধু ওই একটাই নয়, আরও অনেক মুক্তা চুরি করেছে। চোরাই মুক্তার ব্যবসা করে। ওরকম পেশাদার একজন লোক অবশ্যই বিপজনক।
ফিরে এল ম্যাকি। আবার খুলল আলমারি। আরেকবার বাক্স খুলে মুক্তাটা বের করে দেখল। তারপর রেখে দিয়ে দরজা লাগাল। এলোমেলো করে দিল তালার

কম্বিনেশন নাম্বারগুলো।
ফাঁক দিয়ে দেখছে কিশোর, ওভারকোট পরল লোকটা। যাক, বেরোলে বাঁচা যায়। সে-ও বেরোতে পারবে। বাইরে নিশ্চয় অস্থির হয়ে উঠেছে তার বন্ধুরা।
বেরিয়ে গেল ম্যাকি। দোকানের সদর দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ শোনা গেল। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বেরিয়ে এল কিশোর। এগোল ডিভানটার দিকে। তার জানা আছে, ওটার পেছনে নিচে নামার সিঁড়ি আছে, ওই সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাওয়া যাবে মাটির নিচের ঘরে। ওখানে দোকানের স্টোররুম, মাল জমিয়ে রাখা হয়। বেশ কায়দা করে এই খবরটা জেনে নিয়েছে রবিন।
ঢুকেছে যখন সবকিছুই দেখে নিতে চায় কিশোর। সুযোগ সব সময় আসে। বলা যায় না কখন কোন তথ্যটা কাজে লেগে যাবে। সেলারের দেয়ালের ওপরে একটা ছোট জানালা, আলো আসছে ওটা দিয়ে। ওখানে পৌঁছতে পারলে ওটা দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারবে সে। জিনিসপত্রগুলো দেখল সে। সাধারণ জিনিস, দোকানে যা বেচাকেনা হয়। বিশেষ কিছু দেখার নেই। একটা পুরানো টেবিল টেনে এনে জানালার নিচে রাখল। উঠে দাঁড়িয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। কাউকে চোখে পড়ল না। বেরোতে খুব একটা কষ্ট হল না।
উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করছে বন্ধুরা।
এসেছ? বলে উঠল মুসা। আমরা তো ভাবছিলাম আটকাই পড়লে নাকি। তা কি দেখলে?
চল, হাঁটতে হাঁটতে বলছি। ট্রেন ধরতে হবে, কিশোর বলল।
বলেছিলাম না! সব শুনে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল জিনা, ব্যাটা একটা আস্ত শয়তান! আর কোন বেআইনী ব্যবসা করে কে জানে!
বন্ধ করতে হবে এসব, রবিন বলল।
সহজ হবে না,মুসা বলল।
না, তা হবে না, একমত হল কিশোর। তবে অসম্ভবও নয়। ভাগ্যিস আমি থাকতে থাকতেই ফোনটা বেজেছিল। নইলে কিছু জানতেই পারতাম না। মূল্যবান একটা সূত্র পেয়েছি।
কী? জানতে চাইল মুসা।
মাল এল কিনা জানার জন্যে দোকানের জানালায় এসে দাঁড়াবে হেইকি বা তার কোন সহকারী। চোখ রাখব আমরা। কে আসে দেখতে পারব। দলবলসুদ্ধ ম্যাকিকে ধরার ব্যবস্থা করা যাবে তখন।
গুড আইডিয়া, তুড়ি বাজাল জিনা।
হুফ! করে রাফিয়ানও যেন একমত হল।

পরদিন সকালে আবার বেরোল ওরা। এলাকাটায় সেদিন লোকের বেশ ভিড়। ব্যস্ত হয়ে লোকজন বড়দিনের উপহার কিনছে। এতে সুবিধে হল গোয়েন্দাদের। ওদের ওপর চোখ পড়বে না সহজে ম্যাকির দোকানের ওপর চোখ রাখল ওরা।
তার পরদিন রোববার। সম্মেলন বন্ধ। কিন্তু ঘরে বসে রইলেন না মিটার পারকার, স্ত্রীকে নিয়ে বেড়াতে গেলেন এক বন্ধুর বাড়িতে। সুবিধেই হল গোয়েন্দাদের। দুপুরে খাবার পর বেরিয়ে পড়ল ওরাও।
চল, চিড়িয়াখানা দেখতে যাই, প্রস্তাব দিল মুসা। শুনেছি, এখানকার চিড়িয়াখানাটা নাকি বেশ বড়।
সুতরাং চিড়িয়াখানায় চলল ওরা। আর যা ভাবতেও পারেনি তা-ই ঘটে গেল। জন্তুজানোয়ার দেখছে আর ঘুরছে ওরা, হঠাৎ মুসার চোখে পড়ল খোয়া বিছানো একটা পথের ওপর দাঁড়িয়ে আছে রবার্ট ম্যাকি। জাপানী একজন লোকের সঙ্গে কথা বলছে। খানিক পরে পকেট থেকে একটা বাক্স বের করে লোকটার হতে দিল সে।
হারের বারটাই দিল মনে হয়, ফিসফিসিয়ে বলল কিশোর।
এক কাজ করলে হয়, রবিন বলল। আলাদা আলাদা হয়ে দুজনেরই পিছু নিতে পারি আমরা। কোথায় যায় দেখতে পারি।
কিন্তু কাছেই যে একটা শিম্পাঞ্জী রয়েছে, গোল বাধাবে ওটা, ভাবতে পারেনি সে। রাফি চলে গেছে ওটার খাঁচার কাছে। বেশ কিছুক্ষণ থেকেই তক্কে তক্কে ছিল বানরটা, পেয়ে গেল সুযোগ। চোখের পলকে দোলনা থেকে নেমে এসে শিকের ফাঁক দিয়ে হাত বের করে চেপে ধরল রাফিয়ানের লেজ। মারল হ্যাঁচকা টান। ব্যথায় গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল কুকুরটা।
বেশ কিছু ছেলেমেয়ে কাও দেখে দৌড়ে এল। হাসতে শুরু করল অনেকে। তাদের ওপর ভীষণ রেগে গেল জিনা। দৌড়ে এল চিড়িয়াখানার একজন লোক, অনেক চেষ্টা করে শিপাত্রীর হাত থেকে রাফির লেজ ছাড়াল।
এই গোলমালের মাঝে ম্যাকি আর তার সঙ্গীর কথা ভুলেই গেল গোয়েন্দারা। আবার যখন মনে পড়ল, ফিরে তাকিয়ে দেখে দুজনেই চলে গেছে।
গেল সর্বনাশ হয়ে! ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল মুসা। আবার নতুন কোন বুদ্ধি বের করতে হবে আমাদের।
কি মনে হয়? রবিন বলল কিশোরকে, ওই বাক্সে হারটা ছিল?
কি জানি! ভালমত দেখিনি বাটা, জবাব দিল কিশোর। বোধহয় রোববারেই মাল ডেলিভারি দেয় ম্যাকি।
জিনা কোন কথা বলছে না। গভীর হয়ে বসে রাফিয়ানের লেজের পরিচর্যা করছে, আর মাঝেমাঝে জ্বলন্ত চোখে তাকাচ্ছে শিম্পাঞ্জীটার দিকে।

পরদিন আবার ম্যাকির দোকানে চোখ রাখার জন্যে গেল ওরা।
জানালার কাছে চলে গেল কিশোর। একটু পরেই ফিরে এল উত্তেজিত হয়ে। কি দেখলাম জানো?
কী! প্রায় একসাথে জানতে চাইল অন্য তিনজন।
নতুন বাক্স এসেছে অনেকগুলো, দেখে এলাম, কিশোর জানাল। অদুত বাক্সের ওপরে আস্ত ঝিনুক বসানো।
তাই নাকি! বুঝে ফেলেছে রবিন।
খাইছে! কিছুই তো বুঝলাম না, মুসা বলল। ঝিনুকের বাক্স দেখে এত উত্তেজিত হওয়ার কি আছে?
চিন্তিত ভঙ্গিতে কিশোর বলল, ওরকম ভনির আজকাল আর লোকে তেমন কেনে না। তাহলে এত মাল এনেছে কেন ম্যাকি? –
হয়ত কম দামে পেয়েছে কোথাও, রবিন বলল। নিলামে-টিলামে এনেছে। এই দেখ, দেখ!
সবাই দেখল, হালকা-পাতলা ছোটখাট একজন মানুষ ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে ম্যাকির দোকানের দিকে।
জাপানী! ফিসফিসিয়ে বলল মুসা। বিনকিউলার নিয়ে এসেছে আজ সাথে করে।
সেটা চোখে লাগিয়ে তাকাল জানালার দিকে। লোকটা দোকানে ঢুকল। কয়েক মিনিট পরেই বলে উঠল মুসা, এই, ঝিনুকের একটা বাক্স নিয়ে যাচ্ছে ম্যাকি!
আরও কয়েক মিনিট পর দোকান থেকে বেরিয়ে এল জাপানী। হাতে সেই বাক্স।
ভ্রূকুটি করল কিশোর। আনমনে বলল, ভালই চালাচ্ছে ম্যাকি।
কি করব? অধৈর্য হয়ে বলল মুসা। পিছু নেব লোকটার? বাক্সটা কেড়ে নেব? যদি সত্যি সত্যি ও অপরাধী না হয়ে থাকে?
দোকানের ওপর চোখ রাখব আমরা, কিশোর বলল, যেমন রাখছি।
সুতরাং চোখ রাখল ওরা। অনেককে দোকানে ঢুকতে দেখল। বেরিয়ে এল হাতে কোন না কোন জিনিস নিয়ে। নিশ্চয় বড়দিনের উপহার। ওদের মধ্যে তিনজনের গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হল। দুজন জাপানী, একজন ইউরোপিয়ান। তিনজনেই ঝিনুকের বাক্স কিনেছে।
এতে কিন্তু কিছু প্রমাণ হয় না, জিনা বলল।
না, তা হয় না, স্বীকার করল কিশোর।
তাহলে প্রমাণ জোগাড় করি, চল।
কিভাবে? প্রশ্ন রাখল রবিন।
তিনজনেই তাকিয়ে রয়েছে কিশোরের মুখের দিকে।

বার কয়েক ঘনঘন নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল গোয়েন্দাপ্রধান। তারপর বলল, রবিন, এবার তুমি যাবে।
আমি?
হ্যাঁ আমার বিশ্বাস, তোমার ওপরই নজর কম দিয়েছে ম্যাকি। বলতে বলতে সাথে করে আনা ঝোলায় হাত ঢোকাল কিশোর। বের করল একটা কালো পরচুলা। এটা পরে নাও, ভাল হবে। আমাদের শোবার ঘরের তাকে পেয়েছি। আরও আছে কয়েকটা। আর এই সানগ্লাসটা পরে নাও, বলে নিজের চোখেরটা খুলে দিল সে। অন্য চেহারা হয়ে যাবে তোমার। চিনতে পারবে না ম্যাকি।
বেশ, উইগ পরতে পরতে রবিন বলল, গেলাম। কি করতে হবে আমাকে?
সাধারণ কাস্টোমারের মত গিয়ে ঢুকে ঝিনুকের বাক্স দেখিয়ে বলবে, ওরকম একটা কিনতে চাও।
তাতে কি হবে?
ম্যাকির প্রতিক্রিয়া বুঝতে পারবে। হয়ত খুশি হয়েই বিক্রি করবে...
তাহলে সেটা খুশির ব্যাপার হবে না আমাদের জন্যে, হেসে বলল রবিন।
বিক্রি করতে রাজি না-ও হতে পারে। তাহলে আমরা বুঝব ঠিক পথেই এগোচ্ছি। যাও, আর দেরি কোনো না। বিক্রি করুক আর না করুক, বিপদে পড়বে বলে মনে হয় না।
পরচুলা আর সানগ্লাস পরে অন্য মানুষ হয়ে গেল রবিন। এগিয়ে চলল দোকানের দিকে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দ্বিধা করল এক মুহূর্ত, তারপর আস্তে ঠেলে ফাঁক করল পালা। ম্যাকি একা। খরিদ্দার ঢুকছে দেখে বিগলিত উজ্জ্বল হাসি হাসল। এসো এসো। তা, কি চাই? রবিন বুঝল, তাকে চেনেনি ম্যাকি। বলল, একটা স্যভনির চাই। জানালার দিকে তাকাল। বাক্সগুলোর দিকে তাকিয়ে পছন্দ করার ভান করল। বাহ্, দারুণ তো! নিশ্চয় ওগুলোতে কড়ি আছে? খুব ভাল হবে।
সরি, ওগুলো বিক্রির জন্যে নয়, দ্রুত বলল ম্যাকি। এমনি সাজিয়ে রেখেছি, দোকানের সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্যে।...এই যে দেখ, চমৎকার সব জিনিস আছে.....
কিন্তু আমি তো এসব চাই না, হতাশ হয়েছে যেন রবিন। কড়িগুলো কি সত্যি বেচবেন না?
না, দৃঢ়কণ্ঠে বলল ম্যাকি।
নিরাশ ভঙ্গিতে অন্যান্য জিনিসের দিকে তাকাতে লাগল রবিন। শেষে, আর কিছুই পছন্দ হয়নি বলে বেরিয়ে এল দোকান থেকে। পেছন পেছন এল ম্যাকি। যত তাড়াতাড়ি পারে রবিনকে বের করে দিয়ে হাঁপ ছাড়তে চায় যেন।

সরাসরি সাইনবোর্ডের দিকে না এগোনোল্ল মত বুদ্ধি আছে রবিনের। বলা যায়, পেছন থেকে তাকিয়ে থাকতে পারে ম্যাকি। উল্টোদিকে হাঁটতে শুরু করল সে। গোটা দুই বুক ঘুরে আরেক দিক দিয়ে ফিরে এল সাইনবোর্ডের কাছে।
সত্যিই বেচল না হলে! সব নে বলে উঠল মুসা।
ঠিকই সন্দেহ করেছি, কিশোর বলল। চল, জলদি বাড়ি চল। সময় নষ্ট করা যাবে না। আরেকটা উইগ দরকার। ফিরে আসতে আসতে বাকি বাক্সগুলো বিক্রি করে ফেললেই হয়।...
ফেরার পথে তার পরিকল্পনার কথা জানাল কিশোর। ছদ্মবেশ নিয়ে আমিও যাব ঝিনুকের বার কিনতে। দেখি কি বলে!
আমার বোনের জন্যে, বুঝেছেন, বলল আমেরিকান কিশোরের ছদ্মবেশধারী কিশোর। ছোট বোনের জন্যে কিনতে চাই। ভাল কি আছে আপনার দোকানে? জানালার দিকে তাকাল সে। আর মাত্র দুটো বাক্স অবশিষ্ট রয়েছে।
অনেক কিছুই আছে, ইয়াং ম্যান, হেসে বলল ম্যাকি। কিশোরের লা লালচে চুলের দিকে তাকাল। এই যে দেখ, কত জিনিস...
আমি ওই কড়ি কিনতে চাই, হাত তুলে বার দেখাল কিশোর।
সরি, মাথা নাড়ল ম্যাকি, ওগুলো বিক্রির জন্যে নয়।
হতাশ হল কিশোর। তাই নাকি? আহ-হা...
তার কথায় বাধা পড়ল। দোকানে ঢুকল একজন লোক। পকেট থেকে বের করল একটা খাম, বেশ পুরু। অনুমান করতে পারল কিশোর, কি আছে ওর মধ্যে। টাকা! নোটের বাণ্ডিল।
খাম দেখে চমকে গেল ম্যাকি, কিশোরের চোখ এড়াল না সেটা। বলল, আমি ওই কড়ির বাক্সই চাই, অন্য কিছু না। চোখের কোণ দিয়ে দেখল, ভূরু কুঁচকে গেছে আগন্তুকের।
বিশেষ ধরনের খামে টাকা নিয়ে যারা ঢোকে, তাদেরকে ঝিনুকের বাক্স দিয়ে দেয় ম্যাকি, বুঝতে পারল কিশোর। ওই খামই হল সঙ্কেত।
অনেক চাপাচাপি করল কিশোর, কিন্তু কিছুতেই তার কাছে বাক্স বিক্রি করতে রাজি হল না ম্যাকি।
অবশেষে পুরানো আমলের ছোট একটা পেপারওয়েইট কিনে বেরিয়ে এল কিশোর। কয়েক পা এগিয়ে ফিরে তাকাল। দেখল, জানালার কাছের দুটো বাক্সের একটা নেই। মুচকি হাসল সে। চলার গতি বাড়িয়ে দিল। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল, দোকান থেকে বেরিয়ে আসছে সেই লোকটা, হাতে বার। আর কোন সন্দেহ রইল না, চোরাই মুক্তোর ব্যবসা করে ম্যাকি।
উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করছে বন্ধুরা। তাদেরকে সব জানাল কিলোর।

আবার বাড়ি ফিরল ওরা। রাফিয়ানকে নিয়ে চলাফেরা বড় মুশকিল, বাসে ট্রেনে যেখানেই উঠুক, ঝুড়িতে ভরে নিতে হয়। এই বয়ে নেয়া আর ভাল লাগছে তিন গোয়েন্দার। জিনাকে বোঝাতে অবশ্য কষ্ট হল, তবে শেষ পর্যন্ত বুঝল সে। বাড়িতে আটকে থাকতে মোটেও ভাল লাগল না কুকুরটার। ঘাউ ঘাউ করে, আরও নামারকম বিচিত্র শব্দ করে সেটা জানান দিল রাফি, কিন্তু তার অনুনয় কানে তুলল না কিশোর।

বাড়ির কাছেই একটা বাজার। সেখানে পুরানো, মাল বিক্রি হয় এরকম কয়েকটা দোকান দেখে গেছে কিশোর। তারই একটাতে ঢুকল ওরা।

ওই দেখ, হাত তুলে দেখাল রবিন, ম্যাকির দোকানে যেরকম দেখে এসেছে। ওরকম বক্স। ওরকম জিনিসই তো চাও?

হ্যাঁ।

বাক্সটা কিনে নিল কিশোর। তারপর ট্যাক্সিতে করে চলে এল আবার মিমোসা অ্যাভেন্যতে। ম্যাকির দোকানের জানালায় দেখা গেল, আরেকটা বাক্স তখনও রয়েছে।

রবিন, মুসা আর জিনাকে সাইনবোর্ডের কাছে থাকতে বলে, বাক্সটা ঝোলায় ভরে দোকানের দিকে এগোল কিশোর। যেভাবেই হোক, দেখতেই হবে, ঝিনুকের বাক্সের ভেতরে সত্যি সত্যি মুক্তো আছে কিনা।

কিশোর দোকানে ঢুকে দেখল, দুজন মহিলা জিনিস ঘাটাঘাটি করছে। ম্যাকি ওদের নিয়ে ব্যস্ত। আমেরিকান ছেলেটাকে দোকানে ঢুকতে দেখল সে, কিন্তু একবার চেয়েই আবার ফিরল মহিলাদের দিকে। ছেলেটাকে বিশেষ পাত্তা দিল না।

কিশোরও এটাই চায়। কয়েকটা পুতুল দেখতে দেখতে সরে যেতে লাগল জানালার কাছে। সুযোগের অপেক্ষায় রইল। কয়েকটা স্যভনির পছন্দ করল দুই মহিলা। টাকা বের করে দিল। দাম রেখে বাকি টাকা ফেরত দেয়ার জন্যে ক্যাশবাক্সের ওপর ঝুঁকেছে ম্যাকি, এই সময় চট করে ঝোলা থেকে বাক্স বের করে ঝিনুকের বাক্সের সঙ্গে বদল করে ফেলল কিশোর। দ্রত সরে এল জানালার কাছ থেকে। একটা পুতুল তুলে নিয়ে এগিয়ে এল কাউন্টারের দিকে। দাম মিটিয়ে বেরিয়ে পড়ল দোকান থেকে।

সেরে ফেলেছি! তুড়ি বাজিয়ে হেসে বন্ধুদেরকে জানাল কিশোর।

চল, ভাগি, মুসা বলল।

না। শেষ বাক্সটা কার কাছে বিক্রি করে দেখব। দোকানে বাক্স খোলে না ক্রেতা। কারণ, জানাই আছে ভেতরে কি আছে।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না ওদেরকে। একটা লোক ঢুকল দোকানে। বরিয়ে এল ঝিনুকের শেষ বাক্সটা অর্থাৎ কিশোর যেটা রেখে এসেছে সেটা নিয়ে।
এক কাজ করলে তো পারি, হঠাৎ বলল রবিন, ওর পিছু নিই না কেন? দখি না কোথায় যায়? একটা চোরের বাসা তো অন্তত চেনা থাকবে। পুলিশকে বলতে পারব।
ঠিক বলেছ, সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে গেল কিশোর। চল।
বেশ দূরে থেকে লোকটাকে অনুসরণ করে চলল ওরা। কিছুক্ষণ পর মোড় নয়ে কতগুলো দোকানের দিকে এগোল লোকটা। শহরের সব চেয়ে বড় অলঙ্কারের দোকানগুলো রয়েছে ওখানে। তারই একটাতে গিয়ে ঢুকল সে।
তাড়াতাড়ি দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল গোয়েন্দারা। জানালা দিয়ে ভেতরে তাকাল। লোকটা কোন কাউন্টারের সামনে দাঁড়ায়নি, সোজা ঢুকে গেল একটা দরজা দিয়ে ভেতরের ঘরে। ভাবসাবে মনে হল এই দোকানের মালিকই সে।
হুঁ, বুঝলাম! মাথা দোলাল কিশোর। বেআইনী ভাবে মুক্তা আমদানি করে ম্যাকি। সেগুলো বিক্রি করে তারই মত ব্যবসায়ীর কাছে। এভাবে দেদার টাকা কামায় ওরা।
শয়তানটার মুখোশ খোলার সময় হয়েছে, নাকি? মুসা বলল। পুলিশকে এখন বলা যায়। প্রমাণ তো আমাদের সাথেই আছে, তোমার ঝোলায়।
চল, আগে বাড়ি যাই, কিশোর বলল। বাড়ি গিয়েই খুলব বাক্সটা।
বন্ধুদের ফিরতে দেখে খুব খুশি হল রাফিয়ান। আনন্দে চেঁচাতে শুরু করল। তড়িং তিড়িং করে লাফ দিল কয়েকটা। ছুটে আসতে চাইল ওদের কাছে, কিন্তু শেকল ছিড়তে পারল না। তাড়াতাড়ি গিয়ে খুলে দিল জিনা।
কেরিআন্টি ফিরে এসেছেন। রান্নাঘরে ব্যস্ত। খাবারের ডাক পড়তে দেরি আছে।
কিশোররা যে ঘরে থাকে, সেঘরে চলে এল সবাই, রাফি সহ। বাক্সটা ঝোলা থেকে বের করে টেবিলে রাখল কিশোর। সবাই তাকিয়ে আছে ওটার দিকে। ডালা খুলতে এগোল না কেউ, অথচ ভেতরে কি আছে দেখার জন্যে উদগ্রীব হয়ে আছে প্রত্যেকে।
আল্লাহই জানে কি আছে! মা বলল।
আছে হয়ত সাত রাজার ধন! বলল রবিন।
জিনা, খোল, কিশোর বলল।
এগিয়ে গেল জিনা। কাঁপা কাঁপা হাতে তুলল বাক্সটা। ঝাঁকুনি দিল। ঝনঝন করে উঠল ভেতরে।
খোল! খুলে দেখ।

ডালা তুলেই অস্ফুট শব্দ করে উঠল জিনা। সবাই ঘিরে এল তাকে। হফ! করে উঠল রাফিয়ান, এতক্ষণ পর এসেও তার দিকে কেউ নজর দিচ্ছে না, এটা পছন্দ হচ্ছে না তার।
অনেকগুলো ঝিনুক রয়েছে বাক্সে। তাড়াতাড়ি ওগুলো খুলে দেখতে শুরু করল ওরা। শেষ ঝিনুকটাও ভোলা হল। কিন্তু একটা মুক্তাও পাওয়া গেল না কোনটার ভেতরে।
তাহলে কি ভুল করলাম?–ভাবছে কিশোর। বিশ্বাস করতে পারছে না। না, মনের কথাটাই মুখে বলল সে, ভুল করতে পারি না। নিশ্চয় মুক্তা আছে!
জিনার হাত থেকে বাক্সটা নিয়ে নিল রবিন। ভেতরে আঙুল বুলিয়ে দেখল। কাগজের আচ্ছাদন, শক্ত কোন কিছু আঙুলে লাগল না।
ফলস বটম নেই তো? মুসা বলল।। এত জোরে গুলো দিল রবিন, বাক্সের তলা ফুটো হয়ে আরেক পাশ দিয়ে বেরিয়ে এল আঙুল।
না, ফলস বটম নেই, গম্ভীর হয়ে বলল কিশোর। ভুলই করলাম বোধহয় আমরা।
হুফ! করে যেন সান্তনা দেয়ার চেষ্টা করল রাফিয়ান।
রবিনের হাত থেকে বাক্সটা নিল কিলোর। তীক্ষ্ণ চোখে দেখতে লাগল ভেতরটা। বিড়বিড় করে বলল, ফলস বটম নেই! দেয়ালের লাইনিঙের নিচেও কিছু নেই। ডালাটায় নেই তো?
না, পাতলা, মুসা বলল। ওর ভেতরে লুকানোর জায়গাই নেই।
ডালার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। ওপরে বসানো ছোট ঝিনুকটার ওপর দৃষ্টি স্থির। জ্বলজ্বল করছে চোখ। পকেট থেকে ছুরি বের করে এগিয়ে গিয়ে টেবিলের ওপর থেকে তুলে নিল ডালাটা। ঝিনুকের ফাঁকে ঢুকিয়ে দিল চোখা ফলা। চাড় দিয়ে খুলে ফেলল ডালা দুটো।
উত্তেজিত হয়ে তাকিয়ে রয়েছে সবাই।
বেশ কায়দা করে আঠা দিয়ে আটকানো ছিল ঝিনুকের ডালাদুটো। ভেতরে গোলাপী খুঁজে তুলো ঠাসা। সাবধানে তুলোর দলাটা বের করে টেনে টেনে ছিঁড়ল কিশোর। বেরিয়ে পড়ল চমৎকার মুক্তোটা।
হাতের তালুতে ওটা রেখে তাকিয়ে রইল কিশোর। তাকিয়ে রয়েছে অন্য তিনজনও।
খাইছে! হঠাৎ চিৎকার করে উঠল মুসা। এই তাহলে ব্যাপার! এভাবেই মুক্তা চোরাচালান করে!
হাসি ফুটল কিশোরের মুখে।
জিনা আর রবিনের মুখেও হাসি।

কলরব শুরু করে দিল ওরা। পাল্লা দিয়ে ঘেউ ঘেউ জুড়ল রাফিয়ান। ঝটকা দিয়ে খুলে গেল দরজা। হৈ-চৈ শুনে কি হয়েছে দেখতে এসেছেন জিনার বাবা।
কি ব্যাপার? এত গোলমাল কিসের? রাস্তা থেকে চেঁচানি শোনা যাচ্ছে।
বাবা, বললে বিশ্বাস করবে না, জিনা চেঁচিয়ে বলল। দেখ কি পেয়েছি!
মুক্তা! ভুরু কুঁচকে গেল মিস্টার পারকারের। কোথায় পেলে?
অনেক লম্বা কাহিনী, বাবা।
বেশ, তাহলে খেতে খেতে শুনব। চল, গিয়ে দেখি, তোমার মায়ের হল কিনা।
খেতে খেতে সমস্ত কথা শুনলেন মিস্টার এবং মিসেস পারকার। মাঝে মাঝে দুএকটা মন্তব্য করলেন কেরিআন্টি, কিন্তু জিনার বাবা একেবারে চুপচাপ রইলেন।
কাজেই, বুঝতেই পারছ, বাবা, মুক্তা চোরের ঘাটি আবিষ্কার করে ফেলেছি আমরা, জিনা বলল।
আর মিসেস আরনিকা মেয়ারবালের হারটাও খুঁজে পেয়েছি, মুসা বলল। পুশিকে বলা যায় এবার, বলল কিশোর।
তা-ই করা হল। ছেলেমেয়েদের নিয়ে কাছের থানায় চললেন মিস্টার পারকার। ডিউটি অফিসারকে সব খুলে বললেন। মুহূর্ত দেরি না করে পুলিশ সুপারের বাসায় ফোন করল অফিসার। ছুটে এলেন সুপারিনটেনডেন্ট। গোড়া থেকে আরেক দফা মুক্তা-চোরের গল্প শোনানো হল তাকে।
কাল থেকেই শুরু করব কাজ, বললেন তিনি। ওয়ারেন্ট নিয়ে গিয়ে ম্যাকিকে অ্যারেস্ট করব। তারপর চাপ দিলেই সুড়সুড় করে দলের সমস্ত লোকজনের নাম বলতে দিশে পাবে না।
ছেলেমেয়েদেরকে নিয়ে আবার বাড়ি ফিরে এলেন মিটার পারকার। সারাদিন অনেক খাটুনি গেছে, ক্লান্ত লাগছে এখন। তবু ঘুমোতে গেল না জিনা। বাবাকে জিজ্ঞেস করল, কাল পুলিশ আমাদেরকে সঙ্গে নেবে, বাবা?
কি জানি। মনে হয় না। পুলিশের কাজের সময় তোমাদেরকে নেবে কেন?
বা-রে, আমরাই করে দিলাম সব। আর আমাদেরকে নেবে না?
না।
আর কিছু বলল না জিনা। ঘুমোতে চলল নিজের ঘরে। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, আগামী দিন যখন ম্যাকিকে গ্রেফতার করতে যাবে পুলিশ, ওরাও থাকবে তখন ওখানে। পুলিশের সঙ্গে যাবার দরকার নেই, ওরা আলাদাই যাবে।
পরদিন সকালে উঠে এ-নিয়ে তিন গোয়েন্দার সঙ্গে আলোচনা হল জিনা। সবাই রাজি।

দেখ, জিনা বলল, লোকটা মহা শয়তান। পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যেতে পারে। আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, যাবে।
ভাবছি, টনিকে সঙ্গে নিলে কেমন হয়? কিশোর বলল।
সবাই একমত হল এ-ব্যাপারে।
টনিকে ফোন করা হল। সংক্ষেপে জানানো হল সব কথা। সাঘাতিক উত্তেজিত হয়ে উঠল সে। বলল, বাবার গাড়ি নিয়ে চলে আসবে। গোয়েন্দাদের নিয়ে যাবে মিমোসা অ্যাভেন্যুতে।
একেবারে সময়মত পৌঁছল ওরা। রাস্তার পাশের দোকানগুলো সবে খুলতে আরম্ভ করেছে। সাইনবোর্ডের আড়ালে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল ওরা। এল পুলিশের কালো গাড়ি। গাড়ি থেকে নামল সাদা পোশাক পরা দুজন পুলিশ। দোকানের দিকে এগোল। পুলিশের আরেকটা গাড়ি এসে দাঁড়াল প্রথম গাড়িটার কাছে।
বিড়বিড় করে বলল টনি, দোকান সার্চ করবে। ধরে বের করে আনবে ম্যাকিকে।
এখান থেকে কিছু দেখতে পাব না আমরা, মুসা বলল। ভেতরে কি ঘটে দেখা দরকার।
কিন্তু আমাদেরকে কি কাছে যেতে দেবে? রবিনের প্রশ্ন।
এসো আমার সঙ্গে, উঠে দাঁড়াল কিলোর।
গাড়ির দরজায় তালা লাগাল টনি। তারপর দ্রুত রওনা হল কিশোরদের পেছনে।
দোকানের পেছনের ওই যে গলিটা, চলতে চলতে বলল কিশোর, প্রায় নির্জন থাকে, দেখেছি। ওখানে গিয়ে জানালা দিয়ে দোকানের সেলারে নামা যাবে। তারপর সিঁড়ি দিয়ে উঠে পেছনের ঘরে ঢুকে আরামসে দেখতে পারব দোকানের ভেতরে কি হচ্ছে।
এক এক করে জানালা দিয়ে সেলারে নেমে পড়ল ওরা। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে যাবে, এই সময় কানে এল কড়া পুলিশী কণ্ঠ, জলদি আলমারি খোল! ভেতরে কি আছে দেখব।
মিনমিন করে কি বলতে যেয়ে আবার ধমক খেল ম্যাকি।
আলমারি খোলার শব্দ হল। মিনিটখানেক পর বলে উঠল আরেকজন পুলিশ, এই তো! মিসেস মেয়ারবালের নেকলেস!
হাসি ফুটল কিশোরের মুখে। তাকাল সঙ্গীদের মুখের দিকে। প্রমাণ পেয়ে গেছে পুলিশ। বল ধরেছে ম্যাকিকে।
ব্যাটার খেল খতম, হাসতে হাসতে মুসা বলল। আর শয়তানী করতে পারবে না।
যেপথে ঢুকেছিল সেপথেই আবার বেরিয়ে এল ওরা। ভাবতেই পারেনি, বাইরে কি চমক অপেক্ষা করছে ওদের জন্যে।

গলি থেকে মিমো অ্যাভেন্যুতে বেরিয়েই দেখল, দোকানের দরজা দিয়ে সবেগে বেরিয়ে আসছে ম্যাকি। দৌড় দিল একদিকে। হাতে হাতকড়া নেই। পুলিশ নেই পেছনে। হাতে সেই নীল বাক্সটা। কাপড়-চোপড়ের অবস্থা দেখে বুঝতে অসুবিধে হয় না, খুব একচোট ধস্তাধস্তি করে এসেছে।
পালাচ্ছে! চেঁচিয়ে উঠেই পিছু নিতে গেল মুসা।
তার হাত টেনে ধরল কিশোর। না। ওই দেখ।
বেরিয়ে এসেছে পুলিশ দুজন। একজনের নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে। আরেকজন হাত নাড়তে নাড়তে বলল, ধর, ধর ব্যাটাকে! দৌড় দিল ম্যাকির পেছনে।
ইতিমধ্যেই ক্রেতার ভিড় বেড়ে গেছে রাস্তায়। বড়দিনের উপহার কিনতে এসেছে লোকে। সেদিকে দৌড়াচ্ছে ম্যাকি, লোকের ভিড়ে মিশে যাওয়ার ইচ্ছে।
হুড়াহুড়ি করে পুলিশের গাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছে ইউনিফর্ম পরা পুলিশেরা।
পালাল তো! ধর, ধর ব্যাটাকে! চেঁচিয়ে উঠল আবার সাদা পোশাকধারী পুলিশ।
পিস্তল ধরছে না কেন? মুসা বলল।
নেই হয়ত। এখানে পিস্তল-বন্দুক কমই ব্যবহার করে পু মরিকার মত সব সময় পিস্তল বয়ে নিয়ে বেড়ায় না, টনি বলল।
রাফি! চেঁচিয়ে বলল জিনা। ধর ব্যাটাকে!
আদেশ পেয়ে মুহূর্ত দেরি করল না রাফিয়ান। দুটল ম্যাকির পেছনে। তার পেছনে দৌড় দিল কিশোর গোয়েন্দারা।
তারপর খুব দ্রুত ঘটে গেল সমস্ত ঘটনা। লোকের কোলাহল আর পুলিশের হুইসেলে কান ঝালাপালা। বাঘের মত গিয়ে ম্যাকির ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল বিশাল কুকুরটা। কোট কামড়ে ধরে ঝুলে রইল বিচিত্র ভঙ্গিতে।
ঝাড়া দিয়ে ছাড়ানোর চেষ্টা করল ম্যাকি। পারল না। দৌড়াতেও পারল না আর। চোখের পলকে এসে তাকে ঘিরে ফেলল পুলিশ। দুদিক থেকে চেপে ধরল হাত।
হাতকড়া পড়ল রবার্ট ম্যাকির হাতে।
সেদিন বিকেলের কাগজেই একেবারে সামনের পৃষ্ঠায় ছাপা হল খবরটা। তিন। গোয়েন্দা, জিনা আর রাফিয়ানের ছবি ছাপা হল তাতে। মিসেস এরিনা কলিন্স, তার মেয়ে মলি আর হারটার ছবিও ছাপা হয়েছে।
এরিনা আর মলিকে বড়দিনের দাওয়াত দিলেন কেরিআন্টি। টনিকেও। আর মাত্র একদিন দেরি আছে বড়দিনের। কয়েকদিনের জন্যে ছুটি, বৈজ্ঞানিক সম্মেলন বন্ধ। কাজেই বাড়িতেই থাকছেন মিস্টার পারকার। ছেলেমেয়েরা খুব খুশি। উৎসব ভালই জমবে মনে হচ্ছে।
সত্যিই ভাল জমল।

সারাদিন জিনাদের ওখানে কাটিয়ে বিকেলে বাসায় ফিরে গেল এরিনা। তার ওখানে পরদিন বিকেলে চায়ের দাওয়াত করে গেল সবাইকে।
পরদিন বিকেলে বিশেষ কাজ পড়ে যাওয়ায় এরিনার বাসায় যেতে পারলেন না কেরিআন্টি আর জিনার বাবা। ছেলেমেয়েদেরকে পাঠিয়ে দিলেন। টনির বাড়িতে কাজ থাকায় সে-ও আসতে পারল না।
হার ফেরত পেয়ে খুব খুশি এরিনা। গতদিন থেকে কয়েকবার ধন্যবাদ দিয়ে ফেলেছে ওদেরকে। চা খেতে খেতে আবারও বলল, কি বলে যে তোমাদের ধন্যবাদ দেব, বুঝতে পারছি না। আমার জন্যে অনেক করেছ তোমরা, ঝুঁকি নিয়েছ। অনেক ধন্যবাদ। হারটা বিক্রি করলে অনেক টাকা পাব। টাকার জন্যে আর ভাবতে হবে না কখনও আমাকে। কি বাঁচা যে বেঁচেছি বলে বোঝাতে পারব না তোমাদেরকে।
ম্যাকির সম্পর্কে অনেক কিছুই জেনেছে এরিনা, তবু আরও কিছু জানা বাকি। পুলিশের কাছে যা যা শুনে এসেছে ছেলেময়েরা, চা আর চমৎকার নাস্তা খেতে খেতে সেগুলোই বলল।
সব স্বীকার করেছে ম্যাকি, কিশোর বলল। যারা যারা জড়িত আছে এই মুক্তা চোরাচালানের সঙ্গে, বলে দিয়েছে। ওদের বেশির ভাগই এখন হাজতে। জাপান থেকে বেআইনী ভাবে ওই মুক্তা আমদানি করা হত। এতে মধ্যস্থতা করত ম্যাকি।
লোক খারাপ, জিনা বলল। কাজেই হারটার কথা শুনে আর স্থির থাকতে পারেনি। চুরি করতে উঠেপড়ে লেগেছিল।
জানল কিভাবে হারটার কথা? কাপে আরও চা ঢেলে দিল এরিনা। চকোলেট কেকের প্লেটটা ঠেলে দিল। সবাইকে সাধাসাধি করল আরও নেয়ার জন্যে।
ম্যাকির দাদী ছিলেন মিসেস মেয়ারবালের বান্ধবী, রবিন জানাল। দাদীর মৃত্যুর পর তাঁর ডেস্কের ড্রয়ার ঘাঁটতে গিয়ে কতগুলো চিঠি পেয়ে যায় সে। ওগুলো পড়েই জানতে পারে র কথা। কোথায় লুকিয়ে রাখেন জিনিসটা কথায় কথায় একদিন ম্যাকির দাদীকে বলেছিলেন মিসেস মেয়ারবাল। সেটা ম্যাকির দাদীর ডায়েরীতে লেখা ছিল। চোরের ভয় বরাবরই ছিল মিসেস মেয়ারবালের, সে-কারণেই ওরকম একটা জায়গায় হারটা লুকাতেন। প্রায় সারাদিনই ওটার ওপর বসে থাকতেন তিনি, রাতে টাব চেয়ারটা থাকত তার বেডরুমে।
কিন্তু আমার কথা জানল কিভাবে ম্যাকি? এরিনা জিজ্ঞেস করল।
আমাদের পিছু নিয়েছিল, বলল মুসা। কেকের গোটা চারেক টুকরো শেষ করে আরও চারটে তুলে নিল নিজের প্লেটে। আরও হুঁশিয়ার থাকা উচিত ছিল আমাদের।

হুফ! করে মাথা দেলাল রাফিয়ান, যেন মুসার সঙ্গে একমত। আসলে কেক চাইছে সে। :
দুটো টুকরো তাকে দিল এরিনা। হেসে মাথা চাপড়ে দিয়ে বলল, আসল কাজটা তুইই করেছিস, রাফি। চোরটাকে পাকড়েছিস।
তোমার কুকুরটা খুব ভাল, জিনা, রাফিয়ানের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল -মলি। এরকম একটা কুকুর যদি আমার থাকত! মা, দেবে কিনে একটা?
দেব।
হুফ! হুফ! বলল রাফিয়ান। যেন বোঝাতে চাইল, খুব ভাল হবে তাহলে মেয়েটাকে আর একা থাকতে হবে না।
তার মাথা দোলানোর ধরন দেখে না হেসে পারল না কেউ।

ভলিউম ১১ – বুদ্ধির ঝিলিক – তিন গোয়েন্দা – রকিব হাসান – সেবা প্রকাশনী

?

?

স্কুল ছুটি হতেই কারমলের বাড়িতে রওনা হল তিন গোয়েন্দা। বোটানিক্যাল গার্ডেন আর একটা বড় পার্কের পাশে বাড়িটা। খানিক দূরে পাহাড়। সাইকেল, চালাতে চালাতে কিশোর বলল, কড়া নজর রাখবে। বলা যায় না, আমাদের ওপরও চোখ রাখতে পারে কেউ।

খাইছে! কিশোর, দেখ! হাত তুলে পাহাড়ের নিচে দেখাল মুসা।

পাহাড়ের চূড়ায় রয়েছে ওরা। নিচে, বাঁয়ে কারমলের বাড়ি, অনেকখানি জায়গা জুড়ে। বেড়া দেয়া। ভেতরে জঞ্জালের ছড়াছড়ি, পুরানো তক্তা আর আরও নানারকম বাতিল জিনিসের স্তূপ। আর আছে একগাদা বোতল। একপাশে পরিচ্ছন্ন একটা সাদা কটেজ। মাঝখানে পুরানো একটা দালান, দেয়াল ধসে পড়ে পড়ে এই অবস্থা। কিন্তু বাড়ির দিকে চোখ নেই ছেলেদের।

নিচে এক অদ্ভুত দৃশ্য! লোকের ছড়াছড়ি, পিপড়ের মত পিলপিল করছে। বাচ্চা, কিশোর, যুবক, বৃদ্ধ, পুরুষ, মহিলা সবাই পাগলের মত ছুটছে, হুমড়ি খেয়ে পড়ছে এখানে ওখানে, ঝোপঝাড় দলে মাটির সঙ্গে মেশাচ্ছে, জঞ্জাল আর বোতল ছড়িয়ে ফেলছে যেদিকে ইচ্ছে। বসন্তের এই সুন্দর বিকেলে খেপে গেছে যেন মানুষগুলো। চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করেছে।

গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে ওরাঃ ওটা আমার! এই আমি পেয়েছি! ...এই, বোতল ছাড়!...ইত্যাদি।

দলবল নিয়ে এসেছেন ইয়ান ফ্লেচার, সামলাতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছেন। কটেজের বারান্দায় দাঁড়িয়ে হতাশ চোখে তাকিয়ে রয়েছে ওদের দিকে এলসা, নরি আর উড। সাইকেল থেকে নেমে এগিয়ে গেল তিন গোয়েন্দা।

হায় হায়রে! সব সূত্র মুছে দিল, প্রায় কেঁদে ফেলল নরি।

সবখানে ভাঙা বোতল, শান্তকণ্ঠে বলল কিশোর। এত কেন?

কারণ, কারমল বোতল সংগ্রহ করত, ঝাঁঝাল কণ্ঠে বলল উড। হাজার হাজার! আসল বোতলটা আর কোনদিনই খুঁজে পাব না আমরা।

কপালের ঘাম মুছতে মুছতে এগিয়ে এলেন ফ্লেচার। পেছন পেছন এল এক মোটালোক আর এক সাংঘাতিক রোগাটে মহিলা। এত পাতলা, মনে হয় বাতাসেই পড়ে যাবে।

সবগুলোকে ভাগান, অফিসার,মহিলা বলল।

বেআইনী ভাবে ঢুকেছে শয়তানগুলো, মোটা লোকটা বলল, সব কটাকে আরেস্ট করুন।

মাথা নাড়লেন চীফ। সবাইকে ঢোকার অনুমতি দিয়ে গেছেন আপনার মামা, মিস্টার এজটার। আর জোর করে ওদেরকে তাড়াতে হলে এখন মিলিটারি ডাকতে হবে। আমাদের পক্ষে সম্ভব না। বড় জোর বাড়িঘর বাঁচানোর চেষ্টা করতে পারি।

মামাটা তো একটা বদ্ধ পাগল ছিল,মুখ ঝামটা দিল মহিলা, পাগলের কথা মানতে হবে নাকি? আসল মালিক আমরা।

কি যে বল, জেনি এজটার, বলে উঠল এলসা, মালিক তোমরা হতে যাবে কেন? তোমাদের সঙ্গে কি সম্পর্ক...।

রক্তের সম্পর্ক থাকলে কিছুটা আমাদের সঙ্গেই আছে, এলসা, জেনি বলল। তোমার তো তা-ও নেই। তোমাদের বুদ্ধিতেই আমাদের ঠকানোর মতলব করেছিল বুড়োটা। আসলে ওকে দেখাশোনা করার জন্যে আরও আগেই চলে আসা উচিত ছিল আমাদের।

যা। তোমাদেরকে দেখতে পারত না বলেই তো, বোনের সঙ্গে গলা মেলাল মোটা মাইক, ঘরে জায়গা দেয়নি। ওই কটেজে থাকতে দিয়েছে।

তোমাকে কটেজেও দিত না, উড বলল। দশ বছর ধরে খবর নেই, এখন এসেছ দরদ দেখাতে। বেআইনী ভাবে তোমরাই বরং ঢুকেছ।

এই, তুমি বলার কে! চেঁচিয়ে উঠল জেনি।

তুমিও হাত মিলিয়েছ এলসার সঙ্গে! গর্জে উঠল মাইক। তোমরা দুজনে মিলে আমাদের ঠকানোর মতলব করেছ। কিন্তু আমরা জানি, আসল উইল একটা আছে, তাতে নিশ্চয় নাম রয়েছে আমাদের।

আসল উইলে নরি আর এলসার নাম আছে। আর কারও না, উকিল বলল।

রাগে ঘোঘোৎ করে উঠল মাইক। সেকথা শুধু তুমি বলছ। উইলটা হারাল কি করে, অ্যাঁ? আমার তো মনে হচ্ছে, আসল উইলটা তুমিই গাপ করে দিয়েছ, আমাদের ধোকা দেয়ার জন্যে।

তাহলে তো ভালই হত, উকিল হাসল। তোমরা একটা কানাকড়িও পেতে, সব পেত নরি।

আমরাও কারমলের বংশধর! আবার চেঁচিয়ে উঠল জেনি। সম্পত্তির ভাগ আমরাও পাব। ক্যালিফোর্নিয়ার আইনে কিছুই পাবে না। যদি তোমাদের মামার ছেলে বা নাতি না থাকত, তাহলে পেতে।

জ্বলন্ত চোখে নরির দিকে তাকাল ভাইবোন। ছেলেটার চোখে ওদের দৃষ্টিরই প্রতিফলন দেখতে পেল।

দেখে নেব, কুৎসিত ভঙ্গিতে দাঁত খিচাল মাইক।

নিয়ো, এলসা বলল। দয়া করে এখন বেরোও আমার বাড়ি থেকে।

মুলোর মত লাল হয়ে গেল ভাইবোনের মুখ।
আমাদের জিনিস আমরা আদায় করে নেবই, মনে রেখ, দাঁতে দাঁত চেপে বলল জেনি। কি করে নিতে হয় তা-ও আমরা জানি।
গটমট করে চলে গেল দুজনে। ওদিকে লড়াই বাধিয়ে দিয়েছে দুই হোকরা। ভাইবোনের দিকে চেয়ে শাগ করে ছেলেদের লড়াই থামাতে এগিয়ে গেলেন চীফ।
ব্যাটারা একেবারেই ছোটলোক, ফস করে বলে ফেলল মুসা।
ঠিকই বলেছ, একমত, হল উকিল। কারমল এখন থাকলে ঝেটিয়ে বিদেয় করত। একটা পয়সাও পাবে না ব্যাটারা। যাকগে, এখন আমাদের কাজ সেরে ফেলা দরকার। বোতলটা খুঁজতে হবে…
ভেতরে যাওয়া দরকার আমাদের, বাধা দিয়ে বলল কিশোর।
জবাবের অপেক্ষা না করেই কটেজে ঢুকে পড়ল গোয়েন্দাপ্রধান। অন্যেরা অনুসরণ করল। পরিপাটি লিভিংরুমে চোখ বোলাচ্ছে কিশোর। ভোলা জানালা দিয়ে ফুরফুরে চমৎকার বাতাস আসছে।
মিস্টার কারমলের ঘরে বোতল খুঁজেছেন আপনারা? উকিল আর এলসার দিকে তাকাল কিশোর।
জবাবটা দিল নরি, খুঁজেছি। পাইনি। পাওয়ার কথাও না, আনমনে বলল কিশোর। আমার মনে হয় নেই।
পকেট থেকে ধাঁধার নকলটা বের করল সে। এখান থেকেই শুরু করার কথা বলেছেন কারমল, তাঁর বাড়ি থেকেই। কবিতার মত করে লিখেছেনঃ হোয়্যার দ্য ওয়াইল্ড ডগস লিভস। বিশেষ ধরনের কোড।
তারমানে, ধীরে ধীরে বলল রবিন, বটল আর স্টপারও কোন ধরনের কোড? আসল বোতল না হয়ে বোতলের মত দেখতে কোন জিনিসের কথা বুঝিয়ে থাকতে পারেন।
তেমন দেখতে কিছু নেই এখানে, এলসা বলল।
কিন্তু পানি আছে! আস্তে কথা যেন বলতেই পারে না নরি, চেঁচাল, বোটানিক্যাল গার্ডেনের পাশে, হাঁস পালে যে পুকুরে।
রবিন বলল, পরের লাইনটা বলছে, অ্যাবাভ দ্য অ্যাপলস অ্যাণ্ড পেয়ারস অল অ্যালোন। আপেল গাছের কথা বলছে হয়ত। পুকুরটার পাড়ে আছে ওরকম গাছ?
উত্তেজিত হয়ে উঠল উড। ঠিক বলেছ!
বেশ… শুরু করল কিশোর, শেষ করতে পারল না।
জানালার বাইরে থেকে শোনা গেল গা জ্বালানো খিকখিক হাসি। বলল, অনেক ধন্যবাদ তোমাদেরকে, মাথামোটার দল! পায়ের শব্দ শোনা গেল।

জানালার কাছে দৌড়ে গেল মুসা। চেঁচিয়ে বলল, শুঁটকি টেরি!
বোটানিক্যাল গার্ডেনের দিকে ছুটে যাচ্ছে তালপাতার সেপাই এক তরুণ, তিন গোয়েন্দার চেয়ে কিছু বড়। ওদের চিরশত্রু টেরিয়ার ডয়েল।
নে ফেলেছে, গুঙিয়ে উঠল মুসা। আগেই ভাবা উচিত ছিল…
ভেব না,সান্ত্বনা দিল কিশোর, বেশি দূর এগোতে পারবে না। বিলাবং বলে হয়ত হাঁসের পুকুরটা বুঝিয়েছেন কারমল, আপলস অ্যাণ্ড পেয়ারসের মানে গাছ-ও হতে পারে। এত সহজ মনে হয় না। অন্য কোন মানে আছে।
এক এক করে সবার মুখের দিকে তাকাল কিশোর। কেউ জবাব দিতে পারল। ভ্রূকুটি করল সে। কারমলের ব্যাপারে যত বেশি জানতে পারব, তার ধাঁধার সমাধান করা তত সহজ হবে। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল উডের দিকে।
বেশ, শোন, উকিল বলল। উনিশশো, দুই সালে অস্ট্রেলিয়ায় জন্মেছিল, কারমল। তার বাবা ছিল একজন আসামী। তখন আসামীদেরকে সাজা দিয়ে, অস্ট্রেলিয়ায় পাঠাত ইংল্যাণ্ডের লোকেরা। বাপের চেয়ে কোন অংশে ভাল ছিল না কারমল, ছেলেবেলায়ই ভীষণ দুষ্ট ছিল। অল্প বয়েসেই বুশরেঞ্জার, মানে ডাকাত হয়ে গেল সে। ডাকাতি করে বড়লোক হল। তবে অপরাধী সে, আইনের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াতে হত। তরুণ বয়েসে চলে গেল ক্যানাডায়, আরও অনেক টাকা কামাল, বিয়ে করল অনেক বয়েসে, একটা ছেলে হল। বছর বিশেক আগে এসেছিল রকি বীচে, তারপর একাই বাস করেছে। অনেকটা সন্ন্যাসীর মত জীবন যাপন। তার ছেলে বছর পাঁচেক আগে যখন মোটর অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেল, এলসার যাবার জায়গা রইল না। কাজেই তাকে নিজের কাছে নিয়ে এল বুড়ো। আলাদা কটেজ বানিয়ে দিল। দুনিয়ার সব মানুষকে সন্দেহ করত সে, কাউকে নিজের ঘরের ধারেকাছে ঘেঁষতে দিত না। অস্ট্রেলিয়া ছাড়া আর কোন দেশকে ভালবাসত না, বাপের মতই গোঁড়া ককনি ছিল বোধহয়। দুর্ধর্ষ এক মানুষ।
রবিন বলল, ধাঁধায় অস্ট্রেলিয়ান শব্দ ব্যবহার করেছেন কারমল। অ্যাপলস অ্যাণ্ড পেয়ারস বলে অস্ট্রেলিয়ান বা ক্যানাডিয়ান কিছু বোঝননি তো?
বলতে পারব না, বলে এলসার দিকে তাকাল উড।
এলসাও মাথা নাড়ল। বলল, বাড়ি চলে যাও এখন। গিয়ে ভালমত ভাব। দেরি হয়ে গেছে।
নিরাশ হয়েছে নরি। তার হিরোরা পরাজিত, ধাঁধার সমাধান করতে পারেনি। তিন গোয়েন্দাও অখুশি। দেখল, পরাজিত হয়ে আরও অনেকেই ফিরে যাচ্ছে। নীরবে সাইকেল চালাল ওরা রকি বীচের দিকে।
নীরবতা ভাঙল মুসা, কিশোর, ককনি কি?

লণ্ডনের ইষ্ট এতে যাদের বাড়ি তাদেরকে বলে ককনি। কেউ কেউ বলে, সেইন্ট মেরিলবাউ গির্জার ঘন্টার শব্দ যতদূর যায়, ততদূরের মধ্যে যাদের জন্ম তারা আসল ককনি। সে যাই হোক, ককনিদের কিছু কিছু শব্দের উচ্চারণ অদ্ভুত। হটকে বলে অট, ব্লেমকে বলে ব্লাইম, এরকম। অস্ট্রেলিয়ানরাও করে ওরকম।
কিশোর, রবিন বলল। উচ্চারণের ওপর ভিত্তি করে শব্দ বসানো হয়নি তো, ধাঁধায়? হয়ত...
সিটের ওপর হঠাৎ সোজা হয়ে গেল কিশোর। কেঁপে উঠে আরেকটু হলেই কাত হয়ে পড়ে গিয়েছিল সাইকেল। ককজি! চেঁচিয়ে উঠল সে। হয়ত...
কিশোর! বাধা দিল মুসা। স্যালভিজ ইয়ার্ডের কাছে চলে এসেছে ওরা। রাস্তার ধারে একটা পরিচিত গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, সেদিকে চোখ পড়েছে তার। শুঁটকি!
লাল গাড়িটা খালি মনে হল। ভাল করে তাকাতে চোখে পড়ল, সামান্য নড়ল একটা মাথা। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে টেরিয়ার। নিশ্চয় ওদের পিছু নিয়ে এসেছে।
জলদি, বলতে বলতে পকেট থেকে নকলটা বের করল কিশোর, এমন ভাব কর, যেন জরুরী কিছু জেনে ফেলেছি আমরা। তোমাদেরকে তদন্ত করতে পাঠাচ্ছি।
তাড়াহুড়ো করে চলে যাবে, যাতে তোমাদের পিছু নেয় সে। আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে, দেখতে যাচ্ছি ঠিক কিনা। শুঁটকি পিছু নিক, চাই না।
টোপ গিলল শুঁটকি। দ্রুত প্যাড়া করে একটা বাড়ির মোড়ে যাবার সময় স্পোর্টসকারের ইঞ্জিনের শব্দ শুনল রবিন আর মুসা।
ইয়ার্ডের গেট দিয়ে কিশোর ঢুকে যাওয়াতক অপেক্ষা করেছে টেরিয়ার, তারপর পিছু নিয়েছে রবিন আর মুসার।
তাকে পিছে পিছে টেনে নিয়ে চলল দুই সহকারী গোয়েন্দা। এমন ভাব করল, যেন কেউ পিছু নিয়েছে এটা বুঝতেই পারেনি। অহেতুক কয়েকটা আঁকাবাঁকা মোড় ঘুরে সময় নষ্ট করে শেষে বাড়ির পথ ধরল ওরা।
রবিনকে বাড়িতে ঢুকতে দেখে অবাক হল শুঁটকি। তারপর মুসার পিছু নিল। খানিক পরে দেখল, মুসাও বাড়িতে ঢুকছে। ড্রাইভওয়েতে ঢুকে ফিরে তাকাল মুসা। হাহ হাহ করে হেসে শুঁটকির দিকে চেয়ে হাত নাড়ল রাগিয়ে দেয়ার জন্যে। গাড়ি ঘুরিয়ে ধুলোর ঝড় তুলে চলে গেল বঁটকি।
রাতে খাওয়ার পর কিশোরকে ফোন করল রবিন।
কি জানি কোথায় গেল, মেরিচাচী জবাব দিলেন। তাড়াহুড়ো করে খেয়েই বেরিয়ে গেল।...না, কোথায় গেছে বলে যায়নি।
অবাক হয়ে রবিন ভাবল, গেল কোথায় কিশোর?

পরদিন সকালে নাস্তার পরেও কিশোর ফোন করছে না দেখে রবিনকে ফোন করল মুসা।
আমাকেও তো করেনি, রবিন জানাল।
শেষে আর অপেক্ষা না করে স্যালভিজ ইয়ার্ডে চলল দুজনে। হেডকোয়ার্টারে কিশোরকে পাওয়া গেল না। তাই তাকে ঘরে খুঁজতে চলল।
বাড়ির সামনে পিকআপ ট্রাকটার ইঞ্জিন মেরামত করছেন রাশেদ পাশা। রবিনের প্রশ্নের জবাবে বললেন, কি জানি, কোথায় গেল। সেই ভোরে বেরিয়েছে। কি নাকি জরুরী কাজ। নাস্তাও করল না ভালমত।
চল, ইস্কুলেই দেখা হবে, রবিন বলল।
যদি আসে, হতাশ ভঙ্গিতে হাত নাড়ল মুসা।
স্কুলেও কিশোরের দেখা মিলল না। ক্লাসরুমে উদ্বিগ্ন হয়ে বসে বার বার একে অন্যের দিকে তাকাচ্ছে দুই গোয়েন্দা, এই সময় হন্তদন্ত হয়ে ঢুকল কিশোর। চওড়া হাসি উপহার দিল দুই বন্ধুকে। দুপুরে টিফিনের আগে আর কথা বলার সুযোগ হল না। স্কুলের সাইন্স ক্লাবের প্রেসিডেন্ট সে, সুতরাং টিফিনের সময়ও বেশ খানিকটা সময় কাটাতে হল ক্লাবে জরুরী মীটিঙে। আবার ক্লাস শুরু হওয়ার ঘন্টা বাজলে তাড়াহুড়ো করে রবিন আর মুসাকে বলল, পেয়েছি। চাবিকাঠি। ছুটির পর হেডকোয়ার্টারে চলে এস।
শুক্রবারে একটা বাড়তি ক্লাস করতে হয় রবিন আর মুসাকে, কিশোরের সে ঝামেলা নেই। ফলে সে চলে গেল, দুই সহকারীকে বসেই থাকতে হল ক্লাসে। ছুটির পরে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে কৌতূহলে ফেটে পড়তে পড়তে ইয়ার্ডে এসে ঢুকল দুজনে। কিভাবে যে দুই সুড়ঙ্গ দিয়ে ট্রেলারে ঢুকল, বলতে পারবে না। কিশোর বসে আছে তার জায়গায়।
রাইমিং ম্যাং ঘোষণ করল সে।
ডেস্কের উপর ছড়ানো কয়েক পাতা কাগজে গিজগিজ করে কি লেখা।
বাহ, ভারি সহজ করে বললে! নাক কুঁচকাল মুসা। একেবারে গ্রীক দিয়ে শুরু। তা স্ল্যাংটা কি?
কাল তোমাদের কথা থেকেই আইডিয়াটা পেয়েছি আমি, কিশোর বলল। সেটাই জানতে বেরিয়েছিলাম। দেখলাম, আমার ধারণাই ঠিক।
কিন্তু এই রাইমিং স্ল্যাং জিনিসটা কি? রবিনের প্রশ্ন।
এটা এক ধরনের অত্যাং। যে শব্দটা বলতে চাও, সেটা বলার দরকার নেই, অন্য আরেকটা শব্দ দিয়ে সেটা বোঝাতে পারবে। শব্দের মানে এক হওয়ারও দরকার নেই, ছন্দের মিল থাকলেই হল। কবিতার মত করেও বলতে পার। এই যেমন, স্নো বোঝনোর জন্যে তুমি বলতে পার, ফল অ্যাণ্ড থ্রো।

মারছেরে! গ্রীক না, একেবারে মঙ্গল গ্রহের ভাষা, আবার নাক কুঁচকাল মুসা। তারমানে বেসবল বোঝাতে হলে আমাকে বলতে হবে, থ্রো দ্য বল?
বলতেই হবে, এমন নয়, তবে ইচ্ছে করলে ওরকম করে বলে বোবঝাতে পার। তবে বেসবল বোঝতে হলে ম্যাঙে বল বলতে পারবে না, বলতে হবে অন্য কিছু। এই যেমন ডাউন দ্য ওয়াল, কিংবা শর্ট অ্যাণ্ড টল, অথবা আর কিছু।
বুঝেছি, রবিন বলল। কিন্তু এই স্ল্যাঙের সঙ্গে ককনি আর কারমলের সম্পর্কটা কোথায়? দাঁড়াও দাঁড়াও, ওর বাবা ছিল ককনি!
এবং অস্ট্রেলিয়ান। ককনিরা ওই স্ল্যাঙের আবিষ্কারক, সঙ্গে করে নিয়ে গেছে অস্ট্রেলিয়ায়। অন্য লোককে বোকা বানাতে নিজেদের মধ্যে এখনও ওই স্ল্যাঙের মাধ্যমে কথা বলে ককনিরা।
কারমলের ধাঁধার মত করে, বলল মুসা।
মাথা ঝাঁকাল কিশোর। রকি বীচের পাবলিক লাইব্রেরিতে গিয়েছিলাম আমি প্রথমে। তারপর লস অ্যাঞ্জেলেসের লাইব্রেরিতে। রাইমিং স্ল্যাঙের ওপর যত বই পেয়েছি সব ঘেঁটেছি। ধাঁধার নকলটা টেনে নিল সে। প্রথমেই ধর, অ্যাপলস অ্যাণ্ড পেয়ারস। তারমানে, বুঝিয়েছে, স্টেয়ারস।
স্টেয়ারস? সিঁড়ি! হাঁ হয়ে গেছে মুসা। জিন্দেগিতেও কল্পনা করতে পারতাম আমি।
স্ল্যাঙের নিয়মকানুন না জানলে কেউই পারবে না, কিশোর বলল। ইউ অ্যাণ্ড মি মানে কাপ অভ টি। ককনিতে ট্রাবল অ্যান্ড স্ট্রাইফ বলে ওয়াইফ; মানে স্ত্রী বোঝায়। তেমনি, বেড, অর্থাৎ বিছানাকে বলে আঙ্কেল নেড। কি বুঝলে?...
বিমল হাসিতে দাঁত বেরিয়ে পড়ল কিশোরের।
সমাধান তাহলে করে ফেললাম? মুসার মুখেও হাসি।
না না, বেশ খুশি হয়েই যেন মাথা ঝাঁকাল কিলোর। এত সহজ না। শয়তানী বুদ্ধিতে ঠাসা ছিল কারমলের মগজ। সমাধান এখনও অনেক দেরি। তবে রাইমিং স্ল্যাং থেকে কিছু সূত্র পেলাম এই যা। বাকিগুলো সমাধান করতে হবে যেখানে আমাদের যেতে বলা হয়েছে সেখানে গিয়ে।
কেন রাইমে সব জবাব নেই? রবিন জিজ্ঞেস করল।
না, অস্বস্তি ফুটল কিশোরের কণ্ঠে। বলা যায় না, নতুন কোন কায়দা করে রাখতে পারে কারমল?
বুঝব কি করে তাহলে?
রাইমের সূত্র আমাদেরকে যেখানে টেনে নিয়ে যায়, সেখানে গিয়ে হয়ত নতুন সূত্র পাওয়া যাবে। ধর, সিঁড়িতে যেতে বলা হয়েছে। যখন ওই সিঁড়ি পাব, হয়ত ওটার কাছে ধাঁধার পরের সূত্র দ্য লেডি ফ্রম ব্রিস্টলের মানে পেয়ে যাব।

চল তাহলে। হোয়্যার দ্য ওয়াইল্ড ডগস লিভস-এর মানে জানি আমরা, কারমলের বাড়ি। তারপর আসছে বটল অ্যাণ্ড স্টপার। মানে কি?
খাইছে! চেঁচিয়ে উঠল মুসা। সত্যিই তো। এর মানে তো জানি না।
মিটিমিটি হাসল কিশোর। এটার মানে সব বইতেই পেয়েছি। সহজ। দণ্ড পাওয়া সব অপরাধীই জানে...।
অপরাধী? চোখ বড় বড় হয়ে গেল রবিনের। বুঝেছি! স্টপার দিয়ে হবে কপার! কপ, অর্থাৎ পুলিশ!
ঠিক, বলল কিশোর। বুড়ো কারমলের বাড়ির কাছে গিয়ে একজন পুলিশ খুঁজব।। চল, চল, দেরি করছি কেন তাহলে? তর সইছে না আর মুসার।
সমস্ত নোট গুছিয়ে নিতে লাগল কিশোর। ওয়াকিটকি নিতে বলল সহকারীদের। বলা যায় না, দরকার হয়েও যেতে পারে।
সবে গিয়ে বেরোনোর জন্যে ট্র্যাপোর তুলেছে মুসা, এই সময় বাজল টেলিফোন। কিশোর ধরল। তিন গোয়েন্দা বলছি। সরি, এখন কথা বলার সময় নেই, বাইরে বেরোচ্ছি।
স্পীকারে ভেসে এল ভোতা একটা কণ্ঠ। না বেরোলেই ভাল করবে। সাবধান। অন্যের ব্যাপারে নাক না গলানোর পরামর্শ দিচ্ছি।
খুট করে কেটে গেল লাইন। তারপর নীরবতা। ঢোক গিলল রবিন। মহিলার গলা, কিশোর, তাই না? ঠিক বুঝলাম না। তবে মহিলাই হবে, কথায় ব্রিটিশ টান। জেনি এজটার?
তা কি করে হবে? মুসা বলল। ওই বেটির সঙ্গে কথাই হয়নি আমাদের। আমাদের ফোন নাম্বার পেল কিভাবে? কারমলরা নিশ্চয় বলেনি।
জেনি নাহলে আর কে?: চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। আমাদের অচেনা কেউ? অস্ট্রেলিয়া থেকে এসেছে?
এলসা কারমল হয়ত বলতে পারবে, আশা করল রবিন।
অস্বস্তিভরে মাথা ঝাঁকাল অন্য দুজন।
বাইরে বেরিয়ে সাইকেলে চাপল ওরা। গেট দিয়ে বেরোনোর সময় একটা লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল রাস্তার ওপাশের একটা বড় ঝোপের ধারে। বিশালদেহী। গলায় লাল টাই, হাসছে মনে হল। তারপর হঠাৎ উধাও হয়ে গেল। যেন ভোলবাজি, এই ছিল এই নেই। পরস্পরের দিকে তাকাল ছেলেরা।
স-সত্যিই ছিল? ভূতের ভয়ে চোখ বড় বড় হয়ে গেছে মুসার। আমাদের ওপর নজর রাখছিল? রবিনের প্রশ্ন।
হয়ত, বলল কিশোর। না-ও হতে পারে। সাধারণ কেউ, হয়ত বেড়াতে বেরিয়েছে।
তাহলে গেল কোথায়? মুসা বলল।

গেছে ওদিকেই কোথাও। রোদ বেশি, ছায়াও বেশি। ছায়ায় হারিয়ে গেছে। বোধহয়। রাস্তার সামনে পেছনে দুদিকেই তাকাল। কেউ নেই। এস। ধাঁধার সমাধান করে রতগুলো বের করতে হবে আমাদের।
তা তো নিশ্চয়, মাথা দুলিয়ে বলল মুসা। তবে ডজনখানেক বটল অ্যাণ্ড স্টপার আমাদেরকে ঘিরে রাখলে এমন নিরাপদ বোধ করতাম আরকি।
হেসে উঠল রবিন আর কিশোর। কিন্তু অস্বস্তি তাড়াতে পারল না।
আগের দিনের চেয়ে বিচিত্র দৃশ্য কারমলের বাড়িতে। পুলিশের লোক দাঁড়িয়ে আছে হাত গুটিয়ে, কিছুই করার নেই ওদের। জিনিসপত্র ছড়াচ্ছে, লাথি মেরে বোতল ভাঙছে রত্নশিকারিরা। রেগে গেছে। যেন বুঝতে পারছে ঠকানো হয়েছে ওদেরকে।
কটেজের লিভিংরুমে ঢুকল তিন গোয়েন্দা। ওদের জন্যে নরিকে ফলের রস আনতে বলল এলসা। ওদের দিকে চেয়ে হাসল রস উড।
বোকা বনে তো, উকিল বলল। সবাই বনেছে। যা রাগা রেগেছে না ওরা। – এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন আমরা ওদের পাওনা জিনিস কেড়ে নিয়েছি।
মুসা বলে ফেলল, কিশোর বোকা বনেনি।
বলেছিলাম না। চেঁচিয়ে উঠল নরি, ফিরে এসেছে। বলেছিলাম, বুঝে ফেলবে।
পাথরগুলো কোথায়, জেনেছ? উড জিজ্ঞেস করল।
না, জবাব দিল কিশোর। তবে ধাঁধার সমাধানের চাবিকাঠি বোধহয় পেয়েছি। খানিকটার সমাধান করেও ফেলেছি। মিসেস কামল, বিশেষ কোন পুলিশম্যানকে কি চিনতেন আপনার শ্বশুর?
পুলিশ, মাথা খারাপ। পুলিশকে দুচোখে দেখতে পারত না।
পুলিশ? উড বলল, কেন, বোতল, বিলাবং আর নাশপাতি গাছের সঙ্গে পুলিশ খাপ খাচ্ছে নাকি?
ফলের রস খেতে খেতে রাইমিং ম্যাঙের ব্যাপারটা জানাল কিশোর।
এরকম আশ্চর্য কথা কখনও শুনিনি, উকিল বলল। এলসা, তুমি শুনেছ?
। আমি অস্ট্রেলিয়ানও নই, ইংলিশও নই, এলসা বলল। তবে জেনি আর মাইক জানতে পারে, কারণ ওরা ইংরেজ।
সন্দেহ আছে, বলল কিশোর। ককনিদের সঙ্গে ওদের সম্পর্ক থাকার কথা নয়।
আগ্রহের সঙ্গে বলল নরি, মিস্টার সান আর দাদা মাঝে মাঝেই অদ্ভুত ভাষায় কথা বলত। কিশোর, সমাধান করে ফেলছি আমরা, তাই না?
তাই তো মনে হয়, বলে নকলটা বের করে মেলল কিশোর। দেখি আলোচনা করে। প্রথমে, হোয়্যার দ্য ওয়াইল্ড ডগস লিভস, দ্য বটল অ্যান্ড স্টপার; শোজ দ্য ওয়ে টু দ্য বিলাবং হোয়্যার দ্য ওয়াইল্ড ডগস লিভস রাইমিং স্ল্যাং নয়। এটা বোঝায়

কারমলের বাড়ি। বই বলছে, বটল অ্যান্ড স্টপার মানে কপার, অর্থাৎ পুলিশ। বিলাবঙের মানে পুকুর কিংবা ডোবা কিংবা ঝর্না। তারমানে বলা হয়েছে, এখানে এসে একজন পুলিশম্যানকে খুঁজে বের করতে যে একটা বিশেষ জলাশয় চেনে।
চেঁচিয়ে বলল উকিল, সেই পুলিশম্যানকে নিশ্চয় চেনার কথা তোমার!
কিন্তু চিনি না। তুমিও জানো পুলিশ দেখতে পারত না কারমল।
আছে নিশ্চয় একজন, কিশোর বলল। থাক, সেটা পরে দেখা যাবে। পরের ধাঁধাটা দেখা যাক এবার। অ্যাবাভ দ্য অ্যাপলস অ্যাণ্ড পেয়ারস অল অ্যালোন; দ্য লেডি ফ্রম ব্রিস্টল রাইডস ফ্রম আ ফ্রেণ্ড। অ্যাপল অ্যাণ্ড পেয়ারস হল গিয়ে সিঁড়ি। তবে লেডি ফ্রম ব্রিস্টলের মানে কি জানি না আমরা এখনও। আর রাইডস ফ্রম আ ফ্রেণ্ডও রাইম মনে হচ্ছে না। এটা অন্য কোন ধরনের কোড।
তারমানে দাঁড়াল, রবিন বলল, বিশেষ জলাশয়টার কাছে কোন সিঁড়ি পাব আমরা। এবং তার ওপরে ব্রিস্টলের মহিলা কোন একটা সূত্র দেবে একজন বন্ধুকে।
নাহ, গুঙিয়ে উঠল মুসা, এখন আর সহজ লাগছে না।
ধাপে ধাপে, ধীরে ধীরে এগোতে হবে, বলল কিশোর। ফ্রেণ্ড বলেছেন বটে, কিন্তু বন্ধুর কথা হয়ত বোঝননি। সে পরে দেখা যাবে। পরের ধাঁধাটা বলছেঃ অ্যাট দ্য টেনথ বল অভ টোয়াইন, ইউ অ্যাণ্ড মি; সী আওয়ার; ও হ্যান্ডসাম মাগ অ্যাহেড। ভুরু কোঁচকাল সে। কঠিন হচ্ছে আস্তে আস্তে। ইউ অ্যাণ্ড মি-এর মানে, আ কাপ অভ টি, বা এক পেয়ালা চা। কিন্তু বল অভ টোয়াইনের মানে বুঝতে পারছি না। আর, সী আওয়ার হ্যাণ্ডসাম মাগ অ্যাহেডও রাইম নয়। এই তিনটের তো কিছু কিছু মানে করতে পেরেছি, চার নাম্বারটা একেবারে দুর্বোধ্য। ওয়ান ম্যানস ভিকটিম ইজ অ্যানাদারস ডারলিন, ফলো দ্য নোজ টু দ্য প্লেস। এটাতে রাইম আছে কিনা সেটাই বুঝতে পারছি না।
ইউ অ্যাণ্ড মি যদি এক কাপ অভ টি হয়, এলসা বলল, হ্যাণ্ডসাম মাগ বলে হয়ত বিশেষ কোন চায়ের পাত্রের কথা বুঝিয়েছে।
হ্যাঁ, তা হতে পারে, একমত হল কিশোর।
কিন্তু, রবিন প্রশ্ন তুলল, কারমল বলছেন, আওয়ার মাগ! দ্য মাগ কিংবা হিজ মাগ বলেননি। আর চতুর্থ ধাঁধায় তোমার নাক বা আমার নাক না বলে কেন দ্য নোজ বা নাকটি বললেন?
এখনও বুঝিনি, স্বীকার করল কিশোর। তবে আমি শিওর, কারণ একটা নিশ্চয় আছে, যাই হোক, পঞ্চম ধাঁধা বলছে, হোয়্যার মেন বাই দেয়ারট্রাবল অ্যাণ্ড স্ট্রাইফ, গেট আউট ইফ ইউ ক্যান। ট্রাবল অ্যান্ড স্ট্রাইফের মানে ওয়াইফ।

কারমলের কথার মানে দাঁড়াচ্ছে, একজন স্ত্রী কিন। এর কোন অস্ট্রেলিয়ান মানে আছে, মিসেস কারমল? সেটেলাররা ইংল্যাণ্ড থেকে স্ত্রী কিনে নিয়ে যেত, না?
তা অনেকটা এরকমই, এলসা বলল। সেটেলারদের জন্যে জাহাজ বোঝাই করে মেয়েমানুষ পাঠানো হত। ওখান থেকে যার যার পছন্দমত স্ত্রী বাছাই করে মিত ওরা।
মাথা ঝাঁকাল কিশোর। হুঁ, খাপ খাবে মনে হচ্ছে। গেট আউট ইফ ইউ ক্যান বলে হয়ত বিয়ে ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে আসতে বলেছে। যদিও মাথামুণ্ড কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। এবার আসা যাক ছয় নম্বর ধাঁধায়। ইন দ্য পশ কুইনস ওল্ড নেড, বি ব্রাইট; অ্যাণ্ড নেচারাল অ্যাণ্ড দ্য প্রাইজ ইজ ইওরস। ওল্ড নেড মানে বিছানা। পশ হলোগে ফিটফাট। তারমানে পাথরগুলো পাওয়া যাবে ফিটফাট কোন রানীর বিছানায়।
আনমনে মাথা নেড়ে নিজেকেই যেন প্রশ্ন করল উকিল, কোন্ রানী? কিসের বিছানা? কোন্ মিউজিয়মে আছে?
থাকতে পারে। তবে শেষ ধাঁধা নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় হয়নি। আগেরগুলোর সমাধান করতে না পারলে এটা বোঝা যাবে না।
এখন তাহলে প্রথম কাজ, রবিন বলল, বটল অ্যান্ড স্টপার খুঁজে বের করা, যে জানে জলাশয়টা কোথায়।
হতে পারে, ওই জায়গাটা পছন্দ ছিল কারমলের, অনুমান করল মুসা। সাঁতার কাটতে যেতেন, কিংবা পানি আনতে, কিংবা মাছ ধরতে...
মাছ ধরতে! চেঁচিয়ে উঠল নরি। মা, আমাদের বাড়ির পাশের কাউন্টি পার্কে মাছ ধরতে যেত দাদা! ডেপুটি গ্যারেটকে নিয়ে যেত!
ডেপুটি শেরিফ! কথাটা ধরল রবিন। তারমানে পুলিশম্যান! কাউন্টি পুলিশম্যান!
তাই তো, উকিল বলল। পার্কের পুলিশ অফিসার। হঠাৎ ফিসফিসিয়ে মুসা বলল, কিশোর, রাস্তায়!
সবাই দেখল, গাছের নিচে পার্ক করা একটা নীল গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে বিশালদেহী একজন লোক।
আরেকজন গুপ্তধন শিকারি হবে হয়ত,আন্দাজ করল উকিল।
হয়ত, কিশোরের কণ্ঠে অস্বস্তি। ইয়ার্ড থেকে বেরিয়েও লোকটাকে দেখেছে, সেকথা জানাল।
দরজার দিকে রওনা দিল উড। জিজ্ঞেস করা দরকার।
ছেলেরা দেখল, উকিল, রাস্তায় নামতেই গাড়িতে উঠে বসল লোকটা। চলে গেল। ফিরে এল উড।
ওই মজা দেখতেই.এসেছে, বলল সে। অনেক আসছে ওরকম।

উঠে দরজার দিকে চলল তিন গোয়েন্দা। পেছনে এল নরি। আমিও তোমাদের সঙ্গে কাজ করছি, মনে আছে?
তোমার কাজের দরকার নেই, নরম্যান, পেছন থেকে কড়া গলায় বলল তার মা।
হ্যাঁ, তোমার মা ঠিকই বলেছেন, মুসা বলল। তুমি এখনও নেহায়েতই শিশু।
শিশু! চিৎকার করে বলল নরি। ফিরিয়ে নাও বলছি! ফিরিয়ে নাও কথাটা!
আসলে, বোঝানোর চেষ্টা করল কিশোর, তুমি আমাদের সঙ্গে এলে কাজের চেয়ে বাধাই সৃষ্টি করবে বেশি, নিশ্চয় বুঝতে পারছ।
রাগে গাল ফুলিয়ে ফেলল নরি। আমি, আমি তোমাদের সবাইকে দেখিয়ে দেব দাঁড়াও...! বলতে বলতে ছুটে বেরিয়ে গেল সে।
বাইরে বেরিয়ে সাইকেলে চাপল গোয়েন্দারা। পকেটে চাপড় দিয়ে নিশ্চিত হয়ে নিল কিশোর যে, ওয়াকিটকি আছে! বলল, চল।
রাস্তায় পড়ে, বাঁয়ে মোড় নিল ওরা, মুখ ঘোড়াল কাউন্টি পার্কের দিকে। জায়গাটা শহরের বাইরে। পথের ডানে গাছপালায় ছাওয়া প্রায় বুনো এলাকা। খানিক দূরে একটা বড় শপিং সেন্টার। বাঁয়ে গড়ে উঠেছে বোটানিক্যাল গার্ডেন, সুন্দর, দুর্লভ অনেক গাছও রয়েছে ওখানে। বাগানের পেছনে পাহাড়। কারমলের বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাগানের ভেতর দিয়ে একেবেঁকে চলে গেছে একটা পথ, উঠে গেছে পাহাড়ী আবাসিক এলাকায়।
পার্কে ঢুকে পড়ল তিন গোয়েন্দা। জোরে জোরে প্যাডাল ঘুরিয়ে উঠে চলল পাহাড়ী পথ বেয়ে। পেছনে একটা গাড়ি মোড় নেয়ার শব্দ হল, তারপর এগিয়ে। আসতে লাগল। পেছনে তাকিয়ে অস্ফুট শব্দ করে উঠল মুসা। গাড়িটা সোজা এগিয়ে আসছে, থামার বা পাশ কাটানোর কোন লক্ষণ নেই।
নাম, সরো রাস্তা থেকে! চেঁচিয়ে উঠেই নিজের সাইকেলের হ্যাণ্ডেল ঘুরিয়ে দিল মুসা। নেমে পড়ল পাশের খাদে। শাঁ করে ছুটে গেল একটা লাল স্পোর্টস কার, সময়মত সরতে না পেরে লেগে গেল রবিনের সাইকেলের সঙ্গে, ফেলে দিল ওটাকে। সাইকেল পড়ার আগেই লাফ দিয়ে খাদে পড়ল রবিন। গাড়িতে বসা হাসি হাসি মুখটার দিকে মুঠো চাল মুসা। চিৎকার করে বলল, শুঁটকি, রাখ, ধরতে পারলে মজা দেখার! বন্ধুদের দিকে ফিরে বলল, কাল সন্ধ্যায় ওকে বোকা বানানোর প্রতিশোধ নিল ব্যাটা।
ওটার শিক্ষা আর হবে না কোনদিন, আফসোসের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল কিশোর। রবিনকে টেনে তোলার জন্যে হাত বাড়াল। সব গড়বড় করে দিতে পারে। নজর রাখতে হবে ওর ওপর। বিপদেও ফেলে দিতে পারে।
আর অল্প কিছুদূর উঠেই ডেপুটির অফিস চোখে পড়ল ওদের। কেউ নেই। বোটানিক্যাল গার্ডেনে ঢুকে এদিক ওদিক তাকাল।

হাত তুলে দেখাল রবিন, ওই দেখ, কতগুলো গাছ। আর ওই যে পুকুর।
ঝড় বয়ে গেছে যেন পুকুর পাড়ের বাগানে। হাঁসের পুকুরের চারপাশে যত আপেল আর নাশপাতি গাছ আছে সবগুলোর সর্বনাশ করে ফেলা হয়েছে। ডালপালা একটারও নেই, সব ভাঙা। অসংখ্য হাঁস থাকার কথা পানিতে, অথচ আজ একটাও নেই।
শুধু গাছই নষ্ট করেনি, পুকুর পাড়ের মাটি খুঁড়ে ফেলা হয়েছে। ছোট-বড় অনেক গর্ত। ওখানে এসে দাঁড়াল তিন গোয়েন্দা।
কে জানি আসছে, বলতে বলতে একটা ডাল তুলে নিল মুসা। গুপ্তধন খুঁজতেই আসছে বোধহয়…
এই, চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক! ধমক দিয়ে বলল একটা কণ্ঠ।
পাই করে ঘুরল ওরা। হোটখাট একজন মানুষ জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। পরনে শেরিফের পোশাক। আবার বলল, অ্যারেস্ট করা হল তোমাদের।
শান্ত রইল কিশোর। আপনি কি ডেপুটি গ্যারেট?
হ্যাঁ, বলেই গর্জে উঠল শেরিফ, অনেক জ্বালাতন হয়েছে! মরা মানুষের ধাঁধা, যত্তসব! তোমাদেরকে অ্যারেস্ট করলাম।
কিন্তু, প্রতিবাদ জানাল রবিন, আমরা…
শান্তকণ্ঠে কিশোর বলল, ভাল করে খেয়াল করে দেখুন, ডেপুটি, পাতাগুলো কেমন শুকিয়ে আছে। আমরা আসার অনেক আগে ভাঙা হয়েছে এসব ডাল, সম্ভবত গতকাল। আমরা এইমাত্র এসেছি।
তোমরা, ডেপুটির কণ্ঠে সন্দেহ। কারমলের গুপ্তধনের জন্যে না এলে কিসের জন্যে এসেছ?
আমরা খুঁজতেই এসেছি…।
বলেছিলাম না! চেঁচিয়ে উঠল ডেপুটি। ঠিকই আন্দাজ করেছি আমি।
কিন্তু, দৃঢ়কণ্ঠে বলল কিশোর। এই পুকুর আর গাছপালার সঙ্গে গুপ্তধনের সম্পর্ক নেই। ভুল করে এগুলো নষ্ট করে দিয়ে গেছে লোকেরা। আমরা ওদের দলের কেউ নই। মিসেস কারমল আমাদের ভাড়া করেছেন তাঁদের জিনিস খুঁজে দিতে।
ভাড়া? সন্দেহ যায়নি শেরিফের।
আমরা গোয়েন্দা, জানাল মুসা।
চীফ ইয়ান ফ্লেচারের দেয়া সার্টিফিকেট বের করে দেখাল কিশোর। ইচ্ছে করলে ফোন করে তাঁর কাছ থেকে আমাদের কথা জেনে নিতে পারেন। মিসেস কারমলকেও ফোন করতে পারেন।

শাগ করল ডেপুটি। চীফের সই বলেই মনে হচ্ছে। তাহলে তোমরা তিন গোয়েন্দা? মাথা চুলাকাল সে। তোমাদের বিশ্বাস কারমল সত্যিই কিছু
লুকিয়েছে? ফালতু রসিকতা নয়?
না। আর আমরা আপনার সাহায্য চাই।
আমার সাহায্য? বলে কি! আমি কি সাহায্য করব?
বিলাবংটা কোথায় আমাদের বলবেন,মুসা বলল।
হাঁ হয়ে গেল ডেপুটি। বিলাবং! সেটা আবার কি জিনিস?
ডোবা, কিংবা ঝর্না, বলল কিশোর। কোন ধরনের জলাশয়। যেটাতে আপনি আর কারমল মাছ ধরতেন। পার্কে আছে ওরকম জায়গা?
আছে। পুরানো একটা দীঘি। আগে পর্বতের ওদিক থেকে পানি আনতে হত আমাদের। পরে ওয়াইনেজ ক্রিকে বাঁধ দিয়ে পানির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এখন আর পানির জন্যে ওখানেও যাওয়ার দরকার পড়ে না। মাঝে মাঝে মাছ ধরতে যায় লোকে, বিশেষ পাওয়া যায় না। বসন্তে ছাড়া অন্য সময় পানি খুব কম থাকে। পুরানো সব ফিডার ক্রিকগুলোকে সিমেন্টে বাঁধ দিয়ে মুখ আটকে দেয়া হয়েছে, বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্যে ওই মেইন ক্রিকটা বাদে। ওখানে একটা পুরানো হাউসবোট আছে, তাতে উঠেই ছিপ ফেলতাম আমরা।
কোনদিক যেতে হবে, বলবেন স্যার? অনুরোধ করল রবিন।
সহজ। ওই যে পথটা, ওটার পাশেই পড়বে। পার্কের মেইন বাস স্টপের কাছে গিয়ে নিচে তাকালেই দেখতে পাবে।
ডেপুটিকে ধন্যবাদ জানিয়ে সাইকেলের দিকে দৌড় দিল তিন গোয়েন্দা। দ্রুত পেডাল ঘুরিয়ে চলল। খানিক পরেই দেখতে পেল বাধটা, ওদের ওপরে, ডান দিকে। বিশ ফুট চওড়া পানির ধারা বয়ে চলেছে সগর্জনে। উঠেই চলল ছেলেরা, বাঁধের পাশাপাশি এসে থামল। এখান থেকে একটা কাঁচা রাস্তা চলে গেছে ওয়াইনেজ ক্রিকে। মূল সড়কটা দীঘির পাশ দিয়ে গিয়ে পাক খেয়ে উঠে গেছে পর্বতের ওপরে।
কাঁচা রাস্তা ধরে কিছুদূর এগোতেই নজরে এল হাউসবোট। ধাড়ির পাড়ে বঁধা। ওখানে বাঁধের জলধারা তিরিশ ফুট চওড়া। তীব্র গতিতে ছুটছে বোটের পাশ দিয়ে।
যাক, সাইকেল কাত করে রাখতে রাখতে বলল রবিন, বটল অ্যাণ্ড স্টপার অবশেষে বিলাবং দেখাল আমাদের।
এখন অ্যাবাভ দ্য অ্যাপলস অ্যাণ্ড পেয়ারস অল অ্যালন খোঁজা দরকার, বলল মুসা। সিঁড়ি। আমার মনে হয় ওটাই।

খাড়া একটা কাঠের সিঁড়ি, বরং মই বলা ভাল, বোটের মেইন ডেক থেকে উঠে গেছে কেবিনের চ্যাপ্টা ছাতে। ছুটল মুসা। একটা তক্তা ফেলে বোটে ওঠার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ওটা বেয়ে গিয়ে বোটে উঠল সে। তারপর সিঁড়িতে। রেলিঙে, ঘেরা ছাত। পুরানো কাঠের বাক্স, মাছের খাবারের টিন, আর আরও নানারকম জঞ্জাল পড়ে রয়েছে।

লেডি ফ্রম ব্রিস্টল খোঁজ, কিশোর বলল।

খুঁজতে শুরু করল ওরা। বাক্স উল্টে, মাছের টিন ঝাড়া দিয়ে, জঞ্জাল সরিয়ে, যত রকমে খোঁজা সম্ভব কিছুই বাদ দিল না। কিন্তু কিছু পাওয়া গেল না। এমনকি আলগা কয়েকটা তক্তা সরিয়ে তার তলায়ও উঁকি দিল কিশোর।

নাহে, নিরাশ হয়ে মাথা নাড়ল মুসা, ব্রিস্টলের সঙ্গে রাইম মেলাতে পারছি না।

কিন্তু এখানেই থাকার কথা, জোর দিয়ে বলল কিশোর। আমি শিওর, ঠিক পথেই এগোচ্ছি। গ্যারেট একজন পুলিশম্যান, কারমলকে চিনত। গ্যারেটই এই বিলাবঙের খোঁজ দিয়েছে আমাদের। ভুল হতে পারে না।

তীরে দাঁড়িয়ে কিছু দেখার কথা বলেনি তো কারমল? রবিন প্রশ্ন তুলল।

রেলিঙের ছাতে দাঁড়িয়েই চারপাশে তাকাল ওরা। খাঁড়ির দুতীরেই বন। দূরে উঠে গেছে পর্বতের ঢাল। শুকনো, সিমেন্টে তৈরি একটা নালা ঢাল বেয়ে নেমে এসেছে। ব্রিস্টলের সঙ্গে ছন্দে মেলে, এরকম কিছু চোখে পড়ল না।

আচ্ছা, হুইসল না তো? বলে বোটের সামনের হুইলহাউসের ছাতে বসানো হোট একটা এয়ার-হর্ন দেখাল কিশোর।

হুইসল অবশ্য বলা যায়, ধীরে ধীরে বলল মুসা। তরে আসলে ওটা হর্ন। তাছাড়া ব্রিস্টল আর হুইসলের মধ্যে ঠিক ছন্দে মিলছে না। কোনদিকে নির্দেশ করছে ওটা, কিশোর?

ওপরে, রবিন বলল। আকাশের দিকে।

ঠিকই বলেছ, মুসা, একমত হল কিশোর। আসলে আমরা যা খুঁজছি সেটা ব্রিস্টলের সঙ্গে পুরোপুরি মিলতে হবে। আর এমন কিছুকে নির্দেশ করবে, যা থেকে বেরিয়ে আসবে রাইডস ফ্রম আ ফ্রেন্ড-এর সমাধানের সুর। হয়ত ভুল করেছি আমরা, ভূল জায়গায়...

সবাই শুনতে পেল শব্দটা। নিচে কোনখান থেকে এসেছে, ভারি একটা তক্তা মাটিতে পড়েছে বোধহয়।

রেলিঙের ধারে ছুটে গেল ছেলেরা। তীরে দাঁড়িয়ে আছে শুঁটকি টেরি। ওদের দেখে দাঁত বের করে হাসল।

আবার দেখা হয়ে গেল, একেবারে ঠিক সময়ে, বলে খিকখিক করে উঠল সে। সব শুনেছি, সিঁড়িটা কোথায় তা-ও জানি। ধাঁধার সমাধান এবার করেই ফেলব।

হাসি। এই সুযোগে কিছুক্ষণ বেড়িয়ে আস তোমরা।
কিশোর! চিৎকার করে বলল রবিন। হাউসবোটটা খুলে দিয়েছে।
মাটিতে পড়ে আছে তক্তা, যেটা বেয়ে উঠেছে ওরা। যে দড়ি দিয়ে বোটটা বেঁধে রাখা হয়েছিল, ওটা খোলা, পানিতে পড়েছে। দুমদাম করে সিঁড়ি বেয়ে মেইন ডেকে এল ছেলেরা। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। ইতিমধ্যেই তীর থেকে দশ বারো ফুট সরে চলে এসেছে বোট, গা ভাসিয়ে দিয়েছে স্রোতে।
মুঠো পাকিয়ে দেখাল মুসা। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, শুঁটকি, ধরতে পারলে…
যাও, বেড়িয়ে এস খোকাবাবুরা, চেঁচিয়ে বলল টেরিয়ার। ঘন্টাদুয়েকের মধ্যে তীরে উঠে আসতে পারবে। খুব সন্তুষ্ট দেখাচ্ছে তাকে। ঘুরে দৌড় দিল কাঁচা রাস্তার দিকে।
দাঁড়াও, ধরে নিই আগে! শাসিয়ে বলল মুসা। ঘাড় মটকে না দিয়েছি তো আমার নাম মুসা আমান নয়…।
সব্বেনাশ! আঁতকে উঠল রবিন। বাঁধ!
মুসা আর কিশোরও ফিরে তাকাল। ভেসে যাচ্ছে বোট, গতি বাড়ছে দ্রুত। বাড়ছে পানির গর্জন। বাঁধের ওপর দিয়ে গিয়ে জলপ্রপাতের মত নিচে আছড়ে পড়ছে বিশাল এই জলরাশি।
ভেসে চলেছে হাউসবোট।
ঝাঁপ দিয়ে পড়, চিৎকার করে বলল কিশোর। সাঁতরে উঠব।
নাআ! সময়মত নেতৃত্ব নিয়ে নিয়েছে মুসা। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক। দুজনেই।
জমে গেল যেন কিশোর আর রবিন।
স্রোত খুব বেশি, মুসা বলল। টেনে নিয়েই যাবে, বুঝতে পারছি। জরুরী কণ্ঠে নির্দেশ দিল, জলদি গিয়ে ওপরে ওঠ।
মুসাকে অনুসরণ করে ওপরের ডেকে উঠে এল দুজনে। ভয়ঙ্কর স্রোত। প্রতি মুহূর্তে এগিয়ে আসছে বাঁধটা।
বাক্স-টাক্স যা,আছে, সব জলদি ফেল পেছন দিকে, আবার বলল মুসা।
ফেলতে ফেলতে হাঁপিয়ে গেল ছেলেরা। সবে ফেলা শেষ করেছে, এই সময় আওয়াজ হল বোটের তলায়, ঘষা লেগেছে কোন কিছুর সঙ্গে। থেমে গেছে বোট।
কিশোর বলল, আমরা…আমরা বাঁধের ওপর চলে এসেছি!
সামনে শুধুই শূন্যতা। অনেক নিচ থেকে কুয়াশা উঠছে, যেখানে পাথরের ওপর আছড়ে পড়ছে পানি। ঢোক গিলল রবিন, চেহারা ফ্যাকাসে। বাঁধের ওপর প্রায় ঝুলে থেকে দুলছে বোটটা, সেদিকে তাকিয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলল কিশোর।
জোরে কেঁপে উঠল একবার বোট, ঝটকা দিয়ে আগে বাড়ল, তারপর আবার থেমে গেল। দুই ধার দিয়ে বয়ে গিয়ে ঝরে পড়ছে পানি।

গুড। বাঁধের ওপর আটকা পড়েছি আমরা, শান্তকণ্ঠে বলল মুসা।
চোখ মেলল কিশোর। পা বাড়াতে গেল।
না না, নড়ো না! তাড়াতাড়ি বাধা দিল মুসা।
থেমে গেল আবার গোয়েন্দাপ্রধান।
পেছনটা আটকেছে, মুসা বলল। জিনিসপত্র ফেলে ভারি করে ফেলেছি। আমাদেরও ভার রয়েছে। নাহলে আটকাত না। নিঃশ্বাস ফেলতেও ভয় পাচ্ছে ছেলেরা। চারপাশে তাকাল। বাঁধের কিনারে আটকেছে বোট, তীর দুদিকেই দশ ফুট দূরে। ঠিক মাঝখানে রয়েছে ওরা।
কি করা এখন? রবিনের প্রশ্ন।
মাথা ঠাণ্ডা রেখেছে মুসা, ভেবে দেখল কি করা যায়। সাঁতার কেটে তীরে পৌঁছতে পারব না। লাফিয়েও পেরোতে পারব না এতদূর। মাথার ওপরে এমন কোন ডালও নেই যে ধরে বেয়ে বেয়ে চলে যাব। তাড়াহুড়ো করে কিছু করতে গেলে বোটটা যাবে পড়ে।
কি করা যায়, বল তো মুসা? গলা কাঁপছে কিশোরের।
নিচে দড়ি দেখতে পাচ্ছি, মুসা বলল। ওটার মাথায় ফাঁস বানিয়ে ব্যাসোর মত তীরে ছুঁড়ে মারা গেলে, কোন ভাঙা গাছের গুড়িতে আটকানো যাবে। তারপর ওই দড়ি ধরে ঝুলে ঝুলে পেরিয়ে যেতে পারব। রবিন, তোমার ওজন সব চেয়ে কম। যাও, দড়িটা নিয়ে এস।
মাথা ঝাঁকিয়ে দড়ির জন্যে রওনা হল রবিন। দুলে উঠল বোট, ঘ্যাঁস্‌স্‌ করে আওয়াজ হল নিচে, ঝটকা দিয়ে আগে বাড়ল খানিকটা।
ওদিক দিয়ে নয়! হুঁশিয়ার করল মুসা। পেছন দিয়ে যাও, রেলিঙের ওপর দিয়ে বেয়ে নামো। আমরা আরও পেছনে সরে ভার চাপাচ্ছি।
আরেকবার মাথা ঝাঁকিয়ে রেলিঙে উঠে পড়ল রবিন। রেলিঙ ধরে ঝুলে পড়ল। তারপর আলগোছে ছেড়ে দিল হাত। খুব আস্তেই পড়ল নিচের ডেকে। দড়ির বাণ্ডিল তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিল ওপরে।
দড়ি খুলে একমাথায় একটা ফাঁস বানিয়ে ফেলল মুসা। শরীর যথাসম্ভব কম নেড়ে, কম ঝাঁকিয়ে ফাঁসটা ছুঁড়ে মারল একটা গাছ সই করে। গাছের তিন ফুট দূরে পড়ল ফাঁসটা।
টেনে এনে আবার চেষ্টা করল সে। ভাঙা গাছের গোড়ায় পড়ল ফাঁসটা। ভীষণ দুলে উঠল বোট। টাল সামলাতে না পেরে পড়েই যাচ্ছিল কিশোর, কোনমতে রেলিঙ ধরে সামলাল। পানি যেদিক থেকে আসছে সেদিকে চোখ পড়তেই রক্ত সরে গেল মুখ থেকে। তোতলাতে শুরু করল, মু-মুসা, গাছ। এসে বাড়ি মারলে গেছি...।

ভেসে আসা বিশাল গুড়িটার দিকে শান্ত দৃষ্টিতে তাকাল মুসা, আস্তে মাথা ঝাঁকিয়ে খুলে ফেলতে লাগল বাণ্ডিলের বাকি দড়ি। তারপর সাবধানে নিশানা করে ছুঁড়ে মারল আবার ফাঁস। এইবার কাজ হল, ভাঙা গাছের কাণ্ড গলে আটকে গেল ফাঁস। দড়িটা টান টান করে এদিকের মাথা শক্ত করে বেঁধে ফেলল রেলিঙে। বলল, রবিন, তুমি আগে যাও।

সরে গিয়ে ওপরে হাত তুলে দড়িটা ধরল রবিন। ঝুলে ঝুলে এগোল। খুব তাড়াতাড়িই তীরের মাটিতে গিয়ে দাঁড়াল সে। তাড়াতাড়ি ফাঁসটা টেনে নামিয়ে দিল গাছের গোড়ার দিকে। যাতে আরও শক্ত হয়ে আটকে থাকে।

কিশোর, এবার তুমি যাও,মুসা বলল।

দ্বিধা করল কিশোর। দেখল, ছুটে আসছে গাছের গুঁড়িটা। একবার ঢোক গিলে, দড়ি ধরে ঝুলে পড়ল। ভাবছে, সময়মত পেরোতে পারবে তো? পারল। কিছুক্ষণ পরেই রবিনের পাশে এসে দাঁড়াল সে।

দুজনের ভার সরে যাওয়ায় অনেক হালকা হয়ে গেল বোটের পেছনটা। আটকা পড়া কুটোর মত দুলতে শুরু করল, এপাশ ওপাশ নড়ছে গলুই। গাছের গুঁড়িটাও প্রায় এসে গেছে। দেরি করল না আর মুসা। দড়ি ধরে ঝুলে পড়ে সড়সড় করে নেমে চলে এল অনেকখানি। তার পা-ও মাটি ছুঁল, গুড়িটাও এসে ধাক্কা মারল বোটটাকে।

ছেলেদের ভার সরে যাওয়ায় এমনিতেই সরি সরি করছিল বোট, ধাক্কা খেয়ে আর আটকে থাকতে পারল না। সড়াৎ করে পেরিয়ে গেল বাধের বাকি অংশ, হ্যাঁচকা টানে ছিঁড়ে গেল দড়ি।

পাথরে বাড়ি খেয়ে বোট ভাঙার মড়মড় শব্দ কানে এল ছেলেদের, কাঁটা দিল গায়ে।

হউফ, করে মুখ দিয়ে বাতাস ছাড়ল রবিন।

এতক্ষণে রাগ দেখা দিল মুসার মুখে। শুঁটকি! মুঠো শক্ত হয়ে গেল তার। দাঁড়া, আগে ধরে নিই...।

শুঁটকি, ঘোর ভাঙল যেন কিশোরের, আমাদের আগে চলে গেছে। সে বলেছে, সিঁড়িটা কোথায় জানে। এস।

উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে আবার গোয়েন্দাপ্রধানের চোখের তারা। বিপদ কেটে গেছে, তার মগজও চালু হয়ে গেছে পুরোদমে।

আশেপাশেই কোথাও আছে সিঁড়িটা, বলল সে। আলাদা আলাদা হয়ে খুঁজব আমরা। ওয়াকিটকিতে যোগাযোগ রাখব। কারও চোখে কোন সিঁড়ি পড়লেই অন্যকে জানাব।

ওয়াইনেক ক্রিকের ধার ধরে খুঁজতে শুরু করল ওরা। অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে খুঁজল, কিছুই চোখে পড়ল না।
ভুল হয়েছে কোথাও, ওয়াকিটকিতে বলল কিশোর। কি জানি! জবাব দিল মুসা।
কিশোর, রবিন বলল, প্রথম ধাঁধাটার সঠিক সমাধান হয়েছে তো? তুমি কি শিওর, বিলাবং মানে জলাশয়?
নিশ্চয়..., থেমে গেল কিশোর। দ্বিধায় পড়েছে। ডিকশনারিতে অবশ্য দেখিনি। অন্য কোন মানে থাকতেও পারে। কাছাকাছি টেলিফোন কোথায় বল তো?
ডেপুটির অফিসে, জবাব দিল মুসা। যাব নাকি? সাইকেলের কাছাকাছি রয়েছি আমি।
যাও। লাইব্রেরিয়ানকে ফোন করে জিজ্ঞেস কর, কি কি মানে হয়। কুইক।
মুসা গেছে অনেকক্ষণ হয়েছে। পশ্চিম দিগন্তে নেমে যাচ্ছে সূর্য। অন্ধকার হয়ে যাবে শিগগিরই, উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে কিশোর। ভাবছে, মুসাকে খুঁজতে যাবে কিনা এই সময় হঠাৎ ওয়াকিটকিতে শোনা গেল তার কণ্ঠ।
কিশোর? রবিন? আছ ওখানে?
আছি, সেকেণ্ড, জবাব দিল কিশোর। কি জানলে?
অনেক মানেই হয় বিলাবঙের। মূল জলধারা থেকে বেরোনো উপ-জলধারা, যেটা আর কোন জলধারার সঙ্গে মিশতে পারে না, কোথাও গিয়ে বুজে কিংবা মরে যায়, তাকে বলে বিলাবং।
নেই ওরকম, রবিন বলল। এখানে দেখিনি।
তাহলে আরেক রকমের কথা বলি। শুধু বর্ষাকালে পানি বহন করে এরকম জলধারাকেও বিলাবং বলে।
হ্যাঁ, হয়েছে, এইটাই! বলে উঠল কিশোর। সিমেন্টে তৈরি ওই নালাটা, পর্বতের ঢাল বেয়ে যেটা নেমে এসেছে বাঁধে। বৃষ্টি হলেই শুধু পানি বহন করে ওটা, এমনিতে থাকে শুকনো। মুসা, ওখানে মিলিত হব আমরা।
কয়েক মিনিট পর নালাটার মুখের কাছে এসে দাঁড়াল রবিন আর কিশোর। ওয়াইনেজ ক্রিক এখানে সব চেয়ে চওড়া। সিমেন্টে তৈরি নালাটা আঁকা হয়ে উঠে গেছে ঢাল বেয়ে, অদৃশ্য হয়ে গেছে ঝোপঝাড়ের আড়ালে। নালার দুপাড় ধরে ধীরে ধীরে ওপরে উঠতে শুরু করল দুজনে।
কিছুই নেই, মাথা নাড়ল রবিন। সিঁড়ির চিহ্নও দেখছি না।
থাকতেই হবে। আমি এখন শিওর, বুড়ো কারমলের বিলাং এটাই। এস।
কমে আসছে দিনের আলো। আবার আগের জায়গায় নেমে আসতে শুরু করল দুজনে। খানিকটা নেমেছে, হঠাৎ ওয়াইনেজ ক্রিকের অন্য পাড় থেকে শোনা গেল মুসার চিৎকার। এই, পেয়েছি, কোথায় তোমরা?

প্রায় ছুটে নেমে এল দুজনে। হাত তুলে ঝর্নার ভাটির দিকে দেখাল মুসা, ওদের বাঁয়ে।
কই? রবিন জিজ্ঞেস করল। আমি তো কিছু দেখছি না।
এখান থেকে দেখা যাবে না, কিশোর বলল। চল ওখানে যাই। ঝোপঝাড়ের ভেতর ঢুকে পড়ল সে। ছুটতে শুরু করল। তার পিছে রবিন। কয়েক মিনিট পরেই সিঁড়িটা দেখল ওরাও। অনেক পুরানো, কাঠের তৈরি। গাছপালার ফাঁকফোকর দিয়ে আসা পড়ন্ত রোদে সোনালি দেখাচ্ছে। আশেপাশে ঝোপ গজিয়ে উঠেছে। পর্বতের গা থেকে অর্ধেক নেমে এসেছে সিঁড়ি, নিচের অংশ নেই।
পানির তোড়ে ভেঙে চলে গেছে, কিশোর আন্দাজ করল, কিংবা পুরানো হতে হতে আপনাআপনিই ভেঙে পড়েছে। সিঁড়ির অবস্থা খুব খারাপ।
আরেক দিক দিয়ে ঘুরে এসে ওদের পাশে দাঁড়াল মুসা। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, মহা ধড়িবাজ ছিল কারমলটা। ক্রিক থেকে হাজার চেষ্টা করেও দেখা যাবে না। আমি পলকের জন্যে দেখেছি রাস্তার ওপর থেকে।
আশা করি, হেসে বলল কিশোর, তোমার মত ঈগল চোখ নেই শুঁটকির। এস।
পুরানো নড়বড়ে সিঁড়ি বেয়ে পর্বতের ওপরের একটা ভোলা চত্বরে উঠে এল ছেলেরা। বড় বড় ঘাস জন্মে রয়েছে, তৃণভূমিই বলা চলে জায়গাটাকে। অনেক দূর দিয়ে ওটার পাশ কাটিয়েছে পার্কের মেইন রোড। পঞ্চাশ গজমত দূরে একটা বাস স্টপেজ। চত্বরের মাঝে দাঁড়িয়ে রয়েছে ব্রোঞ্জের একটা ছোট মূর্তি।
কিশোর! রবিন বলল, মূর্তিটা!
কাউবয়ের মূর্তি, দাঁড়িয়ে আছে গ্র্যানাইটের বেদির ওপর। গুলি ছোঁড়ার ভঙ্গিতে পিস্তল তুলে রেখেছে কাউবয়।
পিসটল, প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মুসা। দ্য লেডি ফ্রম ব্রিস্টল, অ্যাণ্ড অল আলোন, অর্থাৎ একা!
পিস্তলটা কোনদিক নির্দেশ করছে? নিজেকেই প্রশ্ন করল যেন কিশোর।
বেদিতে চড়ে কাউবয়ের হাতে গাল লাগিয়ে পিস্তল কোনদিকে নিশানা করছে দেখল মুসা। তারপর চোখ মিটমিট করতে করতে মাথা নাড়ল। না, তেমন কিছুই তো দেখলাম না।
রবিনও উঠে দেখল। বলল, শুধু গাছপালা।
বেদির দিকে তাকাল কিশোর। একবার চিমটি কাটল নিচের ঠোঁটে। মাথা দোলাল, হমম্। ঘোরানো যায় মূর্তিটা। ভূমিকম্প হলে ঝাঁকুনি লেগে ঘুরে যায়।
মানে? ভ্রূকুটি করল মুসা। ইদানীং তো ভূমিকম্প হয়নি।
মাথা নাড়ল কিশোর, না, ভুমিকম্পে নয়। পায়ের গোড়ায় তাজা চিহ্ন, পাথরের গুড়োও পড়ে আছে। ঘোরানো হয়েছে।

শুঁটকি! গুঙিয়ে উঠল মুসা।
তাছাড়া আর কে? গম্ভীর হয়ে বলল কিশোর। এটাকে ঘুরিয়ে রেখে গেছে, যাতে আমরা বুঝতে না পারি কোনদিক নির্দেশ করছে।
তাহলে পরের ধাঁধার সমাধান কি করে করব? রবিন বলল।
শুঁটকির ঘাড় চেপে ধরে।
যাওয়ার জন্যে ঘুরল ওরা। গাছের তলায় গোধূলির ছায়া। সেখান থেকে বেরিয়ে পার্কের রাস্তার দিকে ছুটে গেল একটা ছায়ামূর্তি।
আমাদের ওপর চোখ রাখছিল! রবিন বলল।
ধর ব্যাটাকে, বলেই দৌড় দিল কিশোর।
গাছপালার ভেতর দিয়ে ছুটল ওরা। সামনে রাস্তায় গাড়ির ইঞ্জিন স্টার্ট নেয়ার শব্দ হল। ওরা রাস্তায় পৌঁছতে পৌঁছতে অনেক দূরে চলে গেল গাড়িটা।
গাড়িটা চিনেছ? কিশোরের প্রশ্ন।
না, মুসা বলল, তবে শুঁটকির নয় এটা ঠিক।
আবার তৃণভূমিতে ফিরে এল ওরা। সিঁড়ি বেয়ে ঢালে নেমে এল ওয়াইনেজ ক্রিকের কাছে। ঘনায়মান সাঝের ম্লান আলোয় সাইকেল চালাতে চালাতে রবিন বলল, কিশোর, নিশ্চয় সেই দৈত্যটা।
কিন্তু ছায়ামূর্তিটা তো ছোট দেখলাম। না রবিন, অন্য কেউ।
পথের পাশে গাছপালার আড়ালে ঘন ছায়া। সেদিকে তাকিয়ে অস্বস্তি লাগল মুসার। মনে পড়ল, টেলিফোনে হুঁশিয়ারির কথা।
শুঁটকিকে কোথায় খুঁজব? রবিন জানতে চাইল। আর ধরে জিজ্ঞেস করলেই কি বলবে নাকি আমাদেরকে?
না, বলবে না, একমত হল কিশোর। তবে উল্টোপাল্টা কথা শুরু করবে। আর বেশি কথা বলতে গিয়েই কিছু ভুল করে ফেলবে, সব সময় যা করে। চলো আগে ওর বাড়িতে দেখি। দেরি এমনিতেই হয়ে গেছে আমাদের, আর কয়েক মিনিটে কিছু হবে না।
বাড়িতে নেই শুঁটকি। তার মা বললেন, বাবার সঙ্গে নাকি কোথায় বেরিয়েছে।
এবার? রবিন বলল।
নজর রাখব ওর ওপর, বলল কিশোর। আমার মনে হয় না আজ রাতে আর গুপ্তধন খুঁজতে বেরোবে ও। রাইমিং স্ল্যাঙের কথা বলতে শুনেছে আমাদেরকে। বলা যায় না, বঁটকির পক্ষেও এখন ধাঁধার সমাধান করে ফেলা হয়ত সম্ভব।
কিশোর, মুসা প্রশ্ন তুলল। শুঁটকিকে সারাক্ষণ চোখে চোখে রাখতে পারব না আমরা। ওর গাড়ি আছে। আমাদের নেই।
দরকারও নেই। ভূত-থেকে-ভূতের সাহায্য নেব আমরা।

কয়েক ঘন্টা পর রিসিভার রেখে আপনমনেই বলল মুসা, যাক, ভূতকে টেলিফোন করা শেষ। পেছনে যে বাবা এসে দাঁড়িয়েছেন, খেয়াল করেনি।
কি বললে? জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার আমান। ভূতকে ফোন করেছ? তোমার শরীর ভাল তো?
অ্যাঁ... না না, ভূত নয়, ভূত-থেকে-ভূতে। কিশোরের আবিষ্কার। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের খবর পৌঁছে যাবে রকি বীচের সমস্ত ছেলেমেয়ের কাছে।
দীর্ঘ এক মুহূর্ত ছেলের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন আমান। মাঝে মাঝেই দুর্বোধ্য কথাবার্তা বলে তিন গোয়েন্দা, জানা আছে তার। এ-নিয়ে আর চাপাচাপি করলেন না। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, কি জানি, হবে হয়ত।
হাসল মুসা। শুঁটকির ব্যবস্থা করা গেছে। তিন গোয়েন্দার সঙ্গে লাগতে আসার মজা হাড়ে হাড়ে টের পাবে এবার। শহরের কয়েকশো জোড়া চোখ এখন সর্বক্ষণ থাকবে তার ওপর। কোথায় যায়, কি করে, সব জেনে যাবে ওরা, ফোনে জানাবে তিন গোয়েন্দার হেডকোয়ার্টারে।
পরদিন খুব ভোরে উঠল মুসা। কিশোরকে ফোন করল নাস্তার আগেই। ভূতের খবর আছে?
দুটো, জবাব দিল কিশোর। একটা ভুল গাড়ির খবর দিয়েছে। আরেকটা ঠিকই দিয়েছে, বলেছে শুঁটকির লাল গাড়িটা ওদের বাড়ির ড্রাইভওয়েতেই রয়েছে।
তারমানে বাড়িতেই আছে। ঠিক আছে, নাস্তা সেরেই চলে আসছি।
খুব তাড়াহুড়া, তাই বেশি খেতে পারল না মুসা, গোটা তিনেক ডিম আর ছটা মোটা মোটা পাউরুটির টুকরো দিয়ে শেষ করতে হল। ইতিমধ্যে টেবিলে হাজির হয়ে গেল দুধ, ঢক ঢক করে গিলে নিল বড় এক গেলাস।
হেডকোয়ার্টারে ঢুকে মুসা দেখল, কিশোর একা বসে আছে।
রবিন আটকে গেছে, মায়ের কিছু কাজ করে দিতে হবে, কিশোর জানাল। ধাঁধাগুলো নিয়ে আরও মাথা ঘামিয়েছি। কারমলের শব্দ ব্যবহার অবাক করেছে আমাকে। কখনও কখনও বেশ অদ্ভুত। এই যেমন বলছে, দ্য লেডি ফ্রম ব্রিস্টল রাইডস ফ্রম আ ফ্রেণ্ড।
তাতে কি?
বন্ধুর কাছ থেকে এসেছে বলাটা কেমন যেন অদ্ভুত। কারণ পিস্তল নির্দেশ করেছে কোন কিছু, তারমানে পিস্তলের তরফ থেকে কিংবা দিক থেকে হচ্ছে বলা যায়। তাহলে তো বলার কথা রাইডস টু আ ফ্রেণ্ড।
কি জানি, মাথা চুলকাল মুসা।
তারপরে, তিন নাম্বার ধাঁধায় বুড়ো লিখেছে আওয়ার হ্যাণ্ডসাম মাগ, চার নাম্বারে ফলো দ্য নোজ, আর পাঁচ নাম্বারে বাই আ ওয়াইফ।

তারমানে তুমি বলতে চাইছ, বলা উচিত ছিল ফলো ইওর নোজ, সি মাই মাগ কিংবা দ্য মাগ? এবং হু ইজ আ ওয়াইফ?
জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাল কিশোর। হা হা, বুঝেছ। ওরকম করেই কি : বলা উচিত ছিল না? ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বলে আরও জটিল করে দিয়েছে ধাঁধাগুলো।
জটিল করার জন্যেই তো করেছে কুটিল বুড়োটা, মুখ বাকাল মুসা।
উজ্জ্বল হল কিশোরের চোখ। তারমানে গুপ্তধন সত্যি সত্যি আছে। সেকারণেই জটিল করেছে, যাতে সহজে পাওয়া না যায়।
এবং সে সফল,মুসা বলল। আমাদের এখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শুঁটকিকে। খুঁজে বের করতে হবে…
কিশোর! মুসা! মৃদু ডাক শোনা গেল।
রবিন মনে হচ্ছে?
সর্ব-দর্শনে গিয়ে চোখ রাখল কিশোর। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পেরিস্কোপের চোখে রবিনকে দেখতে পেল। ওয়ার্কশপের দিকেই আসছে। সঙ্গে আরেকজন। বাইরে চলো। দুই সুড়ঙ্গ দিয়ে বেরোনো ঠিক হবে না। চার নাম্বার দিয়ে যাব।
চার নাম্বার দরজাটা ট্রেলারের পেছনে। একটা স্লাইডিং ডোর। খুললেই চোখে পড়বে জঞ্জালের গাদা, মাঝখান দিয়ে চলে গেছে সরু করিডর। সেটা দিয়ে বাইরে বেরোল দুজনে, ঘুরে চলে এল ওয়ার্কশপে। রবিনের সঙ্গে রয়েছে জেনি এজটার।
কি ব্যাপার…? বলতে গিয়ে বাধা পেয়ে থেমে গেল মুসা।
যাক, বলে উঠল একটা কণ্ঠ, কথায় কড়া ব্রিটিশ টান, সবাই আমরা এখানে।
পাঁই করে ঘুরল কিশোর আর মুসা। ওয়ার্কশপের দরজায় দেখা দিল মাইক এজটার। বুড়ো কারমলের হোঁকা ভাগ্নের হাতে একটা কালো ওয়াকিং স্টিক।
এখানে কি আপনার? গরম হয়ে জিজ্ঞেস করল মুসা।
হিইছিছিছি, লাল হয়ে গেল মাইকের গোল আলুর মত মুখ। আমেরিকান ছেলেগুলো একেবারেই বেয়াদপ, আদব কায়দা কিচ্ছু শেখে না। কথা বলতে এসেছি, বুঝেছ? আর কিছু না। তাই না, জেনি?
আপাতত, মুখ গোমড়া করে বলল রোগাটে মহিলা।
কিভাবে কথা বলছ? বোনকে তিরস্কার করল মাইক। হুঁশিয়ার হয়ে যাবে তো ওরা। দ্রভাবে ওদেরকে বোঝানো দরকার…
হুঁশিয়ার আমরা ইতিমধ্যেই হয়ে গেছি, কিশোর বলল, কাল থেকেই। ফোনে হুঁশিয়ার করার পর থেকে।
ফোনে হুঁশিয়ার! ভুরু কোঁচকাল জেনি। কি বলছ? শাসিয়েছে নাকি কেউ? বুঝেছি। উকিল ব্যাটাকে গিয়ে ধমক লাগাও।
আমরা আপনাদেরও বন্ধু নই, বলেই ফেলল মুসা।

নও, জেনি বলল। কিন্তু হতে অসুবিধে কি? আমাদের ওপর ভুল ধারণা হয়েছে তোমাদের। এর জন্যে দায়ী এলসা আর উড।
আমাদের মা, মানে বুড়ো কারমলের বোন অনেকদিন শেয়ারে ব্যবসা করেছে, মাইক বলল। রাগ ফুটল চেহারায়। কিন্তু বুড়ো তাকে ঠকিয়েছে। আমাদের ভাগ এখন আমরা ফেরত চাই। …
ভুল লোকের সঙ্গে কাজ করছ তোমরা, ভাইয়ের কথার পিঠে বলল জেনি। আমাদের সঙ্গে চলে এস। ভাল টাকা দেব।
দেখুন, রেগে গিয়ে কিছু বলতে চাইল রবিন। বাধা দিয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠল কিশোর, কত ভাল দেবেন?
অনেক, তাড়াতাড়ি বলল জেনি। যা পাওয়া যাবে তার দশ পার্সেন্ট। অনেক, অনেক টাকা হবে তাতে, বুঝেছ।
হুম। বিড়বিড় করল কিশোর, সত্যিই অনেক।
অবাক হয়ে গোয়েন্দাপ্রধানের দিকে তাকিয়ে আছে দুই সহকারী।
কাউকে বলবে না। খুঁজে পেলে আমাদেরকে দিয়ে দেবে, জেনি বলল, ধরেই নিয়েছে ছেলেরা রাজি।
কাউকে বলব না মানে? তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল হঠাৎ কিশোরের কণ্ঠ। চুরি। করবেন নাকি?
না না, ইয়ে মানে…
আর মানে মানে করতে হবে না। কোর্টে গিয়ে তো আদায় করতে পারবেন, চুরি করতে চান।
কালো হয়ে গেল মাইকের মুখ। বিড়বিড় করে কি বলল জেনি, বোঝা গেল। শাসানির ভঙ্গিতে হাতের লাঠিটা নাড়ল তার ভাই।
বেশ, তাহলে যা যা জেনেছ, শুধু তাই বল, জেনি বলল। আমরা বুঝতে পারছি, সঠিক পথে এগোচ্ছ তোমরা। রাইমিং স্ল্যাঙের ব্যাপারে জানি। ক্রিকে গিয়েছিলে কাল, জানি। রোগাটে ঢেঙ্গা ছেলেটাকেও কাল দেখেছি ওখানে। যা যা
জানো বলে ফেল।
অ, আপনিই তাহলে কাল গুপ্তচরগিরি করছিলেন আমাদের ওপর, রবিন ধরল। মূর্তিটার কাছে।
মূর্তি? মাইক জিজ্ঞেস করল, কিসের মূর্তি?
কিশোর বলল, বোটানিক্যাল গার্ডেনে একটা মূর্তির কাছে ঢেঙ্গা ছেলেটাকে দেখেছিলেন তো? কি করেছে দেখেননি?
মূর্তি-টুর্তি দেখিনি আমরা জেনি বলল। তবে তোমাদেরকে ক্রিকের কাছে দেখেছি। রোগাটে ছেলেটার পিছু নিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমাদেরকে ফাঁকি

দিয়ে উধাও হয়ে গেল। তোমরা…
রাইমিং স্ল্যাঙের কথা কি করে জানলেন? আর কিভাবেই বা জানলেন আমরা মিসেস কারমলের হয়ে কাজ করছি?
হেসে উঠল মাইক। নরি ছেলেটা আস্ত বোকা। আমাদের ওপর এত রেগে গিয়েছিল, আমরা যে ভুল করছি প্রমাণ করতে গিয়ে ফাঁস করে দিয়েছে সব।
বুড়োটা যে মহা শয়তান ছিল, এই স্ল্যাংই তার প্রমাণ, জেনি বলল। আমরা…
এই জেনি, চুপ কর, হঠাৎ গর্জে উঠল মাইক। অনেক হয়েছে। আমি প্রশ্ন করছি। এই ছেলেরা, যা যা জানো ঝটপট বলে ফেল।
না, মিস্টার, কিশোর মাথা নাড়ল, কিছুই বলছি না আমরা আপনাদের।
তাহলে যাতে আর কাউকেই না বলতে পার সেই ব্যবস্থা করছি, হাতের লাঠিটা তুলে এগিয়ে এল মাইক। তার কুতকুতে চোখের তারা জ্বলছে। কিছু। সময়ের জন্যে আটকে রাখব তোমাদেরকে। আমরা মাল নিয়ে চলে যাওয়ার আগে ছুটতে পারবে না।
মাইক আর জেনি আরেক কদম এগোল। পিছিয়ে গেল ছেলেরা।
এই, কি হচ্ছে কি এখানে? পেছনে ধমক শোনা গেল।
ঘুরে তাকাল মাইক, হাতের লাঠি নেড়ে বলল, সরুন, সরে যান বলছি!
টকটকে লাল হয়ে গেল মেরিচাচীর মুখ। একটানে মাইকের লাঠি কেড়ে নিয়ে ধা করে বসিয়ে দিলেন তার মাথায়। গেছিরে! বলে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে পিছিয়ে গেল মাইক। লাফ দিয়ে এসে ভাইয়ের জায়গা দখল করল জেনি। লাঠিটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন মেরিচাচী। কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়ালেন। মারবে নাকি? এস দেখি কে কাকে মারে! মেরিচাচীর উগ্রমূর্তি দেখে আর এগোতে সাহস করল না জেনি। যাও, বেরোও! ভাল চাও তো এক্ষুনি বেরোও!
হৈ-চৈ শুনে সেখানে এসে দাঁড়ালেন রাশেদ পাশা। তার কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি দিল বোরিসের কৌতূহলী মুখ।
আর কক্ষনও যেন এখানে না দেখি! আবার ধমক লাগালেন মেরিচাচী। বিশালদেহী বোরিসের দিকে তাকিয়ে চুপসে গেছে মাইক। বোনের দিকে চেয়ে মাথা ঝাঁকাল। মার খাওয়া কুকুরের মত লেজ গুটিয়ে যেন মেরিচাচীর পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল। ছেলেদের হো হো হাসি পিত্তি জ্বালিয়ে দিল তাদের। কিন্তু সাহস করে আর কিছু বলতেও পারল না।
কড়া চোখে ছেলেদের দিকে তাকালেন মেরিচাচী। কি ব্যাপার? কি হয়েছে? বেতমিজগুলো এরকম ব্যবহার করল কেন?
খুলে বলল সব কিশোর। এটাররা কে, তা-ও জানাল।

নাক সিঁটকালেন মেরিচাচী। সব পাগল! বদ্ধ উন্মাদ একেকটা! কে কবে শুনেছে এমন পাগলামির কথা? মরার আগে গুপ্তধন লুকিয়ে উইল করা...ওই ধাড়ি শকুনটা ছিল আরেক পাগল। যাকগে, তোদের ভয় পাবার আর কিছু নেই। জেনি আর মাইক তোদেরকে আর বিরক্ত করতে সাহস করবে না।
মুচকি হেসে, বোরিসকে নিয়ে চলে গেলেন রাশেদ পাশা। মেরিচাচীও চলে গেলেন অফিসের দিকে। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হা-হা হাসিতে ফেটে পড়ল ছেলেরা।
আচমকা জ্বলতে নিভতে শুরু করল ওয়ার্কশপের দেয়ালে লাগানো লাল আলো। সঙ্কেত। তারমানে হেডকোয়ার্টারে টেলিফোন বাজছে। হুড়াহুড়ি করে দুই সুড়ঙ্গ দিয়ে ট্রেলারে ঢুকল ওরা। ছো দিয়ে রিসিভার তুলে নিল কিশোর। চুপচাপ ওপাশের কথা শুনে বলল, অনেক ধন্যবাদ। কেটে দিল লাইন। বন্ধুদের দিকে ফিরে বলল, শুঁটকিকে দেখা গেছে, বাস ডিপোর কাছে। আবার হুড়াহুড়ি করে বেরোনোর পালা। সাইকেল নিয়ে ছুটতে হবে ডিপোতে।
কিশোর বলল, আমাদেরকে অনুসরণ করা হচ্ছে।
বাস ডিপো থেকে মুকখানেক দূরে রয়েছে ওরা। ট্রাফিক লাইটের কারণে বাধ্য না হলে থামত না, পেছনেও তাকাত না কিশোর, দেখতও না।
কই? রবিন বলল। আমি তো কিছু দেখছি না।
একটা গাড়ির পেছনে বসে পড়েছে। সাইকেল নিয়ে আসছিল। অদ্ভুত পোশাক আর হ্যাট পরেছে। পাশের গলিতে ঢুকে পড়বে।
আলো জ্বলতেই আবার সাইকেল চালাল ওরা। ডানে মোড় নিয়ে ঢুকে পড়ল একটা গলিতে। বড় বড় কয়েকটা ডাস্টবিন দেখে তার আড়ালে লুকিয়ে পড়তে ইশারা করল কিশোর।
সাইকেল চালিয়ে আসছে অদ্ভুত পোশাক পরা লোকটা। মুখ দেখা যাচ্ছে না। খাট শরীর, কুঁকে রয়েছে হ্যাণ্ডেলের ওপর, কুঁজো মানুষের মত ঠেলে বেরিয়ে আছে পিঠ। ঢোল, কালো কোট গায়ে, মাথায় বিচিত্র কানাওয়ালা হ্যাট।
ফিসফিসিয়ে মুসা বলল, একেবারে দেখি শার্লক হোমস সেজেছে।
ভাড়! বলল রবিন। আরি! উঠে দাঁড়াল কিশোর। নরি কারমল। তুমি এখানে কি করছ?
এতই চমকে গেল নরি, হাত কেঁপে সাইকেলের হ্যান্ডেল ঘুরে গিয়ে লাগল দাঁড়িয়ে থাকা একটা গাড়ির ওপর, কোটের সঙ্গে সাইকেল জট পাকিয়ে হুড়ুম করে পড়ল মাটিতে। হঁচড়ে পাঁচড়ে উঠে দাঁড়াল আবার, লাথি দিয়ে ঠিক করল কোটের স্কুল। বলল, আমি তোমাদের সাহায্য করতে এসেছি। যা খুশি বল, কিছু মনে করব না।
হেসে ফেলল মুসা। এই পোশাক পরে?
গোয়েন্দারা তো এরকমই পরে? চেঁচিয়ে উঠল নরি।

আমাদের খুঁজে পেলে কি করে? কিশোর জিজ্ঞেস করল।
পিছু নিয়েছিলাম, গর্বের হাসি ফুটল নরির মুখে। খুব সকালে উঠে গিয়ে বসে ছিলাম স্যালভিজ ইয়ার্ডের কাছে। ইহ, এজটারদের যা খেপতে দেখলাম না। তোমরা এখানে কেন? সূত্রও পেয়েছ?
সে দেখতেই পাবে, কিশোর বলল। এই, রবিন আর মুসাকে বলল, চলো, যাই। সাইকেলে চেপে আবার গলির মুখের দিকে রওনা হল সে।
এই, যাচ্ছি কোথায়? পেছন থেকে চেঁচিয়ে বলল নরি। জোরে জোরে পেডাল ঘুরিয়ে কিশোরের পাশে চলে এল।
তোমাকে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি।
না না, আমি যেতে চাই না…
ঘ্যাঁচ করে একটা গাড়ি এসে থামল পথের পাশে। দরজা খুলে প্রায় লাফিয়ে বেরিয়ে এল রস উড। এই যে, পাওয়া গেছে, এখানে। তোমার মা খুব রাগ করেছে। তিন গোয়েন্দার দিকে তাকিয়ে হাসল সে। না পেয়ে এলসা ঠিকই আন্দাজ করে ফেলেছে, কোথায় গেছে। কিশোর, তোমার চাচীকে কোথায় যাচ্ছি বলে এসে ভাল করেছ। নইলে খুঁজে পেতাম না।
আমি বাড়ি যাব না! চিৎকার করে বলল নরি। আমি থাকব! কাজ করব ওদের সঙ্গে।
নরি, ঝোনোর চেষ্টা করল কিশোর। এজটাররা জেনে গেছে আমরা তোমাদের কাজ করছি। রাইমিং স্ল্যাঙের কথাও জেনেছে। কি করে জানল? তুমি বলেছ। গোয়েন্দাদের পয়লা পাঠ, কক্ষনও অযথা কথা বলা উচিত নয়। মস্ত ভুল করেছ তুমি।
মাপ চাই, কিশোর, সত্যি অন্যায় হয়ে গেছে। আমার মায়ের নামে খারাপ কথা বলছিল, তাই খুব রেগে গিয়েছিলাম। আর ভুল করব না। কসম!
সরি, নরি, কিশোর বলল। তুমি থেকে কোন উপকার করতে পারবে না, অসুবিধেই করবে। মিস্টার উডের সঙ্গে চলে যাও।
কালো মেঘ জমল নরির মুখে, দেখে মনে হচ্ছে যে-কোন মুহূর্তে বর্ষণ শুরু হতে পারে। সাইকেলটা ঠেলে নিয়ে গেল গাড়ির কাছে। ওটা তুলতে তুলতে উকিল জিজ্ঞেস করল, তোমাদের কিছু অগ্রগতি হয়েছে?
নিশ্চয় হয়েছে, মুসা জবাব দিল। দ্বিতীয় ধাঁধাটার সমাধানও খুব তাড়াতাড়ি করে ফেলব।
গুড। কোর্টে উইলটা নিয়ে কাজ শুরু করে দিয়েছি আমি। এখন যত তাড়াতাড়ি পাথরগুলো বের করতে পার, ভাল। তোমাদের কপাল ভাল, বেশির ভাগ লোকই গুপ্তধন খোঁজা বাদ দিয়েছে। যোগাযোগ রাখবে।

রাখব, রবিন বলল।
গাড়ি নিয়ে চলে গেল উকিল। যতক্ষণ তিন গোয়েন্দাকে দেখা গেল, পেছনে। ফিরে ছলছল চোখে তাকিয়ে রইল নরি।
বাস ডিপোতে পৌঁছে ছেলেটার দেখা পেল ওরা, যে শুঁটকির খবর দিয়েছিল। ওর নাম ডিক ব্রাউন। ডিপোর পাশের একটা বাড়ির দরজায় তিন গোয়েন্দার সঙ্গে দেখা করল সে, যাতে শুঁটকি ওদের দেখে না ফেলে।
ডিক বলল, সারা সকাল বাসে করে ঘুরেছে টেরি, ডিপো ম্যানেজার বলেছে আমাকে। দুটো রুট ঘুরে এসেছে ইতিমধ্যেই, তৃতীয় আরেকটায় যাবার জন্যে বাসে চড়েছে।
যেন তার কথার প্রমাণ দিতেই ডিপো থেকে বেরিয়ে এল একটা বাস, ছেলেদের সামনে দিয়ে চলে গেল। দেয়ালের আড়ালে লুকিয়ে গেল ওরা। সামনের একটা সিটে বসেছে টেরি, চেহারা থমথমে। খুব চিন্তিত মনে হল, মুসা বলল।
যা খুঁজছে পাচ্ছে না বোধহয়, বলল ডিক। যে দুটো বাসে করে ঘুরে এসেছে, দুটোরই ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলেছি আমি। দুজনকেই নাকি জিজ্ঞেস করেছে সে, ফ্রেণ্ড-এর সঙ্গে ছন্দের মিল আছে, এরকম কিছু আছে কিনা পথে। ড্রাইভাররা কিছু বলতে পারেনি। হাসল ছেলেটা। যাওয়ার মময় হল আমার। তোমাদের দৌলতে অনেক মজা পেলাম। ধন্যবাদ।
তোমাকেও অনেক ধন্যবাদ, ডিক, কিশোর বলল। যদি পুরস্কার পাই, তোমাকেও ভাগ দেব।
ডিক চলে গেছে। উজ্জ্বল রোদে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভাবছে মুসা, কিসের সঙ্গে ছন্দ মেলে ফ্রেণ্ড-এর?
কিশোর, রবিন বলল, পিস্তল এমন কি নির্দেশ করেছে, যে-জন্যে বাস ডিপোতে আসতে হয়েছে শুঁটকিকে?
হতে পারে কাউন্টি পার্ক বাস স্টপেজের দিকে নির্দেশ করেছিল পিস্তল, কিশোর বলল। মূর্তির কাছেই ওটা। ধাঁধায় রাইড শব্দটাও রয়েছে। শুঁটকি হয়ত মনে করেছে বাসে চড়তে বলা হয়েছে।
কিন্তু তাহলে এখানে কেন এল? পার্কের স্টপেজ থেকে কেন চড়ল না?
আর এত ঘোরাঘুরি করছে কেন? ওদের আলোচনায় যোগ দিল মুসা।
হুম, ঠিকই বলেছ, কিশোর বলল। চলো তো, রুটের নকশাগুলো দেখি। প্রশ্নের জবাব মিলতেও পারে।
ডিপোর ভেতরে ঢুকে, নকশা দেখায় মন দিল ওরা।
এই দেখ, বলল কিশোর। তিনটে রুট দিয়ে বাস যায় পার্কের মেইন স্টপেজে।
তারমানে কোন রুটের কথা বলেছে কারমল, রবিন বলল, শুঁটকি জানে না।

আমরাও জানি না, নিরাশ ভঙ্গিতে হাত নাড়ল মুসা।
ভুরু কোঁচকাল কিশোর। বিশেষ কোন রুটের কথা বলেছে, যেটা ধাঁধা সমাধানে সাহায্য করবে। দেখি তো আরেকবার ধাঁধাগুলো, পকেট থেকে নকলটা বের করল সে। পড়ল, অ্যাবাভ দ্য অ্যাপলস অ্যাণ্ড পেয়ারস অল অ্যালোন; দ্য লেডি ফ্রম আ ব্রিস্টল রাইডস ফ্রম ফ্রেণ্ড।
কোন রুটের নাম্বার ফ্রেণ্ডের সঙ্গে ছন্দ মেলায় না তো? মুসা বলল।
শব্দটার উচ্চারণ ফ্রেন হলে টেন-এর সঙ্গে মিলত। কিন্তু ডি-টা বাদ দিই কি করে? কিশোর, বইতে কি রাইড ফ্রম আ ফ্রেণ্ড-এর কোন মানেই লেখা নেই?
না, আমি অন্তত পাইনি। যতদূর মনে হচ্ছে বাসের কথাই বলেছে কামল। সেই বাসে চড়ে হয়ত কোন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যেত। হয়ত এটা স্ল্যাং নয়, যা বলেছে তা-ই বুঝিয়েছে। কার সঙ্গে দেখা করতে যেত, সেটা জানতে পারলে...
থেমে গেল কিশোর। চোখ মিটমিট করল কয়েকবার। জেনি এজটার এসে দাঁড়িয়েছে কাছে। চোখের তারায় ভয় ফুটেছে। ঠিকই বলেছ তুমি, ইয়াং ম্যান। মনে হয় বুঝতে পারছি কোন বন্ধুর কথা বলেছে।
মুসা বলল, কিশোর, ওর কথা বিশ্বাস কোরো না। ভাওতা দিয়ে...
না না, ভাঁওতা দিচ্ছি না, তাড়াতাড়ি বলল জেনি। তোমাদেরও দোষ নেই। সন্দেহ করার মত কাজই করেছি আমরা। আমাকে বাধ্য করেছিল মাইক। ভয়ানক লোক। সাঙঘাতিক ভয় করি ওকে। তবে এবার ওকে থামানোর সময় হয়েছে, ওর ভালর জন্যেই।
থামাবেন? কিশোর বলল।
কাউকে দিয়ে বাঁধার সমাধান করিয়ে, যাতে সত্যিকারের স্বত্তাধিকারীরা রহগুলো পায়। জানো, স্যালভিজ ইয়ার্ডে আবার গিয়েছিলাম আমি, তোমাদের কাছে, তোমার চাচীর কাছে মাপ চাইতে! আর আমি সাহায্য করছি না মাইককে, যতই ভয় দেখাক।
খাইছে, মুসা বলল, আপনাকে মারধোর করেছে নাকি?
ওর পক্ষে সব সম্ভব, কেঁপে উঠল জেনি। সেজন্যেই তোমাদের সাহায্য করতে এসেছি, ওকে ঠেকানোর জন্যে। আমাকে সাহায্য করবে? কারমলের বন্ধুর আসল ঠিকানা আমি জানি না, তবে মেরে তার কাছে নিয়ে যেতে পারব।
ভ্রূকুটি করল কিশোর। লোকটি কে, মিস এজটার?।
বলছি...তুমি কিশোর, তাই না? আর তুমি রবিন, তুমি মুসা।
মাথা ঝাঁকাল তিনজনেই। সন্দেহ যাচ্ছে না।
হাসল জেনি। গুড। আমার মামা প্রায়ই গিয়ে দাবা খেলত মিস্টার মারফি নামে একটা লোকের সঙ্গে।

তার কাছে বাসে করে যেতেন কারমল? মুসা জানতে চাইল।
হ্যাঁ। তবে বলতে পারব না কোন রুটের কোন বাসে করে যেত। থাকে কোথায়? রবিন জিজ্ঞেস করল।
বললাম না, ঠিকানা জানি না। তবে মামার বাড়ির পাশে পার্কের ধারে একটা বাড়ি আছে মারফির।
মাথা ঝাঁকাল কিশোর। তিনটে বাস রুটই গেছে ওই এলাকার ভেতর দিয়ে। বলল, মিস্টার মারফির কথাই হয়ত বলেছেন কারমল। চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে। তা যাব কিভাবে?
জেনি বলল, অনেক দূর, সাইকেলে করে যেতে অসুবিধে হবে। আমাকে যদি বিশ্বাস কর, আমার গাড়িতে করে নিয়ে যেতে পারি।
বেশ... দ্বিধা যাচ্ছে না কিশোরের।
বাড়িটা কোথায় বলে দিতে পারি তোমাদের, দ্বিধা দেখে বলল জেনি। তোমাদের সঙ্গে বাসে যেতেও আমার আপত্তি নেই। হাসল সে।
পরস্পরের দিকে তাকাল ছেলেরা। গাড়িতে গেলে অবশ্যই সময় বাঁচবে,মুসা বলল।
সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল কিশোর। সময়ের দাম আছে। ঠিক আছে, মিস এজটার, গাড়িতেই যাব।
গুড, জেনি বলল, ডিপোর পার্কিং লটে গাড়ি রেখেছি। তোমাদের সাইকেল ওখানেই রেখে নাও।
গাড়িতে আর কেউ নেই, ওঠার আগে এ-ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে নিল ছেলেরা। সতর্ক থাকল। বোটানিক্যাল গার্ডেন ছাড়িয়ে এল গাড়ি, পাহাড়ের ঢালে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কতগুলো ছোট ছো। কটেজের দিকে এগোল। কিছুক্ষণ পর সরু একটা রাস্তা দেখিয়ে জেনি বলল, ওপথেই যেতে হবে।
বসন্তের চমৎকার রোদ। পাহাড়ের দৃশ্য দেখতে দেখতে আনমনা হয়ে পড়ল কিশোর আর মুসা, সতর্কতা চলে গেল। আরাম করে হেলান দিয়ে বসল ওরা।
পুরানো একটা কটেজের সামনে গাড়ি থামাল জেনি। বলল, এটাই।
বেরিয়ে এল ছেলেরা। মুগ্ধ হয়ে দেখছে। সুন্দর জায়গা। পাখির গানে মুখরিত।
সন্দেহ কিছুটা থেকেই গেল রবিনের, সাবধানে ডাকল, মিস্টার মারফি? মিস্টার মারফি আছেন? মিস্টার কারমলের কথা আলোচনা করতে এসেছিলাম
যদি...
কাঁপা কাঁপা বৃদ্ধ-কণ্ঠ ভেসে এল কটেজের ভেতর থেকে, কে? কারমলের কথা বলছ? দাবা খেলতে আসত, কক্ষনও পারত না আমার সঙ্গে। সব সময় হারত। এস, ভেতরে এস।

আর দ্বিধা রইল না। ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে কিশোর বলল, স্যার, কারমল এখানে বাসে করে আসতেন, তাই না? কখনও কি বাস আর আ বল অভ টোয়াইন সম্পর্কে কিছু বলেছেন?

ওপাশের দেয়াল ঘেঁষে কুককেসের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন একজন বৃদ্ধ, ছেলেদের দিকে পেছন করে। ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়ালেন।

হাল্লো, গর্দভের দল!

এ-কি! কোথায় বৃদ্ধ মিস্টার মারফি! বুড়োর ছদ্মবেশ পরে রয়েছে মাইক এজটার, হাতে সেই ওয়াকিং স্টিক, মুখে কুৎসিত হাসি। ওদের পেছনে সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দিল জেনি এজটার।

খেঁকিয়ে উঠল জেনি, মনে করেছ এত সহজে হাল ছেড়ে দেব?

এতই চমকে গেছে, কথা হারিয়ে ফেলেছে রবিন আর মুসা। রাগে কাঁপছে কিশোর। তবে জিভ সংযত রাখল। দেখতে চাইছে, কি ঘটে।

ভালই অভিনয় করেছ, জেনি, বোঝা যাচ্ছে, বোনকে বলে, ছেলেদের দিকে চেয়ে দাঁত খিচাল মাইক।

তুমিও কম করনি, হেসে উঠল জেনি। তবে ছেলেগুলো বেশি সৎ, আর আগ্রহী। যে কেউ ঠকাতে পারবে এখন ওদের।

মিস্টার মারফির বুদ্ধিটা ভালই হয়েছে, কি বল? হাহ্ হাহ্, নিজের ওপর সন্তুষ্ট হয়ে হাত কচলাল মাইক।

তুমি, তুমি...! রাগে কথা আটকে গেল মুসার মুখে।

থাম, খাম, মেজাজ ঠাণ্ডা কর, হাত তুলল মাইক। ভাল একটা প্রস্তাব দিয়েছিলাম, পাত্তা দাওনি। এখন আর তোমাদেরকে দরকার নেই আমাদের, অন্য লোক পেয়েছি। বল অভ টোয়াইন বলতে কি বুঝিয়েছে, তা-ও জানি। আমরা : কাজ করি গিয়ে, এই ঘরে তোমরা বিশ্রাম নাও। তবে অবশ্যই দরজায় তালা লাগানো থাকবে। মেয়েমানুষের মত হি-হি করে হাসল সে। নিরাপদেই থাকবে। কাছাকাছি আর কোন কটেজ নেই, চেঁচিয়ে সুবিধে করতে পারবে না, কারও কানে যাবে না চিৎকার। এক মাসের জন্যে ভাড়া নিয়েছি এটা, কাজেই ততদিন বাড়িওয়ালাও আসবে না। একমাস অবশ্য থাকছি না আমরা এখানে...।

ব্যস ব্যস, আর বলার দরকার নেই, বাধা দিল জেনি। ওদের ঘরে নিয়ে যাই।

লাঠি তুলে ইশারা করল মাইক, ভেড়ার পালকে যেমন চলার নির্দেশ দেয় রাখাল।

যার যেদিকে খুশি, হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল কিশোর।

ইঙ্গিত বুঝতে পেরেছে, চোখের পলকে ঘুরে, দুদিকে দৌড় দিল রবিন আর মুসা। কিশোর ঘুরল আরেক দিকে। ছোটাছুটি শুরু করল। ধরার জন্যে হাত বাড়াল ভাইবোন। কিন্তু ছুঁতেও পারল না। ওদেরকে হতবাক করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল

তিন কিশোর, একজন সামনের দরজা খুলে, একজন পেছনের দরজা, আর আরেকজন জানালা দিয়ে।
সরু পথ ধরে আগে আগে ছুটল মুসা। ছুটতে ছুটতে তাকাচ্ছে এদিক ওদিক, লুকানোর মত জায়গা খুঁজছে, অন্তত একটা ঘন ঝোপ পেলেও হয়। কিন্তু পথের দুপাশে এখানে খোলা অঞ্চল।
পেছনে টায়ারের তীক্ষ্ণ আর্তনাদ শোনা গেল। পেছনে তাকিয়ে ঢোক গিলল রবিন। বলল, ব্যাটারা আসছে আমাদের ধরতে।
নেমে পড়ো রাস্তা থেকে, নির্দেশ দিল মুসা।
লাফিয়ে পথের পাশের খাদে পড়ল তিনজনে। সেখান থেকে উঠে দৌড় দিল মাঠের ওপর দিয়ে। পেছনে আবার টায়ারের আর্তনাদ, ধাতব বস্তু আছড়ে পড়ার শব্দ। ছেলেরা ভাবল, খাদ পেরিয়ে মাঠের ওপর দিয়েই ওদের তাড়া করতে আসছে গাড়ি। কিন্তু ফিরে তাকিয়ে দেখল সম্পূর্ণ অন্য দৃশ্য।
খাদে কাত হয়ে পড়ে আছে গাড়িটা। জানালার কাঁচ চুরচুর। একটা চাকা ফেটে গেছে। হামাগুড়ি দিয়ে কোনমতে গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে ছুটন্ত আরেকটা নীল গাড়ির দিকে তুলে লাঠি নাচাচ্ছে মাইক।
খাইছে! হল কি? অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে মুসা।
খোঁড়াতে খোঁড়াতে আবার গাড়ির কাছে গিয়ে বোনকে বের করার চেষ্টা চালাল মাইক।
দ্রুত মোড়ের ওপাশে হারিয়ে গেল নীল গাড়িটা। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কিশোর বলল, ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে। গাড়িটা চেনা চেনা লাগল।
ভেতরে কে ছিল দেখেছ?।
দুজন মনে হল, বলল রবিন। ড্রাইভার বেশ বড়সড় মানুষ...বিশালদেহী।
আবার সেই দৈত্য! মুসা বলল।
হয়ত, চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল কিশোর। কিংবা বেপরোয়া কোন ড্রাইভার।
যে-ই হোক, আমাদের বড় উপকার করেছে।
আশ্চর্য! বিড়বিড় করল রবিন। যাকে চিনিই না, কেন যেচে পড়ে উপকার করতে এল আমাদের, যদি বেপরোয়া ড্রাইভার না হয়ে থাকে?
এ, দেখ, হেসে উঠল মুসা।
খোঁড়াচ্ছে ভাইবোন দুজনেই, রওনা দিয়েছে কটেজের দিকে। এদিকেই তাকিয়ে আছে মাইক, হাতের লাঠি নাচাচ্ছে ছেলেদের দিকে।
রবিন আর কিশোরও হাসল। তারপর শহরে রওনা হল ওরা। মাঝে মাঝে পেছনে ফিরে দেখে নেয়, এজটাররা পিছু নিল কিনা। কিন্তু মোটা মাইক আর তার রোগাটে বোনের ছায়াও দেখা গেল না আর।

লাথি মেরে রাস্তার একটা পাথর সরাল কিশোর। আমি একটা আস্ত গর্দভ! নইলে জেনির মত একটা মেয়েমানুষ এভাবে বোকা বানায়। দশ বছর ধরে এখানে আসে না ওরা, একথাটা মনেও হল না একবার। শেষ জীবনে কারমল কি করেছে।
করেছে জানার কথা নয় জেনি আর মাইকের। ভুল করা একদম সহ্য করতে পারে না সে। অথচ এই কেসটায় একের পর এক ভুল করে চলেছে। মনে মনে কষে কয়েক ডজন লাথি মারল নিজেকে।
আস্ত শয়তান,মুসা বলল। কি রকম বানিয়ে বানিয়ে বলল, বিশ্বাস না করে উপায় ছিল? কটেজটাও নিয়েছে কারমলের বাড়ির পাশে। ওদেরও কপাল ভাল বলতে হবে, একেবারে জায়গামত ভাড়া পেয়েছে।
তবে এবার খারাপ হতে শুরু করেছে, হাসি ফুটল কিশোরের ঠোঁটে। গাড়ি ভেঙেছে। কোম্পানি পুরো ক্ষতিপূরণ আদায় করে ছাড়বে। দিতে না পারলে দেবে ওদের নামে কেস করে। কারমলের বন্ধুকে খুঁজে বের করাও ওদের কম্মো নয়।
কেন?
কারণ, কারমলের বন্ধুদের কথা জানার কথা শুধু এলসা আর উডের। ওরা কিছুতেই বলবে না ভাইবোনকে।
কিন্তু আমাদের বলবে! বলে উঠল রবিন?
ঠিক! তুড়ি বাজাল কিশোর। চলো, ওদের সঙ্গেই কথা বলি। বাস স্টপ খোঁজ।
বেশিদূর আর এগোতে হল না, মেইন রোডে এসে উঠল ওরা। বাস কোথায় থামে দেখল। কিন্তু বাস আসার আগেই এল একটা গাড়ি, স্টেশন ওয়াগন, চালাচ্ছেন এক মহিলা, ওদেরই এক সহপাঠীর মা। ছেলেদেরকে বাস স্টপেজে দেখে থেমে জিজ্ঞেস করলেন কোথায় যাবে।
লিফট পেয়ে গেল ওরা।
ফারমলের বাড়িতে কটেজেই পাওয়া গেল এলসাকে। একা।
নরি বোধহয় পেছনের বাগানে, এলসা বলল। ওকে নামিয়ে দিয়ে উড গেছে লস অ্যাঞ্জেলেসে। আমি খেতে বসতে যাচ্ছিলাম। তোমরাও বসে যাও না? খেতে খেতে সব কথা বলবে আমাকে।
স্যাণ্ডউইচ চিবুতে চিবুতে কি ঘটেছে বলল রবিন।
ভীষণ রেগে গেল এলসা। এমন শয়তান লোক জীবনে দেখিনি। বিশ্বাস করাই ভুল হয়েছে তোমাদের।
এই শেষ, মুসা বলল, আর না।
আচ্ছা, এবার ধাঁধার কথা বলি, কিশোর বলল। বাসে চড়ে বন্ধুর কাছে যাবার কথা বলেছেন কারমল। কার কথা বলেছেন, আন্দাজ করতে পারেন?.

ভেবে বলল এলসা, তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু দুজনই আছে। ড্যাম সান, আর ডোরা কেমপার। ভোরা কাছেই থাকে, হেঁটেই যাওয়া যায়। বাসে করে যেতে হলে সানের কথাই বলেছে। হপ্তায় দুএকবার যেত ওখানে। বাড়ির সামনে থেকেই বাস ধরত।
তাহলে তিনিই হবেন, কিশোর বলল। উইলে সাক্ষীও তো হয়েছেন ড্যাম সান। ভুলে গিয়েছিলাম। কোথায় থাকেন তিনি?
কাউন্টি পার্কের মাইল দুয়েক দূরে। পথের পাশের একটা ছাউনিতে। মেইন রোড থেকে দেখা যায় না। তবে সাইনপোস্ট লাগানো রয়েছে পথের মোড়ে, বাস থেকেই দেখবে। আট নাম্বার বাস যায়।
আর দেরি করল না ছেলেরা। খাওয়া শেষ। তাড়াহুড়া করে বেরিয়ে রাস্তা পেরিয়েই থমকে দাঁড়াল কিশোর।
কি হল? রবিন বলল।
উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে কিশোরের চোখের তারা। বাসের সূত্রের মানে বুঝে গেছি! আর বাসে কি খুঁজতে হবে, তা-ও!
খাইছে! চেঁচিয়ে উঠল মুসা। কী, কিশোর?
শোন, পকেট থেকে নকলটা বের করল কিশোর। তিন নাম্বার ধাঁধায় বলছেঃ অ্যাট দ্য টেনথ বল অভ টোয়াইন, ইউ অ্যাণ্ড মি; সী আওয়ার হ্যাণ্ডসাম মাগ অ্যাহেড।
হাসল সে। বাস থেকে অনেক কিছু দেখা যায়। তার মধ্যে।
একটার ছন্দ মিলে যায় বল অভ টোয়াইনের সঙ্গে। এবং সেটা বাস থেকেই দেখা যাবে বলেছে কারমল।
মাথা নাড়ল মুসা, সানের ছাউনি নয়। ওটা বাস থেকে দেখা যাবে না...
কিন্তু সাইনপোস্ট দেখা যাবে! উত্তেজিত হয়ে উঠল রবিন। টোয়াইনের সঙ্গে সাইনের ছন্দও মেলে।
হ্যাঁ, কিশোর বলল। টেনথ বল অভ টোয়াইন মানে, দশ নাম্বার সাইন। প্রথম থেকে এক দুই করে গুনে যেতে হবে।
বাস এল। উঠে বসল ছেলেরা। বোটানিক্যাল গার্ডেন আর শপিং সেন্টারের পাশ কাটিয়ে এল, এগিয়ে চলল পাহাড়ের দিকে।
আট নাম্বার সাইনটা গোনার পর মাথা নাড়ল রবিন, কিশোর, কোথায় বুঝি একটা ভুল হয়ে যাচ্ছে।
আট নাম্বার সাইনটা সানের বাড়ির কাছে। বাস থামল ওখানে।
হ্যাঁ, কিশোরও রবিনের সঙ্গে একমত। গম্ভীর। ভুলটা কি? মুসার প্রশ্ন। দশ নাম্বারে তো এখনও যাইইনি।
সেটাই ভুল। কারমল যেখানে নামত, সেটা ছাড়িয়ে যাবার কথা নিশ্চয় বলবে, জবাব দিল রবিন।

ভাড়া? নিজেদের আলোচনায় এতই মগ্ন ছিল ছেলেরা, বাস ড্রাইভার এসে দাঁড়িয়েছে, বলতেই পারবে না।
দিলাম তো একবার, মুসা বলল।
এখানে নামলে আর লাগবে না। কিন্তু সামনে গেলে আরও দশ সেন্ট করে দিতে হবে।
তাহলে নেমেই যাচ্ছি, উঠে দাঁড়াতে গেল মুসা।, রাখ, বাধা দিল কিশোর। দশ নাম্বার সাইনটা গিয়ে দেখেই আসি না। কারমলের কোন ব্যাপারেই শিওর হওয়া যাচ্ছে না, অসম্ভব চালাক। পকেট থেকে পয়সা বের করে ড্রাইভারের হাতে ফেলল সে।
আবার চলল বাস। দেখা গেল দশ নাম্বার সাইন। ফ্রিওয়ে থেকে ঢোকার আরেকটা পথ, সাইনবোর্ডে লেখাঃ ডু নট এনটার। আনমনে মাথা নেড়ে বাস থামানোর শেকল ধরতে গেল কিশোর, থামানোর ইঙ্গিত দেবে, নেমে যাবে ওরা।।
কিশোর! তার হাতে হাত রাখল মুসা, টেনো না!
হাত তুলে দেখাল সে। ফ্রিওয়ের প্রবেশমুখের কাছে দাঁড়িয়ে আছে চকচকে একটা গাড়ি। গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে জেনি আর মাইক। কোন ব্যাপারে ভীষণ তর্ক জুড়েছে। ওদের অলক্ষ্যে পেরিয়ে যাবার সময় ছেলেরা দেখল, জোরে সাইনপোস্টে লাথি মেরে নিজের আঙুলই ব্যথা পেয়ে সেটা চেপে ধরল মাইক।
সর্বনাশ! গুঙিয়ে উঠল রবিন। হাল ছাড়েনি ব্যাটারা!
মুসা হাসল। কিন্তু আসল সাইনটাও পায়নি।
তবে বুঝে ফেলেছে, কিশোর বলল, সাইনের কথাই বলেছে বুড়ো! পরের স্টপেজে নেমে যাব আমরা। এরপর জলদি কাজ সারতে হবে।
বাস থামলে নেমে পড়ল ওরা। ওটা চলে যেতে দেখে অস্বস্তিতে কাঁধ ঝাঁকাল মুসা। এবার কি করব?
ভাবব, বলল কিশোর। সানের ছাউনির পরে আরও দুটো সাইন পেরিয়ে এসেছি। তারমানে এসব সাইনপোস্টে কিছু নেই। কারমল লিখেছে রাইডস ফ্রম আ ফ্রেণ্ড। ফ্রম লিখল কেন? এখন বুঝেছি। আসলে কারমল বোঝাতে চেয়েছে, সানের বাড়ি থেকে রওনা হওয়ার পর দশ নাম্বার সাইন।
নিশ্চয়ই! চেঁচিয়ে উঠল রবিন। রাস্তার অন্য পাশের সাইন। পরের বাসেই ফিরে যাব।
বাস এল। আবার বাড়তি ভাড়া দিতে হল, উচু এলাকায় ওঠার কারণে এই বিশেষ ভাড়া।
ব্যাটারা খামোকা পয়সা নেয়, নালিশের সুরে বলল রবিন।

যেখানে যা নিয়ম, কিশোর বলল। যাক ওসব কথা। এখন সাইনের ওপর নজর দাও।
ফ্রিওয়ের প্রবেশমুখের কাছে এসে জেনি আর মাইককে দেখা গেল না। নেই ওরা। আবার সাইন গোনায় মন দিল তিন গোয়েন্দা।
আট নাম্বার সাইন এল। কাউন্টি পার্কের মেইন বাস স্টপের কাছেই ওটা। নয় নাম্বারটাতে লেখা রয়েছেঃ শ্লো। পাহাড়ের গায়ে বসানো সাইনপোস্টের পাশ দিয়ে একটা রাস্তা বেঁকে চলে গেছে বাঁধের দিকে।
মনে হচ্ছে পার্ক আর বোটানিক্যাল গার্ডেনের মধ্যেই যত ব্যাপার, মুসা বলল।
হ্যাঁ, বলল কিশোর, সে-রকই লাগছে।
পরের সাইনটা আসার অপেক্ষায় অধীর হয়ে রইল ওরা।
দূর থেকে বলে উঠল মুসা, খাইছে!
রবিন বলল, হায় হায়!
আমি…আমি…, চুপ হয়ে গেল কিশোর।
কাউন্টির সীমানা শেষ ওখানে, শহর শুরু, আর তা-ই লেখা রয়েছে ওখানকার ইনেঃ ওয়েলকাম টু রকি বীচ।
কিশোর, কারমল মোটেও ওটার কথা বলেনি, জোরে হাত নাড়ল রবিন, যেন বাতাসে খাবলা মারল। না! ধীরে ধীরে বলল কিশোর, আবারও ভুল করেছি আমরা!
আমরা একাই নই, কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে ফেলল মুসা। ওই দেখ।
বাইরে তাকিয়ে পরিচিত একটা লাল গাড়ি নজরে পড়ল। সাইনের পাশের মাটি খুঁড়ছে শুঁটকি টেরি, উন্মাদ হয়ে গেছে যেন। হতাশা আর পরিশ্রমে লাল মুখ। অনেকক্ষণ ধরে খুঁড়ছে বোঝা যায়। বাসটা ওর পাশ কাটানোর আগেই রাগ করে ছুঁড়ে ফেলে দিল হাতের শাবলটা!
যাক, শুঁটকিও পায়নি, শিওর হওয়া গেল, রবিন বলল। পায়নি, তবে আমাদের ঘাড়ের কাছেই হুমড়ি খেয়ে আছে, কিশোর বলল। সে আর এজটাররা। সময় খুব কম আমাদের হাতে।
কিন্তু করবটা কি? ভুলটা কোথায় করলাম?
জানি না। সাইন খোঁজা বাদ দিয়ে গিয়ে সানের সঙ্গে দেখা করা দরকার, বলতে বলতেই হাত বাড়িয়ে শেকল ধরে হ্যাঁচকা টান মারল কিশোর।
আধ ঘন্টা পর, ড্যাম সানের ছাউনির রাস্তা ধরে হাঁটতে শুরু করল তিন গোয়েন্দা। দেখা গেল ছাউনি। পুরানো, রঙ নেই। সামনে বেশ বড়সড় একটা কাঁচা চত্বর, ধুলোয় ঢাকা।
চলতে চলতে হঠাৎ চিৎকার করে উঠল মুসা, মাথা নোয়াও!

মত্ত এক পাখির মত শাঁ করে ওদের মাথার সমান্তরালে ছুটে এল বিচিত্র জিনিসটা।
ওদের মাথার ওপরে এসে আচমকা আবার উঠতে শুরু করল জিনিসটা। বেশ চওড়া এক চক্কর নিয়ে ঘুরে আবার রওনা হয়ে গেল যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে। অদৃশ্য হয়ে গেল ছাউনির আড়ালে।
ও-ওটা কি?...ভূ-ভূ... তোতলাতে লাগল মুসা।
অট্টহাসি শোনা গেল ছাউনির পেছন থেকে। বেরিয়ে এল এক বুড়ো, ছোটখাট শরীর, মাথায় কুঁচকানো তারের মত ধূসর রঙের চুল। গায়ে বুশজ্যাকেট, পরনে মোটা কাপড়ের প্যান্ট, পায়ে মাইনারস বুট। হাতে ইংরেজি ভি অক্ষরের মত দেখতে বিচিত্র একটা জিনিস, এটাই উড়ে এসেছিল ছেলেদের দিকে।
খুব ঘাবড়ে দিয়েছি, না? ফ্যাকফ্যাক করে হাসল বুড়ো। হাতের জিনিসটা নাচাল। এটা দিয়ে পঞ্চাশ ফুট দূর থেকে ক্যাঙারু ফেলে দিতে পারি।
বুমেরাঙ! বিড়বিড় করল রবিন।
আমাদের গায়ে লাগতে পারত! কড়া গলায় বলল মুসা।
নেচে উঠল বুড়োর নীল চোখের তারা। লাগানোর জন্যে তো মারিনি। তাহলে বাঁচতে পারত না। আমার সময়ে কুইনসল্যাণ্ডে সবচে ভাল বুমেরাঙ ছুঁড়তে পারতাম আমি।
সব সময়ই কি আপনার হাতে ফেরত যায়? জানতে চাইল রবিন।
ছুঁড়তে জানলে সব সময়ই আসবে।
যদি নিশানা ব্যর্থ হয়, তাহলেই শুধু আসবে, তাই না মিস্টার সান? কিশোর বলল।
হ্যাঁ। চালাক ছেলে। তা, এখানে কি চাই?
কি জন্যে এসেছে বলতে শুরু করল রবিন আর মুসা।
বাধা দিয়ে সান বলল, জানি, আর বলতে হবে না। তোমরাই উড আর এলসাকে সাহায্য করছ। আমার কাছে কি চাই? আমি তো জানি না ওগুলো কোথায় আছে। আর জানলেও বলতাম না।
তা না জানুন, দুএকটা ধাঁধার সমাধানে তো অন্তত সাহায্য করতে পারবেন?
কেন করব, বল? ডেন যদি চাইত,গ্রহগুলো তার ছেলের বৌ পাক, তাহলে তো দিয়েই যেতে পারত। দিল না কেন? ইচ্ছে নেই বলে। নতুন একটা উইল করল, আমাকে সাক্ষী রাখল। অনুরোধ জানিয়ে রাখল, যদি হঠাৎ সে মরে যায় তাহলে ওটা যেন পত্রিকায় প্রকাশের ব্যবস্থা করি...।
হঠাৎ মরে যাবেন আশা করছিলেন নাকি? ফস করে জিজ্ঞেস করে বসল রবিন।
কি জানি। তবে হার্ট খারাপ ছিল, প্রচুর ওষুধ খাচ্ছিল। কারণও আছে। সারাজীবন ওটাকে কম খাটায়নি তো। খাঁটিয়েছি আমরা সবাই। বুশরেঞ্জার,

মাইনার, প্রসপেক্টর, কি কাজ করিনি…
আপনার কি মনে হয়? জানতে চাইল রবিন। কারমল ধাপ্পা দিয়েছেন?
রসিকতা সে পছন্দ করত। চোখ সরু সরু হয়ে এল বুড়োর। ওর মনে কি ছিল, আমি বলতে পারব না।
আপনিও গুপ্তধন চান? মুসা বলল। রাইমিং স্ল্যাং আপনি ভাল জানেন।
দেখ ছোকরা, মুখ সামলে কথা বল! রেগে গেল সান। ও আমার বন্ধ ছিল। ওর জিনিস মরে গেলেও নিতে যাব না আমি। তাছাড়া, ম্যাং জানি বটে, কিন্তু উইলের সমস্ত রাইম আমিও জানি না।
নিশ্চয় মূল্যবান কিছু জানেন আপনি, স্বর নরম করে বলল কিশোর। কারমল নিয়মিত আসতেন আপনার কাছে। তিনি…
দেখ, আমি এলসাকে সাহায্য করব না!
দেখুন, শান্তকণ্ঠে বলল কিশোর, কারমল নিশ্চয় চেয়েছেন আপনি সাহায্য করবেন, যে ধাঁধার জবাব জানতে আসবে তাকেই। মাথা খাঁটিয়ে বের করার কথা বলেছেন আপনার বন্ধু। এলসা যদি মাথা খাঁটিয়েই নিতে চায়, অসুবিধে কি? উত্তরাধিকার সূত্রে তো আর পাচ্ছে না।
তা ঠিকই বলেছ, নরম হল বুড়ো বেশ, বল কি জানতে চাও।
ধাঁধার জবাব খুঁজতে খুঁজতে আপনার কাছে পৌঁছেছি, কিশোর বলল। আমাদের মনে হয়েছে, বল অভ টোয়াইন মানে রোড সাইন। আপনি কি বলেন?
ছন্দ তো মেলে। তবে বল অভ টোয়াইনের রাইমার স্ল্যাং সাইন কিনা বলতে পারব না। হাসি দেখা গেল বুড়োর নীল চোখের তারায়। নিজে নিজেই বানিয়ে থাকতে পারে। পঞ্চাশ বছর আগে অস্ট্রেলিয়ার কোন দুর্গম অঞ্চলে কিছু শুনে এসে সেটা দিয়েই বানিয়েছে কিনা কে জানে। ওর পক্ষে সম্ভব।
কারমল ইঙ্গিত দিয়েছেন, বাসে চড়ে সাইন শুনতে শুনতে যাবার। তার বাড়ি আর আপনার বাড়ির মাঝের পথে। নিশ্চয় দশ নাম্বার সাইনটা কোন সূত্র।
তাহলে ওখানে গিয়ে না খুঁজে আমাকে কেন বিরক্ত করছ? খুঁজেছি, মুসা বলল। পাইনি।
তাই নাকি? শয়তানী বুদ্ধিতে মগজ বোঝাই ছিল ওটার, আবার ফ্যাকফ্যাক করে হাসল বুড়ো।
তা ছিল, মানতে বাধ্য হল কিশোর। কিন্তু বাস রুটে কিছু একটা রয়েছে, যেটা শুধু আপনি জানেন, মিস্টার সান।
জানি? কি সেটা? নেচে উঠল আবার বুড়োর চোখের তারা।
সেটা আপনি জানেন।

চালাক ছেলে, মাথা ঝাঁকাল সান। হ্যাঁ, বাসে চড়ে আসার মধ্যেও তার বিশেষত্ব ছিল। ওকে চিনলে, ওর কাজকর্মে আর কেউ অবাক হবে না।
কি করতেন? জানতে চাইল রবিন।
হাসল সান। সাঙ্ঘাতিক কিপটে ছিল তো, কায়দা করে বাসের পয়সাবাঁচাত। শহরে যাবার পথে আমার বাড়ির কাছের স্টপেজটাই হায়ার জোন-এর শেষ স্টপেজ, উচ্চতার জন্যে বেশি পয়সা দিতে হয়। এর পরেরটা থেকে আর দিতে হয় না। তাই ওখানে হেঁটে চলে যেত সে, তাতে সাত সেন্ট বাঁচত।
স্তব্ধ হয়ে গেল তিন কিশোর। সবার আগে কথা ফুটল মুসার, তারমানে আপনার দোরগোড়া থেকে নয়, সাইন গুনতে হবে পরেরটা থেকে?
যা, কুটিল হাসিতে নেচে উঠল বুড়োর চোখ। তাই বুঝিয়েছে।
আর এক মুহূর্ত দাঁড়াল না তিন গোয়েন্দা। ঘুরে দৌড় দিল বাস ধরার জন্যে। পেছনে শোনা গেল সানের অট্টহাসি।
আগেই আন্দাজ করা উচিত চিল, কিশোর বলল। এখানে উঠলে পয়সা বেশি দিতে হয়।
এক কাজ করলে কেমন হয়? মুসা বলল। কারমলের মত আমরাও এক স্টপেজ হেঁটেই যাই। পয়সা বাঁচবে, হয়ত কিছু চোখেও পড়তে পারে।
উত্তম প্রস্তাব, রবিন বলল।
সুতরাং এক স্টপেজ হেটে এসে বাসে উঠল ওরা। পথে নতুন কিছু অবশ্য চোখে পড়ল না।
প্রথমবার দশ নাম্বার সাইন যেটাকে ধরেছিল, সেটার কাছে এসে গর্ত দেখল অনেকগুলো, তবে শুঁটকিকে আর দেখা গেল না। বোটানিক্যাল গার্ডেন পেরোল..ডেপুটির অফিস গেল...অনেক পরে পার্ক রোড যেখানে কারমলের বাড়ির রাস্তার সঙ্গে মিশেছে, সেখানে এসে দেখল পরের লাইনটা। লেখা রয়েছেঃ টার্ন লেফট হিয়ার ফর ফেয়ারভিউ শপিং মল। অর্থাৎ বাঁয়ে ঘুরলে ফেয়ারভিউ শপিং মল পাওয়া যাবে।
লাভটা কি হল? হতাশ হয়ে হাত ওল্টাল মুসা। যে গোলকধাঁধা সেই গোলকধাঁধা। বাজারে খোঁজা সম্ভব নাকি? কজায়গায় খুঁজব?
আমি শিওর, এটাই সঠিক সাইন, জোর দিয়ে বলল কিশোর। এখান থেকেই পরের সূত্র খুঁজে বের করতে হবে।
বাস থেকে নেমে শপিং সেন্টারের দিকে হাঁটতে শুরু করল ওরা। বিরাট এলাকা নিয়ে মস্ত সুপারমার্কেট করা হয়েছে। নানারকম দোকান ছাড়াও রয়েছে রেস্টুরেন্ট, স্ন্যাক-বার। সেদিকে চেয়ে দমে গেল তিন গোয়েন্দা।

পকেট থেকে নকলটা বের করল গোয়েন্দাপ্রধান। আপনমনেই বলল, টেনথ বল অভ টোয়াইন আমাদেরকে নিয়ে এসেছে শপিং সেন্টারে। তারপরে? ইউ অ্যাণ্ড মি; সী আওয়ার হ্যান্ডসাম মাগ অ্যাহেড।
রবিন বলল, ইউ অ্যাণ্ড মি হল আ কাপ অভ টী।
মরেছে, সেন্টারে গিজগিজ করছে লোক, সেদিকে তাকিয়ে বলল মুসা। এক কাপ চা নিয়ে ওখানে কেউ বসে আছে নাকি আমাদের জন্যে।
বসে হয়ত নেই, কিশোর বলল। তবে চা কোথায় পাওয়া যাবে, তা জানি। ওই দেব।
একটা পনিরের দোকান আর একটা কার্পেটের দোকানের মাঝের দোকানটা চায়ের নাম লেখা রয়েছে দ্য স্ট্যাটফোর্ড টী শপ্পে। নামটার মতই অক্ষরও ইংরেজি পুরানো ধাচে লেখা। জানালার ওপাশে দেখা যাচ্ছে কেকের সারি।
ছোট রেস্টুরেন্ট, রবিন বলল।
হ্যাঁ, বলল কিশোর। আর আমরা কারমলের বাড়ি থেকে মাত্র এক ব্লক দূরে রয়েছি। নিশ্চয় এখানে চা খেতে আসত সে।
ভেতরে ঢুকল ছেলেরা। ছোট ছোট একসারি ঘর রয়েছে, নিচু ছাত। একেবারে খাঁটি ইংলিশ টী শপ। স্ট্যান্ডে দাঁড় করানো রয়েছে স্টাফ করা মাছ, দেয়ালে শোভা পাচ্ছে জজানোয়ারের মাথা, রকি বীচের প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি। ছোট ছোট টেবিলগুলোকে ঘিড়ে ভিড় করে বসেছে লোকে, চা কেক খাচ্ছে। এ
ছেলেদের দিকে এগিয়ে এল এক সুন্দরী ওয়েইট্রেস। হেসে জিজ্ঞেস করল কিছু লাগবে কিনা।
কটা কথা জানতে এসেছিলাম, সৌজন্য দেখিয়ে খুব ভদ্রভাবে বলল কিশোর। মিস্টার কারমল কি প্রায়ই আসতেন এখান?
আসতেন। হপ্তায় অন্তত তিন-চার দিন।
যা, আমারও তাই ধারণা ছিল। নিশ্চয় নির্দিষ্ট একটা মগে চা খেতেন। ওটা দেখতে পারি?
মগ? অবাক হল ওয়েইট্রেস। কোন মগ তো ছিল না। তাছাড়া মগ ব্যবহার করি না আমরা, কাপে চা দিই…
ছিল না? তাহলে…তাহলে…
রবিন বলল, এখানে কখন আসতেন তিনি, কি কি করতেন, কি খেতেন বলতে পারবেন?
নিশ্চয় পারব। বিকেলের দিকেই আসতেন, ঠিক এই সময়। দুতিন কাপ ওললাং আর একটা নরম রোল খেয়ে চলে যেতেন।
ওলোংটা কি জিনিস? মুসা জানতে চাইল।

চীনা চা। ভাল তৈরি হয় আমাদের এখানে, লোকে খায়ও প্রচুর।
মিস্টার কারমল কোন নির্দিষ্ট চেয়ারে বসতেন? রবিন জিজ্ঞেস করল।
হ্যাঁ, এসেই ছয় নাম্বার টেবিলটার খোঁজ করতেন। ওটা খালি না থাকলে অন্য টেবিলে বসতেন।
টেবিলটা দেখতে পারি? কিশোর বলল।
তা পার। খালিই আছে এখন।
ওয়েইট্রেসের পিছু পিছু কোণের একটা টেবিলের কাছে চলে এল ছেলেরা। টেবিলের পাশে দেয়ালে বসানো একটা দানবীয় তলোয়ার মাহ। চেয়ারে বসল মুসা। খাইছে! এখানে বসে উল্টোদিকের দেয়াল ছাড়া তো আর কিছুই দেখা যায় না।
রবিন বসল আরেকটা চেয়ারে। শুধু সামনের দেয়াল দেখা যায়, কিশোর। একটা হরিণের মাথা, বড় একটা আয়না আর গোটা দুই ছবি, ব্যস। মগটগ নেই।
কিশোর, প্রায় চিৎকার করে উঠল মুসা। হরিণটার নাক আছে! পরের ধাঁধায় নাকের কথা বলা হয়েছে না?
নকল বের করে পড়ল কিশোর, ওয়ান ম্যানস ভিকটিম ইজ অ্যানাদারস ডারলিন, ফলো দ্য নোজ টু দ্য প্রেস। মানে হল, একজনের শিকার আরেকজনের প্রিয়, নাক অনুসরণ করে জায়গামত যাও। বেশ। হরিণটা অবশ্যই একজনের শিকার। হরিণ ইংরেজি ডিয়ার, প্রিয় ইংরেজিও ডিয়ার, দুটো শব্দের বানান আলাদা হলেও উচ্চারণ এক। প্রিয়, অর্থাৎ ডিয়ারের প্রতিশব্দ ডারলিং। আবার ডারলিংকে অনেকে উচ্চারণ করে ডারলিন।
করে, রবিন বলল। কিন্তু হরিণের নাক তো এই টেবিল ছাড়া আর কোনদিকে নির্দেশ করছে না।
আশা ছাড়তে পারল না কিশোর। ওই ছবিগুলোতে কিছু নেই তো?
এগিয়ে গিয়ে দেয়ালে ঝোলানো ছবিগুলো কাছে থেকে দেখল তিনজনে। একটাতে রয়েছে রকি বীচের একটা হোটেল, যেটা বহু বছর আগেই ভেঙে ফেলা হয়েছে। আরেকটাতে আগের বছরের ফিয়েস্টা ডেপরেডের দৃশ্য।
টেবিলে কিছু লুকানো নেই তো? রবিন বলল।
টেবিলের ওপরে নিচে তন্ন তন্ন করে দেখা হল। কিছু পাওয়া গেল না। ঘড়ি দেখল ওয়েইট্রেস। দেখ, এখন আমরা খুব ব্যস্ত।
বেরিয়ে যেতে বলা হচ্ছে, বুঝল ছেলেরা। খুবই নিরাশ হয়ে বেরিয়ে এল চা দোকান থেকে। দেরি হয়ে গেছে অনেক, ডিনারের সময় প্রায় হয়ে এসেছে।
ক্ষুধায় মারা যাচ্ছি, ঘোষণা করল মুসা। অযথা এসব খেখুজি বাদ দিয়ে চ বাড়ি চলে যাই। সাইকেলগুলোও নিতে হবে।...

হ্যাঁ, তাই চলে, এভাবে বিফল হয়ে ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে না কিশোরের। তবে চলো আগে এলসার সঙ্গে দেখা করে যাই। চা দোকানের ব্যাপারে হয়ত কোন তথ্য দিতে পারবে।
জানালার কাছে দাঁড়িয়ে ছেলেদের কথা শুনল এলসা। কি জানি। ওই দোকানের কথা আমি কিছু জানি না।
ওলোঙের কোন বিশেষ মানে হয়? রবিন জানতে চাইল।
কি? অন্যমনস্ক মনে হল এলসাকে। আঁ...আসলে কোন কথায়ই মন দিতে পারছি না। সেই দুপুরের পর থেকে আর নরির খবর নেই।...কি যেন বলছিলে, ওললাং? এক জাতের চা, কারমলের খুব প্রিয় ছিল...ওফ, বাঁচা গেল! ওই যে নরি আসছে, সঙ্গে রস!
তাড়াতাড়ি দরজার দিকে এগোল এলসা। ঘরে ঢুকল নরি আর উড। বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে ছেলেটাকে।
এদিকেই আসছিলাম, উড জানাল। শপিং সেন্টারে ঘুরঘুর করতে দেখলাম ওকে। ভুরু কেঁচকাল মুসা। নিশ্চয় আবার আমাদের পিছু নিয়েছিল। রাস্তার ইটকেও বিশ্বাস কোরো না তোমরা চেঁচিয়ে উঠল নরি। আমি...
কর, নরি! ধমক দিল এলসা। সকালেই তোমাকে মানা করেছি, একা। একা বাড়ি থেকে না বেরোতে।
থাক, হয়েছে, হাত তুলল উড। ছেলেরা, এবার বল তো কতখানি এগোলে।
ঘরের ভেতরে পায়চারি করতে করতে ছেলেদের কথা শুনল সে। বলল, চা। দোকানে মগ নেই, তোমরা শিওর?।
শিওর, কিশোর বলল। তার ঘরে নেই তো?
থমকে দাঁড়াল উড। তারপর কি মনে করে ছুটল কারমলের ঘরের দিকে। পিছু নিল অন্যেরা। ধুলোয় ঢাকা ঘরটায় গরুখোঁজা করা হল। মগ একটা পাওয়া গেল বটে, ধূসর রঙের সাধারণ মগ, কোন চিহ্নটিহ্ন নেই।
নাহ, এটা না, মাথা নাড়ল কিশোর।
মগটা রাগ করে ছুঁড়ে ফেলে দিল উড। ইস, এগোনোই যাচ্ছে না, মুঠো করে ফেলল হাত। অথচ তাড়াতাড়ি করা দরকার। এজটাররা আর ডয়েলদের ওই ছেলেটা যেভাবে উঠে পড়ে লেগেছে, আমাদের আগেই না পেয়ে যায়!
মা, নরি বলল, দাদা...।
তাকে থামিয়ে দিল তার মা। তোমার গোসলের সময় হয়েছে। যাও।
তার কথা শুনল না দেখে রাগ করে দুপদাপ পা ফেলে বেরিয়ে গেল নরি।
ধুলোয় ঢাকা ঘরটাতেই পায়চারি শুরু করল আবার উকিল। মাগ-এর সঙ্গে ছন্দ মেলে এরকম আর কি কি শব্দ আছে?

চা দোকানে ওরকম তো কিছু চোখে পড়ল না, কিশোর বলল। মাগের সঙ্গে মেলে বাগ, হাগ, লাগ, রাগ…
কি হয়, সেটা তুমি মিলিয়ে নিয়ো, আচমকা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল উডের কণ্ঠ। জলদি সমাধানের চেষ্টা কর। নইলে অন্য গোয়েন্দা ভাড়া করতে হবে আমাকে।
মনমরা হয়ে কারমলের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা। বাস ধরে ডিপোতে ফিরে যেতে হবে। স্টপেজের দিকে এগোতে এগোতে চমকে উঠল রবিন। এই, দেখ, সেই গাড়িটা!
পরিচিত নীল গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে পথের ধারে। পেছনে গাছের ছায়ায় নড়ছে দানবীয় ছায়া।
এই নিয়ে তিনবার দেখা হল, ফিসফিস করে বলল কিশোর। আর কাকতালীয় বলা যাবে না। নিশ্চয় আমাদের ওপর নজর রাখছে, কিংবা…
কিশোর,মুসা বলল, আরেকজন!
হোট আরেকটা ছায়ামূর্তি যোগ দিল বড়টার সঙ্গে।
চলো, শুনি, ওরা কি বলে, কিশোর বলল। এমন ভাব দেখাবে, কিছু দেখিনি আমরা। খানিক দূর গিয়ে ঘুরে আবার ফিরে আসব।
খানিক দূর এগিয়ে, রাস্তা থেকে নেমে গাছপালার ভেতরে ঢুকে পড়ল ওরা। ঘুরে ফিরে এল গাড়িটার কাছাকাছি। আস্তে মাথা তুলল মুসা। ফিসফিসিয়ে বলল, দৈত্যটা আবার একা হয়ে গেছে।
পেছনে মট করে একটা কুটো ভাঙল। ঝট করে মাথা ঘোরাল ছেলেরা। জ্বলন্ত চোখে তাদের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে হালকা-পাতলা একজন মানুষ। টুপির কানা সামনের দিকে নামানো। কালো জ্যাকেটের বুক খোলা। ভেতরে হোলস্টারে পিস্তল দেখা যাচ্ছে। কঠিন গলায় ধমক দিল, এখানে কি?
আরেক ধার থেকে উদয় হল দৈত্যটা। ছয় ফুট নয় ইঞ্চির কম হবে না লম্বায়, ভোতা নাক, ছড়ানো বড় বড় কান, অস্বাভাবিক লম্বা হাত।
আমাদের ওপর চোখ রাখছিলেন কেন? বেপরোয়া হয়ে গেল মুসা। কে বলল চোখ রাখছি? কর্কশ কণ্ঠে বলল পাতলা লোকটা।
তাহলে কি করছেন? পাল্টা প্রশ্ন করল রবিন।
নিজের চরকায় তেল দাও গিয়ে, থোকা। যাও, ভাগ।
এত সহজে ছাড়া পাবে ভাবেনি ছেলেরা, দৌড় দিল গাছপালার ভেতর দিয়ে। বাস আসার শব্দ শুনল। স্টপেজে এসে বাসটা ধরল ওরা। শহরমুখো অর্ধেক রাস্তা যাবার আগে কথা বেরোল না কারও মুখ দিয়ে।
রবিন বলল, লোকগুলো কে?

কি জানি, হাত নাড়ল কিশোর। ছোটটার কাছে তো পিস্তল দেখলাম। গোয়েন্দা হতে পারে। চোর-ডাকাতও হতে পারে।
গোয়েন্দা? এজটাররা ভাড়া করেনি তো?
করতে পারে! যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখন সী আওয়ার হ্যাণ্ডসাম মাগের মানে বের করতে হবে আমাদের।
গুঙিয়ে উঠল মুসা। মাগের সঙ্গে থাগ, অর্থাৎ ঠগেরও ছন্দ মেলে। ওই দৈত্যের মত ঠগের কাছাকাছি মগ খুঁজতে গিয়ে আর বিপদে পড়তে চাই না।
বাবা, মাগ মানে কি? জিজ্ঞেস করল মুসা।
পরদিন সকালে, খবরের কাগজ পড়ছিলেন মিস্টার আমান। কাগজটা নামিয়ে বললেন, মাগ মানে মগ। কাগজ আবার তুলতে তুলতে বললেন, অবশ্য যদি সেকেণ্ড-রেট কোন লোকের কথা না বল...
মানে?
রাস্তায় ধরে পথিককে পিটিয়ে যে জিনিসপত্র কেড়ে নেয় তাকেও বলে মাগ।
নাহ।
মাগ শট বলে-আরেকটা শব্দ আছে, বললেন তিনি। পুলিশের ভোলা ছবি, চোর-ডাকাতের ক্লোজ আপ তাছাড়া আয়না...
মাগ শট? আয়না! চোখ বড় বড় হয়ে গেল গোয়েন্দা সহকারীর। সজোরে চাপড় মারল উরুতে। তাই হবে!
কি হবে? কাগজের ওপাশ থেকে জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার আমান। জবাব না পেয়ে কাগজ নামিয়ে দেখলেন, রিসিভার তুলে ততক্ষণে ডায়াল শুরু করে দিয়েছে মুসা।
হেডকোয়ার্টারে কিশোরকে পেল না মুসা। ঘরে রয়েছে গোয়েন্দাপ্রধান। তাকে ওখানে ধরল সে। চেঁচিয়ে বলল, সুখবর আছে! রবিনকে আসতে বল!
রিসিভার নামিয়ে দরজার দিকে দৌড় দিল মুসা।
কয়েক মিনিট পর হেডকোয়ার্টারে ঢুকে দেখল, কিশোর বসে আছে। রবিন এসে পৌঁছায়নি।
এসে যাবে, কিশোর বলল। তা কি সুখবর?
সী আওয়ার হাওসাম মাগ অ্যাহেড-এর জবাব, হেসে নাটকীয় ভঙ্গিতে চেয়ারে হেলান দিল মুসা। জানি এখন।
কী?
মুসা জবাব দেয়ার আগেই টেলিফোন বাজল। রিসিভার তুলে নিল কিশোর। এলসা করেছে। নরি আবার হারিয়েছে, বলল উল্কণ্ঠিত মা। আজ সকালে উঠে বলল, মাগের মানে জানে। আমার মনে হয় চায়ের দোকানটাতে গিয়েছে সে।

অনেকক্ষণ হল, এখনও ফিরছে না, ভয় লাগছে আমার। বাড়ির আশেপাশে ঘুরঘুর করছে কিছু আজব লোক। এজটারদের গাড়ি দেখেছি বলেও মনে হল।
আজব মানুষগুলোর একজন কি দৈত্য?
হ্যাঁ। আগেও দেখেছি তাকে। রসকে ফোন করেছিলাম, পাইনি।
এক্ষনি শপিং সেন্টারে যাচ্ছি আমরা, কথা দিল কিশোর। আগের মানে কি, বলেছে কিছু নরি?
না। প্লীজ, তাড়াতাড়ি কর, কিশোর।
করবে, বলে রিসিভারও রাখল কিশোর, রবিনও ঢুকল ট্রেলারে। কি হয়েছে জানানো হল তাকে। গম্ভীর হয়ে বলল কিশোর, নরির যদি কিছু ঘটে যায়, তাহলে কারমলের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়ে যাবে এজটাররা।
কিন্তু মুসা কি যেন জানাবে বললে? রবিন জিজ্ঞেস করল।
সেটার দিকেই তো তাকিয়ে আছি এখন, হেসে বলল মুসা।
কোথায়? চারপাশে খুঁজল রবিন, কিশোরও খুঁজছে।
তোমাদের দুজনের সামনেই!
ভ্রূকুটি করল গোয়েন্দাপ্রধান। ঠাট্টার সময় নয় এটা, সেকেণ্ড।
কই, রবিন বলল, শুধু তো দেখছি ডেস্ক, দেয়াল, পুরানো আয়না, শেকসপীয়ারের মূর্তি…
বুঝেছি! নাকমুখ এমনভাবে কুঁচকে ফেলল কিশোর, যেন নিমের তেতো খেয়েছে। কেউ তার ওপর টেক্কা দিক এটা সইতে পারে না সে। আওয়ার হ্যাণ্ডসাম মাগ। কারমলের আরেকটা শয়তানী।
কই? আবার বলল রবিন। দেখছি না তো কিছু।
আয়না, রবিন, কিশোর বলল। আমরা আমাদের চেহারা দেখতে পাচ্ছি। মাগ হল চেহারার স্ল্যাং। চা দোকানের দেয়ালেও একটা বড় আয়না লাগানো আছে। সী আওয়ার হ্যান্ডসাম মাগ অ্যাহেড বলে আয়নার ভেতর দেখতে বলা হয়েছে।
চলো, জলদি, মুসা তাগাদা দিল।
ট্রেলার থেকে বেরিয়ে সাইকেলে চাপল ওরা। রওনা হল কারমলের প্রিয় চায়ের দোকানে। পৌঁছে দেখল ভোলাই আছে, তবে ভিড় কম, অল্প কয়েকজন। খরিদ্দার, দুপুরের আগে বাড়বে না। নরি নেই ওখানে। আগের দিনের ওয়েটসকেও দেখতে পেল ওরা। প্রশ্নের জবাবে বলল, যা, ওই বয়েসের একটা ছেলেকে দেখেছি। ঘন্টাখানেক আগে এসে বসেছিল ছয় নাম্বার টেবিলে, কিছুক্ষণ বসে থেকে চলে গেছে।
আর কাউকে দেখেছেন? কিশোর জিজ্ঞেস করল।

মোটা এক লোক, আর রোগাটে এক মহিলা। ছেলেটা আসার আগে এসেছিল, মিস্টার কারমলের কথা জিজ্ঞেস করল, আমি বললাম ছয় নাম্বার টেবিলে বসতে। ওরাও বসল। তবে ছেলেটার মত সন্তুষ্ট মনে হয়নি ওদেরকে।
থ্যাঙ্ক ইউ, মিস, বলে বন্ধুদের দিকে ঘুরল কিশোর।
কি মনে হয়, এজটাররা নরিকে ধরে নিয়ে গেছে? রবিন বলল।
তার পিছুও নিয়ে থাকতে পারে।
মাগের জবাব নিশ্চয় পেয়ে গেছে নরি, নইলে সন্তুষ্ট মনে হত না, মুসা বলল। তাকে খুঁজে বের করতে হলে এখন তাড়াতাড়ি পরের ধাঁধাটার জবাব জানতে হবে আমাদের।
ছয় নাম্বার টেবিলের পাশে গিয়ে বসল কিশোর। আয়নার ভেতরে তাকাল। তার কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি দিল মুসা আর রবিন।
নিজের চেহারা দেখতে পাচ্ছি, কিশোর বলল। আর, টেবিল, তলোয়ার মাছ, দেয়ালে ঝোলানো পুরানো একটা খাদ্য তালিকা, দুটো ছবি...এই তো।
পরের ধাঁধাটা পড়ে দেখ, কিশোর, পরামর্শ দিল রবিন।
নকলটা বের করে পড়ল কিশোর, ওয়ান ম্যানস ভিকটিম ইজ অ্যানাদারস ডারলিন, ফলো দ্য নোজ টু দ্য প্রেস।
রবিন বলল, বিশেষ কোন চেহারার কথা বোঝায়নি কারমল। সে জানত না কখন কোন মুখটা উঁকি দেবে আয়নার ভেতর।
মুসা বলল, ছবি দুটোও বন্দরের। শিকার কিংবা প্রিয় কিছুই নেই ওগুলোতে। আর নাকও তো আমাদের তিনটে ছাড়া আর কারও দেখছি না।
পুরানো খাদ্য তালিকাটার ব্যাপারে কি মনে হয়? রবিনের প্রশ্ন।
না, জোরে জোরে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর। মনে হয় বুঝতে পারছি। শিওর হওয়া দরকার। এস।
ওয়েট্রেসের কাছে গিয়ে পাবলিক টেলিফোন কোথায় জিজ্ঞেস করল কিশোর।
আমাদের এখানে নেই, ওয়েট্রেস বলল। রাস্তার ওপারে পেট্রল পাম্পটায় গিয়ে দেখতে পার।
পেট্রল পাম্পটা বন্ধ। তবে বুদটা দেখা গেল, বাইরে। ডিরেক্টরিতে ড্যাম সানের নাম্বার খুঁজে বের করে তাকে ফোন করল।
আবার তুমি, খসখসে কণ্ঠে বলল বুড়ো।
স্যার, নরম গলায় বলল কিশোর। আপনি বলেছেন, মিস্টার কারমলের সব স্ল্যাঙের মানে আপনি জানেন না। কিন্তু আমি যদি ব্ল্যাঙের শব্দটা কি হবে আপনাকে বলে দিই, কি শব্দ দিয়ে সেটা বোঝানো হয় তা তো বলতে পারবেন?
মানে?

মানে মারলিন বলে ডারলিন বোঝানো হয়। কিন্তু উল্টোটা বলেছেন মিস্টার কারমল। ডারিন বলেছেন মারলিন বুঝে নেয়ার জন্য। রাইমিং স্ল্যাং যদিও হয় না এটা,তাই না?
ফিকফিক করে হাসল বুড়ো। তুমিও তাহলে বুঝে ফেলেছ। চালাক ছেলে।
আমিও মানে! সতর্ক হয়ে গেল কিশোর। আরও কেউ বুঝেছে নাকি?
হ্যাঁ, কারমলের নাতি। খুব চালাক। দাদার চেয়ে কম ধড়িবাজ না।
বুড়োকে ধন্যবাদ দিয়ে রিসিভার রেখে দিল কিশোর। ফিরে চলল চায়ের দোকানে। সঙ্গে চলল দুই সহকারী।
মারলিন মানে কি, কিশোর? মুসা বলল।
বড় জাতের মাছ, তলোয়ার মাছেরই প্রজাতি।
খাইছে! নাক আছে নাকি ওগুলোর?
আবার চায়ের দোকানে ঢুকল তিন গোয়েন্দা। সোজা এগিয়ে গেল দেয়ালের মাছটার কাছে। কিছুটা অবাক হয়েই ওদের দিকে তাকিয়ে রইল ওয়েইট্রেস।
মাছের নাক একটা ছুরির দিকে, রবিন বলল।
সামনের দেয়ালে ঝোলানো ফ্রেমে বাঁধাই ছবিটার কাছে এসে দাঁড়াল ওরা।
আরি, মুসা বলল, রকি বীচ টাউন হলের ছবি দেখি।
ফলো দ্য নোজ টু দ্য প্লেস, বিড়বিড় করল কিশোর। নাক অনুসরণ করে ওই জায়গা, মানে ওই টাউন হলে যেতে বলছে!
হোয়্যার, বুঝে ফেলল রবিন, মেন বাই দেয়ার ট্রাবল অ্যাণ্ড স্ট্রাইফ। দ্য ম্যারিজ লাইসেন্স ব্যুরো। বিয়ের ব্যাপার-স্যাপার। বাই বলেছে সে-কারণেই।
হ্যাঁ, মাথা ঝাঁকাল কিশোর। নরি নিশ্চয় ওখানে চলে গেছে। ওর মাকে জানানো দরকার।
আবার পেট্রল পাম্পে এল ফোন করার জন্যে। ডায়াল করছে কিশোর, হঠাৎ কান খাড়া করে ফেলল মুসা। এই শোন শোন! শুনছ?
ডায়াল থামিয়ে কিশোরও কান পাতল। তিনজনেই শুনতে পেল বিচিত্র শব্দ। ধাতব কিছুর ওপর দিয়ে হিঁচড়ে নেয়া হচ্ছে ভারি কিছু।
কী...? বুঝতে পারছে না মুসা।
ওই ঘরের ভেতরে, পেট্রল পাম্পের অফিসটা দেখাল রবিন।
অফিসের বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে আছে তিনজনে। এই সময় শোনা গেল চাপা মৃদু চিত্তার, বাঁচাও! বাঁচাও!
বন্ধ ঘরের ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করল মুসা। কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।
বাঁচাও, বাঁচাও! শোনা গেল আবার।
অফিসের পেছন থেকে আসছে! বলে উঠল রবিন।

পেছনে তিনটে পার্ক করা কার আর একটা ভ্যান দেখা গেল। আবার শোনা গেল হিচড়ানোর আওয়াজ।
মনে হচ্ছে ভ্যানের ভেতরে, মুসা অনুমান করল।
বাঁচাও! শোনা গেল আবার চাপা চিৎকার। নরি! কিশোর বলল। ভ্যানটা খুলতে হবে!
দরজায় তালা নেই। টেনে খুলতেই দেখা গেল, মেকানিকরা মাটিতে যে ক্যানভাস বিছিয়ে কাজ করে, তার একটা বড় বাণ্ডিল। নড়ে উঠল বাণ্ডিলটা, ভ্যানের ছাত থেকে ঝুলে থাকা ভারি একটা পুলিতে বাড়ি লাগল, ওটা ঘষা লাগল ধাতব দেয়ালে। হিচড়ানোর মত আওয়াজ করছে ওটাই।
ক্যানভাসের বাণ্ডিল নিয়ে টানাটানি শুরু করল ছেলেরা। ভেতর থেকে বেরোল নরি। হাত-পা বাঁধা। বাঁধনমুক্ত হয়ে ধড়মড়িয়ে উঠে কন্সল সে, চেহারা ফ্যাকাসে। তবে সাহস হারায়নি।
কি হয়েছিল, নরি? রবিন জিজ্ঞেস করল।
আমার মনে পড়ে গিয়েছিল, দাদা বলত, কিছু লোকের মাগ কুৎসিত, আর কিছু লোকের সুন্দর। আয়নার কথা আন্দাজ করলাম, গর্বের সঙ্গে বলল নরি। মাছটা দেখলাম, বুঝলাম মারলিনের কথা বলেছে। কারণ, প্রায়ই ওই মাছের গল্প করত সে। দেখলাম, ওটার নাক একটা ছবির দিকে। টাউন হলের ছবি। মিস্টার সানকে ফোন করে জেনে নিলাম আমার অনুমান ঠিক কিনা। আমিও রিসিভার রাখলাম, এই সময় পেছন থেকে হঠাৎ আমার মাথায় একটা ব্যাগ ঢুকিয়ে দিল লোকটা। চেহারা দেখিনি। তারপর হাত-পা বেঁধে গাড়িতে ফেলে রেখে চলে গেল। তোমাদের সাড়া পেয়েই চেঁচাতে শুরু করলাম।
ভাল করেছ,মুসা বলল।
এজারদের আর টেরিকে ঘুরঘুর করতে দেখেছি শপিং সেন্টারে। বোধহয় ফোনে বেশি জোরে কথা বলে ফেলেছিলাম, ওরা পেছন থেকে শুনেছে আমার কথা। এত কষ্ট সব মাঠে মারা গেল আমার,হতাশ দেখাল নরিকে।
ধাঁধার চমৎকার সমাধান করেছ, তুমি, প্রশংসা করল কিশোর। আর খুব সাহস তোমার। ভুল আমরা সবাই করি, বুঝলে। এতে এত দুঃখ পাওয়ার কিছু নেই। তবে ভবিষ্যতে আরও হুঁশিয়ার হয়ে কাজ করবে।
এখন তো তাহলে তোমাদের সঙ্গে কাজ করতে পারি? অনুরোধ করল নরি। প্লীজ! তোমাদের সব কথা মেনে চলব। যা করতে বলবে তাই করব। বিপদে ফেলব না।
কিন্তু...
অসুবিধে কি? মুসা বলল। ছেলেটা প্রমাণ করে দিয়েছে, তার সাহস আছে। তাছাড়া বুদ্ধিও কম নয়, একটা ধাঁধার সমাধান তো আমাদের আগেই করে

ফেলল।
নেয়া যায়, রবিনও নরির পক্ষ নিল।
বেশ, অবশেষে রাজি হল কিশোর। নিতে পারি, যদি তোমার মা অনুমতি দেন।
নরি ভাল আছে শুনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল তার মা। কিন্তু কিশোর যখন বলল, ছেলেকে সঙ্গে নেবে কিনা, দ্বিধা করল এলসা।
বুদ্ধিশুদ্ধি বেশ ভালই আছে আপনার ছেলের, কিশোর বলল। তাছাড়া বাড়িতে রেখেও নিশ্চিন্ত থাকতে পারছেন না। যখন তখন আপনাকে ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে বরং বিপদেই পড়ছে।
হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। ঠিক আছে। যাক। তবে ওর ওপর কড়া নজর রাখবে, প্লীজ।
সুখবরটা নরিকে শোনাল কিশোর।
চায়ের দোকানের কাছে পার্ক করে রাখা সাইকেলগুলো নিয়ে রকি বীচে চলল ওরা। রোববারের জনবিরল পথ। কোর্টহাউস আর টাউনহলের কাছে লোকজন বিশেষ নেই, দুচারজনকে এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করতে দেখা গেল। রোববারে বিক্রি বন্ধ, কিন্তু তবু টুরিস্ট আকর্ষণের জন্যে দোকানপাটগুলো খুলে রাখা হয়েছে।
ম্যারিজ লাইসেন্স ব্যুরোর ছোট ঘরটা টাউন হলের দোতলায়, বাঁয়ে, পেছনে একেবারে শেষ মাথায়। শূন্য ঘরটায় ঢুকল ছেলেরা। নকল বের করে পড়ল কিশোর, হোয়্যার মেন বাই দেয়ার ট্রাবল অ্যাণ্ড স্ট্রাইফ, গেট আউট ইফ ইউ ক্যান।
নীরব ঘরটায় চোখ বোলাল ওরা। ডানে বিজনেস উইনডোগুলো বন্ধ। বাঁয়ে দেয়ালের সমান্তরালে লম্বা উঁচু একটা রাইটিং কাউন্টার। সামনের দিকে গরাদওয়ালা দুটো জানালার নিচে একটা কাঠের বেঞ্চ। নানারকম নোটিশ, আর গভর্নর এবং মেয়রের ছবি ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে দেয়ালে।
এখানেই তাহলে স্ত্রী কেনে লোকে, মুসা বলল। মানে বিয়ের লাইসেন্স জোগাড় করে। কথা হল, গেট আউট ইফ ইউ ক্যান দিয়ে কি বুঝিয়েছে?
আবার উল্টো কথা বলেনি তো? রবিন বলল।
বোঝা যাবে, কিশোর বলল। আগে পরের ধাঁধাটা পড়ে দেখি কিছু বোঝা যায় কিনা। ইন দ্য পশ কুইনস ও নেড, বি ব্রাইট অ্যাণ্ড নেচারাল, অ্যাণ্ড দ্য প্রাইজ ইজ ইওরস। এ-ঘরের কোন জিনিস হয়ত কোন রানী কিংবা বিছানা দেখাবে আমাদের।
কোথায়? নরি বলল।.ওরকম কিছু তো দেখছি না।
না, ধীরে ধীরে বলল কিশোর, পশ কুইনস ও নেড এঘরে থাকবেই এমন কোন কথা নেই। গেট আউট ইফ ইউ ক্যান দিয়ে কি বোঝায়, বোঝার চেষ্টা করে দেখি।

গেট আউটের মানে এসকেপ বা পালানো হয়।
তবে কি ফায়ার এসকেপ? কিন্তু ঘরটা দোতলায়। কাছাকাছি কোন ফায়ার এসকেপ নেই। এসকেপ যদি হয় তাহলে তো রাইম হল না, রবিন বলল।
হলে নেই, মানে হলেই হল, বলল মুসা। জানালা? ওটা দিয়েও পালানো যায়। তবে এখানকারগুলো দিয়ে বেরোনো খুব মুশকিল।
তবু জানালার কাছে এসে বাইরে তাকাল ওরা। বাড়ন্ত ঝোপ ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ল না।
ক্যান-এর সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে শব্দ বল তো,কিশোর বলল।
ব্যান, ফ্যান, ম্যান, প্যান, র‍্যান, ট্যান, গড়গড় করে বলে গেল রবিন।
এই, দেয়ালটা ট্যান কালারের, নরি বলল।
তাতে কোন সুবিধে হচ্ছে না ধাঁধা সমাধানের, বলল কিশোর। তবে এখানে। ম্যান আছে, দুজন, গর্ভনর আর মেয়র।
নোটিশে কোন ব্যান-এর ঘোবণা নেই তো? রবিনের প্রশ্ন।
নোটিশগুলো পড়তে ছুটল সবাই। বেশ কিছু নতুন নিয়ম জারি করা হয়েছে, নিষিদ্ধ করা হয়েছে কিছু কিছু ব্যাপার, তবে ওগুলো থেকে ধাঁধার সমাধান হবে না।
অবশেষে কিশোর ঘোষণা করল, আমার মনে হয় না এটা রাইমিং স্ল্যাং।
কারমলের আরেক শয়তানী বুদ্ধি! গো গোঁ করে বলল মুসা।
এখান থেকে বেরোনোর কথাই বলা হয়েছে মনে হয়।
কিভাবে? জিজ্ঞেস করল রবিন। জানালা আটকানো। ফায়ার এসকেপ নেই। দরজা মাত্র একটা, যেটা দিয়ে ঢুকলাম। তাতে স্পেশাল কিছু নেই।
এই দেখ!দরজার কাছের মেঝে দেখিয়ে হঠাৎ চিৎকার করে উঠল কিশোর। মেঝে কেমন ক্ষয়ে গিয়েছে দেখছ লোক যাতায়াতের ফলে?
শ্রাগ করল রবিন। তাতে কি? এটা স্বাভাবিক।
কিন্তু বেঞ্চের কাছের মেঝে দেখ।
সবাই দেখল। ক্ষয়া একটা সরু পথ যেন গিয়ে ঠেকেছে পাশের দেয়ালে।
গোপন দরজা! একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল রবিন আর মুসা।
দেয়ালের কাছে দৌড়ে এল ছেলেরা। খুঁজতে শুরু করল। কিন্তু দেয়ালের অন্যান্য জায়গার মতই এখানেও মসৃণ, প্লাস্টারের ওপর রঙ করা, সামান্যতম চিড় ধরেনি কোথাও। আশা আবার নিভে গেল ওদের।
শূন্য দেয়াল, কেঁদে ফেলবে যেন রবিন, আর কিছু নেই!
আরও ভালমত দেখে মুসা বলল, মনে হয় দরজা-টরজা ছিল এককালে। রঙ দেখ। আশেপাশের দেয়ালের চেয়ে হালকা। নিশ্চয় গত দুতিন মাসের মধ্যে বন্ধ

করা হয়েছে দরজাটা, কিংবা এখানে নতুন করে রঙ লাগানো হয়েছে। এখানে দরজা থাকলে বেরোনো মোটেই কঠিন হত না।
দেয়াল গেঁথে বোজানো হয়েছে? বিড়বিড় করল কিশোর। মুসার দিকে তাকিয়ে চোখ মিটমিট করতে করতে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, বাইরের রাস্তাটা কোন রাস্তা? এটা দিয়ে বেরোলে যেটাতে পড়া যাবে?
রাস্তা? অবাক হল রবিন। কেন স্যালসিপুয়েডস স্ট্রীট, তাই তো হবার কথা। কিন্তু…
কথা শেষ হল না তার। ঝড়ের গতিতে খোলা দরজা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল। কিশোর।
সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে ঘুরে টাউন হলের একপাশে চলে এল কিশোর। পেছনে ছুটছে তার সহকারীরা। জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছে সবাই, চোখ উজ্জ্বল। থমকে দাঁড়াল গোয়েন্দাপ্রধান। দেয়ালে একটা খিলানমত দেখা গেল, দরজা ছিল এককালে বোঝা যায়, ম্যারিজ লাইসেন্স ব্যুরো থেকে বেরোনোর।
কি করব এখন, কিশোর? হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করল মুসা।
দরজার ইট নতুন, আনমনে বুলল কিশোর। তারমানে মুসার কথাই ঠিক,, কয়েক মাস আগে বন্ধ হয়েছে। তারমানে কয়েক মাস আগে এলেও ওই পথে আমরা বেরোতে পারতাম। বোঝা যাচ্ছে, কারমল যখন শেষ দেখেছে এই দরজাটা, তখনও এটা ভোলা ছিল।
কিন্তু,নরি বলল, ধাঁধার সঙ্গে মিলটা কোথায়? স্যালিসপুয়েডস…
কিশোর! বড় বড় হয়ে গেল রবিনের চোখ। স্যালিসপুয়েডস স্প্যানিশ শব্দ, মনে পড়েছে। এর ইংরেজি মানে করলে দাঁড়ায়ঃ গেট আউট ইউ ক্যান!
তারমানে স্যালিসপুয়েডস স্ট্রীটে বেরিয়ে পশ কুইনস ওন্ড নেডের খোঁজ করতে বলছে, কিশোর বলল।
বন্ধ করে দেয়া দরজার আশেপাশে ঘন ঝোপঝাড় জন্মে আছে। বিল্ডিঙের পেছনে গাছও আছে বেশ কিছু। সরু একটা পথ দরজার গোড়া থেকে লন পেবিয়ে গিয়ে উঠেছে স্যালিসপুয়েডস স্ত্রীটে। বন্ধ করে দেয়া দরজাটার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল ছেলেরা, কোন গোপন সূত্র লুকিয়ে রেখেছে কিনা বোঝার চেষ্টা করল। কিছু না পেয়ে, সরু পথ ধরে দ্রুত পা চালাল বড় রাস্তার দিকে।
খোলা জায়গায়, দুপুরের রোদে বেরিয়ে থমকে দাঁড়াল ওরা। ঠিক ওপাশেই চেম্বার অভ কমার্সের অফিস। ডিসপ্লে উইণ্ডোতে বড় বড় অক্ষরে লেখাঃ
সী আ লিজেণ্ড অভ দ্য সী।।
এস, এস, কুইন অভ দ্য সাউথ
ফুললি রিস্টোরড টু

ইটস অরিজিন্যাল গ্লোরি
নাউ ওপেন
স্যুভনির রিফ্রেশমেন্টস
রকি বীচ হারবার হোয়ার্ফ
দ্য কুইন! মানে রানী! টুরিস্টদের জন্যে নতুন আকর্ষণ! মুসা বলল।
তাই? নরি জানতে চাইল।
হ্যাঁ, বলল কিশোর। নিশ্চয় এটা পশ কুইন। আর সমুদ্রগামী জাহাজে বিছানা থাকবেই।
তারমানে এরপর আমাদেরকে যেতে হবে কুইন জাহাজে? মুসা জিজ্ঞেস করল।
বিছানা খোঁজার জন্যে, বলল রবিন।
দাদার জিনিস পেয়ে গেছি! দাদার জিনিস পেয়ে গেছি! হাততালি দিয়ে সুর করে গেয়ে প্রায় নাচতে আরম্ভ করল নরি।
নীরবে দাঁত বের করে হাসল কিশোর। ঘুরে রওনা হল টাউন হলের পার্কিং লটের দিকে, যেখানে ওদের সাইকেলগুলো রেখেছে। থেমে গেল আচমকা যেন হোঁচট খেয়ে।
ঝোপের ভেতর দিয়ে দৌড়ে যাচ্ছে কে যেন। লনে বেরোল। টেরিয়ার ডয়েল!
ধর, ধর ব্যাটাকে! চেঁচিয়ে উঠল মুসা। নিশ্চয় আমাদের কথা শুনে ফেলেছে!
শুঁটকি কোথাকার, শুঁটকি! আজ ভর্তা বানিয়ে খাব! মুসার পেছনে দৌড়াতে দৌড়াতে চেঁচিয়ে বলল রবিন।
বিল্ডিং ঘুরে পার্কিং লটে পৌঁছার আগেই টেরিয়ারকে হারিয়ে ফেলল ওরা। যখন পৌঁছল, দেরি হয়ে গেছে। গাড়ি বের করে ফেলেছে টেরিয়ার। গর্জন করতে করতে ওদের দিকে ছুটে এল গাড়িটা। লাফ দিয়ে সরে গেল ওরা। পেছনে তাকিয়ে বুড়ো আঙুল দেখাল শুঁটকি, দাঁত বেরিয়ে পড়েছে হাসিতে।
জলদি! সাইকেল! ছুটতে শুরু করল আবার কিশোর।
কিন্তু...কিন্তু..., চেঁচিয়ে বলল নরি, সাইকেল নিয়ে গাড়ি ধরতে পারব না! জিনিসগুলো নিয়েই যাবে!
এত সহজ না। আগে আসল বিছানাটা খুঁজে বের করতে হবে তো। চলো চলো, জলদি চলো।
আরি, সাইকেল কোথায়! চোখ কপালে উঠে গেল মুসার। বোকা হয়ে পার্কিং লটের দিকে তাকিয়ে রইল ছেলেরা। নিশ্চয় শুঁটকি সরিয়েছে, রবিন বলল।
দাঁড়াও, হাত তুলে দেখাল কিশোর, ওই যে।
পার্কিং লটের একপ্রান্তে হালকা ঝোপের মধ্যে ভরে রাখা হয়েছে সাইকেলগুলো। লুকানো যায়নি ভালমত, বেশির ভাগই বেরিয়ে আছে। দৌড় দিল আবার ওরা।

এই সময় নরির জুতোর ফিতে গেল খুলে। সঙ্গে সঙ্গে বাঁধতে বসে গেল সে। ঝোপ থেকে সাইকেল বের করে জলদি করার জন্য তাগাদা দিতে লাগল ওকে তিন গোয়েন্দা।
আরে, এই নরি, জলদি কর না, অস্থির হয়ে উঠেছে মুসা। দেরি করলে...
কথা শেষ হল না তার। সামনে এসে দাঁড়াল দুজন লোক। একজন সেই দৈত্য, আরেকজন তার পিত্তলধারী খুদে সঙ্গী।
খপ করে মুসার হাত চেপে ধরল দানবটা। আরেক হাতে কিশোরকে। রবিনকে ধরল খাটো লোকটা। অনেক চেষ্টা করেও তিনজনের একজনও ছুটতে পারল না। একটা গাড়ির দিকে তিন গোয়েন্দাকে টেনে নিয়ে চলল লোকগুলো।
ঝোপের কাছে সাইকেল সরিয়ে আনার কারণটা এতক্ষণে বুঝতে পারল ছেলেরা। ওদেরকে ধরার জন্যে।
চুপচাপ থাক, তাহলে জখম হবে না, ড্রাইভারের সিট থেকে বলল খাটো লোকটা।
পেছনের সিটে গাদাগাদি করে বসেছে চারজনে, দৈত্যটার একপাশে মুসা, আরেক পাশে রবিন আর কিশোর। পেছনের জানালার পর্দা টেনে দেয়া হয়েছে।
আরেকটা ছেলে কোথায়, মিস্টার হিউগ? দানবটা জিজ্ঞেস করল।
পার্টি তো বলল শুধু এই তিনজনের কথাই, খাটো লোকটা জবাব দিল। এদেরকে চুপ করিয়ে রাখ, বিগ, অন্য কাউকে নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা নেই। আরও ছেলে থাকলে থাকুক গে।
ঠিক আছে, বিগ জবাব দিল।
চুপ করে রইল ছেলেরা। গাড়ি চালাচ্ছে হিউগ, খুব সাবধানে, গতি বাড়াচ্ছে, অযথা পুলিশের চোখে পড়ার ইচ্ছে নেই। রকি বীচের অলিতে গলিতে ঘুরছে। গাড়ি। ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে আসছে ছেলেরা, ভয় কাটছে। ওদেরকে মারার জন্যে ধরেনি হিউগ আর বিগ, এটা বুঝে গেছে। অবশেষে জিজ্ঞেসই করে ফেলল কিশোর, আমাদের ধরেছেন কেন?
হেসে উঠল হিউগ। এমনি।
না, জানতে চাইছি, কার হুকুমে ধরেছেন?
সেটা কেন বলব? একজন বন্ধুকে সাহায্য করছি, ব্যস।
বিগ বলে উঠল, ঠিক পথেই তো যাচ্ছিলেন, মিস্টার হিউগ, আবার ঘুরছেন...
চুপ, ধমক লাগাল খাটো। আবার নীরবতা। কয়েকটা বুক পেরোল গাড়ি। তারপর রকি বীচের পশ্চিম অংশের একটা বাড়ির ড্রাইভওয়েতে ঢুকল। বেশ বড় একটা বাড়ির পেছনের ছোট একটা কটেজের সামনে এসে থামল। বড় বাড়িটার জন্যে রাস্তা থেকে কটেজ দেখা যায় না।
বেরোও,আদেশ দিল হিউগ।

কটেজের পেছনে ছোট একটা ঘরে এনে ঢোকানো হল ছেলেদের। ঘরে তনটে ছোট খাঁটিয়া। একমাত্র জানালাটায় ভারি পাল্লা লাগানো। দরজা দুটো, একটা ঘরে ঢোকার জন্যে, আরেকটা লাগোয়া বাথরুমের। ঢোকার দরজাটার পাল্লা ধাতব। বাথরুমটা ছোট, জানালা নেই।
ও-কে, হিউগ বলল, এখন...
বাধা দিয়ে কিশোর বলল, কোন বন্ধুর কথায় ধরেছেন, বললেন তো না। আচ্ছা, যার কথায়ই ধরে থাকেন, তার চেয়ে বেশি টাকে দেবেন আপনাদেরকে মিসেস এলসা কারমল...।
তোমাদেরকে কিছু সময়ের জন্যে সরিয়ে রাখতে বলা হয়েছে, কিশোরের কথায় কান না দিয়ে বলল হিউগ।
কিন্তু একথা বলে কিডন্যাপিঙের দায় এড়াতে পারবেন না, রবিন বলল।
এই ছেলে, গর্জে উঠল দৈত্য, কিডন্যাপার কাদেরকে বলছ?
ভুরু কোঁচকাল হিউগ। আমরা কিডন্যাপার নই।
যেভাবেই বলুন, কিশোর বলল, আপনারা...
হয়েছে, থাম, খেকিয়ে উঠল হিউগ। দেখ, তোমাদের বিরুদ্ধে কোন ক্ষোভ বা রাগ নেই আমাদের। বুঝেছ? শুধু নিজেদের স্বার্থ দেখছি আমরা, ব্যস।
কি স্বার্থ? মুসা জানতে চাইল।
অবশ্যই টাকা, আর কি থাকতে পারে? অনেক টাকা পাই আমরা পার্টির কাছে। দিতে পারে না। অনেক দিন হল। কত আর অপেক্ষা করা যায়।
হেসে উঠল বিগ। বিশাল এক ভালুক যেন মাথা নাড়ল। খেলতে বসে যারা ঠিকমত তাস খেলতে জানে না, তাদের না খেলাই উচিত, তাই না, বস?
চুপ! ধমক দিল হিউগ। বেশি কথা বল তুমি। ঢোক গিলল রবিন। আপনারা আপনারা জুয়াড়ী?
মোটেই না, থোকা, হিউগ বলল। জুয়াড়ী হল তারা, যারা খেলে। আমরা ব্যবসায়ী। লোকে জুয়া খেলতে চায়, আমরা তাদের জায়গা দিই, খেলার সুযোগ করে দিই। আমরা নিজেরা কক্ষনও খেলি না।
মিস্টার হিউগ, কিশোর বলল। আপনার বন্ধু যে-ই হোক, আমি বাজি রেখে বলতে পারি, আমাদেরকে ছেড়ে দিলে তার চেয়ে বেশি টাকা দেবে আপনাকে মিসেস কারমল। সে না দিলে আমার চাচা দেবে...
দেখ, থোকা, প্রথমেই বলেছি আমরা কিডন্যাপার নই। তোমাদেরকে জিম্মি রেখে তোমাদের আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে টাকা চাওয়ার জন্যে ধরে আনিনি। পার্টির কাছে যে টাকা পাই, সেটাই শুধু আদায় করে নিতে চাই, ব্যস। তোমাদের কাছ

থেকে একটা কানাকড়িও নেব না, বেশি নেবারও ইচ্ছে নেই। চুপ কর এখন। বড় বেশি কথা বলছ। দৈত্যের দিকে চেয়ে ইশারা করল বিগ!
দরজার দিকে ঘুরল বিগ। কি মনে হতে ফিরে চেয়ে বলল, তোমরা এখানে ভালই থাকবে।
হ্যাঁ, হিউগ বলল, বিছানা আছে, টয়লেট আছে। ওই আলমারিতে খাবার আছে। জগ ভর্তি পানি আছে। একেবারে নিজের বাড়ির মত লাগবে তোমাদের। খাও-দাও, আলাপ কর, বিশ্রাম নাও। শুধু বেরোতে পারবে না।
বেরিয়ে গেল দুজনে। দরজায় তালা লাগানোর শব্দ শুনতে পেল ছেলেরা। তালা লাগিয়ে, দরজার ভারি দণ্ডটা আড়াআড়ি লাগিয়ে দিয়ে চলে গেল ওরা। বন্দি হল তিন গোয়েন্দা।
সামনের দরজা বন্ধ করার আওয়াজ শোনা গেল। তবে গাড়ির ইঞ্জিন চালু হল। বাইরের ঘরে কে যেন নড়াচড়া করছে। ভারি মানুষ বসায় মড়মড় করে উঠল একটা কাঠের চেয়ার। তারপর শোনা গেল ভারি নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ, ভালুকের দীর্ঘশ্বাসের মত।
বিগ এখনও রয়েছে, ফিসফিসিয়ে বলল মুসা।
নিচু গলায় কিশোর বলল, বেরোনোর পথ খুঁজে বের করতে হবে আগে। তারপর দৈত্যটাকে ফাঁকি দেয়ার কথা ভাবব।
দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল মুসা। জানালা পরীক্ষা করতে লাগল রবিন। কিশোর গিয়ে ঢুকল জানালাবিহীন বাথরুমটায়।
সবার আগে পরাজয় মেনে নিল মুসা।
দরজায় ডাবুল তালা, জানাল সে। ইস্পাতের পান্না, কাজেই তক্তা খুলে যে ফোকর করব তারও উপায় নেই। কব্জাগুলো বাইরের দিকে।
বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল কিশোর। ভেন্টিলেটরের ফোকরও নেই।
জানালার পালার কজাও বাইরের দিকে, রবিন বলল। বাইরে থেকে লোহার চ্যাপ্টা ডাণ্ডা লাগানো, খোলা যাবে না।
মেঝে দেখা বাকি এখনও, মুসা বলল। দেখতে বেশিক্ষণ লাগল না।
নাহ্, মাথা নেড়ে বলল সে, পুরো ঘরটা কংক্রিটের একটা বাক্স। দেয়ালে কোন ফোকরই নেই। ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল মুসা। কিশোর, বেরোতে পারব না। এসব পরিশ্রম না করে এস শুয়ে থাকি। এবং তা-ই করল সে।
ওরা পেশাদার লোক, কিশোর বলল, ফাঁক রাখবে কেন? মুসার পাশের বিছানাটায় শুতে শুতে রবিন বলল, চমৎকার এই রত্নশিকারের এটাই সমাপ্তি। আমাদেরকে আটকে রাখার আদেশ যে দিয়েছে, সে নিশ্চয় এখন রওনা হয়ে গেছে কুইন অভ দ্য সাউথ-এর উদ্দেশে।

ওয়াকিটকিগুলো আনার কথাও মনে হল না আজ।ক্ষোভে দুঃখে মাথার চুল -ছিড়তে ইচ্ছে করছে কিশোরের।
আনলে কি হত? রবিন বলল। তিনজনকেই তো ধরেছে।
নরির কাছে রাখতে পারতাম একটা।
নরি! লাফিয়ে উঠে বসল মুসা। হয়ত আমাদের ধরা পড়তে দেখেছে। তাহলে নিশ্চয় পুলিশে খবর দেবে।
হয়ত ইতিমধ্যে খুঁজতে আরম্ভ করেছে আমাদেরকে, আশা করল রবিন।
এত আশা কোরো না, সাবধান করল কিশোর। নরি না-ও দেখে থাকতে পারে। ও তখন ফিতে বাঁধায় ব্যস্ত। আর যদি দেখেও, অত দূর থেকে গাড়ির নাম্বার নিশ্চয় দেখতে পায়নি। শুধু বলতে পারবে, নীল গাড়ি দেখেছে। আর নীল গাড়ি রকি বীচে শরটা আছে। হতাশ ভঙ্গিতে ধপ করে খাঁটিয়ায় বসে পড়ল সে।
এমনও হতে পারে, জাহাজে চলে গেছে নরি, রবিন বলল। পরের ধাঁধাটার সমাধান করতে ব্যস্ত। বুদ্ধি আছে ছেলেটার। ওল্ড নেড় বের করেও ফেলতে পারে।
বিপদৈও পড়তে পারে! মনে করিয়ে দিল কিশোর। এজটাররা খুবই বিপজ্জনক ওর জন্যে।
তাহলে নরির আশাও নেই! ধীরে ধীরে আবার শুয়ে পড়ল মুসা। কিশোরও শুয়ে পড়ল। আর কিছু করার নেই। শুধু প্রার্থনা করা ছাড়া-নরি ভাল থাকুক, কিছু একটা করুক ওদের জন্যে।
ঘন্টার পর ঘন্টা পেরোল। জানালার পাল্লার ফাঁক দিয়ে এসে পড়া রোদের রশ্মি দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হল। ইতিমধ্যে একবার হিউগের সাড়া পেয়েছে ছেলেরা বিগের সঙ্গে কথা বলে আবার চলে গেছে। খিদে লাগল মুসার। আলমারি থেকে খাবার বের করে খেতে শুরু করল। অন্যদের খিদে নেই, তবু খানিকটা রুটি আর পনির নিয়ে চিবাতে লাগল। গায়ের বল ঠিক রাখতে হবে।
খাওয়ার পর চিত হয়ে শুয়ে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে লাগল কিশোর, একটা ব্যাপার সত্যি অদ্ভুত।
কী? জিজ্ঞেস করল মুসা।
আমাদের কথা জানল কি করে হিউগ আর বিগ? চোখ রাখল কেন দিনের পর দিন? তখন থামানোর চেষ্টা করল না কেন? একবার এমনকি আমাদের সাহায্যও করেছে, এজটারদের গাড়ি খাদে ঠেলে ফেলে। ভাবটা এমন, আমাদের দিয়ে পাথরগুলো বের করিয়ে নিতে চাইছিল। তারপর সময় বুঝে ধরেছে। ঠিক সময়টা কি করে বুঝল? কে বলেছে ওদেরকে? কে চায় ওই পাথর?
এজটাররা? মুসা বলল।

ওরা তো চায়ই। কিন্তু ওরা এসেছে দিন কয়েক আগে, জুয়ায় হেরে হিউগের কাছে অনেক দিন ধরে ঋণী থাকার কথা নয় ওদের।
এমন কেউ, যাকে চিনি না আমরা, রবিন বলল। হতে পারে, আবার ভাবনায় ডুবে গেল কিশোর।
রোদ আসা বন্ধ হয়ে গেল। কমে আসছে বদ্ধ ঘরের আলো। সারা বিকেলটাই আটকে রয়েছে ওরা। অন্য ঘরে নাক ডাকাতে শুরু করেছে বিগ। এইবার বুঝি সত্যিই পরাজিত হল ওরা। এত কষ্ট করে ধাঁধার সমাধান করে দিল, এখন গুপ্তধনগুলো বের করে নেবে অন্য লোক। ওদেরকে ঠকিয়েছে কেউ!
বদ্ধ ঘরের নীরবতায় শুয়ে শুয়ে ওদেরও তন্দ্রা নামল চোখে। কি করারই বা আছে আর?
হঠাৎ ধড়মড়িয়ে উঠে বসল মুসা। কিসের শব্দ!
কান পাতল তিনজনেই। বাড়ি কাঁপিয়ে নাক ডাকাচ্ছে বিগ। কিন্তু সে-শব্দ নয়। টোকার আওয়াজ!
জানালায়! ফিসফিস করে বলল রবিন।
আবার হল টোকার শব্দ। তারপর ফিসফিসিয়ে কথা, তোমরা ওখানে? কিশোর? মুসা?
হ্যাঁ, জানালায় মুখ লাগিয়ে জবাব দিল মুসা।
মৃদু মচমচ করে উঠল জানালা। পাল্লার বাইরে দণ্ড খোলার চেষ্টা করছে কেউ, জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছে, বোধহয় উত্তেজনা আর পরিশ্রমে। অবশেষে খুলে গেল পাল্লা। হাঁ হয়ে গেল তিন গোয়েন্দা।
নরি! প্রায় একসঙ্গে বলে উঠল ওরা। তবে কণ্ঠস্বর নামিয়েই বলল।
শশশ! হাসল ছেলেটা। আস্তে। ভালুকটা দরজা জুড়ে চেয়ার ফেলে ঘুমোচ্ছে। যে-কোন সময় জেগে যেতে পারে। তাড়াতাড়ি কর।
সেকথা আর দ্বিতীয়বার বলতে হল না ওদেরকে। জানালা গলে বেরিয়ে পড়ল। সন্ধ্যার ছায়া নামছে তখন। নিঃশব্দে বাড়ির পাশ ঘুরে এসে দ্রুতপায়ে রাস্তার দিকে এগোল ওরা।
কি করে খুঁজে পেলে আমাদের, নরি? কিশোর জানতে চাইল।
রাস্তায় পৌঁছে গেছে ওরা। নরি জানাল, তোমাদেরকে ধরে নিয়ে গেলে দৌড়ে গিয়ে আমি মিস্টার উডকে ফোন করলাম। কিন্তু বাড়িতে কিংবা অফিসে কোথাও পাওয়া গেল না তাকে। আমার মাকে কিংবা তোমাদের বাড়ির লোককে ঘাবড়ে দিতে চাইনি। তবু অনেক ভেবেচিন্তে শেষে তোমার চাচাকে ফোন করতে যাচ্ছিলাম, এই সময় বুদ্ধিটা এল মাথায়।
কি বুদ্ধি? হাঁপাচ্ছে কিশোর, প্রায় দৌড়ে চলছে এখন ওরা।

ভূত-থেকে-ভূতে।
ক্ষণিকের জন্যে দাঁড়িয়ে গেল মুসা। আবার চলতে চলতে বলল, তুমি...তুমি আমাদের ভূত
তোমাদের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার আগেই এর কথা শুনেছি আমি। সুযোগ পেয়েই আর দেরি না করে কাজে লাগলাম। সাময়িক হেডকোয়ার্টার হিসেবে বেছে নিলাম একটা ফোন বুদ। অবশেষে কয়েকটা ছেলে খুঁজে পেল গাড়িটা। –
আশ্চর্য! গাড়িটার নাম্বারও তো জানো না তুমি!
জানি, গর্বের হাসি হাসল নরি। আমাদের বাড়ির সামনে কয়েকবার দেখেছি ওদের। এত বেশি, শেষে সন্দেহ হয়ে গেছে আমার। আজ সকালেই লিখে নিয়েছি ওদের নাম্বারটা। আসলে গোয়েন্দারা...।
কথা শেষ হল না। পেছনে শোনা গেল জোর গর্জন, প্রচণ্ড ধুড়ুম ধুড়ুম।
দৈত্যটা বেরিয়ে পড়েছে! চেঁচিয়ে বলল নরি। দরজার সামনে ময়লা ফেলার টিন বসিয়ে রেখে এসেছিলাম। দৌড় দাও জলদি!
ছুটতে ছুটতে বুক পেরোল ওরা, আরেকটা রাস্তা পেরিয়ে মোড় ঘুরে ছুটে চলল প্রাণপণে।
আরও জোরে! মুখ দিয়ে বাতাস ছাড়তে ছাড়তে বলল রবিন। গাড়ি নিয়ে আসবে।
পারবে না, এতই হাঁপাচ্ছে, ঠিকমত কথা বলতে পারছে না নরি। পকেট থেকে কালো একটা জিনিস বের করে দেখাল। ডিসট্রিবিউটর ক্যাপটা খুলে নিয়ে এসেছি।
থেমে গেল ওরা। রবিন, মুসা আর কিশোর হাসতে শুরু করল পাগলের মত। মনের পর্দায় স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ওরা, গাড়িটা স্টার্ট না নেয়ায় রেগে গিয়ে কি করছে বিগ। পাশ দিয়ে যাবার সময় অবাক চোখে ওদের দিকে তাকাল পথিক, পরোয়াই করল না ওরা।
চমৎকার, নরি, দারুণ দেখিয়েছ তুমি! হাসতে হাসতে বলল কিশোর। অবশেষে হাসি থামল। বলল, আশা করি দেরি হয়ে যায়নি।
হঠাৎ সকলের হাসি বন্ধ হয়ে গেল।
কিশোর বলল, চলো, সাইকেল নিয়ে ওল্ড নেড খুঁজতে যাই।
টাউন হলের সামনেই রয়েছে সাইকেলগুলো। তাড়াতাড়ি বন্দরে রওনা হল ওরা। বন্দরের এক কোণে ঘাটে বাঁধা রয়েছে বিশাল এক সমুদ্রগামী জাহাজ। কয়েকটা আলো দেখা যাচ্ছে ওটাতে। ছেলেরা পৌঁছে দেখল, সারি দিয়ে লোক নেমে আসছে ওটা থেকে।
শুঁটকি আর এজটারের খেয়াল রেখ, সাবধান করে দিল কিশোর।

লোকের মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে ভিড় ঠেলে চওড়া টুরিস্ট গ্যাংওয়ের সামনে টিকেট বুদের দিকে এগোল ওরা। টেরিয়ার বা এজটারদের চেহারা চোখে পড়ল না।
।টিকেট বুদের কাছে পথ আটকাল অ্যাটেনডেন্ট। সরি, আজকের মত বন্ধ হয়ে গেছে। আর ওঠা যাবে না।
কিন্তু আমাদের এখুনি ওঠা দরকার, চেঁচিয়ে বলল নরি।
কোন উপায় নেই, থোকা, বলে ঘুরে দাঁড়াল অ্যাটেনডেন্ট। দেখতে চাইলে আবার আগামী হপ্তার শেষে।
হতাশ চোখে অ্যাটেনডেন্টের চলে যাওয়া দেখছে ওরা। ঘাটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সে, টুরিস্টদের শেষ দলটা তখন নেমে আসছে জাহাজ থেকে।
পরের হপ্তা! মাথা নাড়ল রবিন হতাশ ভঙ্গিতে। রোজ দেখানোর বন্দোবস্ত করে না কেন?
দর্শক হয় না হয়ত, আন্দাজ করল কিশোর।
হঠাৎ হাত তুলে দেখাল মুসা, এই দেখ, জাহাজের ওপর!
একেবারে ওপরের ডেকে দেখা যাচ্ছে একটা লম্বা মূর্তি। ঝিক করে উঠল দাঁত। নাকটা যেন সরাসরি ওদেরই দিকে ঠেলে দিল দূরের মূর্তিটা।...
শুঁটকি, গুঙিয়ে উঠল মুসা।
দ্রুত চারদিকে চোখ বোলাচ্ছে কিশোর। ঘাটের ডানে চওড়া একটা গেট খোলা এখনও, মাল আনা নেয়ার কাজে ব্যবহার হয় ওটা। চট করে একবার অ্যাটেনডেন্টের দিকে তাকাল সে, টুরিস্টদের শেষ দলটাকে প্রায় খেদিয়ে নিয়ে চলেছে গেটের দিকে।
এই, কুইক, সঙ্গীদের বলল গোয়েন্দাপ্রধান।
চওড়া গেটটা দিয়ে ঢুকে পড়ল ওরা, দৌড় দিল গ্যাংপ্লাঙ্কের দিকে। সবার আগে রয়েছে মুসা। ধাক্কা খেল গ্যাংব্ল্যাঙ্ক দিয়ে নেমে আসা লম্বা একজন মানুষের সঙ্গে। আউফ করে উঠল। পড়েই যাচ্ছিল, ধরে ফেললেন তাকে জাহাজের ক্যাপ্টেনের পোশাক পরা লোকটা।
কি ব্যাপার, থোকা? ভারি কণ্ঠে বললেন ক্যাপ্টেন। তাড়াহুড়ো করে লাভ হবে না। প্রদর্শনী বন্ধ হয়ে গেছে।
জানি, স্যার, এগিয়ে গেল কিশোর, কিন্তু আমরা...
জানো? তাহলে চলে যাবার অনুরোধ করব আমি তোমাদেরকে।
পেছনে তাকিয়ে কিশোর দেখল, কটমট করে তার দিকে তাকিয়ে আছে কয়েকজন অ্যাটেনডেন্ট, সে তাকাতেই বেরিয়ে যাবার ইশারা করল একজন।
ক্যাপ্টেন, মরিয়া হয়ে বলল কিশোর, আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারি?

দেখ, হাসলেন লম্বা মানুষটা, আমি আসল ক্যাপ্টেন নই। একজিবিশন ম্যানেজার। তবে ক্যাপ্টেন ডাকতে পার, আপত্তি নেই। জাহাজ দেখতে আসা যে কারও সাথে আলাপ করতে দ্বিধা নেই আমার, কিন্তু এখন...
আমরা দর্শক নই, চেঁচিয়ে উঠল নরি। আমরা স্যার গোয়েন্দা। এখন একটা কেসে কাজ করছি। কিশোর, কার্ড দেখিয়ে দাও।
কার্ড বের করে দেখাল কিশোর। আমরা জেনেছি আপনার জাহাজে কিছু জিনিস লুকানো আছে।
কার্ডটা পড়ে মুখ তুললেন ক্যাপ্টেন। লুকানো? অনেক টাকার মূল্যবান পাথর, স্যার, মুসা বলল। রত্ন।
রত্ন, না? এটাই তাহলে ব্যাখ্যা!
অধৈর্য হয়ে এগিয়ে এল কয়েকজন অ্যাটেনডেন্ট। হাত নেড়ে তাদেরকে সরে যাবার ইঙ্গিত করলেন ক্যাপ্টেন। ছেলেদের দিকে ফিরলেন আবার। জাহাজের কেবিনের অনেকগুলো বেড় আজ সরিয়ে ফেলা হয়েছে। আমরা ভেবেছি মজা করার জন্যে করেছে কেউ।
মা, স্যার, কিশোর বলল, মজা করার জন্যে নয়। রত খুঁজেছে। বিছানার ভেতর কিংবা আশেপাশে লুকানো রয়েছে পাথরগুলো। সংক্ষেপে জানাল ডেন কারমলের আজব উইলের কথা। ধাঁধাগুলোর সমাধান আমরা করে ফেলেছি। এখন সঠিক বিছানাটা শুধু পেলেই হল। দেরি হয়ে না গিয়ে থাকলেই হয়।
বোধহয় হয়ে গেছে। অনেকগুলো বিছানা সরানো হয়েছে। কিন্তু যদি পাথরগুলো এখনও পেয়ে না গিয়ে থাকে, তুমি কি করে পাবে? ঠিক বিছানাটা বের করবে কিভাবে? পাঁচশো বিছানা আছে জাহাজে।
ঢোঁক গিলল কিশোর। দমে গেল অন্যেরা।
পাঁ-পাঁচশো? তোতলাল রবিন।
কোন কোন কেবিনে দুতিনটে করেও আছে। মোট পাচশো।
বিশেষ কোন বিছানা আছে? মুসা জিজ্ঞেস করল। কোন রানী-টানীর জন্যে। সংরক্ষিত?
না, ওরকম কিছু নেই। কুইন-সাইজ বেড যেগুলোকে বলে সেরকম কিছু? রবিন প্রশ্ন করল।
না। ওরকম বিছানা জনপ্রিয় হওয়ার আগেই জাহাজটার সাগরে চলার দিন ফুরিয়ে গেছে।
আস্তে মাথা দোলাল কিশোর। বিছানাটা পাবার নিশ্চয় কোন উপায় আছে। ক্যাপ্টেন, জাহাজটা কি অস্ট্রেলিয়ায় গেছে কখনও?

বহুবার। লণ্ডন-অস্ট্রেলিয়া-ক্যানাডা রুটে যাতায়াত করত নিয়মিত। কারমল ওতে করেই অস্ট্রেলিয়া গিয়ে! ভাবছ নাকি?
প্রশ্নের জবাব না দিয়ে কিশোর বলল, ওল্ড নেড বোধহয় কেউ একজন একলা ব্যবহার করত। পুরানো প্যাসেঞ্জারদের লিস্ট আছে।
আছে, তবে লণ্ডনে। এই ধাঁধা তোমাদেরকে সেখানে পাঠানোর ব্যবস্থা করবে তো?
করতেও পারে, গোঁ গোঁ করে বলল মুসা। কারমলের কথা কিছু বলা যায় না।
পাওয়ার উপায় একটা নিশ্চয় আছে, কিশোর বলল। ইস, হাতে যদি খালি সময় থাকত! তবে আমার বিশ্বাস এখনও খুঁজে পায়নি কেউ। তাহলে শুঁটকি জাহাজে থাকত না। তবে সে বা অন্য কেউ পেয়ে যেতে পারে যে-কোন মুহূর্তে।
শুঁটকি? ভুরু কোঁচকালেন ক্যাপ্টেন। তারমানে জাহাজে রয়েছে এখনও একজন?
বেশ, দেখছি।
গ্যাংওয়ে ধরে এগোলেন ক্যাপ্টেন। ছেলেরা চলল তার সঙ্গে সঙ্গে। কিশোর কি যেন ভাবছে। হঠাৎ বলে উঠল, মনে হয় বুঝতে পেরেছি..., কথা শেষ হল না তার। চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে একটা লাইফবোটের দিকে। সাবধান!
অনেক ওপরে জাহাজের একটা লাইফবোট খসে গেছে ওটার ব্র্যাকেট থেকে, দোল খেয়ে নেমে এসে বাড়ি মারল জাহাজের গায়ে, হুড়মুড় করে ঝরে পড়ল কতগুলো দাড়, পিপে, বাক্স আর আরও কিছু ভারি মালপত্র। ছুটে এল ক্যাপ্টেন আর ছেলেদেরকে লক্ষ্য করে।
সর! বলেই ধাক্কা দিয়ে মুসাকে সরিয়ে দিলেন ক্যাপ্টেন। খপ করে নরির হাত চেপে ধরে তাকে টেনে নিয়ে সরে গেলেন একপাশে।
গ্যাংওয়ের নিচে ডাইভ দিয়ে পড়ল রবিন। কিশোরও অনেক দূরে সরে গেছে। নরিকে ফেলে দিয়ে তার ওপর উপুড় হয়ে পড়ে তাকে গা দিয়ে আড়াল করলেন ক্যাপ্টেন।
দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কেউ নড়ল না। তারপর, আবার একে একে উঠে দাঁড়াতে লাগল সবাই। অ্যাটেনডেন্টরা দৌড়ে এল। দোল খাচ্ছে এখনও লাইফবোটটা, সেদিকে তাকিয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেল ক্যাপ্টেনের চেহারা। অ্যাটেন্ডেন্টদের আদেশ দিলেন, জলদি গিয়ে জায়গামত আটকাও ওটাকে। ছেলেদের দিকে ফিরে বললেন, সরে থাকবে। ব্যাপারটা দুর্ঘটনা না-ও হতে পারে। হবার কথা নয়। খুব ভাল মত দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয় ওটা, নিয়মিত চেক করা হয়।
শুঁটকির কাজ! জ্বলে উঠল রবিন।
আমার মনে হয় না, কিশোর বলল। মারা যেতে পারতাম আমরা। তারমানে খুন। শুঁটকি এতটা এগোবে বিশ্বাস হয় না।
চল না তাহলে গিয়ে দেখি কে! বলেই গ্যাংওয়ে ধরে উঠতে শুরু করল নরি।

থাম! হাঁক দিয়ে বললেন ক্যাপ্টেন। সরি, বয়েজ, জাহাজে এখন আর উঠতে দিতে পারি না তোমাদেরকে। সাঙ্ঘাতিক, বিপজ্জনক। কাজটা এখন পুলিশের এক্তিয়ারে চলে গেল।
হ্যাঁ, স্যার, শান্তকণ্ঠে বলল কিশোর, আপনি ঠিকই বলেছেন। পুলিশ চীফ ইয়ান ফ্লেচারকে ফোন করুন। রবিন, তাঁকে বুঝিয়ে বলবে কি হয়েছে। মুসা, তুমি এখানেই থাক নরিকে নিয়ে, পুলিশ না আসা পর্যন্ত।
গোয়েন্দাপ্রধানের মতলব বুঝতে না পেরে তার দিকে তাকিয়ে রইল রবিন আর মুসা।
তুমি কি করবে, কিশোর? রবিন-জিজ্ঞেস করল। আমি ওল্ড নেডকে খুঁজে বের করতে যাচ্ছি। আশা করি পারব। এক ঘন্টার মধ্যে যদি না ফিরি চীফকে বলবে জাহাজে খোঁজা শুরু করতে।
কাউকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে দৌড় দিল কিশোর জুটে বেরিয়ে গেল গেটের বাইরে, সাইকেলে চেপে চলে গেল।
এক ঘন্টা পরে। ঘাটে ফ্লাডলাইটের উজ্জ্বল আলোর নিচে দাঁড়িয়ে আছে রবিন, মুসা, নরি, সঙ্গে চীফ ইয়ান ফ্লেচার আর ক্যাপ্টেন। পাশে অন্ধকারে মাথা ভুলে রেখেছে বিশাল জাহাজটা। ঘড়ি দেখলেন ক্যাপ্টেন। আটটা প্রায় বাজে, চীফ, বললেন তিনি। এক ঘন্টা হয়ে গেল। আমার মনে হয় আর অপেক্ষা করা ঠিক না। জাহাজে ইতিমধ্যে কি ক্ষতি হয়ে গেছে কে জানে।
সঠিক বিছানাটা যদি পেয়ে যেত, চীফ বললেন, তাহলে ঝামেলা আর সময় দুটোই বাঁচত।কিশোরের ওপর ভরসা রাখা যায়। দেখি, আরও পনেরো মিনিট অপেক্ষা করে।
সে আসবেই, রবিন আর মুসা একসঙ্গে বলল।
হাসলেন চীফ। আমিও জানি, সে আসবে।
ওই যে! চেঁচিয়ে উঠল নরি। বোধহয় এল!
পায়ের শব্দ ছুটে আসছে। কিশোরের সঙ্গে দেখা করার জন্যে দৌড় দিল রবিন আর মুসা। কয়েক কদম এগিয়েই থেমে গেল। কিশোর নয়, রস উড, গেট পেরিয়ে এগিয়ে এল দলটার কাছে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।
আছ এখানেই, নরির দিকে তাকিয়ে বলল উকিল। তোমার মা বলল, টাউন হলে গেছ। ওখানে গিয়ে তোমাদের না দেখে তো ঘাবড়েই গিয়েছিলাম। পুলিশকে। ফোন করলাম। থানা থেকে জানাল, চীফ ফ্লেচার এখানে আছেন।
শেষ প্রশ্নটার জবাব খুঁজছি আমরা এখন, মিস্টার উড, রবিন বলল। কিন্তু
কে জানি জাহাজে উঠে বসে আছে। পাথরগুলো পেয়েই গেল কিনা!
দেরি করছি কেন তাহলে? উডের তর সইছে না।

কিশোরের জন্যে অপেক্ষা করছি, মুসা বলল। সঠিক ঘরটা খুঁজে বের করার বুদ্ধি করেছে। দেরি করছে কেন বুঝতে পারছি না।
যদি ভাগ হয়ে খুঁজতে থাকি আমরা, উড বলল, আমি শিওর, তাহলে…
তাতে অনেক সময় দরকার, বলে উঠল একটা কণ্ঠ। আর ভাগ্য খুব ভাল হওয়া চাই।
কিশোর! চেঁচিয়ে উঠল নরি।
গেট পেরিয়ে এল কিশোর। তাকাল উকিলের দিকে। আপনি এখানে কিভাবে এলেন, স্যার?
তোমাদের খুঁজতে খুঁজতে। যাকগে, এখন ওসব কথা বলে সময় নষ্ট করে – লাভ নেই। কোন ঘরটা, বুঝেছ?
খুশিমনে মাথা ঝাঁকাল কিশোর। কারমল কুইনে করে পাড়ি জমিয়েছিল কিনা বোঝার খুব সহজ একটা উপায় আছে। কোন কেবিনে করে গিয়েছিল, সেটাও জানা যাবে তার সঙ্গে যে গিয়েছিল তাকে জিজ্ঞেস করলে। মাত্র দুজনের যে-কোন একজন হতে পারে, ড্যাম সান, আর ডোরা কেমপার।
জানে? রবিনের প্রশ্ন।
মিসেস কেমপার জানে। কারমলের সঙ্গে একই জাহাজে অস্ট্রেলিয়ায় গিয়েছিল তিরিশ বছর আগে। তাকে সাক্ষী বানিয়েছেই কারমল, গুপ্তধন শিকারিদের কাছে তাকে পরিচিত করার জন্যে, যাতে মহিলার সাহায্য নেয়া যায়। যাই হোক, হাসল সে, জবাবটা আমি পেয়েছি।
চলো তাহলে জাহাজে,ক্যাপ্টেন বললেন।
পথ দেখিয়ে মেইন ডেক, অর্থাৎ এ-ডেকে সবাইকে নিয়ে এলেন ক্যাপ্টেন। বিশাল জাহাজটায় মাত্র অল্প কয়েকটা আলো জ্বলছে। আবছা হতে হতে দূরে মিলিয়ে গেছে স্নান আলোকিত প্যাসেজগুলো। এ-ডেকের ওপরের টপডেকগুলো অন্ধকারে দেখা যায় না। গ্যাংওয়ে আর অন্যান্য প্রধান প্রবেশপথগুলোতে পুলিশ পাহারা রেখেছেন চীফ। প্রথম শ্রেণীর যাত্রী-সমাবেশের জায়গাটা মস্ত, বিলাসবহুল। একটা টেবিলে রাখা টুরিস্ট ব্রশিউয়ারের স্তূপ থেকে একটা পুস্তিকা তুলে নিল। কিশোর। ওটাতে ছাপা ডেকের নকশা মন দিয়ে দেখতে লাগল।
কোন ঘরটা, কিশোর? চীফ জিজ্ঞেস করলেন।
এই যে, বাইশ নাম্বার কেবিন, ডি ডেকে। মিসেস কেমপার উঠেছিল পাশের কেবিনটায়, একুশ নাম্বার। শিওর কিনা আমি সন্দেহ প্রকাশ করায় হেসে উঠল। বলল, ওগুলোর কথা জীবনে তুলবে না, কারণ ওগুলো জাহাজের সব চেয়ে জঘন্যতম কেবিন। হতচ্ছাড়া গলুইয়ের ঠিক নিচে, বলেছে মহিলা। তার ধারণা, নিচের দিকে বাংকে ঘুমাত কামল। তবে আমার মনে হয় না ওই বিছানায়

পাথরগুলো আছে। নকশাটা পকেটে ভরে ধাঁধার নকলটা বের করল সে। শেষ ধাঁধাটা বলছে, ইন দ্য পশ কুইনস ওল্ড নেড, বি ব্রাইট; অ্যাণ্ড নেচারাল অ্যাণ্ড প্রাইজ ইজ ইওরস। বিছানা প্রসঙ্গে যখন নেচারাল বলছে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস বিছানায় শোবার কথা বলা হয়েছে। আর ব্রাইট বলে একটা শব্দ দিয়েই দুটো মানে বুঝিয়েছে। তারমানে মাথা খাটাও এবং উজ্জ্বল কিছু খোঁজ কর।
কিশোরভাই, চেঁচিয়ে উঠল নরি, কি সেটা?
বিছানায় শুলে হয়ত লাইট-টাইট কিছু চোখে পড়বে।
চলো, ক্যাপ্টেন বললেন, সিঁড়ি বেয়ে নামতে হবে। এলিভেটর বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।
যাওয়ার জন্যে পা বাড়িয়েও থেমে গেল মুসা। একপাশে মাথা কাত করে কি যেন শুনল। কিশের শব্দ যেন শুনলাম।
কান পাতল সবাই। আর শোনা গেল না।
ডি ডেক সব চেয়ে নিচের ডেক, ক্যাপ্টেন বললেন। আলো খুব সামান্য। সাবধানে পা ফেলবে।
নিচে নেমেই চলেছে ওরা। শেষ হওয়ার আর নাম নেই। প্রতিটি ডেক পর পর সিঁড়ি আরও সরু হয়ে আসছে। অবশেষে ডি ডেকে নেমে মোড় নিল ওরা, টুরিস্ট ক্লাস কেবিন এরিয়ার দিকে। পানিরোধক একটা দরজা পেরিয়ে ঢুকল আরেক জায়গায়, ছোট ছোট কিছু কেবিন আছে ওখানে। এই সময় সামনে আবার শুনল শব্দ। চাপা, ভোতা, ঘষার আওয়াজ।
এইবার ঠিক শুনেছি! ঘোষণা করল মুসা। তবে এটা আগের শব্দটার মত নয়।
ইঁদুর-টিদুর হবে, চীফ বললেন। সব জাহাজেই থাকে।
সব জাহাজে থাকলেও আমাদের এটার কেবিনে নেই, ক্যাপ্টেন বললেন। তাছাড়া এত জোরে আওয়াজ করতে পারে না ইঁদুর।
সাবধানে, ম্লান আলোকিত বারান্দা ধরে সামনে এগোল ওরা। শব্দটা এখন আরও স্পষ্ট। কাছেরই একটা ছোট কেবিন থেকে আসছে। বাথরুমের ভেতর থেকে।
তোমরা সরে দাঁড়াও, ছেলেদের বলে গিয়ে দরজা খুললেন চীফ।
শুঁটকি! একসাথে চেঁচিয়ে উঠল ছেলেরা।
হাত-পা বেঁধে, মুখে কাপড় গুঁজে ময়দার বস্তার মত ফেলে রাখা হয়েছে টেরিয়ারকে। কথা বলার চেষ্টায় গোঁ গোঁ করে উঠল। চোখ প্রায় উল্টে যাওয়ার জোগাড়। দুজন পুলিশ গিয়ে তাকে বের করে বাঁধনমুক্ত করল।
দুর্বল ভঙ্গিতে প্রায় টলতে টলতে গিয়ে একটা বাংকে ধপ করে বসে পড়ল দুষ্ট ছেলেটা। কয়েক ঘন্টা ধরে আটকে আছি এখানে...সবে কেবিনটায় খুঁজতে শুরু করেছি, কে যেন পেছন থেকে এসে বাড়ি মারল মাথায়।

মিথ্যে কথা, প্রতিবাদ করল রবিন। এই তো ঘন্টাখানেক আগেই তোমাকে ওপরের ডেকে দেখেছি।
আমি নই। হয়ত আমার মত অন্য কাউকে দেখেছ, বলল টেরি। এমন ভাবে কেঁপে উঠল যেন খুব শীত করছে। হাত-পা বেঁধে, মুখে কাপড় খুঁজে আমাকে বাথরুমে ভরে রাখল। আমি তো ভেবেছি জিন্দেগীতে আর বেরোতে পারব না! –
উচিত শিক্ষা হয়েছে তোমার, মুসা বলল। টকিগিরি করার শাস্তি।
একজন, নাকি দুজন এসেছিল? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
মাথা নাড়ল টেরি। জানি না। দেখিইনি কাউকে। বাড়ি মেরে আরেকটু হ মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল, গোলআলুর মত ফুলে থাকা জায়গাটায় আঙুল ছোঁয়ালো সে।
হঠাৎ, জাহাজের সামনের দিকে কোথাও জোরে শব্দ হল, ঝনঝন করে ভেঙে পড়ল বোধহয় আয়না বা কাচের কিছু।
ভুরু কুঁচকে ফেললেন ক্যাপ্টেন। বাইশ নাম্বারের কাছে মনে হল!
জলদি চলুন, চিৎকার করে বলল কিশোর।
টেরি নড়ল না। আমি আর যাচ্ছি না বাবা, বড় বাঁচা বেঁচেছি। গুপ্তধনের দরকার নেই আমার। তোমরা গিয়ে নাওগে।
টেরির কাছে একজন লোক রেখে অন্যদেরকে নিয়ে দৌড় দিলেন চীফ। সরু বারান্দা ধরে ছুটল সবাই ক্যাপ্টেনের পিছু পিছু। শেষ একটা মোড় ঘুরে ক্যাপ্টেন দেখালেন, ওই যে সামনে, বাইশ।
খাইছে! দেখ! চেঁচিয়ে উঠল মুসা।
বাইশ নাম্বার কেবিন থেকে বেরিয়ে আসছে জেনি এজটার, পেছনে তার মোটা ভাই মাইক। দলটাকে দেখে ঘুরে উল্টোদিকে দিল দৌড়। মাইকের হাতে হোট কালো একটা বাক্স, আঁকড়ে ধরে রেখেছে।
দাঁড়াও! বললেন চীফ। পুলিশ!
থামল তো না-ই, ছোটার গতি আরও বাড়িয়ে দিল ভাইবোন। আগে আগে রয়েছে রোগাটে বোন, পেছনে ছুটন্ত ভাইয়ের শরীরের মাংস হাস্যকর ভঙ্গিতে দুলছে। নাচতে নাচতে চলেছে যেন একটা জেলির পিণ্ড! দুপদাপ করে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল। পেছনে তেড়ে গেল গোয়েন্দারা। বি-ডেকে টুরিস্ট লাউঞ্জের একটা। দরজা দিয়ে ঢুকে গেল দুজনে।
বেরোনোর পথ বাঁ-দিকে, হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন ক্যাপ্টেন। ওদেরকে সামনে থেকে ধরব!
করিডর ধরে তাঁর সঙ্গে ছুটল মুসা। অন্যেরা দাঁড়িয়ে গেল আরেকটা দরজা আটকে, যাতে এদিক দিয়ে আবার বেরিয়ে আসতে না পারে ভাইবোন। মুসা আর ক্যাপ্টেনকে দেখতে পেল দুজনে। চোখের পলকে পথ বদল করল জেনি, দৌড়

দিল রাইটিং রুমের দরজার দিকে। হাঁপিয়ে পড়েছে মোটা মাইক। বোনকে অনুসরণ করে তীক্ষ্ণ মোড় নিতে গিয়ে পা পিছলাল। প্রায় জাহাজ কাঁপিয়ে ধুড়ুম করে পড়ল আছাড় খেয়ে। শোল মাছের মত পিছলে গিয়ে বাড়ি খেল তিনটে টেবিল আর দেয়ালের সঙ্গে। হাত থেকে উড়ে চলে গেল কালো বাক্সটা। উঠে যে তুলবে সেশক্তি নেই। জিভ বের করে হাঁপাচ্ছে।
ভাইয়ের দুরবস্থা দেখে থেমে গেল জেনি। গাল দিয়ে উঠল, মোটকা গাধা কোথাকার!
ওঠার আপ্রাণ চেষ্টা করছে মাইক। তাকে উঠতে সাহায্য করলেন চীফ। জেনিকে ধরে রাখল একজন পুলিশ। কালো বাক্সটা তুলে নিল কিশোর।
নিশ্চয় আড়িপেতে আমাদের কথা শুনেছে ওরা। তখনই কোনভাবে শব্দ করে –
ফেলেছিল, মুসা শুনেছে, বলল সে। কেবিনের নাম্বার শুনেই আর দেরি করেনি, ছুটে চলে গেছে। বাক্সটা কোথায় পাওয়া গেছে, মিস এজটার? বাইশ নাম্বার কেবিনে নিশ্চয়?
কালো হয়ে গেছে জেনির মুখ। মাথা ঝাঁকাল। সিলিঙে।
খোল বাক্সটা, কিশোর, তর সইছে না রবিনের।
বাক্সটা খুলল কিশোর। সবাই তাকিয়ে রইল চকচকে পাথরগুলোর দিকে। তারপর সামনে ঝুঁকলেন চীফ। সবুজ একটা পাথর তুলে হাতে নিয়ে দেখলেন। এটা রত্ন নয়, কাচ! একটার সঙ্গে আরেকটা ঘষা দিয়ে দেখে বললেন, সব কাচ এগুলো।
ওগুলোর নিচে একটা খাম রয়েছে। সেটা থেকে বেরোল একটা চিঠি। তাতে লেখাঃ
সমস্ত আগ্রহী গুপ্তধন শিকারিদের বলছি, তোমাদের বোঝা উচিত ছিল, একজন সুস্থ মানুষ তার টাকা খুব ভেবেচিন্তে খরচ করে। আমিও করেছি। একদল বোকা গাধা আমার গুপ্তধনের পেছনে কিভাবে পাগলের মত ছুটছে কল্পনা করে হাসি ঠেকিয়ে রাখতে পারছি না আমি। বোকাদের জন্যেই রেখে গেলাম এই কাচের টুকরোগুলো, বোকামির পুরস্কার।–ডেন।
স্তব্ধ হয়ে গেছে সবাই। মানে…এ-সবই…, কথা আটকে যাচ্ছে নরির, ফাঁকিবাজি!
মিনমিন করে বলল কিশোর, অথচ আমি শিওর ছিলাম… কেউ তাকে বোকা গাধা বললে খুব খারাপ লাগে তার।
আক্কেল হয়েছে, মুসা বলল, কয়রা আরও লোভ।
নিশ্চয় আরও আছে! জেনির দিক ঘুরল উড। সিলিঙে আর কি পেয়েছ।
আর? রাগ করে বলল মাইক, অনেকগুলো মণিমুক্তো। বস্তা বস্তা পড়ে আছে, নিয়ে এসোগে।

নিশ্চয় কিছু আছে আরও, উকিল বলল। গিয়ে দেখা দরকার।
দল বেঁধে আবার নিচের ডেকে চলল সবাই। জেনি আর মাইকও চলল পুলিশ প্রহরায়। কেবিনে ঢুকতেই চোখে পড়ল ছাতের কালো ফোকর। পাশে ইলেকট্রিকের হেঁড়া তার ঝুলছে। সেগুলো সাবধানে এড়িয়ে খোপের ভেতরে হাত দিল মুসা। হাত ঘুরিয়ে চারপাশে দেখল, মাথা নাড়তে গিয়েও থেমে গেল। দুআঙুলে ধরে বের করে আনল একটা খাম।
তার হাত থেকে ছোঁ মেরে খামটা নিয়ে খুলল উড। চেঁচিয়ে বলল, এটাই আসল উইল! যেটাতে নরি আর এলসাকে সব সম্পত্তি দিয়ে গেছে কারমল। হেসে উঠল সে।
অসম্ভব! কিশোর বলল।
কেন? তীক্ষ্ণ হল উডের কণ্ঠ।
আপনার অফিস থেকে যেটা চুরি গেছে, সেটা যদি এটা হয়, তাহলে এখানে লুকাল এনে কে?
হয়ত কারমলই। ও চেয়েছিল এটা যাতে কেউ নষ্ট করতে না পারে, উকিল বলল। কারমল জানত, উইলটা নষ্ট করে তার সম্পত্তি হাত করার চেষ্টা করবে এজটাররা! পরাজিত ভাইবোনের দিকে খুশি খুশি দৃষ্টিতে তাকাল সে।
কিন্তু, যুক্তি দেখাল কিশোর, উইলটা না পেলেও তো নরিই পাবে সব সম্পত্তি। এজটাররা নয়।
পাগল ছিল তো, ভাবনার ঠিকঠিকানা ছিল না। যা মনে হয়েছে করেছে, ত্যাগ করল উড। যাই হোক, এটা পাওয়ায় ভাল হয়েছে। সম্পত্তি পেতে আর। কোন ঝামেলা হবে না এলসা আর নরির।
হ্যাঁ, চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। কিন্তু এভাবে ফাঁকি দিল...
আমি বিশ্বাস করি না! চেঁচিয়ে উঠল নরি। চিঠিটা নকল, দাদা লেখেনি! আমি বিশ্বাস করি না!
শয়তান! বিড়বিড় করল জেনি। আস্ত শয়তান! শয়তানের আবার রসিকতা!
তার দিকে ফিরে কঠোর গলায় চীফ বললেন, আপনি আর আপনার ভাইয়ের জন্যে এটা শয়তানী হতে পারে, ম্যাডাম, তবে অনেকের জন্যে সত্যি রসিকতা। ক্যাপ্টেন, শো-এর সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরেও এদের জাহাজে থাকার পারমিশন আছে? কিংবা জাহাজের ক্ষতি করার অধিকার?
নিশ্চয় না! কড়া গলায় বললেন ক্যাপ্টেন। তার ছিঁড়েছে, আরও ক্ষতি করেছে।
তারমানে ওরা অপরাধী। জোরাল প্রতিবাদ জানাল মাইক, আপনি আমাদেরকে হয়রানি...

অপরাধ তো আরও আছে আপনাদের, মিস্টার এজটার, বাধা দিয়ে বলল কিশোর। লাইফবোটটা খুলে দিয়ে আরেকটু হলেই প্রায় মেরে ফেলেছিলেন।
গম্ভীর হয়ে বললেন চীফ, খুব খারাপ করেছে। মস্ত অপরাধ।
ইডিয়ট! মাইকের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বলল জেনি, মানা করেছিলাম তখনই, শোননি। এখন দেখ কি বিপদে পড়েছি!
চুপ! ধমক লাগাল মাইক। বোকা ছেলেটা বলল, আর ওমনি…
অকে কথা শেষ করতে দিল না জেনি, চীফের দিকে চেয়ে বলল, সব ওর বুদ্ধিতে হয়েছে, বুঝেছেন। লাইফবোট, চুরি, যত যা ঘটেছে সব। সব ওর পাগলামী বুদ্ধিতে।
হেসে ফেলল কিশোর। ভাইয়ের বিরুদ্ধেই শেষে? হাহ হাহ। আর কি শয়তানি করেছেন? সকালে নরিকেও ভ্যানে আটকেছিলেন আপনারাই।
কীই! পেঁচার তীক্ষ্ণ চিক্কার রেরোল জেনির কণ্ঠে। আমরা কক্ষনও…
নিয়ে যাও, বিরক্ত হয়ে সহকারীদের আদেশ দিলেন চীফ।
দুজন পুলিশ ধরল ভাইবোনকে। ঝাড়া দিয়ে হাত দুটিয়ে নিয়ে বোনকে ঘুসি মারার চেষ্টা করল মাইক। কিন্তু ধরে রাখা হল তাকে।
কাছে এসেই দেখ না খালি, কোলাব্যাঙ! পেঁচার মতই বড় বড় নখ দেখাল। জেনি। নাগালে পেলেই খামচি মারবে।
চুপ, পেঁচি কোথাকার! ঘুসি মেরে একেবারে নাক ভোঁতা করে দেব!
ভাইবোনের ঝগড়া দেখে হাসতে শুরু করল মুসা। ওদের সরিয়ে নিয়ে গেল পুলিশেরা। আরও কিছুক্ষণ প্যাসেজে শোনা গেল ওদের উত্তেজিত চিৎকার, ঝগড়া। মাথা নাড়তে নাড়তে মুচকি হাসলেন চীফ। বললেন, চলো, যাই।
ক্যাপ্টেন আর চীফ আগে আগে বেরোলেন। পেছনে নরি আর উড। উইলটা উডের হাতে। মুসা আর রবিনও যাবার জন্যে, পা বাড়াল, ইশারায় নিষেধ করল কিশোর।
অবাক হল দুই সহকারী। মুসা বলল, কি ব্যাপার?
জবাব না দিয়ে ডেকের প্লেনটা আবার দেখতে লাগল কিশোর। সন্তুষ্ট হয়ে বিচিত্র একটা শব্দ করল মুখ দিয়ে, তারপর বলল, আমার মনে হয় না এটা রসিকতা। এটা ওর শেষ চাতুরি।
কিন্তু আর কোন ধাঁধা নেই, মুসা বলল। শেষটারও সমাধান করে ফেলেছি আমরা।
না। আরেকটা ধাঁধা রয়েছে। খুব চালাকি করে লুকিয়ে রাখা হয়েছে ওটা। নকলটা বের করল কিশোর। এমনভাবে লিখেছে, যেন এটা ধাঁধার অংশ নয়, একটা

কথার কথাঃ হুড হ্যাভ থট দ্য ওল্ড ম্যান হ্যাড সো মাচ মানি ইন হিম? রোল দ্য ডাইস অ্যাণ্ড দ্য সোয়াগ ইজ ইওরস!
এটা আর কি ধাঁধা হল? রবিন বলল। মানে তো সহজ! কে ভাবতে পেরেছিল, বুড়ো লোকটার এত টাকা? পাশা গড়িয়ে দাও, লুটের মাল তোমার হয়ে যাবে।
আমিও তাই ভেবেছিলাম, কিন্তু এখন অন্য কথা ভাবছি। প্রথম বাক্যটা আর কোথায় আছে, বল তো? পরিচিত মনে হয় না?
গালে আঙুল দিয়ে কয়েক সেকেণ্ড ভাবল রবিন। তারপর বলল, নাটকে। সেকসপীয়ারের ম্যাকবেথ নাটকে ঠিক এরকম একটা কথা আছে, শুধু ওখানে মানির জায়গায় রয়েছে ব্লাড়। বাক্যটা এরকমঃ ই উড হ্যাভ থট দ্য ওল্ড ম্যান টু হ্যাভ হ্যাড সো মাচ রাড ইন হিম?।
হ্যাঁ, মাথা ঝাঁকাল কিলোর। কাকতালীয় হতে পারে না। বুঝেশুনেই লিখেছে কারমল।
ম্যাকবেথ খুব পছন্দ করত বোধহয়, মুসা বলল। কিন্তু একথাটাকে ধাঁধা মনে হচ্ছে কেন?
নইলে এরকম একটা অদ্ভুত বাক্য উইলে থাকত না। চিঠিতে লিখেছে বটে, কিন্তু ওর মত কৃপণের সব টাকা খরচ করার কথা নয়। তাছাড়া জুয়া খেলার কথা উল্লেখ করেছে।
জুয়া? রবিন বলল। এর সঙ্গে ধাঁধার কি সম্পর্ক?
ওই যে বলেছে, পাশা গড়িয়ে দাও। রোল দ্য ডাইস কেন বলল?
আল্লাহই জানে! মুসা বলল।
আমি বুঝতে পারছি। পাশা দিয়ে জুয়া খেলার সময় নেচারাল বলে খেলোয়াড়েরা। এর মানে কি?
চোখ বড় বড় হয়ে গেল রবিনের। সাত! তারমানে কারমল বলছে, সতি নাম্বার আরেকটা ধাঁধা রয়েছে।
খাইছে! বলে উঠল মুসা।কোনটা? ওই অদ্ভুত বাক্যটা? হুড হ্যাভ…
হাত নেড়ে তাকে চুপ করতে ইশারা করল কিশোর। কান পেতে কি যেন শুনল। তারপর গলা চড়িয়ে বলল, মনে হয় ওই বাক্যটাই। কিন্তু মানে বুঝতে পারছি না। আমার বুদ্ধিতে কুলাবে না। চলো অন্যদের গিয়ে সব খুলে বলি। দেখি কে কি বলে।
আমরা চেষ্টা করে দেখি না কেন? মুসা বলল। এজটাররাও নেই, শুঁটকিও নেই, কেউ আর জ্বালাতে আসবে না।
না, জোরে জোরে বলল কিশোর, আমরা পারব না। সাহায্য দরকার। এস।

কেবিন থেকে বেরিয়ে সিঁড়িব কাছে এসে দাঁড়াল ওরা। চলে এল প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের সমাবেশ যেখানে হত সেখানটায়। ঢুকে গেল বিশাল জাহাজটার নীরব, অন্ধকার ডেকে।
হয়েছে, থাম, ফিসফিসিয়ে বলল কিশোর। যথেষ্ট দূরে চলে এসেছি।
কি হয়েছে, কিশোর? বুঝতে পারছে না মুসা। আবোল-তাবোল কথা বলছ কেন?
করছিটা কি আমরা? রবিনও অবাক হয়েছে।
আরও কয়েক মিনিট অপেক্ষা করব আমরা, কিশোর বলল। তারপর যাব সেখানে, যেখানে রত্নগুলো রয়েছে।
কোথায়, জানো? কিশোর বলছে দেখে রবিনও ফিসফিসিয়ে বলল। বুঝতে পারছে, গোয়েন্দাপ্রধানের মনে কোন মতলব আছে।
কিন্তু মুসা বুঝতে না পেরে জোরেই জিজ্ঞেস করল, কোথায়?
চট করে একবার চোখ বুলিয়ে নিল কিশোর, কিন্তু অন্ধকার ডেকে কোন নড়াচড়া চোখে পড়ল না। বলল, ডেকের নকশায় দেখলাম, ছোট একটা লাউঞ্জ আছে কুইন জাহাজে, ওটার নাম ম্যাকবেথ রুম। রতগুলো ওখানেই আছে।
খাইছে! আমরা পারব না বলেছিলে কেন তাহলে?
বুঝতে পারবে একটু পরেই, হাতঘড়ি দেখল কিশোর। হয়েছে। চলো এবার যাই। শব্দ করবে না। আমার পেছনে থাকবে, যা যা করতে বলব, করবে।
বেড়ালের মত নিঃশব্দে আবার সমাবেশের জায়গাটায় বেরিয়ে এল গোয়েন্দাপ্রধান। কার্পেট বিছানো চওড়া সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করল বি-ডেকে। নীরবে অনুসরণ করছে দুই সহকারী। বি-ডেকে নেমে স্নান আলোকিত বারান্দা ধরে হেঁটে চলল। একটা দরজার পাশের ছায়ায় এসে দাঁড়িয়ে গেল। দরজার পাল্লার গায়ে গোল জানালা।
ম্যাকবেথ রুমের একপাশের দরজা এটা, বলল কিশোর। সারভিস ডোর।
কি করব এখন? মুসা জানতে চাইল।
অপেক্ষা। এবং নজরে রাখব।
ওর কথা শেষ হওয়ার প্রায় সাথে সাথেই টর্চ জ্বলে উঠল ঘরের ভেতর। একই জায়গায় থেকে আলোর রশ্মি ঘুরতে শুরু করল সারা ঘরে। আলোয় ফুটে উঠতে থাকল কতগুলো টেবিল, আর্মচেয়ার, মরচে পড়া একটা বার, দেয়ালে সাজানো প্রাচীন হেলমেট, বর্ম, বেদীতে বসানো স্কটিশ যোদ্ধাদের দাড়িওয়ালা আবক্ষ মূর্তি। ঘরের মধ্যে ঘোরাফেরা শুরু করল টর্চধারী।
প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে ছেলেরা। গাঢ় রঙের কটটেল লাউঞ্জের ওপর আলো পড়ল। টর্চ ধরে থাকা হাতটা ছাড়া টর্চধারীর শরীরের আর কোন অংশ চোখে পড়ছে না। শুধু কালো একটা মূর্তি দ্রুত সরে যাচ্ছে

এখান থেকে ওখানে, প্রতিটি টেবিলের সামনে দাঁড়াচ্ছে, বারের নিচে, বর্ম আর হেলমেটগুলোর ভেতর খুঁজছে। টান দিয়ে দিয়ে খুলে নিচ্ছে দেয়ালের জিনিস, তুলে নিচ্ছে টেবিলে রাখা জিনিস, টর্চের কাছে এনে পরীক্ষা করছে, তারপর ছুঁড়ে ফেলছে।

আলো ঘুরতে শুরু করল মূর্তিগুলোর ওপর। চাপ দাড়িওয়ালা একটা ব্রোঞ্জের মূর্তির ওপর এসে থামল। ওটার মাথায় একটা রাজকীয় মুকুট। অস্ফুট শব্দ করে দ্রুত মূর্তির কাছে গিয়ে দাঁড়াল লোকটা। তুলে নিল। হাতে নিয়ে ওজন আন্দাজ দেখল, একটা কেবিনে প্রায় দৌড়ে এসে ওই একটা। মুহূর্তে ঢুকে করে সন্তুষ্ট হয়ে আবার শব্দ করল সে, আনন্দ ধ্বনি।

রবিনের কাঁধ খামচে ধরল কিশোরের আঙুল। আরেকটু জোরে দিলেই আউউ করে উঠত রবিন। ফিসফিসিয়ে গোয়েন্দাপ্রধান তার কানে কানে বলল, ভেতরটা বোধহয় ফোপড়া! মনে হয় পেয়েছে!

একটা টেবিলে টর্চটা শুইয়ে রেখে আলোর সামনে ধরে র্তির ফোকরে হাত ঢুকিয়ে দিল লোকটা। চামড়ার একটা বড় বটুয়া বের করল ভেতর থেকে। মূর্তিটা ছুঁড়ে ফেলে খুলল বটুয়াটা। হেসে উঠল একা একাই। বটুয়া হাতে নিয়ে বেরিয়ে গেল ম্যাকবেথ রুমের মেইন ডোর দিয়ে।

এস, কিশোর বলল, পিছু নিতে হবে। শব্দ করবে না, খবরদার।

বি-ডেকের প্যাসেজের একটা মোড়ে এসে থেমে মুখ বের করে উঁকি দিল ওরা। স্নান আলোয় দেখল দ্রুত চলে যাচ্ছে লোকটা। মুহূর্তে ঢুকে গেল পাশের আরেকটা সরু প্যাসেজে। প্রায় দৌড়ে এসে ওই প্যাসেজের মাথায় দাঁড়িয়ে ছেলেরা দেখল, একটা কেবিনে ঢুকে যাচ্ছে সে।

কেবিনের বাথরুমে ঢুকতে দেখা গেল লোকটাকে। যখন আবার বেরিয়ে এল, তার হাতে বটুয়াটা নেই। রবিন আর মুসার কাঁধে টোকা দিয়ে ওদের দৃষ্টি তার দিকে ফেরাল কিশোর। চোখের ইশারায় পাশের আরেকটা কেবিন দেখাল।

কেবিনটাতে ঢুকে পড়ল ওরা। সময়মত ঢুকেছে। লোকটা বেরিয়ে প্যাসেজ ধরে হেঁটে গিয়ে মূল প্যাসেজে উঠল। পিছু নিতে চাইল আবার মুসা, তাকে থামাল কিশোর। না, চলে যাক। ব্যাগটা খুঁজে বের করব, চলো।

প্রথম কেবিনটায় ঢুকে বাথরুম খুলল কিশোর। পকেট থেকে পেন্সিল টর্চ বের করে আলো ফেলল ভেতরে। দেয়ালের ওপর দিকে হাওয়া বেরোনোর পথ আছে, ভেন্টিলেটর, তাতে দেখা গেল বটুয়ার একটা কোণ বেরিয়ে আছে। চোখ চকচক করে উঠল কিশোরের, কিন্তু বটুয়াটা নিল না, বাথরুমের দরজা বন্ধ করে দিল আবার।

নিশ্চয় পাথরগুলো আছে, মুসা বলল। নেবে না?

চোরটার পিছু নেবে না? বলল রবিন। চোরই তো বলা যায় তাকে, নাকি?
নিঃসন্দেহে, জবাব দিল কিশোর। তবে বেশিদূর যায়নি। আর ওটা ছোঁয়া আমাদের উচিত হবে না। চোরটা যে ওটা ধরেছিল প্রমাণ নষ্ট হয়ে যাবে তাহলে।
ফাঁদ পেতেছিলে তুমি, তাই না, কিশোর? বুঝে ফেলল রবিন। তুমি জানতে, ম্যাকবেথ রুম থেকে পাথরগুলো চুরি করবে কেউ। কিভাবে জানলে?
কারণ আমি বুঝতে পেরেছি, নকল পাথরগুলোর সঙ্গে যে উইলটা পাওয়া গেছে ওটাও মেকি। কারমল কখনই ওটা ওখানে রাখেনি। তারমানে এজটারদের আগেই কেউ পাথরগুলো পেয়েছিল, আবার রেখে দিয়েছে ওখানে।
রেখে দিয়েছে? অবাক হল মুসা। কেন?
যাতে আমরা সন্দেহ না করি। চোরটাকে আসল পাথরের সন্ধান করে দিই। তখনই আমি বুঝতে পেরেছি, সব সময় আমাদের ওপর যে চোখ রেখেছে, বিগ আর হিউগের কাছে যে টাকা ধারে, ওই লোকেরই কাজ এটা। আমাদের ওপর তখনও চোখ রেখেছে। কাজেই ফাঁদ পাতলাম।
সাত নাম্বার ধাঁধার কথা জোরে জোরে বললাম, যাতে সে শুনতে পায়। তারপর মানে না বোঝার ভান করলাম। ম্যাকবেথ রুমের কথা চোরটার অজানা থাকার কথা নয়। তাছাড়া নকশাতেও রয়েছে ওটা। একটা নকশা নিয়ে চোখ বুলিয়ে নিলেই হল। বুঝেছি, আমরা জাহাজ থেকে নেমে গেছি বুঝলেই গিয়ে রহগুলো খুঁজে বের করবে সে।
এবং তা-ই করেছে!
হ্যাঁ, হাসল কিশোর। এখন গিয়ে চীফকে পাথরগুলোর কথা জানানো দরকার। ব্যাগ, আর ব্যাগের ওপরের ছাপ...
সেই সুযোগ আর পাবে না তোমরা!
চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরল তিনজনে। খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে উকিল রস উড। হাতে উদ্যত পিস্তল।
ফিরে এসে কাজটা খুব খারাপ করে ফেলেছি, তাই না? গম্ভীর হয়ে বলল উড।
গোড়া থেকেই ওগুলো চুরির মতলব ছিল আপনার! গরম হয়ে বলল রবিন।
এগিয়ে এল উড। রাগত হাসল। টাকা আমার ভীষণ দরকার, অথচ ওই বুড়ো ডাকাতটা তার খেপাটে উইল বানিয়ে আমাকে আটকে দিল। আমি.এলসাকে বিয়ে করি, এটা তার মোটেও পছন্দ ছিল না। তার ভয় ছিল, এলসাকে বিয়ে করে আমি সব টাকা মেরে দেব।
আমাদেরকে ব্যবহার করেছেন আপনি, ধীরে ধীরে বলল কিশোর। সে জন্যেই বয়স্ক কোন গোয়েন্দা সংস্থাকে ভাড়া করার চেয়ে আমাদেরকে করা ভাল মনে করেছেন। ভেবেছেন, কম বয়েসীদের ফাঁকি দেয়া সহজ।

ভুলই ভেবেছি, স্বীকার করল উড। অনেক বয়স্ক লোকের চেয়ে অনেক বেশি চালাক তোমরা।
পিস্তল নাচাল সে। ভয় পেলেও সেটা উডকে বুঝতে দিল না ছেলেরা। দাঁড়িয়ে রইল যেখানে ছিল।
কেউ চুরি করার আগেই কেন ওগুলো হাতিয়ে নিলেন, বুঝতে পারছি, রবিন বলল। কিন্তু আপনি চুরি করতে গেলেন কেন? মিস কারমলকে বিয়ে করলে এমনিতেই তো মালিক হয়ে যেতেন।
একেবারে নিশ্চিত হয়ে নিলেন, না? যোগ করল কিশোর। দলিলের একটা নকল কপিও রেখে দিয়েছেন কাঁচের টুকরোগুলোর সঙ্গে।
চালাক ছেলে! উড বলল। পাথরগুলোর মালিক হয়ত হতে পারতাম এলসাকে বিয়ে করে, তবে আংশিক। আর আংশিক জিনিসে আমার চলবে না। তাছাড়া বিক্রি করতে গেলে তার নানারকম প্রশ্নের জবাব দিতে হত। কে যায় অত ঝামেলা করতে।
জিনিসগুলো কেন আপনার দরকার জানি আমরা, মুসা বলল।
কারণ জুয়া খেলে হেরেছেন, টাকা পায় আপনার কাছে হিউগ আর বিগ, তিক্তকণ্ঠে বলল রবিন। টাকার জন্যে চাপ দিচ্ছে এখন।
আর এলসা যদি শোনেন আপনি জুয়াড়ী, অনেক টাকা ধার রয়েছে আপনার, কিশোর বলল, আপনার ওপরে খারাপ ধারণা হয়ে যাবে তার।
ও, অনেক কিছু জানো তোমরা। বেশি জানো, কপাল খারাপ আরকি তোমাদের, উড বলল। তবে বলেছ ঠিকই, ধারণা খারাপ হয়ে যাবে, বিশ্বাসও রাখতে পারবে না আর। বড় কথা হল, সবগুলোই যখন মেরে দিতে পারি, কোনরকম ঝামেলা ছাড়া, কেন ভাগাভাগি করতে যাব নরি আর এলসার সঙ্গে? কেউ কিছু জানবে না এখন। পাথরও হজম করব, এলসাকে বিয়ে করে আরামে ভোগ করব কারমলের সয়সম্পত্তি।
ছেলেদের দিকে পিস্তল উদ্যত রেখেই জোরে জোরে হাসল উড। তার কাঁধের ওপর দিয়ে কেবিনের দরজার দিকে তাকাল কিশোর। বলল, না, তা পারছেন না। মিস করমল যখনই জানবেন, তাঁকে ঠকাতে চেয়েছেন আপনি, কখনই আর বিয়ে করবেন না আপনাকে।
শয়তানি হাসি ফুটল উডের ঠোঁটে। কিন্তু জানতে তো পারছে না। রত্নগুলোর কথা জানো শুধু তোমরা তিনজন, তোমরা তো গিয়ে বলতে পারছ না।
আমরা হয়ত পারব না, কিশোর বলল। কিন্তু তিনি জেনে যাবেনই। তাই, নরি? জলদি গিয়ে চীফকে জানাও যা যা শুনেছ।

কিশোরের দিকে তাকিয়ে থেকেই হো হো করে হেসে উঠল উড। মাথা নাড়ল। পুরানো কৌশল, কিশোর ওতে পা দিচ্ছি না আমি।
নরি, জলদি কর! মুসা তাগাদা দিল। ভ্রূকুটি করল উড। চুপ! ঘুরছি না আমি।
আহ, দাঁড়িয়ে আছ কেন? আতঙ্ক জাগল কিশোরের কণ্ঠে। জলদি কর, ছেলে, দৌড়ও!
কিশোরের কণ্ঠস্বর উডকে অবাক করল। সরু হয়ে এল চোখের পাতা। তারপর কানে এল পেছনের শব্দ। ঘুরল অবশেষে। তবে দেরি করে ফেলেছে। প্যাসেজে ছুটতে শুরু করেছে ততক্ষণে নরি।
যাক, পেরেছে! খুশি হয়ে বলল মুসা।
প্যাসেজের দিকে তাকিয়ে গাল দিয়ে উঠল উড। তারপর ধীরে ধীরে ফিরল আবার তিন গোয়েন্দার দিকে।
লোভ আপনার সর্বনাশ করে দিয়েছে, মিস্টার উড, কিশোর বলল। সবই, খোয়ালেন। আমাদের মুখ বন্ধ করে দিলেও এখন আর লাভ হচ্ছে না আপনার।
মাথা ঝাঁকাল উকিল। হ্যাঁ, খুব চালাকির সঙ্গে করেছ কাজটা। বোকা বানাতে চেয়েছিলে আমাকে, বানিয়েছ। এমন কাঁচা ভাবে কথা বলার চেষ্টা করেছ, আমি বুঝতেই পারিনি সত্যি সত্যি নরির সঙ্গে বলেছ। যাকগে, যা হবার হয়েছে, কি আর করা।
তারমানে এখন আর আমরা আপনার জন্যে বিপদের কারণ নই।
না। তবে এখন আমাকে সাহায্য করতে যাচ্ছ তোমরা। এ-ধরনের পরিস্থিতি ঘটলে কি করব, আগেই ভেবে রেখেছি আমি। মুসা, বাথরুম থেকে রত্নগুলো বের করে আন! মুসার পেট বরাবর পিস্তল ধরল উড। কোন চালাকির চেষ্টা নয়। এখন আমি বেপরোয়া।
ঢোক গিলল মুসা। যা করতে বলা হল করল। বাথরুম থেকে বটুয়াটা বের করে এনে উডের হাতে তুলে দিল।
ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল উড। পালিয়েই যেতে হচ্ছে শেষ পর্যন্ত। আর কিছু করার নেই। যাকগে, অসুবিধে নেই। মেকসিকো অনেক নিরাপদ জায়গা। আর এসব দামি জিনিস কেনার লোক অনেক আছে ওখানে। পিস্তল নাড়ল সে। হাঁটো। আমার সামনে থাকবে।
উডের নির্দেশ মত ম্লান আলোকিত প্যাসেজ ধরে এগিয়ে চলল ছেলেরা। চীফ আর তার লোকজনের গলা কানে আসছে, খানিক আগে যে কেবিনটায় ছিল ওরা সেদিক থেকে। কান পেতে শুনল উড। তারপর একটা সিঁড়ি দিয়ে ছেলেদেরকে নামিয়ে নিয়ে এল জাহাজের একেবারে পেটের ভেতর। জরুরী

হাঁকডাক শোনা যাচ্ছে ওপরে। ছেলেদের না পেয়ে নানারকম নির্দেশ দিতে আরম্ভ করেছেন ফ্লেচার।
একটা প্যাসেজকে আড়াআড়ি কেটে সি-ডেকে চলে গেছে আরেকটা প্যাসেজ। রবিন আর কিশোরকে ইশারা করল উড, তোমরা দুজন ওদিকে। যাও?
কিন্তু... প্রতিবাদ করতে গিয়ে বাধা পেল রবিন। ধমকে উঠল উড, যা বলছি কর! মুসা যাচ্ছে আমার সাথে। বন্ধুকে জীবিত দেখতে চাইলে সোজা করিডর ধরে চলে যাও। পেছনে তাকাবে না।
নির্দেশ মানতে বাধ্য হল রবিন আর কিশোর। প্যাসেজের শেষ মাথায় পৌঁছার আগে ফিরে তাকানোর সাহস করল না।
মুসাকে নিয়ে চলে গেছে উড।
চেঁচাতে শুরু করল দুই কিশোর। প্যাসেজ ধরে ছুট চীফ আর তার দলের কাছে। অবশেষে তাদের ডাক শুনতে পেলেন চীফ। বি-ডেকের একটা খোলা জায়গায় মিলিত হল ওরা।
উড় কোথায়? জানতে চাইলেন চীফ।
কি হয়েছে, দ্রুত তাকে জানাল কিশোর আর রবিন।
একবার মেকসিকোতে চলে গেলে আর তাকে ধরা যাবে না, চীফ বললেন। তবে জাহাজ থেকেই বেরোতে দিচ্ছি না। গ্যাংপ্ল্যাঙ্কে পাহারা দিচ্ছে পুলিশ।
ভুরু কোঁচকাল কিশোর। জাহাজ থেকে নামার কি ওই একটাই পথ?
আমি তো তা-ই জানি।
চীফ! হঠাৎ সতর্ক হয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন। আরেকটা পথ আছে! পেছনে, মাল খালাস হত যেদিক দিয়ে।
খোলা নাকি?
থাকার তো কথা নয়। কিন্তু...
জলদি করুন, স্যার, চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। ওদিকেই যাবে!
দলটাকে নিয়ে সেদিকে ছুটলেন ক্যাপ্টেন। দেখা গেল, তালা ভেঙে দরজা খোলা হয়েছে। ওটা পেরোতেই চোখে পড়ল, মাল তোলা আর নামানোর সরু গ্যাংপ্যাক ধরে নেমে যাচ্ছে উড। মাথায় পিস্তল ধরে আগে আগে চলতে বাধ্য করছে মুসাকে।
শব্দ শুনে ফিরে তাকাল উকিল। ধমক দিয়ে বলল, খবরদার, কেউ এগোবে না!
উড চীফ বললেন। পালাতে পারবে না! অযথা...
ছেলেটাকে মারতে না চাইলে সরুন...।
শেষ হল না কথা। মুহূর্তের জন্যে অমনোযোগী হয়েছিল উড, সুযোগটার সদ্ব্যবহার করল মুসা। ঝপ করে বসে পড়ে উডের হাঁটুর পেছনে জড়িয়ে ধরে

মারল হ্যাঁচকা টান। চিত করে ফেলল তাকে গ্যাংপ্যাঙ্কে। হাত থেকে খসে পড়ল বটুয়া আর পিস্তল। ঢাল পথে স্থির থাকতে পারল না উড, হাত পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে গড়িয়ে পড়তে লাগল গ্যাংপ্যাঙ্ক ধরে।।
তাকে ধরে থামাতে গিয়ে মুসাও গড়াতে শুরু করল। তবে উকিলের পা ছাড়ল। উডের আরেকটা পা রেলিঙের ফাঁকে ঢুকে আটকে গেল, মট করে শব্দ হল হাড় ভাঙার। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল উড, বাবারে গেছি! মরে গেছিরে বাবা! আমার পা...।
হুড়মুড় করে নেমে এল কয়েকজন পুলিশ। দুজনকে ধরে তুলল। মুসা হাঁপাচ্ছে জোরে জোরে। উকিল সোজা থাকতে পারছে না একপায়ে ভর দিয়ে
আরেকটা পা সোজাই করতে পারছে না। সত্যিই ভেঙেছে।
যাক, ছেড়ে দিলেও এখন বেশ কিছুদিন আর চুরি করতে পারবে না, চীফ বললেন। উচিত শিক্ষা হয়েছে। কিশোরের দিকে ফিরে বললেন, ওভাবে ওকে ধরার চেষ্টা করা মোটেই উচিত হয়নি তোমার। ভাগ্যিস নরি গিয়েছিল, নইলে তো মরেছিলে। তোমার সন্দেহের কথা আমাকে বললেই পারতে।
প্রমাণ তো ছিল না, স্যার, নিজের পক্ষে সাফাই গাইল কিশোর। একটা নকল দলিল রেখে দেয়া ছাড়া আর কিছুই করেনি তখনও। আমি সেটা সন্দেহ করেছি বটে, প্রমাণ করতে পারতাম না। ওকে ওভাবে ফাঁদে না ফেললে রত্নগুলো মারত, মিসেস কারমলকে বিয়ে করে তার সম্পত্তিরও বারোটা বাজাত।
প্রমাণ করার দরকার ছিল না, চীফ বললেন। তোমার সন্দেহের কথা আমাকে বললেই হুঁশিয়ার হতে পারতাম। যাকগে, ভালয় ভালয় সব মিটে গেছে...
আরি, সর্বনাশ! চেঁচিয়ে উঠল নরি। পাথরগুলো পানিতে...
না, পড়েনি, হাসল মুসা। হাত উঁচু করে বটুয়া দেখাল। খুলে উপুড় করে ধরল ডেকের ওপর। ঝরঝর করে ঝরে পড়ল লাল, হলুদ, নীল আর সবুজ রঙের কতগুলো পাথর, ছোটখাট একটা স্তূপ হয়ে গেল। জাহাজের ম্লান আলোয় ঝলমল করে উঠল, ছড়াতে লাগল ঠাণ্ডা রঙিন দ্যুতি।
কয়েক দিন পর। কেসের রিপোর্ট নিয়ে চিত্রপরিচালক ডেভিস ক্রিস্টোফারের অফিসে হাজির হল তিন গোয়েন্দা। খাড়া-পিঠ ডেস্ক-চেয়ারে বসে সামনে পেছনে দোল খেতে খেতে মন দিয়ে ছেলেদের কথা শুনলেন তিনি।
তাহলে গোড়া থেকেই কারমলের রসের পেছনে লেগে ছিল উড, বললেন পরিচালক।
হ্যাঁ, স্যার, কিশোর বলল।
বেঈমান!

কারমল তাকে দেখতে পারত না, সন্দেহ করত, মুসা বলল, এলসাকে বলেছিলও সেকথা। কিন্তু এলসা বুড়োর কথায় কান দেয়নি।
হুঁ, মাথা দোলালেন পরিচালক। মনের ব্যাপারে মানুষ অন্ধই হয়। তা সে জন্যেই বুঝি এই আজব উইল বানিয়েছিল কারমল, উডের হাত থেকে তার কষ্টে অর্জিত টাকা বাঁচানোর জন্যে?
সেটা একটা কারণ, কিশোর বলল। কারমল ভেবেছিল, ধাঁধার ব্যবস্থা করলে, গুপ্তধন শিকারে জড়িত হয়ে পড়বে উড, বিয়েটা করতে দেরি হবে। হয়ত রত্ন খুঁজতে গিয়ে তার আসল রূপ এলসার কাছে ফাঁস করে দিতে পারে। আর তা-ই করেছে উড। ড্যাম সানকে সব কথা বলেছে কারমল। উডের মত একটা বাজে লোকের সঙ্গে মিশছে বলে পুত্রবধুর ওপরও বিরক্ত হয়ে গিয়েছিল সে। সান অন্তত তা-ই বলেছে।
উড বুঝতে পারেনি, হেসে বলল মুসা। কি-রকম ধূর্ত লোকের পাল্লায় পড়েছে সে। প্রথমে তার অফিস থেকে কারমলের আগের উইলটা হারাল, তারপর কারমলের মৃত্যুর পর পত্রিকায় বেরিয়ে গেল আজব উইলের খবর। স্তব্ধ করে দিয়েছিল বেচারা উকিলকে।
তারমানে কি উড প্রথম উইলটা নষ্ট করেনি? পরিচালক জিজ্ঞেস করলেন।
না। কারমল করেছে। উডের অফিস থেকে চুরি করেছিল ওটা, জবাব দিল কিশোর।
পরের উইলটা উডকে দিয়ে করালে, আর তার কাছে থাকলে শিওর ওটা নষ্ট করে ফেলত, রবিন বলল, সে-কারণেই ওটা তার কাছে রাখেনি কারমল। তাকে জানায়ওনি কিছু। রেখেছিল ড্যাম সানের কাছে। অনুরোধ করে গিয়েছিল, তার মৃত্যুর পর যেন পত্রিকায় ছেপে দেয়।
কিশোর বলল, ওই উইলের খবর শুনে তো মাথা খারাপ হওয়ার অবস্থা হল উডের। টাকার জন্যে মাথা তখন তার এমনিতেই গরম। তার ভয় ছিল, অন্য কেউ রত্নগুলো খুঁজে বের করে ফেলবে। সুতরাং আমাদের ভাড়া করল।
তার ধারণা ছিল, রবিন বলল, রতুগুলো পাওয়ার পর আমরা যদি গোলমাল করিই, সহজেই সরিয়ে দেবে আমাদেরকে।
তারমানে তোমাদের ভাড়া করেই ভুলটা করেছে, মিটিমিটি হাসছেন
পরিচালক।
আসলে নিজেকেই পরাজিত করেছে সে, কিশোর বলল। মরেছে তার লোভের জন্য।
ওকে সন্দেহ করলে কেন? পরিচালক জিজ্ঞেস করলেন।

লম্বা দম নিল কিশোর। প্রথম সন্দেহ হল হিউগ আর বিগের কথা শোনার পর। ওরা বলল, একজনের কাছে টাকা পায় ওরা, সেই লোকই ওদেরকে বলেছে আমাদের আটকাতে। রত্নগুলো চায় সেই জুয়াড়ী লোকটা। হিউগ আর বিগ আমাদের ওপর যেমন রাখত, মিসেস কারমলের বাড়ির ওপরও নজর রাখত। বুঝলাম, জুয়াড়ীকে ওখানেই পাওয়া যাবে। আর ওখানে তখন পুরুষ তোক বলতে একমাত্র রস উড।

কাজেই, জাহাজে ওঠার আগে থেকেই আমার সন্দেহ ছিল জুয়াড়ী লোকটা রস উড। তারপর এমন একটা ঘটনা ঘটল, একেবারে শিওর হয়ে গেলাম যে সে-ই সেই লোক। কেবিনের সিলিঙে কাঁচের টুকরোর সঙ্গে পাওয়া গেল নকল উইল।

কিন্তু কি করে বুঝলে নকল? আর উডই যে ওই কাজ করেছে সেটা?

কারণ ভোরা কেমপার আমাকে বলেছে, আগের উইলটা কারমল নষ্ট করে ফেলেছে। দ্বিতীয় উইলটায় সাক্ষী দিতে ডাকার আগেই সেকথা সান আর ডোরা কেমপারকে বলেছিল কারমল। বলেছিল, চুরি করে এনে ওটা পুড়িয়ে ফেলেছে। জানিয়ে রেখেছিল এই কারণে, যদি প্রথম উইলটা আবার উদয় হয় কখনও, সেটা যে জাল ওরা যেন বলতে পারে কোর্টে। কারমলের সন্দেহ ছিল, একটা জাল দলিল তৈরি করবেই উড। তার সন্দেহ সত্যি প্রমাণিত হয়েছে।

আমি এসব কথা শুনে এসেছি আগেই। কাজেই জাল দলিলটা যখন সত্যি বেরোল, বুঝে ফেললাম কার কাজ। কেন রাখা হয়েছে তা-ও বুঝলাম।

বলে যাও, পরিচালক বললেন।

হ্যাঁ, খুলেই বল সব,মুসা অনুরোধ করল। একবার শুনেছি, কিন্তু ব্যাপারটা বুঝতে পারিনি ঠিকমত। দেখা যাক এখন বুঝি কিনা।

বেশ, কিশোর বলল, বলছি। কিন্তু এতে না বোঝার তো কিছু নেই। কারমলের মৃত্যুর পর কে লাভবান বেশি হবে এটা তো জানা কথা। জাল দলিলটা যদি না বেরোয়, তাহলে দাদার স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তির মালিক হবে নরি, কারণ সে-ই একমাত্র উত্তরাধিকারী। তার অমতে তার জিনিস কেউ ছুঁতে পারবে না, এমনকি তার মায়েরও সে-অধিকার নেই।

কাজেই জাল দলিলটা এল, নরি আর তার মায়ের নামে। নরি পাবে শুধু অর্ধেক, পুরোটা নয়। তার মা পাবে বাকি অর্ধেক। উড তাকে বিয়ে করলে সহজেই স্ত্রীর সম্পত্তির অর্ধেকের মালিক হয়ে যাবে, কারণ ক্যালিফোর্নিয়ার আইনে স্ত্রীর সম্পত্তির অর্ধেকের মালিক হয় স্বামী।

হ্যাঁ, মাথা ঝাঁকালেন পরিচালক।

ছেলের জিনিস মা চুরি করবে না, বলে গেল কিশোর, এটা শিওর। কাজেই সন্দেহ করার মত আর একজনই রইল, রস উড। আন্দাজ করলাম, সারাটা বিকেল

জাহাজে পাথরগুলো খুঁজেছে সে। তার পেছনে কেউ লাগবে এ-ভয় ছিল না। হিউগ আর বিগকে বলে দিয়েছিল আমাদের আটকাতে। নরি হোক ছোঁক করছিল বলে তাকে নিজের হাতে বন্দি করে ভরে রেখেছিল ভ্যানে, আমরা যে তাকে ছেড়ে দিয়েছি, জানত না। নকল পাথরগুলো পেল, তবে আমার মতই সে-ও কারমলের চিঠি বিশ্বাস করেনি। বুঝতে পেরেছে, মিথ্যে কথা বলছে কারমল। জাল দলিলটা তখনই রেখে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে গেল যে, যদি রহগুলো না-ও পায়, এলসার সম্পত্তির ভাগীদার সে হবেই। তারপরে অবশ্যই হিউগকে বলত আমাদের ছেড়ে দিতে, এবং আমাদের মাধ্যমে রহগুলো খুঁজে বের করার চেষ্টা করত। কিন্তু আমাদেরকে ছাড়া পেয়ে যেতে দেখে অন্য বুদ্ধি এল তার মাথায়।
আমি যখন শিওর হয়ে গেলাম, তাকে ধরার জন্যে ফাঁদ পাতলাম। সেই কেবিনেই রয়ে গেলাম অন্যেরা বেরিয়ে যাওয়ার পরেও। ব্যাপারটা উডের চোখ এড়াল না। বাইরে বেরিয়ে আড়ি পাতল সে। আমিও তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে সব কথা বললাম। তারপর কায়দা করে তাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে গেলাম ম্যাকবেথ রুমে, একেবারে আমার ফাঁদের মধ্যে।
ফাঁদটা অবশ্য তোমাদেরকেও বিপদে ফেলে দিয়েছিল, পরিচালক বললেন। মরেছিলে আরেকটু হলেই। যাক, ভালয় ভালয় সব শেষ হয়েছে।
হ্যাঁ, স্যার, হাসল কিশোর।
হিসেব করে অনেক কিছু বের করেছ, ঠিক, তবে কিছু কিছু ব্যাপারে আন্দাজেও ঢিল ছুঁড়েছ, তাই না? এই যেমন, মাইক এজটারকে বোট খুলে দেয়ার কথাটা বলা।
না, জোর দিয়ে বলল কিশোর, সেটাও অনুমান নয়। বুঝলাম, লাইফবোট যে খুলে দিয়েছে সে চায় না আমরা জাহাজে উঠি। তারমানে সে জানে না বাইশ নাম্বার কেবিনের পাথরগুলো নকল। উড জানে, শুঁটকি বলি, ওই অকাজ করার মত একমাত্র বাকি থাকে এজটাররাই।
এক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে কিশোরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। চোখে বিস্ময়, চাপা দেয়ার কোন চেষ্টা করলেন না। ধীরে ধীরে এক চিলতে হাসি ফুটে উঠে মিলিয়ে গেল ঠোঁটে। বললেন, হ্যাঁ, এবার বল আসামীদের কথা। কার কি শাস্তি হয়েছে? উড তো জেলে যাবেই, তার কথা বাদ। বাকিদের?
হিউগ আর বিগ উধাও, রবিন জানাল। পুলিশ খুঁজছে ওদের। ইচ্ছে করলে মাইক আর জেনিকে জরিমানা করতে পারতেন বিচারক, জেলও দিতে পারতেন। কিন্তু রত্ন না পেয়ে মানসিক শান্তি অনেক হয়েছে ওদের। সেকথা বিবেচনা করে ওদেরকে ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বিজ্ঞ বিচারক, তবে আমেরিকায় থাকতে পারবে না ওরা। সেই দিনই দেশের জাহাজের টিকেট কেটেছেভাইবোন।

হ্যাঁ, রত্ন না পাওয়ার ব্যথা কোনদিন ভুলতে পারবে না ওরা, এটাই বড় শাস্তি, পরিচালক বললেন। টেরিয়ারের কি খবর?
বাথরুমে আটকে থেকেই আকেল হয়ে গেছে ওর। আর বাড়াবাড়ি করছে। না। ঝিম মেরে গেছে একেবারে।
দেখ কতদিন ভাল থাকে। যাকগে, চমৎকার কাজ দেখিয়েছ তোমরা। আমার কগ্রাচুলেশন রইল।
থ্যাঙ্ক ইউ, স্যার। তবে কাজ মোটেও ভাল দেখাইনি। গর্দভের মত কাজ করেছি, কিশোর বলল।
মানে? ভুরু কোঁচকালেন পরিচালক।
প্রথম পাঁচটা ধাঁধার একটারও সমাধান করার দরকার ছিল না। ছয় নাম্বারটা থেকে শুরু করলেই বের করে ফেলা যেত পাথরগুলো।
কি করে? সোজা হয়ে বসলেন মিস্টার ক্রিস্টোফার।
কইনের আগে পশ শব্দটা ব্যবহার করেছে কারমল। আমি জানতাম, এর মানে ফিটফাট। ধরে নিয়েছিলাম জাহাজের সব চেয়ে ভাল কেবিন, মানে ফার্স্ট ক্লাসের কথা বলছে। কাজেই ওটা নিয়ে আর মাথা ঘামাইনি, দীর্ঘশ্বাস ফেলল কিশোর। তারপর সেদিন ক্যাপ্টেনের কাছে শুনলাম, শব্দটার অন্য মানেও আছে। শব্দটা ইংরেজ নাবিকদের আবিষ্কার, জাহাজে করে যারা ভারতবর্ষে যেত আর আসত। ওদিকে যাওয়ার সময় সব চেয়ে আরাম হত জাহাজের পোর্ট সাইড অর্থাৎ বা দিকের কেবিনগুলোয়, রোদ বাতাস কোনটাই তেমন বিরক্ত করত না। আবার ইংল্যাণ্ডে ফেরার পথে ভাল হত স্টারবোর্ড সাইড অর্থাৎ ডানপাশের গুলো। স্টীমশিপের যাত্রীদের মাঝে একটা কথা প্রচলিত ছিল তখনঃ যদি আরামে যেতে চাও, যাওয়ার সময় বামে, আর ফেরার সময় ডানে উঠবে। সংক্ষেপে ইংরেজিতে বলত—পোর্ট আউট, স্টারবোর্ড হোম। পরে আরও সংক্ষেপ করে ফেলা হল, চারটে শব্দের শুধু প্রথম চারটে অক্ষর এক করে, মানে পি.ও. এস, এইচ. দিয়ে হয়ে গেল পশ।
কিশোর থামতে রবিন বলল, যেহেতু কুইন জাহাজটা লণ্ডন-অস্ট্রেলিয়া যাবার পথে ইনডিয়া হয়ে যেত, পশের আরাম ওটাতেও ছিল। কারমল জানত সেটা। খুব শর্টকাট একটা সূত্র দিয়েছিলঃ পশ কুইন।
এবং গর্দভের মত আমি সেটা মিস করেছি, মুখ কালো করে বলল কিশোর।
তুমি একা নও। সবাই-ই করেছে, পরিচালক বললেন।
সান্ত্বনা দিচ্ছেন, স্যার।
মোটেই না। সবগুলো ধাঁধার সমাধান করতে গিয়ে অনেক বিপদ আর বাধার মুখোমুখি তোমরা হয়েছ, মেধা আর অসামান্য সাহসের জোরে সেগুলো প্রতিহত

করেছ, তোমাদের দক্ষতা তাতে আরও বেশি প্রমাণিত হয়েছে। শুধু চমৎকার আর বলব না, বলব প্রায় অসম্ভবকে সম্ভব করেছ তোমরা, মাই বয়েজ।
হাসিতে উদ্ভাসিত হল তিন গোয়েন্দর মুখ।

ভলিউম ১১ – পাগল সংঘ – তিন গোয়েন্দা – রকিব হাসান – সেবা প্রকাশনী

আহ, বন্ধ করো, অনুনয় করলো কিশোর, বন্ধ করো ওটা।

সুইভেল চেয়ারে এলিয়ে পড়েছে সে। খসখসে হয়ে উঠেছে কণ্ঠস্বর। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে গেছে মুখ। তার সব চেয়ে ঘনিষ্ঠ দুজন বন্ধুর সামনে অত্যাচার করা হচ্ছে তাকে, অথচ সেটা থামানোর কোনো চেষ্টা করছে না ওরা। বরং তার কষ্ট দেখে হাসছে মুসা আমান আর রবিন মিলফোর্ড।

ওদের গোপন হেডকোয়ার্টারে বসে আছে তিনজনেই। তাকিয়ে রয়েছে একটা টেলিভিশন সেটের দিকে। পর্দায়, রান্নাঘরের একটা বড় টেবিলের ওপর আসন মুড়ে বসে রয়েছে গোলগাল খুব মোটা একটা বাচ্চা। তার হাত মুচড়ে পেছন দিকে নিয়ে গেছে আট-নয় বছরের একটা ছেলে। এগারো বছরের আরেকটা ছেলে চিনামাটির বাটিতে কি যেন গুলছে। এই ছেলেটা লম্বা, পাতলা, মাথার চুল কামানো, ডিমের মতো চকচক করছে সাদা মাথার চামড়া, স্পষ্ট দেখা যায়। ওর হাবভাব দেখে ওই ডিমের মতো খুলির ভেতরে ডিমের কুসুম ছাড়া মগজ বলে আর কোনো পদার্থ আছে বলে মনে হয় না।

না না, প্লীত (প্লীজ), অস্বাভাবিক ভারি গলায় অনুনয় করলো বাচ্চা ছেলেটা, প্লীত, আমার বতন্ত (বসন্ত) দরকার নাই।

বন্ধ করো! আবার অনুরোধ করলো কিশোর। দোহাই তোমাদের, বন্ধ করো ওটা!

কিন্তু আমি তো দেখতে তাই (চাই), বাচ্চাটার অনুকরণে বললো মুসা হেসে, দেখতে তাই পেত পর্দন্ত কি কলে।

এসো মোটুরাম, জলহস্তীর বাচ্চা, হেসে বললো পর্দার একটা ছেলে, কাছে এসো। এই ছেলেটা নিগ্রো, গাট্টাগোট্টা শরীর, শজারুর কাঁটার মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে শক্ত চুল। বয়েস বারো। হাসিটা এতোই নিস্পাপ, দুনিয়ার কোনো খারাপ কাজ সে করতে পারে বলে মনে হয় না। তোমার আম্মু আর আবু যখন দেখবে তোমার শুটিবসন্ত হয়েছে, ভয়ে চোখ উল্টে দেবে। তোমার সাথে ছিলাম বলে সবাই ভাববে ছোঁয়াছে রোগটা আমাদের রক্তেও ঢুকেছে। তখন আর আমাদের ইস্কুলে যেতে হবে না।

হ্যাঁ, তার সুরে সুর মেলালো যেন বিশাল পা-ওয়ালা আরেকটা হেলে, সবাই তাই ভাববে।

পর্দায় মাথাকামানো ছেলেটার নাম মড়ার খুলি, তরল জিনিসটা গোলা শেষ করেছে সে। এগিয়ে গেল বাচ্চাটার দিকে।

দুহাতে চোখ ঢাকলো কিশোর পাশা। এরপর কি ঘটবে জানা আছে। পরিষ্কার মনে আছে তার, কান নাচাতে পারে ডিমের মতো মাথাওয়ালা ছেলেটা। এতো ঘন

ঘন নাচায়, বড় বড় লতিদুটোকে তখন মনে হয় জেলি, কানের নিচে লেগে থেকে ঝুলছে।
অভিনেতা হিসে, এটা তার একমাত্র গুণ।
মুসা আর রবিনের হাসি কিশোরের গায়ে জ্বালা ধরালো।
কান নাচাতে নাচাতে গিয়ে একটা রঙ লাগানোর তুলি তুলে আনলো মড়ার খুলি। তারপর বাটি থেকে লাল রঙ তুলে তুলে লাগিয়ে দিতে লাগলো বাচ্চাটার গোলগাল মুখে। শরীর মুচড়ে সরে যাবার চেষ্টা করলো মোটুরাম, কিন্তু কাদলো না। আগের মতোই হাসি হাসি চেহারা।
কিন্তু কিশোরের মুখে হাসির চিহ্নই নেই। আঙুল ফাঁক করে তার ভেতর দিয়ে আবার তাকিয়েছে টিভির দিকে। বিশ্বাসই করতে পারছে না ওই বাচ্চাটাই ছিলো সে নিজে। বাদামী রঙের ফারমার ওভারঅল পরা গোলআলুর মতো মুখওয়ালা ওই বাচ্চাটা সে ছিলো একথা ভাবতেই ইচ্ছে করছে না। নাকে, গালে, সমানে রঙের ফোঁটা দিয়ে চলেছে মড়ার খুলি যে বাচ্চাটার, সে-ই কি আজকের তুখোড় গোয়েন্দা কিশোর পাশা, যার বুদ্ধি দেখে মাঝে মাঝে দুর্ধর্ষ পুলিশবাহিনীরও তাক লেগে যায়?
বিশ্বাস করতে না চাইলেও উপায় নেই, জানে কিশোর। একসময় মোটুরাম ছিলো তার উপাধি, ইংরেজি শব্দটার বাংলা করলে অবশ্য এই নামই দাঁড়ায়। আধ ঘন্টার একটা টিভি সিরিয়ালে অভিনয় করতো সে। হবিটার বাংলা নাম করলে দাঁড়ায় পাগল সংঘ।
জীবনের ওই সময়টাকে ভুলে থাকার যথাসাধ্য চেষ্টা করে কিশোর। তিন বছর বয়েসে নিজের ইচ্ছেয় সে ওই ছবিতে অভিনয় করতে যায়নি। তবে বাবা-মাকেও দোষ দেয় না সে। তারা চেয়েছিলেন একদিন বড় অভিনেতা হবে তাঁদের ছেলে।
একজন বিখ্যাত চিত্রপরিচালক ছিলেন কিশোরের বাবার বন্ধু। প্রায়ই আসতেন তাদের বাড়িতে। এক রোববার বিকেলে খেলতে খেলতে বাচ্চা কিশোর এসে হাজির হলো তার সামনে।
বড় হয়ে খুব ভালো নাচতে পারবে তুমি, খোকা, হেসে বললেন পরিচালক।
না, ওই বয়েসেই অবিশ্বাস্য রকম ভারি গলায় দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিয়েছিলো কিশোর, আমি নাচবো না। আমি পুলিশ হবে। চোর-ডাকাত ধরবো। চোরেরা আমার ভয়ে কাঁপবে।
কিশোরের কথা শুনে দীর্ঘ এক মুহূর্ত তার দিকে তাকিয়ে রইলেন পরিচালক। তারপর তার বাবাকে জিজ্ঞেস করলেন, বয়েস কতো? ছেলেটার পাকা পাকা কথা গুনে তাজ্জব হয়ে গেছেন।
দুই বছর এগারো মাস, জবাব দিয়েছেন বাবা।

এরপর যাওয়ার আগে আর কিশোরের সম্পর্কে একটি কথাও বললেন না পরিচালক। তবে গাড়িতে ওঠার পর আরেকবার বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে আপনমনেই বিড়বিড় করলেন, অসাধারণ প্রতিভা! কাজে লাগাতে পারলে…
কয়েকদিন পরেই এক আজব জায়গায় কিশোরকে নিয়ে গেলেন তার বাবা। স্ক্রীন টেস্ট নেয়া হলো তার। কয়েক মাসের মধ্যেই পাগল সংঘ-এর মোটুরাম হয়ে গেল কিশোর।
ঠিকই আন্দাজ করেছিলেন পরিচালক। ছেলেটা সত্যিই অসাধারণ বুদ্ধিমান। আর অভিনয় যেন সে মায়ের পেট থেকেই শিখে এসেছে, একেবারে স্বাভাবিক, বাস্তব হাসি, কথাবার্তা। পরিচালক যা যা করতে বলেন, ঠিক তা-ই করে। সংলাপ মুখস্থ করায়ও জুড়ি নেই মোটুরামের। একবার বলে দিলেই যেন মগজে গেঁথে যায়, একটি শব্দও ভুল করে না।
শুধু কিশোরের জন্যেই সাংঘাতিক নাম করেছিলো পাগলসংঘ।
টিভিতে অনেক অভিনয় করেছে কিশোর। সিনেমাতেও করতো, যদি না তার বাবা-মা হঠাৎ মোটর দুর্ঘটনায় মারা যেতেন। হয়তো অভিনেতাই হতে হতো তাকে জীবনে।
বাবা-মা মারা যাওয়ার পর তাকে বাঁচালেন যেন নিঃসন্তান মেরিচাচী। নিজের কাছে নিয়ে গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, আর ছবিতে অভিনয় করবি, কিশোর?
না, সরাসরি জবাব দিলো কিশোর।
ভোর সাড়ে পাঁচটায় উঠে, স্টুডিওতে গিয়ে ঘাড়ে, মুখে, গলায়, রঙ মাখতে তার আপত্তি নেই। ক্যামেরা আর উজ্জ্বল চোখ ধাধানো আলোর সামনে দাঁড়িয়ে ঘামতেও রাজি আছে সে। ক্যামেরার সামনে বসে জটিল ধাধা মেলাতে আর অ্যাডভেঞ্চারের বই পড়ার অভিনয় করতে খুব আগ্রহ তার। তোতলাতে পারে, জড়িয়ে জড়িয়ে কথা বলতে পারে, পরিচালক যা করতে বলেন সব পারে, পারে না শুধু তার সহ-অভিনেতাদের সহ্য করতে।
কিশোর বোঝে কোনটা অভিনয়, আর কোনটা নয়। কিন্তু তার চেয়ে অনেক বড় হয়েও মাথামোটা হবার দলের যেন সেটুকু বোঝার বুদ্ধি নেই। ছবিতে যেমন তাকে খেপায়, হবির বাইরেও খেপায়। অভিনয় করতে করতে যেন ওদের ধারণা হয়ে গেছে এটাই স্বাভাবিক। তাই টিফিনের সময় স্টুডিওর ক্যাফেটেরিয়ায় বসেও তার আইসক্রীমে মরিচের গুঁড়ো ঢেলে দেয়। মেকাপ রুমে তার চেয়ারে আঠা মাখিয়ে রাখে। তার ফারমার ওভারঅলের বোতামগুলো কেটে রাখে। আর সব চেয়ে বেশিদুঃখ লাগে, যখন তাকে ওরা মোটুরাম বলে ডাকে। সব সময় ডাকে। ওদের গোবর পোরা। মাথাগুলোয় যেন কিছুতেই ঢুকতে চায় না বাস্তব জীবনে সে মোটেই মোটুরাম নয়কিশোর পাশা।

কাজেই মেরিচাচী যখন তাকে জিজ্ঞেস করলেন পাগল সংঘ ছবিতে আর অভিনয় করবে কিনা, একটা মুহূর্ত দেরি না করে জবাব দিয়ে দিয়েছে সে, না। তার মনে হলো যেন খাঁচায় বদ্ধ একগাদা খেপা বানরের মাঝখান থেকে তাকে মুক্তি দিতে এসেছেন চাচী। ওই মহিলাকে যে সে এতো ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে, যা বলেন মুখ বুজে শোনে, এটা তার একটা বড় কারণ। তার মা-ও যেটা করেননি। তাই করেছেন ওই মহিলা, তাকে ওই বয়েসেই মতামতের স্বাধীনতা দিয়েছেন, যা পাওয়ার জন্যে সে আকুল হয়ে ছিলো।

কাজেই যেদিন তার কন্ট্রাক্টের সময়সীমা শেষ হলো, সেদিনই পাগল সংঘকে অকূল সাগরে ভাসিয়ে চলে এলো কিশোর। আর কোনোদিন যায়নি ওই ছবিতে অভিনয় করার জন্যে। তার বদলে মন দিলো পড়ালেখায়।

ভালোই কাটছিলো দিন। তারপর বহু বছর পরে হঠাৎ এলো একটা প্রচণ্ড আঘাত। ঝড়ের কবলে-পড়া গাছের মতো নাড়িয়ে দিলো যেন কিশোরকে। টিভির পুরনো অনুষ্ঠান দেখানোর তালিকায় নাম উঠলো পাগল সংঘের।

কিশোর জানতো না যে দেখানো হচ্ছে। জানলো প্রথম, যেদিন তার এক সহপাঠি তার অটোগ্রাফ চেয়ে বসলো। হাসিমুখে দিয়ে দিলো কিশোর, ভাবলো, সে গোয়েন্দা হিসেবে ভালো নাম কামিয়েছে বলেই বুঝি অটোগ্রাফ চেয়েছে ছেলেটা। কিন্তু নাম সই করার পর যখন নিচে লিখলো গোয়েন্দাপ্রধান তখন আপত্তি জানালো ছেলেটা। মাথা নেড়ে বললো, না না, ওটা নয়, মোটুাম সেখো।

চমকে গেল কিশোর।

তারপর গত তিনটে হপ্তা ধরে এই এক জ্বালাতন। ইস্কুলের এমন কোনো ছেলেমেয়ে নেই যারা পাগল সংঘ না দেখেছে। সবাই এখন তাকে মোটুরাম বলে খেপায়। যে মেয়েগুলোকে দেখতে পারে না সে, পাত্তা দেয় না, ওরা পেয়েছে ভারি মজা। কিশোরকে দেখলেই মুচকি হেসে বলে, না না, পীত, আমাকে ধেরে দাও, কাতুকুতু দিও না, প্রীত!

ভয়াবহ দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছে কিশোরের দিবারাত্রি। তা-ও গ্রীষ্মের ছুটি শুরু হওয়ায় কিছুটা রক্ষে। ইস্কুলে যেতে হয় না, সবার খেপানোও শুনতে হয় না। কিন্তু আজ কোনো কুক্ষণে যে হেডকোয়ার্টারে ঢুকে টেলিভিশন অন করেছিলো। আর করামাত্রই দেখলো পাগল সংঘ চলছে। বন্ধ করে দিয়েছিলো সে সঙ্গে সঙ্গে, জোর করে মুসা গিয়ে আবার খুলেছে।

পর্দার দিকে তাকিয়ে হাসে মুসা আর রনি। মুখ আর গলায় বসন্ত আঁকা শেষ করে এখন শরীরে আঁকার জন্যে মোটুরামের ওভারঅল খোলার চেষ্টা করছে মড়ার খুলি। এই সময় ঝটকা দিয়ে খুলে গেল রান্নাঘরের দরজা। ঘরে ঢুকলো নয়

বছরের সুন্দরী একটা মেয়ে, পাগল সংঘে কিশোরের উদ্ধারকারিণী। ছবিতে ওর নাম বটি সুন্দরী।
ছেড়ে দাও ওকে, মড়ার খুলিকে ধমক দিয়ে বললো নেলি।
হা হা, থেরে দাও, হাসিমুখে বললো মোটুরাম। কিন্তু হাড়ার কোনো লক্ষণই নেই মড়ার খুলির। জোর করে নেলিকে নিয়ে গিয়ে আলমারিতে ভরে রাখতে চাইলো। নেলির পক্ষ নিলে নিগ্রো হেলেটা, ওর নাম জিকো, ছবির উপাধি শজারুকাঁটা। চুলের জন্যেই ওরকম নামকরণ। আরও ছেলে আছে। ওরা সবাই গেল মড়ার খুলির পক্ষে। নিমিষে মারপিট আর হৈ-চৈ করে এক এলাহি কাণ্ড বাঁধিয়ে ফেললো। একজন তাক থেকে একটা কেক তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারলো নেলিকে সই করে। সে মাথা সরিয়ে নিতে সেটা এসে পড়লো মোটুরামের মুখে। দুঃখ পাওয়ার চেয়ে বরং খুশি হলো সে। বললো, হ্যাঁ, হুঁ এতা ভালো! বতন্তের তেয়ে অনেক ভালো। বলে নাকেমুখে লেগে থাকা মাখন মুছে নিয়ে খেতে শুরু করলো।
কিশোওর। এই কিশোর, কোথায় তুই?
মেরিচাচীর ডাক শোনা গেল বাইরে থেকে।
জলদি বেরিয়ে আয়, আবার বললেন তিনি।
এইই সুযোগ। আর দেরি করলো না কিশোর। লাফিয়ে উঠে গিয়ে বন্ধ করে দিলে টেলিভিশন। মোটামের হাসিখুসি আলুর মতো মুখ অদৃশ্য হয়ে যাওয়ায় হাঁপ ছেড়ে বাচলো সে, অন্যদিকে মন খারাপ হয়ে গেল রবিন আর মুসার। ওদের দেখার খুব ইচ্ছে ছিলো। কিন্তু মেরিচাচীর নির্দেশ অমান্য করে এখানে বসে থাকার সাহস ওদের নেই।
জঞ্জালের ভেতর থেকে গোপন পথ দিয়ে বেরিয়ে এলো ওরা।
এই যে, এসেছিস, মেরিচাচী বললেন।
জ্যাকেট খুলতে খুলতে কিশোর জিজ্ঞেস করলো, কি কাজ করতে হবে, বলো?
কিন্তু কাজ করার জন্যে ডাকেননি মেরিচাচী। গেটের দিকে দেখালেন।
গুঙিয়ে উঠলো কিশোর। আবার! পাগল সংঘ টিভিতে দেখানোর পর থেকেই অনেক লোক আসে তার সঙ্গে দেখা করতে। খবরের কাগজের রিপোর্টারও থাকে তাদের মধ্যে। মোটুরামকে নিয়ে ফীচার স্টোরি করতে। হেডিং লেখেঃ মোটুম এখন কোথায়? কিংবা মোটুরামের কি হয়েছে?
ওকে যেতে বলল, লোকটাকে দেখিয়ে চাচীকে অনুরোধ করলো কিশোর। বলে দাও, আমি কথা বলতে চাই না।
অনেক বার বলেছি, যায় না। ও বলছে, কথাটা নাকি জরুরী। সহানুভূতির হাসি হাসলেন চাচী। কিশোরের কেমন লাগছে বুঝতে পারছেন। টেলিভিশনে সিরিয়ালটা দেখানোর পর থেকে যে লোকে তাকে বিরক্ত করছে, জানেন একথা।

দেখছিস না, কি রকম বড় গাড়িতে চড়ে এসেছে। আমি বলায় বললো, যতোক্ষণ লাগে বসে থাকবে। তুই খেয়েদেয়ে জিরিয়ে নিয়ে যখন খুশি দেখা কর, ও বসে থাকবে। এরপর আর কি কলবো?
ঠিক আছে, কি আর করা! কপাল চাপড়ালো কিশোর। দেখি, খেদানো যায় কিনা।
বিরাট গাড়ি। ফরাসী সিত্রো। সামনের অংশটা দেখতে অনেকটা তিমির মাথার মতো। গাড়ি থেকে নেমে তিন গোয়েন্দার দিকে এগিয়ে আসা লোকটাও তার গাড়ির মতোই বড়, বিলাসী। প্রথমেই লোকটার দাঁত দৃষ্টি আকর্ষণ করলো কিশোরের। বড় বড় সাদা দাঁতগুলো লোকটার রোদে পোড়া চামড়ার পটভূমিতে যেন চাঁদের মতো ঝলমল করছে। যখনই হাসে তখনই চমকায়।
কিশোর পাশা, আরও চওড়া হাসি উপহার দিয়ে বললো লোকটা, আমার নাম হ্যারিস বেকার। মুভি স্টুডিওর বিজ্ঞাপন ম্যানেজার।
মুসা আর রবিনের মাঝখানে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো কিশোর। ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে বেকারের দিকে।
তোমাকে একটা প্রস্তাব দিতে এসেছি, আশা করি পছন্দ হবে তোমার, এমনভাবে কথা বলে লোকটা মনে হয় তার কণ্ঠস্বরও হাসে। পাগল সংঘের সমস্ত অভিনেতাকে স্টুডিওতে আসার দাওয়াত করেছি। ওখানেই লাঞ্চ খাবে। লাঞ্চের পর...
থ্যাংক ইউ, আমার কোনো আগ্রহ নেই, বলে যাবার জন্যে ঘুরলো কিশোর।
পুরনো বন্ধুদের সাথে আবার দেখা হোক, এটা চাও না? বিশাল একটা থাবা কিশোরের কাঁধে ফেলে তাকে আটকালো বেকার। মড়ার খুলি, শিকারী কুকুর ভারিপদ, আর...।
না, থ্যাংক ইউ, বলে কাঁধ থেকে লোকটার হাত সরানোর চেষ্টা করলো কিশোর। কিন্তু লোকটার ভালুক-থাবা শক্ত হলো আরও। ওই বোকাগুলোর সঙ্গে জীবনে আর কোনোদিন দেখা করতে চাই না আমি...
আরও চওড়া হলো বেকারের হাসি। আমিও এটাই আশা করেছিলাম।
কি বললেন? কিশোর আশা করেনি লোকটা এরকম কথা কলবে।
তোমাকে অনেক বিরক্ত করেছে ওরা, তাই না? জ্বালাতন করেছে। মোটুরাম বলে খেপিয়েছে। ওদেরকে ঘৃণা তো করবেই।
মানুষকে ঘৃণা করি না আমি, শীতল গলায় বললো কিশোর। তবে ওদের পছন্দ করি না, এটা ঠিক। অপছন্দ আর ঘৃণাকে নিশ্চয় এক বলবেন না আপনি?
ওয়ান্ডারফুল! বেকারের রোদেপোড়া মুখে চাঁদের হাসি উজ্জল হলো আরও। চমৎকার গুছিয়ে কথা বলো তুমি। ওদের কাছে যাওয়ার একটা সুযোগ করে

দিচ্ছি আমি তোমাকে। যাতে ওদের বুঝিয়ে দিতে পারো, সেই ছোটবেলা থেকেই ওদেরকে গাধা মনে করে এসেছো তুমি, এবং আসলেই ওরা গাধা। কি, সেটা প্রমাণ করতে চাও না?
কিভাবে? এই প্রথম আগ্রহ ঝিলিক দিলো কিশোরের চোখে।
কিশোরের কথার সরাসরি জবাব দিলো না বেকার। ঘুরিয়ে বললো, সারা দেশের লোকের সামনে প্রমাণ করবে ওরা বোকা। টেলিভিশন ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে বলবে সেকথা। দুটো কুইজ শো-এর বন্দোবস্ত করেছে টিভি। পাগল সংঘের সবাই একে অন্যের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা করবে। আমার বিশ্বাস, কিশোর, তুমিই জিতবে। তোমার ব্যাপারে শুনেছি আমি। ওগুলোর সবকটার মাথায় ঘোল ঢেলে দিতে পারবে।
কিশোরে মনের পর্দায় মড়ার খুলির ডিমের মতো মাথাটা ঝিলিক দিয়ে উঠলো। গাধাটার বোকার মতো হাসি যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে অযথাই হাত মুচড়ে দিচ্ছে মোটুরামের। তার টিফিন সঁটিয়ে, বাক্সে মরা ইঁদুর রেখে দিয়ে ফ্যাকফ্যাক করে হাসছে।
হারিস বেকারের হাসিমুখের দিকে তাকিয়ে এসব কথা ভাবছে কিশোর।
ফাস্ট প্রাইজটা তুমিই পাবে, কিশোর, আগুনে যেন ঘি ঢাললো অসাধারণ ধূর্ত লোকটা। আর পুরস্কারের অঙ্কটা জানো কতো? বিশ হাজার ডলার।
হলিউডের ভাইন স্ট্রীট গেটের সামনে লিমুজিনটাকে থামতেই হলো। শোফারকে চেনে ইউনিফর্ম পরা গার্ড, তবু থামালো। গাড়ির পেছন দিকে এসে পেছনের সীটে বসা তিন কিশোরকে দেখলো, হাতে একটা লিস্ট। নাম-ঠিকানা মিলিয়ে নেয়ার জন্যে ওদের নাম জিজ্ঞেস করলো।
কিশোর পাশা, বললো কিশোর। মনে মনে ঠিক করে রেখেছে, মোটুরাম শব্দটা শুধু উচ্চারণ করলেই গার্ডের সঙ্গে তর্ক বাধিয়ে দেবে।
কিন্তু তাকে রাগানোর মতো কিছুই বললো না গার্ড। লিস্ট দেখে পড়লো, কিশোর পাশা। পঁয়তাল্লিশ সাইজ রোড, রকি বীচ। ঠিক আছে?
ঠিক আছে, কিশোর বললো।
মাথা ঝাঁকিয়ে অন্য দুজনের দিকে তাকালো গার্ড।
আমি মুসা আমান।
রবিন মিলফোর্ড।
দুজনের নাম-ঠিকানা মিলিয়ে নিয়ে আবার মাথা ঝাঁকালো গার্ড। সামনের জানালার কাঁচে ওয়াইপারের নিচে একটা সাদা কার্ড লাগিয়ে দিলো সে। চিনতে পারলো কিশোর, স্টুডিওতে ঢোকার পাস।
হাত নেড়ে গার্ড বললো, নয় নম্বর স্টেজ।

ধীর গতিতে গাড়ি চালালো শোফার। পেরিয়ে এলো নিউ ইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরি। তারপর পুরনো স্যান ফ্রানসিসকো অপেরা হাউস। ওটার পর পিসার লীনিং টাওয়ার বা হেলানো স্তম্ভ-পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্যের একটা।
এসবই পরিচিত কিশোরের। যেন স্বপ্নের ভেতর থেকে বাস্তব হয়ে ফুটে বেরিয়ে আসহে ধীরে ধীরে বস্তুগুলো। গলা বাড়িয়ে তাজ্জব হয়ে বিল্ডিংগুলো দেখছে রবিন আর মুসা। কিন্তু কিশোর জানে, ওগুলো আসল নয় কোনোটাই। এমনকি বাড়িও নয়। ক্যানভাস আর প্লাস্টার দিয়ে তৈরি, আসল জিনিসের নকল, তাও শুধু সামনের অংশ। যে কোনোটার রজা খুলে ভেতরে তাকালে দেখা যাবে অন্য পাশে কিছু নেই, ফাঁকা।
লম্বা, কালো গাড়িটায় সীটে হেলান দিয়ে বসে আছে সে। বাইরে তাকানোরও প্রয়োজন বোধ করছে না।
কিশোরকে তার বাড়ি থেকে তুলে নিতে এই গাড়ি পাঠিয়েছে হ্যারিস বেকার। যে দুদিন কুইজ হবে, সেই দুদিনের জন্যে গাড়ি আর শোফার দিয়ে দেয়া হয়েছে কিশোরকে।
রাশেদ চাচা আর মেরিচাচীকেও লাঞ্চে দাওয়াত করেছিলো বেকার, কিন্তু তাঁরা আসতে রাজি হননি। বলে দিয়েছেন সময় নেই। কিশোরকে গোপনে বলেছেন মেরিচাচী, মাঝেসাঝে দুএকটা ছবি যে আমার ভাল্লাগে না, তা নয়। কিন্তু যখনই মনে হয় সব বানানো ব্যাপার, আর দেখতে ইচ্ছে করে না।
তার সাথে একমত হলেন রাশেদ পাশা।
তবে রবিন আর মুসা তা হতে পারলো না। ওরা স্টুডিওতে যাওয়ার কথা শুনেই লাফিয়ে উঠলো। আর খুশি হয়েই ওদেরকে সঙ্গী করে নিলো কিশোর।
স্টুডিও এলাকার ভেতরে ঘন্টায় পাঁচ মাইলের বেশি গতিতে গাড়ি চালানোর নিয়ম নেই। কাজেই শামুকের গতিতে অনেকক্ষণ লাগিয়ে এসে হঠাৎ থেমে গেল লিমুজিন। কিশোর ভাবলো, সাউন্ড স্টেজ-এর সামনেই বুঝি গাড়ি থেমেছে, যেখানে লাঞ্চ খাওয়া হবে। কিন্তু না, থেমেছে কতগুলো উত্তর আমেরিকান আদিবাসীদের কুটিরের সামনে। ওগুলোর সামনে দিয়ে হেঁটে গেল দুজন মধ্যযুগীয় রোমান সৈনিক, হাতে ঢাল, কাঁধে বর্শা।
শোফারের নাম অ্যালিউড হোফার, কিশোরদেরকে তা-ই বলেছে। তার পাশের জানালার কাচ নামিয়ে মুখ রে করলো বাইরে। একজন সৈনিককে জিজ্ঞেস করলো, এই যে ভাই, নয় নম্বর স্টেজ কোনটা বলতে পারেন?
কিশোরকে জিজ্ঞেস করলেই হতো, সে-ই বলতে পারতো। কিন্তু আগ বাড়িয়ে কিছু বলতে গেল না। বললো না, ওই নয় নম্বর স্টেজেই পাগল সংঘের শুটিং

হতো। দেরি হয় হোক, তাড়াতাড়ি গিয়ে মড়ার খুলি আর ডারিপদের সঙ্গে বেশি সময় কাটানোর কোনো ইচ্ছেই তার নেই।
এই পথের শেষ মাথায়, হাতে তৈরি পুরনো আমলের একটা সিগারের মাথা দিয়ে পথ-নির্দেশ করলো সৈনিক।
গেলেই পেয়ে যাবেন, বললো দ্বিতীয় সৈনিক। অসুবিধে হবেনা।
ওদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে আবার এগিয়ে চললো শোফার। পথের শেষ মাথায় দেখা গেল বিমান রাখার হ্যাঙারের মতো দেখতে সাদা একটা বিরাট বাড়ি। একপাশে বড় করে আঁকা রয়েছে ৯।
গাড়ি থেকে নেমে পেছনের দরজা খুলে ধরলো শোফার।
নেমে ওকে ধন্যবাদ জানালো কিশোর। আরেকবার তাকালো লম্বা, স্বাস্থ্যবান তরুণ লোকটার দিকে। দেখে বোঝার চেষ্টা করলো, চকচকে পালিশ করা জুতো পরা, কালো লম্বা চুল আর কালো চামড়ার এই অ্যালউড হোফার নামের মানুষটা কেমন হতে পারে।
নয় নম্বর স্টেজে ঢোকার দরজাটা বাড়িটার তুলনায় ছোট, ভারি। একপাশে লাগানো ধাতব খিল। ভারি রিঙ থেকে ঝুলছে একটা বড় তালা। মাথার ওপরের দুটো আলোর দিকে তাকালো কিশোর। তার জানা আছে, লাল আলোটা যদি জ্বলে, তাহলে খোলা যাবে না দরজা, অর্থাৎ খোলার নিয়ম নেই। ভেতরে কাজ চলছে।
কিন্তু লালটা জ্বলছে না এখন, জ্বলছে সবুজ। তারমানে ঢোকা যায়। পাল্লা ঠেলে খুলে ভেতরে পা রাখলো কিশোর। পেহনে এলো মুসা আর রবিন।
সব পরিচিত এখানকার। কিশোরের মনে হলো, এই তো সেদিন এসেছিলো এখানে অভিনয় করতে। মাঝখানে এতগুলো বছর যে পেরিয়ে গেছে মনেই হলো না তার। ঠিক আগের মতোই এখনও রয়েহে রঙের তাজা গন্ধ, বড় বড় আর্ক ল্যাম্পের তাপ। আগের মতোই সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো কতগুলো কণ্ঠ, এই যে মোটুরাম এসে গেছে! এই ডাকটা জীবনে আর শুনতে হবে কখনও ভাবেনি সে।
প্রেস ফটোগ্রাফাররা ঘিরে ধরলো তাকে। দুই-তিন মিনিট নীরবে ধৈর্য ধরে দাঁড়িয়ে রইলো সে, ওদের ফ্যাশানের আলোর অত্যাচার সহ্য করলো। সহ্য করলো ওদের জ্বালা ধরানো কথাঃ হাসসা, মোটুরাম। এদিকে একটু তাকাও, মোটুরাম। আরেকবার, আরেকবার হাসো, মোটুরাম।
অবশেষে শেষ হলো ছবি তোলা। ওদেরকে ঠেলে হাসিমুখে এগিয়ে এলো হ্যারিস বেকার, তার ভালুক্কে থাবা ফেললো কিশোরের কাঁধে। কিশোর, এসো এসো, ওরা তোমার অপেক্ষা করছে। পাগল সংঘের অভিনেতারা।

বাড়িটার শেষ ধারে উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত বিশাল এক রান্নাঘর। কিশোরের জানা আছে, এটা আসলে রান্নাঘর নয়। সাজানো হয়েছে। স্টোভটা বাতিল, অকেজো। সিঙ্কের ওপরের কল থেকে পানি পড়ে না। শুধু ঘরের মাঝখানে বড় টেবিলটা, যেটায় খাবার সাজাচ্ছে ওয়েইটাররা শুধু সেটাই আসল। অন্যখান থেকে এনে রাখা হয়েছে। ছবি তৈরির সেট সাজানোয় ব্যবহৃত হচ্ছে না এখন ওটা।

তিন গোয়েন্দাকে টেবিলের মাথার কাছে নিয়ে গেল বেকার। ওখানে কালো চুলওয়ালা খুব সুন্দরী এক তরুণীর সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছে তিনজন তরুণ।

কিশোরকে এগোতে দেখে কথা বন্ধ করে মুখ তুলে তাকালো ওরা।

কিশোরও তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। অনেকগুলো বছর ধরে ওদের চেহারা তার মনের পর্দায় ছিলো উজ্জ্বল? মড়ার খুলি-ডিমের মতো সাদা চকচকে মাথা, মুখে বোকা হাসি, সোজা কথায় গর্দভ। ভারিপদের আপেলের মতো টকটকে গোল মুখ, অস্বাভাবিক বড় পায়ের পাতা, হাতের তালুও স্বাভাবিক নয়, রোগা, পাতলা শরীর। শিকারী কুকুরের মুখটা অনেকটা কুকুরের মুখের মতোই লম্বাটে, প্রায় সারাক্ষণ হাঁপায়, জিভ বেরিয়ে পড়ে মাঝে মাঝে, বিষণ্ন চোখ দুটো দেখে মনে হয় এই বুঝি কেঁদে ফেললো। বটিসুন্দরীর সুন্দর চোখা চেহারা, কপালের ওপরের চুল সমান করে কাটা।

ওই চারজনই দাঁড়িয়ে আছে এখন, কিন্তু একেবারে অন্য মানুষ। কিশোরের মনের পর্দায় যে ছবি আঁকা রয়েছে তার সঙ্গে এখনকার ওদের কোনো মিল নেই।

সুদর্শন এক তরুণ, চামড়ার জ্যাকেট গায়ে, সোনালি চুল কাঁধ পর্যন্ত নেমে এসেছে, কান দেখা যায় না। হাত তুলে হেসে বললো, এইই যে, তোমাকেও গলায় দড়ি দিয়ে টেনে এনেছে তাহলে।

মাথা ঝাঁকালো কিশোর। তাকালো ছেলেটার কাউবয় বুটের দিকে। ছয় ফুট লম্বা শরীরের তুলনায় জুতো ছোটই বলতে হবে, তারমানে সে ভারিপদ নয়। শিকারী কুকুরও নয় সে। তার পাশে দাঁড়ানো তরুণের মুখটা লম্বাটে, যদিও জিভ বের করে নেই, আর চোখেও নেই আগের বিষণ্নতা

চামড়ার জ্যাকেট আর হাতে-তৈরি বুট পরা বুদ্ধিমান দেখতে হোকরাই তাহলে মড়ার খুলি?

অন্য দুই পাগলের দিকে তাকিয়েও মাথা ঝাঁকালো কিশোর। নীরবে দেখলো পা থেকে মাথা পর্যন্ত। ভারিপদ আর শিকারী কুকুরকে চিনে নিতে অসুবিধে হলো না। শরীরের তুলনায় এখনও বড়ই রয়েছে ভারিপদের পায়ের পাতা আর হাতের তালু, শরীর আগের মতো রোগাটে না হলেও বেশ পাতলা। বেঁটে। তবে আপেলের মতো

গোলগাল মুখটা বদলে অন্যরকম হয়ে গেছে। তার লাল লাল গাল আর হাসি হাসি চোখ দেখে রকি বীচ সুপারমার্কেটের সেলসম্যানগুলোর কথা মনে পড়ে গেল কিশোরের।

শিকারী কুকুরকে লাগছে তরুণ ব্যবসায়ীর মতো। তার বাদামী রঙের চুল ছোট করে হাঁটা। শার্টের গলার কাছ থেকে শুরু করে নিচ পর্যন্ত একটা বোতামও খোলা নেই। শার্টের কাপড়ও বেশ ঝলমলে, উজ্জ্বল রঙের। একে দেখে এখন বিশ্বাস করাই কঠিন একসময় সে ছিলো কাঁদো কাঁদো চেহারার, পাগল সংঘের বোকা শিকারী কুকুর।

সব শেষে সুন্দরী মেয়েটার দিকে ফিরলো কিশোর। চমৎকার ফন স্যুট পরা। পানের মতো মুখ, গভীর নীল চোখ, ভারি পাপড়ি। এই মেয়েটাই ছিলো তার উদ্ধারকারিণী বটিসুন্দরী, কিন্তু স্টুডিওর বাইরে দেখলে তাকে চিনতেই পারতো না। রাস্তায় দেখলে তো নয়ই। বয়েস কতোটা বদলে দেয় মানুষকে!

হাসলো মেয়েটা। তুমি আসায় খুব খুশি হয়েছি, কিশোর। তোমাকে শুধু কিশোর বলে ডাকলাম, কিন্তু মনে করোনি তো?

না, মোটুরাম বলে না ডাকায় খুশি হয়েহে কিশোর। আমাকে শুধু নেলি বলে ডাকবে।

আস্থা। ওদের সঙ্গে রবিন আর মুসার পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্যে ফিরলো কিশোর। বেকার আর টিভি ক্যামেরার পাশে দাঁড়ানো আরেকজন লোকের সাথে কথা বলছে দুজনে। সাদা চুলওলা লোকটাকে চেনা চেনা লাগল কিশোরের। কিন্তু মনে করতে পারলো না, কে।

যাক, আমরা সবাই যখন এলাম, হাত বাড়িয়ে কিশোরের বাহু ধরে তাকে দলের ভেতরে টেনে নিলো মড়ার খুলি, একটা পরামর্শ আছে আমার। আমাদের প্রত্যেকের জন্যেই ব্যাপারটা জরুরী।

কিন্তু সবাই তো আসেনি এখনও, মনে করিয়ে দিলো নেলি। শজারুকাঁটা বাকি আছে।

ও আসবে না, জানালো ভারিপদ।

কেন? কিছুটা হতাশই মনে হলো নেলিকে।

হতাশ কিশোরও হয়েছে। পাগল সংঘের ওই একটিমাত্র ছেলেকে সে পছন্দ করতো, বটিসুন্দরীর চেয়েও বেশি। বাচ্চা পেয়ে তাকে কখনও খেপানোর চেষ্টা করেনি শজারু, কষ্ট দেয়নি।

কি জানি, কাঁধ ঝাঁকালো শিকারী কুকুর। হয়তো খুঁজে পায়নি। কিংবা আসতে রাজি না।

তারমানে বাকি সবাই আছি আমরা, মড়ার খুলি বললো। এবং এসেছি একটা উদ্দেশ্যে। চামড়ার জ্যাকেটের পকেট চাপড়ালো সে। টাকা। তাই না?
হ্যাঁ, দ্বিধা করে বললো শিকারী কুকুর। তার যেন সন্দেহ রয়েছে এ-ব্যাপারে।
হ্যাঁ, বললো ভারিপদ, তার সন্দেহ নেই, টাকার জন্যেই এসেছি আমরা।
নেলিও মাথা ঝাঁকালো।
তাই না? ঠিক বলিনি? কিশোরের দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচালো মড়ার খুলি।
দ্বিধা করছে কিশোর। বিশ হাজার ডলার জিতে নিতে পারলে খুবই খুশি হবে সে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তিন গোয়েন্দার ফাণ্ডে জমা রাখবে ওই টাকা। গাড়ি কিনতে পারবে। মোটর সাইকেল কিনতে পারবে। গোয়েন্দাগিরির কাজে লাগে এরকম অনেক জিনিসই কেনা যাবে এতো টাকা পেলে। তবে শুধু টাকার জন্যে টিভির এই কুইজ শোতে যোগ দিতে আসেনি সে। বাচ্চা পেয়ে তাকে নিয়ে যারা মজা করেছে, নির্যাতন করেছে তার ওপর, ওদেরকে আচ্ছামতো একটা শিক্ষা দেয়াটাই তার প্রধান উদ্দেশ্য। শুধু টাকার লোভ দেখিয়ে তাকে এখানে কিছুতেই আনতে পারতো না হ্যারিস বেকার। তবে সেকথা তো আর বলা যায় না শত্রুদেরকে। মাথা ঝাঁকিয়ে শুধু বললো, হ্যাঁ।
গুড। এখানে একটা পুনর্মিলনীর ব্যবস্থা করা হয়েছে, মড়ার খুলি বললো। লাঞ্চের পর আমরা সবাই বসে পুরনো দিনের কথা আলোচনা করবো, কিভাবে কি কি মজা করেছি আরা, এ সমস্ত। তাই তো?
আবার মাথা ঝাঁকালো কিশোর।
তোমাদের কাছে মজার হতে পারে, আমার কাছে ছিলো না, ভাবলো কিশোর। তবে কিছুই বললো না সে।
আর আমাদের ওই প্রিয় পরিচালক, বেকারের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সাদা চুলওয়ালা মানুষটাকে দেখালো মড়ার খুলি, আমাদের এই আলোচনা টেপ করে নেবেন। কুইজ শোর আগে টেলিভিশনে দেখানোর জন্যে।
কারে ওপর দিয়ে ফিরে তাকালো কিশোর। অবাক হয়ে ভাবলো, কেন প্রথমেই মানুষটার নাম মনে করতে পারেনি? নাম আর চেহারা তো সাধারণত সে ভোলে না। একটা কথা অবশ্য ঠিক, অনেক বদলে গেছেন রাফায়েল সাইনাস। পাগল সংঘের সবার চেয়েও বেশি বদলেছেন। লম্বা, ছিপহেপে একজন প্রাণবন্ত মানুষ, কথার চাবুক হেনে যিনি চোখের পলকে ঠাণ্ডা করে ফেলতেন দুর্দান্ত বেয়াড়া ছেলেগুলোকেও, সেই মানুষের এ-কি হাল হয়েছে! বৃদ্ধ, কুঁজো, বিধ্বস্ত!
বেশ, বলে যাচ্ছে মড়ার খুলি, এখন আমাদের ভেবে দেখতে হবে, কেন আমরা টেলিভিশনের সামনে যাবো শুধু শুধু? যদি কিছু না-ই দেয়? বসে যে আলোচনা করবো তার জন্যেও পয়সা দিতে হবে আমাদেরকে। ঠিক আছে?

এক এক করে সবার মুখের দিকে তাকালো সে। সবাই মাথা ঝাঁকালো, কিশোর বাদে।
তুমি কি বলো? ভুরু কুঁচকে কিশোরকে জিজ্ঞেস করলো সে।
দ্বিধা করছে কিশোর। ভাবছে। মড়ার খুলির পরামর্শ মেনে নেয়ার অর্থ তাকে দলের নেতা হিসেবে স্বীকার করে নেয়, যেটা কিছুতেই করতে রাজি নয় কিশোর। কারণ ছোটবেলায় এ ছিলো দুষ্ট ছেলেদের সর্দার, মোটুরামকে কষ্ট দেয়ার বেশির ভাগ শয়তানী বুদ্ধিই তার মাথা থেকে বেরোতো।
কারো কর্তৃত্ব মানতে পারেনা কিশোর, এটা তার স্বভাববিরুদ্ধ। তবে একটা কথা এখন স্বীকার না করেও পারছে না, মড়ার খুলির কথায় যুক্তি আছে। টেলিভিশনে যদি তাদেরকে দর্শকদের সামনে হাজির করতে চায় টিভিওয়ালারা, তাহলে কেন পয়সা দেবে না? বিনে পয়সায় কেন কাজ হাসিল করবে?
মাথা ঝাঁকালো কিশোর।
মুখে আঙুল পুরে জোরে শিস দিয়ে উঠলো মড়ার খুলি। হাত নেড়ে ডাকলো, এই বেকার; এদিকে আসুন।
কিশোর ভেবেছিলো এই আচরণে নিশ্চয় মাইন্ড করবে বিজ্ঞাপন ম্যানেজার, মুখ কালো করে ফেলবে, কিন্তু তাকে অবাক করে দিয়ে করলো না। বিন্দুমাত্র মলিন হলো চাঁদের উজ্জ্বলতা। এগিয়ে এলো। পোষা বৃদ্ধ কুকুরের মতো তার পিছে পিছে এলেন সাইনাস।
কি চাও? খুব ভদ্রভাবে জিজ্ঞেস করলো বেকার।
কাটা কাটা বাক্যে পরিষ্কার করে তাকে বললো মড়ার খুলি। আলোচনার জন্যে তাদের প্রত্যেককে একশো ডলার করে সম্মানী দিতে হবে। সেটা করমুক্ত হতে হবে, এবং নগদ।
একটুও মলিন হলো না চাঁদের ঔজ্জ্বল্য, তবে সামান্য একটু কোঁচকালো ভুরু দুটো। তা পারবে না। এমনিতেই লাঞ্চের জন্যে অনেক খরচ করে ফেলেছে স্টুডিও। তাছাড়া প্রত্যেকের জন্যেই একটা করে দামী সুভনিরের ব্যবস্থা করেছি নিজের গাঁটের পয়সা খরচ করে।
কি রে উপহার? জিজ্ঞেস করলো নেলি।
কতো দাম? জানতে চাইলো মড়ার খুলি।
এটা আমি এখন কলবো না, হেসে বললো বেকার, গোপন রাখব। সারপ্রাইজ দেয়ার জন্যে। তবে রেখেছি, এটা ধরে নাও, বলে রান্নাঘরের দরজার দিকে দেখালো সে। আর পেলে খুব খুশি হবে, তা-ও বাজি রেখে বলতে পারি। এক মুহূর্ত দ্বিধা করে বললো, তবে, আলোচনার জন্যে একটা পয়সাও দিতে পারবো না, একথা আবারও বলে দিচ্ছে।

বেশ। টাকা না পেলে আমরাও আলোচনায় বসছি না।
ওদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করলো বেকার। কিন্তু কোনো কথা শুনতে রাজি নয় মড়ার খুলি। তার এক কথা, টাকা ছাড়া কিছু করবে না।
হাসি মুছলো না বেকারের মুখ থেকে, তবে তার কণ্ঠের মোলায়েম ভাবটাও আর রইলো না। দেখো, ব্ল্যাকমেল করছো তোমরা! ব্যাকমেল।
বেশ, করছি, হাসিটা ফিরিয়ে দিলো মড়ার খুলি। কিশোর দেখলে নেলি, ভারিপদ, এমনকি শিকারী কুকুরও হাসছে। তবে আলোচনায় বসাতে হলে টাকা আপনাকে দিতেই হবে।
সাথে সাথে কিছু বললো না বেকার। ভাবছে।
কিশোরও ভাবছে। অবাক হয়েছে সে। পাগল সংঘের যে চেহারা এতোদিন ছিলো তার মনের পর্দায়, সেটা দূর হয়ে গেল আজ। এরা সবাই আজ অন্য মানুষ। সবাই বড় হয়েছে, বুঝতে শিখেছে, স্বার্থ ছাড়া কথা বলে না। কঠোর বাস্তবকে বুঝতে শিখেছে, শিখেছে টাকার জন্যে কিভাবে লড়াই করতে হয়।
কিন্তু কথা হলো, একশো ডলারের জন্যেই যদি এভাবে লড়াই করে, বিশ হাজার ডলারের জন্যে কি করবে? হায়নার মতো কামড়া-কামড়ি শুরু করে দেবে না! ওদের কাছ থেকে টাকাটা বুদ্ধির জোরে ছিনিয়ে নিতে হলে কতোটা সর্তক হয়ে এগোতে হবে, বুঝতে পেরে কিছুটা দমেই গেল কিশোর। হারিস বেকারের কথা থেকে মনে হয়েছিলো, কিশোর আসবে, আর টাকাটা নিয়ে বাড়ি চলে যাবে। কিন্তু এখন বুঝতে পারছে, মোটেও ওরকম সহজ নয় ব্যাপারটা।
পাগলদের ওপর আগের সেই ঘৃণাটা আর নেই এখন কিশোরের, এটা বুঝে আরও অবাক হলো। এই মুহূর্তে বিশ্বাসই করতে পারছে না এরাই কয়েক বছর আগে ছিলো একেকটা গর্দভ, বোকার হদ্দ,তাকে জ্বালিয়ে মেরেছে। প্রতিশোধের ইচ্ছেটা ধীরে ধীরে যতোই দূর হয়ে যাচ্ছে কিশোরের, বাড়ছে প্রতিযোগিতায় জেতার ইচ্ছে।
ওর স্বভাবই হলো, কোনো চ্যালেঞ্জ এলে সমস্ত শক্তি আর বুদ্ধি নিয়ে সেটার মুখোমুখি হওয়া। পিছিয়ে আসার ছেলে সে নয়। এখন তার মনে হচ্ছে, জীবনে এতোবড় চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি সে খুব কমই হয়েছে।
লাঞ্চ টেবিলটা পরিষ্কার করে সরিয়ে নেয়া হলো। তার জায়গায় এনে অর্ধচন্দ্রের আকারে গোল করে রাখা হলো সুইভেল চেয়ার।
মাঝখানের চেয়ারটায় বসলো হ্যারিস বেকার, অনেকটা উপস্থাপকের ভূমিকা নেবে সে। কিংবা বলা যায় গৃহকর্তার। তার একপাশে নেলি, আরেক পাশে মড়ার খুলি। কিশোর বসেছে একমাথায়, শিকারী কুকুরের পাশে। অন্য মাথায় ভারিপদ।

জ্বলে উঠলো আর্কলাইট। কিশোরের মনে হলো, তার ওপর এসে পড়লো আধ ডজন খুদে সূর্যের রোদ। খুব কমই খেয়েছে সে। মাত্র একটুকরো মুরগীর মাংস আর একচামচ পট্যাটো সালাদ। নার্ভাস হয়ে গিয়েছে বলে খায়নি তা নয়। অন্য চিন্তায় ব্যস্ত তার মন, খাবারের কথা ভাবার সময় নেই যেন। ভ্রাম্যমাণ নিয়ন্ত্রণ কক্ষে বসে যখন শুটিঙের নির্দেশ দিলেন সাইনাস, তখনও গভীর চিন্তায় ডুবে রইলো সে। যে করেই হোক কুইজ শোতে জিততে হবে তাকে। প্রায় কথাই বলছে না কারো সাথে।

অন্যেরা সবাই গল্প করছে। কিন্তু কিশোর তাতে যোগ দিলো না। সে শুধু শুনছে। মড়ার খুলি, ভারিপদ, আর শিকারী কুকুরের ব্যাপারে অনেক কথাই জেনে ফেলেছে, ওদের আলোচনা থেকে। কিন্তু ওরা তার ব্যাপারে কিছুই জানতে পারেনি এখনও।

গুড ইভনিং, হাসি হাসি গলায় কললো বেকার। শো শুরু হলো।

নড়েচড়ে বেড়াতে লাগলো তিনটে টেলিভিশন ক্যামেরা। ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন সাইনাস। নানারকম কাজ করতে হচ্ছে প্রায় একই সঙ্গে।

কয়েকজন পুরনো বন্ধুর সঙ্গে নতুন করে আবার পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি আপনাদের, ক্যামেরার চোখের দিকে তাকিয়ে বললো বেকার। কয়েক হপ্তা ধরেই এদের ছোটবেলার অভিনীত ছবি দেখছেন আপনারা। হাজার হাজার চিঠি লিখেছেন আমাদের কাছে। জানতে চেয়েছেন ওরা কে কোথায় কেমন আছে। আপনাদের অনুরোধেই আজ ওদেরকে আমাদের স্টুডিওতে হাজির করেছি।

এক মুহূর্ত থামলো বেকার। রোদেপোড়া মুখে বিদ্যুতের মতো ঝিলিক দিয়ে উঠলো তার দাঁতের সারি। পাগল সংঘের পাগল এরা সবাই।

বলে যেতে লাগলো সে, পাগলদের একজনকে, যাকে শজারুকাঁটা বলে চেনেন দর্শকরা, তাকে হাজির করতে পারেনি বলে কতোখানি দুঃখিত। দুঃখটা অবশ্যই হাসিমুখে প্রকাশ করলো সে। টেলিভিশনের ঘোষক তাদের অনুষ্ঠান যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে কয়েক মিনিট দর্শকরা দেখতে পাননি বলে যেমন দরাজ হাসি হেসে আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করে অনেকটা সে-রকম ভাবে। শজারুকাঁটাকে খুঁজে রে করতে সাধ্যমতো চেষ্টা করা হয়েছে, কলহে বেকার, কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় ক্যালিফোর্নিয়ায় নেই সে। কোথায় গেছে খুঁজেও ব্বে করা যায়নি।

হয়তো জেলে গেছে, মড়ার খুলি বললো।

মৃদু হেসে তার কথা এড়িয়ে গেল বেকার। এক এক করে দর্শকদের সামনে নিজেদের পরিচয় দিতে অনুরোধ করলো পাগলদের।

নেলি বললে প্রথমে, আমি ছিলাম বটিসুন্দরী। কিন্তু সেটা অনেক দিন আগে। এখনও আমি শুধুই নেলি।

কি যে বলো, তার দিকে তাকিয়ে হাসলো বেকার। এতে বিনয়ের দরকার নেই। এখনও তুমি সুন্দরী, রং আগের চেয়ে বেশি। হরি মতো সুন্দর।
নেলি হাসলো না। এখন আর আগের মতো বোকামি করি না আমি। বরং বুদ্ধিমত্তার জন্যে প্রশংসাই পাই।
বেকারের ফিকফিক হাসিটা কেমন শূন্য শোনালো কিশোরের কানে। চেয়ারে হেলান দিলো সে। ক্যামেরার চোখ ছাড়িয়ে তাকালো ইলেকট্রিশিয়ানদের দিকে, যারা কিছু জটিল ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি নিয়ন্ত্রণ করছে। এদের মাঝেই রয়েছে রবিন আর মুস। কিশোর জানে, কোনো ক্যামেরাই এখনও তার দিকে তাকায়নি। কারণ নেলির পর পরিচয় দেয়ার পালা আসবে মড়ার খুলির। দুই সহকারীর দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে, চোখ টিপলো সে।
ওদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করলো, ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে সে যা-ই বলুক, যাই করুক, ওরা যেন অবাক না হয়। রবিনের দৃষ্টিই বুঝিয়ে দিলো, সে ইশারাটা ধরতে পেরেছে।
সামান্য ডানে সরলো কিশোরের নজর। আরেকটা পরিচিত মুখ চোখে পড়লো। অ্যালউড হোফার। সাউন্ড স্টেজের ওপর দিয়ে নিঃশব্দে হেঁটে যাচ্ছে লম্বা দণ্ডের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকটা আর্ক লাইটের দিকে। আলোগুলো এখন ব্যবহার হচ্ছে না।
আমি ছিলাম মাথা কামানো, পরিচয় দিচ্ছে মড়ার খুলি। বোকার ভাণকরতাম। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বেকারের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, খুব একটা বদলেহি বলে কি মনে হয় আপনার?
প্রশ্নের জবাব না দিয়ে হাসিমুখে পাল্টা প্রশ্ন করলো বেকার, তোমার নামই ছিলো মড়ার খুলি, তাই না?
হ্যাঁ। তবে আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন, বোকর ভাণ করে থাকতাম বলেই আমি বোকা নই। আসলে ভালো অভিনেতা। বুদ্ধি বেশি।
তার পর পরিচয় দিলো শিকারী কুকুর, এবং তারও পরে ভারিপদ। এমন শুকনো গলায় নিজেদের উপাধি বললো, যেন বহুবার এক কথা বলতে বলতে বিরক্ত হয়ে গেছে।
শিকারী কুকুর।
ভারিপদ।
ভারিপদকে নাড়া দিয়ে কিছুটা ভেজানোর চেষ্টা করলো যেন বেকার, কেন, তোমাকে ভারিপদ বলা হতো কেন?
কারণ ওই নামেই আমাকে ডাকতো সবাই।
তাতো ডাকতো। কিন্তু কেন?

কারণ ক্রিষ্টে তাই লেখা ছিলো, ডাকতে বলা হয়েছে।
মুহূর্তের জন্যে বেকারের দাঁতের বা অর্ধেক নিভে গিয়ে আবার জ্বলে উঠলো। কিশোরের দিকে ফিরলো। তুমি কে?
হাসিটা ফিরিয়ে দিলো কিশোর। তোতলাতে লাগলো, কি-কি-কি-কি-কিশোর পাশা!
হ্যাঁ। এখন তা-ই। তখন কি ছিলে?
কি-কি-কি-কি-কিশোর পাশা। সব সময়ই আমি কি-কি-কি-কিশোর পাশা। কুঁচকে গেছে তার কপাল। একেবারে বুদ্ধ বনে গেছে যেন। গোয়েন্দাগিরি করতে গিয়ে বহুবার দেখছে, বোকার ভাণ করে থাকলে অনেক ফল পাওয়া যায়।
বেকার যখন আবার জিজ্ঞেস করলো, পাগল সংঘে কিসের অভিনয় করতো, জবাবে কিশোর জানালো, বাবা-বাচ্চার। কথা আমার খুব বেশি ম-ম-ম-মনে থাকে না।
অবশেষে বেকারকেই কিশোরের পরিচয় করিয়ে দিতে হলো দর্শকদের কাছে। কিশোর পাশাই ছিলো মোটুরাম। অনেক দর্শকই স্বীকার করবেন, পাগল সংঘের প্রাণ ছিলো সে-ই। খুব বড় অভিনেতা।
পরিচয়ের পালা শেষ হলে বেকার জিজ্ঞেস করতে লাগলো, কে কি কাজ করছে এখন।
আমি রিসিপশনিস্ট, নেলি জানালো। স্যান ফ্রানসিসকোর এক অফিসে।
নিশ্চয় খুব ভালো রিসিপশনিস্ট তুমি। লোকে অফিসে ঢুকে ওরকম সুন্দর একটা মুখ দেখে নিশ্চয় খুশি হয়। অনেক মিষ্টি হাসি নিশ্চয় উপহার পাও তুমি।
না, মাথা নাড়লো নেলি। দাঁত তোলার আগে রোগীর মুখের অবস্থা দেখেছেন? ওরকম করে রাখেমুখ।
কথার খেই হারিয়ে ফেললো বেকার। শুরু করার আগেই কথা থামিয়ে দিলো মেয়েটা। অন্য ভাবে চেষ্টা করে দেখলো সে, অভিনয় তো ভালোই করতে। একেবারে ছেড়ে দিয়েছো নাকি?
আমি অভিনয় ছাড়িনি, বরং অভিনয়ই আমাকে ছেড়েছে। দশবহুর বয়েসের পর থেকে নতুন আর কোনো ছবিতে অভিনয়ের অনুরোধ আসেনি আমার কাছে।
তারমানে তোমার মা-বাবা চেয়েছেন ইস্কুলে গিয়ে লেখাপড়া শিখে তুমি সাধারণ জীবন যাপন করো…
আবার মাথা নাড়লো নেলি। না, তা তারা চায়নি। চাপ দিয়ে বার বার আমাকে ওরা অভিনয়ের দিকেই ঠেলে দিতে চেয়েছে। সাধারণ জীবন যাপন করার উপায় ছিলো না আমার।

কেন? সেকথা জিজ্ঞেস করার আগেই নেলি জবাব দিয়ে দিলো, লোকে আমাকে দেখলেই টিটকারি দিয়ে তো বটিসুন্দরী, বটিসুন্দরী। বহু বছর ওদের জ্বালায় রাস্তায় বেরোতে পারিনি আমি, ইস্কুলে তো আরও খারাপ অবস্থা। কি করতো, বলবো?

হাসিমুখে মাথা ঝাঁকালো বটে বেকার, কিন্তু তার চোখ দেখেই কিশোর বুঝলো, নেলি খুলে বলুক সেটা মোটেও চায় না সে।

নেলিও কললো না। বললো, যদি কখনও আমার বাচ্চা হয়, তাকে কর খোঁড়ার কাজ শিখতে বলবো রং, তবু অভিনেতা হতে দেবো না। কবর খোঁড়ার মাঝেও অন্তত কিছুটা শান্তি আর ভবিষ্যৎ আছে।

ভবিষ্যতের কথাই যখন বলছে, প্রসঙ্গ থেকে সরে যাওয়ার সুযোগটা হাতছাড়া করলো না বেকার, তখন তোমার নিজের কথাই বলো। কি করবে ভাবছো?

এই প্রথম তার দিকে তাকিয়ে হাসলো নেলি। টাকা জোগাড় করতে পারলে কলেজে ভর্তি হবো। এই সুন্দর চেহারা নিয়ে মহা অশান্তিতে আছি আমি। চেহারার চেয়ে মন আর মগজটা সন্দর হলে সেটা বরং আমার অনেক কাজে লাগবে।

তা লাগবে।

নেলির সঙ্গে আলোচনা শেষ করতে পেরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো বেকার। মড়ার খুলির দিকে ফিরলো। সে যদি ভেবে থাকে তার সাথে আলোচনাটা নেলির চেয়ে সহজ হবে, তাহলে ভুল করেছে। জানা গেল একটা মোটর গ্যারেজে মেকানিকের চাকরি

কিভাবে কি করে জানতে চেয়ে বেকার পড়লো বিপদে। মড়ার খুলি ঝাঁঝালো গলায় বললো, অন্যের গাড়ির নিচে সারাদিন চিত হয়ে পড়ে থাকি আমি। আমার নাকেমুখে টপ টপ করে ঝরে পড়ে পোড়া তেল। সারা গায়ে তেলকালি লেগে যায়। আঙুল, এমনকি নখের ভেতরে গ্রীজ ঢোকে। ওই আঙুল দিয়ে যখন র‍্যাঞ্চ ধরার চেষ্টা করি।

তাড়াতাড়ি অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল বেকার। আবার কি অভিনয়ের জগতে ফিরে আসতে চাও? তুমিই বললে তুমি খুব ভালো অভিনেতা।

অভিনয়? ফুহ! আপনি জানেন, এই শহরে কতোজন অভিনেতা না খেয়ে মরতে বসেছে?

জানে না বেকার। আর জানলেও সেটা নিয়ে আলোচনা করতে চায় না। আচ্ছা, তুমি কি কখনও নেলির মতো বিপদে পড়েছো? মানে, রাস্তায় জ্বালাতন করেছে লোকে?

ওরকম জ্বালায় পড়েনি একথা স্বীকার করতে বাধ্য হলো মড়ার খুলি। বললো, অভিনয় ছেড়ে দেয়ার পর আর মাথা কামালাম না। চুল গজিয়ে গেল। আমার বিখ্যাত কানদুটোও ঢেকে গেল চুলে। চেহারা এমন বদলে গেল, তখন হঠাৎ আমার নিজের মাও দেখলে চিনতে পারতো কিনা সন্দেহ। লোকে চিনতেও পারলো না, যন্ত্রণা থেকেও বাঁচলাম।
ভবিষ্যতে কি করার ইচ্ছে প্রশ্ন করে অহেতুক বিপদে পড়তে গেল না বেকার। ভারিপদের দিকে ফিরলো। সে জানালো, বেশির ভাগ সময়ই বেকার থেকেছে সে, কাজ পায়নি। তবে শিকারী কুকুর অবাক করলো বেকারকে। সে জানালো হাই স্কুল থেকে গ্র্যাজুয়েশন নিয়ে কলেজের ফার্স্ট ইয়ারে পড়ছে।
বেকারের প্রশ্ন ছাড়াই সে বলে গেল, আমি একদিক থেকে ভাগ্যবান। আমার বাবা উকিল। তিনি কখনোই আমাকে অভিনেতা বানাতে চাননি। তার এক শাসালো মক্কেলের চাপাচাপিতেই ছেলেকেলায় আমাকে অভিনয় করতে দিতে রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পর যখন বুঝলেন, এসব করে আমার ভবিষ্যৎই শুধু ঝরঝরে হবে, লাভ কিছু হবে না, আমাকে অভিনয়ের জগত থেকে ছাড়িয়ে এনে ইস্কুলে ভর্তি করে দিলেন।
বেকার জানতে চাইলো, অভিনয় ছেড়ে দেয়ার পর রাস্তায় বিপদে পড়েছে কিনা শিকারী কুকুর।
পড়েছি, জানালো সে, তবে বেশি দিন না। পাগল সংঘে আমি বোধহয় খুব একটা চোখে পড়ার মতো চরিত্র ছিলাম না। লোকে শীঘ্রি ভুলে গেল আমার কথা।
এরপর এলো কিশোরের জবাব দেয়ার পালা।
তুমি কি করছো? বেকার জিজ্ঞেস করলো।
শূন্য দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলো কিশোর, যেন প্রশ্নটা বুঝতে পারছি না। বোকার মতো কললো, কই, কিছুই তো করছি না। চুপচাপ বসে রয়েছি।
এখানে বসে থাকার কথা বলছি না। জীবনে কি করছো?
র-র-রকি বীচে বাস করছি।
ওখানে থেকে কি করো?
প্রশ্নটা যেন খুব অবাক করলো কিশোরকে। মাথা চুলকালো, চেয়ারে নড়েচড়ে বসলো। অবশেষে স্বীকার করলো বাড়ি থেকে বেরিয়ে মাঝে মাঝে স-স-স-সৈকতে সা-সঁ-আঁ তার কাটতে যায়।
ইস্কুলে যাও না? কোনো কিছুই যেন হ্যারিস বেকারে হাসিতে চির ধরাতে পারে। তবে গলায় সামান্য অধৈর্য ভাব ফুটলো।
গ-গ-গরমের ছুটিতে যাই না।

ভবিষ্যতে কিশোরের কি করার ইচ্ছে জিজ্ঞেস করে বিপদে পড়তে চাইলো না বেকার। আর কিছু আপাতত জিজ্ঞেস করলো না তাকে।
তবে এখনও নির্দিষ্ট সময় শেষ হতে বারো মিনিট বাকি। ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে হাসলো বেকার। এখন ওদের অতীত সম্পর্কে আমি কিছু জিজ্ঞেস করবো, ঘোষণা করলো সে। আমার বিশ্বাস, পাগল সংঘে অভিনয় করার সময়কার মজার কোনো ঘটনার কথা ওরা বলতে পারবে।
আবার নেলিকে দিয়ে শুরু হলো।
আমার শুধু মনে আছে নাপিতের কথা, নেলি বললো। এতো জোরে ব্রাশ ঘষতো আমার মাথায়, মনে হতো চামড়া ছিলে ফেলবে।
মড়ার খুলির মনে পড়লো সম্মানী দেয়ার দিনের কথা। প্রতি শুক্রবার রাতে পেতাম আমরা। চেক নয়, নগদ টাকা। বাদামী খামে ভরা থাকতো, লাল সুতো দিয়ে বাঁধা।
নিশ্চয়ই সেটা তোমার জন্যে খুব আনন্দের দিন ছিলো? বেকার বললো হেসে।
মোটেও না। আনন্দের ছিলো আমার বাবার জন্যে। সারা হপ্তায় ওই একবারই স্টুডিওতে আসতো, আমার কাছ থেকে খামটা কেড়ে নেয়ার জন্যে।
ভারিপদর মনে পড়লো বড় জুতোর কথা। এতে বড় জুতো পরতে দেয়া হতো আমাকে, ঢলঢল করতো। পায়ে আটকে রাখার জন্যে ভেতরে কাপড় পুরে দিতে ওরা। একজোড়া জুতো এখনও আছে, এখনও পায়ে ঢিলে হয়।
শিকারী কুকুরের মনে পড়লো, যেদিন স্টুডিওতে কোনো কাজ থাকতো না, সেদিন তার বাবা তাকে বেড়াতে নিয়ে যেতেন সৈকতে। কিংবা খেলতেন ছেলের সঙ্গে। তার যদি সেদিন কোনো কাজও থাকতো, সেটা করতেন না, ছুটি নিতেন।
শেষের দিকে তো দিন গুনতে আরম্ভ করেছিলাম আমরা দুজনেই, কবে অভিনয়ের কন্ট্রাক্ট শেষ হবে, বললো সে।
কিশোর কিছুই মনে করতে পারলো না। বললো, আমি তখন খুব বা-বাবাবাচ্চা।
তোতলাতে তোতলাতে আরও জানালো, তার স্মৃতিশক্তি খুবই দুর্বল, কিছুই মনে রাখতে পারে না। কয়েক হপ্তা আগে টিভিতে পাগল সংঘ দেখানোর আগে নাকি জানতোই না সে, কখনও তার নাম মোটুরাম ছিলো। তা-ও টেলিভিশনে সে দেখেনি। কে জানি একজন এসে-কে সেটাও মনে করতে পারছে না-তাকে বললো, তার নাম মো-মো-মো মোটুরাম।
শুনে নিশ্চয় অবাক লেগেছিলো তোমার, শূন্য হাসি হেসে বললো বেকার। হঠাৎ এক বিস্ময়কর তথ্য উদঘাটিত হওয়ায়?
বিস্ময়কর তথ্য উদ্ঘাটিত বলে একটা নাটকীয় আবহ আনতে চেয়েছিলো কোর, কিন্তু বলেই বুঝলো মস্ত ভুল করে ফেলছে। শুব্দগুলোর মানে যখন বোঝেতে

পারলো সে অনেক চেষ্টার পর, তখন আর মাত্র তিন মিনিট বাকি আছে আলোচনা শেষ হতে।
উঠে দাঁড়িয়ে ক্যামেরার দিকে তাকালো বেকার।
এখন সবাইকে একটা সারপ্রাইজ দেবো, চওড়া হাসি হাসলো সে। আমাদের এই অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার জন্যে পাগলদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। প্রত্যেককে একটা করে সুতনির উপহার দেবো, দেখে এই অনুষ্ঠানের কথা মনে করার জন্যে। অ্যানি, নিয়ে এসো প্লীজ।
মাথা সামান্য কাত করে তাকালো সে। রান্নাঘরের দরজা দিয়ে ঢুকলো একটা সুন্দরী মেয়ে, মাথায় লাল চুল, পরনে খাটো স্কার্ট। হাতে একটা চারকোণা বড় বাক্স, সোনালি কাগজে মোড়া।
বাক্সের ডালাতোলার আগে এক সেকেন্ড দ্বিধা করলো বেকার। তোমাদের প্রত্যেককে একটা করে খুব দামী উপহার দেয়া হবে, তার সব চেয়ে উষ্ণ আর চওড়া হাসিটা উপহার দিয়ে নিলো আগে সবাইকে। সারা জীবন ওটাকে রত্ন মনে করে রেখে দিতে পারবে তোমরা।
উপহারটা কী, বলার আগে আবার এক সেকেন্ডের জন্যে থামলো বেকার। তারপর বললো, রূপার একটা করে চমৎকার কাপ, তার ওপর তোমাদের নাম খোদাই করা, অবশ্যই পাগল সংঘের দেয়া নাম। যখনই দেখবে, মনে মনে হাসবে, আর মনে করবে একসময় কি প্রচণ্ড খ্যাতিই না পেয়েছিলো সিরিজটা।
বাক্সটা অ্যানির হাতে রেখেই ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিলো বেকার। প্রায় থাবা দিয়ে ছিনিয়ে নিলো বাক্সটা। এপাশ-ওপাশ নাড়া দিলো জোরে জোরে। হাত থেকে পড়ে গেল ওটা, মাটিতে পড়ে কাত হয়ে খোলা মুখ করে রইলো ক্যমেরার দিকে।
শূন্য বাক্স। দামী রূপার কাজ তো দূরের কথা, কোনো জিনিসই নেই বাক্সের ভেতরে।
বেকারের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো কিশোর। লোকটার সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার পর এই প্রথম দেখতে পেলো সে, তার মুখে হাসি নেই।
হাসছে না হ্যারিস বেকার।
শুরু হয়নি এখনও, রবিন বললো।
চ্যানেল ঠিক আছে তো? মুসার প্রশ্ন।
মাথা ঝাঁকালো রবিন। পৌনে পাঁচটায় দেখানোর কথা, খবরের আগে। কাগজে তো তাই লিখেছে। কিন্তু এখন তো দেখছি পুরনো এক ওয়েস্টান হবি।
রকি বীচে ফিরেই সোজা এসে হেডকোয়ার্টারে ঢুকেছে তিন গোয়েন্দা।
রকিং চেয়ারে বসে টেবিলে পা তুলে দিয়েছে মুসা। আমার মনে হয়, কাপগুলো হারানোতেই অনুষ্ঠানটা দেখাচ্ছে না। কি বলো, কিশোর?

কিশোর জবাব দিলো না। ডেস্কের ওপাশের চেয়ারে হেলান দিয়ে আনমনে চিমটি কাটছে নিচের ঠোঁটে। গভীর চিন্তায় ডুবে আছে।
টেলিভিশন অফ করে দিলো রবিন। পর্দা থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল কালো হ্যাট পরা দুজন কাউবয়।
এখনও ওখানেই রয়েছে, চিন্তিত ভঙ্গিতে বললো কিশোর।
কারা? টুলে বসে দেয়ালে পিঠ দিয়ে আরাম করে বসলো রবিন।
কারা নয়, কি, শুধরে দিলো কিশোর। ওই কাপগুলো। এখনও ওখানেই আছে।
কোথায়? জিজ্ঞেস করলো মুসা।
স্টেজ নাইন থেকে আমরা চলে আসার আগে আমাদের সবার দেহতল্লাশি করেছে ওরা, কিশোর কললো। তারপর গেটের কাছে আরেকবার খুঁজেছে গাড়ির ভেতর। পায়নি। যারাই চুরি করে থাকুক কাপগুলো, স্টুডিও থেকে সরাতে পারেনি। তারমানে এখনও ওখানেই আছে, সাউন্ড স্টেজের কোথাও, লুকানো।
এই সাউন্ড স্টেজটা আসলে কি জিনিস? জানতে চাইলো মুসা। ওরকম নাম কেন?
কারণ, বুঝিয়ে দিলো কিশোর, বহুদিন আগে যখন কথা বলা সিসটেম চালু হলো সিনেমায়, তখন তাদের সেটকে সাউন্ডপ্রুফ করার প্রয়োজন হতো পরিচালকদের। সাউন্ড স্টেজটা সে-কারণেই দরকার।
ও। তা কাপগুলোর কথা ঠিকই বলেছে। কিন্তু থাকলে আমাদের কি? তোমারটা নিশ্চয় পেতে চাও না? রূপার একটা কাপ দিয়ে কি আর হবে?
তাছাড়া ওটাতে যে নাম লেখা আছে, সেটা তুমি শোনা তো দূরের কথা, মুচকি হেসে বললো রবিন, দেখতেও চাও না।...কিশোর, সত্যিই তুমি ভালো অভিনেতা। আজ বিকেলে বোকার অভিনয় যা করলে না! হ্যারিস বেকারকে বুদ্ধ বানিয়ে ছেড়ে। দিয়েছে।
ওকে হেনস্তা করার কোনো ইচ্ছেই আমার ছিলো না। আসলে মড়ার খুলি আর শিকারী কুকুরকে বেকুব বানালাম।
কিভাবে? বুঝতে পারলো না মুসা।
তলোয়ার খেলার মতো। প্রতিপক্ষ যদি বোঝে তোমার তলোয়ারটা ভোতা, সামনে এগোতে আর দ্বিধা করবে না। তখন তার পেটে সহজেই তলোয়ার ঢোকাতে পারবে তুমি।
আরে বাবা একটু সহজ করে বলো না। দুই হাত তুলে নাচালো মুসা।
সহজ করেই তো বললাম। আমার শত্রুরা যদি ভেবে বসে আমি এতোই বোকা, নিজের নাম মনে রাখতে পারি না, তাহলে আমাকে পরাজিত করার জন্যে বেশি চেষ্টা করবে না। তখন ওদেরকে হারানো আমার জন্যে সহজ হয়ে যাবে।

বুঝলাম।
মাথ ঝাঁকালো রবিন। সে-ও এখন বুঝতে পেরেছে কিশোরের তখনকার ওই অত আচরণের কারণ।
যাই হোক, আগের কথার খেই ধরলো কিশোর, এই কাপ চুরির ব্যাপারটা পরিস্থিতি পালটে দিয়েছে অনেকখানি।
তারমানে, বলতে চাইছে, রবিন বললো, তদন্ত করার মতো একটা কেস পেয়ে গেছে?
কিন্তু বুঝতে পেরেছো? মুসা জিজ্ঞেস করলো।
কারও কথারই জবাব দিলো না কিশোর। নীরবে হাত বাড়ালো টেলিফোনের দিকে। একটা কার্ড দেখে নম্বর ডায়াল করলো। ওপাশ থেকে সাড়া এলে বললো, হলো, ইজি রাইড লিমে? আমি কিশোর পাশা বলছি। আপনাদের একজন ড্রাইভার, অ্যালউড হোপার, তার সঙ্গে কথা বলতে চাই।
কিছুক্ষণ নীরবতার প্র লাইনে এলো হোফার।
হ্যালো, মিস্টার হোফার, কিশোর কললো, আবার রিক্ত করছি। এই মাত্র স্টুডিও থেকে খবর দিলো, আবার যেতে হবে আমাদেরকে। হা হা, এক্ষুণি। যদি চলে আসেনহ্যাঁ, গেটের কাছেই থাকবো।...থ্যাংক ইউ।
আবার যাচ্ছি? উঠে দাঁড়ালো মুসা। কিশোরের ডেস্কে দুহাত রেখে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো, কিন্তু ঢুকবোকিভাবে? ওরা তো তোমাকে ডাকেনি।
না, ডাকেনি, বলতে বলতে পকেট থেকে একটা কাগজ বের করলো কিশোর। কিন্তু আমাকে ঢুকতে দেবে ওরা, কারণ স্টুডিও পাস আছে। লিমুজিনের জানালা থেকে খুলে রেখে দিয়েছিলাম, আমাদেরকে যখন নামিয়ে দিয়ে গেল। তখন অবশ্য ভাবিনি আমাদেরকে আবার ঢুকতে হবে। হোফার আবার ঢুকতে পারে এই ভয়ে খুলে রেখেছিলাম।
আবার কেন যাচ্ছে, জিজ্ঞেস করেও জবাব পেলো না রবিন। চুপ করে থাকাই শ্রেয় মনে করলো। ইচ্ছে করে কিছু না বললে হাজার জিজ্ঞেস করেও কিশোরের কাছ থেকে জবাব পাওয়া যাবে না।
স্টুডিওর গেটে এসে পাস দেখাতেই কোনো প্রশ্ন না করে ওদেরকে ছেড়ে দিলো গার্ড। নয় নম্বর স্টুডিওর সামনে এসে থামলো গাড়ি নেই।
বড় জোর আধ ঘণ্টা লাগবে আমাদের, শোফারকে বললো কিশোর।
আচ্ছা, ঘাড় কাত করলো হোফার।
ছোট দরজাটার সামনে এসে দাঁড়ালো কিশোর। তালা লাগানো নেই। সব সময়ই খোলা থাকে এই স্টেজ, জানা আছে তার। কাজ করার জন্যে আবার সন্ধ্যা আটটার

সময় আসবে এখানে নাইট শিফটের কর্মীরা।
মস্ত ঘরটা এখন অন্ধকার। অনেক ওপরে রয়েছে ধাতব ব্যালকনি। ওখানে, গ্যানট্রিতে কয়েকটা ঝুলন্ত তারের খাঁচার ভেতরে জ্বলছে কয়েকটা বাল্ব।
কিশোরকে অনুসরণ করে রান্নাঘরে এসে ঢুকলো মুসা আর রবিন। টর্চ জ্বেলে দেয়ালগুলো পরীক্ষা করতে আরম্ভ করলো গোয়েন্দা প্রধান।
নরম সুরে নিজের সঙ্গেই কথা বলতে লাগলো সে, টেবিলটা ছিলো এখানে। লাঞ্চের পর নিয়ে যাওয়া হলো ওই দিকে, এখানে এনে পাতা হলো কতগুলো সুইভেল চেয়ার। আর তখন নিশ্চয় সোনালি বাস্কেট ছিলো সেটের বাইরে...।
সেটের দরজার দিকে এগিয়ে গেল সে। এই দরজা দিয়েই বাক্স নিয়ে ঢুকেছিলো লাল চুল মেয়েটা। দরজা খুলে ওপাশে এলো কিশোর, সঙ্গে সঙ্গে এলো দুই সহকারী।
কয়েক ফুট দূরের একটা টেবিলে আলো ফেলে বললো সে, বাক্সটা হয়তো ওটার ওপরেই রাখা ছিলো। কিন্তু আমরা রান্নাঘরে থাকার সময় একবারও ভোলা হয়নি এই দরজা, শুধু বাক্স নিয়ে অ্যানি ঢোকার সময় ছাড়া। ওয়েইটার, ক্যামেরাম্যান সবাই রান্নাঘরে ঢুকেছে সেটের খোলা অংশ দিয়ে, আমরা যেদিক দিয়ে ঢুকেছি। তাছাড়া সারাক্ষণ লোক ছিলো ওখানে, কর্মীরা। সুতরাং, রবিন আর মুসার দিকে ঘুরলো সে, তোমাদের কি মনে হয়?
কাপগুলো যে-ই চুরি করুক, রান্নাঘরে নিয়ে গিয়ে লুকাতে পারেনি, মুসা বললো। তা করতে হলে ওগুলো নিয়ে সবার সামনে এই দরজা দিয়ে বেরোতে হতো, যেটা করা সম্ভব ছিলো না।
হ্যাঁ। মাথা ঝাঁকালো কিশোর। ধরা যাক, আমি চোর। ক্যানভাসে তৈরি রান্নাঘরের দেয়াল ঘুরে খোলা জায়গায় চলে এলো সে, যেখানে লাঞ্চের সময় কর্মীরা দাঁড়িয়ে ছিলো। আমি এখানে ছিলাম, এবং আমাকে ঘিরে ছিলো অনেক লোক। কিন্তু যদি বাক্সটা নিয়ে আমি ওদিকে ওই টেবিলের দিকে চলে যাই, আমাকে কেউ দেখবে। সামনের দিকে টর্চের আলো ফেললো সে। তারপর এগিয়ে গেল টেবিলটার দিকে।
রান্নাঘরের দরজা তখন লাগানো। কাজেই এখানে হুট করে কারও চলে আসার ভানা ছিলো না। কাজেই বাক্স খুলে কাপগুলো বের করে আবার ওটা সোনালি কাগজে মুড়ে রাখার যথেষ্ট সময় আমি পেয়ে যেতাম। সঙ্গে করে একটা চটের বস্তাটস্তা কিছু নিয়ে এলে ওগুলো ভরে ফেলতে পারতাম। কিন্তু সবার চোখের ওপর দিয়ে ওটা বের করে নিয়ে যেতে পারতাম না, কাজেই...
কাজেই এখানেই কোথাও লুকিয়ে রাখতে হতো, কথাটা শেষ করে দিলো রবিন। ওর টর্চ বের করে জ্বাললো। আলো ফেলতে লাগলো কতগুলো তারের কুণ্ডলী,

কিছু রঙের টিন, নানারকম মালপত্রের একটা দুই ফুট চওড়া, চার ফুট লম্বা স্তূপের ওপর। সব শেষে আলো ফেললো পাশের একটা ভারি কাঠের বাক্সের ওপর।
ওটার ওপর আলো ধরে রাখলো কিশোর। তার দুই সহকারী এগিয়ে গেল বাক্সের দিকে। ভেতরে ছুতোর মিস্ত্রীর কয়েকটা যন্ত্রপাতি ছাড়া আর কিছু নেই। মালপত্রের স্তূপ আর রঙের টিনের ভেতরেও কিছু পাওয়া গেল না।
ফিরে তাকালো রবিন আর মুসা। কিন্তু কিশোর ওদের দিকে তাকিয়ে নেই। সে গিয়ে দাঁড়িয়েছে একটা আর্ক লাইটের ধাতব স্ট্যান্ডের কাছে। হাত দিয়েই খোলালাগানো যায় এরকম বড় বড় গুলো পরীক্ষা করছে।
হঠাৎ স্থির হয়ে গেল সে। ঝট করে চোখ তুলে তাকালো কয়েক ফুট ওপরের কালো বড় বাক্সটার দিকে, যেটাতে রিফ্লেক্টর ভরা থাকে।
এই এদিকে এসো, সাহায্য করো আমাকে।
তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলো দুই সহকারী। ক্রুগুলো ঢিল করে বাক্সটা নিচে নামাতে সাহায্য করলো কিশোরকে। বারের হুড়কো খুলে ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিলো গোয়েন্দাপ্রধান।
হঠাৎ যেন রাতের আকাশে সূর্য উঠলো। দপ করে জ্বলে উঠলো হাজার ভোল্টের অসংখ্য বাতি, অন্ধকারের চিহ্নমাত্র রইলো না সেটের কোথাও। আলোর বন্যায় ভেসে গেল সমস্ত রান্না।
আর্ক লাইটের আলোয় স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তিন গোয়েন্দা। ধাতব দণ্ডটায় এখনও হাত রয়ে গেছে মুসা আর রবিনের। কিশোরের হাত রিফ্লেক্টর বক্সের ভেতরে।
যেখানে আহো, দাঁড়িয়ে থাকো, আদেশ দিলো একটা কণ্ঠ।
দাঁড়িয়ে রইলো হেলেরা। আলো জ্বালানোর মাস্টার কন্ট্রোল সুইচ বক্সের কাছ থেকে তাদের দিকে এগিয়ে এলেন পাগল সংঘের পরিচালক রাফায়েল সাইনাস। তাকিয়ে আছেন কিশোরের দিকে। বের করে আনার দরকার নেই আর। উজ্জ্বল আলোয় এখন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে বাক্সের ভেতরে রিফ্লেক্টরের পাশে পাঁচটা রূপার কাপ।
তাহলে ওখানেই লুকিয়েছে, সাইনাস বললেন। বিকেলে দেখা গিয়েছিলো বিধ্বস্ত এক বৃদ্ধ, এখন অন্য রকম হয়ে গেছে কণ্ঠস্বর। বহু বছর আগের সেই ধার আবার ফিরে এসেছে অনেকখানি।
দুহাজার ডলার খরচা হয়েছে স্টুডিওর ওগুলো কিনতে, বললেন পরিচালক। চুরি করেছে তোমরা। সবাই চলে যাওয়ার পর এখন এসেছে রে করে নিতে।

না, কিশোর বললো। আমরা লুকাইনি। খুঁজে ব্রে করেছি। এক এক করে বাক্সের ভেতর থেকে বের করে তুলে দিতে লাগলো পরিচালকের হাতে।
কে বিশ্বাস করবে তোমার কথা? পরিচালক বললেন। যে লুকিয়েছে, তারই শুধু এতো সহজে ওগুলো খুঁজে পাওয়ার কথা।
আমি চুরি করিনি! গলা সামান্য চড়ালো কিশোর। ভেবে বের করেছি কোথায় ওগুলো লুকিয়ে রাখতে পারে চোর। হেডকোয়ার্টারে বসে আলোচনা করেছি আমরা…
হেডকোয়ার্টার! তীক্ষ্ণ হলো পরিচালকের দৃষ্টি। কি বলতে চাইছো?
আমাদের অফিস। যখন কোনো কেস হাতে পাই, ওখানে বসে আলোচনা করি আমরা। গবেষণা করি।
কিসের কেস? সাইনাসও গলা চড়ালেন। এরপর হয়তো বলে বসবে, তোমরা পুলিশের লোক। গোয়েন্দা।
গোয়েন্দাই আমরা, তবে পুলিশের লোক নই। আম্র শব্বে গোয়েন্দা। পকেট থেকে কার্ড বের করে দিলো কিশোর।
শূন্য দৃষ্টিতে কাউটার দিকে তাকালেন পরিচালক। তাতে কিছু প্রমাণ হয় না, গলার স্বরে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হলো না তার। যে কেউ ওরকম ছেপে নিতে পারে। যদি ছেপে নাও তুমি এই স্টুডিওর প্রেসিডেন্ট, তাহলেই কি প্রেসিডেন্ট হয়ে যাবে? এটা কোনো প্রমাণ না যে তুমি কাপ চুরি করোনি।
কিন্তু আমরা করিনি, জোর দিয়ে বললো রবিন। এখানে এসে পাওয়ার আগে জানতামই না কোথায় লুকানো আছে।
আমরা শুধু আন্দাজ করেছি,মুসা বললো, এখানেই কোথাও আছে।
তারপর কিশোর বুঝে ফেললো, রবিন কললো আবার, ওই রিফ্লেক্টর বক্সে রয়েহে ওগুলো।
আর এখানে সমস্ত স্ট্যান্ডের মধ্যে সব চেয়ে বেশি তুলে রাখা হয়েছে ওই বাটার স্ট্যান্ড, বললো কিশোর, সে-কারণেই অবাক লাগলো। অস্বাভাবিক। ভাকলাম, কেন তুলে রাখা হয়েছে? নিশ্চয় কোনো ব্যাপার আছে।
কিন্তু এতো কথা বলার পরেও বিশ্বাস করার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না পরিচালকের মাঝে।
চুপ করে এক মুহূর্ত ভাবলো কিশোর। তারপর জিজ্ঞেস করলো, আপনি নিশ্চয় মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফারের নাম শুনেছেন? চিত্রপরিচালক?
তার নাম কে না শুনেছে, শ্রদ্ধার সঙ্গে বললেন সাইনাস। কেন, তিনি তোমাদের সাফাই দেকেন?
নিশ্চয় দেবেন। আপনি ফোন করেই দেখুন না।

হাসলেন সাইনাস। তোমাদের কপাল খারাপ, তিনি এখন নেই। বাইরে গেছেন একটা শুটিঙের কাজে। বেশ কিছুদিন আসবেন না।
আবার চুপ হয়ে গেল কিশোর। দমে গেছে রবিন আর মুসা। সাইনাসকে বোঝানোর আর কোনো উপায় নেই।
কিন্তু কিশোর দমলো না। আবার জিজ্ঞেস করলো, ভিকটর সাইমনের নাম শুনেছেন? রহস্য কাহিনী লেখক?
একের পর এক বিখ্যাত লোকদের নাম বলে যাচ্ছো। ব্যাপারটা কি? তিনিও কি সাফাই দেবেন নাকি?
কেন দেবেন না? দ্বিধা করলেন সাইনাস। তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়নি। ফোন নম্বর জানি না।
আমি জানি, পরিচালকের হাত থেকে কার্ডটা নিয়ে তার উল্টো পিঠে ফোন নম্বর লিখে দিলো কিশোর।
আরেকবার দ্বিধা এলেন পরিলাচক। তারপর হেঁটে গেলেন স্টেজের দেয়ালে কানো টেলিফোনটার দিকে। তাকে ডায়াল করতে দেখলো তিন গোয়েন্দা। তবে এত দূর থেকে কথা শুনতে পেলো না। অনেক সময় ধরে কথা বললেন। তারপর রিসিভার রেখে দিলেন হাসিমুখে।
ফিরে এসে জানালেন, আমাকে চিনতে পেরেছেন তিনি। আমার নাম জানেন। আশ্চর্যই লেগেছে। তার একটা ছবির শুটিং হয়েছিল, আমাদের এই স্টুডিওতে। তখন নাকি আমার সাথে দেখা হয়েছিলো, অথচ আমি ভুলে বসে আছি। আবার হাসলেন তিনি। কলার সঙ্গে সঙ্গেই নিতে পারলেন।
আমাদের কথা কি বলেছেন? মুসা জিজ্ঞেস করলো।
ও, তোমাদের কথা, জোর করে যেন অতীত থেকে নিজেকে বাস্তবে টেনে আনলেন সাইনাস। যা, তোমাদের কথা বলেছেন। তোমরা চোর নও। তোমরা ইচ্ছে করলে এখন বাড়ি যেতে পারো। কাপগুলো আমি জায়গামতো পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করছি।
তাঁকে ধন্যবাদ দিলো কিশোর।
আশ্চর্য, বিড়বিড় করলেন সাইনাস, কিশোরের কথা যেন শুনতেই পাননি, এই ফিল্ম ব্যবসা! এটা এমন এক জায়গা, এখানে চোখের আড়াল হলেই মানুষ মানুষকে দ্রুত ভুলে যায়। অথচ ভিক্টর সাইমন আমাকে ভোলেননি। আর কাণ্ড দেখো, আমি ভুলে বসে আছি। তিনি বললেন, তার ছবিটা পরিচালনার কথা নাকি প্রথমে আমারই ছিলো। পরে আরেকজনকে নেয়া হয়েছে, আমি সময় দিতে পারিনি বলে। আমার পরিচালিত সমস্ত ভালো হরি নাম মনে আছে তাঁর।

বেরোনোর জন্যে সহকারীদেরকে ইশারা করলো কিশোর। সাইনাসকে তার অতীতের মধ্যেই ডুবে থাকতে দিলো ওরা। এগোলো সাউন্ড স্টেজের প্রজার দিকে।
কি ভাবছো, কিশোর? রাস্তায় পা দিয়েই জিজ্ঞেস করলো মুসা।
জবাব দিলো না গোয়েন্দাপ্রধান। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে।
কে চুরি করেছে বলে মনে হয় তোমার? রবিনের প্রশ্ন। ওই আর্ক লাইট, ওদের কথা যেন কানেই ঢোকেনি কিশোরের, কেউ জানতো, ওগুলো ব্যবহার করা হবে না। থমকে দাঁড়ালো সে। পেছনে দাঁড়িয়ে গেল রবিন আর মুসা, বিশাল স্টেজ-বাড়িটার হায়ায়। বোধহয় সে-কারণেই সে ক্যামেরাগুলো চাল হওয়াতক অপেক্ষা করেছিলো…, ভ্রূকুটি করলো সে। কি জানি, এখনও শিওর হতে পারছি না।
মড়াটা? মুসা বললো। নাকি ভারিপদ?
শিওর না, একই কথা বললো কিশোর। বেশ কিছু রহস্য জট পাকিয়ে আছে এখনও।
যেমন? রবিন জানতে চাইলো।
এক নম্বর, একটা আঙুল তুললো কিশোর, আমাদের শোফার অ্যালউড হোফার।
তার আবার কি রহস্য? জিজ্ঞেস করলো মুসা।
ওর স্মৃতিশক্তি, বুঝিয়ে দিলো কিশোর, এত কম লে? সকালে স্টুডিওর গেট গার্ড তাকে দেখেই চিনতে পারলো, তারমানে এখানে সে অনেকবার এসেছে। তার পরেও নয় নম্বর স্টেজ কোথায় জানার জন্যে অনন্যকে জিজ্ঞেস করতে হলো কেন?
পথের শেষ মাথায় পার্ক করা লিমুজিনের দিকে হাঁটতে আরম্ভ করলো আবার কিশোর। আমাদের সামনে সাউন্ড স্টেজটা না চেনার ভান করছে সে। কেন?
সে-ই কি কাপগুলো চুরি করেছে ভাবছো? রনি বললো।
আবার কুটি এলো কিশোর। এখনও জানি না। তবে, আমাদের আলোচনা অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার ঠিক আগে রান্নাঘরের পেছন ঘুরে ওকে হেঁটে যেতে দেখেছি আমি।
পরদিন সকালে নাস্তা সেরে মেরিচাচীকে বাসন-পেয়ালা ধুতে সাহায্য করলো কিছুক্ষণ কিশোর। তারপর বেরিয়ে এসে ঢুকলো তার ওয়ার্কশপে। কুইজ শোর অনুষ্ঠান রেকর্ড করতে টেলিভিশন স্টেশনে যাবার কথা দুটোর সময়।
বেশির ভাগ কুইজ শোতেই, জানে সে, যার যার নিজের বিষয় পছন্দ করে নিতে বলা হয়। ওয়ার্কবেঞ্চে বসে বসে ভাবতে লাগলো সে, ওদেরকে কি সেরকম কোনো সুযোগ দেয়া হবে? যদি হয়, তাহলে কোন্ বিষয় পছন্দ করবে সে? বিজ্ঞান। ইস্কুলে তার সব চেয়ে প্রিয় বিষয়।

আগের দিন বেকারকে শো-এর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলো নেলি। জবাব দেয়নি, বিজ্ঞাপন ম্যানেজার। শুধু বলেছে, সারপ্রাইজ দেয়ার জন্যে সেটা গোপন রাখতে হচ্ছে, সরি।
একটা টিনের ছাউনির নিচে রয়েছে এই ওয়ার্কবেঞ্চ। বেঞ্চটার একধারে পড়ে আছে কয়েকটা পুরনো ভাঙা ক্যারো। কিনে নিয়ে এসেছিলেন রাশেদ পাশা। ওগুলোর কোনোটার লেন্স, কোনোটার শাটার আর নানারকম পার্টস খুলে নিয়ে একটা বিশেষ ধরনের ক্যারো তৈরি করার ইচ্ছে কিশোরের। খুব ছোট জিনিস। জ্যাকেটের নিচে লুকিয়ে রেখে বোতরে ফুটো দিয়ে চোখ বের করেই যেটার সাহায্যে ছবি তোলা যাবে। পুরনো যন্ত্রপাতি দিয়ে নতুন ধরনের কিছু তৈরি করে ফেলা তার হবি।
কয়েক মিনিট কাজ করার পরই হঠাৎ সোজা হয়ে মুখ তুললো সে, নামিয়ে রাখলো হাতের যন্ত্রপাতি। মাথার ওপরের লাল বাতিটা জ্বলছে-নিভছে। তারমানে ফোন বাজছে হেডকোয়ার্টারে।
দুই সুড়ঙ্গ দিয়ে ট্রেলারে ঢুকে রিসিভার তুলে নিলো সে। হ্যালো, কিশোর পাশা কলছি।
হ্যালো, রাফায়েল সাইনাস বলছি। আমি ফোন করায় আশা করি কিছু মনে করোনি।
অবাক হয়ে ভাবলো কিশোর, কিভাবে খানিক পর পরই বদলে যায় সাইনাসের কণ্ঠস্বর। কাল রাতে কথা বলার সময় পুরনো কণ্ঠ ফিরে পেয়েছিলেন, এখন আবার মনে হচ্ছে পরাজিত, বিধ্বস্ত।
মোটেই না, জবাব দিলো কিশোর। বরং খুশি হয়েছি। জানতে ইচ্ছে করছে কাপ চোরকে ধরতে পেরেছেন কিনা।
না। পুরোপুরি পারিনি এখনও। সে-ব্যাপারেই তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছি। আবার পুরনো সুর খানিকটা ফিরে এলো। সাইনাসের কণ্ঠে। ফোনে এতো কথা গুছিয়ে বলা যাবে না। তুমি যদি দুপুরে একটু আগে আগে চলে আসে, তাহলে বলতে পারি।
আসবো। কটায় আসতে বলেন?
এই এগারোটা। রিসিপশন ডেস্কে আমার নাম বললেই হবে। একটু থামলেন। তোমার বন্ধুরাও আসছে?
না। একাই আসতে হবে আমাকে।
রিসিভার নামিয়ে রাখতে রাখতে খারাপই লাগলো কিশোরের, রবিন আর মুসাকে সঙ্গে নিতে পারছে না বলে। দুপুরে হলে পারতো, কিন্তু এগারোটায় নেয়া যাবে না। ওরা বাড়ি নেই। সৈকতে গেছে সাঁতার কাটতে। কিশোরকেও যেতে অনুরোধ

করেছিলো। সে রাজি হয়নি। অনেক পথ সাইকেল চালিয়ে গিয়ে সাঁতার কেটে এসে ক্লান্ত হয়ে যাবে, শো-এর সময় অসুবিধে হবে।
রবিনের মাকে ফোন করলো সে। বলে দিলো, সে যথাসময়ে গাড়ি পাঠিয়ে দেবে, রবিন আর মুসাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। রবিনকে যেন বলে দেন তিনি। বিশেষ কারণে তাকে আগেই চলে যেতে হচ্ছে।
তারপর অ্যালউড হোফারকে ফোন করলো। ফোন ধরলো হোফারই। বললো তিরিশ মিনিটের মধ্যেই ইয়ার্ডে পৌঁছে যাবে।
গাঢ় রঙের স্যুট, সাদা শার্ট আর সুন্দর একটা টাই পরে এসে ইয়ার্ডের গেটে দাঁড়ালো কিশোর। গাড়ি এলো।
নীরবে চললো ওরা হলিউডের দিকে। একটা কথাও বললেন না হোফার। কিন্তু টেলিভিশন নেটওয়ার্ক অফিসের বিরাট বিল্ডিংটার সামনে গাড়ি রেখে যখন কিশোরের নামার জন্যে পেছনের দরজা খুলে দিলো সে, কিশোরের মনে হলো শোফার কিছু বলতে চায়। চত্বরে চুপ করে দাঁড়ালো সে, শোনার জন্যে।
কুইজ শের শুটিং দেখিনি কখনও, হোফার বললো। অনেক দর্শক উপস্থিত থাকে ওখানে, না?
হ্যাঁ, জবাব দিলো কিশোর। অন্তত শদুয়েক লোক তো থাকবেই।
দেখাটা নিশ্চয় খুব মজার, এক পা থেকে আরেক পায়ে শরীরের ভার সরালো হোফার। দ্বিধা করে বললো, বাড়তি টিকেট কি আছে আর?
আছে। চারটে টিকেট দিয়েছে বেকার, যদি পরিবারের কাউকে আনতে চায় কিশোর, সেজন্যে। রবিন আর মুসাকে দুটো দেয়ার পরেও আরও দুটো রয়ে গেছে তার কাছে, মেরিচাচী আর রাশেদ পাশার। তারা আসেননি। একটা রে করে দিলো সে।
অনেক ধন্যবাদ, বলে খুব আগ্রয়ে সঙ্গে টিকেটটা নিলো হোফার। আপনার বন্ধুদেরকে আগে নিয়ে আসি, তারপর শো দেখবে।
বাড়িটায় ঢুকলো কিশোর। মুখে চিন্তার ছাপ। ক্রমেই অবাক করছে তাকে অ্যালিউড হোফার। তার বয়েসী একজন লোক একদল, প্রাক্তন শিশু শিল্পীর বকবকানি শুনে কি মজা পাবে? কি জানি, কার যে কোন জিনিস কখন ভালো লাগবে, বলা যায় না। হোফরের ডানা আপাতত মন থেকে বিদায় করলো সে।
সোজা সাইনাসের অফিসে কিশোরকে পাঠিয়ে দিলো ডেস্কের রিসিপশনিস্ট। দরজার ওপরে লেখা রয়েছে গেস্ট ডিরেক্টরস। তাকে দেখে খুশি হলেন পরিচালক। ডেস্কে তাঁর মুখোমুখি বসলো কিশোর।
কাল রাতে ভিকটর সাইমন অনেক প্রশংসা করলেন তোমার,ঝলতে শুরু করলেন সাইনাস। যদি শুধু কিশোর বলে ডাকি তোমাকে কিছু মনে করবে?

আপনার বয়েসী অনেকেই আমাকে কিশোর বলে ডাকে, মনে করবো কেন?
গুড। সাইমন বললেন গোয়েন্দা হিসেবে তুমি নাকি অসাধারণ। অনেকগুলো জটিল রহস্যের সমাধান নাকি করেছে তুমি আর তোমার দুই বন্ধু মিলে।
মাথা ঝাঁকালে কিশোর।
সেজন্যেই আমার হঠাৎ মনে হলে, থেমে গেলেন পরিচালক। ওই কাপ চুরির ব্যাপারটা জানাজানি করতে চায় না স্টুডিও কর্তৃপক্ষ, সেজন্যেই পুলিশকে জানায়নি। আবার দ্বিধা করলেন তিনি। কাল রাতেই আমি ভেবেছি, এটা তোমাদের জন্যে একটা চমৎকার রহস্য হতে পারে। যদি চোটাকে ধরে দিতে পারে ছোটখাটো একটা পুরস্কারেরও ব্যবস্থা করতে পারি হয়তো।
তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে কিশোর বললো, পুরস্কারের চেয়ে কেসের ব্যাপারেই আমরা বেশি আগ্রহী।
গুড, সাদা পাতলা চুলে আঙুল চালালেন সাইনাস। কাউকে বলে দেবে না, শুধু এই বিশ্বাসের ওপর তোমাকে আমি বলছি, কিশোর, কাপগুলো কে চুরি করেছে, আমি জানি। যদিও এটা আমার সন্দেহ, তবে খুব জোরালো সন্দেহ।
চুপকরে অপেক্ষা করতে লাগলো কিশোর।
কাল রাতে সাউন্ড স্টেজ থেকে বেরোনোর সময় দেখলাম একটা লোক দৌড়ে যাচ্ছে দরজার দিকে। আমার পায়ের শব্দে চমকে গিয়ে নিশ্চয় দৌড় দিয়েছিলো। বাইরে তখন অন্ধকার, তবু কিছু কিছু দেখা যাচ্ছিলো। দেখলাম তরুণ বয়েসী একটা লোক ছুটে যাচ্ছে স্টুডিওর গেটের দিকে।
এবারও কিছু বললো না কিশোর।
ওর চেহারা দেখতে পাইনি, সাইনাস কললেন, তবে ওর চলাফেরাটা আমার কাছে বেশ পরিচিত লাগলো। পা নাড়ে অনেকটা চার্লি চ্যাপলিনের মতো। সেই ছেলেটা, যে চ্যাপলিনের অনুকরণ করতো, পাগল সংঘের ভারিপদ।
কাপগুলো রে করে নিতে এসেছিলো ভাবছেন? প্রথম প্রশ্নটা করলো কিশোর।
মাথা ঝাঁকালেন পরিচালক। তাছাড়া আর কি? আর তো কোনো কারণ থাকতে পারে না।
আর কোনো কারণের কথা কিশোরও ভাবতে পারলো না। কিন্তু তার দৌড়ে পালানোই প্রমাণ করে না যে ভারিপদই চোর।
তা করে না, তবে সন্দেহ করতে দোষ নেই, আবার আগের কণ্ঠস্বর পুরোপুরি ফিরে পেয়েছেন পরিচালক। সোজা হয়ে গেছে কাঁধ। একটা অনধিকার চর্চা করেছি। আমি জানি, আজ শনিবার, সাউন্ড স্টেজে শুটিং হবে না। কালও বন্ধ। সোমবারের আগে খুলছে না। এটা ভেবেই দরজায় তালা লাগিয়ে দিয়ে এসেছি আমি।

পকেট থেকে একটা চাবি বের করে টেবিলের ওপর রাখলেন তিনি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ভারিপদই একাজ করেছে। আবার ফিরে যাবে স্টেজে, কাপগুলোর জন্যে। ও এখনও জানে না যে কাপগুলো যেখানে লুকিয়েছে সেখানে নেই।
ঠিক কাজই করেছেন আপনি, কিশোর বললো।
কর্তৃপক্ষ কড়া নির্দেশ দিয়ে দিয়েছে, ব্যাপারটা যাতে গোপন রাখা হয়। চাবিটা কিশোরের দিকে ঠেলে দিলেন তিনি। নাও। ভারিপদের ওপর চোখ রাখবে। হয়তো ওকে ফাঁদে ফেলার একটা বুদ্ধি বের করে ফেলতে পারবে। যা ভালো বোঝো করো। তো, এখন আমাকে তো মাপ করতে হয়। কিছু জরুরী কাজ সারার আছে।
চাবিটা নিয়ে উঠে দাঁড়ালো কিশোর।
সে বেরিয়ে আসার সময় আবার বললেন সাইনাস, ভারিপদর ওপর কড়া নজর রাখবে।
করিডরে বেরিয়ে ঘড়ি দেখলো কিশোর। শো শুরু হতে এখনও ঘন্টা দুই বাকি। লিফটে করে লবিতে নেমে এলো আবার সে। কোণের একটা সোফায় আরাম করে বসলো। রাস্তার দিকের দরজা খুলে লোক আসছে, যাচ্ছে। ঢুকে বেশির ভাগই এগিয়ে যাচ্ছে লিফটের দিকে, রিসিপশন ডেস্কের কাছে থামছে কেউ কেউ।
হঠাৎ সামনে ঢুকে দুহাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফেললো কিশোর। যার ওপর চোখ রাখতে বলা হয়েছে তাকে, সে ঢুকলো। লিফটের দিকে হেঁটে চলে গেল ভারিপদ।
ভরিপদ উঠলো। বন্ধ হলো লিফটের দরজা। উঠে গিয়ে নির্দেশক বাতির দিকে তাকিয়ে রইলো কিশোর। কোন্ কোন্ তলায় থামছে লিফট, কতোক্ষণের জন্যে, বাতিই বলে দিচ্ছে পরিষ্কার।
কয়েকবার থামলো লিফট। বোঝার উপায় নেই, ভারিপদ নামলো কোন তলায়। ফিরে এসে আবার আগের জায়গায় বসলো কিশোর।
একটা কথা অবশ্য জেনেছে কিশোর, সতেরো তলায় কুইজ শো-এর শুটিং হওয়ার কথা, কিন্তু সেই তলায় থামেনি লিফট। স্টুডিওতে ঢোকেনি ভারিপদ, তারমানে এই বিল্ডিঙেই অন্য কারও সঙ্গে দেখা করতে গেছে সে। বলা যায় না, আবার ফিরে আসতে পারে লবিতে। কিশোর যেমন এসেছে।
যেখানে আছে সেখানেই বসে থাকার সিদ্ধান্ত নিলো কিশোর। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। মিনিট পাচেক পরেই ফিরে এলো ভারিপদ। হেঁটে গেল তার সামনে দিয়ে। হাতে একটা খাম। বেরিয়ে গেল সে।
পিছু নিলো কিশোর। চত্বরে বেরিয়ে দেখলো, একটা মোটর সাইকেলে উঠে স্টার্ট দিলো ভরিপদ। রওনা হলো ভাইন স্ট্রীট যেদিকে রয়েছে সেদিকে।

ট্যাক্সির আশায় এদিক ওদিক তাকালো কিশোর। কয়েক গজ দূরে একটা ট্যাক্সি থেকে নামছেন এক বৃদ্ধা মহিলা।
মহিলার ভাড়া মিটিয়ে দেয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলো কিশোর, তারপর লাফ দিয়ে উঠে পড়লো পেহরে সীটে।
কোথায় যাবো? জিজ্ঞেস করলো ড্রাইভার।
সামনে ঝুঁকে আছে কিশোর, দ্রুত ভাবনা চলছে মাথায় ভারিপদ যদি স্টুডিওতে যায়ই, তাকে ওখানে অনুসরণ করে গিয়ে লাভ নেই। বরং তার আগেই গিয়ে যদি সাউড স্টেজের ভেতরে লুকিয়ে থাকতে পারে, তাহলে…
ড্রাইভারকে স্টুডিওর ঠিকানা বললো সে। মোটর সাইকেলটা এঞ্জিন খুব একটা জোরালো নয়, জোরে চালালে ওটার আগেই ভাইন স্ট্রীটে পৌঁছে যাবে ট্যাক্সি।
ঠিকই আন্দাজ করেছে সে। যাওয়ার পথে দ্বিতীয় ট্রাফিক সিগন্যালের কাছেই মোটর সাইকেলটাকে পেছনে ফেললো ট্যাক্সি। মাত্র দুই মাইল দূরে স্টুডিও, হলিউড বুলভারের পরেই।
স্টুডিওর গেটে নেমে ড্রাইভারের ভাড়া মিটিয়ে দিলো কিশোর। গার্ডকে পাস দেখাতেই পথ ছেড়ে দিলো। দ্রুত নয় নম্বর স্টেজের নির্জন বাড়িটার কাছে এসে দাঁড়ালো সে। চাবি দিয়ে তালা খুলে ভেতরে ঢুকলো।
পুরোপুরি অন্ধকার এখন বিশাল ঘরটা। সাথে টর্চ থাকলে ভালো হতো, তবে আফসোস করে নষ্ট করার মতো সময় হাতে নেই। যে কোনো মুহূর্তে এখানে পৌঁছে যেতে পারে ভারিপদ, যদি এখানেই আসার উদ্দেশ্য থাকে তার।
দরজাটা সামান্য ফাঁক করে রাখলো কিশোর, কিছুটা আলো যাতে আসতে পারে সেজন্যে। তবে খুব একটা সুবিধে হলো না। অনুমানে রান্নাঘরের দিকে এগোলো সে। বড় জোর মিটার দশেক এগিয়েছে, এই সময় দরজা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ হলো। ফিরে তাকিয়ে দেখলো, ফাঁক বন্ধ হয়ে গেছে। কোনো আলোই আসছে না এখন। বাইরে থেকে লাগিয়ে দেয়া হয়েছে।
অন্ধকারে যতোটা দ্রুত সত্ব, দরজার কাছে ফিরে এলো কিশোর। দরজায় ঠেলা দিলো। পালা খুললো না। আরো জোরে ধাক্কা লাগলো সে। অনড় রইলো পাল্লা। বাইরে খিল লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। অন্ধকার, শব্দনিরোধক এই বাড়িতে আটকা পড়েছে সে। হাজার চিৎকার করলেও এখান থেকে বাইরে শব্দ যাবে না, সে-রকম করেই তৈরি করা হয়েছে এটা। সোমবার সকালের আগে স্টুডিওর কোনো কর্মীও ঢুকবে না এখানে।
এবং আর দেড় ঘন্টার মধ্যেই কুইজ শোর শুটিং শুরু হবে।
পুরো একটা মিনিট চুপ করে দাঁড়িয়ে ভাবলো কিশোর। দ্রুত চলহে মগজ, তবে আতঙ্কে নয়। মনে মনে পরিকল্পনা তৈরি করফেমুক্তির।

প্রথমেই দরকার, আলো।
আগের দিন বিকেলের কথা মনে পড়লো তার। আর্ক লাইটগুলো জ্বলে ওঠার পর মাস্টার কন্ট্রোলের কাছ থেকে সরে আসতে দেখা গিয়েছিলো সাইনাসকে। কিশোররা যখন কাপগুলো খুঁজে পেয়েছে।
রান্নাঘরটা কোনদিকে আহে, অনুমান করে দেয়ালের ধার ঘেঁষে সেদিকে এগুলো সে। রান্নাঘরের সেটের শেষ মাথায়ই আছে মাস্টার কন্ট্রোল। অন্ধকারে হাতড়াতে লাগলো। মনে হলো, দীর্ঘ এক যুগ পর হাতে লাগলো ধাতব সুইচ বক্সটা। হুড়কো খুলে ডালা মেললো। ভেতরে আঙুল ঢোকাতেই হাতে লাগলো সুইচ হ্যান্ডেল। ধরে নামিয়ে দিলো নিচের দিকে।
আলোয় ভেসে গেল রান্নাঘর।
এখন দুই নম্বর কাজ, টেলিফোন।
মাত্র কয়েক মিটার দূরে রয়েছে ওটা। দেয়ালে ঝোলানো। এগিয়ে গিয়ে রিসিভার নামিয়ে কানে ঠেকালো সে।
মৃত। একেবারে ডেড হয়ে আছে টেলিফোন।
কিন্তু তাতেও নিরাশ হলো না গোয়েন্দাপ্রধান। সে আশাও করেনি টেলিফোনটা কাজ করবে। যে লোক তাকে এখানে আটকে রেখে গেছে, সে টেলিফোন চালু রেখে যাবে এতো বোকা নিয়ে নয়।
তিন নম্বর কাজ, ফোনটা ঠিক করা, সম্ভব হলে।
কোথায় লাইনটা কাটা হয়েছে, সহজেই খুঁজে পাওয়া গেল। মেঝের কাছাকাছি জায়গায়। তবে যে কেটেছে সে ভালোমতোই জানে কিভাবে কি করতে হবে। শুধু কেটেই ক্ষান্ত হয়নি, অনেকখানি জায়গার তার টেনে তুলে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে।
রান্নাঘরের পেছনে এখনও আছে হুতোর মিস্ত্রীর যন্ত্রপাতিগুলো। ভালো শক্ত একটা প্লয়ার্স পাওয়া গেল ওখানে। আর সাউন্ড স্টেজ-ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি নিয়ে যেখানে কারবার, সেখানে খানিকটা ভালো তার জোগাড় করাও এমন কোনো কঠিন কাজ নয়। একটা স্পটলাইট থেকেই সেটুকু তার কেটে নিয়ে এলো সে।
দ্রুত হাত চালিয়ে ফোনের লাইনের সঙ্গে তারটা জোড়া দিয়ে ফেললো। রিসিভার তুলতে গিয়ে দুপ দুপ করছে বুক। কাজ হবে তো? বলা যায় না, বিল্ডিঙের বাইরেও কাটা হয়ে থাকতে পারে তার। তাহলে সর্বনাশ।
কিন্তু রিসিভার কানে ঠেকাতেই একটা মিষ্টি শব্দ কানে এলো তার। টেলিফোনে শব্দ সাধারণত বিরক্ত করে তাকে, কিন্তু এখন ডায়াল টোনের আওয়াজ শুনে মনে হলো জীবনে যতগুলো মধুরতম আওয়াজ শুনেহে এটা তার মধ্যে একটা।

স্টুডিওর সুইচবোর্ডে ফোন করে কাউকে আসতে বলতে পারে, নিশ্চয় বাড়তি চাবি আছে ওদের কাছে। কিন্তু ওরা এলে হাজারটা কৈফিয়ত দিতে হবে, প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। এখনই সব কিছু ফাঁস করে দিতে চায় না সে। নিজেদের মধ্যে, অর্থাৎ তিন গোয়েন্দার মধ্যেই আপাতত সীমাবদ্ধ রাখতে চায় ব্যাপারটা।
নিশ্চয় এতোক্ষণে সৈকত থেকে বাড়িতে চলে এসেছে মুসা। তাকেই ফোন করলো কিশোর। দ্বিতীয়বার রিং হতেই রিসিভার তুললো স্বয়ং মু। সংক্ষেপে তাকে বুঝিয়ে বললো কিশোর, কি ঘটেছে।
তারপর বললো, এখুনি অ্যালউড হোফারকে ফোন করে বলো তোমাকে এখানে নিয়ে আসতে। আমি দরজার নিচের দিকে একটা ফুটো করার চেষ্টা করছি, ওখান দিয়ে চাবি কে করে দেবো।
কিশোর রিসিভার রাখার পর আর একটা সেকেন্ড দেরি করলো না মুসা। হোফারকে ফোন করলো। তিরিশ মিনিটের মধ্যে ওদের বাড়িতে পৌঁছে গেল শোফার। রবিনকে ফোন করে আগেই আনিয়ে রেখেছে মুসা। তাড়াহুড়ো করে দুজনে উঠে বসলো গাড়িতে।
আর কিছু করার নেই দুজনের। এখন সব দায়দায়িত্ব ফোরের, লিজিন নিয়ে কতো তাড়াতাড়ি পৌঁছতে পারবে স্টুডিওতে। কিন্তু সে-ও যেন কিছু করতে পারছে না। শনিবারের হলিউডের রাস্তা, সাংঘাতিক ভিড়। যাই হোক, অবশেষে ভাইন স্ট্রীটে পৌঁছলো গাড়ি। দেখা গেল স্টুডিওর গেট।
গার্ড-বুদ থেকে বেরিয়ে এলো গার্ড, গাড়ির পাশে এসে দাঁড়ালো। হাত বাড়ালো, পাস দেখি?
পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো দুই সহকারী গোয়েন্দা। এই কথাটা তো একবারও মনে পড়েনি! পাস রয়েছে কিশোর পাশার কাছে।
বাটালির মাথায় হাতুড়ির শেষ আঘাতটা দিয়ে থামলো কিশোর। মেঝেতে নামিয়ে রাখলো যন্ত্র দুটো, তারপর পরিষ্কার করে ফেলতে লাগলো দরজার নিচ থেকে কাঠের কাটা চিলতেওলো। ওয়ে পড়ে চোখ রাখলো কাটা জায়গার কাছে, বাইরে তাকালো।
ঠিকই আছে। চাবি বের করে দেয়া যাবে। চতুর্থ কাজটাও সমাপ্ত। এখন মুসা এসে হাজির হলেই চাবিটা ঠেলে দেবে বাইরে।
ঘড়ি দেখলো কিশোর। দুটো বাজতে সতেরো মিনিট বাকি। এতো দেরি করছে কেন মুসা? এততক্ষণে পৌঁছে যাওয়ার কথা। শোফারের সঙ্গে কোনো গোলমাল হলো? নাকি অন্য কোনো কারণে আটকে গেছে?
অ্যালউড হোফারের রহস্যজনক আচরণের কথা পড়তেই অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করলো কিশোর।

গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছে লিমুজিন।
পাস আছে আমাদের বোঝানোর চেষ্টা করছে মুসা, কিন্তু ভুলে বাড়িতে ফেলে এসেছি। আমাদের চিনতে পারছেন না? গতকালও আমরা এসেছিলাম, পাগল সংঘের অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার জন্যে। আমাদের বন্ধু কিশোর পাশাকে তুলে নিতে এসেছি।
গম্ভীর মুখে মাথা নাড়লো গার্ড। আমি ওসব শুনতে চাই না। তাছাড়া আজকে বাইরের কারও আসারও কথা নয়, আমাকে ইনফর্ম রা হয়নি। পাস ছাড়া ঢুকতে দেবো না।
কি-কিন্তু, তোতলাতে শুরু করলো রবিন, আমরা…
তার কথা শেষ হওয়ার আগেই দরজা খুলে নেমে পড়লো হোফার। পেছনের রজা খুলে দিয়ে বললো, নামুন আপনারা।
ওরা নামতে আবার গার্ডের দিকে ফিরলো হোফার। এই গাড়িটা মিস্টার হ্যারিস বেকার ভাড়া নিয়েছেন, স্টুড়িওর বিজ্ঞাপন ম্যানেজার। তিনিই এদেরকে অনুমতি দিয়েছেন স্টুডিওটা ঘুরে দেখার জন্যে। আমাকে পাঠিয়েছেন দেখিয়ে নিয়ে যেতে।
কিন্তু মিস্টার বেকার তার অফিসে আছেন বলে তোর মনে হয় না…।
না, তিনি নেই। তাঁর সেক্রেটারি আমাদের কোম্পানিতে ফোন করেছিলো গাড়ি নিয়ে আসার জন্যে। দড়াম করে পেছনের ভোলা দরজাটা লাগিয়ে দিলো হোফার। তিনি কোথায় আছেন? দরজা লাগানোর সময় ফিসফিসিয়ে মুসাকে জিজ্ঞেস করলো সে।
নয় নম্বর। বাইরে তালা, ভেতরে আটকে আছে। দরজার নিচ দিয়ে চাবিটা রে করে দেবে বলেছে।
ফিরে এসে গার্ডের সামনে দাঁড়ালো হোফার। বললো, আমার যেতে তো কোনো বাধা নেই? আমি সেক্রিটারির কাছে যাচ্ছি। বলে আবার উঠে পড়লো গাড়িতে। তাকে আটকালো না গার্ড। হাত নেড়ে যাওয়ার ইশারা করলো।
গাড়িটাকে নয় নম্বর স্টেজের দিকে এগিয়ে যেতে দেখলো রবিন আর মুসা।
কিশোর ঠিকই আন্দাজ করেছে, রবিন ভাবলো, অ্যালউড হোফার লোকটা রহস্যময়।
তখনও দরজার নিচ দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে কিশোর। আলো আসছিলো রজার নিচ দিয়ে, হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল সেটা।
মুসা? ডেকে জিজ্ঞেস করলো সে।
না, আমি অ্যালউড হোফার। চাবিটা দিন। দ্বিধা করলো কিশোর। এতোগুলো কাজ নির্বিঘ্নে সারার পর, এখন তীরে এসে তরী ডোবাতে চায় না ভুল লোকের

হাতে চাবি দিয়ে। চাবিটা নিয়ে যে সরে পড়বে না হোর, তাকে সোমবার এখানে আটকে রেখে যাবে না তার বিশ্বাস কি? এমনও হতে পারে হোফারই তার পিছু নিয়ে এখানে এসেছিলো, তাকে আটকে রেখে গিয়েছিলো।
ঘড়ি দেখলো আবার কিশোর। দুটো বাজতে বারো মিনিট আছে আর। দ্বিধা করার সময় এখন নয়। ঝুঁকিটা নিতেই হবে। মনে মনে আশা করলো, হোফার যেন তার শক্ত না হয়।
দরজার নিচ দিয়ে চাবিটা ঠেলে দিলো, কিশোর। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো।
খুলে গেল দরজা।
ফোঁস করে চেপে রাখা নিঃশ্বাস ছেড়ে উজ্জ্বল দিবালোকে বেরিয়ে এলো কিশোর। বললো, থ্যাংক ইউ, মিস্টার হোফার।
জলদি চলুন, শোফার কললো। আপনার বন্ধুরা গেট দাঁড়িয়ে আছে। আশা করি দুটো নাগাদ পৌঁছে যেতে পারবো।
ঠিক দুটোয় পৌঁছতে পারলো না। এক মিনিট দেরি হয়ে গেল। গাড়ি থেকে নেমে টেলিভিশন নেটওয়ার্ক বিল্ডিংটার দিকে দৌড় দিলো কিশোর। দুর্টে এসে লিফটে উঠলো।
যে রুমে কুইজ শো শুটিঙের ব্যবস্থা হয়েছে, সেটার দরজা খোলা রয়েছে তখনও। একজন ইউনির্ফম পরা অ্যাটেনডেন্টকে বলতেই তাড়াতাড়ি কিশোরকে একটা ঘোরানো গলি পার করে স্টেজে পৌঁছে দিলো।
আদালতে জুরিরা যেরকম জায়গায় বসে, অনেকটা ওরকম একটা লম্বা কাঠের স্ট্যান্ডের কাছের চেয়ারে এনে কিশোরকে বসিয়ে দেয়া হলো। টাইয়ের সঙ্গে মাইক বেঁধে দেয়া হলো। বোকা বোকা ভঙ্গি করে ভারিপদের দিকে তাকালো সে, ওর চোখ দেখে বোঝার চেষ্টা করলো চমকে গেছে কিনা।
এসেছো,ভারিপদ বললো। দেরি করে ফেললে।
ভারিপদর মুখ দেখে কিছু বোঝা গেল না। একটুও অবাক মনে হলো না তাকে। দ্রুত অন্যদের মুখের ওপর চোখ বোলালো কিশোর। নেলিকেও অবাক লাগলো না। বরং কিশোর যে শেষ পর্যন্ত সময় মতো আসতে পেরেছে, তাতে যেন হাঁপ ছেড়েছে। এমনকি তাকে একটা বন্ধুত্বপূর্ণ হাসিও উপহার দিলো।
শিকারী কুকুরকেও খুশি মনে হলো। খুশি মনে হলো হ্যারিস বেকারকে, যে এই শো- উদ্যোক্তা।
শুধু যে একটিমাত্র লোক তাকে দেখে সন্তুষ্ট হতে পারলো না, চোখাচোখি হতেও চোখ সরিয়ে নিলো আরেক দিকে, তার মাথাভর্তি লম্বা সোনালি চুল নেমে এসেছে করে ওপর।

মড়ার খুলি।
পাগল সংঘের প্রথম কুইজ শো শুরু হলো।
রসিকতা আর কিছু উষ্ণ হাসির মাধ্যমে দর্শকমণ্ডলীকে তাতিয়ে নিয়ে, কুইজের নিয়মকানুন কলতে শুরু করলো বেকার।
এক এক করে প্রশ্নের জবাব দেবে প্রতিযোগীরা। সঠিক জবাব দিতে পারলে পাঁচ নম্বর পাবে, প্রতি প্রশ্নের জন্যে। যদি কেউ কোনো প্রশ্নের জবাব দিতে না পারে, এবং সেটা অন্য কেউ পেরে যায়, তাহলে যে দিতে পারবে সে পাবে পাঁচ। কিন্তু যদি অন্যের প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে সেটা ভুল করে তাহলে নিজের নম্বর থেকে পাঁচ নম্বর কাটা যাবে।
প্রতিযোগীদের দিকে তাকিয়ে হাসলো বেকার। কাজেই, না জেনে অযথা নম্বর নষ্ট করো না, হুঁশিয়ার করলো সে।
ক্যামেরার দিকে তাকালে একবার বেকার, তারপর আবার ফিরলো স্টুডিওতে উপস্থিত দর্শকদের দিকে। কলতে লাগলো, কিছু কিছু কুইজ শোতে নিয়ম থাকে, প্রতিযোগী তার নিজের সাবজেক্ট পছন্দ করে নিতে পারবে। এই যেমন কোনো একটা নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর জবাব দিতে চায়ঃ ইতিহাস, খেলাধুলা, প্রাণীজগৎ কিংবা অন্য কিছু। কিন্তু এই প্রতিযোগিতায় তেমন কিছু থাকবে না, শুধু একটা বিষয়ের ওপর জবাব দিতে হবে, ঝিক করে উঠলো তার দাঁত। আর সেটা হলো, পাগল সংঘ।
উত্তেজিত ওজন শোনা গেল দর্শকদের মাঝে।
বেকার বললো, প্রতিটি প্রোগ্রামের শুরুতে পাগল সংঘ ছবির কিছু কিছু অংশ আমরা দেখাবো। মনিটরে আপনারও দেখতে পাবেন। স্টেজের এক কোণে রাখা দর্শকদের দিকে মুখ করে রাখা বড় একটা সিনেমা-পর্দা দেখালো সে। আর প্রতিযোগীরা দেখতে পাবে মাত্র একবার, এই যে এটাতে, আরেকটা পর্দা দেখালো সে। ওটা মুখ করে আছে পাগলরে দিকে।
মনে মনে বেশ উৎফুল হয়ে উঠেহেকিশোর। এইই ভালো হয়েছে। অন্য কোনো বিষয় পছন্দ করতে কলে, পছন্দ করতে গিয়ে বিপদেই পড়ে যেতে সে। কারণ কোনো বিষয়টা যে সে কম জানে নিজেরই জানা নেই। অসাধারণ স্মৃতিশক্তি তার। পর্দায় পাগল সংঘের ছবি দেখলে সব মনে থাকবে, সে নিশ্চিত, ভুল করবে না। একবার কেউ ভুল করলেই হয়, ভাবলো সে, সাথে সাথে সেটার জবাব দিয়ে নম্বরে এগিয়ে যাবে।
পাশে বসা প্রতিযোগীদের দিকে তাকালো সে। শুধুমড়ার খুলির মুখে হাসি।
তাহলে এবার শুরু করা যাক, বেকার বলছে। দেখি পাগলেরা কি করে।
ইলেকট্রোনিক স্কোরবোর্ডের নিচের ডেস্কের ওপাশে সীটে গিয়ে বসলো সে।

শুরু হলো ছবি। পর্দার ওপর মনযোগ দিলো কিশোর।
গল্প নেই। টুকরো টুকরো অংশ তুলে এনে জোড়া দেয়া হয়েছে। লাফ দিয়ে একখান থেকে আরেকখানে চলে যাচ্ছে।
দেখা গেল, কেক বানানোর জন্যে ময়দা মাখাচ্ছে নেলি, তাতে বারুদ ঢেলে দিলো মাড়ার খুলি আর শিকারী কুকুর। ভারিপদর সাইকেলের চাকা থেকে বাতাস ছেড়ে দিহে শজারুকাঁটা। পাগলদেরই একজন মাঝবয়েসী লোক সেজে তার গাড়ি পাহারা দেয়ার জন্যে এক ডলার দিচ্ছে পাগলদের, গাড়িটাতে ভর্তি রয়েছে চোরাই রেডিও। মোটুরামকে কিডন্যাপ করে নিয়ে গিয়ে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখেছে অন্য পাগলরা, বলছে একবাক্স চকলেট না পেলে ছাড়বে না। কান নাড়াতে নাড়াতে শজারুকাঁটার দিকে ছুটলো মড়ার খুলি। তাকে বাধ্য করলো ঘন হয়ে জন্মে থাকা বিহুটির মাঝখানে মাটি খুঁড়ে গুপ্তধন তুলতে। বিছুটি লেগে শজারুকাঁটার শরীর চুলকানো দেখে অন্য পাগলদের সে-কি হাসি। গাছ থেকে মোটুরামের বাঁধন খুলে তাকে নিয়ে পালালো নেলি...।
দুই মিনিট পরেই শেষ হয়ে গেল ছবি। আবার জ্বলে উঠলো স্টেজ আর অডিয়েন্সের ওপরের আলো। সারাক্ষণ হেসেছে দর্শকেরা, এখন জোর হাততালি দিয়ে ধীরে ধীরে শান্ত হলো। চেয়ারে বসা বেকারের ওপর স্থির হলো ক্যামেরার চোখ।
প্রথম প্রশ্ন করা হলো নেলিকে।
চওড়া হাসি হেসে জিজ্ঞেস করলো বেকার, মোটরবাইকের চাকার বাতাস কে হেড়েছে?
কেউ না, জবাব দিলো নেলি। মোটরবাইক নয়, একটা সাধারণ সাইকেলের চাকা থেকে বাতাস ছেড়েছে শজারুকাঁটা।
হয়েছে। চিৎকার উঠলো দর্শকদের মাঝে।
স্কোরবোর্ডে নেলির নামের পাশে পাঁচ নম্বর লিখলো বেকার।
পরের প্রশ্ন মড়ার খুলিকে। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো সাইকেলের রঙ কি ছিলো।
একমুহূর্ত দ্বিধা করে জবাব দিলো সে, সবুজ।
আবার হাততালি দিলো দর্শকেরা।
এর পর শিকারী কুকুরের পালা। হ্যান্ডেলবারের কোন পাশে থ্রী-স্পীড গীয়ার?
দ্বিধা ভরে জবাব দিলো শিকারী কুকুর, ডান পাশে।
গুঞ্জন করে উঠলো দর্শকেরা। নিরাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো কেউ কেউ।
চোখের পলকে হাত উঠে গেল কিশোরের। ভুল জবাব দিয়েছে বলে শিকারী কুকুরের দিকে চেয়ে দুঃখ প্রকাশ করলো বেকার। আরও দুজনে জবাব দিতে

চেয়েছে, দুজনের দিকে তাকিয়েই হাসলো সে। কিশোরের দিকে ফিরে মাথা নাড়লো, বলো?
থ্রী-স্পীড গীয়ার ছিলো না ওটার, বোকা গলায় জবাব দিলো কিশোর। বোকার অভিনয় চালিয়ে যাচ্ছে।
রাইট।
হৈ হৈ করে উঠলো দর্শকেরা। কিশোরের নামের পাশে পাঁচ নম্বর যোগ হলো।
ভারিপদর পালা এলো।
সহজ প্রশ্ন। বটিসুন্দরীর ময়দায় কি ঢেলে দেয়া হয়েছিলো?
বারুদ।
ঠিক।
পাঁচ নম্বর এবং হালকা হাততালি পেলো ভারিপদ।
কিশোরকে চাঁদ দেখালো বেকার। সব চেয়ে কঠিন প্রশ্নটা করলো, গাছ থেকে মোটুরামকে মুক্ত করতে কটা গিট খুলতে হয়েছে বটিসুন্দরীকে?
কিশোর দেখলো, সে জবাব দেয়ার আগেই হাত উঠে গেহে নেলির। একবার ভাবলো, ভুল জবাব দিয়ে দেয় মেয়েটাকে পাঁচ নম্বর পাইয়ে। নাহ, মড়ার খুলি তাহলে পরের বারে তার চেয়ে এগিয়ে যাবে। চারটে গিগি-গিট, এমনভাবে বললো সে, যেন আন্দাজে ঠিক বলে ফেলেছে।
রাইট, বেকার মাথা ঝাঁকালো।
তুমুল হাততালি দিলো দর্শকরা। প্রথম রাউন্ড শেষ হলো। সবাই পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে, তবু ধীরে ধীরে পড়লো বেকার কে কতো নম্বর পেয়েছে। আসলে ক্যামেরায় বেশিক্ষণ চেহারা দেখাতে ভালো লাগছে তার।
দর্শকদের মাথার ওপর দিয়ে পেছনের কন্ট্রোলরুমের দিকে তাকালো কিশোর, যেখানে রয়েছেন রাফায়েল সাইনাস। মনিটরের পর্দার ওপর চোখ। খুব উত্তেজিত দেখাচ্ছে তাকে।
দর্শকদের পঞ্চম সারিতে বসেছে রবিন আর মুসা। পাশে অ্যালউড হোফার। তার কোলের ওপর রাখা একটা ক্লিপবোর্ড, হাতে কলম, কিছু টুকে নিচ্ছে ক্লিপবোর্ডে আটকানো কাগজে।
কিশোরের দিকে হাত নেড়ে তাকে উৎসাহ দিলো মুসা।
রবিনকে বার বার আড়চোখে ক্লিপবোর্ডের দিকে তাকাতে দেখে হেসে কাগজটা তার দিকে তুলে ধ্বলো হোফার। সে লিখেছেঃ
সাধারণ বাইসাইকেল
সবুজ
থ্রী-স্পীড গীয়ার নয়

বারুদ

চার

প্রতিযোগীরা জবাব দেয়ার আগেই আমি আন্দাজ করার চেষ্টা করেছি কি হবে, লেখার কারণ ব্যাখ্যা করলো হোফার। ভালোই পেরেছি দেখা যাচ্ছে। সবই ঠিক। প্রতিটি লেখার পাশে দেয়া টিক চিহ্নগুলো দেখালো সে।

দ্বিতীয় দফা প্রশ্ন শুরু হলো। নেলি আর মড়ার খুলির জবাব ঠিক হলো। আবারও ভুল করলো শিকারী কুকুর। কিশোরের আগে হাত তুলে ফেললো মড়ার খুলি, ফলে পাঁচটা নম্বর বাড়তি পেয়ে গেল ঠিক জবাব দিয়ে। ভারিপদও ভুল করলো, তবে এবারে আগে হাত তুলে ফেললো কিশোর। সে পেলো বাড়তি পাঁচ নম্বর।

প্রতি রাউন্ড প্রতিযোগিতার এই সময় নিয়ে নম্বর পড়ছে বেকার। পড়ার সময়ও সারাক্ষণ তাকিয়ে থাকছে ক্যামেরার দিকে, হাসছে, রসিকতা কমছে দর্শকদের সঙ্গে তখনও ক্যামেরার দিকে চোখ।

পঞ্চম এবং শেষ রাউন্ডের শুরুতেও মড়ার খুলির চেয়ে পাঁচ নম্বর এগিয়ে রইলো কিশোর। নেলির চেয়ে দশবেশি। শিকারী কুকুর আর ভারিপদ প্রায় বাতিল হয়ে গেছে।

প্রশ্ন শুরু হলো। নেলিকে জিজ্ঞেস করলো বেকার, আগন্তুকের গাড়ির সন্দেহজনক ব্যাপারটা কি?

গাড়ি বোঝাই চোরাই রেডিও।

ঠিক। বটিসুন্দরী আরও পাঁচ নম্বর পেলো।

দর্শকদের হাততালি।

মড়ার খুলিও পাঁচ নম্বর পেলো।

শিকারী কুকুরকে একটা সহজ প্রশ্ন করা হলো এবারে। গাড়ির ওপর চোখ রাখার জন্যে কয় ডলার দেয়া হয়েছিলো?

এক ডলার।

ঠিক আছে।

মৃদু হাততালি।

এবারে এমনকি ভারিপদও সঠিক জবাব দিয়ে ফেললো। আগন্তুক সেজে আসা লোকটার নাম পাগল সংঘে কি ছিলো, জিজ্ঞেস করা হয়েছে তাকে। বলে দিলো, জনাব গণ্ডগোল।

এরপর কিশোরের পালা। প্রথম কুইজ শোর শেষ প্রশ্ন। জনাব গণ্ডগোল সেজেছিলো যে তার নাম কি?

প্রশ্নটা করা উচিত হয়নি বেকারের। কারণ মনিটরে দেখানো ছবির সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই, ছবিতে কোথাও বলা হয়নি অভিনেতার নাম। বহু বহুর আগে

অভিনয় করেহে কিশোর, তখন বয়েসও ছিলো তার খুবই কম, অভিনেতার নাম যদি মনে করতে না পারে তাকে দোষ দেয়া যাবে না, অথচ বেকারের এই ভুলের জন্যে পাঁচটা নম্বর হারাতে হবে তাকে।
জোরে জোরে হাত নাড়ছে নেলি আর মড়ার খুলি।
মাথা চুলকে মনে করার ভান করলো কিশোর। না জানার অভিনয় করে মড়ার খুলিকে বোকা বানাতে চাইছে। একটা মিউজিয়মে ডাকাতির তদন্ত করেছে তিন গোয়েন্দা, তখন পরিচয় হয়ে যায় ওই বয়স্ক অভিনেতার সঙ্গে, যে জনাব গণ্ডগোল সেজেছিলো পাগল সাথে। নামটা পরিষ্কার মনে আছে কিশোরের। কলবে কি বলবেনা ভাবতে ভাবতে বোকার হাসি হেসে বলেই ফেললো, ড্ডি-ড্ডি-ড্ডি-গার হ্যানসন।
রাইট।
উন্মাদ হয়ে গেল যেন দর্শকেরা। তুফুল হাততালি আর হৈ-হট্টগোল।
শো শেষ। মড়ার খুলির চেয়ে পাঁচ নর এগিয়ে রয়েছে কিশোর। সারি দিয়ে বেরিয়ে যেতে লাগলো দর্শকেরা। পরদিন দুপুরে ঠিক দুটোয় আবার এখানে হাজির হওয়ার অনুরোধ জানালো প্রতিযোগীদেরকে বেকার।
নেলির মুখ কালো। বেরিয়ে গেল সে। সেদিকে তাকিয়ে দুঃখই হলো কিশোরের, মেয়েটার জন্যে কিছু করার ইচ্ছে হলো তার। কিন্তু কি করবে? সে হয়েছে তৃতীয়, দ্বিতীয় হলেও নাহয় কিছু করা যেতো। ইচ্ছে করে ভুল করে মড়ার খুলিকে জিতিয়ে দেয়ার কোনো ইচ্ছেই তার নেই। মড়ার খুলিকে হারাতে এখন তাকেই জিততে হবে।
প্রায় শূন্য হয়ে গেল অডিটোরিয়াম। দর্শকরা বেরিয়ে গেছে। দাঁড়িয়ে থাকা দুই সহকারীর দিকে এগোলো কিশোর। স্টেজ পেরোনোর আগেই যেন স্প্রিঙের মতো ঝটকা দিয়ে হুটে এলো একটা হাত। খামছে ধরলো কিশোরের বাহু। কঠিন কণ্ঠে কললো, হুঁশিয়ার থেকো, মোটুরাম। তোমাকে আমি ভালো করেই চিনি। তোমার গোয়েন্দাবাহিনীর খবরও রাখি। বোকার ভান করে আমাকে ফাঁকি দিয়ে বিশ হাজার ডলার ছিনিয়ে নিতে আমি দেবো না তোমাকে কিছুতেই।
ফিরে তাকালে কিশোর। তার বাহুতে আরও শক্ত হলো মড়ার খুলির আঙুল। চিবিয়ে চিবিয়ে বললো, এখনও সময় আছে, কেটে পড়ো। আমার পথে কাঁটা হয়ো না, নইলে,কথাটা শেষ না করেই হঠাৎ হাত ছেড়ে দিয়ে গটমট করে হাঁটতে শুরু করলো সে।
ঘোরানো বারান্দায় কিশোকের জন্যে অপেক্ষা করছে মুসা আর রবিন। হোফার চলে গেছে গাড়ির কাছে।
মড়াটা কি বললো? জানতে চাইলো মুসা।

জবাব দিলো না গোয়েন্দাপ্রধান। রবিনকে কললো, রবিন, তুমি তো হোফারের পাশে বসেছিলে।
হ্যাঁ। তাতে কি?
ক্লিপবোর্ডে কি লিখছিলো?
তেমন কিছুনা। আগেই আন্দাজ করার চেষ্টা করেছে প্রশ্নের জবাব।
জবাবগুলো দেখেছো? ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলো কিশোর। তার কণ্ঠস্বরেই বুঝে ফেললো রনি, কোনো একটা সুর পেয়ে গেছে গোয়েন্দাপ্রধান।
নিশ্চয়ই। সে নিজেই দেখিয়েছে। একটা বাদে সবগুলোর জবাব ঠিক হয়েছে।
কোনটা? আগ্রহে সামনে ঝুঁকে পড়লো কিশোর। ডিগার হ্যানসনের নাম? ওটা ভুল করেছে তো?
না, মাথা নাড়লো রবিন। জনাব গণ্ডগোলের গাড়িটা কেমন, সেটা ভুল করেছে। আর ডিগারহ্যানসনের নাম তো তুমি বলার অনেক আগেই লিখে রেখেছিলো।
রবিনের মুখের দিকে দীর্ঘ একমুহূর্ত তাকিয়ে থেকে মাথা ঝাঁকালো কিশোর। রবিন আর মুসা তাকে জিজ্ঞেস করার চেষ্টা করলো, কিছু বুঝতে পেরেছে কিনা, কিন্তু সুযোগই দিলো না সে। হোফারের লেখার ব্যাপারে কেন আগ্রহী হয়েছে, সে-ব্যাপারে কিছুই বললো না ওদেরকে।
লিস্ট থেকে নেমে লবি পেরিয়ে বাইরে বেরোনোর পর আবার কথা বললো কিশোর। জবাবগুলো ঠিকমতো লিখতে পেরেছে তার কারণ, ছবিগুলো সে দেখেছিলো। বুদ্ধিমান লোক সে। কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছি না, চুপ হয়ে গেল সে।
কী? একইসাথে প্রশ্ন করলো দুই সহকারী।
বলো কিশোর, রকিন শুরু করলো, শেষ করলো মুসা, রহস্যটা কি?
রহস্যটা হলো, অনেক দূর থেকে যেন ভেসে এলো কিশোরের কণ্ঠ, পাগল সংঘের ব্যাপারে একজন সাধারণ শোফারের আগ্রহী হওয়ার কারণ কি?
যাদেরকে সন্দেহ করি, কিশোর কললো। এক নম্বর, একটা আঙুল তুললো সে, ভারিপদ।
হেডকোয়ার্টারে আলোচনায় বসেছে তিন গোয়েন্দা। টেলিভিশন স্টেশন থেকে ফিরে সোজা এসে ঢুকেছে এখানে।
ভারিপদ,আবার বললো কিশোর, তার সম্পর্কে কি কি জানি আমরা?
জবাব পেলো না সে। আশাও করেনি পাবে। আসলে মনে মনে না ভেবে জোরে জোরে ভাবছে। ধরে নিতে পারি কাপগুলো সে চুরি করেছিলো। চুরি অবশ্য অন্যেরাও করে থাকতে পারে। টেবিল ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিলাম আমরা। কিচেন সেটের কাছে অনেক লোক ছিলো, ওয়েইটার, ইলেকট্রিশিয়ান, ক্যামেরাম্যান। যে

কেউই রান্নাঘরের পেছন দিয়ে ঘুরে গিয়ে কাপগুলো সরিয়ে থাকতে পারে। দুই-তিন মিনিটের জন্যে আমাদের কেউ ওখান থেকে সরে থাকলেও কারো নজরে পড়ার কথা ছিলো না।
মড়ার খুলি, সামনে ঝুঁকলো রকিং চেয়ারে বসা মুসা। ওই ব্যাটাকেই আমার সন্দেহ।
হাত তুললো কিশোর, বুঝিয়ে দিলো, রাখো, আগে আমার কথা শেষ করি। ভারিপদকে নিয়ে আলোচনা শেষ করি, তারপর অন্যদের কথা। রাফায়েল সাহ সন্দেহ আরিপদকে। রাতের বেলা ওকে নয় নম্বর স্টেজের কাছে ঘুরঘুর করতে দেখেছেন তিনি। তার ধারণা, চোরাই কাপগুলো বের করে নিতে এসেছিল ভারিপদ। তাঁর দেখে সরে পড়েছে। তাঁর অনুমান ছিলো, আবার গিয়ে ওখানে হানা দেবে সে। হয়তো ঠিকই আন্দাজ করেছেন। আজ সকালে, এগারোটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে মোটর সাইকেলে করে স্টুডিওর দিকে রওনা হয়েছিলো সে। আমি তার পিছু নিয়ে তার আগেই ওখানে পৌঁছুলাম। আমাকে স্টেজের ভেতরে ঢুকতে দেখে বোধহয় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলো ভারিপদ, বাইরে থেকে তালা আটকে দিয়েছিলো…
পরিষ্কার হচ্ছে, মাথা দোলালো রবিন।
হয়তো। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটলো কিশোর। হেঁড়া সূত্রের অনেকগুলো মাথা জোড়া দেয়া বাকি এখনও। কারণ, তার মনে হচ্ছে, যে-ই তাকে স্টেজের ভেতরে আটকেছে, মোটেই আতঙ্কিত হয়ে নয়, অন্য কোনো জোরালো কারণ ছিলো। তাকে কুইজ শো থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্যে হতে পারে। আর কুইজ শোতে জেতার ব্যাপারে ভারিপদর কোনো মাথাব্যথা আছে বলে মনে হয় না। জিততে পারবে একথা নিশ্চয় ভাবেওনি সে।
কাকতালীয় ঘটনা ঘটেছে, এটাও বিশ্বাস করতে পারছে না কিশোর। মোটর সাইকেলে চড়ে ভারিপদর স্টুডিওতে যাবার ব্যাপারটা কাকতালীয় হতে পারে না।
দুই নম্বর সন্দেহ, দুটো আঙুল তুললো কিশোর।
মড়ার খুলি, বলে দিলো মুসা।
হ্যাঁ, মড়ার খুলি। ওই ব্যাটা যথেষ্ট সেয়ানা। লোভী। টাকার জন্যেই এই কুইজ শোর ধারণাটা হারিস বেকারের মাথায় ঢুকিয়েছে কিনা কে জানে? শুধু আলোচনার জন্যেই একশো ডলারের জন্যে কি-রকম চাপাচাপি করছিলো। বাজি জেতার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠছে। আমার অভিনয় বুঝে ফেলেছে সে, আমার সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়েছে।
কি করে জানলে? রকিন জিজ্ঞেস করলো।

শো-এর শেষে আমাকে ধরেছিলো ব্যাটা, অন্যমনস্ক হয়ে গেল কিশোর। কোথায় যেন ছিলাম? ও, হ্যাঁ। সুতরাং মড়ার খুলি যদি আমাকে দেখেই থাকে নয় নম্বর স্টেজের দিকে যেতে, তাহলে কেন একজন বিপজ্জনক প্রতিযোগীকে সরিয়ে রাখার সুযোগটা গ্রহণ করবে না? এবং শেষ মুহূর্তে যখন শো-এর স্টেজে হাজির হয়ে গেলাম, আমাকে দেখে তার চমকে যাওয়াটাও স্বাভাবিক। তাকে দেখে যে অস্বস্তি বোধ করছিলো মড়ার খুলি, সেকথা ভাবলো কিশোর। কিন্তু তখন মুভি স্টুডিওতে কি করছিলো সে ভারিপদর সঙ্গে একই সময়ে?

কোনোভাবে চলে গিয়েছিলো আরকি, রবিন বললো, তাই না?

না, জোরে মাথা নাড়লো কিশোর। কাকতালীয় ঘটনা ঘটেছে বলে মনে হয় না আমার।

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে ভালো সে। তারপর তিনটে আঙুল তুললো, সন্দেহ নম্বর তিন, আলউড হোফার।

উঁহুঁ, এবার মাথা নাড়লো রবিন, আমার তা মনে হয় না। ওই লোকটার চোরের মতো স্বভাব নয়।

হয়তো। মনে মনে রবিনের সঙ্গে একমত হলেও মুখে বললো, তবে দেখে চোরের মতো না লাগলেও চোর হবে না এমন কোনো কথা নেই। আলোচনা প্রশ্ন আগে তাকে দেখেছি আমি। কাপ আর অব্যবহৃত আর্ক লাইটগুলো যেদিকে ছিলো সেদিকে গিয়েছিলো সে। পাগল সংঘের ব্যাপারে খুব বেশি আগ্রহ দেখাচ্ছে সে। কুইজ শো দেখার জন্যে টিকেট চেয়ে নিয়েছে আমার কাছ থেকে। হাতে ক্লিপবোর্ড নিয়ে এসে বসেছে শো দেখতে, প্রশ্নের জবাব লিখেছে প্রতিযোগীরা জবাব দেয়ার আগেই। মনে থাকার কথা নয় এরকম একজন অভিনেতার নাম মনে রেখেছে। পাগল সংঘের ব্যাপারে এতো আগ্রহ, অথচ এটা আবার বুঝতে দিতে চায় না কাউকে। নয় নম্বর স্টেজ যে চেনে, সেটা জানতে দিতে চায়নি, থেমে গেল কিশোর। তাকালো দুই সহকারীর দিকে। আমার বিশ্বাস অনেক কিছুই জানে সে, যা হয়তো আমরা জানি না।

হঠাৎ ঘড়ির দিকে চোখ পড়তে লাফিয়ে উঠলো মুসা, ওরেব্বাবা, চারটে বেজে গেছে!

টেলিভিশনের দিকে তাকিয়ে অস্বস্তি ফুটলো কিশোরের চোখে। এখন পাগল সংঘ সিরিজের আরেকটা ছবি দেখানোর কথা। মোটুরামের দিকে তাকিয়ে আবার কষ্ট পাওয়ার পালা কিছুক্ষণ। তবে আগামী দিনের কুইজ শোর ব্যাপারে কিছু সাহায্যও করতে পারে ছবিটা। প্রতিযোগী হিসেবে হব্বি প্রতিটি দৃশ্য খুঁটিয়ে দেখা এখন তার হোমওয়ার্ক বলা চলে।

ও-কে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো কিশোর, রবিন, টিভিটা ছেড়ে দাও।

বিজ্ঞাপন দেখা গেল পর্দায়। সেটা শেষ হতেই মোটুরাম উদয় হলো, অনুরোধ করলো সে, নিয়ে তলো, প্রীত, নিয়ে তলো আমাকে!
অন্য পাগলরা সবাই মাথা নাড়লো। আইসক্রীম কিনতে শহরে যাচ্ছে ওরা। একটা বাচ্চাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে ওদের নেই।
কিন্তু ওকে এখানে একা ফেলে যাই কি করে, নেলি বললো। বেচারা।
বেশ, তাহলে থাকো তুমি ওর সাথে,মড়ার খুলি বললো।
কিন্তু নেলি থাকতে চায় না। অবশেষে ঠিক হলো ওদের জন্যে অনেক আইসক্রীম নিয়ে আসা হবে।
আত্থা,মোটুরাম বললো, এনো তাহলে। অনেক, অনেক বেতি আইতক্রীম।
মড়ার খুলি আর শজারুকাঁটা রওনা হলো। পথে শজারুকে ফাঁকি দিয়ে আরেক দিকে চলে গেল মড়ার খুলি। কি আর করে বেচারা শজারু, মনের দুঃখে ফিরে এলো আবার।
এই ছবিটাতেই রয়েছে জনাব গণ্ডগোল আর তার গাড়িভর্তি চোরাই রেডিও। গাড়ি পাহারা দিতে রেখে গিয়েছিলো কয়েক পাগলকে। আর বিনিময়ে দিয়েছিলো একটা ডলার। সেই টাকা দিয়েই আইসক্রীম কিনে খাওয়ার কথা। পুরনো পিয়ার্সঅ্যারো কনভার্টিবল গাড়িটা ঘিরে দুষ্টুমি কহে পাহারাদাররা, একে অন্যের পিছে লাগছে, আর জনাব গণ্ডগোল গেছে ফোন করতে, এই সময় এলো পুলিশ। পাহারাদার পাগলদেরকেও থানায় ধরে নিয়ে গেল।
যাই হোক, ফিরে এসে রান্নাঘরে নিজেই আসক্রীম বানাতে কালো শজারুফাটা। তাকে সাহায্য করলো মোটুরাম। তাকে চিনি আনতে বললে আনে নুন, ময়দার কথা বললে আনে সুজি। ভালোই জমিয়েছে।
ওদিকে পুলিশের কাছ থেকে আবার গাড়িটা চুরি করে নিয়ে পালালো জনাব গণ্ডগোল। তাড়া কালো পুলিশ। ওদের গাড়িতে বসে আনন্দে চেঁচাতে লাগলো পাগলেরা।
উঠে গিয়ে টিভি বন্ধ করে দিলো কিশোর।
এতৃহে, এটা কি করলে? প্রতিবাদ জানালো মুসা। জনাব গণ্ডগোলকে ধরতে পারবো কিনা সেটাই দেখতে দিলে না।
ধরতে পারবে না, কিশোর কলো। একই অভিনেতাকে আরেকবার ব্যবহার করতে চেয়েছে পরিচালক। আরেকটা সিরিজে শজারুকাঁটাকে ভাড়া করে জনাব গণ্ডগোল, একটা কুকুর চুরি করার জন্যে। কাজেই কামনা করে তাকে পুলিশের হাত থেকে বাঁচাতেই হয়েছে পরিচালককে।
রিসিভার তুলে একটা নম্বরে ডায়াল করলো সে। হালো, মিস্টার হোফার?... কিশোর পাশা-কাছি। এবার আসতে পারবেনইয়ার্ডে?...হ্যাঁ হ্যাঁ, যতো জলদি

পারে।
আবার কোথায় যাচ্ছি? কিশোর রিসিভার রাখলে জিজ্ঞেস করলো রবিন।
কোথাও না, আনমনে বললো কিশোর। কাপওলো কে চুরি করেছে এটা জানতে হলে একজন বন্ধু দরকার আমাদের, যাতে কেউ সন্দেহ করবে না।
আর কোনো প্রশ্ন ব দিলো না সে। হেডকোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে এলো ওরা।
গেটের কাছে এসে থামলো লিমুজিন। নিলামে পুরনো মাল কিনতে গেছেন মেচিচী আর রাশেদ চাচা। হোফারকে ঘরে ডেকে নিয়ে এলো কিশোর।
খোলামেলা সুর রান্নাঘরটায় কালো ওর। চুলায় কফির পানি চাপলো কিশোর। হোফারের জনে। তিন গোয়েন্দর জন্যে বের করলো সোডার বোতল।
কুইজ শো দিয়ে আলোচনা শুরু করলো কিশোর। গাড়িটা কান্ত্র তৈরি সেটা আমাকে বলেনি ওরা, বেঁচেছি। আমি জানি না এর জবাব।
জানেন না? অবাকই মনে হলো যেন হেফারকে। সব প্রশ্নের উত্তরই তো দেখলাম জানা আপনার।
যা, কিশোর কালো। তবে গাড়ির দৃশ্যটায় আমি ছিলাম না। মড়ার খুলি, শিকারী কুকুর আর অন্যেরা ছিলো। আমার মনে হয় গাড়িটা কার তৈরি সেটা মিস্টার সাইনাসকে জিজ্ঞেস করেছিলো মড়ার খুলি, সেজন্যেই বলতে পেরেছে ওটা পিয়ার্সঅ্যারো। কিন্তু ওই গাড়িটা তখন আমি দেখিইনি।
হ্যাঁ, তা ঠিক, শোফার বললো। আপনি ডাকার আগে এই ছবিটাই দেখছিলাম। হাসলো সে। আপনি আর শজারুকাঁটা ঘরে বসে আসক্রীম বানাচ্ছিলেন।
পানি ফুটেছে। কাপে ঢেলে তাতে কফি আর চিনি মিশিয়ে হোফারের দিকে ঠেলে দিলো কিশোর। জিজ্ঞেস করলো, পুরনো এই সিরিজটা বুঝি খুব পছন্দ আপনার?
শ্রাগ করলে হোফর। ঠিক পছন্দ করি বলা যাবে না। বেশি ভাড়ামি। তবে মাঝে মাঝে বেশ হাসায়।
ঠিকই বলেছেন, ভাড়ামি বেশি। তবে পরিচালওে উদ্দেশ্য ছিলো সেটাই, তাই না? আমাদেরকে বেশি বেশি পাগলামি করতে বলেছেন, ছবির নামের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্যে। মড়ার খুলিকে দিয়ে কান নাড়িয়েছে। কুকুরের মতো জিভ বের করে রাখতে বলেছেন শিকারী কুকুরকে। আমাকে বলেছেন জিভে জড়িয়ে কথা ঝলতে। ভারিপদর পায়ের পাতা এমনিতেই বড়, তার ওপর বড়দের জুতো পরিয়েছেন। শজারুকাঁটার চুল খাড়াই, স্পেশাল কিছু করতে হয়নি তার জন্যে। তবে তাকে সুর করে কথা বলতে বলা হয়েছে মামি বোঝানোর জন্যে।
এক মুহূর্ত থামলো কিশোর। তারপর শজারুকাঁটার স্বর অবিকল নকল করে একটা সংলাপ বললো।

হেসে উঠলো হোফর। দারুণ করতে পারেন তো!
টেবিলে দুই রেখে সামনে ঝুঁকলো কিশোর। এখন এসব শুনলে রাগ লাগে, এত্তে ন্যাকামি। তাই না? অন্তত আমার লাগে।
তা কিছু কিছু যে লাগেনা তা নয়,কফির কাপে শেষ চুমুক দিয়ে কাটা নামিয়ে রাখলো থোফর। চলুন, যওয়া যাক। কোথায় কেন?
আপাতত কোথাও নয়। হাত ঝড়িয়ে দিলে কিশোর। নি, হাত মেলান।
হাঁ করে তাকিয়ে রইলো মুসা আর রবিন। কি কলহে কিশোর? কি সুতে চাইছে?
হাতটা বাড়িয়েই রাখলে কিশোর, যতক্ষণ না হোফার তার সঙ্গে হাত মেলালো। তারপর হাসি হাসি গলায় কালো গোয়েন্দাপ্রধান, তোমর সঙ্গে আবার দেখা হওয়ায় খুব খুশি হলাম, শজারু। তুমি করে বললাম, আশা করি কিন্তু মনে করোনি। আগেও তো তুমি করেই বলতাম।
চিনেই ফেললে তাহলে, হেফার কললো। অন্য পাগলদের চেয়ে আমাকে নাকিই বলতে পারো, অন্তত মড়ার খুলির চেয়ে তো বটেই। আমার মা নাম সিনেমায় কক্ষণো ব্যবহার করিনি। তাছাড়া কথা বলতাম সুর করে। অভিনয় ছেড়ে দেয়ার পর চুল লম্বা করে ফেললাম, ফলে কাটার মতো আর দাঁড়িয়ে থাকলো না, অনেক নুয়ে পড়লো। আমার আসল গা এনে শজাগল বলে বুঝতে পারলো না কেউ। চিনতে পারলো না। কাজেই ইস্কুলে কোনো অসুবিধে হয়নি আমার।
তাকে আরেক কাপ কফি ঢেলে দিলো কিশোর। রবিন আর মুসা অধীর হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলে, হেফারের গল্প শোনার জন্যে।
অভিনয় করে যা আয় করেছিলাম, সব জমিয়ে রেখেছিলো আমার বাবা,ফোর বললো আবার। পড়ার খরচের অভাব হলো না। মাথাটাও মোটামুটি ভালো। ষোলো বছর বয়েসে ইস্কুল শেষ করে ভর্তি হলাম টীচার্স কলেজে। পাস করে এখন মন্টারি করছি।
টেবিলের ওপর দিয়ে ওপাশে বসা কিশোরের দিকে তাকালো সে। কাজটা আমার ভালো লাগে। ছাত্র সামলানো খুব কঠিন, তবে ওরা আমাকে বেশি বিরক্ত করে না। মানিয়ে ফেলেছি। ফলে অসুবিধে হচ্ছেনা।
তিক্ত হাসি হাসলো সে। যখন আবার পাগল সংঘ দেখাতে শুরু হলো, ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। যদি আমার ছাত্ররা জেনে যায় আমি শজারুকাঁটা, আমার জীবন অতিষ্ঠ কর দেবে তাহলে। বালি ভেঙাবে। মুখ ভেচে বে হয়রে কপাল, ঘরে এতে কাজ একা আমি কি করে সারবো! শজারুকাঁটার মতো সুর করে সংলাপ বললো সে। কিছুক্ষণ আগে এটাই বলেছিলো কিশোর। ওর জেনে গেলে ওই ইস্কুলে আর ঢুকতে পারবো না জীবনে।

হোফরের মনের কষ্ট বুঝতে পারছে কিশোর। গরমের ছুটির আগের তিনটে হপ্তা তার ওপর দিয়ে যা গেছে, হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে যন্ত্রণা কাকে বলে।
ভয় পেয়েছি বটে, হোফার বলতে লাগলো, পুরনো দিনের কথা ভেবে আনন্দও পেয়েছি। অবাক হয়ে ভেবেছি অন্য পাগলদের কি হলো? ওরা কি করছে? দুই বছর ধরেই ইস্কুল ছুটির সময় ইজি-রাইড কোম্পানিতে পার্ট টাইম চাকরি করি, ছুটির সময় কিছু বাড়তি আয় হয়। অনেক রকমের লোক গাড়ি ভাড়া নেয়া। এদের মধ্যে স্টুডিওর লোকও আছে। কাজেই মাঝে স্টুডিওতেও নিয়ে যেতে হয় ওদেরকে। যখন শুনলাম পাগলদের আবার একখানে করা হচ্ছে, দেখার লোভ সামলাতে পারলাম না। আরেকজন ড্রাইভারের সঙ্গে ডিউটি বদল করে নিলাম, যাতে স্টুডিওতে ঢুকে পালদের দেখতে পারি।
স্টুডিওতে যখন যাও, কিশোর কললো, জায়গা তো তোমার চেনা। তাহলে নয় নম্বর স্টেজের কথা জিজ্ঞেস করছিলে কেন সেদিন?
অনেক বড় জায়গা, হোফার বললো। মস্ত এলাকা। সব জায়গা সবাই চেনে না। তাছাড়া সেই ছেলেবেলায় গিয়েছি নয় নম্বরে, তা-ও একা নয়, বাবা গাড়িতে করে পৌঁছে দিতো আমাকে। তারপর আর যাইনি। ভুলে গেছিলাম স্টেজটা কোনদিকে।
কফিতে চিনি মিশিয়ে আবার কিশোরের দিকে তাকালো হোফার। ভাবতে পারিনি আমাকে কেউ চিনে ফেলবে। অভিনয় ছাড়ার পর স্টুডিওর কেউ আর খোঁজ করেনি আমার, আমিও নিখোঁজ হয়ে থাকার চেষ্টা করেছি। ফলে বেকার আমাকে খুঁজে বের করতে পারেনি। জানেই না আমি কোথায় আছি, কেমন আছি।
চুমুক দিয়ে কাপটা নামিয়ে রেখে বললো সে, তবে তুমি যে এতোটা চালক হয়ে গে, ভাবতে পারিনি।
চালাক না, সৌজন্য দেখিয়ে বললো কিশোর, আসলে লাকিলি চিনে ফেলেছি তোমাকে। যদিও মনে মনে খুব ভালো করেই জানে সে, বুদ্ধির জোরেই শজারুকাঁটাকে চিনতে পেরেছে। রবিনের দেয়া সূত্র থেকেই বুঝে ফেলেছে, হেফার আর কেউ নয়, শজারুকাঁটা। সেজানে না ওটা কি গাড়ি ছিলো। কিশোরও জানে না। ওরা দুজনই একমাত্র তখন অন্য জায়গায় ছিলো, যখন গাড়িটাকে নিয়ে যায় পুলিশ। হোফার জনাব গণ্ডগোলের আসল নাম জানে, তার কারণ হ্যানসনের সঙ্গে পরিচয়, হয়েছে কুকুর চুরি করার অভিনয়ের সময়। একসাথে কাজ করেছে কয়েক দিন। সব সূত্র খাপে খাপে জোড়া লাগিয়েই নিশ্চিত হয়েছে কিশোর, অ্যালউঙ হোফার শজারুকাঁটা ছাড়া আর কেউ নয়।
আমার কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দেবে? অনুরোধ করলো কিশোর।
বলো।

সেদিন রান্নাঘরে যখন আলোচনার শুটিং হচ্ছিলো, তোমাকে পেছনের আর্কলাইটগুলো কানে যেতে দেখেছি। কেন গিয়েছিলে?
ও, সেটাও দেখে ফেলেছে, হাসলে হোফার। সিনেমার টেকনিক্যাল ব্যাপারগুলো নিয়ে সব সময়ই একটা কৌতূহল আছে আমার। এমনকি যখন শজারুকাঁটার অভিনয় করতাম, তখনও ছিলো। ফলে লাইট আর যন্ত্রপাতিগুলো দেখে আর লোভ সামলাতে পারিনি।
হুঁ, বুঝলাম, হাসছে কিশোর। একবার তো আমি সন্দেহই করে বসেছিলাম, তুমিই কাপগুলো চুরি করে রিফ্লেকটরের বাক্সে লুকিয়েছে।
না, আমি লুকাইনি, হোফার বললো। তা এখন কি করবে আমার পরিচয় সবাইকে বলে দেবে?
মোটেই না,দুই সহকারীর দিকে তাকালো কিশোর। এরাও কিছু বলবে না। কি বলো, মূস?
মাথা খারাপ? আমিও বলবো না, কিন বললো। আপনার পরিচয়…
কিশোর যখন তুমি করে বলছে, বাধা দিয়ে বললো হোফার, তোমরাও তুমি করেই বলতে পারো। আপনি আপনি করে বন্ধুত্ব হয় না।
থ্যাংক ইউ। তোমার পরিচয় কেউ জানবে না, অন্তত আমাদের মুখ থেকে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো হোফরি। যাক, বাঁচালে।
কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কিশোর বললো, তো, হোফার, আমাদের কিছু সাহায্যের প্রয়োজন যে?
নিশ্চয়ই করবো। কি করতে হবে?
চোরাই কাপগুলোর কথা খুলে বললো কিশোর। রাফায়েল সাইনাস যে তিন গোয়েন্দাকে তদন্তের ভার দিয়েছেন সেকথাও জানালো। পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে দেখিয়ে বললো, এই দেখো, আমরা সত্যিই গোয়েন্দা। কাপগুলো খুঁজে পেয়েছি বটে, কিন্তু সব রহস্যের মীমাংসা এখনও করতে পারিনি। না করে ছাড়বোও না।
মাথা ঝাঁকালো হোফার। তা তো বুঝলাম। কিন্তু আমি কিভাবে সাহায্য করবো?
আমাদের এখন দুজনকে বেশি সন্দেহ, জানালো কিশোর। মড়ার খুলি আর ভারিপদ। ধরা যাক, ওরা দুজনে মিলে ওই কাপ সরিয়েছে। একসাথে কাজ করছে। তাহলে অনেক প্রশ্নেরই জবাব মিলে যায়। আমি এখনও জানি না, তবে গল্পটা এভাবে হতে পারেঃ আজ দুপুরের মূভি স্টুডিওতে দুজনের দেখা করার কথা। চোরাই শুনে বক্স থেকে বের করে আনার জন্যে। সাউণ্ড স্টেজে বাইরে ভারিপদর জন্যে অপেক্ষা করছিলো মড়ার খুলি। এই সময় আমাকে ঢুকতে দেখলো সে। সঙ্গে সঙ্গে এটা মত করে ফেলল। কাপগুলোর চেয়ে বাজিতে বিশ

হাজার ডলার জেতা তার জন্যে বেশি জরুরী। আমাকে সরিয়ে রাখতে পারলে একজন প্রতিযোগী কমে গেল। সুতরাং আমাকে আটকে ফেললো স্টেজের ভেতর। তারপর যখন ভারিপদ এলো, তাকে আমার কথা কিছুই বললো না সে, শুধু বললো দরজায় তালা দেয়া। খোলা যাবে না। অন্য সময় এসে কাপড়গুলো নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে। তারপর দুজনে ফিরে গেল টেলিভিশন স্টেশনে, কুইজ শোতে যোগ দিতে।

এজন্যেই তোমাকে সময়মতো অজির হতে দেখেও অবাক হয়নি ভারিপদ, মুসা বললো।

হ্যাঁ, মাথা বাঁকালো রবিন। হবে কি? সে তো কিছু জানেই না। মড়ার খুলি জানে বলেই অবাক হয়েছে।

ঠিক,কলে হোফারের দিকে তাকালে কিশোর। এখানেই তোমার সাহায্য আমাদের দরকার।

গোয়েন্দা কাহিনী পড়তে ভালো লাগে আমার, মনে হয় গোয়েন্দাগিরি করতেও ভালোই লাগবে, হোফার কললো। কিন্তু এখনও বলেনি আমাকে কি করতে হবে।

ওদেরকে অনুসরণ করতে চাই, অবশেষে বললো কিশোর। দেখবো, দেখা করে কিনা। আজ আবার সাউন্ড স্টেজে যায় কিনা।

বেশ উঠে দাঁড়ালো হোফার। কোনখান থেকে ওরু করবো?

এটাই হলো আসল কথা, বসে থেকেই হোফারের দিকে তাকালো কিশোর। তোমার সাহায্যটা ওখান থেকেই শুরু মড়ার খুলি আর ভারিপদ কোথায় থাকে জানি না আমরা। ওদের ঠিকানা না পেলে কোনখান থেকে যে শুরু করবো, তা-ও বলতে পারবে না।

আমিও তো জানি না, মাথা নাড়লো হোফার। দুজনের কেউই আমাদের কোম্পানিতে কখনও গাড়ি ভাড়া নিতে আসেনি, কারণ ওদের নিজেদের বাহন আছে। মড়ার ধূলির আছে একটা ব্রিটিশ ঘাতখোলা স্পোর্টস কার। ভারিপদর আছে মোটর সাইকেল।

স্টুডিওর গেটের গার্ড জানতে পারে। মনে করিয়ে দিলো কিশোর, আমার ঠিকানা তো জানে। প্রথম দিন ঢোকার আগে একটা লিস্ট ছিলো ওর হাতে। নিশ্চয় মড়ার খুলি আর ভারিপদরও আছে। তবে মনে হয় জিজ্ঞেস করলেই দিয়ে দেবে।

দেবে কি? আমাকে আর মুসাকে তো ঢুকতেই দিলো না, রবিন কললো। ভীষণ কড়া।

এক মুহূর্ত ভালো হোফার। চেষ্টা করে দেখতে পারি। গার্ডকে গিয়ে বলবে, আমাকে বলা হয়েছে সমস্ত পাগলকে এখানোতে, একটা বিশেষ মীটিঙের জন্যে। আমাকে চেনে সে।

ক্যাপ তুলে নিয়ে মাথায় দিলে সে। হয়তো কাজ হয়ে যাবে। এসো।
স্টুডিওর গেট থেকে খানিকটা দূরে তিন গোয়েন্দাকে নামিয়ে দিয়ে গাড়ি নিয়ে এগিয়ে গেল হোফার। অহেতুক দাঁড়িয়ে না থেকে হালকা নাস্তা করার জন্যে একটা স্ন্যাকবারে ঢুকলো ওরা। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। একটু পরেই হাসিমুখে ফিরে এলো ফোর। কাজ হয়ে গেছে।
একটা কাগজে সমস্ত পাগলদের ঠিকানা লিখে এনেছে সে, তার মধ্যে কিশোরের ঠিকানাও রয়েছে। হ্যামবার্গার চিবাতে চিবাতে ঠিকানাগুলো দেখলো কিশোর। নেলি থাকে সান্ত মনিকায়। শিকারী কুকুর থাকে বাবার সঙ্গে বেভারলি হিল-এ। মড়ার খুলি আর ভারিপদর অ্যাপার্টমেন্ট হলিউডে।
মড়ার খুলিকে দিয়েই শুরু করা যাক,কিশোর বলো। দাঁড়াও, বলতে বলতে পেট থেকে আরেকটা হ্যামবার্গার তুলে নিলো মুসা, আগে ডান হাতের কাজটা সেরে নিই।
হোফারও একটা স্যাণ্ডউইচ নিলো। খাওয়া শেষ হলে আবার বেরিয়ে পড়লো ওরা।
হলিউড বুলভার থেকে বেশি দূরে না মড়ার খুলির বাসা। বাড়িটার নাম ম্যাগনোলিয়া আর্মস, লা পামা স্ট্রীটে। মোটেলের মতো দেখতে লাগে অ্যাপার্টমেন্ট হাউসটাকে। খোলা চত্বরে, মুখোমুখি দুই সারি কাঠের কেবিন। এর পরে রয়েছে গাড়ি পাকার হাট জায়গা।
রাস্তায়ই গাড়ি রাখলো হোফার। চত্বরে ঢুকে পড়লো তিন গোয়েন্দা। অন্ধকার। কয়েকটা কেবিনের জানালায় আলো দেখা যাচ্ছে।
মড়ার ধূলির বাসার নম্বর ১০। চত্বরের শেষ ধারে পাওয়া গেল কেবিনটা, পর্দা টানা থাকা সত্ত্বেও ভেতর থেকে হালকা আলো আসতে দেখা গেল। বোধহয় বাড়িতেই রয়েছে মড়ার খুলি।
ঘাসে ঢাকা চত্বরের ওপর দিয়ে সেদিকে এগোলো তিনজনে। দশ নম্বরের দরজাটা মুখ করে রয়েছে বিরাট একটা ম্যাগনোলিয়ার ঝাড়ের দিকে। অন্ধকারে ওটার আড়ালে লুকিয়ে পড়ে দরজার দিকে চোখ রাখলো তিন বন্ধু।
দরজার ওপরের অংশ কাঁচে তৈরি। পর্দা না লাগিয়ে খড়খড়ি লাগানো হয়েছে সেখানটায়। খড়খড়ির কয়েকটা পাত বেঁকে গেছে। কাঁচের গায়ে নাক ঠেকিয়ে ওই ফাঁক দিয়ে ভেতরে দেখা সম্ভব।
মুসা, তোমার কাজ, কিশোর বললো। তুমি বেশি লম্বা।
দীর্ঘশ্বাস ফেললো মুসা। বিপজ্জনক কাজ করার জন্যে এরকম নির্দেশ অনেক পেয়েছে গোয়েন্দাপ্রধানের কাছ থেকে, অন্যান্য কেসে। তবে প্রতিবাদ কিংবা তর্ক করলো না। নিঃশব্দে উঠে পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল দরজার দিকে।

ম্যাগনোলিয়ার ঝাড় আর দরজায় মাঝে একচিলতে ঘাসে ঢাকা জমি। কয়েক পা এগিয়েই হুমড়ি খেয়ে ঘাসের ওপর শুয়ে পড়লো মুসা। পারলে ঢুকে যেতে চায় মাটির ভেতরে।
মড়ার খুলির ঘরের দরজা খুলে যাচ্ছে।
ভেতরের আলোর পটভূমিকায় দেখা গেল চামড়ার জ্যাকেট পরা লম্বা শরীরটা।
যে কোনো মুহূর্তে তাকে দেখে ফেলতে পারে, মুসা ভাবলো। মাত্র কয়েক মিটার দূরে শুয়ে আছে সে।
বিকেলে কিভাবে কিশোরের হাত খামচে ধরেছিলো, মনে পড়লো তার। ওদেরকে এখন গোয়েন্দাগিরি করতে দেখলে ভীষণ খেপে যাবে সে। হয়তো বিপজ্জনক হয়ে উঠবে।
পেহনের আলোকিত ঘরের দিকে ফিরে তাকালো মড়ার খুলি। ডাকলো, এই, এসে, লম্বা চুলে চিরুণি চালালো সে। যাবার সময় হয়েছে।
মুঠো শক্ত হয়ে গেছে কিশোরের। একা মড়ার খুলির সঙ্গে লাগতে যাওয়াই বিপজ্জনক, তার ওপর যদি তার সহকারী থেকে থাকে তাহলে তিনজনে মিলেও ওদের সঙ্গে পারবে না।
হোফার সাথে থাকলে ভালো হতো, ভাবলো সে। কিন্তু তাকে দেখাই যাচ্ছে না এখান থেকে। ডাকলেও নেবে না, অনেক দূরে রয়েছে।
নীল জিনস আর ডেনিম শার্ট পরা আরেকজন এসে দাঁড়ালো মড়ার খুরি পাশে। দরজার পাশে হাত বাড়ালো মড়ার খুলি। সুইচ টিপে আলো নিভিয়ে দিলো কেবিনের। বেরিয়ে এসে বন্ধ করে দিলো দরজা। অন্ধকারে হাঁটতে শুরু করলো।
মাথা তুলতেই সাহস করছে না মুসা। ঘাসের ওপর মুখ চেপে অনড় পড়ে রয়েছে। তার মাথার পাশ দিয়ে চলে যাওয়া পাগুলোও দেখতে পেলো না। তবে তার মনে হলো, বুঝি মাথা মাড়িয়েই এগিয়ে গেল।
আলো নেভানোর আগে দুজনের চেহারাই দেখতে পেয়েছে কিশোর। চিনতে পেরেছে মড়ার খুলির সঙ্গীকে।
বটিসুন্দরী, নেলি।
অন্ধকারে আবছা হতে হতে মিলিয়ে গেল মূর্তিদুটো। রাস্তার দিকে চলে গেছে দুজনে।
ঝড়ের কাছে আগের জায়গায় ফিরে এলো মুসা। দম নিতে নিতে কললো সে। আরেকটু হলেই মাথা থেতলে দিয়েছিলো! গটগট করে হেঁটে চলে গেল মাথার কাছ দিয়ে!
মুসার কথা শোনার সময় নেই কিশোরের। উঠে পড়েছে ইতিমধ্যেই। রওনা হয়ে গেল। তার পেছনে চললো রবিন আর মুসা।

কিছুদূর এগোতেই মড়ার খুলি আর নেলিকে দেখা গেল আবার। বিশ মিটার মতো দূরে। দ্রুতপায়ে চলেছে হলিউড বুলভারের দিকে। হোফারের লিমুজিনের নাক ওরা যেদিকে যাচ্ছে তার উল্টোদিকে মুখ করে আছে। ওদেরকে ধরতে হলে গাড়ি ঘোরাতে হবে তাকে, সরু রাস্তায় তাতে অনেক সময় লেগে যাবে। ততোক্ষণে হয়তো হারিয়ে যাবে দুজনে।
দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো কিশোর। মুসাকে বললো, তুমি হোফারকে গিয়ে বলো, গাড়ি ঘুরিয়ে রাখতে। রবিন, জলদি চলো, ওদের চোখের আড়াল করা চলবে না।
গাড়ির দিকে দৌড় দিলো মুসা। কিশোর আর রবিন চললো বুলভারের দিকে।
লা পামায় এই সময়টায় রাস্তায় লোকজন প্রায় নেই। ফিরে তাকালেই দুই কিশোর যে ওদেরকে অনুসরণ করতে দেখে ফেলবে মড়ার খুলি। কাজেই দূরে দূরে রইলো কিশোর।
মিনিটখানেক পরেই পেছনে লিমুজিনের শব্দ শোনা গেল। হলিউড বুলভার আর পনেরো মিটার দূরে। সামনের ট্র্যাফিক লাইটের কাছে গিয়ে থামলো মড়ার খুলি আর নেলি। কিশোররাও থেমে গেল। গাড়ি আসার অপেক্ষা করছে।
পাশে এসে দাঁড়ালো গাড়ি। ওঠার জন্যে পেছনের দরজা খুললো কিশোর।
এই সময় দ্রুত, প্রায় একই সঙ্গে ঘটে গেল কয়েকটা ঘটনার।
হলিউড বুলভার পেরোতে লাগলো মড়ার খুলি আর নেলি।
লাফ দিয়ে গাড়িতে উঠে বসলো রবিন আর কিশোর।
বুলভারের মোড়ের কাছে উদয় হলো একটা হলুদ গাড়ি।
ঝাঁকি দিয়ে আগে বাড়লো লিমুজিন।
জানালা দিয়ে মাথা বের করে দিলো কিশোর, যাতে নজরে রাখতে পারে মড়ার খুলি আর নেলিকে।
কিন্তু রাখবে কি? দেখাই গেল না ওদের।
ছুটতে শুরু করলো হলুদ গাড়িটা।
পিছু নাও ওটার, হোফারকে কললো কিশোর।
পিছে ছুটতে গেল লিমুজিন। কিন্তু ওই মুহূর্তে ট্রাফিক লাইটের সবুজ আলো পাগল সংঘ নিভে লাল আলো জ্বলে উঠলো। সময়মতো ব্রেক কষলো হোফার। বাঁয়ে মোড় নিয়ে চলে যাচ্ছে হলুদ পাড়িটা। পলকের জন্যে কিশোরের চোখে পড়লো দুটো মুখ, মড়ার খুলি আর নেলি।
মাথা থেকে ক্যাপ খুলে নিয়ে নিরাশ ভঙ্গিতে সীটে হেলান দিলে হোফার। সবুজ আলো জ্বলার অপেক্ষা করছে। ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে কললো, বোধহয় হারালাম!

সেটা তোমাদের দোষে নয়, সান্ত্বনা দিলো তাকে কিশোর। ব্যাপারটা বুঝতে পারছে। লা পামা আর হলিউড বুলভারের এই মিলনস্থলে হলুদ গাড়িটাকে আসতে বলে দিয়েছিলো নিশ্চয় মড়ার খুলি। গাড়ি এলো। সবুজ আলো নেভার ঠিক আগের ক্ষণে লাফ দিয়ে তাতে উঠে বসেছে দুজনে।
তবে একেবারে বিফল হইনি, চিন্তিত ভঙ্গিতে বললো কিশোর।
নেলির কথা লহে? রকিন জিজ্ঞেস করলো।
হ্যাঁ, মাথা ঝাঁকালো কিশোর। তবে তার চেয়েও জরুরী ব্যাপার হলো হলুদ গাড়িটা। ওটাকে আগেও দেখেছি। কার গাড়ি, জানি।
জানি? মুসার গলায় সন্দেহ।
কার? রবিনের প্রশ্ন
মুভি স্টুডিওর বিজ্ঞাপন ম্যানেজার, শান্তকণ্ঠে কালো গোয়েন্দাপ্রধান, হ্যারিস বেকার।
পরদিন খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠলো কিশোর। রান্নাঘরে এসে নিজেই ফ্রিজ থেকে খাবার বের করে নিয়ে নাস্তা সেরে চলে এলো তার ওয়ার্কশপে।
দিনটা মেঘলা। জোরে জোরে বাতাস বইছে। কাজ করার আগে একটা তারপুলিন দিয়ে ঘিরে নিতে হলো ওয়ার্কবেঞ্চের চারপাশ। নতুন জিনিসটা দিয়ে আপাতত কোনো কাজ হবে কিনা জানে না, তবু শুরু যখন করেছে শেষ করে ফেলা দরকার, এই ইচ্ছেতেই বসেছে। ক্যামেরাটার নাম দেবে সে গোয়েন্দা ক্যামেরা। সংক্ষেপে গ্যো। কাজ প্রাতে বসলো আরও একটা কারণে, এরকম কাজের সময় তার মাথা খোলে ভালো, চিন্তাশক্তি বাড়ে।
হাত জোড়া দিচ্ছে একের পর এক খুদে যন্ত্রপাতি, আর মগজ জোড়া দিচ্ছে রূপালি-কাপ-চুরি রহস্যের ছেঁড়া সূত্রগুলো।
বেশ কিছু সূত্র জোড়া দেয়া যাচ্ছে না। ভারিপদর কথাই ধরা যাক। টেলিভিশন নেটওয়ার্ক বিল্ডিঙে ঢুকেই কার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলো? নির্দিষ্ট সময়ের দুই ঘন্টা আগে এলো। লিফট করে উঠে গেল, কিন্তু সতেরো তলায় নয়। পাঁচ মিনিট পর নেমে এলে আবার লবিতে।
ওই পাঁচ মিনিট কিকরেছে সে? কারও অফিসে দেখা করেছে?
কার সঙ্গে?
আর হ্যারিস বেকারের ব্যাপারটাই বা কি? রাতের বেলা হলিউড বুলভারের মোড় থেকে নেলি আর মড়ার খুলিকে তুলে নেয়ার তার কি দরকার পড়লো?
দুজনকে হোটেলে ডিনার খাওয়াতে নিয়ে গেল? মনে হয় না। মড়ার খুলির সঙ্গে হ্যারিসের যা সম্পর্ক দেখা গেছে, তাতে খাওয়াতে নিয়ে যাওয়ার কথা নয়। আর

নিলোই যদি, সরাসরি ম্যাগনোলিয়া আর্মস থেকে ওদেরকে তুলে নিলো না কেন ব্যারিস?
হলিউড বুলভারের ঘটনাটা একটা স্পাই হরি কথা মনে করিয়ে দিলো কিশোরের। ঠিক এরকম ঘটনাই ঘটেছিলো ছবিটাতে। দুজন সন্দেহভাজনকে অনুসরণ করে চলেছিলো দুজন শাই, তারপর হঠাৎ করে একটা গাড়ি এসে সামনের দুজনকে তুলে নিয়ে গেল, যেন ছিনিয়ে নিয়ে গেল।
ঘন্টা তিনেকের মধ্যেই ক্যামেরাটা বানিয়ে ফেললো কিশোর। পকেট চিরুনির চেয়ে বেশি মোটা হবে না জিনিসটা। জ্যাকেটের ভাঁজের মধ্যেই জায়গা হয়ে গেল। লোকের চোখে পড়ার মতো ফুলেও থাকলো না। সামান্য একটু ঠেলে চোখটা বোতামের ফুটোর কাছে নিয়ে এলো সে। ঠিক এই সময় জ্বলে উঠলো মাথার ওপরের লাল আলো।
তিরিশ সেকেন্দ্রে মধ্যেই ট্রেলারে ঢুকে রিসিভার তুলে নিলো সে। কিশোর পাশা বলছি।
হালো! যাক, বাড়িতেই আছো, টেলিফোনেও গলার খুশি খুশি ভাবটা বোঝা যায়। মিস্টার বেকার?
ধরে নাও আমি একজন বন্ধু, কললো হাসি হাসি কণ্ঠ। নেলির বন্ধু। সে কোনো দুর্ঘটনায় পড়ুক, এটা চাই না। তুমি চাও?
নিশ্চয়ই না। কিন্তু নেলি দুর্ঘটনায় পড়বে কেন? কোথায় আছে?
সেটা জানার দরকার নেই তোমার, মোটুরাম, হাসি বাড়লো কণ্ঠটার। আপাতত নিরাপদেই আছে। তবে বেশিক্ষণ থাকবে না, সেকথাই বলতে চাইছি তোমাকে। এক মুহূর্ত নীরবতা। যদি তুমি আজ ফাস্ট হও, মোটুরাম, নেলি মারা যাবে। মরবে হাসপাতালে গিয়ে, অনেক কষ্ট পেয়ে।
শুনুন..., কথা শেষ করতে পারলো না কিশোর। লাইন কেটে গেল ওপাশ থেকে।
রিসিভার নামিয়ে রেখে ডেস্কের পাশে এসে বসলো কিশোর। গতদিন পাগলদের বাসার যে লিস্টটা তাকে দিয়েছিলো হোফার, সেটা এখনও পকেটেই রয়েছে। বের করলো। রিসিভার তুলে নিয়ে সান্তা মনিকায় নেলির হোটেলের নম্বরে ফোন করলে।
সাড়া দিয়ে নেলির ঘরে লাইন দিলো ক্লার্ক। মিনিটখানেক পরে জানালো, ঘরে নেই।
হোটেল ছেড়ে চলে যায়নি তো?
না, খাতায়-কলমে চলে যায়নি। কিশোর বলার পর সম্রাটা ঢুকলো ক্লার্কের মাথায়। সারা সকাল ধরে নেলিকে দেখেনি। বাক্সেই রয়েছে তার ঘরের চাবি।

লোকটাকে ধন্যবাদ জানিয়ে রিসিভার রেখে দিলো কিশোর। কয়েক মিনিট চুপচাপ বসে বসে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটলো সে। তারপর আনমনে মাথা নাড়লো কয়েকবার। মৃদুস্বরে নিজেকেই বোঝালো, হারিস বেকার ফোন করেনি।
একটা ব্যাপারে সে নিশ্চিত, বেকার তাকে মোটুরাম বলে ডাকবে না। ওই লোকটা এ-পর্যন্ত এনামে তাকে একবারও ডাকেনি। শুধু কিশোর বলে। তাহলে বেকার যদি না-ই হয়ে থাকে, তাহলে এমন কেউ, যে খুব ভালো অভিনেতা, কণ্ঠস্বর নকলে ওস্তাদ।
কে? মড়ার খুলি? কিন্তু মড়ার খুলি তো পাগলদের মধ্যে সব চেয়ে বাজে অভিনেতা ছিলো। কান নাড়ানো ছাড়া আর কিছুই পারতো না। অনেক সময় সংলাপ ভূলে বসে থাকতো। কথার সঙ্গে মুখ-হাত নাড়ানোরও মিল থাকতো না।
জঞ্জালের ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়ছে ঝড়ো হাওয়া, তীক্ষ্ণ শিস কাটতে কাটতে যেন মাথা কুটে মরছে ট্রেলারের ভেতরে ঢোকার জন্যে।
মড়ার খুলির একটা স্পোর্টসকার আছে, কথাটা মনে পড়তেই একটা বুদ্ধি এলো কিশোরের মাথায়। আবার রিসিভার তুলে হোফারকে ফোন করলো। মুসা আর রবিনকে
ওদের বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যতো তাড়াতাড়ি পারে ইয়ার্ডে চলে আসতে বললো। রিসিভার রেখে দিয়ে আরও কয়েক মিনিট ডেস্কের কাছে বসে রইলো সে। প্ল্যান করছে মনে মনে। গোয়েন্দা ক্যামেরাটা এতো তাড়াতাড়িই কাজে লেগে যাবে ভাবেনি।
ট্রেলারের ভেতরেই একটা ছোট ডার্করুম আছে। সেখানে এসে ঢুকলো কিশোর। সাধারণ ক্যামেরার গোল ফিল্ম ভরা যাবে না তার ক্যামেরাটাতে। কারণ জিনিসটা চ্যাপ্টা। কাজেই ফিল্ম থেকে কেটে মাত্র একটা ছবি তোলা যায় এরকম একটা টুকরো ভরা যাবে। একবার তোলার পর আবার তুলতে হলে আবার ফি কেটে অতে হবে।
তবে তার অনুমান যদি ঠিক হয়, আর টাইমিং ঠিক থাকে, তাহলে একবারই যথেষ্ট।
ফিল্ম ভরে ক্যামেরাটা আবার জ্যাকেটের ভঁজে ভরলো কিশোর। বোতামের ফুটো দিয়ে বের করে দিলো ক্যারোর চোখ। ভালো করে না তাকালে চোখে পড়ে না। আর তাকালেও ছোট গোল লেসটাকে দেখে আরেকটা বোতাম বলেই ভুল হবে। শুধু জ্যাকেটের অন্যান্য বোতামের সঙ্গে এটার রঙ মেলে না, এই যা।
গেটে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না তাকে। পৌঁছে গেছে রবিন আর মুসা।
ব্যাপার কি? সে লিমুজিনের পেছনের সীটে উঠে বসার সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করলো রবিন। কিন্তু পেলে?

হ্যাঁ। আর কিছু বললো না, শুধু হোফারকে লা পামা স্ট্রীটে যেতে বললো।
ম্যাগনোলিয়া আর্মরে কাছে এনে গাড়ি রাখলো হোফার।
তুমি যাও, মুসা, কিশোর কললো।
আবার। তা কোথায় যেতে হবে?
হাসলো কিশোর। মরতে নয় অবশ্যই। চট করে কার পার্কে গিয়ে শুধু দেখে এসো মড়ার খুরি স্পোর্টসকারটা আছে কিনা।
তিন মিনিটেই ফিরে এলো মুসা। জানালো, হ্যাঁ, আছে, লাল রঙের। ছোট।
সীটে বসেই একপাশে কাত হলো কিশোর। হাত তোলা, না নামানো?
নামানো। ক্যানভাসের হাত।
শুড, মাথা ঝাঁকালো কিশোর। দোয়া করি যেন নামানোই থাকে।
ঘড়ি দেখলো সে। সাড়ে বারোটা বাজেনি এখনও। কতোক্ষণ বসে থাকতে হয় কে জানে। কখন বেরোবে মড়ার খুলি, টেলিভিশন স্টেশনের দিকে রওনা হবে, ঠিক নেই। একেবারে অ্যাপার্টমেন্টে ঢোকার পথের কাছে প্রায় গেট আগলে রয়েছে লিমুজিন। বেরোতে গেলে কালো গাড়িটা মড়ার খুলির চোখে পড়বেই।
দশ মিটার দুরে একটা গলি এসে পড়েছে লা পাম স্ট্রীটে।
ওই মোড়টায় নিয়ে রাখতে পারবে? হোফারকে অনুরোধ করলো কিশোর। পামার দিকে মুখ করে? তাহলে বেরিয়ে যেদিকেই যাক সে, তার পিছু নিতে পারবো আমরা সহজে।
আঁ, ঠিকই বলেছে।
গাড়িটাকে এগিয়ে নিয়ে গেল হোফার, তারপর পিছিয়ে এনে মোড়ের কাছে ঘাপটি মেরে মেরে বসে রইল লা পামার দিকে মুখ করে।
ক্যামেরাটা ঠিকঠাক আছে কিনা, দেখলো আরেকবার কিশোর।
একটা বাজলে পরে দেখা গেল মড়ার খুলি বেরোচ্ছে। বেরিয়ে কার পার্কের দিকে এগোলো। স্টার্ট দিলে হোফার। মড়ার খুলি লাল গাড়িটা লা পামায় বেরিয়ে ডানে মোড় নিয়ে হলিউড বুলভারের দিকে এগোনোর আগেই চলতে কালো লিমুজিন।
বুলভারে পড়ে আবার ডানে ঘুরলো স্পোর্টসকার। তারমানে টিভি স্টেশনেই চলেছে মর খুলি।
পেছনে চলে যাও, কিশোর বললো হোফারকে। তারপর যেই আমি বলবো যাও, অমনি জোরে ছুটে চলে আসবে তার পাশে। ওর যতো কাছাকাছি সম্ভব নিয়ে যাবে আমাকে।
পেছনের সীটে ডানপাশে বসেছে কিশোর। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে জানালার ভেতর দিয়ে, স্পোর্টসকার চালাচ্ছে মড়ার খুলি। লম্বা সোনালি চুল উড়ছে বাতাসে।

সামনে ঝুঁকলো কিশোর। মাত্র একবার সুযোগ পাবে ক্যামেরা ব্যবহারের, আর একবারেই ছবিতে তুলে নিতে হবে। মিস করা চলবে না।
এবার আর লাল আলো বাধা দিলো না লিমুজিনকে। সবুজ আলো দেখে বেরিয়ে এলো দুটো গাড়িই। গতি বাড়াচ্ছে মড়ার খুলি। বাতাসে পেছনে প্রায় কাড়া হয়ে গেছে এফ তার চুল, ঝুলে ঝুলে গিয়ে বাড়ি মারছে কাধে। গাল, গলা, মাথার পেছনটা দেখা যায় এখন।
দেখতে দেখতে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলো কিশোর। কললো, যাও!
লাফ দিয়ে গতি বেড়ে গেল লিমুজিনের। চোখের পলকে চলে এলো স্পোর্টসকারের পাশাপাশি। সীটের পাশে হেলে পড়ে ফিরে তাকালো কিশোর। জানালার কাঁচে চেপে ধরলো জ্যাকেটের ভাঁজে লুকানো ক্যামেরার চোখ।
এখন ফিরে গাড়িটার দিকে মড়ার খুলি তাকালেই কিশোরের আশা শেষ। নষ্ট হয়ে যাবে ওর পরিকল্পনা।
এখনও সামনে তাকিয়ে রয়েছে মড়ার খুলি। ক্যামেরার বোতাম টিপে দিলো কিশোর। এই সময় লিমুজিনের দিকে ফিরলো মড়ার খুলি। ফিরুক। আর অসুবিধে নেই। কাজ যা করার করে ফেলেছে গোক্যা। মড়ার খুলি বুঝতে পারেনি যে তার ছবি তোলা হয়েছে।
হয়েছে, এবার পিছাতে পারো, হোফারকে কললো কিশোর।
লিমুজিনটা যখন পিছাচ্ছে, জ্যাকেটের ভাজ থেকে ক্যামেরাটা বের করে রবিনের হাতে দিলো সে। আমাকে টিভি স্টেশনে নামিয়ে দিয়েই হেডকোয়ার্টারে চলে যাবে তোমরা। ছবিটা ডেভলপ করে বড় করবে। কুইজ শো দেখতে পারবে না তোমরা। কিন্তু রেকর্ডিং শেষ হতে হতে বড় একটা ছবি চাই আমার। ছবিটা নিয়ে স্টেজে চলে আসবে, শো শেষ হওয়ার পর পরই যেন ঢুকতে পারো।
আচ্ছা, ক্যামেরাটা পকেটে ভরে রাখলো রবিন। কিন্তু ব্যাপারটা কি, কিশোর? মড়ায় খুলির ছবি নিলে কেন?
হেসে বললো কিশোর, ঝড়ো দিনে খোলা গাড়িতে তার একটা প্রোফাইল নিলাম। নিশ্চয় কারণটা বুঝতে পেরেছে?
না, স্বীকার করলো রনি, পারিনি।
আমি কিছুই বুঝিনি, মুসা ফললো।
একপাশ থেকে ছবি তুললাম, তার কারণ তার লম্বা সোনালি চুলগুলো দেখতে চাই, বুঝিয়ে দিলো কিশোর। একটা ব্যাপার নিশ্চয় লক্ষ্য করেছে, সব সময় আঁচড়ে ওগুলো সমান করে নামিয়ে রাখে সে। তবে আজকের ঝড়ো বাতাসকে ধন্যবাদ, ওর লুকিয়ে রাখা একটা অঙ্গের ছবি তুলতে পারলাম। এবার নিশ্চয় বুঝেছো?

না, জবাব দিলো রবিন।
কোন্ অঙ্গের কথা বলছো তুমি? মুসা জিজ্ঞেস করলো।
ওর কান, বলে দিলে কিশোর। ওর বিখ্যাত কান, যে দুটো নড়াতে পারে।
দুটো বাজতে আর এক মিনিট বাকি। কিশোর দেখলো, উদ্বিগ্ন হয়ে ঘড়ি দেখছে হারিস বেকার। এই নিয়ে তিনবার এরকম করলো সে।
আর মিনিটখানেক বাদেই শুরু হবে পাগলদের দ্বিতীয় কুইজ শো, অথচ হাজির রয়েছে মাত্র তিনজন। মড়ার খুলি, শিকারী কুকুর আর কিশোর। নেলি আর ভারিপদ আসেনি।
দর্শকমণ্ডলীর দিকে তাকালে কিশোর। শেষের সারিতে বসেছে আজ মুসা। সে-ও বেকারের মতোই উদ্বিগ্ন। কিশোরকে তার দিকে তাকাতে দেখে অবাক হওয়ার ভঙ্গি করে শ্রাগ করলো। জবাবে কিশোরও শ্রাগ করলো। ভারিপদর জন্যে ভাবছে না সে, নেলির জন্যে চিন্তিত।
আরও পেছনে দৃষ্টি দিলো কিশোর। কন্ট্রোল বুদে জায়গামতোই রয়েছেন সাইনাস। পরনে সেই দোমড়ানো ধূসর স্যুট, এলোমেলো সাদা চুল, চোখের নিচে গাঢ় ছায়। অতি ক্লান্ত বিধ্বস্ত একজন মানুষ।
ঘোরানো গলিতে একটা নড়াচড়া চোখে পড়লো কিশোরের। স্টেজের দিকে দ্রুত এগিয়ে আসছে ভারিপদ। নিজের সীটে এসে বসলো।
ঠিক দুটো বাজে, কিন্তু নেলি এখনও অনুপস্থিত।
ভারিপদর দিকে ঝুঁকে নিচু গলায় বললো কিশোর, দেরি করে ফেলেছো।
হ্যাঁ, হাসলো ভারিপদ। পথে খারাপ হয়ে গেল মোটর সাইকেল। টাইয়ের সঙ্গে মাইক বাঁধলো সে। তবে না আসতে পারলেও কিছু হতো না। জেতার সম্ভাবনা একটুও নেই আমার। টাকাও পাবে না।
আবার বেকারের দিকে নজর দিলো কিশোর। ভারিপদ এসে বসার পর কিছুটা উজ্জ্বল হলো তার হাসি। কন্ট্রোল রুমকে তৈরি হওয়ার ইশারা করে দর্শকদের দিকে ফিরলো।
প্রিয় দর্শকমণ্ডলী, বলতে শুরু করলো সে, পকেট থেকে একটা কাগজ বের করলো, আপনাদের জন্যে একটা দুঃসংবাদ আছে। আমাদের প্রতিযোগী নেলির কাছ থেকে একটু আগে একটা চিঠি পেয়েছি। চিঠিটা এসেছে আমার অফিসের ঠিকানায়। আপনাদেরকে পড়েই শোনাচ্ছি। হাতের কাগজটার দিকে তাকিয়ে নাটকীয় ভঙ্গিতে একটা সেকেণ্ড রিতি দিয়ে, তারপর জোরে জোরে পড়তে লাগলো, ডিয়ার মিস্টার বেকার। আপনাদেরকে এভাবে বেকায়দায় ফেলার জন্যে আন্তরিক দুঃখিত। কিন্তু আমার ছবি পত্রিকায় ছাপা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই বিপদ, বহুবছর আগে যে যন্ত্রণায় পড়েছিলাম, রাস্তায় বেরোলেই

আবার রিক্ত করছে লোকে। কুইজ শো জেতার কোনো সম্ভাবনা নেই আর আমারবুঝতে পেরেই ভাবলাম আর ক্যামেরার সামনে যাবে না। সান ফ্রান্সিসকোয় আমার বাড়িতে চলে যাচ্ছি। ওখানে অন্তত শান্তিতে থাকতে পারবো, লোকে বিরক্ত করবে না আমাকে। আপনি, এবং পাগলদের বার প্রতি রইলো আমার শুভেচ্ছা। আবার নাটকীয় ভঙ্গিতে বিরতি দিয়ে বেকার বললো, নিচে সই করেছে, বটিসুন্দরী।

গুঞ্জন উঠলো দর্শকদের মাঝে। বিরক্ত নয়, সহানুভূতি, বটিসুন্দরীর মর্যাতনা উপলব্ধি করতে পারছে ওরা।

নেলি, বেকার বললো ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে, আমাদের এই অনুষ্ঠান যদি এই মুহূর্তে দেখে থাকো তুমি, তাহলে বলছি তোমার এই সিদ্ধান্তের জন্যে আমরা খুব কষ্ট পেলাম। তোমাকে পেয়ে সত্যিই খুশি হয়েছিলাম আমরা। তোমাকে মিস করছি এ মুহূর্তে।

দর্শকরাও বেকারের সঙ্গে সায় দিয়ে গুঞ্জন করে উঠলো। নানারকম কথা বলতে লাগলো ওরা। হাত তুলে ওদেরকে শান্ত হতে অনুরোধ করলো বেকার, দয়া করে চুপ করুন আপনার। আমাদের শো শুরু হতে যাচ্ছে। পাগলদের দ্বিতীয় এবং ফাইন্যাল কুইজ শো।

নিভে গেল আলো। পর্দার দিকে তাকালো কিশোর। দুই মিনিটের টুকরো ছবি দেখানো আর হলো। ওতে পুরোপুরি মনোনিবেশ করতে পারছে না সে, মাথায় ঘুরছে নানারকম চিন্তা। তবে যেটুকু পারলো, তাতেই পুরো দুটি রেকর্ড হয়ে গেল তার অসাধরণ স্মৃতিতে।

জনাব গণ্ডগোলের জন্যে একটা কুকুর চুরি করছে শজারুকাঁটা। ডোরাকাটা একটা স্ট্রর সাহায্যে স্ট্রবেরি মিল্ক শেক খাচ্ছে বটিসুন্দরী। ভুট্টা পোড়া দেয়ার জন্যে বনের ভেতর আগুন জ্বেলেছে মড়ার খুলি আর শিকারী কুকুর। একটা জলাশয়ে ডাইভ দিয়ে পড়ছে ভারিপদ। দাবানল ছড়িয়ে পড়েছে বনে, তার মধ্যে আটকা পড়েছে মোটুরাম। চেককাটা একটা টেবিলক্লথ দিয়ে ভারিদ্র মাথায় ব্যান্ডেজ বেঁধে দিচ্ছে শিকারী কুকুর। আগুনের ভেতর থেকে মোটুরামকে উদ্ধার করে আনছে নেলি।

ছবি দেখছে আর ভাবছে কিশোর, নিশ্চয় ওই চিঠি নেলি লেখেনি। কারণ, কিছুতেই বটিসুন্দরী লিখে সই করবে না সে। কিশোর যেমন মোটুরামকে ঘৃণা করে, তেমনি নেলি ঘৃণা করে বটিসুন্দরীকে। তাছাড়া, সে বাড়িও যায়নি। হোটেলের ঘর হাড়েনি। অথচ সারা সকাল তাকে হোটেলে দেখা যায়নি, ছিলো না।

নিশ্চয় বিপদে পড়েছে নেলি। তাকে আটকে রাখা হয়েছে কোথাও। তারপর তার নাম সই করে দিয়ে একটা জাল চিঠি পাঠানো হয়েছে। যে এসব করেছে, সেই একই লোক হুমকি দিয়ে ফোন করেছে কিশোরকে।
দুই মিনিট পর ছবি শেষ হয়ে গেল। জ্বলে উঠলো আলো।
ইলেকট্রনিক স্কোরবোর্ডের দিকে তাকালো কিশোর। পঁয়তাল্লিশ নম্বর পেয়েছে সে। মড়ার খুলি চল্লিশ। নেলি পঁয়তিরিশ। ভারিপদ আর শিকারী কুকুর আরও অনেক কম।
সুইভেল চেয়ার ঘুরিয়ে প্রতিযোগীদের মুখোমুখি হলো বেকার।
নেলি না থাকায় প্রথম জবাব দেয়ার পালা এলো মড়ার খুলির।
বলতো, বটিসন্দরী, যে স্ট দিয়ে মিল্ক শেক খাচ্ছিলো, ওটার বিশেষত্ব কি?
ডোরাকাটা, সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলো মড়ার খুলি। লাল, সাদা আর নীল।
হাততালি পড়লো। কিশোরের সমান নম্বর হয়ে গেল তার।
শিকারী কুকুরের পালা। কি ধরনের মিল্ক শেক খাচ্ছিলো?
দ্বিধা করলো শিকারী। মড়ার খুলির আগের মুহূর্তে কিশোরের হাত উঠে গেল।
চকলেট? জবাব নয়, যেন বেকারকে প্রশ্ন করলো শিকারী কুকুর।
না না না, চেঁচিয়ে উঠলো দর্শকরা। হলো না।
হলো না, যেন খুবই দুঃখিত হয়েছে এমন ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে কিশোরের দিকে ফিরলে বেকার। বলো?
দ্বিধা করার ভান করলো কিশোর। তার ভালো করেই জানা আছে জবাবটা কি। কিন্তু বললো, আমারও মনে হয় ওটা চকলেট।
আশা করেছিলো দর্শকরা, কিশোর পারবেই, কিন্তু তাদেরকে নিরাশ হতে হলো। খুব আফসোস করলো তারা। পাঁচ নম্বর হারালো সে। এরপর থেকে হারাতেই থাকলো। তার নিজের প্রশ্ন যখন এলো, জিজ্ঞেস করা হলো কি দিয়ে শিকারী কুকুরের মাথায় ব্যান্ডেজ বাধছিলো ভারিপদ, আবরও দ্বিধায় অভিনয় শুরু করলো সে।
টিসু পেপার? বলে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে বেকারের দিকে তাকালো।
জোর গুঞ্জন উঠলো দর্শকদের মাঝে। ওরা বিশ্বাসই করতে পারছে না যেন কিশোর ভুল করবে।
পঞ্চম এবং শেষ রাউণ্ডে দেখা গেল পঁয়ষট্টি নম্বর পেয়ে এগিয়ে রয়েছে মড়ার খুলি। শেষ জবাবটাও ঠিক ঠিক দিলো সে। শিকারী কুকুর আর ভারিপদ ভুল করলো। কিশোরের পালা এলো।
তোমাকে এবার খুব সহজ একটা প্রশ্ন করি, বেকার বললো। জনাব গণ্ডগোলের জন্যে কি চুরি করেছে শজারুকাঁটা?

জবাব দেয়ার আগে স্কোরবোর্ডের দিকে তাকালো কিশোর।
মাথা চুলকালো। নেরি চেয়ে ইতিমধ্যেই পাঁচ নম্বর কম পেয়েছে। আবারও ভুল জবাব দিলো, ইয়ে, একটা বেড়াল।
গুঙিয়ে উঠলো দর্শকরা। প্রশ্ন-পর্ব শেষ হলো।
অনেক সময় নিয়ে ধীরে ধীরে প্রতিযোগীরা কে কতো নম্বর পেয়েছে, পড়তে লাগলো বেকার। মড়ার খুলি পেয়েছে সত্তর। নেলি পঁয়তিরিশে রয়েছে। তার চেয়েও পাঁচ নম্বর কম পেয়েছে কিশোর, অর্থাৎ তিরিশ। কাজেই নেলি দ্বিতীয় শোতে যোগ না দিয়েও দ্বিতীয় হয়ে আছে।
তিনটে ক্যামেরার চোখেই মড়ার খুলির দিকে ঘুরে গেল, যখন সে হাসিমুখে বিশ হাজার ডলারের চেকটা নেয়ার জন্যে হাত বাড়ালো। সেদিকে তাকানোরও প্রয়োজন বোধ করলো না কিশোর। সে উৎকণ্ঠিত হয়ে তাকিয়ে রয়েছে দর্শকদের মাথার ওপর দিয়ে পেছনে, রবিনকে দেখার আশ্রয়।
অবশেষে ঘোরানো গলি দিয়ে রবিনকে ছুটে আস দেখা গেল। দর্শকদের সারির মাঝ দিয়ে প্রায় দৌড়ে এলো স্টেজের দিকে। তার পেছনে এলো মুসা। হাতের বড় ম্যানিলা খামটা কিশোরের হাতে তুলে দিলো রবিন। ফিসফিসিয়ে বললো, খুব পরিষ্কার উঠেছে।
রবিন আর মুসা ফিরে গেল সীটে। খামটা খুললো কিশোর। যা আশা করেছিলো, তার চেয়ে ভালো উঠেছে ছবিটা। মড়ার খুলির একটা চমৎকার হবি, বাতাসে চুল উড়ছে পেছনে।
তার বাঁ কানটা স্পষ্ট।
লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলম্যান, বেকার বলছে হাসি হাসি কণ্ঠে, এখন আমি পাগলদের সবাইকে একটা করে পুরস্কার দিতে চাই।
দর্শকদের গুঞ্জন স্তব্ধ হয়ে গেল। ছবিটা আবার খামে ভরে ক্যামেরার চোখের দিকে তাকাতে তৈরি হলো কিশোর।
অ্যানি, ডাকলো বেকার, পুরস্কারগুলো নিয়ে এসো।
আলোচনার দিন যে মেয়েটা কাপের বাক্স নিয়ে এসেছিলো, সে-ই এলো আরেকটা সোনালি কাগজে মোড়ানো বাক্স হাতে। একটা ভুরু উঠে গেল কিশোরের। এবার আর একা আসেনি মেয়েটা, সঙ্গে রয়েছে ইউনিফর্ম রা একজন গার্ড।
বাক্সটা খুললো বেকার। নাগাড়ে কথা বলে যাচ্ছে। সব শেষে বললো, … পাগলদেরকে একটা করে রূপার কাপ উপহার দেবো আমরা।
নানারকম কথা বলে আর শব্দ করে আনন্দ প্রকাশ করতে লাগলো দর্শকরা, পাগলরা যখন পুরস্কার নিতে এগোলো।

নেলির কাপটা ডাকযোগে তার বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়া হবে, বেকার বললো। নেলি, তুমি যদি এ-অনুষ্ঠান দেখে থাকো, আবার ধন্যবাদ তোমাকে। উপস্থিত পাগলবৃন্দ, দর্শকমণ্ডলী, আর যারা আমাদের এই অনুষ্ঠান দেখেছেন, তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি আমাদের অনুষ্ঠান। গুড বাই।
ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে হাত নাড়লো বেকার। পূর্ণিমার চাঁদের মতো ঝলমল করছে তার হাসি। জোরে জোরে হাততালি দিচ্ছে দর্শকরা। শো শেষ।
থেমে গেল ক্যামেরার নড়াচড়া। নড়তে শুরু করেছে পাগলেরা। স্টেজের একপাশে দাঁড়িয়ে আছে মড়ার খুলি। বেকার, শিকারী কুকুর, ভারিপদ, ক্যামেরাম্যান আর দর্শকদের কেউ কেউ তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে অভিনন্দন জানাচ্ছে।
পেছনে দুই সহকারীকে নিয়ে ওই ভিড় ঠেলে ভেতর ঢুকলো কিশোর। চামড়ার অ্যাকেট পরা সোনালি-চুলোর মুখোমুখি এসে দাঁড়ালো। ছবিটা বের করে দেখিয়ে বললো, এই ছবিটা কি তোমার?
কেন? ছবির দিকে তাকিয়ে অস্বস্তি ফুটলো মড়ার খুলির চোখে। কিন্তু অস্বীকার করতে পারলো না যে ছবিটা তার নয়। আশপাশের সকলে ঝুঁকে এলো ছবিটা দেখার জন্যে। হ্যাঁ, এটা আমারই হবি। কেন?
কারণ এখানে তোমার কান ঢাকা নেই, কিশোর বললো। পাশে দাঁড়ানো বেকারের দিকে তাকালো সে। বয়েস বাড়লে মানুষের চেহারা অনেক বদলে যায়, সন্দেহ নেই। শিকারী কুকুর, ভারিপদ, আমি, আমাদের সবার চেহারাই বদলেছে। পরিচয় না দিলে ছেলেবেলার সেসব ছবি দেখে লোকে এখন আমাদের চিনতে পারবে না। ঠিক?
ঠিক, শিকারী কুকুর বললো।
মাথা ঝাঁকালো বেকার।
কিন্তু কিছু কিছু জিনিস কখনও বদলায় না, বড় হলে আকারে বাড়ে এই যা, বললো কিশোর। তার মধ্যে একটা অঙ্গ হলো মানুষের কান। মড়ার খুলির কান ছিলো অস্বাভাবিক বড়, কানের লতি এতো ঝোলা, মনে হতো জেলি লেগে আছে, ঝাড় লাগলেই খসে পড়বে। কিন্তু ছবিতে যার কান দেখছেন, এইমাত্র যে বিশ হাজার ডলার পুরস্কার জিতলো, এর কান সম্পূর্ণ অন্যরকম। বয়েস বাড়লে কি কানের এরকম পরিবর্তন হয়?
থাবা দিয়ে কিশোরের হাত থেকে ছবিটা কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করলো চামড়ার জ্যাকেট পরা তরুণ। খপ করে তার চেপে ধরে ঠেলে পিছনে সরিয়ে দিলো মুসা।
কি-ক্কি বলতে চাও তুমি? কিশোরের দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচালো মড়ার খুলি।

বলতে চাই, শান্তকণ্ঠে বললো কিশোর, তুমি কোনোদিনই পাগল সংঘে অভিনয় করোনি। এই কুইজ শোতে অংশ নেয়ার কোনো অধিকার তোমার ছিলো না। আর মিস্টার বেকার নিশ্চয় আমার সঙ্গে একমত হবেন, এই পুরস্কার তোমার প্রাপ্য হতে পারে না, কারণ…

ছবিটা তুলে নাটকীয় ভঙ্গিতে নাচালো কিশোর। কারণ, তুমি আর যেই হও, পাগল সংঘের মড়ার খুলি হতেই পারো না।

টেলিভিশন নেটওয়ার্ক বিল্ডিঙের একটা বড় অফিসে জমায়েত হয়েছে অনেকে। নকল মড়ার খুলি, হ্যারিস বেকার, রাফায়েল সাইনাস, তিন গোয়েন্দা, শিকারী কুকুর, ভারিপদ, আর টেলিভিশন কোম্পানির একজন সিকিউরিটি গার্ড।

ডেস্কের ওপাশে বসেছে বেকার। তার সামনে রাখা কিশোরের তোলা ছবিটা। মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসেছে নকল মড়ার খুলি। আরও কতগুলো চেয়ার নিয়ে তার পেছনে গোল হয়ে ঘিরে বসেছে অন্যান্যরা।

ও-কে, পরাজিত ভঙ্গিতে অবশেষে বললো মড়ার খুলি, স্বীকার করছি, আমি আসল মড়ার খুলি নই। আরও স্বীকার করছি আমি একটা গাধা। গর্দভ না হলে মোটুরামকে আমার ছবি তোলার সুযোগ দিই? কিশোরের দিকে তাকালো সে। তোমাকে আগেই বলেছি, তুমি যে বেশি নও সেটা আমি বুঝেছি, যতোই বোকার অভিনয় করো না কেন। তবে যতোটা চাক মনে করে, তার চেয়ে যে অনেক বেশি, এটা বুঝতে পারিনি। চওড়া কাঁধ ঝাঁকিয়ে নিরাশার ভঙ্গি করলো সে। হাত ওল্টালো। চেষ্টা করে দেখলাম, পারিনি। বিশ হাজার ডলার, কম কথা নয়। তবে প্রায় সেরে ফেলেছিলাম।

পকেট থেকে চেকটা বের করে দেখলো মড়ার খুলি। জ্বলে উঠলো একবার চোখের তারা। তারপর দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে মারলো বেকারের দিকে।

কাপটাও ফেরত দাও, হাত বাড়ালেন সাইনাস। কণ্ঠস্বরে আত্মবিশ্বাস ফিরে আসছে আবার।

পকেট থেকে কাপটা বের করে আহাড় দিয়ে রাখলো টেবিলে।

এখন বলো তুমি কে? মোলায়েম গলায় জিজ্ঞেস করলো সিকিউরিটি গার্ড। তোমার আসল নাম কি?

সেটা জেনে কি লাভ? আবার কাঁধ ঝাঁকালো মড়ার খুলি। আমার নাম দিয়ে কার কি এসে যায়? এ-শহরে আরও হাজারটা অভিনেতার মতোই আমিও একজন, অভিনয় জেনেও যারা সুযোগ পায় না। যদিও অভিনয় ভালোই জানি আমি।

মনে মনে তার সাথে একমত না হয়ে পারলো না গোয়েন্দাপ্রধান। আসল মড়ার খুলির চেয়ে এ অনেক ভালো অভিনেতা।

দল পাকানো চেকটা চেপেচুপে সোজা করে পকেটে ভরে রাখলো বেকার। জিজ্ঞেস করলো, কে তোমাকে একাজ করতে বলেছে?
কেউ না। আত্মবিশ্বাস ফিরে এসেছে আবার নকল মড়ার খুলির গলায়। আমাকে কেউ একাজ করতে বলেনি। টেলিভিশনে পাগল সংঘের ছবিগুলো দেখেছি। কাগজে পাগলদের সম্পর্কে পড়েছি। ইস্কুলে কিছুদিন আসল মড়ার খুলির সঙ্গে পড়েছিলাম। একদিন কাউকে কিছু না জানিয়ে হঠাৎ উধাও হয়ে গেল সে, বোধহয় সহপাঠীদের টিটকারির জ্বালায়ই অনেক বছর হলো তার আর কোন খবর নেই। আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, মারা গেছে সে। একেবারে বোকা ছিলো তো। গরুর গাড়ির চাকার নিচে পড়ে মরলেও অবাক হবো না।
ওর চেহারার সঙ্গে কিছু কিছু মিল আছে আমার। কান বাদে। ছবি দেখতে দেখতে একটা মতলব এলো মাথায়। নিজেকে মড়ার খুলি বলে চালিয়ে দর্শকদের কাছ থেকে বাবা আদায় করবো। প্রথমে ভেবেছিলাম পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেবো। তৈরিও করে ফেলেছিলাম, এই সময় খবর শুনলাম নেটওয়ার্ক একটা কুইজ শোর বন্দোবস্ত করেছে। লুফে নিলাম সুযোগটা। কেন নেবো না? বিশ হাজার ডলার কম কথা?
সবাই নীরব। বেকার হাসছে, তবে প্রাণ নেই হাসিটায়, কেমন যেন দ্বিধায় ভরা।
এখন আমাকে নিয়ে কি করতে চান? জিজ্ঞেস করলো নকল মড়ার খুলি।
পুলিশের হাতে তুলে দেবো, সিকিউরিটি কললো। জালিয়াতির অভিযোগে...
হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিলো বেকার। ওই কাজও করতে যেও না। নেটওয়ার্ক কিংবা মুভি স্টুডিও, কারোই সুনাম হবে না এতে। কল্পনা করতে পারো, খবরের কাগজওয়ালারা শুনতে পেলে কি তুমুল কাণ্ড শুরু করে দেবে? সিকিউরিটিকে একটা উজ্জ্বল হাসি উপহার দিলো সে। আসলে আমাদের এখনও কোনো ক্ষতি তো হয়নি। বিশ হাজার ডলারের চেকটা স্যান ফ্রান্সিকোয় নেলির কাছে পাঠিয়ে দেবো। খুশি হবে। আর একে...।
নকল মড়ার খুলির দিকে তাকিয়ে হাসলো সে। পুরো ব্যাপারটাকেই একটা রসিকতা মনে করি না কেন আমরা? সাইনাসের দিকে তাকালো বেকার। রাফায়েল, তুমি কি বলো?
ক্লান্ত চোখ নামিয়ে নিলেন বৃদ্ধ পরিচালক। সাদা, পাতলা চুলে আঙুল চালালেন। তা তো হতেই পারে। আমার আপত্তি নেই।
উঠে দাঁড়ালো কিশোর। তার ইশারায় রবিন আর মুসাও উঠলো।
আমরা কাগজওয়ালাদের কিছু বলবো না, কথা দিলো কিশোর। মীটিং শেষ হয়ে আসছে বঝেই যেন তাড়াতাড়ি, সবার আগে বেরিয়ে যেতে চায়, বাইরের কার

পার্কে যেখানে লিমুজিন নিয়ে অপেক্ষা করছে হোফার। তাহলে, যদি অনুমতি দেন, মিস্টার বেকার, আমরা এখন যাই।
নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, উঠে দাঁড়ালো বিজ্ঞাপন ম্যানেজার। তোমাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ হয়ে থাকলাম, কিশোর পাশা। হাসিটা ঠিকই রয়েছে মুখে, তবে কণ্ঠস্বরে কৃতজ্ঞতার ছিটেফোঁটাও নেই। বুদ্ধিমান ছেলে তুমি, দারুণ গোয়েন্দা। তোমার সাহায্য না পেলে একটা সাংঘাতিক ভুল হয়ে যেতো। ঠকানো হতো নেলিকে।
তাকে ধন্যবাদ দিয়ে দুই সহাকারীকে নিয়ে বেরিয়ে এলো কিশোর। পেছনে দরজাটা বন্ধ করে দেয়ার আগে চট করে ফিরে তাকালো একবার। চেয়ারে হেলান দিয়ে স্তস্তির হাসি হাসছে বেকার, হাসি ছড়িয়ে পড়েছে মড়ার খুলির মুখেও। চোখ নামিয়ে রেখেছেন সাইনাস, কোটে লেগে থাকা ময়লা নখ দিয়ে খুঁটে পরিষ্কারের চেষ্টা করছেন। ভুরু কুঁচকে জানালার দিকে তাকিয়ে রয়েছে সিকিউরিটি ম্যান।
লিফট লোকে বোঝাই। নীরবে নেমে এলো তিন গোয়েন্দা। লবি থেকে বেরোনোর আগে কথা বলার সুযোগ পেলো না রবিন আর মুসা।
ওদেরকে এভাবে ছেড়ে দিলে? রাগ করে বললো মুসা। সে বিশ্বাস করতে পারছে। কোনো কেসে কিশোর কোনো অপরাধীকে ছেড়ে দেয়নি। অথচ আজ তা-ই করে এলো! মুসার ধারণা, হ্যারিস বেকার প্রথম থেকেই জানতো যে মড়ার খুলি নকল। সে জন্যেই লোকটা ধরা পড়ার পরও তাকে ছেড়ে দেয়ার ব্যবস্থা করেছে।
হ্যাঁ, মুসার সঙ্গে সুর মেলালো রবিন, সে-ও রেগেছে, কেন ছাড়লে? আর নেলির ব্যাপারটাই বা কি? তুমিই আমাদেরকে কললে, সে স্যান ফ্রান্সিসকোয় যায়নি। কললে, ও বিপদের মধ্যে রয়েছে।
হ্যাঁ,রবিনের কথার পিঠে বললো মুসা। রেগেছে তো বটেই, অবাকও মনে হচ্ছে এখন তাকে। কি ভাবছো তুমি, কিশোর?
নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে কাটতে ফিরে তাকালো গোয়েন্দাপ্রধান। আমি ভাবছি নেলির কথা। আজ সকালে আমাকে হুমকি দিয়ে ফোনটা পাওয়ার পর থেকেই ভাবছি। ফোন পাওয়ার কথা আগেই দুই সহকারীকে বলেছে সে। ওর জন্যেই সমস্ত প্রশ্নের ভুল জবাব দিয়েছি আমি। যাতে নেলি জিততে পারে। এখনও ডাবছি তার কথাই। রবিনের দিকে তাকালো সে। ও বিপদেই রয়েছে। তাকে বাঁচাতে হবে আমাদের। এসো।
আর একটিও কথা না বলে তাড়াতাড়ি চত্বর পেরিয়ে এলো কিশোর। সঙ্গে সঙ্গে এলো রবিন আর মুসা।
গাড়িতে বসে ম্যাগাজিন পড়ছিলো হোফার। কিশোর পেছনের দরজায় হাত দিতেই ফিরে তাকালো। হাসিমুখে জিজ্ঞেস করলো, কোথায় যেতে হবে?

কোথাও না। গাড়ির পেছনের সীটে উঠে বসলো কিশোর। রবিন আর মুসাও উঠলো। জানালা দিয়ে হ্যারিস বেকারের হলুদ সিত্রো গাড়িটার দিকে তাকালো সে। আরেকটু বোধহয় পিছানো দরকার। তাহলে ওদের চোখে না পড়েও গাড়িটার ওপর চোখ রাখতে পারবো।

নিশ্চয়ই, জবাব দিলো হোফার।

এঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে কার পার্কের পেছন দিকে গাড়ি পিছিয়ে আনলো সে। ওরা এখানে আছে একথা জানা না থাকলে সহজে কারো চোখে পড়বে না লিমুজিনটা এখন, অন্তত হলুদ গাড়িটার কাছ থেকে। অথচ ওরা এখান থেকে স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছে গাড়িটার তিমির মুখের মতো নাক।

হ্যারিস বেকারের পিছু নেবো নাকি? জিজ্ঞেস করলো হোফার।

তাকে নিরাশ করলো না কিশোর, আনমনে মাথা ঝাঁকালো। সীটে হেলান দিয়ে গভীর চিন্তায় ডুবে গেছে। রবিন বুঝতে পারছে, এখন ওভাবেই কিছুক্ষণ নীরব আর রহস্যময় হয়ে থাকতে চায় গোয়েন্দাপ্রধান, চায় না তাকে বিরক্ত করা হোক।

কিন্তু তাকে ওভাবে থাকতে দিলো না রবিন। বললো, এই, চুপ করে আছে কেন? ভেবেছো পার পেয়ে যাবে। তা হতে দিচ্ছি না। অফিসে ওরকম করলে কেন, জলদি বলো।

হ্যাঁ, রবিনের পক্ষ নিলো মুসা, জলদি বলো। কেন করলে?

বেশ। ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়লো কিশোর। এক আঙুল তুললো, এক নম্বর, বেশ জোরেই বললো, যাতে হোফারও শুনতে পায়, নেলিকে শেষ কখন দেখেছি আমরা?

কাল রাতে, হলিউড বুলভারে, জবাব দিলো রনি। ওকে তুলে নিয়েছিলো বেকার। সাথে ছিলো মড়ার খুলি, যোগ করলো কিশোর। তারপর আজ সকালে সে আমাকে ফোন করলো কিশোর। হ্যারিস বেকারের গলা নকল করে আমাকে শাসালো, যদি আমি ফাস্ট হই তাহলে নেলি দুর্ঘটনায় পতিত হবে। এ থেকে কি বোঝা যায়?

সে কোথাও আটকে রেখেছে নেলিকে, বললো রকিন। বন্দি করেছে। তবে সেটা নিশ্চয় তার ম্যাগনোলিয়া আর্মসের বাসায় নয়। এখানে অনেক লোকের বাস। চেঁচামেচি করে বা অন্য কোনোভাবে লোকের দৃষ্টি আর্কষণ করে ফেলবে তাহলে নেলি।

ঠিক, কিশোর বললো।

কিন্তু এখন তো কুইজ শো জিতেছে, মুসা বললো, আর জালিয়াত বলে চিহ্নিত হয়ে গেছে মড়ার খুলি, এখন আর নেলির কি বিপদ? ছেড়ে দেবেনা?।

না। কেন বাড়বে না বুঝিয়ে দিলো গোয়েন্দাপ্রধান, ওই অফিসে যা-ই বলে থাকুক, একা কাজ করছে না মড়ার খুলি। কেউ তাকে ধরে এনেছে ওই রোলে অভিনয় করার জন্যে। তাকে শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়েছে। পাগলদের ব্যাপারে সব মুখস্থ করিয়েছে। যেমন, তাকে বলা হয়েছে, অভিনয়ের সম্মানী হিসেবে শুক্রবারে নগদ টাকা দেয়া হতো আমাদেরকে। বাদামী খামে ভরে, লাল সুতোয় বেঁধে। তাকে বলে না দিলে ওরকম তথ্য হাজার চেষ্টা করেও নকল মড়ার খুলির জানার কথা নয়। তার জানার কথা নয় যে, জনাব গণ্ডগোলের গাড়িটা ছিলো একটা পিয়ার্স-অ্যারে কনভার্টিবল, টোয়েন্টি নাইন মডেলের। এসব কথা নিশ্চয় বলে দেয়া হয়েছে তাকে।

তারমানে তার সহযোগী আছে, বুঝতে পারলো রকিন।

আছে। আর সেই সহযোগীই নেলিকে কিডন্যাপ করতে তাকে সাহায্য করেছে। এখন ওকে কিছুতেই ছাড়বে না ওরা। কারণ নেলি জানে সেই সহযোগী লোকটি কে। জালিয়াতির চেয়ে কিডন্যাপিং অনেক বড় অপরাধ। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়ে যাবে।

হ্যারিস বেকার। মড়ার খুলিকে সে-ই হেড়ে দিয়েছে। শুরু থেকে সব শয়তানী সে-ই করে আসছে।

কিশোর, তাই? মুসা জিজ্ঞেস করলো। বেকারের বাড়িতে আটকে রাখেনি তো নেলিকে?

জবাব দিলো না কিশোর। চোখ তার হলুদ গাড়ির দিকে এগিয়ে যাওয়া লোকটার দিকে। গাড়িতে উঠে বসলো সে। এঞ্জিন স্টার্ট দিলো। তারপর বেরিয়ে যেতে লাগলো পার্ক থেকে।

না, মুসার প্রশ্নের জবাবে বললো কিশোর, হ্যারিস বেকার নয়। সে বিজ্ঞাপনের লোক। কিসে কিসে স্টুডিওর ক্ষতি হবে ভালো করেই জানে। সে স্টুডিও আর নেটওয়ার্ককেই বাঁচাতে চেয়েছে। সে জানতো না যে মড়ার খুলি নকল। এমন এক লোক মড়ার ধূলির ওস্তাদী করেছে, ছব্বি প্রতিটি ইঞ্চি যার জানা। কোথায় কি আছে না আহে মুখস্থ। সেই লোকই নেলিকে কিডন্যাপ করতে সাহায্য করেছে মড়ার খুলিকে। এবং সেই লোকই এখন ওই হলুদ গাড়িটা চালাচ্ছে।

কে? দেখার জন্যে রবিন আর মুসাও সামনে ঝুঁকে পড়লো।

হোফার পিছু নিয়েছে। হলিউড বুলভারের কাছে মোড় নেয়ার সময় ক্ষণিকের জন্যে হলুদ গাড়ির গতি শ্লথ হলো। সেই সুযোগে ওটার একেবারে কাছে চলে গেল মিজিন।

ধীরে সুস্থে বোমাটা ফাটালো গোয়েন্দাপ্রধান, রাফায়েল সাইনাস।

মোড় নিয়ে বেভারলি হিলের গিরিখাতগুলোর দিকে এগিয়ে চললো হলুদ গাড়িটা।
ধীরগতি, সাবধানী ড্রাইভার সাইনাস। বৃদ্ধ পরিচালকের সন্দেহ না জাগিয়েও তাঁর পিছে লেগে থাকতে অসুবিধে হলো না হোফারের।
এঁকেবেঁকে চলে গেছে পথ, ধীরে ধীরে উঠে যাচ্ছে, তারপর একসময় ঢুকে গেল পাহাড়ের মধ্যে। বাড়িঘর এখন অনেক দূরে দূরে। আকারেও বড় এখন ওগুলো। বিরাট বিরাট এলাকা নিয়ে একেকটা বাড়ি, প্রাসাদের মতো, পাথরের দেয়ালে ঘেরা। ওগুলো সিনেমার লোকদের বাড়িঘর। তবে এখনকার নয়, আগের, যখন সিমেনা কোম্পানিগুলো হঠাৎ করে অনেক টাকা কামাতে শুরু করেছিলো। এই পথে যাতায়াতের জন্যে বিশেষ বাসের ব্যবস্থা আছে। বাস বোঝাই হয়ে আসে টুরিস্টরা। ওসব বাড়ির সামনে কিছুক্ষণের জন্যে থামে। আর বলে দেয় ড্রাইভাররা কোনটা কার বাড়ি, কোন পাথরের দেয়ালের আড়ালে আত্মগোপন করে থাকতো সিনেমা-দর্শকদের অতি-পরিচিত কোন প্রিয় মুখটি।
কিশোর জানে, এখন বেশির ভাগ বাড়িই আসল মালিকের হাতছাড়া হয়ে গেছে। এখন এগুলোর মালিক ব্যাংক, তেল কোম্পানি, আর আরব শেখের। সিনেমার লোকেরা সরে চলে গেছে বেভারলি হিলের ভেতরের চ্যাপ্টা অঞ্চল নামে পরিচিত এলাকায়।
গতি কমালো হোফার। মোড় নিয়ে একটা খোলা গেটের ভেতরে ঢুকছে হলুদ গাড়ি। মোড়ের কাছে এসে থেমে গেল সে।
এখন কি করবো? কিশোরের দিকে ফিরে তাকালো হোফার। ঢুকবো?
না, থ্যাংক ইউ। পেছনের দরজা খুলে রাস্তায় নামলো গোয়েন্দাপ্রধান। নিশ্চয় তাঁর বাড়িতে অনেক লোক। গার্ড, চাকর-বাকর, মালি। আমাদেরকে ঢুকতে দেখলে সর্তক হয়ে যাবে। তুমি এখানেই থাকো, আমরা যাই। নেলিকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে জানার চেষ্টা করবো।
ঠিক আছে। ম্যাগাজিন বের করলো হোফার। গুড লাক। সাহায্যের দরকার পড়লে ডেকো।
ওকে আরেকবার ধন্যবাদ জানিয়ে দেয়ালের ধার ঘেঁষে রওনা হলো কিশোর। সাথে চললো রবিন আর মুসা।
গেট খোলাই রয়েছে। বন্ধ করতে এলো না কোনো দারোয়ান। কাউকে চোখেও পড়লো না। সদর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে বেকারের হলুদ গাড়িটা। কেমন যেন অবাস্তব লাগছে ওটা ওখানে। দক্ষিণাঞ্চলের এই পরিত্যক্ত প্রাসাদটায় আধুনিক সিত্রে বেমানান।

নীরব হয়ে আছে সব কিছু। প্রচুর পয়সা খরচ করে তৈরি হয়েছিলো এই প্রাসাদ, কিন্তু এখন মনে হয় এটাকে সংস্কারে পয়সাও আর নেই। এখানে ওখানে প্রাস্টার খসে পড়েছে, মেরামত করতে পারছে না। রঙ চটে গেছে, নুতন রঙ করা হয়নি। সিঁড়ির পাশে ঘাস গজিয়ে উঠেছে, সাফ করা হয়নি। আশপাশে ঝোপঝাড় বেড়ে উঠেছে বেয়াড়াভাবে।

গেটের ডান পাশ থেকে একসারি গাহ চলে গেছে বাড়িটার দিকে। ইশারায় সহকারীদেরকে কাছের গাছটা দেখালো কিশোর। গাছের গোড়ায় ঘাস এতো লম্বা হয়েছে, হমড়ি খেয়ে ওরা বসে পড়লে স্বচ্ছন্দে লুকিয়ে থাকতে পারবে। আড়ালে আড়ালে এগোতেও পারবে।

খাইছে! বিড়বিড় করলো মুসা। এখনও এখানে লোক থাকে? এ-তো ভূতের বাড়ি!

মাথা ঝাঁকালো কিশোর। আগে বাড়িটা কেমন ছিলো কল্পনা করার চেষ্টা করছেঃ ছিমছাম লন, রঙিন বাগান, উজ্জ্বল রঙের বীচ-চেয়ার, নতুন সাদা রঙ করা খিলান আর অসংখ্য স্তম্ভ, ঝকঝকে জানালা কাজ।

কিন্তু কতো আর বয়েস হয়েছে বাড়িটার? চোদ্দ-পনেরো বছর হবে। ক্ষতিটা বেশি করেছে প্রকৃতি। মাঝে মাঝেই কোনোরকম জানার না দিয়ে আচমকা ধেয়ে আসে দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার বনা, লাভার মতো পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নামে গলিত কাদার ঢল। তার ওপর রয়েছে প্রচণ্ড কড়া রোদ, আর গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলের গাছপালা, বাগান আর বাড়িঘরের সাংঘাতিক ক্ষতি করে। যত্ন করতে না পারলে দ্রুত নষ্ট করে একেবারে ধ্বংস্তুপে পরিণত করে ফেলে। পাগল সংঘ যখন পরিচালনা করতেন সাইনাস, তখনও নিশ্চয় এটা ছিলো একটা জমকালো প্রাসাদ। এখন প্রায় শেষ অবস্থা।

আরেকটা ব্যাপারে নিশ্চিত হলো কিশোর, দারোয়ান-বেয়ারা-মালি বহুকাল আগে বিদায় হয়ে গেছে এখান থেকে। সাইনাস নিশ্চয় একেবারে একা থাকেন এখন, আর হয়তো কাল থেকে রয়েছে নেলি।

এসো, সহকারীদের কললো সে। লুকোচুরির আর দরকার নেই। সোজা গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিয়ে সাইনাসকে ডাকবো। কথা বের করে নেবো তার মুখ থেকে।

একমত হলো দুই সহকারী গোয়েন্দা। বৃদ্ধ সাইনাসের কাছ থেকে ভয়ের কিছু নেই।

ইলেকট্রিক কলিং বেল নিই। দরজার পাশে রাখা একটা পিতলের পুরানো আমলের ঘন্টা আর কাঠের হাতুড়ি রাখা। সেটা তুলে নিয়ে ঘন্টায় বাড়ি মারলো কিশোর। সাথে সাথে খুলে গেল দরজা। তাদের দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন সাইনাস।

কিশোর পাশ তিনি বললেন, তোমরা আসবে জানতাম। পুরস্কার নিতে। কাপ-রহস্যের সমাধান করে দিলে দেবো বলেছিলাম যে। এসো, ভেতরে এসো।
ভেতরে ঢুকলো তিন গোয়েন্দা। পেছনে দরজা লাগিয়ে দিলেন সাইনাস। মস্ত একটা হলঘর, আবছা আলো। এতোবড় ঘরটায় আসবাব বলতে কিছু নেই, শুধু দুটো পুরনো ক্যানভাসে চেয়ার আর একটা নড়বড়ে ডেস্ক ছাড়া।
দেয়ালে চোখ পড়লো কিশোরের। ফ্রেমে বাঁধাই অসংখ্য ফটোগ্রাফ, সুদর্শন তরুণ আর সুন্দরী তরুণীদের। সিনেমা আর টেলিভিশনের কয়েকজন অভিনেতাকে চিনতে পারলো সে। তিরিশ-চল্লিশ বছর আগের বড় বড় অভিনেতা তারা।
ছবির দিকে কিশোরকে তাকিয়ে থাকতে দেখলেন সাইনাস। পিঠ সোজা করলেন। মুহূর্তে যেন অন্য মানুষ হয়ে গেলেন তিনি, একজন সফল মানুষ, ওই ছবিগুলোর মতোই। ওরা আমার পুরানো বন্ধু, বললেন তিনি। স্টুডিও আমাকে অপমান করে পাগল সংঘের মতো ছবি তৈরি করতে দেয়ার আগে, ওসব বড় বড় অভিনেতার ছবি পরিচালনা করেছি আমি। বললে বিশ্বাস করবে, এদের অনেকেই অভিনয় শিখেছে আমার কাছে? গলা চড়লো পরিচালকের, গমগম করে উঠলো হল জুড়ে, শিখিয়েছি কি করে কি করতে হয়। নরম কাদার মতো আঁচে ফেলে ওদের গড়েছি আমি। সৃষ্টি করেছি।
কেঁপে উঠলো রবিন। জানালার কাঁচ ভাঙা, সেগুলো দিয়ে বাতাস আসছে বটে, তবে কেঁপে ওঠার মতো শীত নয় ঘরে। তবু কেমন যেন গা ছমছমে একটা পরিবেশ, অনেকটা পুরনো, ভাঙা কবরখানার মতো, যেন অতীতের মানুষের ভূত হয়ে উঠে এসে ঘোরাফেরা করহে চারপাশে।
হ্যাঁ, আসল কথা বলি, সাইনাস বললেন, পুরস্কার। আমার কাছে নগদ টাকা নেই এখন, তবে বিজ্ঞাপন বিভাগ...।
বাধা দিয়ে কিশোর বললো, পুরস্কারের জন্যে আসিনি আমরা। গোয়েন্দাপ্রধানেরও যে অস্বস্তি লাগছে তারই মতো এটা বুঝতে পারলো রবিন কণ্ঠস্বর
নেই। নেলিকে নিয়ে যেতে এসেছি।
নেলি? মানে বটিসুন্দরী? মলিন জ্যাকেটের পকেটে হাত ঢোকালেন সাইনাস। এখানে আছে কে বলে তোমাকে?
কাল রাতে হলিউড বুলভার থেকে তাকে তুলে নিতে দেখেছি আপনাকে, মুসা বললো। মড়ার খুলি আর নেলি আপনার গাড়িতে উঠছে...।
অসম্ভব, হাসার চেষ্টা করলেন পরিচালক। এখন কোনো গাড়িই নেই আমার। রোলস রয়েসটা গ্যারেজে। আর আমার...।

বাইরের গাড়িটা আমার বিশ্বাস, কিশোর বললো, হ্যারিস বেকারের। কিংবা বিজ্ঞাপন বিভাগের। কুইজ শো পরিচালনার সময়টাতে আপনাকে ব্যবহার করতে দিয়েছে। খানিক আগে আপনাকে চালিয়ে আনতে দেখলাম। কাল রাতে নেলি আর মড়ার খুলিকেও তুলে নিতে দেখেছি।
প্রতিবাদ তো করলেনই না, এবার আর হাসারও চেষ্টা করলেন না সাইনাস। ক্লান্ত ভঙ্গিতে হেঁটে গিয়ে বসে পড়লেন একটা ক্যানভাসের চেয়ারে। বেরিয়ে এলো ক্ষোভ, একটা লিমুজিন পর্যন্ত ওরা ভাড়া করে দেয়নি আমাকে। কুইজ শো পরিচালনার জন্যে যতোটা কম টাকা দেয়া সম্ভব, দিয়ে কাজটা করিয়ে নিয়েছে ওরা। প্রায় ভিখিরির মতো হাত পেতে বেকারের কাছ থেকে গাড়িটা চেয়ে নিয়েছি কদিন ব্যবহারের জন্যে। কিংবা বলা যায় হুমকি দিয়ে নিয়েছি। যদি গাড়ি না দেয়, তাহলে কুইজ শো পরিচালনা করবো না বলে। পাগল সংঘের পরিচালককে বাদ দিয়ে... থেমে গেলেন আচমকা। হাঁটুর দিকে চোখ। সুতো-ওঠা প্যান্টের একটা সুতো টানছেন আনমনে। নেলিকে আমি কিডন্যাপ করিনি। তুমি ভুল করছে।
প্লীজ, মিস্টার সাইনাস, নরম গলায় অনুরোধ করলো কিশোর, যদি কিছু জানা থাকে আপনার, বলুন। আমরা জানি, নেলি ওই চিঠি বেকারকে লেখেনি। নিজের ইচ্ছেয় কুইজ শোতে অনুপস্থিত থাকেনি। এখন তাকে না পেলে পুলিশের কাছে যেতেই হবে আমাদের। পুলিশ এসে সারা বাড়ি খুঁজবে।
নেলি এখানে অবশ্যই আছে, মাথা তুললেন পরিচালক। আবার সেই আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠস্বর ফিরে এসেছে। আমার মেহমান হয়ে এখানে আছে সে। ওকে আমি বড় অভিনেত্রী বানাবো। ধনী, বিখ্যাত বানিয়ে ছাড়বে। উঠে দাঁড়িয়ে দেয়ালের হবিগুলোর দিকে হাত তুললেন তিনি। এই মানুষগুলোর মতো, যারা ওদের সবকিছুর জন্যে আমার কাছে ঋণী। সিনেমায় অভিনয় করিয়ে নেলিকে আমি...
চুপ করো বুড়ো ভাম। বেকুব কোথাকার।
দরজার কাছ থেকে ভেসে এলো কঠিন কণ্ঠ। ফিরে তাকালো তিন গোয়েন্দা। সোনালি চুলওয়ালা, চামড়ার জ্যাকেট রা তরুণ ঢুকে পড়েছে ভেতরে।
একদম চুপ! সাইনাসের দিকে তাকিয়ে আবার ধমক দিলো নকল মড়ার খুলি। তোমার সব কথাই শুনেছি। আমাকে এসবে ঢুকিয়েছো তুমি। কাপগুলো চুরি করিয়েছো। আমাকে দিয়ে। বলেছো আধা বখরা দেবে। পুরস্কার যাতে জিততে পারি তার জন্যে সব প্রশ্নের জবাব শিখিয়ে দিয়েছে। এখন আমি কি কচুটা পেয়েছি? কিছু না।
কিশোরের দিকে তাকালো মড়ার খুলি। সব কিছুর মূলে এই বুড়ো। হলিউডের এক থিয়েটারে কাজ করতাম আমি। স্টেজের পেছন দিয়ে ঢুকে আমার সঙ্গে

দেখা করে বহুত ফোলালো, বললো, আমি নাকি খুব ভালো অভিনেতা। আমার অভিনয়ের তুলনা হয় না।
পকেটে হাত ঢোকানো রয়েছে সাইনাসের। বিসন্ন ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন। হ্যাঁ, সত্যিই মিথ্যে কথা বলেছি। কোনোদিনই বড় অভিনেতা হতে পারবেনা তুমি, এমনকি আমার সাহায্য পেলেও না।
তার কথা যেন কানেই ঢুকলো না মড়ার খুলির। কিশোরের দিকে তাকিয়ে বললো, বেকারের অফিসে সব কথা খুলে বলতে পারিনি। অসুবিধে ছিলো। আমি জানি সাইনাস এখানে একটা ঘরে নেলিকে তালা আটকে রেখেছে। কিডন্যাপিঙের সাজা আমার জানা আছে। পুলিশকে হাজার বোঝালেও ওরা বুঝতে চাইবে না, বলবে আমিও এর সঙ্গে জড়িত। আসলেই তো তাই। এই বুড়োর কথায়ই কাল নেলিকে ফোন করে রাতে আমার বাসায় দেখা করতে বলেছি। বলেছি, হ্যারিস বেকার আমাদের দুজনের সঙ্গে কথা কলতে চায়। গোপনে। শুধু আমাদের দুজনের সঙ্গে, আর কারো সাথে না। এবং একথা যেন আমরা কাউকে না জানাই। বেকার আমাদেরকে হলিউড বুলভার থেকে তুলে নেবে।
মাথা ঝাঁকালো কিশোর। তার ধারণার সাথে মিলে যাচ্ছে মড়ার খুলির কথা। কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছে না, এতো কিছু করে বিনিময়ে কি পেতে চেয়েছিলো এই লোকটা?
আসলে নেলিকে সরিয়ে রাখতে চেয়েছিলাম, বলে গেল মড়ার খুলি। যাতে সে আমাকে টেক্কা দিয়ে বাজি জিততে না পারে। এক ঢিলে দুই পাখি মারতে চেয়েছিলাম। নেলির কথা বলে তোমাকেও ঠেকাতে চেয়েছিলাম।
তো এখন কি চান? কিশোর জিজ্ঞেস করলো।
চুক্তি, মড়ার খুলি বললো। তোমার সঙ্গে একটা চুক্তি করতে চাই। নেলির কাছে নিয়ে যাবো তোমাদেরকে। তারপর, হাসলো সে, তারপর আমরা সবাই মিলে তাকে উদ্ধার করবো। আমার পক্ষ হয়ে কথা বলবে তুমি। বলবে, তোমাদেরকে নিয়ে আমিই এসেছি তাকে রে করে নিয়ে যেতে। তোমার কথা বিশ্বাস করবে ও। কারণ পুরস্কারটা ইচ্ছে করেই তাকে জিতিয়ে দিয়েছো তুমি।
দুই সহকারীর দিকে তাকালো কিশোর। এই চুক্তি করার অধিকার তার নেই। সাইনাস আর মড়ার খুলির বিরুদ্ধে যদি কেস করে দেয় নেলি, পুলিশ জানবেই। পুলিশ তাকে জিজ্ঞেস করবে। তখন মিথ্যে কথা বলতে পারবে না সে।
অথচ এখন যত তাড়াতাড়ি পারা যায় নেলিকে মুক্ত করাও দরকার। তারপর পলিশের কাছে যাওয়া সেটা তার ব্যাপার।
মাথা ঝাঁকালো মুসা। আরও এক সেকেন্ড দ্বিধা করে রবিনও সায় দিলো।

বেশ, কিশোর বললো, আমি ওকে বোঝানোর চেষ্টা করবো যে আপনি ওর কোনো ক্ষতি করতে চাননি। বলবো, আপনি এখানে এসেছেন ওকে মুক্ত করতে। এরপর যা করার নেলি করবে, আমি আর কিছু বলতে পারি না। ও কোথায়?
ওপরতলায়। এদিক দিয়ে এসো। একটা বেডরুমে ওকে তালা আটকে রেখেছে বুড়োটা। এক পা এগিয়েই থেমে গেল মড়ার খুলি।
জ্যাকেটের পকেট থেকে সাইনাসের ডান হাত বেরিয়ে এসেছে। সে হাতে উদ্যত একটা ছোট কালো পিস্তল। না, তোমরা যেতে পারবে না। নেলি এখানে আমার সাথে থাকবে।
দুপা ফাঁক করে দাঁড়িয়েছেন তিনি। মাথা উঁচু। রাফায়েল সাইনাসের সেই তখনকার চিত্রটা মনে পড়লো কিশোরের, পাগল সংঘ পরিচালনার সময় যেরকম আস্থার সাথে দাঁড়াতেন তিনি, তাকাতেন।
ওকে দিয়ে আমি একবার অভিনয় করিয়েছিলাম, ভারি গলায় বললেন পরিচালক, আরেকবার করাবো। ওর প্রতিভা আছে। ওকে দিয়ে হবে। হবেই। অনেক, অনেক বড় অভিনেত্রী আমি বানাবো ওকে। ছবি বানিয়ে অসকার জিতবো। আরেকবার বিখ্যাত হবে আমি।
সাইনাস আর তার মাঝের দূরত্বটা আন্দাজ করলে মুসা। ওর একটা বিশেষত্ব, ডাইভ দিয়ে উড়ে গিয়ে পড়া। মাথা নিচু করে এভাবে গিয়ে শত্রুর হাঁটুতে কিংবা পেটে পড়ে দুই বন্ধুকে নিয়ে কতোবার বেঁচে এসেছে। বেরিয়ে এসেছে বিপদ থেকে।
কিন্তু এবার সেটা করতে পারবে বলে মনে হলো না। দূরত্ব অনেক বেশি। আর দৌড়ে গিয়েও সুবিধে করতে পারবে না, সে গিয়ে পৌঁছানোর আগেই বুলেট এসে লাগবে তার গায়ে।
মুসার মনোভাব বুঝতে পেরে হাত তুলে তাকে সতর্ক করলো কিশোর। বললো, মিস্টার সাইনাস, আমি জানি গুলি করা আপনার উদ্দেশ্য নয়। গুলি করতে পারবেন না। আপনি খুনী নন। একজন পরিচালক, অনেক বড় পরিচালক। আপনি...
এতো বিশ্বাস করো না, বাধা দিলো মড়ার খুলি। ও পাগল। যা খুশি করে বসতে পারে তোমার চেয়ে আমি ওকে ভালো চিনি। কুইজ শোর পুরস্কারে ভাগ পেলে কি করতো জানো? পার্টি দিতো। ওর মতো ফতুর হয়ে যাওয়া বেকুব বুড়োগুলো দাওয়াত করে আনতো। ওর মতোই ওরাও কোনোমতে ধুকে ধুকে টিকে আছে। জিপসি অর্কেস্ট্রাদলকে ভাড়া করতো, পত্রিকার রিপোর্টারদের খবর দিতো...
চুপ! ধমকে উঠলেন পরিচালক। বাঁ হাত তুললেন। একেবারে চুপ! এখন একসারিতে দাঁড়াও সবাই। মাথার ওপরে হাত তোলো।

সবার আগে আদেশ মানলো মড়ার খুলি। তার পেছনে লাইন দিয়ে দাঁড়ালো অন্য তিনজন।
এখন, সামরিক বাহিনীর কমান্ডারের মতো আদেশ দিলেন সাইনাস, আমি হাঁটো রুললেই ডানে ফিরে মার্চ করে হেঁটে যাবে সিঁড়ির দিকে। রেডি?
আবার আগে সাড়া দিলো মড়ার খুলি। মাথা ঝাঁকালো সে। তিন গোয়েন্দাও ঝাঁকালো।
লাইট! চিৎকার করে বললেন পরিচালক। ক্যামেরা। অ্যাকশন! মার্চ!
যেদিকে যেতে বলেছেন তিনি, সেটা হলের পেছন দিক। সিঁড়ি দেখতে পাচ্ছে কিশোর, নেমে যাওয়া সিঁড়ি। নিশ্চয় সিঁড়ির নিচে মাটির তলায় ঘর-টর কিছু আছে। ওখানে যদি আটকান ওদেরকে পরিচালক, যা ভুলো মন, হয়তো খাবার দিতেই ভুলে যাবেন। আশেপাশে কোনো বাড়িঘরও নেই যে চিৎকার শুনে প্রতিবেশীরা ছুটে আসবে। বাঁচতে চাইলে এখনি কিছু করতে হবে।
ঠিক তার পেছনেই রয়েহে মুসা। কদম ছোট করে ফেললো কিশোর।
এই, এই কিন্তু করো না, আতঙ্কিত কণ্ঠে অনুরোধ করলো মড়ার খুলি। গুলিটা আমার গায়ে লাগবে।
খিলানের কাছে পৌঁছে সিঁড়িতে পা রাখলো কিশোর।
মার্চ। পেছন থেকে চিৎকার করছেন সাইনাস। মার্চ। মার্চ মার্চ...
হঠাৎ থেমে গেল কণ্ঠ। অস্ফুট একটা ভয়ার্ত শব্দ কানে এলো কিশোরের। একটা থাতব জিনিস খটাং করে পড়লো মেঝেতে। এসব পরিস্থিতির আগেও পড়েছে তিন গোয়েন্দা, কি করতে হয় জানে। চোখের পলকে লাইন ভেঙে এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়লো ওরা।
প্রথমেই কিশোরে চোখে পড়লো পিস্তলটা পড়ে আছে দরজার কয়েক ফুট দূরে। তারপর দেখতে পেলো, যেন শূন্যে উঠে চার হাত-পা ছড়িয়ে সাঁতার কাটছেন সাইনাস। কোমর জড়িয়ে ধরে তাকে ওপরে তুলে ফেলেছে দুটো শক্তিশালী হাত।
এমনভাবে ধরেছে হোফার, যাতে ব্যথা না পান বৃদ্ধ পরিচালক। তাঁকে নিয়ে গিয়ে একটা ক্যানভাসের চেয়ারে বসিয়ে দিলো সে। এখানে চুপ করে বসুন, মিস্টার সাইনাস। কিশোর, পিস্তলটা তুলে নাও। সেফটি ক্যাচ অন করে দিয়ে পকেটে ভরে রাখো।
যা বলা হলো করলো কিশোর। মড়ার খুলির দিকে তাকালো। দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তরুণ অভিনেতা। মুখ সাদা। অল্প অল্প কাঁপছে।
থ্যাঙ্ক ইউ, হোফার, কিশোর বললো।
ওকে চোরের মতো ঢুকতে দেখলাম এখানে, মড়ার খুলিকে দেখিয়ে বললো হোফার। তখনই সন্দেহ হলো। ভাবলাম, কি করে দেখি তো।

ভালো করেছে। বলে মড়ার খুলির দিকে ফিরলো কিশোর। আসুন। নেলিকে কোথায় রেখেছে দেখান।
তখনও সুস্থির হতে পারেনি তরুণ অভিনেতা। তবে কিশোরের কথামতো এগিয়ে চললো দোতলায় ওঠার সিঁড়ির দিকে। সিঁড়ির ওপরে উঠে দেখা গেল লম্বা করিডর, ধুলোয় ঢাকা। ঘরের দরজার বাইরেই চাবিটা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। চাবি দিয়ে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলো কিশোর।
তক্তা দিয়ে বন্ধ করে রাখা একটা জানালার পাশে ক্যানভাসের চেয়ারে বসে আছে নেলি। মুখে রুমাল গোজা। হাত বাঁধা চেয়ারের হাতলের সঙ্গে, পা বাধা পায়ার সঙ্গে।
তাকে ওই অবস্থায় দেখেই অস্ফুট শব্দ করে উঠলো মড়ার খুলি। আমি ভাবতেই পারিনি, সে বললো, এভাবে বেঁধে রাখবে। জানলে...জানলে কখনোই এখানে আনতে দিতাম না।
ওর কথা বিশ্বাস করলো কিশোর। গত কয়েক মিনিটে তার যা আচরণ দেখেছে, তাতে বুঝতে পেরেছে মড়ার খুলি কঠোরতা যা দেখিয়েছে আগে, সব মেকি, অভিনয়। আস্ত একটা ভীতু।
আবার দুর্বল ভঙ্গিতে দেয়ালে হেলান দিয়ে পঁড়িয়েছে মড়ার খুলি। তাকে দিয়ে কিছু হবে না। দ্রুত গিয়ে নেলির বাঁধন খুলে দিলো তিন গোয়েন্দা।
মাথা ঝাড়া দিয়ে যেন মাথার ভেতরটা পরিষ্কার করে নিতে চাইলো নেলি। হাতের বাঁধনের জায়গা ভললো। মুখের ওপর এসে পড়া চুলগুলো হাত দিয়ে ঢেলে সারালো পেছনে। পা টানটান করে, ঝাড়া দিয়ে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করার চেষ্টা করলো।
উঠে দাঁড়াতে বেশ কষ্ট হলো তার। হাসলো। বেশ একটা মজার কাণ্ড হয়ে গেল, না? আমাদের সেই পুরনো পাগল সংঘ ছবির মতো। শুধু একটা ব্যাপার উষ্টো হয়েছে। ওখানে আমি তোমাকে বাঁচাতাম, কিশোর, আর এখানে তুমি আমাকে বাঁচালে।
পুরস্কারের টাকা পেয়ে এতো খুশি হয়েছে নেলি, কিশোর বললো, মিস্টার সাইনাস বা মড়ার খুলি, কারো বিরুদ্ধেই অভিযোগ করেনি।
এখন সে কলেজে যেতে পারবে, রবিন বললো। যা সে চাইছিল। টাকার জন্যে পারছিলো না এতদিন।
সেপ্টেম্বরেই বার্কেলিতে ভর্তি হবে, মুসা জানালো।
প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে মুখ করে থাকা জানালার সারিওয়ালা, ভিকটর সাইমনের মস্ত লিভিং রুমে বসেছে তিন গোয়েন্দা। মিস্টার সাইমনের অনুরোধেই কপিচুরির কেসের গল্প বলতে ওরা এসেছে এখানে। তিনিই ফোন করেছিলেন

হেডকোয়ার্টারে, সাইনাসের মুখে কাপ চুরি যাওয়ার খবর শুনে বেশ আগ্রহী হয়েছিলেন সব কথা জানার জন্যে।
টেবিলের পাশে রাখা একটা লম্বা বীচ-চেয়ারে আরাম করে বসেছেন বিখ্যাত রহস্য-কাহিনী লেখক। তাহলে আবার নিজের জায়গায় ফিরে গেহে নকল মড়ার খুলি? থিয়েটারে অভিনয় করতে?
গেছে, হাত নাড়লো কিশোর, তবে আমার মনে হয় না এবারেও সুবিধে করতে পারবে। বেঁচে থাকার জন্যে এখনও তাকে মোটর মেকানিকের কাজই করতে হবে।
এক মুহূর্ত থেমে বললো গোয়েন্দাপ্রধান, মজার ব্যাপার হলো, মড়ার খুলিকে দেখতে পারতাম না বলে তার ওপর প্রতিশোধ নেয়ার জন্যেই ওই কুইজ শোতে অংশ নিয়েছিলাম। তাকে এতো বেশি ঘৃণা করতাম, চেয়েছিলাম যেভাবেই হোক পরাজিত করবোই। কিন্তু পরে গিয়ে যে মড়ার খুলিকে দেখলাম, তাকে পছন্দই করে ফেললাম। নেলির কোনো ক্ষতি করতে চায়নি সে এ্যাপারে আমি নিশ্চিত। ও শুধু রাফায়েল সাইনাসের কথামতো নেচেছে টাকার লোভে সততটা, তার চেয়ে বেশি বড় অভিনেতা হওয়ার লোভে।
হুঁ, অভিনেতা হওয়ার লোভে কতো লোকে যে কতো কিছু করে বসে, ধীরে মাথা দোলালেন সাইমন। তা রাফায়েল সাইনাস কি করছেন এখন? সেই পুরানো ভাঙা প্রাসাদেই কি ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে অতীতের স্বপ্ন দেখছেন?
না, মুসা বললো। নেলিকে যখন আমরা নামিয়ে নিয়ে আসছিলাম, শুনলাম পাগলের মতো চিৎকার করছেনঃ চুপ, কোনো গোলমাল নয়! লাইট ক্যামেরা। অ্যাকশন! অনেক কষ্টে তাকে গাড়িতে তুলে হাসপাতালে নিয়ে গেছে অ্যালউড হোফার।
সমবেদনা দেখিয়ে মাথা ঝাঁকালেন লেখক। একসময় অনেক বড় পরিচালক ছিলেন তিনি। তাঁর তৈরি অনেক ছবি দেখেছি আমি, ভালো ভালো ছবি। এখনও কি হাসপাতালেই আছেন?
না, কিশোর জানালো, মোশন পিকচার অ্যাসোসিয়েশনের লোকেরা এসে গেছে। অকসর পাওয়া, অক্ষম সিনেমার লোকদের জন্যে একটা কলোনি বানিয়েছে ওরা, সেখানেই জায়গা দিয়েছে তাকে। আর কিছু না পান, পুরনো বন্ধুদের দেখা সাক্ষাৎ ওখানে পানে সাইনাস, কথা বলে মনের ভার কিছুটা হলেও হালকা করতে পরকে।
যা, তা পব্রকেন। তা হ্যারিস বেকার নিশ্চয় একেবারেই নিরপরাধ? সাইনাস আর মড়ার খুলির পরিকল্পনার কিছুই জানতো না?

না। ওই কুইজ শো-র ব্যবস্থা করে প্রমোশনের আশায় ছিলো বেকার। শো শেষ হলে সব জানার পর সেটা ফাঁস করে নিজের পায়ে কুড়াল মারতে চায়নি। তাই মড়ার খুলিকে ছেড়ে দিয়ে গোপন অতে চেয়েছে।
ভারিপদ আর শিকারী কুকুরের কি খবর?
অনেক দিন বেকার থাকার পর ভারিপদ একটা কাজ পেয়ে গেছে। একটা জুতোর কোম্পানি ওই কুইজ শো দেখে তাকে ডেকে নিয়ে গেছে, বিজ্ঞাপনের কাজ করার জন্যে। কাজটা পেয়ে খুব খুশি ডারিপদ। আর শিকারী কুকুর কলেজ শেষ করে আইন পড়বে। অসুবিধেয় পড়া, বেকার অভিনেতা-অভিনেত্রীদের হয়ে আদালতে লড়াই করবে মুভি স্টুডিও আর টেলিভিশ্ন নেটওয়াকের বিরুদ্ধে। হুট করে যেন আর কাউকে বিদায় করে দিতে না পারে ওরা।
ভালো, খুব ভালো, মন্তব্য করলেন লেখক। রান্নাঘরের দিকে তাকালেন একবার। যেখানে হাড়ি-পাতিল নিয়ে খুটুর-খাটুর করছে তাঁর ভিয়েতনামি বাবুর্চি নিসান জাং কিম। তারপর আবার তিনগোয়েন্দার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, আর অলউড হোফার? তার পরিচয় গোপন আছে তো?
নিশ্চয়ই, মুসা বললো। ওর কথা কাউকে বলিনি আমরা। ছুটি শেষ হলে সেপ্টেম্বরে নিরাপদেই ইস্কুলে ফিরে যেতে পারবে।
ইস্কুলের কথায় আবার রান্নাঘরের দিকে তাকালেন সাইমন। কিমও ইস্কুলে যাবে।
ইস্কুলে যাবে? রবিন বললো। কি পড়বে?
রান্না। আপাতত ফরাসী রান্না। কোন্ কোন্ জিনিস খেলে শরীর-স্বাস্থ্য ভালো থাকে, সে-ভূত নেমেছে মাথা থেকে। নানারকম জটিল রান্নার দিকে ঝুঁকেছে আজকাল। এই যেমন, সাগরের শ্যাওলা দিয়ে মুখরোচক খাবার কি করে তৈরি করা যায়। অবশ্য হজম করতে কিছুটা কষ্টই হচ্ছে আমার। সামনে ঝুঁকলেন তিনি।
তোমরা কিন্তু দুপুরে না খেয়ে যেতে পারবে না। বিশেষ করে তুমি, মুসা।
ঝট করে পরস্পরের দিকে তাকালো রবিন আর কিশোর। এর আগের বার যখন এসেছিলো, ওদেরকে গিনিপিগ আর শামুক খাওয়ানোর জন্যে অনেক জোর-জবরদস্তি করেছিলো কিম। কাজেই এখানে দাওয়াত খাওয়ার কথা শুনলেই আতঙ্কিত হয়ে পড়ে দুজনে।
কেন, বিশেষ করে আমাকে কেন? মুসাও অস্বস্তি বোধ করছে।
কারণ, তোমাকে খুব পছন্দ করে কিম, মুচকি হাসলেন লেখক। যা দেয় তা-ই মুখ বুজে খেয়ে ফেলো তো। বলে, রান্না করে যদি কাউকে মন মতো খাওয়াতেই না পারলাম তাহলে শান্তি কোথায়?

কেশে উঠলো মুসা। স্যার, একটা কথা বলি, কিছু মনে করবেন না। কি খাওয়াবে না খাওয়াবে সেটা আপনি বলে দেন না কেন? আপনি পছন্দ করে দিলেই তো সব ল্যাঠা চুকে যায়।
আমি জানতাম এক সময় না একসময় তোমরা একথা কলবে আমাকে। চেয়ারের পাশে রাখা লাঠিটা তুলে নিয়ে তাতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন লেখক, পা এখনও পুরোপুরি ঠিক হয়নি। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটেন। ঝাল মাংসের পুর দেয়া হ্যামবার্গার খাওয়ার জন্যে আমার প্রাণটা কি কম আঁইঢাই করে? পারি না, বুঝলে, একদম পারি না। জোর করে কিছু বলতে গেলেই ধমক দিয়ে চুপ করিয়ে দেয় কিম।
ও-কি, কোথায় যাচ্ছেন? ভয় পেয়ে গেছে মুসা।
বলে আসি, অন্তত প্লেন হ্যামবার্গার যাতে দেয়, তবে বিনিময়ে তার কথা তোমাকে শুনতে হবে, মুসা।
রান্নাঘর থেকে হাসিমুখে ফিরে এলেন সাইমন। হ্যামবার্গার দেবে। আবার বসলেন চেয়ারে। নীরবে ভাবলেন কিছুক্ষণ। তারপর মুখ তুলে বললেন, তোমাদের কেসের গল্প সবটাই শুনলাম। একটা ব্যাপার পরিষ্কার হচ্ছেনা এখনও।
কী? সামনে ঝুঁকলো কিশোর।
সাইনাসকে সন্দেহ করলে কেন?
সন্দেহটা জাগিয়েছে ভারিপদ। প্রথমে করিনি, কিন্তু যতোই ভাবলাম, ততোই ধারণাটা দৃঢ় হতে লাগলো যে কেউ না কেউ তাকে মুভি স্টুডিওতে পাঠিয়েছে। কোনো কাজে। সেটা দুজন লোক হতে পারে। হ্যারিস বেকার, কিংবা রাফায়েল সাইনাস। হ্যারিস বেকারের, পাঠানোর কোনো কারণ নেই, সে বিজ্ঞাপন ম্যানেজার, চিঠি বা অন্য জিনিস আনা-নেয়ার জন্যে অফিসের লোকই আছে তার। বাকি থাকলেন সাইনাস। ভাবলাম, তিনিই বা কি আনতে পাঠাবেন? যতোই ভাবলাম, সন্দেহ ততোই বাড়তে লাগলো। তাছাড়া কিছুকিছু সূত্রও মিলে যেতে লাগলো তার আচরণের সঙ্গে।
হু্ বুঝেছি, মাথা ঝাঁকালেন প্রাক্তন গোয়েন্দা। তোমাকে যেমন আগে ডেকে এনেছে টিভি স্টেশনে, তেমনি ভারিপদকেও এনেছেন। তাকে একটা চিঠি দিয়ে অযথা পাঠিয়েছেন স্টুডিওর অফিসে, আর তোমাকে বলেছেন তাকে সন্দেহ করেন। লিফটে করে উঠে সাইনাসের অফিসেই ঢুকেছিলো ভারিপদ, খাম নিয়ে বেরিয়ে এসে স্টুডিওতে রওনা হলো। তুমি পিছু নিলে।
টেলিফোনের তার-টার ছিঁড়ে আগেই সব ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করে রেখে এসেছিলেন সাইনাস। তুমি গিয়ে নয় নম্বর স্টেজে ঢুকতেই তালা লাগিয়ে দিলো মড়ার খুলি। তাকে ওকাজ করতে নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন পরিচালক। তোমাকে

আটকাতে চেয়েছিলেন, যাতে কুইজ শো-তে অংশ নিয়ে তুমি মড়ার খুলির পুরস্কার জেতায় বাধা হয়ে না দাঁড়াও।
হুঁ, সব বুঝলাম। বড় বেশি খুঁতখুঁতে মন তোমার, কিশোর পাশা, এটা ভাবতেও পারেননি বেচারা পরিচালক। রান্নাঘরের দিক থেকে আসা পায়ের শব্দ শুনে ঝট করে সোজা হলেন সাইমন। ফিসফিসিয়ে বললেন, ওই যে, আসছে।
টেবিলে খাবার দেয়া হয়েছে, খর দিলো কিম।
ভয়ে ভয়ে গিয়ে বসলো সবাই। তবে গন্ধ ভালোই আসছে। একটা প্লেটের ঢাকনা তুলে দেখালো কিম। ইয়া বড় বড় চারটে হ্যামবার্গার। ডেতরে গরুর মাংসের কিমা। আর পেঁয়াজের কুঁচি। লোভনীয় গন্ধ বেরোচ্ছে ওগুলো থেকে।
একটা নিয়ে কামড় বসালো মুসা।
ভালো না? জিজ্ঞেস করলো কিম।
চমৎকার। ফার্স্ট ক্লাস।
গুড। খুব খুশি হলো বাবুর্চি। বললো, এবার আমার একটা উপকার করতে হবে।
নিশ্চয়ই ক… বলেই মাঝপথে কামড় থামিয়ে কিমের দিকে তাকালো গোয়েন্দা-সহকারী। কি-ক্কি উপকার।
কিছু না, আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে হাত নাড়লো কিম। এই একটু চেখে দেখতে হবে আরকি। একটা প্রাচীন খাবারের উল্লেখ দেখলাম একটা চীনা খাবারের বইয়ে। লোভ সামলাতে না পেরে বেঁধেই ফেললো। আর কেউ তো খেতে জানে না, খেতে বললেও রাজি হয় না। তাই তোমাকে অনুরোধ করছি। দয়া করে যদি…।
তা জিনিসটা কি?
না, তেমন কিছু না। খুব ভালো খাবার বলেই মনে হয় আমার। তুমি যদি খেয়ে ভালো বলো, আমিও খাবোর হাজার হোক, প্রোটিন যখন বেশি…
অতো ভণিতা করছো কেন? দেখি, ঢাকনা তোলো।
ঢাকনা তুললো কিম। মাংস ভাজি। গন্ধটা বেশ চমৎকার।
হাসি ফুটলো মুসার মুখে। তা এর জন্যে এতে অনুরোধ? দাও দেখি, খাই। মাংসই তো, কি আর হবে খেলে?, শুয়োরটুয়োর না হলেই হলো। ওটা ভাই খেতে পারবো না, ধর্মে মানা।
না না শুয়োর না, শুয়োর না। এই নাও, প্লেটটা ঠেলে দিলো কিম।
একটুকরো মুখে দিয়ে দেখলো মুসা। চিবাতে চিবাতে মাথা নাড়লো, হুঁ, মন্দ। আরও কয়েক টকুরো খেয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করলো, তা কিসের মাংস এটা?
হাসলে কিম। প্লেটটা সরিয়ে নিলো মুসার সামনে থেকে। বললো, থাক, আর খেতে হবে না। বুঝেছি, রান্না ভালো হয়েছে।
কিসের মাংস? আগ্রহী হয়ে জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

তুমি খাবে?
না, আর দরকার নেই, হাত নাড়লো কিশোর। শুধু জিজ্ঞেস করছি, কিসের মাংস?
ইঁদুরের। একেবারে খাঁটি চীনা ইঁদুর। অনেক দেখেশুনে বেছে এনেছি, শান্তকণ্ঠে জানালো কিম।
সঙ্গে সঙ্গে খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল রবিনের। ওয়াক ওয়াক করতে করতে উঠে দৌড় দিলো বেসিনের দিকে।
বিকৃত হয়ে গেছে কিশোরে মুখ। রবিনের মতো বমি করতে না ছুটলেও মুখ দেখে বুঝতে অসুবিধে হলো না, পেট থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসা খাবার চাপতে কষ্ট হচ্ছে।
পাথরের মতো মুখ করে বসে রইলেন লেখক। কিমের এসব অত্যাচার গা-সওয়া হয়ে গেছে তার।
কয়েকটা সেকেণ্ড নিথর হয়ে রইলো মুসা। তারপর হাসি ফুটলো মুখে। যাকগে, যা খাওয়ার তো খেয়েই ফেলেছি। এখন আর বলে কি হবে? এর চেয়ে কতো খারাপ জিনিস খেয়েছি। আমাজানের জঙ্গলে সাপ, প্রশান্ত মহাসাগরের মরুদ্বীপে শুঁয়াপোকা...মরুকগে। তা ভাই, কিম, দয়া করে দুই বোতল কোকাকোলা এনে দাও তো দেখি। বলে আবার অর্ধেক খাওয়া হ্যামবার্গারটা তুলে নিলো সে। আর গোটা চারেক হ্যামবার্গার। একটা খেয়ে কি হয়?
নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, ইঁদুরের মাংসের প্লেট হাতে রান্নাঘরের দিকে ছুটলো নিসান জাং কিম।
-: শেষ :-

ভলিউম ১১ – প্রজাপতির খামার – তিন গোয়েন্দা – রকিব হাসান – সেবা প্রকাশনী

এখানেই বিছাই, বলে, মেঝেতে ম্যাপ বিছিয়ে দেখতে বসে গেল কিশোর পাশা।

হ্যাঁ, এইই ভালো হয়েছে, বললো রবিন। টেবিলটা একটু সরাতে হয়েছে, এই যা। তবে বড় ম্যাপ দেখতে মাটিতেই সুবিধে।

বেশি আওয়াজ করো না, হুঁশিয়ার করলো জিনা। বাবা স্টাডিতে। শব্দ শুনলেই এসে চেঁচামেচি শুরু করবে।

না, করবো না, মাথা নেড়ে বললো মুসা।

এই রাফি, চুপ থাকবি, কুকুরটাকেও সাবধান করলো জিনা। নইলে বের করে দেবো। বুঝেছিস? বুঝতে পারলো রাফিয়ান। শুয়ে পড়লো একেবারে ম্যাপটার ওপরই।

আরে গাধা, সরা ধমক লাগালো কিশোর। তাড়া আছে আমাদের। বাটারফ্লাই হিল খুঁজে বের করতে হবে

বাটারফ্লাই হিল? জিনা বললো। দারুণ নাম তো!

হ্যাঁ, বাংলা করলে হয় প্রজাপতির পাহাড়। ওদিকেই ছুটি কাটাতে যাচ্ছি আমরা এবার। কয়েকটা গুহাও আছে কাছাকাছি। তাছাড়া রয়েছে একটা প্রজাপতির খামার…

প্রজাপতির খামার! জিনা অবাক। প্রজাপতির আবার খামার হয় নাকি!

হয়, মুসা জানালো। আমাদের ইস্কুলের এক বন্ধু, জনি, তার বাড়ি ওখানে। সে-ই আমাদের দাওয়াত দিয়েছে ওখানে যেতে…।

তা-ই বলো, মাথা দোলালো জিনা। এজন্যেই হুট করে চলে এসেছে আমাদের বাড়িতে। আমি তো ভাবলাম আমাদের এখানেই ছুটি কাটাতে এসেছে। তোমরা তাহলে বাটারফ্লাই হিলে যাচ্ছে প্রজাপতির খামার দেখতে!

যা, রবিন বললো। ভাবলাম, এদিক দিয়েই যখন যেতে হবে, তোমাকেও নিয়ে নেবো। তা যাবে তো?

যাবো না মানে? এরকম একটা চান্স ছাড়ে নাকি কেউ?

গভীর মনযোগে ম্যাপ দেখছে চারজনে। হঠাৎ ঝটকা দিয়ে খুলে গেল স্টাডিরুমের দরজা। বিড়বিড় করে আপনমনে কি বলতে বলতে এগিয়ে এলেন জিনার বাবা মিস্টার পারকার। ছেলেমেয়েদেরকে দেখতেই পেলেন না আত্মভোলা বিজ্ঞানী, এসে পড়লেন একেবারে ওদের গায়ের ওপর। হোঁচট খেয়ে মাটিতেই পড়ে গেলেন।

রাফি ভাবলো, ওদের সঙ্গে খেলতে এসেছেন মিস্টার পারকার, খুশিতে জোরে ঘেউ ঘেউ করে উঠে নাচানাচি শুরু করলো সে।

তুমি যে কি, বাবা, মিস্টার পারকারকে ধরে বললো জিনা। একটু দেখে হাঁটতে পারো না?
এই রাফি, চুপ! ধমক লাগালো কিশোর। এতো হাসির কি হলো? থাম!
তিন গোয়েন্দাও এসে হাত লাগালো। মিস্টার পারকারকে ধরে তুলে দাঁড় করিয়ে দিলো। তারপর কেউ তার কাপড় ঝেড়ে দিতে লাগলো, কেউ দেখতে লাগলো কোথাও ব্যথা-ট্যথা পেয়েছেন কিনা। কড়া চোখে ছেলেমেয়েদের দিকে তাকিয়ে আচমকা গর্জে উঠলেন তিনি, এটা একটা শোয়ার জায়গা হলো! এই জিনা, তোর মা কোথায়? জলদি যা, ডেকে নিয়ে আয়! ডেস্কটা যদি একটু গুছিয়ে রাখে! কাগজপত্র কিছু পাচ্ছি না। ডাক, জলদি ডাক!
মা তো বাড়ি নেই, বাবা। বাজারে গেছে।
নেই? সেকথা আগে বলবি তো! যত্তোসব! গজগজ করতে করতে গিয়ে আবার স্টাডিতে ঢুকলেন তিনি। দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল দরজা।
পরদিন সকালে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়লো ওরা। তিন গোয়েন্দা আর জিনা সাইকেলে চলেছে, পাশে পাশে ছুটে চলেছে রাফি। সাগরের ধার দিয়ে গেছে পথ। রোদে ঝলমল করছে নীল সাগর।
গোবেল দ্বীপটা দেখা যেতেই হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠলো জিনা, ওই যে, আমার দ্বীপ।
মুখ ফিরিয়ে তাকালো অন্যেরা। বহুবার দেখেছে ওরা ওই দ্বীপ, আর দ্বীপের পুরানো দুর্গের টাওয়ারটা। তবু যতোবারই দেখে নতুন মনে হয়। যতক্ষণ না চোখের আড়াল হলো, সাইকেল চালাতে চালাতে ফিরে ফিরে তাকালো ওরা ওটার দিকে।
সঙ্গে প্রচুর খাবার দিয়ে দিয়েছেন তিন গোয়েন্দার প্রিয় কেরিআন্টি, জিনার মা। কাজেই দুপুরে খাবার অসুবিধে হলো না ওদের। পথের পাশে গাছের ছায়ায় বসে খেয়ে নিলো, জিরিয়েও নেয়া হলো সেই সাথে। তারপর আবার চলা।
কটা নাগাদ পৌঁছবো? জিজ্ঞেস করলো জিনা।
এই চারটে, জবাব দিলো কিশোর।
বেলা গড়িয়ে আসছে। পথের দুধারে এখন ছড়ানো প্রান্তর। কোথাও মাঠ, কোথাও চাষের জমি। দূরে দেখা গেল পাহাড়।
ওটাই বোধহয়, বলে গলায় ঝোলানো ফীল্ডগ্লাস চোখে ঠেকালো কিশোর। যা, ওটাই। অদ্ভুত চ্যাপ্টা চূড়া। বুড়ো মানুষের দুমড়ে যাওয়া হ্যাটের চূড়ার মতো লাগছে দেখতে।
সাইকেল থেকে নামলো সবাই। এক এক করে ফান্ডগ্রাস চোখে লাগিয়ে পাহাড়টা দেখলো।

চারটের আগেই পৌঁছতে পারতো ওরা, রাফির কারণে পারলো না। ওরা সাইকেলে চড়ে চলেছে, আর কুকুরটা চলেছে দৌড়ে, তাড়াতাড়ি ক্লান্ত হয়ে পড়ছে। ওকে বিশ্রাম দেয়ার জন্যে মাঝে মাঝে থামতে হচ্ছে ওদের।
অবশেষে পৌঁছলো ওরা বাটারফ্লাই হিলের গোড়ায়। ঢালু উপত্যকায় ছড়িয়ে আছে তৃণভূমি, তাতে গরু চরছে। ঢালের আরও ওপরে, ঘাস যেখানে ছোট আর শক্ত, সেখানে চরছে ভেড়ার পাল। পাহাড়ের পায়ের কাছে যেন গুটিসুটি মেরে শুয়ে রয়েছে ফার্মহাউসটা।
ওটাই জনিদের বাড়ি, বললো কিশোর। ছবি দেখেছি। এই চলল, ওই ঝর্নাটায় হাতমুখ ধুয়ে চুল আঁচড়ে নিই। রাফি, সাংঘাতিক ঘেমেছিস। ইচ্ছে করলে গোসল করে নিতে পারিস।
মুখহাত ধুয়ে, পরিপাটি হয়ে বাড়িটার দিকে এগোলো ওরা। পায়েচলা মেঠোপথ পেরিয়ে এসে থামলো ফার্মের গেটের কাছে। ভেতরে বিরাট এলাকা। উঠনে মুরগী মাটিতে ঠুকরে ঠুকরে দানা খাচ্ছে। পুকুরে হাঁস সাঁতার কাটছে।
ভেতরে ঢুকলো ওরা। সামনে এগোলো। কোথায় যেন ঘেউ ঘেউ করে উঠলো একটা কুকুর। বাড়ির এককোণ ঘুরে ছুটে বেরিয়ে এলো একটা ছোট জীব। ধবধবে সাদা।
খাইছে! দারুণ সুন্দর ভেড়ার বাচ্চা তো! মুসা বললো।
এই রাফি, চুপ! ধমক দিয়ে বললো জিনা। কিছু বলবি না ওটাকে।
বাচ্চাটার পিছে পিছে বেরোলো একটা বাচ্চা ছেলে। বয়েস পাঁচের বেশি হবে। লালচে কোঁকড়া চুল, বড় বড় বাদামী চোখ। ওদেরকে দেখে থমকে দাঁড়ালো।
তোমরা কারা? জিজ্ঞেস করলো সে।
আমরা জনির বন্ধু, হেসে জবাব দিলো কিশোর। তুমি কে?
আমি ল্যারি। আর ও, ভেড়ার বাচ্চাটাকে দেখিয়ে বললো ছেলেটা, ও টোগো। খুব দুষ্টু।
তাই নাকি? রবিন বললো। খুব সুন্দর তোমার বাচ্চাটা।
সেজন্যেই তো ওকে আমি এতো ভালোবাসি। এই টোগো, আয় আয়, আমার কাছে আয়। বাচ্চাটা এগিয়ে এলে ওটাকে ধরে কোলে তুলে নিলো ল্যারি। তা তোমরা ভাইয়ার কাছে এসেছে বুঝি?।
জনি তোমার ভাই? মুসা বললো। হ্যাঁ, তার কাছেই এসেছি। কোথায় ও?।
ওখানে, হাত তুলে মস্ত গোলাঘরটা দেখালো ল্যারি। ডবিও আছে সাথে। যাও না, গেলেই দেখা হবে।
ভেড়ার বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে যেদিক থেকে এসেছিলো সেদিকে চলে গেল ল্যারি।

ভেড়াটার যেমন লেলাম, ছেলেটার তেমনি গাল। দেখলেই আদর করতে ইচ্ছে করে, জিনা বললো।
অন্য তিনজনেও মাথা ঝাঁকালো। এমনকি রাফিয়ানও বলে উঠলো, হুফ!
গোলাঘরের কাছে এসে গলা চড়িয়ে ডাকলো কিশোর, জনি! জঅনি?
বেরিয়ে এলো ওদেরই বয়েসী একটা ছেলে। সাথে একটা কুকুর। ওদেরকে দেখেই দুহাত তুলে চিৎকার করতে করতে ছুটে এলো জনি, এই যে, তিন গোয়েন্দা, এসে পড়েছে! আরি, জিনাও! আবার রাফিও! এসো এসো। ছুটিটা ভালোই কাটবে এবার আমি তো সেই কখন থেকে অপেক্ষা করে আছি। ভাবছি এই আসছে, এই আসহো!...আরি আরি, ডবি, তুই আবার যাচ্ছিস কোথায়? আরে ও তো রাফি। তোরও বন্ধু।
ঘাড়ের নোম খাড়া হয়ে গেছে রাফিয়ানের। মৃদু গরগর করছে। তার মাথায় চাপড় দিয়ে জিনা বললো, হয়েছে, আর রাগতে হবে না। ও ডবি। ওদের এখানেই বেড়াতে এসেছি আমরা।
দুটো কুকুরের ভাব হতে সময় লাগলো না। জিনা বললো জনিকে, তোমার ভাইটা কিন্তু খুব সুন্দর। ভেড়ার বাচ্চাটাও।
হেসে উঠলো জনি। আর বলো না। টোগোকে নিয়ে সারাক্ষণ ব্যস্ত ও। কিছুতেই চোখের আড়াল করতে চায় না। এসো, বাড়িতে এসো।
মায়ের সঙ্গে বন্ধুদের পরিচয় করিয়ে দিলো জনি।
তোমাদের কথা রোজই বলে জনি, হেসে বললেন মহিলা। বলেছে এখানে নাকি ছুটি কাটাবে। এসেছো, ভালো করেছে। কোনো অসুবিধে হবে না। তবু, কম্বল সব রেডি করে রেখেছে তোমাদের জন্যে ও। খাওয়ারও অসুবিধে হবে না। দুধ, ডিম, রুটি, মাখন, সব পাবে। যখন যা দরকার, চাইবে, লজ্জা করবে না।
ঘরের ভেতরে ছোটাছুটির শব্দ শোনা গেল। ওই যে, আবার শুরু করেছে! দুটোর জ্বালায়... ঘরের দিকে ফিরে চিৎকার করে মহিলা বললেন, এই ল্যারি, চুপ করলি! ভেড়ার বাচ্চাটাকে নিয়ে আবার ঢুকেছিস ঘরে! কতোবার না মানা করেছি, ওসব নিয়ে ঘরে ঢুকবি না। আবার মেহমানদের দিকে ফিরলেন তিনি। বুঝলে, কুকুর-বেড়াল আমার খারাপ লাগে না। কিন্তু ছাগল-ভেড়া একটুও পছন্দ না। কত বলি ওকে, ওটা ফেলে দিয়ে একটা কুকুরের বাচ্চা পোষ, শোনেই না ছেলেটা। টোগো টোগো করে পাগল।
মা, জনি বললো, এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথাই বলবে শুধু? চা-টা খাওয়াতে হবে না ওদেরকে?
ও, নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। এসো, এসো তোমরা। ভেতরে এসো।

খাবারের বহর দেখে আফসোস করলো মুসা, হায় হায়, এতো! এমন জানলে দুপুরে খেতামই না।
না না, এমন আর কি করতে পারলাম, জনির মা বললেন। তাড়াহুড়ো করে করেছি। জনি, তুই খাওয়া ওদের। দেখিস, কোনো কিছু যেন বাকি না থাকে। আমার কাজ পড়ে আছে...
ঠিক আছে, ঠিক আছে, ভদ্রতা করে বললো কিশোর। আমরা নিজেরাই নিয়ে খেতে পারবো।
হ্যাঁ, খাও। নিজের বাড়ি মনে করবে। কোনো লজ্জা করবে না। চলে গেলেন মহিলা।
টোগো আর ল্যারিও বসেছে ওদের সঙ্গে। পারলে ভেড়ার বাচ্চাটাকে টেবিলেই তুলে দিতো ল্যারি, বড় ভাইয়ের ভয়ে পারছে না। কোলে নিয়ে বসেছে।
মাংসের বড়াগুলো দেখিয়ে জনি বললো, ওগুলো কি দিয়ে তৈরি হয়েছে, জানতে পারলে মোটেও খুশি হবে না টোগো। হাসলো সে। ওর দাদার মাংস দিয়ে।
তাড়াতাড়ি টোগোকে মাটিতে নামিয়ে দিলো ল্যারি। ভয়, কি জানি কোনোভাবে দাদার মাংসের অবস্থা দেখে যদি ভয় পেয়ে যায় ভেড়ার বাচ্চাটা?
কুকুর দেখে অভ্যস্ত টোগো, রাফিয়ানকে দেখে মোটেও ভয় পেলো না। তার গা ঘেঁষে গিয়ে দাঁড়ালো। রাফিও আদর করে তার গা চেটে দিলো। ব্যস, ভাব হয়ে গেল দুটোতে।
খাওয়া শেষ হলো। এই সময় হাত মুছতে মুছতে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলেন জনির মা। একটা চেয়ার টেনে বসলেন। জিজ্ঞেস করলেন, তা কি ঠিক করলে? কোথায় থাকবে? ঘরে, না বাইরে?
বাইরেই থাকি, কিশোর বললো। মজা বেশি হবে।
থাকো, যেখানে ইচ্ছে। জনি, তবুটাবুগুলো কোথায় রেখেছিস? দিয়ে দে। ওরা নিজেরাই গিয়ে জায়গা পছন্দ করুক, কোথায় থাকবে।
এসো, বন্ধুদের ডাকলো জনি।
ল্যারি আর ডবিও চললো ওদের সাথে। আর ল্যারির কোলে অবশ্যই রইলো টোগো।
তাঁবু আর অন্যান্য জিনিসপত্র বয়ে নিতে মেহমানদেরকে জনি তত সাহায্য করলোই, ল্যারি আর ডবিও করলো।
পাহাড়ের দিকে যেতে যেতে জনি বললো, যা সুন্দর জায়গা! খুব পছন্দ হবে। তোমাদের। আমিও তোমাদের সঙ্গে ক্যাম্পে থাকতে পারতাম, কিন্তু বাড়িতে অনেক কাজ।

সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে গিয়ে গোলাঘরে রেখেছে জনি। দুটো তাঁবু, দুটোই ভালো। আবহাওয়া এখন যেরকম, তেমন থাকলে এই ভাবুরও দরকার নেই। খোলা আকাশের নিচেই ঘুমাতে পারবে অভিযাত্রীরা।
জিনিসগুলোর প্রশংসা করলো তিন গোয়েন্দা আর জিনা।
একটা ঠেলাগাড়ি বের করে তাতে জিনিসগুলো তুলতে আরম্ভ করলো জনি। তার সঙ্গে হাত লাগালো তিন গোয়েন্দা আর জিনা। ল্যারিও যতোটা পারলো সাহায্য করলো ওদেরকে। চামচ থেকে শুরু করে, ফ্রাইং-প্যান, কেটলি, মোটকথা ক্যাম্পিলের যতো জিনিস দরকার, সব জোগাড় করে রেখেছে জনি।
সে বললো, ঠেলাগাড়ি পরেও নিতে পারবে। আগে জায়গা পছন্দ করো।
তার চেয়ে আরেক কাজ করা যাক, কিশোর বললো। জিনা, তুমি আর রবিন চলে যাও। জায়গা পছন্দ করো গিয়ে আমরা মালপত্র নিয়ে আসছি।
জায়গা বাছতে বেশিক্ষণ লাগলো না। ঠেলে বেরিয়ে থাকা একটা পাথরের নিচ থেকে দেখা গেল ঝর্না বইছে। স্বচ্ছ টলটলে পানি। পানি যেখানে গিয়ে পড়ে ছোট একটা ডোবামতো তৈরি করেছে, সেখানে গজিয়ে উঠেছে ঘন সবুজ গাছপালা। ওই ঝর্নার পাড়েই ক্যাম্প করার সিদ্ধান্ত নিলো ওরা।
মালপত্র সব এনে রাখা হলো জায়গামতো। কিন্তু সেরাতে আর তাঁবু ফেলার ঝামেলায় যেতে চাইলো না কেউ। আকাশ ঝকঝকে পরিষ্কার। তারা থাকবে। বাতাসও বেশ উষ্ণ। রাতে খোলা আকাশের নিচে ঘুমালেও অসুবিধে হবে না।
খাবারের প্যাকেটগুলো খুলতে বসলো রবিন আর জিনা। রবিন ভাবছে, ভাঁড়ার করা যায় কোন জায়গাটাকে। মনে পড়লো, ঝর্নাটা যে পাথরের নিচ থেকে বেরিয়েছে, সেখানে একটা গুহা আছে। ভেতরটা বেশ ঠাণ্ডা। খাবার রাখলে সহজে নষ্ট হবে না। অন্যদেরকে বলতে তারাও একমত হলো তার সাথে।
ওদেরকে কাজেকর্মে সাহায্য করলো জনি। তার যাবার সময় হলো। বললো, রাতের খাবারের দেরি হয়ে গেছে এমনিতেই। আমি যাই। কাল দেখা হবে। ইস্, তোমাদের সঙ্গে থাকতে পারলে ভালোই হতো!...আচ্ছা, চলি।
ডবিকে নিয়ে রওনা হয়ে গেল সে। নেমে যাচ্ছে ঢাল বেয়ে। সেদিকে তাকিয়ে একবার নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটলো শুধু কিশোর। কিছু বললো না।
ও তোমাদের খুব ভালো বন্ধু, জিনা মন্তব্য করলো।
একমত হয়ে মাথা ঝাঁকালো তিন গোয়েন্দা।
কটা বাজে? বলে ঘড়ি দেখলো কিশোর। আরিব্বাপরে! আটটা বাজে! বুঝতেই পারিনি। তা ঘুমটুম পেয়েছে কারো?
পেয়েছে,হাই তুললো মুসা।

রবিন আর জিনা জানালো, তাদেরও ঘুম পেয়েছে। এমনকি কিছুই না বুঝে রাফিয়ানও হুফ বলে মাথা ঝাঁকালো।
ঘুমের আর দোষ কি? মুসা বললো। সারাটা দিন কি কম কষ্ট গেছে? তা ঘুমের আগে হালকা কিছু খেয়ে নিলে কেমন হয়?
আমিও একথাই ভাবছি, কিশোর বললো।
ভাঁড়ারের দায়িত্ব নিয়েছে রবিন। বললো, রুটি, মাখন আর সামান্য পনির হলেই চলবে। কি বলো? আর গোটা দুই টম্যাটো। কিছু জাম, আর, সেই সাথে এক গ্লাস করে বরফ দেয়া দুধ হলে…
চমৎকার হয়। রবিনের কথাটা শেষ করে দিলো মুসা। হাত তালি দিয়ে বললো, জবাব নেই!
বরফ পাবে কোথায়? কিশোর জিজ্ঞেস করলো।
তাই তো, একমুহূর্ত ভাবলো রবিন। চিন্তা নেই, তুড়ি বাজালো সে। ঝর্নার পানি যেরকম ঠাণ্ডা, তাতে বোতল চুবিয়ে রাখলেই বরফের মতো ঠাণ্ডা হয়ে যাবে দুধ। পানি এমন ঠাণ্ডার ঠাণ্ডা, মনে হয় ফ্রিজ থেকে বের করা হয়েছে।
হালকা খাওয়া। তাড়াতাড়িই সেরে ফেললো ওরা। তার পর হলুদ ফুল ফুটে থাকা একটা বড় ঝোপ বেছে নিয়ে তার পাশে কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়লো।
শোয়র সাথে সাথে ঘুমিয়ে পড়লো মুসা। কিশোর ঘুমালো তারপর। রবিন আর জিনা শুয়ে শুয়ে কথা বললো কিছুক্ষণ, ওদেরকে সঙ্গ দিলো রাফিয়ান।
জিনা ঘুমালো। সারাদিন এতো পথ দৌড়ে এসে রাফিয়ান খুব ক্লান্ত। সেও ঘুমালো। রবিন জেগে রইলো আরও কিছুক্ষণ। অনেক তারাই ফুটেছে আকাশে। তবে তার মাঝে ঝকঝক করছে মস্ত একটা তারা, চট করে চোখে পড়ে। দেখছে আর ভাবছে রবিন, আহা, পৃথিবীটা কি সুন্দর এখানে! এরকম একটা জায়গায় যদি চিরটাকাল বাস করা যেতে
আকাশে তারার মেলা, নিচে নিঝুম ধরণী। সব কিছু নীরব, শুধু ঝর্নার একটানা বয়ে চলার কুলকুল ছাড়া। মাঝে মাঝে দূরের খামারবাড়ি থেকে ভেসে আসছে কুকুরের ডাক, বোধহয় ডবি। তারপর বাতাস যখন স্তব্ধ হয়ে গেল, সেই ডাকও শোনা গেল না আর।
কিছুক্ষণ ঘুমানোর পরই জেগে গেল রাফি। একটা কান খাড়া করলো। মৃদু একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছে, মাথার ওপরে। একটা চোখ মেললো। কালো একটা বাদুড়। শূন্যে পাক খেয়ে খেয়ে নিশাচর পোকা খুঁজে বেড়াচ্ছে। আবার ঘুমিয়ে পড়লো সে।
হঠাৎ জোরালো একটা আওয়াজে সবারই ঘুম ভেঙে গেল। লাফিয়ে উঠে বসলো সবাই। নীরবতার মাঝে আওয়াজটা বড় বেশি হয়ে কানে বাজছে।

কী? জিনার প্রশ্ন।
এরোপ্লেন, জবাব দিলো কিশোর। তাকিয়ে রয়েছে পাহাড়ের ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়া ছোট বিমানটার দিকে। নিশ্চয় ওদিকের এয়ারী থেকে এসেছে।...কটা বাজে? আরিব্বাবা, নটা পাচ! বারো ঘণ্টা ঘুমালাম।
বাজুকগে, বলে আবার শুটিসুটি হয়ে শুয়ে পড়লো মুসা। চোখ বন্ধ করে বললো, আমি আরো ঘুমাবো।
এই ওঠো, ওঠো, জোরে জোরে ঠেলা দিলো তাকে কিশোর। এলাকাটা ঘুরে দেখা দরকার। প্রজাপতির খামার দেখবে না?
ভুলেই গিয়েছিলাম, উঠে বসলো আবার মুসা।
ঝর্না থেকে হাতমুখ ধুয়ে এলো সবাই। নাস্তা তৈরি করতে বসলো রবিন। তাকে সাহায্য করলো জিনা।
পরিষ্কার নীল আকাশ, ঝলমলে রোদ। ফুরফুরে হাওয়া বইছে। ঝোপের পাশে বসে বাতাস বাঁচিয়ে আগুন জ্বাললো রবিন। ডিম সেদ্ধ করলো। রুটি কেটে তাতে মাখন মাখালো জিনা। টুকরো করে টম্যাটো কেটে তাতে লবণ আর মশলা মাখালো। ঝর্নার পানিতে চুবিয়ে রাখা কয়েকটা দুধের বোতল গিয়ে নিয়ে এলো কিশোর আর মুসা।
সাধারণ খাবার। কিন্তু এই পরিবেশে বসে এসবই অমৃতের মতো লাগলো ওদের।
খাওয়ার মাঝামাঝি সময়ে ঘেউ ঘেউ শুরু করলো রাফি। ঘনঘন লেজ নাড়ছে। সবাই আন্দাজ করলো, বোধহয় জনি আসছে। হ্যাঁ, সে-ই, কারণ রাফিয়ানের ডাকের জবাবে সাড়া দিলো ডবি। একটু পরেই দেখা গেল তাকে। পাহাড়ের মোড় ঘুরে বেরিয়ে এলো। কাছে এসে লম্বা জিভ বের করে বসলো।
স্বাগত জানাতে তার গা চেটে দিলো রাফিয়ান।
জনি এলো। ও, নাস্তা করছে। এতোক্ষণে? ওদিকে কতো কাজ করে এলাম আমি। সেই ছটা থেকে শুরু করেছি। গরু দোয়ালাম, গোয়াল সাফ করলাম, হাঁসমুরগীগুলোকে খাবার দিলাম, খুপরী থেকে ডিম বের করলাম।
এখানে এসেই পুরোদস্তুর খামারওয়ালা বনে গেছো দেখছি, হেসে ঠাট্টা করলো মুসা।
হাতের ঝুড়িটা নামিয়ে রাখলে জনি। দুধ, রুটি আর ডিম পাঠিয়ে দিলো মা। বাসায় বানানো কেকও দিয়েছে।
অনেক ধন্যবাদ তাকে। তোমাকেও। কিশোর বললো। কিন্তু জনি, তাঁবু আর জিনিসপত্র ধার দিয়ে এমনিতেই অনেক সাহায্য করেছে, ঋণী করে ফেলেছো। ভাই, কিছু মনে করো না, খাবারের দামটা অন্তত দিতে দাও।
মা নেবে না। বললেই রাগ করবে।

কিন্তু আমরাই বা তোমাদের কাছ থেকে পয়সা ছাড়া কতো নেবো? রবিন বললো। নিতে খারাপ লাগবে, বললো মুসা। বুঝতে পারছে না...
পারছি। কিন্তু মাকে আমি বলতে পারবো না, জনি হাতজোড় করলো। আমি মাপ চাই। পারলে তোমরা দাও গিয়ে।
মুশকিলই হলো দেখছি, চিন্তিত ভঙ্গিতে বললো কিশোর।
এক কাজ করা যায়, প্রস্তাব দিলো জিনা। যতোবার খাবার আনবে, ততোবার কিছু কিছু করে পয়সা দেবো আমরা তোমার হাতে। তুমি সেগুলো নিয়ে রেখে দেবে একটা বাক্সে। তারপর আমরা চলে যাবার দিন, কিংবা পরে উপহার কিনে তাকে দেবে। আমাদের তরফ থেকে। তাহলে আর তিনি মাইন্ড করতে পারবেন না। কি, ঠিক আছে?
অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজি হলো জনি। হুঁ, তা দেয়া যায়। তবে তোমরা পয়সা না দিলেই আমরা খুশি হতাম। যাকগে, এখন এগুলো তোমাদের ভাঁড়ারে তুলে রাখো তো।
খাবার রেখে আসা হলে কিছু টাকা বের করে জনির হাতে দিয়ে কিশোর বললো, কালকের আর আজকের খাবারের দাম।
টাকাটা পকেটে রেখে দিয়ে জনি বললো, তা আজ কি করবে ঠিক করেছে কিছু? প্রজাপতির খামার দেখতে যাবে, না আমাদের খামার?
তোমাদের খামারে তো গেছিই কাল একবার, পরে যেতে পারবো যখন খুশি, কিশোর বললো। অন্যদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, এই, আজ কি করা যায় বলো তো? এমন ঝলমলে রোদ ফেলে কালো গুহাগুলোতে ঢুকতে ইচ্ছে করছে না। গুহায় নাহয় আরেকদিন ঢোকা যাবে, কি বলো?
কেউ জবাব দেয়ার আগেই হঠাৎ সমস্বরে চেঁচাতে শুরু করলো রাফি আর ডবি। একই দিকে তাকিয়ে রয়েছে। বড় একটা ঝোপের দিকে।
কে এলো? জিনা বললো। এই রাফি, দেখ তো কে?
ছুটে গেল রাফিয়ান আর ডবি। একটা বিস্মিত কণ্ঠ কানে এলো। এই যে ডবি? এখানে এসে উঠেছিস কেন? তোর বন্ধুটি কে?
মিস্টার ডাউসন, জনি জানালো। প্রজাপতির খামারের এক মালিক। জাল নিয়ে প্রায়ই আসে এখানে, প্রজাপতি ধরতে।
ঝোপ ঘুরে বেরিয়ে এলেন একজন মানুষ। আলুথালু পোশাক, চশমাটা বারবার নাকের ওপর থেকে পিছলে পড়তে চায়। চুল-দাড়িতে কতোদিন নাপিতের কাঁচি লাগেনি কে জানে। হাতে একটা প্রজাপতি ধরার জাল। ছেলেমেয়েদের দেখে থমকে দাঁড়ালেন। হাল্লো! জনি, ওরা কারা?
আমার বন্ধু, মিস্টার ডাউসন। পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি, এ-হলো জর্জিনা পারকার, বিখ্যাত বিজ্ঞানী মিস্টার জোনাথন পারকারের মেয়ে। ও কিশোর পাশা,

বাংলাদেশী। ওর চাছা রকি বীচের বিরাট এক স্যালভিজ ইয়ার্ডের মালিক। ওর নাম মুসা আমান, আফ্রিকান অরিজিন, এখন রকি বীচে থাকে। বাবা উঁচুদরের সিনেমা টেকনিশিয়ান। আর এ-হলোগে রবিন মিলফোর্ড, আইরিশ, বাবা বড় সাংবাদিক। আর এই মিয়া হলো আমাদের রাফিয়ান, ওরফে রাফি, জিনার প্রিয় কুকুর।
হ্যাঁ। বোঝা যাচ্ছে, আমাদেরও প্রিয় হয়ে উঠবে, মাথা নেড়ে এগিয়ে এলেন মিস্টার ডাউসন। কাঁধের ওপর তুলে রেখেছেন লাঠিতে বাঁধা প্রজাপতির জাল। চশমার কাঁচের ওপাশে চোখ দুটো উজ্জ্বল। তিন কিশোর, এক কিশোরী। চমৎকার। তা বাপুরা নোংরা করে দিয়ে যাবে না তো এলাকাটাকে? দাবানল লাগিয়ে দেবে না তো?
কল্পনাই করতে পারি না ওকথা, হেসে বললো জিনা। মিস্টার ডাউসন, আপনার প্রজাপতির খামারটা দেখাতে নিয়ে যাবেন আমাদের? খুব দেখতে ইচ্ছে করছে।
নিশ্চয়ই নেবো, আরও উজ্জ্বল হলো ডাউসনের চোখ। দেখানোর সুযোগই পাই না কাউকে। এদিকে বড় একটা আসে না কেউ। এসো, এদিক দিয়ে।
সরু একটা পাহাড়ী পথ ধরে ওদেরকে নিয়ে চললেন ডাউসন। এতো জঙ্গল হয়ে আছে, পথটা প্রায় চোখেই পড়ে না। মাঝামাঝি আসতেই শোনা গেল একটা ভেড়ার বাচ্চার ডাক, পরক্ষণেই কথা বলে উঠলো একটা কচিকণ্ঠ, ভাইয়া, ভাইয়া, আমি এখানে। আমাকে নিয়ে যাবি?
ল্যারি আর টোগো। প্রায় একই রকম করে লাফাতে লাফাতে এলো। ছুটে গিয়ে ভেড়ার বাচ্চাটার গা শুকলো রাফি, যেন ওটা কোনো ধরনের আজব কুকুরের বাচ্চা।
এখানে কি? কড়া গলায় বললো জনি। বাড়ি থেকে এতোদূর এসেছে! কতোদিন না মানা করা হয়েছে? দেখো, একদিন ঠিক হারিয়ে যাবে।
আমি আসতে চাইনি তো, বড় বড় বাদামী চোখ দুটো ভাইয়ের দিকে মেলে কৈফিয়তের সুরে বললো ল্যারি। টোগো আসতে চাইলো, তাই।
তুমিই এসেছে ওকে নিয়ে। আমি কোথায় যাই দেখার জন্যে।
না না, টোগোই আসতে চাইলো! কেঁদে ফেলবে যেন ল্যারি। আমি মানা করেছিলাম, পালিয়ে চলে এলো।
বেশি মিথ্যে কথা শিখে গেছে। কিছু হলেই টোগোর ওপর সব দোষ চাপিয়ে দিয়ে নিজে বেঁচে যেতে চাও। বাবা শুনলে দেখো কি করে। এখন এসেই যখন পড়েছে, চলো। প্রজাপতির খামারে যাচ্ছি আমরা। এরপর যদি কোথাও যেতে চায় টোগো, ওকে একাই যেতে দেবে। গিয়ে মরুকগে। জ্বালিয়ে মারলো ওই ভেড়ার বাচ্চাটা!

না না, আর যেতে চাইবে না, বলতে বলতে বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিলো ল্যারি। আর নামতেই দেবো না। কিন্তু খানিক পরেই আবার নামিয়ে দিতে বাধ্য হলো। এই মুহূর্তে কোল পছন্দ না হওয়ায় এতো জোরে আচমকা চেঁচিয়ে উঠলো, চমকে গিয়ে লাফ দিয়ে উঠলো রাফি আর ডবি। এরপর থেকে না নামানো পর্যন্ত চেঁচিয়েই চললো বাচ্চাটা।

হুঁমম, ফিরে চেয়ে বললেন ডাউসন, ভালো দর্শক জোগাড় হয়েছে আজকে।

ককুর-ভেড়া দেখলে কি ভয় পায় আপনার প্রজাপতিরা? তাড় পাশে চলে গেল শারি। বলেন তো ওগুলোকে এখানেই রেখে যাই?

গাধার মতো কথা বলে, পেছন থেকে বললো তার ভাই। প্রজাপতির কি...। কথা শেষ না করেই হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো জনি। হ্যাঁচকা টান মারলো ডাউসনের হাত ধরে। ওই যে, স্যার, একটা প্রজাপতি! ধরবেন না!

না, শান্তকণ্ঠে বললো ডাউসন। ওটা মিডো-ব্রাউন। অতি সাধারণ। কি ব্যাপার, ইস্কুলে কিছু শেখায় না নাকি? এরকম একটা প্রজাপতিও চিনতে পারো না।

না, শেখায় তো না, হেসে বললো জনি। আপনি আমাদের ইস্কুলের টীচার হলে খুব ভালো হতো। অনেক কিছু শিখতে পারতাম। তবে জেনারেল নলেজ বইতে দেখেছি অনেক রকম প্রজাপতির নাম। ক্যাবেজ বাটারফ্লাই, কলিফ্লাওয়ার মথ, রেড অ্যাডমিরাল,বু ক্যাপটেন, অসট্রিচ মথ...

তাকে থামিয়ে দিয়ে কিশোর জিজ্ঞেস করলো, মিস্টার ডাউসন, এখানে দুর্লভ প্রজাপতি আছে কিছু?

নিশ্চয়ই আছে, বললেন প্রজাপতি বিশেষজ্ঞ। আর সাধারণ প্রজাপতিও আছে প্রচুর। যতো খুশি ধরে নিয়ে গিয়ে বংশ বাড়াই। একটা প্রজাপতি মানেই শত শত ডিম। ডিম থেকে বাচ্চা ফুটিয়ে বিক্রি করি আমরা।

হঠাৎ একদিকে ছুটলেন তিনি। আরেকটু হলেই ধাক্কা দিয়ে ফেলে। দিয়েছিলেন জিনাকে। সরি! বললেন বটে, কিন্তু ফিরেও তাকালেন না তার দিকে। ওই যে একটা ব্রাউন অ্যারগাস। চমৎকার নমুনা। এ-বছর এই প্রথম দেখলাম। সরো, সরো তোমরা, সরে যাও। কথা বলবে না।

চুপ করে আছে ছেলেমেয়েরা। এমনকি জানোয়ারগুলোও নীরব। পা টিপে টিপে এগিয়ে যাচ্ছেন ডাউসন একটা গাছের দিকে। ফুলের ওপর বসা ছোট কালচে বাদামী রঙের একটা প্রজাপতির ওপর চোখ। কাছে গিয়ে হঠাৎ ওপর থেকে নিচের দিকে নামিয়ে আনলেন জালটা। ধরা পড়লো ব্রাউন অ্যারগাস। ডানা নেড়ে ফড়ফড় করতে থাকা প্রজাপতিটার পাখা দুআঙুলে টিপে ধরে সবাইকে দেখিয়ে বললেন, এটা মাদী প্রজাপতি। গরমের সময় সচরাচর যেসব নীল প্রজাপতি

দেখো, এটা তাদেরই একটা প্রজাপতি। অনেক ডিম পাড়বে এই প্রজাপতিটা, অনেক ঝুঁয়াপোকার জন্ম দেবে, নাদুস-নুদুস পোকা…
নীল প্রজাপতি বললেন, আগ্রহী চোখে ব্রাউন অ্যারগাসের দিকে তাকিয়ে আছে রবিন। কিন্তু এটা তো নীল নয়। কালচে বাদামী। ডানায় কমলা রঙের ফোঁটা…
তাতে কি? রঙে কি এসে যায়? আমি বলছি এটা নীল প্রজাপতির বংশধর। কাঁধে ঝোলানো একটা টিনের বাক্সে প্রজাপতিটা ভরে রাখলেন ডাউসন। বোধহয় ওদিক থেকে এসেছে, তৃণভূমির দিক থেকে, হাত তুলে উপত্যকা দেখালেন তিনি।
মিস্টার ডাউসন, জরুরী গলায় বললো মুসা। সামনের ডানা কালচে সবুজ, তাতে লাল ফোঁটা। আর পেছনের ডানা লাল, তাতে সবুজ বর্ডার। জলদি আসুন। ধরতে পারলে লাভ হবে আপনার।
ওটা প্রজাপতি নয়, রবিন বললো।
ঠিকই বলেছো, প্রশংসার দৃষ্টিতে রবিনের দিকে তাকালেন ডাউসন। জাল তুললেন পতঙ্গটাকে ধরার জন্যে। এটা মথ। আটকে ফেললেন ওটাকে।
কিন্তু মথ তো দিনের বেলা ওড়ে না, তর্ক শুরু করলো মুসা। শুধু রাতে ওড়ে।
কিছু জানে না! ভারি লেন্সের ভেতর দিয়ে মুসার দিকে তাকালেন ডাউসন। আজকালকার ছেলেমেয়েগুলোর হলো কি? অথচ আমাদের সময়ে প্রতিটি ছেলেমেয়েই জানতাম কোনটা দিনের মথ, আর কোনটা রাতের।
কিন্তু, বলতে গিয়ে ডাউসনের কড়া চাহনির দিকে তাকিয়ে থেমে গেল মুসা।
এটার নাম সিক্স-স্পট বারনেট ডে-ফ্লাইং মথ, বাচ্চা ছেলেকে যেন বোঝাচ্ছেন, এমনিভাবে ধীরে, থেমে থেমে প্রতিটি শব্দ উচ্চারণ করলেন ডাউসন। রোদের মধ্যে উড়ে বেড়াতে খুব ভালোবাসে এরা। আর তর্ক করবে না আমার সঙ্গে। মূখ ছেলেকে ভালো লাগে না আমার।
মুসার কাঁচুমাচু মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললো অন্যেরা। তবে অবশ্যই নীরবে, এবং ডাউসনের অলক্ষ্যে।
তবে তাদের দিকে চোখ নেই তার। মথটাকে বাক্সে ভরতে ব্যস্ত। বললেন, এরকম মথ আরও দরকার আমার। দেখলেই বলবে। মনে রেখো, এগুলো আরও বড় হয়। বড় দেখলেও বলবে।
ব্যস, আর কিছু বলতে হলো না। সবাই মথ খুঁজতে আরম্ভ করলো ঝোপেঝাড়ে। প্রজাপতি ধরা খুব ভালো লাগছে ওদের। রাফি আর ডবিও বেশ আগ্রহী। এখানে ওখানে ওকে বেড়াতে লাগলো। কিছুই না পেয়ে আবার আগের জায়গায় এসে জমায়েত হলো সকলে। তারপর আবার এগোনোর পালা।
এমনি করে পথে পথে থেমে, প্রজাপতি ধরে এগোতে অনেক সময় লাগলো। যতোটা লাগার কথা, তার চেয়ে অনেক বেশি সময় লাগিয়ে, অনেক দেরিতে এসে

প্রজাপতির খামারে পৌঁছলো দলটা।
এই কাচের ঘরেই আপনার প্রজাপতি রাখেন? জানতে চাইলো কিশোর।
হ্যাঁ, মাথা ঝাঁকালেন ডাউসন। এসো। সব দেখাচ্ছি। কিভাবে কি করি আমি আর আমার বন্ধু ডরি। আজ অবশ্য ওর দেখা পাবে না, নেই এখানে।
জায়গাটা অদ্ভুত লাগলো দর্শকদের কাছে। কটেজটা দেখে মনে হয় যে কোনো সময় ধসে পড়তে পারে। দুটো জানালা ভাঙা, ছাতের কয়েকটা টালি গায়েব। কিন্তু কাঁচের ঘরগুলো বেশ সুন্দর, সুরক্ষিত অবস্থায় রাখা হয়েছে। প্রতিটি কাঁচ ঝকঝকে পরিষ্কার। নিজেদের চেয়ে প্রজাপতি আর মথের যত্ন অনেক বেশি নেন প্রজাপতি মানবেরা, বোঝা গেল।
এখানে কি শুধু আপনারা দুজনই থাকেন? জিজ্ঞেস করলো রবিন। এরকম একটা জায়গায় দুজন মানুষ কি করে থাকে ভাবতে অবাক লাগছে তার। একা লাগে না?
না, একা লাগবে কেন? রবিনের প্রশ্নটাই যেন অবাক করলো ডাউনকে। তাছাড়া মিসেস ডেনভার আছে, আমাদের কাজকর্ম করে দেয়। তার ছেলে এসে মেরামত-টেরামত কিছু লাগলে করে দেয়। প্রজাপতির ঘরগুলো পরিষ্কার রাখে। মিসেস ডেনভার কীট-পতঙ্গ একদম পছন্দ করে না, ঘরগুলোর কাছেই আসে না সে। কাজেই তার ছেলেকেই সব করতে হয়।
কটেজের জানালা দিয়ে উঁকি দিলো এক বৃদ্ধা। জিনার মনে হলো, বুড়ি তো নয়, রূপকথার বইয়ের পাতা থেকে নেমে আসা ডাইনী। ভুরু কুঁচকে তার দিকে তাকালো মুসা। ভূত আর ডাইনী-পেত্নীকে যে সে ভয় পায়, একথা জানা আছে জনির। হেসে বললো, ভয় নেই, মানুষই, ভূতপ্রেত নয়। মহিলা ভালো। আমাদের রাঁধুনী মেয়েটা প্রায়ই দুধ আর ডিম দিতে আসে এখানে। সে গিয়ে সব বলে। একটা দাঁতও নেই মহিলার। ফলে চেহারাটা ওরকম বিকট লাগে। ডাইনী মনে হয়।
তোমার ভূতের ভয়টা আর দূর করতে পারলে না, রবিন বললো মুসাকে। তোমরা ডাইনীর আলোচনা নিয়েই থাকো, আমি প্রজাপতি দেখতে গেলাম।
ছোট ছোট কাচের বাক্সের ভেতরে শত শত প্রজাপতি উড়ছে। কাঁচের ঘরের মধ্যে নানা রকম গাছ লাগিয়ে ঝোপঝাড় তৈরি করা হয়েছে, বাইরে যেরকম ঝোপে ঝাড়ে থাকে প্রজাপতি, ঠিক সেরকম পরিবেশ।
খাইছে! বলে উঠলো মুসা। কতো খুঁয়াপোকা দেখেছো? পাতা খেয়ে তো সব সাফ করে ফেললো।
হ্যাঁ, রাক্ষসের মতো খায় ওরা, ডাউসন বললেন।
অনেক ধরনের শুঁয়াপোকা দেখা গেল। কোনোটা ভীষণ কুৎসিত, দেখলেই গায়ে কাঁটা দেয়, কোনোটা খুব সুন্দর, সারা শরীরে রঙের বাহার। যেমন, গাঢ় সবুজ

পোকা, লাল আর হলুদ ফোঁটা। আরেক ধরনের আছে, বেশ বড়, সবুজের ওপর লাল আর কালো ডোরা, লেজের কাছে বাঁকা শিঙের মতো। দেখতে যেন বিকট, তেমনি সুন্দর।
প্রাইভেট-হক মথের য়াপোকা, ডাউসন জানালেন।
এর নাম প্রাইভেট-হক কেন? রবিন জিজ্ঞেস করলো ভয়ে ভয়ে। কিছু জানো না বলে যদি আবার গাল দিয়ে ওঠেন ডাউসন?
কিন্তু তাকে অবাক করে দিয়ে হাসলেন প্রজাপতি মানব। বোধহয় তিনি মনে করেছেন, খুব বুদ্ধিমান ছেলেটা। কেন, হক মথ উড়তে দেখোনি কখনও? ও, দেখোনি। অদ্ভুত ভঙ্গিতে ওড়ে। অনেকটা ওই হকহক চেনো তো?
চিনি। বাজপাখি।
গুড। ওই বাজপাখির মতো।
কিন্তু প্রাইভেট কেন? একা একা থাকতে পছন্দ করে বুঝি?
ঠিক ধরেছো। বুদ্ধিমান ছেলে। তবে এখানে একা থাকার সুযোগ পায় না। অন্যদের সঙ্গে একসাথেই বেড়ে উঠতে হয়।
প্রজাপতির খামার দেখতে ভালোই লাগছে ওদের।
গুটি কেটে প্রজাপতি বেরিয়ে আসতে দেখে বিস্ময়ে চোখ কপালে উঠলো মুসার। আশ্চর্য! এ-কি যাদু নাকি!
আমার কাছেও অনেক সময় যাদুই মনে হয়, হেসে বললেন ডাউসন। ডিম থেকে কিলবিলে ওয়াপোকা বেরোনো, সেই পোকার গুটিতে আশ্রয় নেয়া, তারপর সেই শুটি কেটে ডানাওয়ালা চমৎকার রঙিন প্রজাপতি বেরিয়ে আসতে দেখলে অবাক না হয়ে উপায় নেই।
কিন্তু ভীষণ গরম এখানে, মিস্টার ডাউসন, একজিনিস আর বেশিক্ষণ দেখতে ভালো লাগছে না কিশোরের। ওদিকে বোধহয় কিছুটা ঠাণ্ডা হবে। ওদিকে গিয়ে বসি।
হ্যাঁ হ্যাঁ, যাও, বললেন ডাউসন। আমার কাজ আছে। দেখতে ইচ্ছে করলে আবার এসো।
ওখান থেকে সরে একটা ছায়ামতো জায়গায় চলে এলো ওরা। হঠাৎ পেছনে ভাঙা গলায় কথা বলে উঠলো কেউ, যাও, এখানে কি? চলে যাও।
গরগর করে উঠলো রাফি আর ডবি। পাই করে ঘুরলো সবাই। ডাইনীর মতো দেখতে মহিলাটা দাঁড়িয়ে আছে। মুখের ওপর এসে পড়েছে তার পাটের আঁশের মতো ফিনফিনে চুল।
কি ব্যাপার, মিসেস ডেনভার? দ্রকণ্ঠে বললো কিশোর। আমরা খামার দেখতে এসেছি। কিছু নষ্ট করব না।

করো আর না করো, সেটা ব্যাপার না, দাঁত নেই বলে সমস্ত কথা জড়িয়ে যাচ্ছে মহিলার, স্পষ্ট বোঝা যায় না। বাইরের কেউ আসুক এটা আমার ছেলে পছন্দ করে না।
কিন্তু এটা নিশ্চয় আপনার ছেলের জায়গা নয়, অবাক হয়েছে মুসা। মিস্টার ডাউসন আর তার বন্ধু...
তোমাদেরকে চলে যেতে বলা হয়েছে, চলে যাও, ব্যস, ওদের দিকে মুঠো তুলে ঝাঁকালো বৃদ্ধা। আমার ছেলে পছন্দ করে না।
এভাবে কথা বলা রাফিরও পছন্দ হলো না। বৃদ্ধার দিকে তাকিয়ে বেঁকিয়ে উঠলো সে। তার দিকে আঙুল তুলে গড়গড় করে কি সব বললো মহিলা, প্রায় কিছুই বোঝা গেল না। জিনার মনে হলো, মন্ত্র পড়লো বুড়ি! তাকে আরও অবাক করে দিয়ে ফাটা বেলুনের মতো চুপসে গেল রাফি, বসে পড়লো তার পায়ের কাছে।
রেগে উঠতে যাচ্ছিলো জিনা, তার হাত ধরে ইশারায় কথা বলতে নিষেধ করলো জনি। বৃদ্ধার দিকে ফিরে নরম গলায় বললো, আপনার ছেলেই তো থাকে না এখানে। কে এলো, না এলো, তাতে তার কি? আপনাকে এভাবে লোক তাড়াতে বলে গিয়েছে কেন?
চোখে পানি টলমল করতে লাগলো মহিলার। হাড়সব এক হাতের আঙুল আরেক হাতের আঙুলের খাঁজে ঢুকিয়ে চুপ করে রইলো এক মুহূর্ত। ধরা গলায় বললো, ওর কথা না শুনলে ও যে আমাকে মারে! হাত মুচড়ে দেয়! আমার ছেলে লোক ভালো না, খুব খারাপ। চলে যাও। তোমাদেরকে দেখলে রেগে যাবে। তোমাদেরও মারবে।
মহিলার কাছ থেকে সরে এলো ওরা।
জনি বললো, বুড়িটা পাগল। আমাদের রাধুনী বলে ওর ছেলে খারাপ নয়, অথচ বুড়ি বলে বেড়ায় খারাপ। মেরামতের কাজ খুব ভালো পারে তার ছেলে। মাঝে মাঝে আমাদের বাড়িতে আসে তো, দেখি। হাত আর বাড়িঘরের অন্যান্য মেরামতি কাজে ওস্তাদ। আমার মনে হয় বুড়ি বাড়িয়ে বলছে, তবে তার ছেলে খুব একটা ভালো লোকও নয়।
মিস্টার ডাউসনের বন্ধুটি কেমন? জিজ্ঞেস করলো কিশোর। ডরি, যাকে দেখলাম না।
জানি না। কখনও দেখিনি। বেশির ভাগ সময়ই বাইরে বাইরে থাকে। ব্যবসার দিকটা বোধহয় ও দেখে। এই ডিম, ভঁয়াপোকা, প্রজাপতি বিক্রির ব্যাপারটা।
খামারটা আরেকবার দেখতে ইচ্ছে করছে আমার, মুসা বললো। কিন্তু মিস্টার ডাউসন যেরকম করে তাকান, বুকের মধ্যে কাপ ধরে যায়। এতো কড়া চোখে চশমার কি দরকার? এমনিই তো দেখতে পারার কথা।

মাঝে মাঝে তুমি যে কি ছেলেমানুষের মতো কথা বলো না, হেসে বললো রবিন। চোখের কড়া দৃষ্টির সঙ্গে পাওয়ারের কি সম্পর্ক?
না, নেই। এমনি বললাম আরকি।
আমি আর যেতে চাই না ওখানে, জিনা বললো। বুড়িটা আস্ত ডাইনী। রাফিকে কিভাবে বশ করে ফেললো দেখলে?...তো এখন কোথায় যাবো?
ক্যাম্পে, কিশোর বললো। খিদে লেগেছে। জনি, তুমি আমাদের সাথে যাবে, না বাড়িতে কাজ আছে?
না, সব সেরে এসেছি। চলো যাই। তোমাদের সঙ্গে বসে খেতে ভালোই লাগবে।
ভাইয়া, আমিও যাবো, বায়না ধরলো ল্যারি। তার কোলে এখন চুপচাপ রয়েছে ভেড়ার বাচ্চাটা।
না, জনি বললো। মা চিন্তা করবে। তুমি বাড়ি ফিরে যাবে। চলো, আরেকটু এগিয়ে রাস্তা চিনিয়ে দেবো।
হ্যাঁ-না আর কিছু বললো না ল্যারি। মুখ গোমড়া করে রাখলো।
যাওয়ার সময় যতোটা সময় লেগেছিলো, ফিরতে লাগলো তার চেয়ে অনেক কম। জিনিসপত্র যেখানে যা রেখে গিয়েছিলো, ঠিক তেমনি রয়েছে। ভাঁড়ারের খাবারেও কেউ হাত দেয়নি।
হাসি-ঠাট্টার মাঝে খাওয়া শেষ করলো ওরা।
হাত-পা ছড়িয়ে চিত হয়ে শুয়ে পড়লো মুসা। বললো, সারাটা বিকেলই তো পড়ে আছে। এরপর কি করবো?
গোসল করতে পারলে ভালো হতো, জিনা বললো। যা গরম। বাড়িতে হলে তো এতোক্ষণে সাগরে থাকতাম।
গোসল করতে চাইলে অবশ্য এক জায়গায় নিয়ে যেতে পারি, জনি বললো। বড় একটা পুকুর আছে।
পুকুর? আগ্রহে লাফিয়ে উঠে বসলো মুসা। কোথায়?
ওই যে এয়ারফী দেখছো, হাত তুলে দেখালো জনি, ওখানে। এই ঝর্নার পানি কোথায় গিয়ে পড়েছে ভেবেছো একবারও? পাহাড়ের মোড় ঘুরে, উপত্যকা ধরে এগিয়ে গেছে, পথে ঘোট ঘোট খাড়ি তৈরি করেছে কয়েকটা। শেষে গিয়ে পড়েছে ওই পুকুরে। পুকুরটা প্রাকৃতিক, এই ঝর্নার পানি পড়ে পড়েই সৃষ্টি হয়েছে। কিনা কে জানে! খুব ঠাণ্ডা পানি। প্রায়ই গিয়ে ওখানে গোসল করি আমি।
শুনে তো ভালোই মনে হচ্ছে, কিশোর বললো। চলো না এখনই যাই।
এখন? রবিন বললো। এখন তো কাজই সারিনি। খাবারের বাক্স, টিন গোছাচ্ছে সে আর জিনা। ঠিকঠাক মতো নিয়ে গিয়ে আবার ভাঁড়ারে ভরে রাখছে।
অসুবিধে কি? আমরা যাই। তোমরা কাজ সেরে এসো।

ঠিক আছে, জিনা বললো, যাও।
এয়ারফীল্ডের দিকে রওনা হলো কিশোর, মুসা আর জনি। সকালে একটা বিমান দেখেছিলো, তারপর আর একটাও দেখা যায়নি। খুব নীরব এয়ারফীল্ড, ভাবলো কিশোর। সেকথা বললো জনিকে।
নীরব বলছো তো, জনি বললো হেসে। দাঁড়াও, আগে নতুন ফাইটারগুলোর পরীক্ষা শুরু হোক, তারপর বুঝবে। শব্দের জ্বালায় টেকা যাবে না। আমার খালাতো ভাই বলেছে শীঘ্রি পরীক্ষা শুরু হবে।
ফাইটার এনে পরীক্ষা করবে? মুসা বললো। তাহলে তো কাম সারা। কান ঝালাপালা করে দেবে। যা আওয়াজ।
তোমার খালাতো ভাই আছে যখন, কিশোর বললো, তাকে ধরে একদিন গিয়ে এয়ারফীল্ডটাও দেখে আসতে পারবো। পুরানো বিমান ঘাঁটি দেখার খুব শখ আমার।
আমারও, পেছন থেকে বলে উঠলো জিনা। কাজ সেরে চলে এসেছে।
এক জায়গায় এসে জনি বললো, এখান থেকে আমাদের বাড়ি বেশি দূরে না। গিয়ে সুইমস্যুট নিয়ে আসি। যাবো আর আসবো। এই ডবি, দৌড় দে।
আমরা কোন পথে যাবো? মুসা জিজ্ঞেস করলো।
সোজা চলে যাও। ওই যে দূরে বড় পাইন গাছটা দেখছে, জনি বললো, ওটার দিকে হাঁটো। আমি এই এলাম বলে।
ডবিকে নিয়ে দৌড় দিলো জনি। অন্যেরা ধীরে ধীরে এগিয়ে চললো পাইন গাছটার কাছে। বেশ ভালোই দৌড়ায় জনি, তাড়াতাড়িই ফিরে এলো কাঁধে সুইমস্যুট নিয়ে। জোরে জোরে হাঁপাচ্ছে।
পাইন গাছটার কাছে পৌঁছলো ওরা।
ওই যে দেখো, জনি বললো, পুকুর।
পানির রঙ দেখেই বোঝা গেল পুকুরটা গভীর। ঘন নীল, ঠাণ্ডা, কাঁচের মতো মসৃণ পানির উপরিভাগ। একপাড়ে ঘন গাছের সারি। একেবারে পানির কিনারে নেমে গেছে একধরনের ছোট জাতের উদ্ভিদ।
এগিয়ে গেল দলটা। হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো গাছের গায়ে লাগানো একটা নোটিশ দেখে। লেখা রয়েছেঃ
কীপ আউট
ডেনজার
গভার্নমেন্ট প্রোপার্টি
সরে থাকতে বলছে। বিপদ! সরকারি জায়গা! অবাক হয়ে বললো মুসা। এর মানে কি?

দূর, হাত নাড়লো জনি। ওই নোটিশকে পাত্তা দিও না। ও কিছু না।
কি বলো? কথাটা ধরলো কিশোর, কিছু না-ই যদি হবে, তাহলে লিখেছে কেন?
ওরকম নোটিশ এই এয়ারফীল্ডের আশেপাশে অনেক দেখতে পাবে, হালকা গলায় বললো জনি। বিপদ আছে বলে হুঁশিয়ার করে দিয়ে সরে থাকতে বলেছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত একটা বিপদও দেখিনি আমি। শুধু প্লেন আছে, কামান-বন্দুকবোমা কিছু নেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর নাকি অনেক এয়ারফীল্ডের পাশে মাইন পড়ে থাকতে দেখা গেছে, এখানে তা-ও দেখিনি।
তাহলে নোটিশ লিখেছে কেন? মুসাও ধরলো। তোমার খালাতো ভাইকে জিজ্ঞেস করলেই পারো। লিখেছে যখন, নিশ্চয় কোনো কারণ আছে।
বললাম তো, নেই, জোর দিয়ে বললো জনি। জন্মের পর থেকেই ওই নোটিশ দেখে আসছি। একসময় হয়তো লাগিয়েছিলো কোনো কারণে, এখন সেই কারণটা আর নেই। এখানে এসে গোসল করি, যা খুশি করি আমরা। কেউ কিছু বলে না।
বেশ মেনে নিলাম তোমার কথা, বললো বটে কিশোর, কিন্তু মানতে যে পারেনি সেটা তার স্বরই জানিয়ে দিলো। এখানে নোটিশ লাগানোর কোনো কারণ অবশ্য আমিও দেখছি না। কাঁটাতার নেই, বেড়া নেই, কিছুই নেই। শুধু নোটিশ লিখে রাখলেই কি আর লোকে মানবে?
ওসব কথা বাদ দিয়ে এখন এসো, পানিতে নামি।
সুইমস্যুট পরে ডাইভ দিয়ে পানিতে পড়লো ওরা। যতটা ভেবেছিলো, তার চেয়ে গভীর। চমৎকার ঠাণ্ডা, এই গরমে বেশ আরামদায়ক। কুকুরদুটোও তীরে থাকলো না, ঝাঁপিয়ে পড়লো পানিতে। মজা পেয়ে দাপাদাপি করতে লাগলো। রাফি তো উত্তেজনায় চেঁচাতেই শুরু করলো।
এই রাফি, চুপ! ধমক দিলো জনি।
কেন, চুপ করবে কেন? কিছুটা অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করলো জিনা।
এয়ারফীল্ডে কেউ থাকলে শুনতে পাবে।
শুনুক না, অসুবিধে কি? তুমি তো বললে নোটিশ এমনি এমনিই লিখেছে।
আর কিছু বললো না জনি।
রাফির দেখাদেখি কিছুক্ষণ পর ডবিও চেঁচাতে শুরু করলো। আবার ধমক লাগালো জনি, এই ডবি, চুপ করলি। মারবো কষে এক থাপ্পড়!
কিন্তু ডবি চুপ করার আগেই ঘটে গেল আরেক ঘটনা। ধমক দিলো একটা কণ্ঠ, উঁচু গলায় কথা বলা স্বভাব লোকটার, এই, হচ্ছে কি! সরকারি এলাকায় অন্যায় ভাবে ঢুকেছে। নোটিশ দেখোনি?

চিৎকার থামিয়ে দিলো কুকুর দুটো। কে কথা বলে দেখার জন্যে ঘুরে তাকালো সবাই।
এয়ারফোর্সের ইউনিফর্ম পরা একজন লোক, বিশালদেহী, মোটা, লাল মুখ।
কি হয়েছে? লোকটার দিকে সঁতরে এগোলো কিশোর। আমরা গোসল করছি। কোনো ক্ষতি করছি না।
নোটিশ দেখোনি? গাহের দিকে হাত তুললে লোকটা।
দেখেছি। কিন্তু এখানে তো কোনো বিপদ দেখছি না, নিজেকে লাথি মারতে ইচ্ছে করলো কিশোরের, নোটিশ দেখেও জনির কথা বিশ্বাস করেছে বলে।
উঠে এসো! গর্জে উঠলো লোকটা। সব্বাই।
ধীরে ধীরে পানি থেকে উঠে এলো সবাই। কুকুর দুটো উঠে গা ঝাড়া দিয়ে তাকালো লোকটার দিকে।
এই কুত্তাদুটোকেই ঘেউ ঘেউ করতে শুনেছি তাহলে? তোমরা তো ছোট নও, নোটিশ বোঝার বয়েস হয়েছে। তারপরেও অমান্য করলে কেন? উপদেশ দিতে আরম্ভ করলো লোকটা, যা সব চেয়ে বেশি ঘৃণা করে কিশোর। চেঁচামেচি শুনে ভাবলাম, কেউ হয়তো বিপদে পড়েছে। তাই দেখতে এসেছি।
এখন তো দেখলেন পড়িনি, মুখ কালো করে বললো জনি।
পড়নি, কিন্তু পড়তে পারতে। এই ছেলে, তোমাকে আগেও দেখেছি মনে হয়? তুমি আর ওই কুত্তাটাকে? হ্যাঁ, মনে পড়েছে। হ্যাঙারের ওধার থেকে বেরিয়ে নিষিদ্ধ এলাকা দিয়ে চলেছিলে।
হ্যাঁ, গিয়েছিলাম, আমার খালাতো ভাই ফাইট-লেফটেন্যান্ট জ্যাক ম্যানরের সঙ্গে দেখা করতে, কিছুটা ঝাঁঝের সঙ্গেই বললো জনি। সেটা কি দোষের নাকি? সেদিনও বলেছি, আজও বলছি, শাইং করতে যাইনি। আর করার আছেই বা কি ওখানে? আমি শুধু আমার ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে গেছিলাম।
বেশ, আমিও দেখা করবো তার সাথে। দেখা করে বলবো, ভালোমতো ধোলাই দেয় যেন তোমাকে। বড় বেশি ফড়ফড় করো! চোখের মাথা খেয়েছো নাকি? চারদিকে নোটিশ ছড়িয়ে আছে দেখোনি?
তারমানে কি তলে তলে জরুরী কিছু ঘটছে? ফস করে জিজ্ঞেস করে বসলো জনি।
ঘটলে যেন বলবো তোমাকে! বিরক্ত কণ্ঠে বললো লোকটা। এখানে বিপদের কিছু নেই আমিও জানি। ঝর্নার পানি এসে জমা হয় এই পুকুরে, মাছটাছও জিয়ানো নেই যে নষ্ট হবে। তাছাড়া লোকে এখানে পিকনিক করতে এসে জায়গাটাকে সরগরম করে তুললে ভালোই লাগতো, যা নীরব হয়ে থাকে! কিন্তু সেটা করতে দিতে পারি না। আমার ওপর আদেশ রয়েছে কাউকে যেন ঢুকতে না দেয়া হয়।

লোকটা ঠিকই বলছে, ভাবলো কিশোর। জনি তর্ক করছে অযথা। নোটিশ অমান্য করে ওরাই বেআইনী কাজ করেছে। উচিত হয়নি। বললো, দেখুন, আমরা সত্যি অন্যায় করেছি। গরম লাগছিলো তো, ঠাণ্ডা পানির কথা শুনে লোভ সামলাতে পারিনি। গোসল করতে চলে এসেছি। ঠিক আছে, আর আসবো না।

কিশোরের দিকে প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকালো বিমান বাহিনীর গার্ড। হাসি ফুটলো মুখে। বুদ্ধিমান ছেলে। এই গরমের দিনে তোমাদের গোসলটা নষ্ট করলাম বলে খারাপই লাগছে আমার। ওই ছেলেটার মাথায় গোলমাল আছে, জনির দিকে হাত তুললো সে। বেশি গোঁয়ার। এতোই যদি গোসলের শখ ছিলো, তোমার ভাইয়ের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে এলে না কেন? তাহলেই তো আমি আর কিছু বলতাম না। আমার জানা থাকতো, এই সময়ে কুকুরের চিৎকার শোনা যাবে, কিছু হৈ-হট্টগোল শুনতে পাবো। দেখতে আসতাম না।

থাক, কিছু মনে করবেন না, কিশোর বললো। আর আসব না। তাছাড়া এখানে থাকছিও না আমরা, যে জ্বালাতে আসবো। মাত্র কয়েকটা দিন, বেড়াতে এসেছি।

সো লং জানিয়ে, অনেকটা স্যালুটের ভঙ্গিতে হাত তুলে, মার্চ করে চলে গেল লোকটা।

ও ব্যাটা এখানে মরতে এলো কেন? এখনও মেনে নিতে পারছে না জনি। আমাদের গোসলটা নষ্ট করলো! গোপন কোনো ব্যাপার যদি না-ই থাকে...।

আই, চুপ করো! ওকে থামিয়ে দিলো মুসা। কিশোরের মতো সে-ও খুব লজ্জা পেয়েছে। দোষ তো ওদেরই। নোটিশ দেখার পরেও নামলো কেন পানিতে? ও কি বলে গেল শুনলে না? ওর ওপর আদেশ রয়েছে। আমাদের মতো তো আর ইস্কুলের ছাত্র নয় যে অফিসিয়াল আদেশকেও কিছু না বলে উড়িয়ে দেবে। সরকারি চাকরি করে। ইউনিফর্মের একটা দাম তো আছে।

যা, মাথা ঝাঁকালো কিশোর। আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। গা মুছে চলো এখন তোমাদের বাড়িতে। তোমার মার কাছ থেকে কিছু খাবার চেয়ে নেবো। সাঁতার কেটে সব হজম হয়ে গেছে। পরিস্থিতি সহজ করার জন্যে হাসলো সে।

কিন্তু হাসি ফোঁটানো গেল না জনির মুখে। একে তো লোকটার ব্যবহার ভালো লাগেনি, তার ওপর বন্ধুদের কাছে লজ্জা পেয়েছে। বড়মুখ করে এনেছিলো। রাগে, ক্ষোভে এখন মাথার চুল ছিড়তে ইচ্ছে করছে।

গা মুছে কাপড় বদলাতে বদলাতে জিজ্ঞেস করলো, আমার ভাইয়ের কাছ থেকে অনুমতি যদি নিই, আবার আসবে তো?

না, বললো কিশোর। তবে তার সাথে দেখা করতে পারলে খুশি হবো।

হুঁ! আবার চুপ হয়ে গেল জনি।

বাড়ির কাছাকাছি আসতে দেখা গেল, ভেড়ার বাচ্চা কোলে নিয়ে প্রায় ছুটে আসছে ল্যারি।
ওই যে আসছে, হেসে বললো জিনা। ছড়াকার ভুল করেছেন। ওকে নিয়েই বরং ছড়াটা লিখে ফেলা উচিত ছিলোঃ ল্যারি হ্যাড আ লিটল ল্যাম্ব…
হেসে উঠলো সবাই।
ছড়াটা আমিও জানি, হেসে বললো ল্যারি। ম্যারি হ্যাড আ লিটল ল্যাম্ব, ওটা তো? সুর করে দুলে দুলে ছড়া বলতে আরম্ভ করলো সে।
বাড়ি থেকে আবার বেরিয়েছো? জনি বললো।
বা-রে। মা-ই তো তোমাদের ডাকতে বললো। চায়ের সময় হয়েছে…
মোটেও ডাকতে পাঠায়নি মা। তুমি নিজেই এসেছে, মা জানে না…
না এসে কি করবো? টোখোটা পালালো। ওকে খুঁজতে খুঁজতেই না…
আমাদের কাছে চলে এসেছো? হেসে ফেললো রবিন।
আমাদের কি দোষ? বড় বড় মায়াবী চোখ মেলে রবিনের দিকে তাকালো ল্যারি। মা বললো চা হয়েছে। ভাবলাম বুঝি তোমাদের ডাকতে বলছে, তাই…
চলে এসেছে, এই তো? খুব ভালো করেছো, আদর করে তার গাল টিপে দিলো জিনা।
খুশি হয়ে উঠলো আবার ল্যারি। ভেড়ার বাচ্চাটাকে বাড়িয়ে দিয়ে বললো, ওকে আদর করলে না? ও মন খারাপ করবে তো।
হাসতে বাচ্চাটার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলো জিনা। বললো, জনি, তুমি খুব ভাগ্যবান। ইস, আমার যদি এমন একটা ভাই থাকতো!
হাসি ফুটলো জনির মুখে। খানিক আগের গোমড়া ভাবটা কেটে গেল। ল্যারির হাত ধরলো, চল, বাড়ি চল।
হাঁটতে হাঁটতে মুসা ঠাট্টা করলো, ল্যারি, তোমার বাচ্চাটা খালি পালায়, ওকে বেঁধে রাখতে পারো না?
সঙ্গে সঙ্গে জবাব এলো, রাখতাম তো। কিন্তু ও যে খুব কাঁদে। মা নেই তো, তাই।
একেবারে চুপ হয়ে গেল মুসা।
জানালা দিয়ে দলটাকে আসতে দেখে বেরিয়ে এলেন মা। এসেছো। ভালো করেছে। মেহমান এসেছে বাড়িতে। ভাবলাম, তোমরা এলে দেখা হতো। আলাপ করতে পারতে।
কে এসেছে, মা? ভুরু কোঁচকালো জনি।
জ্যাক।
জ্যাক ভাইয়া! এসেছে! খুব ভালো হয়েছে…!

কথা শুনে বেরিয়ে এলো এক সুদর্শন তরুণ। লম্বা। হাসি হাসি মুখ। দেখেই তাকে ভালো লেগে গেল তিন গোয়েন্দা আর জিনার।
হাল্লো! হেসে বললো জ্যাক। তোমাদের কথা খালার কাছে শুনলাম। দেখা হয়ে ভালো হলো। হাত মেলাতে এগিয়ে এলো সে।
এক এক করে তিন গোয়েন্দা আর জিনা হাত মেলালো। এগিয়ে এলো রাফিয়ান। জ্যাকের সামনে বসে একটা পা উঁচু করে দিলো। আরি, কুকুরটা কি করছে! অবাক হয়ে বললো সে।
হাত মেলাতে বলছে, হেসে বললো জিনা। আপনাকে পছন্দ হয়ে গেছে ওর।
খেতে খেতে অনেক কথাই হলো।
শেষে বিদায় নিয়ে যাওয়ার জন্যে উঠলো জ্যাক। তাকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিলো ছেলেমেয়েরা। টোগোকে নিয়ে ল্যারিও এলো তাদের সঙ্গে।
লম্বা লম্বা পায়ে পাহাড়ের মোড়ে হারিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত গেটের কাছে দাঁড়িয়ে রইলো ওরা। তারপর আবার ফিরে এলো বাড়িতে।
ডিম, দুধ, রুটি, মাখন আর পনির ঝুড়িতে ভরে দিলেন মা। সেগুলো নিয়ে, তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আবার ক্যাম্পে ফিরে চললো তিন গোয়েন্দা আর জিনা।
জনি রয়ে গেল খামারে, তার কাজ আছে। পরদিন আবার যাবে ক্যাম্পে, বলে দিলো সে।
ঢাল বেয়ে উঠছে ওরা। আগে আগে চলেছে রাফি। এই সময় কোথা থেকে যেন উড়ে এসে ফুলের ওপর বসলো বড় একটা প্রজাপতি। এরকম প্রজাপতি আর কখনও দেখেনি ওরা।
খাইছে! কতোবড়! বলে উঠলো মুসা। কি প্রজাপতি?
মাথা নাড়লো রবিন। বলতে পারবো না। কিশোর, তুমি জানো?
নাহ, কিশোর বললো। চেহারা-সুরতে তো দুর্লভ জিনিস বলেই মনে হচ্ছে। ধরে নিয়ে যাবো নাকি ডাউসনের কাছে?
কিশোরের কথা শেষ হতে না হতেই পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল জিনা। হাত বাড়ালো প্রজাপতিটাকে ধরার জন্যে। শেষ মুহূর্তে উড়ে গেল ওটা। গিয়ে বসলো কাছেই আরেকটা ফুলে। আবার এগোলো জিনা। শেষ মুহূর্তে আবার উড়লো প্রজাপতি। গিয়ে বসলো আরেক ফলে।
রোখ চেপে গেল জিনার। ধরবেই ওটাকে। প্রজাপতিটাও চালাক। কিছুতেই ধরা পড়তে চাইলো না। গেলও না এলাকা ছেড়ে।
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে তিন গোয়েন্দা। কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে আছে রাফিয়ান।জিনাকে সাহায্য করতে এগোবে কিনা ভাবছে বোধহয়।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য ধরা পড়তে হলো প্রজাপতিটাকে। সাবধানে ওটার দুই পাখা টিপে ধরে রেখে জিনা বললো, একটা পনিরের টিন খালি করে ফেলো, জলদি!
তাড়াতাড়ি টিনের পনির বের করে, একটা প্যাকেটের কাগজ ছিঁড়ে মুড়ে রাখলো রবিন। টিনটা দিলো জিনাকে। সাবধানে ওটার মধ্যে প্রজাপতিটাকে ভরলো জিনা। চেপে রাখা নিঃশ্বাসটা ফোঁস করে ছেড়ে বললো, থাকো এবার আরামসে!
বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বললো, আমি শিওর, এটা দেখে খুব অবাক হবেন মিটার ডাউসন।
তখন না বললে আর যাবে না ওখানে? মুসা বললো। ডাইনী বুড়িটা আছে...
থাকুক। তবুও যাবো।
তোমার কখন যে কি মনে হয়, হাসতে হাসতে বললো কিশোর, ঠিকঠিকানা নেই।
কি বলছো, কিশোর? এতোবড় একটা প্রজাপতি ধরলাম। দুর্লভ কিনা, কি নাম, জানতে ইচ্ছে করছে না তোমার?
করছে। তবে তার চেয়েও বেশি ইচ্ছে করছে ডরি আর বুড়ির ছেলের সঙ্গে দেখা করতে। প্রজাপতিটা না ধরলেও ওদের সঙ্গে দেখা করতে যেতামই একবার।
ঝট করে কিশোরের দিকে তাকালো রবিন। তোমার কথায় রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি! কি ব্যাপার, কিশোর?
নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটলো একবার গোয়েন্দাপ্রধান। এখনও জানি না। তবে এখানে আসার পর থেকেই কতগুলো ব্যাপার বেশ অবাক করেছে আমাকে। তদন্ত করে দেখা দরকার।
নিজে থেকে কিছু না বললে হাজার চাপাচাপি করেও কিশোরের মুখ থেকে কোনো কথা আদায় করা যাবে না, একথা জানা আছে তিনজনেরই। কাজেই আপাতত আর কোনো প্রশ্ন করলো না। সময় হলে আপনা থেকেই সব বলবে কিশোর।
কাঁচের ঘরগুলোর কাছে মিস্টার ডাউসনের দেখা মিললো না, নেই তিনি ওখানে।
বোধহয় কটেজে, কিশোর বললো। ডেকে দেখি।
কটেজের কাছে এসে ডাক দিলো সে, মিস্টার ডাউসন। মিস্টার ডাউসন!
সাড়া দিলেন না প্রজাপতি মানব, বেরিয়ে এলেন না। তবে দোতলার একটা জানালার পর্দা ফাঁক হলো, উঁকি দিলো কেউ। সেদিকে হাত নেড়ে আবার ডাউসনের নাম ধরে ডাকলো কিশোর।
মুসা বললো, মিস্টার ডাউসন, আপনার জন্যে একটা দুর্লভ প্রজাপতি নিয়ে এসেছি।
জানালা খুলে গেল। বেরিয়ে এলো মিসেস ডেনভারের মুখ। জিনার মনে হলো, একেবারে কার্টুন ছবির ডাইনী, কোনো ভুল নেই।

মিস্টার ডাউসন নেই, জবাব দিলো মিসেস ডেনভার।
তার বন্ধু মিস্টার ডরি কোথায়? জিজ্ঞেস করলো কিশোর। তিনি আছেন?
ওদের দিকে তাকিয়ে কি বললো মহিলা, বোঝা গেল না। জানালার ভেতরে ঢুকে গেল আবার তার মুখ।
অবাক হয়ে কিশোরের দিকে তাকালো মুসা। এরকম করলো কেন? হ্যাঁচকা টান দিয়ে কেউ সরিয়ে নিলো বলে মনে হলো না?
ঘরে তার ছেলেটা নেই তো? নিজেকেই যেন প্রশ্ন করলো রবিন।
কি জানি! গাল চুলকালো কিশোর। চলো, আশপাশটা ঘুরে দেখি ডাউসনকে পেয়েও যেতে পারি।
কটেজের একটা কোণ ঘুরে উঁকি দিতে একটা ছাউনি চোখে পড়লো। কেউ নেই।
ঠিক ওই সময় পেছনে পদশব্দ শুনে ফিরে তাকালো ওরা। একজন লোক আসছে তাদের দিকে। খাটো, রোগাটে, লম্বা মুখ, নাকটা বাঁকা। চোখে কালো চশমা। হাতে একটা প্রজাপতি ধরার জাল। বললো, মিস্টার ডাউসন তো নেই। কি চাও তোমরা?
আপনি নিশ্চয় মিস্টার ডরি, কিশোর বললো। আমরা একটা দুর্লভ প্রজাপতি ধরে এনেছি। মিস্টার ডাউসনকে দেখাতে।
দেখি? হাত বাড়ালো ডরি।
টিনটা দিলো জিনা। সাবধানে টিনের ঢাকনা খুলে সামান্য ফাঁক করলো ডরি, যাতে প্রজাপতিটা উড়ে যেতে না পারে।
কালো কাঁচের ভেতর দিয়ে দেখতে দেখতে মাথা ঝাঁকালো ডরি। হুঁ, ভালো। এক ডলার দিতে পারি।
এক পয়সাও দিতে হবে না, এমনিই নিন, জিনা বললো। শুধু বলুন, এটার নাম কি? কি জাতের?
কোনো ধরনের ফ্রিটিল্যারি? রবিন জিজ্ঞেস করলো।
হতে পারে, বলে, পকেট থেকে একটা ডলার বের করে তাড়াতাড়ি তার হাতে গুঁজে দিলো লোকটা। এই নাও। প্রজাপতি পেয়ে খুশি হলাম। মিস্টার ডাউসন এলে বলবো।
আর কাউকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে আচমকা ঘুরে দাঁড়ালো সে। এক হাতে টিন, আরেক হাতে জাল নিয়ে দ্রুত হাঁটতে শুরু করলো।
অবাক হয়ে হাতের টাকাটার দিকে তাকালো একবার রবিন। তারপর আবার তাকালো লোকটার দিকে।
ডরি চলে গেলে মুসা বললো, আজব লোক! এই লোকের সঙ্গে বনিবনা হয় কিভাবে মিস্টার ডাউসনের? টাকাটা কি করবে? এটা দরকার নেই আমাদের।

মিসেস ডেনভারকে দিয়ে দেবো, চিন্তিত ভঙ্গিতে বললো কিশোর। তার দরকার। ছেলে তাকে একটা পয়সাও দেয় বলে মনে হয় না।
আবার কটেজের সামনে এসে দাঁড়ালো ওরা। আশা করেছিলো মিসেস ডেনভারকে দেখতে পাবে। কিন্তু পেলো না। একমুহূর্ত দ্বিধা করে সামনের দরজায় গিয়ে টোকা দিলো রবিন।
দরজা খুলে গেল। বিড়বিড় করে কি বললো মহিলা, বোঝা গেল না। তারপর বললো, তোমরা চলে যাও। আমার ছেলে এসে দেখলে তোমাদের তো গালমন্দ করবেই, আমাকেও মারবে। চলে যাও তোমরা।
যাচ্ছি। এই নিন, বলে টাকাটা মহিলার হাতে গুঁজে দিলো রবিন।
হাতের তালুতে ডলারটা দেখে বিশ্বাসই করতে পারলো না মিসেস ডেনভার। তারপর হঠাৎ যেন সংবিৎ ফিরে পেয়ে তাড়াতাড়ি ছেড়া জুতোর ভেতরে ওটা লুকিয়ে ফেললো। আবার যখন সোজা হলো, দেখা গেল তার চোখে পানি টলমল করছে। তোমরা খুব ভালো! সে-জনন্যই বলছি, চলে যাও। আমার ছেলেটা মানুষ না! তোমাদেরকেও মেরে বসতে পারে। চলে যাও, প্লীজ!
নীরবে ওখান থেকে সরে এলো ওরা।
আজব এক জায়গা! হাঁটতে হাঁটতে বললো কিশোর। দুজন প্রজাপতি মানব, একসাথে থাকে, অথচ আচার ব্যবহারে একজনের সঙ্গে আরেকজনের আকাশ-পাতাল তফাৎ। একজন মহিলা, তার ব্যবহার আরও অদ্ভুত। ছেলের কথা যা শুনি, ওটা নিশ্চয় আরেক পাগল! বুঝতে পারছি, আবার আসতে হবে এখানে।
তারমানে রহস্যের ভূত ঘাড়ে চেপেছে তোমার, হেসে বললো মুসা।
কেন, তোমার কাছে রহস্যময় লাগছে না?
লাগছে।
আমি অবাক হচ্ছি, রবিন বললো, ডরি প্রজাপতিটা চিনতে পারলো না দেখে। প্রজাপতির ব্যবসা করে, অথচ…কি জানি, হয়তো খালি বেচাকেনা নিয়েই থাকে লোকটা। কোনটা কোন প্রজাপতি তার ধার ধারে না।
কিন্তু বেচাকেনা করতে গেলে জিনিস চিনতে হয় না? জিনা প্রশ্ন তুললো। লোকে যখন বলে এই জাতের প্রজাপতি দিন, ওই জাতের শুঁয়াপোকা দিন, না চিনলে কি করে দেয়?
তা-ও কথা ঠিক, মাথা দোলালো রবিন। নাহ, পুরো ব্যাপারটাই রহস্যময়!
ক্যাম্পে ফিরে এলো ওরা। এসেই সোজা ভাঁড়ারের দিকে রওনা হলো রাফিয়ান। হাত নেড়ে রবিন বললো, না না, রাফি, যাসনে। খাবার সময় হয়নি এখনও।
এখন কি করবো? শুয়ে পড়েছে মুসা। সুন্দর বিকেল।

তা ঠিক। কিন্তু রাতে আর সুন্দর থাকবে বলে মনে হয় না, কিশোর বললো পশ্চিম আকাশের দিকে তাকিয়ে। মেঘ জমছে। মনে হচ্ছে বৃষ্টি আসবে।
আমারও মনে হয়, জিনা বললো। সাগরের তীরে বাড়ি। কখন বৃষ্টি আসে না আসে মোটামুটি আঁচ করতে পারে। দূর! আর একটা হপ্তা অপেক্ষা করতে পারলো আকাশ! এখন বৃষ্টি এলে উপায় আছে? সারাদিন তাবুতে বসে থাকতে হবে। ক্যাম্পিঙের আর কোনো মানে হবে না।
যখন আসে আসবে, রবিন বললো। এখন ওসব ভেবে লাভ নেই। বৃষ্টি এলে বসে থাকবো কেন? গুহাগুলো দেখতে চলে যাবো। এখন এসো, মিউজিক শুনি। আবহাওয়ার খবর খারাপ হলে তা-ও জানতে পারবো।
বেশ, চলো তাহলে মিউজিকই শুনি, জিনা বললো। আজ বিকেলে কোনো এক সময়ে প্যাসট্রোল সিমফনি বাজানোর কথা। ঘোষণা শুনেছি, তবে সময়টা ঠিক মনে নেই। এখানে, এই পাহাড়ী গাঁয়ে, ওই মিউজিক শুনতে দারুণ লাগবে। তবে অবশ্যই ভলিউম কমিয়ে শুনতে হবে। জোরে শুনতে ভালো লাগে না ওই বাজনা।
বাবারে, একেবারে কবি হয়ে যাচ্ছে দেখি আমাদের জিনা বেগম, হেসে ঠাট্টা করলো মুসা।
পানি-নিরোধক খাপ থেকে রেডিওটা বের করলো কিশোর। সুইচ টিপে স্টেশন টিউন করতেই শোনা গেল মোটা কণ্ঠ, সংবাদ এখনকার মতো শেষ হলো। ধন্যবাদ।
আহহা, শেষ হয়ে গেল, বললো কিশোর। আবহাওয়ার খবরটা শোনা উচিত ছিলো। যাকগে, পরের বার শুনবো।
শোনা গেল ঘোষকের গলা। হ্যাঁ, জিনা ঠিকই বলেছে, প্যাসট্রোল সিমফনিই শোনানো হবে। নরম, হালকা লয়ে শুরু হলো বাজনা। ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো যেন পাহাড়ী প্রকৃতি জুড়ে। যেন এই পরিবেশে শোনার জন্যেই সৃষ্টি হয়েছে ওই মিউজিক। রেডিওটা সামনে রেখে আরাম করে জাঁকিয়ে বসলো চারজনে। কারো মুখে কথা নেই। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে পশ্চিম আকাশে অপরূপ রঙের খেলা। ধীরে ধীরে দিগন্তে নামছে সূর্য।
ওদিকে একই দিগন্তের কোল থেকে উঠে আসছে মেঘের স্তর। সূর্যটা হারিয়ে গেল তার ওপাশে। মন খারাপ হয়ে গেল ওদের।
ঠিক এই সময়, বাজনা ছাপিয়ে সোনা গেল আরেকটা শব্দ। বিমান।
এতো আচমকা আর এতো জোরে হলো শব্দটা, চমকে গেল শ্রোতারা। ঘেউ ঘেউ শুরু করলো রাফিয়ান।
কোথায় ওটা? দেখতে না পেয়ে অবাক হয়েছে মুসা। কাছেই মনে হচ্ছে অথচ দেখছি না! জনির ভাই জ্যাক ওড়াচ্ছে না তো?

ওই যে, কিশোর হাত তুললো।
পাহাড় পেরিয়ে উড়ে আসতে দেখা গেল হোট বিমানটাকে। ওদের মাথার ওপর একবার চক্কর দিয়ে চলে গেল এয়ারফীল্ডের দিকে।
ছন্দপতন ঘটালো এই বিকট আওয়াজ। বাজনা শুনতে আর ভালো লাগলো না ওদের।
রাতের খাওয়ার জন্যে তৈরি হতে লাগলো ওরা। রবিন আর জিনা গিয়ে খাবার নিয়ে এলো ভাঁড়ার থেকে। রাফিয়ান গেছে সাথে, যদি কোনো সাহায্য করতে পারে এই আশায়। কিন্তু মুখে ঝুলিয়ে আনার মতো কিছু না থাকায় খালিমুখেই ফিরতে হয়েছে তাকে।
খেতে বসে বার বার অস্বস্তিভরে পশ্চিম আকাশের দিকে তাকাতে লাগলো কিশোর। নাহ, বৃষ্টিটা বোধহয় আসবেই। দেখো, ইতিমধ্যেই অর্ধেক আকাশ ছেয়ে ফেলেছে মেযে। সূর্য তো সেই যে ঢুকেছে মেঘের মধ্যে, আর বেরোচ্ছে না। মনে হয় আজ তাঁবু খাটাতেই হবে।
হ্যাঁ, একমত হয়ে মাথা দোলালো জিনা।
করলে তাড়াতাড়ি করতে হবে, মুসা বললো। বাতাস ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। রাতে আজ শীতই লাগবে।
চলো, তাড়াতাড়ি খেয়ে উঠে ঝোপের ভেতর থেকে বের করে ফেলি, রবিন বললো। চারজনে হাত লাগালে বেশিক্ষণ লাগবে না তাবু খাটাতে।
সত্যিই তাই। এক ঘণ্টাও লাগলো না। বিশাল ঝোপের ধারে খাঁটিয়ে ফেলা হলো তাঁবু।
ভালোই খাঁটিয়েছি, কি বললো, তাঁবু দেখতে দেখতে নিজেদের তারি করলো মুসা। সাধারণ বাতাস তো দুরের কথা, হারিকেন এলেও উড়িয়ে নিতে পারবে না। আরামেই থাকবো ভেতরে। এখন বিছানা করে ফেলা দরকার। কম্বল আজ গায়ে দিতে হবে, কাজেই বিছানো চলবে না। বড় আর পাতা দিয়েই বিছানা করতে হবে।
কাছেই গমের খেতের ফসল সবে কাটা হয়েছে। সেখান থেকে খড় তুলে আনলো ওরা। ঝোপের অভাব নেই, পাতারও অভাব হলো না। প্রচুর পাতা জোগাড় করে আনা হলো। সেসব বিছিয়ে তৈরি করে ফেলা হলো চমৎকার পুরু আর নরম গদির মতো বিছানা। তার ওপর যার যার অ্যানারাক বিছিয়ে দিয়ে চাঁদরের কাজ সারলো।
কাজ সেরে বাইরে এসে আরেকবার তাকালো আকাশের দিকে। নাহ, বৃষ্টি আসবেই, আর কোনো সন্দেহ নেই। সেই সাথে ঝড়ও আসতে পারে। তবে ওদের আশা-সকালে থেমে যাবে বৃষ্টি। আকাশ পরিষ্কার হয়ে যাবে। আবার বাইরে বেরোতে পারবে ওরা। আর যদি না-ই হয়, কি আর করা, চলে যাবে গুহা দেখতে।

মেঘ করায় স্বাভাবিক সময়ের আগেই অন্ধকার হয়ে গেছে। তাঁবু খাটানো হয়েছে দুটো, কিন্তু ঘুমানোর আগে এক তাবুতে বসে গল্প করবে ঠিক করলো ওরা। রেডিও শুনবে। তাবুতে ঢুকে চালু করে দিলো রেডিও। রাফিকে ডাকলো জিনা। কিন্তু ভেতরে এলো না কুকুরটা, বাইরেই শুয়ে থাকলো। বোধহয় আরাম লাগছে ওখানেই।
রেডিওটা সবে অন করেছে কিশোর, এই সময় ঘেউ ঘেউ করে উঠলো রাফিয়ান। সঙ্গে সঙ্গে সুইচ অফ করে দিলো সে।
নিশ্চয় কেউ আসছে, জিনা বললো। কে?
হয়তো জনি, আন্দাজ করলো মুসা। আকাশের অবস্থা খারাপ দেখে আমাদেরকে বাড়িতে নিয়ে যেতে আসছে।
নাকি আঁধার রাতে মথ খুঁজতে বেরোলেন মিস্টার ডাউসন, হেসে বললো রবিন।
হাসলো কিশোর। মুসার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বললো, বলা যায় না, মিসেস ডেনভারও হতে পারে। ঝড়ের রাতে কাউকে যাদু করতে বেরিয়েছে হয়তো।
দূর, বাজে কথা বলো না তো, গায়ে কাঁটা দিল মুসার। আল্লাহ না করুক। মিসেস ডেনভার ভালো মানুষ, ডাইনী নয়। তাছাড়া পৃথিবীতে ডাইনী বলে কিছু নেই...
তা-ই নাকি? আরে, আমাদের মুসা আমান বলে কি? ভূতপ্রেতের ওপর থেকে বিশ্বাস তাহলে উঠে যাচ্ছে তোমার। আশ্চর্য!
ভূতের কথায় আরও কুঁকড়ে গেল মুসা।
কিশোরের সঙ্গে সঙ্গে রবিন আর জিনাও হাসতে আরু করলো।
ওদিকে ডেকেই চলেছে রাফিয়ান।
কে এলো, দেখতে হয়। বলে তাবুর দরজা দিয়ে মাথা বের করে জিজ্ঞেস করলো কিশোর, এই রাফি, কে-রে?
মুখও ফেরালো না রাফিয়ান। কিশোরের কথা যেন কানেই যায়নি। একই দিকে তাকিয়ে ঘেউ ঘেউ করে চলেছে। নিশ্চয় কিছু দেখতে পেয়েছে।
শজারু-টজারু হবে, ভেতর থেকে বললো জিনা।
কি জানি। তবে আমার মনে হয় ওকে নিয়ে গিয়ে দেখা উচিত কি দেখেছে। জানা দরকার। অন্য কিছুও হতে পারে।
তাঁবু থেকে বেরিয়ে পড়লো কিশোর। আয়, রাফি। কি দেখেছিস? দেখা তো আমাকে।
লেজ নাড়তে নাড়তে ছুটলো রাফিয়ান। পেছনে প্রায় দৌড়ে এগোলো কিশোর। অন্ধকারে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। গাছের শেকড়ে কিংবা লতায় লেগে হোঁচট খাচ্ছে। টর্চ আনা উচিত ছিলো, ভাবলো সে। এখন আর আনার সময় নেই। অনেকখানি চলে এসেছে।

ঢাল বেয়ে দৌড়ে চললো কিছুক্ষণ রাফিয়ান, এয়ারফীল্ডের দিকে মুখ। তারপর বার্চ গাছের একটা জটলার পাশ কাটিয়ে এসে দাঁড়িয়ে গেল। আরও জোরে চিল্কার করতে লাগলো।
আবছামতো একটা ছায়া নড়তে দেখলো কিশোর। চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলো, এই, কে?
আমি...আমি..., জবাব দিলো একটা দ্বিধান্বিত কণ্ঠ। ডরি।
ছায়ার হাতে লম্বা লাঠির মাথায় জালের মতো দেখতে পেলো কিশোর।
আমাদের ফাঁদগুলো দেখতে এসেছি, আবার বললো ডরি। ঝড় আসছে তো। ভাবলাম, দেখেই যাই কোনো মথ-টথ পড়লো কিনা। বৃষ্টি এলে সব ধুয়ে চলে যাবে, পরে এসে কিছুই পাবে না।
ও, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো কিশোর। আমি ভেবেছিলাম না জানি কি। তা মিস্টার ডাউসনও বেরিয়েছেন নাকি?
যা! রাতে প্রায়ই বেরোই আমরা, মথ শিকারে। কাজেই যদি তোমাদের কুকুরটা রাতে ডেকে ওঠে, যখনই ডাকুক, ধরে নেবে আমরা।...চেঁচিয়ে তো কান ঝালাপালা করে দিলো ওটা! থামাও না। বড় পাজি কুকুর মনে হচ্ছে।
এই রাফি, চুপ! ধমক দিয়ে বললো কিশোর। লোক চিনতে পারিস না?
চুপ হয়ে গেল বটে রাফি, কিন্তু তার অস্বস্তি দূর হলো না। শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো ছায়াটাকে।
আরেকটা ফাঁদ দেখতে যাচ্ছি আমি, ডরি বললো। তোমরা যাও। কুকুরটার মুখ বন্ধ রাখতে বলবে।
টর্চ জ্বলে উঠলো ডরির হাতে। হাঁটার তালে নেচে নেচে এগিয়ে চললো আলোটা।
আমরা এই পাহাড়েই ক্যাম্প করেছি, কিশোর বললো। এই তো, বড় জোর শখানেক গজ হবে। ইস, টর্চ আনলে আপনার সঙ্গে যেতে পারতাম। রাতে মথ ধরা দেখতে ইচ্ছে করছে। নিশ্চয় খুব ভালো লাগতো।
জবাব দিলো না লোকটা। চলে যাচ্ছে। যতোই দূরে সরছে, ধীরে ধীরে স্নান হয়ে আসছে টর্চের আলো।
ফিরে চললো কিশোর। অন্ধকারে দিক ঠিক রাখাই মুশকিল। আরও নানারকম অসুবিধে তো রয়েছেই। একশো গজ যেতেই পথ হারালো সে। ক্যাম্পের কাছ থেকে অনেক ডানে সরে গেল। অবাক হলো রাফি। কিশোরের শার্টের হাতা কামড়ে ধরে আস্তে টান দিলো।
কি-রে। দাঁড়িয়ে গেল কিশোর। পথ ভুল করলাম নাকি? সর্বনাশ, তুই না থাকলে তো এই অন্ধকারে সারারাত ঘুরে মরতাম! তবু কিছুতে খুঁজে পেতাম না। যা, পথ দেখা।

পথ দেখিয়ে তাকে নিয়ে চললো রাফিয়ান। কিছুদূর এগিয়ে তিনটে টর্চের আলো চোখে পড়লো কিশোরের। তার দেরি দেখে বেরিয়ে পড়েছে রবিন, মুসা আর জিনা।
কিশোওর, তুমি? শোনা গেল রবিনের উদ্বিগ্ন কণ্ঠ। এতোক্ষণ কি করছিলে?
আর বলো না, পথ হারিয়েছিলাম। টর্চ ছাড়া বেরোনোই উচিত হয়নি। রাফি সাথে না থাকলে আজ আর তাঁবুতে ফিরতে পারতাম না।
কি দেখে চেঁচামেচি করল জানতে চাইলো জিনা। প্রজাপতি মানব, ডরি। ও বললো মিস্টার ডাউসনও নাকি বেরিয়েছেন।
কেন? মুসা বললো। ঝড় আসছে দেখছে না? মথ-টথ কি আর বেরোবে নাকি এখন। নিশ্চয় বাসায় ঢুকে বসে আছে।
মধু-ধরা ফাঁদ দেখতে বেরিয়েছে নাকি। যদি ধরা-টরা পড়ে থাকে? কিশোর জানালো। কোথায় যেন পড়েছি, হে ডালে মধু মাখিয়ে রাখা হয়। সেই মধুর গন্ধে ঝাঁকে ঝাঁকে মথ এসে সেখানে পড়ে। তখন ওগুলোকে ধরা মোটেই কঠিন না।
তাই নাকি? মজার ব্যাপার তো, মুসা বললো। দেখতে যেতে পারলে হতো।... এহহে, বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে আরম্ভ করেছে। ডরি আর তার মথ, সবাই ভিজবে। চলো চলো, তাঁবুতে চলল।
এবার আর বাইরে থাকতে চাইলো না রাফিয়ান। পানির বড় বড় ফোঁটা ভালো লাগলো না মোটেও। সবার আগেই ঢুকে পড়লো তাঁবুর ভেতর। বসলো রবিন আর জিনার পাশে।
জায়গা তো সব তুইই দখল করে ফেললি, রাফি, হেসে বললো জিনা। আরেকটু ছোট হতে পারলি না।
জবাবে জিনার হাঁটুতে মাথা রেখে দীর্ঘশ্বাস ফেললো রাফি। যেন তার দুঃখ বুঝতে পেরেছে। _ তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে জিনা বললো, কাণ্ড দেখে। ওরকম বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলছিস কেন? তোর আবার কিসের দুঃখ? ও, বুঝেছি। বাইরে বসে শজারু দেখতে পারবি না, হাঁকডাক করতে পারবি না, এই জন্যে?
বসে বসে কি করি? ঘুমও তো আসছে না, কিশোর বললো। তার টর্চটা জেলে,শুইয়ে রেখেছে রেডিওর ওপর। রেডিওতেও বোধহয় শোনার মতো কিছু নেই।
গল্প করা ছাড়া আর কি করার আছে? জিনা বললো। এক কাজ করো, তোমাদের অথৈ সাগর ভ্রমণের গল্পটা আরেকবার বলো। অনেক মজা করে এসেছে।
মজা না ছাই, গজগজ করলো মুসা। ছাইভস্ম কতো কি যে খেলাম। শুঁয়াপোকাও বাদ দিইনি?

ওই শুঁয়াপোকাই বলতে গেলে জান বাঁচালো আমাদের, রবিন বললো। ওগুলো খেয়ে খানিকটা শক্তি পেয়েই না আবার খাবার খুঁজতে পেরেছি। নইলে তো মরেছিলাম। আরিব্বাপরে, যা রোদ আর গরম ছিলো, জিনা, কি বলবো? কুমালো ওদিকে গুলি খেয়ে বেহুশ, মরে মরে অবস্থা। পানি নেই। বড় বাঁচা বেঁচে এসেছি। জীবনে আর ওমুখো হচ্ছি না আমি।
আমার কিন্তু অতো খারাপ লাগেনি, কিশোর বললো। দ্বীপটা ছেড়ে আসতে শেষে কষ্টই হয়েছে।
বলোই না আরেকবার গল্পটা, অনুরোধ করলো জিনা।
গুছিয়ে গল্প বলায় ওস্তাদ রবিন। কেস-ফাইল লিখতে লিখতে এটা রপ্ত করেছে। সে-ই আরম্ভ করলো।
বাইরে ভালোমতোই শুরু হয়েছে ঝড়-বৃষ্টি। ছোই তাঁবুটাকে হ্যাঁচকা টানে উড়িয়ে নিয়ে যেতে চাইছে প্রবল বাতাস।
গল্প বলে চলেছে রবিন। মুসাকে অক্টোপাসে ধরে মারার উপক্রম করেছে, সেই জায়গাটায় এসেছে, তন্ময় হয়ে শুনছে সবাই, এই সময় নিতান্ত বেরসিকের মতো ঘেউ ঘেউ শুরু করে দিলো রাফিয়ান। চমকে দিলো সবাইকে। শুধু চেঁচিয়েই ক্ষান্ত হলো না। তাবুর ফাঁকে নাক ঢুকিয়ে ঠেলে মাথাটা বের করে দিলো বাইরে। আরও জোরে চেঁচাতে লাগলো।
মরেছে! আরেকটু হলেই হার্ট অ্যাটাক হয়ে যেতো আমার, বলে উঠলো মুসা। এই রাফি, তোর হলো কি?...আরে আরে দেখো, আবার বেরিয়ে গেল। এই, ভিজে ঠাণ্ডা লাগাবি তো। কি দেখতে গেছিস? দুটো পাগলকে? ওরা মথ ধরতে এসেছে...আয়, আয়।
কিন্তু ফিরেও এলো না রাই, চিৎকারও থামালো না। গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে চলেছে। কিশোর গিয়ে টেনে আনার চেষ্টা করলে তার দিকে তাকিয়ে রেগে উঠলো। শেষে জিনা গিয়ে তাকে ধরে আনলো।
ব্যাপারটা কি? কিছুটা অবাকই হয়েছে কিশোর। এই রাফি, চুপ কর না। কানের পর্দা ফাটিয়ে দিলি তো।
কোনো কিছু উত্তেজিত করেছে তাকে, চিন্তিত ভঙ্গিতে বললো জিনা। অস্বাভাবিক কিছু!...এই শোনো, শোনো, একটা চিৎকার শুনলে?
কান পাতলো সবাই। কিন্তু ঝড়ো বাতাস আর তাঁবুর গায়ে আছড়ে পড়া বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে আর কিছু শোনার উপায় নেই।
কিছু থাকলেও এখন যাওয়া সম্ভব না, মুসা বললো। ভিজে চুপচুপে হয়ে যাবো। আর এই বৃষ্টিতে খুঁজে বের করাও মুশকিল হবে। রাফি, চুপ কর। যেতে পারবো না।

তবু থামলো না রাফি।
শেষে রেগে গেল জিনা। ধমক লাগালো, এই, চুপ করলি! হতচ্ছাড়া কুত্তা কোথাকার!
রেগে এভাবে তাকে খুব কমই গালি দেয় জিনা। অবাক হয়ে চুপ করলো সে। ফ্যালফ্যাল করে তাকাতে লাগলো জিনার মুখের দিকে।
হয়েছে, আর ওরকম করে তাকাতে হবে না, পাজি কোথাকার! চুপ, একদম চুপ! ইঁদুর, ছুঁচো যা দেখবে চেঁচাতে শুরু করবে। আর একটা চিৎকার করলে চড়িয়ে দাঁত ফেলে দেবো...।
জিনার কথা শেষ হলো না। ঝড়ের গর্জন আর মুষলধারে বৃষ্টির ঝপঝপ ছাপিয়ে শোনা গেল আরেকটা ভারি গোঁ গোঁ আওয়াজ ইঞ্জিনের।
চট করে পরস্পরের দিকে তাকালো চারজনে।
খাইছে! এরোপ্লেন! ফিসফিস করে বললো মুসা, যেন বিমানটা শুনতে পাবে তার কথা। এই ঝড়বৃষ্টির মাঝে বেরোলোয় ব্যাপারটা কি?
অবাক হয়ে একে অন্যের দিকে তাকাতে লাগলো ওরা। এমন কি জরুরী ব্যাপার ঘটলো যে এই দুর্যোগের মাঝেওউড়তে হলো বিমানটাকে?
ঝড়ের মাঝে ওড়ার ট্রেনিং দিচ্ছে? নিজের কানেই বেখাপ্পা শোনালো যুক্তিটা। না, তা হতে পারে না।
এখান থেকে ওড়েনি, রবিন বললো। হয়তো অন্য কোনোখান থেকে এসেছে। কিংবা উড়ে যাচ্ছিলো এখান দিয়ে। আবহাওয়া বেশি খারাপ হয়ে যাওয়ায় ল্যান্ড করছে।
হ্যাঁ, তা হতে পারে, একমত হলো মুসা। আশ্রয় খুঁজছে।
মাথা নাড়লো কিশোর। না, আমার তা মনে হয় না। এয়াররুট থেকে অনেক দূরে এই এয়ারফীল্ড। তাছাড়া এটাকে ঠিক এয়ারপোর্টও বলা যায় না, অতি সাধারণ একটা এক্সপেরিমেন্টাল স্টেশন। আর যদি আবহাওয়া খারাপের কারণে নামতে বাধ্যই হয়, এখানে কেন? ধারেকাছেই প্রথম সারির বিমান বন্দর রয়েছে, ওখানে যাবে। আশ্রয়, সাহায্য সবই পাওয়া যাবে ওখানে।
তাহলে হয়তো মহড়াই দিচ্ছে, জিনা বললো। জনির ভাই। ঝড়ের মাঝে উড়ে হাত পাকিয়ে নিচ্ছে।
যা-ই হোক, এঞ্জিনের শব্দ হারিয়ে যেতেই ব্যাপারটা গুরুত্ব হারালো ওদের কাছে, আপাতত। হাই তুললো রবিন, শোয়া দরকার। ঘুম পাচ্ছে।
হ্যাঁ, মাথা ঝাঁকালো কিশোর। ঘড়ি দেখলো। রবিন, রাফিকে নিয়ে তুমি আর জিনা এটাতেই থাকো। আমি আর মুসা চলে যাচ্ছি ওটাতে। দড়ি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে

দরজার ফাঁক বন্ধ করে দেবে। কিছু দরকার হলে, কিংবা অসুবিধে হলে ডাকবে আমাদের।
আচ্ছা, মাথা কাত করলো রবিন।
বৃষ্টির মাঝে মাথা নিচু করে বেরিয়ে গেল কিশোর আর মুসা। দরজার ফাঁকটা শক্ত করে আটকে দিয়ে এসে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লো রবিন।
জিনাও হলো। তার পাশ ঘেঁষে শুয়ে পড়লো রাফিয়ান। সারা রাতে একটা শব্দও করলো না আর।
পরদিন সকালেও মুখ গোমড়া করে রইলো আকাশ। তাঁবুর ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়ে মুসা বললো, আবহাওয়ার পূর্বাভাস শোনা উচিত ছিলো। আজও পরিষ্কার হবে কিনা সন্দেহ। কটা বাজে, কিশোর?
আটটা! আজকাল ঘুম খুব বেড়ে গেছে আমাদের। চলো দেখি, ওরা উঠলো কিনা। অ্যানারা পরে নাও, নইলে ভিজবে।
গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে তখনও। ঝর্না থেকে হাতমুখ ধুয়ে এলো ওরা। নাস্তা করতে বসলো। তাবুর মধ্যে গাদাগাদি করে খেতে ভালো লাগছে না। রোদ নেই, ফলে মনও বিষণ্ন হয়ে যায়। ভাবছে, দিনটা যদি কিছু পরিষ্কার হতো, জনিদের ফার্মে অন্তত যাওয়া যেতো।
নাস্তার পরে মুসা বললো, যে-রকম অবস্থা, গুহায়ই বোধহয় ঢুকতে হবে আমাদের। বাইরে কোথাও যেতে পারবো না।
তা-ই চলো, জিনা বললো।
ম্যাপ দেখে নেয়া দরকার, পরামর্শ দিলো কিশোর। গুহার কোনো একটা মুখ নিচয় রাস্তা-টাস্তার কাছে বেরিয়েছে। পাহাড়ের গোড়ার দিকেই কোথাও হবে।
থাকলে থাক না থাকলে নেই,মুসা বললো, গেলেই দেখতে পাবো। আর না থাকলেই বা কি? আসল কথা, এখন বসে থাকতে ভাল্লাগছে না, একটু হাঁটাহাঁটি করতে চাই, ব্যস।
বাস, ঝোপঝাড়, সব ভেজা। ওগুলোর মধ্যে দিয়ে হাঁটতেই বিরক্ত লাগে। লাফিয়ে লাফিয়ে আগে আগে চলছে রাফিয়ান।
সবাই টর্চ নিয়েছে তো? মনে করিয়ে দিলো রবিন। গুহার ভেতরে কিন্তু দরকার হবে।
যা, রাফি ছাড়া সবাই নিয়েছে। তার অবশ্য দুটো প্রাকৃতিক টর্চই আছে, চোখ, গুহার অন্ধকারেও দেখতে পাবে। তাছাড়া রয়েছে প্রখর ঘ্রাণশক্তি আর শ্রবণশক্তি, মানুষের নাক-কানের চেয়ে অনেক বেশি উন্নত ওর যন্ত্রগুলো।
ঢাল বেয়ে কিছুক্ষণ নেমে উত্তরে মোড় নিলো ওরা। হঠাৎ করেই এসে পড়লো একটা চওড়া পথে, ঘাস আর আগাছা নেই ওখানে, কেটে সাফ করা।

দাঁড়িয়ে গেল কিশোর। নিশ্চয় কোথাও নিয়ে যাওয়া হয়েছে এই পথ।
তাই তো মনে হচ্ছে, রবিন বললো। চকের খনিটনি আছে বোধহয়। রাস্তায় পড়ে থাকা একটা খড়িমাটির ডেলায় লাথি মারলো সে।
চলো না এগিয়ে দেখি, বললো জিনা।
পথের একটা মোড় ঘুরতেই নোটিশ চোখে পড়লো। ওটার বাংলা করলে দাঁড়ায়ঃ গুহা এদিকে। দড়ি লাগানো পথগুলো ধরে গেলে ভালো। যেগুলোতে দড়ি নেই সেগুলোয় ঢুকলে পথ হারানোর ভয় আছে। সাবধান!
ভালোই তো মনে হচ্ছে, উত্তেজনা ফুটলো কিশোরের কণ্ঠে। জনিও বলেছিলো বটে, ওগুলোতে বিপদ আছে। চলো, ঢুকেই দেখা যাক।
হাজার হাজার বছরের পুরানো এগুলো, রবিন বললো। স্ট্যালামাইট আর স্ট্যালাকটাইট জমে থাকে এসব গুহায়।
শুনেছি, জিনা বললো, হাত থেকে নাকি ঝুলে থাকে জমাট বরফ। নিচে থেকেও বরফের স্তম্ভ উঠে যায় ওপর দিকে, ওপরেরগুলোকে ধরার জন্যে।
আমিও শুনেছি, মুসা বললো। নাকি ভূগোল বইয়ে পড়লাম, মনে নেই। ছাত থেকে যেগুলো নামে ওগুলোকে বলে স্ট্যালাকটাইট, আর মেঝে থেকে যেগুলো ওঠে ওগুলোকে স্ট্যালাগমাইট।
বইয়েই বোধহয় পড়েছি। হাত নাড়লো জিনা, কি জানি, কোনটাকে কি বলে।
গুহার কাছাকাছি এসে পথের চেহারা অন্যরকম হয়ে গেল। আলগা খড়িমাটি পড়ে নেই। রুক্ষও নয়, বেশ মসৃণ। প্রবেশপথটা মাত্র ছয় ফুট উচু, তার ওপরে একটা সাদা রঙ করা বোর্ডে বড় বড় কালো অক্ষরে লেখা রয়েছে মাত্র দুটো শব্দঃ বাটারফ্লাই কেভস।
রাস্তার মোড়ে যে হুঁশিয়ারিটা দেখেছিলো, সেরকমই আরেকটা নোটিশ দেখা গেল গুহা-মুখের ঠিক ভেতরে।
ওটার দিকে রাফিয়ানকে তাকিয়ে থাকতে দেখে হেসে জিনা বললো, পড়ে নে ভালোমতো। আমাদের কাছাকাছি থাকবি।
টর্চ জ্বেলে ঢুকে পড়লো ওরা। চারটে টর্চের আলোয় ঝলমল করে উঠলো চারপাশের দেয়াল। অবাক হয়ে চিৎকার শুরু করে দিলো রাফি। বদ্ধ গুহায় প্রতিধ্বনি তুললো সেই ডাক, বিকট হয়ে এসে কানে বাজলো।
রাফির নিজেরই পছন্দ হলো না সেই শব্দ। চিৎকার থামিয়ে জিনার গা ঘেঁষে এলো। হাহ হাহ করে হাসলো জিনা। দূর, বোকা, এটা তো গুহা। জীবনে কম গুহা দেখেছিস, ভয় পাচ্ছিস যে এখন?...এই, সাংঘাতিক ঠাণ্ডা তো এখানে! ভাগ্যিস অ্যানারাক এনেছিলাম।

গোটা দুই ছোট আর সাধারণ গুহা পেরিয়ে বড় একটা গুহায় ঢুকলো ওরা। যেখানে সেখানে বরফ চমকাচ্ছে। কিছু ঝুলে রয়েছে হাত থেকে, কিছু উঠে গেছে মেঝে থেকে। ওপরের বরফের সঙ্গে নিচের কোনো কোনোটা মিলে গিয়ে তৈরি হয়েছে থাম, দেখে মনে হয় এখন গুহার ছাতের ভার রক্ষা করছে ওগুলো।
দারুণ। বিড়বিড় করলো রবিন। দেখার মতো জিনিস!
সুন্দর, কিন্তু কেমন যেন গা ছমছমে, কিশোর বললো। বলতে পারবো না কেন। এসো, পরের ওহাটা দেখি।
পরেরটা আবার ছোট। তবে বরফ আছে। টর্চের আলো ঠিকরে পড়ছে ওগুলোতে। সৃষ্টি করছে রামধনুর সাত রঙ। আরিব্বাবা! চোখ বড় বড় করে ফেললো জিনা। একেবারে পরীর রাজ্য!
পরের গুহাটায় কোনো রঙ নেই। দেয়াল, মেঝে, ছাত, থাম সবকিছু একধরনের ফ্যাকাসে সাদা, টর্চের আলো ঠিকরে এসে চোখে লাগে। আসলে স্ট্যালাকটাইট আর স্ট্যালাগমাইট এতো বেশি লেগে গেছে এখানে, থাম এত ঘন, মাঝের ফাঁক দিয়ে অন্যপাশ দেখাই কঠিন।
মোট তিনটে সুড়ঙ্গমুখ দেখা গেল এই গুহাটায়। একটাতে দড়ি আছে, দুটোতে নেই। যে দুটোতে নেই, ওগুলোর মুখের কাছে দাঁড়িয়ে ভেতরে উঁকি দিলো অভিযাত্রীরা। ভেতরটা অন্ধকার, নিস্তব্ধ। তাকিয়ে থাকতে থাকতে গায়ে কাঁটা দিলো ওদের। যদি ঢুকে পথ হারায়, আর কোনোদিন বেরোতে পারবে কিনা সন্দেহ!
দড়িওয়ালাটা দিয়েই ঢোকা যাক, জিনা প্রস্তাব দিলো। ওমাথায় কি আছে দেখে ফিরে আসবো। কি আর থাকবে, হয়তো আরও কিছু গুহা।
দড়ি ছাড়া একটা গুহামুখের ভেতরে ঢুকে ঝুঁকতে আরম্ভ করলো রাফিয়ান। তাড়াতাড়ি ডাক দিলো তাকে জিনা, এই, জলদি বেরিয়ে আয়! হারিয়ে যাবি?
কিন্তু ফিরলো না রাফি, ঢুকে গেল আরও ভেতরে। ঘন কালো অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে শঙ্কিত হলো সবাই।
খাইছে! বলে উঠলো মুসা। কি দেখে গেল ওখানে? রাফি, এইই রাফি! বিকট প্রতিধ্বনি উঠলো গুহার দেয়ালে দেয়ালে।
ঘেউ ঘেউ করে সাড়া দিলো রাফি। মনে হলো, মুহূর্তে ওই ডাকে ভরে গেল সমস্ত গুহা আর সুড়ঙ্গ। বিচিত্র আওয়াজ! সহ্য করতে না পেরে কানে আঙুল দিলো রবিন।
ঘাউ! ঘাউ! ঘাউ! ঘাউ। ডেকেই চলেছে যেন একাধিক কুকুর। অথচ রাফি ডেকেছে মাত্র দুবার। ছুটে বেরিয়ে এলো সে। সাংঘাতিক অবাক হয়েছে। বিশ্বাসই করতে পারছে না যেন এই শব্দের স্রষ্টা সে নিজে।

গলায় শেকল পরিয়ে আনা উচিত ছিলো তোকে, বকা দিলো জিনা। খবরদার, আর কাছ থেকে সরবি না।
কথা শুনলো এবার রাফি। কাছে কাছেই রইলো। গুহা থেকে গুহায়, সুড়ঙ্গ থেকে সুড়ঙ্গে ঘুরে বেড়াতে লাগলো দলটা। দড়ি লাগানো জায়গাগুলোতেই শুধু ঘুরছে ওরা। অনেক সুড়ঙ্গ দেখলো, যেগুলোতে দড়ি নেই। ভেতরে কি আছে। দেখার লোভও হলো, কিন্তু জোর করে দমন করলো কৌতূহল। অযথা বিপদে পড়ার কোনো মানে হয় না।
একটা গুহায় একটা ডোবামতো দেখা গেল। পানি জমে বরফ হয়ে আছে। আয়নার কাজ করছে ওটা। ছাতের সব কিছুর প্রতিবিম্ব দেখা যাচ্ছে ওর ভেতর। ঠিক এই সময় একটা অদ্ভুত শব্দ কানে এলো ওদের। চিনতে পারলো না কিসের শব্দ। সোজা হয়ে কান পাতলো সবাই।
কাঁপা কাঁপা, তীক্ষ্ণ শব্দটা যেন ক্রমান্বয়ে ভরে দিতে লাগলো সব গুহা, সুড়ঙ্গ। একবার বাড়ছে, আবার কমছে...বাড়ছে...কমছে...
বেশিক্ষণ চুপ থাকতে পারলো না রাফি। ঘেউ ঘেউ করে চেঁচিয়ে উঠলো সে। যেন তার ডাকের জবাবেই আরও জোরে হলো আগের বিচিত্র শব্দটা।
এ-কি ভূতুড়ে কাণ্ড! ভয়ে ভয়ে অন্ধকার সুড়ঙ্গের দিকে তাকিয়ে রইলো মুসা।
ব্যাপারটা কি! ফিসফিসিয়ে বললো জিনা, জোরে বলতে ভয় পাচ্ছে। চলো, এখানে আর এক মুহূর্তও না!
কানে আঙুল দিয়ে ছুটলো ওরা। দৌড়ে চললো প্রবেশপথের দিকে। যেন হাজারখানেক বুনো কুকুর একসঙ্গে তাড়া করেছে ওদেরকে।
প্রবেশপথের বাইরে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগলো দলটা। শব্দ শুনে ভয় পেয়ে পালিয়ে এসেছে বলে এখন গাধা মনে হচ্ছে নিজেদের।
বাবারে বাবা! কপালের ঘাম মুছে বললো মুসা। মনে হচ্ছিলো কানের ফুটো দিয়ে একেবারে মগজে ঢুকে যাচ্ছে।
ভয়ানক শব্দ! ফ্যাকাসে হয়ে গেছে জিনার মুখ। ওই গুহায় আর ঢুকছি না আমি! চলো, ক্যাম্পে যাই।
খড়িমাটি বিছানো রাস্তা ধরে তাঁবুতে ফিরে চললো ওরা। বৃষ্টি থেমেছে। মেঘও কাটতে শুরু করেছে।
ক্যাম্পে ফিরে একটা তাবুতে ঢুকে আলোচনায় বসলো ওরা।
ওরকম শব্দ প্রায়ই শোনা যায় কিনা, মুসা বললো, জিজ্ঞেস করতে হবে জনিকে।
আশ্চর্য! দর্শকদের এভাবেই স্বাগত জানায় নাকি ওই গুহা!
সে যা-ই হোক, কিশোর বললো, বেশি ছেলেমানুষী করে ফেলেছি আমরা। রীতিমতো লজ্জা পাচ্ছে এখন সে।

এক কাজ করা যাক তাহলে, পরামর্শ দিলো জিনা, আবার ফিরে গিয়ে চিল্কারের জবাবে আমরাও চিৎকার শুরু করি। দেখবো কি হয়?
ওসব করে আর লাভ নেই, আরও বেশি ছেলেমানুষী করতে রাজি নয় কিশোর। চিৎকার-প্রতিযোগিতায় কিছু হবে না। কম্বলের তলা হাতড়ে ফীভগ্নাস বের করে গলায় ঝোলালো সে। এয়ারফীল্ডের অবস্থা দেখতে যাচ্ছি আমি।
বাইরে বেরিয়ে ফীগ্লাস চোখে লাগিয়ে, একবার দেখেই চিৎকার করে উঠলো কিশোর। ওরেব্বাবা, কতো লোক! হচ্ছেটা কি ওখানে? পেনও এসেছে অনেকগুলো। নিশ্চয় আজ সকালে আমরা যখন গুহায় ছিলাম তখন এসেছে।
এক এক করে কীভগ্নাস চোখে লাগিয়ে দেখলো সবাই। ঠিকই বলেছে কিশোর। কিছু একটা ঘটছে এয়ারফীল্ডে। তাড়াহুড়া আর উত্তেজনা দেখা যাচ্ছে মানুষগুলোর মাঝে। এই সময় শোনা গেল ইঞ্জিনের শব্দ।
আরেকটা প্লেন আসছে, মুসা বললো। জ্যাক ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে পারলে হতো, রবিন বললো। সে বলতে পারবে কি হচ্ছে।
লাঞ্চের পর ফার্মে গিয়ে জনিকে জিজ্ঞেস করতে পারি, মুসা প্রস্তাব দিলো। হয়তো সে কিছু জানে, ভাইয়ের কাছ থেকে শুনে থাকতে পারে।
যাক, বাঁচা গেল, আবার রোদ উঠছে, খুশি খুশি গলায় বললো জিনা। মেঘের ফাঁকে উঁকি দিয়েছে সূর্য, একঝলক সোনালি উষ্ণ বোদ ছড়িয়ে দিয়েছে বৃষ্টিভেজা প্রকৃতির ওপর। ইতিউতি ছুটে চলা হেঁড়া মেঘের ফাঁকে ফাঁকে চোখে পড়ছে এখন নীল আকাশ। এরকম কড়া রোদ থাকলে শীঘ্রি শুকিয়ে যাবে ঝোপঝাড়। চলো, রেডিও শুনি, আবহাওয়া অফিস কি বলে? অযথা অ্যানারাক বয়ে বেড়াতে রাজি না আমি।
রেডিও অন করলো ওরা। কিন্তু অল্পের জন্যে মিস করলো আবহাওয়ার খবর।
দূর! বলে বন্ধ করে দিতে গিয়েও থমকে গেল মুসা। দুটো শব্দ কানে এসেহে, বাটারফ্লাই হিল। বাড়ানো হাতটা মাঝপথেই ঝুলে রইলো তার, কান পেতে আছে আরও কথা শোনার জন্যে। ঘোষক বলছে, বাটারফ্লাই হিল থেকে চুরি যাওয়া প্লেন দুটো খুব দামী, ভেতরে অনেক টাকার যন্ত্রপাতি লাগানো। হয়তো ওগুলোর জন্যেই চুরি হয়েছে প্লেন। দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, ওগুলো উড়িয়ে নিয়ে গেছে আমাদের দুজন সেরা পাইলট। ওরা হচ্ছে ফ্লাইট-লেফটেন্যান্ট জ্যাক ম্যানর আর ফ্লাইট-লেফটেন্যান্ট রিড বেকার। দুটো প্লেনই একেবারে গায়েব, কোনো খোঁজ নেই। হারিয়েছে কাল রাতে ঝড়ের সময়।
এক মুহূর্ত থেমে আরেক খবরে চলে গেল ঘোষক। রেডিও বন্ধ করে দিয়ে শূন্য দৃষ্টিতে অন্যদের দিকে তাকালো মুসা।

জ্যাকের মতো মানুষ এরকম একটা কাণ্ড করলো! বিড়বিড় করলো কিশোর। আনমনে চিমটি কাটলো একবার নিচের ঠোঁটে। বিশ্বাস হচ্ছে না!
প্লেন উড়ে যেতে কিন্তু শুনেছি আমরা, মুসা বললো। দুটোই। পুলিশকে গিয়ে সব জানানো উচিত। ইস, জ্যাক একাজ করলো! হায়রে, দুনিয়ায় কাকে বিশ্বাস করবো?
ঠিক, মাথা দোলালো রবিন।
রাফিও কিন্তু বিশ্বাস করেছিলো ওকে, জিনা মনে করিয়ে দিলো। আর লোক চিনতে সাধারণত সে ভুল করে না।
জনি খুব দুঃখ পাবে, মুসা বললো। বেচারা ভাই বলতে অজ্ঞান...
হঠাৎ আবার চেঁচাতে শুরু করলো রাফি। এবার আনন্দের ডাক। কে আসছে দেখার জন্যে ফিরে তাকালো কিশোর। জনি।
কাছে এসে ওদের পাশে বসে পড়লে জনি। মুখচোখ শুকনো। হাসার চেষ্টা করলো। খুব খারাপ খবর আছে, কেমন ভাঙা ভাঙা কণ্ঠস্বর।
জানি,মুসা বললো। এইমাত্র শুনলাম রেডিওতে।
সবাইকে অবাক করে দিয়ে কাঁদতে শুরু করলো জনি। গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে পানি। মোছার চেষ্টা করলো না। পানি যে পড়ছে সেটাই যেন টের পাচ্ছে না। কে কিভাবে সান্ত্বনা দেবে বুঝতে পারলো না। শুধু রাফি গিয়ে চেটে দিতে লাগলো তার ভেজা গাল। বিচিত্র কুঁই কুঁই আওয়াজ বেরোচ্ছে গলা দিয়ে। কুকুরটার গলা জড়িয়ে ধরে অবশেষে বললো সে, জ্যাক ভাইয়া হতেই পারে না! সে এরকম কাজ করবে না! আমি বিশ্বাস করি না! তোমরা তো দেখেছো তাকে, তোমাদের কি মনে হয়?
আমিও বিশ্বাস করতে পারছি না, গলায় সহানুভূতি মিশিয়ে বললো কিশোর। মাত্র একবার দেখেছি, তা-ও অল্প সময়ের জন্যে। আমার মনে হয় না তোমার ভাই খারাপ লোক।
সে আমার কাছে হিরো, বলে ভেজা গাল মুছলো জনি। আজ সকালে যখন মিলিটারি পুলিশ প্রশ্ন করতে এসেছিলো বাবাকে, কি যে মনের অবস্থা হয়েছিলো আমার, বলে বোঝাতে পারবো না। জ্যাক ভাইয়াকে চোর বলায় এতো রেগে গিয়েছিলাম, ঘুসি তুলে মারতে গিয়েছিলাম পুলিশকে। শেষে জোর করে ধরে আমাকে ঘর থেকে বের করে দিলো মা।
শুধু ওই দুজন পাইলটই তো? জানতে চাইলো কিশোর। নাকি আরও কেউ নিখোঁজ হয়েছে?
না, ওই দুজনই। আজ সকালে রোলকলের সময় অন্য সবাই হাজির ছিলো। শুধু আমার ভাই আর রিড ভাইয়া বাদে। ওরা দুজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

কেসটা আরও খারাপ হয়েছে সেজন্যেই, মুসা বললো।
কিন্তু আমি বলছি ওরা চুরি করেনি! জোর দিয়ে বললো জনি। মুসার দিকে তাকালো ভুরু কুঁচকে। তুমিও ওদেরকে চোর ভাবছো নাকি?
প্রশ্নই ওঠে না। ওদেরকে..., রাফিয়ানকে দৌড় দিতে দেখে থেমে গেল মুসা। আবার কে আসছে?
প্রচণ্ড চিৎকার করতে লাগলো রাফি। মোটা, ভারি একটা কণ্ঠ আদেশ দিলো, চুপ! চুপ! এই, তোর বন্ধুরা কোথায়?
উঠে এগিয়ে গেল কিশোর।
ঢাল বেয়ে উঠে আসছে দুজন মোটাসোটা ইউনিফর্ম পরা লোক। মিলিটারি পুলিশ।
এই রাফি, চুপ কর, ডেকে বললো কিশোর। আসতে দে।
দৌড়ে তার কাছে ফিরে এলো রাফি। উঠে এলো লোক দুজন। এখানেই ক্যাম্প করেছে, না? বললো একজন। কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই। কাল রাতে
তো এখানেই ছিলে?।
হ্যাঁ, বললো কিশোর। আসুন। আপনারা কি জিজ্ঞেস করবেন, জানি। ভেরি গুড। বসো সবাই। এখানেই বসি, নাকি?
মাথা ঝাঁকালো কিশোর। গোল হয়ে বসলো সবাই। যা যা জানে, সব জানালো ওরা। বেশি কিছু বলতে পারলো না অবশ্য। শুধু দুটো প্লেন উড়ে যাওয়ার কথা ছাড়া।
সন্দেহজনক আর কিছুই শোনোনি কাল রাতে? জিজ্ঞেস করলো প্রথম লোকটা।
না, জবাব দিলো কিশোর।
কেউ আসেটাসেনি এদিকে? নোটবুক থেকে মুখ তুললো দ্বিতীয়জন।
আঁ...ও হ্যাঁ, একজনকে দেখেছি। মিস্টার ডরি। প্রজাপতি ধরে।
তুমি শিওর, মিস্টার ডরিকেই দেখেছো?
নাম তো তা-ই বললো। হাতে প্রজাপতি ধরার জাল ছিলো। চোখে কালো চশমা, আবছা অন্ধকারেও কাচ চকচক করতে দেখেছি। মিস্টার ডাউসনকে দেখিওনি, তাঁর কথাও শুনিনি। মিস্টার ডরি বললো, দুজনেই বেরিয়েছে, মথ শিকারে।
আর কিছু জানো না, না?
না, মাথা নাড়লো কিশোর।
হুঁ, বলে নোটবুক বন্ধ করলো লোকটা। অনেক ধন্যবাদ তোমাদেরকে। যাই, ওই দুজনের সঙ্গেও কথা বলা দরকার। রাতে বেরিয়েছিলো যখন, কিছু দেখলেও দেখতে পারে। কোথায় থাকে ওরা?

চলুন, দেখিয়ে দিচ্ছি, জনি উঠে দাঁড়ালো। তার সঙ্গে অন্যেরাও উঠলো। হাঁটতে হাঁটতে পুলিশদেরকে বললো, দেখুন, আপনারা হয়তো বিশ্বাস করতে চাইবেন না। তবু আমি বলছি, জ্যাক ম্যানর চোর নয়। হতে পারে না।
ও তোমার কে হয়? জিজ্ঞেস করলো একজন পুলিশ।
ভাই।
ও। দেখা যাক তদন্ত করে, কি বেরোয়।
প্রজাপতির খামারটা দেখা গেল। হাত তুলে ভাঙা কটেজটা দেখিয়ে জনি বললো, ওখানেই থাকেন মিস্টার ডাউসন আর ডরি। আমাদের কি আর আসার দরকার আছে?
না। তোমরা যাও। থ্যাংক ইউ।
একটা কথা, স্যার, অনুরোধ জানালো জনি। জ্যাক ম্যানর চুরি করেনি, একথাটা জানতে পারলে দয়া করে কি একটা খবর দেবেন আমাদেরকে? দেখবেন, যখনি সে জানবে তাকে সন্দেহ করা হচ্ছে, যোগাযোগ করবে আপনাদের সঙ্গে।
তোমার ভাই, না? দ্বিতীয় লোকটা বললো। কোনো আশা নেই, বুঝলে। কাল রাতে একটা প্লেন জ্যাক ম্যানরই উড়িয়ে নিয়ে গেছে। কোনো সন্দেহ নেই তাতে।
পাহাড় বেয়ে নেমে খামারের দিকে এগিয়ে গেল দুজন পুলিশ। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো ছেলেমেয়েরা। রাফিও দুপায়ের ফাঁকে লেজ ঢুকিয়ে দিয়ে চেয়ে রয়েছে। সে জানে না কি হয়েছে, কিন্তু বুঝতে পারছে খারাপ কিছু ঘটেছে।
এখানে দাঁড়িয়ে থেকে আর লাভ নেই, কিশোর বললো। প্রজাপতি মানবদের কাছে কিছু পাবে না। মথ ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়বে না ওদের। সামনে দিয়ে হাতি হেঁটে গেলেও না।
যাবার জন্যে সবে ঘুরেছে ওরা, এই সময় কানে এলো তীক্ষ্ণ চিত্তার। থমকে দাঁড়য়ে কান পাতলো সবাই। নিশ্চয় মিসেস ডেনভার, মুসা বললো। তার আবার কি হলো?
চলো তো দেখি, বলে এগোলো কিশোর। তার পেছনে সবাই এগিয়ে চললো কটেজের দিকে।
কাছে এসে শুনতে পেলো একজন পুলিশের গলা। বলছে, আহহা, এতো ভয় পাচ্ছেন কেন? আমরা শুধু কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করতে এসেছি।
যাও! ভাগো! তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলো আবার বৃদ্ধা। কাঠির মতো সরু হাতটা নাড়ছে জোরে জোরে। তোমরা এখানে কিজন্যে এসেছো? যাও, যাও!
শুনুন, মা, শান্তকণ্ঠে বোঝানোর চেষ্টা করলো আরেকজন, আমরা মিস্টার ডাউসন আর মিস্টার ডরির সঙ্গে কথা বলতে এসেছি। তারা কি নেই?

কে? কার কথা বললে? ও, পাগল দুটো। বেরিয়ে গেছে, জাল নিয়ে, মহিলা বললো। আমি ছাড়া আর কেউ নেই এখন। অপরিচিত লোক দেখলে আমি ভয় পাই। যাও, যাও।
শুনুন, বললো আরেকজন, মিস্টার ডাউসন আর মিস্টার ডরি কাল রাতে পাহাড়ে কোথায় গিয়েছিলো বলতে পারবেন?
রাতে তো আমি ঘুমাচ্ছিলাম। কি করে বলবো? যাও। আমাকে একটু শান্তিতে থাকতে দাও?
পরস্পরের দিকে তাকিয়ে নিরাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো দুই পুলিশ। মহিলাকে প্রশ্ন করে লাভ নেই। কিছু জানা যাবে না।
বেশ, যাচ্ছি আমরা, একজন আলতোভাবে বৃদ্ধার কাঁধ চাপড়ে দিলো। অযথাই ভয় পেয়েছেন। ভয়ের কিছু নেই তো।
ওদের সঙ্গে আবার দেখা হয়ে গেল কিশোরদের। কিশোর বললো, মহিলার চিৎকার শুনে দেখতে এলাম কি হয়েছে।
জাল নিয়ে বেরিয়ে গেছে তোমাদের প্রজাপতি মানব, বললো একজন পুলিশ, দুজনেই। আজব লোক, আজব জীবন! এতোসব কিলবিলে খুঁয়াপোকার মাঝে যে কি করে বাস করে...করুক, যেভাবে খুশি। হ্যাঁ, যা বুঝতে পারছি, কাল রাতে বোধহয় ওরা কিছু দেখেনি। আর দেখার আছেই বা কি? দুজন পাইলট দুটো প্লেন উড়িয়ে নিয়ে চলে গেছে। এটা দেখলেই বা কার সন্দেহ হবে?
তবে ওই দুজনের একজন যে আমার ভাই জ্যাক নয়, এ-ব্যাপারে আমি শিওর, জনি বললো।
শ্রাগ করলো লোক দুজন। তারপর হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল।
আবার পাহাড়ের ঢালে এসে উঠলো ছেলেমেয়েরা। নীরব। অবশেষে কথা বললো কিশোর, কিছু খাওয়া দরকার। লাঞ্চের সময় পেরিয়ে গেছে অনেকক্ষণ আগে। জনি, এসো, আমাদের সাথেই খাও।
না ভাই, আমি কিছুই মুখে দিতে পারবো না।
ক্যাম্পে ফিরে রবিন আর জিনাকে খাবার বের করতে বললো কিশোর। প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে সবারই, জনি বাদে। জোর করে তার হাতে একটা স্যাণ্ডউইচ তুলে দিলো মুসা। সেটা চিবানোর চেষ্টা করতে লাগলো জনি।
অর্ধেক খাওয়া হয়েছে, এই সময় চিৎকার শুরু করলো রাফি। কে এলো দেখার জন্যে ফিরে তাকালো সবাই। কিশোরের মনে হলো, নিচে একটা ঝোপের ভেতরে কি যেন নড়লো। তাড়াতাড়ি ফীল্ডগ্লাস বের করে চোখে লাগালো সে।
মনে হয় মিস্টার ডাউসন, দেখতে দেখতে বললো কিশোর। জাল দেখতে পাচ্ছি। প্রজাপতি ধরছেন বোধহয়।

ডাকি, কি বলো? মুসা বললো। তাকে জানাই, মিলিটারি পুলিশেরা তাঁর সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিলো।
গলা চড়িয়ে ডাকলো কিশোর।
সাড়া এলো।
আসছেন, বললো মুসা।
মিস্টার ডাউসনকে এগিয়ে আনতে গেল রাফিয়ান। ঢাল বেয়ে উঠে এলেন প্রজাপতি মানব, পরিশ্রমে হাঁপ ধরে গেছে।
তোমাদের কাছেই আসছিলাম, ডাউসন বললেন। বনেবাদাড়ে ঘোরাঘুরি করো, হয়তো চোখে পড়ে যেতে পারে, সেকথা বলতে। সিনাবার মথ, দেখলেই আমাকে খবর দেবে। পারলে ধরে নিয়ে যাবে কটেজে। দেখতে কেমন বলে দিচ্ছি। পাখার নিচটা...।
চিনি, বাধা দিয়ে বললো কিশোর। একটু আগে দুজন মিলিটারি পুলিশ গিয়েছিলো আপনার সাথে কথা বলতে। কাল রাতে কোথায় ছিলেন, জিজ্ঞেস করার জন্যে। ভাবলাম, মিসেস ডেনভার তো বুঝিয়ে বলতে পারবে না, আমরাই বলি।
শূন্য দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকালেন ডাউসন। মিলিটারি পুলিশ গিয়েছিলো আমার বাড়িতে?
হ্যাঁ, কাল রাতে সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়েছে কিনা আপনার জিজ্ঞেস করার জন্যে। মথ শিকারে বেরিয়েছিলেন তো তখন। দুটো এরোপ্লেন...
তাকে কথা শেষ করতে দিলেন না ডাউসন। মথ শিকারে। আমি বেরিয়েছিলাম? পাগল নাকি। ঝড় আসছিলো তখন। শুধু আমাদের এই এলাকা কেন, দুনিয়ার কোনো অঞ্চলেই ওরকম সময়ে মথ বেরোয় না। রাতের বেলা হলেও না। আবহাওয়া খারাপ হলে মানুষের অনেক আগেই বুঝতে পারে ওরা।
ডাউসনের কথা শুনে অবাক হলো কিশোর। কিন্তু আপনার বন্ধু ডরি যে বললো, দুজনেই মথ শিকারে বেরিয়েছেন?
এবার ডাউসনের অবাক হওয়ার পালা। ডরি? কাকে দেখতে কাকে দেখেছো! ও তো আমার সাথেই ছিলো বাড়িতে। দুজনে মিলে নোট লিখেছি।
চুপ হয়ে গেল কিশোর। ভাবছে। ব্যাপার কি? মিস্টার ডাউসন কি কিছু ধামাচাপা দিতে চাইছেন? কাল রাতে যে বেরিয়েছিলেন কোনো কারণে স্বীকার করতে চাইছেন না?
দেখুন, স্যার, শেষে বললো সে, কাল রাতে আমি মিস্টার ডরিকেই দেখেছিলাম। অন্ধকার ছিলো বটে, কিন্তু জাল আর চোখের চশমা লুকাতে পারেনি। কালো কাচের চশমা।

ডরি কালো কাচের চশমা পরে না, আরও অবাক হয়ে বললেন ডাউসন। কি সব আবল-তাবল বকছে!
না, স্যার, আবল-তাবল নয়, এবার কথা বললো মুসা। কাল নিজের চোখে দেখে এসেছি তাকে, কালো কাচের চশমা পরতে। একটা প্রজাপতি ধরে নিয়ে গিয়েছিলাম, বিকেলে। আমাদের কাছ থেকে ওটা নিয়ে একটা ডলার দিলো।
তোমাদের মাথা খারাপ! নাকি ইয়ার্কি মারছো আমার সঙ্গে! রেগে গেলেন ডাউসন। অযথা সময় নষ্ট! আমার বন্ধু, আমি জানি না? ডরি কালো কাঁচের চশমা পরে না। কাল বিকেলে বাড়িতেও ছিলো না সে। আমার সঙ্গে বেরিয়েছিলো। দুজনেই শহরে গিয়েছিলাম কিছু দরকারী জিনিস কিনতে। আর তোমরা বলছো কাল তার সাথে দেখা হয়েছে, প্রজাপতি নিয়ে এক ডলার দিয়েছে, রাতে পাহাড়েও আবার কথা বলেছো!
রাগ করবেন না, স্যার, মোলায়েম গলায় বললো কিশোর। কিন্তু আমরা সত্যিই...
আবার বলছে সত্যি! গর্জে উঠলেন প্রজাপতি মানব। চমকে গেল রাফিয়ান। গরগর করে উঠলো।
আর দাঁড়ালেন না ওখানে মিস্টার ডাউসন। গটমট করে নেমে যেতে লাগলেন ঢাল বেয়ে। রাগতঃ ভঙ্গিতে বিড়বিড় করছেন আপনমনে।
খুব অবাক হয়েছে সবাই। তাকালো একে অন্যের দিকে।
মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না! দুহাত নাড়লো কিশোর। কাল রাতে কি তাহলে স্বপ্ন দেখলাম নাকি? একজনকে যে দেখেছি, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। রাফিও দেখেছে। হাতে জাল, চোখে চশমা। কথা বলেছি। মথ না ধরলে ওরকম ঝড়ের রাতে কি করতে বেরিয়েছিলো সে?
জবাবটা দিলো জনি, হয়তো পেন চুরির সঙ্গে ওই লোকের কোনো সম্পর্ক আছে।
কিশোরও একই কথা ভাবছে। চুপ করে তাকিয়ে রইলো জনির দিকে।
উঁহুঁ, মাথা নাড়লো মুসা, আমার তা মনে হয় না। কাল দেখলাম তো কটেজে। ওই লোক আর যা-ই করুক, প্লেন চুরি করতে পারবে না। দেখে ওরকম মনে হয় না।
কিন্তু আমাদেরকে যে টাকা দিয়েছে, সে যদি সত্যিই ডরি না হয়ে থাকে? প্রশ্ন তুললো রবিন।
নাকি ওই ব্যাটাই মিসেস ডেনভারের ছেলে? জিনা বললো।
দেখতে কেমন? জনি জানতে চাইলো। মিসেস ডেনভারের ছেলেকে আমি চিনি। বলেছি না, আমাদের ওখানে মাঝে মাঝে কাজ করতে যায়। ওর ওপর মোটই বিশ্বাস রাখা যায় না। বলো তো কেমন চেহারা, টেড কিনা বুঝতে পারবো।
খাটো, রোগাটে, চোখে কালো কাঁচের চশমা, বলে চেহারার বর্ণনা দিলো মুসা।

ও টেড ডেনভার নয়, মাথা নাড়লো জনি। টেড লম্বা, মোটা, ঘাড় এতো মোটা, নাড়তেই কষ্ট হয়। কোনো রকম চশমাই পরে না।
ব্যাটা তাহলে কে? নিজেকে ডরি বলে চালিয়ে দিলো? সবার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো মুসা।
কেউ তার প্রশ্নের জবাব দিতে পারলো না। হঠাৎ তার চোখ পড়লো খাবারের দিকে। আরি, আরি, সব তো নষ্ট হয়ে গেল! অর্ধেক খাওয়াই এখনও বাকি!
নীরবে খেয়ে চললো সকলে।
ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেললে জনি। প্লেন চুরির সঙ্গে এ-সবের কোনো সম্পর্ক আছে কিনা বুঝতে পারছি না...
থাক বা না থাক, ঘোষণা করলো যেন কিশোর, ওই প্রজাপতির খামারের ওপর চোখ রাখতে হবে আমাদের। রহস্যময় কিছু একটা ঘটছে ওখানে, আমি এখন শিওর!
প্রায় সারাটা বিকেল বিমান চুরি আর কালো চশমা পরা লোকটার কথা আলোচনা করেই কাটালো ওরা। একটা কথা কিছুতেই বুঝতে পারছে না, নিজেকে ভরি বলে চালাতে গেল কেন সে? এতো বড় বোকামি কেন করলো? তার বোঝা উচিত ছিলো, কারো সন্দেহ হলে, আর সামান্য খোঁজ করলেই ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে যাবে।
হয়তো ব্যাটা পাগল, মুসা বললো। নিজেকে ডরি ভাবতে ভালোবাসে। এজন্যেই, ডরি নয় বলেই ব্যাটা আমাদের প্রজাপতিটা চিনতে পারেনি।
এক কাজ করলে কেমন হয়? জিনা প্রস্তাব দিলো, আজ রাতে গিয়ে লুকিয়ে থেকে চোখ রাখবো প্রজাপতির খামারের ওপর। নকল ডরি, আসল ডরি, ডাউসন, কে কি করে দেখে আসা যাবে।
আমিও এই কথাই ভাবছি, কিশোর বললো। যাবো, তবে সবাই নয়। আমি আর মুসা। তোমরা ক্যাম্পে থাকবে। সবার একসাথে যাওয়া ঠিক হবে না।
আমিও যাবো, জনি বললো।
না, দল ভারি করে লাভ নেই। ধরা পড়ার ভয় আছে। তাহলে রাফিকে নিয়ে যাও, জিনা বললো। তোমাদের বিপদটিপদ হলে...
ও গিয়ে ঝামেলা আরও বাড়াবে, মুসা বললো। কিছু দেখলেই চিৎকার শুরু করবে। অযথা শব্দ করবে। তারচে আমরা দুজনই যাই। ভয় নেই, আমাদের কিছু হবে না। যদি বুড়িটা সত্যি সত্যি ডাইনী না হয়ে থাকে...
হেসে উঠলো জনি। অন্যেরাও হেসে ফেললো মুসার কথা শুনে।
আমি তাহলে বাড়িতেই যাই, জনি উঠে দাঁড়ালো। অনেক কাজ। শোনো, আবারও বলছি, আমাকে নিয়ে যাও। এই এলাকা তোমাদের অচেনা, আমার চেনা। রাতের

বেলা আমি সাথে থাকলে সুবিধে হবে…কি বলো?
চুপ করে এক মুহূর্ত ভাবলো কিশোর। তারপর মাথা কাত করলো। ঠিক আছে। তবে খুব সাবধানে থাকবে। এধরনের কাজ করে তোমার অভ্যাস নেই তো…
আমি কোনো বিপদে ফেলবো না তোমাদের, কথা দিলাম। তা কখন রওনা হতে চাও?
এই দশটা নাগাদ। নাকি এগারোটা? এগারোটা হলেই বোধহয় ভালো হয়। অন্ধকার থাকবে তখন।
ঠিক আছে। খামারের পেছনের ওক গাছটার কাছে দেখা হবে। দেখেছে তো, বড় গাছটা? ওটার নিচেই থাকবো আমি।
আচ্ছা।
জনিকে কিছুদূর এগিয়ে দিয়ে এলো রাফি।
চা-টা চলবে নাকি, মুসা? রবিন জিজ্ঞেস করলো। বানাবো?
বানাও,হাত ওল্টালো মুসা। তবে আর কিছু না। দুপুরের খাওয়াটা দেরিতে হয়ে গেছে। খিদে নেই। এখন আর নাস্তার ঝামেলা না করে রাতে একবারেই খাবো।
ও হা, কিশোর মনে করিয়ে দিল, ছটার খবর শোনা দরকার। চুরি যাওয়া প্লেনের কথা কিছু বলতে পারে।
ছ'টা বাজার মিনিটখানেক আগে রেডিও অন করলো সে। খবরের জন্যে কান পেতে রইলো। অবশেষে শুরু হলো খবর। নানারকম খবর পড়ছে সংবাদ পাঠক। ওরা যখন হতাশ হয়ে ভাবতে আরম্ভ করেছে প্লেনের কথা কিছু বলবেই না, তখনই বলা হলোঃ কাল রাতে বাটারফ্লাই হিল এয়ারপোর্ট থেকে চুরি যাওয়া বিমান দুটো পাওয়া গেছে। দুটোই সাগরে পড়েছে। ওগুলোকে পানির তলা থেকে টেনে তোলার ব্যবস্থা হচ্ছে। দুই পাইলটের একজনকেও পাওয়া যায়নি। ধারণা করা হচ্ছে, পানিতে ডুবে মারা গেছে ওরা।…
অন্য খবরে চলে গেল সংবাদ পাঠক।
রেডিও বন্ধ করে দিয়ে সবার মুখের দিকে তাকালো কিশোর। পড়লো কিভাবে? নিশ্চয় ঝড়ে। তাহলে চোরেরা আর যন্ত্র বিক্রি করতে পারলো না।
কিন্তু জনির ভাই তো মারা পড়লো? ফ্যাকাসে হয়ে গেছে জিনার চেহারা।
চোরই যদি হয়ে থাকে জ্যাক ম্যানর, রবিন বললো, তার জন্যে দুঃখ করে লাভ নেই।
কিন্তু সে চোর নয়, প্রতিবাদ করলো জিনা। চোরের মতো লাগেনি।
আমার কাছেও লাগেনি, মুসা বললো।
রবিন ঠিকই বলেছে, কিশোর বললো।চোর হলে দুঃখ করে লাভ নেই। আর চোর না হয়ে থাকলে তো প্লেনেও থাকবে না, মরেওনি, দুঃখ করা প্রয়োজনই হবে না

আমাদের। তবে মারা গিয়ে থাকলে জনি বেচারা খুব কষ্ট পাবে। জ্যাক তার কাছে আর হিরো থাকবে না।
হ্যাঁ, মাথা দোলালো রবিন। জ্যাক সত্যি সত্যি মারা গিয়ে থাকলে আর আমাদের এখানে থাকা চলবে না। সারাক্ষণ মন খারাপ করে থাকবে জনি, আমাদের মজা নষ্ট হবে। আর কোনো আনন্দ পাবো না এখানে থেকে।
ভুল বললে, কিশোর বললো, মারা গিয়ে থাকলে আরও বেশিদিন এখানে থাকা উচিত আমাদের। জনিকে খুশি রাখার জন্যে। আমরা চলে গেলে সান্ত্বনা দেয়ার কেউ থাকবে না, ও আরও বেশি মনমরা হয়ে যাবে।
হ্যাঁ, ঠিকই বলেছো তুমি, একমত হলো মুসা। দুঃখের দিনে পাশেই যদি না থাকলো, বন্ধুবান্ধব কিসের জন্যে?
সে-ও নিশ্চয় খবরটা শুনেছে, জিনা বললো। কি মনে হয়, তোমাদের জন্যে ওক গাছের নিচে অপেক্ষা করবে আর?
জানি না, কিশোর বললো। না থাকলেও অসুবিধে নেই। আমাদের তো দুজনেরই যাবার কথা ছিলো। ও তো জোর করে ঢুকলো। যা খুশি ঘটুক, খামারের রহস্যের কিনারা না করে আমি যাচ্ছি না এখান থেকে।
বসে থাকলে সময় কাটতে চায় না, তাই পাহাড়ের ওদিকে ঘুরতে বেরোলো ওরা। ফিরে এলো কিছুক্ষণ পর। আটটায় রাতের খাওয়া শেষ করে আবার রেডিও অন করলো। নটার সংবাদ শুনবে।
কিন্তু নটার সংবাদে আর নতুন কিছু বললো না। ছটায় যা বলেছিলো, তা-ই বললো।
রেডিও বন্ধ করে দিয়ে ফীগ্লাস চোখে লাগিয়ে এয়ারফীল্ডে কি হচ্ছে না হচ্ছে দেখতে চললো কিশোর।
লোকজনের চলাফেরা আর খুব একটা দেখা যাচ্ছে না, বললো সে। শান্ত হয়ে আসছে সব। জ্যাক আর রিডের বন্ধুরা বোধহয় খুব শক পেয়েছে খবর শুনে।
আচ্ছা, আমরা শুনলাম, অথচ ওরা কেউ কাল রাতে প্লেন দুটো উড়তে শুনলো? প্রশ্ন তুললো জিনা।
না শোনার তো কথা নয়, রবিন বললো।
তাহলে বাধা দিলো না কেন?
ঝড়ের জন্যে হয়তো প্রথমে বুঝতে পারেনি কিছু। তারপর তো উড়েই চলে গেল। তখন আর কিছু করার ছিল না।
তা-ই হবে, মাথা ঝাঁকালো জিনা।
আমরা সাড়ে দশটায় রওনা হবো, কিশোর বললো। তোমরা শোয়ার ব্যবস্থা করছে না কেন?

সে করা যাবে, যাও না আগে তোমরা, জিনা বললো। রাফিকে নিয়েই যাও, বুঝেছো? ওই ডাইনী বুড়িটা কি করে বসে ঠিক নেই! তার ওপর রয়েছে কালো চশমাওয়ালা লোকটা। পাজি লোক।
তোমরা এই পাহাড়ে একা থাকবে, রাফিকে তোমাদেরই বেশি দরকার। আমাদের কিছু হবে না। বারোটার মধ্যেই ফিরে আসবো।
খোলা আকাশের নিচে বসে কথা বলছে ওরা। আজ আর মেঘ নেই, ফলে ভাবতে ঢোকারও দরকার নেই। ঝকঝকে তারাজলা আকাশের দিকে তাকিয়ে এখন কল্পনাই করা যায় না, গত রাতে এই সময় কি প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি ছিলো।
ঘড়ি দেখলো কিশোর। যাবার সময় হয়েছে। মুসা, ওঠো।
রবিন আর জিনাকে সাবধানে থাকতে বলে রওনা হলো দুজনে। আকাশ পরিষ্কার বটে, কিন্তু অন্ধকার যথেষ্ট আছে। খোলা অঞ্চলে এমনিতেই অন্ধকার কিছুটা কম লাগে, কিন্তু তারপরেও যা আছে, অনেক।
তবু সাবধানে থাকতে হবে আমাদের, নিচু গলায় বললো কিশোর। কেউ যাতে দেখে না ফেলে।
সোজা চলে এলো ওরা খামারের পেছনের বড় ওক গাছটার কাছে। জনি নেই। তবে মিনিট দুয়েক পরেই খসখস শব্দ শোনা গেল। জনি এলো। হাঁপানো দেখেই অনুমান করা গেল ছুটে এসেছে।
সরি, দেরি হয়ে গেল, ফিসফিস করে বললো সে। ছটার খবর শুনেছো?
শুনেছি, জবাব দিলো কিশোর। খুব খারাপ লেগেছে আমাদের।
আমাদের লাগেনি, জনি বললো। আমি জানি, জ্যাক ভাইয়া আর রিড ওগুলোতে ছিলো না। যদি মরেই থাকে, দুটো চোর মরেছে। চোরের জন্যে দুঃখ করতে যাব কেন?
না, কোনো কারণ নেই, কিশোর বললো। মনে মনে অবশ্য সে জনির মতো নিশ্চিত হতে পারলো না যে বিমান দুটোতে ওই দুইজন ছিলো না।
তা এখন কি করবে, ভেবেছো কিছু? জনি জিজ্ঞেস করলো। কটেজের জানালায় আলো দেখছি, পর্দা টানেনি বোঝাই যায়। গিয়ে উঁকি দিয়ে দেখতে পারি ভেতরে কি হচ্ছে।
তা-ই করবো। এসো। সাবধান, একটু শব্দও যেন না হয়। আমার পেছনে, একসারিতে এসো।
পা টিপে টিপে কটেজের দিকে এগিয়ে চললো ওরা।
নিঃশব্দে কটেজের কাছে চলে এলো তিনজনে।
জানালার বেশি কাছে যাবে না, সতর্ক করলো কিশোর, ফিসফিস করে কথা বলছে। যতোটা না গেলে নয় ঠিক ততোটা। আমরা দেখবো, কিন্তু আমাদের যেন

দেখে না ফেলে।
ওটা বোধহয় রান্নাঘরের জানালা, মুসা বললো। মিসেস ডেনভার হয়তো ওখানেই থাকে। ঘুমিয়েছে কিনা কে জানে!
জানালার কাছে এসে দাঁড়ালো ওরা। পর্দা নেই। একটা মাত্র মোম জ্বলছে ঘরে। আলোর চেয়ে ছায়াই বেশি।
ঘুমায়নি মিসেস ডেনভার। বাদামী রঙের একটা রকিং চেয়ারে বসে ধীরে ধীরে দুলছে সামনে পেছনে। পরনে ময়লা ড্রেসিং গাউন। মুখ দেখা যাচ্ছে না স্পষ্ট, তবু কিশোরের মনে হলো, ভয় পাচ্ছে মহিলা। কোনো কারণে অস্বস্তিতে ভুগছে। বুকের ওপর ঝুলে পড়েছে মাথাটা। মাঝে মাঝে কাঁপা হাতে সরিয়ে দিচ্ছে মুখের ওপর এসে পড়া ধোঁয়াটে চুল।
না, ডাইনী নয়! ফিসফিসিয়ে বললো মুসা। এখন শিওর হলাম। ডাইনী হলে ওভাবে ভয় পেতো না। এখন বসে বসে তপজপ করতো। আসলে ও অতি সাধারণ এক বৃদ্ধা।
এত রাত পর্যন্ত জেগে রয়েছে কেন? নিজেকেই যেন প্রশ্নটা করলো কিশোর। কারো অপেক্ষা করছে নিশ্চয়।
আমারও সেরকমই মনে হচ্ছে, জনি বললো। আরও হুঁশিয়ার থাকতে হবে আমাদের। বলে চট করে একবার পেছনে তাকিয়ে নিলো সে, পেছন থেকে এসে ঘাড়ের ওপর কেউ পড়ছে কিনা দেখলো।
চলো, ঘুরে বাড়ির সামনের দিকে চলে যাই, মুসা বললো।
সামনের দিকেও একটা আলোকিত জানালা দেখা গেল। রান্নাঘরের চেয়ে অনেক বেশি আলো এখানে। কারও চোখে পড়ে যাওয়ার ভয়ে কাঁচের শার্সির কাছ থেকে দূরে রইলো ওরা। টেবিলের সামনে বসে থাকতে দেখা গেল দুজন লোককে, একগাদা কাগজ ঘাটাঘাটি করছে।
মিস্টার ডাউসন, নিচু গলায় বললো কিশোর। অন্য লোকটা নিশ্চয় তাঁর বন্ধু ডরি। চোখে চশমা তো সত্যিই নেই। এই লোকের সঙ্গে দেখা হয়নি আমাদের, টাকাও এই লোক দেয়নি। যে দিয়েছিলো তার সঙ্গে এর কোনো মিল নেই।
লোকটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে তিনজনে। অতি সাধারণ চেহারা, আর দশজনের মাঝখান থেকে আলাদা করে চেনা যাবে না। ছোট গোঁফ, কালো চুল, বড় নাক।
কি করছে? জনির প্রশ্ন।
কোনো কিছু লিস্ট করছে, কিশোর বললো। বোধহয় কাস্টোমারদের। বিলটিল বানাবে আরকি। মিস্টার ডাউসন ঠিকই বলেছিলেন, আমাদেরকে যে টাকা দিয়েছে সে ডরি নয়। তারমানে কাল রাতে পাহাড়ে জাল হাতে এই লোককে দেখিনি।

তাহলে সে কে? বলে জানালার কাছ থেকে টেনে দুজনকে সরিয়ে আনলো মুসা, সহজভাবে কথা বলার জন্যে। আর কেনই বা জাল হাতে পাহাড়ে গেল সে? মথ শিকারের মিথ্যে গল্প শোনালো? আর যে রাতে প্লেনগুলো চুরি গেল, ঠিক সেই রাতেই কেন?

ঠিক, কেন? মুসার সুরে সুর মেলালো জনি। আরও আস্তে কথা বলার জন্যে তাকে কনুইয়ের গুতো লাগালো কিশোর। কাল রাতে নিশ্চয় রহস্যময় কিছু ঘটেছিলো পাহাড়ে, আস্তেই বললো সে। এমন কিছু, যে ব্যাপারে লোকে কিছুই জানে না। কিশোর, তোমরা তো গোয়েন্দা। ধরো না ওই লোকটাকে, যে নিজেকে ডরি বলে চালিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছে। খুঁজে বের করো তাকে। জিজ্ঞেস করো এসবের মানে কি?

করবো, কথা দিলো কিশোর। এখন দেখি, আর কোনো জানালায় আলো আছে কিনা?...আছে, ওই যে একটায়। ছাতের ঠিক নিচে। কে থাকে ওখানে?

হয়তো বুড়ির ছেলে, আন্দাজ করলো মুসা। থাকতেও পারে, জনি বললো। কিন্তু দেখবো কিভাবে?

উপায় আছে, কিশোর বললো, দিনের বেলায় দেখেছি। পলকের জন্যে টর্চ জ্বেলেই নিভিয়ে ফেললো সে, যাতে কাছেই ছাউনির বেড়ায় ঠেস দিয়ে রাখা মইটা ওরা দেখতে পারে।

যা, দেখা যাবে, মুসা বললো। তবে খুব আস্তে আস্তে আনতে হবে ওটা। শব্দ করা চলবে না। মই লেগে সামান্য ঘষার আওয়াজ হলেও ওঘরে যে আছে, উঁকি দিয়ে দেখতে আসবে।

তিনজনে মিলে বয়ে আনবো, শব্দ হবে কেন? জানালাটা বেশি ওপরে না, মইটাও লম্বা না যে বেশি ভারি হবে।

সত্যি বেশি ভারি না মইটা। বয়ে এনে আস্তে করে কটেজের দেয়ালে ঠেকাতে কোনো অসুবিধেই হলো না ওদের। শব্দ হলো না।

আমি আগে উঠি, কিশোর বললো। মইটা শক্ত করে ধরে রাখো। আর আশেপাশে নজর রাখবে। কারও সাড়া পেলে কিংবা কাউকে আসতে দেখলে সতর্ক করে দেবে আমাকে। মইয়ের ওপর আটকে থেকে বিপদে পড়তে চাই না।

দুদিক থেকে মইটাকে শক্ত করে ধরে রাখলো জনি আর মুসা। বেয়ে ওপরে উঠলো কিশোর। জানালার চৌকাঠের কাছে পৌঁছে সাবধানে মাথা তুললো।

এই ঘরেও মাত্র একটা মোম জ্বলছে। খুব ছোট ঘর। আসবাবপত্র নেই বললেই চলে। অগোছালো। বিছানায় বসে আছে একজন বিশালদেহী মানুষ। চওড়া কাধ, ভীষণ মোটা বাড়।

লোকটার দিকে একনজর তাকিয়েই নিশ্চিত হয়ে গেল কিশোর, হ্যাঁ, এই লোক মায়ের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতেই পারে। ভয়ানক নিষ্ঠুর চেহারা। মনে পড়লো বৃদ্ধার কথাঃ আমাকে মারে সে! হাত মুচড়ে দেয়! খুব খারাপ লোক!
মোমের কাছে ধরে একটা খবরের কাগজ পড়ছে লোকটা।
কিছুক্ষণ পর পকেট থেকে একটা ঘড়ি বের করে সময় দেখলো। বিড়বিড় করে কি বললো, বোঝা গেল না। তারপর উঠে দাঁড়ালো লোকটা। ভয় পেয়ে গেল কিশোর, জানালার কাছে চলে আসবে না তো সে? আর এখানে থাকা যায় না। শব্দ না করে যতো তাড়াতাড়ি পারলো নেমে এলো মই বেয়ে।
মিসেস ডেনভারের ছেলে, বন্ধুদেরকে জানালো সে। ও জানালার কাছে আসবে এই ভয়ে তাড়াহুড়ো করে নেমেছি। জনি, তুমি গিয়ে একবার দেখে এসো। তাহলে পুরোপুরি শিওর হওয়া যাবে যে ওই লোকটাই টেড ডেনভার।
মই বেয়ে উঠে গেল জনি। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নেমে এলো আবার। হ্যাঁ, টেডই। আশ্চর্য! এতোখানি বদলে গেল! শয়তানের মতো লাগছে আজ। অথচ কয়েক দিন আগেও এতোটা খারাপ লাগেনি। মা সন্দেহ করতো, খারাপ লোকের সঙ্গে ওঠাবসা আছে তার। অনেক বেশি মদ খায়। ওই করে করেই এরকম চেহারা হয়েছে।
এমনভাবে ঘড়ি দেখলো, কিশোর বললো, যেন কারো আসার অপেক্ষা করছে। আমাদেরকে যে টাকা দিলো, কাল রাতে পাহাড়ে গেল, সেই চশমা পরা লোকটার জন্যে নয় তো? নিশ্চয় কোনো খারাপ মতলব আছে ব্যাটাদের। নইলে মিথ্যে কথা বলবে কেন?
এসো, জনি বললো, কোথাও লুকিয়ে থাকি। দেখবো, কি করে?
হ্যাঁ। ওই গোলাঘটায় চলো।
নিঃশব্দে ভাঙা বাড়িটার কাছে চলে এলো ওরা। ছাতের অনেকখানি নেই। দেয়ালও বেশির ভাগই ধসে পড়েছে। পুরোপুরি ধসে পড়ার অপেক্ষাতেই যেন এখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ধুকছে ভাঙা বাড়িটা। ভাপসা গন্ধ। নোংরা। বসার কোনো পরিষ্কার জায়গাই নেই। আশাও করেনি কিশোর। ধুলো লেগে থাকা কয়েকটা পুরানো বস্তা এককোণে টেনে নিয়ে গিয়ে বসে পড়লো তার ওপরেই।
খাইছে! কি গন্ধরে বাবা! নাক সিঁটকালো মুসা। আলু পচেছে। এখানে বসা যাবে না। চলো, আর কোথাও যাই।
শশশ! হুঁশিয়ার করলো কিশোর। একটা শব্দ শুনলাম!
চুপ করে বসে কান পাতলো ওরা। শব্দটা তিনজনেই শুনতে পাচ্ছে। খুব হালকা পায়ে এগিয়ে আসছে কেউ। পায়ে রবার সোলের জুতো, সেজন্যেই বেশি শব্দ হচ্ছে না। চলে গেল গোলাঘরের পাশ দিয়ে। তারপর শোনা গেল মৃদু শিস।

উঠে দাঁড়িয়ে ভাঙা জানালা দিয়ে উঁকি দিলো কিশোর। দুজন লোক, জানালো সে। টেডের জানালার নিচে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের জন্যেই নিশ্চয় অপেক্ষা করছিলো টেড। ওই যে, টেড নামছে মনে হয়। এখানে না আবার কথা বলতে চলে আসে!

সরে যাওয়া উচিত। কিন্তু আর সময় নেই। কটেজের সামনের দরজা খোলার আওয়াজ হলো। বেরিয়ে এলো টেড। এখনও তাকিয়েই রয়েছে কিশোর। সামনের জানালা দিয়ে মিস্টার ডাউসনের ঘর থেকে এসে পড়া স্নান আলোয় আবছামতো দেখতে পাচ্ছে লোকগুলোকে।

গোলাঘরের দিকে এলো না ওরা। কটেজের কোণ ঘুরে নিঃশব্দে চলে গেল তিনজনেই।

এসো, জরুরী গলায় বললো কিশোর, পিছু নেবো। ব্যাটাদের কথা শুনতে হবে। তাহলে বোঝা যাবে কি করছে।

কটা বাজে? মুসা বললো। আমাদের দেরি দেখলে রবিনরা না আবার চিন্তা করে।

বারোটা বেজে গেছে, স্যুমিনাস ডায়াল ঘড়ি দেখে বললো কিশোর। ওরা বুঝবে, জরুরী কোনো কাজে জড়িয়ে গেছি আমরা।

পা টিপে টিপে কটেজের অন্যপাশে বেরিয়ে এলো ওরা। লোকগুলোকে দেখা গেল কাঁচের ঘরের ওপাশে কয়েকটা গাছের গোড়ায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। কথা বলছে, কিন্তু এতো নিচু গলায়, কিছু বোঝা যায় না এখান থেকে।

তারপর গলা চড়ালো একজন লোক। জনি চিনতে পারলো, টেড ডেনভার। কোনো কারণে রেগে গেছে। খুব বদমেজাজী। যদি বোঝে তাকে ঠকানোর চেষ্টা হচ্ছে, তাহলে আর এক মুহূর্ত শান্ত থাকতে পারে না।

অন্য দুজন তাকে শান্ত করার চেষ্টা করলো। কিন্তু লাভ হলো না। চিৎকার করে বললো টেড, আমি কিছু শুনতে চাই না। আমি আমার টাকা চাই। তোমরা যা যা করতে বলেছে, তাই করেছি। তোমাদের সাহায্য করেছি, এখানে এনে লুকিয়ে রেখেছি। কাজ শেষ হয়ে গেছে, এখন আমার টাকা দাও।

এতো জোরে কথা বলছে সে, ভয় পেয়ে গেল অন্য দুজন। তারপর ঠিক কি ঘটলো, বুঝতে পারলো না ছেলেরা। কানে এলো, একটা ঘুসির শব্দের পর পড়ে গেল একজন। তারপর আরেকটা ঘুসি, আরেকজন পড়ে গেল। খিকখিক করে হেসে উঠলো টেড। কুৎসিত হাসি।

কয়েক সেকেণ্ড পরেই কটেজের জানালায় দেখা দিলো মিস্টার ডাউসন আর ডরির মুখ। শোনা গেল উদ্বিগ্ন কণ্ঠ, কে ওখানে? কি হয়েছে?

ঝনঝন করে কাঁচ ভাঙলো। বড় একটা পাথর কুড়িয়ে নিয়ে কাঁচের ঘর সই করে ছুঁড়েছে টেড। এতো জোরে হলো আওয়াজ চমকে গেল কিশোররা।

কিছু না, স্যার, চেঁচিয়ে জবাব দিলো টেড। কে যেন ঘোরাফেরা করছিলো এখানে। চোর মনে করে দেখতে বেরোলাম। ঠিকই আন্দাজ করেছি। আমার সাড়া পেয়েই বোধহয় দৌড়ে পালাতে গিয়ে কাঁচের ঘরের ওপর পড়ে কাচ ভেঙেছে।

ধরতে পারলে না?

চেষ্টা তো করলাম। পালালো। তারপর যেন ভাগ্য তার প্রতি সদয় হয়েই দেখিয়ে দিলো তিন কিশোরকে। টর্চ জ্বাললো সে। আর আলো এসে পড়লো একেবারে কিশোরদের ওপর। চেঁচিয়ে উঠলো সে, কে? এই তো, পেয়েছি। তোমরাই, অ্যাঁ? তাহলে তোমরাই এসেছো চুরি করতে? কাঁচের ঘরের দেয়াল ভেঙেছো? দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা!

পালানোর চেষ্টা করলে অবশ্য সবাই ধরা পড়তো না, কিন্তু সে চেষ্টা করলো না ওরা। জনি আর মুসার কজি চেপে ধরলো টেড। অবাক হলো মুসা। সাংঘাতিক জোর লোকটার গায়ে। হাতই নাড়াতে পারছে না সে, এতো জোরে ধরেছে।

বেরিয়ে এলেন মিস্টার ডাউসন আর ডরি। কিশোরকে ধরলেন।

এখানে কি করছো? কাচের ঘর ভাঙলে কেন? রেগেমেগে বললো ডাউসন। ভাঙা ফোকর দিয়ে এখন আমাদের সমস্ত প্রজাপতি বেরিয়ে যাবে!

ছাড়ুন, হাত ছাড়ন, কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করলো কিশোর। আমরা ভাঙিনি।

ও-ই ভেঙেছে! চিৎকার করে বললো টেড। আমি দেখেছি।

মোটেই দেখোনি, মিথ্যুক কোথাকার। ভাঙলে তো তুমি! এখন বলছো আমাদের নাম! পাল্লা দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো জনি। ছাড়ো আমাকে। আমি জোনার কলিউড। ভালো চাইলে ছাড়ো আমাকে, নইলে আমার বাবা তোমার মুণ্ডু চিবিয়ে বাবে!

ও জনি, দাঁত বের করে হাসলো টেড। জোনার কলিউড। যার বাবা টেডকে খারাপ লোক বলে ফার্মে চাকরি দিতে চায় না। অথচ দিনমজুরী করাতে বাধে না। দাঁড়াও, এইবার পেয়েছি সুযোগ। অপমানের প্রতিশোধ নেববা আমি। মুরগী চুরি করতে আসার অপরাধে পুলিশ যখন তার ছেলেকে কান ধরে টেনে নিয়ে যাবে, তখন টের পাবে কে খারাপ আর কে ভালো।

ডাউসনকে বোঝানোর চেষ্টা করলো কিশোর, কিন্তু তিনিও কিছুই শুনতে চাইলেন না।

মুসা আর জনিকে টানতে টানতে ছাউনির দিকে চললো টেড। ডাউসন আর ডরিকে বললো, ওদেরকেও নিয়ে আসুন। সারারাত অন্ধকার ঘরে বন্দী থাকলে সকালে আপনিই তেজ কমে যাবে।

হাত ছাড়ানোর কোনো চেষ্টাই করলো না কিশোর।

এই সময় শোনা গেল কুকুরের ঘেউ ঘেউ।
রাফিয়ান! শান্তকণ্ঠে কিশোর বললো, কামড় খেতে না চাইলে হাত ছাড়ন।
রাফি! রাফি! চেঁচিয়ে ডাকলো মুসা। এদিকে আয়! আমরা এখানে!
এমন বিকট গর্জন করে উঠলো রাফিয়ান, টেড পর্যন্ত ভয় পেয়ে গেল। লাফিয়ে কাছে চলে এলো। কামড় বসানোর আগে টেডের পায়ের কাছে মুখ এনে খটাস করে বন্ধ করলো হাঁ। ভয় দেখানোর জন্য। দাঁতে দাঁতে বাড়ি খেয়ে যে আওয়াজ হলো, তাতেই ভয়ে সিটিয়ে গেল টেড। কখন যে ছেড়ে দিলো মুসা আর জনিকে নিজেই বলতে পারবে না। ডাউসন আর ডরি কিশোরকে ছেড়ে দিয়ে আগেই দৌড় দিয়েছে দরজার দিকে।
টেডও তাদের পিছু নিলো। তেড়ে গেল রাফি।
চলো দেখি, কিশোর বললো, লোক দুটোর কি হলো?
কিন্তু নেই ওরা। ঘুসি খেয়ে পড়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু গোলমালের সুযোগে গা ঢাকা দিয়েছে।
পালিয়েছে! জনি বললো। তো, এখন? আর তো কিছু করার নেই এখানে?
না, কিশোর বললো। আমরা ক্যাম্পে ফিরে যাবো। খুব একটা কিছু জানতে পারলাম না। শুধু জানা গেল, ডাউসন সত্যি কথাই বলেছেন, চশমাওয়ালা লোকটা ডরি নয়। টেড ডেনভার খারাপ লোক, বাজে লোকের সঙ্গে তার মেলামেশা…
এবং ওদেরকে কোনোভাবে সাহায্য করেছে, কিশোরের কথাটা শেষ করলো মুসা। ওদেরকে এখানে এনে লুকিয়েছে। কাজের বিনিময়ে পয়সা পায়নি। কিন্তু কাজটা কি করেছিলো?
জানি না। মাথা আর কাজ করছে না এখন। চলো, গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। কাল এসব নিয়ে ভাববো। জনি, বাড়ি চলে যাও।
অধীর হয়ে অপেক্ষা করছে রবিন আর জিনা। কিশোরদেরকে দেখেই বলে উঠলো, কি ব্যাপার? কি হয়েছিলো? এতো রাত করলে? রাফি তাহলে ঠিকমতোই খুঁজে পেয়েছে তোমাদের?
এক্কেবারে সময়মতো, হেসে বললো মুসা। আমাদের দেরি দেখে পাঠিয়েছিলে, না?
হ্যাঁ, জিনা বললো। আমরাও যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু রবিন বললো, আগে রাফিই যাক। ও যদি না ফেরে তাহলে আমরা যাবো। তা হয়েছিলো কি?
সব কথা ওদেরকে জানালো মুসা আর কিশোর।
অবাক কাণ্ড! রবিন বললো। হচ্ছেটা কি ওই প্রজাপতির খামারে! টেড ওই লোক দুটোকে কি সাহায্য করেছে? কিভাবে বের করা যায়, বলো তো?

হাজার চেষ্টা করেও টেডের কাছ থেকে জানা যাবে না, কিশোর বললো। দেখি, কাল আবার যাবো খামারে। টেড যদি তখন না থাকে, তার মাকে ফুসলেফাঁসলে কিছু কথা আদায়ের চেষ্টা করবো।
হ্যাঁ, ওই মহিলা নিশ্চয় অনেক কিছু জানে, রবিন বললো। দুজন লোককে কটেজে লুকিয়ে রেখেছিলো তার ছেলে। এর মানে ওদের খাওয়া মিসেস ডেনভারকেই জোগাতে হয়েছে। কিন্তু বলবে তো?
সেটা কাল দেখা যাবে। কথা বলতে আর ভাল্লাগছে না এখন। আমি ঘুমাতে যাচ্ছি।
পরদিন বেশ বেলা করে ঘুম ভাঙলো ওদের।
ভাঁড়ারে গিয়ে দেখা গেল, খাবার ফুরিয়েছে। কিশোর আশা করলো, জনি ওদের জন্যে খাবার নিয়ে আসবে। আর যদি না-ই আসে, ওরাই যাবে ফার্মে, খাবার আনতে। রুটি, মাখন আর সামান্য পনির দিয়ে নাস্তা সেরে বসে রইলো জনির অপেক্ষায়।
এখান থেকে সোজা প্রজাপতির খামারে যাবো আমরা, কিশোর বললো। রবিন, মিসেস ডেনভারের সঙ্গে কথাবার্তা তুমিই বলবে। তোমার কথার জবাব হয়তো দিতে পারে। কারণ টাকাটা তুমিই তার হাতে দিয়েছে। কাজেই চক্ষুলজ্জার খাতিরে হলেও কিছু বলে ফেলতে পারে।
ঠিক আছে, মাথা কাত করলো রবিন। তা যাবো কখন? এখনই?
দেখি আরেকটু। জনি আসে কিনা।
জনি এলো না। প্রজাপতির খামারে রওনা হলো গোয়েন্দারা।
কটেজের কাছে এসে সাবধান হলো ওরা। টেড-এর সামনে পড়তে চায় না। কিন্তু কটেজে সে আছে বলে মনে হলো না। এমনকি প্রজাপতি মানবদেরও দেখা গেল না।
প্রজাপতি ধরতে বেরিয়েছে হয়তো, মুসা বললো। ওই যে, মিসেস ডেনভার। কতগুলো কাপড় ধুয়েছে দেখেছো? খুব পরিশ্রম হয়েছে বোধহয়। দড়িতে টানাতেই হাত কাঁপছে এখন। রবিন, যাও, ওকে সাহায্য করো।
মহিলার কাছে চলে এলো রবিন। মিষ্টি হেসে জিজ্ঞেস করলো, এই যে মিসেস ডেনভার, কেমন আছেন?...আহহা, অনেক কষ্ট হচ্ছে তো আপনার। দিন, আমি মেলে দিই। মহিলার মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলো। ডান চোখের চারপাশ কালো হয়ে ফুলে উঠেছে। আরে, আপনার চোখে কি হলো?
মিসেস ডেনভারের কাছ থেকে কাপড়ের বালতিটা নিয়ে নিলো রবিন। বাধা দিলো না মহিলা। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রবিনের কাজ দেখতে লাগলো।
মিস্টার ডাউসন আর মিস্টার ডরি কোথায়? জিজ্ঞেস করলো রবিন।

বিড়বিড় করে যা বললো মহিলা, বুঝতে বেশ অসুবিধে হলো রবিনের। কথার মর্মোদ্ধার করতে পারলো শুধু, দুজনে প্রজাপতি ধরতে বেরিয়েছে।
আপনার ছেলে টেড কোথায়? আবার প্রশ্ন করলো রবিন।
হঠাৎ ফোঁপাতে আরম্ভ করলো মহিলা। নোংরা অ্যাপ্রন তুলে মুখ ঢেকে এগোলো রান্নাঘরের দিকে।
আশ্চর্য! আনমনে বিড়বিড় করলো রবিন। হলো কি আজ মহিলার! কাপড় মেলা বাদ দিয়ে তাড়াতাড়ি তার পেছনে পেছনে গেল সে। ধরে বসিয়ে দিলো রকিং চেয়ারটায়।
মুখ থেকে কাপড় সরিয়ে রবিনের দিকে তাকালো মহিলা। তুমিই আমাকে ডলারটা দিয়েছিলে; না? রবিনের হাতে আলতো চাপড় দিয়ে বললো, খুব ভালো ছেলে তুমি। মনটা খুব নরম। জানো, কেউ ভালো ব্যবহার করে না আমার সঙ্গে। আর আমার ছেলেটা তো একেবারেই না। যখন তখন শুধু মারে।
আপনার চোখে ঘুসি মেরেছিলো, না? নরম গলায় সহানুভূতির সুরে বললো রবিন। কবে? কাল?
হ্যাঁ। টাকা চাইছিলো। ও সব সময় আমার কাছে টাকা চায়। আবার ফুপিয়ে উঠলো মহিলা। টাকা দিতে পারিনি বলে মেরেছে। তারপর পুলিশ এসে ধরে নিয়ে গেল ওকে।
কি বললেন! পুলিশ! নিশ্চয় আজ সকালে। অবাক হয়ে গেছে রবিন। পায়ে পায়ে অন্যেরাও এসে দাঁড়িয়েছে দরজার কাছে, তাদের কানেও গেছে কথাটা।
পুলিশ বললো, সে নাকি চোর, ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললো মিসেস ডেনভার। মিস্টার হ্যারিসনের হাঁস চুরি করেছে। আগে এরকম ছিলো না আমার ছেলে। ওই শয়তান লোকগুলো এসেই তার সর্বনাশ করেছে, তাকে বদলে দিয়েছে।
কোন লোক? মহিলার হান্ডি-সর্বস্ব হাতে হাত বুলিয়ে দিয়ে রবিন বললো, আমাদেরকে সব খুলে বলুন, সব ঠিক হয়ে যাবে। আমরা আপনাকে সাহায্য করবো।
ওই লোকগুলো তাকে নষ্ট করেছে!
কোন লোক? কোথায় থাকে ওরা? এখনও কি এখানে লুকিয়ে আছে?
ওরা চারজন, এতো নিচু গলায় বললো মহিলা, শোনার জন্যে মাথা নিচু করে কান পাততে হলো রবিনকে। আমার ছেলেকে এসে বললো, ওদেরকে যদি খামারে লুকিয়ে থাকার ব্যবস্থা করে দেয়, তাহলে অনেক টাকা দেবে। বদলোক ওরা, নিশ্চয় কোনো খারাপ মতলব আছে, তখনই বুঝেছি। ওপরে আমার শোবার ঘরে বসে কানাকানি, ফিসফাঁস করতো ওরা, দরজায় আড়ি পেতে সব শুনেছি।
মতলবটা কি ওদের, জানেন?হৃৎপিণ্ডের গতি দ্রুত হয়ে গেছে রবিনের।

কোনো কিছুর ওপর নজর রাখছিলো ওরা। পাহাড়ের ওদিকের কোনো কিছুর ওপর। কখনও দিনে, কখনও রাতে। আমার শোবার ঘরটাও দখল করেছিলো ওরা, এখানে ঘুমাতো। আমি ওদের খাবার বেঁধে দিতাম। কিন্তু এর জন্যে একটা পয়সাও দেয়নি আমাকে। জঘন্য লোক!

আবার কাঁদতে লাগলো মহিলা। সবাই এসে ঘরে ঢুকেছে। কোমল গলায় সান্ত্বনা দিলো কিশোর, কাঁদবেন না, মিসেস ডেনভার। এর একটা বিহিত আমরা করবোই।

বাইরে পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল এই সময়। জানালার কাছে এসে দাঁড়ালেন মিস্টার ডাউসন। তোমরা! আবার এসেছে! কিশোর আর মুসার ওপর চোখ পড়তে চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি। তোমাদের শাস্তির ব্যবস্থাও হয়েছে। পুলিশকে সব বলে দিয়েছি। আজ সকালে টেডকে যখন নিতে এসেছিলো তখন। রাতের বেলা আমার প্রজাপতির ঘর ভাঙো! মজা টের পাবে। কত্তোবড় সাহস, আবার এসেছে এখানে!

চলো যাই, জিনা বললো। এখানে আর কথা বলা যাবে না। মিসেস ডেনভারও বোধহয় আর কিছু জানে না। ওর ছেলেটাকে ধরে নিয়ে যাওয়ায় খুব খুশি হয়েছি। আমি। আর এসে মাকে মারতে পারবে না। এমন বদমাশ ছেলে, মাকে মারে...

তোমরাও কি কম নাকি? জানালার বাইরে থেকে বললেন ডাউসন।

চুপ করুন! রেগে গেল জিনা। আপনার সঙ্গে কে কথা বলে? না বুঝে বক বক করেন...

এই মেয়ে, মুখ সামলে কথা বলবে। ধমকে উঠলেন ডাউসন।

জিনাকে আর কিছু বলতে হলো না। প্রচণ্ড ঘাউ করে উঠে লাফিয়ে গিয়ে জানালার কাছে পড়লো রাফি। পারলে জানালা দিয়ে মুখ বের করেই ডাউসনকে কামড়ায়। আর দাঁড়ালেন না ওখানে প্রজাপতি মানব। ঘুরেই দিলেন দৌড়।

রান্নাঘর থেকে বেরোতেই দেখা গেল কাঁচের ঘরগুলোর কাছে দাঁড়িয়ে আছেন ডাউসন।

আমরা যাচ্ছি, শীতল গলায় বললো কিশোর। পুলিশের সাথে দেখা হলে ভালোই হয়। আমাদেরও কথা আছে ওদের সঙ্গে। এখানে অনেক কিছু ঘটছে, আপনি এর কিছুই জানেন না। প্রজাপতি ছাড়া আপনার চোখে আর কিছু পড়ে না।

তাতে তোমার কি, বেয়াদব ছেলে!

আমার কিছু না, আপনারই ক্ষতি হচ্ছে। আপনি কি জানেন, এই বাড়িতে কি সব কাণ্ড ঘটছে? জানেন, টেড ডেনভার তার মাকে ধরে ধরে মারে? চোখে যে কালশিরা পড়েছে মহিলার, আজ সকালে তা-ও নিশ্চয় আপনার চোখে পড়েনি।

পুলিশ আপনাকেও ধরবে। আপনার এখানে যে চার চারটে মানুষ লুকিয়ে থাকতো, দিনরাত আনাগোনা করতো, পুলিশ আপনাকে সেসব কথা জিজ্ঞেস করবে না ভেবেছেন?
কি বলছো তুমি, বদমাশ ছেলে? বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল ডাউসনের মুখ। মানুষ? কেথেকে এলো? কারা?
জানি না। তবে জানতে পারলে ভালো হতো। আর কোনো কথা না বলে দলবল নিয়ে পাহাড়ের দিকে এগোলো কিশোর। পেছনে তাকালে দেখতে পেতো, এখনও হাঁ করে রয়েছেন বিস্মিত প্রজাপতি বিশেষজ্ঞ।
কি মানুষরে বাবা! ঝাঁঝালো কণ্ঠে জিনা বললো। একই বাড়িতে থাকে, অথচ কিছুই দেখে না, খেয়াল করে না! বিজ্ঞানীগুলো সব এক। আমার বাবাকে দেখোনা, খালি থাকে গবেষণা নিয়ে, বাইরের আর কিছু চোখে পড়ে না।
এখন কথা হলো, অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল রবিন, লোকগুলো কে? পাহাড়ে উঠে কিসের ওপর চোখ রাখতো? কেন? কিশোর, ঝড়ের রাতে ওদেরই একজনকে দেখেছিলে। নিজেকে ডরি বলে চালিয়েছে। হাতে ছিলো প্রজাপতি ধরার জাল, যাতে তার এই রাতে ঘোরাঘুরির ব্যাপারে কু প্রশ্ন না তোলে।
হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছে, কিশোর বললো। চোখ রেখেছিলো ওরা এয়ারফীল্ডের ওপর। আমি একটা আস্ত গর্দভ! আগে কেন ভাবলাম না কথাটা? রাতদিন পাহারা দিয়েছে ওরা। দুজন রাতে, দুজন দিনে। দুজন করে লুকিয়ে থেকেছে মিসেস ডেনভারের শোবার ঘরে।
কিশোর, উত্তেজিত হয়ে উঠেছে জিনা, প্লেন চুরির সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই তো?
নিশ্চয় আছে। এছাড়া আর কি? কিন্তু এর সাথে রিড আর জ্যাককে কিভাবে জড়ালো, সেটাই বুঝতে পারছি না। পুলিশকে জানানো দরকার। তবে তার আগে জানানো দরকার, বড় কাউকে। পুলিশ আমাদের কথা বিশ্বাস না-ও করতে পারে। এখানে একমাত্র জনির বাবাকেই বলা যায়।
আমারও তাই মনে হয়, রবিন বললো।
চলো।
পাহাড়ী পথ ধরে প্রায় ছুটে চললো ওরা।
ফার্মের চত্বরে ঢুকেও কাউকে চোখে পড়লো না। একেবারে নির্জন।
জনির নাম ধরে ডাকলো মুসা।
গোলাঘরের দরজায় দেখা দিলে জনি। চেহারা ফ্যাকাসে। রাতে নিশ্চয় ভালো ঘুম হয়নি। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, কি ব্যাপার? খুব উত্তেজিত মনে হচ্ছে?
তোমার বাবা কোথায়? কিশোর জিজ্ঞেস করলো। জরুরী কথা আছে।

দীর্ঘ এক মহূর্ত কিশোরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো জনি। আর কোনো প্রশ্ন করলো না। মাঠের দিকে তাকিয়ে-যেখানে লাল-সাদা গরুগুলো চরছেচেঁচিয়ে বাবাকে ডাকলো সে।
ডাক শুনে তাড়াহুড়ো করে এগিয়ে এলেন মিস্টার কলিউড। কি ব্যাপার? বাবা, কিশোর কি যেন বলবে তোমাকে।
এক এক করে ছেলেমেয়েদের মুখের দিকে তাকালেন কলিউড। বললেন, তোমরাই তাহলে জনির বন্ধু। গুড়। তা কি বলবে?
আপনি নিশ্চয় খুব ব্যস্ত, কিশোর বললো। বেশি দেরি করাবো না। সংক্ষেপে সব কথা বলতে লাগলো সে। প্রজাপতির খামারে কাকে কাকে দেখেছে, পাহাড়ের ওপর কাকে দেখেছে, খামারের বৃদ্ধা মহিলা আর তার ছেলের কথা...টেডের কথায় আসতেই মাথা ঝাঁকালেন কলিউড। অতো খারাপ ছিলো
আগে। বছরখানেক আগে থেকে শুরু হয়েছে, যখন অসৎ-সঙ্গে পড়লো।
ওর সঙ্গীদের কয়েকজনের সাথে দেখা হয়েছে কাল রাতে, গতরাতের অভিযানের কথা খুলে বললো কিশোর। সকালে খামারে গিয়েছিলো, মিসেস ডেনভারের সাথে কি কি কথা হয়েছে, তা-ও জানালো।
খারাপ কাজ করলে শাস্তি পেতেই হবে, আনমনে বললেন কলিউড। সব কথা বলতে হবে তাকে, কাকে কাকে জায়গা দিয়েছিলো, কেন দিয়েছিলো, ওরা কারা, সঅব। আমারও মনে হচ্ছে পেন চুরির সঙ্গে এসবের সম্পর্ক আছে।
উত্তেজনায় লাল হয়ে গেছে জনির মুখ। বাবা, আমার মনে হয় ওই লোকগুলোই প্লেন চুরি করেছে! চারজন তো। সহজেই জ্যাক ভাইয়া আর রিডকে ধরে, বেঁধে সরিয়ে ফেলতে পারে। তারপর দুজনে দুটো প্লেন উড়িয়ে নিয়ে যাওয়াটা কিছু না, প্লেন চালানো জানলেই হলো। সেটা তো আজকাল অনেকেই জানে। নিয়েছে ওই হারামজাদারা, মাঝখান থেকে দোষী হলো আমার ভাই।
হ্যাঁ, ঠিকই বলেছো, বাবাও একমত হলেন। এখন তাড়াতাড়ি পুলিশকে জানানো দরকার। টেডকে চাপ দিলেই গড়গড় করে সব বলে দেবে। জ্যাক আর রিডকে কোথায় রেখেছে, তা-ও জানা যাবে।
আনন্দ, উত্তেজনায় প্রায় লাফাতে শুরু করলো জনি। আমি জানতাম! তখনই বলেছিলাম, আমার ভাই হতেই পারে না! বাবা, বলেছি না তোমাকে! জলদি চলো, পুলিশকে জানাতে হবে।
দ্রুত ঘরের দিকে রওনা হলেন কলিউড। টেলিফোন করলেন থানায়। তারপর রিসিভার রেখে দিয়ে বললেন, ওরা খুব সিরিয়াসলি নিয়েছে। টেডকে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছে। আধ ঘণ্টা পর এখানে ফোন করবে বললো।

ওই আধ ঘণ্টা যেন আর কাটতেই চাইলো না। বার বার ঘড়ি দেখছে কিশোর। স্থির হয়ে বসতে পারছে না কেউই। সব চেয়ে বেশি অস্থির হয়ে আছে জনি। ল্যারি আর তার ভেড়ার বাচ্চাটাকে এতোক্ষণে একবারও দেখা গেল না। গেল কোথায়? —অবাক হয়ে ভাবলো জিনা।

টেলিফোনের শব্দ যেন বোমা ফাটালো ঘরে, খুব জোরে বেজেছে বলে মনে হলো ওদের কাছে। প্রায় ছুটে গিয়ে রিসিভার তুললেন কলিউড। হ্যাঁ হ্যাঁ, বলছি...খবর কি?...ও, হ্যাঁ...হ্যাঁ... রিসিভার কানে ঠেসে ধরেছেন তিনি। তাই নকি?...থ্যাঙ্ক ইউ। গুড-বাই।

রিসিভার নামিয়ে রেখে ছেলেমেয়েদের দিকে ফিরলেন তিনি।

জ্যাক ভাইয়া চুরি করেনি, তাই বললো না? জনি জিজ্ঞেস করলো।

হ্যাঁ।

হাত তালি দিয়ে বাচ্চা ছেলের মতো লাফাতে শুরু করলো জনি। বলেছিলাম ! বলেছিলাম না! ও চোর হতেই পারে না, হতেই পারে না...

খারাপ খবরও আছে, বাবা বললেন।

কী? থমকে গেল জনি।

টেড স্বীকার করেছে, কলিউড বললেন, প্লেন চুরি করতেই এসেছিলো চারজন লোক। ওদের দুজন খুব ভালো পাইলট। বিদেশী। অন্য দুজন সাধারণ অপরাধী, ওদেরকে আনা হয়েছে ঝড়ের রাতে বিড় আর জ্যাককে কিডন্যাপ করার জন্যে। ওদেরকে বেহুশ করে ধরে এনে এয়ারফীল্ডের বাইরে লুকিয়ে রাখা হয়েছে কোথাও। ওদেরকে সরিয়ে ফেলার পর দুই পাইলট গিয়ে প্লেন নিয়ে উড়ে গেছে। এয়ারফীল্ডের লোকেরা টের পেলো যখন তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।

তারমানে, সাগরে পড়ে যারা মারা গেছে, তারা রিড আর জ্যাক নয়, ওই দুজন বিদেশী পাইলট? কিশোর বললো।

হ্যাঁ। তবে ওদের জন্যে ভাবছি না আমি। আমার উদ্বেগ রিড আর জ্যাককে নিয়ে। ওদেরকে কোথায় লুকানো হয়েছে, টেড জানে না। তাকে বলা হয়নি। তাকে টাকা দেয়নি, কারণ প্লেন দুটো সাগরে পড়ে গেছে, তাদের উদ্দেশ্য সফল হয়নি।

পাইলট দুজন মরেছে, বাবার উদ্বেগের কারণ বুঝে উদ্বিগ্ন হলো জনিও, আর চোর দুটোও নিশ্চয় পালিয়েছে! এমন কোথাও রেখে গেছে বন্দিদেরকে, যেটা কোনোদিনই জানা যাবে না!

ঠিক তাই, বাবা বললেন। এখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দুজনকে খুঁজে বের করতে হবে। এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে অনেক, অনেক কষ্ট হচ্ছে নিশ্চয় ওদের। হাত-পা বাঁধা থাকলে, খাবার আর পানি না পেলে মরে যাবে। চোর দুটো যদি পালিয়ে থাকে কে ওদেরকে খাবার দিয়ে আসবে?

আতঙ্কিত হয়ে বললো জনি, ওদেরকে খুঁজে বের করতেই হবে, বাবা!
কিন্তু কোথায় খুঁজতে হবে জানি না আমরা। পুলিশও জানে না।
বিড়বিড় করে কি বললো কিশোর, বোঝা গেল না। নিচের ঠোঁটে ঘনঘন চিমটি কাটতে শুরু করলো সে।
থমথমে নীরবতা। কেউ জানে না কোথায় খুঁজতে হবে। কথাটা যেন প্রচণ্ড আঘাত করে স্তব্ধ করে দিয়েছে সবাইকে। সবার মনেই এক প্রশ্নঃ কোথায় আছে রিড আর জ্যাক?
এতো সহজে কজা হয়ে গেল দুজনে? মুসা মুখ খুললো। নিশ্চয় এয়ারফীল্ডে বিশ্বাসঘাতক রয়েছে, চোরগুলোকে সাহায্য করেছে যে।
থাকতে পারে, কলিউড বললেন। খুব ধীরেসুস্থে ঠাণ্ডা মাথায় পরিকল্পনা করে এই কাজ করেছে। নিশ্চয় নতুন ধরনের কিছু ছিলো প্লেনের ভেতর, যেগুলোর নকশার জন্যেই প্লেন চুরি করেছিলো বিদেশী ওই পাইলটেরা। পালিয়ে তো প্রায় গিয়েই ছিলো। ওদের কপাল খারাপ, পড়লো ঝড়ের মুখে।
ওরা ভেবেছিলো, জিনা বললো, ঝড়র সময় চুরি করাটাই ভালো। আন্দাজ ঠিকই করেছিলো। তখন ওদেরকে পেন চুরি করতে বাধা দিতে আসেনি কেউ। গার্ডেরা নিশ্চয় গিয়ে সবাই ঘরে ঢুকে বসেছিলো।
আমার অবাক লাগছে, কিশোর বললো, এতো কিছু ঘটে গেল ডাউসন আল ডরির নাকের ডগা দিয়ে, অথচ ওরা কিছুই জানলো না?
প্রজাপতি ছাড়া ওদের মাথায় আর কিছু নেই, বিরক্ত গলায় বললো জনি। পুলিশ সহজে ছাড়বে না ওদেরকে। এতো বেকুব যে মানুষ হয়, না দেখলে বিশ্বাসই করতাম না।
এখন কথা হলো, কুটি করলো কিশোর, আমরা কি করতে পারি? এভাবে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে তো ইচ্ছে করছে না। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে কলিউডের দিকে তাকালো সে।
তোমরা আর কি করবে? তিনি বললেন। পুলিশের কাছে খবর এসেছে, দুজন লোক খুব দ্রুত একটা ভ্যান চালিয়ে চলে গেছে। ওদের গতিবিধি সন্দেহজনক ঠেকেছে দুচারজন পথচারীর কাছে। গাড়ির নম্বরও টুকে নিয়েছে ওরা। হতে পারে চোরদুটোই। ওদেরকে যদি পুলিশ ধরে ফেলে, জ্যাক আর রিড কোথায় আছে জানা যাবে। আর তো কোনো উপায় দেখি না।
হতাশায় গুঙিয়ে উঠলো কেউ কেউ। কিছুই করার নেই ওদের। এখানে মাইলের পর মাইল ছড়িয়ে থাকা আদিম প্রকৃতিতে কোথায় খুঁজবে দুজন বন্দি মানুষকে? খড়ের গাদায় সুচ খোঁজার চেয়েও কঠিন কাজ, প্রায় অসম্ভব।

এখানে বসে বসে ভাবলে তো আর সমস্যার সমাধান হবে না, উঠলেন মিস্টার কলিউড। আমি কাজে যাই। তোর মা কোথায়, জনি?
বাজার করতে গেছে, ঘড়ির দিকে তাকালো জনি। ডিনারের আগেই ফিরবে।
ল্যারিটাও কি ওর সঙ্গে গেল নাকি? ওর কোনো সাড়াশব্দই নেই। বাচ্চাটাকেও নিশ্চয় নিয়ে গেছে?
ও-কি ওটাকে ছাড়া নড়ে নাকি?
হুঁ! বেরিয়ে গেলেন কলিউড।
তিন গোয়েন্দা আর জিনার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ মনে পড়লো জনির, আরে, ভুলেই গিয়েছিলাম! তোমাদের নিশ্চয় খাবারে টান পড়েছে?
হ্যাঁ, মাথা নাড়লো কিশোর। জনির মনের এই অবস্থা, এ-সময়ে তার কাছে খাবার চাইতে লজ্জাই লাগছে তার। ভাগ্যিস পয়সা দিয়ে কিনে নেয়ার ব্যবস্থা করে নিয়েছিলো, নইলে এখন আরও খারাপ লাগতো।
রবিন, তুমি আমার সাথে এসো, জনি বললো। যা যা লাগে, নিয়ে নাও।
রান্নাঘরের দিকে চলে গেল দুজনে।
খানিক পরে খাবারের ঝুড়ি নিয়ে ফিরে এলো।
জনি, কিশোর বললো, সকালটা আজ তোমার সাথেই থাকি আমরা, কি বলো? তোমার কাজে সাহায্য করবে।
তাহলে তো খুব ভালোই হয়, উজ্জ্বল হলো জনির মুখ। কাজে সাহায্যের চেয়ে এখন বেশি প্রয়োজন তার বন্ধুদের সঙ্গ। বাবাকে কথা দিয়েছিলাম আজ মুরগীর ঘরগুলো পরিষ্কার করবো। তোমরাও হাত লাগালে ডিনারের আগেই সেরে ফেলতে পারবো।
ঠিক আছে, চলো। তোমার কাজ শেষ হয়ে গেলে আমাদের সাথে বেরোতে পারবে। বিকেলে কোথাও একসাথে ঘুরতে যেতে পারবো আমরা।
মুরগীর খোয়াড়ের কাছে শুয়ে থাকতে দেখা গেল ডবিকে। সোজা তার দিকে এগিয়ে গেল রাফিয়ান। সাথী পেয়ে গিয়ে খেলা জুড়ে দিলো দুটোতে।
সারাটা সকাল কঠোর পরিশ্রম করলো ছেলেরা। জিনা ওদেরকে খোঁয়াড় পরিষ্কারের কাজে সাহায্য করতে পারলো না, ওর এসব নোংরা লাগে। সে গিয়ে জনিদের বাগানে ফুল দেখলো। কিছু গাছের মরা পাতা বাছলো। বেড়ে ওঠা পাতা কাঁচি দিয়ে হেঁটে দিলো। ফুল গাছের পরিচর্যা করতে খুব ভালো লাগে তার।
ওদের কাজও শেষ হয়েছে, এই সময় গাড়ির এঞ্জিনের শব্দ কানে এলো।
নিশ্চয় আন্টি আসছেন, কিশোর বললো। চলো, দেখি।
হাত ধুয়ে ছেলেরা এসে দেখলো, ইতিমধ্যেই যা বলার স্ত্রীকে বলে ফেলছেন মিস্টার কলিউড। শুনে জনির মা-ও উদ্বিগ্ন হলেন। বের করতে না পারলে মরবে

তো! পায়ের আওয়াজ শুনে মুখ তুললেন। ও, তোমরা। আমি ভাবলাম ল্যারি।
ল্যারি? ভুরু কোঁচকালো জনি। গাড়িতেই বসিয়ে এসেছিলে নাকি?
গাড়িতে? অবাক হলেন মিসেস কলিউড। তাকে পাব কোথায় বসানোর জন্যে? আমার সঙ্গে যায়নি তো। বাড়িতেই আছে।
কই, বাড়িতে তো নেই। আমরা তো ডাবলাম তোমার সাথে গেছে।
বলিস কি! ভয় দেখা দিলো মায়ের চোখে। আমি তো ভেবেছি তোর কাছে। আছে!
আর আমরা ভেবেছি তোমার সাথে গেছে। গলা কাঁপছে জনির।
জনি, পুকুর! প্রায় কেঁদে ফেললেন মা। জলদি গিয়ে দেখ পানিতে পড়লো কিনা!
ল্যারি, ল্যারি, বাপ আমার, কোথায় গেলি...! বলতে বলতে মা-ই ছুটে বেরোলেন ঘর থেকে।
মিস্টার কলিউড বললেন তিন গোয়েন্দাকে, তোমরা পাহাড়ের দিকে চলে যাও। হয়তো ভেড়ার বাচ্চাটা ছুটে গিয়েছিলো। ওটাকে খুঁজতে গিয়ে পথ হারিয়ে থাকতে পারে।
ল্যারির নাম ধরে ডাকতে ডাকতে পুকুরের দিকে চলে গেল জনি। মাঝখানটা বেশ গভীর ওটার, আর ল্যারি সাঁতার জানে না।
রাফিয়ানকে নিয়ে জিনা আর তিন গোয়েন্দা ছুটলো গেটের দিকে।
খাড়া ঢাল বেয়ে ওঠার সময় এদিক ওদিক তাকালো ওরা, বার বার ডাকতে লাগলো ল্যারির নাম ধরে। কিন্তু ছেলেটার ছায়াও নেই। কেন যেন কিশোরের মনে হচ্ছে, ফার্মে নেই ল্যারি। ভেড়ার বাচ্চাটাই হারিয়েছিলো, তাকে খুঁজতে খুঁজতে দূরে কোথাও চলে গেছে সে।
আমাদের ক্যাম্পে হয়তো গিয়ে বসে আছে, মুসা বললো। ওখানে যাবার খুব ইচ্ছে ওর, দেখলাম সেদিন।
গিয়ে থাকলে তো ভালোই, কিশোর বললো। আমার মনে হয় না। একা একা অতদূরে যায়নি সে কখনও। চেনার কথা নয়।
কি যে শুরু হলো আজ! খালি লোক হারানোর খবর শুনছি! জিনা বললো। প্রথমে গেল রিড আর জ্যাক, কোথায় আছে কেউ জানে না। এখন ল্যারি নিখোঁজ!
কোনো ছুটিই কি আরামে কাটাতে পারবো না আমরা? রবিনের প্রশ্ন। যেখানেই যাই, উত্তেজনা আর রহস্য যেন আমাদের পায়ে পায়ে গিয়ে হাজির।
খালি উত্তেজনা আর রহস্য হলে তো কোনো কথা ছিলো না, মুসা বললো। বিপদ আসে যে! সেটাই মাঝে মাঝে অসহ্য লাগে।
ক্যাম্পে এসে পৌঁছলো ওরা। ল্যারি আর টোগোর ছায়াও নেই।
এবার কোথায় যাই? জিনা বললো।

যাবো যেখানেই থোক, মুসা বললো। বলা যায় না কতোক্ষণ লাগবে খুঁজতে। এক কাজ করা যাক, কিছু মুখে দিয়ে নিই। খালি পেটে খুঁজতে বেরিয়ে আমরাও সুবিধে করতে পারবো না।
কথাটা মন্দ বলোনি। কিভাবে কোথায় খুঁজব, ইতিমধ্যে একটা প্ল্যানও করে ফেলা যাবে, একমত হলো কিশোর।
খাবার, অর্থাৎ শুধু স্যান্ডউইচ তৈরি করতে বসলো জিনা আর রবিন। হাত কাঁপছে জিনার। কোনো জিনিসই ঠিকমতো ধরে রাখতে পারছে না। বললো, গেল কোথায় ছেলেটা! কোনো ক্ষতি না হয়ে যায়, আল্লাহ না করুক! সারা সকাল ধরে নিখোঁজ!
স্যান্ডউইচ তৈরি হলো।
রবিন ডাকলো, এসো, বসে যাও। তা কি ঠিক করলে? কিভাবে কোথায় খুঁজবো?
আলাদা হয়ে ছড়িয়ে পড়বো আমরা, কিশোর একটা স্যান্ডউইচ হাতে তুলে নিলো। কিছু টম্যাটো আর গাজর নিয়ে পকেটে ভরলো। পাহাড়ের আশেপাশে খুঁজবো। একটু পর পরই ল্যারির নাম ধরে ডাকবো। তোমরা যাবে পাহাড়ের ওই দিকটায়, রবিন আর জিনাকে বললো সে। একজন খুঁজতে খুঁজতে ওপর দিকে উঠবে, আরেকজন নামবে। এই পাশটায় খুঁজবো আমি আর মুসা, একইভাবে। তারপর আমরা দুজন চলে যাবো প্রজাপতির খামারে। ওখানেও যেতে পারে।
স্যান্ডউইচ হাতে নিয়েই উঠে পড়লো ওরা। দুই দল চলে গেল দুদিকে। রাফি একবার গেল এদলের কাছে, আরেকবার দলের কাছে। এমনি করে সারা পাহাড়ময় ছুটে বেড়াতে লাগলো সে। একটা কাজ পাওয়া গেছে। সে-ও বুকে গেছে, ল্যারি হারিয়েছে। ছেলেটা আর টোগোর গন্ধ তার চেনা। বাতাস কে সেই গন্ধ বের করার চেষ্টা চালাচ্ছে।
প্রজাপতির খামারে গিয়ে দেখা গেল, সেখানে কেউ নেই। কারো চিহ্নই নেই খামারে। এমনকি মিসেস ডেনভারও কটেজে নেই, বাইরে কোথাও গেছে। আর দুই প্রজাপতি মানবের তো এ-সময় থাকারই কথা নয়। প্রজাপতি ধরতে বেরিয়েছে।
ওদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল রবিন আর জিনার। দর থেকে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলো, একটা পাঁচ বছরের ছেলে আর একটা ভেড়ার বাচ্চাকে দেখেছে কিনা।
জবাব এলো, দেখেনি।
রেগে রয়েছে এখনও, জিনা বললো রবিনকে। দেখেছো কেমন কাটা কাটা জবাব দিলো? প্রজাপতি না খুঁজে এখন ওরাও আমাদের সাহায্য করলে কাজ হতো।
আবার আগের জায়গায় জমায়েত হলো তিন গোয়েন্দা, জিনা আর রাফি। প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েছে ওরা। ল্যারিকে পাওয়া যায়নি। এরপর কি করবে, এই নিয়ে

আলোচনা করছে ওরা, এই সময় হঠাৎ কান খাড়া করে ফেললো রাফিয়ান। তারপর চেঁচিয়ে উঠলো উত্তেজিত হয়ে। যেন বোঝানোর চেষ্টা করছে, আমি একটা জিনিস বোধহয় পেয়েছি।
বুঝে ফেললো জিনা। চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কি, কি পেয়েছিস রাফি?
কান আরও খাড়া করে ফেললো রাফিয়ান।
যা যা এগো, নির্দেশ দিলো জিনা। দেখ কি পেয়েছিস!
চলতে আরম্ভ করলো রাফিয়ান। মাঝে মাঝেই থেমে গিয়ে কান পাতে, শোনে, তারপর আবার চলে। ওরাও শোনার চেষ্টা করছে, কিন্তু কুকুরের মতো প্রখর নয় ওদের শ্রবণশক্তি। কিছুই শুনতে পেলো না।
আরি! কিশোর বললো। ও তো গুহার দিকে চলেছে! ওদিকে গেছে ল্যারি? ফার্ম থেকে অনেক দূরে, পথও খুব জটিল। কি করে এলো!
কি জানি! বুঝতে পারছি না, জিনা বললো। কিন্তু রাফির তো ভুল হওয়ার কথা নয়?
যেভাবেই যাক,মুসা বললো, সেটা পরেও জানা যাবে। এখন ছেলেটাকে খুঁজে পেলেই হয়।
মিনিটখানেক পরেই শোনা গেল একটা ক্লান্ত কণ্ঠ, টোগো টোগো! কোথায় তুই?
ল্যারিইইই! প্রায় একসঙ্গে চিৎকার করে উঠে ছুট লাগালো চারজনে।
অবশ্যই সবার আগে পৌঁছলো সেখানে রাফিয়ান। তিন গোয়েন্দা আর জিনা পৌঁছে দেখলো ছেলেটার মাথা চাটছে সে, তার গলা জড়িয়ে ধরে রেখেছে ল্যারি। গুহার ঠিক বাইরে বসে আছে। ভেড়ার বাচ্চাটা নেই সাথে।
ল্যারি! ল্যারি! বলে চিৎকার করে ছুটে গেল জিনা। কোলে তুলে নিলো তাকে।
বাদামী চোখ মেলে সকলের দিকে তাকালো ল্যারি। মোটেই অবাক হয়নি ওদেরকে দেখে। শান্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলো যেন, টোগো পালিয়েছে। ওই ওখানে গিয়ে লুকিয়েছে। গুহাটা দেখালো সে।
গেছে, যাক, মুসা তার গাল টিপে দিয়ে বললো। তুমি যে যাওনি, এটাই বুদ্ধিমানের কাজ করেছে। ঢুকলে আর কোনোদিন পাওয়া যেতো না তোমাকে।
চলো ওকে বাড়ি নিয়ে যাই, রবিন বললো।
কিন্তু জিনার কোলে থেকেই লাথি মারতে শুরু করলো ল্যারি। চিৎকার করে বললো, না, না, আমি যাবো না! টোগোকে ফেলে যাবো না! টোগো! টোগো!
শোনো, ল্যারি, বোঝনোর চেষ্টা করলো কিশোর। গুহার ভেতরে থেকে থেকে শীঘ্রি বিরক্ত হয়ে যাবে টোগো। তখন আপনাআপনিই বেরিয়ে আসবে। তোমার মা তোমার জন্যে কাঁদছেন।
কাঁদুক, সাফ জবাব দিয়ে দিলো ল্যারি। আমি টোগোকে ছাড়া যাবে না।

তোমার খিদে পায়নি? মুসা জিজ্ঞেস করলো।
এই উত্তেজনার মুহূর্তেও মুসার কথায় হেসে ফেললো সবাই।
ল্যারি বললো, পেয়েছে। কিন্তু টোগোকে ছাড়া খাবো না। টোগো! টোগো! জলদি আয়। আমরা বাড়ি যাবো।
ওকে এখুনি নিয়ে যাওয়া দরকার, রবিন বললো। বাড়িতে নিশ্চয় সবার পাগল হওয়ার অবস্থা। টোগো ঢুকতে যখন পেরেছে, বেরিয়ে আসতে পারবে। জন্তুজানোয়ারের অনুভূতি খুব প্রখর। আর যদি বেরোতে না-ই পারে, দুঃখ করা ছাড়া আর কি করার আছে? দড়ি ছাড়া গুহাগুলোয় ঢোকা কোনোমতেই উচিত হবে না।
চলো, ল্যারি, জিনা বোঝালো ওকে। টোগো সময় হলেই আসবে। খেলতে গেছে তো ভেতরে। খেলা শেষ হলেই বেরিয়ে আসবে। ধীরে ধীরে গুহার কাছ থেকে সরে আসতে লাগলো সে। তোমার মা যে কাঁদছে, খারাপ লাগছে না তোমার?
লাগছে তো।
তাহলে চলো বাড়ি গিয়ে খেয়েদেয়ে টোগোকে নিতে আসবো আমরা আবার।
অবশেষে রাজি হলো ল্যারি।
খড়িমাটির পথ বেয়ে ফিরে চললো দলটা। সবাই খুশি। ল্যারিকে খুঁজে পাওয়ার উত্তেজনায় জ্যাক আর রিডের কথা ভুলেই গেছে ওরা।
ছেলেকে দেখে ছুটে এলেন মিসেস কলিউড। জিনার কোল থেকে নিয়ে নিলেন তাকে। জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়ে কেঁদে বললেন, কোথায় চলে গিয়েছিলি তুই, ল্যারি? ওই ভেড়ার বাচ্চাটাই তোর সর্বনাশ করলো। গেল কই হতচ্ছাড়াটা!
ওকে গাল দিচ্ছো কেন? ওর খেলতে ইচ্ছে করে না? গুহার ভেতরে খেলতে গেছে।
সব শুনে শিউরে উঠলেন মিসেস কলিউড। ওই গুহায় ল্যারি ঢুকলে কি সর্বনাশ হতো সেকথা আর ভাবতে চাইলেন না তিনি।
বাবার দাও, মা, খিদে পেয়েছে, ল্যারি বললো।
সে বসলো খেতে, আর টেবিল ঘিরে সবাই বসলো তার খাওয়া দেখতে। আজ যেন ল্যারির খাওয়াটাই এক নতুন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।
গপগপ করে খেতে লাগলো ল্যারি। তার খাওয়া দেখেই বোঝা গেল কি প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে।
খাওয়া শেষ করেই চেয়ার থেকে নেমে পড়লো ল্যারি, আমি টোগোকে আনতে যাবো।
না না, তোমার যাবার দরকার নেই, তাড়াতাড়ি ছেলের হাত ধরলেন মা। আমি কেক বানাতে যাচ্ছি, তুমি আমার কাছে বসে থাকবে। সময় হলে আপনিই ফিরে আসবে টোগো।

সত্যিই ফিরে এলো টোগো। তিন গোয়েন্দা, জিনা আর জনি বসে কথা বলছে তখন পুকুর পাড়ে। নাচতে নাচতে চত্বরে ঢুকলো বাচ্চাটা। মানুষ দেখেই ব্যা ব্যা করে উঠলো।
টোগো, এসেছিস! আয়, আয়, এদিকে আয়! চিৎকার করে ডাকলো জনি।
আর, তোর পিঠে লিখলো কে?
ভুরু কোঁচকালো কিশোর।
লেখাটা পড়ার চেষ্টা করে পারলো না মুসা। বললো, শয়তান লোকের কাজ। বাচ্চাটাকে একা পেয়ে তার পিঠে কি লিখে দিয়েছিলো। মুছে গেছে।
ওর সাদা রঙটাই নষ্ট করে দিয়েছে, জিনা বললো জনিকে, ধুয়ে ফেলো। বিচ্ছিরি লাগছে দেখতে।
দাঁড়াও! তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠলো কিশোর। জে আর এম-এর মতো লাগছে আমার কাছে। আর ওই দুটো অক্ষর বোধহয় আর এবং পি, না না, বি! নিচের অংশটা মুছে যাওয়ায় পি-এর মতো লাগছে।
জে এম! আর বি! উত্তেজনায় দম বন্ধ হয়ে যাবে যেন জনির। কোটর থেকে চোখ প্রায় ঠিকরে বেরোনোর অবস্থা। তার মানে কি জ্যাক ম্যানর আর রিড বেকার! কে লিখলো?
আরও অক্ষর আছে ওর পিঠে, ছোট ছোট করে লেখা! কিশোর বললো, শক্ত করে ধরে রাখা ওকে। পড়ার চেষ্টা করি। আমার বিশ্বাস জ্যাক আর রিডই ওকে দিয়ে মেসেজ পাঠিয়েছে। ওদের কাছেই চলে গিয়েছিলো বাচ্চাটা!
প্রায় মুছে যাওয়া অক্ষরগুলো পড়ার চেষ্টা করতে লাগলো সবাই। মোট চারটা অক্ষর আছে বলে মনে হচ্ছে। ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে এসেছে বোধহয় বাচ্চাটা, পাতার ঘষায় ঝাপসা হয়ে গেছে অক্ষর।
শব্দটা কে! দেখতে দেখতে বললো কিশোর। প্রথম অক্ষরটাকে জি. ও. সি. যা খুশি ধরা যায়। কিন্তু তৃতীয় শব্দটা ভি, কোনো সন্দেহ নেই। আমি শিওর লেখাটা কেভ, মানে গুহা। আর গুহার ভেতরেই ঢুকেছিলো টোগো। মুখ তুললো সে। তাহলে ওখানেই নিয়ে গিয়ে আটকে রেখেছে জ্যাক আর রিডকে আর আমরা কিনা ভাবছিলাম...তোমার বাবা কোথায়, জনি?
গোলাঘরের পেছনে পাওয়া গেল কলিউডকে। কাজ করছেন। ভেড়ার বাচ্চা আর ওটার পিঠের লেখা দেখানো হলো তাকে।
কি করবো এখন? জিজ্ঞেস করলো কিশোর। গুহায় ঢুকবো? না পুলিশকে ফোন করবেন?
পুলিশকে অবশ্যই জানানো দরকার, কলিউড বললেন। তোমরা গুহায় চলে যাও। সাথে করে দড়ি নিয়ে যাও বেশি করে। দড়িওয়ালা গুহাগুলোয় ওদেরকে রাখার

সম্ভাবনা কম, কারণ ওগুলোতে প্রায়ই লোক ঢোকে দেখার জন্যে। দড়ির একমাথা ধরে সুড়ঙ্গের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে একজন। আরেক মাথা ধরে অনন্যরা ভেতরে ঢুকবে। এতে হারানোর ভয় থাকবে না। বুঝতে পেরেছে আমার কথা?
মাথা কাত করলো কিশোর। আপনি না বললেও তা-ই করতাম। তাছাড়া রাফিকে তো নিয়েই যাচ্ছি। ও অনেক সাহায্য করতে পারবে।
মাথা ঝাঁকিয়ে পুলিশে ফোন করতে চলে গেলেন কলিউড।
জনি, কিশোর বললো, জলদি গিয়ে দড়ি নিয়ে এসো। আর টর্চ, যে কটা পারো। মোমবাতি আর দেশলাইও আনবে। গুহায় ঢুকে বিপদে পড়তে চাই না।
ঝাড়-জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে রুদ্ধশ্বাসে প্রায় দৌড়ে চলেছে দলটা। ভেড়ার বাচ্চাটা মুসার কোলে। ওটা বুঝতেই পারছে না ব্যাপারটা কি? মানুষগুলো এরকম করছে কেন? আর সেজন্যেই যেন থেকে থেকে চেঁচিয়ে উঠছে ব্যা ব্যা করে। শরীর মুচড়ে, লাথি মেরে নেমে পড়তে চাইছে কোল থেকে, কিন্তু কেউ তার আবেদন কানে তুলছে না। দরকার আছে বলেই নিয়েছে ওকে।
অবশেষে গুহায় যাবার খড়িমাটি বিছানো পথে এসে পড়লো ওরা। জুতোর ঘায়ে বিচিত্র শব্দ করে ছিটকে কিংবা গড়িয়ে পড়ছে আলগা খড়িমাটির টুকরো। ওরা এসে দাঁড়ালো প্রবেশপথের কাছে, যেটার কপালে লেখা রয়েছে সাবধানবাণী।
ভেড়ার বাচ্চাটাকে মাটিতে নামিয়ে শক্ত করে ধরে রাখলো মুসা। জিনা ডাকলো, রাফি, এদিকে আয়। শোক টোগোকে। গন্ধটা মনে রাখ। তারপর ওর পিছে পিছে যাবি, যেখানেই যায়। দেখতে না পেলে গন্ধ শুকে কে এগোবি।
অযথা এসব কথা বললো জিনা। কিভাবে অনুসরণ করতে হয় খুব ভালোই জানা আছে রাফিয়ানের। টোগোর গন্ধ তার পরিচিত, তবু জিনার কথায় আরেকবার ভেড়ার বাচ্চাটার আগা-পাশ-তলা কলো সে।
টোগোকে ছেড়ে দিলো মুসা। রাফিকে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে বললো জিনা। জানে পারবে, তবু নিশ্চিত হতে চায় টোগোর গন্ধ শুকে ঠিকমতো এগোতে পারে কিনা রাফি। মাটি আর বাতাস শুকতে শুকতে প্রায় ছুটে চললো কুকুরটা। প্রথম গুহাটায় এসে ঢুকলো। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ফিরে তাকালো জিনার দিকে।
যা যা, এগোরাফি, আদেশ দিলো জিনা। বুঝতে পারছি, টোগোর পিছু নিয়ে এই অত গুহায় তোকে ঢুকতে বলায় তোর অবাক লাগছে। কিন্তু ঢুকতে বলার কারণ আছে। আমরা জানতে চাই, বাচ্চাটা কোথায় যায়। এতো কথা বললো সে এই জন্যে, তার আশঙ্কা হচ্ছে বিরক্ত হয়ে না আবার এই মজার খেলাটা বন্ধ করে দেয় রাফি।
কিন্তু বন্ধ করলো না রাফিয়ান। আবার মাটি কলো।

সেই গুহাটায় এসে ঢুকলো সে, যেটাতে রঙের সৃষ্টি করেছে বরফের ঝাড় আর স্তম্ভ। চকচকে উজ্জ্বল রঙিন থামের মতো লাগছে কোনো কোনোটাকে। ওটা পেরিয়ে ঢুকলো আরেকটা গুহায়, যেটাতে সব চেয়ে বেশি রঙ। রামধনুর সাত রঙের বাহার দেখা যায় যেখানে। যেটাকে পরীর রাজ্য মনে হয়েছিলো জিনার। সেটা পেরিয়ে ঢুকলো আরেক গুহায়, যেখানে দড়ি ছাড়া সুড়ঙ্গ রয়েছে কয়েকটা।
এই যে, তিনটে সুড়ঙ্গ, জিনা বললো। আমার মনে হয় না, দড়িওয়ালা সুড়ঙ্গ ধরে ঢুকবে রাফি...।
তার কথা প্রমাণ করতেই যেন একটা দড়িছাড়া সুড়ঙ্গের মুখের কাছে মাটি শুঁকতে শুরু করলো রাফি। বাঁয়ের একটা পথ, যেটাতে সেদিন আচমকা ঢুকে গিয়েছিলো সে, তারপর অনেক ডাকাডাকি করে বের করে আনতে হয়েছে।
ঢুকে পড়লো সবাই। প্রত্যেকের হাতেই টর্চ জ্বলছে।
আমিও ভেবেছিলাম..., বলেই থেমে গেল জিনা। তার কথার প্রতিধ্বনি উঠলো সুড়ঙ্গের দেয়ালে বাড়ি খেয়েঃ আমিও ভেবেছিলাম, আমিও ভেবেছিলাম... ভেবেছিলাম...ছিলাম... ছিলাম...ইলাম...
সেদিনকার চিৎকারের মানে এখন বুঝতে পারছি, প্রতিধ্বনির ভয়ে কণ্ঠস্বর একেবারে খাদে নামিয়ে ফিসফিসিয়ে বললো কিশোর। ডাকাতগুলো চিৎকার করেছে, জোরে জোরে শিস দিয়েছে। সুড়ঙ্গে প্রতিধ্বনিত হয়ে ওই শব্দ হয়ে উঠেছিলো ভয়ঙ্কর। আমার বিশ্বাস রাফির ঘেউ ঘেউ ওরা শুনতে পেয়েছিলো। ঘাবড়ে গিয়েছিলো মানুষ আসছে ভেবে। কাজেই ভয় দেখিয়ে আমাদেরকে তাড়ানোর জন্যে ওরকম শব্দ করেছিলো।
আর সত্যি... বলেই প্রতিধ্বনি শুনে গলার স্বর নামিয়ে ফেললো রবিন, আমরা ভয় পেয়ে পালিয়েছিলাম। হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছে, ওই শয়তানগুলো ওরকম আওয়াজ করেছিলো। এছাড়া ওরকম অদ্ভুত আওয়াজের আর কোনো ব্যাখ্যা নেই।... আরিব্বাবারে, কি লম্বা সুড়ঙ্গ! আর কি রকম এঁকেবেঁকে ঘুরে ঘুরে গেছে!...আরে, সামনে দেখি আবার দুই মুখ! কোনটা দিয়ে যাবো?
সেটা রাফিই বলে দেবে, জিনা বললো। একটা সুড়ঙ্গের মুখের কাছের মাটি ইতিমধ্যেই শুকতে আরম্ভ করেছে রাফি, এবারও বাঁয়েরটা।
দড়ি আনার দরকারই ছিলো না, জনি বললো। রাফি যেভাবে পথ চিনে এগোচ্ছে, আমাদের অসুবিধে হতো না। ঠিক বের করে নিয়ে আসতো।
যা, মাথা ঝাঁকালো কিশোর। দড়ির চেয়ে অনেক ভালো পথপ্রদর্শক সে। তবে ও না থাকলে দড়ি অবশ্যই ব্যবহার করতে হতো। নইলে এই সুড়ঙ্গ আর গুহার গোলকধাঁধা থেকে বেরোনো মুশকিল হয়ে যেতো। মনে হয় পাহাড়ের একেবারে পেটের মধ্যে চলে এসেছি...।

এই সময় হঠাৎ থেমে গেল রাফি। মাথা তুলে পাশে কাত করে কান পেতে শুনছে। জ্যাক আর রিডের সন্ধান কি পেয়ে গেল? ঘেউ ঘেউ করে উঠলো একবার। বদ্ধ জায়গায় বিকট হয়ে কানে বাজলো সেই ডাক।
কাছেই কোনোখান থেকে শোনা গেল তার ডাকের জবাবঃ এইই। এইই! এই যে! এখানে! এখানে!
জ্যাক ভাইয়া! প্রতিধ্বনির কথা ভুলে গিয়ে চিৎকার করে উঠলো জনি। আনন্দে অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যেই লাফাতে শুরু করলো। জ্যাক ভাইয়া, শুনছো! আমিইইই, আমি জনিইই!
সাথে সাথে সাড়া এলো, জনি, এই যে এদিকে! বুঝতে পারছিস?
প্রায় ছুটে এগোলো রাফিয়ান। থমকে দাঁড়িয়ে পড়লে হঠাৎ। আগে আগে চলেছে কিশোর, আরেকটু হলে তার গায়ের ওপরই পড়তো। প্রথমে বুঝতে পারলো না কি ব্যাপার। তারপর টর্চের আলোয় স্পষ্ট হলো নিরেট দেয়াল, ওদের পথ আগলে যেন এক বিরাট চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেয়ালের কাছে দাঁড়িয়ে আছে টোগো। অবাক কাণ্ড। সামনে দেয়াল, অথচ জ্যাকের কণ্ঠ কানে আসছে!
এই যে, আমরা এখানে!
বোঝা গেল, কিভাবে আসছে। রাফিয়ান যেখানে দাঁড়িয়ে আছে ঠিক তার পাশেই মেঝেতে একটা ফোকর। কিশোরের টর্চের আলো পড়লো তার ওপর। বললো, ওই যে, ওখানেই আছে! ওই গর্তে! জ্যাকডাই, ওখানেই আছেন, না? জবাব দিন!
জবাব এলো।
আরেকটু সামনে এগিয়ে গর্তের ভেতর আলো ফেললো কিশোর। ওই তো, গুহার মেঝেতে পড়ে রয়েছে একজন মানুষ। পাশে দাঁড়িয়ে আরেকজন, জ্যাক ম্যানর। শুয়ে থাকা লোকটাই তাহলে রিড।
ঈশ্বরকে অনেক ধন্যবাদ, আমাদের খুঁজে পেয়েছে তোমরা, জ্যাক বললো। ওরা আমাদেরকে এখানে রেখে চলে গেল, আর এলো না। হঠাৎ পেছন থেকে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে ফেলে দিয়েছে এই গর্তে। রিডের গোড়ালি মচকে গেছে। আমি ভালোই আছি, কিন্তু উঠবো কিভাবে? অনেক চেষ্টা করেছি, পারিনি। কারও সাহায্য ছাড়া পিরবোও না।
আর কোনো অসুবিধে নেই, জ্যাক ভাইয়া, আমরা এসে গেছি, কিশোরের পাশে দাঁড়িয়ে গর্তের ভেতরে উঁকি দিয়ে বললো জনি। কিভাবে তুললে সুবিধা হবে? গর্তের মুখটা তো বেশি বড় না।
প্রথমে আমাকে টেনে তোলো, জ্যাক বললো। তারপর দুজন গর্তে নেমে রিডকে তুলে ধরবে, তখন তাকে আমি টেনে তুলে নিতে পারবো। এমন বাজে জায়গা আর দেখিনি। ওই গর্তটা ছাড়া বেরোনোর আর কোনো জায়গাই নেই। কতো

লাফালাফি যে করলাম। ছুঁতেই পারলাম না ওপরের ধার! আর রিড তো দাঁড়াতেই পারে না।
শুধু কিশোর আর জনিকে দিয়ে হলো না। মুসাকেও হাত লাগাতে হলো। তারপর অনেক কায়দা কসরৎ করে টেনে তোলা হলো জ্যাককে। সাথে দড়ি না আনলে বের করতে পারতো না। জিনা আর রবিনও হাত গুটিয়ে বসে নেই। টোগোকে আটকে রেখেছে জিনা, ওটা কেবলই ছুটে একদিকে চলে যেতে চায়। আর রবিন দুই হাতে দুটো টর্চ উচিয়ে রেখেছে।
অবশেষে উঠে এলো জ্যাক। দড়ি ধরে নেমে গেল কিশোর আর মুসা। ঘোরের মধ্যে রয়েছে যেন রিড। ঘোলাটে দৃষ্টি। জ্যাকের ধারণা, মাথায় আঘাত পেয়েছে রিড। দুদিক থেকে ধরে তাকে তুলে দাঁড় করালো কিশোর আর মুসা। এক পা বাকা করে বেকায়দা ভঙ্গিতে দাঁড়ালো সে, মুসার কাঁধে ভর রেখে। বের করা শক্ত। তবে বেশি ভারি না রিড, এই যা সুবিধে। দুই হাতে ধরে তাকে মাথার ওপর তুলে ধরলো মুসা, অনেকটা টারজানের মতো। সুড়ঙ্গের মেঝেতে বিপজ্জনক ভঙ্গিতে শুয়ে পড়লো জ্যাক। মেঝে ঢালু, তাই মাথা পায়ের চেয়ে নিচুতে। পিছলে আবার গর্তে পড়ে যাওয়ার ভয় আছে। কিন্তু পরোয়া করলো না সে। পেছনে একই ভাবে শুয়ে পড়ে শক্ত করে তার পা জড়িয়ে ধরে রইলো জনি।, বুক পর্যন্ত গর্তের কিনারে বাড়িয়ে দিয়ে স্কুলে পড়লো জ্যাক। হাত বাড়ালো নিচের দিকে। রিডের হাতের নাগাল পেয়ে শক্ত করে ধরলো। তারপর ইঞ্চি ইঞ্চি করে টেনে তুলতে লাগলো। নিচ থেকে ঠেলে রেখেছে কিশোর আর মুসা।
অবশেষে তুলে আনা হলো রিড়কে। দড়ি বেয়ে উঠতে মুসা আর কিশোরের খুব একটা অসুবিধে হলো না, কারণ জনি আর জ্যাক তো রয়েছেই সাহায্য করার জন্যে।
খুব মজার একটা ব্যাপার ঘটে গেছে ভেবে আর চুপ থাকা সমীচীন মনে করলো না রাফি। ঘাউ ঘাউ করে হাঁক ছাড়লো কয়েক বার, বদ্ধ জায়গায় কানে তালা লাগিয়ে দিলো সকলের। ভয় পেয়ে ডেকে উঠলো ভেড়ার বাচ্চাটা, জিনার হাত থেকে ছুটে যাওয়ার জন্যে ছটফট করতে লাগলো।
হউফ! করে জোরে নিঃশ্বাস ফেললো জ্যাক। আর কোনোদিন বেরিয়ে আসতে পারবো ভাবিনি! বাপরে, কি জায়গা দম বন্ধ করে দেয়! চলো, এখানে আর এক মুহূর্তও না। বেরোই। আলোবাতাস দরকার। পানির অভাবে বুকটা শুকিয়ে যা খাঁ করছে। হারামজাদাগুলো সেই যে ফেলে চলে গেল, আর এলো না!
আবার পথ দেখিয়ে দলটাকে গুহার বাইরে বের করে নিয়ে এলো রাফিয়ান। স্বচ্ছন্দে। এবার আর মাটি কিংবা বাতাস শোকারও প্রয়োজন বোধ করেনি। ভুল করেনি একটিবারের জন্যেও। ভেড়ার বাচ্চাটা কিভাবে নিরাপদে বেরিয়ে

গিয়েছিলো, এখন বোঝা গেল। অনুভূতি ওটারও যথেষ্ট প্রখর। ইন্দ্রিয়ের এই প্রখরতা কেবল মানুষেরই নেই।
উজ্জ্বল সূর্যালোকে বেরিয়ে এসে চোখ ধাধিয়ে গেল ওদের। বিশেষ করে রিড আর জ্যাকের। দীর্ঘ সময় গাঢ় অন্ধকারে বন্দী ছিলো ওরা। হাত দিয়ে চোখ ঢেকে ফেললো দুজনেই।
এখানে কিছুক্ষণ বসে আগে চোখের আলো সইয়ে নিন, কিশোর পরামর্শ দিলো, নইলে হাঁটতে পারবেন না। তারপর আমাদের বলুন, ভেড়ার বাচ্চাটার গায়ে মেসেজ লিখলেন কিভাবে? ওটাও কি গর্তে পড়ে গিয়েছিলো?
হ্যাঁ, মাথা ঝাঁকালো জ্যাক। আমাদের গর্তে ফেলে দিয়ে লোকগুলো চলে গেল। আমরা পড়েই আছি, পড়েই আছি। দিনরাত্রির প্রভেদ বোঝার উপায় নেই। সময় কতো, কি বার, কিছুই বুঝতে পারছি না। কোনো শব্দও নেই। তারপর হঠাৎ করেই কানে এলো মুদ খটখট আওয়াজ। কিসের, বুঝতে পারলাম না। তখনও জানি না পাথরে লেগে ভেড়ার বাচ্চাটার খুরের শব্দ হচ্ছিলো। অবাক হলাম। আমাদের আরও অবাক করে দিয়ে গর্তে পড়লো বাচ্চাটা। একেবারে আমার ওপরেই। পড়েই চেঁচাতে শুরু করলো গলা ফাটিয়ে। বের করে দিতে গিয়েও থেমে গেলাম। বুদ্ধিটা এলো মাথায়। মনে করলাম, বাইরে বেরোলে লোকের চোখে পড়বেই। যদিও বুঝতে পারছিলাম না কি করে ঢুকলো ওটা, আবার ঠিকমতো বাইরে বেরোতে পারবে কিনা এসব।
লিখে দিয়েছিলেন বটে, মুসা বললো, কিন্তু আরেকটু হলেই নষ্ট হয়ে যেতো আপনার মেসেজ। প্রায় মুছেই গিয়েছিলো।
তবু, শেষ পর্যন্ত বুঝতে তো পেরেছে, জোরে নিঃশ্বাস ফেললো জ্যাক। রিড হাত পা ছড়িয়ে চুপ করে বসে আছে, চোখ বন্ধ। তার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে আবার বললো সে, সুড়ঙ্গে ঢোকানোর পর পরই আমাদের সমস্ত জিনিস কেড়ে নিয়েছে ডাকাতগুলো। ঘড়ি, টাকাপয়সা, এমনকি কলমটা পর্যন্ত।
তাহলে লিখলেন কি দিয়ে? জিনা জিজ্ঞেস করলো।
রিডের প্যান্টের পকেটে একটুকরো কালো চক ছিলো, জ্যাক জানালো। ওই চক আমাদের কাছে থাকে। চিহ্ন দেয়ার জন্যে ব্যবহার করি আমরা। বিশেষ করে বড় বড় ম্যাপে এয়াররুটগুলোর ওপর। বাচ্চাটাকে ধরে রাখলো রিড, আমি ওটার পিঠে লিখলাম। অন্ধকারে কি লিখছি, তা-ও বোঝার উপায় ছিলো না। পড়তে যে পেরেছো, এটাই আমাদের ভাগ্য। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে গর্তের বাইরে ছুঁড়ে দিয়েছি বাচ্চাটাকে। ভয় পেয়ে, কিংবা ব্যথা পেয়ে, যে কারণেই হোক, গলা ফাটিয়ে কয়েকবার চেঁচালো ওটা। তারপর দিলো দৌড়, যেদিক থেকে এসেছিলো সেদিকে। কি কাণ্ড, বলো তো? যেন আমাদের মেসেজ নেয়ার জন্যেই এসেছিলো

ওটা! দুনিয়াতে অনেক রহস্যময় ব্যাপারই ঘটে, যার কোনো ব্যাখ্যা নেই। আবার কাকতালীয় ব্যাপার বলতেও ইচ্ছে করে না!
হুঁ, মাথা দোলালো জনি। নইলে ল্যারিই বা ওটার জন্য পাগল হবে কেন? আর ওটারই বা ঘুরে বেড়ানোর এতো শখ হবে কেন? যখন-তখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে এদিক সেদিক চলে যায়। আর গেলেই ওটার পিছে পিছে ছোটে ল্যারি। এজন্যে সবাই মিলে কতো বকাবকি করি দুজনকে। অথচ আজ এটার এই বাড়িপালানো স্বভাবের কারণেই খুঁজে পাওয়া গেল তোমাদেরকে! নইলে কোনোদিনই ওই গর্ত থেকে…
আর বলিস না, বলিস না! তাড়াতাড়ি হাত নাড়লো জ্যাক। দম বন্ধ হয়ে আসছে!…আচ্ছা, এবার বল দেখি, আমরা গায়েব হয়ে যাওয়ায় এয়ারফীল্ডে শোরগোল ওঠেনি?
উঠেছে, রবিন বললো। আপনাদের দুজনের প্লেন দুটো যে চুরি হয়েছে জানেন? যে দুটো আপনারা চালাতেন?
আন্দাজ করেছি। ওরাও আমাদেরকে ধরে নিয়ে এলো, ওদিকে প্লেনও উড়লো দুটো।…একটা কুকুরের চিত্তার কানে আসছিলো, পাহাড়ের ওপর থেকে। বুঝতে পেরেছি, রাফিয়ান। ইস, যদি তোরা তখন বুঝতে পারতি আমাদের ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তাহলে ছুটে আসতে পারতি।
হ্যাঁ, ঝড়ের রাতে অনেক ঘেউ ঘেউ করেছে রাফি, জিনা বললো। আমি ওকে ধমক দিয়ে থামিয়েছি। যদি বুঝতে পারতাম ডাকাতদের দেখে চিৎকার করেছে ও…যাকগে, যা হবার হয়ে গেছে। এখন আর ওসব বলে লাভ নেই।
প্লেনগুলোর কি হয়েছে, জানো কিছু?
শুনেছি, ঝড়ের মধ্যে উড়তে গিয়ে সাগরে ভেঙে পড়েছে। পাইলটদের পাওয়া যায়নি, জনি জানালো।
ও, বিষণ্ন হয়ে গেল জ্যাক। আমার খুব প্রিয় ছিলো প্লেনটা! আর ওড়াতে পারবো না! রিড, তোমারও নিশ্চয় খারাপ লাগছে?
হ্যাঁ, ক্লান্ত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালো রিড। গুহা থেকে বেরিয়ে খোলা বাতাসে আসার পর অনেকটা সুস্থ লাগছে তাকে, ঘোরের ভাবটা আর নেই! চল, যাওয়া যাক।
হাঁটতে জ্যাকের অসুবিধে হলো না, কিন্তু রিড একেবারেই পারলো না। পালা করে তাকে বয়ে নিয়ে চললো ছেলেরা। জিনার কোলে টোগো। ছাড়লেই সোজা পথে না গিয়ে ওটা আরেক দিকে চলে যেতে চায়।
মাঝপথে দেখা হলো পুলিশের সঙ্গে। কলিউডের ফোন পেয়ে গুহার দিকেই আসছিলো। রিডের দায়িত্ব নিলো ওরা।

ফার্মে ফিরে এলো ছেলেমেয়েরা। উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করছিলেন জনির বাবা, মা, আর ল্যারি। উষ্ণ সংবর্ধনা জানালেন সবাইকে। জিনার কোল থেকে টোগোকে প্রায় কেড়ে নিলো ল্যারি। জড়িয়ে ধরে আদর করতে করতে বললো, পালিয়ে যাওয়ার অভ্যাসটা তুই ছাড়, বুঝেছিস! বড়দের মতো করে বললো সে। বড় খারাপ অভ্যাস! ধরে একদিন এমন মার লাগাবো... কথা আর শেষ হলো না তার। যেন বুঝতে পেরেই মারের ভয়ে ঝটকা দিয়ে তার হাত থেকে ছুটে গিয়ে মাটিতে লাফিয়ে পড়লো বাচ্চাটা। তিড়িং বিড়িং করে খানিকটা লাফিয়ে নিয়ে দৌড় দিলো গোলাঘরের দিকে। ওটাকে ধরে আনতে ছুটলো ল্যারি।

বাচ্চা দুটোর কাণ্ড দেখে হাসতে আরম্ভ করলো সবাই। এমনকি রিডও পায়ের ব্যথা ভুলে গিয়ে হেসে উঠলো।

পাগল ছেলে! সস্নেহে সেদিকে তাকিয়ে বললেন মা। থাক, আর কিছু বলবো না টোগোকে। ওটার জন্যেই আজ ওদের ফিরে পাওয়া গেল..আরে, তোমরা সব দাঁড়িয়ে কেন? এসো এসো, ঘরে এসো। চা-নাস্তা রেডিই আছে।

ওসব নাস্তা-ফাস্তায় কাজ হবে না আমার, হেসে হাত নাড়লো জ্যাক। আমার আর রিডের ভুড়িভোজন দরকার। কখন যে শেষ খেয়েছি, ভুলেই গেছি।

ঠিক আমার কথাটা বলেছেন,তুড়ি বাজালো মুসা। কখন যে খেয়েছি মনেই নেই। এতো খাটাখাটনি করেছি, মনে হচ্ছে নাড়ি পর্যন্ত হজম হয়ে গেছে। আন্টি, দুটো বড় বড় কেক, আর অন্তত খানকুড়ি মাংসের বড়া না হলে চলবে না আমার।

পাগল ছেলে! মুসার দিকে তাকিয়ে দ্বিতীয়বার বললেন মিসেস কলিউড।

ভলিউম ১২ – ভাঙা ঘোড়া – তিন গোয়েন্দা – রকিব হাসান – সেবা প্রকাশনী

এইই, কিশোর, ইস্কুলের গেটে দাঁড়িয়ে ডাক দিলো মুসা আমান, পিনটু আলভারেজ কথা বলতে চায় তোমার সঙ্গে। সবে ছুটি হয়েছে ইস্কুল, বাইরে তারই জন্যে অপেক্ষা করছে রবিন আর কিশোর।

ওই নামের কাউকে চেনো বলে জানতাম না তো, রবিন বললো কিশোরকে।

ঠিক চিনি বলতে পারবো না এখনও, জবাব দিলো গোয়েন্দাপ্রধান। ক্যালিফোর্নিয়া হিস্টরি ক্লাবে মাঝে মাঝে দেখা হয়। তবে কথা বিশেষ বলে না। নিজের কাজে ব্যস্ত থাকে। মুসা, কি চায় ও?

কাছে এসে দাঁড়িয়েহে মুসা। জানি না। আমাকে অনুরোধ করলে তোমাকে বলতে, ইস্কুল ছুটির পর যেন তার সাথে দেখা করো, অবশ্য যদি তোমার সময় হয়। জরুরী কথা বলবে বলেই মনে হলো।

তিন গোয়েন্দার সাহায্য চায় নাকি?

শ্রাগ করলে মুসা। চাইতেও পারে।

চল তো, কি বলে শুনি। কোথায় দেখা করতে বলেছে?

খেলার মাঠে।

আগে আগে চললো কিশোর। ইস্কুল বিল্ডিঙের পাশ দিয়ে এসে পড়লো শান্ত, নীরব একটা রাস্তায়। দুই ধারে গাছের সারি। শেষ মাথায় একটা গেট, ওটা দিয়ে যেতে হয় খেলার মাঠে। গায়ের জ্যাকেট টেনেটুনে নিলো ওরা। নভেম্বরের বিকেল। রোদেলা দিন, কিন্তু তারপরেও ঠাণ্ডা, নকনে বাতাস বইছে।

কই, পিনটু কোথায়? এদিক ওদিক তাকালো রবিন।

সর্বনাশ হয়েছে। নিমের তেতো ঝরলো মুসার কণ্ঠে। দেখো, কে।

গেটের ঠিক বাইরে হোট একটা হুডতোলা পিকআপ দাঁড়িয়ে রয়েছে। এগুলোর ডাকনাম রাঞ্চ ওয়াগন, র্যাধের কাজে ব্যবহার হয়। চওড়া কাধ, গাট্টাগোট্টা একজন মানুষকে দেখা গেল গাড়ির সামনের বাম্পারের ওপর বসে থাকতে। মাথায় কাউবয় হ্যাট, গায়ে ডেনিম জ্যাকেট, পরনে নীল জিনস, পায়ে ওয়েস্টার্ন বুট। ওর পাশে গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিপছিপে, লম্বা এক তরুণ। ঈগলের ঠোঁটের মতো বাঁকানো, লম্বা, পাতলা নাক। পিকআপটার দরজায় সোনালি অক্ষরে বড় বড় করে লেখা রয়েছেঃ ডয়েল র‍্যাঞ্চ।

শুঁটকি টেরি! নাকমুখ কুঁচকে ফেললো রবিন। ও এখানে...

রবিনের কথা শেষ হওয়ার আগেই ওদেরকে দেখে ফেললো লম্বা ছেলেটা, বলে উঠলো, বাহ, শার্লক হোমস এসে গেছে দেখি। সঙ্গে দুই চেলাও আছে।

খিকখিক করে গা জ্বালানো হাসি হাসলো তিন গোয়েন্দার চিরশত্রু টেরিয়ার ডয়েল। ধনী ব্যবসায়ীর বখে যাওয়া ছেলে সে। সুযোগ পেলেই ওদের পেছনে

লাগে, জ্বালিয়ে মারে। নিজেকে খুব চালাক ভাবে, কিন্তু প্রতিবারেই হেরে যায় তিন গোয়েন্দার কাছে।
শুঁটকির টিটকারির জবাব না দিয়ে পারা যায় না, গেটের কাছে থমকে দাঁড়ালো কিশোর। ভোতা গলায় বললো, রবিন, ঘেউ ঘেউ করে উঠলো যেন কেউ?
কই, কোনো মানুষকে তো দেখতে পাচ্ছি না, শুঁটকির দিকে তাকিয়ে জবাব দিলো রবিন।
মানুষ দেখছি না, তবে একটা দুর্গন্ধ পাচ্ছি, নাক কোঁচকালো মুসা। বোধহয় শুঁটকির।
রসিকতাটা বুঝলো কাউবয়, হেসে উঠলো। লাল হয়ে গেল টেরির মুখ। ঘুসি পাকিয়ে হুমকির ভঙ্গিতে এগোলো তিন গোয়েন্দার দিকে। এই সময় ডেকে উঠলো আরেকটা নতুন কন্ঠ, কিশোর পাশা, দেরি করে ফেললাম, সরি। একটা উপকার চাইতে এসেছি তোমার কাছে।
সুন্দর স্বাস্থ্য, কালো চোখ, কালো চুলওয়ালা একটা ছেলে বেরিয়ে এলো গেট দিয়ে। পিঠ এতো খাড়া করে হাঁটে যে যতোটা না লম্বা তার চেয়ে বেশি লম্বা মনে হয়। পরনে আঁটো পুরানো জিনস, পায়ে খাটো রাইডিং বুট, গায়ে ঢাললে সাদা শার্ট, জোড়াগুলো রঙিন সুতো দিয়ে সেলাই করা। কথায় কোনো টান নেই, তবে পোশাকেই বোঝা যায় পুরানো স্প্যানিশ জমিদারের রক্ত রয়েছে শরীরে।
কি উপকার? জানতে চাইলো কিশোর।
হেসে উঠলো টেরি। হা-হা, শার্লক, শেষমেষ চেঁড়োদের সঙ্গে মিশলে? লাল কাপড় দেখিয়ে ষড় খেদানো ছাড়া ওরা আর কি বোঝে? একটা উপকার অবশ্য করতে পারো। ঘাড়টা ধরে মেকসিকোতে ফেরত পাঠাতে পারো। উপকারটা আমাদের সবারই হয় তাহলে।
চরকির মতো পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়ালো পিনটু। এতোই দ্রুত, অবাক করে দিলো টেরিকে, মুখের হাসি মুছে দিলো তার কঠিন কণ্ঠে বললো, কথাটা ফিরিয়ে নাও! আর মাপ চাও আমার কাছে।
শুঁটকির চেয়ে খাটো ছেলেটা, ওজনও কম হবে, কিন্তু পরোয়াই করলো না। মাথা তুলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে টেরির মুখোমুখি, একেবারে স্প্যানিশ জমিদার। কিংবা ডন।
পাগল!কললো বটে, কিন্তু হাসলো না টেরি। আমি মেকসিকানদের কাছে মাপ চাই না।
সবাইকে অবাক করে দিয়ে ঠাস করে টেরির গালে চড় মারলো ছেলেটা।
শয়তানের বাচ্চা! ভীষণ রাগে গাল দিয়ে উঠে এক ধাক্কায় ছেলেটাকে মাটিতে ফেলে দিলো টেরি। কিন্তু চোখের পলকে লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল পিনটু। আবার

তাকে ফেলে দিলো টেরি। আবার উঠলো পিনট, আবার পড়লো। আবার উঠলো। টেরির শার্টের বুক খামচে ধরলো। তাকে ঠেলে রাস্তার দিকে নিয়ে চললো টেরি, এদিক ওদিক তাকাচ্ছে, যেন আশা করছে কেউ এসে এই অসম লড়াইটা থামায়। চেঁচিয়ে বললো, এই, এই আঁকটাকে সরাও তো...।

জেঁকটাকে সরানোর জন্যে নয়, অন্য উদ্দেশ্যে শার্টের হাতা গুটিয়ে আগে বাড়লো মুসা। হেসে উঠলো মোটা কাউবয়। লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো বাম্পার থেকে। পিনটুকে বললো, এই ছেলে, থামো। পারবে না ওর সাথে। অহেতুক মার খাবে আরও।

নাআআ!

তীক্ষ্ণ, কঠিন আরেকটা কণ্ঠ যেন চাবুকের মতো আছড়ে পড়ে জমিয়ে দিলো সবাইকে। কোনদিক থেকে এসেছে সে, উত্তেজনার মাঝে খেয়াল করেনি কেউ। পিনটুর একটা বড় সংস্করণ মনে হচ্ছে লোকটাকে। চেহারার মিল তো রয়েছেই, পোশাক-আশাকও অবিকল একরকম, শুধু পিনটুর চেয়ে লম্বা আর বয়েস কিন্তু বেশি এই যা। আর মাথায় একটা কালো সমব্রেরো হ্যাট রয়েছে। পাথর কুঁদে তৈরি যেন মুখ, কালো শীতল চোখ। কেউ এগোবে না, গর্জে উঠলো আবার লোকটা। ওরা লেগেছে, ওদেরকেই মীমাংসা করতে দাও।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে আবার ফিরে এলো কাউবয়, হেলান দিয়ে দাঁড়ালো গাড়ির গায়ে। মুসাও দাঁড়িয়ে গেছে। চেয়ে রয়েছে রবিন আব কিশোর। জ্বলন্ত চোখে সবার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে আবার পিনটুর দিকে তাকালে টেরি। রাস্তায় নেমে গেছে দুজনে। টেরির শার্ট ছেড়ে দিয়েছে পিনটু। ঘুসি তুলে এগিয়ে গেল তাকে মারার জন্যে।

বেশ, সেঁড়ো, দেখাচ্ছি মজা! বলে ঘেঁকিয়ে উঠলো টেরি।

র‍্যাঞ্চ ওয়াগনের একটু দূরে আরেকটা গাড়ি পার্ক করা। মাঝখানের খালি জায়গায় বাধলো লড়াই। হঠাৎ লাফিয়ে পিছিয়ে গেল টেরি, ভালোমতো সই করে একটা ঘুসি ঝাড়ার জন্যে।

সরো! সরো। একসাথে চেঁচিয়ে উঠলো রবিন আর মুসা।

পিছিয়ে একেবারে রাস্তার মাঝে চলে গেছে টেরি। খেয়ালই করেনি গাড়ি আসছে। চোখ পিনটুর দিকে। টায়ারের তীক্ষ্ণ আর্তনাদ শোনা গেল। ব্রেক কষেছে ড্রাইভার, কিন্তু বাঁচাতে পারতো না টেরিকে, যদি সময়মতো ডাইভ দিয়ে না পড়তে পিনটু। করে এক প্রচণ্ড ধাক্কায় টেরিকে সরিয়ে দিলো গাড়ির সামনে থেকে। তাকে নিয়ে গিয়ে পড়লো মাটিতে।

ক্ষণিকের জন্যে নিশ্চল হয়ে পড়ে রইলো দুটো দেহ। চেঁচামেচি করে ছুটে গেল দর্শকরা।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো পিনটু, হাসিমুখে। টেরিও উঠলো। ক্ষতি হয়নি তারও।
পিনটুর পিঠ চাপড়ে বাহবা দিলো মুসা। গাড়ি থেকে নেমে তাড়াহুড়ো করে ছুটে এলো ড্রাইভার। পিনটুকে বললো, দারুণ হেলে তো হে তুমি? তা কোথাও লাগেনি তো?
মাথা নাড়লো পিনটু। ওকে ধন্যবাদ দিয়ে টেরির দিকে এগোলো ড্রাইভার। তার খোঁজখ নিলো। যখন দেখলো কারোরই কোনো ক্ষতি হয়নি, আবার গিয়ে উঠলো গাড়িতে। চলে গেল। টেরি তখনও পা ছড়িয়ে বসে আছে। কাঁপছে মৃদু মৃদু। চেহারা ফ্যাকাসে।
এগিয়ে গিয়ে হাত ধরে টান দিলো তার কাউবয় সঙ্গী। ওঠো! অল্পের জন্যে বেঁচেছে। ওঠো!
ও…ও আমাকে বাঁচালো। বিড়বিড় করলো টেরি।
কি মনে হয় তোমার? ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করলো মুসা। ধন্যবাদ দাও ওকে।
থ্যা-থ্যাংকিউ, পিনটু,কাপা গলায় বললো টেরি। শু
ধু থ্যাংকিউ? কড়া গলায় বললো পিনটু। আর কিছু না?
দ্বিধায় পড়ে গেল টেরি। আর আবার কি?
আর? কেন ভুলে গেছো মাপ চাওয়ার কথা? জলদি মাপ চাও। নইলে এসো, দেখি, আবার হয়ে যাক এক হাত।
ছেলেটার দিকে দীর্ঘ এক মুহূর্ত নীরবে চেয়ে রইলো টেরি।
কি হলো? ভুরু নাচালো পিনটু। কথা বলছো না কেন? কথা ফিরিয়ে নাও। আর মাপ চাও।
লাল হয়ে গেল টেরির গাল। বেশ, তাতে যদি খুশি হও-ফিরিয়ে নিলাম আমার কথা…
হাত তুললো পিনটু। ঠিক আছে, আর মাপ চাইতে হবে না। এমনিতেই মাপ করে দিলাম। বলে ঘুরে দাঁড়ালো সে।
এই, শোনো…,বলতে ঝলতেই টেরির চোখ পড়লো তিন গোয়েন্দার হাসিমুখের দিকে, তার দিকে তাকিয়েই হাসছে। রাগে লাল হয়ে গেল মুখ। ঝটকা দিয়ে ঘুরে গটমট করে এগোলো র‍্যাঞ্চ ওয়াগনের দিকে। ডরি! হেঁকে বললো কাউবয়কে, আদেশের সুর, চলো!
পিনটুর দিকে তাকালো এবার ডরি। তারপর তার পাশে দাঁড়ানো কঠিন চেহারার লোকটার দিকে। চিবিয়ে চিবিয়ে বললো, কাজটা ঠিক করোনি তোমরা। এজন্যে পস্তাতে হবে।
র‍্যাঞ্চ ওয়াগলে টেরির পাশে উঠে বসলো ডরি। গাড়ি স্টার্ট দিলো।

ডরির হুমকি তখনও যেন কানে বাজছে তিন গোয়েন্দার। দেখলো, চলন্ত ওয়াগনটার দিকে তাকিয়ে আছে পিনটু, চোখে বিতৃষ্ণা।
এই অহংকারই সর্বনাশ করলো আমাদের! দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে তার অন্তর থেকে বেরিয়ে এলো ক্ষোভটা।
না, পিনটু, প্রতিবাদ করলো লম্বা লোকটা, এটা অহংকার নয়। আত্মসম্মানজ্ঞান। আলভারেজদের গর্ব।
তিন গোয়েন্দার সঙ্গে লোকটার পরিচয় করিয়ে দিলো পিনটু, আমার ভাই, রিগো। বর্তমানে আমাদের পরিবারের কর্তা। ভাইয়া, এরা হলো আমার বন্ধু, কিশোর পাশা, মুসা আমান, আর রবিন মিলফোর্ড।
ছেলেদের দিকে তাকিয়ে সামান্য একটু মাথা নোয়ালো রিগো। বয়েস পঁচিশের বেশি নয়, পরনের কাপড়-চোপড়ও পুরানো কিন্তু তবু আচার-আচরণই স্পষ্ট বলে দেয় এককালে বড় জমিদার ছিলো বাপ-দাদারা। বললো, তোমাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম।
ডা নাদা! বলে স্প্যানিশ কায়দায় বাউ করলো কিশোর।
বাহ্! এই প্রথম হাসি ফুটলো রিগোর মুখে। তুমি স্প্যানিশ জানো?
একআধটু চর্চা করি ইস্কুলে, কিছুটা লজ্জিত কণ্ঠেই বললো কিশোর। তবে তেমন পারি না। আপনাদের মতো করে বলার তো প্রশ্নই ওঠে না।
স্প্যানিশ কলার দরকার নেই আমাদের সঙ্গে, ভদ্রতা করে কললো রিগো। আমরা নিজেরা যখন কথা বলি দেশী ভাষায়ই বলি। কিন্তু এখন আমরা আমেরিকারও নাগরিক, তোমাদেরই মতো, কাজেই ইংরেজিও আমাদের ভাষা কলা চলে।
কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো কিশোর, তার আগেই অধৈর্য হয়ে হাত নাড়লো মুসা, বলে উঠলো, আচ্ছা, পস্তাবে বলে শাসিয়ে গেল কেন কাউবয়টা?
ওই এমনি বলেছে, বিশেষ পাত্তা দিলো না রিগো, কথার কথা। পিনটুর কণ্ঠে অস্বস্তি ফুটলো, কিন্তু ভাইয়া, মিস্টার ডয়েল…
থাক থাক বাধা দিয়ে বললো রিগো, আমাদের ব্যক্তিগত সমস্যা ওটা। অন্যকে বিরক্ত করার দরকার নেই।
কোনো গোলমাল হয়েছে? জিজ্ঞেস করলো কিশোর। কিছু করেছে ডরি আর টেরিয়ার?
না, না, তেমন কিছু না।
ভাইয়া, প্রতিবাদ জানালো পিনটু, আমাদের র‍্যাঞ্চ চুরি করে নিয়ে যেতে চাইছে, আর একে তুমি কিছু না বলহো!
হাঁ হয়ে গেল রবিন আর মুসা। রবিন বললো, তোমাদের র‍্যাঞ্চ? মুসা বললো, করে কিভাবে?

কথা শুদ্ধ করে বলবে, পিনটু, বললো তার ভাই। চুরি শব্দটা ঠিক হয়নি।
কোন শব্দটা হলে ঠিক হতো? ফস করে জিজ্ঞেস করলো কিশোর।
দ্বিধায় পড়ে গেল যেন রিগো। মুখ ফসকে বলে ফেলেছে, এখন বাকিটা বলবে কিনা ভাবছে যেন। শেষে বলেই ফেললো, কয়েক মাস আগে আমাদের পাশের র‍্যাঞ্চটা কিনেছেন মিস্টার ডয়েল। তারপর আশেপাশে যত বড় বড় র‍্যাঞ্চ আছে সব কিনে ফেলবেন ঠিক করেছেন। আমার বিশ্বাস জমির ওপর টাকা খাটাচ্ছেন। আমাদের র‍্যাঞ্চটাও চাইছেন। অনেক টাকা দাম দিতে চেয়েছেন। কিন্তু আমরা বিক্রি করতে রাজি না হওয়ায় ভীষণ রেগে গেছেন তিনি।
তোমার শব্দ-চয়নও ঠিক হয়নি, হেসে বললো পিনটু। বরং বলো পাগলা ঘোড়া হয়ে গেছেন।
ভাইয়ের কথায় কান না দিয়ে বলতে থাকলো রিগো, বুঝেছে, আসলে আমাদের জমির দরকার খুব একটা নেই তার কাছে। তিনি চাইছেন অন্য জিনিস। পুরানো একটা ড্যাম আর রিজারভোয়ার রয়েছে আমাদের এলাকায়, নাম সান্তা ইনেজ ক্রীক। মিস্টার ডয়েরে বিশাল র‍্যাঞ্চের জন্যে পানি দরকার, তাই বাধ আর ওই দীঘিটা চায়। প্রথমে এসে কেনার প্রস্তাব দিলো আমাদের কাছে, রাজি হলাম না। আরও বেশি দাম দিতে চাইলো। তারপরও যখন রাজি হলাম না, আমাদের পুরানো দলিল ঠিক না বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করলো। পারলো না। আমাদের জমি আমাদেরই রইলো।
তখন অন্য পথ ধরলো ডয়েল, মিস্টার ডয়েলকে সৌজন্য দেখানোর ধার দিয়েও গেল না পিনটু। ডরিকে দিয়ে শেরিফকে বলে পাঠালো, প্রায়ই আমাদের র‍্যাঞ্চে আগুন লাগে। সেই আগুন নাকি তার র‍্যাঞ্চেও ছড়িয়ে পড়তে পারে। বলে আমাদের লোক কম। আরও লোক রাখা দরকার যাতে ওরকম দুর্ঘটনা আর না ঘটতে পারে। রাগ চাপা দিতে পারলো না সে।
এই ডরিটাকে? রবিন জানতে চাইলো।
মিস্টার ডয়েলের র‍্যাঞ্চ ম্যানেজার, জানালো রিগো। মিস্টার ডয়েল হলেন গিয়ে ব্যবসায়ী মানুষ। র‍্যাঞ্চ সম্পর্কে কোনও ধারণা নেই। তাই লোক রেখে চালাতে চাইছেন আমার মনে হয়।
ডরির কথা নিশ্চয় বিশ্বাস করেননি শেরিফ, মুসা আশা করলো। নইলে এতোদিনে হাতছাড়া হয়ে যেতো আপনাদের র‍্যাঞ্চ, তাই না?
ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেললো রিগো। কাগজ-পত্র সব ঠিক আছে বলেই কিছু করতে পারছে না। কিন্তু আমাদের টাকা নেই, কতোদিন ঠেকাবো? ট্যাক্স জমে গেছে অনেক। সেটা জেনে ফেলেছেন মিস্টার ডয়েল। কাউন্টিকে ফুসলাচ্ছেন

যাতে নীলামে তোলে আমাদের জমি, তাহলে তিনি কিনে নিতে পারবেন। এখন যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব ট্যাক্স ক্লিয়ার করতে হবে আমাদের...
ব্যাংকের কাছে বাধা দিয়ে টাকা ধার নিতে পারেন, কিশোর বললো।
হ্যাঁ, কিশোরের কথা সমর্থন করতে পারলো না মুসা, তারপর ব্যাংক এসে জমিটা নিয়ে নিক। ফুটন্ত কড়াই থেকে জ্বলন্ত চুলায় ঝাপ দেয়ার পরামর্শ দিচ্ছো।
না, তা কেন হবে? কিশোরের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে তার পক্ষ নিলো রবিন। নিশ্চয় অনেক টাকা ট্যাক্স জমেছে। সেটা ব্যাংক দিয়ে দেবে। সেই টাকার ওপর কিছু সুদ ধরে কিস্তিতে শোধ দিতে কলবে জমির মালিককে। একবারে দেয়ার চেয়ে অল্প অল্প করে দেয়া অনেক সহজ, আর দেয়ার সময়ও পাওয়া যাবে।
তা ঠিক, রাগ ফুটলো রিগোর কণ্ঠে। কিন্তু কথা হলো আমাদের মতো বাইরের লোকদের ধার দিতে চায় না ক্যালিফোর্নিয়ার ব্যাংক। খাঁটি আমেরিকান না হলে বিশ্বাস করে না। জমি বন্ধক রেখে ট্যাক্সের জন্যে ধার আমরা নিয়েছি, আমাদেরই এক পুরানো বন্ধু, প্রতিবেশী, আমাদের মতোই মেকসিকান-আমেরিকান রডরিক হেরিয়ানোর কাছ থেকে। কয়েক দিনের জন্যে। টাকাটা শীঘ্রি শোধ করতে হবে। সে-কারণেই তোমার কাছে এসেছি, কিশোর পাশা।
আমার কাছে?
যেহেতু র‍্যাঞ্চ ছাড়ছি না আমরা, জায়গা আর বিক্রি করতে পারছি না। বিক্রি করার মতো জমিই নেই। যা আছে সেগুলো দিয়ে আমাদেরকে চলতে হবে। অনেক পুরুষ ধরে অনেক জিনিসপত্র কিনেছে আলভারেজরা, অনেক কিছু জমিয়েছে। এই যেমন আসবাবপত্র, ছবি, ভাস্কর্য, বই, পোশাক, যন্ত্রপাতি, আরও নানারকম জিনিস। আলভারেজদের ইতিহাসই বলা চলে ওগুলোকে। কিন্তু জমির চেয়ে তো বড় না, তাই ওগুলো বিক্রি করে ধারশোধ করবো ঠিক করেছি। পিনটুর কাছে শুনেছি, তোমার চাচা নাকি সব ধরনের পুরানো জিনিস কেনেন।
নিশ্চয়ই কেনেন, কিশোরের আগেই চেঁচিয়ে উঠলো মুসা। আর যতো বেশি পুরানো জিনিস হয় ততো বেশি খুশি হন।
হ্যাঁ, কিশোর কললো, পুরানো হলে খুশি হয়েই কিনবেন। আসুন।
সত্যিই খুশি হলেন রাশেদ পাশা। মুসা আর কিশোরের মুখে শুনে প্রায় লাফিয়ে উঠলেন। মুখ থেকে পাইপ সরিয়ে বললেন, তাহলে আর বসে আছি কেন? উত্তেজনায় চকচক করছে চোখ।
কয়েক মিনিট পরেই স্যালভিজ ইয়ার্ডের একটা ট্রাক উত্তরে রওনা হলো। প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, পার্বত্য এলাকার দিকে চলেছে, আলভারেজদের র‍্যাঞ্চের দিকে। গাড়ি চালাচ্ছে ইয়ার্ডের কর্মচারী, ব্যাভারিয়ান ভাইদের একজন, বোরিস। পাশে বসেছেন রাশেদ পাশা আর পিনটু। ট্রাকের

পেছনে চড়ে চলেছে কিশোর, মুসা, রবিন আর রিগো। নভেম্বরের বিকেলের রোদ এখনও মুছে যায়নি, তবে পর্বতের মাথায় কালো মেঘ জমতে আরম্ভ করেছে।
সেদিকে তাকিয়ে রবিন বললো, বৃষ্টি তাহলে নামবে মনে হয়। গত মে-এর পর থেকে এক ফোঁটা বৃষ্টিও হয়নি। সময় হয়েছে এখন। যখন তখন শুরু হতে পারে শীতের বর্ষণ।
কাঁধ ঝাঁকালো রিগো। মনে হয়। না-ও হতে পারে। গত কিছু দিন ধরেই দেখছি, মেঘ জমে, কেটে যায়, জমে আবার কেটে যায়। বৃষ্টি হলে ভালোই হতো। পানি দরকার। আমাদের দীঘিটা আছে বলে বেঁচে গেছি। ওটার পানিতেই চলে সারা বছর। তবে এবছর খরা পড়েছে বেশি, পানি একেবারে নিচে নেমে গেছে। শীঘ্রি বৃষ্টি হলে বিপদ হবে।
পথের পাশে শুকনো বাদামী অঞ্চল। মাঝে মাঝে ওক গাহ, সবুজ পাতাগুলো লালচে হয়ে আছে ধূলিতে।
সেদিকে তাকিয়ে বিষণ্ন কণ্ঠে বললো রিগো, একসময় এসবই ছিলো আলভারেজদের জায়গা। এদিকের উপকূল থেকে শুরু করে ওদিকে ওই যে ওই পর্বতের একেবারে গোড়া পর্যন্ত। বিশ হাজার একরের বেশি।
দ্য আলভারেজ হাসিয়েনডা, মাথা ঝাঁকিয়ে বললো রবিন। পড়েছি। স্পেনের রাজার কাছ থেকে এই জমি ভোগদখলের অনুমতি পেয়েছিলো আলভারেজরা।
হ্যাঁ, রিগো বললো। অনেক দিন ধরে এখানে আছি আমরা। প্রথম যে ইউরোপিয়ান মানুষটি ক্যালিফোর্নিয়ায় পা রাখেন তাঁর নাম হুয়ান ক্যাবরিলো। পনেরো শো বিয়াল্লিশ সালে এটা স্পেনের সম্পত্তি বলে দাবি করেন। কিন্তু তারও আগে থেকেই আমেরিকায় ছিলেন নিরো আলভারেজ। হারনানদো করটেজের সেনাবাহিনীতে একজন সৈনিক ছিলেন তিনি। করটেজের নাম নিশ্চয় অনেহো, পনেরোশো একুশ সালে দক্ষিণ মেকসিকোতে আজটেকদেরকে পরাজিত করেছিলেন যে বীর সেনাপতি।
খাইছে! প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো মুসা। তারমানে প্লাইমাউথ রকে খ্রীষ্টান তীর্থযাত্রীদের ঢোকারও একশো বছর আগের ঘটনা সেটা।
তাহলে আলভারেজরা ক্যালিফোর্নিয়ায় এলো কবে? এই ইতিহাস শুনতে খুব ভালো লাগছে কিশোরের, আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলো।
অনেক পরে, রিগো জানালো। ক্যাবরিলো ক্যালিফোর্নিয়ায় ঢোকার পর থেকেই ধীরে ধীরে স্প্যানিশ এই এলাকায় ঢুকতে আরম্ভ করলো। তবে ঠিকমতো বসতি জমাতে দুশো বছরেরও বেশি সময় লেগে গেল তাদের। এর কারণ, নিউ স্পেনের তৎকালীন রাজধানী মেকসিকো সিটি থেকে ক্যালিফোর্নিয়া অনেক দূরে। দুর্গম

ছিলো তখন এই এলাকা, আর ভয়ংকর ছিলো এখানকার ইনডিয়ানরা। শুরুর দিকে তো স্থলপথে এখানে আসতেই পারতো না স্প্যানি, আসতো সমুদ্রপথে।
ক্যালিফোর্নিয়াকে তখন দ্বীপ মনে করতো স্প্যানিশরা, তাই না? কিশোর কলো।
মাথা ঝাঁকালো রিগো।। তারপর, সতেরোশো ঊনসত্তর সালে স্থলপথে এক অভিযান চালালেন ক্যাপ্টেন গ্যাসপার ডা পরটোলা। উত্তরে এগোতে এগোতে তিনি পৌঁছে গেলেন স্যান দিয়েগোতে। আমাদের পূর্বপুরুষ লেফটেন্যান্ট ডারিগো আলভারেজ ছিলেন তখন তাঁর সঙ্গে। সান ফ্রানসিসকো বে-এর অনেক জায়গা ঘুরে ঘুরে দেখলেন পরটোলা। তারপর সতেরোশো সওর সালে মনটেরোতে বসতি স্থাপন করলেন। ওই সময়ই রকি বীচকে চোখে লেগে গিয়েছিলো ডারিগোর। ঠিক করলেন, এখানেই বসতি করবেন। ক্যালিফোর্নিয়ার প্রভিনশিয়াল গভার্নমেন্টের কাছে দরখাস্ত করলেন জায়গা চেয়ে। অনুমতি পেলেন সতেরোশো চুরাশি সালে।
আমার তো ধারণা ছিলো স্পেনের রাজা তাকে জমি দিয়েছেন, মুসা কললো।
মাথা ঝাঁকালো রিগো। একদিক থেকে তা-ই করা হয়েছে আসলে। নিউ স্পেনের সমস্ত জায়গাই অফিশিয়ালি তখন রাজার সম্পত্তি। তাঁর পক্ষেই অনুমতিপত্র সই করতেন তৎকালীন মেকসিকো আর ক্যালিফোর্নিয়ার গভার্নার। ডারিগো পেলেন ফাইভ স্কোয়ার লীগস, অর্থাৎ বিশ হাজার একরেরও বেশি। এতো জায়গা ছিলো, অথচ এখন আমাদের আছে মাত্র একশো একর।
বাকি জমি? জানতে চাইলো রবিন।
বাকি? বিষণ্ন চোখে ট্রাকের পাশ দিয়ে ছুটে যাওয়া জমির দিকে তাকিয়ে রইলো রিগো এক মুহূর্ত। বোধহয় ঈশ্বরের বিচার! ইনডিয়ানদের কাছ থেকে তাদের জায়গা কেড়ে নিয়েছিলো স্প্যানিশরা; কাজেই ও-জমি তাদের দখলে থাকবে কেন? যাবেই। বছরের পর বছর আলভারেজদের সংখ্যা বেড়েছে, জমি ভাগাভগি হয়েছে। কিছু বিক্রি করেছে, কিছু কায়দা করে দখল করে নিয়েছে শরা, আর কিছু কেড়ে নিয়ে গেছে কলোনির উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা।
ধীরে ধীরে হোট থেকে ছোট হয়ে এলো আমাদের র‍্যাঞ্চ। কিন্তু জমিদারি মেজাজ আর অহংকার হাড়তে পারিনি আমরা। বড় বড় লোকদের সঙ্গে ছিলো আমাদের পূর্বপুরুষদের আত্মীয়তা। ক্যালিফোর্নিয়ার শেষ মেকসিকান গভার্নার পিও পিকো ছিলেন আমাদের আত্মীয়। বহু বহুর আগে করটেজের একটা মূর্তি স্থাপিত হয়েছিলো আলভারেজদের জমিতে, এখনও সেটা আমাদের সীমানার মধ্যেই আছে।
মিষ্টার ডয়েল তাহলে আপনাদের এই শেষ সম্বলটুকু ছিনিয়ে নিতে চাইছেন, সহানুভূতি মিশিয়ে বললো মুসা।

এতো সহজে নিতে দেবো না, দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করলো যেন রিগো। খুব একটা ভালো জায়গা নয় ওটা, ভালো তৃণভূমি নেই, ফসল ফলানো কঠিন। শুধু বাপ-দাদার জায়গা বলেই ভিটে আঁকড়ে পড়ে আছি। পড়ে থাকবো। ঘাস বেশি নেই বলে গরু তেমন পোষা যাচ্ছে না। তবে বিকল্প হিসেবে ঘোড়ার প্রজনন শুরু করেছি আমরা। অ্যাভোক্যাডো গাছ লাগিয়েছি। ছোটখাটো একটা তরকারীর খামারও করেছি। তারপরেও আমার বাবা আর চাচাকে গিয়ে শহরে নানারকম কাজ করতে হয়েছে র‍্যাঞ্চটা খাড়া রাখার জন্যে। এখন তারা নেই, মারা গেছে। র‍্যাঞ্চটা টিকিয়ে রাখতে হলে এখন আমাকে আর পিনটুকেও গিয়ে তাদের মতো কাজ করতে হবে।

কাউন্টি রোড ধরে চলেছে এখন ট্রাক। পাহাড়ী অঞ্চল। উত্তরে চলেছে ওরা। ধীরে ধীরে ওপরে উঠছে পথ। হঠাৎ করেই যেন পাহাড়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো ছড়ানো একটা সমতল জায়গায়। বাঁয়ে সামান্য মোড় নিয়ে পশ্চিমে এগিয়ে গেছে এখন রাস্তাটা। মোড়ের কাছ থেকে আরেকটা কাছা রাস্তা বেরিয়ে গেছে ডানে।

সেই রাস্তাটা দেখিয়ে রিগো কললো, ডয়েল র‍্যাঞ্চে গেছে ওটা।

দূরে ডয়েল র‍্যাঞ্চ দেখতে পেলো গোয়েন্দারা, তবে বাড়িটার পাশে কোনো গাড়িটাড়ি চোখে পড়লো না। টেরি আর ডরি কি তাহলে ফেরেনি?

কাউন্টি রোডটা যেখানে মোড় নেয়া শেষ করেছে ওখানে একটা ছোট পাথরের ব্রিজ আছে। নিচে শুকনো খট খটে বুক চিতিয়ে রেখেছে যেন পাহাড়ী নালা, পানি নেই।

সান্তা ইনেজ ক্রীক, নালাটা দেখিয়ে বললো রিগো, আমাদের সীমানা এখান থেকে শুরু। বৃষ্টি না নামলে আর পানি আসবে না ওটাতে। ওটা ধরে মাইলখানেক উত্তরে বাঁধ। ওই ওদিকে।

কতগুলো শৈলশিরা দেখালো সে। বোঝালো বাধটা ওগুলোর ওপাশে। নালার অন্যপাশে রয়েছে একটা শিরা, কাউন্টি রোডের সঙ্গে তাল রেখে পাশাপাশি এগিয়ে গেছে। উত্তরের পর্বতের গায়ে গ্রিগুলো এমনভাবে বেরিয়ে রয়েছে, দেখে মনে হয় হাতের হুড়ানো আঙুল।

আঙুলগুলোর পাশ দিয়ে গেছে পথ। শেষ আঙুলের কাছে এসে হাত তুলে দেখালো রিগো। ওটার ওপরে পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা কালো বিশাল মূর্তি-ঘোড়ার পিঠে বসে আছে ঘোড়সওয়ার, একটা হাত এমন ভাবে তুলে রেখেছে, মনে হয় যেন পেছনের সেনাদলকে এগোনোর নির্দেশ দিচ্ছে।

মহাবীর কটেজ, গর্বের সঙ্গে বললো রিগো। আলভারেজদের প্রতীকই বলা চলে ওটাকে। আলভারেজ হীরো। দুশো বছর আগে বানিয়েছিলো ইনডিয়ানরা।

শেষ শিরাটা পেরোনোর পর আবার দেখা গেল সমভূমি। আরেকটা পাথরের বিজ পেরোতে হলো। নিচে গভীর খাদ, এটাও শুকনো।
আরেকটা নালা? জিজ্ঞেস করলো মুসা।
নালা হলে তো ভালোই হতো, রিগো বললো। এটার মেকসিকান নাম অ্যারোইও। জোর বৃষ্টি হলেই শুধু এসব অ্যারোইওতে পানি জমে। আর কোনো উৎস নেই।
আর উৎস মানে?
পর্বতের গা থেকে বেরোনো ঝর্নার কথা বলছি। সান্তা ইনেজ ক্রীকে যেমন আসে।
সান্তা ইনেজ ক্রীকেও না বললেন বৃষ্টি হলে পানি আসে?
হ্যাঁ, তাই তো। বৃষ্টি হলে পর্বতের ভেতরের ফাঁকফোকরে পানি ঢুকে যায়, ঝর্না হয়ে বেরিয়ে আসে আবার নিচের নালা বেয়ে। কিন্তু অ্যারোইওর মুখ বন্ধ থাকে বলে ঢুকতে পারে না।
ডানে মোড় নিয়ে একটা কাঁচা রাস্তায় নামলো ট্রাক। পথের দুপাশে এখানে অ্যাভোকাডো গাছ লাগানো। আরেকবার ডানে মোড় নিয়ে পথটা বেরিয়ে এলো একটা ছড়ানো, খোলা চত্বরের মতো জায়গায়।
সিয়েনডা অ্যালভারেজে স্বাগতম, নাটকীয় ভঙ্গিতে বললো রিগো। নিচের মাটিতে ধুলো জমে আছে। লাফ দিয়ে দিয়ে ট্রাক থেকে নামলো গোয়েন্দারা। লম্বা, নিচু হাতওলা একটা বাড়ি। দেয়ালে সাদা চুনকাম। কোটরে বসা চোখের মতো যেন ক্ষ দেয়ালের গভীরে বসে রয়েছে জানালাগুলো। লাল টালির ঢালু ছাত। কালচে বাদামী রঙের খুঁটি আর কড়িকাঠের ওপর ভর দিয়ে হাতটা এসে যেন ঝুলে রয়েছে বারান্দার ওপর। এই বাড়িটাই অ্যালভারেজদের হাসিয়েনডা। বাঁয়ে ঘোড়ার ঘর, এটারও হাত নিচু। অনেকটা গোলাঘরের মতো দেখতে। সামনে তারের বেড়া দিয়ে তৈরি করা হয়েছে কোরাল। মুরগীর খোয়াড়ের বাইরে যেমন দিনের বেলা চরে খাওয়ার জন্যে ঘেরা জায়গা থাকে, কোরালও অনেকটা এরকমই। কোরাল আর গোলাঘরের চারপাশে গজিয়ে উঠেছে বাকাচোরা ওকগাছ। নভেম্বরের এই মেঘলা বিকেলে সব কিছুই কেমন যেন মলিন, বিষণ্ন দেখাচ্ছে।
হাসিয়েনডার পেছনে খানিক দূরেই দেখা গেল সেই অ্যারোইওটা, যেটা পেরিয়ে এসেছে ট্রাক। তার ওপাশে মাথা তুলে রেখেছে শৈলশিরাগুলো। হাত তুলে করটেজের মূর্তিটা চাচাকে দেখালো কিশোর।
ওটাও কি বিক্রি হবে? রিগোকে জিজ্ঞেস করে বসলেন রাশেদ পাশা কিছু না ভেবেই।
না না, রিগো মাথা নাড়লো। বিক্রির জিনিস রয়েছে গোলাঘরের ভেতরে।

কোরারে কাছে ট্রাক পিছিয়ে নিতে শুরু করলো বোরিস। অন্যেরা দ্রুত এগোলো ধুলো মাড়িয়ে গোলাঘরের দিকে। ভেতরে আলো খুব কম। একটা কাঠের হুকের মাথায় হ্যাটটা প্রায় ছুঁড়ে ফেললো রিগো, পারিবারিক রত্নগুলো ভালোমতো দেখার এবং দেখানোর জন্যে। হাঁ হয়ে গেছে তিন গোয়েন্দা।
লম্বা ঘরটার অর্ধেকটা জুড়ে রয়েছে ঘোড়া রাখার স্টল, আর কৃষিকাজের সাধারণ যন্ত্রপাতি। বাকি অর্ধেকটা গুদাম। মেঝে থেকে হাত পর্যন্ত জিনিসপত্রে বোঝাই। টেবিল, চেয়ার, ট্রাংক, আলমারি, লণ্ঠন, কাজের যন্ত্রপাতি, জমকালো পোশাক, তৈজসপত্র, গোসল করার ব্রিট গামলা আর আরও নানা জিনিস। দুই চাকার একটা রানো ঠেলাগাড়িও দেখা গেল। দেখে তিন গোয়েন্দার মতোই স্তব্ধ হয়ে গেছেন রাশেদ পাশাও।
অনেক ঘর ছিলো আলভারেজদের, জানালো রিগো। এখন অবশিষ্ট আছে মাত্র একটা হাসিয়েনডা। ওসব ঘরের প্রায় সমস্ত জিনিসপত্রই এনে রাখা হয়েছে এখানে।
সব কিনবো আমি! ঘোষণা করে দিলেন রাশেদ পাশা। এই দেখো দেখো! প্রায় চিৎকার করে বললো রবিন। পুরানো আরমার! একটা হেলমেট, একটা ব্রেস্ট-প্লেট …
…একটা তলোয়ার, একটা জিন! রবিনের কথাটা শেষ করলো মুসা। দেখো, জিনের গায়ে আবার রূপার কাজ!!
মালপত্রের মাঝে মাঝে সরু গলিমতো করে রাখা হয়েছে ভেতরে ঢোকার জন্যে। ঢুকে পড়লো তিন গোয়েন্দা। তালিকা তৈরি করার জন্যে সবে নোটবুক বের করেছেন রাশেদ পাশা, এই সময় বাইরে শোনা গেল চিৎকার।
ভালো করে শোনার জন্যে কান পাতলে সবাই। আবার শোনা গেল চিৎকার। স্পষ্ট বোঝা গেল এবার কি কলহেঃ আগুন! আগুন!
আগুন লেগেছে! জিনিস দেখা বাদ দিয়ে দৌড় দিলো সবাই দরজার দিকে।
গোলাঘর থেকে ছুটে বেরোলো তিন গোয়েন্দা। হালকা ধোঁয়ার গন্ধ নাকে ঢুকলো। চত্বরে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছে আর চিৎকার করছে দুজন লোক। রিগো! পিনটু! আগুন! ওই যে! বাঁধের কাছে।
ফ্যাকাসে হয়ে গেছে রিগোর মুখ। কোরালে দাঁড়িয়েই দেখতে পেলো সবাই, উত্তরের শুকনো বাদামী পর্বতের ভেতর থেকে মেঘলা আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে ধোঁয়া। বিপদটা বুঝতে দেরি হলো না কারোই। দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার ওসব পর্বতের ঢালে, খাড়িতে, গিরিপথের যেখানে সেখানে ঘন হয়ে জন্মায় মেসকিট আর চ্যাপারালের ঝোপ। প্রায় শুকিয়ে ঝনঝনে হয়ে আছে নিশ্চয়

এখন। একটা ঝোপে আগুন লাগার মানেই দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা, এবং তার অর্থ দাবানল!
জলদি দমকল আর বনবিভাগকে খবর দাও! চেঁচিয়ে উঠলো দুজনের একজন। বেলচা! কুড়াল! জলদি!
দৌড়ে গিয়ে পারবো না! বললো আরেকজন। ঘোড়া লাগবে, ঘোড়া!
তারচে আমাদের ট্রাকে করে চলুনা পরামর্শ দিলো কিশোর। ঠিক! সায় জানালো রিগো। এই, বেলচা আর কুড়াল রয়েছে গোলাঘরে!
ট্রাক স্টার্ট দেয়ার জন্যে দৌড় দিলো বোরিস। অন্যেরা গোলাঘরের দিকে ছুটলো আগুন নেভানোর যন্ত্রপাতি আনতে। আগের মতোই বোরিসের পাশে উঠে বসলেন রাশেদ পাশা আর পিনটু। অন্যেরা টপাটপ লাফিয়ে উঠে পড়লো ট্রাকের পেছনে। ট্রাকের দুধার খামচে ধরে দাঁড়িয়ে রইলো, যাতে উঁচু-নিচু জায়গায় চলার সময় আঁকুনিতে ছিটকে না পড়ে। হাঁপাতে হাঁপাতে দুজন লোকের পরিচয় করিয়ে দিলো রিগো, যারা চিৎকার করে আগুনের কথা জানিয়েছে।
আমাদের বন্ধু, পুয়ের্তে হুগো, আর ডা স্টেফানো, এক এক করে দুজনকে দেখালো রিগো। কয়েক পুরুষ ধরে হাসিয়েনডা আলভারেজে কাজ করছে। এই পথের ধারেই এখন বাড়ি করেছে দুজনে। শহরে কাজ করে। তবে অবসর সময়ে এখনও আমাদের র‍্যাঞ্চের কাজ করে দেয়।
দুজনেই বেঁটে। কালো চুল। খুব ভদ্রভাবে মাথা নুইয়ে সৌজন্য দেখালো তিন গোয়েন্দাকে। তবে চোখের উৎকণ্ঠা তাতে ঢাকা পড়লো না। ট্রাকের কেবিনের ওপর দিয়ে আবার ফিরে তাকালো ওরা আগুনের দিকে। রোদ-বাতাসে অল্প বয়েসেই ভাঁজ পড়েছে মুখের চামড়ায়, উদ্বেগে গভীর হলো সেগুলো। অস্বস্তিতে হাত ডললো পুরানো জিনসের প্যান্টের পেছনে।
সোজা উত্তরে ছুটেছে ট্রাক। ঘন হচ্ছে এখন ধোঁয়া। ঢেকে দিচ্ছে মেঘের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসা মলিন রোদকে। আগুনের দিকেই নজর, তবু, পথের পাশের সজী বাগানগুলো চোখ এড়ালো না ওদের। দক্ষিণের একটা মাঠের দিকে ছুট দিয়েছে একপাল ঘোড়া। শুরুতে অ্যারোইও আর শৈলশিরার পাশাপাশি চললো কাঁচা রাস্তাটা, তারপর পর্বতের কাছাকাছি এসে দুভাগ হয়ে গেল। আগুনটা ডান দিকে, তাই ডানের পথই ধরলো বোরিস। রুক্ষ এবড়োখেবড়ো পথে ঝাঁকুনি খেতে খেতে ছুটে চলেছে ট্রাক, ছড়িয়ে পড়া ধোঁয়া লক্ষ্য করে। বাঁক নিয়ে সোজা অ্যারোইওর দিকে এগিয়েছে পথ। হঠাৎ করেই যেন হোঁচট খেয়ে দাঁড়িয়েছে একটা পাথুরে শৈলশিরার গোড়ায়। খানিক দূরে শিরাটাও যেন আচমকাই শেষ হয়ে গেছে। এবং তার পরে ডানে একটা পুরানো পাথরের বধ, তার ওপ্র দিয়ে হুটলো টাক। বাধে নিচে সান্তা ইনেজ ক্রীকে শুকনো বুক দীর্ঘ বাঁক নিয়ে এগিয়ে

গেছে দক্ষিণ-পুবে শৈলশিরার একেবারে দূরতম প্রান্তের কাছে। বাঁধের পেছনে রিজারভোয়ার অর্থাৎ রিগোর দীঘি, বড়জোর একটা পুকুর বলা চলে ওটাকে, পর্বতের পায়ের কাছে শুয়ে শুয়ে যেন ঝিমোচ্ছে ক্লান্তিতে। পুকুরের পাশ দিয়ে ঘুরে ছুটলো ট্রাক। সামনে লাফিয়ে ওঠা আগুনের শিখা চোখে পড়লো এতোক্ষণে।

থামো। থামো! কেবিরে জানালার পেছনে মুখ বাড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠলো রিগো।

ঘ্যাচ করে ব্রেক কষলো বোরিস। এগিয়ে আসা আগুনের কাছ থেকে শখানেক গজ দূরে। লাফিয়ে নেমে পড়লো সবাই।

ছড়াও! ছড়িয়ে পড়ে! নির্দেশ দিলো রিগো। ঝোপের মাঝখানে কেটে দাও, আলাদা হয়ে যাক। বালি খুঁড়বে আগুনের ওপর। কোনোমতে ঠেলে পুকুরের দিকে নিয়ে যেতে পারলে বাঁচোয়া! জলদি ফ করো!

নালার দুই পাশেই আগুন জ্বলছে, অনেকটা অর্ধচন্দ্রাকারে। নিচে লাল আগুন, ওপরে কালো ধোঁয়ার একটা বিচিত্র দেয়াল যেন কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে আসছে, ছড়িয়ে পড়ছে দুপাশে। হড়াচ্ছে লাফ দিয়ে দিয়ে। এইমাত্র যেখানে দেখা যাচ্ছে সবুজ ঝোপ, পরমুহূর্তেই সেখানে লাল আগুন, দেখতে দেখতে পুড়িয়ে ছাই করে ফেলছে।

বাতাস কম, তাই রক্ষা! মুসা বললো।

নালার বাঁ দিকে ছুটে গেল তিন গোয়েন্দা। কুপিয়ে কেটে ফেললো ছোট ছোট গাহ, ঝোপ পরিষ্কার করে মাঝখানে একটা লম্বা গর্ত করে ফেললো, অনেকটা ট্রেঞ্চের মতো। মাটি নরম, কাটতে খুব একটা কে পেতে হলো না। খুঁড়ে তোলা মাটি ছিটিয়ে দিলো আগুনের ওপ্র।

আরি, দেখো! হাত তুলে দেখালো রবিন। শুঁটকি! আর ম্যানেজারটা!

লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটে আসছে টেরি আর ডরি। আরও লোক আসছে ওদের পেছনে। ডয়েলদের র‍্যাঞ্চ ওয়াগন আর আরও দুটো ট্রাকে করে এসেছে ওরা। হাতে কুড়াল, বেলচা। আগুনের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করলো ওরাও। কিশোর দেখলো এমনকি মিস্টার ডয়েলও চলে এসেছেন। হাত নেড়ে নেড়ে চেঁচিয়ে আদেশের পর আদেশ দিয়ে চলেছেন।

দুই র‍্যাঞ্চের দুটো দল, আগুন আর ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে পরস্পরকে দেখতে পাচ্ছে

ভালো করে, লড়ে চললো আগুনের সঙ্গে। মনে হলো কয়েক ঘণ্টা পেরিয়ে গেল। অথচ মেঘ আর ভাঙা ঘোড়া ধোঁয়ার ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে দেখা যাওয়া সূর্য দেখেই আন্দাজ করতে পারলো গোয়েন্দারা, সময় কেটেছে মাত্র আধ ঘণ্টা। ইতিমধ্যে পুরো কাউন্টিই যেন এসে হাজির হয়েহে আগুন নেভানোর জন্যে।

রাসায়নিক পদার্থ ভরা ট্যাংক আর বুলডোজার নিয়ে এসেছে বনবিভাগ। শেরিফের সহকারীরা হাত লাগিয়েহে আলভারেজ আর ডয়েলদের সঙ্গে। জোরালো এঞ্জিনের গর্জন তুলে আর ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে মাটি কাঁপিয়ে ছুটে এলো দমকলের গাড়ি। লাফিয়ে নামলো কর্মীরা। পাইপ খুলে নিয়ে দৌড় দিলো পুকুরের দিকে। পানি ছিটানো শুরু করলো আগুনের ওপর।

এলাকার আরও লোক ছুটে আসছে সাহায্য করতে। নালার দুই তীরেই অপেক্ষা করছে অনেকে, দুরে। ওদেরকে আনতে ছুটলো সিভিলিয়ানদের ট্রাকগুলো। বোরিস গেল একদিকে। ডয়েলদের ওয়াগন আর ট্রাকগুলো গেল দক্ষিণে কাউন্টি রোডের দিকে।

উড়ে এলো বনবিভাগের হেলিকপ্টার আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্যবহৃত বম্বার প্লেন। খুব নিচু দিয়ে উড়তে উড়তে আগুনের ওপর রাসায়নিক পদার্থ ছিটাতে লাগলো। পানিও ছিটাচ্ছে কোনো কোনোটা। কয়েকটা উড়ে গেল পর্বতের অন্যপাশে, আগুন ছড়িয়ে গেছে ওদিকেও। কয়েকটা উড়তে লাগলো দমকল-কর্মীদের ওপর, পানি ছিটিয়ে আগুন নেভাতে গিয়ে ভিজিয়ে চুপচুপে করে দিলো ওদের।

পরের একটা ঘন্টা ধরে চললো জোর লড়াই, মনে হচ্ছে সব বৃথা। আগুনকে পরাজিত করা যাবে না। ধোঁয়া আর আগুনের চাপে ক্রমেই পিছিয়ে আসতে বাধ্য হলো দমকল-কমীরা। তবে বাতাস কম থাকায় বেশিক্ষণ আর সুবিধে করতে পারলো না। আগুন। প্রতিপক্ষের চাপের মুখে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হলো একটু একটু করে। দাউ দাউ করে জ্বলতে জ্বলতে প্রথমে দ্বিধা করলো যেন কিছুক্ষণ, তারপর ঘন কালো ধোঁয়ায় আকাশ কালো করে দিয়ে কমতে আরম্ভ করলো। তবে খুব ধীরে।

থেমো না! চালিয়ে যাও! চেঁচিয়ে আদেশ দিলো দমকল বাহিনীর ক্যাপ্টেন। ঢিল পেলেই আবার লাফিয়ে উঠবে।

আরও দশ মিনিট পর বেলচায় ভর দিয়ে দাঁড়ালো কিশোর। হাত দিয়ে মুখের ঘাম মুছলো। গালে এসে লাগলো কিছু। চেঁচিয়ে উঠলো সে, বৃষ্টি। বৃষ্টি! বৃষ্টি আসছে

একটা দুটো করে বড় বড় ফোঁটা পড়তে শুরু করলো। কাজ থামিয়ে আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকালো কয়েকজন দমকলকর্মী। হঠাৎ করেই যেন ফাঁক হয়ে গেল আকাশের ট্যাংক, ঝমঝম করে নেমে এলো বারিধারা। ঘামে ভেজা, ধোঁয়ায় কালো মুখগুলো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। আনন্দের হুল্লোড় বয়ে গেল নালার একমাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত। সেই চিৎকারকে ছাপিয়ে হিসহিস করে উঠলো আগুনের অন্তিম আর্তনাদ।

মাথার ওপর দুহাত তুলে দিয়েছে রবিন। মুখ আকাশের দিকে। মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে, সে
য় নিচ্ছে হাত-মুখের কালি-ময়লা। ঝিলিক দিয়ে গেল বিদ্যুতের তীব্র নীল শিখা। বাজ পড়লো ভীষণ শব্দে। তারপর থেকে একটু পর পরই পড়তে লাগলো পর্বতের মাথায়।
পানিতে ধুয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে ধোঁয়া, তবে এখনও কিছু কিছু ভাসছে এখানে ওখানে। মার খাওয়া কুকুরের মতো নেতিয়ে পড়ছে আগুন, শেষ ছোবল হানার চেষ্টা করছে পাথরের ফাঁকে ফাঁকে যেখানে বৃষ্টি সরাসরি পড়তে পারছে না সেসব জায়গায়। তবে ভঙ্গি দেখেই বোঝা যায় সুবিধে করতে পারবে না আর।
বিপদ কেটেছে। সাহায্য করতে যারা এসেছিলো আস্তে আস্তে সরে পড়তে লাগলো তারা। বাকি কাজ শেষ করার দায়িত্ব রেখে গেল বনবিভাগ আর দমকল বাহিনীর ওপর।
সারা শরীরে কালি মাথা, ভিজে চুপচুপে হয়ে এসে পুকুরের পাড়ে দাঁড়ালো আলভারেজদের দল। ট্রাকে করে লোক নামিয়ে দিতে গেছে বোরিস, এখনও ফেরেনি।
কমে আসছে বৃষ্টি। শেষে গুঁড়ি গুঁড়িতে এসে স্থির হলো। কিছুটা পরিষ্কার হলো শেষ বিকেলের আকাশ।
চল, যাই, রিগো বললো। এক মাইলও হবে না। এখানে দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে হেঁটেই চলে যাই।
ক্লান্ত, ভেজা শরীর নিয়ে অন্যদের পেছন পেছন চলেছে তিন গোয়েন্দা। কিন্তু মনে সুখ, আগুনটা শেষ পর্যন্ত নেভাতে পেরেছে। বৃষ্টিতে ভিজে কাদায় প্যাঁচপ্যাঁচ করছে এখন কাঁচা রাস্তা, তার ওপর দিয়েই চলেছে মানুষ আর গাড়ির মিছিল, দক্ষিণে। সামনে মাথা তুলে রেখেছে উঁচু শৈলশিরা, যেটা শুকনো অ্যারোইও আর সান্তা ইনেজ ক্রীককে আলাদা করে রেখেছে।
ভিড় আর কাদার দিকে তাকালো রিগো, নিজের দলকে সরিয়ে নিয়ে এলো বায়ে। বললো, আরেকটা পথ আছে। এতে ভিড়ও নেই, কাদাও কম থাকবে, সহজেই চলে যেতে পারবো হাসিয়েনডায়।
বাঁধের কিনার দিয়ে হেঁটে উঁচু শৈলশিরার গোড়ায় একটা বড় ঢিবির কাছে চলে এলো ওরা। জংলা জায়গা, ঝোপঝাড় জন্মে রয়েছে। শৈলশিরার পশ্চিম অংশে অ্যারোইওর পথ রোধ করেছে এই টিবিটাই। প্রায় মুছে যাওয়া একটা পায়ে-চলা পথ চোখে পড়লো এখানে নেমে গেছে বাঁধের তিরিশ ফুট নিচে নালার বুকে। ওটাতে নামার আগে মুখ ফেরালো একবার সবাই, পেছনে দেখার জন্যে। বাঁধের

দুধারে যতো দূর চোখ যায়, শুধু পোড়া ঝোপঝাড়। কিন্তু পুড়ে ছাই হয়ে মিশে গেছে মাটিতে, কিছু কালো ডাটা এখনও মাথা তুলে রেখেছে এখানে ওখানে।
গাছপালা নেই। পোড়া মাটি এখন পানি আটকাতে পারবে না, হুগো কললো গজর হয়ে। বৃষ্টি যদি বাড়ে, বন্যা হয়ে যাবে।
টিবির নিচের পথ ধরে নিচে নামতে আরম্ভ করলো দলটা। নালার বুকও এখন আর আগের মতো শুকনো নেই, কাদা হয়ে গেছে। অন্য পারে আরেকটা কাঁচা রাস্তা আছে, ওটা গেছে ডয়েল র‍্যাঞ্চের ভেতর দিয়ে। যানবাহন আর লোকের ভিড় ওটাতেও। কাউন্টি সড়কের দিকে ওই রাস্তা দিয়েই ফিরে চলেছে দমকল বাহিনী। ডয়েলদের র‍্যাঞ্চ ওয়াগনটাকে ধীরে ধীরে পাশ কাটিয়ে যেতে দেখলো তিন গোয়েন্দা। কয়েকজন লোকের সঙ্গে পেহনে বসেছে টেরি। গোয়েন্দাদের দেখলো ঠিকই, কিন্তু সে-ও এতো পরিশ্রান্ত, টিটকারি মারারও বল পেলো না যেন। এমনকি তার গা জ্বালানো হাসিটা পর্যন্ত হাসলো না।
ওটা কি ডয়েলদের এলাকা? রবিন জিজ্ঞেস করলো।
মাথা ঝাঁকালো রিগো। নালাটাই হলো সীমানা, এদিকটা আমাদের, ওদিকটা ওদের।
ডানে, উঁচু শৈলশিরা যেন হঠাৎ করে ডুব মেরেছে বালির তলায়। ওটার ওপাশে এখন কি আছে দেখা যায়। গোয়েন্দারা দেখলো, একসারি শৈলশিরা এগিয়ে গেছে দক্ষিণে। নালার বুক থেকে উঠে এসে মোড় নিলো রিগো। পায়েচলা পথটা এখানে ঘাসে ঢেকে গেছে। চলে গেছে কতগুলো ছোট পাহাড়ের ভেতর দিয়ে, অনেকটা গিরিপথের মতো। এতে সরু, দুজন পাশাপাশি চলতে কষ্ট হয়। ফলে একসারিতে এগোলো দলটা। এখানে কিছু পোড়েনি, আগুন আসতেই পারেনি এ-পর্যন্ত। প্রকৃতির শোভা দেখতে দেখতে চললৈ তিন গোয়েন্দা। পাহাড়ের ঢালে জন্মে রয়েছে নানা জাতের ঝোপ। ফাঁকে ফাঁকে বেরিয়ে রয়েছে বাদামী পাথর। মাথার ওপরে এখনও ঝুলে রয়েছে যেন ছাড়া ছাড়া ধোঁয়া। বৃষ্টি থেমে গেছে পুরোপুরি। মেঘের ফাঁক থেকে বেরিয়ে এসেও থাকার সময় পানি আর সূর্য, প্রায় ডুবে গেছে।
আগে আগে হাঁটছে এখন মুসা। তার পাশে চলে এলো কিশোর। পায়েচলা পথ ধরে ওরা যখন শেষ শৈলশিরাটার ওপর উঠলো, দলের অন্যেরা তখন প্রায় বিশ গজ পেছনে পড়েছে।
খাইছে! কিশোওর! হঠাৎ করে ওপরে হাত তুলে দেখালো মুসা।
ওদের মাথার ওপরে ভেসে যাওয়া ধোঁয়ার ফাঁক থেকে বেরিয়ে আসছে একজন মানুষ। কালো একটা ঘোড়ার পিঠে বসা। গোধূলীর আলোয় হাঁ করে তাকিয়ে

রয়েছে দুজনে। সামনের দুপা তুলে দিয়ে পেছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছে ঘোড়াটা সামনের খুর দিয়ে যেন লাথি মারতে চাইছে ধোঁয়াকে, মাথাটা…
আরে …আরে…, কথা আটকে যাচ্ছে কিশোরের, ও-ওটার মা-থা কই!
চূড়ার ওপর পেছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল এক মুণ্ডুহীন ঘোড়া!
খাইছেরে! ভূউত! গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো মুসা।
দেখে মনে হচ্ছে ধোঁয়ার ভেতর থেকে এই বুঝি লাফিয়ে এসে ওদের ঘাড়ে পড়বে ঘোড়াটা।
তার জন্যে অপেক্ষা করলো না আর দুজনে, ঘুরেই দিলো দৌড়। চিৎকার শুনে ওদের দিকে ছুটে আসতে লাগলো রবিন আর পিনটু। পেছনে সরু পথে চলার গতি বাড়িয়ে দিলেন রাশেদ পাশা, রিগো, হুগো আর স্টেফানো।
মাথা নেই! মাথা নেই! চেঁচালো আবার মুসা। ঘোড়া-ভূতটার মাথা নেই! এসো না! পালাও!
থমকে দাঁড়ালো রবিন। মুসার মাথার ওপর দিয়ে তাকালো ঘোড়াটার দিকে। ধোঁয়া পাতলা হয়ে এসেছে এখন। তাকিয়েই চোখ বড় বড় হয়ে গেল তার।
কিশোর, ওটা, ওটা…, কথা শেষ করতে পারলো না রবিন।
হো হো করে হেসে উঠলো পিনটু। আরে কি শুরু করলে! ওটা তো মূর্তি, করটেজের মূর্তি। ধোঁয়া ভাসছে, ফলে ধোঁয়ার ভেতরের মূর্তিটাকে মনে হচ্ছে নড়ছে।
অসম্ভব! কিছুতেই মানতে রাজি নয় মুসা। করটেজের মূর্তির ঘোড়ার মাথা ছিলো!
মাথা? তাজ্জব হয়ে গেল পিনটু। আরে, তাই তো! মাথা গেল কই! নিশ্চয় কেউ ভেঙে ফেলেছে! ভাইয়া, দেখে যাও!
অন্যদেরকে নিয়ে এসে হাজির হলো রিগো। ঘোড়টার দিকে তাকিয়ে বললো, আশ্চর্য। চল তো দেখি!
কাঠের মূর্তিটার কাছে এসে জড়ো হলো সবাই। এখনও হালকা ধোঁয়া উড়ছে ওটার ওপরে। বিশাল একটা গাছের কাণ্ড কুঁদে তৈরি হয়েছে ঘোড় আর মানুষের আস্ত ধড়টা, পুরোটাই একটা অংশ। হাত, পা, তলোয়ার আর জিন আলাদা তৈরি করে লাগিয়ে দেয়া হয়েছে ওটার সঙ্গে। ঘোড়াটার শরীরের রঙ কালো, তাতে লাল আর হলুদের অলংকরণ করে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে ওখানটায় ঝুলে আছে উঁচু জিনের নিচের ঝালর। আরোহীর রঙও কালো। দাড়ি হলুদ, চোখ নীল, আর লাল রঙে আঁকা রয়েছে আরমার-প্লেট। মলিন হয়ে এসেছে সমস্ত রঙ।
আগে নিয়মিত রঙ করা হতো, পিনটু জানালো। কিন্তু অনেক দিন থেকেই আর তেমন যত্ন নেয়া হয় না। কাঠও নিশ্চয় পচে নরম হয়ে গেছে এতেদিনে।

মূর্তির পাশে ঘাসের ওপর পড়ে আছে ভাঙা মাথাটা। মুখের হাঁ-এর ফাঁকে লাল রঙ করা। কাছেই মাটিতে পড়ে আছে একটা ধাতব ভারি জিনিস।
ওটা পড়েই ভেঙেছে, বললো সে। আগুন নেভানোর কেমিক্যালের সিলিণ্ডার। নিশ্চয় প্লেন থেকে পড়েছে, মূর্তিটার ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় ফেলা হয়েছে।
মাথাটা ভালোমতো দেখার জন্যে ওটার কাছে বসে পড়লো মুসা। ঘাড়ের অনেকখানি নিয়ে ভেঙেছে মাথা। ডেটা ফাপা। নিশ্চয় ওজন কমানোর জন্যেই ওরকম করে তৈরি করা হয়েছিলো। কি যেন একটা বেরিয়ে রয়েছে ভেতর থেকে। টেনে বের করলো সে। কি জিনিস?
দেখি তো? ওর হাত থেকে জিনিসটা নিলো কিশোর।
চামড়া আর ধাতুর তৈরি লম্বা, পাতলা একটা সিলিন্ডারের মতো জিনিস, ভেতরে ফাপা। হুঁ, ধীরে ধীরে বললো কিশোর, লাগছে তো তলোয়ারের খাপের মতো। ওই যে, কোমরে ঝুলিয়ে নিতো যেগুলো সৈন্যরা…
কিন্তু বেশি বড়, রবিন বললো। খাপে খাপে মিলবে না, ঢিলে হয়ে থাকবে তলোয়ার।
হা। আর বেল্টে ঝোলানোর জন্যে কোনো হুকটুকও নেই।
দেখি, হাত বাড়ালো রিগো। না, তলোয়ারের খাপ না এটা, ঢাকনা। খাপের খোলস। খুব দামী তলোয়ারকে আগে এভাবেই যত্ন করে রাখা হতো। যাতে খাপটারও ক্ষতি না হয়। বিশেষ করে যখন ব্যবহার হতো না। অনেক পুরানো মনে হচ্ছে।
পুরানো? দামী? উত্তেজিত হয়ে উঠলো পিনটু। কটেজ সোর্ড-এর খোলস না তো! মুসা, দেখো তো, মাথাটার ভেতরে ভালো করে দেখো…
ততোক্ষণে ভাঙা ঘাড়ের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিয়েছে মুসা। ঘাড় দেখলো, মাথা দেখলো, তারপর পুরো মূর্তিটার ভেতরেই দেখলো। মাথা নেড়ে বললো, ঘাড়-মাথার ভেতরে কিছু নেই। ধড় আর পায়ের ভেতরে ফাঁপা নয়। সলিড।
বোকামি করছিস, পিনটু, রিগো বললো। অনেক আগেই হারিয়ে গেছে কটেজ সোর্ড।
দামী ছিলো? মুসার প্রশ্ন।
হয়তো ছিলো, তবে আমার ঠিক বিশ্বাস হয় না। হয়তো আর দশটা সাধারণ তলোয়ারের মতোই ছিলো ওটা, ঐতিহাসিক কারণে দামী হয়ে গেছে। অনেক দিন নাকি ছিলো আমাদের পরিবারে।
করটেজের ব্যক্তিগত জিনিস? রবিন জিজ্ঞেস করলো।
পারিবারিক ইতিহাস তো তাই বলে। ডন নিরো আলভারেজ, নিউ ওয়ার্ল্ডে আমাদের প্রথম পূর্ব-পুরুষ, একবার গুপ্ত আক্রমণ থেকে বাঁচিয়েছিলেন

করটেজের সেনাবাহিনীকে। খুশি হয়ে তখন তাঁকে নিজের তলোয়ারটা উপহার দিয়েছিলেন কটেজ। তলোয়ারটা সম্পর্কে কিংবদন্তী আছে, স্পেনের রাজা নাকি বিশেষ উপলক্ষে অনেক আয়োজন করে ওটা উপহার দেন কাটেজকে। খাঁটি সোনার তৈরি বাঁট, দামী পাথর বসানো। ফলা আর খাপটাতেও নাকি পাথর বসানো ছিলো। ওটা এই অঞ্চলে নিয়ে আসেন নিরো আলভারেজের বংশধর লেফটেন্যান্ট ডারিগো আলভারেজ।
তারপর কি হলো ওটার? আগ্রহী হয়ে উঠেছে কিশোর।
আঠারোশা ছেচল্লিশ সালে মেকসিকোর যুদ্ধের সময় আমেরিকানরা যখন রকি বীচে ঢুকতে আরম্ভ করে, তখন হারিয়ে যায় ওটা। একেবারে গায়েব।
আমেরিকান সৈন্যরা চুরি করেছিলো?
হয়তো। দামী জিনিস যা-ই পেতে তুলে নিয়ে যাওয়ার স্বভাব ছিলো ওদের। পরে সেনাবাহিনীর দপ্তরে খোঁজ নেয়া হয়েছে। দপ্তরের লোকেরা সাফ জানিয়ে দিয়েছে, তলোয়ারটার কথাই শোনেনি ওরা। হয়তো সত্যিই বলেছে, কে জানে। আমার দাদার-বাবার-বাবা পিউটো আলভারেজ লড়াই করেছিলেন আমেরিকানদের বিরুদ্ধে। গ্রেপ্তার এড়ানোর জন্যে পালাতে গিয়ে গুলি খেয়ে সাগরে পড়ে যান। তাঁর লাশ খুঁজে পাওয়া যায়নি। রকি বীচ গ্যারিসন কমাণ্ডারের ধারণা, তলোয়ারটা তখন পিউটোর হাতে ছিলো, ওটা নিয়েই সাগরে পড়েছেন। যা-ই হোক, তলোয়ারটা আর পাওয়া যায়নি।
কিন্তু, চিন্তিত ভঙ্গিতে বললো কিশোর, একটা কথা ঠিক, কেউ ঠিক করে বলতে পারে না তলোয়ারটা আসলে কোথায় গেছে। এবং কেউ একজন নিশ্চয় ওই খাপের খোলসটা ঢুকিয়ে রেখেছিলো ঘোড়ার গলার মধ্যে...।
ভাইয়া! হাসিয়েনড়া! শৈলগ্রির কিনারে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠলো পিনটু।
কি হয়েছে দেখার জন্যে ছুটে গেল সবাই। আঁতকে উঠলো হাসিয়েনডার দিকে তাকিয়ে।
আরি, ঘরেও আগুন! রাশেদ পাশা চিৎকার করে বললেন।
জলদি! চেঁচিয়ে উঠলো রিগো।
ঢাল বেয়ে দৌড়ে মাঠের ওপর দিয়ে হুটলো সবাই। লাফিয়ে উঠছে আগুনের শিখা। আকাশে এখনও ভাসমান দাবানলের ধোঁয়ার সঙ্গে মিশতে চলেছে নতুন আগুনের কালো ধোঁয়া। হাসিয়েনডার চত্বরে দাঁড়িয়ে আছে একটা দমকলের গাড়ি, হোসপাইপ হাতে নিয়ে গোলাঘরের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করছে কয়েকজন দমকলকর্মী। রিলোর দল ওখানে পৌঁছতে পৌঁছতে ক্ষতি যা করার করে ফেললো আগুন, ধড়াস করে ধসে পড়লো পোড়া ছাত। দুটো বাড়িই পুড়েছে ভালোমতো। ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে।

নাহ, হতাশ ভঙ্গিতে বললো দমকল বাহিনীর ক্যাপ্টেন, লাভ হলো না! দাবানলের আগুনই নিশ্চয় ছিটকে এসেছিলো।
তা কি করে হয়? প্রতিবাদ করলো মুসা। বাতাসই তো ছিলো না। কি করে আসবে?
নিচে ছিলো না,ক্যাপ্টেন বললো। তবে মাটির কাছে না থাকলেও অনেক সময় ওপরে জোর বাতাস থাকে। আর আগুন লাগলে তো বটেই। গরম বাতাস দ্রুত ওপরে উঠে যায়, সাথে করে নিয়ে যায় স্ফুলিঙ্গ, ওপরের বাতাস সেই স্ফুলিঙ্গকে বয়ে নিয়ে যেতে পারে অনেক দূর। ওরকম ঘটতে দেখেছি। ঘরগুলোর কাঠ শুকিয়ে খটখটে হয়েছিলো। আগুন লাগতে দেরি হয়নি। পুরানো বাড়ির কড়িবর্গার কাঠ বেয়ে আগুন নিচে নেমেছে, টালির হাতের নিচে চলে আসার পর সেই আগুনকে আর ছুঁতে পারেনি বৃষ্টি। আরও আগে দেখলে হয়তো বাঁচাতে পারতাম। কিন্তু তখন এতো ধোঁয়া ছিলো, কোনটা যে কোনখান থেকে উড়ছে বোঝা যায়নি...।
পুরানো হাসিয়েনডার দুটো দেয়াল ধসে পড়ার শব্দে থমকে গেল ক্যাপ্টেন। দ্রুত কমে আসছে আগুন, পোড়ানোর মতো কিছু না পেয়ে। স্তব্ধ হয়ে গেছে দুই ভাই, পিনটু আর রিগো। রাশেদ পাশা চুপ, ছেলেরা নীরব। কি বলবে?
নীরবতা ভাঙলো মুসা। চেঁচিয়ে উঠলো, জিনিসগুলো!
ভাড়ারের দিকে ঝট করে ফিরলেন রাশেদ পাশা। কিশোর আর রবিনও তাকালো। তবে এগোনোর চেষ্টা করলো না কেউ। পোড়া ধ্বংসস্তূপ। কয়েকটা দেয়াল এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে বটে, তবে ভেতরের জিনিস কিছুই নেই, পুড়ে ছাই। রাশেদ পাশার কেনার মতো কিছুই নেই ওখানে।
সব গেছে। কান্নার সুর বেরোলো রিগোর কণ্ঠ থেকে। সব! বীমাও করানো ছিলো না! সব গেল আরকি আমাদের!
যাবে কেন? ফুঁসে উঠলো পিনটু, কার বিরুদ্ধে রাগ কে জানে। আবার হাসিয়েনডা বানিয়ে নেবো আমরা।
তাহয় নিলাম। ধারের টাকা শোধ করবো কোত্থেকে, ট্যাক্স দেবো কি দিয়ে? জায়গাই তে রাখতে পারবো না, ঘর বানিয়ে কি হবে?
চাচা,রাশেদ পশির দিকে তাকিয়ে বললো কিশোর, জিনিসগুলো আমরা কিনে নিয়েছিলাম। টাকা দিইনি বটে, কথা তো দিয়েছি। তারমানে আমাদের জিনিস পুড়লো। টাকাটা আমাদের দিয়ে দেয়া উচিত।
সামান্যতম দ্বিধা না করে হাসলেন রাশেদ পাশা কিশোরের দিকে চেয়ে, তারপর মাথা ঝাঁকালেন, ঠিক বলেছিস, কিশোর। পোড়ার আগে আমরা রাতে পারিনি, সেটা আমাদের দোষ...

জোরে জোরে মাথা নাড়লো রিগো। না, তা হয় না। ভিক্ষে আমরা নিতে পারবো না। বাপ-দাদার অপমান করতে পারবো না এভাবে। তারচে জায়গাই বিক্রি করে দিয়ে শহরে চলে যাবো। কিংবা ফিরে যাবো মেকৰিকোতে।
কিন্তু আপনারা এখন আমেরিকান, বোঝানোর চেষ্টা করলো রবিন। অনেক আমেরিকানের চেয়ে আলভারেজরা আগে এসেছিলো এই অঞ্চলে।
নিশ্চয়ই, রবিনের সঙ্গে সুর মেলালো কিশোর। কি যেন ভাবছে। প্রয়োজনীয় টাকা চেষ্টা করলে অন্যখানেও পেয়ে যেতে পারেন।
বিষণ হাসি হাসলো রিগো। আর কোনো উপায় নেই, কিশোর।
হয়তো আছে, ধীরে ধীরে বললো গোয়েন্দাপ্রধান। অনেক দূরের ব্যাপার যদিও সেটা...যা-ই হোক, আপনাদের টাকাটা কি এখনই শোধ করতে হবে? না কিছু দিন সময় পাবেন? ঘর তো পড়ে গেল, কদিন অন্য কারও বাড়িতে থাকতে পারবেন?
পারবো। সিনর হেরিয়ানোর বাড়িতে। পিনট জানালো।
হ্যাঁ, বললো তার ভাই। টাকাটাও কয়েক দিন পরে দিলে চলবে। কিন্তু কিশোর, পাবো কোথায়?
তলোয়ারটার কথা ভাবছি আমি, জবাব দিলো কিশোর, করটেজ সোর্ড। মেকসিকোর যুদ্ধের সময় ওটা চুরি যায়। একশো বছরেরও বেশি হয়ে গেছে, ইতিমধ্যে কোথাও না কোথাও ওটা বেরোনোর কথা। সৈন্যরা চরি করলে বিক্রি করে দিতো। আর যেহেতু বেরোয়নি, সেহেতু আমার সন্দেহ হচ্ছে, আদৌ চুরি হয়েছিলো কিনা ওটা। হয়তো এখনও কোথাও লুকানোই রয়েছে, ওই খোলসটার মতো!
ঠিক বলেছো! তুড়ি বাজালো পিনটু। ভাইয়া, ও ঠিকই...
আরে দূর! বাতাসে বাবা মারলো যেন রিগো। তা-ও কি হয় নাকি? তলোয়ারটা না বেরোনোর একশো একটা কারণ থাকতে পারে। হয়তো সাগরে পড়ে গিয়েছিলো সত্যিই, কিংবা নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো অন্য কোনোভাবে। কিংবা সৈন্যরা নিয়ে গিয়ে এমন কারো কাছে বিক্রি করেছে, যারা আজ পর্যন্ত বের করেনি ওটা, লুকিয়ে রেখেছে। অ্যানটিক জিনিস অনেকে ওভাবে লুকিয়ে রাখে। কিংবা হয়তো বহুদূরে চলে গেছে ওটা, একেবারে চীন দেশে, যেখান থেকে এখানে খোঁজ আসার সম্ভবনা খুবই কম। খোলসটা দেখেই তুমি এতো আশা করছে। হতে পারে এটা অন্য কোনো তলোয়ারের। তুমি অসম্ভঘকে সম্ভম্ব করার কথা ভাবছে, কিশোর পাশা। স্রেফ ছেলেমানুষী। ফ্যানটাসি দিয়ে আমাদের র‍্যাঞ্চকে রক্ষা করা যাবে না।
আপনার কথায় যুক্তি আছে, মোটেও দমলো না কিশোর। কিন্তু খোলসটা আপনাআপনি মূর্তির ভেতরে ঢুকে যায়নি, ঢোকানো হয়েছে। ভেবে দেখুন, শহরে

তখন ছিলো শত্রুসেনা, ডন পিউটো আলভারেজ যদি তলোয়ারটা লুকিয়ে ফেলে থাকেন, অবাক হওয়ার কিছু আছে কি? ওরকম একটা দামী জিনিস! পান আর না পান, অন্তত খোঁজার চেষ্টা তো করে দেখতে পারেন। আমরা আপনাকে সাহায্য করতে রাজি আছি। আর মোটেই ছেলেমানুষী করছি না আমরা। এ-পর্যন্ত ওরকম অনেক জিনিস খুঁজে বের করেছি, যেগুলো কখনও পাওয়া যাবে না বলে হাল ছেড়ে দেয়া হয়েছিলো।
ও ঠিকই বলছে, ভাইয়া, উত্তেজনায় টগবগ করছে পিনটু। ওরা দুর্দান্ত গোয়েন্দা, আমি জানি! এই কিশোর, কার্ড দেখাও না তোমাদের। আর পুলিশের ক্যাপ্টেন ফ্লেচারের সার্টিফিকেটটা। আছে না সঙ্গে?
মাথা ঝাঁকালো কিশোর।
দেখলো রিগো। বেশ, বুঝলাম তোমরা গোয়েন্দা। অভিজ্ঞতাও আছে। পুলিশের একজন ক্যাপ্টেন ফালতু কথা বলবেন না। কিন্তু একশো বছর আগে নিখোঁজ হয়ে যাওয়া একটা তলোয়ার কিভাবে খুঁজে বের করবে?
একটা সুযোগ তো অন্তত দিয়ে দেখো? পিনটু বললো।
হ্যাঁ, ছেলেদের পক্ষ নিলেন রাশেদ পাশা, তাতে অসুবিধেটা কি? পেলে তো ভালোই।
পুরানো হাসিয়েনডার ধ্বংসস্তুপের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললো রিগো। বেশ, করো চেষ্টা। আমার সাধ্যমতো সাহায্য আমি করবো। কিন্তু তলোয়ার পাবে বলে আমার মনে হয় না। যাকগে, কোত্থেকে কাজ শুরু করতে চাও? কিভাবে? কি সূত্র নিয়ে?
সেটা ভেবে বের করে ফেলবো, কিশোর কললো। তবে গলার জোর কমে গেছে তার।
ট্রাক নিয়ে ফিরে এলো বোরিস। রিগো জানালো, হুগো আর স্টেফানোকে নিয়ে হেরিয়ানোর বাড়ি চলে যাবে।
বাড়ি ফিরে চললো তিন গোয়েন্দা। ট্রাকের পেছনে উঠেছে।
কিশোর, মুসা জিজ্ঞেস করলো, কোনখান থেকে শুরু করবো?
কেন? হেসে বললো গোয়েন্দাপ্রধান, গলার জোর আবার বেড়েছে। তোমার হাতেই তো রয়েছে জবাব।
আমার হাতে? অবাক হয়ে পুরানো তলোয়ারের খোলসটার দিকে তাকালো মুসা। সাথে করে নিয়ে এসেছে ওটা।
এখনও তেমন আশা করতে পারছি না, কিশোর বললো, তবে একটা জিনিস চোখে লেগেছে আমার। খোলসটার ধাতব অংশে খুদে লেখার মতো কিছু দেখেছি। সাংকেতিক চিহ্নও হতে পারে। মিস্টার ক্রিস্টোফারের সাহায্য নিতে

পারি আমরা। তিনি আমাদেরকে এমন কারো খোঁজ দিতে পারেন, যে ওগুলোর মানে বুঝিয়ে দিতে পারবে।
চোখ চকচক করে উঠলো তার। মনে হয় পথ আমরা পেয়ে গেছি! করটেজ সোর্ড খুঁজে বের করার সূত্র বুঝি পায়ে হেঁটে এসে ধরা দিলো আমাদের হাতে!
ফ্যানটাসটিক! চিৎকার করে উঠলেন প্রফেসর ওয়ালটার সাইনাস, চকচক করছে চোখ। কোনো সন্দেহ নেই, ইয়াং ম্যান, কোনো সন্দেহ নেই! এগুলো ক্যাসটিলির রয়াল কোট অভ আরমরেই চিহ্ন!
শুক্রবার বিকেল। হলিউডে প্রফেসরের স্টাডিতে বসে আছে তিন গোয়েন্দা। সেদিন সকালে ফোন করে বিখ্যাত চিত্রপরিচালক ডেডিস ক্রিস্টোফারকে সব বলেছিলো, কিশোর, তিনিই তাঁর বন্ধু সাইনাসের সঙ্গে ওদের যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছেন। স্প্যানিস আর মেকসিকান ইতিহাসের বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ওয়ালটার সাইনাস। সেদিন ইস্কুল ছুটি হলে স্যালভিজ ইয়ার্ডের ট্রাকটা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে ওরা। চালক অবশ্যই বোরিস।
তলোয়ারের এই খোলসটা মোল শতকের গোড়ার দিকে তৈরি, বললেন প্রফে। জিনিসটা ছিলো স্পেনের রাজার, আমি শিওর। তোমরা কোথায় পেলে?
মূর্তিটার কথা জানালো কিশোর। জিনিসটা কি করটেজ সোর্ডের? অতো পুরানো? করটেজ সোর্ড? ভুরু উঠে গেল প্রফেসরের। হ্যাঁ, তা হতে পারে। তবে তলোয়ারটা হারিয়ে গেছে। আঠারোশো ছেচল্লিশ সালে পিউটো আলভারেজের সঙ্গে সাগরে পড়ে হারিয়ে গেছে ওটা...কেন, একথা জিজ্ঞেস করছো কেন? ওটাও পেয়েছে নাকি?
না, স্যার, জবাব দিলো রবিন।
এখনও পাইনি, এমনভাবে হাসলো মুসা, যেন অদূর ভবিষ্যতে পাবে।
স্যার, কিশোর জিজ্ঞেস করলো, পিউটো আলভারেজের সত্যি সত্যি কি হয়েছিলো, একথা কোথায় গেলে জানতে পারবো?
রকি বীচ হিসটোরিক্যাল সোসাইটিতে গেলে পেতে পারো, প্রফেসর বললেন। আলভারেজরে তো বটেই, মেকসিকোর যুদ্ধের ইতিহাসও জানতে পারবে।
প্রফেসরকে ধন্যবাদ জানিয়ে উঠতে গেল ছেলেরী। হাত তুললেন তিনি, এক মিনিট। আচ্ছা, তলোয়ারটার কথা জিজ্ঞেস করলে কেন? যোজটোজ পেয়েছে নাকি ওটার?
পাইনি এখনও, কিশোর কললো। পাওয়ার আশা করছি আরকি।
তাই? আবার চকচকে হলো প্রফেসরের চোখ। পেলে জানিও আমাকে।
নিশ্চয়ই জানাবো, স্যার, বলে উঠে পড়লো কিশোর।

বাইরে গুঁড়ি গুড়ি বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। ওদেরকে নামিয়ে দিয়ে ট্রাক নিয়ে একটা কাজে গেছে বোরিস, এখনও ফেরেনি। একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো ছেলেরা।
তলোয়ারটার কথা শুনে কেমন চমকে গেলেন প্রফেসর, দেখেছো? মুসা বললো।
হা, ভ্রূকুটি করলো কিশোর, অনেকেই ওরকম চমকাবে। করটেজ সোর্ডের নাম পারতপক্ষে আর কারও কাছে বলা উচিত হবে না। লোভে পড়ে কে এসে বাগড়া দিতে শুরু করবে কে জানে! একটা ব্যাপারে শিওর হয়ে গেছি, খোলসটা করটেজ সোর্ডেরই, আর ওটা খুঁজে পাওয়ার চান্স আছে।
হিসটোরিক্যাল সোসাইটিতে যাবে? রবিন জিজ্ঞেস করলো।
যাবো।
কি খুঁজবো ওখানে? মুসার প্রশ্ন।
জানি না এখনও, জবাব দিলো কিশোর। ভাবহি, ইতিহাস থেকে কোনো সূত্র পেয়েও যেতে পারি।
বোরিস আসতে আসতে বৃষ্টি বেড়ে গেল অনেক। ট্রাকের পেছনে ওঠার আর উপায় নেই, কেবিনেই গাদাগাদি করে বসতে হলো সবাইকে। রকি বীচে পৌঁছে ওদেরকে হিসটোরিক্যাল সোসাইটিতে নামিয়ে দিয়ে আরেকটা কাজে চলে গেল বোরিস।
ঘরটা নীরব, নির্জন, শুধু নির্দিষ্ট জায়গায় বসে রয়েছেন অ্যাসিসটেন্ট হিসটোরিয়ান। তিন গোয়েন্দাকে চেনেন। হেসে বললেন, আরে, তিন গোয়েন্দা যে। তা কি মনে করে? নতুন কোনো কেস-টেস?
এই কর..., শুরু করেই আঁউউ করে উঠে থেমে গেল মুসা। তার পা মাড়িয়ে দিয়েছে কিশোর। হিসটোরিয়ানের দিকে চেয়ে হেসে বললো তাড়াতাড়ি, না, স্যার, কোনো কেস-টেস না। ইস্কুলের ম্যাগাজিনের জন্যে একটা গবেষণামূলক লেখা লিখতে চায় রবিন। তাকে সাহায্য করছি। রকি বীচ আলভারেজ ফ্যামিলির ওপর গবেষণা করছে সে।
ও। আলভারেজদের ফাইল তো আছে আমাদের কাছে। জায়গামতোই এসেছে। ডন পিউটো আলভারেজের কথাও নিশ্চয় লেখা আছে?
মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে গেলেন হিসটোরিয়ান। দেয়াল ঘেঁষে সারি সারি তাকে বই ঠাসা। কতগুলো আলমারি আর শেলফও আছে। শেলফ থেকে দুটো ফাইল রে করে আনলেন তিনি। হেসে বাড়িয়ে দিলেন ছেলেদের দিকে।
ফাইলের আকার দেখেই দমে গেল মুসা। তবে কিশোর আর রবিনের মুখ দেখে কিছু বোঝা গেল না।

ফাইল দুটো কোণের একটা টেবিলের কাছে বয়ে নিয়ে এলো কিশোর। এটা তোমরা দেখো। যুদ্ধের ওপর লেখা ফাইলটা রবিন আর মুসার দিকে ঠেলে দিলো সে। নিজে নিলো আলভারেজদের ওপ্র লেখা ফাইল। এটা আমি দেখছি।
পরের দুটো ঘন্টা পাতার পর পাতা উল্টে গেল ওরা। ডন পিউটো আলভারেজ আর করটেজ সোর্ডটার কথা কিছু লেখা আছে কিনা খুঁজছে। হিসটোরিয়ান কাজে ব্যস্ত, ছেলেদেরকে বিরক্ত করলেন না। ইতিমধ্যে অন্য কেউ ঢুকলো না ওঘরে।
দুই ঘণ্টা পর দুটো ফাইলই ওল্টানো শেষ হলো। তার ফাইলে একটা জিনিসই শুধু দৃষ্টি আকর্ষণ করলো কিশোরের, একটা চিঠি পুরানো হতে হতে হলদে হয়ে এসেছে কাগজ। দুই সহকারীকে জানালো সে, ছেলের কাছে এই চিঠি লিখেছিলেন ডন পিউটো আলভারেজ। রকি বীচে একটা ঘরে তাকে বন্দি করে রাখা হয়েছে তখন। ওই সময় তাঁর ছেলে ছিলো মেকসিকো সিটিতে, মেকসিকান আর্মির একজন অফিসার।
কি লিখেছেন? জানতে চাইলো মুসা।
ভাষাটা স্প্যানিশ, তা-ও আবার পুরানো ঢঙে, নাক কুঁচকালো কিশোর, খুব কঠিন। ভালো বুঝলাম না। তবে এটুকু বুঝেছি, সাগরের কাছে একটা বাড়িতে আটকে রাখা হয়েছিলো ডন পিউটো আলভারেজকে। লোকজন বোধহয় দেখা করতে আসতো তার কাছে, ওরকম কিছু লিখেছে। বিজয়ের পরে ছেলের সঙ্গে দেখা করবেন তিনি, এরকম কথাও আছে। বোধহয় পালিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত এটা, তবে আমি শিওর না। চিঠিটার তারিখ তেরো সেপ্টেম্বর, উনিশশো ছেচল্লিশ। তলোয়ারটার কথা কিছু লেখা নেই।
বন্দি অবস্থায় লিখেছে, না? চিন্তিত ভঙ্গিতে গাল চুলকালো মুসা। আচ্ছা, কিশোর, সাংকেতিক কিছু লেখা নেই তো?
তা থাকতে পারে, মাথা ঝাঁকালো কিশোর। রিগোকে দিয়ে পড়াতে হবে। মানে ঠিকমতো না বুঝলে কিছু বলা যাচ্ছে না...
পড়িয়ে লাভ হবে বলে মনে হয় না, রবিন বললো। এই যে আরেকটা চিঠি, আমেরিকান আর্মি লিখেছিলো ডন পিউটোর ছেলে স্যানটিনোকে। যুদ্ধের পর সে তখন বাড়ি ফিরেছে। চিঠিতে দুঃখপ্রকাশ করেছে আমেরিকান প্রকার, ডন পিউটোর মৃত্যুর জন্যে। আঠারোশো ছেচল্লিশের পনেরোই সেপ্টেম্বর পালাতে গিয়ে মারা পড়েন ডন। তাকে গুলি করা ছাড়া নাকি আর কোনো উপায় ছিলো না সৈন্যদের, কারণ তিনি সশস্ত্র ছিলেন, এবং আগে হামলা করেছিলেন। গুলি খেয়ে সাগরে পড়ে যান তিনি...

ওসব তো পুরানো খবর, বাধা দিয়ে বললো মুসা, জানি আমরা। নতুন কি লিখেছে?
ডনের এভাবে সাগরে পড়ে যাওয়ার কথা রিপোর্ট করেছে জনৈক সার্জেন্ট রবার্ট ডগলাস। তার পক্ষে সাক্ষি দিয়েছে দুজন করপোরাল, তিনজনেই তখন ওই বাড়িতে পাহারায় ছিলো। ডগলাসের লেখা রিপোর্টটাও আছে এই ফাইলে, বলে ফাইলে টোকা দিলো রবিন। একথাও বলা হয়েছে, ডনের হাতে তখন একটা তলোয়ার ছিলো।
ভুরু কুঁচকে গেল কিশোরের। মুসার চোখে নিরাশা।
সার্জেন্টের ধারণা, বলে চললো রবিন, তলোয়ারটা লুকিয়ে ডনের কাছে নিয়ে এসেছিলো তার কোনো সহচর, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতো যারা, তাদেরই কেউ। মুখ তুললো রবিন। তারমানে, তলোয়ার হাতে নিয়েই সাগরে পড়েছিলেন ডন পিউটো।
বাইরে জোর বৃষ্টি হচ্ছে। জানালা দিয়ে সেদিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলো কিশোর। কিছুক্ষণ পর জিজ্ঞেস করলো, মুসা, তুমি কিছু পেয়েছো?
তেমন কিছু না, জবাব দিলো মুসা হতাশ কণ্ঠে। আমিও একটা চিঠি পেয়েছি। ২৩ সেপ্টেম্বর লস অ্যাঞ্জেলেস গ্যারিসনের ওপর মেকসিকান হামলার বিব্রণ চেয়ে কমাণ্ডিং অফিসারের কাছে চিঠিটা লিখেছেন একজন ঊর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তা। কয়েকজন সৈন্যের নাম উল্লেখ করেছেন, যারা দুটি না নিয়েই নিরুদ্দেশ হয়েছে। ষোল সেপ্টেম্বরের পর থেকে তাদের আর কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না বলে জানানো হয়েছে। সামরিক নিয়মে পলাতক ঘোষণা করা হয়েছে ওদেরকে। ডন পিউটো কিংবা তলোয়ারটার কথা কিছু লেখা নেই...
মুসার কথা শেষ হওয়ার আগেই কিশোর জানতে চাইলো, পলাতকদের নাম কি?
সার্জেন্ট রবার্ট ডগলাস, করপোরাল হ্যানসন, এবং করপোরাল...
ডি. ফাইবার! মুসার কথা শেষ হওয়ার আগেই চেঁচিয়ে উঠলো রবিন। এদের কথাই লেখা আছে আমার চিঠিটাতেও! ডন পিউটোকে পাহারা দিয়ে রেখেছিলো!
চিৎকার শুনে অবাক হয়ে যে ওদের দিকে তাকিয়ে আছেন হিসটোরিয়ান খেয়ালই করলো না ওরা।
ডগলাস, হ্যানসন এবং ফাইবার, খুশি খুশি মনে হলো কিশোরকে। আঠারোশো ছেচল্লিশের মোল সেপ্টেম্বর থেকে নিখোঁজ!
হ্যাঁ, কিন্তু... হঠাৎ চোখ বড় বড় হয়ে গেল মুসার। খাইছে! ওরাই ডনকে গুলি করেনি তো?
ওরা রিপোর্ট করেছে যে গুলি খেয়েছেন ডন, কিশোর বললো। কে করেছে, তা বলেনি।

ওরাই গুলি করেছে, তাই না কিশোর? জিজ্ঞাসু চোখে গোয়েন্দাপ্রধানের দিকে তাকালো রবিন।
তাই তো মনে হয়, গম্ভীর হয়ে গেল কিশোর। ব্যাপারটা খুবই রহস্যজনক। যারা ডনকে আগের দিন গুলি করে মারলো, প্রদিন থেকেই নিখোঁজ হয়ে গেল তারা, পলাতক ঘোষিত হয়ে গেল। তারপর আর কোনো খবরই নেই তাদের।
তলোয়ারটা চুরি করে পালায়নি তো? মুসা জিজ্ঞেস করলো।
পালাতেও পারে। কিন্তু তাহলে ওই খোলসটা মূর্তির ভেতরে লুকালো কে, এবং কেন? অবাক লাগছে আমার। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটলো কিশোর। রিগোর সঙ্গে কথা বলতে হবে। এহহে, অনেক দেরি হয়ে গেছে, ঘড়ির দিকে চোখ পড়তে বলে উঠলো মুসা। তাই তো বলি, পেটের মধ্যে এমন মোচড় দেয় কেন? খুব খিদে পেয়েছে, বুঝলে, আমি বাড়ি যাবো।
আমিও, রবিন কালো।
কিশোর বললো, তাহলে কাল সকালেই রিগার সঙ্গে দেখা করতে যাবো।
সোসাইটির ডুপ্লিকেটিং মেশিনে চিঠি আর দলিলের কপি করে নিলো ওরা। তারপর হিসটোরিয়ানকে তাঁর সাহায্যের জন্যে ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে এলো। তখনও বৃষ্টি পড়ছে। বোরিস আসেনি। দাঁড়িয়ে থাকতে চাইলো না আর মুসা। তাছাড়া বাড়ি যাচ্ছে, ভিজে গেলেই বা কি। বাড়ি গিয়ে কাপড় পাল্টে নেবে।
ভিজে চপচপে হয়ে স্যালভিজ ইয়ার্ডে পৌঁছলো তিনজনে। রবিন আর মুসা সাইকেল ফেলে গিয়েছিলো এখানে, নিয়ে রওনা হলো বাড়ির দিকে। গেট দিয়ে বেরোতেই দেখা শুঁটকি টেরির সঙ্গে। টিটকারি দিয়ে বললো, আহারে, ইস্, একেবারে গোসল করে ফেলেছে! এসো, গাড়িতে ওঠো, পৌঁছে দি।
শুঁটকির গন্ধে বমি করার চেয়ে ভিজে যাওয়া অনেক ভালো, জবাব দিলো মুসা।
চকিতের জন্যে রাগ ঝিলিক দিয়ে উঠলো টেরিয়ারের চোখে। চিবিয়ে চিবিয়ে, বললো, দেখো, আলভারেজ র‍্যাঞ্চের ধারেকাছে যাবেনা আর। সাবধান!
টেরিয়ারের গাড়ি দেখে এগিয়ে এসেছে কিশোর। তার কথা কানে গেছে। জিজ্ঞেস করলো, ধমক দিচ্ছো?
ওদের র‍্যাঞ্চটার লোভ, না? কড়া গলায় বললো মুসা। ছুঁতেও দেয়া হবে না তোমার বাপকে, মনে রেখো!
দাঁত বের করে হাসলো টেরি। কি করে ঠেকাবে?
আমরা তলো..., প্রায় বলে দিয়েছিলো মুসা। তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বলে উঠলো কিশোর, দেখতেই পাবে, কি করে ঠেকাই।
যা করার তাড়াতাড়ি করো, খিকখিক করে হাসলো টেরি, সময় বেশি পাবে না। হপ্তাখানেকের মধ্যেই দখল করে নেবো ওটা। আলভারেজদের কপালে শনি

আছে। ওদের সঙ্গে খাতির লাগিয়ে কিছু করতে গেলে তোমাদেরও ভালো হবে না।
তিন গোয়েন্দাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে চলে গেল টেরি। অঝোর বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে সেদিকে তাকিয়ে রয়েছে তিন গোয়েন্দা। ভাবছে, বড় বেশি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কথাগুলো বলে গেল শুঁটকি!
শনিবার সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠলো কিশোর। বৃষ্টি থামেনি, পড়েই চলেছে। তবে বৃষ্টি তাকে আলভারেজ র‍্যাঞ্চে যাওয়া ঠেকাতে পারতো না, যেতে পারলো না অন্য কারণে। ফোন করে রবিন আর মুসা জানালো, বাড়িতে জরুরী কাজ আছে, দুপুরের আগে আসতে পারবে না।
গেল মনটা খারাপ হয়ে। শেষে আর ঘরে বসে থাকতে না পেরে ভিজে ভিজেই গিয়ে ইয়ার্ডের কাজে সাহায্য করলো বোরিস আর রোভারকে।
দুপুরে খাবার পরে এলো রবিন আর মুসা। বৃষ্টি থামেনি, তবে হালকা হয়ে এসেছে। রেনকোট পরে এসেহে দুজনেই। কিশোরও পরে নিলো। সাইকেল নিয়ে আলভারেজ র‍্যাঞ্চে রওনা হলো তিনজনে। কাউন্টি রোড ধরে চললো। সাথে ম্যাপ নিয়ে নিয়েছে কিশোর, যাতে পাহাড়ের গলিঘুপচি দিয়ে যাওয়ার সময় পথ ভুল না হয়। আলভারেজ হাসিয়েনডার পোড়া ধ্বংসপ পেরিয়ে এসে সহজেই খুঁজে বার করলো প্রতিবেশী রডরিক হেরিয়ানোর বাড়িটা। অ্যাভোকাডোর ফার্ম করা হয়েছে ওখানে।
পুরানো ধাঁচের পুরানো বাড়ি। মস্ত গোলাঘর, তার পেছনে ছোট ছোট দুটো কটেজ। বৃষ্টির মধ্যেই কাঠ ফাড়ছে পিনটু, সেখানে হাজির হলো তিন গোয়েন্দা।
তোমার ভাই আছে ঘরে? কিশোর জিজ্ঞেস করলো।
আছে, এসো, কুড়ালটা হাত থেকে ফেলে দিলো পিনটু।
একটা কটেজে ঢুকলো ওরা। মাত্র দুটো ঘর, আর ছোট্ট রান্নাঘর। ফায়ারপ্লেসে তখন আগুন জ্বালছে রিগো। তিন গোয়েন্দাকে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে হাসলো। এসো এসো।
প্রফেসর সাইনাসের কথা বললো পিনটু আর রিগোকে কিশোর। বললো, তিনি বলেছেন করটেজ সোর্ডেরই খোলস ওটা।
পালাতে গিয়েও মারা পড়েননি পিউটো আলভারেজ, যোগ করলো মুসা।
পড়েননি এটা জোর দিয়ে বলা যায় না, শুধরে দিয়ে বললো রবিন, তবে কথাটা ঠিক না-ও হতে পারে এই আরকি।
কপি করে আনা দলিলগুলো দুই ভাইকে দেখালো কিশোর।
এতে আর নতুন কি বোঝা গেল? হাত ওল্টালো রিগো।

কেন, কিছুই সন্দেহ হচ্ছে না আপনার? ডন পিউটো পালাতে গিয়ে মারা পড়েছে বলে যারা রিপোর্ট করেছে, তাদেরকেই পরদিন থেকে পলাতক ঘোষণা করেছে আর্মি
এটা সন্দেহজনক নয়? তিন তিনজন লোক একই সাথে পালালো!
হুঁ, মাথা দোলালো রিগো, আমার সন্দেহই তাহলে ঠিক। এখন তোমাদের বলি, তলোয়ারটা সাগরে পড়ে হারিয়ে গেছে, কথাটা বিশ্বাস হয়নি আমার। বুঝতে পারছি, ওরা তলোয়ারটা কেড়ে নিয়ে ডনকে খুন করে সাগরে ফেলে দিয়েছে। রিপোর্ট করেছে, পালাতে গিয়ে মারা পড়েছেন ডন। তারপর তলোয়ার নিয়ে পালিয়েছে তিনজনে।
হয়তো, কিশোর বললো। কিন্তু খোলসটার ব্যাপারে কি বলবেন? মূর্তির ভেতরে কে লুকিয়েছে ওটা? একমাত্র ডনের কথাই মনে আসে আমার। আমেরিকানদের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে একাজ করেছেন হয়তো তিনি। কোনো কারণে খোলসটা ওখানে লুকিয়ে তলোয়ার আর খাপটা আলাদা জায়গায় নিয়ে গেছেন।
তলোয়ারটা ডনের কাছে নিয়ে গেছে যে, সে-ও তো লুকাতে পারে, যুক্তি দেখালো রিগো।
এই আরেকটা রহস্য! দামী একটা তলোয়ার জেনেশুনে ওভাবে শত্রুর গুহায় নিয়ে যাওয়া হলো কেন? ধরে নিলাম অস্ত্র দরকার ছিলো ডনের, একটা বন্দুক নিয়ে গিয়ে দিলেই তো আরও ভালো হতো। বন্দুকের বিরুদ্ধে তো বন্দুকই দরকার, তলোয়ার কেন? তা-ও আবার পাথর বসানো?
শ্রাগ করলো রিগো। পাথর ছিলোই তা কিন্তু শিওর না।
আমি কি ভাবছি, শুনুন। ডন পিউটোকে অ্যারেস্টই করেছিলো আমেরিকানরা কর্টেজ সোর্ডের জন্যে। হ্যাঁ, রবিন, প্রফেসর সাইনাস কি বলেছেন আমি জানি, রবিন মুখ খুলতে যাচ্ছিলো দেখে তাকে থামিয়ে দিলো কিশোর। ডন সেটা বুঝতে পেরে মূর্তির ভেতরে লুকিয়ে ফেলেন তলোয়ারটা, ধরা পড়ার আগেই। বন্দিশালা থেকে যখন পালালেন তিনি, তার পিছু নিলো সার্জেন্ট ডগলাস আর তার দুই করপোরাল। রিপোর্ট করে দিলো যে পালাতে গিয়ে গুলি খেয়ে তলোয়ারসহ সাগরে পড়ে গেছেন ডন। ডন বুঝতে পারলেন ওদের উদ্দেশ্য, পিছু যে নিয়েছে হয়তো টের পেয়ে গিয়েছিলেন। তলোয়ারটাকে নতুন আরেক জায়গায় লুকালেন তিনি। খোলসটা মূর্তির মধ্যেই রেখে দিলেন ওদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্যে।
তারপর ডনের কি হলো? প্রশ্ন করলো রিগো।
আমি জানি না।
কিছু না জেনেই একটা গল্প বানিয়ে বলে দিলে তুমি, কিশোর পাশা, ধীরে ধীরে মাথা নাড়তে লাগলো রিগো। ধরলাম তোমার কথা সত্যি, মানে ডনের পালিয়ে

যাওয়ার ব্যাপারটা, আর তলোয়ারটাও তিনি লুকিয়েছেন। কোথায়? আর কিভাবে সেটা খুঁজে বের করবে?
ডনের চিঠিটা দেখাও তো কিশোর, রবিন বললো।
চিঠির কপি বের করে রিগোর হাতে দিলো কিশোর। এটার অনুবাদ করুন। রবিন, লিখে নাও।
চিঠিটা একবার দেখেই রিগো বললো, এই চিঠি আমি দেখেছি। আমার দাদা এটা বহুবার পড়েছে, হারানো তলোয়ারের সূত্র খুঁজেছে, কিছুই পায়নি। ঠিক আছে, আমি অনুবাদ করছি, লিখে নাও। কনডর ক্যাসল, তেরো সেপ্টেম্বর, আঠারোশো ছেচল্লিশ। মাই ডিয়ার স্যানটিনো, আশা করি কুশলেই আছো, আর তোমার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে খাঁটি মেকসিকানের মতো। ইয়াংকিরা এসে ঢুকেছে আমাদের হতভাগ্য শহরে, আর আমি গ্রেপ্তার হয়েছি। কেন ধরা হয়েছে আমাকে, বলেনি ওরা তবে আন্দাজ করতে পারছি, বুঝলে? সাগরের কাছে ক্যাবরিলো হাউসে আমাকে বন্দী করে রাখা হয়েছে, কাউকে দেখা করতে দেয়া হচ্ছে না আমার সঙ্গে। আমাদের পরিবারের সাই, এবং সবকিছু ভালো আছে, নিরাপদে আছে। জানি, শীঘ্রি, জয় আমাদের সুনিশ্চিত।
নোটবুকে লিখে নিয়েছে রবিন। দ্রুত একবার পড়লো। বললো, কেন ধরা হয়েছে আন্দাজ করতে পেরেছেন তিনি। তলোয়ারটার জন্যেই কি?
এবং সব কিছু বলে উঠলো মুসী। তারমানে কি স্যানটিনোকে বোঝাতে চেয়েছেন তলোয়ারটা নিরাপদে আছে?
দেখি, নোটবুকের জন্যে হাত বাড়ালো কিশোর। বললো, হয়তো। তবে একটা ব্যাপারে শিওর হয়ে গেলাম এখন, মিথ্যে কথা বলেছে সার্জেন্ট ডগলাস।
কি করে শিওর হলে? রিগো জানতে চাইলো।
রিপোর্টে বলেছে ডগলাস, যে তলোয়ার সহ পালাতে গিয়ে গুলি খেয়ে মরেছেন ডন। তলোয়ারটা তাঁকে পৌঁছে দিয়েছিলো একজন বন্ধু বা ওরকম কেউ। কিন্তু ডনের সঙ্গে কাউকে দেখাই করতে দেয়া হতো না, তাহলে কি করে দিলো তলোয়ার? তারমানে হাতে তলোয়ার পৌঁছেনি। বানিয়ে বলেছে ডগলাস, যাতে সবাই ভাবে তলোয়ারটা হারিয়ে গেছে। কেউ আর ওটার খোঁজ না করে। তাহলে নিশ্চিন্তে খুঁজতে পারবে সে।
চিঠির দিকে তাকিয়ে বললো, তোমার কথায় যুক্তি আছে, কিন্তু...
থেমে গেল একটা শব্দে। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। তার মাঝেই হলো আওয়াজটা, লাকড়ির ওপর লাকড়ি পড়ার। পরক্ষণেই শোনা গেল পায়ের শব্দ।
এই, দাঁড়াও। চেঁচিয়ে উঠলো একটা কণ্ঠ।

ঘর থেকে ছুটে বেরোলো তিন গোয়েন্দা, রিগো আর পিনটু। দেখলো গোলাঘরের ওপাশ দিয়ে একটা ঘোড়া দৌড়ে যাচ্ছে। সাদা চুল, ছোটখাটো একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছেন চত্বরে।
জানালায় আড়ি পেতে নছিলো, রিগোকে জানালেন তিনি। তোমার সঙ্গে কথা বলতে আসছিলাম, এই সময় দেখি আমার সাড়া পেয়েই লাফ দিয়ে নামতে গিয়ে পড়লো লাকড়ির ওপর। ঘোড়াটা রেখে দিয়েছিলো গোলার পেছনে।
লোকটা কে, চিনেছেন? পিনটু জিজ্ঞেস করলো।
মাথা নাড়লেন বৃদ্ধ। চোখে তো ভালো দেখতে পাই না, চিনতে পারিনি।
ভিজে যাচ্ছেন, ডন, বৃদ্ধকে খুব সম্মান দেখিয়ে বললো রিগো। ভেতরে চলে আসুন।
কটেজের ভেতরে এনে ফায়ারপ্লেসের কাছে বসালো সে। পরিচয় করিয়ে দিলো তিন গোয়েন্দার সঙ্গে। তাদের দিকে তাকিয়ে হেসে মাথাটা সামান্য নোয়ালেন ডন রডরিক হেরিয়ানো।
লোকটা কতোক্ষণ ছিলো, স্যার, বলতে পারবেন? কিশোর জিজ্ঞেস করলো।
কি জানি। আমি তো এইমাত্র এলাম।
কে হতে পারে? কিশোরের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো রবিন। আড়ি পেতে ছিলো কেন?
আমি কি করে বলি? কর্টেজ সোর্ডটার কথা শুনে ফেললো কিনা কে জানে!
শুনলে কি ক্ষতি হবে? মুসার প্রশ্ন।
সরাসরি জবাব দিলো না কিশোর। কললো, আমার মনে হয়, মিস্টার ডয়েল চান তলোয়ারটা আমরা খুঁজে বের করি। কাল শুঁটকি খুব আগ্রহ দেখাচ্ছিলো আমাদের সম্পর্কে। আমরা কি করছি বোঝার চেষ্টা করছে নিশ্চয়।
শুনলেও কিছু এসে যায় না, বিশেষ গুরুত্ব দিলো না রিগো। এমন কিছু শোনেনি। তলোয়ারটা কোথায় আছে সেকথা তো আর বলিনি আমরা।
আমি শিওর,আগের কথার খেই ধরে শুরু করলো আবার কিশোর, ডন পিউটো। জানতেন তিন সৈন্য তার পিছু নিয়েছে। তিনি সেটা লুকিয়ে ফেললেন। নিশ্চয়ই ছেলের জন্যে কোনো সূত্র রেখে গেছেন তিনি। চিঠিটাতে না থাকলে অন্য কোথাও। তবে চিঠিতেও কিছু না কিছু আছেই। বন্দি ছিলেন তিনি, বিপদের মধ্যে ছিলেন, সরাসরি কিছু লেখা সম্ভব ছিলো না। জানতেন, ওই চিঠিই ছেলেকে কিছু জানানোর শেষ সুযোগ।
আরেকবার করে চিঠিটা পড়লো ওরা। তিন গোয়েন্দা পড়লো অনুবাদ করা লেখাটা, আর দুই ভাই পড়লে কপিটা।

আমি কিছুই পেলাম না, হাল ছেড়ে দিলো মুসা। মাথা নাড়লো রিগো, আমিও না। এটা সাধারণ একটা চিঠি, কিশোর। সাংকেতিক কোনো কিছুই নেই।
এবং সব কিছু ভালো আছে, নিরাপদে আছে কথাটা ছাড়া, বললো পিনটু।
কিশোর? রবিন বললো হঠাৎ, তারিখের ওপরে হেডিং লেখা হয়েছে কনডর ক্যাসল, খেয়াল করেছো? রিগোকে জিজ্ঞেস করলো সে। আপনি জানেন এটা কি?
না, ধীরে ধীর বললো রিগো, হবে কোনো দুর্গ-টুর্গ। অনেকেই ওরকম লিখে থাকে। যেখানে থেকে লিখছে সেটার নাম।
কিন্তু, রবিন বললো, ডন চিঠিটা লিখেছিলেন ক্যাবরিলো হাউস থেকে।
আপনাদের সিয়েনডাটার নাম কখনও কি কনডর ক্যাসল ছিলো? কিশোর জিজ্ঞেস করল।
না, জবাব দিলো রিগো। এটার নাম সব সময়ই হাসিয়েনডা আলভারেজ।
তাহলে ওপরে ডর ক্যাসল লিখলেন কেন? ভুরু নাচালো মুসা। বিশেষ কোনো জায়গা না তো যেটা স্যানটিনো চিনতো?
সঙ্গে করে আনা ম্যাপটা খুললো কিশোর। বাই দেখার জন্যে ঝুঁকে এলো তার কাঁধের ওপর দিয়ে। কিছুক্ষণ দেখে জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে আবার হেলান দিলো কিশোর। নো কনডর ক্যাসল! তারপর হঠাৎ কি মনে পড়াতে আবার তাকালো ম্যাপের দিকে। দাঁড়ান দাঁড়ান, এটা আধুনিক ম্যাপ! পুরানো হলে, মানে আঠারোশো ছেচল্লিশ সালের...
আমার কাছে একটা প্রানো মাপ আছে, বললেন ডন হেরিয়ানো।
ওটা আনার জন্যে বেরিয়ে গেলেন তিনি। অস্থির হয়ে তার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলো সবাই। হলদে হয়ে আসা পুরানো একটা ম্যাপ নিয়ে এলেন হেরিয়ানো। ১৮৪৪ সালে তৈরি করা হয়েছিলো, অর্ধেকটা স্প্যানিশে লেখা, অর্ধেকটা ইংরেজিতে। ভালোমতো ম্যাপটা দেখলো রিগো আর কিশোর।
কিছুই নেই, নিরাশই মনে হলো রিগোকে।
না, একমত হলো কিশোর।
পরাজিত হয়েই যেন রেগে গেল রিগো। বোকামি হচ্ছে! বুঝলে, পাগলামি! আমি আগেই বলেছি ফ্যান্টাসি দিয়ে আমাদের র‍্যাঞ্চ বাঁচানো যাবে না...
আস্তে করে বললেন হেরিয়ানো, এছাড়া আর কি-ই বা করার আছে তোমার, রিগো? একটা খারাপ খবর জানাতে এসেছি তোমাকে, আমি টাকাটা ধার করে নিয়ে দিয়েছিলাম তোমাকে। আমার টাকা নয়। বললে তুমি নিতে না, তাই দেয়ার সময় বলিনি। এখন আর না বলে পারছি না। ওই লোক টাকা ফেরত দেয়ার জন্যে

চাপ দিচ্ছে আমাকে। টাকা দিতে না পারলে মিস্টার ডয়েলের কাছে জায়গা তোমাকে বিক্রি করতেই হবে।
হিঁসিয়ে উঠলো মুসা, শুঁটকিটার গলায় এজন্যেই এতো জোর ছিলো কাল!
অনেক করেছেন আমার জন্যে, ডন, বিষণ্ন কণ্ঠে বললো রিগো। কি বলে যে ধন্যবাদ দেবো আপনাকে…
কি আর করতে পারলামশোনো, তুমি যেও না এখান থেকে। আমার কটেজেই থেকে যাও। খুব খুশি হবো।
আপাতত তো আছিই। জায়গা বিক্রি করে দিলে পরে কি করবো সে তখন দেখা যাবে।
উলেন হেরিয়ানো। বিদায় নিয়ে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। চত্বরে কাদা হয়ে গেছে। বৃষ্টি থামেনি। মাথা নিচু করে হাঁটছেন বৃদ্ধ। সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে রিগোও বেরিয়ে গেল। একটু পরেই লাকড়ি ফাড়ার শব্দ কানে এলো ছেলেদের।
সব গেল! দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো পিনটুর বুক চিরে।
না, কিছুই যায়নি! দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করলো কিশোর। করটেজ সোর্ড আমরা খুঁজে রে করবোই।
হ্যাঁ, করবো। প্রতিধ্বনি করলো যেন রবিন।
নিশ্চয় করবো! সুর মেলালো মুসা। আমরা… আমরা খাইছে, কিশোর, কিভাবে কাজটা করবো আমরা?
কাল, কিশোর জবাব দিলো, যতো পুরানো ম্যাপ পাওয়া যাবে সবগুলো দেখবো আমরা। কনভর ক্যাসল একটা সূত্রই। কি বোঝাতে চেয়েছেন ডন, জানার চেষ্টা করবো। রকি বীচে পুরানো ম্যাপের অভাব নেই।
আমি তোমাদের সঙ্গে আছি! উত্তেজিত হয়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো পিনটু। মেলাও হাত!
হাসি ফুটলো চারজনের মুখেই।
রোববার সকালে ইলশে গুঁড়িতে পরিণত হলো বৃষ্টি। হেরিয়ানার কাছ থেকে একটা সাইকেল আর একটা রেনকোট চেয়ে নিয়ে শহরে রওনা হলো পিনটু। হিসটোরিক্যাল সোসাইটির সামনে কিশোরের সাথে দেখা করলো দুপুরের দিকে।
রবিন গেছে লাইব্রেরিতে খুঁজতে, কিশোর জানালো। কাউন্টি ল্যাণ্ড অফিসে গেছে মুসা।
কনডর ক্যাসল খুঁজে বের করবোই আমরা! দৃঢ় কণ্ঠে বললো পিনটু।
হিসটোরিক্যাল সোসাইটিতে ঢুকলো ওরা। অনেকে বসে পড়ছে। আজ বেশ ব্যস্ত অ্যাসিসট্যান্ট হিসটোরিয়ান। ম্যাপের কথা বললো কিশোর। ম্যাপ রাখার ঘর

আলাদা। সেদিকে দুজনকে নিয়ে যাওয়ার সময় তিনি বললেন, আরেকজন এসে আলভারেজদের ব্যাপারে খোঁজ-খবর করেছে। লম্বা, পাতলা।
শুঁটকি! হিসটোরিয়ানের কাছ থেকে সরে এসে নিচু গলায় পিনটুকে বললো কিশোর। আমরা কি করছি জানার চেষ্টা করছে।
ওর নিশ্চয় ভয়, তলোয়ারটা খুঁজে বের করে ফেলবে তোমরা।
আমারও তাই মনে হয়।
ম্যাপ-ঘরে আর লোক নেই। ১৮৪৬ সালের পঞ্চাশটা সাপ পাওয়া গেল। কোনো কোনোটা সমস্ত কাউন্টির, আর কোনোটা শুধু রকি বীচ এলাকার। কনডর ক্যাসল খুঁজে পেলো না ওরা।
এই যে আরেকটা, কিশোর বললো। এটা শুধু আলভারেজ র‍্যাঞ্চের।
আরিব্বাবা! কত্তোবড় ছিলো তখন দেখো!
কিন্তু ওটাতেও কনভর ক্যাসল খুঁজে পাওয়া গেল না।
ডন পিউটোর সময়কার আর কোনো ম্যাপ নেই! হতাশ কণ্ঠে বললো পিনটু।
নেই, তাতে কি? হাল ছাড়লো না কিশোর। ওই সময়কার না হোক, রকি বীচের যতো ম্যাপ পাবো, সব দেখবো।
১৮৪০-এর কয়েকটা পাওয়া গেল। ওগুলোতেও নেই কনডর ক্যাসল। আরও কিছু আধুনিক ম্যাপেও যখন পাওয়া গেল না, হাল না ছেড়ে আর উপায় থাকলো না ওদের। ফিরে চললো স্যালভিজ ইয়ার্ডের হেডকোয়ার্টারে।
দেখি, রবিন আর মুসা কিছু পায় কিনা, আশা করলো কিশোর।
দুই সুড়ঙ্গ দিয়ে ট্রেলারে ঢুকলো দুজনে। ভেতরটা দেখে অবাক হয়ে গেল পিনটু। বললো, দারুণ সাজিয়েছো তো!
জবাবে শুধু মৃদু হাসলো কিশোর।
রবিন আর মুসার অপেক্ষায় বসে রইলো ওরা। রবিন এলো প্রথমে।
নাহ, হলো না! ধপাস করে একটা চেয়ারে বসে পড়লো সে। কোথাও আর বাদ রাখিনি!
মুসা ঢুকলো কালো মুখটাকে আরও কালো করে। তার চেহারার দিকে একবার তাকিয়েই যা বোঝার বুঝে গেল সবাই। একটা টুলে বসতে বসতে বললো, কনডর ক্যাসলের যদি কোনো মানে সত্যিই থেকে থাকে, তাহলে সেটা জানে শুধু ডন পিউটো আর সানটিনো আলভারেজ!
তারমানে আর কিছুই করার নেই আমাদের, কিশোরের দিকে তাকিয়ে বললো রবিন। প্রায় কেঁদে ফেলবে যেন পিনটু। না না, ওরকম করে বলো না!
হঠাৎ পিঠ সোজা করে ফেললো মুসা। ঠোঁটে আঙুল রেখে চুপ করতে ইশারা করলো সবাইকে।

কান পাতলো সকলেই। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত সব কিছু চুপচাপ। তারপর সবার কানেই এলো ক্ষীণ শব্দটা, বাইরে ধাতব কিছু নড়ছে। তারপর শব্দ শোনা গেল আরেক জায়গা থেকে। পরক্ষণেই হলো টোকা দেয়ার শব্দ।
ফিসফিসিয়ে রবিন বললো, কেউ কিছু খোঁজাখুঁজি করছে।
আচ্ছা, কিশোর বললো, তোমাদের পিছু নিয়ে আসেনি তো কেউ?
কি জানি, আমি অন্তত দেখিনি। মুসার দিকে তাকালো কিশোর।
আমি…ঠিক বলতে পারবো না, মুসা বললো চিন্তিত ভঙ্গিতে। তাড়াহুড়া করে এসেছি। পেছনে তাকানোর কথা মনেই হয়নি।
বাইরে জঞ্জালের মধ্যে কয়েক মিনিট ধরে চললে টোকা দেয়া আর খোঁচাখুচির শব্দ। তারপর নীরব হয়ে গেল।
দেখতো, রবিন, ফিসফিস করে বললো কিশোর।
আস্তে করে উঠে গিয়ে ট্রেলারের ছাতে লাগানো পেরিস্কোপ সর্ব-দর্শনে চোখ রাখলো রবিন। এই, ম্যানেজার, ডরি! বেরিয়ে যাচ্ছে!
লোকটা চলে যাওয়ার পর সর্ব-দর্শন থেকে চোখ ফিরিয়ে তাকালো রবিন। নিশ্চয় ফলো করেছিলো। কাকে করলো বুঝলাম না। ও-ই হয়তো কাল গিয়ে আড়ি পেতে ছিলো কটেজের জানালায়।
বোধহয়, নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটলো কিশোর। আমাদের ওপর বড় বেশি আগ্রহ দেখাচ্ছে টেরি আর ডরি। র‍্যাঞ্চ দখলের জন্যেই, না কোনো মতলব আছে? আর এখানেই বা কেন এসেছিলো?
হয়তো কোনোভাবে জেনে ফেলেছে তলোয়ারটার কথা! পিনটু বললো উত্তেজিত কণ্ঠে।
তা হতে পারে।
আমাদের চেয়ে বেশি জানলেই মুশকিল, বললো মুসা।
গভীর হয়ে মাথা ঝাঁকালো কিশোর। হ্যাঁ। এখন যে-করেই হোক একটা ম্যাপ খুঁজে পেতে হবে আমাদের, যেটাতে কনডর ক্যাসল রয়েছে।
একটা ইনডিয়ান ম্যাপ দেখলে কেমন হয়? কিছুটা রসিকতা করেই বললো মুসা। আমরা তো পড়তে পারবো না, কোনো ইনডিয়ানই পড়ে দেবে।
দূর! বিরক্ত হয়ে হাত নাড়লো রবিন। এখন ওসক…
মুসাআ! চিৎকার করে উঠলো কিশোর। ঠিক বলেছো!
ঠিক বলেছি! নিশ্চয়! এটাই জবাব! আমি একটা গাধা!
জবাবটা কি? দ্বিধায় পড়ে গেছে মূসা।
একটা সত্যিকারের পুরানো ম্যাপ! ডন পিউটো জানতেন, সব ম্যাপেই পাওয়া যায় এমন নাম লিখলে আমেরিকানরা সেটা বের করে ফেলবে। তাই এমন কিছু কথা

বলেছেন, যেটা শুধু স্যানটিনোই বুঝতে পারে। ওঠো, জলদি চলো! হিসটোরিয়ান সোসাইটিতে!
দুই সুড়ঙ্গের পাইপের ভেতর দিয়ে যতো দ্রুত সত্য বেরিয়ে এলো ওরা। দৌড় দিলো সাইকেলের দিকে।
পেছন থেকে ডাক দিলেন মেরিচাচী, কিশোওর!
থমকে দাঁড়ালো কিশোর। ফিরে তাকালো। অফিসের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন মেরিচাচী। বললেন, যাচ্ছিস কোথায়? আমার চাচার জন্মদিন আজ ভুলে গেছিস নাকি? জলদি রেডি হ। পনেরো মিনিটের মধ্যেই বেরোবো।
গুঙিয়ে উঠলো কিশোর। আ-আমি না গেলে হয় না, চাচী?
বলিস কি? তোকে এতো করে যেতে বললো, আর তুই যাবি না? না গেলে খুব দুঃখ পাবে তোর নানা। চল।
রবিন, মুসা আর পিনটুকে চলে যেতে বললো কিশোর। তারপর এগোলো ঘরের দিকে।
কি করবো এখন? মুসা জিজ্ঞেস করলো।
আবার কি? হিসটোরিক্যাল সোসাইটিতে যাবো, নেতৃত্ব নিয়ে ফেললো রবিন। কোন্ ধরনের ম্যাপে খুঁজতে হবে বুঝে গেছি আমি। চল।
রবিন কি চায় শুনলেন অ্যাসিসট্যান্ট হিসটোরিয়ান। তারপর বললেন, ওরকম একটা ম্যাপ আছে, আমাদের রেয়ার কালেকশন। অনেক পুরানো, সতেরোশো নব্বই সালের। এতো নরম হয়ে গেছে বের করে আলোতে আনাই রিস্কি।
প্লীজ, স্যার, অনুরোধ করলো রবিন। একবার অন্তত দেখান।
দ্বিধা করলেন হিসটোরিয়ান। মাথা ঝাঁকালেন। পেছনের ঘরের একটা দরজার দিকে নিয়ে চললেন ওদেরকে। ঘরটায় কোনো জানালা নেই, আর এমনভাবে তৈরি যাতে তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা সবসময় একরকম থাকে। কাচের বাক্সে কিংবা কাচের দরজা লাগানো শেলফের মধ্যে রয়েছে সমস্ত পুরানো দলিলপত্র। একটা ফাইল দেখলেন হিসটোরিয়ান, তারপর একটা ডয়ার খুলে বের করে আনলেন লম্বা একটা কাচের বাক্স। ভেতরে একটা ম্যাপ। মোটা, হলদে কাগজে বাদামী রঙে আঁকা।
বের করা যাবে না, হিসটোরিয়ান বললেন। কাঁচের ওপর দিয়েই দেখো।
ম্যাপটার ওপর ঝুকে দাঁড়ালো গোয়েন্দারা।
ওই তো! বিশ্বাস করতে পারছে না পিনটু। স্প্যানিশে লেখা, কনডর ক্যাসল!
এটা! কাচের বাক্সের ওপর পিনটুর আঙুলের পাশে আঙুল রাখলো রবিন।
হ্যাঁ! একেবারে আলভারেজ ব্যাঙ্কের মধ্যেই! আঁকাবাকা রেখাগুলো দিয়ে বোধহয় সান্তা ইনেজ কীককে বোঝানো হয়েছে।

হঠাৎ করে চুটকি বাজালো মুসা। তাহলে দাঁড়িয়ে আছি কেন এখনও?
বিস্মিত হিসটোরিয়ানকে ধন্যবাদ জানিয়েই দরজার দিকে দৌড় দিলো ছেলেরা।
বৃষ্টি থেমেছে। কিন্তু পর্বতের ওপরে এখনও ইতিউতি ঘুরছে কালো মেঘের ভেলা যে-কোনো সময় ঝরঝর করে নামার পাঁয়তাড়া কষছে যেন। কাঁচা রাস্তা ধরে সাইকেল চালিয়ে বাঁধের দিকে চলেহে দুই গোয়েন্দা আর পিনটু। শুকনো অ্যারোইওর কাছে একজায়গায় মোড় নিয়েছে পথটা, সেখানে এসে থামলো পিনটু।
আমি যতদূর বুঝলাম, সে বললো, এই পাহাড়ের শেষ মাথায় চূড়াটাকেই বলা হতো কনডর ক্যাসল। ওটার ওপাশেই সান্তা ইনেজ ক্রীক।
রাস্তার ধারের ঝোপের মধ্যে সাইকেলগুলো লুকিয়ে ফেললো ওরা। তারপর চ্যাপারালের ঘন ঝোপ ঠেলে এগোলো গভীর অ্যারাইওর কিনারার দিকে। বাঁয়ে রয়েছে বাধটা, এখান থেকে চোখে পড়ে না-ঝোপঝাড়ে ঢাকা ঢিবিটার জন্যে, যেটা অ্যারোইওর মুখ বন্ধ করে দাঁড়িয়েছে।
উঁচু চূড়াটার দিকে মুখ তুলে তাকালো ছেলেরা।
ওটাই! পিনটু বললো। ম্যাপ তা-ই বলে।
এখন কি নাম ওটার? মুসা জানতে চাইলো। ভিজে মাটি নরম হয়ে গেছে, প্রায় কাদা। সেটা ধরে সাবধানে নেমে চলেছে।
বলতে পারবো না।
অ্যারোইও থেকে উঠে পাহাড়ে চড়তে আরম্ভ করলো ছেলেরা। ঢাল কোথাও ঢালু, কোথাও খাড়া। ওপরে উঠতে উঠতে হাঁপ ধরে গেল ওদের।
এই তাহলে কনডর ক্যাসল! বিস্ময়ে গলা কেঁপে গেল রবিরে।
অতো ওপরে দাঁড়িয়ে আশপাশের পুরো এলাকাটা চোখে পড়ছে শুধু উত্তর দিক ছাড়া। সেদিকে অনেক ওপরে উঠে গেছে পর্বতের চূড়া যেন আকাশ ছোঁয়ার চেষ্টায়। পর্বতের গোড়ায় বাধ আর ক্রীকের কাছে ছড়িয়ে রয়েছে পোড়া অঞ্চল।
পশ্চিমে দেখা যাচ্ছে রাস্তা আর গভীর অ্যারোইও, একেবারে হাসিয়েনডার ধ্বংস্তুপের কাছে এগিয়ে গেছে। অনেক দূরে চোখে পড়ছে সাগর, ধূসর এই মেঘলা দিনে কালচে হয়ে আছে। দক্ষিণ-পশ্চিমে বাঁকা হয়ে পড়ে আছে যেন সান্তা ইনেজ ক্রীক, কিছু পানি চকচক করছে এখন তাতে। তার পরে প্রায় মাইলখানেক দূরে দেখা যায় ডয়েল র‍্যাঞ্চের বাড়িঘর আর কোরাল। দক্ষিণ থেকে একটা রাস্তা ডয়েল র‍্যাঞ্চ হয়ে চলে গেছে উত্তরে পর্বতের দিকে।
জায়গাটাকে কনডর ক্যাসল বলে কেন? মুসার প্রশ্ন। না দেখছি কনডর, না দুর্গ।
কনডর মানে জানো তো? রবিন বললো। এক ধরনের শকুন।

আমার মনে হয় নামটা দেয়া হয়েছে বার্ডস-আই ভিউ থেকে, অনুমান করলো পিনটু। অর্থাৎ পাখির চোখ থেকে দেখা। অনেক ওপর থেকে দেখা আরকি।
জানি। হতে পারে। তবে নাম নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। এসো তলোয়ার খুঁজি। কোথায় লুকানো হয়েছে বলো তো?
লুকানোর জায়গা আছে নিশ্চয়, মুসা বললো। গর্ত, ফাটল। গুহাটুহাও থাকতে পারে। এসো, খুঁজি।
ছড়িয়ে পড়ে খুঁজতে আরম্ভ করলো ওরা। কিন্তু কোনো ফাটল বা গর্ত চোখে পড়লো না, গুহা তো দূরের কথা। মার্বেলের মতো মসৃণ পিঠ এখানে পাহাড়ের। প্রতিটি ইঞ্চি পরীক্ষা করে দেখলো ওরা। খাড়া ঢালের কিনারে যতোদূর যাওয়া সম্ভব গিয়ে উঁকি দিয়ে নিচে তাকালো। একেবারে নিরেট পাথর।
নাহ্, এখানে কিছু লুকানো যাবে না, মাথা নাড়লো মুসা। চলো চূড়ার নিচে ঢালে খুঁজে দেখি।
চলো, রবিন বললো। তুমি খোজো কীকের দিকটায়, আমি আর পিনটু অ্যারোইওর দিকটায়।
দুই দিক মোটামুটি ঢালু, ততোটা খাড়া নয়। আবার খোঁজা শুরু হলো। মুসা যেদিকে নামলো সেদিকে কিছু বড় বড় পাথর দেখা গেল, কোনো খাঁজটাজ বা ফাটল নেই। ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলো। রবিন আর পিনটু তখনও খুঁজছে। ওদের কাছে চলে এলো সে।
না, লুকানোর জায়গা এখানেও নেই, রবিন বললো। গাল চুলকালো পিনটু। মাটিতে পুঁতে রাখেনি তো?
খাইছে! তাহলে সর্বনাশ! আঁতকে উঠলো মুসা। সমস্ত পাহাড় খুঁড়তে হবে তাহলে! অস!
আমার মনে হয় না মাটিতে পোঁতা হয়েছে, ধীরে ধীরে বললো রবিন। তাড়াহুড়োর মধ্যে ছিলেন তখন ডন। পুঁততে সময় লাগে। এতো সময় নিশ্চয় পাননি। তাছাড়া যেখানে পুঁতবেন সেখানে চিহ্ন দিয়ে রাখতে হবে, নইলে কিভাবে খুঁজে বের করবে স্যানটিনো? আর চিহ্নতে ডগলাসের চোখেও পড়ে যাওয়ার কথা।
মাথা নাড়লো রবিন। না, পুঁতে রাখেননি তলোয়ারটা। তবে কনডর ক্যাসলের কাছেই কোথাও লুকানো হয়েছে, যেখানে খুঁজে পাওয়ার কথা স্যানটিনোর। এমন কোনো জায়গা, যেটা তৈরি করতে হয়নি তখন, আর যেটাতে চিহ্ন দেয়ার দরকার পড়েনি।
কিন্তু, চারপাশে চোখ বোলালো মুসা, কোথায়?
কনডর ক্যাসলে নেই, এটা বোঝা গেল, বললো রবিন। তাহলে টাকে একটা চিহ্ন হিসে চিহ্ন হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকতে পারে। কাছেই কোনো জায়গা আছে,

মনে হয়, যেখানে ডন আর স্যানটিনো প্রায়ই যেতো। পিনটু, তেমন কোনো জায়গা…
বাঁধটা হতে পারে।
বাঁধ? হ্যাঁ, হতে পারে।
পথ দেখিয়ে বাঁধের কাছে দুই গোয়েন্দাকে নামিয়ে নিয়ে এলো পিনটু। সেন্টার গেট দিয়ে পানি গিয়ে পড়ছে তিরিশ ফুট নিচের নালায়। বারে যতোটা ওপরে ওঠা স উঠে দেখলো ওরা। হাজার হাজার ছোট পাথর একসাথে চুণ-সুরকি দিয়ে গেঁথে তৈরি হয়েছে ওটা।
একেবারে ইস্পাত হয়ে গেছে, মুসা বললো। কুড়াল দিয়ে কুপিয়েও কাটা যাবে না।
দুশো বছর আগে স্থানীয় ইনডিয়ানদের সাহায্যে এটা তৈরি করেছিলো আলভারেজরা, পিনটু জানালো।
এখানেও তো কোনো ফাঁকফোকর দেখছি না, রবিন বললো। ওইই নিচে দেখা যাচ্ছে অবশ্য কয়েকটা। কিন্তু ওখানে নামতে হলে দড়ির মই দরকার। ডন পিউটোর কাছে নিশ্চয় তখন ওরকম মই ছিলো না।
মুসাও একমত হলো তার সঙ্গে।
কোথায় যে রাখলো! নিরাশা ঢাকতে পারলো না রবিন। আরও সূত্র যদি পেতাম!।
সূত্রই বা আর কোথায় পাবো, বলো? ডন পিউটো চিঠি তো লিখেছিলেন মোটে একটা।
গণ্যমান্য লোক ছিলেন তিনি। নিশ্চয় অনেক বন্ধু ছিলো তার। হয়তো কারও কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছেন। কেউ তাকে দেখে থাকতে পারে। এমন কিছু সূত্র খুঁজে রে করা দরকার, যাতে বোঝা যায় পালানোর দিনটিতে কি কি করেছিলেন তিনি।
কিভাবে? বিশেষ আশা করতে পারলো না পিনটু। সে-অনেক বছর আগের কথা।
হ্যাঁ, তা ঠিক। তবে ওই সময়ে টেলিফোন ছিলো না। লোকে চিঠির মাধ্যমেই যোগাযোগ করতো। লোকে ডায়রি রাখতো এখনকার চেয়ে অনেক বেশি। হয়তো এই এলাকায় খবরের কাগজও ছিলো একআধটা। কিছু না কিছু পেয়ে যাবোই…
আবার সেই হিসটোরিক্যাল সোসাইটি! গুঙিয়ে উঠলো মুসা। পুরানো কাগজ ঘটতে আর ভাল্লাগে না!
হেসে উঠলো রবিন। তোমার অসুবিধে হবে না। ওসব দলিলের বেশির ভাগই স্প্যানিশে লেখা। পড়ার কষ্ট করতে হবে না তোমাকে। আজ যাচ্ছি না আর আমরা, কাল কিশোরকে নিয়ে যাবো। এ-হপ্তার হোমওয়ার্ক করেছো?
আবার গুঙিয়ে উঠলো মুসা। সর্বনাশ! তাই তো! মনেই ছিলো না! আমারও না। আজ সারতে হবে। সাইকেলগুলোর কাছে ফিরে চললো ওরা।

ডান দিকে চোখ পড়তে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো মুসা। সরে বাঁধের ওপর থেকে নেমেছে ওরা। পিনটু, বললো সে, তোমাদের র‍্যাঞ্চের কারো কুকুর আছে? চারটে, বড় বড় কালো কুত্তা?
কুকুর? না তো…
আমিও দেখেছি, রবিনের কণ্ঠে অস্বস্তি।
দীঘির ওপারে আলভারেজদের সীমানার মধ্যেই ঘোরাফেরা করছে চারটে বিরাট কুকুর। লাল টকটকে জিভ বের করা, জ্বলন্ত চোখ।
বিকট চেহারা… কথা শেষ করতে পারলো না রবিন। তার আগেই শোনা গেল তীক্ষ্ণ হুইসেল। পাই করে ঘুরলো মুসা। সংকেত! জলদি দৌড় দাও!।
দাঁত বের করে লাফিয়ে উঠে বাঁধের দিকে দৌড় দিলো কুকুরগুলো।
পড়িমড়ি করে আবার বাঁধের ওপর উঠে পড়লো ছেলেরা। প্রাণপণে ছুটলো সামনে পঞ্চাশ গজ দূরের কতগুলো ওক গাছের দিকে।
অনেক…দূর..! হাঁপাচ্ছে রবিন।
পারবো না…! পিনটুরও কথা আটকে গেল।
জলদি করো! আরো জোরে! তাগাদা দিলো মুসা।
মুসাআ! পেছনে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠলো পিনটু। দেখো, সাঁতরাচ্ছে!
দীঘির পাশ দিয়ে ঘুরে না এসে তাড়াতাড়ি আসার জন্যে পানিতেই লাফিয়ে পড়েছে কুকুরগুলো। দ্রুত সঁতরে আসছে। শিগগিরই উঠে আসবে এপাশে। ধরে ফেলবে ছেলেদের।
তবে ভুল করেছে কুকুরগুলো। পানিতে না নেমে যদি ঘুরে আসতো তাহলে আরও তাড়াতাড়ি করতে পারতো। কিছুটা সময় পেয়ে গেল ছেলেরা। এবং সেটা কাজে লাগালো।
পৌঁছে গেল গাছগুলোর কাছে। কোনোদিকে না তাকিয়ে গাছে উঠতে শুরু করলো। উঠে বসলো ওপরের ডালে, কুকুরের নাগালের বাইরে।
পৌঁছে গেল জানোয়ারগুলো। শিকার হাতছাড়া হয়েছে দেখে খেপে গেল ভীষণ। তুমুল ঘেউ ঘেউ করে লাফালাফি শুরু করলো। ধরতে পারলে ছিঁড়ে ফেলবে এমন ভাব।
গাছের ওপর আটকা পড়লো তিন কিশোর।
আবার বেজে উঠলো হুইসেল। শান্ত হয়ে গেল কুকুরগুলো, শুয়ে পড়লো গাছের গোড়ায়।
দেখো। হত তললো রবিন। ভটকি আর তার মানেজার!
লাফিয়ে লাফিয়ে বাঁধের ওপর দিয়ে দৌড়ে আসহে তালপাতার সেপাই ছেলেটা। পেছনে তার হোল্কা ম্যানেজার। গাহের ওপরে ছেলেদের দেখে দাঁত বের করে

হাসলো টেরিয়ার। আমাদের এলাকায় ঢুকেছো কেন? হাসতে হাসতে বললো সে। চুরি করতে?
তোমার কুত্তাগুলো তাড়িয়ে এনেছে আমাদের! রাগ করে জবাব দিলো পিনটু।
আলভারেজদের এলাকায় তোমরা কি করছিলে? ধমক দিয়ে জিজ্ঞেস করলো মুসা।
হেসে উঠলো ডরি। ঢুকেছিলাম সেটা প্রমাণ করতে পারবে?
আমরাই রং প্রমাণ করে দিতে পারি চুরি করে আমাদের সীমানায় ঢুকেছে তোমরা, টেরি বললো।
শেরিফকে জানিয়েছি, এখানে চোরের উৎপাত হচ্ছে, হেসে ডরি বললো। ওই যে, এসে পড়েছে।
ডয়েলদের এলাকার ভেতর দিয়ে আসা কাঁচা রাস্তা ধরে একটা গাড়ি আসতে দেখা গেল।
গাড়িটা থামলো। নামলেন শেরিফ আর তার ডেপুটি। এগিয়ে এলেন গাছের কাছে। জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার?
কয়েকটা চোরকে আটক করেছি, শেরিফ, ডরি বললো। আলভারেজদের ছেলেটা, আর তার দুই দোস্ত। বলেছিলাম না, ছেলেগুলো প্রায়ই ঢোকে আমাদের এখানে। নিশ্চয়ই চুরি করার মতলব। আরও শয়তানী করে। ঘোড়া ঢুকিয়ে গাছপালা নষ্ট করে, বেড়া ভাঙে, বেআইনীভাবে ক্যাম্প করে আগুন জ্বালে। আমার তো মনে হয় সেদিন আগুনটা ওরাই লাগিয়েছিলো।
মুখ তুলে ছেলেদের দিকে তাকালেন শেরিফ। নেমে এসো। ডরি, কুকুরগুলো সরাও।
নেমে এলো তিন কিশোর। ওদের দিকে তাকিয়ে গরগর করে উঠলো কুকুরগুলো।
দুই গোয়েন্দার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকালেন শেরিফ। মুসা আর রবিন না তোমাদের নাম? ইয়ান ফ্লেচারের সঙ্গে দেখেছিলাম। তোমরা গোয়েন্দা। অনুমতি না নিয়ে অন্যের এলাকায় ঢাকা যে বেআইনী এটা তো তোমাদের জানা উচিত।
জানি, শান্ত কণ্ঠে বললো রবিন। ইচ্ছে করে ঢুকিনি আমরা। ওরাই বরং না বলে আলভারেজদের এলাকায় ঢুকেছিলো। আমাদের দেখে কুত্তা লেলিয়ে দিয়েছে। উপায় না দেখে এসে এই গাছে উঠেছি।
মিথ্যে কথা বলছে ওরা, শেরিফ! গর্জে উঠলো টেরিয়ার।
মিথ্যে কথা তো তুমি বলছো! পাল্টা জবাব দিলো মুসা।
শেরিফ, রবিন প্রমাণ করার চেষ্টা করলো, আমরা যদি আগে থেকেই ওদের সীমানায় থাকতাম, তাহলে কুত্তাগুলো কি করে ভিজলো? এখন তো বিষ্টি-টিষ্টি কিছু নেই?

ভিজেছে? কুকুরগুলোর দিকে তাকালেন শেরিফ। তাই তো?
আমাদের তাড়া করতে দীঘি সাঁতরে এসেছে বলেই ভিজেছে। ওটা আলভারেজদের এলাকা।
লাল হয়ে গেল ডরির গাল। বললো, ওদের কথা শুনবেন না, শেরিফ। কুকুরগুলোর গা আগেই ভেজা ছিলো।
তোমার কথা কিন্তু আর বিশ্বাস করতে পারছি না, কড়া চোখে ডরির দিকে তাকালেন শেরিফ। কুকুরগুলো কি করে ভিজেছে?
সেটা পরে বলছি। আরেকটা জিনিস দেখবেন, আসুন।
শেরিফকে নিয়ে চলে গেল ডরি।
কি দেখাবে, উটকি? রবিন জিজ্ঞেস করলো।
সেটা এখন বলতে যাবো কেন? দাঁত বের করে হাসলো টেরি। দেখতেই পাবে।
মিনিট পনেরো পরে ফিরে এলেন শেরিফ। হাতে বাদামী রঙের একটা ব্যাগ। দুই গোয়েন্দা আর পিনটুর দিকে চেয়ে গভীর ভঙ্গিতে মাথা আঁকালেন, যাও, ছেড়ে দিলাম। কে মিথ্যে বলেছে, বুঝলাম না। যা-ই হোক, ডরিকে সাবধান করে দিয়ে এসেছি যাতে অন্যের এলাকায় কুত্তা না ছাড়ে। আর তোমাদেরও হুঁশিয়ার করছি অন্যের এলাকায় ঢুকবে না।
প্রতিবাদ করার জন্যে মুখ খুলতে যাচ্ছিলো পিনট আর মুসা। তাদের থামিয়ে দিয়ে রবিন বললো, ঠিক আছে, মনে থাকবে আপনার কথা। তারপর যেন নিতান্ত কথার কথা বলছে, এমনুভাবে জিজ্ঞেস করলো, ব্যাগে কি, স্যার?
সেটা তোমাদের জানার দরকার নেই। গম্ভীর হয়ে বললেন শেরিফ। এখন ভাগো এখান থেকে।
বাঁধের ওপর দিয়ে আবার সাইকেলের দিকে রওনা হলো ওরা। আলভারেজদের এলাকার কাঁচা রাস্তা দিয়ে যখন পোড়া খসিয়েনার দিকে চললো, জোর বৃষ্টি শুরু হলো আবার।
ধ্বংসস্তুপের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় রিগোর সঙ্গে দেখা। পোড়া হাইয়ের মধ্যে কিছু খুঁজছে যেন। পুড়ে নষ্ট হয়নি এমন কিছু এখনও আছে কিনা দেখছে হয়তো। ওদেরকে দেখতে পেলো না।
কিছু পেলেন? ডেকে জিজ্ঞেস করলো মুসা।
চমকে মুখ তুললো রিগো। কাঁচুমাচু হয়ে গেল, লজ্জা পেয়েছে। ইয়ে, কটেজ সোর্ডটাই খুঁজছি। আমার মনে হলো, ডন পিউটো যদি কোথাও লুকিয়ে থাকেন সেটা, হাসিয়েনডার ভেতরেই লুকিয়েছেন। বাড়ি পুড়ে ছাই হয়েছে। ভাবলাম এখন বেরোতে পারে। পড়ে থাকা কয়েকটা টালিতে লাথি মারলো রাগ করে। পেলাম না। কোনো চিহ্নই নেই!

কনডর ক্যাসল খুঁজে পেয়েছি আমরা, ভাইয়া, পিনটু জানালো।
সংক্ষেপে সব জানালো ওরা।
কনডর ক্যাসল খুঁজে পেয়েছে শুনে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিলো রিগোর চোখ, ওখানেও কিছু পাওয়া যায়নি শুনে আবার নিষ্প্রভ হয়ে গেল ধীরে ধীরে। তাহলে আর পেয়েই কি লাভ হলো?
তলোয়ারটা পাইনি বটে, তবে একেবারেই লাভ হয়নি একথাও বলা যাবে না, রবিন কললো।
কি লাভ?
হেলের জন্যে তলোয়ারটা লুকিয়ে রাখার পরিকল্পনা করেছিলেন ডন পিউটো। কনডর ক্যাসলের নির্দেশ রয়েছে অনেক পুরানো ম্যাপে। যেখানে বন্দি করা হয়েছিলো ডনকে, সেই জায়গা আর তার বাড়ির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই জায়গাটার। অথচ সেটার কথা লেখা হয়েছে চিঠিতে। এটা সূত্র না হলে কিছুতেই লিখতেন না।
যুক্তিতে তাই বলে, রিগো কললো। কিন্তু লাভটা…।
এঞ্জিনের শব্দে থেমে গেল সে। দুটো গাড়ি এসে ঢুকলো হাসিয়েনডার চত্বরে। একটা ডয়েলদের ওয়াগন, আরেকটা শেরিফের গাড়ি। ওয়াগন থেকে লাফিয়ে নামলো টেরি আর ডরি।
ওই তো! চেঁচিয়ে উঠলো ডরি।
ছাড়বেন না! ছাড়বেন না। ম্যানেজারের চেয়ে জোরে চেঁচালো টেরি। গাড়ি থেকে নামলেন শেরিফ। চুপ করো। অতো চেঁচিও না! বলেছি না, যা করার আমি করবো। তাঁর হাতে তখনও বাদামী ব্যাগটা রয়েছে। রিগোর সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি। রিগো, যেদিন আগুন লেগেছিলো সেদিন কোথায় ছিলে?
কোথায় ছিলাম? ভুরু কোঁচকালো রিগো। কেন, আর সবার সঙ্গে আগুন নেভাতে গিয়েছিলাম। আপনি জানেনই তো। তার আগে ছিলাম রকি বীচের সেন্ট্রাল ইস্কুলে, পিনটুর সঙ্গে।
হ্যাঁ, ছিলে। তখন বিকেল তিনটে। তার আগে কোথায় ছিলে?
আগে? আমাদের র‍্যাঞ্চে। ব্যাপারটা কি, শেরিফ?
আগুন কিভাবে লেগেছে জানা গেছে। ডয়েলদের এলাকায় কেউ একজন ক্যাম্পফায়ার জ্বেলেছিলো। তিনটের বেশ কিছুক্ষণ আগে। বছরের এই সময়ে এভাবে আগুন জ্বালানো বেআইনী। যা-ই হোক, আগুনটা ঠিকমতো নেভানো হয়নি। ডয়েলদের বেড়া ভেঙে…
ঘোড়ার পায়ের ছাপ পাওয়া গেছে! শেরিফের কথা শেষ হওয়ার আগেই বলে উঠলো ডরি। তোমাদের ঘোড়া। ওগুলো ধরে আনতে গিয়েই আগুনটা

জ্বেলেছিলে, টেরি বললো। তারমানে আগুনটা তুমিই লাগিয়েছে।
শীতল গলায় বললো রিগো, পাশাপাশি র‍্যাঞ্চ থাকলে গরু-ঘোড়ায় ওরকম বেড়া ভাঙেই। ওগুলো ধরে আনার জন্যে একে অন্যের এলাকায়ও ঢেকে র‍্যাঞ্চাররা। সেটা এমন কোনো ব্যাপার না। পড়শীদের মধ্যে একটা আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং থাকেই। তবে ঢুকলেও আগুন আমরা লাগাইনি।
ব্যাগ খুলে একটা কালো সমব্রেরো হ্যাট বের করলেন শেরিফ। এটা কার হ্যাট, রিগো?
আমার। আমি মনে করেছিলাম সেদিন আগুনে পুড়ে গেছে। পেয়েছেন ভালোই হয়েছে…
আগুনে পুড়ে গিয়েছিলো মনে করেছিলে? কর্কশ গলায় বলে উঠলো ডরি।
হ্যাঁ। তাতে কি? কঠিন দৃষ্টিতে ম্যানেজারের দিকে তাকালো রিগো।
রিগো, ডরি আর কিছু বলার আগেই বললেন শেরিফ, হ্যাটটা কখন হারিয়েছিলে?
কখন? মনে করার চেষ্টা করলো রিগো। বোধহয় আগুন নেভানোর সময়-…
না। আগুন নেভানোর সময় তোমার মাথায় হ্যাট ছিলো না। আমার ঠিক মনে আছে। কয়েকজন লোকের সাক্ষিও নিয়ে এসেছি। তারাও আমার সঙ্গে একমত।
কি জানি, মাথা চুলকালো রিগো। কখন হারিয়েছি সত্যিই মনে নেই আমার।
রিগো, এই হ্যাটটা পাওয়া গেহে একটা ক্যাম্পফায়ারের পাশে। যেটা থেকে আগুন ছড়িয়েছিলো।
তাহলে এটা পুড়লো না কেন?
কারণ, আগুনটা ক্যাম্পফায়ার সেকে শুধু একটা দিকে সরেছে। হ্যাটটা পড়ে ছিলো আরেক পাশে।
চুপ হয়ে গেল রিগো।
ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেললেন শেরিফ। রিগো, তোমাকে অ্যারেস্ট করতে বাধ্য হচ্ছি আমি।
চিৎকার করে কিছু বলতে যাচ্ছিলো পিনটু, তাকে থামালো রিগো। শেরিফের দিকে ফিরে মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, আপনার ডিউটি আপনি করুন, শেরিফ। তারপর আবার ভাইয়ের দিকে ফিরে বললে, ডন হেরিয়ানোকে গিয়ে এখুনি খবর দাও।
টেরি আর তার ম্যানেজারের দিকে ফিরে শেরিফ বলেন, তোরাও এসে আমার সাথে। স্টেটমেন্ট দিতে হবে।
নিশ্চয়ই, ডরি বললো।
খুশি হয়েই দেবো, বলে ছেলেদের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপলো টেরি। মুখে মুচকি হাসি।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে দুটো গাড়িকে চলে যেতে দেখলো ছেলেরা। পিনটুর চোখে পানি টলমল করছে। দুই গোয়েন্দার দিকে ফিরলো সে। বিশ্বাস করো, আমার ভাই আগুন লাগায়নি!
জানি, রবিন বললো। নিশ্চয়ই কোথাও একটা ঘাপলা আছে। ওই হ্যাটটা আগেও একবার দেখেছি, কিন্তু কোথায়, কখন, মনে করতে পারছি না। ইস্, এখন কিশোর এখানে থাকলে কাজ হতো।
হতাশ ভঙ্গিতে হাত নাড়লো মুসা, যেন বাতাসে থাবা মারলো। সমস্যা ছিলো একটা, এখন হয়েছে দুটো। তলোয়ারটাও খুঁজে বের করতে হবে, রিগোকেও ছাড়িয়ে আনতে হবে।
হেরিয়ানোকে খবর দিতে চললো পিনটু। রকি বীচে ফিরে চললো মুসা আর রবিন। তাড়াতাড়ি সাইকেল চালালো ওরা। বাড়ি ফিরে বার বার কিশোরকে ফোন করলে দুজনে, কিন্তু সাড়া পাওয়া গেল না স্যালভিজ ইয়ার্ড থেকে। বার্থডে পার্টি থেকে ফেরেনি বোধহয় কিশোররা। শুতে যাওয়ার আগে আরও একবার ফোন করলো দুজনে, সাড়া মিললো না ইয়ার্ড থেকে।
পরদিন সকালে নাস্তার জন্যে নিচে নেমে দেখে রবিন তার বাবা কাগজ পড়ছেন। ছেলের সাড়া পেয়ে মুখ তুললেন মিস্টার মিলফোর্ড। এই, রবিন, রিগোকে দেখি অ্যারেস্ট করেছে। আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। রিগোর মতো অভিজ্ঞ র‍্যাঞ্চার ওরকম একটা কাঁচা কাজ করতেই পারে না।
ও লাগায়নি, বাবা। হয় শেরিফ ভুল করেছে, নয়তো কেউ ইচ্ছে করে রিগোকে ফাসিয়েছে। শয়তানী। সেটা প্রমাণ করে ছাড়বো আমরা।
তাই করো।
তাড়াহুড়ো করে নাস্তা সারলো রবিন। তারপর কিশোরকে ফোন করলো। সব শুনে কিশোর বললো, রিগো তো লাগায়নি। ওই হাটটাকেই প্রমাণ হিসেবে ধরেছে না? ইচ্ছে করলে তুমিই ঠেকাতে পারতে শেরিফকে। মনে নেই? ওই হ্যাট ওর মাথায় দেখেছি আমরা।
কখন? তোমার মতো তো ফটোগ্রাফিক মেমোরি না আমার। কোথায় দেখলাম?
ইস্কুলে এসো। বলবো।
কিশোরের এইসব তথ্য চেপে রেখে টেনশনে রাখার ব্যাপারটা ভালো লাগে না রবিনের। এখন ফোনে বললে কি অসুবিধে হতো? বিরক্তি চাপতে না পেরে রিসিভারটা আছড়ে ক্রেডলে ফেললো সে। ইস্কুলে পড়াশোনা আর ক্লাস নিয়ে এতো ব্যস্ত রইলো কথা বলার সুযোগ পেলো ছুটির পর। তবে সেদিন ছুটি হলো সকাল সকাল।

আজ পিনটুকে দেখেছো তোমরা? জোর বৃষ্টির মধ্যে সাইকেল চালিয়ে ইয়ার্ডে ফেরার সময় জিজ্ঞেস করলো কিশোর।
খুঁজেছি, মুসা জবাব দিলো। দেখিনি। ইস্কুলে আসেনি মনে হয় আজ।
আসলেই আসেনি পিনটু। হেরিয়ানোর সঙ্গে কাটিয়েছে। একজন উকিল ঠিক করার চেষ্টা করেছে, ভাইকে ছাড়িয়ে আনার জন্যে। ইয়ার্ডে ঢুকে দেখলো তিন গোয়েন্দা, ওদের জন্যেই অপেক্ষা করছে পিনটু। হেডকোয়ার্টারে ঢুকলো চারজনে।
প্রাইভেট উকিলের খরচ দেয়ার সামর্থ্য নেই আমাদের, পিনটু জানালো, তাই পাবলিক ডিফেন্ডারস অফিসের সাহায্য চেয়েছি। ওরাও আশা দিতে পারলো না। কেসটা নাকি খারাপ।
সে তো জানিই,মুখ গোমড়া করে বললো রবিন। যদিও কাজটা করেনি সে।
কি করে প্রমাণ করবো, করেনি? চোখের কোণে পানি দেখা দিলো পিনটুর। আমাদের র‍্যাঞ্চই বা বাঁচাবো কি করে? ভাইয়া জেলে, কোনো সাহায্য করতে পারবে না। হাড়িয়ে আনতে যে জামিনের টাকা লাগবে, তা-ও দিতে পারবো না।
এক মুহূর্ত থেমে কললো। পাঁচ হাজার ডলার জমা দিতে হয়।
পাঁচ হাজার! চোখ বড় বড় করে ফেললো মুসা তারমানে র‍্যাঞ্চটা তোমাদের বেচতেই হবে।
ওটা বেচেও তো লাভ হবে না। হেরিয়ানোর ধার শোধ করে আর খুব একটা থাকে না। প্রথমেই পাঁচ হাজার দেয়ার দরকার নেই অবশ্য। জজ বলেছে, দশ ভাগের একভাগ আপাতত দিলেই চলবে, বাকিটা কিস্তিতে। সেটাই বা পাবো কোথায়? ধারে চেষ্টা করছি।
আমার মনে হয়, গম্ভীর হয়ে বললো কিশোর, বুঝেশুনেই শয়তানীটা করেছে কেউ। আগুন লাগাটা দুর্ঘটনা ছিলো না। হ্যাটটা চুরি করে নিয়ে গিয়ে ক্যাম্পফায়ারের কাছে ফেলে রেখেছে। সেটা প্রমাণ করতে পারলেই হতো।
কিন্তু কিভাবে? করুণ হয়ে উঠেছে পিনটুর মুখ।
হ্যাটটা শেষ কখন রিগোর মাথায় ছিলো, তাই তো জানি না আমরা, বললো রবিন।
জানি, কিশোর বললো। গত বিষ্ণুত্বারে বেলা তিনটায় তার মাথায় ছিলো ওটা। যেদিন আগুন লেগেছিলো। মনে নেই? ইস্কুলের বাইরে যখন আমাদের সাথে দেখা হলো, তখন ছিলো।
ঠিক বলেছো, ঠিক! চেঁচিয়ে উঠে টেবিলে বাবা মারলো রবিন।
তারমানে ক্যাম্পফায়ারের কাছে হ্যাট ফেলে আসেনি রিগো, শান্তকণ্ঠে বললো কিশোর, তিনটের আগেও ছিলো মাথায়, পরেও। আমাদের সঙ্গে ছিলো তখন।

তার পরে আগুন নেভাতে গিয়েছিলো। শেরিফ যদি তার মাথায় হ্যাট দেখে না থাকেন, তাহলে হ্যাটটা খোয়া গেছে ইস্কুল থেকে আমাদের রওনা হওয়া থেকে আগুন নেভাতে যাওয়ার সময়ের মাঝখানে, কোনো এক সময়।
কিশোর, রবিন বললো, আগুন নেভাতে যাওয়ার সময় ট্রাকের পেছনে ছিলো রিগো, আমাদের সঙ্গে। তখন বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে ফেলেনি তো? ক্যাম্পফায়ারের কাছে গিয়ে পড়ে থাকতে পারে।
অসম্ভব, পিনটু মাথা নাড়লো। ড্র-কর্ড দিয়ে চিবুকের নিচে আটকানো থাকে ওই হ্যাট। কোনো কিছুতে চড়ার সময় ওটা খুব শক্ত করে আটকে নেয় ভাইয়া।
তাছাড়া সেদিন তেমন বাতাসও ছিলো না, যোগ করলো মুসা। সেজন্যেই তো বেশি ছড়াতে পারেনি আগুন।
যাই হোক, কিশোর কললো, আগুনটা শুরু হয়েছিলো আমরা র‍্যাঞ্চে পৌঁছার আগেই। কাজেই ট্রাক থেকে হ্যাটটা উড়ে গিয়ে থাকলেও বুঝতে হবে আগুন লাগার পরে ক্যাম্পফায়ারের কাছে গিয়ে পড়েছিলো ওটা।
প্রমাণ করতে পারছি না, নাক কুঁচকালো রবিন, সেটাই হলো মুশকিল।
আমরা সাক্ষি দিতে পারি অবশ্য। তাতে কতোটা কাজ হবে জানি না। তবে সত্যিকারের কোনো প্রমাণ নেই আমাদের হাতে। সুতরাং প্রমাণ জোগাড় করতে হবে। জানতে হবে হ্যাটটা কিভাবে ক্যাম্পফায়ারে কাছে গিয়ে পড়েছিলো।
কি করে, কিশোর? মুসার প্রশ্ন।
প্রথমে রিগোর সঙ্গে দেখা করে জিজ্ঞেস করবো, হ্যাটটা শেষ কখন মাথায় ছিলো, কিংবা কখন খুলেছিলো মনে করতে পারে কিনা। একই সঙ্গে করটেজ সোর্ড খোঁজাও চালিয়ে যাবো। আমরা যে খুঁজছি এটা জানে টেরি আর ডরি। তলোয়ার খুঁজছি কি না জানলেও এটা বুঝতে পেরেছে, দামী কিছু খুঁজছি আমরা, যেটা বিক্রি করে আলভারেজ র‍্যাঞ্চ বাঁচানো যাবে। সেজন্যেই হয়তো রিগোকে অ্যারেস্ট করিয়েহে আমাদের ঠেকানোর জন্যে।
আবার তাহলে হিসটোরিক্যাল সোসাইটিতে যেতে হবে আমাদের, রবিন বললো, নতুন সূত্র খুঁজতে।
পাবো না, নিরাশ ভঙ্গিতে এপাশ ওপাশ মাথা দোলালো মুসা। সারা জিন্দেগী খুঁজেও বের করতে পারবো না।
কাজটা সহজ হলে তো অনেক আগেই বের করে ফেলতো কেউ, কিশোর বললো। তবে ঠিকমতো চেষ্টা করলে বের করা যাবেই। দুটো দিনের ওপর জোর দিতে হবে আমাদের। পনেরো আর মোল সেপ্টেম্বর, আঠারোশো ছেচল্লিশ সালের। পনেরো তারিখে পালিয়েছেন ডন পিউটো, তার আগে পর্যন্ত বন্দি ছিলেন, এবং তার পরে তার কি হয়েছে কেউ জানে না। দেখেওনি কেউ। তারপর,

ঠিক পরের দিনই, ষোল তারিখে আর্মি থেকে পালিয়েছে তিনজন সৈনিক। তাদেরকেও আর দেখা যায়নি।
আচ্ছা, টেবিলে কনুই রেখে সামনে ঝুঁকলো রবিন, কনডর ক্যাসলকে নিজের ঠিকানা বোঝাতে চাননি তো ডন?
মাথা নাড়লো কিশোর। না, তার ঠিকানা ছিলো ক্যারিলো হাউস।
একটা গল্প বলি। ডন পিউটোর মতোই বিপদে পড়েছিলো একজন লোক, স্কটসম্যান, নাম ক্লানি ম্যাকফারসন। সতেরোশো পঁয়তাল্লিশ সালে ইংরেজরা স্কটিশ হাইল্যাণ্ড দখল করে বসলো, কালোডেনের যুদ্ধে স্কটদেরকে পরাজিত করে। ম্যাকফারসনকে খুঁজে বেড়াতে লাগলো তারা, খুন করার জন্যে। কারণ ম্যাকফারসন ছিলো হাইল্যাণ্ডের একজন চীফ। বেশি ভাগ চীফই তখন দেশ ছেড়ে পালিয়েছে। কিন্তু ম্যাকফারসন পালায়নি।
কি করলো? কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলো পিনটু।
ঠিক তার বাড়ির কাছেই গুহায় গিয়ে ঢুকলো। পুরো এগারোটা বছর বাস করেছিলো ওখানে। তার অনেক বন্ধু ছিলো, তারা তাকে সাহায্য করেছে। খাবার দিয়েছে, পানি দিয়েছে, কাপড় দিয়েছে। ইংরেজরা বুঝতেই পারেনি কিছু। বিপদ কেটে গেল একদিন, আবার বেরিয়ে এলো ম্যাকফারসন।
তারমানে, উত্তেজিত হয়ে উঠেছে মুসা, তুমি বলতে চাইছে, কনডর ক্যাসলের কাছাকাছি কোনো গুহায় লুকিয়েছিলেন ডন পিউটো?।
মাথা ঝাঁকালো রবিন। অসত্ব কি? লুকিয়ে ছিলেন বলেই হয়তো কেউ তাঁকে আর দেখতে পায়নি।
কেউ দেখতে পায়নি, একথাটা তাহলে ঠিক না, শুধরে দিলো কিশোর। ম্যাকফারসনের মতোই তাঁর বন্ধুরা তাঁর সাথে দেখা করেছে, খাবার-কাপড়-পানি দিয়েছে। এদিকটা তুমি ভালোই ভেবেছে, রবিন, আমার খেয়াল হয়নি। তাহলে আমাদের খোঁজার সময়টা আরও বাড়িয়ে দিতে হবে। আঠারোশো হেচল্লিশের শুধু ষোল সেপ্টেম্বরে হবে না, পরের দিনগুলোরও খাবার নিতে হবে।
খাইছে! আতঙ্ক ফুটলো মুসার চোখে। কয়েকটা কমপিউটর লাগবে! নইলে অসম্ভব।
গোয়েন্দাগিরি অতো সহজ না, নির্বিকার ভঙ্গিতে বললো কিশোর। রহস্য জটিলতর হচ্ছে বলে মজাই পাচ্ছে সে। খোঁজার দরকার হলে খুঁজবে। তবে তোমার তেমন ভয় নেই। তুমি স্প্যানিশ জানো না। কাজটা করতে হবে আমাকে আর নিটুকেই।
আমি আর মুসা তাহলে কি করবো? রনি জানতে চাইলো।
জেলে যাবে।

জেলে! চমকে গেল মূস।
আরে না না, মুচকি হাসলো কিশোর, আসামী হয়ে যাবার কথা বলছি না। যাবে রিগোর সঙ্গে কথা বলতে।
পুলিশ হেডকোয়ার্টারের ওপরের একটা তলায় রকি বীচ জেলখানা। তালাবদ্ধ গরাদের সামনে ডেস্কে বসে আছে একজন ডিউটিরত পুলিশ্যান। দ্বিধাজড়িত পায়ে তার দিকে এগিয়ে গেল দুই গোয়েন্দা। রিগো আলভারেজের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি চাইলো।
সরি, বয়েজ, লোকটা বললো, লাঞ্চের পরে ভিজিটিং আওয়ার। তবে আসামীর উকিল যখন খুশি তার সঙ্গে দেখা করতে পারে। একটা বিমল হাসি উপহার দিলো পুলিশম্যান।
কেউকেটা গোছের মানুষ ওরা, এমন ভাব দেখিয়ে রবিন বললো, সে আমাদের মক্কেল।
অনেকটা উকিলের মতোই ধরতে পারেন আমাদেরকে, মুসা বললো।
দেখো, আমি বস্ত। অহেতুক বকবক করার সময়...
অহেতুক করছি না, তাড়াতাড়ি বললো রবিন। আমরা প্রাইভেট ডিটেকটিভ। রিগো আমাদের মক্কেল। এই কেসের ব্যাপারে তার সাথে কথা বলতে চাই। খুব জরুরী। আমরা
হাসি হাসি ভাব দূর হয়ে গেছে লোকটার। পুরোপুরি গভীর এখন। ভ্রুকুটি করে বললো, যাও, বেরোও এখন! বেরোও।
ঢোক গিললো রবিন। মুসাকে নিয়ে বেরোতে যাবে, এই সময় পেছনে কথা বলে উঠলো একটা কণ্ঠ, ওকে তোমাদের কার্ডটা দেখাও না, তাহলেই তো হয়।
চরকির মতো পাক খেয়ে ঘুরলো রবিন আর মুসা। হাসিমুখে দাঁড়িয়ে রয়েছেন রকি বীচের পুলিশ চীফ ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্লেচার।
কার্ড বের করে কর্তব্যরত পুলিশম্যানকে দেখালো রবিন। ইয়ান ফ্লেচারের দেয়া সার্টিফিকেটের একটা ফটোকপিও দেখালো।
কি জন্যে এসেহো, রবিন? চীফ জিজ্ঞেস করলেন।
জানালো রবিন।
সব শুনে মাথা ঝাঁকালেন চীফ। পুলিশম্যানের দিকে ফিরে বললেন, দেখা করতে দিতে পারো।
দিচ্ছি, স্যার, উঠে দাঁড়ালো লোকটা। আমি জানতাম না আপনি ওদেরকে সার্টিফাই করেছেন। আগে ওটা দেখালেই হতো।
ওরা যে কতোবার কতোভাবে পুলিশকে সাহায্য করেছে, জানো না তুমি। বয়েস কম হলে কি হবে, তুখোড় গোয়েন্দা, উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন চীফ। ছেলে চেয়ে

বললেন, আমি যাই, কাজ আছে। একবার হেসে চলে গেলেন তিনি।
একটি কলিংবেলের বোতাম টিপলো পুলিশম্যান। একটা করিডর দিয়ে বেরিয়ে এলো আরেকজন পুলিশ। গোয়েন্দাদেরকে নিয়ে যাওয়ার কথা বললো তাকে প্রথম পুলিশম্যান।
আসামীর সঙ্গে দেখা করতে যাবারও নানা ঝক্কি। অনেক নিয়ম-কানুন। সেগুলো পালন করার পর গিয়ে আসামীর দেখা পেলো দুই গোয়েন্দা।
এসেছো, শান্তকণ্ঠে বললো রিগো। ভালো। তবে আমার কিছু দরকার নেই।
আমরা জানি আগুনটা আপনি লাগাননি, মুসা বললো।
হাসলো রিগো। জানি আমিও। কিন্তু কে বিশ্বাস করবে?
আমরা সেটা প্রমাণ করে ছাড়বো, দৃঢ়কণ্ঠে বললো রবিন।
কিভাবে?
বেলা তিনটায় যে রিগোর মাথায় হ্যাট দেখেছে, সেকথা তাকে বললো রবিন।
তাহলে নিশ্চয়ই, উজ্জ্বল হলো রিগোর চোখ, আগুন লাগার পর কোনোভাবে ডয়েলদের জমিতে গিয়ে পড়েছিলো হ্যাটটা!
এমনও হতে পারে, অন্য কোথাও পড়ে ছিলো ওটা, কেউ তুলে নিয়ে গিয়ে রেখে দিয়েছে ডয়েলদের এলাকায়?
হ্যাঁ, পারে! আমাকে ফাঁসানোর জন্যে।
সেটা জানার চেষ্টা করছি আমরা। কে, কিভাবে ক্যাম্পফায়ারের কাছে নিয়ে গিয়ে হ্যাটটা ফেললো।
কাজেই আমাদের জানা দরকার, রবিনের কথার পিঠে বললো মুসা, কখন আপনার মাথা থেকে খুলেছেন ওটা। ট্রাকে করে যখন আগুন নেভাতে যাচ্ছিলাম, তখন কি ছিলো?
গাল চুলকালো রিগো। চোয়ালে হাত বোলালো। তারপর মাথা নাড়লো, নাই, মনে করতে পারছি না।
ভাবুন! জোর দিয়ে বললো মুসা।
হ্যাঁ, ভাবুন, গলা মেলালো রবিন।
কিন্তু অসহায় চোখে শুধু তাদের দিকে তাকিয়ে রইলো বেচারা রিগো।
পুরানো খবরের কাগজের সমস্ত সংস্করণ মাইক্রোফিল্ম করে রাখা হয়েছে। মাইক্রোফি রীডারে সেগুলো পুরে পড়ছে পিনটু। তাকে রকি বীচ লাইব্রেরিতে রেখে হিসটোরিক্যাল সোসাইটিতে চলে গেছে কিশোর। দুজনে দুই জায়গায় খোঁজার জন্যে।
কাগজের প্রতিটি সংখ্যার প্রতিটি পাতা খুঁটিয়ে দেখছে পিনটু। সেপ্টেম্বরের ষোল থেকে অক্টোবরের শেষ হপ্তায় চলে এলো। কিছুই পায়নি এতোক্ষণেও, শুধু একটা

সংখ্যায় ডন পিউটোর মৃত্যুর সংক্ষিপ্ত খবর ছাড়া। সার্জেন্ট ডগলাসের রিপোর্টেরই পুনরাবৃত্তি, আর কিছু না।
জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে হাত মাথার ওপরে তুলে শরীর টানটান করলো সে। ঘরটা নীরব। বাইরে বৃষ্টি পড়ার শব্দ হচ্ছে।
পত্রিকা দেখতে ইচ্ছে হলো না আর তার। বুঝলো, ওগুলোতে কিছু পাওয়া যাবে। টেবিলে হাতের কাছেই একগাদা বই ফেলে রেখেছে। ওগুলো সব ছাপানো মেমোয়ার আর ডায়েরী, উনিশ শতকে লেখা স্থানীয় মানুষের। যতোগুলো জোগাড় করতে পেরেছে লাইব্রেরি, সব তুলে এনে একসাথে করে ছেপে নিয়েছে।
প্রথম মেমোয়ারটা টেনে নিলো পিনটু। লিস্ট দেখে পাতা খুললো : মিড-সেপ্টেম্বর ১৮৪৬।
পঞ্চম জার্নালটা বন্ধ করে কান পাতলো কিশোর পাশা। বাইরে ঝমঝম ঝরছে অব্রিাম বৃষ্টি। স্প্যানিশ সেটেলারদের হাতে লেখা পুরানো ইতিহাস পড়তে দারুণ লাগে তার, তবে সেগুলোর ওপর থেকে জোর করে চোখ সরিয়ে এনে শুধু খুঁজছে ডন পিউটোর খবর। কিন্তু এততক্ষণেও কোনো সূত্র চোখে পড়েনি।
কিছুটা হতাশ হয়েও হয় নম্বর জার্নালটা টেনে নিলো সে। এটা পড়তেততো কষ্ট হবে না, বুঝলো, কারণ এটা ইংরেজিতে লেখা।
মিনিট দশেক পরে হঠাৎ সামনে ঝুঁকে গেল সে, ঢিলেমি ভাবটা দূর হয়ে গেছে মুহূর্তে। চকচক করছে চোখ। বার বার করে পড়লো লেখাটা। আমেরিকান সেনাবাহিনীর একজন সেকেণ্ড লেফটেন্যান্টের কথা।
লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো সে। পৃষ্ঠাটার একটা ফটোকপি করে নিলো। জার্নালগুলো অ্যাসিসটেন্ট হিসটোরিয়ানকে বুঝিয়ে দিয়ে প্রায় ছুটে বেরোলো ঘর থেকে। বাইরের বৃষ্টির পরোয়াই করলো না।
আবার মাথা নাড়লো রিগো। নাহ্, কিছু মনে করতে পারছি না!
বেশ, রবিন বললো, জোর করে শান্ত রাখছে নিজেকে, আমরা আপনাকে সাহায্য করছি। ধাপে ধাপে আসা যাক। ইস্কুলে আপনার মাথায় হ্যাটটা ছিলো। কিশোরের সেটা মনে আছে, আমারও। এখন
টেরি আর ডরিরও নিশ্চয় মনে আছে, বাধা দিয়ে তিক্ত কণ্ঠে বললো মুসা। হাজার চাপ দিলেও ব্যাটারা স্বীকার করবে না সেটা।
না করুক, রবিন বললো। মুসা বলেছে, স্যালভিজ ইয়ার্ডে আপনার মাথায় ওটা দেখেছে, তাই না মুসা?
মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলো মুসা।
ট্রাকে আলভারেজদের ইতিহাস আমাদের শুনিয়েছেন আপনি। আমার পরিষ্কার মনে আছে, হাত তুলে তুলে জায়গা দেখাচ্ছিলেন আপনি, আপনার হাতে ছিলো

না হ্যাট। ট্রাকে করে যাওয়ার সময় জোরালো বাতাস ছিলো, কনকনে ঠাণ্ডা, কাজেই মাথায় যাতে বাতাস না লাগে সেজন্যে হ্যাটটা তখন মাথায় পরে থাকাই স্বাভাবিক।
তারপর আমরা হাসিয়েনডায় পৌঁছলাম, রবিনের কথার খেই ধরলো মুসা। ট্রাক থেকে নামলাম। আপনি রাশেদ আংকেলের সঙ্গে করটেজের মূর্তিটা নিয়ে কথা বললেন। তারপর? হাসিয়েনডায় ঢুকেছিলেন? হ্যাটটা খুলেছিলেন?
ভালো রিগো। না, আমি ঘরে ঢুকিনি।...আমি...দাঁড়াও দাঁড়াও...হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে!
কী? চেঁচিয়ে উঠলো মুসা। জলদি বলুন! তাগাদা দিলো রবিন।
জ্বলজ্বল করছে এখন রিগোর চোখ। সরাসরি গোলাঘরে ঢুকেছিলাম, মিস্টার পাশাকে মাল দেখানোর জন্যে। ভেতরে আলো কম ছিলো। হ্যাটের কানা ছায়া ফেলছিলো চোখের ওপর, তাই খুলে হাতে নিয়েছিলাম। তারপর, ছেলেদের দিকে তাকালো সে, ওটা দরজার কাছে একটা হুকে ঝুলিয়ে রেখেছিলাম। ওটা ওখানেই থাকলো। হুগো আর ষ্টেফানো যখন আগুন আগুন বলে চিৎকার করে উঠলো হ্যাট না নিয়েই ছুটে বেরোলাম।
হুঁ। তাহলে ওটা ওখানেই থাকার কথা, রবিন কললো। ক্যাম্পফায়ারের কাছে নয়।
তারমানে কেউ একজন, বললো মুসা, ওটা বের করে নিয়ে গেছে ঘরে আগুন লাগার আগেই। নিয়ে গিয়ে রেখে দিয়েছে ক্যাম্পফায়ারের কাছে।
কিন্তু, রিগো কললো, সেটা প্রমাণ করা যাচ্ছে না।
দেখি গোলাঘরে গিয়ে কিছু মেলে কিনা, আশা করলো রবিন। সব নিশ্চয় পুড়ে মাটিতে মিশে যায়নি। সূত্র পেলে পেতেও পারি। মুসা, চলো, কিশোরকে গিয়ে বলি।
রিগোকে গুডবাই জানিয়ে বেরিয়ে এলো দুজনে।
বাইরে বৃষ্টি। তারমধ্যেই সাইকেল চালিয়ে হিসটোরিক্যাল সোসাইটিতে চললো ওরা। কিন্তু ওখানে পাওয়া গেল না কিশোরকে।
গেল কোথায়? রবিনের দিকে তাকালো মুসা।
কি জানি, ঠোঁট কামড়ালো রবিন। অন্ধকার হতে দেরি আছে, আরও ঘণ্টা দুয়েক। চলো, আমরাই গিয়ে খুঁজি।
চলো। কিশোররাও হয়তো ওখানেই গেছে।
আবার বাইরে বৃষ্টিতে বেরিয়ে এলো ওরা। রওনা হলো আলভারেজ র‍্যাঞ্চে।
হাসিয়েনডার চত্বরে ঢুকলো রবিন আর মুসা। বৃষ্টি থেমেছে। পোড়া কালো ধ্বংসপটা নীরব, নির্জন। কিছু পোড়া খুঁটি আর দেয়াল দাঁড়িয়ে রয়েছে এখনও, যেন ঘরগুলোর কঙ্কাল। হাসিয়েনডার পেছনে পাহাড়ের মাথায় আগের মতোই

দাঁড়িয়ে রয়েছে ভাঙা ঘোড়ার মূর্তি, নিচ দিয়ে ভেসে যাওয়া মেঘের মধ্যে কেমন যেন ভূতুড়ে লাগছে ওটাকে। কিশোর আর পিনটুকে দেখা গেল না।
অপেক্ষা করবো? মুসার প্রশ্ন।
এসেছি যখন চুপ করে থেকে লাভ কি? এসো খুঁজি।
ভাঙা দেয়াল, আর পড়ে থাকা কড়িবর্গাগুলোর দিকে বিতৃষ্ণ নয়নে তাকালো মুসা। যা অবস্থা! কি করে খুঁজবো?
বাইরেই খুঁজি আগে। কোনো কিছু পড়ে থাকতে পারে। পায়ের ছাপ পাওয়া যেতে পারে।
কোরালাটা যেখানে ছিলো তার দুপাশে ছড়িয়ে পড়লো দুজনে। মাথা নিচু করে দেখতে দেখতে এগোলো গেটের দিকে। পুরো চত্বরে কাদা হয়ে গেছে বৃষ্টিতে। আঠালো কাদা জুতো কামড়ে ধরে টান দিয়ে তুলতে গেলে বিচিত্র শব্দ হয়ে যায় ফচাৎ করে।
গোলার দরজার কাছে চলে এলো ওরা। পোড়া কাঠামোটা কিম্ভুত ভঙ্গিতে বেঁকেচুরে রয়েছে।
একটা কাঠিও দেখছি না মাটিতে, মুসা বললো। এমন কাদার কাদা, সব ঢেকে ফেলেছে।
পায়ের ছাপও পাওয়া যাবেনা। চলো, ভেতরে দেখি।
ভেতরের অবস্থা আরও খারাপ। কড়িগা, ধসে পড়া দেয়াল, হাত, ঘোড়ার স্টল, আর হাজারটা পোড়া জিনিস যেন জট পাকিয়ে রয়েছে। বৃষ্টিতে ভিজে সেসব জঞ্জাল থেকে পচা গন্ধ বেরোচ্ছে, নাকে জ্বালা ধরায়। কোনো জিনিসই চেনার উপায় নেই। দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়লো দুজনে।
এখানে পাবো? মাথা নাড়লো মুসা। মনে হয় না। কি খুঁজতে এসেছি সেটাই জানি না!
সূত্র। দেখলেই বুঝে যাবো যে ওটা খুঁজছি। কোনখান থেকে শুরু করবো?
দরজার কাছ থেকে। যেখানে ঝোলানো ছিলো হ্যাটটা। ওই দেখো, বাঁ দিকের দেয়ালে হুকটা এখনও আছে।
আছে। হুকের কঙ্কাল, বিড়বিড় করলো মুসা। পুড়ে নষ্ট হয়ে গেছে কাঠের হুক।
কালো হয়ে থাকা দেয়ালে এখনও গাথা রয়েছে তিনটে হুক, একসারিতে। ওগুলোর নিচের মাটিতে খোঁজা আরম্ভ করলো ওরা।
জঞ্জালের অভাব নেই। অনেক জিনিসই পাওয়া গেল, কিংবা বলা ভালো জিনিসের ধ্বংসাবশেষ, তবে সবই ওগুলো আলভারেজদের জিনিস, কোনো সূত্র-টুত্র না।

অবশেষে কিছু না পেয়ে ধপ করে একটা পোড়া বর্গার ওপর বসে পড়লো মুসা। হবে না। সূত্রটার গায়ে যদি সূত্র সীল মারা থাকে, তাহলেই শুধু চিনবো।
ঠিকই বলেছে, হাল ছেড়ে দিয়েছে রবিনও। এতো বেশি জঞ্জলি…
এই, কে যেন আসছে, লাফ দিয়ে উঠে দরজার দিকে এগোলে মুসা। বোধহয় কিশোর-..। কথা শেষ না করেই চকিতে সরে চলে এলো ভাঙা দেয়ালের আড়ালে। ফিসফিস করে বললো, তিনজন! চিনি না!
জঞ্জালের তূপের আড়ালে বসে পড়ে সাবধানে মাথা তুলে উঁকি দিলো রবিন।
এদিকেই আসছে! জলদি ওখানে ঢোকো। কড়িকর্গার ওপর পড়ে থাকা কতগুলো টালি দেখালো সে। ভেতরে ঢোকার জায়গা আছে।
শরীর মুচড়ে মুচড়ে নিঃশব্দে সেই ফাঁকে ঢুকে পড়লো দুজনে। উপুড় হয়ে পড়ে রইলো মাটিতে। নিঃশ্বাস ফেলতেও ভয় পাচ্ছে, পাছে ওনে ফেলে লোকগুলো।
গোলাঘরে এসে ঢুকলো তিন আগন্তুক।
জঘন্য চেহারা, ফিসফিসিয়ে না বলে পারলো না মুসা। তাকে চুপ করতে বললো রবিন।
ঠিক দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক চোখ বোলাতে লাগলো লোকগুলো। একজন বিশালদেহী, কালো চুল, পুরু গোঁফ, মুখে তিন-চার দিনের না-কামানো দাড়ি। দ্বিতীয়জন ছোটখাটো, মুখটা লম্বাটে-মুসার মনে হলো, ইঁদুরের মুখের সঙ্গে যথেষ্ট মিল রয়েছে, কুতকুতে চোখে যেন রাজ্যের শয়তানী ভরা। তৃতীয়জন মোটা, টাকমাথা, টকটকে লাল মোটা নাক, সামনের কয়েকটা দাঁত ভাঙা। তিনজনেই নোংরা, পরনে মলিন জিনস, কাদামাখা কাউবয় বুট পায়ে, গায়ে ওঅর্ক শার্ট, মাথায় তেল চটচটে, ময়লা, দোমড়ানো হ্যাট। হাত-মুখের খসখসে চামড়া দেখে অনুমান করতে কষ্ট হয় না, শেষ গোটা মাসখানেক আগে হয়তো করেছে।
পোড়া ধ্বংসস্তুপের দিকে তাকিয়ে একজনও খুশি হতে পারলো না।
এখানে কিছু পাবো না, বললো হাড্ডিসর্বস্ব ইঁদুরমুখো। কি করে বের করবো এখান থেকে, গুড়ু?
রে করতেই হবে, জবাব দিলো বিশালদেহী লোকটা।
সম্ভব না, গুড়ু, ইঁদুরের মতো কিচকিচ করে কথা বলে মোটা, টাকমাথা লোকটা। কোনো উপায় দেখছি না।
না খুঁজেই ঘ্যানর ঘ্যানর শুরু করে দিলে? ধমকের সুরে বললো গুড়। এখানেই আছে।
বেশ, দেখছি, ইঁদুরের কণ্ঠ শোনালো আবার মোটো। লাথি মারতে আরম্ভ করলো জঞ্জালে। এমন একটা ভাব করছে, যেন যা খুঁজছে যে কোনো মুহূর্তে লাফ দিয়ে

বেরিয়ে চলে আসবে চোখের সামনে।
এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি শুরু করলো ইঁদুরমুখো। খুঁজছে, তবে তেমন মন আছে বলে মনে হলো না। গুড়ু বলেছে, তাই খুঁজছে, এই আরকি।
রেগে গেল গুড। এটা কিরকম কাজ হচ্ছে নিকি! ভালোমতো খোজো।
গুড়ুর দিকে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত নীরবে তাকিয়ে রইলো ইঁদুর, তারপর খোঁজায় আরেকটু মন লাগালো।
এই, হারনি, তুমিও ফাঁকি মারছে! টাকমাথাকে ধমক লাগালো বিশালদেহী।
সাথে সাথে মেঝেতে বসে পড়লো হারনি। চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে জঞ্জালের তলায়, ফাঁকফোকরে উঁকি দিয়ে দেখতে লাগলো। তার দিকে তাকালো একবার নিকি আর গুড়ু, দুজনেই বিরক্ত, দরজার ফ্রেমের দুই পাশে খুঁজতে শুরু করলো ওরা।
এখানেই হারিয়েছে? নিকি জিজ্ঞেস করলো গুড়ুকে। তুমি শিওর?
না হলে কি এসেছি নাকি? তাড়াতাড়ি পালানোর জন্যে ইগনিশনের কি করেছিলাম মনে নেই? পরে আরেক সেট লাগাতে হয়েছে।
খুঁজতে খুঁজতে অন্তত বার দুই মুসা আর রবিনের কাছাকাছি চলে এলো ওরা। একবার তো গুড়ু এতো কাছে চলে এলো, হাত বাড়ালেই তার জুতো ছুঁতে পারতো মুসা। লোকটার বুটের বিশেষ খাপে ঢোকানো ধারালো কাউবয় হুরিটার দিকে তাকিয়ে ঢোক গিললো সে।
বুঝতে পারছি না কিছু কিছুক্ষণ পর আরও বিরক্ত হয়ে বললো নিকি। আর কোথাও হারায়নি তো?
গাধা নাকি! গর্জে উঠলো গুড়। এখানেই তো…
এতো ধমক মারছো কেন? সমান তেজে জবাব দিলো এবার নিকি। তারপর বললো, দেখি, বাইরে পড়লো কিনা।
আরেকবার খোঁজায় মন দিলো ইদরখো। তার দুরিটাও দেখতে পেলো মুসা।
হুঁ, অবশেষে বললো গুড়ু, বুঝতে পারছি, এভাবে খুঁজে পাওয়া যাবে না। আলো দরকার। চলো, আরেকবার গিয়ে খুঁজে দেখি, যেখানে সেদিন পার্ক করেছিলাম। কিছু না পেলে আলো নিয়ে এসে আবার খুঁজবো।
বেরিয়ে গেল তিনজন। চত্বরে ওদের কথা কাটাকাটি শোনা গেল কিছুক্ষণ। তারপর চুপ হয়ে গেল। বোধহয় চলে গেছে। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে নিঃশব্দে বেরিয়ে এলো রবিন আর মুসা। নির্জন চত্বর।
ওরা কে জানি না, রবিন কললো। তবে একটা কথা বোঝা গেল, আগুন লাগার দিন ওরা এসেছিলো এখানে। রিগোর হাট চুরির সঙ্গে ওদের কোনো সম্পর্ক আছে।

আমার মনে হয় গাড়ির চাবিটাবি হারিয়েছে ওরা।
আমারও তাই মনে হলো। মিষ্টার ডয়েলের ওখানে কাজ করে বোধহয়।
চাবি হারিয়ে থাকলে ব্যাপারটা সত্যি ওদের জন্যে বিপজ্জনক। কিংবা আর কারও জন্যে। এসসা, খুঁজি।
খুঁজলাম তো। ওরাও খুঁজলো নেই।
ওরা ঠিকমতো খোজেনি। এখন আমরা জানি কি খুঁজতে হবে। দরজার আশপাশে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জঞ্জাল তুলে দেখবো। একটা পোড়া কাঠ-টাঠ তুলে আনো না।
একটা বেলচাই পাওয়া গেল। যুই আর জঞ্জাল খুঁচিয়েতুলতে আরম্ভ করলো মুসা। যেই ধাতব কিছুতেই লাগে কেলচা, শব্দ হয়, অমনি দুজনে মিলে বসে পড়ে বেলচায় উঠে আসা জঞ্জালে হাত দিয়ে দেখে। প্রতিটি জিনিস রীক্ষা করে। ওদেরকে সাহায্য করার জন্যেই যেন মেঘ অনেকখানি পাতলা হয়ে এসেছে, আলো বেড়েছে, দেখতে সুবিধে হচ্ছে তাতে। মেঘের ফাঁকে এখন নীল আকাশও বেরিয়ে এসেছে কোথাও কোথাও।
হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো রবিন, মুসাআ! আঙুল নির্দেশ করলো একটা চকচকে জিনিসের দিকে।
তুলে নিলো মুসা। দেখার জন্যে এমনভাবে ঝুঁকে এলো রবিন, মাথা ঠোকাঠুকি হয়ে গেল দুজন্মে। থাবা মেরে প্রায় কেড়ে নিলো জিনিসটা মুসার হাত থেকে।
দুটো চাবি। রিঙে লাগানো। রিঙটায় একটা খাটো চেন, চেনের আরেক মাথায় রূপার একটা নকল ডলার।
কোনো চিহ্নটি আছে? মুসা জিজ্ঞেস করলো। নাম-টাম?
না। তবে গাড়ির চাবি তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এটাই খুঁজতে এসেছিলো লোকগুলো?
না-ও হতে পারে, অতোটা আশা করতে পারলো না মুসা। রিগোর চাবিও হতে পারে এটা। কিংবা তার কোনো বন্ধুর।
এই, তোমরা এখানে কি করছো?
ঝট্ করে ফিরে তাকালো মুসা আর রবিন। হারনি দাঁড়িয়ে আছে পোড়া দরজার কাছে।
পেছনে। রবিনের কানের কাছে মুখ নিয়ে বললো মুসা। কুইক! পেছনে ঘুরে দৌড় মারলো দুজনে। লাফিয়ে পেরিয়ে এলো জঞ্জালের কয়েকটা প। গোলাঘরের পেছনে ওক গাছগুলো পোড়েনি, এখনও জীবন্ত। ঢুকে পড়লো ওগুলোর ভেতরে। গাছের আড়ালে থেকে ফিরে তাকালো চত্বরের দিকে।

এই! কে ছেলেগুলো! শুডুর গর্জন শোনা গেল। পোড়া হাসিয়েনডার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।
ঠিক এই সময় কোরালের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো নিকি, ডেকে বললো, গুডু, ছেলেগুলো নাকি কিছু পেয়েছে! হারনি বলেছে!
পাগলের মতো আশেপাশে লুকানোর জায়গা খুঁজলো রবিন আর মুসা। হাসিয়েনডার চত্বরে রয়েছে ওদের সাইকেল। ওগুলোর কাছে যেতে হলে লোকগুলোকে
পেরিয়ে যেতে হবে। এখানেও লুকানোর জায়গা নেই।
পাহাড়! ফিসফিসিয়ে বললো মুসা। আর কোথাও জায়গা নেই!
তর্ক করলো না রকিন। করার সময়ও নেই। মুসার পেছন পেছন দিলো দৌড় সেই শৈলশিরাটার দিকে, যেটাতে পেছনের দুই পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে মুণ্ডুহীন ঘোড়র মূর্তিটা।
লাইব্রেরিতে এসে পিনটুকে খুঁজে বের করলো কিশোর। মুখ কালো করে বসে আছে আলভারেজদের শেষ বংশধর। কললো, গিরিখাতে গোলাগুলির অনেক খবর আছে। কিন্তু ডনের কি হয়েছিলো, সে-সম্পর্কে কিছুই নেই।
দরকারও নেই। জিনিস পেয়ে গেছি আমি। রবিন আর মুসাও নিশ্চয় কাজ শেষ কবে ফেলেছে। চলো, যাই।
কোথায়? হেডকোয়ার্টারে। ওখানেই আসবে ওরা।
স্যালভিজ ইয়ার্ডে এসে দুটো সাইকেল পার্ক করে রেখে ট্রেলারে ঢুকলো দুজন। রবিন আর মুসা আসেনি।
এখনও হয়তো কথা বলছে রিগোর সাথে, কিশোর বললো। আসুক। আমরা বসি। তুমি কি জিনিস পেলে? বসতে বসতে জিজ্ঞেস করলো পিনটু।
পকেট থেকে একটা কাগজ বের করলো কিশোর। উত্তেজনায় আবার চকচক করে উঠলো চোখ। আমেরিকান সেনাবাহিনীর কমাণ্ডার ছিলো ফ্রিমন্টস, যার দলে ছিলো সার্জেন্ট ডগলাস আর দুই করপোরাল। আরও একজন অফিসার ছিলো, সে সেকেণ্ড লেফটেন্যান্ট, জার্নাল রাখতো। আঠারোশো ছেচল্লিশের পনেরো সেপ্টেম্বর লিখেছে এই লেখাটা, বলে পড়তে লাগলো সে। মাথা ঘুরছে আমার! মেজাজও ভীষণ খারাপ। হবেই। যা অত্যাচার যাচ্ছে শরীরের ওপর দিয়ে। তারপরেও স্বস্তি নেই, রেহাই পেলাম
কাজ থেকে। আজ রাতে আমার ডিউটি পড়লো ডন পিউটো আলভারেজের হাসিয়েনডায়, লুকানো জিনিসের খোঁজ করার জন্যে। শোনা গেছে, চোরাই মাল নাকি আছে ওখানে। সন্ধ্যা হয় হয় এই সময় এমন একটা জিনিস চোখে পড়লো, বিশ্বাস করতে পারলাম না। হয়তো আমার চোখের ভুল, প্রচণ্ড ক্লান্তিতে অমন

হয়েছে। দেখলাম, সান্তা ইনেজ ক্রীকের পাশের একটা শৈলশিরা ধরে ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে ডন পিউটো আলভারেজ, হাতে একটা ব্রিট তলোয়ার। পিছু নেয়ার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কাছাকাছি যাওয়ার আগেই অন্ধকার নেমে এলো। আর এগোতে সাহস করলাম না, কারণ আমার শরীরের অবস্থাও ভালো নয়। যদি সত্যিই ডন হয়ে থাকে, তার সাথে একলা লাগতে যাওয়া বোকামি হয়ে যাবে। ক্যাম্পে ফিরে রিপোর্ট করলাম। আমাকে, জানানো হলো, সেইদিন সকালেই পালাতে গিয়ে গুলি খেয়ে মারা পড়েছে ডন, কাজেই আমি যাকে দেখেছি সে ডন হতেই পারে না। তাহলে কাকে দেখলাম? চোখের ভুল? ভূত? বার বার জিজ্ঞেস করছি ক্লান্ত মনকে, কোনো জবাব পাচ্ছি না।
তারমানে গুলি খেয়ে মরেননি ডন প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো পিনটু। লেফটেন্যান্ট সত্যিই দেখেছে। কিশোর, তার হাতে তলোয়ারটাও ছিলো
ছিলো, হাসলো কিশোর। এখন জোর দিয়ে বলা যায়, পনেরো সেপ্টেম্বর রাতে জীবিত ছিলেন ডন, সাথে ছিলো করটেজ সোর্ড। ভুল দেখেনি লেফটেন্যান্ট। মুসা আর রবিন এলেই দেখতে যাবো।
কিন্তু আরও আধঘণ্টা পরও যখন ওরা ফিরলো না, আশঙ্কা জাগলো পিনটুর মনে। কিছু হয়নি তো ওদের?
গোয়েন্দাগিরি করতে গেলে হওয়াটা স্বাভাবিক, গভীর হয়ে বললো কিশোর। আমার মনে হয়, রিগোর কাছ থেকে কোনো তথ্য জানতে পেরে খোঁজ নিয়ে দেখতে গেছে সেটা।
কোথায় গেল?
নিশ্চয় হাসিয়েনডায়। আর কোথায় যাবে? চলো, আমরাও যাই।
ট্রেলার থেকে বেরিয়ে আবার সাইকেলে চাপলো দুজনে। বৃষ্টি কমছে। ওরা হাসিয়েনডায় পৌঁছতে পৌঁছতে একেবারে কমে গেল। ধীরে ধীরে পরিষ্কার হচ্ছে আকাশ। কাউন্টি রোড ধরে সান্তা ইনেজ কীকের ব্রিজ পেরোনোর সময় দেখলো পানিতে কানায় কানায় ভরে গেছে নালাটা। অ্যারোইওর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় মুখ তুলে করটেজের মূর্তিটার দিকে তাকালো পিনটু। চিৎকার করে উঠলো, কিশোর, দেখো দেখো, নড়ছে!
ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষলো দুজনেই।
না, মূর্তি নড়ছে না, কিশোর কললো। ওটার কাছে কেউ উঠেছে।
মূর্তির পেছনে লুকিয়েছে?
মনে হয়…দুজন…আরে দৌড়াচ্ছে!
আসছে তো এদিকেই!
মুসা আর রবিন!

চলো, চলো!
পথের পাশের ঝোপে ঠেলা দিয়ে সাইকেল দুটো ঢুকিয়ে রেখেই দৌড় দিলো দুজনে। তাড়াহুড়ো করে নামতে গিয়ে হোঁচট খাচ্ছে, পিছলে পড়ছে রকিন আর মুসা, কিন্তু পরোয়াই করছে না যেন ওসবের। কি করে রাস্তায় নেমে আসবে দ্রুত, কেবল সেই চেষ্টা। শৈলশিরাটা যেখানে শেষ হয়েছে, তার গোড়ায় একটা খাদ রয়েছে। ওখানে মিলিত হলো চার কিশোর।
কিশোর, প্রমাণ পেয়েছি! হাঁপাতে হাঁপাতে বললো মুসা।
লোক তিনটে দেখে ফেলেছে আমাদের! এতো জোরে দম ফেলছে রবিন, জড়িয়ে যাচ্ছে কথা।
তিনজন? কারা? পিনটু হাঁপাচ্ছে।
চিনি না। তাড়া করলো আমাদের।
জলদি চলো ব্রিজের দিকে, কিশোর বললো। ওটার নিচে লুকানোর জায়গা আছে।
কিন্তু ওখানেও খুঁজবে,রবিন বললো, জানা কথা।
রাস্তার ধারে একখানে একটা বড় ড্রেন-পাইপ আছে, পিনটু জানালো। ওটা দিয়ে একটা খাদে নেমে যাওয়া যায়। খাদের মধ্যে এতো জংলা, ঢুকলে আর দেখতে পাবে না। চলো চলো।
পাহাড় থেকে বেরিয়ে আসা বিশাল ড্রেনটার মুখের কাছে এসে পঁাড়ালো চারজনে। ভেতরে পানি বইছে, তবে খুব কম, সামান্যতম দ্বিধা না করে তাতে ঢুকে পড়লো পিনটু। অন্য তিনজনও ঢুকলো। গিয়ে নামলো খাদের মধ্যে। কাদা থিকথিক করছে ওটাতে, একেবারে তলায় পানিও জমেছে যেখানটায় সবচেয়ে বেশি গভীর। চারপাশে চ্যাপারালের ঘন ঝোপ। তার মধ্যে লুকিয়ে বসে রইলো ওরা।
কি প্রমাণ পেয়েছো? ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলো কিশোর।
চাবিটার কথা জানালো রবিন আর মুসা। ওটা হাতে নিয়ে ম্লান আলোয় দেখলো পিনটু। আমাদের না।
তাহলে ওই লোকগুলোরই কারো, কিশোর বললো। মনে হচ্ছে গোলাঘরে আগুন লাগার আগে ঢুকেছিলো ওখানে। চাবিটা হারিয়েছে। এবং কাউকে জানতে দিতে চায় না যে ওরা ঢুকেছিলো। হয়তো হ্যাটটা ওরাই চুরি করে নিয়ে গিয়ে ক্যাম্পফায়ারের কাছে রেখে দিয়েছিলো।
কিন্তু ওরা কারা? খসখসে হয়ে গেছে মুসার গলা।
কি করে বলি? তবে ওই আগুন লাগা আর রিগোর অ্যারেস্টের পেছনে ওদের হাত আছে শশশশ!

রাস্তায় হুটন্ত পায়ের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। আস্তে ঝোপ ফাঁক করে তাকালো ছেলেরা। দুপদাপ করে দৌড়ে ওদের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল তিন কাউবয়।
কখনও দেখিনি, ফিসফিসিয়ে জানালো পিনটু। মিস্টার ডয়েলের লোক হতে পারে। নতুন চাকরি নিয়েছে হয়তো।
এখানে কি করছে? মুসার প্রশ্ন।
সেটাই জানতে হবে, জবাব দিলো কিশোর।
আবার ফিরে না এলেই বাঁচি! রাস্তার দিকে তাকিয়ে থেকে বললো রবিন।
বসেই রইলো ছেলেরা। কান পেতে রয়েছে। আরও পনেরো মিনিট পর জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে কিশোর বললো, গিয়ে দেখা উচিত।
আমি যাচ্ছি, পিনটু উঠে দাঁড়ালো। মুসা আর রবিনের পিছে লেগেছে ওরা, আমার নয়। আমাকে সন্দেহ করবে না।
রাস্তায় উঠে বাঁয়ে মোড় নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল পিনটু। খাদের মধ্যে অপেক্ষা করতে লাগলো তিন গোয়েন্দা। শব্দটা প্রথম শুনতে পেলো রবিন। কে এসেছে দেখার জন্যে উঠতে গেল সে।
রাখো! বাধা দিলো মুসা। পিনটু না-ও হতে পারে।
খাদের কাছে এসে থামলো কেউ। ডেকে বললো, বেরিয়ে এসো।
পিনটু। খাদ থেকে উঠে এলো তিন গোয়েন্দা। ফিরে এলো সান্তা ইনেজ ক্রীকের ব্রিজের কাছে। হাত তুলে দেখালো পিনটু। সবাই দেখলো, উত্তরের কাঁচা রাস্তা ধরে ডয়েল র‍্যাঞ্চের দিকে চলে যাচ্ছে তিন কাউবয়।
গেছে, হেসে বললো পিনটু। এখান থেকেই আমাদের তদন্ত শুরু হবে, তাই না কিশোর?
কিসের তদন্ত? বুঝতে পারলো না মুসা।
লেফটেন্যান্টের জার্নালের কথা মুসা আর রবিনকে জানালো কিশোর। ফটোকপি করে আনা লেখাটাও দেখালো।
খাইছে বলে উঠলো মুসা। ডন পিউটো তাহলে সত্যি সত্যি পালিয়েছিলেন। সঙ্গে ছিলো করটেজ সোর্ড।
হ্যাঁ, মাথা ঝাঁকালো কিশোর। তবে লেফটেন্যান্ট যেভাবে লিখেছে, তাতে জায়গা খুঁজে পাওয়ার ভরসা কম। জায়গাটার কোনো বর্ণনা দেয়নি।
কিন্তু কিশোর, বলেছে... প্রতিবাদ করতে গিয়েও থেমে গেল পিনটু।
ও তো বিশ্বাসই করেনি, বলবে কি? তবে যতদূর মনে হয় ওদিকটার কথা বলেছে। হাত তুললো কিশোর। বলেছে সান্তা ইনেজ ক্রীকের পাশের একটা স্লো ধরে গিয়েছেন। নিশ্চয় বেরিয়েছিলেন হাসিয়েনডা থেকে। তার মানে পশ্চিমে গেছে।
সেদিকে তাকালো সবাই।

কিছুই বোঝা গেল না, ওদিক দিয়ে কোথায় গিয়েছিলেন ডন।
মাথা গরম ছিলো তখন লেফটেন্যান্টের নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটলো কিশোর।
কি দেখতে কি দেখেছে। কিছু একটা ভুল করেছে, লিখতে গিয়ে। হয়তো যা দেখেছিলো ঠিকমতো লিখতে পারেনি।
আবার নিরাশা এসে ভর করলো ওদের মনে।
চলো ফিরে যাই, হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো গোয়েন্দাপ্রধান।
ধীরে ধীরে আবার ফিরে চললো ওরা। বাড়ি যাবে।
রাতে আবার জোর বৃষ্টি শুরু হলো। ঝরলো পরদিন সারাটা কেলা। ইস্কুলে যেতে হলো তিন গোয়েন্দাকে। ক্লাসে বসে তলোয়ারটার কথা আলোচনার সুযোগ পেলো না।
বিকেলে ভাইকে চাবিটা দেখাতে নিয়ে গেল রিগো। তিন কাউবয়ের কথা বললো। রিগোও চিনতে পারলো না ওদের। চাবিটাও না। পোড়া গোলাবাড়িতে কেন এসেছিলো ওরা, তা-ও বুঝতে না পেরে অনুমানে বললো, মিস্টার ডয়েল জোর করে আমাদের তাড়াতে চান আরকি। সেজন্যেই গুণ্ডাপাণ্ডা ভাড়া করেছেন।
ডিনারের পর আবার বেরোলো সেদিন তিন গোয়েন্দা। হিসটোরিক্যাল সোসাইটি আর লাইব্রেরিতে তথ্য খুঁজতে। আবার ঘাটতে লাগলো গাদা গাদা পুরনো খবরের কাগজ, জার্নাল, ডায়রি, মেমোয়ার, আর্মি রিপোর্ট। নতুন কিছুই পেলো না।
কোনোদিনই আর থামবে না বলে যেন জেদ ধরেছে বৃষ্টি। পড়েই চলেছে, পড়েই চলেছে, একটান। সেদিন রাতে পড়লে, পরদিন বুধবারেও কমতি নেই। বন্যা হতে পারেঃ জনগণকে হুঁশিয়ার করে দিলো কাউন্টি। ইস্কুল ছুটির পর বাড়িতে কাজ সারতে গেল রবিন আর মুসা। ভাইকে দেখতে গেল পিনটু। হিসটোরিক্যাল সোসাইটিতে গেল আবার কিশোর।
কাজ শেষ করে হেডকোয়ার্টারে চলে এলো রবিন আর মুসা। কিশোরফেরেনি। পিনটুও আসেনি। ভেজা রেনকোট ছড়িয়ে দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো ওদের জন্যে
রবিন, তলোয়ারটা পাবো তো? আর তেমন আশা করতে পারছে না মুসা।
জানি না,মুসার মতোই নিরাশায় ভুগছে রবিন।
আগে এলো পিনটু। দুই সুড়ঙ্গ দিয়ে এসে ট্র্যাপডোর দিয়ে ঢুকলো ট্রেলারে। গত দুই দিন তার সঙ্গে দেখা হয়নি গোয়েন্দাদের। বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে ছেলেটাকে।
কি ব্যাপার? শঙ্কিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো রবিন। তোমার ভাইয়ের কিছু হয়েছে?
ভাইয়ার কিছু হয়নি, তবে আমরা শেষ! ভেজা জ্যাকেটটা খুলে ওদের পাশে বসে পড়লো পিনটু। আমাদের মর্টগেজের কাগজ ছিলো সিনর হেরিয়ানোর কাছে। তিনি সেটা বিক্রি করে দিয়েছেন মিস্টার ডয়েলকে।

বলো কি কপাল কুঁচকে ফেললো মুসা।
কিন্তু তিনি তো বলেছিলেন…
বলেছিলেন আরও সময় দেবেন, রবিনের কথাটা শেষ করে দিলো পিনটু। কিন্তু আমাদের জন্যেই সেটা করতে পারলেন না। ভাইয়ার জামিনের টাকা দরকার। আর নিজের ইচ্ছেয় বিক্রি করেননি হেরিয়ানা, ভাইয়ার সঙ্গে আলোচনা করেই করেছেন। ভাইয়াই চাপাচাপি করেছে করতে।
হুঁহ! গেল তাহলে, বলে চুপ হয়ে গেল রবিন।
তলোয়ারটাও পাওয়ার আশা নেই, এদিকে জমিও…, কিশোরকে দেখে থেমে গেল মুসা।
ভিজে চুপচুপে হয়ে আছে গোয়েন্দাপ্রধান। হাঁপাচ্ছে। জানালো, শুঁটকি ব্যাটা পিছু নিয়েছিলো। অনেক কষ্টে খসিয়ে এসে লাল-কুকুর-চার দিয়ে ঢুকলাম।
পিছু নিয়েছিলো কেন? পিনটু জিজ্ঞেস করলো।
জিজ্ঞেস তো আর করিনি,ভোতা গলায় জবাব দিলো কিশোর। আমার রয়েছে তাড়া, ওকে জিজ্ঞেস করার সময় কোথায়? যতো তাড়াতাড়ি পারলাম চলে এলাম। কি পেয়েছি, শোনো…
ধুড়ুম করে কি যেন পড়লো, ট্রেলারের বাইরের জঞ্জালের মাঝে। আরেকবার হলো শব্দ। বাইরের বৃষ্টির মধ্যে থেকে ভেসে এলো টেরিয়ারের কণ্ঠ, শার্লকের বাচ্চা! এখানেই কোথাও লুকিয়েছে, আমি জানি!
দড়াম করে আবার কিছু একটা বাড়ি লাগলো এসে ট্রেলারের গায়ে। গোয়েন্দারা কোথায় লুকিয়েছে জানে না, তবে আন্দাজ করতে পারছে জঞ্জালের ভেতরেই কোথাও রয়েছে। চেঁচিয়ে বললো, নিজেদের খুব চালাক ভাবো, না? বারোটা বাজিয়ে ছাড়বো এবার মেকসিকান ছাগলগুলোর। শনিবারে ওদের র‍্যাঞ্চ দখল করবো, দেখি কিভাবে ঠেকাও।
পরস্পরের দিকে তাকালো ছেলেরা। শুধু কিশোরকে অবাক মনে হলো। মর্টগেজটা যে বিক্রি করে দেয়া হয়েছে এটা এখনও জানানো হয়নি তাকে।
শনিবার, বুঝলে শার্লকের বাচ্চারা? আবার চেঁচালো টেরিয়ার। এইবার হেরে গেলে আমার কাছে। পরক্ষণেই শোনা গেল গা জ্বালানো হাসি।
হাসতে হাসতে চলে গেল টেরিয়ার। তার হাসি মুছে যাওয়ার পরও কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলো চার কিশোর। ইয়ার্ডে কোনো শব্দ নেই। শুধু মাথার ওপরে ট্রেলারের হাতে বৃষ্টির ঝমঝমানি ছাড়া।
অবশেষে কিশোর বললো, আমাদের ধোঁকা দিতে চেয়েছে…
না, পিনটু বললো। ঠিকই বলেছে ও।
মিস্টার ডয়েলের কাছে মর্টগেজ বিক্রি করা হয়েছে, একথা কিশোরকে জানালো

শনিবারে আমাদের পয়লা পেমেন্ট দেয়া হবে, একমুহূর্ত চুপ থেকে আবার বললো নিট।
জিতেই গেলেন মিস্টার ডয়েল, আনমনে বিড়বিড় করলো কিশোর।
হার মানবো! রবিন অবাক।
কিশোর পাশা হেরে যাবে, মুসাও বিশ্বাস করতে পারছে না। কিশোর, তুমি...তুমি একথা বলছো!
ক্ষণিকের জন্যে হাসি ঝিলিক দিলো কিশোরের চোখের তারায়। দুটো শব্দ বাদ দিয়েছি। বলতে চেয়েছি মনে হয় জিতে গেলেন। একটা সুবিধে হয়েছে এতে। আমাদের থামাতে আসবে না এখন আর কেউ। সময় যেটুকু পেলাম, তার পুরো সদ্ব্যবহার করতে হবে। তবে খুব বেশি সময় নেই আমাদের হাতে।
সময়ও নেই, সূত্রও নেই,নাক কুঁচকে বললো মুসা।
অনেক আছে, কিশোর বললো। ঠিকমতো এতোদিন কাজে লাগাতে পারিনি ওগুলো। আরও একটা জিনিস পেয়েছি। পকেট থেকে একটা কাগজ বের করলো সে। রবিনের আন্দাজ ঠিক। গুহায়ই লুকিয়েছিলেন ডন পিউটো।
লুকিয়েছিলেন? তাহলে পরে কি হলো তাঁর? বন্ধুরা দেশ থেকে বেরিয়ে যেতে সাহায্য করেছিলো?
হতে পারে। তবে আমার তা মনে হয় না। ওরকম হলে কোনো না কোনো দলিলে প্রমাণ পাওয়া যেতোই। পালাতে পারেননি তিনি। পর্বতের মধ্যেই কিছু একটা ঘটেছিলো তার। কেউই হয়তো জানে না, কি হয়েছিলো। এবং আমার বিশ্বাস, ওটা জানতে পারলেই রহস্যের সমাধান করে ফেলতে পারবো।
কেউই যদি না জানে, আমরা জানবো কি করে?
জেনে নেবো নিজেরাই। কারণ আমি জানি কোথায় লুকানোর পরিকল্পনা করেছিলেন তিনি। চিঠিতেই সেকথা স্পষ্ট বলে দিয়েছেনঃ কনডর ক্যাসল। ওই পাহাড়ের কাছেই রয়েছে রহস্যের জবাব। তোমরা খুঁজতে গিয়েছিলে বটে, তবে নিশ্চয় কিছু একটা মিস করেছিলে, বুঝতে পারোনি। কাল ইস্কুল ছুটির পর আবার যাবো আরা কনডর ক্যাসলে।
বৃহস্পতিবার ইস্কুল ছুটি হলো। বৃষ্টি কিছুটা কমে এসেছে। সূত্র খুঁজতে রওনা হলো গোয়েন্দারা।
বৃষ্টিতে ভিজে কাহিল হয়ে আছে রাস্তার অবস্থা। সাইকেল চালানোই মুশকিল। কাঁচা রাস্তার ধারে মাঝে মাঝে হাউনি রয়েছে, হঠাৎ বৃষ্টি এলে বা অন্য কোনো অসুবিধেয় পড়লে পথচারীদের মাথা গোঁজার জন্যে। ওরকম একটা ছাউনিতে সাইকেল রেখে পায়ে হেঁটে এগোলো ওরা। সাথে করে ব্যাগ নিয়ে এসেছে রবিন। তাতে কিছু প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আর টর্চ আছে। ব্যাগটা সাইকেলের ক্যারিয়ার

থেকে খুলে বেল্টে ঝুলিয়ে নিলো। বাঁধের দিকে পথ ধরলো ওরা, ওদিক দিয়েই যাবে কনডর ক্যাসলে।
আরিব্বাবা, কতো পানি! চলতে চলতে বললো মুসা। আরও বৃষ্টি হলে আর হাঁটার দরকার নেই, সাঁতরেই ফিরতে পারবো।
কনডর ক্যাসলের কাছাকাছি পৌঁছে দেখলো পানিতে টইটম্বুর হয়ে আছে অ্যারোইও। ওটা ঘুরে এসে টিবিটার ওপর দিয়ে চড়তে হবে শৈলশিরায়।
টিবির নরম গা থেকে অনেক ঝোপঝাড় খসে পড়েছে বেশি খাড়া হলে চড়াই যেতো না, ঢালু বলে রক্ষা।
তারপরেও চড়তে অনেক অসুবিধে হলো। যাই হোক, কোনোমতে এসে উঠলো কনডর ক্যাসলের চুড়ায়। ওপর থেকে আজ অন্য দৃশ্য দেখতে পেলো রবিন আর মুসা, সেদিনকার সঙ্গে অনেক পার্থক্য। শুধু সেন্টার গেট দিয়েই বাঁধের পানি উপচে পড়ছে না আজ, পুরো বাঁধটাই যেন ভাসিয়ে নেয়ার মতলব করেছে, ওপর থেকে মনে হচ্ছে একটা বড়সড় জলপ্রপাত। বাঁধের নিচে পাক খেয়ে খেয়ে বয়ে যাচ্ছে পানি, প্রচুর ফেনা, কাউন্টি রোডের পাশের নালা আর খানাখন্দ ভরে দিয়ে বয়ে চলেছে সাগরের দিকে।
কিশোর এই দৃশ্য দেখতে আসেনি। সেদিকে তাকালো বটে, তবে তার মন অন্য চিন্তায় ব্যস্ত। বিড়বিড় করে বললো, কোথায় একজন মানুষ দীর্ঘদিন লুকিয়ে থাকতে পারে?
এখানে তো নিশ্চয়ই নয়, বললো মুসা। গুহা তো দূরের কথা, একটা ফাটলও নেই।
আশেপাশে কোথায় গুহা আছে, পিনটু? রবিন জিজ্ঞেস করলো।
কি জানি, মাথা চুলকালো পিনটু। আমি বলতে পারবো না। পর্বতের ওদিকে অবশ্য আছে
না, অতোদূরে নয়, মাথা নেড়ে বললো কিশোর। কাছাকাছি।
বাঁধের ভেতরটা হয়তো ফাঁপা, মুসা বললো।
আরে নাহ,মানতে পারলো না রবিন।
গোপন কোনো খাদ-টাদ থাকতে পারে, বললো কিশোর। যেখানে তাঁবু বা ঝুপড়ি তুলে থাকা যায়। বাইরে থেকে কারো চোখে পড়বে না।
ওরকম কিছুই নেই এখানে, কিশোর, পিনটু বললো। এদিকের সমস্ত পাহাড় আমি চিনি।
শ্রমিকদের বাড়িঘরের কি অবস্থা? রবিন জিজ্ঞেস করলো। নিশ্চয় অনেক কাজের মানুষ ছিলো ডন পিউটোর?
ছিলো। কিন্তু সব কাউন্টি রোডের ধারে, ভালো জায়গায়। একটাও এখন নেই।

পিনটু, জিজ্ঞাসু চোখে পিনটুর দিকে তাকালো মুসা, কাঁচা রাস্তাটা এক জায়গায় দুভাগ হয়ে গেছে দেখেছি। একটা তো এসেছে বাঁধের দিকে, আরেকটা কোথায় গেছে?
পর্বতের ভেতর দিয়ে ঢুকে আবার বেরিয়ে গিয়ে উঠেছে কাউন্টি রোডে, সিনর হেরিয়ানোর এলাকায়।
অ্যারোইওর ওপাশে দূরে একটা পথ দেখিয়ে আবার জিজ্ঞেস করলো মুসা, ওই পথটার সাথে কোনো যোগাযোগ আছে ওটার?
পথ? ভুরু কুঁচকে চোখ ছোট ছোট করে তাকালো কিশোর, মুসা যা দেখেছে দেখার জন্যে।
হ্যাঁ, হাত তুললো পিনটু, ওই ওটার কথা বলছো তো? আছে। কাঁচা রাস্তা থেকে বেরিয়ে পাহাড় ঘুরে গেছে।
সবাই দেখেছে পথটা এখন। খুব সরু একটা পায়েচলা পথ, চ্যাপারালের ঝোপের ভেতর দিয়ে দিয়ে এগিয়ে গিয়ে হারিয়ে গেছে পাহাড়ের গোড়ায় ওকে জঙ্গলে।
ছাউনি! হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো পিনটু। ভুলেই গিয়েছিলাম! পুরানো একটা ঝুপড়ি আছে। অনেক আগে এক বুড়ো বানিয়েছিলো, থাকতো ওখানে। তক্তা আর টিন দিয়ে। অনেক দিন যাই না।
ডন পিউটোর আমলে ছিলো ওটা? কিশোর জিজ্ঞেস করলো।
ছিলো। ভাইয়ার মুখে শুনেছি, আগে নাকি ওখানটায় একটা অ্যাডাব রুম ছিলো।
লুকানো, অব্যবহৃত, আর যাওয়ার পথটা শুধু কনডর ক্যাসল থেকেই দেখা যায়!
উত্তেজিত হয়ে উঠেছে গোয়েন্দাপ্রধান। বোধহয় ওটাই জায়গা!
তাড়াহুড়ো করে আবার নামতে শুরু করলো ওরা। টিবির ঢালে পিছলে পড়া ঠেকাতে পারলো না একজনও, কাদায় মাখামাখি হয়ে গেল জুতো, প্যান্টে লেগে গেল কাদা। বাঁধ পার হয়ে যেতে হবে। উপচে পড়া পানির দিকে শঙ্কিত চোখে তাকালো কিশোর। ভেঙে-টেঙে পড়বে না তো পানির চাপে?
সব সময়ই ওরকম পানি হয়, পিনটু জানালো। পড়ে তো না। টিকে আছে শত শত বছর ধরে।
তাহলে চলো,মুসাও ভয় পাচ্ছে এতো পানি দেখে।
নিরাপদেই এসে পায়েচলা সরু পথটায় উঠলো ওরা। পথের দুই পাশে চ্যাপারাল জন্মেছে ঘন হয়ে, মাঝে মাঝে খাটো ওক। এদিকটায় মানুষজন আসে না, কোনো কাজও হয় না, ফলে ইচ্ছেমতো বাড়তে পেরেছে ঝোপঝাড়। একটা পাথুরে পাহাড়ের কাঁধ পেরিয়ে পথটা গিয়ে ঢুকেছে দুটো মাঝারি আকারের পাহাড়ের মধ্যে, গিরিপথ হয়ে গেছে। মেঘলা এই ধূসর দিনে পথটা ছায়াঢাকা, প্রায় অন্ধকারই বলা চলে।

ওই যে, হাত তুলে দেখালো পিনটু।
অনেক গাছপালা আর উঁচু উঁচু ঝোপের মধ্যে, পাহাড়ের গা থেকে বেরিয়ে থাকা একটা বড় পাথরের নিচে আড়াল হয়ে আছে ঝুপড়িটা। ওটা যে আছে একথা জানা না থাকলে সহজে কারো চোখে পড়বে না। একচালা টিনের ছাউনি। মরচে পড়ে লাল হয়ে গেছে চাল। কাঠের বেড়া, তক্তার মাঝে বড় বড় ফাঁক। দরজায় ঠেলা দিলো পিনটু। খুলে মাটিতে পড়ে ধুলো ওড়ালো কপাটটা। ওপরের চ্যাপ্টা পাথরটার জন্যে বৃষ্টি পড়ে চালার ওপর। ভেতরটা খটখটে শুকনো।
একটা মাত্র, কাঁচা মেঝে। গারে খুটি ভর রেখেছে চালার। বিদ্যুৎ নেই, জানালা নেই, কোনো আসবাব নেই, শুধু এককোণে পড়ে রয়েছে মরচে পড়া একটা স্টোভ, একসময় ঘর গরম করার কাজে ব্যবহার হতো।
দুতিনটে বছর লুকিয়ে থাকা যাবে এখানে সহজেই, মুসা মন্তব্য করলো। তবে আমি দুই দিন থাকতেও রাজি না।
খুন করার জন্যে যদি সৈন্যরা তেড়ে আসতো, সেকেণ্ড, কিশোর বললো, আর তোমার সাথে থাকতো একটা দামী তলোয়ার, তাহলে তুমিও থাকতে পারতে। তবে জায়গাটা বাজে।
একেবারেই বাজে, বললো রবিন। আর কোনো জায়গাই তো নেই তলোয়ার লুকানোর।
হ্যাঁ, একমত হয়ে মাথা দোলালো পিনটু। মেঝেতে? মাটির দিকে আঙুল তুললো মুসা। পুঁতে রাখেননি তো ডন?
মাথা নাড়লো কিশোর। না। পুঁতলে মাটি খোঁড়ার আলামত বোঝা যেতোই তখন, সৈন্যদের চোখে পড়ে যাওয়ার সম্ভবনা ছিলো। ওই ঝুঁকি নিশ্চয় নেননি ডন...
পুরানো স্টোভটার দিকে চিন্তিত ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইলো সে। একটা চ্যাপ্টা পাথরের ওপর রয়েছে ওটার পায়াগুলো, পাইপটা চালা ভেদ করে উঠে গেছে। স্টোভটা সরানো যায় না?
চেষ্টা করে দেখা যাক,মুসা বললো।
জোরে ঠেলা দিয়ে দেখলো সে। ভারি জিনিস, তবে নড়লো। নিচের পাথরের সাথে লাগানো নয় পায়াগুলো।
পাইপটা খুলতে পারো নাকি দেখো তো, কিশোর বললো। চেষ্টা করে দেখলো মুসা। খাইছে! মরচে। নড়েও না।
নড়বে কি করে? আঠারোশো ছেচল্লিশ থেকেই আছে হয়তো ওই অবস্থায়। পারলে ভেঙে ফেলে।
রবিনের ব্যাগে যন্ত্রপাতি রয়েছে। ওগুলোর সাহায্যে গোড়া থেকে পাইপটা ভেঙে ফেললো মুসা। তারপর চারজনে মিলে পাথরের ওপর থেকে ভারি স্টোভটা

সরিয়ে আনলো ওর। হাঁটু গেড়ে বসে পাথরটা সরানোর চেষ্টা করলো মুসা।
কিছুক্ষণ ঠেলাঠেলি করে জোরে হাউফ করে উঠে বললো, বেজায় ভারি। একলা পারছি না।
দেয়াল থেকে একটা তক্তা খুলে নেয়া হলো। বেশ শক্ত কাঠ। পাথরের নিচে ছোট একটা গর্ত করলো মুসা। সেটাতে ঢুকিয়ে দিলো কাঠের এক মাথা। ওটাকে লিভার হিসেবে ব্যবহার করে, আর অন্য তিনজনের সহায়তায় অবশেষে নড়াতে পারলো জগদ্দল পাথরটাকে। বেরিয়ে পড়লো একটা গর্ত। গর্তের ভেতরে উঁকি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো পিনটু, কি যেন দেখা যাচ্ছে!
ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে টেনে বের করে আনলো একটুকরো দড়ি, একটা কাগজ-বয়েসের ভারে হলুদ, আর গোল করে পাকানো একটুকরো ক্যানভাস-বাইরের দিকটায় আলকাতরা মাখানো।
কাগজটার দিকে তাকিয়ে পিনটু বললো, স্প্যানিশে লেখা। এই, আমেরিকান আর্মির একটা ঘোষণাপত্র এটা, তারিখ আঠারোশো ছেচল্লিশের নয় সেপ্টেম্বর। কিছু একটা আইন জারি করা হয়েছিলো।
ক্যানভাসটার ভেতর কি? হাত বাড়িয়ে ওটা নিলো কিশোর। সাইজ তো তলোয়ারের সমানই। ভেতরে আছে নাকি? মোড়কটা খুলে ফেললো সে।
দূর, কিছু তো নেই। বড়ই নিরাশ হলো মুসা।
পিনটু, গর্তে আর কিছু আছে?
রবিন এগিয়ে গেল টর্চ হাতে। গর্তের ভেতর ফেললো। পিনটু হাত ঢুকিয়ে হাতড়ে হাতড়ে দেখতে লাগলো। না, নেই...না না, আছে! ছোট পাথরের মতো...
পাথরটা বের করে আনলো সে। সাধারণ পাথরের মতোই দেখতে। তবে মাটি লেগেও ওরকম হয়ে থাকতে পারে ভেবে প্যান্টের কাপড়ে ঘষে পরিষ্কার করতে লাগলো। ঠিকই ভেবেছে। বেরিয়ে পড়লো ঘন সবুজ উজ্জ্বল রং।
এটা...,রবিন ওরু করলো, শেষ করলো কিশোর, পান্না! নিশ্চয়ই তলোয়ারটা লুকানো ছিলো এখানে প্রথমে এখানেই লুকিয়েছিলেন ডন। পালিয়ে আসার পর সরিয়ে ফেলেছিলেন অন্য জায়গায়। নিশ্চয় তার তখন মনে হয়েছিলো এটা নিরাপদ জায়গা নয়।
ঠিকই ভেবেছেন, রবিন বললো। সহজেই তো ব্বে করে ফেললাম আমরা।
তাহলে নিজেও এখানে লুকাননি, পিনটু বললো, এটাও ঠিক।
হ্যাঁ, একমত হলো কিশোর। পেছনে তাড়া করে আসছিলো ডগলাসেরা। সময় বিশেষ পাননি। তলোয়ারটা ব্বে করে নিয়ে গিয়েই তাড়াতাড়ি লুকিয়ে ফেলেছিলেন কোথাও, নিজেও লুকিয়ে পড়েছিলেন।
এই কিশোর,হঠাৎ বলে উঠলো মুসা, কিসের আওয়াজ?

কান পাতলো সবাই। বাইরে থেকে আসছে, বেশ জোরালো, ভূমিধস নামার সময় যেমন হয়, অনেকটা এরকম।
বৃষ্টি, রবিন বললো। সব জায়গায় পড়ছে, শুধু ঝুপড়িটার ওপর ছাড়া। বেশ মজা তো।
না, বৃষ্টি না, অন্য শব্দ, মুসা বললো আবার। শুনছো?
মাথা নাড়লো কিশোর। রবিনও শুনতে পায়নি। তবে পিনটু শুনলো। কথা! ফিসফিস করে বললো সে।
ঝুপড়ি থেকে বেরিয়ে এসে ঘন ঝোপে লুকিয়ে পড়লো ওরা। একটু পরেই দেখলো গিরিপথ ধরে আসছে সেই তিনজন কাউবয়। ভারি বৃষ্টির মধ্যেও হালকা ভাবে ভেসে আসছে ওদের কথা।
এদিকেই আসতে দেখেছি, শুড়ু। চারজনকেই। এগোও।
ঝুপড়িটার পাশ দিয়ে চলে গেল লোকগুলো, দেখতে পেলো না ওটা। অদৃশ্য হয়ে গেল পাহাড়ের আড়ালে।
উঠে দাঁড়ালো কিশোর। চলো ভাগি। এসে পড়ার আগেই। আবার কনডর ক্যাসলে যাবো।
লোকগুলো যে ঘাপটি মেরেছিলো, বুঝতে পারেনি ছেলেরা। ওরা বেরোতেই পেছনে চিৎকার করে উঠলো গুড়ু, ধরো! ধরো!
খিঁচে দৌড় মারার কথা বলে দিতে হলো না চারজনের একজনকেও।
কাদায় ভরা কাঁচা রাস্তায় পৌঁছার আগে থামলো না ছেলেরা। হাঁপাতে হাঁপাতে তাকালো ডানে-বাঁয়ে। বুঝতে পারছে না এখন কোনদিকে যাওয়া দরকার।
এটা দিয়ে গেলে, মুসা বললো, কাউন্টি রোডে যাওয়ার আগেই ধরে ফেলবে।
পাহাড়ে উঠতে গেলেও দেখে ফেলবে, বললো রবিন।
বাঁধের ওপর দিয়েও আর যাওয়া যাবে না এখন, পিনটু বললো। পানির যা তোড়। ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।
প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভিজছে ওরা। কি করবে সিদ্ধান্ত নিতে পারছে।
বেরিয়ে এলো তিন কাউবয়। ঝোপঝাড় ভেঙে ছুটে এলো ছেলেদের ধরার জন্যে। সঙ্গীদেরকে চেঁচিয়ে নির্দেশ দিচ্ছে গুড়।
রাস্তার দিকে যাই। মুসা বললো।
জোরে মাথা নাড়লো কিশোর, না না, অ্যারোইও! শেষ মাথায় চলে যাবো, বাঁধের কাছাকাছি। আমরা ওদিকে গেহি এটা ভাববে না ওরা।
একটা মুহূর্ত সময় নষ্ট করলো না হেলেরা, হুড়মুড় করে এসে নামলো অ্যারোইওতে। নিচে নামতে পারলো না, ওখানে পানি, কিনার ধরে চললো।

পিচ্ছিল হয়ে আছে ঢালের মাটি, তার ওপর ঝোপঝাড়, দৌড়াতে পারলো না। তবে ঝোপ থাকায় গাহ ধরে ধরে মোটামূটি দ্রুতই এগোতে পারলো।
ওপরে রাস্তার কাদায় ভারি বুটের ছপাৎ হুপাৎ শব্দ হচ্ছে। মাটির ওপর উপুড় হয়ে পড়লো ছেল্লো, পিছলে যাতে পানিতে না গিয়ে পড়ে সেজন্যে গাছ আঁকড়ে ধরে রেখেছে। দুরুদুরু করছে বুক। ঠিক মাথার ওপরেই শোনা গেল কর্কশ কণ্ঠ, গেল কোথায় বদমাশগুলো!
এক্কেবারে ইবলিসের বাচ্চা!
চাবিটা সত্যিই পেয়েছে?
পেয়েছে। নইলে আমাদের দেখলেই পালায় কেন?
বাঁধের দিকে যায়নি তো?
গাধা নাকি? মরতে যাবে?
পাহাড়েও চড়েনি। তারমানে রাস্তা দিয়েই গেছে। এসো।
কাউন্টি রোডের দিকে ছুটলো তিন কাউবয়। চুপ করে পড়ে রইলো ছেলেরা। চ্যাপারালের ঝোপ আড়াল করে রেখেছে তাদের শরীর।
ঝুপঝুপ করে বৃষ্টি পড়ছে। উঠে বসে মাথা ঝাড়া দিলো রবিন। গেছে। বাঁচা গেল।
এখানে লুকিয়ে থাকা যাবে না, পিনটু বললো। ওঠো।
যাবোটা কোথায়? মুসার প্রশ্ন। আপাতত বাঁচলাম। রাস্তায় না পেয়ে আবার ফিরে আসবে ওরা। তখন?
বাঁধের কাছে লুকানোর একটা জায়গা খুঁজে ব্বে করতে হবে, কিশোর বললো। আর তেমন জায়গা না পেলে ঢিবি পেরিয়ে চলে যাবো। কনডর ক্যাসলের ওধারে লুকানোর জায়গা পাওয়া যাবেই।
মাথা নিচু করে, রাস্তা থেকে যাতে দেখা না যায় এমনভাবে আবার টিরি দিকে এগোলো ওরা। বাঁধের ওপর থেকে পানি পড়ার শব্দ কানে আসছে বৃষ্টির আওয়াজকে আপিয়ে।
দেখ, কিশোর বললো, ঝোলা পাথর-টাথর আছে কিনা। কিংবা কোনো গর্ত।
ঢালের গায়ে গাছ আঁকড়ে দাঁড়িয়ে চোখ বোলালো চারজনেই।
মুসা মাথা নাড়লো, নাহ্ একটা ইঁদুরের গর্তও নেই।
রাস্তার ওপারে পাথর আছে, ওগুলোর আড়ালে লুকানো যেতে পারে, বলে মাথা তুলে দেখতে গেল পিনট। পরক্ষণেই ঝট করে নামিয়ে ফেললো। ওরা আসছে!
আবার মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়লো ওরা।
দেখেনি তো তোমাকে? রবিনের কণ্ঠে শঙ্কা।
মনে হয় না।
কোনখানে আছে? কিশোর জিজ্ঞেস করলো।

আমরা যেখানে অ্যারোইওতে নেমেছি।
ঝুপড়িতে ফিরে যাচ্ছে বোধহয় আবার, আশা করলো মুসা।
না, অতোটা আশা করতে পারলো না কিশোর, ওরা এদিকেই আসবে। বাঁধের কাছে খুঁজতে। এখানেই থাকতে হবে আমাদের। দেখে ফেললে,ফেলবে, আর কিছু করার নেই।
ঝোপ আর মাটির সঙ্গে যতোটা সম্ভব গা মিশিয়ে পড়ে রইলো ওরা। বুটের শব্দ কানে আসছে। অবশেষে শোনা গেল কথা, …বাঁধের কাছে না পেলে এখানে এসে ঝোপের মধ্যে খুঁজবো।
থাকা যাবে না এখানেও। ফিসফিসিয়ে বললো কিশোর। ওরা সরলেই টিবি বেয়ে উঠতে শুরু করবো, যতোটা ওপরে ওঠা যায়। যেই ওরা এদিকে সরে আসবে ওদিকে চলে যাবো আমরা।
কিন্তু চূড়ায় উঠলেই তো দেখে ফেলবে আমাদের, মুসা বললো।
ঝুঁকি নিতেই হবে। বেশিক্ষণ থাকছি না আমরা ভোলা জায়গায়, মাত্র কয়েক সেকেণ্ড।
কিশোরে পরামর্শটা পছন্দ হলো না মুসার, কিন্তু এর চেয়ে ভালো কিছু আর রে করতে পারলো না। ভাবনারও সময় নেই। ওদের মাথার ওপর দিয়ে কাউবয়দের চলে যাওয়ার শব্দ হলো। আস্তে করে মাথা তুলে দেখলো কিশোর। টিবির আড়ালে চলে যাচ্ছে তিনজন লোক। চলো, বললো সে।
চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে অ্যারোইওর বাকি পথটুকু পেরিয়ে এলো ওরা, টিবির ঢাল বেয়ে উঠতে আরম্ভ করলো। ঝোপের কমতি নেই, সেগুলোর গড়া কিং শেকড় ধরে ধরে বেয়ে উঠছে, খাড়া ঢালে পর্বতারোহীরা যেমন করে ওঠে। দাঁড়ানো তো দূরের কথা, ঠিকমতো মাথা তোলারই সাহস করতে পারছে না। যদি চোখে পড়ে যায়। প্রতি মুহূর্তে আশা করছে এই বুঝি চেঁচিয়ে উঠলো কেউ। কিন্তু না, শোনা গেল না।
যাক তাহলে উঠলাম! অবশেষে বললো মুসা।
সোজা শিরাটার দিকে! তাগাদা দিলো কিশোর। যত তাড়াতাড়ি পারো?
তাড়াতাড়ি কি আর হয়? সব পিচ্ছিল হয়ে আছে। মাথা নামিয়ে শরীরটাকে যথাসর কজো করে চলতে লাগলো ওরা। দুইবার কিশোর আর রবিন পা পিছলালো। আরেকবার পিনটু। পড়েই যাচ্ছিলো নিচে, অনেক কষ্টে সামলালো গাছের বেরিয়ে থাকা শেকড় চেপে ধরে। তারপর ধীরে ধীরে উঠে এলো আবার আগের জায়গায়। কেবল মুসা পড়লো না। অন্য তিনজনকে সাহায্য করলো বরং। সারা শরীর কাদায় মাখামাখি হয়ে গেছে ওদের। তবে শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছতে পারলো শৈলশিরার প্রায় খাড়া পাথুরে ঢালের কাছে।

থামলো না। উঠতে শুরু করলো কনডর ক্যাসলের চূড়ায়। নাড়া লেগে ঝুরঝুর করে ঝড়ে পড়তে লাগলো আলগা ছোট পাথর।
জলপ্রপাতের গর্জনকে হাপিয়ে হঠাৎ শোনা গেল উত্তেজিত চিৎকার, ওই যে! ওখানে!
চূড়ার ওপরে!
ওরাই! ধরো, ধরো!
ঢালের ওপরে স্থির হয়ে গেল ছেলেরা। ফিরে তাকালো। রাস্তা থেকে সরে বাপ্পে ধরে চলে এসেছে তিন কাউবয়।
দেখেই ফেললো! কান্নার মতো স্বর বেরোলো পিনটুর।
এত্তো তাড়াতাড়ি! কোলাব্যাঙ ঢুকেছে যেন মুসার গলায়।
টিবির পাশ ঘুরে ততক্ষণে শৈলশিরার দিকে ছুটতে শুরু করেছে তিন কাউবয়।
কিশোর, এখন কি করা? কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করলো রবিন।
তোতলাতে লাগলো কিশোর, কি-ক্কি..
অঝোর বৃষ্টি আর প্রপাতের শব্দকে ছাপিয়ে অদ্ভুত একটা আওয়াজ যেন ভরে দিতে লাগলো বাতাসকে। ক্রমেই বাড়ছে, জোরালো হচ্ছে। বারে ওপরে কোনোখান থেকে আসছে। টিরি ওপরে অর্ধেকটা উঠে পড়ছিলো কাউবয়রা, শব্দটা শুনে থমকে গেছে ওরাও। কান পেতে শুনহে।
আরি, দেখো! চেঁচিয়ে উঠলো মুসা।
বাঁধের ওপর দিয়ে গড়িয়ে পড়া পানির উচ্চতা যেন হঠাৎ করে বেড়ে গেল দশ ফুট। তাতে ভাসছে কাঠ, ওপড়ানো ঝোপঝাড়। এমনকি আস্ত গাছও রয়েছে। প্রচণ্ড বেগে ঝাঁপিয়ে পড়লো বাঁধের নিচে। জলপ্রপাতের গর্জন একলাফে যেন বেড়ে গেল একশো গুণ। ছেলেদের পায়ের নিচে থরথর করে কেঁপে উঠলো পাহাড়টা।
থেমে গিয়েছিলো, আবার টিবি বেয়ে ছেলেদের দিকে উঠে আসতে লাগলো তিন কাউবয়। ছেলেরাও থেমে রইলো না আর, চূড়ায় উঠতে শুরু করলো আবার। কি মনে করে একবার পেছনে ফিরে তাকিয়েই অস্ফুট শব্দ করে উঠলো পিনটু। অন্য তিনজনেও ফিরে তাকালো। দুভাগ হয়ে গেছে টিবিটা। একটা অংশ দাঁড়িয়ে আছে, খসে পড়ছে আরেকটা অংশ। চেঁচামেচি, হাত-পা ছোড়াছুঁড়ি শুরু করে দিলো তিন কাউবয়। কিন্তু কিছুই করতে পারলো না। ওদেরকে নিয়েই পানিতে ভেঙে পড়লো মাটির বিশাল চাঙড়। জলপ্রপাতের মধ্যে পড়ে খাবি খেতে লাগলো কাউবয়েরা, সঁতরে বাঁচার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে। একজন একটা ভেসে যাওয়া গাছের গুড়ি চেপে ধরলো। পানি ওদেরকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

গেল ব্যাটারা! হঠাৎ বড় বেশি ক্লান্তি লাগলো রবিনের। অবশ হয়ে গেছে যেন হাত-পা।
বেশিক্ষণের জন্যে না, রবিনের মানসিক শান্তি আবার নষ্ট করলো কিশোর। বাঁধের নিচে পড়েনি ওরা, পড়েছে অ্যারোইওর ভেতরে। ভেসে চলে যাবে শেষ মাথায়। স্রোতের জোর কম ওখানে। সাঁতরে পাড়ে উঠে আবার ধরতে আসবে আমাদের।
আগে আগে উঠছে এখন মুসা। কনডর ক্যাসলের চূড়ায় উঠে নিচে তাকালো সবাই। ঢাল থেকে খসে পড়ছে মাটি আর পাথর। বেরিয়ে পড়ছে নতুন নতুন পাথর, শেকড়। মাটি খসে গিয়ে যেন ক্ষত সৃষ্টি করছে পাহাড়ের গায়ে।
যেভাবে মাটি ভাঙছে, পাহাড়টাই না ধসে পড়ে। উল্টোদিকের ঢাল বেয়ে নামার সময় কললো মুসা। এবারেও আগে আগে চলেছে সে।
বেরিয়ে থাকা কয়েকটা পাথরের ওপাশে চলে গেল মুসা।
অন্য তিনজনও এলো পেছনে পেছনে।
কিন্তু মুসা নেই। গেল কোথায়?
বাতাসে মিলিয়ে গেছে যেন মুসা।
কোথায় গেল? এদিক ওদিক তাকাচ্ছে পিনটু, চোখে অবিশ্বাস।
মুসাআ! চিৎকার করে ডাকলো রবিন।
মুসা, কোথায় তুমি? ডেকে জিজ্ঞেস করলো কিশোর।
ঢালে যতদূর চোখ যায়, চোখ বোলালো ওরা। মুসার চিহ্নও নেই। সাড়াও দিলো। কান পেতে রয়েছে তিনজনে। তারপরে শোনা গেল আওয়াজটা। কোথা থেকে আসছে বোঝা গেল না।
আমি এখানে! নিচে! আবার শোনা গেল কথা। পাহাড়ের গভীর থেকে যেন ভেসে এলো মুসার চাপা কণ্ঠ।
কোথায় তুমি? জিজ্ঞেস করলো পিনটু। বুঝতে পারছি না।
এই যে এখানে। কয়েকটা বড় বড় পাথর আছে না, যেগুলো পেরিয়ে এসেছি, ওগুলোর গোড়ায়!
আরেকটু পাশে সরলো তিনজনে। চোখে পড়লো গর্তটা। আগের বার যখন এখানে এসেছিলো, তখন ছিলো না।
মাটি খসে যাওয়ায় বেরিয়েছে। রবিন কললো।
গর্তের মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলো কিশোর, মুসা, বেরোতে পারছো না? সাহায্য লাগবে?
বেরোতে চাই না, জবাব এলো। এটা একটা গুহা। ভেতরে অনেক পাথর আছে। ইচ্ছে করলে গর্তের মুখ ভেতর থেকে বন্ধ করে দেয়া যাবে। কাউবয়েরা দেখতে

পাবে না। জলদি নেমে এসো।
পরস্পরের দিকে তাকালো তিন কিশোর।
বেশ, আসছি, জবাব দিলো কিশোর।
তাড়াতাড়ি করো, নইলে ওরা চলে আসবে। অসুবিধে নেই, ভালো জায়গা। শুকনো, খোলামেলা।
একে একে ঢুকে পড়লো তিনজনে। টর্চ বের করলো রবিন।
জানতামই না এখানে গুহা আছে! পিনটুর কণ্ঠে বিস্ময়।
টর্চের আলোয় দেখা গেল, বেশি বড় না গুহাটা। গাড়ি রাখার গ্যারেজের সমান। নিচু হাত। মেঝেতে ছড়িয়ে আছে অনেক পাথর। এখনও শুকনো রয়েছে ভেতরটা। তার মানে মুখটা যে খুলেহে বেশিক্ষণ হয়নি। নইলে যে হারে বৃষ্টি হচ্ছে এতোটা শুকনো থাকার কথা নয়।
আলোটা আরও ঘোরাও তো, কিশোর ললো।
দশ বাই পনেরো ফুট হবে গুহাটা। একপাশে পাথর জমে উঁচু হয়ে গিয়ে হাতে ঠেকেছে। গুহামুখের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালে কিশোর, বহুদিন বন্ধ হয়ে ছিলো মুখটা। হয়তো ভূমিকম্পে পাথর গড়িয়ে পড়ে…
যেভাবেই হয়েছে, হয়েছে, বাধা দিয়ে বললো মুসা, সেকথা পরেও ভাবা যাবে। এখন মুখটা বন্ধ করে দেয়া দরকার। নইলে কাউবয় ব্যাটারা এসে দেখে ফেলবে।
পাথরের অভাব নেই। চারজনে মিলে গড়িয়ে গড়িয়ে পাথর নিয়ে গিয়ে রাখতে লাগলো মুখের কাছে। দ্রুত বন্ধ করে দিলো গুহামুখ দিয়ে আসা বিকেলের ধূসর আলো। মুখ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বৃষ্টিও আর ভেতরে আসতে পারছে না। দেয়ালে আরাম করে হেলান দিয়ে বসলো ওরা, হাসি ফুটেছে মুখে।
কয়েক ঘণ্টা থাকতে হবে আমাদের। অনুমান করলো কিশোর, আমাদের খুঁজে পাবেনা লোকগুলো। চলে যাবে। তার পর বেরোবো।
কারা ওরা? রবিনের প্রশ্ন।
ডয়েলের লোক, আর কে হবে? বললো পিনটু। নইলে ভাইয়ার হ্যাটই বা চুরি করবে কেন, আর ক্যাম্পফায়ারের পাশেই বা ফেলে রাখবে কেন?
গাড়ির চাবি খুঁজছে ওরা, কিশোর কললো। ভাবছি, গাড়িটা কোথায়? ওদেরকে তো একবারও গাড়িতে দেখা যায়নি।
গাড়ি যেখানেই থাকুক, মুসা বললো, চাবিটা ওদের ভীষণ দরকার। হয়তো ওদেরকে ফাসিয়ে দিতে ওই চাবিই যথেষ্ট, সেজন্যেই ওরকম হন্যে হয়ে খুঁজছে।
হতে পারে…
কি-ক্কি-ক্কিশোর…!

রবিনের তোতলামিতে থেমে গেল কিশোর। তাকালো টর্চের আলোর দিকে। গুহার পেছন দিকে ধরে রেখেছে রবিন।
ওই… ওই পাথরটার…
চোখ! ঢোক গিললো পিনটু। দাঁতও আছে!
খাইছে! কেঁপে উঠলো মুসার কণ্ঠ। খুলি!
স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হলো মুখ। উঠে এগিয়ে গেল সেদিকে।
খুলিই। ওখান থেকে বললো সে। এই এসে, মাটি খুঁড়তে হবে।
হাড়গোড় আছে। অস্বস্তিতে ভরা মুসার কণ্ঠ। ভূমিকম্পে মাটি চাপা পড়ে মরেছিলো হয়তো!
এই, কাপড় আছে, রবিন বললো।
একটা বোতাম! তুলে নিলো পিনটু। তামার তৈরি বোতামটায় ময়লা জমে কালো হয়ে গেছে। ঘষে পরিষ্কার করলো সে। আরি, আমেরিকান আর্মির!
ভূমিকম্পে মরেনি, বুঝলে, খুলিটা দেখতে দেখতে বললো কিশোর। খুন করা হয়েছে একে। এই দেখো, গুলির ফুটো।
উত্তেজিত গলায় বলতে লাগলো গোয়েন্দাপ্রধান, মনে হচ্ছে ঈগলের বাসাটা খুঁজে পেলাম! এখানেই লুকানোর মতলব করেছিলেন ডন পিউটো, তলোয়ারটাও হয়তো এখানেই লুকিয়েছেন। কনডর ক্যাসলের ঠিক নিচে এই গুহা, সূত্রের সঙ্গে মিলে যায়। তাঁর ছেলে স্যানটিনো নিশ্চয় জানতে এই গুহার কথা।
কিশোর, পিনটু কললো, এই লোকটা কি সার্জেন্ট ডগলাসের দলের কেউ?
বোধহয়। আমার বিশ্বাস, আরও কঙ্কাল আছে এখানে।
কয়েকটা পাথর দেখিয়ে মুসা বললো, আলগা। ধসে পড়েছে। ওপাশে কিছু আছে নাকি?
মাথা ঝাঁকালো কিশোর। থাকতে পারে।
দ্রুত পাথরগুলো প্রাতে লাগলো ছেলেরা। কিন্তু যতোই সরায়, কমে না আর। একটা রালে তিনটে এসে পড়ে। তবে ধৈর্য হারালো না ওরা। সরিয়ে চললো এক এক করে। ফাঁক বাড়তে লাগলো আস্তে আস্তে।
বেরিয়ে পড়লো একটা সরু সুড়ঙ্গ। আলো হাতে আগে আগে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকলো রবিন। সোজা এগিয়েছে সুড়ঙ্গটা। কয়েক মিনিট পরে আরেকটা গুহা আবিষ্কার করলো সে, প্রথমটার চেয়ে তিন গুণ বড়।
রবিনের পেছনে ঢুকলো পিনই। উঠে দাঁড়িয়ে বললো, অনেক বড়!
প্রথমটার চেয়ে এটা উঁচুও বেশি, প্রায় দ্বিগুণ।
একেবারে ক্যাসলের নিচে, রকিন বললো।

লুকানোর চমৎকার জায়গা, বললো মুসা। সহজেই ভেতর থেকে পাথর দিয়ে মুখ বন্ধ করে দেয়া যায়। জানা না থাকলে বাইরে থেকে কেউ কিছু বুঝতেই পারবে না।
যতোদিন খুশি থাকা যাবে এখানে, মন্তব্য করলো পিনটু, যদি বাইরে থেকে নিয়মিত খবর দিয়ে যাওয়া হয়।
তবে, কিশোর বললো, আমার মনে হয় না সময়মতো মুখটা বন্ধ করতে পেরেছিলেন ডন। হাত তুলে বয়ে দেখালো সে।
আসেটা সামান্য সরালো রবিন, ভালোমতো দেখার জন্যে। আরেকটা কাল পড়ে আছে। কালচে হয়ে আসা তামার বোম পড়ে রয়েছে কয়েকটা, আর পাশেই পড়ে আছে একটা পুরানো মরচে ধরা রাইফেল।
পাথরের আড়ালে কভার নিয়েছিলো বোঝা যাচ্ছে, মুসা কললো। আরেকজন সৈন্য।
ওই, আরও একজন, কিশোর দেখালো।
উপুড় হয়ে ওহার প্রায় মাঝখানে পড়ে রয়েছে তৃতীয় কঙ্কালটা। এটার পাশেও তামার বোতাম আছে। আর আছে চামড়ার বুট, বেল্ট আর হোলস্টার। নষ্ট হয়ে এসেছে। কঙ্কালের এক হাতের আঙুলের কাছে পড়ে রয়েছে একটা মেকসিকান ওয়রস্টাইল রিভলভার।
নিশ্চয় সার্জেন্ট ডগলাস। ধীরে ধীরে মাথা নাড়লো কিশোর, পালানোর পর ওদেরকে যে আর পাওয়া যায়নি, এটাই কারণ।
কিন্তু, চারপাশে চোখ বোলাচ্ছে পিনটু, ডন কোথায়?
গুহার চারপাশে টর্চের আলো বোলালো রবিন। লুকানোর কোনো জায়গা চোখে পড়লো না, শুধু খাড়া, শূন্য দেয়াল।
এই তিনজনকে গুলি করে মেরেছে কেউ, মুসা বললো। কে মারলো? ডন পিউটো?
বোধহয়, নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটলো একবার কিশোর। কিন্তু তাই যদি করবেন, তাহলে তো সহজেই ওদেরকে কবর দিয়ে এখানে থাকতে পারতেন। কেন থাকলেন না?
হয়তো তিনি মারেননি, মুসা বললো। মারাটা কঠিনও ছিলো অবশ্য। তিনজন ট্রেইনড সৈন্যের বিরুদ্ধে একা...।
ডনই মেরেছেন! বলে উঠলো রবিন। ওই দেখো!
কোণের দিকে অন্ধকার মতো একটা জায়গায় আলো ফেলেছে রবিন। ছোট একটা গর্ত রয়েছে ওখানে দেয়ালের গোড়ায়। ভালো করে না তাকালে চোখে পড়ে না ওটা। লুকিয়ে থাকার চমৎকার জায়গা। ওখানেই দেখা গেল চতুর্থ

কঙ্কালটা। এগিয়ে গেল ছেলেরা। কঙ্কালের পোশাক সৈন্যদের চেয়ে আলাদা। পাশে পড়ে আছে একটা মেকসিকান হ্যাট, ইনডিয়ান ডিজাইন। আর আছে দুটো মরচে পড়া রাইফেল।
হ্যাটটা তুলে নিলো পিনটু। স্থানীয় ইনডিয়ানদের তৈরি। একে বলে কনচো। এজন্যেই...বুঝলে, এজন্যেই ডন পিউটোকে কোনোদিন কেউ দেখেনি... ধরে এলো তার গলা।
মাথা ঝাঁকালো কিশোর। পালিয়ে এসে কনডর ক্যাসলের এই গুহায় লুকানোর মতলব করেছিলেন ডন। পিছু নিয়েছিলো ডগলাস আর তার দুই করপোরাল। এখানে এসে ঢুকেছিলো। ওদেরকে গুলি করে মেরেছেন ডন। তবে তিনিও রেহাই পাননি ওদের গুলি থেকে। তার পর ভূমিকম্প হয়েছিলো, বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো গুহামুখ, ওদেরকে আর কেউ খুঁজে পায়নি। একেবারে গায়েব হয়ে গিয়েছিলো চার চারজন মানুষ।
কিন্তু কিশোর, রবিন প্রশ্ন তুললো, তার বন্ধুরা এখানে খুঁজতে এলো না কেন? ওরা নিশ্চয় জানতো ঈগল তার বাসা খুঁজে পেয়েছে।
এই প্রশ্নের জবাব আমরা কোনোদিনই জানতে পারবো না। হয়তো তাঁর বন্ধুরা জানতোই না যে তিনি এসেছেন, জানানোর সময়ই হয়তো পাননি। কিংবা ওরা আসার আগেই ভূমিকম্পে বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো গুহামুখ। স্যানটিনো যুদ্ধ শেষে বাড়ি ফিরে হয়তো এমন কাউকে পায়নি, যে তাকে জানাতে পারে ডগলাসের রিপোর্ট ঠিক নয়। তলোয়ারটা সাগরে পড়ে গেছে একথা নিশ্চয় বিশ্বাস করেনি সে, ভেবেছিলো, চুরি হয়ে গেছে।
কিশোওর! চেঁচিয়ে উঠলো মুসা। করটেজ সোর্ডটার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম আমরা! এখানেই হয়তো আছে!
গুহাটায় তন্ন তন্ন করে খুঁজলো ওর।
কিন্তু পাওয়া গেল না তলোয়ার।
পেছনে লোক লেগে ছিলো, কিশোর বললো, এটা জানতেন ডন। এখানে আনেননি হয়তো সেজন্যেই।
তাহলে কোথায় লুকালেন? রবিনের প্রশ্ন।
পিনটু বললো, ডন চিঠিতে কনডর ক্যাসলের কথা লিখেছিলেন। যাতে তাঁর ছেলে এসে তলোয়ারটা খোজে এখানে। ঠিক?
ঠিক, বললো কিশোর। তিনি হয়তো আশা করেছিলেন, ছেলে ফিরে আসা পর্যন্ত এখানেই লুকিয়ে থাকতে পারবেন।
কিন্তু পারলেন না। গুলি খেয়ে মরলেন। এমনও হতে পারে, গুলি খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মারা যাননি। তাহলে তলোয়ারটা এমন কোথাও রেখে যাবেন, যাতে

স্যানটিনো খুঁজে পায়...।
এবং তাহলে একটা মেসেজ রেখে যাবেন ছেলের জন্যে! বাক্যটা শেষ করে দিলো কিশোর। ঠিক বলেছো। এতোদিন পর এখন মেসেজটা নষ্ট না হয়ে গেলেই হয়।
কিন্তু আছে কোথায় মেসেজটা? ইতিমধ্যেই খুঁজতে আরম্ভ করে দিয়েছে মুসা।
জখমী মানুষ, কিশোর বললো, বেশি দূর যেতে পারার কথা নয়। গর্তটাতেই আগে দেখা যাক।
গর্তের দেয়ালে কোনো লেখা দেখা গেল না।
কঙ্কালটার কাছে, পাথরের পেছন থেকে হোট একটা জিনিস কুড়িয়ে নিলো পিনটু। ইনডিয়ানদের তৈরি মাটির একটা জগ। উল্টেপাল্টে দেখে বললো, কি যেন আছে।
জগটা হাতে নিলো কিশোর। শুকনো রঙের মতো লাগছে।
কালো রঙ? দেখার জন্যে ঝুঁকে এলো রবিন।
হুঁ, করলো শুধু মুসা।
গুহার দেয়ালে আরেকবার খোঁজা দরকার, কিশোর বললো। ধুলো লেগে আছে। পুরু হয়ে। ঢেকে থাকতে পারে লেখাটা। পকেট থেকে রুমাল বের করে সাবধানে বাড়ি দিয়ে ধুলো ঝাড়তে শুরু করলো সে।
অন্যেরাও রুমাল রে করলো।
বেশ কিছুক্ষণ পর হঠাৎ মুসা বলে উঠলো, রবিন, আলোটা ধরো তো এদিকে?
কঙ্কালের পাশে পাথরের দেয়ালে সত্যিই লেখা রয়েছে চারটে শব্দঃ হাই...ধুলো—বৃষ্টি...সাগর। কালচে রঙে লেখা।
চেয়ে রয়েছে চারজনেই। কিছু বুঝতে পারছে না।
পরের দুটো শব্দ বেশ কাছাকাছি, পিনটু বললো। লিখলেন কি দিয়ে? রক্ত?
ছাই আর ধুলোর কথা লিখেছেন কেন? মুসার প্রশ্ন। কোনো ফায়ারপ্লেসে লুকিয়েছেন?
নাকি সাগরের ধারে কোথাও? রবিন যোগ করলো।
কিন্তু এর সাথে বৃষ্টির সম্পর্ক কোথায়? ভুরু নাচালো পিনটু।
নাহ, অর্থহীন! মাথামুণ্ডু কিছুই বোঝা যায় না, মাথা নাড়লো মুসা।
কিন্তু অর্থহীন কথা কেন লিখবেন একজন মানুষ, যিনি মরতে চলেছেন?
লেখেননি, পিনটুর সঙ্গে একমত হলো কিশোর। ঘন ঘন চিমটি কাটছে নিচের ঠোঁটে। অর্থ একটা নিশ্চয়ই আছে।
অন্য কেউ লিখে থাকতে পারে, রবিন বললো। ডন পিউটোর আগেই।
আমার মনে হয় না, কিশোর কললো। ডনই লিখেছেন, ছেরে জন্যে মেসেজ। তিনি মারা যাওয়ার পর অন্য কেউ এসে লিখেছে, তা-ও হতে পারে না। তাহলে বেরিয়ে

গিয়ে চারটে লাশের কথা বলতেই সেই লোক।
এমনও হতে পারে, তখন মাথার ঠিক ছিলো না তাঁর, কি লিখতে কি লিখেছেন, রবিন বললো।
এটাও বিশ্বাস কতে ইচ্ছে করছে না…
কিশোর! হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো পিনটু। ও কিসের শব্দ?
গুহার হাতের ওপরে হচ্ছে শব্দটা।
পায়ের শব্দ! রবিন বললো। বুট পরা। কনডর ক্যাসলের ওপরে উঠেছে কেউ।
কাউবয়গুলো হবে, পিনটু বললো।
কাদায় জুতোর ছাপ পড়েছে আমাদের! শঙ্কিত হয়ে উঠলো মুসা। গুহামুখের কাছেই যদি পড়ে থাকে তাহলে দেখে ফেলবে ওরা। তাহলে আর বাঁচতে পারবো না!
এসো! আদেশ দিলো গোয়েন্দাপ্রধান।
কোথায় যেতে বলছে, প্রশ্ন করলো না কেউ। কিশোরের সাথে চললো। সরু সড়ঙ্গ দিয়ে বেরিয়ে এলো ছোট ওহাটায়। গুহামুখের দুপাশে ঘাপটি মেরে বসে অপেক্ষা করতে লাগলো। বাইরে থেকে আসছে কথা বলার মৃদু আওয়াজ।
আসবেই! মুসা বললো ফিসফিসিয়ে।
জোরালো হচ্ছে কণ্ঠস্বর। তারপর শোনা গেল গুহামুখের কাছে পায়ের আওয়াজ।
দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে সেঁটে থাকো, নির্দেশ দিলো কিশোর। পাথরগুলো ঠেলে সরিয়ে নামতে হবে ওদেরকে। ঢুকেই প্রথমে আমাদের দেখতে পাবে না, অন্ধকারে পাথর-টাথরই ভাববে দেখলেও। আর না দেখলে সরে যাবে পেছন দিকে, এই সুযোগে বেরিয়ে দেবো দৌড়।
পাথরের গায়ে বুট দিয়ে লাথি মারার আওয়াজ হলো কয়েকবার। তর্ক শুরু করে দিলো তিনটে কণ্ঠ। তার পর পাথরের গায়ে পাথর বাড়ি লাগার শব্দ হলো।
কি বলছে? জিজ্ঞেস করলো রবিন। কিছুই তো বোঝা যায় না।
আমিও বুঝতে পারছি না, মুসা বললো।
কান খাড়া করে আছে চারজনেই।
পাথর দিয়ে গুহামুখ বন্ধ করে রাখার ফলে বাইরে থেকে আওয়াজ আসছে ঠিকই, তবে ছাঁকুনিতে আঁকা হয়ে যেন, স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না কথা।
আসে না কেন এখনও? ফিসফিস করে বললো পিনটু।
গুহার অন্ধকারে বসে আছে চার কিশোর, টানটান উত্তেজনা।
সময় যেন স্থির হয়ে গেছে ওদের জন্যে।
প্রায় মিনিট পনেরো পর গুহার বাইরে বুটের শব্দ জোরালো হলো আবার। তার সরে যেতে লাগলো। মিলিয়ে গেল কণ্ঠস্বর। চলে যাচ্ছে বোধহয় লোকগুলো।

আরও পনেরো মিনিট অপেক্ষা করলো ছেলেরা। গুহামুখটা দেখেনি, পিনটু বললো।
না, দেখেনি, প্রতিধ্বনি করলো যেন রবিন।
কিন্তু, মুসার প্রশ্ন, আমাদের পায়ের ছাপ তো না দেখার কথা নয়। গুহামুখটা কেন চোখে পড়লো না ওদের?
গুহামুখের দিকে তাকিয়ে ভাবহে কিশোর। বিড়বিড় করে বললো, আমাদের কাছ থেকে বেশি দূরে ছিলো না ওরা। কথা বুঝলাম না কেন? কেন পরিষ্কার হলো না?
চলো, বেরোই, মুসা কললো। পাথর সরাতে হবে। টর্চ জ্বেলে ধরে রাখলো রবিন। পাথর সরাতে লাগলো অন্য তিনজন। একটা সরালো...দুটো...তিনটে...কিন্তু বাইরে থেকে আলো কিংবা তাজা বাতাস আসার কোনো লক্ষণ নেই।
যেকটা পাথর দিয়ে মুখ বন্ধ করেছিলো, সরিয়ে ফেললো ওরা। তার পরেও না এলো আলো, না বাতাস, না বৃষ্টির ছাঁট।
ব্যাপারটা কি? বুঝতে পারছে না পিনটু।
হামাগুড়ি দিয়ে গুহামুল্মে কাছে এগোলে মুসা। খাইছে! চিৎকার শোনা গেল তার। পাথর!
কি বলছো! পেছন থেকে চেঁচিয়ে বললো রবিন, শঙ্কিত হয়ে উঠেছে, বন্ধ করে দেয়নি তো!
ধীরে ধীরে ফিরে এলো মুসা। চোখে আতঙ্ক। না, ওরা বন্ধ করেনি। কাদার আরেকটা ধ্বস নেমেছিলো মনে হচ্ছে। বিরাট এক পাথর এসে পড়েছে গুহামুখে। সেজন্যেই ওর মুখটা দেখেনি, ওদের কথা স্পষ্ট কানে আসেনি আমাদের।
ঠিক দেখেছো তো মুসা? শান্তকণ্ঠে বললো কিশোর, হয়তো তেমন বড় নয়। চলো, দেখে আসি।
সুড়ঙ্গটা সরু, কিন্তু ঠাসাঠাসি করে জায়গা হয়ে গেল চারজনের। সবাই মিলে ঠেলা লাগালো পাথরটায়।
হাউফ করে নিঃশ্বাস ছাড়লো মুসা। বা
পরে বাপ! পা ফসকে গেল পিনটুর।
গায়ের জোরে ঠেলছে কিশোর আর রবিন।
কিন্তু এক চুল নড়লো না পাথর।
হবে না, হাল ছেড়ে দিলো রবিন। এভাবে কিছুই করতে পারবো না।
মুসাও একমত হলো তার সঙ্গে।
আবার গুহায় ফিরে এলো ওরা।
আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই, কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রাখলো কিশোর। আজ আমরা না ফিরলে কাল খোঁজাখুঁজি শুরু হবে। রিগো বলে দেবে তখন কনডর ক্যাসলের

কথা। কথা বোঝা যায়নি বটে, তবে গলার স্বর তো শুনেছি। বাইরে কেউ এলে আমরা শুনতে পাবো, আমরা চেঁচামেচি করলে বাইরে থেকে শোনা যাবে।
গুঙিয়ে উঠলো মুসা। তার মানে আজ সারাটা রাত এখানে থাকতে হবে?
আর কি করার আছে? হাসলো কিশোর। গুহাটা খারাপ না। শুকনো। বাতাস আছে। গুহার মুখে এতো বড় পাথর থাকা সত্ত্বেও বাতাস যখন আসছে, আমার মনে হয় আরও কোনো পথ আছে। ফাটল তো থাকতেই পারে।
ঠিকই বলেছো, সায় জানালো পিনটু।
ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আলো ফেলতে লাগলো রবিন। অন্য তিনজন খুঁজে দেখলো কিন্তু একটা ফাটলও কোথাও চোখে পড়লো না যেটা দিয়ে বাতাস আসতে পারে।
বায়ের দেয়ালটা দেখো, কিশোর কললো, পাথরের চেয়ে মাটি বেশি। আর ভেজা ভেজা। বেশি পুরু মনে হচ্ছে না। খুঁড়ে বেরোনো হয়তো যায়।
খুড়বো কি দিয়ে? মুসা জিজ্ঞেস করলো।
তাহলে চলো, আবার বললো কিশোর, বড় গুহাটায় ফিরে যাই। দেখি আর কোন পথ আছে কিনা।
ওটাতে তো অনেক খুঁজলাম, রবিন মনে করিয়ে দিলো। পথ থাকলে কি চোখে পড়তো না?
আরেকবার চেষ্টা করতে দোষ কি? তাছাড়া সাংকেতিক লেখাটাও আবার দেখতে চাই।
সুড়ঙ্গ পেরিয়ে আবার বড় গুহাটায় এসে ঢুকলো ওরা। ছেলেদের দিকে তাকিয়ে যেন ব্যঙ্গ করছে খুলিগুলোর শূন্য কোটর। বিকট হাসিতে বেরিয়ে পড়েছে সঁত। টর্চের আলোয় আরেকবার দেয়ালগুলো পরীক্ষা করলো ওরা। তাজা বাতাস রয়েছে ভেতরে, ঢোকার পথ নিশ্চয় আছে, অথচ সেটা বের করা গেল না।
সাহায্যের অপেক্ষায় বসে থাকা ছাড়া আর কিছু করার নেই, হতাশ ভঙ্গিতে হাত নাড়লো রবিন। কিংবা খালি হাতেই দেয়াল খোঁড়ার চেষ্টা করতে পারি।
কোনোটাই করার ইচ্ছে নেই আমার, সাফ মানা করে দিলো মুসা।
খোঁড়াটা কঠিনই, অসম্ভব শব্দটা বলতে চাইলো না কিশোর। বেরোতে না পারলে সারারাত বসে থাকা ছাড়া উপায় নেই। শুধু শুধু বসে থাকবে কেন? মেসেজটা নিয়েই মাথা ঘামাই।
তুমি ঘুমাওগে, মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো মুসা। আমার মাথাও নেই, ঘামও নেই।
তার কথায় কান দিলো না কিশোর। আরেকবার দেখা যাক লেখাগুলো।
হোট গর্তের কিনারে এসে বসে পড়লো চারজনে। স্প্যানিশ ভাষায় লেখা চারটে শব্দের দিকে তাকালো নীরবে।

বার কয়েক নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটলো কিশোর। পিনটু, ঠিকই বলেছে, চারটে শব্দের মাঝে ফাঁক একরকম নয়। তাই আর ধুলোর মাঝে ফাঁক বেশি, কিন্তু বৃষ্টি আর সাগরের মাঝে কম। প্রায় গায়ে গায়েই লেগে আছে। মাঝখানে একটা ড্যাশমতোও দেখা যাচ্ছে, হাইফেনও বলা যায়। দুটো শব্দকে এক করে বোঝাতে চেয়েছেন বোহয় ডন। তাহলে মেসেজটা পড়তে হবে এভাবেঃ হাই...ধুলো-বৃষ্টি-সাগর। মানেটা কি?

কিছু না, বলে দিলো মুসা।

সাগর আর বৃষ্টির মাঝে একটা মিল আছে, পিনটু বললো। পানি।

ঠিক, মাথা ঝাঁকালো কিশোর।

সম্পর্ক আরও আছে, রবিন বললো, যদি গোড়া থেকে ভৌগোলিক কারণ খুঁজতে যাও। সাগর থেকে বাষ্প উঠেই মেঘের সৃষ্টি হয়, সেই মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়ে আবার সাগরে নেমে আসে পানি, আবার বাস্প হয়, চলতে থাকে এভাবেই।

বেশ, কিশোর বললো, সাগর থেকে বৃষ্টির উৎপত্তি, তারপর আবার সাগরেই ফিরে যায়। এর সাথে ধুলোবালি আর হাইয়ের কি সম্পর্ক?

হাইয়ের মধ্যে ধুলোবালি থাকতে পারে, পিনটু কালো। কিংবা ধুলো থেকে হাই আসে...।

উহুঁ, সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করলে মুসা, ধুলো থেকে হাই আসতেই পারে না।

না, পারে না, ধীরে ধীরে বললো কিশোর। ভাবো, ভাবতে থাকো। কোথাও কোনো যোগাযোগ আছেই। চারটে শব্দের মধ্যেই রয়েছে সূত্র। স্যানটিনোকে কি বোঝাতে চেয়েছিলেন ডন?

কেউ জবাব দিতে পারলো না।

আবার বললো কিশোর, মাথা খাটাও। চলো যাই ছোট গুহাটায়। দেখি খোঁড়াটোড়া যায় কিনা? আশা ছাড়তে রাজি নয় গোয়েন্দাপ্রধান।

এক কাজ করতে পারি! তুড়ি বাজালো মুসা। রাইফেলগুলোকে খোঁড়ার যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারি!

বেল্টে ঝোলানো যন্ত্রপাতির ব্যাগে চাপড় দিলো রবিন। মাটি ঘোড়ার কিছু নেই এটাতে। তবে ভ্রু-ড্রাইভারটা কাজে লাগানো যায়।

হোট গুহায় ফিরে এসে বাঁয়ের দেয়ালটা পরীক্ষা করে দেখলে ওরা। ভেজা, নরম মাটি।

পুরো এক হপ্তা ধরে বৃষ্টি হচ্ছে, মুসা কললো, কাদা হয়ে গেছে মাটি। কতোটা পুরু আল্লাহুই জানে। হাসলো সে। দেখা যাক।

পুরানো রাইফেল, ক্রু-ড্রাইভার আর চ্যাপ্টা পাথর নিয়ে কাজে লেগে গেল ওরা। শুরুতে মাটি বেশ আঠালো, সাবানের মতো আটকে থাকতে চায়। সেই স্তরটা

সরানোর পর আঠা কমে গেল, ভেজা বাড়লো। মাটিতে খোঁচা দিলেই এখন পুচপুচ করে কাদা বেরোয়। আরও ফুটখানেক খোঁড়ার পর পড়লো পাথর। বড় না, খুঁড়ে ঝে করে আনলো সেটা।
দরদর করে ঘামছে চারজনেই। মাটি-কাদায় মাখামাখি হয়ে গিয়েছে শরীর আগেই, তার সঙ্গে যুক্ত হলো আরও মাটি। ক্লান্ত হয়ে আসছে ওরা, পেট মোচড় দিচ্ছে খিদেয়। শেষে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না, সটান শুয়ে পড়লো মাটিতে। তার পরেই ঘুম। ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিলো ভোর পর্যন্ত। ঘড়ি দেখে বুঝলো যে ভোর হয়েছে। ব্যাটারি ফুরিয়ে আসছে রবিনের টর্চের। আবার কাজে লাগলো ওরা। টর্চের আলো থাকতে থাকতেই যা করার করতে হবে।
সাড়ে সাতটার দিকে চেঁচিয়ে উঠলো মুসা, আলো! এই, আলো দেখা যায়
নতুন উদ্যমে সুড়ঙ্গ খোঁড়ায় ঝাঁপিয়ে পড়লো সকলে। আলো বাড়ছে...বাড়ছে, ব্যস, হয়ে গেল কাজ। সরু সুড়ঙ্গ পথে হামাগুড়ি দিয়ে একের পর এক বেরিয়ে এলো ওরা, ঝমঝম বৃষ্টির মধ্যে।
খাইছে! মুসা কললো। আওয়াজ শুনতে পাচ্ছো?
পানির গর্জন কাঁপিয়ে দিচ্ছে যেন পুরো এলাকাটাকে। নেমে এসেছে পাহাড়ী ঢল।
হাত তুলে চিৎকার করে বললো পিনটু, দেখো দেখো, অর্ধেকটা বাঁধ শেষ...
টিবিটাও গায়েব। রবিন বললো।
দেখো! অ্যারোইওর দিকে হাত তুললো কিশোর।
ওদের নিচে যে অ্যারোইওটা চলে গিয়েছিলো হাসিয়েনডা পর্যন্ত, ঢিবি ধসে পড়ায় ওটা আর অ্যারোইও নেই, এমনকি নালা বা খালও বলা যাবে না এখন, নদীই হয়ে গেছে প্রায়। প্রচণ্ড বেগে বয়ে চলেছে ঘোলাটে পানির স্রোত। একটা ক্রীক নয়, দুটো ক্রীক দিয়ে এখন সাগরের দিকে চলেছে পানি।
সেদিকে তাকিয়ে চক চক করে উঠলো কিশোরের চোখ। জোরে তুড়ি বাজিয়ে বললো, পেয়েছি! জবাব পেয়েছি!
কী, কিশোর? একসাথে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলো মুসা আর রবিন।
কথা বলতে গিয়ে থেমে গেল গোয়েন্দাপ্রধান। কাউন্টি রোডের দিকের শৈলশিরাটার দিকে হাত তুললো। মানুষ! কাউবয়গুলো না তো?
কপালের ওপর হাত তুলে এনে বৃষ্টি বাঁচিয়ে ভালোমতো তাকালো মুসা। চারজন লোক আসছে।
না না, কাউবয় না! খুশি হয়ে বললো মুসা। আমার আর রবিনের বাবা আসছে! সাথে শেরিফ আর ক্যাপ্টেন ফ্লেচার!
পিচ্ছিল ঢাল বেয়ে যতো দ্রুত সম্বদৌড়ে নামতে আরম্ভ করলো চার কিশোর।
মুসাআ! দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার আমান, তোরা ভালো আছিস?

আছি, হাসিমুখে জবাব দিলো মুসা।
রাগ করে বললেন মিস্টার মিলফোর্ড, এখানে সারা রাত কি করলে তোমরা?
আটকে গিয়েছিলাম, কি করে গুহায় আটকা পড়েছিলো জানালো রবিন। ডন পিউটো আর তিন সৈনিকের কঙ্কাল আবিষ্কার করেছে যে সেকথাও জানালো।
আরেকটা রহস্যের সমাধান তহলে করে ফেললে, হাসতে হাসতে বললেন পুলিশ-চীফ।
মা-বাবাকে যা দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছিলে না, শেরিফ বললেন। রিগে বললো তলোয়ার খুঁজতে বেরিয়েছো তোমরা। অর্ধেকটা রাত এই পাহাড়ে খোঁজাখুঁজি করছি আমরা। কিশোর, বোরিস আর রোভারকে নিয়ে খুঁজছেন তোমার চাচা। মিস্টার ডয়েলও খুঁজছেন দলবল নিয়ে, নালার ওদিকটায়। গুহায় কি করে ঢুকলে এখন খুলে বলো তো শুনি?
শুরু করতে যাচ্ছিলো মুসা, তাকে থামিয়ে দিয়ে কিশোর বললো, চলুন, হাসিয়েনডার দিকে যেতে বলছি। চাচাকে আর দুশ্চিন্তায় রেখে লাভ নেই। রেডিওতে খবর দেয়া যাবে?
ওয়াকি-টকিতে কথা বললেন শেরিফ। সার্চ পার্টিকে এসে জমায়েত হতে বললেন হাসিয়েনডার কাছে।
হাঁটতে হাঁটতে জানালো ছেলেরা, কিভাবে কাউবয়েরা তাড়া করেছিলো ওদের। কাউন্টি রোডে উঠে ব্রিজ পেরোলো, এসে পৌঁছলো হাসিয়েনডার কাছে।
ইতিমধ্যেই ওখানে বোরিস আর রোভারকে নিয়ে পৌঁছে গেছেন রাশেদ পাশা। তাঁদের পেছনে ডয়েলদের র‍্যাঞ্চ ওয়াগনটা, ওটার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন মিস্টার ডয়েল, টেরিয়ার, ম্যানেজার ডরি, আর দুজন লোক।
শেরিফের গাড়িটাও আছে। তাতে বসে আছেন ডেপুটি শেরিফ।
দৌড়ে এলেন রাশেদ পাশা। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস কলেন, কিশোর, ভালো আছিস তোরা?
আছি, চাচা।
এগিয়ে এলেন মিস্টার ডয়েল, তার সাথে এগোলো টেরি আর ডরি।
দাঁত বের করে হেসে বললো টেরি, ইহুহি, চেহারার কি ছিরি হয়েছে। একেবারে ভূত...
এই, থাম্ তো! ধমক দিলেন তার বাবা। ছেলেদের দিকে তাকিয়ে বললেন, ভালোয় ভালোয় যে ফিরে এসেছো এটাই বেশি।
কাজের কথা শুরু করলেন শেরিফ, ওই তিনজন লোক কেন তাড়া করেছিলো তোমাদের?

কারণ, ওরা রিগোকে ফাঁসানোর জন্যে ফাঁদ পেতেছিলো, জবাব দিলো মুসা। আর সম্বত হাসিয়েনডাটাও ওরাই পুড়িয়েছে।
গজগজ করতে লাগলো ডরি, আগুন রিগো লাগিয়েছে। ওরকম একটা কাণ্ডজ্ঞান ছাড়া লোক র‍্যাঞ্চ চালাবে এখানে? অসম্ব!
র‍্যাঞ্চ থাকলে তো চালাবে, হেসে উঠলো টেরি।
এই, তোকে চুপ থাকতে বলেছি না! কড়া ধমক লাগালেন মিস্টার ডয়েল। ডরি, তুমিও কথা বলবে না। কিশোরের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, রিগো যে লাগায়নি প্রমাণ করতে পারবে?
নিশ্চয় পারবো। আগুন যেদিন লেগেছিলো সেদিন বিকেল তিনটেয় তার মাথায় হ্যাট ছিলো। আমাদের সঙ্গে ছিলো তখন রকি বীচ সেন্ট্রাল ইস্কুলে। শেরিফ বলেছেন, আগুনটা লেগেছে তিনটের আগে। তাহলে ক্যাম্পফায়ারের কাছে তখন রিগোর হ্যাট পড়ে থাকে কি করে?
কিশোর থামতে রবিন যোগ করলো, শুঁট...ইয়ে, টেরিয়ার আর মিস্টার ডরিও ইস্কুলে রিগোর মাথায় হ্যাটটা দেখেছে। কারণ ওরাও তখন ওখানে ছিলো।
আমি মনে করতে পারছি না, গোমড়া মুখে বললো টেরি।
ছিলোই না মাথায়, ডরি বললো, মনে থাকবে কি?
ছিলো, জোর দিয়ে বললো কিশোর। বিকেলে যখন তার সাথে হাসিয়েনায় ফিরলাম, তখনও ছিলো মাথায়। গোলাঘরে ঢুকে একটা হুকে ঝুলিয়ে রেখেছিলো। এই সময় আগুন লাগার কথা শুনে দৌড়ে বেরোয় ঘর থেকে। গোলাঘর পুড়লো, তখন হ্যাটটা ভেতরে থাকলে পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ার কথা, অথচ পোড়েনি। এর কারণ, দাবানল নেভাতে যখন ব্যস্ত ছিলো সবাই, তখন এসে গোলাঘর থেকে হ্যাটটা তুলে নিয়ে যায় তিন কাউবয়। নিয়ে গিয়ে ক্যাম্পফায়ারের কাছে ফেলে রাখে ওটা, রিগোকে ফাঁসানোর জন্যে।
সেটা প্রমাণ করতে পারবে না, কুকুরের মতো গরগর আওয়াজ বেরোলো ডরির গলা দিয়ে। কেন রিগোকে ফাঁসাতে চাইবে ওরা?
কারণ, ওই দাবানলটাও ওরাই লাগিয়েছিলো। গোলাঘর আর হাসিয়েনডা পোড়ানোর জন্যেও ওরাই দায়ী।
প্রমাণ করতে পারবে, কিশোর? ইয়ান ফ্লেচার জিজ্ঞেস করলেন।
আর ওই কাউবয়গুলোকে পাওয়া যাবে কোথায়? জানতে চাইলেন শেরিফ।
আমার বিশ্বস, ডয়েল র‍্যাঞ্চে পাবেন।
রেগে গেলেন মিস্টার ডয়েল, কি বলছো তুমি, ছেলে! আমি এসব করিয়েছি কলতে চাও?

না, স্যার, আপনি এসব্বে কিছুই জানেন না। তবে যারা জানে, তারা, এখানেই আছে। কাউবয়ের হ্যাটটা আনতে একা যায়নি, তাই না টেরি?
টেরি? ঝট করে ছেলের দিকে তাকালেন মিস্টার ডয়েল।
ও পাগল হয়ে গেছে, বাবা, ওর কথা বিশ্বাস করো না!
পকেট থেকে চাবির রিঙটা বের করলো কিশোর। গোলাঘরে পেয়েছি। এটা খুঁজতেই এসেছিলো কাউবয়েরা, আর এটার জন্যেই আমাদেরকে তাড়া করে বেড়িয়েছে। রিগোর হ্যাটটা নেয়ার সময় চাবিটা পড়ে গিয়েছিলো। র‍্যাঞ্চ ওয়াগনের চাবি।
আমাদের ওয়াগনের? বিশ্বাস করতে পারছেন না মিস্টার ডয়েল।
আমার তো তাই বিশ্বাস। আপনার ছেলেকে জিজ্ঞেস করুন।
টেরি! কঠিন দৃষ্টিতে ছেলের দিকে তাকালেন মিস্টার ডয়েল।
আ-আমি…আমি…, তোতলাতে শুরু করলো টেরি। তারপর ডরির দিকে তাকিয়ে জ্বলে উঠলো তার চোখ। এই ম্যানেজারের বাচ্চাকে দিয়েছিলাম এটা, বাবা! ও বললো, তার কাছে যেটা ছিলো, আগুন লাগার সময় সেটা হারিয়ে ফেলেছিলো। আমাকে বলেনি…
চুপ করো! গর্জে উঠলো ডরি। তুমি জানো না কিছু, না? হ্যাটটা আনার সময় যে চাবিটা হারিয়েছি একথা ভালো করেই জানো তুমি।
সবার চোখ এখন হোঁৎকা ম্যানেজারের দিকে।
ওই গাধা তিনটে আমার দোস্ত, সব বলে দিতে লাগলো ডরি, রাগটা টেরির ওপর। আমাকে একবার বিপদ থেকে বাঁচিয়েছিলো। এবার ওরা বিপদে পড়ে এলো আমার কাছে। মিস্টার ডয়েলের এলাকায় ওদের লুকিয়ে থাকার ব্যবস্থা করলাম। আগুন জ্বালতে কতোবার মানা করেছি, তা-ও শুনলো না গাধাগুলো, জ্বাললোই। ওদের ক্যাম্পফায়ার থেকেই দাবানল লাগলো। বুঝলাম, এটা জানাজানি হয়ে গেলে আমারও বিপদ হবে, ঘাড় ধরে বের করে দেবেন আমাকে মিস্টার ডয়েল। টেরিয়ারকে বললাম সেকথা। সে-ই আমাকে বুদ্ধি দিলো রিগোকে ফাঁসিয়ে দেয়ার জন্যে। চলে গেলাম আলভারেজদের গোলাঘরে, রিগোর ব্যবহার করা একটা জিনিস খুঁজে আনার জন্যে। দেখলাম, দরজার পাশেই কে ঝোলানো রয়েছে ওর ব্যাটটা নিয়ে এলাম। পরে গিয়ে ফেলে রেখেছিলাম ক্যাম্পফায়ারের কাছে। হয়ে গিয়েছিলো কাজ, সব ভজঘট করে দিলো ওই হতচ্ছাড়া চাবিটা!
গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করলেন শেরিফ, চাবিটা তখন তুলে নিলে না কেন?
তাড়াহুড়ার মধ্যে ছিলাম তখন, ডরি বললো। খোঁজার সময়ই ছিলো না। কে কোত্থেকে দেখে ফেলে এই ভয়ে…

সময় আর থাকবে কি করে? খোঁচা দিয়ে বললো মুসা। গোলাঘর তখন নিশ্চয় পুড়তে শুরু করেছে।
হ্যাঁ, গলা বসে গেল ডরির। কাশি দিয়ে পরিষ্কার করে নিয়ে বললো, আসলে এসব পোড়ানোর কোনো ইচ্ছে আমার ছিলো না। আমি শুধু শয়তান তিনটেকে জায়গা দিয়েছিলাম। ওরা শুনে ফেললো, আলভারেজদের র‍্যাঞ্চটা আমরা চাই। তাই ইচ্ছে করেই আমাদেরকে সাহায্য করতে এলো, দাবানল লাগালো, হাসিয়েনডা আর গোলাঘর পোড়ালো। আমি যখন জানলাম, তখন দেরি হয়ে গেছে। আগুন লাগিয়ে দিয়েহে গোলাঘরে। ছুটতে ছুটতে গিয়ে ঢুকলাম, হ্যাটটা পেয়ে আর একটা মুহূর্ত দেরি না করে বেরিয়ে চলে এলাম। চাবি খোঁজার সময়ই পেলাম না।
আরেকটা কথা স্বীকার করছেন না কেন? ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললো রবিন, তলোয়ার খোঁজায় আমাদের বাধা দিয়েছেন আপনারা। আপনি আর টেরি। পিছে লেগেছেন, জানালায় আড়ি পেতেছেন, আমাদের হুমকি দিয়েছেন।
দায়িত্ব পালন করেছি শুধু, প্রতিবাদ জানালো ডরি।
দায়িত্ব আর পালন করতে হবে না তোমাকে, মিস্টার ডয়েল বললেন। যাও, জিনিসপত্র যা আছে, নিয়ে বিদেয় হও। তারপর জ্বলন্ত চোখে তাকালেন ছেলের দিকে। আর তোমার ব্যবস্থাও আমি করছি, পরে! যাও, গাড়িতে গিয়ে বসো।
আপনি যেতে বললেও আমরা ওদের যেতে দিতে পারি না, শেরিফ বললেন। ডেপুটিকে আদেশ দিলেন, অ্যারেস্ট করো।
উরি আর টেরিকে হাতকড়া পরিয়ে নিয়ে গিয়ে গাড়িতে তুললেন ডেপুটি।
দীর্ঘ একটা মুহূর্ত সেদিকে তাকিয়ে রইলেন মিস্টার ডয়েল। তারপর নীরবে গিয়ে নিজের গাড়িতে উঠলেন। শেরিফরা রওনা হওয়ার আগেই গাড়ি হাঁকিয়ে চলে গেলেন, বোধহয় উকিলের সঙ্গে দেখা করার জন্যেই।
গাড়ির দিকে যাওয়ার আগে তিন গোয়েন্দার দিকে তাকিয়ে হাসলেন ইয়ান ফ্লেচার, একজন নির্দোষ মানুষকে মুক্ত করলে তোমরা। আমি এখুনি গিয়ে রিগোকে ছাড়ার ব্যবস্থা করছি।
শেরিফ, ক্যাপ্টেন ফ্লেচার, আর ডয়েলরা চলে গেল। ঘড়ি দেখলেন রাশেদ পাশা। ইয়ার্ডের ট্রাকটা আনতে বললেন বোরিস আর রোভারকে। ছেলেদেরকে বললেন, ভূত সেজে আছিস তো একেকজন। চল, আগে গোসল করতে হবে। তারপর খাওয়া।
কিন্তু আরও কিছুক্ষণ থাকতে হবে আমাদেরকে এখানে, কিশোর কললো। অন্তত পনেরো মিনিট। তাতেই হয়ে যাবে।
আরও থাকবি? অবাক হলেন রাশেদ পাশ। কেন?
তাতে কি হয়ে যাবে, কিশোর? রবিন জিজ্ঞেস করলো।

আলভারেজদের র‍্যাঞ্চটা বাঁচাতে হবে না? কিশোর বললো, করটেজ সোর্ডটা বের করবো।
হায় হায়, ভুলেই গিয়েছিলাম! প্রায় চিৎকার করে উঠলো পিনটু। তুমি বলছিলে জবাব পেয়ে গেছে!
হ্যাঁ, পেয়েছি তো। এসো আমার সঙ্গে।
কাউন্টি রোডের দিকে এগোলো সে। সাথে চললো রবিন, মুসা, পিনটু। কৌতূহল দমাতে না পেরে রাশেদ পাশাও চললেন পেছন পেছন। বৃষ্টি থেমেছে। মেঘের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসার তাল করছে সূর্য। অ্যারোইওর ওপরের ব্রিজটায় পৌঁছে দাঁড়িয়ে গেল কিশোর। আমেরিকান লেফটেন্যান্টের জার্নালের কথা মনে আছে তোমাদের? লিখেছিলো, শৈলশিরার ওপরে তলোয়ার হাতে দেখেছে ডন পিউটোকে। ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিলেন ডন।
আছে, মুসা বললো। তবে ভুল লিখেছিলো। হাসিয়েনডার দিক থেকে আসা কোনো নালাও নেই, আর পাশে কোনো শৈলশিরাও নেই, যেটাতে ঘোড়সওয়ার দেখা যাবে।
আছে এখন, খুশি খুশি গলায় বললো কিশোর। আর আঠারোশো ছেচল্লিশ সালেও ছিলো। ওই দেখো।
অ্যারোইওটাই ক্রীক বা নালা হয়ে গেছে এখন। ওটার ওপাশে লৈশিরার মাথায় সগর্বে দাঁড়িয়ে রয়েছে যেন মুণ্ডুহীন ঘোড়ার মূর্তিটা।
আঠারোশো ছেচল্লিশ, এবং তারও আগে, বুঝিয়ে বললো কিশোর, শান্তা ইনেজ ক্রীকের নিশ্চয় দুটো শাখা ছিলো। ম্যাপে দেখেছি, কিন্তু বুঝতে পারিনি আমরা। কারণ ম্যাপে আঁকা অ্যারোইও আর ক্রীক দেখতে একই রকম। আঠারোশো ছেচল্লিশ সালে লেফটেন্যান্ট যখন এখানে এসেছিলো, অ্যারোইওটা তখন ক্রীকই ছলো। তারপর ভূমিকম্পে কিংবা ভূমিধস নেমে এটার মুখ বন্ধ হয়ে যায়, নালা বন্ধ হয়ে গিয়ে সৃষ্টি হয় অ্যারোইও। সম্ভবত ওই একই ভূমিকম্পে বন্ধ হয়ে যায় কনডর ক্যাসলের নিচের গুহামুখটাও। দিন যেতে থাকলো। এই অ্যারোইওটা যে একসময় ক্রীক ছিলো, ধীরে ধীরে লোকে ভুলেই গেল সেকথা।
লেফটেন্যান্ট তাহলে ঠিকই দেখেছিলো, রবিন বললো। উন পিউটোকে দেখেছিলো সান্তা ইনেজ ক্রীকের পাশের শৈলশিরায়।
দেখেছিলো। চলতে দেখেছিলো, তারপর নিশ্চয় হারিয়ে ফেলে। লেফটেন্যান্টের মাথা গরম ছিলো তখন, তাছাড়া সন্ধ্যার অন্ধকার। মূর্তিটার কথা জানতো না। মূর্তিটাকে যখন দেখলো, ওটাকে ডন পিউটো বলেই ভুল করলো।
ব্রিজ থেকে নেমে পাহাড় বেয়ে উঠতে শুরু করলো কিশোর। অন্যেরা সঙ্গী হলো তার। রবিন জিজ্ঞেস করলো, কিন্তু মূর্তিটাকে তো নড়তে দেখার কথা নয়।

নড়েওনি, কিশোর বললো। নড়েছেন পিউটো। ওটার কাছে দাঁড়িয়ে।
তলোয়ারের খোলসটা তখন ওটার ভেতরে লুকাচ্ছিলেন তিনি।
তাহলে কি আরও কোনো সূত্র আছে মূর্তির কাছে? মুসা জিজ্ঞেস করলো। যেটা আমাদের চোখ এড়িয়ে গেছে?
ছাই... ধলো...বৃষ্টি-সাগর, বিড়বিড় করলো গোয়েন্দাপ্রধান। ছেলের জন্যে মেসেজ রেখে গিয়েছিলেন ডন। সাগর থেকে বৃষ্টির উৎপত্তি, আবার সাগরেই ফিরে যায়। ছাই যায় কোথায়? ধূলো যায় কোথায়? স্প্যানিশ ক্যালিফোর্নিয়ানরা খুব ধার্মিক লোক ছিলো। তারা...
দ্বাই থেকে হাই! বলে উঠলো পিনটু।
আর ধুলো থেকে ধুলো! প্রতিধ্বনি করলো যেন রবিন। কবর দেয়ার সময় এই শ্লোক আওড়ায় পাদ্রীরা। এটা বোঝানোর জন্যে, যেখান থেকে আসে সেখানেই আবার ফিরে যায় সব কিছু। যেখান থেকে উৎপত্তি!
ঠিক, মাথা ঝাঁকালো কিশোর। আহত ডনের হাতে সময় ছিলো খুব কম। স্যানটিনো যেন বুঝতে পারে, এরকম একটা ম্যাসেজই তিনি লিখেছিলেন ওই অল্প সময়ে। বোঝাতে চেয়েছিলেন, তলোয়ারটা যেখান থেকে এসেছে, সেখানেই ফিরে গেছে। অর্থাৎ করটেজের কাছ থেকে এসেছে, আবার তার কাছেই গেছে।
পাহাড়ের চূড়ায় উঠে মূর্তিটার দিকে তাকালো সবাই। মুহীন ঘোড়ার পিঠে আসীন দাড়িওয়ালা গর্বিত আরোহী যেন তাকিয়ে রয়েছে আলভারেজদের জমিদারীর দিকে।
তাহলে কি মূর্তির মধ্যেই লুকানো রয়েছে তলোয়ারটা? প্রশ্ন করলেন রাশেদ পাশা।
তা কি করে হয়? মানতে চাইলো না পিনটু। খোঁজা তো আর বাদ রাখিনি আমরা। তলোয়ার লুকানোর জায়গাই নেই ভেতরে।
দোহাই তোমার, কিশোর, দুই হাত ওপরে তুলে ফেললো মুসা, মূর্তির তলায় খুঁড়তে বলো না আর! এমনিতেই যা খুঁড়েছি, আগামী একশো বছর আর ওকাজটি করার ইচ্ছে নেই।
তার কথায় হেসে ফেললো সবাই।
না, সেকেণ্ড, অভয় দিয়ে বললো কিশোর, মাটি খুঁড়তে কলবো না। দরকার নেই। মনে আছে, খোলস থেকে তলোয়ারটা বের করে ফেলায় অবাক হয়েছিলাম আমরা? খোলসটা তৈরিই হয়েছে জিনিসটা নিরাপদে রাখার জন্যে, অথচ বের করে ফেলা হয়েছে। নিশ্চয় জরুরী কারণে। কারণটা এখন আমি জানি।
জানো?
বলো।
কোথায় ওটা, কিশোর?

হাসলো গোয়েন্দাপ্রধান। সবাইকে টেনশনে রেখে আনন্দ পাচ্ছে সে। গুহার ভেতরে জগটার কথা মনে আছে, যেটাতে কালো রঙ ছিলো? মেসেজ লেখা ছাড়াও ওই শুরু দিয়ে আরও একটা কাজ করেছেন ডন। গুলি খাওয়ার আগেই। যেখান থেকে তলোয়ারটা এসেছিলো, সেখানেই ফিরিয়ে দিয়েছেন। মূর্তির ভেতরে নেই ওটা, আছে মূর্তির গায়ে।

কাঠের মূর্তির পাশে ঝুলছে কাঠের তলোয়ার। আপাত দৃষ্টিতে তাই মনে হয়। তলোয়ারটা ধরে টান দিলো কিশোর। খুলে এলে তার হাতে, একটা নখের সর্বনাশ করলো। হাত থেকে ছেড়ে দিলো ওটা। পাথরে লেগে ঠং করে উঠলো তলোয়ার। নখটা একবার দেখে পকেট থেকে ঝের কালো ছোট ছুরি। উত্তেজনায় ব্যথা ভুলে গেছে। তলোয়ারের কালো শরীর থেকে রঙ চেয়ে তুলতে লাগলো। মেঘের ফাঁক দিয়ে বেরোনো সূর্যের আলোয় ঝিকমিক করে উঠলো তলোয়ারের ধাতব শরীর। বেরিয়ে পড়লো লম্বা একসারি দামী পাথর-লাল, নীল, সবুজ রঙের, হীরাও আছে কয়েকটা।

তলোয়ারটা সূর্যের দিকে তুলে ধরলো কিশোর। ঝিক করে উঠলো কয়েকটা পাথর। গতর গলায় ঘোষণা করলো সে, এটাই করটেজ সোর্ড!

ছাই থেকে ছাই, ধুলো থেকে ধুলো! একঘেয়ে কণ্ঠে বললেন বিখ্যাত চিত্রপরিচালক ডেভিস ক্রিস্টোফার, অনেকটা মন্ত্রপাঠের মতো করে। চমৎকার একটা মেসেজ রেখে গিয়েছিলেন ডন পিউটো আলভারেজ। অসাধারণ বুদ্ধিমান লোক। আমাদের কিশোর পাশার মতোই।

তলোয়ারটা খুঁজে পাওয়ার দিন কয়েক পরে পরিচালকের অফিসে রিপোর্ট করতে এসেছে তিন গোয়েন্দা। একজন প্রহরীকে নিয়ে এসেছে সাথে করে, কারণ, কটেজ সোর্ডটা মিস্টার ক্রিস্টোফারকে দেখাতে এনেছে ওরা। বিশাল টেবিলে পড়ে আছে এখন ওটা। ঘরের আলোয় দ্যুতি ছড়াবে পাথরগুলো, ঝিকমিক করছে সোনা আর রূপার অলংকরণ। একটা পান্না দেখালো কিশোর, ওটা এখন তলোয়ারের গায়ে জায়গামতো বসানো, ঝুপড়ির গর্তে খুঁজে পেয়েছিলো যেটা।

চমৎকার জিনিস। তলোয়ারটার দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করলেন পরিচালক। তাহলে র‍্যাঞ্চটা বাচলো আলভারেজদের। কিশোরের দিকে মুখ তুললেন তিনি। কাউবয়গুলোকে ধরেছে পুলিশ?

ধরেছে, কিশোর জানালো। টেকসাসে ডাকাতির দায়ে ওদের খুঁজছিলো পুলিশ এমনিতেই। আগুন লাগিয়ে আরেকটা অপরাধ করেছে। ওদেরকে সাহায্য করার জন্যে ডরিকেও জেলে ভরে দিয়েছে পুলিশ।

আর টেরিয়ারকে?

টেরিয়ার ওদেরকে প্রাসরিভাবে সাহায্য করেনি, মুসা জানালো। তাই কিছুটা নমনীয় হয়েছেন বিচারক। কিশোর অপ্রাধীদের সংশোধন করার ইস্কুলে পাঠিয়ে দিয়েছেন। হাসলো মুসা। বেরিয়ে এসে আর শয়তানী করতে হবে না আমাদের সঙ্গে। বোরোতেই দেবে না।
বেশি লাই দিয়ে আসলে মাথায় তুলে ফেলা হয়েছিলো তাকে। সন্তান খারাপ হওয়ার জন্যে বাবা-মায়েরাই বেশি দায়ী। যাকগে, সংশোধন ইস্কুলে যখন দেয়া হয়েছে, স্বভাব-চরিত্র ভালো না করে আর ছাড়বে না। তো, করটেজ সোর্ভটার কি হবে?
দেখেই কেনার অফার দিয়ে ফেলেছেন মিস্টার ডয়েল, কিশোর বললো।
তবে দাম আসলে যা হওয়া উচিত, তার চেয়ে কম, রবিন বললো। ঠকানোর লোভ এখানেও হাড়তে পারেননি।
টাকা ধার দিতে রাজি হয়ে গেল একটা লোক্যাল ব্যাংক, কিশোর জানালো, মিস্টার ডায়েলের কাছ থেকে হেরিয়ানো পয়লা পেমেন্ট নেয়ার আগেই। মর্টগেজটা ডন হেরিয়ানোর কাছ থেকে আপাতত ব্যাংকই নিয়ে নিয়েছে।
আহারে, কি দরুদ! তিক্ত কণ্ঠে বললেন পরিচালক। আগে কোথায় ছিলো ওরা? যেই দেখালো, অত্যন্ত দামী একটা জিনিস পেয়ে গেহে আলভারেজরা, ওটা হাতিয়ে নেয়ার জন্যে উঠে-পড়ে লাগলো। তলোয়ারটা কিনে নিয়ে গিয়ে আরেকটা ব্যবসা করার জন্যে। দামী অ্যানটিক দেখলে ওরকম অনেক ব্যাংকই এগিয়ে আসে। তবে মিস্টার ডয়েলের চেয়ে নিশ্চয় বেশি দেবে?
অনেক বেশি, মুসা জানালো। কিন্তু রিগো আর পিনটু ব্যাংককে সেটা দিতে রাজি নয়। ধার যা দিয়েছে ব্যাংক সেটা ওরা সুদসহ আদায় করে দেবে। তলোয়ারটা বিক্রি করতে চায় মেকসিকান গভার্নমেন্টের কাছে, ওখানকার ন্যাশনাল মিউজিয়ম অভ হিসটোরিকে। ব্যাংক যা দিতো দাম অবশ্য তার চেয়ে কমই পাবে। তবু ওখানেই বেচবে ওরা। রিগো কাছে, মেকসিকোর ইতিহাসের সঙ্গে তলোয়ারটা জড়িত, কাজেই যেখানকার জিনিস সেখানেই যাক।
আবার হাই থেকে দুইয়ে, মৃদু হাসলেন পরিচালক। ভালো সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
টাকা যা পাবে, কিশোর বললো, তাতে ব্যাংকে ঋণ শোধ করেও অনেক বাচবে। আবার নতুন করে সিয়েনড়া বানাতে পারবে আলভারেজরা, কৃষিযন্ত্রপাতি কিনতে পারবে। হাসি ছড়িয়ে পড়লো তার মুখে। তারপরেও আরও টাকা থাকবে। এবং সেটা দিয়ে কিনে নেবে মিস্টার ডয়েলের সমস্ত র‍্যাঞ্চ।
ভুরু সামান্য কুঁচকে গেল পরিচালকের, অবাক হয়েছেন, মিস্টার ডয়েল বিক্রি করে দেবেন?

দেবেন, হেসে উঠলো মুসা, র‍্যাঞ্চ করার শখ তার মিটিয়ে দিয়েছে টেরি আর ভরি মিলে। তিনি র‍্যাঞ্চার নন। বেতন দিয়ে লোক রেখে যে ওই কাজটি করানো যায় না বুঝেছেন এতোদিনে। আরও একটা কারণ আছে। ইচ্ছে করলেই তাঁর বিরুদ্ধে এখন মামলা ঠুকে দিতে পারে আলভারেজরা, কারণ তাঁর লোকই ওদের ক্ষতি করেছে। ঝিগোকে অনুরোধ করেছেন তিনি, মামলা যাতে না করে, তাহলে খুব কম দামে তাদের কাছে র‍্যাঞ্চ বিক্রি করে দেবেন তিনি।

নিশ্চয় রাজি হয়েছে রিগো?

হয়েছে।

এটা সবচেয়ে ভালো খবর, খুব খুশি হয়েছেন পরিচালক, তাঁর হাসির পরিমাণ দেখে সেটা অনুমান করা গেল। এক কাজ করো। সময় করে একদিন পিনটুকে নিয়ে এসে আমার এখনে। এই বিজয় সেলিব্রেট করবো আমরা। মূসা, মেন্যুটা তুমিই তৈরি করো।

ঝকঝকে সাদা দাঁত সব বেরিয়ে পড়লো মুসার। নিশ্চয় করবো, স্যার।

কিশোর হাসলো না। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে পরিচালকের দিকে, আলভারেজরা র‍্যাঞ্চ ফিরে পেয়েছে, নিশ্চয় সে-খুশিতে নয়, তাই না, স্যার?

নো, মাই বয়, হাসি মুহূলো না পরিচালকের মুখ থেকে। ঠিকই, ধরেছে। আমিও ব্যবসায়ী। সেলিব্রেটটা করবো গল্পের জন্যে, নতুন একটা ভালো গল্প উপহার দিয়েছে। ছবি করবো। ভাবহি, শুটিংও করবো আলভারেজদের জায়গায়ই। অবশ্যই ভাড়া দেবো। কেমন হবে, বলো তো?

খুব ভালো হবে, স্যার, খুব ভালো! সমস্বরে বলে উঠলো তিন গোয়েন্দা।

ভলিউম ১৩ – জলকন্যা – তিন গোয়েন্দা – রকিব হাসান – সেবা প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ : ৪ আগস্ট, ১৯৯১

গেল-রে, গেল, আবার হারালো! চিৎকার করে চত্বর ধরে ছুটে এলো মহিলা। কিটুটা আবার গায়েব! মহিলার বয়েস অল্প। সুন্দরী। চোখেমুখে ভয়ের ছাপ। মিস্টার ডেজার, ওকে খুঁজে পাচ্ছি না!

বেঞ্চে বসে তিন কিশোরের সঙ্গে গল্প করছেন মিস্টার ডেজার। বিরক্ত ভঙ্গিতে হাত নাড়লেন। দুত্তোর! একটা মুহূর্তের জন্যে কি স্থির থাকতে পারে না ছেলেটা!

উঠে এগিয়ে গেল মহিলার দিকে। এতে অস্থির হচ্ছো কেন, নিনা? ডব তো সঙ্গেই রয়েছে তার। ও-ই দেখবে।

ডব যায়নি, ঘুমোচ্ছে। মুহূর্তের জন্যে চোখ সরিয়েছিলাম কিটুর ওপর থেকে, অমনি পালালো!

পরস্পরের দিকে তাকালো বেঞ্চে বসা তিন কিশোর।

আপনার ছেলে? মহিলাকে জিজ্ঞেস করলো একজন। তার মাথা ভর্তি কোকড়া চুল। সুন্দর দুই চোখে বুদ্ধির ছটা। বয়েস কতো?

পাঁচ, জবাব দিলো নিনা। একা একা গেল, কোথায় যে হারায়…

বেশি দূরে যায়নি, বাধা দিয়ে বললেন ডেজার। দেখি, ওশন ফ্রন্টের দিকটায় খুঁজে। তুমি ওদিকে যাও, আমি মেরিনার দিকে যাচ্ছি। পেয়ে যাবো।

দুজন দুদিকে খুঁজতে চলে গেল।

পাঁচ বছর, বললো তিনজনের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম বয়স্ক কিশোরটি। হালকা-পাতলা রোগা শরীর তার। কিশোর, কাণ্ডটা দেখেছো! আজব চরিত্র এখানে। পাঁচ বছরের একটা বাচ্চাকে একা ছাড়লো কিভাবে?

অজান্তে পালালে কি করবে? চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো কিশোর পাশা।

তিন বন্ধু মিলে ক্যালিফোর্নিয়ার ভেনিস শহরটা দেখতে এসেছে ওরা। শুধু দেখতে এসেছে বললে ভুল হবে, কাজও আছে এই উপকূলীয় শহরে। বাজারের পার্কিং লটে সাইকেল রেখে হেঁটে এসেছে চওড়া সৈকতের কিনারে। দেখার অনেক কিছু আছে এখানে। কারনিভল চলছে। খোলা জায়গায় দড়াবাজির খেলা চলছে। সাইকেলের খেলা থেকে শুরু করে সার্কাসের আরও নানা রকম খেলা শেখ কয়েকটা মেয়ে। বাঁশি বাজাচ্ছে স্ট্রীট মিউজিশিয়ান। তার কাছেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। এক আইসক্রীমওয়ালা। আশেপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে কয়েকজন ভাঁড়। একধারে গম্ভীর মুখে বসে লোকের ভাগ্য গণনা করছে এক জ্যোতিষ।

উৎসব চলছে ভেনিসের পথে। খেলা যেমন চলছে, তেমনি চলছে মদ আর জুয়ার আড্ডা। এক জায়গায় বসে একটা বোতল থেকেই পালা করে মদ খাচ্ছে তিন ভবঘুরে। হই চই শোনা গেল। কি ব্যাপার? একটা লোককে পুলিশে ধরেছে,

বেআইনী ড্রাগ বিক্রি করছিলো সে। আরেক দিকে বগলে একটা বাক্স নিয়ে দৌড় দিলো একটা লোক। তার পেছনে চোর! চোর! ধরো! ধরো! বলে চিৎকার করে ছুটলো আরেকজন। নিশ্চয় কোনো দোকানের মালিক।

ভেনিসের মজার উৎসব সম্পর্কে যেমন শুনেছে কিশোর, তেমনি এর বদনামও অনেক শুনেছে সে। সৈকতের কাছে পিয়ারের নিচে বাস করে অনেক না-খেতে পাওয়া মানুষ। চোর, গুণ্ডা, বদমাশের স্বর্গ হয়ে উঠেছে জায়গাটা। পাঁচ বছরের একটা বাচ্চাকে এখানে ঘুরতে দেয়া নিতান্তই বিপজ্জনক।

বন্ধুদের দিকে তাকালে কিশোর। একটা কিছু সিদ্ধান্ত নেবে সে, এই আশায়ই তার দিকে চেয়ে রয়েছে রবিন আর মুসা। নির্দেশের জন্যে অপেক্ষা করছে।

হাসি ফুটলো অবশেষে গোয়েন্দা প্রধানের মুখে। বললো, মনে হচ্ছে, আরেকটা কেস এসে গেল হাতে। চলো, আমরাও খুঁজি।

ওশন ফ্রন্ট ধরে এগোলো তিনজনে। বৃদ্ধ মিস্টার ডেজার কিংবা কিটুর মায়ের চেয়ে খোঁজার ব্যাপারে অভিজ্ঞতা তাদের অনেক বেশি, ফলে ওদের কাজটাও হলো। অনেক নিখুঁত। খোলা দরজা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখলো। তাকালো স্তূপ হয়ে থাকা ময়লার ওপাশে। খালিপায়ে সৈকতে হাঁটাহাঁটি করছে অনেক ছেলেমেয়ে, ওদের। সঙ্গে কথা বললো। ওশন ফ্রন্টে এসে পড়া সমস্ত গুলি উপগলিতে খুঁজলো। এমনকি স্পীডওয়ে আর প্যাসিফিক অ্যাভেনিউও বাদ দিলো না।

ওরকম একটা নিরালা পথেই এক বাড়ির বারান্দায় বসে থাকতে দেখা গেল ছেলেটাকে। একটা বাদামী রঙের বেড়ালের সঙ্গে গভীর আলোচনায় ব্যস্ত। আলোচনাটা চলছে একতরফা। বকবক করে যাচ্ছে ছেলেটা, আর বেড়ালটা চোখ মুদে আদির খাচ্ছে। ছেলেটার চুল আর চোখ দুইই কালো, নিনার মতো।

এগিয়ে গেল কিশোর। এই, তোমার নাম কিটু?

জবাব দিলো না ছেলেটা। ধীরে ধীরে পিছিয়ে গিয়ে দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়ালো।

তুমি এখানে, আবার বললো কিশোর। আর তোমার মা ওদিকে খুঁজে মরছে। চলো।

আরেক মুহূর্ত কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইলো ছেলেটা। তারপর হাত বাড়িয়ে দিলো, আচ্ছা।

কিটুর হাত ধরে তাকে নিয়ে চললো কিশোর। সাথে চললো রবিন আর মুসা। চত্বরে আসতেই প্রথম দেখা হলো মিস্টার ডেজারের সঙ্গে। চোখেমুখে দারুণ। উত্তেজনা আর উল্কণ্ঠার ছাপ। তাড়াহুড়ো করে এগিয়ে এসে কিটুর হাত চেপে ধরে চেঁচিয়ে উঠলেন, এই দুষ্টু ছেলে, কোথায় গিয়েছিলি! তোর মা ওদিকে পাগল হয়ে গেছে!

পাগল মা-ও এসে হাজির হলো। প্রথমে ছেলেকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলো, তারপর গেল রেগে। কাধ ধরে জোড়ে জোড়ে ঝুঁকি দিয়ে বললো, এই, কোথায় গিয়েছিলি! বল, কোথায়! না বলে আবার যদি যাস...! কি করবে কথাটা উহ্য রাখলো নিনা।
এই হুমকি মোটেও গায়ে মাখলো না কিটু। তবে তর্ক না করার মতো বুদ্ধি তার আছে। চুপ করে রইলো।
নিজেদের পরিচয়, অর্থাৎ নাম বললো তিন গোয়েন্দা। কিটুর মা-ও তার পরিচয় জানালো। পুরো নাম নিনা হারকার। ছেলেকে ফিরে পেয়ে উৎকণ্ঠা দূর হয়ে গেছে। হঠাৎ তাই হালকা হয়ে গেল মেজাজ। ছেলেদেরকে নিয়ে চলে এলো সেই চত্বরে, যেখানে খানিক আগে গল্প করছিলো তিন গোয়েন্দা। চত্বর দিয়ে ঘিরে ইংরেজী U অক্ষরের মতো করে গড়ে উঠেছে অনেকগুলো পাকা বাড়ি। ইউ-র দুই প্রান্তে বেশ কিছু দোকানপাট। বয়ের প্রথম দোকানটার দিকে এগোলো নিনা। বইয়ের দোকান ওটা, নাম রীডারস হেভেন।
ভেতরে খরচের খাতা দেখছেন বছর ষাটেকের এক বৃদ্ধ। নাম হেনরি বোরম্যান। পরিচয় করিয়ে দিলো নিনা। ভদ্রলোক তার বাবা। দুজনে মিলে বইয়ের দোকানটা চালায়।
মায়ের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে দরজার কাছে শুয়ে থাকা একটা বিশাল কুকুরের দিকে এগিয়ে গেল কিটু। ওটার নামই ডব, বুঝতে অসুবিধে হলো না গোয়েন্দাদের। ডবের ধমনীতে বইছে মিশ্র রক্ত। বাবার জাত গ্রেট ডেন, মা লাব্রাডর। কিটুকে এগোতে দেখে নড়েচড়ে উঠে বসলো, থুতনি রাখলো ছেলেটার কাঁধে।
দেখছিস কি রকম করছে! নিনা বললো। ওকে ফেলে যেতে লজ্জা করে না তোর? ও ঘুমোচ্ছিলো। কারো ঘুম ভাঙানো কি ঠিক?
বড় বড় কথা শিখেছে! আরেক দিন ওরকম করে কোথাও যাবি তো বুঝবি মজা।
দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন মিস্টার ডেজার। কাঁধ দিয়ে তাকে ঠেলে সরিয়ে ভেতরে ঢুকলো মাঝবয়েসী একজন লোক। চেহারাটা ভালোই, কিন্তু পাথরের মতো কঠিন করে রেখেছে। চোখ গরম করে কিটুর দিকে তাকিয়ে ধমক দিয়ে বললো, টুথপেস্ট দিয়ে আমার জানালায় তুমি ছবি এঁকেছো?
জবাব না দিয়ে ডবের পেছনে সরে গেল কিটু।
কিটু! ভীষণ রেগে গেল নিনা। এতো শয়তান হয়েছিস তুই।
ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেললেন বোরম্যান। তাই তো বলি, আমার টুথপেস্টের কি হলো! ৬-জলকন্যা
আবার যদি এরকম করো, পুলিশের কাছে যাবো বলে দিলাম, হ্যাঁ! হুমকি দিলো আগন্তুক।
সরি, মিস্টার ক্যাম্পার, ছেলের হয়ে মাপ চাইলো মা, আর ওরকম হবে না...

না হলেই ভালো। এতো লাই দিলে ছেলে মাথায় উঠবেই। একটু-আধটু শাসন দরকার।
তার খুদে মনিবকেই গালমন্দ করা হচ্ছে, এটা বুঝে গেল ডব। ব্যাপারটা পছন্দ হলো না তার। চাপা গরগর করে উঠলো।
এই কুত্তা, চুপ! ধমক দিয়েই বুঝলো ক্যাম্পার, ভুল করে ফেলেছে। জ্বলে। উঠেছে বিশাল কুকুরটার চোখ। দোকান থেকে দ্রুত বেরিয়ে গেল সে।
মায়ের দিকে তাকিয়ে হাসি মুছে গেল কিটুর। মা হাসছে না। এমনকি নানাও না। কুকুরটার পাশে বসে ওকে জড়িয়ে ধরলো সে।
হয়েছে, আর মুখ ওরকম করতে হবে না! খেঁকিয়ে উঠলো নিনা। দেখো না, যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না! লোক আর পাসনি, বাড়িওলার জানালায় গেছিস ছবি আঁকতে। ঘাড়টি ধরে যখন বের করে দেবে তখন বুঝবি।
চুপ করে রইলো কিটু। তারপর উঠে রওনা দিলো দোকানের পেছন দিকে। একটা টেবিলের নিচে কিছু খেলনা পড়ে আছে, সেদিকে। সঙ্গী হলো ডব।
সেদিকে তাকিয়ে আনমনে বিড়বিড় করলো নিনা, মিনিট পনেরো শান্ত থাকলে হয়। কি ছেলেরে বাবা!
কিটুকে খুঁজে বের করে দেয়ার জন্যে আরেকবার তিন গোয়েন্দাকে ধন্যবাদ দিলো নিনা। তার বাবা এক বোতল করে সোডা খেয়ে যাবার আমন্ত্রণ জানালেন। খুশি হয়েই তাতে সায় দিলো ছেলেরা। কারণ এই অঞ্চলে কাজ আছে ওদের। আমেরিকান সভ্যতার ওপর গবেষণা করতে এসেছে রবিন, ইস্কুলের ম্যাগাজিনে লিখবে। তাকে সাহায্য করছে কিশোর আর মুসা।
শহর এলাকার কথাই বেশি লিখবো, বোরম্যানকে জানালো রবিন। যেসব জায়গার পরিবর্তন খুব বেশি হচ্ছে। ভাবছি ভেনিস থেকেই শুরু করবো।
মাথা ঝাঁকালেন বোরম্যান।
আনন্দে টেবিলে থাবা মারলেন ডেজার। ঠিক জায়গায় এসেছে! কেবলই বদলাচ্ছে ভেনিস, সেই গড়ে ওঠার পর থেকেই। এতো বিভিন্ন ধরনের লোকের আনাগোনা এখানে পরিবর্তনটা হচ্ছেই সে-কারণে।
কালকে প্যারেড দেখতে আসছো তো? নিনা জিজ্ঞেস করলো।
নিশ্চয়ই, রবিন বললো। ফোর্থ অভ জুলাই প্যারেডের কথা অনেক শুনেছি। সুযোগ যখন পেলাম, না দেখে কি আর ছাড়ি।
হ্যাঁ, দেখারই মতো, বোরম্যান বললেন। এরকম প্যারেড আর কোথাও হয় না। তবে গণ্ডগোল হয় ভীষণ। যাচ্ছে তাই কাণ্ড ঘটে যায়।
চোখে জিজ্ঞাসা নিয়ে বন্ধুদের দিকে তাকালো রবিন। জানালার বাইরে তাকিয়ে রয়েছে মুসা। লাল স্কার্ট পরা এক তরুণী হেঁটে যাচ্ছে, তাকেই দেখছে গোয়েন্দা

সহকারী। তরুণীকে উদ্দেশ্য করে কি যেন বলছে এক বখাটে ছোকরা। চোখের পলকে ঝটকা দিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো মেয়েটা। সোজা গিয়ে ঠাস করে এক চড় কষিয়ে দিলো ছোকরার গালে। ব্যস, শুরু হয়ে গেল গোলমাল। দেখতে দেখতে আরও কয়েকটা ছেলে এসে দাঁড়ালো সেখানে। দল হয়ে গেল দুটো। তর্ক শুরু হলো দুই দলে। অবস্থা দেখে মুসার মনে হলো, হাতাহাতিতেও গড়াতে পারে ব্যাপারটা।
মেয়েটার নাম মিস লিয়ারি গুন, ডেজার বললেন। প্রায়ই আসে সৈকতে। এলেই একটা না একটা গোলমাল বাধায়।
খাইছে! এই রকম কাণ্ড হয় এখানে! হরহামেশাই যদি এই অবস্থা হয়, প্যারেডের সময় না জানি কি ঘটে! নাহ, প্যারেডটা না দেখলেই নয়। আবা, কাল অবশ্যই আসবো।
আমিও আসবো, ঘোষণা করলো কিশোর পাশা।

.
পরদিন সকালে সৈকতের কাছে পৌঁছতেই তীক্ষ্ণ একটা শব্দ কানে এলো।
চমকে উঠলো মুসা, গুলি নাকি?
না, বাজি, বললো কিশোর।
গুলির মতোই লাগলো। প্যারেডের হট্টগোল শুরু হয়ে গেল তাহলে।
কংক্রীটের চত্বরটা লোকে বোঝাই। নানা রকম মানুষের ভিড়। ভিড়ের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে ছোট ছেলেমেয়ের দল। অসংখ্য ছাতার নিচে গিয়ে ঠাই নিয়েছে। বুড়োরা। আইসক্রীম খাচ্ছে। ছোট ঠেলাগাড়িতে করে শিশুদের ঠেলে নিয়ে চলেছে মায়েরা। তাদের কারো কারো পায়ে পায়ে রয়েছে কুকুর-এক কিংবা একাধিক। বাজনা বাজিয়ে লোকের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করছে স্ট্রীট মিউজিশিয়ানরা। একটা ভ্যানের পেছন থেকে কাপড়ে তৈরি বিচিত্র সব জিনিস নামাচ্ছে কয়েকজন বিচিত্র পোশাক পরা মানুষ।
সঙ্গে ক্যামেরা এনেছে রবিন। একের পর এক ছবি তুলছে। লাল গাউন পরা। মিস লিয়ারি গুনকে দেখে তার ছবি তুললো। অ্যাকর্ডিয়ন বাজাচ্ছে একটা লোক। দুই কাঁধে বসে আছে উজ্জ্বল রঙের দুটো কাকাতুয়া। আর বাজনার তালে তালে নাচছে মেয়েটা।
পানির দিক থেকে ঠেলাগাড়ি ঠেলে আনছে একজন লোক। গাড়িটাতে বোঝাই বোতল আর ক্যান। তার পেছন পেছন আসছে দুটো নেড়ি কুকুর। যেখানে সেখানে। কোকাকোলা আর লেমোনেডের খালি বোতল ছুঁড়ে ফেলছে লোকে। লোকটা সেগুলো কুড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আবর্জনা ফেলার জায়গায় নিয়ে গিয়ে

ফেলে আসবে। গাড়ি থামিয়ে বোতল বা ক্যান তোলার জন্যে লোকটা থামলেই বাধ্য ছেলের মতো দাঁড়িয়ে যাচ্ছে কুকুর দুটো।
ওর নাম বরগু, ছেলেদের পেছন থেকে বলে উঠলো একটা কণ্ঠ। ফিরে তাকিয়ে দেখলো ওরা, মিস্টার ডেজার কথা বলছেন। খুব ভালো মানুষ। এরকম কমই দেখা যায়। কারো সাতেপাচে নেই, নিজের মতো থাকে। কষ্ট করে যা রোজগার করে, কুকুর দুটোর সঙ্গে ভাগাভাগি করে খায়। ভালো, সত্যি ভালো লোক, শেষের বাক্যটা মাথা নেড়ে বললেন তিনি।
বরগুকে দেখতে লাগলো ছেলেরা। গাড়িটা ঠেলে নিয়ে গিয়ে এক জায়গায় রাখলো লোকটা। তারপর সৈকতের একটা কাফের সামনে পাতা একটা বেঞ্চিতে বসলো। পকেট থেকে বের করলো একটা হারমোনিকা। তার দিকে মুখ করে কুকুর দুটো বসলো পায়ের কাছে। বাজনা শোনার আশায় খাড়া করে ফেলেছে কান।
বাজাতে আরম্ভ করলো বরগু। শুরুটা হলো খুব নিচু খাদ থেকে। মোলায়েম সুর, চড়তে লাগল ধীরে ধীরে। তারপর অবাক কাণ্ড! একটা দুটো করে ছেলে মেয়েরা আসতে লাগলো। ঘিরে বসলো তাকে।
অপরিচিত সুর। ভারি মিষ্টি। কান পেতে শুনছে তিন গোয়েন্দা। ভালো লাগছে ওদের। বাচ্চাদেরও লাগবে, এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।
মাত্র কয়েক মিনিট বাজিয়েই উঠে পড়লো বরগু। হারমোনিকা পকেটে ভরে আবার চললো তার ঠেলাগাড়ির দিকে। কুকুর দুটো চুলো তার পেছনে। নিতান্ত নিরাশ হয়েই যেন উঠে পড়ে আবার যার যার মতো চলে গেল ছেলেমেয়েরা।
সব সময়ই এরকম হয়? জিজ্ঞেস করলো কিশোর। বাচ্চারা ছুটে আসে?
সব সময়, জবাব দিলেন ডেজার। বরগুর নাম রেখেছি আমরা ভেনিসের বংশীবাদক। হ্যাঁমিলনের সেই বাঁশিওয়ালার মতোই বাঁশি বাজিয়ে বাচ্চাদের টেনে নিয়ে আসার অদ্ভুত ক্ষমতা আছে তার।
হাঁটতে শুরু করলো আবার তিন গোয়েন্দা। ওদের সঙ্গী হলেন ডেজার। প্রচুর বাজি-পটকা পোড়ানো হচ্ছে সৈকতের ধারে। চত্বরের ওপরে উড়ে এসেও ফাটছে দু-একটা। ওরা বইয়ের দোকানের কাছাকাছি হতেই ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো। কিটু। নজর সামনের চত্বরে জনতার ভিড়ের দিকে। ডবও রয়েছে তার সঙ্গে। পা বাড়ালো ছেলেটা। কুকুরটা ছায়ার মতো সেঁটে রইলো তার সঙ্গে। হাঁটার আড়ষ্টতা দেখেই বোঝা যায় অনেক বয়েস। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছে।
আবার দেখি একা একা বেরোলো ছেলেটা, মুসা বললো।
অসুবিধে নেই, ডেজার বললো। ডব রয়েছে সঙ্গে…
বাধা দিয়ে রবিন বললো, ছেলেটা এরকমই করে নাকি…কালকের মতো…

করে। একদণ্ড স্থির থাকতে পারে না। বলে বলে হদ্দ হয়ে গেছে তার মা। কিছুতেই কথা শোনাতে পারে না। দোকানে থাকতেই চায় না কিটু। বেরিয়ে যায় কুকুরটাকে নিয়ে। সারা সৈকতে ছোটাছুটি করে। খেলে বেড়ায়। তবে হারিয়ে যায় না। ডব সঙ্গে থাকলে কোনো ভয় নেই। ওর মা বলেছে, এই সেপ্টেম্বরেই ইস্কুলে ভর্তি করে দেবে। দুষ্টুমি অনেক কমবে তখন।

হ্যাঁ, মাথা ঝাঁকালো মুসা। সময়ই পাবে না দুষ্টুমি করার।

সব ব্যাপারেই যেন দ্রুত আকর্ষণ হারিয়ে ফেলে ছেলেটা। প্যারেডের কোন কিছুই তাকে ধরে রাখতে পারলো না। ভিড় থেকে সরে গিয়ে চত্বরের একধারে। একটা বাড়ির দেয়ালের গায়ে বল ছুঁড়ে খুঁড়ে খেলতে শুরু করলো। বাড়িটা অনেক পুরানো। তিনতলা। দুই পাশে নতুন গড়ে ওঠা দোকানপাটগুলো ওই প্রাচীনতার সঙ্গে কেমন যেন বেমানান।

বেশ পুরানো, রবিন বললো। ডেজারকে জিজ্ঞেস করলো, ইতিহাস টিতিহাস আছে নাকি এটার?

নিশ্চয় আছে। ওটার নাম মারমেড ইন..।

জলকন্যা! বাংলায় বিড়বিড় করলো কিশোর।

অ্যাঁ! কি বললে?

না, কিছু না।

আবার আগের কথার খেই প্রলেন ডেজার, ওটার নামেই চত্বরটার নাম রাখা হয়েছে, মারমেড কোর্ট। আগে বাড়িটা সরাইখানা ছিলো। ভেনিস সম্পর্কে লিখতে গেলে ওটার কথা অবশ্যই লিখতে হবে তোমাকে। ছবি তুলে নাও।

ছবি তুলতে লাগলো রবিন। কিশোর আর মুসা ভালো করে দেখতে লাগলো চত্বরটা, আগের দিন দেখার সুযোগ পায়নি। পশ্চিম দিকে খোলা, পুরানো হোটেলটা থেকে স্পষ্ট চোখে পড়ে সাগর। কোর্টের উত্তরে লম্বা একটা দোতলা বাড়ি, নিচতলায় দোকানপাট। এটাতেই রয়েছে রীডারস হেভেন। একটা ঘুড়ির দোকান। আছে, নাম ব্লু স্কাই। ওটার পাশে আরেকটা ছোট দোকানের নাম হ্যাপি বাইইং। জানালার কাছে শো কেসে সাজানো রয়েছে নানা রকম রঙিন পাথর, খনিজ দ্রব্য আর রুপার তৈরি নানা রকম অলঙ্কার। হোটেল আর এই দোকানটার মাঝের কোণ থেকে সিঁড়ি উঠে গেছে আরেকটা দোকানের প্রবেশপথের কাছে। ওটার নাম। মারমেড গ্যালারি, ঠিক হ্যাপি বাইইঙের ওপরে।

মিস্টার ক্যাম্পার ওটার মালিক, ডেজার জানালেন। মারমেড কোর্ট আর হোটেলটাও তারই। গ্যালারির পাশে ওই যে, বইয়ের দোকানের ওপরের অ্যাপার্টমেন্টটায় থাকেন।

চত্বরের অন্যান্য বাড়িগুলোর দিকে নজর ফেরালো এবার ওরা। চত্বরের পুরো পুব প্রান্ত জুড়ে রয়েছে মারমেড ইন। দক্ষিণে রয়েছে আরও কিছু দোতলা বাড়ি। নিচতলায় দোকান, ওপরতলায় বাসা। হোটেলের গাঁ ঘেষে রয়েছে বড় একটা কাফে, নাম ওশন ফ্রন্ট স্ন্যাকস। আর সৈকতের শেষে পানির একেবারে ধার ঘেঁষে। রয়েছে আরেকটা দোকান। উয়েয়ার সামথিং এটার নাম। সুতা, উল থেকে শুরু করে সেলাই আর বোনার যাবতীয় সরঞ্জাম পাওয়া যায় এখানে।
খোয়া বিছানো রাস্তা, ফোয়ারা, ঘাসের চাপড়া আর ফুলের টব দিয়ে সুদৃশ্য করে সাজানো হয়েছে চত্বরটা। কাফের সামনে সিমেন্টে বাঁধানো এক বিশাল বেদির মতো উঁচু জায়গা, ছোটখাটো চত্বরই বলা চলে ওটাকে। তাতে চেয়ার-টেবিল সাজানো। শুকনো, রোগা, কালো চুলওয়ালা একজন মানুষ ঘুরে ঘুরে টেবিল থেকে এঁটো বাসন-পেয়ালাগুলো তুলে নিয়ে রাখছে একটা ট্রেতে। দেখে মনে হয়, বহুদিন ঘুম কিংবা গোসল কপালে জোটেনি তার। ওখানেই দেখা গেল কিটুকে। বেদির ওপর উঠে কিনারে গিয়ে লাফ দিয়ে নিচে পড়ছে। আবার উঠছে, আবার পড়ছে। কাছে বসে খুদে বন্ধুর খেলা দেখছে ডব, আর নীরব ভাষায় বাহবা দিচ্ছে যেন।
এই ছেলে! হঠাৎ ধমক দিয়ে বললো রোগাটে লোকটা, অনেক হয়েছে! থামো এবার!
মন খারাপ হয়ে গেল কিটুর। বেদি থেকে নেমে বইয়ের দোকানের দিকে রওনা। হলো।
অতোটুকুন একটা ছেলের সঙ্গে ওরকম ব্যবহার করলো! লোকটার আচরণ ভালো লাগেনি মুসার। কি এমন ক্ষতি করে দিচ্ছিলো?
ভদ্রতা এখনও শেখেনি, ডেজার বললেন। ওর নাম রাগবি ডিগার। লোকটোক না পেয়ে শেষে ওকেই রেখেছে হেনরি আর শেলি লিসটার। কাফেটা ওদেরই।
ওই বাড়িটাও কি মিস্টার ক্যাম্পারের? রবিন জানতে চাইলো।
হ্যাঁ। দেখছো না দুপাশের বাড়িগুলো নতুন। শুধু মাঝের সরাইখানাটা। পুরানো। উনিশশো বিশ সালে যখন এখানে সবে বসতি শুরু হয়েছিলো তখনকার তৈরি। শহরটার নাম যে ভেনিস রাখা হয়েছে তার কারণও আছে। ইটালির ভেনিসের মতোই এখানেও রয়েছে প্রচুর খাল। আর এগুলো দেখতেই আগে অনেক লোক আসতো এখানে। ছুটির দিনে দলে দলে আসতো হলিউড থেকে। মারমেড ইনে উঠতো তারা, খাল দেখতো, সাগরে সাঁতার কাটতো। তারপর ধীরে ধীরে এখানকার আকর্ষণ কমে গেল লোকের কাছে। পয়সাওয়ালারা চলে যেতে লাগলো মালিবুতে। শেষে লোকজন আসা প্রায় বন্ধই হয়ে গেল একসময়। লালবাতি জ্বললো সরাইখানাটার। জায়গাটা তখন ব্রড ক্যাম্পার কিনে নিয়ে

দুপাশে নতুন বাড়ি তুললো। আমরা ভেবেছিলাম পুরানো বাড়িটারও সংস্কার করবে। কিন্তু কিছুই করলো না। হাতই দিলো না ওটাতে।
ব্রড ক্যাম্পার! হঠাৎ তুড়ি বাজালো কিশোর। চিনেছি! কাল দেখেই চেনা। চেনা লেগেছিলো, মনে করতে পারছিলাম না। এখন মনে পড়েছে। অভিনেতা।
কই, নামও তো শুনিনি কখনও, মুসা বললো।
হ্যাঁ, অভিনেতাই ছিলো ক্যাম্পার, কিশোরের কথায় সায় জানিয়ে বললেন ডেজার। অনেকদিন হলো অভিনয় ছেড়ে দিয়েছে, তোমাদের জন্মেরও আগে থেকে। কিশোর, তুমি চিনলে কি করে? টেলিভিশনে দেখেছো?
সিনেমার পোকা ও, হেসে বললো রবিন। হলিউডের ছোট থিয়েটারগুলোতে। পুরানো ছবি দেখতে যায় মাঝে মাঝেই।
মুচকি হাসলো মুসা। ও নিজেও অভিনয় করেছে এক সময়। মোটুরাম।
চোখ কপালে উঠলো ডেজারের। মাই গুডনেস! তুমিই মোটুরাম! ভালো, ভালো, খুব ভালো! ইউ আর আ জিনিয়াস!
রক্ত জমলো কিশোরের মুখে। অতীতের এই নামটা শুনতে একটুও ভালো লাগে না তার। টিভি সিরিয়াল পাগল সংঘ-তে ওই নামে অভিনয় করেছিলো, এই স্মৃতি মনে পড়লেই তেতো হয়ে যায় মন। তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্যে। বললো, গ্যালারিটা তাহলে ব্রড ক্যাম্পারই চালায়?
হ্যাঁ। ছবি, চীনামাটি আর রুপার তৈরি নানা রকম জিনিস, এসব বিক্রি করে।
কাফে আর উয়েয়ার সামথিঙের ওপরে একটা ব্যালকনি দেখালেন ডেজার। দুটো অ্যাপার্টমেন্ট আছে ওখানে। একটাতে আমি থাকি। আর ওই যে সাগরের দিকে মুখ করা, ওটাতে থাকে মিস জেলড এমিনার। খুব ভালো মহিলা।
মিস্টার ডেজারের পড়শীর বয়েস সত্তর। ব্যালকনি থেকে সিঁড়ির রেলিং বেয়ে। আস্তে আস্তে নেমে আসতে লাগলেন। পরনের গাউনটা বর্তমান ফ্যাশনের তুলনায় অনেক বেশি ঢোলা। ঝুলও বেশি। হ্যাঁটের চারপাশে বসানো কাপড়ের তৈরি লাল গোলাপ।
গুড মরনিং মিস এমিনার, ডেজার বললেন। আসুন। এরা আমার ইয়াং ফ্রেণ্ড। একে একে নাম বলে বলে পরিচয় করিয়ে দিলেন তিনি।
কিশোর পাশা! উচ্চারণটা ঠিকমতো করতে পারলেন না মহিলা। চমৎকার। নাম তো! ওরকম শুনিনি।
ও বাংলাদেশী। বুঝিয়ে বললেন ডেজার, একটা কাজে এসেছে এখানে। রিসার্চ ওঅর্ক। ভেনিস সম্পর্কে লিখবে ইস্কুলের ম্যাগাজিনে।
ভেনিস? নাকি শুধু মারমেড কোর্ট?
অবাক হলো রবিন। মারমেড কোর্টেই এতো কিছু জানার আছে নাকি?

অনেক, অনেক, মিস এমিনার বললেন। এই মারমেড ইন থেকেই নিরমা। হল্যাণ্ড নিখোঁজ হয়েছিলো।
শূন্য দৃষ্টিতে তাকালো রবিন আর মুসা।
অনেক দিন আগের কথা, তাই না? ডেজারের দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটা করলেন মিস এমিনার। জবাবের অপেক্ষা না করেই বললেন, তখন ভেনিসের খুব জমজমাট অবস্থা। এখানে প্রায়ই থাকার জন্যে আসতো নিরমা। এক রোববারে সকালে উঠে সাঁতার কাটতে বেরিয়েছিলো। তারপর থেকে গায়েব, আর দেখা যায়নি।
ভুরু কোঁচকালো কিশোর। গল্পটা আমিও শুনেছি।
তা তো শুনবেই। হলিউডের অনেকেই জানে এই গল্প। নিরমার লাশ পাওয়া যায়নি। ফলে রঙ চড়িয়ে নানা গল্প বলতে লাগলো লোকে। কেউ বললো ভাসতে ভাসতে উপকূলের দিকে চলে গিয়েছিল ও। অ্যারিজোনার ফিনিক্সে গিয়ে উঠে ছিলো। তারপর থেকে বাস করছে ওখানকার এক পোলট্রি ফার্মে। কেউ বা বললো সাগর থেকে উঠে লুকিয়ে লুকিয়ে এসে আবার মারডেম ইনে ঢুকেছিলো নিরমা। একটা ঘরে আটকে রেখেছিলো নিজেকে। কারণ হঠাৎ জানতে পেরেছিলো, এক ভয়ঙ্কর রোগে আক্রান্ত হয়েছে সে। যে রোগের কথা জানলে আঁতকে উঠবে লোকে। মানুষের সামনে বেরিয়ে তাদের ঘৃণার পাত্র হতে চায়নি।
মিস এমিনার থামতেই ডেজার বললেন, লোকে বলে হোটেলে নাকি ভূতের উপদ্রব আছে। আর ভূতটা হলো নিরমা হল্যাণ্ডের। কথাটা আমিও বিশ্বাস করি।
দুর, কিসের ভূতটুত! হাত নেড়ে উড়িয়ে দিলেন যেন মিস এমিনার।
কিছু একটা আছেই! জোর দিয়ে বললেন ডেজার। রাতে জানালায় আলো দেখেছি। কাউকে ঢুকতেও দেখা যায় না, বেরোতেও না। তারমানে ভেতরেই থাকে কেউ। ব্রড ক্যাম্পার হয়তো জানে ব্যাপারটা। সে জন্যেই তেমনি রেখে দিয়েছে হোটেলটা। মেরামত করে ঠিকঠাক কছে না।
কেন, ভূতের ভয়ে? জিজ্ঞেস করলো রবিন।
না, বিরক্তি দেখা দিলো মিস এমিনারের চোখে। হয়তো পাবলিসিটি চাইছে। যাও না, গিয়ে ওকেই জিজ্ঞেস করো না। গ্যালারিতে আছে।
ক্যাম্পারের রাগ দেখেছে রবিন। আমতা আমতা করে বললো, যাবো এখন?... তিনি হয়তো এখন ব্যস্ত।
কথা বলার সময় পাবে না, এতোখানি ব্যস্ত সে কোনো কালেই থাকে না, হঠাৎ রেগে গেলেন মিস এমিনার। লোকটাকে যে দুচোখে দেখতে পারেন না, বোঝা গেল। নিজের ঢাকঢোল পেটানোর সুযোগ পেলে আর কিছুই চায় না। গিয়ে খালি বলে দেখো না, ইস্কুলের ম্যাগাজিনে তার নাম ছাপবে। লাফিয়ে উঠবে। সাক্ষাৎকার দেয়ার জন্যে।

ক্যাফের দিকে এগোলেন মিস এমিনার।
ডেজার হাসলেন। প্যারেড শুরু হতে দেরি আছে এখনও। কথা বলতে ইচ্ছে করলে যেতে পারো।
কোর্টের উত্তরে সিঁড়ির দিকে এগোলো ছেলেরা। একবার দ্বিধা করে লম্বা একটা দম নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে আরম্ভ করলো রবিন। বদমেজাজী লোকটার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছেও করছে, আবার সাহসও পাচ্ছে না। সমস্যাই বটে!

.

মারমেড গ্যালারির উঁচু ছাত, সাদা দেয়াল। ছেলেরা ঢুকতেই কোথাও একটা ঘণ্টা বাজলো। চারপাশে তাকালো ওরা। উজ্জ্বল রঙের পর্দা। আবলুস আর রোজউড কাঠ কুঁদে তৈরি নানারকম চমৎকার ভাস্কর্য রয়েছে। আর আছে দেয়ালে ঝোলানো ছবি এবং কাঁচের সুদৃশ্য বাক্সে রাখা চীনামাটির তৈরি নানারকম সুন্দর সুন্দর জিনিস। ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা হয়েছে রুপা কিংবা রঙিন কাঁচে তৈরি অনেক ধরনের ফুলদানী।
দরজার পাশে বিরাট জানালাটার কাছে দাঁড়িয়ে আছে চীনামাটির তৈরি একটা তরুণী জলকন্যার মূর্তি। ফুট দুয়েক লম্বা। অর্ধেক-মানুষ-অর্ধেক-মাছ ওই কল্পিত জীবটি হাসছে। বেশ একটা খেলা খেলা ভাব। মাছের লেজের ওপর ভর রেখে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দুহাতে ধরে রেখেছে একটা সাগরের ঝিনুক।
কি চাই? তপ্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো ব্রড ক্যাম্পার। কোমর সমান উঁচু একটা। কাউন্টারের ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে। ছোট একটা ভাড়ার ঘরমতো করা হয়েছে ওখানটায়। একটা সিংক আছে, ক্যাবিনেট আছে। ব্রাশ আর ঝাড়ু রাখার আলমারিটা রাখা হয়েছে ঘরের ডান কোণ ঘেঁষে।
আবার দ্বিধা করলো রবিন, একবার ভাবলো বেরিয়েই যায়। লোকটার গোমড়া মুখ দেখেই বুকের মধ্যে কেমন করছে তার।
কিন্তু কিশোর এগিয়ে গেল ভারিক্কি চালে। পরিচয় দিলো, আমি কিশোর পাশা। কাল দেখা হয়েছিলো আমাদের। কিটুদের বইয়ের দোকানে আপনার কথা অনেক শুনেছি, তাই দেখা করতে এলাম।
তার শেষ কথাটায় অনেকখানি নরম হলো ক্যাম্পার। সেটা বুঝতে পেরে ভরসা পেলো কিশোর। রবিনকে দেখিয়ে বললো, আমার বন্ধু রবিন মিলফোর্ড। ইস্কুলের ম্যাগাজিনে একটা আর্টিকেল লিখবে। তথ্য দরকার। আমরা শুনলাম, ভেনিসের একজন বিশিষ্ট লোক আপনি।
অ্যাঁ! হ্যাঁ, তা ঠিক, দেয়ালের ধারে রাখা কয়েকটা চেয়ার দেখালো ক্যাম্পার। তা বসো না তোমরা, দাঁড়িয়ে কেন? একেবারে বদলে গেছে। নিজেও একটা চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে, খুব সতর্কভাবে শব্দ চয়ন করে ভেনিস সম্পর্কে বলতে শুরু

করলো, বহুদিন থেকেই মারমেড কোর্টের ব্যাপারে ইনটারেস্টেড ছিলাম আমি। ভেনিসে সাঁতার কাটতে আসতাম। সাইকেল চালানোর রাস্তাও তখন ছিলো না এখানে। সৈকতের ধারে ছোট ছোট কয়েকটা বীচ হাউস ছিলো, প্রায় ধসে গিয়েছিলো ওগুলো। খালের পাড় আগাছায় ভর্তি।
এই সময় একদিন শুনলাম মারমেড ইন বিক্রি হবে। খোঁজ নিয়ে জানলাম, দাম। খুব বেশি না, আমার সামর্থ্যের মধ্যেই। সামনের জায়গাটা সহ কিনে ফেললাম হোটেলটা। ছোটবেলায় নিরমা হল্যাণ্ডের ভক্ত ছিলাম আমি। হোটেলটা কিনে খুব ভালো লাগলো। মনে মনে গর্ব হতে লাগলো-আমার প্রিয় অভিনেত্রী যেখানে তার শেষ রাতটা কাটিয়েছেন, সেটার মালিক হতে পেরেছি আমি।
এক এক করে তিন কিশোরের মুখের দিকে তাকালো ক্যাম্পার। নিরমা হল্যাণ্ডের কথা নিশ্চয় জানো?
জানি, মাথা ঝাঁকালো রবিন।
জায়গাটা যখন কিনেছিলাম, ক্যাম্পার বললো, শুধু সরাইখানা আর সামনে কাঁটাতারের বেড়া দেয়া একটা চত্বর ছাড়া আর কিছু ছিলো না এখানে। দুপাশের নতুন বিল্ডিং দুটো আমি বানিয়েছি। সামনের জায়গাটা আমি সাজিয়েছি। থাকবোই যখন ঠিক করেছি, একটু গোছগাছ করে না নিলে কি চলে। আর করেছি বলেই তো। আবার লোকজন আসতে আরম্ভ করেছে। অনেক গণ্যমান্য লোক আছে তাদের মধ্যে।
নিজের বক্তৃতায় নিজেই সন্তুষ্ট হয়ে হাসলো ক্যাম্পার। দেখে নিও, একদিন এই ভেনিস একটা শহরের মতো শহর হবে। সবার মুখে মুখে ফিরবে এর নাম। পতিত জায়গাগুলো সব ঠিকঠাক হবে। গড়ে উঠবে নতুন নতুন বড়িঘর। দাম অনেক বেড়ে যাবে এই মারমেড কোর্টের।
ক্যাম্পার থামতেই কিশোর বলে উঠলো, সরাইখানাটার কি হবে? মেরামত করবেন?
এখনো মনস্থির করিনি। একেবারেই নষ্ট হয়ে গেছে। হয়তো পুরোটাই ভেঙে। ফেলে নতুন করে গড়তে হবে। কিন্তু এটা একটা ইতিহাস, ভাঙতে মন চায় না।
খোলা দরজার দিকে তাকালো ক্যাম্পার। প্যারেড আসছে। ছেলেদের দিকে ফিরলো আবার। তা আর কিছু জানার আছে?
ইঙ্গিতটা বুঝতে পারলো ওরা। বেরিয়ে যেতে বলা হচ্ছে ওদের। ক্যাম্পারকে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এলো।
শূন্য চত্বর। সবাই গিয়ে ভিড় করেছে প্যারেড যেখানে হচ্ছে সেখানটায়। জোরে জোরে বাজছে এখন বাজনা। বাজনা না বলে হর্ন, ড্রাম আর বাঁশির কান ঝালাপালা করা মিশ্র শব্দ বললেই বোধহয় মানায় ভালো।

তিন গোয়েন্দাও এগোলো সেদিকে। সৈকতে বাজি পুড়ছে এখনও। ফাটছে। পটকা। শুরু হলো প্যারেড। আসলেই, ওরকম প্যারেড আর কখনো দেখেনি ওরা। ড্রাম বাজার তালে তালে ইস্কুলে দল বেঁধে যে রকম প্যারেড করে ওরা সে রকম। নয়। লোকে মার্চ করছে ঠিকই, তবে যার যার মতো করে। কেউ নির্দেশ দেয়ার নেই, নির্দেশ মানারও কেউ নেই। পোশাকও ইচ্ছে মতো পরেছে সবাই। শার্ট প্যান্ট তো বটেই, বেদিং স্যুট এমনকি শাড়িও পরেছে কেউ কেউ। কেউ পরেছে বিচিত্র আলখেল্লা, বুকের কাছে গোল গোল আয়না সেলাই করে লাগিয়ে নিয়ে। মোট কথা, যার যা পরনে আছে, তাই নিয়ে নেমে পড়া যায় ওই প্যারেডে।
খাইছে! বিড়বিড় করে বললো মুসা, কাণ্ড দেখেছো! মনে হয় ন্যাংটো হয়ে নেমে গেলেও কেউ কিছু মনে করবে না!
তার কথার জবাব দিলো না কেউ। রবিন ক্যামেরা নিয়ে ব্যস্ত। কিশোর। তাকিয়ে রয়েছে কিটুর দিকে। কয়েক ফুট দূরে মায়ের কাঁধে চড়ে প্যারেড় দেখছে। সেদিক থেকে মুখ ফেরাতে চোখে পড়লো, ওশন ফ্রন্টে তার প্রিয় বেঞ্চটায় গিয়ে। বসেছেন মিস্টার ডেজার।
বেশিক্ষণ কাঁধে থাকতে ভালো লাগলো না কিটুর। জোর করে নেমে পড়লো। মায়ের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে দৌড় দিলো চত্বরের দিকে। এই, এই কোথায় যাচ্ছিস! চেঁচিয়ে ডাকলো নিনা। খদার, ক্যাম্পারের বাড়ির ধারেকাছেও যাবি না!
আচ্ছা। ফিরে তাকালো না কিটু। দৌড়ে চলে গেল। পেছনে গেল ডব।
প্যারেড চলছে। শুধু আজকের দিনের জন্যে ওশন ফ্রন্টে গাড়ি ঢোকার অনুমতি দেয়া হয়েছে।– আরও কিছুক্ষণ পর, কিশোরের কানে এলো নিনা বলছে, কিটুটা গেল কোথায়?
মারমেড কোর্টের দিকে গেল নিনা। ফিরে এলো একটু পরেই। বাবা? ডাকলো সে ভিড়ের দিকে তাকিয়ে।
বাবা, কোথায় তুমি?
বেরিয়ে এলেন হেনরি বোরম্যান।
বাবা, কিটুকে খুঁজে পাচ্ছি না!
আছে কোথাও, মেয়ের হাত চাপড়ে দিয়ে বললেন বৃদ্ধ। ডব আছে তো সঙ্গে?... কিছু হবে না।
কিন্তু মায়ের উদ্বেগ কাটলো না। শেষে মেয়েকে নিয়ে কোর্টের দিকে এগোলেন বোরম্যান, নাতিকে খোঁজার জন্যে।
ডেকে ডেকে সারা হয়ে গেল দুজনে, কিন্তু না মিললো কিটুর সাড়া, না দৌড়ে এলো ডব।

কোর্টের নিচতলার দোকানগুলোতে খুঁজলেন বোরম্যান। ব্যালকনিতে বেরিয়ে। এলো ক্যাম্পার। কাফের মালিক বেরিয়ে এলো তার দোকানের সামনের বেদিতে। কিটুর কথা জিজ্ঞেস করতে ঘাড় নাড়লো দুজনেই। দেখেনি।
এইবার ভয় ফুটলো নিনার চোখে। বাবা, আবার হারিয়েছে! হারিয়ে গেছে!
আহ, এতো অস্থির হোস কেন? সান্ত্বনা দিলেন বাবা। পাওয়া যাবেই।
আরেকবার কিটুকে খুঁজতে বেরোলো তিন গোয়েন্দা। আগের দিনের মতো করেই খুঁজতে শুরু করলো। তবে এদিন ভিড়ের কারণে খোঁজাটা ততো সহজ হলো না। মারমেড কোর্ট থেকে পাঁচ কি ছয় ব্লক দূরে এসে দাঁড়িয়ে গেল ওরা। ধসে পড়া পুরানো একটা অ্যাপার্টমেন্টের ভাঙা সিঁড়িতে জিরিয়ে নিতে বসলো।
পেলাম না তো, রবিন বললো। হয়তো ফিরে গেছে। বইয়ের দোকানে, মায়ের কাছে। গিয়ে দেখা যাক, কি বলে?
চলো, উঠে দাঁড়ালো মুসা। খামোকাই বোধহয় প্যারেডটা মিস করলাম।
কিশোর কথা বলছে না। সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। অস্থির।
কি ভেবে উঠে দাঁড়ালো রবিন। এগিয়ে গেল বাড়িটার একপাশে। বড় একটা রাবিশ বিন দেখে উঁকি দিলো তার ভেতরে। চেঁচিয়ে উঠলো পরক্ষণেই, এই, জলদি দেখে যাও!
কি, কি হয়েছে! ছুটে গেল মুসা।
ফ্যাকাসে হয়ে গেছে রবিনের মুখ। একটা কুকুর..ডব..মনে হয় মরে গেছে!

.

বিকেল বেলা পুলিশ এলো কিটুকে খুঁজতে। সমস্ত ওশন ফ্রন্ট চষে ফেলা হলো, কিন্তু ছেলেটাকে পাওয়া গেল না।
পুলিশ যখন খুঁজছে, তখন মারমেড কোর্টে ক্যাফের বারান্দায় বসে অপেক্ষা করছে তিন গোয়েন্দা। ওদের সঙ্গে রয়েছেন ডেজার। শেষ বিকেলে মিস এমিনার এসে ওদের সঙ্গে যোগ দিলেন। বললেন, সাংঘাতিক কাণ্ড!
মহিলার কথায় শঙ্কা ফুটলো মুসার চোখে। বোধহয় ভূতের কথা মনে পড়ে গেছে। বিড়বিড় করে বললো, কিসে যে মারলো কুকুরটাকে! তবে আমার মনে হয় কিটু ভালোই আছে।
জোর দিয়ে বলা যায় না। সব সময় একসঙ্গে থাকতো দুজনে। ডবকে যে। মেরেছে তাকে নিশ্চয় দেখেছে কিটু। চিৎকার করেছে। হয়তো বাধা দেয়ারও চেষ্টা করেছে। আর সেটা করে থাকলে... কথাটা শেষ করলেন না তিনি, শুধু মাথা নাড়লেন।
আপনি ঠিকই আন্দাজ করেছেন, একমত হলো কিশোর। কিটুকে কেউ কিছু করতে এলে ডবের তাকে ছেড়ে দেয়ার কথা নয়। আর সেটা করতে গিয়েই

নিশ্চয়। খুন হয়েছে বেচারা।
পুলিশের ধারণা, রবিন বললো, গাড়ি চাপা পড়েছে কুকুরটা। সাধারণ অ্যাক্সিডেন্ট। মরে যাওয়ার পর তোক জানাজানি করে আর ঝামেলা করেনি ড্রাইভার। চুপচাপ রাবিশ বিনে লাশটা ফেলে দিয়ে পালিয়েছে।
তাহলে কিটু বাড়ি ফিরলো না কেন? প্রশ্ন তুললো কিশোর।
এই সময় বইয়ের দোকান থেকে বেরিয়ে এলেন বোরম্যান। পিছে পিছে এলো। নিনা। শুকনো, ফ্যাকাসে চেহারা। দুজনেরই চোখ ওশন ফ্রন্টের দিকে। সৈকতে এখন লোকের ভিড় নেই। পাশের একটা রাস্তা থেকে এসে চত্বরে ঢুকলো একটা গাড়ি। মারমেড কোর্টের ঠিক সামনে এসে থামলো। দুজন লোক নামলো, একজনের হাতে ভিডিও ক্যামেরা।
টেলিভিশনের লোক, ডেজার বললেন। নিনার সাক্ষাৎকার নেবে মনে হচ্ছে? হ্যাঁ, তাই তো।
নিনার মুখের কাছে মাইক্রোফোন ধরে আছে একটা লোক।
এই সময় বেরোলো ব্রড ক্যাম্পার। গ্যালারি থেকে নেমে গিয়ে দাঁড়ালো নিনার পাশে। তাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে কাঁধে হাত রাখলো।
হায়রে কপাল! কপাল চাপড়ালেন মিস এমিনার। ক্যামেরার সামনে দাঁড়ানোর লোভটাও ছাড়তে পারলো না। বেহায়ার হাড্ডি।
ওকে আপনি দেখতে পারেন না, কিশোর বললো।
না, পারি না। ওরকম একটা ছোটলোককে কেউ দেখতে পারে নাকি?
আমার কিন্তু অতোটা খারাপ মনে হয় না, ডেজার বললেন।
আপনি লোক চেনেন না, মিস্টার ডেজার, তাই একথা বলছেন। ওটা একটা পাজীর পা ঝাড়া!
যাকে নিয়ে এতো সমালোচনা সে ওদিকে বেশ জমিয়ে ফেলেছে রিপোর্টারদের সঙ্গে। সাক্ষাৎকারটা এখন মূলতঃ সে-ই দিয়ে চলেছে।
বেশরম কোথাকার! ঝাঝালো কণ্ঠে বললেন মিস এমিনার।
টেলিভিশনের লোকেরা চলে গেলে তিন গোয়েন্দাও উঠলো। বাড়ি যাবে। বইয়ের দোকানটার সামনে দাঁড়িয়ে আছে নিনা। কাঁদছে। কি মনে হলো তিন কিশোরের, কাছে এগিয়ে গেল। পকেট থেকে তিন গোয়েন্দার কার্ড বের করে দিয়ে বললো, এটা রাখুন। আমাদের ঠিকানা। সাহায্যের প্রয়োজন হলে ডাকবেন।
কার্ডটা পড়লো নিনা। তোমরা গোয়েন্দা?
হ্যাঁ, মুসা বললো। অনেক জটিল রহস্যের সমাধান আমরা করেছি। বিশ্বাস হলে রকি বীচের পুলিশকে জিজ্ঞেস করতে পারেন।

না না, বিশ্বাস করছি। পুলিশ খুঁজছে তো এখন, খুঁজুক। আশা করি বের করে ফেলবে। বললো বটে, কিন্তু নিনার কণ্ঠ শুনে মনে হলো না খুব একটা ভরসা। রাখতে পারছে পুলিশের ওপর।
গোধূলির ম্লান আলোয় সাইকেল চালিয়ে রকি বীচে ফিরে চললো তিন গোয়েন্দা। মনে ভাবনা। হারানো ছেলেটার কথাই ভাবছে।
আস্ত শয়তান! সাইকেল চালাতে চালাতে বললো মুসা। নইলে ওরকম একটা কুকুরকে মারে!
আমার মনে হয় অ্যাক্সিডেন্টই, রবিন বললো। কিশোর, তোমার কি মনে। হয়?
বুঝতে পারছি না, জবাব দিয়ে আবার চিন্তায় ডুবে গেল গোয়েন্দাপ্রধান।
রাত দশটায় টিভির খবরে নিখোঁজ সংবাদটা দেখলো সে। ড্রইং রুমে বসে আছে। রাশেদ পাশা আর মেরিচাচীও আছেন ওখানে।
নিনাকে একলা দেখা গেল কিছুক্ষণের জন্যে। তার পরেই এসে উদয় হলো ব্রড ক্যাম্পার। বললো, আমরা সবাই দোয়া করি, ভালো ভাবে ফিরে আসুক ছেলেটা। খুব লক্ষ্মী ছেলে। মারমেড কোর্টের সবাই তাকে ভালোবাসে।
আশ্চির্য! টেলিভিশনের পর্দায় স্থির হয়ে আছে মেরিচাচীর দৃষ্টি। বয়েস এতো কম লাগছে কেন ক্যাম্পারের? শরীর-স্বাস্থ্যের দিকে কড়া নজর রেখেছে দেখছি!
কিছু মানুষের শরীরই থাকে ওরকম, রাশেদ চাচা মন্তব্য করলেন। সহজে ভাঙে না।
পর্দা থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল ক্যাম্পার। ঘোষককে দেখা গেল। বললো সে, এখনও কিটু আরকারের খোঁজ মেলেনি। তার সম্পর্কে কেউ কিছু জানতে পারলে স্থানীয় পুলিশ স্টেশনে জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে। কিটুর বয়েস পাঁচ, তিন ফুট ছয় ইঞ্চি লম্বা, কালো চুল, পরনে জিনসের প্যান্ট, গায়ে লাল-নীল ডোরাকাটা টি শার্ট।
কিটুর একটা ফটোগ্রাফ দেখানো হলো। ছবিটা তেমন স্পষ্ট নয়। ভালো ওঠেনি, কিংবা নষ্ট হয়ে গেছে। এরপর অন্য কথায় চলে গেল ঘোষক।
আহারে, বেচারি, নিনার জন্যে আফসোস করলেন মেরিচাচী। কতো না। জানি কান্নাকাটি করছে এখন!
রাত হয়েছে। উঠে ঘুমাতে চলে গেলেন চাচা-চাচী। কিশোর একা বসে বসে ভাবতে লাগলো। এভাবে গায়েব হয়ে গেল কি করে ছেলেটা? লোকজন তো কম ছিলো না তখন। নিশ্চয় কারো না কারো নজরে পড়েছে।
পরদিন সকালেও নিখোঁজ রইলো কিটু। নাস্তার পর রান্নাঘরের কাজে চাচীকে সাহায্য করলো কিশোর। তারপর বেরিয়ে এলো বাইরে। ঢুকলে এসে

হেডকোয়ার্টারে। ঢুকতেই টেলিফোন বাজলো। রিসিভার তুলে কানে ঠেকালো। ভেসে এলো নিনা হারকারের কণ্ঠ, হালো, কিশোর পাশা?
বলুন?
কিশোর, কান্না জড়ানো গলায় বললো নিনা, সারা রাত বাবা খোঁজাখুঁজি করেছে। পুলিশও অনেক খুঁজেছে। পায়নি... ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো সে।
কাঁদবেন না। পাওয়া যাবেই। আমরাও খুঁজবো।
সে জন্যেই ফোন করেছি। প্লীজ, যদি আসো!...তোমাদের অনেক প্রশংসা করেছেন ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্লেচার।
কিশোর বুঝতে পারলো, রকি বীচ পুলিশ স্টেশনে খবর নিয়েছে নিনা। বললো, আপনি ভাববেন না। রবিন আর মুসাকে নিয়ে এখনই আসছি।

.
বইয়ের দোকানে একা বসে আছে নিনা হারকার। চোখের কোণে কালি পড়েছে। হাত কাঁপছে অল্প অল্প। তিন গোয়েন্দাকে দেখেই বলে উঠলো, নাহ, কোনো খোঁজ নেই! কিচ্ছু না! পুলিশ এখনও খুঁজছে। ডবের পোস্ট মর্টেম করেছে। খোদাই জানে, কেন!
কিভাবে মরেছে বোঝার জন্যে, কিশোর বললো।
বুঝলে কি হবে?
মৃত্যুটা কি করে হয়েছে জানা থাকলে অনেক সময় হত্যাকারীকে খুঁজে বের করতে সুবিধা হয়। তদন্ত করতে যাচ্ছি আমরা। মারমেড কোর্ট থেকেই শুরু করবো, যেখানে ডবের লাশটা পাওয়া গেছে।
কি লাভ? পুলিশ কোনো জায়গাই বাদ রাখেনি। সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে।
তবু চেষ্টা করবো। সব কথা আমাদেরও জানতে হবে। এমন কিছু জানাতে পারে আমাদেরকে কেউ, যা পুলিশকে বলতে ভুলে গেছে। হয় ওরকম। কিটুর ব্যাপারেও খোঁজ খবর নেবো যতোটা পারা যায়। কাল তাকে আমরা কোর্টে দেখেছি। নিশ্চয় কেউ না কেউ বেরোতে দেখেছে। ঠিক না?
তা দেখতে পারে।
তদন্ত করতে বেরোলো তিন গোয়েন্দা। প্রথমে কথা বললো ঘুড়ির দোকানের লম্বা, রোগাটে লোকটার সঙ্গে। তার নাম জনি মিউরো। মারমেড কোর্ট থেকে কিটুকে বেরিয়ে আসতে দেখেছে সে। তারপর কোথায় গেছে বলতে পারলো না।
দোকান থেকে বেরিয়ে কোর্টের সামনে গিয়েছিলাম, মিউরো বললো, প্যারেড দেখতে। মিনিটখানেকের বেশি থাকিনি। কিটুকে দেখলাম বেরিয়ে আসছে। সঙ্গে ডব। কুত্তাটা সব সময় তার সঙ্গে থাকতো।

আপনার দোকানের দরজা খোলা ছিলো? জিজ্ঞেস করলো কিশোর। এমনও তো হতে পারে সামনের দরজা দিয়ে ঢুকে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেছে ও?
মাথা নাড়লো মিউরো। পেছনের দরজায় ডেড-বোল্ট লক লাগানো, দেখছো।? বেরোতে হলে ওটা খুলতে হতো তাকে। নাগাল পেতে হলে উঠতে হতো। চেয়ারে। খুলে বেরিয়ে গেলে খোলা থাকতো দরজাটা। আমার চোখে অবশ্যই পড়তো। চালাকি করে চেয়ার সরিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে হয়তো বেরিয়ে যেতে পারতো, তাহলে সহজে আমার চোখে পড়তো না ব্যাপারটা। কিন্তু কোনো জিনিস একবার সরিয়ে আবার আগের জায়গায় নিয়ে রাখবে কিটু? অসম্ভব! যেখানে যা নিয়ে। যাবে সেখানেই ফেলে রেখে যাবে।
রক স্টোরের মালিক মিস জারগনও একই রকম কথা বললো। প্যারেডের সময় দোকান ছেড়ে বাইরে বেরিয়েছিলো, কিন্তু কিটু বা অন্য কাউকেই দোকানে ঢুকতে দেখেনি। তাছাড়া দরজায় তালা দিয়ে বেরিয়েছিলো। এখানে দরজা খোলা রেখে বেরোবো! মাথা খারাপ! বললো সে। চোরের যা উৎপাত! এক মিনিটে ফাঁকা করে দেবে দোকান।
কিটু কথা আর কি বলবো? কিভাবে পালিয়েছে ও-কি একটা বলার ব্যাপার হলো? ও ওভাবেই পালায়। চোখের পলকে। এই আছে তো এই নেই। নিশ্চয়। ভিড়ের ভেতর থেকে মানুষের পায়ের ফাঁক দিয়েই বেরিয়ে চলে এসেছিলো।
আসলে, কোন দিকে গেছে ও বোঝার চেষ্টা করছি। কেউ না কেউ হয়তো দেখেছে। কুকুরটা সঙ্গে ছিলো তো, চোখে না পড়ার কথা নয়।
কুকুরের কথায় কেঁপে উঠলো মিস জারগন। বোলো না, বোলো না, লোকটা একটা পিশাচ! নইলে ওরকম একটা বুড়ো জানোয়ারকে ওভাবে মারতে পারে!
ডবকে কে মেরেছে এখনো জানি না আমরা। তিন গোয়েন্দার একটা কার্ড রে করে দিলো কিশোর, আমাদের ফোন নম্বর। যদি কিছু মনে পড়ে আপনার, দয়া করে জানাবেন।
রুক স্টোর থেকে বেরিয়ে সুতোর দোকানে চললো ওরা।
মিসেস কেলান শান্ত, ভদ্র। সুন্দর চুল। সুতোর দোকানটার মালিক। কিটুকে তিনি দেখেছেন আগের দিন। তবে তখনো দোকান থেকে বেরোননি। জানালা দিয়েই প্যারেড দেখছিলাম, বললেন তিনি। ছেলেটা যে কোথায় গেল, দেখিনি। নিনা বেচারির জন্যে কষ্ট লাগছে। ছেলে হারালে মায়ের কি কষ্ট হয় বুঝি তো।
এরপর ক্যাফেতে এসে ঢুকলো তিন গোয়েন্দা। কফি আর পেস্ট্রি খাচ্ছে কয়েকজন লোক। খাবার সরবরাহ করছে হেনরি লিটার। ছেলেরা ঢুকে তাকে প্রশ্ন শুরু করতেই ওদেরকে রান্নাঘরে স্ত্রীর কাছে এনে রেখে গেল সে। যা জবাব দেয়ার শেলিই দিক।

কাল এখানে আসেনি কিটু, শেলি জানালো। মাঝে মাঝে আসতো আমাদের এখানে। মায়ের নাম করে ফাঁকি দিয়ে কেকটেক নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতো। কয়েক দিন দিয়েছি। পরে যখন বুঝে গেলাম, আর দিতাম না।
প্যারেড শুরু হওয়ার পর আর ওকে দেখেননি, না? জিজ্ঞেস করলো। কিশোর।
না। ব্যস্ত ছিলাম। আমাদের রেগুলার ওয়েইটার রাগবিটা তখন বেরিয়ে গেছে। না জানিয়ে মাঝে মাঝেই গায়েব হয়ে যায় ও।
শেলি লিসটারকে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এলো তিন গোয়েন্দা। চত্বর পেরিয়ে এসে মারমেড গ্যালারির সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করলো। ভেতরেই পাওয়া। গেল মালিককে।
কিটুর কথা জানতে এসেছো কেন? কিশোরের প্রশ্নের জবাবে পাল্টা প্রশ্ন করলো ব্রড ক্যাম্পার। তোমরা তো ইস্কুলের ম্যাগাজিনের তথ্য সংগ্রহ করছিলে। হঠাৎ এই নতুন কৌতূহল কেন?
রবিন জবাব দিলো, আজ আমরা তথ্য সংগ্রহ করছি না। মিসেস হারকারকে সাহায্য করতে এসেছি।
তোমরা আর কি সাহায্য করবে? যা করার পুলিশই তো করছে। এসব কাজে ওরা তোমাদের চেয়ে অনেক বেশি দক্ষ।
তবু মিসেস হারকার আমাদের সাহায্য চেয়েছেন, কিশোর বললো। একটা কার্ড বের করে দেখালো ক্যাম্পারকে।
বাহ! গোয়েন্দা! কিছুটা টিটকারির সুরেই বললো ক্যাম্পার।
হ্যাঁ, মুসা বললো। অনেক রহস্যের সমাধান আমরা করেছি।
তাই? ভালো। তা কি জানতে চাও?
জানতে চাই, কাল কিটু কি কি করেছে, কিশোর বললো। ও কোনদিকে গেছে জানতে পারলে সুবিধে হতো। প্যারেড শুরু হওয়ার পর কোথায় গেছে, বলতে পারবেন?
না। তবে যেদিকেই যাক, যা-ই ঘটুক তার, এখানে কিছু ঘটেনি। কুত্তাটা গাড়ির নিচে পড়ে মরেছে, শুনেছো তো? মারমেড কোর্টে তো গাড়িই নেই, এখানে মরে কিভাবে?
তা ঠিক। আমি একথা বলতে চাইছি না। আমার কথা, কোর্টে দেখা গেছে। কিটুকে। অনেকেই দেখেছে। তারপর হঠাৎ করে একেবারে লাপাত্তা, কারো। চোখেই পড়লো না, এটা বিশ্বাস করা কঠিন। পেছনের একটা দরজা দেখিয়ে বললো কিশোর, সামনে দিয়ে ঢুকে ওখান দিয়ে বেরিয়ে যায়নি তো?
বলতে বলতে গিয়ে ঠেলা দিলো পাল্লায়। তার হাতের ছোঁয়া লাগতেই খুলে। গেল ওটা। দেখা গেল সিঁড়ি নেমে গেছে বাড়ির পেছন দিকে। পাশের বাড়ির সামনে।

গাড়ি পার্কিডের জায়গা। একটা রাস্তা চলে গেছে ওশন ফ্রন্টের সমান্তরালে, ওটারই নাম স্পীডওয়ে। খোয়া বিছানো, সরু, এবড়ো-খেবড়ো পথ। পার্কিং লটে ঢোকার জন্যে গুতোগুতি করছে ড্রাইভাররা।
পাল্লাটা ভেজিয়ে দিলো কিশোর। দরজার ছিটকানি লাগান না?
ঘর বন্ধ করে বেরোনোর আগে লাগিয়ে যাই। দিনের বেলা খোলাই রাখি। গ্যারেজে যেতে হয়, ডাস্টবিনে ময়লা ফেলতে যেতে হয়। কতোবার খুলবো ছিটকানি?
মাথা ঝাঁকিয়ে সামনের দরজার কাছে ফিরে এলো কিশোর। ছোট একটা ঘণ্টা। আছে। ইলেকট্রিক বীমের সাহায্যে সুইচ অন হয়। কিশোরের শরীরে ওই বীম বাধা। পেতেই বেজে উঠলো ঘণ্টাটা। কোমর সমান, বিড়বিড় করলো সে। বেল না। বাজিয়ে সহজেই বীমের নিচে দিয়ে চলে যেতে পারে কিটু। আপনি ক্ষণিকের জন্যে এখান থেকে সরলেও চলে যেতে পারে, পলকে।
শূন্য দৃষ্টিতে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইলো ক্যাম্পার। তারপর হাসলো। ও, গত হপ্তায় এভাবেই ঢুকেছিল তাহলে! তাই তো বলি, জিনিসপত্র সব ছড়িয়ে ফেলে রেখে গেল, ঘণ্টা বাজলো না কেন?
বীম এড়িয়ে যে ওটুকু একটা বাচ্চা ছেলে ঢুকতে পারে, খেয়ালই করেননি। কখনও? বিশ্বাস করতে পারছে না কিশোর।
নাহ্!
ওরা যখন কথা বলছে, মুসা তখন ঘুরে ঘুরে দেখছে গ্যালারিটা। বড় ডিসপ্লে উইণ্ডোর সামনে রাখা বেদিটার কাছে এসে হতাশ হলো সে। শূন্য বেদি। ক্যাম্পারকে জিজ্ঞেস করলো, জলকন্যাটা কি বেচে দিয়েছেন?
না... দ্বিধা করলো ক্যাম্পার। কাল চুরি হয়ে গেছে। একজন খদ্দেরকে নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম, তখন। ওটা কেন চুরি করলো বুঝলাম না। এর চেয়ে অনেক দামী জিনিস আছে এখানে।
হু, আনমনে বললো কিশোর।
দুনিয়ার যতো আজেবাজে লোক এসে হাজির হয় এই বীচে, বিরক্ত কণ্ঠে বললো ক্যাম্পার। কুত্তাটার কথাই ধরো। অহেতুক মেরে রেখে গেল ওটাকে।
সত্যিই গাড়ি চাপা পড়ে মরেছে কিনা তাই বা কে জানে, রবিন বললো। পুলিশ নাকি জানার জন্যে পোস্ট মর্টেম করতে নিয়ে গেছে।
তাই?
দীর্ঘ নীরবতা। ছেলেদের কথা শোনার অপেক্ষা করলো, যেন ক্যাম্পার। শেষে বললো, যদি তা-ই হয়...

বাধা দিয়ে কিশোর বললো, আচ্ছা, হোটেলে ঢোকেনি তো কিটু? জানালা খোলা ছিলো হয়তো, কিংবা দরজার তালা ভাঙা…
না, জোর দিয়ে বললো ক্যাম্পার। ভালোমতো আটকে রাখি আমি, যাতে বাইরের কেউ ঢুকতে না পারে। কখন কি নষ্ট করে ফেলে, না আগুনই লাগিয়ে দেয়, ঠিক আছে কিছু?
কাল পুলিশ ওখানে খুঁজেছিলো?
নিশ্চয়ই। তালা খুলে দিয়েছিলাম। ওরাও দেখেছে, বহুদিন ওখানে কেউ ঢোকেনি।
ভালোমতো খুঁজেছো তো?
রেগে গেল ক্যাম্পার। অনেক হয়েছে! কাজ আছে আমার। তোমাদের প্রশ্ন শেষ হয়ে থাকলে…
বেরিয়ে এলো ছেলেরা। কিন্তু ওরা অর্ধেক সিঁড়ি নামতেই পেছন থেকে ডাকলো ক্যাম্পার। রাগ পড়ে গেছে। দরজায় দাঁড়ানো মানুষটাকে এখন কেমন বয়স্ক আর বিধ্বস্ত লাগছে।
সরি, বললো সে, মেজাজ ঠিক রাখতে পারিনি। ছোটবেলায় আমার একজন বন্ধু হারিয়ে গিয়েছিলো। লাঞ্চের পরেও ক্লাসে এলো না। ওকে খুঁজতে বেরোলাম। আমিই খুঁজে পেয়েছিলাম। তখন আইওয়াতে থাকি। ওখানেই জন্মেছি আমি। ভালোমতো চিনি শহরটা। শহরের বাইরে পুরানো একটা গর্ত ছিলো। বৃষ্টির পানিতে ভরে গিয়েছিলো সেটা। দেখলাম, তাতে ভাসছে লাশটা।
বেচারা! জিভ দিয়ে চুকচুক করে দুঃখ প্রকাশ করলো কিশোর।
চত্বর ধরে এগোলো, ওরা। ক্যাফের বারান্দায় দেখা গেল মিস জেলড়া এমিনারকে। কফি খাচ্ছেন। ওদেরকে দেখেই বলে উঠলেন, এতো দেরি করলে! তোমাদের জন্যেই বসে আছি। এসো, একটা জিনিস দেখাবো।
হেনরি লিসটারকে ডেকে আনলেন মিস এমিনার। বললেন, দুপুর হয়ে আসছে। নিশ্চয় খিদে পেয়েছে ওদের। আমার সঙ্গে লাঞ্চ খাবে। চিকেন স্যাণ্ডউইচই দাও। আমাকে বাদ দিয়ে। আজকাল আর হজম করতে পারি না। বয়েস হয়ে গেছে। আর কি খাওয়ার মজা আছে!
স্যাণ্ডউইচ নিয়ে আসছি, বলে চলে গেল লিটার।
তোমাদের বয়েসে, বিষণ্ন কণ্ঠে বললেন মিস এমিনার, লোহা খেয়ে হজম করে ফেলেছি। টন কে টন পেনি ক্যাণ্ডি গিলেছি। লিকোরাইস হুইপ, টুটসি রোলস, কিছু বাদ দিতাম না। চেয়ারে সোজা হয়ে বসে দুঃখটা ঝেড়ে ফেললেন যেন তিনি। ভালো কথা, ক্যাম্পার কি বললো?
হঠাৎ এই প্রসঙ্গ পরিবর্তনে কিশোরও সোজা হয়ে বসলো।

নিনাকে সাহায্য করতে এসেছো তোমরা, তাই না? আবার বললেন মিস এমিনার। তোমাদেরকে যে ফোন করেছে, একথা সকালেই বলেছে আমাকে। আমারও অনুরোধ, ওর জন্যে কিছু করো। মেয়েটা খুব ভালো। এখানে ভালো লোকের বড় অভাব। বেশির ভাগই তো অসভ্য!

পেছন ফিরে তাকালেন মিস এমিনার। ভেজা কাপড় নিয়ে এসে টেবিল মুছতে লাগলো রাগবি ডিগার। উজ্জ্বল রোদে আরো বেশি রোগা লাগছে তাকে। গালে লাল লাল দাগ, সেগুলোর মধ্যে থেকে নারকেল গাছের জটলার মতো চুল গজিয়েছে খাড়া হয়ে। কনুয়ের কাছে আঠা আঠা কি যেন লেগে রয়েছে। অ্যাপ্রনের নিচে টি শার্টটা ময়লা।

স্বাস্থ্য বিভাগ ওর খবর জানে কিনা ভাবি মাঝে মাঝে! নাক কুঁচকালেন মিস এমিনার। সে-ও ওদের একজন!

কাদের একজন? জানতে চাইলো রবিন।

অসভ্যদের! রবিনের দিকে ঝুঁকে খাটো গলায় বললেন মিস এমিনার। স্পীডওয়ের ওধারে ভাঙাচোরা বাড়ি আছে কয়েকটা, একটাতে থাকে ও। চোর ডাকাত, ফকির-টকিরের আজ্ঞা ওখানে। ওদেরকে দিয়ে সবই সম্ভব। অল্পবয়েসী একটা মেয়ে থাকে...

থেমে গেলেন মিস এমিনার। শক্ত হয়ে গেছে ঠোঁট। ঝাঝালো কণ্ঠে বললেন, অসভ্যের একশেষ একেকটা! বাপ-মা যে কোথায় ওদের, খোদাই জানে! কোথায় জন্ম, কোথায় বড় হয়, কে জানে! তারপর আর কোনো জায়গা না পেয়ে এসে ঢোকে এই ভেনিসে!

কাফে থেকে বেরিয়ে এলো হেনরি লিসটার। হাতে ট্রে। তাতে স্যাণ্ডউইচ, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, আর কোকা কোলা। টেবিলে সাজিয়ে দিয়ে চলে গেল। তার পেছনে গেল রাগবি ডিগার।

ডিগারকে, নিচু গলায় বললেন মিস এমিনার, দেখতে পারতো না কিটু।

কিশোর বললো, অনেকেই তো কিটুকে দেখতে পারে না, তার দুষ্টুমির জন্যে।

না না, আমি কাউকে দোষ দিচ্ছি না, তাড়াতাড়ি বললেন মিস এমিনার। চত্বরে যে কটা দোকান মালিক আছে, কিটুর নিখোঁজ হওয়ার পেছনে তাদের কারোই হাত নেই। প্যারেড শুরু হওয়ার সময় আমার ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে ছিলাম। মিস্টার মিউরোকে দেখেছি। রক মিউজিক পছন্দ করে যে মহিলা, মিস জারগন, তাকে দেখেছি। প্যারেড দেখতে চত্বরের দিকে এগোচ্ছিল ওরা। ব্রড ক্যাম্পারকেও দেখেছি। তার অ্যাপার্টমেন্ট আর গ্যালারির মাঝখানে পায়চারি করেছে কয়েকবার। তারপর কিটু আর ডবকে দৌড়ে ঢুকতে দেখলাম।

ও! হঠাৎ সতর্ক হয়ে উঠলো গোয়েন্দাপ্রধান। ওশন ফ্রন্ট থেকে বেরিয়ে। যাওয়ার পর তাহলে দেখেছেন! গুড! কি কি দেখেছেন?
বেশি কিছু না। ঠিক ওই সময় আমার চুলার টাইমারটা অফ হয়ে গেল। চুলায় কেক ছিলো। তাড়াতাড়ি নামাতে গেলাম। আবার জানালার কাছে ফিরে এসে কিটু বা ডব কাউকেই দেখলাম না। অন্তত চত্বরে ছিলো না তখন, এটা ঠিক। তবে রাগবি ডিগার ছিলো।
আবার বারান্দায় বেরিয়ে এসেছে ডিগার। মিস এমিনারের শেষ কথাটা কানে গেল। তাঁর দিকে তাকিয়ে কুঁচকে গেল ভুরু। কোমরে দুহাত রেখে দাঁড়ালো। আমি কি করেছি? তার এক হাতে ব্যাণ্ডেজ, কব্জির ঠিক ওপরে।
সামান্যতম চমকালেন না মিস এমিনার, নরম হলেন না। জবাব দিলেন, গতকাল প্যারেডের সময় দেখলাম মিস্টার মিউরোর দোকান থেকে বেরোচ্ছো। আমার কাছে সেটা অদ্ভুত লেগেছে। খেলনা কিংবা ঘুড়ির ব্যাপারে কোনোদিন। কোনো আগ্রহ দেখিনি তোমার। অবাক লেগেছে সে কারণেই। এরা কিটুকে খুঁজতে সাহায্য করছে, তিন গোয়েন্দাকে দেখিয়ে বললেন তিনি। ভাবলাম…
কি ভাবলেন! কি ভাবলেন? চেঁচিয়ে উঠলো ডিগার। আমি কিছু করিনি! আপনার কি মনে হয়, খেলনার লোভ দেখিয়ে ওকে ধরে নিয়ে গেছি? পাগল হয়ে গেছেন আপনি!
বারান্দায় বেরিয়ে এলো লিসটার। শুনে ফেলেছে কথা। কাল তুমি ঘুড়ির দোকানে ঢুকেছিলে?
ঢুকেছিলাম। একটা চীনা ঘুড়ির দাম, দেখতে। জানালার কাছে যেটা রেখেছিলো।
শুধু এ জন্যেই?
তাহলে আর কি জন্যে? আবার রেগে উঠলো ডিগার।
কড়া চোখে তার হাতের ব্যাণ্ডেজের দিকে তাকিয়ে মিস এমিনার বললেন, হাতে কি হলো? কুকুরে কামড়ে দিয়েছে, তাই না? আজ সকালে শেলির সঙ্গে বলছিলে, আমি শুনেছি। তোমার নিজের কুকুরে কামড়েছে?
আপনি….আপনি… রাগে কথা আটকে গেল ডিগারের।
আমি কি? নাক গলাচ্ছি? বেশি আগ্রহ দেখাচ্ছি? হা, দেখাচ্ছি। দেখাবো, সন্তুষ্ট মনে হচ্ছে মিস এমিনারকে।
দেখুন, বেশি বাড়াবাড়ি করবেন না। ভালো হবে না…
এই, চুপ করো! ধমকে উঠলো লিসটার। আর একটা কথাও বলবে না!
আহ্, কি আরম্ভ করলে তোমরা! শেলিও ধমক লাগালো। লোকে শুনলে কি বলবে! একটানে গা থেকে অ্যাপ্রনটা খুলে টেবিলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গটমট করে চত্বরে নেমে পড়লো সে। চলে যাবে।

অ্যাপ্রনটা তুলে নিয়ে লিসটার বললো, মিস এমিনার, মাঝে মাঝে আপনি একটু বাড়াবাড়িই করে ফেলেন। আমিও করি। খেলনার দোকানে না হয় কাল ঢুকেইছে রাগবি, তাতে কি হয়েছে? অন্যায় তো কিছু করেনি।
দুজনেই বাড়াবাড়ি করি, তাই না? মুখ কালো করে বললেন মিস এমিনার। কোর্টের আশেপাশে যারা থাকে, সবারই জিনিসপত্র চুরি যাচ্ছে, তোমারও ক্যাশবাক্স থেকে টাকা চুরি হচ্ছে। এর পরও ডিগারকে ভালো বলবে?
ইয়ে…আমার আমতা আমতা করতে লাগলো লিসটার। মাথা ঝাঁকালো। তারপর কোনো জবাব খুঁজে না পেয়ে গিয়ে আবার ঢুকলো কাফের ভেতরে।
বিজেতার হাসি হাসলেন মিস এমিনার। স্বভাব কি আর সহজে বদলায় মানুষের। ডিগারই বা কি করে বদলাবে। যাকগে, কুকুরের কামড়ের কথায় আসা যাক। রাস্তার কয়েকটা নেড়ি কুত্তা গিয়ে বাস করে ওর সঙ্গে।
নেড়ি কুত্তা! মহিলার কথা শেষ হওয়ার আগেই বলে উঠলো মুসা। তাহলে কামড়ে দিতেও পারে।
তা পারে। তবে সে সত্যি কথা বলছে কিনা কে জানে?
চুপ করে মিস এমিনারের দিকে তাকিয়ে রয়েছে তিন গোয়েন্দা।
ধরা যাক, নেড়ি কুত্তায় কামড়ায়নি, বলতে লাগলেন তিনি। হয়তো অন্য কোনো কুকুর, যেটার খুদে মনিবের ক্ষতি করতে যাচ্ছিলো ডিগার। ব্যস, মনিবকে বাঁচাতে কুকুরটা দিয়েছে ওকে কামড়ে। একটা কথা অবশ্য স্বীকার করতেই হবে, জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে ডিগারের খুব ভাব। কি করে যেন চোখের পলকে খাতির করে ফেলে। কুকুর-বেড়াল সব কিছু। আগে কখনও তাকে কোনো কিছুতে কামড়েছে বলে শুনিনি।
এটাই আমাদের দেখাবেন বলেছিলেন? কিশোর জিজ্ঞেস করলো। ডিগারের ব্যাণ্ডেজ?
মাথা ঝাঁকালেন মিস এমিনার।
হু, কিশোর বললো। বড় বেশি কাকতালীয়!
কফির কাপে চুমুক দিলেন মহিলা। কাপটা নামিয়ে রেখে ছেলেদের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। তা ক্যাম্পারের সঙ্গে কেমন কাটলো?
আরও কিছু বলার আছে তার, বুঝতে পেরে চুপ করে রইলো কিশোর।
নিশ্চয় নিজের সম্পর্কে খুব ভালো ধারণা দিতে চেয়েছে, মিস এমিনার। বললেন। তা-ই করে সব সময়। কাল টেলিভিশনের লোকের সামনে কি রকম বেহায়ার মতো গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, দেখোনি?
দেখেছি। হয়তো সত্যিই সাহায্য করতে চাইছে। এই ঘটনাটা ছেলেবেলার আরেকটা দুর্ঘটনার কথা নাকি মনে পড়িয়ে দিয়েছে তার। আপনি জানেন,

ছেলেবেলায় তার এক বন্ধু হারিয়েছিলো? তারপর গর্তের পানিতে ভাসতে দেখা যায় ছেলেটার লাশ?
ওর বন্ধু? ন্যাপকিনে ঠোঁট মুছলেন মিস এমিনার। আমি তো শুনেছি ওর ছোট ভাই। এখন আবার বন্ধু হয়ে গেল কিভাবে? কি জানি, ভুলও শুনে থাকতে পারি। আর কিছু জানার আছে তোমাদের?
মাথা নাড়লো ছেলেরা। নেই। লাঞ্চ খাওয়ানোর জন্যে ধন্যবাদ জানালো। বারান্দা থেকে নেমে নিজের অ্যাপার্টমেন্টের দিকে চলে গেলেন তিনি।
মৃদু শিস দিয়ে উঠলো মুসা। বাপরে বাপ, মহিলা বটে!
চত্বরে ঢুকলো একজন লোক। মলিন চেহারা। পরনের পোশাকটা বেটপ রকমের ঢলঢলে, বেমানান। একটা ঠেলাগাড়ি ঠেলতে ঠেলতে আসছে। পেছনে আসছে একজোড়া মাংরল কুকুর। কাফের বারান্দার কাছে পৌঁছে কুকুর দুটোকে বসতে বললো লোকটা। বাধ্য ছেলের মতো সিঁড়ির গোড়ায় বসে পড়লো জানোয়ার দুটো। ঠেলাটা ওখানে রেখে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলো লোকটা।
কয়েক মিনিট পরে কাফে থেকে বেরোলো সে। হাতে একটা বড় ঠোঙা। তার পেছনে বেরোলো হেনরি লিসটার। ঠেলা নিয়ে লোকটা সরে যাওয়ার পর বললো, জঞ্জালের মধ্যে নিশ্চয় কিছু কুড়িয়ে পেয়েছে বরগু। আট ডলারের পেস্ট্রি কিনে নিয়ে গেল। কল্পনাই করা যায় না!
মিস এমিনারের ঘরের দিকে তাকালো সে। গলা নামিয়ে বললো, ওই মহিলার ব্যাপারে সাবধান। যদি পছন্দ করে তোমাদের, ভালো। না করলে সর্বনাশ করে দেবে। সাংঘাতিক মহিলা!
লিসটার কাফেতে গিয়ে ঢুকলো।
মুসা বললো বিড়বিড় করে, সেটা আমরাও বুঝেছি। ডিগারকে যেভাবে। আক্রমণ করলো! জবাবই দিতে পারলো না বেচারা!
হ্যাঁ, একমত হলো কিশোর। আনমনে চিমটি কাটলো নিচের ঠোঁটে। কুকুরের দেখছি ছড়াছড়ি এখানে। বরগুর সঙ্গে কুকুর। ডিগারের সঙ্গে কুকুর। জন্তু জানোয়ারের সঙ্গে তার এতো ভাব, তা-ও কামড় খেলো কুকুরের? কিটুর ছিলো। কুকুর। সেটা নিয়ে বেরোলো, তারপর গায়েব। কুকুরটাকে পাওয়া গেল। ডাস্টবিনে...।
বাধা দিয়ে বললো মুসা, ডিগারের ওপর চোখ রাখা দরকার, কি বলো?
অন্তত ওর ব্যাপারে আরেকটু খোঁজখবর নেয়া তো অবশ্যই দরকার, মুসার কথার পিঠে বললো রবিন। স্পীডওয়ের ওধারে ভাঙা বাড়িতে থাকে।...এসো, যাই।
.

বাড়িটা খুঁজে বের করতে একটুও অসুবিধে হলো না। সামনের সিঁড়ির ওপর বসে। ঝিমোচ্ছে তখন ডিগার। মারমেড ইনের পেছনে এসে দাঁড়ানো ছেলেদের দেখতে পেলো না সে। চট করে একটা গাড়ির আড়ালে লুকিয়ে পড়লো ওরা।

চুপ করে দেখছে তিন গোয়েন্দা। বেশ কিছুক্ষণ কিছুই ঘটলো না। নীরব হয়ে আছে ভাঙা বাড়িটা। তারপর স্পীডওয়ে ধরে এগিয়ে এলো একজন মানুষ। সঙ্গে একটা কুকুর। ওটার গলায় বাঁধা দড়ির এক মাথা ধরে রেখেছে। ডিগারের ঘরের পেছনে বেড়ার কাছ থেকে একসঙ্গে গলা ফাটিয়ে ঘাউ ঘাউ করে উঠলো কয়েকটা

লাফ দিয়ে উঠলো ডিগার। চিৎকার করে বললো, এই চুপ চুপ! থাম! .

এক মুহূর্ত থমকালো আগন্তুক। তারপর কুকুরটাকে নিয়ে উঠে গেল ডিগারের বারান্দায়।

কী? ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করলো ডিগার।

কুকুর নিয়ে এসেছে যে লোকটা সে মাঝবয়েসী। ভদ্র। মাথা জুড়ে টাক। চোখে। ভারি পাওয়ারের চশমা। ডিগারের কর্কশ কণ্ঠ শুনে পিছিয়ে গেল এক পা। অস্বস্তি। জড়ানো কণ্ঠে বললো, শুনলাম, কুত্তা পছন্দ করো তুমি। তাই নিয়ে এসেছি। বীচফ্রন্ট মার্কেটের সামনে রাবিশ বিনে ঢোকার চেষ্টা করছিলো। ধরে নিয়ে এসেছি। নিশ্চয় খুব খিদে পেয়েছে এটার।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কুকুরটাকে দেখলো ডিগার। দো-আঁশলা।

কয় আঁশলা জানি না। তবে তুমি…

আমাকে দেখে কি মনে হয়? খেঁকিয়ে উঠলো ডিগার। কুত্তার দালাল? নাকি এতিম জানোয়ারের জন্যে এতিমখানা খুলেছি?

অবাক হয়ে গেল লোকটা। কিন্তু… ওরা যে বললো, কু-কুকুর পছন্দ করো। তুমি…

তাহলে ওদের কাছেই যাও! গজগজ করতে লাগলো ডিগার। কুত্তা আর কুত্তা!, এমন জানলে কে পালতো! যাও, যে চুলো থেকে এনেছো, সেখানেই নিয়ে ফেলে দাও! যাও!

ধমক খেয়ে পিছিয়ে এলো লোকটা। কুকুরটাকে নিয়ে আবার নামলো পথে। টেনে নিয়ে চললো।

হঠাৎ পুরানো বাড়ির বারান্দা থেকে ডাক শোনা গেল, এই রাগবি, কি হয়েছে?

কিছু না।

একটা মেয়ে বেরিয়ে এসেছে। বয়েস বিশ-বাইশ হবে। কালো চুল। পরনে স্কেটারদের পোশাক। স্কেটিং করতে যাচ্ছে বোধহয়। কিছু না মানে কি? শুনলাম

তো চেঁচামেচি করছো। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলো কি যেন। নাহ, তোমাকে। নিয়ে আর পারা যায় না। কতো আর মিথ্যে বলবে?
এই চুপ, চুপ, আস্তে! দ্রুত চারপাশে চোখ বোলালো ডিগার।
ছেলেটার খোঁজ নিতে পুলিশ এসেছিলো। তোমার কুত্তাগুলোর কথা জিজ্ঞেস করলো। মিথ্যে বললাম। এখন দুর্ব্যবহার করে লোকটাকে তাড়ালে। সে কি ভাববে? রেখে দিলে কি এমন হতো?
কি হতো না হতো সেটা আমার ব্যাপার। তোমাকে মাতব্বরি করতে বলেছে।
দেখো, ধমক দিয়ে কথা বলবে না আমার সঙ্গে! মেয়েটাও রেগে গেল। আর আমি থাকছি না এখানে। মিথ্যে কথা বলার দায়ে শেষে আমাকেও নিয়ে গিয়ে গারদে ভরবে পুলিশ।
দুপদাপ করে গিয়ে ঘরে ঢুকলো মেয়েটা। জানালা দিয়ে শব্দ আসছে। তিন গোয়েন্দার কানে এলো, কাঠের সিঁড়িতে পা ফেলার মচমচ আওয়াজ। দুড়ুম-দাড়ুম আওয়াজ হলো এরপর। নিশ্চয় ড্রয়ার টানাটানি করছে। খানিক পরেই আবার বেরিয়ে এলো মেয়েটা। আঁটো পোশাকের ওপর ঢেলা, লম্বা হাতাওয়ালা গাউনের মতো পোশাক চাপিয়েছে।
এই, নরিনা... বলতে গিয়ে বাধা পেলো ডিগার।
আমি আর এসবের মধ্যে নেই, হাতে একটা বেতের ঝুড়ি নরিনার। সেটাতে জিনিসপত্র উপচে পড়ছে। তার মানে যথাসর্বস্ব যা ছিলো, সব নিয়ে চলে যাচ্ছে সে। সিঁড়ি বেয়ে গিয়ে রাস্তায় নামলো।
মেয়েটাকে চলে যেতে দেখলো ডিগার। পার্কিং লটের দিকে ফিরতে চোখ। পড়লো ছেলেদের ওপর। এই, এই কি চাও তোমরা?
আর লুকিয়ে থেকে লাভ নেই। বেরিয়ে এলো কিশোর। স্পীডওয়ে পেরিয়ে এগোলো বাড়িটার দিকে। তাকে অনুসরণ করলো রবিন আর মুসা। ভাবছি, আমা দেরকে সাহায্য করতে পারবেন, কিশোর বললো। আপনি হয়তো জানেন..
ছুঁচোগিরি করতে এসেছো! জলদি ভাগো! নইলে কুত্তা লেলিয়ে দেবো। যত্তোসব!
রাগে গরগর করতে করতে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো ডিগার। কিশোরের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল মেয়েটা যেদিকে গেছে সেদিকে।
পিছু নেবো নাকি? নিজেকেই যেন প্রশ্নটা করলো কিশোর।
নেয়া উচিত, মুসা বললো। মেয়েটার কথা শুনলে তো? পুলিশের ভয়েই পালাচ্ছে। তারমানে কিছু একটা অন্যায় করেছে।
শোনো, শোনো, ওদেরকে থামালো রবিন। বাড়িটায় আরও কেউ আছে।
কান পাতলো তিনজনেই। একটা লোকের গলা শোনা গেল। কথা বললো, থামলো, তারপর আবার বলতে লাগলো।

নিশ্চয় টেলিফোন, রবিন বললে আবার। এক কাজ করো। তোমরা। ডিগারের পিছু নাও। আমি থাকি। দেখি, কে বেরোয়?

কথাটা পছন্দ হলো কিশোরের। মুসাকে নিয়ে তাড়াতাড়ি রওনা হলো। প্যাসিফিক অ্যাভেনিউর দিকে। দক্ষিণে অনেকখানি এগিয়ে গেছে ততোক্ষণে ডিগার। নতুন কিছু অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং আর একটা বোট ম্যারিনা আছে ওদিকে। দূর থেকে তাকে অনুসরণ করলো কিশোর আর মুসা।

মারমেড কোর্ট থেকে আধমাইল দূরে ছোট একটা মার্কেটে ঢুকলো ডিগার।

দুর, লাভ হলো না, মুসা বললো। খাবার-টাবার কিনবে বোধহয়।

হয়তো। দেখা যাক।

মার্কেটের পার্কিং লটে দাঁড়িয়ে রইলো ওরা। কাঁচের পাল্লার ভেতর দিয়ে দেখতে পাচ্ছে ডিগারকে। গোশতের বাক্স থেকে কিছু নিয়ে সোজা স্ট্যাণ্ডের কাছে। চলে গেল সে।

চট করে একটা গাড়ির আড়ালে বসে পড়লো দুজনে। বেরিয়ে এলো ডিগার। আবার দক্ষিণে এগোলো, ম্যারিনার দিকে। কিছু দূর এগিয়ে মোড় নিয়ে একটা গলিতে ঢুকলো। এগোলো একটা রেস্টুরেন্টের দিকে।

রেস্টুরেন্টটার নাম মুনশাইন। বেশ উঁচু দরেরই মনে হচ্ছে। পার্কিং লটে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল মার্সিডিজ, ক্যাডিলাক আর জাগুয়ার গাড়ি। ওগুলোর। মাঝখান দিয়ে এগোলে ডিগার। মাঝে মাঝে থেমে লাথি মারে গাড়ির টায়ারে।

ব্যাটা টায়ার চোর! মন্তব্য করলো মুসা। ভালো চাকা খুঁজছে।

আমার মনে হয় না। দেখো।

একটা হুডখোলা কনভারটিবলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো ডিগার। সীটের ওপর একটা সেইন্ট বার্নার্ড কুকুর বসে আছে। গলার শেকলটা স্টিয়ারিং হুইলের সঙ্গে বাধা। কুকুরটার চোখে চোখে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ ডিগার। তারপর কথা বলতে আরম্ভ করলো।

উঠে দাঁড়িয়ে লেজ নাড়তে লাগলো কুকুরটা।

হাতের ব্যাগ থেকে গোশত বের করে ওটার দিকে বাড়িয়ে ধরলো ডিগার। গোশত শুঁকল সেইন্ট বার্নার্ড। চাটলো। তারপর খেতে শুরু করলো।

কুত্তা চোর! ফিসফিসিয়ে বললো মুসা।

চুপ করে রইলো কিশোর। দেখছে।

দেখতে দেখতে কুকুরটার সঙ্গে খাতির করে ফেললো ডিগার। গাড়ির দরজা খুলে শেকল খুলতে শুরু করলো।

আর চুপ করে থাকতে পারলো না মুসা। লাফিয়ে উঠে দৌড় দিলো। সিঁড়ি বেয়ে উঠে ঢুকে পড়লো রেস্টুরেন্টের ভেতর। প্রথমে আবছা অন্ধকার একটা হলওয়ে।

তারপরে উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত ডাইনিং রুম। দরজার ভেতরে। দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বললো সে, এই যে শুনছেন? বার্নার্ড কুকুরটা কার? চুরি করে। নিয়ে যাচ্ছে তত!

ঘরের একধারে চেয়ারে বসা একজন লালমুখো মানুষ লাফ দিয়ে উঠে এলো। মুসার পাশ কাটিয়ে দমকা হাওয়ার মতো বেরিয়ে চলে গেল।

রাস্তায় নেমে পড়েছে তখন ডিগার। ব্যাগের গোশতের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে খুশিমনে তার পাশে পাশে চলেছে কুকুরটা।

পিছু নেয়ার চেষ্টাও করলো না কুকুরের মালিক। দুই আঙুল মুখে পুরে সিটি বাজালো।

থমকে দাঁড়িয়ে ফিরে তাকালো বিশাল কুকুরটা।

আবার সিটি বাজালো লোকটা।

হঠাৎই ডিগারের ব্যাপারে সমস্ত আকর্ষণ হারিয়ে ফেললো যেন সেইন্ট বার্নার্ড। দৌড় দিলো মনিবের দিকে।

হাত থেকে শেকলটা খুলে ফেলার চেষ্টা করলো ডিগার। পারলো না। শক্ত করে পেঁচিয়ে নিয়েছিলো শেকলের এক মাথা, টান লেগে আরও শক্ত হয়ে এঁটে গেল। হ্যাঁচকা টানে পেছনে বাঁকা হয়ে গেল তার শরীর। চিৎকার করে সামলানোর চেষ্টা করলো কুকুরটাকে। পারলো না। রাস্তায় চিত হয়ে পড়ে গেল সে। তাকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে চললো সেইন্ট বার্নার্ড।

এই থাম! চেঁচিয়ে চলেছে ডিগার, এই থাম...

অবশেষে কব্জির প্যাঁচ খুলে গেল। গড়িয়ে গিয়ে একটা ল্যাম্প পোস্টে বাড়ি লেগে থেমে গেল ডিগারের দেহটা।

বড় বড় কয়েক লাফে পার্কিং লট পেরিয়ে গিয়ে মনিবের ওপর প্রায় আঁপিয়ে পড়লো কুকুরটা। তার হাত চাটতে শুরু করলো।

কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালো ডিগার। সারা গায়ে ধুলো আর মাটি। কাপড় ছিঁড়েছে। কয়েক জায়গায় ছড়ে গেছে চামড়া। শাই করে রাস্তার মোড় ঘুরে তার পাশে এসে ঘ্যাচ করে ব্রেক কষলো একটা পেট্রোল কার। লাফ দিয়ে নেমে এলো একজন পুলিশ অফিসার। এই, কি হয়েছে তোমার? ব্যথা পেয়েছো?

দৌড় দিলো ডিগার। পার্কিং লট থেকে চলে গেল পানির ধারে। একটা মুহূর্ত দ্বিধা করলো না। ঝাঁপ দিয়ে পড়লো পানিতে। অফিসারকে বোকা বানিয়ে সাঁতরে চললো খোলা সাগরের দিকে।

কুকুরের মনিবের পাশ দিয়ে বারান্দা থেকে নেমে এলো মুসা। কিশোরের দিকে এগোলো। একটা মার্সিডিজের গায়ে হেলান দিয়ে হো হো করে হাসছে গোয়েন্দা প্রধান। হাসতে হাসতে পানি বেরিয়ে গেছে চোখ দিয়ে। তার হাসিটা সংক্রমিত

হলো মুসার মধ্যে। বললো, দারুণ একটা খেল দেখালো! একেবারে পানিতে ফেলে ছেড়েছে। কদ্দিন পর গোসল করলো কে জানে!
হাসি কমে এলো অবশেষে কিশোরের। জোরে জোরে দম নিয়ে বললো, এসো, যাই। রবিন কি করছে দেখিগে। বলেই আবার হা হা করে হেসে উঠলো।

.

পার্কিং লটে একটা গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে অপেক্ষা করছে রবিন। খোলা জানালা দিয়ে কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে, কিন্তু কথা বোঝা যাচ্ছে না। আরেকটু এগিয়ে যাবে? বাড়ির সামনের সিঁড়িতে গিয়ে বসবে? নাকি পেছনের বেড়ার ভেতরে চলে যাবে?
ঠিক এই সময় একসঙ্গে ঘেউ ঘেউ করে উঠলো কুকুরগুলো। নাহ্, ভেতরে ঢোকা অসম্ভব। কিছু একটা দেখে চিৎকার করছে ওগুলো।
সামান্য সরতেই ট্রাকটা, চোখে পড়লো রবিনের। বাড়ির পাশের ড্রাইভওয়েতে পার্ক করা, বেড়ার বাইরে, একটা খোলা জায়গার ঠিক নিচে।
ট্রাকের পেছনে বস্তা আর বিছানার পুরানো গদি ফেলে রাখা হয়েছে কয়েকটা। নিশ্চয় কাঁচের জিনিসপত্র বহন করে ট্রাকটা। গদি আর বস্তার ওপর সাজিয়ে রাখা হয় যাতে না ভাঙে। নোঙরা, ময়লা গদিগুলো। কিন্তু দ্বিধা করার সময় নেই। একছুটে চলে এলো ট্রাকের পেছনে। উঠে পড়লো। লুকিয়ে পড়লো একটা গদির তলায়।
হ্যাঁ, বাড়ির ভেতরের লোকটার কথা এখন পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে রবিন। লোকটা উন্মাদ। কি যে করে বসবে ঠিক নেই। সর্বনাশ হয়ে যাবে তখন। সে। জন্যেই আরেকটা জায়গা খুঁজছি। এরই মধ্যে দুবার ঘুরে গেছে পুলিশ। জেনে যাবেই।
একটু বিরতি দিয়ে অসহিষ্ণু কণ্ঠে বললো লোকটা, বড় ব্যাপার নয় মানে! অনেক বড় ব্যাপার! রাবিশ বিনে ফেলে রাখা কুত্তাটার কথা শোনোনি?
শক্ত হয়ে গেল রবিন। ডবের কথা বলছে।
আরে ঠিকই আছি আমি, ঠিকই আছি, বলে যাচ্ছে লোকটা। পাগল হইনি। যা-ই বলো, আমি থাকছি না। এখন যাচ্ছি, কিছু টাকা জোগাড় করতে পারি কিনা, দেখি। দরকার আছে।
আবার নীরবতা। তারপর লোকটা বললো, ঠিক আছে। যা হয় হবে। স্লেভ মার্কেট তো আছেই।
অবাক হলো রবিন। স্লেভ মার্কেট?
রিসিভার নামিয়ে রাখার শব্দ হলো। শুয়েই আছে রবিন। দরজা লাগানোর আওয়াজ হলো। তারপর বারান্দায় পদশব্দ।

শঙ্কিত হলো রবিন। লোকটা পেছনে আসবে না তো? না, এলো না। ট্রাকের দরজা খুলে উঠে বসলো একজন। গর্জে উঠলো ইঞ্জিন। ঝাঁকুনি দিয়ে চলতে শুরু করলো ট্রাক। ড্রাইভওয়ে থেকে রাস্তায় এসে উঠলো, বোঝা গেল।
অস্থির ভাবনা চলেছে রবিনের মাথায়। একবার ভাবলো লাফিয়ে পড়ে। পরে ভাবলো, দেখাই যাক না কোথায় যায়? লোকটা কে? ডিগারের রুমমেট? বিপদের আশঙ্কা করছে লোকটা, টেলিফোনে তার আলাপ থেকেই বোঝা গেছে। কার কাছ থেকে বিপদ? ডিগার? কিটুর ব্যাপারে কি কিছু জানে? তার আচরণ নিঃসন্দেহে সন্দেহজনক।
নিশ্চয় এখন রহস্যময় স্লেভ মার্কেটে চলেছে লোকটা। হয়তো ওখানে কিটুর নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারে কোনো সূত্র পাওয়া যাবে।
ট্রাক চলেছে। মাঝে মাঝে উঁকি দিয়ে মুখ বের করে দেখছে রবিন। শহরের রাস্তা, দোকান-পাট চোখে পড়ছে। সব অপরিচিত।
অবশেষে থামলো ট্রাক। ইঞ্জিন বন্ধ হলো। ড্রাইভার বেরিয়ে যাওয়ার সময় মচমচ শব্দ উঠলো ট্রাকের সামনের অংশে।
লোকটা কি পেছনে আসবে? লাফিয়ে উঠে ঝাঁপ দিয়ে মাটিতে পড়ার জন্যে তৈরি হলো রবিন।
কিন্তু এবারেও পেছনে এলো না লোকটা। তার পদশব্দ সরে যেতে লাগলো। যানবাহনের আওয়াজ কানে আসছে। বেশ ভিড়। আস্তে মাথা তুলে ট্রাকের পাশ দিয়ে উঁকি দিলো রবিন। চওড়া একটা জায়গার মধ্যে দিয়ে অনবরত আসছে যাচ্ছে। নানারকম গাড়ি। রাস্তার দুই ধারে সারি সারি দোকানপাট। পথের পাশে এক জায়গায় জটলা করছে কিছু লোক। প্রায় সবাই বিশাল দেহী, পরনে কাজের পোশাক। কারো কারো পায়ে ভারি বুট, কারো মাথায় শক্ত হ্যাট। কালো চামড়ার লোক আছে, বাদামী চামড়ার আছে, বিভিন্ন দেশের মানুষ ওরা।
পথের মোড়ে একটা গাড়ি এসে থামলো। দ্রুত কয়েকজন লোক গিয়ে। ড্রাইভারকে ঘিরে দাঁড়ালো, কথা শুরু করে দিলো একসঙ্গে। এই সুযোগে টুক করে নেমে পড়লো রবিন। সরে গেল ট্রাকের কাছ থেকে।
শখানেক গজ দূরে একটা নিচু দেয়াল দেখে তার ওপর উঠে বসলো। কৌতূহলী চোখে দেখতে লাগলো লোকগুলোকে।
একটু পর পরই এসে মোড়ের কাছে গাড়ি থামছে। জটলার মধ্যে থেকে কিছু লোক যাচ্ছে বসা লোকের সঙ্গে কথা বলতে। কোনো কিছু নিয়ে মনে হয় দর কষাকষি করছে। কথায় বলে উঠে বসছে গাড়িতে, না বলে সরে আসছে।
একজন লোক এসে রবিনের পাশে বসলো। ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে আপনমনেই মাথা নাড়লো। তারপর তাকালো রবিনের দিকে, এই ছেলে, কি চাই

তোমার এখানে? কাজ?
বুঝতে না পেরে তাকিয়ে রইলো রবিন। আমি এই হাঁটতে হাঁটতে...ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। একটু জিরিয়ে নিচ্ছি। আপনি কি কাজ খুঁজতে এসেছেন?
মাথা ঝাঁকালো লোকটা। আমরা সবাই সে জন্যেই এসেছি। এটা স্লেভ মার্কেট। নাম শোনোনি?
না। সাংঘাতিক কাণ্ড! দাস ব্যবসা কি এখনও হয় নাকি?
হাসলো লোকটা। আরে না না, ওরকম কিছু না। শ্রমিকরা আসে এখানে। কাজের জন্যে। দাঁড়িয়ে থাকে। যাদের কাজ করানো দরকার, তারাও আসে, দামদর করে লোক নিয়ে যায়। হয়তো দেয়াল ধোয়ানোর দরকার পড়লো তোমার, বাগানের ঘাস সাফ করানো দরকার পড়লো, চলে আসবে স্লেভ মার্কেট। লোক পেয়ে যাবে।
ডেনিম শার্ট আর রঙচটা জিনস পরা মোটা একজন লোক জটলা থেকে বেরিয়ে হেঁটে গেল ট্রাকটার কাছে। সামনের দরজা খুলে এক প্যাকেট সিগারেট বের করলো। ভেতর থেকে। তারপর আবার গিয়ে দাঁড়ালো জটলায়। রবিন আন্দাজ করলো, এই লোকটাই ডিগারের রুমমেট।
মোড়ের কাছে এসে থামলো একটা নীল বুইক। বেরিয়ে এলো একজন লোক। বেশ ভালো স্বাস্থ্য, ধূসর পুরু গোঁফ। পরনে হালকা রঙের স্ল্যাকস, গায়ে গাঢ় রঙের শার্ট। মাথায় নাবিকের টুপি। চোখে কালো চশমা।
দেখলে? রবিনকে বললো তার পাশে বসা লোকটা। এখানে প্রায়ই আসে ও। এমন শ্রমিক ভাড়া করে নিয়ে যায়, যার ট্রাক আছে।
ডিগারের রুমমেটের কাছে এগিয়ে গেল টুপিওয়ালা। কথা বলতে লাগলো– দুজনে। অবশেষে মাথা ঝাঁকালো রুমমেট। নিজের ট্রাকে গিয়ে উঠলো। নীল গাড়ির পেছনে পেছনে চালিয়ে চলে গেল।
নিয়ে গেল, বললো রবিনের সঙ্গী।
আনমনে মাথা ঝাঁকালো রবিন। খুব হতাশ হয়েছে। ভেবেছিলো এখানে এসে কোনো জরুরী সূত্র পেয়ে যাবে। ওসব কিছুই পায়নি, শুধু জানলো স্লেভ মার্কেটে শ্রম বেচাকেনা হয়। আর বসে থেকে লাভ নেই। দেয়াল থেকে নেমে রাস্তা ধরে এগোলো। সৈকত থেকে কয়েক মাইল দূরে এই জায়গা, মোড়ের একটা সাইন বোর্ড দেখে বুঝলো। জায়গাটার নাম ল্যাব্রিয়া।

.

কোথায় ছিলে এতোক্ষণ? মুসা জিজ্ঞেস করলো।
মারমেড কোর্টে উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করছে সে আর কিশোর।
সব খুলে বললো রবিন।

হু, কিশোর বললো, স্লেভ মার্কেটের কথা আমিও শুনেছি। আমাদের কেসের সাথে বোধহয় সম্পর্ক নেই এর। একটা ব্যাপার বোঝা গেল, ডিগারের ঘরে আরও লোক থাকে। কিটুর হারানোর পেছনে ওদের কোনো হাত না থাকলেও হয়তো। ডিগারের আছে।
আচ্ছা, মুসা বললো, ওই পুরানো বাড়িটাতে আটকে রাখেনি তো কিটুকে?
মাথা নাড়লো রবিন। মনে হয় না। পুলিশকে ভীষণ ভয় পায় ডিগারের রুমমেটরা। কিটুকে ওখানে নিয়ে গেলে বহু আগেই পালাতো ওরা। নাহ্, কিটু নেই ওখানে। তবে আমার মনে হচ্ছে কুকুরগুলো সাধারণ কুকুর নয়।
হতেও পারে, কিশোর বললো। সেইন্ট বানার্ডটা চুরি করতে গিয়ে কি রকম হেনস্তা হয়েছে ডিগার, রবিনকে বললো সে। আবার হাসতে আরম্ভ করেছে।
হাসলো মুসাও। বললো, লোকটার অবস্থা যদি তখন দেখতে!
হাসি মুছতে পারছে না কিশোরও। বললো, যথেষ্ট হয়েছে, চলো বাড়ি যাই। হেডকোয়ার্টারে কাজ আছে।
বুকশপের সামনে থেকে পার্ক করা সাইকেলের তালা খুলছে ওরা, এই সময় সৈকতের দিক থেকে এলো ব্রড ক্যাম্পার। তিন গোয়েন্দাকে দেখেই ভারিক্কি করে তুললো চেহারা। জিজ্ঞেস করলো, খবর আছে?
না, এখনও কিছু পাইনি, জবাব দিলো কিশোর।
দরজায় এসে দাঁড়ালো নিনা হারকার।
সহানুভূতি দেখিয়ে তাকে বললো ক্যাম্পার, এতো ভয় পেও না। ছেলেটা দুষ্টুমি বেশি করে তো, হয়তো তোমাকে ভয় দেখানোর জন্যেই এখন কোথাও গিয়ে লুকিয়েছে। নির্জন দ্বীপে বন্দি লং জন সিলভার। বইটা পড়েছে নিশ্চয়?
না, পড়িনি, মাথা নাড়লো নিনা।
তাই? তাহলে হয়তো পু সেজেছে, চলে গেছে উত্তর মেরুতে। কিংবা বাক রোজার সেজে উড়ে গেছে অন্য কোনো গ্রহে। যা উল্টোপাল্টা কল্পনা না তোমার ছেলের। অবশ্য যদি কোথাও চিত হয়ে... চুপ হয়ে গেল ক্যাম্পার।
বুঝে ফেলেছে ছেলেরা। ও বলতে চেয়েছে কোথাও চিত হয়ে যদি পানিতে না ভাসে।
রক্ত সরে গেল নিনার মুখ থেকে। তাকিয়ে রয়েছে ক্যাম্পারের দিকে।
ওহহো, তাড়াতাড়ি বললো ক্যাম্পার, দেখো, কি বলতে কি বলে ফেললাম। কখন যে মুখ ফসকে যায়। আসলে..আসলে..ছোটবেলায় দেখেছি তো ভুলতে পারি না। আমার ছোট ভাইটা খেলতে খেলকে গিয়ে...এরপর থেকে বাচ্চা ছেলে হারালেই আমার ওই এক ভয়। কষ্ট দিয়ে ফেলেছি তোমাকে, কিছু মনে করো না।
চুপ করে রইলো নিনা। দুচোখ থেকে গাল বেয়ে নেমে আসছে পানি।

আর কিছু বললো না ক্যাম্পার। গ্যালারির দিকে রওনা হলো।

.

সেদিন বিকেলে হেডকোয়ার্টারে মিলিত হলো তিন গোয়েন্দা।

রবিন আর মুসা ঢুকে দেখলো, ট্রেলারের বুক শেলফ বই ঘটছে কিশোর ওদেরকে দেখে মুখ ফেরালো।

রেফারেন্স বই খুঁজছি পুরানো সিনেমার ওপর।

কিশোরের সিনেমা-প্রীতির কথা জানা আছে অন্যদের। চুপ করে রইলো।

গত বসন্তে হলিউডের সানডাউন থিয়েটারে পুরানো কিছু ব্যারি ব্রীম ছবি দেখিয়েছিলো, কিশোর বললো। ব্রীমের কথা মনে আছে? হেনরী হকিনস সিরিজে গোয়েন্দার অভিনয় করেছিলো।

মুখ বাঁকালো মুসা। কি যে বলো। তখন তো জন্মই হয়নি আমাদের, দেখবো কি করে?

জন্মের আগের ছবি জন্মের পরে দেখতে অসুবিধে হয় না। যাকগে, ব্রীমের কিছু ছবিকে এখন ক্লাসিক হিসেবে ধরা হয়। চলচ্চিত্র উৎসবে দেখানো হয় ওই ছবি। একটা ছবির কাহিনী ছিলো একটা ছেলেকে নিয়ে, যে দশ লাখ ডলারের মালিক। হয়েছিলো উত্তরাধিকার সূত্রে। তার পর পরই একটা ডোবায় তার লাশ ভাসতে দেখা যায়। এরপর একের পর এক খুন হতে থাকে মানুষ। উত্তরাধিকার সূত্রে ওই টাকা যার হাতেই যায় সে-ই খুন হয়ে যায়।

ডোবায় ভাসছিলো? ভুরু কোঁচকালো মুসা।

ব্রড ক্যাম্পারের ভাইয়ের মতো! বললো রবিন।

কিংবা তার বন্ধুর মতো, কিশোর বললো। কোনটা সত্যি সে-ই জানে। বই ঘাটছি সে জন্যেই। ব্রীমের ছবির কোনো স্টিল মেলে কিনা দেখছি।

শেলফ থেকে পুরানো একটা বই নামিয়ে আনলো কিশোর। ডেস্কের ওপর রেখে পাতা ওল্টাতে লাগলো। কিছুক্ষণ পর থেমে গিয়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো, এই তো, পেয়েছি!

ছবিটার নাম স্ক্রীম ইন দা ডার্ক। একটা রহস্য কাহিনী নিয়ে করা। বইয়ের। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, ডোবায় ভাসছে একটা বাচ্চা ছেলের লাশ। পাড়ে দাঁড়িয়ে গলা বাড়িয়ে সেটা দেখছে একজন আর্দালী।

দেখার জন্যে কিশোরের কাঁধের ওপর দিয়ে ঝুঁকে এলো মুসা আর রবিন।

আরেকটা ছবিতে দেখা গেল, ডোবার পাড়ে এসে ভিড় করেছে অনেক লোক। পানির একেবারে ধারে বসে লাশটাকে ধরার জন্যে হাত বাড়িয়েছে আর্দালী। ধরতে তাকে বাধা দিচ্ছে ডিটেকটিভ হেনরী হকিনস, অর্থাৎ ব্যারি ব্রীম। তার

পেছনে দাঁড়িয়ে আছে দুজন পুলিশ। একজনের বয়েস খুবই কম-কিশোরই বলা চলে। মাথার টুপিটা খুলে হাতে নিয়েছে সে। বেশ সুন্দর চেহারা।
খাইছে! এ তো ব্রড ক্যাম্পার!
হ্যাঁ, মাথা ঝাঁকালো কিশোর। আমার মনে হচ্ছিলো, এই ছবিতেই ক্যাম্পারকে দেখেছি। তাই বই বের করলাম, শিওর হওয়ার জন্যে।
লোকটা মিথ্যুক! বিরক্তিতে কুঁচকে গেল ররিনের নাক। না ছিলো ছোট ভাই। তার, না ছিলো বন্ধু। গল্পটা বলেছে ও, কারণ-কারণ... বলতে না পেরে থেমে গেল সে।
রহস্যটা এখানেই, আনমনে বললো কিশোর। এরকম গল্প কেন বলতে গেল। ক্যাম্পার? তার নিজের জীবনে সত্যি সত্যি ঘটেনি তো ও রকম কিছু?
আল্লাহই জানে, হাত ওল্টালো মুসা। কিন্তু বেশি কাকতালীয় হয়ে যাবে না?
তা হবে। যদি মিথ্যেই বলে, তাহলে পুরানো একটা ছবির গল্প চুরি করে বলতে যাবে কেন?
রহস্যই! মাথা দোলালো রবিন। একটা কারণ হতে পারে। ছবির ওই দৃশ্যটা বোধহয় তার খুব মনে ধরেছিলো। কিটুর ওপর সেটা চালিয়ে দিয়ে এক ধরনের আনন্দ পাচ্ছে। ওরকম স্বভাবের লোক আছে।
কিছু বলতে যাচ্ছিলো কিশোর, এই সময় টেলিফোন বাজলো। রিসিভার তুলে নিলো কিশোর, বলুন?
কিশোর পাশা?
মিস এমিনার! প্রায় চিৎকার করে বললো কিশোর। অবাক হয়েছে। তাড়াতাড়ি ফোনের লাইনের সঙ্গে লাগানো স্পীকারের সুইচ অন করে দিলো। যাতে রবিন আর মুসাও শুনতে পারে।
নিনার কাছে তোমাদের ফোন নম্বর পেয়েছি। ইন্টারেসটিং নিউজ আছে। পুলিশকে বলতে পারতাম, কিন্তু ওরা গুরুত্ব দেবে বলে মনে হয় না। তাই তোমাদেরকেই ধরলাম।
কি হয়েছে?
ওশন ফ্রন্টে হাঁটতে গিয়েছিলাম। ব্রড ক্যাম্পারকে দেখলাম গ্যালারি থেকে বেরিয়ে আসছে, হাতে একটা কাগজের লম্বা প্যাকেট।
বলুন বলুন!
তার আচরণ ভালো লাগেনি আমার। উসখুস করছিলো, আর এদিক ওদিক তাকাচ্ছিলো। দেখেও না দেখার ভান করলাম। মুখ ঘুরিয়ে তাকিয়ে রইলাম সাগরের দিকে।
তারপর?
ভেনিস পিয়ারের দিকে চলে গেল সে। পিছু নিলাম।

তারপর?
কিছুদূর এগিয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল সে। এমন ভান করলো, যেন সূর্যাস্ত দেখছে। তারপর আরেকটু এগিয়ে পিয়ারের আড়ালে চলে গেল। আবার যখন বেরিয়ে এলো, দেখি হাতের প্যাকেটটা নেই।
কি ধরনের প্যাকেট? কতো ভারি হবে? কি রকম...
কিটুর লাশ ছিলো ভাবছো তো? না, তা নয়। বেশি বড় না, ভেতরে অন্য কিছু ছিলো।
কি ছিলো?
সেটা জানতে হবে তোমাদের।
নিনাকে কিছু বলেছেন?
মাথা খারাপ! বয়েস হয়েছে বটে, কিন্তু চিন্তা-ভাবনা এখনও ভালোই করতে পারি।
আপনি কিছু আন্দাজ করতে পারেন, কি ছিলো ভেতরে?
নাহ!... ঠিক আছে, রাখলাম।
অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, মিস এমিনার।
লাইন কেটে গেল।
যাক, খুশি হয়ে বললো মুসা, স্কুবা ডাইভিঙের একটা সুযোগ বোধহয় মিললো। বস্তাটা নিশ্চয় পানিতে ফেলেছে ব্যাটা।

.

পরদিন সকালে সৈকতে পৌঁছলো তিন গোয়েন্দা। রোলস রয়েসে করে ওদেরকে নিয়ে এসেছে হ্যানসন। ধূসর, কুয়াশাচ্ছন্ন সকাল। লোকজন বেশি নেই ওশন ফ্রন্টে।
পরে ভিড় হবে, হ্যানসনকে বললো কিশোর। এখন অল্প আছে। সুবিধেই হয়েছে আমাদের।
পিয়ারের পার্কিং লটে গাড়ি ঢোকালো হ্যানসন। পেছনের সীটে হেলান দিয়ে আছে মুসা। গাড়ি থামতেই ডুবুরির পোশাক পরতে আরম্ভ করলো। বেরোলো গাড়ি থেকে। তার পিঠে এয়ার ট্যাংক বাঁধতে সাহায্য করলো রবিন আর কিশোর। পরে মুখে মাউথপীস লাগিয়ে পানিতে নেমে গেল মুসা।
ও কয়েক ফুট যেতে না যেতেই কনুই দিয়ে কিশোরের গায়ে গুতো দিলো রবিন। হাত তুলে দেখালো।
ওশন ফ্রন্টে এসে হাজির হয়েছে ডিগারের রুমমেট। সৈকতের পিজা স্ট্যাণ্ডের। কাউন্টারে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছে। পিজা আর সফট ড্রিংক দিয়ে নাস্তা করছে।
আশ্চর্য! অবাক হয়ে বললো হ্যানসন। এই সময়ে পিজা!

আরেক দিক থেকে ঠেলা ঠেলতে ঠেলতে এসে উদয় হলো বরগু। পেছনে আসছে নিতান্ত বাধ্য ছেলের মতো কুকুর দুটো। পিজা স্ট্যাণ্ডের কাছে এসে? কাউন্টারের ওপাশে দাঁড়ানো সেলসম্যানকে ইশারা করলো সে।
পিজা শেষ করে কাউন্টারের কাছ থেকে সরে এলো রুমমেট। স্পীডওয়ের দিকে চললো।
এই, মূসার ওপর চোখ রাখার দরকার নেই, রবিন বললো। আমি যাচ্ছি ওর পিছে। দেখি কোথায় যায়?
সাগরের দিকে তাকালো আবার কিশোর। ডুব দিচ্ছে মুসা। মুহূর্তে তলিয়ে গেল মাথাটা।
ঠিক আছে, রবিনকে বললো গোয়েন্দাপ্রধান, যাও। হুশিয়ার থাকবে। ওরা কতোটা খারাপ লোক জানি না এখনও। সাবধান!
থাকবো। এগিয়ে গেল রবিন। পিজা স্ট্যাণ্ডের পাশ কাটাচ্ছে সে, এই সময় বেরিয়ে এলো বরগু। হাতে একটা কাগজের ঠোঙা। ঠেলা গাড়িতে ঠোঙাটা রেখে। গাড়ি ঠেলে নিয়ে এগোলো আবার যেদিক থেকে এসেছিলো সেদিকে।
রবিনের সাহায্য লাগবে? কিশোরকে জিজ্ঞেস করলো হ্যানসন। যাবো নাকি ওর পেছনে?
হাসলো কিশোর। গোয়েন্দাগিরি করে হ্যানসনও আনন্দ পায়, সেজন্যেই যেতে চাইছে। বললো, লাগবে না।
হতাশ মনে হলো শোফারকে। মারমেড কোর্টের ওধারে হারিয়ে গেল রবিন। মুসার দিকে নজর ফেরালে কিশোর আর হ্যানসন। পানির ওপরে দেখা যাচ্ছে একসারি বুদবুদ, মুসা কোন দিকে চলছে বুঝিয়ে দিচ্ছে।

.

ধীরে ধীরে সাঁতরে চলছে মুসা, তলদেশের সামান্য ওপর দিয়ে। পানি তেমন পরিষ্কার না। ঘোলা। ক্যাম্পারের ছুঁড়ে দেয়া প্যাকেটটা এই পানিতে খুঁজে বের করতে পারবে কিনা সন্দেহ হলো তার। তাছাড়া পরিত্যক্ত জিনিসের অভাব নেই। এখানে। বোতল, ক্যানেস্তারা, আরও হাজারো রকম জিনিসে বোঝাই হয়ে আছে সাগরের তলদেশ। একটা চটের পোটলা দেখে সেটা ধরে টান দিলো সে। বেরিয়ে। পড়লো বাতিল একটা ডুবুরির পোশাক। সেটা ছেড়ে আবার আগে বাড়লো সে।
পিয়ার বায়ে রেখে এগোচ্ছে মুসা।
হঠাৎ একটা নড়াচড়া টের পেয়ে মাথা ঘোরালো। ডানে নড়ছে কিছু। তলদেশ ধরে যেন ঠেলে এগিয়ে এলো কিছুদূর ওটা, তারপর ওপরে উঠলো। —
হাঙর।

বিশাল হাঙরের হাঁ করা মুখে তীক্ষ্ণ দাঁতের সারি দেখতে পেলো মুসা। অলস ভঙ্গিতে সঁতরাচ্ছে, কোনো তাড়া নেই। থেমে গেছে মুসা। নিঃশ্বাস বন্ধ করে। ফেলেছে। একেবারে স্থির হয়ে ভাসছে। হাঙর সম্পর্কে নানারকম তথ্য ভিড় করে। আসছে মনে।–

কোনো কোনো হাঙর মানুষ দেখলেই আক্রমণ করে। তবে বেশির ভাগই করে। এটা কি করবে? অনেক সময় জোর শব্দ কিংবা চিৎকার শুনলে ঘাবড়ে গিয়ে। সরে যায় হাঙর।

জোর শব্দ? এমন শব্দ বলতে একমাত্র মুসার হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকানি। দশ ফুট পানির তলায় কি করে জোরালো আওয়াজ করবে? চিৎকার করতে পারবে না। পানির ওপরে যেমন হাত নেড়ে দাপাদাপি করে শব্দ করা যায়, নিচে সেটাও পারা যায় না।

একটা পাথরের দিকে আস্তে হাত বাড়ালো মুসা। তুলে নিলো। আরেকটা লাগবে। দুটো ঠোকাঠুকি করলে শব্দ হবে, কিন্তু তাতে কি পালাবে হাঙর?

আওয়াজ না করলে কিছু বোঝা যাবে না। কে জানে, ওই আওয়াজে না পালিয়ে রং রেগে গিয়ে এসে আক্রমণ করে বসবে!

কিন্তু চেষ্টা তো করে দেখতে হবে। আবার হাত বাড়ালো মুসা। হাতে। লাগলো গোল, শক্ত একটা জিনিস।

দুঃস্বপ্ন দেখছে যেন মুসা।

হঠাৎ আতঙ্কের ঠাণ্ডা শিহরণ বয়ে গেল তার শিরদাঁড়া বেয়ে।

এগিয়ে আসছে হাঙরটা!

ডিগারের রুমমেটকে অনুসরণ করে চলছে রবিন।

পুরানো বাড়ির সিঁড়িতে লোকটা পা রাখতেই পেছনের বেড়ার ভেতর থেকে কুকুরের চিত্তার শোনা গেল। পার্কিং লটে একটা গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে কি ঘটে দেখতে লাগলো রবিন।

পেছনে দরজা খোলার শব্দ হলো। ফিরে তাকালো সে।

গ্যালারির পেছনের দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছে ব্রড ক্যাম্পার। পরনে একটা হালকা নীল রঙের স্ন্যাকস। গায়ে একই রঙের শার্ট। নেমে আসছে সিঁড়ি বেয়ে।

লোকটার অলক্ষ্যে থেকে তার ওপর নজর রাখলো রবিন।

স্পীডওয়ে পেরিয়ে ওশন ফ্রন্টের দিকে চললো ক্যাম্পার।

ডিগারের বাড়িতে কিছু ঘটছে না। বোধহয় ঘটবেও না, ভেবে, ক্যাম্পারের পিছু নেয়ার সিদ্ধান্ত নিলো রবিন। লোকটা বেশ কিছুদূর এগিয়ে যাওয়ার পর আড়াল থেকে বেরোলো সে। পিছু নিলো।

বেশ কিছুটা আগে রয়েছে ক্যাম্পার। উত্তরে চলেছে দ্রুত পায়ে। মারমেড কোর্টের পরে আরও পাঁচ ব্লক এগোলো, তারপর ঢুকে পড়লো একটা গলিতে।
পিছে লেগে রইলো রবিন। গলিটার নাম ইভলিন স্ট্রীট। পথের পাশে পুরানো বাড়িঘর। কোথাও কোথাও গাড়ি আছে। পুরানো মডেলের পুরানো গাড়ি। বারান্দায় খেলছে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা। পথে আর বাড়িঘরের ফাঁকে যত্রতত্র। ঘুরে বেড়াচ্ছে কুকুর।
পুরানো একটা অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকলো ক্যাম্পার।
রবিন ভাবছে, এখানে কেন এসেছে লোকটা? এরকম জায়গায় তার বন্ধু-বান্ধব আছে?
বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেল। নিচু হয়ে জুতোর ফিতে বাধার ভান করলো। চোখের কোণ দিয়ে দেখছে বাড়ির ভেতরে কি আছে। খোলা দরজা দিয়ে একটা ছোট চত্বর চোখে পড়লো। কোনো মানুষ দেখা গেল না।
আবার সোজা হয়ে রাস্তা পেরিয়ে এলো রবিন। লুকিয়ে থেকে চোখ রাখার। জন্যে একটা সুবিধেমতো জায়গা খুঁজছে। একটা উঁচু বারান্দায় খেলছে দুটো ছেলে। ওটার সিঁড়িতে এসে বসলো সে। যেন ওদেরই একজন।
বসে আছে তো আছেই। অ্যাপার্টমেন্টের ভেতরে কি যে হচ্ছে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে একেবারে শূন্য, নির্জন। জানালার ভারি পর্দাগুলোর কোনোটাই সরা তো দূরের কথা, সামান্য কাঁপছেও না।
মিনিটের পর মিনিট কাটছে।
পনেরো মিনিট পর একটা গাড়ি বেরিয়ে এলো বাড়িটার পাশ থেকে। নীল বুইক। তীক্ষ্ণ হলো রবিনের দৃষ্টি। চেনা চেনা লাগছে গাড়িটা। ড্রাইভিং সীটে বসা আরোহীকেও চেনা লাগছে।
ঠিক! স্লেভ মার্কেটে দেখেছিলো আগের দিন! এই লোকটাই ডিগারের রুমমেটকে ট্রাকসহ ভাড়া করেছিলো। সেই একই টুপি মাথায়। চোখে কালো চশমা। পুরু গোফ।
রাস্তায় উঠে পুব দিকে মোড় নিলো গাড়িটা। গতি বাড়িয়ে চলে গেল।
নোটবুক বের করে নম্বর প্লেটের নম্বর আর বাড়িটার নম্বর লিখে ফেললো রবিন। নোটবুক বন্ধ করে ভাবতে লাগলো-বুইকের ওই আরোহীর সঙ্গেই দেখা করতে। এসেছে নাকি ক্যাম্পার? লোকটার সঙ্গে ডিগারের কোনো রকম যোগাযোগ আছে? নাকি যোগাযোগটা ডিগারের রুমমেটের সঙ্গে। স্লেভ মার্কেটে রুমমেটকে ভাড়া করার ব্যাপারটা কি শুধুই কাকতালীয় ঘটনা?
এভাবে এখানে বসে থাকাটা ঠিক হচ্ছে না। ক্যাম্পার বেরিয়ে তাকে দেখলেই বুঝে যাবে, নজর রাখছে রবিন।

উঠে অন্য কোথাও সরে যাওয়ার জন্যে জায়গা খুঁজলো সে। পেলো না। পায়ে। পায়ে আবার এগিয়ে গেল অ্যাপার্টমেন্ট হাউসটার কাছে। কেমন যেন রহস্যময় লাগছে। কোনো নড়া নেই চড়া নেই শব্দ নেই। যেন ভূতের বাড়ি, মানুষ বাস করে না এখানে।

কয়েকবার দ্বিধা করে শেষে বাড়িটার আরও কাছে চলে এলো রবিন। দরজার বেল বাজালো। কেউ এলো না।

আরকটা দরজার আরেকটা বেল বাজলো। জবাব নেই। তৃতীয় আরেকটা বাজিয়েও সাড়া পাওয়া গেল না।

একটা জানালার কাছে এসে নাক চেপে ধরলো কাঁচের গায়ে। কাঠের মেঝে চোখে পড়লো। নির্জন। ধুলোয় ঢাকা। কয়েকটা খালি বাক্স পড়ে রয়েছে। বাড়িতে কেউ আছে বলে মনে হয় না। আলো জ্বলছে না। নিশ্চয় বিদ্যুৎ নেই। আর সে কারণেই হয়তো বেলের সুইচ টিপেও লাভ হয়নি, ঘণ্টা বাজেনি।

কিন্তু ক্যাম্পার গেল কোথায়?

সদর দরজা দিয়েই তো ঢুকেছিল..

হঠাৎ দম বন্ধ করে ফেললো রবিন। বুঝে ফেলেছে! সদর দরজা দিয়ে ঢুকেছে বটে, কিন্তু বাড়ির ভেতরে নেই ক্যাম্পার, বেরিয়ে গেছে পেছনের কোন দরজা দিয়ে। তারপর গাড়ি হাঁকিয়ে চলে গেছে। নীল বুইক! আলগা গোঁফ লাগিয়ে নিয়েছে। মাথায় নাবিকের টুপি। চোখে কালো চশমা।

পেছনে ভারি বুটের শব্দ হলো। ঝট করে ফিরে তাকালো সে। চমকে গেল।

বিশালদেহী একজন মানুষ। মাঝবয়েসী। টাকা মাথা। খপ করে রবিনের হাত চেপে ধরে বললো, এই ছেলে, এখানে কি?

শুকনো গলায় জানালো রবিন, ইস্কুলের ম্যাগাজিনের জন্যে রিসার্চ করছি, তথ্য সংগ্রহ করছি। নিজের কানেই বেখাপ্পা শোনালো কথাটা।

লোকটাও বিশ্বাস করলো না। ধমক দিয়ে বললো, মিছে কথা বলার আর জায়গা পাওনি! ওই সিঁড়িতে বসে বসে চোখ রাখছিলে, দেখেছি আমি। তারপর উঠে এসেছে চুপি চুপি। জানালা দিয়ে উঁকি দিয়েছে। নিশ্চয় চুরির মতলব?

না না, আপনি ভুল করছেন! প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো রবিন। আমি চোর নই! লোকের সঙ্গে কথা বলতেই এসেছি। বেলপুশ টিপলাম। কেউ এলো না।

হাতের চাপ সামান্য ঢিল হলো।

এই সুযোগে এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে দৌড় দিলো রবিন।

এই থামো! থামো বলছি! চিৎকার শুরু করলো লোকটা। নইলে ভালো হবে না…

রবিন কি আর দাঁড়ায়? ঝেড়ে দৌড়াতে লাগলো।

.

মুসার মাথার ওপর চক্কর দিচ্ছে হাঙর।
হুমকির ভঙ্গিতে নামলো একবার। সঙ্গে করে ছুরি আনা উচিত ছিলো, আফসোস করলো মুসা। যখন ভাবলো, এইবার হামলা চালাবে, ঠিক তখনই হঠাৎ নাক উঁচু করে উঠে গেল ওটা। কয়েক ফুট উঠে দ্রুতগতিতে চলে গেল গভীর পানির দিকে। যাক, বাঁচা গেল। আবার দম নিতে আরম্ভ করলো মুসা।
শক্ত কি যেন ধরে রয়েছে, মনে পড়লো এখন। পাথর নয় জিনিসটা। শক্ত, গোল, পিচ্ছিল কি যেন। ঘোলাটে পানিতেও চিনতে অসুবিধে হলো না তার। একটা জলকন্যার মাথা। চীনামাটির তৈরি। নিশ্চয় ব্রড় ক্যাম্পারের হারানো জলকন্যা! টুকরো টুকরো হয়ে সাগরের তলায় ছড়িয়ে রয়েছে মূর্তিটার অন্যান্য অংশ। এখনো কোনো কোনোটাতে জড়িয়ে রয়েছে ছেঁড়া বাদামী কাগজ।
এই তাহলে ব্যাপার! মূর্তিটাকেই এনে পানিতে ফেলে গেছে ক্যাম্পার! কিন্তু। কেন? কয়েকটা টুকরো তুলে নিয়ে যাবে কিনা ভাবছে সে, এই সময় চোখের কোণে আবার দেখলো নড়াচড়া। কি ওটা, ভালো করে দেখার জন্যে থামলো না। প্রয়োজনও মনে করলো না। তার দৃঢ় বিশ্বাস, হাঙরটাই ফিরে এসেছে।
তীরের দিকে পাগলের মতো সাঁতরে চললো সে। অল্প পানিতে পৌঁছে উঠে দাঁড়ালো। দৌড়ানোর চেষ্টা করলো। ঝুপঝুপ, থপথপ, নানা রকম শব্দ করতে করতে কোনোমতে এসে উঠলে কিনারে। ধপ করে বসে পড়লো বালিতে। তারপর একেবারে চিৎপাত।
কি হয়েছে? কানের কাছে বেজে উঠলো হ্যাঁনসনের কণ্ঠ।
হাঙর! মাস্ক খুলে ফেলেছে মুসা, হাঁপাতে হাঁপাতে জবাব দিলো।
শিস দিতে দিতে খোশমেজাজে এগিয়ে এলো একজন লাইফগার্ড। চিত হয়ে থাকা মুসর ওপর কিশোর আর হ্যানসনকে উপুড় হয়ে থাকতে দেখে থমকে দাঁড়ালো। জিজ্ঞেস করলো, কি ব্যাপার?
উঠে বসলো মুসা। হাঙর!
তাই নাকি? ঠিক আছে, রিপোর্ট করবো। খবরদার, আর নামবে না।
পাগল! আরও নামি!
মুসাকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করলো কিশোর। এখনও জলকন্যার মাথা ধরে রেখেছে গোয়েন্দা সহকারী। সেটা কিশোরের হাতে দিয়ে গাড়ির কাছে এসে দাঁড়ালো পোশাক বদলানোর জন্যে। কাপড় বদলে ফিরে এসে দেখলো পিয়ারের একটা গাছের গুঁড়ির ওপর বসে রয়েছে কিশোর। মূর্তির মাথাটা দেখছে। এটাই তাহলে পানিতে ফেলেছিলো ক্যাম্পার?
তাই তো মনে হয়, মুসা বললে। বাকি টুকরোগুলোও আছে।
কেন করলো একাজ?

আল্লাহই জানে! হাত ওল্টালো মুসা। মিছে কথা বলার ওস্তাদ লোকটা। কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছি না, ফেললোই যখন, পানিতে কেন? রাবিশ বিন কি করেছিলো?
নিশ্চয় তার ভয়, কেউ দেখে ফেলবে।
কি হতে দেখলে? কার এতো ঠেকা পড়েছে একটা ভাঙা মূর্তি নিয়ে মাথা। ঘামানোর?
পাশে দাঁড়িয়ে কথা শুনছিলো হ্যানসন। কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে বললো, মিস্টার ক্যাম্পারকে কয়েকবার এখানে ওখানে নিয়ে গেছি গাড়ি চালিয়ে। হলিউডের অনেক পার্টিটার্টিতে যায়। অদ্ভুত আচরণ করে তখন। সিনেমার ডায়লগ নকল করে কথা বলে। বিখ্যাত অভিনেতাদের ভাবভঙ্গি নকল করে। আস্ত একটা ভীড়। পানিতে মূর্তি ছুঁড়ে ফেলাটাও তেমন একটা অভিনয়ের নকল কিনা কে জানে।
লোকটার স্বভাব-চরিত্র আসলেই যেন কেমন! মুসা বললো। কেমন মেকি মেকি!
ঠিক বলেছেন!
কিশোর, বলতে গিয়ে থেমে গেল মুসা। ওশন ফ্রন্টের দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। মুসাও তাকালো। দেখলো, ছুটে আসছে রবিন।
কাছে এসে ধপ করে কিশোরের পাশে বসে পড়লো সে। যা জেনে এসেছে, কলার জন্যে আর তর সইছে না। বললো, ডিগার, তার রুমমেট আর ক্যাম্পারের মধ্যে একটা যোগাযোগ রয়েছে।
ইভলিন স্ট্রীটে কি ঘটেছে, খুলে বললো সব রবিন। সব শেষে আবার বললো, আমি শিওর, ও ব্রড ক্যাম্পারই।
খাইছে! মুসা বললো, ছদ্মবেশ নিয়েছে ব্যাটা!
স্তব্ধ হয়ে গেছে কিশোর। আরও কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে বললো, তুমি বলছো নির্জন বাড়িতে ঢুকে ছদ্মবেশ নিয়ে নীল বুইক চালিয়ে চলে গেছে? গোপন কোনো উদ্দেশ্যে? কাল একই রূপ ধরে গিয়েছিলো স্লেভ মার্কেটে?
আমি শিওর।
হুম! ওই বুইকটার মালিককে বের করা দরকার।
নম্বর নিয়েছি আমি, নোটবুক বের করলো রবিন।
সেটা নিতে নিতে কিশোর বললো, নির্জন বাড়ি, না?
হ্যাঁ
ক্যাপ্টেন ফ্লেচারকে বলতে হবে। গাড়িটা কার বের করে দেবেন।
ফোন করবে?
না। নিজে যাবো।

লাঞ্চ সেরে কিশোর আর হ্যানসন রওনা হয়ে গেল। রবিন আবার ফিরে গেল। মারমেড কোটে। গ্যালারিতে ক্যাম্পার ফিরেছে কিনা দেখতে। মুসা গেল ডিগারের ওপর চোখ রাখতে। তার বাড়ির কাছে গিয়ে পথের পাশের একটা ঝোপে লুকিয়ে বসে রইল।

কোস্ট হাইওয়ে ধরে উত্তরে চলেছে রোলস রয়েস। আধ ঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে গেল রকি বীচ পুলিশ স্টেশনে। জরুরী কাজে ব্যস্ত ইয়ান ফ্লেচার। কিশোরকে দেখে মুখ তুললেন। আরে কিশোর? কি ব্যাপার?

একটা বুইক সেডানের মালিক কে জানতে চাই। নম্বর নিয়ে এসেছি। ভেনিস বীচের একটা গ্যারেজে রাখা হয় ওটা।

ভেনিস বীচ? চোখ সরু হয়ে এলো ফ্লেচারের। ওই বাচ্চা ছেলেটা...কি যেন নাম... হারিয়ে গেছে। তার কেসে জড়াওনি তো?

হ্যাঁ, স্যার, ওই কেসই। ছেলেটার নাম কিটু। তার মায়ের অনুরোধেই তদন্ত করছি।

কেন, লস অ্যাঞ্জেলেসের পুলিশকে বিশ্বাস করতে পারছে না তার মা?

না স্যরি, তা নয়। নিনা হারকার মনে করছে, আমরা অন্য ভাবে সাহায্য করতে পারবো...

বাধা দিয়ে বললেন চীফ, দেখো, কিশোর, খুব সাবধান। একটা ছেলের জীবনের ঝুঁকি রয়েছে, ভুল যাতে না হয়। তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

জানি, স্যার। নিজে নিজে কিছুই করতে যাবো না। তেমন বুঝলে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে খবর দেবো, কথা দিচ্ছি।

কিশোরের কাছ থেকে গাড়ির নম্বরটা নিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে গেলেন চীফ। কয়েক মিনিট পরেই ফিরে এলেন। হাতে এক টুকরো কাগজ। ব্রড ক্যাম্পার নামে এক লোকের নামে গাড়ির রেজিস্ট্রেশন। ঠিকানা, ফোর এইটি এইট, ওশন ফ্রন্ট, ভেনিস।

হুমম! মাথা দোলালো কিশোর।

এরকমই কিছু আশা করেছিলে, তাই না?

আবার মাথা ঝাঁকালো কিশোর।

বেশ, এবার ক্যাম্পারের সম্পর্কে সব বলো তো।

এখনও সময় হয়নি, স্যার।

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কিশোরের চোখে চোখে তাকিয়ে রইলেন চীফ। হাসলেন। ঠিক আছে, চাপাচাপি করবো না। তবে মনে রেখো, কোনো রকম ঝুঁকি নেবে না। কিছু দেখলেই পুলিশকে খবর দেবে।

দেবো, স্যার।

আবার ভেনিসে ফিরে এলো ওরা। মারমেড কোর্টের পেছনে কিশোরকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল হ্যানসন। বলে গেল ঘণ্টাখানেক পর ফিরবে। কাফের বারান্দায় বসে থাকতে দেখা গেল রবিনকে। হাতে একটা খালি গেলাস। কোকা কোলা খেয়েছে।
আধ ঘন্টা আগে গ্যালারি খুলেছে ক্যাম্পার, জানালো সে।
ইভলিন স্ট্রীটে ওর গাড়িটাই দেখেছিলে, বললো কিশোর।
আমারও তাই মনে হয়েছিলো। নিনা হারকারকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, বললো, একটা জাগুয়ার চালায় ক্যাম্পার। তার বাড়ির পেছনের গ্যারেজে রাখে গাড়িটা। আরেকটা গাড়ি আর ছদ্মবেশ নেয়ার তার দরকার হলো কেন?
জবাব দিতে পারলো না কিশোর। বসে পড়লো বারান্দায়।
একটু পর ফিরে এলো মুসা। বললো, ডিগারের পিছু নিয়েছিলাম। কুকুরের। রহস্য জেনেছি। মুক্তিপণ দাবি করে না সে, পুরস্কার আদায় করে। দেখলাম, একটা সান্তা মনিকার কপি কিনলো। শুধু বিজ্ঞাপনগুলো দেখে ফেলে দিলো কাগজটা। সুযোগ করে ওটাও দেখলাম। একটা বিজ্ঞাপনের ওপর পেন্সিল দিয়ে দাগ দেয়া। সাদা-কালো একটা স্প্যানিয়েল কুকুরের জন্যে একশো ডলার পুরস্কার ঘোষণা করা। হয়েছে। কিছুদিন আগে হারিয়ে গেছে কুকুরটা। কাগজটা ফেলে দিয়ে বাড়ির পেছন। থেকে একটা সাদা-কালো স্যানিয়েল বের করে আনলো ডিগার, নিয়ে গেল ওশন পার্কের একটা বাড়িতে। বেল টিপতে দরজা খুলে দিলো এক মহিলা। তাকে দেখে। দৌড়ে গিয়ে গায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো কুকুরটা, চেটেচুটে অস্থির করে দিলো। ডিগারকে কিছু টাকা এনে দিলো মহিলা। প্রায় নাচতে নাচতে বাড়ি ফিরলো ডিগার।
থেমে দম নিলো মুসা। তারপর বললো, কিন্তু এর সঙ্গে কিটুর নিখোঁজের সম্পর্ক কি বুঝতে পারছি না। ডবকে নিশ্চয় আটকাতে চায়নি ডিগার, ওই কুত্তা আটকে কোনো লাভ হতো না।
জবাব দিলো না কিশোর। ঘন ঘন চিমটি কাটছে নিচের ঠোঁটে। গভীর চিন্তায়। ডুবে গেছে। হঠাৎ মুখ তুললো। হতে পারে, অন্য দিকে সরে যাচ্ছি আমরা। হয়তো কিটুর হারানোর সঙ্গে ক্যাম্পারের কোনো হাতও নেই। ডিগার হয়তো এতে জড়িত নয়। ছেলেটা ভীষণ দুষ্ট, হয়তো নিজে নিজেই গিয়ে কোথাও আটকা পড়েছে।
সরাইখানাটা দেখিয়ে বললো সে, কোনো ফাঁকফোকর দিয়ে মাটির তলার ঘরে ঢুকে যেতে পারে। খোলা জানালা দিয়ে গিয়ে সেলারে ঢুকে বসে থাকতে পারে। পুলিশ অবশ্য খোঁজ করেছে, কিন্তু ওরা কি সমস্ত জায়গা তন্ন তন্ন করে। খুঁজতে পেরেছে? হোটেলটা ছাড়াও এখানে অসংখ্য জায়গা আছে, যেখানে একটা বাচ্চা ছেলে আটকা পড়তে পারে।

সোজা হয়ে বসলো রবিন। কি করতে বলো?
গ্যালারিতে রয়েছে এখন ক্যাম্পার। মারমেড ইনে খুঁজতে ঢুকবো আমরা। দেখি ক্যাম্পার কি বলে।

.

পুরানো সরাইখানাটা খুলতে প্রথমে রাজি হতে চাইলো না ক্যাম্পার। অনেক বছর। ধরে তালা দেয়া রয়েছে। জানালা আটকানো। ছেলেটার ঢোকার পথ নেই। কিটুর বয়সে, একটা গল্প শোনালো মুসা, একটা নির্জন বাড়িতে ঢুকে পড়েছিলাম আমি। জানালা দরজা বন্ধ ছিলো, কিন্তু আমার ঢোকা তো বন্ধ করতে পারেনি। চিলে কোঠার জানালাটা ছিলো খোলা। গাছ বেয়ে উঠে ওই পথে ঢুকে পড়লাম। ঢুকেছি তো সহজেই, কিন্তু বেরোতে গিয়ে জান বেরিয়ে গেছে। অনেক কষ্টে তবে বেরিয়েছি।
মারমেড ইনের দিকে তাকিয়ে রইলো ক্যাম্পার। একতলা আর দোতলার জানালা বন্ধ, কিন্তু তিনতলার কিছু কিছু ভোলা। অসম্ভব! ওপথে ঢুকতে পারবে না কিটু। ঢুকতে হলে এই গ্যালারি কিংবা মিস্টার ডেজারের ছাতের ওপর দিয়ে গিয়ে উঠতে হবে। = আমরা বলছি না যে কিটুও ওরকম করেছে, শান্তকণ্ঠে বললো কিশোর। কলছি, বাচ্চারা এমন অনেক কাজ করে বসে, বয়স্করা যা কল্পনাও করতে পারে না। খুঁজলে কি কোনো অসুবিধা হবে? হয়তো আটকা পড়ে আছে কোথাও, বেরোতে পারছে না। হয়তো জখম হয়েছে, কিংবা বেহুশ হয়ে আছে।
আর কিছু বলার থাকলো না ক্যাম্পারের। একগোছা চাবি বের করে CLOSED লেখা একটা দরজার দিকে এগোলো। সরাইতে কিটু আটকা পড়লে ডব বেরোলো কিভাবে?
সেটাই তো বুঝতে পারছি না।
দেখতে চাইছো, দেখাচ্ছি। তবে অযথা সময় নষ্ট করছে।
সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো ওরা, মারমেড ইনের মস্ত দরজার কাছে। দরজার তালা খুলে ঠেলে পাল্লা খুললো ক্যাম্পার। ছোট একটা হলওয়ে দেখা গেল, আবছা অন্ধকার আর প্রচুর ধুলো। হলওয়ে পেরিয়ে লবি, সেখানে বেশ কিছু সোফা আর চেয়ার অগোছালো হয়ে পড়ে আছে। পুরু হয়ে ধুলো জমে থাকা জানালার কাঁচের। ভেতর দিয়ে আলো ঠিকমতো আসতে পারছে না। পচে টুকরো টুকরো হয়ে আছে কার্পেট। ফুলের টবে মরা গাছের শুকনো উঁটি খাড়া হয়ে রয়েছে এখনো। মেঝের ধুলোয় জুতোর ছাপ, পুলিশ এসে খোঁজাখুঁজি করে গেছে সেই চিহ্ন।
লবি বেরিয়ে ডাইনিং রুমে ঢুকলো ওরা। টেবিলের ওপরে স্তূপ করে রাখা। হয়েছে চেয়ার। ডাইনিং রুমের পরে অনেক গলিপথ, অফিস রান্নাঘর, স্টোররুম। সব

জায়গায়ই খোঁজা হলো, কিন্তু কিটুকে পাওয়া গেল না।
রান্নাঘরে মাকড়সার রাজত্ব, জালের অভাব নেই। তাক আর আলমারি গুলোতে বাসা বেঁধেছে নেংটি ইঁদুর। এখানে সেখানে উঁকি দিয়ে দেখছে গোয়েন্দারা, হঠাৎ পায়ের নিচে কোনোখান থেকে একটা অদ্ভুত গোঙানি কানে এলো।
ঝট করে সেদিকে তাকালো কিশোর ও মুসা।
কে! কে! বলে চিৎকার করে উঠলো মুসা।
এমনকি ক্যাম্পারের মুখও ফ্যাকাসে হয়ে গেল। রান্নাঘরের একধারের একটা দরজা খুললো গিয়ে। তার কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি দিলো কিশোর। অন্ধকার একটা সিঁড়ি চোখে পড়ছে। কেমন যেন ভেজা ভেজা আর টক গন্ধ বাতাসে।
সেলার, ক্যাম্পার কললো। ওটা আগেও ব্যবহার হতো না খুব একটা। আর এখন তো প্রশ্নই ওঠে না। জোয়ার বেশি হলে পানি ঢুকে যায় ওখানে।
ডাইনিংরুম থেকে গিয়ে খুঁজে পেতে মোমবাতি বের করে আনলো রবিন। আস্ত নয়, মোমের একটা গোড়া।
মোম জ্বেলে আগে আগে চললো ক্যাম্পার, পেছনে তিন গোয়েন্দা।
সিঁড়ি বেয়ে নামছে ওরা, এই সময় আবার শোনা গেল গোঙানি। এবার আরও কাছে, আরও ভয়াবহ। পাথর হয়ে গেল যেন ওরা। হাত তুলে দেখালো মুসা, সেলারের ওপর দিকে দেয়ালে একটা জানালা। ম্লান একফালি আলো এসে ঢুকছে সে পথে। যানবাহনের আওয়াজও আসছে সেদিক দিয়ে। ধাতব একটা খটাখট, ঘটাং ঘটাং, তারপর আবার সেই ভয়ানক গোঙানি।
রাস্তায় হচ্ছে শব্দটা, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো মুসা। জানালা ঢেকে রাখা তক্তায় ঠেলা দিলো। বড় হলো ফাঁক। সেখান দিয়ে তাকাতে চোখে পড়লো সরু একটুকরো চত্বর, স্পীডওয়ের সঙ্গে গিয়ে মিশেছে। সরাইখানার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে একটা লরি। ময়লা ফেলার গাড়ি ওটা। বিরাট একটা ইস্পাতের দাঁড়া নেমে আসছে চাবি টিপলেই, রাবিশ বিনকে চেপে উপরে তুলে নিয়ে গিয়ে খোলা মুখটা কাত করে ধরছে, ময়লা-জঞ্জাল সমস্ত ট্রাকের পেছনে তুলে নিয়ে আবার মাটিতে নামিয়ে রাখছে বিনটা। বিন ওপরে ভোলার সময়ই বিকট গোঙানির মতো শব্দ করছে মেশিন।
দূর! হতাশ হয়েছে কিশোর। ময়লা ফেলার গাড়ি!
মাথা ঝাঁকালো ক্যাম্পার। পুরানো আর বদ্ধ জায়গা বলেই শব্দটা বেশি। হচ্ছে।
সেলরিটা খুঁজে দেখতে বেশিক্ষণ লাগলো না। নিরাশ হয়ে আবার রান্নাঘরে ফিরে এলো তিন গোয়েন্দা।
নিচতলায় কিটু নেই। দোতলায় উঠলো ওরা। ঘরে ঘরে সেই একই রকম শূন্যতা, ধুলো মাকড়সার জাল আর ইঁদুর।

একটা বন্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো ক্যাম্পার। ঘরটার নাম রাজকন্যের। স্যুইট। অনেকবার ঢোকার চেষ্টা করেছি। চাবিও আছে, কিন্তু কিছুতেই তালা, খুলতে পারিনি। মরচে পড়ে বোধহয় আটকে গেছে তালাটা। দরজা না ভেঙে আর ঢোকা যাবে না। সাধারণ দরজা হলে ভেঙে ফেলতাম, কিন্তু সুন্দর পাল্লাটা ভাঙতে। মন চায় না।
সত্যিই সুন্দর। নানারকম সামুদ্রিক জীব আঁকা রয়েছে, চারপাশে জলজ আগাছা এঁকে করা হয়েছে অলঙ্করণ। ঠিক মাঝখানে আঁকা একটা জলকন্যার হাসিমুখ।
গ্যালারিতে যে মারমেডটা ছিলো, ক্যাম্পার জানালো, ওটা আগে ছিলো। নিচতলার লবিতে। ইস, এটাকেও যদি নষ্ট না করে খুলে নিয়ে যেতে পারতাম!
চেষ্টা করলে পারতেও পারেন, কিশোর বললো। সত্যিই কি এই ঘরটায় কখনও ঢোকেননি?
না। ভেনিসে এলে এটাতেই থাকতো নিরমা হল্যাণ্ড।
এখানেই ভূত দেখা যায়? মুসার প্রশ্ন।
হাসলো ক্যাম্পার। ওসব গালগল্প বিশ্বাস করো নাকি? আমি করি না। লোকে কতো কিছুই তো বানিয়ে বলে। সব ফালতু।
এরপর তিনতলায় উঠলো ওরা। জানালা দরজা বেশির ভাগই খোলা। ক্যাম্পার বললো, মাটি থেকে তিরিশ ফুট ওপরে। এখানে উঠতে পারবে না। ও। অসম্ভব।
চিলেকোঠা আছে? কিশোর জানতে চাইলো।
না।
আশা নেই তবু খুঁজলো গোয়েন্দারা। কিটুর কোনো চিহ্নই পাওয়া গেল না। এককোণ থেকে একটা শ্যাফট নেমে গেছে নিচের ভাড়ার ঘরে।
এটাকে বলে ডামবওয়েইটার শ্যাফট, বুঝিয়ে বললো ক্যাম্পার। রান্নাঘর থেকে এটা দিয়ে খাবার সরাসরি ওপরে পাঠিয়ে দেওয়া হতো।
শ্যাফটটা শূন্য। ক্যাম্পার জানালো, টর্চ দিয়ে ভালমতো এটার ভেতরে খুঁজে দেখছে পুলিশ।
নিচতলায় নেমে এলো আবার ওরা। গ্যালারিতে ঢুকলো। ক্যাম্পারকে ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে এলো বাইরে, রোদে। চত্বরে দেখা গেল নিনা হারকারকে। চোখ বসে গেছে, রোগা হয়ে গেছে শরীর। গোয়েন্দাদের দেখে বললো, ওখানে খুঁজতে গিয়েছিলে তো? নেই আমি জানি। এ-ও জানি, ওর কি হয়েছে। স্পীডওয়েতে চলে– গিয়েছিলো, কিংবা আরও দূরে। গাড়ি এসে চাপা দিয়ে কুকুরটাকে মেরে ফেলে। বকা শোনার ভয়ে আরও দূরে চলে গিয়েছে কিটু, তারপর আর পথ চিনে ফিরে আসতে পারেনি। এটাই হয়েছে। থামলো একটু, তারপর বললো,

টেলিভিশন দেখে কিংবা বই পড়ে সে অনেক কিছু করতে চাইতো। গত হপ্তায় কি ছবি দেখেছে জানো? পুরানো একটা সিনেমা, দ্য লিটল ফিউজিটিভ।

হু? বলে উঠলো ক্যাম্পার। ছেলেদের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। কানে গেছে নিনার কথা।

হ্যাঁ। একটা ছোট ছেলেকে নিয়ে গল্প। ছেলেটার মনে হয়েছে, তার ভাইকে সে খুন করেছে। ফলে কনি আইল্যাণ্ডে পালিয়েছে সে। কিটুও ওরকম করেই পালিয়েছে। ভেনিস পিয়ারে খুঁজেছে পুলিশ। পায়নি। তারমানে অন্য কোথাও লুকিয়েছে।

ঠিক বলেছো, নিনা, জোর গলায় বললো ক্যাম্পার। যাবে কোথায়? না। খেয়ে কদিন থাকবে? খিদে সহ্য করতে না পেরে সুড়সুড় করে বাড়ি ফিরে আসবে।

গ্যালারিতে ফিরে গেল ক্যাম্পার।

কিন্তু খিদে আর কতো সহ্য করবে? কাদো কাদো গলায় বললো নিনা, দুদিন তো হয়ে গেল। চোখের পানি মুছে ঘুরলো। পা টেনে টেনে এগোলো বুকশপের দিকে।

মারমেড় গ্যালারির দিকে ফিরলো মুসা। গ্যালারি বন্ধ করে দিয়েছে ক্যাম্পার, দরজায় ঝুলিয়ে দিয়েছে CLOSED লেখা সাইনবোর্ড।

গেছে কোথাও, মুসার দৃষ্টি অনুসরণ করে বললো কিশোর। নিনার গল্পটা নাড়া দিয়েছে তাকে। ওর মুখ দেখেছিলে, কি রকম বদলে গিয়েছিলো?

বেশি দূর যেতে পারেনি নিশ্চয়, রবিন বললো। দৌড় দিলো ওশন ফ্রন্টের দিকে। চত্বরের উত্তর দিকটা দেখে ফিরে এলো একটু পরেই। গ্যালারির পেছনের সিঁড়ি দিয়ে নামছে। জলদি এসো।

ঘুরে মারমেড ইনের পেছনে চলে এলো ওরা। গ্যারেজ থেকে জাগুয়ারটা বের। করে ফেলেছে ক্যাম্পার।

খাইছে! গাড়ি! ফলো করবো কি করে? হাত নাড়লো মুসা।

এসো, পারবো, বলে অল্পীডওয়ের দিকে ছুটলো কিশোর। রোলস রয়েসটা। এসে গেছে। ওদের পাশে এসে ব্রেক কষলো হ্যানসন। বললো, যাবেন কোথাও…

তার কথা শেষ হলো না। একটানে পেছনের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলো। কিশোর। জাগুয়ারটা দেখিয়ে বললো, ওটাকে ফলো করুন।

রবিন আর মুসাও উঠে বসেছে।

গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে জাগুয়ারের পেছনে লাগলো হ্যানসন।

প্রথমে পুবে গেল জাগুয়ার। ব্লকখানেক এগিয়ে উত্তরে মোড় নিয়ে চললো সান্তা মনিকার দিকে।

সান্তা মনিকায় গিয়ে সৈকতের দিকে মুখ ঘোরালো জাগুয়ার। থামলো না। থামলো সান্তা মনিকা পিয়ারের সিকি মাইল দূরে। হ্যানসন থামলো না। জাগুয়ারের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গিয়ে পরের পার্কিং এরিয়ায় ঢুকলো।

গাড়ি থেকে বেরোলো না গোয়েন্দারা। এখান থেকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে জাগুয়ারটা। ক্যাম্পার বেরোলো।
হেঁটে চললো পিয়ারের দিকে।
হু, আনমনে বললো কিশোর, এখানকার পিয়ারের নিচেই তাহলে লুকিয়েছে ছেলেটা। পুলিশ ভেনিস পিয়ারে খুঁজেছে, সান্তা মনিকায় আসেনি। নিনার কাছে শুনেই ক্যাম্পার অনুমান করে নিয়েছে এখানে থাকতে পারে।
ভেনিস থেকে তো বেশ দূরে জায়গাটা, ক্যাম্পারকে পিয়ারের আড়ালে হারিয়ে যেতে দেখছে রবিন। দু-মাইল তো হবেই।
কিটুর মতো একটা ছেলের জন্যে কি এটা বেশি দূর?
ক্যাম্পার যদি দেখে ফেলে? মুসার গলায় উদ্বেগ। লোকটা সুবিধের না। কি করে বসবে...
থেমে গেল সে। পিয়ারের নিচ থেকে ছুটে বেরিয়ে এসেছে ক্যাম্পার। রোগা, লালমুখো, ছেঁড়া পোশাক পরা এক লোক তাড়া করেছে তাকে। হাতে একটা খালি মদের বোতল। বাড়ি মারার ভঙ্গিতে নাড়ছে ওটা।
অলিম্পিক জেতার বাজি রেখেছে যেন ক্যাম্পার। লোকটার আগেই চলে। এলো গাড়ির কাছে। এক ঝটকায় দরজা খুলে উঠে বসলো ড্রাইভিং সীটে। মুহূর্ত পরেই হাইওয়ের দিকে চলতে আরম্ভ করলো জাগুয়ার।
নীরবে হাসছে হ্যানসন। কিশোর তার দিকে তাকাতেই বললো, প্রায়ই কানে আসে সান্তা মনিকা পিয়ারের নিচে বিশেষ ভদ্রলোকদের আড্ডা। আজ বুঝলাম ঠিকই শুনেছি। ক্যাম্পার সাহেবের বোধহয় খবরটা জানা ছিলো না।
হ্যানসনের কথা শেষ হওয়ার আগেই গাড়ি থেকে নেমে পড়েছে মুসা। এগোলো লোকটার দিকে। মাতালের মতো দুলছে লালমুখে, নিজে নিজেই কথা বলছে।
তার কাছে গিয়ে মুসা খুব বিনয় করে বললো, শুনছেন?
জ্বলন্ত চোখে মুসার দিকে তাকালো লোকটা।
ছোট্ট একটা ছেলেকে খুঁজছি আমরা, আবার বললো মুসা। হাত দিয়ে উচ্চতা দেখিয়ে বললো, এই এত্তোটুকু হবে লম্বা। দুদিন ধরে নিখোঁজ।
না, দেখিনি। বাচ্চাদের ঢুকতে দিই না এখানে। দেখলেই ভাগিয়ে দিই।
আর কিছু বলে লাভ হবে না বুঝে ফিরে এলো মুসা। নাহ, কাজ হলো না।
একেবারেই হয়নি, তা নয়, কিশোর বললো, একটা ব্যাপারে শিওর হয়ে গেছি। ক্যাম্পারও জানে না কিটু কোথায় আছে। এবং সে-ই ছেলেটাকে খুঁজে বের করতে চায় সবার আগে। অবাক লাগছে না? তার এতো মাথাব্যথা কিসের? একটু থেমে বললো, বুঝতে পারছি, কিটুকে খুঁজে বের করতে হলে আগে ব্রড ক্যাম্পার রহস্যের সমাধান করতে হবে।

.
পরদিন সকালে আবার ভেনিসে গেল তিন গোয়েন্দা। নিনাকে পাওয়া গেল না। বুকশপের সামনে অস্থির ভাবে পায়চারি করছেন তার বাবা।
বাড়িতে গিয়ে শুয়ে থাকতে বলেছি, বোরম্যান বললেন। না খেয়ে না ঘুমিয়ে একেবারে কাহিল হয়ে গেছে। দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি। তিনটে দিন হয়ে গেল, এখনও এলো না! কি যে হলো ছেলেটার!
কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করলো কিশোর। মিস্টার বোরম্যান, কুকুরটার পোস্ট মর্টেম করার কথা ছিলো। কিছু বোঝা গেছে?
নাহ, গাড়ি চাপা পড়েছে বলে মনে হয় না। মাথায় আর ঘাড়ে খুব সামান্য আঘাত। ডাক্তারদের ধারণা, হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছে। বুড়ো হয়ে গিয়েছিলো, শক পেয়েছিলো হয়তো, সইতে পারেনি।
দোকানে ঢুকে গেলেন বোরম্যান। ছেলেরা চললো তাদের কাজে।
একটা পরিকল্পনা করে তৈরি হয়ে এসেছে ওরা আজ। সঙ্গে করে ওয়াকি-টকি এনেছে। রবিন আর মুসাকে একটা করে দিয়ে তৃতীয়টা নিজে রাখলো কিশোর। ডিগারের বাড়ির কাছে ঝোঁপের ভেতর গিয়ে নজর রাখার জন্যে লুকিয়ে বসলো রবিন।
কাফের বারান্দায় একটা টেবিলের কাছে বসলো মুসা আর কিশোর। ব্রড ক্যাম্পারের বাড়ির ওপর চোখ রাখবে ওরা। একটু পরেই সরে গেল জানালার পর্দা। উঁকি দিলো ক্যাম্পার। কিশোর আর মুসার ওপর চোখ পড়তে দ্বিধা করলো একবার, তারপর হাত নাড়লো।
হাত নেড়ে জবাব দিলো দুই গোয়েন্দা।
এখানে বসে সুবিধে করতে পারবো না, মুসা বললো। দেখে ফেলেছে।
তবু এখানেই বসতে হবে। আগেও বসেছি, কাজেই সন্দেহ করবে না।
কাফে থেকে বেরিয়ে এলো লিসটার। জিজ্ঞেস করলো, কি লাগবে?
ঠিক এই সময় ওয়াকি-টকিতে ভেসে এলো রবিনের কণ্ঠ, কিশোর, এইমাত্র বেরিয়ে গেল ডিগার। তার রুমমেট গেছে দশ মিনিট আগে। বাড়িতে কেউ নেই এখন।
শুনলো লিসটার। ভুরু কোঁচকালো। কিন্তু কিছু বললো না।
মুসাকে বললো কিশোর, তুমি এখানে থাকো। খিদে পেলে খাও। আমি আসছি। গ
লিসটার কিংবা মুসাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে উঠে দাঁড়ালো সে। চলে এলো মারমেড কোর্টের পেছনে, রবিন যেখানে বসে আছে।
হেঁটে গেছে ডিগার, রবিন জানালো। একবার ভাবলাম পিছু নিই, ভাবলাম দেখিই না, এখানেও কিছু ঘটতে পারে।

ভালো করেছে। বসে থাকো, আমি যাচ্ছি।
দরজায় তালা আটকে দিয়েছে ডিগার।
ঢোকার নিশ্চয় আরও পথ আছে।
ঠিকই আন্দাজ করেছে কিশোর। বাড়ির পুবধারে একটা জানালা খোলা পাওয়া গেল। আস্তে করে চৌকাঠে উঠে বসে ভেতরে লাফিয়ে নামলো সে।
ঘরটা বোধহয় একসময় ডাইনিং রুম হিসেবে ব্যবহার হতো। ছাত থেকে ঝুলছে অনেক পুরানো একটা ঝাড়বাতি। একধারের দেয়ালে একটা সাইডবোর্ড তৈরি করা হয়েছে, রুপালি রঙ করা। কাঠের মেঝেতে এক জায়গায় পড়ে রয়েছে। কতগুলো ছেঁড়া ম্যাগাজিন। আর কিছু নেই, একটা চেয়ারও না।
রান্নাঘরে ঢুকলো কিশোর। একটা টেবিলে পড়ে আছে এঁটো প্লেট। সিংকে। রয়েছে আরও কয়েকটা। টেবিলের এক কোণে জড়ো করে রাখা হয়েছে কুকুরের খাবার। বাজে গন্ধ বেরোচ্ছে সব কিছু থেকেই। পেছনে যাবার দরজাটা ভাঙা, বেঁকে রয়েছে।
সামনের ঘরে একটা চামড়ার সোফা, বয়েস কতো অনুমান করাই মুশকিল। কাঁচের টপওয়ালা গোল একটা টেবিল, তাতে কয়েকটা কুকুরের কলার, আর সান্তা মনিকা পত্রিকার একটা কপি পড়ে আছে। কুকুর হারানো বিজ্ঞাপনে দাগ দিয়ে চিহ্নিত করা। বাদামী রঙের ম্যানিলা খাম আছে কয়েকটা। সরকারী খাম। ডাকবাক্স থেকে এসব চুরি করে আনে নাকি?–ভাবলো কিশোর।
সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে এলো সে। শোবার ঘর আর গোসলখানা দেখতে বেশি সময় লাগলো না। চোখে পড়ার মতো কিছু নেই, বাথরুমে কিছু অধধায়া পুরানো কাপড় ছাড়া।
তিনতলা নেই বাড়িটায়, বেসমেন্টও নেই, নেই কিটুর কোনো চিহ্ন।
হতাশ হয়ে বেরিয়ে আসতে যাবে কিশোর, এই সময় ওয়াকি-টকিতে শোনা গেল রবিনের গলা। কিশোর ডিগার আসছে!
এক দৌড়ে ডাইনিং রুমে চলে এলো কিশোর। জানালা দিয়ে দেখলো, প্যাসিফিক অ্যাভেনর দিক থেকে আসছে ডিগার।
রান্নাঘরে ঢুকলো কিশোর। সামনের বারান্দায় পদশব্দ শোনা গেল। ভাঙা দরজাটা খুলে পিছনের বারান্দায় চলে এলো সে। একসঙ্গে ফেটে পড়লো যেন কুকুরগুলো। প্রচণ্ড ঘেউ ঘেউ শুরু করে দিলো।
এই, অমন করছিস কেন? সামনের বারান্দা থেকে চেঁচিয়ে উঠলো ডিগার।
চট করে পেছনের আঙিনাটায় চোখ বুলিয়ে নিলো কিশোর। তক্তার উঁচু বেড়ায় ঘেরা জায়গাটা। ওটা ডিঙিয়ে যাওয়া যাবে না। একমাত্র যে গেটটা আছে, ওটা দিয়ে বেরোতে গেলে ডিগারের চোখে পড়ে যাবে।

একটা কাজই করতে পারে, এবং সেটাই করলো কিশোর। দৌড় দিলো। কুকুরের খোয়াড়ের দিকে।
এই, এই! দেখে ফেলেছে ডিগার। বাড়ির ধার ঘুরে দেখতে আসছিলো চেঁচামেচি করছে কেন কুকুরগুলো।
ফিরেও তাকালো না কিশোর। সব চেয়ে কাছে যে খোয়াড়টা পেলো, খুলে দিলো ওটার দরজার হুড়কো। খোলা পেয়ে চোখের পলকে বেরিয়ে পড়লো জার্মান শেফার্ড।
এই, এই কুত্তা, ঢোক, ভেতরে ঢোক! চেঁচিয়ে আদেশ দিলো ডিগার।
কি হলো দেখার জন্যে দাঁড়ালো না কিশোর। খুলে দিলো আরেকটা খোয়াড়ের হুড়কো। ঘাউ করে উঠে বেরিয়ে এলো আরেকটা কুকুর। শেফার্ডের ওপর চোখ পড়তেই গেল রেগে। লাফ দিয়ে গিয়ে পড়লো ওটার ঘাড়ে। বেধে গেল মারামারি। থামানোর জন্যে পাগলের মতো চেঁচাতে লাগলো ডিগার। বৃথা চেষ্টা।
আরেকটা খোয়াড়ের হুড়কো খুলে দিলো কিশোর, তারপর আরও একটা।
কুকুরগুলোকে ছাড়াতে গিয়ে ইতিমধ্যেই দু-জায়গায় কামড় খেলো ডিগার।
বেড়ার ফাঁক দিয়ে এসব দেখলো রবিন। তাড়াতাড়ি খুলে দিলো চত্বর আর ড্রাইভওয়ের মাঝের গেট। খোলা দেখে চোখের পলকে ঝগড়া থামিয়ে দিলো কুকুরগুলো। দৌড় দিলো বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে।
ডিগারের অবস্থা দেখার মতো। চেঁচাতে চেঁচাতে গলার রগ ফুলে গেছে, চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসবে যেন, দুহাত তুলে উন্মাদ নৃত্য শুরু করেছে। কে শোনে কার। কথা। প্রথমেই খোলা গেট দিয়ে বেরিয়ে গেল শেফার্ডটা।
একে একে চারটে কুকুর স্পীডওয়েতে বেরিয়ে চার দিকে ছড়িয়ে পড়লো। ওদের পেছনে ছুটলো ডিগার। শিস দিয়ে এবং আরও যতো রকমে কুকুরকে ডাকা। স, ডেকে ডেকে ফেরানোর চেষ্টা করলো।
রাস্তার মোড়ে বসে পড়েছে রবিন। বেদম হাসছে।
এই সময় স্পীডওয়ে ধরে আসতে দেখা গেল রুমমেটের ট্রাক।
ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষে দাঁড়ালো ট্রাকটা। লাফিয়ে নামলো রুমমেট। একটা কুকুরকে ধরার জন্যে ছুটলো। কয়েক পা গিয়েই থেমে গেল যেন দেয়ালে হোঁচট খেয়ে। রাস্তার মাথায় দেখা দিয়েছে দুটো পুলিশের গাড়ি।
দেখেই আরেক দিকে দৌড় দিলো ডিগার। বেড়ার পাশের কয়েকটা ঝোঁপের দিকে। রুমমেট ছুটলো তার উল্টোদিকে।
চেঁচামেচি শুনে অন্যান্য বাড়ির কয়েকজন লোক বেরিয়ে এসেছে।
গাড়ি থামিয়ে নামলো পুলিশ।

সবার চোখ এড়িয়ে সরে পড়লো দুই গোয়েন্দা। সন্তুষ্ট হয়েছে কিশোর। একটা কাজ অন্তত সমাধা করতে পেরেছে। বন্ধ করে দিয়েছে ডিগারের কুকুর চুরির ব্যবসা।

.

মারমেড কোর্টের উত্তর ধারে রবিনকে রেখে, ক্যাম্পারের গ্যালারির দিকে এগোলো কিশোর। ঘুরে এসে দেখলো, কাফের বারান্দায় বসে রয়েছে মুসা।
সুতোর দোকানের ওপরে একটা দরজা খুলে গেল। ব্যালকনিতে বেরিয়ে এলেন মিস এমিনার। ডেকে বললেন, এই, তোমাদের সঙ্গে কথা আছে।
চট করে পরস্পরের মুখের দিকে তাকালো মুসা আর কিশোর।
সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলো দুজনে। দরজায় অপেক্ষা করছেন মিস এমিনার। ডেকে নিয়ে এলেন ভেতরে।
বসার ঘরে বসে আছেন মিস্টার ডেজার। ব্রড ক্যাম্পারের জানালার দিকে চোখ।

ডিগারকে তো ফাঁসিয়ে দিয়েছো দেখলাম, মিস এমিনার বললেন হাসিমুখে। ক্যাম্পারকেই বা ছাড়বে কেন?
আবার চোখে চোখে তাকালো দুই গোয়েন্দা। ক্যাম্পারকে একেবারেই দেখতে পারেন না মহিলা।
ওকে আপনি দেখতে পারেন না, বলেই ফেললো মুসা।
ভালো লোক হলে তো পারবো? ডেজার বললেন।
জানালার বাইরে তাকালো কিশোর। গ্যালারিতেই রয়েছে ক্যাম্পার। কফির কাপ হাতে নিয়ে বেরিয়েছে রান্নাঘর থেকে।
পুরানো সরাইখানাটার পেছনের অংশে চোখ পড়লো কিশোরের। ডেজারকে জিজ্ঞেস করলো, ওটা সম্পর্কে তার কি ধারণা।
লোকে বলে ভূত আছে বাড়িটাতে, আগেও বলেছেন, আবার বললেন ডেজার। ভূতের কাছাকাছি বাস করতে পেরে যেন খুব খুশি তিনি। ওটা নাকি নিরম হল্যাণ্ডের প্রেতাত্মা।
একেবারে কাঠির মতো শুকনো তার শরীর, যোগ করলেন এমিনার। ভূতের কাছ থেকে নিশ্চয় ভাড়া পায় না ক্যাম্পার। অথচ তার মতো একটা লোক টাকা উপার্জনের চেষ্টা করছে না হোটেলটা থেকে, এটা বিশ্বাস হয় না। না ভাঙার নিশ্চয়। কোনো কারণ আছে।
কিন্তু কারণটা কি? নিজেকেই যেন প্রশ্ন করলো কিশোর। দামী জায়গা এখন এটা। সাগরের দিকে মুখ করা। চমৎকার হোটেল বানিয়ে প্রচুর টাকা ইনকাম করা যায়।

আসলে ক্যাম্পারটাকে বোঝাই মুশকিল, জোরে মাথা আঁকালেন মিস এমিনার। আজব লোক!
ওপর তলার জানালায় শিক নেই, কিশোর বললো। ভাবছি, ঢোকা যাবে। কিনা! এই বাড়িটার ছাতের ওপর দিয়ে যাওয়া যায়, চেষ্টা করলে।
অবাক হলো মুসা। কেন? দেখেই তো এলাম একবার।
নিরমা হল্যাণ্ডের ঘরটাতে ঢুকতে পারিনি, ভুলে গেছো?
ওটাতেই তো থাকে ভূত, সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন ডেজার। ওই জানালী গুলো দেখছো, উত্তর ধারে? ওটা নিরমা হল্যাণ্ডের ঘর। রাতের বেলা ওখানেই আলো দেখি মাঝে মাঝে।
ঘরের ভেতরের আলো না। যুক্তি দেখালেন মিস এমিনার, হয়তো বাইরের আলো এসে পড়ে জানালার কাঁচে, আপনার মনে হয়েছে ভেতরে জ্বলছে।
জবাব দিলেন না ডেজার, এড়িয়ে গেলেন। কিশোরকে বললেন, তোমরা যেতে চাইলে আমি সাহায্য করতে পারি। ক্যাম্পারের সঙ্গে কথা বলার ছুতোয় তাকে আটকে রাখবো, এই সুযোগে তোমরা গিয়ে ঢুকে দেখে আসতে পারো।
থ্যাংক ইউ, মিস্টার ডেজার।
আমি এখান থেকে চোখ রাখছি, মিস এমিনার বললেন। যদি এক ঘণ্টার মধ্যে না ফেরো তোমরা, মিস্টার ডেজার আর মিস্টার বোরম্যানকে পাঠাবো তোমাদের খুঁজতে।
উঠে বেরিয়ে গেলেন ডেজার। গ্যালারিতে গিয়ে ঢুকলেন। কথা বলতে শুরু করলেন ক্যাম্পারের সঙ্গে। চত্বরের দিকে পেছন ফিরে আছে ক্যাম্পার।
এসো, যাই, মুসাকে বললো কিশোর।
কাজটা কি ঠিক হচ্ছে? মুসার কণ্ঠে অস্বস্তি। যদি…যদি সত্যিই ভূত থেকে থাকে?
থাকবে না, কারণ, ভূত বলে কিছু নেই। এসো।
কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারলো না মুসা। তবে আর প্রতিবাদও করলো না। মিস এমিনারের ঘরের পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে সিঁড়ির কাছে চলে এলো। ছাতে উঠে পেরিয়ে এলো মিস্টার ডেজারের ঘরের ছাত। সামনেই সরাইখানার দেয়াল। মাথা নিচু করে রইলো ওরা, যাতে গ্যালারি থেকে ক্যাম্পারের চোখে না পড়ে।
হাত থেকে উঁচুতে তিনতলার জানালা। তবে বেশি উঁচু নয়। উঁকি দিয়ে একবার দেখলো কিশোর, ক্যাম্পার আর ডেজার কথা বলছেন।
সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে একটা জানালার পাল্লায় ঠেলা দিলো মুসা। খুলে গেল ওটা। জানালা গলে ঢুকে পড়লো ঘরের ভেতর।
তিনতলার সমস্ত ঘরই একবার দেখে গেছে। আজ আর দেখার প্রয়োজন মনে। করলো না। সোজা এগোলো সিঁড়ির দিকে। নেমে এসে দাঁড়ালো প্রিন্সেস স্যুইটের।

সামনে। নব ধরে মোচড় দিলো মুসা। ঘুরলো না। জানে লাভ হবে না, তবু কাঁধ দিয়ে ধাক্কা দিলো পাল্লায়।
আমরা রান্নাঘরের ওপরে রয়েছি, চিন্তিত ভঙ্গিতে বললো কিশোর। কিংবা ভাঁড়ারের ওপর। আর তিনতলার কোণের ঘরের নিচে রয়েছি, যেটা থেকে ডামব ওয়েইটার নেমে গেছে। হাসি ফুটলো মুখে। শ্যাফটটা নিশ্চয় প্রিন্সেস স্যুইটের ভেতর দিয়ে নেমেছে। এই দেয়ালটার ঠিক ওপাশে। ঘরে খাবার পাঠানোর জন্যে তৈরি হয়েছে ডামবওয়েইটার, নিশ্চয় বন্ধ থাকার কথা নয় সব জায়গায়। প্রতি তলাতেই ওটা থেকে বেরোনোর জায়গা আছে।
খাইছে! তাই তো!
তাড়াতাড়ি আবার তিনতলায় উঠে এলো ওরা। শ্যাফটের ছোট দরজাটা খুলে ভেতরে উঁকি দিলো কিশোর। অন্ধকার। বাড়িটা তৈরি করতে কাঠ লেগেছে, ওগুলোর মাথা অনেক জায়গায় বেরিয়ে রয়েছে শ্যাফটের ভেতর।
ধরে ধরে সহজেই নেমে যেতে পারবো, বললো মুসা। মইয়ের মতো।
নেমে যেতে আরম্ভ করলো সে।
ওপর থেকে দেখছে কিশোর।
বেশিক্ষণ লাগলো না, দোতলায় দরজাটা পেয়ে গেল মুসা। পা দিয়ে ঠেলতেই খুলে গেল পাল্লা। শূন্য একটা ঘরে ঢুকলো মুসা। ধুলোর ছড়াছড়ি সবখানে। দরজা। দিয়ে আবার মুখ বের করে ওপরে তাকিয়ে ডাকলো সে, এসো।
কিশোরও নেমে এলো। ঢুকলো নিমা হল্যাণ্ডের ঘরে।
ছোট একটা অ্যান্টিরুমে ঢুকেছে ওরা। পুরানো ধাচের একটা সুইং ডোরের। গায়ে বসানো ছোট কাঁচের ভেতর দিয়ে আলো আসছে।
বাকি ঘরগুলো ওপাশে আছে, ফিসফিসিয়ে কথা বলছে মুসা, ভয়ে ভয়ে। তাকালো এদিক ওদিক। যেন ভয় করছে এখুনি বেরিয়ে আসবে ভূতটা।
সুইং ডোরে ঠেলা দিলে কিশোর। ওপাশে তাকিয়েই হাঁ হয়ে গেল।
ধুলোর নামগন্ধও নেই ঘরটায়। অনেকদিন বদ্ধ থাকলে যেমন ভ্যাপসা গন্ধ থাকে বাতাসে, তেমন গন্ধও নেই। লুকানো কোনো ভেন্টিলেটর দিয়ে বাতাস এসে থিরথির করে কাঁপছে জানালার পর্দা। ভারি, সুন্দর পর্দা, দামী। ঘরে আলো খুব কম তবে কি আছে না আছে দেখতে অসুবিধে হয় না। সাইডবোর্ড আছে কয়েকটা। তাতে রয়েছে রুপার মোমদানী, রুপার নানারকম পানপাত্র। দেয়ালে ঝোলানো অসংখ্য সুন্দর সুন্দর ছবি।
এই যে,বললো একটা চাপা কণ্ঠ, এটা কেমন?
ভীষণ চমকে গেল মুসা। ধক করে উঠলো বুক। কিশোরের হাত আঁকড়ে প্রলো। ব্রড ক্যাম্পারের গলা।

বাহ সুন্দর তো, মিস্টার ডেজার বললেন। মডার্ন আর্ট বুঝি না আমি, তবে দেখতে ভালোই লাগছে।
শব্দ করলে শোনা যাবে, বুঝে গেছে গোয়েন্দারা, তাই শব্দ করলো না। ঘরে কি আছে দেখতে লাগলো। দামী দামী অনেক জিনিস আছে। কার্পেট, চেয়ার, বাক্স, আর আরও অনেক জিনিস।
ক্যাম্পার আর ডেজার কথা বলছেন। কিন্তু তাদেরকে দেখা যাচ্ছে না।
দেয়ালের ওপাশ থেকে আসছে শব্দ, অনুমান করলো কিশোর। সেটার দিকে এগোতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো সে। পুরানো একটা কাঠের বাক্স দৃষ্টি আকর্ষণ করছে তার। ডালায় আর গায়ে খোদাই করা রয়েছে নানারকম পৌরাণিক দানরে ছবি। পায়ে পায়ে এসে দাঁড়ালো বাক্সটার কাছে। ডালা ধরে টান দিলো।
ঘাড়ের পেছনে দাঁড়িয়ে অস্ফুট একটা শব্দ করে উঠলো মুসা। বিস্ময়ে।
বাক্সটা টাকায় বোঝাই। দশ, বিশ, পঞ্চাশ, একশো ডলার নোটের বাণ্ডিল থরে থরে সাজানো। ব্যাংকে যেমন থাকে।
আপনার সঙ্গে কথা বলে বেশ ভালোই লাগলো মিস্টার ডেজার, ক্যাম্পার বলছে। তার ইচ্ছে, ডেজার এবার চলে যাক। এতো কাছাকাছি থাকি, অথচ কথা বলারই সুযোগ হয় না। এসে খুব ভালো করেছেন।
ঠেলে চেয়ার সরানোর শব্দ হলো। দেয়ালের ওপাশে পায়ের আওয়াজ এগিয়ে গেল গ্যালারির দরজা পর্যন্ত।
আস্তে ডালাটা আবার নামিয়ে দিলো কিশোর।
গ্যালারির দরজার ঘণ্টাটা বাজলো। তারমানে বেরিয়ে গেছেন ডেজার। আগের জায়গায় ফিরে এলো ক্যাম্পার। চেয়ারটা জায়গামতো নিয়ে গিয়ে রাখলো, আওয়াজ শুনেই আন্দাজ করা যাচ্ছে।
দেয়ালের কাছ থেকে সরে এলো কিশোর। মুসাকে ইশারা করলো পাশের ঘরে চলে আসতে। তারপর এগোলো, যেখান দিয়ে ঢুকেছে, সেখান দিয়েই বেরিয়ে যাবে আবার।
কতো টাকা, দেখলে! ফিসফিস করে বললো মুসা।
আনমনে মাথা দোলালো শুধু কিশোর।
কিন্তু এখনো পড়ে আছে কেন? আবার বললো মুসা। নিরমা হল্যাও তো সেই কবেই মরে গেছে।
আমার মনে হয় না টাকাটা তার। ক্যাম্পার কিছু একটা করছে। ও আমাকে বলেছিলো, সরাইটা যখন কেনে তখন একেবারে খালি ছিলো এটা... থমকে গেল। কিশোর। পাশের ঘরে হুড়কো খুলেছে বোধহয় কেউ।
আসছে! বলেই শ্যাফটের দরজা দিয়ে ঢুকে পড়লো মুসা।

তাকে কয়েক ফুট ওঠার সময় দিলো কিশোর, তারপর নিজেও ঢুকে পড়লো। সাবধানে লাগিয়ে দিলো দরজা।
আরেকটা দরজা খোলার আওয়াজ হলো। নিশ্চয় সুইং ডোরটা-ভাবলো। কিশোর। ক্যাম্পার ঢুকেছে। ও কি বুঝতে পারবে ঘরে লোক ঢুকেছিলো? দরজা খুলে শ্যাফটে দেখতে আসবে?
কিচ করে আরেকবার শব্দ হলো। ধড়াস করে উঠলো কিশোরের বুক। তবে না, শ্যাফটের দরজা নয়, সুইং ডোরটাই বন্ধ হলো আবার।
আওয়াজ হয়ে যাওয়ার ভয়ে থেমে গিয়েছিলো মুসা, কিশোরের মতোই সে-ও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। উঠতে আরম্ভ করলো ওপরে।
তিনতলায় উঠে মুসা বেরিয়ে গেল, কিশোর শ্যাফটের ভেতরেই রইলো।
প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে এলো মুসা! বললো, হল, গ্যালারি সব দেখে এসেছি। কেউ নেই। এসো।
কি যেন ভাবছে কিশোর। জবাব দিলো না। এই কিশোর, কি ভাবছো?
উ! ভাবছি, টাকার বাক্সটা কোনোভাবে বের করে নিয়ে যাওয়া যায় কিনা?
নিয়ে গিয়ে কি হবে, একথাটা আর জিজ্ঞেস করলো না মুসা।
এক কাজ করো, কিশোর বললো। ওয়াকি-টকিতে রবিনের সঙ্গে কথা বলে। ক্যামেরা নিয়ে আসতে বলো।
কথা বললো মুসা। ক্যামেরা সাথেই আছে রবিনের। কিভাবে কিভাবে আসতে হবে, তা-ও বললো।
কিছুক্ষণ পর এলো রবিন। উত্তেজিত।
সংক্ষেপে সমস্ত কথা বলে তার বিস্ময় কিছুটা ঘোচালো মুসা। আবার ফিরে যেতে হবে অ্যান্টিরুমে, কিশোর বললো।
কেন? রবিনের প্রশ্ন।
ক্যামেরা আনতে বলেছি কিসের জন্যে।
হাসলো রবিন। বুঝে ফেলেছে। ঘরের জিনিসপত্রের ছবি তুলবে।
হ্যাঁ, তুলবো। বিশেষ করে পেইন্টিংগুলোর। ওগুলোর মধ্যে একটার ছবি দেখেছি খবরের কাগজে, পরিষ্কার মনে পড়ছে। কারো কাছ থেকে চুরি করে আনা হয়েছে ওটা।
হাঁ করে কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইলো দুই সহকারী। মুসা বললো অব শেষে, ক্যাম্পার চোর?
জানি না। এক বাক্স বোঝাই টাকা, চোর হলে কি ওভাবে ফেলে রাখে ওরকম একটা জায়গায়? তবে, চোরাই মালের ব্যবসা যারা করে, তাদের প্রচুর নগদ টাকার দরকার হয়।

হ্যাঁ, মাথা দোলালো রবিন। জিজ্ঞেস করলো, যাবো ছবি তুলতে?
একলা পারবে?
কেন পারবো না। এই কয়েক মিনিট লাগবে। আসছি।
নেমে গেল রবিন।
দেয়ালে হেলান দিয়ে চুপ করে বসে ভাবতে লাগলো কিশোর। ঘন ঘন চিমটি কাটছে নিচের ঠোঁটে। পায়চারি করছে মুসা। হঠাৎ কিশোর বললো, হু, বুঝেছি!
থেমে গেল মুসা। কি বুঝলে?
ফিরে তাকালো না কিশোর। তাকিয়ে রয়েছে দেয়ালের দিকে। যেন সেখানে প্রোজেক্টরে ছবি চলছে, তাই দেখেই বলতে লাগলো, ধরো আজকে জুলাইয়ের চার তারিখ। তোমার বয়েস পাঁচ। কিটুর মতো। প্যারেড চলছে। সবাই ব্যস্ত, সবাই উত্তেজিত। তুমি এখন কি করবে?
ভ্রুকুটি করলো মুসা। এমন কিছু, যেটা করা উচিত নয়।
ঠিক। মারমেড গ্যালারিতে ঢোকার চেষ্টা করবে না তুমি, ভেতরে কি আছে দেখার জন্যে? কারণ ওটা দেখার প্রচণ্ড কৌতূহল আছে তোমার। নিঃশব্দে সবার চোখ এড়িয়ে চলে আসবে সিঁড়ির কাছে, উঁকি দিয়ে দেখবে ক্যাম্পার আছে কিনা।
দেখলে আন্দাজ করবে, আর সবার মতোই সে-ও বেরিয়ে গেছে প্যারেড দেখতে। এই সুযোগে ঢুকে পড়বে তুমি গ্যালারিতে, যেহেতু তোমার উচ্চতা কম, ঘণ্টার ইলেকট্রিক বীমে বাধা আসবে না। খুব সহজেই ঢুকে পড়তে পারবে তুমি, ডবকে নিয়ে।
গ্যালারিতে ঢুকে দারুণ সব জিনিস দেখবে তুমি। একটা দরজা চোখে পড়বে, ভাঁড়ারে ঢোকার। কাউন্টারের ওপারে দরজাটা। ওর ওপাশে কি আছে জানো না তুমি, দেখার কৌতূহল হবেই। ঢুকে পড়বে।
এক এক করে দেখতে দেখতে এভাবেই চলে যাবে প্রিন্সেস স্যুইটের কাছে। থেমে দম নিলো কিশোর। তারপর বললো, আমার বিশ্বাস, সেদিন সকালে নিরমা। হল্যাণ্ডের ঘরে ছিলো ক্যাম্পার।
কিন্তু দরজা তো বন্ধ, ঢুকলো কিভাবে? প্রশ্ন তুললো মুসা। নিশ্চয় শ্যাফট দিয়ে নয়?
না। অবশ্যই আরেকটা গোপন দরজা আছে, যেখান দিয়ে ক্যাম্পার ঢোকে। সেটা দেখে ফেলেছিলো কিটু। সবাই তখন প্যারেড দেখায় ব্যস্ত, তাই হয়তো ভেতরে ঢুকে দরজাটা আর লাগিয়ে দেয়ার কথা মনে হয়নি ক্যাম্পারের। ভেবেছে, কে আর আসবে দেখতে?
তারপর কোনো কারণে চোখ তুলে কিটুকে দেখে ফেলেছে। কিংবা এমনও হতে পারে, দরজাটা খোলা ফেলে নিজের অ্যাপার্টমেন্টে গিয়েছিলো ক্যাম্পার, ফিরে

এসে দেখে ট্রেজার রুমে ঢুকে বসে আছে কিটু। কি করবে তখন সে? ভয়। পাবে? রেগে যাবে?
ধরার চেষ্টা করবে কিটুকে, মুসা বললো।
হ্যাঁ। আর কিটু পালানোর চেষ্টা করবে। বেরিয়ে চলে এসেছিলো হয়তো গ্যালারিতে। লুকানোর চেষ্টা করেছিলো জলকন্যার বেদির আড়ালে। তাতে নাড়া লেগে পড়ে গিয়ে ভেঙে যায় জলকন্যা। ডব ছিলো কিটুর সাথে। মূর্তিটা সরাসরি মাটিতে পড়েনি, পড়েছিলো কুকুরটার ওপর। ব্যথা যা পেয়েছে, তার চেয়ে বেশি পেয়েছিলো শক। সহ্য করতে পারেনি জানোয়ারটার বুড়ো, নষ্ট হয়ে যাওয়া। হৃৎপিণ্ড। মারা যায় ওটা।
ততোক্ষণে পেছনের দরজার কাছে চলে যায় কিটু। দরজার ছিটকানি খুলে রাখে ক্যাম্পার, যখন সে ওঘরে থাকে, ফলে কিটুর বেরিয়ে যেতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। কিন্তু, বেরোনোর আগেই মুর্তিটা পড়ে যদি ভেঙে গিয়ে থাকে, তাহলে শব্দ হয়েছে। নিশ্চয় ফিরে তাকিয়েছে কিটু। কি দেখবে, এবং তখন কি করবে?
ফিরে আসবে কুকুরটাকে তোলার জন্যে।
কিংবা মূর্তি ভেঙেছে দেখে এতো ভয় পেয়ে যাবে, ডবের কথা আর ভাববে না। সোজা বেরিয়ে যাবে। ভাববে, তার দোষেই এতো কিছু ঘটেছে। মায়ের শাস্তির ভয়ে লুকিয়ে পড়বে কোথাও গিয়ে।
হ্যাঁ, ঠিকই, একমত হলো মুসা। ওর বয়েসে আমি হলেও ওরকমই ভয় পেতাম। কিন্তু কোথায় লুকাতাম? এমন কোনো জায়গা আছে যেখানে পুলিশও খুঁজে বের করতে পারছে না? নাকি অন্য ব্যাপার হয়েছে। ক্যাম্পার ধরে ফেলেছে কিটুকে...
না। ও কোথায় আছে ক্যাম্পার জানেই না। সান্তা মনিকা পিয়ারে খুঁজতে গিয়েছিলো, মনে নেই?
তাই তো! কিন্তু কেন খুঁজতে গেল। ছেলেটাকে খুঁজে বের করে মানে, মুখ বন্ধ করে দেয়ার জন্যে, যাতে সে ট্রেজার রুমের কথা বলতে না পারে?
জবাব দিলো না কিশোর। দীর্ঘ একটা নীরব মুহূর্ত পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলো ওরা। তারপর রবিনের নড়াচড়ার শব্দ শুনে শ্যাফটের কাছে এগিয়ে গেল। তাকে উঠতে সাহায্য করার জন্যে।
অদ্ভুত! বেরিয়েই বলে উঠলো রবিন। মনে হলো আরব্য রজনীর কোনো গল্পের মধ্যে গিয়ে ঢুকেছিলাম..।
বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করলো কিশোর, ছবি তুলেছো?
নিশ্চয়ই। পেইন্টিং, টাকা, সব কিছুর। এখন কি করব? পুলিশের কাছে যাবো?
হয়তো। তবে তার আগে জরুরী আরও কাজ আছে। আর একটা, সূত্র পেলেই কিছু নিখোঁজ রহস্যের সমাধান করে ফেলতে পারবো।

.
বুকশপেই পাওয়া গেল নিনা হারকারকে। ছেলেদের দেখে বলে উঠলো, কিছুতেই বাড়ি বসে থাকতে পারলাম না। ভাবলাম, দোকানেই চলে আসি...।
ছেলে নিখোঁজ হয়েছে তিনদিন, একেবারে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে মহিলাকে হলদে হয়ে এসেছে চামড়া, ভারি ভাঁজ পড়েছে কপালের চামড়ায়।
যতোটা সম্ভব কম শব্দ করে একটা ঝাড়ন দিয়ে ধুলো ঝাড়ছেন বোরম্যান। বইয়ের তাকের ফাঁক দিয়ে এমনভাবে ঝাড়নটা ঢুকিয়ে দিচ্ছেন, যেন ঘোরের মধ্যে রয়েছেন?
কিশোর জিজ্ঞের করলো, মিসেস হারকার, এখানে কিটুর এমন কোনো বন্ধু আছে, যাকে সে খুব বিশ্বাস করে?
হাসলো নিনা। কান্নার মতো দেখালো হাসিটা। বললো, ছিলো, শুধু ডব। তাকেই বিশ্বাস করতো কিটু।
মিসেস হারকার, আমি শিওর, কিটুকে সাহায্য করছে কেউ। পালিয়েই গেছে সে। কেউ একজন তাকে লুকিয়ে রেখেছে, খাওয়াচ্ছে, থাকার জায়গা দিয়েছে। নিশ্চয় আরেকটা বাচ্চা। তেমন কাউকে চেনে হয়তো কিটু, আপনারা জানেন না।
তেমন কে আছে, মনে করার চেষ্টা করতে লাগলো নিনা।
জানালা দিয়ে সৈকতের দিকে তাকালো কিশোর। বরগু চলেছে। সাদা একটা পেটফোলা ব্যাগ তার হাতে। ব্যাগের গায়ে, মুরগীর মাংসে তৈরি খাবারের বিজ্ঞাপন। হু! আনমনে বললো কিশোর।
জানালার পাশ দিয়ে ওশন ফ্রন্টের দিকে চলে গেল বরগু। হাসলো কিশোর। মিসেস হারকার, আসুন আমার সঙ্গে।
কিশোরের কণ্ঠস্বরের হঠাৎ পরিবর্তনে ঝট করে মুখ তুলে তাকালো নিনা। কী? কি ব্যাপার?।
একটা ব্যাপার পুরোপুরি চোখ এড়িয়ে গিয়েছিলো আমাদের, হাত তুলে ওশন ফ্রন্টের দিকে দেখালো কিশোর।
তিন গোয়েন্দা আর নিনা বেরিয়ে গেল।
নিনা? পেছন থেকে ডাকলেন বোরম্যান।
জবাব দিলো না নিনা। ওশন ফ্রন্টের দিকে তাকিয়ে আছে। বরগুকে দেখছে।
দোকান থেকে বেরিয়ে এসে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন বোরম্যান। ছেলেদের সঙ্গে চললেন তিনি আর নিনা। সামনে বেশ কিছুটা দূরে রয়েছে বরগু। আজ তার সাথে কুকুর দুটো নেই। ঠেলাটাও নেই। শুধু খাবারের ব্যাগটা হাতে।
ওর একশো গজের মধ্যে পৌঁছে গেছে অনুসরণকারীরা, এই সময় ঘুরলো বরগু। ঢুকে পড়লো একটা ছোট গলিতে। ওশন ফ্রন্ট আর স্পীডওয়েকে যুক্ত। করেছে

এই গলি।
মুসা, জলদি যাও! চেঁচিয়ে বললো কিশোর। চোখের আড়াল না হয়!
যাচ্ছি, বলেই দৌড় দিলো মুসা।
যেখান থেকে অদৃশ্য হয়েছে বরগু, সেখানে পৌঁছে ঘুরে তাকালো স্পীডওয়ের দিকে। কিশোর আর রবিনের উদ্দেশ্যে একবার হাত নেড়ে ঢুকে পড়লো গলিতে। চলার গতি বাড়িয়ে দিয়েছে কিশোর।
বরগু! নিনা বললো, তাই, না? বরগুই!
কিশোরের পেছনে প্রায় ছুটতে আরম্ভ করলো সে।
নিনা, হয়েছে কি? জিজ্ঞেস করলেন উত্তেজিত বোরম্যান। কিছু তো বুঝতে পারছি না!
বরগু! ইস, আগেই আন্দাজ করা উচিত ছিলো আমার!
গলির মুখে পৌঁছে গেল ওরা। দুটো বাড়ির মাঝে সরু পথ, কোণের কাছে সাইনবোর্ড ফেয়ার আইলস ওয়ে।
স্পীডওয়ের ধারে অপেক্ষা করছে মুসা। ওদেরকে দেখে হাত নেড়ে আবার। হাঁটতে শুরু করলো, প্যাসিফিক অ্যাভেনিউর দিকে।
দৌড় দিলো নিনা। অ্যাভেনিউর অর্ধেক যেতে না যেতেই মুসাকে ধরে ফেললো।
পুরানো একটা ভাঙা বাড়ির ঘাস-জন্মানো ড্রাইভওয়ের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। মুসা। ও বাড়িতে ঢুকেছে, হাত তুলে বললো সে। কুত্তার ডাক শুনেছি।
বারান্দায় বেরিয়ে এলো একজন বৃদ্ধ। দুজনকে দেখে জিজ্ঞেস করলো, কি চাই?
ড্রাইভওয়ের দিকে এগোলো নিনা।
দাঁড়াও! চেঁচিয়ে উঠলো বৃদ্ধ। একটা দাঁতও নেই, ফলে উচ্চারণ অস্পষ্ট, কেমন জড়িয়ে যায় কথা। অন্যায় ভাবে ঢুকেছো! পুলিশ ডাকবো বলে দিলাম!
পরোয়াই করলো না নিনা। কিশোর আর বোরম্যানও তার পিছু নিলেন।
আবার ঘেউ ঘেউ করে উঠলো কুকুর।
এই, শুনছো! চিৎকার করে বললো বৃদ্ধ। এটা আমার জায়গা, জোর করে ঢুকছো তোমরা! বেরোও!
কিটু-উ! চেঁচিয়ে ডাকলো নিনা। কিটু-উ, কোথায় তুই?
পেছনের উঠানে আগাছার ছড়াছড়ি। একপাশে কাত হয়ে গেছে পুরানো। গ্যারেজটী। ওটার দরজার হাতল ধরে টান মারলো নিনা। মাটিতে ঘষা খেতে। খেতে তার দিকে যেন ছুটে এলো পাল্লাটা।
ভেতরে আবছা অন্ধকার। অনেক শরীরের নড়াচড়া। খেক কে করে নিনার দিকে তেড়ে আসতে চাইলো দুটো কুকুর। কিন্তু আটকালো বরও। পেছনের দেয়াল

ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে আরেকটা ছোট্ট শরীর। ফ্যাকাসে মুখ, চোখ বড় বড় হয়ে গেছে।
কিটু-উ! বলে চেঁচিয়ে উঠে ছুটে গেল মা।
মুরগীর পা চিবোচ্ছিলো কিটু। ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে লাফিয়ে উঠে ছুটে এলো। মায়ের দিকে। জড়িয়ে ধরলো একে অন্যকে।
ছোট্ট একটা কাশি দিয়ে আরেক দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন বোরম্যান।
কুকুরগুলোকে শান্ত করলো বরগু। নিয়ে গেল গ্যারেজের কোণে। একটা দড়ির খাঁটিয়া রয়েছে ওখানে, তার ওপর বসে পড়লো সে। বিষণ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে মা-ছেলের দিকে। দিন কয়েকের জন্যে একটা বাচ্চাকে আপন করে পেয়েছিলো সে। একা হয়ে গেল আবার। তার মতো একজন মানুষকে বিষণ্ন করে দেয়ার জন্যে এটা যথেষ্ট।

.

খবর ছড়িয়ে পড়তে দেরি হলো না। ভিড় জমে গেল পথে। পুলিশ এলো। গুর হাতে হাতকড়া দিয়ে গাড়িতে তুলে নিয়ে গেল তারা।
এবার কি করবো? রবিনের প্রশ্ন। কিটু ট্রেজার রুমটা দেখে থাকলে বলে দেবেই। তার আগেই হুঁশিয়ার হয়ে যাবে ক্যাম্পার। মালপত্র সব সরিয়ে ফেলবে অন্য কোথাও বন্ধ ঘরে বাক্স ভর্তি টাকা আর দামী দামী জিনিসের কথা কে বিশ্বাস করবে তখন?
করবে না, মাথা নাড়লো মুসা।
কাজেই সেটা প্রমাণ করার দায়িত্ব আমাদের, ঘোষণা করলো কিশোর। সান্তা মনিকায় একটা ছবি তোলার দোকান আছে, এক ঘণ্টার মধ্যেই ফটো ডেভেলপ করে দেবে। রবিন, ক্যামেরাটা নিয়ে চলে যাও, ট্রেজার রুমে তোলা ছবিগুলো করিয়ে আনো। আমি আর মুসা যাচ্ছি ভেনিস লাইব্রেরিতে। ছবিগুলো। নিয়ে ওখানে চলে এসো।
রবিন রওনা হয়ে গেল উত্তরে ফটোর দোকানের দিকে। কিশোর আর মুসা চললো মেইন স্ট্রীটে, যেখানে রয়েছে ছোট লাইব্রেরিটা। যাওয়ার সময় একটা মস্ত বেলুন দেখে দাঁড়ালো দুজনে। নতুন একটা সুপার মার্কেট করা হয়েছে, ওটার পার্কিং লটে বেঁধে রাখা হয়েছে বেলুনটা, আজ মার্কেটের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। বিজ্ঞাপন। লেখা রয়েছেঃ
প্রতি একশো জন খরিদ্দারের মধ্যে
লটারি করে যে কোনো একজনকে
বেলুনে করে বিনে পয়সায়
আকাশে ওড়ার সুযোগ দেয়া হবে।

বাহ, দারুণ তো! হেসে মুসা বললো। বেলুনের গনডোলায় গিয়ে উঠছে। কয়েকজন লোক, সেটা দেখছে সে।
চলো, আমাদের কাজে যাই, খানিকটা অসহিষ্ণু হয়েই হাত নাড়লো কিশোর।
লাইব্রেরিতে ঢুকেই পত্রিকা ঘাটতে বসলে সে, মুসা তাকে সাহায্য করলো। গত দুই হপ্তার কাগজ বের করলো ওরা, তখনও যেগুলোর মাইক্রোফিল্ম করা হয়নি।
কি খুঁজছো? জিজ্ঞেস করলো মুসা।
একটা চোরাই ছবির কথা পড়েছিলাম, কোন সংখ্যায় ঠিক মনে নেই। সেটাই খুঁজছি।
লম্বা একটা রীডিং টেবিলে পত্রিকাগুলো এনে ফেললো ওরা। তারপর ছড়িয়ে নিয়ে দেখতে আরম্ভ করলো।
মুসার চোখে পড়লো প্রথমে। বলে উঠলো, এই তো! কাগজটা কিশোরের দিকে ঠেলে দিলো সে।
পেইন্টিংটার একটা পরিষ্কার ফটোগ্রাফে দেখা যাচ্ছে-তৃণভূমিতে খেলছে কয়েকটা বাচ্চা ছেলেমেয়ে। মারমেড ইনে দেয়ালে ঝোলানো একটা ছবিতে এই দৃশ্য দেখেছে ওরা।
ছবিটা দেখেই চেনা চেনা লাগছিলো তখন, সন্তুষ্ট হয়ে বললো কিশোর।
ঘণ্টাখানেক পরে এসে মুসা আর কিশোরকে লাইব্রেরিতেই পেলো রবিন। ছবি আর প্রতিবেদনটার ফটোকপি করে নিয়েছে কিশোর। প্রতিবেদন পড়ে জানা গেল বিখ্যাত চিত্রকর ডেগার আঁকা পেইন্টিং ওটা। তাঁর বিখ্যাত ছবি নয় এটা, তবু। যথেষ্ট দামী। দিন কয়েক আগে আরও কিছু মূল্যবান জিনিস সহ ছবিটা চুরি গেছে। একজন ধনী লোকের বাড়ি থেকে।
হাতের খাম থেকে ছবিগুলো টেবিলে ঢাললো রবিন। বেছে বেছে বের করলো একটা ছবি, পত্রিকার ছবিটার সঙ্গে অবিকল মিলে যায়।
হুবহু এক, মুসা বললো। কিন্তু ডেগার ছবির নকলও হতে পারে এটা। সব পেইন্টিঙেরই নকল পাওয়া যায়, তাই না?
যায়, বিখ্যাতগুলোর, জবাব দিলো কিশোর। তবে আমি শিওর মারমেড ইনের ছবিটা আসল। ঘরের অন্যান্য জিনিসগুলোও চোরাই মাল। এইবার পুলিশকে। জানানো যায়।
লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে এলো তিন গোয়েন্দা। বাইরে তখন শেষ বিকেলের রোদ। আপনমনে শিস দিতে দিতে চললো কিশোর।
ভেনিস পুলিশ স্টেশনে এসে ঢুকলো ওরা। একজন অফিসারকে দেখে তার। সঙ্গে কথা বলতে গেল কিশোর। অন্য দুজন দাঁড়িয়ে রইলো পেছনে।

ভূমিকা না করে কিশোর বললো, চোরাই একটা ছবির খবর দিতে পারি, ডেগার ছবি। কোথায় আছে ওটা জানি। কে চুরি করেছে, তা-ও আন্দাজ করতে পারি।
ফটোকপি করে আনা পত্রিকার প্রতিবেদনটা দেখালো কিশোর, তারপর দেখালো রবিনের তুলে আনা ছবিটা। আজ বিকেলে তোলা হয়েছে এটা, বললো সে।
দুটো ছবি ভালোমতো মিলিয়ে দেখলো অফিসার। মন্তব্য করলো না। ছেলেদেরকে নিয়ে এলো আরেকটা ছোট ঘরে, ওখানে একটা টেবিল ঘিরে কয়েকটা চেয়ার সাজানো রয়েছে। ওদেরকে ওখানে বসতে বলে চলে গেল।
খানিক পরেই এসে হাজির হলো একজন সাদা পোশাক পরা পুলিশের গোয়েন্দা। হাতে ফটোকপির কাগজ আর রবিনের তুলে আনা ছবিটা। অফিসার নিয়ে গিয়েছিলো ওগুলো।
ইনটারেসটিং, দুটোই দেখিয়ে এমনভাবে বললো ডিটেকটিভ, যেন মোটেও ইনটারেসটিং নয় ব্যাপারটা। দেখতে দুটো ছবি একই রকম। তবে তোমরা যেটা তুলে এনেছো, সেটা আসল না-ও হতে পারে। কোত্থেকে আনলে? বলেই চোখ। পড়লো রবিনের কাঁধে ঝোলানো ক্যামেরার ওপর। তুমি তুলেছে, না?
হ্যাঁ, স্যার। মারমেড ইনের একটা ঘর থেকে।
মারমেড ইন? ওটা তো বহু বছর ধরে তালা দেয়।
কথা বললো কিশোর, সবাই তাই জানে বটে, কারণ মালিকের তা-ই ইচ্ছে। হোটেলের একটা সুইট এখনও নিয়মিত ব্যবহার হয়। নানারকম দামী দামী জিনিসে বোঝাই ওটা, চোরাই মাল। আমার বিশ্বাস, হোটেলটার বর্তমান মালিক ব্রড ক্যাম্পার এর সঙ্গে জড়িত। মনে হয় চোরাই মালের ডিলার সে, কারণ ওই ঘরে এক বাক্স ভর্তি টাকা দেখেছি।
খামটা খুলে আরেকটা টেবিলে ছবিগুলো ঢেলে দিলো রবিন। তার মধ্যে একটা ছবিতে স্পষ্ট উঠেছে টাকার বাণ্ডিলের ছবি।
হুমম! বলে মাথা দুলিয়ে, ছেলেদের আইডেনটিটি কার্ড দেখতে চাইলো। ডিটেকটিভ। স্টুডেন্ট কার্ড বের করে দেখালো ওরা। তারপর কি মনে করে তিন গোয়েন্দার একটা কার্ড বের করে দিলো কিশোর।
গুঙিয়ে উঠলো ডিটেকটিভ। শখের গোয়েন্দা! আগেই আন্দাজ করা উচিত ছিলো আমার। এই বয়েসে অনেক ছেলেই গোয়েন্দা হতে চায়। অন্তত ভাবে, যে তারা গোয়েন্দা।
ভাবাভাবির মধ্যে নেই আমরা, ভারিক্কি চালে বললো কিশোর। আমরা। সত্যিই গোয়েন্দা। অনেক জটিল রহস্যের সমাধান করেছি। অনেক বড় বড় চোর ডাকাতের কোমরে দড়ি পরিয়েছি...

হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিলো ডিটেকটিভ। উঠে দাঁড়ালো। বসো এখানে। আসছি।
প্রতিবেদনের ফটোকপি আর ছবিগুলো নিয়ে চলে গেল লোকটা।
কি করতে গেল? মুসার প্রশ্ন।
চোরাই মালের লিস্ট থাকে থানায়। ছবিগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে গেছে। হয়তোঁ। ফোন-টোন করে খোঁজ-খবরও নিতে পারে।
ক্যাম্পারকে না আবার করে বসে! রবিন বললো।
ক্যাম্পারকে? উদ্বিগ্ন হয়ে বললো মুসা। কেন, তাকে করবে কেন?
কারণ তার হোটেলে চুরি করে ঢুকেছি আমরা, সেটা একটা অপরাধ। ইচ্ছে করলেই আটকে দিতে পারে আমাদেরকে পুলিশ। যদি হোটেলের কামরা থেকে জিনিসগুলো সরিয়ে ফেলে থাকে ক্যাম্পার, আর চোরাই মালের লিস্টের সঙ্গে না মেলে, তাহলে মরেছি!
রবিনের কথার মানে বুঝে চুপ হয়ে গেল মুসা।
দীর্ঘ নীরবতার পর মুখ খুললো কিশোর, যেন মনের ভাবনাগুলোই মুখে উচ্চারণ করলো, যদি ক্যাম্পারকে ফোন করেই, তো কি করবে ক্যাম্পার? কিটু যদি ঘরটা দেখে থাকে…
বাধা দিয়ে রবিন বললো, কিটু যে দেখেছেই, তার নিশ্চয়তা কি? নিশ্চয়তা? আছে। এতো দামী দামী খাবার কেনার টাকা কোথায় পেলো গু? পেসট্রি, পিজা, চিকেন। আমার বিশ্বাস বাক্স থেকে কিছু টাকা তুলে নিয়ে এসেছিলো কিটু। কড়কড়ে নোট দেখেছে, ছেলেমানুষ, তুলে নিয়ে পকেটে ভরে ফেলেছে। টাকা দেখলে অনেক ছেলেই ওরকম করে। ওই টাকা দিয়েই তাকে খাবার কিনে এনে দিয়েছে ব্রগু।
এক মুহূর্ত চুপ থেকে আবার ক্যাম্পারের কথায় ফিরে গেল কিশোর, হ্যাঁ, যা। বলছিলাম, ক্যাম্পার কি করবে? আমার ধারণা, ও পালানোর চেষ্টা করবে। কারণ অপরাধীর মন সব সময়ই দুর্বল থাকে। ওর ব্যাপারেই একটা সহজ উদাহরণ ধরো-জলকন্যার মূর্তিটা ভাঙার পর আমরা হলে, কিংবা অপরাধী না হয়ে অন্য কেউ হলে কি করতো? ভাঙা টুকরোগুলো তুলে নিয়ে জাস্ট ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে আসতো। সে করলো কি? অনেক সাবধানে লুকিয়ে লুকিয়ে নিয়ে গিয়ে ফেললো। সাগরের পানিতে, যাতে কারও চোখে না পড়ে। কি দরকারটা ছিলো? সব কিছু গড়বড় হয়ে যাচ্ছে এখন। কিটু যদি মুখ খোলে, এই ভয়ে ওর মুখ বন্ধ করার চেষ্টা করতে পারে এখন ক্যাম্পার।
চোখ বড় বড় হয়ে গেল রবিন আর মুর্সার।
রবিন বললো, তার আগেই আমাদের কিছু করা দরকার!

এখুনি চলো! বলেই দরজার দিকে রওনা হয়ে গেল মুসা।
কিশোর আর রবিনও তার পিছু নিলো। ডিটেকটিভের ফিরে আসার অপেক্ষা করলো না আর ওরা।

.

ওশন ফ্রন্টে যখন পৌঁছলো তিন গোয়েন্দা, সাতটা বেজে গেছে। দিনের বেলা যে রকম ভিড় থাকে ভেনিসে, সেটা কমে এসেছে। স্পীডওয়েতে গাড়ি খুব কম। ওশন। ফ্রন্টে ঘোরাঘুরি করছে অল্প কয়েকজন মানুষ।
বইয়ের দোকানের বাইরে গলিতে দাঁড়িয়ে আছে টেলিভিশনের একজন। রিপোর্টার। কিটু আর নিনার সাক্ষাৎকার নিতে এসেছে। কিছু লোক ঘিরে দাঁড়িয়েছে তাদেরকে।
সেদিকে গেল না গোয়েন্দারা। ওদের একমাত্র ভাবনা, কিটুকে বাঁচাতে হবে। বিপদের খাড়া ঝুলছে ছেলেটার মাথার ওপর।
মারমেড ইনের কাছে চলে এলো ওরা। গ্যালারি বন্ধ। তবে কি ক্যাম্পার পালালো? অ্যাপার্টমেন্টের জানালায় পর্দা টানা। ভেতরে লোক আছে কিনা বোঝার উপায় নেই।
হঠাৎ করেই সামনের দিকের একটা পর্দা নড়ে উঠলো। ওশন ফ্রন্টের দিকে উঁকি দিলো বোধহয় কেউ।
আছে! আছে! বলে উঠলো মুসা।
মনে হয় পালানোর তাল করছে, কিশোর বললো। সিঁড়ি দিয়ে পেছনে গ্যারেজের কাছে নেমে যাবে।
তাহলে দাঁড়িয়ে আছি কেন? তাগাদা দিলো রবিন।
চত্বরের উত্তর পাশ ঘুরে পেছনে চলে এলো ওরা। ঠিকই বলেছে কিশোর। বেরিয়ে এসেছে ক্যাম্পার। পেছনের সিঁড়ির মাথায় রয়েছে এখনও। হাতে একটা। স্যুটকেস। ওখানেই দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকালো সে, তারপর আস্তে লাগিয়ে দিলো পাল্লাটা। তিন গোয়েন্দা আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে, ওদেরকে দেখতে পেলো না।
পেছনের গ্যারেজের দিকে এগোলো ক্যাম্পার। হাতে ঝুলছে চাবি। কিন্তু। দরজার তালা খোলার আগেই বড় করে দম নিয়ে এগিয়ে গেল কিশোর। বললো, চলে যাচ্ছেন, মিস্টার ক্যাম্পার? খুব খারাপ কথা। আমরা ভাবছি এই কেসের। একটা কিনারা করে দেবো।
পাই করে ঘুরলো ক্যাম্পার। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে তার সুন্দর চেহারা। কেসের কিনারা তো করেই ফেলেছো। ছেলেটা ফিরে এসেছে। খুব চালাক তোমরা। কংগ্রাচুলেশন।

কিছু কথা বলার আছে আপনাকে, শুনবেন? নাকি কি বলবো বুঝে ফেলেছেন? পানিতে যখন মূর্তির টুকরোগুলো ফেলেছিলেন, অবাক লেগেছিলো। তারপর হোটেলের ভেতরে যখন ট্রেজার রুমটা আবিষ্কার করলাম, বুঝে ফেললাম সব।
ঢোক গিললো ক্যাম্পার। জিভ বোলালো শুকনো ঠোঁটের ওপর। ঠোঁটের কোণ কাঁপছে। কোনো কথা না বলে তাড়াতাড়ি তালা খোলার চেষ্টা করলো।
না! বলেই লাফ দিলো মুসা। প্রায় উড়ে গিয়ে পড়লো ক্যাম্পারের গায়ের। ওপর। মাথা দিয়ে তো মেরে ফেলে দিলো লোকটাকে। হাতের চাবি গিয়ে ঝনঝন করে পড়লো স্পীডওয়েতে। চোখের পলকে ক্যাম্পারের পাশে চলে এলো। কিশোর। রবিন চলে গেল রাস্তার ওপর। চাবিটা তুলে নিলো।
স্পীডওয়ে ধরে একটা গাড়ি এগিয়ে আসছে। কাছে এসে জানালার কাঁচ নামিয়ে দিলো চালক। জিজ্ঞেস করলো, এই যে ভাই, কি হয়েছে?
প্রশ্নটা ক্যাম্পারকে করেছে, কিন্তু জবাবটা দিলো কিশোর, জলদি গিয়ে পুলিশে খবর দিন! কুইক!
এক সেকেণ্ড দ্বিধা করলো লোকটা। তারপর গাড়ির গতি বাড়িয়ে গিয়ে মোড় নিয়ে উঠে গেল আরেকটা রাস্তায়।
বিচ্ছুর দল! উঠে দাঁড়িয়েছে ক্যাম্পার। গলা কাঁপছে তার।
কি হয়েছে কিছুই জানে না লোকটা, গাড়ির চালকের কথা বললো কিশোর। কিন্তু পুলিশকে খবর দিতেও পারে। আসার আগে পুলিশকে ট্রেজার রুমের কথা। জানিয়ে এসেছি আমরা। লোকটার কাছে খবর পেলে চোখের পলকে এসে হাজির। হবে। আপনার হাতে টাকা ভর্তি স্যুটকেস দেখলে কি ভাববে ওরা বলুন তো?
ক্ষণিকের জন্যে ঝুলে পড়লো ক্যাম্পারের মাথা। যেন হাল ছেড়ে দিয়েছে। তারপর আচমকা সোজা হলো আবার। হাতে বেরিয়ে এসেছে একটা পিস্তল। বেশ, তোমরাও আসছো আমার সঙ্গে। পুলিশ এখানে এসে কাউকে পাবে না।
পিস্তল আশা করেনি কিশোর, তৈরি ছিলো না। থমকে গেল তিনজনেই। আদেশ পালন না করে উপায় নেই। মরিয়া হয়ে উঠেছে ক্যাম্পার। পিস্তলটার কুৎসিত নলের দিকে তাকিয়ে একবার দ্বিধা করলো ওরা, তারপর গা ঘেঁষাঘেঁষি করে এলো।
আগে বাড়ো! পিস্তল নাচিয়ে নির্দেশ দিলো ক্যাম্পার।
গুলি আপনি করতে পারছেন না, কিশোর বললো। যে কোনো মুহূর্তে পুলিশ এসে যেতে পারে।
আসুক। এখানে আমি আর থাকতে পারছি না কিছুতেই। কাজেই দেখে ফেললেও কিছু এসে যায় না। তোমাদের জিম্মি করে ওদের নাকের ওপর দিয়েই চলে

যাবো। হাঁটো। প্যাসিফিক এভেনুতে যাবো আমরা। আমি থাকবো পেছনে। টু শব্দ করলে খুলি উড়িয়ে দেবে।
আর কিছু বললো না ছেলেরা। ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করলো। পরের সরু গলিটা দিয়ে যাবে প্যাসিফিক এভেনিউতে।
এই, নিগ্রো! পেছন থেকে ধমকের সুরে বললো ক্যাম্পার, স্যুটকেসটা নাও। গায়ে তো মেলা জোর, কুলিগিরি একটু করো।
সুটকেসটা হাতে নিলো মুসা। ক্যাম্পারের হাত এখন পকেটে। নিশ্চয় পিস্তলটা ধরে আছে। নলের মুখও যে ওদেরই দিকে, বুঝতে অসুবিধে হলো না তিন গোয়েন্দার।
পালাতে আপনি পারবেন না, কিশোর বললো। ইভলিন স্ট্রীটের বাড়িটার কথাও পুলিশকে বলে দিয়েছি আমরা।
কথাটা মিথ্যে, কিন্তু বিশ্বাস করলো ক্যাম্পার। গাল দিয়ে উঠলো তিন গোয়েন্দাকে। তাড়াতাড়ি পা চালাতে বললো। প্যাসিফিক পেরিয়ে গিয়ে মেইন স্ট্রীটে উঠতে বললো।
সূর্য অস্ত যাচ্ছে। ডুবন্ত সূর্যের সোনালি আলো এসে পড়েছে মেইন স্ট্রীটের বাড়িগুলোর জানালায়। এমনভাবে চমকাচ্ছে, মনে হচ্ছে যেন আগুন লেগেছে ওগুলোয়। সুপার মার্কেটের পার্কিং লটে বেলুনটাকে বাধছে বেলুন-চালক, আজকের মতো ওড়ানো শেষ।
ছেলেদেরকে সেদিকে এগোতে বললো ক্যাম্পার।
আজ আর উড়ছি না, বুঝলেন, ক্যাম্পারের উদ্দেশ্য বুঝে বললো বেলুন চালক। কাল আসবেন। বেঁধে ফেলেছি, আর খুলতে পারবো না। রাতের বেলা। হবে না।
পিস্তলটা বের করে দেখালো ক্যাম্পার।
ভীত হাসি হাসলো চালক। না না, একেবারেই ওড়াতে পারবো না, তা বলিনি। বেশি জরুরী হলে...
জলদি করো! কড়া গলায় ধমক দিলো ক্যাম্পার। চালাকির চেষ্টা করবে না। দ্বিতীয়বার আর হুঁশিয়ার করবো না আমি! তিন গোয়েন্দার দিকে ফিরে বললো, যাও, ওঠো!
নীরবে একে একে গনডোলায় চড়লো কিশোর, মুসা, রবিন। বেলুনের নিচে ঝুলছে বিশাল ঝুড়ি। ওটাকে গনডোল বলে। সব শেষে উঠলো ক্যাম্পার। বেলুন বাধা দড়িগুলো দেখিয়ে চালককে নির্দেশ দিলো, কাটো ওগুলো! জলদি!
আপনার ইচ্ছেটা বুঝতে পারছি না, আমতা আমতা করে বললো চালক। অন্তত একটা দড়ি তো রাখতেই হবে। নইলে নামবো কি করে? আপনার ইচ্ছে মতো চলবে না এটা।

অধৈর্য ভঙ্গিতে হাত নাড়লো ক্যাম্পার। কড়া গলায় বললো, বেশি কথা বলো তুমি! যা বলছি করো। শেষ দড়িটা কেটে দিয়েই লাফিয়ে উঠে পড়বে। নইলে গুলি খাবে বলে দিলাম।

এসব না করলেও পারতেন, পরামর্শ দিলো মুসা। ট্যাক্সি ধরে এয়ারপোর্ট কিংবা বাস স্টেশনে চলে যেতে পারেন...

চুপ! ধমক দিয়ে তাকে থামিয়ে দিলো ক্যাম্পার।

চুপ হয়ে গেল মুসা। এক এক করে দড়ি কেটে দিতে লাগলো চালক। শেষ। দড়িটা কেটে দিলে ওপরে উঠতে শুরু করলো বেলুন। নাগালের বাইরে চলে। যাওয়ার আগেই লাফ দিয়ে গনডোলায় চড়লো সে।

বেশি দূর কিন্তু যাবে না, উঠেই বললো। ওরকম করে তৈরি হয়নি। যদি সাগরের ওপর চলে যায়...।

যাবে না। বাতাস উল্টোদিকে বইছে, ক্যাম্পার বললো।

এখনো দেখা যাচ্ছে সূর্যটাকে, সাগরের দিগন্ত রেখার আড়ালে নেমে যাচ্ছে। লম্বা লম্বা ছায়া পড়েছে বাড়িঘরের আশপাশে। রাস্তার আলো জ্বলে উঠেছে। হেডলাইট জ্বেলে দিয়েছে রাস্তায় চলমান গাড়িগুলো।

উঠছে...উঠছে...উঠছে বেলুন। গনডোলার কিনারের দড়ি আঁকড়ে ধরে রেখেছে ওরা। তাকিয়ে রয়েছে নিচের দিকে। বেয়াড়া ভাবে দুলছে গনডোলা, মোচড় দিয়ে ওঠে পেটের ভেতর। বেলুনে চড়া যতোটা আরামদায়ক ভাবতো মুসা, ততোটা আর মনে হলো না এখন।

নিচের দিকে তাকালো না ক্যাম্পার। কঠিন দৃষ্টিতে বার বার তাকাচ্ছে তিন গোয়েন্দা আর চালকের দিকে।

কয়েক শো ফুট ওপরে উঠে এসেছে বেলুন। উত্তর-পূবে ওটাকে উড়িয়ে নিয়ে চলেছে বাতাস। নিচে তাকালো কিশোর। ঠিক ওদের নিচেই দেখা যাচ্ছে একটা গাড়ি। সাদা ছাত দেখেই বোঝা গেল পুলিশের গাড়ি।

স্যুটকেসটা নামিয়ে রেখেছে মুসা। পা দিয়ে সেটাকে ঠেলে দেখলো কিশোর। পুরানো ধাচের জিনিস। আলগী তালা লাগিয়ে বন্ধ করার ব্যবস্থা। তালা নেই, তারমানে খোলা। ক্যাম্পারের অলক্ষ্যে জুতোর ডগা দিয়ে আস্তে আস্তে তুলে। ফেললো হুড়কোটা। তারপর হঠাৎ ঝুঁকে একটানে তুলে নিলো স্যুটকেস। ঝটকা লেগে আপনাআপনি খুলে গেল ডালা। ওই অবস্থায়ই ওটাকে গনডোলার বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিলো সে।

এই, কি করছো ক্যাম্পার বলতে বলতেই কাজটা সেরে ফেললো কিশোর।

বাতাসে উড়তে লাগলো নোটের বাণ্ডিল দশ-বিশ...পঞ্চাশ.. একশো ডলারের নোট। কোনো কোনোটার রবার ব্যাও খুলে ছড়িয়ে পড়লো।

নেমে যাচ্ছে টাকা!
রাস্তায় গিয়ে পড়তে লাগলো।
লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো পুলিশ। রাস্তার অন্যান্য গাড়িগুলোও থেমে গেল। বেরিয়ে আসতে লাগল লোকে।
সাইরেন বেজে উঠল। আরেকটা পুলিশের গাড়ি এসে দাঁড়ালো প্রথমটার কাছে। সবাই এখন তাকিয়ে আছে ওপর দিকে, বেলুনটাকে দেখছে।
মিস করবে না পুলিশ, শান্তকণ্ঠে বললো কিশোর। দেখতে পাবেই আমাদের। বেলুন থেকে টাকা ছিটানোর বিরুদ্ধে অবশ্য কোনো আইন নেই। তবে প্রশ্ন জাগবেই ওদের মনে। নজর রাখবে পুলিশ। বেলুনটা নামলেই এসে হেঁকে ধরবে, যেখানেই নামুক। শেষ বাক্যটা বললো নাটকীয় ভঙ্গিতে, আর নামবেই এটা, মিস্টার ক্যাম্পার। কারণ মানুষের তৈরি কোন কিছুই চিরকাল আকাশে ওড়ে না।
কিছুই বললো না ক্যাম্পার।
অনেক পেছনে পড়েছে এখন পুলিশের গাড়ি দুটো। রাস্তায় আরও পুলিশের গাড়ি দেখা যাচ্ছে। সাইরেন বাজিয়ে, ছাতে বসানো ফ্ল্যাশ লাইট জ্বেলে ছুটে যাচ্ছে ওগুলো প্রথম দুটোর কাছে।
শোনা গেল একটা নতুন শব্দ। ওপর থেকে বেলুনের ওপর এসে পড়লো। উজ্জ্বল সার্চ লাইটের আলো।
পুলিশের হেলিকপ্টার, হাসি হাসি গলায় বললো কিশোর, বেশ উপভোগ করছে ব্যাপারটা।
কথা নেই ক্যাম্পারের মুখে। হাঁপাচ্ছে এমন ভাবে, যেন বহুদূর দৌড়ে এসেছে।
বলতে থাকল কিশোর, পিছু লেগে থাকবে পুলিশ। রেডিওতে যোগাযোগ রাখবে হাইওয়ে পেট্রোলের সঙ্গে। শহর থেকে বেলুনটা বেরিয়ে গেলেও অসুবিধে নেই। শেরিফের কাছে খবর চলে যাবে। মোট কথা, কিছুতেই আর পিছু ছাড়ছে না আইনের লোকেরা।
ঠিকই বলেছে ও, মিস্টার, ক্যাম্পারকে বললো চালক। অহেতুক দেরি করে। লাভ নেই। নামিয়ে ফেলি, সে-ই ভালো।
জবাব দিলো না ক্যাম্পার। তবে পিস্তলটা নামিয়ে ফেললো। ওটা তার হাত থেকে নিয়ে নিলো চালক, বাধা দিলো না অভিনেতা।
উইলশায়ার বুলভারের উত্তরে একটা গোরস্থানের মধ্যে নামলো বেলুন। গনডোলা মাটি ছুঁতে না ছুঁতেই ঘিরে ফেললে পুলিশ।
হেসে বললো রবিন, টেলিভিশনের লোকে খবর পায়নি। তাহলে শেষবারের মতো একবার টিভির পর্দায় চেহারা দেখানোর সুযোগ পেতেন মিস্টার ক্যাম্পার।

হেসেই জবাব দিলো কিশোর, সেটা পারবেন। সময় এখনও ফুরিয়ে যায়নি। ঠিকই হাজির হয়ে যাবে টিভির রিপোর্টার।

.

চারদিন পর। বিখ্যাত চিত্র পরিচালক মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফারের অফিসে এলো তিন গোয়েন্দা, তাদের জলকন্যা কেসের রিপোর্ট দিতে।

ফাইলটা আগাগোড়া মন দিয়ে পড়লেন পরিচালক। তারপর মুখ তুলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, খুবই দুঃখজনক! একটা বাচ্চার জন্যে নিজের জীবনের ওপর এতোবড় ঝুঁকি নিলো মানুষটা! ভালোবাসা এমনই জিনিস! আর আরেকজনের হলো লোভ। লোভের জন্যে, কিছু জিনিস বাঁচানোর জন্যে বিপজ্জনক হয়ে উঠলো। বাচ্চাটার কাছে। টেবিলের ওপর দুই হাত বিছিয়ে তালুর দিকে তাকিয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ তিনি। আবার মুখ তুললেন। চোরাই জিনিসগুলো কি মালিককে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে?

কিছু কিছু হয়েছে, রবিন বললো। যেগুলোর মালিককে পাওয়া গেছে। অনেক ধন্যবাদ পেয়েছি আমরা, হাসলো সে। মালিকদের কাছ থেকে তো বটেই, পুলিশের কাছ থেকেও।

পাবোই, মুসা বললো। আমাদের দেয়া তথ্য অনেক কাজে লেগেছে। পুলিশের। ইভলিন স্ট্রীটের বাড়িটায় তল্লাশি চালিয়েছে ওরা। একটা পেশাদার চোরকে বমাল গ্রেপ্তার করেছে ওখান থেকে।

সব বলে দিয়েছে সে, মুসার কথার পিঠে বললো রবিন। পুলিশ জেনেছে, হলিউডের বড় বড় পার্টিতে দাওয়াত পড়তো ক্যাম্পারের। অভিনয় ছেড়ে দিলেও চিত্রজগৎ ছেড়ে আসেনি সে। যোগাযোগ ছিলো। ওসব দাওয়াতে গিয়েই লোকের বাড়ির জিনিসপত্র দেখে আসতো। খোঁজখবর করে আসতো কোথায় আছে বার্গলার। অ্যালার্ম, চোর ঠেকানোর আর কি কৌশল করা হয়েছে। কারা কখন বাড়ি থাকবে, কারা বেড়াতে যাবে, বাড়িতে কতোজন লোক আছে, কে কখন থাকে, সব জেনে আসতো। পেশাদার চোরদেরকে এসব তথ্য সরবরাহ করতো সে। এমনকি এ-ও বলে দিতো, কোন কোন জিনিস চুরি করতে হবে।

যেসব জিনিস তার প্রয়োজন, সেসব কিনে নিতে চোরদের কাছ থেকে। বেশি। দামী আর কিছুটা দুর্লভ জিনিস ছাড়া নিতো না। চোরকে কাছ থেকে জিনিস কিনতে নগদ টাকার দরকার হয়, চেকফেক নিতে চায় না চোর। কাজেই বাক্স বোঝাই করে নগদ টাকা রেখেছে ক্যাম্পার। ইভলিন স্ট্রীটের বাড়িটা চোরের আড্ডা, চোরাই মালের গুদামও ওটা। ওখানে জিনিস কিনতে যেতো সে। তারপর শহরে গিয়ে চড়া। দামে ওগুলো আবার বিক্রি করতো। বিক্রি করে দেয়ার জন্যে

দালালও রেখে ছিলো। কিছু কিছু জিনিস নিজেই বিক্রি করে ফেলতো তার গ্যালারিতে রেখে।
ঝুঁকিটা খুব বেশি নিয়ে ফেলেছিলো না? মিস্টার ক্রিস্টোফার বললেন। চোরেরা জানলেই তো ব্ল্যাকমেল শুরু করে দিতো।
আসলে ওরা জানতোই না ক্যাম্পার তাদের জিনিস কেনে, অনেকক্ষণ পর,— মুখ খুললো কিশোর। ছদ্মবেশ নিয়ে তারপর ওদের কাছে যেতো সে। আর নিজে গিয়ে দেখা করতো ওদের সঙ্গে, কখনোই তার কাছে কাউকে আসতে দিতো না। কোথায় থাকে, ঠিকানাও দিতো না।
হু, চালাক লোক। কিটু গিয়ে ট্রেজার রুমে ঢুকেই দিলো তার সর্বনাশ করে।
হ্যাঁ। কিটু সব বলে দিয়েছে। প্যারেডের দিন প্রিন্সেস স্যুইটে ঢুকেছিলো সে। জিনিসগুলা দেখেছে। বাক্সের ডালা খুলে একটা বাণ্ডিল সবে তুলেছে, এই সময়। ঢুকেছে ক্যাম্পার। ভয় পেয়ে ডবকে নিয়ে দৌড় দেয় কিটু। তার পেছনে ছোটে ক্যাম্পার। গ্যালারিতে এসে জলকন্যার পেছনে লুকায় কিটু। কুকুরটাও লুকাতে এসে দেয় ঘাপলী বাধিয়ে। ধাক্কা দিয়ে মূর্তিটা ফেলে দেয়। তার গায়ের ওপ্র পড়ে ভেঙে যায় জলকন্যা। আঘাত অল্পই লাগে কুকুরটার শরীরে। কিন্তু শক সইতে পারেনি তার দুর্বল হার্ট। মারা পড়ে। নিজেকে ভীষণ অপরাধী ভাবতে আরম্ভ করে কিটু, ক্যাম্পারের ঘর থেকে পালিয়ে গিয়ে লুকায় পিয়ারে। বরগু তাকে দেখে বাড়ি নিয়ে যায়। অভয় দেয়, লুকিয়ে রাখে।
বেচারা! আফসোস করলেন পরিচালক।
ট্রেজার রুমটা যদি কিটু দেখে না ফেলতো, অসুবিধে হতো না ক্যাম্পারের। নিনা হারকারকে বলে শাসন করাতে পারতো ছেলেটা। কিটু হারিয়ে যাওয়ায় ভয়ে ভয়ে ছিলো সে, কখন ফিরে এসে সব কিছু বলে দেয় ছেলেটা।
অপরাধ কোনো সময় চাপা থাকে না। হ্যাঁ, ডিগার আর তার রুমমেটের খবর কি? ওরাও কি কোনোভাবে জড়িত ছিলো ক্যাম্পারের সঙ্গে?
না। ডিগারটা একটা ছিঁচকে চোর। তার রুমমেটটা সাধারণ শ্রমিক, স্লেভ মার্কেটে গিয়ে কাজ জোগাড় করে। বড় জিনিস, কিংবা বেশি মাল সরানোর প্রয়ো জন পড়লে স্লেভ মার্কেটে চলে যেতো ক্যাম্পার, ট্রাকসহ শ্রমিক ভাড়া করতো।
হুম! তো, বরগুর খবর কি? পুলিশ কি এখনও আটকে রেখেছে তাকে?
না। তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আনেনি নিনা হারকার। বরং পুলিশকে অনুরোধ করে তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে এসেছে, কিশোর বললো। আবার আগের জায়গায় ফিরে এসেছে বরগু। জঞ্জাল সাফ করে, কুকুরদুটোকে সঙ্গে নিয়ে। কিটুও। ভালো আছে। আসছে সেপ্টেম্বরেই তাকে ইস্কুলে ভর্তি করে দেয়া হবে।

এবং স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে তার মা, মৃদু হাসলেন পরিচালক। কোথায়। গেল, কোথায় গেল, ভেবে আর সারাক্ষণ তটস্থ থাকতে হবে না।
না, হবে না, একমত হলো তিন গোয়েন্দা।
এবার তোমাদের জন্যে আইসক্রীম দিতে বলি, কি বলো? মুহূর্ত দ্বিধা না করে একমত হলো মুসা। দুই কানের গোড়ায় গিয়ে ঠেকেছে তার হাসি।

ভলিউম ১৩ – ঢাকায় তিন গোয়েন্দা – তিন গোয়েন্দা – রকিব হাসান – সেবা প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ ৪ জুলাই, ১৯৯১

বেশ রহস্যজনক তো! শোনা গেল আরিফ সাহেবের কণ্ঠ।

বাগানে বসে মামার কথাটা কানে গেল কিশোর পাশার। বাংলাদেশী শীতের আমেজ উপভোগ করছে সে। টকটকে লাল গোলাপের ওপর উড়ছে একটা মৌমাছি। তাকিয়ে ছিল সেদিকে, খাড়া হয়ে গেল কান। ঘরের ভেতর থেকে কথা আসছে।– আমার তা মনে হয় না, বললো আরেকটা কণ্ঠ। সব ওর শয়তানী।

হৃৎপিণ্ডের গতি বেড়ে যাচ্ছে কিশোরের। বাংলাদেশে এসেই একটা রহস্য পেয়ে যাচ্ছে না। তো?

একবার দুবার হলে না হয় ধরে নিতাম অ্যাকসিডেন্ট, বলে যাচ্ছে কণ্ঠটা। কিন্তু চার-চারবার একই ঘটনা। বলছে মাল দেয়ার জন্যে কাস্টোমারের বাড়ি ঢুকেছে, বেরিয়ে এসে দেখে উইশীল্ড ভাঙা।

হ্যাঁ, তাই দেখেছি, বললো আরেকটা তরুণ কণ্ঠ। মিথ্যে কথা বলিনি।

মিথ্যে বলছিস, সেটা তো বলছি না আমি, বললো লোকটা। আমি বলতে চাইছি, দোষটা তোর। কারও সাথে ঝগড়া করেছিস, এখন সে শোধ তুলছে…

বিশ্বাস করো, আব্বা, ওরকম কিছুই করিনি আমি!

ঠিক আছে, শান্তকণ্ঠে বললো লোকটা, করিসনি যে প্রমাণ কর। নইলে আমার যা বলার, বলে দিয়েছি। গাড়ি চালানো তোর বন্ধ। সত্যি সত্যি কি হয়েছে, জেনে এসে বলবি, যদি দেখি তোর দোষ নেই, তাহলেই চাবি পাবি।

মাল দিতে অসুবিধে হবে না? সকাল সাতটার মধ্যেই তো মাখন না পেলে রেগে যায় লোকে, ডিম আর দুরে কথা নাহয় বাদই দিলাম…রাতে একবার, সকালে একবার; কবার যাবে তুমি মাল ডেলিভারি দিতে?

সেটা তোর ভাবনা নয়। ঠিক সময়েই মাল পাবে কাস্টোমার। তোর এখন কাজ পিকআপে মাল বোঝাই করা আর কাস্টোমারের ঘরে রেখে আসা, ব্যস। দুই বেলা গাড়ি আমিই চালাতে পারবো।

এনায়েত, আবার শোনা গেল আরিফ সাহেবের কণ্ঠ, আমার এখনও মনে হচ্ছে, রহস্য একটা আছে এর মধ্যে।

তা তো আছেই, স্যার, হেসে বললো ছেলেটার বাবা। আর সেটা কি আমি খুব ভালোই জানি। কারও সঙ্গে নিশ্চয় গোলমাল বাধিয়েছে কচি, সে এখন শোধ তুলছে।…আজ উঠি, স্যার।

বসো, টাকা নিয়ে যাও। আর হ্যাঁ, দুধ-ডিম-মাখন, তিনটেই ডবল করে দিয়ে যেও কদিন। আমার ভাগ্নে এসেছে তার বন্ধুদের নিয়ে, আমেরিকা থেকে। দেখি, বিলটা

দেখি, কতো হলো?
খানিক পরে সামনের দরজা খুলে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল মাঝারি উচ্চতার একজন মানুষকে। গায়ের রঙ কালো। ভোতা নাক। খাটো করে ছাঁটা চুল। দেখেই কিশোরের মনে হলো, এই লোকটাও একসময় পুলিশে চাকরি করেছে। বাগানের পাশের রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা পুরানো একটা টয়োটা পিকআপের দিকে এগিয়ে গেল। গাড়িটার গায়ে সাদা রঙে বড় বড় করে লেখা রয়েছে
এনায়েত উল্লাহ ডেয়ারি ফার্ম।
আমরা সুলভ মূল্যে ডিম, মাখন, দুধ
সরবরাহ করিয়া থাকি।
এনায়েত উল্লাহর পেছনে বেরোলো সতেরো-আঠারো বছরের একটা ছেলে। বাবার মতো কালো না হলেও ফর্সা নয়। গায়ে-গতরে প্রায় মুসার সমান, ভালো স্বাস্থ্য।
গাড়িতে গিয়ে উঠলো লোকটা। ড্রাইভিং সীট থেকে মুখ বের করে বললো, কি হলো, দাঁড়িয়ে আছিস কেন? ওঠ।
গোঁ ধরে দাঁড়িয়ে রইলো ছেলে। রাগ করে বললো, না, আমি বাসেই যেতে পারবো।
তোর খুশি। তবে যতো যা-ই করিস, চাবি আমি দিচ্ছি না তোকে। আর। একটিবারও ছেলেকে উঠতে সাধলো না এনায়েত উল্লাহ। স্টার্ট দিয়ে চলে গেল।
কিশোরের ওপর চোখ পড়ল ছেলেটার। হাত নেড়ে তাকে ডাকলো কিশোর। এগিয়ে এলো কচি। কি?
আপনার নাম কচি, না?
অবাক হলো ছেলেটা। কি করে জানলে?
ঘরে আপনার কথা বলছিলেন, সব শুনেছি। হাত বাড়িয়ে দিলো কিশোর, আমি কিশোর পশি।
ও, তুমিই চৌধুরী আংকেলের ভাগ্নে। খুব আগ্রহ নিয়ে হাত মেলালো কচি। আর কে কে এসেছে তোমার সঙ্গে?
রবিন আর মুসা। আমার বন্ধু।
এদিক ওদিক তাকালো কচি। নাম তিনটে তাকে অবাক করেছে বোঝা গেল। কোথায় ওরা?
মামার স্টাডিতে পড়ছে রবিন। মুসা হাতুড়ি-বাটাল নিয়ে খুটুর-খাটুর করছে। ঘুঘুপাখি ধরার ফাঁদ বানাচ্ছে। মামী বলেছেন, মধুপুরের গড়ে নিয়ে যাবেন। ফাঁদ পেতে সেখানে ঘুঘু ধরবে সে। হাহ্ হাহ!...তা দাঁড়িয়ে কেন? বসুন।

আমাকে আপনি আপনি করছো কেন? কতো আর বড় হবো তোমার চেয়ে? তুমি করেই বলো। কচি ভাই-টাইয়েরও দরকার নেই। শুধু কচি। একটা চেয়ারে বসলো সে। কবে এসেছো?
এই তো, পরশু রাতে।
ও। তা থাকবে তো কিছুদিন?
থাকবো। এসেছি যখন দেখেই যাবো বাংলাদেশটা। একটা আঙুল মটকালো। কিশোর। আচ্ছা, তোমার আব্বা রাগারাগি করলেন শুনলাম। কি হয়েছে? …বেশি কৌতূহল দেখাচ্ছি না তো?
না না! বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো কচি। আর বলো না ভাই। বয়েসে হয় না, বাড়িয়ে দেখিয়ে কত কষ্টে লাইসেন্সটা বাগালাম, অথচ চালাতেই পারলাম না। দুদিন চালাতে না চালাতেই বন্ধ। সহ্য হয়?
হু, বুঝতে পারছি তোমার দুঃখ, সমঝদারের ভঙ্গিতে মাথা দোলালো। কিশোর। কিন্তু ব্যাপারটা কি, বলতে আপত্তি আছে?
চুপ করে রইলো কচি।
বেশি উৎসাহ দেখাচ্ছি মনে হচ্ছে তো? দাঁড়াও, দেখাচ্ছি, তাহলেই বুঝতে পারবে। পকেট থেকে তিন গোয়েন্দার একটা কার্ড বের করে দিলো কিশোর।
পড়ে প্রথমে স্তব্ধ হয়ে গেল কচি। ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হলো মুখ। হঠাৎ হাত বাড়িয়ে কিশোরের একটা হাত খপ করে চেপে ধরে বললো, তোমরা! সত্যি তোমরা এসেছ বাংলাদেশে! উফ, কি যে ভালো লাগছে! নাম শুনেই সন্দেহ হয়েছিলো! ভাগ্যটা ভালোই বলতে হবে আমার, এক্কেবারে সময়মতো পেয়ে গেছি তোমাদের! ইস, বিশ্বাসই করতে পারছি না।
ওই যে, রবিন আর মুসা আসছে, দরজার দিকে হাত তুললো কিশোর।
ওদের কাছে আরেক দফা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলো কচি। ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে কথা বলতে যাচ্ছিল ওদের সঙ্গে। হেসে জানিয়ে দিলো কিশোর, ওরা দুজনে বাংলা বোঝে। বলতেও পারে মোটামুটি।
আলাপ পরিচয়ের পালা শেষ হলো।
অদ্ভুত কাণ্ড, বুঝলে,কচি বললো। গভীর রহস্য!
বলেই ফেললো না, হেসে বললো কিশোর। কখন থেকেই তো জানতে চাইছি।
কতোখানি শুনেছো?
ঘরে বসে তোমরা বাপ-বেটায় যতোখানি ঝগড়া করেছে।
আমাদের গাড়ির কাঁচ, বুঝলে, পিকআপটার উইশীল্ড, কচি জানালো, কি করে জানি ভেঙে যায়। একবার না দুবার না, চার চারবরি ভাঙলো। কাস্টোমারের বাড়িতে মাল দিতে ঢুকি, বেরিয়ে এসে দেখি ভেঙে রয়েছে।

কি করে ভাঙে কিছুই আন্দাজ করতে পারো না?
নাহ, এপাশ ওপাশ মাথা নাড়লো কচি। শেষবার অবশ্য কাঁচ ভাঙার শব্দ কানে এসেছিলো। ছুটে বেরোলাম। কিন্তু গাড়ির কাছে কাউকে দেখতে পেলাম না। এক এক করে তিন গোয়েন্দার মুখের দিকে তাকালো সে। খুব অবাক। লেগেছে আমার। মনে হলো যেন আপনাআপনি ভেঙে গেল কাঁচটা।
হয় এরকম, আনমনে বললো কিশোর। একে বলে কাঁচের ফ্যাটিগ। আপনাআপনি চুরমার হয়ে যায় কাঁচ। তবে সেটা একআধবার হতে পারে। একই গাড়ির বেলায় চারবার? উঁহু, সেটা সত্ব না।
আমিও তাই বলি, চেপে রাখা নিঃশ্বাসটা শব্দ করে ছাড়লে কচি। আপনাআপনি ভাঙেনি ওই কাঁচ।
মনে হয় রহস্য একটা পেয়েই গেলাম, বিড়বিড় করলো গোয়েন্দাপ্রধান।
রবিন আর মুসা চুপ করে শুনছে। কিছু বলছে না।
গোড়া থেকে সব খুলে বলো তো, কিশোর বললো। কখন, কোথায় ঘটেছে এই ঘটনা?
নাক চুলকালো কচি। তারপর শুরু করলো, গুলশানের সাত নম্বর রোডের একটা বাড়ির সামনে। রাতের বেলা। পথের পাশে সব সময় যেখানে গাড়ি রাখে। আব্বা, সেখানেই রেখেছিলাম। ডিম আর দুধ সাধারণত রাতে দিয়ে আসি আমরা, মাখন সকাল বেলা। অনেককে দুধও সকালেই দিই। যা-ই হোক, গত দুমাসে রাতের বেলা, সাত নম্বর রোডে কাঁচ ভেঙেছে মোট চারবার।
অন্য একটা প্রশ্ন করি। তুমি আর তোমার আব্বাই কি মাল সাপ্লাই দাও? কোন কর্মচারী-টর্মচারী নেই?
কারখানায় আছে। আমাদের ফার্মটা খুব ছোট। বেশি লোক রাখতে পারি না। ভীষণ খাটতে হয় আব্বাকে। পড়ালেখার ফাঁকে ফাঁকে আমি আর আমার ছোট ভাই যতোটা পারি সাহায্য করি।
হু, বলে চুপ করে কি ভাবতে লাগল কিশোর।
মুসার দিকে তাকালো কচি। আচ্ছা, তোমার না একটা কুকুর আছে, সিমবা? শুনলাম, ওকেও নিয়ে আসবে। কই?
আনিনি। হঠাৎ শরীর খারাপ হয়ে গেল। হাসপাতালে।
ওটাকে এখানে এনেও কোন লাভ হতো না, কিশোর বললো। বুনো কুকুরের রক্ত শরীরে, কিছুতেই হিংস্রতা ভুলতে পারে না। কখন কার ওপর লাফিয়ে পড়ে টুটি ছিঁড়ে দেবে শহরের রাস্তায় ওটাকে নিয়ে বেরোনোই মুশকিল। ওর জায়গা আফ্রিকা, কিংবা অন্য কোন জঙ্গল-টল...
তারমানে জঙ্গল ছাড়া ওকে সঙ্গে রাখে না? হেসে জিজ্ঞেস করলো কচি।

না রাখাই উচিত। মুসাদের বাসার কাছেই বের করেছিলো একদিন। দিলো এক ছোকরাকে কামড়ে। অনেক কষ্টে পুলিশের ঝামেলা এড়ানো গেছে। এক মুহূর্ত চুপ থেকে আবার আগের কথা তুললো কিশোর, শেষ বার কবে ভাঙলো তোমাদের গাড়ির কাঁচ?
গত বুদ্বার রাতে। আর কপালটা কি দেখো, চার দিন ভাঙলো, চার দিনই আমি বেরিয়েছিলাম গাড়ি নিয়ে। ফলে আব্বাকেও কিছু বোঝাতে পারছি না।
চিন্তিত ভঙ্গিতে কচির দিকে তাকালো কিশোর। ওভাবে আর কোন গাড়ির উইণ্ডশীল্ড ভেঙেছে, জানো?
কি জানি!
কিছু ভাবছে কিশোর, বুঝতে পেরে জিজ্ঞেস করলো রবিন, কেন?
যদি খালি কচিদেরটাই ভাঙে, জবাব দিলো কিশোর, তাহলে বুঝবো ফ্রেমে দোষ আছে, কিংবা শত্রুতা করে কেউ ভাঙছে। কিন্তু আরও গাড়ির যদি ভেঙে থাকে, তাহলে নিশ্চয় অন্য কারণ।
তা ঠিক, ঘাড় দোলালো মুসা।
এই দাঁড়াও, দাঁড়াও! হাত তুললো কচি। মনে পড়েছে! গুলশানে আমার এক বন্ধু আছে। আমাদেরটা ভাঙার কিছুদিন আগে ওদের গাড়ির কাঁচ ভাঙার কথা কি যেন বলেছিলো। তখন খেয়াল করিনি। এখন মনে পড়ছে। কি করে ভেঙেছিলো, বুঝতে পারছিলো না সে-ও।
হু, মাথা দোলালো কিশোর, তাহলে তো মনে হচ্ছে...
থেমে গেল সে। দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন তার মামী। মহিলার বয়েস বোঝা যায় না। অনেক কম মনে হয়। খুব সুন্দরী। এক ছেলে আর এক মেয়ে, দুজনেই থাকে আমেরিকায়।
হাত নেড়ে হেসে বললেন তিনি, এই, আর কতো গল্প করবি? সেই কোন। সকালে নাস্তা করেছিস। খিদে পায়নি?
লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো মুসা। একান ওকান হয়ে গেল হাসি। পায়নি মানে, কি যে বলো তুমি, আন্টি। পেটের মধ্যে কখন থেকেই তো ছুঁচো নাচছে, শুধু ভাঙা কাঁচই এতোক্ষণ আটকে রেখেছিলো। নানারকম বাংলাদেশী খাবার খাইয়ে দুদিনেই মুসাকে একেবারে ভক্ত বানিয়ে ছেড়েছেন মামী। ইতিমধ্যেই বহুবার বলে ফেলেছে তাঁকে মুসা, দুনিয়ায় শুধু দুজন মানুষ ঠিকমতো রাঁধতে জানে। একজন তুমি, আরেকজন আমাদের মেরিচাচী।
আবার হাসলেন মহিলা। আয়, খেতে আয়। কচি, তুমি যাওনি তোমার আব্বার সঙ্গে?

না, রাগ করে বললো কচি। ওই গাড়িতে আর উঠবো না। বাসে যাবো বলে রয়ে গিয়েছিলাম, ওদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল
ভালো হয়েছে। এসো, তুমিও এসো খেতে।
এই পরিবারের সঙ্গে মোটামুটি ভালোই খাতির জমিয়ে ফেলেছে কচি। মহিলার ছেলেমেয়ে এখানে কেউ নেই। এতো বড় বাড়িতে একা একা থাকেন শুধু স্বামীকে নিয়ে। ছেলেমেয়ের বয়েসী কাউকে পেলেই দ্রুত আপন করে নেন।
বিনা প্রতিবাদে উঠে দাঁড়ালো কচি। জানে খাবো না বলে লাভ হবে না, তাকে না খাইয়ে ছাড়বেন না নাদিরা খালাম্মা।
মামী যেমন দিলখোলা, হাসিখুশি, মামা তেমনি গম্ভীর। চাকরি করতেন পুলিশে, বড় অফিসার ছিলেন, অবসর নিয়েছেন। সময় কাটানোর জন্যে সারাক্ষণই কোনো না কোনো কাজে ব্যস্ত থাকেন। প্রচুর বই পড়েন, বিশেষ করে গোয়েন্দা গল্প। কিশোরকে তার খুব পছন্দ। সুযোগ পেলেই বলে দেন, দেখ ইয়াং ম্যান, চাকরিই যদি করো, তাহলে পুলিশের। এর বাড়া চাকরি নেই। আর যেহেতু তুমি গোয়েন্দা, রহস্য পছন্দ করো, পুলিশ না হয়ে আর কি হবে? কোথায় গিয়ে আর গোয়েন্দাগিরি করার এমন সুযোগ পাবে?
কথাটা তিনি ঠিকই বলেন, মেনে না নিয়ে পারে না কিশোর। গোয়ন্দাগিরি করতে হলে পুলিশ হওয়াই উচিত। আমেরিকায় অবশ্য শখের গোয়েন্দা সে হতে। পারে, তবে পুলিশের চাকরিতে থেকে এই কাজ করার সুযোগ সুবিধে অনেক বেশি।
খাবার টেবিলে খেতে বসলো সবাই। মাথার কাছে বসেছেন চৌধুরী সাহেব। পুরু পুলিশী গোফ। চোখের দৃষ্টি এতো তীক্ষ্ণ, সরাসরি তাকাতে অস্বস্তি বোধ করে মুসা, মনে হয় ধারালো ছুরির ফলা তার মনের ভেতরে ঢুকে গিয়ে ফালাফালা করে চিরে দেখছে কিছু লুকানো রয়েছে কিনা।
কচিকে তিন গোয়েন্দার সঙ্গে দেখে মুচকি হেসেছেন পুলিশের ভূতপূর্ব ডি আই। জি। মামী প্লেটে খাবার বেড়ে দেয়াতক অপেক্ষা করলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, কি হে গোয়েন্দারা, রহস্য পেয়ে গেছে মনে হচ্ছে?
মনে হয়, জবাব দিলো কিশোর।
কাঁচ ভাঙার রহস্য তো? আমার কাছেও কিন্তু ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগছে।
লাগছে, নী? পর পর চারবার একই গাড়ির কাঁচ ভাঙলো। কাউকে গাড়ির কাছে দেখা গেল না। কি করে ভাঙলো, কিছু বোঝা গেল না। অদ্ভুত ব্যাপার!
আলাপটা পরেও করতে পারবি, মুসার প্লেটে চিঙড়ির বিশাল দুটো কাটলেট তুলে দিয়ে বললেন মামী, আগে খেয়ে নে।
হাসিঠাট্টার মধ্যে দিয়ে শেষ হয়ে এলো খাওয়া।

ইয়া বড় পুডিঙের অর্ধেকটাই মুসার পাতে দিয়ে দিলেন মামী। ফ্রিজ থেকে ঠাণ্ডা পানির বোতল আনতে গেলেন।
হ্যাঁ, কাঁচ ভাঙার কথা হচ্ছিলো, কথাটা আবার তুললেন মামা। একই গাড়ির কাঁচ...
আলট্রাসনিক ওয়েভস! হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো রবিন। শব্দ কাঁচ ভাঙতে পারে।
ঠিক! পুডিঙের চামচ মাঝপথেই থেমে গেল মুসার। জেট প্লেনের শব্দে জানালার কাঁচ ভেঙে যেতে দেখেছি আমি!
এদেশে ওরকম প্লেন আসে না, বললেন চৌধুরী সাহেব। গাড়ি রেখেছিলে যেখানে, তার কাছাকাছি এমন কোনো কারখানা আছে, যেটার যন্ত্রপাতি থেকে। আলট্রাসোনিক ওয়েভ বেরোতে পারে?
না, মাথা নাড়লো কচি।
ভূমিকম্প নয় তো? মুসার প্রশ্ন।
এটা ক্যালিফোর্নিয়া নয়, মনে করিয়ে দিলো কিশোর। এখানে এতো জোরে ভূমিকম্প হয় না যে গাড়ির কাঁচ ভাঙবে।
বাতাস? রবিন বললো। ঝড়টর তো হয় এদেশেও। ঘূর্ণিঝড়?
নাহ, ওসব না।
কোনো ধরনের রশ্মি? মুসা বললো। বুঝেছি বুঝেছি, ডেথ রে!
স্টার ওয়ারস ছবিতে যেমন দেখায়? কচি বললো। হীট রে কিংবা ফোর্স রে?
অসুবিধে কি? রবিন বললো। বাংলাদেশে কি স্পেস শিপ নামতে পারে না?
নিশ্চয়ই! চামচ রেখে দিয়ে টেবিলে চাপড় মারলো মুসা। ভিনগ্রহ থেকে আসা!
অতি বুদ্ধিমান কোনো প্রাণীর কাজ বলে ভাবছো? কচি বললো।
কিংবা...কিংবা... ভয়ে ভয়ে উজ্জ্বল রোদে আলোকিত জানালার দিকে তাকালো মুসা, ভূত-টুত!
হ্যাঁ, হ্যাঁ, একেবারে জার্মান ভূত, পোলাটারগাইস্ট। বিরক্ত হয়ে বললো কিশোর। হাত নেড়ে বললো, কি সব ফালতু বকবকানি শুরু করেছো! থামো! মামার দিকে তাকিয়ে দেখলো, তাঁর সদাগম্ভীর মুখেও এখন যেন চিরস্থায়ী হাসি ফুটেছে, খুব উপভোগ করছেন তিনি। ভূত, স্পেস শিপভিসিআর সবার মাথা খারাপ করে দিয়েছে!
তাহলে তোমার কি ধারণা? কিশোরের কথার ধরন পছন্দ হলো না কচির রবিন আর মুসার মতো কিশোরের কড়া কথার সাথে অভ্যস্ত নয় সে।
হ্যাঁ, স্পেস শিপ না হলে কি? রবিনের প্রশ্ন।
আমি বলে দিয়েছি, ভূত, ব্যস, হাত নাড়লো মুসা।

তোমার মাথা, কিশোর বললো। অবাস্তব সব কথাবার্তা। যুক্তিতে এসো। সহজ কোনো ব্যাখ্যা আছে এই কাঁচ ভাঙার। যেটা এখনও জানি না আমরা। জানতে হলে এখন দুটো কাজ করতে হবে।
কী? আগ্রহের সঙ্গে মুখ তুললো কচি।
আড়চোখে কিশোর দেখলো, মামার তীক্ষ্ণ চোখ দুটোও এখন তার ওপর নিবদ্ধ, সে চোখে কৌতূহল।
মামা, তোমার গাড়িটা ধার দেবে? কিশোর জিজ্ঞেস করলো। রাতের বেলা?
কেন?
ওটা দিয়ে ফাঁদ পাতবো। পথের মোড়ে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখবো...।
কেউ কাঁচ ভাঙে কিনা দেখার জন্যে? কিশোরের কথাটা শেষ করে দিলেন মামা। বুদ্ধিটা মন্দ না। দেবো। যদিও রিস্কি হয়ে যায় ব্যাপারটা। আর দ্বিতীয় কাজ কি?
ভূত-থেকে-ভূতে।
টেবিলে পানির বোতল রেখে কি কাজে রান্নাঘরে গিয়েছিলেন মামী। বেরিয়ে আসতেই কানে গেল কথাটা। মামা তিন গোয়েন্দা পড়েন, তিনি পড়েন না। একথার মানেও জানেন না। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কী?
ভূত-থেকে-ভূতে, বললেন মামা। বুঝিয়ে দিলেন, এটা আমাদের তিন গোয়েন্দার একটা অসাধারণ আবিষ্কার। কোন জিনিস খুঁজতে হলে এর জুড়ি নেই। আমি চাকরি করার সময় এই পদ্ধতিটা যদি জানতাম, কতো যে সুবিধে হতো কি বলবো!
কিছুই বুছতে পারছি না তোমার কথা!
বেশ, বুঝিয়ে দিচ্ছি, বললেন চৌধুরী সাহেব। শুনলে হাঁ হয়ে যাবে। ধরো, তোমার গাড়িটা খুঁজে পাচ্ছে না। যতো পরিচিত বাড়ি আছে তোমার, ফোন করে ওসব বাড়ির ছেলেমেয়েদের জানিয়ে দাও খবরটা। বলবে, গাড়ির খোঁজ দিতে পারলে ভালো পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে। আরও বলবে, ওদের বন্ধুদের যেন খবরটা জানায় ওরা। সবাইকে জানানোর দরকার নেই। ওদের পাঁচজন পাঁচজন করে। বন্ধুকে জানালেই চলবে। কি ঘটবে, বুঝতে পারছো?
কি আর এমন.. বলতে বলতে সত্যিই হাঁ হয়ে গেলেন মামী। বুঝে ফেলেছেন। সর্বনাশ! কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই শহরের সমস্ত ছেলেমেয়ে জেনে যাবে, যাদের টেলিফোন আছে!
ঠিক! তুড়ি বাজালেন চোধুরী সাহেব। ওরা ছুটবে তখন গাড়ি খুঁজতে। ওদের আরও অনেক বন্ধু আছে, যাদের টেলিফোন নেই। মুখে মুখে তাদের কানেও খটা চলে যাবে। ঢাকা শহরে থাকলে তখন গাড়িটা আর লুকিয়ে রাখা যাবে বেশিক্ষণ?

না, যাবে না! ছেলেদের দিকে তাকিয়ে স্নেহের হাসি হাসলেন। নাহ্, আছে তোদের। সত্যি
কিন্তু ভূত-থেকে-ভূতে ব্যবহার করে এখন কি লাভ? কচি জিজ্ঞেস করলো। কি খুঁজবে ওরা?
আর কোনো গাড়ির কাঁচ ওভাবে ভেঙেছে কিনা, জবাব দিলো কিশোর।
হু। তা জবাবটা দেবে কার ঠিকানায়? তোমরা এখানে এসেছে জানলে ঢাকা শহরের ছেলেমেয়ে আর থাকবে না। সব এসে ভেঙে পড়বে এই উত্তরায়। তোমাদের দেখার জন্যে পাগল হয়ে যাবে সবাই।
এতোই পপুলার আমরা? গর্ব হচ্ছে মুসার।
টেলিফোন করেই দেখো না, হাসলো কচি।
হোক না পাগল, কিশোর বললো, অসুবিধে কি? ওদের সঙ্গে দেখা করতেই তো এসেছি আমরা। তবে একটা কাজ করা যায়। এখানে এসে ভিড় করার দরকার নেই। শিডিউল করে নিয়ে একেক দিন একেক পাড়ায় আমরাই দেখা করতে যাবো, জানিয়ে দিলেই হবে। কচির দিকে তাকালো সে, তোমাদের ফোন আছে?
আছে।
সারাক্ষণ ওটা ধরার কেউ আছে? মানে, বললে প্রতে পারবে?
পারবে, আমার ভাই, রচি। ইস্কুল এখন ছুটি। সারাদিন বাড়িতেই থাকে।
তাহলে ওর ওপরই দায়িত্বটা চাপানো যাক, কি বলো? এখানে তো সারাদিন। আমরা থাকবো না। নানা জায়গায় যাবো। অনেক ফোন আসবে, বুঝতে পারছি।
ধরবে কে?
অসুবিধে হবে না, আশ্বাস দিলো কচি। রচিকে বলে দেবো। খুশি হয়েই কাজটা করবে ও।

.

রাত্রে মামা বললেন, তিনিও যাবেন সঙ্গে। গাড়ি বের করলেন। খাওয়া-দাওয়া শেষ। কিশোর বললো, নটার মধ্যে জায়গামতো পৌঁছে যাওয়া চাই। মামা আশ্বাস। দিলেন, তাতে অসুবিধে হবে না।
বিকেলেই কচির সঙ্গে গিয়ে জায়গাটা দেখে এসেছে তিন গোয়েন্দা।
গাড়ি রাস্তায় বেরিয়ে এলে কিশোর তার পরিকল্পনার কথা বললো। সাত নম্বর রাস্তার মোড়ে গাড়ি থেকে নেমে যাবে ওরা তিনজন। কচিকে নিয়ে মামা চলে যাবেন সেই জায়গাটায়, যেখানে রোজ পিকআপ পার্ক করে কচি। গাড়ি থেকে বেরিয়ে মামাকে জোরে জোরে বলবে সে, বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে, কাজেই দুটাখানেক দেরি হবে। মামা বলবেন, তিনিও গাড়ি রেখে কাছের চা-দোকানে চা খেতে যাচ্ছেন। তারপর কচি চলে যাবে বাড়ির দিকে, মামা চলে যাবেন।

রেস্টুরেন্টের দিকে। যে বাড়িতে মাল সরবরাহ করে কচিরা সেখানে ঢুকে ঘণ্টাখানেক বসে থাকার দরকার হলেও অসুবিধে হবে না তার। বাড়ির গিন্নির সঙ্গে ভালো খাতির। কিন্তু সে দিকে গেলেও আসলে বাড়িতে ঢুকবে না সে, অন্ধকারে কোথাও ঘাপটি মেরে থেকে চোখ রাখবে গাড়িটার ওপর। ততোক্ষণে পা টিপে টিপে রাস্তার অন্যপাশে চলে আসবে তিন গোয়েন্দা। লুকিয়ে থেকে ওরাও চোখ। রাখবে গাড়ির ওপর।

সাত নম্বর রাস্তার মোড়ে পৌঁছে গাড়ি থামালেন মামা। নেমে পড়লো তিন গোয়েন্দা। আবার এগিয়ে গেল গাড়ি, মোড় নিয়ে ঢুকে পড়লো গলিতে।

হেঁটে চললো তিন গোয়েন্দা। বিকেলেই দেখে গেছে লুকানোর অনেক জায়গা আছে এখানে। পথের একপাশে বাড়িঘর খুব পাতলা, ঝোঁপঝাড় আছে বেশ, খাদও আছে। একটা ঝোঁপের আড়ালে এসে বসে পড়লো ওরা। গাড়িটার দিকে চোখ।– দেখলো, একটা বাড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে কচি। মামা চলে যাচ্ছেন মোড়ের। দিকে, চায়ের দোকানে গিয়ে বসে থাকবেন।

ছায়ায় মিলিয়ে গেল কচি।

ওই পথ ধরে প্রথম একজন মহিলাকে আসতে দেখলো ওরা।

আসছে, ফিসফিসিয়ে বললো মুসা।

বিদেশী মহিলা। মনে হয় হাওয়া খেতে বেরিয়েছিলো। বেশ লম্বা। পরনে জিনস, গায়ে গলাবন্ধ সোয়েটার। হাতে একটা চকচকে কালো লাঠি, হাতলটা রূপোয় বাধানো। সঙ্গে সঙ্গে আসছে বিশাল একটা কুকুর। জানোয়ারটা খুব অস্থির। এটা শুঁকছে, ওটা শুঁকছে, এদিকে চলে যাচ্ছে, ওদিকে চলে যাচ্ছে। কাছাকাছি রাখার জন্যে ডেকে ডেকে হয়রান হয়ে যাচ্ছে মহিলা।

গাড়িটার কাছে এসে টায়ার হুঁকতে লাগলো কুকুরটা। মহিলাও দাঁড়িয়ে গেল।

সামনের টায়ার ওকে হঠাৎ লাফ দিয়ে জানালার কাছে দুই পা তুলে দিলো। কুকুরটা। ওকে নামতে বললো মহিলা। নামলো না দেখে হাতের লাঠিটা তুলে শাই করে বাড়ি মারলো, তবে গায়ে লাগানোর জন্যে নয়, ভয় দেখানোর জন্যে। সেই সঙ্গে দিলো কড়া ধমক।

পা নামিয়ে নিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করলো কুকুরটা। মহিলা লাঠি হাতে চললো পেছনে।

মহা হারামী কুত্তা! মুসা মন্তব্য করলো।

আচ্ছা, রবিন বললো, কুকুরটাকে মারতে গিয়েই জানালার কাঁচে বাড়ি লাগিয়ে দেয়নি তো মহিলা?

মাথা নাড়লো কিশোর। না।

মহিলা চলে যাওয়ার পর পরই এলো দুটো ছেলে। একজনের হাতে একটা ক্রিকেট ব্যাট, আরেকজনের হাতে বল। বলটা বার বার ওপরে ছুঁড়ে দিয়ে লুফে নিচ্ছে। এগোচ্ছে ওভাবেই। গাড়ির কাছে পৌঁছে হাত ঘুরিয়ে ক্রিকেট বল যে ভাবে ছেড়ে তেমনি ভাবে জানালার কাঁচ সই করে ছুঁড়ে মারার ভঙ্গি করলো ছেলেটী। কিন্তু মারলো না।

ছেলে দুটো পাশ দিয়ে চলে যাওয়ার পর মুসা বললো, কিশোর, ওরা শয়তানী করে ভাঙেনি তো? বল ছুঁড়ে, কিংবা ব্যাট দিয়ে বাড়ি মেরে?

না, আবার মাথা নাড়লো কিশোর, তা-ও মনে হয় না।

ছেলেগুলো চলে যাওয়ার পর আবার নীরব হয়ে গেল গলি। সময় যাচ্ছে। বাড়িঘরের অনেক জানালার আলোই নিভে যাচ্ছে একে একে। এক ঘণ্টা পেরোলো। এই সময়টায় একেবারে নির্জন রইলো গলিটা। তারপর এলো। লোকটা। লম্বা। মোড়ের দিক থেকে শাঁ শাঁ করে ছুটে এলো একটা টেন-স্পীড সাইকেলে চড়ে।

সতর্ক হয়ে উঠলো গোয়েন্দারা। সাইকেলের আলোটা বেশ উজ্জ্বল, টর্চের আলোর মতো এসে পড়েছে সামনের পথে। আঁটোসাঁটো পোশাক পরেছে। লোকটা, সাইকেল চালানোর সময় স্পোর্টসম্যানেরা যে রকম পরে। বিচিত্র আরও কিছু জিনিস রয়েছে তার শরীরে। পিঠে বাঁধা ব্যাকপ্যাক, মাথায় টুপি-ক্রিকেট খেলোয়াড়েরা যে রকম পরে, চোখে বিচিত্র গগলস-গোল গোল কাঁচ, কানে। হেডফোন-ওয়াকম্যান কিংবা রেডিওটা দেখা যাচ্ছে না, নিশ্চয় পিঠের ব্যাগের ভেতরে ভরে রেখেছে।

খাইছে! হেসে ফেললো মুসা। ব্যাটাকে দেখে তো মনে হয় ভিনগ্রহ থেকেই নেমেছে। হাহ্ হাহ্! স্টার ট্রেক ছবির দৃশ্য। টুপির বদলে মাথায় হেলমেট থাকলেই হয়ে যেতো।

গাড়িটার কাছে এসে গতি ধীর করলো লোকটা। দম বন্ধ করে ফেললো। ছেলেরা। মুখ এদিকে, যেন ওদের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে। মনে হলো, এখুনি কিছু ঘটবে। কিন্তু ঘটলো না। ওদেরকে নিরাশ করে আবার গতি বাড়িয়ে দিলো। লোকটা। ঢুকে পড়লো গিয়ে সামনের আরেকটা উপ-গলিতে।

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে মুসা বললো, আমি তো মনে করেছিলাম...

এই ব্যাটাই কাঁচ ভাঙবে, বাক্যটা শেষ করে দিলো রবিন। অন্তত কিছু একটা করবে বলে মনে হচ্ছিলো আমার।

অন্ধকারে বসে ভ্রূকুটি করলো কিশোর, সেটা দেখতে পেলো না কেউ। আসলে সবাইকেই সন্দেহ করছি তো আমরা, ফলে নিরাশ হতে হচ্ছে। ধৈর্য ধরতে হবে।

বসে থাকতে থাকতে হাত-পায়ে খিল ধরে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। ঝাড়া। দিয়ে আবার স্বাভাবিক করে নিলো ওরা। অস্বস্তিতে নড়েচড়ে বসলো কিশোর। এক ঘন্টা থাকার কথা, যে কোনো মুহূর্তে এখন বেরিয়ে আসতে পারে কচি।
হঠাৎ একটা নড়াচড়া চোখে পড়লো কিশোরের। দূরের একটা কোণ থেকে ছায়ায় ছায়ায় এগিয়ে আসছে একজন মানুষ।
আরও কাছে এলে দেখা গেল মানুষটা ছোটখাটো, হাতে কি যেন রয়েছে।
হাতে কি? ফিসফিসিয়ে বললো মুসা।
এগিয়েই আসছে লোকটা, গাড়ির দিকে। মাঝে মাঝে পেছনে আর এদিক ওদিক ফিরে তাকাচ্ছে। যেন ভয় পাচ্ছে কোনো কারণে। হাতে একটা ছড়ি।
লাঠি! বেশ জোরেই বলে ফেললো রবিন, উত্তেজনায় আস্তে বলার কথা ভুলে গেছে।
ছড়ি দোলাতে দোলাতে গাড়ির দিকে আসছে লোকটা। ওটার একটা মাত্র বাড়ি লাগলেই চুরমার হয়ে যাবে জানালার কাঁচ।
রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে ছেলেরা।
এগিয়ে আসছে লোকটা..আসছে পৌঁছে গেল গাড়ির কাছে...এবার একটামাত্র বাড়ি...কিন্তু না, পাশ কাটাচ্ছে সে, দ্রুত এগিয়ে চলেছে যেন তাড়া খেয়ে। দেখতে দেখতে হারিয়ে গেল মোড়ের অন্ধকারে।
হতাশায় গুঙিয়ে উঠলো মুসা।
হতাশ অন্য দুজনও হয়েছে। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো সামনের নির্জন, নীরব পথের দিকে। আর কেউ আসছে না। কোনো গাড়িও না। এগারোটা বাজলো, তার পরেও কিছু ঘটলো না।
এগারোটায় কচির বাড়ি ফেরার কথা, মনে করিয়ে দিলো মুসা।
সে-ও নিশ্চয় আমাদেরই মতো অপেক্ষা করছে, রবিন বললো, কাঁচ ভাঙার। বেরোচ্ছে না সেজন্যেই।
কিন্তু আর দেরি করে লাভ নেই, উঠে দাঁড়ালো কিশোর। আজ আর ভাঙবে বলে মনে হয় না। চলো।
ঝোঁপের আড়াল থেকে পথে বেরিয়ে এলো ওরা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটা বাড়ির ছায়া থেকে বেরিয়ে এলো কচি। সবাই জড়ো হলো গাড়ির কাছে।
বিষণ্ন কণ্ঠে কিশোর বললো, হয়তো আমার ধারণা ভুল।
ভুল? কি ভুল? জানতে চাইলে রবিন।
ভেবেছিলাম, কচির বন্ধুর গাড়িরও যখন একটা কাঁচ ভেঙেছে, তারমানে শুধু। কচিদেরটাই নয়, অন্য গাড়ির ওপরও চোখ আছে লোকটার, কাঁচ যে ভাঙে।

কিন্তু। এখন মনে হচ্ছে, কোনো কারণে শুধু পিকআপটার ওপরই নজর। দেখা যাক আরও খোঁজ নিয়ে।
তাহলে আবার কাল এসে পিকআপের ফাঁদ পাতলেই পারি, মুসা পরামর্শ দিলো।
ভূত-থেকে-ভূতে কোনো কাজ দিচ্ছে না, রবিন বলে। অন্য গাড়ি কাঁচই যদি না ভাঙা হয়, কি খবর আসবে?
হু, গম্ভীর হয়ে মাথা দোলালো কিশোর, এখনও কিছু বোঝা যাচ্ছে না। দেখা যাক, কি হয়!

.

পরদিন সকালে বাগানে বসে রোদ পোহাচ্ছে তিন গোয়েন্দা, এই সময় ছুটতে ছুটতে এলো কচি। ভীষণ উত্তেজিত। এসেই ধপ করে বসে পড়লো একটা চেয়ারে। হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, একশো বেয়াল্লিশটা।
কি একশো বেয়াল্লিশটা? মুসা অবাক।
গাড়ি!
গাড়ি?
একশো বেয়াল্লিশটা গাড়ির কাঁচ ভেঙেছে! রাত একটা পর্যন্ত টেলিফোন এসেছে। ভোর থেকে শুরু হয়েছে আবার!
একশো বেয়াল্লিশটা! বিড়বিড় করলো কিশোর।
হ্যাঁ, কচি বললো। প্রথমটা ভেঙেছে দুই মাস আগে। আমাদেরটা ভাঙারও আগে।
তাহলে কিশোরের ধারণাই ঠিক, রবিন বললো। শুধু তোমাদের গাড়ির পেছনেই লাগেনি লোকটা।
সব কি ঢাকা শহরেই ভেঙেছে? জিজ্ঞেস করলো কিশোর।
হ্যাঁ, মাথা ঝাঁকালো কচি।
কোন কোন এলাকার গাড়ি জিজ্ঞেস করেছিলে?
করেছি। ঠিকানাও লিখে নিয়েছি, বলে পকেট থেকে নোটবুক বের করলো। কচি। সেটা নিয়ে পাতা উল্টে দেখতে লাগলো কিশোর। অনেকক্ষণ পর মুখ তুলে বললো, চলো ঘরে যাই। দেখি, মামার কাছে ঢাকা শহরের কোনও ম্যাপ আছে। কিনা।
না থাকলেও অসুবিধে নেই। জোগাড় করে নেয়া যাবে।
স্টাডিতে পাওয়া গেল চৌধুরী সাহেবকে। একটা গোয়েন্দা গল্পের পেপারব্যাক পড়ছেন। মুখ তুলে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এই যে গোয়েন্দারা, কি খবর?
বললো কিশোর।
ম্যাপ পাওয়া গেল। বেশ বড় একটা। সেটা নিয়ে শোবার ঘরে চলে এলো। কিশোর, বন্ধুদেরকে সঙ্গে নিয়ে।

আরিফ সাহেব জানতে চেয়েছেন ম্যাপ দিয়ে কি করবে কিশোর। বলেনি সে শুধু বলেছে, আগে কাজটা শেষ হোক, তারপর সব জানাবে। তিনিও আর জানার জন্যে চাপাচাপি করেননি। মুচকি হেসে শুধু বলেছেন, একেবারে এরকুল পোয়ারো।
তাঁর সঙ্গে একমত রবিন। আগাথা ক্রিস্টির গোয়েন্দা গল্পের নায়ক এরকুল পোয়ারোর সঙ্গে স্বভাবের অনেক মিল আছে কিশোর পাশার।
ঘরে এসে ম্যাপটা টেবিলে বিছাতে বিছাতে কিশোর বললো, কচি, ধারে কাছে ভালো স্টেশনারি দোকান আছে?
কেন?
কয়েক বাক্স পিন দরকার। ওই যে, যেগুলোর পেছনে রঙিন প্ল্যাস্টিকের বোতাম লাগানো থাকে। লাল, নীল, সবুজ, হলুদ, যে কটা রঙে পাওয়া যায়, সব। লাগবে।
এখানে এই উত্তরায় তেমন দোকান...আচ্ছা, ঠিক আছে, না পেলে টঙ্গি থেকে নিয়ে আসবো। এখুনি লাগবে?
হ্যাঁ, এখুনি।
নিয়ে আসছি আমি।
আমরা আসবো?
দরকার নেই। দরজার দিকে এগোলো কচি।
টাকা নিয়ে যাও।
আছে আমার কাছে, বলে বেরিয়ে গেল কচি। ফিরতে অনেক দেরি করে ফেললো। জানালো, এখানে পাইনি। টঙ্গি যেতে হয়েছে। পিনের বাক্সটা টেবিলে নামিয়ে রাখলো সে।
সবাইকে নিয়ে কাজে বসলো কিশোর। কচি যখন দোকানে গেছে, বসে থাকেনি সে। চৌধুরী সাহেবের নানা বিচিত্র জিনিসের গুদাম থেকে বড় একটুকরো চারকোণী প্লাইউড জোগাড় করে এনেছে। সেটার ওপর ম্যাপটা ছড়িয়ে টেপ দিয়ে আটকে নিয়েছে।
চার রঙের পিন এনেছে কচি। সবগুলো খুলে বসলো কিশোর। কচিকে বললো, তুমি নোটবুক দেখে এক এক করে ঠিকানা বলো।
বলতে লাগলো কচি। বাক্স থেকে পিন তুলে নিয়ে ঠিকানা মোতাবেক ম্যাপের গায়ে গাঁথতে লাগলো কিশোর। তাকে সাহায্য করলো রবিন আর মুসা।
সময় যে কোনদিকে দিয়ে কেটে গেল, খেয়ালই রইলো না ওদের। দুপুরের খাবার জন্যে যখন ডাকতে এলেন মামী, তখন টনক নড়লো মুসার। প্রচণ্ড খিদে টের পেলো। এই খিদে ভুলে এতোক্ষণ থাকলো কি করে ভেবে নিজেই অবাক হলো।

উত্তেজিত হয়ে আছে চারজনেই। খাবার টেবিলে খুব একটা কথা বললো না। ওরা। তাড়াতাড়ি খেয়ে এসে আবার পিন গাঁথতে বসলো। আরও ঘণ্টাখানেকের খাটুনির পর শেষ হলো কাজ। হউফ করে জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলো কিশোর। বললো, দেখো তো, এবার কিছু বোঝা যায় কিনা?
ম্যাপের দিকে তাকিয়ে থেকে মাথা ঝাঁকালো মুসা, পারছি। ঢাকা শহরের কোন কোন এলাকায় ভাঙছে, স্পষ্ট করে বোঝা যাচ্ছে এখন।
হ্যাঁ। আরেকটা ব্যাপার লক্ষ করেছো? কচি যখন ঠিকানাগুলো বলে যাচ্ছিলো, তারিখও বলতে বলেছিলাম। কোন তারিখে কোন দিন ভেঙেছে। কাঁচগুলো। শুধু সোম আর বুধবারে। অন্য কোনো বারে একটা কাঁচও ভাঙেনি।
ঠিক ঠিক! বলে উঠলো রবিন। আর কোনো বারের কথা লেখেনি কচি!
আরও একটা ব্যাপার, ম্যাপের দিকে তাকিয়ে বললো কিশোর, যে রাস্তায়ই ভাঙে, মাঝের দু-তিনটে করে গলি বাদ দিয়ে নেয়।
কেন দেয়? জানতে চাইলো মুসা।
সেটা এখনও বলতে পারবো না। তবে জেনে যাবো।
গাড়ি নিয়ে আবার কি ফাঁদ পাততে যাচ্ছি আমরা? রবিন জিজ্ঞেস করলো।
নিশ্চয়ই। তবে আজ বিকেলে বেড়াতে যাচ্ছি, কিশোর বললো। তুরাগ নদীর ধার ধরে হেঁটে চলে যাবো গ্রামের ভেতর। যতদূর যেতে পারি। দূর থেকে দেখে মনে হয়, গ্রামগুলো সুন্দর। ভেতরে ঢুকে দেখতে চাই সত্যি কেমন।
নদীর ধার দিয়ে হেঁটে চলেছে ওরা। তিন গোয়েন্দা আর কচি। শীতকাল। শুকনো মৌসুম। অনেক নিচে নেমে গেছে পানি। খুব ধীরে ধীরে বয়ে চলেছে। একেবেঁকে যাওয়া পানির স্রোত। রেললাইন পেরিয়ে হেঁটে চললো ওরা।
একপাশে ছড়ানো ফসলের খেত। ফসল কাটা হয়ে গেছে সেই কবে, এখন খেত জুড়ে শুধু সাদা মাটির ঢেলা।
নদীর পাড়ে সাদা বালি, পানির ধার পর্যন্ত নেমে গেছে। জায়গায় জায়গায় অসংখ্য শালিক বসে আছে। ঝগড়া বাধিয়েছে কোনো কোনোটা, কিচির মিচিয়ে কান ঝালাপালা। একখানে দেখা গেল পানির কিনারে এক পা তুলে ধ্যানমগ্ন হয়ে আছে সাদা বক। ওদের এগোতে দেখে ধ্যান ভঙ্গ হয়ে গেল তার। চোখের পলকে ডানার আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো আরেকটা পা। সতর্ক দৃষ্টিতে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে লাগলো ওদেরকে। বোধ হয় লক্ষ করছে হাতে এয়ারগান আছে কিনা। ইদানীং এই বয়েসী ছেলেরা বড় বেশি বিরক্ত করে। এই তো, দিন কয়েক আগেই মেরে নিয়ে গেছে তার সঙ্গিনীকে।
ওদের হাতে কিছু নেই দেখে আশ্বস্ত হলো পাখিটা, তবে সতর্কতা কমলো না। ব্যাপারটা লক্ষ করলো মুসা। বকটা ওরকম করছে কেন জিজ্ঞেস করলো।

এয়ারগানের কথা জানালো কচি।
আরও খানিক দূর গিয়ে একটা বড় মাছরাঙা দেখা গেল। পানিতে পড়ে থাকা মরা পচা ডালের ওপর বসে আছে। ওদেরকে দেখে ওটাও সতর্ক হয়ে গেল। ওরা আরও খানিকটা এগোতেই চিড়ড়িক ডাক ছেড়ে উড়ে চলে গেল।
এটারও কি এয়ারগানের ভয়?
চড়ুই থেকে শুরু করে কিছুই তো বাদ দেয় না ছেলেগুলো।
এগিয়ে চলেছে ওরা। পায়ে চলা পথের কিনারে এখন খানিক পর পরই খেজুর গাছ। পথের পাশে খেত আছে এখানেও। তবে ফসলের খেতের মতো শূন্য নয়। শীতকালীন শাকসজিতে সবুজ হয়ে আছে। কোথাও সরষে খেতের হলদে ফুলের শোভা। তার ওপর এসে পড়েছে বিকেলের পড়ন্ত সোনালি রোদ।
সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আবেগজড়িত কণ্ঠে বলেই ফেললো মুসা, কিশোর, তোমাদের দেশটা সত্যিই সুন্দর! এতোদিন তো শুধু শুনেছি, আজ দেখলাম...
জবাব দিলো না কিশোর। শুধু মাথা ঝাঁকালো। স্বপ্নিল হয়ে উঠেছে তার। মায়াময় দুই চোখ। গুনগুন কবে বেসুরো গলায় গেয়ে উঠলো, ধনধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা...
পেছনে সূর্য ডুবছে। খেজুর গাছে শালিক আর শ্যামার ভিড়। বেশির ভাগই ডাকছে নানান সুরে। কোন কোনটা এসে বসেছে রসের কলসের কানায়। রস বেয়ে পড়ার কাঠিতে ঠোঁট ডুবিয়ে রস খাচ্ছে। দূরে কোথায় যেন আপনমনে শিস দিয়ে চলেছে একটা দোয়েল। এক জায়গায় এসে দেখলো, খেজুর গাছে কলসি পাতছে ওদেরই বয়েসী একটা ছেলে।
কলসিতে যে মিষ্টি রস পড়ে, ইতিমধ্যে তা জেনে গেছে মুসা। কচিকে জিজ্ঞেস করলো, কখন খাওয়া যাবে?
সকালে, জানালো কচি।
সকালে কেন?
সারারাত ধরে কুয়াশা পড়বে। কুয়াশা আর রস গিয়ে জমা হবে কলসিতে। সকালে ওগুলো নামিয়ে বেচতে নিয়ে যাবে কৃষক।
ও। সকালে আসাই ভালো ছিলো তাহলে।
কেন, রস খাওয়ার জন্যে? হাসলো কচি। বেশ, আসবো একদিন সকালে।
গাছের ওপর থেকে ওদের কথাবার্তা সবই শুনেছে কৃষকের ছেলেটা। মুসার ভাঙা বাংলা বুঝতেও অসুবিধে হয়নি। স্থানীয় ইস্কুলে ক্লাস এইটে পড়ে সে।
কলস পাতা শেষ করে নিচে নামলো ছেলেটা। তখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা। মুসা আর রবিনের দিকে কৌতূহলী চোখে তাকাতে লাগলো সে। বুঝতে পারছে,

বিদেশী। কচির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, আপনেরা কি এখানে নতুন আইলেন?
আমি পুরানোই। এরা নতুন।
ইনিও? কিশোরকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলো সে।
হ্যাঁ।
কই থাকেন ভাই আপনেরা? এবারের প্রশ্নটা কিশোরকে।
আমেরিকায়। আমার নাম কিশোর পাশ, হাত বাড়িয়ে দিলো সে। ওরা আমার বন্ধু। ওর নাম মুসা আমান। আর ও রবিন মিলফোর্ড।
চকচক করে উঠলো ছেলেটার দুচোখ। দৃষ্টিতে বিস্ময় মেশানো অবিশ্বাস। রাখেন, রাখেন, আপনেদের নাম শুনছি! রকি বীচে থাকেন না আপনেরা?
হ্যাঁ, মাথা ঝাঁকালে কিশোর। চোখে কৌতূহল।
বুঝেছি, আপনেরাই! কতো পড়ছি আপনেগো কিচ্ছা! খুব ভাল লাগে আমার। আপনেরা তিন গোয়েন্দা, ঠিক কইলাম না? বলে জবাবের অপেক্ষা না করেই কিশোরের হাত দুই হাতে চেপে ধরলো সে। আমার নাম আবদুল করিম। হগগলে ডাকে করিম কইয়া। খালি বাবায় আর হেডস্যারে যখন বেশি রাইগ্না যায়, তখন কয় করিম্মা। নিষ্পাপ হাসি হাসলো সে। এক এক করে মুসা আর রবিনের হাতও ন্টঝাঁকিয়ে দিলো।
ছেলেটার সরলতায় মুগ্ধ হয়ে গেল মুসী আর রবিন। আমেরিকায় এই বয়েসী কোন ছেলের এতোখানি আন্তরিকতা কল্পনাও করা যায় না।
মুসা জিজ্ঞেস করলো, তুমি আমাদের কথা জানো?
হ জানি, আবার হাসলো ছেলেটা। আপনে খালি খাইছে খাইছে করেন না? আর হগল সময় খালি খাওনের লাইগ্যা পাগল হইয়া থাকেন। ভূতের নাম শুনলেই কাছার কাপড় ফালাইয়া দৌড়। ঠিক না?
হ্যাঁ, ছেলেটার সব কথার অর্থ বুঝতে পারছে না মুসা, তবে মানে মোটামুটি আন্দাজ করে নিতে পারছে।
গাছের মাথায় থাইক্কাই শুনলাম, রস খাওনের কতা কইতাছেন। অখন তো। অইবো না, বাই, সকালের আগে রস পাওন যাইবো না।
খুব সহজেই ওদেরকে আপন করে নিলো ছেলেটা। বকবক করে চললো। কাছেই ওদের বাড়ি। হাত তুলে দেখিয়ে দিলো।
সূর্য এখন আর চোখে পড়ে না। ডুবে গেছে। কিন্তু তার রেশ ছড়িয়ে রয়েছে। পশ্চিম আকাশে সাদা মেঘের ছোট-বড় পাহাড়গুলো এখন রক্তলাল।
ওদেরকে তার বাড়িতে রাতের খাওয়ার দাওয়াত দিয়ে বসলো করিম। আজ না, আরেক দিন, বলে অনেক কষ্টে এড়ানো গেল।

দ্রুত কমে আসছে গোধূলির কালচে সবুজ আলো। ছায়াঢাকা মেঠোপথ ধরে আবার শহরের দিকে ফিরে চললো ওরা। এক অপূর্ব আনন্দে মন ভরে গেছে। সবারই, বিশেষ করে তিন গোয়েন্দার।
মনে মনে আরেকবার স্বীকার করতে বাধ্য হলো রবিন আর মুসা, বাংলাদেশটা সত্যিই সুন্দর সুন্দর এর মানুষগুলো!

.

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে হাতমুখ ধুয়ে ঘর থেকে বেরোতেই মামীর সঙ্গে দেখা। মুসার। তাকে ডাকতেই আসছিলেন তিনি। বললেন, উঠেছে। বারান্দায় গিয়ে দেখো কে এসেছে।
কে?
গিয়েই দেখো না, মিটিমিটি হেসে চলে গেলেন তিনি।
ভীষণ কৌতূহল হলো মুসার। চলে এলো বারান্দায়। তাকে দেখেই হাসিমুখে উঠে দাঁড়ালো ছেলেটা।
আরে, করিম।
হ। রস লইয়া আইছি। আইজ রাইতে কুয়াশা খুব ভালো পড়ছিলো। ভালো। রস অইছে। সামনে রাখা দুই কলস রস দেখালো করিম। যান, একটা গেলাস লইয়া আয়েন। ঢাইল্লা দেই, খান।
দীর্ঘ একটা মুহূর্ত স্থির দাঁড়িয়ে রইল মুসা। এই কষ্টটা কেন করতে গেলে?-বলে যে সৌজন্যটুকু দেখাবে সেকথাও ভুলে গেল। ভাবতেই পারেনি এভাবে রস নিয়ে হাজির হয়ে যাবে আবদুল করিম।
এই নে, গেলাস, পেছন থেকে মামীর কথায় সংবিৎ ফিরলো যেন তার।
গেলাসটা নিয়ে হাসলো মুসা। বাড়িয়ে দিলো করিমের দিকে। দাও।
কলসের মুখে পরিষ্কার গামছা বাধা। সাদা ফেনা জমে রয়েছে। রস ঢেলে দিলো করিম।
হাতে নিয়ে পানীয়টুকু ভালো করে দেখলো মুসী। এই জিনিস আগে কখনও দেখেনি সে। গন্ধ শুকলো। তারপর চুমুক দিলো গেলাসে। দিয়েই বলে উঠলো, হখাইছে! এতো মিষ্টি! বলেই ঢকঢক করে সবটুকু গিলে ফেলে আবার গেলাসটা বাড়িয়ে দিলো।
গিলে চলেছে মুসা। আর ক্রমেই বাড়ছে করিমের হাসি। দারুণ মজা পাচ্ছে। গ্রামে ওরা বন্ধুরা মিলে বাজি ধরে রস খায়। সবাই প্রচুর খেতে পারে। কিন্তু এখন তার মনে হলো, মুসার ধারে কাছে যেতে পারবে না কেউ।
চলেন, একদিন আমাগো বাড়িত গিয়া বাজি ধইরা খাইবেন? প্রস্তাব দিয়ে ফেলল করিম।

না বুঝেই মাথা কাত করলো মুসা, আচ্ছা। আবার বাড়িয়ে দিলো গেলাস।
একের পর এক গেলাস খালি করে অবশেষে ওটা করিমের হাতে দিতে দিতে। মস্ত ঢেকুর তুলল সে, নাও, আর পারবো না।
একটা চেয়ারে ধপ করে বসে পড়লো মুসা। ঢোল হয়ে যাওয়া পেটে হাত বোলাচ্ছে। কিশোর আর রবিনও এসেছে। ওদেরকে বললো, দারুণ টেস্ট, বুঝলে। খেয়ে দেখো। ঝকঝকে সাদা দাঁত বের করে হাসলো সে। এতো মজা, লোভ সামলাতে পারিনি। এর সঙ্গে কোথায় লাগে পেপসি-কোক-ফান্টা…
রস খাওয়া শেষ হলো। কিছুতেই পয়সা নিতে চাইলো না আবদুল করিম। কিন্তু তিনজনের কাছ থেকে তিনটে ভনির তাকে নিতেই হলো। আমেরিকা থেকে নিয়ে এসেছে তিন গোয়েন্দা। রবিন দিলো ইলেকট্রনিক ঘড়ি বসানো একট বলপেন। কিশোর দিলো একটা পকেট নাইফ। মুসা দিল সুন্দর একটা গেঞ্জি আর একবাক্স চকলেট।
খুব খুশি হলো করিম। ওদেরকে আবারও খাওয়ার দাওয়াত দিলো। একেবারে নাছোড়বান্দা। কথা আদায় না করে যাবেই না।
শেষে কিশোর বলল, ঠিক আছে, যাবো, তবে আজ না। আজ তো বুধবার, যেতে পারবো না। আরেক দিন।
বুধবারে কি অসুবিধা বুঝতে পারলো না করিম। জিজ্ঞেসও করলো না। জানতে চাইলো, আরেক দিন কবে?
কালও হতে পারে। এসো একবার যেতে পারলে চলে যাবো।
আচ্ছা, বলে উঠে পড়লো করিম।

.
দিনের বেলাটা নানা জায়গায় ঘুরে কাটালো তিন গোয়েন্দা। সোনার গাঁ দেখে এলো। বিকেল বেলা ফিরে খেয়েদেয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলো। রাতের খাওয়ার পর বেরোলো আবার, গাড়ি নিয়ে, মামার সঙ্গে।
সোমবার আর বুধবারেই ঘটে কাঁচ ভাঙার ঘটনাগুলো।
আগের বারের মতোই সেদিনও সাত নম্বর রোডের মোড়ে তিন গোয়েন্দাকে নামিয়ে দিলেন চৌধুরী সাহেব। নির্দিষ্ট জায়গায় এনে গাড়ি পার্ক করলেন। কচি নেমে চলে গেল একটা বাড়ির ছায়ার দিকে। তিনি চললেন মোড়ের চায়ের। দোকানে।
আগের দিনের মতোই ঝোঁপের আড়ালে লুকিয়ে বসলো তিন গোয়েন্দা।
প্রথমে এলো সেই লম্বা বিদেশী মহিলা। হাতে লাঠি, সঙ্গে কুকুর। সেদিনের। মতোই সব কিছু শুঁকতে শুঁকতে এলো কুকুরটা, লাফ দিয়ে গাড়ির কাঁচে পা তুলে দিলো, ধমক দিয়ে তাকে নামিয়ে নিলো মহিলা।

ফিক করে হেসে ফেললো মুসা।
কুকুরটাকে নিয়ে চলে গেল মহিলা। আবার নীরব হয়ে গেল রাস্তা।
এরপর গোটা দুই গাড়ি হুস হুস করে বেরিয়ে গেল। পার্ক করে রাখা গাড়িটার কাছে এসেও একটু গতি কমালো না।
দ্বিতীয় গাড়িটা যাওয়ার কিছুক্ষণ পর এলো সেই বিচিত্র পোশাক পরা তরুণ। টেন-স্পীড সাইকেলে করে। সেদিন তো পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় গতি কমিয়েছিলো, আজ তা-ও কমালো না। শাই শাই করে সোজা ছুটে গিয়ে মোড় নিয়ে ঢুকে পড়ল একটা উপ-গলিতে।
ঝোঁপের আড়ালে অপেক্ষা করে আছে ছেলেরা।
দশটার দিকে মোড়ের কাছে আরেকটা গাড়ির হেডলাইট দেখা গেল। আরও কাছে এলে দেখা গেল একটা ফোক্স ওয়াগেন। অদ্ভুত রঙ করেছে–ওপরের অংশটা বেগুনী, নিচের অংশ হলুদ। তোবড়ানো ফেনড়ার। সামনের বাম্পারের একপাশ খুলে গেছে, আরেক পাশ ছুটলেই খসে পড়ে যাবে। ইঞ্জিনের ভারি শব্দ আর ঝুলে পড়া বাম্পারের ঝনঝন আওয়াজ তুলে এগিয়ে এলো ওটা। পার্ক করা গাড়িটার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় জানালা দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে এলো কি একটা জিনিস। গিয়ে পড়ল গাড়িটার নিচে।
কি ছুঁড়লো! চেঁচিয়ে বললো মুসা।
চল, দেখি! কিশোর বললো।
লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো তিনজনে। ছুটে রাস্তা পেরিয়ে এসে উঁকি দিলো গাড়ির নিচে। টর্চের আলোয় জিনিসটা দেখে মুখ বাকলিলা কিশোর।
জিনিসটা বের করে আনলো মুসা। ভীষণ নিরাশ হয়েছে।
সিগারেটের প্যাকেট! বিড়বিড় করলো রবিন। ভেতরে কিছু নেই তো?
খুলে দেখলো মুসা। কিচ্ছু নেই! নিমের তেতো ঝরলো তার কণ্ঠ থেকে, ধুর…
কথা শেষ হলো না তার। হঠাৎ বেজে উঠলো সাইরেন। মোড়ের কাছে দেখা দিলো পুলিশের গাড়ি। হাতের ওপরে লাল-নীল আলো জ্বলছে-নিভছে। পথের আরেক মাথায় একটা উপ-গলির ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো একই রকম আরেকটা গাড়ি।
তিন গোয়েন্দাকে ঘিরে ফেললো পুলিশ।

.

পুলিশের গাড়িতে বসানো সার্চ লাইটের আলো এসে পড়লো ওদের গায়ে এগিয়ে এলেন একজন গম্ভীরমুখো সার্জেন্ট। বুকে প্ল্যাস্টিকের ফলক ঝুলছে, তাতে নাম লেখাঃ আবদুল আজিজ। এক এক করে তাকালেন কিশোর, মুসা আর রবিনের

মুখের দিকে। শেষ দুজনকে দেখে অবাক হয়েছেন, বোঝা গেল। জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের পরিচয়?
কি জিজ্ঞেস করছেন! বলে উঠল রাগত একটা কণ্ঠ, ধরে লাগান না ধোলাই! পথেঘাটে চুরি, ছিনতাই, বোমাবাজি অতিষ্ঠ করে ফেললো!
মোটা একটা বেতের লাঠিতে ভর দিয়ে পুলিশের ভিড় সরিয়ে ভেতরে ঢুকলেন এক বৃদ্ধ। পরনে অবিন্যস্ত পোশাক। পেছন পেছন এলো এক তরুণ আর সতেরো আঠারো বছরের আরেক তরুণী।
চোর কোথাকার! তিন গোয়েন্দার দিকে চেয়ে চোখ পাকিয়ে গর্জে উঠলেন বৃদ্ধ, আমার ঈগল কোথায়?
একটা পেট্রল কার থেকে নেমে এলেন পুলিশের একজন সাব-ইন্সপেক্টর। বুকে। ঝোলানো ফলকে নাম লেখা, হাফিজ আলি। তিন গোয়েন্দাকে দেখে সার্জেন্টের মতোই অবাক হলেন তিনিও। কুঁচকে গেল ভুরু। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত ছেলেদের দিকে তাকিয়ে থেকে একই প্রশ্ন করলেন, তোমাদের পরিচয়?
পরিচয়-ফরিচয় পড়ে! ধমকে উঠলেন বৃদ্ধ। আমার ঈগলটা কোথায় আগে জিজ্ঞেস করুন! ধরে পেটান না…
আহ, থামুন তো আপনি, হাত তুলে বললেন পুলিশ অফিসার। আবার তাকালেন ছেলেদের দিকে, এখানে কি করছো তোমরা?
উ…উই… ইংরেজিতে বলতে গিয়েও থেমে গেল মুসা। বাংলায় তোতলাতে শুরু করলো, আ-আমরা-চো-চো-চো…
চোর নই, বাক্যটা শেষ করে দিলো কিশোর। বৃদ্ধকে দেখিয়ে বললো, ইনি ভুল করছেন।
কি বলতে যাচ্ছিলেন সাব-ইন্সপেক্টর, চেঁচিয়ে বললো একজন কনস্টেবল, স্যার, আরেক ব্যাটাকে ধরেছি! লুকিয়ে ছিলো! কচিকে টানতে টানতে নিয়ে আসছে সে।
চিৎকার করে উঠলেন বৃদ্ধ, আরি, ওটাকে চিনি তো! তিন-তিনবার দেখেছি একটা পিকআপের কাছে, আর তিনবারই কাঁচ ভেঙেছিলো, গাড়িটার!
ওটা আমাদেরই গাড়ি, কচি বললো। মাল ডেলিভারি দিতে এসেছিলাম। কে জানি ভেঙে রেখে গেছে।
এটা কার? সামনের গাড়িটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন সাব-ইন্সপেক্টর।
ওসব কথা বাদ দিন না! খেপে গেলেন বৃদ্ধ। আমার ঈগল কোথায় জিজ্ঞেস করুন!
আপনি স্যার থামুন না! বিরক্ত হয়ে বললেন পুলিশ অফিসার। আমরাই তো করছি যা করার। আপনি চুপ থাকুন, প্লীজ।

গজগজ করতে লাগলেন বৃদ্ধ।
কিশোর বললো, দেখুন, আমরা গাড়ির কাঁচ ভাঙতে আসিনি। চুরি করতেও নয়।
বার বার চোর চোর শুনতে শুনতে অসহ্য হয়ে গেছে মুসা। চমকের প্রথম ধাক্কাটাও কাটিয়ে উঠেছে। রেগে গেল। ইংরেজি বাংলা মিশিয়ে বললো, ঈগল ভেরি বিগ পাখি। পকেটে ভরে রেখেছি নাকি?
ঠিক, বাংলায় বললো রবিন। পরের কথাটা বললো ইংরেজিতে, পাখি চুরি করতে যাবো কোন দুঃখে?
সেটা আমি কি জানি? চুপ থাকতে পারছেন না বৃদ্ধ। মুখ ভেঙচালেন, এহ্, ভেরি বিগ পাখি! ন্যাকামো হচ্ছে! জানো না কি পাখি...।
আরেকজন কনস্টেবল চেঁচিয়ে উঠলো, স্যরি, এই গাড়িটা চিনি! নাম্বার প্লেটের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। চৌধুরী সাহেবের! আরিফুর রহমান চৌধুরী! ডি আই জি ছিলেন...
হ্যাঁ, আমারই, পেছন থেকে শোনা গেল ভারি কণ্ঠ।
ঝট করে ফিরে তাকালেন সাব-ইন্সপেক্টর। স্যার, আপনি?
অ্যাটেনশন হয়ে গেলেন তিনি আর তার দলের লোকেরা। স্যালুট করলেন।
সালামের জবাব দিয়ে ধীর পায়ে এগিয়ে এলেন ভূতপূর্ব ডি আই জি, হ্যাঁ। কাঁচ ভাঙে কে ধরতে এসেছি। কিশোরকে দেখিয়ে বললেন, ও আমার ভাগ্নে, কিশোর পাশা। আমেরিকায় থাকে। বেড়াতে এসেছে।...আর এরা ওর বন্ধু। ও মুসা আমান।...ও রবিন মিলফোর্ড। গোয়েন্দাগিরির খুব শখ। নামটাম ভালোই করেছে ওখানে।
আমি ওদের কথা জানি, স্যার, হাসিমুখে বললো একজন কনস্টেবল। পড়েছি। তিন গোয়েন্দা।
হ্যাঁ, মাথা ঝাঁকালেন চৌধুরী সাহেব।
ফোন করে ডেকে আনলাম চোর ভেবে, বিড়বিড় করলেন বৃদ্ধ। এখন শুনি গোয়েন্দা। অস্থির ভঙ্গিতে রাস্তায় বেত ঠুকতে ঠুকতে বললেন, আমার ঈগলটা কি পাবো না?

.

এরা যে লুকিয়ে আছে, আপনারা খবর পেলেন কোথায়? চৌধুরী সাহেব জিজ্ঞেস করলেন।
কথা হচ্ছে বৃদ্ধ আকবর আলি খানের ড্রইংরুমে বসে, তিন গোয়েন্দাকে চোর ভেবে বসেছেন যিনি। মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছে কিশোর। আসবাবপত্র খুব দামী, কিন্তু পুরানো ধাচের। জমিদারী আমলের জিনিসের মতো ভারি আর নকশা করা। বসার ঘরে দেয়ালে টানানো আকবর আলি খানের তিরিশ-চল্লিশ বছর আগের

একটা ছবি। পরনে কালো স্যুট। ঠিক একই রকম পোশাক পরেন এখনও। কিছুতেই যেন সময়টা পার হয়ে আসতে পারেননি, কিংবা হয়তো চাই না।
দুমাস ধরেই ধরার চেষ্টা করছি, স্যার, সার্জেন্ট জানালেন। অনেকেই খবর। দিচ্ছে, রহস্যময় ভাবে গাড়ির উইণ্ডশীল্ড ভেঙে রেখে যাচ্ছে কেউ। গত হপ্তায় খান। সাহেবও থানায় ডাইরি করে এসেছেন, বৃদ্ধকে দেখালেন তিনি। তাঁর গাড়ির কাঁচ ভেঙে ভেতর থেকে ঈগলটা রে করে নিয়ে গেছে। বাড়ির সামনে তখন ছিলো গাড়িটা। ভুলে ঈগলটা রয়ে গিয়েছিলো গাড়িতে। খানিক পরে মনে পড়তেই ছুটে গিয়ে দেখেন গাড়ির কাঁচ ভাঙা, ঈগল উধাও। তারপর থেকেই রাস্তার ওপর চোখ রাখেন। পরশুদিন রাতেও নাকি তিনজন ছেলেকে বাড়ির সামনের রাস্তায়, ঝোঁপের আড়ালে ঘাপটি মেরে থাকতে দেখেছেন। আমাদেরকে হুঁশিয়ার করে রেখেছেন। আজও যখন এদেরকে দেখলেন, তিন গোয়েন্দাকে দেখালেন আবদুল আজিজ, ফোন করলেন থানায়। আমি তখন চৌরাস্তার মোড়ে ডিউটিতে ছিলাম। অয়্যারলেসে আমাকে জানিয়েছেন সাব-ইন্সপেক্টর হাফিজ আলি।
জানালার কাঁচ ভাঙার পর, রবিন বললো, উড়ে পালিয়েছে হয়তো ঈগলটা।
মুসা বললো, ঈগল ডেঞ্জারাস পাখি। ছেড়ে রাখা হয় না। পালালো কিভাবে?
কড়া চোখে ওদের দিকে তাকালেন আকবর আলি খান। ইচ্ছে করে ন্যাকা সাজছে, না কী? পাখি হবে কেন? আমার জিনিসটা একটা..।
বুঝেছি! বলে উঠলো কিশোর। জ্বলজ্বল করছে চোখ। পাখি নয়, মুদ্রা! একটা দুর্লভ মুদ্রা!
মুদ্রা? অবাক হয়ে কিশোরের দিকে তাকালো কচি।
মাথা ঝাঁকালো কিশোর। আমেরিকান। সোনার টাকা, দশ ডলারের। আঠারোশো সালের শুরুতে বাজারে ছাড়া হয়েছিলো। এক পিঠে ঈগলের ছাপ মারা, ঈগল বললেই লোকে চিনতো তখন। আরও একটা প্রায় একই রকম মুদ্রা ছিলো তখন, হাফ ঈগল, ছাড়া হয়েছিলো আঠারোশো বাইশ সালে। দুনিয়ার। সবচেয়ে দুর্লভ মুদ্রাগুলোর একটা এখন।
শুনলেন! গর্জে উঠলেন আকবর সাহেব। সব জানে। তার মানে ঈগলটা দেখেছে!
দেখলেই যে জানবে শুধু, না দেখলে জানবে না, এটা কোনো কথা হলো না,। গম্ভীর হয়ে বললেন আরিফ সাহেব। না দেখেও জানা যায়, বই পড়ে। আর আমার। ভাগ্নে প্রচুর বই পড়ে।
আরিফ সাহেবের সঙ্গে সুর মিলিয়ে মেয়েটা বললো, ঠিকই তো। তুমি কিন্তু দুর্ব্যবহার করছ, আব্বা।
কিছু বললেন না আকবর সাহেব। তবে দৃষ্টি কিছুটা নরম হলো।

তিন গোয়েন্দার দিকে চেয়ে আবার বললো মেয়েটা, তোমরা কিছু মনে করো না, ভাই। আব্বার মনমেজাজ ভালো নেই। ঈগলটা হারিয়ে ভীষণ অস্থির। উঠে এসে কিশোরের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো, কোনো জড়তা নেই। আমি ডলি। সোফায় বসা তরুণকে দেখিয়ে বললো, ও আমার চাচতো ভাই, সানি।
সানিও এসে এক এক করে হাত মেলালো তিন গোয়েন্দার সঙ্গে।
এই সময় চা-নাস্তা নিয়ে ঢুকলো বাড়ির কাজের লোক। মেহমানদেরকে সেগুলো পরিবেশন করতে লাগলো ভাই-বোন মিলে।
কি ঈগল আপনাদেরটা? চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে সানিকে জিজ্ঞেস করলো কিশোর।
ডাবল ঈগল।
তার মানে বিশ ডলারের। আঠারোশো ঊনপঞ্চাশ সালে তৈরি। হাফ ঈগলের চেয়েও দুর্লভ। যতদূর জানি, আমেরিকায় এখন একটাই আছে, গভর্নমেন্টের কাছে। দশ লাখ ডলারে কিনতে চেয়েছিলো এক কোটিপতি, তা-ও রাজি হয়নি সরকার।
জানি, সানি বললো। আঠারোশো তিপ্পান্ন সালে নাকি আরও তিনটে তৈরি হয়েছে, যার দুটোর খোঁজ আছে এখন। একেকটার দাম পাঁচ লাখ ডলার।
আশ্চর্য! বিড়বিড় করলো মুসা। বিশ ডলারের একটা সোনার টুকরোর এতো দাম!।
অ্যানটিক ভ্যালু, কিশোর বললো।
হ্যাঁ, সানি বললো। চাচারটা তৈরি হয়েছে উনিশশো সাত সালে। দাম আড়াই লাখ ডলারে মতো।
গাড়িতে ছিলো কেন ওটা? রবিন জিজ্ঞেস করলো।
ধানমণ্ডিতে পুরানো মুদ্রার একটা একজিবিশন হয়েছিলো, ডলি জানালো, সেখানে দিয়েছিলো আব্বা। ওখান থেকে নিয়ে আসার পর ভুলে গাড়িতেই রয়ে গিয়েছিলো।
দোষটা তোর!
এবার মেয়ের ওপর রেগে গেলেন আকবর আলি। কতোবার মানা করেছি, গাড়ি চালানোর সময় এতো জোরে ক্যাসেট বাজাবি না! ভুলে গেলেন পুলিশের সামনে একথা বলা ঠিক হচ্ছে না, কারণ তাঁর মেয়ের ড্রাইভিং লাইসেন্সই নেই, ওই বয়সে পাওয়া যায় না। গোপনে চালায়। গান না ছাই! ধুড়ুম ধুড়ুম ঢাকের শব্দ আর চেঁচামেচি, আফ্রিকার জংলীরাও এই কাণ্ড করে না। কি যে শোনে আজকালকার। ছেলেমেয়েগুলো! মাথা ধরে গিয়েছিলো আমার! ওই

চেঁচামেচিতেই সব ভুলে গিয়েছিলাম, বাক্স ফেলে এসেছি গাড়িতে। নইলে কি আর ঈগলটা খোয়াতাম!
দুর্লভ জিনিস তো, তাঁকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে সহানুভূতির সুরে বললো। কিশোর, টাকা দিয়েও সব সময় পাওয়া যায় না। এসব জিনিস হারিয়ে গেলে কষ্টটা সে জন্যেই বেশি পায় সংগ্রহকারী।
কিশোর, মুসা বললো, গাড়ির ভেতরের জিনিস চুরি করার জন্যেই কি তাহলে কাঁচ ভাঙে?
মাথা নাড়লো কিশোর। আমার তা মনে হয় না।
আমারও না, মাথা নাড়লো কচি। কারণ আমাদের গাড়ি থেকে একবারও কিছু চুরি যায়নি। চুরি যাওয়ার মতো অবশ্য কিছু ছিলোও না ভেতরে।
তাহলে কাঁচ ভাঙার আর কি কারণ থাকতে পারে? সানির প্রশ্ন।
তাই তো, আর কি কারণ? প্রশ্নটা উলিরও। আমার তো বিশ্বাস চুরিই এর। একমাত্র কারণ। সঙ্ঘবদ্ধ কোনো দলের কাজ।
না আমারও মনে হয় না চুরি এর কারণ, সার্জেন্ট আজিজ বললেন। তোমাদেরটা বাদে আর কোনো গাড়ি থেকেই কোনো কিছু চুরি যায়নি। রিপোর্ট করেনি কেউ। এমন কতোগুলো গাড়ির কাঁচ ভেঙেছে যেগুলোর দরজা লক করা ছিলো না। যদি আর কোনো উদ্দেশ্য না থাকে, তাহলে বলতে হবে এটা স্রেফ শয়তানী।
কি জানি, কথাটা মানতে পারলো না কচি। শয়তানী করলে তো কোনো দুষ্টু ছেলের কাজ হতো। তাহলে কি ধরে ফেলতে পারতেন না এতোদিনে?
ঠিকই বলেছো, একমত হলো কিশোর। ম্যাপে যা দেখলাম, তাতে মনে হয় বেশ হিসেব করে একেকখানে গিয়ে একেকবার কাঁচ ভাঙে। এটা দুষ্টু ছেলের কাজ হতে পারে না। তাছাড়া সব দিন নয়, ভাঙে দুটো বিশেষ দিনে, সোম আর বুধবার।
তাই নাকি? অবাক মনে হলো সাব-ইন্সপেক্টরকে। এটা তো খেয়াল করিনি!
পরদিন সকাল আটটায় ড্রইং রুমে এসে বসলো তিন গোয়েন্দা। আরিফ সাহেব আগে থেকেই আছেন। কচিও এলো। তাকে আসতে বলে দিয়েছিলো কিশোর।
মামা, একটা কাজ করে দেবে? ভূমিকা না করে সরাসরিই বললো কিশোর।
কি কাজ? খবরের কাগজ থেকে মুখ তুললেন আরিফ সাহেব।
থানায় গিয়ে পুলিশের সঙ্গে কথা বলতে চাই। কাঁচ ভাঙার রাতে রাস্তায় ডিউটি ছিলো যাদের, তাদের কয়েকজনের সঙ্গে।
এক মুহূর্ত ভাবলেন আরিফ সাহেব। তারপর মাথা কঁকালেন, হু, তা অবশ্য করা যায়। গুলশান থানার ওসিকে ফোন করে বলতে পারি। ব্যবস্থা করে দেবে। কখন যেতে চাস?
পারলে এখনই।

আচ্ছা দেখি।
পনেরো মিনিট পর রিসিভার রেখে দিয়ে ফিরে তাকালেন আরিফ সাহেব। মৃদু হেসে বললেন, হয়ে গেছে। আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি। ওসি কথা দিয়েছে, আমার চিঠি দেখালেই সহযোগিতা করবে পুলিশ।
আরও আধঘণ্টা পর বেরিয়ে পড়লো ওরা। বাসে করে উত্তরা থেকে বনানীতে এসে নামলো।
ফুটপাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে কিশোর বললো, যেসব রাস্তায় কাঁচ ভেঙেছে, ওসব জায়গায় সোমবার কিংবা বুধবারে যাদের ডিউটি ছিলো তাদেরকে জিজ্ঞেস করবো। গত হপ্তার খবর নিলেই হবে।
কিন্তু জিজ্ঞেসটা করবো কি? মুসার প্রশ্ন।
অস্বাভাবিক কিছু দেখেছে কিনা। কাকে কাকে দেখেছে, কি রকম লোক, এসব।
মনে আছে কিনা ওদের কে জানে! রবিন বললো। প্রশ্নগুলো সব তুমিই ১ করো। আমরা তো বাংলা ভালো বলতে পারি না।
থানায় ঢুকে পরিচয় দিয়ে ওসি কথা জিজ্ঞেস করতেই তার ঘরে ওদেরকে নিয়ে। এলেন একজন ডিউটিরত পুলিশ। আরিফ সাহেবের চিঠি তাঁকে দেখালো কিশোর। ব্যবস্থা মোটামুটি তিনি আগেই করে রেখেছেন।
একজন তরুণ পুলিশ কনস্টেবলের সাক্ষাৎকার নেয়া হলো প্রথম।
ওই কাঁচ ভাঙা? মাথা নাড়লেন কনস্টেবল। নাহ্ কিচ্ছু দেখিনি। দেখলে তো ধরেই ফেলতাম। সন্দেহজনক মনে হয়নি কাউকে। অযথা সময় নষ্ট করেছি, বুঝলে। আসল চোর-ডাকাত ধরা বাদ দিয়ে কতগুলো দুষ্টু ছেলের পেছনে লেগেছি।
দুষ্টু ছেলেই, আপনি শিওর? কিশোরের প্রশ্ন।
তাছাড়া আর কি? দেখো, চাকরিতে ঢুকেছি সাত বছর হয়ে গেছে। শয়তান লোক তো আর কম দেখলাম না…।
আচ্ছা, কাকে কাকে দেখেছেন, মনে আছে? অনেক লোক?
রাস্তা যখন, লোক তো দেখবোই। আসছে যাচ্ছে, আসছে যাচ্ছে, কেউ দাঁড়ায়নি। কোনো গাড়ির দিকে ইট-পাথর ছুঁড়ে মারেনি কেউ, হাতুড়ি দিয়ে বাড়ি মেরে কাঁচ ভাঙেনি…
যাদেরকে দেখেছেন, তাদের কারও চেহারা মনে আছে?
নিশ্চয়ই আছে। অনেকেরই। সাত বছর কাটিয়ে ফেলেছি, এখন একটা। প্রমোশন দরকার আমার। কাজেই ডিউটিতে ফাঁকি দিই না। আর আমার স্মরণশক্তি খুব ভালো, কাউকে একবার দেখলে সহজে ভুলি না…
দাঁড়ান দাঁড়ান, লিখে নিই। পকেট থেকে তাড়াতাড়ি নোটবুক বের করলো কিশোর।

নোটবুকের দিকে তাকিয়ে অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন হঠাৎ কনস্টেবল, অযথাই কেশে গলা পরিষ্কার করলেন, ফালতু কথা আর বলা চলবে না বুঝে গেছেন। কারণ বক্তব্য লেখা হয়ে যাচ্ছে খাতায়। আর সেটা যদি ওসি সাহেব। দেখেন...সর্তক হয়ে কথা বললেন এবার তিনি, দাঁড়াও মনে করি। সে রাতে যে রাস্তায় পাহারা দিয়েছি, সেটাতে বিদেশীদের বাড়ি-ঘর বেশি। বেশির ভাগই এমব্যাসিতে চাকরি করে। একজন আমেরিকান মহিলাকে দেখলাম দামী একটা গাড়ি নিয়ে এসে এক বাড়ির সামনে রাখলো। বেশ কিছুক্ষণ বসে রইলো। তারপর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো আরেক মহিলা। গাড়িতে উঠলো। চলে গেল ওরা। এরপর...এরপর, হ্যাঁ এরপর এলো আরেক বিদেশী মহিলা। হাওয়া খেতে বেরিয়েছিলো বোধহয়। সাথে একটা কুকুর। এমন পাজি জানোয়ার, আমার হলে পিটিয়ে পাছার চামড়া তুলে ফেলতাম। যেটা দেখে সেটাই শোকে, এখানে লাফ দিয়ে ওঠে, ওখানে লাফ দিয়ে ওঠে... চলে গেল ওরা। তারপর এলো একটা রামছাগল..

রামছাগল?

আরে মানুষই। ছাগলের মতো স্বভাব আরকি। ওই যে দেখেছো না রাস্তায়, কতগুলো ছেলেছোকরা আছে, চুলের ঠিক নেই, কাপড়ের ঠিক নেই, কি যে পরে আর কি যে করে:-ছাগল না ওগুলো? তেমনি একটা আরকি। তোমার তো আরো ভালো জানার কথা। একটা বিদেশী সাইকেলে চড়ে এলো। মাথায় কাপ, চোখে কালো চশমা। আরো দেখো কাণ্ড! পিঠে বস্তার মতো একটা ব্যাগ, সেটার ভেতরে বোধহয় ওয়াকম্যান-টোয়াকম্যান ছিলো, কানে হেডফোন। অনেক দেশেই গাড়ি কিংবা কিছু চালানোর সময় ওসব ব্যবহার করা নিষেধ, অ্যাকসিডেন্ট করে বলে, আমাদের দেশেও মানা করে দেয়া উচিত...এই যে দেখো না, লাজারি কোচগুলো, সারারাত ধরে চলে। দিনেও চলে। কানের পোকা বের করে দিয়ে। সারাক্ষণ ওগুলোর মধ্যে হিন্দি ছবির গান বাজে। ভিসিআর চলে। মাঝে মাঝে ড্রাইভারও গুনগুন করে গলা মেলায়, মাথা দোলায়, অসতর্ক হয়ে যায়। আর অসতর্ক হলেই দুর্ঘটনা ঘটতে পারে..।

তা ঠিক, এক মত হলো মুসা। সব যাত্রী তো ওসব পছন্দও করে না। নিশ্চয়। অসুবিধা হয়। তো, আর কাকে দেখেছেন?

দেখেছি তো অনেককেই। তবে মনে রাখার মতো কাউকে নয়।

অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, নোটবুক বন্ধ করতে করতে বললো কিশোর।

তোমাকেও ধন্যবাদ। অযথা কষ্ট করছে, বুঝলে। সব দুষ্টু ছেলেদের কাজ।

দেখা যাক, কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে কি বেরোয়? হেসে বললো গোয়েন্দাপ্রধান।

এরপর কথা হলো সেই সার্জেন্ট আবদুল আজিজের সঙ্গে, সে রাতে যার। সাথে দেখা হয়েছিলো তিন গোয়েন্দার। হেসে স্বাগত জানালেন ছেলেদেরকে। আমার ওপরই তাহলে গোয়েন্দাগিরি চালাতে এসেছো। ভালো। তো কি জানতে চাও?
গত হপ্তায় তো সাত নম্বর রোডের কাছে ডিউটি ছিলো আপনার। কাউকে কাঁচ ভাঙতে দেখেননি। একটা কথা বলুন তো, ওই রোডে এমন কাউকে চোখে। পড়েছে, যার আচরণ সন্দেহজনক মনে হয়েছে?
তাহলে তো ধরতামই। অন্তত জিজ্ঞেস তো করতাম, ওখানে কি করছে? না, সে রকম কাউকে চোখে পড়েনি।
লোকজন, গাড়ি, নিশ্চয় অনেক গেছে। এমন কাউকে চোখে পড়েছে, যার। কথা মনে আছে এখনও আপনার?
উ! গাল চুলকালেন সার্জেন্ট, মনে করার চেষ্টা করছেন। কিছু কিছু আছে। লাল একটা টয়োটা করোলাতে করে গেছেন দুজন বিদেশী ভদ্রলোক। একটা ধূসর ফোক্স ওয়াগেন চালিয়ে গেছে দাড়িওয়ালা এক লোক। সম্বত ড্রাইভার। খবরের। কাগজের এক হকার ঢুকেছিলো এক বাড়িতে, বোধহয় বিলটিল নিতে। দুজন বয়স্কা মহিলা হেঁটে গেছেন, সাথে একটা ছেলে। ছেলেটার হাতে গুলতি ছিলো। একজন মহিলা গেছেন, সাথে একটা কুকুর নিয়ে...
মহিলার হাতে একটা লাঠি ছিলো, না?
মাথা নাড়লেন আবদুল আজিজ, না, কিছুই ছিলো না। শেকল ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছিলেন কুকুরটাকে।
বিদেশী?
হা, বিদেশী।
কুকুরটার রঙ সাদা, তার মধ্যে কালো ছোপ, তাই না?
না। সারা শরীর ধূসর।
নিরাশ মনে হলো কিশোরকে। না, তাহলে যার কথা বলছি সে না। আচ্ছা, আর কাকে দেখেছেন?
বয় স্কাউটের পোশাক পরা দুটো ছেলে। লম্বা চুলওয়ালা হিপ্পি মার্কা এক তরুণ। টেন-স্পীড সাইকেলে করে গেছে আরেক তরুণ, মাথায় ক্যাপ, চোখে চশমা। পিঠে ব্যাকপ্যাক, তাতে ওয়াকম্যান ছিলো, কানে লাগানো হেডফোন দেখেই বুঝেছি। মোটর সাইকেলে চড়ে গেছে তিনজন, তাদের কোন কিছুই চোখে। পড়ার মতো নয়। চারজন বয়স্ক লোক গেছেন জগিং করতে করতে, সবার গায়েই গেঞ্জী, তিনজনের পরনে ফুল প্যান্ট, একজনের হাফফকির-টকির আর সাধারণ কিছু লোক পায়ে হেঁটে গেছে, তাদের কথা মনে রাখার প্রয়োজন বোধ করিনি...
একজন হাবিলদারের সাক্ষাৎকার নিতে গেল তারপর ওরা।

কিছুই ঘটেনি, জবাব দিলেন হাবিলদার। চোখে পড়ার মতো কিছু না। যা জিজ্ঞেস করার তাড়াতাড়ি করো। আমার ডিউটি আছে।
জানি, কাঁচ ভাঙতে কাউকে দেখেননি। সন্দেহজনক কাউকে দেখেছেন? জিজ্ঞেস করলো কিশোর।
না। ঘড়ি দেখলেন হাবিলদার।
আচ্ছা, তাড়াতাড়ি বললো কিশোর। কাকে কাকে দেখেছেন সে রাতে? মানে, চোখে পড়ার মতো?
অনেককেই।
খুলে বলবেন?
আরেকবার ঘড়ি দেখলেন হাবিলদার। পুরানো একটা টয়োটা পিকআপ ট্রাক। ঢুকতে দেখেছি। পেছনে কতগুলো ছেলে হই-হট্টগোল করে গান গাইছিলো। পিকনিক-টিকনিকে গিয়েছিলো বোধহয়। গলির প্রায় শেষ মাথায় গিয়ে একটা বাড়ির সামনে থামলো গাড়িটা। কয়েকটা ছেলে নেমে যাওয়ার পর বেরিয়ে গেল। আরও অনেককেই দেখেছি। টেবিল থেকে ক্যাপ তুলে নিলেন তিনি।
আরও দু-চারজনের কথা বলুন, প্লীজ!
মোটর সাইকেল নিয়ে তিনটে ছেলেকে যেতে দেখেছি। পাশাপাশি চলেছিলো। নিশ্চয় বন্ধু। গাড়ি গেছে কয়েকটা। তবে মনে রাখার মতো একজনই গেছে।
সে কে? আগ্রহে সামনে ঝুঁকে এলো কিশোর।
দেখে তো মনে হলো পাগলা গারদ থেকে বেরিয়েছে। একটা সাইকেলে করে। এলো। মাথায় টুপি, চোখে কালো চশমা, পিঠে ব্যাগ, কানে হেডফোন...শাই শাই করে চলে গেল। একবার ভেবেছি, থামাবো। তারপর ভাবলাম মরুকগে। আমার। কি? তৃতীয়বার ঘড়ি দেখলেন হাবিলদার। চলি, আর থাকতে পারছি না। আর কিছু জানার থাকলে অন্য সময় এসো, যখন আমার বাইরে ডিউটি থাকবে না।
ফাইলে মুখ গুঁজে ছিলেন সাব-ইন্সপেক্টর হাফিজ আলি। ছেলেরা অফিসে। ঢুকতে সাড়া পেয়ে মুখ তুললেন। হেসে বললেন, আরে, তিন গোয়েন্দা যে। এসো এসো।
টেবিলের কাছে এসে দাঁড়ালো কিশোর। স্যার, আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা ছিলো...
বসো, চেয়ার দেখিয়ে দিলেন সাব-ইন্সপেক্টর। জানি। ওসি সাহেব। বলেছেন। খুব বেশি সময় দিতে পারবো না কিন্তু...
বেশি সময় লাগবে না।
বলো, কি জানতে চাও?
.

নিশ্চয় সাইকেলওয়ালা! টেবিলে চাপড় মারলো মুসা।
ঠিক! তার সঙ্গে সুর মেলালো কচি। টুপি, গগলস, ব্যাকপ্যাক, হেডফোন!
চারজন পুলিশকে জিজ্ঞেস করেছি আমরা, একমত হলো রবিনও। চারজনেই ওকে দেখেছে। আমরা দুবার পাহারা দিয়েছি। দুবারই দেখেছি।
আলোচনা হচ্ছে বসার ঘরে। পুলিশদের কাছ থেকে নতুন কিছুই জানতে পারেনি ওরা।
তবে, কিশোর বললো, কেউই তাকে কিছু করতে দেখেনি। আমরাও না।
না, তা দেখেনি, সায় দিলে অন্য তিন জনেই।
একটা ব্যাপার কিন্তু সন্দেহজনক, আবার বললো কিশোর। তাকে বিভিন্ন রাস্তায় দেখা গেছে। রাতের বেলা। মোটামুটি একটা বিশেষ সময়ে। ওটা লোকের বাড়ি ফেরার সময়, বেরোনোর নয়। হতে পারে তার বাড়ি ওই এলাকায়। একেক দিন একেক রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফেরে। কতো লোকেরই তো কতো স্বভাব থাকে।
তারমানে বলতে চাইছে, নিরাশ মনে হলো মুসাকে, ব্যাপারটা কাকতালীয়?
একবার দুবার কাকতালীয় হতে পারে। কিন্তু এবার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না। তাকে জানালা ভাঙতে দেখা যায়নি, তারমানে এই নয় যে সে ভাঙেনি। সন্দেহ থেকে বাদ দেয়া যায় না।
তোমার ধারণা, রবিন বললো, পুলিশ দেখেই সতর্ক হয়ে যায় সে? ওই রাস্তায় আর না ভেঙে অন্য যেখানে পাহারা নেই সেখানে গিয়ে ভাঙে?
অসম্ভব কি?
আমরা পাহারা দেয়ার সময়ও ভাঙেনি, মুসা বললো। তাহলে কি আমাদেরও দেখেছে?
দেখে থাকতে পারে। ভাঙতে এলে তা সাবধান হয়েই আসে। দেখেশুনে নেয় সব। আমরা যে ঝোঁপের আড়ালে লুকিয়েছি, সেটা তেমন ঘন নয়। ভালো মতো তাকালে যে কারোই চোখে পড়তে পারে। এক মুহূর্ত চুপ করে থাকলো। কিশোর। তারপর বললো, এখন আমাদের বড় সন্দেহ ওই সাইকেলওয়ালা। তাকে অপরাধী প্রমাণ করতে পারলেই হয়।
কি করে করবো? মুসা জিজ্ঞেস করলো।
ভাবছো কিছু? রবিনের প্রশ্ন।
কিশোর জবাব দেয়ার আগেই কচি বললো, কিন্তু ও-ই যদি ভেঙে থাকে, তাহলে আমি দেখলাম না কেন? মানে, আমি তো চোখ রেখেছিলাম। কাঁচ ভাঙতে হলে কোনো কিছু দিয়ে বাড়ি মারতে হবে। গাড়ির কাছে থামতে হবে। কোনোটাই করেনি সে। এমন কি যে রাতে কাঁচ ভাঙার শব্দ শুনেছি, সে রাতেও তাকে দেখিনি।

কিশোরের দিকে তাকালো রবিন। সাইকেল না থামিয়ে কি করে কাঁচ ভাঙা যায় কিশোর?

কিংবা নাহয় থামলোই, মুসা বললো। কিন্তু কারো চোখে না পড়ে কি ভাবে ভাঙে? কি দিয়ে? অদৃশ্য মানব হয়ে যায় নাকি?

অবাস্তব কোনো কিছু ঘটে না নিশ্চয়ই, কিশোর বললো। সেটা সম্ভবও নয়। কচির দিকে তাকালো সে। সে রাতে কাঁচ ভাঙতে শুনেছো তুমি, গাড়ির কাছে কাউকে দেখোনি। হতে পারে তুমি বেরোতে বেরোতে তোমার চোখের আড়াল হয়ে গিয়েছিলো সে। এমন কিছু কি চোখে পড়েছে তোমার যা মনে করতে পারছে না?

চোখ আধবোজা করে ভাবার চেষ্টা করলো কচি। পিকআপের কাছে কাউকে দেখিনি..রাস্তায়ও না... হঠাৎ সোজা হয়ে বসলো সে। দাঁড়াও দাঁড়াও, একটা নড়াচড়া বোধহয় দেখেছি! গাড়ির সামনে! দূরে! রাস্তায়!

কি ধরনের নড়াচড়া?

বলতে পারবে না। মনে করতে পারছি না। মনে হলো যেন পলকের জন্যে। দেখেছি।

মাথা ঝাঁকালো কিশোর। হয় এরকম। অনেক কিছুই দেখি আমরা যা মনে রাখার চেষ্টা করি না। ফলে ভুলে যাই। নড়াচড়াটা হয়তো কোনো সাইকেলেরই দেখেছো। কিন্তু যেহেতু কাঁচ ভাঙার সাথে সাইকেলের কোনো সম্পর্ক নেই, অন্তত তখন আমার মনে হয়নি, ওটার কথা মনে রাখার চেষ্টা করোনি তুমি। অথচ দেখেছো ঠিকই। একে বলে সাইকোলজিক্যাল ইনভিজিবিলিটি।

এতো দ্রুত যদি চলেই গিয়ে থাকে, রবিন প্রশ্ন তুললো, তার মানে কাঁচি ভাঙার জন্যে থামেনি সে। চলন্ত সাইকেল থেকে কি করে ভাঙলো?

ঠিক বলতে পারবো না। তবে একটা আইডিয়া আসছে মাথায়। দেখি, পুলিশের সঙ্গে আবার কথা বলতে হবে। কচি, তোমাদের পিকআপটাও পরীক্ষা। করতে চাই।

করবে। যখন খুশি।

কিন্তু কিশোর, রবিন বললো, সাইকেলওয়ালা যে কাঁচ ভাঙে, এটা প্রমাণ করবে কি করে? অবশ্য যদি ও-ই ভেঙে থাকে।

হাতেনাতে ধরবো। আবার ভূত-থেকে-ভূতে ব্যবহার করে।

মানে, শহরের সমস্ত ছেলেমেয়েকে হুঁশিয়ার করে দেবে চোখ রাখার জন্যে? মুসা বললো।

হ্যাঁ, তাই করবো। কিছু তথ্য এখন আমাদের হাতে আছে। ওদেরকে পরিষ্কার করে বলতে পারবো, কার ওপর চোখ রাখতে হবে। এতোগুলো চোখের কড়া নজর এড়িয়ে নিরাপদে কিছুতেই কাজ সারতে পারবে না সে।

যদি সে আগেই জেনে না যায় যে চোখ রাখা হচ্ছে, মুসা বললো। যে ভাবে জেনে যায় পুলিশ নজর রাখছে। এক্সরে ভিশন না তো তার? কিংবা ইনফ্রা রেড চোখ, যে অন্ধকারেও দেখবে! কে জানে হয়তো অলৌকিক কোনো ক্ষমতা আছে। শুনেছি এদেশে নাকি ওরকম ক্ষমতাশালী লোকের অভাব নেই, অনেক পীর–ফকির আছে

ওসব কিছু না। অন্য কোনো ভাবে জানে। বাস্তব, সহজ কোনো উপায়ে। রাতেও চোখে কালো চশমা পরে, উদ্ভট চেহারার জিনিস। আমার এখন সন্দেহ। হচ্ছে, ওটা ফীল্ড গ্লাস। ওকে হাতেনাতে ধরতে পারলেই জেনে যাবো সেটা। কিন্তু মুশকিল হলো সেটা জানার জন্যে আগামী সোমবার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে আমাদেরকে। তার আগে আঘাত হানবে না সে।

ভালোই হয়েছে, মুসা বলল। ঘোরার সময় পেলাম। করিমদের বাড়িতে দাওয়াত খাবো, রাত কাটাবো। ও বললো এদেশে গাঁয়ের বাড়িতে রাতে থাকার মজাই নাকি আলাদা, বিশেষ করে শীতকালে। দেখে আসবো সেটা।

আমার পক্ষে যাওয়া বোধহয় সম্ভব হবে না, কচি বললো। অনেক কাজ। আমি ফার্মে না থাকলে অনেক ক্ষতি হয়ে যায়। বাবা একা কদিক সামলাবে?

হ্যাঁ, তা ঠিক, মাথা ঝাঁকালো কিশোর। তোমাকে আটকাবো না। তবে আমাদের সঙ্গে যেতে পারলে ভালো হতো। থাক, অসুবিধে হবে না। করিম পথঘাট চেনে। তো, এখন কি তোমাদের বাড়ি নিয়ে যাবে? পিকআপটা দেখতাম।

চলো।

উঠতে যাবে ওরা, এই সময় বাজলো টেলিফোন। মামা-মামীর কারো হবে মনে করে রিসিভার তুললো কিশোর, হ্যালো।

ইয়ে, পরিচিত একটা কণ্ঠ, অস্বস্তি বোধ করছে বোঝা যায়, আরিফ সাহেরে বাসা?

হ্যাঁ।

কিশোর পাশা আছে?

অবাক হলো কিশোর। বলছি।

ও, কিশোর। আমি সানি। আকবর সাহেবের ভাতিজা। কাল রাতে আমাদের বাসার সামনে দেখা হয়েছিলো।

হ্যাঁ, মনে আছে। কি ব্যাপার?

ডলির মুখে তোমাদের সুখ্যাতি শুনে শুনে চাচার ধারণা হয়েছে, চেষ্টা করলে তোমরা হয়তো তার ঈগলটা খুঁজে বের করে দিতে পারবে। তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে বললেন আমাদের। তা ফিস কতো তোমাদের?

ফিস-টিস নিই না আমরা। মানুষকে সাহায্য করতে পারলে, রহস্য আর সমস্যার সমাধান করে দিতে পারলেই খুশি।
তাই নাকি? ভালো কথা। চাচাকে বলবো। এখন কি একবার আসতে পারবে? ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করা যেতো। টেলিফোনে তো সব কথা বলা। যায় না...
এখুনি? এক মুহূর্ত ভাবলো কিশোর। বেশ আসছি।
বাসা চিনবে তো?
নিশ্চয়। রাখলাম।

.

বাড়িটা বিশাল। সেদিন রাতের বেলা ঢুকেছিলো গোয়েন্দারা, ভালোমতো দেখতে পারেনি, এখন দেখলো। ভেতরে প্রচুর গাছপালা। গাড়ি বারান্দায় নতুন মডেলের একটা হোণ্ডা সিভিক দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলো ওরা। গ্যারেজে আরেকটা গাড়ি আছে। অনেক পুরানো। গায়ে ধুলো জমে আছে পুরু হয়ে। কোন আদ্যিকাল থেকে। ওটা ওখানে পড়ে আছে কে জানে। হুড আর উইশীল্ড ক্যানভাসে ঢাকা।
গাছপালার ভেতর দিয়ে এগিয়ে গেছে খোয়া বিছানো পথ। গাছের কারণে। সামনের দরজাটা প্রায় চোখেই পড়ে না।
কাছে এসে কলিং বেলের সুইচ টিপলো কিশোর। দরজা খুললো না।
এখুনি আসতে বলেছিলো? দরজা খুলছে না দেখে সন্দেহ হলো মূসার। ঠিক শুনেছো?
হা, জবাব দিলো কিশোর।
হঠাৎ বাড়ির অনেক ভেতর থেকে শোনা গেল রেগে যাওয়া কণ্ঠস্বর। দ্রুত। আরও কয়েকবার সুইচ টিপলো কিশোর। দরজা এবারও খুললো না, তবে কথা থেমে গেল।
বেলটাই বোধহয় কাজ করে না, রবিন বললো।
পাশে ঢোকার অন্য দরজা থাকতে পারে, মুসার অনুমান।
আবার রাস্তায় ফিরে এসে আশেপাশে উঁকি দিতে লাগলো ওরা। গ্যারেজটা যে পাশে সে পাশে আর কোনো দরজা দেখা গেল না।
ওটা কি? অদ্ভুত একটা জিনিসের দিকে তাকিয়ে রয়েছে মুসা। পাশের খোলা চত্বরে চিত হয়ে আছে চার ফুট চওড়া একটা ধাতব জিনিস। দেখতে পিরিচের মতো। নিচে তিনটে পা। আকাশের দিকে পেট।
স্যাটেলাইট ডিশ, কিশোর বললো।
মহাকাশের স্যাটেলাইট থেকে পাঠানো সঙ্কেত ধরে, জানালো রবিন। টেলিভিশন আর রেডিওর সঙ্কেত গিয়ে স্যাটেলাইটে ধাক্কা খেয়ে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসে। আর আসে বলেই স্যাটেলাইটের মাধ্যমে অনেক দূর থেকে পাঠানো

টেলিভিশনের ছবি দেখি, রেডিও শুনতে পাই আমার। এখানকার আইন জানিনে, তবে আমেরিকায় এই ডিশের মাধ্যমে সঙ্কেত ধরে টিভি দেখলে কিংবা রেডিও শুনলে কেবল কোম্পানিকে পয়সা দিতে হয় না। খরচ বাঁচে।
কিশোর বললো, এখানে ওরকম কোন কোম্পানি নেই। রেডিও, টিভি দুটোই সরকারী। লাইসেন্সের খরচ দিতেই হবে।
তাহলে এটা রেখেছে কেন? মুসার প্রশ্ন।
হয়তো এমনি। কিংবা ওটাকে অ্যান্টেনা হিসেবে কাজে লাগায়। কোনো সময় আমেরিকায় ছিলেন হয়তো ভদ্রলোক, তখন কিনেছিলেন, আসার সময় নিয়ে এসেছেন সাথে করে।
মনে হয়, একমত হলো রবিন।
আবার কথা শোনা গেল। মুসা বলে উঠলো, খান সাহেবের গলা না?
ঘরের ভেতর থেকেই এসেছে বোধহয় কথা, মানুষটাকে দেখা যাচ্ছে না।
এই যে, এসে গেছে, এসো! বাড়ির সামনের দিক থেকে শোনা গেল আরেকটা কণ্ঠ। তাড়াতাড়ি আবার সামনের দরজার কাছে চলে এলো ছেলেরা। সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে রয়েছে সানি। কেমন যেন দ্বিধান্বিত। এসো, আবার বললো সে।
কয়েকবার বেল বাজালাম, বাড়ির পাশে চলে যাওয়ার কৈফিয়ত দিলো। কিশোর, কেউ খুললো না। ওদিকে আর কোনো দরজা-টরজা আছে কিনা দেখতে গিয়েছিলাম।
সরি, সানি বললো। পেছন দিকে ছিলাম আমরা। চাচার সঙ্গে কথা। বলছিলাম। বেল শুনিনি।
ওদের নিয়ে ঘরে ঢুকলো সে। বাড়িটা পুরানো, কিন্তু ঝকঝকে তকতকে। গুলশান-বনানীর আর দশটা আধুনিক বাড়ি থেকে আলাদা, অনেকটা পুরানো ঢাকার বাড়ির মতো। এ
চাচার শরীরটা ভালো নেই আজ, সানি বললো। শুয়ে আছেন। আমাকেই তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে বললেন। ওই ঈগলটা খুঁজে দেয়ার ব্যাপারে আর
আসলে, রবিন বললো, এই কেসে ইতিমধ্যেই জড়িয়ে গেছি আমরা। কে কাঁচ ভাঙে রার জন্যে কচিকে সাহায্য করছি।
তাই তো। ভুলেই গিয়েছিলাম।
নতুন একটা আঙ্গিক যখন পাওয়া গেল, কিশোর বললো, এদিক থেকেও তদন্ত চালাতে পারি আমরা। হয়তো ঈগল খুঁজতে গিয়েই কাঁচ যে ভাঙে তাকে ধরে। ফেলতে পারবো। চুরি যখন করেছে; নিয়ে গিয়ে নিশ্চয় বিক্রিরও চেষ্টা করবে।
কি করে? মুসা বললো। এতে দামী জিনিস বেচবে কার কাছে? সাধারণ লোকে কিনবে না। টাকা এবং শখ দুটোই যার আছে সে ছাড়া। আর এখন কেনার

ঝুঁকিও নিতে চাইবে না কেউ সহজে। চুরির খবর জেনে ফেলেছে অনেকে। এতে টাকা দিয়ে কিনে পুলিশের ঝামেলায় কেউ পড়তে চাইবে না।
এসব জিনিস যারা সংগ্রহ করে তাদেরকে চেনো না তুমি, মুসা, কিশোর বললো। কিছু লোক আছে, যারা রীতিমতো পাগল হয়ে যায়। হিতাহিত জ্ঞান। থাকে না। যে-কোনো ঝুঁকি নিয়ে বসে। জোগাড় করে লুকিয়ে রেখে দেয়। শুধু নিজে দেখে, কাউকে দেখতেও দেয় না।
মাথা ঝাঁকালো সানি। ও ঠিকই বলেছে। আর এদের টাকাও থাকে প্রচুর। নইলে একটা মুদ্রার জন্যে এতো টাকা কি করে খরচ করবে বলো।
তবে, মুসার কথার খেই ধরলো কিশোর, এটা আমেরিকা নয়। এখানে ওরকম সংগ্রহকারী দু-চারজনও আছে কিনা সন্দেহ। মুদ্রাটা বিক্রি করতে পারবে বলে মনে হয় না।
খুব কঠিন হবে।
আচ্ছা, মুদ্রা, স্ট্যাম্প ঢাকায় যারা সাপ্লাই দেয়, তাদের নিশ্চয় চেনেন আপনারা। নাম-ঠিকানা বলুন, ওদের ওপর চোখ রাখবো আমরা।
আমি? অস্বস্তি ফুটলো সানির চোখে। চুলে হাত চালাতে চালাতে মাথা নাড়লো। নাহ্, আমি চিনি না। ওসব চাচার ব্যাপার। খুব কমই নাক গলাই আমি।
তাহলে তাকেই জিজ্ঞেস করা দরকার।
চোখ মিটমিট করলো সানি। চাচাকে?...ঠিক আছে, করতে পারবে। আগে তোমাদেরকে কাজে নিয়োগ করুক... হাতের ঘড়ির দিকে তাকালো সে। আরিব্বাবা...
তার দিকে একটা মুহূর্ত স্থির তাকিয়ে রইলো কিশোর। তারপর ঘরে চোখ বোলালো। আপনার চাচার নিশ্চয় আরও মুদ্রা আছে। দেখা যাবে? এখানে তো। একটাও দেখছি না।
এখানে রাখে না। পড়ার ঘরে। আবার ঘড়ি দেখলো সে।
দেখা যাবে?
দেখবে? ঠিক আছে, এসো।
লিভিং রুম, তারপর আরেকটা বড় হলঘর পার করিয়ে ওদেরকে পেছনের একটা দরজার কাছে নিয়ে এলো সানি। চাবির গোছা থেকে একটা বেছে নিয়ে তালা। খুললো। ঘরটা ছোট। লাল রঙের পুরু কার্পেট বিছানো। মেহগনি কাঠের ভারি ভারি আসবাব। শেলফগুলো বইয়ে ঠাসা। একধারে সুন্দর করে সাজানো পায়। লাগানো অনেকগুলো সুদৃশ্য কাঁচের বাক্স। ভেতরে গাঢ় নীল মখমলের বিছানায় যেন ঘুমিয়ে রয়েছে নানারকম মুদ্র।

একটা বাক্স দেখিয়ে সানি বললো, ওটাতে আমেরিকান মুদ্রা। ডাবল ঈগল আরেকটা আছে ওতে, দেখো। যেটা চুরি গেছে সেটারই মতো। তবে এটার দাম। চুরি যাওয়াটার তুলনায় কিছুই না।
গা ঘেঁষাঘেষি করে মাথা নিচু করে এসে বাক্স ঘিরে দাঁড়ালো তিন গোয়েন্দা। নীল মখমলে শুয়ে আছে সোনার মুদ্রাটা। চকচক করছে। একটা রূপার টাকার প্রায় সমান মুদ্রাটার এক পিঠে একটা উড়ন্ত ঈগল ছাপ মারা। ভোরের আকাশে ডানা মেলে দিয়েছে। সূর্য উঠছে সবে, ছড়িয়ে পড়েছে সূর্যরশ্মি।
কতো পুরানো এটা? জিজ্ঞেস করলো রবিন। উনিশশো নয় সালের, সানি জানালো। তারিখটা অন্য পিঠে। একই রকম সুন্দর, অথচ দাম মাত্র আট হাজার আমেরিকান ডলার।
শিস দিয়ে উঠলো মুসা। মাত্র! আট হাজার ডলার মাত্র হলো!
মাত্র বলেছি যেটা চুরি গেছে তার তুলনায়। দেখতে যেমনই হোক, সেটা আসল কথা নয়, দাম কম-বেশি অন্য কারণে। যেটা যতো বেশি দুর্লভ সেটার দাম ততো বেশি।
চুরি যাওয়ার সময় কিসের মধ্যে ছিলো জিনিসটা? রবিন জিজ্ঞেস করলো।
কালো চামড়ার একটা গহনার বাক্সে। ওই যে সৌখিন বাক্স আছে না কিছু, মহিলারা আঙটি-টাঙটি রাখে, ওরকম। সিগারেটের প্যাকেটের সমান। ডালার একপাশে দুটো কব্জা লাগানো, আরেক পাশে হুড়কো। বোতাম টিপলেই লাফ দিয়ে উঠে যায় ডালা। ভেতরে এরকমই নীল কাপড়। চাকচিক্য নষ্ট হয়ে যেতে পারে এই ভয়ে প্ল্যাস্টিকে মুড়ে রাখা হয়েছিলো।
সোনার চমৎকার মুদ্রাটার দিকে তাকিয়ে সানির কথা শুনছে তিন গোয়েন্দা। তারপর মুখ তুলে সারা ঘরে চোখ বোলালো কিশোর। নিজেকেই যেন প্রশ্নটা করলো, এ ঘরে তো কোনো টিভি দেখছি না?
টেলিভিশন দুচোখে দেখতে পারে না চাচা, হেসে বললো সানি।
আঙিনায় তাহলে স্যাটেলাইট ডিশ বসানো হয়েছে কেন?
ডিশ? আবার চোখ মিটমিট করলো সে। টিভি একটা আছে। গেম রুমে। আমি আর ডলি দেখি। চাচা এখন শুয়ে আছে ওঘরে, নইলে ডিশটা দিয়ে কি কাজ হয় দেখাতাম।
ও, বলে কি বোঝালো কিশোর বোঝা গেল না। ঠিক আছে, পরে এসে এক সময় নাহয় দেখবো। তা আপনার চাচাকে জিজ্ঞেস করবেন কি, আমাদেরকে...
ঝটকা দিয়ে খুলে গেল দরজা। হাতে বেত নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন আকবর আলি। কঠিন দৃষ্টিতে ছেলেদের দিকে তাকিয়ে গর্জে উঠলেন, এখানে কি? লাঠিতে ভর

দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে এলেন তিনি। এরপর কোনটা চুরি করবে সেটা দেখতে এসেছো?
আপনার ভাতিজাই এঘরে নিয়ে এসেছে আমাদের, শান্ত কণ্ঠে বললো কিশোর। চুরি করে ঢুকিনি। ঈগলটা খুঁজতে গেলে আমাদের জানতে হবে দেখতে ওটা কি রকম। এখন...
আমার ঈগল খুঁজবে! ভুরু কুঁচকে গেল খান সাহেবের। ওটার ধারে কাছে ঘেঁষতে দেবো ভেবেছো? বেরোও!
কিন্তু, স্যার, আপনার ভাতিজা... সানিকে দেখালো কিশোর, আমাদেরকে ফোন করে ডেকে এনেছে তদন্ত করার জন্যে! আপনিই নাকি আসতে বলেছেন।
সানি! লাল হয়ে গেছে আকবর আলির মুখ। ও ডেকে এনেছে! আমি আসতে বলেছি! সানি, তুই যে এতো মিথ্যে কথা বলিস জানতাম না তো! ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন খান সাহেব। আমি কিছু বলিনি! বেত তুলে আরেক পা এগোলেন তিনি। ভাতিজাকে বাড়িই মারবেন যেন।
তবে বেতটা যথাস্থানে আঘাত হানার আগেই ঢুকলো ডলি। একটানে বাবার হাত থেকে কেড়ে নিলো ওটা। তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, আব্বা!
মেয়ের দিকে কড়া চোখে তাকিয়ে রইলেন বৃদ্ধ। বললেন, তোরা ভাইবোনে মিলে যে কি করছিস বুঝতে পারছি না। থাকগে, বোঝার দরকারও নেই আমার। এই ছেলেগুলোকে বের করে দে এখান থেকে।
বেতটা মেয়ের হাত থেকে আবার ফেরত নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেরিয়ে গেলেন আকবর আলি। বিরক্ত দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে রইলো ভাইবোন।
জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে তিন গোয়েন্দাকে বললো সানি, সরি, কিছু মনে করো না। চাচার মন-মেজাজ খুব খারাপ হয়ে গেছে ইদানীং। খিটখিটে হয়ে গেছেন। কথায় কথায় রেগে যান।
হ্যাঁ, ভাইয়ের সঙ্গে সুর মেলালো ডলি, আব্বার কথায় কিছু মনে করো না। তোমাদের ডাকতে বলে নিজেই এখন ভুলে বসে আছে। এরপর আবার ডাকতে বললে লিখে দিতে বলবো।
মাথা ঝাঁকালো সানি। হ্যাঁ, তাই করবো। লিখে না দিলে আর ডাকছি না। তোমাদেরকে। গজগজ করে বললো, অযথা মানুষকে ডেকে এনে অপমান...
বাইরে বেরিয়ে খোয়া বিছানো পথ ধরে গেটের দিকে এগোলো তিন গোয়েন্দা।
আশ্চর্য! আনমনে বললো কিশোর। ডাকতে বলেছেন, সেটাও ভুলে। গেলেন? এতো তাড়াতাড়ি?
আমার কাছেও অবাক লাগছে ব্যাপারটা, রবিন মাথা দোলালো।

পাগল আরকি, সাফ মন্তব্য করে দিলো মুসা। এতো টাকা দিয়ে নইলে একটা সোনার টাকা কেনে?
গাড়ি বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে এখন আরেকটা গাড়ি, লাল ছোট একটা সুজুকি। চিন্তিত ভঙ্গিতে ওটার দিকে তাকিয়ে থেকে কিশোর বললো, যাকগে, ওসব নিয়ে পরে ভাববো। এখন তাড়াতাড়ি যাওয়া দরকার। সন্ধ্যার আগেই কচিদের বাড়ি গিয়ে ওদের পিকআপটা দেখতে চাই।

.
চারজনে মিলে পিকআপটা পরীক্ষা করলো ওরা। সীটের ওপরে, তলায়, সীটের সামনের মেঝেতে, পিকআপের ঘোট কেবিনের ভেতর যতো জায়গা আছে, সবখানে।
কাগজ আটকানোর ক্লিপ দিয়ে নিশ্চয় কাঁচ ভাঙা যায় না।
সীটের নিচ থেকে একটা ক্লিপ বের করে দেখালো মুসা।
না, শুকনো গলায় বললো কিশোর।
কিংবা কয়েকটা খালি দুধের টিন দিয়ে? পিকআপের পেছন থেকে টিনগুলো রে করলে রবিন।
আমি রেখেছি ওগুলো, হেসে বললো কচি। মাঝে মাঝে কাজে লাগে।
এটা কি? জুতোর তলায় চ্যাপ্টা হয়ে যাওয়া মটর দানার চেয়ে ছোট একটুকরো ধাতব জিনিস বের করে দেখালো মুসা।
হাতে নিয়ে দেখলো রবিন। চিনতে পারলো না।
কচিও পারলো না।
যাই হোক, মুসা বললো। বেশি ছোট। এটা দিয়ে ঢিল মেরে কাঁচের কিচ্ছু। করা যাবে না। তবে জিনিসটা চেনা চেনা লাগছে।
লাগবেই, বললো রবিন। সীসা। কোনো জিনিস ঝালাই-টালাই করতে গিয়ে পড়ে থাকতে পারে।
হাতের তালুতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখলো কিশোর। চিনলো না। ফিরিয়ে দিলো আবার মুসাকে। নিজের অজান্তেই জিনিসটা পকেটে ভরলো মুসা। আবার খোঁজাখুজি চললো। কাঁচ ভাঙা যেতে পারে, ওরকম কিছুই পাওয়া গেল না।
কচির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ি ফিরে চললো তিন গোয়েন্দা।
বাগানে ছিলেন মামী। ওদেরকে দেখে এগিয়ে এলেন বাগানের কিনারে। এসেছিস। যা, হাতমুখ ধুয়ে নে গে। চা দিচ্ছি।...ও, হ্যাঁ, কিশোর, সানি নামে একজন ফোন করেছিলো। আসতে না আসতেই কতোজনের সঙ্গে পরিচয় করে ফেললি। ফোনও করে।
হাসলো কিশোর। কিছু বললো?

বললো তার চাচা নাকি মত পরিবর্তন করেছেন। যা ঘটে গেছে তার জন্যে অনুতপ্ত।
আবার যাবো! মুসা বললো। কিশোর, এবার পয়সা দিতে রাজি না হলে আর যাচ্ছি না আমি। যেমন লোক, তেমনি তার ব্যবস্থা। বিনে পয়সায় কাজটা করে। দিতে চেয়েছিলাম, ভাল্লাগেনি।
হ্যাঁ, ঠিক, তুড়ি বাজালো রবিন। অন্তত মোটা একটা পুরস্কার ঘোষণা না। করা পর্যন্ত ওঁর মোহর আর খুঁজতে যাচ্ছি না।
কিন্তু ওদের কথায় তেমন কান নেই কিশোরের। জিজ্ঞেস করলো, মামী, আজ বাইরে কাউকে অদ্ভুত আচরণ করতে দেখেছো?
অদ্ভুত আচরণ? অবাক হলেন মামী। না তো!
বেশ, অদ্ভুত আচরণ না হয় না-ই করলো, থামের মাথায় উঠেছিল কেউ? যে ধাতব থামটা থেকে টেলিফোনের তার এসে ঢুকেছে এই বাড়িতে সেটার দিকে হাত তুললো কিশোর।
না, মাথা নাড়লেন মামী। দাঁড়া দাঁড়া, দেখেছি। মেকানিক। ফোনের তার। চেক করতে আসে যে, ওদেরই একজন। লোকটা নতুন। চিনি না।
কখন সেটা? আগ্রহ দেখাল কিশোর।
এই তো, তোরা বেরোনোর একটু আগে। বাগানেই ছিলাম আমি তখন, দেখলি না? যা, হাত-মুখ ধো গিয়ে।
কৌতূহল আর চেপে রাখতে পারলো না মুসা। ওরা ওখান থেকে সরে আসার সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করলো, ব্যাপারটা কি, কিশোর?
লোকটা কি ছদ্মবেশী? রবিনের প্রশ্ন। আসল মেকানিক নয়? এ বাড়ির ওপর চোখ রাখছিলো?
রাখতেও পারে, দায়সারা জবাব দিলো কিশোর। এ নিয়ে পরে চিন্তা-ভাবনা করবো। সোমবারের আগে অনেক সময় পাওয়া যাবে। আপাতত হাত-মুখ ধুয়ে নিয়ে চলো চা খাইগে।

.

পরদিন করিমদের বাড়িতে দাওয়াত খেতে গেল তিন গোয়েন্দা। দাওয়াত রাতে, অথচ নেয়ার জন্যে দুপুরবেলাই এসে বসে রইলো ছেলেটা।
করিমের মায়ের আদর-যত্নে অভিভূত হয়ে গেল ওরা। সম্পন্ন গৃহস্থ করিমের বাবা, বাড়ি-ঘরের অবস্থা দেখেই সেটা আন্দাজ করা গেল।
বাড়িতে ঢোকার পর থেকেই শুরু হলো খাবার আসা। খানিক পর পরই এটা নিয়ে আসেন করিমের মা, ওটা নিয়ে আসেন। নানা রকম পিঠা, খেজুরের রসে। তৈরি পায়েস, চিড়া-মুড়ির মোয়া। থালায় করে নিয়ে আসেন, আর বলেন, খাও, বাবারা,

খাও। আমরা গরীব মানুষ। ভালা জিনিস ত আর খাওয়াইতে পারুম না। এগুলানই খাও।
বৈঠকখানায় ভিড়। প্রায় সবাই করিমের সমবয়েসী গায়ের ছেলে। বিদেশী বন্ধুদের দাওয়াত করে আনছে একথাটা প্রায় ঢাকঢোল পিটিয়ে জানিয়ে দিয়েছিলো। সে। ওদের আঞ্চলিক সব কথা বুঝতে পারে না মুসা, তা-ও ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেল। দেখতে দেখতে।
শীতের রাত। আটটা বাজতে না বাজতেই ঘুমিয়ে পড়ে গাঁয়ের লোক, নিঝুম। হয়ে যায় পাড়া। কচিত কারও ঘরে কুপির কাঁপা আলো চোখে পড়ে। তিন গোয়েন্দাকে দেখতে আসা ছেলেরা চলে গেল আটটা বাজার আগেই। সঙ্গে করে নিয়ে আসা কিছু কিছু জিনিস ওদেরকে উপহার দিয়েছে গোয়েন্দারা। খুব খুশি হয়েছে ছেলেগুলো। ঢাকায় তিন গোয়েন্দা–
রসুই ঘরে ভাত বেড়ে দিয়ে খেতে ডাকলেন করিমের মা।
হ্যারিকেনের মিটমিটে আলো। মাটির মেঝেতে মাদুরের ওপর খেতে বসলো। তিন গোয়েন্দা। এ রকম ভাবে খায়নি আর কখনও। এক অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছে ওদের। আবছা অন্ধকার, খাবারও ঠিকমতো দেখা যায় না। ঘরের ভেতরে কেমন এক ধরনের ভ্যাপসা গন্ধ। ওরা জানে না, শুকনো পাট, কাঁচা সরষে, আর অনেক পুরানো তেল চিটচিটে কাঁথা-বালিশের মিশ্র গন্ধ ওটা।
কড়া ঝাল দেয়া মুরগীর মাংস, লাল চালের ভাত, মসুরের ডাল, আর নানা রকম সব্জী। সেই সাথে প্রচুর কাঁচা মরিচ আর পেঁয়াজ।
সাধারণ খাবার। কিন্তু খেতে খেতে মুসার মনে হলো খাবারের এই স্বাদ আগে কমই পেয়েছে। পরিবেশের জন্যেই বোধ হয় ভালো লাগছে এতোটা। মানুষগুলোর অকৃত্রিম ভালোবাসা আর আন্তরিকতাও যোগ হয়েছে এর সঙ্গে। রুটি খেতে অভ্যস্ত যে রবিন, তারও খারাপ লাগছে না খেতে। শুধু ঝালটা একটু বেশি লাগছে। খানিক পর পরই পানি গিলতে হচ্ছে। নাক-চোখ দিয়ে পানি গড়াচ্ছে ঝালের চোটে।
খাওয়া সেরে বাইরে দাওয়ায় এসে বসলো ছেলেরা। রাতে থাকবে। কাজেই কম্বল-টম্বল নিয়ে তৈরি হয়েই এসেছে।
পরিষ্কার আকাশ। তবু কেমন যেন ঝাপসা লাগছে। কুয়াশার জন্যে। অনেক গাছপালা এখানে। বাড়ির সামনে একটা পুকুর। তিন পাড়ে বাঁশঝাড়। ঘন কালো। দেখাচ্ছে এখন। পুকুরে শব্দ করে ঘাই মারছে কাতলা মাছ। বাঁশ বনে কর্কশ গলায় ডেকে উঠলো একটা পেঁচা। তার পর পরই শোনা গেল ঝাড়ের ওপাশের খেত। থেকে আসা শেয়ালের হুক্কা-হুয়া।

উঠানে নেমে নাড়ার আগুন জ্বাললো করিম। অগ্নিকুণ্ডের পাশে পিড়ি পেতে দিয়ে তিন গোয়েন্দাকে ডাকলো ওখানে গিয়ে বসতে।
গোল হয়ে বসলো সবাই।
বাঁশের ছোট টুকরিতে করে খেত থেকে তুলে নিয়ে আসা হয়েছে অনেক মটরশুটি। আগুনে সেগুলো পোড়াতে দিয়ে করিম বলল, বিকালে তুইল্লা আইন্না রাখছে আমার ভাই। পোড়াইয়া খাইতে খুব মজা লাগে।
মাথার ওপরে খোলা আকাশ। নিচে অন্ধকার নীরবতার মাঝে আগুনের পাশে গল্প চললো ওদের। কথায় কথায় করিম জানালো, চাঁদ উঠলে নাকি মুন্সী বাড়ির দীঘির পাড়ে শেয়ালের আসর বসে। শেয়ালদের রাজা থাকে, মন্ত্রী থাকে, বিচার আচার চলে অনেক রাত পর্যন্ত। জলসা হয়।
বিশ্বাস করলো না মুসা। মুচকি হাসলো।
রেগে গেল করিম। জেদ ধরে বললো, বিশ্বাস করলা না? দ্যাখতে চাও?
মাথা ঝাঁকালো মুসা।
ঠিক আছে। চান উঠুক। তারপর যামু।
অনেক রাতে বাঁশ বনের মাথা ছাড়িয়ে উঠে এলো হলদে চাঁদ। সেদিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়ালো করিম। পুরানো চাদরটা ভালোমতো গায়ে জড়াতে জড়াতে বললো, চল, সময় অইছে।
বাঁশঝাড়ের ভেতর দিয়ে গেছে পায়ে চলা পথ। সঙ্গে টর্চ এনেছে তিন গোয়েন্দা। করিমের সঙ্গে চলতে অসুবিধে হলো না। এ যেন এক রহস্যময় জগতে এসে পড়েছে ওরা। বাঁশ গাছের নিচে ঘন অন্ধকার যেন জমাট বেঁধে রয়েছে। জ্যোৎস্না ঢুকতে পারে না।
এমন কি টর্চের আলোয়ও কাটতে চায় না সে অন্ধকার। সামান্য বাতাস। লাগলেই সড়সড় করে বাঁশের পাতা, গাছের ফাঁক দিয়ে শিস কেটে বেরিয়ে যায়। বাতাস, যেন অশরীরী কোনো প্রেতাত্মার বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস। ধক করে ওঠে বুকের ভেতরটা। ছমছম করতে থাকে গা।
বাঁশবন থেকে বেরোতেই দেখা গেল ধবধবে সাদা মাঠ। ফসল কাটা শেষ। একটা ঘাস নেই কোথাও। সমস্ত খেত জুড়ে পড়ে রয়েছে মাটির ঢেলা। ঘোলাটে চাঁদের আলোয় দূর থেকে দেখলে মনে হয় দিগন্তজোড়া বিশাল এক সাদা চাদর বিছিয়ে দিয়েছে যেন কেউ। খেতের ওপর দিয়েই কোণাকুণি চলে গেছে পায়েচলা। পথ। সেই পথে নামলো ওরা। কয়েক পা এগোতে এগোতেই জুতোর ওপর মিহি ধুলোর আস্তরণ পড়লো।
বেশ কয়েকটা খেতের পর মুন্সী বাত্রি সীমানা। অনেক বড় এলাকা নিয়ে বাড়ি। বিরাট দীঘির পাড়ে ঘন বাঁশবন। উঁচু হয়ে আছে দীঘির পাড়। কাছে আসতে দেখা

গেল কালো কালো অনেক গর্ত।
এই গুলান শিয়ালের গর্ত, জানালো করিম। আমরা বসমু গিয়া দীঘির ঘাটলায়। চুপচাপ।
শান বাঁধানো ঘাট। সিঁড়ির ওপরে বেশ চওড়া একটা প্ল্যাটফর্ম মতে, তাতে বেশ সাজিয়ে তৈরি করা হয়েছে ইট-সিমেন্টের চেয়ার। পাকাঁপোক্ত ব্যবস্থা। সিঁড়ি যতদিন থাকবে এগুলোও থাকবে, নষ্ট হবে না।
সেই চেয়ারে এসে বসলো ওরা।
এইবার খালি বইয়া থাকো চুপ কইরা, করিম বললো।
কখন আসবে? মুসা জিজ্ঞেস করলা।
আইবো, সময় অইলেই।
সময় যায়। চুপ করে বসে আছে ওরা। ফিসফাস পর্যন্ত করছে না। কানের কাছে মশা পিনপিন করছে। চাপড় মারতে গিয়েও মারছে না। যদি আওয়াজ শুনে শেয়ালেরা আসা বন্ধ করে দেয়।
রাত বাড়ছে। মাথার ওপরে উঠে এসেছে চাঁদ। মস্ত বড়। ঘোলাটে ভাব দূর হয়ে গেছে অনেকখানি, হলদেটে রঙ কেটে গিয়ে সাদা হয়ে উঠেছে। পুকুরের পানির ওপর ধোয়ার মতো কুণ্ডলি পাকিয়ে উড়ছে কুয়াশা।
দূর, আসবে না, আর ধৈর্য রাখতে পারছে না মুসা।
আইবো, আইবো। দ্যাখো না খালি।
রবিন চুপ হয়ে আছে। কিশোরও। করিমের কথা বিশ্বাস করেছে। এতো জোর দিয়ে যখন বলছে, নিশ্চয় আসবে।
আরও কয়েক মিনিট কাটলো। হঠাৎ মুসার বাহু খামচে ধরলো করিম। হাত তুলে দেখালো ঢেলা-খেতের দিকে।
প্রথমে কিছু চোখে পড়লো না। তারপর তিনজনেই দেখলো, দীঘির পাড়ের দিক থেকে খেতের ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছে একটা জানোয়ার। কুকুরের মতো দেখতে। বেশ রাজকীয় ভঙ্গিতে হেলেদুলে ধীরেসুস্থে চলেছে। গিয়ে বসলো ওটা খেতের একটা আলের ওপর।
পাড়ের কাছ থেকে আরেকটা শেয়াল বেরোলো। বসলো গিয়ে প্রথমটার সামনে, মুখোমুখি, যেন আলাপ করতে বসেছে। তারপর যেন মাটি খুঁড়ে উদয় হতে লাগলো একের পর এক শেয়াল। কোনোটা একা, কোনোটা জোড়া বেঁধে, আবার কেউ কেউ বাচ্চা-কাচ্চা, পরিবার-পরিজন নিয়ে। দল বেঁধে এগোলো সবাই প্রথম। শেয়াল দুটোর দিকে।
আলে বসা প্রথম শেয়ালটার সামনে গোল হয়ে বসলো ওগুলো। যেন বিচারে বসেছে গাঁয়ের মোড়ল। তার সামনে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে জড়ো হয়েছে গ্রামবাসী।

দীঘির পাড়ের গর্তে বোধহয় আর একটা শেয়ালও রইলো না। সব গিয়ে। সামিল হয়েছে সভায়। চাঁদের দিকে মুখ তুলে লম্বা হাঁক ছাড়ল প্রথম শেয়ালটা। ওটাই নেতা, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ওটার ডাক মিলাতে না মিলাতেই হা-উ উ-উ-উ-উ করে ডেকে উঠলো আরেকটা। সুর মেলালো আরেকটা। তারপর আরও একটা। সমস্বরে চেঁচাতে শুরু করলো সবগুলো। মহা আনন্দে কেউ কেউ করে লাফালাফি শুরু করলো বাচ্চাগুলো।
সে এক বিচিত্র জারি গান। কেউ বলছে হাউ, কেউ বলছে হোউ, কেউ কা-হুঁয়া, কেউ বা আবার হুক্কা-হুঁয়া। দু-একটা আবার তার জের টানছে হুয়া হুয়া হুয়া হুয়া। বলে। থ হয়ে গেছে তিন গোয়েন্দা। বাস্তবে এ রকম কিছু ঘটতে পারে, তা-ও আবার নিজের চোখে দেখবে, কোনো দিন কল্পনাই করেনি ওরা।
আড়চোখে করিমের দিকে তাকালো মুসা।
মিটিমিটি হাসছে করিম।
শেয়ালের জারি গান একবিন্দু পছন্দ করতে পারেনি গায়ের কুকুরের দল। পাগল হয়ে গেল যেন ওগুলো। চারদিক থেকে ভেসে আসছে এখন ওগুলোর হাঁকডাক। পাত্তাই দিলো না শেয়ালের দল। আরও কয়েকবার ডেকে খেলা জুড়ে দিলো। তবে সবাই নয়, ছোটগুলো। বড়রা স্নেহের দৃষ্টিতে দেখতে লাগলো ওদের খেলা। সেই সঙ্গে চললো গুরু-গম্ভীর আলোচনা।
থেকে থেকে জারি গান শুরু করে শেয়ালেরা। শোনামাত্র খেপে উঠে। কুকুরগুলো। যেন ওগুলোকে খেপানোর জন্যেই এমন করে ওরা।
সভা ভাঙলো এক সময়।
আবার দীঘির পাড়ের গর্তের দিকে ফিরে চললো শেয়ালের দল।
খাইছে! বিড়বিড় করে শুধু একটা শব্দই উচ্চারণ করতে পারলো বিস্মিত মুসা।
আশ্চর্য! জোরে বললো না রবিন, যেন আমেজ কেটে যাওয়ার ভয়ে। কয়োট আর নেকড়ে এ রকম সভা করে শুনেছি। শেয়ালেরাও যে করে জানতাম না।
না করার কোনো কারণ নেই, কিশোর বললো। হাজার হলেও জাতভাই। শেয়ালের এ রকম জলসা বসানোর কথা চাচার কাছেও শুনেছি। চাঁদনী রাতে নাকি সুন্দর বনের হরিণেরাও জলসা বসায়, নাচে। বনের মধ্যে মধু জোগাড় করতে যায় যে সব মৌয়াল, তারা এসে এসব কিচ্ছা বলে।
বানিয়ে বলে? মুসার প্রশ্ন।
আগে সে রকমই মনে হয়েছে। কিন্তু এখন আর বলব না সে কথা। চোখের সামনেই যে কাণ্ডটা ঘটতে দেখলাম!
বড় করে হাই তুললো করিম। বিজয়ীর ভঙ্গিতে তাকালো মুসার দিকে। রাইত অনেক অইছে। লও, বাড়িত যাই।

.
আরেক সোমবার এলো অবশেষে। মাঝখানে কয়েকটা দিন। তবে মোটেও। একঘেয়ে লাগেনি তিন গোয়েন্দার। ফুড়ুৎ করে উড়ে চলে গেছে যেন। অনেক দেখেছে ওরা, অনেক ঘুরেছে। পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে দাওয়াত খেয়ে এসেছে। হই হট্টগোল আর আনন্দ করেছে। ইতিমধ্যে একদিন মামার সঙ্গে গিয়ে পাখি শিকার করে এসেছে। তবে সব কিছুর মাঝেও বারে বারে ঘুরে ফিরে মনে এসেছে। প্রশ্নগুলোকে কাঁচ ভাঙে? কি করে ভাঙে? কেন ভাঙে? ঈগলের সঙ্গে গাড়ির কাঁচ ভাঙার কি সম্পর্ক? কে চুরি করলো মুদ্রাটা?

সোমবার দুপুর বেলায়ই আরিফ সাহেবের বাড়িতে চলে এলো কচি। কিশোর বললো তাকে, আজই আরেকবার ভূত-থেকে-ভূতে চালান দিতে চাই।

আবার?

হ্যাঁ। কেন, ভুলে গেলে, আরেকবার চালান দেয়ার কথা ছিলো না? ভিনগ্রহের মানুষের খোঁজ চেয়ে?

এবার রবিন আর মুসাও অবাক। সমস্বরে বলে উঠলো, ভিনগ্রহের মানুষ!

তোমরাই তো বললে। টেন-স্পীড যে চালায় তাকে ভিনগ্রহের মানুষের মতো লাগে।

অনেক জায়গায় ফোন করলো কচি, তার বন্ধুদের। বলে দিলো কি করতে হবে। হুঁশিয়ার করে দিলো, যাতে লুকিয়ে থেকে নজর রাখে। সাইকেলওয়ালা যেন টের না পায়। জানিয়ে দিলো, কেউ খবর পেলে যেন ওদের বাড়িতে টেলিফোনে। রচিকে জানায়। বাড়িতে ফোন করে তার ছোট ভাই রচিকে বুঝিয়ে বললো, ভূতদের ফোন যদি আসে, যা যা বলে নোটবুকে লিখে রাখতে। আরিফ সাহেবের ফোন নম্বর দিয়ে বললো নয়টা পর্যন্ত ওই বাড়িতেই থাকবে। ইতিমধ্যে যদি ফোন। আসে, সঙ্গে সঙ্গে সে যেন জানায়।

সকাল সকাল রাতের খাবার খেয়ে নিলো সেদিন ওরা। তারপর বসার ঘরে এসে বসলো। ফোন আসার অপেক্ষা করছে। আটটা বাজলো। এলো না। গেল আরও পনেরো মিনিট সাড়ে আটটায় বেজে উঠলো ফোন। ছোঁ মেরে রিসিভার তুলে নিলো কচি। তার ভাইই ফোন করেছে। উত্তেজিত হয়ে বললো, সর্বনাশ। হয়েছে! একগাদা গাড়ির কাঁচ ভেঙেছে!

দাঁড়া দাঁড়া, কাগজ-কলম বের করি! কচি বললো। আস্তে আস্তে বল!

নোটবুকে লিখে রাখা তথ্য পড়লো ওপাশ থেকে রচি, ক্যাপ, চশমা, হেডফোন আর ব্যাকপ্যাক পরা একটা লোক সাইকেল চালিয়ে গেছে ধানমণ্ডির দশ নম্বর রাস্তা দিয়ে। এইমাত্র একটা গাড়ির কাঁচ ভাঙলো। সাইকেল চালককে কিছু করতে দেখা যায়নি।

মুখ বাঁকালো মুসা। তারমানে ও কিছু করেনি।
তাই তো মনে হয়, ঠোঁট কামড়ালো কিশোর। কিন্তু সে ছিলো ওখানে।
আট নম্বর রাস্তায় দেখা গেছে সাইকেল আরোহীকে, রচি বললো। কালো একটা টয়োটা প্রিন্টারের কাঁচ ভাঙা হয়েছে। লোকটা গাড়ির কাছে থামেনি।
থামেনি! কচির মুখে শুনে প্রায় চিৎকার করে উঠলো মুসা।
কিন্তু ও যাওয়ার সময়ই তো ভেঙেছে কাঁচ! রবিন বললো। সে না হলে আর কে?
ছয় নম্বর রাস্তায় আর একটা টয়োটার কাঁচ ভেঙেছে। সাইকেল আরোহীকে দেখা গেছে, ভাইয়ের কাছে শুনে বললো কচি। শার্টের ভেতর থেকে কিছু একটা বের করছিলো।
কী? আবার চেঁচিয়ে উঠলো মুসা।
দাঁড়াও দাঁড়াও, শুনি, হাত তুললো কচি। হ্যাঁ, রচি, বল।
জানা গেল, বারো নম্বর রাস্তায় গগলস পরা টেন-স্পীড সাইকেল আরোহীকে দেখা গেছে। ওই রাস্তায় কোনো গাড়ির কাঁচ ভাঙেনি। চোদ্দ নম্বর রাস্তায়ও সাইকেল আরোহীকে দেখা গেছে। একটা টয়োটা পাবলিকার কাঁচ ভাঙা হয়েছে। শার্টের ভেতর থেকে কিছু একটা বের করেছিলো সে।
কিন্তু কি রে করছিলো? প্রশ্ন করলো রবিন। গাড়ির কাঁচ ভাঙা যায় এমন কিছু?
ভাঙতে হলে হয় ভারি কিছু দিয়ে পিটাতে হবে, নয়তো ছুঁড়ে মারতে হবে, যুক্তি দেখালো মুসা। আর সে রকম কিছু করে থাকলে চোখে পড়তে বাধ্য। পড়লো না কেন?
রচি জানালো, ষোল নম্বর রাস্তায় দেখা গেছে সাইকেল আরোহীকে। একটা টয়োটা স্টারটেলের কাঁচ ভাঙা হয়েছে। মনে হলো গাড়ির দিকে কোনো কিছু নিশানা করছিল লোকটা। কিন্তু এতো দ্রুত সরে চলে গেল, যে ছেলেটা চোখ রেখেছিলো সে ঠিকমতো দেখতেই পারেনি। রাস্তার কয়েকটা পোস্টে আলোও ছিল না।
নিশানা করেছে, না? বিড় বিড় করে বললো মুসা। পকেট হাতড়াচ্ছে। হ্যাঁ, আছে এখনও। যত্ন করেই রেখেছিলো। দু-আঙুলে ধরে বের করে আনলো। জিনিসটা। চোখের সামনে এনে ভালোমতো দেখলো। চিৎকার করে উঠলো হঠাৎ। বুঝেছি! কিশোর, এয়ার গানের গুলি! গুলি করে গাড়ির কাঁচ ভাঙে! শক্তিশালী কোনো এয়ারগান!
রচির কথা শুনছে আর নোটবুকে লিখে চলছে কচি, আঠারো নম্বর রোডে দেখা। গেছে সাইকেল চালককে। সবুজ রঙের একটা টয়োটার কাঁচ ভেঙেছে। সাইকেল। আরোহীকে কিছু করতে দেখা যায়নি।
এটাই শেষ তথ্য। ভাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে ফোন রেখে দিলো কচি।

মুসার কথাটা ভেবে দেখলো কিশোর। বললো, তুমি ঠিকই আন্দাজ করেছে, সেকেণ্ড। শার্টের নিচে গানটা লুকিয়ে রাখে সে। এয়ার-পিস্তল। গাড়ির পাশ দিয়ে যাবার সময় একটানে বের করে গুলি করেই আবার লুকিয়ে ফেলে। মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের ব্যাপার। শব্দ হয় না তেমন। আর যা-ও বা হয় কাঁচ ভাঙার আওয়াজ সেটাকে ঢেকে দেয়, আলাদা করে বোঝা যায় না। অন্ধকারে দেখাও যায় না কিছু। কাঁচে লেগে চ্যাপ্টা হয়ে যায় গুলিটা। যদি জানা না থাকে কি খুঁজছে, তাহলে দেখলেও ওটা চোখে পড়বে না কারো।

এইবার পুলিশকে জানানো যায়! কচি বললো। আমার বাপ জানও এবার বিশ্বাস না করে পারবে না।

না, এখনও সময় হয়নি, কিশোর বললো। আগে হাতেনাতে ধরি ব্যাটাকে, তারপর।

কেন, এখন বললে... বাধা পেয়ে থেমে গেল মুসা। আবার বেজে উঠেছে টেলিফোন।

রিসিভার কানে লাগিয়েই চেঁচিয়ে উঠলো কচি, ধরে ফেলেছে! এই, আরেকবার বল রচি, কোন রাস্তায়!...সাতাশ নম্বর? ঠিক আছে তো? তিন গোয়েন্দার দিকে চেয়ে বললো সে, সাইকেলওয়ালাকে ধরে ফেলেছে পুলিশ! যাবে নাকি?

নিশ্চয় যাবো! বলে উঠলো রবিন।

মামা তো ঘরে নেই, কিশোর বললো উত্তেজিত কণ্ঠে। যাবো কিভাবে? এতো দূর যেতে...

গাড়ি নিয়ে যাবো, কচি বললো।

কার গাড়ি?

তোমার মামারটাই। ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে আমার মামীকে রাজি করাও।

প্রথমে রাজি হতে চাইলেন না মামী। পরে কিশোর যখন জোর দিয়ে বললো, বিশ মাইলের বেশি গাড়ির স্পীড ওঠাতে দেবে না কচিকে, তখন রাজি হলেন।

এ সময়ে রাস্তায় গাড়ির ভিড় তেমন নেই। খোলা হাইওয়ে। ইচ্ছে করলে উড়ে। যাওয়া যায়, কিন্তু কিশোরের চাপে ইচ্ছেটা দমন করতে বাধ্য হলো কচি। তবে বিশ মাইল গতিবেগে কিছুতেই সীমাবদ্ধ রাখতে পারছে না সে। তিরিশ-পঁয়তিরিশে উঠে যাচ্ছে।

সাতাশ নম্বর রোডের মোড়ে এসে দেখলো পুলিশ নেই। সারা রাস্তায় কোথাও পুলিশ দেখা গেল না। লোকজনকে জিজ্ঞেস করলো কচি, একটু আগে এখানে কাউকে কোনো কারণে ধরেছিলো কিনা। কোনো বাড়ির দারোয়ান, কোনো দোকানদার, কিংবা কোনো পথচারীকেউই বলতে পারলো না ওরকম কিছু

ঘটেছে এখানে। সবাই একবাক্যে বললো, সন্ধ্যার পর থেকে পুলিশই দেখেনি এই রাস্তায়। এমনকি টহলদার পুলিশও না।
আশ্চর্য! রবিন বললো।
ব্যাপারটা কি? মুসার প্রশ্ন। ঠকানো হয়েছে আমাদেরকে! গম্ভীর হয়ে বললো কচি। চালাকি! শেষ ফোনটা রচি করেনি। করেছে অন্য কেউ। আমাদেরকে ফাঁকি দেয়ার জন্যে। ইস, তখন বুঝলাম না! গলাটা অন্যরকম লাগছিলো সে জন্যেই!
কিন্তু কেন? নীরব পথের এমাথা-ওমাথা দেখছে গোয়েন্দা-সহকারী। যেখানে। পুলিশ আর মানুষে গিজগিজ করার কথা সেখানটা এখন পুরোপুরি নির্জন।
রসিকতা করেছে আমাদের সঙ্গে, কিশোর বললো।
কিংবা যাতে পুলিশকে খবর দিতে না পারি সে জন্যে। কে জানে, হয়তো এখনও এখানকারই কোনো পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে। কচি, দেখো তো রাস্তাগুলো ঘুরে।
আবাসিক এলাকার রাস্তাগুলো ধরে ধীরে ধীরে গাড়ি চালালো কচি। পথের পাশে কোনো গাড়ি দাঁড়ানো দেখলেই বকের মতো গলা বাড়িয়ে দেখার চেষ্টা করছে তিন গোয়েন্দা, সেটার কাঁচ ভাঙা কিনা।
ওই যে একটা! আচমকা চেঁচিয়ে উঠলো রবিন।
গাড়ি থামাও! সাথে সাথে বললো কিশোর।
ঘ্যাচ করে ব্রেক কষলো কচি। তারপর গাড়ি পিছিয়ে আনলো। একটা লাল টয়োটা করোলার কাঁচ ভাঙা। মালিক এখনও বোধহয় জানে না। পথের পাশে গাড়ি, রেখে গেছে, ফিরে এলে দেখবে। কিংবা হয়তো জানে। কিন্তু কি আর করবে? এখন তো কাঁচ বদলানো সম্ভব না। দিনের বেলা যা করার করবে।
তারমানে গাড়ির কাঁচ সত্যি সত্যি ভাঙা হয়েছে এই এলাকায়, আনমনে। বিড়বিড় করে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটলো কিশোর। সেটা মিথ্যে কথা নয়। ভূত থেকে-ভূতেরা সত্যি কথাই বলেছে। শুধু শেষ ভূতটা ছাড়া।
মানে? মুসার প্রশ্ন।
ওই যে, যে ভূতটা আমাদের বললো সাইকেলওয়ালাকে পুলিশে ধরেছে। হাত নাড়লো কিশোর, কচি, চলো বাড়ি চলো।

.
কাঁচগুলো ভাঙতে দেখলো, রবিন বললো, কিন্তু তাকে যেতে দেখলো না কেন কেউ?, সমস্ত শহরেই ভূত রয়েছে আমাদের। তাদের কারো চোখেই পড়লো না।
কেন আর? কাঁচ ভাঙার পর একেবারে উধাও! _ বাড়ি ফিরে বসার ঘরে আলোচনা হচ্ছে ওদের। আরিফ সাহেব এখন ফেরেননি।
গাড়িটা গ্যারেজে ঢুকিয়ে রেখে এলো কচি। রবিনের কথা শুনতে পেয়েছে। বললো, ঠিক, পালালো কোথায় ব্যাটা? এতোগুলো চোখকে এভাবে ফাঁকি দিলো।

কিভাবে?
দুটো উপায়ে সেটা করতে পারে, দুই আঙুল তুললো গোয়েন্দাপ্রধান। হয় সমস্ত কাপড়-চোপড় বদলে সাইকেলটা কোথাও ফেলে পালিয়েছে। নয়তো কোথাও একটা পিকআপ অপেক্ষা করছিলো তার জন্যে, সাইকেলসহ তুলে নিয়ে গেছে।
কেন এই সাবধানতা? মুসার জিজ্ঞাসা। ছেলেমেয়েরা যে তার ওপর চোখ। রেখেছে, টের পেয়েই কি পালালো?
আমার তা-ই ধারণা।
কিভাবে জানল? কচির প্রশ্ন।
তার ওপর যে চোখ রাখা হয়েছে, এটা বলে দেয়া হয়েছে তাকে। তাড়াতাড়ি কাঁচ ভাঙা বাদ দিয়ে পালিয়েছে যখন, এছাড়া আর কোন কারণ নেই।
কিন্তু সতর্ক করলো কি ভাবে? সন্দেহ যাচ্ছে না কচির।
কোনো ভূত হয়তো চেনে তাকে। বলে দিয়েছে, রবিন অনুমান করলো।
উঁহু, তা নয়, মাথা নাড়লো কিশোর। আস্তে আস্তে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে ন্টআসছে। অন্য কোনো ভাবে জেনেহে আমাদের কথা। যেভাবে সব সময় সে জেনে যায় কোন রাস্তায় পুলিশ যাচ্ছে তার ওপর নজর রাখার জন্যে। নিশ্চয় হুঁশিয়ার করা হয় তাকে, হেডফোনের মাধ্যমে।
তার কানে লাগানে হেডফোন?
সিবি রেডিও! বললো মুসা।
নাকি হ্যাম রেডিও! রবিন বললো।
যে রেডিওই হোক, সেটা পুলিশের ওয়্যারলেসে বলা কথা ধরতে পারে, বললো কিশোর। থানার সঙ্গে সর্বক্ষণ যোগাযোগ রাখে ডিউটিতে থাকা পুলিশ। অফিসার, রেডিওর মাধ্যমে। ওই ধরনের যন্ত্র আর কারও কাছে থাকলে তার পক্ষেও সেই কথা শোনা সম্ব। একই ওয়েভলেংথে টিউন করে রাখে সে রেডিও। পুলিশের কথাবার্তা সব শোনে। হুঁশিয়ার হয়ে যায়। যে রাস্তায় পুলিশ থাকে সেখানে আর কাঁচ ভাঙতে যায় না। আজ রাতেও রেডিওতেই কেউ তাকে সাহায্য করেছে।
কিন্তু কিশোর, প্রতিবাদ করলো, ভূত-থেকে-ভূতের খবর শুধু আমরা। চারজনই জানি।
ঠিক, একমত হয়ে বললো মুসা। আমাদের সঙ্গে রসিকতা যে করলো সে কিভাবে জানলে? আর কি করেই বা জানলো কোন নম্বরে ফোন করতে হবে। আমাদের?
চলো, বোধহয় দেখাতে পারবো, কিশোর বললো। টর্চ আর একটা মই দরকার। গ্যারেজে লম্বা মই আছে, দেখেছি।

মিনিট কয়েক পর দল বেঁধে চললো চারজনে। টর্চ হাতে কিশোর চলেছে আগে আগে। পেছনে মই বয়ে নিয়ে চলেছে মুসা আর কচি। রবিন সাহায্য করছে। তাদের। সেই টেলিফোনের থামটার কাছে এসে দাঁড়ালো ওরা, যেটা থেকে লাইন। এসেছে আরিফ সাহেবের বাড়িতে।
টেলিফোন বক্সটা থামের মথিার কাছে। সেটা দেখিয়ে মুসাকে নির্দেশ দিলো। কিশোর, যাও, মই লাগিয়ে ওখানে উঠে যাও।
কি করবো উঠে?
বাক্স খুলে দেখো কি আছে। জানাবে আমাদের।
টর্চের পেছনে লাগানো কর্ডটা হাতে ঢুকিয়ে কনুয়ের কাছে ঝুলিয়ে নিয়ে মই বেয়ে উঠে গেল মুসা। বাক্সের দরজা খুলে ভেতরে আলো ফেললো। শুধু তো তার... না না, দাঁড়াও আরেকটা জিনিস আছে!
কী? জিজ্ঞেস করলো কিশোর।
আরো ভালো করে দেখলো মুসা। চিনতে পারছি না। চারকোণা খুব ছোট একটা বাক্সের মতো জিনিস। ধাতুর না প্ল্যাস্টিকের বোঝা যায় না। দুটো তার বেরিয়ে গেছে। বোধহয় টেলিফোনের তারের সঙ্গে জোড়া দেয়া হয়েছে। খুলে আনবো?
না। নেমে এসো।
মাটিতে নেমে আবার ওপরের বাক্সটার দিকে তাকিয়ে বললো মুসা, ওয়্যারট্যাপ, না? চৌধুরী আংকেলের লাইনের সঙ্গে লাগিয়ে দিয়ে আমাদের। কথাবার্তা শুনেছে। এভাবেই জেনেছে ব্যাটা ভূত-থেকে-ভূতের কথা।
মাথা ঝাঁকালো কিশোর। এটাই একমাত্র জবাব।
বাক্সটার দিকে রবিনও তাকিয়ে রয়েছে। কিন্তু শোনে কোত্থেকে? বাক্স থেকে তো আর কোনো তার বেরিয়ে যায়নি। মানে, স্বাভাবিক তারগুলো ছাড়া আর কিছু?
নিশ্চয় কোনো ধরনের রিমোট লিসেনিং ডিভাইস। রেডিওর মতো তার ছাড়াই সঙ্কেত পাঠায়। যে এই কাজ করেছে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আধুনিক ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি সম্পর্কে তার অসাধারণ জ্ঞান।
তারমানে আমাদের ওপর সর্বক্ষণ নজর রেখে চলেছে সে, ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেললো রবিন।
রবিনের কথার মানে বুঝতে পারলো মুসা। তার দিকে তাকিয়ে গুঙিয়ে উঠলো।
মইটা নিয়ে আবার ফিরে চললো ওরা।
গ্যারেজে মই রেখে আবার ঘরে এসে বসলো ওরা। আরিফ সাহেব তখনও ফেরেননি। মামী রান্না তৈরীতে ব্যস্ত।
কিশোর বললো, সেদিন যে মামী একটা লোককে খাম্বায় উঠতে দেখেছিলো, আমার ধারণা ওই লোকই যন্ত্রটা লাগিয়েছে ফোন বক্সে।

কে সে? মুসার প্রশ্ন। আমাদের ওপর নজর রাখে কেন? কি চায়? কাঁ
কাচ ভাঙুরার অ্যাসিসট্যান্ট হতে পারে, কচি বললো।
ঠোঁট কামড়ালো কিশোর। তা পারে।
আসল ব্যাপারটা কি বলো তো? রবিন বললো, এতো আঁটঘাট বেঁধে এভাবে গাড়ির কাঁচ ভাঙার কি মানে? এয়ার পিস্তল, ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি, পুলিশ ব্যাণ্ড রেডিও, ওয়্যারট্যাপ...নাহ্, এতো সব জিনিসপত্র নিয়ে শুধু শুধু মজা করার। জন্যে কাঁচ ভাঙছে না!
ঠিক, আঙুল নাচালো মুসা। অন্য কোনো কারণ আছে। লাভজনক কিছু। নইলে এতো সব করতে যেতো না।
লাভজনক কাজই তো করে, কচি বললো। গাড়িতে অনেক সময় দামী জিনিস রেখে যায় লোকে। উইশীল্ড ভেঙে সেগুলো চুরি করে চোরটা। ওই যে। ঈগলটা যেমন করলো। অনেক দামী জিনিস। ওই একটা বিক্রি করলেই সারা জীবন। খেতে পারবে।
এদেশে ওই ঈগল বিক্রি করতে পারবে কিনা যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কিশোরের দিকে তাকালো রবিন। কিশোর, তুমি কি বলো?
বলে আর কি হবে? এই কেস খতম।
হাঁ হয়ে গেল অন্য তিনজন। নীরবে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ গোয়েন্দাপ্রধানের দিকে।
হ্যাঁ, এই কেস শেষ, আবার বললো কিশোর। লোকটাকে হারিয়েছি আমরা।
চুপ করেই রইলো তিন শ্রোতা।
আমরা এখন জানি টেন-স্পীডওলাই কাঁচ ভাঙে, কিশোর বললো। কিন্তু সে কে, জানি না। ওর নাম জানি না, পরিচয় জানি না, ওর সম্পর্কে কিছুই জানি না। অন্ধকারে তার চেহারাও দেখতে পারিনি ভালোমতো। সে জেনে গেছে, তার পরিচয় ফাস হওয়ার পথে, ফলে ডুব দেবে এখন। আর হয়তো গাড়ির কাঁচ ভাঙবে না। যদি না ভাঙে ধরবো কিভাবে?
হতাশায় গুঙিয়ে উঠলো মুসা। তাই তো! জানি ওই ব্যাটাই শয়তান, কিন্তু ধরতে পারছি না!
হ্যাঁ, মাথা ঝাঁকালো কিশোর। রহস্যের সমাধান আমরা করেছি। কিন্তু অপরাধীকে ধরতে পারলাম না।
চুপ করে ভাবতে লাগলো চারজনে।
ঘড়ির দিকে তাকালো মুসা, আর বসে থেকে কি লাভ? চলো, শুতে যাই।
হ্যাঁ,তাই চলো, আফসোস করে বললো রবিন। এই কেস এখানেই শেষ। গাড়ির কাঁচও আর ভাঙবে না, লোকটাকেও ধরতে পারবো না।

তোমাদের তো কিছু হবে না, ক্ষতিটা হলো আমার, বিষণ্ন কণ্ঠে বললো। কচি। চেহারা দেখে মনে হলো কেঁদে ফেলতো, লজ্জায় পারছে না। মস্ত ক্ষতি। আব্বাকে কিছুতেই বোঝাতে পারবো না, আমার সঙ্গে শত্রুতা করে নয়, চুরি করার জন্যে গাড়ির কাঁচ ভাঙে একটা চোর! ড্রাইভিং লাইসেন্স করাটাই সার হলো আমার! গাড়ি আর চালাতে পারবো না!
বিদায় নিয়ে বাস ধরতে চললো কচি।

.
পরদিন সকালে নাস্তার টেবিলে বসে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো এনায়েত। উল্লাহ। চোখে অবিশ্বাস। বললো, বলিস কি? এয়ার পিস্তল দিয়ে কাঁচ ভাঙে?
হ্যাঁ, আব্বা, তাই। কাল রাতে সেটা প্রমাণ করে দিয়েছে কিশোর। ভূত থেকে-ভূতের সাহায্যে কিভাবে সাইকেলওয়ালার কাঁচ ভাঙার খবর জেনেছে সব কথা বাবাকে খুলে বললো কচি।
ভূত-থেকে-ভূতে! নামটা ভালোই দিয়েছে। আইডিয়াটাও চমৎকার! বুদ্ধি। আছে ছেলেটার, হাসলো এনায়েত উল্লাহ। তা পুলিশের কাছে মুখ খুলেছে। চোরটা?
পুলিশকে বলা হয়নি এখনও।
বলা হয়নি? ভ্রুকুটি করলো এনায়েত উল্লাহ। কেন? তোরা নিজেরাই ধরার চেষ্টা করবি নাকি?
না।
তাহলে?
লোকটা কে তা-ই জানি না আমরা এখনও, আরেক দিকে তাকিয়ে বললো কচি। ওর নাম জানি না, কোথায় থাকে জানি না, বিদঘুঁটে টুপি আর গগলস পরে থাকে বলে চেহারাও দেখতে পারিনি।
জানিসই না লোকটা কে? ভুরু কোঁচকালো এনায়েত উল্লাহ।
না, ধরতে পারলে তবে তো জানবো। তার আগেই পালালো। তবে…তবে, আমার মনে হয় কিশোর যেভাবেই হোক বের করে ফেলবে..পারবে ও! পারবেই!
হু, কচির মতো এতোটা আশা করতে পারলো না এনায়েত উল্লাহ। আবার খাওয়ায় মন দিলো। দেখ, পারে যদি ভালো। তবে যতোক্ষণ আমাকে প্রমাণ দেখাতে না পারছিস, গাড়ির চাবি আমি তোক দিচ্ছি না।
মুখ কালো করে নাস্তা শেষ করলো কচি। তারপর রওনা হলো কিশোরদের ওখানে। সারারাত অনেক ভেবেছে সে। লোকটাকে ধরার মতো কোনো উপায় বের করতে পারেনি। আশা করছে তিন গোয়েন্দার মাথা থেকে কোনো বুদ্ধি বেরোবে।

গেট দিয়ে ঢুকেই দেখলো কচি, বাগানে রোদ পোহাচ্ছে রবিন আর মুসা। এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কিশোর কই?
সেটা তো আমাদেরও প্রশ্ন, মুসা বললো।
বাড়িতে নেই, রবিন জানালো। ঘুম থেকে উঠেই দেখলাম নেই। আন্টিকে জিজ্ঞেস করলাম। বাইরে যাচ্ছে বলে নাকি বেরিয়ে গেছে কিশোর। কোথায় যাবে বলে যায়নি। তারপর থেকে এই বসেই আছি।
একটা চেয়ারে বসলো কচি। সাইকেলওয়ালাকে পাকড়াও করার কোন উপায় করতে পেরেছো? কোন বুদ্ধি-টুদ্ধি?
নিরাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো দুই সহকারী গোয়েন্দা।
আধ ঘণ্টা পেরিয়ে গেল। তবু কিশোর ফিরলো না।
আরও পাঁচ মিনিট পর দেখা গেল তাকে। ঢুকছে গেট দিয়ে।
কিশোওর! চিৎকার করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো মুসা।
কোথায় গিয়েছিলে? রবিন বললো। সারাটা সকাল তোমার জন্যে বসে– আছি।
হাসলো কিশোর। আসলে ঠিকমতো আলোচনা করতে পারলে কাল রাতেই সমস্যার সমাধান করে ফেলা যেতো। মাঝরাতে হঠাৎ খিদেয় ঘুম ভেঙে গেল। রাতে কম খেয়েছিলাম। তুমি আর মুসা জিজ্ঞেস করেছিলে না, গাড়ির কাঁচ কেন ভাঙে সাইকেলওয়ালা?
কেন! প্রায় একই সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো অন্য তিনজন।
সেটাই আলোচনা করবো এখন, হাসলো গোয়েন্দাপ্রধান। এখন আমাদের বুঝতে হবে কেন উইশীল্ড ভাঙে। আর তাহলেই জেনে যাবো লোকটা কে।
নীরবে বসে রইলো তিন শ্রোতা। একে অন্যের মুখের দিকে তাকাচ্ছে। তারপর তাকালো কিশোরের মুখের দিকে।
আমি কিছুই বুঝতে পারবো না, সাফ জানিয়ে দিলো রবিন।
কচি বললো, না হয় কারণটা জানা গেলই, তাতে লোকটাকে চিনবো কিভাবে? যে কেউ এ কাজ করে থাকতে পারে।
জানা যাবে, দৃঢ়কণ্ঠে বললো কিশোর। গাড়ির কাঁচ কেন ভাঙে জানতে পারলে এটাও বুঝে যাবো কোন জায়গায় তাকে খুঁজতে হবে।
কি যে বলো কিছুই বুঝতে পারি না, অনুযোগের সুরে বললো মুসা। ঠিক আছে, তোমার কথাই সই। মেনে নিলাম, উইশীল্ড কেন ভাঙে বুঝতে পারলেই সমস্যার সমাধান হবে। এখন বলো, কেন ভাঙে? গাড়ির কাঁচ পছন্দ করে না বলে?
নাকি সে গাড়িই পছন্দ করে না? হিংসা? কেন লোকে চালাবে, আমি পারবো না, ওরকম কিছু? রবিনের প্রশ্ন। সে জন্যেই গাড়ির ক্ষতি করে?

না, মাথা নাড়লো কিশোর, ওসব নয়। তাহলে গাড়ির শুধু একটা বিশেষ কাঁচই ভাঙতো না। সব ভেঙে দিতো। কিংবা গাড়ির অন্য ক্ষতিও করতো। কিন্তু তা না করে যেন প্ল্যান করে খুব সাবধানে একটা করে কচি ভাঙে। এমন একটা ভাব করে রাখতে চায়, যাতে লোকে মনে করে ব্যাপারটা নিছকই দুর্ঘটনা।
পাগল হতে পারে, মুসা বললো, সেয়ানা পাগল। কাঁচ ভাঙতে ভালোবাসে, আবার ধরাও পড়তে চায় না।
পাগলের অতো সূক্ষ্ম বুদ্ধি হবে না, কিশোর মানতে পারলো না মুসার কথা। হ্যাঁ, বড়লোকের ওপর অনেকের রাগ থাকে, তাদের ক্ষতি করতে পারলে খুশি হয়। আর রেগে গিয়ে মানুষ যখন কোন কাজ করে বুদ্ধি তখন ঘোলা হয়ে যায়। বোকামি। কিংবা ভুল করে বসে। ওরকম কারো কাজ হলে এতোদিনে ধরা পড়ে যেতো।
হ্যাঁ, তা ঠিক, একমত হলো কচি।
আসলে এই লোকটা পাগল-টাগল কিছু না, কিশোর বললো। খুব বুদ্ধিমান। কাঁচও ভাঙছে, আবার অত্যন্ত চালাকির সঙ্গে লুকিয়ে রাখছে নিজেকে।
তাহলে হয়তো প্রতিশোধ, রবিন বললো। কি বলো?
কার ওপর?
গাড়ি কোম্পানির ওপর।
সেটা আমেরিকায় কিংবা জাপানে হতে পারে, যেখানে গাড়ি তৈরি হয়। কোম্পানিতে কোম্পানিতে রেষারেষি থাকলে, প্রতিযোগিতা থাকলে সেটা ভাবা। যেভো, যদিও গাড়ি কোম্পানির মতো বড় বড় প্রতিষ্ঠান এতো বাজে কাজ করবে না। আর বাংলাদেশে যেখানে গাড়ি তৈরিরই কোন কোম্পানি নেই, সেখানে। এসবের প্রশ্নই ওঠে না।
তাহলে ওই কথাই ঠিক। গাড়ির মালিকদের ওপরই লোকটার রাগ।
অনেক গাড়ির কাঁচ ভাঙা হয়েছে, নথি, কিশোর বললো। এতোগুলো মানুষের ওপর রাগ কিংবা ঘৃণা কোনটাই থাকতে পারে না একজনের।
তাহলে পাগলই, মুসা বললো।
কিন্তু পাগলের মতো আচরণ তো করছে না, প্রতিবাদ করলো কচি।
তাহলে আমি ফেল, দুহাত নাড়তে নাড়তে বলল মুসা। হাল ছেড়ে দিয়ে বলল, কেন ভাঙে শয়তানটাই জানে!
কিশোর, সামনে ঝুঁকলো রবিন, ঈগলের ব্যাপারটা এর মধ্যে আনছি না। কেন? এমনও তো হতে পারে সমস্ত সূত্র লুকিয়ে আছে ওটার মাঝেই? অন্য সব গাড়ির কাঁচ ভাঙা তার কাছে একটা বাহানা মাত্র। আসলে ভাঙতে চেয়েছে ওই একটা গাড়িরই কাঁচ, যেটাতে মুদ্রা ছিলো। আর মুদ্রা চুরির ব্যাপারটাকে ধামাচাপা

দেয়ার জন্যে, মানে, পুলিশের চোখ অন্য দিকে সরানোর জন্যেই এতোগুলো গাড়ির কাঁচ ভেঙেছে।
চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা দোলালো কিশোর। তোমার কথায় যে যুক্তি একেবারেই নেই তা নয়। তবে সেক্ষেত্রে কাঁচ ভেঙে আরও জিনিস চুরি করতো, যাতে সবাই মনে করে কাঁচ ভাঙাই হয় চুরি করার জন্যে। সাধারণ চুরির মধ্যেই পড়ে গেছে মুদ্রা চুরির ব্যাপারটাও। তাই না?
তাহলে… আবার ভাবতে আরম্ভ করেছে মুসী। কথা শেষ করলো না।
আর কি কারণ হতে পারে? মুসার কথাটাই যেন শেষ করলো কচি।
আমিও আর কিছু ভেবে পাচ্ছি না, মাথা নাড়লো রবিন।
ভাবলে আরও অনেক সম্ভাবনা বেরিয়ে আসতে পারে, কিশোর বললো। তবে মুসার কাল রাতের একটা কথা আমার কাছে খুব মূল্যবান মনে হয়েছে।
আমি বলেছি! মুসা অবাক। কাল রাতে?
হ্যাঁ, বলেছো। তুমি বলেছো, গাড়ির কাঁচ ভেঙে কার কি লাভ?
চোখ মিটমিট করতে লাগলো অন্য তিনজন।
লাভ? ভুরু কুঁচকে বললো কচি। গাড়ির কাঁচ ভেঙে লাভ?
বুঝেছি! তুড়ি বাজিয়ে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো মুসা। তারপর বসে পড়লো। আবার ধীরে ধীরে। ঠিক, লাভ! তাদের লাভ, যারা গাড়ির জানালার কাঁচ বানায়, কিংবা সাপ্লাই দেয়!
ঠিক, ঠিক! রবিনও উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশে নিশ্চয় ওরকম কাঁচ তৈরির কোন কোম্পানি নেই। বাকি রইলো যারা সাপ্লাই দেয়। বিদেশ থেকে আমদানী করে। আর নিশ্চয় ওই-কাঁচ আমদানী কোন একটা প্রতিষ্ঠানই করে থাকে। একচেটিয়া ব্যবসা।
ঠিক এই কথাটাই আমি বলতে চাইছি, নথি, হাসিমুখে বললো কিশোর। যারা কাঁচ আমদানী করে। গাড়ির কাঁচ ক্রমাগত ভাঙতে থাকলে তাদেরই লাভ। কারণ কাঁচ ছাড়া গাড়ি চালানো সন্ত্র নয়। বাধ্য হয়েই নতুন আরেকটা লাগাতে হবে মালিককে। আরও একটা ব্যাপার কি লক্ষ করেছো? শুধু টয়োটা গাড়িরই কাঁচ ভাঙে। তারমানে শুধু টয়োটার কাঁচই আমদানী করে তারা।
তেমন প্রতিষ্ঠান আছে এদেশে? কচির প্রশ্ন। খোঁজ লাগাতে হয়।
নিশ্চয় আছে। সকালে সেটা খুঁজতেই বেরিয়েছিলাম, কিশোর বললো। কয়েকটা মেকানিক শপে খোঁজ নিয়েছি। সবাই একটা নামই বললো। গাড়ির ওই কাঁচ একটা কোম্পানিই আমদানী করে। মডার্ন গ্লাস কোম্পানি।
.

লাল রঙা একটা পাকা বাড়ি। একতলা। পেছনে আরও তিনটে বাড়ি, পাকা দেয়াল, ওপরে টিনের চাল। এক সীমানার মধ্যেই বাড়িগুলো, কাঁটাতারের ছয় ফুট উঁচু বেড়া দিয়ে ঘেরা। এই হলো মডার্ন গ্লাস কোম্পানি। জায়গাটা শহরের বাইরে, খিলক্ষেত এলাকায়। উত্তরা এবং গুলশানের মাঝামাঝি, দুটো জায়গা থেকেই বেশি দূরে নয়। সামনের দিকে মূল গেট ছাড়াও ডেলিভারি ট্রাক আর কর্মচারীদের ঢোকার জন্যে আরেকটা গেট আছে একপাশে। সামনের বিল্ডিংটায় অফিস আর শো রুম। পেছনের টিনের চালাওয়ালাটা গুদাম। লাল বাড়িটার পাশে বেশ ছড়ানো একটা চত্বর রয়েছে। ওখানে গিয়ে ট্রাক কিংবা অন্য গাড়ি দাঁড়ায়, মাল বোঝাই করার জন্যে। গাড়ি পার্ক করার জায়গাটা এখন অর্ধেক খালি।

কোম্পানির মালিকই কি কাঁচ ভাঙে? প্রশ্ন করলো রবিন।

ঠিক নেই, জবাব দিলো কিশোর। তবে সে সম্ভাবনাও কম।

পাশে ছোট একটা মার্কেট তৈরি হচ্ছে। ওটার হাতে দাঁড়িয়ে কাঁচ কোম্পানির ওপর নজর রেখেছে তিন গোয়েন্দা আর কচি।

সেলসম্যানের কাজও হতে পারে, নিচের চত্বরের দিকে তাকিয়ে বল না কিশোর। যতো বেশি কাঁচ বিক্রি করবে ততো বেশি কমিশন পাবে। কমিশনের লোভেই হয়তো ভাঙে। কিংবা নতুন সেলসম্যান রাখা হয়েছে। মালিককে খুশি করার জন্যে সে এই কাজ করে বা করায়। অন্য কোন কর্মচারীর কাজও হতে পারে। একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক কাঁচ বিক্রি না হলে চাকরি খোয়ানোর ভয় আছে। হয়তো তার।

সেটা জানবো কিভাবে? কচি বললো। চেহারাই তো দেখিনি।

চেহারা না দেখলেও শরীর দেখেছি। লম্বা, পাতলা, সম্ভবত কম বয়েসী। বয়স্ক লোকেরা সাধারণত ওরকম টেন-স্পীড সাইকেল চালায় না।

তাকিয়েই রয়েছে ছেলেরা। প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে নিচের কাজকর্ম দেখছে। মূল। বাড়িটার মুখ রাস্তার দিকে নয়, ডানের পার্কিং লটের দিকে। বয়ে আরেকটা আছে, সেটাতে শুধু ট্রাক কিংবা ভ্যানগাড়ি ঢোকে, মাল বোঝাইয়ের জন্যে। আর ঢোকে খুচরা খরিদ্দার। নানা রকম গাড়ি আসছে যাচ্ছে সেখানে-পিকআপ, ভ্যান, কার। সব টয়োটা। এবং সবগুলোর কাঁচ ভাঙা।

দেখে তো মনে হয় পাইকারী বিক্রি করে এরা, মুসা বললো কিছুটা অবাক হয়েই। তাহলে ওই গাড়িগুলো আসছে কেন এতো বেশি?

শুধু পাইকারী বিক্রিতে বোধহয় চলছিলো না আর, জবাবটা দিলো কচি। খুচরাও শুরু করেছে।

মূল বাড়িটার সামনের দিকের দেয়াল প্রায় পুরোটাই কাঁচের। ভেতরে অফিস। ডেস্ক, চেয়ার, ফাইলিং কেবিনেট দেখেই বোঝা যায়। গুদাম থেকে বড় বড় চ্যাপ্টা

বাক্স এনে তোলা হচ্ছে বায়ের চত্বরে দাঁড়িয়ে থাকা একটা ট্রাকে। ওটার পাশে দাঁড়িয়ে আছে আরেকটা ট্রাক, মাল বোঝাই। সেটা থেকে মাল খালাস করে নিয়ে গিয়ে ভরা হচ্ছে গুদামে। দু-তিনজন লোক অফিস থেকে কিছুক্ষণ পর পরই বেরিয়ে। এসে গুদামে ঢুকছে, বাদামী কাগজে মোড়া চ্যাপ্টা চ্যাপ্টা প্যাকেট বয়ে নিয়ে আবার চলে যাচ্ছে অফিসে। বুঝতে অসুবিধে হয় না প্যাকেটগুলোতে রয়েছে কাঁচ। গাড়ি নিয়ে যারা আসছে তাদের অনেকেই কিনে নিয়ে যাচ্ছে ওই কাঁচ।

কাউকেই কিন্তু সাইকেলওয়ালার মতো লাগছে না, কর্মচারীদের কথা বললো কচি।

না, একমত হলো কিশোর। ওই লোকটা নিশ্চয় অফিসে কাজ করে। কোনো কেবিনে বসে রয়েছে, কিংবা গুদামের ভেতর। গুদাম-কর্মচারীও হতে পারে। আর সেলসম্যান হলে তো অফিসে থাকবে না। নিশ্চয় বেরিয়ে গেছে দোকানে দোকানে খোঁজ নিতে, কার কি মাল লাগবে।

মাল নামানো হয়ে গেলে বেরিয়ে গেল ট্রাক। যেটাতে বোঝাই হচ্ছিলো, সেটা রইলো, মাল তোলা এখনও শেষ হয়নি।

কি করবো, কিশোর? রবিন জিজ্ঞেস করলো। এভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু দেখবোই?

না, খালি হওয়ার অপেক্ষা করছি, জবাব দিলো কিশোর। ট্রাকগুলো চলে গেলেই গুদামের সামনেটা খালি হয়ে যাবে। মাল খালাস কিংবা বোঝাইয়ের কাজ না থাকলে গুদামের ভেতরেও লোক থাকবে বলে মনে হয় না। তখন কচিকে নিয়ে আমি যাবো অফিসের দিকে। কথা বলার চেষ্টা করবো কর্মচারীদের সঙ্গে। শশী। রুমের জিনিস দেখার ভান করবো। এই সুযোগে তুমি আর মুসা গিয়ে গুদামে ঢুকবে। সূত্র খুঁজবে।

কি সূত্র? মুসা জিজ্ঞেস করলো।

সাইকেলওয়ালাকে ধরা যায় এরকম কিছু?

আর তোমরা কি জিজ্ঞেস করবে?

আমি না, জিজ্ঞেস করাবো কচিকে দিয়ে। ওর ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে। তাছাড়া ওদের গাড়ির কাঁচ ভেঙেছে চার চারবার। কাঁচের কথাই জিজ্ঞেস করবে। ও দামদর জানবে।

ঠিক আছে, বললো রবিন।

আরও আধ ঘণ্টা কাজ চললো গুদামের সামনের চত্বরে। তারপর বেরিয়ে গেল ট্রাক। চর খালি হয়ে গেল।

সময় হয়েছে, কিশোর বললো অবশেষে। মুসা, রবিন, মনে রাখবে খুব বাজে একটা লোককে নিয়ে কারবার করছি আমরা। বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে যে কোন সময়। সাইকেলওয়ালা এখানে আছে এরকম কোন চিহ্ন দেখলে গুদামের সামনের দরজা কিংবা জানালায় চকের দাগ দিয়ে রাখবে। আশ্চর্যবোধক চিহ্ন। আমি আর কচি সঙ্গে সঙ্গে তখন বাড়ি চলে যাবো। মামাকে বলে পুলিশ নিয়ে ফিরে আসবো।

ছাতের ওপর থেকে নেমে এলো ওরা। অর্ধেক হয়ে বন্ধ হয়ে আছে মার্কেট তৈরির কাজ। বোধহয় টাকা-পয়সার অভাবেই। লোকজন কেউ নেই। ছাতে। উঠতে তেমন বাধার সম্মুখীন হতে হয়নি। নামতেও জবাবদিহি করতে হলো না।

গ্লাস কোম্পানির পাশের দরজাটাও খোলা, সামনেরটাও। এদিক ওদিক তাকিয়ে চট করে ঢুকে পড়লো মুসা আর রবিন। গুদামের দিকে এগোলো।

কচিকে নিয়ে কিশোর ঢুকলো শো রুমে। চারজন খরিদ্দার দাঁড়িয়ে আছে। তাদের সঙ্গে কথা বলছে তিনজন সেলসম্যান। কাউন্টারের ওপাশে বিরাট ব্রিট তাক নানা রকম কাঁচে বোঝাই। কিছু কাঁচ আছে নকশা করা, কিছু নকশা ছাড়া। সাদা কাঁচ আছে, রঙিন কাঁচ আছে। এসবই বাড়ি-ঘরের জানালার শার্সিতে লাগানো হয়। খরিদ্দাররা দেখে, পছন্দ করে, অর্ডার দেয়।

বাঁয়ের কাঁচের দেয়ালের ওপাশে আরেকটা ঘর। অফিস। একজন মহিলা আর দুজন পুরুষ কর্মচারীকে দেখা যাচ্ছে।

খরিদ্দারদের পেছনে দাঁড়িয়ে সেলসম্যানদের দেখছে কিশোর। তাদের একজন। মোটাসোটা বয়স্ক মানুষ। আরেকজন লম্বা, পাতলা, তরুণ। চোখে চোখে কথা হয়ে গেল কচি আর কিশোরের। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে সামান্য মাথা ঝাঁকালো। ওরা।

কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে এখন কথা বলছে দুজন খরিদ্দার।

এই সুযোগে চারপাশে চোখ বোলাতে লাগলো কিশোর। কাঁচের দেয়ালের ওপাশের মহিলা তরুণী। যথেষ্ট লম্বা, প্রায় পুরুষের সমান, পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি। পুরুষদের একজন লম্বা, মাঝবয়েসী। কোণের দিকে কাঁচে ঘেরা একটা খুপরিমতো ঘরে বসে আছে। একা। খুপরির কাঁচের দেয়ালে লেখা রয়েছে।

শরাফত আহমেদ

ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

তারমানে ওই লোকটাই এই কোম্পানির মালিক। বেশ বড় একটা ডেস্কের ওপাশে বসে আছে লম্বা আরেকজন মানুষ। বয়েস প্রৌঢ়ত্বের কোঠা ছাড়িয়ে গেছে। ডেস্কে তার পদবী লেখা প্ল্যাস্টিকের বোর্ড দাঁড়িয়ে রয়েছেঃ

জেনারেল ম্যানেজার।

কিশোর! কানের কাছে ফিসফিস করে উঠলো কচির কণ্ঠ।
ঝট করে ফিরে তাকালো কিশোর। সেলসম্যানদের একজন, সেই তরুণ লোকটা হেঁটে যাচ্ছে পাশের দরজার দিকে। গুদামে যাওয়ার চত্বরে বেরোনোর পথ। ওটা।

.

কিশোরদেরকে ভেতরে ঢুকে যেতে দেখলো মুসা আর রবিন। চত্বরে অপেক্ষা করলো আর মিনিট দুয়েক। কাউকে আসতে না দেখে দ্রুতপায়ে এগোলো গুদামের দিকে। নির্জন। কেউ নেই। মূল বাড়িটার পেছনে গুদামের দিকে মুখ করে রয়েছে। একটিমাত্র জানালা। দরজা আছে। সব বন্ধ।
আরেকবার এদিক ওদিক তাকিয়ে চট করে গুদামে ঢুকে পড়লো দুজনে।
ভেতরে অলৌ কম। জানালা নেই। দরজা দিয়ে যা আসছে তাতে ভেতরের অন্ধকার কাটছে না। ফলে সারাক্ষণ বৈদ্যুতিক আলো জ্বেলে রাখতে হচ্ছে। সারি। সারি তাক, ওগুলোতে নানা রকমের প্যাকেট আর বাক্স। মেঝেতে একটার ওপর আরেকটা সাজিয়ে স্কুপ করে রাখা হয়েছে ছোট-বড় কাঠের বাক্স। বাদামী কাগজে মোড়া অনেক কাঁচ,দেখা গেল একটা তাকে। কান পেতে রইলো কিছুক্ষণ দুজনে। নিশ্চিত হয়ে নিলো ভেতরে ওরা ছাড়া আর কেউ নেই।
লম্বা শেলফগুলোর মধ্যে দিয়ে রয়েছে চলাচলের জন্যে সরু গলিপথ। সে পথে এগোলো ওরা। তাকের মধ্যে ফাঁক দেখলেই উঁকি দেয়, মাথা নিচু করে তাকায় শেলফের নিচের ফাঁকে। সাইকেলওয়ালার ব্যবহৃত জিনিসের চিহ্ন খুঁজছে।
কিছুই পাওয়া গেল না।
গুদামের শেষ প্রান্তে পার্টিশন দিয়ে ছোট একটা অফিস করা হয়েছে। তবে সেটা বোধহয় এখন আর অফিস হিসেবে ব্যবহৃত হয় না। কারণ ওটার ভেতরেও বাক্স বোঝাই করে রাখা হয়েছে। অফিসের জিনিসপত্র রাখার একমাত্র কাঠের আলমারিটা এখন খালি। ব্যবসা বোধহয় খারাপ যাচ্ছে, লোক ছাটাই করতে বাধ্য হয়েছে মালিক।
আবার গুদামের সামনের দিকে চলে এলো ওরী। ভেতরে আরও খুঁজে দেখার ইচ্ছে আছে। তবে তার আগে দেখে নিশ্চিন্ত হতে চায় যে কেউ আসছে না। আগের মতোই নির্জন চত্বর। সামনের গেট দিয়ে গাড়ি আসা-যাওয়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে। কিন্তু কোন গাড়িই পাশের গেট দিয়ে ঢুকছে না।
কেউ নেই... বলতে গিয়েই থেমে গেল মুসা।
কি হলো! তার পাশে এসে দাঁড়ালো রবিন।
দুজনেই দেখতে পাচ্ছে, খুলে যাচ্ছে মূল বিল্ডিং থেকে চত্বরে বেরোনোর দরজা।

.

তিন লাফে কাউন্টারের শেষ মাথায় চলে এলো কিশোর। ওদিকেই চত্বরে বেরোনোর দরজাটা। হাত নেড়ে ডেকে বললো, এই যে ভাই, শোনেন। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি। আমার কথাটা খুব জরুরী।
আসছি, দরজা ঠেলে খুলতে খুলতে বললো লোকটা। বেশি দেরি হবে না।
এমনিতেই অনেক দেরি হয়ে গেছে, রেগে যাওয়ার ভান করলে কিশোর। কথা বলছেন তো বলছেনই। আমাদের কি চোখে পড়ে না? মালিক কে আপনাদের? তার সঙ্গে কথা বলবো।
দরজার হাতলে হাত রেখেই থমকে গেল সেলসম্যান। দ্বিধা করছে। এ রকম করে যখন কথা বলছে নিশ্চয় হোমড়া চোমড়া কারও ছেলে।
মালিক কে? কড়া গলায় আবার জিজ্ঞেস করলো কিশোর। হাত তুলে কাঁচের অফিসে একলা বসা মানুষটাকে দেখিয়ে বললো, উনি?...এই কচি, এসো, বাবার কথা গিয়ে বলি। বলবো, আমাদেরকে পাত্তাই দেয়নি আপনাদের সেলসম্যান।
চলো, কিশোরের অভিনয় দেখে মনে মনে অবাক না হয়ে পারলো না কচি।
যা বোঝার বুঝে গেল সেলসম্যান। এই ছেলেকে বেশি ঘাটানো উচিত হবে না। চাকরি চলে যেতে পারে তাহলে। দরজার হাতল ছেড়ে দিয়ে কাউন্টারের কাছে ফিলে এলো সে। জিজ্ঞেস করলো, কি চাই?
একটা রোলস রয়েসের কাঁচ, গম্ভীর মুখে বললো কিশোর। ভেতরে ভেতরে পেট ফেটে যাচ্ছে হাসিতে।
রোলস রয়েস! বিস্ময়ে ভুরু উঁচু হয়ে গেল সেলসম্যানের। এতো দামী গাড়ির কাঁচ পাবো কোথায়?
সেটা আমি কি জানি? বাবা বলে পাঠালো নিয়ে যেতে, নিতে এলাম।
কোন মডেলের? মড়েল জানলে বলতে পারবো। টয়োটার কোন কাঁচ ওটায় লাগে কিনা দেখা যেতে পারে।
ঊনিশশো সাইতিরিশ মডেলের সিলভার ক্লাউড, আমেরিকায় যে গাড়িটাতে চড়ে ওরা, হ্যাঁনসন চালায়, সেটার কথা বলে দিলো কিশোর।
মরা মাছের মতো হাঁ হয়ে গেল সেলসম্যানের মুখ। ঢোঁক গিললো। ফ্যাকাশে মুখে রক্ত ফিরতে সময় লাগলো। তারপর ধীরে ধীরে মাথা নাড়লো, নামই শুনিনি। কখনও, দেখা দূরে থাক। গাড়িটা কি নিয়ে এসেছো?
আপনি করে বলুন, ঝাঝালো কণ্ঠে বললো কিশোর। তুমি শুনতে ভালো লাগে না আমার।...না, গাড়ি আনিনি।
তাহলে দয়া করে যদি ড্রাইভারকে দিয়ে পাঠিয়ে দাও..মানে, দেন, তাহলে চেষ্টা করে দেখতে পারি টয়োটার কাঁচ ফিট করে কিনা।
.

দরজা খুলতে দেখে বরফের মতো জমে গেছে রবিন ও মুসা। ওদের মনে হলো। অনন্ত কাল ধরে দাঁড়িয়ে আছে ওরা খেলা চত্বরে রোদের মাঝে, আর খুলেই চলেছে দরজাটা। এই খোলার যেন আর শেষ নেই।
তারপর ধীরে ধীরে আবার বন্ধ হয়ে গেল।
হাউফ! করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো মুসা।
এসো, তাড়া দিলে রবিন। জলদি ঢুকে পড়ি ওটায়। দুই নম্বর গুদামটা। দেখালো সে।
প্রায় দৌড়ে এসে দ্বিতীয় গুদামে ঢুকলো ওরা। এটার ভেতরটাও প্রথমটারই মতো অন্ধকার। আলো জ্বেলে রাখতে হয় সর্বক্ষণ। সারি সারিতাক। তবে তাকগুলোর বেশির ভাগই খালি।
প্রথম ঘরটার মতোই এটাতেও খুঁজতে শুরু করলো ওরা। এখানেও কিছু পেলো। না। আরেকবার এসে উঁকি দিলো দরজায়। কাউকে দেখা গেল না। মূল বাড়ি থেকে বেরোলো না কেউ। চত্বরে বেরিয়ে একছুটে এসে ঢুকলো তৃতীয় এবং সব চেয়ে– ছোট গুদামটায়। অন্য দুটোর মতোই এটাতেও আলো কম। কিছু মালপত্র রয়েছে কয়েকটা তাকে। ঘরের মাঝখানে একটা বড় টেবিল। তার ওপর কাঁচ কাটার যন্ত্রপাতি। পাশে কয়েকটা লম্বা লম্বা টুলও রয়েছে। কাজ হয় ওগুলোতে।
বায়ের শেলফগুলো ধরে পেছনে এগোলো রবিন। মুসা এগোলো ডান পাশ দিয়ে। চোখে লাগার মতো কিছুই দেখতে পেলো না। এই গুদামের পেছনেও পার্টিশন দেয়া একটা ছোট অফিস রয়েছে। জিনিসপত্রে ঠাসা।
রবিন! চেঁচিয়ে উঠলো মুসা।
অফিসের পেছনের দেয়াল ঘেঁষে কয়েকটা বাক্সের ওপর তেরপল টেনে দেয়া। ছিলো। সেটা সরাতেই বেরিয়ে পড়েছে একটা টেন-স্পীড বাইসাইকেল। দেয়াল। ঘেঁষে দাঁড় করানো।
এইটাই? রবিন এলে আবার বললো মুসা।
কি জানি! দ্বিধা করলো রবিন। অন্ধকারে দেখেছি। রঙ-টঙ তো দেখিনি। তবে এ রকম সাইকেলও এ শহরে দেখিনি আর। এটাই হবে।
সীটটা কিন্তু বেশ উঁচু। লম্বা মানুষের মাপে বসানো।
আরও ভাল করে দেখার জন্যে এগোতে গেল মুসা। হাতের ধাক্কায় উল্টে পড়ে গেল ওপরের একটা বাক্স।
রবিন আর মুসা দুজনেই আশঙ্কা করেছিলো ঝনঝন করে কাঁচ ভাঙবে। কিন্তু তেমন আওয়াজ হলো না। তবে কি কাঁচ নেই ভেতরে?
বাক্সটা সোজা করে বসিয়ে ডালা তুলে দেখলো মুসা। তারপরেই অস্ফুট শব্দ করে উঠলো। কি আছে দেখার জন্যে রবিনও এসে উঁকি দিলো ভেতরে।

পাওয়া গেল একটা ক্যাপ, চশমা, ব্যাকপ্যাক, তার ভেতরে রেডিও, হেডফোন, হলদে রঙের একটা স্পোর্টসম্যানদের জামা, কালো পায়জামা, আর সাইকেল চালানোর উপযোগী একজোড়া কেডস জুতো।

.

সেলসম্যানকে ওদিকে ব্যস্ত রেখেছে কিশোর, বেশ, ধরুন, এখানকার কোন কাঁচ ফিট করলো না। আনিয়ে তো দিতে পারবেন?

তা-ও জানি না, জবাব দিলো লোকটা। তবে চেষ্টা করে দেখতে পারি। অনেক সময় লাগবে। যে মডেলের কথা বলছেন, সিঙ্গাপুরেও পাওয়া যাবে কিনা। যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ফ্যাক্টরিতে অর্ডার দিয়ে বানিয়ে আনতে হবে। প্রচুর দাম। পড়ে যাবে তাতে।

পড়লে পড়বে, তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে হাত নাড়লো কিশোর। ভাঙা কাঁচ না বদলে তো আর গাড়ি চালানো যায় না।

তা বটে, স্বীকার করলো সেলসম্যান। মুখ দেখেই আন্দাজ করা গেল মনে মনে বলছে, ব্যাটা তোদের টাকা তোরা পানিতে ঢালবি, তাতে আমার কি?।

গুড, লোকটার কথায় খুব যেন সন্তুষ্ট হয়েছে কিশোর, এমন ভঙ্গি করলো। তারপর বললো, আরেকটা গাড়ির কাঁচ লাগবে। ক্যাডিলাক। উনিশশো সাতান্ন…

কিশোর! ডেকে উঠলো জানালায় দাঁড়ানো কচি। উত্তেজনায় শক্ত হয়ে

কী? বিরক্ত ভঙ্গিতে চোখমুখ কুঁচকে ফেললো কিশোর। তারপর যেন নেহায়েত অনিচ্ছার সঙ্গেই এগিয়ে গেল। ধমকের সুরে বললো, কথা বলছি যে দেখো না?

কচির পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। কি দেখে ডাকা হয়েছে তাকে, দেখিয়ে দেয়ার প্রয়োজন হলো না। কচির মতো সে-ও দেখলো, ছোট গুদামটার জানালায় বড় করে চকে আঁকা আশ্চর্যবোধক।

আহ, জ্বালিয়ে মারলো! বিরক্ত স্বরে বললো সে। সময় অসময় বোঝে না!

সেলসম্যানকে পুরোপুরি অন্ধকারে আর বিস্মিত করে রেখে কচিকে নিয়ে বেরিয়ে এলো কিশোর।

বাইরে বেরিয়ে আর হাসি চাপতে পারলো না।

কচিও হাসতে হাসতে হাত নেড়ে বললো, যা গুল মারতে পারো না তুমি! রোলস রয়েস, ক্যাডিলাক…এমন করে বলছিলে, আমারই বিশ্বাস করে ফেলতে ইচ্ছে করছিলো। সেলসম্যানের আর কি দোষ? কিশোরের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হেসে রসিকতার সুরে জিজ্ঞেস করলো, তা এদেশে তোমার কোটিপতি বাবাটি কে হে?

হেফাজত আলি পাটোয়ারি, হেসেই জবাব দিলো কিশোর। নাম শোনোনি? আগে কাগজ ফেরি করে বেচতো, এখন করে সোনার ব্যবসা, গোল্ড স্মাগলার। শুনতে

খুব ভালো লাগে, না? কি গালভরা নাম। মানুষকে বলেও শান্তি। প্রচুর টাকা আছে আব্বা হুজুরের। আর আছে কয়েক ডজন পোষা সন্ত্রাসী। কেউ কিছু বললেই ঠিচু, বলে পিস্তলের ট্রিগার টেপার ভঙ্গি করলো সে। সে জন্যেই তো কাউকে কেয়ার করি না। মুখের ওপর যা খুশি বলে দিই।...নাও, চলো এখন, পুলিশকে খবর দিতে হবে।

.

গুদামের জানালার নিচে ঘাপটি মেরে বসে আছে রবিন আর মুসা। ওরা যে জিনিস। পেয়েছে সেটা বোঝানোর জন্যে জানালায় চিহ্ন আঁকার পর পেরিয়ে গেছে দশটি মিনিট।

আধ ঘণ্টার বেশি লাগবে না, হিসেব করে বললো রবিন। বাসে কিংবা বেবিতে করে বাড়ি যাওয়া, মামাকে দিয়ে থানায় টেলিফোন করানো, তারপর থানা। থেকে পুলিশ নিয়ে আসা...ওই আধ ঘণ্টাই যথেষ্ট।

ওকে যদি আমরা ধরতে পারতাম ভালো হতো, মুসা আফসোস করলো।

হয়তো হতো। তবে তার জন্যে দুঃখ করার কিছু নেই। রহস্যের কিনারা তো। আমরাই করলাম। ধরার চেষ্টা হয়তো এখনও করা যায়, কিন্তু উচিত হবে না। ব্যাটার কাছে পিস্তল-টিস্তল থাকতে পারে। এয়ার পিস্তল তো আছেই।

কিন্তু তার পরেও... বলতে গিয়ে থেমে গেল মুসা।

পাশের গেট দিয়ে ঢুকলো একটা নীল রঙের গাড়ি। তীব্র গতিতে চত্বরে ঢুকে অতো জোরে ব্রেক কষলো, কর্কশ আর্তনাদ করে উঠলো টায়ার। গাড়ি থেকে নেমে গটগট করে এগোলো এক তরুণ।

মুসা, দেখো দেখো! ফিসফিসিয়ে বললো রবিন।

লম্বা, পাতলা শরীর। চেহারা ফ্যাকাশে, যেন রক্তশূন্যতায় ভুগছে। লম্বা লম্বা চুল নেমে এসেছে ঘাড়ের ওপর। গায়ে নীল স্পোর্টস জ্যাকেট। খাড়া পাতলা ঠোঁট। চঞ্চল চোখের তারা, যেন সার্বক্ষণিক দ্বিধায় অস্থির। ধূসর প্যান্ট পরনে, পায়ে কালো চকচকে জুতো। মূল বাড়িটার দিকে এগোচ্ছে। কেমন একটা কর্তৃত্বময় ভঙ্গি, যেন কোম্পানিটার মালিক সে-ই।

সাইকেলওয়ালার সঙ্গে পুরোপুরি মিলে যাচ্ছে, নিচু গলায় বললো রবিন।

বাড়িটায় গিয়ে ঢুকলো সে।

ঘড়ি দেখলো মুসা। গাড়ির নম্বরটা নিয়ে রাখা দরকার। পুলিশ আসার আগেই চলে যেতে পারে।

নোটবুকে নম্বর লিখছে মুসা, এই সময় ঝটকা দিয়ে খুলে গেল চত্বরে বেরোনোর দরজা, প্রায় ছুটে বেরিয়ে এলো লম্বা লোকটা। দ্রুতপায়ে চত্বর পেরিয়ে এগোলে মূসা আর রবিন যে গুদামটায় লুকিয়ে আছে সেটার দিকে।

আরি, এদিকেই তা আসছে! আঁতকে উঠলো রবিন।
লুকানোর জায়গা খুঁজতে শুরু করলো দুজনেই।
জলদি! মুসা বললো, শেলফের নিচে!
দরজার কাছেই একটা বড় বাক্সের পেছনে শেলফের নিচে কিছুটা খালি জায়গা পাওয়া গেল লুকানোর মতো। হামাগুড়ি দিয়ে কোনোমতে তার মধ্যে গিয়ে ঢুকলো দুজনে।
এতো জোরে দরজা খুললো তরুণ, দড়াম করে গিয়ে পাল্লাটা বাড়ি খেলো দেয়ালের সঙ্গে। কোনো দিকে না তাকিয়ে দুটো শেলফের মাঝখান দিয়ে পেছন–দিকে প্রায় দৌড়ে গেল সে। ওর জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলার শব্দও কানে আসছে গোয়েন্দাদের। আবার যখন বেরিয়ে এলো, মাথায় ক্যাপ পরা, বিচিত্র। চশমাটা ঝুলছে গলায়, সাইকেল চালানোর কাপড়গুলো ঢোকানো ব্যাকপ্যাকে। ব্যাগটা ঝুলছে সাইকেলের হ্যান্ডেলবারে।
সমস্ত প্রমাণ নিয়ে যাচ্ছে! হিসিয়ে উঠলো মুসা। নষ্ট করে ফেললে গেল! আর প্রমাণ করা যাবে না সে-ই কাঁচ ভাঙতো!
থামানো তো যাবে না! যা খুশি করে বসতে পারে!
কিন্তু ততক্ষণে বেরোতে শুরু করে দিয়েছে মুসা। একবার দ্বিধা করে রবিনও তাকে অনুসরণ করলো।
জিনিসগুলো গাড়িতে তুলছে ব্যাটা! আরেকবার হিসিয়ে উঠলো মুসা।
গাড়ির পেছনের বুটে সাইকেলটা ঢোকানোর চেষ্টা করছে ও।
আমার কাছে তো মোটেও ভয়ঙ্কর লাগছে না লোকটাকে, মুসা বললো। অতো ভয় পাচ্ছি কেন? রবিন প্রতিবাদ করার আগেই লাফিয়ে উঠে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল সে।
তাকে দেখেই সাইকেলটা ফেলে দিলো লোকটা। তাড়াতাড়ি গিয়ে উঠে বসলো গাড়িতে। ছুটতে শুরু করলো মুসা।
ফিরে তাকালো আবার লোকটা। জানালা দিয়ে বেরিয়ে এসেছে ডান হাত। হাতে ধরা বিকট চেহারার একটা পিস্তল।
মুসার দিকে তাক করেছে!
মডার্ন গ্লাস কোম্পানি! ভুরু কুঁচকে বললেন আরিফ সাহেব। অসম্ভব! কিশোর, ওটার মালিককে আমি ভালো করেই চিনি। ভদ্রলোক।
কিন্তু আমাদের কাছে প্রমাণ আছে, জোর গলায় বললো কিশোর। মুসা আর রবিন দেখতে পেয়েছে।
ভুল করছিস না তো?
না।

এক মুহূর্ত গম্ভীর হয়ে রইলেন আরিফ সাহেব। চুপচাপ ভাবলেন। তারপর হাত বাড়ালেন ফোনের দিকে।
তিনি যতোক্ষণ থানার সঙ্গে কথা বললেন, ততক্ষণ অস্থির হয়ে পায়চারি করলো কিশোর। সোফায় বসে উসখুস করছে উত্তেজিত কচি। ঘড়ি দেখছে বার বার। শেষে আর থাকতে না পেরে বলেই ফেললো, কিশোর, ওরা কোনো বিপদে পড়বে না তো?
এসব কাজে সব সময়ই বিপদ থাকে, ভারি গলায় জবাব দিলো কিশোর। বিশেষ করে যখন কোনো প্রমাণ আটকাতে যাও তুমি। আর সেই সাথে যুক্ত থাকে লাখ লাখ টাকার ব্যাপার।
এই সময় রিসিভার রেখে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন আরিফ সাহেব। বললেন, ও রেডি। চলো, থানায় যাবো। আমরা গেলেই ওরা রওনা হবে।
তুমি শিওর তো, কিশোর? কাঁচ কোম্পানির দিকে যেতে যেতে জিজ্ঞেস করলেন সার্জেন্ট। কোম্পানির কোনো লোকেরই কাজ এসব?
এছাড়া আর কি? শান্তকণ্ঠে বললো কিশোর। ভালোমতো ভাবলে। আপনারাও আমার সঙ্গে একমত হবেন। ওরাই একমাত্র কোম্পানি, যারা টয়োটা গাড়ির কাঁচ আমদানী করে। কাঁচ ভাঙলে নতুন কাঁচ লাগাতেই হবে, নইলে গাড়ি চালানো যায় না। যতো বেশি কাঁচ বিক্রি করতে পারবে ততো বেশি লাভ কোম্পানির।
শরাফত সাহেব্বে মতো ভদ্রলোক এরকম কাজ করবেন, আমার বিশ্বাস হয় না।
হয়তো তিনি জানেনই না যে এসব ঘটছে। আর হয়তো বলছি কেন, সত্যি তিনি জানেন না। ব্যাপারটা ফাস হয়ে গেল কেলেঙ্কারি হবে, তাঁর ব্যবসা নষ্ট হয়ে যাবে। গাড়ির কাঁচ কিছু বেশি বিক্রি হলে লাভ হবে বটে, কিন্তু যেটুকু হবে, জানাজানি হয়ে গেলে ক্ষতি হবে তার চেয়ে বেশি। সামান্য ওই লাভের জন্যে তিনি পুরো ব্যবসার ওপর ঝুঁকি নেবেন না।
ঠিকই বলেছিস তুই, কিশোর, আরিফ সাহেব বললেন। জীপে পুলিশের গাড়িতে না বসে আরিফ সাহেরে গাড়িতেই বসেছেন ওসি সাহেব। জীপে অন্যান্য পুলিশদের সঙ্গে রয়েছেন সার্জেন্ট আবদুল আজিজ। রেডিওতে ওসির সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন তিনি।
মডার্ন গ্লাস কোম্পানির কাছে চলে এলো ওরা। কিশোর বললো, পাশের দরজাটা দেখছি খোলাই আছে।
মাথা ঝাঁকালেন ওসি। রেডিওতে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলেন সার্জেন্টকে। গ্লাস কোম্পানির পাশের গেটের দিকে ঘুরলো পুলিশের জীপ, এই সময় শাঁ করে বেরিয়ে এলো একটা নীল রঙের টয়োটা। পুলিশ দেখে যেন চমকে গেল। বেসামাল হয়ে গেল ক্ষণিকের জন্যে, ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষলো ড্রাইভার। তারপর

শাঁই শাই স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে টায়ারের তীক্ষ্ণ আর্তনাদ তুলে, অনেকখানি রবার ক্ষয় করে না ঘুরিয়ে ফেললো অন্যদিকে।
গেট দিয়ে ছুটে বেরিয়ে এলো রবিন। পুলিশের গাড়ি দেখেই বুঝে গেল যা বোঝার। পাগলের মতো চিৎকার করে দুই হাত শূন্যে তুলে নাড়তে শুরু করলো। নীল গাড়িটা দেখিয়ে চিৎকার করে বলতে লাগলো, মুসাকে ধরে নিয়ে গেছে! মুসাকে ধরে নিয়ে গেছে!
রেডিওতে চিৎকার করে উঠলেন ওসি, ধরো,ধরো, গাড়িটাকে থামাও!
নীল টয়োটার পেছনে ছুটলো পুলিশের জীপ। যেদিকে গেছে গাড়িটা, সে পথটা শেষ হয়ে গেছে খানিক দূর গিয়েই। তারপরে জলা। একপাশে ফসলের খেত। মাঝে মাঝে নতুন মাটি ফেলা হয়েছে বাড়ি তোলার জন্যে। উঁচু হয়ে আছে ভিটেগুলো।
জলার ধারে গিয়ে থেমে গেল গাড়ি। ভেতর থেকে কামানের গোলার মতো ছিটকে বেরোলো নীল জ্যাকেট পরা এক তরুণ। ভয়ার্ত চোখে একবার পুলিশের গাড়ির দিকে তাকিয়েই লাফ দিয়ে গিয়ে নামলো খেতের মধ্যে। এঁকেবেঁকে দিলো দৌড়।
ধরো! ধরো! চেঁচিয়ে আদেশ দিলেন ওসি।
কিন্তু জীপ থামিয়ে পুলিশ নামার আগেই নীল গাড়িটা থেকে ছিটকে বেরোলে। আরেকজন। তাড়া করলো লোটাকে। মুসা আমান। নিয়মিত ব্যায়াম করা শরীর তার, তাছাড়া দৌড়াতে পারে খুব। লাফিয়ে ছুটলে খেতের ওপর দিয়ে। দ্রুত দূরত্ব। কমে আসছে দুজনের মাঝে। দৌড়ানোর অভ্যাস বোধহয় খুব একটা নেই তরুণের, তাছাড়া পায়ে রয়েছে চামড়ার জুতো। চষা-খেতের ওপর দিয়ে ছুটতে গিয়ে। কয়েকবার হোঁচট খেয়ে পড়তে পড়তে সামলে নিলো।
লোকটার কয়েক ফুট পেছনে থাকতেই মাথা নিচু করে ডাইভ দিলো মুসা। তার বিখ্যাত ফ্লাইং ট্যাক। কায়দাটার একটা গালভরা বাংলা নাম দিয়েছে কিশোরঃ উড়ুক্কু মানব বর্শা।
পিঠে যেন মুগুরের বাড়ি পড়লে তারুণের। মুসার ভীষণ শক্ত খুলির প্রচণ্ড আঘাতে হাত-পা ছড়িয়ে হুমড়ি খেয়ে থেতের ওপর পড়ে গেল সে। পরমুহূর্তেই হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে বসলো আবার। কিন্তু দাঁড়াতে পারলো না। তার এক পা আঁকড়ে ধরেছে মুসা।
গায়ের জোরে ঝাড়া দিয়ে পা-টা ছাড়িয়ে নিতে না নিতেই আরেক পা ধরে। ফেললো মুসা। হ্যাঁচকা টানে চিৎ করে ফেলে দিলো তাকে। লোকটা আবার উঠে বসার আগেই পৌঁছে গেল পুলিশ। ঘিরে ফেললো।
মাটির ওপরই পা ছড়িয়ে বসে জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছে মুসা। ঝকঝকে সাদা দাঁত বের করে হাসলো সার্জেন্ট আজিজের ওপর চোখ পড়তে। হাত তুলে

তরুণকে দেখিয়ে বললো, এই যে নিন আপনার কাঁচ ভাঙুরে।
দুদিক থেকে দুহাত চেপে ধরেছে পুলিশ। ঝাড়াঝুঁড়া দিয়ে ছাড়া পাওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিলো তরুণ। খেঁকিয়ে উঠলো, মিথ্যে কথা! আমি কিচ্ছু জানি না। আমাকে কেন ধরেছে! কিছুই করিনি আমি এই ব্যাটাই চুরি করতে। ঢুকেছিলো আমাদের গুদামে!।
হাসি মুছলো না মুসার মুখ থেকে। উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললো, ওর গাড়িতে গিয়ে দেখুন। তাহলেই বুঝতে পারবেন।
গালাগাল শুরু করলো তরুণ। তাকে জীপের দিকে টেনে নিয়ে চললো পুলিশ। ওখানে নীল টয়োটার পাশে দাঁড়িয়ে আছে রবিন।
গাড়ির মধ্যে পাওয়া গেল ক্যাপ, চশমা, ব্যাকপ্যাক, তার ভেতরে রেডিও আর হেডফোন। সাইকেল চালানোর পোশাকগুলোও রয়েছে ব্যাগে। কিশোরের অনুমান। ঠিক, চশমাটা ফীল্ড গ্লাসই, চোখে লাগালে রাতের অন্ধকারেও সব দেখা যায়।
ওরা ইচ্ছে করে এগুলো আমার গাড়িতে ভরে রেখেছে। চেঁচিয়ে উঠলো তরুণ। আমাকে ফাসানোর জন্যে!
জিনিসগুলো যে আপনার, প্রমাণ করা যাবে সেটা, শান্তকণ্ঠে বললো কিশোর। আপনার কোম্পানির লোকই সাক্ষী দেবে আশা করি। সাইকেলটা পড়ে আছে চত্বরে। সেটা আপনার, অফিসের সবাই জানে। ওটাতে, সিরিয়াল নম্বর রয়েছে। কোন দোকান থেকে কিনেছেন, সহজেই বের করা যাবে।
ওসবের দরকারই নেই আসলে, মুসা বললো। বড় প্রমাণটা রয়েছে ওর গাড়ির সামনের সীটের নিচে। ঢুকিয়ে রাখতে দেখেছি। এয়ার-পিস্তলটা। আঙুলের ছাপও পাওয়া যাবে তাতে।
চুপ হয়ে গেল তরুণ।
সীটের নিচ থেকে সাবধানে রুমালে চেপে ধরে পিস্তলটা ব্রে করে আনলেন ওসি। মোটা খাটো নল। নলের নিচে আরেকটা নলের মতো পাইপ। ওটায় চাপ দিয়ে ভেতরের স্প্রিংটাকে ভাঁজ করা যায়। ইস্পাতে তৈরি নীলচে চকচকে অস্ত্রটার ওজন বড়জোর দুই পাউণ্ড। খোদাই করে লেখা রয়েছে কোম্পানির নাম ও দি ওয়েবলি প্রিমিয়ার। তার নিচে অপেক্ষাকৃত ছোট অক্ষরে লেখা, মেড ইন ইংল্যাণ্ড।
হু, পয়েন্ট টু-টু ক্যালিবার, দেখতে দেখতে বললেন আরিফ মামা। এই জিনিস একটা ছিলো আমার। সাংঘাতিক শক্তি স্প্রিঙের। কাছে থেকে গুলি করলে গাড়ির কাঁচ সহজেই গুঁড়িয়ে দেয়া যায়।

তাঁর সঙ্গে একমত হয়ে মাথা ঝাঁকালেন ওসি সাহেব। তরুণকে দেখিয়ে পুলিশদের নির্দেশ দিলেন, নিয়ে এসো ওকে। শরাফত আহমেদের সঙ্গে কথা বলবো।
হাঁটতে হাঁটতে জানালো রবিন আর মুসা, কিভাবে গুদামের মধ্যে তরুণের ব্যবহার করা জিনিসগুলো খুঁজে পেয়েছে। কি করে সেগুলো নিয়ে পালানোর চেষ্টাটা করেছিল সে। মুসা বাধা দিতে গেলে কিভাবে তাকে পিস্তল দেখিয়ে গাড়িতে তুলে নিয়েছে।
পালাচ্ছে দেখে খেপে গিয়েছিলাম, কৈফিয়তের সুরে বললো মুসা। আসলে ওকে দেখে একটুও বিপজ্জনক লোক মনে হয়নি আমার। বরং মনে হচ্ছিলো খুব ভীতু। ধরার জন্যে বেরোলাম। এয়ার পিস্তল দেখিয়ে ঠেকালো আমাকে। গাড়িতে উঠতে বাধ্য করলো। চিনতে পেরেছি তখনি, ওটা এয়ার পিস্তল। জানি, ক্লোজ রেঞ্জে আসল পিস্তলের চেয়ে কম ভয়ঙ্কর নয়। হৃৎপিণ্ড বরাবর গুলি চালিয়ে সহজেই মানুষ মেরে ফেলা যাবে। কি আর করবো, উঠে বসলাম। গেট দিয়ে বেরিয়েই আপনাদের দেখে মাথা খারাপ হয়ে গেল ওর। দিলো আরেক দিকে টান।
হই চই, পুলিশের বাঁশি, সবই শুনতে পেয়েছে গ্লাস কোম্পানির লোকেরা। পাশের গেটের বাইরে বেরিয়ে জটলা করছে। পুলিশের সঙ্গে তরুণকে দেখে ভুরু কুঁচকে গেল কয়েকজনের। ওরা সবাই অফিসের কর্মচারী। একজন ফিরে দৌড় দিলো অফিসের দিকে।
চত্বরে ঢুকলো পুলিশ। এই সময় অফিসের কাঁচের দরজা ঠেলে বেরিয়ে এলেন মাঝবয়েসী মানুষটা। এঁকেই কাঁচে ঘেরা ছোট অফিসে একলা বসে থাকতে দেখে কিশোর আর কচি। নাকমুখ কুঁচকে ভারি গলায় জানতে চাইলেন, কি হয়েছে?
আপনি? পাল্টা প্রশ্ন করলেন।
আমি শরাফত আহমেদ। এই কোম্পানির মালিক।
ও। একে চেনেন?
চিনবো না কেন? আমার ছেলে, রনটু। কি করেছে ও?
টেন-স্পীডটা ঠেলে নিয়ে এসেছে একজন কনস্টেবল। সেটা দেখিয়ে আবার জিজ্ঞেস করলেন ওসি, এই সাইকেলটা কি আপনার ছেলের? আর এই ক্যাপ, চশমা...
আব্বা, বলো না, বলো না, কিছু বলো না! চেঁচিয়ে বাধা দিলো রনটু।
ছেলের দিকে অবাক হয়ে এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন শরাফত আহমেদ। তারপর ওসির দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালেন, হ্যাঁ, ওরই। কেন? ব্যাপারটা কি? কি করেছে ও?
বাবার দিকে নীরবে তাকিয়ে রইলো ছেলে। তার মুখের দিকে চেয়ে কি বুঝলেন শরাফত সাহেব, কে জানে। হাত নেড়ে সবাইকে ডাকলেন, ভেতরে আসুন। বসে

কথা বলি।
শরাফত সাহেব, আরিফ সাহেব বললেন, শুনলে দুঃখ পাবেন। আপনার ছেলে যে কাজ করেছে... এয়ার পিস্তল দিয়ে কিভাবে একের পর এক গাড়ির কাঁচ ভেঙেছে খুলে বললেন তিনি।
গাঙির কাঁচ ভেঙেছে! বিড়বিড় করলেন শরাফত আহমেদ। হু, বুঝতে পারছি, কেন করেছে এই কাজ। দুঃখের সুরে বললেন তিনি, কলেজে দিয়েছিলাম। পড়ালেখা করলো না। বাজে ছেলেদের সঙ্গে মিশে বখে গেল। ভাবলাম, এনে ব্যবসায় লাগিয়ে দিই। কিছু দিন কিছুই করলো না। রেগেমেগে শেষে একদিন। হুঁশিয়ার করে দিলাম, ঠিকমতো কাজ দেখাতে না পারলে বাড়ি থেকেই বের করে। দেবো। সম্পত্তির একটা কানাকড়িও দেবো না। তারপর হঠাৎ ভালো হয়ে গেল। গত তিনমাস ধরে তো চমৎকার কাজ দেখাচ্ছিলো। সেলস ম্যানেজার বানিয়ে দিয়েছিলাম। এমন ভাবে গাড়ির কাঁচ বিক্রি শুরু করলো, আমি তো ভাবলাম... হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছলেন তিনি। বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, অথচ...এই কাজ করেছে! নিজেই গাড়ির কাঁচগুলো ভেঙে দিয়ে এসেছে, যাতে মালিকেরা কিনতে বাধ্য হয়। ইস্, রনটু, তুই এভাবে আমার মুখে চুনকালি মাখালি...
ওদের কথা বিশ্বাস করো না, আব্বা! প্রতিবাদ করলো রনটু। কি বলছে তাই বুঝতে পারছি না। ওরা শত্রুতা করছে আমার সঙ্গে, তিন গোয়েন্দাকে দেখালো সে। আমার জিনিসগুলো চুরি করে নিয়ে গাড়িতে ভরে রেখেছে আমাকে ফাসানোর জন্যে! প্রমাণ করতে পারবে আমি ভেঙেছি? কেউ দেখেছে?
পারবো! জোর দিয়ে বললো রবিন। চোরাই ঈগলটা খুঁজে পেলেই হয়।
চোখ মিটমিট করলেন শরাফত আহমেদ। চোরাই ঈগল! ঈগল পাখিও চুরি করেছে!
পাখি নয়, ব্যাখ্যা করলো কচি, একটা দুর্লভ মুদ্রা। উনিশশো নয় সালে তৈরি। একটা আমেরিকান বিশ ডলারের সোনার মোহর, ডাবল ঈগল বলে ওটাকে। গাড়ির জানালা ভেঙে চুরি করেছে ওটা আপনার ছেলে। অনেক দাম...
মোহর চুরি করেছে! শরাফত আহমেদের গলা কেঁপে উঠলো। আমার ছেলে চোর! ফ্যাকাশে হয়ে গেছে রনটুর চেহারা। বললো, বিশ্বাস কোরো না, আব্বা! গলায় জোর নেই তার। এটাও আমার ঘাড়ে চাপাতে চাইছে। বেশ, স্বীকার করছি, গাড়ির কাঁচ ভেঙেছি আমি। কিন্তু কক্ষনো মোহর চুরি করিনি! খোদার কসম! আমাদের ব্যবসা খারাপ হয়ে গেছে, তাই বাড়াতে চেয়েছিলাম। বিক্রি করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু মোহর আমি চুরি করিনি!

অনেকক্ষণ থেকেই একেবারে চুপ হয়ে আছে কিশোর। শুনছে কথাবার্তা। হঠাৎ এখন রনটুর সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলে উঠলো, না, আমারও বিশ্বাস, আপনি চুরি করেননি!

.

কিশোরের কথা শুনে হাঁ হয়ে গেল তার বন্ধুরা। প্রথমে কথা খুঁজে পেলো রবিন, ঈগলটা ও চুরি করেনি?

কিশোর? ভুরু কোঁচকালেন আরিফ সাহেব। ব্যাপারটা কি বল তো? তুই জানিস কে চুরি করেছে?

ধীরে ধীরে নাটকীয় ভঙ্গিতে বললো কিশোর, আমি এখনও শিওর না।

শিওর না হলে বলা উচিত না।

ঈগলটা যে শরাফত সাহেরে ছেলে চুরি করেনি, এটা শিওর। কে করেছে সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারছি না। তবে চেষ্টা করলে হয়তো ধরে ফেলতে পারবো।

তারমানে তুই বলতে চাইছিস যে কাঁচ ভাঙে সে মোহর চোর নয়?

না। এর অন্য কোনো ব্যাখ্যা আছে।

সেটা কি? অধৈর্য হয়ে হাত নাড়লো মুসা।

এ ধরনের অপরাধকেই বলে কপিক্যাট ক্রাইম, শান্তকণ্ঠে বললো কিশোর।

কি ক্রাইম! নাকমুখ কুঁচকে জিজ্ঞেস করলো কচি।

বাংলা মানে বোধহয় করা যাবে না এর, কিশোরের হয়ে জবাবটা দিলেন আরিফ সাহেব। তবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। ধরা যাক, একই সময়ে দুটো অপরাধ ঘটলো। আগে থেকেই ঘটছে এ রকম একটা অপরাধ আরও একবার ঘটলো। ঠিক ওই সময়ে আরেকজন অপরাধী আরেকটা অপরাধ ঘটালো। এমন ভাবে, যাতে মনে হয় দুটোই একজনের কাজ। দ্বিতীয় কোনো অপরাধী যে আছে এটা সহজে বোঝা যাবে না।

মাথা ঝাঁকালো কিশোর। গাড়ির কাঁচ ভাঙার খবরটা জানা ছিলো আমাদের এই দ্বিতীয় অপরাধীর। কাজেই সুযোগ বুঝে আকবর সাহেবের গাড়ির জানালা ভেঙে ঈগলটা চুরি করেছে সে। আশী করেছে, দোষটা গিয়ে পড়বে যে কাঁচ ভাঙে তার ঘাড়ে।

হ্যাঁ, এ রকম অপরাধ অনেক সময়ই ঘটে, এবার মুখ খুললেন ওসি সাহেব। কিশোরের বুদ্ধি, জ্ঞান আর কথাবার্তা রীতিমতো অবাক করেছে তাকে। কি করে বুঝতে পারলে সেটা?

সবার মুখের দিকে তাকালো একবার কিশোর। তারপর বললো, গোড়া থেকেই আমার সন্দেহ হচ্ছিলো, এই কেসে আরও একজন জড়িত রয়েছে। আড়িপেতে আমাদের কথা শুনেছে। কোন ভাবে আমাদের কথা জেনে গিয়েছিল সে, সে

জন্যেই শুনতে চেয়েছে আমাদের কথা। টেলিফোন লাইনে ওয়্যারট্যাপ লাগিয়ে দিয়েছে। হুঁশিয়ার করে দিয়েছে রনটুকে যে সারা শহরে ভূত-থেকে-ভূতে চালু হয়ে গেছে, ভূতেরা শুরু করে দিয়েছে কাজ। ব্যাপারটা সম্পর্কে শিওর হতে পারতাম না আমি, যদি সে ছোট্ট একটা রসিকতা করার লোভ সামলাতে পারতো। ভেবেছে আমাদের নিয়ে খানিকটা মজা করবে। ফোনে আমাদের খবর দিয়েছে যে কাঁচ ভাঙুরা ধরা পড়েছে। যা-ই হোক, আমাদের ঠকিয়েছে সত্যি, তবে ফাঁকিটাতে সে নিজেই পড়ে নিজেকে ফাস করে দিয়েছে।

অবাক হয়ে কিশোরের কথা শুনছেন ওসি সাহেব। ছেলেটার কিছু কিছু কথা বুঝতে পারছেন না। এই যেমন ভূত-থেকে-ভূতে। তবে কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। কিশোরের কথা থেকে আন্দাজ করে নেয়ার অপেক্ষায় আছেন।

ওরা কি একসঙ্গে কাজ করতো? রবিন জানতে চাইলো। মানে, পার্টনার?

মাথা নাড়লো কিশোর। না। রনটুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কি, ঠিক বলিনি?

মাথা নেড়ে সায় জানালো রনটু।

পার্টনার না হলে, আবার জিজ্ঞেস করলো রবিন, তাকে হুঁশিয়ার করতে গেল কেন দ্বিতীয় লোকটা?

এ তো সহজ কথা, হাত ওল্টালো কিশোর। রনটু ধরা পড়লেই পুলিশ জেনে যাবে ঈগলটা সে চুরি করেনি। আসল চোরকে খুঁজতে শুরু করবে তখন। সেই ভয়েই তাকে ওয়্যারলেসে হুশিয়ার করে দিয়েছে চোর যে, তার ওপর সন্দেহ পড়েছে। প্রমাণ খোঁজা হচ্ছে। ব্যস, তাড়াতাড়ি এসে সেগুলো সরানোর চেষ্টা। করেছে রনটু। তার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলো, তাই না?

আবার মাথা ঝাঁকালো, রনটু। তাজ্জব হয়ে গেছে, তার চোখ দেখেই অনুমান করা যায়।

কে করেছে, নিশ্চয় জানেন না?

না।

ওসি সাহেব বললেন, তাহলে ধরে নেয়া যাচ্ছে, আরেকজন আছে। কে, জানো নাকি? ধরতে পারবে?

সরাসরি প্রশ্নের জবাব না দিয়ে কিশোর বললো, ইলেকট্রনিকসে তার। অসাধারণ জ্ঞান। মনে হয় ধরতে পারবো। আজ বিকেলেই। যদি আমাকে সাহায্য করেন।

কিশোরের ওপর বিশ্বাস জন্মে গেছে ওসি সাহেবের। তবু দ্বিধা করলেন। আরিফ সাহেবের দিকে তাকালেন একবার। তারপর বললেন, বেশ, করবো। শরাফত আহমেদের দিকে তাকিয়ে বললেন, সরি, শরাফত সাহেব, আপনার ছেলেকে

থানায় নিয়ে যেতে হচ্ছে আমাদের। জামিন চাইলে হয়তো পাবেন। উকিলের সঙ্গে কথা বলুন।
গম্ভীর হয়ে বললেন শরাফত আহমেদ, নিয়ে যান। যে ছেলে বাপের নাক-কান কাটে, তাকে ছাড়িয়ে আনতে যাচ্ছি না আমি।
কিন্তু আব্বা, মরিয়া হয়ে বললো রনটু, তুমি বুঝতে পারছে না, ব্যবসার উন্নতির জন্যেই আমি একাজ…
ব্যবসার উন্নতির জন্যে এসব করতে বলা হয়নি তোমাকে! কড়া গলায় বললেন শরাফত সাহেব। ওসি সাহেব, নিয়ে যান। যা শাস্তি হয় তোক। ওর শাস্তি হওয়াই উচিত। বলে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। চোখের কোণে জল।
জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেললেন আরিফ সাহেব। আস্তে বললেন, জীবনে কতো যে ঘটনা দেখলাম! সন্তান মানুষ না হলে… কথাটা শেষ করলেন না তিনি। কিশোরের দিকে তাকালেন, তা চোরটা কে, বললি না তো?
ডলি খান, বোমা ফাটালো যেন কিশোর। মিস্টার আকবর আলি খানের মেয়ে।

.

কিশোরের ওপর ভীষণ রেগে গেল ডলি। আকবর সাহেরে বসার ঘরে বসেছে সবাই-আকবর সাহেব, তাঁর মেয়ে ডলি, তিন গোয়েন্দা, কচি, ওসি সাহেব, আরিফ সাহেব। রনটুকে নিয়ে পুলিশের জীপে করে থানায় চলে গেছেন সার্জেন্ট আজিজ।
কাজটা আপনিই করেছেন, শান্তকণ্ঠে আবার বললো কিশোর। আরো আগেই বোঝা উচিত ছিলো আমার।
কিন্তু একাজ কেন করবে আমার মেয়ে? হাতের লাঠিটা সজোরে মেঝেতে ঠকলেন আকবর সাহেব।
আপনার মেয়েকেই জিজ্ঞেস করুন।
না, আমি তোমার মুখ থেকেই শুনতে চাই।
আসলে মেয়ের কোনো খোঁজখবর রাখেন না তো আপনি, আছেন নিজেকে নিয়ে আর আপনার মুদ্রা নিয়ে, নইলে অনেক আগেই বুঝতে পারতেন। কিছুটা ঝাঁঝের সঙ্গেই বললো কিশোর। আকবর সাহেবের দুর্ব্যবহার অনেক সহ্য করেছে সে, আর নয়। ডলির দিকে তাকিয়ে বললো, দয়া করে আপনার কামিজের হাতাটা একটু তুলবেন?
রেগে গেলেন আকবর সাহেব। কেন, কামিজের হাতা তুলবে কেন? ফাজলেমি করার আর জায়গা পাওনি!
আমি ফাজলেমি করছি না। তুলতে বলুন, নিজের চোখেই দেখতে পাবেন।
কি দেখতে পাবো?

আগে তো তুলুক।
কিন্তু দ্বিধা করতে লাগলো ডলি।
কি হলো? ডলির দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচালো কিশোর। তুলুন।
ধীরে ধীরে ডান হাতের হাতাটা কনুই পর্যন্ত গোটালো ডলি। চোখ নামিয়ে রেখেছে। তার হাতের কালো কালো দাগগুলো সবাই দেখলো। সবাই বুঝতে পারলো কিসের দাগ ওগুলো, শুধু কচি আর আকবর সাহেব ছাড়া। তিনি বললেন, তুললো তো, এখন কি হলো?
ধৈর্য হারালেন ওসি। আকবর সাহেবের কাটা কাটা কথা তারও পছন্দ হচ্ছে না। কঠিন কণ্ঠে বললেন, কেন, বুঝতে পারছেন না?
না, পারছি না! প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন আকবর সাহেব।
আরিফ সাহেব বললেন, সর্বনাশ হয়ে গেছে আপনার মেয়ের, জানেনই না আপনি! ও ড্রাগ অ্যাডিক্ট। সর্বনাশা নেশার জালে জড়িয়ে পড়েছে আপনার মেয়ে। ওগুলো ইঞ্জেকশনের সুচের দাগ।
হঠাৎ যেন ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন আকবর সাহেব। এলিয়ে পড়লেন। সোফায়। বোকার মতো চেয়ে রয়েছেন মেয়ের হাতের দাগগুলোর দিকে। স্তব্ধ হয়ে গেছেন।
এবার কি আর অস্বীকার করবেন, ডলির দিকে চেয়ে কোমল গলায় বললো কিশোর, হেরোইন কেনার টাকার জন্যে ঈগলটা চুরি করেননি আপনি?
জবাব দিলো না ডলি। মাথাটা ঝুলে পড়েছে বুকের ওপর।
আমেরিকায় গিয়ে এই নেশার শিকার হয়েছেন, তাই না?
হ্যাঁ, মাথা ঝাঁকালো ডলি। পড়তে গিয়েছিলাম। বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে এই সর্বনাশ হয়েছে আমার। আব্বা টাকা পাঠাতে পড়ার জন্যে, আমি পড়ালেখা বাদ দিয়ে খরচ করতাম নেশার পেছনে। তাতেও কুলাতো না। নানান অসুবিধায়। পড়লাম। শেষে বাধ্য হয়ে চলে এসেছি দেশে।
ইলেকট্রনিকসে আপনার অসাধারণ জ্ঞান। ওই স্যাটেলাইট ডিশটা আপনারই, তাই না?
হ্যাঁ। আব্বা আনিয়ে দিয়েছে আমেরিকা থেকে। আমার শখ দেখে। সিবি রেডিও, হ্যাম রেডিও, টিভি, সব কিছুরই অ্যান্টেনা হিসেবে ব্যবহার করি আমি ডিশটা।
আমাদের কথা শোনার জন্যে টেলিফোন লাইনে ওয়্যারট্যাপ আপনিই লাগিয়েছিলেন?
না। সানি লাগিয়ে দিয়েছে। ও আমাকে ভালোবাসে। সে জন্যে যা করতে বলি তা-ই করে। আমার ড্রাগ নেয়ার কথাও জানে। অনেক চেষ্টা করেছে। ছাড়ানোর জন্যে। আমি মানা করেছি, তাই বলেনি আব্বাকে। গোপন রেখেছে।

এখন কোথায় সে?
বাইরে কোথাও গেছে।
আচ্ছা, আপনার আব্বা আমাদেরকে কাজে লাগাতে চান একথা বলে ফোনটা। করেছিলো কেন সানি? জবাবের অপেক্ষা না করে নিজে নিজেই বললো কিশোর, নিশ্চয় নিজেদেরকে সন্দেহমুক্ত রাখতে চেয়েছিলেন। অপরাধী প্রায়ই ভাবে, এই বুঝি কেউ তাকে সন্দেহ করে বসলো। আপনারও হয়েছিলো সেই অবস্থা। আপনি ধরেই নিয়েছিলেন, আমরা আপনাকে সন্দেহ করছি। শিওর হওয়ার জন্যেই আসলে সেদিন ওকে দিয়ে ফোন করিয়ে আমাদের বাড়িতে ডেকে এনেছিলেন? তাই না?
আস্তে মাথা ঝাঁকালো শুধু ডলি।
মোহর যে রাতে চুরি করেছেন, বলে গেল কিশোর, সে রাতে আপনিই গাড়ি চালিয়েছিলেন। আপনার আব্বা ভুলে বাক্সটা ফেলে রেখে চলে গেলেন। এই ফাঁকে আপনি তুলে নিলেন বাক্সটা। এতোই ছোট ওটা, যে জানে সে ছাড়া অন্ধকারে আর কারও চোখে পড়ার নয়। লুকিয়ে ফেললেন বাক্সটা। তারপর ভাঙলেন গাড়ির কাঁচ। ভাবখানা এমন, যেন অন্য কেউ এসে ভেঙে দিয়ে গেছে। গাড়ির কাঁচ ভাঙা যাচ্ছিলো কয়েক মাস ধরে, সেটা জানা ছিলো আপনার। সময় মতো সুযোগটা কাজে লাগিয়েছেন।
চুপ করে রইলো ডলি।
জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেললো কিশোর। এইই হয়। ড্রাগের নেশা এমনই ভয়ঙ্কর সে জিনিস পাওয়ার জন্যে সব কিছু করতে রাজি মানুষ। হিতাহিত জ্ঞান। হারিয়ে ফেলে। নিজের বাপের জিনিসও চুরি করতে বাধেনি আপনার। আপনার
জন্যে সত্যিই দুঃখ হচ্ছে আমার, মিস খান! মুদ্রাটা কি বিক্রি করে ফেলেছেন?
মাথা নাড়লো ডলি। এখনও বিক্রি করতে পারেনি।
এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করলো কিশোর, তো, এখন কি জিনিসটা বের করে দেকেন? দেখতাম।
নীরবে উঠে দাঁড়ালো ডলি।
তার পেছনে চললো সবাই।
সোজা পাশের দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো মেয়েটা। এগোলো স্যাটেলাইট ডিশ্নে দিকে। ওটার কাছে এসে থামলো। কারো দিকে না তাকিয়ে ঝুঁকে বসে হাত ঢুকিয়ে দিলো ডিশের নিচে। টেপ দিয়ে আটকানো রয়েছে মুদ্রাটা। টেনে টেপ ছিঁড়ে খুলে আনলো ওটা। বাড়িয়ে দিলো কিশোরের দিকে।
.

বিকেলে বাগানে চেয়ার পেতে বসেছে সবাই। আরিফ সাহেব, ওসি সাহেব, তিন। গোয়েন্দা আর কচি। মামী রান্নাঘরে ব্যস্ত। কাঁচ ভাঙার রহস্য নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। বেশির ভাগ কথা কিশোরই বলছে। মাঝে মাঝে প্রশ্ন করছেন ওসি সাহেব।
আচ্ছা, কিশোর, জিজ্ঞেস করলেন তিনি, কি ভুলটা করেছিলো ডলি, যে জন্যে তোমার সন্দেহ হলো কচি যে ভাঙে সে মোহর চোর নয়?
দুটো কারণে, জবাব দিলো কিশোর। প্রথমত, পেছনের কাঁচ ভেঙেছে ডলি। আর দ্বিতীয় কারণ, ওদের গাড়িটা টয়োটা নয়। রনটু শুধু টয়োটার কাঁচই ভাঙতো। এ ব্যাপারটা জানা ছিলো না ডলির। ফলে ভুলটা করে বসেছে। বুঝে গেলাম একটা কপিক্যাট ক্রাইম ঘটেছে। পেছনের সীটে রাখা ছিলো বাক্সটা, তাই সেদিকের কাঁচটাই ভেঙেছে সে। কিন্তু রনটু ভাঙতে সামনের কাঁচ, উইণ্ডশীল্ড।
আনাড়ি কপিক্যাট, মুচকি হাসলেন আরিফ সাহেব। বোকার মতো কাজ করে ব্রাটা পড়লো।
আরও একটা বোকামি করেছে আমাদের ফোন করে। এরকম করেই ব্রা পড়ে অপরাধী, এ-তো জানা কথাই। আকবর সাহেবের বাড়ি গিয়ে দুটো ব্যাপার জানলাম। একঃ আকবর সাহেব আমাদেরকে তদন্তে নিয়োগ করতে বলেননি। তার সঙ্গে এ ব্যাপারে কোনো আলোচনাই করেনি ডলি আর সানি।
আর দ্বিতীয় ব্যাপারটা? মুসার প্রশ্ন।
হাফ-হাতা ব্লাউজ পরেছিলো সেদিন ডলি, নিশ্চয় মনে আছে তোমাদের?
কি জানি! মাথা চুলকালো মুসা।
মাথা নাড়লো রবিন, না, খেয়াল করিনি। কিন্তু তাতে কি?
গোয়েন্দাগিরি করছ এতোদিন, খেয়াল করা উচিৎ ছিলো, সুযোগ পেয়েই খানিকটা উপদেশ ঝেড়ে দিলো গোয়েন্দাপ্রধান। ডলির হাতে ইঞ্জেকশনের সুচের দাগ। প্রথমে অবাক হয়েছিলাম। পরে সন্দেহ জাগলো। ধীরে ধীরে বুঝে ফেললাম, কে, কেন চুরি করেছে মুদ্রাটা।–
দরজায় দেখা দিলেন মামী। ডেকে বললেন, এই কিশোর, তোর ফোন।
ফোন? ভুরু কুঁচকালো মুসা। এখন আবার কে ফোন করলো?
দেখে আসি, উঠে দাঁড়ালো কিশোর।
কয়েক মিনিট পরে ফিরে এলো হাসিমুখে। চোখে জিজ্ঞাসা নিয়ে তার দিকে তাকালো মুসা, রবিন আর কচি।
দাওয়াত, খবরটা জানালো কিশোর। দাওয়াত দিয়েছে গোড়ানের ছেলেরা। একটা ক্লাব করেছে ওরা, নাম দিয়েছে তিন গোয়েন্দা ক্লাব।
কি বলেছো? জানতে চাইলো কচি, যাবে?

নিশ্চয় যাবো। আগামী তেরো-চোদ্দ দিন প্রত্যেকটা পাড়ায় গিয়ে সবার সঙ্গে পরিচয় করবো। ওরা যে টেলিফোনের মাধ্যমে একটা অন্যায় কাজ বন্ধ করতে সাহায্য করেছে সে গল্প বলতে হবে না ওদেরকে?
কাল আমাকেও নিয়ে যেও, একদিন ফার্মে কাজ না করলে কিছু হবে না, বললো কচি। ওর হাতে শোভা পাচ্ছে পিকআপের চাবি।
নিশ্চয়।
সুখেই আছো, দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ওসি সাহেব। ইস, বিশটা বছর যদি কমে যেতো বয়স আমার, ভিড়ে যেতাম তোমাদের দলে! এই কাজকর্ম, দায়িত্ব, টেনশন আর ভালো লাগে না!
তুমি তো তা-ও আরামেই আছো, একই রকম দীর্ঘশ্বাস ফেললেন আরিফ সাহেবও। কাজ করে সময় পার করে দাও। আমার কি অবস্থা ভাবো তো। সময় একদম কাটতে চায় না। কিশোরের দিকে তাকলেন তিনি। অনেকটা অনুরোধের সুরেই বললেন, এই কিশোর, কাল আমাকেও নিয়ে যাস তোদের সঙ্গে। গাড়িও পাবি, বিনা বেতনে একজন ড্রাইভারও। কি, নিবি আমাকে?
নেবো, মামা।

ভলিউম ১৩ – বেগুনী জলদস্যু – তিন গোয়েন্দা – রকিব হাসান – সেবা প্রকাশনী
প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ১৯৯১
ঘড়ির অ্যালার্মের তীক্ষ্ণ শব্দে ঘুম ভেঙে গেল মুসার। চোখ মেলে গুঙিয়ে উঠলো সে। গরমের ছুটির দ্বিতীয় সপ্তাহ সবে শুরু হয়েছে। এরই মাঝে বিরক্ত হয়ে উঠেছে কাজ করতে করতে। মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে এখন। ইস, কেন যে। পড়শীদের বাগান সাফ করার দায়িত্বটা নিলো! না নিয়েও অবশ্য উপায় ছিলো না। রবিন আর কিশোরের সঙ্গে ডিজনিল্যাণ্ডে যাবার কথা, অথচ তিন গোয়েন্দার ফাণ্ড প্রায় শূন্যের কোঠায় ঠেকেছে। ডিজনিল্যাণ্ডে যাওয়ার খরচই নেই, তার ওপর পড়ে আছে লম্বা ছুটিটা। টাকা খুব দরকার। অন্য দুজনও বসে নেই। রবিন লাইব্রেরিতে ওভারটাইম করছে। কিশোর খাটছে ওদের ইয়ার্ডে, বাড়তি সময়।
আরেকবার গুঙিয়ে উঠে বিছানা থেকে নামলো মুসা। তাড়াহুড়ো করে কাপড় পরে নিচে রান্নাঘরে এসে দেখলো টেবিলে বসে গেছেন তার বাবা মিস্টার আমান।
কিরে, এতো তাড়াতাড়ি? হেসে জিজ্ঞেস করলেন বাবা।
আর কি! বাগান সাফ! গোঁ গোঁ করে বলে রেফ্রিজারেটরের দিকে এগোলো মুসা, কমলার রস বের করবে।
টাকার দরকার, না? সহজ একটা উপায় বাতলে দিতে পারি। হলদে একটা কাগজ টেবিলের ওপর দিয়ে ঠেলে দিলেন মিস্টার আমান। গতরাতে মেলবক্সে ফেলে গেছে এটা।
চেয়ারে বসলো মুসা। কমলার রস খেতে খেতে চোখ বোলালো কাগজের লেখায়। একধরনের বিজ্ঞাপন। স্থানীয় বিজ্ঞাপন কোম্পানি বাড়ি বাড়ি দিয়ে যায়। পড়তে পড়তে উত্তেজিত হয়ে উঠলো মুসা। লেখা রয়েছেঃ
আপনি কি অভিযানপ্রিয়? ঐতিহাসিক?
বইয়ের পোকা? জলদস্যুদের বংশধর? তাহলে
আপনার জন্যে সুখবর আছে!
ডাকাত, জলদস্যু, ছিনতাইকারী, ঠগ, চোর
এদের ব্যাপারে কি কোনো গল্প জানা আছে আপনার?
সত্যি ঘটনা? তাহলে আসুন আমাদের কাছে।
প্রতিটি গল্পের জন্যে ২৫ (পঁচিশ) ডলার। করে পাবেন।
তবে শুধু ক্যালিফোর্নিয়ার কাহিনী বলতে
হবে, আর কোনো জায়গার হলে চলবে না। এবং
এই গল্প নেয়া হবে জুন ১৮ থেকে ২২ তারিখ

সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত।
যোগাযোগের ঠিকানাঃ ১৩১২ ডি লা ভিনা স্ট্রীট।
খাইছে! বলে উঠলো মুসা। টাকা দিয়ে ভরে ফেলা যাবে! অনেক গল্প জানি আমরা। বিশেষ করে কিশোর আর রবিন। এখুনি যাচ্ছি, দেখাতে। আজ আঠারো, আটটা বেজে গেছে।
আরে বসো, বসো, হাত তুললেন মিস্টার আমান। কোটিপতি পরেও হতে পারবে। নাস্তাটা আগে শেষ করো।
বাবা, অনেক কাজ! আগে লনে পানি দিতে হবে
পেট খালি থাকলে কোনো কাজই করা যায় না। শেষ করো। তোমাকে তো খাওয়ার কথা এতো বলতে হয় না…
কিন্তু বাবা…, থেমে গেল মুসা। হাল ছেড়ে দিয়ে বললো, আচ্ছা, ঠিক আছে।
বাবার ঠেলে দেয়া ভাজা গরুর মাংসের প্লেটটা টেনে নিলো সে। দ্রুতহাতে রুটি কেটে খাওয়া শুরু করলো। দেখতে দেখতে শেষ করে ফেললো পুরো প্লেট। এরপর ডিম ভাজি। চোখের পলকে উধাও হয়ে গেল চারটে ডিম। একটা ফুটকেকের অর্ধেকটা শেষ করে ঢকঢক করে পানি খেলো এক গেলাস। উঠে দাঁড়িয়ে ঝুড়ি থেকে একটা আপেল তুলে নিতে নিতে বললো, হয়েছে তো?
মা কাজ করছেন রান্নাঘরে। খুটখাট আওয়াজ হচ্ছে। সেদিকে একবার তাকালো মুসা। এখন পালাতে পারলে বাঁচে। বেরিয়ে এসে যদি আবার কোনো কাজ চাপিয়ে দেন?
মুচকি হাসলেন মিস্টার আমান। হ্যাঁ, চলবে। দুপুর পর্যন্ত থাকতে পারবে।
বিজ্ঞাপনটা হাতে নিয়ে প্রায় ছুটে ঘর থেকে বেরোলো মুসা। পাশের বাড়ির লনে পানি দিলো। অধৈর্য হাতে সাফ করলো মরা পাতা আর শুকনো ডাল। তারপর সাইকেল নিয়ে চললো কিশোরদের বাড়িতে, অর্থাৎ স্যালভিজ ইয়ার্ডে। সবুজ ফটক এক দিয়ে ঢুকলো ভেতরে, কিশোরের ব্যক্তিগত ওয়ার্কশপে আরও দুটো সাইকেল দেখা গেল, তার মানে রবিন আর কিশোর আছে। ওগুলোর পাশে নিজেরটাও রেখে দুই সুড়ঙ্গ দিয়ে হেডকোয়ার্টারে ঢুকলো সে। হাতের কাগজটা নেড়ে চেঁচিয়ে বললো, এই দেখো, কি এনেছি!
বলেই চুপ হয়ে গেল। ডেস্কের কাছে দাঁড়িয়ে আছে কিশোর। রবিন হেলান দিয়ে রয়েছে একটা ফাইলিং কেবিনেটে। দুজনের কাছেই দুটো হলদে কাগজ, একই রকম।
পাঁচ মিনিট আগে এসেছি আমি, সেকেণ্ড, রবিন বললো। তোমার মতোই। সাংঘাতিক খবর নিয়ে!

আমি সকালেই পেয়েছি, কিশোর জানালো, ডাকবাক্সে। মনে হচ্ছে টাকা, কামানোর আগ্রহ আমাদের তিনজনের একই রকম।
একটা আর্মচেয়ারে প্রায় এলিয়ে পড়লো মুসা। আল্লাহ কাজ করতে করতে বিরক্ত হয়ে গেছি।
সত্যি সত্যি কাজ করলে কখনও বিরক্তি আসে না কারও, শুধরে দিলো কিশোর। চেয়ারে বসলো। বড়জোর ক্লান্তি আসে। সেটাই হয়েছে আমাদের। বুঝতে পারছি, জলদস্যুরা উদ্ধার করবে এবার।
সহজ পথে টাকা উপার্জন, বিড়বিড় করলো রবিন।
কাদের গল্প বলবো? মুসা জিজ্ঞেস করলো।
কেন, অনেকেই তো আছে, জবাব দিলো কিশোর। ফরাসী জলদস্যু ডা বুচার্ডের কথা বলা যায়। ক্যালিফোর্নিয়ার ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছে সে।
মাথা দোলালো মুসা। হ্যাঁ। এল ডিয়াবলোর কথাও বলতে পারি আমরা।
পারি, একমত হলো রবিন। এরপর আছে ডন সেবাসটিয়ান অ্যালভারো।
বিখ্যাত আরেকজন আছে, কিশোর বললো। ডা বুচার্ডের পর উদয় হয়েছিলো। উইলিয়াম ইভানস, বেগুনী জলদস্যু নামেই বেশি পরিচিত। মেরামত করে চালানো পুরনো গ্র্যাণ্ডফাদার ঘড়িটার দিকে তাকালো সে। তবে এসব গল্প এখানকার অনেকেরই জানা। বলতে হলে তাড়াতাড়ি যেতে হবে আমাদের। কেউ বলে ফেলার আগে।
আবার ওয়ার্কশপে বেরিয়ে এলো ওরা। বেরিয়েই শুনলো ডাক, কিশোর, ও কিশোর, কোথায় গেলি?
মেরিচাচী! আঁতকে উঠলো রবিন।
নিশ্চয় অনেক কাজ জমিয়েছে! চেঁচাতে গিয়েও কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে ফেললো মুসা।
ফ্যাকাশে হয়ে গেছে কিশোরের মুখ। আজ আর কিছু করতে পারবো না! জলদি পালাও! মেরিচাচী ওয়ার্কশপে ঢোকার আগেই সবুজ ফটক এক দিয়ে। বেরিয়ে পড়লো তিনজনে।
সাইকেল চালাতে চালাতে রবিন বললো, চিনি জায়গাটা। পুরনো স্প্যানিশ স্টাইলের চত্বর ঘিরে ইটের দেয়াল। একধারে কয়েকটা দোকান আছে। বেশির ভাগই এখন খালি।
সেজন্যেই হয়তো জায়গাটা বেছে নিয়েছে ওরা, বিজ্ঞাপন দিয়েছে যারা তাদের কথা বললো কিশোর। সস্তায় পাবে। তাছাড়া ভিড়টিড়ও কম। আরামে ইন্টারভিউ নিতে পারবে।

ডি লা ভিনা স্ট্রীটে উঠলো ওরা। ১৩০০ নম্বর ব্লকের কাছে থাকতেই চোখে পড়লো জনতার ভিড়। প্রতি মিনিটে বাড়ছে। রবিন যে দেয়ালটার কথা বলেছে, তার ভেতরে ঢোকার কাঠের গেটটা বন্ধ। দেয়ালে বড় করে নম্বর লেখা রয়েছেঃ ১৩১২।

চিন্তিত ভঙ্গিতে ভিড়ের দিকে তাকিয়ে কিশোর বললো, বড় মানুষ খুব কমই আছে। আজ কাজের দিন, অফিস-আদালত সব ভোলা। আসবে ওরাও, ছুটি হলে। আমাদের জন্যে এই সময়টাই সুবিধে।

পথের পাশের একটা লোহার রেলিঙে শেকল ঢুকিয়ে সাইকেলে তালা দিলো তিনজনে। খুলে গেল কাঠের দরজা। বেরিয়ে এলেন একজন চটপটে মানুষ। শাদা চুল। পুরু গোঁফ দেখলে মনে হয় নাকের নিচে ছোটখাটো দুটো ঝোঁপ ঝুলে রয়েছে, মানুষটার ছোট্ট শরীরের তুলনায় বেঢপ আকার। গায়ে টুইডের জ্যাকেট, পরনে ঘোড়ায় চড়ার উপযোগী পাজামা, পায়ে বুট, গলায় বাঁধা সিল্কের রুমাল, হাতে একটা বেত-ঘোড়া চালানোর সময় প্রয়োজন হয়। সব কিছু দেখে মনে হয়। প্রাচীন অশ্বারোহী বাহিনীর একজন সৈনিক জ্যান্ত হয়ে উঠে এসেছে। ভিড়ের দিকে তাকিয়ে চাবুকটা তুললেন তিনি, চুপ করার নির্দেশ।

আমার নাম মেজর নিরেক। পাইরেটস সোসাইটি অভ জাস্টিসে আসার জন্যে স্বাগত জানাচ্ছি সবাইকে। সবার কথাই শুনবো আমরা। তবে আজ এতো বেশি চলে এসেছো, শুনে শেষ করতে পারবো না একদিনে। যারা কাছে থেকে এসেছে, তারা ফিরে যাও। আরেক দিন এসো। রকি বীচের বাইরে থেকে যারা এসেছে, তারা শুধু থাকো।

হতাশার তীব্র গুঞ্জন বয়ে গেল জনতার মাঝে। ঠেলাঠেলি, ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়ে গেল। দরজার কাছে পিছিয়ে গিয়ে পাল্লাটা লাগিয়ে দিলেন মেজর নিরেক। দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে কথা বলার চেষ্টা করলেন তিনি, কিন্তু। কেউ শুনতে চাইলো না। ভীষণ হৈ-হট্টগোলে চাপা পড়ে গেল তার কথা।

নানারকম প্রতিবাদঃ

ইয়ার্কি পেয়েছো?

আসতে বলে এখন চলে যাওয়ার কথা!

শয়তানি ঘুচিয়ে দেবো, বেশি বেশি করলে!

এসেছি ফিরে যাওয়ার জন্যে?

আরও নানারকম কথা, গালাগাল হজম করতে হলো মেজরকে। সতেরো আঠারো বছরের ছেলেগুলোই বাড়াবাড়ি করছে। তাদের দিকে বেত তুলে চেঁচিয়ে। উঠলেন তিনি, এই ভাগো, ফাজিলের দল!

আরও রেগে গেল ওরা। একটা ছেলে এসে টান দিয়ে বেতটা কেড়ে নিতে চাইলো। আরও কয়েকজন এগিয়ে এলো তিনদিক থেকে, মেজরকে মারার জন্যে। রক্ত সরে গেল তার মুখ থেকে। চিৎকার করে সাহায্য চাইলেন, বাঁচাও, রিগো, বাঁচাও! দেয়ালের ভেতর থেকে কেউ বেরোলো না।

তিনদিক থেকে চেপে আসছে রেগে যাওয়া, উত্তেজিত জনতা।

.

বাঁচাও! আবার চিৎকার করলেন মেজর। এগিয়ে আসছে জনতা। রিগো, বাঁচাও? কিশোরের দিকে তাকালো মুসা। দেরি হয়ে যাচ্ছে। মেজরকে ভেতরে নিয়ে যাওয়া দরকার! বলেই আর দাঁড়ালো না সে। ছুটে গিয়ে একলাফে চড়লো পার্ক করে রাখা একটা গাড়ির ছাতে। চেঁচিয়ে বললো, পুলিস। পুলিস আসছে!

ঝট করে ফিরে তাকালো গেটের কাছে চলে যাওয়া কয়েকটা ছেলে। কিশোর। আর রবিন ততোক্ষণে প্রায় পৌঁছে গেছে মেজরের কাছে।

চলো, ভাগি! বলেই ছাত থেকে লাফিয়ে নেমে রাস্তার দিকে দৌড় দিলো। মুসা। কয়েকটা ছেলে ছুটলো তার পেছনে, বাকিরা দাঁড়িয়ে রইলো, দ্বিধা করছে। ধাক্কা দিয়ে কাঠের গেটটা ফাঁক করে ফেললো রবিন।

আসুন, স্যার, বলে ঠেলে মেজরকে সেই ফাঁকের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলো কিশোর।

মেজরকে নিয়ে চত্বরে ঢুকে পড়লো দুজনে। খানিক পরেই সেখানে এসে হাজির হলো মুসা। আর কেউ ঢুকে পড়ার আগেই ঠেলে বন্ধ করে দিলো, ভারি গেটটা। দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছেন নিরেক।

রিগো! গর্জে উঠলেন তিনি। গেল কোথায় শয়তানটা!

অনেক কাল আগে বড় বড় পাথর বসিয়ে তৈরি করা হয়েছিলো এই চত্বর। মাঝে মাঝে ফাঁক, সেখানে লাগানো হয়েছিলো পিপুল আর জ্যাকারাণ্ডা গাছের চারা, সেগুলো বড় হয়েছে এখন। ফুলের ঝড়ে প্রায় ঢাকা পড়েছে উঁচু দেয়াল। উজ্জ্বল রঙের ফুল ফুটেছে। চত্বরের দূর প্রান্তে একসারি দোকান। সবগুলোই খালি এ মনে হচ্ছে। নিঃসঙ্গ, ছোট একটা ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে ওগুলোর সামনে।

জ্যাকেটের পকেট থেকে লাল একটা রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছলেন মেজর। অনেক ধন্যবাদ তোমাদেরকে। পুলিসও চলে এসেছে। ধরে নিয়ে গিয়ে এখন গারদে ভরবে ব্যাটাদের।

হাসলো মুসা। পুলিস আসেনি, স্যার। ফাঁকি দিয়েছি ওদের। ভয় দেখিয়ে তাড়ানোর জন্যে।

তাই নাকি? সাংঘাতিক চালাক ছেলে তো তুমি! ভালো। তোমার গল্পই আগে শুনি। যেখানেই থাকো না কেন। রিগো! গেল কোথায় গাধাটা! এই রিগো, শুনে যাও!

ওদের গল্প শুনতে রাজি হওয়ায় তাকে ধন্যবাদ দিলো রবিন আর মুসা।

কিন্তু কিশোর তেমন খুশি হতে পারলো না। ভুরু কুঁচকে বললো, বাইরের ওরা খুশি হবে না একথা শুনলে।
না হলে না হোক। কয়েকটা বাচ্চার ভয়ে কাবু হয়ে যাবে? অসম্ভব! রিগো! বলদটাকে নিয়ে আর পারা গেল না! কোথায় গেল?
ঝটকা দিয়ে খুলে গেল একটা দোকানের দরজা। বেরিয়ে এলো বিশালদেহী এক লোক, যেন একটা ছোটখাটো হাতির বাচ্চা। বিচিত্র ভঙ্গিতে লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটে এলো মেজরের দিকে। শোফারের পোশাক পরনে, লাগেনি ঠিকমতো, ছোট হয়েছে। গোল মুখটা দেখে বয়স বোঝার উপায় নেই। লালচে ঘন চুলের ওপর। বসানো শোফারের টুপিটাও ঠিকমতো লাগেনি, যেন অসহায় ভঙ্গিতে আঁকড়ে ধরে আছে চুল, পড়ে যাওয়ার ভয়ে। নীল চোখে ভয়। স-স-সরি, মে-মে-মেজর!
এই গরু, ছিলে কোথায়? আরেকটু হলেই তো মেরে ফেলেছিলো আমাকে!
ছিলাম না...মানে এখানে ছিলাম না! কাজ করছিলাম! টেপ রেকর্ডারটা ঠিক করে রাখছিলাম। অযথা গালাগাল করছিলো টনি। আপনার ডাক শুনতে পাইনি...
তা শুনবে কেন! খেঁকিয়ে উঠলেন মেজর। এখন যাও। গিয়ে বলো ওদেরকে, দশ মিনিটের মধ্যেই গেট খুলছি। লাইন দিয়ে দাঁড়াতে বলো। ভালো করে বুঝিয়ে বলে দেবে, শহর এলাকার মধ্যে থাকে এমন কারো ইন্টারভিউ নেয়া হবে না আজ। শুধু শহরের সীমানার বাইরের...
বাধ্য ছেলের মতো হেলেদুলে গেটের দিকে এগোলো রিগো। দরজা খুলতেই হৈ হৈ করে উঠলো জনতা। মেজর আবার বেরোচ্ছেন ভেবে ছুটে আসতে যাচ্ছিলো, কিন্তু রিগোকে দেখে থমকে গেল। হাসলেন নিরেক। ওকে দেখলেই অনেক গোলমাল থেমে যায়।
থামবেই, বললো রবিন।
আমার তো মনে হয়, ট্যাংক থামিয়ে দেয়ার ক্ষমতা রাখে, মুসা বললো।
তা বোধহয় পারে, নাক দিয়ে খোতখোত করলেন মেজর। এসো আমার সঙ্গে।
মাঝখানের একটা দোকানের কাছে ওদেরকে নিয়ে এলেন তিনি। বাইরের। খালি ঘরের পেছনে ছোট আরেকটা ঘর। জানালা দিয়ে পেছনের চত্বর চোখে পড়ে, জংলা হয়ে আছে, তার ওপাশে উঁচু দেয়াল। সব কটা জানালাই বন্ধ, কাঁচ লাগানো। একটা জানালার নিচে বসানো এয়ার কনডিশনার মৃদু ঝিরঝির করছে। একটা ডেস্ক,আর কয়েকটা ফোল্ডিং চেয়ার ছাড়া আর কোনো আসবাব নেই ঘরে। ডেস্কের ওপর রাখা একটা টেলিফোন। একটা টেপ রেকর্ডার নিয়ে ব্যস্ত একজন লোক। মাথায় কালো চুল। পরনে শ্রমিকের পোশাক।
দেরি আছে? জিজ্ঞেস করলেন মেজর।

মুখ না তুলেই মাথা ঝাঁকালো শুধু লোকটা।
ও ওটা ঠিক করুক, নিরেক বললেন, এসো ততোক্ষণ গল্প করি আমরা। আমাদের পাইরেটস সোসাইটির কথা শুনবে? বেশ। ডেস্কের এক কোণে উঠে বসলেন তিনি। টেবিলে বুকলেন বেতটা। এই সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আমার এক দাদা, আমার আপন দাদার ভাই। মস্ত ধনী ছিলেন তিনি। মূল লক্ষ্য, জলদস্যুদের নিয়ে গবেষণা করা, তাদেরকে সাহায্য করা, তাদের পরিবারের উন্নতি করা। আমাদের এক পূর্ব পুরুষ হামফ্রে নিরেকের ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে গিয়েই এই সোসাইটি প্রতিষ্ঠার ইচ্ছে জাগে তাঁর মনে। হামফ্রের নাম দিয়েছিলো লোকে টাইগার নিরেক। প্রাইভেটিয়ার ছিলেন তিনি। ঔপনিবেশিক আমলে জাহাজ নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে। প্রাইভেটিয়ার কাদেরকে বলে জানো তো?
জানি, মাথা ঝাঁকালো রবিন। বেসরকারী লোক, তবে সরকারী ভাবে অনুমতি দেয়া হতো যাদেরকে, শত্রু জাহাজ লুট করার জন্যে। তা, টাইগার নিরেকের নাম কিন্তু কখনও শুনিনি।
আমিও না, বিড়বিড় করলো কিশোর। কোনো কিছু জানে না বলতে খুব। খারাপ লাগে তার। ওই এলাকার সবচেয়ে বিখ্যাত একজনের নামই জানি আমি, জেনারেল জঁ ল্যাফিটি।
টাইগার নিরেকও তারচেয়ে কম বিখ্যাত নন। মেজর নিরেক বললেন, ল্যাফিটির মতোই দেশপ্রেমিক। আঠারোশো বারো সালে রেভলুশনারি ওঅরে তিনিও যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু ইতিহাস মনে রাখেনি তার কথা। দুজনেই প্রাইভেটিয়ার ছিলেন। নিরেক ইংরেজ জাহাজকে আক্রমণ করে তাদের অস্ত্রশস্ত্র, রসদ কেড়ে নিয়ে গিয়ে জমা করতেন বিদ্রোহীদের ভাঁড়ারে। আর জেনারেল হামলা চালাতেন স্প্যানিশ জাহাজের ওপর। অ্যানড্র জ্যাকসনের দলে থেকে ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন তিনি। নিরেক বা ল্যাফিটি, কেউই কম ছিলেন না, অথচ একজনের কথা লোকে মনে রাখলো, আরেকজনের কথা বেমালুম ভুলে গেল। ইতিহাস যে কেন এই গোলমালটা করে, বুঝি না! এই ব্যাপারটাই খারাপ লেগেছিলো আমার দাদার। লাখ লাখ ডলার খরচ করে এই সোসাইটি প্রতিষ্ঠা। করলেন। বই, পুস্তিকা প্রকাশ করলেন। সেসব বইতে লেখালেন সেই সব লোকদের কথা, যাদেরকে এড়িয়ে গেছে ইতিহাস।
কিন্তু... শুরু করতে যাচ্ছিলো কিশোর। তার কণ্ঠে সন্দেহের সুর।
থামিয়ে দিয়ে মেজর বললেন, শুনলে অবাক হবে, ইয়াং ম্যান, বছরের পর। বছর আমার দাদা সারা দুনিয়া চষে বেড়িয়েছেন ওরকম মানুষের খোঁজে। তাদেরকে অনেক বড় করে তুলে ধরেছেন। তার সেই অসমাপ্ত কাজটাই চালিয়ে যাওয়ার

সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি। আমি বুঝেছি, ক্যালিফোর্নিয়ায় ওরকম হিরো অনেক আছে, দেশের জন্যে যারা ডাকাত হয়েছে।...এই টনি, হলো? মাথা। ঝাঁকালো লোকটা। মেজর বললেন, কে আগে শোনাবে?
আমি! মুসা বললো। ডাকাত এল ডিয়াবলোর গল্প বলবো আমি।
আগে বলার ইচ্ছে ছিলো কিশোরের, থেমে গেল। বসে পড়লো রবিনের পাশের চেয়ারটায়। মুসার মুখে আরেকবার শুনতে লাগলো মেকসিকান দস্যু ডিয়াবলোর বীরগাথা, মেকসিকান যুদ্ধের সময় কি করে আমেরিকান অনুপ্রবেশ কারীদের বাধা দিয়েছিলো। কিন্তু মুসা অর্ধেকও বলে সারতে পারলো না, তাকে থামিয়ে দিয়ে মেজর বললেন, ভালো। আমাদের সোসাইটির জন্যে চমৎকার সিলেকশন। কাজে লাগবে এল ডিয়াবলো, তাকে তুলে ধরা উচিত। এরপর কে বলবে?
শুরু করে দিলো কিশোর, আমি দুজনের কথা বলবো। একজন, ফরাসী প্রাইভেটিয়ার হিপোলাইট ডা বুচারড। আরেকজন তার চাকর উইলিয়াম ইভানস, পরে যার ডাক নাম হয়ে যায় বেগুনী জলদস্যু। ফরাসী জাহাজের ক্যাপ্টেন ছিলেন। ডা বুচার্ড, পরে আরজেনটিনা সরকারের চাকরি নিয়ে নেন। আঠারোশো আঠারো। সালে যুদ্ধে নেমেছিলো দেশটা। তার জাহাজের নাম ছিলো সান্তা রোজা, মাঝিমাল্লা আর যোদ্ধা মিলিয়ে লোক ছিলো দুশো পঁচাশিজন। দশটা দেশ থেকে যোগাড় করেছিলেন ওদেরকে। স্প্যানিশ জাহাজ আর ঔপনিবেশিকদের ওপর হামলা চালাতে পাঠানো হয়েছিলো তাঁকে। আলটা ক্যালিফোর্নিয়ার স্প্যানিশ ঔপনিবেশিকদের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী ছিলেন তিনি। জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দেন মনটিরে অঞ্চল, পাবলো সোলার গভর্নরকে পরাজিত করেন, তারপর আসেন লস অ্যাঞ্জেলেসে হামলা চালাতে...
গুড! ভেরি গুড! হাততালি দিলেন মেজর। রবিনের দিকে ফিরে বললেন, তুমি কিছু বলবে?
হঠাৎ বাধা পেয়ে থমকে গেল কিশোর। চোখ মিটমিট করছে। মেজরের এই আচরণে খুবই অবাক হয়েছে সে। মুসার দিকে তাকালো। সে-ও তাকিয়ে আছে তার দিকে।
ডন স্যাবাসটিয়ান অ্যালভারোর গল্প আরম্ভ করলো রবিন। কিন্তু মাঝপথে আসার অনেক আগেই হাত তুললেন মেজর। দারুণ! চমৎকার! ভালো ভালো গল্প নিয়ে এসেছে তোমরা। টেপে রেকর্ড করে রেখেছে নিক। পরে আবার বাজিয়ে শুনবো আমরা। তারপর যোগাযোগ করবো তোমাদের সঙ্গে।
যোগাযোগ করবেন? ভুরু কোঁচকালো মুসা।
কিন্তু বিজ্ঞাপনে লিখেছেন...

হেসে কিশোরকে থামিয়ে দিলেন মেজর। আমরা ওটুকু শুনেই ঠিক করবো, কার গল্প নেয়া যায়। তারপর পুরোটা শোনার জন্যে ডেকে পাঠাবো। এক ঘন্টার জন্যে পঁচিশ ডলার, কম তো না। ভালোমতো না শুনে দিই কি করে, তোমরাই বলো? ও হ্যাঁ, যাওয়ার সময় রিগোকে বলো পরেরজনকে পাঠিয়ে দিতে, প্লীজ।
মেজরের ব্যবহারে থ হয়ে গেছে তিন গোয়েন্দা। গেটের বাইরে বেরিয়ে রিগোকে জানালো তার মনিবের নির্দেশ। সারি দিয়ে অপেক্ষা করছে গল্প বলিয়েরা, তাদের পাশ দিয়ে ধীরে ধীরে এগোলো ওরা। সাইকেলগুলো ঠিকমতোই রয়েছে।
প্রথমে মুখ খুললো মুসা, বিষ ঝাড়লো, আমাদেরকে ঠকিয়েছে!
জ্বলে উঠলো রবিন, বিজ্ঞাপনে বলেছে অন্য কথা! যে কেউ গল্প শোনালেই টাকা দেবে বলেছে!
হুম! আনমনে মাথা নাড়লো কিশোর। ভাবছে কিছু।
প্রতিবাদ করা উচিত ছিলো! রবিন বললো।
শুরু করেছিলাম তো, বললো মুসা। পাত্তাই দিলো না!
হ্যাঁ। বড়দেরকে এভাবে ঠকাতে পারতো না। আমরা ছেলেমানুষ বলেই...
বড়দেরকে টাকা দিলে তখন গিয়ে ধরবো মেজরকে! দুই সহকারীর মুখোমুখি হলো গোয়েন্দাপ্রধান। চলো, মেজরের ওপর নজর রাখবো।

.

সাইকেলগুলো যেখানে আছে সেখানেই রেখে, দৌড়ে দেয়াল ঘুরে চত্বরের পেছনে চলে এলো তিন গোয়েন্দা। দেয়ালে চড়ে বসলো। দোকানগুলোর পেছনে। পুরনো একটা ওক আর একটা জ্যাকারাণ্ডা ডালপালা ছড়িয়েছে, ওসবের আড়ালে মোটামুটি লুকিয়ে থেকে দৃষ্টি দিলে মেজরের ঘরে। আরেকটা ছেলের সাক্ষাৎকার নেয়া হচ্ছে। জানালা বন্ধ, তার ওপর এয়ারকুলারের গুঞ্জন, ভেতরের কথা কিছুই। শুনতে পেলো না গোয়েন্দারা। তবে কি ঘটছে, আন্দাজ করতে একটুও অসুবিধে হলো না।
দেখো! নিচু গলায় বললো মুসা।
তিনজনেই দেখলো, ঘরের ছেলেটার চোখে হঠাৎ বিস্ময় দেখা দিয়েছে। তর্ক শুরু করলো। একরকম জোর করেই তাকে ঠেলে বের করে দিলেন মেজর।
হু, মাথা দোলালো রবিন, শুধু আমাদের সঙ্গেই এরকম করেনি।
কিশোর বললো, এই, টনির ওপর চোখ রাখো!
রাখছিই তো, মুসা বললো। আর কি দেখবো?
দেখোই না কি করে।
পনেরো-ষোল বছরের একটা ছেলে ঘরে ঢুকলো। কথা বলতে আরম্ভ করলো। কয়েক মিনিট শুনেই তাকে বের করে দিলেন মেজর। ছেলেটা বেরিয়ে যেতেই

টেপ রেকর্ডারের একটা বোতাম টিপলো টনি। কিছুক্ষণ বিরতি দিয়ে আবার আরেকটা বোতাম টিপে মাইক্রোফোনটা রেডি করলো। পরের ছেলেটা যখন এলো, আবার ঘুরতে শুরু করেছে মেশিনের টেপ।
রিওয়াইন্ড করে নিয়ে আবার রেকর্ড করছে, মুসা বললো ধীরে ধীরে। কি দেখতে বললে বুঝলাম না…
বুঝেছি! বলে উঠলো রবিন। বার বার একই কাজ করছে। একটা। ফিতাকেই টেনে টেনে বার বার তাতে রেকর্ড করছে!
এবং, যোগ করলো কিশোর, আগের বার যেটা রেকর্ড করছে, পরের বারই সেটা মুছে ফেলছে।
মুছে ফেলছে? হাঁ হয়ে গেছে মুসা। তারমানে আমরা যা বলে এসেছি, সেসবও মুছে ফেলেছে?
কারো কথাই রাখছে না, সেকেণ্ড, সব মুছে ফেলছে।
তাহলে আবার ডাকবে কিভাবে?
ডাকবে না, জবাব দিলো রবিন।
ভালো প্রশ্ন করেছো, কিশোর বললো। কেন…, সতর্ক হয়ে গেল সে। এই একজন বড় মানুষ! দেখা যাক, এবার নতুন কিছু করে কিনা?
একই ভঙ্গিতে, একই হাসি দিয়ে লোকটাকে স্বাগত জানালেন মেজর। টেপ রিওয়াইও করেছে টনি। লোকটাও বেশিক্ষণ গল্প বলতে পারলো না, ছেলেদের মতোই বের করে দেয়া হলো তাকেও।
আসলে, মেজর যে মিছে কথা বলছেন কেউই বুঝতে পারছে না, বিড়বিড় করে বললো কিশোর। সবাই ভাবছে, আবার ডাকা হবে তাদেরকে।
তার মানে ফাঁকিবাজি, রবিন বললো। কিন্তু কেন?
মাথা নাড়লো কিশোর। বুঝতে পারছি না। বিজ্ঞাপন করে ডেকে নিয়ে আসা হলো সবাইকে। টেপে কথা তুলে আবার মুছে ফেলছে! অবাক কাণ্ড! নিচের ঠোঁটে ঘন ঘন চিমটি কাটতে লাগলো সে।
একসাথে দুজন ঢুকলো মেজরের ঘরে। একজন লম্বা, রোগা, দাড়ি আছে। পরনে জাহাজ ক্যাপ্টেনের ইউনিফর্ম। ছোট একটা ছেলের হাত ধরে ঢুকেছেন। হতিনি। ওঁদেরকে দেখে চঞ্চল হয়ে উঠলেন মেজর, হঠাৎ যেন বড় বেশি আগ্রহী। মনে হলো তাকে। ক্যাপ্টেনের সাথে হাত মেলালেন তিনি, বাচ্চাটার গাল টিপে আদর করলেন। দুজনকেই আদর করে এনে বসালেন চেয়ারে। মাইক্রোফোন মুখের কাছে এনে যখন কথা বলতে লাগলেন ক্যাপ্টেন, উৎসুক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন মেজর।

নবাগতদের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে রবিন বলে উঠলো, ছেলেটাকে চিনতে পেরেছো? আমাদের ইস্কুলে পড়ে, নিচের ক্লাসে। ক্যাপ্টেন নিশ্চয় তার বাবা।
জাহাজের ক্যাপ্টেন মনে হচ্ছে? মুসা বললো।
অনেকটা তা-ই। পাইরেটস কোভে বেগুনী জলদস্যুর আড্ডার নাম শুনেছো?
শুনেছি, ডিজনিল্যাণ্ডের মতোই অনেকটা। তবে খুব সামান্য ব্যাপার। জাহাজে করে যেতে হয়, জলদস্যুদের কি কি সব দেখায়, ব্যস।
মাথা ঝাঁকালো কিশোর। আমিও শুনেছি। কবছর হলো খুলেছে। এখনও। তেমন পরিচিত হয়নি।
ব্যবসাও হচ্ছে না, রবিন বললো। বেগুনী জলদস্যুর বিশেষজ্ঞ বলা হয়। ক্যাপ্টেন ফিলিপকে। একবার আমাদের ইস্কুলে লাইব্রেরীতে একটা ছোটখাট লেকচার দিয়েছিলেন তার ওপরে, তোমরা সেদিন ছিল না।
আরে, মেজর বেরিয়ে যাচ্ছে! মুসা বললো।
মাইক্রোফোনের সামনে বসে তখনও গল্প বলে যাচ্ছেন ক্যাপ্টেন ফিলিপ। পাশে বসে আছে তার ছেলে পিটার। মিনিটখানেক পরে রাস্তার দিক থেকে শোনা গেল সম্মিলিত চিৎকার। আবার কোনো কারণে রেগেছে গল্প বলিয়েরা। দেয়াল। থেকে নেমে পড়লো মুসা। ঝোঁপের আড়ালে থেকে দেয়াল ঘেঁষে এগোলো কি হয়েছে দেখে আসার জন্যে। কয়েক মিনিট পরেই ফিরে এলো উত্তেজিত হয়ে।
সবাইকে ভাগিয়ে দিচ্ছেন মেজর। গেটের ওপর নো মোর ইন্টারভিউ লেখা সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দিয়েছে রিগো। আজ আর কোনো সাক্ষাৎকার নেয়া হবে না। আবার ফাঁকি দেয়া হলো গল্প বলিয়েদের। ফিরে এলেন মেজর। পেছন পেছন এলো হাতির বাচ্চা রিগো–অন্তত মুসার কাছে লোকটাকে সেরকমই লাগছে। ইশারায় তাকে কথা বলতে মানা করলেন। নিরেক।
খাইছে! ক্যাপ্টেনের গল্প ঠিকই রেকর্ড করা হচ্ছে! পুরোপুরি!
বুঝেছি! আচমকা চেঁচিয়ে উঠেই কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে ফেললো রবিন। কেউ শুনে ফেললো কিনা তাকিয়ে দেখলো আশেপাশে। ক্যাপ্টেন ফিলিপ বেগুনী জলদস্যুর বিশেষজ্ঞ। নিরেক শুধু বেগুনী জলদস্যুর গল্পই চান, সেজন্যে আর সবাইকে ভাগিয়ে দিয়েছেন।
না। মনে করিয়ে দিলো কিশোর, বেগুনী জলদস্যুর গল্প আমিও বলতে চেয়েছিলাম। শোনেননি।
হয়তো খেয়ালই করেননি, মুসা যুক্তি দেখালো।
কিংবা গুরুত্ব দেননি, বললো রবিন। কারণ মেজর জানেন, ক্যাপ্টেন ফিলিপ বললে অনেক বেশি বলতে পারবেন। তাকেই তার দরকার ছিলো।

তাহলে তাঁর বাড়িতে গিয়ে কেন বললেন না, যে গল্প শুনতে চাই? কিশোরের জিজ্ঞাসা। কেন এতোসব ঝামেলা করতে গেলেন?
কি জানি..., গাল চুলকালো রবিন।
টাকা বাঁচানোর জন্যে, কিশোর, মুসা বললো। বাবা বলে, যদি শস্তায় কিছু। পেতে চাও, পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দাও। অনেকে হাজির হবে, দামদর করার সুযোগ পাবে।
রবিনের কথাই ঠিক, ক্যাপ্টেনের মুখেই গল্পটা শুনতে চেয়েছেন নিরেক। কায়দা করে ডেকে এনেছেন পুরো গল্পটা শোনার জন্যে, কম পয়সায়।
এটা অবশ্য হতে পারে। এই যুক্তিটাও তেমন জোরালো মনে হলো না কিশোরের।
সাক্ষাৎকার ওদিকে চলছে। সাড়ে এগারোটায় ঘড়ি দেখলেন ক্যাপ্টেন। চেয়ার থেকে উঠতে গেলেন। তাকে আবার বসিয়ে দিলেন নিরেক। পকেট থেকে টাকা বের করে দিলেন। নিতে আপত্তি করলেন ফিলিপ। জোর করেই তাঁর হাতে টাকাটা গুঁজে দিলেন মেজর। বার বার হাত ধরে ঝাঁকালেন। পিটারের মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করলেন। এগিয়ে দিতে গেলেন দুজনকে।
টপাটপ লাফিয়ে দেয়াল থেকে নেমে পড়লো তিন গোয়েন্দা। ঝোঁপের। আড়ালে আড়ালে ছুটলো চত্বরের সামনের দিকে।
গেটের ফাঁক দিয়ে দেখলো, রাস্তার পাশে দাঁড় করিয়ে রাখা পুরনো একটা পিকআপ ট্রাকের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন ফিলিপ আর পিটার। গাড়িটার রঙ বেগুনী। পাশে সোনালি অক্ষরে বড় করে লেখা রয়েছেঃ
বেগুনী জলদস্যুর আড়া
একদিনের জন্যে জলদস্যু হোন!
গেটের কাছে দাঁড়ানো মেজরের দিকে ফিরে বললেন ফিলিপ, তাহলে রাতে। দেখা হচ্ছে। নটায়।
বেগুনী পিকআপে করে চলে গেলেন ফিলিপ আর পিটার।
আজ রাতে? ফিসফিস করে বললো মুসা।
নিশ্চয় বেগুনী জলদস্যুর সমস্ত গল্পটা শুনতে চান মেজর, অনুমান করলো রবিন।
কিন্তু..., থেমে গেল কিশোর।
চত্বরে দাঁড়ানো একটা ছোট ট্রাকের এঞ্জিন গর্জে উঠেছে। চালিয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল উনি। গেটটা লাগিয়ে দিয়ে দোকানের পেছনের ঘরে ফিরে এলেন মেজর আর রিগো।
ঝোঁপের আড়ালে আড়ালে আবার আগের জায়গায় চলে এলো তিন গোয়েন্দা। দেখলো, টেবিলে কি যেন রেখে ঝুঁকে দেখছেন মেজর আর রিগো।
দলিল, না ছবি? মুসার প্রশ্ন।

নকশা-টকশা হতে পারে, রবিন বললো।
আরো কাছে থেকে দেখতে যাবে ছেলেরা, এই সময় চত্বরে গাড়ির এঞ্জিনের শব্দ হলো। নতুন আরেকজন লোক এসে ঢুকলো দোকানে। খাটো, মোটা, মাথায় একটা রোয়াও নেই, পুরোপুরি টাক। নাকের নিচে মস্ত, বেমানান গোফ। উত্তেজিত ভঙ্গিতে মেজরের পাশে দাঁড়িয়ে আঙুল দিয়ে টেবিলে রাখা জিনিসটা দেখাতে লাগলো। খানিক পরেই হাসতে শুরু করলো। তাতে যোগ দিলেন মেজর। রিগোকেও খুশি দেখাচ্ছে।
বন্ধ জানালার কারণে এবারেও ভেতরের কথা শুনতে না পেরে হতাশ হয়ে পড়লো তিন গোয়েন্দা। এগিয়ে গিয়ে বোতাম টিপে টেপ রেকর্ডারে লাগানো ক্যাসেটের ফিতা রিওয়াইও করতে লাগলেন মেজর।
কিশোর? মুসা বললো। এটাতেই রেকর্ড করেছিলো না ক্যাপ্টেনের কথা?
মুসার মুখের দিকে তাকালো একবার কিশোর আর রবিন, পরক্ষণেই মাথা ঘোরালো টেপ রেকর্ডারের দিকে। রিওয়াইণ্ডিং চলছে এখনো।
ওটাই হবে! রবিন বললো উত্তেজিত কণ্ঠে। টনি ক্যাসেটটা বের করেনি, আমি খেয়াল রেখেছি। ক্যাপ্টেনের সাথে সাথে তিনজনেই বেরিয়ে গিয়েছিলো, ঘরে আর কেউ ছিলো না। মেজর আর রিগো ফিরে এসেও মেশিনটার কাছে যায়নি।
চোখ মিটমিট করলো বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে। ক্যাপ্টেনের কথাও মুছে ফেলছে!
তারমানে, গম্ভীর হয়ে বললো কিশোর, বেগুনী জলদস্যুর কাহিনীও চায় না ওরা।
কিন্তু ক্যাপ্টেনের গল্প তো শুনলো, মুসা বললো।
তার কথা শোনার জন্যে ভাগিয়ে দিলো সবাইকে, বললো রবিন।
এমনকি টাকাও দিলো, কিশোর বললো। উদ্দেশ্য যা-ই হোক, সেটার সঙ্গে ক্যাপ্টেন ফিলিপ আর পিটারের সম্পর্ক আছে।
কিন্তু উদ্দেশ্যটা কী?
ঘটছেই বা কী? রবিনের সুরে সুর মেলালো মুসা।
সেটাই, কিশোর বললো, জানার চেষ্টা করবো আমরা। চলো, বাড়ি যাই। খিদে পেয়েছে। বিকেলে আবার আসবো, নজর রাখবো মেজর আর তার। লোকজনের ওপর। ক্যাপ্টেন ফিলিপের সঙ্গেও কথা বলবো। হাসি ফুটলো তার মুখে। মনে হচ্ছে, নতুন আরেকটা কেস পেয়ে গেল তিন গোয়েন্দা!

.

০৪.

সেদিন আর মেজরের ওখানে যেতে পারলো না তিন গোয়েন্দা। ইয়ার্ডে ফিরতেই রাশেদ পাশা বললেন, তাঁর সঙ্গে যেতে হবে কিশোরকে। স্যান লুইস। অবিসপোতে অনেক পুরনো মাল দেখে রেখে এসেছেন। সেগুলো কিনবেন। রবিনকেও আটকে

দিলেন লাইব্রেরিয়ান, যেখানে সে পার্টটাইম চাকরি করে। একজন কর্মচারি অসুস্থ হয়ে পড়ায় বাড়তি কাজ করতে হলো রবিনকে। মুসাকে আটকালেন তার মা। গ্যারেজ আর তার আশপাশটা পরিষ্কার করা হয় না অনেকদিন। লাগিয়ে দিলেন সেই কাজে। দুই দিন পর রেহাই পেলো তিনজনেই ওরা। সকাল এগারোটায় এসে মিলিত হলো হেডকোয়ার্টারে। মেজর নিরেকের বেঅদ্ভুত আচরণের ব্যাপারে আলোচনার জন্যে।

কাল রাতে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম, কিশোর জানালো। গিয়ে দেখি ক্যাপ্টেন ফিলিপ আর পিটারের কথা রেকর্ড করছেন মেজর।

দ্রুত আলোচনায় ঠিক হলো, সাইকেল নিয়ে পাইরেটস কোভে যাবে কিশোর আর মুসা। আর তিন গোয়েন্দার নতুন, আজব আবিষ্কারটা বয়ে নেবে রবিন।

এটা একটা অদৃশ্য অনুসরণের যন্ত্র, বললো কিশোর। যাকে চাই, সে চোখের আড়ালে থাকলেও খুঁজে বের করে ফেলতে পারবো।

ছোট্ট যন্ত্রটা হাতে নিয়ে দেখতে লাগলো মুসা। একটা পকেট রেডিওর সমান। ভেতরে একটা ধাতব পাত্র রয়েছে, তাতে ঘন এক ধরনের তরল পদার্থ ভরা। নিচের দিকে একটা সরু টিউব, চোখে ওষুধ দেয়ার ড্রপারের মতো জিনিস। ড্রপারের ভেতরে একটা খুদে ভালভ আছে। বাক্সের একপাশে একটা শক্তিশালী। চুম্বক লাগানো।

কি করে কাজ করে এটা, কিশোর? রবিন জিজ্ঞেস করলো।

অদৃশ্য চিহ্ন রেখে যাবে এটা, বুঝিয়ে বললো কিশোর। আমাদের ছাড়া আর কারও চোখে পড়বে না। যে কোনো যানবাহনের ধাতব বডিতে চুম্বকের সাহায্যে আটকে দিতে পারবো যন্ত্রটা। ভেতরের তরল কেমিক্যাল সাধারণ ভাবে দেখা যায় না, অতিবেগুনী আলো ফেলতে হয়। আলট্রাভায়োলেট লাইট যাকে বলে। ড্রপারের মাথার কাছে লাগানো ভালভটা নির্দিষ্ট সময় পর পর সরে গিয়ে একফোঁটা করে কেমিক্যাল ছেড়ে দেবে বাইরে। মাটিতে পড়বে জিনিসটা, আর সুন্দর একসারি চিহ্ন রেখে যাবে। হাতে আলট্রাভায়োলেট টর্চ থাকলে ওই চিহ্ন ধরে অনুসরণ করে যাওয়া খুবই সহজ।

তারমানে আলট্রাভায়োলেট টর্চও আছে আমাদের কাছে?

নিশ্চয়ই, হেসে বললো কিশোর। ছোট একটা টর্চ বের করে দিলো রবিনের হাতে। সাধারণ টর্চের মতোই দেখতে, শুধু বা অদ্ভুত।

এটা থেকেই বেরোবে আলট্রাভায়োলেট লাইট? উসখুস করে জিজ্ঞেসই করে ফেললো মুসা, ওটা কি ধরনের আলো, কিশোর? ক্লাসে নিশ্চয় পড়িয়েছে, আমি বোধহয় অ্যাবসেন্ট ছিলাম।

সাধারণ আলোর চেয়ে এই আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য খাটো, ব্যাখ্যা করলো রবিন। ব্ল্যাক লাইট বা কৃষ্ণ আলোকও বলা হয় একে। অন্ধকারে কোনো কিছুর ওপর এই আলো ফেললে একধরনের বিচিত্র আভা দেখা যায়, নামটা হয়েছে সে-কারণেই। আরেকটা ব্যাপার, যে জিনিসের ওপর ফেলবে, সেই জিনিসটা দেখা যাবে, কিন্তু আলোক রশ্মি দেখা যাবে না।
ইনফ্রারেড লাইটের মতো, তাই না? তবে ওটা শুধু রাতে কাজ করে। আলট্রাভায়োলেট কি দিনেও কাজ করবে, মানে দেখা যাবে এটা দিয়ে?
যাবে, তবে রাতের মতো অতো উজ্জ্বল হবে না চিহ্নগুলো, স্পষ্ট হবে না। এতে বরং সুবিধেই। আশপাশে কেউ থাকলে তার চোখ এড়ানো সহজ হবে। রবিন, মেজরের গাড়িতে যন্ত্রটা লাগিয়ে দেবে। তারপর সাইকেল নিয়ে অনুসরণ করবে চিহ্ন। যন্ত্রের কনটেইনারে লিকুইড কেমিক্যাল যা ভরা আছে, তাতে অন্তত দুঘন্টা চলবে। তার মানে বহুদূর পর্যন্ত অনুসরণ করতে পারবে গাড়িটাকে।
বসে আছি কেন তাহলে?
হ্যাঁ, চলো।
যন্ত্র আর টর্চ একটা ব্যাকপ্যাকে ভরে ব্যাগটা পিঠে বেঁধে নিলো রবিন। দুই সুড়ঙ্গ দিয়ে বেরিয়ে এলো তিনজনে। সাইকেল রাখা আছে ওয়ার্কশপে। নিয়ে। বেরিয়ে পড়লো ওরা। রবিন রওনা হয়ে গেল শহরের দিকে। কিশোর আর মুসা চললো উত্তরে, শহরের প্রান্তসীমার দিকে, সাগরের সীমানাও শুরু হয়েছে ওখান থেকেই।
মনের ভাবনাটা মুসার কাছে প্রকাশ করে ফেললো কিশোর, ব্যাপারটা কাকতালীয় মনে হচ্ছে আমার কাছে, বুঝলে। শহরের ভেতরের কারো গল্প শুনতে চাইলেন না মেজর, শুধু শহর এলাকার বাইরে…
আরেকটা সেটআপ। চালাকি। ক্যাপ্টেন ফিলিপকে ধরার জন্যে। ঠিক না?
হতে পারে।

.

রকি বীচের কয়েক মাইল উত্তরে উপকূলরেখা বরাবর একটা ছোট খাড়ির নাম। পাইরেটস কোভ। ছোট্ট একটা গ্রাম আছে ওখানে, অল্প কয়েকটা ঘর আর দোকানপাট আছে। কিছু মাছধরা নৌকা আর জাহাজ আছে। আর আছে একটা এয়ার ট্যাক্সি সার্ভিস। সাইকেল চালিয়ে সাগরের তীরে চলে এলো কিশোর আর মুসা। খাড়ির কাছাকাছি আসতে চোখে পড়লো কাঁচাহাতে আঁকা একটা সাইনবোর্ডঃ
বেগুনী জলদস্যুর আড্ডা
ছোট-বড় সবার জন্যেই চমৎকার অ্যাডভেঞ্চার।

একটা কারখানা বাড়ির পরেই এই টুরিস্ট অ্যাট্রাকশন। আড্ডাটা গড়ে তোলা হয়েছে খাড়ির মাঝের একটা ছোট উপদ্বীপে। মূল ভূখণ্ডের দিকটায় কাঠের পুরনো বেড়া। বেড়ার বাইরে দুটো জায়গায় গাড়ি পার্ক করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। যে পথ ধরে চলেছে কিশোররা, তার ডানে ঘন গাছের একটুকরো জঙ্গল, তার ওপাশেও বেড়া।

দুটো পার্কিং লটেই প্রচুর ধুলো। অল্প কয়েকটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে এই সকাল বেলা। গেটের বাইরে টিকেট বুদের কাছাকাছি বসে সোডা খাচ্ছে কয়েক জোড়া দম্পতি। তাদের বেয়াড়া বাচ্চাগুলো চেঁচামেচি করছে,মারামারি করছে। দুটো ছেলে একে অন্যকে ল্যাং মেরে ফেলে দেয়ার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে। বুদের ওপরে একটা কাঠের সাইনবোর্ডে পাইরেট শো-এর সময় লেখা রয়েছেঃ

ব্লাক ভালচার-এর যাত্রার সময়

প্রতিদিন ১২টা, ১টা, ২টা, ৩টা, ৪টা।

বুদের ভেতরে বসে আছে একজন গাঁট্টাগোট্টা লোক। অনবরত বাতাসের মধ্যে কাটিয়ে মুখের চামড়ার এমন অবস্থা হয়েছে, দেখে আর এখন বোঝার উপায়। নেই বয়েস কতো। ডোরাকাটা একটা নাবিকদের শার্ট পরেছে সে। চোখে লাগিয়েছে কালো কাপড়, অন্ধরা যেমন লাগায়। মাথায় লাল রুমাল বাঁধা। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে চলেছে, ভাবলেই গায়ের লোম খাড়া হয়ে যায়, দর্শকবৃন্দ। কল্পনাই করতে পারবেন না কতোখানি রোমাঞ্চকর এই অভিযান। নিশ্চয় লিখে মুখস্থ করে নিয়েছে এই বক্তৃতা, ভাবলো কিশোর। লোকটা বলছে, বেগুনী জলদস্যুর আড্ডায় এসে একদিনের জন্যে জলদস্যু হয়ে যান সবাই। জাহাজে পাল তুলে দিয়ে বেরিয়ে পড়ুন পাইরেটস কোভে। মাথার ওপর দুলবে কালো পতাকা, তাতে মড়ার খুলির নিচে হাড়ের ক্রস আঁকা। অদ্ভুত দেখতে একটা স্কোয়ার-রিগার টাইপের জাহাজ। জলদস্যুরা যেরকম পছন্দ করতো। আবার তার নামেরই বা কি বাহার দেখুন, ব্ল্যাক ভালচার। কালো শকুন। কেমন গা ছমছম করে না? দ্বীপে দ্বীপে দেখবেন লড়াই চলছে। বারুদের গন্ধ ভাসে বাতাসে, আপনিও পাবেন সেই গন্ধ। নিজের চোখে দেখবেন কি করে আক্রমণ করে জলদস্যুরা। আর মাত্র কয়েকটা টিকেট বাকি। বিশ মিনিটের মধ্যেই ছাড়বে ব্ল্যাক ভালচার। পেছনে পড়ে থাকবেন না। হেলায় সুবর্ণ সুযোগ হারাবেন না। আসুন, জলদি আসুন।

অবাক হয়ে এদিক ওদিক তাকালো দম্পতিরা, এতো টিকেট কারা কিনে ফেললো যে মাত্র অল্প কয়েকটা বাকি আছে? কাউকেই চোখে পড়লো না, শুধু ওর ছাড়া। তবে দেরিও করলো না। উঠে গিয়ে লাইন দিলো টিকেট কাউন্টারে সামনে। দলে গিয়ে দাঁড়ালো কিশোর আর মুসা। যখন কিশোরের পালা এলো। জানালার কাছে

মুখ নিয়ে গিয়ে বললো সে, ক্যাপ্টেন ফিলিপের সঙ্গে দেখা করতে চাই, ভাই, খুব জরুরী।
লোকটার একটামাত্র চোখ তাকিয়ে রয়েছে কিশোরের দিকে। শো-এর সম ক্যাপ্টেন কারো সঙ্গে দেখা করেন না।
কিন্তু, তর্ক শুরু করলো কিশোর, শো তো এখনও…
ক্যাপ্টেন এখন জাহাজে। মারিয়া!
উঠে পড়লো কানা নাবিক। চলে গেল বুদের পেছনের ঘরে। প্রায় দৌড় এসে তার জায়গায় বসলো আঠারো-উনিশ বছরের একটা মেয়ে। জলপাই রঙের চামড়া মুখের। কালো চুল, বেণি করেছে।
কটা? কিশোরকে জিজ্ঞেস করলো মারিয়া। কথায় স্প্যানিশ টান।
ক্যাপ্টেন ফিলিপকে দরকার, মিস। এখুনি।
বুঝলাম না। কটা টিকেট? দুটো? কেমন যেন অনিশ্চিত শোনালো মেয়েটার কণ্ঠ।
ওভাবে বলে হবে না, কিশোর, পেছন থেকে বললো মুসা। কি করবে?
আর কি করবো? টিকেটই কাটতে হবে। জাহাজে উঠে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দেখা করতে হবে আরকি।

.
টিকেট কেটে, চওড়া একটা গেটের দিকে এগোলো দুজনে। কাঠের ফ্রেমে কাঁটাতারের বুনন দিয়ে তৈরি হয়েছে পাল্লা। দুটো পাকা নিচু বাড়ির মাঝখান দিয়ে চলে গেছে পথ, একেবারে ডক পর্যন্ত। ডকে বাঁধা রয়েছে জাহাজটা, ব্ল্যাক ভালচার। কাঠের সিঁড়ি নামিয়ে দেয়া হয়েছে যাত্রীদের জন্যে। দুই মাস্তুলের। পালতোলা প্রাচীন স্কোয়ার-রিগার জাহাজের মতো করে তৈরি করা হয়েছে। কালো রঙ। প্রধান মাস্তুলে উড়ছে কালো জলি রোজার পতাকা, তাতে জলদস্যুদের কুখ্যাত চিহ্ন আঁকা রয়েছেঃ মড়ার খুলি আর হাড়ের ক্রস।
গেটের অন্যপাশে চলে এলো দুই গোয়েন্দা। নিচু বাড়িগুলো বোধহয় আস্তাবল ছিলো একসময়, পরে গ্যারেজ হিসেবে ব্যবহার হয়েছে। বাঁয়ের বাড়িটায় এখন তিনটে দোকান। একটাতে আইস ক্রীম আর কোল্ড ড্রিংকস বিক্রি হয়। আরেকটায় ভনির। আর তৃতীয়টাতে বিক্রি হয় কফি আর হট ডগ। ডানের বাড়ির সামনেটা পুরো খোলা। মিউজিয়ম করা হয়েছে। তাতে জাহাজী আর জলদস্যুদের ব্যবহৃত নানা জিনিসের প্রদর্শনী চলছে। দুটো বাড়ির মাথায়ই জলি। রোজার পতাকা উড়ছে। তৃতীয় আরেকটা উড়ছে গেটের ওপর। সব কিছুই কেমন। মলিন। ঠিকমতো রঙ করা হয়নি। পুরনো, ক্ষয়া চেহারা।
ডানে, মিউজিয়মের পেছনে অনেকগুলো ওকগাছের পেছনে দেখা গেল বোটহাউস। তারও পরে পাথরের একটা টাওয়ার। ওদিকে পানির একটু পর

থেকেই শুরু হয়েছে একসারি দ্বীপ, মোট চারটে। এতোই ছোট, ঘর বানিয়ে মানুষ বাসেরও অনুপযুক্ত। দ্বীপ ছাড়িয়ে, খাড়ির অপর পারে দেখা গেল এয়ার ট্যাক্সি সার্ভিসের একটা প্লেন উঠে গেল রানওয়ে থেকে।
আহামরি কোনো জায়গা নয়, আনমনে বললো কিশোর। দেখার তেমন কিছু নেই।
রবিন তো বললোই, ব্যবসায় সুবিধে করতে পারছেন না ক্যাপ্টেন ফিলিপ, মুসা বললো। হয়তো এই দুর্বলতাটাকেই কাজে লাগিয়ে কিছু করতে চাইছেন মেজর নিরেক।
তা হতে পারে।
দুটো বিল্ডিঙের মাঝের চওড়া প্রমেনাড় ধরে হেঁটে চললো ওরা। ডানের মিউজিয়মের দিকে তাকালো। ধুলোয় ঢাকা তলোয়ার, মরচে পরা কামান-বন্দুক, মোমে তৈরি জলদস্যু আর নাবিকদের মূর্তি, আর জাহাজীদের নানা-রকমের পোশাক সাজিয়ে রাখা হয়েছে। সেগুলোও তেমন মনোযোগ আকর্ষণ করে না দর্শকদের, বুঝতে পারলো কিশোর। ডকের কাছে পৌঁছে একটা ছেলেকে দেখতে পেলো। ঢলঢলে শার্ট গায়ে, পরনে ঢেলা, ফোলা প্যান্ট, জলদস্যুরা যেরকম পরতো।
পিটার ফিলিপ! বলে উঠলো মুসা।
বেশ জোরেই বলেছে সে, কিন্তু ছেলেটা শুনলো বলে মনে হলো না। দ্রুত এগিয়ে গেল ব্ল্যাক ভালচারের সিঁড়ির দিকে। জাহাজের পেছনের কোয়ার্টারডেকে পায়চারি করছেন ক্যাপ্টেন ফিলিপ। কালো, লম্বা ঝুলওয়ালা কোট গায়ে। গোড়ালি ঢাকা উঁচু বুট পরেছেন। কোমরে চওড়া চামড়ার বেল্ট, তাতে ঝুলছে ভোজালি। ছেলের মতোই তিনিও একটা ট্রাইকর্ন হ্যাট মাথায় দিয়েছেন, তাতে লাল পালক গোঁজা। বাঁ হাতের তালু আর আঙুল যেখানে থাকার কথা, সেখানে দেখা গেল বাঁকা একটা স্টীলের হুক। লাগিয়ে নিয়েছেন জলদস্যুর ভয়ংকরতা বোঝানোর জন্যে। টুরিস্টদের দিকে তাকিয়ে গর্জে উঠলেন, ইয়ো হো হো, অ্যাণ্ড আ বটল অভ রাম! জলদি করো, জলদি করো, উঠে এসো! ব্যবসায়ীদের একটা জাহাজ দেখতে পাচ্ছি! স্রোতও চমৎকার! এখুনি নোঙর তুলে তাড়া করবো ওটাকে!
এমন ভঙ্গিতে কথাগুলো বললেন ক্যাপ্টেন, মুসার মনে হলো এটা অভিনয় নয়, সত্যি সত্যি। রোমাঞ্চিত হলো সে। নীরবে জাহাজে উঠে গেল দুই গোয়েন্দা। হঠাৎ গান গেয়ে উঠলো একদল জলদস্যু, বুনো চিৎকারে ঝালাপালা করে দিলো কান। চমকে ওপর দিকে তাকালো মুসা। লাউডস্পীকারে বাজছে ওসব। ঝট করে ডেকের দুই পাশে লাফিয়ে উঠলো অনেক জলদস্যু, কানা চোখে কালো পট্টি লাগানো, দাঁতে কামড়ে ধরে রেখেছে ছুরি, যেন অন্য জাহাজের ওপর ঝাঁপিয়ে

পড়তে প্রস্তুত। কার্ডবোর্ডে তৈরি ওগুলো। সামনের মাস্তুলে পতপত করছে একটা পাল। ঢিলে ভাবে। চলতে আরম্ভ করলো ব্ল্যাক ভালচার। বাতাসের সঙ্গে ওটার যাত্রাপথের কোনো সম্পর্ক নেই। এঞ্জিনে চলছে।
দূর, বিরক্ত হয়ে হাত নাড়লো মুসা, মজাটাই নষ্ট করে দিলো ওই লাউডস্পীকার আর এই এঞ্জিন! বেশি মেকি হয়ে গেল।
দর্শক বেশি না। বিষণ্ন চোখে দেখছে ওরা পাল আর হার্ডবোর্ডের মানুষগুলোকে। হঠাৎ ঝড়ো বাতাস আর উত্তাল ঢেউয়ের ভারি শব্দ যেন ছিটকে বেরিয়ে এলো লাউডস্পীকার থেকে। জলদস্যুদের গান আর চেঁচামেচি বন্ধ হয়নি। এরই মাঝে এঞ্জিনের ভটভট-ভটভট আওয়াজটা ভারি বেমানান। পাইরেটস কোভের দিকে এগিয়ে চলেছে জাহাজ।
বাজে। আবার বিরক্তি প্রকাশ করলো মুসা। একেবারেই বাজে! কিন্তু এ জিনিসের ওপর এতো আগ্রহ কেন মেজর নিরেকের?
জানি না, কিশোর বললো। দেখে যাও।

.

ডি লা ভিনা স্ট্রীটের দেয়ালে ঘেরা চত্বরের কাছে এসে পৌঁছলো রবিন। কাঠের উঁচু গেট বন্ধ। ঘুরে পেছন দিকে চলে এলো সে, আগের বার যেখানে উঠে বসেছিলো তিন গোয়েন্দা, সেখানে উঠলো। দোকানের পেছনের ঘরটার দিকে তাকালো। কেউ নেই। অপেক্ষা করতে লাগলো সে।
পনেরো মিনিট পর কিচকিচ করে খুলে গেল গেটের ভারি পাল্লা। চত্বরে ঢুকলো একটা গাড়ি। দোকানের পেছনের ঘরটায় এসে ঢুকলেন মেজর। হাতে একটা প্রাস্টিকের ব্যাগ। মনে হয় একাই এসেছেন। ব্যাগ থকে কফির সরঞ্জাম বের করে খেতে বসলেন তিনি। খাওয়া শেষ করে পকেট থেকে ভাঁজ করা একটা কাগজ বের করে খুলে বিছালেন টেবিলের ওপর।
ছোট একটা রুলার বের করে কাগজটার ওপর রেখে মাপজোক করলেন। সন্তুষ্ট মনে হলো তাকে। ছোট একটা নোটবুকে কিছু লিখলেন। উঠে দাঁড়িয়ে কিছু শোনার জন্যে কান পাতলেন। রবিনও শুনতে পেলো শব্দটা। আরেকটা গাড়ি ঢুকলো চত্বরে। দোকানের সামনের দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন মেজর। ডালপালার আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে দেখছে রবিন। গেট দিয়ে ঢুকছে আরও একটা মোটরযান, বড় ট্রাক।
এটাতে করেই দুদিন আগে চলে গিয়েছিলো টনি।
মোট তিনটে ট্রাক এখন চত্বরে। একটা, টনির ট্রাক। দ্বিতীয়টা একটা আইস ক্রীম ভ্যান। আর তৃতীয়টা বিরাট এক লরি, পেছনে প্ল্যাটফর্ম লাগানো রয়েছে ইচ্ছেমতো নামানো যায়, ওঠানোও। যায়। পাশে বড় করে লেখা রয়েছেঃ

হ্যারিসনস ট্রী সার্ভিস। দুজন ট্রাক ড্রাইভারের একজনের পরনে আইস ক্রীম বিক্রেতার শাদা ইউনিফর্ম। আরেকজনের পরনে মালির পোশাক। কোমরের ভারি বেল্ট থেকে ঝুলছে নানারকম যন্ত্রপাতি। রবিনের দিকে পেছন করে রয়েছে ওরা। মেজর নিচু গলায় কথা বলছেন ওদের সঙ্গে। দুটো লোককেই চেনা চেনা লাগছে। রবিনের। কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও মনে করতে পারলো না কোথায় দেখেছে। কথা শেষ করে যার যার ট্রাকে গিয়ে উঠলো ওরা। বেরিয়ে গেল। ভোলাই রইলো। গেটটা।

আবার আগের ঘরে ফিরে এলেন মেজর নিরেক।

দেয়াল থেকে নেমে পড়লো রবিন। গুঁড়ি মেরে চলে এলো দোকানের সামনের দিকে। কানে এলো মেজরের কথা, হ্যাঁ, বুঝেছি, গাধা কোথাকার! দশ মিনিট সময় দিলাম! খটাস করে রিসিভার আছড়ে রাখলেন ক্রেডলে।

তাড়াতাড়ি পকেট থেকে কিশোরের দেয়া যন্ত্রটা বের করে চত্বরে দাঁড়ানো ট্রাকটার দিকে চললো রবিন। নিচের ইস্পাতের ফ্রেমে এমন ভাবে লাগালো ওটা, যাতে ড্রপারের মুখটা নিচের দিকে থাকে। লাগিয়ে আর এক মুহূর্ত দেরি করলো না, এক দৌড়ে এসে ঢুকলো ঝোঁপের ভেতর।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। দোকান থেকে বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠলেন মেজর। গেটের বাইরে ট্রাকটা বের করে থামালেন। নেমে এসে লাগিয়ে দিলেন গেটটা।

ট্রাকটা চলে যাওয়ার শব্দ শুনলো রবিন। দৌড়ে এলো দেয়ালের কাছে। দেয়াল টপকে ওপাশে নেমে চলে এলো একটা টেলিফোন পোস্টের কাছে, যেটাতে সাইকেল বেঁধে রেখে গিয়েছিলো। তাড়াতাড়ি খুলে নিয়ে তাতে চড়ে এলো গেটের কাছে। আলট্রাভায়োলেট টর্চ বের করলো।

সহজেই খুঁজে বের করলো চিহ্ন। অতিবেগুনী রশ্মি পড়ে জ্বলজ্বল করছে। বেগুনী ফোঁটাগুলো। আপনমনেই হাসলো রবিন। এগিয়ে চললো ওই ফোঁটা অনুসরণ করে।

প্রথমে সাগরের দিকে গেছে চিহ্নগুলো, তারপর গিয়ে উঠেছে হাইওয়েতে। উদ্বিগ্ন হলো রবিন। গাড়িতে করে গেছেন মেজর। এই খোলাপথে গাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সাইকেলে করে অনুসরণ করা অসম্ভব। খানিক দূর এগিয়ে আবার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো সে। চিহ্নগুলো হাইওয়ে থেকে আরেক দিকে মোড় নিয়েছে, চলে গেছে বড় একটা শপিং সেন্টারের দিকে।

অনেক গাড়ি পার্ক করা রয়েছে বাজারের পার্কিং লটে। ওগুলোর ভেতর দিয়ে চললো রবিন। চোখ খুঁজছে ভ্যানটাকে। এই দিনের আলোয় মাটির দিকে আলো

জ্বালার ভঙ্গিতে টর্চ ধরে রাখতে সঙ্কোচ লাগছে তার, বোকা ভাবতে পারে লোকে। তবে বাইরে লোকজন তেমন নেই, বেশির ভাগই ভেতরে, কেনাকাটায় ব্যস্ত।
ভ্যানটা চোখে পড়লো না। টর্চ দিয়ে না খুঁজে উপায় নেই। যে যা খুশি ভাবুকগে, বলে মন থেকে জোর করে অস্বস্তি দূর করে দিলো রবিন। চিহ্ন ধরে ধরে এগোলো আবার। একটা হার্ডওয়্যারের দোকানের পাশ দিয়ে চলে গেছে। ফোঁটাগুলো।
সাইকেল থেকে নেমে সাবধানে দোকানটার কোণায় দাঁড়িয়ে উঁকি দিলো সে। দোকানের পাশের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে ভ্যানটা। পেছনের দরজা খোলা। একটু পরেই দোকান থেকে বেরিয়ে এলেন মেজর। পেছনে হস্তীদেহী রিগো। হাতে কয়েকটা বস্তা, আলুর বস্তার মতো।
বস্তাগুলো ভ্যানে তুললো সে। আবার দুজনে গিয়ে ঢুকলো দোকানে। ভ্যানের ভেতরে উঁকি দেয়ার ইচ্ছেটা অনেক কষ্টে ঠেকালো রবিন। বেশি ঝুঁকি নেয়া হয়ে। যাবে। যে-কোনো মুহূর্তে বেরিয়ে আসতে পারেন মেজর আর রিগো। এবং তা-ই করলো ওরা। এবারও আগে আগে বেরোলেন মেজর। পেছনে রিগো বেরোলো হাতে কতগুলো ব্যাটারির মতো জিনিস নিয়ে। ওগুলোও ভ্যানের পেছনে। তুলে দরজা লাগিয়ে দিলো।
এত ঢিলা, ছাগল! ধমক লাগালেন মেজর। জলদি ওঠো। আমার খিদে পেয়েছে।
ভ্যানের সামনের সীটে উঠলো দুজনে।
চট করে সরে গেল রবিন। মেজরের চোখে পড়তে চায় না।
বেগুনী ফোঁটা ধরে ধরে আবার ভ্যানটাকে অনুসরণ করলো সে। এতো জোরে চলেছে, পার্কিং লটের মোড় ঘুরে আরেকটু হলেই গিয়ে পড়েছিলো ভ্যানটার গায়ে। একটা রেস্টুরেন্টের সামনে দাঁড়িয়েছে গাড়ি। কাঁচের দরজার ওপাশে মেজর আর রিগোকে দেখতে পেলো সে। খেতে গেছে, বেরোতে সময় লাগবে। এটাই সুযোগ!
ভ্যানের পেছনের দরজা খুলে ভেতরে তাকালো রবিন। আলুর বস্তাগুলো দেখলো। ব্যাটারিগুলো দেখলো। আরও জিনিস পড়ে আছে মেঝেতে। কতগুলো বেলচা আর গাইতি। মাটি লেগে আছে ওগুলোতে। সদ্য খোঁড়া মাটি!
ভটভট-ভটভট করে পাইরেটস কোবের দিকে চলেছে ব্ল্যাক ভালচার। বাতাস, ঢেউয়ের গর্জন, আর জলদস্যুদের কোলাহল ছাপিয়ে লাউডস্পীকারে গম গম করে উঠলো ক্যাপ্টেন ফিলিপের কণ্ঠ, বেগুনী জলদস্যুর আড্ডায় স্বাগতম। উত্তর লস। অ্যাঞ্জেলেসের সব চেয়ে রোমাঞ্চকর এক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে এসেছেন। আপনারা। কুখ্যাত বেগুনী জলদস্যু আর তার ভয়ংকর সহকারীদের নিষ্ঠুর। কাণ্ডকারখানা দেখবেন আপনারা পাইরেটস কোভে। তবে তার আগে ওই দসর্দারের কথা কিছু জানা থাকা দরকার আপনাদের, আমি মনে করি। কাহিনীর

শুরু আঠারোশো আঠারো সালে, যেদিন আলটা ক্যালিফোর্নিয়ার উপকূলে এসে নোঙর ফেলেছিলো দুটো কালো জাহাজ। একটা থারটি এইট-গান ফ্রিগেট, নাম আরজেনটিনা। কমাণ্ডার ছিলেন একজন ফ্রেঞ্চ প্রাইভেটিয়ার, ক্যাপ্টেন হিপোলাইট ডা বুচার্ড। দ্বিতীয় জাহাজটা টোয়েন্টি সিক্স-গান, ওটার কমাণ্ডার একজন জলদস্যু, পেড্রো কনডে। তার প্রধান সহকারী ছিলো লেফটেন্যান্ট উইলিয়াম ইভানস। জাহাজের সেকেন্ড ইন কমাণ্ড।
জাহাজটায় দুশো পঁচাশি জন লোক ছিলো। আরজেনটিনার পতাকা। আঠারোশো আঠারো সালে স্পেনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমেছিলো আরজেনটিনা। কুখ্যাত সব ডাকাতদের ভাড়া করেছিলো স্প্যানিশ জাহাজ আর শহর আক্রমণ করার জন্যে। কালিফোর্নিয়া তখন স্পেনের দখলে। আঠারোশো আঠারো সালের। একুশে নভেম্বর মনটিরে শহরের ওপর কামানের গোলা ফেলতে আরম্ভ করেছিলো জাহাজ দুটো। ওখানকার গভর্নর ছিলেন তখন সোলা।
বুম্মম্! করে কামান গর্জে উঠলো।
খাইছে! বলে লাফিয়ে একহাত শূন্যে উঠলো মুসা। তার পাশেই রয়েছে। কামানটা। একঝলক কালো ধোঁয়া বেরোলো ওটার মুখ দিয়ে। ছড়িয়ে পড়লো ডেকের ওপর। হাঁচি দিলো কয়েকজন, কাশতে লাগলো অনেকে।
কামানের গোলার জবাব এলো তীর থেকে, গল্পের খেই ধরলেন আবার ক্যাপ্টেন।
সত্যিই এলো জবাব।
কামানের গোলা ফাটলে আর পানিতে পড়লে যেরকম আওয়াজ হয়, তেমন। শব্দ হতে লাগলো লাউডস্পীকারে।
চারটে দ্বীপের প্রথমটার দিকে এগিয়ে চলেছে ব্র্যাক ভালচার। সরু পথ দিয়ে। দ্বীপগুলো একটার সঙ্গে আরেকটা এবং মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত। প্রথম দ্বীপটার পাশ দিয়ে জাহাজ যাওয়ার সময় ঝোঁপের ভেতর থেকে চারটে কার্ডবোর্ডের মূর্তি লাফিয়ে উঠলো। যান্ত্রিক কোনো ব্যবস্থা রয়েছে ওগুলোকে ভোলা এবং নামানোর জন্যে। পুরনো কালের স্প্যানিশ সৈনিকের মূর্তি। ছোট একটা পুরনো কামান, চাকায় গড়িয়ে বেরিয়ে এলো পাথরের আড়াল থেকে। জাহাজ লক্ষ্য করে গোলা ফেললো।
চললো ভয়াবহ লড়াই! বললেন ক্যাপ্টেন ফিলিপ।
বুম করে ধোয়া উদগীরণ করলো আবার জাহাজের কামান। জবাব দিলো। তীরের কামানটা।
শীঘ্রি ডা বুচার্ডের সৈন্যরা তীরে নামলো, বলছেন ক্যাপ্টেন। হটিয়ে দিলো। গভর্নর সোলার সৈন্যদের।

ধীরে এগোচ্ছে ব্ল্যাক ভালচার। গলুইয়ের কাছ থেকে দড়িতে ঝুলে দ্বীপে। নামলো দুজন জলদস্যু, দাঁতে কামড়ে রেখেছে কাঠের ছুরি। ডাঙায় পা দিয়েই কোমর থেকে একটানে ভোজালি বের করে, গালি দিয়ে উঠে কার্ডবোর্ডের সৈন্যগুলোকে আক্রমণ করলো ওরা। ঝোঁপের মধ্যে পড়ে গেল ওগুলো। দুজন। দস্যুই চেনা কিশোর আর মুসার। একজন সেই টিকেট বিক্রেতা, যার বয়েস। আন্দাজ করা যায় না, আরেকজন পিটার ফিলিপ।
কেন ব্যবসা করতে পারছেন না ক্যাপ্টেন, মুসা বললো, বুঝতে পারছি।
আমিও পারছি, শুকনো গলায় বললো, কিশোর।
লাউডস্পীকারে গমগম করছে কণ্ঠ, মনটিরের সমস্ত বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে দস্যুরা, শুধু মিশনারি আর কাস্টোম হাউসটা বাদে। তারপর জাহাজ নিয়ে দক্ষিণে রওনা হলো ওরা। পৌঁছলো গিয়ে রিফোজিও কোভ আর ওরটেগা সিয়েনড়ায়। সমস্ত ধনরত্ন একটা ট্রাংকে ভরে রিফোজিও পাস দিয়ে পালালো ওরটেগারা, সান্তা। ইনেস মিশনে আশ্রয় নেয়ার জন্যে।
দ্বিতীয় দ্বীপটায় পৌঁছলো ব্ল্যাক ভালচার। ঝোঁপ থেকে বেরিয়ে এলো দুজন। মানুষ, মাথায় কাউবয় হ্যাট, পরনে পুরনো ছাঁটের স্যুট। পিটার আর সেই টিকেট বিক্রেতা। প্রথম দ্বীপটা থেকে পায়ে হেঁটে চলে এসেছে এখানে, পোশাক বদলে। নিয়েছে। স্প্যানিশ জমিদার সেজেছে ওরা এখন। ছোট একটা টিলার ওপর দিয়ে একটা ট্রাংক বয়ে নিয়ে চলেছে। লাউডস্পীকারে শোনা যাচ্ছে ছুটন্ত অশ্বারোহী বাহিনী আর জলদস্যুদের চেঁচামেচি।
ঝাঁকে ঝাঁকে জলদস্যু গিয়ে নামলো তীরে, বললেন ক্যাপ্টেন। আগুন। লাগিয়ে দিলো পুরো ওটেগা হাসিয়েনড়ায়।
ঝোঁপের ভেতর হারিয়ে গিয়েছিলো, আবার জলদস্যুর পোশাক পরে বেরিয়ে এলো পিটার আর টিকেট বিক্রেতা। হাতে মশাল। আসল মশাল নয়, তৈরি করা। হয়েছে ঝাড়ুর ডাণ্ডায় লাল প্ল্যাস্টিকের গোলক বসিয়ে। গোলকের ভেতরে ব্যাটারির সাহায্যে ছোট বাল্ব জ্বলছে। একটা স্মোক বম্ব ফাটলো, ছড়িয়ে দিলো ঘন ধোয়া। কার্ডবোর্ড দিয়ে র‍্যাঞ্চ হাউস বানানো হয়েছে। দেয়ালে লাল রঙ করে বোঝাতে চাইছে, আগুন জ্বলছে। চিৎকার করে সেই আগুনের চারপাশে নাচানাচি শুরু করলো দুই জলদস্যু।
উপকূল ধরে এগিয়ে চললো দুটো জাহাজ, বললেন ক্যাপ্টেন। পথে বাড়িঘর যা চোখে পড়লো, সব পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে লাগলো। পৌঁছলো। তৎকালীন বুয়েনাভিস্তা কোভে। এখানকার বড় বড় স্প্যানিশ জমিদারেরা শেষ। চেষ্টা করলো লস অ্যাঞ্জেলেস আর স্যান ডিয়েগোর শহরগুলোকে বাঁচানোর।

খাঁড়ির সব চেয়ে বড় দ্বীপটার দিকে এগোচ্ছে জাহাজ। কার্ডবোর্ডের অসংখ্য মূর্তি উঠে দাঁড়াচ্ছে ঝোঁপের ভেতর থেকে। রঙ দিয়ে পোশাক একে বোঝানো হয়েছে কোনটা কোন ধরনের মানুষ। কাঁচা হাতে রঙ করা হয়েছে। বেশির ভাগই রঙ নষ্ট হয়ে গেছে। কিছু মূর্তি ভেঙে গেছে কয়েক জায়গায়। প্রথমে পাহাড়ের। গোড়ায় দেখা দিলো একসারি মূর্তি, আরেক সারি মূর্তি লাফিয়ে উঠলো পানির কিনারে। লাউডস্পীকারে বাজতে লাগলো প্রচণ্ড লড়াইয়ের শব্দ-কামানের গর্জন, জলদস্যু আর স্প্যানিশ সৈন্যদের চিৎকার, তলোয়ারের ঝনঝন। এতো কিছু ঘটছে, কিন্তু দর্শকদের তাতে কোনো প্রতিক্রিয়া হলো না। এমন ভঙ্গিতে তাকিয়ে রয়েছে, যেন পুরো ব্যাপারটাই হাস্যকর আর একঘেয়ে লাগছে তাদের কাছে।
উত্তেজিত করার যথেষ্ট চেষ্টা করছেন ক্যাপ্টেন ফিলিপ। প্রাণপণে যুদ্ধ করলো স্প্যানিশরা, কিন্তু জলদস্যুরাই জিতলো। এখন আমরা যে খাড়িটায় রয়েছি, এটারই নাম ছিলো তখন বুয়েনাভিস্তা কোভ। জলদস্যুরা জেতার পর থেকেই এর নাম হয়ে গেল পাইরেটস কোভ। ডা বুচার্ড আর তার সহযোগীরা ধ্বংস করে দিলো সমস্ত হাসিয়েনড়া, লুটপাট করলো ইচ্ছেমতো। রওনা হলো আরও দক্ষিণে। একের পর এক শহর ধ্বংস করে দিয়ে কেবল এগিয়েই গেল ওরা, ফিরলো না আর কোনোদিনই। তবে পাইরেটস কোভের নাম আর ধ্বংসস্তূপই শুধু ফেলে যায়নি, মূর্তিমান একটা মারণাস্ত্রও ফেলে গিয়েছিলো। তার নাম বেগুনী জলদস্য!
নাটকীয় ভঙ্গিতে শেষ দ্বীপটার দিকে হাত তুললেন ক্যাপ্টেন। সিমেন্টের একটা বেদির ওপর সেখানে দাঁড়িয়ে আছে একটা মূর্তি, হাতের ভোজালিটা কোপ মারার ভঙ্গিতে তুলে রেখেছে। মোটা, খাটো এক লোকের মূর্তি। হ্যাট থেকে শুরু করে পায়ের জুতো পর্যন্ত, সব কিছুর রঙ বেগুনী। ঢোলা বেগুনী আলখেল্লার কিনারে সোনালি কাজ করা। ঢোলা প্যান্টের রঙ বেগুনী। মুখের নাক-ঢাকা বেগুনী মুখোশের নিচে ইয়াবড় পাকানো গোঁফ। বিকট করে তুলেছে চেহারাটাকে। কোমরের বেগুনী বেল্টে ঝুলছে পুরনো ধাচের পিস্তলের খাপ। গোড়ালি ঢাকা উঁচু বুটের ভেতরে ঢোকানো বড় ছুরি।
লেফেটেন্যান্ট উইলিয়াম ইভানস, বলে চলেছেন ক্যাপ্টেন, সান্তা রোসার। সেকেণ্ড ইন কমাণ্ড। ডা বুচার্ডের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিদ্রোহ করেছিলো, খুন করেছিলো পেড্রো কোনডেকে। জাহাজে করে চলে এসেছিলো পাইরেটস কোভে। এখানে জলদস্যুদের একটা ঘাঁটি গড়ে তুলেছিলো সে, নিজের জাহাজ করেছিলো, নাম দিয়েছিলো ব্ল্যাক ভালচার। উপকূলে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে রেখেছিলো। বহু বছর ধরে। সব সময় বেগুনী রঙের পোশাক পরে থাকতো সে, যাতে নাম হয়ে যায়। বিখ্যাত হতে পারেনি, সত্যি, তবে ভীষণ কুখ্যাত যে হয়েছিলো তাতে কোনো সন্দেহ নেই। জলে, স্থলে, সবখানে ছিলো তার জয়

জয়কার। তার বিরুদ্ধে পাঠানো কোনো সেনাবাহিনীই জিততে পারেনি বহু বছর ধরে। তবে মাঝে মাঝে কোণঠাসা যে হতো না, তা নয়। কোণঠাসা হলেই এসে ঢুকতো তার পাথরের দুর্গে। শক্তি সঞ্চয় করে আবার বেরোতো। পরাজিত করে ছাড়তো হামলাকারীদের। তবে একদিন তার দুর্গ বেগুনী জলদস্যুর আড়ায় ঢুকে আর বেরোলো না সে। সেটা আঠারোশো চল্লিশ সালে। বাইরের সৈন্যরা ভাবলো, আটকে ফেলেছে, এবার ধরতে পারবে। কিন্তু পারলো না। দুর্গের ভেতর থেকেই। গায়েব হয়ে গেল সে। তারপর আর কেউ কোনোদিন দেখেনি তাকে। তার বংশধররাই এখনও এই উপদ্বীপ আর টাওয়ারের মালিক।

ক্যাপ্টেনের কাহিনী শেষ হলো। মুখ ঘোরালো ব্ল্যাক ভালচার, দ্বীপগুলোর। পাশ দিয়ে ফিরে চললো। চার তলা পাথরের দুর্গটা দেখালেন ক্যাপ্টেন। নির্জন, শূন্য লাগছে বাড়িটা।

ফিরে এলো টিকেট বিক্রেতা আর পিটার। শশা শেষ হয়েছে। দর্শকদের মনে কোনোই দাগ কাটতে পারলো না জলদস্যুদের নাটক। শুধু বেগুনী জলদস্যুর কাহিনী যা-ও বা একটু কেটেছে, তা-ও নষ্ট করে দিলো এয়ার ট্যাক্সি সার্ভিসের। একটা বিমানের গর্জন।

লেডিজ অ্যাণ্ড জেন্টলমেন, ক্যাপ্টেন বললেন, আমাদের অভিযান শেষ। হয়েছে। ক্যালিফোর্নিয়ার কুখ্যাত বেগুনী জলদস্যুর ইতিহাস জানলেন আপনারা। ডকে ফিরে যাচ্ছি আমরা। খিদে পেলে খেতে পারেন ওখানে, ব্যবস্থা আছে। সুভনির কিনতে পারে। যতো সময় ইচ্ছে কাটাতে পারবেন ওখানে, কেউ মানা। করবে না। আবার যদি আসতে চান, তা-ও পারেন। পনেরো মিনিটের মধ্যেই আবার শো শুরু হবে।

হেসে উঠলো কয়েকজন, কয়েকজন বিড়বিড় করলো। একটা ব্যাপার। পরিষ্কার হয়ে গেল, দ্বিতীয়বার আর এই ছেলেমানুষী দেখার ইচ্ছে কারো নেই। জাহাজ তীরে ভিড়তেই সিঁড়ি বেয়ে নেমে পড়লো সবাই। সুভনিরের দোকানের সামনে থামলো কয়েকজন। হংকং থেকে আমদানী করা প্ল্যাস্টিকের জাহাজের মডেল, ছুরি, খুদে ভোজালি আর আরও নানারকম জিনিস রয়েছে, জলদস্যুরা যেসব জিনিস ব্যবহার করতো, তার নকল। কেউই তেমন আগ্রহ দেখালো না ওগুলোর প্রতি। মারিয়া, সেই মেকসিকান মেয়েটা টিকেট বিক্রি বন্ধ রেখে এসে এখন খাবারের দোকান চালাচ্ছে। কয়েকটা ছেলে মা-বাবার কাছে বায়না ধরলো। কোক আর হটডগ কিনে দেয়ার জন্যে। কিশোর আর মুসা এসে দাঁড়ালো। ওখানটায়। ক্যাপ্টেন ফিলিপের আসার অপেক্ষায়। কিন্তু তিনি এলেন না। এমনকি তার ছেলে পিটারও না।

আসবে না, মুসা বললো।

তাই মনে হচ্ছে, একমত হলো কিশোর। কিন্তু অন্য সময় থাকে কোথায়? বাড়িটাড়ি নিশ্চয় আছে।
মিউজিয়মের পেছনে উঁকি দিয়ে দেখলো ওরা। কোনো বাড়িঘর চোখে পড়লো না, শুধু ওক গাছের জটলার মাঝে দাঁড়িয়ে রয়েছে পাথরের টাওয়ারটা। তবে খাবারের দোকান আর স্যুভনির স্ট্যাণ্ডের পেছনে বড় একটা হাউস ট্রেলার দেখতে পেলো ওরা। দ্রুত গিয়ে দাঁড়ালো ওটার কাছে। দরজায় লাগানো একটা মলাটের টুকরোর ওপর নাম লেখা রয়েছেঃ ক্যাপ্টেন রোজার ফিলিপ।
পাওয়ার আশা নেই, তবু এগিয়ে গিয়ে দরজায় টোকা দিলো কিশোর। সাড়া মিললো না।
জাহাজ থেকেই নামেননি হয়তো, আন্দাজে বললো মুসা।
আমার তা মনে হয় না। হয়তো ভেতরেই আছেন। টোকা শুনতে পাননি।
ট্রেলারের সামনের দিকে জানালাগুলোয় ভারি পর্দা টানা। পেছনটা ফেরানো রয়েছে খাড়ির দিকে, লম্বা পিয়ার আর কারখানাটা রয়েছে যেদিকে। ওদিকের একটা জানালা খোলা দেখা গেল। উঁকি দিয়ে ভেতরে কি আছে দেখতে গেল। কিশোর।
কি-কি-কিশোর! তোতলাতে লাগলো মুসা।
ঝট করে মাথা ঘোরালো কিশোর। জ্বলন্ত চোখে ওদের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে বেগুনী জলদস্যু। মুখে মুখোশ। হঠাৎ বিকট চিৎকার করে উঠে ভোজালি উঁচিয়ে ছুটে এলো সে।

.

ভোজালিটার দিকে তাকিয়ে ঢোক গিললো মুসা। কিশোর চুপ।
দিনে দুপুরে চুরি করতে এসেছো, না! চিৎকার করে বললো বেগুনী জলদস্যুরূপী টিকেট বিক্রেতা।
আ-আ-আমরা ক্যাপ্টেন ফিলিপকে খুঁজছিলাম, মুসা বললো। চো-চো
চুপ! আবার মিছে কথা! জানালা দিয়ে উঁকি মেরে মানুষ খুঁজছিলে! দাঁতে দাঁত ঘষলো লোকটা। দিনেও আসে, রাতেও!
রাতে? কথাটা ধরলো কিশোর। প্রায়ই আসে নাকি?
আসে কিনা জানো না?
এই সময় ট্রেলারের কোণ ঘুরে বেরিয়ে এলো পিটার ফিলিপ। অবাক হয়ে তাকাতে লাগলো তিনজনের দিকে। কিশোর আর মুসাকে চিনতে পারলো। আরি, তোমরা?
তাড়াতাড়ি বললো মুসা, তোমার আব্বাকে খুঁজতে এসেছিলাম, পিটার।
ওদের চেনো? সন্দেহ যায়নি টিকেট বিক্রেতার।

চিনি, জেসন আংকেল। আমাদের ইস্কুলে পড়ে। ওটা নামান।
অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভোজালিটা খাপে ভরে রাখলো জেসন। মুখোশ খুললো। গত দুরাত ধরে চোরের আনাগোনা বড্ড বেড়েছে!
জেসন আংকেলেরও দোষ নেই, কৈফিয়তের সুরে বললো পিটার। সন্দেহ হবেই। ইদানীং বড় বেশি চোর আসে। ...আংকেল, ও কিশোর পাশা। আর ও মুসা আমান। ওদেরকে বললো, ইনি আব্বার হেলপার; জেসন গিলবার্ট। ডাক। নাম নোনতা জেসন।
নোনতা? বিড়বিড় করলো কিশোর। তারমানে জাহাজে কাজ করেছেন? নাবিক ছিলেন?
নেভিতে বিশ বছর চাকরি করেছি, জেসন বললো।
পাইরেটস কোভে এই প্রথম এসেছি আমরা। ক্যাপ্টেন ফিলিপের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে ছিলো। মেজর নিরেকের কথা কিছু জিজ্ঞেস করতাম।
কফি মেশিনটা হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল, পিটার বললো। সেটা দেখছে আব্বা। এসো।
কফি স্ট্যাণ্ডেই পাওয়া গেল ক্যাপ্টেনকে। রেগে যাওয়া বেঁটে এক টুরিস্টকে বোঝানোর চেষ্টা করছেন।
ঠকানো হয়েছে আমাদের! ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললো লোকটা। পাইরেট শো না ছাই! টাকা ফেরত দিন!
আপনার ভালো লাগেনি, সেজন্যে আমরা দুঃখিত, স্যার, শান্ত কণ্ঠে বললেন ক্যাপ্টেন। কিন্তু টাকা ফেরত দেয়া যাবে না। সব জিনিসই সবার কাছে ভালো লাগবে, এমন কোনো কথা নেই। অমন যে বিখ্যাত ডিজনিল্যাণ্ড, সেটাও তো ভালো লাগে না অনেকের কাছে। তারা কি টাকা ফেরত পায়?
জ্বলে উঠলো লোকটার চোখ। ওরা আপনাদের মতো মিথ্যে কথা বলে না! আপনারা স্রেফ ঠকিয়েছেন। বেশ, দেখে নেবো আমি। বেটার বিজনেস বুরোতে নালিশ করবো!
কাছেই দাঁড়িয়ে থাকা একজন মহিলা আর ছেলেকে ইশারায় সঙ্গে যেতে বলে পার্কিং লটের দিকে এগোলো সে। বেগুনী একটা রুমাল বের করে কপালের ঘাম। মুছলেন ফিলিপ। পিটারের দিকে চোখ পড়তে আফসোস করে বললেন, আর কদ্দিন এভাবে চলবে বুঝতে পারছি না! টাকাও পাচ্ছি না, ঠিকমতো চালাতেও পারছি না সব!
বন্ধই করে দিন, ক্যাপ্টেন, হাত নেড়ে হতাশ কণ্ঠে বললো নোনতা জেসন। হবে না যখন, হবেই না। খালি খালি কষ্ট করে, লোকের কথা শুনে লাভ আছে?

কথাটা পছন্দ হলো না পিটারের। কড়া চোখে একবার জেসনের দিকে তাকিয়ে বাবার দিকে ফিরলো। হবে। চেষ্টা করলেই হবে।
জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেললেন ক্যাপ্টেন। হয়তো হবে। ঘন্টায় পঁচিশ ডলারে যদি গল্প জোগাড় করতে পারে মেজর, আর দিতে থাকে আমাদের, দর্শক ধরে রাখা হয়তো যাবে।
আমি জানি, আব্বা, মেজর পারবে।
স্যার, গলা পরিষ্কার করলো কিশোর। এই ব্যাপারেই আলোচনা করতে এসেছিলাম আমরা।
আলোচনা? কিশোর আর মুসার দিকে তাকিয়ে ভুরু কোঁচকালেন ক্যাপ্টেন। কে তোমরা?
আমাদের ইস্কুলেই পড়ে। পরিচয় করিয়ে দিলো পিটার। মেজর নিরেকের ব্যাপারে কথা বলতে চায় তোমার সঙ্গে।
কি কথা? ক্যাপ্টেন জানতে চাইলেন।
মেজর কি করছেন? বলে উঠলো মুসা।
তাকে সন্দেহ হয় আমাদের, বললো কিশোর।
সন্দেহ! কিশোরের কথার প্রতিধ্বনি করলেন যেন বেগুনী জলদস্যুর আড্ডার মালিক। মেজর নিরেককে সন্দেহ! আশ্চর্য! দিন দিন মানুষগুলো যে সব কি হয়ে যাচ্ছে! নিজের চরকায় তেল দেয়া যেন বন্ধ করে দিয়েছে সবাই!

.

মেজর নিরেক আর রিগোর বেরোনোর অপেক্ষায় রইলো রবিন। বেরোলো ওরা। ভ্যান নিয়ে রওনা হলো। পেছনে চিহ্ন দেখে দেখে অনুসরণ করলো সে।
পাইরেটস, কোভে চলে গেছে চিহ্নগুলো। পার্কিং লট পেরিয়ে গিয়ে ঢুকেছে বেগুনী জলদস্যুর আড়ার ভেতরে। হাতে গোনা কয়েকটা গাড়ি দেখা গেল লটে। মাত্র দুজন দর্শক দাঁড়িয়ে রয়েছে আইস ক্রীম ভ্যানটার সামনে। ওটার পাশ দিয়ে চলে গেছে চিহ্ন। ঢুকে গেছে ছোট বনের ভেতরে। হ্যারিসনস ট্রী সার্ভিসের একজন শ্রমিক ট্রাকের ওপর দাঁড়িয়ে একটা গাছের যেন কি করছে। এদিক ওদিক তাকালো রবিন। ভ্যানটাও চোখে পড়লো না, মেজর কিংবা রিগোকেও দেখলো না। একটা রাস্তা ধরে উত্তরে চলে গেছে চিহ্ন।
ভাবছে রবিন। আইস ক্রীম ভ্যান! ট্রী-সার্ভিস ট্রাক! এসব গাড়ি নিয়ে মেজরের চত্বরে ঢুকেছিলো দুজন ড্রাইভার, তারপর বেরিয়ে গেছে। ওরাই এসেছে এখানে,পাইরেটস কোভে চিহ্ন যখন রয়েছে, মেজরও এসেছেন। কেন? লোকগুলোর সঙ্গে কথা বলে চলে গেছেন আবার?

সাইকেলটা ঝোঁপের ভেতর লুকিয়ে রেখে পা টিপে টিপে ট্রী-সার্ভিসট্রাকটার কাছে চলে এলো রবিন। লোকটাকে দেখলো ভালোমতো। চিনতে পারলো। টনি! কি মনে হতে ফিরে তাকালো আইস ক্রীম বিক্রেতার দিকে। চিনতে পারলো তাকেও। খাটো, মোটা, টাকমাথা লোকটা, যার নাকের নিচে বেমানান গোঁফ।
তার মানে ছদ্মবেশী ওরা সবাই! কেন এসেছে? নিশ্চয় বেগুনী জলদস্যুর হআড়ার ওপর চোখ রাখতে। চব্বিশ ঘন্টাই চোখ রাখার ব্যবস্থা করেছে ওরা।
ট্রাকের পেছনে বসানো লম্বা লিফটটা তুলে নিলো টনি। ওপরে উঠে গেল। তারপর বিনকিউলার বের করে দেখতে লাগলো। কি দেখছে, বুঝতে পারলো না। রবিন। বেড়া আর গাছপালার জন্যে দেখতে পাচ্ছে না সে। দ্রুত মনস্থির করে নিলো। নিরেক আর রিগো কোথায় গেছে, পরেও দেখা যাবে। আপাতত টনি কি দেখছে সেটা জানা দরকার।
গাছপালার ভেতর দিয়ে সরে চলে এলো রবিন, আড্ডার উল্টোদিকে। ফিরে তাকালো। ডানে নজর লোকটার। কারো দিকে না তাকিয়ে হেঁটে চললো রবিন। আইস ক্রীম ওয়ালার পাশ কাটালো। টিকেট বুঁদ বন্ধ হয়ে গেছে, তবে গেট খোলা। ঢুকে পড়লো সে। হঠাৎ মোড় নিয়ে ঢুকে গেল ওকের জঙ্গলের মধ্যে, যেগুলোর অন্যপাশে রয়েছে পাথরের টাওয়ারটা।
টাওয়ারের কাছে এসে থামলো সে। চারতলা পুরনো বাড়ি। উপদ্বীপের উত্তরে, পানির ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। কাঠের বেড়া দেয়া আছে, রাস্তা থেকে সরাসরি যাতে কেউ ঢুকতে না পারে এখানে। গাছপালার পরে, টাওয়ারের লাগোয়া আর কিছু নেই, শুধু লন, আর বালিতে ঢাকা চত্বর। পুরনো একটা বোটহাউস রয়েছে, ধসে পড়েছে এখন। কি দেখছে টনি? টাওয়ার? না ওই ভাঙা বোট-হাউস? বোট হাউসের ভেতরেই প্রথমে দেখার সিদ্ধান্ত নিলো রবিন।
কালচে হয়ে গেছে বোটহাউসের তক্তাগুলো। ক্ষয়া। সামনের দিকে একটামাত্র জানালা। বড় দরজাটা বন্ধ। বাঁয়ে কাত হয়ে রয়েছে ঘরটা, বেশ কিছু তক্তা খসে গেছে। বেগুনী জলদস্যুর আমল থেকেই বোধহয় আছে ওটা ওখানে।
জানালা দিয়ে ভেতরে উঁকি দিলো সে। চোখে পড়লো শুধু কালো পানি। দরজায় ঠেলা দিয়ে খোলার চেষ্টা করলো।
আচমকা শক্ত কি যেন লাগলো পিঠে। ঠেসে ধরা হয়েছে।
ঘোরো, খোকা, আদেশ দিলো একটা ভারি কণ্ঠ। খুব ধীরে।
ঘুরে দাঁড়ালো রবিন। চওড়া কাঁধ, মাঝারি উচ্চতার একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। পরনে শাদা ট্রাউজার, পায়ে দড়ির স্যাণ্ডাল, গায়ে নীল টি-শার্ট। হাতের। পিস্তলটা ধরে রেখেছে রবিনের পেট বরাবর।

.

ক্যাপ্টেন ফিলিপ এভাবে নিরাশ করবেন, ভাবেনি কিশোর আর মুসা। যাওয়ার জন্যে ঘুরলো।
পিটার বলে উঠলো, আব্বা, ওদেরকে আমি চিনি। কি বলতে এসেছে, অন্তত শোনো তো?
আরে দূর! কি আবার বলবে? গোলমাল পাকাতে এসেছে, হাত নেড়ে উড়িয়ে দিলো যেন নোনতা জেসন। যাক, বেরিয়ে যাক।
অতোটা রুক্ষ ব্যবহার করলেন না ক্যাপ্টেন। আমার কাজ আছে। ঠিক আছে, পাঁচ মিনিট সময় দিলাম। জেসন, টিকেট বুদে যাও। এই, তোমরা এসো আমার সঙ্গে।
দুই গোয়েন্দাকে ট্রেলারে নিয়ে এলেন ক্যাপ্টেন। কাউচ দেখিয়ে ওদেরকে বসার ইঙ্গিত করলেন। পিটার বসলো একটা চেয়ারের হাতলে।
বলে ফেলো, ফিলিপ বললেন।
দুদিন আগের সাক্ষাৎকারের কথা সংক্ষেপে বললো কিশোর। কি করে ঠকিয়েছেন মেজর, সে কথাও জানালো।
ঠকালো কোথায়? প্রশ্ন তুললেন ক্যাপ্টেন। গল্প পছন্দ হয়নি, টাকা দেয়নি, ব্যস। মুছে ফেলেছে। পছন্দ না হলে টাকা কেন দেবে?
বিজ্ঞাপনে তো সেকথা বলেনি, মুসা বললো। বলেছে, যে-ই গল্প শোনাবে, তাকেই দেবে।
এটা হতে পারে না। যে যা খুশি শুনিয়ে আসবে, তার জন্যেই টাকা দিতে হবে নাকি? বিজ্ঞাপনটা লেখা হয়নি ঠিকমতো।
বেশ, ধরে নিলাম লেখা হয়নি। কিন্তু গল্প পুরোটা না শুনেই কি করে বুঝলেন। উনি, ভালো না মন্দ? শুরু করতে না করতেই তো থামিয়ে দিয়েছেন অনেককে। কিশোর বললো।
যে বোঝার সে অল্প শুনেই বুঝতে পারে। তাছাড়া পয়লা দিন অনেক বেশি লোক চলে এসেছিলো। কি করে শুনবে এতো লোকের গল্প? বরং বুদ্ধিটা ভালোই। বের করেছিলো, শহরের বাইরে থেকে যারা এসেছিলো তাদের গল্প শুনবে।
তাহলে ওকথাও বিজ্ঞাপনে লিখে দিতে পারতো, পিটার বললো। শহরের ভেতরের কারো গল্প যদি না-ই শুনবে তাহলে ঢালাও ঘোষণা দেয়া কেন? অবিচার করা হলো না? ডেকে এনে ফিরিয়ে দেয়া? আমি হলে সোজা গিয়ে পুলিশকে রিপোর্ট করে দিতাম। ..
ছেলের কথার জবাব দিতে পারলেন না ক্যাপ্টেন। দ্বিধা করলেন। ইয়ে...
চাপটা বাড়ালো কিশোর, লোকের বাড়ি বাড়ি সার্কুলার দিয়ে আসার কি প্রয়োজন ছিলো? সাক্ষাঙ্কারই যদি না নেবে, কেন এই অহেতুক হয়রানী?

তা ঠিক, গাল চুলকালেন ক্যাপ্টেন। তবে মনে হয় আমার আর পিটারের গল্পই শুধু শুনতে চেয়েছে।
তাহলে শুধু আপনাকে ডেকে নিয়ে গেলেই পারতেন। আর তা-ই বা কি করে বলবেন? আপনার বলে আসা গল্পও তো মুছে ফেলেছেন মেজর।
আমারটাও মুছেছেন!
নিজের চোখে দেখেছি! জোর পেয়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো মুসা।
অসম্ভব! তোমরা কি জন্যে এসেছো…
আব্বা, বাধা দিয়ে বললো পিটার, ঘাপলা একটা আছে। মুসা আর কিশোর– খুব ভালো গোয়েন্দা। আমার মনে হয় না ওরা ভুল করছে।
ডিটেকটিভ? এই বয়েসে অনেক ছেলেই গোয়েন্দা সাজতে চায়। এক ধরনের খেলা।
মোটেও খেলা নয়, স্যার। গম্ভীর হয়ে গেছে কিশোর। পকেট থেকে প্রথমে তিন গোয়েন্দার কার্ড, তারপর পুলিস ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্লেচারের প্রশংসাপত্র বের করে দিলো।
পড়লেন ফিলিপ। মাথা দোলালেন। হু, পুলিসের একজন চীফ ফালতু কথা বলবেন না। তোমাদের সম্পর্কে খুব উঁচু ধারণা তার। কিন্তু কিশোর, মানুষ মাত্রেই ভুল করে। আমার বিশ্বাস, মেজরের ব্যাপারেও তোমরা ভুল করছে।
আগে বলো তাহলে, চেপে ধরলো পিটার, তোমার গল্প মুছলো কেন?
হতে পারে, টেকনিক্যাল কোনো কারণ ছিলো। কিংবা পরে বিশেষ টেপে। রেকর্ড করার কথা ভেবেছিলো। দুদিন ধরেই তো আমাদের সাক্ষাৎকার নিচ্ছে। ওগুলো নিশ্চয় মুছছে না।
জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন, স্যার, পরামর্শ দিলো কিশোর।
ভ্রূকুটি করলেন ক্যাপ্টেন। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কিশোরের দিকে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার বক্তব্যটা কি, বলে ফেলো তো?
আমার ধারণা, পুরো ঘটনাটাই ঘটিয়েছেন মেজর, আপনাকে আর পিটারকে হাতে পাওয়ার জন্যে।
কিন্তু আগে কখনও পরিচয় ছিলো না মেজরের সঙ্গে! কখনও তার নামও শুনিনি। আমাদের কাছে কি চায়? টাকা নেই, পয়সা নেই, কিচ্ছু নেই আমাদের। এই শো বিজনেস চালিয়ে কোনোমতে খেয়েপরে বেঁচে আছি। তা-ও যায় যায় অবস্থা।
কিন্তু বিরাট এলাকা আপনার, মুসা বললো। অনেক জমি। হয়তো ওগুলো চায়?
আমার জমি নয় এটা, মুসা। ইভান পরিবারের কাছ থেকে লীজ নিয়েছি।
ইভান পরিবার? চোখে জিজ্ঞাসা নিয়ে তাকালো কিশোর।

মাথা ঝাঁকালেন ক্যাপ্টেন। হ্যাঁ। পুরনো সেই জলদস্যুর বংশধর। এই কোভের মালিক এখনও ওরাই।
আপনি না বললেন ইভান গায়েব হয়ে গেছে? মুসার প্রশ্ন।
হাসলেন ক্যাপ্টেন। গিয়েছিলো। তারপর আবার ফিরে এসেছে। নতুন বেশে। তবে সেকথা বলি না শো-এর সময়। অযথা নাটকটা নষ্ট করে লাভ কি? স্রেফ গায়েব হয়ে যাওয়ার মধ্যে একটা অন্যরকম ব্যাপার থাকে।
কিশোর জিজ্ঞেস করলো, রাতে নাকি এখানে চোর আসে?
চোর কিনা বলতে পারবো না। রাতে ঘুরতেও বেরোয় অনেক মানুষ, নির্জন। জায়গা দেখলে বেড়াতে চলে আসে। তাছাড়া কাছে দিয়েই গেছে রেললাইন। কাজেই দুচারটে ভবঘুরে যে নেমে না পড়ে তা নয়। আমাদের বড়িঘরগুলোকে ঘুমানোর জায়গা হিসেবে বেছে নেয়। কিশোরের দিকে তাকালেন ক্যাপ্টেন। দেখো, মেজরের ব্যাপারে ভুল করছো তোমরা। এমন কিছু নেই আমাদের কাছে, যার জন্যে আমরা তার কাছে দামী হয়ে যাবো।
আব্বা, শেষ চেষ্টা করলো পিটার, কিছু না হোক, তিন গোয়েন্দাকে কাজ করতে দিতে অসুবিধে কি আমাদের? কিছু বেরিয়েও তো যেতে পারে?
না, দরকার নেই, দৃঢ়কণ্ঠে বললেন ক্যাপ্টেন। অযথা ভালো মানুষকে হয়রানী করা আমার পছন্দ নয়। তাছাড়া ভালো টাকা দিচ্ছে আমাদেরকে মেজর। এক ঘন্টা গল্প বলার জন্যে কে পঁচিশ ডলার করে দেবে? আমি সেটা হারাতে চাই না। তোমরা ওকে খোঁচাতে যাবে না, ঠিক আছে?
কিশোর কিংবা মুসা জবাব দেয়ার আগেই বাইরে থেকে ডাক শোনা গেল, ফিলিপ! দরজা খুলুন! বলেছিলাম না, চোর আসে!

.

ভিকটর ইভানস! উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিলেন ক্যাপ্টেন।
নীল টি-শার্ট পরা মাঝারি উচ্চতার একজন মানুষ ট্রেলারে ঢুকলো। মুখ রাগে। লাল। এই ফিলিপ, বলেছিলাম না খেয়াল রাখতে? টাওয়ারে লোক যায় কেন? একটা ছেলে বোটহাউসে ঢোকার চেষ্টা করছিলো। জিজ্ঞেস করলাম, বললো গোয়েন্দা। ইহ! আপনার কাজ নাকি করছে।
রবিন! প্রায় একসঙ্গে বলে উঠলো কিশোর আর মুসা।
কী? দরজা দিয়ে বাইরে উঁকি দিলো ভিকটর। এই ছেলে, এসো, ঢোকো। রবিন ট্রেলারে ঢুকলে তাকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলো, এটাকে চেনো, ফিলিপ? চোর-টোর না তো?
না! গরম হয়ে বললো মুসা। চোর আমরা কেউই নই।

চোখ পাকিয়ে মুসার দিকে তাকালো আগন্তুক। তোমার সঙ্গে কথা বলে কে? ফিলিপ, এটাকে ওরা চেনে কি করে?
সরি, ভিকটর, ক্যাপ্টেন বললেন, আপনাকে বিরক্ত করেছে। ওদের হয়ে আমি মাপ চাইছি। ওরা পিটারের বন্ধু। আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে...।
তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললো কিশোর, বেগুনী জলদস্যুর কাহিনী শুনতে, স্যার। ইস্কুলের ম্যাগাজিনে লিখবো। ওর নাম রবিন, গবেষণার কাজগুলো সে-ই করে। তিনজনে একসাথে কাজ করি আমরা। জায়গাটা ভালোমতো দেখতে গিয়েছিলো, বর্ণনা দেয়ার জন্যে। আপনাকে বিরক্ত করার, কিংবা আপনার জায়গার ক্ষতি করার কোনো ইচ্ছেই ওর নেই। টাওয়ারে তাহলে আপনিই থাকেন। ভিকটর ইভানস, তার মানে কি বেগুনী জলদস্যু উইলিয়াম ইভানসের বংশধর আপনি?
মোরগের মতো ঘাড় কাত করে কিশোরের দিকে তাকালো ভিকটর। খুব। চালাক মনে হচ্ছে? ম্যাগাজিনে লেখ বা জাহান্নামে লেখ, সেটা তোমাদের ব্যাপার। খবরদার, আমার এলাকার ধারেকাছে আসবে না! ওকের সারিটার দিকে আর যাবে না, মনে থাকে যেন। ক্যাপ্টেনের দিকে ফিরে বললো, এবার ছেড়ে দিলাম। আপনাকেও বলে দিচ্ছি, টুরিস্ট হোক আর যে-ই হোক, আমার সীমানায় যেন না ঢোকে।
ঢুকবে না, কথা দিলেন ফিলিপ।
না ঢুকলেই ভালো। বেরিয়ে গেল ভিকটর। দড়াম করে লাগিয়ে দিয়ে গেল ট্রেলারের দরজা।
লোকটা বেরিয়ে যেতেই কিশোরের দিকে ফিরলেন ক্যাপ্টেন। আসল কথা ভিকটরকে বললে না কেন?
কথা গোপন রাখতে হয় গোয়েন্দাদের। যাকেতাকে সব বলে দেয়া উচিত না। মিস্টার ইভানসকে চিনি না, কি কাজ করে তা-ও জানি না। অচেনা একজন মানুষকে পেটের কথা কেন বলবো?
তা বটে, আনমনে ঘাড় দোলালেন ক্যাপ্টেন।
চোরের ওপর খুব রেগে আছে মনে হয়?
চোরকে কে পছন্দ করে? তাছাড়া বিনা অনুমতিতে কেউ ওর এলাকায় ঢুকলে রাগ তো করবেই।
আচ্ছা, মুসা বললো, জলদস্যু আবার সম্পত্তির মালিক হয় কি করে? সেটা। আবার বংশধরদের জন্যে রেখেও যায়? মানে, নিজেই তো একটা অপরাধী। রাষ্ট্র। কি স্বীকৃতি দেয়?

ক্যাপ্টেন হাসলেন। উইলিয়াম ইভানস খুব চালাক মানুষ ছিলো, মুসা। শুনেছো, কখনও ধরা পড়েনি সে। ১৮৪০ সালের সেই দিনে টাওয়ার থেকে গায়েব হয়ে যায়। কিন্তু স্ত্রী আর ছেলেমেয়েদের রেখে যায়। আঠারোশো আটচল্লিশ সালে আবার এসে হাজির হয় একদিন, আমেরিকান সৈনিকের বেশে, মেকসিকানদের বিরুদ্ধে লড়াই চলছে তখন। আমেরিকা জিতলো, ক্যালিফোর্নিয়া হয়ে গেল। ইউনাইটেড স্টেটসের অংশ। যুদ্ধে জেতার পুরস্কার হিসেবে আমেরিকান সরকারের কাছ থেকে তার জায়গা ফেরত পায় ইভানস। কারণ, কেউ প্রমাণ। করতে পারেনি যে সে-ই বেগুনী জলদস্যু। তখন আঙুলের ছাপ দেখে অপরাধী। ধরার উপায় জানা ছিলো না কারো। বেগুনী জলদস্যু কখনও ধরাও পড়েনি কারো। হাতে। তার কোনো ছবি ছিলো না, যা দেখে বলবে বেগুনী জলদস্যু আর উইলিয়াম ইভানস একই লোক। কাজেই সৈনিক হিসেবে জায়গাটা সরকারের কাছ থেকে নিতে কোনো অসুবিধে হলো না তার। তার পর অনেক বছর গেল। তার বংশধরেরা জায়গা বিক্রি করে করে ছোট করে ফেললো। বাকি রইলো শুধু ওই টাওয়ার আর উপদ্বীপটা। ভিকটরও কোথায় চলে গিয়েছিলো। বহু বছর পরে আবার ফিরে এসেছে।

কতো দিন আগে? জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

এই বছর খানেক।

এতো দিন! হতাশই মনে হলো কিশোরকে।

ঘড়ি দেখলেন ক্যাপ্টেন। এহ্হে, পরের শো-এর সময় হয়ে গেছে।

তুমি যাও, আব্বা, আমি আসছি। তিন গোয়েন্দার সঙ্গে বেরোলো পিটার। বাইরে উজ্জ্বল রোদ, লুকোচুরি খেলছে যেন গাছপালার ফাঁকে। গেটের বাইরে সারি দিয়ে দাঁড়িয়েছে কয়েকজন দর্শক।

সত্যি কি মেজর আমাদের সঙ্গে ফাঁকিবাজি করছে? পিটারের প্রশ্ন।

করছে, জবাব দিলো কিশোর। তাতে কোনো সন্দেহ নেই আমার।

যা দেখলাম আজ, রবিন বললো কিশোরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে, তাতে সন্দেহ আমারও নেই।

ছদ্মবেশে এসে টনি আর আইসক্রীমওয়ালাকে কি করতে দেখেছে, খুলে বললো সে। আলুর বস্তা, ব্যাটারি আর মাটি খোঁড়ার যন্ত্রপাতিগুলোর কথাও বললো।

শুনে পিটার বললো, চলো, আব্বাকে গিয়ে সব বলি!

মাথা নাড়লো কিশোর। লাভ হবে না এখন বলে। আমাদের কথা বিশ্বাস করতে চাইবেন না। আরও জোরালো প্রমাণ জোগাড় করতে হবে আমাদের। জানার চেষ্টা করবো, মেজর আর তার চেলারা কিসের পেছনে লেগেছে। রবিন, বেগুনী জলদস্যুর কথা লোকাল হিস্টরি কি বলে, জানার চেষ্টা করো। মুসা, তুমি

পাইরেটস কোভের ইতিহাস জানবে। আর আমি জানবো, ক্যাপ্টেন ফিলিপের অতীত কি বলে। পিটার, তুমি কি চাও এই রহস্যের সমাধান হোক?
নিশ্চয়ই চাই, আগ্রহের সঙ্গে বললো পিটার। আমাকে কি করতে হবে?
মাথা খাটাবে। তোমার বাবার অতীত জানার চেষ্টা করবে। মেজর নিরেক তার ব্যাপারে ইন্টারেস্টেড কেন, বোঝা দরকার। তোমাদের শেষ শশা তো। চারটেয়। আমাদের স্যালভিজ ইয়ার্ডে কখন দেখা করতে পারবে?
সাড়ে পাঁচটায়?
গুড। তোমরা?
আমি পারবো, জবাব দিলো রবিন।
আমিও, বললো মুসা।
বেশ, কাজে নেমে পড়া যাক তাহলে। সাড়ে পাঁচটায় হেডকোয়ার্টারে দেখা করবো আমরা। আলোচনা করবো, এর পর কি করা যায়।

.
কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে পাঁচটায় পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে ঢুকলো পিটার। জঞ্জালের স্কুপের কাছে দাঁড়িয়ে তাকালো এদিক ওদিক। তিন গোয়েন্দার ছায়াও চোখে পড়লো না।
এই ছেলে, কি চাও? কোমল কণ্ঠে প্রশ্ন হলো।
চমকে ফিরে তাকালো পিটার। একজন সুন্দরী মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন তার পেছনে।
আমি...আমি কিশোর, রবিন আর মুসাকে...
ও। আমি কিশোরের মা, মারিয়া পাশা। বাইরের লোকের কাছে নিজেকে কিশোরের মা বলে পরিচয় দেন মেরিচাচী। ওদেরকে খুঁজছো? হেসে হাত নাড়লেন তিনি। গায়েব। সারাটা দিন দেখা নেই। খানিক আগে যা-ও বা ছায়াটা। দেখলাম, তারপরেই দেখি আবার গায়েব।
এখানে আছে?
ছিলো, পাঁচ মিনিট আগেও। জ্যান্ত রাডার একেকটা!.. আমি জানার আগেই কি করে জানি জেনে যায় কাজের জন্যে ডাকবো ওদের। নিজেদের ইচ্ছে হলে আমাকে কিছু বলতে হয় না, অসম্ভব খাটে। কিন্তু ইচ্ছে না। হলে.. বাক্যটা শেষ না করে হাত নেড়ে বুঝিয়ে দিলেন মেরিচাচী, ওরা কি করে। গত কদিন ধরে ভালোই ছিলো, কাজটাজ ঠিকমতো করছিলো। আজকেই বদলে গেছে। নিশ্চয় নতুন কেস পেয়েছে। তা কি নাম তোমার?
পিটার ফিলিপ।

ও। তো পিটার, তুমি বরং আজ চলেই যাও। আরেকদিন এসো। ওরা আজ আর বেরোবে বলে মনে হয় না। জমানো কাজ যতোক্ষণ না অন্যকে দিয়ে শেষ। করাচ্ছি, ওরা আর বেরোচ্ছে না…
কিন্তু আমাকে তো আসতে বলে দিয়েছে। আরেকটু থাকি?
থাকতে পারো। তোমার ইচ্ছে। ওই যে, ওটা কিশোরের ওয়ার্কশপ। ওখানে বেঞ্চ আছে, গিয়ে বসো। তবে ওদেরকে আজ আর পাবে বলে মনে হয় না। হেসে, ইয়ার্ডের অফিসের দিকে রওনা হয়ে গেলেন মেরিচাচী।
সব চেয়ে বড় জঞ্জালের স্তূপটার পাশে ওয়ার্কশপ, সহজেই খুঁজে পেলো। পিটার। সাইকেলটা বাইরে রেখে ঢুকলো ভেতরে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কানে এলো ডাক। ফিসফিসিয়ে ডাকলো তার নাম ধরে কেউ, পিটার!
কেমন যেন ফাঁপা শোনালো ডাকটা। ভীষণ চমকে গেল পিটার। চারপাশে। তাকিয়ে কিছুই চোখে পড়লো না।
আরে ওখানে না, এখানে!
পিটারের মনে হলো, বিশাল জঞ্জালের স্তূপের ভেতর থেকেই আসছে কথা।
মু-মু-মুসা! তোতলাতে শুরু করলো পিটার। কি-কি-কি-কিশোর!
শশশ! আবার শোনা গেল ফিসফিসানি। আস্তে বলো! মেরিচাচী শুনলেই ধরে নিয়ে গিয়ে কাজে লাগিয়ে দেবে! কেসফেস সব শেষ হয়ে যাবে। তাহলে।
চারদিকে তাকালে আবার পিটার, ওপরে তাকালো, নিচে তাকালো। কাউকেই চোখে পড়লো না। বেগুনী জলদস্যু
হেসে উঠলো অদৃশ্য কণ্ঠটা। বাইরে গিয়ে দেখে এসো, মেরিচাচী আছে। কিনা। তারপর ঢুকে পড়ো এই পাইপটায়! জলদি করো!
মোটা পাইপটার দিকে তাকালো পিটার। জঞ্জালের নিচে হারিয়ে গেছে ওটা, শুধু মুখ বেরিয়ে রয়েছে। চট করে গিয়ে দেখে এলো কেউ আছে কিনা। তারপর হাত-পায়ের ওপর ভর দিয়ে উবু হয়ে উঁকি দিলো পাইপের ভেতরে। আবছা আলোয় দেখলো মুসার মুখ। উপুড় হয়ে পাইপের ভেতরে শুয়ে আছে সে। চোখাচোখি হতেই হাসলো।
এটার নাম দুই সুড়ঙ্গ, বললো মুসা। হেড-কোয়ার্টারে ঢোকার আরও পথ আছে। তবে এটাই বেশি ব্যবহার করি আমরা।
হেডকোয়ার্টার! ওই মালপত্রের তলায় বসে কথা বলো তোমরা?
বলি, হাসলো আবার মুসা। এসো।
ঢুকে পড়লো পিটার। মুসার পিছে পিছে হামাগুড়ি দিয়ে এগোলো। মাথার ওপর দেখা গেল একটা চারকোণা ফোকর, আলো আসছে ওপথে। ওটা। ট্র্যাপোর, পরে বুঝলো সে। ওই পথে ঢুকলো একটা ঘরের মধ্যে। চেয়ার, টেবিল, ফাইলিং

কেবিনেট আর আরও নানারকম জিনিস আর যন্ত্রপাতি রয়েছে ওই ঘরে। এমনকি একটা স্টাফ করা কাক পর্যন্ত সাজানো রয়েছে বুককেসের ওপর। তার দিকে তাকিয়ে হাসলো কিশোর আর রবিন।
আশ্চর্য! অবাক হয়ে দেখছে পিটার। এ-তো দেখি ঘর! আমি ভেবেছিলাম। জঞ্জালের তলায় খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করে নিয়েছো বুঝি।
এটা একটা ট্রেলার। তোমাদেরটার মতোই, রবিন বললো। তবে ছোট।
আমরা এখানে থাকলে বাইরে কেউ দেখতে পায় না, মুসা বললো। কিন্তু আমরা দেখি, এই পেরিস্কোপটা দিয়ে। এটার নাম দিয়েছি আমরা সর্ব-দর্শন, বাংলা। নাম। এখানে ঢুকে বসে থাকলে, কিশোর বললো, কারো পক্ষে খুঁজে বের করাও কঠিন। এমনকি মেরিচাচীর কাছ থেকেও নিরাপদ, হেসে বললো মুসা। যেই দেখি। বেশি কাজ, পালিয়ে আসি এখানে। হাহ্ হাহ!
তার সঙ্গে যোগ দিয়ে সবাই হাসলো। একটা চেয়ার দেখিয়ে পিটারকে বসতে ইশারা করলো কিশোর। বললো, তারপর, পিটার, তোমার বাবার অতীত কিছু জানতে পারলে?
কিছু না। সারাটা বিকেল ভেবেছি। যতোদূর মনে পড়ে আমার, রকি বীচেই বাস করছি। কখনও কোনো গোলমালে জড়ায়নি আব্বা, অপরাধ করেনি। আগে। আমার আম্মাকে নিয়ে স্যান ফ্রানসিসকোয় থাকতো আব্বা, যখন নেভিতে চাকরি করতো। আম্মা মারা যাওয়ার পর আমাকে নিয়ে এখানে চলে এলো, তখনও আমি কিছু বুঝি না। একটা মাছধরা জাহাজ কিছুদিন ভাড়া নিয়েছে আব্বা। তারপর ইভানসদের জায়গাটা লীজ নিয়ে এই বেগুনী জলদস্যুর ব্যবসা খুলেছে।
মাথা ঝাঁকালো কিশোর। হ্যাঁ, ঠিক এসবই জেনেছি আমিও তোমার আব্বার সম্পর্কে। অস্বাভাবিক কিছুই নেই। রবিন, বেগুনী জলদস্যুর কথা তুমি কি জানলে?
বেশি কিছু না। প্রায় সবই তো তোমরা জেনেছো ক্যাপ্টেন ফিলিপের কাছে, শো-এর সময়। স্প্যানিশরা শিওর, উইলিয়াম ইভানসই বেগুনী জলদস্য, কিন্তু কোনোদিন প্রমাণ করতে পারেনি সেটা। কয়েকবার তার টাওয়ারে তাকে আটক করেছে, কিন্তু ধরতে পারেনি। চেহারাও দেখেনি। শেষ বার আটকানোর পর সবার চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে গেল, ফিরে এলো একজন সম্মানিত আমেরিকান নাগরিক হয়ে।
মুসা বললো, পাইরেটস কোভের ব্যাপারে খোঁজ নিয়েছি আমি। অনেক আর্টিক্যাল লেখা হয়েছে জায়গাটাকে নিয়ে, গোটা দুই আস্ত বইও আছে। বেগুনী। জলদস্যু ছাড়াও আরও অনেকে জায়গাটাকে তাদের আস্তানা বানিয়েছিলো

বিভিন্ন সময়। সবাই ওরা অপরাধী। চোরাচালানী, চোর-ডাকাত, খুনী, এসব ধরনের লোক। যো রকমের অন্যায় কাজ হতে পারে, সব ঘটেছে ওখানে। তবে ফিলিপ কিংবা নিরেক নামের কেউ, এমনকি শুধু উইলিয়াম ইভানস ছাড়া ইভানস নামের আর কোনো অপরাধীও ছিলো না কখনো ওখানে।
ভ্রূকুটি করলো কিশোর। হু। বিশেষ কিছু জানা গেল না। সূত্র বলতে একটাই দেখতে পাচ্ছি, বেগুনী জলদস্যু। বুঝতে পারছি, মেজর নিরেক আর তাঁর চেলারা গিয়ে মাটি খোঁড়াখুঁড়ি করছে কোনো কারণে। কিন্তু আঁড়ার ওপর কেন চোখ। রেখেছে বোঝা যাচ্ছে না। পিটারের আব্বার সঙ্গেই বা কেন দীর্ঘ সাক্ষাত্তারের ব্যবস্থা করেছে, সেটাও দুর্বোধ্য।
গুপ্তধন লুকানো নেই তো? মুসার প্রশ্ন। জলদস্যুদের গুপ্তধন? ক্যাপ্টেন। ফিলিপকে ভুলিয়ে ভালিয়ে সরিয়ে রেখে হয়তো সেসব খুঁজছে ওরা।
যাতে নিরাপদে নিয়ে পালাতে পারে, মুসার কথার পিঠে বললো রবিন।
কথাটা ভেবে দেখলো কিশোর। অসম্ভব নয়। ক্যাপ্টেনের গল্প শোনার আরও কারণ থাকতে পারে। মেজর হয়তো ভেবেছেন, এমন কিছু জানেন ফিলিপ, যেটা জানা থাকলে ধনরত্ব খুঁজে বের করতে সুবিধে হবে।
তাহলে আব্বা খুঁজছে না কেন? পিটার প্রশ্ন তুললো।
হয়তো তিনি জানেনই না গুপ্তধনের কথা। কিন্তু মেজর জানেন। তোমার। আব্বার গল্প শুনে আন্দাজ করতে পারবেন হয়তো, কোথায় রয়েছে ওগুলো। হয়তো সূত্র পাবেন। কারণ বেগুনী জলদস্যুর সম্পর্কে অনেকের চেয়ে অনেক বেশি জানেন তোমার আব্বা।
তাহলে হয়তো ইতিমধ্যেই মেজর সব জেনে ফেলেছে।
মনে হয় না। তাহলে ওই সাক্ষাৎকার বন্ধ হয়ে যেতো, এখনও চলতো না। আড্ডার ওপর ওভাবে চব্বিশ ঘন্টা নজর রাখারও ব্যবস্থা করতো না। জাস্ট তুলে নিয়ে চলে যেতো। সাক্ষাৎকারে কি কি বলেছেন ক্যাপ্টেন, সব আমাদের জানা দরকার।
পিটার বললো, আমি সাহায্য করতে পারি। ছোট একটা টেপ রেকর্ডার নিয়ে যেতে পারি সঙ্গে করে, আব্বা যা যা বলে তুলে আনতে পারি।
হ্যাঁ, তা পারো, পিটারের দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। কাল রাতেও তোমার আব্বার সঙ্গে গিয়েছিলে। সব সময়ই যাও।
হ্যাঁ, যাই, কিশোরের কথায় অবাক হয়েছে পিটার। মেজরই যেতে বলে আমাকে। প্রায় জোরই করে। বলে, বছরের পর বছর আমাকে জলদস্যুদের গল্প শুনিয়েছে আমার আব্বা, অনেক কিছুই মনে আছে। এমন কিছু হয়তো বলে ফেলতে পারবো, যা আব্বা ভুলে বলেনি। মনে করিয়ে দিতে পারবো।

উজ্জ্বল হলো কিশোরের চোখ। সন্ধ্যায় যখন সাক্ষাৎকার দিতে যাও, তখন। কি মেজর থাকেন?
মাথা নাড়লো পিটার। কখনও না। অন্য লোক থাকে। কথা রেকর্ড করে নেয়।
নোনতা জেসন কোথায় থাকে ওই সময়টায়?
রকি বীচে ঘর ভাড়া নিয়েছে। রাতে ওখানেই থাকে।
তুমি আর তোমার আব্বা ছাড়া আর কেউ থাকে আড্ডায়?
না। শুধু ভিকটর ইভানস।
আরেকটা কথা। কতোক্ষণ ধরে সাক্ষাঙ্কার চলে?
নটা থেকে এগারোটা।
ঠিক আছে। আজ রাতেও তো সাক্ষাৎকার দিতে যাবে। ঘরের এয়ারকুলারটা বন্ধ করে দেবে। যাতে লোকটা বুঝতে না পারে। আর একটা জানালা খুলে ফাঁক করে রাখবে। কি কি কথা হয়, শুনতে চাই।
চোখে বিস্ময় নিয়ে তিনজনেই তাকিয়ে রইলো গোয়েন্দাপ্রধানের দিকে।
রহস্যটা বোধহয় আন্দাজ করে ফেলেছি, আনমনে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটলো একবার কিশোর। আশা করছি, আজ রাতেই সমাধান হয়ে যাবে।
সন্ধ্যা আটটায় আবার হেডকোয়ার্টারে মিলিত হলো তিন গোয়েন্দা।
কি করতে হবে বললো কিশোর। বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎকার দিতে যাবে। পিটার। আমি যাবো ওখানে, ওদের কথা শুনতে। মুসা, তুমি গিয়ে আড্ডার ওপর নজর রাখবে। আমাদের নতুন ওয়াকি-টকির রেঞ্জ তিন মাইল। কিন্তু ডি লা ভিনা থেকে পাইরেটস কোভ পাঁচ মাইল। কাজেই মাঝামাঝি জায়গায় একজনকে থাকতে হবে। রবিন থাকবে। মুসার মেসেজ আমাকে দেবে, আমার মেসেজ মুসাকে। ঠিক আছে?
মাথা ঝাঁকালে দুই সহকারী গোয়েন্দা।
বেরিয়ে এলো ওরা। সাইকেল নিয়ে রওনা হয়ে গেল যার যার জায়গার দিকে।

.

পাইরেটস কোভের পথে যখন নামলো মুসা, অন্ধকার হয়ে গেছে তখন। সাইকেলের আলো জ্বেলে দিলো। আড্ডার গেটের কাছে এসে থামলো। আলো নিভিয়ে অপেক্ষা করলো কিছুক্ষণ, চোখে অন্ধকার সইয়ে নেয়ার জন্যে।
আগের জায়গায়ই ট্রী-সার্ভিস ট্রাকটাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলো সে। সিগারেটের আগুন দেখেই বুঝতে পারলো, ড্রাইভিং সীটে বসে আছে কেউ। নিশ্চয়। নজর রাখছে।
ওয়াকি-টকি বের করলো মুসা। বললো, রবিন, কিশোরকে বলল, মেজরের ন্টসহকারী টনি এখনও চোখ রাখছে আড়ার ওপর।

প্রায় মাইল তিনেক দূরে, হাইওয়ের পাশে একটা ছোট টিলার ওপরে বসে আছে। রবিন। ওয়াকি-টকিটা মুখের কাছে তুলে আনলো। অন্ধকার রাস্তার দিকে তাকিয়ে। বললো, কিশোর, মুসা জানিয়েছে, এখনও আড়ার ওপর চোখ রাখছে টনি।
ওর কাছ থেকে মাইল দুয়েক দূরে, দোকানের জানালার নিচে একটা ঝোঁপের মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে কিশোর। মেসেজের জবাব দিলো, মেজর নিরেক, রিগো, আর টাকমাথা লোকটা এখনও বসে আছে এখানে। কিছুই করছে না। মুসাকে বলো, কড়া নজর রাখতে। খুব সাবধান যেন থাকে।
হুঁশিয়ারির প্রয়োজন ছিলো না। মাত্র কয়েকশো মিটার দূরে রয়েছে টনি। এই অবস্থায় সাবধান থাকতেই হবে, তা-ই রয়েছে মুসা। লুকিয়ে আছে গাছের ছায়ায়। এমন একটা জায়গায় গাছের গায়ে হেলান দিয়ে বসেছে, যেখান থেকে পার্কিং লট, গেট, টাওয়ারের ওপরের দুটো তলা আরট্রী-সার্ভিসট্রাকটা দেখা যায়।
আড্ডায় ঢোকার মুখে একটা খুঁটিতে আলো জ্বলছে। এঞ্জিন স্টার্ট নেয়ার শব্দ হলো। গেট দিয়ে বেরিয়ে এসে থামলো একটা ভ্যান। দরজা খুলে লাফিয়ে নামলো পিটার। গেটটা লাগিয়ে দিয়ে এসে আবার গাড়িতে উঠলো।
চলে গেল ভ্যানটা। আবার ট্রাকের দিকে তাকালো মুসা। নড়লো না ওটা। বেগুনী জলদস্যু তেমনি ভাবে বসে বসে সিগারেট টানছে টনি।
কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আবার মেসেজ পাঠালো মুসা, ক্যাপ্টেন ফিলিপ আর পিটার বেরিয়ে গেছে। টনি আগের মতোই বসে আছে। নজর রাখছে।
মেসেজটা কিশোরের কাছে পাচার করলো রবিন। পথের দিকে চোখ। কয়েক মিনিট পরেই দেখতে পেলো, তার সামনে দিয়ে পার হয়ে যাচ্ছে পিটারদের ভ্যানটা।
মেসেজ শুনলো কিশোর। তাকিয়ে রয়েছে ঘরের দিকে। রবিনের কথা শেষ হতে না হতেই ঘড়ি দেখলেন মেজর। উঠে রওনা হলেন দরজার দিকে।
লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো বিশালদেহী রিগো। লাফিয়ে লাফিয়ে চললো মেজরের পেছনে। একভাবে বসে রইলো টাকমাথা লোকটা।
দ্রুত হামাগুড়ি দিয়ে দোকানের পাশে চলে এলো কিশোর। চত্বরের দিকে তাকালো। দোকান থেকে বেরিয়ে ভ্যানে গিয়ে উঠলেন মেজর আর রিগো, যেটাতে খোঁড়ার যন্ত্রপাতিগুলো রয়েছে।
চলে গেল গাড়িটা।
খবরটা রবিনকে জানালো কিশোর। তারপর ফিরে এলো আবার আগের জায়গায়। টেপ রেকর্ডারে ক্যাসেট ভরছে টাকমাথা লোকটা। দুটো চেয়ার সাজিয়ে রাখলো ডেস্কের সামনে। চত্বরে আরেকটা ভ্যান ঢোকার শব্দ হলো।

একটু পরেই ঘরে এসে ঢুকলেন ক্যাপ্টেন ফিলিপ, সঙ্গে পিটার। ঢুকেই জড়োসড়ো হয়ে গেল পিটার। এমন ভঙ্গি করতে লাগলো, যেন ভীষণ শীত করছে। এয়ারকুলার বন্ধ করে দিতে বললো। অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠে গিয়ে সুইচ অফ করে দিলো। লোকটা। মনে মনে হাসলো কিশোর, বুদ্ধি আছে ছেলেটার। শুধু তাই নয়, লোকটা যখন এয়ারকুলার বন্ধ করতে গেছে, সে এসে খুলে দিয়েছে জানালা। এক পলকের জন্যে কিশোরের মুখটা নজরে পড়েছে বোধহয়, কারণ হেসেছে এদিকে তাকিয়ে। তাড়াতাড়ি ফিরে গেছে আবার, টাকমাথা কিছু সন্দেহ করার আগেই।

মিস্টার গুন, ক্যাপ্টেন বললেন, একদিন যা বলেছি, রেকর্ড তো করে। রেখেছেন। আবার শুনতে চাই। দরকার আছে।–

সরি, ক্যাপ্টেন, জবাব দিলো গুন, এখানে নেই ওগুলো। মেজর সব নিয়ে গেছেন।

কেন? জানতে চাইলো পিটার।

বোধ হয় এডিট করবেন। তারপর আরও কপি করে পাঠিয়ে দেবেন সোসাইটির ডিরেকটরদের কাছে।... আসুন, কাজ শুরু করা যাক।

রেকর্ডিঙের বোতাম টিপে যন্ত্রটা ক্যাপ্টেনের দিকে ঠেলে দিলো গুন। নিজে গিয়ে বসলো দরজার কাছে। ক্যাপ্টেন গল্প শুরু করলেন। সে চুপচাপ কমিক পড়তে লাগলো।

জানালা দিয়ে ঘরের ভেতর তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। ভাবছে, মেজর আর রিগো কোথায় গেল? টনিকে বসিয়ে এসেছে আড়া পাহারা দিতে। গুনকে রেখে গেছে ক্যাপ্টেনের সাক্ষাৎকার নেয়ার জন্যে। পঁচিশ ডলার করে ঘন্টায়। ফিলিপের। টাকার টানাটানি চলছে। এই অবস্থায় এটা তার জন্যে লোভনীয় কাজ। আন্তরিক ভাবে গল্প বলে যাবেন, যততা গল্প তাঁর জানা আছে। কিন্তু কেন এই কাজ করাচ্ছেন। মেজর? আন্দাজ করতে পারছে গোয়েন্দাপ্রধান। আরও আন্দাজ করতে পারছে,। কোথায় গেছেন মেজর নিরেক রিগোকে নিয়ে।

.

আড্ডার বাইরে খুঁটিতে ওই একটামাত্র আলোই জ্বলছে।

টিকেট বুদ আর তালা দেয়া গেটটা দেখা যাচ্ছে সেই আলোয়। খুব সামান্যই গিয়ে পড়েছে পার্কিং লটে, তবে ওই ম্লান আলোতেই নড়াচড়াটা চোখ এড়ালো না। মুসার। ট্রাকের ভেতরে জ্বলছে সিগারেটের আগুন, একবার উজ্জ্বল হচ্ছে, টান। দেয়ার সময়। টান ছেড়ে দিলেই আবার কমে যাচ্ছে। মাঝে মধ্যে পেছনের পথ। দিয়ে চলে যাচ্ছে গাড়ি। মুসা আসার পর এয়ার ট্যাক্সি সার্ভিসের একটা বিমানও। উড়ে গেছে।

তারপর, রকি বীচের দিক থেকে এলো একটা ভ্যান। পাকিং লটে ঢুকলো। হেডলাইট নিভালো। গিয়ে থামলো বন্ধ গেটের সামনে। দরজা খুলে নেমে এলেন। মেজর নিরেক আর রিগো।

রবিন! নিচু গলায় মেসেজ পাঠালো মুসা, মেজর আর রিগো ব্যাটা এসে গেছে!

জানালার নিচে বসে মেসেজটা শুনলো কিশোর। উত্তেজিত হয়ে উঠলো। বললো, এটাই আশা করেছিলাম, নথি। ক্যাপ্টেন ফিলিপ আর পিটারকে সরিয়ে দেয়া। হয়েছে আড্ডা থেকে, যাতে নিরাপদে খোঁড়ার কাজ চালিয়ে যেতে পারে মেজরের। চেলারা। ওরা জানে কিংবা অনুমান করেছে কিছু একটা লুকানো রয়েছে ওখানে।

ওয়াকি-টকির খুদে মাইক্রোফোনে কড়কড় করে উঠলো রবিনের কণ্ঠ, মুসা বলেছে, মেজর আর রিগো গেটের কাছে দাঁড়িয়েছিলো। টনি নেমে গেছে। ওদের কাছে। গেটের তালা খুলে দিয়েছে। ভ্যান নিয়ে ভেতরে ঢুকেছে মেজর আর রিগো। যতোটা সম্ভব আস্তে আর নীরবে করেছে কাজটা। আলো জ্বালেনি। ওরা। ঢুকে যেতেই আবার তালা লাগিয়ে ট্রাকে ফিরে এসেছে টনি। ভ্যানটা আর দেখতে পাচ্ছে না মুসা।

নিচের ঠোঁট কামড়ালো কিশোর। রবিন, মুসাকে বললো ভ্যানের পিছু নিতে। মেজর আর রিগো কি করছে জানা দরকার।

অন্ধকারে নিজে নিজেই মাথা নাড়লো মুসা। গেটের ভেতরে ঢোকার উপায় নেই। এখন ট্রাকের হাইড্রলিক লিফটে চড়ে বসেছে টনি। আমি বেরোলেই আমাকে দেখে ফেলবে। বেড়ার কাছেও যেতে পারবো না, দেখে ফেলবে। আর গিয়ে লাভও নেই। এতো উঁচু বেড়া, ডিঙাতে পারবো না।

কিশোর বলেছে, যে ভাবেই হোক, ঢুকতে হবে তোমাকে। ওরা কি করছে, জানা দরকার। কোনো না কোনো উপায় নিশ্চয় আছে। খোঁজো। ..

আরেকবার চোখ বোলালো মুসা। বললো, কারখানার ওদিক দিয়ে ঢোকার চেষ্টা করতে পারি। বেড়া ওখানেও আছে। ডিঙানোর চেষ্টা করবো। না পারলে আরও এগিয়ে চলে যাবো। পিয়ারের কাছে। পিয়ার পার হয়ে পানিতে নেমে সাঁতরে ঢুকবো আড্ডার ভেতরে। তাহলেই আর টনি দেখতে পাবে না।

রবিনের জবাবের অপেক্ষায় রইলো মুসা। কিশোরের সঙ্গে কথা বলবে রবিন, তারপর জবাব দেবে।

বেড়ার অন্যপাশে পথের দিকে তাকিয়ে রয়েছে মুসা। কোনো শব্দ নেই ওখানে। আলো নেই।

অবশেষে জবাব দিলো রবিন, ঠিক আছে, মুসা, যাও। তবে খুব সাবধান!

.

কয়েকশো মিটার দূরে দৈত্যাকার ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে ট্রি-সার্ভিসট্রাকটা। সিগারেটের আগুন জানিয়ে দিচ্ছে এখনও হাইড্রলিক লিফটের ওপরে রয়েছে টনি।

পথটা দেখলো মুসা। পার্কিং লটের দিকে তাকালো। নির্জন। টনির দিকে আরেক বার তাকিয়ে সমস্ত দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে উঠে পড়লো সে। ছায়ায় ছায়ায় দৌড়ে চলে এলো কারখানার কাছে। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো কয়েক সেকেণ্ড। বোঝার চেষ্টা করলো, কারো চোখে পড়ে গেল কিনা। বোধহয় পড়েনি। দেয়ালের ধার ধরে ধরে চলে এলো শেষ মাথায়, যেখানে খাড়ির সঙ্গে মিশেছে ওটা। দেয়াল থেকে বেরিয়ে থাকা ইট আর কড়িকাঠ ধরে ওপরে উঠে পড়লো সে, তারপর দম বন্ধ করে লাফ দিলো। কাঠের পিয়ারে নিঃশব্দে পড়ার প্রশ্নই ওঠে না। থ্যাপ করে একটা শব্দ হলো। অন্ধকারে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলো আরও কিছুক্ষণ। কারো সাড়া নেই দেখে হাঁটতে আরম্ভ করলো। এগোলো কিছুদূর। খানিক দূরে চকচক করছে খুঁড়ির কালো পানি। মিটার দশেক দূরে আবছাভাবে চোখে পড়ছে ঘরবাড়ি।

পানিতে না নেমে ওখানে পৌঁছানোর আর কোনো উপায় নেই। পিয়ারের ওপর হাতড়ে হাতড়ে একটা নৌকা বাঁধার দড়ি পেয়ে গেল। টেনে দেখলো, একটা মাথা এখনও পিয়ারের সঙ্গে বাঁধা রয়েছে। ওটা ধরে ঝুলে পড়লো সে। নেমে এলো পানির কাছে। পা দিয়ে ছুঁয়ে দেখলো। কনকনে ঠাণ্ডা পানি। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত দ্বিধা করলো সে। তারপর হাত ছেড়ে দিলো।

পানি একেবারেই কম ওখানে, মাত্র গোড়ালি ডুবলো। দ্রুত একবার তাকালো। এদিক ওদিক, কেউ দেখছে কিনা দেখলো। তারপর হেঁটে চললো পানির মধ্যে দিয়ে। সাঁতরাতে হলো না বলে খুশি।

ট্রেলারটার কাছে উঠে এলো সে। জীবনের কোনো চিহ্নই নেই কোথাও। সব কিছু চুপচাপ।

ডকে ভাসছে জাহাজটা, মাঝে মাঝে ঘষা লাগছে জেটির সঙ্গে, কচমচ আওয়াজ করছে। প্রমিনাডের দুপাশের ঘরগুলো সব বন্ধ। কফি স্ট্যাণ্ড, মিউজিয়ম, সব। মেজরের গাড়িটা চোখে পড়লো না।

ঘুরে মিউজিয়মের পেছনে চলে এলো সে। অন্ধকার আকাশের পটভূমিকায়। অনেক উঁচু লাগছে জাহাজের গলুইটা। সেদিকে একবার তাকিয়ে ওয়াকি-টকি তুলে আনলো মুখের কাছে। রবিন, ভেতরে ঢুকেছি। ট্রেলার, বাড়ি, জাহাজ, সব জায়গায় দেখলাম। মানুষজন চোখে পড়ছে না। মেজরের ভ্যানটাও না। কোথায় যে গায়েব হয়ে গেল, আল্লাহ মালুম!

কিছুক্ষণ পর রবিনের কথা শোনা গেল, কিশোর বলছে, ওরা ওখানেই। কোথাও আছে। খুঁজতে বলেছে।

গুঙিয়ে উঠলো মুসা। তবে তর্ক করলো না। ঘুরে রওনা হলো ওকের জঙ্গলের দিকে। ঘন গাছপালার মধ্যে ঢুকে দাঁড়ালো। কান পাতলো শব্দ শোনার আশায়। কিছুই কানে এলো না, শুধু তীরে ঢেউ আছড়ে পড়ার মৃদু ছলাৎছল ছাড়া। আর আছে বাতাসের ফিসফাস কানাকানি। আড়র দিকে মুখ করে থাকা, টাওয়ারের একটা জানালায় আলো দেখা যাচ্ছে।
নিচু গলায় ওয়াকি-টকিতে কথা বললো মুসা, ভিকটর ইভানসের টাওয়ারে আলো দেখা যাচ্ছে। ভালো করে দেখতে যাচ্ছি আমি।
বনের ভেতর থেকে সরাসরি না বেরিয়ে বেড়ার কাছে চলে এলো মুসা। বেড়ার ধার ঘেঁষে এগোলো, যাতে সহজে কারো চোখে না পড়ে। টাওয়ারের কাছাকাছি এসে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লো মাটিতে। বুকে হেঁটে এগোলো। আলো কিত জানালাটার কাছে এসে থেমে দম নিলো, তারপর আস্তে মাথা তুলে উঠে দাঁড়ালো।
ঘরের ভেতর ভিকটর একা। ইজি চেয়ারে শুয়ে পড়ছে। হঠাৎ কি মনে করে মাথা উঁচু করে কান পাতলো। যেন কোনো শব্দ কানে গেছে। সতর্ক হলো মুসা। সে কোনো আওয়াজ করে ফেললো না তো?
তাড়াতাড়ি জানালার কাছ থেকে সরে আসতে গেল সে। ফেলে দেয়া একটা খাবারের খালি টিনে পা বেধে ঠনঠন করে গড়িয়ে গেল ওটা। নীরব অন্ধকারে মুসার মনে হলো টিনের শব্দ তো না, যেন বোমা ফেটেছে।
চোখের পলকে মাটিতে শুয়ে স্থির হয়ে গেল সে।
ঝটকা দিয়ে খুলে গেল ঘরের দরজা। এক ফালি আলো এসে পড়লো বাইরে। আলোর দিকে পেছন করে দাঁড়িয়ে আছে ভিকটর। হাতে পিস্তল।
কেঁপে উঠলো মুসা। নেমে এলেই লোকটা তাকে দেখে ফেলবে...
মিআঁউউউ!।
অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে ভিকটরের পায়ে গা ঘষতে আরম্ভ করলো একটা। কালো বেড়াল। হেসে পিস্তলটা নামিয়ে ফেললো সে। তুই। আমি ভেবেছিলাম না। জানি কে। আয়, ভেতরে আয়। _
বেড়ালটাকে তুলে নিয়ে ঘরে ঢুকে গেল ভিকটর।
কপালের ঘাম মুছলো মুসা। বেড়ালটা সময়মতো না বেরোলে...আর ভাবতে পারলো না সে। বুকে হেঁটে যতোটা তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে এলো আবার বেড়ার কাছে। উঠে একছুটে ঢুকে পড়লো ওকের জঙ্গলে।
জোরে জোরে দম নিলো কয়েকবার। তারপর ওয়াকি-টকি বের করে বললো, রবিন, কিশোরকে বলো, ঘরে রয়েছে ভিকটর। পড়ছে। মেজর নিরেক আর রিগোর চিহ্নও দেখলাম না। যেন বাতাসে মিলিয়ে গেছে!

.
দোকানের পেছনে ঝোঁপের মধ্যে বসে অন্ধকারেই ভুরু কোঁচকালো কিশোর। বললো, ভ্যানটা ওখানেই কোথাও আছে।
ঘড়ি দেখলো সে। এগারোটা প্রায় বাজে। রবিনের জবাব শোনা গেল, মুসা। বলছে, পুরনো আস্তাবলগুলোর সব কটার ডবল দরজা। সহজেই ভ্যান ঢোকানো যাবে। তবে ভেতরে ঢুকতে চাইছে না, মুসা, মেজরের চোখে পড়ে যাওয়ার ভয়ে।
এখনও আমরা কিছু জানতে পারিনি। ওরকম ঝুঁকি না নেয়াই ভালো। জিজ্ঞেস করো, আর কি করতে পারে সে?
দোকানের ভেতরে একটা প্যাকেট খুলে কেক বের করে ক্যাপ্টেন আর পিটারকে দিলো গুন। মুসার কাছ থেকে রবিনের মুখে জবাব এলো ওয়াকি টকিতে, একটা কাজই করতে পারে বলছে। গেটের কাছে লুকিয়ে থেকে দেখতে পারে, কোত্থেকে বেরোয় ভ্যানটা। _ আপনমনেই মাথা ঝাঁকালো কিশোর। এটাই একমাত্র বুদ্ধি..এই শোনো, ধরো, দেখি। মাথা আরেকটু তুললো সে। রেকর্ডিং শেষ হয়েছে মনে হচ্ছে।...হা, উঠে দাঁড়িয়েছেন ক্যাপ্টেন আর পিটার। এগারোটা বাজে। বেরিয়ে যাবেন।
সামনের গেটের কাছে, মিউজিয়মের কোনায় মাটিতে পেট দিয়ে শুয়ে আছে মসা। তাকিয়ে রয়েছে প্রমিনাডের দিকে। ব্ল্যাক ভালচারের দানবীয় ছায়া ছায়া শরীরটা চোখে পড়ছে। কানে আসছে শুধু বাতাসের ফিসফাস, ঢেউয়ের ছলছল, আর কাঠের জেটিতে জাহাজের ধাতব শরীর ঘষা লাগার বিচিত্র ক্যাচকোচ।
একভাবে শুয়ে থাকতে থাকতে ঘুম পেয়ে গেল মুসার। দুই চিবুকের ওপর। থুতনি রেখে চোখ মিটমিট করে ঘুম তাড়ানোর চেষ্টা করলো সে। হঠাৎ করেই চোখে পড়লো ওটা। ভ্যান! হেডলাইট নেভানো। এগিয়ে আসছে গেটের দিকে। এঞ্জিন স্টার্ট নেয়ার শব্দ শুনতে পায়নি সে। কোনদিক থেকে এলো, তা-ও বুঝতে পারেনি। ঘড়ি দেখলো সে। ঠিক ১১টা।
মাটিতে শরীর চেপে ধরলো মুসা, একেবারে মিশিয়ে ফেলতে চায় যেন। প্রায় নিঃশব্দে এসে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে গেল ভ্যান। গেট খোলার জন্যে নামলো রিগো। খুলে দিতে বেরিয়ে গেল গাড়িটা।
খানিকটা এগিয়ে আচমকা ব্রেক কষে দাঁড়ালো ভ্যান। ঝাঁকুনি লেগে হাঁ হয়ে খুলে গেল পেছনের দরজা। খুঁটির আলো গিয়ে পড়েছে ওটার গায়ে, ভেতরে কি আছে স্পষ্ট দেখতে পেলো মুসা। গাদা গাদা বস্তা সাজিয়ে রাখা হয়েছে, বোঝাই।
গাল দিয়ে উঠলেন ড্রাইভিং সীটে বসা মেজর, গাধা কোথাকার! তালা লাগায়নি! লাগিয়ে জলদি এসে ওঠো!

মেজরের নির্দেশ পালন করতে ছুটলো রিগো। দরজাটা লাগিয়েই থেমে গেল। ফিরে তাকালো মুসা যেখানটায় শুয়ে আছে সেদিকে। দেখে ফেললো নাকি! জমে গেল মুসা।
এই, কি হলো, বলদ! এতো দেরি কেন? ধমক দিলেন মেজর।
মাথা চুলকালো রিগো। দ্বিধা করলো একবার। তারপর গিয়ে উঠলো সামনের। সীটে। হেডলাইট জ্বালানো হলো এবার ভ্যানের। চলে গেল ওটা।
ওয়াকি-টকির ওপর কুঁকলো মুসা। রবিন, এইমাত্র বেরিয়ে গেল মেজর আর রিগো। কোথায় ছিলো ওরা, কোত্থেকে এলো, কিছুই বুঝতে পারিনি। তবে ভ্যানের পেছনে কি আছে দেখেছি। অনেক বস্তা বোঝাই করা!

.

ক্যাপ্টেন ফিলিপ আর পিটারকে দোকান থেকে বেরিয়ে যেতে দেখলো কিশোর। ট্রাক চলে যাওয়ার শব্দ শুনলো। ওরা চলে যেতেই খোলা জানালাটা চোখে পড়লো গুনের। বিড়বিড় করে কি বলে এসে বন্ধ করে দিলো। এয়ারকুলার চালু করলো। তারপর গিয়ে বসলো টেপ রেকর্ডারের সামনে। টেপ রিওয়াইন্ড করে মুছে ফেলতে শুরু করলো ক্যাপ্টেনের কথা। অযথাই বকবক করে গেছেন যেন ফিলিপ, কোনো মানেই নেই ওসবের।
এই সময় এলো রবিনের মেসেজ। ভ্যানের পেছনে বোঝাই বস্তার কথা শুনে উত্তেজিত হয়ে উঠলো। বোঝাই? যা-ই আছে, ওগুলোর জন্যেই গিয়েছিলো ওখানে ওরা! জিজ্ঞেস করো তো মুসাকে, কি আছে দেখতে পারবে কিনা?
পারবে না। ভ্যানটা চলে গেছে। এখনও পাহারা দিচ্ছে টনি। যে পথে ঢুকেছিলো সেপথেই ফিরে আসছে মুসা। হেডকোয়ার্টারে দেখা করবে, পরে।
ঠিক আছে, ঠোঁটে চিমটি কাটলো কিশোর। তুমি জলদি চলে এসো এখানে।
পনেরো মিনিটের মধ্যেই একটা ভ্যানের শব্দ শুনলো কিশোর। চত্বরে। থামলো। খানিক পরে ঘরে এসে ঢুকলেন মেজর আর রিগো। গুনের সঙ্গে কথা: বলতে লাগলেন তিনি, আর রিগো কেকের বাকিটা শেষ করায় মন দিলো। মাঝে মাঝে চোখ তুলে তাকাচ্ছে। জানালার বাইরে। ঝোঁপের ভেতর গুটিয়ে গেল। কিশোর। কথা শেষ করে রিগোকে ইশারা করলো গুন। নেহায়েতই অনিচ্ছা নিয়ে যেন তার পিছে পিছে চললো হাতির বাচ্চা। নিশ্চয় বেগুনী জলদস্যুর আড্ডায় পাহারা বদল করতে যাচ্ছে, কিশোর ভাবলো।
দেয়ালের পেছনে একটা খসখস কানে এলো তার। অন্ধকারে ঘুরে তাকালো।
রবিন এসেছে।
হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেল কিশোর। ফিসফিস করে বললো, এসেছে। ভালো হয়েছে। আমার জায়গায় গিয়ে বসো। বস্তাগুলোয় কি আছে দেখতে যাচ্ছি আমি।

আমাদের যন্ত্রটাও খুলে আনবো। মেজরকে বেরোতে দেখলেই আমাকে হুঁশিয়ার করবে।
তাড়াতাড়িই ফিরে এলো কিশোর।
দেখেছো? জিজ্ঞেস করলো রবিন।
দেখেছি। দশটা বস্তায়ই। যন্ত্রটাও খুলে নিয়ে এসেছি। চলো, বাড়ি যাবো।
কি আছে?
ততোক্ষণে চলতে আরম্ভ করেছে কিশোর। রবিনের কথার জবাব দিলো না। সাইকেল নিয়ে রওনা হলো দুজনে।
ওরা ইয়ার্ডে আসার কিছুক্ষণ পর এলো মুসা।
নষ্ট হয়ে যাওয়া ট্রেইলিং ডিভাইসটা টেবিলে ফেলে রেখেছে কিশোর। কিসের সঙ্গে যেন বাড়ি খেয়ে হয়েছে এই অবস্থা।
গেল! জোরে নিঃশ্বাস ফেলে বললো রবিন। ওই জিনিস আরেকটা কেনার পয়সাও নেই এখন আমাদের।
যাক, হাত নাড়লো মুসা। পয়সা হলে কিনে নেবো আরেকটা। এই কিশোর, বস্তার ভেতর কি দেখলে?
মাটি।
মাটি! মুসা আর রবিন দুজনেই অবাক।
মাটি আর পাথর, আবার বললো কিশোর। দশ বস্তা বোঝাই খুব বাজে মাটি আর পাথর।
কিন্তু...কিছুই বুঝতে পারছি না! হাত ওল্টালো মুসা।
এটুকু বোঝা যাচ্ছে, কিশোর বললো, মাটি খুঁড়েছে জলদস্যুর আভজাতেই। কাল আবার যাবো আমরা। ক্যাপ্টেন ফিলিপকে বলবো গল্প রেকর্ডিংটা স্রেফ একটা ধাপ্পাবাজি। তারপর খুঁজে বের করবো, কোন জায়গায় খুঁড়ছেন মেজর, এবং কেন।

.

পরদিন সকালে হেডকোয়ার্টারে রবিন দেখলো, রিসিভার ক্রেডলে নামিয়ে রাখছে কিশোর। মুসা আসছে না, জানালো সে। বাড়ি থেকে কাজ চাপানো হয়েছে ওর ওপর। ওকে রেখেই যেতে হচ্ছে আমাদের। যতো তাড়াতাড়ি পারে কাজ শেষ। করে আড্ডায় আমাদের সঙ্গে দেখা করবে বলেছে।
হাসলো রবিন। মায়ের ওপর রেগে নিশ্চয় ভোম হয়ে আছে।
যা-ই হোক, অন্তত খুশি মনে হলো না। চলো। তিনটে ওয়াকি-টকিই নিয়ে। নিচ্ছি। কাজে লাগতে পারে।
যন্ত্রগুলো ব্যাগে ভরে নিলো রবিন।

সবুজ ফটক এক দিয়ে সাইকেল নিয়ে বেরোলো ওরা। চললো জলদস্যুর আড়ার দিকে। কুয়াশা পড়েছে। হাইওয়ে দিয়ে সাবধানে সাইকেল চালালো
পৌঁছে দেখলো নির্জন পাইরেটস কোভ-এর ওপরে নীরবে যেন ঝুলে রয়েছে। ভারি কুয়াশার চাদর।
পিটারকে ফোন করেছিলাম, কিশোর জানালো। সে বলেছে, তার আব্বাকে বলেকয়ে রাজি করিয়ে রাখবে আমাদের সঙ্গে কথা বলার জন্যে।
গেটের কাছে পৌঁছে নিচু গলায় বললো রবিন, আইসক্রীমের ভ্যানটা আছে রিগো কোথায় লুকিয়েছে কে জানে। হয়তো গাছের আড়ালে।
রাস্তার দিকে তাকালো কিশোর। গাড়িটা দেখলো। গাছের জটলার দিকে তাকিয়ে হাসলো। হ্যাঁ, আছে। অতোবড় হাতির মতো দেহ লুকানো কি আর সহজ?
গেটের ভেতরে ঢুকলো দুজনে। ট্রেলারের কাছে এসে বেল বাজালো।
সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল দরজা। পিটার বললো, এসো। তোমাদের জন্যেই বসে আছি।
রান্নাঘরে টেবিলের সামনে বসে আছেন ক্যাপ্টেন ফিলিপ। সবে নাস্তা শেষ করেছেন। ছেলেদেরকে কফি খাবে কিনা জিজ্ঞেস করলেন। ভদ্রতার সঙ্গে বললো। ওরা, খাবে না।
হাতের কাপটা টেবিলে নামিয়ে রেখে বললেন তিনি, মেজর নিরেককে বিরক্ত করতে মানা করেছিলাম তোমাদেরকে।
মনে আছে, স্বীকার করলো কিশোর। আমরা করিনি। তদন্ত যে করছি। বগুনী জলদস্যু জানেনই না মেজর।
তাহলেই ভালো। শুনলাম, রহস্যের কিনারা নাকি করে ফেলেছে। খুলে বল তো সব।
পিটার বোধহয় বাড়িয়ে বলেছে, নরম গলায় বললো কিশোর। রহস্যের সমাধান এখনও করতে পারিনি, তবে শিওর হয়ে গেছি, রহস্য একটা সত্যিই আছে। আগের দিন রাতে যা যা ঘটেছে বলতে লাগলো সে।
আরেক কাপ কফি ঢাললেন ক্যাপ্টেন। কিশোরের কথা শেষ হলে বললেন; তাহলে তোমার বিশ্বাস, পুরো ব্যাপারটাই একটা ফাঁকিবাজি। গল্প বলানোর ছুতোয় আমাদেরকে সরিয়ে দিচ্ছে মেজর, যাতে নিরাপদে মাটি খুঁড়তে পারে।
হ্যাঁ, স্যার।
কিন্তু কেন? আর এতো পাহারার ব্যবস্থাই বা কেন করেছে?
এখনও জানি না। তবে অনুমান করতে পারি। বেগুনী জলদস্যুর গুপ্তধন। আছে হয়তো এখানে, আর সেটা জানা আছে মেজর আর তার চেলাদের। ম্যাপও আছে একটা। টেবিলে ম্যাপ বিছিয়ে যে দেখেছিলেন মেজর, সেকথা জানালো কিশোর।

সন্দেহ যাচ্ছে না ক্যাপ্টেনের। পাইরেটস কোভে গুপ্তধন আছে, একথা কারো কাছে শুনিনি। কোনো গুজব নেই। তবে উইলিয়াম ইভানস ফিরে এসে মারা। যাওয়ার পর লোকে ভাবতে শুরু করেছিলো, সে গুপ্তধন লুকিয়ে রেখে গেছে। খোঁজাখুঁজিও করেছে। কেউ কিছু পায়নি। তারপর আর ওসব নিয়ে মাথা ঘামায়নি। কেউ।

গুপ্তধন না-ও হতে পারে। তবে মাটি যে খোঁড়া হচ্ছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কোন জায়গায় খুঁজছে, এখন গিয়ে সেটা বের করা দরকার।

পাওয়া যাবে! উত্তেজনায় চকচক করছে পিটারের চোখ। তিন দিন ধরে খুঁড়ছে, নিশ্চয় বেশ বড় গর্ত!

তাহলে পাওয়া সহজই হবে, ক্যাপ্টেন বললেন।

আমার তা মনে হয় না, সন্দেহ রয়েছে কিশোরের। মাটি খুঁড়ে বস্তায় ভরে নিয়ে যাচ্ছে, এটা অতি সাবধানতা। যাতে সহজে কারো চোখে না পড়ে।

আলাদা আলাদা হয়ে খুঁজতে বেরোই আমরা, কি বলো? রবিন বললো। তুমি ক্যাপ্টেনকে নিয়ে যাও। আমি আর পিটার যাচ্ছি। দুদিকে যাবো। দুজনেই এলাকা চেনেন, অসুবিধে হবে না।

মাথা ঝাঁকালো কিশোর।

ঠিক হলো দুদিক থেকে খুঁজে এসে জাহাজটার কাছে মিলিত হবে ওরা।

কফি স্ট্যাণ্ডের পেছন দিকটায় খুঁজতে চললো কিশোর আর ক্যাপ্টেন। কুয়াশা। এখনও কাটেনি। মাথার ওপরে কুণ্ডলী পাকিয়ে উড়ছে, হালকা মেঘের মতো।

এটা আর মিউজিয়ম করা হয়েছে যে বাড়িটায়, ক্যাপ্টেন বললেন, আগে আস্তাবল ছিলো। ওদিকে ওই গাছপালাগুলো দেখছো, ওখানে আরেকটা বাড়ি ছিলো। কোভ রোড তৈরি হওয়ার আগে।

ঘরের ভেতরেও মাটি খোঁড়া হয়ে থাকতে পারে, সন্দেহ করে একটা আস্তাবলের দরজা খুললেন তিনি। কোমল পানীয় আর টিনজাত খাবারের বাক্সে। ঘরটা বোঝাই। তবে ভ্যান রাখার জায়গা রয়েছে। মাটিতে টায়ারের কোনো চিহ্ন দেখা গেল না, গর্তটর্তও খোঁড়া হয়নি। কিছুই পাওয়া গেল না। বাইরে বেরিয়ে আশেপাশে খুঁজলো কিছুদূর। তারপর নিরাশ হয়ে এসে দাঁড়ালো ব্ল্যাক ভালচারের কাছে।

রবিন আর পিটারও ফিরে এলো।

পাইনি, হতাশ কণ্ঠে জানালো রবিন। একটা ইঞ্চি জায়গাও বাদ দিইনি।

ঘড়ি দেখলেন ক্যাপ্টেন। শো-এর সময় হয়ে যাচ্ছে। নোনতা তো এখনও এলো না। আসেই কিনা কে জানে! মাঝে মাঝেই এরকম করে। একা মারিয়া। সামলাতে পারবে না। লোক যদি বেশি হয়ে যায়, তোমরা কি সাহায্য করতে পারবে?

উজ্জ্বল হয়ে উঠলো কিশোরের চোখ। নিশ্চয় পারবো, স্যার। অভিনয়ও করতাম একসময়। জলদস্যুর অভিনয় ভালোই পারবো। প্রয়োজন হলেই বলবেন। আমরা আছি।
এক কাজে দুই কাজ হয়ে যাবে, প্রস্তাবটা রবিনেরও মনে ধরেছে। কাজও করবো, ওদিকে খোঁজাও হয়ে যাবে, গর্তটা। মিউজিয়মের চাবিটা দিন।
পকেট থেকে চাবি বের করে দিলেন ক্যাপ্টেন। ছেলেকে নিয়ে চলে গেলেন, শো-এর জন্যে তৈরি হতে। তালা খুলে মিউজিয়মের ভেতরে ঢুকলো কিশোর আর রবিন।
কিশোর বললো, দেখ, মাটিতে চাকার দাগ আছে কিনা?
প্রথম ঘরটায় কোনো দাগ পাওয়া গেল না। মাটি খোঁড়ার চিহ্নও নেই। পরের ঘরটায়ও দাগটাগ মিললো না। বেরোনোর জন্যে পা বাড়িয়েই থেমে গেল রবিন। হাত তুলে হুঁশিয়ার করলো কিশোরকে।
বাইরে কুয়াশার মধ্যে নড়ছে কিছু। শব্দ শুনতে পেয়েছে সে।
দরজার দিকেই এগিয়ে আসছে শব্দটা।

.

কুইক! ফিসফিসিয়ে বললো কিশোর। দরজার পেছনে!
কিন্তু লুকানোর আগেই দরজায় দেখা দিলো একটা ছায়া। কুয়াশার ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো।
অ, তুমি! আমরা তো ভেবেছিলাম কে জানি! মুসাকে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস। ফেললো রবিন।
কি করে বুঝলে এখানে আছি? কিশোর জিজ্ঞেস করলো। পিটারকে জিজ্ঞেস করেছো নাকি?
নাহ, দেখাই হয়নি। ভেতরে শব্দ শুনলাম, দরজাও খোলা। ভাবলাম, দেখি তো কে? কোথায় খুঁড়েছে দেখেছো?
মাথা নাড়লো কিশোর। না। তবে এ-বাড়ির একটা ঘর এখনও বাকি।
শেষ ঘরটারও তালা খুলে দেখলো ওরা। কিছু পেলো না।
বাইরে হালকা হয়ে এসেছে কুয়াশা। মিউজিয়ম বিল্ডিং আর ওকের জটলার মাঝের জায়গায় ছড়িয়ে পড়লো তিন গোয়েন্দা। কয়েকজন দর্শককে দেখতে পেলো, ব্ল্যাক ভালচারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কফি স্ট্যাণ্ডটা খোলা হয়েছে, কাউন্টারের পেছনে বসেছেন ক্যাপ্টেন। সাগরের কিনার, বেড়া আর ওকের সারির মাঝের জায়গা তন্ন তন্ন করে খুঁজলো ছেলেরা।
খোঁড়ার কোনো লক্ষণই তো দেখছি না, রবিন বললো হতাশ কণ্ঠে।
হয়তো খুঁড়েছিলো, মুসা বললো। কালরাতে এসে আবার ভরে দিয়ে

তাহলে পরিষ্কার বোঝা যেতো, বললো কিশোর। সবখানেই, তো খুঁজলাম…
বাধা দিলো রবিন, না, সবখানে নয়! টাওয়ার আর বোটহাউসের ভেতরটা এখনও বাকি!
বাঁকাচোরা পুরনো ওকের ভেতর দিয়ে তাকালো ওরা টাওয়ারের দিকে। পানির কিনারে কাত হয়ে থাকা বোট-হাউসটা দেখলো। গাছপালার ভেতর দিয়ে ভ্যান চালিয়ে যাওয়ার মতো যথেষ্ট ফাঁক রয়েছে।
কিন্তু পাথরের টাওয়ারের ভেতরে খুঁড়বে কি করে? প্রশ্ন তুললো মুসা। বোটহাউসে পারা যাবে না। একটায় পাথর, আরেকটায় পানি।
তবে বোটহাউসে ভ্যান লুকানো সম্ভব, কিশোর বললো। রবিন ঠিকই বলেছে। দেখা দরকার।
দাঁড়াও, আবার বাধা দিলো রবিন। ভিকটর লোকটার মাথায় ছিট আছে। কাল আমাকে যেরকম করে ধরেছিলো! ক্যাপ্টেনকে নিয়ে আসা উচিত আমাদের।
ফোঁস করে নিশ্বাস ফেললো কিশোর। তা-ও বটে।
ভিকটর এখন টাওয়ারে নেই, মুসা বললো। আমি ঢোকার সময় দেখলাম। পার্কিং লট থেকে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।
চলো তাহলে, তুড়ি বাজালো কিশোর। এটাই সুযোগ।
হালকা বনের ভেতর দিয়ে যাওয়ার সময় দেখতে পেলো ওরা, জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে আছেন ক্যাপ্টেন ফিলিপ। কয়েকজন দর্শকের সঙ্গে কথা বলছেন। ঘড়ি দেখলেন একবার। গেটের কাছে টিকেট বুদটা খোলা রেখেছে এখনও মারিয়া।
প্রথমে বোটহাউসের দিকে এগোলো ওরা। ডাঙার দিকের দরজাটা বেশ বড়, তালা নেই। দরজার ঠিক ভেতরেই কাঠের মেঝে, ভ্যান রাখা সম্ভব ওখানে। তবে টায়ারের চিহ্ন কিংবা তেলটেল পড়ে নেই। কালো পানির ওপর যেন ঠেলে বেরিয়ে আছে ডক, নৌকা বাঁধার জায়গা রয়েছে দুপাশে। একটা নৌকাও নেই। শেষ মাথায় দরজা ছিলো একসময় নৌকা ঢোকানোর জন্যে, তবে এখন এমনভাবে বসে গেছে পানিতে, ঢোকানোর আর উপায় নেই। ডকের ওপরে ছাতের কাছে। পাল রাখার জায়গা। ওখানে এখনও বেশ কিছু পাল, মাস্তুল আর দড়ি রয়েছে। ডকের নিচে কাঠের গায়ে ঢেউ ভাঙছে। সব কিছুই খুব স্বাভাবিক, মাটি খোঁড়ার চিহ্নই নেই।
টাওয়ারে যাওয়ার পথেও কোথাও খোঁড়ার চিহ্ন দেখা গেল না।
মুসা, কিশোর বললো, বনের ভেতর গিয়ে পাহারা দাও। ওয়াকি-টকি বের করে দিলো। নাও। ভিকটরকে আসতে দেখলেই হুঁশিয়ার করবে। সারাক্ষণ অন করে রাখবো আমাদের যন্ত্র।

টাওয়ারের দিকে তাকিয়ে হাঁটছে কিশোর। একতলায় দুটো দরজা আর কয়েকটা জানালা। দোতলা-তিনতলায় একটা করে খুদে জানালা। আর চারতলার প্রায় পুরোটাই কাঁচের, লাইটহাউসের মতো। জানালার মাঝে দেয়ালের গা থেকে বেরিয়ে আছে ইটের ধাপ, মইয়ের মতো অনেকটা, উঠে গেছে একেবারে চ্যাপ্টা ছাত পর্যন্ত।

সামনের একটা দরজায় ঠেলা দিলো কিশোর। তালা নেই। খুলে গেল। ছোট একটা লিভিং রুম দেখা গেল, গোল, ছাতটা উঠে গেছে গম্বুজের মতো গোল হয়ে। ডানে ওই একই আকারের বেডরুম, বাঁয়ে রান্নাঘর। ওখান থেকে বেরোনোর। আরেকটা দরজা আছে, ভেতর থেকে ছিটকানি লাগানো। একটা কাঠের সিঁড়ি নেমে গেছে মাটিরতলার ঘরে, এক পাশের দেয়ালে তার দরজা। আরেক পাশের দেয়ালে আরেকটা দরজা, সেখানে একটা মোটা পাইপের মতো দেখা গেল, সিমেন্টের তৈরি। ভেতর দিয়ে লোহার মই। উঠে গেছে ওটা।

আগে নিচে নামি, কিশোর বললো।

রবিন কিছু বললো না। কাঠের সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলো গাঢ় অন্ধকার সেলারে। হাতড়ে হাতড়ে সুইচবোর্ড বের করলো কিশোর।

একটা মাত্র বা ঝোলানো রয়েছে ছাতে, অল্প পাওয়ারের। আলো খুব। সামান্য। তবে তাতে দেখতে অসুবিধে হয় না। নিচু ছাতওয়ালা একটা ঘরে ঢুকেছে ওরা। পাথরের দেয়াল। মেঝেটা কাঁচা, কিন্তু সিমেন্টের মেঝের চেয়ে কম শক্ত না। মসৃণ। দেয়ালে ধুলো জমে রয়েছে কতো বছর ধরে, বলার জো নেই।

এখানেও কেউ খোড়েনি, রবিন বললো।

তাই তো মনে হচ্ছে। বার বার নিরাশ হতে ভালো লাগছে না কিশোরের।

দেয়ালের ওপাশে আরেকটা ঘর আছে। স্টোররুম। তাতে পড়ে আছে। জমকালো সব আসবাবপত্র, ধুলোয় মাখামাখি। জানে পাবে না, তবু ওগুলোর তলায় উঁকি দিয়ে দেখলো দুজনে, খোঁড়ার চিহ্ন আছে কিনা।

কেউ আসেনি এখানে, রবিন বললো।

মাথা ঝাঁকালো কিশোর। জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেললো।

পেছনে বিকট চিৎকার শুনে চরকির মতো পাক খেয়ে ঘুরলো দুজনে।

দাঁড়িয়ে রয়েছে বেগুনী জলদস্যু। হাতে ভোজালি।

মিস্টার জেসন, রবিন বললো, আমরা।

কথা বললো না বেগুনী জলদস্যু। বেগুনী মুখোশের ফুটো দিয়ে তাকিয়ে রয়েছে জ্বলন্ত চোখে। নাকের নিচে পুরু গোঁফ।

আপনি মিস্টার জেসন না? সন্দেহ হলো কিশোরের।

জবাবে ভোজালি উঁচিয়ে ছুটে এলো লোকটা। লাফ দিয়ে পাশের একটা মস্ত আলমারির ওপর গিয়ে পড়লো রবিন। কিশোর পড়লো কয়েকটা চেয়ারের ওপর। রবিনের পায়ে পা বেধে হুমড়ি খেয়ে লম্বা এক টেবিলের ওপর গিয়ে পড়লো। জলদস্যু। পিছলে চলে গেল পেছনের দেয়ালের কাছে।
একটা মুহূর্ত নষ্ট করলো না দুই গোয়েন্দা। লাফ দিয়ে উঠে দিলো দৌড়। পেছনে তাকালো না একবারও, সিঁড়ি বেয়ে উঠে চলে এলো ওপরে। রান্নাঘরে ঢুকতেই কানে এলো মুসার কণ্ঠ, শুনছো! ভিকটর! এই শুনছো? ভিকটর এসেছে!
চোখের পলকে গিয়ে পেছনের দরজাটার ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়লো। কিশোর। দেখলো, ছিটকানি তো আছেই, তালাও লাগানো। নিচে সেলারে পায়ের আওয়াজ হচ্ছে। নিশ্চয় সিঁড়ির দিকে আসছে লোকটা। বাইরে, সামনে দিয়ে আসছে ভিকটর ইভানস।
আটকা পড়েছে দুই গোয়েন্দা। পালানোর পথ নেই।

.

আরও হালকা হয়ে এসেছে কুয়াশা। বনের মধ্যে বসে আছে মুসা। ওয়াকি-টকি মুখের কাছে ধরা। আবার বললো সে, হুশিয়ার! ভিকটর আসছে! বেরিয়ে এসো!
জবাব এলো না।
ভিকটরের দিকে ফিরে তাকালো সে। গেট দিয়ে ঢুকে হেঁটে আসছে বনের দিকে। এখন না বেরোলে আর ভিকটরের চোখ এড়িয়ে বেরোতে পারবে না। কিশোর আর রবিন। করছে কি ওরা?
রবিন! কিশোর! হুঁশিয়ার! আবার সতর্ক করলো মুসা। জলদি বেরিয়ে এসো!
সামনের দরজাটা খুলতে আরম্ভ করলো। কিন্তু কেউ বেরোলো না। চোখ মিটমিট করতে লাগলো মুসা। তাহলে আপনাআপনিই খুলেছে, বাতাসে? না, বাতাস নয়। দরজা ফাঁক করে বেরিয়ে আসছে কালো একটা বেড়াল। বেরিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটে আসতে লাগলো। রবিন আর কিশোর বেরোলো না।
মরিয়া হয়ে উঠলো মুসা। প্রায় চেঁচাতে শুরু করলো, রবিন! কিশোর! ভিকটর…
এই, কি করেছে ভিকটর!
মুখ ফেরাতেই একেবারে লোকটার মুখোমুখি হয়ে গেল মুসা।
আবার ঢুকেছো চুরি করে! কার সঙ্গে কথা বলছো? ধমক দিয়ে জিজ্ঞেস করলো ভিকটর।
ঢোক গিললো মুসা। কোথায় খোঁড়া হয়েছে, বের করার চেষ্টা করছি আমরা, স্যার। আমাদের ধারণা, এখানে কোথাও গুপ্তধন লুকানো রয়েছে। রবিন আর কিশোর গেছে আপনার টাওয়ারের ভেতরে খুঁজতে। আমি…আমি…
চট করে খোলা দরজার দিকে তাকালো ভিকটর। কে খুঁড়ছে?

ওরা!
ওরা কারা?
যারা গুপ্তধন খুঁজছে।
কারা খুঁজছে, সেটাই তো জিজ্ঞেস করছি! রেগে গেল ভিকটর।
মেজর নিরেক আর তার চেলারা। টনি, রিগো, গুন–সেই টাকমাথা লোকটা।
বিস্ময় ফুটলো ভিকটরের চোখে। আবার তাকালো টাওয়ারের দরজার দিকে। কোথায় খুঁড়ছে, দেখেছো?
না। সব জায়গায় খুঁজেছি আমরা, শুধু…
হঠাৎ যেন হাঁপাতে শুরু করলো মুসার ওয়াকি-টকি। এটা এক ধরনের সংকেত, কিশোর পাঠাচ্ছে। জিজ্ঞেস করলো, কি, কিশোর?
নিচু গলায় জবাব এলো, টাওয়ারে একটা লোক ঢুকেছে, মুসা। আমাদের হামলা করেছে। সেলার থেকে উঠে এসেছি আমরা, কিন্তু ঘর থেকে বেরোতে পারছি না। পেছনের দরজায় তালা। সামনে দিয়ে বেরোতে গেলে ভিকটর দেখে ফেলবে। একটা কাজই করার আছে আমাদের, ওপরে চলে যাওয়া… থেমে গেল হঠাৎ কিশোর। পরক্ষণেই শোনা গেল তার উদ্বিগ্ন কণ্ঠ, আসছে লোকটা! আমরা চলে যাই…
নীরব হয়ে গেল ওয়াকি-টকি।

.
টাওয়ারের দোতলায় উঠে গেছে কিশোর আর রবিন। রান্নাঘর থেকে মই বেয়ে ওঠার শব্দ শুনতে পাচ্ছে ওরা। জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছে লোকটা।
জলদি, কিশোর বললো।
ছোট একটা জানালা দিয়ে ম্লান আলো আসছে। সেই আলোয় দেখে দেখে মই বেয়ে নিঃশব্দে তেতলায় উঠে এলো দুজনে। আলো এখানেও খুব কম। পুরনো কয়েকটা পিপা আর কাঠের বাক্স পড়ে আছে, ধুলোয় মাখামাখি। দেখে মনে হয় বেগুনী জলদস্যু। শত বছর ধরে ওভাবেই আছে ওগুলো ওখানে। দুটো বাক্সের ওপর বসলো ওরা। নিচে, দোতলায় ভারি পায়ের শব্দ হচ্ছে, নিশ্চয় ওদেরকে খুঁজে বেড়াচ্ছে লোকটা।
ও কে, কিশোর? ফিসফিসিয়ে বললো রবিন। নোনতা জেসন?
নোনতা জেসন আমাদের আক্রমণ করবে কেন?
তা-ও তো কথা।
কান পেতে শুনতে শুনতে হঠাৎ কিশোর বলে উঠলো, রবিন, আমার মনে হয় আমাদেরকে খুঁজছে ও! আমাদের পিছুও নেয়নি। অন্য কিছু খুঁজছে সে।
কিন্তু সেলারে তো হামলা চালালো?

চালিয়েছে। তবে আমাদের পিছু নিয়ে যায়নি। এখনও আমাদের পেছনে লাগেনি সে। ও হয়তো ভাবছেই না আমরা আছি এখানে। ভেবেছে, বেরিয়ে চলে গেছি।
মেজর নিরেক নয় তো?
মাথা নাড়লো কিশোর। না, মেজরের শরীর আরও ছোট। আর রিগো অনেক বড়। তবে অন্য দুজনের একজন হতে পারে, টনি কিংবা গুন আর ভিকটর ইভানস যে নয়, সে তো জানিই। কারণ সে বাইরে রয়েছে।
কিশোর! ওপরে আসছে!
মই বেয়ে চারতলায় উঠতে শুরু করলো দুজনে। মইটা শেষ হয়েছে একটা ট্র্যাপডোরের কাছে। ঠেলা দিতেই ওপরে উঠে গেল ওটা। ওরা বেরিয়ে এলো উজ্জ্বল রোদে। চারতলার এই ঘরটা ছোট, চারপাশে অসংখ্য জানালা। তাড়াতাড়ি ট্র্যাপডোর বন্ধ করে দিয়ে জানালার কাছে চলে এলো ওরা। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে খাড়িটা। ঘাটে বাঁধা রয়েছে ব্ল্যাক ভালচার। প্রথম শো শুরু হতে বেশি দেরি নেই।
কিশোর, এখানেও যদি আসে?
জানালার অনেক নিচে মাটি। টাওয়ার থেকে নেমে যাওয়ার আর কোনো পথও নেই। ঘরটায় আসবাব নেই, লুকানোর কোনো জায়গাই নেই।
কিছু একটা করতেই হবে আমাদের। ভয় ফুটলো কিশোরের কণ্ঠে।
আসছে! ও আসছে!
.
বনের মধ্যে বসে টাওয়ারের দিকে তাকিয়ে রয়েছে মুসা আর ভিকটর। ওয়াকি টকিতে কিশোরের মেসেজের অপেক্ষা করছে।
গিয়ে দেখা দরকার, মুসা বললো।
নাম কি তোমার? শান্তকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো ভিকটর।
মুসা। মুসা আমান।
মুসা, আমরা জানি না টাওয়ারে কে ঢুকেছে। কজন ঢুকেছে। গিয়ে হয়তো তোমার বন্ধুদেরকে আরও বিপদে ফেলে দেবো।
আ-আপনি বোধহয় ঠিকই বলেছেন। কিন্তু…
মুসা, টাওয়ারের দিকে হাত তুললো ভিকটর, ওই দেখো!
দেখলো মুসাও। টাওয়ারের ওপরতলার জানালা দিয়ে মুখ বের করেছে। কিশোর আর রবিন। লাফিয়ে উঠে দৌড় দিতে গেল সে। খপ করে হাত চেপে ধরলো ভিকটর, টেনে থামালো। থামো! বিপদে ফেলে দেবে, ওদেরকে। তোমাকে দেখলেই বেস কিছু করে বসতে পারে ওরা।
বুঝলো মুসা। মাথা ঝাঁকালো। ঢোক গিললো। জানালা থেকে সরে গেছে। কিশোর আর রবিন। আবার জানালার দিকে হাত তুলে দেখালো ভিকটর, মুসাকে

ছাড়েনি। মুসা দেখলো, জানালায় দেখা যাচ্ছে এখন বেগুনী জলদস্যুর মুখ। বেগুনী মুখোশ, কালো গোঁফ, পালক লাগানো বেগুনী হ্যাট, সোনালি কাজ করা বেগুনী কোট।
কো-কোথায় লুকালো ওরা! জোরে বলতে ভয় পাচ্ছে যেন মুসা।
মাথা নাড়লো ভিকটর। কোথাও না, মুসা! ওখানে আলমারি-টালমারি কিচ্ছু নেই, লুকানোর কোনো জায়গাই নেই! আটকা পড়েছে ছেলে দুটো!
নীরব টাওয়ারের দিকে তাকিয়ে রয়েছে দুজনে। জানালা থেকে অদৃশ্য হয়েছে। বেগুনী জলদস্যুর মুখ। রোদ চমকাচ্ছে কাঁচের পাল্লায়।
নিশ্চয় ওদেরকে ধরে ফেলেছে! জোরে কথা ভিকটরও বলছে না।
বাঁচাতে হবে ওদের! চেঁচিয়ে উঠলো মুসা।
আস্তে, আস্তে কথা বলো! বোকামি করে বিপদ বাড়াবে…
মুসা! লোকটা কি চলে গেছে? আচমকা ওয়াকি-টকিতে ভেসে এলো যেন বিদেহী কারো কণ্ঠস্বর, মুসার সে-রকমই মনে হলো। ওকে দেখেছো?
কিশোর! কোথায় তুমি?
টাওয়ারের ওপরে। কেন, দেখতে পাচ্ছো না?
ওপর দিকে তাকিয়ে রয়েছে মুসা আর ভিকটর। অবাক। কাউকে দেখতে পাচ্ছে না।
কই, কোথায়? জিজ্ঞেস করলো মুসা।
হাসলো কিশোর। আরও ওপরে, মুসা। জানালার ওপরে।
এই বার দেখতে পেলো মুসা। রবিন আর কিশোর দুজনেই হাসছে। জানালার ওপরে বেরিয়ে থাকা কার্নিশে উঠে গেছে ওরা।
উঠলে কি করে ওখানে!
ভয় পেয়ে কতো কিছুই তো করে বসে মানুষ, কিশোর জবাব দিলো। কথা সেটা না। ওঠার সময় তো উঠেছি, এখন নামি কি করে?
মাটি থেকে চারতলা ওপরে, ছাতের কাছাকাছি উঠে আছে কিশোর আর রবিন। ওখান থেকে পড়লে—নিজের অজান্তেই একটা গোঙানি বেরিয়ে এলো মুসার মুখ থেকে।
মুসা, রবিনের কণ্ঠ, তোমার সঙ্গে আরেকজন কে?
মিস্টার ভিকটর ইভানস। তিনি ভালো মানুষ, ভয়ের কিছু নেই।
ওয়াকি-টকিতে জানালো ভিকটর, তোমরা কি করছো, সব বলেছে আমাকে মুসা। অবশ্যই আমি সাহায্য করবো তোমাদেরকে। লোকটা কি চলে গেছে?
তিনতলায় নামতে তো শুনলাম, রবিন বললো। একেবারে নিচে নামলো। কিনা বুঝতে পারছি না।

ঠিক আছে, দেখছি আমরা। তোমরা যেভাবে আছো, থাকো।
সাবধানে টাওয়ারের সামনের দরজার দিকে এগোলো ভিকটর আর মুসা। কোনো শব্দ নেই। পেছনের দরজাটা তেমনি ছিটকানি লাগানো রয়েছে। সামনের দরজা দিয়ে লোকটা বেরোলে ওদের চোখে পড়তোই। সেলার, দোতলা আর তিনতলায় খুঁজে দেখা হলো। নেই লোকটা। ওপর তলায় উঠে এসে দেখলো, পেছনের একটা জানালা বেয়ে সবে নেমেছে কিশোর আর রবিন। মুসাকে দেখে হাসলো।
উঠলে কি করে ওখানে? জিজ্ঞেস করলো ভিকটর।
আসুন, দেখাচ্ছি, ডেকে একটা জানালার কাছে তাকে নিয়ে গেল রবিন। জানালার বাইরেটা দেখিয়ে বললো, ওগুলো বেয়ে।
মুসা আর ভিকটর, দুজনেই গলা বাড়িয়ে দিলো। দেয়ালের গায়ে জানালার লাগোয়া কতগুলো পাথর এমনভাবে বের করা, মইয়ের মতো ওগুলো বেয়ে উঠে যাওয়া যায়।
নিশ্চয় ছাতে যাওয়ার পথ ওটা, কিশোর বললো। আপনার পূর্বপুরুষরা বানিয়ে রেখে গেছেন, ইচ্ছে করেই। যাতে সময়ে কাজে লাগে।
হুঁ, মাথা দোলালো ভিকটর, তোমাদের যেমন লাগলো।
যদি পড়ে যেতে! অনেক নিচে মাটির দিকে তাকিয়ে এখনও ভয় পাচ্ছে। মুসা।
তখন কি আর অতো কথা মনে ছিলো, রবিন বললো। লোকটা উঠে আসছে। লুকানোর কোনো পথ দেখছি না। খুঁজতে খুঁজতে কিশোরের চোখে। পড়লো প্রথমে ওই মই। আর কি, উঠে গেলাম। ওই সময় তুমি হলেও পারতে।
তা ঠিক।
জানালার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে কিশোর। খাড়ির দিকে চোখ। রওনা হয়ে। গেছে ব্ল্যাক ভালচার। প্রথম শো, কিন্তু শুরু হয়েছে অনেক দেরিতে। অন্য দিনের চেয়ে আজ যাত্রী বেশি, তার কারণ বোধহয় দুটো শো-এর লোক একবারে উঠেছে। জেসন এসেছে। পিটার আর সে জলদস্যু সেজে আক্রমণের পাঁয়তারা করছে।
হঠাৎ ফিরে তাকালো সে। কাউকে বেরিয়ে যেতে দেখেছিলে?
শুধু বেড়ালটাকে, মুসা জানালো।
সেজন্যেই আমাদের বেগুনী সাহেব ভেবেছেন, সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেছি আমরা। বেরোতে দেখেনি তো, তাই। ভেবেছে, ভয়ে লেজ তুলে পালিয়েছি আমরা। এবং তাতেই সে খুশি।
শুধু কি আমাদের তাড়িয়েই সে খুশি? রবিনের প্রশ্ন।
তাছাড়া আর কি? মারতে নিশ্চয় চায়নি।
লোকটা কে, চিনেছো? জিজ্ঞেস করলো ভিকটর।

না, স্যার। মেজর নিরেক নয়। রিগোও নয়। গায়ে-গতরে আপনার সমান, কিন্তু আপনি তো ছিলেন মুসার সঙ্গে। তারমানে আপনিও নন। এটি
ভাগ্য ভালো, ছিলাম, হাসলো ভিকটর। নইলে আমাকেই সন্দেহ করে বসতে।
তা করতাম।
শুধু কি তোমাদের তাড়াতেই এসেছিলো সে?
মনে হয়, এসেছিলো অন্য উদ্দেশ্যে। আমাদের দেখে তাড়া করেছে আরকি। আমার ধারণা, কিছু লুকানো রয়েছে টাওয়ারে, সেটা খুঁজতেই এসেছিলো।
কি লুকানো আছে, কিশোর? রবিনের জিজ্ঞাসা। মাটি খুঁড়ে গুপ্তধন খোঁজার কথা বলছিলে…
কি জিনিস, জানি না, বাধা দিয়ে বললো কিশোর। তবে এখন মনে হচ্ছে, যা-ই থাকুক, মাটির তলায় নয় সেটা। লুকানো রয়েছে অন্য কোথাও।
তাহলে মাটি খুঁড়লো কেন? মুসার প্রশ্ন।
সেলারে গেলেই বোধহয় তার জবাব মিলবে। চলো, দেখিগে।

.

বদ্ধ জায়গায় কাঠের সিঁড়িতে ওদের পায়ের শব্দ বড় বেশি হয়ে কানে বাজলো।
নথি, কিশোর বললো, লোকটার আসার শব্দ আমরা কখন পেয়েছি মনে আছে?
নিশ্চয়ই। তখন স্টোররুমে ছিলাম। ঠিক পেছনেই গর্জে উঠলো লোকটা। মুখ ফিরিয়েই দেখি, প্রায় গায়ের ওপর এসে পড়েছে।
ঠিক। তাহলে প্রথম আমরা শুনলাম গর্জন, স্টোররুমে, আমাদের পেছনে। এই যে এখন আমরা নামছি, কতো জোরে শব্দ হচ্ছে। অথচ লোকটার পায়ের। আওয়াজ কেন শুনতে পেলাম না?
হয়তো পা টিপে টিপে এসেছিলো।
অসম্ভব। ধাপগুলো নড়বড়ে, একটা চাপ লাগলেই কাঁচকাঁচ করে ওঠে। আরেকটা প্রশ্ন। মুসা, লোকটা যে ঢুকলো টাওয়ারে, কেন আমাদের হুঁশিয়ার করলে না?
দেখিইনি, সাবধান করবো কি?
ঠিক, আবার বললো কিশোর। তাহলে তুমি কাউকে টাওয়ারে ঢুকতে দেখোনি। আমি আর রবিন তার আসার শব্দ শুনিনি। রান্নাঘরের দরজা ভেতর থেকে ছিটকানি লাগানো।
তাতে কি? জিজ্ঞেস করলো মুসা।
তাতে? লোকটা রান্নাঘর থেকে সিঁড়ি বেয়ে সেলারে নামেনি। টাওয়ারের সামনে-পেছনের কোনো দরজা দিয়ে ভেতরে ঢোকেনি।
কিন্তু সেলারে ঢোকার তো আর কোনো পথও নেই, রবিন বললো।

থাকতে বাধ্য, দৃঢ়কণ্ঠে যেন ঘোষণা করলো কিশোর। অন্তত এখন। ছিলো না বলেই মাটি খুঁড়তে হয়েছে মেজরের চেলাদেরকে।
সুড়ঙ্গ কেটে ঢুকেছে! প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো রবিন।
না, সম্ভবত কাটেনি, পরিষ্কার করেছে, শুধরে দিলো কিশোর। অনেক বছর। আগে দুর্গ থেকে বার বার পালিয়েছে বেগুনী জলদস্যু, মনে নেই? কেউ টাওয়ার থেকে তাকে বেরোতে দেখেনি, নিশ্চয় গোপন কোনো পথে পালিয়েছে। এবং সেটা সুড়ঙ্গ ছাড়া আর কিছু না।
এতোক্ষণে মুখ খুললো ভিকটর, কিশোর ঠিকই বলেছে। পুরনো একটা সুড়ঙ্গ আছে টাওয়ার থেকে বেরোনোর। অনেক আগেই ধসে পড়েছিলো, হয়তো নতুন করে খুঁড়ে নেয়া হয়েছে। আমি শুনেছি, আছে, কিন্তু ঠিক কোথায়, জানি না।
খুঁজে বের করে ফেলা যাক, চঞ্চল হয়ে উঠলো মুসা। তাহলেই জেনে যাবো।
সেলারের ভেতরে ছড়িয়ে পড়ে খুঁজতে আরম্ভ করলো চারজনে। স্টোররুমে পাইপ আর শিক পাওয়া গেল। ওগুলো দিয়ে দেয়ালে, মেঝেতে বাড়ি মেরে আর খুঁচিয়ে দেখতে লাগলো ওরা। আলগা পাথর কিংবা যা-ই পড়ে থাকতে দেখছে, সরিয়ে ফেলছে।
মেঝেতে পায়ের ছাপ খোজো, পরামর্শ দিলো কিশোর।
কিন্তু মেঝের মাটি এতো শক্ত, পায়ের ছাপ পড়েই না।
এই যে! হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো ভিকটর।
হুড়াহুড়ি করে এলো ছেলেরা। শিক দিয়ে বাড়ি মারলো আবার সে। ফাপা। আওয়াজ বেরোলো দেয়ালের গা থেকে। কিছু পাথর পড়ে আছে জায়গাটার নিচে। সেলারের ম্লান আলোয় পরীক্ষা করে দেখলো কিশোর। কিন্তু দেয়ালে কোনো দরজা কিংবা আলগা পাথর বসানো দেখলো না।
সুড়ঙ্গটা গোপন রাখা হয়েছে, বললো সে, তারমানে মুখটাও গোপন। দরজা-টরজা যদি থাকে, এপাশ থেকে খোলার ব্যবস্থা থাকবে। এবং সেটা খুব : দ্রুত আর সহজে খুলবে, নইলে বেরোতে পারতো না বেগুনী জলদস্যু। রান্নাঘর থেকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে দ্রুত খুলেছে। সিঁড়িটার কাছে দেখা দরকার।
সিঁড়ির প্রতিটি ধাপ, ওপর-নিচের জায়গা ভালো করে দেখা হলো। জিনিসটা প্রথমে চোখে পড়লো মুসার। অর্ধেক সিঁড়ি নিচে একটা ধাপের তলায় ছোট একটা লোহার আঙটা। ওটা ধরে টান দিতেই দেয়ালের গা থেকে খুলে এলো একটা চ্যাপ্টা পাথর। তার পেছনে দেখা গেল একটা লোহার লিভার, ভালোমতো তেল দেয়া। চাপ দিলো সে। নিঃশব্দে ফাঁক হয়ে গেল সিঁড়ির কাছে দেয়ালের একাংশ।
বাহ, চমৎকার, কিছুটা বিরক্ত হয়েই বললো ভিকটর। এখানে একেবারে। আমার নাকের ডগায় আলি-বাবার সিসেম ফাঁক রয়েছে, আর আমি গর্দভ কিছু জানি

না!
স্টোররুম থেকে একটা টর্চ নিয়ে এলো সে। আগে আগে ঢুকে পড়লো। সুড়ঙ্গে। পেছনে চললো তিন গোয়েন্দা। যেমন সরু দেয়াল, তেমনি নিচু ছাত। ওদের মধ্যে মুসাই সব চেয়ে লম্বা, সে কোনোমতে সোজা হতে পারে। দুজন মানুষ। পাশাপাশি চলতে পারে না, শুধু একজনের জায়গা হয়। সুড়ঙ্গমুখের সামান্য ভেতরেই আরেকটা লিভার।
ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করার জন্যে নিশ্চয়, কিশোর বললো।
সুড়ঙ্গর ছাত আর দেয়াল পাথরের, তবে পায়ের তলায় মাটি। সর্বত্র ছড়িয়ে। রয়েছে দেয়াল আর ছাত থেকে খসে পড়া পাথর। মিটার বিশেক পরেই ধসে পড়েছে সুড়ঙ্গটা।
বাবার কাছে শুনেছি, ভিকটর বললো, আমার জন্মের আগেই নাকি ভেঙেছে। ওটা। ভূমিকম্পে।
তবে ধসে পড়লেও এখন আর বন্ধ নয়, পথ করা হয়েছে। মোটা একজন। মানুষও ওই ফোকর গলে হামাগুড়ি দিয়ে যেতে পারে। মাটি আর পাথর সরিয়ে পথটা করা হয়েছে। তাতে ঢুকে পড়লো চারজনেই, একজনের পেছনে একজন। হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এলো অন্যপাশে। তারপর আবার উঠে দাঁড়ালো। পায়ের বেহলায় পাথরের ছড়াছড়ি। আরও মিটার বিশেক পরে শেষ হলো সুড়ঙ্গ। চারটে ভারি তক্তার ওপর লোহার দণ্ড আড়াআড়ি লাগিয়ে পাল্লামতো তৈরি করা হয়েছে। কজা লাগানো রয়েছে। ঠেলা দিতেই ঝটকা দিয়ে নেমে গেল পাল্লাটা। পুরোটা নামলো না, ঝুলে থাকলো মাঝপথে, দুপাশের দুটো শেকলের ওপর। হেঁটে ওটার ওপর উঠে এলো ওরা। নিচে দেখা যাচ্ছে কালো পানি। সামনে কাঠের দেয়াল, কাঠের ছাত।
বোটহাউসে ঢুকেছি আমরা! চেঁচিয়ে উঠলো কিশোর। পিয়ারের নিচে!
ঠিকই বলেছো! ঘাড় নাড়লো ভিকটর।
ওপাশে যেতে হলে সাঁতরাতে হবে, রবিন আন্দাজ করলো।
না-ও লাগতে পারে, বললো মুসা। পিয়ারের নিচে রাতের বেলা পানিতে নামার কথা মনে পড়েছে তার। হয়তো খুব কম। তাহলে হেঁটেই যাওয়া যাবে।
মুসার কথাই ঠিক। নিচে পানি খুব কম। পাল্লাটা আবার আগের মতো করে সুড়ঙ্গের মুখে লাগিয়ে দুপাশের ফাঁকে দুটো কাঠের গোঁজ লাগিয়ে দেয়া হলো। লাগানো ছিলো ওভাবেই।
পানি মাড়িয়ে হেঁটে এসে পিয়ারের ওপর উঠলো ওরা। আলো বেশি নেই। একমাত্র ছোট জানালাটা আর তক্তার ফাঁক দিয়ে যা আলো আসছে। তাতে এতোবড় বোটহাউসের অন্ধকার কাটছে না।

দরজা দিয়ে বেরিয়ে পেছনে ফিরে তাকালো কিশোর। চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, জানা না থাকলে বোটহাউসে ঢুকে ওই সুড়ঙ্গ খুঁজে বের করা কঠিন। বোঝাই যায় না। মেজর নিরেকের নিশ্চয় জানা ছিলো।
দোকানে একটা নকশা দেখছিলো, মনে আছে? রবিন বললো। মনে হয় ওটাতেই রয়েছে সুড়ঙ্গের নির্দেশ।
হতে পারে, একমত হলো কিশোর।
বনের ভেতর দিয়ে জেটিতে চলে এলো ওরা। প্রথম অভিযান শেষ করে ফিরে এসেছে ব্ল্যাক ভালচার। যাত্রীরা নেমে গেছে, তবে ক্যাপ্টেন ফিলিপ, পিটার আর জেসন এখনও রয়েছে ডেকে। তিন গোয়েন্দার সঙ্গে ভিকটরকে দেখে ভয় পেয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন। বলে উঠলেন, এই, তোমাদেরকে না বলেছিলাম...
হেসে অভয় দিলো ভিকটর, হয়েছে হয়েছে, ধমকাতে হবে না। ওরা কি করছে, জানি আমি। এখন আমিও চাই রহস্যটার সমাধান হোক। কি যেন নাম বললে? মেজর... মেজর...
মেজর নিরেক, ধরিয়ে দিলো কিশোর। ক্যাপ্টেনকে জিজ্ঞেস করলো, শো কখন শুরু করেছিলেন, স্যার?
পঁয়তাল্লিশ মিনিট আগে। মোনতা জেসনের দিকে তাকালেন ক্যাপ্টেন। দূরে তাকিয়ে রয়েছে লোকটা। দেরিটা হলো ওর জন্যে। ওকে বাদ দিয়েই শুরু করে দিয়েছিলাম আমরা। তবে শেষ মুহূর্তে এসে হাজির হলো, আমরা তখন প্রথম দ্বীপটার কাছে চলে গেছি।
খবরটা আর চেপে রাখতে পারলো না মুসা। কোথায় খোঁড়া হয়েছে, দেখে। ফেলেছি, স্যার আপনাকে আর পিটারকে কেন সরিয়ে রাখতে চেয়েছে, তা-ও বোঝা গেছে। বোটহাউস থেকে টাওয়ারে ঢোকার একটা সুড়ঙ্গ আছে। ওটার। ভেতরেই খুঁড়েছে ওরা, মাটি আর পাথর পরিষ্কার করেছে।
টাওয়ারে ঢোকার পর থেকে কি কি ঘটেছে খুলে বললো ছেলেরা।
জেসনের দিকে তাকালো কিশোর। আপনার এতো দেরি হলো যে আজ?
গাড়িটা ট্রাবল দিচ্ছিলো, বলেই মুখ কালো করে কিশোরের মুখোমুখি হলো নোনতা জেসন। তাতে তোমার কি?
তার কথার জবাব না দিয়ে ক্যাপ্টেনকে জিজ্ঞেস করলো কিশোর, বেগুনী জলদস্যুর পোশাকটা কোথায় রাখেন, স্যার?
দ্বীপে। একটা ছাউনিতে। কাজের সময় হাতের কাছে পেয়ে যায় ওরা।
তালা দেয়া থাকে?
নাহ।
তারমানে যে খুশি গিয়ে পরতে পারে?

পারে।
নিরাশ মনে হলো কিশোরকে। পরক্ষণেই উজ্জ্বল হলো আবার চেহারা। যা-ই। হোক, এখন আমরা জানি, কোথায় খুঁড়ছেন মেজর। কি খুঁজছেন জানি না। টাওয়ারে হয়তো লুকানো আছে কিছু। সুড়ঙ্গেও থাকতে পারে। মিস্টার ইভানস, আপনি কিছু জানেন?
শ্রাগ করলো ভিকটর। মুখ বাঁকালো। মাথা নেড়ে বললো, না।
আপনি? ক্যাপ্টেনকে জিজ্ঞেস করলো কিশোর।
বেগুনী জলদস্যুর রেখে যাওয়া কোনো জিনিস হয়তো খুঁজছে। লোকে তো ঘাঁটাঘাঁটি কম করেনি একশো বছর আগে। উপদ্বীপের কোথাও খোঁজা বাদ রাখেনি।
তার রেখে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। পরে অবশ্য অনেক চোর-ডাকাত আস্তানা গেড়েছিলো এখানে। তারাও রেখে যেতে পারে কিছু।
রবিন বললো, যা-ই রেখে যাক, এখনও নিশ্চয় আছে। কারণ খোঁজাখুঁজি চলছেই।
হ্যাঁ, কিশোর বললো, কাল রাতেও এসেছিলেন মেজর। মুসা, দেখগে তো পাহারা এখনও চলছে কিনা?
মাথা ঝাঁকিয়ে দ্রুতপায়ে গেটের দিকে রওনা হয়ে গেল গোয়েন্দা সহকারী। ভুরু কুঁচকে সেদিকে তাকালো ভিকটর। পাহারা? কিসের পাহারা?
পাহারা দেয়ার লোক রেখে গেছেন মেজর নিরেক, জানালো রবিন। দিন রাত পাহারা দেয় বেগুনী জলদস্যুর আড়া। কখনও একজন, কখনও দুজন, থাকেই। চোখ রাখে।
চোয়াল ডললো ভিকটর। সারাক্ষণই?
এই আরেকটা ব্যাপার, জবাব দিলো কিশোর, আমাকে অবাক করেছে। মেজরের যেন ভয়, এখান থেকে লুকানো জিনিস নিয়ে বেরিয়ে যাবে কেউ। হতে পারে, অন্য কেউও ওই জিনিসের পেছনে লেগেছে। ভয়টা হয়তো সেকারণেই পাচ্ছেন।
বেগুনী জলদস্যুর পোশাক পরা লোকটা না তো? রবিন বললো।
ফিরে এলো মুসা। আইসক্রীম ভ্যানটা আছে।
আজ রাতে আবার গল্প শোনাতে যাবেন, স্যার? ক্যাপ্টেনকে জিজ্ঞেস করলো কিশোর।
নিশ্চয় যাবো, বাবার হয়ে আগ বাড়িয়ে জবাবটা দিলো পিটার।
তাহলে, বেশ জোর দিয়ে বললো কিশোর, আজ রাতে আবার আসতে হবে আমাদের। সারাটা রাতই জেগে থাকতে হতে পারে। বাড়ি গিয়ে এখন কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নেয়া দরকার।

ভিকটর আর জেসনের দিকে তাকালো সে। আপনাদেরকে একটা অনুরোধ করবো। আজ রাতে আমাদের সঙ্গে থাকতে হবে আপনাদের। মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে পরিস্থিতি। তখন সাহায্য লাগবে। একা হয়তো কুলিয়ে উঠতে পারবো না আমরা।

.

আবার বেগুনী জলদস্যুর আড্ডায় এসে ঢুকলো তিন গোয়েন্দা। টর্চ আর ওয়াকি টকি নিয়ে এসেছে। ওরা এসে দেখলো, শেষ শো-এর দর্শকরা বেরিয়ে যাচ্ছে।
ঘন্টাখানেক পর নোনতা জেসন এসে ঢুকলো ট্রেলারে।
নির্দিষ্ট সময়ে গল্প রেকর্ড করার জন্যে ছেলেকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন ফিলিপ।
সময় হয়েছে, শান্তকণ্ঠে বললো কিশোর।

ট্রেলার থেকে বেরিয়ে ছায়ায় ছায়ায় এগোলো ওরা। কালো কাপড় পরে। এসেছে, প্রহরীর চোখে পড়বে না সহজে।
বোটহাউসে এসে ঢুকলো চারজনে, তিন গোয়েন্দা আর নোনতা জেসন। মই বেয়ে পাল রাখার তাকে উঠে পড়লো রবিন, মুসা আর জেসন। কিশোর নেমে পড়লো পিয়ারের নিচের পানিতে। সুড়ঙ্গমুখের তক্তা সরিয়ে ভেতরে ঢুকলো। দ্রুত চলে এলো শেষ মাথায়। লিভার চেপে গোপন দরজা খুলে ঢুকলো টাওয়ারের সেলারে। ওখানে তার জন্যে অপেক্ষা করছে ভিকটর ইভানস।
তাকের ওপরে ঘাপটি মেরে রয়েছে মুসা, রবিন আর জেসন। জুনের ঠাণ্ডা রাত। বাইরের রাস্তায় গাড়ি চলাচলের শব্দ হচ্ছে। গাঁয়ের ভেতরে একটা কুকুর। ডাকলো। পানির কিনারে দূরে কে যেন গান গাইছে চড়া বেসুরো গলায়। একটা বিমান উড়লো। একটা ভ্যানের দরজা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ হলো। শব্দটা এলো। গেটের কাছ থেকে।
খানিক পরে শোনা গেল এঞ্জিনের চাপা গুঞ্জন। স্নায়ু টানটান হয়ে গেল রবিন। আর মুসার। দম বন্ধ করে ফেললো ওরা। বোটহাউসের বাইরে থামলো গাড়িটা। দরজা খুলে দেয়া হলো, বোটহাউসের ভেতরে ঢুকে পড়লো ওটা। ওপরে নিথর হয়ে আছে তিনজনে। ওয়াকি-টকি নাকের কাছে এনে জোরে জোরে তিনবার। নিঃশ্বাস ফেললো রবিন। কিশোরের জন্যে মেসেজ।
জবাবে তিনবার টোকার শব্দ হলো। নিজের ওয়াকি-টকির গায়ে টোকা দিয়েছে কিশোর।
দরজা খুলে ভ্যান থেকে নামলেন মেজর নিরেক আর রিগো। টর্চ জ্বেলে নেমে পড়লেন পানিতে। হেঁটে চললেন সুড়ঙ্গের দিকে।

হঠাৎ দড়াম করে গড়িয়ে পড়লো একটা মাস্তুল। এতো জোরে চমকে উঠলো। মুসা আর রবিন, মনে হলো ওদের কানের কাছে বোমা ফেটেছে। মুখ খিস্তি করে গাল দিয়ে উঠলো জেসন। বোধহয় সরতে গিয়েছিলো, নাড়া লেগে পড়ে গেছে মাস্তুলটা।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে টনি, তার টর্চের আলো এসে পড়লো সোজা রবিন আর মুসার ওপর। মেজর আর রিগোর টর্চও ঘুরে গেল এদিকে। একমুহূর্ত থেমে দাঁড়িয়ে দেখলো দুজনে চুপচাপ। তারপর আবার এসে উঠলো পিয়ারে।

নামো! টর্চের আলো নাচিয়ে আদেশ দিলো টনি।

নেমে এলো মুসা আর রবিন।

এই, কোথায় যেন দেখেছি তোমাদের? মেজর বললেন। হ্যাঁ, মনে পড়েছে। তোমরাই সেদিন আমাকে বাঁচিয়েছিলে। গল্প শোনাতে এসেছিলে। এখানে কি করছো? আরেকটা ছেলে কই? তিনজন এসেছিলে, মনে আছে।

আ-আ-আমরা... তোতলাতে লাগলো রবিন।

ওপরে আর কেউ আছে কিনা দেখার জন্যে উঠে গিয়েছিলো রিগো, চেঁচিয়ে বললো, আর কেউ নেই, বস।

অবাক হলো তিন গোয়েন্দা। জেসন গেল কোথায়?

গাধা কোথাকার! ধমক দিয়ে বললেন মেজর, ভালো করে দেখো। নিশ্চয়। আছে আরেকজন। মুসা আর রবিনের দিকে ফিরে বললেন, এবার বলো, এখানে কি করছো।

এমনি, জবাব দিলো রবিন। শো দেখতে এসেছিলাম। বোটহাউসটা চোখে পড়লো। কৌতূহল হওয়ায় দেখতে এসেছিলাম। ওই তাকে উঠেছি দেখার জন্যে। টায়ার্ড লাগছিলো। বিশ্রাম নিতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি।

ঠিক, তাড়াতাড়ি বললো মুসা, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

মই বেয়ে নেমে আসছে রিগো। শেষ কয়েকটা ধাপ নামার আগেই হাত পিছলালো। পুরো বোটহাউসটা কাঁপিয়ে দিয়ে ধুড়ুম করে পড়লো হাত-পা ছড়িয়ে ধাক্কা লেগে চিত হয়ে পড়ে গেল মুসা।

এতোবড় অপদার্থ জীবনে দেখিনি! রাগে চেঁচিয়ে উঠলেন মেজর।

হাস্যকর ভঙ্গিতে উঠে বসলো রিগো। ঘাড় ফিরিয়ে মুসার দিকে তাকালো। সে এখনও উঠতে পারেনি। তাকে টেনে তুলে মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো দীর্ঘ একটা মুহূর্ত। তারপর চিৎকার করে বললো, বঅস, চিনেছি! বলেছিলাম না কাল। রাতে চোখ রেখেছিলো? এই ছেলেটাই!

তাই নাকি? চিন্তিত মনে হলো মেজরকে। পকেট-টকেট ঘেঁটে দেখো কি আছে?

বেরোলে তিন গোয়েন্দার কার্ড, টর্চ আর ওয়াকি-টকি। টনি বের করলো বেগুনী জলদস্যু ওগুলো।
কার্ডটা পড়লেন মেজর। গোয়েন্দা! হুমম! এ-জন্যেই আমাদের পেছনে লেগেছো। তোমাদের আরেক সঙ্গী কাছাকাছিই আছে, তোমাদের মেসেজের অপেক্ষায়। একটা ওয়াকি-টকি তুলে নিলো সে। মুখের কাছে এনে কিশোরের উদ্দেশ্যে বললো, যেখানেই থাকো, মন দিয়ে শোনো। তোমার দুই দোস্তকে ধরেছি। কোনো চালাকির চেষ্টা করবে না। আমাদের কাজে বিঘ্ন ঘটাবে না। তাহলে তোমার বন্ধুরা মরবে, বিশ্বাস করো কথাটা-মরবে।

.

লিভিং রুমে বসে ওয়াকি-টকিতে বোটহাউসের সমস্ত কথাই শুনলো কিশোর আর ভিকটর। পরিষ্কার দেখতে পেলো যেন দৃশ্যটা।
ওয়াকি-টকির সুইচ অফ করে দিয়ে কিশোর বললো, ধরে ফেললো!
শান্ত হও, ভিকটর বললো।
কিছু একটা করা দরকার।
কি করবো? হয়তো…
ঘন ঘন করাঘাতের শব্দ হলো সামনের দরজায়। একটানে পকেট থেকে পিস্তল বের করে সেদিকে এগোলো ভিকটর। হ্যাঁচকা টান দিয়ে খুলে ফেললো পাল্লা।
জেসন দাঁড়িয়ে রয়েছে। পা ভেজা। দ্রুত এসে ঘরে ঢুকলো সে। একবার কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে তাকিয়ে বন্ধ করে দিলো দরজাটা। বললো, মেজরের লোকেরা ধরে ফেলেছে ছেলেদুটোকে!
জানি। তুমি পালিয়ে এলে কি করে?
জানালার কাছে বসেছিলাম। তাক থেকে ওটা গলে বেরিয়ে পড়েছি, ব্যাটাদের চোখ এড়িয়ে। পানি ভেঙে পাড়ে উঠেছি।
কপাল ভালো তোমার। যাক, তুমি আসায় ভালোই হলো। একটা উপায় বোধহয় করতে পারবো।
কি করতে চাইছেন, স্যার? কিশোর জিজ্ঞেস করলো।
চলো, জলদি সেলারে চলো!
তাড়াহুড়ো করে সেলারে নেমে এলো ওরা। সিঁড়ির আড়ালে জেসনকে লুকিয়ে থাকতে বললো-ভিকটর।
আপনার প্ল্যানটা কি? জানতে চাইলো জেসন।
হ্যাঁ, কি করতে চান? জিজ্ঞেস করলো কিশোর।
একটা কথা বলা দরকার, ভিকটর বললো। স্বীকারই করে ফেলি। আমি…

গুপ্তধন পেয়ে গেছেন! চেঁচিয়ে উঠলো কিশোর।পাইরেটস কোভে এসেছেনই আপনি সেজন্যে! জানেন, আছে!
হ্যাঁ, কিশোর, জানতাম। ঠিকই বুঝেছো। সাতদিন আগেই বের করে ফেলেছি আমি।
তার মানে টাওয়ারেই ছিলো?
মাথা ঝাঁকালো ভিকটর। ছিলো। এই স্টোররুমেই। পুরনো একটা চীনা আলমারিতে। অনেক আগে বাবার মুখে শুনেছিলাম গল্পটা। বেগুনী জলদস্যু লুকিয়ে রেখে গিয়েছিলো। এতোদিন নানা কাজে ব্যস্ত ছিলাম বিদেশে, এশিয়ায়। ওখান থেকে ফিরেই চলে এসেছি টাওয়ারে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর গত হপ্তায় পেয়েছি ওগুলো।
তাহলে কাউকে বললেন না কেন?
সত্যি বলতে কি, আমি এখনও জানি না, আইনত ওগুলো কার প্রাপ্য। যতোদিন সেটা না জানবো, গোপনই রাখতে চাই খবরটা।
এতোদিন পর যার হাতে পড়বে তারই হওয়ার কথা। আর আপনার তো বিশেষ অধিকার রয়েছে। জিনিসগুলো আপনার পূর্বপুরুষের।
চোর-ডাকাত যারই হাতে পড়বে, তার? জেসনের প্রশ্ন।
জানি না, ভিকটর বললো। সেজন্যেই আর কারও হাতে পড়তে দিতে চাই না। অন্তত মেজরের হাতে তো নয়ই।
এখুন প্ল্যানটা কি বলে ফেলুন, তাড়া দিলো কিশোর। সময় বেশি নেই।
সেলারেই ঢুকবে মেজর, কোনো সন্দেহ নেই। খালি হাতে নিশ্চয় আসেনি, পিস্তল-টিল থাকবে। এখানে এসে তোমাকে দেখলে অবাক হবে না। কিন্তু জেসন আছে, কল্পনাই করবে না। সেজন্যেই ওকে সিঁড়ির আড়ালে লুকাতে বলছি। মেজরকে বলবো আমি গুপ্তধন খুঁজে পেয়েছি। সেগুলো বের করে দিতে বাধ্য করবে আমাকে সে। দেখাতে নিয়ে যাবো। ওই সময়টায় তোমার কথাও হয়তো ভুলে যাবে সে। ওই সুযোগে তুমি বেরিয়ে যাবে স্টোররুম থেকে। বাইরে, থেকে তুমি আর জেসন মিলে দরজাটা লাগিয়ে দেবে। আর তুমি যদি বেরোতে না। পারো, জেসন একাই লাগাবে।
কিন্তু আপনি তো ওদের সঙ্গে ভেতরে আটকা পড়বেন।
আমার কাছে পিস্তল আছে। স্টোররুম থেকে বিরাট একটা পুরনো তালা এনে। জেসনের হাতে দিলো ভিকটর। একেবারে তালা লাগিয়ে দেবে। আমার জন্যে ভেবো না। ওদেরকে ঠিকই আটক করতে পারবো আমি। আটকে রাখবো। তোমরা তখন গিয়ে মুসা আর রবিনকে মুক্ত করবে। ওরা গিয়ে পুলিস নিয়ে। আসবে।

ওই যে, আসছে, ফিসফিস করে বললো জেসন।
যাও, সিঁড়ির নিচে লুকাও গিয়ে। কিশোর, তুমি আমার পেছনে থাকো।
ঘরের ঠিক মাঝখানে এসে দাঁড়ালো ভিকটর। খুলতে আরম্ভ করেছে সুড়ঙ্গের দরজা। বেগুনী জলদস্যু
পিস্তল হাতে ঘরে ঢুকলেন মেজর আর টনি। ভিকটর আর কিশোরকে দেখেছেন।
তিন নম্বর গোয়েন্দা তাহলে এখানে, মেজর বললেন। গুড। মিস্টার ইভানসও আছেন। আগেই আন্দাজ করা উচিত ছিলো আমার। যাকগে, খারাপ। হয়নি। মিস্টার ইভানস, কোনো চালাকি চাই না। মালগুলো আপনি পেয়ে গেছেন। জানি। নইলে আমি পেতাম। বলুন, কোথায় সরিয়েছেন?
শ্রাগ করলেন ভিকটর। যেন হাল ছেড়ে দিয়েছেন, এমন ভঙ্গিতে বললেন, ঠিক আছে, কি আর করা! ছেলেগুলোর ক্ষতি হোক, এটা চাই না। স্টোররুমে পেছনের দেয়ালের কাছে একটা আলমারি আছে, তার মধ্যে।
উত্তেজনায় হুঁশ হারিয়ে ফেললো টনি। সোজা দৌড় দিলো আলমারির দিকে। বলতে না বলতেই যে এতো সহজে রাজি হয়ে গেছে ভিকটর, কেন হলো, ভাবলো না একবারও। পিস্তল ঢুকিয়ে ফেলেছে হোলস্টারে।
কিন্তু মেজরের মাথা এতোটা ফাঁকা নয়। টনি! বলে চিৎকার করে উঠলেন। তিনি। মাঝপথে থমকে দাঁড়ালো টনি। ভিকটরের দিকে পিস্তল নাচালেন তিনি। আপনি আগে যান, মিস্টার ইভানস। হাঁটুন।
ঘুরে দাঁড়ালো ভিকটর। ঠিক পেছনেই রইলো টুনি আর মেজর। একবারের জন্যেও তার চওড়া কাঁধ থেকে চোখ সরালেন না মেজর। কিশোরের দিকে নজরই নেই দুজনের কারো।
নিঃশব্দে বেরিয়ে চলে এলো কিশোর। সিঁড়ির আড়াল থেকে বেরোলো জেসন। দুজনে মিলে, ঠেলে বন্ধ করে দিলো ভারি পাল্লাটা। তালা লাগিয়ে দিলো।
দরজা যে বন্ধ হয়ে গেছে, সেটা বুঝতেও দেরি করে ফেললেন মেজর। তারপর শুরু হলো ভেতরে চেঁচামেচি, হট্টগোল। দরজায় জোর ধাক্কা পড়লো।
তার পর শোনা গেল ভিকট্টর ইভানসের কঠোর কণ্ঠ, খবরদার! পিস্তল ফেলো! নইলে খুলি ছাতু করে দেবো!
চলুন! জেসনকে বলেই আর দাঁড়ালো না কিশোর। সিঁড়ির দিকে ছুটলো।
.
ভ্যানের ভেতরে পড়ে রয়েছে রবিন আর মুসা। হাত-পা বাঁধা। ওদেরকে পাহারা। দিচ্ছে রিগো। সে নিজেই অস্বস্তিতে ভুগছে, বন্দি পাহারা দেবে কি। তার হাতের টর্চের কাঁপুনি দেখেই বোঝা যায়। মাঝে মাঝেই কিছু না করার জন্যে হুঁশিয়ার

করছে বন্দিদের। শেষে একটা খচমচ আওয়াজ শুনে আর থাকতে না পেরে উঠে চলে গেল, বোটহাউসের বাইরে কেউ আছে কিনা দেখার জন্যে।
ফিসফিস করে উঠলো রবিনের ওয়াকি-টকি।
নথি, নিচু গলায় বললো মুসা, কিশোর! দেখো, সুইচটা অন করতে পারো। কিনা! তাহলে ট্রান্সমিট করতে পারবে।
হাত-পা বাঁধার আগে ওদের যার যার জিনিস আবার ফেরত দিয়েছে রিগো।
শরীর অনেক মুচড়ে-টুচড়ে, হাতের আঙুল কোনোমতে সুইচের কাছে নিয়ে যেতে সক্ষম হলো রবিন। কাপড়ের ওপর দিয়েই সুইচ টিপে দিলো। বললো, রবিন বলছি!
রিগো আছে? ভেসে এলো কিশোরের কণ্ঠ।
বাইরে গেছে। কেউ আসছে কিনা দেখতে।
ওকে বলো, মেজর কথা বলতে চায়।
কিন্তু মেজরের কাছে তো ওয়াকি-টকি নেই। ও জানে।
বললো, আমারটা কেড়ে নিয়েছে।
মুসা ডাকলো, রিগো? মেজর ডাকছেন!
দুপদাপ করে ছুটে এসে ভ্যানে ঢুকলো হাতির বাচ্চা। কী?
মেজর আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান, রবিন বললো।
কথা? চারপাশে তাকালো রিগো। মেজরকে দেখতে পেলো না।
ওয়াকি-টকিতে বলবেন, মুসা বুঝিয়ে দিলো।
ওহ্! শরীর ঢিল করলো রিগো। কিন্তু তিনি ওয়াকিটকি পেলেন কোথায়?
আমাদের আরেক বন্ধু আছে না, তারটা কেড়ে নিয়েছেন। সে-ও ধরা পড়েছে। আমাদের মতোই।
ভালো হয়েছে…
হঠাৎ শোনা গেল ভারি কণ্ঠ, এই বলদ, এতো কথা বলছো কেন? কথা বলতে বলেছি, বলো?
অবাক হলো না মুসা আর রবিন। কিশোরের অভিনয় ক্ষমতার কথা জানা, আছে ওদের। তবে রিগো চমকে গেল। ব-ব্বলুন, বস্!
তোতলাচ্ছো কেন, রামছাগল! শোনো, ছেলেদুটোকে আরও শক্ত করে বাঁধো। ওদের ওয়াকি-টকিগুলো কেড়ে নিয়ে চলে এসো আমাদের কাছে, সুড়ঙ্গ দিয়ে। এখুনি। গাধামি করবে না।
না, বস। এখুনি আসছি, বলতে বলতেই রবিনের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিলো রিগো।

তাড়াহুড়োয় রবিন আর মুসাকে আরও শক্ত করে বাঁধার কথাও ভুলে গেল সে। ওয়াকি-টকিদুটো বের করে নিয়েই বেরিয়ে গেল ভ্যান থেকে। মুহূর্ত পরেই পানিতে শোনা গেল তার ভারি পায়ের আওয়াজ।
রিগো বেরিয়ে যাওয়ার মিনিটখানেক পরেই খুলে গেল বোটহাউসের দরজা। ভ্যানে এসে ঢুকলো জেসন। মুসা আর রবিনের বাঁধন খুলে দিলো দ্রুতহাতে। হেসে জানালো, মেজর আর টনিকে কিভাবে স্টোররুমে আটক করেছে।
গুপ্তধন পেয়ে গেছেন মিস্টার ইভানস? অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো রবিন।
পেয়ে গেছেন। আমিও খোঁজা শুরু করার আগেই।
আপনিই তাহলে বেগুনী জলদস্যু সেজে এসেছিলেন সেদিন। আমাদের ভয় দেখিয়েছেন, মুসা বললো।
একটা জিনিস ফেলে গিয়েছিলাম, আরেক দিকে তাকিয়ে বললো জেসন। সেটা নিতে এসেছিলাম আড্ডায়, রাতের বেলা। বোটহাউস থেকে বেরোতে দেখলাম কয়েকজন লোককে। সন্দেহ হলো। খোঁজাখুঁজি শুরু করলাম। সুড়ঙ্গমুখটা খুঁজে বের করতে দুদিন লেগেছে। লুকিয়ে থেকে শুনে বুঝলাম, কোনো মূল্যবান। জিনিস খুঁজছে ওরা। আমিও ওই কাজে লেগে পড়লাম। তোমাদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। বিশ্বাস করো, কোনো ক্ষতি করতে চাইনি।
বাদ দিন ওসব কথা, রবিন বললো। তাড়াতাড়ি বেরোনো দরকার। রিগো ফিরে আসতে পারে।
টাওয়ারের কাছে অন্ধকারে অপেক্ষা করছে কিশোর। ওদেরকে আসতে দেখেই ওয়াকি-টকির ওপর কুঁকলো। এই গাধা, শুনছো?, বোটহাউসে ফিরে যাও। তোমার আসার আর দরকার নেই। গিয়ে পাহারা দাও ওদের। যদি ওরা পালায়, পিঠের ছাল তুলবো আমি তোমার! জলদি যাও! বলে আপনমনেই নীরবে হাসলো গোয়েন্দাপ্রধান।
কিশোরের কথা মুসার কানেও গেছে। কাছে এসে হাসলো সে। আহারে, বেচারার জন্যে কষ্টই লাগছে আমার!
এখন কি করবো? রবিন জিজ্ঞেস করলো।
পুলিসের কাছে যেতে হবে, কিশোর জবাব দিলো।

.

পুলিস এসে আটক করলো মেজর নিরেক আর টনিকে। পাহারা দিচ্ছিলো আড্ডার বাইরে গুন, তাকেও ধরলো। কিন্তু রিগোকে ধরতে পারলো না। যেই এসে সে দেখেছে, মুসা আর রবিন নেই, আর দেরি করেনি। ভ্যান নিয়ে পালিয়েছে মেজরের ভয়ে। বোর্টহাউসের দরজা লাগানো ছিলো, সেটা খোলার প্রয়োজন মনে করেনি। গাড়ি দিয়ে গুতো মেরে দরজা ভেঙেই পালিয়েছে।

আলমারি থেকে কালো একটা বাক্স বের করলো ভিকটর। ডালার ওপরে তামার পাত বসিয়ে নাম লেখা রয়েছেঃ লেফটেন্যান্ট উইলিয়াম ইভানস। একটা টেবিলে বাক্সটা রেখে ডালা তুললো সে।
খাইছে! বলে উঠলো মুসা।
গলা বাড়িয়ে এগিয়ে এলো পিটার, ভেতরে কি আছে দেখার জন্যে।
সোনা আর রূপার নানারকম মূল্যবান অলংকার আর তৈজসপত্রে বাক্সটা। বোঝাই। ঝকঝক করছে ঘরের ম্লান আলোয়।
একটা আঙটি তুলে নিলো কিশোর। বাক্সের গায়ে আঙুল বুলিয়ে দেখলো।
কয়েক লাখ ডলারের জিনিস, বিড়বিড় করলো রবিন।
পুলিসের সঙ্গে ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্লেচারও এসেছেন। বললেন, আপনি যখন পেয়েছেন, আপনারই থাকবে জিনিসগুলো। হারানোর ভয় নেই। কারণ আপনি। উইলিয়াম ইভানসের বংশধর। তবে সেটা প্রমাণ করতে হবে আপনাকে কোর্টে। ভালো দেখে একজন উকিল রাখবেন, হয়ে যাবে।
আপনার পরামর্শের জন্যে ধন্যবাদ, বললো বটে ভিকটর, কিন্তু অস্বস্তি গেল না তার।
বন্দিদেরকে নিয়ে বেরিয়ে গেল পুলিস। ক্যাপ্টেন রইলেন শুধু। তিন গোয়েন্দার দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, আরেকটা রহস্যের সমাধান করলে। তোমাদের নিয়ে গর্বই হয় আমার। বাড়ি যাবার সময় হয়েছে নিশ্চয়। যাবে না? লিফট দিতে পারি।
আমার তরফ থেকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি ওদের, ভিকটর বললো। চোর গুলোকে ধরিয়ে দেয়ার জন্যে। কাল আসবে, নাকি তোমরা? আমাকে সাহায্য করতে? বাক্সটা সরিয়ে ফেলা দরকার। চোরগুলো জামিনে মুক্তি পেয়েই আবার এগুলো কেড়ে নিতে আসবে।
কাল দুপুরের আগে জামিন পাচ্ছে না ওরা, চীফ বললেন। ততক্ষণে বাক্সটা সরিয়ে ফেলতে পারবেন। কোনো ব্যাংকে নিয়ে গিয়ে রেখে দিলেই হলো।
কিন্তু রিগো? সে তো ছাড়া রয়েছে। যদি আসে?
ও আসবে না। যা ভীতু লোক। আশা করছি, ওকেও খুব শীঘ্রি ধরে ফেলতে পারবো। আপনার ভয় নেই।
আমরা কি সাহায্য করতে পারি? কিশোর জিজ্ঞেস করলো।
জিনিসগুলোর একটা তালিকা করবো, ভিকটর বললো। তোমরা সাহায্য করলে তাড়াতাড়ি হবে।
তা করতে পারি।

আমিও করবো! বলে উঠলো পিটার। জলদস্যুর লুটের মাল! ঘটতেও ভালো লাগবে আমার!
পিটারের উত্তেজিত মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলো ভিকটর। বেশ, করবে। সাহায্য। আমার আপত্তি নেই। বেশি লোক পেলে বরং ভালোই হয়। তিন গোয়েন্দার দিকে ফিরলো সে। তোমাদেরকে একটা করে পুরস্কার দিতে চাই। নেবে তো? বলে জবাবের অপেক্ষা না করেই বাক্স থেকে একটা দামী আঙটি বের করে দিলো মুসাকে।
দ্বিধা করলো মুসা। এভাবে জিনিস নিতে ভালো লাগে না তার। কিশোরের দিকে তাকালো পরামর্শের আশায়। মাথা ঝাঁকালো কিশোর। আঙটিটা নিলো মুসা। রবিন আর কিশোরকেও একটা করে আঙটি দিলো ভিকটর।

.
পরদিন সকাল আটটায় লাফিয়ে উঠে বসলো মুসা। কানে আসছে আঁচড়ানোর শব্দ। বিছানায় থেকেই ভালো করে চেয়ে দেখলো, জানালার কাঁচে ঘষা লাগছে হএকটা ডাল। হেসে আবার শুয়ে পড়লো। ঘুম যায়নি। কিন্তু পরক্ষণেই আবার লাফ দিয়ে উঠলো। তার জানালার কাছে তো কোনো গাছ নেই! বিছানা থেকে নেমে দৌড়ে এলো জানালার ধারে।
বাইরে ধূসর হয়ে আছে সকালটা। বিষণ। কুয়াশার জন্যে সূর্য উঠতে পারেনি। দেখলো, লম্বা একটা লাঠিতে ডালটা বেঁধে জানালার কাঁচে ঘষছে কিশোর। রবিন দাঁড়িয়ে রয়েছে পাশে। বুঝলো, এরকম কেন করছে। তাকে যেতে বলছে। তার আম্মা দেখে যদি কাজ করার জন্যে আবার তাকে আটকে দেন, সে-জন্যে ঘরে ঢোকেনি ওরা। টেলিফোন করারও সাহস পায়নি।
চুলোয় যাক কাজ! নাস্তা খাওয়ারও দরকার নেই বাড়িতে। বাইরে কোনোখানে খেয়ে নিলেই হবে। তাড়াতাড়ি কাপড় পরে জানালা খুললো মুসা। সিঁড়ি বেয়ে নামতে গিয়ে মায়ের চোখে পড়ার ঝুঁকি নিতে চায় না। জানালা গলে। বেরিয়ে পাইপ বেয়ে নেমে এলো মাটিতে।
কি ব্যাপার? জিজ্ঞেস করলো সে।
কিশোর বলছে, ভিকটর ইভানসের কিছু হয়েছে, রবিন জবাব দিলো।
খাইছে! কি হয়েছে?
সাইকেল বের করে নিয়ে এসো, কিশোর বললো। এখানে দাঁড়িয়ে কথা বললে ধরা পড়বে। চলো, ভাগি।
হাইওয়েতে ওঠার আগে কথা বললো না কিশোর। তারপর বললো, সকালে পিটার ফোন করলো। ভোরে উঠেই নাকি চলে গিয়েছিলো টাওয়ারে, ভিকটরের মালের তালিকা করতে। উত্তেজনায় সারারাত ঘুমায়নি সে। গিয়ে দেখে ভিকটর

নেই। বাক্সটাও নেই। তার পর আমিও চেষ্টা করেছি, ফোনের জবাবই দিলো না কেউ টাওয়ার থেকে।
পালালো নাকি?
না গিয়ে বলতে পারবো না।
বেগুনী জলদস্যুর আড্ডায় পৌঁছে সাইকেল গেটের বাইরে রাখলো ওরা। পিটার ওদের অপেক্ষাতেই ছিলো। দেখেই দৌড়ে এলো। চারজনে মিলে চলে এলো টাওয়ারে। সদর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে ডাকলো কিশোর, মিস্টার ইভানস! মিস্টার ইভানস!
সাড়া এলো না।
এরপর মুসা ডাক দিলো। ঠেলা দিলো দরজায়। পাল্লা ফাঁক হতেই মিয়াও করে বেরিয়ে এলো কালো বেড়ালটা।
ভিকটর নেই ভেতরে, বেড়ালটার দিকে তাকিয়ে চিন্তিত ভঙ্গিতে বললো। কিশোর। চলো, ঢুকে দেখি।
সারা টাওয়ারে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও তাকে পাওয়া গেল না। গুপ্তধনের বাক্সটাও উধাও।
পালিয়েছে! পিটার বললো।
কাল রাতেই সন্দেহ হয়েছিলো আমার, আনমনে বললো কিশোর। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটলো একবার। ভিকটরের স্টাডিতে দাঁড়িয়ে আছে।
মাঝারি আকারের একটা ঘর। চারপাশে সাজানো বুককেসে অসংখ্য বই। ঘরের মাঝখানে বড় একটা কাউচ, বসে আরাম করে পড়ার জন্যে। একপাশের দেয়াল ঘেঁষে একটা লেখার টেবিল। তাতে টেলিফোন আছে। এগিয়ে গেল। কিশোর। টেলিফোন সেটটার পাশেই পড়ে আছে একটা প্যাড। তাতে একটা বিচিত্র নকশা। সেটার দিকে দীর্ঘ এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলো সে। হঠাৎ বলে উঠলো, সী-প্লেন!
কি বললে! মাথাটাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি তোমার! মুসা কিছু বুঝতে পারছে না।
এটা কি? প্যাডে টোকা দিয়ে জিজ্ঞেস করলো কিশোর।
মনে তো হচ্ছে একটা সী-প্লেনের ছবি, পিটার বললো। নামার জন্যে পনটুন খুঁজছে, এরকম আঁকতে পারলে ভালো হতো।
ভালো আর্টিস্ট হলে সেটা পারতো। ভিকটর তা নয়।
কি বলতে চাইছো? রবিনও বুঝতে পারছে না কিশোরের কথা।
আমি শিওর, যাবার আগে টেলিফোন করেছিলো ভিকটর, কিশোর বুঝিয়ে দিলো। লাইন পেতে দেরি হয়েছিলো হয়তো, কিংবা অন্য কোনো কারণ ছিলো। যাই হোক, আঁকার যথেষ্ট সময় পেয়েছে সে।

এয়ার ট্যাক্সি সার্ভিস! চেঁচিয়ে উঠলো মুসা। ফোন করেছিলো ওখানেই! সে জন্যেই প্লেনের ছবি।
হ্যাঁ, নিশ্চয় প্লেনে করে পালিয়েছে ভিকটর। পিটার, তোমার আব্বা কোথায়?
ঘরেই।
জলদি চলো। কুইক!
এতো সকালে গোয়েন্দাদের দেখে অবাক হলেন ক্যাপ্টেন ফিলিপ। ভিকটরের নিখোঁজ হওয়ার কথা পিটার তাকে কিছু বলেনি। নেই দেখেই সোজা কিশোরকে বে ফোন করেছে।
সব শুনে গম্ভীর হয়ে গেলেন তিনি।
এয়ার ট্যাক্সি সার্ভিস কটায় খোলে? জিজ্ঞেস করলো কিশোর।
আটটা তিরিশে। কেন?
আটটা পঁয়তাল্লিশ বাজে! এখনও হয়তো সময় আছে। জলদি একটা ফোন করুন ওদেরকে। বলুন, ডেঞ্জারাস একটা ক্রিমিন্যাল ওদের প্লেনে করে পালাচ্ছে!
টেলিফোন বুক খুললেন ক্যাপ্টেন। নম্বর বের করে ফোন করলেন। বললেন, একটা সাংঘাতিক অপরাধী পালাচ্ছে। ভিকটরের চেহারার বর্ণনাও দিলেন।
লোকটা জানালো, হ্যাঁ, ওরকম চেহারার একজন লোক বিমান ভাড়া করেছে। নাম, ভিকটর ইভানস। প্লেনে উঠে পড়েছে।
জলদি ঠেকান ওকে! থামান! টেলিফোনেই চেঁচিয়ে উঠলেন ক্যাপ্টেন। পাইলটকে বলুন, যাতে না ওড়ে।
দাঁড়ান দেখছি, জবাব এলো অন্যপাশ থেকে। কিছুক্ষণ পর লোকটা জানালো, জবাব দিচ্ছে না পাইলট। বোধহয় পিস্তল দেখিয়ে মুখ বন্ধ করে রেখেছে ভিকটর। পুলিসকে ফোন করবে বলে লাইন কেটে দিলো ট্যাক্সি সার্ভিসের কর্মচারি।
একটা বিমানের শব্দ শেনা গেল। ডক থেকে ওড়ার পাঁয়তারা করছে বিমানটা। ট্রেলার থেকে ছুটে বেরোলো তিন গোয়েন্দা আর পিটার। পেছনে বেরোলেন ক্যাপ্টেন ফিলিপ।
ওড়ার জন্যে তৈরি হচ্ছে ছোট একটা সী-প্লেন।
আহহা, দেরি হয়ে গেল! হতাশ ভঙ্গিতে হাত নাড়লো কিশোর। আর ঠেকানো গেল না ওকে!
সেদিকে তাকিয়ে থেকে কি ভাবছেন ক্যাপ্টেন। তারপর বলে উঠলেন, পারবো! এসো! বলেই দৌড় দিলেন জেটির দিকে।

.

ব্ল্যাক ভালচারের হুইল ধরেছেন ক্যাপ্টেন ফিলিপ। এগিয়ে চলেছে জাহাজ। জোর বাতাস উড়িয়ে নিয়ে গেছে পাতলা কুয়াশা। মাস্তুলের ওপরের ক্রো-নেস্টে উঠে

বসেছে নোনতা জেসন। ওখান থেকে যা যা দেখবে, চেঁচিয়ে জানাবে। ক্যাপ্টেনকে। জাহাজের গলুইয়ের কাছে রেলিঙ ধরে দাঁড়িয়েছে তিন গোয়েন্দা আর। পিটার।
বিমানটা কোন দিকে গেছে? উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো কিশোর।
মেইন চ্যানেল ধরে সোজা চলে যাবে সাগরের দিকে, পিটার জানালো। ওই লাল আর কালো বয়াগুলোর মাঝ দিয়ে। সাগরের দিক থেকে আসা বাতাসকে কাজে লাগাবে।
ক্রো-নেস্ট থেকে চেঁচিয়ে উঠলো নোনতা জেসন, ডক ছেড়েছে, ক্যাপ্টেন! গতি বাড়িয়েছে!
দূরে দেখা যাচ্ছে সী-প্লেনটা। দমে গেল ছেলেরা। ধরার আশা কম।
পারবো না! নিরাশ হয়ে বললো মুসা। আমরা যাওয়ার আগেই উড়ে যাবে।
পারবো! রবিন বললো। এঞ্জিনের শক্তি বাড়াতে সময় লাগবে।
ধরা কঠিন হবে।
গুঙিয়ে উঠলো কিশোর। ধরতে না পারলে আমাদের ওপর দিয়েই উড়ে যাবে, বুড়ো আঙুল দেখিয়ে!
এঞ্জিনের সমস্ত শক্তি নিংড়ে ছুটেছে জাহাজ। বয়ার লম্বা সারির মুখে চলে গেছে বিমানটা। একমাত্র প্রপেলারটা ঘুরতে আরম্ভ করেছে।
পাইলটকে দেখতে পাচ্ছি, কিশোর বললো। পাশের লোকটা::-ভিকটর, কোনো সন্দেহ নেই...।
প্রতি মুহূর্তে বিমানটার কাছাকাছি চলে যাচ্ছে জাহাজ।
লাল বয়াগুলোর ভেতরে বিমান প্রবেশের মানে হচ্ছে ওড়ার জন্যে অর্ধেক। প্রস্তুত ওটা।
লাল বয়ার সারি পেরিয়ে কালোগুলোতে যখন ঢুকলো বিমান, জাহাজ ডুকে পড়লো চ্যানেলের মধ্যে।
জাহাজে সবাই দম বন্ধ করে ফেলেছে।
পাইলটের শাদা মুখ হাঁ হয়ে গেছে। জানালার কাছে ঝুঁকে রয়েছে ভিকটর, হাতে পিস্তল। জাহাজটা আরো এগিয়ে যেতেই এদিকে সই করে পিস্তল তুললো সে।
শুয়ে পড়ো, শুয়ে পড়ো সবাই! চিৎকার করে বললেন ক্যাপ্টেন।
গুলি করলো ভিকটর...একবার-দুবার
একটা মুহূর্তের জন্যে যেন স্তব্ধ হয়ে গেল সময়। কিন্তু জাহাজ থেমে নে এগিয়ে যাচ্ছে বিমানটার দিকে, যেন মুখোমুখি ধাক্কা লাগানোর ইচ্ছে।
হঠাৎ শাই করে একপাশে ঘুরে গেল বিমান, একটা কালো বয়ায় লেগে। ছিঁড়ে গেল একটা ডানা। কাত হয়ে গেল একপাশে।

পানিতে লাফিয়ে পড়েছে পাইলট। সাঁতরে সরে যেতে চায় যতো দ্রুত সম্ভব।
পানি ঢুকছে বিমানে। কাত হয়ে ভাসছে এখন। এঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেছে। ওটার কাছাকাছি এসে গতি কমালো জাহাজ। দড়ি ছুঁড়ে দিলো পিটার। ওটা ধরলো পাইলট।
ভিকটরকে দেখা গেল আরেক দিকে সাঁতরাচ্ছে। দুটো লাইফ বেল্ট বেঁধে নিয়েছে। কালো বাক্সটা ঠেলে নিয়ে সাঁতরাচ্ছে।
দড়ি বেয়ে ডেকে উঠে ধপাস করে গড়িয়ে পড়লো পাইলট। পানি গড়াচ্ছে কাপড় থেকে। কয়েকবার জোরে জোরে দম নিয়ে বললো, তোমরা আমার প্রাণ বাঁচালে! ওই পাগলটার কাছে পিস্তল আছে। প্লেন চালাতে বাধ্য করেছে ও আমাকে। ধাক্কা লেগে কাত হয়ে না পড়লে কি হতো জানি না! জাহাজের সঙ্গে ধাক্কা লেগে বিমান চুরমার হয়ে যাওয়ার কথা কল্পনা করে শিউরে উঠলো সে। কে লোকটা? ডাকাত-টাকাত?
ডাকাতই, পানির দিকে তাকিয়ে জবাব দিলো কিশোর। ভিকটরের দিকে এগোচ্ছে জাহাজ।
এখনও পালানোর চেষ্টা করছে ভিকটর। কিন্তু বাক্সটা বেশি ভারি। ওটা নিয়ে এগোতে পারছে না তেমন। জ্বলন্ত চোখে ফিরে তাকালো একবার জাহাজের দিকে। বুঝলো, বাক্সটা নিয়ে পালানো অসম্ভব। শেষে ওটা ছেড়ে দিয়ে সাঁতরাতে শুরু করলো।
কিন্তু জাহাজের সঙ্গে সাঁতরে আর কতক্ষণ? হাল তাকে ছাড়তেই হলো। ক্রো-নেস্ট থেকে নেমে এসেছে নোনতা জেসন। পানিতে ঝাঁপ দিতে তৈরি হচ্ছে। তার আগেই ঝাঁপিয়ে পড়লো মুসা। তারপর জেসন। শেষে একে একে রবিন, পিটার আর পাইলট। সবাই মিলে ধরে ফেললো ভিকটরকে।
দড়ি নামিয়ে দেয়া হলো। তাতে বাক্সটা বেঁধে দিলো মুসা। কিশোর আর ক্যাপ্টেন মিলে টেনে তুললেন ওটা ডেকে।
ভিকটরকেও তোলা হলো।
দেখাবো, মজা দেখাবো সব কটাকে! নিষ্ফল হুমকি দেয়া শুরু করলো সে।
পাত্তাই দিলো না তাকে কেউ। তবে চারপাশ থেকে ঘিরে রাখলো, যাতে আবার গিয়ে পানিতে পড়তে না পারে।
জাহাজের মুখ ঘোরালেন ক্যাপ্টেন। বললেন, কিশোর, বলে ফেলো তো এবার সব। এই ভিকটর লোকটা আসলে কে?
আমার ধারণা, চোর, গম্ভীর হয়ে বললো কিশোর। মেজর নিরেকের দলের। লোক।
কি করে বুঝলে? পিটার অবাক।

গুপ্তধনগুলো জলদস্যুদের লুটের মাল নয়। আধুনিক চোরের চোরাই মাল।
কি বলছো? বিশ্বাস করতে পারছেন না ক্যাপ্টেন।
ঠিকই বলছি। একটা ব্যাপার প্রথমে বুঝতে পারছিলাম না, আপনাকে আর পিটারকে সরিয়ে দেয়ার পরেও চব্বিশ ঘন্টা কেন আড়ার ওপর নজর রাখছিলো মেজরের লোক। এখন জানি। ভিকটরের ওপর নজর রাখা হচ্ছিলো।
ভিকটর! প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো রবিন। ভিকটরকে পাহারা দিচ্ছিলো?
হ্যাঁ, তাই। তবে ভিকটর আমাদেরকে মালগুলো দেখানোর আগে পর্যন্ত সেটা বুঝতে পারিনি।
পরে কি করে বুঝলে? জানতে চাইলো মুসা।
খুব সহজ। বাক্সটা দেখেই বুঝে ফেলেছি। ওটার ওপরে তামা দিয়ে লেখা রয়েছে নাম। অনেক পুরনো হলে ময়লা হয়ে যায় তামা, রঙ বদলে যায়, সবুজ দাগ পড়ে। অথচ এটা একেবারে নতুন, চকচক করছে। আর বাক্সটাও তৈরি হয়েছে প্লাইউড দিয়ে, আগের দিনের মতো ভারি কাঠ নয়। তার ওপর রঙ করেছে। বেশি কাঁচা কাজ করে বসেছে ভিকটর।
বাক্সটা নতুন বলেই যে মালও নতুন, তা কি করে বুঝলে? ক্যাপ্টেনের প্রশ্ন। নতুন বাক্সে কি পুরনো মাল রাখা যায় না?
যায়। তবে এক্ষেত্রে তা করা হয়নি। আমাকে একটা আঙটি দিয়েছিলো ভিকটর। সেটা আমি জুয়েলারির দোকানে নিয়ে গিয়ে দেখিয়েছি। নতুন। মাত্র কয়েক বছর আগে বানানো হয়েছে। তাতেই বুঝলাম, ভেতরের সব মালই নতুন। জলদস্যুর গুপ্তধন নয়।
কিন্তু কিশোর, রবিন বললো, যদি ওরা জানেই ওগুলো গুপ্তধন নয়, তাহলে…
হ্যাঁ, রবিন, মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললো কিশোর, ঠিকই ধরেছো। কেন তাহলে বিনা প্রতিবাদে জেলে চলে গেল চোরের দল? পুলিসকে কিছুই বললো না? এই তো? কেন ভিকটরকে মাল নিয়ে পালাতে দিলো, এটাও নিশ্চয় তোমার প্রশ্ন। সহজ জবাব, চোরাই মাল। পুলিশে জেনে গেলেই সব খোয়াতে হতো। তাই চুপ করে গিয়েছিলো মেজর। আর তখনই পুরো সত্যটা বুঝে গেছি আমি।
ভিকটরের হাত দড়ি দিয়ে বাঁধা। সেই অবস্থায়ই ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল কিশোরের ওপর। তাকে যখন আটকে ফেলা হলো, গালাগাল করতে লাগলো। চেঁচিয়ে বললো, বিশ্বাস করো না ওর কথা! ওটা একটা মিথ্যুক! সব বানিয়ে বলছে!
কেউ কান দিলো না তার কথায়।
সত্যটা কি, কিশোর? জিজ্ঞেস করলো পিটার।
মেজর নিরেক আর তার চেলারা জানে যে মালগুলো চোরাই। কারণ ওরাই। চুরি করে জমিয়েছে ওগুলো। ভিকটরও জানে। কারণ সে-ও একই দলের লোক। মাল

নিয়ে পালিয়েছিলো ভিকটর, সেগুলো খুঁজতেই এসেছে মেজুর আর তার চেলারা। আবার না ওগুলো বের করে নিয়ে ভিকটর পালিয়ে যায়, সেজন্যই দিন রাত তার ওপর চাখ রাখা হতো। আসলে, সমস্ত মাল হাতিয়ে নিয়ে টাওয়ারে এসে লুকিয়েছিলো সে। তার জানা ছিলো, লুকানোর চমৎকার জায়গা ওটা।
তীরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্লেচারকে। দলবল নিয়ে পৌঁছে গেছেন তিনি।
সেদিকে তাকিয়ে আরেকবার নিষ্ফল আক্রোশে ফুঁসে উঠলো ভিকটর। চোখ পাকিয়ে কিশোরকে বললো, তোমাকে...তোমাকে দেখে নেবো আমি...

.

কয়েক দিন পর। বিখ্যাত চিত্র পরিচালক মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফারের অফিসে এসেছে তিন গোয়েন্দা, বেগুনী জলদস্যুর কেসের রিপোর্ট নিয়ে।
মন দিয়ে ফাইলটা পড়লেন পরিচালক। তারপর মুখ তুললেন। বুঝলাম। তবে একটা কথা এখানে লেখোনি। কি দেখছিলো সেদিন মেজর? নকশা?
ম্যাপ, স্যার, জবাব দিলো কিশোর। পাইরেটস কোভের। ওতে অবশ্য সুড়ঙ্গটা দেখানো নেই।
কিন্তু রিপোর্টে বলেছে, জানা না থাকলে ওই সুড়ঙ্গ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। মেজর নিরেক কি করে পেলো?
হাসলো কিশোর। কয়েক বছর আগে একথা ভিকটরই জানিয়েছিলো মেজরকে। পুলিসের ভয়ে পালিয়ে আত্মগোপন করে আছে তখন ওরা। ভিকটর। অবশ্য তখনও জানতো না, সুড়ঙ্গটা ঠিক কোথায় আছে। গল্প করতে করতে এমনি বলেছিলো আরকি মেজরকে, পূর্বপুরুষের কাহিনী বলতে গিয়ে। তারপর একদিন। মাল হাতিয়ে নিয়ে পালালো ভিকটর। মেজর জানতো না, টাওয়ারটা কোথায়। তবে খুঁজে খুঁজে বের করে ফেললো। অনেক দিন লেগেছে খুঁজে বের করতে। এসে দেখলো, সত্যি, টাওয়ারেই এসে উঠেছে ভিকটর। বুঝতে অসুবিধে হলো না, মালগুলো টাওয়ারেই লুকিয়েছে ভিকটর। তাকে কিছু জিজ্ঞেস করলো না মেজর। কারণ তাহলে অন্য জায়গায় মাল সরিয়ে ফেলতে পারে। বোটহাউসে ঢুকে বের। করলো সুড়ঙ্গমুখ। মাটি কেটে সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে টাওয়ারে ঢোকার পথ করে। নিলো।
তারপর?
ওরা মালগুলো পাওয়ার আগেই টের পেয়ে গেল ভিকটর, জবাব দিলো এবার রবিন। সতর্ক হয়ে গেল। শেষে মাল নেয়ার জন্যে শেষবার যখন ঢুকলো মেজর আর নিরেক, তখন জেসন আর কিশোরকে নিয়ে তৈরি হয়ে আছে সে, বাধা। দেয়ার জন্যে।

মেজর আর রিগোকে ঠেকালো বটে ভিকটর, রবিনের কথার খেই ধরলো কিশোর, কিন্তু আমরা তখন জেনে গেছি। বুঝলো, শেষ রক্ষা করতে হলে একটাই উপায়, পুলিসের হাতে ধরা দেয়া। ভিকটরকে মালগুলো নিয়ে পালাতে দেয়া। তাহলে শেষমেষ ভাগ একটা পাবার আশা আছে। সেরকমই চুক্তি হয়েছে ওদের মধ্যে, স্টোররুমে।

ওই চুক্তির কোনো অর্থ নেই, মাথা নাড়লেন পরিচালক। ভিকটরকে বিশ্বাস। করা যায় না।

না, তা যায় না, এতোক্ষণে মুখ খুললো মুসা। তবে এছাড়া আর কিছু করারও ছিলো না ওদের। ভিকটর নিয়ে পালালে পাওয়ার কিছুটা অন্তত আশা আছে। কিন্তু পুলিসের হাতে পড়লে একেবারেই নেই। তাই ওই বুদ্ধি করেছিলো।

হু। একমুহূর্ত চুপ করে রইলেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। তাহলে বেগুনী। জলদস্যুর গুপ্তধন আসলেই নেই?

আপাতত তো পেলাম না, মুচকি হাসলো কিশোর। তবে তদন্ত আমরা চালিয়ে যাবো ভাবছি। বলা যায় না, কিছু বেরিয়েও যেতে পারে।

ভলিউম ১৬ – দক্ষিণের দ্বীপ – তিন গোয়েন্দা – রকিব হাসান – সেবা প্রকাশনী
বসন্তের এক চমৎকার সকাল। ওমর শরীফ-তিন গোয়েন্দার ওমর-ভাইয়ের সঙ্গে হেঁটে চলেছে কিশোর আর মুসা, রকি বীচ এয়ার ক্লাবের দিকে। বিমানে উড়বে, তারপর ওখানেই দুপুরের খাবার সারার ইচ্ছে ওদের। বিশাল এলাকা জুড়ে তৈরি হয়েছে রানওয়ে আর অন্যান্য বাড়িগুলো। পাশে একটা পার্ক। মাঝখান দিয়ে পথ চলে গেছে। পার্কের ভেতর দিয়েও যাওয়া যায়। সেদিক দিয়েই চললো ওরা, সকালের মিষ্টি রোদ গায়ে মাখতে মাখতে। টুঁইই টুঁইই করে একটা নাম না জানা পাখি ডাকছে ফুলের ঝাড়ে, দেখা যায় না।
এতো ভালো লাগছে, পার্ক থেকেই বেরোতে ইচ্ছে করছে না কিশোরের। তবে বিমানে ওড়াটাও কম মজার নয়। সুযোগ পেলেই আসে এখানে, ওড়া চর্চা করে।
ঢোকার মুখে দেখা হয়ে গেল লোকটার সঙ্গে। খাটো, একহারা শরীর, ক্লিন শেভ, ইটের মতো লাল চুল ছোট করে ছাটা, রোদে পোড়া চামড়া। মুখ দেখলে মনে হয় কোনো কথা বললেই বুঝি মারমুখো হয়ে উঠবে। তোবড়ানো একটা ব্রায়ার পাইপ দাঁতে কামড়ে রেখেছে। তাকিয়ে আছে সবুজ মাঠের দিকে, যার বুক চিরে চলে গেছে রানওয়ে।
লোকটার দিকে তাকিয়ে নজর ফিরিয়ে নিয়েছিলো ওমর, কি মনে হতে আবার তাকালো। থমকে দাঁড়ালো সে। ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইলো দীর্ঘ একটা মুহূর্ত। তারপর প্রায় চিৎকার করে উঠলো, আরে, ডজ না! হ্যাঁ, ডজ ম্যাকমবার! তুমি এখানে কি করছো? এতোদিন পর! কেমন আছো?
দাঁতের ফাঁক থেকে পাইপ সরিয়ে নিলো ছোটখাটো মানুষটা। তার চোখও বড় বড় হয়ে গেছে। ওমর না! আমাদের সেই দুর্ধর্ষ ওমর শরীফ, মরুর বুনো ঘোড়া!
মনে আছে তাহলে?
থাকবে না আবার। তোমার মতো বেদুইন ডাকাতকে ভোলা যায় নাকি? হাত বাড়িয়ে দিলো ডজ।
হাতটা ধরলো ওমর। তারপর একটানে নিয়ে এসে বুকে ফেললো। জড়িয়ে ধরলো একে অন্যকে, বেদুইনের কায়দায় কোলাকুলি করে স্বাগত জানালো।
তার পর? কেমন আছো, ভাই?
ভালো।
আরও কিছু কুশল বিনিময়ের পর দুই কিশোরের দিকে তাকালো ডজ। ওমরকে জিজ্ঞেস করলো, ছাত্র বুঝি?
ছাত্র এবং বন্ধু। পরিচয় করিয়ে দিলো ওমর, ও কিশোর পাশা। আর ও মুসা আমান। নামকরা গোয়েন্দা ওরা।

তা-ই নাকি? হাত বাড়িয়ে দিলো ডজ। এক এক করে হ্যান্ডশেক করলো কিশোর আর মুসা।
ডজের পরিচয় দিলো ওমর, ক্যাপ্টেন ডজারন ম্যাকমবার। আমরা ডাকি ডজ। ইরাকী বাহিনীতে একই স্কোয়াড্রনে ছিলাম আমরা। ইরাক-ইরানের যুদ্ধের সময় যা খেল দেখিয়েছে না ও। হুট হুট করে যখন তখন প্লেন নিয়ে ঢুকে পড়তো। শত্রু এলাকায়। একদিন খুব নিচু দিয়ে উড়ে শত্রুর বাংকার আবিষ্কার করতে গিয়ে বাড়ি লাগালে টেলিগ্রাফের খুঁটির সঙ্গে। তারপর গায়েব। আমরা তো ভেবেছি মরেই গিয়েছে। প্লেনটা পাওয়া গেছে বিধ্বস্ত অবস্থায়। কিন্তু ডজের খোঁজ নেই। বহুদিন আর কোনো খবর পাইনি। থামলো ওমর। ডজের দিকে তাকিয়ে হাসলো। তারপর একদিন খবর পেলাম, দক্ষিণ সাগরের এক দ্বীপে বিলাসী জীবন যাপন করছেন। আমাদের ডজারন ম্যাকমবার।
যে বলেছে, সে একটা আস্ত মিথ্যুক, কড়া গলায় প্রতিবাদ করলো ডজ। কারণ ওখানে বিলাসেও গা ভাসিয়ে ছিলাম না আমি, কোনো একটা বিশেষ দ্বীপে বাসও করছিলাম না। আমি তখন ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম।
তা বেশ করেছিলে, ওমর বললো। যার যা স্বভাব তা-ই তো করবে। কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি কেন আমরা? এতোদিন পর তোমার সঙ্গে দেখা। একটু খাতির-টাতির করা দরকার। খেয়েছো?
এখানেই খেয়ে নেবো ভাবছিলাম। আমি এসেছিলাম ক্লাবটা দেখতে। হলিউড-ফলিউড দেখে দেখে আর সময় কাটছিলো না। রকি বীচ ক্লাবের নাম শুনেছি। অনেক পুরনো আমলের বিমানও নাকি আছে এখানে। তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে কল্পনাই করিনি।
আমিও না। এখানকার মেম্বার আমি। এরা দুজনও, কিশোর আর মুসাকে দেখালো ওমর। এসো। আগে গিয়ে বসি। খাওয়া-দাওয়া হোক। দক্ষিণের দ্বীপে নারকেল আর কলা কেমন ফলালে সেই গল্প শোনাও আমাদেরকে। তারপর ক্লাবটা দেখানো যাবেখন। এসো।
নারকেল ফলাবো! ফুহ্! জঘন্য লাগে আমার! দেখলেই বমি আসে এখন। তোমারও আসতো, যদি আমার মতো এতো নারকেল খেতে হতো, মুখ বাঁকালো ডজ। সুইং ডোর ঠেলে রেস্টুরেন্টে ঢুকলো ওমরের পিছু পিছু।
জানালার কাছে একটা টেবিল বেছে নিয়ে এসে বসলো চারজনে।
তো, আমেরিকায় কি করছো? জানতে চাইলো ওমর। মেনু কার্ড টেনে নিলো সে। ছুটিতে বেড়াতে এসেছো? বাড়ি গিয়েছিলে?
ডজের বাড়ি বৃটেনে। মাথা নাড়লো সে, না, যাইনি। বেড়ানোর কথা বলছো? এখানেও জঘন্য লাগছে আমার। দুনিয়ার কোথায় গেলে যে ভালো লাগবে বুঝতে

পারছি না। আসলে দক্ষিণ সাগর মেজাজের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে আমার। আরেকটা মেনু কার্ড, টেনে নিলো সে। এই, শিক কাবাব হলে কেমন হয়? ভেড়ার মাংসের?
চমৎকার হয়!
দারুণ! বলে উঠলো মুসা।
ভুরু কুঁচকে ওর দিকে তাকালো ডজ। জোরে হেসে উঠলো, ভোজন রসিক মনে হচ্ছে?
ধরে ফেলেছেন তাহলে, হাসতে হাসতে বললো কিশোর।
দ্বীপের কথা আর বলবেন না, ডজ ভাই...
বাধা দিয়ে ডজ বললো, শুধু ডজ। ওসব ভাবটাই শুনতে ভালো লাগে না। শুধু ডজ।
আচ্ছা, ঠিক আছে, শুধু ডজ। মাথা ঝাঁকাল মুসা। দ্বীপের খাবারের কথা বলছেন তো? সেকথা আর মনে করিয়ে দেবেন না, ডজ ভাই...
আবার ভাই।
থুককু। মনে থাকে না। নিজের চেয়ে বয়সে বড় কাউকে দেখলেই... যাকগে, ডজ। হ্যাঁ, দক্ষিণের কিছু দ্বীপে আমরাও বেরিয়ে এসেছি, ডজ। শুয়াপোকার বাচ্চা পর্যন্ত খেয়ে এসেছি আমরা তিনজনে...
তিনজন? আরেকজন কোথায়?
গানের অফিস চালাতে গেছে। রবিন মিলফোর্ড, বললো ওমর। আমাদের আরেক বন্ধু। ওরা তিনজনে মিলে একটা গোয়েন্দা সংস্থা খুলেছে। নামঃ তিন গোয়েন্দা।
সংক্ষেপে তিন গোয়েন্দার কথা ডজকে জানালো সে।
ভালো, খুব ভালো, মাথা দুলিয়ে বললো ডজ। ওমর শরীফের সঙ্গে যখন এতো মাখামাখি, তখনই বুঝেছি স্বভাবও একই হবে। বেপরোয়া, অ্যাডভেঞ্চারাস, দুঃসাহসী...
কাকে কি বলছো? তুমি কি আর কম নাকি?
সেজন্যেই তো তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে। হাঁ হাঁ করে হাসলো ডজ। অন্য তিনজনের মাঝেও সংক্রমিত হলে হাসিটা।
খাবারের অর্ডার দিয়ে আবার ডজের দিকে তাকালো ওমর, হ্যাঁ, এবার বলো। কি জন্যে আমেরিকায় এসেছে? বেড়াতে আসেনি। তোমার আচরণ বলে দিচ্ছে।
সত্যি কথা বলবো? টাকার জন্যে এসেছি। শুনেছি, এখানে নাকি বাতাসে টাকা ওড়ে।
ঠিকই শুনেছে। তবে তার পেছনে ছোটার লোকেরও অভাব নেই। প্রতিদিন ধরার জন্যে হন্যে হয়ে ছুটছে কোটি কোটি লোক। বেশির ভাগই ধরতে পারছে না, মুখ

চুন করে বাড়ি ফিরছে। এই আমার কথাই ধরো না। অনেক তো ছুটলাম, বড় লোক আর হতে পারলাম না। কিছুদিন থেকে ভাবছি, পুলিশের চাকরিতে যোগ দেবো। ভালো অফার এসেছে।
চেহারা কিন্তু চকচক করছে তোমার, ডজ বললো। পকেটে পয়সা না থাকলে অমন হয় না। টাকার জন্যে নয়, পুলিশে যোগ দেয়ার যদি ইচ্ছে হয়ে থাকে তোমার, তাহলে ওই বেদুইনগিরি করার লোভে। অ্যাডভেঞ্চার। তা কতো জমিয়েছো?
ব্যাপারটা কি, বলো তো? এতোই টানাটানিতে পড়ে গেলে? ঠিক আছে, লাগলে অল্পস্বল্প ধার দিতে পারি।
অল্পতে হবে না, বেদুইন, বিষন্ন কণ্ঠে বললো ডজ, গাদা গাদা দরকার আমার। আর ধারটারের মধ্যেও যাচ্ছিনে। আমি চাইছি পার্টনার।
গাদা গাদা বলতে কতো বোঝাচ্ছে?
ধরো, শুরুতে হাজার পঞ্চাশেক।
শিস দিয়ে উঠলো ওমর। কেন? দ্বীপ কিনবে নাকি?
দ্বীপফীপের দরকার নেই আমার। নাক দিয়ে ঘোৎ ঘোঁৎ করলো ডজ। বিনে পয়সাতেই হাজারটা দ্বীপ দখল করে নিতে পারি, ইচ্ছে করলে। পয়সা লাগে না। সাগরের ওই দক্ষিণ অঞ্চলটায় খালি পড়ে আছে হাজারে হাজারে। থাকার লোকও নেই। তোমার ইচ্ছে হলে তুমিও গিয়ে থাকতে পারো। না ভাই, ওসব নয়। আমার উচ্চাকাঙ্খা আরেকটু বেশি।
বলে ফেলো। দেখি সাহায্য করা যায় কিনা।
উজ্জ্বল হলো ডজের মুখ। সত্যি সাহায্য করবে আমাকে? টাকার ব্যবস্থা করে দেবে?
সেই টাকা দিয়ে তুমি কি করতে চাও, তার ওপর নির্ভর করে দেয়া না দেয়া। তোমাকে তো আমি চিনি। আর স্মৃতিশক্তিও অতোটা খারাপ না আমার। আগেও বহুবার নানারকম উর্বর বুদ্ধি এসেছিলো তোমার মাথায়। কোটিপতি হবার অনেক পরিকল্পনা করেছিলে। কয়েকবার ফতুর করেছে আমাকে। আর ফতুর হতে রাজি আমি।
ছুরি কাঁটা তুলে নিয়েছিলো ডজ। নামিয়ে রেখে হেলান দিলো চেয়ারে। স্থির দৃষ্টিতে তাকালো ওমরের দিকে। এক ঝুড়ি মুক্তো যদি দিয়ে দেয়া হয় তোমাকে, নিজেকে আর ফতুর ভাববে?
হাসলো ওমর। বাড়িয়ে বলার স্বভাবও গেল না তোমার। একমুঠো বললেও নাহয় বিশ্বাস করতাম।

এক ঝুড়িই বলছি! বড় এক ঝুড়ি! জোর দিয়ে বললো ডজ। আর এখানকার গহনার দোকানে যেসব মটরের দানার মতো দেখলাম, সেরকম নয়। আরও অনেক বড়। পায়রার ডিমের সমান।
তাহলে তো ভালোই হয়, স্বীকার করলো ওমর। তারপর মাথা নাড়লো অবিশ্বাসীর ভঙ্গিতে, কিন্তু তা তো তুমি দিতে পারবে না। কারণ সেই মুক্তো আনতে হলে ডালাস কিংবা হলিউডের বড়বড় বাড়িতে যেতে হবে তোমাকে। দুর্গম দুর্গ একেকটা। সেসব বাড়িতে ঢোকার সাধ্য বড় বড় ডাকাতেরও নেই। তবে সঙ্গে যদি নিয়ে এসে থাকো, আলাদা কথা।
সঙ্গে আনতে পারলে কি আর তোমার কাছে টাকা চাইতাম নাকি? গুঙিয়ে উঠলো ডজ। তবে আমি দেখেছি।
নাকি অন্য কেউ দেখে তোমাকে বলেছে? সেকথাই শোনাচ্ছো।
গ্লাস তুলে নিয়েছিলো, দড়াম করে নামিয়ে রাখলো ডজ। আরেকটু জোরে আছাড় দিলেই ভেঙে যেতো। চেহারার মারমুখো ভাবটা আরও প্রকট হয়ে গেছে।
দেখ, বেদুইন, আমি বলছি আমি দেখেছি। নিজের চোখে। বিশ্বাস করো দয়া করে!
মাথা ঝাঁকাল ওমর। বেশ, এতোই যখন জোর দিয়ে বলছো, বিশ্বাস করলাম। কিন্তু দেখলেই যখন, পকেটে ভরে কয়েকটা নিয়ে এলে না কেন?
পারলে কি আর আনতাম না নাকি? আরেকটা হুইস্কি আনতে বলো। গল্পটা শোনাচ্ছি। তাহলেই বুঝতে পারবে।
হুইস্কি আনার অর্ডার দিলো ওমর। সিগারেট কেস বের করে টেবিলের ওপর রাখলো। ডালা তুলে বেছে নিয়ে ঠোঁটে লাগালো একটা। লাইটার দিয়ে ধরালো।
মুখ তুলে তাকালো ডজের দিকে। শুরু করো। অনেক দিন ভালো গল্প শুনিনি।
বিশ্বাসই যদি না করো, অহেতুক বকবক করে সময় নষ্ট করতে চাই না আমি। গম্ভীর হয়ে গেল ডজ।
না শুনলে বুঝবো কি করে? সত্যিই বলবে তো, নাকি বানিয়ে বানিয়ে? তোমার তো আবার কল্পনার দৌড় একটু বেশি।
একটা শব্দও বাড়িয়ে বলবো না। যা সত্যি, শুধু তা-ই।
নীরব একটা মুহূর্ত ডজের দিকে তাকিয়ে রইলো ওমর। বেশ, বলো। বিশ্বাস করবো।
হ্যাঁ, শুরু করুন, কৌতূহলী হয়ে উঠেছে কিশোর।
একটা কথাও বাড়িয়ে বলবো না আমি, আবার বললো ডজ। গেলাসে লম্বা একটা চুমুক দিলো। যে লোকের কাছে শুনেছো, আমি দক্ষিণের দ্বীপে আছি, সে ঠিকই বলেছে। তবে আরামে ছিলাম, একথা ঠিক নয়। ওরকম জায়গায় আরামে থাকা

যায় না। সভ্যতার ছিটেফোঁটা আছে কিনা ওখানে সন্দেহ। যা-ই হোক, গিয়ে তো উঠলাম। বসে থাকতে ভালো লাগে না। কিছু একটা করার চেষ্টা করতে লাগলাম। মনের মতো কাজ পেলাম না। আমি হলাম গিয়ে বৈমানিক, প্লেন চালানো আর বোমা ফেলা ছাড়া আর কিছু বুঝি না। ওখানে ওরকম লোকের দরকার হয় না কারো। চিন্তায় পড়ে গেলাম। কি করি, কি করি! পকেটের টাকাও প্রায় শেষ। কোথাও যেতে হলে ভাড়ার টাকা লাগে। শেষে তাহিতির পাপিতি দ্বীপে যাওয়ার জন্যে জাহাজের একটা তৃতীয় শ্রেণীর টিকেট কাটলাম। মোটামুটি বাস করার মতো একটা জায়গা ওটা।

গিয়েছি আমরা, মুসা বললো।

তার দিকে তাকালো ডজ। গিয়েছে, না? তাহলে তো জানোই। সব রকমের লোক আছে ওখানে। সৎ লোক যেমন আছে, তেমনি আছে অসৎ লোক। ভদ্রলোক আছে, আছে অভদ্রলোক। ব্যবসায়ী, চোর-ডাকাত, শাদা, কালো, বাদামী, হলুদ, যতো রকমের মানুষ আছে দুনিয়ায়, সব রকমের পাওয়া যাবে ওখানে। সমস্ত দুনিয়ায় ঘুরেফিরে আর কোথাও ঠাঁই না পেয়ে গিয়ে যেন ওঠে ওই তাহিতির বন্দরে। একটা ব্যাপারে সবার মিল রয়েছে, সকলেই পোড় খাওয়া লোক। সাধারণ কেউ গিয়ে বাঁচতে পারবে না ওখানে। আমার যা মনে হয়েছে, বেশির ভাগই ভালো। তবে যেগুলো শয়তান, মহা শয়তান। একেবারে খাটাশ। থেমে দম নিলো ডজ। বার কয়েক চুমুক দিলো গেলাসে।

আবার বলতে লাগলো, সব কিছু মিলিয়ে, চমৎকার একটা জায়গা তাহিতি, আমার তা-ই মনে হয়েছে।

আমারও, মুসা বললো।

বাহ্, স্বভাব চরিত্রে মিলে যাচ্ছে দেখি! হাত বাড়িয়ে দিলো ডজ। হাত মেলাও। হ্যাঁ, যা বলছিলাম। তোমরা যখন গিয়েছে, নিশ্চয় সব জানো…

আমি যাইনি, ওমর বললো। যা বলার বলো।

এককালে সোসাইটি অ্যাইল্যান্ড বলা হতো দ্বীপটাকে। তখন ফ্রান্সের দখলে ছিলো ওটা। চীনারা থেকেছে বহুদিন। জাপানীরা দ্বীপটা নিয়ে বহু গুতোগুতি করেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। চীনারা এখনও আছে। মায়া কাটাতে পারে না। দেখার মতো একটা বন্দর। জাহাজ আসছে যাচ্ছে। পোড় খাওয়া সব মানুষ, দ্বীপের প্রধান রপ্তানী দ্রব্য নারকেলের ছোবড়ার মতো শুকনো, রোদে পোড়া। রপ্তানী দ্য আরও আছে। নানা রকমের ঝিনুক এবং মুক্তো। আশপাশের দ্বীপে যতো মুক্তো তোলা হয়, সব নিয়ে আসা হয় পাপিতিতে, বিক্রির জন্যে। ব্যাপারিরা কিনে চালান করে দেয় প্যারিসে কিংবা অন্য কোনো বড় শহরে। সেখানে মুক্তার

চাহিদা রয়েছে। যা-ই হোক, ভূগোলের জ্ঞান অনেকই দিলাম। এবার আসল কথায় আসি।

জাহাজে তো উঠলাম। ভেসে চললাম এক দ্বীপ থেকে আরেক দ্বীপে। একদিন গিয়ে পৌঁছলাম পাপিতিতে। গিয়েই কাজ পেয়ে গেলাম। আমার মনের মতোই বলতে হবে। অবশ্যই জাহাজের চাকরি। দ্বীপ থেকে দ্বীপে যাই। কয়েক দিনের বেশি ভালো লাগলো না এই চাকরি। মালবাহী জাহাজ থেকে নেমে চাকরি নিলাম, এক ব্যবসায়ীর দোকানে। দোকানদারি করলাম কিছুদিন। ভালো লাগলো না। বসে রইলাম কয়েক দিন। আরও খারাপ লাগলো। কথা বলার লোকের অভাব হয় না ওখানে। যদি কেউ মানিয়ে নিতে পারে, আরামেই সারাটা জীবন কাটিয়ে দিতে পারে ওরকম একটা দ্বীপে। দুই বেলা রুটি জোগাড়ের জন্যে খুব একটা পরিশ্রম করতে হয় না। দেখার জিনিসের অভাব নেই। তবু মাঝে মাঝে মনে হতো, ওই সবুজ দ্বীপ, রূপালী সৈকত, নীল লেগুন আর ঝলমলে মুক্তার চেয়ে অনেক ভালো আমাদের স্কটল্যান্ডের ধোঁয়াটে কুয়াশা ওঠা মেঘলা দিনগুলোও। পালিয়ে আসতে ইচ্ছে করতো। আসতে পারতাম, কিন্তু আসিনি। চেষ্টা করতে লাগলাম কিছু একটা করার। ওখানে অনেকে বড়লোক হয়েছে, আমি পারবো না কেন? টাকা নিয়ে স্কটল্যান্ডে ফিরতে পারলে বাকি জীবনটা আরামে কাটিয়ে দিতে পারবো। অনেক উপায় আছে টাকা রোজগারের, কিন্তু আমার হাতে ধরা দিতে চাইলো না। হাতে আসি আসি করেও আসে না, কেবলই ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে বেড়ায়।

কিভাবে? কৌতূহল বাড়ছে কিশোরের।

কিভাবে? সেসব গল্প বলতে গেলে কয়েক ঘণ্টায় কুলোবে না। অনেক সময় দরকার। তবে কিছু উদাহরণ দিচ্ছি। পমোটাস দ্বীপে একদিন এক দোকানে একটা ডাইভিং স্যুট নজরে পড়লো। জিনিসটা দোকানের মালিকের শখের জিনিস। বিক্রি করতে রাজি হলো না। তবে আমার চাপাচাপিতে ধার দিতে রাজি হলো এক শর্তে। যদি মুক্তো খুঁজে বের করতে পারি, তাহলে তিন ভাগের এক ভাগ দিয়ে দিতে হবে তাকে। ওটা নিয়ে চলে গেলাম আরেক পরিচিত লোকের কাছে। ঝরঝরে একটা বোট আছে তার। আরও একটা ভাগ দিতে হবে, এই কথা আদায় করে নিয়ে বোটটা নিয়ে আমার সঙ্গে যেতে রাজি হলো সে। স্যুট পেলাম, বোট পেলাম, আর ভাবনা কি? বেরিয়ে পড়লাম মুক্তো শিকারে। নিগ্রোরা ওখানে ভীষণ পরিশ্রম করে। গাধার মতো খাটতে পারে। আমিও ওদেরই মতো গাধা হয়ে থাকলাম পুরো একটা বছর। ডুবলাম ভাসলাম, ডুবলাম ভাসলাম, কতো হাজার বার যে ডুব দিয়েছি সাগরে, হিসেবই করতে পারবো না। বেশ কিছু মুক্তোও জোগাড় করলাম। ছোটখাটো একটা ব্যাগ ভর্তি। তিন ভাগের দুই ভাগ দিয়েও

আমার যা থাকবে, যথেষ্ট। আর দরকার নেই। নিয়ে রওনা হলাম পাপিতিতে। পরের দিনই আঘাত হানলো সাইক্লোন। ওখানে ঝড়ের কোনো ঠিকঠিকানা নেই। যখন তখন চলে আসে। ভাঙা একটা কাঠ ধরে ভাসতে ভাসতে গিয়ে পৌঁছলাম মেরিয়েটা দ্বীপে, জান নিয়ে কোনোমতে ধুকতে ধুকতে। রোদে পুড়ে উঠে গেছে পিঠের চামড়া। নতুন চামড়া গজানোর জন্যে পড়ে থাকতে হলো হাসপাতালে। আর মুক্তোগুলো? যেখান থেকে তুলেছিলাম সেই সাগরের তলায়ই আবার ফিরে গেছে বোটটা সহ। আরেকবার একটা মালবাহী জাহাজে চাকরি নিয়ে চলেছি। একটা ক্যানুতে দেখলাম দুজন লোক, মারকুইস দ্বীপের লোক। মুক্তোর জন্যে ডুব দিচ্ছে। বড় বড় তিরিশটা ঝিনুক তুলে ফেলেছে, একটাও খোলা হয়নি। হাতে কাজকর্ম কিছুই নেই। ভাবলাম কিছু তো একটা করি। ঝিনুকগুলোর জন্যে দুটো পুরনো পাইপ আর এক কৌটো তামাক দিতে চাইলাম। লাফিয়ে উঠলো ওরা। লুফে নিলো প্রস্তাবটা। কারণ তিরিশটা কেন, তিরিশ হাজার ঝিনুক খুলেও অনেক সময় একটা মুক্তো পাওয়া যায় না। তবে ঝিনুকেরও দাম আছে, সেটা অন্য ভাবে। বীজ হিসেবে। টন টন ঝিনুক কিনে নিয়ে গিয়ে সাগরের বিশেষ জায়গায় ফেলে, যারা মুক্তোর চাষ করে। ওসব ঝিনুকের অনেক দাম। তবে এমনিতে তিরিশটা ঝিনুকের কোনো দামই নেই ব্যাপারটা আমার পাগলামি হিসেবেই ধরে নিলো ওরা। কিন্তু আমি তখন কাজ খুজছি, হাত চালানোর মতো যে কোনো কাজ। ডেকে বসে খুলতে শুরু করলাম ঝিনুকগুলো। একটা কথা বলে নিই। কিশোর আর মুসার দিকে ফিরে বললো, তোমাদেরকে বলছি না। তোমরা নিশ্চয় জাননা। ওমরকে বললো, এমনিতে সাধারণত যেসব ঝিনুক দেখা যায়, দক্ষিণ সাগরের ওসব মুক্তোওয়ালা ঝিনুক সেরকম নয়। অনেক বড়। কয়েক পাউন্ড ওজন। অনেক সময় নিয়ে খুললাম প্রথমটা কিছু নেই। দ্বিতীয়টা খুললাম। ওটাতেও কিছু পেলাম না। এক এক করে উনত্রিশটা ঝিনুক খুলে ছড়িয়ে ফেললাম ডেকের ওপরে। আমার ভাগ্যে কিছুই মিললো না। আর একটা মাত্র ঝিনুক বাকি। ওতে কিছু পাওয়ার আশা করলাম না। সবগুলোর চেয়ে ছোট ওটা। খাবার সময় লোকে কি করে? প্রথমে বড়টা বেছে নেয়, সে যা-ই হোক। মিষ্টি হোক, মাছ হোক, যেটাই হোক, প্লেটের বড়টার দিকেই ঝোঁক মানুষের। আমিও তা-ই করেছিলাম। প্রথমে বড়টা বেছে নিয়ে খুলেছিলাম, তারপর ওটার চেয়ে ছোটটা। এভাবে খুলতে খুলতে বাকি রয়ে গিয়েছিলো সব চেয়ে ছোটটা। বেশ অবহেলা নিয়েই ফাঁক করলাম ওটা। ভেতরে আঙুল ঢোকালাম। নরম মাংসের মধ্যে শক্ত কি যেন লাগলো। বের করে আনলাম। মুক্তোই! থ্রাশ পাখির ডিমের সমান বড়। এমন মুক্তো জীবনে দেখিনি। ডেকের ওপর পড়ে রইলো। ঝিনুক থেকে বের করার পর ভেজা মুক্তোর রঙই অন্যরকম লাগে। আগুনের মতো

জ্বলে। প্যারিসে নিয়ে গেলে ওই একটার দামই বিশ হাজার ডলারের কম হবে না। বেশিও হতে পারে। এর আগে আমিও এতো বড় আর সুন্দর মুক্তো দেখিনি। বোকা হয়ে গেলাম যেন। হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম। ঠিক ওই সময় জোরে বাতাস লাগলো, ঢেউয়ে কাত হয়ে গেল জাহাজ। ডেকের ওপর দিয়ে গড়িয়ে চলে গেল মুক্তোটা। চিৎকার করে উঠে ঝাঁপ দিয়ে পড়লাম, থাবা দিয়ে তুলে নিতে চাইলাম ওটাকে। ধরতে পারলাম না। চোখের সামনে গড়িয়ে গিয়ে সাগরে পড়ে গেল। বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গের মতো ঝিলিক দিয়ে গিয়ে হারিয়ে গেল নীল সাগরে। আরেকবার চিৎকার করে উঠেছিলাম, যেন ওটাকে ফেরানোর জন্যেই। কিন্তু কথা শুনলো না মুক্তোটা। চলে গেল। মুক্তো সম্পর্কে অনেক গুজব রয়েছে। অনেক কিংবদন্তী। দ্বীপের লোকেরা বলে, অনেকের ভাগ্যে মুক্তো সয় না। তাকে দেখা দিয়ে আবার ফিরে যায় সাগরে অনেকের আবার দুর্ভাগ্য বয়ে নিয়ে আসে। আমার ভাগ্যে যে কোনটা ঘটলো, বুঝতে পারলাম না। মাথায় হাত দিয়ে বসে বসে ভাবতে লাগলাম। কতো মুক্তোই হাতে এসেছে, একটাও বিক্রি করতে পারিনি। যা-ই হোক, আসল গল্পটা এবার বলি।

বছর দেড়েক আগে, টাকাপয়সা নেই আমার হাতে। শেষে এক জাহাজে চাকরি নিলাম। মালিক করসিকার লোক, ভীষণ পাজি। নাম গুডু কারনেস। অনেক বদনাম আছে লোকটার। তার শয়তানী হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি আমি। চিনতে দেরি হয়নি। ওসব দ্বীপে তো চিনতে সময় লাগে না। সবাই খোলামেলা। বুঝেও কিছু করতে পারলাম না। চাকরিটা না নিয়ে উপায় ছিলো না আমার। আর কোনো কাজ পাচ্ছিলাম না। মারকুইসাস হয়ে পমোটাস ঘুরে এসেছে সবে তার জাহাজ। জাহাজটারও অদ্ভুত নাম রেখেছে। দুনিয়ার ভয়ংকরতম হাঙরের নামে নাম, হোয়াইট শার্ক; যতোটা নোংরা করা সম্ভব করে রেখেছে। তেলাপোকা আর ছারপোকায় বোঝাই। নারকেলের ছোবড়ায় একরকম পোকা হয়, সাংঘাতিক যন্ত্রণা দেয়, সেই পোকারও অভাব নেই। আর তেলাপোকাও যা একেকখান। গ্রীষ্মমন্ডলীয় ওসব তেলাপোকার কথা আরেকদিন বলবো তোমাকে। রাতে ঢেকেঢুকে না ঘুমালে ঘুমের মধ্যেই পায়ের তলার চামড়া খেয়ে সাফ করে দেবে, টেরও পাবে না। সকালে উঠে যখন আর দাঁড়াতে পারবে না তখন বুঝবে মজা। হারামীর একশেষ। ওই জাহাজে করেই রওনা হয়ে পড়লাম একদিন পাপিতি বন্দর থেকে। লম্বা একটা পাড়ি জমাবে গুডু কারনেস। ছয় মাস, এমনকি নয়মাসও লেগে যেতে পারে।

যতোটা খারাপ ভেবেছিলাম তার চেয়েও খারাপ কারনেস। আস্ত শয়তান। ভীষণ মুখ খারাপ। আমি বাদে আরও আটজন নাবিক তার জাহাজে। স্থানীয় লোক। ওগুলোও মহা বদমাশ। বোধহয়, একারণেই ওদেরকে বাছাই করেছে সে।

সাধারণত স্থানীয় মানুষেরা ভালো হয়, তাহিতি, মারকুইস, পমেটোর লোকেরা। কিন্তু কারনেসের লোকগুলোর বাড়ি ওসব অঞ্চলে হলেও বেজায় খারাপ। পরে শুনেছি, মানুষের মাংস খাওয়ার অপরাধে অস্ট্রেলিয়ায় জেল খাটতে হয়েছে ওদের। তাতে আর অবাক হইনি তখন। ততোদিনে জেনে গেছি, কপালে দুঃখ আছে আমার। তবে কতোটা দুঃখ আছে তা যদি জানতাম, দ্বীপ থেকে নড়তামই না; যতোই না খেয়ে মরি। সাগরে বেরোনোর পর জানতে পারলাম কারনেসের জাহাজে কি আছে। স্থানীয়দের কাছে স্পিরিট বিক্রি করা ওখানে বেআইনী। ওসব খেলে কতোটা ক্ষতি হয়, ভালো করেই জানে স্থানীয়রা। তার পরেও খায়। আর সাপ্লাই দেয়ার লোকেরও অভাব নেই। নানারকম কায়দা করে চালান দেয়া হয় ওগুলোকে। এই যেমন সেন্টের শিশিতে ভরে, কিংবা তেলের বোতলে ভরে। ব্যাপারটা ভালো লাগলো না আমার। কারনেসের সঙ্গে কথা বললাম। স্বীকার করলো সে, আছে। নিজেও প্রচুর গিলে সে। অন্য ব্যবসায়ীদের মতো সেন্টের কিংবা তেলের বোতলেও ভরেনি সে, এতোই বেপরোয়া। সরাসরি নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দেয়, কেয়ারই করে না আইনের। ওর ওসব ব্যবসায় আমি জড়াতে চাই না, সাফ বলে দিলাম। তর্কাতর্কি হলো, ঝগড়া হলো। শেষমেষ বোকার মতো হুমকি দিয়ে বসলাম আমি ওকে। পুলিশকে বলে দেব। বলার সময়ও বুঝিনি, আমাকে পুলিশের কাছে পৌঁছতেই দেবে না সে।

যাই হোক, আমি আমার মতো আছি। আর কারনেস তার সলোমন আইল্যান্ডের গলাকাটা ডাকাতগুলোকে নিয়ে সারাদিনই মদে চুর হয়ে থাকে। জিজ্ঞেস করতে পারো, ওই অবস্থায় জাহাজ চলছিলো কি করে? চলছিলো। তার কারণ কারনেসের লোকগুলো সব পাকা নাবিক। ওসব অঞ্চলের সব লোকই ভালো নাবিক। সমুদ্র সম্পর্কে অসীম জ্ঞান। ছোট একটা ক্যানুতে করেও বিশাল সাগর পারি দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না। কম্পাস-টম্পাস বাদেই দুহাজার মাইল দূরের অন্য কোনো দ্বীপে চলে যেতে পারে, একটুও ভুল করে না। বিশ্বাস করো, এক বিন্দু বাড়িয়ে বলছি না। প্রথমে আমরা গেলাম পমোটোসে। ঠিক দ্বীপ বলা যায় না। ওটাকে, একসারি প্রবালের দেয়াল বলাই ভালো। পানি থেকে বেশি উঁচু নয়। তাই অনেকে এর নাম দিয়েছে লো আরচিপেলাজো। স্থানীয়রা নাম দিয়েছে বিপদের দ্বীপ, এটাই মানিয়েছে ভালো। ওখানকার সাগরে জাহাজ চালানো যতোটা কঠিন, পৃথিবীর আর কোনো সাগরেই ততটা নয়। মারকুইসাসের দিকে চললাম আমরা। ওটা হলো পমোটোস থেকে একেবারে ভিন্ন জাতের। আগ্নেয় শিলায় বোঝাই, আর রয়েছে ঘন জঙ্গল। বিজ্ঞানীদের ধারণা, মস্ত কোনো মহাদেশ ছিলো একসময় ওই জায়গাটায়, প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে সাগরের নিচে চলে গেছে। উঁচু পার্বত্য অঞ্চলগুলো ডোবেনি, বেরিয়ে রয়েছে এখনও

পানির ওপরে। দেখে অবশ্য সেরকমই মনে হয়। হাজার হাজার ফুট উঁচু বড় বড় পাহাড় যেন তালগোল পাকিয়ে রয়েছে। পাহাড়ের এরকম চেহারা আর কোথাও দেখা যায় না। কোনো কোনোটা তো বিশাল। হ্যাঁ, যা বলছিলাম।
দুটো দ্বীপপুঞ্জকেই ম্যাপে দেখে মনে হবে খুব বুঝি কাছে। আসলেই কাছে, অবশ্যই দক্ষিণ সাগরের বেলায়। ওখানে পাঁচশো মাইল কিছুই না। এখানে আমেরিকায় এই দূরত্ব অনেক বেশি। ওখানে শত মাইলের হিসেবটাকে কিছুই মনে করা হয় না। বিশাল প্রশান্ত মহাসাগরে জাহাজ নিয়ে হয়তো বেরিয়ে পড়লে, চলছে তো চলছেই, ছহাজার সাত হাজার মাইল পেরিয়ে গেলে, এতো মাইলের মধ্যে ছোট একটা প্রবাল প্রাচীর দেখা না গেলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। ওখানে ওরকমই। মারকুইসাসের দিকে এগিয়ে চলেছি আমরা। ভালো বাতাস পাওয়ার জন্যে সামান্য একটু বায়ে কেটে চালাচ্ছে নাবিকেরা। বোধহয় তাতেই, কিংবা বাতাসের কারণে সরে গেল জাহাজ। একটা দ্বীপ দেখতে পেলাম। নাবিকেরা তো বটেই, কারনেসের কাছেও দ্বীপটা নতুন। আগে কখনও দেখেনি। গ্যালাপাগো থেকে ল্যাডরোনি পর্যন্ত এলাকা যাদের নখদর্পণে, তাদের নজরে ওই দ্বীপ পড়েনি! অবাকই হলাম। ওরা হলো না। প্রশান্ত মহাসাগরে দ্বীপের অভাব। নেই, কখন কোন একটা দ্বীপ নজর এড়িয়ে গেল, তা নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই ওদের। যেহেতু অচেনা দ্বীপ, নোঙর করার কোনো প্রয়োজন বোধ করলো না কারনেস। দ্বীপটা নির্জন। ওখানে থেমে তার কোন লাভ হবে না। এইখানে এসেই আমার আসল গল্প শুরু, এবং এখানেই আমার প্রাণ প্রায় যেতে বসেছিলো।
কদিন ধরে একনাগাড়ে মদ গিলে চলেছে কারনেস। ওদের সঙ্গে থাকতে থাকতে জাহাজ চালানো আমি শিখে গেছি ভালোমতোই। চালাচ্ছি। আর কোনো উপায়ও ছিলো না। জাহাজে তখন একমাত্র আমিই সুস্থ রয়েছি। বাকি সবগুলোর অবস্থা কাহিল। কোনখান দিয়ে চলেছি আমরা কিছুই বুঝতে পারবে না কারনেস, বাইরে না বোরোলে। আর বেরোনোর মতো অবস্থাও তখন নেই তার। দ্বীপটার কাছ ঘেঁষে গেলাম, পাঁচশো মাইল দূর দিয়ে গেলাম, কিছু জানবে না। না জানায় ভালোই হয়েছে আমার জন্যে, পরে বুঝতে পারবে। সাগর মোটামুটি শান্ত। তখন ঠিক দুপুর। প্রচন্ড গরম। দ্বীপটাকে কাছে থেকে দেখলাম। প্রবালে তৈরি, অ্যাটল বলে ওগুলোকে। পাশ দিয়ে ভেসে চলে যাচ্ছে জাহাজ। মনে হয় জাহাজটাই স্থির হয়ে আছে, দ্বীপটা ভেসে যাচ্ছে। চার্টে অবস্থান দেখে নিলাম। সেক্সট্যান্টটা রাখলাম হুইলের কাছে। কখন আবার উঠে এসে রীডিং দেখতে চায় কারনেস কে জানে। সব কিছু রেডি রাখলাম। কে বকা শুনতে যায় খামোকা। লংগি চিউড আর ল্যাটিচিউড দুটোই মনে রাখলাম। পরে লগবুকে লিখে নেবো। ওরকম বহুবার করেছি। কখনো ভুল হয়নি। ডেকেই ছায়ায় শুয়ে পড়লাম। বাতাসের

অপেক্ষায় রয়েছি। ভালো বাতাস না হলে ঠিকমতো চলবে না জাহাজ। কেন, নিশ্চয় বুঝতে পারছে। হোয়াইট শার্ক স্কুনার জাতের জাহাজ। ইঞ্জিন থাকলেও পালের দরকার হয়। নীল সাগরের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবছি। অলস ভাবনা। কারনেসের কথা, আমার কথা, আরও অনেক কথা। ডেকের কিনারে উপুড় হয়ে রয়েছি। হঠাৎ এমন একটা জিনিস চোখে পড়লো, ধক করে উঠলো বুক। আরেকটু হলেই বোধহয় কোটর থেকে ছিটকে বেরিয়ে সাগরে পড়ে যেতো চোখ। সাগরের যেখানটায় সাংঘাতিক গভীর থাকার কথা, আচমকা যেন সেখানটা উঠে চলে এসেছে কোন জাদুমন্ত্রের বলে! জাহাজের, খোলের নিচেই একেবারে, পঁচিশ-তিরিশ ফুট গভীর হবে। আরেকটু উঠলেই ঘষা লাগবে জাহাজের তলায়। উঠে গিয়ে যে হুইল ঘোরাবো, সে কথাও মনে রইলো না। এতোই অবাক হয়েছি। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না। যেমন হঠাৎ উঠলো তেমনি হঠাৎ করেই নেমে গেল সাগরের তল। বিশ্বাস করলাম না। ভাবলাম, গরম আর রোদ এমন কিছু করেছে, যাতে চোখে ভুল দেখেছি। কিন্তু। ডেকের কিনারে বসে তাকিয়েই রইলাম। মনে হতে লাগলো আবার দেখতে পাবো। ঘটলোও তাই। অদ্ভুত কান্ড। মুহূর্তের জন্যে দেখা যায় তল, তারপরই মিলিয়ে যায়, আবার দেখা যায়, আবার গায়েব। গায়ে কাঁটা দিলো। ব্যাপারটা কি! হঠাৎই বুঝে ফেললাম। সাগরের তল উঠছে নামছে তা নয়। ঢেউ। অনেক চওড়া আর উঁচু ঢেউ। খুব ধীরে আসছে। সেজন্যেই জাহাজটা যে একবার উঠছে ঢেউয়ের মাথায়, একবার নামছে সেটা টের পাওয়া যাচ্ছে না। যখন ঢেউয়ের নিচে নামছে, তখন তল চোখে পড়ছে, ওপরে উঠলেই হারিয়ে যাচ্ছে আবার। আর উঁচু কতো জানো একেকটা ঢেউ? চল্লিশ-পঞ্চাশ ফুট। নিচে কিন্তু বালির চড়া নয়, প্রবাল। ঘাবড়ে গেলাম। ভীষণ ধারালো। কোনোমতে যদি একটা ঘষা লাগে জাহাজের তলায়, তরমুজের মতো চিরে ফেলবে। আর আছড়ে পড়লে গুড়িয়ে যাবে ডিমের খোসার মতো। এখানে জাহাজ সামলানো আমার কর্ম নয়। আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলাম।

ছুটে এলো কারনেস আর তার দলবল। যতোটা মাতাল ভেবেছিলাম ওদেরকে ততোটা হয়নি। চেঁচিয়ে শুধু বলতে পারলাম, জাহাজ সামলাও! কি হয়েছে জানতে চাইলো কারনেস। ডেকের কিনারে এসে দেখতে বললাম। এলো ওরা। পাথর হয়ে গেল যেন আমারই মতো। ওদের মতো মানুষও অবাক হয়েছে বুঝতে পারলাম। আর আমার তো কথাই নেই। তাকিয়ে রয়েছি নিচের দিকে। কি দৃশ্য, বলে বোঝাতে পারবো না। লাল, নীল, সবুজ, আরও কতো রঙ প্রবালের না দেখলে বুঝবে না। যেন এক অপরূপ বাগান তৈরি হয়ে আছে সাগরের তলায়। প্রবাল দেখে অবাক হইনি, ওরকম অনেক দেখেছি দক্ষিণ সাগরে। অন্য জিনিস দেখে হয়েছি। ঝিনুক। হাজারে হাজারে, বাসনের সমান বড় একেকটা।

একেকজোড়া করে গায়ে গায়ে লেগে রয়েছে। ভালো করে তাকাতে বুঝলাম ব্যাপারটা কি। খুলে রয়েছে ঝিনুকগুলো, খোসাগুলো ফাঁক করে চিত হয়ে আছে। খাওয়ার জন্যে ওরকম করে খুলে যায় ওরা। খুব ভালো করেই জানি ওরকম ঝিনুকের ভেতরেই মুক্তো থাকে। সাগরের তলায় তিল ধারণের জায়গা নেই, শুধু ঝিনুক আর ঝিনুক, খুলে রয়েছে। খোলা জায়গায়, প্রবালের খাঁজে, যেখানেই ঠাই, পেয়েছে শুধু ঝিনুক আর ঝিনুক, সোয়ালো পাখির বাসার মতো আঁকড়ে রয়েছে যেন প্রবালের গা। কতো লক্ষ-কোটি ডলারের সম্পদ পড়ে রয়েছে ওখানে কল্পনা করে পা কাঁপতে লাগলো আমার, দুর্বল হয়ে এলো, যেন দেহের ভার রাখতে পারবে না। মনে হতে লাগলো এরকম দৃশ্য শুধু স্বল্পেই দেখা সম্ভব। এতো কিছুর মধ্যেও কি এক অদ্ভুত উপায়ে যেন সজাগ হয়ে গেল আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। অকারণেই ঝট করে ফিরে তাকালাম কারনেসের দিকে। একেবারে সময় মতো। তাকিয়ে ভালো করেছিলাম। তার চোখে এক ধরনের বন্য দৃষ্টি, কলজে ঠান্ডা করে দেয়। ওরকম আর কখনো কোনো মানুষের চোখে দেখতে চাই না আমি। হাত চলে গেছে পকেটে। ওখানেই তার পিস্তলটা থাকে, জানি আমি। চেহারাটা কুৎসিত হয়ে উঠেছে। চিবিয়ে চিবিয়ে বললো, খুব বেশি নেই এখানে, কি বলো? আমাদের দুজনের নেয়ার মতো হবে না। লাফিয়ে সরে গেলাম। আর একটা মুহূর্ত দেরি হলেই গুলি খেতে হতো। অল্পের জন্যে মিস হয়ে গেল বুলেট।

তখন আমার অবস্থা কল্পনা করতে পারছো? প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝখানে রয়েছি। কারনেসের হাতে পিস্তল, খুনের নেশা চেপেছে তার মাথায় আমার কাছে অস্ত্র বলতে কিছুই নেই। ছুরি বের করে ফেলেছে তার সাগরেদরা। পালানোর পথ নেই। লুকানোর জায়গা নেই। সারা জাহাজে এমন একটা জায়গা নেই যেখানে গিয়ে লুকিয়ে পড়ে রেহাই পাবো। ঝাঁঝরা করে দেয়া হবে আমার শরীর। বুঝতে পারলাম, আমার দিন শেষ। বিদ্যুৎ চমকের মতো মনে পড়লো, মুক্তোর খেত দেখেছে বটে কারনেস, কিন্তু সেটার অবস্থান জানা নেই তার। আমরা কোথায় রয়েছি, জানে না। জানি শুধু একমাত্র আমি। লগবুকে লিখিনি। তবে সেক্সট্যান্টটা দেখলে জেনে যাবে কারনেস। পরে এসে তুলে নেয়ার ব্যবস্থা করতে পারবে। আমি যদি মরি, তাকেও পেতে দেবো না ওই মুক্তো। সেক্সট্যান্টের রীডিং ছাড়া কিছুতেই বের করতে পারবে না কারনেস; আমরা কোথায় রয়েছি। এমনিতেও মরেছি, ওমনিতেও। গুলির পরোয়া আর করলাম না। মরিয়া হয়ে দিলাম ছুট। গুলি করলো কারনেস। তাড়াহুড়োয় আবার মিস করলো। পৌঁছে গেলাম হুইলের কাছে। থাবা দিয়ে তুলে নিলাম সেক্সট্যান্টটা। সাগরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চিৎকার করে উঠলাম আনন্দে। আবার গুলি করলো কারনেস। কিন্তু ওর গুলিতে আমার মরণ লেখা নেই। ঈশ্বরের দয়া। ঠিক এই মুহূর্তে জোরে এক ঢেউ এসে বাড়ি

মারলো জাহাজের গায়ে। ভীষণ দুলে উঠলো জাহাজ। পড়ে গেলাম আমি। কারনেসও পড়লো। কিন্তু তার সাগরেদরা বহাল তবিয়তেই রইলো। ছুরি নিয়ে তেড়ে এলো আমাকে খুন করার জন্যে। মোরব্বা হওয়ার চেয়ে সাগরে ঝাপিয়ে পড়ে মৃত্যু অনেক ভালো মনে হলো আমার। দ্বিধা করলাম না আর। ঝাঁপ দিয়ে পড়লাম পানিতে। প্রাণপণে সাঁতরাতে লাগলাম। প্রাণের ভয়ে সাঁতরাচ্ছি। উঠতে উঠতে দেরি করে ফেললো কারনেস। ততক্ষণে আমি দূরে চলে গেলাম। গুলির রেঞ্জের বাইরে যেতে পারিনি। কিন্তু অতো দূর থেকে পিস্তল দিয়ে গুলি করে ঢেউয়ের মাঝে একটা মানুষের গায়ে লাগানো আর সম্ভব ছিলো না। তবু গুলির পর গুলি করতে লাগলো সে। আমার আশেপাশে এসে পড়লো কয়েকটা। গায়ে লাগলো না।

কিছুতেই আমাকে পালাতে দিতে রাজি নয় কারনেস। ফিরে তাকিয়ে দেখলাম, পাল ঠিক করছে সাগরেদরা। জাহাজের মুখ ঘুরিয়ে আমাকে ধাওয়া করলো। জানি, পালাতে পারবো না। ধরা আমাকে পড়তেই হবে। সাগরের মাঝে কোথায় যাবো? বাতাসও বইতে শুরু করেছে। খানিক আগে যেরকম শান্ত ছিলো সেরকম নয়। দুবার আমার পাশে চলে এলো জাহাজ। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ডুব মারলাম। এলোপাতাড়ি গুলি চালাতে থাকলো কারনেস। লাগাতে পারলো না। বাতাসের বেগ বাড়লো। ভীষণ গড়াতে লাগলো জাহাজ। এই অবস্থায় রেলিঙের কিনারে দাঁড়িয়ে গুলি করা খুব কঠিন। বাতাস আরেকটু বাড়তে গুলি করা বাদ দিয়ে জাহাজ সামলাতেই ব্যস্ত হতে হলো ওকে। নইলে যাবে কাত হয়ে ডুবে কিংবা প্রবালে বাড়ি খেয়ে ছাতু হবে। ধীরে ধীরে আমার কাছ থেকে সরে যেতে লাগলো স্কুনারটা। আমি বাঁচবো না, জানি। তবে শান্তিতে মরতে পারবো, এই যা। সেটাও আর তেমন সুখকর কল্পনা মনে হলো না কয়েক মিনিট পরে। কিন্তু মরা ছাড়া আর করবোটাই বা কি? কল্পনা করতে পারছো? প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝখানে। ডাঙা নেই। হাঙরের ঝাঁক। তার ওপর প্রচন্ড ঝড়ো বাতাস। সাংঘাতিক না?

হ্যাঁ, মারাত্মক, স্বীকার করলো ওমর।

একেবারে ঠিক শব্দটা বলেছো। মারাত্মক। অনেকক্ষণ বলে বলে গলা শুকিয়ে এসেছে ডজের! চুমুক দিতে লাগলো গেলাসে। দম নিয়ে আবার বলতে লাগলো, একটা খড়ও নেই যে ধরে ভাসবো। জাহাজডুবি হলে অনেকেই অনেক কিছু পায়, ধরতে পারে, আমার নেই। তবে চিত হয়ে থাকলে অনেকক্ষণ ভেসে থাকা যায়। যদি হাঙরে না ধরে। পানি গরম। চিত হয়ে ভেসে রইলাম। খুব আস্তে পা দিয়ে লাথি মারছি পানিতে, ভেসে থাকার জন্যে। বেশি জোরে নাড়াতে সাহস পাচ্ছি না, যদি হাঙরের নজরে পড়ে যায়। কাপড় খুলে ফেলে দিলাম, বোঝা কমানোর

জন্যে। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম কখন ভেসে ওঠে হাওরের পিঠের পাখনা। শাই শাই করে ছুটে আসে পানি কেটে। দুএকটা এলো কাছাকাছি, তবে কোনোটাই মানুষখেকো নয়, কামড়াতে এলো না আমাকে। দিগন্তে হারিয়ে গেল জাহাজটা। আমার চারপাশে শুধু ঢেউ আর ঢেউ। আমি জানি, মরবো, তবু ইচ্ছে করে তো আর ডুবে যেতে পারি না। ভেসেই রইলাম। রাত হলো। বাতাস পড়ে গেল। শান্ত হতে লাগলো সাগর। ভেসেই রয়েছি তখনও। মনে হতে লাগলো, কেন ভেসে থাকছি? যন্ত্রণা আরও দীর্ঘ হচ্ছে! মরে গেলেই তো হয়! কিন্তু একেবারে নিরাশার মধ্যেও মানুষ বেঁচে থাকতে চায়। টিকে থাকতে চায়। আমারও হয়েছিল সেই অবস্থা। মরা দরকার, মরলেই ভালো হয়, কিন্তু মরতে আর পারছি না। কেউ যে আমাকে তুলে নেবে, তারও কোনো-আশা নেই। কয়েক হাজার বর্গ মাইলের মধ্যে তখন কোনো জাহাজ আছে কিনা, কারনেসের স্কুনারটা ছাড়া, সন্দেহ। আর থাকলেই বা কি? জানতে পারছে না আমি রয়েছি ওখানে। বছর পেরিয়ে গেলেও কোনো জাহাজ এসে আমাকে উদ্ধার করার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু আমার কপাল ভালো, বাঁচবো, তাই এমন একটা স্রোতে পড়ে গেলাম, যেটা আমাকে টেনে নিয়ে চললো। কোথায় যাবো, জানতাম না। উত্তর মেরুর দিকে, না দক্ষিণ আমেরিকার দিকে। যেদিকেই যাই, বাঁচবো না এটা ঠিক, ধরেই নিয়েছিলাম। সকাল বেলা দেখতে পেলাম ওটাকে। কাছেই। খুব নিচু, পানির সমতল থেকে সামান্য উঁচুতে। দ্বীপটা দেখলাম না, চোখে পড়লো শুধু নারকেল গাছের মাথা। মনে হলো, পানি থেকে গজিয়ে উঠেছে। আশা হলো মনে। সাঁতরাতে শুরু করলাম সেদিকে। ভালো করেই জানি, শুধু পানিতে নারকেল গাছ জন্মাতে পারে না। ডাঙা আছেই। আজব একটা ব্যাপার ঘটলো আমার মধ্যে, বাঁচার সম্ভাবনা দেখা দিতেই। যতোক্ষণ জেনেছি, মৃত্যু নিশ্চিত, ভয়-ডর-আশঙ্কা কোনো কিছু ছিলো না। যেই বাঁচার আশা দেখলাম অমনি সেসব এসে চেপে ধরলো। সেই সঙ্গে উদ্বেগ আর উত্তেজনা। মনে হতে লাগলো গাছগুলোর কাছে। পৌঁছার আগেই হাঙরে ধরে খেয়ে ফেলবে, কিংবা ডুবে যাবো সাঁতরাতে না পেরে।

কাছে পৌঁছে গেলাম। এটা সেই দ্বীপ, জাহাজ থেকে যেটা দেখেছিলাম। আরেকটু হলেই তীরে গিয়ে তরী ডুবতে বসেছিলো আমার। ভীষণ ঢেউ আছড়ে পড়ছিলো তীরে। চুবিয়ে মারার জোগাড় করেছিলো। সেই দশটা মিনিট জীবনে ভুলতে পারবো না আমি। প্রতিটা অ্যাটল ঘিরে গড়ে উঠেছে প্রবালের দেয়াল, তার ভেতরে লেগুনের শান্ত পানি। কিন্তু সেখানে যাওয়া সহজ নয়। কোন দিক দিয়ে মুখ বুঝতে পারলাম না। কিছু লেগুন আছে প্রশান্ত মহাসাগরে যেগুলোতে ঢোকার কোনো মুখই থাকে না সাগরের দিক থেকে। তার বাইরের দেয়ালগুলোতে যে কি ভয়ানক বেগে ঢেউ আছড়ে পড়ে না দেখলে বুঝবে না। প্রচন্ড কোনো শক্তি

পাহাড়ের মতো অনড় কোনো কিছুকে নড়াতে চাইলে যে কান্ডটা ঘটবে, অনেকটা সেরকম ব্যাপার, আর কোনো ভাবে বোঝাতে পারছি না। হাজার হাজার টন পানির বোঝা নিয়ে একেকটা ঢেউ গর্জন করতে করতে ছুটে আসছে। দেখে মনে। হবে এমন শক্ত কোনো জিনিস নেই যা ঠেকাতে পারে ওই ঢেউকে। কিন্তু আটকে ফেলছে প্রবালের দেয়াল। ঢেউয়ের গোড়ায় ধরে টান মেরে যেন ছিনিয়ে নিচ্ছে ওটার ভিত। পুরো একটা মিনিট শূন্যে ঝুলে থাকছে পানির পর্বত, তারপর হাজারো বজ্রের মিলিত শব্দকে এক করে ধসে পড়ছে হড়মুড় করে। টগবগ করে যেন ফুটছে ওখানে সাগর, শাদা ফেনা তৈরি করছে, লম্বা একটা শাদা রেখা সৃষ্টি করছে সেসব ফেনা, যেন ফেনার স্তূপকে টেনে লম্বা করে দিচ্ছে অদৃশ্য কোনো হাত। সরে যেতে চাইছে পরাজিত ঢেউয়ের সঙ্গে, কিন্তু দেয়ালের মায়া কাটাতে না পেরে রয়ে যাচ্ছে পরের ঢেউটা আসার অপেক্ষায়। চলছে এভাবেই। বছরের পর বছর, একটানা। থামাথামি নেই। মাঝে মাঝে যেন খেপে গিয়ে সমস্ত রাগ প্রবালের ওপর ঢেলে দেয় সাগর, ঝাল মেটাতে চায়। সেটা হারিকেনের সময়। ওই সময় কোনো নৌকা কিংবা মানুষ ঢেউ আর দেয়ালের মাঝখানে পড়লে ভর্তা হয়ে যাবে। যাই হোক, আমি যখন পৌঁছলাম তখন হারিকেন ছিলো না। সাঁতরাতে থাকলাম দেয়ালের ধার দিয়ে। পেয়ে গেলাম একটা পথ। এগিয়ে গেলাম সেদিকে। ঢেউ এসে ধরে ফেললো আমাকে। ছুঁড়ে ফেলে দিলো দেয়ালের ভেতরে, এক্কেবারে সময়মতো, কারণ তখন কয়েকটা হাঙর আগ্রহ দেখাতে শুরু করেছিলো আমার প্রতি। কয়েক মিনিট ধরেই আমার পিছে লেগেছিলো। ভেজা একটা কম্বলের দলার মতো গিয়ে নেতিয়ে পড়লাম সৈকতে।

লোক-টোক ছিলো দ্বীপে? তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করলো মুসা। উত্তেজনায় কাঁপছে তার কণ্ঠ। সাংঘাতিক আগ্রহ নিয়ে শুনছে ডজের গল্প।

না, জবাব দিলো ডজ। আগেই তো বলেছি নির্জন। রবিনসন ক্রুসো হয়ে গেলাম। একা, শুধু একা আমি, আর কেউ নেই। সে অন্তত একটা পায়ের ছাপ দেখতে পেয়েছিলো দ্বীপে, আমি তা-ও পেলাম না। সৈকতে পড়ে থাকতে দেখলাম। শুধু নানারকম ঝিনুক আর নারকেল। প্রথম ভাবনাটা হলো পানির জন্যে। যদি মিষ্টি পানি না থাকে? কিন্তু ঈশ্বর কাউকে বাঁচাতে চাইলে সব ব্যবস্থা করেই দেন। আমাকেও দিলেন। পানি আছে দ্বীপে। ওই নোনা পানির মাঝে কোথেকে যে এলো ওই মিষ্টি পানি, বলতে পারবো না। এই প্রশ্নের জবাব আমি কিছুতেই বের করতে পারিনি। পানি খেলাম। নারকেল খেলাম। বালিতে কিছুক্ষণ শুয়ে থেকে শক্তি সঞ্চয় করলাম শরীরে। তারপর উঠলাম দ্বীপটা ঘুরে দেখতে। কোন স্বর্গে উঠেছি জানার আগ্রহ হলো খুব। খুবই সুন্দর দ্বীপ, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। লেওনের দিক থেকে চোখ ফেরানো যায় না, এতোই সুন্দর। কিন্তু সৌন্দর্য দেখার অবস্থা

তখন নেই আমার। একটা কথা এখন জোর গলায় বলতে পারি, রবিনসন ক্রুসোর গল্প পড়তে যতো ভালো লাগে, বাস্তবে তার মতো অবস্থায় পড়লে লাগে ঠিক উল্টোটা। যেমন খারাপ লাগে, তেমনি অসহায়। যতোই ভাবতে লাগলাম বাকি জীবনটা এখানেই একা কাটাতে হবে, ততোই চুপসে যেতে লাগলাম ভেতরে ভেতরে। ভাবো একবার, এতো টাকার মুক্তো পেলাম, জানি কোথায় আছে, তুলে নিতে পারলেই রাজার হালে কাটাতে পারি জীবনটা। তা না, হয়ে গেলাম রবিনসন ক্রুসো। আর কোনো জাহাজ না আসুক, মুক্তোর খোঁজে কারনেসের জাহাজ আসতে পারে, হয়তো বাড়ি ফেরার একটা ব্যবস্থা হলেও হতে পারে, এই আশায় তাকিয়ে রইলাম সাগরের দিকে। তাকিয়ে তাকিয়ে চোখ ব্যথা করে ফেললাম, জাহাজ আর এলো না। আর দেখলাম না তার স্কুলারটাকে।

ওই দ্বীপে কতোদিন ছিলেন আপনি? জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

মাত্র তিন মাস। আরেকবার আমার ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিতে হয়। রাটুনা থেকে দুজন মারকুইজান এসে ক্যানুতে করে নিয়ে যায় আমাকে। একটা ছেলে, আর একটা মেয়ে। মেয়েটার মারকুইজান নামের ইংরেজি অর্থ করলে হয় সাগরের হাসি, আর ছেলেটার ঝিনুক। ওরকম নামই পছন্দ ওখানকার লোকের। কঠিন নাম নয়। সহজ। বেশির ভাগই সাগর কিংবা প্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে রাখে। মনে রাখা বোধহয় সহজ, সে-জন্যেই। মাছ ধরতে বেরিয়েছিলো দুজনে, অ্যালবিকোর মাছ। ছোট একটা ঝড়ে পড়ে, স্রোতের মুখে পড়ে যায়। ভেসে যায় দূর সাগরে। তাতে মোটেও উদ্বিগ্ন হয়নি ওরা। ওরকম হরহামেশাই ঘটে। সাগরে ভেসে যায়, আবার বাড়ি ফেরে। সাগরও ওদের কাছে ডাঙার মতোই। ডাঙায় যেরকম সহজ ভঙ্গিতে ঘটতে পারে, পানিতেও তেমনি সাঁতরাতে পারে। পানিকে একটুও ভয় করে না। ভাসতে ভাসতে এসে আমার দ্বীপটা চোখে পড়েছিলো ওদের। পানি আর নারকেলের জন্যে চলে এসেছিলো। পেয়ে গেল আমাকে। কি হাসাটাই না হাসলো আমাকে ওখানে দেখে, যেন এক মস্ত রসিকতা। ওদের কাছে ওরকম দ্বীপে থাকাটা তো কিছু না, সেজন্যে কিছুই মনে করলো না। তবে আমি খুশি হয়েছিলাম ওদেরকে দেখে, সাংঘাতিক খুশি। সাথে করে আমাকে রাটুনায় নিয়ে গেল ওরা।

তারপর ক্যানুতে করে এ দ্বীপ থেকে সে দ্বীপ, সে দ্বীপ থেকে আরেক দ্বীপ করতে করতে দুমাস পরে গিয়ে নুকা-হিভায় পৌঁছুলাম। ওই অঞ্চলের সব চেয়ে বড় দ্বীপ ওটা। আরও তিন মাস অপেক্ষা করতে হলো আমাকে জাহাজের জন্যে। জর্জি গ্রিম এলো তার স্কুনার নিয়ে, তুলে নিলো আমাকে। তাহিতিতে পৌঁছে দিলো। জানতে পারলাম, কারনেস ফিরে এসেছিলো, তারপর আবার চলে গেছে। এসেই তাড়াহুড়ো করে চলে যাওয়ায় আমি ভাবলাম, নিশ্চয় মুক্তোর সন্ধানে গিয়েছে

সে। যাবেই। তাতে অবাক হওয়ার কিছুই নেই। এতো টাকার সম্পদ দেখে এসে কোন্ মানুষটা আনতে যাবে না? সে গেলেও আমি চিন্তা করলাম না। আসল অবস্থান জানা নেই তার। কিছুতেই বের করতে পারবে না অতো বড় মহাসাগরের মাঝে। শুধু আমি জানি কোথায় আছে সেই ঝিনুকের খেত। আর গাধাটা আমাকে খুন করতে না চাইলে অবশ্যই জানিয়ে দিতাম ওকে।

মুক্তোগুলো তুলে আনার জন্যে ভাবনাচিন্তা শুরু করলাম। দ্বীপের এক জাহাজের মালিককে লোভ দেখানোর চেষ্টা করলাম। আমার সঙ্গে গেলে তাকে আধাআধি বখরা দেয়ার কথাও বললাম। রাজি হলো না। বিশ্বাসই করলো না আমার কথা। ওসব অঞ্চলে এরকম গল্প প্রায়ই এসে বলে নাবিকেরা, বেশির ভাগই মিথ্যে। তাই কেউ আর বিশ্বাস করতে চায় না। হেসেই উড়িয়ে দেয়। আর ওদেরই বা দোষ দেব কি। আমি নিজের চোখে না দেখলে কেউ এসে যদি ওই গল্প আমার কাছে বলতো, আমিও বিশ্বাস করতাম না। আমিও মুখের ওপর হাসতাম। যদিও এরকম খেত অনেক পাওয়া গেছে। মুক্তোও তুলে নিয়ে এসেছে কেউ না কেউ।

রাটুনায় থাকার সময় স্থানীয়রা আমাকে কয়েকটা ছোট মুক্তো উপহার দিয়েছিলো। অন্যান্য দ্বীপেও পেয়েছি কিছু। বিক্রি করে টাকাও পেয়েছি। কিন্তু এততাই সামান্য, তা দিয়ে বড় ধরনের একটা অভিযান চালানো সম্ভব নয়। অনেক খরচ। জাহাজ ভাড়া করতে হবে, ডুবুরির পোশাক লাগবে, আরও অনেক জিনিস। তাহিতিতে বেশিদিন থাকতে সাহস হলো না। কোন দিন ফিরে চলে আসে কারনেস, ঠিক নেই। মুখোমুখি হলে আমাদের একজনকে মরতেই হতো, খুনের দায়ে অ্যারেস্ট হতো আরেকজন। টাকা জোগাড়ের জন্যে চলে গেলাম অস্ট্রেলিয়ায়। সেখানেও একই অবস্থা। কেউ বিশ্বাস করতে চায় না। দুএকজন যা-ও বা করলো, এতো বেশি খবর জানতে চাইলো, বলাটা উচিত মনে করলাম না। ওরা একেবারে জায়গার ঠিকানাই চায়। বলে দিলে আমাকে ফাঁকি দিয়ে নিজেরাই যদি চলে যায় কিছুই করতে পারবো না। শেষে ভাবলাম, পৃথিবীতে এখন টাকার জায়গা বলতে আমেরিকা আর জাপান। জাপানীরা বেশি চালাক, ওদেরকে রাজি করাতে পারবো না। বাকি থাকলো আমেরিকা। চলে এলাম। মনে করলাম যদি কেউ ইনটারেস্টেড হয়...

তেমন কাউকে পেয়েছো? জানতে চাইলো ওমর।

না।

পাবে বলেও মনে হয় না। আসলে, কাউকে বিশ্বাসই করাতে পারবে না। আর কেউ যদি করেও, এতোবড় জুয়া খেলতে রাজি হবে না।

জুয়া! প্রায় চিৎকার করে উঠলো ডজ, জুয়া বলছে, কেন? সোজা আমি জায়গাটায় নিয়ে চলে যেতে পারি।

নোটবুক আর পেন্সিল বের করলো ওমর। তাহিতি থেকে তোমার দ্বীপটার দূরত্ব কতো? নাম কি?
কোনো নাম নেই। ম্যাপে বের করতে পারিনি। ওদিকের অনেক দ্বীপের নামই ম্যাপে নেই। নেভির চার্টে হয়তো থাকতে পারে।
হু। বেশ, তাহলে একটা নাম ঠিক করে ফেলা যাক। যাও, ওটার নাম রেখে দিলাম ডজ আইল্যাণ্ড। তাহিতি থেকে কদ্দূর?
আটশো মাইল মতো হবে।
লেগুনে জাহাজ ঢোকানো যাবে? নিরাপদ?
তা যাবে।
প্লেন তো নেয়া যাবে না। এক কাজ করা যেতে পারে। ফ্লাইং বোট। ল্যান্ড করা যাবে?
উড়ে যাওয়ার কথা ভাবছো নাকি?
কেন নয়?
গাল চুলকালো ডজ। না, তেমন অসুবিধে নেই। তবে একবারও কথাটা মনে আসেনি আমার। পকেটে টাকা না থাকলে বুদ্ধিও খোলে না। স্কুনারে করে যাওয়ার চেয়ে তাতে খরচ বেশি পড়বে।
কিন্তু যাওয়া যাবে তাড়াতাড়ি।
তা যাবে।
ফ্লাইং বোট থেকে পানিতে নামা যাবে? ডুব দিয়ে ঝিনুক তোলার জন্যে?
যাবে। আবহাওয়া ভালো থাকলে। ওখানকার সাগর শান্তই থাকে দেখেছি।
ডাইভিঙের অভ্যাস তো নিশ্চয় করে ফেলেছো। এতোদিন ওখানে থেকে যখন মুক্তো তোলার কাজ করেছো।
ভালোমতো।
কি কি জিনিস লাগবে, জান তো? ভুলচুক করবে না?
নিশ্চয় জানি। করবো না।
তাহলে, ফ্লাইং বোটের ব্যবস্থা যদি করে দিই, আর সমস্ত খরচ-খরচা জোগাড় করে দিই, মুক্তোর বখরা দিতে রাজি আছো?
দেবো না মানে! নিশ্চয়ই দেবো! চেঁচিয়ে উঠলো ডজ। তুমি সব খরচ দেবে, আমি তুলে আনার ব্যবস্থা করবো। আধাআধি ভাগ হবে।
আধাআধিতে চলবে না। এতো টাকা আমি একলা দিতে পারবো না। কিশোরের সাহায্য লাগবে। কি কিশোর, তোমার চাচার কাছ থেকে কিছু জোগাড় করতে পারবে?

পারবো বলতে একটুও দ্বিধা করলো না কিশোর। চাচাকে চেনে সে। এরকম ঝুকি নেয়ার অভ্যাস আছে তার। অনেক ঝুঁকি নিয়েছেন জীবনে। মেরিচাচীর বাধা না থাকলে এই অভিযানে শুধু টাকা দেয়াই নয়, তিনি নিজেও বেরিয়ে পড়তেন, জানে সে। তবে, তিন ভাগ করলে চলবে না। আমার সঙ্গে মুসা আর রবিনও যাচ্ছে। পাঁচ ভাগ করতে হবে। কি বলো, মুসা?

আমি অবশ্যই যাবো, মুসা জবাব দিলো। তবে মুফতে বখরা নিতে চাই না। বাবাকে বলে, আমিও কিছু টাকার বন্দোবস্ত করতে পারবো আশা করি, যদি মাকে না শোনাই।

ভেরি গুড, ওমর বললো। আর রবিন?

তার বাবাও যে কিছু দেবেন না, তা নয়, কিশোর বললো। তবে রবিন যেতে পারবে কিনা সেটাই কথা। আজকাল ও ভীষণ ব্যস্ত, গানের ব্যবসায়। মিস্টার বার্টলেট লজ ইদানীং তাকে বেতনের টাকা তো দেনই, কমিশনও দিতে আরম্ভ করেছেন। ফলে ইস্কুলের পড়ালেখা আর মিউজিক ছাড়া এখন আর কিছু বোঝে না রবিন।

হুঁ, মাথা ঝাঁকাল মুসা। রবিনটা যে এভাবে বদলে যাবে, কল্পনাই করিনি কোনোদিন। তার কণ্ঠে দুঃখের সুরটা অপ্রকাশিত থাকলো না।

দেখা যাক, বলে। যেতে রাজি হলে ভালো। না হলে আমরা দুজনেই যাবো। এরকম একটা অ্যাডভেঞ্চার মিস করা যায় না। কি বলো?

তা তো বটেই। দক্ষিণ সাগরে গিয়ে আরেকবার শুঁয়োপোকা খেতে হলেও আপত্তি নেই আমার, তবু যাবো।

তার কথায় হাসলো ডজ। না, শুয়োপোকা আর খেতে হবে না, এটুকু গ্যারান্টি দিতে পারি। তবে প্রচুর নারকেল খেতে হতে পারে।

নারকেল তো ভালো জিনিস। আমার মজাই লাগে।

তাহলে, কাজের কথায় এলো ডজ। কবে রওনা হচ্ছি আমরা?

জিনিসপত্র গোছানো হয়ে গেলেই। এখনই একটা চেক নিয়ে যেতে পারো। যা যা লাগবে লিস্ট করে নিয়ে কিনতে শুরু করে দাও। তবে খরচ যতোটা কম করা যায় সেই চেষ্টা করবে। ফ্লাইং বোটের ব্যবস্থা আমি করবো।

দুই ঢোকে গেলাসের বাকি পানীয়টুকু শেষ করে ফেললো ডজ। হাত বাড়ালো, দাও, চেক। এখুনি বেরিয়ে যাই। আর ভাবনা নেই। ওই মুক্তো এখন আমাদের!

একটা ঝুড়ি কিনতে ভুলো না যেন, হেসে মনে করিয়ে দিলো ওমর। তুমি বলেছিলে ঝুড়ি বোঝাই করে মুক্তো আনতে পারবে। তার কম হলে চলবে না আমাদের।

যদিও একটা দিনও নষ্ট করেনি ওরা, তারপরেও দক্ষিণ সাগরে ওদের প্রথম সাময়িক ঘাঁটিটাতে পৌঁছতেই এক মাস পার হয়ে গেল। অনেক কাজ করতে

হয়েছে। বসে বসে প্ল্যান করেছে ওমর, এ-ব্যাপারে তাকে সাহায্য করেছে কিশোর। কারণ এই বুদ্ধিটুদ্ধিগুলো তার মাথায়ই ভালো খেলে। জিনিসপত্র কিনতে ডজকে সাহায্য করেছে মুসা। ডাইভিঙের ব্যাপারটা কিশোরের চেয়ে ভালো বোঝে সে। রবিন সত্যিই আসতে পারেনি, পারলো না বলে অনেক দুঃখ করেছে। তবে রকি বীচে থাকতে অনেক সাহায্য করেছে সে, জিনিসপত্র জোগাড়ের কাজে। আরও নানারকম সাহায্য করেছে। হঠাৎ করে জরুরী কাজে বার্টলেট লজ ইউরোপে চলে না গেলে সে অবশ্যই বসে থাকতো না মিডজিকের ব্যবসা নিয়ে; আসতোই সঙ্গে।
ওমর আর কিশোরকে অনেক জটিল সমস্যার সমাধান করতে হয়েছে। যেমন প্রথমেই ভাবতে হয়েছে, দ্বীপে বিমান নামানোর ব্যাপারটা। কি করে নিয়ে যাবে? অনেক জটিলতা আছে। নিয়ে যাওয়ার জন্যে সরকারী অফিস থেকে অনুমতি জোগাড় করতে হয়। তবে সেটা সহজ কাজ। কঠিন কাজটা হলো বিমানটাকে জায়গামতো নিয়ে যাওয়া। আর কোন ধরনের বিমান নিয়ে গেলে সুবিধে হবে সেটাও বুঝতে হবে।
যেরকম জায়গা, বিমান নিয়ে যাওয়ার দুটো উপায় আছে। এক, জাহাজে করে বয়ে নিয়ে যাওয়া। দুই, উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া। সহজে যাওয়া আর খরচ কমাতে চাইলে জাহাজে তুলে নিয়ে যাওয়াটাই ভালো। আরেকটা বড় সমস্যা হলো, এসব কাজের জন্যে বিমান ভাড়া দিতে চায় না কেউ। কিনতে হবে। আধুনিক বিমানের অনেক দাম। কম দামে পুরনো আমলের জিনিস পাওয়া যায়। তবে কাজ চলার মতো মজবুত আর ভালো জিনিস পাওয়াটা সহজ নয়। তবু খুঁজতে শুরু করলো ওমর।
পেয়েও গেল বিমান বাহিনীর পুরনো বিমান ফেলে রাখার গুদামে। অনেক পুরনো আমলের একটা ফ্লাইং বোট, টুইন ইঞ্জিন। বেশি চলেনি। তবে পড়ে থেকে থেকে অনেক জিনিস নষ্ট হয়ে গেছে। তা নিয়ে ভাবে না ওমর। নিজেই সারিয়ে নিতে পারবে। একটু বেশি খাটতে হবে আরকি। লম্বা ডানাওয়ালা মনোপ্লেন ওটা। বড় ট্যাঙ্ক। একবার তেল ভরে নিলে অনেক দূর যাওয়া যায়।
দরাদরি করে বেশ শস্তায়ই জিনিসটা কিনে নিয়ে এলো ওমর। মেরামতের কাজ শুরু করে দিলো। তাকে এ-ব্যাপারেও সাহায্য করতে লাগলো কিশোর আর মুসা, খুশি হয়েই। বিমান সম্পর্কে অনেক কিছু জানা হয়ে যাবে তাতে। কাজও চলতে লাগলো, সেই সঙ্গে আলোচনাও, কোথায় কিভাবে নিয়ে যাবে বিমানটাকে। ডজ পরামর্শ দিলো, জিনিসপত্র সব নিয়ে আগেই রওনা হয়ে যাবে সে। গিয়ে কিছু প্রয়োজনীয় কাজ সেরে রাখবে। এতো পুরনো একটা ফ্লাইং বোট নিয়ে তাহিতিতে গেলে একটা আলোড়ন সৃষ্টি হবেই। একটা হৈ চৈ শুরু হয়ে যাবে। সেটা এড়ানো গেলেই ভালো। গোপন একটা মিশনে চলেছে ওরা, এতো মানুষের নজরে পড়ে

যাওয়া ঠিক হবে না। তার চেয়ে অস্ট্রেলিয়ার কোনো এজেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করে যদি রারাটোঙ্গা দ্বীপে পেট্রোল আর তেল পাঠানোর ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে খুব ভালো হয়। দ্বীপটা যেহেতু অস্ট্রেলিয়ার প্রধান জাহাজ-পথটাতেই পড়ে, তেল পাঠানোর অসুবিধে হবে না। তাই সরাসরি রারাটোঙ্গায় চলে যেতে চায় সে। সেখানে বিমানটার জন্যে খানিকটা তেল রেখে দেবে। বাকিটা জলপথে পাঠানোর ব্যবস্থা করবে ভেইটিতে। কুক দ্বীপপুঞ্জের সব চেয়ে ছোট দ্বীপগুলোর একটা হলো ডেইটি। দ্বীপ ছোট হলে হবে কি, অনেক বড় একটা লেগুন আছে ওখানে। ফ্লাইং বোট নোঙর করিয়ে রাখার চমৎকার ব্যবস্থা হতে পারে ওই লেগুনে। বার বার তেল ভরা যাবে ওখানে রেখে। রারাটোঙ্গা থেকে বিমানটাকে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে ওখানে। ভেইটি থেকে ডজকে তুলে নিয়ে সোজা রওনা হয়ে যাবে বিমানটা ভজ আইল্যান্ডের উদ্দেশে। এই ব্যবস্থায় অনেক সুবিধে। অকারণ অনেক ঝুঁকি এড়ানো যাবে।

আরও কিছু পরিকল্পনা করা হলো। তবে সবগুলোর মধ্যে ডজের পরামর্শটাই উপযুক্ত মনে হলো। ওমরের মন খুঁতখুঁত করতে লাগলো যদিও। এর চেয়ে ভালো আর কোনো বুদ্ধি বের করতে না পেরে অবশেষে সেটাই মেনে নিলো সে। বিমানটাকে তুলে দেয়া হলো একটা স্টীমারে। রারাটোঙ্গায় নামিয়ে দেবে। ওটার সঙ্গেই যাবে ওমর, কিশোর আর মুসা।

সব কিছু গুছিয়ে নিয়ে রওনা হয়ে গেল ডজ। মাসখানেক পরে রারাটোঙ্গায় পৌঁছে কিশোররা দেখলো প্ল্যানমাফিক তেল রেখে ভেইটিতে চলে গেছে সে।

তেল-টেল ভরে, বিমানটাকে একবার পরীক্ষামূলক ভাবে উড়িয়ে দেখলো ওমর। ঠিকই আছে। তিন অভিযাত্রীকে নিয়ে রওনা হয়ে গেল ওটা ভেইটির উদ্দেশে। ওখানে পৌঁছে দেখলো একটা অ্যাক্সিডেন্ট করে ফেলেছে ডজ, এতে ওদের পরিকল্পনায় একটা বড় রকম পরিবর্তন হয়ে গেল। সে ঠিকমতোই পৌঁছেছে ওখানে, তেল আর জিনিসপত্রও বহাল তবিয়তেই আছে, কিন্তু তার নিজের হাতটা রয়েছে স্লিঙে ঝোলানো। বেশ লজ্জিত হয়েই সে তার এই দুর্ঘটনার কাহিনী শোনালো।

ভেইটিতে সময়মতোই পৌঁছেছিলো সে। দ্বীপটায় মানুষের বসবাস নেই। পালতোলা ছোট যে জাহাজটায় করে সে ওখানে পৌঁছেছে তার ক্যাপ্টেন স্থানীয় লোক, পলিনেশিয়ান, নাম হাইপো-বললো, একটা কাজে তাহিতিতে ফিরে যাচ্ছে। ফেরার পথে খাবার পানি নেয়ার জন্যে আবার থামবে ভেইটিতে। শুনে ডজের মাথায় একটা বুদ্ধি এলো। অযথা দ্বীপে বসে থেকে একা একা কি করবে? জিনিসপত্র রেখে চলে যেতে পারে হাইপোর সঙ্গে। জাহাজটা তো ফিরবেই, তখন আবার না হয় ফিরে আসা যাবে। তাহিতিতে গিয়ে বরং গুড্ডু কারনেসের

খোঁজখবর নেয়া ভালো। লোকটা কোথায় আছে এখন, কি করছে, জানা থাকলে সুবিধে। ডজ মুক্তোর খেতটা আবিষ্কারের পর অনেক সময় পেরিয়ে গেছে। হয়তো ইতিমধ্যে ওটা বের করে ফেলেছে কারনেস। ফেলে থাকলে খবরটা চেপে রাখতে পারবে না। সেটাই জানার জন্যে তাহিতিতে চললো আবার ডজ।

বন্দরে পা দিয়েই প্রথম যে লোকটার ওপর চোখ পড়লো তার, সে হলো স্বয়ং কারনেস। তাড়াতাড়ি আবার জাহাজে উঠে পড়তে চেয়েছিলো ডজ, পারলো না, দেখে ফেললে তাকে কারনেসের এক সাগরেদ। একটা গন্ডগোল বাধিয়ে হামলা করে বসলো। হাতে ছুরির খোঁচা খেলো ডজ।

দ্বীপের গভর্নরকে ব্যাপারটা জানাতে পারতো সে। তাতে হয়তো কারনেসকে পাকড়াও করতে পুলিশ। কিন্তু কেন এই শত্রুতা তা জানার চেষ্টা করতেনই গভর্নর। মুক্তোর খেতের কথা ফাঁস হয়ে যাওয়ার ভয় ছিলো তাতে। কাজেই বাড়াবাড়ি না করে সোজা এসে আবার জাহাজে উঠলো ডজ। হাইপোকে অনুরোধ করলো তখনি তাকে ভেইটিতে নিয়ে যাওয়ার জন্যে।

নিয়ে এসেছে হাইপো। কিশোররা আসার একটু আগে ভেইটিতে পৌঁছেছে ডজ। তখনও নোঙর করা রয়েছে হাইপোর জাহাজ। যায়নি।

জখমটা এক পলক দেখেই বুঝতে পারলো ওমর, ডাইভিঙের ক্ষমতা নেই এখন ডজের। মুক্তো তোলার জন্যে সাগরে ডুব দিতে পারবে বলেও মনে হলো না। অনেকখানি মাংস কেটেছে, চিরে একেবারে হাঁ হয়ে আছে। পচবে কিনা কে জানে! জ্বর এসে গেছে ইতিমধ্যেই। এই অবস্থায় তাকে নিয়ে যাওয়া বিপজ্জনক। এমনিতেই ওসব গ্রীষ্মমন্ডলীয় অঞ্চলে ঘা শুকাতে দেরি হয়। তা-ও ঠিকমতো ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করা গেলে। অভিযানে যাওয়া বাদ, ভাবলো ওমর। বরং এখানে থেকে এখন ভালোমতো ওষুধ দিয়ে ডজের জখমের চিকিৎসা করা দরকার।

অযথা বসে থাকতে হবে। তার চেয়ে বরং তাহিতিতে চলে যাওয়া ভালো, ভাবলো সে, হাইপোর জাহাজটা যখন রয়েছে। লোকটার যেতে কোনো আপত্তি নেই, সে ভাড়া পেলেই খুশি। তাহিতিতে বিমান নামাতে চায়নি ডজ, লোকের নজরে পড়ে যাওয়ার ভয়ে। সেটা এড়ানো গেছে। জাহাজে করে এখন ওমর আর আরেকজন যদি যায়-মুসা কিংবা কিশোর, যে কোনো একজন হতে পারে, তাহলে কারো চোখে পড়বে না। কতো নতুন লোকই তো তাহিতিতে যায়, আসে। আরেকটা ভয় ছিলো ডজের, কারনেসের চোখে পড়ার ভয়। সে ভয় করেও আর লাভ নেই। যা ঘটার ঘটে গেছে, চোখে পড়েই গেছে লোকটার। হাইপোর জাহাজে করে গিয়ে এখন আবার ওমররা তাহিতিতে নামলে কারনেস দেখে ফেলবে, আর অনেক কিছু অনুমান করে ফেলবে। করুক। তাতে আর কিছু যায় আসে না। ডজকে

দেখেই হয়তো যা করার করে বসে আছে সে। বরং গিয়ে এখন খোঁজ নেয়া দরকার কতোটা বুঝেছে কারনেস, আর কি পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছে।
কাজেই সেই রাতেই হাইপোর জাহাজে করে তাহিতিতে ফিরে চললো কিশোর আর ওমর। মুসাকে রেখে এসেছে ডজের কাছে। জখম বেশি খারাপ হয়ে গেলে যাতে বিমানে করে উড়িয়ে নিয়ে আসতে পারে তাহিতিতে।
এরকম ছোট জাহাজে বিশাল মহাসাগরে বেরোনো কোনো নতুন অভিজ্ঞতা নয় কিশোরের কাছে। আগেও এসেছে এখানে। শুধু নারকেল গাছের কান্ড সম্বল করে ভেসে পড়েছিলো বিপজ্জনক সাগরে। রেলিঙের কাছে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো জাহাজ ঘিরে হাঙরের ঘোরাফেরা। খাবারের গন্ধ পেয়ে গেছে যেন প্রাণীগুলো, কাছছাড়া হতে চাইছে না আর।
বাতাস চমৎকার। আবহাওয়াও ভালো। নিরাপদেই তিনদিন পরে তাহিতিতে এসে পৌঁছলো জাহাজ। বেশি সময় ওখানে থাকার ইচ্ছে নেই ওমরের। কারনেসের খোঁজ নেয়া হয়ে গেলেই ফিরে যাবে ভেইটিতে।
ডজের পরামর্শ মতো প্রথমেই দুজনে চলে এলো রেস্টুরেন্ট ডু পোর্টে। প্রায় ভরে গেছে জায়গাটা। মানুষ আর তাদের বিচিত্র আচরণ দেখতে ভালো লাগে কিশোরের। কৌতূহল নিয়ে তাকালো। মানুষ দেখার জন্যে এরকম জায়গা খুব কমই আছে। ভালো পোশাক পরা কয়েকজন টুরিস্ট দেখা গেল। তাদের বেশির ভাগই আমেরিকান। জাহাজের ক্যাপ্টেন রয়েছে কয়েকজন, ওরা সব স্থানীয় লোক। শ্বেতাঙ্গ রয়েছে বেশ কিছু, দাঁড়িওয়ালা, নানা দেশ থেকে এসেছে জীবিকা আর রোমাঞ্চের সন্ধানে। পৃথিবীতে যতো রঙের চামড়ার মানুষ আছে, কালো থেকে হলুদ, সব আছে এখানে। রয়েছে চীনা ব্যবসায়ী। পলিনেশিয়ান আছে কয়েকজন, কানের পেছনে আর চুলে রঙিন ফুল গোঁজা। ঢুকতেই ইংরেজি, ফরায়ী, জার্মান, চীনা আর আরও অসংখ্য ভাষার মিলিত কণ্ঠ এসে কানে ধাক্কা মারলো যেন কিশোরের।
এক কোণে দুটো চেয়ার দেখে এগিয়ে গেল ওমর। কিশোরকে নিয়ে বসে খাবারের অর্ডার দিলো। গলা নামিয়ে কিশোরকে বললো, কোথেকে তদন্ত শুরু করবো বুঝতে পারছি না। হাইপো তো বললো কাজ সেরে আসবে। তাকে দিয়ে যদি কোনো সুবিধে হয়। কি বলো?
কারনেসের কথা তাকে বলেছেন? জিজ্ঞেস করলো কিশোর। জাহাজে তো দেখলাম আপনাদের দুজনের খুব ভাব।
না। তবে ও আন্দাজ করে ফেলেছে, কারনেসের সঙ্গে মন কষাকষি চলছে আমাদের কোনো কারণে। ডজকে মারতে দেখেছে ও। শত্রুতা যে আছে বুঝে

গেছে। মুক্তোর কথা জেনেছে কিনা কে জানে। ভেইটিতে আমরা অনেক কথা বলছি। আড়ি পেতে কিছু শুনে থাকতে পারে।
যদি আড়ি পাতে। বিশালদেহী, স্বাস্থ্যবান পলিনেশিয়ান লোকটাকে খারাপ মনে হয় না কিশোরের। আমার মনে হয় ওকে বিশ্বাস করতে পারি আমরা। তার সাহায্য পাবো। এখানকার লোক সে। তার ওপর নাবিক। এখানকার অনেক গুজবই তার কানে যাবে। তার কাছে...ওই তো, এসে গেছে।
কিশোর লক্ষ্য করলো, শুধু ওরা দুজনেই নয়, হাইপো ঢোকার পর অনেক জোড়া চোখই তার দিকে ঘুরে গেছে। সে চোখগুলোতে কৌতূহল। সোজা কিশোরদের টেবিলের দিকে এগিয়ে এলো সে। একটা চেয়ার টেনে বসলো। আপনারা ক্যাপ্টেন কারনেসের খোঁজ করছেন তো? ইংরেজি আর ফরাসী ভাষার একটা অদ্ভুত মিশ্রণে কথা বলে সে। ফিসফিস করে বললো।
চিন্তিত ভঙ্গিতে একটা মুহূর্ত তার দিকে তাকিয়ে রইলো ওমর। মাথা ঝাঁকালো। হ্যাঁ, খুঁজছি।
খারাপ লোক।
আমারও তাই বিশ্বাস।
সাবধানে থাকবেন।
কেন? আমাদের সঙ্গে কেন লাগতে আসবে সে? চিনিই তো না।
ওই লোক সবার সঙ্গেই ঝগড়া বাধায়। কালও গন্ডগোল করেছিলো।
তার মানে এখানেই আছে?
হ্যাঁ। তার স্কুনার হোয়াইট শার্ক পাপিতি বন্দরে নোঙর করা রয়েছে। রাটুনা থেকে এসেছে আজ সকালে। কাল ভোরেই আবার জাহাজ নিয়ে বেরোবে। মালপত্র বোঝাই করছে জাহাজে, অনেক জিনিস।
গন্ডগোলটা কি করেছে?
রাটুনা থেকে জোর করে একটা ছেলেকে ধরে নিয়ে এসেছে কাজ করানোর জন্যে। কাল বন্দরে নেমেই পালানোর চেষ্টা করেছিলো ছেলেটা। ধরে ফেলে তাকে প্রচন্ড মার মেরেছে কারনেস। সে বলছে, জাহাজে কাজ করার জন্য চুক্তি করেছে ছেলেটা, আগাম টাকাও নিয়েছে, এখন পালারে কেন? জোর করে ধরে আবার জাহাজে তুলেছে।
কাল ভোরে চলে যাচ্ছে, না?
হ্যাঁ। গভর্নর তাকে বেরিয়ে যাওয়ার হুকুম দিয়েছেন।
কোথায় যাচ্ছে?
বলেনি। কারনেস আর তার সাগরেদরা ছাড়া আর কেউ কিছু জানে না। কেউ জিজ্ঞেস করতে গেলে শুধু চোখ টেপে ওরা, আর মিটমিট করে হাসে।

আপনি জানলেন কি করে?
আমার লোকেরা শুনে এসেছে। বন্দরে নেমেছিলো, সেখান থেকে।
ছেলেটার কি অবস্থা? রাটুনা থেকে যাকে ধরে এনেছে?
কি জানি! হাত ওল্টালো হাইপো। তবে খারাপই হবে। কারনেসের হাতে কেউ পড়লে তার আর ভালো হওয়ার উপায় নেই। সবাই ভয় পায় লোকটাকে।
গভর্নরও?
মনে তো হয়। নইলে ধরে কিছু করেন না কেন? শুধু বেরিয়ে যেতে বলেছেন।
এতোই খারাপ, বিড়বিড় করলো কিশোর। তো, ছেলেটা পালিয়েছিলো কিভাবে? ওরকম একজন লোকের হাত ফসকে?
জাহাজের রেলিঙ টপকে সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো। পানিকে ওরা ভয় পায় না।
কি যেন ভাবছে কিশোর। আনমনেই বিড়বিড় করলো, রাটুনা থেকে ধরে আনলো...পানিকে ভয় পায় না...হাইপোর চোখের দিকে তাকালো। ছেলেটার নাম বলতে পারেন?
পারবো না কেন? সবাই জানে। ঝিনুক।
ঝট করে কিশোরের দিকে তাকালো একবার ওমর। হাইপোর দিকে ফিরলো। কি বললেন!
ঝিনুক।
হুঁ, যা ভেবেছিলাম! নিচু গলায় বললো কিশোর।
কি ভেবেছিলে? জানতে চাইলো হাইপো। অবাক হয়েছে।
না, কিছু না, আরেক দিকে মুখ ফেরালো কিশোর। সে কি ভাবছে বুঝতে পারলো ওমর। হাইপোকে জিজ্ঞেস করল, রাটুনা থেকেই এনেছে তো?
নিশ্চয়।
আর কোনো সন্দেহ রইলো না কিশোর কিংবা ওমরের। রাটুনাতে গিয়েছিলো কারনেস। কোনো ভাবে জেনেছে, ঝিনুকই উদ্ধার করে এনেছে ডজকে। তার মানে যে দ্বীপ থেকে এনেছে সেটার অবস্থান বলতে পারবে এবং তার অর্থ ওই দ্বীপের কাছাকাছিই কোথাও রয়েছে মুক্তোর খেত। ছেলেটাকে ধরে এনেছে সেই জায়গা চিনিয়ে দেয়ার জন্যে।
এখানে এসে ভালোই করেছি, বুঝলে? কিশোরের দিকে তাকিয়ে বললো ওমর। একটা জরুরী খবর জানা গেল। এখুনি ভেইটিতে ফেরা দরকার। দেরি করা...
দরজার কাছে একটা হৈ চৈ শুনে ফিরে তাকালো সে। হঠাৎ করেই নীরব হয়ে গেল সবাই। সব কটা চোখ ঘুরে গেছে সেদিকে। মোটা, গাট্টাগোট্টা একজন ইটালিয়ান লোক ঢুকেছে। ধীরে ধীরে এগোতে লাগলো। মুখের মসৃণ চামড়া

কালো দেখাচ্ছে রক্ত জমায়। আধবোজা চোখ। আস্তে করে মোচড় দিচ্ছে গোঁফে। তাকে দেখে সবাই যে এমন চমকে গেছে, এটা যেন উপভোগ করছে খুব।
চেয়ার থেকে অর্ধেক উঠে পড়েছিলো হাইপো, বসে পড়লো আবার। হাত রাখলো ওমরের বাহুতে। কারনেস! তার কণ্ঠে অস্বস্তি।
তাতে কি হয়েছে? আপনি তো আর কিছু করেননি। এতো ভয় পাওয়ার কি হলো?
বুঝতে পারছেন না আপনি। আমার ওপর ওর কুনজর পড়লে বিপদে পড়ে যাবো। আমি কিছুই করতে পারবো না।
কেন পারবেন না?
কারনেস শাদা মানুষ। শাদা মানুষের গায়ে হাত তুললে মুশকিল হবে।
অবাক হয়ে গেল ওমর। ঔপনিবেশিক শাসনের ছোঁয়া এখনও পুরোপুরি দূর হয়নি এই অঞ্চল থেকে। এখনও এখানকার মানুষের মনে রয়ে গেছে শাদা মানুষের ভয়। নিশ্চয় এখনও ওদেরকে অত্যাচার করে শ্বেতাঙ্গরা। মাথা ঝাঁকালো সে, বুঝেছি। পকেট থেকে টাকা বের করলো বিল দেয়ার জন্যে। চোখের কোণ দিয়ে একটা নড়াচড়া দেখতে পেয়ে মুখ তুলে তাকালো। ওদের টেবিলের কাছাকাছি এসে থেমেছে করসিকান লোকটা। ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রয়েছে হাইপোর দিকে।
এই কুত্তা! খেকিয়ে উঠলো কারনেস, আমার জাহাজের কাছে ঘুরঘুর করছিলি কেন?
আপনার জাহাজের কাছেও যাইনি আমি, ক্যাপ্টেন কারনেস, তাড়াতাড়ি জবাব দিলো হাইপো।
বাঁকা হয়ে গেল কারনেসের ঠোঁটের এক কোণ। আরও কুৎসিত করে তুললো মুখটাকে। মুঠো হয়ে গেল আঙুল। ব্যাটা মিথুক... বলতে গিয়েই থেমে গেল। তাকালো ওমরের দিকে। উঠে দাঁড়িয়েছে সে।
দেখুন, কঠিন কণ্ঠে বললো ওমর। এটা আমার টেবিল। আপনাকে ডেকেছি বলে তো মনে পড়ে না।
চুপ হয়ে গেছে সবাই। থমথমে পরিবেশ।
জ্বলন্ত চোখে ওমরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে কারনেস। দাঁতে দাঁত চেপে বললো, তোমাকে কথা বলতে কে বলেছে? বসো!
তার ধমকের পরোয়াই করলো না ওমর। ভদ্রভাবে কথা বলো। তোমার সাগরেদ পেয়েছো নাকি আমাকে?
বসো! চেঁচিয়ে উঠলো, কারনেস। আমার কাজ আমাকে করতে দাও।
কি করবে?
এই কুত্তাটাকে ভর্তা বানাবো।

মাথা নাড়লো ওমর। না, তা তোমাকে করতে দেয়া হবে না। কিছু করতে গেলে আমাকে নাক গলাতেই হবে।
অবাক হলো যেন কারনেস। আমি কে জানো?
জানি। তুমি কে, কী, ভালো করেই জানি। তোমার নাম কারনেস। একটা সাধারণ গুন্ডা। যে মনে করে এই দ্বীপটা তার সম্পত্তি। সরো, আমার টেবিলের সামনে থেকে!
চোখের পলকে পকেটে হাত চলে গেল লোকটার। বেরিয়ে এলো একটা ছুরি। ঝিক করে উঠলো আলোয়।
বিদ্যুৎ খেলে গেল ওমরের শরীরে। এসব ছুরি-টুরির থোড়াই পরোয়া করে সে। থাবা দিয়ে পানির একটা গেলাস তুলে নিয়েই ছুঁড়ে মারলো কারনেসের মুখে। একলাফে এগিয়ে এলো। ধা করে গিয়ে বাঁ হাতটা আঘাত হানলো লোকটার সোলার প্লেক্সাসে। প্রচন্ড আঘাতে ঝটকা দিয়ে সামনে ঝুঁকে এলো করসিকানের মাথা। ওমরের ডান হাতের ঘুসি লাগলো তার চোয়ালে। মাঠ পার করে দেয়ার জন্যে ক্রিকেট বলকে ব্যাট দিয়ে বাড়ি মারলে যেমন হয় শব্দ হলো সেরকম।
গুঙিয়ে উঠলো কারনেস। টলে উঠলো। ধারালো দা দিয়ে এক কোপে কলাগাছের গোড়া কেটে দেয়া হলো যেন, ধীরে ধীরে কাত হয়ে তেমনি ভঙ্গিতে উল্টে পড়লো লোকটা, চেয়ার টেবিল নিয়ে। সেই টেবিলের সামনে বসেছিলো একজন তরুণ আমেরিকান, লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো সে। চেঁচিয়ে বলতে লাগলো, দারুণ! দারুণ মার মেরেছেন! দেখালেন বটে!
ঘরের কেউ নড়লো না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাত ডলছে রেস্টুরেন্টের মালিক, কিন্তু কিছুই করতে এগোলো না। যেখানে ছিলো সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলো ওমর। তাকিয়ে রয়েছে কারনেসের দিকে।
ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো আবার করসিকান। মাথা নেড়ে যেন ভেতরটা পরিষ্কার করতে চাইছে। শুয়োরের চোখের মতো খুদে কুকুতে চোখ জোড়ায় তীব্র ঘৃণা। দ্রুত একবার দৃষ্টি ঘুরে এলো সারা ঘরে, তার এই হাস্যকর পরিণতিতে কে কতোটা খুশি হলো যেন দেখলো। ঘুরে এসে চোখজোড়া আবার স্থির হলো ওমরের ওপর। জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছে। দ্বিধা করলো একটা মুহূর্ত। তারপর দাঁতের ফাঁক দিয়ে হিসহিস করে বললো, আবার দেখা হবে আমাদের।
আলোয় আর দেখা করতে এসো না, শান্তকণ্ঠে বললো ওমর। অন্ধকার রাতে আমার পেছন দিক থেকে এসো, যদি আমাকে মারতে চাও। আরেকবার সামনে পড়লে দাঁত কটা খসিয়ে দেবো, মনে থাকে যেন। যাও, ভাগো! চুরি করে মদ বিক্রি করে গিয়ে। যেটা ভালো পারো।

আরেকবার সারা ঘরে চোখ বোলালো কারনেস। কয়েকজন হাসছিলো, তার চোখে চোখ পড়তেই হাসি মিলিয়ে গেল ওদের। ছুরিটা আবার পকেটে ভরলো করসিকান। তারপর শান্ত পায়ে এগোলো দরজার দিকে। বেরিয়ে গেল বাইরের অন্ধকারে।

একসাথে কথা বলে উঠলো অনেকগুলো কণ্ঠ। কিশোরের মনে হলো, ঝাঁপ দিয়ে এসে পড়লো যেন শব্দগুলো।

ভালো হয়েছে! আচ্ছা, শিক্ষা হয়েছে! বললো একটা কণ্ঠ। শয়তানটাকে একটা শিক্ষা দেয়া দরকার ছিলো!

তাহলে কেন এতোদিন দিলেন না? জিজ্ঞেস করলো ওমর। ভালোমতো একবার দিয়ে দিলেই তো ঠান্ডা হয়ে যেতো। ঘরের সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললো, নিন। খাওয়া শুরু করুন। আপদ বিদেয় হয়েছে।

উঠে দাঁড়ালো একজন লম্বা, সুন্দর চুলওয়ালা স্ক্যানডিনেভিয়ান লোক। পরনে নাবিকের পোশাক, পুরনো, মলিন হয়ে গেছে। এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিলো। আমার নাম স্ট্রাডস স্যানটোজ। একটা কাজের কাজ করেছেন। আমার একটা জাহাজ আছে। সাহায্যের দরকার পড়লে জানাবেন, খুশি হয়েই করবো।

থ্যাংকস, স্যানটোজ, ওমর বললো। মনে থাকবে আপনার কথা। আর বসলো না। কিশোর আর হাইপোর দিকে ফিরে বললো, চলো।

দরজার দিকে এগোলো সে। প্রশংসার দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলো ঘরের সব কটা চোখ। বাইরে বেরিয়েই হাইপোকে জিজ্ঞেস করলো, আপনার কাজ শেষ হয়েছে?

হয়েছে, বস। শেষ।

জাহাজ ছাড়া যাবে?

যক্ষুণি বলবেন।

গুড। আমি গভর্নরের সঙ্গে দেখা করবো। ঝিনুক ছেলেটার ব্যাপারটা তদন্ত করতে অনুরোধ করবো। কারনেসের হাত থেকে ওকে ছাড়িয়ে আনা দরকার।

জ্যোৎস্নায় আলোকিত বন্দরের দিকে তাকিয়ে বললো হাইপো, দেরি হয়ে গেছে, বস।

মানে? কি বলতে চান?

কারনেসের জাহাজ ছেড়ে দিয়েছে। হাত তুলে দেখালো হাইপো, ওই যে তার স্কুনার, চলে যাচ্ছে।

ওমর আর কিশোরও দেখলো। ধীরে ধীরে বন্দরের মুখের দিকে এগিয়ে চলেছে একটা জাহাজ নোঙর থেকে পানি ঝরছে এখনও।

এইমাত্র ছাড়লো, তিক্ত কণ্ঠে বললো ওমর। আর কিছুই করার নেই। তবে আমার বিশ্বাস, কারনেসের সঙ্গে আবার দেখা হবে আমাদের। চলুন, ভেইটিতে ফিরে যাই।

হাইপোর জাহাজটা যেখানে নোঙর করা রয়েছে, সেদিকে হেঁটে চললো তিনজনে। ভেইটিতে ফিরে দেখা গেল, ডজের জখমের অনেক উন্নতি হয়েছে। ঝিনুক কারনেসের হাতে পড়েছে শুনে চমকে গেল সে। ঘাবড়ে গেল রীতিমতো।

ফুঁসে উঠলো ডজ, সোজা মুক্তো খেতের দিকে যাচ্ছিলো ব্যাটা। পথে রাটুনা থেমেছে খাবার পানি নেয়ার জন্যে। থামতেই হবে। কয়েকটা কারণ। মিষ্টি পানি আছে। ওখানকার যে কটা দ্বীপ আছে, তার মধ্যে ওটাই সব চেয়ে বড়। লোকেরা নিশ্চয় বলেছে আমি কয়েক দিনের জন্যে উঠেছিলাম ওখানে। এজন্যে ওদেরকে দোষ দেয়া যায় না। এমনিতেই ঘটনা ওসব জায়গায় খুব কম ঘটে। আর আমার মতো একজন বিদেশীর ওখানে থাকাটা বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে ওদের মাঝে, সহজে ভুলবে না। এটা একটা খবরের মতো খবর ওদের কাছে। কারনেস নেমে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবে আমার কথা। আর তা-ই সে করেছে। জেনেছে সাগরের হাসি আর ঝিনুক, নামের দুটো ছেলেমেয়ে সাগরের মাঝের এক দ্বীপ থেকে উদ্ধার করে এনেছে আমাকে। মেয়েটার গায়ে হাত দেয়ার সাহস করবে না কারনেস। কারণ মেয়েদের অপমান সহ্য করবে না দ্বীপের লোকে। এরকম অন্যায় করে অনেক বিদেশীকে মুন্ডু খোয়াতে হয়েছে। তাই ছেলেটাকে ধরেছে সে। লোভ-টোভ দেখিয়েই হয়তো বের করে নিয়ে এসেছে দ্বীপ থেকে। রসদপত্র ফুরিয়ে গিয়েছিলো হয়তো, তাই ফিরে গিয়েছিলো তাহিতিতে। এখন যখন বেরিয়ে গেছে, নিশ্চয় আবার গেছে মুক্তো খেতের দিকে।

মন দিয়ে শুনলো হাইপো। একমত হয়ে মাথা ঝাঁকাল, ঠিকই বলেছেন। অনেক মালপত্র কিনেছে সে। ডুবুরির পোশাক কিনেছে।

কি করে জানলেন? তীক্ষ্ণ হলো ডজের কণ্ঠ।

হু চি মিনের কাছে নারকেলের ছোবড়া বিক্রি করি আমি। ওর কাছে ডুবুরির পোশাক আছে। এবার গিয়ে শুনলাম সেটা নাকি বেচে দিয়েছে কারনেসের কাছে।

কেন নিয়েছে সে-তো বোঝাই যায়, ওমর বললো। ওসব নিয়ে আলোচনা করে আর লাভ নেই। দেরি করা যাবে না এখন। কারনেসের আগে গিয়ে পৌঁছতে হবে আমাদের।

এই তাড়াহুড়োটা করতে হতো না, বিড়বিড় করলো ডজ। ছেলেটাকে ধরেই সর্বনাশটা করলো।

ছেলেটা তাকে কতোটা বলবে, তার ওপর নির্ভর করবে অনেক কিছু। মুখ খুলবে?

কি জানি। মারকুইজানরা কখন যে কি করবে বলা কঠিন। ওদের দাদারা ছিলো মানুষখেকো, ভুলে যেও না। মানুষ খাওয়ার ব্যাপারে কানাঘুষা কিছু কিছু এখনও শোনা যায়। ভীষণ জেদী। যদি কোনো বিদেশীকে পছন্দ করে তো, তার জন্যে জীবন দিয়ে দেবে। আর না করলে, তার কথাই শুনবে না। কেটে ফেললেও একটা কথা বের করবে না মুখ থেকে। কারননসকে পছন্দ করার কোনো কারণই নেই ঝিনুকের। হয়তো ভুল জায়গায় নিয়ে চলে যাবে। ইচ্ছে করে।
পথে আবার রাটুনায় থামবে নাকি কারনেস? জানতে চাইলো ওমর। কি মনে হয়? দরকার আছে?
আছে। তাহিতি থেকে ডজ আইল্যান্ড অনেক দূরে। যেতে যেতে খাবার আর পানি ফুরোবেই। রাটুনায় থামতে বাধ্য হবে সে।
তাহলে এক কাজ করলেই পারি, কিশোর পরামর্শ দিলো। আগেই গিয়ে রাটুনায় বসে থাকি আমরা। কারনে গেলেই ধরবো। ঝিনুককে ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করবো।
হুঁ, বুদ্ধিটা মন্দ না, ডজ বললো। কারনেসও ভাববে সে বেরিয়ে গেছে। জাহাজ নিয়ে তার পিছু নিলেও আগে দ্বীপে পৌঁছতে পারবো না আমরা। সে তো আর জানে না যে প্লেন আছে আমাদের। ওর আগে গিয়ে ওত পেতে থাকবো আমরা, এটা কল্পনাই করতে পারবে না।
পারি, আর না পারি, মুসা বললো। চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি?
ওমরও ভেবে দেখলো কথাটা। পছন্দ হলো।
লেগুনের পানিতে ভাসছে ফ্লাইং বোট। ওড়ার জন্যে তৈরি। কিশোরকে নিয়ে ওর চলে যাওয়ার পর বসে থাকেনি মুসা। বিমানটাকে স্টার্ট দিয়ে পানিতেই চালিয়েছে কিছুক্ষণ। কোনো খুঁত আছে কিনা বোঝার চেষ্টা করেছে। ট্যাঙ্কে ভরার পর পেট্রোল যা বাকি রয়ে গেছে, আর যেসব জিনিস তখুনি নেয়ার প্রয়োজন নেই, সেগুলো সুবিধে মতো জায়গায় লুকিয়ে ফেলেছে। যাতে প্রয়োজনের সময় এসে বের করে নিতে পারে।
রওনা হতে কোনো অসুবিধে নেই। হাইপো আর তার হাসিখুশি তিনজন নাবিককে ধন্যবাদ জানালো ওরা। তারপর গিয়ে উঠলো বিমানে। ইঞ্জিন স্টার্ট দিলো ওমর। মিনিট কয়েক পরেই শাদা রেখা তৈরি করে নীল পানিতে ছুটতে শুরু করলো বিমান। জয়স্টিক চেপে ধরেছে সে। ইনসট্রুমেন্ট বোর্ডের ওপর সাঁটানো রয়েছে চার্ট।
কয়েক ঘণ্টা ধরে মাঝারি গতিতে সাগরের ওপর দিয়ে উড়ে চললো ওরা। মাঝে মাকে নিচে দেখা গেল দ্বীপ, নীল মখমলের মাঝে সবুজ পান্নার মতো। একবার

নিচে কালো একটা ফুটকির মতো দেখে ডজ জানালো ওটা আদিবাসীদের ক্যানু। শেষ বিকেলে দিগন্তের দিকে হাত তুলে দেখালো, স্কুনার! নিশ্চয় কারনেস!
আরেকটু পরেই সামনে লম্বা একটা ঝিলিমিলি দেখা গেল। আবছা থেকে স্পষ্ট হতে লাগলো ওটা। ভজ ঘোষণা করলো, রাটুনা এসে গেছে। ঘন নীল আকাশে এখন সবুজ একটা প্রতিবিম্ব। এসব জায়গায় বিমান থেকে দ্বীপগুলোকে ওরকমই দেখায়, দূর থেকে আরো কাছে এগোলে আকাশ থেকে যেন পানিতে নেমে পড়লো সবুজ রঙের ঝিলিমিলি। ধীরে ধীরে রূপ নিচ্ছে পর্বতের উঁচু চূড়াগুলো।
আগেও দেখেছি এসব, কিশোর বললো। তার পরেও নতুন মনে হয়। যতোবারই দেখি, অবাক হই।
হওয়ারই জিনিস, ডজ বললো। আমি তো কতদিন ধরে আছি। বার বার দেখেছি। তার পরেও পুরনো হয় না। বেশির ভাগ দ্বীপই তৈরি করেছে প্রবালকীট। পানির সমতলের বেশি ওপরে উঠতে পারেনি সেজন্যেই। পমেটো ওই রকম দ্বীপপুঞ্জ। কিন্তু মারকুইস দ্বীপপুঞ্জ আলাদা। বড় বড় পাহাড় পর্বত যেন সাগরের ভেতর থেকে ঠেলে উঠেছে। প্রথমবার দেখে কেমন ভয়ই লাগতো। হাজার হাজার ফুট উঁচু পাহাড়। প্রবালের তৈরি দ্বীপের চেয়ে অবশ্য ওই পাহাড়ওয়ালা দ্বীপগুলোর সৈকতই সুন্দর। ধবধবে শাদা বালি। পাহাড়ের গোড়ায় ঘন জঙ্গলও আছে।
সাপটাপ নেই তো? মুসা জিজ্ঞেস করলো। অতো সুন্দর বনে সাপ থাকলে ভালো লাগবে না।
না, তা নেই। তবে বিষাক্ত পোকামাকড়ের অভাব নেই। দশ ইঞ্চি লম্বা শতপদী আছে। ওগুলো সাপের চেয়ে কম বিষাক্ত না। কামড়ে দিলে টের পাবে।
কিছুটা নিচে নামলো ওমর। ডজ তাকে দেখালো, ওই যে, গ্রাম। সৈকতের কিনারে কয়েকটা কুঁড়ে চোখে পড়ছে। নারকেল পাতার ছাউনি। দ্বীপের আরেক ধারে আরেকটা গ্রাম আছে। তবে সেটার চেয়ে এই গ্রামটা বড়। লোকজন এখানেই বেশি। সৈকতের ধারে যেখানে খুশি নামাতে পারো। টিলাটকর কিছু নেই। তবে ক্যানু থাকতে পারে।
গাঁয়ের ওপরে ধীরে ধীরে চক্কর দিতে লাগলো ওমর। উচ্চতা কমিয়ে আনলো আরও। তারপর নাক নিচু করে উড়ে গেল নীল পানির দিকে। যেখানে পানির গা ঘেঁষে রয়েছে একফালি বাঁকা শাদা সৈকত।
চিলের মতো ডানা মেলে দিয়ে যেন ভেসে ভেসে নামতে শুরু করলো ফ্লাইং বোট। সামনে ঝুঁকে এসে কোন জায়গায় নামতে হবে ওমরকে দেখিয়ে দিলো ডজ।
তাকিয়ে থাকতে থাকতে একসময় কিশোর মন্তব্য করলো, পৃথিবীর দেশ বলে মনে হয় না! একেবারে স্বর্গ!

তা ঠিক, কথাটা ডজও স্বীকার করলো। এতো সুন্দর জায়গা পৃথিবীতে কমই আছে। তবে স্বর্গেও সাপ থাকে।
সাপ! অবাক হয়ে বললো মুসা। এই না বললেন নেই!
আরে না না, ওই সাপের কথা বলছি না, ডজ বললো, ব্যাখ্যা করে কিভাবে বোঝাই! বলতে চাইছি ভালোর পাশাপাশিই মন্দ জিনিস তৈরি করে রাখে প্রকৃতি। এই যেমন রুটিফল আর কলার কথাই ধরো। কতো ভালো খাবার। ওই পাহাড়ের গোঁড়ায় প্রচুর জন্মায়। তেমনি জন্মায় বিষ। বনের ভেতরে বিষাক্ত অর্কিড জন্মায়। এমন সব মাছি আছে কামড়ালে সাংঘাতিক জ্বালা করে। সাগরে যেমন মুক্তো আছে, তেমনি রয়েছে হাঙর আর অন্যান্য ক্ষতিকর জিনিস। জ্যান্ত প্রবাল তো পৃথিবীর সুন্দরতম জিনিসগুলোর একটি। কিন্তু গিয়ে ঘষা লাগিয়ে দেখ না। কেটে রক্ত তো বেরোবেই, বিষও ঢুকে যেতে পারে। সবার ওপর রয়েছে অসুখ, দক্ষিণ সাগরের এই স্বর্গগুলোতে। একশো বছর আগে এই দ্বীপটাতেই শুধু ছিলো দশ হাজার মানুষ। এখন আছে মোটে দুশো। বাকি সব মরেছে শাদা মানুষের বয়ে নিয়ে আসা অসুখে। কেউ এনেছে যক্ষ্মা, কেউ কুষ্ঠ। আর কয়েক বছর পরে এখানে একজন মানুষ থাকবে কিনা সন্দেহ! পঙ্গপালের মতো মরে সাফ হয়ে গেছে এখানে মানুষ...
পানিতে নেমে পড়েছে ফ্লাইং বোট। ছুটলো গায়ের দিকে। বিমানের শব্দ শুনেই ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে গায়ের লোক। জটলা করছে সৈকতের ধারে। কেউ কেউ উত্তেজনায় নাচতে শুরু করেছে।
এই প্রথম এখানে প্লেন নামছে। জানালার বাইরে মাথা বের করে দিলো ডজ। চেঁচিয়ে বললো, কাওহা!
আরও বেড়ে গেল সৈকতে উত্তেজনা। ডজকে চিনেছে। তাকে চেনা সহজ, লাল রঙের চুলের জন্যে। ঝপাঝপ কয়েকটা ক্যানু টেনে নামানো হলো পানিতে। ছুটে এলো বিমানের পেছনে। ঘিরে ফেললো এসে। কেউ কেউ সাঁতরে চলে এলো। নারী, পুরুষ, ছেলেমেয়ে, সব রকমের মানুষ। চেঁচিয়ে ডজের নাম ধরে ডাকতে লাগলো ওরা, স্বাগত জানাচ্ছে, তবে ডজ নামটা বলছে না, বলছে লাল চুল। কাওহা কাওহা বলে তার জবাব দিচ্ছে ভজ। শান্ত পানিতে বিমানের নোঙর ফেলে ক্যানুতে নামলো বৈমানিকেরা। নিয়ে আসা হলো ওদেরকে নারকেল গাছে ঘেরা সৈকতে।
উঁকি দিয়ে শরীরে অনেক বেশি আঁকিবুকি আঁকা বয়স্ক একজন লোককে হাত ধরে টেনে নিয়ে এলো ডজ। পরিচয় করিয়ে দিলো, ওর নাম অশান্ত সাগর। তারপর হো হো করে হেসে উঠলো যখন অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে ওমরের নাকে নাক ঘষার আগে মোড়ল ভালোমতো তার মুখটা শুকে নিলো। মোড়ল ইংরেজি

তেমন জানে না। বললো সে, ফরাসী ভাষা জানে। তবে তার মাতৃভাষা মারকুইসাসে কেউ কথা বললেই বেশি খুশি হয়। আমি কিছু কিছু জানি। আলোচনা চালাতে পারবো।
মোড়লের পেছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে কয়েকজন তরুণ ওদেরকে দেখিয়ে ডজকে বললো ওমর, ওদের ভাবভঙ্গি তো সুবিধের লাগছে না। মনে হচ্ছে মাথায় মুগুরের বাড়ি মারার জন্যে হাত নিসপিস করছে ওদের।
মোড়লের সঙ্গে কথা বললো ডজ। লোকগুলোর দিকে একবার ফিরে তাকিয়ে আবার ডজের দিকে ফিরলো মোড়ল। মারকুইসাসে কিছু বললো। সঙ্গীদেরকে জানালো ডজ, ওরা ভয় পাচ্ছে। জোর করে আমরা ধরে নিয়ে যেতে পারি, এই ভয়। ভয়টা পাইয়েছে ওদের কারনেস, ঝিনুককে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে।
ওদের বলো, ওমর বললো। ঝিনুককে ছাড়িয়ে আনতে যাবো আমরা।
আবার মোড়লের সঙ্গে কথা বললো ডজ। মোড়ল কি বললো সেটা অনুবাদ করে শোনালো, খুশি হয়েছে ওরা। বলছে এই দ্বীপকে আমরা নিজেদের বাড়ির মতো মনে করতে পারি। তারপর নিজে থেকে বললো, ওরা যা বলে, ঠিক তাই বোঝায়। ফাঁকি-ঝুঁকি নেই। যাকে পছন্দ করবে তাকে সব দিয়ে দিতে রাজি। এখুনি আমাদের জন্যে একটা ঘর বানাতে হুকুম দিয়ে দিয়েছে মোড়ল। রাতের বেলা ভোজ হবে।
ঘর বানিয়ে দেবে, ঠিক আছে, ওমর বললো। তবে খাবার দাওয়াতটা রাখতে পারবো কিনা সন্দেহ। আসার সময় কারনেসের স্কুনার দেখে এসেছি। সত্যিই যদি তারটাই হয়, তাহলে সন্ধ্যার পর পরই পৌঁছে যাবে সে। ভোজফোজের মধ্যে না গিয়ে তার ওপর নজর রাখাটা জরুরী।
আরেক দফা লম্বা আলোচনা হলো ডজের সঙ্গে মোড়লের। ওমরের দিকে ফিরে ডজ বললো, ও বুঝতে পেরেছে। কয়েকজন যোদ্ধাকে পাহাড়ে পাঠিয়ে দেবে নজর রাখার জন্যে। স্কুনারটাকে দেখা গেলেই আমাদের হুঁশিয়ার করে দেবে।...
আহ্, ওই যে আসছে সাগরের হাসি, ঝিনুকের বান্ধবী। বছর পনেরোর এক কিশোরী এগিয়ে এলো। খুব সুন্দরী। পরনে হালকা নীল রঙের পোশাক, দ্বীপের লোকেরা যেমন পরে। ছেলে আর মেয়েতে কোনো ভেদাভেদ নেই, একই রঙের কাপড় পরে। চমৎকার স্বাস্থ্য। তেল চকচকে বাদামী চামড়া। হাসতে হাসতে এসে হাত চেপে ধরলো জজের, কোনো জড়তা নেই, বললো, কাওহা, কাওহা।
আদর করে তার চুলে হাত বুলিয়ে দিলো ডজ, মেয়েদেরকে এখানে অভ্যর্থনার জবাব দেয়ার এটাই নিয়ম। বললো, ঝিনুককে ছাড়িয়ে আনতে যাবো আমরা।
বন্ধুর নাম শুনে মেঘ জমলো যেন মেয়েটার বাদামী মুখে। ওর জন্যে আমার খুব খারাপ লাগে। কাঁদি।

ডজ, এসো, ডাকলো ওমর। প্লেন থেকে কিছু খাবার নামিয়ে নিয়ে আসি। আর মোড়লের জন্যে কিছু উপহার। তার পর কথা বলা যাবে যতো খুশি। এসো।
বিমান থেকে মাল নামানো, কোনো কাজই না, কিন্তু ইচ্ছে করেই এগিয়ে এলো অনেকে, সাহায্য করার জন্যে। মানা করলেও শোনে না। বরং মুখ বেজার করে ফেলে। আপাতত মোড়লের ঘরে ওদেরকে নিয়ে আসা হলো। পরে নতুন ঘর তৈরি হলে সেখানে নিয়ে যাওয়া হবে।
তোমার দ্বীপ থেকে কত দূরে আছি? ডজকে জিজ্ঞেস করলো ওমর।
বিশ-তিরিশ মাইল। এর বেশি না।
এই দ্বীপেই আমাদের হেডকোয়ার্টার করলে কেমন হয়?
পেট্রোলের অসুবিধে হবে। বার বার যেতে আসতে অনেক তেল খরচ হবে, অতো নেই স্টকে। আবহাওয়া ভালো হলে ওড়ারও দরকার পড়বে না, পানিতে ট্যাক্সিইং করে চলে যেতে পারবো। রোজ সকালে রওনা হতে হবে তাহলে। রোজ এভাবে নিয়মিত যেতে-আসতে থাকলে সন্দেহ করে বসতে পারে এখানকার লোকে। সেটা উচিত হবে না। যতো কম লোক জানাজানি হয় ততোই ভালো। ওদের লোভ নেই, এটা ঠিক। কিন্তু বিদেশী কোনো জাহাজ চলে আসতে পারে। ফাঁস হয়ে যেতে পারে খবরটা।
মাথা ঝাঁকাল ওমর। ঠিকই বলেছো। যাকগে, সেটা নিয়ে পরে ভাবা যাবে। আগে কারনেসের ব্যাপারটার একটা মীমাংসা করে নিই।
হালকা খাবার খেয়ে নিলো ওরা। ঘুরতে বেরোলো কিশোর আর মুসা। উঁচু উঁচু অসংখ্য নারকেলের জটলার ফাঁকে ফাঁকে তৈরি হয়েছে কুঁড়েগুলো। বেরিয়ে চলে এলো ওরা সৈকতে। শান্ত নিথর হয়ে আছে সাগর। দিগন্ত সীমায় হেলে পড়ছে সূর্য! ফ্যাকাসে হয়ে গেছে আকাশের ঘন নীল, মাঝেমাঝে লালচে-হলুদ রঙের ছোপ। মৃদু বাতাস বইছে, যেন সাগরের শেষ নিঃশ্বাস, থিরথির করে কাঁপছে নারকেলের ডগা। আশ্চর্য এক নীরবতা। সামনে ছড়ানো শাদা সৈকত। জীবনের কোনো চিহ্নই নেই, কিছু ঋষি কাঁকড়া বাদে। চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকছে, যেন বোঝাতে চাইছে-না, না, আমরা জীবন্ত কিছু নই, পাথর। কিন্তু কাছে গেলেই ঝট করে বেরিয়ে আসছে দাঁড়া। বিদ্যুতের গতিতে ছুটে গিয়ে ঢুকে পড়ছে অসংখ্য গর্তের কোনো একটাতে। সৈকতের কিনার ধরে হাঁটতে হাঁটতে সামনে বাধা দেখতে পেলো ওরা। পথ রুদ্ধ করে দিয়ে যেন দাঁড়িয়ে গেছে, পাথরের দেয়াল। দেখলে মনে হবে হয় আকাশ থেকে ঝুপ করে পড়েছে হঠাৎ করে, কিংবা ধীরে ধীরে সাগরের নিচ থেকে ঠেলে মাথা তুলেছে। বেশি দূরে যেতে ওদেরকে মানা করে দিয়েছে ডজ। থামলো ওরা। এই সময় পেছনে শোনা গেল হালকা পায়ের

আওয়াজ। ফিরে তাকিয়ে দেখলো হাতে একটা আদিম মাছ ধরার বড়শি নিয়ে এগিয়ে আসছে সাগরের হাসি।
অনেক টুপা, হেসে হাত তুলে কাঁকড়াগুলোকে দেখালো সে। মাছও অনেক আছে। দেখবে? এসো। দুজনের মধ্যে হাত ধরার জন্যে মুসাকেই বেছে নিলো সে টেনে নিয়ে চললো পাথরের দেয়ালের পাশের একটা বড় চাঙড়ের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে চললো কিশোর।
চাঙড়টা আসলে দেয়ালেরই অংশ। ওপরে উঠে বোঝা গেল, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে চূড়াটা কেটে চলে গেছে। জায়গা বেছে নিয়ে বসে পড়লো সাগরের হাসি। সাথে করে নিয়ে এসেছে অনেক কুঁচো চিঙড়ি। বড়শিতে সেগুলো গেঁথে পানিতে ফেলে দেখতে দেখতে অনেক মাছ ধরে ফেললো। একেকটা করে মাছ ধরে, আর সেগুলোর স্থানীয় নাম বলে, মুসাকে দিয়ে আবার উচ্চারণ করায় সেগুলোর।
শুনে কিশোরও শিখে ফেলেছে। তাকিয়ে রয়েছে স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ পানির দিকে। একেবারে তল পর্যন্ত দেখা যায়। যেন ভিডিওতে নেচারাল ওয়ার্ল্ড দেখছে। আজব, সুন্দর সেই জগৎ। বিশাল এক অ্যাকুয়ারিয়াম যেন। খেলে বেড়াচ্ছে নানা রকম রঙিন মাছ। কোনোটা চুপ করে ভাসছে, কোনোটা ছোটাছুটি করছে, তাড়া করছে একে অন্যকে, পাথরের খাঁজ থেকে সুড়ুং করে বেরিয়ে আসছে কেউ, কেউ বা আবার ধীরে সুস্থে গিয়ে ঢুকে পড়ছে।
মস্ত একটা বান মাছ দেখতে পেলো। পুরো পনেরো ফুট লম্বা। কুৎসিত, ভয়ংকর মুখ। পাথরের কালো গর্ত থেকে বেরিয়ে পিছলে গিয়ে যেন ঢুকে পড়লো আরেকটা পাথরের ফাটলের ভেতরে। দেখতে দেখতে এতেই তন্ময় হয়ে গেল, অনেকক্ষণ থেকেই যে নীরব হয়ে আছে সাগরের হাসি, সেটা লক্ষ্যই করলো না। করলো অনেক পরে, যখন তার গায়ে কনুই দিয়ে গুতো দিলো মুসা।
পাথরের দেয়ালের গায়ে কালো বিষন্ন চেহারার একটা গুহামুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে মেয়েটা। নিশ্চয় কিছু দেখতে পেয়েছে। মুসাও দেখেনি, কিশোরও পাচ্ছে না। তবে পেলো খুব তাড়াতাড়িই। চামড়ায় একধরনের শিরশিরে অনুভূতি হলো কিশোরের, ভয় পেলে কিংবা বেশি অবাক হলে এরকমটা হয় মানুষের। কালো কিছু একটাকে নড়তে দেখেছে।
সাগরের হাসির তীক্ষ্ণ চিৎকার ফালা ফালা করে দিলো যেন অখন্ড নীরবতা। গাঁয়ের দিকে ফিরে মুখের ওপর দুই হাত জড়ো করে চেঁচিয়ে বলতে লাগলো, ফেকি! ফেকি! ফেকি!
চিৎকার শুনেই ছুটে ঘর থেকে বেরোলো চার-পাঁচজন মানুষ। হাতে মাছ মারার বর্শা। দৌড়ে আসতে লাগলো এদিকে। কাছে এসে ওরাও চেঁচাতে শুরু করলো।

কি হয়েছে জিজ্ঞেস করছে সাগরের হাসিকে। হাত তুলে গুহাঁটা দেখিয়ে মেয়েটা আবার বললো, ফেকি!
পানির আরও কিনারে গিয়ে দাঁড়ালো লোকগুলো, দ্বিতীয়ার বাঁকা চাঁদের মতো গোল হয়ে। ওদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে নিচে উঁকি দিলো কিশোর আর মুসা। কিন্তু ঠেলে সরিয়ে দেয়া হলো ওদেরকে। মনে হলো বিপজ্জনক কোনো ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। বেশি দূরে সরলো না গোয়েন্দারা। গলা বাড়িয়ে তাকিয়ে রইলো কালো গুহাঁটার দিকে।
ঝট করে বেরিয়ে এলো একটা লম্বা লিকলিকে বাহু। আরেকটা। তারপর আরেকটা।
মোচড় দিয়ে উঠলো কিশোরের পেট। এই জীব আগেও দেখেছে সে, তবু চমকে গেল। কিলবিলে ওই কুৎসিত গুড়গুলো দেখলে অনেকেরই হয়, এরকম, জানা আছে তার, ওয়াপোকা দেখলে যেমন হয়। ঘেন্না লাগে, শিউরে ওঠে শরীর।
কাঁপতে কাঁপতে একটা শুঁড় উঠে এলো লোকগুলোর দিকে। লাফিয়ে কিশোরদের কাছে সরে এলো সাগরের হাসি। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে, টাটা-টা-টা! ছেলেদের দিকে চেয়ে হেসে বললো, ভয় লাগছে? আমরা ভয় পাই না। ও আমার ভাই। লম্বা, জোয়ান একটা লোককে দেখালো সে। দুর্দান্ত সাহসী। ঠিক মেরে ফেলবে। অনেক ফেকি মেরেছে। এটাকেও মারবে।
জীবটা কি? শরীরটা এখনও বেরোয়নি, আন্দাজ করতে পারছে কী, তবু জিজ্ঞেস করলো।
ফেকি! কিশোরের মুখের দিকে তাকিয়ে ভাঙা ইংরেজিতে অশুদ্ধ উচ্চারণে অনুবাদ করে দিলো সাগরের হাসি, ডেবিল ফিশ! ডেবিল ফিশ! ডেভিল ফিশ, অর্থাৎ শয়তান মাছ।
এই জীবের সঙ্গে লড়াইয়ের তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে মুসার, অথৈ সাগর অভিযানে যখন এসেছিলো। মরতে মরতে বেঁচেছিলো সেবার। দ্বিতীয়বার আর এর কবলে পড়তে চায় না। ওই শুঁড়ের ভয়ংকর ক্ষমতা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিলো সেবার। ভয়ে ভয়ে দেয়ালের দিকে পিছিয়ে গেল সে।
কিশোর নড়লো না। বেরিয়ে এলো শুঁড়ের চেয়ে কুৎসিত শরীরটা। জীবটাকে কেউ দেখে না থাকলে তার কাছে হরর ছবির ভয়াবহ দানব বলে সহজেই চালিয়ে দেয়া যাবে। মস্ত, কালচে-লাল একটা মাংসের দলা যেন। সেটা থেকে বেরিয়ে রয়েছে অসংখ্য আঁচিল, দেখলেই গা গুলিয়ে ওঠে। মুখটা হাতির মুখের মতো, শুঁড় বাদ দিয়ে। গোল গোল বিশাল দুটো চোখ, শরীরের তুলনায় অনেক বড়, তাতে একধরনের শয়তানী উজ্জ্বলতা, এতোই কুৎসিত, না দেখলে বলে বোঝানো যাবে না। মোট আটটা বাহুঁ, হাতির শুঁড়ের মতো গুটিয়ে নিয়ে আবার লম্বা করে

দিচ্ছে, একেকটা চোদ্দ-পনেরো ফুটের কম হবে না। লাফ দিয়ে এসে পড়লো একটা শুঁড়ের মাথা, কিশোরের কয়েক ফুটের মধ্যে। ভয় পেয়ে লাফিয়ে সরে গেল সে কয়েক পা। লোকগুলো সরছে না। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে একনাগাড়ে খুঁচিয়ে চলেছে ওদের পায়ের কাছে এসে পড়া শুঁড়গুলোকে।

পরোয়াই করছে না যেন বিশাল অকটোপাস। গর্ত থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে পড়েছে, এগিয়ে আসছে ধীরে ধীরে। একটা মানুষকে ধরতে পারলেই রাতের খাবার হয়ে যাবে তার। শিকার ধরতে গেলে কিছুটা আঘাত সইতেই হয়, কাজেই বর্শার খোঁচাগুলো হজম করে যাচ্ছে সে।

পানি থেকে ছিটকে বেরিয়ে যেন উড়ে এসে কিশোরের পায়ের কাছে পড়লো একটা শুঁড়ের মাথা। ছুঁয়ে ফেললো পা। লাফ দিয়ে পিছিয়ে গেল কিশোর। জড়িয়ে ধরতে পারলে আর মুক্তি ছিলো না ওই গুঁড়ের কবল থেকে। ঠান্ডা ভেজা স্পর্শ। নিজের অজান্তেই গলা চিরে বেরিয়ে এলো চিৎকার। তার হাত ধরে একটানে সরিয়ে নিলো মুসা, দেয়ালের কাছে, শুঁড়ের নাগালের বাইরে।

ভোজালি দিয়ে এক কোপে শুঁড়ের মাথাটা কেটে আলাদা করে ফেললো একজন যোদ্ধা। টিকটিকির লেজের মতো কুৎসিত নাচ শুরু করলো কাটা অংশটা।

রাগে ব্যথায় ভীষণ খেপে গেল অকটোপাস। যে করেই হোক মানুষ শিকার করবেই, পণ করে ফেললো যেন সে। একসঙ্গে পানি ওপরে তুলে দিলো আটটা শুঁড়। এরই জন্যে অপেক্ষা করছিলো যোদ্ধারা। প্রচন্ড আক্রমণ চালালো। কুপিয়ে টুকরো টুকরো করে ফেলতে লাগলো শুঁড়গুলো।

পানিতে মাথা তুলেছে অকটোপাস। যন্ত্রণায় শরীর মোচড়াচ্ছে। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে কাটা শুঁড়ের মাথা থেকে। রীতিমতো হরর ছবি। অনেকটা মানুষের মতো করেই গোঙাতে আরম্ভ করেছে মৃত্যু যন্ত্রণায়। শরীরের যেখানে সেখানে বর্শা বিদ্ধ হচ্ছে। আক্রমণ করছে না আর, অস্ত্রই নেই, করবে কি দিয়ে? অদ্ভুত আচরণ করছে। মুসার মনে হলো, অন্তিম মুহূর্ত উপস্থিত, বুঝে গেছে জীবটা। গর্তের ভেতরে থেকে লড়াইয়ের সময় অকটোপাসের বুদ্ধির যে পরিচয় পেয়েছিলো সে, তাতেই এরকমটা ভাবতে পারলো।

খোঁচানোর বিরাম নেই। যতো তাড়াতাড়ি শেষ করে দেয়া যায়, সেই চেষ্টা করছে যোদ্ধারা।

আনন্দে নাচতে শুরু করেছে সাগরের হাসি। ওকে খাবো! ওকে খাবো! মজার মাংস! মুসা আর কিশোরের দিকে তাকিয়ে বাচ্চা মেয়ের মতো হাততালি দিয়ে হাসতে লাগলো সে। তোমরাও খাবে!

তুমি খেয়ো। হাত নেড়ে বললো কিশোর, আমি এর মধ্যে নেই। বাপরে বাপ, কি বিচ্ছিরি! শুয়াপোকা এর চেয়ে অনেক সুন্দর!

মুসা কিছু বললো না। খাবারটা কেমন হয়, না দেখে আগেই মানা করে দিতে রাজি নয়।
পানি থেকে তোলা হলো মৃত অকটোপাসটাকে। ওখানেই কুপিয়ে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলা হতে লাগলো। সাগরের হাসিও যোগ দিলো সেই কাটাকাটিতে। ঘন হয়ে আসছে গোধূলী। ঘরে ফিরে চললো কিশোর আর মুসা! কুঁড়েতে ফিরে দেখলো কথা বলছে ডজ আর ওমর। অকটোপাসের সঙ্গে লড়াইয়ের কথা ওদেরকে বলতে যাবে, এই সময় পাহাড়ের দিক থেকে ভেসে এলো চিৎকার, আসছে! আসছে!
জাহাজটাকে দেখতে পেয়েছে, ডজ বললো। চলো, দেখি, কতোটা এগোলো।
বেশি দূরে যেতে হলো না। সৈকতেই এসে জড়ো হয়েছে গাঁয়ের লোক। উত্তেজিত হয়ে কলরব করছে। কয়েকজনের কথা শুনলো ডজ। ফিরে সঙ্গীদেরকে জানালো, অবাক কান্ড! কারনেই এসেছে। তবে এদিকে না এসে চলে গেছে কার আরেক ধারে। ওখানে নোঙর ফেলেছে। এটা ভাবা উচিত ছিলো আমাদের। এখানে জাহাজ ভেড়াতে সাহস করবে না, এ-তো জানা কথা। গায়ের লোকে ধরে খুন করে ফেলবে। এখুনি কয়েকজনে গিয়ে কাজটা সেরে আসতে চাইছে। আমি ওদের মানা করেছি। অন্তত আমরা যতোক্ষণ এখানে রয়েছি কোনো খুনখারাপি চলবে না।
তাহলে কি করা যায়? পরামর্শ চাইলো ওমর। ঘুরে যেতে হলে কতদূর?
হেঁটে যাওয়ার উপায় নেই। ঘুরে যেতে হলে ক্যানুতে চড়ে। তাতে পনেরোবিশ মাইলের কম হবে না।
শিস দিয়ে উঠলো ওমর। এতো? দ্বীপের মাঝখান দিয়ে সরাসরি গেলে?
সাত-আট মাইল। তবে যাওয়াটা অতো সোজা না। খানিক দূর গিয়েছিলাম একবার, পুরোটা যেতে পারিনি। যাওয়া যায় না তা নয়। তবে সাংঘাতিক কঠিন। যেতে হয় পাহাড় ডিঙিয়ে, তিন হাজার ফুট উঁচু। ভয়ানক বিপজ্জনক। শুধু যে পড়ে মরার ভয় আছে তা নয়, বুনো জানোয়ারও আছে।
এখানে বুনো জানোয়ার? মুসা অবাক।
মহাসাগর পেরিয়ে এই দ্বীপে জানোয়ার এলো কোত্থেকে? কিশোরও বুঝতে পারছে না।
এসেছে। ষাঁড় আর কুকুর। কুত্তাগুলো হলো সব চেয়ে খারাপ। আমি অবশ্য দেখিনি, শোনা কথা বলছি। একপাল শাদা কুত্তা নাকি বাস করে পাহাড়ে। হিংস্র। আগে পোষা ছিলো, ছাড়া থাকতে থাকতে বুনো হয়ে গেছে। কয়েক বছর আগে তিমি-শিকারীদের এক জাহাজে করে নিয়ে আসা হয়েছিলো ওগুলোকে, ফেরার সময় ফেলে চলে গেছে জাহাজের মালিক। গরুও বোধহয় অনেক আগে ওভাবেই

ফেলে যাওয়া হয়েছে। আশপাশের অনেক দ্বীপে বনবেড়াল আছে, আগে পোষা ছিলো। ফেলে যাওয়ার পর বনে থাকতে থাকতে বন্য হয়ে গেছে।
হুঁ, ওমর বললো। ওসব জানোয়ারকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। যাওয়া যাবে কিনা তাই বলো। কারনেসকে ঠেকাতেই হবে। ছেলেটাকে অন্তত কেড়ে রেখে দেয়া উচিত।
দেখি, অশান্ত সাগরকে জিজ্ঞেস করে। মোড়লের কাছে এগিয়ে গেল ডজ। কথা বলে ফিরে এলো। বললো, হ্যাঁ, যাওয়া যাবে বলছে। তবে পথ খুব খারাপ। গাইড হিসেবে তার কয়েকজন লোক দিতেও রাজি হয়েছে।
তাহলে তাড়াতাড়ি রওনা হওয়া দরকার। অস্ত্র-টস্ত্র নেবো নাকি? রাইফেল?
বেশি বোঝা নিলে অসুবিধে হতে পারে। যা দরকার শুধু তা-ই। আমরা তো আর যুদ্ধ করতে যাচ্ছি না। পিস্তল নিলেই যথেষ্ট।
বেশ। মোড়লকে বলো এখুনি রওনা হতে চাই আমরা।
কয়েক মিনিটের মধ্যেই রওনা হলো ওরা। সঙ্গে চললো ছয়জন যোদ্ধা। মশাল জ্বেলে নিয়েছে। দেখতে দেখতে চলে এলো পাহাড়ের গোড়ায়। আঁকাবাকা পাহাড়ী পথ ধরে ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করলো। দুপাশে ঘন জঙ্গল। মশালের আলোয় আরো বেশি ঘন লাগছে, মনে হচ্ছে লতাপাতার দুর্ভেদ্য দেয়াল। এর মধ্যে প্রবেশ করা যাবে না।
কিছুদূর এগোনোর পর হাতে একটা আলতো ছোঁয়া পেলো মুসা। তার বাহু খামচে ধরলো নরম একটা হাত। অবাক হয়ে ফিরে তাকিয়ে দেখলো, সাগরের হাসি। হাসলো। মশালের আলোয় ঝিক করে উঠলো শাদা দাঁত। এলাম।
মেয়েটার খালি পায়ের দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠলো মুসা। যে হারে ধারালো পাথর খোঁচা খোঁচা বেরিয়ে রয়েছে, তাতে জুতো না থাকলে কেটে পা ফালাফালা হয়ে যাওয়ার কথা। বললো, কেটে যাবে তো!
কাটবে না, হেসে বললো সাগরের হাসি। কতো উঠলাম। প্রবালের ওপর দিয়েও হাঁটতে পারি খালি পায়ে।
পাশাপাশি চলছে কিশোর। বিশ্বাস করলো কথাটা। কথা শুনে ফিরে তাকিয়ে ওমর বললো, এই, তুমি এসেছো কেন?
আসুক, ডজ বললো। ওকে নিয়ে ভাবতে হবে না তোমাকে। বিপদে ফেলবে ভাবছো তো? ফেলবে না। বরং সাহায্য করবে। ঝিনুক ওর বন্ধু। ও যাবেই। বলেও ফেরাতে পারবে না।
আর কিছু বললো না ওমর। মশালের আলোয় জঙ্গল দেখতে দেখতে চললো। বুনো ফুল ফুটে আছে। অর্কিডের অভাব নেই, অনেক জাতের, অনেক ধরনের। একধরনের দানবীয় পাতাসর্বস্ব গাছ জন্যে রয়েছে, এর নাম কুমারীর চুল। ওই

চুলের মাঝে বিচিত্র অলংকরণ সৃষ্টি করেছে অর্কিডগুলো। কিছু লতানো অর্কিড ঝুলে রয়েছে বড় গাছের ডাল থেকে। হাজারে হাজারে গিনিপিগ রয়েছে। হুটোপুটি করছে, ছুটে যাচ্ছে সামনে দিয়ে।

যতোই উঠছে খাড়া হচ্ছে আরও পথ। দুপাশে খাড়া হয়ে আছে পাহাড়ের দেয়াল, গিরিপথের মতো লাগে। কখনও হঠাৎ করে শেষ হয়ে যাচ্ছে দেয়াল, তার পরে রয়েছে গভীর গিরিখাত। পড়লে ছাতু হয়ে যেতে হবে। কখনও পথ মোড় নিচ্ছে বিপজ্জনক ভঙ্গিতে। নারকেল আর রুটিফল গাছ পড়ে আছে অনেক নিচে, এখানে উঠতে পারেনি। আরেকটু এগিয়ে বড় বড় পাথরের চাঙরের ভেতরে হারিয়ে গেছে পথ। কখনো তার ভেতরে ঢোকা যায়; কখনো যায় না। তখন এক পাথর থেকে আরেক পাথরে লাফিয়ে লাফিয়ে এগোতে হয়।

একটা খোলা জায়গা পেরোনোর সময় নিচে তাকালো কিশোর। অদ্ভুত একটা শৈলশিরা চোখে পড়লো। ধারের ওপরটা করাতের দাঁতের মতো হয়ে আছে। আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ ছিলো ওটা একসময়, বুঝতে পারলো। আরো অনেক নিচে পানিতে ভাসতে দেখা যাচ্ছে বিমানটাকে, ওটার রূপালি ডানায় চাঁদের আলো পড়ে চিকচিক করছে। বিমান আর মনে হচ্ছে না এখান থেকে, এতোই ছোট দেখাচ্ছে। বরং মনে হয় পানিতে ভেসে আছে ডানা মেলে দেয়া কোনো নিশাচর পতঙ্গ। লেগুনের বাইরে সাগরকে লাগছে রূপালি চাদরের মতো। পানি বলে মনে হয় না। যেন এই পৃথিবীর কোনো কিছু নয় ওসর, অপার্থিব।

উঠেই চলেছে পথ। অনেক পাহাড়ে চড়েছে মুসা, কিন্তু এরকম পাহাড় আর দেখেনি। মনে হয় যেন পৃথিবীর বুকের বিশাল এক ফোড়া ফেটে গিয়েছিলো। পুঁজের বদলে বেরিয়ে এসেছিলো পাথর। সেসব ছড়িয়ে রয়েছে। আর ফোঁড়ার মুখের কাছটা বিকৃত হয়ে গেছে।

পথ এখানে সরু। একপাশে গভীর খাদ। পাশাপাশি চলার আর উপায় নেই। একসারিতে এগিয়ে চলেছে মশালধারীরা। শুধু তাদের দিকে চোখ রেখে এগিয়ে চলেছে কিশোর। পাশে খাদের দিকে তাকাতে সাহস করছে না। যদি মাথা ঘুরে পড়ে যায়?

কিশোরের মনের অবস্থা কি করে জানি টের পেয়ে গেছে সাগরের হাসি। হাসতে লাগলো সে। পাহাড়ী ছাগলের মতো আশ্চর্য ক্ষিপ্রতায় হালকা পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছে। পড়ে যাওয়ার ভয় নেই। কোনো কিছুরই পরোয়া করছে না।

একটা জায়গায় এসে সমতল হয়ে গেছে খানিকটা জায়গা। তার ওপাশ থেকে নামতে আরম্ভ করেছে পথ। দ্রুত নেমে গেছে পেয়ালা আকৃতির একটা খাদের মধ্যে। কোনো গাছপালা নেই তাতে। ওটাই মৃত আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের নিচের গহ্বর, অনুমান করতে পারলো কিশোর। ওখানে নেমে থামলো যোদ্ধারা। বিশ্রাম

নিতে। মশালের আলোও নিভু নিভু হয়ে এসেছে। থামতে পেরে খুব খুশি হলো কিশোর।. গড়িয়ে পড়লো মাটিতে। দরদর করে ঘামছে।
কিন্তু শুয়েও সারতে পারলো না, লাফিয়ে উঠে দাঁড়াতে হলো আবার। রক্ত জমাট করা একটা চিৎকার শুনতে পেয়েছে। নেকড়ের ডাকের সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে। যোদ্ধারাও উঠে পড়েছে। চেঁচিয়ে বলতে লাগলো, কুকুর! কুকুর! ভয় পেয়েছে ওরা।
খাইছে! বলে সাগরের হাসির হাত ধরে একটানে তাকে পেছনে সরিয়ে দিলো মুসা। পিস্তল বের করলো।
ওমরও পিস্তল বের করে ফেলেছে। ওই যে! এসে গেছে! তাকিয়ে রয়েছে কুকুরগুলোর দিকে। চাঁদের আলোয় ভূতুড়ে লাগছে শাদা জানোয়ারগুলোকে। সোজা ছুটে আসছে এদিকেই।
গুলি করলো সে। প্রায় তার গায়ের ওপর এসে পড়লো একটা মৃত জানোয়ার।
গুলি করেই সাগরের হাসিকে টেনে নিয়ে একপাশে সরে গেল মুসা। গর্জন করতে করতে ছুটে আসছে কুকুরগুলো। মানুষকে ধরতে পারলে ছিড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে।
কিশোর আর ডজও গুলি চালাতে লাগলো।
রুদ্ধ জায়গায় প্রচন্ড শব্দ হতে লাগলো গুলির। প্রতিধ্বনি উঠতে লাগলো। সেই সঙ্গে কুকুরের আর্তনাদ আর গর্জন। নরক গুলজার শুরু হয়ে গেল যেন।
মশালগুলো জ্বালিয়ে ফেলেছে আবার যোদ্ধারা। শুকনো ঘাস জড়ো করে তাতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। দেখতে দেখতে ঘাসের একটা চক্র তৈরি করে ফেললো ওরা। আগুন লাগালো। তার মধ্যে ঢুকে পড়তে অনুরোধ করলো অভিযাত্রীদেরকে।
ঢুকে পড়লো সবাই। আগুনের বৃত্তের বাইরে এসে থেমে গেল কুকুরগুলো। চারপাশ ঘিরে গোল হয়ে বসে পড়লো। লম্বা টকটকে লাল জিভ বের করে দিয়েছে। ঝুলছে ওগুলো, লালা গড়াচ্ছে। কয়েক মিনিট মানুষের দিকে তাকিয়ে থাকলো ওগুলো। আগুন পেরিয়ে এসে ধরতে পারবে না বুঝে অন্য কাজে মন দিলো। মরা আর আহত সঙ্গীদেরকে ছিড়ে ছিড়ে খেতে শুরু করে দিলো। মাঝে মাঝে মুখ ফিরিয়ে মানুষদের দিকে তাকিয়ে দাঁত খিচাচ্ছে। জানোয়ারগুলোর হিংস্রতা দেখে গায়ে কাঁটা দিলো কিশোরের।
এখন কি করবো? জিজ্ঞেস করলো ওমর।
যোদ্ধাদের সঙ্গে আলোচনায় ব্যস্ত ডজ। ফিরে তাকিয়ে বললো, ওরা বলছে, নতুন করে মশাল বানিয়ে নেবে। আগুনকে ভয় পায় কুকুরগুলো। এগোতে সাহস করবে না।

কিছু একটা করা দরকার, গম্ভীর হয়ে বললো ওমর। এভাবে আটকে থাকলে কারনেস ওদিকে চলে যাবে।
আরেক ধরনের মশাল বানাতে শুরু করলো যোদ্ধারা। শুকনো ঘাসকে শক্ত করে পাকিয়ে নিয়ে লাঠির মাথায় বাঁধলো। যে ঘাস তুলছে, তাকে আগের মশাল নিয়ে পাহারা দিলো অন্যেরা। তবে ওদের দিকে এখন আর তেমন খেয়াল নেই কুকুরগুলোর। ভোজে ব্যস্ত। মশাল বানানো শেষ করার পর এলো কুকুর তাড়নোর পালা। যোদ্ধারা শুকনো ডালের মাথায় আগুন ধরিয়ে ছুঁড়ে মারতে শুরু করলো ওগুলোর দিকে। সেই সঙ্গে পাথর। কয়েক রাউন্ড গুলিও চালানো হলো, মেরে ফেলা হলো আরও কয়েকটাকে।।
এই বার ঘাবড়ালো কুকুরের পাল। পালালো। পেছনে মশাল হাতে তেড়ে গেল যোদ্ধারা। তবে বেশি দূর গেল না। কুকুরগুলো আবার সাহসী হয়ে উঠলে মুশকিল।
রওনা হলো আবার ওরা। জ্বালামুখটা পেরিয়ে এলো দ্রুত। ঝপ করে যেন হঠাৎ নিচে নেমে গেছে পথটা। সামনে আবার আরম্ভ হয়েছে জঙ্গল। পায়ের নিচে এখন নরম শ্যাওলা। হাঁটছে ওরা আর বার বার পেছনে ফিরে তাকাচ্ছে। আর কোনো সাড়া নেই কুকুরগুলোর।
বেশ সুন্দর একটা ফুল দেখতে পেলো মুসা। পাপড়িগুলো কেমন পালকের মতো ছড়িয়ে গেছে, কোমল মনে হচ্ছে দেখে। হাত বাড়িয়ে সেটা ছিড়তে গেল, সাগরের হাসিকে উপহার দেয়ার জন্যে। খপ করে তার হাত চেপে ধরলো মেয়েটা সরিয়ে আনতে আনতে বললো, পাকে!
ডজও দেখলো ফুলটা। ছুঁয়ো না। ওটা পাকে!
পাকেটা কি জিনিস? জানতে চাইলো কিশোর।
ছুঁয়ে দেখ, তাহলেই বুঝবে। জীবনে ভুলবে না আর। আগুনের পোড়ার মতো জ্বলতে শুরু করবে। বিছুটি এর কাছে কিছু না।
ঠিকই বলেছিলো ডজ, স্বর্গেও সাপ থাকে-ভাবলো কিশোর। দক্ষিণ সাগরের দ্বীপগুলো খুব সুন্দর, কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এই সৌন্দর্যের মাঝেও এমন সব ব্যাপার রয়েছে, যা অনেক ভালো লাগাকেই ম্লান করে দেয়।
আরও ঘণ্টাখানেক একনাগাড়ে হাঁটলো ওরা। শেষ দিকে নামলো হুড়মুড় করে বৃষ্টি। নারকেল গাছের এলাকা শুরু হয়েছে তখন। থেমে মশাল নিভিয়ে ফেললো যোদ্ধারা। ডজকে একজন বললো, এর বাইরে বেরোলেই সৈকত, শুনেছি।
আমি আগে যাই, ওমর বললো। দেখে আসি। বলেই হাঁটতে আরম্ভ করলো। হারিয়ে গেল নারকেল কুঞ্জের ভেতরে। ফিরে এলো একটু পরেই। ঠিকই। জাহাজটা দেখে এলাম। তীর থেকে শখানেক গজ দূরে। আলো একটা জ্বলছে

বটে, তবে কোনো সাড়াশব্দ নেই। লোকগুলো জাহাজে আছে না ডাঙায় বুঝতে পারলাম না। ছোট একটা গা দেখে এলাম পানির কিনারেই। ওখানে গিয়ে থাকতে পারে।

আমার মনে হয় না কারনেস গিয়েছে, ডজ বললো। গেলে তার সাগরেদরা গিয়েছে। সে জাহাজেই রয়ে গেছে। লোকগুলো গায়ে মদ খেতে গেছে।

মদ? মুসার প্রশ্ন।

হ্যাঁ। নারকেলের ফুল থেকে তৈরি করে এখানকার লোকে।

তাই নাকি! নারকেলের ফুল থেকে মদ...

ব্রান্ডির চেয়ে কোনো অংশে খারাপ না...

আচ্ছা, মদের আলোচনা বাদ দাও এখন, হাত নেড়ে বাধা দিলো ওমর। কাজের কথা বলো। কারনেসটার একটা ব্যবস্থা হওয়া দরকার। যেমন কুকুর তেমন মুগুর পেটা করা উচিত। তবে আগেই কিছু করবো না। যদি শয়তানী করে, তাহলে। সৈকতে কিছু ক্যানু দেখে এলাম। একটায় করে জাহাজে গিয়ে তাকে সোজাসুজি বলতে হবে ঝিনুককে ফিরিয়ে দেয়ার জন্যে। এক ক্যানুতে করেই আমরা সবাই যেতে পারবো। আমি কারনেসকে সামলাবো। কিশোর, তুমি আর মুসা পাহারায় থাকবে, সাগরেদগুলো ফিরে আসে কিনা দেখবে। ডজ, তুমি থাকবে নৌকায়। যোদ্ধাদেরকে বলো, আমরা না ফেরাত যেন এখানেই থাকে।

আবার সৈকতের দিকে রওনা হলো ওমর। নারকেল কুঞ্জের ভেতর থেকে বেরোনোর আগেই চোখে পড়ে ঝলমলে সাগর। চাঁদের আলোয় মনে হচ্ছে গলিত রূপা। তার পেছনে এলো অন্য তিনজন।

নীরব নির্জন সৈকত। জীবনের চিহ্ন নেই। খোলা জায়গায় বেরোলো না ওরা, একধারে কয়েকটা রুটিফল গাছ জন্মে রয়েছে, তার নিচে এসে দাঁড়ালো। গাঁয়ের উঠনে আগুনের কুন্ড জ্বলছে। শুধু ওই আগুন আর স্কুনারটা প্রমাণ করছে যে এখানে মানুষ আছে। গাছের ছায়ায় ছায়ায় নীবে এগিয়ে চললো ওরা, ক্যানুগুলোর দিকে। বালির ওপরে কাত হয়ে পড়ে আছে ওগুলো। একটা ক্যানু টেনে নামালো চারজনে মিলে। পানিতে পড়েই টলে উঠলো ওটা। জীর্ণ দশা। মেরামত করা জরুরী হয়ে পড়েছে। সবগুলো ক্যানুর একই অবস্থা। কিশোরের ভয়ই হলো, চারজনে উঠলে না ডুবে যায়। তবে ডুবলো না নৌকাটা। সাবধানে দাঁড় বাইতে শুরু করলো ওমর আর মুসা। জাহাজের দিকে এগিয়ে চললো যতোটা সম্ভব কম শব্দ করে আর ঢেউ না তুলে। আস্তে করে এসে স্কুনারের গায়ে ভিড়লো নৌকা। মুসার তুলে রাখা দাঁড়ের পানি ফোটা ফোটা ঝরছে, তার শব্দও কানে আসছে, এতোই নীরব হয়ে আছে চারপাশ।

বেয়ে ওপরে উঠে গেল ওমর। তার পেছনে উঠলো মুসা আর কিশোর। ডজ নৌকায় বসে রইলো।
থাকো, ফিসফিস করে বললো ওমর। পিস্তল তো আছে। গুলি চালাতে দ্বিধা করবে না।
দেখেশুনে করবেন, নীরবে হাসলো মুসা। আমাদের গায়ে আবার লাগিয়ে দেবেন না।
কম্প্যানিয়ন ওয়ের দিকে চললো তিনজনে। সবে সিঁড়ির গোড়ায় পৌঁছেছে। ওরা, এই সময় গর্জে উঠলো একটা কণ্ঠ, কে?
যে কেবিন থেকে কথা বলেছে লোকটা, একটানে ওটার দরজা খুলে ফেললো ওমর। নাকেমুখে এসে ধাক্কা মারলো যেন তামাকের ধোঁয়া আর কড়া মদের গন্ধ। হ্যারিকেন জ্বলছে। ধোঁয়ার জন্যে ছড়াতেই পারছে না হলদেটে আলো, অন্ধকার কাটেনি। ঘরের মাঝখানে একটা টেবিল। তার ওপরে একটা চার্ট বিছিয়ে দেখছে কারনেস। আস্তে করে উঠে দাঁড়ালো সে। দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে ওমর, যেন বিশ্বাস হচ্ছে না এটা। আচমকা গাল দিয়ে উঠে এক ধাক্কায় একপাশে সরিয়ে দিলো টেবিলটা। খেঁকিয়ে উঠলো, এখানে কি?
তোমার কাছেই এসেছি, কঠিন গলায় জবাব দিলো ওমর। সেই রাটুনা ছেলেটাকে চাই।
তাই নাকি? রাগে ফুসতে শুরু করলো কারনেস।
হ্যাঁ, তাই। আসতে বলবে, নাকি আমরাই গিয়ে ডেকে আনবো?
তোমাকে তোমাকে আমি...
বুঝেছি। আমরাই ডেকে নিয়ে যাচ্ছি। এই কিশোর, ছেলেটা কোথায় দেখ তো?
ঝিনুকের নাম ধরে ডাকতে ডাকতে সরু করিডর ধরে এগোলো কিশোর। কয়েকবার ডাকতেই সাড়া এলো দুর্বল কণ্ঠে। একটা দরজার সামনে এসে থামলো কিশোর। ওটার ভেতর থেকেই শব্দটা এসেছে। কিন্তু দরজায় তালা দেয়া। ডেকে জিজ্ঞেস করলো, ঝিনুক, তুমি ভেতরে আছো?
আছি।
করিডরের দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে জুতোসহ একটা পা পাল্লার ওপরে তুলে দিলো কিশোর। তারপর ঠেলা দিলো। হলো না কিছু। আরো জোরে ঠেলতে লাগলো। চাপ সইতে না পেরে তালা ছুটে গিয়ে ঝটকা দিয়ে খুলে গেল পাল্লা। নাকে এসে লাগলো দুর্গন্ধ। কিছু দেখতে পাচ্ছে না অন্ধকারে। পকেট থেকে টর্চ বের করে জ্বাললো। মেঝেয় বসে আছে একটা ছেলে।
তোমার নাম ঝিনুক? কিশোর জিজ্ঞেস করলো।
হ্যাঁ। আমি ঝিনুক।

গুড। তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি। এসো, ওঠো।
দুর্বল ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালো ছেলেটা। ঘর থেকে বেরিয়ে কিশোরের পেছন পেছন চললো।
এই যে, নিয়ে এসেছি, ওমরকে বললো কিশোর। দরজায় আগের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে ওমর। হাতে পিস্তল।
খাঁচায় আটকা জানোয়ারের মতো আচরণ করছে কারনেস। মুখ খারাপ করে গালাগাল করছে। হুমকি দিচ্ছে বার বার।
এবার ছেড়ে দিলাম, ওমর বললো। আর যদি দেখি কখনও শয়তানী করেছে, এমন শিক্ষা দেবো তোমাকে বুঝবে তখন। বরফের মতো শীতল হয়ে উঠেছে তার কণ্ঠ। ঘর থেকে বেরোবে না বলে দিলাম। তোমার মাথা দেখলেই গুলি চালাবো আমি, মনে রেখো। কিশোরকে নির্দেশ দিলো, ছেলেটাকে নৌকায় নিয়ে যাও।
ডেকের কিনারে এসে দেখলো ওরা, তীরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে ডজ। আরেকটা নৌকা নামানো হয়েছে। অনেকগুলো ছায়ামূর্তি নড়ছে তাতে। কারনেসের সাগরেদরা ফিরে আসছে, নিচু গলায় বললো সে। কি করবো? দেখলে গন্ডগোল করবেই।
না, করবে না, বলে উঠলো আরেকটা কোমল কণ্ঠ। ক্যানুর কিনার থেকে।
অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখলো কিশোর, চাঁদের আলোয় সাগরের হাসির হাসি হাসি মুখটা। বললো, আরে তুমি। তুমি এখানে কি করছো?
দেখাচ্ছি, বলেই ডুব দিলো মেয়েটা। খুব হালকা একটা আলোড়ন তুলে তলিয়ে গেল মাছের মতো।
নৌকায় নামো, নির্দেশ দিলো ওমর। সৈকতে ফেরা দরকার।
ওদের ক্যানুটা এগোতে লাগলো সৈকতের দিকে, অন্য ক্যানুটা আসছে জাহাজের দিকে। দ্রুত। ডেকে বেরিয়ে এসেছে কারনেস। চেঁচিয়ে আদেশ দিলো তার সাগরেদদেরকে। আঞ্চলিক ভাষায়।
কি বললো, ব্যাটা? ডজকে জিজ্ঞেস করলো ওমর।
আমাদেরকে ডুবিয়ে দিতে বললো।
চেষ্টা করেই দেখুক।
তবে লড়াইটা আর হলো না। কারনেসের আদেশ পালন করার জন্যে ঠিকই তৈরি হয়েছিলো তার লোকেরা। নৌকার মুখও ঘুরিয়েছিলো কিশোরদের ক্যানুর কয়েক গজের মধ্যে এসে। কিন্তু হঠাৎ করেই এমন একটা কান্ড ঘটলো, যা কল্পনাও করতে পারেনি বিরোধী দল। পানিতে ঝপ করে একটা শব্দ হলো। মড়মড় করে উঠলো নৌকার পচা কাঠ। পরক্ষণেই কাত হয়ে গেল ক্যানুটা। একে অন্যের ঘাড়ের ওপর গিয়ে পড়লো লোকগুলো। পর মুহূর্তেই পানিতে। চেঁচাতে শুরু

করলো ওরা। তাদের চিৎকারকে ছাপিয়ে পানির ওপরে ছড়িয়ে পড়লো যেন মেয়েলী কণ্ঠের খিলখিল হাসি।
টা-টা-টা-টা! চেঁচিয়ে উঠলো ঝিনুক। অকটোপাস মারার সময় সাগরের হাসিকেও এরকম শব্দ করতে শুনেছে কিশোর, অনুমান করলো বেশি উত্তেজিত কিংবা আনন্দিত হলেই বোধহয় ওরকম শব্দ করে এখানকার লোকে। ঝিনুক বলছে, দিয়েছে। নৌকা ডুবিয়ে দিয়েছে সাগরের হাসি! সে-ও ঝাপ দিলো পানিতে।
কিশোর আশা করলো, তার মাথাটা ভেসে উঠবে এখনই। উঠলো না। সাগরের হাসি কিংবা ঝিনুক, কারো মাথাই আর দেখতে পেলো না।
মুসাও খুঁজছে দুজনকে। না দেখে বললো, খাইছে! ডজ, ঠিকই বলেছিলেন! এগুলো মানুষ না, মাছ!
জাহাজের দিকে সাঁতরাতে শুরু করেছে কারনেসের সাগরেদরা। এছাড়া আর কিছু করারও নেই ওদের, জানে এখন ওমরদেরকে ধরতে এলে হয় বৈঠার বাড়ি খাবে, কিংবা পিস্তলের গুলি। ছুরির খোঁচা খাওয়ারও আশঙ্কা আছে। কে যায় শুধু শুধু মরতে।
নিরাপদেই তীরে পৌঁছলো অভিযাত্রীরা। ঝিনুক আর সাগরের হাসির জন্যে অপেক্ষা করবে ভেবেছিলো, কিন্তু ডাঙায় উঠে দেখলো ওরা দুজনই ওদের অপেক্ষায় রয়েছে।
যাক, জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেললো ওমর। যা করতে এসেছিলাম, করেছি। এবার বাড়ি ফেরা যাক।
গায়ের দিক থেকে এগিয়ে এলো কয়েকজন লোক। তবে খারাপ লোক মনে হলো না ওদেরকে। মারমুখো হয়ে আসেনি। ঝিনুক আর সাগরের হাসির সঙ্গে কয়েকটা কথা বলে আবার ফিরে চললো ওরা।
নিজের দলকে নিয়ে রওনা হলো ওমর, যোদ্ধারা যেখানে অপেক্ষা করছে সেখানে। ঝিনুককে দেখে খুব খুশি হলো ওরা।
অনেক পরিশ্রম করেছে। খানিকক্ষণ জিরাতে বসলো কিশোররা। সবাইকে বিস্কুট আর চকলেট ভাগ করে দিলো ডজ। খেতে খেতে ঝিনুককে জিজ্ঞেস করলো, কারনেস শয়তানটা তোমাকে অনেক প্রশ্ন করেছে, না?
করেছে। কোন দ্বীপে আপনাকে পাওয়া গেছে জানতে চেয়েছে বার বার।
বলেছো?
না। বলেছি, অনেক দূরে। বিশ্বাস করেনি। আমাকে মিথুক বলেছে। মেরেছে। ধমক দিয়েছে, না বললে একেবারে মেরে ফেলবে।
হয়েছে, আর কিছু করতে পারবে না, ছেলেটার কাঁধ চাপড়ে দিলো ডজ।

ঢাল বেয়ে যখন পাহাড়ে চড়ছে ওরা, তখনও মৃদু ভাবে কানে আসতে থাকলো কারননসের চেঁচামেচি।
আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের কাছে পৌঁছতে পৌঁছতে ভোর হয়ে গেল। বোধহয় একারণেই কুকুরগুলোর আর কোনো সাড়াশব্দ পেলো না এখানে এসে। যদিও মশাল জ্বেলে তৈরিই রয়েছ যোদ্ধারা। দিনের আলোয় পথ চলতেও সুবিধে। পাহাড়ের যেসব জায়গা ভয়াবহ মনে হয়েছিলো রাতের অন্ধকারে, এখন আর ততোটা বিপজ্জনক লাগছে না। চলার গতিও বাড়লো।
অবশেষে নারকেল কুঞ্জে ঘেরা গায়ে প্রবেশ করলো ওরা। ঝিনুককে দেখে এমন কান্ড শুরু করলো গায়ের লোকে, এমন করে স্বাগত জানাতে লাগলো, যেন কবর থেকে ফিরে এসেছে সে।
অনেক পরিশ্রম করেছে। অভিযাত্রীরা সবাই ক্লান্ত! কারনেসের স্কুনারটা ফিরে আসতে পারে, আবার কোনো শয়তানীর চেষ্টা করতে পারে সে। অশান্ত সাগরকে কড়া নজর রাখার ব্যবস্থা করতে বলে তিন সহকারীকে নিয়ে কুঁড়েতে এসে ঢুকলো ওমর। ঘুমাতে হবে। ডজ আইল্যান্ডে যাওয়াটা স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিলো আগামী দিন ভোর পর্যন্ত।
চমকে জেগে গেল কিশোর। কানে আসছে চিৎকার। কিছুই বুঝতে না পেরে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো। দরজার দিকে ছুটলো। মনে হচ্ছে কোনো গোলমাল হয়েছে। দরজা থেকেই সৈকত চোখে পড়ে। ভোর হয়ে গেছে। পুবের আকাশ লাল। মৃদু বাতাসে যেন অস্বস্তি বোধ করছে, এমনি ভঙ্গিতে কাঁপছে নারকেল পাতা। লেগুনের পানি শান্ত। আগের জায়গাতেই ভাসছে ফ্লাইং বোট। একটা নড়াচড়া চোখে পড়তেই ঝট করে তাকালো সেদিকে। সৈকত ধরে দৌড়ে আসছে সাগরের হাসি। আসছে! আসছে! চিৎকার করছে সে, শয়তানটা আসছে!
কি হয়েছে? ভেতর থেকে জিজ্ঞেস করলো ওমর। উঠে পড়েছে বিছানা ছেড়ে। জ্যাকেট চড়াচ্ছে গায়ে।
কারনেস আসছে বলে!
দুই লাফে দরজার কাছে চলে এলো ওমর। কই?
দেখতে তো পাচ্ছি না।...হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই যে! পাথরের দেয়ালটার দিকে দেখালো কিশোর। লেগুনে ঢোকার মুখে খুদে একটা দ্বীপ পড়ে। ওটার পেছনে দেখা যাচ্ছে স্কুনারের পাল। সব কটা পালই ফুলে উঠেছে ভোরের বাতাসে। সাগরের পানিতে রাজহাঁসের মতো স্বচ্ছন্দে ভেসে চলেছে জাহাজ। আরেকটু এগিয়ে ঘুরে গেল ওটার নাক। ঢুকে পড়লো লেগুনে। সোজা এগিয়ে আসতে লাগলো সৈকতের দিকে।

করছে কি? পাল নামায় না কেন? কাঁধের ওপর দিয়ে বললো ডজ। সে-ও এসে দাঁড়িয়েছে পেছনে।
খাইছে! ওটা... মূসার কথা শেষ হওয়ার আগেই কিশোরও বুঝে ফেললো। চেঁচিয়ে উঠলো, প্লেনটাকে ভাঙতে যাচ্ছে! ধাক্কা মারবে!
একটা মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইলো সে। তারপরেই নড়ে উঠলো। মুসা, এসো! বলেই সৈকতের দিকে দৌড় দিলো কিশোর। যেখানে ক্যানুগুলো রয়েছে। ওদের পেছনে ছুটলো সাগরের হাসি।
ধরো, ধরো, হাত লাগাও! একটা ক্যানুকে টানতে শুরু করলো কিশোর, পানিতে নামানোর জন্যে। বেজায় ভারি। বললো, নাহ! নামানো যাবে না! বলে একটা মুহূর্তও আর দেরি না করে গিয়ে পানিতে ঝাঁপ দিয়ে পড়লো। কিছুই বুঝতে না পেরে মুসাও নামলো তার সঙ্গে। সাগরের হাসিও নামলো।
বিমানটার দিকে সাঁতরাচ্ছে কিশোর। পাশে চলে এলো মুসা আর সাগরের হাসি। কিশোরের চেয়ে ভালো সাঁতরায় মুসা, তার চেয়েও অনেক ভালো সাগরের হাসি, একেবারে মাছের মতো। মুসা জিজ্ঞেস করলো, কি করবে?
নোঙরের দড়িটা কেটে দিতে হবে! হাঁপাতে শুরু করেছে কিশোর। মুসা, জলদি!
আমি যাচ্ছি, বলেই গতি বাড়িয়ে দিলো সাগরের হাসি। পানির ওপর দিয়ে পিছলে চলে যেতে লাগলো যেন। অনেক পেছনে পড়ে গেল মুসা আর কিশোর।
একশো গজ দূরে রয়েছে বিমানটা। কিশোরের মনে হলো, কয়েক মাইল। জাহাজটার আগে সে কিছুতেই পৌঁছতে পারবে না, বুঝে গেছে। মুসাও না। সাগরের হাসিই এখন একমাত্র ভরসা। ওরা অর্ধেক যাওয়ার আগেই পৌঁছে গেল মেয়েটা। নোঙরের দড়ি বেয়ে উঠে গেল ওপরে। কোমর থেকে ছুরি টেনে নিয়ে কাটতে শুরু করলো দড়ি। ভোরের রোদে ঝিক করে উঠছে ছুরির ফলা। জাহাজটাও প্রায় পৌঁছে গেছে। ভালো বাতাস পেয়েছে। ফুলে উঠছে সব কটা পাল।
সাগরের দিক থেকে বইছে বাতাস, দড়ি কাটা হয়ে গেল। বিমানটাকে ঠেলে নিয়ে আসতে লাগলো তীরের দিকে। নাক ঘোরাতে শুরু করলো হোয়াইট শার্ক। ধাক্কা মারবেই, যে করেই হোক।
তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে কিশোর। ঝড়ের গতিতে চিন্তা চলছে মগজে। কিছু একটা করা দরকার, কিছু একটা...আবার সাঁতরাতে শুরু করলো সে বিমানের দিকে। জাহাজের ধাক্কা খাওয়ার ঝুঁকিকে অগ্রাহ্য করে চলে এলো বিমানের কাছে। নোঙরের দড়িটা চেপে ধরলো। মুসাকে বললো, ধরো! দড়িটা ছেড়ে দিয়েই হাত বাড়িয়ে ধরে ফেললো একটা উইং ফ্লোট। যেগুলোর ওপর ভর করে পানিতে ভেসে থাকে ফ্লাইং বোট। একপাশে কাত হয়ে গেল বিমান। পরোয়াই করলো না

সে। মুসা দড়ি ধরেছে কি না সেটাও দেখতে গেল না। ফ্লোট থেকে এক ডানার ওপরে চড়লো। নাকের ওপর বসে জাহাজটার দিকে অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে সাগরের হাসি। কি করবে বুঝতে পারছে না। ডানার ওপর দিয়ে দৌড় দিলো কিশোর। মেয়েটাকে চুপ করে বসে থাকতে বললো। পিঠের ওপর দিয়ে পার হয়ে এসে নামলো আরেক ডানায়। চলে এলো ডানার একেবারে প্রান্তে। ওদিক দিয়েই এগোচ্ছে স্কুনারটা। লোহায় বাঁধানো গলুইয়ের একটা ধাক্কা লাগলেই চুরমার হয়ে যাবে ফ্লাইং বোট। ইঞ্জিন স্টার্ট দিতে পারলে সরিয়ে নেয়া যেতো, কিন্তু সময় নেই। কারনেসও বুঝতে পারছে সেটা। হুইল ধরে দাঁড়িয়েছে। মুখে কুৎসিত হাসি। নিশ্চিত হয়ে গেছে, তারই জিৎ হবে।

তবে একটা ব্যাপার সে জানে না, যেটা কিশোর জানে। উইং ফ্লোটের ওপর খুব হালকা হয়ে ভাসে ফ্লাইং বোট। একটা বাচ্চা ছেলেও টেনে ওটাকে সহজেই সরিয়ে ফেলতে পারে। তবে কোনো কিছুর ওপর দাঁড়িয়ে। দাঁড়ানোর মতো সেরকম কোনো জায়গা পায়নি কিশোর। তাই বিমানের ওপরই দাঁড়িয়েছে।

নোঙরের দড়ি ধরে রেখেছে মুসা। কিশোরের উদ্দেশ্য বুঝে ফেলেছে। ধাক্কা দেয়ার আগেই দু হাত বাড়িয়ে স্কুনারের গলুইয়ের নিচেটা ধরে ফেলতে চায় কিশোর। তাহলে আর বিমানের গায়ে ধাক্কা লাগবে না। জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে বিমানটাও সরতে থাকবে।

দুরুদুরু করছে কিশোরের বুক। আতঙ্কিত চোখে তাকিয়ে রয়েছে গলুইয়ের নিচের লোহাবাঁধানো জায়গাটার দিকে। ঠেকাতে পারবে তো? চট করে তাকালো একবার জাহাজের নোঙরটার দিকে। কাদা লেগে রয়েছে। পানি ঝরছে ফোটা ফোটা। বলা যায় না, রেগে গিয়ে ওটা তার মাথার ওপরে ছেড়ে দিতে পারে কারনেস।

দুই পা ফাঁক করে শক্ত হয়ে দাঁড়ালো কিশোর। এসে গেছে গলুই। ধাক্কা প্রায় লাগে লাগে এই সময় হাত বাড়িয়ে ধরে ফেললো গলুইয়ের নিচের অংশ। প্রচন্ড একটা ঝাঁকুনি লাগলো। পলকের জন্যে মনে হলো তার, পায়ের নিচ থেকে পিছলে সরে যাচ্ছে বিমানের ডানা। দুলুনিতে পড়ে যাচ্ছিলো সে আরেকটু হলেই। কোনোমতে সামলে নিয়ে জোরে এক ঠেলা মারলো জাহাজের গায়ে। জাহাজ সরলো না, সেটাকে সরানোর চেষ্টাও করেনি সে, পায়ের ধাক্কায় বিমানটাই বরং সরলো। এবার আর তাল সামলাতে পারলো না কিশোর। মাথা নিচু করে পড়ে গেল পানিতে ঝাঁ ঝাঁ করে উঠলো কানের ভেতর। বিশাল একটা ছায়া উঠে আসছে মাথার ওপরে। ডাইভ দিয়ে নিচে নেমে যেতে লাগলো সে। বাতাসের জন্যে আকুলি-বিকুলি করছে ফুসফুস। ফেটে যাবে যেন। কিন্তু ওঠার উপায় নেই। জাহাজের তলায় বাড়ি লেগে ছাতু হয়ে যাবে খুলি। হাত-পা ছোড়াছুঁড়ি করে ছায়াটার নিচ থেকে সরে আসার আপ্রাণ চেষ্টা চালালো সে। সে সরলো, না

ছায়াটাই সরলো, বলতে পারবে না। সুযোগ পেয়েই উঠতে শুরু করলো ওপরে। যখন মনে হলো, আর টিকবে না ফুসফুসটা, ঠিক ওই মুহূর্তে ভুস করে মাথাটা ভেসে উঠলো ওপরে। হাঁ করে শ্বাস টানতে শুরু করলো সে।
দীর্ঘ কয়েকটা সেকেন্ড একভাবে ভেসে থেকে বাতাস টানলো সে। শক্তি ফিরে এলো খানিকটা। মুখ ঘুরিয়ে তাকালো বিমানটার কি হয়েছে দেখার জন্যে। স্পষ্ট হয়নি এখনও দৃষ্টি। আবছা ভাবে দেখলো, তার দিকে সাঁতরে আসছে সাগরের হাসি। তীরের দিকে বিমানটাকে টেনে নিয়ে চলেছে মুসা। মুসার মুখটা দেখা যাচ্ছে ককপিটের জানালায়। স্টার্ট নিয়েছে ইঞ্জিন। তীরে দাঁড়িয়ে আছে ওমর আর ডজ। দুজনের হাতেই পিস্তল।
চলতে শুরু করলো বিমান।
ওটাকে ধরতে পারবে না বুঝেই যেন সমস্ত আক্রোশ কিশোর আর সাগরের হাসির ওপর এসে পড়লো কারনেসের। জাহাজের নাক ঘোরালো ওদের দিকে। মেরেই ফেলবে। গুলি আরম্ভ করলো ওমর আর ডজ। কিন্তু হুইল হাউসে কারনেসের গায়ে লাগাতে পারলো না একটা গুলিও।
বিমানটাও ছুটে আসছে।
কিশোরের হাত ধরে টান মারলো সাগরের হাসি। ডুব দাও! বলেই ডুব মারলো সে। কিশোরও ডুব দিলো। সাঁতরে চললো তীরের দিকে। কোনোমতে অল্প পানিতে চলে যেতে পারলেই হয়, যেখানে পৌঁছতে পারবে না জাহাজ। আবার যখন বাতাসের জন্যে তাগাদা দিতে লাগলো ফুসফুস, তখন ভাসলো। দেখলো, অনেকটা সরে এসেছে জাহাজের কাছ থেকে। আবার দিলো ডুব। আবার ভাসলো। আর ডুবলো না। নিরাপদ জায়গায় চলে এসেছে। এখানে আর পৌঁছতে পারবে না স্কুনার। আর পারলেও ধরতে পারবে না ওকে।
তীরের অনেক কাছাকাছি চলে গেছে সাগরের হাসি। দৌড়ে আসছে ঝিনুক। পানির কিনারে এসে একটা মুহূর্ত থমকালো। দেখলো পুরো অবস্থাটা। তারপর নেমে পড়লো পানিতে কিশোরকে সাহায্য করতে এগোলো।
ফ্লাইং বোট নিয়ে উড়াল দিলো মুসা।
তীরে উঠে ধপাস করে বালিতেই বসে পড়লো কিশোর। থু থু করে মুখ থেকে ছিটিয়ে ফেললো নোনা পানি আর বালি।
নাক ঘুরিয়ে ফেলেছে স্কুনাটা। আর কিছু করার নেই, বুঝে গেছে কারনেস। ফিরে যাচ্ছে খোলা সাগরে।
জাহাজটা বেরিয়ে যাওয়ার পর লেগুনে নামলো আবার মুসা।
জিরিয়ে নিয়ে কাপড় পরে ডজ আর ওমরের সঙ্গে নাস্তা সেরে নিলো কিশোর ও মুসা। তারপর বিমানে করে রওনা হলো ডজ আইল্যান্ডের উদ্দেশে। ঝিনুক আর

সাগরের হাসিকেও নেয়া হয়েছে সঙ্গে। এতোগুলো মানুষ নিয়ে আকাশে উড়তে বেশ কষ্টই হলো ফ্লাইং বোটের। তবে যেটুকু অসুবিধে হয়েছে, তা ওঠার সময়। ওপরে উঠে আর কিছু হলো না। উড়ে চললো নিরাপদেই।
দশ মিনিটের মধ্যেই নজরে এলো ডজ অ্যাইল্যান্ড।
দ্বীপের লেগুনে বিমান নামালো ওমর। দক্ষিণ সাগরের অনেক দ্বীপেরই লেগুন দেখেছে কিশোর আর মুসা। তবে এটার মতো এতো সুন্দর আর দেখেনি। ওদের দিকে তাকিয়ে হাসলো কিশোর। জীবনে এই প্রথম প্লেনে চড়েছে ওরা। দারুণ খুশি। গড়গড় করে কি যেন বললো আঞ্চলিক ভাষায়। কয়েকটা শব্দ শুধু বুঝলো কিশোর আর মুসা। ডজকে জিজ্ঞেস করলো, কি বলেছে।
ওরা বলছে, ডজ জানালো। বিদেশী মানুষের কাজকারবারই আলাদা। এমন কোনো মজার কান্ড নেই, যা তারা করতে পারে না। বাক্সের ভেতর থেকে গান বের করে দিতে পারে। ক্যানুতে ডানা লাগিয়ে আকাশে উড়তে পারে।
হাসলো দুই গোয়েন্দা। এসব কথায় কান দিচ্ছে না ওমর। সে তখন নোঙরের জায়গা খুঁজছে। বিমানের উইং ফ্লোট চিরে দিচ্ছে যেন লেগুনের শান্ত পানিকে, লাঙল দিয়ে মাটি ফাড়ার মতো করে। বিশাল ঢেউ উঠছে। এখানেই রাখলাম, কি বলো? ডজের দিকে তাকালো সে।
রাখো, যেখানে খুশি, ডজ বললো।
ক্যাম্পের কাছাকাছি রাখাই ভালো। চোখের আড়াল করা উচিত না। একবার করেই তো শিক্ষা হয়েছে।
ওই যে ওই নারকেল গাছগুলোর কাছাকাছি নিয়ে রাখো। তীরের কাছেও পানি বেশ গভীর। প্লেন থেকেই লাফ দিয়ে ডাঙায় নামতে পারবো। জুতো ভেজাতে হবে না। ওই যে, ওটাই আমার কুঁড়ে। নারকেল পাতায় তৈরি ছাউনিটা দেখলো ডজ।
তিনটে মাস থেকেছো ওর মধ্যে! বিড়বিড় করলো ওমর।
থেকেছি। বিল্ডিং আর এখানে পাবো কোথায়।
ডজ যে জায়গাটা দেখিয়েছে ধীরে ধীরে বিমানটাকে সেখানে নিয়ে এলো ওমর। ইঞ্জিন বন্ধ করলো। পানি ওখানে এতো পরিষ্কার, মনে হয় নেইই, অবিশ্বাস্য লাগে। প্রবালের একটা চড়ায় নামলো সে। বললো, এখানেই বাঁধি। জিনিসপত্র নামিয়ে নিয়ে যাবো। যাতে সকালে উঠেই কাজে লেগে যেতে পারি।
চোখা পাথরের মতো বেরিয়ে থাকা এক টুকরো প্রবালে বিমানের দড়ি বাঁধা হলো। ভেসে যাওয়ার ভয় নেই। টান লেগে ছুটবেও না, কারণ সামান্য ঢেউও নেই পানিতে। রসদপত্র আর পেট্রোল তীরে নামানো হলো প্রথমে। তারপর বয়ে আনা হলো ডজের কুঁড়েতে। ঘরটা অতো খারাপ না। মেরামত করে নিলে সবারই জায়গা হয়ে যাবে। সাগরের হাসি আর ঝিনুকও অভিযাত্রীদের কাজে সাহায্য

করলো। অনর্গল বকবক করে যাচ্ছে ওরা আঞ্চলিক ভাষায়। ভালো লাগলো অন্যদের। ছেলেমেয়ে দুটো সহজ করে রেখেছে পরিবেশ। ডাইভিঙের পোশাক আর অন্যান্য সরঞ্জাম বিমানেই রেখে দেয়া হলো। আগামী দিন সকালে কাজে লাগবে ওগুলো।
মুক্তো খেতটা কোনদিকে? ওমর জানতে চাইলো।
ওদিকে, হাত তুলে দেখালো ডজ। কাল এই সময়ে অনেক ঝিনুক তোলা হয়ে যাবে আমাদের।
আচ্ছা, একটা কথা, মুসা বললো। ঝিনুক খুলতে যাবে কে? যে রকম বড় বড় বললেন। ঝিনুক খোলা খুব কঠিন।
হাসলো ডজ। ঠিকই। একটা দুটো হলে সম্ভব। কিন্তু আমাদেরকে যতোগুলো তুলতে হবে, অতোগুলো জ্যান্ত অবস্থায় ছুরি দিয়ে খুঁচিয়ে খোলা.. হাত নাড়লো সে। কিছুতেই পারবো না। তুলে এনে সৈকতে ছড়িয়ে রাখতে হবে, পচানোর জন্যে। ঝিনুক মরে গেলে আপনা আপনি ডালা ফাঁক হয়ে যাবে।
এতো ঝিনুক পচে নিশ্চয়ই খুব গন্ধ বেরোয়? ওমর জানতে চাইলো।
খুব মানে? ভয়াবহ! এতো দুর্গন্ধ পৃথিবীতে আর কিছুর আছে কি না জানি। তবে ভয় নেই। আমরা ওগুলোকে ফেলবো দ্বীপের একধারে, বাতাস যেদিকে বইবে তার উল্টো দিকে। তাহলেই আর গন্ধ লাগবে না।
আলোচনা আর খাবার তৈরি একসাথে চললো। তারপর খেতে বসলো ওরা। তখুনি একবার মুক্তো খেত দেখতে যেতে চাইলো কিশোর। ওমর রাজি হলো না। বললো, প্লেনটা একবার পরীক্ষা করে দেখবে। যাতে পরে কোনো বিপদ না ঘটায়। আর ক্যাম্পেও সব কিছু গোছগাছ করা দরকার। ডজ বললো, সে ডুবুরির পোশাক আর সরঞ্জামগুলো পরখ করবে। তাকে সাহায্য করতে চাইলো মুসা।
আপাতত কিশোরের কিছু করার নেই। সে সাগরের হাসি আর ঝিনুককে নিয়ে চললো লেগুন দেখতে। ওটা কেমন, ভাবতে একটা শব্দই শুধু মাথায় এলো তার পরীর রাজ্য। রঙের বাহার অভিভূত করে ফেললো তাকে। স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ পানিতে গাঢ় নীল আকাশের ছায়া পড়ে পানিকেও নীল করে তুলেছে। এর পটভূমিতে নারকেলের ঘন সবুজ পাতাকে লাগছে ছবির মতো। পানিতে সাঁতার কাটছে হাজার রকমের মাছ। কোনোটা ছোট, কোনোটা বড়। রামধনুর সমস্ত রঙই রয়েছে ওগুলোর শরীরে। যেমন রঙ তেমনি ছটা। রীফের গায়ের কাছে এখানে ওখানে দেখা যাচ্ছে প্রবালের ছড়াছড়ি। সূর্য রশ্মি তেরছা ভাবে এসে পড়েছে তার ওপর। কোথাও কোথাও এমন লাগছে, মনে হচ্ছে মেঘ করেছে পানির তলায়। কোথাও তুষার-শুভ্র প্রবাল পাথরের বিশাল চাইয়ের মতো মাথা তুলেছে পানির ওপরে, ভাসমান বরফখন্ড ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না

ওগুলোকে। লেগুনের নিচেটা যেন রূপকথার এক রহস্যময় জগৎ। প্রবালের বিচিত্র আকার, আজব চেহারা। রঙও তেমনি। লালই আছে কয়েক রকম। ঘন লাল, রক্ত লাল, টুকটুকে লাল, ফ্যাকাসে লাল, গোলাপী। আছে নীল, সবুজ, হলুদ। মোট কথা একজন শিল্পীর তুলি দিয়ে যতগুলো রঙ তৈরি করা সম্ভব, সবই আছে এখানে। অসাধারণ সুন্দর। জ্যান্ত উদ্ভিদের মতো লাগছে গোলাপী আর আশমানি রঙের প্রবালের ডালপালা। কোনোটা বড় পাতার মতো দেখতে, কোনোটা কৌণিক, কোনটা আবার বিশাল ব্যাঙের ছাতার মতো। সে-এক উজ্জ্বল পৃথিবী। কোথাও কোনো অসামঞ্জস্য নেই। কঠিন অথচ দেখতে লাগে কোমল। সব কিছুতেই যেন জাদুর পরশ। অবিশ্বাস্য! এই সুন্দরের মাঝে দুই ফুট লম্বা একটা শুঁয়াপোকার মতো জীবকে বুকে হেঁটে এগোতে দেখে গায়ে কাঁটা দিলো কিশোরের। মনে পড়ে গেল ডজের কথা, সৌন্দর্য আর কদর্যের ঠাই এখানে পাশাপাশি।

জীবটাকে দেখে কিশোরের মুখ বিকৃত করে ফেলা নজর এড়ালো না সাগরের হাসির। ঝাঁপ দিয়ে পড়লো সে পানিতে। স্বচ্ছন্দে ডুবে গেল পানির তলায়। তুলে নিয়ে এলো জীবটাকে। কিশোরের চেহারা দেখে খিলখিল করে হাসলো। ওটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উঠে এলো ওপরে। কুকুরের মতো গা ঝাড়া দিয়ে শরীর থেকে পানি ফেলছে।

কিশোর অনুমান করলো দ্বীপটা তিন কি চার মাইল লম্বা। পাশে একেবারেই কম, মাত্র কয়েকশো গজ। তা-ও সব চেয়ে চওড়া অংশটায়। লেনের দিকটায় হ্রদের পানির মতোই শান্ত পানি, কিন্তু সাগরের দিকটায় ঢেউ আছড়ে ভাঙছে ভীমবেগে। হাজারো বজ্রের আওয়াজ তুলে ফাটছে পানির পর্বত, অনবরত পানি ছিটাচ্ছে বৃষ্টির মতো। প্রবালের ওপর এসে জমা হয়েছে হাজারে হাজারে ঝিনুকের খোসা, সাগরে যতো রকম আর আকারের থাকতে পারে সব রকম-কিশোরের অন্তত তা-ই মনে হলো। আছে মাছের কঙ্কাল। বড় বড় দাঁতও পড়ে থাকতে দেখা গেল। সেগুলো কোন জীবের বুঝতে পারলো না সে। তবে যারই হোক, সে-যে দৈত্যাকার প্রাণী, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ঢেউ আসছে, আর সঙ্গে করে বয়ে আনছে ওসব।

দ্বীপে উদ্ভিদের প্রজাতি তেমন বেশি নেই। এসব অঞ্চলের প্রধান যে গাছ, নারকেল, তা আছে প্রচুর পরিমাণে। পানির ধার ঘেঁষেও জন্মেছে অনেক। ওপরের উঁচু দিকটায় জন্মেছে ঘন সবুজ ঘাস। কিছু অচেনা ঝোঁপ হয়ে আছে, তাতে উজ্জ্বল রঙের ফুল ফুটেছে। সব চেয়ে উঁচু জায়গাটাও পানির সমতল থেকে পঁচিশ ফুটের বেশি উচু হবে না। হারিকেনের সময় নিশ্চয় ওখানেও পানি

উঠে যায়। নোনা পানির এই অত্যাচারের কারণেই এসব অঞ্চলে উদ্ভিদ তেমন জন্মাতে পারে না।
ডাঙায় জীবনও অনেক কম, পানির তুলনায় প্রায় শূন্য বললেই চলে। যারা আছে তারাও বেশির ভাগই পানির জীব। বালিতে ঋষি কাঁকড়ার ছড়াছড়ি, হাজারে হাজারে, অদ্ভুত খোলাওলো বিচিত্র শব্দ করে বন্ধ করছে, আবার খুলছে। পাথরের ওপর নুড়ি পড়লে যেরকম আওয়াজ হয়, বন্ধ করার শব্দটা অনেকটা তেমন। এছাড়া আছে কিছু সামুদ্রিক পাখি।
বিকেলের দিকে ভাটায় যখন টান পড়লো, আশ্চর্য রকম নীরব হয়ে গেল তখন পরিবেশ। কেমন যেন গায়ে লাগে সেই নীরবতা। অসহ্য মনে হয়। বিষন্ন করে দেয় মন। সাংঘাতিক নিঃসঙ্গ মনে হলো নিজেকে কিশোরের। এখানে তিনটে মাস একা একা থাকলে কি করে ডজ! পাগল যে হয়নি এটাই যথেষ্ট। অস্বাভাবিক মনের জোর আর সহ্য ক্ষমতা তার। কিশোর হলে পারতো না। অনেকে তো সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যাই করে বসে। তাড়াতাড়ি ফিরে এলো সে অন্যদের কাছে। সবাই কেমন যেন চুপচাপ হয়ে আছে। পরিবেশের চাপ ওদের ওপরও পড়েছে, বোঝা যায়। এমনকি সাগরের হাসি আর ঝিনুকও অগ্নিকুন্ডের দিকে তাকিয়ে ঝিম মেরে রয়েছে।
অবশেষে নীরবতা ভাঙলো ওমর, কিশোরের দিকে তাকিয়ে বললো, পাহারায় থাকতে হবে। কারনেসকে বিশ্বাস নেই। প্রথম পালা তোমার।
ঠিক আছে, বস, পরিবেশটাকে হালকা করার জন্যে হেসে নাটকীয় ভঙ্গিতে বললো কিশোর। আগুনের দিকে তাকিয়ে আনমনে মাথা নাড়তে নাড়তে বললো, মনে হচ্ছে, এই পৃথিবীতে নেই আমরা, অন্য কোনো গ্রহে চলে গেছি! আশ্চর্য! আগেও তো দক্ষিণের দ্বীপে এসেছি, আটকা পড়েছি, পানির অভাবে মরতে বসেছি, তখন তো এরকম লাগেনি!
লাগেনি, ডজ বললো। তার কারণ, তখন বাঁচার জন্যেই ব্যস্ত ছিলে। চুপ করে বসে থাকার সময়ই ছিলো না। ফলে বিষন্নতাটা টের পাওনি। যে কোনো জায়গাতেই থোক, বাড়িতেও, কাজকর্ম না থাকলে, শুধু শুধু বসে থাকতে হলে মন খারাপ হয়ে যায়।
আস্তে ঘাড় নাড়লো কিশোর। হ্যাঁ, তা বটে।
কাঁকড়ার যন্ত্রণায় রাতে ভালো ঘুমোতে পারেনি কিশোর। ঘরের মধ্যে এসে ঢুকেছে ওগুলো, বার বার গায়ের ওপর উঠেছে। মুসা আর ওমরের ঘুম ভেঙেছে ওগুলোর জ্বালায়। তবে ডজ, সাগরের হাসি আর ঝিনুকের কিছু হয়নি। ওদের অভ্যেস, হয়ে গেছে।

ঝিনুক তুলতে যাওয়ার জন্যে ফ্লাইং বোটে চড়লো ওরা। সকালটা বেশ ভালো। ওরকম একটা কাজে যাওয়ারই উপযুক্ত। এমনকি খোলা সাগরও শান্ত।
ট্যাক্সিইং করে চললো ওমর। পাশে বসে নির্দেশ দিতে লাগলো ডজ, কোনদিক দিয়ে যেতে হবে। বাইরে যদিও ঢেউ প্রায় নেই, তবু লেগুনে ঢোকার মুখটায় জোয়ারের পানি ঢোকার তীব্র স্রোত রয়েছে। বিমানটাকে এগোতে বাধা দিচ্ছে। তবে ঠেকাতে পারলো না। কারণ দুটো এঞ্জিন রয়েছে। তাছাড়া ওটার উইং ফ্লোটগুলো পানিতে তেমন ডোবে না। কামড় বসাতে পারলো না পানি। নৌকা-টৌকা হলে অবশ্য অন্য কথা ছিলো।
খোলা সাগরে বেরোতেই হাত তুলে একটা দিক নির্দেশ করলো ডজ, ওদিকে যেতে হবে। ওড়ার দরকার নেই। সাগর যে রকম শান্ত, এভাবেই চালিয়ে চলে যাওয়া যাবে। তবে প্রবালের দেয়াল-টেয়াল আছে কি না লক্ষ্য রাখতে হবে। এসব সাগরে ওসবের বিশ্বাস নেই। কোথায় যে পানির তলায় ঘাপটি মেরে থাকে, কিছু বোঝা যায় না। এমনিতে মনে হবে শুধু পানি, কিন্তু ফুটখানেক নিচেই হয়তো রয়েছে দেয়াল। লাগলে ফ্লোটের বারোটা বেজে যাবে।
জানালার পাশে বসে দেখছে কিশোর। সাগরের ওপর দিয়ে এভাবে ট্যাক্সিইং করে ছুটে যেতে দারুণ লাগছে তার। জাহাজ কিংবা স্পীড বোট এতো জোরে ছুটতে পারে না। কোথাও কোনো বাধা নেই। শুধুই ছুটে চলা। আনন্দে বেসুরো গলায় গানই গেয়ে উঠলো সে।
পনেরো মিনিট একটানা সামনে ছুটলো ওমর। তারপর গতি কমাতে বললো ডজ। তার মনে হলো জায়গাটার কাছে পৌঁছে গেছে। চেনার মতো কোনো চিহ্ন নেই। কয়েকশো গজের মধ্যে চলে এলেও বোঝার উপায় নেই। সাগরে এমনকি যন্ত্রের রিডিংও সঠিক হয় না। গড় কিংবা প্রায় ধরে নিতে হয়।
গতি একেবারে কমিয়ে ফেললো ওমর। ডজকে জায়গাটা খুঁজে বের করার সুযোগ দিলো।
বেশ কিছুক্ষণ খোঁজাখুজি করলো। বের করতে না পেরে বললো, আশপাশে থাকতে পারে। এক কাজ করো। গতি এরকমই থাক। চক্কর দিতে শুরু করো তো।
যে ভাবে যা করতে বলা হলো, সে ভাবেই করতে লাগলো ওমর। সব কটা চোখ এখন পানির দিকে। সাগরের তল খুঁজছে।
দেখি, রাখ তো এখানে, ডজ বললো ওমরকে। ভাসুক। পেট্রোল খরচ বাঁচবে। ডজ আইল্যান্ড দেখা যায় ওখান থেকে। সেটার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে খেতটা কোন জায়গায় হতে পারে বোঝার চেষ্টা করতে লাগলো। এখানেই আছে কোথাও। মুশকিলটা হলো, এখন সাগর শান্ত। আমি দেখেছি ঢেউয়ের সময়। এখন ডুব দেয়া সহজ বটে, কিন্তু জায়গাটা খুঁজে বের করা কঠিন।

স্টার্ট বন্ধ করলো না ওমর, তবে গতি বন্ধ করে দিলো। সাগরের ওপর ভেসে রইলো ফ্লাইং বোট। একটু একটু করে সরছে। পেরিয়ে গেল কয়েকটা নীরব মুহূর্ত। এখনও সব কটা দৃষ্টি পানির দিকে, সাগরের তল খোঁজায় ব্যস্ত।
আমাদের এই কান্ড দেখলে এখন, হেসে বললো মুসা। পাগল বলতো লোকে। ফ্লাইং বোটে বসে সাগরের দিকে এভাবে তাকিয়ে থাকা। হাহ হাহ।
হ্যাঁ, ওমরও হাসলো।
তোমাদের সন্দেহ হচ্ছে মনে হয়? ভুরু কোঁচকালো ডজ। এখানে নেই ভাবছো নাকি?
না না, তা ভাবছি না। তবে যে রকম করে খুঁজছি আমরা সেটা হাস্যকর।
এই দেখ, ওটা কি? আচমকা চিৎকার করে উঠলো কিশোর। কি যেন দেখলাম মনে হলো!
কিশোরের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলো সাগরের হাসি। বললো, আমি দেখে আসি। বলেই খুব সামান্য একটা ঢেউয়ের আঙটি তৈরি করে ডুবে গেল গানিতে।
অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। কয়েক মুহূর্ত একই জায়গায় থেকে মুখ নিচু করে নিচের দৃশ্য দেখলো সাগরের হাসি। তারপর ডুবতে শুরু করলো। মাছ যেভাবে আস্তে আস্তে পাখনা দোলায় অনেকটা তেমনি করে পা দোলাচ্ছে মেয়েটা। পানি এতো পরিষ্কার, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ওকে। এক ঝাঁক মাছ চলে গেল ওর শরীরের ওপর দিয়ে। অদৃশ্য হয়ে গেল সাগরের হাসি। আর ওঠে না। ভয়ই পেয়ে গেল কিশোর। সাগরের এই মাঝখানে কিছু হলো না তো তার!
সাগরের হাসিকে আবার ভেসে উঠতে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো কিশোর। মাথা তুললো মেয়েটা। হাতটা তুলে দেখালো। মস্ত একটা ঝিনুক নিয়ে এসেছে। নাক উঁচু করে দম নিতে লাগলো। শিসের মতো শব্দ বেরোতে লাগলো নাক দিয়ে। এই শব্দের সঙ্গে পরিচিত হয়ে গেছে কিশোর, অনেকক্ষণ পানির নিচে ডুব দিয়ে এসে এভাবেই দম নেয় দক্ষিণ সাগরের উভচর মানুষগুলো।
মেয়েটার হাতে ঝিনুক দেখে আনন্দে চিৎকার করে উঠলো ডজ। ওই তো! পেয়েছে, পেয়েছে! সাগর এখানে বেশি হলে একশো ফুট গভীর। কেন দেখা যাচ্ছে বুঝতে পারছি। সূর্য অনেক নিচুতে রয়েছে। খাড়া রোদ না পড়লে দেখা যাবে না তল। আমি যখন দেখেছি, তখন ঠিক দুপুর, মাথার ওপরে ছিলো সূর্য।
হ্যাঁ, এটা ঠিক বলেছে, একমত হয়ে মাথা দোলালো ওমর।
ঝিনুকটা বিমানের ভেতরে ছুঁড়ে দিয়ে বেয়ে উঠে এলো সাগরের হাসি। উত্তেজিত কণ্ঠে মারকুইজান ভাষায় দ্রুত কিছু বললো ডজকে। নিচের দিকে দেখাতে লাগলো।

ও বলছে, অনুবাদ করে বললো ডজ। সাগরের তলা এখানে পাহাড়ের ঢালের মতো নেমে গেছে। আর ওদিকটায় গভীরতা কম। আমি যা ভেবেছিলাম। আসলে সাগরের তল নয় এটা, একটা ডুবো পর্বতের চূড়া। ওমর, ওদিকটায় নিয়ে যাও।
চালাতে শুরু করলো ওমর। ফ্লাইং বোটটাকে নিয়ে এলো ডজের নির্দেশিত স্থানে।
হ্যাঁ, হ্যাঁ, রাখো এখানেই! চেঁচিয়ে বললো ডজ। তল দেখতে পাচ্ছি। ওই তো! বলেছিলাম না? পানি বেশি হলে বিশ-তিরিশ ফুট হবে!
অন্যেরও তাকিয়ে দেখলো, ঠিকই বলছে ডজ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে সাগরের তল। অসংখ্য ঝিনুক ছড়িয়ে আছে, ডালা ফাঁক করা।
দেরি করলো না ডজ। ডাইভিং স্যুট পরতে আরম্ভ করলো। তার দিকে তাকিয়ে মুসাও উসখুস করে উঠলো ওই পোশাক পরে ডুব দেয়ার জন্যে। কাজটা বিপজ্জনক, তার পরেও আনন্দ পায় সে। খুব ভালো ডুবুরি মুসা। কানে বাজছে ওস্তাদের কণ্ঠস্বর, অনেকে পেশা হিসেবে নেয় কাজটাকে। ভয়ানক বিপজ্জনক পেশা। দুনিয়ার কোনো বীমা কোম্পানিই ডুবুরির জীবন বীমা করতে রাজি নয়। কারণ যে কোনো মুহূর্তে যা খুশি ঘটে যেতে পারে তার।
ঠিক যেন সেই ওস্তাদের কথাগুলোই নকল করে বলতে লাগলো ডজ, মুসার সেরকমই মনে হলো, বিপদে পড়াটা এখানে কিছুই না। অনেক ব্যাপার আছে। সেগুলো এখন কোনোটাই মনে করতে চাই না। তবে একটা কথা না বলে পারছি না। বাথটাবের মতো বড় বড় ঝিনুক আছে সাগরে, এখানটায়ও থাকতে পারে। টন খানেক ওজন হবে। ডালা ফাঁক করে ছড়িয়ে পড়ে থাকে অনেক সময়, শিকার ধরার জন্যে। ওটার মধ্যে পা পড়লে আর রক্ষা নেই। ঝট করে বন্ধ হয়ে যাবে ডালা। টেনে খোলা অসম্ভব। কপাল ভালো হলে তখন ডাইভারের কোনো একজন সঙ্গী গিয়ে যদি পা কেটে আলাদা করে তুলে আনতে পারে। আর কোনো উপায় নেই। সাগরের হাসি আর ঝিনুককে দেখিয়ে বললো, ওরা এসেছে, খুব ভালো হয়েছে। ওরকম অবস্থায় পড়লে কি করতে হবে জানে। দুজনের সঙ্গে কথা বললো সে। একটা করে হাতকুড়াল তুলে দিলো ওদের হাতে। মাথা ঝাঁকাল দুজনেই। হাসি হাসি ভঙ্গিটা দূর হয়ে গেছে মুখ থেকে।
এসব কথা কিশোরেরও জানা আছে। সে আর রবিনও মুসার সাথে একই সময়ে ট্রেনিং নিয়েছে। তবে মুসা জাতসাঁতারু, ওরা নয়। কিছুদিন দক্ষিণ সাগরের কোনো দ্বীপে মুসাকে রেখে দিলে সে-ও ঝিনুক কিংবা সাগরের হাসির সঙ্গে সমানে পাল্লা দিতে পারবে।
সংকেতগুলো মনে আছে তো? কিশোর, মুসা আর ওমরের দিকে তাকিয়ে বললো ডজ। ঈশ্বর যেন সেরকম অবস্থায় না ফেলেন! দড়িতে চারটে টান দিলে বুঝতে হবে, ভয়ানক বিপদে পড়েছি। যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব তখন দড়ি টেনে তুলে

আনতে হবে। ওরকম করার প্রয়োজন সাধারণত পড়ে না, দশ লাখে একবার হয়তো পড়তে পারে, আমি যদ্দুর জানি। তবু, ওই একটা বার আমার কপালেও ঘটতে পারে। টানতেই থাকবে, দড়ি ছিড়ে যায় যাক, তবু থামবে না। তবে সংকেত না পেলে কক্ষণো ওরকম করবে না, বুঝলে? শেষ কথাটা ওমরের দিকে তাকিয়ে বললো সে।

হ্যাঁ, বুঝেছি, শান্তকণ্ঠে বললো ওমর।

বেশ। এবার আমাকে সাজিয়ে দাও, এই কথাটা কিশোর আর মুসাকে উদ্দেশ্য করে বললো ডজ।

ডাইভিং স্যুটের বেল্ট বাঁধতে তাকে সাহায্য করলো দুই গোয়েন্দা। সব শেষে হেলমেটটা মাথায় গলিয়ে সকেটে বসিয়ে দিলো। নাটগুলো টাইট করে দিলো দুজনে। বেজায় ভারি পোশাক। পা টেনে টেনে এগোলো ডজ বিমানের দরজার পাশে ঝুলিয়ে রাখা মইয়ের দিকে, ওটা বেয়েই নামতে হবে।

নেমে গেল নিচে। পানিতে মাথা ডোবানোর আগে এক মুহূর্ত থেমে ওপরের দিকে তাকালো। হেলমেটের কাচের ঢাকনার ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে তার মুখ। হাসলো। তারপর ডুবে গেল। ডাইভিং স্যুটের সঙ্গে যুক্ত এয়ারপাম্পের হ্যান্ডেল ঘোরাতে শুরু করে দিয়েছে মুসা। কিশোর ছাড়ছে লাইফ লাইন। স্কুবা ডাইভিঙে যেসব পোশাক ব্যবহার হয়, ওগুলোতে এতো সব ঝামেলা করতে হয় না। তবে ওগুলো নিয়ে বেশি দূর যেমন নামাও যায় না, বেশিক্ষণ ডুবেও থাকা যায় না পানিতে। কারণ পিঠে বাধা অক্সিজেন সিলিন্ডারে থাকে সীমিত অক্সিজেন। আর নিজের দায়িত্বে ঘুরে বেড়ায় ডুবুরি। কিছু ঘটলে বাইরের কেউ জানতে পারে না তার কিছু হয়েছে।

মিনিটখানেক পরে দড়ি হঠাৎ ঢিল হয়ে যাওয়ায় বোঝা গেল তলায় পৌঁছেছে ডজ। ঝিনুকের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালো কিশোর। সঙ্গে সঙ্গে দড়িতে বাঁধা একটা তারের ঝুড়ি নামিয়ে দিলো ছেলেটা, ঝিনুক ভোলার জন্যে। ওর হাতে কুড়াল। তাকিয়ে রয়েছে পানির দিকে।

কয়েকটা মিনিট কেটে গেল। দড়িতে একটামাত্র টান পড়লো।

ঝুড়ি তোলো, নির্দেশ দিলো কিশোর।

তোলা হতে লাগলো। পানির অনেক নিচে থাকতেই দেখা গেল ঝুড়িটা। বিশ-পঁচিশটা বড় বড় ঝিনুকে বোঝাই। কোথায় রাখতে হবে দেখিয়ে দিলো ওমর। কেবিনের মেঝেতে ওখানে ঝিনুকগুলো ঢেলে দিয়ে আবার ঝুড়িটা নিচে পাঠিয়ে দিলো ঝিনুক।

কয়েকবার করে চললো এরকম। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে অনেক ঝিনুক জমে গেল কেবিনে। সেগুলোকে ছড়িয়ে দেয়া হলো মেঝেতে, বিমানের ভারসাম্য সমান

রাখার জন্যে। নইলে একদিকে বেশি কাত হয়ে যাবে। সবচেয়ে কম গভীর জায়গাটা প্রায় খালি করে ফেললো ডজ। তারপর সরে গেল আর একটু গভীরে মাঝে মাঝে ওপর থেকে তাকে দেখা গেল হালকা রঙের প্রবালের ওপর দিয়ে পার হয়ে যাওয়ার সময়। কিন্তু গাঢ় রঙের প্রবালের মাঝে যেখানে অন্ধকার হয়ে আছে, সেখানে থাকলে দেখা যায় না। পানিতে বেশিক্ষণ ডুবে থাকলে, কিংবা গভীর পানিতে থাকলে ডুবুরির রক্তে এক ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটতে থাকে। তখন তাকে তাড়াতাড়ি তোলার চেষ্টা করলে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া হয়। এতে অকল্পনীয় কষ্ট পেয়ে মারা যায় রোগী। তবে ডজ এখন যে গভীরতায় রয়েছে, তাতে সেরকম কিছু ঘটার সম্ভাবনা নেই।

ডজের উঠে আসার ইঙ্গিত পেয়ে হাঁপ ছাড়লো কিশোর। কয়েক মিনিট পর তার মাথা ভেসে উঠলো পানির ওপরে। দুর্বল ভঙ্গিতে মই বেয়ে উঠে এসে মেঝেতে বসে পড়লো সে। তার হেলমেট খুলে নেয়া হলো।

ভালোই তুলেছি, তাই না? ঝিনুকগুলোর দিকে তাকিয়ে বললো ডজ। জিরাতে এলাম।

নিচেটা কেমন? জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

চমৎকার। দুএকটা বিশ্রী খাঁজ আছে অবশ্য। ডাঙার ওপরের পাহাড়েও থাকে ওরকম। তাতে হোঁচট খেয়ে পড়ার সম্ভাবনা আছে। আরেকটা বাজে জিনিস হলো প্রবাল, আকৃতির কোনো ঠিকঠিকানা নেই। লাইফ লাইন আর এয়ার টিউবের ওপর কড়া নজর রাখতে হয়েছে সারাক্ষণ। প্রবালে ঘষা লেগে কিংবা জড়িয়ে গিয়ে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। স্রোতও বেশ জোরেই টানে।

দড়ি প্যাঁচ লাগে নাকি?

লাগে মানে? প্রবালে ওটাই তো বেশি লাগে। সব চেয়ে বড় ভয় এখানে।

ডাইভিং স্যুট খুললো না ডজ। আরেকবার নামার ইচ্ছে। যতগুলো তুলেছি, আরও অতগুলো তুলবো, বললো সে। ঝিনুককে বললো আবহাওয়ার দিকে নজর রাখতে। কারণ কখন বাতাস বইতে আরম্ভ করবে তার ঠিক নেই। ঝিনুকই সেটা ভালো বুঝতে পারবে। সাগরে হঠাৎ ঢেউ উঠলে বিপদে পড়তে চায় না ডজ।

তবে আবহাওয়া পরিবর্তনের কোনো লক্ষণ আপাতত দেখা যাচ্ছে না। আগের মতোই শান্ত রয়েছে সাগর। কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো ডজ। নেমে গেল পানিতে।

পঁয়তাল্লিশ মিনিট পেরোলো। বিমানে যারা বসে আছে তাদের কাছে অনেক দীর্ঘ লাগছে। তবে ঝিনুক তোলার বিরাম নেই। কিছুক্ষণ পর পরই ঝুড়ি ভর্তি করে পাঠাচ্ছে।

অনেক হয়েছে, অবশেষে ঝিনুকের স্কুপের দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করলো ওমর। আর বেশি তুললে বিপদে পড়তে পারি।
বিপদ? বুঝতে পারলো না মুসা।
বাতাস বইতে শুরু করলে আর ঢেউ উঠলে মহাবিপদ হবে। এতো ভার নিয়ে কিছুতেই আকাশে তোলা যাবে না প্লেন। সীসার মতো ভারি হয়ে যাবে, উঠতেই চাইবে না পানি থেকে। বাঁচার তাগিদে তখন ঝিনুক ফেলেও দেয়া লাগতে পারে। এতো কষ্ট করে তুলে এনে ফেলার কোনো মানে হয় না। তার চেয়ে কম রাখাই ভালো। আকাশের দিকে তাকালো সে। আকাশ অবশ্য ভালোই আছে। হঠাৎ খারাপ হবে বলে মনে হয় না। তবে এখানকার আবহাওয়াকে বিশ্বাস না করাই ভালো।
সেটা খুব ভালো করেই জানে কিশোর আর মুসা। আগের বার এখানে এসে হারিকেনের রূপ দেখছিলো ওরা। ভাবলেই পিলে চমকে যায়।
ভাবতে চাইলো না কিশোর। বললো, আর বেশি তুলবেও না। ঘড়ি দেখলো সে। উঠে চলে আসবে। লাইফ লাইনটাকে এমন ভাবে ছুঁলো, যেন বড়শি ফেলে মাছের অপেক্ষায় রয়েছে, ফাৎনায় টান পড়লেই মারবে কষে টান।
আরও কয়েক মিনিট পেরোলো। টেনে তোলার সংকেত আর আসে না। অনেকক্ষণ হলো, কিশোর বললো, আর কোনো ঝিনুকও তো পাঠাচ্ছে না।
কেউ জবাব দিলো না। ধীরে গড়িয়ে চলেছে সময়, মিনিটের পর মিনিট কাটছে। ঘড়ির দিকে তাকালো ওমর। তারপর ইনস্ট্রমেন্ট বোর্ডের দিকে। এক ঘণ্টা হয়ে গেছে। ঘোষণা করার মতো করে বললো।
নড়ছে, বললো কিশোর। দড়িতে টের পাচ্ছি। তবে বেশি না। ঝিনুকের খোলে পা দিলো না তো? বড়গুলোর?
বিমানের পিঠের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে নিচে তাকিয়ে রয়েছে সাগরের হাসি বেশ কিছুক্ষণ যাবৎ কোনো কথা বলছে না। হঠাৎ কোমর থেকে একটানে ছুরিটা খুলে নিয়ে দাঁতে কামড়ে ধরলো। পিছলে নেমে গেল পানিতে। মাথা নিচু করে দ্রুত সাঁতরে নেমে যেতে লাগলো।
চট করে মুসার চোখে চোখে তাকালো কিশোর। দৃষ্টি ফেরালো ওমরের দিকে।
শ্রাগ করলো ওমর। বুঝলাম না কেন ওরকম করলো! নিশ্চয় কোনো কারণ আছে।
খাইছে! প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো মুসা। উঠে আসছে! এতো তাড়াহুড়ো করছে কেন?
ভুস করে পানির ওপরে মাথা তুললো সাগরের হাসি। মুখ থেকে পানি ছিটিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, ফেকি! ফেকি! দুই হাত ছড়িয়ে দিয়ে বললো, অনেক বড়!

ফেকি! খোদা! অকটোপাসের কথা বলছে! ফ্যাকাসে হয়ে গেছে কিশোরের চেহারা। ওমর ভাই, কি করবো? টেনে তোলার চেষ্টা করবো?
ও তো বললো সংকেত না দিলে না টানতে, কঠিন হয়ে উঠেছে ওমরের মুখ।
ভাবভঙ্গিতে আর ভাঙা ইংরেজিতে মেয়েটা জানালো, অকটোপাসের সঙ্গে লড়াই করছে ডজ। সাগরের হাসি তাকে সাহায্য করতে যেতে সাহস করেনি। দড়িতে জড়িয়ে যেতে পারে। আটকে গিয়ে দম আটকে মরবে তখন।
মুসা, থেমো না! কিশোর বললো, পাম্প চালিয়ে যাও! দড়ি টান দিলো সে। একটুও উঠলো না। টানটান হয়ে গেল দড়ি। কাঁপছে, মৃদু।
এভাবে হবে বলে মনে হয় না! উৎকণ্ঠা আর উত্তেজনায় ভারি হয়ে উঠেছে মুসার নিঃশ্বাস। অন্য কিছু করা দরকার!
মিনিটখানেক সময় দিয়ে দেখা যেতে পারে! কিছু করার সিদ্ধান্ত ওমরও নিতে পারছে না। রক্ত সরে গেছে মুখ থেকে। হয়তো তাড়িয়ে দিতে পারবে। প্রয়োজন হলে নিশ্চয় তোলার জন্যে সংকেত দিতো।
হাতটাত সব জড়িয়ে ধরেছে কি না তাই বা কে জানে! কিশোর বললো। হয়তো নড়তেই দিচ্ছে না! জানোয়ার তো না ওগুলো, শয়তানের চেলা!
দাঁড়াও! টেনো না!
মিনিটখানেক কেউ কোনো কথা বললো না। দড়ি ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে কিশোর। মূর্তির মতো।
ঝিনুক, অবশেষে বললো ওমর। নিচে গিয়ে দেখবে কি হয়েছে?
হাত থেকে ঝুড়ির দড়িটা ছেড়ে দিলো ঝিনুক। কোমর থেকে ছুরিটা নিয়ে দাঁতে কামড়ে ধরে ঝাপ দিতে যাবে এই সময় চিৎকার করে উঠলো কিশোর, টানছে!... এক...দুই...তিন... চার! তার মানে টানতে হবে, যতো জোরে পারা যায়! টানতে শুরু করলো সে। একচুল নড়লো না দড়ি। যেন পাথরে আটকে গেছে। ওমরভাই! ঝিনুক! ধরো!
দুজনেই ছুটে এলো তাকে সাহায্য করার জন্যে। কিন্তু তিনজনে মিলে টেনেও এক ইঞ্চি তুলতে পারলো না দড়ি।
ইয়াল্লা! বলে উঠলো ওমর। আর জোরে টান দিলে ছিড়ে না যায়! খসখসে হয়ে উঠেছে তার কণ্ঠ। না টেনে আর কিছু করারও নেই। মুসাকে পাম্প চালিয়ে যেতে বলে আবার টান দিলো দড়িতে। তিনজনে মিলেই টানছে। দড়ি আর নড়ে না।
হবে না, দাঁতের ফাঁক দিয়ে বিড়বিড় করলো কিশোর। বোধহয় পেঁচিয়ে ফেলেছে কোনো কিছুতে। দেখি আরেকবার চেষ্টা করে। সাগরের হাসি, এসো, তুমিও ধরো।
চারজনে মিলে টানতে শুরু করলো। ঘাম বেরিয়ে এসেছে সকলেরই। টানের চোটে একপাশে কাত হয়ে গেছে বিমানটা। তবু এক ইঞ্চি নড়লো না দড়ি। মনে

হচ্ছে ওমরের অনুমানই ঠিক। পেঁচিয়ে গেছে কিছুতে।
সোজা হয়ে দাঁড়ালো ওমর। জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজালো। ও বলেছে যততক্ষণ দড়ি না ছেড়ে, টানতে। ঠিক আছে। হয় সে উঠবে, নয়তো দড়ি ছিড়তে যাচ্ছি আমি। এটাই ওর শেষ সুযোগ! কিশোর যেখানে ধরেছে, তার পেছনের দড়ির অংশটুকু নিয়ে একটা সীটের পায়ায় পেঁচিয়ে বাঁধলো সে। সবাইকে দড়ি ছেড়ে দিতে বলে গিয়ে উঠে বসলো পাইলটের সীটে। থ্রটলে চেপে বসলো আঙুলগুলো। মৃদু ঝিরঝির করে চলছিলো এঞ্জিন, সেটা রূপান্তরিত হলো গর্জনে। সামনে টান দিলো বিমান। ধনুকের ছিলার মতো টানটান হয়ে গেল দড়ি। প্রচন্ড চাপে ডানে কাত হয়ে গেল বিমান। ডানার ডগা পানি ছুঁই ছুঁই করছে। কিন্তু আগে আর বাড়তে পারছে না। শেষে ডানে কেটে, চক্রাকারে ঘুরতে শুরু করলো।
কতোটা দিয়েছেন? চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলো কিশোর।
হাফ থ্রটল।
আরো লাগবে। দড়ি নড়ছে না। চালিয়ে যান।
ভয় লাগছে, প্লেনটাই না উল্টে যায়!
যাবে না। টানুন।
আরও গম্ভীর হয়ে গেল এঞ্জিনের গর্জন।
উঠছে? উঠছে! চিৎকার করে উঠলো কিশোর।
আরো জোর বাড়ালো ওমর। বুনো ঘোড়ার লাগাম পরানো হয়েছে যেন, খেপে গেছে, ওরকম আচরণ করছে বিমান। যেখানটায় ঘুরছে ওটা, সেখানে ফেনার ঘূর্ণি সৃষ্টি হয়েছে।
আসছে। আবার চেঁচিয়ে বললো কিশোর। দড়ি ধরে টানতে শুরু করেছে সে। ঠেলে বেরিয়ে আসবে যেন চোখ, পরিশ্রমে।
হঠাৎ থ্রটলের পাওয়ার কেটে দিয়ে লাফিয়ে নেমে গেল ওমর, কিশোরকে সাহায্য করার জন্যে। ঝিনুক আর সাগরের হাসিকেও ডাকলো। টানো! টানো! ছাড়বে না!
মুসা পাম্প ছাড়ছে না। উঠে আসছে ডেজা দড়িটা, প্রতিবারে এক ফুট করে।
ওমাথায় ডজ ছাড়াও আর কিছু আছে, ওমর বললো। ভাগ্যিস, নতুন দড়ি। মোটা দেখে লাগিয়েছিলো ডজ।
নাইলন না হলে যতো মোটাই হোক, টিকতো না, মুসা বললো।
হ্যাঁ। ঝিনুক, কুড়াল নিয়ে গিয়ে দাঁড়াও।
এক ফুট এক ফুট করে উঠে আসছে দড়ি। সাংঘাতিক কাত হয়ে গেছে বিমান। এখন শুধু কিশোর আর ওমর টানছে। সাগরের হাসিও চলে গেছে দরজার কাছে, উবু হয়ে বসে তাকিয়ে রয়েছে পানির দিকে। হঠাৎ লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো। আসছে! আসছে! ওই তো! একটু থেমে আবার চিৎকার করে উঠলো তীক্ষ্ম কণ্ঠে।

আসছে! ফেকি আসছে! হাতে ছুরি, সামান্য ফাঁক হয়ে আছে দাঁত। চকচকে চোখ। পুরোপুরি বন্য লাগছে এখন তাকে, আদিম মানবী, ভয়াবহ শত্রুর সঙ্গে লড়াইয়ের জন্যে তৈরি।
পানির ওপরে ঝটকা দিয়ে বেরিয়ে এলো একটা শুঁড়, বীভৎস ভঙ্গিতে পেঁচালো আর খুললো, প্রজাপতির শুঁড়ের মতো করে। কিলবিল করে উঠলো।
খবরদার! টান ছাড়বে না! চিৎকার করে বললো ওমর।
টেনে ডুবিয়েই না ফেলে!
টান ছেড়ো না! প্লেন ডুববে না। ওই তো, আরও উঠছে। ডজকে পেঁচিয়ে ধরে রেখেছে অকটোপাসটা। ধরে রাখো, ছেড়ো না। বলে দড়ি ছেড়ে দিলো ওমর। তুলে নিলো একটা হাতকুড়াল। সাগরের হাসিকে তখন যেটা দিয়েছিলো। কোপ মারলো পানিতে।
দড়ি কাটবেন না! সাবধান! চেঁচিয়ে হুশিয়ার করলো কিশোর।
কিশোর, আমিও যাই! হাত নিসপিস করছে মুসার। পাম্পের কাছে এভাবে বসে থাকতে আর ভালো লাগছে না ওর।
না! তাড়াতাড়ি বললো কিশোর। যা করছো করো।
ওমর কিছুই বললো না। কুপিয়ে চলেছে। ভেসে উঠলো একটা, কাটা শুঁড়। এখনও পাক খুলছে আর বন্ধ করছে। টিকটিকির লেজের মতোই যেন শরীর থেকে আলাদা হয়ে গেলেও মরে না। আরেকটা শুঁড় বেরিয়ে এসে বিমানের কাঠামো পেঁচিয়ে ধরে টান দিলো। কাত করে ডুবিয়ে দেয়ার ইচ্ছে যেন বিমানটাকে। ধা করে কোপ মারলো ওমর। শুঁড় কেটে প্লাইউডে বসে গেল কুড়ালের ফলা। হ্যাচকা টান দিয়ে তুলে আনলো আবার।
কুড়াল দিয়ে কোপাতে বোধহয় ভালো লাগেনি ঝিনুকের, সেটা রেখে দিয়ে ছুরি দিয়ে খোঁচা মারছে ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ করে। সাগরের হাসিও খোঁচাচ্ছে। দুজনে পানির একবারে কাছাকাছি চলে গেছে। সাংঘাতিক ঝুঁকি নিয়েছে। যে কোনো মুহূর্তে একটা শুঁড় এসে টেনে নিতে পারে ওদেরকে পানিতে।
দড়ি ছাড়ছে না কিশোর। টেনে ধরে রেখেছে। বাঁকা হয়ে গেছে তার শরীর। টপটপ করে ঘাম ঝড়ছে কপাল থেকে।
দেখা যাচ্ছে, অকটোপাসের বড় বড় চোখ, কেমন সম্মোহনী দৃষ্টি। কুড়াল রেখে দিয়ে পিস্তল বের করলো ওমর। পিরিচের মতো বড় চোখদুটোর মাঝখানে সই করে গুলি শুরু করলো। খালি করে ফেললো ম্যাগাজিন।
আচমকা ঢিল হয়ে গেল দড়ি। চিত হয়ে পড়ে গেল কিশোর। কোনোমতে উঠে দেখলো, পানিতে ভাসছে ধূসর রঙের একটা মাংসের দলা, তাতে যেন জোড়া লেগে রয়েছে কতোগুলো কুৎসিত শুঁড়, তার কয়েকটা আবার কাটা, আরও

ভয়ংকর লাগছে। ধক করে উঠলো বুক। ডজ কি নেই! না, আছে। ওই তো, হেলমেট দেখা যায়। নিচু হয়ে হাত বাড়িয়ে দিলো ওমর আর সাগরের হাসি। টেনে তুললো ডজকে। চিত হয়ে মেঝেতে পড়ে রইলো ডুবুরি।
হেলমেটটা খোল! নির্দেশ দিয়েই ককপিটের দিকে ছুটলো ওমর। গর্জে উঠলো এঞ্জিন।
ম্যাকো! ম্যাকো! বাচ্চা মেয়ের মতো হাততালি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো সাগরের হাসি। হাত তুলে দেখালো। ফেকিকে এবার শেষ করবে!
সবাই দেখলো, কয়েকটা হাঙর এসে হাজির হয়েছে। কামড়াতে শুরু করেছে অকটোপাসটাকে। সাবাড় করতে সময় লাগবে না, বোঝা গেল। কেঁপে উঠলো কিশোর। ডজকে তুলতে আরেকটু দেরি হলেই...ভাবতে চাইলো না সে। মুসাকে ডাকলো তাকে সাহায্য করার জন্যে। হেলমেট খুলতে শুরু করলো। নিথর হয়ে পড়ে আছে ডজ। ছাই হয়ে গেছে মুখের রঙ। সেদিকে তাকিয়ে বলে উঠলো মুসা, খাইছে! মরেই গেল নাকি!
ছুটে গিয়ে কেবিন থেকে একটা ফ্লাস্ক বের করে নিয়ে এলো সে। আঙুল দিয়ে টেনে ঠোঁট ফাঁক করে মুখের ভেতরে ঢেলে দিলো খানিকটা ব্র্যান্ডি।
ততোক্ষণে লেগুনের কাছে পৌঁছে গেছে বিমান। প্রায় ওড়ার গতিতেই ছুটছে। পানির ওপর দিয়ে। কয়েকবার লাফিয়ে উঠেই পড়েছিলো কয়েক ইঞ্চি করে। মুখের কাছে পৌঁছেও গতি কমালো না ওমর। তীব্র গতিতে ঢুকে পড়লো সরু চ্যানেলে। নিয়ে এলো শান্ত পানিতে, যেখানে নোঙর করেছিলো। এঞ্জিন বন্ধ করে দিয়ে অন্যদেরকে সাহায্য করলো ডজকে তীরে নামাতে।
নারকেল গাছের ছায়ায় এনে আস্তে করে বালিতে শুইয়ে দেয়া হলো তাকে। চোখ মেললো ডজ। নীল আকাশের ছায়া পড়লো তার চোখে। দুর্বল কণ্ঠে ককিয়ে উঠলো, ঝিনুকগুলো আছে তো?
নিজে যে মরতে বসেছিলে, সেটা নয়, প্রথমেই ঝিনুকের চিন্তা, স্বস্তি মেশানো ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললো ওমর। তোমাকে যে বাঁচাতে পেরেছি এতেই আমরা খুশি। চুলোয় যাক ঝিনুক। কিশোর, ধরো তো, স্যুটটা খুলে ফেলা যাক। ডজকে জিজ্ঞেস করলো, খুলতে পারবে তো? তোমার অসুবিধে হবে?
না। আমি ভালো আছি। কয়েকটা আঁচড় শুধু লেগেছে।
কয়েকটা আঁচড় যে কি পরিমাণ পোশাক খুলতেই দেখতে পেলো সবাই। মাথা থেকে পা পর্যন্ত কোনো জায়গা আর বাকি নেই, কালো কালো দাগে ভরা। থেঁতলে গেছে। ওসব জায়গায় শুড় দিয়ে পেঁচিয়ে ধরে চাপ দিয়েছিলো দৈত্যটা। তবে জখম তেমন নেই, রক্ত বেরুচ্ছে না, হাতের ছুরির ক্ষতটা বাদে। কেননা কোনো জায়গা এখনও কাঁচা রয়েছে, যা পুরোপুরি শুকায়নি, সেখান থেকে বেরিয়ে

এসেছে দুই এক ফোটা রক্ত। উঠে বসলো সে। কয়েক ঢোক ব্র্যান্ডি পেটে পড়তেই আরেকটু সুস্থ হলো।
ঝিনুক তোলার অভিযান তাহলে আমাদের শেষ? চোখে প্রশ্ন নিয়ে ভজের দিকে তাকালো ওমর।
কেন? এটা কোনো একটা ব্যাপার হলো নাকি? ডুবুরির জীবনে প্রায় প্রতিদিনই ওরকম ঘটনা ঘটে।
হাঁ করে ডজের দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। তার মানে... তার মানে, আপনি আবার ওই জায়গাটায় নামবেন?
নিশ্চয়। আগের চেয়ে নিরাপদ ভাবলো এখন নিজেকে।
কেন? মুসার প্রশ্ন।
এজন্যে, ওখানে আর ওরকম দানব নেই, ডজ বললো। জানা কথা। এক রাজ্যে দুই রাজা বাস করতে পারে না। একটাই থাকে, আর সেটাকে মেরে ফেলা হয়েছে। সাগরের আতঙ্ক ওই শয়তানগুলো, সাধে কি আর ডেভিল ফিশ বলে। অনেকেই ভয় পায় ওগুলোকে, এড়িয়ে চলে।
হাঙররা পাচ্ছে না, কিশোর বললো।
মরা বলে। জ্যান্ত হলে আসতো না। হাসলো ডজ। এমন ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াতে গেল, যেন শক্ত হয়ে গেছে পা। অকটোপাসটাকেও খুব একটা দোষ দিই না। গাধামীটা আমিই করেছি। কালো একটা গর্ত দেখতে পেলাম। মাছটাছ কিংবা অকটোপাসের বাচ্চা দেখলাম না তার মধ্যে। ওরকম গর্তে যা প্রায়ই থাকে। ওগুলো কোনো ক্ষতি করতে পারে না। মানুষ দেখলেই বরং সরে যায়, বিশাল মাকড়সার মতো দেখতে লাগে। ভেতরে কিছু নেই দেখে অবাকই লাগলো। তবে গুরুত্ব দিলাম না। ভাবলাম, এরকম গর্তে অনেক ঝিনুক থাকবে। দেখতে গেলাম। কপাল ভালোই বলতে হবে আমার। কারণ প্রথম শুঁড়ের মাথাটা এসে আলতো করে ছুঁয়ে দেখলো আমার হেলমেট। সঙ্গে সঙ্গে বুঝে গেলাম ওটা কি। তারপর যা করার তা-ই করলাম। হাত দুটো তুলে ফেললাম ওপর দিকে, যাতে শরীরের সঙ্গে পেঁচিয়ে ধরে আটকে ফেলতে না পারে। ভাগ্যিস, তুলেছিলাম! আরেকটা শুঁড় এসে জড়িয়ে ধরলো আমার কোমর। তখন আমার হাত তোলা না থাকলে শেষ করে ফেলতো। লড়াই করার একটা সুযোগ অন্তত পেলাম। ছুরি বের করে ফেলেছি আগেই। খোঁচাতে শুরু করলাম। বোধহয় মিনিট বিশেক ওরকম লড়াই করেছি। তবে আমার মনে হয়েছে কয়েক যুগ। গর্তের ভেতর থেকে জুলজুল করে আমার দিকে তাকিয়ে ছিলো জীবটা। চারটে শুঁড় ব্যবহার করেছে আমাকে কাবু করার জন্যে। বুঝলাম, বাকি চারটে দিয়ে পাথর আঁকড়ে ধরেছে, গ্যাট হয়ে বসে থাকার জন্যে। আসলে চারটে শুঁড়ই আমাকে শেষ করে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট।

বাকিগুলো আর খাটাতে যাবে কেন? আমাকে তোলার সংকেত দিয়ে তখন লাভ নেই। তুলতে পারবে না। হাত দিয়ে টেনে তো দূরের কথা, যুদ্ধ জাহাজ দিয়ে টানলেও উঠতো কিনা সন্দেহ। তাই জোর যাতে কমানো যায় সেই চেষ্টা চালালাম। চারটে শুঁড়ের গোটা দুই যদি কেটে দেয়া যায় তাহলে জোর কমবে। আমার বড় ভয় ছিলো, দড়ি আর এয়ার টিউবের লাইন না ছিড়ে ফেলে। তাহলে আর কেউ বাঁচাতে পারতো না আমাকে। দড়িটা টানটান হয়ে ছিলো বলেই পেঁচিয়ে যায়নি কোনো কিছুতে। অনেক চেষ্টা করে আমার গায়ে পেঁচানো দুটো শুঁড়ের মাথা কেটে দিলাম। আরও দুটো বের করে আনলো তখন ওটা। পেঁচিয়ে ধরলো। ভাবলাম, সংকেত দিই। তার পরে মনে হলো, না, ছিড়ে যেতে পারে। আরেকটু জোর কমানো যাক। কিন্তু দুর্বল হয়ে গেছি ততোক্ষণে। আর সেটা বুঝতে পেরেছে জানোয়ারটা। টানতে শুরু করলো নিজের দিকে। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তখন চোখজোড়া। শয়তানীতে ভরা। একবার ভাবলাম, যাই, গিয়ে ছুরি দিয়ে খোঁচা মেরে গেলে দিই। কিন্তু ওই চেষ্টা করাটাই বোকামি। চোখের কাছে কিছুতেই পৌঁছতে দেবে না আমাকে। একটু পর পরই কালি ছুঁড়ে অন্ধকার করে দিচ্ছে পানি, যাতে ওর শরীর কিংবা শুঁড় দেখতে পারি আমি। প্রায় শেষ করে এনেছিলো আমাকে। পাথরের মতো ভারি হয়ে উঠছিলো হাত। নড়নোর শক্তিও পাচ্ছিলাম না আর। একটা হাত পেঁচিয়ে ফেললো শরীরের সঙ্গে। আরেকটাও আটকে ফেলবে যে কোনো সময়। দড়ি না টেনে আর উপায় নেই। আমাকে টেনে তার মুখের দুই গজের মধ্যে নিয়ে গেছে। টান দিলাম। পর পর চার বার। তার পর আর কিছু মনে নেই।

হুঁ, আনমনে মাথা দোলালো মুসা। অকটোপাসের সঙ্গে হাতাহাতি লড়াইটা যে কেমন, হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি আমি। আপনাকে তো সাহায্য করার জন্যে অনেকেই ছিলাম আমরা, আমাকে করার কেউ ছিলো না। কেউ জানতোই না যে আমাকে অকটোপাসে ধরেছে।

হ্যাঁ, বুদ্ধির জোরেই বেঁচে এসেছিলে সেদিন, কিশোর বললো। আর কপাল অসম্ভব ভালো ছিলো বলে।

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেললো ওমর। যা-ই বলো, ডজকে বললো সে। আর তোমাকে ওখানে নামতে দিতে রাজি নই আমি। আমার ভালো মনে হচ্ছে না।

অহেতুক ভয় পাচ্ছো। একদিন বিশ্রাম নিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। কিছু হবে না আমার। আর, হাসলো সে। লক্ষ লক্ষ টাকা কামাতে চাইলে ওরকম একআধটু ঝুঁকি নিতেই হবে। টাকা জিনিসটা তো আর সহজে পাওয়া যায় না।

দেখা যাক, ওমর বললো। ভাবনাচিন্তা করি। ঝিনুক যা তুলে এনেছো সেগুলো কি করবো?

সৈকতে ফেলে রাখতে হবে। পশ্চিম দিকে। ওপরে, যাতে জোয়ারের পানি নাগাল না পায়। দিন দুয়েকের মধ্যে পচে যাবে। দেখতে পারবো, অকটোপাসের সঙ্গে লড়াই করে কি আনতে পেরেছি। হাসলো ভজ। ঝিনুক খোলাটা একটা মহা উত্তেজনার কাজ, দারুণ খেলা। বোঝার উপায় নেই, কোনটা খুললে বেরিয়ে পড়বে অনেক টাকার সম্পদ।

হু। আপাতত পেটপূজাটা সেরে নেয়া যাক। খিদে পেয়েছে। খেয়েদেয়ে তুমি রেস্ট নাও। আমরা ঝিনুকগুলো সরিয়ে ফেলবো।

যতোটা ভাবা গিয়েছিলো, তার চেয়ে বেশি কাহিল হয়ে পড়লো ডজ। দুই দিন লাগলো তার শক্ত হতে। থেতলানো জায়গাগুলোতে ব্যথা। তার অবস্থা দেখে সবাই তো ভয়ই পেয়ে গেল। ওদের মনে হতে লাগলো, ঝিনুক তোলার কাজটাই বাতিল করে দিতে হবে। সেকথা বলাও হলো ডজকে।

ডজ মানতে নারাজ। তার এক কথা, এক জায়গায় বড় অকটোপাস একটাই থাকে। সেটা যখন মারা পড়েছে, নিরাপদেই এখন ডুব দেয়া যায়। তার কথা শুনতে প্রায় বাধ্য করলো সে অন্যদেরকে।

কাজেই তৃতীয় দিনে আবার চললো ফ্লাইং বোট, মুক্তো খেতের উদ্দেশে।

বেশ কয়েকবার ডুব দিলো ডজ। দুপুরের দিকে, বেজায় কাহিল হয়ে পড়লো সে। সেদিনের মতো ঝিনুক তোলা স্থগিত রেখে দ্বীপে ফেরার সিদ্ধান্ত নিলো ওমর।

ডজ জানালো, ঢালের অগভীর অংশটায় ঝিনুক আর বেশি নেই, তোলা হয়ে গেছে। এরপর তুলতে হলে আরও নিচের দিকে নামতে হবে। আরও বেশি পানিতে ডুবে অতো নিচে নামার ক্ষমতা তার নেই। স্বীকার করলো একথা। অবশ্য আর ঝিনুক তোলার দরকারও নেই। যা তুলেছে, তাতে যদি মুক্তো পাওয়া যায়, যথেষ্ট হবে। সেগুলো নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে যা টাকা পাওয়া যাবে তা দিয়ে বড় জাহাজ ভাড়া করতে পারবে। প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম কিনে, অভিজ্ঞ জাপানী ডুবুরি ভাড়া করে আরও গভীর থেকে ঝিনুক তোলার জন্য নিয়ে আসতে পারবে। এই এলাকার মুক্তো সব সাফ করে নিয়ে বিদেয় হবে তখন, তার আগে নয়।

দ্বীপে ফিরে চললো বিমান। কি ভাবছিলো ডজ, হঠাৎ মুখ তুনে হাসলো। এই শোনো, বিকেলটা শুধু শুধু বসে না থেকে ঝিনুকগুলো কিন্তু খুলে ফেলতে পারি। নিশ্চয়, এতোদিনে পচন ধরেছে ঝিনুকগুলোতে। দুর্গন্ধ এখন ততোটা হবে না।

কথাটা ঠিক। হুল্লোড় করে উঠলো সবাই।

ওমর বললো, ভালো কথা বলেছে।

লাঞ্চ সেরে আর একটা মুহূর্ত দেরি করলো না ওরা। সবাই উত্তেজিত হয়ে আছে ঝিনুকের ভেতরে কি আছে দেখার জন্যে। চলে এলো দ্বীপের পশ্চিম ধারে, যেখানে পচার জন্যে ফেলে রাখা হয়েছে ঝিনুক।

এসেই নাকমুখ কুঁচকে ফেললো ওমর, কিশোর আর মুসা। ওদের অবস্থা দেখে হেসে ফেললো ডজ আর দুই পলিনেশিয়ান। মরা ঝিনুকগুলোর দিকে এগোতে এগোতে ডজ বললো, এখনই এই, আরও পচলে কি করতে? তা-ও তো বাতাস বইছে উল্টো দিকে, সরাসরি নাকে এসে লাগে না। নইলে দুর্গন্ধ কাকে বলে বুঝতে। হাসলো সে। তার পরেই কি মনে পড়ায় হাসি মুছে গেল। চিন্তিত ভঙ্গিতে তাকালো সাগরের দিকে।
কি হলো? জিজ্ঞেস করলো ওমর।
একটা কথা, তার দিকে তাকিয়ে আনমনে মাথা ঝাঁকাল ডজ। এতোগুলো ঝিনুক একবারে পচতে দেয়া ঠিক হচ্ছে কিনা বুঝতে পারছি না। ভয়াবহ গন্ধ, কল্পনা করতে পারবে না। সাগরের বিশ মাইল দূর থেকে পাওয়া যাবে। আর এই গন্ধ একবার যার নাকে লেগেছে, জীবনে ভুলবে না সে।
তুমি বলতে চাইছো কারনেসও পেয়ে যাবে?
মাথা কঁকালো ডজ। হ্যাঁ। তারপর গন্ধ শুকে ওকে এখানে এসে হাজির হওয়াটা কিছুই না তার জন্যে।
তা বোধহয় ঠিকই বলেছে।
অবশ্যই ঠিক বলেছি। তবে আর কিছু করার নেই এখন। ভবিষ্যতে আর এরকম ভুল করবো না। অল্প অল্প করে তুলে এনে পচাবো। মুক্তো বের করে নিয়ে হয় খোলাগুলো পুঁতে ফেলবো, নয়তো পানিতে ফেলে দেবো।
হ্যাঁ, সেটাই ভালো হবে। যদি আর এভাবে তোলার দরকার পড়ে আমাদের। জাহাজ নিয়ে এলে তো অন্য রকম ব্যবস্থা হবে।
হাতে করে একটা প্লাষ্টিকের বালতি আর একটা বিস্কুটের টিন নিয়ে এসেছে ডজ। বালতিতে পানি ভরে নিয়ে চলে এলো ঝিনুকগুলোর কাছে। গভীর আগ্রহ আর কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে রয়েছে অন্যেরা, বিশেষ করে কিশোর, ওমর আর মুসা।
একটা ঝিনুক তুলে বালতির ওপরে এনে ডালার ফাঁকে আঙুল ঢুকিয়ে দিলো ডজ। শক্ত কিছু লাগে কিনা দেখলো। তারপর ঝিনুকের ভেতরের নরম অংশটা বের করে ফেললো পানিতে। ডালাটা ছুঁড়ে ফেলে দিলো একপাশে। সেটা কুড়িয়ে নিয়ে ঝুড়িতে রাখলো সাগরের হাসি।
একে একে চল্লিশটা ঝিনুক খুললো ডজ। যতোই খুলছে, হতাশা বাড়ছে। খোলাগুলো ছুঁড়ে ফেলছে। একটা মুক্তোও বেরোয়নি এতোক্ষণে। তবে, একচল্লিশ নম্বর ঝিনুকটা খুলে ভেতরে আঙুল ঢুকিয়েই চিৎকার করে উঠলো। বের করে আনলো ছোট নুড়ির সমান শাদা একটা জিনিস। তুলে দেখালো। রোদ লেগে ঝিক করে উঠলো যেন ওটার ভেতরের সুপ্ত আগুন।

মুক্তোটাকে চুমো খেলো সে। বললো, আমাদের সৌভাগ্য নাম্বার ওয়ান। এই শুরু হলো।
হাত থেকে হাতে ঘুরতে লাগলো মুক্তোটা।
দাম কতো হতে পারে? জিজ্ঞেস করলো মুসা। হাতের তালুতে রেখে মুক্তোটা দেখছে।
পাঁচ হাজারের কম বললে ঘুসি মারবো পাইকারের নাকে, হেসে জবাব দিলো ডজ।
যে হারে চলছে, ওমর বললো। তাতে এক বাটি ভরতেই অনেক সময় লাগবে। ঝুড়ি ভরতে অনেক দিন।
তবে ভরে ফেলবো, জোর দিয়ে বললো ডজ। অতো তাড়াহুড়ো করলে চলে না। মুক্তো বের করতে হলে ধৈর্য রাখতে হয়। একচল্লিশটা খুলে যে একটা পেয়েছি, এটা অনেক বেশিই মনে হয়েছে আমার কাছে। অনেক সময় কয়েক হাজার ঝিনুক খুলেও একটা মেলে না। আবার তার পর হয়তো পর পর ছয়-সাতটা খোলা হলো, দেখা যাবে সবগুলোতেই মুক্তো রয়েছে। এটা এক ধরনের জুয়াখেলা বলতে পারো। মরা ঝিনুকগুলোর ওপর হাত বোলালো সে। এগুলো হাজারে হাজারে খুলতে হবে বলে মনে হয় না। তবে হলে খুব হতাশ হব।
তার কথার সমর্থনেই যেন পরের ঝিনুকটাতেই পাওয়া গেল একেবারে পাঁচটা মুক্তো। তবে বেশি বড় নয়, ভালোও নয়। কমদামী জিনিস। যা-ই হোক, পাওয়া তো গেল। আশা বাড়লো ওদের। দ্রুত হাত চালালো ডজ। তার কাজ দেখেই বোঝা যায়, এই কাজে অভ্যস্ত সে।
কলরব করে উঠলো সবাই যখন অনেক বড় একটা মুক্তো বের করলো ডজ। দেখতে অনেকটা পানের মতো। রেফারেন্স বইতে লিখে রাখার মতো জিনিস এটা। কোনো একদিন হয়তো এটা শোভা পাবে কোনো রাজার মুকুটে, কিংবা রাজকুমারীর টায়রায়। আর পত্রিকায় যখন সেই ছবি দেখবে, কি একটা ধাক্কা খাবে, ভাবো? মনে করবে না, এটা তুমিই তুলেছিলে সাগরের তল থেকে! পঁচিশ থেকে তিরিশ হাজার ডলারে বিকোবে এটা। বিড়বিড় করে নিজেকেই যেন বললো সে।
খুব সুন্দর, কিশোর বললো।
তবে এতো সুন্দর আর লাগবে না, তিক্ত কণ্ঠে বিড়বিড় করলো ডজ। এখন যেমন লাগছে।
কাজ চলতে লাগলো। বিস্কুটের টিনে জমা হচ্ছে একের পর এক মুক্তো। একপাশে বড় হচ্ছে ফেলে দেয়া খোলার স্তূপ। শেষ ঝিনুকটাও খুলে ছুঁড়ে ফেলা হলো। কতগুলো মুক্তো পাওয়া গেল গুনতে লাগলো ডজ। পাঁচটা বড় বড় মুক্তো,

অনেক দাম হবে সেগুলোর। উনিশটা পাওয়া গেছে মাঝারী আকারের। একটা ডাবল বাটন–দুটো মুক্তো জোড়া লেগে থাকলে ওগুলোকে বলে ডাবল বাটন আর দুই মুঠো সীড পার্ল-ছোট মুক্তো, কম দামী।
যাক, ভালোই পাওয়া গেল, ডজ বললো। অন্তত আফসোস করতে হবে না আর কিছু পেলাম না বলে। সব মিলিয়ে লাখ খানেকের বেশি চলে আসবে।
মুক্তো-টুক্তো তো ভালোই চেনেন, আইডিয়া আছে, মুসা বললো। কালচারড পার্লের কথা কিছু বলতে পারবেন? ওগুলোর নাম বেশ শোনা যায়। জাপানীরা নাকি ছোট ছোট খামার করে ওই মুক্তোর চাষ করে। খোলা ঝিনুকের পেটের ভেতরে হঠাৎ করে বালির কণা ফেলে দেয়, যাতে রস ছাড়তে পারে ঝিনুক। মুক্তো তৈরি হয়ে যায় ওই কণার চারপাশে রস জমে শক্ত হয়ে।
ওগুলো মুক্তো হলো নাকি? তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে হাত নাড়লো ডজ। আসল মুক্তোর সঙ্গে ওসবের কোনো তুলনাই হয় না। আর কিছুদিন পর ওগুলো স্টেশনারি দোকানেই কিনতে পাবে। গয়নায় লাগিয়ে ফেরিওয়ালারা বিক্রি করলেও অবাক হবো না।
এতোই শস্তা?
এতোই শস্তা।
কেন? ঝিনুকের পেট থেকেই তো আসে।
এলে কি হবে? রাসায়নিক কোনো গোলমাল রয়েছে হয়তো। ঝিনুকের পেট থেকে বের করার সময় চকচকেই থাকে, আসল মুক্তোর মতো। তারপর দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। তাড়াহুড়োয় তৈরি অনেক জিনিসের মতোই। আসল মুক্তোর মতো আভা থাকে না ওর ভেতরে। আর খোসা ছাড়ানো যায়।
খোসা! মুক্তোর? অবাক হয়েছে মুসা।
হ্যাঁ, খোসা। পেঁয়াজের খোসার মতো। একটার ওপরে আরেকটা জড়িয়ে থাকে। কথা বলছে, আর বালতির পানিতে হাতড়াচ্ছে ডজ, মুক্তো রয়েটয়ে গেল কিনা দেখছে।
ভুলেই গিয়েছিলাম, আচমকা বলে উঠলো কিশোর। আরেকটা আছে।
সবগুলো চোখ ঘুরে গেল তার দিকে। ওমর জিজ্ঞেস করলো, কী?
সেই প্রথম মুক্তোটা, সাগরের হাসি যেটা তুলে এনেছিলো। রেখে দিয়েছিলাম। একটা গাছের গোড়ায়। যাই, নিয়ে আসি। দৌড়ে গিয়ে আধখোলা একটা ঝিনুক নিয়ে ফিরে এলো কিশোর। চেহারা দেখে তো মনে হয় না এর ভেতরে কিছু আছে। ঝিনুকটা ছোট। দেখতে বিশ্রীই বলা চলে। খোলার নানা জায়গায় দাগ, নিশ্চয় কোনো রোগ হয়েছিলো। শ্যাওলা লেগে রয়েছে এখনও, শুকিয়ে গেছে। অনেক

বয়েস। বালিতে বসে পচা মাংসে আঙুল ঢুকিয়ে দিলো সে। শক্ত হয়ে গেল হঠাৎ। মুখ তুলে তাকালো সবার দিকে।
হাসলো ডজ। প্রথম মুক্তোটা পেলে ওরকমই হয়।
এটা আমার প্রথম নয়, কাঁপা গলায় বললো কিশোর। বড় বলেই! দুই আঙুলে ধরে মার্বেলের মতো বড় একটা মুক্তো বের করে আনলো সে। শাদা নয় ওটা, গোলাপী। এই জিনিস আগেও দেখেছে সে। একটা নয়, অনেকগুলো, আস্ত একটা হার। তবে সেগুলোর কোনোটাই এটার মতো বড় ছিলো না। এতো জীবন্তও নয়। হ্যাঁ, ভেতরের আগুন এমনভাবে ঝলকাচ্ছে, তার কাছে জ্যান্তই লাগছে জিনিসটা।
চুপ হয়ে গেছে সবাই। ডজ যতগুলো পেয়েছে, তার কোনোটাই এটার মতো নয়। অবশেষে প্রায় ফিসফিসিয়ে বললো সে, গোলাপী মুক্তো! নামই শুনেছি শুধু এতোদিন দেখিনি। প্যারিসে নিয়ে গেলে ঈশ্বরই জানে কতো পাওয়া যাবে!
খোসাটা একপাশে ছুঁড়ে ফেলে কিছু বলতে যাবে কিশোর, এই সময় আবার চোখ পড়লো ওটার ওপর। হাঁ করে তাকিয়ে রইলো। অন্যেরাও তাকালো। দেখলো ডালার ফাঁকে গোলাপী একটা জিনিস চকচক করছে। সবাই চুপ। কোনো শব্দ নেই। নীরবে গিয়ে দ্রুত ঝিনুকটা আবার কুড়িয়ে নিলো কিশোর, বের করে আনলো আরেকটা গোলাপী মুক্তো। বাঁ হাতের তালুতে দুটো মুক্তোই রেখে সবাইকে দেখালো।
কথা হারিয়ে ফেলেছে যেন ডজ। যখন বললো, গলা কাঁপতে লাগলো তার, কি সুন্দর! ব্যাঙ ঢুকেছে যেন তার গলায়, ঘড়ঘড় স্বর বেরোচ্ছে। দেখ, দেখ সবাই ভালো করে! কারণ আর কোনোদিন এমন দৃশ্য দেখতে পাবে না। লক্ষ লক্ষ বছর বাঁচলেও না। বহু বছর ধরে এদিকের সাগরে মুক্তো খুঁজে বেরিয়েছি আমি। আমারই মতো অনেকেই খুঁজে বেড়িয়েছে, এখনও খুঁজছে। ওদের কেউ কেউ জীবনের পঞ্চাশ-ষাট বছর এর পেছনে খরচ করে দিয়েছে। তা-ও এরকম কেউ দেখেনি, অন্তত আমার জানা মতে নেই কেউ। ওরকম একটা মুক্তোই ঝিনুক থেকে বের করে দেখার ভাগ্য খুব কম মানুষের হয়, একসঙ্গে দুটোর কথা তো ভাবাই যায় না! আমার যে কেমন লাগছে বলে বোঝাতে পারবো না!
ভালোই হয়েছে, কিশোর বললো। এখন একটা করে রাখতে পারবো আমরা।
মানে?
একটা আমাদের, আর একটা সাগরের হাসির। ঝিনুকটা সে-ই তুলেছে। একটা তার পাওয়া উচিত।
পাগল হয়েছে! গলা চেপে দম আটকে দেয়া হয়েছে যেন ডজের। ওরকম একটা জোড়া ভাঙবে? অসম্ভব! রীতিমতো অপরাধ হয়ে যাবে সেটা। একই সঙ্গে

জন্মেছে মুক্তোদুটো, একই সঙ্গে থাকা উচিত। তুমি বুঝতে পারছে না দুটো একসাথে থাকার কি মানে। ওর একটা মুক্তোর দামই হবে পঞ্চাশ-ষাট হাজার পাউন্ড। আর দুটো একসাথে থাকলে যা দাম হাঁকবে তাতেই বিক্রি হয়ে যাবে। রাজা তার রাজত্ব ছেড়ে দিতে রাজি হয়ে যাবে ওদুটো পাওয়ার জন্যে!
হ্যাঁ, ওগুলোর একসাথেই থাকা উচিত, ডজের সঙ্গে একমত হয়ে মাথা ঝাঁকালো ওমর।
ঠিক আছে, জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেললো কিশোর। তাহলে দুটোই সাগরের হাসিকে দিয়ে দিই। একসাথেই থাকুক।
আরে না না, পাগল নাকি... কিশোরের মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ হয়ে গেল ডজ। বোধহয় ছোট হতে চাইলো না।
ঠোঁট ওল্টালো সাগরের হাসি। সহজ কণ্ঠে বললো, আমার ওসব দরকার নেই। কি করব? তার চেয়ে পিং মিনের দোকান থেকে কিছু লাল পুঁতি যদি কিনে দাও, এদুটো তোমাদেরকে দিয়ে দিতে পারি।
নিশ্চয় দেবো! তাড়াতাড়ি বললো ডজ। যত চাও ততো দেবো!
দেবে! খুব খুশি সাগরের হাসি। চোখ জ্বলজ্বল করছে। যতো চাই, দেবে!
দেবো।
পাগল নাকি! বিড়বিড় করলো মুসা। কয়েকটা পুঁতি কিনে দিলেই ওরকম দুটো মুক্তো...
মুসার দিকে তাকালো সাগরের হাসি। ওগুলো দিয়ে কি করবো আমি? পুঁতি পেলে হার বানিয়ে গলায় পরতে পারবো। ওগুলো ফুটোও করা যাবে না, মালাও গাঁথা যাবে না।
এরকম যুক্তির পর আর কথা চলে না। চুপ হয়ে গেল মুসা।
ডজ বললো, এতো পুঁতি কিনে দেবো, যতো খুশি মালা বানাতে পারবে। রাটুনায় পিং মিনের দোকানে নিয়ে যাবো। তোমার ইচ্ছে মতো কিনে নিও। পাউডার, স্নো, লিপস্টিক, যা খুশি।
গম্ভীর হয়ে গেছে কিশোর। তার মনে হচ্ছে মেয়েটাকে ঠকানো হচ্ছে।
সেটা বুঝতে পেরে হেসে ডজ বললো, তুমি ভাবছো ঠকাচ্ছি। তা ঠকাচ্ছি বটে। তবে দিতে তো চাইলে, নিলো না তো। এর চেয়ে অনেক বেশি খুশি হবে ও পুতি পেলে। মুক্তোগুলো জোর করে দিলে হয়তো নেবে, কিন্তু একটু পরেই ফেলে দেবে। ওর কাছে এগুলোর কোনো মূল্য নেই। তার চেয়ে ও যা পছন্দ করে সেটা দিলেই কি ভালো হয় না? মুক্তোগুলোও থাকবে।
আর কিছু বললো না কিশোর।

উঠে দাঁড়ালো ডজ। হাতটাত ধুয়ে গিয়ে চা খাওয়া দরকার। বাপরে বাপ, কি পচা গন্ধ! একেবারে গলার মধ্যে ঢুকে গেছে! বিস্কুটের টিনটা তুলে নিয়ে বললো, এগুলো কোথাও লুকিয়ে রাখা দরকার। প্লেনে রাখা ঠিক হবে না এখন, অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে যেতে পারে। একবারে যাওয়ার সময় তুলে নিলেই হবে।
লেগুনের ধারে ক্যাম্পে ফিরে এলো ওরা। নারকেল গাছের গোড়ায় বালির ওপরে পড়ে রয়েছে বিশাল একটা প্রবালের চাঙড়। কি করে এলো কে জানে। হয়তো ঝড়ে নিয়ে এসে ফেলেছে। যেভাবেই আসুক, তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই ডজের। টিনটা লুকানোর ভালো একটা জায়গা পেয়েই খুশি সে। চাঙড়ের তলায় বালিতে পুঁতে রাখলো টিনটা।
চা খাওয়ার পর সিগারেট ধরিয়ে নারকেল গাছের গোড়ায় হেলান দিয়ে আয়েস করে টানতে শুরু করলো ওমর। পাইপ ধরালো ডজ। ভালোই পেয়েছি, কি বল, বললো সে। বাকি ঝিনুকগুলো পচলে বের করে নিয়ে রওনা হতে পারি। যদি আবহাওয়া গন্ডগোল না করে।
আর যদি রেশনে টান না পড়ে, বললো ওমর। আরও তিনদিনের খাবার হবে বলে মনে হয় না। ছয়টা মুখ, কম তো নয়।
মাছ ধরতে পারি। পানিতে তো অভাব নেই। খাবারের অসুবিধে হবে না। তিনটে মাস কাটিয়ে দিয়েছি এখানে, কোনো সরঞ্জাম ছাড়া। এখন তো বড়শি সুতো সবই রয়েছে। কোন কোন মাছ খেতে ভালো, সাগরের হাসি আর ঝিনুক জানে। ওদের দিকে ফিরলো ডজ। এই, কিছু মাছ ধরে আনো না। খাওয়ার জন্য।
কথাটা মনে ধরলো। লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো দুজনে।
কিশোরের দিকে তাকিয়ে মুসা বললো, চলো, আমরাও যাই।
চলো।
পানির ধার ঘেঁষে শাদা বালির ওপর দিয়ে হেঁটে চললো চারজনে। মাছ ধরার জন্যে জায়গা বাছাই করতে শুরু করলো সাগরের হাসি। কয়েকটা জায়গায় থেমে দেখলো। শেষে ছোট একটা গুহার সামনে এসে থামলো সে। খাড়া নেমে গেছে প্রবালের দেয়াল। আয়নার মতো শান্ত নিথর হয়ে আছে পানির ওপরটা। স্বচ্ছ। নিচে অলস ভঙ্গিতে ঘোরাফেরা করছে নানারকম মাছ, দেখা যাচ্ছে। ছোট একটা খাড়ি। বিশ ফুট গভীর হবে। দেয়ালের গা থেকে নেমে গেছে সিড়ির মতো ধাপ। একধারে জন্মে রয়েছে কয়েকটা নারকেল গাছ, দেখে মনে হয় একটাই গোড়া, সেটা থেকে বেরিয়েছে কান্ডগুলো, বাঁশের মতো। মাথা নুইয়ে রেখেছে পানির ওপর। পানিতে স্পষ্ট প্রতিবিম্ব পড়েছে ওগুলোর। মনে হয় যেন পানির নিচে গজিয়েছে মাথা উল্টো করে।

দেয়ালের গা কামড়ে রয়েছে অসংখ্য শামুক। কয়েকটা তুলে আনলো সাগরের হাসি। খোলা ভেঙে ভেতরের মাংস বের করে বড়শিতে গেথে পানিতে ফেললো। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এসে টোপ গিললো মাছ।
একের পর এক মাছ তুলে বালিতে ফেলতে লাগলো সে। এতো দ্রুত, বিশ্বাসই হতে চাইছে না দুই গোয়েন্দার। মেয়েটার হাত থেকে ছিপটা নিলো কিশোর। বড়শিতে টোপ গেঁথে দিলো সাগরের হাসি। সে ছিপ ফেললো। মিনিট খানেকের মধ্যেই তিনটে মাছ ধরে ফেললো।
যেগুলো খেতে ভালো, বেছে বেছে সেগুলোকে আলাদা করলো ঝিনুক। কিশোর বললো, হয়েছে। রাতে হয়ে যাবে। আর দরকার নেই।
এতো তাড়াতাড়ি মাছ ধরা শেষ হয়ে যাওয়ায় নিরাশই হলো মুসা। কাজকর্ম না থাকলে ভালো লাগে না। অহেতুক কতো আর বসে থাকা যায়?
আমি সাঁতার কাটতে যাচ্ছি। ছিপ সরিয়ে রেখে ভোঁদড়ের মতো স্বচ্ছন্দে পানিতে নেমে গেল সাগরের হাসি। মিনিটখানেক তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো মুসা। পানির নিচে এমন সহজ ভঙ্গিতে সাঁতার কাটছে মেয়েটা, দেখেও বিশ্বাস হতে চায় না। ডাঙার মানুষ নয় যেন, জলকুমারী। সাঁতার কাটার ইচ্ছেটা আর দমিয়ে রাখতে পারলো না মুসা। উঠে দাঁড়িয়ে শার্ট খুলতে শুরু করলো। সেদিকে তাকিয়ে হাসলো কিশোর, আর পারলে না? তোমারও এখানেই জন্মানো উচিত ছিলো। হাহ হাহ।
গাছের নিচে শুকনো নারকেল পড়ে আছে। কুড়াতে কুড়াতে মুখ ফিরিয়ে তাকালো। মুসার দিকে তাকিয়ে ভুরু কোঁচকালো একবার, তারপর আবার নিজের কাজে মন দিলো।
জুতো খুলে রেখে পানির কিনারে গিয়ে দাঁড়ালো মুসা। সাগরের হাসিকে দেখার জন্যে নিচে তাকালো। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে একেবারে তল পর্যন্ত। কিন্তু মেয়েটা নেই। কোথায় গেল? অস্বস্তি বাড়তে লাগলো। হাত নেড়ে ডাকলো ঝিনুককে। এই ঝিনুক, দেখে যাও।
কি হয়েছে? তাড়াতাড়ি উঠে এসে মুসার পাশে দাঁড়ালো কিশোর।
ঝিনুকও এলো। পানির নিচে চোখ বোলালো একবার। অবাক হয়েছে, চেহারাই বলে দিচ্ছে তার। খোলা লেগুনের দিকে খুঁজলো একবার। নেই দেখে আবার দৃষ্টি ফেরালো গুহাঁটার দিকে। অস্বস্তি ফুটেছে চোখে। সেটা দেখে ভয়ই পেয়ে গেল কিশোর আর মুসা। ওরকম গুহা মানেই এখন ওদের জন্যে আতঙ্কের জায়গা। অকটোপাস কিংবা অন্য কোনো জলদানবের বাড়ি।
পানিতে ঝাপিয়ে পড়লো ঝিনুক, ঢেউ উঠলো। সেটা না কমা পর্যন্ত নিচের দৃশ্য স্পষ্ট দেখতে পারলো না কিশোর আর মুসা।

ঝিনুকও গায়েব। তাকেও আর দেখা যাচ্ছে না কোথাও। এক মিনিট গেল...দুই মিনিট। পরস্পরের দিকে তাকালো দুই গোয়েন্দা। দুজনে একই কথা ভাবছে। এমনকি পলিনেশিয়ানরাও পানির নিচে এতোক্ষণ দম বন্ধ করে থাকতে পারে না। কেমন অসহায় বোধ করতে লাগলো দুজনেই।
দেয়ালের ধার ধরে কিছুদূর দৌড়ে গেল মুসা। ঝিনুক কিংবা সাগরের হাসি আছে কিনা দেখার চেষ্টা করলো। কিছুই নেই। সাগরের তলটা এখানে বেশ অন্ধকার, পানি বেশি গভীর হলে যেরকম হয়।
সাগরের হাসি যে গায়েব হয়েছে, পাঁচ মিনিটের বেশি হয়ে গেছে। পৃথিবীর কোনো মানুষের সাধ্য নেই, পানির নিচে ডুব দিয়ে এতোক্ষণ দম আটকে রাখে। নিশ্চয় অকটোপাসে ধরেছে! বিড়বিড় করলো মুসা।
ওমর আর ডজকে ডাকার জন্যে বলতে যাবে কিশোরকে, এই সময় যেন জাদুর বলে ভুস করে একটা মাথা ভেসে উঠলো। সাগরের হাসি! ফুচ করে মুখ থেকে পানি বের করে দিয়ে খিলখিল করে হাসলো।
কোথায় গিয়েছিলে? মুসার প্রশ্ন। ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম! স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো সে।
জবাবে আরেকবার খিলখিল হাসি। আবার বললো, সাঁতার কাটতে। পানিতে মুখ ডুবিয়ে ফু দিয়ে ভুরভুর করে বুদবুদ তুলতে লাগলো।
তুমি মানুষ না! মাছ!
ঝিনুকও ভেসে উঠলো। দুজনে মিলে সাঁতরে চললো লেগুনের মাঝখানে। কিছুদূর গিয়ে ফিরে আসতে শুরু করলো। মুসার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে কিশোর। নীরবে ওদের সাঁতার কাটা দেখছে।
মুসার দিকে হাত নেড়ে ডাকলো সাগরের হাসি, এসো।
পানিতে নামার কথা ভুলেই গিয়েছিলো মুসা। ঝাঁপ দিয়ে পড়লো। সাঁতরে চলে এলো মেয়েটার কাছে।
এসো আমার সঙ্গে, মেয়েটা বললো। এসো, দেখাচ্ছি। বললো ঝিনুক।
কি দেখাবে?
সাগরের তল। খুব সুন্দর।
দেখতেই তো পাচ্ছি। আর কি দেখবো?
এসোই না।
কাছে এলো ঝিনুক। হ্যাঁ, এসো। জোরে দম নাও। ভয় লাগছে না তো?
না।
এসো তাহলে।

লম্বা শ্বাস টেনে ডুব দিলো মুসা। নামতে লাগলো নিচের দিকে। তার দুপাশে রয়েছে সাগরের হাসি আর ঝিনুক। কিছুদূর নেমে, গুহাঁটার দিকে ইঙ্গিত করলো মেয়েটা। তিনজনেই সাঁতরাতে শুরু করলো ওটার দিকে। পানির বিশ ফুট নিচে রয়েছে এখন। আরও কাছে আসার পর মুসা বুঝলো, পানির ওপর থেকে প্রথমে যে গুহা দেখেছিলো, এটা সেটা নয়। আরেকটা।

সাগরের হাসি আর ঝিনুকের সঙ্গে ঢুকে পড়লো ভেতরে। ভয় ভয় লাগছে। অকটোপাস নেই তো? না বোধহয়। তাহলে ওদের দুজনকে আগে ধরতো। ওরা যে হারিয়ে গিয়েছিলো তখন, নিশ্চয় এই গুহাতেই ঢুকেছিলো। বাতাসও আছে। নইলে কিছুতেই পাঁচ মিনিটের বেশি সময় এখানে শ্বাস নিতে পারতো না সাগরের হাসি।

ঠিকই আন্দাজ করেছে মুসা। ওপরে ভেসে উঠলো সে, ওদের দেখাদেখি। পানির নিচের বেশ বড় একটা গুহায় ঢুকেছে ওরা। একধারে তাকের মতো দেখা গেল। তার ওপর উঠে পা দুলিয়ে বসলো সাগরের হাসি আর ঝিনুক। সাঁতরে এসে মুসাও উঠে বসলো।

গুহার সৌন্দর্য দেখে থ হয়ে গেল সে। পানির বেশি ওপরে নয় ছাতটা। জোয়ারের সময় ভরে যায় কিনা কে জানে। তবে সেটা নিয়ে আপাতত ভাবছে না মুসা। স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে এক অপরূপ পরীর রাজ্য! ঘন নীল পানি। আলো আসছে কোথা থেকে বুঝতে পারছে না। নানা রঙের প্রবালের ছড়াছড়ি চারপাশে। রঙিন মাছের ঝাঁক।

অনেকক্ষণ দেখার পর জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেললা মুসা। বললো, চলো, যাই। বেশি দেরি করলে ওরা আবার ভাববে।

বাইরে বেরিয়ে পানিতে মাথা তুলে দেখলো; নিচের দিকে ঝুঁকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। উদ্বিগ্ন। মুসাকে দেখেই জিজ্ঞেস করলো, কোথায় গিয়েছিলে?

গুহার ভেতরে। দারুণ জায়গা। যাবে নাকি?

মাথা নাড়লো কিশোর। নাহ, আরেক দিন।

মাছ নিয়ে ক্যাম্পে ফিরে এলো ওরা।

ঝিনুক মরে পচন শুরু হতে অন্তত দুটো দিন সময় লাগবে। অযথা বসে না থেকে এই দুদিন মুক্তোর খেত থেকে ঝিনুক তুলে আনতে পারলেই লাভ, যা পাওয়া যায়। সেই আশাতেই যেতে লাগলো অভিযাত্রীরা। আবহাওয়া খারাপ হয়ে যাবে খুব তাড়াতাড়িই, সতর্ক সংকেত জানালো ঝিনুক। এগিয়ে আসছে ঝড়।

জায়গাটাতে অকটোপাসের ভয় আপাতত নেই, ডজের সঙ্গে এব্যাপারে একমত হলো সাগরের হাসি আর ঝিনুক দুজনেই। ডজের সঙ্গে সঙ্গে ওই দুজনও নামতে লাগলো। ডুবুরির গোশাকের দরকার হয় না ওদের। বড় করে দম নিয়ে ডুব দেয়,

খানিক পরে ভেসে ওঠে দুই হাতে করে ঝিনুক নিয়ে। দেখে মুসারও নামার লোভ হলো। গভীর পানিতে কি করে ডুব দিতে হয়, জানা আছে তার, অভিজ্ঞতাও আছে। তবু বার বার করে তাকে শিখিয়ে দিলো সাগরের হাসি আর ঝিনুক। ওদের পদ্ধতি কিছুটা আলাদা। এতে সুবিধেই হলো মূসার।
ঝিনুক তোলার চেয়ে পানিতে নেমে খেলা করার দিকেই আগ্রহ বেশি সাগরের হাসি আর ঝিনুকের। মুসাও ওদের সঙ্গে যোগ দিলো।
দ্বিতীয় দিনের কথা। পানিতে নেমে ওরকম খেলা করছে তিনজনে। সাঁতরে দুজনের কাছ থেকে কিছুটা দূরে এসেছে মুসা। হঠাৎই দেখতে পেলো ওটাকে। শরীর বাকিয়ে ঘুরছে বিশাল এক হাঙর।
নাক নিচু করে এগিয়ে আসতে শুরু করলো ওটা। লম্বায় বিশ ফুটের কম হবে না। পেটটা শাদা, বাকি শরীরও শাদাই, তবে কিছুটা ময়লা। ধড়াস করে এক লাফ মারলো মুসার হৃৎপিন্ড। সঙ্গে ছুরিও নেই, যে বাধা দেবে। জানে যদিও, এতো বড় দানবের বিরুদ্ধে সামান্য ছুরি দিয়ে কিছুই করতে পারবে না। ওপরে উঠে যে, পার পাবে তারও উপায় নেই। হাঙরটা নেমে আসছে ওপর দিক থেকেই। ফুসফুসের বাতাসও ফুরিয়ে এসেছে। এখন রওনা হলেও ওপরে উঠতে উঠতে শেষ হয়ে যাবে বাতাস। কি করবে?
দানবটা যদি তাকে আক্রমণের পরিকল্পনা করে থাকে; তাহলে কোনোমতেই রক্ষা নেই। ফুসফুসে বাতাস থাকলেও না, না থাকলেও না। তবু হাত-পা গুটিয়ে রেখে বাঁচার চেষ্টা তো অন্তত করে দেখতে হবে।
ওপরে উঠতে শুরু করলো মুসা। বোধহয় এতোক্ষণ তাকে নজরে পড়েনি হাঙরটার, কিংবা দ্বিধায় ছিলো, কোন ধরনের জীব, আক্রমণ করবে কিনা, এসব। এখন মনে হলো সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। কারণ, আবার মুসার দিকে মুখ ঘুরিয়েছে ওটা। দ্রুত এগিয়ে আসতে শুরু করেছে।
এই সময় মুসা দেখলো ঝিনুক আর সাগরের হাসি নেমে আসছে। পানি এতই পরিষ্কার, মনে হচ্ছে পানিতে নয় ডাঙাতে রয়েছে ওরা। অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে হাঙরটার দিকে সাঁতরে যাচ্ছে ঝিনুক। এখনও উঠছে মুসা, শেষ হয়ে আসছে শক্তি। যেন দুঃস্বপ্নের মাঝে আতঙ্কিত দৃষ্টিতে দেখছে দৃশ্যটা। ধীরে ধীরে ঘুরছে বিশাল দানবটা, তাকে ধরার জন্যে আসছে। ওটার মাথার কাছ দিয়ে চলে গেল ঝিনুক। পলকের জন্যে মুসা দেখলো, তার হাতটা উঠল নামলো একবার দ্রুত, সাপের মত ছোবল মারলো যেন ছুরি। হাঙরের মাথা থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত, বেরিয়ে এলো। আবার আঘাত হানলো ঝিনুক। পাক খেয়ে ঘুরে গেল হাঙর। হাঁ হয়ে গেছে মুখ। বেরিয়ে পড়েছে মারাত্মক দাঁতের সারি। কাছাকাছি রয়েছে

সাগরের হাসি, তাকে কামড়াতে গেল ওটা। ওপর দিকে ছুরি চালিয়ে হাঙরের পেট কেঁড়ে দিলো মেয়েটা।
হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি শুরু করেছে মুসা। পানিতে লাথি মেরে ভেসে উঠতে চাইছে ওপরে। পানি আর আগের মত পরিষ্কার নয়, রক্তে লাল হয়ে যাচ্ছে। হারিয়ে গেল চোখের সামনে থেকে হাঙর। ঘোলাটে লাল পানির ভেতরে এখন কি ঘটছে, আর দেখা গেল না। একটাই ভাবনা, যে করেই হোক, ভেসে উঠতে হবে। মনে হচ্ছে এই বুঝি পায়ে কামড় বসালো হাঙরটা। ফুসফুসের বাতাস শেষ। যখন ভাবলো, আর উঠতেই পারবে না, এই সময় পানির ওপরে ভেসে উঠলো মাথা। হাত বাড়িয়েই রেখেছে ডজ আর কিশোর। একটানে তাকে তুলে নিলো ওপরে।
কয়েক সেকেন্ড কেবিনের মেঝেতে চিত হয়ে রইলো মুসা। জোরে জোরে দম নিচ্ছে। অবশেষে কোনমতে জিজ্ঞেস করলো, ওরা উঠেছে?
না, জবাব দিলো ডজ।
কিন্তু...নিচে...একটা হাঙর...
জানি। দেখেছি। ওটাকে মারতেই গেছে দুজনে।
ওদেরকেই মেরে ফেলবে তো!
তা পারবে না। এরকম লড়াই অনেক করেছে ওরা। মারকুইজানদের সঙ্গে পারে না হাঙর। পেছন থেকে না জানিয়ে হঠাৎ এসে যদি ধরে ফেলতে পারে, তো পারে, নইলে সম্ভব না। হাঙর শিকার করতে ওস্তাদ মারকুইজানরা। ওদের কাছে খেলা।
আমার কাছে মোটেও খেলা মনে হয়নি, বিড়বিড় করলো মুসা। টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালো নিচে কি ঘটছে দেখার জন্যে।
পানিতে ভাসলো সাগরের হাসির মাথা। হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠে এলো ওপরে। ফুচচ করে মুখ থেকে পানি ফেলে বললো, আউফ! ম্যাকো!
তার পর পরই উঠে এলো ঝিনুক। কাঁধের একটা কাটা থেকে রক্ত পড়ছে। সেটা দেখে চিৎকার করে উঠলো মুসা, খাইছে! কামড়ে দিয়েছে!
নাআহ, তেমন কিছু না, ডজ বললো। সামান্য আঁচড়। সিরিশ কাগজের মত ধারালো হাঙরের চামড়া, ঘষা লাগলে ছড়ে যায়।
মেঝেতে বসে জোরে জোরে হাঁপাতে লাগলো দুই পলিনেশিয়ান। নিজেরা নিজেরা কথা বলছে।
কি বলে? জানতে চাইলো ওমর।
বলছে, মারতে পারেনি। তার আগেই এসে হাজির হয়েছে একটা সোর্ডফিশ। ঝগড়া বাধিয়ে দিয়েছে। রক্তের গন্ধে হাজির হয়েছে। ওরা বলছে, হাঙরের চেয়ে বড় ওটা।
নিশ্চয় ততটা ডেনজারাস নয়, তাই না?

তা বলা যায় না। হাঙরের মত যখন তখন মানুষকে আক্রমণ করে না বটে, তবে যদি করে, তো বাঁচার আশাও শেষ। হাঙরের কবল থেকে ফেরা যায়; ওদের কবল থেকে না। সাংঘাতিক শক্ত তলোয়ার দিয়ে জাহাজের তলা ফুটো করে দেয়, মানুষ তো কিছু না।
বিশ্বাস করেন, একথা? মুসার প্রশ্ন।
করব না কেন? অ্যাডমিরালটি রেকর্ড দেখলেই বুঝবে। প্রাইমাউথের জাহাজ দা ফরচুনকে একবার আক্রমণ করেছিলো সোর্ডফিশ। তামার পাত লাগানো ছিল জাহাজটার তলায়। পাতের ওপরে ছিলো তিন ইঞ্চি পুরু লোহাকাঠ, তার ওপরে বার ইঞ্চি পুরু ওককাঠের তক্তা। সেসব তো ফুড়েছেই, ওপরে রাখা একটা তেলের ড্রামও ফুটো করে দিয়েছিলো। আরেকবার একটা ব্রিটিশ জাহাজ-নামটা ভুলে গেছি, ওটারও তলা ফুটো করেছিলো সোর্ডফিশ। সমস্ত পাম্প চালিয়ে দিয়ে পানি সেচতে সেচতে বন্দরে ফিরেছিলো জাহাজটা। সোর্ডফিশকে ছোট করে দেখো না।
তাহলে কেটে পড়া দরকার, শঙ্কিত হয়ে উঠলো ওমর। জাহাজেরই যদি এই গতি করে, ফ্লাইং বোটের ওপর খেপে গেলে সর্বনাশ করে দেবে। এক ইঞ্চি ধাতব পাত ওটার জন্যে কিছুই না, বুঝতে পারছি। তার কথা শেষ হতে না হতেই পানিতে জোর আলোড়ন উঠলো। এই, কি হল?
সবাই তাকালো সেদিকে। পানিতে প্রচন্ড আলোড়ন, সেই সাথে ফেনা। দেখ দেখ! চিৎকার করে উঠলো কিশোর।
সবার চোখ পড়েছে সেদিকে। পানিতে লাফিয়ে উঠলো বিশাল এক হাঙর। মুসাকে আক্রমণ করেছিলো যেটা সেটাও হতে পারে কিংবা অন্যটা। একটা মুহূর্ত যেন ঝুলে থাকলো শূন্যে, তারপর ঝপাস করে পড়লো। মস্ত ঢেউ উঠলো পানিতে। পরক্ষণেই একটু দূর ভেসে উঠলো সোর্ডফিশটা। নিশ্চয় ওটাই হাঙরটাকে শূন্যে ছুঁড়ে দিয়েছিল।
আপু! আপু! চেঁচিয়ে উঠলো ঝিনুক। জলদি পালান!
ওমর, জলদি! তাগাদা দিলো ডজ। ঝিনুক যখন ভয় পেয়েছে, তার মানে..
আর শোনার জন্যে দাঁড়ালো না ওমর। ককপিটের দিকে দৌড় দিলো। শখানেক গজ দূরে রয়েছে সোর্ডফিশ। বিমানটাকে বোধহয় কোন শয়তান জানোয়ার ভেবে ছুটে আসতে শুরু করলো আক্রমণ করার জন্যে।
চালু হয়ে গেল একটা ইঞ্জিন। তার পর পরই দ্বিতীয়টা। সবে চলতে শুরু করেছে বিমান, এই সময় প্রচন্ড এক আঘাতে কেঁপে উঠলো থরথর করে। ঝাঁকি দিয়ে পানির ওপরে উঠে গেল কয়েক ইঞ্চি। সীট থেকে প্রায় উড়ে চলে গেল ওমর। যন্ত্রপাতি নিয়ন্ত্রণের কেউ রইলো না। কোনমতে উঠে গিয়ে সীটে বসে আবার জয়স্টিক চেপে ধরলো সে।

মুহূর্ত পরেই তিরিশ ফুট দূরে ভেসে উঠলো সোর্ডফিশ। দ্রুত বিমানটাকে ওটার কাছ থেকে সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করলো ওমর। কিন্তু ওড়ার আগেই আবার এক ভয়াবহ ঝাঁকুনি। ভোজবাজির মত যেন কেবিনের মেঝে ফুড়ে উদয় হলো একটা বিশাল তলোয়ারের মাথা। পলকের জন্যে। তারপরই এক হ্যাচকা টানে সরে গেল ওটা। গলগল করে পানি ঢুকতে শুরু করলো ফুটো দিয়ে। একটা তোয়ালে দিয়ে পানি বন্ধ করার ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগলো কিশোর। চেঁচাতে লাগলো, ওমরভাই, জলদি! জলদি করুন! দুই মিনিটও লাগবে না ডুবতে!
ককপিটের দিকে ছুটে গেল মুসা। তাড়াতাড়ি ওড়ান! ফুটো করে দিয়েছে!
চেষ্টা তো করছি!
পঞ্চাশ ফুট গিয়ে ঘুরতে শুরু করলো সোর্ডফিশ। আবার এসে খোঁচা মারার ইচ্ছে বোধহয়। আবার আসছে! বলেই পিস্তল বের করে গুলি করতে লাগলো ডজ। ওটার গায়ে লাগলো কিনা বোঝা গেল না, তবে ততক্ষণে মাছটার চেয়ে গতি বেড়ে গেছে বিমানের। কেবিনে ফিরে এসে মুসা দেখলো তুলকালাম কান্ড শুরু হয়েছে সেখানে। পানি বন্ধ করার চেষ্টা করছে সবাই প্রাণপণে। কিন্তু বন্ধ হচ্ছে না। ইতিমধ্যেই ভেসে গেছে মেঝে। কিশোর বললো মুসাকে, ওমর ভাইকে চালিয়ে যেতে বল। থামলে আরও বেশি ঢুকবে।
ছুটে এসে ওমরকে খবরটা জানালো মুসা।
তুলতেই পারছি না! ফাসফেঁসে কণ্ঠে বললো ওমর। একেতো ঝিনুকের ভার, তার ওপর পানি…উঠতেই চাইছে না!
কি করব?
সমস্ত ভার ফেলে দিতে হবে। আগে গিয়ে ডুবুরির সরঞ্জামগুলো ফেল। ওগুলোই সব চেয়ে ভারি।
ছুটে কেবিনে ফিরে এলো মুসা। জানালা দিয়ে দেখলো, ডজ আইল্যান্ড প্রায় মাইল দুয়েক দূরে এখনও। তীব্র গতিতে ট্যাক্সিইং করে ছুটছে বিমান। তবে ওড়ার শক্তি অর্জন করতে পারছে না কিছুতেই। ওমর ভাই বলেছে, ডাইভিং গীয়ারগুলো ফেলে দিতে। বোঝা কমাতে।
একটা মুহূর্ত দ্বিধা করলো না ডজ। টেনে নিয়ে এলো বেজায় ভারি ডাইভিং কিট, সাথে লাগানো চল্লিশ পাউন্ড ওজনের বুটসহ। দরজা দিয়ে ফেলে দিলো পানিতে। ওগুলো অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার আগেই ফেললো হেলমেটটা। তার পর একে একে পাম্প, লাইন, আর আরও যা যন্ত্রপাতি আছে, সব।
ঝিনকুগুলোর দিকে হাত বাড়ালো মুসা। তাকে বাধা দিলো সাগরের হাসি, না, দরকার নেই। আমি নেমে যাচ্ছি। কাউকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেল দরজা দিয়ে। তার পেছনে গেল ঝিনুক।

ধরো! ধরো! চেঁচিয়ে উঠলো কিশোর।
ভয় নেই, ডজ বললো। মাত্র এক মাইল। ওটুকু সাঁতরানো কিছুই না ওদের জন্যে।
অনেকখানি ভারমুক্ত হয়ে গিয়ে অবশেষে উঠতে শুরু করলো বিমানটা। পানি ছেড়ে ওপরে উঠতেই ফুটো দিয়ে বেরিয়ে যেতে লাগলো কেবিনের পানি। আরও কমে যেতে লাগলো ভার। লেগুনের ওপর যখন চক্কর মারতে শুরু করলো ওটা, সব পানি বেরিয়ে গেছে ততক্ষণে।
ওমরের কাছে এসে দাঁড়ালো কিশোর। তাকে বললো ওমর, সবাইকে গিয়ে বলো, বেশি পানিতে নামালে আবার পানি ঢুকে ডুবে যাবে। পানির কিনারে নামিয়ে বালিতে তুলে ফেলার চেষ্টা করবো। পানি ছোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন সবাই লাফিয়ে নেমে যায়। ভার কম থাকলে বালিতে তোলা সহজ হবে।
ছুটে এসে সবাইকে কথাটা বললো কিশোর।
যতটা সম্ভব আস্তে পানিতে নামানোর চেষ্টা করলো ওমর। কিন্তু বিমানের পেট পানি ছুঁতে না ছুঁতেই আবার গলগল করে পানি ঢুকতে আরম্ভ করলো। সোজা সৈকতের দিকে ছোটালো সে।
পঞ্চাশ গজ দূরে থাকতে প্রথম লাফ দিলো মুসা। বিশ মাইল গতিতে ছুটছে তখন বিমান। মাথা তুললো বিমানের পেছনে ঢেউ আর ফেনার মধ্যে। তার পেছনে গেল কিশোর। সবার শেষে ডজ। পানিতে হাবুডুবু খেল তিনজনেই, সব চেয়ে বেশি কিশোর।
আবার যখন কেবিনে এসে উঠলো তিনজনে, কোমর পানিতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল ওমরকে। ঝিনুকগুলো বের করে সৈকতে ফেলার চেষ্টা করছে। তিনজনকে দেখে কাজের ভার ওদের ওপর ছেড়ে দিয়ে ককপিটে ফিরে এলো সে। একটু একটু করে ইঞ্জিনের জোর বাড়িয়ে বালিতে টেনে তোলার চেষ্টা করতে লাগলো বিমানটাকে। ঝিনুক ফেলতে শুরু করেছে অন্য তিনজনে। এতে আরও কমে যেতে লাগলো। ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগিয়ে চললো বিমান।
সমস্ত জিনিসপত্র বের করে আনা হলো বিমান থেকে। কতটা ক্ষতি হয়েছে দেখতে বসলো ওমর। ডজের উদ্দেশ্যে বললো, তুমি তো মানাই করেছিলে। বললে কি দরকার। এ জন্যেই বুঝলে, এ কারণেই ওগুলো আনতে চেয়েছি আমি। জানতাম প্রবালে ঘষা খেয়ে ফুটো হয়ে যেতে পারে। পাতগুলো এনে ভাল করেছি, কি মনে হয়?
নীরবে মাথা ঝাঁকালো শুধু ডজ।
আরেকটু হলেই মারা পড়েছিলো, কিশোর বললো। ডজের বড়জোর তিন ইঞ্চি দূর দিয়ে গিয়েছিলো মাথাটা। একটু সরে লাগলেই এতক্ষণে..., কথাটা শেষ করে হাতের ইশারায় বুঝিয়ে দিলো সে।

বাপরে বাপ, যে জায়গার জায়গা, হেসে বললো ওমর। বিমানের তলায় আরমার প্লেট লাগিয়ে নেয়া দরকার। যাকগে। ক্ষতি বেশি হয়নি। পাত কেটে লাগিয়ে ফুটোটা বন্ধ করে ফেলা যাবে। বাড়ি ফেরার বন্দোবস্ত হবে, তবে ঝিনুক তোলার এখানেই ইতি।
আর বোধহয় দরকারও নেই, মুসা বললো।
না। অনেক হয়েছে, সায় জানালো ডজ। যা পেয়েছি নিয়ে চলে যাই। পরে আসা যাবে।
ওই যে ওরা আসছে, কিশোর বললো। আরেকটু দেরি হলেই ভাবনায় পড়ে যেতাম।
একটুও ক্লান্ত মনে হলো না দুই পলিনেশিয়ানকে। স্বচ্ছন্দে সাঁতরে আসছে। কাছে এসে হাত তুলে হেসে বললো, কাওহা! যেন পুরো ব্যাপারটাই একটা রসিকতা।
ঝিনুকগুলো রোদে ফেলে রাখতে হবে, ডজ বললো। আশা করি কালই খুলতে পারব। এই, হাত লাগাও, কিশোর। আর মুসাকে বললো সে। শেষ করে ফেলি।
এগুলোতেও নিশ্চয় কিছু পাওয়া যাবে, ঝিনুকগুলো দেখিয়ে ওমর বললো। স্কুনার একটা কিনে ফেলতে পারবে, ডজ। আরও মুক্তো তুলতে ফিরে আসতে পারবে।
চোয়াল ডললো ডজ। কি জানি। আসতে তো চাইই। তবে মুক্তো পাওয়া এবং ধরে রাখার জন্যে ভাগ্য লাগে। আমার সেটা আছে বলে মনে হয় না। যা কিছু ভালো হয়েছে সব তোমাদের ভাগ্যে।
ননসেন্স! অধৈর্য হয়ে হাত নাড়লো ওমর। ওসব বিশ্বাস কর নাকি। কাল বিকেলে রাটুনায় ফিরে যাচ্ছি আমরা। এর মধ্যে কাজ শেষ করতে হবে।
পরদিন খুব সকালে ঘুম থেকে উঠলো ওরা। কাজে লেগে গেল। বিমানটা মেরামত করতে গেল ওমর, কিশোর আর মুসা। ধাতুর পাত কেটে টুকরো করে ফুটোটা বন্ধ করবে। ডজ, ঝিনুক আর সাগরের হাসি গেল ঝিনুকগুলো খুলে দেখতে। পানির ধার থেকে দূরে সৈকতের ওপরে বসে খুলতে শুরু করল ওরা। মাঝে মাঝে শোনা যেতে লাগলো ওদের চিৎকার, মুক্তো পেলেই আনন্দে চেঁচিয়ে উঠছে।
ভালই কাটলো দিনটা। বিকেলের শেষে আকাশের নীল যখন মলিন হয়ে এলো, মেরামতের কাজ তখন শেষ করে এনেছে ওমররা। আর মাত্র কয়েকটা ঝিনুক খোলা বাকি ডজদের। প্রথম দিনের মত এত ভাল আর বেশি ঝিনুক পাওয়া গেল না, তবে মন্দ পায়নি। ঝিনুকগুলো ঠিকমত পচার সময় পায়নি, নরম হয়নি, ফলে খুলতে সময় লাগছে।

সব মিলিয়ে ঝুড়ি না ভরলেও ডজের হ্যাটের অর্ধেকটা যে ভরা যাবে মুক্তো দিয়ে তাতে সন্দেহ নেই। নতুন সরঞ্জাম কিনে নিয়ে এসে খেতের বাকি ঝিনুকগুলোও সাবাড় করে দিয়ে যাবার ইচ্ছেটা তার একটুও কমলো না, বরং বাড়লো।
মুক্তোগুলো সব একসাথে রাখতে রাখতে ডজ বললো, তোমরা গিয়ে কিছু মাছ ধরে আনলে পার। খাওয়া যেত।
কাছে এসে দাঁড়িয়েছে কিশোর। হেসে বললো, প্রতি বেলাতেই যে হারে মাছ খাচ্ছি, শেষে না মাছের গন্ধই বেরোতে শুরু করে গা দিয়ে।
বড়শি নিয়ে রওনা হলো সাগরের হাসি আর ঝিনুক। কিশোরও তাদের সঙ্গে চললো।
পশ্চিমের আকাশে বিচিত্র রঙ। প্রশান্ত মহাসাগরের অপরূপ সূর্যাস্তের দিকে নীরবে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ ওমর। তারপর চোখ ফেরালো আবার জায়গাটার দিকে, যেখানটা মেরামত করেছে। শেষবারের মত পরীক্ষা করে দেখলো সব ঠিক আছে কিনা। ককপিটে এসে ইনস্ট্রমেন্ট বোর্ডের দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে গেল দৃষ্টি। বেরিয়ে দ্রুত চলে এলো ডজের কাছে। মুসাও তখন ওখানে।
কি ব্যাপার? ওমরের মুখ দেখেই আন্দাজ করে ফেলেছে ডজ, খারাপ খবর আছে।
ব্যারোমিটারের রিডিং ভাল না, জানালো ওমর।
আকাশের দিকে তাকালো ডজ। কই, ভালই তো আবহাওয়া। খারাপ লাগছে না।
আকাশ-ফাঁকাশ দেখে বোঝা মুশকিল। রিডিং তিরিশের নিচে নেমে গেছে। পড়ছেই।
চমকে গেল ডজ। কী!
মাথা ঝাঁকাল ওমর। গিয়ে দেখ বিশ্বাস না হলে।
তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালো ডজ। ব্যারোমিটার দেখতে গেল না। বললো, জলদি গোছগাছ করে নিতে হবে। যেরকম নামছে বলছো, বড় রকমের ঝড় আসবে। এখনি উড়তে হবে।
পারা যাবে না।
কেন?
জোয়ার না এলে পানিতে নামানো যাবে না প্লেনটাকে।
এতক্ষণ থাকা যাবে না। ঠেলেঠুলে নামাতে হবে। রাটুনায় গিয়ে পৌঁছতে পারলে যত বড় ঝড়ই আসুক, কিছু করতে পারবে না আমাদের। কিন্তু এখানে থাকলে পাঁচ মিনিটে ভর্তা বানিয়ে ফেলবে প্লেনটাকে চল।
ফুরফুর করে বাতাস বইছে। মনে হয় খুব ভাল, আসলে তা নয়। ইতিমধ্যেই লেগুনের বাইরে দেয়ালের গায়ে বড় হয়ে আছড়ে পড়তে শুরু করেছে ঢেউ।

বজ্রের মত গর্জন করছে, আর সেই সাথে অনেক ওপরে ছিটিয়ে দিচ্ছে পানির কণা।
আরও আগেই বোঝা উচিত ছিলো আমার, বিড়বিড় করলো ডজ।
এখন আর ভেবে লাভ নেই। চল দেখি নড়ানো যায় নাকি। মুসার দিকে ফিরে ওমর বললো, জলদি ওদের ডেকে নিয়ে এস। মাছ আর লাগবে না।
দৌড় দিলো মুসা। জরুরী অবস্থা এখন।
বিমানের নাকের কাছটায় রইলো ওমর। ঠেলতে লাগলো। নড়লও না বিমান। যেন বালিতে শেকড় গজিয়ে গেছে ওটার। পানির দিকে তাকিয়ে বললো, জোয়ার অবশ্য এসে গেছে। আর দশ মিনিট পরেই ভাসিয়ে ফেলবে। দেয়ালের দিকে তাকিয়ে বললো, আল্লাহ! দেখতে দেখতে কি কান্ড হয়ে গেল!
ঢোকার মুখটা দেখুন না! মুসা বললো।
লেগুনে ঢোকার প্রণালীটাতে এখন আর পানি আছে বলে মনে হয় না। শুধু ফেনা। পাক খেয়ে খেয়ে ঘুরছে। হ্যাঁ, হয়ে গেছে কাজ! ডজ বললো। আসছে। আর কোনই সন্দেহ নেই।
দশ মিনিটের মধ্যেই রওনা হতে না পারলে, উদ্বিগ্ন কণ্ঠে ওমর বললো। রাটুনায় পৌঁছতে রাত হয়ে যাবে। ঝড়ের মধ্যে অন্ধকার সাগরের ওপর দিয়ে ওড়ার সাহস নেই আমার। রাটুনায় ল্যান্ডিং লাইটও নেই যে আলো দেখে নামতে পারব। সময় থাকতে এখানে একটা জায়গা খুঁজে বের করা দরকার, যেখানে একটু আশ্রয় মিলবে।
কিছু বলছে না ডজ। তাকিয়ে রয়েছে সাগরের দিকে।
পায়ের শব্দে ফিরে তাকাল ওমর। মুসা ফিরে এসেছে, একা।
ওরা কোথায়? জানতে চাইলো ডজ। আমরা এখুনি রওনা হব।
পেলাম না, জবাব দিলো মুসা।
পেলে না মানে? যাবে কোথায়? দ্বীপেই আছে।
সারাটা দ্বীপ খুঁজে এসেছি। ওরা নেই। কিশোরের জুতো পেয়েছি, আর বড়শি দিয়ে ধরা কিছু মাছ। ওদের চিহ্নও নেই।
জুতো কোথায় পেলে?
এই তো, কাছেই। প্রবালের ওপর পড়ে ছিলো। একটা খাড়ির ধারে।
ডজের দিকে তাকালো ওমর। ব্যাপারটা কি? গেল কোথায়?
মাথা নাড়লো ডজ। বুঝতে পারছি না। ক্ষতি হবে না কিশোরের। সাগরের হাসি আর ঝিনুক রয়েছে তার সঙ্গে। এসময় কি করতে হবে ভাল করেই জানে ওরা।
জানলেই ভাল। কিন্তু কথা হল, ওদেরকে না নিয়ে তো যেতে পারছি না আমরা। প্লেনটা ভাসিয়ে রাখি। তৈরি হয়ে থাকি। ওরা এলেই রওনা দেব।

পনের মিনিট পেরিয়ে গেল। টকটকে লাল হয়ে উঠেছে পশ্চিমের আকাশ। তার ভেতরে অস্ত যাচ্ছে সূর্য। কেমন যেন রহস্যময় লাগছে দৃশ্যটা। ভয় ভয় করে। ইতিমধ্যেই দিগন্ত রেখার নিচে অনেকখানি নেমে গেছে সূর্য, যেন পানিতে তলিয়ে যাচ্ছে।
অবশেষে যেন টুপ করে ডুবে গেল। অন্ধকার নামতে শুরু করলো।
গেল! হাত নেড়ে বলল ওমর। আজকে ফেরার আশা শেষ। রাতে আর পারব না।
কিন্তু ওরা গেল কোথায়? আর তো চুপ করে থাকতে পারছি না।
প্লেনটার একটা ব্যবস্থা করা দরকার। রীফের দিকে হাত তুলে দেখালো মুসা। এখুনি কিছু করতে না পারলে সর্বনাশ করে দেবে।
এই প্রথমবার দেখলো, প্রবালের দেয়াল ছাপিয়ে লেগুনে ঢুকতে আরম্ভ করেছে সাগরের পানি। ঢেউ এসে ঝাপিয়ে পড়ছে ওপাশে, ঠেলে পানি ঢুকিয়ে দিচ্ছে লেগুনের ভেতর, ফলে ভেতরেও ঢেউ উঠছে এখন। পানি ফুলে ওঠায় বিমানটাও ভেসে উঠেছে। ভীষণ দুলছে।
নোঙরে ভার বেঁধে দেয়া দরকার, ওমর বললো। তাহলে দুলুনি কিছুটা কমতে পারে।
সত্যি সত্যি যদি ঝড় আসে, এক ডজন নোঙর বাঁধলেও লাভ হবে না, ডজ বললো। ছিড়ে নিয়ে চলে যাবে। চোখের পলকে।
জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেললো ওমর। সেজন্যে তো হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারি না। কিছু একটা করতেই হবে। বড় বড় প্রবালের চাঙড় এনে নাক আর লেজের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলে রাখব। নোঙরের কাজ করবে।
এটা অবশ্য করা যায়, ডজ বললো। টিকবে বলে মনে হয় না। তবু, চেষ্টা করি।
মুসা, আরেকবার গিয়ে দেখ কিশোরদেরকে পাও কিনা। আমি আর ডজ কাজটা সেরে ফেলি।
মাথা ঝাঁকিয়ে তাড়াহুড়া করে রওনা হয়ে গেল মুসা।
আধ ঘণ্টা পরেই ফিরে এল। ততক্ষণে ছয়টা নোঙর বেঁধে ফেলা হয়েছে বিমানের, ভাল সময়ে এর যে কোন একটাই বিমানকে আটকে রাখতে যথেষ্ট। পেলাম না, মুসা জানালো। কিশোরের জুতো আগের জায়গাতেই পড়ে রয়েছে। সাঁতার কাটতে নেমেছিলো মনে হয়। ওমর ভাই, ভয় লাগছে আমার। কিছু হলো তো?
একটা মুহূর্ত নীরব হয়ে রইলো ওমর। হ্যাঁ, ধীরে ধীরে বললো সে। কিছু একটা হয়েছে। নইলে ফিরে আসতো। পানিতেই কোন একটা ব্যাপার ঘটেছে। ডুবে মরেছে, এটা ভাবতে পারছি না। তবে কোন ভাবে বাইরের সাগরে গিয়ে পড়লে কি হবে বলা যায় না। ঢেউয়ের টানে ভেসে চলে যেতেই পারে।

তাহলে তো আরও অনেক কিছুই ঘটতে পারে, বললো ডজ। হাঙরে ধরে খেয়ে ফেলতে পারে…
তা পারবে না, বাধা দিয়ে বললো ওমর। একজনকে হয়ত খেতে পারে, একসঙ্গে তিনজনকে সম্ভব না। বিশেষ করে ঝিনুক আর সাগরের হাসিকে। ওই একটা ঘটনাই ঘটে থাকতে পারে। দেয়ালে চড়েছিল হয়ত কিশোর। ঢেউ এসে ভাসিয়ে নিয়েছে তাকে। বাঁচানোর জন্যে লাফিয়ে পড়েছে তখন সাগরের হাসি আর ঝিনুক। ওরাও ভেসে গেছে। ঢেউয়ের জন্যে এখন আর ফিরতে পারছে না। এক মুহূর্ত ভাবল সে। অন্ধকার না হলে উড়ে গিয়ে দেখতে পারতাম। কিন্তু এখন প্লেন নিয়ে ওঠাই যাবে না। উঠলে আর নামতে পারবো না। যা ঢেউ, নামতে গেলেই বাড়ি মেরে উল্টে ফেলবে। এক মিনিট লাগবে ডোবাতে।
বিশাল ঢেউয়ের ভারি গর্জন যেন সমর্থন করল ওমরের কথা। ভয়ংকর গতিতে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে দেয়ালের গায়ে, তার আঘাতে কাঁপছে এখন দ্বীপটা। বাতাসের বেগ বাড়ছে। নারকেলের পাতা ধরে টানাটানি শুরু করে দিয়েছে।
এখানে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই, ওমর বললো।
করবটা কি তাহলে? বিড়বিড় করলো ডজ। কিছু তো করা দরকার। চুপ থাকতে পারি না।
চল, সবাই মিলে আরেকবার খুঁজি, গম্ভীর হয়ে বললো ওমর। ফল হবে বলে মনে হয় না। মুসা, তুমি পুবে যাও। ডজ মাঝখানটায় গিয়ে খোঁজ। আমি যাচ্ছি পশ্চিম দিকে।
আলাদা হয়ে খুঁজতে বেরোল তিনজনে। কিশোর আর দুই পলিনেশিয়ানের নাম ধরে জোরে জোরে ডাকছে।
ঘণ্টাখানেক পরে আগের জায়গায় ফিরে এসে ওমর দেখলো, মুসা আর ডজ দাঁড়িয়ে আছে। জিজ্ঞেস করতে হলো না, ওদের মুখ দেখেই যা বোঝার বুঝে নিলো। আর কিছু করার নেই আমাদের, তিক্ত কণ্ঠে বললো সে। সকালের জন্যে বসে থাকতে হবে। ঝড় যদি থামে, আর প্লেনটা আস্ত থাকে তাহলে আরেকবার খুঁজতে বেরোব আরকি। থমথম করছে তার মুখ। আল্লাই জানে ওদের কি হলো!
ধীরে ধীরে কাটছে সময়।
মুসার মনে হলো কয়েক শো বছর পরে অবশেষে হালকা হয়ে এলো পুব আকাশের অন্ধকার। ভোর যতই এগিয়ে এলো, বাড়তে থাকলো-ঝড়ের বেগ। দেয়ালের ওপর দিয়ে পানি পাঠাতে আর চেষ্টা করতে হচ্ছে না এখন ঢেউকে, আপনাআপনিই ঢুকে পড়ছে। সাগর আর লেগুন এখন প্রায় এক হয়ে গেছে। কয়েক ঘণ্টা আগেও নীরব আর শান্ত ছিলো যে সৈকত সেখানে এখন ঢেউ

আছড়ে ভাঙছে। বাঁধা গরুর মতো দড়ি টানাটানি করছে বিমানটা, যেন দড়ি ছিড়ে পালাতে চাইছে।
আরেকটু জোর বাড়লে টিকবে না, ওমর বললো। ব্যারোমিটারটা দেখে আসিগে। কোমর পানিতে ভিজে এসে অনেক কায়দা কসরৎ করে বিমানে উঠলো সে। ককপিটে ঢুকলো। ইনট্রুমেনটস বোর্ড দেখে ফিরে এসে নামলো আবার পানিতে। কিংবা বলা যায় পানিতে ছুঁড়ে ফেলা হলো তাকে।
কি দেখলে? জিজ্ঞেস করলো ডজ।
উনত্রিশ।
ভাল। এসেই গেল তাহলে।
এখন উড়তে না পারলে আর কোনদিনই পারব না। লেগুনের দিকে হাত তুললো ওমর। অবস্থা দেখেছ। আরেকটু পরেই বাইরের সঙ্গে এর কোন তফাৎ থাকবে না। মহাবিপদে পড়ে গেলাম। কিশোররাও ফিরল না। এই ডজ, কি করি?
যাওয়াই উচিত, গলায় জোর নেই ডজের। ঝড় থামলে আবার ফিরে আসা যাবে। খুঁজতে হবে ওদের। আর বসে থেকে এখন প্লেনটাই যদি ভেঙে যায়, আমরাও ফিরতে পারবো না। ওরা এলে ওরাও পারবে না। মোটকথা সবাই আটকা পড়বো তখন।
বেশ, ওঠ গিয়ে, ওমর বললো। খুব সাবধান। যে হারে টানে পানি, পা ফসকে ভেসে গেলে আর আসতে পারবে না।
একজন আরেকজনের হাত ধরে একটা শেকল তৈরি করলো ওরা। পানির টানের সঙ্গে লড়াই করতে করতে কোনমতে যেন নিজেদেরকে টেনে তুললো বিমানে। ইঞ্জিন স্টার্ট দিল ওমর। ইঞ্জিন, ঢেউ, বাতাস আর নারকেল পাতার মিলিত শব্দকে ছাপিয়ে চিৎকার করে বললো, দড়ি কেটে দাও! কণ্ঠস্বরটা নিজের কানেই বেখাপ্পা শোনালো। ডজ, আগে সামনেরগুলো কাট। মুসা, তুমি পেছনে যাও। আমি না বললে কাটবে না। সাবধান।
এমনিতেই টান টান হয়ে আছে দড়ি। ডজ ছুরি ছোঁয়াতে না ছোঁয়াতেই আলাদা হয়ে গেল। এক হ্যাচকা টানে বিমানটাকে সরিয়ে নিয়ে গেল ঢেউ। এমন টানতে শুরু করলো, যেন লেজ ছিড়েই নিয়ে চলে যাবে। থ্রটল দিলো ওমর। চেঁচিয়ে বললো, মুসা, কাট।
চাবুকের মত লাফিয়ে উঠলো কাটা দড়ির মাথা। গায়ে বাড়ি লাগলে চামড়া উঠে যেত। সরে এল সে। সাংঘাতিক দুলে উঠল বিমান। মেঝেতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল মুসা। পড়েই থাকলো। দাঁড়ানোর চেয়ে এটা সহজ।
ঢেউয়ের ওপর দিয়ে ছুটতে শুরু করেছে বিমান। সামনে পানির ছিটে ফোয়ারার মত হয়ে এসে ককপিটের জানালায় লাগছে। এর ভেতর দিয়ে কিছু দেখাই

মুশকিল। অনুমানের ওপরই সামনে ছোটালো ওমর। কোন ভাবে এখন দেয়ালে বাড়ি লেগে গেলে সব শেষ। পর পর দুই বার ঢেউয়ের খাঁজে পড়ল বিমান, যেন হঠাৎ করে শূন্য থেকে নিচে এসে পড়লো। ধক করে উঠলো ওমরের বুক। মনে হলো, এই বুঝি বাড়ি লাগল দেয়ালে। তবে নিতান্ত অলৌকিক ভাবেই যেন বেঁচে গেল দুবারই।

ঢেউয়ের মাথায় উঠে সারতেও পারলো না বিমানটা, নাকের ওপর এসে ভেঙে পড়লো আরেকটা ঢেউ। চুবিয়ে মারতে চাইছে। ঘোরানোর চেষ্টা করলো ওমর। কিছু করতে পারলো না। নিয়ন্ত্রণ নাগালের বাইরে চলে গেছে। তবে কয়েকটা মুহূর্তের জন্যে। আবার সাড়া দিলো বিমানের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা। ততক্ষণে আরেকটা ঢেউয়ের খাজে নেমে পড়েছে বিমান। ঢেউয়ের দিকে আর নাক না ঘুরিয়ে দুটো ঢেউয়ের মাঝের খাঁজ দিয়ে তীব্র গতিতে ট্যাক্সিইং করে ছুটলো ওটা। দ্রুত কমে যাচ্ছে মাঝের ফাঁক। বুঝতে অসুবিধে হলো না সাগরের দিক থেকে গড়িয়ে আসছে আরেকটা ঢেউ। যদি বিমানের পিঠে ভেঙে পড়ে, তাহলে আর বাঁচতে হবে না। মরিয়া হয়ে জয়স্টিক ধরে টান দিলো ওমর। ওড়ার এটাই শেষ সুযোগ।

মাতাল হয়ে গেছে যেন বিমানটা। ঢেউয়ের কথা শুনবে, না ইঞ্জিনের বুঝতে পারছে না। অবশেষে টলমল করে যেন ওড়ারই চেষ্টা করলো। মায়া কাটালো পানির। ফ্লোটের গায়ে এসে বাড়ি মারলো ঢেউ। কাঁপিয়ে দিলো বটে, তবে রুখতে পারলো না বিমানটাকে। জোর করতে পারলো না। মস্ত একটা উড়ুক্কু মাছের মত যেন ঢেউয়ের নিচ থেকে লাফ দিয়ে বেরোল ফ্লাইং বোট। ককপিটের জানালায় এসে পড়লো পানির ফোয়ারা। সামনের সব কিছু চোখের আড়াল করে দিল ক্ষণিকের জন্যে।

চেপে রাখা দমটা ফোঁস করে ছেড়ে সীটে হেলান দিলো ওমর। সীট বেল্টের বাঁধন শক্ত করলো। রাটুনার দিকে কোর্স ঠিক করলো বটে, তবে সরাসরি যেতে পারছে একথা বলা যাবে না। কারণ সরাসরি সেদিক থেকেই ধেয়ে আসছে বাতাস। নাকটা কোণাকোণি করতে বাধ্য হলো সে। তারমানে দ্বীপের দিকে না গিয়ে চলে যাবে খোলা সাগরের দিকে, এই পথে চললে। চট করে একবার চোখ বুলিয়ে নিলো ব্যারোমিটারে। সাড়ে আটাশ।

রাটুনা দেখা গেল। শাদা হয়ে গেছে সাগর। তার মাঝে যেন ফ্যাকাসে সবুজ মরুদ্যান। আতঙ্কিত হয়ে ল্যান্ড করার জায়গা খুঁজলো সে। শাদা আর সবুজের মাঝখানে এক জায়গায় সরু এক চিলতে পানি দেখা গেল, সাগরের সঙ্গে যেটার রঙের অমিল রয়েছে। নিশ্চয় ওটাই লেগুন। দেয়াল ডিঙিয়ে এখনও সাগরের ঢেউ ঢুকতে পারেনি ওখানে।

সেদিকেই চললো ওমর। লেগুনের ওপরে এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। বাইরে সাগরের তুলনায় একেবারে শান্ত রয়েছে ওখানকার পানি, বলা চলে। বাতাসে উড়ছে নারকেলের ছেড়া পাতা। অনেক পাতা এসে পড়েছে পানিতে। সরের মত ভাসছে। কতটা পুরু হয়ে, বোঝা কঠিন। বেশি পুরু হলে বাড়ি লেগে ফ্লোটের ক্ষতি হতে পারে। তবে এখন আর বিমান বাঁচানোর কথা ভাবছে না ওমর, নিজেদের বাঁচার কথা ভাবছে। রাটুনায় যখন একবার পৌঁছতে পেরেছে, ঝড় থামলে ডজ আইল্যান্ডে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারবেই।

কোথায় নামাবে জায়গা বাছাই করে নিলো সে। গতিবেগ একটুও কমলো না, পুরো খুলে রেখেছে থ্রটল। পানিতে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো যেন বিমান। সঙ্গে সঙ্গে ঝটকা দিয়ে ঘুরে গেল একপাশে। নারকেল পাতার স্তূপ আঁকড়ে ধরেছে ওদিকের উইং ফ্লোট। কয়েক গজ এগোতে এগোতেই অন্য ফ্লোটটাকেও ধরল। থামাতে পারলো না। টেনেহিচড়ে আরও কয়েকগজ গিয়ে তারপর থামল বিমান।

আরও গজ বিশেক যেতে পারলে নামা যেত। তীরের কাছাকাছি, পানি আছে, তবে মাটি নাগাল পাওয়া যাবে।

ইঞ্জিন বন্ধ করে অন্য দুজনের দিকে ফিরলো ওমর। মনে হচ্ছে কিছু সময় থাকতে হবে এখানে। তা নাহয় থাকলাম, আসল বিপদ কাটিয়ে এসেছি। কিশোরদের জন্যে ভয় লাগছে এখন।

ঝড় থামলে না হয় গিয়ে দেখা যেত, ভীষণ মুষড়ে পড়েছে মুসা। তার কণ্ঠস্বরেই বোঝা যাচ্ছে। কিশোর মারা গেছে, এটা বিশ্বাস করতে পারছে না সে। ঢেউ তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে সাগরের হাসি আর ঝিনুক থাকতে, এটাও বিশ্বাস করে না। তাহলে হলোটা কি?

এখানে থাকার চেয়ে চল গাঁয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি, ডজ বললো। ঝড় থামলে লোক নিয়ে এসে পাতা কেটে প্লেনটা বের করে দ্বীপে যাব আবার। মুসা, ভয় পেয়ো না। সাগরের হাসি আর ঝিনুক থাকতে কিশোর মরতে পারে না। নিশ্চয় কোথাও নিরাপদেই আছে ওরা। আমাদের অজানা কোনখানে।

এই ঝড়ের মধ্যে নামবে? ওমরের প্রশ্ন। শুনেছি, ঝড়ের সময় কামানের গোলার মতো নারকেল ওড়ে এসব অঞ্চলে। মাথায় লাগলে ছাতু বানিয়ে দেবে।

তাই তো! ভুলে গিয়েছিলাম। বাতাস না কমলে বেরোনো যাবে না।

ঠিক আছে, বসেই থাকি। সীটে হেলান দিলো ওমর। পাতায় ঢেকে যাবে আরকি আমাদের ওপরটা। তা যাক। ভাল কথা, মুক্তোগুলো কোথায় রেখেছ?

মুক্তো! চোখ মিটমিট করলো ডজ। তুমি আননি? আমার কি আনার কথা নাকি?

দেখার মত হলো ডজের চেহারা। মাথা নাড়তে নাড়তে বিড়বিড় করে বললো সে, আগেই বলেছি, আমি একটা হতভাগা! পোড়া কপাল! মুক্তো কি আর আমার মত

লোকের কপালে সইবে! দুহাতে মাথা চেপে ধরলো সে। রয়ে গেছে দ্বীপেই। পাথরের নিচে যেখানে রেখেছিলাম।
ঘুরতে ঘুরতে এসে মাথার ওপরে হাতে পড়লো একটা নারকেল পাতা।
বাহ, চমৎকার! এভাবে পড়তে থাকলে ছাতটাও কতক্ষণ সহ্য করতে পারবে আল্লাহই জানে! ওমরের কণ্ঠে সন্দেহ।
কোথায় যে গেছে কিশোর, মুসার অন্তত এটা বোঝা উচিত ছিলো। কিন্তু উত্তেজনা আর বিপদের সময় হাত-পা যতটা সহজে খেলে ততটা খেলে না তার মগজ। সে জায়গাটায় মুসা গিয়েছে, কিন্তু সেকথা বলার প্রয়োজন বোধ করেনি ওমর কিংবা ভজকে। তাহলে ওরা হয়ত অনুমান করতে পারতো।
ডজের অনুরোধে গুহার কাছে এসে মাছ ধরতে বসলো সাগরের হাসি আর ঝিনুক। তাদের পাশে কিশোর। দেখতে দেখতে যথেষ্ট মাছ ধরা হয়ে গেল। আগের দিনের মতই প্রস্তাব দিলো সাগরের হাসি, সাঁতরাতে নামবে। বলেই নেমে পড়ল।।
ঝিনুকও কি আর বসে থাকে? নেমে পড়লো সে-ও। কিশোর ভাবলো, গুহাঁটা দেখেই আসা যাক। এত সুন্দর যখন বলেছে মুসা।
সাগরের হাসি আর ঝিনুককে বললো সেকথা। ওরা তো বলতেই রাজি। ঢুকে পড়লো তিনজনে।
গুহাঁটা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল কিশোর। মুসার মত এত সহজে আগ্রহ নষ্ট হলো তার, দেখছেই, দেখছেই। কোন দিক দিয়ে যে বেরিয়ে যাচ্ছে সময়, খেয়ালই রাখছে না। অবশেষে যখন খেয়াল হলো, তাকে বসেই মুখ ফিরিয়ে দুই সঙ্গীকে বললো সে, চল, যাই। আর দেরি করলে রাত হয়ে যাবে। পানির দিকে তাকিয়ে কি ভাবলো। দেখ, পানির রঙ কেমন বদলে যাচ্ছে। না?
তাকের ওপর দাঁড়িয়ে সাগরের হাসি আর ঝিনুকও তাকিয়ে রয়েছে পানির দিকে। তাকের কিনার ধরে দুই হাতে ভর দিয়ে শরীরটাকে উঁচু করলো কিশোর। এক দোলা দিয়ে আলগোছে ছেড়ে দিতে যাবে এই সময় চিৎকার করে উঠলো সাগরের হাসি, ম্যাকো! ম্যাকো?
শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলালো কিশোর। কিংবা বলা যায় ভীষণ চমকে গিয়ে শরীরটাকে ছেড়ে দিলো। ধপ করে বসে পড়লো আবার তাকের ওপর। কি বললে?
পানির দিকে হাত তুলে রেখেছে সাগরের হাসি।
মস্ত একটা তিনকোণা পাখনা ভেসে উঠেছে পানিতে। গুহার প্রবেশ মুখের কাছে। এগিয়ে আসতে লাগলো ধীরে ধীরে।
পুরো একটা মিনিট নীরবে তাকিয়ে রইলো কিশোর। লেগুনের পানিতে এখানে এই প্রথম হাঙর দেখলো। বাধা দিতে আর একটা সেকেন্ড দেরি করলে সাগরের

হাসি কি ঘটত ভেবে শিউরে উঠলো। কি করবো? প্রায় ফিসফিসিয়ে বললো সে।
বসে থাকতে হবে, বললো ঝিনুক। আর তো কোনো উপায় দেখি না।
সাত দিনেও যদি না যায় ওটা?
আমাদেরও থাকতে হবে।
তাকে উঠে দাঁড়ালো কিশোর। সে যেখানে রয়েছে তার ফুট দশেক দূরে ভেসে উঠলো বিশাল হাঙরের পিঠ। এত বড় ওটা, গুহাঁটা যেন প্রায় ভরে গেল। ছোট ওই বদ্ধ জায়গায় তিমির চেয়ে বড় লাগলো ওটাকে। যেখানে রয়েছে ওরা, নিরাপদেই থাকবে। কারণ তাকটা পানি থেকে তিন ফুট উঁচুতে, কোন জায়গায় দুই ফুট। ওপরে থাকলে কিছু হবে না, কিন্তু পানিতে পা নামালে মহা বিপদে পড়বে। পা কামড়ে ধরে টেনে নিতে পারে হাঙরটা। আর তার অর্থ ভয়াবহ যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু।
আটকা পড়লাম আমরা! বললো সে। বেরোতে পারব না। কিন্তু ব্যাটা এখানে এল কেন মরতে?
অনেক বড় ঝড় আসছে, ঝিনুক বললো। হয়ত হারিকেন। বড় বড় মাছ যখন লেগুনে ঢোকে, গুহায় ঢোকে, বুঝতে হবে বাইরের সাগরের অবস্থা খারাপ।
তাহলে এখন কি করব? এসব অবস্থায় কি করতে হয় তোমরাই ভাল বোঝ।
থাকতে হবে, আরকি।
মারা যায় না? কিংবা তাড়ান? তোমরা তো হাঙরের সঙ্গে লড়াই কর।
সেটা খোলা জায়গায় হলে। এখানে গুহার ভেতরে পারব না। আটকে ফেলবে সহজেই। ওদের ক্ষমতা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি। বুদ্ধির জোরেই কেবল কাবু করা যায়।
বিশাল পাখনাটার দিকে তাকালো আবার কিশোর। নৌকার পালের মত খাড়া হয়ে আছে। ওরা খুব চিন্তা করবে। আমাদেরকে না পেয়ে।
বসলো সাগরের হাসি। তাকের কিনারের দেয়াল থেকে আলগা একটুকরো প্রবাল খুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারলো হাঙরটাকে সই করে। গাল দিলো আঞ্চলিক ভাষায়।
ধীরে সুস্থে শরীর নাড়লো হাঙরটা। দেখিয়ে দিলো ধূসর-শাদা পেট।
তোমাদের দেবতাকে ডাক, কিশোরকে পরামর্শ দিলো ঝিনুক। চিন্তিত লাগছে তাকে।
কিছু বললো না কিশোর। সে-ও ভাবছে। চিমটি কাটছে নিচের ঠোঁটে। কালো হয়ে গেছে নীল পানি। তার মানে সূর্য ডুবে গেছে। কল্পনায় দেখতে পাচ্ছে। ওদেরকে খুঁজে বেড়াচ্ছে অন্যেরা। পাবে না ওপরে। তখন মূসার হয়ত, মনে পড়বে গুহাঁটার কথা। মাছ আর জুতো ফেলে এসেছে ওপরে। ওগুলো দেখে সে আন্দাজ করে ফেলবে, ওরা কোথায় রয়েছে। তখন দেখতে আসতে পারে। ওকে হুঁশিয়ার করার

কোন উপায়ই নেই। সোজা এসে পড়বে হাঙরের মুখে। নিজেদের চেয়ে মুসার জন্যে এখন বেশি চিন্তিত হয়ে পড়লো সে।
জীবনে অনেক বিপদে পড়েছে কিশোর। সেগুলো থেকে উদ্ধারও পেয়েছে কোন না কোন ভাবে। কখনও নিজের বুদ্ধির জোরে, কখনও অন্যের সাহায্যে। কিন্তু এই বিপদ থেকে উদ্ধারের কোন পথই খুঁজে পাচ্ছে না সে। কোন বুদ্ধি বের করতে পারছে না। কতদিন থাকবে এখানে হাঙরটা, সেটা এখন আর বড় কথা নয়। বড় কথা হলো, মুসা খুঁজতে আসবে।
শান্ত পানিতে কাঁপন উঠেছে এখন। হাঙরটা চুপ করে রয়েছে, আলোড়নটা তার সৃষ্ট নয়। পানি একবার উঠছে একবার নামছে। সেদিকে তাকিয়ে ঝিনুককে বললো কিশোর, ঠিকই বলেছ। ঝড়ই আসছে।
ঝড় থেমে গেলেই ম্যাকো চলে যাবে, বললো ঝিনুক।
ঝড়টা কতক্ষণ থাকবে?
দুই দিন। তিন দিন। ঠিক নেই।
দেয়ালে হেলান দিয়ে বসলো কিশোর। প্রবালের টুকরো ভেঙে ভেঙে ছুঁড়ছে সাগরের হাসি। যেন ঝাল মেটাচ্ছে হাঙরের ওপর। গায়েই যেন লাগছে না এই আঘাত, কিংবা অপমান গায়ে মাখছে না হাঙর। চুপ করে রয়েছে সেটা। দ্রুত অন্ধকার হয়ে গেল। আলোর কোন ব্যবস্থা নেই এখানে। তার মানে একটা রাত এই গুহার ভেতরে অন্ধকারে কাটাতে হবে, যদি মুসা না আসে। আল্লাহ্, না আসুক, প্রার্থনা শুরু করলো কিশোর। না আসুক! অন্ধকারেই থাকব আমরা!
ঘুটঘুটে অন্ধকার। পানির ওঠানামার মৃদু শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দও নেই। হাঁটুতে থুতনি রেখে রাত কাটাতে তৈরি হলো কিশোর। জীবনের দীর্ঘতম রাত।
রাত যেন আর শেষই হতে চায় না। ভোরের আলো আসতে এত দেরি হচ্ছে, একসময় কিশোরের মনে হল দেয়াল ধসে পড়ে গুহার মুখটাই বুঝি বন্ধ হয়ে গেছে। পানির ওঠানামার শব্দ বাড়ছে। তার মানে বাইরে ঝড়ও বাড়ছে। ঘুমানো তো দূরের কথা, চোখের পাতাও এক করতে পারছে না সে। অন্ধকারে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না, তাকিয়ে রয়েছে তবু।
অবশেষে দেখা গেল আলো। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো কিশোর। নাহ, গুহার মুখটা খোলাই আছে, দেয়াল ধসে পড়েনি। কিন্তু আলো বাড়লেও পানির রঙ আর নীল হলো না। ধূসর, একঘেয়ে, বিষন্ন। আবার দুশ্চিন্তা হতে লাগলো মুসার জন্যে। রাতের অন্ধকারে পানিতে নামেনি বটে, কিন্তু এখন আলো ফুটেছে। নিশ্চয় দেখতে আসবে।
গুহার দেয়ালে হেলান দিয়ে শান্তিতে ঘুমিয়ে আছে সাগরের হাসি আর ঝিনুক। যেন ঘরের ভেতরে রয়েছে। ভাবনার কিছুই নেই এখানে। কোন বিপদ নেই, ভয়

নেই। আস্তে করে ঝিনুকের কাঁধ ধরে ঝাঁকি দিল সে। জেগে গেল ঝিনুক। সাগরের হাসিও। পানির রঙ দেখাতে গিয়ে হঠাৎ খেয়াল হল, পাখনাটা দেখা যাচ্ছে না। তার মানে কি হাঙরটা নেই?
ভালো করে দেখে ঘোষণা করলো সাগরের হাসি, নেই, চলে গেছে। স্বস্তির কাপা নিঃশ্বাস পড়লো কিশোরের। আনন্দে চিৎকার করে উঠতে যাবে, এই সময় গম্ভীর মুখে ঝিনুক বললো, ওপর থেকে দেখা যাচ্ছে না বটে। হয়ত নিচে ডুবে রয়েছে। নামলেই ধরবে।
ফাটা বেলুনের মত চুপসে গেল যেন কিশোর। এটা ভাবেনি। সত্যি, নিচে ডুব দিয়ে থাকতেই পারে।
আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরেও যখন হাঙরটা ভাসলো না, উঠে দাঁড়ালো ঝিনুক। বললো, আমি যাচ্ছি।
হাঙরটা যদি থাকে? কিশোরের প্রশ্ন।
লড়াই করবো। হয় ম্যাকো মরবে। নয়তো আমি।
মাথা নাড়লো কিশোর। তবে নিষেধ করতে পারলো না ঝিনুককে। করতে হলে অন্য কোন উপায় বাতলে দিতে হবে এখান থেকে মুক্তির। সেটা যখন পারছে না, কি আর বলবে।
আমি যাই, আবার বললো ঝিনুক। তোমরা থাক। ম্যাকো না থাকলে ফিরে আসব।
এতবড় একটা ঝুঁকি নিতে চলেছে কেন ঝিনুক, বুঝতে পারছে কিশোর। মুসার কথা ভেবে। তাকে যেতে না দেয়াই উচিত। কিন্তু এবারও মানা করতে পারলো না। ভাবলো, সে নিজেও যাবে। সাহায্য করবে ঝিনুককে। পরক্ষণেই বাতিল করে দিলো চিন্তাটা। বদ্ধ জায়গায় উপকার তো করতেই পারবে না, গিয়ে আরও সমস্যা বাড়াবে ঝিনুকের। অসহায় দৃষ্টিতে সাগরের হাসির দিকে তাকালো সে। পানির দিকে চেয়ে রয়েছে মেয়েটা। বোধহয় ম্যাকোকে খুঁজছে।
ওই মুহূর্তে ছুরি কামড়ে ধরে পানিতে ঝাঁপ দিলো ঝিনুক। কোমরের ছুরির বাঁটে হাত ছোঁয়ালো সাগরের হাসি। তৈরি রয়েছে। দরকার হলেই যাতে ঝাঁপ দিতে পারে।
কয়েকটা সেকেন্ড পানির দিকে তাকিয়ে রইলো মেয়েটা। তারপর আচমকা কোমর থেকে ছুরিটা টেনে বের করে দাঁতে কামড়ে নিয়ে দিলো ঝাঁপ। কিশোর কিছু বলার সময়ও পেল না, বাধা দেয়া দূরে থাক। চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইলো পানির দিকে।
বেশ আলোড়ন উঠতে লাগলো। যেন হঠাৎ করেই সাংঘাতিক তোলপাড় শুরু হয়েছে তলায়। গুহামুখের কাছে কালো ছায়া দেখতে পেল বলে মনে হলো তার।

মিনিট কাটছে। উত্তেজনায় টান টান হয়ে উঠেছে স্নায়। ভেসে উঠলো ঝিনুকের মাথা। ডেকে বললো, জলদি এস!
ম্যাকো গেছে?
জলদি এস! বড় বড় ঢেউ!
একবার দ্বিধা করলো কিশোর। তার পরই ঝাঁপ দিলো পানিতে নেমে চললো ঝিনুকের পিছু পিছু। ভয়ে বুক কাঁপছে। মনে হচ্ছে এই বুঝি এসে পা কামড়ে ধরলো হাঙরটা।
ঠেলে নিয়ে গিয়ে চেপে ধরতে চাইছে তাকে স্রোত। ঢোকার সময় এই স্রোত ছিলো না। এখন এলো কোথা থেকে? হাত ধরে তাকে টেনে নিয়ে চললো ঝিনুক। সুড়ঙ্গের মুখের ভেতরে ঢুকতেই যেন অদৃশ্য এক দানবের হাত হ্যাচকা টানে বাইরে বের করে নিয়ে গেল তাকে। তারপর ছুঁড়ে দিলো ওপর দিকে।
কি করে ডাঙায় উঠলো কিশোর, বলতে পারবে না। শুধু মনে আছে, পেছন থেকে তাকে ঠেলছে ঝিনুক, আর চুল ধরে তাকে টেনে তুলছে সাগরের হাসি। হাঁটু পানিতে থাকতেই পেছন থেকে এসে ধাক্কা মারলো মস্ত এক ঢেউ। তিনজনকেই প্রায় ছুঁড়ে ফেললো সৈকতে।
ধপ করে বসে পড়লো কিশোর। টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালো ঝিনুক। হাত তুলে দেখালো ঢেউয়ের দিকে। মস্ত একটা পাখনা ভেসে উঠেছে। শিউরে উঠলো কিশোর। ওরা যখন বেরিয়ে আসছে তখনও কাছাকাছিই ছিল হাঙরটা।
গুহায় অসুবিধে হচ্ছিলো, ঝিনুক বললো। অনেক বড় তো। হাঁসফাস লাগছিলো হয়ত। তাই বেরিয়ে পড়েছে।
চারপাশে তাকানোর সুযোগ পেলো এতক্ষণে কিশোর। অনুভব করলো ঝড়ের শক্তি। বাতাসের অদৃশ্য থাবা তার দেহ আঁকড়ে ধরে যেন উড়িয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। কাত হয়ে যাচ্ছে নারকেলের পাতা, ছিড়ে চলে যাচ্ছে ডালের গোড়া থেকে। লেগুনের দেয়ালের নিচে যেন কয়েক কোটি দৈত্যের তান্ডব নৃত্য শুরু হয়েছে। এমন করে ফুসছে সাগর। শাদা ফেনায় ভরে গেছে লেগুনের পানি। দেখে বিশ্বাসই হয় না, ঝলমলে রোদের সময় ওটা নীল ছিলো। কালচে-ধূসর আকাশের মতই এখন রঙ হয়ে গেছে পানির।
বিমানটাকে খুঁজতে গিয়ে হাঁ হয়ে গেল কিশোর। ছোট্ট একটা চিৎকার বেরিয়ে এলো গলা দিয়ে। নেই। সে ভাবলো, প্রচন্ড ঢেউ নোঙর ছিড়ে নিয়ে গেছে ওটাকে, ডুবিয়ে দিয়েছে। মুসারা কোথায়? সাগরের হাসি আর ঝিনুককে বললো সে, দেখতে যাচ্ছে। বাতাসের মধ্যে মাথা নিচু করে দৌড় দেয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে বুঝলো কতটা ভয়ংকর ঝড়। প্রচন্ড বাধার বিরুদ্ধে যেন লড়াই করতে করতে এগোতে হলো তাকে। যেখানে ক্যাম্প করেছিলো ওরা সেখানে এসে দেখলো

কোন মানুষ নেই। মাটিতে বিছিয়ে রয়েছে নারকেল পাতা। ইতস্তত পড়ে থাকা কয়েকটা কাঠের বাক্স প্রমাণ করছে এখানে ক্যাম্প ছিলো। হতাশ কণ্ঠে চিৎকার করে যেন নিজেকেই বোঝালো সে, ওরা চলে গেছে!
সৈকতের দিকে তাকালো। যেখানে বিমানটা বাঁধা ছিলো। বিড়বিড় করে বললো, নিশ্চয় ঝড় শুরু হতেই চলে গেছে।
ওসব নিয়ে পরে ভাববে। আপাতত মাথা গোঁজার একটা ঠাই দরকার। দ্বীপের মাঝখানের দিকে চললো সে। ওখানে নারকেল গাছের জটলার ভেতরে ঢুকে বসার ইচ্ছে। কিন্তু এমন ভাবে ছোটাছুটি করছে নারকেলের পাতা, নিরাপদ মনে করতে পারলো না জায়গাটাকে।
সাগরের হাসি আর ঝিনুকের দিকে তাকালো। হাত নেড়ে সেদিকেই যাওয়ার ইঙ্গিত করলো ওরা। ওরাও সেদিকে চলেছে। নিশ্চয় কোন কারণ আছে। এসব ঝড় দেখে অভ্যস্ত পলিনেশিয়ানরা। ঝড়ের সময় আত্মরক্ষা করতে হয় কিভাবে জানে।
নারকেলের জটলার ভেতরে পৌঁছে গেল ওরা। মুখের কাছে দুহাত এনে কিশোরের কানের কাছে মুখ নিয়ে ঝিনুক বললো, বাতাস পড়ে গেলেই আসবে, বড় জোয়ার।
বোধহয় জলোচ্ছ্বাসের কথা বলছে ঝিনুক। পাগল হয়ে যাওয়া বিশাল ঢেউয়ের দাপাদাপির দিকে তাকিয়ে কিশোর বললো, এর চেয়ে বড়?
হ্যাঁ। দ্বীপ ভাসিয়ে দেবে। এস। যেন ঝিনুকের কথার সমর্থনেই বিশাল এক ঢেউ এসে আছড়ে পড়লো সৈকতে, পানি উঠে চলে এল অনেকখানি ওপরে।
এস এস!
নারকেল উড়ছে না আর। কারণ ওড়ার মত নেইই। সব পড়ে গেছে, বিছিয়ে রয়েছে গাছের তলায়। মোটা একটা গাছ বেছে নিয়ে কাজ শুরু করে দিলো সাগরের হাসি। গাছের চারপাশ ঘিরে খাঁজ কাটছে। কাটা শেষ করে নিজের শরীর পেঁচিয়ে দড়ি দিয়ে বাঁধলো গাছের সঙ্গে, দড়িটা বসিয়ে দিয়েছে খাঁজের মধ্যে। ক্যাম্পের কাছে দড়ি পড়ে ছিলো, ওখান থেকে তুলে এনেছে। কিশোরের দিকে তাকিয়ে ইশারা করলো, গাছে ওঠার জন্যে। তার সঙ্গে একই গাছে।
ঠিক কি করতে চাইছে সাগরের হাসি তখনো বুঝতে পারছে না কিশোর। যা করতে বলা হলো করলো সে। মেয়েটার কাছে উঠে এলো। আরেকটা খাঁজে দড়ি বসিয়ে কিশোরের চারপাশে পেঁচিয়ে বাঁধলো সাগরের হাসি।
ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের মত মনে হচ্ছে ব্যাপারটা কিশোরের কাছে। বাতাসে দুলছে নারকেলের কান্ড, মাঝে মাঝে এত বেশি নুয়ে পড়ছে তার ভয় লাগছে ভেঙেই না

যায়। মাটি থেকে অনেক ওপরে রয়েছে। দড়ি ছিড়ে গেলে কি হতে পারে কল্পনা করতে চাইলো না সে।
ক্রমেই এগিয়ে আসছে ঢেউ, পানি উঠছে দ্বীপে। সব চেয়ে উঁচু জায়গাটায় উঠতেও দেরি হবে না, বুঝতে পারছে কিশোর। এখনও গুহার ভেতরে থাকলে কি অবস্থা হতো ভেবে গায়ে কাঁটা দিলো তার। হাঙরে না খেলেও পানিতে ডুবেই মরতে হতো। নিশ্চয় এতোক্ষণে পানিতে ভরে গেছে গুহাঁটা।
মাথা ঘুরিয়ে তাকালো কিশোর। আরেকটা গাছে উঠে একই ভাবে নিজেকে বেঁধেছে ঝিনুক। এই বাতাসের মধ্যে নারকেলের কান্ড আঁকড়ে থাকা যে কতটা কঠিন, হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে গোয়েন্দাপ্রধান। ওই মুহূর্তে তার মনে হলো এসব অ্যাডভেঞ্চারের চেয়ে গোয়েন্দাগিরি অনেক ভালো এবং সহজ।
তার দিকে তাকিয়ে হাসলো ঝিনুক। বাপরে, বাপ! সাহস আছে ওদের! ভাবলো কিশোর।
গাছের কান্ড আঁকড়ে থাকা ছাড়া আর কিছু করার নেই। কখন থামবে সেটা ঝড়ের ইচ্ছে।
এক ঘণ্টা পেরোল, দুই ঘণ্টা। তারপর আচমকা নীরব হয়ে গেল সব কিছু। বাতাস বন্ধ হয়ে গেল। এমনকি মাথার ওপরে নীল আকাশও চোখে পড়লো একটুকরো।
যাক, ঝড়টা তাহলে গেল। হাঁপ ছাড়লো কিশোর।
কিন্তু মাথা নাড়লো সাগরের হাসি। উহু! শেষ হয়নি। এটা ঝড়ের মধ্যিখাটা। আবার আসবে বাতাস।
মেয়েটা কি বলছে বুঝতে পারলো কিশোর। মনে পড়ল অথৈ সাগর অভিযানের কথা। সেবারেও হারিকেনের মাঝে পড়েছিল জাহাজ। ঝড়ের মধ্যিখান বলতে কেন্দ্রবিন্দু বোঝাচ্ছে সাগরের হাসি। ঝড়ের কেন্দ্রে বাতাস থাকে না, সেটা পেরোলেই আবার আগের মত জোরালো তুফান শুরু হবে।
বেশিক্ষণ থাকলো না ওই নীরবতা। হঠাৎ যেমন থেমে গিয়েছিল, তেমনি হঠাৎই আবার এসে যেন ঝাঁপিয়ে পড়লো বাতাস। মাথার ওপর থেকে হারিয়ে গেল নীল আকাশ। ধেয়ে এল ঢেউ।
ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে একটানা বয়ে চললো ঝড়। বিকেল চারটের দিকে কমে এলো বাতাসের বেগ। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লান্তিতে একবারে কাহিল হয়ে পড়েছে কিশোর। গাছ জড়িয়ে ধরে রাখার শক্তিও যেন নেই।
পানি নেমে যেতে শুরু করলো। মেঘের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিলো সূর্য। দিগন্তসীমার কাছাকাছি নেমে গেছে। বিরাট এক আগুনের গোলার মত লাগছে এখন ওটাকে।
নামবে কিনা জিজ্ঞেস করলো কিশোর। মাথা নাড়লো সাগরের হাসি। এখনও সময় হয়নি।

সূর্য ডুবলো। সাগরের হাসি ঘোষণা করলো, এবার নামা যেতে পারে। নেমেই ভেজা মাটিতে চিত হয়ে শুয়ে পড়লো কিশোর। শরীরের প্রতিটি ইঞ্চি ব্যথা হয়ে গেছে। লবণে শক্ত হয়ে গেছে চুল এমনকি ভুরু পর্যন্ত।
সাগরের হাসি আর ঝিনুকের অবস্থাও খুব একটা ভাল নয়। তবে সকলেই খুশি। ঝড়টা কাটাতে পেরেছে। আর বেঁচে তো রয়েছে এখনও। কোন কিছু নিয়েই একটুও উদ্বিগ্ন হলো না দুই পলিনেশিয়ান।
খানিকক্ষণ জিরিয়ে নিয়ে উঠলো ওরা। এগোল ক্যাম্প এলাকার দিকে। দ্বীপের চেহারা বদলে দিয়ে গেছে ঝড়। প্রবালের অনেক চড়া গায়েব হয়ে গেছে। জায়গায় জায়গায় মাটি খুবলে নিয়ে গেছে ঢেউ। পানিতে ভেসে গেছে অনেক পাতা, কিছু কিছু ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এখনও। তবে তার চেয়ে বেশি জমে রয়েছে সামুদ্রিক আগাছা। আর রয়েছে ঝিনুক। অগুনতি। নানা জাতের, নানা আকারের। ওসবের মাঝে কিলবিল করছে কাঁকড়ার দল। আরও নানা রকম জলজ প্রাণী উঠে এসেছিলো ঢেউয়ে, নামার সময় আর যেতে পারেনি, আটকা পড়েছে বালিতে।
ক্যাম্প এলাকাটা সব চেয়ে উঁচু ওই দ্বীপে। ওখানে পানি ওঠেনি। কাছাকাছি ঝাপটা দিয়ে গেছে শুধু ঢেউ। পানি ছিটিয়ে ভিজিয়ে রেখে গেছে। প্রবালের চাঙড়ের খাঁজে একটিন গরুর মাংস আটকে থাকতে দেখলো কিশোর। কয়েক টিন কনডেনসড মিল্ক, আর এক টিন বিস্কুট পাওয়া গেল, বালিতে অর্ধেক গাঁথা অবস্থায়। খিদেয় চো চো করছে পেট। তর সইছে না আর। সাগরের হাসির কাছ থেকে ছুরিটা নিয়ে মাংস আর বিস্কুটের টিন কাটলো সে। মুখে দিয়ে চিবুতে গিয়ে টের পেল জিভই নাড়তে পারছে না। শুকিয়ে যেন আঠা হয়ে লেগে গেছে মুখের ভেতরে। পানি দরকার। ঝর্নাটার দিকে চলল সে। কিন্তু গিয়ে অবাক হয়ে গেল। যেখানে থাকার কথা সেখানে নেই ওটা। বালিতে ঢাকা পড়ে গেছে।
দুই পলিনেশিয়ানও এসেছে তার পিছু পিছু। তাদের দিকে চেয়ে গুঙিয়ে উঠলো কিশোর, পানি নেই! এবার মরব!
হেসে উঠলো সাগরের হাসি। না, মরব না। পানি অনেক আছে। পড়ে থাকা অনেক ডাব দেখালো সে।
তাই তো! ভুলেই গিয়েছিলো কিশোপ। চিন্তা দূর হলো।
একটা ডাব তুলে নিলো সাগরের হাসি। ছুরি দিয়ে মুখটা কেটে ছিদ্র করে তুলে দিলো কিশোরের হাতে।
মিষ্টি পানিতে ভরে গেল কিশোরের মুখ। জিভ নাড়তে কষ্ট হচ্ছে এখনও। আস্তে আস্তে ভিজিয়ে নরম করে আনলো। পানি খাওয়ার পর ডাবটাকে দুই টুকরো করে ভেতরের নরম মিষ্টি শাস খেলো সে। অনেকটা বল ফিরে পেলো শরীরে।

ভেজা মাটিতে বসে নীরবে অনেকক্ষণ ধরে খাওয়া চালিয়ে গেলো ওরা। ধীরে ধীরে খাচ্ছে। গরুর মাংস, বিস্কুট আর নারকেল।
শেষ হলো খাওয়া। চাঁদ উঠেছে। উজ্জ্বল জ্যোৎস্না। সাগরের দিকে তাকিয়ে ভাবছে কিশোর, ওমররা প্লেন নিয়ে নিরাপদ জায়গায় যেতে পেরেছে তো? নাকি ডুবে মরেছে সাগরে? কালকের মধ্যে যদি ফিরে না আসে, তাহলে বুঝতে হবে বেঁচে নেই ওরা।
বেশিক্ষণ দুশ্চিন্তা করার সুযোগ পেলো না কিশোর। এতে ক্লান্ত হয়েছে শরীর, বসেও থাকতে পারছে না আর। শুয়ে পড়লো বালিতে। শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম।
সকালে আগে ঘুম ভাঙলো কিশোরের। চোখ মেলে তাকিয়ে রইলো নীল আকাশের দিকে, পুরো দুই মিনিট। কি যেন একটা গন্ডগোল হয়ে গেছে, অনুভূতি বলছে। হঠাৎ মনে পড়লো। গন্ডগোলটা আর কিছু না, আগের দিনের ঝড়। বিপদে রয়েছে ওরা। নড়তে ইচ্ছে হলো না। বাতাস তাজা। গায়ে পরশ বোলাচ্ছে যেন ভোরের কাঁচা রোদ। বেশ আরাম। মাথার নিচে হাত দিয়ে চিত হয়ে থেকে ভাবতে শুরু করলো সে।
কি করেছে ওমর ভাই? তার জায়গায় সে নিজে হলে কি করতো? ওদেরকে অনেক খোঁজাখুঁজি করেছে। বেশিক্ষণ থাকতে পারেনি, কারণ ঝড় আসছিলো, বিমানটাকে বাঁচানোর জন্যে শেষে মুসা আর ডজকে নিয়ে উড়ে চলে গেছে। অবশ্যই ফিরে আসবে আবার। ঝড়ে পানিতে ডুবে মারা গেছে ওরা, ভাবতেই পারলো না কিশোর। এত সহজে মরবে না। যে কোন মুহূর্তে এখন ফিরে আসতে পারে।
চোখ মেললো সাগরের হাসি। উঠে বসে কিশোরের দিকে তাকিয়ে হাসলো। লেগুনের দিকে ফিরলো। সাগরের দিকে চোখ পড়তেই হাসি মিলিয়ে গেল মুখ থেকে। বলে উঠলো, সর্বনাশ! কারনেস!
লাফিয়ে উঠে বসলো কিশোর। লেগুনে ঢোকার প্রণালী দিয়ে ঢুকছে স্কুনারটা। ঝড়ে পড়েছিলো, অবস্থা দেখেই বোঝা যায়। শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ক্ষত। একটা পালও আস্ত নেই। কারনেসের হোয়াইট শার্ক, কোন সন্দেহ নেই। দীর্ঘ একটা নীরব মুহূর্ত জাহাজটার দিকে তাকিয়ে ভাবলো কিশোর, কি করবে? ঝিনুকের পা ধরে ঝাঁকানি দিলো, এই ঝিনুক, ওঠ।
উঠে বসলো ঝিনুক। জাহাজটা দেখে দূর হয়ে গেল ঘুম। ভয় দেখা দিলো চোখে।
নড়ো না, হুঁশিয়ার করলো কিশোর। হয়ত আমাদেরকে দেখেনি। এসেছে কোন কারণে। আমাদের না দেখলে চলে যাবে শীঘ্রি।
মাথা নাড়লো ঝিনুক। না, যাবে না। ঝড়ে পড়েছিল। অনেক ক্ষতি হয়েছে জাহাজের। এখানে থেমে মেরামত করবে।

ঠিক, সাগরের হাসি বললো। না হলে আসছে কেন?
নিশ্চয় পানি আর খাবারের খোঁজে, কিশোর বললো। দ্রুত একবার চোখ বোলালো দ্বীপটায়। লুকানোর জায়গা খুঁজলো। চল, ওদিকটায় চলে যাই। নারকেল কুঞ্জের অন্য পাশটার কথা বললো সে।
উঠে দাঁড়াতে গেল সাগরের হাসি আর ঝিনুক। বাধা দিলো কিশোর। কারনেসের চোখে পড়ে যেতে পারে। হামাগুড়ি দিয়ে এগোল ওরা কুঞ্জের দিকে। ভেতরে বালির একটা ঢিবি আছে। তার আড়ালে লুকিয়ে বসে থাকলে জাহাজ থেকে দেখা যাবে না।
গাছপালার ভেতরে ঢুকেই উঠে দাঁড়ালো কিশোর। দৌড় দিলো ঢিবির দিকে। ওটার আড়ালে আসার আগে পেছন ফিরে তাকালো না একবারও। বসে হাঁপাতে হাঁপাতে তাকিয়ে দেখলো লেগুনে ঢুকে পড়েছে জাহাজটা। নোঙর ফেলছে। ডেকে লুটোপুটি খাচ্ছে ছেড়া পাল। ওগুলো মাড়িয়েই হাঁটাচলা করছে নাবিকেরা। কারনেসের গলাকাটা সাগরেদের দল। হুইল ধরে থাকতে দেখা গেল কারনেসকে। কিছুই করার নেই, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখা ছাড়া। তা-ই করলো কিশোর আর দুই পলিনেশিয়ান। কিশোর ভাবছে, কারনেস কি করবে? আশা করলো, একটুক্ষণ থেকেই নারকেল নিয়ে চলে যাবে জাহাজটা। তবে যতই সময় যেতে লাগলো, নিরাশ হতে থাকলো সে। ডেকটা যতটা সম্ভব গোছগাছ করলো নাবিকেরা। তার পর ডিঙি নামানোর আদেশ দিলো কারনেস। পানির ওপর দিয়ে স্পষ্ট ভেসে আসছে তার কণ্ঠ। ডিঙি নামানো হলো। তাতে চড়ে বসলো কারনেস আর দুই সাগরেদ। দ্বীপের দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করলো।
নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরেছে কিশোর। কপালে মনে হয় দুঃখ আছে আমাদের। কারনেস নিশ্চয়, অনুমান করেছে, এই দ্বীপের কাছাকাছিই কোথাও রয়েছে মুক্তোর খেত। দ্বীপে নেমে ঝিনুকের খোসাগুলো দেখলে শিওর হয়ে যাবে। আরও একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে যাবে, যে আমরাও উঠেছি দ্বীপে। খুঁজতে শুরু করবে।
জবাব দিলো না সাগরের হাসি কিংবা ঝিনুক। তাকিয়ে রয়েছে।
তীরে নামলো কারনেস। চোখ বোলালো দ্বীপের লেগুনের দিকের অংশটায়। পরিত্যক্ত ক্যাম্পটা চোখে পড়লো। দাঁতের ফাঁকে সিগার। কি ভেবে এগিয়ে গেল কয়েক পা। থামলো। দেখলো। আবার এগোল। নিচু হয়ে কুড়িয়ে নিলো একটা জিনিস। ঝিনুকের খোলা। এখান থেকেও দেখতে পাচ্ছে কিশোর।
ব্যস, হয়ে গেছে কাজ! অস্বস্তি বেড়ে গেল কিশোরের। ক্যাম্প দেখতে পেয়েছে কারনেস। ঝিনুকের খোলা পেয়েছে। ওটা কিভাবে কিজন্যে খোলা হয়েছে বুঝতে অসুবিধে হবে না পাকা মুক্তো শিকারীর।

হাত নেড়ে দুই সঙ্গীকে ডাকলো কারনেস। ওরা কাছে এলে খোলাটা দেখালো।
ঘণ্টাখানেক দ্বীপে থাকলো ওরা। তারপর ফিরে গিয়ে উঠল ডিঙিতে। জাহাজের দিকে রওনা হলো। তীর থেকে একশ গজ দূরে নোঙর করা হয়েছে।
আশা হলো আবার কিশোরের। তীরে নেমে ক্যাম্প আর ঝিনুকের খোলা পাওয়ার পরেও যখন কিছু করেনি, আর করবে না। ফিরে যাবে কারনেস।
কিন্তু নড়লো না জাহাজটা। নোঙর তোলার কোন লক্ষণই নেই। জাহাজ আর পাল মেরামতে ব্যস্ত নাবিকেরা। যতই সময় যাচ্ছে উৎকণ্ঠা বাড়ছে কিশোরের। বিমানটা কখন এসে হাজির হয় কে জানে। তাহলে শুরু হবে বড় রকমের গন্ডগোল।
সারাটা দিন গেল। পশ্চিমে ঢলতে শুরু করলো সূর্য। তখনও দেখা নেই বিমানের। আসেনি বলে বরং স্বস্তিই বোধ করছে কিশোর। ভালই হয়েছে। কারনেস চলে যাওয়ার পর আসুক। তাহলে অহেতুক গোলমাল এড়ানো যাবে।
কিন্তু জাহাজটার নড়ার কোন লক্ষণই নেই।
ঝিনুকের দিকে ফিরলো কিশোর। আচ্ছা, ছোট একটা নৌকায় করে এখান থেকে রাটুনায় যেতে কতক্ষণ লাগবে?
এক মুহূর্ত ভাবলো ঝিনুক। একদিন। বড় জোর দুদিন।
জাহাজের পাশে বাধা ডিঙিটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলো, ওই নৌকাটা হলে?
ঝিনুক জানালো, রাতের বেলা রওনা হতে পারলে পরদিন গিয়ে তার পরদিন সকালে রাটুনায় পৌঁছতে পারবে।
পথ চিনে যেতে পারবে কিনা সে সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করলো না কিশোর। সে নিশ্চিত, একটুও ভুল না করে চলে যেতে পারবে সাগরের হাসি কিংবা ঝিনুক।
তাহলে, ঘোষণা করলো যেন কিশোর। রাতে কারনেসরা ঘুমিয়ে পড়লে নৌকাটা চুরি করবো আমরা।
কিশোরের কথা শুনে খুব খুশি সাগরের হাসি আর ঝিনুক। উত্তেজনা ফুটলো চেহারায়। লোলুপ দৃষ্টিতে তাকালো ডিঙিটার দিকে, যেন ওটা মহামূল্যবান একটা বস্তু।
ভাবছে কিশোর, ডিঙি চুরি করাটা কিছুই না। অন্ধকারে নিঃশব্দে সাঁতরে চলে যেতে পারবে ওটার কাছে। তারপর বাঁধন খুলে নিয়ে রওনা হয়ে গেলেই হল। ভয় একটা আছে অবশ্য, হাঙরটার। ওটা এখনও লেগুনে রয়েছে কিনা কে জানে। সারা দিনে একবারও ওটার পাখনা দেখা যায়নি যদিও। তবু থাকতে পারে। কিছু করার নেই। ডিঙিটা পেতে চাইলে ঝুঁকিটা নিতেই হবে।
এখানকার গোধূলি খুব সংক্ষিপ্ত। এসেই চলে যায়। সেদিনও গেল। অন্ধকার নামলো। একটামাত্র আলো জ্বলছে জাহাজে। নাবিকদের ঘুমিয়ে পড়ার

অপেক্ষায় রইলো কিশোর। অন্ধকারে এখনও যেতে পারে, ডেকের ওপর দেখা যাচ্ছে না কাউকে। কিন্তু বলা যায় না। বেরিয়ে আসতে পারে। তাড়াহুড়ো করে অযথা বিপদে পড়ার কোন মানে হয় না।
কোন শব্দ নেই জাহাজে। ডেকে একবারের জন্যেও আর কেউ আসেনি। সারাদিন খেটেছে নাবিকেরা। সন্ধে হতে না হতেই তাই ঘুমিয়ে পড়েছে। উঠে। দাঁড়াল কিশোর। চাঁদ ওঠেনি এখনও। তবে তারার আলো আছে। আকাশটাকে লাগছে বিশাল এক গম্বুজের মতো। ভেতরের দিকে যেন ঝুলে রয়েছে তারাগুলো। সাগরের হাসির দিকে ফিরে বললো সে, একসাথে সবার যাওয়ার দরকার নেই আমাদের। তুমি নারকেল কুড়িয়ে নাও, যত বেশি পার। আমি আর ঝিনুক গিয়ে নৌকাটা নিয়ে আসি।
লেগুনের কিনারে চলে এলো ঝিনুক আর কিশোর। পানিতে পা দিলো। কোমর পানিতে নেমে সাঁতরাতে শুরু করলো। অন্ধকারে পানির ওপরে আবছা ভাবে চোখে পড়ছে জাহাজটা। কালো বিশাল একটা ভূতুড়ে অবয়ব। নিঃশব্দে সাঁতরে চললো দুজনে।
আলোটার দিকে কিশোরের চোখ। ওটা কারনেসের কেবিন। সে জেগে থাকতে পারে। হয়ত বসে বসে মদ গিলছে। খোলা বাতাসের জন্যে বেরিয়ে আসতে পারে। বলা যায় না। সতর্ক থাকা দরকার। ওকে দেখলেই ডুব মারতে হবে।
মাত্র কয়েক গজ দূরে রয়েছে ডিঙিটা। নীরব হয়ে আছে জাহাজ। কোন শব্দ নেই। কেউ বেরোচ্ছে না ডেকে। ডিঙির কাছে পৌঁছে আস্তে হাত দিয়ে খামচে ধরল সে ওটার কিনারা। কান পেতে রইল। না, কোন শব্দই শোনা যাচ্ছে না। আস্তে করে দুহাতের সাহায্যে টেনে তুললো নিজেকে। ডিঙির পাটাতনে নামতে গিয়ে পড়লো নরম কিছুর ওপর। ভয়ানক চমকে গেল সে। নরম জিনিসটা কি বুঝতে পেরেছে। মানুষ!
ডিঙিতে ঘুমিয়েছে লোকটা। অন্ধকারে কোন ফাঁকে নেমেছে ও, ঢিবির আড়ালে বসে দেখতে পায়নি কিশোর। জেগে গেল লোকটা। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠলো। জাপটে ধরলো কিশোরকে।
ছাড়া পাওয়ার জন্যে ধস্তাধস্তি শুরু করলো কিশোর। কিন্তু অসুরের শক্তি লোকটার গায়ে। তাকে পেড়ে ফেলে গলা টিপে ধরলো। ছটফট করতে লাগলো কিশোর। বাতাসের জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে ফুসফুস। কানে আসছে অনেক লোকের চেঁচামেচি। ডেকে বেরিয়ে এসেছে নাবিকেরা।
আরেকবার ছাড়া পাওয়ার জন্য জোরাজুরি করলো কিশোর। প্রচন্ড ঘুসি এসে লাগলো চোয়ালে। হাজারটা তারা জ্বলে উঠলো যেন মাথার ভেতরে। জ্ঞান হারালো সে।

বেশিক্ষণ অচেতন থাকলো না। হুঁশ ফিরলে দেখলো ডেকে পড়ে আছে। প্রায় চোখের কাছে জ্বলছে একটা হ্যারিকেন। অনেকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে তাকে।
চোখ মেলতেই তার দিকে তাকিয়ে কুৎসিত হাসি হাসলো কারনেস। ওঠ ওঠ। নরম গলায় ডাকলো সে। কিশোরের মনে হলো বেড়ালের ঘড়ঘড়ে স্বর বেরোল লোকটার গলা দিয়ে।
উঠে বসলো কিশোর। এরকম একটা কান্ড ঘটবে কল্পনাই করতে পারেনি। যেন ঘোরের মধ্যে রয়েছে এখনও। মাথা ঝাড়া দিয়ে মগজের ঘোলাটে ভাবটা দূর করার চেষ্টা করলো। সে একাই ধরা পড়েছে? নাকি ঝিনুকও? তবে পালিয়ে গেলেও বেশিক্ষণ বাঁচতে পারবে না। সকাল হলেই ধরা পড়তে হবে।
আবার তাহলে দেখা হলো, আঁ? দাঁত বের করে হাসলো কারনেস।
জবাব দিলো না কিশোর।
তোমার দোস্তরা কোথায়? শীতল গলায় জিজ্ঞেস করলো কারনেস।
জানি না, তিক্ত কণ্ঠে জবাব দিলো কিশোর।
মিছে কথা বলবে না বলে দিলাম!
মাথা নাড়লো কিশোর। না, মিথ্যে বলছি না। ঝড়ের সময় হারিয়ে গেছে ওরা। দ্বীপের নিচে একটা গুহার ভেতরে আটকা পড়েছিলাম আমি। হাঙর ঢুকেছিলো গুহায়। ওটার জন্যে বেরোতে পারছিলাম না। সকালে বেরিয়ে দেখি, নেই। জলোচ্ছ্বাস থেকে বাঁচার জন্যে তখন নারকেল গাছে চড়ে বসে রইলাম।
এমন ভঙ্গিতে বলেছে কিশোর, বিশ্বাস করতে বাধ্য হলো কারনেস। মসৃণ গলায় জিজ্ঞেস করলো, অনেক মুক্তো পেয়েছে, না?
অল্প কিছু, অস্বীকার করার কোন কারণ দেখতে পেলো না কিশোর। বেশি তুলতে পারিনি। একটা সোর্ডফিশ প্লেনের তলা ফুটো করে দিয়েছিলো। ডুবুরির সাজসরঞ্জাম সব পানিতে ফেলে দিয়ে চলে আসতে বাধ্য হয়েছি আমরা।
মুক্তোগুলো কোথায়?
ওদের কাছে।
খেতটা কোথায়, জান?
মোটামুটি।
ঠিক আছে। সকালে আমাকে দেখাবে।
আচ্ছা। কথা দিলো বটে কিশোর, তবে দেখাবে কিনা ভাবতে হবে। আসলে সময় চাইছে সে। এখনই কারনেসের বিরোধিতা শুরু করে মার খেতে চায় না।
কোমরের খাপ থেকে ছুরি বের করলো কারনেস। ইচ্ছে করেই চোখা মাথাটা তুললো কিশোরের দিকে। হুমকি দেয়ার জন্যে। বললো, সাবধান, চালাকির চেষ্টা করবে না। তাহলে কি করবো জানো? দিয়ে দেব তোমাকে। আমার সাগরেদদের

হাতে। ওরা নিয়ে গিয়ে জবাই করবে। কেটে মাংস খাবে তোমার। অনেক দিন মানুষের মাংস খায় না। পেলে খুব খুশি হবে।
কিশোরকে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দিলো কারনেস।
প্রায় টেনেহিঁচড়ে কিশোরকে নিচে নামিয়ে আনলো দুজন নাবিক। একটা ঘরের ভেতর ঠেলে দিয়ে বাইরে থেকে দরজা লাগিয়ে দিলো ওরা। বোটকা গন্ধ। গন্ধেই চিনতে পারলো কিশোর, এই ঘরেই বন্দী করে রাখা হয়েছিলো ঝিনুককে।
প্রচন্ড মাথা ধরেছে কিশোরের। দপদপ করছে চোয়ালের যেখানটায় ঘুসি খেয়েছে। তার পরেও ঘুম এলো।
ওপরে ডেকে চেঁচামেচি শুনে ঘুম ভেঙে গেল তার। আঞ্চলিক ভাষায় অনর্গল কথা বলছে নাবিকেরা। মুখ খারাপ করে গালাগাল করছে কারনেস। কাকে, কেন, কিছুই বোঝা গেল না। গোল একটা ফুটো দিয়ে আলো আসছে। ভোর হয়ে গেল? অবাকই লাগলো কিশোরের। ঘুম কত দ্রুত সময় পার করে দেয়।
বাইরের করিডরে পায়ের আওয়াজ হলো। ঝটকা দিয়ে খুলে গেল দরজা। দুজন নাবিক ঘরে ঢুকলো। আগের রাতে যারা কিশোরকে এখানে রেখে গেছে তারা দুদিক থেকে এসে চেপে ধরলো তাকে। আবার টেনে নিয়ে চললো ওপরে।
ডেকে পায়চারি করছে কারনেস। কিশোরকে দেখে থমকে দাঁড়ালো। রাগে লাল হয়ে গেছে মুখ। পিচিক করে থুথু ফেললো ডেকের ওপরেই। ধীরে ধীরে এগোল শিকারি বেড়ালের মত। হাতের আঙুল একবার খুলছে, একবার মুঠো করছে।
তোমার সাথে দ্বীপে আর কে ছিল? লোহা, ঘষলো যেন শিরিষ দিয়ে এমনই কণ্ঠস্বর।
চুপ করে রইলো কিশোর।
ফেটে পড়লো কারনেস। কে নৌকা চুরি করেছে?
লম্বা দম নিলো কিশোর। তাহলে এই ব্যাপার। ডিঙিটা নেই। নিশ্চয় তাকে ধরে আনার পর ফিরে এসেছিলো ঝিনুক। নৌকাটা নিয়ে চলে গেছে। আশা হলো মনে। তবে সেটা চেহারায় প্রকাশ পেতে দিলো না। কিন্তু তার পরেও কি করে যেন বুঝে ফেললো কারনেস। ঠাস করে চড় মারলো।
মাথা সরানোরও সুযোগ পায়নি কিশোর। আরেকটু হলেই উল্টে পড়তো। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে ঠোঁটের রক্ত মুছলো সে।
আর কে ছিলো তোমার সাথে? আবার গর্জে উঠলো কারনেস।
আর চুপ করে থাকার কোন মানে হয় না। লাভ হবে না। নৌকা যখন চুরি হয়েছে, কেউ না কেউ ছিলোই দ্বীপে এটা বুঝে ফেলেছে কারনেস। অস্বীকার করে অযথা মার খেতে হবে। বললো, ঝিনুক। মনে মনে আশা করলো, এতক্ষণে নিশ্চয় সাগরের হাসিকে নিয়ে অনেক দূরে চলে গেছে ঝিনুক।

তীব্র ঘৃণা দেখা দিলো কারনেসের চোখে। শুঁয়োপোকার দিকে যে দৃষ্টিতে তাকায় মানুষ সেভাবে তাকালো কিশোরের দিকে। জুতো দিয়ে মাড়িয়ে পিষে ফেলতে চায় যেন। ওই নোংরা কানাকাটা! জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছে করসিকান। কোথায় গেছে? এত জোরে চিৎকার করে উঠলো সে, চমকে গেল কিশোর। পিছিয়ে গেল এক পা।

গেলে রাটুনাতেই গেছে, আর কোথায়।

আকাশের দিকে নজর চলে গেল কারনেসের। তার মনে কি ভাবনা চলেছে অনুমান করতে পারলো কিশোর। রাটুনায় পৌঁছার আগেই নৌকা-টাকে ধরতে পারবে কিনা ভাবছে সেকথা। পারবে না। এক বিন্দু বাতাস নেই। সাগরের পানিও লেগুনের মত শান্ত, এক বিরাট আয়নার মত লাগছে। এক রত্তি মেঘ নেই আকাশে। বাতাস যে আসবে তার কোন সম্ভাবনাই নেই।

সেটা বুঝে আরও রেগে গেল কারনেস। মাথায় আগুন ধরছে তার, বুঝতে পারছে কিশোর। ভয় পেয়ে গেল। এখন বেফাস কিছু করে বসলে মরতে হবে।

কিশোরের গলা চেপে ঠেলতে ঠেলতে মাস্তুলের কাছে নিয়ে গেল কারনেস। ছুরি বের করে দাঁতে দাঁত চেপে বললো, আমার সঙ্গে চালাকির মজা দেখাচ্ছি!

মাথা গরম করলো না কিশোর। গলায় চাপ রয়েছে। ফ্যাসফ্যাস করে কোনমতে বললো, আমাকে মেরে ফেললে মুক্তোর খেতটা আর খুঁজে পাবেন না।

দ্বিধা করলো কারনেস। গলার চাপ বাড়িয়েই আবার ঢিল করে ফেললো। কিশোরকে ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে এলো এক পা। হ্যাঁ, মুক্তো। আরও কিছুক্ষণ বাঁচিয়ে রাখতেই হবে। ফিরে তাকিয়ে আঞ্চলিক ভাষায় আদেশ দিলো। নাবিকদেরকে।

লোকটাকে যে কি ভীষণ ভয় পায় সেটা নাবিকদের আচরণেই বোঝা গেল। লংবোট নামাতে দৌড়ে গেল ওরা। দেখতে দেখতে নামিয়ে ফেললো জাহাজের পাশে পানিতে। তাতে চড়ে বসলো ছজন লোক, দাঁড় তুলে নিলো।

এসো আমার সঙ্গে, কিশোরকে বললো কারনেস। ওরা উঠলে দাঁড় বাইতে শুরু করলো লোকগুলো। তীরে পৌঁছলো।

অবাক হয়ে কিশোর ভাবছে, কি করবে লোকগুলো? একটু পরেই বুঝতে পারলো। ঢেউয়ের সঙ্গে যে ঝিনুকগুলো তীরে এসে পড়েছে, সেগুলো কুড়াতে এসেছে ওরা। অনেক ঝিনুক পড়ে থাকতে দেখলো কিশোর। শুকনোয় তো আছেই, পানিতেও আছে। অল্প পানিতে ছেয়ে রয়েছে লেগুনের নিচে। তবে ওগুলোর প্রতি কোন আগ্রহ বোধ করলো না সে। চারজন লোক ঝিনুক কুড়িয়ে এক জায়গায় করছে, একজন বয়ে নিয়ে গিয়ে তুলছে নৌকায়। ছয় নম্বর লোকটা নারকেল কুড়াচ্ছে।

কিশোরকে নিয়ে ক্যাম্পের কাছে চলে এলো কারনেস। যেখানে যা পেলো, কাজে লাগার মত, তুলে নিতে আরম্ভ করলো। অভিযাত্রীদের ফেলে যাওয়া জিনিস। মাঝে মাঝে কথা বলছে কিশোরের সঙ্গে, প্রশ্ন করছে। পারলে জবাব দিচ্ছে কিশোর।

তাড়াহুড়া করছে কারনেস। কেন, সেটা বুঝতে পারলো কিশোর। কারনেসের ভয়, ঝিনুক পালিয়েছে। গিয়ে দলবল নিয়ে ফিরে আসতে পারে। তাই পালাতে চাইছে কারনেস, লেগুন থেকে বেরিয়ে দূরে চলে যেতে চাইছে।

পাথরের নিচে, শ্যাওলার ভেতরে খোঁজাখুঁজি করছে কারনেস। নীল আকাশের অনেক ওপরে উঠে গেছে সূর্য। বেলা যতই বাড়ছে, গরমও বাড়ছে। নিরাসক্ত চোখে তার কাজকর্ম দেখছে কিশোর। সে একটা কথাই ভাবছে, কি করে পালাবে। কিন্তু কোন উপায়ই বের করতে পারছে না। এক কাজ করতে পারে। দৌড়ে গিয়ে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। চলে যেতে পারে দ্বীপের নিচের সেই গুহায়। তবে তাতে হাঙরের ভয় আছে। আর কারনেসের লোকেরাও যে গুহাঁটা খুঁজে বের করতে পারবে না তা নয়। তার ওপর রয়েছে গুলি খাওয়ার ভয়। সে দৌড় দিলেই কোমর থেকে রিভলভার নিয়ে গুলি চালাবে কারনেস। গুহায় ঢোকার ভাবনাটা বাতিল করে দিলো সে।

একটা পাথরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে কারনেস। ওটার নিচেই মুক্তোর টিনটা লুকিয়ে রেখেছিল ডজ। এইবার কিছুটা আগ্রহী হলো কিশোর। পাথরের চারপাশে শ্যাওলার স্তূপ জমে রয়েছে। টেনে টেনে কিছু সরালো কারনেস। কিছু সরালো পা দিয়ে। ঘুরে দাঁড়াতে যাবে এই সময় একটা জিনিস চোখে পড়লো তার।

ধক করে উঠলো কিশোরের বুক। মনে হলো হৃৎপিন্ডের গতিই বুঝি থেমে যাবে। এত গরমেও ঠান্ডা শিহরণ জাগলো শরীরে। চিকণ ঘাম দেখা দিলো কপালে। জিনিসটা সে-ও দেখতে পেয়েছে। বালির ভেতর থেকে বেরিয়ে আছে টিনের একটা অংশ। সেই বিস্কুটের টিনটাই, চিনতে অসুবিধে হলো না তার। ওপরের বালি অনেকখানি ধুয়ে নিয়ে গেছে পানি, ফলে বেরিয়ে পড়েছে টিনটা।

কিশোর আশা করলো, দেখতে পেলেও টিনটা ছোঁবে না কারনেস। কারণ পুরনো একটা জিনিস বালিতে দেবে রয়েছে, কোন মূল্য নেই ওটার। কিন্তু কারনেসের কাছে আছে। এখানে কিশোরদের আনা জিনিস যা-ই পাচ্ছে তুলে নিচ্ছে লোকটা। কি করবে আল্লাহই জানে। লাথি দিয়ে টিনের ওপরের বালি আরও সরালো কারনেস। তারপর টেনেটুনে বের করে আনলো ওটা বালির নিচ থেকে। ওই সময় একবার কিশোরের মুখের দিকে তাকালেই তার কাছে ফাঁস হয়ে যেত ব্যাপারটা। কারণ একেবারে শাদা হয়ে গেছে তার মুখ।

টিনের অবস্থা দেখে পছন্দ হলো না কারনেসের। ছুঁড়ে ফেলে দিলো। হাঁপ ছাড়তে যাচ্ছিলো কিশোর, ছাড়া আর হলো না। টিনের মুখটা হয় ঠিকমত লাগেনি, নয়তো জোর ঝাকুনিতে গেল খুলে। ছড়িয়ে পড়লো ওটার ভেতরের জিনিস।
পাথরের মূর্তি হয়ে গেল যেন কারনেস। ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে চোখ। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তাকিয়ে রইলো জিনিসগুলোর দিকে। বিশ্বাস করতে পারছে না। তারপরই জোরে এক চিৎকার দিয়ে দৌড় দিলো। হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো মুক্তোগুলোর কাছে। কাঁপা হাতে তুলে রাখতে শুরু করলো আবার টিনের মধ্যে। একবার তাকালো কিশোরের দিকে। উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে। ঘামছে দরদর করে। দৌড়ে এলো তার সাগরেদরা। উত্তেজিত হয়ে আঞ্চলিক ভাষায় কিচির মিচির করে কি বলতে লাগলো ওরা বুঝতে পারছে না কিশোর।
অসহায় চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখা ছাড়া আর কিছুই করার নেই তার। টিনটা যে কেন ফেলে গেছে ডজ, মাথায় ঢুকছে না কিশোরের। এত কষ্ট করলো ওরা ওগুলোর জন্য, সব শেষ, কোনই লাভ হলো না। এসব জিনিসের লোভ নেই তার, নির্দ্বিধায় ওই একটিন মুক্তো দান করে দিতে পারে, কিন্তু এখন তার ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে। কারণটা আর কিছু না, অভিযানের ব্যর্থতা। মনটা খারাপ হয়ে গেল তার। রাগ হতে থাকলো ডজের ওপর, আর কারনেসের প্রতি তীব্র ঘৃণা। ওই মুহূর্তে বুঝতে পারলো কেন এসব মূল্যবান রত্নের জন্যে মানুষ মানুষকে খুন করে।
কারনেস মুক্তোগুলো পাওয়ার খানিক আগে ঝিনুকের প্রথম চালানটা নিয়ে রওনা হয়েছিলো লংবোট। জাহাজের কাছে পৌঁছে গেছে। দুজন লোক গেছে সঙ্গে। চিৎকার করে জানতে চাইলো, কি হয়েছে। তীর থেকে জানালো ওদের সঙ্গীরা। দ্রুত ঝিনুকগুলো ডেকে ছুঁড়ে ফেলে নৌকা নিয়ে ফিরে এলো ওরা।
অনেক ঝিনুক পড়ে রয়েছে এখনও। সেগুলো তোলার নির্দেশ দিল কারনেস। লোকটার লোভ দেখে আরও তেতো হয়ে গেল কিশোরের মন। এতগুলো মুক্তো পেয়েছে, তার পরেও আরও পাওয়ার লোভে ঝিনুক তুলে নিয়ে যাচ্ছে। জাহাজ বোঝাই করে মুক্তো দিয়ে দিলেও হবে না, আরও চাইবে, আরও।
নিজে দাঁড়িয়ে ঝিনুক তোলা দেখতে লাগল কারনেস। তদারক করছে। কোনটা বাকি রয়ে গেল কিনা দেখছে। মাঝে মাঝে চোখ তুলে তাকাচ্ছে কিশোরের দিকে। কিশোরের গম্ভীর হয়ে যাওয়া মখের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে, খুব মজা পাচ্ছে যেন। ক্ষোভ, রাগ সব দূর হয়ে গেছে তার। খোশমেজাজে আছে। একবার জিজ্ঞেস করলো, এগুলো যে আছে বলনি কেন?
জানতাম না।

কণ্ঠের তিক্ততা চাপতে পারলো না কিশোর। তাতে আরও মজা পেল লোকটা। হেসে উঠলো। অনেক কষ্ট থেকে আমাকে বাচিয়ে দিলো তোমার বন্ধুরা। এতগুলো মুক্তো রেখে গেল। কিশোরের দিকে একটা ডাব ছুঁড়ে দিলো সে। ছুরি দিয়ে আরেকটা ডাবের মুখ কাটলো নিজে খাওয়ার জন্যে।

ডাবটা দেখে পিপাসার কথা মনে পড়লো কিশোরের। কারনেসের কাছ থেকে ছুরিটা নিয়ে মুখ কাটতে লাগলো। গলা শুকিয়ে গেছে।

শেষ ঝিনুকটা যখন নৌকায় তোলা হলো, পশ্চিম দিগন্ত ছুঁই ছুঁই করছে তখন সূর্য। নৌকায় উঠলো দাঁড়ীরা। যার যার জায়গায় বসলো। কিশোর ভাবলো, তাকে ফেলেই চলে যাবে কারনেস। তাতে বরং খুশিই হবে কিশোর। কারণ ওমররা ফিরে আসবেই। কিন্তু তাকে নিরাশ করলো কারনেস। চিন্তিত ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইলো তার দিকে। এক ধরনের অদ্ভুত দৃষ্টি ফুটেছে চোখে। নৌকায় ওঠার ইশারা করলো।

উঠলো গিয়ে কিশোর। তার পেছনেই বসলো কারনেস। নৌকা ছাড়তে বলার আগে শেষবারের মত সৈকতে চোখ বোলালো সে, কিছু ফেলে যাচ্ছে কিনা দেখলো। আরেকবার ফেরার কোন ইচ্ছেই নেই তার। নৌকা ছাড়তে বললো সে।

জাহাজের দিকে এগিয়ে চললো নৌকা। একেবারে নিরাশ হয়ে পড়েছে কিশোর। সারাটা দিন বিমানের অপেক্ষা করেছে। ভেবেছে এই বুঝি এলো, এই বুঝি এলো। শব্দ শোনা গেল। কিন্তু এলো না ওটা। এখন রাত হয়ে আসছে। আজ আর আসবে না বিমানটা। এলেও আগামী দিন।

জাহাজের গায়ে এসে ভিড়লো নৌকা। ডেকে উঠতে বলা হলো কিশোরকে। উঠলো সে। সাগরের দিক থেকে ধেয়ে এলো এক ঝলক বাতাস। আলোড়ন তুললো লেগুনের পানিতে। মৃদু দুলতে লাগলো জাহাজ। আনন্দে চিৎকার করে উঠলো কারনেস। তার খুশির কারণ বুঝতে পারলো কিশোর। প্রকৃতিও যেন কারনেসের সহায়তা করতে এগিয়ে এসেছে। প্রথমে পাঠিয়েছে ঝড়, মুক্তোগুলো দ্বীপে ফেলে রেখে বিমানটাকে চলে যেতে বাধ্য করেছে। সেগুলো পাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছে কারনেসকে। এখন পাঠিয়েছে বাতাস। স্কুনারটাকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। পরদিন ওমররা আসতে আসতে অনেক দূরে চলে যাবে ওটা। ধরার আর কোন উপায়ই থাকবে না হয়তো।

মুক্তোর টিনটা বগলে চেপে নিচে চলে গেল কারনেস। ফিরে এলো একটু বাদে। ওটা ছাড়া অন্য কোন পরিকল্পনা ছিলো হয়ত তার, বাতাস আসায় সেটা পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নিচু গলায় নির্দেশ দিতে আরম্ভ করল তার নাবিকদের। ওরা ফিরে তাকালো কিশোরের দিকে। ওদের দৃষ্টি দেখে ভয় পেয়ে গেল সে। নিশ্চয় তার ব্যাপারেই কিছু আলোচনা হয়েছে।

আমার জাহাজটা তোমার পছন্দ হয়নি, কিশোরকে বললো কারনেস। ভাল কথা। এখানেই থেকে যাও! রেখে যাওয়া হবে তোমাকে।
এতে বরং খুশিই হলো কিশোর। এটাই চাইছিলো। বললো না কিছু।
তবে, কারনেস বললো, অনেক কিছু জেনে ফেলেছ তুমি। বলে দিলে বিপদে পড়বো আমি। তাই যাতে বলতে না পার সেই ব্যবস্থা করে যাব। আবার নাবিকদের দিকে ফিরে মাথা ঝাঁকালো। রওনা হয়ে গেল হুইলের দিকে।
ক্যাপস্টানের দিকে দৌড়ে গেল চারজন নাবিক। নোঙর তোলার সময় ঝনঝন করে উঠলো শেকল। দ্রুত কালো হয়ে আসা আকাশের পটভূমিতে দুলে উঠলো একটা শাদা পাল।
দুজন নাবিক রয়ে গেল কিশোরের পাশে। ফুলে উঠলো পাল। লেগুনের মুখের দিকে রওনা হয়ে গেল জাহাজ। কি করতে বলা হয়েছে লোকগুলোকে?
সতর্ক নজর রাখলো কিশোর। রেখেও কিছু করতে পারলো না। জোর করে তাকে ধরে শুইয়ে ফেললো লোকগুলো। কারাত আর জুডোর সাহায্যে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করলো সে। কিছুই করতে পারলো না। অসম্ভব শক্তি লোকগুলোর গায়ে। চেপে ধরে রেখে সাহায্যের জন্যে ডাকলো অন্যদেরকে। একজন একটা দড়ি পেঁচিয়ে বাঁধলো তার কোমর। আরেক মাথা বাঁধলো একটা লোহার পাইপের সঙ্গে। আতঙ্কিত হয়ে পড়লো কিশোর। ওদের উদ্দেশ্য বুঝে ফেলেছে। পানিতে ফেলে দেয়া হবে তাকে, হাত-পা বেঁধে। লোহার পাইপের ভার তাকে টেনে নিয়ে যাবে। লেগুনের তলায়। কিছুতেই ভেসে উঠতে পারবেনা।
ছাড়া পাওয়ার জন্যে ধস্তাধস্তি শুরু করলো সে। দুএকজনের নাকে ঘুসিও মারলো। লাভ হলো না কিছু। এতগুলো শক্তিশালী হাত থেকে মুক্তি পেলো না। উপুর করে ফেলে মুচড়ে তার হাত নিয়ে আসা হলো পিঠের ওপর। দড়ি দিয়ে বাঁধা হলো। আরেকজন পা বেধে দিলো। শিকারীর হাতে অসহায় খরগোশ যেন সে, কিংবা কসাইয়ের কাছে ছাগল। বয়ে নিয়ে আসা হলো রেলিঙের কাছে। খিকখিক করে তার কানের কাছে হেসে উঠল একটা লোক। দুজনে দুদিক থেকে ধরে তুলে দোলা দিয়ে তাকে রেলিঙের ওপর দিয়ে ছুঁড়ে দিলো। ঝপাং করে পানিতে পড়লো সে।
পড়েও সারতে পারলো না। টেনে নিয়ে চললো তাকে লোহার পাইপ। মরিয়া হয়ে চেষ্টা করতে লাগলো ছাড়া পাওয়ার জন্যে। সব দিক থেকে চেপে ধরতে শুরু করেছে যেন কালো পানি।
অবশেষে শেষ হলো নিচের দিকে টানা। তার মানে তলায় পৌঁছে গেছে। লোহার পাইপ, বালিতে ঠেকেছে। চারপাশে শুধুই ঘন অন্ধকার।

রাটুনাতেই রয়েছে ওমর, মুসা আর ডজ। কিশোরের মতো মারাত্মক বিপদে নেই ওরা, তবে অসুবিধেয় পড়েছে। প্রচন্ড দুশ্চিন্তা হচ্ছে কিশোরদের জন্য। উৎকণ্ঠাও খুব খারাপ জিনিস। শরীরের ওপর ভীষণ চাপ দেয়।

ওমর আশা করেছিলো লেগুনে থাকলে ঝড়ে তেমন কোনো ক্ষতি হবে না বিমানটার। ভেবেছে, কিছু পাতাটাতা এসে পড়তে পারে, তাতে আর কি এমন হবে? কল্পনাই করতে পারেনি সে কতটা ক্ষতি হবে। প্রথমেই ধরা যাক, বড় একটা নারকেলের ডালের কথা। তুমুল গতিতে উড়ে এসে একটা ডানার ওপর আছড়ে পড়েছে ওটা। যদিও খসে যায়নি ডানাটা, তুবড়ে গেছে। ওড়া অসম্ভব, যতক্ষণ না ওটা মেরামত হয়। আর শুধু পাতাই যে কি করতে পারে সেটা না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। ঝড়ের মধ্যে উড়ে এসে বৃষ্টির মত অঝোরে ঝড়ে পড়েছে যেন। হারিকেন শেষ হতে হতে পাতার নিচে পুরোপুরি ঢাকা পড়ে গেল বিমানটা।

সেই পাতা সরানোই এক মহা ঝামেলার ব্যাপার। সরিয়ে বেরোনোর পথ তো পরিষ্কার হলো, কিন্তু তীরে যাবে কি করে? পানির ওপরে পাতার স্তর এতটা পুরু নয় যে ওদের ভার রাখতে পারবে। হেঁটে যাওয়া যাবে না। আবার সাঁতরে যাওয়াও মুশকিল। একটা কাজই করা যায়। চারপাশ থেকে লতাপাতা জোগাড় করে ফেলে ফেলে একটা সাঁকোমত তৈরি করে তার ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া। পাতা ঠেলে সাঁতরে যাওয়ার চেয়ে সেটা কোন অংশেই সহজ মনে হলো না ওদের কাছে।

রাত হয়ে গেল। তীরে পৌঁছতে পারলো না ওরা। বিমানের মধ্যে বসে বসে একটা বিনিদ্র রাত কাটাতে হলো ওদের। কিশোরদের ভাবনা না থাকলে এতটা কষ্ট পেতে হতো না। শরীরের কষ্টের চেয়ে মানসিক কষ্ট অনেক বেশি। তবে শারীরিক কষ্টও কিছু কম হলো না। বিমানটা যেখানে নেমেছে তার কাছেই রয়েছে একটা খড়ি। তার ওপাশে জলাভূমি। সেখান থেকে এসে হাজির হলো মশার ঝাঁক। ছেকে ধরলো। কিছুই করার নেই ওগুলোর বিরুদ্ধে। মসকুইটো কয়েল কিংবা স্প্রে কোনটাই নেই বিমানে।

ভোরের আলো ফুটতে দেখে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো ওরা। মশার যন্ত্রণা অন্তত কমবে। সারা রাত ঘুমোতে পারেনি। ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে শরীর। সাঁকো তৈরি শেষ হয়নি তখনও। ক্লান্ত শরীর নিয়েই কাজে লাগলো ওরা। অনেক কষ্ট আর কায়দা কসরৎ করে ভাসমান সেই পাতার সাঁকো দিয়ে এসে নামলো তীরে। রওনা দিলো গায়ের দিকে। সেটাও কম দূরে নয়। পাঁচ ছয় মাইল তো হবেই। সাধারণ সময়ে ভালো রাস্তা পেলে ঘণ্টা দুয়েকের পথ। কিন্তু গায়ে জোর নেই। তার ওপর ঘন জঙ্গল। জীবনে অনেক জঙ্গল দেখেছে ওমর, এত ঘন দেখেনি। প্রতিটি ইঞ্চি পথ লতাপাতা কেটে তৈরি করে নিতে হচ্ছে। তার ওপরে রয়েছে ভয়ংকর গরম। দ্রুত শরীরকে অবসন্ন করে দেয়।

শত শত মশার কামড়ের দাগ একেকজনের শরীরে। দিনের বেলা এখন জঙ্গলে হামলা চালালো এক ধরনের মাছি, স্যান্ড ফাই। কামড়ে ভীষণ জ্বালা। রক্ত বেরিয়ে যায়। এতে বাধার পরেও এগোনো থেমে থাকলো না। তবে পানির কিনার থেকে পোয়াটাক মাইল পেরোনোর পরেই এমন আরেকটা বাধা পড়লো সামনে, দিশেহারা হয়ে গেল ওমর।

একটা নদীর মুখ। নদী না বলে সাংঘাতিক জলাভূমি বললেই ঠিক হয়। পাহাড়ের গোড়ায়। যদি খালি পানি থাকতো, তেমন অসুবিধে হত না। তবে পেরিয়ে গেলেই চলতো। একশ গজের বেশি চওড়া নয়। কিন্তু পানিতে জন্মে রয়েছে কচুরীপানা। বড় বড় ফুল ফুটে রয়েছে। অন্য সময় হলে বরং মুগ্ধই হতো ওমর, দেখে চোখ জুড়াতো। এখন সে অবস্থা নয়। ঘন হয়ে জন্মানো শুধু কচুরীপানা পেরোনোই এক অসম্ভব ব্যাপার। তার ওপর তার ভেতরে যদি থাকে এক ফুট লম্বা হাজার হাজার বিষাক্ত, শতপদী তাহলে তো কথাই নেই। না যাবে সাঁতরানো, না ওপর দিয়ে হেঁটে পেরোনো।

স্তব্ধ হয়ে কয়েক মিনিট বসে রইলো ওখানে ওরা। কি করা যায়? সরাসরি পার হওয়ার আশা ছাড়তেই হলো। জলার পাশ দিয়ে জঙ্গল কেটে ঘুরে এগোনে ছাড়া বিকল্প নেই। শেষে তা-ই করতে লাগলো। জানে না কতদূর গড়িয়ে রয়েছে জলাটা। তবে আশার কথা, কাছেই পাহাড় রয়েছে। উপত্যকার পরে যেখান থেকে ঢাল শুরু হবে, সেখানে আর নদী থাকতে পারবে না। এটা অবশ্য ডজের অনুমান। ঠিকই অনুমান করেছে সে। আস্তে আস্তে সরু হয়ে আসছে নদী। শেষে এতই সরু হয়ে গেল, খাল বলা চলে এখন। তার পরেও পার হওয়া গেল না, শতপদীর ভয়ে। এগোতে থাকলো ওরা। যতটুকু হয়েছে, তার চেয়ে বেশি আর সরু হচ্ছে না নদী। অবশেষে ভাগ্য কিছুটা সদয় হলো ওদের ওপর। একটা জায়গায় ঝড়ে কাত হয়ে পড়ে গেছে একটা রুটিফল গাছ, আর পড়েছে একেবারে খালের ওপর লম্বা হয়ে, এপার থেকে ওপারে যাবার সাঁকো তৈরি করে দিয়ে।

খাল পেরোলো ওরা। ততক্ষণে রাত হয়ে এসেছে। অন্ধকার নামতে দেরি নেই। সারাটা দিন কাটিয়ে জঙ্গলে ঘুরে মরে গাঁয়ের দিকে মাত্র একটা মাইল এগোতে পেরেছে।

সাঁকো পেরিয়ে এসে দেখলো, এখানকার জঙ্গলও একই রকম ঘন। রাতে এগোনো সম্ভব না। দিনের জন্যে অপেক্ষা করতেই হবে। কিন্তু বসে থাকতে চাইলো না ওমর। বললো রাতেই চলবে। ডজ রাজি হলো না। সে এখানকার জঙ্গল চেনে। বললো সেই চেষ্টা করাটাই স্রেফ পাগলামি। সামনে অনেক বাধা থাকতে পারে। আরও জলা থাকতে পারে। চোরাকাদা থাকতে পারে। আর যদি

কিছু না-ও থাকে, সারারাত পথ হারিয়ে অযথা ঘুরে মরতে হতে পারে বনের ভেতর।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ক্লান্তিতে আধমরা হয়ে গেছে ওরা। গড়িয়ে পড়লো বনের ভেজা মটিতে। একধরনের অদ্ভুত ফাঙ্গাস জন্মে রয়েছে। অন্ধকারে জ্বলে। বাতাসে একধরনের সোঁদা গন্ধ। নিঃশ্বাস নিতে গেলে মনে হয় ফুসফুসে চাপ লাগছে। বিমানে থাকতে বন থেকে মশা গিয়ে হামলা চালিয়েছিলো, আর এখানে তো মশার রাজত্বেই এসে ঢুকেছে ওরা। কাজেই কামড়ানোর পরিমাণটা অনেক বেশি। ভয়াবহ আরেকটা রাত কাটাতে তৈরি হলো তিনজনে।।
এখন বুঝতে পারছি, বিষন্ন কণ্ঠে বললো ওমর। মুক্তো কেন এত দামী। দুহাতে একনাগাড়ে চাপড় মারছে শরীরের যেখানে সেখানে।
রাত বাড়তেই মশার অত্যাচারও এতই বেড়ে যেতে লাগলো যে আগুন জ্বালাতে হলো ওদেরকে। ধোঁয়ার ভেতরে গা ডুবিয়ে বসতে হলো। সেই ধোঁয়ার ঝাজে পানি এসে গেল চোখে, গলার ভেতরে জ্বালা ধরালো, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হলো। মশার কামড়, না সেই ধোঁয়া কোনটা যে ভাল বোঝাই কঠিন হয়ে দাঁড়ালো।
এতেও এত কষ্ট হত না, ওমর বললো। হাসিমুখে সহ্য করে নিতাম, যদি জানতাম কিশোররা ভাল আছে।
জবাব দিলো না ডজ কিংবা মুসা। খারাপ সম্ভাবনাগুলোই কেবল আসছে মনে। সেগুলো আর প্রকাশ করতে চাইলো না।
স্থির হয়ে আছে যেন সময়, কাটতেই চাইছে না। মাঝে মাঝে জলার দিকে তাকাচ্ছে মুসা। শিউরে উঠছে। আলোজ্বলা ফাঙ্গাস ওখানেও আছে। নড়ছে চড়ছে থেকে থেকে। কারণটা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না তার। কোন প্রাণী ঘুরে বেড়াচ্ছে তার ওপর দিয়ে। বনের ভেতর থেকে আসছে বিচিত্র ডাক, চলাফেরার আওয়াজ। সেগুলো যে কিসের ডজও বলতে পারলো না। ধোঁয়ার ওপাশে উড়ছে বড় বড় মথ। ডানা মেলে দিয়ে উড়ছে, গিয়ে বসছে পাতার ওপর। নিঃশব্দে উড়ে এল একটা বিশাল বাদুড়। ড্রাকুলার গল্প পড়া আছে মুসার। ভূতের ভয়ে এমন এক চিৎকার দিলো, লাফিয়ে উঠলো ওমর আর ডজ। বাদুড়টাও চমকে গেল। কাছেই একটা গাছের ডালে গিয়ে ঝুলে রইলো।
এত অন্ধকারও আর কখনও দেখেনি মুসা। মনে হচ্ছে ভারি নিরেট কোন জিনিসের মত চেপে বসেছে ওদের ওপর। এত অত্যাচারের মাঝেও ঢুলতে শুরু করলো সে। দুঃস্বপ্ন দেখতে শুরু করলো। পায়ে কিসের ছোঁয়া লাগতে টুটে গেল তন্দ্রা। আগুনের আলোয় আতঙ্কিত চোখে দেখলো লালচে-বাদামী একটা শতপদী এসে পায়ে উঠেছে। দশ ইঞ্চি লম্বা। জুতোর ওপরে অনেকখানি উঠে এসেছে প্যান্ট। পায়ের সেই খালি জায়গাটায় উঠেছে ঘিনঘিনে প্রাণীটা। চিৎকার

দিয়ে উঠে থাবা মেরে ওটাকে ফেলে দিলো সে। পায়ের চামড়ায় দেখতে পেলো দুটো লাল বিন্দু। দেখতে দেখতে ফুলে উঠলো জায়গাটা। অকল্পনীয় ব্যথা। ডজ বললো, কয়েক দিন ধরে থাকবে ব্যথাটা।

একনাগাড়ে পাইপ টেনে চললো ডজ। সমস্ত সিগারেট শেষ করে ফেললো ওমর।

আল্লাহ, ভোর মনে হয় হচ্ছে, বিড়বিড় করলো মুসা। আর একটা রাত যদি এই জঙ্গলে কাটাতে হয়, সোজা পাগলা গারদে পাঠাতে হবে আমাকে। আগের বার এসে দক্ষিণ সাগরের এই দ্বীপগুলোকে মনে হয়েছিলো বেহেশত, এখন মনে হচ্ছে দোজখ।

উঠে দাঁড়ালো ওমর। শক্ত হয়ে গেছে শরীর, নড়তেই চায় না। ঝড়াঝুড়া দিয়ে হাত-পাগুলোকে সচল করলো। চল, রওনা হওয়া যাক।

ভোর তখনও হয়নি। শুধু অন্ধকার ফিকে হয়েছে কিছুটা। এরই মাঝে বন কেটে এগোতে শুরু করলো ওরা।

গত দুদিনে শরীরের ওপর দিয়ে অনেক ধকল গেছে। আর সহ্য করতে পারছে না শরীর। বন থেকে বেরোতে যদি বেশি দেরি হয়, তাহলে আর বেরোতেই পারবে না। তবে বন আর বেশিক্ষণ ঠেকিয়ে রাখলো না ওদের। পাতলা হয়ে এলো। বাইরের খোলা অঞ্চলে বেরিয়ে ধপ করে বসে পড়লো মুসা। চিত হয়ে শুয়ে পড়লো বালিতে। চারপাশে তাকাচ্ছে ডজ। পানি খুঁজছে। একপাশে জলা ছাড়া পানির আর কোন উৎস চোখে পড়লো না। সেই জলার পানি ছুঁয়েও দেখলো না। গিজগিজ করছে জীবাণুতে। খেলেই মরবে।

কয়েক মিনিট শুয়ে বিশ্রাম নিলো ওরা। তারপর উঠল।

সান্ত্বনা দিয়ে ওমর বললো, আর বেশিক্ষণ লাগবে না। গায়ের কাছে চলে এসেছি। গিয়েই পানি খেতে পারব।

পা টেনে টেনে এগিয়ে চললো তিনজনে। প্রথম নারকেল গাছটার গোড়ায় এসেই দাঁড়িয়ে গেল। ঝড়ে অনেক নারকেল পড়ে রয়েছে। তর সইলো না আর। খেতে বসে গেল। প্রথমে খেল পানি, তার পরে শাস। লোভীর মত।

গায়ের কাছাকাছি গিয়ে থমকে দাঁড়ালো মুসা। তাকিয়ে রয়েছে সামনের দিকে। সে কি দেখেছে দেখার জন্যে অন্য দুজনও তাকালো। ঘন গাছের আড়ালে ছায়ার মত মিশে যেতে দেখলো একজন আদিবাসীকে। ঝিনুকদের গায়ের মানুষের চেয়ে অন্য রকম মনে হলো লোকটাকে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত শাদা চক কিংবা কাদা দিয়ে অদ্ভুত সব দাগ আঁকা।

আমার ভাল্লাগছে না, বিড়বিড় করে বললো ডজ। কিছু একটা ঘটছে এখানে।

কি ঘটছে? জানতে চাইলো ওমর।

লোকটাকে দেখলে? কেমন রঙ মেখেছে। যুদ্ধের সাজ। হাতের মুগুরটাও লড়াইয়ের সময় ব্যবহার করে। বহু দেখেছি ওরকম। আইনের বিরুদ্ধ কাজ এটা। তার পরেও লেগে যায় ওরা। ডজের কথার সমর্থনেই যেন দিড়িম দিড়িম করে ঢাক বেজে উঠলো। কয়েকবার বেজে থেমে গেল। দূর থেকে শোনা গেল আবার। থামলো। বিরতি দিয়ে আবার বেজে উঠলো এপাশে। শুনছো? মেসেজ পাঠাচ্ছে। সংবাদ আদান প্রদান করছে। আমরা এখান থেকে যাওয়ার পর নিশ্চয় সাংঘাতিক কিছু ঘটেছে, যার ফলে খেপে গেছে লোকগুলো। আমাদের ওপর এখন কোন কারণে খেপে না গেলেই হয়। তাহলে সোজা ধরে কেটেকুটে রান্না করে খেয়ে ফেলবে।

এখন তো আর নরখাদক নয় ওরা, বিশ্বাস করতে পারছে না মুসা।

তার দিকে তাকালো ডজ। জোর দিয়ে বলতে পার না। কেউ স্বীকার করে না বটে। আজকালকার ছেলেছোকরাগুলোকে অবশ্য বাদ দেয়া যায়। তবে বুড়োগুলোকে বিশ্বাস নেই। মানুষের মাংসের লোভ আছে ওদের। আগে খেয়েছে তো। কর্তৃপক্ষ কড়া নজর রেখেছে ওদেরকে ঠেকানোর জন্যে। তার পরেও বলা যায় না।

ওসব ভেবে লাভ নেই, ওমর বললো। তবে গলায় জোর নেই তার। চল, গিয়ে দেখি কি হয়েছে।

গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল দুজন আদিবাসী। ওদের ঠিক সামনে। দুজনের গায়েই রঙ মাখা, হাতে মুগুর। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো অভিযাত্রীদের দিকে, তারপর ছুটে পালালো।

গায়ে এসে ঢুকলো অভিযাত্রীরা। কোন পুরুষমানুষ চোখে পড়লো না। শুধু দুতিনজন মহিলা। ঢাকের আওয়াজ হচ্ছে না আর।

সব চেয়ে বয়স্ক মহিলাটার কাছে এগিয়ে গেল ওমর। জিজ্ঞেস করলো, গাঁয়ের লোক কোথায়?

জবাব দিলো না মহিলা। আরেক দিকে মুখ ফেরালো।

ঝোপের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বললো তখন ওমর, অশান্ত সাগর, আমি জানি আপনারা কাছাকাছিই আছেন। আমাদের ওপর চোখ রাখছেন। বেরিয়ে আসুন।

ঝোঁপ ফাঁক করে বেরিয়ে এল একটা ছিপছিপে শরীর। এক তরুণ। শাদা রঙ দিয়ে বন্ধনী আঁকা হয়েছে কপালে। সারা শরীরে দাগ।

বিশ্বাস করতে পারছে না যেন ওমর। ঝিনুক, তুমি!

হ্যাঁ, আমি, এগিয়ে এলো ঝিনুক।

যুদ্ধ ঘোষণা করেছ কার বিরুদ্ধে? ডজ জিজ্ঞেস করলো।

ওই শয়তানটার।

কোন শয়তানটার?

গুড়ু কারনেস।
দম ফুরিয়ে এসেছে কিশোরের। মৃত্যু অবধারিত। ছটফট করছে না আর মুক্তি পাওয়ার জন্যে। লাভ নেই। ভাবছে, মরতে কি খুব কষ্ট হবে? কততক্ষণ লাগবে প্রাণ বেরোতে?
হালকা একটা ছোঁয়া লাগলো শরীরে। চমকে উঠলো সে। হাত চেপে ধরলো নরম আরেকটা হাত। না না হাত আসবে কোথা থেকে? হাতের মত কিছু। হয়ত অকটোপাসের গুড়। এসে গেছে তাহলে খুন করার জন্যে! ভাল। সরে গেল চাপটা, পেটের কাছে। হাত বুলিয়ে যেন বোঝার চেষ্টা করছে কোনখান থেকে খাওয়া শুরু করবে। খুঁজে পেলো কোমরে পেঁচানো দড়িটা, যেটার সঙ্গে লোহার পাইপ বাঁধা রয়েছে। তারপর তাকে অবাক করে দিয়ে যেন পোচাতে শুরু করলো দড়িতে।
ফুসফুসের বাতাস প্রায় শেষ। আর কয়েক সেকেন্ড টিকবে বলে মনে হয় না। দড়িটা কাটা হয়ে গেল। তার হাতের বাঁধনে পোচ মারা শুরু হলো এবার। অলৌকিক কান্ডই হোক আর যা-ই হোক, কার কাজ বুঝতে পারলো সে। মানুষ। ছুরি দিয়ে প্রথমে পাইপের দড়ি কেটেছে, এখন হাতেরটা কাটছে। পায়েরও কেটে দেয়া হলো। ওঠার কথা আর বলতে হলো না কিশোরকে।
ওপরে ভেসে হাঁ করে বাতাস টানতে লাগলো কিশোর। চোখের কোণ দিয়ে অন্ধকারেও দেখতে পেলো আরেকটা মাথা ভেসে উঠেছে তার পাশে। কে? জিজ্ঞেস করলো সে।
ফিসফিস করে জবাব এলো, আমি, সাগরের হাসি।
তুমি! যাওনি?
চল, ডাঙায় চল। কারনেস দেখে ফেলবে।
তীরে এসে উঠলো দুজনে। চলে এলো নারকেল গাছের আড়ালে।
তুমি এলে কোত্থেকে? জানার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে কিশোর।
আমি যাইইনি। এখানেই ছিলাম।
কোথায়? কিশোর অবাক।
কারনেসের জাহাজে। পালের নিচে লুকিয়ে ছিলাম।
আনমনে মাথা নাড়লো কিশোর। এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না এভাবে মুক্তি পেয়ে যাবে।
ঝিনুক কোথায় তাহলে?
রাটুনায় চলে গেছে।
কিন্তু জাহাজে গেলে কি করে তুমি? উঠলে কখন?

তুমি ধরা পড়তেই ডুব দিয়ে সরে এলো ঝিনুক। আমাকে বললো। সাঁতরে গিয়ে লুকিয়ে জাহাজে উঠলাম, দেখতে লাগলাম তোমাকে নিয়ে কি করে ওরা। ওরা ঘুমাতে যাওয়ার পরেও জাহাজ থেকে নামলাম না। রাতে নৌকা নিয়ে চলে গেল ঝিনুক। আমাকে থাকতে বলে গেল। তোমাকে সাহায্য করার জন্যে।
ভাগ্যিস থেকেছিলে! নইলে এতক্ষণে শেষ হয়ে যেতাম!
হেসে উঠলো সাগরের হাসি। জানালো, ঝিনুক লোক নিয়ে ফিরে আসবে। অশান্ত সাগরকে বলে অনেক যোদ্ধা নিয়ে আসবে, বলে গেছে। এবার আর ছাড়বে কারনেসকে। অনেক জ্বালান জ্বালিয়েছে সে।
ও চলেই গেছে, না? অন্ধকার সাগরের দিকে তাকালো কিশোর। জাহাজটা চোখে পড়লো না।
হ্যা। ঝিনুক এসে ওকে খুঁজে বের করবে।
কারনেসের জাহাজে রয়েছে ওরা? চিন্তিত ভঙ্গিতে বললো ওমর। মুশকিল হয়ে গেল।
হ্যাঁ, মাথা নাড়লো মুসা। জাহাজ থেকে কিশোর আর সাগরের হাসিকে উদ্ধার করা কঠিনই। কারনেস মেরেই ফেলে কিনা ওদেরকে কে জানে!
কি করা যায়, বল তো? ওমরের দিকে তাকালো ডজ। নৌকা নিয়ে গিয়ে জাহাজটাকে ধরা যাবে না।
বিমানটা নিয়ে যেতে হবে।
কি করে? মেরামত করতেই তো অনেক সময় লেগে যাবে। ততোক্ষণে অনেক দূরে চলে যাবে কারনেস।
উড়তে পারবো না, কিন্তু ট্যাক্সিইং করে যেতে অসুবিধে কোথায়? পাতার দঙ্গল থেকে ওটাকে বের করে নিয়ে গিয়ে খোলা পানিতে ফেলতে পারলেই তো হয়ে গেল।
তাই তো। এটা তো ভেবে দেখিনি।
অভয় পেয়ে বেরিয়ে এসেছে গাঁয়ের লোকে। যুদ্ধে যাওয়ার আর দরকার নেই, ওদেরকে বোঝাল ওমর। অশান্ত সাগরকে অনুরোধ করলো, কিছু লোক দিতে, যাতে নৌকা নিয়ে গিয়ে বিমানটাকে সরিয়ে আনতে পারে। ওটার চারপাশের জঞ্জাল সাফ করে দিতে পারলেই হলো, এর বেশি আর কিছু করা লাগবে না।
খুশি হয়েই লোক দিলো অশান্ত সাগর। ওদেরকে নিয়ে রওনা হলো আবার ডজ, ওমর আর মুসা। তবে অবশ্যই খাওয়া-দাওয়ার আর খানিকক্ষণ বিশ্রামের পর। তাদের সঙ্গে চললো ঝিনুক।
বনের ভেতর দিয়ে গেল না আর। অত্যন্ত দুর্গম পথ, বললো অশান্ত সাগর। পারতপক্ষে ওই বনে কেউ ঢুকতে চায় না, একথাও জানালো। সৈকতে চলে এলো

দলটা। সাথে এসেছে তিরিশজন অদিবাসী, সবাই যুদ্ধের সাজে সেজেছে। ঝিনুকের সঙ্গে লড়াই করতে যেতে চেয়েছিলো। যেতে পারলো না বলে কিছুটা নিরাশ হয়েছে যেন।
কয়েকটা ক্যানুতে চড়লো সবাই। যুদ্ধে যেতে পারেনি তাতে কি হয়েছে, আরেকটা বিশেষ কাজ তো করতে যাচ্ছে। সেটাকে লড়াইয়ের সামিল ধরে নিলো বোধহয় যোদ্ধারা, দাঁড় বাইতে বাইতে বিচিত্র ভাষায় সুর করে যুদ্ধের গান গাইতে গাইতে চললো।
কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বিমানের কাছে পৌঁছে গেল ওরা। পাতার দঙ্গল যতই পুরু হোক, এতগুলো মানুষের কাছে টিকতে পারলো না বেশিক্ষণ। পরিষ্কার করে ফেলা হলো আশপাশের অনেকখানি জায়গা। তারপর বিমানের সঙ্গে দড়ি বেঁধে তিনটে ক্যানু টেনে সরিয়ে আনলো ওটাকে পরিষ্কার পানিতে।
রাত হয়ে গেল কাজ সারতে সারতে। পুরোপুরি অন্ধকার। কিন্তু ভোরের অপেক্ষায় আর থাকতে চায় না ওমর। তখুনি রওনা দেবে ডজ আইল্যান্ডে। তার পরিকল্পনার কথা খুলে বললো সে। বড় একটা শক্ত ক্যানু বাঁধা হলো বিমানের পেছনে। দশজন আদিবাসীকে উঠতে বলা হলো তাতে। ঝিনুক ও আরও চারজন আদিবাসী সহ মুসা আর ডজকে নিয়ে বিমানে উঠলো ওমর। ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে রওনা হলো খোলা সাগরের দিকে। টেনে নিয়ে চললো ক্যানুটাকে।
চাঁদ উঠলো। নারকেল কুঞ্জের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো কিশোর আর সাগরের হাসি। দ্বীপের সেদিকটায় চললো যেখানে থেকে সাগরের অনেকদূর পর্যন্ত চোখে পড়ে। কয়েক পা এগিয়েই থমকে দাঁড়ালো। ধড়াস ধড়াস করতে লাগলো কিশোরের বুক। লেগুন থেকে সাগরে বেরোনোর মুখটার কাছে রয়েছে স্কুনারটা। যায়নি। থেমে আছে। ওদের কাছ থেকে বড়জোর একশো গজ দূরে।
ঝপ করে বড় একটা পাথরের আড়ালে বসে পড়লো সাগরের হাসি। কারনেস ফিরে এসেছে! ফিসফিস করে বললো সে।
কিশোরও বসলো তার পাশে। স্তব্ধ হয়ে গেছে। এটা আশা করেনি। একটা চিৎকার উঠলো জাহাজে। যতই লুকাক, চোখে পড়ে গেছে ওরা।
লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো সাগরের হাসি। দৌড় দাও! যত জোরে পার! চিৎকার করে বললো কিশোর। বলেই ছুটলো।
পেছনে গর্জে উঠলো একটা রাইফেল। কাছেই একটা প্রবালের চলটা তুলে দিয়ে বিইইং করে সাগরের দিকে উড়ে গেল বুলেট। ফিরেও তাকালো না কিশোর। আবার গুলি হলো। কয়েক গজ দূরে আরেকটা প্রবালের চলটা তুললো বুলেট। চাঁদের আলোয় ছুটন্ত নিশানার গায়ে গুলি লাগানো সহজ নয়।

কয়েকটা নারকেল গাছের আড়ালে এসে দাঁড়িয়ে পড়লো দুজনে। তাকালো জাহাজটার দিকে। নোঙর তুলে ফেলেছে ওটা। প্রণালী দিয়ে লেগুনে ঢুকেছে।
কিছু দূর এগিয়ে লেগুনের শান্ত পানিতে এসে আবার থামলো জাহাজ। লংবোট নামাতে ব্যস্ত হলো নাবিকেরা। চেঁচিয়ে আদেশ দিচ্ছে কারনেস। ভীষণ রেগে গেছে সে। এবার ধরতে পারলে গুলি করে মারবে, কোন সন্দেহ নেই।
কি করা যায়? ভাবতে শুরু করলো কিশোর। নৌকা নিয়ে দ্বীপে পৌঁছতে দেরি হবে না লোকগুলোর। ধরে ফেলবেই। তবে যতক্ষণ দেরি করিয়ে দেয়া যায়। সকাল পর্যন্ত টিকে থাকতে পারলে, আর ওদের কপাল ভাল হলে ওমর ভাই এসেও যেতে পারে। কিংবা লোকজন নিয়ে ঝিনুক। দ্বীপের সরু অংশটায় রয়েছে ওরা। চওড়া দিকটায় যাবে বললো সাগরের হাসিকে। ছুটলো। ওদিকে উঁচুনিচু অনেক টিলাটক্কর রয়েছে। লুকানোর জায়গা মিলতে পারে।
গাছের আড়ালে আড়ালে ছুটছে দুজনে। যাতে গুলি করতে না পারে কারনেস। ঝড়ে নানারকম জঞ্জাল এনে ফেলেছে বালিতে। নারকেল পাতা, শ্যাওলা, ঝিনুকের খোসা। সেসবের জন্যে কঠিন হয়ে যাচ্ছে দৌড়ান। কিন্তু কোন কিছুই ঠেকাতে পারলো না ওদেরকে। চলে এলো দ্বীপের চওড়া দিকটায়। বেশ উঁচু একটা টিলা রয়েছে ওখানে। ঢালের গায়ে মিশে থেকে আস্তে মুখ বাড়িয়ে তাকালো কিশোর। দেখলো, পৌঁছে গেছে লংবোট। টেনে সৈকতে তুলছে নাবিকেরা। রাইফেল বগলে চেপে দাঁড়িয়ে রয়েছে কারনেস।
চলেই তো গিয়েছিল, বিড়বিড় করে বললো কিশোর। আবার ফিরে এলো কেন ব্যাটা?
চুপ করে রইলো সাগরের হাসি।
ঝড়ের গতিতে ভাবনা চলেছে কিশোরের মগজে। এই দ্বীপে বেশিক্ষণ লুকিয়ে থাকা অসম্ভব। জায়গাই নেই তেমন। নারকেল গাছে চড়ে বসে থাকতে পারে। বড়জোর রাতটা টিকতে পারবে তাতে। আলো ফুটলেই চোখে পড়ে যাবে। জ্যান্ত নামার আর সুযোগ পাবে না তখন। গুলি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়তে হবে গাছ থেকে। লুকানোর আরেকটা জায়গা হলো দ্বীপের নিচের গুহাঁটা। ওতে লুকালে হয়তো কয়েকদিন লুকিয়ে থাকতে পারবে, যদি নাবিকেরা ডুব দিয়ে খুঁজতে না আসে। ওখানে লুকানোর সব চেয়ে বড় বিপদ হল হাঙর। ঝড়ের সময় ঢুকেছিলো। এখনও লেগুনেই আছে, না বেরিয়ে গেছে? থাকলে ওদেরকে ধরলো না কেন? কয়েকবার তো লেগুনে নামতে হয়েছে ওদেরকে। থাকুক না থাকুক, ওখানেই গিয়ে লুকানোর সিদ্ধান্ত নিলো কিশোর। কারনেসের হাতে ধরা দিলেও মরতে হবে। তার চেয়ে গুহায় ঢোকার ঝুঁকিটাই নেয়া যাক। ভাগ্যে যদি থাকে হাঙরের পেটে যাওয়া, ঠেকাতে তো আর পারবে না।

কিন্তু এগোতে গিয়ে থমকে গেল সে। কি করে আন্দাজ করেছে কারনেস, কে জানে। কিংবা এমনিই হয়তো একজন লোককে পাহারায় রেখেছে ওদিকটায়, যেদিক দিয়ে গুহায় যেতে হয়। অন্যখান দিয়ে পানিতে নেমেও যাওয়া যায়। তবে যেদিক দিয়েই যাক, চাঁদের আলোয় কারনেসের লোকের চোখে পড়ে যাবেই ওরা।

কিশোরের মত একই ভাবনা চলেছে সাগরের হাসির মাথায়। বললো, নারকেল গাছে চড়তে হবে। তার পর সুযোগ বুঝে চলে যাব গুহায়। সকাল হতে দেরি আছে। অনেক সময় পাওয়া যাবে।

তা ঠিক। টিলার পাশ দিয়ে চলে এলো দুজনে একটা নারকেল কুঞ্জের ভেতরে। দুজনে দুটো গাছ বেছে নিয়ে চড়তে শুরু করলো।

কিশোরের অনেক আগেই উঠে গেল সাগরের হাসি। পাতার আড়ালে লুকিয়ে বসলো। একেবারে মিশে গেছে। কিশোরও দেখতে পাচ্ছে না। ভালমত আলো না ফুটলে তাকে বের করতে পারবে না কারনেসের লোকেরা।

সাগরের হাসির মত একই ভাবে পাতার আড়ালে ঢুকলো কিশোর। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে এখন পুরো দ্বীপটা। খোঁজাখুঁজি করছে নাবিকেরা। রাইফেল হাতে পায়চারি করছে কারনেস।

ওদের গাছের নিচে চলে এলো একজন। ওপরের দিকে তাকাল। কিশোরের ভয় হতে লাগলো দেখে ফেলবে। পা বাড়াতে গিয়ে আচমকা চিৎকার করে উঠলো লোকটা। ধক করে উঠলো কিশোরের বুক। দেখে ফেললো? না। বসে পড়েছে লোকটা। পায়ের পাতা উল্টে দেখার চেষ্টা করছে। নিশ্চয় ভাঙা শামুকে পা কেটে গেছে।

খোঁড়াতে খোঁড়াতে ফিরে গেল লোকটা।

কি হলো? জিজ্ঞেস করলো কারনেস। চেঁচালে কেন?

পা কেটে ফেলেছি।

ওরা কোথায়?

দেখিনি।

হু। যাবেটা কোথায়? দিনের বেলা খুঁজে বের করবো।

একটা পাথরের ওপর গিয়ে বসলো কারনেস। রাইফেলটা কোলের ওপর রেখে সিগারেট ধরালো। খুঁজেই চলেছে তার লোকেরা।

ধীরে ধীরে মাথার ওপরে উঠল চাঁদ। চলতে শুরু করল পশ্চিমে। মলিন হয়ে আসছে জ্যোৎস্না। কিশোরের মনে হচ্ছে বড় বেশি দ্রুত যেন ডুবতে চলেছে চাঁদটা। কেটে যাচ্ছে রাত। অনেকবার বিপদে পড়েছে জীবনে। রাত যেন

তাড়াতাড়ি কাটে সেই প্রার্থনা করেছে তখন। আজ করতে লাগলো, না কাটার জন্যে। কারণ রাত ফুরিয়ে গেলেই মরতে হবে।
কিছুক্ষণ থেকেই ইঞ্জিনের শব্দ কানে আসছিলো কিশোরের। বিমানটা আসছে ভেবে বার বার আকাশের দিকে তাকিয়েছে। কিছুই চোখে পড়েনি। কারনেসকেও চঞ্চল হয়ে উঠতে দেখেছে। কয়েকবার করে পাথরের ওপর থেকে উঠে আকাশের দিকে তাকিয়েছে।
আরও বাড়লো শব্দ। সাগরের দিকে চোখ পড়তেই দেখতে পেলো ওটাকে। পুব আকাশে তখন ভোরের আলোর আভাস। আকাশ দিয়ে নয়, জলপথে ছুটে আসছে বিমানটা। ট্যাক্সিইং করে।
এইবার আর স্থির থাকতে পারলো না কারনেস। একজনকে পাঠালো জাহাজে, কিসের শব্দ দেখে আসার জন্যে। দরকার হলে যেন মাস্তুলে চড়ে দেখে, সেকথাও বলে দিলো।
দাঁড় বাওয়ার জন্যে আরেকজন নাবিককে সঙ্গে করে রওনা হলো লোকটা। লংবোট নামিয়ে তাতে চেপে বসলো। কয়েক মিনিটেই পৌঁছে গেল জাহাজে। মাস্তুলে ওঠা আর লাগলো না তার। জাহাজের ডেক থেকেই দেখতে পেলো বিমানটাকে। চেঁচামেচি শুরু করে দিলো। আঞ্চলিক ভাষায় চেঁচিয়ে জানালো কারনেসকে কি দেখতে পেয়েছে।
নৌকা নিয়ে আসার নির্দেশ দিলো কারনেস। ফিরে এলো লংবোট। তাড়াতাড়ি দলবল নিয়ে গিয়ে তাতে চাপলো কারনেস। জাহাজে গিয়ে উঠলো। দূরবীন দিয়ে ভাল করে দেখলো বিমানটাকে। পেছনের ক্যানুতে বসা লোকগুলোকেও দেখলো। প্রমাদ গুণলো সে। বুঝতে পারলো সামনাসামনি লড়াইয়ে পারবে না ওদের সঙ্গে। তাড়াতাড়ি জাহাজ ছাড়ার নির্দেশ দিলো সে।
লেগুনের মুখের কাছে যাওয়ার আগেই পৌঁছে গেল বিমানটা। নারকেল গাছ থেকে নামলো না কিশোর আর সাগরের হাসি। ওখানে বসে বসেই সমস্ত ঘটনা দেখতে লাগলো।
তার পরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত। গুলি করতে করতে জাহাজের দিকে এগিয়ে এলো বিমান। কারনেস এতই ভয় পেয়ে গেছে, গুলি চালানোর কথাও যেন ভুলে গেল। তার লোকেরা গিয়ে ঢুকেছে জাহাজের খোলে। আদিবাসীদের যুদ্ধের সাজই ঘাবড়ে দিয়েছে ওদেরকে। তাছাড়া জেনে গেছে অনেকগুলো আগ্নেয়াস্ত্র রয়েছে বিমানে। শুধু কারনেসের একটা রাইফেল আর একটা পিস্তল দিয়ে ঠেকানো যাবে না ওদেরকে। তাছাড়া লোকবলও বেশি বিমানের। ফলে যা করার তাই করেছে ওরা। লুকিয়েছে গিয়ে।

জাহাজের কাছে চলে এলো বিমান। দড়ি খুলে ক্যানুটাকে নিয়ে গিয়ে জাহাজের গায়ে ভেড়ালো আদিবাসীরা। উঠে গেল জাহাজে।
মিনিট কয়েক পরেই দেখা গেল, ডেকে তুলে আনা হয়েছে কারনেসের গলাকাটা ডাকাতদের। হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখা হলো।
কিন্তু পালের গোদাটা গেল কোথায়? খুঁজছে কিশোরের চোখ। দেখতে পেলো। জাহাজের পাশের একটা দড়ি ধরে ঝুলে রয়েছে, পেছন দিকটায়। পানির একেবারে কাছাকাছি। তবে বেশিক্ষণ বাঁচতে পারলো না। আদিবাসীদের চোখে পড়ে গেল।
ধর! ধর! কলরব উঠলো। দড়ি থেকে হাত ছেড়ে দিলো কারনেস। পড়লো পানিতে। সাঁতরাতে শুরু করলো তীরের দিকে।
এই সময় পাখনাটা ভেসে উঠতে দেখলো কিশোর। লেগুনের পানি কেটে দ্রুত ছুটে চলেছে ত্রিকোণ পাখনাটা, পালের মতো উঁচু হয়ে আছে। হাঙর! ছুটে যাচ্ছে কারনেসের দিকে। যেন ওরই জন্যে অপেক্ষা করছিলো এতোক্ষণ ওটা। তাহলে কিশোররা যখন পানিতে নেমেছিলো তখন ছিল কোথায়? নিশ্চয় গুহার ভেতরে, ভাবলো কিশোর, এর আর কোন ব্যাখ্যা থাকতে পারে না।
চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর।
জাহাজে যারা রয়েছে তারাও দেখতে পেয়েছে। একসঙ্গে হৈ চৈ করে উঠলো ওরা। অনেক পরে দেখতে পেলো কারনেস! আতঙ্কে বিকট চিৎকার করে উঠলো। তাড়াতাড়ি হাত পা ছুড়ে তীরে পৌঁছার চেষ্টা করলো। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। তীর অনেক দূর।
তার কাছে চলে এসেছে হাঙরের পাখনা। ডুবে গেল। পরক্ষণেই ঝটকা দিয়ে নিচে ডুবে গেল কারনেসের মাথা। আবার ভাসলো। চিৎকার করে উঠলো। আবার ডুবলো। ভাসলো। চিৎকার। ডুবলো।
অপেক্ষা করে রয়েছে দর্শকেরা। কিন্তু আর ভাসতে দেখা গেল না তাকে।
উচিত সাজা হয়েছে! পাশের গাছ থেকে বললো সাগরের হাসি। কিশোর কিছু বলতে পারলো না। তাকিয়ে রয়েছে পানির দিকে। কারনেসের মত লোকেরও এই পরিণতি মেনে নিতে পারছে না সে। ভীষণ খারাপ লাগছে।
হৈ হৈ করে উঠল জাহাজে দাঁড়ানো আদিবাসীরা। চেঁচিয়ে বলছে, ঠিক হয়েছে। উচিত সাজা হয়েছে! শয়তানটাকে খেয়েছে ম্যাকো!
বন্দিদেরকে লংবোটে নামাতে শুরু করলো ওরা। ওদের উদ্দেশ্য বুঝতে পারলো না কিশোর। সব কজনকে নামিয়ে নিজেরাও নেমে এলো ক্যানু আর লংবোটে। একজন বাদে। সে চলে গেল নিচে।

একটু পরেই বুঝতে পারলো, কেন জাহাজটা থেকে সবাইকে নামিয়ে আনা হয়েছে। শেষ লোকটাও বেরিয়ে এসে তাড়াহুড়া করে নৌকায় নামলো। সরে আসতে লাগলো দুটো নৌকাই। ক্যানু থেকে চেঁচিয়ে কিছু বললো ঝিনুক। বিমানটাও সরে আসতে লাগলো জাহাজের কাছ থেকে।

কারণটা বুঝতে পারলো এতক্ষণে কিশোর। ধোয়া দেখা গেল। জাহাজে। আগুন লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। গাছের মাথায় থেকেই চিৎকার করে বললো সে, ওমরভাই! জলদি! আগুন নেভাতে বলুন!

কিন্তু ইঞ্জিনের শব্দের জন্যেই বোধহয়, লোকের হট্টগোলের জন্যেও হতে পারে, তার চিৎকার কানে গেল না কারও। আগুন নেভাতে গেল না কেউ।

পিছলে গাছ থেকে নামতে গিয়ে দুই উরু ছিলে গেল কিশোরের। কেয়ারই করলো না। গোড়ায় নেমেই দিলো, দৌড়। সৈকতের কিনারে পৌঁছতে পৌঁছতেই আগুন ছড়িয়ে পড়লো অনেকখানি। ডেকের নিচে বোঝাই করা নারকেলের ছোবড়ায় নিশ্চয় আগুন লাগানো হয়েছে।

কিনারে এলে ডজকে যখন বোঝাতে সমর্থ হলো কিশোর, তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। সমস্ত জাহাজে জড়িয়ে গেছে আগুন। ওটাতে এখন গিয়ে ঢোকা আর আত্মহত্যা করা সমান কথা।

অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে সেদিকে ডজ। তার চোখের সামনে পুড়লো জাহাজটা, ডুবে গেল, কিছুই করলো না সে। একেবারে চুপ। পাথরের মূর্তি হয়ে গেছে যেন। চেয়ে চেয়ে দেখলো তার অত সাধের মুক্তোগুলো নিয়ে তলিয়ে গেল জাহাজটা।

কিশোরের কানে বাজতে লাগল ডজের কথাঃ যেখান থেকে এসেছে সেখানেই ফিরে গেল মুক্তো, রাখতে আর পারলাম না।

পাশে এসে দাঁড়ালো সাগরের হাসি। এইমাত্র গাছ থেকে নেমে এলো।

নষ্ট হয়ে যাওয়া ক্যাম্পের কাছে নারকেল গাছের ছায়ায় বসে কিশোরকে জানালো ওমর আর মুসা, কেন আসতে দেরি হয়েছে ওদের।

কিশোর বলতে লাগলো, সে কি করে মরতে মরতে বেঁচেছে।

খাইছে! শুনতে শুনতে বলে উঠলো মুসা। সাগরের হাসি না থাকলে তো...

হ্যাঁ, না থাকলে এতক্ষণে হাওরের পেটে চলে যেতাম। একটা মুহূর্ত চুপ করে রইলো কিশোর। কিন্তু এত কিছু করেও লাভ হলো না। যার জন্যে এসেছিলাম তা আর নিয়ে যেতে পারব না। আগুনে পুড়ে নিশ্চয় চুণাপাথর হয়ে গেছে সব মুক্তো।

দুঃখ করে লাভ নেই, যেন নিজেকেই সান্ত্বনা দিলো ওমর। মুক্তো তোলার জন্যে দরকার হলে আবার আসা যাবে, টাকাপয়সা জোগাড় করে। তবে যে অ্যাডভেঞ্চারটা হল, তাতেই আমি খুশি। এই একটিবার অন্তত আমার টাকা

খোয়ানোর জন্যে একলা ডজকে দায়ী করতে পারছি না। হাসলো সে। নিষ্প্রাণ দেখালো হাসিটা।
কিসের কথা বলছেন? ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করলো সাগরের হাসি। একটু দূরে বসে ওদের কথা শুনছিলো।
মুক্তো। যেগুলো তুলেছিলাম, ওমর বললো। কিশোর বলছে, টিনটা পেয়ে গিয়েছিলো কারনেস। জাহাজে নিয়ে গিয়ে রেখেছিলো। পুড়ে সব নষ্ট হয়েছে। আর পাওয়া যাবে না।
না, হয়নি, সাগরের হাসি বললো।
হয়নি! একসাথে বলে উঠলো ডজ, ওমর আর দুই গোয়েন্দা।
না, হয়নি। আমি নিয়ে এসেছি।
নিয়ে এসেছ! ডজ বললো।
কিভাবে? জানতে চাইলো ওমর।
জাহাজে উঠলাম, বললো সাগরের হাসি। পালের নিচে লুকিয়ে রইলাম। কারনেস দলবল নিয়ে দ্বীপে গেল। একটু পরে ওদের চিৎকার শুনলাম, মুক্তোর টিনটা পেয়ে গেছে। ওটা নিয়ে ফিরে এলো জাহাজে। ডেকের একটা জানালা দিয়ে দেখলাম টিনটা কোথায় রাখছে কারনেস। ও ঘর থেকে বেরিয়ে এলে এক সুযোগে জানালা দিয়ে ঢুকে চট করে নিয়ে চলে এলাম ওটা।
কোথায় রেখেছ? উত্তেজনায় কাঁপছে ডজ।
লেগুনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি, শান্তকণ্ঠে বললো সাগরের হাসি।
চিৎকার করে উঠলো ডজ। শুনলে! কি বললো শুনলে! পানিতে ফেলে দিয়েছে। চুল খামচে ধরলো সে। এজন্যেই বুঝলে, এজন্যেই ফিরে এসেছিলো কারনেস। জাহাজ ছাড়লে কেবিনে গিয়ে টিনটা খুঁজে পায়নি। তার হয়তো সন্দেহ হয়েছে, দ্বীপে আরও কেউ আছে। যে টিনটা চুরি করেছে। সেটা নেয়ার জন্যেই ফিরেছিলো সে।
সবাই উঠে দাঁড়ালো। তাদের ভাবভঙ্গিতে অবাক হলো সাগরের হাসি। তাকাতে লাগলো একেক জনের মুখের দিকে। মুক্তো নিয়ে এরকম করে বিদেশী মানুষ, ব্যাপারটা খুব বিস্মিত করে তাকে।
হ্যাঁ, এই মুক্তোর জন্যেই ফিরে এসেছিলো কারনেস, বিড়বিড় করলো কিশোর।
আমারও তাই মনে হচ্ছে, সাগরের হাসিও একমত হলো।
তখন আমাকে বলনি কেন? বলার সময় পেলাম কোথায়? আর আর...
ব্যাপারটাকে অত গুরুত্ব দাওনি, এই তো?
কোথায় ফেলেছ ওটা? জানতে চাইলো ডজ।
দ্বিধা করলো সাগরের হাসি। আসুন, দেখাচ্ছি।

আবার উত্তেজনা দেখা দিলো অভিযাত্রীদের মাঝে। আদিবাসীদের অনুরোধ করলো ডজ, ক্যানুটা দিতে। সেটাতে করে চলে এলো লেগুনের সেইখানটায় যেখানে নোঙর করে ছিলো হোয়াইট শার্ক। সবাই নিচে তাকাতে শুরু করলো। ওপর থেকেই দেখতে চায় লেগুনের তলায় কোথায় পড়ে আছে মুক্তোর টিনটা। পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়লো সাগরের হাসি। ডুব দিলো।

হাঙরটা যদি আসে? কিশোরের প্রশ্ন।

এলে ওটার কপালে দুঃখ আছে। মেয়েটার জন্যে ভাবছো তো। ভেবো না।

দাঁড় বেয়ে ওদের সঙ্গে এসেছে ছয়জন আদিবাসী। তাদের মুখের দিকে তাকালো কিশোর। মনে পড়লো রাটুনায় অকটোপাস শিকারের কথা। বুঝতে পারলো, হাঙরটার কাপালে দুঃখ আছে কেন বলছে ডজ। সাগরের হাসির সামান্যতম বিপদের সম্ভাবনা দেখলেই ছুরি হাতে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়বে ওরা।

ভেসে উঠলো মেয়েটা। ঝাড়া দিয়ে চুল থেকে পানি ফেললো। দেখেছি, বললো সে। মিনিট দুয়েক ক্যানুর ধার খামচে ধরে দম নিলো সে। তারপর লম্বা খাস টেনে গভীর পানিতে ফুসফুসটাকে বেশিক্ষণ ডুবে থাকার উপযুক্ত করে, আবার ডুব দিলো।

সবাই তাকিয়ে রয়েছে নিচের দিকে। টানটান উত্তেজনার মাঝে কাটতে লাগলো দীর্ঘ মুহূর্তগুলো। অবশেষে শেষ হল উত্তেজনা। ভাসলো আবার সাগরের হাসি। ডান হাতটা তুলে ধরলো। টিনটা বাড়িয়ে দিলো নৌকার দিকে।

প্রায় ছোঁ মেরে তার হাত থেকে টিনটা নিয়ে নিলো ডজ। খুলে ফেললো ডালা। ঝকঝক করে উঠলো মুক্তোগুলো। আছে! সবই আছে! উত্তেজনায় খসখসে হয়ে গেছে তার কণ্ঠ।

পুরো ব্যাপারটাই অবাস্তব লাগছে! ওমর বললো। এই অভিযানের পর কোন ঘটনাকেই আর অসম্ভব মনে হবে না আমার কাছে!

নৌকায় উঠলো সাগরের হাসি। হাঙরটা আসেনি। দেখাও যায়নি ওটাকে। হয়ত কারনেসকে দিয়ে ভূরিভোজের পর সাগরে বেরিয়ে গেছে। কিংবা আবার গিয়ে গুহায় ঢুকেছে ঘুমানোর জন্যে।

তীরে ফিরে এলো ক্যানু। টিনটা শক্ত করে ধরে রেখেছে ডজ। আর কোন ভাবেই এটাকে হাতছাড়া করতে চায় না।

আর থেকে কি হবে, ওমর বললো। রওনা হওয়া দরকার। রাতের আগেই ফিরে যেতে চাই রাটুনায়।

বিমানে এসে উঠলো অভিযাত্রীরা। সাগরের হাসি আর ঝিনুকও উঠলো ওদের সঙ্গে। দুটো নৌকাকে বাঁধা হলো এখন বিমানের লেজের সঙ্গে। এত বোঝা টেনে নিতে অসুবিধে তেমন হবে না ওটার, তবে গতি কমে যাবে। কমুক। ভাবলো ওমর।

তার পরেও ঠিক সময়ে ফিরে যেতে পারবে রাটুনায়, যদি আর। ঝড়টড় না ওঠে। আকাশের দিকে তাকালো। ঘন নীল রঙ। মেঘের চিহ্নও নেই। সহসা আর হারিকেনের সম্ভাবনা নেই।

ইঞ্জিন স্টার্ট দিলো ওমর। চলতে শুরু করলো বিমান।

মিনিট পনের পরে উঠে দাঁড়িয়ে পেছনে ফিরে তাকালো কিশোর। নারকেলের পাতা দুলতে দেখলো বাতাসে। ধীরে ধীরে দিগন্তে মিলিয়ে গেল ওগুলো। ততক্ষণ চেয়েই থাকলো সে। অদ্ভুত এক বিষন্নতায় ভরে গেছে মন। ভাবছে আর কোনদিন দেখতে পাবে না দ্বীপটা।

আবার আসব, বিড়বিড় করলো কিশোর। আবার ফিরে আসব এ দ্বীপে!

তার কথাটা শুনে ফেললো ডজ। হাসলো। হ্যাঁ, এইই হয়। আশ্চর্য এক আকর্ষণ এসব দ্বীপের। কাছে টানে। কিছুতেই যেন এর মায়া কাটাতে পারে না মানুষ। বার বার ফিরে আসতে চায়।

***

ভলিউম ১৬ – প্রাচীন মূর্তি – তিন গোয়েন্দা – রকিব হাসান – সেবা প্রকাশনী

ভিকটর সাইমনের পিছু পিছু রকি বীচের উকিল মিস্টার নিকোলাস ফাউলারের অফিসে এসে ঢুকলো কিশোর আর রবিন।

হাল্লো, ভিকটর! উঠে দাঁড়ালেন ফাউলার। হাত বাড়িয়ে দিলেন বিখ্যাত গোয়েন্দা মিস্টার সাইমনের দিকে। তারপর কেমন আছো? কিশোর, রবিন, তোমরা কেমন?

ভাল, স্যার, ঘাড় কাত করে জবাব দিলো কিশোর।

তার মানে হাতে সময় আছে তোমাদের, রবিনের দিকে তাকিয়ে হাসলেন উকিল সাহেব। কেস নিতে পারবে।

পারবো, রবিন বললো। মিস্টার সাইমনের কাছে সে-খবর শুনেই তো এলাম।

গুড। বসো।

ডেস্কের সামনে তিনটে চেয়ারে বসলো তিনজনে। ফাউলার বসলেন ডেস্কের ওপাশে তার আগের জায়গায়। জিজ্ঞেস করলেন, চা? কফি?

মাথা নাড়লো রবিন আর কিশোর। খাবে না। মাথা ঝাঁকালেন সাইমন। কফি।

বেল বাজিয়ে খানসামাকে ডেকে নির্দেশ দিলেন উকিল, দুকাপ কফি।

ভূমিকা বিশেষ করলেন না তিনি। সরাসরি কাজের কথায় চলে এলেন। কিশোর আর রবিনকে জিজ্ঞেস করলেন, মুসাকে দেখছি না?

ও গাড়ি নিয়ে ব্যস্ত, জবাব দিলো কিশোর। কোথায় নাকি পুরনো গাড়ির পার্টস পেয়েছে, আনতে চলে গেছে।

হুঁ। যাই হোক, তোমাদের কেন ডেকেছি, জানো নিশ্চয়?

শুধু জানি, একটা কেস ঠিক করেছেন আমাদের জন্যে। আর কিছু না। মিস্টার সাইমনকে নাকি ফোন করেছিলেন। তিনি আমাদের খবর দিয়েছেন।

হ্যাঁ। দারুণ রহস্যময় একটা কেস। সেটার সমাধান করতে হবে। আশা করি পারবে তোমরা, মাথার টাকে হাত বোলালেন উকিল সাহেব। ছোটখাটো মানুষ। উঁচু ডেস্কের ওপাশে তার শরীরের বেশির ভাগটাই অদৃশ্য। মিস্টার চেস্টার রেডফোর্ডের মৃত্যুর খবর নিশ্চয় কাগজে পড়েছে।

মাথা ঝাঁকালো কিশোর আর রবিন।

সাইমন বললেন, চিরকুমার ছিলেন যদ্দূর শুনেছি। লোকে বলে মাথায় ছিট ছিলো। রকি বীচে এসেছেন বেশিদিন হয়নি।

হ্যাঁ, কিশোর বললো। একটা কেসে তাঁর সঙ্গে আমাদের পরিচয়। হাতির দাঁতের একটা মূল্যবান মূর্তি হারিয়ে গিয়েছিলো তাঁর। খুঁজে দিয়েছিলাম। মেরিচাচীর বাবার বন্ধু ছিলেন। ঘনিষ্ঠ আত্মীয় কেউ ছিলো না তার। দূর সম্পর্কের দুচারজন ভাইটাই বাদে। খামখেয়ালি লোক ছিলেন। দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসতেন।

অনেক কিছুই জানো দেখছি, উকিল বললেন। উইলে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করে গেছেন। তবে একটা বিশেষ রহস্যের সমাধান করতে না পারলে কেউই কিছু পাবে না।
ফাউলার জানালেন, নিজের হাতে উইল লিখেছেন রেডফোর্ড। তবে তাতে আইনগত কোনো বাধা নেই। সাক্ষী ছিলো দুজন।
দুজনেই তাঁর আত্মীয়, সম্পত্তির উত্তরাধিকারী, কাজেই রহস্য সমাধানের ব্যাপারে কোনোরকম সাহায্য ওরা করবে না। তাতে নিজেদের ক্ষতি, হাসলেন উকিল। তবে আশা করি তোমাদের কোনো অসুবিধে হবে না। পুরানো রহস্য খুঁচিয়ে বের করে সমাধান করে ফেলতে পারো। আর এটা তো নতুনই। রহস্যটা কি জানার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছ, না? দাঁড়াও, আগে উইল থেকে কয়েকটা প্যারাগ্রাফ পড়ি...
ট্রে নিয়ে ঘরে ঢুকলো খানসামা। দুটো কাপ টেবিলে নামিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল।
নাও, চা নাও, সাইমনকে বললেন উকিল। নিজে একটা কাপ তুলে নিলেন। গোটা দুই চুমুক দিয়ে নামিয়ে রাখলেন কাপটা। তারপর ড্রয়ার খুলে একটা দলিল বের করলেন। পড়তে শুরু করলেন, আমি নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছি, মূল্যবান অ্যাজটেক যোদ্ধাকে তারই হাতে দেয়া হবে, যে এসে প্রমাণ করতে পারবে যে সে ওই যোদ্ধার সত্যিকারের বংশধর।
ফাউলার থামলে রবিন বলে উঠলো, এইই? কারো নামটাম নেই?
আরেক জায়গায় তোমাদের চারজনের নাম লেখা রয়েছে, বলে শেষ পাতাটা ওল্টালেন ফাউলার। সাইমন আর তিন গোয়েন্দার নাম। পড়লেন, আমার অনুরোধ থাকলো রকি বীচের গোয়েন্দা ভিকটর সাইমন আর তিন গোয়েন্দা; কিশোর পাশা, মুসা আমান এবং রবিন মিলফোর্ড যেন অ্যাজটেক যোদ্ধাকে খুঁজে বের করে তার সম্পত্তি তাকে প্রদান করে। তদন্তের জন্যে যতো খরচ হবে, সব দেয়া হবে আমার এস্টেট থেকে। কাজ শেষে তাদের পারিশ্রমিকও দেবে এস্টেট। আর যতোক্ষণ অ্যাজটেক যোদ্ধাকে তার সম্পত্তি ফিরিয়ে দেয়া না হয়, ততোক্ষণ আমার কোনো উত্তরাধিকারী আমার সম্পত্তির একটা কানাকড়িও পাবে না।
উইলের দুটো অংশ আরেকবার পড়তে বললেন সাইমন। মন দিয়ে শুনলেন। ভ্রূকুটি করলেন। অবাক হয়েছেন। জিজ্ঞেস করলেন, তোমার হাতে কোনো সূত্র আছে, নিক? যা দিয়ে শুরু করা যায়?
না। যে কজন উত্তরাধিকারী আছে, সবাইকে জিজ্ঞেস করেছি আমি নানাভাবে। মিস্টার রেডফোর্ডের পরিচিত যাদেরকে চিনি, তাদেরকেও খুঁটিয়ে প্রশ্ন করেছি। কেউ কিছু বলতে পারেনি। তবে উইলে একটা বাক্য রয়েছে, এটা সূত্র হলেও হতে পারে। এই যে, লেখা আছেঃ গোয়েন্দাদেরকে অবশ্যই পিন্টো আলভারোকে খুঁজে বের করতে হবে।

দলিলের একটা কপি দেয়া যাবে কিনা জানতে চাইলেন সাইমন। মাথা ঝাঁকিয়ে উকিল বললেন, অবশ্যই। চাইতে পারো ভেবে ফটোকপি করিয়েই রেখেছি, বের করে দিলেন তিনি। এই নাও। যেসব জায়গায় তোমাদের কথা লেখা আছে, তোমাদের প্রয়োজন হবে বুঝেছি, দাগ দিয়ে রেখেছি।
দলিলটা মন দিয়ে পড়তে শুরু করলেন সাইমন।
কিশোর জিজ্ঞেস করলো, নাম শুনে তো মনে হচ্ছে স্প্যানিশ, লোকটা কে বলতে পারবেন?
না, জবাব দিলেন উকিল।
অ্যাজটেক যোদ্ধা কে, কি তার সম্পত্তি, এ-ব্যাপারে কিছু জানেন কিনা জিজ্ঞেস করলো রবিন। কিছুই বলতে পারলেন না উকিল।
পুরানো কোনো মূর্তি-টুর্তি হতে পারে, আন্দাজ করলো কিশোর।
কি জানি। মিস্টার রেডফোর্ডের বাড়িতে তেমন কোনো মূর্তি নেই, ফাউলার বললেন।
স্টাফ করা কোনো পাখি বা জন্তু আছে? ডানাওয়ালা সাপ পবিত্র ছিলো অ্যাজটেকদের কাছে।
ওরকম কিছুই পাইনি মিস্টার রেডফোর্ডের বাড়িতে, ফাউলার বললেন। কোনো ছবিও না। এমন কিছু চোখে পড়েনি, অ্যাজটেক যোদ্ধার সঙ্গে যার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক আছে।
জটিল এবং মজার একটা রহস্য। আগ্রহী হলেন সাইমন। বললেন, নিক, কেসটা নিলাম। আমি আর তিন গোয়েন্দা মিলে কাজ করলে সমাধান করে ফেলতে পারবো। সময় লাগবে না।
ভেতরে ভেতরে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে কিশোর। বেশ কিছুদিন ধরে রহস্য না পেয়ে নিরাশ হয়ে পড়েছিলো। হঠাৎ করে এরকম একটা পেয়ে যাবে, ভাবতেও পারেনি। পুলকিত হয়ে উঠেছে। সাইমনকে জিজ্ঞেস করলো, কখন থেকে কাজ শুরু করবো, স্যার?
পারলে এখন থেকেই করো।
তাহলে রবিনকে নিয়ে একবার রেডফোর্ড এস্টেটে যেতে চাই, এখুনি। দেখা দরকার। কোনো সূত্র মিলতে পারে।
উকিল বললেন, তিনি ওদেরকে নিয়ে যেতে রাজি আছেন। সাইমন জানালেন, যেতে পারবেন না। আরেক জায়গায় জরুরী অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। দরকার হলে পরে যাবেন রেডফোর্ড এস্টেটে। তাছাড়া কিশোর যখন যাচ্ছে, তার নিজের আর যাওয়ার তেমন প্রয়োজন আছে বলেও মনে করছেন না।

সাইমন চলে গেলেন তার কাজে। দুই গোয়েন্দাকে নিয়ে এস্টেটে রওনা হলেন ফাউলার। শহর ছাড়িয়ে চলে এলেন পার্বত্য এলাকায়। একটা পথের পাশে বিরাট এক প্রাইভেট এস্টেট ছিলো, সেটা ভেঙে এখন হাউজিং ডেভেলপমেন্টের কাজ চলছে। এরকম করার নির্দেশ দিয়ে গেছেন রেডফোর্ড। তার রহস্যের সমাধান হলেই এই হাউজিং সোসাইটির মালিক হয়ে বসবে উত্তরাধিকারীরা। অনেক টাকার মালিক। কিশোর আর রবিনকে এসব কথা জানালেন উকিল।

আরো কিছুদূর এগিয়ে মোড় নিলেন ফাউলার। পুরানো পাইনের সারির ভেতর দিয়ে চলে গেছে একটা পথ। সেই পথ ধরে চলে এলেন বিশাল এক বাড়ির সামনে। ভিকটোরিয়ান আমলের বাড়ি। চারপাশ ঘিরে পাতাবাহারে বেড়া গাড়িবারান্দায় গাড়ি রেখে নামলেন উকিল। দুই গোয়েন্দাও নামলো।

চওড়া আর অনেক উঁচু সিড়ি বেয়ে সামনের বারান্দায় উঠে এলো তিন জনে। সদর দরজার হুড়কো খুললেন ফাউলার। ছেলেদেরকে নিয়ে ভেতরে ঢুকলেন।

ভেতরটা আকর্ষণীয়। চকচকে পালিশ করা মেহগনি কাঠের আসবাবপত্র। বড় বড় জানালায় টকটকে লাল মখমলের পর্দা। ছাতের সামান্য নিচ থেকে শুরু হয়েছে, নেমে এসেছে মেঝের কাছাকাছি-এতো বড় জানালা। অনেক বড় একটা ফায়ারপ্লেসের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে মস্ত এক টেবিল, ঘরের এক কোণে।

ব্যাচেলরদের বাড়ি যা হয় তাই, ফাউলার বললেন। খোঁজ। সূত্র খুঁজতে খুঁজতেই বুঝে যাবে, কিভাবে বাস করতে পছন্দ করতেন মিস্টার রেডফোর্ড। বাড়িঘরের কাজ করার জন্যে অনেক লোক রেখেছিলেন তিনি। তাদের মাঝে মহিলাও ছিলো। তবে কোনো কিছুতেই যাতে কোনো মেয়েলী ছাপ না পড়ে সেদিকে কড়া নজর রাখতেন তিনি। তেমন কিছু করতে গেলেই কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিতেন মহিলা সার্ভেন্টদেরকে।

প্রথমে একতলার ঘরগুলোতে দ্রুত চক্কর দিয়ে এলো কিশোর আর রবিন। আন্দাজ করার চেষ্টা করলো কোনখান থেকে খোঁজা শুরু করলে সুবিধে হয়। টেবিল আর ছোট বড় বেদির ওপর সাজিয়ে রাখা হয়েছে অনেক ধরনের মূর্তি– মধ্যযুগীয় রোমান যোদ্ধা, আঠারোশো শতকের ওয়েস্টার্ন বন্দুকবাজ কাউবয়, কুস্তিগীর, ঘোড়সওয়ার সৈনিক, এসব।

কি বুঝলে? জিজ্ঞেস করলেন ফাউলার। হলে অপেক্ষা করছিলেন ছেলেদের জন্যে। নিশ্চয় দেয়ালে ঠুকে ঠুকে দেখেছো, চোরকুঠুরি আছে কিনা...

দড়াম করে কি আছড়ে পড়লো ওপর তলায়। বিকট শব্দ। পুরো বাড়িটা যেন কেঁপে উঠলো।

কি হলো? ভুরু কুঁচকে ফেলেছে কিশোর।

কি জানি! আনমনে মাথা নাড়লেন ফাউলার। চলো তো দেখি!

একেক বারে দুটো করে সিড়ি টপকে দৌড়ে উঠে এলো ওরা দোতলায়। আলাদা হয়ে গিয়ে ঘরগুলোতে খুঁজতে শুরু করলো। কোনো ঘরেই কিছু পড়ার চিহ্ন দেখতে পেলো না।
চিলেকোঠায় ওঠার সিঁড়িঘরের দরজা খুলে ফেললেন ফাউলার। উঠতে শুরু করলেন। পিছে চললো দুই গোয়েন্দা। চিলেকোঠায় ঢুকে থমকে দাড়ালো। অসংখ্য বাক্স আর পুরানো আসবাব স্তূপ হয়ে আছে। তার মধ্যে বড় একটা মেহগনি কাঠের দেরাজ উল্টে পড়েছে। নিচে চাপা পড়েছে একজন মানুষ। বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে, পারছে না।
মরে গেল তো! চেঁচিয়ে উঠলো রবিন।
লোকটাকে বের করে আনার জন্যে লাফিয়ে এগোলো কিশোর। তাকে সাহায্য করতে এগোলো রবিন আর ফাউলার। তুলে সোজা করে রাখলো দেরাজটা তারপর তাকালো লোকটার দিকে মাঝবয়েসী একজন লোক রোগা শরীর নরছে না আর এখন। বেহুশ হয়ে গেছে। কপাল কেটে রক্ত ঝরছে। চেহারা ফ্যাকাসে তাড়াতাড়ি হাঁটু গেড়ে বসে নাড়ি দেখলো কিশোর। নাড়ির গতি ক্ষীণ।
অ্যামবুলেন্স ডেকে হাসপাতালে পাঠানো দরকার, ফাউলার বললেন। এখানে কি করতে এসেছিলো?
চেনেন? জিজ্ঞেস করলো রবিন।
আন্দাজ করতে পারছি। শিওর হতে হলে আরও কিছু দেখা দরকার, অচেতন লোকটার জ্যাকেটের পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করলেন উকিল। নাম-ঠিকানা লেখা কাগজটা পড়ে বললেন, যা ভেবেছিলাম। এর নাম উইলিয়াম বারোজ। মিস্টার রেডফোর্ডের খালাতো ভাই। উইলে এর নামও রয়েছে।
উত্তরাধিকারী! বিড়বিড় করলো কিশোর। উঁকিলের দিকে তাকিয়ে বললো, নিশ্চয় কিছু খুঁজতে এসেছিলো। জরুরী কিছু।
নিচে টেলিফোন আছে। সেকথা রবিনকে জানালেন ফাউলার। অ্যামবুলেন্সের জন্যে টেলিফোন করতে বললেন। অ্যামবুলেন্স আসুক। আমাদের অপেক্ষা করাই ভালো।
লোকটার ওপর নজর রেখে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। কিশোর খুঁজতে শুরু করলো। ড্রয়ার, বাক্স, আলমারি, সব জায়গায়। বের করার চেষ্টা করছে লোকটা কি নিতে এসেছিলো।
দেরাজের মধ্যেও খুঁজতে গিয়েছিলো, বললো সে। হয়তো ঠিকমতো বসেনি। টান লেগে উল্টে পড়েছে গায়ের ওপর।
তাই হবে। চুরি করে ঢুকেছে। আমাকে না নিয়ে এবাড়িতে ঢোকার অনুমতি নেই কারো। ভাবছি, ঢুকলো কিভাবে?

দেরাজের ড্রয়ার পুরানো কাপড় আর বইতে বোঝাই। নাহ্, তেমন কিছু তো দেখছি না, নিরাশ হয়ে মাথা নাড়লো কিশোর। অ্যাজটেক যোদ্ধার সূত্র পাবো। আশা করেছিলাম।
রবিন ফিরে এসে জানালো অ্যামবুলেন্স আসছে। আবার ফিরে গেল নিচে, অ্যামবুলেন্স এলে তাদেরকে পথ দেখিয়ে আনার জুন্যে।
বেশিক্ষণ লাগলো না। একটু পরেই একজন ডাক্তার আর দুজন স্ট্রেচার বাহককে নিয়ে এলো রবিন। বারোজকে পরীক্ষা করলেন ডাক্তার। বললেন, অবশ্যই হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।
লোকটাকে স্ট্রেচারে ভোলা হলো। বাহকদের সঙ্গে চললেন ডাক্তার, উকিল, আর দুই গোয়েন্দা।
অ্যামবুলেন্স চলে যেতেই কিশোর বললো, আবার সে চিলেকোঠায় ফিরে যেতে চায়। খোঁজার কাজটা শেষ করে ফেলবে।
কেন, কিছু চোখে পড়েছে নাকি? জিজ্ঞেস করলো রবিন।
মনে হয়। কয়েক বাক্স পিকচার স্লাইড পড়ে থাকতে দেখেছি। বোধহয় ওগুলোর জন্যেই গিয়েছিলো বারোজ। আর তাহলে ধরেই নেয়া যায়, সূত্র রয়েছে ওই ছবির মাঝেই।
দাঁড়িয়ে আছো কেন? জলদি চলো!
তুমি ভাবছো, ফাউলার বললেন। এর মধ্যে অ্যাজটেক যোদ্ধার ছবিটবি আছে?
চিলেকোঠার দরজায় পৌঁছে গেল ওরা। কিশোর বললো, হ্যাঁ। হয় লোকটার। নয়তো জিনিসটার।
স্লাইডগুলো কোথায় বসে দেখবে? কিশোর বললো, নিচে গিয়ে দেখাই ভালো। চিলেকোঠায় বসে দেখতে অসুবিধে। কথাটা পছন্দ হলো ফাউলারের। বললেন, সেই ভালো। চলো। স্লাইড দেখতে তো প্রোজেক্টর আর পর্দা লাগে। আছে যে তুমি জানলে কি করে?
সহজ। স্লাইড যখন আছে, প্রোজেক্টর আর পর্দাও আছে। এ-তো জানা কথা। তবে আমি দেখেছি নিচতলার ঘরগুলো খোঁজার সময়। চলুন।
চলো। তিনজনে মিলে বাক্সগুলো নিচে নামিয়ে আনলো। তারপর প্রোজেক্টর আর পর্দা বয়ে নিয়ে এলো লিভিং রুমে। বাক্সের ওপর বিভিন্ন দেশের নাম লেখা রয়েছে। গ্রীস, ইটালি, মিশর, আর ভারত লেখা বাক্সগুলো সরিয়ে রাখলো কিশোর। অ্যাজটেক যোদ্ধাকে এগুলোতে পাবো না, বললো সে। আমি শিওর। আমরা যাকে খুঁজছি তাকে পাবো মেকসিকোয়।
পর্দাটা টেনে নামিয়ে দিয়ে এলো রবিন। প্রোজেক্টর রেডি করে তাতে স্লাইড ঢোকালো কিশোর। একটা বাক্সের ওপরে কিছু লেখা নেই, সেটা থেকেই নিয়েছে

প্রথম ছবিটা। দেখলো। তারপর একের পর এক ছবি ঢোকাতে থাকলো।
কিছু ছবি দেখে মনে হলো, সেগুলো রকি পর্বত থেকে তোলা হয়েছে। তারপর এলো হাওয়াই, ক্যানাডা আর ইংল্যান্ডের বিভিন্ন জায়গার দৃশ্য।
মেকসিকোতে ভোলা একটা ছবিও চোখে পড়েনি এখনও, তবু বিমোহিত হয়ে দেখছে কিশোর রবিন। খুবই ভালো লাগছে ওদের। অজানা অচেনা দুর্গম সব জায়গার ছবি। কিছু কিছু তো বিস্ময়কর। কোন দিক দিয়ে যে একটা ঘণ্টা পেরিয়ে গেল টেরই পেলো না ওরা। ফাউলারও মুগ্ধ হয়ে দেখছেন। হঠাৎ কি মনে হতে হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, আরিব্বাবা, অনেক দেরি হয়ে গেছে! আর বেশিক্ষণ থাকতে পারবো না আমি। অফিসে যেতে হবে।
প্রোজেক্টরের দায়িত্ব নিয়েছে এখন রবিন। একের পর এক স্লাইড তুলে দিচ্ছে কিশোর, সেগুলো মেশিনে ঢোকাচ্ছে সে। ছবি দেখতে বেশিক্ষণ আর সময় নিচ্ছে না ওরা। দ্রুত দেখছে। তাড়াতাড়ি কাজ সারতে হবে।
দাঁড়াও, দাঁড়াও! প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন ফাউলার। মেক্সিকো! ওই বিল্ডিংটা মেকসিকো সিটিতে, ওখানকার বিশ্ববিদ্যালয়!
গিয়েছিলেন নাকি ওখানে?
হ্যাঁ।
ছবিটা ভালো করে দেখে সরিয়ে দিলো রবিন। আরেকটা ছবি দেখে ফাউলার জানালেন, ওটা পিরামিড অভ দি সান। মেকসিকো সিটির বাইরে বিশাল এক প্রাচীন ধ্বংসস্তূপ।
রবিন, ধরে রাখ ছবিটা, কিশোর বললো। এটাই অ্যাজটেক। কোনো সূত্র আছে কিনা দেখ।
অনেকক্ষণ দেখেও কিছুই বের করা গেল না ছবিটা থেকে। ছবিতে কয়েকজন লোক রয়েছে। কারোর চেহারাই স্পষ্ট নয়, চেনা যায় না।
বোতাম টিপে দিলো আবার রবিন। চলতে শুরু করলো আবার প্রোজেক্টর। কয়েকটা ছবিতে নানা রকম ক্যাকটাস দেখা গেল, ক্যান্ডেল ক্যাকটাসও রয়েছে তার মধ্যে। একটা হ্রদ দেখা গেল। মাছ ধরছে জেলেরা। জালগুলো অদ্ভুত।
ওটা লেক প্যাজকুয়ারো, ফাউলার জানালেন। আর ওই জালগুলোকে বলে প্রজাপতি জাল। দুনিয়ায় একমাত্র ওই হ্রদেই ওরকম জাল দিয়ে মাছ ধরা হয়, আবার ঘড়ি দেখলেন তিনি। আর তো বসতে পারছি না আমি। এবার যেতে হয়। বাকি ছবিগুলো দেখার জন্যে আবার নাহয় একসময় ফিরে আসা যাবে।
আমরা থাকি? কিশোর অনুমতি চাইলো। ছবিগুলো দেখেই যাই আমি আর রবিন। অসুবিধে আছে?

হাসলেন উকিল সাহেব। ব্যক্তিগত ভাবে আমার কোনো অসুবিধে নেই। কিন্তু আমি একটা দায়িত্ব পালন করছি। একজনের সম্পত্তি আমার কাছে গচ্ছিত রয়েছে। লোকে জানলে খুব সমালোচনা করবে।
কিশোর কথা বলছে, সময় নষ্ট না করে এই সুযোগ আরেকটা স্লাইড ঢুকিয়ে দিয়েছে রবিন। দুটো লোককে দেখা গেল পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকতে।
অস্ফুট শব্দ করে উঠলো কিশোর। একজনকে চিনতে পেরেছে। বায়ের মানুষটি মিস্টার চেস্টার রেডফোর্ড।
অন্য লোকটা কে? রবিনের প্রশ্ন। দেখতে তো অনেকটা ইনডিয়ানদের মতো লাগছে।
স্প্যানিশ-ইনডিয়ান! বিড়বিড় করলো কিশোর। ফাউলারের দিকে তাকালো। কেও? পিন্টো আলভারো?
বলতে পারবো না, মাথা নাড়লেন উকিল সাহেব। স্থির দৃষ্টিতে ছবিটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। অ্যাজটেক যোদ্ধার সত্যিকারের বংশধর হতে পারে! চেহারা অন্তত তা-ই বলছে।
কিশোর আর রবিনের মতোই উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন ফাউলার। যাওয়ার কথা ভুলে গিয়ে তাকিয়ে রয়েছেন ছবিটার দিকে। দ্রুত পরের ছবিগুলো চালিয়ে দিলো রবিন। প্রতিটিতেই দুজনের ছবি, নানা ভঙ্গিতে, চমৎকার একটা বাগানের মধ্যে তোলা।
মিস্টার ফাউলার, আবার অনুরোধ করলো কিশোর। ছবিগুলো তো সবই প্রায় এক। একটা নিয়ে গেলে কোনো অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। নিতে পারি? প্রিন্ট করে নেবো।
ভেবে দেখলেন উকিল। তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে অনুমতি দিলেন।
সব চেয়ে পরিষ্কার ছবিটা বেছে বের করলো কিশোর। সাবধানে রুমালে জড়িয়ে পকেটে রাখলো।
প্রেজেক্টর, পর্দা আর বাক্সগুলো যেখানে ছিলো, সেখানে রেখে এলো আবার তিনজনে মিলে। বেরিয়ে এলো বাড়ি থেকে। সদর দরজার তালা লাগালেন ফাউলার। তারপর ছেলেদের নিয়ে এসে গাড়িতে উঠলেন। পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে ওদেরকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেলেন।
ভেতরে ঢুকেই সোজা হেডকোয়ার্টারের দিকে এগোলো দুই গোয়েন্দা। পথে দেখা হয়ে গেল রাশেদ পাশার সঙ্গে। পুরানো একটা গার্ডেন চেয়ারে বসে পাইপ টানছেন তিনি। গভীর মনোযোগে কি যেন দেখছেন ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে। ওদের সাড়া পেয়ে মুখ তুললেন। হাত নেড়ে ডাকলেন, দেখে যা।

গেল দুজনে। ময়লা পুরানো একটা কাগজ বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, দুটো আঙুলের ছাপ আছে। দেখ তো একরকম না আলাদা?
অবাক হয়ে চাচার মুখের দিকে তাকালো কিশোর। নীরবে হাত বাড়িয়ে কাগজ আর গ্লাসটা নিলো। ভালোমতো দেখে ফিরিয়ে দিতে দিতে বললো, আলাদা। একজনের না।
মুচকি হাসলেন রাশেদ পাশা। আমি যদি বলি একজনের?
চাচার মুখের দিকে তাকিয়েই রয়েছে কিশোর। কি হয়েছে তোমার, চাচা? পুরানো মাল বাদ দিয়ে হঠাৎ এই গোয়েন্দাগিরি!
তুই যদি পুরানো মাল আর গোয়েন্দাগিরি একসাথে চালাতে পারিস, আমি পারবো না কেন?
তা বটে। কিন্তু হঠাৎ তোমার এই শখ কেন?
হঠাৎ দেখলি কোথায়? তোরা যখন কোনো কেসে কাজ করিস, আমি কি ইনটারেস্টেড হই না? খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক প্রশ্ন করি না?
তা করো…
নতুন একটা খবর শুনবি? হাসিটা ছড়িয়ে পড়েছে রাশেদ পাশার চোখে। গোঁফের কোণ ধরে টানলেন। আমিও একসময় গোয়েন্দা ছিলাম।
বোমা ফাটলো যেন, এমন ভাবে চমকে গেল কিশোর রবিন। গোয়েন্দা! একই সঙ্গে বলে উঠলো দুজনে।
হ্যাঁ, গোয়েন্দা। জীবনে অনেক কাজই করেছি, জানিস। বাড়ি থেকে পালিয়ে সার্কাসের দলে যোগ দিয়েছি। ছন্নছাড়ার মতো ঘুরে বেড়িয়েছি দেশে দেশে। জাহাজের নাবিক হয়েছি। মরুভূমিতে গিয়ে বেদুইনদের সঙ্গে বাস করেছি…
সেসব জানি, বাধা দিয়ে বললো কিশোর। জনতাম না শুধু গোয়েন্দা হওয়ার খবর।
ভালো ডুবুরি ছিলাম আমি, সেখবর জানিস? প্রশান্ত মহাসাগরের এক দ্বীপে বহুদিন থেকেছি আমি, মুক্তো-শিকারীদের দলে।
আশ্চর্য! এতো কিছু ছিলে তুমি…
তোর বাপও অনেকটা এরকমই ছিলো। তোর দাদাও। নইলে রহস্য আর, রোমাঞ্চের এই তীব্র নেশা এলো কোত্থেকে তোর রক্তে?
হুঁ! বিমূঢ় হয়ে গেছে যেন কিশোর। রবিন থ। তা গোয়েন্দাটা কবে ছিলে? কোথায়?
জাহাজে থাকতে। একদিন এক কোটিপতি মহিলার নেকলেস হারিয়ে গেল। জাহাজের ডিটেকটিভ কিছুই করতে পারলো না। আমার খুব আগ্রহ হলো, দেখি তো চেষ্টা করে? দুই ঘণ্টার মধ্যেই বের করে দিলাম নেকলেসটা…
এত্তো তাড়াতাড়ি! চোখ বড় বড় করে ফেললো রবিন।

হ্যাঁ। সেদিনই আমাকে সহকারী গোয়েন্দার চাকরি দিয়ে ফেললেন ক্যাপ্টেন। ছমাসের মধ্যেই আসল ডিটেকটিভকে ছাড়িয়ে আমাকে তার জায়গায় বহাল করলেন। কিন্তু টিকলাম না। বছরখানেক পরেই পালালাম। আফ্রিকার উপকূল ধরে চলছিলো তখন জাহাজ। সিংহ আর হাতি শিকারের লোভ সামলাতে পারলাম …

আচমকা কি হলো কিশোরের কে জানে! চট করে বসে পড়ে পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে ফেললো চাচাকে। এতো কথা কোনোদিন কিন্তু জানাওনি তুমি আমাকে!

জানাবো কি? আমার এই ছন্নছাড়া জীবনের কথা শুনলেই তোর চাচী খেপে যায়। বলে ফালতু সময় নষ্ট করেছি আমি। কে যায় অহেতুক সংসারের শান্তি নষ্ট করতে…

হুঁ! মাথা দোলালো কিশোর। তা এই আঙুলের ছাপের ব্যাপারটা কি, বল তো? আবার গোয়েন্দাগিরি শুরু করেছে নাকি?

না। পুরানো ডায়েরী ঘাঁটতে গিয়ে ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়লো কাগজটা। অবসর সময়ে ধাঁধার খেলা আমার খুব ভালো লাগতো। বসে বসে খেলতাম। এই আঙুলের ছাপ আমারই। এই যে এটা আসল। আর এটা নকল।

নকল! বুঝতে পারলো না রবিন। কিশোর বুঝে ফেলেছে। বললো, বুঝেছি। রবারের নকল চামড়া লাগিয়ে নিয়েছিলে। এভাবে নকল ছাপ দিয়ে বাঘা বাঘা গোয়েন্দাকে ধোকা দিয়ে দেয় অপরাধীরা।

হ্যাঁ, মাথা ঝাঁকালেন রাশেদ পাশা। ভাইপোর মুখের দিকে তাকালেন সরাসরি। খুব উত্তেজিত মনে হচ্ছে। কোনো কেস পেয়েছিস নাকি?

পেয়েছি, খুলে বললো কিশোর। ছবিটা প্রিন্ট করার কথা বললো।

চল, আমিও দেখি। হাতে কাজটাজ বিশেষ নেই। ভাবছি, পুরানো পেশাটা আবার নতুন করে ঝালিয়ে নেবো। মন্দ হয় না, কি বলিস?

একটুও না, খুশি হয়ে বললো কিশোর। স্যালভিজ ইয়ার্ডের পাশাপাশি নতুন কতো ব্যবসাই তো করো। এই যেমন জন্তুজানোয়ার ধরে বিক্রি করার ব্যবসাটা। একটা ডিটেকটিভ এজেন্সি খুলে ফেললেই বা ক্ষতি কি?

তোদেরকে দেখে সেকথা ভাবছি অনেকদিন থেকেই। সাহস পাই না, বুঝলি, অফিসের দিকে তাকালেন তিনি। ভেতরে কাজ করছেন মেরিচাচী। তোর চাচীর এসব কাজ একদম পছন্দ না।

কই, আমাকে তো কিছু বলে না?

তোকে বলে না। আমাকে বলবে। ওই বেরোচ্ছে। নিশ্চয় খেতে ডাকবে।

বারান্দায় বেরিয়ে এলেন মেরিচাচী। হাত নেড়ে সবাইকে যেতে ডাকলেন। ঠিকই আন্দাজ করেছেন রাশেদ পাশা। খেতেই ডাকলেন তিনি।
টেবিলে বসে সবে প্লেট টেনে নিয়েছে কিশোর, মেরিচাচী জিজ্ঞেস করলেন, এই কিশোর, মিস্টার সাইমন ফোন করেছিলেন কেন রে? নিশ্চয় নতুন কোনো কেস?
হ্যাঁ। তেমন কিছু না... এড়িয়ে যেতে চাইলো কিশোর।
কেসটা কি? মিথ্যে বলে পার পাবে না, বুঝে গেল, কিশোর। বলতেই হলো। বারোজের কথায় আসতেই রেগে গেলেন। কড়া গলায় বললেন, শয়তান! ওটাকে আবার সম্পত্তি দিতে গেলেন কেন মিস্টার রেডফোর্ড! ও তো একটা চোর!
কিন্তু সত্যিই কিছু চুরি করতে গিয়েছিলো কিনা আমরা জানি না।
নিশ্চয় গিয়েছিলো! নইলে লুকিয়ে চিলেকোঠায় উঠতে যাবে কেন? উকিল সাহেবের জায়গায় আমি হলে সোজা সার্চ ওয়ারেন্ট নিয়ে বারোজের বাড়িতে তল্লাশি চালাতাম। আজই পয়লা নয়, আমার দৃঢ় বিশ্বাস আরও চুরি করেছে সে। তার বাড়িতে চোরাই মাল পাওয়া যাবেই।
তুমি রেগে যাচ্ছো কেন? মোলায়েম গলায় বললেন রাশেদ পাশা। তবে একেবারে ভুল কথা বলোনি। চোর হতেও পারে। যাই হোক, পালিয়ে তো আর যেতে পারছে না। হাসপাতালে রয়েছে। পুলিশ ছাড়বে না। সুস্থ হলেই গিয়ে প্রশ্ন শুরু করবে।
দেখবে তখন, আমার কথাই ঠিক, বলে রান্নাঘরে চলে গেলেন তিনি।
খাওয়ার পরে লিভিং রুমে এসে বসলো সবাই। হাসপাতালে ফোন করলো কিশোর। জানা গেল, তখনও হুঁশ ফেরেনি বারোজের।
অ্যাজটেক যোদ্ধার কেস নিয়েই চললো আলোচনা।
মেকসিকোর পুরানো ইতিহাস ঘাটতে হবে, কিশোর বললো একসময়। বিশেষ করে সেই সময়কার, যখন অ্যাজটেকরা ক্ষমতায় ছিলো।
বাড়িতে বড় একটা লাইব্রেরি গড়ে তুলেছে কিশোর। অবশ্যই সেটা গড়তে সাহায্য করেছেন রাশেদ পাশা আর মেরিচাচী। বইয়ের ব্যাপারে তিনজনেরই প্রচন্ড আগ্রহ। মোটা মোটা দুটো বই নিয়ে এলো কিশোর।
একটা রবিনকে দিয়ে আরেকটা নিজের কোলের ওপর রেখে পাতা ওল্টাতে শুরু করলো। দেখতে দেখতে নিমগ্ন হয়ে গেল বইয়ের পাতায়।
নীরবে পাইপ টানছেন রাশেদ পাশা। মেরিচাচী একটা পেপারব্যাক উপন্যাস নিয়ে বসেছেন।
বাপরে! কি জল্লাদ ছিলো! হঠাৎ বলে উঠলো রবিন। কিভাবে মারতে মানুষগুলোকে! দেবতার ভোগ! স্বাস্থ্যবান দেখে একজন তরুণকে বেছে নিতো। একটা বছর তাকে ভালো ভালো খাবার খাওয়াতো, কাপড় দিতো, আনন্দের

যতো রকম উপকরণ আছে, সব দেয়া হতো। তারপর নিয়ে গিয়ে তাকে বলি দিতো যুদ্ধ দেবতার উদ্দেশ্যে।
হ্যাঁ, তিক্ত কণ্ঠে বললো কিশোর। ধর্মের নামে ধরে ধরে খুন করতে অসহায় মানুষগুলোকে। সব শয়তানী ওই ধর্মগুরুগুলোর। ধর্মযাজক না ছাই! আস্ত পিশাচ একেকটা!
পুরানো আমলের নরবলি নিয়ে কিছুক্ষণ আলোচনা চললো। তাতে রাশেদ পাশা আর মেরিচাচীও যোগ দিলেন। অ্যাজটেক যোদ্ধাদের কয়েকটা ছবি রয়েছে বইতে। বিচিত্র পোশাক পরা। একটা দেখিয়ে রবিন বললো, দেখ দেখ, কি অদ্ভুত! রঙিন ছবি। কাকাতুয়ার পালকের মুকুট মাথায়। গায়ের খাটো জামাটাও তৈরী হয়েছে কাকাতুয়া আর কিছু দুর্লভ পাখির পালক দিয়ে। সোনার সুতো দিয়ে গাঁথা হয়েছে পালকগুলো। এছাড়াও জায়গায় জায়গায় সোনার কারুকাজ।
আরেকটা ছবিতে দেখা গেল পুরো এক স্কোয়াড্রন যোদ্ধা। পরনে জাগুয়ারের চামড়ার তৈরি ইউনিফর্ম। হাতে বর্ম, তাতেও সোনার কারুকাজ। প্রজাপতি আর সাপের প্রতিকৃতি। পায়ে চামড়ার স্যান্ডেল। তাতে সোনা। সোনার ছড়াছড়ি। প্রচুর স্বর্ণখনির মালিক ছিলো ওরা, বোঝা যায়।
মন দিয়ে দেখছে কিশোর আর রবিন, এই সময় এঞ্জিনের শব্দ হলো। বিকট শব্দ করতে করতে অফিসের কাছে এসে থামলো গাড়িটা।
হাসলো কিশোর নিশ্চয় মুসা।
উঠে জানালার কাছে চলে গেল রবিন। ঠিকই বলেছো।
দরজায় দেখা দিলো মুসা। এই যে আছো। ব্যাপার কি? কেস তাহলে সত্যিই মিললো? মিস্টার সাইমন সেজন্যেই ডেকেছিলেন?
হ্যাঁ, রবিন বললো। তা কি কি করে এলে?
তেমন কিছু না, জবাব দিলো কিশোর। দেরাজের নিচে চাপা পড়া একজন মানুষকে বের করে হাসপাতালে পাঠিয়েছি। আর একজন অ্যাজটেক যোদ্ধার খোঁজ করছি।
বড় হয়ে গেল মুসার চোখ। কিসের খোঁজ করছো!
অ্যাজটেক যোদ্ধার, মুসাকে কেসটার কথা খুলে বললো কিশোর আর রবিন।
এই যোদ্ধার ব্যাপারটা ভাল্লাগছে না আমার। পুরানো ব্যাপার-স্যাপার তো, ভূত বেরিয়ে পড়তে পারে। পুরানো, বাড়িতেই ভূত বেশি থাকে জানোই তো, মুসা বললো। তবে মেকসিকোর ব্যাপারটা বেশ ইনটারেসটিং।
এই উইলের ব্যাপারটা পাগলামি মনে হচ্ছে আমার, মুসা বললো। তবে মেকসিকো বেশ মজার। কিছু ইতিহাস আমিও পড়েছি। পুরানো ওই অ্যাজটেকরা কি খেতে জানো?

না, মাথা নাড়লো রবিন।
ফুল মিশিয়ে খাবার রান্না করতো, নাটকীয় ভঙ্গিতে বললো মুসা। রবিন আর কিশোরের কাছে বিদ্যে জাহির করার সুযোগ কমই পায় সে। পেয়ে আর ছাড়তে চাইলো না। তাতে নাকি অনেক অসুখ দূরে থাকে। এই যেমন, অ্যাকাশে ফুল নাকি মেলানকালিয়া মানে বিষন্নতা দূর করে, প্রাচীন অ্যাজটেক ওঝারা বিশ্বাস করতো। ডিমের সঙ্গে মিশিয়ে, তাতে চিনি আর দারুচিনি দিয়ে ভাজা করে খেতো, ঠোঁট চাটলো সে। টেস্ট খারাপ হবে না। ভাবছি একদিন বানিয়ে খেয়ে দেখবো।
কেন, তোমাকে মেলানকালিয়া ধরলো কবে থেকে? হেসে জিজ্ঞেস করলো কিশোর।
আর কোনো ফুল খেতো? রবিনের প্রশ্ন।
নিশ্চয় খেতো। পাই ফিলিং তৈরি করতো গোলাপ ফুল দিয়ে। তাতে মেশাতো চিনি আর লেবু। একধরনের শরবত বানাতে জ্যামাইকা গাছের লাল কুঁড়ি দিয়ে। আর স্কোয়াশ কুঁড়ি খাওয়ার কথা তো নিশ্চয় শুনেছো। শোনোনি? সূর্যদেবতার পুজোর সময় ওই কুঁড়ি মুখে পুরে পানের মতো চিবাতো।
ছাগল ছিলো নাকি ব্যাটারা! মেরিচাচী বললেন।
এক কাজ করো, মেরি, হেসে বললেন রাশেদ পাশা। একদিন জেরানিয়াম, ফুল দিয়ে স্যুপ বানিয়ে দেখ না। অ্যাজটেকরা খেতে পারলে আমরা কেন পারবো না?
হাসতে শুরু করলো সবাই।
হাসতে হাসতে মুসা বললো, কেন এসেছি, সেটা শুনলে না?
নিশ্চয় পার্টসটা পেয়ে গেছ, সেটা বলতে, কিশোর বললো। চমৎকার হয়ে যাবে এবার ভাঙা গাড়িটা। একেবারে নতুনের মতো।
মতো না। নতুনই! তর্জনী নাচিয়ে জোর দিয়ে বললো মুসা। আবার যেতে হবে আমাকে। আরেকটা পার্টসের খোঁজে। এদিক দিয়েই যাচ্ছিলাম। ভাবলাম, বলেও যাই, জিজ্ঞেসও করে যাই, মিস্টার সাইমন ডেকেছিলেন কেন? যাক, তোমরা অ্যাজটেক যোদ্ধাকে খোঁজাখুঁজি করো। প্রয়োজন পড়লে আমাকে নিও। আগে গাড়ির কাজটা শেষ করে নিই...
ঠিক আছে, যাও।
বেরিয়ে গেল মুসা। একটু পরেই শোনা গেল তার জেলোপি গাড়ির ভটভট শব্দ। ইয়ার্ড থেকে বেরোনোর পরেও কিছুক্ষণ শোনা গেল শব্দটা।
বিশ্রাম নেয়া হয়েছে। অফিসে চলে গেলেন মেরিচাচী। ইয়ার্ডের কাজ করতে বেরিয়ে গেলেন রাশেদ পাশা। একা হয়ে গেল কিশোর আর রবিন।
তারপর? রবিন জিজ্ঞেস করলো। এই কেসের ব্যাপারে আর কি করা যায় বলো তো?

তোমার গাড়িটা নিয়ে এসোগে। মিস্টার সাইমনের ওখানে যাবো। তাঁকে সব জানাবো। আর ভাবছি, আজ রাতে আরেকবার যাবো রেডফোর্ড হাউসে। ভেতরে ঢোকা নিষেধ, বাইরে থেকে দেখতে তো বাধা নেই।
তা নেই। কি দেখবে?
দেখি!
মিস্টার সাইমনের সঙ্গে দেখা করে ফিরে এলো দুজনে। রাতের খাবারের পর আবার বেরিয়ে পড়লো। চললো রেডফোর্ড এস্টেটে। গেটের পাশে এনে গাড়ি রাখলো রবিন। এখানেই রেখে যাই, কি বলো?
আরেকটু সরিয়ে রাখো, কিশোর বললো।
গাড়ি থেকে নেমে ড্রাইভওয়ে ধরে হেঁটে চললো দুজনে। আলো রয়েছে তখনও, টর্চ জ্বালার দরকার পড়লো না। বাড়ির বাঁ পাশে পৌঁছে থমকে গেল ওরা। একজন মহিলা, ওপর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। মোটাসোটা। মাথায়, শাদা চুল।
শব্দ শুনে ফিরে তাকালো মহিলা। একটা মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো ওদের দিকে। তারপর হাসলো। গুড ইভনিং। চমকে দিয়েছিলে। চোর মনে করেছিলাম।
তা নও, দেখেই বুঝতে পারছি। আমার নাম ক্লারা অ্যাডামস। এখানেই কাজ করতাম, বাড়ির মালিক থাকতে।
মিস্টার রেডফোর্ড? জিজ্ঞেস করলো কিশোর।
মাথা ঝাঁকালো মহিলা। খুব ভালো লোক ছিলেন। তাঁর কাছে কাজ করে শান্তি ছিলো। কি আরামে ছিলাম ভাবলে কষ্টই লাগে এখন।
কতোদিন আগে কাজ করেছে, জানতে চাইলো কিশোর।
ক্লারা জানালো, বছর দুই আগে চলে গিয়েছিলাম। ইদানীং বেশি বেশি বাইরে যেতেন মিস্টার রেডফোর্ড, নিয়মিত কাজের লোক তেমন লাগতো না।
মিস অ্যাডামস, অ্যাজটেক যোদ্ধার নাম কখনো বলতে শুনেছেন মিস্টার রেডফোর্ভকে? প্রশ্ন করে বসলো কিশোর।
শূন্য দৃষ্টি ফুটলো মহিলার চোখে। নাহ্।
মেকসিকোতে যেতেন, তাই না? জিজ্ঞেস করলো রবিন।
প্রায়ই। অনেক সুভনির এনেছেন ওখান থেকে।
ওগুলো কি করেছেন? কিশোর জানতে চাইলো।
কিছু নিজের কাছে রেখেছেন। কিছু দিয়ে দিয়েছেন একে-তাকে।
মেকসিকোর কোনো বন্ধু বা পরিচিতজনের নাম উল্লেখ করেছেন কিনা তিনি। কখনও, জিজ্ঞেস করলো কিশোর।
মাথা নাড়লো ক্লারা। সত্যি বলতে কি, মিস্টার রেডফোর্ড কথা তেমন বলতেনই না। বাড়ির চাকর-বাকরের সঙ্গে তো নয়ই। তবে কার সাথে যেন কথা বলার সময়

একবার বলতে শুনেছিলাম, মেকসিকোতে গিয়ে ইনডিয়ান অস্ত্রশস্ত্র জোগাড়ের চেষ্টা করেন তিনি, সংগ্রহে রাখার জন্যে। ওই সময় একটা লোক ছিলো তার সঙ্গে। নামটা বলেননি।
অনেক অস্ত্র সংগ্রহে আছে বুঝি তার? রবিন জিজ্ঞেস করলো।
আছে। মিউজিয়ামে দান করে দেবেন বলতেন। দেখলে বুঝতে কি সব জিনিস! রোজ ওগুলোর ধুলো মুছে পরিষ্কার করে রাখতাম আমি। কয়েকটা অস্ত্র ছিলো ভয়ংকর, দেখলেই হাত-পা সিঁটিয়ে যেতো আমার।
কোনো অস্ত্রের কথা বলতে গিয়ে অ্যাজটেক শব্দটা কি বলেছেন?
নাহ্, শুনিনি। কিছু কিছু অস্ত্র আনা হয়েছে আফ্রিকা আর ইউরোপ থেকে। মেকসিকো থেকে যেগুলো এনেছেন, সেগুলোর নাম বলার সময়ও কখনও অ্যাজটেক কথাটা বলেননি।...দেরি হয়ে গেল। যাই। তোমাদের সঙ্গে কথা বলে ভালো লাগলো।
আপনি কি এখানে প্রায়ই আসেন? প্রশ্ন করলো কিশোর।
কিশোরের দিকে নীরবে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ ক্লারা। সন্দেহ করছো, না?
না, না, এমনি...
হাসলো মহিলা। করলে অবশ্য তোমাকে দোষ দেয়া যায় না। এরকম সময়ে বন্ধ একটা বাড়িতে একজন মহিলাকে দেখলে সন্দেহ হওয়ারই কথা। হ্যাঁ, আসি। মানে, আসতাম। মালিক বেঁচে থাকতে তার সঙ্গে দেখা করতে আসতাম। তাছাড়া বাড়িটার মায়া আমি কিছুতেই কাটাতে পারি না।...ঠিক আছে, চলি। গুড বাই।
দ্রুত হেঁটে চলে গেল মহিলা।
তাকে নিয়ে খুব একটা ভাবছে না দুই গোয়েন্দা। তাদের মনে তখন অন্য চিন্তা। অ্যাজটেক যোদ্ধা কোনো অস্ত্রের নাম নয় তো?
লনের ধার দিয়ে হেঁটে বাড়ির সামনের দিকে চলে এলো দুজনে। অনেক বড় বাড়ি। ডান পাশে চোখ পড়তেই থমকে গেল ওরা।
একটা বাক্সের ওপর উঠে জানালা দিয়ে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছে একজন মানুষ।
লোকটাকে ধরার জন্যে ছুটলো দুজনে। কিন্তু দেখে ফেললো লোকটা। লাফ দিয়ে বাক্স থেকে নেমে একটা পাথর কুড়িয়ে নিয়ে ছুঁড়ে মারলো ওদের দিকে। তারপর ঘুরে দৌড় দিলো উল্টো দিকে।
পাথরটাকে এড়ানোর জন্যে ঝট করে মাথা সরিয়ে ফেললো, কিশোর আর রবিন।
চিৎকার করে ডাকলো কিশোর, শুনুন! দাঁড়ান!
কিন্তু লোকটা কি আর শোনে। থামলো না। টর্চ জ্বেলে তার পিছু পিছু দৌড় দিলো দুই গোয়েন্দা। লোকটা বেঁটে, কালো চুল। দৌড়ানোর ভঙ্গিতেই বোঝা যায়

এলাকাটা খুব ভালোমতো চেনে, কোনো রকম দ্বিধা নেই। পেছনের একটা পথ দিয়ে ছুটে হারিয়ে গেল অন্ধকারে। তন্ন তন্ন করে খুঁজলো কিশোর আর রবিন। একজায়গায় মাটিতে জুতোর ছাপ ছাড়া লোকটার আর কোনো চিহ্নই দেখতে পেলো না।

পুলিশকে জানানো দরকার, কিশোর বললো। আমি থাকি। পাহারা দিই। তুমি গিয়ে পুলিশকে ফোন করো।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই এসে হাজির হলো একটা পেট্রোল কার। লোকটা যেখানে ছিলো, সেই জায়গাটা পরীক্ষা করতে লাগলো। জানালার চৌকাঠে আঙুলের ছাপ ফেলে গেছে লোকটা। সেগুলো তোলার ব্যবস্থা করলো পুলিশের বিশেষজ্ঞ। মাটি থেকে জুতোর ছাপের মডেল তৈরি করলো। আর যে বাক্সের ওপর দাঁড়িয়েছিলো লোকটা, সেটাও তুলে নিলো গাড়িতে।

ছেলেদেরকে ধন্যবাদ দিলেন পেট্রোল কারের অফিসার-ইন-চার্জ। আবার কোনো চোরছ্যাঁচোড়কে চোখে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে জানানোর অনুরোধ করে চলে গেলেন।

পুলিশ চলে গেলে আবার অ্যাজটেক যোদ্ধার সূত্র খুঁজতে শুরু করলো দুই গোয়েন্দা। টর্চের আলো ফেলে ঘুরে ঘুরে দেখলো। কিছুই চোখে পড়ছে না। তারপর হঠাৎ বলে উঠলো কিশোর, মনে হয় পেলাম!

দৌড়ে এলো রবিন। কিশোরের আলোটার পাশে আলো ফেললো। একটা বড় পাতের কান্ডে খোদাই করে আঁকা হয়েছে একজন ইনডিয়ান মানুষের প্রতিকৃতি, মাথা থেকে কাধের নিচ পর্যন্ত।

কি বোঝাতে চেয়েছে, কিশোর বললো। বুঝলাম না। তবে অ্যাজটেক যোদ্ধার ছবি হতে পারে।

গাছের পুরো কাণ্ডটাতেই চোখ বোলালো ওরা, আরও সূত্রের আশায়। আরেকটা ছবি কিংবা ফাপা জায়গা। নেই কিছু।

গাছের কাছে মাটিতে কিছু পুঁতে রাখেনি তো? রবিনের প্রশ্ন।

আবার খোঁজা শুরু হলো। গাছটাকে ঘিরে চক্কর দিতে শুরু করলো দুজনে। মাটির দিকে চোখ। অনেকখানি জায়গা দেখলো। মাটি খোঁড়ার চিহ্ন চোখে পড়লো না। সমান মাটি। সব জায়গায় সবুজ ঘাস, একরকম হয়ে জন্মেছে। মাটির রঙেরও কোনো পরিবর্তন নেই।

খোঁড়া হলেও, কিশোর বললো। কিছু দিনের মধ্যে অন্তত হয়নি। অনেক আগে। মাটি না খুঁড়লে কিছু বোঝাও যাবে না আছে কিনা। আজ রাতে হবে না সেটা। তাছাড়া মিস্টার ফাউলারের অনুমতি নিতে হবে।

চলো, গিয়ে অনুমতি নিয়ে নিই।

আজকে তো আর হবে না। কাল সকালে দেখা যাক।

রাত তো বেশি হয়নি। এখন কোথায় যেতে চাও? বাড়িতে?
না, চলো, একবার মিস্টার সাইমনের ওখান থেকে ঘুরে যাই। তিনি কিছু করতে পারলেন কিনা জানা দরকার।
আরেকটা জরুরী কেসে ব্যস্ত মিস্টার সাইমন। অ্যাজটেক যোদ্ধা নিয়ে মাথা ঘামানোর সময়ই পাচ্ছেন না। দুই গোয়েন্দাকে দেখে খুশি হলেন। রেডফোর্ড এস্টেটে যা যা ঘটেছে তাকে জানালো কিশোর আর রবিন।
অস্ত্রের কথা শুনে সাইমন বললেন, ইনটারেসটিং! লুকানো থাকতেও পারে। নিককে ভিজ্ঞেস করবো। গাছের গোড়ায় লুকানো থাকলে অবাক হবো না।
ফাউলারকে ফোন করলেন তিনি। মাটি খুঁড়তে দিতে আপত্তি নেই উকিল সাহেবের। তাকেও বেশ আগ্রহী মনে হলো। জানিয়ে দিলেন, আগামী দিন সকাল নটায় রেডফোর্ড এস্টেটে যাবেন তিনি। ইচ্ছে করলে তখন গোয়েন্দারাও যেতে পারে।
অস্ত্র সংগ্রহের ব্যাপারে তাঁকে প্রশ্ন করলেন সাইমন। জবাবে ফাউলার বললেন, বছরখানেক আগেই ওই শখ চলে গিয়েছিলো মিস্টার রেডফোর্ডের। তালিকাটা আমি দেখেছি। তাতে অ্যাজটেক যোদ্ধার নাম নেই।
পরদিন সকালে সময়মতো এসে রেডফোর্ড এস্টেটে হাজির হলো কিশোর, রবিন আর মিস্টার সাইমন। মুসা আসতে পারেনি। গাড়ি নিয়ে ব্যস্ত। দুটো গাড়ি সাপ্লাই দেবে বলে দুজন খদ্দেরের কাছ থেকে অগ্রীম টাকা নিয়েছে, ঠিকমতো ডেলিভারি দিতে না পারলে ইজ্জত যাবে। সে-কারণে প্রচন্ড আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও আসতে পারেনি।
গ্যারেজ থেকে কোদাল আর বেলচা বের করে আনলেন ফাউলার। চারজনে মিলে মাটি খুঁড়তে শুরু করলেন। গাছের চারপাশে বড় বড় গর্ত খোড়া হয়ে গেল। কিছুই পাওয়া গেল না। হতাশ হয়ে সেগুলো আবার মাটি দিয়ে ভরে দিতে লাগলো দুই গোয়েন্দা। হোস পাইপ দিয়ে পানি ছিটিয়ে, মাটি ডলে সমান করে আগের মতো করে ঘাসের চাপড়াগুলো আবার বসিয়ে দিতে লাগলো। ভীষণ পরিশ্রমের কাজ।
সাইমন বললেন, নিক, যদি সময় দিতে পারো, আমি একবার বাড়িটাতে ঢুকতে চাই। মিস্টার রেডফোর্ডের কাছে নিশ্চয় অনেক চিঠিপত্র আসতো। সেগুলো একবার দেখতে চাই, অ্যাজটেক যোদ্ধার ব্যাপারে কিছু পাওয়া যায় কিনা।
রাজি হলেন উকিল। তবে তেমন কিছু পাওয়া যাবে আশা করতে পারলেন না। রেডফোর্ডের কাগজপত্র নাকি সবই পড়া হয়ে গেছে তার। তবু সাইমন যখন দেখতে চাইছেন...তালা খুলে দিলেন তিনি।

কিশোর বললো, আপনারা কাগজ দেখুন। আমি আর রবিন বাকি স্লাইডগুলো দেখে ফেলি।
ভালো কথা বলেছো, উকিল বললেন। দেখ। ও হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি, পুলিশকে ফোন করেছিলাম সকালে। আঙুলের ছাপের কথা জিজ্ঞেস করলাম। ওদের রেকর্ডে নেই ওই ছাপ। তারমানে অতীতের কোনো অপরাধের ইতিহাস নেই লোকটার। পুলিশের যে রকম ধারণা ছিলো।
বারোজের কি খবর? জানতে চাইলো কিশোর। হুঁশ ফিরেছে?
না। তবে অবস্থা উন্নতির দিকে। ডাক্তারদের ধারণা তাড়াতাড়িই ফিরবে।
কাগজপত্র ঘাটায় মন দিলেন সাইমন। তার সঙ্গে রয়েছেন ফাউলার। কিশোর ও রবিন প্রোজেক্টর আর পর্দা সাজিয়ে বসলো। মেকসিকোতে তোলা ছবির আরেকটা বাক্স পাওয়া গেল। মেশিনে স্লাইড ঢুকিয়ে বোতাম টিপে চালু করে দিলো রবিন। কয়েকটা ছবি পেরোতেই চেঁচিয়ে উঠলো, আরেকটা সূত্র!
একটা মেকসিকান পিরামিডের সামনে তোলা হয়েছে ছবিটা। সেই রহস্যময় লোকটা দাঁড়িয়ে রয়েছে। পরনে অ্যাজটেক যোদ্ধার পোশাক।
স্টিল করে রাখো, কিশোর বললো। আমি মিস্টার সাইমন আর ফাউলারকে ডেকে আনি।
দৌড়ে এসে লাইব্রেরিতে ঢুকলো সে। গভীর মনোযোগে চিঠি পড়ছেন সাইমন। পাশে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে রয়েছেন উকিল সাহেব। দুজনকে খবরটা জানালো কিশোর।
হুমম! ছবিটা দেখে মাথা দোলালেন খোঁড়া গোয়েন্দা (এখন আর খোঁড়া নন তিনি, পা ভালো হয়ে গেছে), ভালো সূত্র বের করেছে। হয়তো ওই লোকটাই মিস্টার রেডফোর্ডের অ্যাজটেক যোদ্ধা।
এবং সেই সম্পত্তির সত্যিকার মালিক, যোগ করলেন ফাউলার। যেটার কথা লিখে গেছেন তিনি।
লোকটা কে? নিজেকেই যেন প্রশ্ন করলো কিশোর। পিন্টো আলভারো, না অন্য কেউ?
এসব ছবি একটা কথাই প্রমাণ করে, রবিন বললো। আমরা যাকে খুঁজছি, তার আসল ঠিকানা রয়েছে মেকসিকোতে।
হাসলেন সাইমন। এতো শিওর হয়ো না। লোকটা মেকসিকোতেই আছে, তা না-ও হতে পারে। অন্য কোনো দেশেও থাকতে পারে। মেকসিকান হলেই যে মেকাকোতে থাকতে হবে তার কোনো মানে নেই।
আরেকটা কথা বললেন তিনি, লোকটা যদি অ্যাজটেক যোদ্ধা হয়ও, কি জিনিস খুঁজে বের করে তাকে ফিরিয়ে দিতে বলা হয়েছে, ছবি দেখে তা জানার কোনোই উপায় নেই।

একটা কথা কিছুতেই বুঝতে পারছি না, উকিল বললেন মাথা চুলকাতে চুলকাতে। লোকটার নাম কেন উইলে উল্লেখ করলেন না, মিস্টার রেডফোর্ড? দুটো রহস্য রেখে গেছেন তিনি। এক, অ্যাজটেক যোদ্ধাকে খুঁজে বের করা। দুই, যোদ্ধার সম্পত্তি খুঁজে বের করা।

রহস্য আরও একটা আছে, সাইমন বললেন। কেসের সমাধান না হওয়াতক কেন সম্পত্তির উত্তরাধিকারীদেরকে তাদের পাওনা থেকে বঞ্চিত রাখতে চেয়েছেন?

এর একটাই জবাব হতে পারে, কিশোর বললো। কোনো বিশেষ কারণে ওদেরকে ঠেকিয়ে রাখতে চেয়েছেন তিনি। আর সেই কারণটা হলো, অ্যাজটেক যোদ্ধা আর তার সম্পত্তি রক্ষা করা। উত্তরাধিকারীরা পাওনা দখল করে ফেললে কোনো ভাবে যোদ্ধা আর তার সম্পত্তির ক্ষতির সম্ভাবনা আছে।

যুক্তি আছে তোমার কথায়, একমত হলেন উকিল সাহেব। কিন্তু সেই সম্পত্তিটা কি হতে পারে?

নিশ্চয় দামী কোনো জিনিস, রবিন অনুমান করলো। জিনিসটার নাম বললে হয়তো চোর-ডাকাতেরা ছুটে আসবে ছিনিয়ে নেয়ার জন্যে। সেই ভয়েই গোপন রেখেছেন।

হুঁ, মিস্টার সাইমনেরও তা-ই মনে হলো। আরও সাবধানে কাজ করতে হবে আমাদের। আরও গোপনে।

সূত্র খোঁজা চললো। স্লাইড দেখতে লাগলো দুই গোয়েন্দা। সাইমন আর ফাউলার আবার ফিরে গেছেন লাইব্রেরিতে। একের পর এক স্লাইড ঢোকাচ্ছে আর বের করছে রবিন। গভীর মনোযোগে পর্দার দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। আচমকা হাত চেপে ধরলো রবিনের। স্টিল করতে বললো। আরেকটা ছবি আগ্রহ জাগিয়েছে তার। বিশাল এক গাছের নিচে দাঁড়িয়ে রয়েছে রহস্যময় সেই লোক।

বাপরে বাপ! বলে উঠলো রবিন। কত্তোবড় গাছ! কয়েক মিনিট পরে আরেকটা ছবি পাওয়া গেল।

আবার সেই লোক! প্রায় ফিসফিস করে বললো কিশোর, যেন জোরে বললে ছুটে পালিয়ে যাবে মানুষটা।

লাইব্রেরি থেকে ফিরে এলেন সাইমন আর ফাউলার। ওদেরকে ছবিদুটো দেখানো হলো। চিন্তিত ভঙ্গিতে চোয়াল ডললেন গোয়েন্দা। এখন আমার মনে হচ্ছে, লোকটাকে মেকসিকোতেই পাওয়া যাবে।

তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর আর রবিন। কিন্তু তিনি ওদের দিকে তাকিয়ে নেই। পর্দার দিকে চেয়ে কিছু ভাবছেন। চোখ ফেরালেন হঠাৎ। শোনো, ছেলেদের বললেন তিনি। আমার এখন যাওয়ার উপায় নেই। একটা সিরিয়াস কেসের তদন্ত

করছি। উইলে তোমাদেরকেও দায়িত্ব নিতে অনুরোধ করা হয়েছে। যাবে নাকি মেকসিকোতে? আলভারোকে খুঁজতে?
হাসিতে দাঁত বেরিয়ে পড়লো রবিনের। আমি এক্ষুণি যেতে রাজি।
তোমার গানের অফিসের চাকরি?
ছুটি নিয়েছি কয়েকদিনের। বাইরে কোথাও যাওয়ার জন্যেই। তবে কোথায় যাবো, ঠিক করতে পারছিলাম না। পেয়ে গেলাম।
গুড। কিশোর, তুমি?
প্লেনের টিকেট কেটে শুধু হাতে দিন। তারপর আর আমার ছায়াও দেখতে পাবেন না এ-শহরে, হেসে বললো কিশোর।
সাইমনও হাসলেন। তা দিতে আপত্তি নেই। খরচ তো দেবে রেডফোর্ড এস্টেট। তবে তোমাদের বয়েসী, অর্থাৎ, টীনএজারদের মেকসিকোতে যাওয়ায় কিছু সরকারী অসুবিধে আছে। বয়স্ক কারো সঙ্গে ছাড়া এই বয়েসীদের ঢুকতে দেয়া হয় সাধারণত, খুব কড়াকড়ি। দুটো বিশেষ পাসের ব্যবস্থা করে দিতে পারি আমি।
সাইমনের কাঁধে হাত রাখলেন উকিল। ভালোই হবে তাহলে। ওরা গিয়ে ওখানে খুঁজুক, আমরা এখানে খুঁজবো। দেখি, কোন্ দল সেই রহস্যময় সম্পত্তি খুঁজে বের করতে পারে?
দেখা যাবে! কিশোরের কণ্ঠে চ্যালেঞ্জের সুর। সাইমনের দিকে তাকিয়ে বললো, পাস দুটো হলে চলবে না, স্যার, তিনটে।
ওহ্ হো, ভুলেই গিয়েছিলাম। মুসা বাদ পড়ে গেছে। ঠিক আছে, তিনটেরই ব্যবস্থা হবে।
থ্যাংক ইউ, স্যার।
যে স্লাইডগুলোতে রহস্যময় লোকটার ছবি রয়েছে, সেগুলো নিয়ে গিয়ে প্রিন্ট করার অনুমতি চাইলো কিশোর। রাজি হলেন ফাউলার।
ইয়ার্ডে ফিরে এলো কিশোর আর রবিন। লাঞ্চের পর হেডকোয়ার্টারে ঢুকলো। স্লাইডগুলো নিয়ে ডার্করুমে ঢুকলো রবিন। কিশোর ফোন করতে বসলো মুসাকে।
কে, কিশোর? চেঁচিয়ে উঠলো মুসা। খুশি খুশি লাগছে তাকে। পেয়ে গেছি! সব পার্টস পেয়ে গেছি!
মেকসিকোতে বেড়াতে যাবে?
কি বললে!
শুনতে চাইলে পার্টসের ভাবনা বাদ দিয়ে এক্ষুণি চলে এসো। আমি আর রবিন আছি।
জাহান্নামে যাক গাড়ি! আমি আসছি!

মিনিট পনেরো পরেই শোনা গেল মুসার গাড়ির বিকট ভটভট। ইয়ার্ডে ঢুকলো। মিস ফায়ার করলো কয়েকবার, যেন পিস্তলের গুলিবর্ষণ করলো। থেমে গেল এঞ্জিন।
খুব সাবধান হতে হবে তোমাকে, মুসা, কিশোর বললো। মেকসিকোর সব খাবার কিন্তু ভালো না। পাকস্থলী জ্বালিয়ে দেয়ার ওস্তাদ।
সব খেতে যাচ্ছে কে? ভুরু নাচালো মুসা। যেগুলোতে ঝাল কম সেগুলো খাবো। টরটিলা খাবো, এনচিলা খাবো। ওসব নাকি দারুণ খাবার। তবে লাল মরিচের চকলেট সস, ওরিব্বাপরে, হাত তুলে ফেললো সে। একশো হাত দূরে থাকবো আমি।
সুর করে গেয়ে উঠলো রবিন
ফর মেকিং টরটিলাস ইউ উইল ইউজ আ মিটেট
অ্যান্ড ফর আ বেড উই উইল ইউজ আ পিটেট।
ভ্রূকুটি করলো মুসা। নাম কি! পিটেট! তা যে-টেটই হোক, আমি বাপু ওই। ঘাসের মাদুরে ঘুমোতে পারবো না। আমি অ্যাজটেক নই।
হেসে উঠলো রবিন আর কিশোর। মূসাও হাসলো।
রবিন, কিশোর বললো। দেখ, ছবিগুলো শুকালো কিনা।
ডার্করুমে গিয়ে কয়েকটা ছবি নিয়ে এলো রবিন। ভেজা রয়েছে। বিছিয়ে দিলো টেবিলে। আগ্রহে সামনে ঝুঁকলো মুসা।
যেসব জায়গায় ছবি তুলেছেন মিস্টার রেডফোর্ড, কিশোর বললো। সবখানে যাবো আমরা।
তারমানে প্রাচীন কীর্তিগুলো দেখার সুযোগ পাচ্ছি? মুখ তুললো মুসা।
হ্যাঁ। সবগুলো না হলেও কিছু কিছু।
হাসি দূর হয়ে গেল মুসার মুখ থেকে। সেই জায়গায় ফুটলো সন্দেহ। ছবির পিরামিডের সিঁড়িতে আঙুল রেখে বললো, এখানে আবার ওঠার কথা বলবে না তো? যা সরুরে ভাই, আর যা খাড়া! কোমর ভাঙার কোনো ইচ্ছেই আমার নেই!
আমারও না, সুর মেলালো কিশোর। ইনডিয়ানরা একটা বিশেষ কায়দায় ওপরে ওঠে, হাঁটাচলা করে। সেভাবে চললে আর পড়বে না।
কিছুক্ষণ পরে ফোন করলেন মিস্টার সাইমন। জানালেন, সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। তিনটে পাস যোগাড় করেছি। মেকসিকো সিটিতে হোটেলও বুক করা হয়েছে। ওখানে উঠবে। তার পর ইচ্ছে মতো যেখানে খুশি যাবে। কোথায় যাবে, কিভাবে যাবে, সেটা তোমাদেরকেই ঠিক করতে হবে।
প্লেনের টিকেট?

লাগবে না। আমার প্লেনটাতে করেই যেতে পারবে। ল্যারি কংকলিন গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসবে তোমাদের। আসার আগে ফোন করে দিও আমাকে। আবার প্লেন পাঠিয়ে দেবো।
টাকার অভাব নেই মিস্টার সাইমনের। বই লিখে, গোয়েন্দাগিরি করে অনেক টাকা আয় করেছেন। ব্যক্তিগত বিমান কিনে, পাইলট সহ সেটার খরচ বহন করারও ক্ষমতা আছে তার। ল্যারি কংকলিন হলো তাঁর পাইলট। বিমানটা খুবই ভালো। তাতে উড়েছে তিন গোয়েন্দা। কংকলিনের পাশে বসে কয়েকবার ওটাকে উড়িয়েছেও মুসা।
কখন রওনা হচ্ছি? জানতে চাইলো কিশোর।
কাল সকালে।
আচ্ছা, ফোন রেখে দিলেন সাইমন।
গাড়ির কাজ শেষ করে মুসাকে তৈরি হয়ে নিতে বললো কিশোর। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল সহকারী গোয়েন্দা। আরও কিছু ছবি প্রিন্ট করার জন্যে ডার্করুমে গিয়ে ঢুকলো রবিন। টেবিলের ছবিগুলো কাছে টেনে নিলো কিশোর। ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে ভালোমতো পরীক্ষা করে দেখবে, নতুন কিছু পাওয়া যায় কিনা।
কয়েক মিনিট পর আবার ফোন করলেন মিস্টার সাইমন। জানালেন, বারোজের জ্ঞান ফিরেছে। তিনি হাসপাতালে যাচ্ছেন। কিশোররা চাইলে আসতে পারে।
এখুনি আসছি, বলে উঠে দাঁড়ালো কিশোর। ডাক দিলো রবিনকে।
হাসপাতালের গেটে দেখা হলো সাইমনের সঙ্গে। ওদের অপেক্ষায়ই দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। ইনফরমেশন ডেস্কে জিজ্ঞেস করতেই জানিয়ে দেয়া হলো বারোজের ঘর কোথায়। এলিভেটরে করে তিনতলায় চলে এলো ওরা। ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন ফাউলার। গোয়েন্দাদেরকে ভেতরে নিয়ে গেলেন।
ফ্যাকাসে হয়ে আছে বারোজের চেহারা। মলিন হাসি হাসলো। আপনাদেরকে অনেক কষ্ট দিচ্ছি। মাপ করে দেবেন। ওই বাড়িতে ঢুকে একটা গাধামি করেছি। বছরখানেক আগে একটা ডুপ্লিকেট চাবি দিয়েছিলেন আমাকে রেডফোর্ড।
টাকার খুব প্রয়োজন তার, জানালো বারোজ। সেজন্যেই উইলের পাওনাটা তাড়াতাড়ি আদায়ের জন্যে অ্যাজটেক যোদ্ধার খোঁজ করতে গিয়েছিলো। কারণ যোদ্ধাকে বের করে তার সম্পত্তি ফিরিয়ে দিলেই টাকা জোগাড়ের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। টাকা তো পেলামই না, আক্ষেপ করে বললো সে। ঘটালাম দুর্ঘটনা। এখন আরো বেকায়দা অবস্থা আমার।
অ্যাজটেক যোদ্ধা কে, বা কি, সে-ব্যাপারে কোনো ধারণা আছে কিনা বারোজের জিজ্ঞেস করলেন সাইমন। মাথা নাড়লো অসুস্থ মানুষটা। অনেক দিন আগে

একবার রেডফোর্ড বলেছিলেন আমাকে, অ্যাজটেকদের একজন উত্তরাধিকারীর কাছ থেকে একটা দামী জিনিস পেয়েছেন। তবে সেটা কি, বলেননি। আমার ওই ভাইটা ছিলেন সাংঘাতিক চাপা স্বভাবের। জিনিসটা কি আন্দাজ করতে পারেন? না। বারোজ জানালো, রেডফোর্ড নাকি বলেছেন, জিনিসটা তাঁকে রাখতে দেয়া হয়েছিলো পাঁচ বছরের জন্যে। তারপর আবার ফিরিয়ে দেয়ার কথা। আমার বিশ্বাস, বারোজ বললো। এই জিনিসটার কথাই উল্লেখ করা হয়েছে উইলে।

তাহলে এমনও তো হতে পারে, ফাউলার বললেন। পাঁচ বছর মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। যার জিনিস তাকেই আবার ফেরত পাঠিয়েছেন মিস্টার রেডফোর্ড। উইলে সেকথা লেখার আর সুযোগ পাননি।

মাথা নাড়লো বারোজ। আমার তা মনে হয় না। যদ্দূর মনে পড়ে, বছর তিনেক আগে আমাকে কথাটা বলেছিলেন রেডফোর্ড। আমাকে বিশ্বাস করতেন। অনেক গোপন কথাই বলতেন। বলেছেন, জিনিসটা তিনি যত্ন করে লুকিয়ে রেখেছেন। কিন্তু কি জিনিস, তা বলেননি। আমিও চাপাচাপি করিনি। বাড়িতেও থাকতে পারে ওটা, কিংবা অন্য কোথাও। জানি না।

আর কিছু বলার নেই বারোজের। রাস্তায় নেমে কিশোর প্রস্তাব দিলো আরেকবার রেডফোর্ড এস্টেটে যাওয়ার। মেকসিকোতে যাওয়ার আগে আরও একবার খুঁজে দেখতে চায়। ওদেরকে নিয়ে চললেন ফাউলার।

সব সময় কিছু বিশেষ যন্ত্রপাতি থাকে সাইমনের গাড়ির বুটে। তদন্তের সময় কাজে লাগে। নেমে গিয়ে বুট খুললেন তিনি।

তিনটে গাড়ি নিয়ে এসেছে চারজনে। নিজের গাড়ি থেকে নেমে এলেন ফাউলার। কিশোর আর রবিন নামলো রবিনের ফোক্সওয়াগন থেকে। সাইমনকে যন্ত্রপাতি নামাতে সাহায্য করতে এগোলো।

পোর্টেবল ফ্লোরোস্কোপ আর একটা মেটাল ডিটেকটর বের করা হলো। বাড়ির দেয়াল, মেঝে, হাত, সব জায়গায় খোঁজা হলো যন্ত্রের সাহায্যে। কয়েকবার মিটমিট করে জানান দিলো যন্ত্রের বাতি, জিনিস রয়েছে। তবে সেগুলোর কোনোটারই কোনো গুরুত্ব আছে বলে মনে হলো না।

সারাক্ষণ গোয়েন্দাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকলেন ফাউলার। কিছুই পাওয়া গেল না দেখে জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, এভাবে হবে না। সমস্ত রহস্যের চাবিকাঠি রয়েছে, আমার ধারণা, পিন্টো আলভারোর কাছে।

সাইমনও একমত হলেন। মনে পড়লো সেই লোকটার কথা,সন্ধ্যাবেলা যাকে তাড়া করেছিলো কিশোর আর রবিন। তার কোনো খবর আছে কিনা জিজ্ঞেস করলেন উকিলকে।

না, জবাব দিলেন ফাউলার। বেনিফিশারিদের কেউ হতে পারে ভেবে, উইলে যতজনের নাম লেখা রয়েছে, সবার খোঁজখবর নিয়েছি আমি। কেউ আসেনি ওরা। সবারই অ্যালিবাই রয়েছে, হাসলেন তিনি। গোয়েন্দা হওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছি অযথা। কিছুই করতে পারলাম না।
ভূল বললে, হেসে বললেন সাইমন। অনেক কিছুই করেছে। এই যে খোঁজাখুঁজিটা করলে, এতে অনেক লাভ হয়েছে। আর এতো দুঃখ পাওয়ার কিছু নেই তোমার। আমরা তো অভিজ্ঞ গোয়েন্দা। কি করতে পারলাম? এখনও অন্ধকারেই রয়েছি।
সেদিন আর কিছু করার নেই। অফিসে চলে গেলেন ফাউলার। সাইমন চলে গেলেন কাজে। দুই গোয়েন্দা ফিরে এলো ইয়ার্ডে।
পরদিন সকালে মালপত্র গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো তিন গোয়েন্দা। ট্যাক্সি নিয়ে চলে এলো বিমান বন্দরে। অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিল্ডিঙের ভেতর দিয়ে ঢুকে বেরিয়ে এলো একটা খোলা অঞ্চলে। ওখানে রাখা হয় ব্যক্তিগত বিমান। অবশ্যই ভাড়া দিতে হয়। মিস্টার সাইমনের বিমানটা দেখতে পেলো ওরা। রানওয়ের শেষ মাথায়।
হঠাৎ চলতে শুরু করলো ওটা। কিন্তু ছেলেদের দিকে এগিয়ে এলো না। বরং রানওয়ে ধরে উল্টোদিকে রওনা হয়েছে। গতি বাড়ছে দ্রুত। দেখতে দেখতে মাটি ছেড়ে শূন্যে উড়াল দিলো।
খাইছে! বলে উঠলো মুসা।
আমাদের রেখেই চলে যাচ্ছে! রবিনও কিছু বুঝতে পারছে না।
আমার তা মনে হয় না! উত্তেজিত শোনালো কিশোরের কণ্ঠ। নিশ্চয় কিছু ঘটেছে! হাইজ্যাক করা হয়েছে প্লেনটা?
হাইজ্যাক! প্লেনটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে মুসা। কি বলছো তুমি!
রবিনও তাকিয়ে রয়েছে। ধীরে ধীরে ছোট হয়ে আসছে বিমানটা।
ঠিকই বলেছি, বিমানের দিকে আর নজর নেই কিশোরের। ছুটতে শুরু করলো অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিল্ডিঙের দিকে। কন্ট্রোল টাওয়ারের সঙ্গে কথা বলতে হবে। এখুনি।
টাওয়ারের রিপোর্ট শুনে থ হয়ে গেল। ল্যারিই নাকি কন্ট্রোলের কাছে ক্লিয়ারেন্স চেয়েছে। তাড়াতাড়ি দেয়ার অনুরোধ জানিয়েছে। কেন, কিছু হয়েছে নাকি? জানতে চাইলো ডিসপ্যাচার। সন্দেহের কথা জানালো কিশোর। প্লেনটাকে ফেরানোর চেষ্টা করবে, বললো ডিসপ্যাচার।
অস্থির হয়ে পায়চারি করতে লাগলো কিশোর রবিন আর মুসা চুপ করে রয়েছে। তবে ওরাও ভীষণ উত্তেজিত। অবশেষে জানানো হলো ওদেরকে, কোনো সাড়াই দিচ্ছে না বিমানটা থেকে।

হাইজ্যাকই মনে হচ্ছে, এতোক্ষণে বিশ্বাস করলে ডিসপাচার। ফেডারেল অ্যাভিয়েশন অথরিটিকে রিপোর্ট করছি।
তাকে বললো কিশোর, পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চায়। তিন গোয়েন্দার একটা কার্ড আর চীফ ইয়ান ফ্লেচারের দেয়া সার্টিফিকেটটা দেখিয়ে গোয়েন্দা পরিচয় দিলো নিজেদের। ফীল্ডে গিয়ে তদন্ত করার অনুমতি চাইলো।
দিয়ে দিলো ডিসপ্যাচার।
তদন্তে নতুন কিছুই বেরোলো না। কয়েকজন মেকানিক ল্যারিকে বিমানে উঠতে দেখেছে। তার সাথে আর কাউকে চড়তে দেখেনি। তবে ফীল্ডে আরেকজন লোকের সঙ্গে তাকে কথা বলতে দেখেছে।
লোকটা দেখতে কেমন? জিজ্ঞেস করলো কিশোর।
চেহারা ভালোমতো দেখিনি, জবাব দিলো একজন মেকানিক। আসলে দেখার প্রয়োজনই মনে করিনি। তাছাড়া অনেক দূরে ছিলো। যেটুকু দেখেছি তা হলো, বেঁটে, কালো চুল। প্লেন নিয়ে পালাবে জানলে কি আর অবহেলা করতাম! একটা জেট এয়ারলাইনারের দিকে রওনা হয়ে গেল সে। ওটার এঞ্জিনের কাজ করছিলো।
আর কিছু করার নেই এখানে। রবিন বললো, এই লোকটা আমাদের রহস্যের সঙ্গে জড়িত। সেদিন রেডফোর্ড এস্টেটে তাড়া করেছিলাম যাকে, মনে হচ্ছে সে-ই। জোর করে ল্যারিকে দিয়ে ক্লিয়ারেন্স নিয়ে প্লেন নিয়ে ভেগেছে।
হতে পারে, কিশোর বললো। টাওয়ারে চলে যাই। দেখি কি হলো?
উদ্বিগ্ন হয়ে আছে ডিসপ্যাচার। ছেলেদের দেখে বললো, কোনো খবরই নেই প্লেনটার। বড় বড় সমস্ত এয়ারপোর্টকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। ওরাও যোগাযোগ করতে পারছে না।
অনেক কাজ ডিসপ্যাচারের। সাংঘাতিক ব্যস্ত। তার সঙ্গে আলোচনা করার, কোনো অবকাশ নেই। ওয়েটিং রুমে এসে বসলো তিন গোয়েন্দা।
কারণটা কি, কিছু বুঝতে পারছো? রবিনের প্রশ্ন। হাইজ্যাকিং, এবং কিডন্যাপিং!
ল্যারির কোনো ক্ষতি না করলেই হয়, পাইলটকে পছন্দ করে মুসা। তাকে হাতে ধরে অনেক কিছু শিখিয়েছে, বিমান চালনার। খাঁটি ভদ্রলোক। কিন্তু ধরে নিয়ে গেল কেন? আর প্লেনটাই বা হাইজ্যাক করলো কেন?
এর জবাব জানলে, কিশোর বললো। হয়তো ল্যারি আর প্লেনটার খোঁজ বের করে ফেলতে পারতাম!
তো, এখন কি করবো? মেকসিকো যাওয়া বন্ধ?
জোরে মাথা নাড়লো কিশোর। মোটেই না!

মিস্টার সাইমনকে ফোন করার জন্যে উঠে গেল সে। কিন্তু বাড়িতে নেই। ডিটেকটিভ। ধরলো তার ভিয়েতনামী কাজের লোক নিসান জাং কিম। খবর শুনে সে-ও চিন্তিত, হলো। বললো, কয়েক জায়গায় ফোন করে মিস্টার সাইমনকে ধরার চেষ্টা করবে। খবরটা জানাবে। তাকে বলবে, তিনি যেন এয়ারপোর্টে কিশোরের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

আবার এসে আগের জায়গায় বসে পড়লো। দীর্ঘ হয়ে উঠলো অপেক্ষার মুহূর্তগুলো। কথাবার্তা তেমন জমছে না এই উত্তেজনার সময়। খবরের কাগজ পড়ার চেষ্টা করলো। কিছুই মাথায় ঢুকলো না। শব্দগুলোকে মনে হলো অর্থহীন।

শেষে বিরক্ত হয়ে কাগজটা ছুঁড়ে ফেলে, উঠে দাঁড়ালো কিশোর। বললো, ফাউলারকে ফোন করবে। দেখতে চায় তিনি কিছু বলতে পারেন কিনা। কি আর বলবেন তিনি? খবর শুনে চুপ করে রইলেন দীর্ঘ একটা মুহূর্ত।

কিশোর বললো, কি মনে হয় আপনার? রেডফোর্ড এস্টেটে যে লোকটা এসেছিলো, সে-ই একাজ করেছে?

করতেও পারে। কি বলবো, বলো? ওর সম্পর্কেও তো কিছুই জানি না আমরা।

তা ঠিক। আপনারা তো দেখেননি। পুলিশ আঙুলের ছাপ পেলো, জুতোর ছাপ নিলো, তা-ও তো কিছু করতে পারছে না। ঠিক আছে, রাখলাম।

ওয়েইটিং রুমে ফিরে এলো কিশোর। উজ্জ্বল হয়ে উঠলো মুখ। মিস্টার সাইমন চলে এসেছেন। চোখেমুখে উৎকণ্ঠা, ল্যারির জন্যে। প্লেনটাকে খুঁজে বের করা সহজ হবে না, ধারণা করলেন তিনি। বড় কোনো এয়ারপোর্টে নামতে সাহস করবে না হাইজ্যাকার, বললেন তিনি। পুলিশের ভয়ে। কোনো খামারের মাঠে কিংবা অব্যবহৃত এয়ারফীল্ডে নামার চেষ্টা করবে।

আমার কি মনে হয়, জানো? আরও কেউ অ্যাজটেক যোদ্ধাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা চালাচ্ছে। প্লেনটা হাইজ্যাক করেছে তোমাদেরকে ভয় দেখানোর জন্যে। যাতে তোমরা আর মেকসিকোতে না যাও।

একই কথা রবিনও ভাবছে। রেগে গেল সে। তাই যদি হয়, তাহলে তো আরও বেশি করে যাবো আমরা। একটা হাইজ্যাকারের ভয়ে পিছিয়ে থাকবো?

ঠিক! মুঠো তুলে ঝাঁকালো মুসা। একটা প্লেন নিয়েছে। সব তো আর নিতে পারেনি। টিকেট কেটে চলে যাবো।

হাসলেন সাইমন। আমিও সেকথাই বলতে যাচ্ছিলাম। প্লেন নিয়ে গিয়ে বেশিদিন আটকে রাখতে পারবে না। খুঁজে বের করে ফেলবোই। তার জন্যে তোমাদের পিছিয়ে আসার কারণ নেই। তোমরা চলে যাও।

টিকেটের খোঁজ নিতে রিজারভেশন কাউন্টারে চলে এলো কিশোর। রবিন আর মুসা এলো খানিক পরে। ততোক্ষণে জানা হয়ে গেছে কিশোরের। মাঝরাতে

একটা প্লেন ছাড়বে। মেকসিকো সিটিতে যাবে। সেটার টিকেট পাওয়া যাবে।
তাতেই রাজি তিন গোয়েন্দা। মোট কথা, যখনই হোক, যেতে পারলেই খুশি। মিস্টার সাইমনকে জানানো হলো। টাকা বের করে দিলেন তিনি, তিনটে টিকেট কেটে নাও।
প্লেন ছাড়তে অনেক দেরি। ততোক্ষণ বসে থাকতে হবে। এছাড়া আর কিছু করারও নেই। বই পড়ে সময় কাটানোর সিদ্ধান্ত নিলো ওরা। এয়ারপোর্টের বুক কাউন্টার থেকে তিনটে পেপারব্যাক বই কিনলো তিনজনে। রবিন কিনলো একটা মিউজিকের ওপর লেখা বই। মুসা কিনলো দেশীবিদেশী খাবারের বই। আর কিশোর কিনলো মেকসিকান ইতিহাসের ওপর লেখা বই। অ্যাজটেক যোদ্ধাদের ব্যাপারে অনেক কিছু লেখা আছে ওতে।
একসময় মুখ তুলে মুসা বললো, প্লেন হাইজ্যাকের খবরটা বাড়িতে জানাবো ফোন করে?
না না, দরকার নেই, তাড়াতাড়ি হাত নাড়লো কিশোর। শুনলেই যাবে ঘাবড়ে। আমাদের যাওয়াও বন্ধ করে দিতে পারে। আমরা চলে যাওয়ার পর শুনলে শুনুকগে, তখন আর ফেরাতে পারবে না। চাচী এখন শুনলে একদম যাওয়া বন্ধ।
অনেকক্ষণ হলো মিস্টার সাইমন চলে গেছেন। ফোন করলেন তিনি। কিশোর গিয়ে ধরলো। একটা জরুরী খবর জানালেন। একজন সত্যিকারের অ্যাজটেক যোদ্ধার বংশধরকে খুঁজে বের করেছি। না না, চমকে উঠো না। আমরা যাকে খুঁজছি এ-লোক সেই লোক নয়। অ্যাজটেক তো আর একজন নয় মেকসিকোতে। কিছু তথ্য জানতে পারলাম ওর কাছে। তোমাদের কাজে লাগবে। ও হ্যাঁ, আগে আরেকটা কথা বলে নিই। লোকটা বিমানের মেকানিক। বাহুতে উল্কি দিয়ে অ্যাজটেক যোদ্ধার ছবি আঁকা।
অনেক প্রশ্ন করেছি লোকটাকে। বাড়ি মেকসিকোতে। পিন্টো আলভারো নামে কাউকে চেনে না। তবে টিকা আলভারো নামটা পরিচিত। ট্যাক্সকোর কাছে চমৎকার একটা হ্যাঁসিয়েন্ডার নাম টিকা আলভারো। ওখানে নাকি কয়েক বছর কাজ করেছে সে। ইচ্ছে হলে ওখানে গিয়ে খোঁজখবর করতে পারো।
সত্যিকারের অ্যাজটেক যোদ্ধার ব্যাপারে প্রশ্ন করতে করতে আরেকটা নাম। জানলাম। সিনর ডা স্টেফানো। লোকটাকে দেখেনি সে, নাম শুনেছে।
কোথায় থাকে? জিজ্ঞেস করলো কিশোর।
বলতে পারলো না। পুরানো প্রত্নতাত্ত্বিক স্পটগুলোতে নাকি ঘুরে বেড়ান। প্রচুর খোঁড়াখুঁড়ি করেন।
প্রত্নতাত্ত্বিক? হ্যাঁ।

আরও কয়েকটা কথার পর লাইন কেটে দিলেন ডিটেকটিভ। ফিরে এসে তথ্যগুলো বন্ধুদের জানালো কিশোর।
সিনর ডা স্টেফানো, না? আরকিওলজিস্ট! দীর্ঘশ্বাস ফেললো মুসা। তারমানে তাকে খুঁজে তুমি বের করবেই। আর তার অর্থ হলো, আমার নিস্তার নেই। পুরানো ওই পিরামিডগুলোর মাথায় আমাকে চড়িয়েই ছাড়বে।
প্লেন ছাড়ার সময় হলো অবশেষে। ছাড়ার পর পরই চমৎকার খাবার দেয়া হলো। অনেক রাত। খাওয়া শেষ করেই ঘুমিয়ে পড়লো ওরা। ঘুম ভাঙলো পরদিন সকালে। রোববার। স্টুয়ার্ডেস ঘোষণা করলো, বিশ মিনিটের মধ্যেই মেকসিকো সিটিতে ল্যান্ড করবে বিমান। দ্রুত বাথরুমে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে এলো তিন গোয়েন্দা। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলো, বিমান বন্দরের ওপরে চক্কর মারছে বিশাল বিমানটা। ল্যান্ড করার প্রস্তুতি নিচ্ছে।
নামলো বিমান।
মুসা প্রস্তাব রাখলো, চলো, ট্যাক্সি নিয়ে শহরটা আগে ঘুরে দেখি। এখুনি হোটেলে যাওয়ার কোনো দরকার নেই।
কাজ চালানোর মতো কিছু শব্দ শিখে এসেছে তিনজনেই। ভাঙা ভাঙা স্প্যানিশে কথা বললো একজন ট্যাক্সি ড্রাইভারের সঙ্গে। হাসলো লোকটা ওদের উচ্চারণ শুনে। দেখেই বুঝে গেছে টুরিস্ট। মেকসিকোতে স্বাগত জানালো। বললো, কোনো অসুবিধে হবে না। দর্শনীয় জায়গাগুলো ঘুরে ঘুরে দেখিয়ে তারপর নিয়ে যাবে হোটেলে।
গাড়িতে চড়লো তিন গোয়েন্দা। এয়ারপোর্ট এলাকা থেকে বেরিয়ে একটা চওড়া রাস্তায় উঠলো ড্রাইভার। দুপাশে পুরানো স্প্যানিশ ধাচের বাড়িঘর, খোলা বাজার। মাঝে মাঝে মাথা তুলে রেখেছে বিরাট উঁচু উঁচু অ্যাপার্টমেন্ট হাউস।
খুব বেশি পুরানো লাগছে না, মুসার কণ্ঠে হতাশার সুর। যেন আশা করেছিলো, এক লাফে হাজার কিংবা পনেরোশো বছর আগের পৃথিবীতে চলে যেতে পারবে।
তাই নাকি? হাসলো ড্রাইভার। পুরানো এলাকায় যেতে চাও? নিয়ে যাবো।
কিছুক্ষণ এপথ ওপথ ঘুরে, অসংখ্য মোড় নিয়ে মস্ত একটা চত্বরে এসে পৌঁছলো ওরা। ড্রাইভার বেশ গর্বের সঙ্গে জানালো, উত্তর দিকে ওই যে গির্জাটা দেখছো, অনেক পুরানো। ১৬৬৭ সালে মহান অ্যাজটেক মন্দিরের ধ্বংসস্তুপের ওপর তৈরি হয়েছিলো।
বিশাল বাড়িটাকে আগ্রহ নিয়ে দেখতে লাগলো তিন গোয়েন্দা। চতুরের আরেক ধারে লম্বা আরেকটা বাড়ি দেখালো ড্রাইভার। ওটা ন্যাশনাল প্যালেস। তার উল্টো দিকে চত্বরের অন্য একধারে রয়েছে প্যালাসিও মিউনিসিপাল, এবং একটা তোরণ। তোরণের নিচে একসারি ছোট ছোট দোকান।

হ্যাঁ, খুশি হয়ে বললো মুসা। এ-জায়গাটা বেশ পুরানো!
হঠাৎ আরেকটা ট্যাক্সি ওদের গাড়ির পাশ কাটালো। জানালা দিয়ে বেরিয়ে এলো একটা হাত। শাদা একটা রুমাল নেড়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইলো যেন তিন গোয়েন্দার।
সংকেত! প্রায় চিৎকার করে উঠলো কিশোর।
জলদি ওই গাড়িটার পাশে নিয়ে যান! ড্রাইভারকে নির্দেশ দিলো কিশোর।
প্যাডালে চেপে বসলো ড্রাইভারের পা। লাফ দিয়ে আগে বাড়লো গাড়ি। শাঁ করে চলে এলো অন্য গাড়িটার পাশে। ভেতরে কে আছে দেখার চেষ্টা করলো তিন গোয়েন্দা।
পলকের জন্যে লোকটাকে চোখে পড়লো কিশোরের। অবাক হয়ে গেছে। ল্যারি কংকলিন! বন্ধুদেরকে বললো সে। অন্য লোকটা মনে হয় মেকসিকান।
এই দুজন বসেছে পেছনের সীটে। সামনের সীটে রয়েছে আরও দুজন। একজন ড্রাইভ করছে। হঠাৎ সামনের গাড়িটা সরে এসে কিশোরদের গাড়ির পথ রুদ্ধ করে দিলো। ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষতে বাধ্য হলো ড্রাইভার।
সামনের গাড়িটাও থেমে গেল। এক ঝটকায় খুলে গেল সামনের প্যাসেঞ্জার সীটের দরজা। নেমে এলো ড্রাইভারের পাশে বসা লোকটা। কিশোরদের গাড়ির কাছে এসে ওদের ড্রাইভারের নাকের সামনে একটা ব্যাজ আর একটা আইডেনটিটি তুলে ধরে বললো, পুলিশ! দরজা খোলো!
আস্তে করে হাত বাড়িয়ে প্যাসেঞ্জার সীটের দরজা খুলে দিলো বিস্মিত ড্রাইভার। উঠে বসলো লোকটা। তোমাদেরকে অ্যারেস্ট করা হলো!
কে-কেন! তোতলাতে শুরু করলো ড্রাইভার। আমি বেআইনী কিছু করিনি...
থানায় গেলেই বুঝবে কি করেছো! ধমক দিয়ে বললো লোকটা। চালাও!
ঝট করে পরস্পরের দিকে তাকালো কিশোর আর রবিন। ঢোক গিললো মুসা। ব্যাপারটা কোনো চালবাজি? কংকলিনকে গ্রেপ্তার করবে কেন পুলিশ? বেআইনি ভাবে বিমান নামানোর দায়ে? বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হলো না কিশোরের। ফিসফিসিয়ে বন্ধুদেরকে বললো, মনে হয় শয়তানী! পালাতে হবে! নামো!
মাথা ঝাঁকালো মুসা। সামনের লোকটা কিছু বোঝার আগেই নিজের ব্যাগের হাতল চেপে ধরে এক ঠেলায় খুলে ফেললো দরজা। ঝাপ দিয়ে পড়লো রাস্তায়। তার পর পরই রবিন, সবার শেষে কিশোর। তিনজনের হাতেই ব্যাগ। নেমে আর একটা মুহূর্ত দেরি করলো না। পেছন ফিরে দিলো দৌড়। চেঁচিয়ে উঠলো ড্রাইভারের পাশে বসা লোকটা।
ফিরেও তাকালে না তিন গোয়েন্দা। ঢুকে পড়লো গাড়ির ভিড়ে। সবই চলমান। প্রায় একসঙ্গে একাধিক হর্ন বেজে উঠলো। ব্রেক কষার পর টায়ারের তীক্ষ্ণ

আর্তনাদ উঠলো। ধাক্কা দেয়া থেকে ছেলেদেরকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে গাড়িগুলো। এঁকেবেঁকে দৌড় দিয়েছে ছেলেরা। যে করেই হোক ওপাশের চত্বরে পিয়ে পৌঁছতে চায়। কিন্তু যানবাহনের জন্যে অসম্ভব মনে হচ্ছে কাজটা।
বুঝলো এভাবে হবে না। শেষে এক বুদ্ধি বের করলো কিশোর। রবিন আর মুসাকে নিয়ে হাত তুলে একসারিতে দাঁড়িয়ে গেল গাড়ির নাকের সামনে। থেমে গেল সামনের কয়েকটা গাড়ি। পেছনেরগুলোও আর এগোতে পারলো না। অবাক হয়েছে চালকেরা। কেউ কেউ গাল দিয়ে উঠলো। যারা কিশোরদেরকে দেখছে, তারা বুঝতে পারলো, রাস্তা পেরোনোর চেষ্টা করছে ওরা। যদিও এভাবে রাস্তা পেরোনো নিয়ম নয়। টীনএজারগুলো সব সময়ই খেপাটে, উল্টোপাল্টা কাজ করে বসে। তাছাড়া এই তিনটেকে মনে হচ্ছে বিদেশী। বোধহয় আমেরিকান। অকাজ তো করবেই।
যাই হোক, সুযোগ পেয়ে একটা মুহূর্ত আর দেরি করলো না কিশোর। ছুটতে শুরু করলো। রবিন আর মুসা তার পেছনে। রাস্তা পেরিয়ে এলো একদৌড়ে।
আবার চলতে শুরু করলো গাড়ির সারি। ল্যারি যে গাড়িটাতে রয়েছে, সেটাকে কোথাও আর দেখা গেল না।
একটা স্যুটকেসের ওপর বসে কপালের ঘাম মুছে বললো মুসা, খাইছে! আরেকটু হলেই চাকার নিচে চলে যেতাম! এমন কাজ আর করতে বলবে না। কখনও!
ঠিক! আরেকটু হলেই মারা পড়েছিলাম! রবিন বললো হাঁপাতে হাঁপাতে।
কিশোরও হাঁপাচ্ছে, এছাড়া আর কিছু করারও ছিলো না। বাদ দাও এখন। বেঁচে তো আছি, হাত নাড়লো সে। আসল কথা বলো। গাড়িটার নাম্বার নিয়েছো?
মাথা নাড়লো মুসা। পারেনি।
আমি নিয়েছি, রবিন জানালো।
আমি শুধু দেখেছি, মুসা বললো। হলুদ রঙের একটা সেডান। বাঁ পাশে পেছনের দরজায় মোটা একটা আঁচড়ের দাগ। কোনো কিছুর সঙ্গে ঘষা লাগিয়েছিলো।
আমিও দেখেছি, কিশোর বললো। যাক, চমৎকার কিছু সূত্র মিললো। গাড়িটা বের করা যাবে। পুলিশকে জানানো দরকার। চলো।
খালি একটা ট্যাক্সি দেখে হাত তুলে ডাকতে যাবে কিশোর, এই সময় একটা গাড়ি এসে থামলো ওদের পাশে। জানালা দিয়ে বেরিয়ে এলো একটা পরিচিত মুখ। সেই ড্রাইভার, যার গাড়িতে বিমান বন্দর থেকে উঠেছিলো ওরা। হাত নেড়ে ডাকলো, এসো।
গাড়ি চালাতে চালাতে লোকটা বললো, কিছুদূর পিস্তল দেখিয়ে নিয়ে গেল আমাকে। তারপর নেমে ওদের গাড়িতে উঠে চলে গেল। হারামজাদা!
তারপর আমাদের খুঁজতে এলেন আপনি? মুসার প্রশ্ন।

হ্যা।
যদি এখানে না পেতেন?
হোটেলে চলে যেতাম। নাম তো জানিই হোটেলের।
লোকটা তাহলে পুলিশ নয়? কিশোর জিজ্ঞেস করলো।
আরে না। আস্ত শয়তান! কিন্তু ব্যাপারটা কি বলো তো? আমাকে নয়, আসলে তোমাদেরকে আটকাতে চেয়েছিলো লোকটা।
সব গোপন না করে কিছু কিছু কথা ড্রাইভারকে জানালো কিশোর। প্লেন, হাইজ্যাক আর কংকলিনকে কিডন্যাপ করা হয়েছে, বললো। হলুদ গাড়িটাতে যে আমেরিকান লোকটাকে আটকে রাখা হয়েছে সে-ই ল্যারি কংকলিন, একথাও জানালো।
হু! মাথা দোলালো ড্রাইভার। তাহলে তো পুলিশকে জানানো দরকার।
তাই জানাবো। থানায় চলুন।
আমার মনে হয়, মুসা বললো। রুমাল নেড়ে আমাদেরকেই ইঙ্গিত দিচ্ছিলো ল্যারি। আমাদের নজরে পড়তে চাইছিলো।
কিশোর, রবিন বললো। ব্যাপারটা বেশি কাকতালীয় হয়ে গেল না? একেবারে আমাদের সামনে এসে পড়লো ল্যারি, আর জায়গা পেলো না!
মোটও কাকতালীয় নয়, কিশোর বললো। হয়তো ওকে রেখে আসার সময় পায়নি ব্যাটারা। তাই গাড়িতে নিয়েই ঘুরছে। আমাদের পিছে লেগেছিলো। এয়ারপোর্ট থেকেই অনুসরণ করেছে। এখানে এসে গাড়ি থামিয়ে নকল পুলিশ অফিসারের ছদ্মবেশে আমাদেরকেও কিডন্যাপ করতে চেয়েছে।
হ্যাঁ, এইটা হতে পারে, তুড়ি বাজালো রবিন। তা-ই করেছে। আরেকটা ব্যাপারে শিওর হয়ে গেলাম। এতো কিছু যখন করছে, তার মানে অ্যাজটেক যোদ্ধা সত্যিই খুব দামী।
গেটের কপালে বড় করে লেখা রয়েছে পুলিশিয়া। ভেতরে গাড়ি ঢোকালো ড্রাইভার। পুলিশ চীফ ডা মারকাসের সঙ্গে দেখা করলো তিন গোয়েন্দা। মন দিয়ে ওদের কথা শুনলেন তিনি। রিপোর্ট লিখে নিলেন। তারপর জানালেন, স্টেটসের রিপোর্ট আমরাও পেয়েছি। প্লেনসহ পাইলট ল্যারি কংকলিনকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। প্লেনটা আমাদের এয়ারপোর্টে নামেনি। তোমরা বলছে, ল্যারিকে দেখেছে। তার মানে অন্য কোথাও নেমেছে। ছোট প্লেন তো, নামার জায়গার অভাব হয় না। ঠিক আছে, আর বেশিক্ষণ লাগবে না। গাড়ির নম্বর রেখে কাজই করেছো। ল্যারি কংকলিনের ছবিও আমরা পেয়েছি। এখুনি অ্যালার্ট করে দিচ্ছি মস্ত পয়েন্টগুলোতে। নিশ্চিন্তে হোটেলে চলে যাও।

আরেকটা অনুরোধ করবো, স্যার, কিশোর বললো। দুজন লোককে খুঁজে দিতে বলবো, যদি এ-শহরে থাকে। একজনের নাম পিন্টো আলভারো, স্যুটকেস থেকে ছবি বের করে দেখালো। আরেকজনকে চিনি না, শুধু নাম শুনেছি। আরকিওলজিস্ট। সিনর ডা স্টেফানো। ছবিটা কার, বলতে পারবো না। তবে ওই দুজনেরই কোন একজন হতে পারে।
চেষ্টা করবেন, কথা দিলেন চীফ। তাঁকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এলো ওরা। ট্যাক্সিতে উঠে হোটেলে যাওয়ার নির্দেশ দিলো ড্রাইভারকে।
ঘুমিয়ে পড়েছিলো, টেলিফোনের শব্দে জেগে গেল কিশোর। ফোন এসেছে পুলিশ হেডকোয়ার্টার থেকে। চীফ মারকাস। কে, কিশোর পাশা? এখুনি চলে এসো। তোমাদের পাইলট ল্যারি কংকলিনকে পাওয়া গেছে।
তাই! কোথায়?
এখানেই বসে আছে।
আসছি।
মুসা আর রবিনকেও খবরটা জানালো কিশোর। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিতে বললো। মুসা মন্তব্য করলো, বাহ্, দারুণ পুলিশ ফোর্স তো! সাংঘাতিক দক্ষ!
নিচে নেমে একটা ট্যাক্সি ডেকে উঠে পড়লো তিনজনে। থানায় চললো।
ল্যারি! পাইলটকে দেখে আনন্দে প্রায় চিৎকার করে উঠলো মুসা।
আন্তরিক হ্যান্ডশেক চললো। তিন গোয়েন্দার সঙ্গে হাত মেলালো ল্যারি। সমস্ত ঘটনাটা শুনতে চাইলো কিশোর।
বিধ্বস্ত লাগছে লম্বা, একহারা লোকটাকে। মুখে চওড়া হাসি। বললো, লোকটা যে কোনদিক দিয়ে উঠলো, দেখিইনি। ঘাড়ের ওপর পিস্তল ঠেসে ধরে বললো, টু শব্দ না করে প্লেন চালাতে। কি আর করবো। অনুমতি নিলাম। তারপর উড়লাম। তবে আমি শিওর ছিলাম, আমাকে খুঁজে বের করবেই তোমরা। কিছুতেই পিছু ছাড়বে না।
আজ সকালে রুমালটা দেখিয়ে একটা কাজের কাজ করেছিলেন, কিশোর বললো। নইলে কিছু বুঝতে পারতাম না।
হ্যাঁ, মাথা ঝাঁকালো ল্যারি। ওরা আমাকে হুমকি দিলো, পালানোর চেষ্টা করলে মরবো। মরতাম কিনা জানি না, তবে বেরোনোর কোনো সুযোগই পাইনি। তাই তোমাদেরকে হুঁশিয়ার করার পয়লা সুযোগ যেটা পেলাম, কাজে লাগালাম।
টেলিফোন বাজলো। তুলে নিয়ে কানে ঠেকালেন চীফ। কথা বলতে লাগলেন। কিশোরের কানের কাছে মুখ সরিয়ে এনে ফিসফিস করে ল্যারি বললো, লোকগুলো অ্যাজটেক যোদ্ধার জিনিসের পেছনে লেগেছে। আমার কাছ থেকে

কথা আদায়ের চেষ্টা করেছে। আমি জানি কিনা জিজ্ঞেস করেছে। ওদের কথা থেকে বুঝলাম, জিনিসটা খুবই দামী।
কথা শেষ করে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন চীফ। ল্যারি বলতে থাকলো, যে লোকটা আমাকে কিডন্যাপ করেছে, তার নাম বলতে পারবো না। শহরের বাইরে একটা বাতিল খামারের কাছে মাঠে নামার নির্দেশ দিলো। মুখোশ পরা আরও কয়েকজন লোক অপেক্ষা করছিলো ওখানে। প্লেন থেকে আমাকে নামিয়ে নিয়ে গিয়ে একটা গাড়িতে তুললো। শহরে নিয়ে এলো। একটা বাড়িতে ঢুকিয়ে প্রশ্ন শুরু করলো। ওদের অনেক প্রশ্নের জবাব দিতে হয়েছে আমাকে। তোমাদের কথাও জিজ্ঞেস করেছে। তোমরা মেকসিকোতে আসবে, একথা বলতে আমাকে বাধ্য করেছে ওরা।
তারপর বের করে নিয়ে গিয়ে আবার গাড়িতে তোলা হলো আমাকে। বোধহয় বাড়িতে একা ফেলে যেতে সাহস হচ্ছিলো না। যদি পালাই। এয়ারপোর্টে নিয়ে গেল। বসে রইলো তোমাদের আসার অপেক্ষায়। তোমরা এলে। তখন থেকেই তোমাদের পিছু নিয়েছে। তোমাদেরকেও ধরে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে ছিলো। ভাবলাম, সেটা ঠেকাতে হবে। বেপরোয়া হয়ে গিয়েই রুমাল দেখিয়ে ইঙ্গিত করেছিলাম, যাতে হুশিয়ার হয়ে যাও।
খুব ভালো কাজ করেছিলেন, রবিন বললো। তা না করলে লোকটাকে সত্যি সত্যিই পুলিশ অফিসার ভাবতাম আমরা। আটকা পড়তাম।
ওই লোকটাও ওদের দলের একজন, ল্যারি বললো।
আমরা তো বেরিয়ে পালালাম। তারপর কি করলো? জিজ্ঞেস করলো কিশোর।
হলুদ গাড়িটা চলতে শুরু করলো। তোমাদের গাড়িটাকে কিছুদূর আসতে বাধ্য করলো নকল পুলিশ অফিসার। তারপর নেমে আবার আগের গাড়িতে উঠলো। আমাকে নিয়ে গেল ল্যানিলা মার্কেটে। ওখান থেকেই পুলিশ আমাকে উদ্ধার করেছে। ভাগ্যিস, গাড়ির নম্বরটা রাখতে পেরেছিলে।
লোকটাকে আবার দেখলে চিনতে পারবেন?
মনে হয় না। আমাকে বাড়িটাতে ঢোকানোর পর, অন্য ঘরে গিয়ে মুখোশ খুলে ছদ্মবেশ নিয়ে ছিলো সব কজন। এটা আমার ধারণা। তবে ওগুলো ওদের আসল চেহারা হলে চিনতে পারবো। একটু আগে চীফকে বললাম সেকথা।
ও। আচ্ছা, যে লোকটা আপনাকে কিডন্যাপ করলো, তাকে চিনেছেন?
না। ও একবারের জন্যেও মুখোশ খোলেনি। তবে তার কথায় বুঝলাম, মিস্টার রেডফোর্ডের বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা করেছিলো।
লোকটা বেঁটে, কালো চুল। চেহারা আমরাও দেখতে পারিনি। আপনি আর কিছু লক্ষ্য করেছেন?

করেছি। দাঁত। স্বাভাবিক নয়। তেড়াবেঁকা। একটার ওপর আরেকটা উঠে এসেছে।
এই কথাটা ধরলেন চীফ। দাঁতের রঙ কেমন, বলুন তো? লাল? আর সামনের দুটো দাত পোকায় খাওয়া? ফ্যাসফাস করে কথা বলে?
হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন! আপনি জানলেন কি করে?
মাথা দোলালেন মারকাস। বোধহয় চিনতে পেরেছি। ওর নাম গুডু টেরিয়াননা। একটা অপরাধী দলের নেতা। হেন কুকর্ম নেই যা ওরা করে না। জেল খেটেছে কয়েকবার। পুলিশের খাতায় নাম আছে। যে বাড়িটা থেকে আপনাকে উদ্ধার করা হয়েছে মিস্টার কংকলিন, ওটা ওদের বাড়ি নয়। এক বুড়ির। পুলিশ দেখেই বুড়ি ওদেরকে সাবধান করে দিয়েছে। আমার বিশ্বাস, পালানোরও সুযোগ করে দিয়েছে সে-ই। নইলে দুএকটাকে অন্তত ধরতে পারতামই। যাই হোক, বললেন যখন চোখকান সজাগ রাখবো। ধরা না পড়ে যাবে কোথায়।
ল্যারির কথামতো সেই মাঠে গিয়ে খোঁজ নিয়েছে পুলিশ। যেখানে নামিয়েছিলো, সেখানেই রয়েছে বিমানটা। সেটা নিয়ে আবার রকি বীচে ফিরে যাবে সে। ওড়ার জন্যে অনুমতি দরকার। ব্যবস্থা করে দেয়ার জন্যে, চীফকে অনুরোধ করা হলো।
ঠিক আছে, বললেন চীফ। টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিলেন।
আরেকবার ফিসফিস করে কিশোরকে বললো ল্যারি, তোমাদেরকে কোনো সাহায্য করতে পারলাম না, সরি।
যা করেছেন, অনেক করেছেন, কিশোর বললো। আপনার কিডন্যাপের ঘটনাটা না ঘটলে পুলিশ এতো আগ্রহ দেখাতো না। বিপদে পড়ে যেতাম আমরা।
পুলিশের গাড়িতে করে চলে গেল ল্যারি। তাকে বিমানটার কাছে পৌঁছে দেয়া হবে। তিন গোয়েন্দা থানা থেকে বেরিয়ে এলো। আলোচনা করে ঠিক করলো, ইউনিভারসিটি অভ মেকসিকোতে যাবে। খোঁজখবর করবে ডা স্টেফানো নামে আরকিওলজির কোনো প্রফেসর আছেন কিনা। শহরের বাইরে বিশ্ববিদ্যালয়টা। ট্যাক্সি নিলো ওরা।
পথে অনেকগুলো বাড়ি চোখে পড়লো। সুন্দর রঙ। কংক্রীটের ওপরেও লাল রঙ করা হয়েছে। চমৎকার লন আর বাগান। উজ্জ্বল রঙের ফুল।
বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছাকাছি গাড়ি পৌঁছলো। অবাক বিস্ময়ে প্রায় চিৎকার করে উঠলো মুসা, খাইছে! দেখ, দেখ, কি সুন্দর! হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছে সে বাড়িটার একধারের মোজাইকের কাজ করা দেয়ালের দিকে। লাইব্রেরিটা রয়েছে ওখানটাতেই।
মোজাইকে আঁকা রয়েছে মস্ত এক দানবীয় মূর্তি। একজন ইনডিয়ানের। মেকসিকোর ইনডিয়ান আর স্প্যানিশ ইতিহাসের কিছুটা আন্দাজ করা যায়

বাকি ছবিগুলো দেখলে।
অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিল্ডিঙের কাছে এসে ড্রাইভারকে থামতে বললো, কিশোর। নেমে ভেতরে ঢুকে একজনকে জিজ্ঞেস করলো আরকিওলজি ডিপার্টমেন্টটা কোথায়। ওই ডিপার্টমেন্টের আরেকজন প্রফেসর ডক্টর হ্যাসিয়ানোর কথা বলে তাকে বলা হলো তিনি হয়তো জানতে পারেন।
ভালো মানুষ প্রফেসর হ্যাসিয়ানো। বেশ আন্তরিক। তিনি বললেন, সিনর ডি স্টেফানোকে চেনেন। ছবি দেখে সনাক্ত করলেন। বললেন, অনেক দিন দেখা হয় না। বেশি ঘোরাঘুরি করার স্বভাব। এক জায়গায় বেশি দিন থাকে না। স্থায়ী কোনো ঠিকানাও নেই, অন্তত আমার জানা নেই।
তাকে খুঁজে বের করার উপায় আছে কিনা এই প্রশ্নের জবাবে প্রফেসর বললেন, পাওয়া খুব মুশকিল। বেশিরভাগ সময়ই কাটায় প্রাচীন ধ্বংসস্তূপগুলোতে। ইনটারেসটিং অনেক প্রাচীন নিদর্শন মাটি খুঁড়ে বের করেছে। তবে নিজে গিয়ে কখনও সরকারী লোকের কাছে কিংবা মিউজিয়ামকে দিয়ে আসেনি ওসব জিনিস, অন্য সব আরকিওলজিস্টরা যা করে। সব সময় অন্য লোকের হাতে পাঠায়।
কিশোর বললো, ডক্টর স্টেফানোকে তার খুব দরকার। জরুরী কাজে। হেসে বললো, কিন্তু আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে পাওয়াটা খুব কঠিন হবে।
তা হবে। কারণ মেকসিকোতে ধ্বংসস্তুপের অভাব নেই। তার অনেকগুলোই এখনও খোঁড়া হয়নি। কোনটাতে গিয়ে বসে আছে এখন ডক্টর কে জানে।
প্রফেসরকে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে কিশোর বললো, ঠিক আছে, যাই। খুঁজে দেখিগে। ভাগ্য ভালো হলে পেয়ে যাবো।
ওদেরকে গুড লাক জানালেন হ্যাঁসিয়ানো। বললেন, স্টেফানোকে পেলে আমার কথা বলো। যেন দেখা করে। কয়েকটা ক্লাস নিতে বলবো। কিছু কিছু বিষয়ে আমার চেয়ে অনেক বেশি জ্ঞান তার।
বেরিয়ে এলো তিন গোয়েন্দা। ঘড়ি দেখলো কিশোর। আজ আর কোথাও যাওয়ার সময় নেই। কাল বেরোবো। সবচেয়ে কাছের ধ্বংসস্তূপটা হলো টিওটিহুয়াকান।
ওখানেই বন্ধুর ছবিটা তুলেছেন মিস্টার রেডফোর্ড, তাই না? মুসার প্রশ্ন। অ্যাজটেক যোদ্ধার পোশাক পরিয়ে?
হ্যাঁ।
ফেরার পথে বইয়ের দোকান থেকে একটা ম্যাপ আর একটা চার্ট কিনলো কিশোর। হোটেলে বসে বসে তিনজনে মিলে চার্ট দেখে বের করতে লাগলো, কোন কোন্ ধ্বংসস্তুপে গাড়িতে করে যাওয়া যায়। রেডফোর্ডের তোলা যে ছবিগুলোর

প্রিন্ট করে নিয়েছে রবিন, সেগুলোও মন দিয়ে দেখতে লাগলো। যদি কিছু বের করতে পারে!
যেসব জায়গায় গাড়ি যায়, আগে সেখানে যাই, রবিন বললো। না পেলে তারপর অন্য জায়গায় যাওয়ার কথা ভাববো। কি বলো?
মাথা ঝাঁকালো কিশোর।
টিওটিহুয়াকানের ব্যাপারে বেশ আগ্রহ দেখালো মুসা। এসব পুরানো ধ্বংসস্তূপ দেখতে খুব ভালো লাগে তার। মানুষের প্রাচীন ইতিহাস জানার প্রচন্ড কৌতূহল। মাঝে মাঝে তো দুঃখই প্রকাশ করে ফেলে, প্রাগৈতিহাসিক পৃথিবীতে জন্মালো না বলে। তাঁর জানা আছে, টিওটিহুয়াকান হলো টোলটেকদের ধর্মমন্দির, যেটা পরে জোর করে দখল করে নেয় অ্যাজটেকরা।
একটা ছবির ওপর আঙুল রেখে বললো সে, এই পিরামিডগুলো খুব উঁচু।
হ্যাঁ, রবিন মাথা ঝাকালো। পিরামিড অভ দি সান।
সূর্যের পিরামিড, কিশোর বললো। অদ্ভুত নাম, না?
নাম যা-ই হোক, হাত নাড়লো মুসা। দয়া করে আমাকে অন্তত ওখানে চড়তে বলো না। পা পিছলালে গেছি। চূড়ায় গিয়ে বসে নেই তো সিনর স্টেফাননা?
কি জানি, হাসলো রবিন। থাকেই যদি, যাবে। আচ্ছা, পাহাড়-টাহাড় তো খুবই বাইতে পারো। ভয় লাগে না। তার মানে উচ্চতা নিয়ে কোনো ফোবিয়া নেই তোমার। পিরামিডে চড়ার ব্যাপারে এতো ভয় কেন?
সত্যি কথা বলবো? বলো।
পিরামিড হলোগে প্রাচীন রাজারাজড়াদের কবর। ওখানে ভূত থাকবেই...
একেবারে রাজকীয় ভূত, কিশোর বললো। হাহ্ হাহ্ হা!
না, ঠাট্টা করো না, সত্যি আছে...
ভালোই তো হবে তাহলে। কখনও তো সত্যিকারের ভূত দেখনি। এবারে দেখা হয়ে যাবে।
তারমানে আমাকে পিরামিডে চড়িয়েই ছাড়বে!
তুমি তো আর একা উঠবে না। প্রয়োজন হলে আমরাও তোমার সঙ্গে থাকবো।
গুম হয়ে গেল মুসা। বুঝতে পারলো, ওরা তার কথা শুনবে না।
পরদিন সোমবার। সকালে নাস্তা সেরেই বেরিয়ে পড়লো তিন গোয়েন্দা। হোটেলের কাছেই একটা রেন্ট-আ-কার সার্ভিস রয়েছে। সেখান থেকে একটা ট্যাক্সি ভাড়া করলো। একটা কনভারটিবল গাড়ি। টিওটিহুয়াকানে চললো।
দুপুরের দিকে একটা রেস্টুরেন্ট দেখে নাম পড়লো মুসা, গ্রোটো রেস্টুরেন্ট। হুঁ, খাবার-দাবার ভালোই হবে মনে হচ্ছে। চলো, ঢুকে পড়া যাক।

রেস্টুরেন্টটা কোনো বাড়ির মধ্যে নয়। পাহাড়ের একটা গুহার ভেতরে। একসময় প্রাচীন ইনডিয়ানদের একটা গোত্র বাস করতো এখানে।
গাড়ি সরিয়ে এনে রাস্তার পাশে পার্ক করলো কিশোর। তিনজনে মিলে ঢুকে পড়লো গুহার ভেতর। মুসার অনুমান ভুল হয়নি। খাবার সত্যিই চমৎকার। একবার খেয়ে আরেক প্রস্থ খাবারের অর্ডার দিলো মুসা। তাকে সাবধান করলো কিশোর, বুঝেশুনে খেও। অনেক ওপরে উঠতে হবে আমাদের। পেট বোঝাই থাকলে অসুবিধে হতে পারে।
সে দেখা যাবে, তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে হাত নাড়লো মুসা।
অবশেষে পিরামিডের কাছে পৌঁছলো তিন গোয়েন্দা। মিশরীয় পিরামিডের মতো তিনটে দেয়াল নয় মেকসিকান পিরামিডের, দেয়ালগুলো সমানও নয়। চারটে দেয়াল, এবং ধাপে ধাপে সিঁড়ি উঠে গেছে ক্রমশ সরু হয়ে। যতোই ওপরে উঠেছে, চেপে এসেছে দুই পাশ, ফলে চূড়াটা হয়ে গেছে একেবারে চোখা। শত শত ধাপ সিঁড়ি। হাঁ করে তাকিয়ে রইলো ওরা। দর্শকের যেমন অভাব নেই, প্রত্নতাত্ত্বিকদেরও কমতি নেই। অসংখ্য জায়গায় খোঁড়াখুঁড়ি চলছে। মুসার আশঙ্কা হতে লাগলো, এভাবে চলতে থাকলে কোনোদিন ধসিয়েই দেবে পিরামিডটা। তবে তার আশঙ্কা অমূলক। কোনো কিছু নষ্ট না করে কিভাবে খুঁড়তে হয় জানা আছে আরকিওলজিস্টদের।
কি সর্বনাশ! মুসার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বললো রবিন। এসেছিলাম একটা ভূতুড়ে শহর দেখতে। কিন্তু এ-যে বাজার বানিয়ে ফেলেছে।
রবিনের কথায় কান নেই মুসার। তাকিয়ে রয়েছে চুড়ার দিকে। আরিব্বাপরে, কি উঁচু। সূর্যের পিরামিড নামটা ভুল রাখেনি। মনে হয় একেবারে সূর্য ছুঁতে চাইছে। ওখানে উঠতে হবে আমাকে?
ভয় পাচ্ছো? জিজ্ঞেস করলো কিশোর।
ভূতের ভয় আর পাচ্ছি না এখন। এতো লোকের সামনে ভূত আসবে না। উচ্চতার ভয়ই পাচ্ছি। এতো উঁচুতে উঠতে গিয়ে মাথা ঘুরেই না পড়ে যাই!
পড়বে না, কিশোর বললো। যদি ইনডিয়ান কায়দায় ওঠো। ওরা কক্ষণো সিড়ির দিকে মুখ করে উঠতো না। পাশ থেকে উঠতো। নামার সময়ও একই ভাবে নামতো।
ছাগল ছিলো আর কি, মুসা বললো। পাশ থেকে ওঠা তো আরও কঠিন।
হয়তো। কিন্তু তাতে পড়ার সম্ভাবনা নেই। সিড়িগুলো কি সরু দেখছো না?
তাহলে উঠবেই?
হ্যাঁ। সবাই ওঠো। ডা স্টেফানোকে পাই আর না পাই, এতোদূরে এসে পিরামিডে চড়ার সুযোগ ছাড়বো না।

এগিয়ে গিয়ে উঠতে শুরু করলো কিশোর। দেখাদেখি রবিনও গেল। সবার শেষে মুসা। কিছুদূর উঠে আর পাশ থেকে ওঠার কথা মনে রইলো না তার। কিংবা পরোয়া করলো না। সামনের দিকে মুখ করে উঠতে আরম্ভ করলো। বড় জোর পাঁচ কি সাতটা ধাপ পেরিয়েছে, তার পরই পা পিছলালো। সোজা থাকার অনেক চেষ্টা করলো। পারলো না কিছুতেই। পড়ে গেল। গড়াতে শুরু করলো শরীরটা।
সরাসরি উঠতে গিয়ে সবার আগে চলে গিয়েছিলো সে। পেছনে পড়েছিলো কিশোর আর রবিন। কারণ ওরা তাড়াহুড়ো করেনি। মুসার পতন ঠেকাতে চেষ্টা করলো ওরা। পারলো তো না-ই, ওরাও পড়ে গেল।
গড়াতে গড়াতে নিচে পড়তে লাগলো তিনটে শরীর।
চেঁচামেচি শুনে একবার ফিরে তাকিয়েই আবার যার যার কাজে মন দিলো যারা মাটি খুঁড়ছিলো। গুরুত্বই দিলো না। বোঝা যায়, এভাবে গড়িয়ে পড়াটা এখানে নতুন নয়। দেখে দেখে গা সওয়া হয়ে গেছে ওদের।
বিশাল পিরামিডের একেবারে গোড়ায় এসে বন্ধ হলো গড়ানো। হাঁসফাস করতে করতে উঠে বসলো তিনজনেই। হাঁটু আর কনুই ছড়ে গেছে। আরও কয়েক জায়গায় ব্যথা পেয়েছে, তবে হাড়টাড় ভাঙেনি।
বলেছিলাম না ভূত আছে! কোলাব্যাঙের স্বর বেরোলো মুসার কণ্ঠ দিয়ে। ধাক্কা দিয়ে ফেলেছে!
তোমার মাথা! রেগে গেল কিশোর। কতোবার সাবধান করলাম ওভাবে উঠতে পারবে না! ইনডিয়ানদের শত শত বছরের অভিজ্ঞতাকে বুড়ো আঙুল দেখাতে গিয়েই এই বিপদটা বাধালে। ভাগ্যিস বেশি ওপরে উঠে অকাজটা শুরু করোনি!
রবিন কাঁপছে। মুখ থেকে ধুলো আর মাটি মুছে বললো, মুখ-টুখ মোছো না। ভাঁড়ের মতো লাগছে তো।
কিশোর আর রবিনের মুখের অবস্থা দেখেই নিজেরটা কেমন হয়েছে আন্দাজ করে ফেললো মুসা। মুছতে মুছতে বললো, বাপরি বাপ! মনে হলো গত একহাজার বছর ধরে একটানা গড়াগড়ি খেয়েছি। জাহান্নামে যাক সূর্যের পিরামিড। আমি আর এর মধ্যে নেই, দুহাত নাড়লো সে।
জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেললো কিশোর। কিন্তু আরেকবার চেষ্টা করে দেখতে চাই।
উঠতে শুরু করলো আবার সে। পিছু নিলো রবিন। পুরো আধ মিনিট সেদিকে তাকিয়ে বসে রইলো মুসা। তারপর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো। ওরা দুজনে পারলে সে পারবে না কেন? উঠতে শুরু করলো সে-ও। তবে এবার আর তাড়াহুড়ো করলো না। নিয়মও লঙঘন করলো না। ধীরে ধীরে উঠে এলো ওরা চূড়ার কাছে চওড়া বেদিমতো জায়গাটায়।

এক সময় একটা শহর ছিলো বটে! অবাক হয়ে চারপাশে তাকাচ্ছে রবিন। আর এসব মন্দির এতো কষ্ট করে তৈরি হয়েছে শুধু মানুষ খুনের জন্যে! ভাবতে কেমন লাগে না? এখানে এনে বলি দেয়া হতো মানুষকে।
বইয়ে পড়েছি, হাত তুলে দূরের একটা জায়গা দেখিয়ে মুসা বললো। একসময় ওখানে নাকি লক্ষ লোকের বাস ছিলো। ওটাই পিরামিড অভ দি মুন। চাঁদের পিরামিড, তাই না?
মাথা ঝাঁকালো কিশোর আর রবিন।
যেটাতে দাঁড়িয়ে আছে, দেখতে অবিকল একই রকম ওই পিরামিডটাও, কেবল আকারে ছোট।
একটা মন্দির দেখিয়ে কিশোর বললো, ওটা তৈরি হয়েছিলো একজন বিদেশীর সম্মানে।
কী! মুসা বললো। আমি তো জানতাম, হাজার বছর আগেই তৈরি হয়েছে ওটা। স্প্যানিয়ার্ডরা এখানে আসার আগে।
তা-ই হয়েছিলো। কেন, কিংবদন্তীটা শোননি? শাদা চামড়া, নীল চোখ, লম্বা দাড়িওয়ালা একজন মানুষ এসে হাজির হয়েছিলো সাত সাগরের ওপার থেকে, পালকে ঢাকা সাপের পিঠে চড়ে? সেজন্যেই সাপ ছিলো প্রাচীন মেকসিকানদের কাছে পবিত্র। ওই মানুষটার নাম দিয়েছিলো ওরা কোয়েজাল-কোয়াটল। তখনকার ইনডিয়ানদের চেয়ে অনেক অনেক জ্ঞানী ছিলো সেই লোক। তাদেরকে শিখিয়েছিলো কি করে বিল্ডিং তৈরি করতে হয়, ফসল ফলাতে হয়, পাথর কুঁদে শিল্প সৃষ্টি করতে হয়।
এই গল্প খুব ভালো লাগছে মুসার। অ্যাজটেকদের সঙ্গে বাস করতো সেই লোক?
না। ওরা আসার অনেক আগে থেকেই সেই লোক ছিলো সেখানে। তার মৃত্যুর পর তাকে দেবতা বানিয়ে ফেললো ইনডিয়ানরা। কোয়েঞ্জালকোয়াটল ইনডিয়ানদের অনেক দেবতার একজন।
দেখা হয়েছে। আবার নামতে লাগলো তিন গোয়েন্দা। অর্ধেক নামার পর হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো রবিন, এই দেখ দেখ! ওই যে! ছবির লোকটার মতো লাগছে?
সিনর স্টেফানো! মুসা বললো।
হতে পারে, বললো রবিন। তবে নামার গতি বাড়ানোর কোনো চেষ্টা করলো না। এতো ওপর থেকে পড়ে ঘাড় ভেঙে মরতে চায় না।
গোড়ায় নেমে আর লোকটাকে দেখতে পেলো না ওরা। ভাবলো, আরেক পাশে চলে গেছে। দ্রুত হেঁটে আরেক পাশে চলে এলো তিনজনে। নেই লোকটা। প্রায় দৌড়াতে শুরু করলো তিনজনে। পুরো পিরামিডের চারপাশে এক চক্কর দিয়ে এলো। আশ্চর্য! কোথাও দেখা গেল না লোকটাকে। যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।

ধপ্ করে মাটিতে বসে পড়লো মুসা। পাগল হয়ে গেছি আমরা! কি সব কাণ্ড করে বেড়াচ্ছি! এসবের কোনো মানে হয়? পুরো মেকসিকো শহর ঘুরে এলেও এতো কষ্ট লাগতো না।
তিনজনের মধ্যে মুসাই সব চেয়ে বেশি কষ্ট সহ্য করতে পারে। তারই যখন এই অবস্থা, কিশোর আর রবিনের অবস্থা অনুমানই করা যায়। এক জায়গায় সামান্য ঘাস দেখে তার ওপর শুয়েই পড়লো রবিন। ওই অ্যাজটেক ব্যাটাদের ফুসফুসের ক্ষমতা ছিলো অসাধারণ!
কিশোরও বসে হাঁপাচ্ছে। সে ভাবছে লোকটার কথা। বললো, হয়তো অন্য পিরামিডটার কাছে চলে গেছে সে। দেরি করলে আর পাওয়া না-ও যেতে পারে।
তাড়াতাড়ি এসে গাড়িতে উঠলো তিন গোয়েন্দা। ছুটলো চাঁদের পিরামিডের দিকে। সেখানেও পাওয়া গেল না লোকটাকে। এর পর গেল ওরা কোয়েঞ্জালকোয়াটলের মন্দিরের কাছে। এটাকেও ছোটখাটো আরেকটা পিরামিডই বলা চলে। চারপাশে চক্কর দিল এলো একবার।
ভ্রূকুটি করলো কিশোর। লোকটা কে, কে জানে! সিনর স্টেফানো না-ও হতে পারে। আমাদের দেখলে পালাবেন কেন ডক্টর?
তা-ও তো কথা, বললো মুসা। কিন্তু তিনি যদি স্টেফানোই হন, আর আমাদের দেখে এভাবে পালাতে থাকেন, তাহলে তার সঙ্গে কথা বলবো কিভাবে? রবিন, ঠিক দেখেছো তো?
দেখলাম তো আমাদের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে, রবিনের কণ্ঠে সন্দেহ। তবে সিনর স্টেফানোই কিনা, শিওর নই। মনে হলো তারই মতো।
হু। সব মেকসিকানের তো একই চেহারা! অন্তত আমার আলাদা মনে হয় না।
আবার মন্দির দেখায় মন দিলো ছেলেরা। পাথর কুঁদে দারুণ সব দৃশ্য আর কল্পিত জীবজন্তুর মূর্তি আঁকা হয়েছে। ফণা তুলে রেখেছে মস্ত এক সাপ। হাঁ করা। ভয়ংকর দাঁতগুলো বেরিয়ে রয়েছে। কয়েকটা সাপ রয়েছে ওরকম। ওগুলোর মাঝে দেখা গেল একজন মানুষকে। বোধহয় ওই লোকই কোয়েঞ্জাল-কোয়াটল। সেই প্রাচীনকালে এরকম শিল্প সৃষ্টি কি করে সম্ভব হয়েছিলো, যখন পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতি ছিলো না, ভাবলে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না।
আনমনে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটলো একবার কিশোর। বিড়বিড় করে বললো, এর সামনেই ছবি তুলেছিলেন মিস্টার রেডফোর্ড। এখানে অ্যাজটেক যোদ্ধার কোনো সূত্র লুকিয়ে নেই তো?
বিশাল, মন্দিরটার দিকে তাকিয়ে রবিন বললো, এখানে চিঠি কিংবা দলিল লুকানো আছে ভাবছো? এক মাস লেগে যাবে খুঁজে বের করতে।

তবে আপাতত সেটা নিয়ে মাথা ঘামালো না ওরা। যে কোনো সময় ফিরে আসতে পারবে কোয়েঞ্জালকোয়াটলের মন্দিরে। এখন জরুরী কাজ হলো সিনর স্টেফানোকে খুঁজে বের করা। এখানে যখন নেই, অন্য কোনো ধ্বংসস্তুপে রয়েছেন হয়তো।
আবার গাড়িতে এসে উঠলো ওরা। হোটেলে ফিরে চললো।
হোটেলে ফিরে কাপড় ছেড়েও সারতে পারলো না কিশোর। টেলিফোন বাজলো। পুলিশ চীফ মারকাস ফোন করেছেন। বললেন, এক ঘণ্টা যাবৎ তোমাদেরকে ধরার চেষ্টা করছি। কোথায় গিয়েছিলে?
টিওটিহুয়াকানে। কেন?
একটু আগে খবর পেলাম, একটা গুজব নাকি ছড়িয়ে পড়েছে; মনটি অ্যালবানে একজন আরকিওলজিস্ট একটা বিরাট আবিষ্কার করেছেন। তিনিই তোমাদের লোক নন তো?
সিনর স্টেফানো?
বুঝতে পারছি না। রিপোর্ট পেয়েছি, একজন লোক নাকি শহরে এসে ঢুকেছে। বলে বেড়াচ্ছে খবরটা। তাকে ধরে জিজ্ঞেস করা হয়েছে। বললো, আরকিওলজিস্ট নাকি তার পরিচয় ছড়াতে নারাজ। সেজন্যেই মনে হচ্ছে আমার, তিনি সিনর স্টেফানো।
তাহলে আর দেরি করবো না, কিশোর বললো। এখুনি বেরিয়ে পড়বো। দেখি তাঁকে ধরতে পারি কিনা। তা আবিষ্কারটা কি করেছেন?
লোকটা বলতে চাইলো না। অনেক চেষ্টা করলাম, একটু থামলেন মারকাস। তারপর বললেন, এখুনি যাবে? মনটি অ্যালবানের রাস্তা কিন্তু ভালো না। আমি অবশ্য কখনও যাইনি। পাহাড়ের ভেতর দিয়ে ঘুরে ঘুরে যেতে হয়। অনেক দূর। আজকে না গিয়ে কাল সকালেই যাও।
আচ্ছা। লাইন কেটে গেল।
রবিন আর মুসাকে খবরটা জানালো কিশোর। তারপর ম্যাপ খুলে বসলো। মেকসিকোর উত্তরপুবে প্রায় সাড়ে তিনশো মাইল দূরে ছোট একটা শহর আছে। নাম অকজাকা। যেতে হবে ওই শহরের ভেতর দিয়ে।
রবিন বললো, একদিনে মনটি অ্যালবানে যাওয়া সম্ভব না। এক কাজ করবো। অকজাকায় গিয়ে হোটেলে উঠবো। ওখান থেকে আবার রওনা হওয়া যাবে।
পরদিন খুব সকালে রওনা হয়ে গেল তিন গোয়েন্দা। প্যান-আমেরিকান হাইওয়ে ধরে যেতে হয়। প্রচন্ড ভিড়। দুই ঘণ্টা লেগে গেল পর্বতের কাছাকাছি আসতেই। ভিড় না থাকলে আরও অনেক আগেই চলে আসতে পারতো। সরু একটা শাখা পথ ঢুকে গেছে পর্বতের ভেতরে। সেই পথ ধরে চললো ওরা। একটু পর পরই

তীক্ষ্ণ মোড়। ওপাশ থেকে সাড়া না দিয়ে গাড়ি এলে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। মোড় ঘোরার সময় তাই বার বার হর্ন দিতে লাগলো কিশোর। তার পরেও আরেকটু হলেই অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যাচ্ছিলো একবার। ওপাশ থেকে তীব্র গতিতে ধেয়ে এলো একটা গাড়ি। এরকম মোড়েও গতি কমায়নি। শাই শাই করে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে পর্বতের দেয়ালের সঙ্গে প্রায় সেঁটে গেল কিশোর। অন্য গাড়িটা পড়ে যাচ্ছিলো পাশের গভীর খাদে, নিতান্ত কপাল জোর আর ড্রাইভারের দক্ষতার কারণে বেঁচে গেল।

অপূর্ব দৃশ্য পর্বতের। দেয়াল কোথাও খাড়া, কোথাও ঢালু। বেরিয়ে রয়েছে গ্রানাইটের বিচিত্র স্তর। ছোটবড় চূড়ার কোনো কোনোটাতে রোদ পড়ে জ্বলছে। যেন কড়া লাল রঙে রাঙিয়ে দেয়া হয়েছে। ছবির মতন।

ঢালে জন্মে রয়েছে নানা জাতের ক্যাকটাস। চিউলিপ ফুলের মতো দেখতে খাটো ম্যাগুই ক্যাকটাস থেকে শুরু করে দৈত্যাকার ক্যানডেল ক্যাকটাস, সবই আছে। যেমন বিচিত্র চেহারা, তেমনি রঙ।

ছড়ানো, সমতল একটা জায়গায় পৌঁছলো ওরা। জায়গাটা পর্বতের ওপরেই। ক্যাকটাসের এক ঘন ঝাড় হয়ে আছে ওখানে।

এই, দাঁড়াও তো! কিশোরের কাঁধে হাত রাখলো মুসা।

গাড়ি থামালো কিশোর। গরুর গাড়ির চাকার মতো সমব্রেরো হ্যাঁট পরা একজন মানুষ মাটিতে ঝুঁকে বসে কি যেন করছে একটা ম্যাগুই কাকটাসের গোঁড়ায়। তার কাছে এগিয়ে গেল মুসা। বুঝতে পারলো কি করছে লোকটা। ক্যাকটাসের ভেতরে এক ধরনের রস হয়। পানির বিকল্প হিসেবে সেটাকে খাওয়া যায়। তা-ই বের করছে লোকটা।

এদিকে অনেক টুরিস্ট আসে। এখানকার লোকেরা তাই ইংরেজি বোঝে, বলতেও পারে কিছু কিছু। এই লোকটাও পারে। সহজেই তার সঙ্গে আলাপ জমিয়ে ফেললো মুসা।

রবিন আর কিশোরও নেমে এলো। খিদে পেয়েছে তিনজনেরই। গাড়িতে লাঞ্চ প্যাকেট আর পানির বোতল রয়েছে। নামিয়ে আনা হলো। ক্যাকটাসের ছায়ায় খেতে বসলো তিনজনে। লোকটাকে আমন্ত্রণ জানাতেই রাজি হয়ে গেল সে।

লেখাপড়া মোটামুটি জানে লোকটা। তার নাম ডিউগো। মেকসিকো সম্পর্কে অনেক কিছু বলতে পারলো সে। অনেক মজার মজার গল্প, ইতিহাস।

ইনডিয়ানদের সামাজিকতা, দেবতার উদ্দেশ্যে নরবলির কাহিনী, এসব অনেক কিছুই জানে সে। বলে গেল গড়গড় করে। আর বলতেও পারে বেশ গুছিয়ে, সুন্দর করে। শুনতে ভালোই লাগে।

একসময় পিন্টো আলভারোর কথা জিজ্ঞেস করে বসলো কিশোর।

না, চিনি না, মাথা নাড়লো ডিউগো।
অজাকায় থাকে?
জানি না, পকেট থেকে ছবি বের করে দেখালো কিশোর। এই আরেকজন লোক, সিনর স্টেফানো। আরকিওলজিস্ট। নাম শুনেছেন?
সি, সি. দ্রুত জবাব দিলো লোকটা। দেখিনি কখনও। তবে শুনেছি, সিনর স্টেফানো নামে একজন লোক এখানকার ধ্বংসস্তূপগুলোতে খুঁড়তে আসে। বহুবার এসেছে।
মনটি অ্যালবানে যায়?
তা বলতে পারবো না।
লোকটাকে আরও কিছু প্রশ্ন করে, ধন্যবাদ এবং গুডবাই জানিয়ে উঠে এলো তিন গোয়েন্দা। গাড়িতে উঠলো। এবার ড্রাইভিং সীটে বসলো মুসা।
নাহ, একবিন্দু এগোতে পারছি না, নিরাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো কিশোর। লাভের মধ্যে শুধু বেড়িয়ে বেড়াচ্ছি, রহস্যের কিছুই করা যাচ্ছে না!
অকজাকাতে একটা হোটেলে উঠলো ওরা। ম্যানেজারের সঙ্গেও আলাপ করে দেখলো কিশোর। কিছুই জানতে পারলো না। মনটি অ্যালবানে যে একটা বড় আবিষ্কার হয়েছে, এই খবরটা জানে না পর্যন্ত ওই লোক।
রবিন জিজ্ঞেস করলো, আজই যাবে?
ঘড়ি দেখলো কিশোর। ছটা বাজে। এখুনি খেয়ে নিলে যাওয়া যায়।
তাহলে দেরি করছি কেন? ভুরু নাচালো মুসা। বসে গেলেই হয়।
খেয়েদেয়ে আবার বেরিয়ে পড়লো তিন গোয়েন্দা। এবারের গন্তব্য মনটি অ্যালবানের ধ্বংসস্তূপ, যেখানে সিনর স্টেফানো যুগান্তকর এক প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার করেছেন বলে গুজব ছড়িয়েছে।
যেতে নিশ্চয় রাত হবে না, কি বলো? দুই সহকারীর উদ্দেশ্যে বললো কিশোর।
হলেই বা কি? রবিন বললো। শুনেছি, রাতে ওসব প্রাচীন ধ্বংসস্তূপ দেখার আলাদা মজা। আর চাঁদ থাকলে তো কথাই নেই।
ওরা যখন বেরোলো তখন সাতটা বাজে। অচেনা পথঘাট। শুরুতেই পথ হারালো। ব্যাপারটা ধরতে পারলো প্রথমে রবিন। ম্যাপ দেখে। ঠিক পথে এসে ওঠার জন্যে এবড়োখেবড়ো একটা কাঁচা রাস্তা ধরতে হলো।
প্যান প্যান শুরু করলো মুসা, এভাবে চললে ঘণ্টাখানেক পরেই আবার খিদে পাবে। নাহ, ঘোড়ার ডিমের অ্যাজটেক যোদ্ধাকে খুঁজে আর বের করা হলো না এযাত্রা!
গতি খুব ধীর। কিশোরও অধৈর্য হয়ে উঠেছে। নিজেকেই যেন সান্ত্বনা দিলো, আসল রাস্তায় উঠতে বেশিক্ষণ লাগবে না।

এঞ্জিনটা এখন বন্ধ না হলেই হয়, মুসা বললো।
কিংবা টায়ার পাংচার, পেছনের সীট থেকে বললো রবিন।
তবে এঞ্জিন বন্ধ কিংবা টায়ার পাংচার কোনোটাই হলো না। খোয়া বিছানো একটা পথে এসে উঠলো গাড়ি। গতি বাড়ালো মুসা। পাহাড়ী পথ ধরে দ্রুত ধ্বংসস্তুপের দিকে উঠে চললো। পথ ভুল করায় বেশ কিছুটা সময় নষ্ট হয়েছে। সেটা পুষিয়ে নিতে চেষ্টা করছে মুসা। কিন্তু তার পরেও দিনের আলো থাকতে থাকতে পর্বতের ওপরের চ্যাপ্টা সমতল জায়গাটায় পৌঁছতে পারলো না, যেখানে রয়েছে মনটি অ্যালবানের ধ্বংসস্তূপ। সূর্য ডুবে গেছে। চাঁদ উঠেছে।
টর্চ না নিয়ে নেমো না, সতর্ক করলো কিশোর, যতোই চাঁদ উঠুক। মুসা, ভূতের ভয় লাগছে না তো?
লাগলেই আর কি করবো?
হাসলো কিশোর। রবিন কিছু বললো না।
চাঁদের আলোয় কেমন যেন ভূতুড়ে লাগছে মনুটি অ্যালবানের পিরামিড আকৃতির মন্দির, সমাধিস্তম্ভ, আর বাড়িঘরগুলোকে। গা ছমছমে পরিবেশ। বিশাল এক চত্বর দেখতে পেলো ওরা। চারপাশ ঘিরে তৈরি হয়েছে পাথরের বাড়ি। দুটো বাড়ির মাঝের ফাঁকে গাড়ি রাখলো মুসা। টর্চ হাতে নেমে পড়লো তিনজনে। জায়গাটার বিশালত্বের কাছে অনেক ক্ষুদ্র মনে হলো নিজেদেরকে। স্তব্ধ, নীরব। অথচ এককালে নিশ্চয় গমগম করতো লোকজনে।
ডানে বাঁয়ে তাকালো মুসা। রবিনকে জিজ্ঞেস করলো, মিস্টার বুক অভ নলেজ, এর ইতিহাস কিছু জানো নাকি?
কিছু কিছু। পনেরোশো শতকের গোড়ার দিকে গড়ে উঠেছিলো এই শহর। তারপর হাত বদল হলো। স্প্যানিশরা এসে দখল করে ফেললো। নতুন মনিবেরা অনেক কিছু রদবদল করে তৈরি করলো নতুন শহর। মূল জায়গা থেকে কিছুটা সরে গিয়ে। আর পুরানো শহরটাকে ব্যবহার করতে লাগলো, ধর্মীয় অনুষ্ঠানের কাজে। তাদের বড় বড় নেতাকেও কবর দিলো এখানে।
তার মানে পুরোপুরিই ভূতুড়ে শহর!
একটা পাথরের দেয়ালের পাশে চলে এলো ওরা। নাচের দৃশ্য আঁকা হয়েছে খোদাই করে। খাইছে! প্রায় চিৎকার করে উঠলো মুসা। দেখ দেখ!
ঝট করে ঘুরে গেল অন্য দুটো টর্চের আলো। কিশোর জিজ্ঞেস করলো, কি?
জ্যান্ত! ওগুলো জ্যান্ত!
হাসতে শুরু করলো কিশোর আর রবিন। এই ভূতই তোমার সর্বনাশ করবে। মাথাটা একেবারেই খারাপ করে দিয়েছে! একটা মূর্তির গায়ে হাত বোলালো কিশোর। এই দেখ, একেবারে মরা! পাথর!

যতো যা-ই বলো, হাসিতে যোগ দিতে পারলো না মুসা। আমি কিছু নড়তে দেখেছি। মনে হচ্ছে চারপাশের কবর থেকে বেরিয়ে এসেছে সমস্ত প্রেতাত্মা! আমাদের দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসছে!
বাদ দাও তো ওসব ফালতু কথা! অধৈর্য হয়ে হাত নাড়লো কিশোর। কি কাজে এসেছি ভুলে গেছ? সিনর স্টেফানোকে খুঁজতে।
কিন্তু তাকে পাওয়া যাবে না। অন্তত এই বেলা। ধ্বংসস্তূপে যদি কাজ করেনও রাতের বেলা এখন কি করতে আসবেন?
কোথায় ঘুমান, সেটা খুঁজে বের করবো, বললো বটে, কিন্তু জোর নেই কিশোরের গলায়। জায়গাটায় এসেই তার মনে হয়েছে, কিছু একটা ভুল হয়ে গেছে। স্টেফানো এখানে সত্যি আছেন কিনা, এ-ব্যাপারেও সন্দেহ জাগতে আরম্ভ করেছে। হয়তো ইচ্ছে করেই গুজব ছড়িয়ে ওদেরকে টেনে আনা হয়েছে এখানে, কে জানে!
অ্যাই, দেখ! বলে উঠলো রবিন। হাত তুলে দেখালো।
সামনে পিরামিডের মাথায় একটা আলো মিটমিট করছে। লণ্ঠনের আলোর মতো।
পেয়েছি! উত্তেজিত কণ্ঠে আবার বললো ররিন। নিশ্চয় সিনর স্টেফানো! কাজ করছেন ওখানে!
সন্দেহ গেল না কিশোরের। কেন যেন মনে হতে লাগলো, পুরো ব্যাপারটাই একটা ফাঁকিবাজি। ধোকা! মনটি অ্যালবানেতে এসে ডা স্টেফানোর প্রত্নতাত্ত্বিক খোড়াখুঁড়ির গল্পটা ভুয়া। ওরকম কিছু হলে, আর এতো বড় একটা আবিষ্কার ঘটলে, হোটেলের ম্যানেজারের অন্তত না জানার কথা নয়। তার সন্দেহের কথাটা বললো দুই সহকারীকে।
কিন্তু কেন এই গল্প বানিয়ে বলতে যাবে? রবিনের প্রশ্ন।
শুধু আন্দাজ করতে পারি, জবাব দিলো কিশোর। নিশ্চিত হয়ে এখনও কিছু বলতে পারবো না। আমার বিশ্বাস, টোপ দেখিয়ে আমাদেরকে এখানে পাঠানোর উদ্দেশ্যেই একাজ করা হয়েছে। আমাদের শত্রুরা জানে, শুনলে তদন্ত করতে আসবোই আমরা। হয়তো কোনো কারণে সরিয়ে দিতে চেয়েছে। কিংবা ভুল পথে ঠেলে দিয়ে সময় নষ্ট করাতে চেয়েছে। যা-ই হোক, আলোটার দিকে দেখালো সে। ওটা দেখতে যাবো। কিসের আলো জানা দরকার। খুব সাবধানে থাকবে।
ওই আলো দেখতে যাওয়ার ব্যাপারটা ভালো লাগছে না মুসার। দশজন ষন্ডামার্কা লোকের সঙ্গে লাগতেও ভয় পায় না সে। কিন্তু রোগাটে একটামাত্র ভূত হলেও তার ধারেকাছে যেতে রাজি নয় সে। তবে কিছু করার নেই। কিশোর যখন যেতে বলেছে, যেতেই হবে।

সিড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করলো কিশোর। তার পেছনে রইলো রবিন। আরেকবার দ্বিধা করে যা থাকে কপালে ভেবে মুসাও পা রাখলো সিঁড়িতে। চিৎকার করে উঠলো হঠাৎ। কিশোর, সাবধান, ব্যাটারা…
কথা শেষ করতে পারলো না সে। প্রচন্ড বাড়ি লাগলো মাথায়। বেহুশ হয়ে গেল।
ঝট করে ঘুরে তাকালো কিশোর আর রবিন। চোখে পড়লো দুটো ছায়ামূর্তি। ওদেরই দিকে আসছে। দুজনের হাতেই হকিস্টিক।
পালানোর চেষ্টা করে লাভ নেই। রুখে দাঁড়ালো দুই গোয়েন্দা। লোকদুটোকে আরও কাছে আসার সময় দিলো। তারপর ওরা আঘাত হানার আগেই নড়ে উঠলো কিশোর আর রবিন। একজন ব্যবহার করলো জুডোর কৌশল, আরেকজন চালালো কারাত। ফেলে দিলো লোক দুটোকে। তারপর উঠতে শুরু করলো সিড়ি বেয়ে। চূড়ায় কি আছে দেখতেই হবে।
কথাটা রবিনের মনে পড়লো প্রথমে। ফাঁদ নয়তো? হয়তো আলোর টোপ জ্বেলে আমাদের টেনে নিয়ে চলেছে ব্যাটারা!
তা-ও দেখবো, কি আছে! বলে পেছন ফিরে তাকালো কিশোর, লোকদুটো আসছে কিনা দেখার জন্যে। তাকিয়েই থমকে দাড়ালো। লোকগুলো নেই। মুসাও নেই। তার মাথায় যে বাড়ি মারা হয়েছে, একথা জানে না কিশোর কিংবা রবিন। ভেবেছে, সে-ও আসছে পেছনে। উত্তেজনায় খেয়ালই করেনি, লোকগুলোর সঙ্গে মারপিট করার সময় মুসা সেখানে ছিলো না। মুসা কই?
রবিনও ফিরে তাকালো। বেশ উজ্জ্বল হয়েছে জ্যোৎস্না। ভালোমতোই চোখে পড়ছে নিচের সিড়িগুলো। কোথাও দেখা গেল না মুসার্কে। হয়তো কোথাও লুকিয়েছে। লোকগুলোকে দেখেই আমাদেরকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে লুকিয়ে পড়েছে।
তা হতেই পারে না! জোর দিয়ে বললো কিশোর। তুমিও মুসাকে চেন। মানুষের ভয়ে লেজ গুটিয়ে পালানোর বান্দা ও নয়।
তাহলে গেল কোথায়?
চাঁদের আলোয় যতদূর চোখ যায় তাকিয়ে দেখলো দুজনে। কোথাও মুসাকে দেখা গেল না। কোনো নড়াচড়া নেই। কোনো মানুষ নেই। যে দুজন লোক বাড়ি মারতে এসেছিলো, তাদেরও চোখে পড়লো না। আশ্চর্য!
উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লো দুই গোয়েন্দা। মেরে বেহুঁশ করে ধরে নিয়ে যায়নি তো! রবিন বললো।
দুজন বাদেও আরও লোক থাকতে পারে, কিশোর বললো। নিয়ে যাওয়াটা অস্বাভাবিক নয়।

চূড়ায় উঠে কিসের আলো জ্বলছে দেখার আগ্রহটা আপাতত চেপে রাখতে বাধ্য হলো কিশোর। মুসার কি হয়েছে দেখা দরকার আগে। তাড়াতাড়ি নেমে চললো সিড়ি বেয়ে। শুধু চাঁদের আলোর ওপর ভরসা না করে টর্চও জ্বাললো। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আলো ফেলে খুঁজতে লাগলো মুসাকে। চিহ্নই নেই। তবে কি সত্যিই কিডন্যাপ করে নিয়ে গেল?

ব্যাপারটা কি... বলতে গিয়ে থেমে গেল রবিন।

পাথরের একটা বাড়ির দরজায় দুজন লোককে দেখা গেল। সোজা সেদিকে দৌড় দিলো দুই গোয়েন্দা। কিন্তু হারিয়ে গেল লোকগুলো। এই এলাকা ওদের পরিচিত। যখন খুশি বেরোচ্ছে, যখন খুশি লুকিয়ে পড়ছে। বাড়িটার কাছে এসে অনেক খোঁজাখুজি করলো দুজনে, লোকগুলোকে পেলো না। কয়েক মিনিট পরে একটা গাড়ির এঞ্জিনের শব্দ হলো।

চলে যাচ্ছে, হাঁপাতে হাঁপাতে বললো কিশোর। তবে একটা ব্যাপার শিওর। মুসা ওদের সঙ্গে নেই।

মাথা ঝাঁকালো রবিন। যে বাড়িটা থেকে বেরোলো, তাতে ঢুকিয়ে রেখে যায়নি তো?

চলো, দেখি।

দরজায় দাঁড়িয়ে টর্চের আলো ফেললো দুজনে। শূন্য ঘর। মুসার নাম ধরে চেঁচিয়ে ডাকলো রবিন। পাথরের দেয়ালে দেয়ালে প্রতিধ্বনি তুললো সে চিৎকার। কিন্তু মুসার সাড়া নেই।

দুজনকে যেতে দেখেছি, কিশোর অনুমান করলো। আরও লোক থাকতে পারে। ওরা হয়তো টেনেহিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে গাড়িতে তুলেছে মুসাকে। তাহলে, এখানে চেঁচামেচি করে লাভ হবে না।

তবু চুপ করলো না রবিন। চেঁচিয়েই চললো মুসার নাম ধরে। কিশোর খুঁজে চলেছে। ভালো মতো না খুঁজে বেরোবে না এখান থেকে।

পায়ের ওপর শরীরের ভার বদল করলো সে। কি যেন শুনলাম! কান পাতলো দুজনেই। চাপা একটা গোঙানির মতো শব্দ শোনা গেল। বাড়ির আরও ভেতরে! ফিসফিসিয়ে বললো কিশোর।

পাথরের দেয়াল। দরজা খুঁজতে লাগলো ওরা। ঢোকার পথ। একজায়গায় বুক সমান উঁচু চারকোণা একটা ফোকর দেখতে পেলো। কয়েকটা পাথর পড়ে রয়েছে আশেপাশে। এককালে দরজাই ছিলো, এখন আর সেটা বোঝার উপায় নেই। পাল্লা-টাল্লা কিছু নেই। আর কোনো পথ না দেখে সেটা দিয়েই ঢুকে পড়লো দুজনে। আরও স্পষ্ট হলো গোঙানিটা।

আরেকটা ফোকর চোখে পড়লো। সেটা দিয়ে ছোট আরেকটা ঘরে চলে এলো ওরা। মুসাকে দেখতে পেলো। হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। জ্ঞান পুরোপুরি ফেরেনি।
হাঁটু গেড়ে তার দুপাশে বসে পড়লো দুজনে। মাথায় বাড়ি মেরে বেহুঁশ করা হয়েছে। একপাশ ফুলে উঠেছে গোল আলুর মতো। এছাড়া শরীরের আর কোনো জায়গায় জখম নেই।
পানি দরকার ছিলো, কিশোর বললো। তাহলে তাড়াতাড়ি হুঁশ ফেরানো যেতো।
যেন তার কথা কানে যেতেই চোখ মিটমিট করলো মুসা। শূন্য দৃষ্টি।
মুসাআ! একই সঙ্গে প্রায় চিৎকার করে উঠলো রবিন আর কিশোর কিশোর যোগ করলো, ভালো আছো তো, মুসা?
কথা বলার শক্তি পাচ্ছে না যেন মুসা। তবু কনুইয়ে ভর দিয়ে কোনোমতে উঠে বসলো।
চলো, বাইরে চলো, কিশোর বললো। তাজা বাতাস পেলে ভালো লাগবে। চলো, ধরে ধরে নিয়ে যাচ্ছি আমরা।
দুদিক থেকে ধরে মুসাকে দাঁড়াতে সাহায্য করলো কিশোর আর রবিন। ওদের কাঁধে ভর দিয়ে টলতে টলতে বাইরে বেরোলো মুসা। কয়েকবার জোরে জোরে শ্বাস টানলো। অনেকটা সুস্থ বোধ করলে ভার সরিয়ে আনলো বন্ধুদের কাঁধ থেকে।
বাড়ি মেরেছিলো, না? জিজ্ঞেস করলো কিশোর।
ম-মনে হয়, দুর্বল কণ্ঠে জবাব দিলো মুসা। ঝাড়া দিয়ে যেন ঘোলাটে মগজ পরিষ্কার করতে চাইলো। তোমরা ভালোই আছো মনে হয়। ভালো। লোকদুটোকে দেখলাম, হকিস্টিক হাতে তোমাদেরকে হুঁশিয়ার করেও সারতে পারলাম না। ধা করে মেরে বসলো আমাকে। তারপর সব কালো। আমার চিৎকার শুনতে পেয়েছিলে, না?
হ্যাঁ, রবিন বললো। অনেক ধন্যবাদ তোমাকে। নিজে মার খেয়ে আমাদের বাঁচিয়েছো।
আরে না, হাত নাড়লো মুসা। অতোটা হীরো নই আমি। চিৎকার না করলেও আমাকে মারতো ওরা। কারণ আমিই ছিলাম সবার পেছনে, আবার টলে উঠলো সে।
তাড়াতাড়ি তাকে ধরে ফেললো কিশোর আর রবিন। একটা পাথরের ওপর বসিয়ে দিলো জিরিয়ে নেয়ার জন্যে। আপাতত হোটেলে ফেরারই সিদ্ধান্ত নিলো। মুসাকে ধরে ধরে নিয়ে এগোলো গাড়ির দিকে। কিশোর আশঙ্কা করছে,

লোকগুলো কোথাও লুকিয়ে থেকে ওদের ওপর চোখ রাখছে। সুযোগ পেলেই হয়তো বেরিয়ে এসে আবার হামলা চালাবে।
কিন্তু না, কেউ বেরোলো না। নিরাপদেই গাড়িতে উঠতে পারলো ওরা। ড্রাইভিং সীটে বসলো কিশোর। গাড়ি চালাতে চালাতে ভাবতে লাগলো, কে লোকগুলো? কোথা থেকে এলো? কেন পিছু লেগেছে ওদের? অ্যাজটেক যোদ্ধাকে যারা খুঁজছে, তাদেরই কেউ? তদন্ত করা থেকে বিরত করতে চাইছে ওদেরকে?
একই ভাবনা চলেছে মুসা আর রবিনের মনেও। মুসা বললো, আমি সব ভজঘট করে দিলাম। কিশোর, পিরামিডের ওপরে কে আলো জ্বেলেছিলো, জেনেছো? শয়তান লোকগুলোই গিয়ে উঠেছিলো ওখানে?
মনে হয় না, কিশোরের দৃষ্টি রাস্তার ওপরে নিবদ্ধ। ওরা নিজেদেরকে লুকিয়ে রাখতে চায়। অতো খোলা জায়গায় যাবে না। কাল দিনের বেলা আবার যাবো মনটি অ্যালবানে। দেখি, কোনো জবাব মেলে কিনা।
আর কিছু বললো না মুসা। আহত জায়গাটা ব্যথা করছে। মাথা ঘুরছে অল্প অল্প। আগামী দিন রবিন আর কিশোরের সঙ্গে বেরোতে পারার শক্তি পাবে বলে মনে হলো না তার। তবে রাতের বেলা ভালো একটা ঘুম দিতে পারলে বলা যায়, সুস্থও হয়ে যেতে পারে সকালে।
হোটেলে ঘরে পৌঁছেই বিছানায় গড়িয়ে পড়লো মুসা। কাপড় খোলারও শক্তি নেই!
দাঁড়াও, খুলে দিচ্ছি, কিশোর বললো।
সে আর রবিন মিলে প্রথমে মুসার জ্যাকেট খুলে ঝুলিয়ে রাখলো। তারপর খুললো জুতো আর মোজা। সবশেষে প্যান্ট। চোখ বন্ধ করে পড়ে রইলো মুসা। মাঝে মাঝে নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে শুধু বললো, কি করো, কি করো!
শাট খুলতে গিয়ে বুক পকেটে একটা কাগজ পেলো রবিন। জিজ্ঞেস করলো, আই মুসা, এটা কি? এই কাগজটা?
আমি কোনো কাগজ রাখিনি…
ভাঁজ খুলে ফেললো রবিন। পড়ে বিস্ময় ফুটলো চোখে। তাকিয়েই রয়েছে কিশোর। ব্যাপারটা নজর এড়ালো না তার। জিজ্ঞেস করলো, কি?
নীরবে কাগজটা বাড়িয়ে ধরলো রবিন। কিশোরও পড়লোঃ বাড়ি যাও। আমাদের গুপ্তধন ছিনিয়ে নেয়ার কোনো অধিকার তোমাদের নেই। কথা না শুনলে মরবে।
পুলিশকে জানানো দরকার, কিশোর বললো চিন্তিত ভঙ্গিতে। আলোচনা করে দুজনেই একমত হলো। মুসা ঘুমিয়ে পড়েছে, সে এসবের কিছু জানলো না।
হোটেলের ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করলো কিশোর, রাতে এখন রাস্তায় বেরোনো উচিত হবে কিনা। প্রশ্নটা অবাক করলো লোকটাকে। যেন বুঝতে পারছে না,

রাতের বেলা আর দিনের বেলা রাস্তায় বেরোনোর কি তফাৎ থাকতে পারে। চোর-ডাকাতের ভয় আছে কিনা, একথা কিশোর বুঝিয়ে বললে ম্যানেজার। জবাব দিলো, অকজাকার পুলিশ খুবই সতর্ক। এখানে কোনো রকম অঘটন ঘটে না।
তাই নাকি? না বলে পারলো না রবিন। এই তো খানিক আগেই আমার বন্ধুকে পিটিয়ে বেহুশ করে দিলো কয়েকটা ডাকাত। ঘটে না মানে?
আরেক দিকে মুখ ফিরিয়ে ম্যানেজার বললো, তাহলে ওরা বাইরের লোক। এখানকার লোক খারাপ না।
এই লোকের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা, বুঝতে পেরে, থানাটা কোথায় জেনে নিয়ে রবিনকে সহ বেরিয়ে এলো কিশোর। তখন ডিউটিতে রয়েছেন ক্যাপ্টেন ডগলাস। মনটি অ্যালবানে যা যা ঘটেছে খুলে বললো তাকে দুজনে।
ভ্রূকুটি করলেন অফিসার। তাই! এখানে অপরাধ খুব কমই ঘটে! আশ্চর্য! কাগজটা এনেছো?
বের করে দিলো রবিন। পড়তে পড়তে ভাঁজ পড়লো ডগলাসের কপালে। মুখ তুলে বললেন, হুঁ, বুঝতে পারছি। একদল তরুণ আছে এই এলাকায়, বেশি দেশপ্রেমিক। তাদের উদ্দেশ্যটা ভালোই, তবে মাঝেসাঝে বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলে দেশপ্রেম দেখাতে গিয়ে। আইন বিরোধী কাজ করে বসে।
ওরা কি করে, জানতে চাইলো কিশোর।
ক্যাপ্টেন জানালেন, বাইরে থেকে কেউ এলেই তাদের পেছনে লাগে। তাদের ধারণা, যে-ই আসুক, মেকসিকো থেকে প্রাচীন নিদর্শন সব বের করে নিয়ে যাবে। ঠেকানোর জন্যে উঠে পড়ে লাগে ওরা। বাইরের কেউ কিছু আবিষ্কার করলে কেড়ে নিয়ে গিয়ে মিউজিয়ামে জমা দেয়, হাসলেন তিনি। অকজাকার স্টেট মিউজিয়াম সাংঘাতিক। দেখলে বুঝবে। অনেক অমূল্য সংগ্রহ রয়েছে ওখানে।
বাইরে থেকে কেউ এলেই যে তারা চোর হবে, প্রতিবাদের সুরে বললো রবিন। তা ঠিক নয়।
আমরা সেটা বুঝি, ক্যাপ্টেন বললেন। কিন্তু ওই মাথা গরম ছেলেগুলোকে বোঝানো শক্ত। ফ্যানাটিক।
প্রসঙ্গ পরিবর্তন করলো কিশোর, তথ্য বের করে নিতে চাইলে ডগলাসের কাছ থেকে, দুজন লোককে খুঁজতে এসেছি আমরা। ঠিক বেড়াতে আসিনি। সেজন্যেই গিয়েছিলাম মনটি অ্যালবানে। একজনের নাম পিন্টো আলভারো, আরেকজন ডা স্টেফানো তিনি আরকিওলজিস্ট।
আরকিওলজিস্ট? নাম শুনেছি, মাথা নাড়লেন ক্যাপ্টেন। আর পিন্টো আলভারো অনেক আছে এদেশে। কজনের কথা বলবো? কাছেই থাকে একজন। পিন্টো আলভারো রবার্টো হারমোসা আলবার্টো সানচেজ।

চোখ কপালে তুললো রবিন। একজনের নাম, না তিনজনের?
হাসলেন ক্যাপ্টেন। একজনেরই। ম্যাটাডর।
মানে বুল ফাইটার? ভুরু কোঁচকালো কিশোর।
মাথা ঝাকালেন ডগলাস।
না, তাকে আমাদের দরকার নেই। আমরা যাকে খুঁজছি, ও আর যাই হোক, বুল ফাইটার নয়।
তবে কি আরেকজন আরকিওলজিস্ট?
তা হতে পারে।
আরকিওলজিস্টেরও অভাব নেই এদেশে। মেকসিকান তো আছেই, বাইরে থেকেও প্রচুর আসে। শুনেছি, খুব বড় একজন আরকিওলজিস্ট কাজ করছেন এখন মনটি অ্যালবানে। তিনিই ডা স্টেফানো হতে পারেন, জানি না।
কয়েকটা সেকেন্ড নীরবে ভাবলেন পুলিশ অফিসার। তোমাদেরকে খুব একটা সাহায্য করতে পারছি না। দেখ, তোমরা যদি কিছু বের করতে পারো। তবে নোটটা রেখে দিলাম। অতি দেশপ্রেমিকদের বিরুদ্ধে একটা প্রমাণ রইলো। আবার যদি কিছু করে ধরতে পারবো। খুব সাবধান। ওরা ডেনজারাস। বুঝেই তো গেছ সেটা।
হোটেলে ফেরার সময় ব্যাপারটা নিয়ে ভাবলো কিশোর। আসলেই কি দেশপ্রেমিক তরুণেরা হামলা করেছে ওদের ওপর? নাকি অ্যাজটেক যোদ্ধাকে যারা খুঁজছে, তারা?
কাল সকালেই বেরোতে হবে, রবিন বললো। বোঝা গেল একই ভাবনা চলেছে তার মাথায়ও। আর দেরি করা যায় না। মনটি অ্যালবানে গিয়ে তদন্ত করতে হবে। যতো তাড়াতাড়ি পারা যায় এই রহস্যের সমাধান করে ফেলা উচিত।
হ্যাঁ, চিন্তিত ভঙ্গিতে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটলো কিশোর।
পরদিন সকালে রাক্ষুসে খিদে পেয়ে গেল যেন মুসার। ফল, সিরিয়াল, ডিম, গরুর মাংস ভাজা, আর বড় বড় দুটো পাউরুটি দিয়ে নাস্তা সেরে তৃপ্তির ঢেকুর তুললো। অনেকটা সুস্থ বোধ করছে। তাকে নোটটার কথা জানালো রবিন আর কিশোর। রাতে যে থানায় গিয়েছিলো সেকথাও বললো।
চিন্তিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো, মনটি অ্যালবানে যাচ্ছো নাকি?
নিশ্চয়, কিশোর বললো।
চলো, আমিও যাবো। ব্যাটারা এলে বাড়ি মারার শোধ না নিয়েছি তো আমার নাম মুসা আমান নয়।
না, তোমার আজ ওখানে যাওয়ার দরকার নেই। শরীর এখনও ঠিক হয়নি। ওখানে ঘোরার অনেক ধকল, সহ্য করতে পারবে না। ঘরে বসে থাকতে ভালো না

লাগলে বরং আরেক কাজ করো, শহরে স্টেট মিউজিয়ামে চলে যাও। কিউরেটরের সঙ্গে আলাপ করতে পারো ইচ্ছে হলে। জানার চেষ্টা করবে অ্যাজটেক যোদ্ধা সম্পর্কে। সূত্র পেয়েও যেতে পারো।
তা মন্দ বলোনি। মিউজিয়াম দেখতে ভালোই লাগে আমার।
কাপড় পরে দুই সহকারীকে নিয়ে নিচে নামলো কিশোর। রকি বীচের খবর জানা দরকার। মিস্টার সাইমনকে ফোন করলো। এখানকার সমস্ত খবর জানিয়ে জিজ্ঞেস করলো, তিনি কতখানি এগিয়েছেন। ডিটেকটিভ বললেন, প্রায় কিছুই না। জ্যাক আর আমি কয়েকবার করে গিয়েছি রেডফোর্ড এস্টেটে, লাভ হয়নি। জ্যাক ফাইবার তার সহকারী, আরেকজন তুখোড় গোয়েন্দা।
সাইমনের কথা থেকে নতুন একটা খবরই জানতে পারলো কিশোর, তা হলো, যে গাছটায় অ্যাজটেক যোদ্ধার মাথা আঁকা আছে, তাতে আরও একটা ছবি আঁকা রয়েছে। ছোট একটা তীর, জানালেন তিনি। খুব ভালো করে না তাকালে চোখেই পড়ে না। দেখে মনে হলো কোনো কিছু নির্দেশ করতে চেয়েছে। আমি আর জ্যাক অনেক জায়গায় খুঁড়েছি, পাইনি কিছু।
আর কাউকে এস্টেটে রহস্যজনক ভাবে ঢুকতে দেখা গেছে কিনা, কিশোরের এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন, না। পুলিশ কড়া নজর রাখছে। তারপর কিশোরদেরকে সাবধান থাকতে বলে, গুড লাক জানিয়ে লাইন কেটে দিলেন তিনি।
বেরিয়ে পড়লো তিন গোয়েন্দা। শহরের দিকে চলে গেল মুসা। কিশোর আর রবিন মনটি অ্যালবানের দিকে। হোটেলের নিউজ স্ট্যান্ড থেকে মনটি অ্যালবানের ওপর লেখা একটা পুস্তিকা কিনে নিয়েছে কিশোর।
দিনের আলোয় পুরানো শহরটাকে অনেক বেশি জমকালো মনে হলো রাতের চেয়ে। সত্যি, দেখার মতো। এতো প্রাচীন কালে যখন যান্ত্রিক সুবিধা বলতে গেলে ছিলোই না, তখন কিভাবে এরকম একটা শহর গড়া হয়েছিলো, দেখলে অবাক না হয়ে পারা যায় না।
ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলো দুজনে। বিরাট বিরাট মন্দির, স্তম্ভ, প্রাকার, পিরামিড তৈরি করা হয়েছে পাথর দিয়ে। প্রাকারের গায়ে নানারকম চির আঁকা হয়েছে পাথর কুঁদে। পাথরের তৈরি মূর্তিও রয়েছে অনেক। রাতের বেলা যে পিরামিডের ওপরে আলো দেখা গিয়েছিলো, তার নিচে এসে দাঁড়ালো দুজনে। চ্যাপ্টা চূড়ায় উঠে এলো। ওপর থেকে নিচে তাকিয়ে পুরো শহরটা দেখা যায়।
একবার তাকিয়েই সূত্র খুঁজতে শুরু করলো কিশোর। একটা ভাঙা পাথরের টুকরো দৃষ্টি আকর্ষণ করলো তার। আস্ত বড় কোনো পাথর থেকে ভেঙে আনা

হয়েছে টুকরোটা, দুই বাই তিন ফুট, চার ইঞ্চিমতো পুরু। একটা কোণ ভাঙা। একটা ছবি খোদাই করা রয়েছে ওটাতে।
অ্যাজটেক যোদ্ধা! উত্তেজনায় স্বাভাবিক স্বর বেরোলো না রবিনের, ফিসফিসিয়ে বললো। আশ্চর্য! এটা এখানে কেন?
হয়তো এটাই নিতে উঠেছিলো লোকটা। তাড়াহুড়োয় বা অন্য কোনো কারণে ফেলে গেছে। হয়তো মূল্যবান কোনো আবিষ্কার।
কি জানি! পাথরটা তোলার চেষ্টা করলো কিশোর। বেজায় ভারি। দুজনের পক্ষে বয়ে নেয়াই মুশকিল। হাত থেকে ফেলে দিলে ভেঙে নষ্ট হতে পারে। খুব সাবধানে জিরিয়ে জিরিয়ে সিড়ি বেয়ে নামতে লাগলো ওরা। নিরাপদেই নামিয়ে আনলো অবশেষে। আর কেউ নেই তখন। একেবারে নির্জন। বোধহয় দর্শকদের আসার সময় হয়নি এখনও।
পাথরটাকে গাড়ির বুটে রেখে দিয়ে এলো ওরা। মুসাকে যেখানে বাড়ি মারা হয়েছিলো, সেজায়গাটায় এসে দেখতে লাগলো কিছু পাওয়া যায় কিনা। গাইড বুক বলছে, কিশোর বললো। এটা সাত নম্বর কবর। অনেক মূল্যবান নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে এখানে। স্টেট মিউজিয়ামে রাখা আছে ওগুলো।
আরও অনেক খোঁজাখুঁজি করলো ওরা। যে ঘরটায় মুসাকে ফেলে রাখা হয়েছিলো, সেটাতেও খুঁজলো। কিছু পাওয়া গেল না।
আর থাকার প্রয়োজন মনে করলো না কিশোর। তাছাড়া পাথরটাকে ভালোমতো পরীক্ষা করে দেখার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে সে। হতো না, যদি ওটাতে অ্যাজটেক যোদ্ধার ছবি আঁকা না থাকতো।
হোটেলে নিয়ে যাওয়া উচিত হবে না, ওদেরকে চোর ভেবে বসতে পারে। সোজা অজাকার মিউজিয়ামে চলে এলো ওরা। কিউরেটরের সঙ্গে দেখা করলো।
পাথরটা অফিসে এনে ম্যাগনিফাইং গ্লাস আর আরও নানা যন্ত্রপাতি দিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলেন কিউরেটর। অবশেষে মুখ তুললেন, ভালো। খুব ভালো। তবে সাংঘাতিক কিছু না। এরকম জিনিস পাওয়া যায়।
কোনোই বিশেষত্ব নেই? নিরাশই হয়েছে কিশোর।
আছে, ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে কিউরেটর বললেন। কোণের কাছে খরগোশের ছবি আর কয়েকটা বৃত্ত আঁকা আছে দেখ। এটা একটা অ্যাজটেক ক্যালেন্ডার। খরগোশ দিয়ে বছর গুনতো ওরা। একে বলে খরগোশ বছর। আমাদের ক্যালেন্ডার অনুযায়ী এটা পনেরোশো দশ সাল।
কিন্তু এটা বের করলো কে? রবিনের প্রশ্ন। পিরামিডের মাথায় নিশ্চয় আপনাআপনি ওঠেনি?

না, তা তো নয়ই, মাথা নাড়লেন কিউরেটর। হয়তো কোনো কবরের ভেতরে পেয়েছে কেউ।
কিন্তু ওখানে গেল কি করে? কিশোর বললো। পিরামিডের ওপরে?
একথার জবাব দিতে পারলেন না কিউরেটর। তাঁর কাছেও রহস্যময় লাগলো ব্যাপারটা।
মিউজিয়াম থেকে ফেরার পথে বিড় বিড় করে যেন নিজেকেই বোঝালো কিশোর, জবাব একটাই হতে পারে। আমাদেরকে ফাঁকি দিতে চেয়েছে। পেয়েছে কোনো কবরের ভেতর। ভেঙে এনেছে। ফেলে রেখেছে আমাদেরকে বোঝানোর জন্যে, যে এটাই অ্যাজটেক যোদ্ধা। যাতে আমরা এটা নিয়েই সন্তুষ্ট হয়ে বাড়ি ফিরে যাই।
কারা?
আর কারা? যারা আমাদের পিছে লেগেছে। যারা মুসাকে বাড়ি মেরেছে। যারা হুমকি দিয়ে নোট লিখেছে। এভাবে ফাঁকি দেয়ার জন্যেই মনটি অ্যালবানে টেনে এনেছে আমাদের।
তোমার কি মনে হচ্ছে, যারা নোট লিখেছে তারা দেশপ্রেমিক তরুণের দল নয়?
না। ওটাও আরেকটা চালাকি। তরুণদের ওপর নজর ফেলতে চেয়েছে। আমাদের এবং পুলিশের। নিজেরা আড়ালে থাকতে চেয়েছে।
খুশিতে প্রায় নাচতে নাচতে হোটেলে ফিরলো মুসা। হাতে একটা মূর্তি। ছোট। জানালো, এক সুভনিরের দোকান থেকে অ্যাজটেক যোদ্ধার মূর্তিটা কিনে এনেছে সে। কিশোরকে দেখিয়ে বললো, এটাই, কি বলো?
না, মাথা নাড়লো কিশোর। এ-হতেই পারে না। সাধারণ মূর্তি। এখনকার কুমোরদের তৈরি…
কিন্তু সেলসম্যান যে বললো, কবর খুঁড়ে পাওয়া!
ফাঁকি দিয়েছে। মিথ্যে কথা বলেছে বিক্রি করার জন্যে। আসল জিনিস হলে ওটা দোকানে যেতো না, মিউজিয়ামে থাকতো।
চোরাই মালও তো হতে পারে?
উঁহু। তাহলে অতো খোলাখুলি বেচতে পারতো না। পুলিশের ভয় তো আছেই। সব চেয়ে বেশি ভয় তরুণ দেশপ্রেমিকদের।
তা বটে! হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছো। নইলে একরকমের এতো মূর্তি আসতে দোকানে…
মানে?
লোকটা বললো, আরও অনেকগুলো মূর্তি নাকি ছিলো। এটার মতোই। অ্যাজটেক যোদ্ধা। কাল একটা লোক সব কিনে নিয়ে গেছে। এটা পড়ে ছিলো

বাক্সের তলায়, কাল পাওয়া যায়নি। আজ বাক্সের খড়টড় ফেলতে গিয়ে বেরিয়ে পড়েছে।
কাল পেলে এটাও কিনে নিয়ে যেতো? রবিনের প্রশ্ন।
তাই তো মনে হয়, জবাব দিলো মুসা।
কে কিনেছে জিজ্ঞেস করেছো? কিশোর জিজ্ঞেস করলো। এতো আগ্রহ কেন অ্যাজটেক যোদ্ধার মূর্তির ওপরে?
না তো!
ভুল করেছো। চলো।
কোথায়?
দোকানে। লোকটা কেমন দেখতে, জিজ্ঞেস করবো। আমার বিশ্বাস, এই লোকই আমাদের পেছনে লেগেছে। আমাদের মতোই অ্যাজটেক যোদ্ধাকে খুঁজছে সে-ও।
মনটি অ্যালবানে গিয়ে কি পেয়েছে, খুলে বললো মুসাকে রবিন আর কিশোর। মুসা জানালো, সে-ও মিউজিয়ামে গিয়েছিলো। খোঁজখবর করেছে অ্যাজটেক যোদ্ধার ব্যাপারে। তদন্তের কাজে লাগতে পারে তেমন কিছু জানতে পারেনি।
দোকানে গেলে জানতে পারবো, কিশোর বললো। যোদ্ধার ব্যাপারে না হোক, লোকটার ব্যাপারে পাবোই। চলো।
নানারকম জিনিসে ঠাসা দোকানটা। ছোটখাটো আরেকটা মিউজিয়ামের মতোই লাগে। কাঁচের শো-কেসে সাজানো রয়েছে নানারকম প্রাচীন অস্ত্র, আধুনিক নির্মাতাদের তৈরি। পিস্তল আর ছুরি রয়েছে নানারকম। দেয়ালে ঝোলানো রয়েছে শিরস্ত্রাণ, ধাতব পোশাক আর বিভিন্ন আকারের, বিভিন্ন আকৃতির তলোয়ার, ভোজালি।
ডাক শুনে পেছনের ছোট একটা ঘর থেকে বেরোলেন মাঝবয়েসী একজন হাসিখুশি মানুষ। কি চায়, জিজ্ঞেস করলেন।
কাউন্টারের দিকে নির্দেশ করে মুসা জানতে চাইলো, ওই লোকটা কোথায়?
কে? ও, হুগো? খেতে গেছে। আমি এই দোকানের মালিক। বলো, কি চাই?
না, কিছু চাই না। খানিক আগে একটা পুতুল কিনে নিয়ে গিয়েছিলাম। অ্যাজটেক যোদ্ধা। ওটা কি আসল?
হাসলেন দোকানের মালিক। একই সাথে বিরক্তও হলেন। তাই বলেছে বুঝি? এই হুগোটাকে নিয়ে আর পারি না। কতোবার মানা করেছি, মিথ্যা কথা বলে মাল বিক্রির দরকার নেই। শোনে না। তো, আসল নয় জেনে নিরাশ হয়েছো? ফেরত দিতে চাও?
না, সেজন্যে আসিনি, এগিয়ে এলো কিশোর। আসলে, অ্যাজটেক যোদ্ধার ব্যাপারে কয়েকটা প্রশ্ন করতে এসেছি।

তা বাবা, আমি তো সেটা ভালো বলতে পারবো না। আমি সামান্য দোকানদার। আরকিওলজিস্ট নই। বলতে পারবে আরকিওলজিস্টরা। সব চেয়ে ভালো হয়, মিউজিয়ামে চলে যাও, কিউরেটরের সঙ্গে দেখা করো…
করবো। আচ্ছা, খুব মাল বিক্রি হয় আপনার দোকানে, তাই না?
মোটামুটি।
কি ধরনের জিনিস বেশি চলে?
এই ছুরি, পিস্তল, এসব। অস্ত্র।
মূর্তি?
খুব বেশি না। তবে কাল একটা আজব ব্যাপার ঘটেছে। প্রায় দেড় ডজন অ্যাজটেক যোদ্ধার মূর্তি কিনে নিয়ে গেছে একজন। মনে হলো, আরও থাকলে আরও কিনতো। পাগল! অথচ ওই মূর্তি খুব একটা বিক্রি হয় না এখানে।
সুযোগ পেয়ে গেল কিশোর। জিজ্ঞেস করলো, লোকটা কেমন? ওরকম একজনকে চিনি আমরা, মূর্তি কেনার পাগল, শেষ কথাটা মিথ্যে বললো সে। কথা আদায়ের জন্যে। তবে জবাব শুনে বুঝলো, একেবারে মিথ্যে বলেনি। লোকটা ওদের পরিচিতই। অন্তত দেখেছে, ওকে। ল্যারি কংকলিনকে যে লোক কিডন্যাপ করেছিলো, ভুয়া পুলিশ অফিসার সেজে যে ওদের ট্যাক্সিতে চড়েছিলো, তার সঙ্গে মূর্তি কিনেছে যে লোক, তার চেহারার বর্ণনা হুবহু মিলে গেল।
অ্যানটিক আর সুভনির নিয়ে আরও কয়েকটা কথা বলার পর আচমকা প্রশ্ন করে বসলো কিশোর, আচ্ছা, পিন্টো আলভারো নামে কাউকে চেনেন আপনি? আপনার বাড়ি তো এখানে। নামটা শুনেছেন?
ওরকম নামে তো কতো লোকই আছে এখানে।
তা আছে। তবে একজন বিশেষ লোককে খুঁজছি আমরা, পকেট থেকে ছবি বের করে দেখালো কিশোর।
চশমা লাগিয়ে ভালো করে ছবিটা দেখলেন মালিক। ধীরে ধীরে মাথা দোলালেন। বোধহয় চিনি। কয়েকবার দেখেছি একে। আমার দোকানেও ঢুকেছে। টুলে ট্রীর কাছে থাকে। ওখান থেকে মিটলা খুব কাছে তো, গিয়ে খুঁড়তে সুবিধে হয় বোধহয় মেকসিকান ধ্বংসস্তুপের একজন বিশেষজ্ঞ এই লোক।
টুলে ট্রী কী এবং কোথায় জিজ্ঞেস করলো কিশোর। শুনে ধক করে উঠলো বুক। বুঝলো, পেয়ে গেছে। এই লোককেই খুঁজছে। মনে পড়লো, স্লাইডের বিশাল গাছটার কথা।
মিটলা হলো একটা ধ্বংসস্তূপ, মালিকের কাছে জানতে পারলো কিশোর। ওই দোকানে ম্যাপও আছে। ওখানকার একটা ভালো ম্যাপ কিনে নিয়ে, ভদ্রলোককে

অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে ফিরে এলো হোটেলে।
ডা স্টেফানোর কথা জিজ্ঞেস করেছে দোকানদারকে, কিছু বলতে পারেননি তিনি। তবে তাতে কিছু এসে যায় না, বুঝতে পারছে কিশোর। কান টানলে যেমন মাথা আসে, তেমনি করে আলভারোকে বের করতে পারলেই বেরিয়ে আসবেন ডা স্টেফানো। কোনো সন্দেহ নেই আর এখন তার।
হোটেলে ফিরে ম্যাপ নিয়ে বসলো কিশোর। আর গাইডবুক পড়তে লাগলো রবিন। মুসা বসে বসে অপেক্ষা করতে লাগলো।
মিটলা ধ্বংসস্তুপে যাওয়ার পথেই পড়ে টুলে ট্রী। ম্যাপ থেকে মুখ তুলে কিশোর বললো, দরকার হলে একেবারে মিটলাতেই চলে যাবো। মনে আছে, একটা ছবিতে ছিলো, বিশাল এক গাছের নিচে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক লোক?
সিনর স্টেফানোকেও ওখানেই পাবে ভাবছো? মুসার প্রশ্ন। টুলেট্রীতে?
পেতেও পারি। কিংবা মিটলাতে। টুলে ট্রী থেকে মিটলা বেশি দূরে নয়।
গাইডবুক থেকে মুখ তুলে রবিন বললো, জানো, গাছটা তিন হাজার বছরের পুরানো! আমেরিকান কন্টিনেন্টের সম্ভবত সব চেয়ে পুরানো গাছ ওটা।
কি গাছ? মুসা জিজ্ঞেস করলো। সাইপ্রেস। সবুজ সাইপ্রেস।
এতো বছর বেঁচে আছে! খাইছে! ইস, আমি যদি এতোদিন বাঁচতাম! কতো কিছু দেখতে পারতাম, খেতে পারতাম!
তার কথায় হেসে ফেললো কিশোর। তোমার খালি খাওয়ার কথা। এক কাজ করলেই পারতে। গাছ হয়ে গেলেই হতো। মাটির ওপর শেকড় গেড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে, আর খালি রস টানতে মাটি থেকে...
নাহ, গাছ হয়ে লাভ নেই। বেঁচে থাকে বটে। নড়তে চড়তে পারে না, পাখিরা বাসা বাঁধে, পায়খানা করে। লোকে মড়াৎ করে ডাল ভেঙে ফেলে, পাতা ছেড়ে। না, বাপু, মানুষ হয়ে বাঁচতে পারলেই খুশি হতাম আমি...
ভূত হলে? হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলো রবিন।
ভেবে দেখলো মুসা। তা হতাম। মানুষ হওয়ার চেয়ে অনেক ভালো। কেউ দেখতে পেতো না আমাকে। যা ইচ্ছে করতে পারতাম। যেখানে খুশি যেতে পারতাম। আর খাওয়া! সে তো যখন যা খুশি! যে রেস্টুরেন্টে যা পাওয়া যায়, যা খেতে ইচ্ছে করতো...নারে ভাই, ভূতই হওয়া উচিত ছিলো।
বেরোনোর সময় ম্যানেজার জানতে চাইলো, আবার কোথায় যাচ্ছে ওরা। এতে তাড়াতাড়ি বেরোচ্ছে দেখে কৌতূহল হয়েছে লোকটার। জানালো কিশোর।
টুলেট্রীর দিকে গাড়ি চালালো মুসা। ম্যাপ দেখে রাস্তা বাতলে দিতে থাকলো কিশোর। শহর ছাড়িয়ে আরও কয়েক মাইল আসার পর মস্ত গাছটার দেখা মিললো। মুসা বললো, এই যে, সাইপ্রেস গাছের দাদার দাদা।

পেছন থেকে রবিন মন্তব্য করলো, শুধু দাদার দাদা না, তারও অনেক বেশি।
গাছটাকে ঘিরে গড়ে তোলা হয়েছে একটা পার্ক। দর্শনীয় জিনিস। টুরিস্টরা আসে। গাড়ি থেকে নেমে হাঁ করে গাছটার দিকে তাকিয়ে রইলো তিন গোয়েন্দা। বিশ্বাসই করতে ইচ্ছে করছে না, তিন হাজার বছর ধরে বেঁচে রয়েছে ওই গাছ। পৃথিবীর কতো পরিবর্তনের নীরব সাক্ষি। ওই গাছের বিশালত্ব আর বয়েসের কাছে নিজেদেরকে বড় ক্ষুদ্র মনে হতে লাগলো ওদের।
আশ্চর্য! বিড়বিড় করলো রবিন।
গাছের কান্ডে একটা সাইনবোর্ড লেখা রয়েছে, তাতে গাছটা সম্পর্কে তথ্য। কান্ডের বেড় একশো ষাট ফুট। বয়েস, তিন হাজার বছর। জাত, সবুজ সাইপ্রেস। চারদিকে অনেকখানি ছড়িয়ে রয়েছে ডালপালা। গোড়ার চারপাশ ঘিরে চক্কর দিতে শুরু করলো তিন গোয়েন্দ।
নীরবে গাছের কাছে এগিয়ে এলো বারো বছরের এক কিশোর। তিন গোয়েন্দাকে গাছের গোড়ায় চক্কর দিতে দেখে অবাক হয়নি। এই দৃশ্য বহুবার দেখেছে সে। বুঝতে পেরেছে, ওরা বিদেশী, টুরিস্ট। তার জানা আছে, টুরিস্টদেরকে তথ্য জানাতে পারলে খুশি হয়ে পয়সা দেয়। সেই লোভেই এসেছে সে।
ঠিক যা ভেবেছিলো ছেলেটা, তা-ই ঘটলো। তাকে দেখেই কাছে ডাকলো কিশোর। জিজ্ঞেস করলো, কি নাম তোমার?
পিকো।
এই গাছটর কথা কি জানো তুমি?
সঅব। কয়েক পেসো পেলে বলতে পারি।
পাবে, বলে পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিলো কিশোর। কয়েকটা মুদ্রা বের করে ফেলে দিলো ছেলেটার বাড়ানো হাতে। দাঁত বের করে হাসলো পিকো। পয়সাগুলো ময়লা প্যান্টের পকেটে রেখে দিয়ে বললো, কি জানতে চান?
এই গাছের পুরো ইতিহাস।
সত্যিই জানে ছেলেটা। গড়গড় করে বলে যেতে লাগলো। গাইডবুকের সঙ্গে তার কথার সামান্যতম অমিল হলো না। আরও নতুন তথ্য দিলো সে, হন্ডুরাসে যাওয়ার পথে এই গাছের নিচেই জিরোতে বসেছিলেন বিখ্যাত স্প্যানিশ যোদ্ধা করটেজ।
কথায় কথায় অ্যাজটেক যোদ্ধার কথায় চলে এলো কিশোর।
অনেক যোদ্ধাই আছে। কার কথা জিজ্ঞেস করছেন?
তা তো জানি না। বিশেষ কার নাম জাননা তুমি?
অনেক অনেক আগে একজন নামকরা যোদ্ধা ছিলেন, অ্যাজটেকদের মহান নেতা। ম্যাক্সিল ডা স্টেফানো।

চট করে দৃষ্টি বিনিময় করলো তিন গোয়েন্দা। একটা জরুরী তথ্য জানতে পেরেছে। কিশোর জিজ্ঞেস করলো, একজন ডা স্টেফানোকে খুঁজছি আমরা। আধুনিক স্টেফানো। আরকিওলজিস্ট। এদিকে বেশ খোড়াখুড়ি করেন। চেনোটেনো নাকি?

না, মুখ কালো হয়ে গেল ছেলেটার। প্রশ্নের জবাব জানা না থাকা যেন বিরাট অপরাধ তার কাছে।

পিন্টো আলভারোকে চেনো? চেহারার বর্ণনা দিলো কিশোর।

হাসি ফিরে এলো ছেলেটার মুখে। সবাই চেনে তাকে। এই তো, কাছেই থাকেন সিনর আলভারো, পুবে হাত তুললো সে। ওদিকে যাবেন। বায়ের প্রথম গলিটাতে ঢুকবেন। সোজা এগিয়ে গিয়ে থামবেন শাদা রঙ করা উঁচু দেয়ালওয়ালা বাড়িটার সামনে। ওরকম বাড়ি একটাই আছে। চিনতে অসুবিধে হবে না।

ছেলেটার হাতে আরেকটা পেসো গুজে দিয়ে জিজ্ঞেস করলো কিশোর, আলভারোর কথা আর কিছু বলতে পারবে?

খুব ভালো খুঁড়তে পারেন তিনি। বড় বড় আরকিওলজিস্টরা এসেই তাঁর খোঁজ করেন। তাদের সঙ্গে অনেক জায়গায় চলে যান সিনর আলভারো।

আর কোনোই সন্দেহ থাকলো না তিন গোয়েন্দার, এই পিন্টো আলভারোকেই খুঁজছে ওরা। তার কাছে হয়তো জানা যাবে অ্যাজটেক যোদ্ধার বংশধরের খবর। রহস্যের সমাধান হয়ে যাবে তাহলে।

উত্তেজিত হয়ে এসে গাড়িতে উঠলো তিনজনে। গাড়ি ছাড়লো মুসা। পিকো ঠিকই বলেছে, বাড়িটা খুঁজে পেতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে হলো না। দরজার কড়া নাড়ল কিশোর। খুলে দিলো মোটাসোটা এক মহিলা পরনে কালো পোশাক। কালো একটা ফিতে দিয়ে চুল বাঁধা। নিশ্চয় আলভারের হাউসকিপার।

কি চাই?

সিনর আলভারো আছেন?

মিটলা ধ্বংসস্তুপে গেছেন।

ও। সেখানে গেলে তার দেখা পাবো?

পেতে পারো। যদি অন্য কোথাও চলে না গিয়ে থাকেন। মিটলা থেকেও খুঁজে বের করা কঠিন। অনেক বড় জায়গা। কোথায় যে কখন থাকবেন, বলা যায় না, হাসলো মহিলা। তবে কাছাকাছি যদি চলে যেতে পারো, তোমাদের আর খুঁজে বের করা লাগবে না। তোমাদেরকেই খুঁজে বের করবে।

মানে? বুঝতে পারলো না রবিন।

সিনরের কুত্তাগুলো বড় সাংঘাতিক। ধারেকাছে কাউকে ঘেঁষতে দেয় না। কাজ করতে গেলে লোকে বিরক্ত করে। ইদানীং তাদের হাত থেকে বাচার জন্যেই

বোধহয় এই পাহারার ব্যবস্থা করেছেন তিনি।
গাড়িতে এসে উঠলো আবার ওরা। মিটলায় চললো। টুলেট্রী ছাড়িয়ে কিছুদূর আসার পর চোখে পড়লো ধ্বংসস্তূপ। দেখ, কতো পিরামিড! বলে উঠলো মুসা।
আরও খানিকদূর এগিয়ে গাড়ি থামালো সে। তিনজনেই নামলো। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল ওরা। এর কাছে মনটি অ্যালবান কিছু না। মহিলা একটু ভুল বলেছে, খুঁজে বের করা কঠিন! আসলে বলা উচিত ছিলো, অসম্ভব! কিশোরের তা-ই মনে হলো। যেদিকেই তাকায়, সবই একরম লাগে দেখতে। আলাদা করা মুশকিল।
তবে, আলভারোকে সহজেই খুঁজে বের করে ফেললো ওরা। কিংবা ওদেরকেই খুঁজে বের করলো কুকুরগুলো।
কুকুরের ঘেউ ঘেউ শুনে এগোলো তিন গোয়েন্দা। ধ্বংসস্তুপে ঢুকে ঘোরাঘুরি করছিলো, এই সময় কানে এলো ডাক। একটা সমাধি মন্দিরের কাছে পৌঁছতেই জোরালো হলো চিৎকার। মনে হলো ভেতর থেকে আসছে।
দরজার কাছে গিয়ে উঁকি দিয়েই ছিটকে সরে এলো মুসা। ঘেউ ঘেউ করে বেরিয়ে এলো বিশাল এক অ্যালসেশিয়ান। ওটার পেছনে বেরোলো আরও দুটো। ঘিরে ফেললো তিন গোয়েন্দাকে। কামড়ালো না, গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে লাগলো। সেরকমই ট্রেনিং দেয়া হয়েছে, ওগুলোকে। জোরে জোরে ডাকলো কিশোর, সিনর আলভারো আছেন? সিনর আলভারো! আপনাকে খুঁজছি আমরা। আমেরিকা থেকে এসেছি!
দরজায় বেরিয়ে এলো একজন মানুষ। স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলে উঠলো। ডেকে সরিয়ে নিলো কুকুরগুলোকে। তিন গোয়েন্দার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলো, কি চাও?
মেকসিকান লোকটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে, কিশোর, আপনি সিনর পিন্টো আলভারো?
হ্যাঁ। কেন?
আমেরিকা থেকে এসেছি আমরা; আপনার খোঁজে। কয়েকটা প্রশ্ন আছে।
একটা পাথরের ওপর বসে পড়লো আলভারো। তিন গোয়েন্দাকেও পাথর দেখিয়ে বসতে বললো। জানতে চাইলো, কি প্রশ্ন?
চেস্টার রেডফোর্ড নামে একজন কোটিপতি আমেরিকানকে চেনেন? লস অ্যাঞ্জেলেসের কাছে রকি বীচে বাড়ি।
চিনি। আমার এক বন্ধুর বন্ধু।
আপনার বন্ধুর নাম ডা স্টেফানো?
বিস্ময় ফুটলো মেকসিকান মানুষটির চোখে। হ্যাঁ। তুমি কি করে জানলে?

প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো কিশোর, আলভারো আর স্টেফানো কি শুধুই বন্ধু, না বিজনেস পার্টনার।
হেসে জবাব দিলো আলভারো, দুটোই বলতে পারো। আজকাল আর খুব একটা দেখা হয় না তার সঙ্গে। তবে কয়েক বছর আগে একসঙ্গে খুঁড়েছি আমরা। তারপর কি জানি কি হলো। আমাকে বাদ দিয়ে একাই খুঁড়তে লাগলো।
এখন কোথায় আছে জানেন? রবিন জানতে চাইলো।
মাথা নাড়লো আলভারো। জানি না। তবে বেশি জরুরী হলে খুঁজে বের করতে তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারি। মিস্টার রেডফোর্ডের কথা কি যেন বললে?
পকেট থেকে ছবির খামটা বের করলো কিশোর। দেখালো। সঙ্গে সঙ্গে স্টেফানোকে চিনতে পারলো আলভারো। সাথের অন্য লোকটাকেও।
কিশোর বললো, উইলে পিন্টো আলভারো নামটা লিখে গেছেন মিস্টার রেডফোর্ড। আমার মনে হয় আপনিই সেই লোক।
উইলে আমার কথা লিখেছেন! বিশ্বাস করতে পারছে না আলভারো।
ব্যাপারটা আমাদেরকেও অবাক করেছে। আমরা গোয়েন্দা। আমাদের কথাও লিখেছেন তিনি। অনুরোধ করেছেন, যেন অ্যাজটেক যোদ্ধার সত্যিকার উত্তরাধিকারীকে খুঁজে বের করে তার সম্পত্তি তাকে ফিরিয়ে দিই। কোনো একটা জিনিসের কথা বোঝাতে চেয়েছেন তিনি।
এতোই অবাক হয়েছে আলভারো, কথা বলতে পারলো না পুরো তিরিশ সেকেন্ড। তারপর বললো, তাহলে তোমরা ডিটেকটিভ?
নিজেদের পরিচয় দিলো কিশোর। কার কি নাম, বললো।
হুঁ, আলভারো বললো। কয়েকটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে আসছে এখন। খোঁড়াখুড়ির সময় আগে কুকুর সঙ্গে নিতাম না। কয়েক দিন ধরে নিচ্ছি। কারণ গত দুই হপ্তায় কয়েকবার রহস্যজনক ভাবে হামলা হয়েছে আমার ওপর। কয়েকজন লোক, যাদেরকে আগে কোনোদিন দেখিনি, আমাকে ধরে হুমকি দিয়েছে। অ্যাজটেক যোদ্ধার জিনিস কোথায় আছে না বললে মেরে ফেলারও হুমকি দিয়েছে।
চট করে আবার একে অন্যের দিকে তাকালো তিন গোয়েন্দা।
ওরা কি বলছে বুঝতে পারিনি তখন, বলছে আলভারো। বার বার বলেছি, আমি কিছু জানি না। ভুল লোককে ধরেছে। মনে হয় ওরা আমার কথা বিশ্বাস করেছে। আর আসছে না। তা এই জিনিসটা কি, তোমরা কিছু বলতে পারবে?
পুরানো অস্ত্রশস্ত্র হতে পারে, মুসা বললো।
কিংবা প্রাচীন কোনো অ্যাজটেক মূর্তি, বললো রবিন।
আসলে, কিশোর বললো। কিছুই জানি না আমরা। জানার চেষ্টা করছি।

পিন্টো আলভারোকে বিশ্বাস করা যায়, মনে হলো তার। একবার দ্বিধা করে রেডফোর্ডের উইলের কথাটা বলতে শুরু করলো। কিছুক্ষণ শোনার পর হঠাৎ হাত তুললো আলভারো। বললো, ডা স্টেফানো একটা জিনিস পেয়েছিলো। মিউজিয়ামকে দেয়ার কথা ছিলো। কিন্তু তার আগে মিস্টার রেডফোর্ডকে ধার দিতে বাধ্য হলো, এমন করেই চেপে ধরেছিলো তাকে। একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জিনিসটা আবার স্টেফানোকে ফেবত দেবে কথা দিয়েছিলো আমেরিকান লোকটা। দুজনে আলোচনা করে ঠিক করেছে, জিনিসটা পাওয়ার কথা চেপে রাখবে, যতোদিন না মিউজিয়ামকে দেয়া হয়।

তবে জিনিসটা কি, কথা শেষ করলো আলভারো। আমি বলতে পারবো না।

সেই নির্দিষ্ট সময়টা নিশ্চয় অনেক দীর্ঘ ছিলো, কিশোর বললো। ওই সময়ের মধ্যে মারাও যেতে পারে দুজনের যে কোনো একজন। এবং তা-ই হয়েছে। মিস্টার রেডফোর্ড মারা গেছেন।

আর মজার ব্যাপার হলো, মধ্যস্থতা করার জন্যে রাখা হয়েছিলো আমাকে। জিনিস দেয়ার জন্যে কেউ খোঁজ করতে এলে যাতে চিনিয়ে দিতে পারি ডা স্টেফানোকে, অ্যাজটেক যোদ্ধার সত্যিকার উত্তরাধিকারী বলে। তবে জিনিসটা যে কি, কিছু জানানো হয়নি আমাকেও। তুমি কিছু আন্দাজ করতে পারছো?

যেহেতু, জবাব দিলো কিশোর। অ্যাজটেক যোদ্ধা বলা হয়েছে, প্রাচীন মূর্তিটুর্তি হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু মূর্তি কালেকশন করতেন না মিস্টার রেডফোর্ড, সেরকম কোনো আভাস পাইনি। পেয়েছি অস্ত্রের ব্যাপারে। পুরানো অস্ত্র জোগাড় করাটা নাকি তার নেশা ছিলো। স্টেফাননা ওরকম কোনো অস্ত্রের আভাস আপনাকে দিয়েছেন কখনও?

না, চুপ করে কি ভাবলো আলভারো। তারপর বললো, মিস্টার রেডফোর্ডের উইলের কথা জেনে গেছে লোকগুলো, যারা আমার ওপর চড়াও হয়েছিলো। তার মানে জিনিসটার কথাও জানে ওরা। কি করে জানলো?

সেটা আমিও বুঝতে পারছি না, জোরে নিঃশ্বাস ফেললো কিশোর। উইলের কথাটা গোপন রাখা হয়েছে। শুধু আমরা কয়েকজন জানি।

ভ্রূকুটি করলো আলভারো। এসব ব্যাপারে জড়াতে আমার ভালো লাগে না। কিন্তু কি আর করবো, কথা যখন দিয়েছি... দেখি খোঁজখবর করে। ডা স্টেফানো এখন কোথায় খুঁড়ছে বের করতে পারি কিনা।

থ্যাংকস।...আচ্ছা, অনেক আগে নাকি একজন মহান অ্যাজটেক নেতা ছিলেন, নাম মাক্সিল ডা স্টেফানো?

হ্যাঁ। কেন জিজ্ঞেস করেছো বুঝতে পেরেছি। ঠিকই অনুমান করেছো তুমি। আজকের আরকিওলজিস্ট এমিল ডা স্টেফানো সেই স্টেফানোরই বংশধর।

উত্তেজনা চাপতে কষ্ট হলো তিন গোয়েন্দার। কিশোর বললো, সে আলভারোর সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে। হোটেলের নাম বললো, রুম নম্বর দিলো, টেলিফোন নম্বর দিলো। কিছু জানতে পারলে যেন দেরি না করে তাদেরকে জানানো হয়। জানাবে কথা দিলো আলভারো। আন্তরিক হ্যান্ডশেক করলো তার সঙ্গে তিন গোয়েন্দা।

হোটেলে ফিরেই আগে মিস্টার সাইমনকে ফোন করলো কিশোর। তদন্তের অগ্রগতির কথা জানালো ডিটেকটিভকে।

ওদের কাজের অনেক প্রশংসা করলেন তিনি। কিভাবে ডা স্টেফানোকে খুঁজে বের করা যেতে পারে, কয়েকটা পরামর্শ দিলেন। একটা খুব মনে ধরলো কিশোরের। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া। বলতে হবে, খুব জরুরী একটা ব্যাপারে কথা বলার জন্যে আরকিওলজিস্ট এমিল ডা স্টেফানোকে খোঁজা হচ্ছে। বিজ্ঞাপন পড়ে থাকলে তিনি যেন অবিলম্বে সাড়া দেন এই অনুরোধ করা হবে।

গোসল আর খাওয়া শেষ করেই আবার বেরিয়ে পড়লো তিন গোয়েন্দা। অকজাকা থেকে যে কটা দৈনিক বেরোয়, সব কটার অফিসে গিয়ে বিজ্ঞাপনের জন্যে ফিস জমা দিয়ে এলো। সবাই বলে দিলো, সকালের খবরেই বেরোবে বিজ্ঞাপনটা।

পরদিন সকালে হোটেলের ঘরে বসে নাস্তা সেরে নিচে নামলো তিন গোয়েন্দা। নিউজ স্ট্যাণ্ডে এসে প্রথম কাগজটা হাতে নিয়েই চমকে উঠলো কিশোর। হেডলাইন করা হয়েছেঃ পাহাড় থেকে পড়ে বিখ্যাত আরকিওলজিস্ট এমিল ডা স্টেফানোর মৃত্যু!

ধাক্কাটা সামলে নিয়ে খবরটা পড়তে শুরু করলো তিন গোয়েন্দা।

পুরোটা পড়ার পর বোঝা গেল, মারা গেছেন তিনি, এটা অনুমান করা হচ্ছে। একেবারে নিশ্চিত নয় কেউ। পার্বত্য এলাকায় বেড়াতে গিয়েছিলো তিনজন আমেরিকান টুরিস্ট-নীল হ্যাঁমার, রবার্ট জনসন, আর ডেভিড মিলার। এমিল স্টেফানোকে ওখানে দেখেছে তারা।

পর্বতের চূড়ায় দাঁড়িয়েছিলেন আরকিওলজিস্ট। হঠাৎ পা পিছলে পড়ে যান। দৌড়ে যায় তিন টুরিস্ট। কিন্তু যেখানে স্টেফানোর দেহ পড়ে থাকার কথা সেখানে পৌঁছে কিছুই দেখতে পায়নি। অনেক খোঁজাখুঁজি করে ফিরে এসেছে তিনজনে।

এসেই হ্যামার ফোন করেছে পুলিশকে। জনসন করেছে পত্রিকা অফিসকে। একটা উদ্ধারকারী দল ছুটে গেছে সঙ্গে সঙ্গে। অরকিওলজিস্টের লাশ পাওয়া যায়নি। ধারণা করা হচ্ছে, গিরিখাতে আছড়ে পড়েছেন স্টেফানো, সেখান থেকে নদীতে গড়িয়ে পড়েছে তার লাশ। ভেসে চলে গেছে।

দুবার করে খবরটা পড়লো ওরা। অবশেষে মুসা বললো, সর্বনাশ হয়েছে। আমাদের রহস্যের কিনারা বুঝি আর হলো না!
আমি বিশ্বাস করাতে পারছি না, কিশোর বললো।
পত্রিকা কি আর মিথ্যে খবর ছাপবে? রবিনের প্রশ্ন।
ওদের রিপোর্টার নিজে গিয়ে তো আর খবর আনেনি। অন্যের কথা শুনে লিখেছে।
তোমার কি মনে হয়? মুসা জিজ্ঞেস করলো, স্টেফানো মারা যাননি?
হয়তো গেছেন। তবে পা পিছলে পড়েছেন, একথা বিশ্বাস হচ্ছে না। হয়তো ঠেলে ফেলে দেয়া হয়েছে। অ্যাজটেক যোদ্ধার সম্পত্তি পুরোপুরি গোপন করে ফেলার জন্যে। আর আরেকটা প্রশ্ন। ডা স্টেফানো ঘোরাঘুরি করেন ধ্বংসস্তূপগুলোতে। পর্বতের ওপরে তিনি যাবেন কি করতে?
প্রশ্নটা রবিন আর মুসা দুজনকেই ভাবিয়ে তুললো।
তাহলে কি যাননি? রবিনের প্রশ্ন।
জবাব দিলো না কিশোর। গভীর ভাবনায় ডুবে গেছে। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটলো কয়েকবার। বিড়বিড় করে বললো, ব্যাটারা ভুয়াও হতে পারে। চলো, ফোন করি।
কোথায়? মুসা অবাক।
মেকসিকান টুরিস্ট ডিপার্টমেন্টে। জানবো, ওই নামের তিনজন আমেরিকান টুরিস্ট সত্যিই এসেছে কিনা।
ঠিক বলেছো! রবিন বললো। চলো।
ফোন করলো কিশোর। ফোন ধরেছে যে লোকটা, সে কথা দিলো, যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব জানাবে। ফোনের কাছে অপেক্ষা করতে বললো কিশোরকে।
অস্থির হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো তিনজনে। এতোই উত্তেজিত হয়ে আছে, আলোচনা পর্যন্ত করতে পারছে না। শেষে আর থাকতে না পেরে বলেই ফেললো মুসা, দূর, এতো দেরি কেন...
ঠিক এই সময় বাজলো ফোন।
ওপাশের কথা শুনলো কিশোর। ধীরে ধীরে বিমল হাসি ছড়িয়ে পড়লো মুখে। রিসিভার রেখে দিয়ে বন্ধুদেরকে বললো, যা ভেবেছিলাম। ওই নামে কোনো আমেরিকানই মেকসিকোতে ঢোকেনি গত কয়েক দিনে। মনে হচ্ছে মারা যাননি ডা স্টেফানো। কিডন্যাপ করা হয়েছে। মৃত্যুর খবর ছড়ানো হয়েছে আমাদেরকে ফেরানোর জন্যে। আর কোনো কারণ নেই। লোকগুলো ভেবেছে, এখবর পেলে আমেরিকায় ফিরে যাবো আমরা। এটা সেই দলের কাজ, যারা আমাদের এবং অ্যাজটেক যোদ্ধার সম্পত্তির পিছে লেগেছে।

এখন তাহলে কি করবে? মুসা জিজ্ঞেস করলো।
ডা স্টেফানোকে খুঁজতে বেরোবো।
কোথায়?
অবশ্যই সেই পার্বত্য এলাকায়। আমি শিওর, ওখানেই কোথাও লুকিয়ে রাখা হয়েছে তাঁকে।
কোন এলাকায় মারা গেছেন স্টেফানো, ছাপা হয়েছে পত্রিকায়। ম্যাপ নিয়ে বসলো কিশোর। জায়গাটা চিহ্নিত করলো। তারপর বেরিয়ে পড়ল দুই সহকারীকে নিয়ে।
জায়গাটা অকজাকার উত্তর-পুবে। সরু একটা আঁকাবাঁকা পথে এসে পড়লো ওদের গাড়ি। ধীরে ধীরে উঠে চললো পর্বতের ওপরে। অনেক উচু একটা চুড়া চোখে পড়ছে। মেঘের মধ্যে ঢুকে গেছে। ঢালের গায়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে স্থানীয় অধিবাসীদের কুঁড়ে।
গাছপালার ফাঁক দিয়ে নিচে দেখা যায় নদী। সিনয় স্টেফানো ওটাতে পড়েই ভেসে গেছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। পর্বতের গোড়ায় বড় বড় গাছের জঙ্গল, কিন্তু যতোই ওপরে উঠছে ঢাল, কমে গেছে বড় গাছ। তার জায়গায় ঠাই করে নিয়েছে ঝোঁপঝাড় আর লতা। তবে পাথর আছে সর্বত্রই। বড়, ছোট, মাঝারি সব রকমের, সব আকারের।
হুঁ, মাথা দোলালো মুসা, কেন এসেছিলেন এখানে বোঝা যায়। ধ্বংসস্তূপ এখানেও আছে।
বেশ কিছু কুঁড়ে পেরিয়ে এলো গাড়ি। তারপর শেষ হয়ে গেল পথ।
গাড়ি থামিয়ে কিশোরের দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচালো মুসা। এবার?
ম্যাপ দেখতে লাগলো কিশোর। আন্দাজ করলো, যে জায়গা থেকে পড়ে গেছেন স্টেফানো, বলা হয়েছে, সেটা আরও ওপরে। গাড়ি রেখে যেতে হবে।
সবার যাওয়া কি ঠিক হবে? মুসা বললো। লোকগুলো বেপরোয়া। লুকিয়ে রেখে এখন আমাদের ওপর নজর রেখেছে কিনা তাই বা কে জানে। এক কাজ করো, তোমরা দুজন যাও। আমি গাড়ির কাছে থেকে পাহারা দিই। বলা যায় না, তোমাদের পেছনে যাওয়ার আগে গাড়িটাও এসে নষ্ট করে দিয়ে যেতে পারে।
ঠিকই বলেছে মুসা। একমত হলো কিশোর। বললো, থাকো। যদি কোনো বিপদে পড়ি, জোরে জোরে শিস দেবো দুবার। যদি মনে করো, একা আমাদেরকে উদ্ধার করতে পারবে না, সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি নিয়ে থানায় চলে যাবে।
আচ্ছা। ঢাল ওখান থেকে বেশ খাঁড়া। এবড়োখেবড়ো। পাথরে বোঝাই। সে-জন্যে আরও ওপরে রাস্তা নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। উঠে চললো কিশোর আর রবিন। সন্দেহ হতে শুরু করেছে, সত্যিই এরকম একটা জায়গায় এসেছিলেন কিনা

সিনর স্টেফাননা। কোনো ফাঁদে গিয়ে পা দিচ্ছে না তো! আরও কিছুটা উঠে থেমে আলোচনা করতে লাগলো দুজনে। ঠিক করলো, এতোটাই যখন এসেছে, একেবারে চূড়ায় না উঠে ফেরত যাবে না।
আরিব্বাবা! কি ঠান্ডা! চূড়ার কাছাকাছি পৌঁছে রবিন বললো।
চূড়ায় পৌঁছলো দুজনে। সাধারণত পাহাড়ের চূড়া যেমন হয় তেমন নয় এটা। কয়েকশো গজ জুড়ে একেবারে সমতল। এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে চলে এলো। নিচে চোখে পড়লো গিরিখাত। হালকা মেঘ ভেসে যাচ্ছে ওদের নিচ, দিয়ে। মেঘের ফাঁকে ফাঁকে চোখে পড়ে পাহাড়ী নদীর চকচকে জলস্রোত।
পড়লে একেবারে ভর্তা! নিচের পাথরস্তুপের দিকে তাকিয়ে গায়ে কাঁটা দিলে কিশোরের। নিশ্চয় ওখানেই খুঁজেছে ওরা স্টেফানোকে। এখানে আসেনি।
দরকার মনে করেনি।
সমতল চূড়াটায় চষে বেড়ালো দুজনে। কোনো সূত্র চোখে পড়লো না। হাঁটতে হাঁটতে চলে এলো আরেক প্রান্তে, যেখান থেকে নেমে গেছে আরেকটা ঢাল। যেটা দিয়ে উঠেছে ওরা, তার চেয়ে কম খাড়া।
কিশোরের হাত খামচে ধরলো রবিন। আরেক হাত তুলে দেখালো। জুতোর ছাপ! অনেকগুলো!
ধস্তাধস্তি হয়েছে! কিশোর দেখে বললো।
ছাপগুলোর কাছে এসে দাঁড়ালো ওরা। চারপাশে ভালোমতো নজর করে তাকাতেই চোখে পড়লো ভারি জিনিস হিচড়ে নিয়ে যাওয়ার দাগ। পাশে জুতোর ছাপও রয়েছে, অন্তত দুই জোড়া। তিন জোড়াও হতে পারে, বোঝা গেল না ঠিক। তবে অনুসরণ করা সহজ।
একজায়গায় এসে হারিয়ে গেল দাগ। এর কারণ মাটি ওখানে নরম নয়। বেশি রকম পাথুরে। ছড়িয়ে পড়ে খুঁজতে লাগলো দুজুনে। আবার পেলো দাগ। একটা কাঁচা পায়েচলা পথে উঠে গেছে। কিছুদূর এগিয়ে আবার হারিয়ে গেল দাগটা। তবে জুতোর ছাপ ঠিকই রয়েছে।
সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন বোধ করলো কিশোর। এখান থেকে নিশ্চয় বয়ে নেয়া হয়েছে স্টেফানোকে। তার মানে কাছেই কোথাও লুকিয়ে রাখা হয়েছে তাকে।
আরও শখানেক গজ এগিয়ে থমকে দাঁড়ালো দুজনেই। সামনেই পাহাড়ের ঢালে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা কুঁড়ে। পাতার ছাউনি।
ওখানে! ফিসফিসিয়ে বললো রবিন। মাথা নাড়লো শুধু কিশোর, মুখে কিছু বললো না।
খুব সাবধানে, চারপাশে নজর রেখে, পা টিপে টিপে এগোলো দুজনে। চলে এলো কুঁড়েটার কাছে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে, আরেকবার চারদিকে দেখলো কাউকে

দেখা যায় কিনা। নেই।
আস্তে দরজায় ঠেলা দিলো কিশোর। সরে গেল বাঁশের ঝাঁপ। ভেতরে মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে আছে একজন মানুষ। হাত-পা বাঁধা।
মুখ দেখা না গেলেও মানুষটা কে, বুঝতে অসুবিধে হলো না ওদের। দ্রুত এসে ভেতরে ঢুকলো দুজনে। বাঁধন খুলতে লাগলো রবিন। টেনে মুখে গোঁজা কাপড়টা বের করে আনলো কিশোর। জিজ্ঞেস করলো, আপনি সিনর এমিল ডা স্টেফানো, তাই না?
দুর্বল ভঙ্গিতে উঠে বসলেন ছিপছিপে মানুষটা। মাথায় ধূসর চুল। মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানালেন। এতোই দুর্বল, কথা বলতেও বোধহয় কষ্ট হচ্ছে। দেয়ালে ঝোলানো একটা লাউয়ের খোল দেখে উঠে গিয়ে নামালো রবিন। এগুলোতে পানি রাখে পাহাড়ী অঞ্চলের মেকসিকানরা। এটাতেও পানি রয়েছে। বাড়িয়ে দিয়ে বললো, নিন। পানি খান। ভালো লাগবে।
খুব আগ্রহের সঙ্গে খোলটা নিয়ে পানি খেলেন স্টেফানো। ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে আস্তে করে বললেন, অনেক ধন্যবাদ, তোমরা এসেছে।
ফালতু কথা বলে সময় নষ্ট করতে চাইলো না কিশোর। কাজের কথায় চলে এলো। জিজ্ঞেস করলো, আপনার আরেক নাম কি অ্যাজটেক যোদ্ধা, সি স্টেফানো? মানে, অ্যাজটেক যোদ্ধা নামে ডাকা হয় আপনাকে?
অবাক হলেন আরকিওলজিস্ট। হ্যাঁ। তোমরা জানলে কিভাবে? কে তোমরা?
আমার নাম কিশোর পাশা। ও রবিন মিলফোর্ড। আপনাকে সাহায্য করতে এসেছি।
তাহলে কথা না বলে জলদি আমাকে নিয়ে চলো। ডাকাতগুলো ফিরে আসার আগেই।
প্রশ্ন করার জন্যে অস্থির হয়ে আছে দুই গোয়েন্দা। তবে সেটা পরেও করা যাবে। আগে স্টেফানোকে এখান থেকে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাওয়া দরকার। দুদিক থেকে তাকে ধরে তুললো ওরা। রবিন আর কিশোরের কাধে ভর রেখে বাইরে বেরোলেন আরকিওলজিস্ট। ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়েছেন।
ঢাল বেয়ে যেখান দিয়ে নেমেছে ওরা, স্টেফানোকে নিয়ে সেখান দিয়ে ওঠা যাবে না। তার পক্ষে সম্ভব নয়। ঘুরে আরেক পাশে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। তাতে সময় লাগবে বেশি। লোকগুলোর সামনে পড়ারও ভয় আছে। কারণ ওরা এলে ওদিক দিয়েই আসবে। চূড়ায় উঠে আবার নামার কষ্ট করতে যাবে না। তবু ঝুঁকিটা নিতে বাধ্য হলো গোয়েন্দারা।
এমনই একটা জায়গা, স্টেফানোকে বয়ে নেয়াও কষ্টকর। অগত্যা হাঁটিয়েই নিয়ে যেতে হলো। তবে শরীরের ভর বেশির ভাগটাই কিশোর আর রবিনের কাঁধে দিয়ে

রেখেছেন তিনি।
কিন্তু এতো চেষ্টা করেও পার পেলো না। ধরা পড়তেই হলো। বড় জোর একশো ফুটও যেতে পারলো না, বিশাল এক পাথরের চাঙরের ওপাশ থেকে বেরিয়ে এলো একজন মানুষ। ওদের দিকে তাকিয়ে থমকে গেল, এক মুহূর্তের জন্যে, তার পরেই পেছন ফিরে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠলো। বেরিয়ে এলো আরও দুজন।
কিছুই করার সময় পেলো না কিশোর আর রবিন। তিনটে ল্যাসো উড়ে এলো ওদের দিকে। এভাবে ল্যাসোর ফাঁস ছুড়ে ছুটন্ত বুনো জানোনায়ারকে বন্দী করে ফেলে মেকসিকানরা, আর ওরা তো দাঁড়ানো মানুষ। মাথা গলে কাঁধের ওপর দিয়ে নেমে এলো দড়ির ফাঁস। হ্যাঁচকা টান পড়লো দড়িতে। বুকের কাছাকাছি চেপে বসলো ফাঁস, এমন ভাবে, হাত নাড়ানোরও ক্ষমতা রইলো না কারো। আটকা পড়লো দুই গোয়েন্দা। আবার বন্দি হলেন সিনর স্টেফানো।
শিস দিতে গিয়েও দিলো না কিশোর। মুসা একা এসে কিছু করতে পারবে না তিনজনের বিরুদ্ধে। তাকেও আটকে ফেলবে। তার চেয়ে মুক্ত থাকুক। ওদেরকে পরে উদ্ধার করার একটা ব্যবস্থা করতে পারবে।
দড়ির ফাঁস থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যে জোরাজুরি করলো অবশ্য কিশোর আর রবিন। বৃথা। সামান্যতম ঢিলও করতে পারলো না।
খকখক করে হাসলো একজন লোক। স্প্যানিশ আর ভাঙা ভাঙা ইংরেজি মিলিয়ে বললো, খামোকা নড়ো, খোকা। ষাঁড় ছুটতে পারে না এই ফাঁস থেকে, আর তোমরা তো ছেলে মানুষ। ভ্যাকুয়ারোর হাতে পড়েছে তোমরা, ছোটার আশা বাদ দাও।
আমাদের কেন ধরেছেন? রাগ দেখিয়ে বললো কিশোর।
হেসে উঠলো লোকটা। তোমাদের দেশে তোমরা হলে কি করতে, যদি তোমাদের বন্দিকে কেউ ছিনিয়ে নিতে চাইতো?
কিন্তু এই মানুষটাকে আটকে রাখার কোনো অধিকার আপনাদের নেই, স্টেফানোকে দেখিয়ে রাগ করে বললো রবিন।
সেটা তোমরা ভাবছো, আমরা না, হেসে জবাব দিলো লোকটা। শুরুতে ভেবেছিলাম, ছোট মাছ ধরেছি। এখন বুঝতে পারছি, দুজনেই তোমরা বড় মাছ। তবে প্রজাপতি জাল দিয়ে না ধরে ধরেছি ল্যাসসা দিয়ে। পালাতে আর পারবে না! নিজের রসিকতায় নিজেই হা হা করে হেসে উঠলো সে। বেরিয়ে পড়লো নোংরা হলদেটে দাঁত।
অন্য দুজনও যোগ দিলো তার সঙ্গে।
ল্যাসোর দড়ি টানটান করে ধরে রেখে নিজেদের মধ্যে আলোচনা শুরু করলো তিনজনে। নিচু স্বরে। কিছুই বুঝতে পারলো না ছেলেরা। মনে হলো, তর্ক করছে

তিনজনে। কোনো একটা ব্যাপারে একমত হতে পারছে না। হাবভাবেই বোঝা যায়, কিশোরদের সঙ্গে যে কথা বলেছে, সে-ই দলপতি। অবশেষে একমত হলো তিনজনে। দলপতি বললো কিশোরদেরকে, আমরা ঠিক করলাম, তোমাদেরকে কুঁড়েতেই রেখে যাবো। আর বড় মাছটাকে নিয়ে যাবো সাথে করে।
বড় মাছ কে, বুঝতে অসুবিধে হলো না গোয়েন্দাদের। ছাড়া পাওয়ার চেষ্টা করলো আরেকবার। বুঝতে পারলো এই ফাঁস গলায় আটকালে কতোটা কষ্ট পায় গরু।
শক্ত করে হাত-পা বাঁধা হলো কিশোর আর রবিনের। টেনেহিঁচড়ে এনে ওদেরকে কুঁড়ের মেঝেতে ফেললো লোকগুলো। কিছুক্ষণ আগে সিনর স্টেফানো যেখানে পড়েছিলেন। দুজনের মুখেই রুমাল গুঁজে দিয়ে আরকিওলজিস্টকে নিয়ে চলে গেল।
সাংঘাতিক অস্বস্তিকর অবস্থা। না পারছে নড়তে, না পারছে কথা বলতে। এমন বাঁধা-ই বেঁধেছে, সামান্যতম ঢিল করা যাচ্ছে না।
অনেক চেষ্টা করার পর হাল ছেড়ে দিলো ওরা। নাহ, হবে না। নিজে নিজে খুলতে পারবে না। একমাত্র ভরসা এখন মূসা। কোনো বোকামি করে সে-ও যদি ধরা পড়ে যায়, তাহলে সব আশা শেষ।
অপেক্ষা করতে লাগলো দুজনে। গড়িয়ে চললো সময়। এক মিনিট দুই মিনিট করতে করতে ঘণ্টা পেরোলো। কিন্তু মুসার আসার আর নাম নেই। তবে কি সে-ও ধরা পড়লো! বাইরে বেলা শেষ হয়ে এলো। ছায়া ফেলতে আরম্ভ করেছে গোধূলি।
ভয় পেয়ে গেল রবিন আর কিশোর। হলো কি মুসার?
আরেকবার মুক্তির চেষ্টা শুরু করলো দুজনে। দরদর করে ঘামছে, কিন্তু দড়ির বাঁধনকে পরাজিত করতে পারলো না। যেমন ছিলো তেমনি রয়ে গেল ওগুলো। উপুড় হয়ে মাটিতে মুখ গুঁজে হাঁপাতে লাগলো ওরা।
হঠাৎ, একটা ছায়া দেখা গেল দরজায়। ফিরে তাকালো কিশোর।
মুসা।
রবিনও দেখেছে। ঢিপঢিপ করছে বুকের ভেতর। আনন্দে।
পাশে এসে বসে পড়লো মুসা। একটানে কিশোরের মুখের রুমাল খুলে দিলো। তারপর রবিনের।
এতো দেরি করলে! রবিন বললো। আমরা তো ভাবলাম তোমাকেও ধরেছে! বললো কিশোর।
দেখিইনি কাউকে, ছুরি বের করে বাঁধনে পোঁচ দিলো মুসা। ধরবে কি?
দেরি করলে কেন? জিজ্ঞেস করলো রবিন।

আমি কি জানি নাকি তোমরা ধরা পড়েছো? বসে থেকে থেকে বিরক্ত হয়ে গিয়েছিলাম। তোমরা বলে গেছ, বিপদ দেখলে শিস দেবে। আসসা না দেখে উল্টো তোমাদেরকেই বকাবকি শুরু করেছিলাম। রবিনের বাঁধন কাটা শেষ হয়ে গেল। উঠে বসলো সে। ডলে ডলে বাধনের জায়গাগুলোয় রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করতে লাগলো। কিশোরের দড়িতে পোচ দিতে দিতে মুসা বললো, শেষে আর থাকতে না পেরে বেরিয়ে পড়লাম, তোমরা কি করছে দেখতে। জুতোর ছাপ আর হিচড়ানোর দাগ চোখে পড়লো অনুসরণ করে চলে এলাম কুঁড়েটার কাছে।...তা কি হয়েছিলো, বলো তো?

সমস্ত কথা তাকে জানালো কিশোর আর রবিন।

তার মানে তীরে এসে তরী ডুবলো! মুসা বললো। ধরেও রাখতে পারলে না। আর কি পাওয়া যাবে সিনর স্টেফানোকে? নিশ্চয় এমন জায়গায় লুকিয়ে ফেলবে, যেখান থেকে খুঁজে বের করা খুব কঠিন হবে। কারণ, তোমরা দেখে ফেলেছ। মুক্তি পাবেই। সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে বলবে পুলিশকে, এরকমই ভাববে ওরা। অনেক দূরে কোথাও নিয়ে যাবে সিনর স্টেফানোকে, বুঝলে। যেখানে আমরা কিংবা পুলিশ, কেউই খুঁজে পাবে না।

আমারও সেরকমই মনে হচ্ছে! চিন্তিত ভঙ্গিতে বললো কিশোর। মারাত্মক বিপদে পড়েছেন সিনর স্টেফাননা। টর্চার করে হোক, যেভাবেই হোক, তার মুখ থেকে কথা আদায়ের চেষ্টা করবে লোকগুলো। তারপর আর না-ও ছাড়তে পারে। হয়তো খুন করে গুমই করে ফেলবে।

হোটেলে ফিরে এলো তিন গোয়েন্দা। আসার পথেই থানায় নেমে পুলিশকে। জানিয়ে এসেছে সব কথা।

অপেক্ষা করছে ওরা। পুলিশ বলেছে, কোনো খোঁজ পেলেই জানাবে। অনেক রাত হলো। কিন্তু ফোন আর আসে না। বসে বসে আলোচনা করছে তিনজনে, অনুমান করার চেষ্টা করছে, কোথায় নিয়ে যাওয়া হতে পারে সিনর স্টেফানোকে। কিছুই বুঝতে পারছে না। কোনো সূত্র ছাড়া বুঝবেই বা কিভাবে?

ঘুমোতে যেতে তৈরি হলো তিনজনে। এই সময় এলো ফোন। রিসিভারটা কিশোরের দিকে বাড়িয়ে ধরে ম্যানেজার বললো, তোমাকে চাইছে।

প্রায় থাবা দিয়ে রিসিভারটা নিয়ে কানে ঠেকালো কিশোর। হালো!

কিশোর? আমি, পুলিশ নয়। আমি, পিন্টো আলভারো।

ও, আপনি! কি খবর?

তোমাদেরকে বলেছিলাম না, খোঁজখবর করবো। করেছি। আমার পরিচিত সমস্ত জায়গায় ফোন করেছি। যেখানে যেখানে স্টেফানো যেতেন, আমাকে নিয়ে, সব জায়গায়। এইমাত্র ট্যাক্সকো থেকে হ্যানিবাল কারনেস জানালো, তাকে নাকি

দেখেছে। তিনজন লোকের সঙ্গে গাড়িতে। খাবার কিনতে থেমেছিলো গাড়িটা। কারনেসের মনে হয়েছে, পুরানো কোনো ধ্বংসস্তূপ খুঁড়তে চলেছেন আরকিওলজিস্ট। সেজন্যেই তোক নিয়েছেন সাথে।
কোনদিকে গেছে! দুরুদুরু করছে কিশোরের বুক।
উত্তর-পশ্চিমে। ঠিক কোথায়, বলতে পারলো না। জিজ্ঞেস করতে পারেনি কারনেস।
এই হ্যানিবাল কারনেসটি কে?
ট্যাক্সকোর একটা সুভনিরের দোকানের মালিক। আর্টিস্ট-কাম-আরকিওলজিস্ট। ডা স্টেফানোর ছাত্র।
ও। আর কিছু বলতে পারলো? গাড়িটা কি গাড়ি? লোকগুলো কেমন?
গাড়িটা কালো রঙের সেডান। লোকগুলো মেকসিকান, জেলে বলেই মনে হয়েছে কারনেসের। নানারকমের কাজ করে ওই অঞ্চলের জেলেরা মাছ ধরে, গরু পোষে, ভালো টাকা পেলে শ্রমিকের কাজ করে। বিশেষ করে মাটি খোঁড়ার কাজ। অনেক টাকা দেয় তো আরকিওলজিস্টরা।
ডা স্টেফানোর সঙ্গে যে দেখা হয়েছে, সংক্ষেপে সেকথা জানালো কিশোর। শুনে খুব চিন্তিত হলো আলভারো। বললো, পুলিশ খুঁজছে খুঁজুক, সে আরও খোঁজ নেবে।
তাকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে ফোন রেখে দিলো কিশোর। দুই সহকারীকে নিয়ে ঘরে ফিরে এলো। ম্যাপ খুলে বসলো।
ট্যাক্সকো বের করলো। উত্তর-পশ্চিম দিকে আঙুল এগিয়ে নিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ বলে উঠলো, বুঝেছি! লেক প্যাজকুয়ারোতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে!
কি করে বুঝলে? একই সঙ্গে জিজ্ঞেস করলো রবিন আর কিশোর।
ওটাই ওদের জন্যে একমাত্র নিরাপদ জায়গা। এখানকার পুলিশ অতদূরে খুঁজতে যাবে না। তাছাড়া, কয়েকটা সূত্র আছে আমাদের হাতে। রবিন, মনে আছে, কথা বলার সময় খালি মাছ মাছ করছিলো লোকগুলো? আলভারোও বললো, কারনেসের নাকি জেলের মতো মনে হয়েছিলো লোকগুলোকে। আর সব চেয়ে বড় সূত্রটা হলো প্রজাপতি জাল। বলেছে, প্রজাপতি জাল দিয়ে না ধরে ধরেছি ল্যাসো দিয়ে। লেক প্যাজকুয়ারোই একমাত্র জায়গা পৃথিবীতে, যেখানে ওই জাল দিয়ে মাছ ধরা হয়। তারমানে লোকগুলো ওখানকারই অধিবাসী। কাউকে লুকানোর জন্যে নিজের অঞ্চলকেই সবচেয়ে নিরাপদ মনে করবে ওরা। গেছেও সেদিকেই। আর কোনো সন্দেহ নেই, টেবিলে চাপড় মারলো কিশোর। ওই হ্রদেই সিনর স্টেফানোকে নিয়ে গেছে ওরা।
পুলিশকে জানানো দরকার, মুসা বললো।

না! এটাই আমাদের শেষ সুযোগ, বিফল হতে চাই না। পুলিশ দেখলে হুঁশিয়ার হয়ে যেতে পারে ব্যাটারা। জায়গায় জায়গায় ওদের চর থাকতে পারে। খবর পেলেই আবার সিনর স্টেফানোকে সরিয়ে ফেলবে। ওরা এখনও জানে না আমরা আন্দাজ করে ফেলেছি। কাজটা আমাদেরকেই করতে হবে। গোপনে।
তার মানে লেক প্যাজকুয়াররাতে যাচ্ছি আমরা?
হ্যাঁ। কাল সকালে উঠেই।
পরদিন সকালে নাস্তা সেরে বেরিয়ে পড়লো তিন গোয়েন্দা। ট্যাক্সকোতে পৌঁছলো দুপুরবেলা। লাঞ্চের সময় হয়েছে। গাছে ছাওয়া বড় একটা চর মতো জায়গায় গাড়ি রাখলো। মেকসিকানরা এরকম জায়গাকে বলে ক্যালো। চারপাশ ঘিরে রয়েছে পর্বত। বাড়িঘর রয়েছে ঢালের ওপর। অসংখ্য পাথরের রাস্তা উঠে গেছে এদিক ওদিক। চত্বরের একধারে সুন্দর একটা পাথরের গির্জা দেখা গেল। অনেক পুরানো। বাকি তিনধারে রয়েছে চমৎকার সব দোকানপাট, হোটেল, রেস্টুরেন্ট।
হেঁটে একটা রেস্টুরেন্টের দিকে এগোলো তিন গোয়েন্দা। বেশির ভাগ দোকানেই দেখলো রূপার তৈরি জিনিসপত্রের আধিক্য।
ট্যাক্সকো রূপার জন্যে বিখ্যাত, বিদ্যে ঝাড়লো চলমান জ্ঞানকোষ, রবিন। অনেক রূপার খনি আছে এখানে। ফলে রূপার জিনিস বানানোর কারিগরও আছে।
একটা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে গেল কিশোর। হাত তুলে দেখালো, দেখ, কি সুন্দর!
রূপার তৈরি একটা প্রমাণ সাইজের মানুষের মূর্তি। একজন ইনডিয়ান। হাতের একটা বটুয়া থেকে শস্যের বীজ ছিটানোর ভঙ্গি।
হ্যানিবাল কারনেসের খোঁজ করলে হয় না? মুসা বললো, হয়তো সিনর স্টেফানোর ব্যাপারে আরও কিছু জানা যেতে পারে। ছাত্র ছিলো যখন তার।
ঠিক বলেছো! তুড়ি বাজালো কিশোর। দাড়াও, আগে খেয়ে নিই। খেয়েদেয়ে বিল দেয়ার সময় ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করলো কিশোর।
কারনেস? ম্যানেজার বললো, একটু আগেই তো দেখে এলাম। কয়েকজন ছাত্রকে নিয়ে ছবি আঁকছে। কয়েকটা দোকান পরেই তার দোকান। ডান পাশে ঘুরে সোজা চলে যাও।
দোকানের সামনে বেড়া দেয়া একটা উঠান। সেখানে বসে ছবি আঁকছে কয়েকজন চিত্রকর। তাদের মধ্যে রয়েছে লাল দাড়িওয়ালা একজন লোক। উজ্জ্বল নীল স্মক পরনে। সেই কারনেস।
ছেলেরা তার পরিচয় জিজ্ঞেস করতেই মুখ তুলে হাসলো। হ্যাঁ, আমিই হ্যানিবাল কারনেস। আলভারো তোমাদের কথা বলেছে। আমেরিকা থেকে এসেছো। সিনর

স্টেফানোর খোঁজে। চমৎকার জায়গা আমেরিকা। অনেকদিন থেকেছি। আঁকার অনেক দৃশ্য আছে ওখানে।
অন্যান্যদের সঙ্গে কারনেসও বসে ছবি আঁকছে। ক্যানভাসে দেখা গেল একটা স্কেচ, ছোট একটা ছেলে একটা খচ্চরের গলায় দড়ি ধরে টানছে।
সেদিকে তাকিয়ে কিশোর জিজ্ঞেস করলো, কি ধরনের ছবি বেশি আঁকেন আপনি?
সব ধরনেরই। তবে মানুষের প্রতিকৃতি আঁকতেই বেশি ভালো লাগে আমার, হাসলো সে। তোমরা যাকে খুঁজতে এসেছো, সেই সিনর স্টেফানোরও ছবি আমি এঁকেছি। দেখবে? এসো।
তিন গোয়েন্দাকে দোকানের ভেতরে নিয়ে এলো কারনেস। চলে এলো পেছনের একটা ঘরে। তার স্টুডিওতে।
সুন্দর একটা লাইফ-সাইজ ছবি। দেয়ালে ঝুলিয়ে রেখেছে কারনেস। নিখুঁত করে একেছে তার ওস্তাদ এমিল ডা স্টেফানোর ছবি।
প্রশংসা করলো কিশোর। স্টেফানোর সম্পর্কে প্রশ্ন করতে লাগলো। অনেক তথ্য জানালো কারনেস, যেগুলো তিন গোয়েন্দার কাছে নতুন।
সিনর স্টেফানো খুব ভালো লোক, কারনেস বললো। শান্ত স্বভাবের। কারো সাতেপাচে যান না। নিজের কাজ নিয়ে থাকেন। অ্যাজটেক যোদ্ধার রক্ত বইছে শরীরে। বিশ্ববিদ্যালয়ে সহকর্মীরা তো তার নামই দিয়ে ফেলেছে অ্যাজটেক যোদ্ধা।
শুনেছি, রবিন বললো, একেকজন আরকিওলজিস্টের একেক জিনিসের প্রতি শখ। যদিও প্রাচীন সব ধরনের জিনিস খুঁড়ে বের করতেই সমান আগ্রহী তারা। সিনর স্টেফাননার শখটা কি, বলতে পারেন?
ঠিক এই প্রশ্নটাই করতে যাচ্ছিলো কিশোর, চুপ হয়ে গেল, করে ফেলেছে রবিন।
তুমি ঠিকই বলেছো, মাথা ঝাঁকালো কারনেস। একেকজনের একেক শখ। সিনর স্টেফানোর ছিলো পুরানো অস্ত্রের। বিশেষ করে অ্যাজটেকদের। অনেক অস্ত্র যোগাড় করেছেন তিনি। শত শত বছরের পুরানো। স্টেট মিউজিয়ামকে দিয়ে দিয়েছেন।
এই তথ্যটা জেনে খুব উত্তেজিত হলো তিন গোয়েন্দা।
পুরানো অস্ত্র হাতে, তার একটা ছবিও এঁকেছি আমি, কারনেস জানালো। এসো, এদিকে, আরেকটা ছবি দেখালো সে। শেষ হয়নি ছবিটা। বাকি আছে। তিন বছর আগে একেছি এটা। শেষ করে ফেলতে পারতাম, করিনি। সিনর স্টেফানো অনুরোধ করেছেন, আরও দুটো বছর যেন অন্তত অপেক্ষা করি। শেষ করে এটা স্টেট মিউজিয়ামে দিয়ে দেয়ার ইচ্ছে আছে আমার।

এতদিন অপেক্ষা করতে বলেছেন কেন? মুসার প্রশ্ন।
কি জানি, বলতে পারবো না। নিশ্চয় কোনো কারণ আছে। অকারণ ফালতু কথা বলার মানুষ তিনি নন।
আরও কাছে গিয়ে গভীর মনোযোগে ছবিটা দেখতে লাগলো কিশোর। ঝলমলে অ্যাজটেক পোশাক পরে রয়েছেন স্টেফানো। হাতে একটা বড় ছুরি। সোনা দিয়ে তৈরি বাঁটটায় পালকওয়ালা সাপের ছবি খোদাই করা রয়েছে। নীলকান্তমণি বসানো।
ভাবনা চলেছে তার মাথায়। তিন বছর আগে আঁকা হয়েছে ছবিটা, আরও দুবছর অপেক্ষা করার কথা। তার মানে পাঁচ বছর। অ্যাজটেক যোদ্ধার সম্পত্তি ফেরত দেয়ার একটা নির্দিষ্ট সময় চেয়েছিলেন মিস্টার রেডফোর্ড। স্টেফানোও সময় চেয়েছেন কারনেসের কাছে। দুটোর মাঝে কোনো সম্পর্ক আছে?
সিনর স্টেফানোর পাওয়া অস্ত্রগুলো কখনও দেখেছেন? আচমকা প্রশ্ন করলো কিশোর।
না। তিনি সেসব কাউকে দেখাতেন না। জানাতেনই না। মিউজিয়ামে পাঠানোর পর সবাই জানতো। আগে প্রকাশ না করার কারণ বোধহয় চোর ডাকাতের ভয়। তবে একটা জিনিস আমি দেখে ফেলেছিলাম।
কী?
ছুরি। ওই যে, ছবিতে যেটা এঁকেছি।
আর কোনো সন্দেহ রইলো না কিশোরের। উইলে অ্যাজটেক যোদ্ধা বলে কাকে বোঝাতে চেয়েছেন মিস্টার রেডফোর্ড, এবং তার জিনিসটা কি। যোদ্ধা হলেন এমিল ডা স্টেফানো, আর সম্পত্তি হলো ওই ছুরি।
অনেক মূল্যবান তথ্য জানতে পেরেছে। আর কিছু জানার নেই। আরও কিছু ছবি দেখে, বেরিয়ে এলো তিন গোয়েন্দা। ট্যাক্সকো থেকে বেরিয়ে সোজা রওনা হলো লেক প্যাজকুয়ারোর পথে। আগের রাতে আলভারোকে যা যা বলেছে, ছেলেদেরকেও ঠিক একই কথা বললো কারনেস, সিনর স্টেফানোকে কখন কি অবস্থায় দেখা গেছে।
বিকেল বেলা হ্রদের পাড়ে পৌঁছলো ওরা। ছোট একটা গ্রাম প্যাজকুয়াররা। একটামাত্র সরু রাস্তার ধারে গড়ে উঠেছে ওখানকার যতো সব বাণিজ্যিক ভবনগুলো। একটা হোটেল আছে। তাতে উঠলো তিন গোয়েন্দা। গোসল-টোসল সেরে বেরিয়ে পড়লো সিনর স্টেফানোর খোঁজে।
রাস্তার ধারের দোকানগুলোতে ঢুকে লোকের সঙ্গে কথা বললো। স্টেফানোর হবি দেখিয়ে তাঁকে দেখেছে কিনা জিজ্ঞেস করলো। কেউ দেখেনি। নিরাশ হয়ে

হোটেলে ফিরে এলো গোয়েন্দারা। সেদিন আর কিছু করার নেই। সকাল সকাল খেয়েদেয়ে শুতে গেল।
ভুল করলাম না তো? রবিনের প্রশ্ন। হয়তো এখানে আনাই হয়নি তাঁকে।
প্রজাপতি জালের কথা কিছুতেই মন থেকে সরাতে পারছি না আমি, কিশোর বললো। কাল সকালে হ্রদের পাড়ে চলে যাবো। জেলেদেরকে জিজ্ঞেস করবো। দেখি, কিছু বলতে পারে কিনা।
এতে কাজ হলো। তিনজন লোক জানালো, ছবির মানুষটাকে দেখেছে। যে তিনজনের সঙ্গে দেখেছে, তাদেরকেও চেনে ওরা। খারাপ লোক। জাতে জেলে কিন্তু মাছ ধরার চেয়ে, অন্যায় কাজেই বেশি আগ্রহ ওদের। একটা লঞ্চে করে চলে গেছে জ্যানিৎজিও দ্বীপের দিকে। তীরে দাঁড়িয়েই দেখা যায় দ্বীপটা পাহাড়ও রয়েছে একটা ছোটখাটো। বিশাল এক মূর্তি গড়া হয়েছে পাহাড়ের মাথায়, একজন পাদ্রীর। তার নাম মোরোজ। ১৮১০ সালে একটা বিদ্রোহী বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।
ওখানে যাওয়ার জন্যে বোট ভাড়া পাওয়া যাবে কিনা জানতে চাইলো কিশোর। ছোট একটা বন্দর দেখিয়ে দেয়া হলো তাকে। ওখান থেকে ছোটখাটো এক লঞ্চই ভাড়া করে ফেললো সে। দ্বীপে রওনা হলো।
তিনজনেই অবাক হয়ে দেখতে লাগলো জেলেদের মাছ ধরা। বিচিত্র জাল ঝপাৎ করে ফেলছে পানিতে। যেন ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে দানবীয় প্রজাপতির ডানা। যখন টেনে তোলা হচ্ছে, তাতে লাফালাফি করছে সার্ডিন মাছের মতো একধরনের মাছ। প্রচুর ধরা পড়ছে।
লঞ্চের সারেং ওদেরকে জানালো, সে জাতে জেলে। মাছ, ধরে বিক্রি করে পয়সা জমিয়ে এই লঞ্চ কিনেছে।
এতো ছোট মাছ দিয়ে কি হয়? রবিন জানতে চাইলো।
খায়। শুকিয়ে শুটকি করে মেকসিকো সিটিতে পাঠানো হয়। প্যাজকুয়ারো হ্রদের মাছের দারুণ চাহিদা। খুব স্বাদ। অনেক দামে বিকোয়।
দ্বীপের কাছাকাছি চলে এসেছে বোট। পানির কিনারে সারি দিয়ে বাঁধা আস্ত গাছের কাণ্ড কুঁদে তৈরি একধরনের ডিঙি, অনেকটা বাংলাদেশের তালের নৌকার মতো। ওগুলো জেলেদের সম্পত্তি। এই ডিঙিতে করেই মাছ ধরতে বেরোয় প্যাজকুয়ারোর জেলেরা।
সৈকতে মানুষের অভাব নেই। জাল ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে শুকানোর জন্যে। ছেঁড়া জায়গাগুলো মেরামতে ব্যস্ত মেয়েরা।
তীরে ভিড়লো বোট। পাইলটকে অপেক্ষা করতে বলে নামলো তিন গোয়েন্দা। প্রথম যে মহিলাকে ছবিটা দেখালো কিশোর, সে-ই বলে দিতে পারলো সিনর

স্টেফানোকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পাহাড়ের দিকে দেখিয়ে দিলে সে। ঢাল বেয়ে উঠে গেছে একটা পাথরের তৈরি রাস্তা। দুপাশে বাড়িঘর দোকানপাট। প্রতিটি বাড়ির সামনেই খুঁটি পুঁতে তার ওপর লম্বা করে সরু গাছের কাণ্ড ফেলে রাখা হয়েছে। জাল ঝুলিয়ে রখার জন্যে।
আবার ছবিটা দেখালো কিশোর। কয়েকজন লোককে। ওরাও পাহাড়ে দিকে নির্দেশ করলো।
মনে হয়, চলার গতি বাড়িয়ে দিলো রবিন, এইবার আর বিফল হবে না।
দাড়াও! বাধা দিলো কিশোর। পুলিশ দেখছি না এখানে। বিপদে পড়ে যেতে পারি, এভাবে গেলে। ব্যাটাদের ল্যাসোর ক্ষমতা তো দেখেছি। জোয়ান দেখে দুতিনজন লোক নিয়ে যাওয়া দরকার।
কাকে নেবে? মুসার প্রশ্ন।
আশেপাশে তাকালো কিশোর। জাল নিয়ে কাজ করছে কয়েকজন জেলে। দুজনকে খুব পছন্দ হলো তার। জোয়ান, বলিষ্ঠ শরীর। ফুলে ফুলে উঠছে হাতের পেশী। তাদেরকে গিয়ে সবকথা বুঝিয়ে বললো সে।
অবাক হলো লোকগুলো। একজন বললো, আমাদের দ্বীপে কিডন্যাপার! শেষ পর্যন্ত শয়তানগুলো কিডন্যাপিং করলো! চলো, আমি যাবো, ওই লোকটার নাম হুগো।
উঠে দাঁড়ালো আরেকজন, আমিও, তার নাম নিটো।
পাহাড় বেয়ে উঠতে শুরু করলো দলটা। পথের পাশের প্রতিটি বাড়ি, দোকান খুঁজতে খুঁজতে চললো। পাহাড়ের ওপরে যেতে দেখা গেছে। কিডন্যাপারদের, কিন্তু কোন বাড়িতে তা দেখেনি কেউ। অনেক ওপরে উঠে বয়ে মোড় নিয়েছে পথটা। কিশোর বললো, একসাথে না থেকে ভাগাভাগি হয়ে খোঁজা দরকার। তাতে অনেক তাড়াতাড়ি আর সহজ হবে।
রাস্তার শেষ বাড়িটার দিকে এগিয়ে চললো সে। সমস্ত দরজা খোলা। নাহ, এখানে থাকবে না, ভাবলো সে।
তবু, না দেখে যাওয়া ঠিক হবে না। কয়েকটা দরজায় দাঁড়িয়ে ভেতরে উঁকি দিলো কিশোর। আর মাত্র একটা দরজা। সেটার সামনে সবে এসে দাঁড়িয়েছে, হ্যাঁচকা টানে তাকে ভেতরে টেনে নিলো কয়েকটা হাত বাধা দেয়ার সুযোগই পেলো না। এমনকি সাহায্যের জন্য যে চিৎকার করবে, তারও উপায় রাখলো না। মুখে গুজে দেয়া হলো ময়লা কাপড়। একটা জাল দিয়ে জড়িয়ে ফেলা হলো। ঠেলে ফেললো ঘরের কোণে। আরও কিছু জাল ফেলে চাপা দেয়া হলো তাকে।
এতো সহজে ধরা পড়ে গেল বলে নিজের ওপরই রাগ হতে লাগলো কিশোরের। কয়েক মিনিট সব কিছু চুপচাপ রইলো, তারপর একটা লোককে বলতে শুনলো,

তোমার জন্যে কি করতে পারি?
এই লোককে দেখেছেন? রবিনের কণ্ঠ। নিশ্চয় ছবি দেখিয়ে জিজ্ঞেস করেছে।
এক মুহূর্ত নীরবতা। তারপর লোকটা জবাব দিলো, হ্যাঁ, দেখেছি। তিনজন লোকের সঙ্গে গেছে। হ্রদের দিকে। সাথে একটা ছেলেও ছিলো, মনে হয় আমেরিকা থেকে এসেছে।
থ্যাংক ইউ। যাই, দেখি, ওদিকেই খুঁজি।
নীরব হয়ে গেল আবার বাইরে। অসহায় হয়ে পড়ে থেকে কিশোর ভাবছে, সাহায্যের আশা শেষ। চলে গেছে রবিন।
আবার ভাঙলো নীরবতা। তবে এবার কথা বললো কিশোরকে যারা ধরেছ তাদের একজন। খুব চালাক মনে করেছিলে নিজেকে। কেমন বুঝলে মজাটা?
অচেনা কণ্ঠস্বর। তোমাকে আর সিনর স্টেফানোকে ছাড়া হবে না কিছুতেই। তবে অ্যাজটেক ড্যাগারটা কোথায় আছে যদি বলো, তাহলে ছেড়ে দিতেও পারি।
জালের নিচে চাপা থেকে শ্বাস নিতেও যেন কষ্ট হচ্ছে কিশোরের। নড়াচড়ার চেষ্টা করতে গিয়ে লক্ষ্য করলো, আরেকজন মানুষ রয়েছে তার পাশে। নিশ্চয় সিনর স্টেফানো। এতোক্ষণ বুঝতে পারেনি কেন, যে তিনি আছেন? হয়তো তাঁর মুখেও কাপড় গোঁজা। বেঁধে রাখা হয়েছে। যাতে নড়তেও না পারেন, কথা বলতে না পারেন।
জেলে দুজনকে নিয়ে হ্রদের পাড়ে পৌঁছেছে ততোক্ষণে রবিন আর মুসা। লঞ্চটা আগের জায়গাতেই রয়েছে। সারেঙকে ডেকে জিজ্ঞেস করলো, কিশোর এদিকেই এসেছে। দেখেছেন? যে মানুষটাকে খুঁজতে এসেছি তাকে নিয়ে সেই লোক তিনজনও এসেছে। বোটটোট যেতে দেখেছেন নাকি?
না, অবাক মনে হলো সারেঙকে। দেখিনি তো!
মুসার দিকে তাকালো রবিন। তারপর জেলে দুজনের দিকে। হুগো আর নিটো। বললো, মিথ্যে কথা বলেছে লোকটা। নিশ্চয় আটকে ফেলেছে। কিশোরকে। ওই কুঁড়েতেই রয়েছে এখনও। সরানোর সময় পায়নি। জলদি চলুন।
ঘুরে প্রায় দৌড়াতে শুরু করলো সে। আগের পথ বেয়ে উঠতে লাগলো। পেছনে অন্য তিনজন।
কুঁড়েটায় পৌঁছতে বেশিক্ষণ লাগলো না। তাদেকে হুড়মুড় করে ঢুকতে দেখে অবাক হয়ে তাকালো ঘরের দুজন লোক।
কিশোর কোথায়? কঠিন গলায় জিজ্ঞেস করলো রবিন।
মানে? কি বলছো? বললো একজন।
ততোক্ষণে ঘরের আবছা অন্ধকার চোখে সয়ে এসেছে রবিন আর মুসার। লোকটাকে চিনে ফেললো, চেহারাটা ভালোমতো দেখতেই। এই সেই নকল পুলিশ

অফিসার, গাড়িতে উঠে ওদেরকে যে কিডন্যাপ করে নিতে চেয়েছিলো।
জাল থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠলো কিশোর। না পেরে দাপাতে শুরু করলো মেঝেতে। লাথি মারতে শুরু করলো।
ওই তো! চেঁচিয়ে উঠলো মুসা। ওই যে!
দরজার দিকে দৌড় দিলো দুই কিডন্যাপার। ঝট করে এক পা বাড়িয়ে দিলো মুসা। পায়ে লেগে আছাড় খেয়ে পড়লো একজন। আরেকজনকে আটকে ফেললো হুগো আর নিটো।
রবিন জাল সরাতে শুরু করে দিয়েছে। টেনে টেনে তুলে ছুঁড়ে ফেলছে একপাশে। বেরিয়ে পড়লো দুজন মানুষ। একজন কিশোর, আরেকজন সিনর স্টেফানো। মুক্ত করলো ওদেরকে।
বিধ্বস্ত মনে হচ্ছে আরকিওলজিস্টকে। বিড়বিড় করে বললেন, থ্যাংক ইউ!
এতো কাহিল হয়ে পড়েছেন তিনি, উঠে দাঁড়ানোরই শক্তি পাচ্ছেন না। তাকে প্রায় বয়ে আনতে হলো বাইরে।
হয়েছে, ছেড়ে দাও, স্টেফানো বললেন। আমার অসুবিধে হচ্ছে না। কাল রাতে তোমাদের কথা আর মিস্টার সাইমনের কথা আলোচনা করতে এনেছি লোকগুলোকে। দারুণ গোয়েন্দা তোমরা। হাল তো ছাড়োইনি, পিছু নিয়ে ঠিক চলে এসেছে এখানে।
ঠিকই বলেছেন! বললো হুগো। কয়েকটা ছেলে যেরকম সাহস দেখালো...এদের জন্যেই শয়তানটাকে ধরতে পারলাম। বলে দুই অপরাধীর একজনের বুকে খোঁচা মারলো। এটার বাড়ি আমাদের এলাকায়। শয়তানী করতে করতে শেষে কিডন্যাপার হতেও বাধলো না! রবিনের দিকে তাকালো। কি করবো দুটোকে?
প্যাকুয়ারে পুলিশের কাছে নিয়ে যাবো, অনুরোধের সুরে বললো রবিন। আপনারা কি আমাদের সঙ্গে যেতে পারবেন? এদুটোকে নিতে সুবিধে হতো।
নিশ্চয় যাবো, জবাব দিলো নিটো।
পিছমোড়া করে হাত বেঁধে টেনে নেয়া হলো দুই বন্দিকে। হাঁ করে দৃশ্যটা দেখতে লাগলো গায়ের লোক। লঞ্চে তোলা হলো দুজনকে। সারেংও অবাক হয়েছে। বললো, ধরতে পারলে তাহলে!
হ্যাঁ, পেরেছি, মুসা বললো।
গাল ফুলিয়ে বসে রইলো দুই বন্দি। কোনো কথারই জবাব দিলো না। প্রশ্ন করা বাদ দিলো ওদেরকে কিশোর। কিভাবে ধরা পড়েছেন, গল্পটা বললেন সিনর স্টেফানো। পর্বতের ওপর একটা ধ্বংসস্তূপ আছে। ওটাতে প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যাবে ভেবে খুঁড়তে গিয়েছিলেন। পুরানো একটা মন্দিরও আছে ওখানে।

মন্দিরের ভেতর আমাকে আটক করলো ওরা, বললেন তিনি। ধরে নিয়ে গেল কুঁড়েটায়, যেটাতে প্রথম আমাকে পেয়েছিলে তোমরা। অনেক প্রশ্ন করলো। জোর করতে লাগলো। বার বার জিজ্ঞেস করলো ছুরিটার কথা। বলিনি। তারপর খেতে চলে গেল। এই সময় এলে তোমরা তোমাদেরকেও বাধলো ওরা। ছুটলে কিভাবে?
মুসা এসে খুলে দিয়েছে, মুসাকে দেখালো রবিন। আমাদের গোয়েন্দা সংস্থার তৃতীয় সদস্য। মুসা আমান।
হেসে হাত বাড়িয়ে দিলো মুসা। হাতটা ধরে জোরে ঝাঁকিয়ে দিলেন আরকিওলজিস্ট। পরের ঘটনা বলতে লাগলেন। টেনেহিঁচড়ে তাকে একটা গাড়িতে নিয়ে গিয়ে তুললো কিডন্যাপাররা। তারপর নিয়ে এলো প্যাজকুয়ারোতে। এই লোকটা, নকল পুলিশ অফিসারকে দেখালেন তিনি। আমাকে অনেক হমকি দিয়েছে। প্রশ্নের জবাব না দিলে নাকি টর্চার করে মেরে ফেলবে। কিছুতেই মুখ খুলিনি আমি।
তীব্র ঘৃণা ফুটলো লোকটার চোখে। থুহ করে থুথু ফেললো আরকিওলজিস্টের পায়ের কাছে। দাঁতে দাঁত চেপে বললো, ভেবো না পার পেয়ে গেছো! আমার দলের লোকেরা এখনও মুক্ত রয়েছে। কিছু একটা করবেই ওরা।
আর করবে কচু, বুড়ো আঙুল দেখালো কিশোর। তোমাদেরকে পাবে তো। ঠিকই কথা বের করে নেবে পুলিশ। ঘাড় ধরে টেনে আনবে তোমার দোস্তদের। শয়তানী করা বের করে দেবে।
প্যাজকুমারোতে পৌঁছে সোজা থানায় চলে এলো ওরা। সঙ্গে সঙ্গে হাজতে ঢোকানো হলো দুই আসামীকে। হুগো আর নিটো কিশোরদেরকে বললো, ওরা দ্বীপে ফিরে যেতে চায়। তাদের কাজের জন্যে অনেক ধন্যবাদ দিলো কিশোর, পারিশ্রমিক দিতে চাইলো।
মাথা নাড়লো হুগো। কি যে বলো। জীবনে এই প্রথম আসামী ধরার সুযোগ পেয়েছি। সমাজের একটা উপকার করলাম। এ-তো আমার ভাগ্য। তোমাদের মতো সাহসী ছেলে যদি কিছু আমাদের এখানেও থাকতো, অনেক ভালো হতো।
ধন্যবাদ বিনিময় চললো কিছুক্ষণ। তারপর চলে গেল জেলে দুজন।
তিন গোয়েন্দা আর সিনর স্টেফানোর মুখে ঘটনার বৃত্তান্ত শুনলেন থানার ইনচার্জ। মেকসিকো সিটি আর অকজাকায় লোকদুটোকে খুঁজছে পুলিশ, একথা শুনে টেলিফোন করলেন দুটো শহরের পুলিশকে। তারপর রিসিভার নামিয়ে রেখে ফিরে এলেন হাসিমুখে।
তোমাদের জন্যে একটা সুখবর আছে, বললেন তিনি। দলের নেতা হুবার্ট রিগোকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে মেকসিকো সিটিতে।

হুবার্ট রিগো! তিক্তকণ্ঠে বললেন স্টেফানো। এতোক্ষণে বুঝতে পারলাম, ওরা এতো কিছু জানলো কার কাছে। আমার কথা, ছুরিটার কথা। লোকটা আমার গাইউ ছিলো। বহু বছর সঙ্গে থেকেছে।

আরও খবর আছে, অফিসার জানালেন। তিন গোয়েন্দার দিকে ফিরে বললেন, মিস্টার সাইমনের পাইলটকে যে কিডন্যাপ করেছিলো, তাকেও ধরা হয়েছে। ওর দলের লোকেরাই আমেরিকান সেজে ছদ্মনামে ফোন করেছিলো পুলিশ আর পেপারকে, সিনর স্টেফানোর মৃত্যুর মিথ্যে সংবাদ দিয়েছিলো।

যাক, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো কিশোর। তবে আরও দুজন বাকি রয়ে গেছে। তিন ভ্যাকুয়ামোর একজন ধরা পড়েছে, হাজতের দিকে দেখালো সে। বাকি রয়েছে… ধরবো। যাবে কোথায়?

অফিসারের কাছে শুনলো ওরা, পুলিশের কাছে সব স্বীকার করেছে হুবার্ট রিগো। এক কোটিপতি নাকি তাকে লোভ দেখিয়েছিলো, ছুরিটা বের করে দিতে পারলে অনেক টাকা দেবে। চুরি করে কিংবা অন্যভাবে আরও প্রাচীন জিনিস জোগাড় করে ওই লোককে দিয়েছে রিগো। অ্যাজটেকদের জিনিস সংগ্রহের নেশা কোটিপতি লোকটার।

সিনর স্টেফানোকে নিয়ে থানা থেকে বেরোলো তিন গোয়েন্দা। ফিরে এলো হোটেলে। প্রথমেই গোসল সেরে নিলো সবাই। খাওয়া শেষ করলো। তারপর বিশ্রাম নিতে এলো। বিছানায় শুয়ে পড়লেন আরকিওলজিস্ট। কেন তাকে খুঁজতে এসেছে এতোক্ষণে জানানোর সুযোগ পেলো ছেলেরা। সংক্ষেপে সব জানানো হলো তাকে।

মন দিয়ে শুনলেন স্টেফানো। ছেলেরা তাদের কথা শেষ করলে বললেন, এবার তাহলে আমার গল্প শোনো। মাস দুই আগে একদিনের কথা। বিরক্ত করে তুলেছিলো আমাকে রিগো। তাকে বরখাস্ত করলাম। হোটেলের ঘরে বসে ফোনে আলাপ করছি রেডফোর্ডের সঙ্গে, হঠাৎ দেখি জানালা দিয়ে আড়িপেতে আমার কথা শুনছে রিগো। আমার মনে হয় সেদিনই ছুরিটার কথা শুনে ফেলেছিলো সে, চুরি করার মতলব এটেছিলো। প্রায়, হাজার বছরের পুরানো জিনিস ওটা। অনেক টাকার জিনিস।

দম নেয়ার জন্যে তিনি থামলে কিশোর বললো, আপনি মিস্টার রেডফোর্ডকে ধার দিয়েছিলেন ছুরিটা। আপনারা দুজন আর রিগো বাদে কি আর কেউ জানতো এটা?

মনে হয় না। জানার কোনো উপায় ছিলো না। পাওয়ার পর আর কাউকে বলিনি আমি।

মুসা জিজ্ঞেস করলো, ছুরিটা দেখতে কেমন?

খুব সুন্দর। আগ্নেয় শিলায় তৈরি ফলাটা। এখনও অনেক ধার। সোনার তৈরি বাট। তাতে ডানালা সাপের ছবি খোদাই করা। নীলকান্তমণি আর চুনি, পাথর খচিত।

তিন বছর আগে পুরানো অস্ত্র জোগাড় করতে এদেশে এসেছিলো রেডফোর্ড। আমার সংগ্রহ দেখলো। অনুরোধ করতে লাগলো ছুরিটা দেয়ার জন্যে। বিক্রি করতে রাজি হলাম না আমি। বললাম, জিনিসটা আমার দেশের সম্পত্তি। স্টেট মিউজিয়ামে দিয়ে দেবো। অবশেষে অনেক চাপাচাপি করে আমাকে রাজি করালো, কিছুদিনের জন্যে ধার দিতে। আমি তাকে বিশ্বাস করতাম। পাঁচ বছরের জন্যে ছুরিটা তার সংগ্রহে রাখতে চেয়েছিলো। দিয়ে দিলাম।

ছুরিটা কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন মিস্টার রেডফোর্ড, কিশোর জিজ্ঞেস করলো। জানেন আপনি?

না। বলেনি। আমিও শোনার দরকার মনে করিনি। বের করতে পারেনি এখনও কেউ?

মনে হয় না।

মুখ কালো করে ফেললেন স্টেফানো। দেয়াই উচিত হয়নি। বের করতে না পারলে… কিন্তু কি করবো? এমন চাপাচাপি শুরু করলো!

ভাববেন না, কিশোর বললো। অন্য কারো হাতে চলে না গিয়ে থাকলে ঠিকই বের করে ফেলবো।

হ্যাঁ, হেসে বললো রবিন। লুকানো জিনিস বের করতে ওস্তাদ আমাদের কিশোর পাশা। ধরে নিতে পারেন, পেয়ে গেছেন। আচ্ছা, আরেকটা কথা এসবের মধ্যে পিকো আলভারো এলো কিভাবে? উইলে তার নামও রয়েছে।

এক মুহূর্ত ভাবলেন আরকিওলজিস্ট। বললেন, জিনিসটার কথা গোপন রেখে একজন সাক্ষি রাখতে চেয়েছিলাম। আমার আর রেডফোর্ডের মাঝে যে একটা চুক্তি হয়েছে একথাই শুধু জানবে তৃতীয় লোকটি, কি জিনিসের ব্যাপারে তা জানানো হবে না। রেডফোর্ডের কিছু হলে আমাকে চিনিয়ে দেয়ার জন্যেও একজনকে দরকার। আলভারোকে সেই তৃতীয় লোক হিসেবে বেছে নিলাম দুজনেই। রেডফোর্ড মারা গেছে শুনে, সত্যি, খুব কষ্ট লাগছে, দীর্ঘশ্বাস ফেললো স্টেফানো। আমার সঙ্গে বেঈমানী করেনি। গোপন রেখেছে ছুরির কথা। তোমাদের সঙ্গে রকি বীচে যাবো আমি। ছুরিটা আনার জন্যে। ওটা খোঁজার ব্যাপারেও তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারবো।

খুব ভালো হয় তাহলে, কিশোর বললো। মিস্টার রেডফোর্ডের বাড়িতে ছবির যেসব স্লাইড পেয়েছে ওরা, জানালো সিনর স্টেফানোক। একটা ছবি ভোলা হয়েছে একটা বাগানে।

বুঝতে পেরেছি। মেকসিকো সিটির বাইরে, একটা কটেজ ভাড়া নিয়েছিলো। রেডফোর্ড। ওখানে তোলা হয়েছে।
আরেকটাতে অ্যাজটেক যোদ্ধার পোশাকে দেখা গেছে আপনাকে, হেসে বললো মুসা।
স্টেফানোও হাসলেন। পিরামিড অভ দি সানের কাছে ইনডিয়ানদের একটা অনুষ্ঠান হচ্ছিলো সেদিন। আমিও যোগ দিয়েছিলাম তাতে। ইউনিভারসিটির কয়েকজন প্রফেসর ধরলেন, আমার ছবি তুলবেন। তোলা হলো। রেডফোর্ডও তুলছিলো। অনেক পুরানো একটা পোশাক পরেছিলাম সেদিন।
মিস্টার সাইমনকে ফোন করা হলো। সব শুনে খুব খুশি হলেন তিনি। সিনর স্টেফানো তিন গোয়েন্দার সঙ্গে আসছেন শুনে আরও খুশি হলেন। বললেন, প্লেন পাঠানোর ব্যবস্থা করবেন।
পরদিন মেকসিকো সিটিতে পৌঁছলো ওরা। প্লেন অপেক্ষা করছে। তাকে যে কিডন্যাপ করেছিলো, সেই লোকটা হাজতে শুনে ল্যারি কংকলিনও খুশি হলো।
রকি বীচে পৌঁছার পরদিন সকালে দল বেঁধে মিস্টার রেডফোর্ডের বাড়িতে গেল সবাই–তিন গোয়েন্দা, মিস্টার সাইমন, উকিল মিস্টার নিকোলাস ফাউলার এবং সিনর এমিল ডা স্টেফাননা। গাছের গায়ে যে তীর চিহ্নগুলো রয়েছে, সেগুলো দেখার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে কিশোর। ও হ্যাঁ, রকি বীচে আসার পর সাইমন জানিয়েছেন, গাছটাতে আরও কতগুলো তীর আঁকা রয়েছে। এতো সূক্ষ্মভাবে, খুব ভালো করে না দেখলে চোখে পড়ে না।
অনেকক্ষণ ধরে ওগুলোকে দেখলো কিশোর। ঘন ঘন চিমটি কাটলো নিচের ঠোঁটে। তারপর সাইমনকে বললো, একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছেন? তীরগুলো সব একই দিক নির্দেশ করছে। আর মাথাগুলো নিচের দিকে ঝোকানো। কোন জায়গায় খুঁজতে হবে, তাই বোঝাতে চাইছে, না? আর অ্যাজটেক যোদ্ধার ছবিটা দিয়ে বোঝাতে চেয়েছে ওদিকে রয়েছে জিনিসটা।
হ্যাঁ, ইঙ্গিতটা পরিষ্কার, সাইমন বললেন। তীরের মাথা নিচের দিকে ঝোঁকানো। তার মানে মাটির নিচে খুঁজতে বলেছে। খোঁজা তো আর বাদ রাখিনি।
মাটির নিচে বলতে মাটিতে পুঁতে না রেখে মাটির তলার ঘরও তো হতে পারে। সেলার? ওদিকেই তো।
দীর্ঘ একটা নীরব মুহূর্ত কিশোরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন ডিটেকটিভ। তারপর ঝট করে দৃষ্টি ফেরালেন তীরের মাথা যেদিকে করে রয়েছে সেদিকে। হাঁটতে শুরু করলেন। তার পিছু নিলো তিন গোয়েন্দা।
সেলারে এসে ঢুকলো ওরা। শুরু হলো খোঁজা। তন্ন তন্ন করে খুঁজেও পাওয়া গেল না ছুরিটা। চারপাশে তাকাতে লাগলো কিশোর। কোথায় হতে পারে? সেলারের

কথাই বোঝানো হয়েছে কোনো সন্দেহ নেই তার। একধারে একটা পাইপ রয়েছে। নেমে এসেছে ওপর থেকে। ফুটখানেক নেমে বেরিয়ে গেছে দেয়াল কুঁড়ে। সেটার দিকে পুরো একটা মিনিট স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো সে। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটলো। তারপর আনমনেই বললো, এটা এখানে কেন? এ পাইপের কি দরকার? এটার তো কোনো কাজ নেই! বুঝেছি! তুড়ি বাজালো সে। সাইমনের দিকে তাকিয়ে বললো, আসুন আমার সঙ্গে।

বাইরে বেরোলো কিশোর। পাইপটা যেদিকে দিয়ে বেড়িয়েছে সেখানকার মাটি খুঁড়তে শুরু করলো। বেরিয়ে পড়লো পাইপটা। মাটির নিচ দিয়ে চলে গেছে পুব দিকে। রবিন আর মুসাকেও হাত লাগাতে অনুরোধ করলো সে। খুঁড়তে খুঁড়তে এগিয়ে চললো।

দশ ফুট দূরে একটা ঝোপের ভেতরে গিয়ে শেষ হয়েছে পাইপ। কংক্রীটের গাঁথুনি দিয়ে একটা ছোট বাক্সমতো তৈরি করা হয়েছে পাইপের মাথার কাছে। বাক্সের ওপর গোল একটা লোহার ঢাকনা। ঢাকনার মাথায় আঙটা। পানি নিষ্কাশনের পাইপের মাথায় যেমন জয়েন্ট বক্স তৈরি করা হয়, সেরকম। কেউ দেখে কিছু সন্দেহ করতে পারবে না।

আঙটা ধরে টান দিতেই উঠে এলো ঢাকনাটা। ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিলো কিশোর। পানি নেই। খটখটে শুকনো। আসলে পানি যাওয়ার জন্যে বসানো হয়নি পাইপটা। বের করে আনলো সুন্দর করে অয়েল পেপারে মোড়া একটা প্যাকেট। না খুলেই বলে দেয়া যায় ভেতরে কি রয়েছে। নীরবে সেটা সিনর স্টেফানোর হাতে তুলে দিলো সে।

কাঁপা হাতে প্যাকেটটা খুলতে লাগলেন আরকিওলজিস্ট। সবাই তাকে ঘিরে এসেছে। আগ্রহে উত্তেজনায় চকচক করছে সকলেরই চোখ।

বেরিয়ে পড়লো অ্যাজটেক যোদ্ধার সম্পত্তি। ছবিতে যেরকম দেখেছে গোয়েন্দারা, সেরকমই, তবে অনেক বেশি সুন্দর। আলো পড়লেই ঝিক করে উঠছে নীলকান্তমণি আর রুবি পাথরগুলো।

সুন্দর! প্রায় ফিসফিসিয়ে বললেন ফাউলার। চোরেরা যে পিছু লেগেছিলো, এ-কারণেই। সিনর স্টেফানো, অনেক দাম এটার, তাই না?

হাসি ফুটেছে আরকিওলজিস্টের মুখে। অনেক! অ্যানটিক মূল্য! মাটি খুঁড়ে একবার বের করেছিলাম আমি, আরেকবার বের করলো এই ছেলেগুলো! সত্যি, এরা জিনিয়াস! আমি ওদের কাছে কৃতজ্ঞ।

কৃতজ্ঞ শুধু আপনিই নন, সিনর, উকিল বললেন। আরও অনেকেই হবে। মিস্টার রেডফোর্ডের উইলে যাদের যাদের নাম লেখা রয়েছে, তারা সবাই। কারণ এখন আর সম্পত্তি ভাগাভাগি করে নিতে কোনো অসুবিধে হবে না ওদের।

***

ভলিউম ০১৭ – ঈশ্বরের অশ্রু – তিন গোয়েন্দা – রকিব হাসান – সেবা প্রকাশনী
প্রথম প্রকাশ: আগস্ট, ১৯৯২
সাবধান! তিন গোয়েন্দাকে হুঁশিয়ার করল হেনরি বেসিন, একটু এদিক ওদিক হলেই কিন্তু খেপে যাবে বুড়োটা।
এমনিতে হাসিখুশি লোক বেসিন। রসিক। কিন্তু এখন ভুরু কুঁচকে রেখেছে। ওই শকুনটা, বললো সে। এমন কিপটের কিপটে, পয়সাই ছাড়তে চায় না। তাই তোমাদের ইউনিফর্ম ঠিকমত করে দিতে পারলাম না। কিশোর, জ্যাকেটটা ঢলঢলে হয়েছে।
হাতের ট্রেটা নামাল কিশোর। চীজ পাফ আর রুমাকিগুলো সরিয়ে রাখল। তারপর তাকাল গায়ের শাদা ওয়েইটারের পোশাকটার দিকে। তার চেয়ে অনেক মোটা লোকের পোশাক এটা। সব জায়গাতেই ঢোলা। বিশেষ করে দুই কাঁধ থেকে হাতা অনেকখানি ঝুলে পড়েছে।
এর বেশি আর কিছু দিতে পারছি না, বেসিন বলল। ছোট আরেকটা আছে অবশ্য, তবে সেটা গায়েই লাগবে না তোমার। নাহ্, এভাবে আর পারা যায় না।
কিশোরের পেছনে রয়েছে মুসা। তার হাতেও ট্রে। তাতে ক্যারট স্টিক আর ডিপ। তার জ্যাকেটটা এত খাটো হয়েছে, প্রায় কোমরের কাছে উঠে এসেছে। কনুইয়ের সামান্য নিচে হাতা, কবজি থেকে অনেক দূরে। অনেকটা কাকতাড়ুয়া পুতুলের মত লাগছে তাকে।
আর রবিনেরটা তো সব চেয়ে ঢোলা। এমনকি কিশোরেরটার চেয়েও। হাতা গুটিয়ে রাখতে হয়েছে। নইলে আঙুল সহ ঢেকে যায়। হাতে ট্রে। বেঢপ লাগছে। শরীরটা পোশাকের কারণে।
ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল বেসিন। আর কিছু করার নেই আমার। যাও, মেহমানদের খাবার দাও। লিসটারের সামনে না পড়লেই হবে। কিছু ভাঙলে নিজের দায়িত্বে ভাঙবে। আমি কিছু করতে পারব না। এক ফোঁটা চা ফেলে দিলেও মুণ্ডু চিবিয়ে খাবে বুড়োটা।
রান্নাঘরের দরজা খুলে দিল বেসিন। ট্রে নিয়ে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা। লিভিং রুমের গেস্টদেরকে খাবার বিতরণ করতে লাগল। পুরনো আমলের ঘর। মানুষগুলোও পুরনো। পুরনো আসবাব আর তাক বোঝাই জিনিসপত্র কেমন অস্বস্তি জাগায়। বাগানের দিকের ফ্রেঞ্চ উইণ্ডোগুলো খোলা। ফুরফুর করে ঢুকছে জুনের উষ্ণ হাওয়া। গরম লাগছে তিন গোয়েন্দার। অস্বস্তিতে শক্ত হয়ে গেছে শরীর, নড়তে চাইছে না যেন হাত পা। শক্ত করে ধরে রেখেছে ট্রে, একটু খাবারও যাতে না পড়ে সেদিকে কড়া নজর। ভীষণ বদমেজাজী ডেভিড লিসটারের গালাগাল শুনতে চায় না।

মিস্টার লিসটারের সঙ্গে পরিচয় হয়নি ওদের। দেখাই হয়নি। তবে তার সম্পর্কে এত কথা শুনেছে, দেখা করার প্রচণ্ড ইচ্ছে। ওয়েস্ট কোস্টের একজন কোটিপতি তিনি। রকি বীচে তার প্রতিবেশী এবং তার সঙ্গে যাদের ব্যবসার সম্পর্ক আছে, তাদের কেউই ভাল বলে না। আর এমন কিপটের কিপটে, নব্বইটা সেন্ট পেলে না খেয়ে জমিয়ে রেখে দেয় এখনও, আরও দশটা সেন্ট জোগাড় করে পুরো একটা ডলার করার জন্যে।

পার্টিতে সাহায্য করার জন্যে তিন গোয়েন্দাকে ভাড়া করেছে হেনরি বেসিন। কিছুটা বেপরোয়া হয়েই। কারণ ওই খরচের টাকাটাও লিসটারের কাছ থেকে আদায় করতে ঘাম ছুটবে তার। শহরের নতুন এবং সবচেয়ে অল্প বয়েসী ক্যাটারার সে। এতদিন ছোটখাট কাজ করেছে। এই প্রথম লিসটারের বাড়িতে পার্টির মত বড় একটা কাজ পেয়েছে। কাজেই নাম করার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছে সে। তার সঙ্গে মোটামুটি পরিচয় আছে তিন গোয়েন্দার। স্যালভিজ ইয়ার্ডে পুরনো জিনিস কিনতে যায়। লিসটারের নাম তিন গোয়েন্দাও শুনেছে। কেমন লোক দেখার ইচ্ছে কিশোরের অনেক দিনের। কথায় কথায় বেসিনের কাছে যখন শুনল, পার্টিতে সাহায্য করার জন্যে লোক খুঁজছে, ওয়েইটারের কাজটা দেয়ার জন্যে চেপে ধরল তাকে। লিসটারের বাড়িতে ঢোকার এইই সুযোগ। কম পয়সায়, কাজের লোক পেয়ে বেসিনও রাজি হয়ে গেল। ওরকম কিপটে লোকের বাড়িতে যেতে মুসা প্রথমে রাজি হতে চায়নি। অনেক বলেকয়ে তাকে রাজি করিয়েছে কিশোর। রবিনের ব্যাপারটা অন্যরকম। গানের কাজ একঘেয়ে লাগতে আরম্ভ করায় কিছুদিন ছুটি নিয়েছে সে। তাছাড়া বেশ কিছুদিন থেকে তিন গোয়েন্দার সঙ্গে তেমন যোগাযোগ রাখতে পারছে না। দক্ষিণ সাগরে যেতে পারেনি। এখন আবার মনপ্রাণ দিয়ে লেগে গেছে পুরনো কাজে।

হেনরি বেসিনকে কন্ট্রাক্ট করেছে লিসটার খরচ বাঁচানোর জন্যে। বড় এবং নামী ক্যাটারার ভাড়া করতে চাইলে অনেক খরচ। কড়া হুকুম দিয়ে দিয়েছে যত, কম খরচে সম্ভব পার্টি শেষ করতে হবে। ওয়েইটার নিয়ে শুরু হয়েছে খেঁচাখেঁচি। কজন লাগবে সেটা নিয়ে। অনেক চাপাচাপি করে তারপর লিসটারকে রাজি করাতে পেরেছে বেসিন। তবে এক শর্তে, সব চেয়ে কমদামী ওয়েইটার নিয়োগ করতে হবে।

তা-ই করেছে বেসিন। আর এ কারণেই বাগানে যে মেয়েগুলো টেবিল সাজাতে ব্যস্ত, ওরা সব রকি বীচ হাই স্কুলের ছাত্রী। বারটেনডারের দায়িত্বে রয়েছে যে ছেলেটা, সে লস অ্যাঞ্জেলেসের কাপ অভ চিয়ার বারটেনডিং স্কুলের একজন শিক্ষানবিস। আর পিকো নামের যে ভবঘুরে লোকটা বাসন ধোয়ামোছার কাজ

করছে, তাকে রাস্তা থেকে ধরে এনেছে বেসিন। একটা মিশনারির কাছে ঘুরঘুর করছিল খাবারের লোভে।
ওয়েইটার রাখা হয়েছে তিন গোয়েন্দাকে। টাকার জন্যে আসেনি। এত কম দামে কেউ ওয়েইটারের কাজ করতে রাজি হত না। ওরা হয়েছে শুধু কৌতূহল মেটানোর জন্যে।
ডেভিড লিসটার রহস্যময় মানুষ। রকি বীচে কিংবদন্তী হয়ে উঠেছেন। নিঃসঙ্গ মানুষ। একা থাকতে পছন্দ করেন। মকিংবার্ড লেনে তার বাড়িটা যেন একটা পোড়োবাড়ি। বাগানটাকে বলা যায় লতাপাতার জঙ্গল। আর কিছুদিন ওভাবে পড়ে থাকলে দক্ষিণ আমেরিকার ইতুরি জঙ্গল হয়ে যাবে। লোকে বলে, ঢুকলে গা ছমছম করে। ভূতের বাসা। মুসা যে রাজি হতে চায়নি আসতে এটা একটা কারণ।
লিসটারের মেয়ে এলিনার সম্মানে দেয়া হচ্ছে এই পার্টি। বৃদ্ধের একমাত্র মেয়ে সে। বোর্ডিঙে থেকে স্কুলে পড়ত। ফলে রকি বীচের ছেলেমেয়েরা তার সঙ্গে পরিচিত হতে পারেনি, বন্ধুত্ব করতে পারেনি। এখন পুবের একটা কলেজে পড়ে। গোপনে তিন গোয়েন্দাকে বলেছে বেসিন, মেয়েটা এই পার্টিতে তার এনগেজমেন্টের খবরও ঘোষণা করতে পারে। বেসিন নিশ্চিত, ভাবি জামাইকে দুচোখে দেখতে পারবেন না লিসটার। এই পার্টি দেয়ারও ইচ্ছে ছিল না তার, মেয়ের চাপে বাধ্য হয়েছেন।
সারাক্ষণ গজগজ করছে বুড়ো, বেসিন বলেছে। এসব নাকি টাকা পানিতে ফেলার ফন্দি। চাপে পড়ে রাজি হয়েছে বটে, তবে যতটা সম্ভব কম টাকা খরচ করে কোনমতে কাজটা সারতে চায়। কিছু সাধারণ খাবার আর কয়েকজন তৃতীয় শ্রেণীর মিউজিশিয়ানকে ভাড়া করেছে, যেনতেন ভাবে মেয়েকে খুশি করতে পারলেই বাঁচে। তার ইচ্ছে, মেয়েকে বুঝিয়ে শুনিয়ে, মেয়ের ফিয়াশেকে ভয় দেখিয়ে, দুজনকে আলাদা করবে। তারপর ওয়াল স্ট্রীটের কোন বড় ব্যবসায়ীর ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবে। মেয়েকে ব্যবসায় ঢোকাবে। এগুলো সবই অবশ্য আমার অনুমান।
সমস্ত কথা মনে পড়ছে কিশোরের। কলরব করছে মেহমানরা। কেন যে এত কথা বলে লোকে বুঝতে পারে না সে। অহেতুক বকবক করে। চীজ পাফ সরবরাহ করতে লাগল ওদেরকে। অবাক হয়ে ভাবছে কোন মানুষটা ডেভিড লিসটার। বেশির ভাগই মাঝবয়েসী। সে শুনেছে, লিসটারের বয়েস সত্তর। মেহমানদের পরনে দামী পোশাক। দামী দরজির দোকান ঘুরে এসেছে। অনেক খরচ পড়েছে তার জন্যে। এরকম দামী পোশাক লিসটারের পরনেও থাকবে, আশা করতে পারল না সে।

হাসাহাসি করছে মেয়েরা। উচ্চকণ্ঠে কথা বলছে। চেঁচাচ্ছে। গান গাইছে। যা ইচ্ছে করছে। ওদেরই কেউ একজন হবে এলেনা লিটার। হয়ত চুলের রঙ হবে লাল, পরনে শাদা পোশাক। কিংবা হতে পারে সোনালি চুল, তাতে গোলাপী আভা। ওই যে সোনালি চুল, নীল পোশাক পরা মেয়েটা কথা বলছে ধূসর সিল্ক পরা মহিলার সঙ্গে সে-ও হতে পারে এলেনা। কেমন যেন বিধ্বস্ত লাগছে। মহিলাকে। যখন পাশের মসৃণ চেহারার তরুণের সঙ্গে কথা বলার জন্যে ঘুরল মেয়েটা, ছাতের দিকে নিস্পৃহ চোখে তাকিয়ে রইলেন মহিলা। অমনোযোগী। হঠাৎ হাত উঠে গেল গলার কাছে। ঈশ্বরের অশ্রু

ওপরে তাকাল কিশোর। এক কোণে মাকড়সার জাল ঝুলে রয়েছে। কে। জানি একটা শুয়াপোকা মেরেছিল, দেয়ালে লেপ্টে রয়েছে এখনও।

বিরক্তিতে কুঁচকে গেল মহিলার মুখ, দ্রুত চোখ সরিয়ে নিলেন। হাসি চাপতে কষ্ট হল কিশোরের। গোয়েন্দাগিরির চেয়ে অনেক বেশি কঠিন ওয়েইটারের কাজ, এখন তাই মনে হল। তবে আনন্দ পাচ্ছে।

হঠাৎ, মিউজিশিয়ানরা সবে একটা বাজনা শেষ করেছে, এই সময় একটা গেলাস ভাঙল একটা মেয়ে। সঙ্গে সঙ্গে জেনে গেল কিশোর, ডেভিড লিসটার কার নাম। লম্বা, তালপাতার সেপাই, ধূসর চুল, কালো মলিন স্যুট পুরনো হতে হতে চকচকে ভাবটাই নষ্ট হয়ে গেছে। এক কোণ থেকে ছুটে এলেন তিনি। রাগে চিৎকার করে ছুটলেন বাগানের দিকে। কিশোরের মনে হল, মেয়েটাকে ধরে মারবেনই বুঝি লিসটার। শেষ মুহূর্তে সামলে নিলেন। বকা দিলেন, গায়ে জোর নেই? খাও না? বিড়বিড় করে আরও কি বললেন, বোঝা গেল না। কড়া চোখে তাকিয়ে রইলেন মেয়েটার দিকে।

আব্বা, রাগটা একটু কমাও, বলে লিসটারের দিকে এগিয়ে গেল নীল পোশাক পরা মেয়েটা।

এলেনা? মেয়েটাকে আটকানোর জন্যেই বোধহয় হাতটা বাড়িয়ে ছিলেন ধূসর চুল মহিলা, সরিয়ে নিলেন। মসৃণ চেহারার যুবকের দিকে তাকিয়ে বললেন, নিক, দেখলি! একটা লোক বটে!

এগিয়ে গেল যুবক। এলেনা, দাঁড়াও। মিস্টার লিসটার, শান্ত হোন। মেয়েটা তো আর ইচ্ছে করে ফেলেনি। আপনি…

ফিরেও তাকালেন না লিসটার। গটমট করে গিয়ে রান্নাঘরের দরজা খুললেন ধাক্কা দিয়ে। দরজা জুড়ে দাঁড়ালেন।

তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। সাংঘাতিক ব্যস্ত বেসিন। চুলার কাছ থেকে দৌড়ে যাচ্ছে টেবিলের কাছে, আবার টেবিল থেকে চুলার কাছে। অনেকগুলো প্লেটে খাবার সাজাতে হচ্ছে। একগাদা বাসন সিংকে ফেলে ধুচ্ছে ভবঘুরে লোকটা।

হেনরি, চিৎকার করে উঠলেন লিসটার। কোত্থেকে কি ধরে এনেছ! ওই গর্দভ মেয়েটাকে বের কর আমার বাড়ি থেকে! ওই গেলাসের দাম রেখে দেবে ওর কাছ থেকে! নইলে তোমার টাকা থেকে কাটব।
আব্বা, শান্ত হও না, আহ! পেছনে গিয়ে দাঁড়াল মেয়ে। এমন কাণ্ড শুরু করলে! আমার পার্টিই তো শেষ করবে। এসো। এই, আব্বা। প্লীজ! লিসটারের হাত ধরে টান দিল এলেনা। এ কিন্তু চিৎকার বন্ধ করার ইচ্ছে নেই লিসটারের। ফিরে তাকাল পিকো। হাতে একগাদা বাসন। তাকিয়ে রয়েছে ভদ্রলোকের চোখের দিকে। এতগুলো বাসন। একসঙ্গে নেয়াই বোধহয় ঠিক হয়নি, কিংবা অন্য কোন কারণে গেল একটা। পিছলে। ব্যস, বাকিগুলোও মেঝেতে পড়ে ভাঙল ওটার সঙ্গে সঙ্গে।
লিসটারের চিৎকারে সব আলাপ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল আগেই। নীরবতার মাঝে প্রচণ্ড শব্দ হল বাসন ভাঙার। ঝনঝন করে।
হাঁ হয়ে গেলেন লিসটার।
আব্বা, তোমার জন্যেই এমন হল? চেঁচিয়ে উঠল এলেনা। তুমি...তুমি... আব্বা!
বুক চেপে ধরেছেন লিসটার। ভঁজ হয়ে যাচ্ছে হাঁটু।
আমি আগেই বলেছি। এজন্যেই রাগতে মানা করেছি। আব্বা? আব্বা? কডি, জলদি এস! বেহুশ হয়ে যাচ্ছে!
বাবার কোমর জড়িয়ে ধরল এলেনা।

.
লিভিং রুম থেকে দৌড়ে এল কালোচুল এক তরুণ। সে আর বেসিন মিলে মেঝে থেকে তুলল লিসটারকে। ডাইনিং রুম থেকে একটা চেয়ার এনে পেতে দিল। এলেনা, তাতে বসান হল তার বাবাকে।
আব্ব, কতবার মানা করলাম তোমাকে! রাগে, দুঃখে প্রায় কেঁদে ফেলল। এলেনা। আমি জানতাম এরকম একটা কিছু করবে।
ডাক্তার কই? চেঁচিয়ে উঠল মোটা এক মহিলা। সব কিছু ঠিক করার দায়িত্ব যেন এখন তারই। এগিয়ে এসে লিসটারের নাড়ি দেখল। টেলিফোন কোথায়? ডাক্তারকে ফোন করছি।
না! চিৎকার করে বলল লিসটার। হুশ ফিরেছে। ডাক্তার লাগবে না! লাগবে
ঝুঁকে দাঁড়াল কালোচুল তরুণ। মিস্টার লিসটার, আমরা আপনাকে সাহায্য করতেই চাইছি...
আমি বলেছি ডাক্তার লাগবে না আমার! খেঁকিয়ে উঠলেন লিসটার। ইডিয়ট!
কিছুই মনে করল না তরুণ। যেন শুনতেই পায়নি। দেখেশুনে কিশোরের মনে হচ্ছে লিসটারের স্বভাবই হল মানুষকে অপমান করা। কিন্তু একজন মেহমান এই

অপমান সইবে কেন?
এই সময় নিচু গলায় একজনকে বলতে শুনল, ছেলেটার নাম কডি হোয়েরটা। লিটারের পারসনাল সেক্রেটারি।
আজকাল চাকরি পাওয়াটা বোধহয় কঠিনই হয়ে উঠেছে, শুকনো মন্তব্য করল আরেকজন।
ওপরে! লিসটার বললেন, ওপরে নিয়ে চল আমাকে! কয়েক মিনিট শুয়ে থাকলেই ঠিক হয়ে যাব।
মেহমানদের দিকে তাকাল কডি। মুসার ওপর চোখ পড়ল। অস্বাভাবিক খাটো ওয়েইটারের পোশাক পরে বুফে টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। এই, তাকে ডাকল সেক্রেটারি। এস তো। ধর।
টেবিলে ট্রে রেখে লিসটারের কাছে এসে দাঁড়াল মুসা। সে আর কডি মিলে লিসটারকে ধরে তুলল। ধীরে ধীরে নিয়ে চলল সামনের হলের দিকে, সেখানে রয়েছে দোতলায় ওঠার সিঁড়ি। আগে আগে চলল এলেনা। মেহমানরা সরে পথ করে দিতে লাগল ওদেরকে।
একেবারে হালকা শরীর লিসটারের। যেন কোন ওজনই নেই। সিঁড়ি বেয়ে তুলতে বিন্দুমাত্র বেগ পেতে হল না। মুসা একাই পারত। বেডরুমে নিয়ে আসা হল তাকে। ঘরটা বাড়ির সামনের অংশে। জানালা দিয়ে পর্বত দেখা যায়।
আরাম করে বিছানায় শুইয়ে দেয়া হল লিসটারকে। লাগোয়া বাথরুমে গিয়ে ঢুকল এলেনা, বাবাকে এক গেলাস পানি এনে দেয়ার জন্যে। পানি এনে দিলে ঠেলে সরিয়ে দিলেন লিসটার। বিছানায় ছলকে পড়ল পানি। চেঁচিয়ে উঠলেন, নিট্রো! আমার নিট্রো কোথায়?
এই যে, আছে, একটা ড্রয়ার খুলল এলেনা। একটা ওষুধের শিশি বের করল।
খোল! জলদি কর! চাবুকের মত শপাং করে উঠল যেন লিসটারের কণ্ঠ। হাঁ। করে দাঁড়িয়ে আছ কেন, বলদের মত!
আব্বা, নিট্রো নয়, একদিন বিষ খাওয়াবো তোমাকে আমি। স্ট্রিকনিন। বিশ্বাস কর। শিশি ঝাঁকি দিয়ে উপুড় করল এলেনা। বাবার মেলে দেয়া হাতে। ফেলে দিল কয়েকটা ট্যাবলেট।
তা আর করতে দিচ্ছি না, লিসটার বললেন। উইলে কি লিখেছি ভাল করেই জান। আমার অস্বাভাবিক মৃত্যু হলে একটা কানাকড়িও আর পাবে না তুমি।
জিভের নিচে ট্যাবলেট রেখে দিয়ে চিত হয়ে শুলেন তিনি।
বাবা-মেয়ের এই ধরনের আলোচনায় অস্বস্তি লাগছে মুসার। বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে ঘুরতেই তার হাত চেপে ধরল এলেনা। তুমি থাক এখানে, আব্বার কাছে। আমি যাই। মেহমানদের দেখাশোনা করিগে। কডি, এস। আমি একা পারব না।

আতঙ্কিত হয়ে পড়ল মুসা। এত বদমেজাজী অসুস্থ একজন বুড়ো মানুষের কাছে থাকার কোন ইচ্ছেই তার নেই। মিস লিটার, বলতে গেল সে। ওখানে আমার কাজ…
এটাও কাজ, বাবার মতই খেঁকিয়ে উঠল এলেনা। এখানে থাকতে বলা হয়েছে, থাক।
কিন্তু…কিন্তু যদি ওঁর…মানে হার্ট বন্ধ হয়ে যায়…।
হবে না। এটা হার্ট অ্যাটাক নয়, অধৈর্য ভঙ্গিতে বলল এলেনা। একে বলে অ্যানজিনা। রক্তবাহী শিরা বিদ্রোহ করেছিল বলা যায়। তাতে হৃৎপিণ্ডে ঠিকমত অক্সিজেন পৌঁছতে পারেনি। বুক ব্যথা করছে সে কারণেই। ট্যাবলেট নিয়েছে, ঠিক হয়ে যাবে। ভয়ের কিছু নেই।
তোমার হলে বুঝতে! কটকট করে বললেন লিসটার, যার হয় সে-ই বোঝে। ভয়ের কিছু নেই তুমি জানলে কি করে?
জানার ব্যাপার, তাই জানলাম। গটগট করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল এলেনা।
মুসার দিকে তাকিয়ে হাসল হোয়েরটা, যেন তার জন্যে আফসোস হচ্ছে, তারপর বেরিয়ে গেল এলেনার পিছু পিছু।
নিথর হয়ে পড়ে আছেন লিস্টার। চোখ বোজা। বিছানার কাছে একটা আর্মচেয়ারে বসল মুসা। তাকিয়ে রয়েছে বৃদ্ধ মানুষটার দিকে। মুখের চামড়া ধূসর রঙের, তার মাঝে শিরাগুলো জেগে রয়েছে বেগুনী জালের মত। উঁচু, পাতলা নাক। বসা গাল। হাতের দিকে দৃষ্টি সরে গেল তার। একেবারে যেন কঙ্কাল, এক ছটাক মাংস আছে কিনা সন্দেহ। আড়াআড়ি ফেলে রেখেছে বুকের ওপর। যেন। কবর দেয়ার জন্যে শোয়ানো হয়েছে মানুষটাকে।
ভয় ধরে গেল মুসার। দ্রুত সরিয়ে নিল চোখ। দেখতে লাগল ঘরে কি আছে। গত শীতের পর বোধহয় আর পরিস্কার করা হয়নি ফায়ারপ্লেসটা। পিতলের কালো হয়ে যাওয়া বেড়ার ওধারে উঁচু হয়ে আছে ছাই। কাছে একটা পিতলের ঝুড়িতে রাখা কিছু লাকড়ি। আর একগাদা হলদেটে খবরের কাগজ। ওগুলো দিয়ে আগুন ধরাতে সুবিধে। ফায়ারপ্লেসের ওপরের ম্যানটেলপিসে সাজানো একটা জাহাজের মডেল, আর চীনামাটির মোমদানিতে দুটো মোম। সব কিছুতে ধুলো জমে রয়েছে। পুরু হয়ে।
লম্বা দম নিল মুসা। বাতাসে ধুলোর গন্ধ। দেয়াল, ময়লা পর্দা আর রঙচটা কার্পেট থেকেই হালকা কুয়াশার মত উড়ছে ওই ধুলো-তার ধারণা।
বড় একটা ড্রেসারের ওপরে ঝুলছে একটা আয়না, দাগ পড়া, হলদেটে। পেছনে জায়গায় জায়গায় পারা উঠে গেছে। ড্রেসারের পাশে দুটো ছোট আর্মচেয়ার রাখা। গদির রঙ উঠে গেছে। দেয়ালে ঝোলানো ছবিগুলোরও একই রকম করুণ

দশা। জাহাজ আর সাগরের ছবি–উত্তাল সাগরে চলেছে জাহাজ, ঢেউ আছড়ে ভাঙছে পাথুরে উপকূলে।
আর সর্বত্রই ছড়িয়ে রয়েছে যেন বুককে। দেয়াল ঘেঁয়ে, ড্রেসারের ধারে, চেয়ারের পাশে। বই উপচে পড়ছে ওসব কেসে। পেপারব্যাক, হার্ডকভার, ছোট বই, বড় বই, ভলিউম; খাড়া করে, কাত করে, শুইয়ে, যতোভাবে ঢোকানো সম্ভব, রাখা হয়েছে। আর আছে কাগজপত্র। রোল পাকিয়ে, চ্যাপ্টা করে, ভাজ করে, গুঁজে দেয়া হয়েছে বইয়ের ফাঁকে সামান্যতম জায়গা যেখানে পাওয়া গেছে। সেখানেই। আরও আছে বাদামী রঙের ম্যানিলা খাম আর ফোল্ডার, ছোট, বড়, বইয়ের মাথার ওপরের ফাঁকে, কিংবা পাশের অন্যান্য ফাঁকে। মা বিছানার দিকে তাকাল আবার মুসা। লিসটার মনে হয় ঘুমিয়ে পড়েছেন। কেমন খসখসে কাঁপা নিঃশ্বাস পড়ছে। তবে নিয়মিত। হাড্ডিসর্বস্ব আঙুলগুলো এখন আর মুঠো হয়ে নেই, খুলে রয়েছে বুকের ওপর।
উঠে একটা বুককেসের কাছে এসে দাঁড়াল মুসা। বইয়ের পেছনের নাম পড়ল। একটার নাম ব্লাডি মার্ডার। আরেকটার নাম শার্ক হান্টার। এডগার অ্যালান পো-র গল্প সংকলন রয়েছে কিছু। আরেকটা বইয়ের নাম দেখা গেল পোলারিস। ওটা টেনে বের করে খুলল সে। নাবিকদের গাইডবুক ওটা। সমুদ্রে নক্ষত্র দেখে কি করে জাহাজ চালাতে হয় তার ওপর লেখা।
গুঙিয়ে উঠলেন লিসটার। এমন চমকে উঠল মুসা যেন চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছে। বইটা আগের জায়গায় ঢুকিয়ে রেখে অপেক্ষা করতে লাগল। তাকিয়ে রয়েছে বুড়ো মানুষটার দিকে। কানে আসছে নিচতলায় মেহমানদের কণ্ঠস্বর। কতক্ষণ চলবে পার্টি? কতক্ষণ তাকে আটকে থাকতে হবে এখানে, এমন একটা বিরক্তিকর কাজে?
হাতের দিকে তাকাল সে। ধুলো-ময়লা লেগে গেছে। বুককেসটা কতদিন পরিষ্কার করা হয় না কে জানে। কয়েক মাস হতে পারে, কয়েক বছর হলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই।
বাথরুমে গিয়ে দরজা লাগিয়ে দিল মুসা। ওখানেও বই আছে। পুরনো আমলের বাথটাব আর ওয়াশবেসিনের পাশে একটা টেবিলে স্তূপ করে রাখা হয়েছে। নানা রকম গল্প আর প্রবন্ধের বইয়ের মাঝে রয়েছে কার্টুনের বই। অ্যাটমিক এনার্জির ওপর লেখা বইও আছে একটা। তার মানে যা পান তা-ই। পড়েন লিসটার, সব ধরনের বই। কিশোরকে বলার মত একটা খবর বটে।
কলের মুখ খুলে হাত ধুতে শুরু করল মুসা।
হঠাৎ স্পষ্ট শুনতে পেল তালা লাগানোর শব্দ।

এইই! টান দিয়ে তোয়ালে নিয়ে দরজার দিকে ছুটল সে। নব ধরে মোচড় দিল। নড়লও না। তালা লাগিয়ে দেয়া হয়েছে বাথরুমে।
নরম গলায় ডাকল সে, মিস্টার লিস্টার! মিস্টার লিসটার, দরজাটা খুলুন, প্লীজ!
কেউ জবাব দিল না।
আরও জোরে ডাক দিল, মিস্টার লিস্টার!
দরজার কাছ থেকে সরে গেল পদশব্দ। কাঠের পালায় কান রাখল মুসা। নিচতলা থেকে মেহমানদের কথা আর হাসি কানে আসছে। বাজনা বন্ধ। কাছেই
একটা দরজা খোলা হল। জোরাল হল নিচের কোলাহল।
মিস্টার লিস্টার!
কেউ সাড়া দিল না। দরজা খুলতে এল না কেউ।
অস্বস্তি লাগছে মুসার। ভয় লাগছে। বাথরুম ব্যবহার করায় কি রেগে গেলেন লিসটার? হয়ত ভেবেছেন মুসা চোরটোর কিছু। পুলিশকে খবর দিতে গেছেন?
বাথটাবের কিনারে বসে অপেক্ষা করতে লাগল সে। পুলিশ এলে বরং ভালোই।
আবার শোনা গেল পদশব্দ। একই রকম পায়ের আওয়াজ, আগের বার যেমন শুনেছিল। বাথরুমের দরজার কাছে এসে থামল। কিন্তু দরজা খুলল না।
বিচিত্র একটা শব্দ হল। মাটিতে পড়ে গেলেন বোধহয় লিসটার, কারও সঙ্গে ধস্তাধস্তি হচ্ছে। গুঙিয়ে উঠল কেউ, তারপর চুপ।
লাফ দিয়ে উঠে দরজার কাছে চলে এল মুসা। থাবা দিতে দিতে চিৎকার করে ডাকল, মিস্টার লিসটার!
কে এই সময় নিচে লিভিং রুমে আবার শুরু হল গানবাজনা। কোরাস গেয়ে উঠল রক দল, বেইবে, হোয়াই এইনটু ইউ মাই বেইবে নো মোর? জোরাল কণ্ঠ। সেই সাথে দ্রিম দ্রিম করে বাজছে ড্রাম।
মিস্টার লিসটার! গলা ফাটিয়ে চিৎকার করল মুসা, আপনি ঠিক আছেন?
বেজেই চলেছে বাজনা, গাইছে গায়কদের দল।
ঘামছে মুসা। আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। লাথি মারতে শুরু করল দরজায়।
জবাব দিচ্ছেন না কেন লিসটার? হার্ট অ্যাটাক হয়েছে? হয়ত মারা যাচ্ছেন এ মুহর্তে, এ দরজাটার ঠিক ওপাশেই।
এই কে আছ, শুনছো? চিৎকার করতে লাগল মুসা। বের কর! বের কর আমাকে।
কেউ শুনল না তার ডাক। কেউ এল না।
বেইবে, হোয়াই এইনট ইউ মাই বেইবে না মোর? প্রশ্নটা করে উপসংহার। টানল গায়কেরা, কিন্তু বাজনা বন্ধ হল না। আরেক সুরে চলে গেল। ড্রামের বিরতি নেই। গেয়ে উঠল ওরা, রকিং রকিং রকিং অল দা নাইট।

হতাশ ভঙ্গিতে দুম দুম করে দরজায় কিল মারতে লাগল মুসা। এখন কি করব? ভাবছে সে। একজন মানুষ ওদিকে মরতে বসেছে। সে জানতে পারছে কিন্তু কিছুই করতে পারছে না। করবটা কি এখন? কিশোরটা কোথায়?

শান্ত হয়ে বস, স্মৃতিতে বেজে উঠল যেন কিশোরের কণ্ঠ। মাথা ঠাণ্ডা রেখে। ভাব।

ঠিক! ভাবল মুসা। মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। ছোট ঘরটায় চোখ বোলাল। জানালায় দৃষ্টি আটকে গেল।

জানালা! হ্যাঁ, জানালা! পুরনো আমলের বাথরুমটায় একটা জানালা আছে। ওটার বাইরে দেয়ালের কাছেই রয়েছে একটা গাছ। বেশ বড় একটা অ্যালডার। গাছ, বেয়ে নামা যাবে সহজেই।

জানালাটা খুলল মুসা। বইগুলো নামিয়ে রেখে টেবিলটা নিয়ে এল জানালার। কাছে। ওটাতে উঠে মাথা বের করে দিল জানালার বাইরে, তারপর বের করল। কাধ।

নিচে তাকাল। চোখে পড়ল বাড়ির একপাশ। ঠিক নিচেই রয়েছে সিমেন্টে বাঁধন পথ। পড়লে হাত-পা ভাঙার ভয় আছে।

তবে সে ভয় তেমন করল না। গাছটাছ ভালই বাইতে পারে। পড়বে না। আর পড়া চলবেও না, অন্তত এখন। মারা যাচ্ছেন লিসটার। মুসা গিয়ে দ্রুত। সাহায্য আনতে না পারলে মারাই যাবেন।

.

যতো দ্রুত সম্ভব নামছে মুসা। কোথায় ধরছে, কোথায় পা রাখছে সেদিকেও খেয়াল নেই। বাড়ির এই পাশটা নির্জন, কাউকে চোখে পড়ছে না। কিন্তু সে মাটিতে নামতে না নামতেই একটা লাল চুল ওয়ালা মেয়ে এসে হাজির হল। বাহ, নামার বেশ ভাল উপায় বের করেছ তো! আমি তো জানতাম লোকে সিঁড়ি দিয়েই নামতে চায়।

আমিও চাই। ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন মনে করল না মুসা। মেয়েটার পাশ কাটিয়ে দৌড় দিল বাড়ির অন্য পাশে যেখানে লম্বা জানালাগুলো রয়েছে সেদিকে। একটা জানালা গলে যখন ঢুকছে তখনও বাজনা বাজছে। সেই শব্দ ছাপিয়ে চেঁচিয়ে কথা বলতে হচ্ছে মেহমানদের ট্রে হাতে ঘুরছে রবিন আর কিশোর, ঘাম দেখা দিয়েছে কপালে।

ভিড়ের ভেতর দিয়ে পথ করে সোজা এলেনার দিকে ছুটল মুসা। সেই ধূসর সিল্ক পরা মহিলার সঙ্গে কথা বলছে মেয়েটা। দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে তার হাত চুল সে। ফিরে তাকিয়ে মুসাকে দেখেই ভুরু কুচকে ফেলল এলেনা। তুমি এখানে কেন? ড্রামের ভারি গমগম শব্দকে ছাপিয়ে চেঁচিয়ে বলল সে। এ বোঝানোর চেষ্টা

করতে গিয়ে থেমে গেল মুসা। এখানে কথা বলা অসম্ভব মনে হচ্ছে তার কাছে। ইশারায় এলেনাকে সরে আসতে বলল রান্নাঘরের দিকে।
ডাইনিং রুমের ভেতর দিয়ে, যাওয়ার সময় কডি হোয়েরটাকে দেখতে পেল ওরা। ঘরের একধারে হেনরি বেসিনের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। প্লেটে খাবার। সাজাচ্ছে ক্যাটারার। আঙুল বাকা করে ইশারায় হোয়েরটাকে ডাকল এলেনা। খালি রান্নাঘরের দিকে এগোল। তার পেছনে নির্জন রান্নাঘরে চলে এল লোকটা। মুসা ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিল যাতে বাজনার শব্দ কম শোনা যায়।
আপনার বাবা আমাকে বাথরুমে তালা আটকে রেখেছিলেন, মুসা বলল। হাত ধুতে গিয়েছিলাম আমি। দুই এক মিনিট পরেই একটা শব্দ শুনলাম। মনে হল তিনি পড়ে গেছেন। চিৎকার করে অনেক ডাকাডাকি করলাম। শুনলেনই না। জবাব দিলেন না। শেষে জানালা গলে বেরিয়ে গাছ বেয়ে নেমে এসেছি...
শোনার জন্যে আর অপেক্ষা করল না এলেনা। পেছনের সিঁড়ির দিকে দৌড় দিল। তার পেছনে ছুটল হোয়েরটা।
ডাইনিং রুমে ঢোকার দরজাটা ফাঁক হল। মুখ বের করল কিশোর। তার কাঁধের ওপর দিয়ে তাকাচ্ছে রবিন।
কি হয়েছে? কিশোর জিজ্ঞেস করল।
বারোটা বেজেছে লিসটারের! কি হয়েছে বলল মুসা। এলেনা দেখতে গেছে বাবাকে।
ছাতের দিকে তাকাল কিশোর। তারপর পেছনের সিঁড়ির দিকে। রওনা হয়ে গেল।
কোথায় যাচ্ছ? বাধা দেয়ার চেষ্টা করল রবিন, এলেনা আমাদের কুত্তার মত দূর দূর করে তাড়াবে। বাপ আর মেয়ের তো একই স্বভাব।
মিস্টার লিসটার সত্যিই অসুস্থ হয়ে থাকলে, কিশোর বলল, আমাদের সাহায্য দরকার হবে তার।
যাও, ভুরু নাচাল মুসা। মাথায় ডাণ্ডা খেতে চাইলে। কিন্তু পরক্ষণেই কিশোরের পেছনে রওনা হল সে-ও। কিছুটা কৌতূহলী হয়েই। কিশোরকে কি বলে এলেনা দেখার জন্যেই। তাছাড়া লিসটারের আসলে কি হয়েছে সেটাও দেখার ইচ্ছে।
দ্বিধা করল রবিন। তারপর সে-ও চলল দুজনের পেছনে।
ওপরের হলঘরে. যেন পালকের তুষারপাত হচ্ছে। একটা বালিশ ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। খোলটা পড়ে রয়েছে মেঝেতে, ভেতরের পালকগুলো উড়ছে। তার মাঝ দিয়ে ছুটে গেল এলেনা। শোবার ঘরের দরজায় ধাক্কা দিল একবার, নব মোচড় দিয়ে ঠেলে খুলে ভেতরে তাকাল। চেঁচিয়ে উঠল। হোয়েরটা চেঁচাল না। তাকিয়ে রয়েছে ভেতরে।

ওখানেই কোথাও আছে! চিৎকার করে বলল এলেনা। যাবে কোথায়? যাওয়ার কোন জায়গা নেই।
ঠেলা দিয়ে পাল্লা পুরোটা খুলে দিল হোয়েরটা। ভেতরটা এখন কিশোরও দেখতে পাচ্ছে। বিছানার চাঁদরে কুঁচকে রয়েছে। খানিক আগে যে ওখানে একজন মানুষ শুয়েছিল বোঝা যায়। ফায়ারপ্লেসে নাচানাচি করছে ছোট ছোট আগুনের শিখা। কাগজ পোড়া কালো ছাই, গরম বাতাসের সঙ্গে উড়ে চিমনিতে ঢোকার চেষ্টা করছে। ভুরু কুঁচকাল কিশোর। গরম আবহাওয়া। এই সময়ে ফায়ারপ্লেস, জ্বালানোর দরকার পড়ল কেন?
দৌড়ে গেল সে। ফায়ারপ্লেসের পাশে রাখা চিমটাটা তুলে নিয়ে ঢুকিয়ে দিল আগুনের ভেতর। কিন্তু কাগজ, যা ফেলা হয়েছিল পুড়ে গেছে। চিমটার খোঁচা। লেগে ঝুরঝুর করে ভেঙে গেল পোড়া কাগজ।
কি করছ? কিশোরের হাত থেকে চিমটাটা টান মেরে নিয়ে নিল এলেনা। রাগত কণ্ঠে বলল, এখানে ঢুকেছ কেন? যাও, নিচে যাও!
মিস লিসটার, বেশ গঙার ভারিক্কি গলায় বলল কিশোর, আমরা থাকলে আপনার সুবিধে হতে পারে। রহস্যময়, অস্বাভাবিক ঘটনা, এসব তদন্তের ব্যাপারে আমাদের অভিজ্ঞতা আছে। অনেক জটিল রহস্যের সমাধান আমরা করেছি।
কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেও থেমে গেল এলেনা। হাসিটা চেপে রাখল মুসা। নাটকীয় ভাবভঙ্গি করে আবার বাজিমাত করে দিয়েছে কিশোর পাশা।
শান্ত দৃষ্টিতে সারা ঘরে চোখ বোলাল কিশোর। এখনও বন্ধ রয়েছে বাথরুমের দরজা। তালায় দোকান রয়েছে পুরনো ধাচের স্কেলিটন কী। এগিয়ে গিয়ে তালা খুলে দরজাটা খুলল কিশোর। মুসা যেভাবে ফেলে গেছে সেভাবেই রয়েছে বাথরুম। জানালার নিচে টেবিলটা রয়েছে।
চাবিটা দিয়ে হলঘর আর শোবার ঘরের মাঝের দরজার তালা খোলার চেষ্টা করল কিশোর। লেগে গেল। এ বাড়ির যে কোন তালা এ চাবি দিয়ে খোলা যাবে মনে হচ্ছে। মিস লিসটার, পালানোর আগে মুসাকে বাথরুমে আটকেছিলেন আপনার বাবা। মেহমানদের সঙ্গে এরকম ব্যবহারই করেন নাকি উনি?
তোমার বন্ধু মেহমান নয়, কাটা জবাব দিল এলেনা। এখানে কাজ করতে এসেছে।
বেশ, তাহলে কর্মচারী। তো আপনার বাবা কি কর্মচারীদের এরকম করে বাথরুমে আটকে রাখেন?
জবাবের অপেক্ষায় না থেকে মুসার দিকে তাকাল কিশোর। তোমাকে আটকে ফেলার পর ধুপ করে একটা শব্দ শুনেছ বললে। কিছু একটা পড়েছিল। মানুষ পড়ার শব্দ? মিস্টার লিসটার?

হতে পারে। আর কেউ তো ছিল না।
মিস্টার লিসটারের কাছে যখন বসে ছিলে তখন ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বলছিল?
না, মাথা নাড়ল মুসা। একেবারেই আগুন ছিল না।
গরম আবহাওয়া, আনমনে বলল কিশোর। কেন আগুন জ্বালতে যাবে। ফায়ারপ্লেসে?
বিছানার দিকে তাকাল সে। হলঘরে দেখে এলাম একটা বালিশ ছিঁড়েছে। বিছানায় এখন বালিশ নেই। যেটা ছিঁড়েছে সেটা আগে থেকেই কি ফাটা ছিল? আর আরেকটা বালিশ কোথায়? বিছানায় তো সাধারণত দুটো বালিশ থাকে। কারণ এটা ডাবল বেড।
ভ্রূকুটি করল মুসা। দুটোই থাকার কথা। তবে খেয়াল করিনি আমি।
অবশ্যই দুটো ছিল, এলেনা বলল। দেখ, এসব শার্লক হোমসগিরি করে ভোলাতে পারবে না আমাকে। যাও, নিচে যাও। মেহমানদের খাবার লাগবে...
তার কথা যেন কানেই ঢুকল না কিশোরের। বিড়বিড় করে বলতে থাকল, আজ এখানে কি ঘটেছে বোধহয় আন্দাজ করতে পারছি। স্পষ্ট। মুসা বাথরুমে। ঢুকেছিল। দ্রুত বিছানা থেকে উঠে গিয়ে দরজায় তালা লাগিয়ে দিয়েছেন আপনার বাবা, যাতে সে বেরোতে না পারে। তারপর কিছু পুড়িয়েছেন ফায়ারপ্লেসে।
ঘরে ঢুকল এতক্ষণে হোয়েরটা। এমন কিছু, কিশোরের সুরে সুর মিলিয়ে বলল সে, যেটা অন্য কাউকে দেখতে দিতে চাননি। গোপনীয়তা রক্ষার ব্যাপারে তিনি...
দেখ, কডি, কড়া গলায় ধমক দিল এলেনা। ছেলেগুলোকে আর উসকানি দিয়ো না। কিশোরের দিকে ফিরে বলল, কি করেছে আমি বলি। মূল্যবান কিছু পোড়ায়নি বাবা। ফায়ারপ্লেসে আগুন ধরানোর জন্যে কাগজ ব্যবহার করেছে। একটা বালিশ ছিঁড়েছে, আরেকটা লুকিয়েছে। নিজেও গায়েব। এসব করেছে। আমাকে রাগানোর জন্যে। কোন কিছু পছন্দ না হলেই এরকম করে। এর চেয়ে খারাপ কাজ করেছে আগেও। বিশ্বাস কর। আজকের এই পার্টি একটুও পছন্দ ছিল। না তার।
তার মানে আপনাকে ভয় দেখাতে চেয়েছেন? কিশোরের প্রশ্ন। তা-ই যদি করে থাকেন এখন তিনি কোথায়?
নাক দিয়ে খোঁৎখোঁৎ শব্দ করল এলেনা। খুঁজতে শুরু করল। তার সঙ্গে যোগ দিল হোয়েরটা। মিনিটখানেক চুপ করে থেকে তিন গোয়েন্দাও যোগ দিতে গেল। বাধা দিতে গিয়েও দিল না এলেনা, বরং বলল, ঠিক আছে, খোজ। বেশি লোকে খুঁজলে তাড়াতাড়ি বের করা যাবে।

বিরাট বর্গাকার শোবার ঘরগুলোয় পুরু হয়ে ধুলো জমে রয়েছে। নোংরা। সাফ। করা হয় না। কয়েকটাতে বিছানা আর ড্রেসার রয়েছে। বাকিগুলোতে ছাত সমান উঁচু শেলফে রয়েছে গাদাগাদা বই আর কাগজপত্র।
বই সংগ্রহের বাতিক ছিল, মন্তব্য করল কিশোর।
এটা একটা রোগ, এলেনা বলল। বিশ্বাস কর। আব্বার জন্যে এটা রোগ।
শুধু বইই সংগ্রহ করেননি ডেভিড লিসটার। অনেক ধরনের ট্রফিও রয়েছে। দূরদূরান্তে জাহাজে করে ঘুরে বেড়ানোর প্রমাণ ওগুলো। তুর্কি টুপি, হুকের নল, একজোড়া চামড়ার চটি দেখিয়ে এলেনা বলল, ওগুলো মিশরের বাজার থেকে আনা হয়েছে। আফ্রিকা থেকে এসেছে হাতির দাঁতে খোদাই করা জিনিস। মারাকে থেকে একটা পিতলের ল্যাম্প। পেনসিলের বাক্স আর পুরনো ম্যাগাজিনের পাশে তাকে অগোছাল হয়ে রয়েছে জাহাজ চালনার যন্ত্রপাতি।
কোন জিনিস ফেলে না আব্বা। পরিষ্কার করতেও দেয় না। তার ভয়, কাউকে ঢুকতে দিলেই জিনিসপত্র চুরি করে নিয়ে পালাবে।
জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলল সে। তার জন্যে খারাপই লাগল তিন গোয়েন্দার। বাবা আর মেয়ের স্বভাবে অনেক অমিল। আর তার জন্যে নিশ্চয় মনোকষ্টে ভুগতে হয় মেয়েকে। মেয়ে চায় সাফসুতরো থাকতে, আর বাবাটা একদম নোংরা। এলেনার নিজের ঘরটা ঝকঝকে, তকতকে পরিষ্কার।
দোতলায় আরও একটা ঘর পরিষ্কার আছে, সেটা কমপিউটার রুম। ধুলো ময়লা সহ্য করতে পারে না ওই যন্ত্র, তাই বাধ্য হয়েই সাফ রাখতে হয়। ঘরটা লিসটারের শোবার ঘরের পাশেই। এয়ারকুলার লাগানো। শাদা দেয়াল। লাল রঙ করা ইস্পাতের ফ্রেমের চেয়ার। আর দুটো কমপিউটার কনসোল রয়েছে ঘরে।
একটা সেট রাখা হয়েছে অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্যে, হোয়েরটা জানাল। বাইরে বেরোতেই চান না মিস্টার লিসটার। যোগাযোগ রাখার জন্যে তাই কমপিউটার ব্যবহার করেন। কর্মচারীদের হুকুম দেন এই যন্ত্রের সাহায্যে। কারও সঙ্গেই কথা বলতে চান না। কমপিউটারে আরেকটা মস্ত সুবিধে রয়েছে। কেউ আদেশ পালন না করলে কিংবা কাজে ভুল করে ফেললে রেকর্ড থেকে যায়, কোন ভাবেই ফাঁকি আর দিতে পারে না।
গোলমালটা কোনখানে হয়, সেটা আগে খুঁজে বের করতে চায় আব্বা, এলেনা বলল। যাতে খুব তাড়াতাড়ি সেটা মিটিয়ে ফেলা যায়। ঠোঁট কামড়াল। কই, এখানেও তো নেই!
চিলেকোঠা আছে? মুসা জিজ্ঞেস করল।
আছে। তাতেও বই, বাক্স আর স্যুভনির। অতীতের সাক্ষি। তবে ডেভিড লিসটার নেই।

ওপরতলায় খোঁজা শেষ। কিশোরের দিকে তাকাল এলেনা। বেশ, বল এবার, কোথায় আব্বা? খুব তো চালাকি জাহির করেছিলে। এখন বল, সে কোথায়?
অনেক সম্ভাবনাই আছে। তবে আপাতত সেসব বলছি না, কিশোর বললো। একটা সিদ্ধান্তে আসতে পারি। তিনি হেঁটে বেরিয়ে গেছেন সামনের দরজা দিয়ে। সিঁড়ি বেয়ে নেমে। মেহমানরা আলাপে ব্যস্ত, তাকে দেখতে পায়নি…
বাধা দিল এলেনা। আমার তা মনে হয় না। আমি সিঁড়ির দিকে মুখ করে ছিলাম। নামলে দেখতে পেতামই।
তাহলে পেছনের সিঁড়ি দিয়ে? অনুমান করল হোয়েরটা। ওখান দিয়ে নেমে সেলারে চলে যেতে পারেন। পেছনের আঙিনায় বেরোতে পারেন। কেউ দেখতে পাবে না।
বালিশ নিয়ে? কিশোরের প্রশ্ন।
বালিশের কথা বার বার কেন বলছো? জিজ্ঞেস করল এলেনা।
কারণ, আমার মনে হচ্ছে ওটা একটা বড় সূত্র।
পেছনের সিঁড়ির কাছে চলে এল ওরা। যে ভবঘুরে লোকটাকে ধোয়ামোছায় সাহায্য করার জন্যে নিয়ে আসা হয়েছিল সে সিংকে ব্যস্ত।
এই, আমার আব্বাকে এখান দিয়ে যেতে দেখেছ?
এলেনার দিকে ঘুরে তাকাল, লোকটা। বয়েস পঞ্চাশ, এমনকি ষাটও হতে পারে। বয়েসের তুলনায় স্বাস্থ্য বেশ ভাল, শক্তসমর্থ, পেশিবহুল। ডান বাহুতে একটা ড্রাগন আঁকা উল্কি দিয়ে। কিশোরের মনে হল মুখটা বেশি গোমড়া করে রেখেছে লোকটা। শুধু মাথা নেড়ে এলেনার কথার জবাব দিয়ে আবার তার কাজে মন দিল।
ডাইনিং রুম থেকে এল হেনরি বেসিন। কিছু হয়েছে?
আব্বাকে খুঁজে পাচ্ছি না।
সেলারে খুজল তিন গোয়েন্দা। আছে ভাপসা গন্ধ, পুরনো ট্রাঙ্ক আর মাকড়সার জাল। বেরিয়ে এসে বাড়ির বাইরেটা ঘুরে দেখতে লাগল। বড় বড় ঘাস। ঝোপঝাড়। অযত্ন আর অবহেলার ছাপ সর্বত্র। বাগানে টেবিল পেতে দেয়া। হয়েছে। তাতে বসে খাচ্ছে মেহমানরা। কিন্তু লিসটারকে দেখা গেল না ওদের। মাঝে।
অবশেষে সব জায়গায় খোঁজা হয়ে গেল, আর কোন জায়গা বাকি রইল না।
হু, মাথা ঝাঁকিয়ে বলল এলেনা। বেরিয়েই চলে গেছে। আমাকে ফেলে, রেখে। আমার বিয়েতে মত ছিল না, তাই ফাঁকি দিয়ে কেটে পড়েছে। যাতে আমি কিছু করতে না পারি। ভেবেছে, এরকম করলে বেকায়দায় পড়ে যাব আমি। এনগেজমেন্ট আর করতে পারব না আজ…

তা না-ও হতে পারে, কিশোর বলল। বালিশের কথা ভুলে যাবেন না। চলে। যাওয়ার ইচ্ছে হলে একজন বয়স্ক লোক বালিশ সঙ্গে নিয়ে যাবেন কেন? সেই গল্পটার কথা মনে হচ্ছে, লিনুস আর কম্বলের কথা। আরেকটা ব্যাপার ভুলে যাচ্ছেন। ধুপ করে একজন মানুষকে পড়ে যেতে শুনেছে মুসা। আর ফায়ারপ্লেসে। আগুন জ্বলারই বা অর্থ কী?

কি অর্থ? ভাবতে লাগল, এলেনা। আর ওই শব্দ...ওটা হতে পারে, তার পরিকল্পনারই একটা অংশ। এরকম সে করতেই পারে। তার কাছে ওটা খেলা। আমাকে রাগানোর চেষ্টা। যাতে মাথা গরম করে উল্টোপাল্টা কিছু করে বসি, আর সে সুযোগ পায়।

মাথা নাড়ল কিশোর। তার চেয়ে আরও সহজ যুক্তিতে আসুন না। কারও হাত থেকে বাঁচানর জন্যে কোন একটা জিনিস ফায়ারপ্লেসে পুড়িয়েছেন আপনার আব্বা। আর সেই লোকটাই তাকে ধরে নিয়ে গেছে মুখে বালিশ চাপা দিয়ে, যাতে চিৎকার করতে না পারেন।

স্থির দৃষ্টিতে কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইল এলেনা। রক্ত সরে যাচ্ছে মুখ থেকে। তুমি বলছ কিডন্যাপ করা হয়েছে?

মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

পুরো এক মিনিট চুপ করে রইল এলেনা। ভাবল। তারপর বলল, পুলিশকে খবর দেয়া দরকার!

.

আপনার বাবা হারিয়ে গেছেন? সত্যি? বড় বড় হয়ে গেল লালচুল মেয়েটার চোখ। মুসাকে গাছ বেয়ে নামতে দেখে মজা পেয়েছিল। এখন এলেনার কথা শুনে অবাক হল।

নিচের হলঘরে ঢুকেছে এলেনা। টেলিফোন রিসিভারে হাত। রকি বীচ পুলিশকে ফোন করেছে।

এটা একটা খেলা, তাই না? লালচুল মেয়েটা বলল আবার। অনেক পার্টিতেই, এরকম খেলা হয়। কেউ একজন খুন হয়ে যাওয়ার ভান করে। অন্যদেরকে তখন বলতে হয় কে খুন করেছে।

আহ, চুপ কর তো, নিনা, বিরক্ত হয়ে বলল এলেনা। এটা খেলা নয়।, কিন্তু মেয়েটা শুনল না। আমাদের বলতে হবে আপনার বাবা কোথায় লুকিয়েছেন, তাই না? কিংবা কে তাকে লুকাতে সাহায্য করেছে। তাই তো? বলতে হবে মোটিভটা কি।

নিনা, তোমার মাথায় গোবর আছে!

মসৃণ চেহারার যে যুবক যাকে কিছুক্ষণ আগে এলেনার সঙ্গে দেখা গিয়েছিল সে বেরিয়ে এল লিভিং রুম থেকে। অস্বস্তিতে পড়ে গেছে। কিশোর জেনেছে ওই

যুবকই এলেনার হবু বর। যাকে মেয়েটা বিয়ে করতে চায়। নাম নিকিনজা ভিশন। একই কলেজে পড়ে দুজনে। ধূসর সিল্ক পরা মহিলা তার মা। বোস্টন থেকে ছেলের সঙ্গে এসেছেন পার্টিতে যোগ দিয়ে এনগেজমেন্টের ঘোষণা শোনার জন্যে।

বিকেলে কিশোর দেখছে, জানালার চৌকাঠে আঙুল ছুঁইয়ে ধুলো পরীক্ষা করছেন মহিলা। ক্যালিফোর্নিয়ায় এসে খুশি হয়েছেন কিনা কে জানে। লিসটারের মেয়েকে বিয়ে করতে চায় তার ছেলে, এতেও কতটা খুশি হয়েছেন বোঝার উপায় নেই। কিশোর অন্তত বোঝেনি এখনও।

কোথায় ছিলে? এলেনাকে জিজ্ঞেস করল নিক। সবাই তোমাকে খুঁজছে।

আব্বাকে খুঁজতে গিয়েছিলাম।

ও। কেন? এখনও রাগ পড়েনি? ভুলে যাও ওসব।

কাছেই দাঁড়িয়ে রইল কিশোর, কথা শোনার জন্যে।

কড়া চোখে নিকের দিকে তাকাল এলেনা। দেখ, তুমি পছন্দ কর আর না-ই কর, সে আমার বাবা। লিভিংরুমে এসে ঢুকল সে। চেঁচিয়ে বাদকদেরকে বলল বাজনা থামাতে।

একবার বললে শুনল না। ক্রমেই গলা চড়িয়ে মোট তিনবার বলতে হল। এলেনাকে। পুরোদমে গলা আর বাদ্যযন্ত্রের ওপর গায়ের ঝাল মেটাচ্ছিল যেন। বাদকের দল। অবশেষে শুনতে পেয়ে. থামল।

মেহমানদের দিকে ফিরল এলেনা। আমার আব্বা-আমার আব্বার শরীরটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। এখন...এখন কোথায় আছে বলতে পারব না। কেউ দেখেছেন? সিঁড়ি দিয়ে নামতে?

গুঞ্জন উঠল। একে অন্যের দিকে তাকাতে শুরু করল মেহমানেরা। কয়েকজন শ্রাগ করল। কয়েকজনকে মুচকি হাসতে দেখল কিশোর, দৃষ্টিতে ব্যঙ্গ। তবে কথা। বলল না কেউই। ডেভিড লিসটারকে দেখেনি কেউ।

ড্রাইভওয়েতে ইঞ্জিনের শব্দ হল। সামনের দরজায় দেখা দিল দুজন পুলিশ। অফিসার। সরে তাদেরকে ঢোকার জায়গা করে দিল মুসা। এগিয়ে নিয়ে এল। এলেনা আর নিক।

আবার উত্তেজিত গুঞ্জন উঠল মেহমানদের মাঝে। মোটা বয়স্ক একজন লালমুখো মানুষ বেশ জোরেই বলল, বাহ, চমৎকার!

এই পিটার, চুপ, তাকে থামিয়ে দেয়ার জন্যে বলল তার পাশে দাঁড়ানো। মহিলা। কি বলবে বুঝতে পেরেছি।

কি বলব? পকেট থেকে চুরুট বের করল পিটার। বুড়ো জলদস্যুটা অবশেষে ধরা পড়তে যাচ্ছে একথা বলতে মানা করছ?

চুপ! সিগারেট খেতে হলে বাইরে গিয়ে খাও। যাও! হাতে হাতব্যাগ, তাই শুধু হাতটা নাড়তে পারল না, ব্যাগসহই নাড়ল। আরেকটু হলেই লোকটার মুখে বাড়ি লাগত।
ধূসর রঙের চুলওয়ালা একজন লোক মহিলার দিকে তাকিয়ে হাসল। ডেভিড লিসটার জলদস্যু ছিলেন, সত্যি?
এইই, ডোপ, বলল আরেকজন। রিমলেস চশমার পেছনে চকচক করছে তার চোখ, তুমি না তার উকিল? তোমার মুখে এসব মানায় না কিন্তু। বেশ মজাই পাচ্ছে যেন লোকটা।
তুমিও তো তার ম্যানেজার, খোঁচা দিয়ে বলল উকিল, ব্যাপারটা কি। এনথনি? হঠাৎ এত ভদ্র হয়ে গেলে কিভাবে? নাকি কিছু লুকানোর চেষ্টা করছ?
উকিলের কণ্ঠটা কেমন যেন ভোঁতা লাগল কিশোরের কাছে। অবাক হয়ে ভাবল, অনেক বেশি গিলে ফেলল না তো? মাতাল?
কি বলতে চাও? রেগে যাবে কিনা সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না যেন এনথনি।
বলতে চাই, লিসটারের কিছু হয়ে গেলে তোমার তো আর কিছু হবে না। বরং তোমার তখন পোয়া বারো…
ওদের দিকে অবাক হয়ে তাকাতে লাগল অন্যেরা। কয়েকজন এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল, কিন্তু কান তবু চলেই গেল ওদের কথায়। রুমাল দিয়ে বার বার কপাল মুছতে লাগলেন নিকের মা মিসেস ভিশন। বললেন, নিক, ভীষণ গরমরে এখানে। আমি বাইরে যাচ্ছি।
নিক যেন তার কথা শুনতেই পেল না। বেসিন হাসল। হাসিটা কেমন যেন বাকা। ইতিমধ্যেই মেহমানরা তার বুফের বেশির ভাগটাই সাবার করেছে। কাজেই দরজায় এসে দেখার সুযোগ পেল তরুণ ক্যাটারার, কি নিয়ে এত উত্তেজনা।
সাউথ'স স্পেশালিটি স্টোরের ম্যানেজার ছিলে যখন, ডোপ বলছে। কন্ট্রাকটরদের সঙ্গে তোমার গোপন চুক্তি হত। ভাবছ ভুলে গেছি। পোমোনার ওই নতুন ব্রাঞ্চটা খোলার সময় তো রীতিমত তাদেরই একজন হয়ে গিয়েছিলে তুমি। অবশ্য বেশি টাকার প্রয়োজন হলে আর ওরকম সুযোগ পেলে কে না কাজে লাগায়। বল। কন্ট্রাকটররা তো মানুষকে টাকা দেয়ার জন্যে মুখিয়েই থাকে।
মিথ্যে কথা! প্রায় চিৎকার করে উঠল এথনি। নিজে যেমন অন্যকেও তেমনই ভাবে সবাই। এসব কাণ্ড নিশ্চয় তুমিই করতে, তাই না, ডোপ?
চুপ করে আছে ডোপ। কুৎসিত ভঙ্গিতে হাসল এন্থনি। স্টক মার্কেটে দ্রুত বেশ কিছু কামিয়ে নিলে, সেটা নিশ্চয় সৎ উপায়ে নয়। ঠিক বলছি না? লিটারের সন্দেহ ছিল, মক্কেলের গচ্ছিত টাকা তাদেরকে না জানিয়ে বিনা অনুমতিতে নিজের ব্যবসায় খাঁটিয়েছ।

থাম! চেঁচিয়ে উঠল ডোপ। চুপ কর!
লিসটারের টাকাও নষ্ট করেছিলে নাকি? ধরা পড়ে গেছ? তার ওপর সে কারণেই রেগেছ… আচমকা থেমে গেল এনথনি। চারপাশে তাকিয়ে যেন এই প্রথম খেয়াল করল ঘরে আরও লোক রয়েছে, তাদের উত্তপ্ত বিতণ্ডা বেশ আগ্রহ নিয়ে শুনছে।
সিগার ধরিয়েছে যে লোকটা সে ঘড়ির দিকে তাকাল। আরে, এত্তো দেরি হয়ে। গেছে। জোরেই বলল কথাটা। স্পষ্টই বুঝিয়ে দিল, যথেষ্ট হয়েছে, এই বিচ্ছিরি পরিবেশে আর থাকতে চায় না। যাওয়া দরকার। পুলিশ কি বেশি দেরি করবে?
এটা সূচনা। বিরক্ত প্রায় সবাই হয়েছে। হাত মেলাতে শুরু করল বয়স্ক মেহমানেরা। গুডবাই জানিয়ে বিদায় নিতে লাগল। একসাথে লাঞ্চ খাওয়ার জন্যে। দিন ঠিক করছে দুজন লোক, শুনে ফেলল কিশোর। এলেনার অল্পবয়সী বন্ধুরাও লম্বা জানালা দিয়ে বাগানে বেরিয়ে গেল, সেখান থেকে হেঁটে বাড়ির বাইরে।
পার্টি শেষ। অধিকাংশ মেহমানই চলে গেছে। বেসিন আর তার সহকারীরা মিলে টেবিলগুলো পরিষ্কার করতে লাগল। টেবিল থেকে গোলাপী রঙের টেবিলক্লথগুলো নিয়ে বাগানে চলে গেল ধোয়ামোছার জন্যে যে লোকটাকে রাখা হয়েছে সে। সেখান থেকে ছোট একটা ঠেলাগাড়িতে তুলে নিয়ে গেল পেছনের হলঘরে। বারের দায়িত্বে নিয়োজিত লোকটা খালি বোতল ভরতে লাগল বাক্সে।
ফোল্ডিং চেয়ার আর টেবিলগুলো ভাজ করে বয়ে নিয়ে গিয়ে ট্রাকে তুলতে সাহায্য করল তিন গোয়েন্দা। গিয়ে দেখল, টেবিলক্লথ ঝেড়ে পরিষ্কার করে ভাজ করে বয়ে নিয়ে এসেছে ধোয়ামোছার লোকটা, ট্রাকে তুলছে কাপড়গুলো।
পুলিশের সঙ্গে যখন বেরিয়ে এল এলেনা, তখনও ট্রাকে মাল তোলায় ব্যস্ত তিন গোয়েন্দা। সিঁড়ির দিকে দেখাল মেয়েটা। হোয়েরটাকে সাথে করে উঠে গেল দুই অফিসার। হলের ভেতর দিয়ে লিভিং রুমে চলে এল এলেনা।
উসখুস করছে নিক। যেন এখানে থাকার কথা নয় তার। এলেনা, তুমি ঠিক আছ তো? বলল কোনমতে।
আছি, দীর্ঘশ্বাস ফেলল এলেনা। বু-বুঝতে পারছি না কি করব। ভয় পাব না। কি করব। আব্বা ইচ্ছে করে একাজ করে থাকতে পারে। পার্টি দেয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে ছিল না তার। আমার চাপাচাপিতেই করেছে। মেহমানরা চলে গেলেই এসে ঢুকবে হয়ত, চওড়া হাসি দেবে আমার দিকে তাকিয়ে। তাহলেও ভাল হত। কিন্তু যদি সত্যিই বিপদে পড়ে থাকে?
পুলিশ কি বলে?
কি আর বলবে। তদন্ত করবে। ওরা এখনও ভাবছে না আব্বার খারাপ কিছু হয়েছে। গেছে যে বেশিক্ষণ হয়নি। তাছাড়া খামখেয়ালি মানুষ, শুনেছেই তো।

জিজ্ঞেস করেছে আব্বর শত্রু আছে কিনা। তাদের নাম জানি কিনা। কি আর বলব বল। আমার আব্বার শত্রুদের নাম? লস অ্যাঞ্জেলেসের পুরো টেলিফোন ডিরেকটরিটাই দিয়ে দিতে হয় তাহলে!
অত ভেবো না। সব ঠিক হয়ে যাবে।
এগিয়ে আসতে দেখা গেল মিসেস ভিশনকে। মুখে হাসি। যেন সব কিছু ঠিক করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আর কোন অসুবিধে হবে না, হাসিতেই বুঝিয়ে দেয়ার প্রচেষ্টা। কাছে এসে বললেন, এলেনা, মা, কিছু ভেবো না, সব ঠিক হয়ে যাবে। আমাকে দরকার হলে একটুও দ্বিধা না করে মোটেলে ফোন করো।
থ্যাঙ্ক ইউ, বলল এলেনা।
দস্তানা পরতে শুরু করল্লেন নিকের মা। চমৎকার একটা পার্টি দিলে, সত্যি। বলেই বুঝলেন ভুল করে ফেলেছেন, রুটিন মাফিক সৌজন্য দেখানো অন্তত এই একটি ক্ষেত্রে চলবে না, শুধরে দেয়ার জন্যে বললেন, মানে হতো আরকি। যদি তোমাদের যাকগে। কিচ্ছু ভাববে না। সব ঠিক হয়ে যাবে। নিক, আয়। মেয়েটা একা থাকুক কিছুক্ষণ। রেস্ট নিক।
আমি ফোন করব, এলেনাকে কথা দিল নিক।
হ্যাঁ, বিড়বিড় করে বললেন মিসেস ভিশন। অবশ্যই করবে। করতে তো হবেই।
ঘুরে তাকাতেই কিশোরের ওপর চোখ পড়ল এলেনার। কী? কিছু লাগবে?
ইয়ে…মিস লিসটার…আমি দুঃখিত, বলল, কিশোর।
হ্যাঁ, সবাইই দুঃখিত। কিন্তু তাতে আমার কি উপকার হবে?
এই মুহূর্তটার জন্যেই যেন অপেক্ষা করছিল কিশোর। পকেট থেকে বের করল তিন গোয়েন্দার কার্ড। বাড়িয়ে দিল এলেনার দিকে। দরজায় দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা দেখতে পেয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে এল রবিন আর মুসা।
হেসে উঠল এলেনা। তিন গোয়েন্দা! প্রাইভেট ডিটেকটিভ! হাহ হাহ!
তিনজনের মুখের দিকে তাকাতে লাগল সে। অনেক ধন্যবাদ। গোয়েন্দার দরকার হলে প্রফেশনাল লোককেই ভাড়া করতে পারব আমি, নবিসকে নয়।
মাথা ঝাঁকাল কিশোর। কিছুটা হতাশই হয়েছে এলেনার আচরণে। যদিও মানুষের এই আচরণ নতুন নয় তার কাছে। তবে একেবারে নিরাশ করেনি তাকে– মেয়েটা। কার্ডটা ফিরিয়ে দেয়নি কিংবা ফেলে দেয়নি। ল্যাম্প রাখা আছে যে টেবিলটায় তার ড্রয়ারে গুঁজে রেখে দিল।
বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা। হেনরি বেসিনের গাড়িতে করে চলল। তার দোকানে গিয়ে তার নিজস্ব জিনিসপত্র নামাতে সাহায্য করবে। তারপর ট্রাকটা। নিয়ে চলে যাবে পিকো। ডেকোরেটরের টেবিল চেয়ার আর টেবিলক্লথ ফিরিয়ে দিয়ে আসবে। বেসিনের দোকান থেকে, তাদের সাইকেল নিয়ে বাড়ি ফিরবে ছেলেরা।

ডিনারের পর মুসাদের বাড়িতে একটা অনুষ্ঠান আছে, সেটাতে যোগ দিতে হবে। তাকে। তার দাদার জন্মদিনের পার্টি। কিন্তু রবিনের তেমন কোন কাজ নেই। কিশোরের সঙ্গে ইয়ার্ডে যেতে অসুবিধে নেই তার।
বেসিনের ওখানে কাজ সেরে বাড়ি রওনা হল তিন গোয়েন্দা। কিছুদূর এসে মোড় নিয়ে একদিকে চলে গেল মুসা, কিশোর আর রবিন আগের পথেই রইল। চলে এল স্যালভিজ ইয়ার্ডে। ওয়ার্কশপে সাইকেল রেখে দুই সুড়ঙ্গ দিয়ে এসে ট্রেলারে ঢুকল, তিন গোয়েন্দার হেডকোয়ার্টার। বিকেলের ঘটনাগুলো নিয়ে আলোচনার জন্যে।
তো, কি ভাবছ? কথা শুরু করল রবিন। মিস্টার লিসটার কি সত্যিই পাগল?
খামখেয়ালি তো বটেই। এবং নিষ্ঠুর। একটা বিশেষ ভঙ্গিতে বলল কিশোর। যখন কোন রহস্যের সমাধান খোঁজে কিংবা প্রশ্নের জবাব বের করতে চায় তখন এভাবে কথা বলে সে। নইলে পার্টি থেকে ওরকম করে চলে গিয়ে মেয়েকে অপদস্ত করার কি মানে? পাগল না হলে করে কোন ভদ্রলোক?
একটা প্যাডে আনমনে আঁকতে শুরু করল গোয়েন্দাপ্রধান। পার্টির মেহমানরাও অদ্ভুত। কেমন যেন। শুধু একটা ব্যাপারেই ওদের মিল দেখতে পেলাম, লিসটারকে কেউ পছন্দ করে না। তাদের অনেকেই নিশ্চয় তার কর্মচারী। ওই যে উকিল আর অন্য লোকটার মাঝে বিশ্রী আলোচনা হল..
জঘন্য! মুখ বিকৃত করল রবিন। কোন ভদ্রলোক যে ওভাবে কথা বলতে পারে… তবে এলেনার কলেজের বন্ধুরা কিন্তু ভাল, অন্তত স্বাভাবিক বলা চলে। অবাক ব্যাপারই। ওরকম বদমেজাজী একটা মেয়ের সঙ্গে যে কারও বন্ধুত্ব হয়। বিশ্বাস করা কঠিন।
টেলিফোন বাজল।
তুলে নিয়ে কানে ঠেকাল কিশোর। বলুন।
রবিন কিছু শুনতে পাচ্ছে না। তাকিয়ে রয়েছে কিশোরের দিকে।
ও, কিশোর বলল, তাই!
আরও কিছুক্ষণ ওপাশের কথা শুনল। তারপর বলল, বেশ।
রিসিভার নামিয়ে রাখল কিশোর। এলেনা লিসটার। এখুনি যেতে বলেছে আমাদের। তার বাবাকে কিডন্যাপ করা হয়েছে।

.

পনের মিনিটের মাথায় লিসটারের বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়াল দুই গোয়েন্দা। কলিং বেল বাজাল কিশোর।
দরজা খুলে দিল এলেনা। পুরনে এখনও সেই নীল পোশাক, পার্টিতে যেটা পরেছিল। তবে এখন আর তেমন ধোপদুরস্ত নেই, কুঁচকে গেছে। হাই-হলিও নেই

পায়ে।
টাকার জন্যে নোট পেয়েছেন? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
নীরবে একটুকরো কাগজ কিশোরের হাতে তুলে দিল এলেনা। জোরে জোরে পড়ল গোয়েন্দাপ্রধান, বিশপের বই বদল করলেই শুধু ফেরত আসবে বাবা। পুলিশ ডাকা চলবে না। যা করার জলদি করতে হবে। দেরি করলে ভীষণ বিপদ হবে।
পেন্সিল দিয়ে বড় করে লেখা রয়েছে বিশপ শব্দটা। বাকি শব্দগুলো খবরের কাগজের পাতা থেকে কেটে সাটা হয়েছে।
বিশপ শব্দটা খবরের কাগজে হরহামেশা ছাপা হয় না, এলেনা বলল। সেজন্যেই পায়নি। হাতে লিখতে হয়েছে। খামে করে পাঠায়নি। শুধু কাগজটা। .. পেছনের দরজার নিচ দিয়ে ভেতরে ঠেলে দিয়েছে কেউ। তারপর ঘণ্টা বাজিয়ে দৌড়ে পালিয়েছে।
কিডন্যাপিংই, আপনি শিওর? কিশোরের প্রশ্ন। আজ বিকেলে কিন্তু আপনার সন্দেহ হয়েছিল, আপনার আব্বা পুরো ব্যাপারটা প্ল্যান করেই করেছেন।
নাহ্, আব্বা অতোটা খারাপ নয়। দরজার ঘন্টা বাজিয়ে দৌড়ে পালাতেও পারবে না। ক্ষমতা নেই। জোরে হাঁটতেই কষ্ট হয় ইদানীং। এটা কিডন্যাপিংই। এখন আমাকে বিশপের বই খুঁজে বের করতে হবে। কোন বই ওটা এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র ধারণা নেই আমার। তোমাদেরকে সেজন্যেই ডেকেছি। বইটা খুঁজতে আমাকে সাহায্য করতে হবে।
নোটটা তুলে ধরল কিশোর। এটার কথা পুলিশকে জানানো উচিত। জানিয়েছেন?
না। তোমরাও বলবে না। কারণ লোকটা বলতে নিষেধ করে দিয়েছে। এ ঝুঁকি আমি নিতে পারব না। এমনকি আমার আব্বার মত বদমেজাজি লোকের জন্যেও না। বিপদে পড়বে। আরও একটা কথা আছে, তার খারাপ কিছু হলে আমারও সাংঘাতিক ক্ষতি। সম্পত্তির একটা কানাকড়িও পাব না। উইলে সে রকমই লেখা আছে। যদি অস্বাভাবিক মৃত্যু হয় তার, কিংবা গায়েব হয়ে যায়। রহস্যজনকভাবে, তাহলে আমাকে ফকিরের মত ঘাড় ধরে এ বাড়ি থেকে বের করে দেয়ার নির্দেশ দেয়া আছে। বোঝ এবার, কেমন বাপ আমার। আমার কোন দোষ না থাকলেও বঞ্চিত করা হবে তখন আমাকে।
হু! মাথা দোলাল কিশোর।
চমকে গেলে নাকি? আব্বা সব সময় খারাপ দিকটাই ভাবে, আর আমাকে সন্দেহ করে। আমার তা-ই মনে হয়। ভেবে দেখ, নিজের মেয়েকে অবিশ্বাস করে। নইলে ওরকম উইল লিখতে পারতো? থাক ওসব কথা। এসো, কাজ শুরু করিগে।

ঘুরে সিঁড়ির দিকে রওনা হল এলেনা। তাকে অনুসরণ করল ছেলেরা। মেয়ের মুখে লিসটারের অদ্ভুত চরিত্রের কথা শুনে অবাক হয়েছে।
ওপরের হলঘরে একটা ভ্যাকুয়াম ক্লিনার লাগান হয়েছে। ছেঁড়া বালিশের পালক যতটা সম্ভব পরিষ্কার করে ফেলেছে এলেনা। তবে পুরোপুরি পারেনি। বিভিন্ন জায়গায় কিছু কিছু রয়ে গেছে এখনও। তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই। গোয়েন্দাদের। যে কাজ করতে ডাকা হয়েছে ওদের সে কাজে মনোযোগ দিল। ডেভিড লিসটারের শোবার ঘর থেকে শুরু করল বইটা খোঁজা। বিভিন্ন বিষয়ের ওপর লেখা বই রয়েছে এখানে। দর্শনশাস্ত্র, রসায়ন শাস্ত্রের মত কঠিন বিষয় যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে পাখি নিয়ে গবেষণার বই। তার পাশাপাশিই রয়েছে হালকা বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী। অভিধান আছে, আছে মূল্যবান পাথরের ওপর লেখা বই। ঠিক তার কাছেই রয়েছে ডিকেনসের লেখা সুদৃশ্য চামড়ায় বাঁধানো একসেট বই।
এই যে একটা পেলাম, ধুলো পড়া নোংরা মলাটের একটা পেপারব্যাক বই। তুলে ধরল কিশোর। নাম দা বিশপ মারডার কেস। এস. এস. ভ্যান ডাইন-এর লেখা একটা রহস্যকাহিনী।
বইটা নিয়ে হলদেটে পাতাগুলো ওল্টাতে লাগল এলেনা। দূর! এটার জন্যে কিডন্যাপিঙের মত একটা অপরাধ করবে না কেউ। থাক এটা। খুঁজতে থাক।
নাকে ধুলো ঢুকেছে রবিনের। জোরে হাঁচি দিল। তাক থেকে বই নামিয়ে মলাট দেখছে, নাম পড়ছে, আবার তুলে রেখে দিচ্ছে আগের জায়গায়। বলল, অনেক পড়াশোনা করেন আপনার আব্বা, তাই না?
না, বই দেখে যতটা মনে হয় ততটা না। বই কেনেই শুধু। নেশা। বলে, সময় করে নিয়ে ভালমত পড়তে শুরু করবে একদিন। সব পড়ে শেষ করে। ফেলবে। কিন্তু সেই সময় আর করতে পারে না। কিনেই চলেছে, কিনেই চলেছে, তাকে তুলে রাখছে। নামানো আর হয় না। বইয়ের মালিক হতে পেরেই যেন খুশি। আব্বা। কোন বই কখনও হাতছাড়া করে না, ফেলে দেয়া তো দূরের কথা। শুধু বইই না, কোন জিনিসই ফেলে না।
বড় দেরাজটার দিকে ঘুরল এলেনা। দেখি, এর ভেতরে কি আছে। বিড়বিড় করতে করতে গিয়ে টান দিয়ে ড্রয়ার খুলল সে। কয়েক জোড়া মোজা, একটা মাফলার আর কাগজের বাণ্ডিল। কাগজগুলো বের করে তার ভেতরে বই খুঁজল। খবরের কাগজের কাটিং, ছেলেদেরকে জানাল। একটা প্রেসক্রিপশন। কিছু। ভ্রমণের ব্রশিয়ার।
কাগজগুলো আবার ড্রয়ারে ছুঁড়ে ফেলল সে। কি খুঁজছি জানা থাকলে অনেক সহজ হত। একটা রহস্যোপন্যাস চেয়ে পাঠিয়েছে একথা একদম বিশ্বাস করতে

পারছি না। তাও আবার পুরনো।
এটার ব্যাপারে কি মনে হয়? একটা বই তুলে ধরল রবিন। নাম দা ডে লিংকন ওয়াজ শট। লেখকের নাম জিম বিশপ।
মনে হয় না, কিশোর বলল। যাক। তাকে তুলো না। বাইরেই রাখ।
হতে পারে কোন বইয়ের দুর্লভ প্রথম সংস্করণ, আন্দাজ করল এলেনা। কিংবা প্রকাশই হয়নি এমন কোন পাণ্ডুলিপি চায়। নোট কিংবা বৈজ্ঞানিক গবেষণার নথিপত্রও হতে পারে। অথবা কোন লগবুক-অতীতের কোন গোপন ঘটনার কথা লেখা রয়েছে যাতে। সাংঘাতিক মূল্যবান কোন দলিল। কোন। কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের ইতিহাস। হতে পারে না? কী
সবই খুঁজে দেখব, শান্তকণ্ঠে বলল কিশোর।
বুককেসগুলো দেখা শেষ করে পুরনো আলমারির তাকে রাখা বাক্স আর ফোল্ডারগুলোর দিকে দৃষ্টি দিল গোয়েন্দারা। ক্যানূসেল করে দেয়া ব্যাংক চেকের বাণ্ডিল দেখতে পেল। পুরনো টেলিফোনের বিল, পোস্টকার্ড কোন কোনটা সুদূর জিব্রালটার আর কায়রো থেকেও এসেছে। সব শাদা। লেখা নেই। বোঝা গেল। চিঠি লেখার জন্যে নয়, স্যুভনির হিসেবে আনা হয়েছে ওগুলো।
তরুণ বয়েসেই সাগর পাড়ি দিয়েছিল আব্বা, এলেনা জানাল। ইনডাস্ট্রির ব্যবসায় ঢোকার অনেক আগের কথা সেটা। ওয়াল স্ট্রীটে তো তার ডাকনামই দিয়ে ফেলা হয়েছে জলদস্যু। হয়ত পাইরেটই ছিল, কে জানে! নইলে একেবারে জিভারো থেকে শুরু করে এতটা ওঠে কিভাবে? শুরু যখন করে একটা ফুটো পয়সা ছিল না পকেটে। লোকে জানে, একথা। কিন্তু দেখতে দেখতে একটা শিপিং লাইনের মালিক হয়ে গেল। কয়েকটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোর দিয়ে ফেলল। তারপর কিনল একটা পেপার মিল, গোটা তিনেক ব্যাংক। অথচ অতটা চালাক লোক নয় সে, সাংঘাতিক বুদ্ধিমান যে তা-ও নয়।
ততটা খারাপও ভাবতে পারছি না, কিশোর বলল।
এই সময় টেলিফোন বাজল। চমকে উঠল এলেনা। রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কিছুই বলল না। তারপর চিৎকার করে উঠল, চেষ্টা তো করছি! শোন, কিছু কিছু পেয়েছিও। লাগলে নিয়ে যেতে পার। একটার নাম দা বিশপ মারডার কেস। আরেকটা বইয়ের লেখকের নাম জিম বিশপ...
থেমে গেল সে। ভ্রূকুটি করল। আবার বলল, তোমাকে ঠকানোর কোন ইচ্ছে আমার নেই। শোন, কি খুঁজতে বলছ সেটাই জানি না। জানলে আরে শোন শোন... রিসিভারটা নামিয়ে এনে তাকিয়ে রইল ওটার দিকে।
কিডন্যাপার? জানতে চাইল কিশোর।

হ্যাঁ। তার ধারণা আমি তার সঙ্গে ইয়ার্কি মারছি। পুরনো খুনের গল্পের বই চায় না সে। সে চায় বিশপের বই। আর কোন তথ্য না জানিয়েই লাইন কেটে দিল।
গলা শুনে কি মনে হল? রবিনের প্রশ্ন, চিনলেন?
মাথা নাড়ল এলেনা। খসখসে। হয় ঠাণ্ডা লেগেছে, নয়ত মুখে রুমাল দিয়ে নিয়েছিল। যাতে চেনা না যায়। কথায় এক ধরনের টান রয়েছে। তবে বুঝতে পারলাম না কোন দেশের।
আবার গিয়ে দেরাজে খোঁজায় মন দিল এলেনা। শেষ ড্রয়ারটা যখন খোঁজা শেষ করল সে, রবিন আর কিশোর তখন সবগুলো তাক দেখে শেষ করে ফেলেছে। অধৈর্য হয়ে উঠছে তিনজনই। এলেনার খিদে পেয়েছে। নার
ডিনার খাইনি, বলল সে। ফ্রিজেও কিছু নেই। পার্টির জন্যে খাবারের অর্ডার দেয়া হয়েছিল। খুব হিসেব করে। এখন পিজা কিনে এনে খাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই।
চলবে, হাসল রবিন।
রবিন, তুমিও যাও। একটু পনিরটনিরও নিয়ে এসো, কিশোর বলল। আর কোক।
রবিন গেল এলেনার সঙ্গে খাবার কিনতে। কিশোর রয়ে গেল। খোঁজা বন্ধ করল না। পরের বেডরুমটায় রওনা হল সে। চিলেকোঠায় যাওয়ার দরজাটার ওপর চোখ পড়ল।
কি মনে করে টান দিয়ে দরজাটা খুলল সে। সুইচ টিপে সিঁড়ির আলোটা জ্বালল। তারপর উঠতে শুরু করল ওপরে।
এককোণে ঠেলে সরিয়ে রাখা হয়েছে ট্রাঙ্কগুলো। বাক্স আর বুককেস আছে, তবে উপচে পড়ছে না অন্যান্য জায়গার মত। দরজার কাছের তাকগুলো থেকে খোঁজা শুরু করল কিশোর। পাতলা একটা বই টেনে বের করল। নাম দা সিক্রেট অভ টাইপরাইটিং স্পীড। ১৯১৭ সালে লেখা।
বইটা আবার তাকে রেখে দিল। কানে এল নিচে দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ। রবিন! ডাক দিল সে। তুমি?
জবাব এল না। তাকের দিক থেকে ঘুরে কান পাতল কিশোর। হঠাৎ বুঝতে পারল রবিন কিংবা এলেনা নয়। পিজা নিয়ে এত তাড়াতাড়ি আসার কথা নয়। ওদের।
কিন্তু কেউ একজন ঢুকেছে।
আর ডাকল না কিশোর। নড়লও না। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। পদশব্দ শোনা গেল। উঠে আসছে কেউ।
কাপড়ের খসখস শোনা গেল। সিঁড়ির মাথার কাছেই পৌঁছে গেছে বোধহয় লোকটা। ভারি নিঃশ্বাস পড়ছে।
কিট করে উঠল লাইট সুইচ। চিলেকোঠার আলো নিভে গেল।

হঠাৎ অনেক বেশি অন্ধকার লাগল কিশোরের কাছে। মনে হল যেন চারদিক থেকে চেপে এসে ধরতে চাইছে। বুককেসের কাছ থেকে সরে গেল সে। লুকোতে গেল আরেকটা বুককেসের আড়ালে। কিন্তু তার আগেই গায়ে এসে পড়ল উজ্জ্বল। আলো। টর্চ।
সরে যাওয়ার চেষ্টা করল কিশোর। সঙ্গে সঙ্গে এল আলোক রশ্মি। গায়ের ওপর থেকে সরছে না। ঘরে ঢুকল লোকটা। উজ্জ্বল আলো চোখে পড়ায় আর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না কিশোর। লুকানোর উপায় নেই। বেরোনোর পথ নেই। দরজা আগলে দাঁড়িয়েছে লোকটা।
পিস্তল আছে কি লোকটার হাতে? চোখের ওপর হাত তুলে এনে দেখার চেষ্টা। করল কিশোর। দেখতে পেল না। যা থাকে কপালে ভেবে লাফ দিয়ে এগোল। দা চালানোর মত কোপ মারল লোকটার টর্চ ধরা হাতের কব্জিতে। উফ করে উঠল। লোকটা। টর্চ খসে পড়ল। ঝনঝন করে কাঁচ ভাঙল। গড়িয়ে সরে যাচ্ছে টর্চটা। কয়েকবার মিটমিট করে নিভে গেল আলো। আবার অন্ধকারে ডুবে গেল চিলেকোঠা।
আলো নেই। এবার দুজনেই সমান। অন্ধকারে চলল একে অপরকে পরাজিত করার চেষ্টা। কিশোরের গলা টিপে ধরতে চাইল লোকটা। সরে গেল গোয়েন্দাপ্রধান। পিছাতে গিয়ে কিসে যেন পা বেধে গেল। উল্টে পড়ত আরেকটু হলেই। সামলাতে কষ্ট হল।
হাত পড়ল তার কাঁধে। ঝাড়া দিয়ে সরানোর চেষ্টা করল কিশোর। ছাড়ল না তাকে আঙুলগুলো। খামচে ধরেছে। হাতটা খুজছে বোধহয় মুচড়ে ধরার জন্যেই।
আন্দাজে লোকটার চোয়াল সই করে ঘুসি চালাল কিশোর। লাগল না। পেট সই করে হাত চালাল। এবারেও লাগাতে পারল না। জোরে ঠেলা লাগল কাঁধে জোর আছে লোকটার গায়ে। হুমড়ি খেয়ে পড়ল কিশোর। সামলে নিতে পারত, একটা বাক্সে পা বেধে যাওয়াতেই পড়ে গেল।
নিচে দরজা খোলার শব্দ হল।
কিশোর! ডাক দিয়ে বলল রবিন। এনেছি। এসো।
বিড়বিড় করে উঠল আরেকটা কণ্ঠ। কিছু বুঝতে পারল না কিশোর। অন্ধকারে দরজা দিয়ে প্রায় ছুটে বেরোল রহস্যময় হামলাকারী। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ দুপদাপ করে নেমে চলে গেল।
হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠে পড়ল কিশোর। দৌড় দিল সে-ও। লোকটাকে ধরার জন্যে। দোতলায় পৌঁছে পায়ের আওয়াজ শুনতে পেল পেছনের সিঁড়িতে।
আবার ডাকল রবিন, এই কিশোর! কি হয়েছে?

জবাব না দিয়ে দৌড়ে নামল কিশোর। রান্নাঘরে ঢুকল। দড়াম করে লেগে গেল ঘরের পেছন দিকের দরজাটা। লোকটা বেরিয়ে গেল। ছুটে গিয়ে সে দরজা। খুলে তাকাতে তাকাতে, আঙিনা পার হয়ে গেল হামলাকারী।

.

পুলিশকে খবর দিল এলেনা। এসে রিপোর্ট লিখে নিল ওরা। বাড়ির চারপাশে ঝোপগুলোতে খুঁজে দেখল। গ্যারেজে দেখল। তারপর এলেনাকে পরামর্শ দিল, আবার যদি কেউ হামলা করতে আসে নাইন ওয়ান ওয়ানে যেন ফোন করে।
লিসটারের আর কোন খবর আছে কিনা জিজ্ঞেস করল পুলিশ সান্ত্বনা দিয়ে বলল, ভয় নেই, অনেকেই ওরকম বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়, আবার ফিরেও, আসে। র‍্যানসম নোটটার ব্যাপারে কিছুই বলল না এলেনা। দরজায় দাঁড়িয়ে পুলিশের গাড়িটা চলে যেতে দেখল। জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, কে ওই লোক? সাধারণ চোর? নাকি কিডন্যাপার? চিন্তায়ই ফেলে দিল।
আমার ধারণা কিডন্যাপার, রবিন বলল। হয়ত বিশপের বইয়ের জন্যে তর সইছে না আর। অস্থির হয়ে নিজেই দেখতে চলে এসেছে।
হয়ত, কিশোর বলল। তবে তার চেয়ে আমাদেরই খুঁজে দেখার সুযোগ বেশি। আমাদের ওপর দায়িত্বটা ছেড়ে দিয়ে চুপ করে বসে থাকাই তার জন্যে সুবিধে। একটা ব্যাপার অবশ্য জেনে গেলাম, এ বাড়ির ওপর নজর রাখা হচ্ছে।
ভয় ফুটল এলেনার চোখে। আজ রাতে মায়ের কাছে চলে যাব কিনা ভাবছি। এ বাড়িতে আমি একা থাকতে পারব না।
আপনার আম্মা কি কাছেই থাকেন? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
সান্তা মনিকায়। আব্বার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। হ্যাঁ, চলেই যাব। কিন্তু... থাকতে পারলেই ভাল হত। আবার ফোন করতে পারে কিডন্যাপার। আমি না থাকলে কথা বলবে কে? কডিকে ফোন করে অবশ্য থাকতে বলতে পারি। আব্বার সেক্রেটারি যখন, এটা তার ডিউটির মধ্যেই পড়ে। কিছু ওভারটাইম দিলেই হবে।
আপনার হবু বর আর তার মা এসে থাকতে পারেন না?
পারত। তবে বোস্টন থেকে নাকি খবর এসেছে, বাড়িতে জরুরী কাজ। আজ রাতেই চলে যেতে হবে ওদেরকে। গুঙিয়ে উঠল এলেনা। নিক অবশ্য থাকতে চেয়েছিল, আমি মানা করে দিয়েছি।
কিশোর বলল, আপনি চাইলে আমি আর রবিন থাকতে পারি।
চোখ মিটমিট করল এলেনা। এমন ভান করতে লাগল এলেনা যেন প্রস্তাবটায় খুশি হয়নি, কিন্তু চেপে রাখতে পারল না। অবশেষে বলল, বেশ। আমি তোমাদের

মক্কেল। কাজেই আমার ভালমন্দ দেখার দায়িত্ব এখন তোমাদের। হাসল। তোমাদের বাড়ি থেকে কোন আপত্তি আসবে না তো?
না। আমাদের এসব অত্যাচার বাড়িতে গা সওয়া হয়ে গেছে। রাতে না ফিরলে এখন আর কিছু মনে করে না। তবে একটা ফোন করে বলে দিতে হবে, বলল কিশোর।
বাসায় বলে দিল কিশোর আর রবিন। এলেনাকে পাহারা দেয়ার জন্যে লিসটারের বাড়িতে রাত কাটাতে অনুমতি মিলল দুজনেরই। ফোন করার পর মনে। পড়ল রবিনের পিজা খাওয়ার কথা। খাওয়া শেষ করে আবার বিশপের বই খোঁজায় মন দিল। দোতলার ঘরে অনেক বই, কাগজপত্র আর স্যুভনির মিলল, ম যেগুলো প্রমাণ করে তরুণ বয়েসে নাবিক ছিলেন লিসটার, সাগরে সাগরে; ঘুরেছেন।
অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় লেখক ছিলেন আপনার আব্বা, হাতির দাঁতের তৈরি একটা হাতির প্রতিকৃতির দিকে তাকিয়ে রয়েছে রবিন। ভারত থেকে আনা হয়েছে জিনিসটা। দেশে দেশে ঘুরতে নিশ্চয় খুব ভাল লাগত তার।
অ্যাডভেঞ্চারটা তখন করতে হয়েছে পেটের দায়ে, বিষণ্ন কণ্ঠে বলল এলেনা। যেখানে কাজ পেত সেখানেই চলে যেত। তারপর কোন ভাবে কিছু টাকা। জমিয়ে কিনল লিসটার স্টীমশিপ লাইন। পুরনো মরচে পড়া দুটো মালবাহী। জাহাজ, হিউসটন থেকে ক্যারিবিয়ান বন্দরগুলোতে যাতায়াত করত। ওই দুটো লক্কড় মার্কা জাহাজের আয় থেকেই আরেকটু ভাল আরেকটা জাহাজ কিনল। আরও টাকা জমল। ভিজালিয়ায় ছোট একটা ব্যাংক কিনল। ঢুকে পড়ল স্টক মার্কেটে।
আম্মা বলে ওই সময়টাতেই টাকার জন্যে রীতিমত খেপে ওঠে আব্বা। ভাল একটা মানুষ চোখের সামনে পাকা জুয়াড়ি হয়ে গেল যেন, আম্মার কাছে তা-ই। মনে হয়েছে। আসলে আমার মনে হয় আম্মা আব্বাকে বুঝতে পারেনি।
আপনি পারেন? রবিন জিজ্ঞেস করল।
শ্রাগ করল এলেনা। মনে হয়। অন্তত আর সবার চেয়ে বেশি। মজুতদারী ব্যবসা আরেকটু কম করলেই আমি খুশি হতাম। ওকাজটা আমার ভাল লাগে না। মাল কিনে জমিয়ে রেখে সুযোগ বুঝে ছেড়ে দেয়া। অনেক কিছু শিখিয়েছে। আমাকে আব্বা, তার মধ্যে ওটা একটা। এর জন্যে অবশ্য অনেক সচেতন থাকতে হয়। ভুল করলেই ডুবতে হবে।
আমার পাঁচ বছর বয়েসে আম্মার সঙ্গে আব্বার ডিভোর্স হয়ে যায়। কলেজে যাওয়ার আগে আম্মার কাছেই বেশি থাকতাম। অন্যখানে থাকলেও পরের দিকে প্রায়ই দেখা করতাম আব্বার সঙ্গে। তাকে মনে করিয়ে দিতে চাইতাম যে তার একটা মেয়ে আছে।

দোতলায় খোঁজা শেষ করতে অনেক রাত হয়ে গেল। গুড নাইট জানিয়ে শোবার ঘরে চলে গেল এলেনা। ওপর তলার হলঘরে পালা করে পাহারা দেয়ার সিদ্ধান্ত নিল কিশোর আর রবিন। এলেনার কাছাকাছি থাকতে পারবে এতে। সামনে আর পেছনের দিকটায়ও একই সঙ্গে নজর রাখতে পারবে। পা টিপে টিপে এসে হঠাৎ ওদের ওপর হামলা চালাতে পারবে না কেউ।
প্রথম পালা রবিনের। বেডরুম থেকে একটা আর্মচেয়ার এনে একটা কোকের বোতল হাতে নিয়ে আরাম করে বসল।
আলমারি থেকে কম্বল বের করে অব্যবহৃত শোবার ঘরের একটাতে শুয়ে. পড়ল কিশোর। শুরুতে মনে হল ঘুমই আসবে না। সারাদিন অনেক উত্তেজনা। গেছে। সেগুলো ঘুরছে মাথার মধ্যে।
রবিনের ঝাঁকানিতে ঘুম ভাঙল তার। তিনটে বাজে। আমি আর পারছি না। ওঠো। এবার তুমি যাও।
কম্বলের নিচ থেকে বেরিয়ে এল কিশোর। সেই জায়গায় ঢুকল রবিন। হুমম! গরম কম্বলের জন্যে ধন্যবাদ।
দুঃখিত। তোমার ধন্যবাদটা নিতে পারলাম না, গোঁ গোঁ করে বলল কিশোর। হলঘরে চলে এল পাহারা দিতে। ঠাণ্ডা লাগছে। বসে পড়ল চেয়ারে। তার মনে হল, রাত তিনটে হল দিনের সব চেয়ে বিষণ্নতম সময়।
ভোর হতে কতক্ষণ লাগবে জানা আছে, কিন্তু সেই সময়টা কাটবে কি করে। বুঝতে পারছে না।
মাথার ওপরে কি যেন নড়ছে। ওপর দিকে তাকাল। দম বন্ধ করে ফেলেছে। কান খাড়া।
কিছুই না! একেবারে নীরব। পুরনো অদ্ভুত এই বাড়িটা, স্নায়ুর ওপর চাপ ফেলতে আরম্ভ করেছে। অলীক কল্পনা শুরু হয়ে গেছে তার।
কিন্তু না, কল্পনা নয়। আবার শোনা গেল। খুব হালকা নড়াচড়া। খালি পায়ে চিলেকোঠার মেঝেতে হাটছে যেন। ছোট্ট, হালকা পাতলা শরীরের কোন মানুষ।
কিন্তু ওখানে তো কারও থাকার কথা নয়!
উঠে দাঁড়াল কিশোর। পা টিপে টিপে নিঃশব্দে উঠে এল সিঁড়ি বেয়ে। চিলেকোঠার দরজার সামনে এসে থামল। হাত বাড়িয়ে নব চেপে ধরে মোচড় দিল। আস্তে ঠেলা দিয়ে ফাঁক করল পাল্লা।
অন্ধকার ঘর। আলোর চিহ্নমাত্র নেই। পরিত্যক্ত জায়গার এক ধরনের পুরনো ধুলোটে গন্ধ এসে নাকে লাগছে।
কেউ আছে। সিঁড়ির মাথায়। দেখতে পাচ্ছে না, তবে কাপড়ের মোলায়েম খসখস কানে আসছে। বুঝতে পারছে তাকে ঠিকই দেখতে পাচ্ছে মানুষটা, ওপর থেকে

নিচের দিকে তাকিয়ে।
তেতো হয়ে গেল কিশোরের মন। মস্ত ভুল করেছে আসার আগে সিঁড়ির আলোটা না জ্বেলে। লোকটার হাতে পিস্তল থাকলে চমৎকার একটা নিশানা হয়ে আছে এখন সে।
যে লোকটা তখন আক্রমণ করেছিল এ কি সেই লোক? যদি হয়, ফিরে এল কেন? ভেতরেই বা ঢুকল কিভাবে? চিলেকোঠায় কি করছে?
পিছিয়ে এসে আবার দরজাটা লাগিয়ে দিল কিশোর।
কি হয়েছে? কিশোরের পেছনে ফিসফিস করে কথা শোনা গেল।
এমন চমকে উঠল কিশোর যেন গুলি খেয়েছে।
আরে আমি।
এলোমেলো হয়ে আছে রবিনের পোশাক। পায়ে জুতো নেই। বিছানা থেকে সোজা উঠে চলে এসেছে। ছাতের দিকে দেখিয়ে বলল, ওপরে কেউ হাঁটছিল। ফিসফিস করছে এখনও।
তুমিও শুনেছো?
মচ করে উঠল একটা তক্তা। সিঁড়ি থেকে সরে গেছে লোকটা। বাড়ির সামনের দিকে চলেছে।
তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিলে, কিশোর বলল। ওই লোকটা তোমার সামনে দিয়েই গিয়েছিল। আর কোন পথ ছিল না। ঘুমিয়ে ছিলে বলেই দেখতে পাওনি।
একটুও না? জোর দিয়ে বলল রবিন। এক সেকেণ্ডের জন্যেও না। ঘুম তাড়ানোর জন্যে দুবার উঠে পায়চারিও করেছি।
ভুরু কুঁচকে হাতের দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। যাই হোক, সে ঢুকেছে। জানে সে একা নয়। আমরা রয়েছি। জানে ওখানে কি আছে। আর সেজন্যেই...
এক টান দিয়ে চিলেকোঠার দরজা খুলে ফেলল সে। চেঁচিয়ে বলল, এই, কে কে ওখানে?
জবাব নেই। তবে হাঁটা বন্ধ হয়ে গেল।
আবার ডাকল কিশোর।
সাড়া নেই এবারেও।
চিলেকোঠার আলো জ্বালল কিশোর।
না না যেও না! বাধা দিল রবিন। লোকটার কাছে পিস্তল থাকতে পারে!
গুলি করার ইচ্ছে থাকলে এতক্ষণে করে ফেলত। তবে আত্মবিশ্বাসের জোর ততটা নেই।
এক দৌড়ে উঠে গেল সিঁড়ি বেয়ে। কেউ নেই। শূন্য ঘর। বুককেস, ট্রাঙ্ক আর বাক্সগুলো রয়েছে আগের মতই। কিন্তু কোন মানুষ নেই। চিলেকোঠা থেকে

লোকটা সিঁড়িঘরে বেরোনোর আগেই সে উঠে যেতে চায়।
নিরাপদেই পৌঁছল। কিন্তু মানুষ দেখতে পেল না। শূন্য চিলে কোঠা। বুককেস, ট্রাঙ্ক, বাক্স সব আগের মতই রয়েছে। মানুষ নেই।
স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে কান পেতে রইল সে।
কোন শব্দ নেই।
বেরিয়ে এল আবার সিঁড়িতে। নিচে তাকাল। ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে রবিন।
কিছুই নেই, কিশোর জানাল। আমরা...আমরা নিশ্চয় কোন ধরনের হ্যালুসিনেশনের মধ্যে ছিলাম!
আমি বিশ্বাস করি না!
কেউ নেই এখানে। চুপ করে এক মুহূর্ত ভাবল কিশোর। তবে এই সিঁড়ি বাদে আসাযাওয়ার আর কোন পথ যদি থাকে, আলাদা কথা। হ্যাঁ, তা-ই হয়েছে। পুরনো বাড়ি একটা। গোপন পথ থাকতেই পারে। আগের দিনে লোকে গুপ্তপথ তৈরি করে রাখত। এই পথের খবর যে ওখানে উঠেছে সে ছাড়া আর কেউ জানে না।
রবিনের পেছনে হলঘরে এসে ঢুকল এলেনা। পরনের শোবার পোশাকটা দুমড়ে কুঁচকে গেছে। ভারি হয়ে আছে চেহারা। কি ব্যাপার? কি হয়েছে? কিশোর, ওখানে কি করছো?
এলেনা, মেয়েটার অনুরোধেই তাকে মিস লিসটার বলা বাদ দিয়েছেনকিশোর। এ বাড়িতে কি কোন গোপন পথ আছে? চিলেকোঠায় ওঠা যায়?
জানি না তো?
কোন গুজব শুনেছেন পথটা সম্পর্কে।
মাথা নাড়ল এলেনা। না।
খুঁজতে লাগল কিশোর। বাক্স আর ট্রাঙ্কের পিছনে দেখল। চিমনির কাছের জিনিসপত্র সরাল, যদি কোন গুপ্তদরজা থেকে থাকে ওখানে সে আশায়। রান্নাঘর থেকে একটা টর্চ নিয়ে এল। কাঠের মেঝের শেষ প্রান্তে যেখানে চালু হয়ে। কডিকাঠের ওপর নেমে এসেছে ছাত; সেখানে খানিকটা খোলা জায়গা রয়েছে। হামাগুড়ি দিয়ে দেখতে দেখতে সেখানটায় চলে এল। শোবার ঘরের ছাতের কিছুটা জায়গার পাসটার চোখে পড়ে এখান থেকে। তবে বেরোনোর মত কোন পথ নেই। বহু বছরে অনেক ময়লা জমেছে ওখানে। আর এমন টুকিটাকি জিনিস, যেসব ফেলে দিয়ে তারপর ভুলে যায় লোকে। যেমন, একটা পুরনো, গলফ বল, একটা কোকা কোলার বোতল, আর দলা পাকিয়ে ফেলে দেয়া কিছু কাগজ।

চিলেকোঠার প্রতিটি ইঞ্চি পরীক্ষা করে দেখে তারপর বেরোল কিশোর। নেমে এল নিচের হলঘরে। রবিন আর এলেনা বসে রয়েছে ওখানে।
আশ্চর্য! পথ নেই শুনে বলল রবিন।
সব তোমাদের কল্পনা, বলল এলেনা।
নিজের ঘরে গিয়ে আবার দরজা দিল সে।
শোবার ঘর থেকে গিয়ে কম্বলটা নিয়ে এল রবিন। শরীর মুড়ে বসে পড়ল। কিশোরের আমচেয়ারের পাশে।
শোবে না আর? কিশোর বলল, এখন আমার ডিউটি। চলে যাও।
একা যেতে আর ভাল্লাগছে না। এখানেই থাকি।
বাকি রাতটা ওখানে বসেই কাটাল দুজনে। তাকিয়ে রইল সিঁড়িতে যাওয়ার। পথের দিকে। একটু পর পরই মুখ ভোলে ছাতের দিকে। কান সজাগ এমনি করেই ভোর হল।
আরেক বার পায়ের আওয়াজ শুনল বলে মনে হল রবিনের। তবে এত হালকা, নিশ্চিত হতে পারল না সত্যিই শুনেছে কিনা।
অবশেষে পাতলা ধূসর আলো দেখা দিল জানালায়। সূর্য উঠতে দেরি নেই। শেষ হল দীর্ঘ বিরক্তিকর পাহারার পালা।
হঠাৎ শক্ত হয়ে গেল কিশোর। তালায় চাবি ঢোকানোর আওয়াজ শুনেছে। নিচতলায়। রান্নাঘরের দরজা খুলল। ওখানে কেউ রয়েছে। যার কাছে চাবি আছে।
একলাফে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল কিশোর। অস্ত্র। একটা অস্ত্র দরকার। খালি হাতে আর যাবে না।
কম্বলটা ছুঁড়ে ফেলে দিল রবিন।
ঠোঁটে আঙুল রেখে তাকে শব্দ করতে মানা করল কিশোর। চুপ থাকতে ইশারা করল। চিলেকোঠার সিঁড়ির দেয়ালে ঝোলানো একটা পিতলের বাসন দেখতে পেয়ে সেটাই খুলে নিল। ভাল কোন অস্ত্র নয়, তবে হাতে একেবারে কিছু না থাকার চেয়ে ভাল।
পেছনের সিঁড়ি ধরে ছুটে নামতে শুরু করল। পেছনে রবিন।
সিঁড়ির গোড়ায় নেমে রান্নাঘরের ভেতরে তাকানোর চেষ্টা করল। রান্নাঘরের। দরজার ওপরের অর্ধেকটা কাঁচের। কিন্তু অন্য পাশে কাপড়ের পর্দা লাগানো থাকায় এপাশ থেকে ভেতরটা দেখা যায় না। দরজা না খুলে ভেতরে কে আছে দেখার উপায় নেই।
সামনে এগোল কিশোর। বাসনটা শক্ত করে ধরল।
মৃদু একটা খটখট শব্দ হচ্ছিল। থেমে গেল সেটা। হাঁ হয়ে খুলে গেল দরজা।

বাড়ি মারার জন্যে বাসন তুলল কিশোর।

.

ও বাবা গো!

চিৎকার করে পিছিয়ে গেল ধূসর চুল এক মহিলা। বাসনের বাড়ি থেকে বাঁচানোর জন্যে দুহাত তুলে নিয়ে এল মাথার ওপর।

পাথর হয়ে গেছে যেন কিশোর। একটা সেকেণ্ড জমেই রইল সে, বাসনটা তোলা। মহিলার হাতের বাজারের থলের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারল এই মানুষের কাছ থেকে ক্ষতির আশঙ্কা নেই। সরি, বলে বাসনটা নামিয়ে নিল সে।

পুলিশ! আবার চিৎকার করে উঠল মহিলা। বাঁচাও! বলেই ঘুরে দিল দৌড়। গেটের দিকে।

আরে শুনুন শুনুন! চেঁচিয়ে বলল কিশোর। প্লীজ! এক মিনিট।

শোবার পোশাক পরে খালি পায়ে ছুটতে ছুটতে নেমে এল এলেনা। মহিলাকে দেখতে পেয়ে সে-ও চেঁচিয়ে ডাকল, মিসেস বেকার, শুনুন শুনুন!

কিশোরের পাশ দিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে গেল সে। মহিলা অর্ধেক পথ যাওয়ার আগেই তাকে ধরে ফেলল। শুনুন। ওরা ভাল ছেলে। কিছু করবে না।

ধীরে ধীরে ফিরে এল আবার মহিলা।

রবিন, কিশোর, পরিচয় করিয়ে দিল এলেনা। ও মিসেস বেকার। আমাদের হাউসকীপার। মিসেস বেকার; ওরা আমার বডিগার্ড।

কড়া চোখে গোয়েন্দাদের দিকে তাকাতে লাগল মিসেস বেকার, বিশেষ করে কিশোরের দিকে। জোরে জোরে হাঁপাচ্ছে। কিশোরের মনে হল বহু বছর পর এত জোরে দৌড়েছে মহিলা।

বডিগার্ড? মহিলার চোখে সন্দেহ। গুপ্তধন পেয়েছ নাকি? বডিগার্ড লাগে কেন? তোমার আব্বই বা কোথায়? তোমার জন্যে তিনিই তো যথেষ্ট। যে কোন মানুষের জন্যেই! শয়তানও কাছে ঘেঁষবে না।

আব্বা নেই। নিরুদ্দেশ। কাল থেকে। কিডন্যাপ করা হয়েছে তাকে।

কিডন্যাপ? বল কি!

ঠিকই বলছি, এলেনা বলল। বাবার রহস্যময় নিরুদ্দেশের কথা খুলে বলল। র‍্যানসমের নোটটাও দেখাল মিসেস বেকারকে। এরা আমাকে সাহায্য করছে, গোয়েন্দাদের দেখিয়ে বলল সে। বিশপের বই খুঁজছি আমরা। ঈশ্বরই জানেন ওটা কি! ওই নামটা আব্বার মুখে কখনও শুনেছেন?

না, সোজাসাপ্টা জবাব দিল মিসেস বেকার। পাদ্রী-(বিশপ)র সঙ্গে তোমার আব্বার বনিবনা হবে না। কোনদিন হয়েছে বলেও মনে হয় না। তুমি বলতে চাইছ কেউ বাড়িতে ঢুকে, তোমার আব্বাকে তুলে নিয়ে গিয়ে ওই নোট পাঠিয়েছে?

ফ্যাকাসে ওই ছোকরাটাকে জামাই করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই তার, তুমি জান। আমারও পছন্দ নয় ছেলেটাকে। পছন্দ করার মত কিছু থাকলে তো করব। তোমার কাছে হেরে গিয়ে ওই পার্টি দেয়াটা মস্ত ভুল হয়ে গেছে তোমার আব্বার। কিন্তু রাজি তুমি করিয়ে ছেড়েছ। আর দিয়েছ রোববারে, এমন একটা দিনে যেদিন আমার ডিউটি নেই। তোমার বাবা কিডন্যাপ হয়েছেন বলছ? আমার বিশ্বাস হয় না। নিশ্চয় চলে গেছেন লুকিয়ে, নোট পাঠিয়েছেন তোমাকে ভয় দেখানোর জন্যে। আসলে কায়দা করে তোমার বিয়েটা ঠেকাতে চাইছেন।

না, জোর দিয়ে বলল এলেনা। আমার তা মনে হয় না। নিজে নিজেই চলে গেছে একথা ভেবে চুপ করে থাকতে পারব না আমি। ঝুঁকিটা নেয়া কি ঠিক আপনিই বলুন? কিডন্যাপাররা যদি কোন ক্ষতি করে তার?

মাথা নাড়তে লাগল মিসেস বেকার। বিচ্ছিরি অবস্থা। বাজারের থলেতে হাত ঢুকিয়ে একটা অ্যাপ্রন বের করে আনল। সেটা পরে নিয়ে নাস্তা বানাতে বসল। কথা বলে চলেছে একনাগাড়ে। বাড়ি হল এটা একটা? অভিশাপ আছে এর। ওপর। সব সময়ই খারাপ ঘটনা ঘটছে। বাড়িটা বানিয়েছিল ডিক ব্রাউন নামে এক লোক। আমার পড়শী শেলি টেনারের কাছে শুনেছি এসব। ব্রাউন খুব ধনী লোক ছিল। কিন্তু যেদিন বাড়িটা তৈরি শেষ হল সেদিনই সব কিছু খোয়াল। স্টক মার্কেট ধসে পড়ল, সেটা কবে যেন? হ্যাঁ, উনিশ শো উনত্রিশ সালে। ব্রাউন এখানে। থাকতে আসেনি। বহু বছর খালিই পড়ে রইল বাড়িটা। তারপর, আমি যেই নিউ : ইয়র্কে চলে গেলাম কার্পলি নামের এক পরিবার বাড়িটা কিনল। ওদের কথা মনে আছে আমার। দ্রলোক বেশ বড়সড় শরীরের মানুষ ছিলেন, একদিন পড়ে গেলেন সিঁড়ি থেকে। কোমর ভাঙলেন। জীবনে আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারেননি। হাটাচলা বাদ।

কার্পলিদের পরে এল মিস হ্যাঁমারসন। বৃদ্ধা। অনেক টাকার মালিক। একা মানুষ। সেজন্যেই বোধ করি তার এক ভাস্তিকে নিয়ে এল। মেয়েটাকে আমি দেখেছি। সুন্দর ছিল খুব। কিন্তু বিষণ্ন। সারাক্ষণই মন খারাপ করে রাখত। এর জন্যে অবশ্যই মিস হ্যাঁমারসন দায়ী। বেশি কড়াকড়ি করত মেয়েটার সঙ্গে। ইস্কুল থেকে এসেই রাতের খাবার বানাতে সাহায্য করতে হত ফুফুকে। মিস হ্যাঁমারসন। বলত, কাজ করা ভাল, তাতে আখেরে উন্নতি হয়। চরিত্র ঠিক হয়। আমার বিশ্বাস, চাকরের পয়সা বাঁচাতেই মেয়েটাকে এনেছিল বুড়ি। সাংঘাতিক কিপটে ছিল তো। আহারে, বেচারি মেয়েটার জন্যে খুব কষ্ট হত আমার। ওর বয়েসী ছেলেমেয়েরা যখন খেলত, কিংবা গল্প করত, সে তখন খেটে মরত রান্নাঘরে।

মেয়েটার চোদ্দ বছর বয়েস তখন। একদিন একটা চুলের কাটা হারিয়ে গেল। মিস হ্যাঁমারসনের। দোষ দিয়ে বসল মেয়েটাকে। বলল সে-ই চুরি করেছে। রাগ

করে তখন মেয়েটাকে তার বাবা-মার কাছে পাঠিয়ে দিল। শুনেছি, কয়েক বছর পর একটা শয়তান ছেলের সঙ্গে পালিয়ে গেছে মেয়েটা। তার পর যা হয় তা-ই হল। কিছু দিন পর মেয়েটাকে ফেলে রেখে পালাল ছোকরা। শেষ খবর যা জানি, স্যানফ্রানসিসকোয় আছে মেয়েটা। একটা মার্কেটে চাকরি করে।
ডিম, টোস্ট আর ভাজা মাংস এনে টেবিলে সাজিয়ে দিল মিসেস বেকার। এক কাপ কফি খাবার জন্যে নিজেও বসল সবার সঙ্গে।
এ বাড়িতে ভূতের উপদ্রব আছে, শুনেছেন কখনও? কিশোর জিজ্ঞেস করল। এখানে যেসব কাণ্ড হয়েছে তাতে নিশ্চয় অনেক কানাঘুষা করেছে লোকে। গুজব রটেছে।
লোকে তো বলেই, মিসেস বেকার বলল। আর পুরনো বাড়ির ব্যাপারে খামোকাই অনেক কথা বলে, কিছু না থাকলেও। তবে এ বাড়ি সম্পর্কে আমি। তেমন কিছু শুনিনি। কিছু দেখিওনি। বাড়িটা আনলাকি, একথাই শুধু বলতে পারি। আর মাঝে মাঝে, মেঘলা দিনে এমন মনে হয়...মনে হয় কি যেন তাকিয়ে রয়েছে আমার দিকে! লুকিয়ে আমাকে দেখছে। কেন যে এমন লাগে বলতে পারব না। রাতের বেলা আর কিছুতেই থাকতে রাজি নই আমি এখানে।
যত্তোসব ছেঁদো কথা! বিড় বিড় করল এলেনা।
চিলেকোঠায় ঘুরে বেড়ানো কোন কিছুর কথা আপনি শুনেছেন? জিজ্ঞেস করল রবিন।
চিলেকোঠায়? মাথা নাড়ল মিসেস বেকার। নাহ! ওরকম কিছুই শুনিনি, আমি। চিলেকোঠায় কিংবা কোনখানেই কিছু আছে বলে জানি না। শুধু শুধু আমার মনে হয়, আছে.। কোথাও কোন একটা ব্যাপার রয়েছে, ঠিক বুঝতে পারি না।
কফির কাপে ঘন ঘন কয়েকবার চুমুক দিল মিসেস বেকার। গম্ভীর হয়ে গেছে।
প্রসঙ্গটা বদল করল দুই গোয়েন্দা। মিসেস বেকার তেমন কোন তথ্য দিতে পারল না ওদেরকে। তবে একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গেল ওরা, গত রাতের ঘটনাটা এ বাড়িতে নতুন।
নাস্তা শেষ করে, এলেনার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ওরা। স্যালভিজ ইয়ার্ডে ঢুকতেই দেখা হয়ে গেল মেরিচাচীর সঙ্গে। কিশোর ভেবেছিল, তাকে দেখলেই নানা কথা জিজ্ঞেস করতে শুরু করবেন তিনি। কিন্তু করলেন না। ফুরসৎ নেই। কাজে ব্যস্ত। প্যাসাডেনায় একটা পুরনো বাড়ি ভেঙে নতুন করে তোলা হবে। ওটার যত পুরনো জিনিসপত্র আছে সব কিনে নিয়ে এসেছেন রাশেদ পাশা। শুধু তাই নয়, পুরনো ইটও নিয়ে এসেছেন। সুড়কি লেগে রয়েছে। কিশোর আর রবিনকে দেখেই কাজে লাগিয়ে দিলেন মেরিচাচী। ইট পরিষ্কারের কাজ।

মেজাজ খিঁচড়ে গেল কিশোরের। কিন্তু কিছু করার উপায় নেই। মেরিচাচীর মুখের ওপর না বলার সাহস নেই তার। কাজ শেষ করতে করতে অনেক বেলা হয়ে গেল। ঘরে ঢুকে হাতমুখ ধুয়ে এল দুজনে। খেতে দিলেন চাচী। স্যাণ্ডউইচ। ডাইনিং রুমে বসে না খেয়ে সেগুলো নিয়ে ওয়ার্কশপে চলে এল ওরা।

বেঞ্চে বসে খাবার চিবুচ্ছে, এই সময় মাথার ওপরের লাল আলোটা জ্বলে নিভে জানান দিল হেডকোয়ার্টারে টেলিফোন বাজছে।

দুই সুড়ঙ্গ দিয়ে এসে ট্রেলারে ঢুকল দুজনে। রিসিভার তুলে নিল কিশোর। ফোন করেছে ডেভিভ লিটারের সেক্রেটারি কডি হোয়েরটা।

এলেনা বলল তোমাকে ফোন করতে। সারা সকাল ধরে সেই রহস্যময় বইটা খুঁজেছি। পাইনি। তখন এলেনা বলল, তার আব্বার কমপিউটারে খোঁজ নিতে। ফাইল দেখলে হয়ত কিছু জানা যাবে। কিন্তু ফাইল বের করার সংকেত জানি না। এলেনা তোমাকে আসতে বলেছে। তার ধারণা, তুমি কিছু করতে পারবে।

রবিনের দিকে ঘুরল কিশোর। রিসিভারে হাত চাপা দিয়ে হোয়েরটা কি। বলেছে বলল। জিজ্ঞেস করল, যাবে নাকি?

যাব।

হাত সরিয়ে নিয়ে হোয়েরটাকে বলল কিশোর, আমরা আসছি।

বাইরে বেরিয়েই মুসাকে দেখতে পেল ওরা। সাইকেল স্ট্যাণ্ডে তুলছে সহকারী গোয়েন্দা। লিসটারের বাড়িতে যাবে কিনা জিজ্ঞেস করল তাকে কিশোর। বলল, এলেনা আমাদের সহ্য করে নিয়েছে।

আমি তাকে পারব কিনা জানি না, মুসা বলল। বাপের চেয়ে কোন অংশে কম নয়।

কিন্তু রবিন আর কিশোর যখন রওনা হল ঠিকই ওদের সঙ্গে চলল সে।

কয়েক মিনিট পরেই লিসটারের বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়াল তিন গোয়েন্দা। বেল। বাজাল। মিসেস বেকার খুলে দিল দরজা। এক হাতে একটা স্প্রে, উইনডো। ক্লীনার, আরেক হাতে একমুঠো পেপার টাওয়েল, জানালা পরিষ্কার করছিল বোধহয়। খুশি খুশি গলায় বলল, এদ্দিন পরে সুযোগ পেলাম। সব ময়লা এবার ঝেটিয়ে বিদেয় করব। বুড়োটার জ্বালায় পারতাম না। ছুতেই দিত না কোন কিছু। তোমরা যাও। এলেনা আর কডি কমপিউটার রুমে অপেক্ষা করছে।

ঘুরে সিঁড়ির দিকে রওনা হল মিসেস বেকার। তার পেছনে চলল তিন গোয়েন্দা। সিঁড়ির মাথায় উঠে ইশারায় কমপিউটার রুমের দিকে যেতে বলে নিজে গিয়ে ঢুকল একটা শোবার ঘরে।

দুটো কমপিউটারের মধ্যে যেটা ছোট, সেটার সামনে বসে রয়েছে হোয়েরটা। চাবি টিপছে। প্রতিটি চাপের পর পরই টিইট টিইট শব্দ করছে কমপিউটার।

তার পেছনে দাঁড়িয়ে মনিটরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে এলেনা।
এটা আব্বার ব্যক্তিগত কমপিউটার, ছেলেদেরকে জানাল, সে। আব্বার অফিসে যে কমপিউটার সিসটেম রয়েছে তারই একটা অংশ এই বড়টা। তবে ছোটটা একেবারে আলাদা। এটার সঙ্গে কোনটার যোগাযোগ নেই। মডেম নেই, কাজেই বাইরের কেউ ঢুকতে পারবে না এটাতে। সংকেতটা বের করতে পারলেই তার ফাইলগুলো দেখতে পারব। এমনও হতে পারে, বিশপের বই আসলে বইই। নয়, অন্য কোন কিছুর সংকেত। কোড নেম।
মাথা নাড়ল হোয়েরটা। বুই না ছাই। আসলে মিস্টার লিসটারের ওপর ভীষণ রাগ আছে কারও। শোধ তুলছে। তিনি নিখোঁজ হলে অনেকেরই সুবিধে হয়, অনেকেই খুশি হবে। কি জানি কি করেছেন। মাথায় ছিট আছে তো। হয়ত নিজেই বেরিয়ে চলে গেছেন।
উনি তোমার বস! কঠিন কণ্ঠে বলল এলেনা। ভদ্রভাবে কথা বল!
সরি, কীবোর্ডের দিকে ফিরল হোয়েরটা। কর্মচারীদের ব্যাপারে তথ্য জোগাড় করেন তিনি, তিন গোয়েন্দাকে বলল সে। তাদের অতীত জীবন, ব্যক্তিগত জীবন, সব। যেহেতু আমি তার সেক্রেটারি, তাই জানি। এসব জানতে হলে গোয়েন্দা লাগাতে হয়। প্রাইভেট ইনভেসটিগেটর। তাদের বিলগুলো আমাকেই করতে হয়। তবে রিপোর্ট আমাকে দেখতে দেয়া হয় না। সেটা শুধু মিস্টার লিসটারই দেখেন। আমার বিশ্বাস কিছু কিছু কর্মচারীর অতীত এত বেশি গোলমেলে, অফিসের ফাইলে সেগুলো রাখা যায় না। তাই ব্যক্তিগত কমপিউটারে ঢুকিয়ে রেখেছেন তিনি। কিন্তু বিশপের বই? কোন বিশপের সঙ্গে তাঁর আলাপ নেই।
কোড নেম, আবার বলল এলেনা। কোড নেম হতে পারে।
পাসওয়ার্ড নয়, এটা জেনে গেছি, হোয়েরটা বলল। দেখলামই তো টেস্ট করে।
মিনিট খানেক চুপ করে থেকে ভাবল সে। তারপর টাইপ করে লিখল হাসলার
পি এইচ ইউ এস টি এল ই আর, পড়ল মুসা। মানে কি?
হাসলার কি জান না?
আভিধানিক অর্থ জানি। তিনটে মানে হয়। কর্মতৎপর ব্যক্তি, যে লোক তাড়াহুড়ো করে কাজ করে এবং প্রতারক। কোনটা বোঝাতে চাইছেন?
=ভেঙে বলি। ধর ফুটবল খেলতে নামল কোন লোক। তাকে ভালমত চেনে না। অন্য খেলোয়াড়েরা। তার সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানে না। শুরুতে ভাল খেলতে না। পারার অভিনয় করে গেল সে। তারপর সুযোগ বুঝে কায়দা করে গোল দিয়ে। দিল। এমন সময় গোল, যখন প্রতিপক্ষের আর কিছুই করার থাকল না। ওই চালাকি অবশ্য মিস্টার লিসটারও পছন্দ করেন, তাই লিখলাম। চালাক লোক

দরকার তার। আর এমন লোক যাদের অতীত রহস্যময়, কোন গোলমাল আছে। ওই ধরনের লোককে খাটানোর সুবিধে, তার দুর্বলতা জানা থাকলে।
আব্বা খুব চালাক, তাই না?
এলেনার কথার জবাব দিল না হোয়েরটা।
টিট টিট করছে কমপিউটার। মনিটরে লেখা উঠলঃ অশুদ্ধ সংকেত। আবার চেষ্টা করুন। এবার স্লাই ফক্স টাইপ করল হোয়েরটা।
আবার টিট টিট করল যন্ত্র। আবার মেসেজ দিল, অশুদ্ধ। আমার বাবা ধূর্ত শেয়াল? তুমি...তুমি একটা শয়তান! চেঁচিয়ে উঠল আচমকা এলেনা। সে জন্যেই এসব লিখছ!
তাহলে বন্ধ করে দেব? শীতল কণ্ঠে বলল হোয়েরটা। কমপিউটারে খোঁজার আইডিয়াটা কিন্তু তোমারই ছিল।
না, থামব না! জানতেই হবে আমাদের। কিন্তু আব্বার অপমান হয় এমন কিছু করতে পারবে না তুমি। ভাল করেই জান ব্যবসাটা তার কাছে একটা মজার খেলা। উঁচু মানের ফুটবল কোচ বলা যায় তাকে। ভীষণ চালাক। তাতে দোষটা কোথায়? চালাক না হলে কি ব্যবসা করা যায়? আর আব্বা চায় সব সময়। জিততে। জেতার জন্যে যা যা দরকার সবই করে।
নীরবে মনিটরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। ঢুলু ঢুলু চোখ, যেন তন্দ্রালু। হয়ে উঠেছে। হঠাৎ সজাগ হয়ে উঠল, খেলা? আপনার আব্বা ব্যবসাটাকে খেলা হিসেবে দেখেন? পাসওয়ার্ডের সূত্র এর মধ্যে নেই তো?
দ্রুত গেম শব্দটা টাইপ করে ফেলল হোয়েরটা। টিইট টিইট করে একঘেয়ে শব্দ করল যন্ত্র।
নানা রকম খেলা চালিয়ে যান, রবিন পরামর্শ দিল। ফুটবল দিয়ে শুরু করুন।
ফুটবল দিয়ে লাভ হল না। বেজবল, বাস্কেট বল, হকি, কোনটা দিয়েই নয়।
খেলাধুলায় বিশেষ আগ্রহ ছিল না আব্বার, এলেনা বলল। অন্য কিছু দিয়ে। চেষ্টা করা যাক।
একচেটিয়া ব্যবসা করার খুব আগ্রহ, হোয়েরটা বলল। মনোপলি লিখে দেখা যাক।
তাতেও সুবিধে হল না।
পোকার লিখে দেখুন তো, মুসা বলল।
একে একে পোকার, জিন রামি, পিনোকল, ব্ল্যাকজ্যাক, সব কিছু দিয়েই দেখা হল। নিরাশ করল কমপিউটার।
তাসের নাম দেয়া শুরু করি, বলে এস লিখল হোয়েরটা। তারপর কিং। সেই একই অবস্থা। কোন মেসেজ দিতে পারল না যন্ত্র। কিন্তু যেই জোকার লেখা হল, অন্য

মেসেজ দেখা দিল স্ক্রীনে। আসুন, আমরা খেলা করি! আমন্ত্রণ জানাল, কমপিউটার।
খাইছে! বলে উঠল মুসা।
কমপিউটারকে একটা নির্দেশ দিল হোয়েরটা।
নামের একটা লম্বা তালিকা ফুটে উঠল মনিটরে। ডোপের ওপর একটা ফাইল খুলেছেন লিসটার। এনথনির নামেও আছে একটা। ভিজালিয়া ব্যাংকের ম্যানেজার। আর বড় বড় অফিসারদের নাম চিনতে পারল হোয়েরটা। আরও অনেক নাম, এমনকি হাউসকীপার মিসেস বেকারের নামও রয়েছে ফাইলে।
আরেকটা ফাইল দেখা গেল কডি হোয়েরটার নামে।
আপনাকেও বাদ দেননি, মুচকি হাসল রবিন।
আড়চোখে সেক্রেটারির দিকে তাকিয়ে কিশোর দেখতে পেল হোয়েরটার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। এলেনারও নজর এড়াল না সেটা। আপনার ফাইলে কি আছে?
সাধারণত যা থাকে, কোনমতে বলল হোয়েরটা। বয়েস, শিক্ষা, এসব।
দেখি তো, খসখসে হয়ে গেছে এলেনার কণ্ঠ।
এলেনা, আমার ফাইল দেখে….
আমি দেখব!
শ্রাগ করল হোয়েরটা। একটা চাবি টিপল। লিস্টে তার নামের কাছে চলে এল কারসরটা। আরেকটা চাবি টিপল সে। মিলিয়ে গেল নামের তালিকা। পর্দায় ফুটল কডি হোয়েরটা। তার পরে দেখা দিলঃ আসল নাম আরনি ভিনসেনজো। বাবার নাম কার্লো ভিনসেনজো। আমাকে কিছু করার তালে আছে মনে হয়। আরও কিছুদিন কাছাকাছি রাখব। কর্মঠ লোক। আমার ভয়ে যখন কাপে, দরদর করে ঘামে, দেখতে খুব ভাল লাগে আমার।
লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল হোয়েরটা। কমপিউটারের দিকে পেছন করে দাঁড়িয়ে বলল, আমি যাচ্ছি! আর কখনও ফিরব না!

.

সর্বনাশ! গলার কাছে হাত নিয়ে গেল এলেনা। কার্লো ভিনসেনজোর ছেলে কডি!
সে-ই! কিডন্যাপ সে-ই করেছে।
একটা ভুরু উঁচু করল কিশোর। সহায়তা করে থাকতে পারে। তবে সে নিজে কিডন্যাপটা করেনি। সারাক্ষণ পার্টিতে ছিল, মনে আছে? আর সহায়তাইবা করবে কেন? কার্লো ভিনসেনজোই বা কে?
একজন লোক…ওয়েস্ট লস অ্যাঞ্জেলেসের একজন টায়ার ব্যবসায়ী। যে জায়গাটায় তার দোকান সে জায়গাটা আব্বার খুব পছন্দ। অফিসের জন্যে একটা। বহুতল বাড়ি বানাতে চায় ওখানে। অনেক টাকার অফার দিয়েছে আব্বা,

বিক্রি করতে রাজি হয়নি ভিনসেনজো। তখন তার দোকানের পাশে আরেকটা টায়ারের দোকান দিয়েছে আব্বা। শস্তায় ভাল জিনিস বিক্রি করছে। তাতে তার লস হলেও কেয়ার করছে না। আসলে ভিনসেনজোর ব্যবসা খারাপ করে দিয়ে তাকে ওখান থেকে তোলার জন্যেই একাজ করেছে আব্বা। টিকে থাকার চেষ্টা করেছে। ভিনসেনজো। কম দামে টায়ার দেয়ার চেষ্টা করেছে। আব্বার সঙ্গে পারেনি, লস দেয়ার মত এত টাকা তার নেই। ছয় মাসের মধ্যেই কাবু হয়ে গেছে বেচারা।
কাজেই তার ছেলে ছদ্ম নামে চাকরি নিয়েছে এখানে, এলেনার কথার খেই ধরল রবিন। আপনার আব্বার ক্ষতি করার জন্যে। কিন্তু তার আগেই আপনার আব্বা জেনে গেছেন হোয়েরটার আসল পরিচয়। হোয়েরটা কি করে ভাবতে পারল। যে লোক অন্যের ব্যাপারে খোঁজ নেয়ার জন্যে গোয়েন্দা লাগান, তার বিরুদ্ধে সে। কিছু করতে পারবে?
হয়ত ভেবেছে তার কভার স্টোরি এত ভাল যে গোয়েন্দাকে বোকা বানিয়ে দিতে পারবে, কিশোর বলল। কীবোর্ডের সামনে বসে পড়ল। কডি হোয়েরটার ফাইলের ফুল প্রিন্ট দেয়ার জন্যে নির্দেশ দিল কমপিউটারকে। জীবন্ত হয়ে উঠল প্রিন্টার। কটকট কটকট করে আধ মিনিটের মধ্যেই বের করে দিল হোয়েরটার ফাইল। বের করে নিয়ে জোরে জোরে পড়ল কিশোর, সবাইকে শোনানোর জন্যে।
চাকরির দরখাস্তে যে ঠিকানা আর ফোন নম্বর ব্যবহার করেছে হোয়েরটা, সেটা তার হাই স্কুলের এক বন্ধুর। রুটিন চেক করে কিছু পাওয়া যায়নি। তারপর গোয়েন্দা লাগিয়েছেন লিসটার। জেনেছেন, কাজের শেষে ওশন পার্কে ভিনসেনজোর বাড়িতে রোজ যায় হোয়েরটা। প্রতিবেশীদের কাছে খোঁজ নিয়েছে গোয়েন্দা। বীমার দালাল পরিচয় দিয়ে। সত্যি কথাগুলো জেনে এসেছে।
হ্যাঁ, মাথা দোলাল রবিন। কিডন্যাপের একটা মোটিভ দেখা যাচ্ছে। লোকটাকে দেখে কিন্তু মনে হয় না এতবড় একটা অপরাধ করতে পারে।
তা অবশ্য হয় না, একমত হল এলেনা। আর এই বিশপের বই...এটার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। কডি হোয়েরটা:নাহ, আমার ভাল লাগছে না!
বড় কমপিউটারের সামনে বসে পড়ল সে। চোখ বন্ধ করে কপাল টিপে ধরল। কডি একাজ করেছে একথা বিশ্বাসই করতে পারছি না। করেওনি। তাহলে। এই কমপিউটারটা নষ্ট করে দিতই, যাতে তার নাম না জানতে পারি। নাহ, সে করেনি। অন্য কারও কাজ।
মাথা ঝাঁকাল কিশোর। ও-কে। আরও কিছু ফাইল দেখা যাক। মিরহাম এনথনির ফাইলটার জন্যে নির্দেশ দিল কমপিউটারকে।

শুরুতে এনথনির ওপরও রুটিন চেক করা হয়েছে। বিয়ে করেছিল, স্ত্রী মারা গেছে। ছেলেমেয়ে নেই। সার্চন্ট এলাকার একটা বাড়িতে বাস করে। ডি. এল. ডিপার্টমেন্ট স্টোরের ম্যানেজারের পদটা নেয়ার আগে অন্য মালিকের আরেকটা স্টোরের ডিরেক্টর অভ অপারেশনের দায়িত্ব নিয়ে কাজ করেছে। লিসটারের স্টোরটা সান্তা মনিকায়।

খানিক পরেই এনথনির ডোসিয়ার আর সাধারণ রুটিন চেকের আওতায় থাকল না। আরও গভীরে ঢুকতে লাগল। একবার গ্রেফতার হয়েছে। একটা বীমা কোম্পানিতে জালিয়াতির অভিযোগে। একটা বাড়ির মালিক ছিল সে। আগুন লেগে পুড়ে যাওয়ার পর বীমা কোম্পানি সন্দেহ করে বসল এতে এনথনির হাত রয়েছে। অ্যারেস্ট করা হলেও পরে তাকে সসম্মানে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় পুলিশ, কারণ কোম্পানি তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণ করতে পারেনি। তারপর। প্রথম স্টোরটায় চাকরি নিল এনথনি। সেখানেও তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ। আছে। সরাসরি কেউ কিছু বলেনি। তবে কানাঘুষা হয়েছে, কন্ট্রাকটর আর। সাপ্লাইয়ারদের কাছ থেকে ঘুষ নিত সে।

ফাইলের শেষে দুটো শব্দে, খুব বাজে একটা মন্তব্য পেশ করা হয়েছেঃ উইমেন-চেজার। অর্থাৎ মহিলাদের পেছনে লাগার বদস্বভাব আছে।

লিটারের উকিল ডোপের ডোসিয়ারও কম মজার নয়। ডোপ ছিল একজন। জুয়াড়ি। রেসের খেলা আর পোকারে আসক্ত। স্টক মার্কেটেও বেশ বড় বড় ঝুঁকি নিয়েছে। লিসটারের সন্দেহ জরুরী কাজে খরচের জন্যে যে ফাণ্ড রাখা আছে তার কাছে সেটা থেকে সে নিজের প্রয়োজনে খরচ করে। বার অ্যাসোসিয়েশনে। যোগাযোগ করে তার অ্যাকাউন্ট চেক করানোরও হুমকি দিয়েছেন তিনি। এক হুমকিতেই কাজ হয়ে গেছে বলে লিটারের ধারণা।

ভিজালিয়া ব্যাংকের ম্যানেজারের ফাইল বলছে, ডোপ নেভিতে ছিল আগে। সেখান থেকে বের করে দেয়া হয়েছে তাকে, কি একটা অপরাধ করেছিল বলে। লিসটার যে একথা জেনেছেন, সেটা আবার জানিয়ে দিয়েছেন ম্যানেজারকে।

ফাইলের পর ফাইল দেখে চলল কিশোর। একের পর এক মজার তথ্য উঠে আসছে মনিটরের পর্দায়। মিসেস বেকারেরও একটা বড় রকমের দোষ রয়েছে। প্রতি হপ্তায়ই একটা বিশেষ জায়গায় জুয়া খেলতে যায়। নেশা হয়ে গেছে সেটা।

এসব দেখে কোন লাভ হবে না আমাদের, এলেনা বলল অবশেষে। এখানে। এমন একদল লোকের ডোসিয়ার যারা আব্বাকে দুচোখে দেখতে পারে না। ঘৃণা করে। তার কোন বন্ধু নেই। ভাবতেই খারাপ লাগছে আমার। লোকের ব্যক্তিগত জীবন ঘাটাঘাটি করেছে, এটাও ভাল্লাগছে না আমার।

কেঁদে ফেলবে যেন সে। এই একটি বার বাবার পক্ষে সাফাই গাইছে না।

কিশোরকেও স্বীকার করতে হল, এই সব গোপন ফাইল আসল কাজের কোন সাহায্য করছে না। প্রত্যেকেরই মোটিভ রয়েছে লিসটারের ক্ষতি করার। কিন্তু কোন একজন বিশেষ মানুষ বেরিয়ে আসছে না যাকে সন্দেহ করা যায়। সবাইকেই করা যায়, আবার কাউকেই করা যায় না।

আর একটা ফাইল আছে, বলল সে। এটাও দেখার দরকার। ফাইলটার। নাম মুজের/ভিয়েজা। স্প্যানিশ এই শব্দের মানে বৃদ্ধা মহিলা।

বাহ, ভাল কথা, মুসা বলল। হয়ত মিসেস বেকারের সম্পর্কে আরও কিছু লেখা রয়েছে। তার দুর্বলতা যাতে প্রকাশ না হয় সে জন্যে মিস্টার লিসটারকে গায়েব করে দিয়েছে।

কিন্তু আবার ফেরত দেবেও বলেছে, মনে করিয়ে দিল রবিন। বিশপের বইটা দিলে। প্রতিশোধ বলতে পার। দুর্বলতা ঢাকা দেয়ার জন্যে কিডন্যাপটা করেনি।

ওদের কথা শুনছে না কিশোর। আনমনেই বলল, মিসেস বেকারের ফাইল স্প্যানিশে লেখা থাকবে কেন? চাবি টিপে ফাইলটা কল করল সে।

অন্য ফাইলের চেয়ে এটা আলাদা। একটা চিঠি। এলেনাকে লেখাঃ

সোগামোসোকে দিয়ে শুরু কর। বৃদ্ধা মহিলার কাছে যাও। মধ্যগ্রীষ্মের দিনে সূর্যাস্তের সময় তার ছায়া স্পর্শ করে ঈশ্বরের অশ্রুকে। সব তোমার জন্যে। তবে সিয়েটার ব্যাপারে সাবধান থেক। সে কি লিগাল? চেক ইনস।

চমৎকার, এতক্ষণে খুশি হল কিশোর। চিঠিটার একটা প্রিন্ট আউট বের করে দিতে নির্দেশ দিল কমপিউটারকে। কাগজের ওপর ছোটাছুটি শুরু করল প্রিন্ট হেড। এই সুযোগে এলেনার দিকে তাকাল সে। চোখে জিজ্ঞাসা।

মাথা নাড়ল এলেনা।

কিছুই বুঝতে পারছেন না? জিজ্ঞেস করল কিশোর।

একটা বর্ণও না।

সিয়েটার ব্যাপারে সাবধান থাকতে বলা হয়েছে। বলেই সরাসরি এলেনার চোখের দিকে তাকাল কিশোর। তাকে চেনেন?

শ্রাগ করল এলেনা। আব্বার আরেক ফেরেশতা হবে হয়ত। কর্মচারী। ব্যবসার সহযোগীও হতে পারে। পার্টিতে কোন সিয়েটাকে আসতে দেখিনি। মারাত্মক কিছু শত্রুকে মনে হচ্ছে দাওয়াত থেকে বাদই দিয়েছিল আব্বা।

কাঁদতে শুরু করল এলেনা। গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল পানি। মোছার চেষ্টা করল না সে।

ঠিক আছে, কিশোর বলল। আর কোথাও কোন সূত্র আছে কিনা দেখা দরকার। টেবিলের ড্রয়ার ঘাটতে শুরু করল সে। রবিনও তাকে সাহায্য করল। একটা ছোট নোটবুক পেয়ে তুলে, দেখাল। অ্যাড্রেস বুক। অনেক ঠিকানা আছে। হাতে লেখা।

প্রতিটি পৃষ্ঠার প্রতিটা ঠিকানা খুঁটিয়ে দেখা হল, কিন্তু কোন সিয়েটাকে পাওয়া গেল না।
আম্মা হয়ত জানতে পারে, এলেনা বলল। সামলে নিয়েছে। ইদানীং আর আব্বার সঙ্গে দেখা হয় না তার, কথাও হয় না। তবে অনেক পুরনো কেউ হতে পারে, একসাথে যখন ছিল দুজনে তখনকার কোন সিয়েটা থাকতেও পারে।
ফোন করে জিজ্ঞেস করবেন? মুসা জানতে চাইল।
ইয়ে...তাতেও সমস্যা আছে। আম্মা রেগে আছে আমার ওপর। এখানে। আসাটা একদম পছন্দ নয় তার। আমার হবু বরকেও দেখতে পারে না।...যাই হোক, চেষ্টা করে দেখি।
রিসিভার তুলে নিয়ে ডায়াল করল এলেনা। ওপাশের কথা শুনে কানের কাছ থেকে সরিয়ে এনে বলল, ঘরে নেই। জবাব দিচ্ছে অ্যানসারিং মেশিন। রিসিভারে কিচকিচ শুনে তাড়াতাড়ি আবার কানে ঠেকাল সে। কে? আম্মা? কোথায় গিয়েছিলে? আমি। আম্মা, শান, আব্বাকে মনে হয় কিডন্যাপ করা হয়েছে। তিনটে ছেলে আমাকে সাহায্য করার চেষ্টা করছে। ওরা তিন গোয়েন্দা, কিশোর পাশা, মুসা আমান আর রবিন মিলফোর্ড। তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। কথা বলবে?...আচ্ছা।...কিছু জানা থাকলে ওদেরকে বলে দিও। আমি চলে আসতাম তোমার কাছে, কিন্তু আব্বা বাড়িতে নেই। খালি ফেলে যেতেও পারছি না। আব্বার ব্যাপারটা ফয়সালা হলেই চলে আসব।
মাকে গুড বাই জানিয়ে রিসিভার নামিয়ে রাখল এলেনা। যেতে পার। আমার আম্মা খুব ভাল। সবাইকেই সাধ্যমত সাহায্য করে।
যতগুলো প্রিন্ট আউট বের করেছে, সব একখানে করল কিশোর। মায়ের ঠিকানা লিখে দিল এলেনা। সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর ঠিক হল, মুসা থাকবে এ বাড়িতে। বাকি দিনটা। রাতটাও। মিসেস বেকার রাতে থাকে না, বাড়ি চলে যায়। তার স্বামী আছে। রবিন বাড়িতে যাবে, কিছু জরুরী কাজ আছে। সেখান থেকে মিউজিকের অফিসে গিয়ে টু মেরে দেখে আসবে একবার কি পরিস্থিতি। রকি বীচ লাইব্রেরিতে যাবে। অনেক দিন যায় না ওখানে। অথচ কত বছর কাজ করেছে। সময় পেয়েছে যখন লাইব্রেরিয়ানের সঙ্গে দেখা করে আসবে। আরও মা একটা কারণ আছে লাইব্রেরিতে যাওয়ার। রেফারেন্স বইতে সোগামোসো খুজবে।
সিয়েটার রেফারেন্স খোঁজার বোধহয় কোন প্রয়োজন নেই, কিশোরকে বলল সে। লস অ্যাঞ্জেলেসের ফোন বুকে ওই নামের অভাব নেই। তবে সোগামোসোটা সাধারণ নাম নয়। এই রহস্য ভেদের শুরু এটা দিয়েও হতে পারে।
কোন লোকের নাম না-ও হতে পারে এটা, কিশোর বলল। কোন জায়গা। কিংবা কোম্পানির নাম হলে অবাক হব না।

কিশোর যাবে এলেনার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে। এলেনা আর বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রওনা হল সে। সাইকেল নিয়ে চলল সান্তা মনিকায়। এই আরেকবার আফসোস হতে লাগল একটা গাড়ি নেই বলে। ভাল জিনিস ছাড়া তার মন ভরে না। আর ভাল কিনতে হলে নতুন দরকার। এত টাকা নেই। পুরনো ভাল জিনিস কে খুঁজে দেবে? মুসা তো কথা কানেই তোলে না। নিকভাইটারও দেখা নেই...

নির্জন একটা রাস্তার ধারে ভদ্রমহিলার বাড়ি। একতলা। লিসটারের বাড়ির ঠিক উল্টো। নতুন রং করা। ঝকঝকে তকতকে। সুন্দর বাগান। সবুজ লন। পায়ে চলা যে পথটা চলে গেছে বাড়ির দরজায়, সেটাতে একটা কুটোও, পড়ে নেই। দিনে অনেকবার করে ঝাট দেয়া হয়, বোঝা যায়।

ঘন্টা বাজাতেই খুলে দিলেন, এলেনার মা। সুন্দর চেহারা। কফি রঙের চুল। একই রঙের চোখ। মোটাই বলতে হবে তাকে। তবে চামড়া বেশ মসৃণ, কোথাও একটা ভাজ নেই। ডেভিড লিসটারের চেয়ে বয়স অনেক কম।

তুমি নিশ্চয় তিন গোয়েন্দার একজন, বললেন তিনি। বেরোতে হবে। বেশি। সময় দিতে পারব না, তোমাকে। এসো।

হলঘরের ভেতর দিয়ে কিশোরকে লিভিং রুমে নিয়ে এলেন মহিলা। নরম সবুজ কার্পেট। সোফা আর অন্যান্য আসবাবপত্রের কভার শাদা মখমলের তৈরি।

ফায়ারপ্লেসের কাছে বড় একটা চেয়ারে বসলেন ভদ্রমহিলা। কিশোর বসল। সোফায়। এলেনা ভাল আছে? জিজ্ঞেস করলেন তিনি। সত্যি বল তো, ও আসছে না কেন?

ফোন করে খবর জানতে চাইতে পারে কিডন্যাপার, জবাব দিল কিশোর। সে জন্যে রয়ে গেছে।

আমারও ওখানে যাওয়া উচিত, কিন্তু ভাল লাগে না। ওই বাড়িটাকে দেখলেই রাগ হয় আমার, ঘৃণা করি। ওখানে ঢোকার পর থেকে অশান্তি শুরু হল। আমাদের। তার আগে ভালই ছিলাম।...এলেনা কি একা রয়েছে?

না। আমার বন্ধু মুসা রয়েছে তার সঙ্গে।

তোমার বন্ধু? নিশ্চয় তোমারই বয়েসী। পুলিশ কোথায়? এরকম। পরিস্থিতিতে ওদেরকে দরকার। একটা ছেলে আর কতটা সাহায্য করতে পারবে। এলেনাকে।

বয়েস অল্প, কিন্তু কোন বয়স্ক লোকের চেয়ে কম নয় মুসা। কারাত জানে। গুলি চালাতে পারে। দুচারজনকে খালি হাতেই পিটিয়ে তক্তা করে দিতে পারে। পুলিশকে খবর দিতে মানা করেছে কিডন্যাপার। হুঁশিয়ার করে দিয়েছে তাহলে মিস্টার লিসটারের ক্ষতি করবে। বিশপের বইটা দিলেই তাকে ছেড়ে দেবে। বলেছে।

বিশপের বই? সামনে ঝুঁকলেন ভদ্রমহিলা। কিশোরের মনে হল অন্যমনস্ক হয়ে গেছেন তিনি। যেন কোন শব্দ শুনে কান খাড়া করেছেন। অপেক্ষা করছেন আবার শোনার আশায়।
কিশোরও কান পাতল। কিছুই শুনল না। বাড়িটা বেশি নীরব।
বিশপের বই সম্পর্কে কিছু জানেন আপনি?
মাথা নাড়লেন ভদ্র মহিলা। না। কিছুই জানি না। আজকাল ডেভিড কি করছে না করছে কোন খোঁজই রাখি না আমি। এ জন্যেই কি দেখা করতে এসেছ? বইয়ের ব্যাপারে খোঁজ নিতে? হাজার হাজার বই আছে ডেভিডের। ওগুলো দেখেছ?
দেখেছি। কিডন্যাপার যেটা খুঁজছে সেটা পাইনি। আপনি সিয়েটা নামে কাউকে চেনেন? আর সোগামোসো?
সোগা-কি?
ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর।
আমি খুব একটা সাহায্য করতে পারছি না, তাই না? বললেন ভদ্রমহিলা। সরি। জানলে অবশ্যই বলতাম। আবার বল তো নামটা। সিয়েটা বাদে আরেকটার কথা যেটা বললে?
সোগামোসো।
মাথা নাড়লেন তিনি। সরি।
মিস্টার লিসটারকে কি কখনও বৃদ্ধা মহিলার কথা বলতে শুনেছেন? স্প্যানিশে ওটার মানে মুজের ভিয়েজা।
বলতে পারলেন না তিনি। ঈশ্বরের অশ্রুর কথাও তিনি কিছু জানেন না। দ্রুত জবাব সারছেন। কিশোর চলে গেলেই খুশি হন।
ঈশ্বরের অশ্রু বেশ কাব্য করে বলা হয়েছে, বললেন তিনি। কিন্তু ডেভিড। কবিতা নিয়ে মাথা ঘামায় না। সরি, আমি কিছুই বলতে পারব না। আইলিন লিসটারে খোঁজ নিয়েছ? অনেক সময় ওখানে জিনিস রাখে ডেভিড।
আইলিন লিসটার?
ওর ইয়টের নাম। আমার আর ডেভিডের নামে জাহাজটার নাম রেখেছে ও। ওটা কেনার সময় সম্পর্ক ভালোই ছিল আমাদের।
উঠে দাঁড়ালেন ভদ্রমহিলা। যেতে হবে এবার, সে কথা আর মুখ ফুটে বলতে হল না কিশোরকে। সে-ও উঠল। মহিলার পিছু পিছু চলে এল দরজার কাছে। তিন গোয়েন্দার একটা কার্ড ধরিয়ে দিয়ে বলল, যদি কিছু মনে পড়ে আপনার, আমাদের তদন্তে সাহায্য হবে ভাবেন, তাহলে দয়া করে এই নাম্বারে ফোন করবেন।
করবেন, বললেন তিনি। বেরিয়ে এল কিশোর।

মোড়ের কাছে এসে থামতে হল তাকে। একটা বাসকে সরে যাওয়ার সুযোগ দেয়ার জন্যে। পেছন ফিরে তাকাল একবার, এলেনার মায়ের বাড়ির দিকে।
গাঁট্টাগোট্টা একজন লোক বেরিয়ে আসছে পায়েচলা পথ ধরে বড় রাস্তার দিকে। লোকটাকে আগে দেখেছে কিশোর। লিসটারের বাড়িতে। এলেনার পার্টির একজন মেহমান ছিল ওই লোক।
এনথনি! বিড়বিড় করল বিস্মিত কিশোর।
লিসটারকে সরিয়ে দেয়ার যথেষ্ট মোটিভ রয়েছে লোকটার। ও বাড়িতে কি করছে সে? কিশোর যখন মহিলার সঙ্গে কথা বলছিল তখন নিশ্চয় সে বাড়িতে ছিল ও। দুজনের কথা নিশ্চয় শুনেছে। কল্পনায় দেখতে পেল কিশোর, রান্নাঘরে ঝুঁকে রয়েছে লোকটা, দরজায় কান পেতে।
এ কারণেই উত্তেজিত হয়ে ছিলেন ভদ্রমহিলা। বার বার অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিলেন। তাড়াহুড়া করে বের করে দিতে চেয়েছিলেন কিশোরকে। বাইরে যাওয়ার কথা নয় তার। ঘরে লোক রেখে বাইরে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।
ব্যাপারটা কি? এলেনার মা আর এনথনি মিলে ষড়যন্ত্র করেছে? মহিলার চেহারা দেখে মনেই হয় না এরকম একটা অপরাধ করতে পারেন। তবে বলা যায় না কিছুই। অপরাধ জগৎ এমনই একটা জগৎ, যেখানে যা খুশি ঘটতে পারে। চেহারা কোন ব্যাপার নয়। যেটা অসম্ভব বলে মনে হয়, সেটাই ঘটে যেতে পারে।
রাস্তা পেরোল এনথনি। কিছুদূরে পার্ক করে রাখা একটা গাড়িতে গিয়ে উঠল। জ্বলে উঠল ব্রেক লাইট। একজস্ট পাইপ থেকে এক ঝলক ধোয়া বেরোল। চলতে শুরু করল গাড়িটা।

সাইকেল ঘোরাল কিশোর। পিছু নিল গাড়িটার। দুশো গজ পেছনে থেকে অনুসরণ করে চলল। পায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে প্যাডাল করছে, যতোটা জোরে সম্ভব ঘোরাতে চাইছে চাকা।

.

যে সময় আসবে আশা করেছিল তার চেয়ে অনেক পরে লাইব্রেরিতে আসতে পারল রবিন। কোনখান থেকে খোঁজা শুরু করবে?–ঢুকেই ভাবল। টেলিফোন ডিরেক্টরির কথা প্রথমেই বাদ দিয়ে দিল। লাভ হবে না। তবু একবার চোখ বোলাতে অসুবিধে কি?

লাইব্রেরিয়ানের সঙ্গে দেখা করে কুশল বিনিময় করে এল প্রথমে। তারপর ডিরেক্টরিটা দেখতে বসল। লস অ্যাঞ্জেলেস টেলিফোন বুকে সিয়েটার অভাব নেই। তবে একটা সোগামোসোও চোখে পড়ল না।

লিসটারের কমপিউটারে করা মেসেজের প্রিন্ট আউটটা বের করে টেবিলে বিছাল সে। শব্দগুলো যেন ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রয়েছে তার দিকে।

সোগামোসোকে দিয়ে শুরু কর…
কি করব? ভাবছে রবিন। মেসেজটায় সাঙ্কেতিক কথা রয়েছে। মানে বের করতে হলে আগে সিয়েটা আর সোগামোসাকে খুঁজে বের করতে হবে। শেষ শব্দ ইনস, আই এন এস। ইনিশিয়ালের সংক্ষেপও হতে পারে ওটা, কিংবা ইমিগ্রেশন অ্যাণ্ড নেচারালাইজেশন সার্ভিসের আদ্যাক্ষর। সিয়েটা হয়ত একজন ইলিগাল লোক এদেশে, অবৈধ ভাবে প্রবেশ করেছে। জানতে পারলে খুব সুবিধে হবে কি? সিয়েটার খোঁজ পেলে তাকে আই এন এস-এর হাতে ধরিয়ে দেয়ার কথা বলেননি তো এলেনাকে লিসটার? দূর! কিছু বোঝা না গেলে রাগই লাগে।
আর এরকম একটা নোটই বা কেন কমপিউটারের মেমোরিতে রেখে গেলেন। লিসটার? কমপিউটারে আগ্রহ নেই এলেনার। মেসেজটা যে দেখবেই এরকম কোন নিশ্চয়তা ছিল না।
হতে পারে, এর চেয়ে ভাল আর কোন উপায় বের করতে পারেননি লিসটার, তাড়াহুড়ায়। হয়ত হঠাৎ করেই আবিষ্কার করেছেন বিপদে পড়তে চলেছেন তিনি। যে লোকটা তাঁর হুমকির কারণ, কমপিউটার সম্পর্কে তার জ্ঞান না থাকলে নিরাপদে থাকবে মেসেজটা। কিন্তু এলেনাও যদি কিছু বুঝতে না পারে, ওই মেসেজ কোন উপকার করবে না তার।
রেফারেন্সের বই রাখা হয় যেসব তাকে সেখানে এসে দাঁড়াল রবিন। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ওপর অনেক ডিরেক্টরি রয়েছে এখানে। ডেভিড লিসটার ব্যবসায়ী। তার ব্যবসার সঙ্গে যোগামোসোর কোন সম্পর্ক থাকতে পারে। বড় একটা বইতে আমেরিকান কোম্পানিগুলোর তালিকা রয়েছে। নাম রাখা হয়েছে, স্ট্যাণ্ডার্ড অ্যাণ্ড পুয়োরস। সেটাতে সোগামোসো খুঁজল সে। পেল না। তারপর খুঁজল দা ওয়াল স্ট্রীট জার্নাল এবং ফোর্বস ম্যাগাজিনে। সোগামোসোর চিহ্নও নেই। হজ হু-এর। যতগুলো সংস্করণ পেল, সবগুলোতে দেখল, কোনটাতেই পাওয়া গেল না ওই নাম।
বিখ্যাত লোক নয় সোগামোসো, বোঝা গেল। ব্যবসায় জড়িত নয়। পুরোপুরি অন্য কিছু। স্প্যানিশ কোন শব্দ নয় তো? স্প্যানিশ শব্দ ব্যবহার করেছেন লিসটার। স্প্যানিশ টু ইংলিশ ডিকশনারিটা নামিয়ে আনল সে। পেল না। ওটাতেও। বোকা হয়ে গেল। রেফারেন্স সেকশনের সব চেয়ে নিচের তাকটায় রয়েছে ম্যাপ। বড় একটা বই এনে ফেলল টেবিলে। অবশেষে দেখা মিলল সোগামোসোর।
কলাম্বিয়ার একটা শহর সোগামোসো।
দশ মিনিটের মধ্যেই বন্ধ হয়ে যাবে লাইব্রেরি! ঘোষণা করল পাবলিক অ্যাড্রেস সিসটেমের যান্ত্রিক কণ্ঠ।

ইনডেক্স দেখে দ্রুত পাতা ওল্টাল রবিন। দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর-পশ্চিম কোণের একটা ম্যাপ বেরিয়ে পড়ল। কলাম্বিয়া রয়েছে ওখানে। বেগুনী রঙে সীমানা চিহ্নিত করা হয়েছে। শাদাটে রঙে আঁকা রয়েছে অ্যানিডজ পর্বতমালা।
তেরছা দৃষ্টিতে ম্যাপের দিকে তাকিয়ে রয়েছে রবিন। সোগামোসো! ইনডেক্সে বলা হয়েছে, শহরটার লোকসংখ্যা উনচল্লিশ হাজার। তার মানে বড় শহর নয়।
বোগোটার উত্তর-পুবে শাদা পর্বতের গায়ে ছোট্ট একটা ফোঁটা দিয়ে বোঝানো হয়েছে সোগামোসো। এত দূরের একটা অঞ্চলে বৃদ্ধা মহিলাকে খুঁজতে কেন যেতে বলেছেন লিসটার? আসলেই কি তেমন কোন মহিলা আছে? বিশেষ কোন মহিলা? না যে কোন মহিলা হলেই চলবে?
ম্যাপের পাশে সোগামোসোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ রয়েছে।
কলাম্বিয়ায় বসতি তেমন জমে ওঠেনি, পড়ছে রবিন। মানুষজন বাস করে শুধু উপকূলের কাছে, আর অ্যানডিজ পর্বতমালার পশ্চিম দিকের পাদদেশে। উপকূলের কাছের ভেজা অঞ্চলে ইক্ষু আর ক্যাকাও-এর চাষ হয়। আর অনেক উঁচুতে, তিন থেকে সাড়ে ছয় হাজার ফুট উচ্চতায় বিশ্বের সব চেয়ে বড় কফি খেত রয়েছে। উপত্যকায় জুনে বার্লি আর গম। পাহাড়ী চারণভূমিতে ভেড়া চরার ব্যবস্থা আছে, তাই বিপুল পরিমাণে ভেড়া পোষা হয় সেখানে। অ্যানটিওকুইয়া ভ্যালিতে রয়েছে টেক্সটাইল মিল। সোগামোসোর কাছে কয়লা আর লোহার খনি রয়েছে, তাই সেখানে গড়ে উঠেছে ইস্পাতের কারখানা। সোনা আর পান্নার খনিও রয়েছে পর্বতের গায়ে। বেশির ভাগ কলাম্বিয়ানই কফির আয় থেকে জীবিকা নির্বাহ করে।
মিটমিট করতে লাগল মাথার ওপরের আলো। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই বন্ধ হয়ে। যাবে লাইব্রেরি, ঘোষণা করল লাউড স্পীকার।
ম্যাপটা ঠেলে সরিয়ে তাড়াহুড়া করে এনসাইক্লোপেডিয়ার তাকগুলোর কাছে, চলে এল রবিন। আমেরিকানায় বেশ কয়েক পৃষ্ঠা জুড়ে লেখা রয়েছে কলাম্বিয়া সম্পর্কে। ব্রিটানিকাতেও বেশ প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। সব পড়ার সময় নেই। রেফারেন্স বই লাইব্রেরির বাইরে নিয়ে যাওয়ারও অনুমতি নেই।
আবার জ্বলতে লাগল আলো। তাকের কাছে দৌড়ে গেল রবিন। দক্ষিণ আমেরিকার ওপর লেখা দুটো বই বের করল। একটার নাম কলাম্বিয়া, ল্যাণ্ড অ্যাণ্ড কনট্রাস্টস। আরেকটা কলাম্বিয়া, ফ্রম নিউ এ্যানাডা টু বলিভার।
মেসেজটা টেবিল থেকে প্রায় ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে দ্রুতপায়ে চেকআউট ডেস্কে চলে এল সে। একটু পরেই বেরিয়ে এল বাইরে, লাইব্রেরির গেটের পাশের সাইকেল র‍্যাক থেকে সাইকেল বের করল। কলাম্বিয়ার ওপরে লেখা বইগুলো পড়তে পারলে খুশি হত। যতগুলো রয়েছে লাইব্রেরিতে। সময় পায়নি। যেদুটো

নিয়েছে সেগুলো পড়ার জন্যেই উদগ্রীব হয়ে উঠেছে সে। কোন সূত্র মিলতেও পারে, যা দিয়ে লিসটার রহস্যের সমাধান হবে।

.

প্রায় দশটা বাজে। পায়ের শব্দ শুনতে পেল মুসা। লিভিং রুমে রয়েছে সে আর এলেনা। রেস্টুরেন্ট থেকে ফ্রাইড চিকেন এনে খেয়েছে। ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বেলে দিয়ে আরাম করে বসেছে। বেশি গরম হয়ে গেছে ঘর। তবে বেশ আলো হয়েছে। অন্ধকার ছায়াগুলোকে একেবারে ঘরের কোণে ঠেলে নিয়ে গেছে যেন আগুনের লালচে আভা।

তাস খেলছিল দুজনে। এলেনা জিতছিল। এই সময় থেমে যেতে হল পায়ের শব্দে। শুনেই বুঝল মুসা চিলেকোঠার দিকে যাচ্ছে কেউ। নীরব বাড়িটাতে সেই শব্দ বেশ পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে, যেন সমস্ত বাড়িতেই ছড়িয়ে পড়েছে।

দমে গেল মুসা। ওপরতলায় যেতে চায় না সে। লিসটারের বাড়িটা ভাল, লাগেনি। কেমন যেন! ভূত থাকলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। এখানকার সব কিছুই তার অপছন্দ। ঠাণ্ডা। ভেজা ভেজা। অনেক ধোয়ামোছা দরকার। দরজা জানালা সব খুলে দিয়ে বোদ বাতাস লাগানো দরকার। আর এমন একটা চিলেকোঠা রয়েছে যেটা কারও প্রয়োজনই নেই, কেউ ব্যবহার করে না। গত রাতেও নাকি পায়ের শব্দ পাওয়া গেছে, অথচ রবিন আর কিশোর গিয়ে কিছুই দেখেনি।

গত রাতে হয়েছিল, আজ আবার শুরু হয়েছে।

মুখ তুলল এলেনা। শুনছ? ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল সে।

না বলতে চাইল মুসা। কিছুই বলতে পারল না। আরেকদিকে মুখ ফেরাল।

পেছনের দরজায় তালা লাগিয়েছিলে? এলেনার প্রশ্ন।

আমি তো মনে করেছি আপনি লাগিয়েছেন।

উঠে দাঁড়াল এলেনা। রান্নাঘরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। কেউ ঢুকেছে।

ওপথে ঢুকলে শুনতে পেতাম। দরজা খুললেই টের পেয়ে যেতাম আমরা।

রান্নাঘরের দিকে এগোল মুসা। দরজাটা পরীক্ষা করল। তালা দেয়া। ছিটকানি লাগানো ওপথে। কেউ আসেনি।

নাকি কেউ ঢুকে ভেতর থেকে ছিটকানি লাগিয়ে দিয়েছে?

রান্নাঘরে এসে দরজার দিকে তাকিয়ে রইল এলেনা। ভ্রুকুটি করল। তারপর পিছিয়ে: বেরিয়ে গেল। তাকে অনুসরণ করে হলে চলে এল মুসা। সিঁড়ির দিকে চেয়ে রয়েছে এলেনা।

শুনছো! এলেনা বলল।

জোরালো হয়েছে পদশব্দ। চিলেকোঠার কাঠের মেঝেতে ফাপা আওয়াজ তুলছে।

মরুক! টেলিফোনের দিকে এগিয়ে এল এলেনা। রিসিভার তুলে ৯১১ ডায়াল করল। শয়তানটার কথা পুলিশকে না বলে আর পারছি না।
শয়তান, অর্থাৎ মানুষের কথা বলছে এলেনা। কিন্তু আসলে কি মানুষ? কিশোর বলেছে গতরাতে সিঁড়ি দিয়ে কাউকে উঠতে দেখেনি। কাউকে নামতেও দেখেনি। কিন্তু চিলেকোঠায় গিয়েছিল কেউ। হেঁটেছিল।
আমার ভাল্লাগছে না! বলেই ফেলল মুসা।
শুনলই না যেন এলেনা। লাইনের অন্য পাশে ডিসপ্যাচারকে ঠিকানা বলছে।
সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল মুসা। কাঁপছে সে। গলা এত শুকিয়ে গেছে ঢোকই গিলতে পারছে না। তবু উঠছে...এক ধাপ..আরেক ধাপ...আরও এক ধাপ...
চিলেকোঠায় পায়চারি চলছেই। ভূত? নাকি ভূতের চেয়েও ভয়ঙ্কর কিছু?
রিসিভার রেখে মুসাকে অনুসরণ করল এলেনা। সে-ও ভয় পেয়েছে। মুসার কাছাকাছি থাকতে চাইছে।
যখন ছোট ছিলাম, বলল সে। আমাদের বাড়িতে একজন বাবুর্চি ছিল। মানুষকে ভয় দেখানোর ওস্তাদ। বিশেষ করে ছোটদেরকে। ছাতি থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছিল ও। ও বলেছিল এ বাড়িতে ভূত আছে।
তাড়াতাড়ি হাত নেড়ে বাধা দিল মুসা। আর বলবেন না, প্লীজ!
ওপরের হলে উঠে দাঁড়াল দুজনে। পায়চারি বন্ধ হয়ে গেছে। কান পেতে রইল আবার শব্দ শোনার অপেক্ষায়।
ওপরেও কি কেউ কান পেতে রয়েছে? চিলেকোঠার সিঁড়িতে অপেক্ষা করছে, রেলিঙে হেলান দিয়ে, নিচের দিকে তাকিয়ে? শিকার দেখলেই ঘাড়ে এসে লাফিয়ে পড়ার জন্যে ওত পেতে রয়েছে?
এখানেই থাকি, যেতে চায় না মুসা। একটা চেয়ার নিয়ে এল কমপিউটার। রুম থেকে। বসার ইঙ্গিত করল এলেনাকে।
পুলিশ এসে যদি দেখে, এলেনা বলল। কিছুই নেই, সব সময়ই যেমন থাকে না, তাহলে কি ভাববে বলতো?
পাগল।
ঠিক। আর এরকম করে বাঘ এসেছে বাঘ এসেছে যদি করতে থাকি, এক সময় আসাই বন্ধ করে দেবে ওরা। আমি ফোন করলেই হাসবে। বলবে কিপটে লিসটারের পাগলা মেয়ে ডাকছে।
কিন্তু আমার মনে হয় যতবারই ফোন করুন না কেন পুলিশকে আসতেই হবে। বলা যায় না, কখন সত্যিকারের বিপদে পড়ে যাবেন আপনি। ওই ঝুঁকি ওরা নিতে চাইবে না। এসে কিছু না দেখলে বকাঝকা করবে হয়ত, কিন্তু আসতে ওদেরকে হবেই।

পুরো এক মিনিট চুপ করে থেকে ভাবল মুসা। কিশোর এখন এখানে থাকলে কি করত? প্রমাণ খুজত, যেটা দেখিয়ে পুলিশকে বিশ্বাস করানো যায়। ভাঙা তালা… পায়ের ছাপ! হ্যাঁ, পায়ের ছাপ!

লিসটারের বাথরুমে একটা জিনিস দৈখেছিল মনে পড়ল মুসার। গতকাল ওখানে আটকে ছিল, তখন দেখেছে। বেসিনের ওপরের তাকে রাখা ট্যালকম পাউডারের একটা টিন।

দৌড়ে এসে লিসটারের ঘরে চলে এল সে। বাথরুমে ঢুকল। সুইচ টিপে আলো জেলে, দেখল টিনটা আগের জায়গাতেই রয়েছে। থাবা দিয়ে ওটা নামিয়ে নিয়ে আবার দৌড়ে ফিরে এল হলে। চিলেকোঠার দরজার কাছে মেঝেতে পাউডার ছিটিয়ে দিল।

চোখে প্রশ্ন নিয়ে তার দিকে তাকাল এলেনা।

মানুষ হলে এপথে ছাড়া বোরোতে পারবে না। বুঝিয়ে বলল মুসা, আর এদিকে এলে তাকে দেখতে পাবই। এই পাউডার মাড়িয়ে যেতে হবে। পায়ের। ছাপ রেখে যাবে। পুলিশকে দেখাতে পারব তখন। প্রমাণ।

ঠিক! ঠিক বলেছ! হাততালি দিতে গিয়েও থেমে গেল এলেনা, কিন্তু যদি পায়ের ছাপ পড়ে?

জবাব দিল না মুসা। ড্রাইভওয়েতে ইঞ্জিনের শব্দ হল। দড়াম করে বন্ধ হল গাড়ির দরজা। বাড়ির চারপাশে ঘুরে দেখতে লাগল কেউ। শব্দ হচ্ছে। দেখছে। বোধহয় ঝোপঝাড়ে, কেউ লুকিয়ে আছে কিনা।

সিঁড়িতে অর্ধেক নেমে গেছে এলেনা, এই সময় বাজল কলিং বেল। দরজা খুলে দিল সে। রকি বীচ পুলিশ ডিপার্টমেন্টের দুজন অফিসার দাঁড়িয়ে আছে। এলেনাকে বলতে শুনল মুসা, ওপরে চিলেকোঠায় আসুন।

চলুন, বলল একজন অফিসার। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল।

আরেকটা শব্দও কানে আসছে মুসার। চিলেকোঠার সিঁড়িতে, নামছে বোধহয় রহস্যময় অনুপ্রবেশকারী।

ঝট করে দরজার দিকে ফিরল সে। এখান থেকেই সিঁড়ির গোড়াটা দেখা যায়।

হঠাৎ করেই থেমে গেল চিলেকোঠার সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ হল না আর। মেইন সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসতে লাগল একজন অফিসার।

সাহস পেয়ে চিলেকোঠার দরজার কাছে উঠে এল মুসা। যেমন পাউডার তেমনি রয়েছে। কোন ছাপ পড়েনি। মানুষের চিহ্নও চোখে পড়ছে না।

ভূত! কোলা ব্যাঙের স্বর বেরোল মুসার কণ্ঠ থেকে। ভূতের বাড়ি এটা!

সব শুনে এলেনা বলল, তোমরা থাকলে থাক! আমি আর এক মুহূর্তও না! মার কাছে চলে যাচ্ছি।

.
তিন ব্লক পেছনে রয়েছে কিশোর, এই সময় সান্তা মনিকা বুলভার ধরে পুবে মোড়। নিল এনথনির গাড়ি। চার ব্লক পেছনে পড়ে গেল যখন মেফিল্ডে ঢুকল গাড়িটা। গতি কমাল। একটা মার্কেটের পার্কিং লটে নিয়ে গিয়ে ঢোকাল। ডি. এল; ডিপার্টমেন্টাল স্টোর দেখা গেল কমপ্লেক্সের পশ্চিম প্রান্তে। এই ব্রাঞ্চেই লিসটারের ম্যানেজারি করে সে। র‍্যাকে সাইকেল তালা দিয়ে রেখে দোকানের দিকে এগোল কিশোর।
এখন কেনাকাটার সময় লোকের। দোকানদারী ফেলে এই সময়ে ওবাড়িতে কেন গিয়েছিল এনথনি? অবাকই লাগছে তার। দুজনে মিলে ষড়যন্ত্র করছে মিস্টার লিসটারের বিরুদ্ধে? এতে কি লাভ ওদের?
ঠোঁট কামড়াল কিলোর। এনথনির সঙ্গে দেখা করার সিদ্ধান্ত নিল। তাকে– বলবে, সে আর তার বন্ধুরা মিলে এলেনা লিসটারকে সাহায্য করছে। বিশপের– বইয়ের ব্যাপারে কিছু জানে কিনা জিজ্ঞেস করবে। সিয়েটা আর সোগামোসোর। কথাও জানতে চাইবে। এসব প্রশ্ন অবশ্য নতুন নয় এনথনির জন্যে। এলেনার মায়ের রান্নাঘরে লুকিয়ে থেকে তো সবই শুনেছে। তবু তার প্রতিক্রিয়া দেখার কৌতূহল সামলাতে পারছে না কিশোর। এমনও হতে পারে মুখ ফসকে কোন তথ্য দিয়ে ফেলতে পারে এনথনি, যেটা তদন্তের সুবিধে করে দেবে।
স্টোরের অফিসগুলো রয়েছে তিনতলায়। চিলড্রেনস ডিপার্টমেন্টের পেছনে। ডেস্কের ওপাশে বসা এক মহিলা কিশোরের দিকে তাকিয়ে হাসল। কি সাহায্য করতে পারে জিজ্ঞেস করল। তিন গোয়েন্দার একটা কার্ড দিয়ে নিজের নাম বলে জিজ্ঞেস করল কিশোর মিস্টার এনথনির সঙ্গে দেখা করা যাবে কিনা।
কার্ডটার দিকে তাকাল মহিলা। গোয়েন্দা? কিছুটা অবাক হয়েই আবার কিশোরের দিকে মুখ তুলল।
মিস্টার লিসটারের নিখোঁজের ব্যাপারে কথা বলব, কিশোর বলল। গতকাল এলেনা লিসটারের এনগেজমেন্ট পার্টিতে ছিলাম। মিস্টার এনথনির সঙ্গে ওখানেই। দেখা হয়েছে।
মিস্টার লিসটার? হাসি চলে গেছে মহিলার মুখ থেকে। তিনি নিখোঁজ হয়েছেন?
মিস্টার এনথনি সব জানেন।
কিশোর আর কিছু বলতে চায় না এটা বুঝে ফোন তুলল মহিলা। এক্সটেনশনে ডায়াল করে বলল কিশোর পাশা এসেছে, মিস্টার এনথনির সঙ্গে দেখা। করতে চায়। তারপর বলল মিস্টার লিসটারের সম্পর্কে কথা বলবে।
ওপাশের কথা শুনল। রিসিভার নামিয়ে রেখে কিশোরের দিকে তাকিয়ে বলল, মিস্টার এনথনি খুব ব্যস্ত। আজ কথা বলতে পারবেন না।

তাই? অতীতে বহুবারই বহুজুন কিশোরের সঙ্গে দেখা করতে অসম্মতি জানিয়েছে, এটা নতুন নয় তার কাছে একটুও নিরাশ হল না। তবে একটা উপায় বের করতেই হবে দেখা করার। এবং আজই। লিটারের কমপিউটারের ফাইলের কথা হয়ত জানে না এনথনি। ওটার কথা শুনলে নরম হতেও পারে।
আমি জানি মিস্টার এনথনি ব্যস্ত মানুষ, শান্তকণ্ঠে বলল কিশোর। কিন্তু তারপরেও আমার সঙ্গে তিনি দেখা করতে চাইবেন। তার জন্যে খবর আছে। মিস্টার লিটারের ব্যাক্তিগত ফাইলে লেখা রয়েছে তার নাম।
মোলায়েম হাসি হাসল গহিলা। বেশ, তোমার কার্ড আর মেসেজ রেখে যাও। তাকে দেব। দরকার মনে করলে ফোন করবেন।
বসকে পাহারা দেয়ার গুরু দায়িত্ব নিয়েছেন যেন মহিলা। কিছুতেই দেখা করতে দেবে না। কিশোরকে সরাতে সর পরিকর। ঘড়ি দেখল কিশোর। পাঁচটার। বেশি। আরেকটু পরেই শেষ হয়ে যাবে, অফিসের সময়। ঠিক আছে, বসি, বলল সে। তিনি বেরোলেই নাহয় কথা বলব।
অনেকক্ষণ বলতে হবে তাহলে। দোকান বন্ধ হতে নটা।
অফিস থেকে বেরিয়ে এল কিশোর। এসকেলেটর, অর্থাৎ চলমান সিঁড়ি নেমে যাচ্ছে নিচে। তাতে উঠল। হাল ছেড়ে দিয়ে ফিরে যাবে? নাকি অপেক্ষা করবে এনথনির জন্যে? কাপড় আর পারফিউমের দোকানের পাশ দিয়ে নামতে নামতে এসব কথা ভাবছে সে। দোতলা থেকে একতলায়, নামল, আসবাব আর নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দোকান ওখানে।
এনথনির জন্যে অপেক্ষাই করবে ঠিক করল কিশোর। অফিস বন্ধ করার। আগে নিশ্চয় তার মেসেজ পেয়ে যাবে ম্যানেজার। ঘাবড়ে গিয়ে কথা বলতে চাইবে। আর তা যদি না করে, লোকটার ওপর চোখ রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। আইলিন লিসটার আর এনথনির মাঝে কোন একটা সম্পর্ক নিশ্চয় আছে। কি, সেটা বের করতে হবে। হয়ত লিটারের কিডন্যাপিঙের সঙ্গেও এর যোগাযোগ রয়েছে।
নিচে আঙিনায় নেমে এল কিশোর। এখন সময় কাটাতে হবে, কয়েক ঘন্টা। কয়েকটা ইলেকট্রনিকের দোকানের সামনে ঘুরল। বিভিন্ন মডেলের স্টেরিও সেট আর রেকর্ড দেখল,। একটা স্ন্যাকস শপে ঢুকে চিকেন বারগার আর কোক খেল। একটা কাপড়ের দোকানে ঢুকে ব্যায়ামের জন্যে কিছু পোশাক পছন্দ করল। একটা বইয়ের দোকানে ঢুকে বই বের করে পড়তে শুরু করে দিল। দোকানদার বিরক্ত হয়ে তার দিকে তাকানো শুরু করতে করতে শেষ করে ফেলল অর্ধেকটা কাহিনী।
বার বার ঘড়ি দেখছে কিশোর। আরও এক ঘন্টার বেশি রয়েছে। একটা আসবাবের দোকানে ঢুকে চামড়ায় মোড়া একটা বড় সোফায় বসল হেলান দিয়ে।

চুপ করে বসে থাকা ছাড়া আর কিছু করার নেই।
দোকানের এই কোণটা নীরব, বড় বেশি নীরব। খরিদ্দার বেশি নেই। নিঃসঙ্গ। একজন সেলসম্যান পায়চারি করছে আসবাবের সারির মাঝের লম্বা একটা ফাঁকে। তার পায়ের শব্দ ঢেকে দিচ্ছে মেঝেতে বিছানো কার্পেট। বসে থাকতে থাকতে ঘুম পেয়ে গেল কিশোরের। ঢুলতে শুরু করল। আগের রাতে লিটারের বাড়িতে ভাল ঘুম হয়নি। এখন সেটার খেসারত দিতে হচ্ছে।
চিলেকোঠায় অনুপ্রবেশকারীর কথা মাথায় ঢুকতেই তন্দ্রা টুটে গেল তার। যদিও মাথাটা ঝুলেই রইল বুকের ওপর। এই আরেকটা রহস্য। কি ঘটেছে। চিলেকোঠায়? ভূতে হাঁটাহাঁটি করেছে?
কিন্তু ভূত বিশ্বাস করে না কিশোর। র‍্যাপারটা অদ্ভুত হতে পারে, কিন্তু ভূত। নয়। কবর থেকে উঠে আসতে পারে না প্রেতাত্মা। গলা কেটে বললেও কিশোরকে অন্তত একথা বিশ্বাস করাতে পারবে না কেউ। ওই শব্দের অন্য ব্যাখ্যা আছে। হতে পারে সাগরের দিক থেকে জোরাল হাওয়া এসেছিল ওই সময়, কোনভাবে শব্দের সৃষ্টি করেছে। তবে এটা একটা সম্ভাবনা, অন্য কিছুও হতে পারে। এই যেমন, বড় ইঁদুর।
আবার ঢুলতে লাগল সে। হঠাৎ চমকে জেগে গেল। চোখ মেলল।
অন্ধকার। চারপাশে তাকিয়ে নানারকম আকৃতি দেখতে পেল সে। কালো কালো অদ্ভুত সব ছায়ামূর্তি যেন। চিনতে অবশ্য দেরি হল না। দোকানের আলমারি, চেয়ার, টেবিল, ওয়ারড্রোব এসব।
সতর্ক হয়ে গেল সে। দেরি করে ফেলেছে! দোকান বন্ধ হয়ে গেছে। টেরই পায়নি সে কখন বন্ধ করে দিয়ে চলে গেছে সেলসম্যান।
উঠে দাঁড়াল কিলোর। কান পাতল। নিশ্চয় ঝাড়ুদার আছে বাইরে। কিন্তু বাড়ুর শব্দ কানে এল না। পাহারাদার থাকবেই। ওরা এসে তাকে জাগিয়ে দিল না কেন? সেলসম্যানই বা এভাবে দোকান বন্ধ করে দিয়ে চলে গেল কেন? তাকে জাগিয়ে বের করে দিতে পারত।
একটাই কারণ হতে পারে। এমন এক কোণে ঢুকে বসে আছে সে, যেখানে ভাল করে না তাকালে কারও চোখ পড়বে না। তার তিন ফুট দূর দিয়ে হেঁটে গেলেও না।
চোখ ডলল কিশোর। আলমারি আর কিছু উইং চেয়ারের ওপাশে একটা আলো জ্বলছে, ঘোলাটে লাল আভা ছড়িয়ে দিয়েছে শুধু। তার নিচে লেখা রয়েছে একজিট, তার মানে বেরোনোর পথ।
অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে সেদিকে এগোল কিশোর। একজিটের কাছে পৌঁছে আরেকটা নির্দেশ দেখতে পেলঃ ইমারজেন্সি একজিট ওনলি। অ্যালার্ম উইল রিং

ইফ দিস ডোর ইজ ওপেনড। জরুরী অবস্থায় বেরোনোর পথ। দরজা খুললেই সতর্কীকরণ ঘন্টা বেজে উঠবে।
কল্পনায় দেখতে পেল কিশোর, ইমারজেন্সি তোর ঠেলে বাইরে বেরিয়েছে। প্রচণ্ড শব্দে বাজতে আরম্ভ করেছে অ্যালার্ম বেল। জ্বলে-নিভে সঙ্কেত দিতে শুরু করেছে বিশেষ আলো। কোন সন্দেহ নেই টিভি মনিটরের সামনে পাহারাদারও বসে রয়েছে, চোখ রাখছে সর্বত্র। পর্দায় কিশোরকে দেখামাত্র ছুটে আসছে ওরা। পিস্তল বের করে ফেলেছে। মার্কেটের সীমানা পেরোনার আগেই ধরে ফেলা হয়েছে তাকে। তার পরের ঘটনা আর মনে করতে চায় না সে।
কেঁপে উঠল কিশোর। কয়েক মাস আগে একটা ছেলেকে পাওয়া গিয়েছিল। আঙিনার ভেতরে। বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে। ধরে তাকে প্রথমে ভালমত ধোলাই দিয়েছে পাহারাদাররা, যদিও সেটা আইন বিরুদ্ধ। তারপর পুলিশ ডেকে তাদের হাতে তুলে দিয়েছে। জেলখাটা কিছুতেই এড়াতে পারেনি ছেলেটা। কিশোরের ক্ষেত্রে জেলটা না থাকলেও ধোলাইটা খেতেই হবে। ধরলে কিছু উত্তম মধ্যম না দিয়ে ছাড়বে না প্রহরীরা। তার ওপর রয়েছে লোকাল নিউজপেপারগুলো। ছবিসহ বড় করে ছাপবে সামনের পাতায়, হেডিং লিখবে সুপার মার্কেটে চোর। রাতের বেলা কি কারণে আসবাবের দোকানে ঢুকে লুকিয়ে বসেছিল কিশোর, কিছুতেই বোঝাতে পারবে না রিপোর্টারদেরকে।
ইমারজেন্সি একস্জিটের দিক থেকে ঘুরে দাঁড়াল সে। প্রধান প্রবেশ পথের দিকে চলল। ইস্পাতের মস্ত শাটার লাগানো রয়েছে সেখানে।
সাবধানে এগোল সে। সামান্যতম শব্দ না করে এসে খুঁজে বের করল কর্মচারীদের প্রবেশ পথটা। এই দরজাতেই সাবধান বাণী লেখা রয়েছে। জোর করে বেরোতে গেলেই অ্যালার্ম বেজে উঠবে।
দরজার পাশের একটা ঘড়িতে দেখা গেল রাত এগারোটা বাজে। বাড়িতে খবর দিতে পারেনি কিশোর। রেগে কাই হয়ে যাবেন মেরিচাচী।
খুঁজতে খুঁজতে একটা পে ফোন বের করল সে। স্লটে পয়সা ফেলে বাড়ির নম্বরে ডায়াল করল। মেরিচাচী ধরলেন। কণ্ঠ শুনেই কিশোর বুঝে ফেলল উদ্বিগ্ন হয়ে আছেন। সে নাম বললেই ফেটে পড়বেন এখন। তা-ই করলেন। জিজ্ঞেস করলেন, তুই কোথায়?
আমাদেরকে এলেনা লিসটারের প্রয়োজন, ঘুরিয়ে জবাব দিল, কিশোর। সত্যি কথাই বলল।
কি মাঝে মাঝে আমারও তোকে প্রয়োজন হয়! সেকথা কখনও ভেবেছিস? লিসটারের বাড়ি থেকে বলছিস নাকি? ওর বাপের কোন খোঁজ পাওয়া গেছে?
না। চাচী, শোন, আজ রাতেও থাকতে চাই। তোমার কোন অসুবিধে হবে না। তো?

রাতে আর কি অসুবিধে? ইয়ার্ডের কাজ তো দিনের বেলা। থাকতে চাইলে থাক। তবে সাবধানে থাকবি। বিপদ-আপদ ঘটাবি না।
লাইন কেটে দিলেন তিনি।
ফোন ছেড়ে দিয়ে আবার আসবাবের দোকানে ফিরে এল, ঘরের কোণে তার। সেই সোফায়। সোফাটাকেই এখন তার বাড়ি ভাবতে আরম্ভ করেছে। বসে পড়ল। সকাল হতে অনেক দেরি। কি করে যে রাতটা কাটবে কে জানে।
মোচড় দিয়ে উঠল পেট। খিদে জানান দিচ্ছে। একটা গল্পের কথা মনে পড়ল। একটা ছেলে ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে রাতের বেলা আটকা পড়েছিল। রেস্টুরেন্টের রেফ্রিজারেটর থেকে খাবার বের করে খেয়েছিল সে। কিন্তু বিকেলে ভেতরে কোন রেস্টুরেন্ট দেখতে পায়নি কিশোর। আছে বলেও মনে হয় না। রাখার কোন প্রয়োজন মনে করেননি লিসটার। কারণ স্টোরের বাইরেই চত্বরে অনেক খাবারের দোকান রয়েছে।
তবু, খাবার কি খুঁজবে? সুইট কাউন্টার কিংবা ছোটখাট স্ন্যাকস থাকতে পারে কোথাও।
বাতিল করে দিল ভাবনাটা। অতিরিক্ত ঝুঁকির কাজ হয়ে যাবে।
চোখ মুদল সে। আবার তন্দ্রা এসে গেল। ঢুলতে শুরু করল। স্বপ্ন দেখল। লিসটারের বাড়িতে রয়েছে আর কে যেন টোকা দিচ্ছে দরজায়। স্বপ্নের মধ্যেই বুঝতে পারল কে লোকটা, ডেভিড লিসটার। ভেতরে ঢুকতে চাইছেন। আসছি! চিৎকার করে সাড়া দিল কিশোর। যাবেন না! এখুনি আসছি!
জোর করে যেন টেনে তুলল শরীরটাকে। আলোকিত হয়ে গেছে। লোকজন। দেখতে পেল সামনে। তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। হাসাহাসি করতে লাগল ওরা। সকালের খরিদ্দার। বিজনেস স্যুট পরনে, হাতে খবরের কাগজ। ওদেরই একজন টোকা দিচ্ছিল জানালায়।
জানালা! কাল সন্ধ্যায় যখন বসেছিল তখন তো ওটা ছিল না। এখন এল কোথা থেকে?
বুঝতে পারল অন্ধকারে অন্য জায়গায় এসে বসেছে। আগের দিন সন্ধ্যায়, শুরুতে যে সোফায় বসেছিল এটা সেটা নয়। ডিসপ্লে উইনডোতে জমায়েত হয়েছে লোকে দোকানের ভেতর তাকে ঘুমোতে দেখে। যেন এটা তাদের কাছে এক। সাংঘাতিক মজার ব্যাপার।
লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল কিলোর। যে কোন মুহূর্তে হাজির হয়ে যেতে পারে প্রহরীরা, চেপে ধরতে পারে তাকে। পুলিশ ডাকবে। তারা খবর দেবে মেরিচাচী আর রাশেদ চাচাকে।
প্রহরীদের গলা শোনা গেল। কর্মচারীদের ঢোকার দরজা খুলছে ওরা।

দৌড়ে গিয়ে বড় একটা টেবিলের নিচে লুকিয়ে পড়ল কিশোর।
আসবাবের সারির মাঝের পথ দিয়ে এগিয়ে এল ওরা। এখানেই আছে, বলল একজন। আশোঁপাশে কোথাও লুকিয়ে পড়েছে।
কিশোর যে টেবিলের নিচে লুকিয়েছে তার কাছে এসে দাঁড়াল আরেকজন। মোটা গলায় বলল, কাল রাতে দেখলে না কেন? কারও চোখে পড়ল না?
সব কটা চেয়ার টেবিলের তলায় তো আর উঁকি দেয়া সম্ভব না, প্রথম লোকটা জবাব দিল। টহল দিই। তখন চোখে পড়লে তো ধরতামই।
লোকগুলো চলে গেলে বেরিয়ে এসে মাথা তুলে উঁকি দিল কিশোর। ডিসপ্লে উইনডোর কাছে দেখতে পেল ওদেরকে। সোফাটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে, যেন ওটাই ওদেরকে বলে দেবে কিশোর কোথায় আছে।
পেছনে শব্দ হল। ফিরে তাকাল কিশোর। হাড়সর্বস্ব একজন মানুষ দাঁড়িয়ে রয়েছে দোকানের প্রধান প্রবেশ পথের কাছে। পরনে জলপাই রঙের জাম্প স্যুট। তালা খুলল লোকটা। তারপর টান দিয়ে তুলতে শুরু করল ইস্পাতের শাটার।
পথ পরিষ্কার হয়ে আসছে।
লাফিয়ে উঠে দৌড় দিল কিশোর। একছুটে লোকটার পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। চিৎকার চেঁচামেচি কিছুই করল না লোকটা। অবাক হয়ে তাকিয়ে রয়েছে শুধু তার দিকে।
চত্বরে বেরোল কিশোর। এই সময় শুনতে পেল চিৎকার। দেখার জন্যে থামল।, ফিরেও তাকাল না। ছুটে চতুর পার হয়ে অটোমেটিক দরজা দিয়ে বেরিয়ে চলে এল পার্কিং এরিয়ায়।
র‍্যাকে আগের জায়গাতেই বাঁধা রয়েছে সাইকেলটা। খুলতে গিয়ে তাড়াহুড়োয় হাত থেকে চাবিই ফেলে দিয়েছিল প্রায়। কাঁপা হাতে খুলল তালাটা। একটানে সাইকেলটা বের করে নিয়েই চেপে বসল। প্যাডাল ঘোরাতে শুরু করল। পেছনে ছুটে আসছে লোকজন।
এবারও ফিরে তাকাল না কিশোর। এখন একটাই করণীয়, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া, লোকগুলোর হাতে পড়ার আগেই।

.

ভূত বিশ্বাস করি না আমি, ঘোষণা করল কিশোর। ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রয়েছে। মুসার দিকে।
তা তো বুঝলাম, মুসা বলল। কিন্তু ভূত না হলে কী?
বাতাসের কারসাজি হতে পারে। ইঁদুর হতে পারে, রবিন বলল।
হেডকোয়ার্টারে আলোচনায় বসেছে তিন গোয়েন্দা। কিশোর বসেছে তার নির্দিষ্ট ডেস্কের ওপাশে। চোখ লাল। ঘুম ঘুম দৃষ্টি। ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে রাতের ধকলের

স্বাক্ষর। মুসার চোখেও ক্লান্তি। শুধু স্বাভাবিক দেখাচ্ছে রবিনকে। তিনজনের মধ্যে রাতে একমাত্র তারই ভাল ঘুম হয়েছে।
লাইব্রেরি থেকে যে বই দুটো পড়তে এনেছিল রবিন সেদুটো নিয়ে এসেছে। এখানে। পাতা ওল্টাতে শুরু করল।
ভূত হলেই বা কি? বইয়ের দিকে তাকিয়ে বলল সে। লিসটারের বাড়িতে নিশ্চয় অনেক দিন ধরে বাস করছে সে। হঠাৎ করে লিসটারকে নিয়ে পরপারে চলে যাওয়ার ইচ্ছে নিশ্চয় তার হয়নি। আমাদেরকে এখন বিশপেরই বই খুঁজে বের করতে হবে। আর সেটা করতে পারলেই লিসটারকেও বের করে আনতে পারব। কাজেই ভূতের ওপর জোর না দিয়ে এখন বিশপের বইয়ের ওপরই জোর দেয়া উচিত। আর সেজন্যে কমপিউটারের মেসেজের মানে বের করতে হবে আমাদের।
যাই হোক, তোমাদেরকে থ করে দেয়ার মত খবর আছে আমার কাছে। মুখ তুলল। রবিন। হাসল। হাততালি দেয়ার দরকার নেই। বাহবা দেয়ার দরকার নেই।
শোন, আমি সোগামোসো খুঁজে পেয়েছি।
ঘুম থেকে যেন জেগে গেল কিশোর। একেবারে সজাগ। পেয়েছ! কে?
কে নয়, কি। দক্ষিণ আমেরিকার কলাম্বিয়ার একটা ছোট শহর। মাত্র, উনচল্লিশ হাজার লোকের বাস। এখন এলেনা গিয়ে যদি বৃদ্ধা মহিলাকে জিজ্ঞেস করে সে কি চায় তাহলে হয়ত জেনে আসতে পারবে। ওই মহিলা নিশ্চয় সোগামোসোরই বাসিন্দা।
আর সেটা করতে গেলে সিয়েটার ব্যাপারে হুশিয়ার থাকতে হবে তাকে,, মুসা মনে করিয়ে দিল। কমপিউটারের মেসেজে সেকথা বলা আছে।
হ্যাঁ, মাথা ঝাঁকাল রবিন। মহিলাকে জিজ্ঞেস করতে হবে। হুশিয়ার থাকতে হবে যাতে সিয়েটার কানে এসব কথা চলে না যায়।
না, মাথা নাড়ল কিশোর। সিয়েটা কলাম্বিয়ায় নেই। লিসটার কমপিউটারে মেসেজ লেখার সময় অন্তত ছিল না। লিসটার জানতেন না সিয়েটা বৈধ কিনা। আই এন এস-এর কথা উল্লেখ করেছেন তিনি। আই এন এস মানে ইমিগ্রেশন অ্যাণ্ড নেচারালাইজেশন সার্ভিস। সুতরাং ধরে নিতে পারি বেআইনী ভাবে আমেরিকায় প্রবেশ করেছে সিয়েটা, তার কাছে বৈধ কাগজপত্র নেই।
বেশ, রবিন বলল। তাহলে এখানেও হুশিয়ার থাকতে হবে এলেনাকে। যতক্ষণ সোগামোসোয় রওনা না হচ্ছে ততক্ষণ সাবধান থাকতে হবে যাতে সিয়েটার সামনে না পড়ে যায়। কিংবা সামনে পড়লেও কোন কথা ফাঁস না করে দেয়।
কিশোর, তোমাকে চিলেকোঠায় যে আক্রমণ করেছিল সে-ই সিয়েটা হতে পারে। তোমার ওপর হামলা চালিয়েছিল একজন মানুষ, ভূত-প্রেত নয়।
ভূত তো হতেই পারে না, কিশোর বলল। মানুষ। জীবন্ত মানুষ।

টেলিফোন বাজল।
এলেনা হয়ত ভাবছে আমরা কি করছি, মুসা আন্দাজ করল। কাল রাতে মায়ের বাড়িতে চলে গিয়েছিল। বাবার ওখানে থাকতে সাহস পায়নি।
তাকে দোষ দেয়া যায় না। রিসিভার তুলে নিয়ে কানে ঠেকাল কিশোর। এলেনার ফোন নয়। আরনি ভিনসেনজো ওরফে হোয়েরটার।
টেলিফোন লাইনের সঙ্গে লাগানো লাউডস্পীকারের সুইচ অন করে দিল কিশোর, সকলের শোনার জন্যে। আপনি ফোন করলেন, অবাকই লাগছে মিস্টার ভিনসেনজো। কাল তো বেরিয়ে চলে গেলেন...
আমাকে কডিই বলবে। ওটা ছদ্মনাম নয়। মিডল নোম। আরনি কডি ভিনসেনজো। বন্ধুরা আমাকে ওই নামেই ডাকে। আর কাল চলে না গিয়ে কি করতে পারতাম। এত বড় অপমান...থাক ওসব কথা। আজ থানায় গিয়েছিলাম। লিসটারের নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারে খুব একটা আগ্রহী নয় পুলিশ। তেমন মাথা ঘামাচ্ছে না। তবে কিডন্যাপের কথা জানলে হয়ত ঘামাত। আর তখন আমিও তাদের সন্দেহের তালিকায় পড়ে যেতাম।
কারণ লিসটারকে কিডন্যাপের মোটিভ রয়েছে আপনার, কিশোর বলল।
হ্যাঁ, স্বীকার করল আরনি। ওই বুড়ো ভামটাকে একটা শিক্ষা দেয়ার ইচ্ছে ছিল আমার। আমার বাবার সর্বনাশ করার জন্যে।
সহজ সরল স্বীকারোক্তি। বন্ধুদের দিকে তাকাল কিশোর।
সত্যিই বলছে মনে হয়, বিড়বিড় করল রবিন।
মাথা ঝাঁকাল কিশোর। বেশ, বিশ্বাস করলাম আপনার কথা। কিন্তু আমাকে ফোন করেছেন কেন?
তোমাদের ওপর এলেনার বিশ্বাস আছে, তাই আমারও হয়েছে। মিস্টার লিসটারকে খুঁজে বের করতে আমার কোন সাহায্য দরকার হলে, করব। এটা তার জন্যে দয়া নয়, আমার নিজেরই স্বার্থে। যতদিন লিসটার নিখোঁজ হয়ে থাকবে, আমার ওপর সন্দেহ থাকবে তোমাদের। এটা বয়ে বেড়াতে পারব না আমি। কাজেই, আমাকে দরকার হলেই ফোন করবে।
এখনই একটা কথা ভাবছি, কিশোর বলল। মোগামোসো সম্পর্কে কিছু জানেন?
সোগা...সোগা কে?
নামটা আবার বলল কিশোর। কিছু বুঝতেই পারল না আরনি, বলা তো দুরের কথা। সিয়েটার কথা শুনে বলল, ওই নামে কয়েকজনকে চিনি। খুব প্রচলিত এই নাম, অনেকেই রাখে। তাঁদের কেউই লিসটারকে চেনে না এটাও বলতে পারি।
কখনও ঈশ্বরের অশ্রুর কথা বলতে শুনেছেন মিস্টার লিসটারকে? ঈশ্বরের অশ?
তা কি করে হয়? কি করে হয় জানি না। তবে ওটা মিস্টার লিসটারের কাছে খুবই

জরুরী। সরি। শুনিনি। শুনলে ওরকম একটা কথা মনে না থাকার কথা নয়।
তা ঠিক। আরেকটা প্রশ্ন। সোগামোসোর কথা আমরা জানি। ওটা কলাম্বিয়ার। একটা ছোট শহর। কোকেনের প্রধান ঘাঁটিগুলোর একটা। মাদকদ্রব্য চোরাচালানের সঙ্গে মিস্টার লিসটারের কোন যোগ নেই তো?
মোটেই না, জোর দিয়ে বলল আরনি। মাদককে ঘৃণা করে লিসটার। নেশা করে শুনলেই যত ভাল কর্মচারীই হোক চাকরি থেকে বের করে দেয় সে। আমার কথা বিশ্বাস না হলে এলেনাকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পার।
তাকে ধন্যবাদ দিল কিশোর।
যোগাযোগের জন্যে টেলিফোন নম্বর দিয়ে লাইন কেটে দিল আরনি।
অসংখ্য ছেঁড়া সুতো রয়েছে এই কেসে, কিশোর বলল। সব জোড়া দিতে। পারলে রহস্যের কিনারা করা যাবে না। অথচ কোনটার সঙ্গে কোনটার। যোগাযোগ দেখতে পাচ্ছি না এখনও{ দুদিন আগে যে অন্ধকারে ছিলাম এখনও তা-ই রয়েছি।
সোগামোসোও কোন সাহায্য করতে পারবে বলে মনে হচ্ছে না, মুসা বলল। ওখানে গিয়ে বৃদ্ধা মহিলার সঙ্গে এলেনা যোগাযোগ করার আগেই হয়ত এদিকে তার বাপ মরে ভূত হবে।
স্বাভাবিক মৃত্য যদি হয়, বলল রবিন। বয়েসের কারণে। ও-কে, এর পর কি করব?
এলেনার মা পরামর্শ দিয়েছেন আইলিন লিসটারে খোঁজ নিতে, কিশোর বলল। লিসটারের বাড়িতে তো আর খোঁজা বাদ রাখিনি। এখন জাহাজটায় গিয়ে খুঁজলে মন্দ হয় না। কোথায় আছে ওটা এলেনা নিশ্চয় জানে।
জানতে পারে, মাথা দোলাল রবিন। আর ওখানে বিশপের বইটা খুঁজে বের করতে পারলে তার বাবা মুক্তি পাবে। লিসটারই তখন বলে দিতে পারবে বৃদ্ধা। মহিলাকে কোথায় পাওয়া যাবে, কোথায় মিলবে ঈশ্বরের অশ্রু।
সান্তা মনিকায় এলেনার মায়ের বাড়িতে ফোন করল কিশোর। ফোন ধরল। এলেনা। সে ওদেরকে বলল সেন্ট্রাল কোস্ট মেরিন করপোরেশনের ড্রাই ডকে রয়েছে ইয়টটা। ওটা একটা শিপইয়ার্ড, এলেনা বলল। বোটি ড্রাইভে। ফোন। করে আমি ওদেরকে বলে দিচ্ছি তোমরা যাচ্ছ। তোমাদের যাতে ইয়টে উঠতে দেয়া হয়।
মিনিট কয়েক পরেই কোস্ট হাইওয়ে ধরে সাইকেল চালিয়ে চলল তিন গোয়েন্দা। বিশ মিনিট একটানা প্যাড়াল করে এসে পৌঁছল বোটি ড্রাইভে।
তীর থেকে মাইলখানেকেরও বেশি সাগরের ভেতরে ঢুকে গেছে মানুষের তৈরি এক টুকরো জুমি। মাটি ফেলে ফেলে তৈরি করা। বিশাল এক দানবের আঙুল।

যেন। আঙুলের মাথায় জেটি। একটা ইয়ট ক্লাব আর এক সারি দোকানপাট। জেটির দক্ষিণ পাশে। উত্তর পাশে কয়েকটা শিপইয়ার্ড। বড় রাস্তা থেকে প্রায়। কোয়ার্টার মাইল ভেতরে সেন্ট্রাল কোস্ট মেরিন করপোরেশন। ঝড়ের কবল থেকে রক্ষা করার জন্যে বেশ শক্ত বেড়া চারপাশ ঘিরে। গেটে পাহারা দিচ্ছে ইউনিফর্ম পরা দারোয়ান। গেটের পাশে ছোট গার্ডহাউসে বসে আছে সে।
গেটের কাছে এসে থামতে হল তিন গোয়েন্দাকে। পরিচয় দিল কিশোর।
হ্যাঁ, মিস লিটার ফোন করেছিলেন, দারোয়ান বলল। তবে বয়স্ক মানুষ আশা করেছিলাম আমি। যাকগে, মিস যখন বলেছেন, আমার কি এখানে সই করতে হবে। ঈশ্বরের অশ্রু
একটা নোটবুক বের করে দিল লোকটা। এক এক করে সই করল তিন গোয়েন্দা। তিনজনের নামের পাশে নোট লিখল দারোয়ান। তারপর তার পেছনের পেগবোর্ড থেকে একগোছা চাবি নিয়ে কিশোরের দিকে বাড়িয়ে ধরল, আইলিন লিসটারের কেবিন আর হুইলহাউসগুলোতে তালা দেয়া। এটা দরকার হবে।
ডানে দেখাল সে। ওদিক দিয়ে পথ। ওই যে স্কুনারটা, ওটার পাশ কাটিয়ে যেতে হবে। ওই যে, নিচের রঙ চেছে তুলে ফেলা হয়েছে যে। হ্যাঁ, তার পরেই রয়েছে আইলিন লিসটার। ড্রাই ডকে। বড় জাহাজ। কালো খেল। গলুইয়ের কাছে সোনালি রঙে নাম লেখা রয়েছে।
লোকটাকে ধন্যবাদ জানিয়ে সাইকেল চালিয়ে চলল তিন গোয়েন্দা। সাগর থেকে, আসছে তাজা বাতাস। মাথার ওপরে চক্কর দিচ্ছে গাল, কর্কশ চিৎকার করছে। বাতাসে শুকনো শ্যাওলা, ঝিনুক, মাছ আর জাহাজের রঙের মিশ্র গন্ধ। পানি থেকে মেরামতের জন্যে শুকনোয় তোলার পর খোলে লেগে থাকা শ্যাওলা। শুকিয়ে এক ধরনের শুঁটকি শুঁটকি গন্ধ ছড়াচ্ছে।
অনেক জাহাজের পাশ কাটাল ছেলেরা। বেশির ভাগই সেইলবোট। কাঠ আর ফাঁইবারগ্লাসে তৈরি বোটগুলো লম্বায় চল্লিশ থেকে ষাট ফুট। আইলিন লিসটার জাহাজটাকে অনেকটা আলাদা লাগল ওগুলোর তুলনায়, অন্য রকম। ছোট একটা ওশন লাইনার। কালো খোল। শরীরটা শাদা। বিলাসতরীর রূপ দিয়েছে। ইয়টটাকে।
খাইছে! বলে উঠল, মুসা। বুড়োটার রুচি আছে! বাড়িঘরগুলো অমন করে রাখে কেন? এখানে তো কিপটেমি নেই!
থাকবে কি করে, রবিন মন্তব্য করল। এটা কাজের জিনিস যে। কমপিউটার রুমটা দেখনি। কেমন ঝকঝকে তকতকে, দামী মেশিন।
সেইলবোটগুলোকে যেভাবে পানি থেকে টেনে তোলা হয়েছে সেরকম করে তোলা হয়নি এটাকে। কংক্রিটের মস্ত ট্রেঞ্চের ওপর দিয়ে ভাসিয়ে আনা হয়েছে,

এটাকেই বলে ড্রাই ডক। ট্রেঞ্চের সাগরের দিকের বিশাল ওয়াটারপ্রুফ গেটগুলো বন্ধ, তালা দেয়া। জাহাজটাকে এখানে আনার পর দমকলের সাহায্যে সমস্ত পানি বের করে দেয়া হয়েছে। খটখটে শুকনো এখন খোলের নিচে। ড্রাই ডকের ভেতরে বিরাট বিরাট ইস্পাতের কাঠামোর ওপরে ডিমে তা দিতে বসা হাঁসের মত করে। যেন বসে রয়েছে আইলিন লিসটার।

সিঁড়ি উঠে গেছে জাহাজের ওপর। প্রথম ডেকে উঠল কিশোর। তারপর রবিন। আর মুসা।

সামনের দিকে এগোল তিনজনে। ব্রিজে ওঠার মই বেয়ে উঠে এল। চাবি বের করল কিশোর। এক এক করে তালায় ঢোকাতে শুরু করল। লেগে গেল একটা। হুইলহাউসের দরজা খুলল সে। ভেতরে ঢুকল ওরা। চারপাশে বড় বড় কাঁচের জানালা। বালি আর লবণ লেগে নোংরা হয়ে আছে। জানালার নিচে কেবিনেট, অনেক ড্রয়ার ওগুলোতে। অল্প আসবাবে সুন্দর করে সাজানো ঘরটা, জাহাজের হুইলহাউস যে রকম হয়।

আমি আশা করেছিলাম অগোছাল হবে, রবিন বলল। মিস্টার লিসটারের যা স্বভাব। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকার কথা সব।

জাহাজের ব্যাপারে হয়ত তার অন্য মনোভাব, কিশোর বলল। পুরনো জিনিস ছড়িয়ে রাখার জায়গা নয় জাহাজ।

কিংবা এমন কাউকে ক্যাপ্টেন বানিয়েছেন, মুসা বলল। যে নোংরামি একদম সইতে পারে না। তার সঙ্গে কুলিয়ে উঠতে পারছেন না লিটার।

টান দিয়ে একটা ড্রয়ার খুলল কিশোর। সুন্দর করে একটার পর আরেকটা সাজিয়ে রাখা হয়েছে ম্যাপ। দ্রুত ওগুলো উল্টে দেখতে শুরু করল সে। সবই নটিক্যাল চাট, কোথায় প্রবাল প্রাচীর, কোথায় গভীরতা কম, এসব দেখানো রয়েছে। দক্ষিণ আমেরিকার উপকূলের কাছের চার্ট ওগুলো।

সোগামোসোতে বন্দর নেই, রবিন বলল। ওখানে যেতে চাইলে স্থলপথে। যেতে হবে লিসটারকে। কিংবা ভেনিজুয়েলার কোন বন্দরে নেমে গাড়িতে করে।

আমরা এখানে সোগামোসো খুজুতে আসিনি, মনে করিয়ে দিল মুসা। এসেছি বিশপের বই খুজতে। সেটাই খোঁজা দরকার। কোথায় ওটা?

ভাল প্রশ্ন। একটা ড্রয়ার খুলল রবিন। আরেকটা। তারপর আরেকটা। ড্রয়ারের পর ড্রয়ার ঘেঁটে চলল, যা পেল, বেশির ভাগই চার্ট। আলমারিগুলোতে খুঁজছে মুসা। কিশোর খুঁজছে কয়েকটা খোলা তাকে। জাহাজ চালানোর ওপর কিছু বই পাওয়া গেল, আর কিছু যন্ত্রপাতি, কিন্তু বিশপের বইটা মিলল না। বিশপের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে, এরকম কিছুও না।

হুইলহাউসের প্রতিটি ইঞ্চি খোঁজার পর বেরিয়ে এসে দরজায় তালা লাগিয়ে দিল কিশোর। দুই সহকারীকে নিয়ে মই বেয়ে আবার নেমে এল ডেকে। দুই ধারেই সারি সারি কেবিন রয়েছে। ওগুলোতে ঢুকে দেখতে লাগল ওরা।

বেশির ভাগই মনে হল অব্যবহৃত। বাংক আর রেডগুলোতে চাদর বালিশ কিছুই নেই। উল্টে ফেলে রাখা হয়েছে ম্যাট্রেস। নাবিকদের কোয়ার্টারটা দেখে। মনে হল, অল্প কিছু দিন আগেও ব্যবহার করা হয়েছে। বাংকের নিচে একটা টি শার্ট দলা পাকিয়ে ফেলে রেখে গেছে একজন নাবিক। ময়লা ফেলার ঝুড়িতে পড়ে রয়েছে পোভা সিগারেটের গোড়া, দলা পাকানো কাগজ।

অবশেষে সবচেয়ে বড় একটা কেবিনে এসে ঢুকল গোয়েন্দারা। জানালায় পর্দা টানা। অন্ধকার হয়ে আছে ভেতরটা। দরজার পাশের সুইচ টিপল কিশোর। আলো জ্বলল না।

পাওয়ার নেই, বিড়বিড় করে বলল সে। আইলিন লিসটার এখন মরা। জাহাজ।

দরজার পল্লা পুরোটা খুলে দিল কিশোর। চওড়া একটা বিছানা প্লাস্টিকের চাঁদরে ঢাকা। চেয়ার আর টেবিলগুলোও ঢেকে রাখা হয়েছে একই রকম চাদর দিয়ে। কেবিনের একধারে রয়েছে অসংখ্য তাক। তাকের সামনের ধারগুলোতে নিচু রেলিঙ দেয়া, যাতে কোন জিনিস গড়িয়ে পড়তে না পারে।

একটা তাকে টর্চ দেখতে পেল কিশোর। নামিয়ে এনে জ্বালল। সারা ঘরে আলো বোলাল।

হ্যাঁ, এটাই লিসটারের ঘর, মুসা বলল।

তাকের ওপর যা থাকার কথা তা-ই রয়েছে। বই আর বই। যেখানেই ফাঁক। পাওয়া গেছে ঠেসে ভরে দেয়া হয়েছে কাগজপত্র। বইয়ের ফাঁকে টোল পড়ে যাওয়া দুটো টেনিস বলও ঢুকিয়ে রাখা হয়েছে। চামড়ার একটা দস্তানা ফেলে। রাখা হয়েছে একটা বাউলিং ট্রফির পাশে, আরনেস্ট জে. ক্র্যাবস নামে একজনকে ওটা পুরস্কার দিয়েছে ওয়েস্টসাইড কোলারস ক্লাব।

আরেকজনের পুরস্কার লিসটার রেখেছেন কেন? রবিনের প্রশ্ন।

এগিয়ে গেল কিশোর। ট্রফিটার দিকে চোখ। মেঝেতে স্তূপ করে রাখা জিনিসে পা বেধে হুমড়ি খেয়ে পড়ত আরেকটু হলেই। পেছনের দেয়াল থেকে টেনে সরিয়ে আনা হয়েছে একটা তাক। কাত হয়ে রয়েছে ওটা। বইপত্র মেঝেতে ছড়ানো। নিচু হয়ে স্কুপের সব চেয়ে ওপরের বইটা তুলে নিল কিশোর। অনেক পুরনো একটা বই। চামড়ায় বাধানো। শক্ত হয়ে গেছে পুট, ফলে খুলে ছেড়ে দিলেই ঝট করে বন্ধ হয়ে যায়, যেন স্প্রিং লাগানো রয়েছে।

আলো ফেলে ভাল করে দেখল কিশোর। ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইল কাভারের ডিজাইনটার দিকে। চোখা, উঁচু চূড়াওয়ালা একটা টুপির মত দেখতে। টুপিটার

সামনের দিকে একটা ক্রস।
দুই সহকারীকে দেখাল ওটা সে। বিশপের টুপির মতই তো লাগছে। বিশপের বইটা বোধহয় খুঁজেই পেলাম অবশেষে।
দরজার দিকে ঘুরল সে। ডেকে ফিরে যাওয়ার জন্যে। বাধা পেল। দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন মানুষ। চওড়া কাধ। নীল রঙের ওয়র্ক শার্ট পরা।
ভালুকের থাবার মত বড় একটা হাত বাড়াল লোকটা। ওটা নিয়ে যেতে পারবে না এখান থেকে। দেখি, দাও!

.

বারো বিশালদেহী লোকটার পেছনে এসে হাজির হল আরও দুজন। চুপ করে থাকা ছাড়া আর কিছু করার নেই তিন গোয়েন্দার।
বইটা দিতে চাইল না কিশোর। তার হাত থেকে কেড়ে নিল বিশালদেহী লোকটা।
পেছনের একজনের হাতে একটা পাইপ। এক হাতে আলতো করে ধরে ওটার মাথা বাড়ি মারতে লাগল আরেক হাতের তালুতে। এমন ভঙ্গিতে কিশোরের দিকে। তাকাল, যেন তার মাথায় বাড়িটা মারতে পারলে খুশি হত।
বিরক্ত করে ফেলেছে, লোকটা বলল। কি করে যে বেড়া ডিঙিয়ে চলে আসে! আর এলেই কেবল চুরির তাল! এবার আর ছাড়ছি না। চুরির মজা এবার টের পাবে।
আমরা চোর নই, জবাব দিল কিশোর। মিস এলেনা লিসটারের অনুরোধে এসেছি। গেটে সই করেছি। দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করতে পারেন।
সন্দেহ ফুটল লোকগুলোর চোখে। একজনও স্বীকার করতে রাজি নয়, ভুল করেছে।
আমাদের কিছু হলে মিস লিসটারের কাছে জবাব দিতে হবে আপনাদেরকে, গম্ভীর কণ্ঠে বলল আবার কিশোর।
এবং শুধু দিয়েই পার পাবেন না, আরেকটু ঘাবড়ে দেয়ার জন্যে বলল মুসা, আরও ভোগান্তি আছে।
সেটা বুঝতে পেরে রবিন বলল, পুলিশ চীফ ইয়ান ফ্লেচার আমাদের বন্ধু। যান। বিশ্বাস না করলে থানায় ফোন করে দেখতে পারেন। কিশোর পাশা, মুসা আমান আর রবিন মিলফোর্ডকে চেনে কিনা জিজ্ঞেস করুন।
কি বল, ডিক? পাইপওয়ালা লোকটার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল। একজন।
আমাদের বোকা বানাচ্ছে, বলল বিশালদেহী ভালুক। কিন্তু গলায় জোর নেই। তাকিয়ে রয়েছে গেটের দিকে, যেখান দিয়ে ঢুকেছে ছেলেরা।
শিওর হওয়া দরকার, বলল তৃতীয়জন। আগেই কিছু করা উচিত হবে না। গেটে যাওয়ার জন্যে রওনা হল সে।

অপেক্ষা করতে লাগল অন্য দুজন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ফিরে এল। লোকটা। সঙ্গে এসেছে দারোয়ান। ছেলেদের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, হ্যাঁ, এরাই। আধ ঘন্টা আগে ঢুকতে দিয়েছি।

তাই, সাংঘাতিক নিরাশ হল যেন বিশালদেহী লোকটা। কিছু কিলচড় দেয়ার জন্যে হাত নিশপিশ করছিল বোধহয়। সেটা আর পারল না। বেশ। কর, যা করছিলে।

বইটা দিন, হাত বাড়াল কিশোর।

সরি! বইটা ফেরত দিল লোকটা। ভুল হয়ে গেছে। অনেক চোরছ্যাচড়। আসে তো, বড় জ্বালাতন করে।

চলে গেল লোকগুলো। লোহালক্কড়ের জঙ্গলে ওরা হারিয়ে না যাওয়া তক অপেক্ষা করল ছেলেরা। তারপর লম্বা দম নিয়ে হাতের রইটার দিকে তাকাল। কিশোর।

তুমি কাঁপছ, মুসা বলল।

দূর! মনে মনে ধমক দিয়ে হাতটাকে কাঁপতে নিষেধ করল কিশোর। ধাপ্পা দিচ্ছিল লোকগুলো। কিছুই করত না।

বইটার মলাট ওলটাল সে। ভয় হল পাতা খুলে ছড়িয়ে যাবে, কিন্তু গেল না। শুকিয়ে খসখসে হয়ে আছে। বেশি জোরে চাপ লাগলে মুড়মুড় করে ভেঙেও যেতে পারে, এমনই মনে হল তার কাছে। বইয়ের মাঝের কয়েকটা পাতা নেই। কেটে নেয়া হয়েছে।

এটা একটা ডায়রি, ঘোষণা করল যেন গোয়েন্দাপ্রধান। কিংবা ডায়রির মতই কিছু। হাতে লেখা। তারিখ রয়েছে। শুরু হয়েছে এনিরো দিয়ে। স্প্যানিশে জানুয়ারিকে এনিরো বলে। জানুয়ারির পয়লা তারিখে বিশপ সান্তাফে বোগোটা নামে একটা জায়গায় গিয়েছিল...

বোগোটা! প্রায় চিৎকার করে বলল রবিন। ওটা তো কলাম্বিয়ায়! তাহলে সোগামোসোর সঙ্গে একটা যোগাযোগ পাওয়া গেল। সোগামোসোও কলাম্বিয়ায়।

ঠিক! শান্ত থাকার চেষ্টা করছে কিশোর, কিন্তু পারছে না, চকচক করছে চোখ। এখন আর স্বীকার করতে বাধা নেই ডেভিড লিসটারের গায়েব হওয়ার সঙ্গে ওই কমপিউটারের মেসেজেরও সম্পর্ক রয়েছে। হয়ত ওটাই আসল কারণ।

কিন্তু বইটার ব্যাপারে কি হবে? মুসার প্রশ্ন। কিশোর, কি আছে, বলত?

ভ্রূকুটি করল কিশোর। অনেক শব্দই অপরিচিত। লেখাও আবছা। আর এত ঘন, মাঝে মাঝে দুটো লাইন প্রায় এক হয়ে গেছে। আমার পড়ার সাধ্য হবে না, বলল সে। ইংরেজি হলেও পারতাম না, যা অবস্থা।

কিশোরের কাঁধের ওপর দিয়ে তাকাল রবিন। হ্যাঁ। পুরনো দলিলের মত। যেগুলোতে এস লিখলে এফ-এর মত লাগে।
তাহলে আর এখানে দাঁড়িয়ে আছি কেন? মুসা বলল, জলদি চল, প্রফেসর সাইনাসের কাছে চলে যাই। ডক্টর ওয়ালটার সাইনাস, রুক্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের প্রফেসর, স্প্যানিশ আর মেকসিকান ইতিহাস বিশেষজ্ঞ। বিখ্যাত চিত্র পরিচালক মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফারের বন্ধু। আগেও অনেক সাহায্য করেছেন তিন গোয়েন্দাকে।
তার কাছে গেলেই ভাল হয়, কিশোর বলল। তবে বইটা নিতে হলে। এলেনার অনুমতি দরকার। আমাদেরকে বইটা খুঁজে দিতে অনুরোধ করেছে সে, যাতে ওটা দিয়ে তার বাবাকে উদ্ধার করে আনতে পারে কিডন্যাপারদের হাত থেকে। হয়ত বইটা নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই তার। বাবাকে উদ্ধার করতে পারলেই খুশি।
তা বটে, একমত হল মুসা। কেসটা এমনই, মাঝে মাঝেই আমি, কিডন্যাপিঙের কথা ভুলে যাই। অথচ ওটাই আসল ব্যাপার।
মাথা ঝাঁকাল কিশোর। লিটারের কেবিনের দরজায় তালা লাগিয়ে দিল। গেটে এসে চাবির গোছা বুঝিয়ে দিল দারোয়ানকে। তারপর চলল একটা পে ফোন খুঁজে বের করতে। এলেনার মায়ের বাড়িতে ফোন করে এবার আর তাকে পেল না। জবাব দিল আনসারিং মেশিন। একটা মেসেজ রেখে দিয়ে, রকি বীচে লিসটারের বাড়িতে ফোন করল কিশোর।
ফোন ধরল মিসেস বেকার। বলল, ধর। আমি ডেকে আনছি ওকে।
এলেনা লাইনে এলে তাকে সব কথা খুলে বলল কিশোর। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত যেন স্তব্ধ হয়ে রইল সে, যেন খবরটা হজম করতে সময় লাগছে, তারপর বলল, থ্যাঙ্ক গুডনেস!
বইটা কেন এত জরুরী, কিশোর বলল, বের করতে চান? নাকি শুধু পেলেই খুশি, কিডন্যাপারদের দিয়ে দেবেন?
দ্বিধা করল এলেনা। সময় কম। আবার ফোন করেছিল লোকটা। তাকে বলেছি বইটা খোঁজার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি আমরা। আর মাত্র একদিন সময় দিয়েছে।
তার মানে আগামী কাল পর্যন্ত সময় পাচ্ছি, খুশি হয়ে উঠল কিশোর। ডক্টর সাইনাসের কথা বলল। তিনি হয়ত পড়ে দেবেন। আর তার সময় না থাকলে অন্য কারও কাছে পাঠাবেন। তো বইটা কি নিয়ে যাব?
নিতে পার। আরেক মুহূর্ত দ্বিধা করল এলেনা। সেটাই বোধহয় ভাল হবে। কি জিনিসের জন্যে আব্বাকে আটক করেছে ওরা জানার আগ্রহটা চেপে রাখতে। পারছি না। লেগে যাও কাজে। এছাড়া আর কিছু করারও নেই এখন আমাদের।

বইটা যে পেয়েছি লোকটাকে জানানোর উপায় নেই। সে ইচ্ছে করে যখন ফোন। করবে তখন বলতে পারব। তার আগে সম্ভব না।
একটা সেকেণ্ড বিরতি দিয়ে আবার বলল এলেনা, আর বাড়িতে এখন বইটা রাখতেই সাহস পাচ্ছি না আমি। যেটার জন্যে আব্বা কিডন্যাপড় হয়েছে সেটার জন্যে আমারও ক্ষতি করতে পারে অন্য কেউ, বলা যায় না। কাল রাতে কেউ ঢুকেছিল এ বাড়িতে। আমার ঘর, আলমারি, ড্রয়ার সব খুঁজেছে। মনে হচ্ছে চাবি আছে লোকটার কাছে। আব্বাকে ধরে নিয়ে গিয়ে হয়ত তার কাছ থেকে আদায় করেছে। ইচ্ছে মত আসাযাওয়া করতে পারছে এখন লোকটা।
একজন চাবিওয়ালাকে ডাকন, পরামর্শ দিল কিশোর। তালাগুলো বদলে দিয়ে যাক। এভাবে চলতে পারে না। ঠিক আছে, আমরা প্রফেসর সাইনাসের। ওখানে যাচ্ছি। কিছু জানতে পারলে আপনাকে জানাব।
রুক্সটনে প্রফেসর সাইনাসকে ফোন করল কিশোর। ভাগ্য ভাল। গরমের ছুটি শুরু হয়ে গেছে, তবু অফিসেই পাওয়া গেল প্রফেসরকে। নিয়মিত অফিসে আসেন। তিনি ছুটিতেও। ছেলেদের জন্যে অপেক্ষা করতে রাজি হলেন।
তাড়াতাড়ি ইয়ার্ডে ফিরে এল তিন গোয়েন্দা। রাশেদ চাচাকে অনুরোধ করল। পিকআপটা দেয়ার জন্যে। তিনি তখন বেরোচ্ছিলেন, তিন গোয়েন্দাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে নামিয়ে দিয়ে যেতে রাজি হলেন। সেখান থেকে কাজে চলে যাবেন। ফেরার পথে সুযোগ পেলে আবার তুলে নেবেন ওদেরকে। আপাতত এই ব্যবস্থাই মেনে নিতে হল কিশোরকে।
একজন বন্ধুর সঙ্গে অফিসে বসে রয়েছেন প্রফেসর সাইনাস। তার বন্ধুটি ভীষণ রোগা। চকচকে টাক। ইনি ডক্টর ক্রুগার মনটাগো, পরিচয় করিয়ে দিলেন তিনি। আমাদের ডিপার্টমেন্ট অভ রোমান্স ল্যাঙ্গুয়েজের হেড। তোমাদের জন্যেই বসিয়ে রেখেছি। পুরনো স্প্যানিশ পাণ্ডুলিপির প্রতি তাঁর সাংঘাতিক আগ্রহ।
হাসিতে দাঁত বেরিয়ে পড়ল কিশোরের। এরকম একজনকেই আশা করছিল মনে মনে। প্রফেসর সাইনাসের চেয়ে ডক্টর মনটাগোকে দিয়ে বেশি সাহায্য হবে, বুঝতে পারছে সে। বিশপের বইটা বের করে বাড়িয়ে দিল ভক্টরের দিকে।
বই খুলে প্রথম পৃষ্ঠাটার দিকে চেয়েই বলে উঠলেন তিনি, বাহ! পাতার পর। পাতা ওল্টাতে থাকলেন তিনি। হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে মুখ। সাংঘাতিক জিনিস!
কি স্যার? জানতে চাইল কিশোর।
পয়লা জানুয়ারি, সান্তা ফে বোগোটায়, আবার প্রথম পৃষ্ঠায় ফিরে এলেন, মনটাগো। লেখক নিউ গ্রানাডার মানুষের জন্যে ঈশ্বরের কাছে দোয়া করছেন। বলছেন যেন তাদের চেষ্টা সফল হয়। তারপর রয়েছে একটা চিঠির কথা। প্রাসাদে অপেক্ষা করছিল হিজ মোস্ট গ্রেশাস ম্যাজেসটি কিং কার্লোসের চিঠিটা।

বই থেকে মুখ তুললেন ডক্টর। এ তো একটা গুপ্তধন পেয়ে গেছ। এই জার্নালের লেখক সম্ভবত বিশপ ছিলেন। একটা প্রাসাদের কথা লিখেছেন তিনি। আসলে বলতে চেয়েছেন প্যালেস। বিশপের বসত বাড়িকে প্যালেসই বলে। তার কাছে চিঠি লিখতেন রাজা। ওই বিশপ সাধারণ পাদ্রী হলে এভাবে তাঁর কাছে লেখার কথা নয় রাজার। সেটা অবশ্য জানা যাবে একটু পরেই। এসব পুরনো লেখা থেকে তথ্য খুঁজে বের করার কায়দা আছে। কাগজ, কালি এসব পরীক্ষা করে দেখতে হবে। মনে হচ্ছে ডায়রিটা এনরিক জিমিনির, রক্তাক্ত বিশপ বলা হত যাকে!

রক্তাক্ত বিশপ? প্রতিধ্বনি করল যেন কিশোর।

ঢোক গিলল মুসা। কিছু হয়েছিল নাকি তার?

আসলে, আমাদের সবারই কিছু না কিছু ঘটে, ডক্টর মনটাগো বললেন। জীবন হল একটা সাময়িক ব্যাপার। তাই মৃত্যু থেকে মুক্তি নেই কারও। রক্তাক্ত বিশপের ঠাণ্ডা লেগেছিল। তখনকার দিনে ঠাণ্ডা ছিল মারাত্মক অসুখ। সহজেই নিউমোনিয়ায় রূপ নিয়ে শেষ করে দিত মানুষকে। শোনা যায়, অসুস্থতার সময় তাকে এড়িয়ে চলেছিল তার একজন চাকর। ইচ্ছে করেই। যাতে তার মৃত্যটা তাড়াতাড়ি হয়। তবে নিশ্চিত করে কেউ বলতে পারে না একথা। সন্দেহটা গাঢ় হয় একটা ব্যাপার থেকে, বিশপের মৃত্যুর পর পরই পালিয়েছিল সেই চাকর। প্রতিদিন জার্নাল লিখতেন বিশপ জিমিনিজ, কিন্তু তাঁর সেই জার্নাল পাওয়া যায়নি।

প্রফেসর সাইনাস দরাজ হাসি হাসলেন তিন গোয়েন্দার দিকে তাকিয়ে। যাও, পেয়ে গেলে আরেকটা রহস্য। পুরনো রহস্য খুঁচিয়ে বের করতে তো ওস্তাদ তোমরা। বেশি না, মাত্র চারশো বছরের পুরনো এই ঘটনা। সূত্রটুত্র এখনও নিশ্চয় কিছু পাবে।

স্বর্ণ জড়িত থাকতে পারে এতে, মনটাগো বললেন। ছেলেদের দিকে তাকালেন। দক্ষিণ আমেরিকায় এসে ঢুকল স্প্যানিশ সৈন্যরা। মার্চ করে এগিয়ে। চলল। চলার পথে যত জমি পড়ল, সব দখল করে নিল রাজা আর রানীর নামে। সোনাও পাওয়া যেত মাঝে মাঝে। জাহাজ বোঝাই করে সেসব সোনাচালান যেত স্পেনে। মূল্যবান, যা কিছু পেয়েছে নিয়ে গেছে স্প্যানিশরা। জোর করে ধরে এনে ইনডিয়ানদেরকে খনির কাজ করতে বাধ্য করেছে। শোনা যায় সোনার খনিতে যে। সব ইনডিয়ানরা কাজ করত তাদের ওপর ভয়াবহ অত্যাচার করেছেন বিশপ জিমিনিজ। সে জন্যেই তার নাম হয়ে গিয়েছিল রক্তাক্ত বিশপ...

ও, কথাটা শোনামাত্রই বিশপের ওপর থেকে শ্রদ্ধা চলে গেল রবিনের। এই ব্যাপার। তাহলে তো তার নাম রাখা উচিত ছিল রক্তখেকো বিশপ।

তবে সত্যিই তিনি অত্যাচারী ছিলেন কিনা জানা যায়নি, মনটাগো বললেন। হতে পারে রাজার লোকেরাই গিয়ে মিথ্যে কথা ছড়িয়েছে। খনির ওভারশিয়ার নিজেই হয়ত ওসব অত্যাচার করেছে, দোষ দিয়েছে বিশপের। শত শত বছর পরে এখন আর কে ঠিক করে করে বলবে?

যাই হোক, বিশপ নাকি পরে নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হয়েছেন। বৃদ্ধ বয়েসে ইনডিয়ানদের সঙ্গে ভাব করে অতীত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চেয়েছেন। লোকে মানুষের ভালটার চেয়ে খারাপটাই বেশি দেখে। ভাল বেশি। হলেও দেখে না, খারাপ কম হলেও সেটা মনে রেখে দেয়। রক্তাক্ত বিশপের বেলায়ও এই ব্যাপারই ঘটেছে। তার কুকর্মগুলোর কথাই বেশি মনে রেখেছে লোকে।

নীরব হয়ে রইল ছেলেরা। ভাবছে সেই চারশো বছর আগের ঘটনার সঙ্গে বর্তমান লিসটার কিডন্যাপিঙের কি যোগাযোগ?

অবশেষে জিজ্ঞেস করল কিশোর, বিশপ জিমিনিজের জার্নালটা কি খুবই দামী কিছু? যেটা খোয়া গেছে?

দ্বিধায় পড়ে গেলেন ডক্টর মনটাগো। দামী? তা সবার জন্যে না-ও হতে পারে। স্কলার আর ঐতিহাসিকদের কাছে হয়ত অমূল্যই হবে, কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে নয়। এই যেমন ম্যাগনা কার্টা-র লেখার খসড়া, কিংবা কলম্বাসকে লেখা রানী ইসাবেলার চিঠির মত অনেক দামে বিক্রি হবে না এটা।

বইটা বগলদাবা করলেন মনটাগো। কিন্তু একজন স্কলারের কাছে? অসাধারণ! আমি আর থাকতে পারছি না। এখনই গিয়ে অনুবাদে বসতে চাই...

না না! রবিন বলল।

সময় পাবেন না! বলল মুসা।

মানে? হাসি মুছে গেছে মনটাগোর।

এর বর্তমান মালিক কিডন্যাপড হয়েছেন, বুঝিয়ে বলল কিশোর। তাঁকে মুক্তি দেয়ার বিনিময়ে এই বইটা দাবি করেছে কিডন্যাপার। কালকের মধ্যে না দেয়া গেলে কি করে বসে ঠিক নেই।

ও, চিন্তায় পড়ে গেলেন যেন ডক্টর। পরক্ষণেই উজ্জ্বল হল মুখ। তাহলে... ফটোকপি করার সময়...নাহ, হবে না। এরকম বই সাধারণ জেরোক্স মেশিনে করা যাবে না। ল্যাবরেটরিতে পাঠাতে হবে। বিশেষ ব্যবস্থায় ফটোকপি করে নেবে ওরা।

বগলের নিচ থেকে বইটা বের করে ওটার দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকালেন ডক্টর। যেন ওটা একটা মহামূল্যবান বস্তু। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাড়িয়ে দিলেন বলে কিশোরের দিকে।

আশা করি, বললেন তিনি। আর এটা নিখোঁজ হবে না। কোনভাবে বাঁচাতে যদি পার...।
চেষ্টা তো নিশ্চয় করব, স্যার, আশ্বাস দিল কিশোর। আর রাখতে পারলে অনুবাদের জন্যে আপনাকেই প্রথম দেব।
দরজার দিকে চলল তিন গোয়েন্দা। হঠাৎ ফিরে তাকাল কিশোর, আচ্ছা, ঈশ্বরের অশ্রুর কথা আপনি কিছু জানেন, স্যার?
ঈশ্বরের অশ্রু? ভুরু কোচকালেন মনটাগো। পান্নার ওই নাম রেখেছে ইনডিয়ানরা। কেন? তার সঙ্গে এই বইয়ের কোন সম্পর্ক আছে?
থাকতে পারে!

.

পান্না! চেয়ারে হেলান দিয়ে হাসল রবিন। তাকিয়ে রয়েছে হেডকোয়ার্টারের ছাতের দিকে। স্প্যানিশ সৈন্য! চোরাই ডায়রি! নিরুদ্দেশ চাকর! সব মিলিয়ে। চমৎকার এক রহস্য! মিস্টার ক্রিস্টোফার শুনলে খুব খুশি হবেন। এরকম কাহিনীই তো তিনি চান ছবি বানানোর জন্যে।
কিশোরও হাসল। বানাতে চাইলে অপেক্ষা করতে হবে তাকে। সমস্ত রহস্যের জট খুলে পুরো একটা কাহিনী তৈরি করতে হবে, তার পর না ছবি।
মেসেজের কমপিউটার প্রিন্ট আউটটা ডেস্কে রেখে দেখছে গোয়েন্দাপ্রধান। ঈশ্বরের অশ্রু এলেনার জন্যে সূত্র। কিন্তু অশ্রুগুলো কোথায়? আর রক্তাক্ত বিশপের সঙ্গে এর কি সম্পর্ক ছিল?
কলাম্বিয়ায় প্রচুর পান্না পাওয়া গেছে, রবিন বলল। পান্নার খনি আছে। ওখানে। দুনিয়ার সব চেয়ে বড় পান্নার খনি, রেফারেন্স বইতে পড়েছি। মনে হচ্ছে, ওগুলো খুঁজে আনার জন্যে এলেনাকে সোগামোসোতে যেতেই হবে। পান্নার খনির সঙ্গে বিশপের কোন যোগাযোগ ছিল না তো? নাকি শুধুই সোনা?
ঘড়ি দেখল কিশোর। দেরি হয়ে যাচ্ছে। বিকেল তো শেষ। ফোন করে এলেনাকে জানানো দরকার সব কথা। রিসিভার তুলল সে। লিটারের নম্বরে ডায়াল করল। দ্বিতীয়বার রিং হতেই জবাব দিল এলেনা। আমি, কিশোর বলল। কি ব্যাপার? উত্তেজিত লাগছে। ফোন করেছিল নাকি আবার?
না। তুমি করলে তো, ভাবলাম কিডন্যাপারই করেছে। রুক্সটনে গিয়েছিলে?
গিয়েছি। বইটা একজন লিশপের ডায়রি। কয়েক শো বছর আগে কলাম্বিয়ায় বাস করতেন। সোনার খানকে সাংসাতি অত্যাচার করতেন ইনডিয়ানদের ওপর, সে জন্যে নাম হয়ে গেছে রক্তাক্ত বিশপ। অসুখ হয়ে বিশপ মারা গেলে ডায়রিটা নিখোঁজ হয়ে যায়। সব কিছু পরিষ্কার বলা যাচ্ছে না, কারণ বইটার পুরো অনুবাদ

করা হয়নি। উক্তর মনটাগোর কাছে রেখে আসতে পারলে, সময় দিতে পারলে, হত। আমরা তো সেটা করতে পারি না।
না, পার না।
আরেকটা কথা, ঈশ্বরের অশ্রু জিনিসটা কি জানতে পেরেছি। অ্যাডিজ পর্বতের ইনডিয়ানরা পান্নার ওই নাম দিয়েছে।
পান্ন? এক সেকেও চুপ করে থাকল এলেনা। তারপর আবার বলল, পান্না? আমাকে এতগুলো দামী জিনিস দান করে দিল আব্বা? মধ্য গ্রীস্মের দিন আর বৃদ্ধা টি মহিলা বলতেই বা কি বোঝাতে চেয়েছে? আরও যেসব সংকেত?
আপনার আব্বাকে উদ্ধার করে আনতে পারলে সমস্তই জানা যাবে। এখন যেটা জরুরী, বইটা কিডন্যাপারকে দিয়ে তাকে মুক্ত করে আনা। আজ রাতে কোথায় থাকবেন? ওখানেই? কাউকে আপনার সঙ্গে থাকতে হবে?
না, এলেনা বলল। দরকার নেই। আজ রাতে আম্মা এসে থাকবে বলেছে। কিছু জানতে পারলে তোমাদেরকে জানাব।
লাইন কেটে দিল এলেনা।
প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবার বেজে উঠল ফোন। হেনরি বেসিন ফোন করছে। এলেনা লিসটার আমার সমস্ত পাওনা মিটিয়ে দিয়েছে। দোকানে আসতে পারবে? তোমাদের টাকাটা দিয়ে দিতাম।
নিশ্চয়ই, জবাব দিল কিশোর।
রিসিভার নামিয়ে রেখে বইটা আলমারিতে ভরে তালা দিল কিশোর। তারপর দুই সহকারীকে নিয়ে বেরিয়ে এল ট্রেলার থেকে। সাইকেল নিয়ে রওনা হল।
রকি বীচের একটা গলিতে বেসিনের দোকান। ছেলেরা পৌঁছে সামনের অংশে। কাউকে দেখতে পেল না। রান্নাঘরে চলে এল ওরা। ওখানে পাওয়া গেল বেসিনকে। টেবিলে খাতা বিছিয়ে গভীর মনোযোগে হিসেব করছে। কিশোররা ঢুকতে একটা মেয়ে বেরিয়ে গেল। সে-ও পার্টিতে কাজ করতে গিয়েছিল। পাওনা বুঝে নিয়ে গেল বোধহয়।
হাসল বেসিন। টাকা রেডিই রেখেছি। একটা করে খাম তুলে দিল তিনজনের হাতে। সবাইকেই দিয়েছি। বাকি রইল একমাত্র পিকো।
পিকো? কিশোর বলল। ওহহো, মনে পড়েছে। ধোয়ামোছার জন্যে যাকে নেয়া হয়েছিল।
হ্যাঁ। গত দুহপ্তা ধরে আমার এখানে কাজ করছে। অনেক সাহায্য হচ্ছে আমার।
নিজের খামটা খুলল রবিন। নোটগুলো গুণে বলল, বেশি দিয়ে ফেলেছেন।–
কিছুটা বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে, বেসিন বলল। এত কম হাতে উঠছিল না। অনেক খেটেছ, দেখেছি তো। চকলেট কেক খাবে? কাল বিকেলে একটা বাচ্চার

জন্মদিনে গিয়েছিলাম। অনেক কেক বেঁচেছিল, নিয়ে এসেছি। আমি মুখেও দিতে সাহস করিনি। এমনিতেই মোটা হয়ে যাচ্ছি। আমার গার্লফ্রেণ্ডও জানলে মাথায় বাড়ি দেবে।
কেকটা ভালই হয়েছে, না? জানতে চাইল কিশোর।
হাসল বেসিন। প্যানট্রিতে রয়েছে। ওই দরজাটার ওপাশে, তাকে।
প্যানট্রিতে এসে ঢুকল কিশোর। মেঝে থেকে ছাত পর্যন্ত রয়েছে অসংখ্য তাক। জিনিসপত্র বোঝাই। চকলেট, ময়দা, চিনি, তেল, খাবার বানাতে লাগে। এরকম নানা জিনিস।
চকলেট কেকটা নামাতে দরজাটা বাধা হয়ে দাঁড়াল। পাল্লাটা অর্ধেক ভেজিয়ে দিল কিশোর। কেকের পাত্রের পাশে যে ছুরিটা রেখে দিয়েছে বেসিন সেটা নেয়ার জন্যে হাত বাড়িয়েছে সে, এই সময় পায়ে লাগল কি যেন। নিচে চেয়ে দেখল দরজার পেছনে একটা প্ল্যাস্টিকের ব্যাগ ঠেলে রাখা হয়েছে। লাল ব্যাগ। উজ্জ্বল বেগুনী রঙে লেখা রয়েছে কোম্পানির নাম। ডি এল ডিপার্টমেন্টাল স্টোর থেকে এসেছে জিনিসটা।
একটা মুহূর্ত ওটার দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। তাহলে লিসটারের দোকানে গিয়েছিল বেসিন। তা যেতেই পারে। জিনিস কিনতে যে কেউ যেতে পারে ওই দোকানে। ক্যাটারার গেলেও কোন দোষ নেই। কি কিনতে গিয়েছিল? শার্ট? জুতো? এন্থনির সঙ্গে নিশ্চয় ব্যবসার সম্পর্ক নেই বেসিনের।
এলেনার মায়ের বাড়ি থেকে তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে আসছে এনথনি, দৃশ্যটা মনে পড়ে গেল কিশোরের। ঠিক কোন জায়গাটায় ছিল সে, যখন মহিলার সঙ্গে কথা বলছিল কিশোর?
লুকিয়ে ছিল। আর কোন ব্যাখ্যাই হতে পারে না। যদি কোন কুমতলব না থাকত, আর শুধুই দেখা করতে যেত তাহলে লিভিং রুমেই বসে থাকত, স্বাভাবিক ভাবে। কিশোরের সামনে থাকতে দ্বিধা করত না। কিন্তু সে লুকিয়েছিল। কেন?
তার সঙ্গে হেনরি বেসিনেরও কোন সম্পর্ক রয়েছে? লিসটারের কিডন্যাপের ব্যাপারে তারও হাত রয়েছে? নাহ, লোকটাকে দেখে সেরকম মনে হয় না। তবে মুখ দেখে সব সময় অপরাধীকে সনাক্ত করা যায় না। তাহলে মোটিভটা কি? লিসটারের কমপিউটারে বেসিনের নাম নেই। থাকার কথাও নয়। লিসটারের কোন প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে না বেসিন। কিন্তু তাই বলে শত্রুতা থাকতে পারে না এমন কোন কথা নেই। কে যে কখন কিভাবে কার শত্রু হয়ে উঠবে বলা মুশকিল। এমনও হতে পারে রক্তাক্ত বিশপের ডায়রির কথাটা জানে বেসিন। কিংবা এনথনি জানিয়েছে। বেসিনের টাকার দরকার। কাজেই সাহায্য করতে রাজি হয়েছে। ঘুস নিয়েছে।

প্ল্যাস্টিকের ব্যাগের ওপর দিকটায় নীল রঙের কি যেন রয়েছে। ঝুঁকে ছুঁয়ে দেখল, কিশোর। একটা উইণ্ডব্রেকার। নাড়া লেগে কাত হয়ে পড়ে গেল ব্যাগটা, ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়ল উইণ্ডব্রেকারটা। ওটার নিচে রয়েছে ভঁজ করা একটা খবরের কাগজ। চুলো না কিশোর। শুধু তাকিয়ে রইল।
দেখতে পাচ্ছে কাগজটার বিভিন্ন জায়গা কাটা। শব্দ! প্রথম পৃষ্ঠার হেডলাইন থেকে শব্দ কেটে নেয়া হয়েছে। ওগুলো কেটেই লাগিয়েছিল এলেনার কাছে। পাঠানো নোটে…
কিশোর? রান্নাঘর থেকে ডাকল বেসিন। কি করছ? পাওনি?
ভীষণ চমকে গেল কিশোর। তাড়াতাড়ি ব্যাগের ভেতরে উইণ্ডব্রেকারটা ঢুকিয়ে আগের মত করে রেখে দিল। দ্রুত হাতে তিন টুকরো কেক কেটে নিয়ে বেরিয়ে এল প্যান্ট্রি থেকে।
আপনার জন্যে আনলাম না, বেসিনকে বলল সে।
না, খাব না। ঠিকই করেছ।
খেতে শুরু করল রবিন আর মুসা। একটা টুল টেনে নিয়ে নিজের টুকরোটায় কামড় বসাল কিশোর।
তারপর? যেন নিছকই আলোচনার জন্যে বলল বেসিন। এলেনার সঙ্গে কেমন কাটছে তোমাদের? কিছু পেলে? বাবাকে মুক্ত করতে পারবে মেয়েটা?
চেষ্টা তো নিশ্চয় করবে। কিন্তু খুব কঠিন কাজ। কিডন্যাপার এমন একটা জিনিস চাইছে যেটার মাথামুণ্ড কিছুই বোঝা যায় না। টাকাটুকা কিছু না, লোকটা। চাইছে বিশপের বই।
খাওয়া থামিয়ে দিয়েছে রবিন আর মুসা। কিশোরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে দুজনে। মুসা বলেই ফেলতে যাচ্ছিল, কিন্তু আমরা তো জানি!
কি ভেবে বলল না সেকথা। বলার জন্যে মুখ খুলে ফেলেছে, কিছু একটা বলতেই হয়, লিসটারের বাড়ির হাজার হাজার বই ঘেঁটে ফেলেছি আমরা। আরও কত জিনিস যে ঘেঁটেছি। কোন কিছুই ফেলে দেয় না লোকটা। এক অদ্ভুত চরিত্র।
হাসল বেসিন। হ্যাঁ। বেশির ভাগেরই কানাকড়ি দামও নেই।
ভাবছি, কিশোর বলল, সেন্ট্রাল কোস্ট মেরিনেও যাব। বোম্প্রিট ড্রাইভের শিপইয়ার্ডটার কথা শুনেছেন? সেখানে ড্রাই ডুকে লিসটারের একটা ইয়ট তুলে রাখা হয়েছে। আইলিন লিসটার। দেখা যাক, বিশপের বই মেলে কিনা ওখানে। ওখানেও নিশ্চয় বাড়ির মতই জঞ্জাল বোঝাই করে রেখেছেন লিটার।
রাখলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কিশোরের কাঁধের ওপর দিয়ে দরজার দিকে তাকাল বেসিন। এসেছ। এস। টাকা রেড়ি। যা বলেছিলাম তার চেয়ে বেশিই পাবে।

ফিরে তাকিয়ে কিশোরও দেখতে পেল পিকোকে। ছেলেদের দিকে একবার মাথা নুইয়ে এগিয়ে গেল বেসিনের কাছে।
তোমাদের হল? রবিন আর মুসাকে বলে শেষ টুকরোটা মুখে পুরল কিশোর।
বেসিনকে গুডবাই জানিয়ে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা। দাঁড়িয়ে রয়েছে বেসিনের ভ্যান। সেটার পাশ কাটাল ওরা। গলি পার হয়ে এসে পড়ল বড় রাস্তায়। ফিরে তাকাল কিশোর।
ব্যাপারটা কি বল তো? জিজ্ঞেস করল রবিন। ওরকম না জানার ভান করলে কেন?
নিশ্চয় কিছু বের করেছ, মুসা বলল।
প্যানট্রিতে একটা প্ল্যাস্টিকের ব্যাগ আছে, কিশোর বলল। লিসটারের ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের জিনিস। তার মধ্যে একটা খবরের কাগজ আছে। কিছু কিছু শব্দ কেটে নেয়া হয়েছে।
বল কি! হাঁ হয়ে গেল রবিন।
ঠিকই বলছি।
বেসিন? বিশ্বাস করতে পারছে না মুসা। ও কিডন্যাপার? যত যাই বল আমার বিশ্বাস হয় না! তোমার দাদা ড্রাকুলা ছিলেন একথা বললে যেমন বিশ্বাস হবে না
বিশ্বাস না হলেও ব্যাপারটা সত্যি হতেই পারে, বাধা দিয়ে বলল কিশোর। বেসিনের ব্যাপারটাও অসম্ভব কিছু নয়। নিজের চোখকে তো আর অবিশ্বাস করতে পারি না।
তার মানে তার জন্যে একটা ফাঁদ তৈরি করে এলে, রবিন বলল।
করে এলাম। সে ভাববে শিপ ইয়ার্ডে ইয়টের মধ্যে থাকতে পারে বিশপের, বই। জানল তো। দেখা যাক এখন কি করে।
উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল মুসা। তার পিছু নিতে হলে একটা গাড়ি এখন জরুরী। আমাদেরগুলো তো জাহান্নামে গেছে। কোথায় যে পাই...
আরনি ভিনসেনজোর কাছে, সমাধান করে দিল কিশোর। আমাদেরকে সাহায্য করবে কথা দিয়েছে সে।

.
পনেরো মিনিটেই পৌঁছে গেল আরনি। ধূসর রঙের একটা সিডান নিয়ে এসেছে। বাম্পারে মরচে পড়া। রঙ চটে গেছে জায়গায় জায়গায়। পাশের বাড়ির একজনের কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছি, জানাল সে। ইচ্ছে করেই আনলাম। এত পুরনো গাড়ির ওপর নজর দেয় না কেউ। তা কার পিছু নিতে হবে?
হেনরি বেসিন, কিশোর বলল। ওদিকটায় তার দোকান। বেরোবে। এখনই।
বেসিন? অবাক হল আরনি। সে এতে জড়িত? এত ভাল একটা লোক?

বিশ্বাস করা শক্ত, স্বীকার করল কিশোর। কিন্তু আমি প্রমাণ পেয়েছি-ওই যে, বেরোল।
ক্যাটারিং শপের পেছন দিকে তাকাল সবাই। ছিটকানি লাগাচ্ছে বেসিন।
ইঞ্জিন স্টার্ট দিল আরনি।
ভ্যানে উঠল বেসিন। চলতে শুরু করল গাড়িটা।
মাথা নিচু করে ফেলল ছেলেরা।
মোড়ের কাছে গিয়ে ব্রেক করল বেসিন। ডানে বায়ে তাকাল। তারপর মোড় নিয়ে কোস্ট হাইওয়ের দিকে রওনা হল।
একটা ব্লক তাকে এগোতে দিল আরনি। তারপর অনুসরণ করে চলল।
চৌরাস্তায় এসে থামতে হল বেসিনকে। লাল আলো জ্বলেছে। দূরে থাকতেই গতি কমিয়ে দিল আরনি। আরেকটা ভ্যান পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গিয়ে ঢুকে পড়ল মাঝের ফাঁকে। গাড়িটাতে কয়েকজন লোক, সার্ফ করতে চলেছে সাগরে।
বেশ সাবধানী লোক আপনি, প্রশংসা করল মুসা।
হাসল আরনি। ডিটেকটিভ ছবি দেখেছি অনেক। কি করে অনুসরণ করতে হয় শিখে নিয়েছি।
সবুজ আলো জ্বলল। হাইওয়েতে উঠল গাড়িগুলো। উত্তরে চলল, বোম্প্রিটের। দিকে। শেষ মোড়টার কাছে গিয়ে উত্তেজনায় টান টান হয়ে গেল কিশোরের স্নায়ু। কিন্তু তাকে হতাশ করে দিয়ে থামল না ক্যাটারারের ভ্যান, সোজা এগিয়ে চলল।
কিশোর, রবিন বলল। থামল না তো! তার মানে এসবে নেই?
জবাব দিল না কিশোর।
চ্যাপার‍্যাল ক্যানিয়নে পৌঁছে ব্রেক করল বেসিন। ডানে মোড় নিল। হাইওয়ে থেকে তিন ব্লক দূরে একটা অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্স। ওটার সামনে গাড়ি রেখে গিয়ে সামনের দরজায় উঠল সে। বেল বাজাল।
ভ্যানের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল আরনি। পরের ব্লকের কাছে গিয়ে থামল। পেছনের জানালা দিয়ে তাকিয়ে রয়েছে ছেলেরা। বাড়ির ভেতরে ঢুকতে দেখল বেসিনকে। কয়েক মিনিট পরে একটা মেয়েকে সহ বেরিয়ে এল। সুন্দর চেহারা মেয়েটার, কালো চুল। দুজনে এসে উঠল ভ্যানে। যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে ফিরে চলল আবার গাড়িটা।
কিন্তু এবারেও গতি কমাল না শিপইয়ার্ডের কাছে।
নাহ, যাচ্ছে না তো, নিরাশ হয়ে বলল রবিন। আজ রাতে আর যাবে না।
সত্যিই গেল না বেসিন। সোজা দক্ষিণে মেরিনা ডেল রে-এর কাছে একটা রেস্টুরেন্টের পার্কিং লটে গিয়ে ঢুকল।

বুঝলাম, আরনি বলল। গার্লফ্রেণ্ডকে নিয়ে গেছে ডিনারে। এতে কোন দোষ নেই। ক্রাইম করেনি। ও শিপইয়ার্ডে ঢুকলে হার্ট অ্যাটাক হয়ে যেত আমার।
আরনি কথা বলছে, বেসিন তখন রেস্টুরেন্টের সামনের দরজায় গিয়ে দড়িয়েছে। দরজা ঠেলে খুলে ধরে রাখল যাতে মেয়েটা ঢুকতে পারে। তারপর ফিরে তাকাল। যেন আরনির গাড়িটার দিকেই তার নজর। একই মুহূর্তের জন্যে। ডেভিড লিটারের দাঁড়ানোর ভঙ্গি মনে পড়ে গেল কিশোরের। গেলাস ভাঙার পর রান্নাঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন লিসটার, ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে ছিলেন বেসিন আর পিকোর দিকে। কল্পনায় দেখতে পেল পিকোর চেহারা, তাকিয়ে রয়েছে লিসটারের দিকে। আরনির বলা হার্ট অ্যাটাক শব্দটা যেন প্রতিধ্বনি তুলল। কিশোরের মনে।
আমি একটা গাধা! কপালে চাপড় মারল কিশোর। বেসিন কি করে হয়? ও হতেই পারে না। এখন আমার মনে পড়ছে। রান্নাঘরের দরজায় গিয়ে। দাঁড়িয়েছিলেন লিসটার, বেসিনকে শাসানোর জন্যে, তার ভাড়া করে নিয়ে যাওয়া। একটা মেয়ে গেলাস ভেঙে ফেলেছে বলে। তখন থেকেই সমস্ত ঘটনা শুরু।
নীরব হয়ে গেল সে। তাকিয়ে রয়েছে সামনের দিকে। চোখ মুদে ফেলল ধীরে ধীরে। ওখানে হেনরি বেসিনও ছিল। ট্রেতে খাবার রাখছিল। পিকো কাজ করছিল। সিংকে। সাবান দিয়ে বাসন ডলছিল। হাত ভেজা। ওই মুহূর্তের আগে। কিডন্যাপিঙের প্লটই তৈরি হয়নি। বাজি ধরে বলতে পারি। নিরাপদেই ছিলেন লিসটার, হঠাৎ করেই পরিস্তিতি বিপজ্জনক হয়ে উঠল তার জন্যে। মারাত্মক বিপদ। সেটা বুঝতে পেরেছেন তিনি। আমি দেখেছি সেটা। অথচ তখন বুঝতে পারিনি।
সামনে ঝুঁকল রবিন। কেন পারলে না? কি ঘটেছিল?
কি রকম রেগে গিয়েছিলেন লিসটার মনে আছে? চিৎকার করছিলেন। তাকে থামানোর চেষ্টা করছিল এলেনা। তারপর পিকো তাকিয়েছিল তার দিকে। হাত থেকে বাসন ফেলে দিয়েছিল। আরেকটু হলেই হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাচ্ছিল লিসটারের।
তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই, আরনি বলল। কোন জিনিস ভাঙলে ভীষণ খেপে যায় বুড়োটা। চোখের সামনে একগাদা বাসন ভাঙতে দেখলে শান্ত থাকার কথা নয় তার।
আসল কারণ সেটা নয়, কিশোর বলল। বাসনগুলো ভাঙার পর প্রথম ভালমত পিকোর ওপর নজর দিয়েছিলেন লিসটার। তাঁর দিকে তাকিয়েছিল পিকো। লিসটারের মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম না আমি, কিন্তু পিকোর পাচ্ছিলাম। অদ্ভুত দৃষ্টি ফুটেছিল তার চোখে। আমি তখন ভেবেছিলাম বুঝি ভয় পেয়েছে। এখন বুঝতে

পারছি ভয় নয়, ঘৃণা। কেঁচোর দিকে যে দৃষ্টিতে তাকায় মানুষ, সেই দৃষ্টি। লিসটারকে চিনতে পেরেছিল পিকো। আগে থেকেই পরিচয় ছিল। লিসটারও চিনতে পেরিছিলেন তাঁকে। এ কারণেই অ্যানজিনার অ্যাটাক হয়।
হাঁ করে শুনছে রবিন। পিকো…পিকোই সিয়েটা!
হতে পারে, কিশোর বলল। ওর ব্যাপারেই এলেনাকে হুঁশিয়ার করেছেন হয়ত লিটার। আমার ভুল না হয়ে থাকলে এ মুহূর্তে আইলিন লিসটারে বিশপের বই খুঁজতে চলে গেছে পিকো। আমি বেসিনের সঙ্গে যখন ইয়টটার সম্পর্কে কথা বলছিলাম, ওই সময়ই সে ঢুকেছিল। নিশ্চয় শুনে ফেলেছে। প্যাস্ট্রিতে যে ব্যাগটা পেয়েছি ওটা বেসিন রাখেনি ওখানে, পিকো রেখেছে।
চল তাহলে! তাড়াতাড়ি গাড়ি ঘোরাল আরনি। তীব্র গতিতে ছুটল বোটি ড্রাইভের দিকে।
সেন্ট্রাল কোস্ট মেরিনে পৌঁছতে পৌঁছতে অন্ধকার হয়ে গেল। মুসার ভয় হতে লাগল, দারোয়ান ওদেরকে কিছুতেই ঢুকতে দেবে না।
গেট দিয়ে যাওয়ার দরকারও নেই, কিশোর বলল। ওই দেখ।
দেখল সবাই। আরনির গাড়ির হেডলাইটে ধরা পড়েছে পিকো। শিপইয়ার্ডের কাঁটাতারের বেড়ার কাছে দাঁড়িয়ে আছে সে। বেড়ার এক জায়গায় বেশ বড় একটা ফোকর কাটা হয়েছে।
থামবেন না! প্রায় চিৎকার করে বলল রবিন। আমরা যে দেখেছি বুঝতেই যেন না পারে। আগে হাতেনাতে ধরি, তারপর জিজ্ঞেস করা যাবে লিসটারকে কি করেছে।
চলে যান, কিশোর বলল। পরে নেমে তার পিছু নেব।
এগিয়ে গেল আরনি। পেছনের জানালা দিয়ে তাকিয়ে রইল গোয়েন্দারা। দেখল, বেড়ার কাছ থেকে সরে যাচ্ছে পিকো। দৌড় দিল হাইওয়ের দিকে।
পুরো আধপাক ঘুরে গাড়ির মুখ আবার ঘুরিয়ে ফেলল আরনি। হেডলাইট নিভিয়ে দিয়ে এগোল। আরেক বার পাশ কাটাল পিকোর। লোকটা তখন হেঁটে চলেছে। আরনির গাড়ির পার্কিং লাইট শুধু জ্বলছে। অন্য গাড়ি মনে করল পিকো। হাত তুলল থামানোর জন্যে। লিফট চায়।
তুলে নেব? আরনির প্রশ্ন।
মাথা খারাপ? কিশোর বলল। চিনে ফেলবে না?
থামল না আরনি। দক্ষিণে এগিয়ে গেল ব্লক দুয়েক। তারপর একটা রেস্টুরেন্টের পার্কিং লটে ঢুকে থামল। এবারও পেছনের জানালা দিয়ে তাকিয়ে রয়েছে গোয়েন্দারা। রাস্তায় একটা ভ্যানকে দেখল থেমে পিকোকে তুলে নিতে।
ডার্ক শেভি ভ্যান, বলল কিশোর।
বুঝেছি, আরনি বলল।

আবার অনুসরণের পালা। দুটো গাড়ির পেছনে রইল আরনি সর্বক্ষণ। চলে এল সান্তা মনিকায়। লিংকন বুলভারে পৌঁছে থেমে গেল ভ্যান। পিকে নেমে গেলে চলতে শুরু করল গাড়িটা।
আরেকবার পিকোর পাশ কাটাল আরনি। কোণের কাছে পৌঁছে- থামল। পেছনের জানালা দিয়ে চেয়ে রয়েছে ছেলেরা।
মাথা নিচু, কাঁধ বাঁকা করে হাঁটছে পিকো। ফিরে এল আরনি। পাশ কাটাল। দাঁড়াল। আবার ঘুরল। পাশ কাটাল। দাঁড়াল। এভাবেই অনুসরণ করে চলেছে। খেয়ালই করছে না যেন পিকো।
কয়েক ব্লক পরে একটা নির্জন জায়গায় চলে এল ওরা। জায়গাটা পতিত। যেন দানবীয় কোন রেজর ব্লেড দিয়ে চেঁছে তুলে নেয়া হয়েছে ওপরের মাটি।
পুরনো বাড়িঘর সব ভেঙে ফেলা হয়েছে এখানে, আরনি বলল। পার্ক বানাবে বোধহয়। রাস্তার এত কাছে, যা শব্দ, পার্ক কেমন হবে কে জানে। জায়গা সিলেকশন ভাল হয়নি ওদের। পার্ক হওয়া দরকার নীরব জায়গায় গাড়ি থামিয়ে তাকিয়ে রয়েছে পিকোর দিকে।
লোকটা এখন শুধু একটা ছায়া। কয়েকটা অন্ধকার আকৃতির দিকে হেঁটে চলেছে। আলো নেই এখানটায়। খোলা জায়গাটার ওপাশের আকৃতিগুলো। বাড়িঘরের। নির্জন, শূন্য, ধ্বংস হয়ে আসা সব বাড়ি। দুটো বাড়ির মাঝের গলিতে হারিয়ে গেল পিকো।
গাড়ি নিয়ে না গিয়ে, কিশোর বলল, হেঁটেই যাই। সুবিধে। দরজা খুলল সে।
বেরিয়ে এল চারজনেই। নীরবে পিছু নিল পিকোর। যেদিকে অদৃশ্য হয়েছে সে সেদিকে চলল দ্রুতপায়ে।
এখানে কোথায় এল? অন্ধকারে হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল মুসা।
শশশ! হুঁশিয়ার করল কিশোর। দেখ!
সামনে ম্লান আলো। আলোর আভা বললেই ঠিক বলা হয়, পরিত্যক্ত একটা বাড়ির ভেতর থেকে আসছে। পা টিপে টিপে এগোল গোয়েন্দারা। আরও কাছে এলে দেখল জানালার ভেতর দিয়ে আসছে আলোটা। শাটার লাগানো। কিন্তু কয়েক জায়গায় ভাঙা, আলো বেরোচ্ছে ওই পথে।
অন্য পাশ দিয়ে বাড়ির একেবারে গা ঘেষেই চলে গেছে গাড়ি চলাচলের পথ। এত জোরে হর্ন বাজাল একটা লরি, চমকে উঠল ওরা।
গর্জন করতে করতে চলে গেল গাড়িটা। শাটারের একটা ভাঙা অংশে চোখ রাখল কিশোর। একটা ঘর। একটা বিছানা। পাশে একটা পুরনো আলমারি। তার ওপর হারিকেন জ্বলছে। বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে শুয়ে থাকা লোকটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে পিকো। লোকটাকে মনে হচ্ছে বেহুশ। কাত হয়ে আছে। মুখটা জানালার

দিকে ফেরানো। চোখ বন্ধ। এক গোড়ালিতে একটা আংটা, সেটার সঙ্গে শেকল লাগানো। শেকলের আরেক মাথা মেঝের বড় একটা পাথরের ফুলকে গাথা। আরেকটা আংটার সঙ্গে লাগানো। বেঁধে রাখা হয়েছে লোকটাকে।
পিছিয়ে এল কিশোর। সঙ্গীদেরকে ইশারা করল সরে যাওয়ার জন্যে।
বেশ কিছুটা সরে এসে ফিসফিস করে ওদেরকে জানাল কিশোর, ডেভিড লিসটারকে পেয়েছি। বের করে আনতে হবে এখন।

.

আরেকটা পরিত্যক্ত বাড়িতে এসে ঢুকল গোয়েন্দারা। পরিকল্পনা করার জন্যে।
সোজা ঢুকে পড়তে পারি আমরা, আরনি বলল। পিকোর কাছ থেকে জোর করে চাবি আদায় করে খুলে নিয়ে আসতে পারি। তবে পিস্তল থাকতে পারে পিকোর কাছে। তাহলে মুশকিল হবে। রাগের মাথায় লিসটারকেই গুলি করে। বসতে পারে।
আমাদেরকেও করতে পারে, মুসা বলল। এত ঝুঁকির মধ্যে না গিয়ে পুলিশকে ফোন করতে পারি আমরা।
তা পারি। বেশ, আমি ফোন করতে যাচ্ছি। ওরা এসে হাতে নাতে ধরবে পিকোকে। আমি সন্দেহ থেকে বাদ যাব। বেঁচে যাই তাহলে। একটু থেমে আরনি বলল, তোমরা এখানেই বসে থাক।
ছেলেদেরকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে বেরিয়ে গেল আরনি।
আমাদের কারও যাওয়া উচিত ছিল ওর সঙ্গে আরনির পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেলে আফসোস করল মুসা।
কেন? রবিনের প্রশ্ন। সে কি পুলিশকে ফোন করতে পারবে না?
তা পারবে। কিন্তু করবে কিনা সেটাই প্রশ্ন। লিসটারকে ঘৃণা করার তার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। মত বদলাতে পারে। চলে যেতে পারে। তাহলে আমরা এখানে বসেই থাকব বসেই থাকব, গাধা হয়ে।
থাকতে যাচ্ছে কে? মুখ খুলল কিশোর। আরনিও ভাল করেই জানে বেশিক্ষণ তার জন্যে এখানে বসে থাকব না আমরা। আর চলে গেলে তো সন্দেহমুক্ত হতে পারল না, বরং তার ওপর আমাদের সন্দেহ আরও বাড়বে। নাহ, সে যাবে না। পুলিশকে ফোন করবে। লিসটারকে এখন আর হাতছাড়া করতে চাইবে না। এক সেকেণ্ড চুপ করে ভাবল গোয়েন্দাপ্রধান। শোন, পিকোর হাবভাব একটুও ভাল লাগেনি আমার। মরিয়া হয়ে উঠেছে সে। খারাপ কিছু করে বসতে পারে।
অযথা বসে না থেকে বেরিয়ে পড়ল তিন গোয়েন্দা। চলে এল ম্লান আলোকিত জানালাটার কাছে। ফোকরে চোখ রাখল কিশোর। এখনও আগের জায়গাতেই। রয়েছে পিকো। ঝুঁকে তাকিয়ে রয়েছে লিসটারের দিকে। হারিকেনের আবছা

আলোয় মনে হচ্ছে তার গালে মাংস নেই, গর্ত। আর সারাটা জীবনই যেন ক্ষুধার্ত রয়ে গেছে লোকটা।
বুড়ো ভাম, বিড়বিড় করে বল পিকো। আমাকে তুমি বোকা বানাতে পারবে। এইই, এইই! বলে, জোরে চিৎকার করে ডাকল সে। জানালায় কাঁচ নেই। তাই রাস্তার গাড়িঘোড়ার শব্দকে ছাপিয়ে সেই চিকরি কানে এল গোয়েন্দাদের।
এইই, শুনছো! আরও ঝুঁকে লিসটারের পা চেপে ধরল পিকো। জোরে ঝাঁকি। দিল। ঠিকই শুনতে পাচ্ছ। ভান করছ না শোনার। যেন বেহুশ হয়ে গেছে, এহ! আমার সঙ্গে ওসব চালাকি খাটবে না।
ঘাবড়ে গেল তিন গোয়েন্দা। লিসটারকে কিছু করবে না, তো পিকো? পুলিশ নিয়ে আরনি ফেরার আগেই ওরা কিছু করার চেষ্টা করবে?
বইটা চাই আমি! লিসটারের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল পিকো। ওটা আমার জিনিস, আমি অনেক কষ্ট করেছি, আদায় করে নিয়েছি বলা যায়। সারাটা জীবনই নষ্ট করেছি ওটার জন্যে। জেল খেটেছি। তোমার সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিতে আপত্তি ছিল না আমার। কিন্তু তুমি এমনই লোভী, পুরোটা একাই মেরে। দেয়ার তালে ছিলে। তুমি আমাকে জেলে পাঠিয়েছ, পাঠাওনি? বইটা হাতে পেতেই চলে গিয়েছ পুলিশের কাছে। গিয়ে বলেছ ওটা কার কাছে আছে জান। আমার নাম বলে দিয়েছ। আমাকে অ্যারেস্ট করল ওরা। আমার মত একজন মানুষকে! পিকো সিয়েটাকে! ছ্যাচড়া চোরের মত কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে গিয়ে আমাকে জেলে ভরল পুলিশ!
আমার ঘরে বইটা পায়নি ওরা, তা-ও জান তুমি। জানবেই তো, তোমার কাছেই তো ছিল। ওরা আমাকে কি করেছে জান? পিটিয়েছে। বার বার জিজ্ঞেস করেছে, বইটা কি করেছি। বলতে পারলাম না। ওরা ধরে নিল আমি ওটা বিক্রি করে দিয়েছি। কিছুতেই বিশ্বাস করাতে পারলাম না। জেলে ভরলই ওরা আমাকে।
তারপর তুমি কোথায় গিয়েছ লিসটার, আমি জানি। সোজা সেই জায়গাটায় চলে গিয়েছিলে। পকেট ভর্তি করার জন্যে। ধনী হওয়ার জন্যে!
বিছানার কাছ থেকে সরে এল পিকো। ঘুরে দাঁড়াল। পায়চারি শুরু করল। মুঠো শক্ত হয়ে গেছে।
আরনি যেদিকে গেছে অধৈর্য হয়ে সেদিকে তাকাল মুসা। এখনও আসছে না। কেন? এত দেরি কেন?
পায়চারি থামাল পিকো। বিছানার কাছে গিয়ে আবার কথা বলতে লাগল। অন্য রকম হয়ে গেল কণ্ঠস্বর। মানসিক চাপের লক্ষণ। তার জন্যে এখন তোমাকে জবাবদিহি করতে হবে। তুমি ভেবেছ, তোমার মেয়েটা গিয়ে পুলিশকে বলবে। ওরা খুজতেই থাকবে,খুজতেই থাকবে, তারপর নাটকীয় ভাবে চলে আসবে,

এখানে, তোমাকে উদ্ধার করার জন্যে। না, তা হবে না। সে রকম কিছু যাতে না ঘটতে পারে সেজন্যে সতর্ক রয়েছি আমি। মেয়েটা আস্ত ভীতু। রাতে একা বাড়িতে থাকতে পারে না বলে কয়েকটা ছেলেকে ডেকে এনেছে সঙ্গ দেয়ার। জন্যে। আরও বেশি যখন ভয় পেলে, পালিয়ে চলে গেল মায়ের কাছে। ও রকম একটা মেয়ের ওপর ভরসা করে আছ তুমি। পুলিশ নিয়ে আসবে। হুহ! এখানেই। থাকতে হবে তোমাকে, বুঝলে?

কোথায় আনা হয়েছে ভাল করেই জান তুমি, লিসটার। এখানে কেউ আসে। কেউ চলাচল করে না এদিক দিয়ে। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করলেও কারও কানে যাবে না। সময়ের অভাব নেই আমার। তাড়াহুড়া করব না। যতক্ষণ না বলছ, ছাড়ছি না। বুঝলে?

গটমট করে শাটারের কাছে এসে দাঁড়াল পিকো।

ঝট করে একপাশে সরে গেল মুসা।

আরেক পাশে সরল রবিন।

কিশোর পিছিয়ে গেল। লুকিয়ে পড়ার চেষ্টা করল। কিন্তু সময় মত পারল না, দেরি করে ফেলল। শাটার খুলে দিল পিকো। আরেকটু হলেই বাড়ি লাগত কিশোরের মুখে।

চোখে চোখে তাকিয়ে রইল দুজনে। পুরো একটা সেকেণ্ড নড়তে পারল না। কিশোর, পা যেন অসাড় হয়ে গেছে। তারপর পাশ থেকে হাত ধরে এক হ্যাঁচকা টানে তাকে সরিয়ে নিল মুসা। ততক্ষণে গোলমাল যা হওয়ার হয়ে গেছে।

দৌড় দিল তিনজনে।

চেঁচিয়ে উঠল পিকো। দড়াম করে আবার বন্ধ হয়ে গেল শাটার। আরও জোরে শব্দ হল দরজার।

ওদের পেছনে ছুটে আসছে পিকো।

পেছনে তাকাল কিশোর। লোকটার হাতে অস্ত্র দেখতে পেল। পিস্তল নয়। লাঠি জাতীয় কিছু। অন্ধকারে ভাল দেখতে পেল না সে, আন্দাজ করল পুরনো বেজবল ব্যাট হবে। পিকোর মত লোকের হাতে ওই জিনিসই আগ্নেয়াস্ত্রের চেয়ে কম ভয়ঙ্কর নয়। ওই ব্যাটের কাছে কিশোর আর মুসার জুডো ক্যারাট খাটবে না। লোকটার গায়ে ষাড়ের শক্তি। বন বন করে ঘোরাতে ঘোরাতে যদি এগিয়ে আসে, কাছেও ঘেষতে পারবে না তিনজনের কেউ। পালানো ছাড়া গতি নেই।

ছুটছে তিন গোয়েন্দা। তেড়ে আসছে পিকো, চিৎকার করে গালাগাল করছে। স্প্যানিশ আর ইংরেজিতে। সব বুঝতে পারল না ওরা। এটুকু বোঝা গেল, ধরতে পারলে মাটিতে মিশিয়ে দেয়ার হুমকি দিচ্ছে। গালাগাল থামিয়ে দিল আরও জোরে দৌড়ানোর জন্যে।

তাড়া খাওয়া জানোয়ারের মত গুঙিয়ে উঠল মুসা। দুটো বাড়ির মাঝের অন্ধকারে ঢুকে পড়ল। তার পেছনে গেল রবিন। সব শেষে কিশোর। নিজেকে যেন ছুঁড়ে দিল অন্ধকার ছায়ায় মিশে যেতে চাইছে।
পিকো থামছে না। আসছেই। ছুটে আসছে ব্যাট উঁচ করে।
আর দৌড়ানোর কোন মানে হয় না। বুঝতে পারছে তিনজনেই। রুখে দাঁড়ানোই দরকার।
ঝুঁকিটা অনেক বেশি হয়ে যাবে, ভাবল মুসা। মাথায় এক বাড়ি পড়লে, দুফাঁক হয়ে যাবে খুলি। বাড়ি লাগার আগেই ব্যাট ধরে হ্যাঁচকা টানে যদি নিয়ে চলে আসা যায় তাহলে…তবে তার জন্যে সুযোগ দরকার।
অযথা ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে না। পিকো একা, ওরা তিনজন, সুযোগ আসবেই। রবিনের হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল মুসা। কিশোর এগোল ওদের। পেছনে। আবার ফিরে তাকাল পেছনে, পিকো কতখানি এসেছে দেখার জন্যে।
অনেক কাছে চলে এসেছে।
মুসা এসে দাঁড়াল কিশোরের পাশে। রবিনকে সরিয়ে দিয়ে এসেছে। হাত তুলে দেখাল। অন্ধকারে আবছামত চোখে পড়ল কিশোরেরও, একটা দরজা। শূন্য বাড়িটাতে ঢুকে লুকিয়ে পড়া যায়।
ঢুকে পড়ল কিশোর আর মুসা। আগেই ঢুকে বসে আছে রবিন। হাত ধরাধরি করে এগোল তিনজনে, যাতে আলাদা হয়ে না যায়। অত অন্ধকার, চোখ খোলা। রাখা আর বন্ধ রাখা সমান কথা।
কয়েক পা এগিয়েই ফিরে তাকাল দরজার দিকে। বাইরের আলো আসছে, ফলে ওখানটায় অন্ধকার কিছুটা কম। ফ্যাকাশে। দরজার বাইরে থামতে শোনা গেল পিকোকে। খসখসে হয়ে উঠেছে নিঃশ্বাস। শোনা যাচ্ছে। নিশ্চয় দরজার কাছে ঘাপটি মেরে রয়েছে, ভাবল কিশোর, ওদের বেরোনোর অপেক্ষায়। শব্দ শোনার চেষ্টা করছে, যাতে বুঝতে পারে ওরা কোথায় আছে।
অবশেষে নড়ল পিকো। একটা পা বাড়াল, নীরবতার মাঝে এত মদু শব্দও কিশোরের কান এড়াল না। পিছিয়ে যেতে লাগল সে। দরজার কাছ থেকে যতটা সম্ভব সরে যাওয়া উচিত।
এক পা এক পা করে পিছাতে পিছাতে দেয়ালে এসে ঠেকল, পিঠ। মুসা এসে থামল তার পাশে। নাকি রবিন? যে-ই হোক, তাতে কিছু এসে যায় না। তিনজনের একসঙ্গে থাকার দরকার,ব্যস।
পাশে সরতে শুরু করল তিনজনে। এক সময় পিঠের কাছটায় শুন্য মনে হল কিশোরের। দেয়াল নেই। ফাঁকা। তার মানে দরজা। যেটাতে রয়েছে ওরা তার পেছনে আরেকটা ঘর। দরজা দিয়ে পিছাতে লাগল কিশোর। সঙ্গে এল অন্য

দুজন। আপাতত নিরাপদ। তবে কয়েকটা সেকেণ্ড কিংবা মিনিটের জন্যে। ওঘরেই রয়েছে পিকো। চুপ করে আছে। কান পেতে শুনছে নিশ্চয়। শব্দ শুনলেই ছুটে আসবে।
চারপাশে তাকাল কিশোর। আর কোন দরজা কিংবা জানালা আছে কিনা। বোঝার চেষ্টা করল। বেরিয়ে যেতে পারলে ভাল হত। নেই। শুধু নিচ্ছিদ্র অন্ধকার।
ঈশ্বরের অশ্রু
আরনি! এতক্ষণে মনে পড়ল তার কথা। আরনি কোথায়? পুলিশ নিয়ে আসছে না কেন?
মুসার সন্দেহই সত্যি হল, তেতো হয়ে গেল কিশোরের মন। মত বদল করেছে আরনি। ওদেরকে ফেলে চলে গেছে। যা করার এখন নিজেদেরকেই করতে হবে। কারও সাহায্য পাবে না। পিকোকে আক্রমণ করে তার হাত থেকে ব্যাটটা কেড়ে নিতে হবে। তার পরেও কথা থাকে। পিকোর পকেটে পিস্তল থাকতে পারে। ব্যাট হাতছাড়া হয়ে গেলে বের করবে ওটা। তাহলে মারাত্মক বিপদে পড়ে যাবে ওরা।
আচমকা কেঁপে উঠল মেঝেটা। ওদের পায়ের তলায় মাটির গভীরে যেন প্রচণ্ড তোলপাড় শুরু হয়েছে। ভারি কোন লরি রাস্তা দিয়ে গেলে যেমন কেঁপে ওঠে মাটি অনেকটা তেমনি।
তারপর গর্জে উঠল ধরণী। গর্জন বাড়ছেই, আরও, আরও। এমন ভাবে ভরে দিল দিগ্বিদিক, যেন ওই শব্দটাই একমাত্র আছে পৃথিবীতে আর কিছু নেই। টলতে শুরু করল বাড়িটা। ঝিলিক দিয়ে উঠছে আলো। বিদ্যুৎ চমকের মত উজ্জ্বল, চোখ ধাঁধানো। বাইরের টেলিগ্রাফের খুঁটিগুলো চোখে পড়ল, মাটিতে দেবে যাচ্ছে, যেন মুহূর্তে নরম কাদা হয়ে গেছে কঠিন মাটি।
অন্তিম মুহূর্ত ঘনিয়ে এসেছে যেন বাড়িটার। তীব্র আর্তনাদ শুরু করে দিয়েছে। তীক্ষ্ণ রোম খাড়া করা শব্দ করে তা থেকে খুলে আসছে খুঁটিতেমারা পেরেক।
ভূমিকম্প! আর বুঝতে অসুবিধে হল না ছেলেদের। যে কোন মুহূর্তে এখন ধসে পড়তে পারে পুরনো বাড়িটা। দেয়াল থেকে সরে যাবে ছাত, ধুড়ুম করে ভেঙে পড়বে ওদের মাথায়। বাঁচতে চাইলে এখনি বেরিয়ে যেতে হবে।
কিন্তু বেরোতে পারছে না কিশোর। এমনকি সোজা হয়ে দাঁড়াতেও পারছে। মেঝে দুলছে অশান্ত সাগরের মত। তক্তা আঁকড়ে ধরে কোনমতে দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা চালাল।
আটকা পড়ল ও।

কেঁপেই চলেছে ধরণী। থামবে না নাকি? বসে পড়তে বাধ্য হয়েছে কিশোর। সিনেমায় দেখেছে, ভূমিকম্পের সময় কি রকম করে মাটি ফাঁক হয়ে যায়। তার

ভেতরে তলিয়ে যায় ডাইনোসরের মত বিশাল প্রাণীও। কল্পনায় সেসব দেখতে দেখতে শিউরে উঠল সে। তার নিচেও ওরকম ফাঁক হয়ে যাবে না তো? তলিয়ে যাবে না তো মাটির গভীরে? তার পর হাজার বছর পরে ভবিষ্যতের কোন প্রত্নতাত্ত্বিক খুড়ে বের করবে তার ফসিল হয়ে যাওয়া কঙ্কাল...

চারপাশে গুঙিয়ে চলেছে খুঁটি আর তক্তা। দেয়াল থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে টানাটানি করছে ছাত। কাছেই বিকট একটা শব্দ হল। ধড়াস করে এক লাফ মারল কিশোরের বুক। এই বুঝি গেল বাড়িটা। না, পুরোটা নয়, একটা দেয়াল ধসে পড়েছে। আরও বিকট আরেকটা শব্দ হল। আস্ত একটা বাড়ি ধসেছে। এটাও পড়বে। হঁটকাঠের তলায় জ্যান্ত কবর হয়ে যাবে তিন গোয়েন্দার।

অবশেষে দীর্ঘ এক যুগ পরে যেন থামল ধরণীর কম্পন। কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল কিশোর। ঘরের কালো অন্ধকারের মাঝে চারকোণা একটা ফ্যাকাশে ফোকর চোখে পড়ল। জানালা। তারমানে দেয়ালটা দাঁড়িয়েই আছে। সাংঘাতিক শক্ত বাড়ি তো! ধসে পড়ার আর ভয় নেই।

অন্ধকারে বলে উঠল মুসা, বাপরে বাপ! কাণ্ডটা কি হল। এভাবে ভূমিকম্পের মধ্যে আর পড়িনি কখনও।

নাগরদোলায় চড়লাম! রসিকতার চেষ্টা করল রবিন, জমল না, কোলা ব্যাঙের স্বর বেরোল তার গলা দিয়ে।

পিকোর কথা মনে পড়ল কিশোরের। ভুমিকম্প শুরুর আগে পাশের ঘরটায় ছিল সে। এখনও কি আছে?

কাঁপা পায়ে দরজার কাছে এগিয়ে গেল কিশোর। ঘরটা এখন আর আগের মত অন্ধকার নয়। দেয়াল ধসেছে। রাস্তার গাড়ির আলো এসে পড়েছে ভেতরে। বাতাসে ধুলো উড়ছে। ভারি, কেমন যেন শ্যাওলা শ্যাওলা গন্ধ। পিকোকে দেখা গেল না।

অসংখ্য আলো আছে রাস্তায়। গাড়ির। তবে সব অচল হয়ে আছে। দাঁড়িয়ে গেছে সব। লোকের চিৎকার, গাড়ির তীক্ষ্ণ হন, আগের নীরবতার কিছুই অবশিষ্ট নেই আর এখন। নড়ছে না একটা গাড়িও, কিংবা হয়ত নড়তে পারছে না।

রাস্তার পাশের বাড়িটার দিকে তাকিয়ে চমকে গেল কিশোর। কয়েক মিনিট। আগেও যেটা আস্ত ছিল, সেটার অনেকখানিই ধসে পড়েছে এখন। বাড়ি বলেই চেনা যায় না আর। তিন দিকের দেয়াল নেই। বাকি একটা দেয়ালের ওপর কাত হয়ে ঠেস দিয়ে রয়েছে কোনমতে ছাতটা।

ওটাই সেই বাড়ি! যেটাতে লিসটারকে বন্দি করে রেখেছিল পিকো!

সর্বনাশ! গুঙিয়ে উঠল রবিন। ভু-ভর্তা হয়ে গেছে...

থেমে গেল একটা গাড়ির আলো দেখে। উঁচুনিচু জমিতে ঝাঁকুনি খেতে খেতে, এগিয়ে আসছে ওটা। অন্ধকারের চাদর ফুড়ে দিয়েছে যেন ওটার হেডলাইট। বিদ্ধ করেছে পিকোকে।
ধসে যাওয়া বাড়ির দিকে হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রয়েছে সে। এগিয়ে আসা গাড়িটার দিকে তাকাল। অন্ধ করে দিয়েছে যেন তাকে হেডলাইট। পেছনে যে আরেকটা গাড়ি আসছে দেখতেই পেল না। হাতের ওপর জ্বলছে লাল-নীল আলো। পুলিশের গাড়ি।
হাসি ফুটল কিশোরের মুখে। এসে গেছে পুলিশ।
ফিরে তাকাল পিকো। ছেলেরা যে বাড়িটায় রয়েছে সেদিকে। হাতে এখনও রয়েছে বেজবল ব্যাটটা। বেরিয়ে পড়ল তিন গোয়েন্দা। সতর্ক রয়েছে। পিকো ব্যাট উঁচিয়ে তেড়ে এলেই সরে যাবে তিন দিকে। কিন্তু এল না লোকটা। বরং ব্যাটটা হাত থেকে ফেলে দিয়ে দৌড় দিল। ছুটতে ছুটতে হারিয়ে গেল ধসে পড়া বাড়ির দেয়ালের আড়ালে।
জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে গেল পুলিশের গাড়ি। ঝটকা দিয়ে খুলে গেল দরজা। লাফিয়ে নামল দুজন অফিসার। ধসে পড়া বাড়িটার দিকে দৌড় দিল। আরনিও নামল। লিসটারের নাম ধরে চিৎকার করে ডাকতে ডাকতে ছুটল, বলল, আর কোন ভয় নেই।
জবাবে ভেসে এল আরেকটা কণ্ঠ, রেডিওর স্পীকারের মত কড়কড় করে উঠল যেন, জলদি এস! গাধা কোথাকার! আস্ত একটা বাড়ি ধসে পড়েছে আমার ওপর, আর বলছে কোন ভয় নেই! রামছাগল!
ডেভিড লিসটার। বেঁচে আছেন এখনও। ধসে পড়া বাড়ির নিচে চাপা পড়েছেন। এত বড় বিপদে থেকেও মেজাজের সামান্যতম পরিবর্তন হয়নি তার।
পিকোর পিছু নিয়েছে পুলিশ। রাস্তায় পৌঁছার আগেই ধরে ফেলল তাকে। হাতকড়া পরিয়ে দিল। নিয়ে আসতে লাগল গাড়ির দিকে।
ও-ই কিডন্যাপার, অফিসারদের দিকে এগিয়ে গেল রবিন।
পুলিশের হাত থেকে হ্যাঁচকা টানে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল পিকো। লাফ দিয়ে এসে লাথি মারার চেষ্টা করল রবিনকে। ঝট করে সরে গেল রবিন।
আবার তাকে চেপে ধরল পুলিশ। শক্ত করে, যাতে আর ছুটতে না পারে। টেনেহিঁচড়ে গাড়িতে এনে তুলল।
দেয়ালের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে আরনি। চিৎকার করে বলল, ভয় নেই, মিস্টার লিসটার, আমরা আপনাকে বের করে আনব।
তাহলে করছ না কেন? সারারাত লাগাবে নাকি? খেঁকিয়ে উঠলেন লিসটার।

এই সময় মনে পড়ল আরনির, সে কে, কেন এখানে এসেছে। বাবার কথা ভাবল। যাকে ধংস করে দিয়েছে দেয়ালের নিচে চাপা পড়ে থাকা ওই বুড়োটা।
মিস্টার লিসটার, চুপ করে থাকুন! বলল সে। ফিরে গেল তার গাড়িতে। ভেতরে ঢুকে চুপ করে বসে রইল। আর কোন সাহায্য করতে রাজি নয়। বেরোলই না আর। মাঠের ওপর দিয়ে যখন নাচতে নাচতে ছুটে এল এলেনার গাড়িটা, তখনও না।
আসার সময় ফোন করে এসেছে নিশ্চয় এলেনাকে, অনুমান করল মুসা। আসতে এত দেরি হয়েছে সে জন্যেই। সব দিক গোছগাছ করেই এসেছে।
এলেনার সঙ্গে এসেছেন ওর মা। বাবা কোথায় আছে জানতে পেরে যেন পাগল হয়ে গেল মেয়েটা। দেয়ালের জানালা দিয়েই গিয়ে ঢুকতে চাইল। তাকে ধরে রাখলেন মা, যেতে দিলেন না।
আপনারা কিচ্ছু ভাববেন না, একজন অফিসার বলল। যা করার আমরা। করছি।
যা করার একটু জলদি করলে ভাল হয় না? চেঁচিয়ে বললেন লিসটার। ধুলোয় দম আটকে যাচ্ছে তো! লাশ হয়ে গেলে আর বের করে লাভ কি?
মড়মড় করে উঠল কাত হয়ে থাকা ছাত। গোঙাল। বাকি দেয়ালটাকেও ধসিয়ে দেয়ার হুমকি দিচ্ছে।
জানালা দিয়ে ঢুকে পড়ল দুই অফিসার। বাইরে যারা রইল, তারা দম বন্ধ করে অপেক্ষা করতে লাগল। আপাতত পড়বে না আর দেয়ালটা, যতই হুমকি। দিক। ছাতটাও এমনভাবে আটকে গেছে পড়ার ভয় নেই। যদি আবার কাঁপুনি শুরু না হয়। বড় ভূমিকম্পের পরে মাঝে মাঝেই আবার শুরু হয় কাপুনি, বিরতি দিয়ে দিয়ে। সে রকম একটা কম্পন এলেই সর্বনাশ। এখন সামান্য একটা কাপুনিই। ছাতটাকে ধসিয়ে দিতে যথেষ্ট।
তবে আর কোন কম্পন শুরু হল না। খানিক পরে জানালা দিয়ে বেরিয়ে এল। একজন অফিসার। ছেলেদের দিকে তাকিয়ে ভুরু কুচকাল। মেঝের সঙ্গে শেকলে বাধা। একথাটা জানানো হয়নি আমাদের। অনেকটা অভিযোগের সুরেই বলে গাড়িতে ফিরে গেল সে। সাহায্যের জন্যে ফোন করতে।
দমকলের গাড়ি এল ফোন পেয়ে। আধ ঘণ্টা পর। তবে এসে আর দেরি করল না একটা মুহূর্ত। আটকা পড়া মানুষকে উদ্ধার করার ট্রেনিং আছে ওদের। দুজন ঢুকে গেল জানালা দিয়ে। ভেতরের অবস্থাটা দেখে এল। একটা লোহাকাটার করাত চাইল সহকর্মীদের কাছে। করাত দিয়ে কাজ সারার পর চাইল একটা শাবল। ধ্বংসস্তূপের ভেতরে তাদের কাজ করার বিচিত্র শব্দ হতে লাগল। একটা স্ট্রেচার ঢোকান হল জানালা দিয়ে। এর খানিকক্ষণ পরে ওই পথেই বের করে আনা হল লিসটারকে।

ততক্ষণে একটা অ্যাম্বুলেন্স চলে এসেছে।
খবরদার, মাথামোটার দল! অ্যাম্বুলেন্সে তোলার সময় চিৎকার করে বললেন লিসটার, ছেড়ে দিও না!
বাবার পাশে পাশে এসেছে এলেনা। ওফ, আব্বা, একটি বারের জন্যেও কি চুপ থাকতে পার না! বাবার সঙ্গে সে-ও অ্যাম্বুলেন্সে উঠল। হাসপাতালে যাবে।
ঠিক ওই সময় আবার কেঁপে উঠল মাটি। মা-ভূমিকম্প ঘুরে যাওয়ার পরে হাজির হয়ে গেছে ছানা-ভূমিকম্প। ছোট ছোট কয়েকটা ঝাঁকুনি দিল। যেন হ্যাঁচকা টানে কাত করে ফেলল অবশিষ্ট দেয়ালটাকে, পুরোপুরি ধসিয়ে দিল ছাত, একটু আগেও যেটার নিচে আটকা পরে ছিলেন ডেভিড লিসটার। ধুলো উড়তে লাগল চারদিকে।

.

তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছে তিন গোয়েন্দা। স্যালভিজ ইয়ার্ডে আসবেন ডক্টর ক্রুগার মনটাগো। লিসটারকে উদ্ধার করে আনার পর পুরো একটা হপ্তা পেরিয়ে গেছে। তিনি এলে তাকে নিয়েই মিস্টার ভিকটর সাইমনের ওখানে যাবে ওরা। চিত্রপরিচালক মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফার নেই হলিউডে। জরুরী একটা কাজে ইউরোপ চলে গেছেন। তবে যাবার আগে দেখা হয়েছে গোয়েন্দাদের সঙ্গে। কেসের রিপোর্ট পড়েছেন। গল্পটা ভারি পছন্দ হয়েছে তাঁর। ছবি বানাবেন। চিত্রনাট্য লিখে দিতে অনুরোধ করেছেন মিস্টার সাইমনকে।
তাকে পুরো গল্পটা শোনাতেই তিন গোয়েন্দার যাওয়ার কথা আজ। রওনা হবে হবে করছে, এই সময় ফোন এসেছে রুক্সটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, ডক্টর মনটাগোর। দেখা করতে আসতে চাইলেন তিনি। বিশপের বইটাতে কি লেখা আছে বলার জন্যে।
গাড়ি নিয়ে এলেন তিনি। কোথায় কি জন্যে যেতে হবে তিন গোয়েন্দাকে, খুলে বলল তাকে কিশোর।
আপনিও যেতে পারেন, মুসা বলল। অসুবিধে নেই। মিস্টার সাইমন খুব ভাল মানুষ। তাকে আপনারও ভাল লাগবে। অনেক বড় গোয়েন্দা। তেমনি বড় লেখক। কোনটাতে যে বেশি সুনাম কামিয়েছেন, বলা মুশকিল। বিরাট এক বাড়ির মালিক। এককালে ওটা সরাইখানা ছিল।
তাই নাকি? মনটাগো বললেন। শুনে তো যাওয়ার জন্যে লোভই হচ্ছে।
লোভটাকে আরও বাড়িয়ে দেয়ার জন্যেই রবিন বলল, শুধু কি বাড়ি। ভিয়েতনামী একজন কাজের লোকও আছে। নাম নিসান, জাং কিম। সে-ও খুব ভাল। তবে একটা দোষ আছে, অদ্ভুত সব খাবার রান্না করার ঝোঁক। আর সুযোগ পেলেই

মানুষকে খাইয়ে সেসব রান্না কেমন হয়েছে পরীক্ষা করার প্রবণতা। কিছু। কিছু রান্না তো দারুণ! আর কিছু কিছু...মুখেই দেয়া যায় না!
আর লোভ সামলাতে পারলেন না ডক্টর মনটাগো। তিন গোয়েন্দার সঙ্গে যেতে রাজি হলেন। বিশপের বই নিয়ে আলোচনা ওখানেও করা যাবে।
ডক্টরের গাড়িতেই চলল তিন গোয়েন্দা। সামনে বসল কিশোর, ড্রাইভারের পাশের সীটে। রবিন আর মুসা বসল পিছনে। পথ দেখিয়ে দিতে লাগল কিশোর। কোস্ট হাইওয়ে থেকে মোড় নিয়ে সরু একটা পাহাড়ী পথে উঠল গাড়ি। কিছু দূর এগোনোর পর বিরাট একটা শাদা রঙ করা বাড়ি চোখে পড়ল।
এই কিশোর, দেখ, পেছন থেকে বলল মুসা। বাড়ির দরজা খোলা। বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে ছোট একটা মেয়ে। একটা চামড়ার ফিতে দিয়ে কপাল আর চুল বাঁধা। তাতে পাখির লাল পালক গোঁজা।
ইনডিয়ান মেয়ে! মনটাগো বললেন। ওর কথা তো কিছু বলনি।
নতুন এসেছে মনে হয়, জবাব দিল কিশোর। ইনডিয়ানদের মত লাগছে, তবে ইনডিয়ান নয়।
ভাল করে দেখে ডক্টরও একমত হলেন কিশোরের সঙ্গে। মেয়েটা এশিয়ান। লজ্জিত ভঙ্গিতে হেসে হাত নাড়ল। নিসান জাং কিম বেরিয়ে এল বারান্দায়। মেয়েটার হাত ধরল।
চুমাশ রাজকুমারীর পোশাক পরেছে। সুন্দর না? মেয়েটার কথা বলল কিম, ক্যালিফোর্নিয়ার আদিম মানুষের আচার আচরণ শিখছে।
মনটাগোকে নিয়ে বারান্দার দিকে এগোল তিন গোয়েন্দা। আরও কয়েকটা বাচ্চা বেরিয়ে এল। সবাই এশিয়ান। পরনে ইনডিয়ান পোশাক।
পূর্ব-পশ্চিমের মধ্যে বন্ধুত্বের চেষ্টা করছে এরা, বুঝিয়ে বলল কিম। আমেরিকানদের রীতিনীতি শেখাচ্ছে আমাদের দেশের বাচ্চাদের। যাতে সহজেই যে কোন আমেরিকান ইস্কুলে ভর্তি হতে পারে। সহপাঠীদের সাথে মিশতে পারে। এক দেশ থেকে আরেক দেশে পড়তে গেলে আর সে দেশের কিছুই জানা না থাকলে অসুবিধে হয়ে যায়।
প্রজেক্টটা তাহলে নতুন শুরু করলেন, হেসে বলল রবিন।
হ্যাঁ, করলাম।
ইনডিয়ানদের দিয়েই শুরু? আরও তো লোক রয়েছে আমেরিকায়।
তা আছে। তবে আসল অধিবাসী তো ইনডিয়ানরাই। এখানে তাদের রীতিনীতিই হল খাঁটি। বাকি সব ভেজাল। নানা দেশের লোক এসে ভিড় জমিয়েছে আমেরিকায়, সব তালগোল পাকিয়ে ফেলেছে। সে জন্যে ইনডিয়ানদেরই বেছে নিয়েছি। আজকে ওদেরকে রান্না শেখাচ্ছি। চুমাশ ইনডিয়ানদের রান্না। পাহাড়ী

এলাকায় গিয়ে শিখে এসেছি। অ্যাক্রন কেক। ক্রীমড ড্যানডেলিয়ন। আর হজমের সুবিধের জন্যে রোজহিপ চায়েরও ব্যবস্থা করব।
মারছে! বিড়বিড় করল মুসা, অবশ্যই নিচু স্বরে, যাতে কিম শুনে না ফেলে।
বেরিয়ে এলেন ভিকটর সাইমন। বাচ্চাদেরকে ভেতরে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিল কিম। ডক্টর মনটাগোর সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিল কিশোর। আসার উদ্দেশ্যও জানাল। বিশপের বই নিয়ে আলোচনা করতে চান ডক্টর। হাত মেলালেন সাইমন। খুব খুশি হলেন। তিন গোয়েন্দার দিকে ফিরে ওয়েলকাম জানালেন ওদেরকেও।
প্রথমেই প্রশ্ন করল মুসা, আচ্ছা, স্যার, এই ক্রীমড ড্যানডেলিয়নের ব্যাপারটা কি বলুন তো?
মুচকি হাসলেন সাহিত্যিক গোয়েন্দা। ভয় নেই। কড়া নির্দেশ দিয়ে দিয়েছি আমি। আমরা চুমাশ নই, ভিয়েতনামী শিশুও নই যে আমেরিকানদের রীতি শিখতে হবে। কাজেই পাহাড় থেকে শিখে আসা কোন ইনডিয়ান খাবার চলবে না। সকালে আমি নিজে বাজারে গিয়ে পছন্দ মত খাবার কিনে এনেছি। আলাপ আলোচনা শেষ হোক, তারপর খেতে বসব।
হাঁপ ছেড়ে বাচল যেন তিন গোয়েন্দা। যাক, অন্তত এই একটা দিন সাইমনের বাড়িতে এসে তার ভিয়েতনামী বাবুর্চি কিমের অত্যাচার সহ্য করতে হবে না। অ্যাক্রন কিংবা ড্যানডেলিয়ন চেখে দেখার কোন ইচ্ছেই ওদের নেই।
পথ দেখিয়ে মেহমানদেরকে মস্ত ঘরটায় নিয়ে এলেন সাইমন, যেটা থেকে সাগরের চমৎকার দৃশ্য দেখা যায়। সরাইখানা চালু থাকার সময় এ ঘরটা ছিল প্রধান ডাইনিং রুম। এখন হয়েছে একাধারে লিভিং রুম, লাইব্রেরি আর অফিস। কফি টেবিল ঘিরে বসল সবাই। কেসের রিপোর্ট ফাইলটা ঠেলে দিল রবিন। এতে সব নেই, বলল সে। সেগুলো ডক্টর মনটাগো মুখেই বলবেন।
মাথা ঝাঁকালেন ডক্টর। আগে ফাইলটা পড়া শেষ করুন। আমার কাহিনী অনেক পুরনো একটা রহস্য নিয়ে। চারশো বছর আগের। তাড়াহুড়া নেই। সব বলা যাবে।
পড়তে আরম্ভ করলেন সাইমন। রান্নাঘরে শোনা যাচ্ছে বাচ্চাদের কলরব। কিন্তু পড়তে পড়তে এতই মগ্ন হয়ে গেলেন তিনি, সে সব শব্দ কানেই ঢুকল না। শেষ পৃষ্ঠাটাও শেষ করে মুখ তুললেন। হাসলেন। ভূমিকম্পের ঝাঁকুনি খেয়েও তাহলে লিটারের মেজাজ ঠিক হয়নি! হাহ্ হাহ্।
কিশোরও হাসল। চিতাবাঘ কি আর চামড়ার ফোঁটা মুছে ফেলতে পারে। সিয়েটাও কিন্তু কম বদমেজাজী নয়। দুজনে মিলেছিল ভাল।
দুটো দক্ষিণ আমেরিকান দেশে সিয়েটাকে খুঁজছে পুলিশ, রবিন জানাল। বড় রকমের অপরাধী। জীবনের বেশির ভাগ সময়ই কাটিয়েছে জেলখানায়। বিশপের ডায়রি চুরির ব্যাপারে তার হাত কতটা ছিল, ডক্টর মনটাগো সেটা ভাল বলতে

পারবেন। এসব নিয়ে গবেষণা করেছেন তিনি। আগেও অনেক অপরাধ। করেছে সিয়েটা। তবে বিশপের বই হাতে গিয়েই প্রথমবার পুলিশের হাতে ধরা পড়ল। জেলে গেল। তার পরে কুকাজ করতে গিয়ে আরও কয়েকবার জেলে গেছে।

অ্যাটাচি কেস খুলে চামড়ায় বাধানো পুরনো বইটা বের করলেন মনটাগো। আইলিন লিসটারে ওটা খুঁজে পেয়েছিল কিশোর। আমি এখন শিওর, ডক্টর বলতে লাগলেন, এটাই বিশপ এনরিক জিমিনিজের হারানো ডায়রি। অনেক বছর আগে বোগোটাতে বাস করতেন তিনি। সোনার খনিতে ইনডিয়ান শ্রমিকদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার করার কারণে লোকে তার নাম দিয়েছিল রক্তাক্ত বিশপ। স্প্যানিশ বিজেতাদের দখল করা পান্নার খনিও দেখাশোনা করেছেন তিনি। স্প্যানিশ কলোনির একজন উঁচুদরের লোক ছিলেন। গভীর আঁতাত ছিল। সরকারের সঙ্গে।

লোকে বলে তিনিও অত্যাচারী ছিলেন। অথচ বিশপ তার ডায়রিতে লিখে গেছেন, খনির শ্রমিকদের ওপর স্প্যানিশদের অত্যাচারে তিনি মর্মাহত। সেসব অত্যাচার ঠেকানোর জন্যেই নাকি খনি পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন তিনি। একটা পান্নার খনিতেও গিয়েছিলেন। এক চিলতে জমিতে পাওয়া গিয়েছিল খনিটা। বেশি গভীরে খুঁড়তে পারেনি ইনডিয়ানরা, কেবল ওপরটা কিছুদূর খুঁড়েছিল। আরও ভেতরে কেন নামতে পারছে না ওর। সেজন্যে সাংঘাতিক অত্যাচার চলছিল। ওদের ওপর। দেখেশুনে আর স্থির থাকতে পারেননি বিশপ। ছুটে এসেছিলেন। বোগোটায়। স্প্যানিশ সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করার জন্যে। যাতে ইণ্ডিয়ানদেরকে খনির কাজ থেকে রেহাই দেয়া হয়। সরকার কিছু করার আগেই পর্বতে ভূমিধস ঘটল। যে খনিটা দেখে এসেছিলেন বিশপ, সেটা চাপা পড়ে গেল। অনেক মাটির তলায়।

এ পর্যন্ত বলে থামলেন মনটাগো। দম নিলেন। তারপর ডায়রি খুলে পড়ে অনুবাদ করে বলতে লাগলেন, কয়েক মাস ধরে খুঁড়ল অনেক লোক মিলে। মাটি সরানোর চেষ্টা করল। কাজটা মারাত্মক বিপজ্জনক। আরও ভূমিধস নামতে পারে। আলগা মাটি খসে পড়ে মানুষকে চাপা দিতে পারে। কিন্তু এত বিপদের মধ্যেও লোকগুলোকে কাজ করতে বাধ্য করল সৈন্যরা। বিদ্রোহী হয়ে উঠল ইনডিয়ানরা। আর খুড়তে অস্বীকার করল। এই সময় আদেশ এল সরকারের কাছ থেকে, খনিটা বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ওটাতে আর কাজ করানোর দরকার নেই। বাঁচল ইনডিয়ানরা। তবে ঈশ্বরের অশ্রু খুঁজতে গিয়ে অনেক অশ্রু ঝরে গেছে ততদিনে।

হুমম! মাথা দোলালেন সাইমন। এতদিন তাহলে ভুল কথা জেনে এসেছি। বিশপ অন্যায় করেননি। অত্যাচারী ছিলেন না।

অযথা বদনামের ভাগী হয়েছেন, মুসা বলল। সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস…
বইয়ের মাঝখানে নাকি কিছু পৃষ্ঠা নেই। সাইমন জিজ্ঞেস করলেন, সেগুলোতে কি লেখা ছিল? কিছু বুঝতে পেরেছেন?
ওগুলোই ছিল আসল, মনটাগো জানালেন। খনিটার অবস্থান। বোগোটা থেকে রওনা দিয়ে খনিতে পৌঁছতে যে কদিন লেগেছিল সে কদিনের কথা নিশ্চয়। লেখা ছিল ওই পৃষ্ঠাগুলোতে। ওই লেখার নির্দেশ পড়ে গিয়ে পৌঁছানো যাবে, সোগামোসোর সেই পান্নার খনিতে। যে জায়গায় বৃদ্ধা মহিলা তার ছায়া ফেলবে সেখানেই পাওয়া যাবে খনিটা। বৃদ্ধা মহিলা, অর্থাৎ ওল্ড উয়োমেন হল অ্যানডিজ পর্বতমালার একটা চুড়ার নাম। স্থানীয় ইনডিয়ানরা ওই নাম রেখেছে।
বহু বছর ব্যক্তিগত সংগ্রহে ছিল বিশপের ডায়রি। মালিক জানতই না এটাতে কি লেখা রয়েছে। তার হাত থেকে চলে গেল এক বই ব্যবসায়ীর হাতে, দুর্লভ বই কিনে বিক্রি করত ওই ব্যবসায়ী। তার মনে হয়েছিল মূল্যবান আবিষ্কার। করা যাবে ও বইয়ের লেখার মানে বের করতে পারলে। কিন্তু বের করার আগেই চুরি হয়ে গেল বইটা। পুলিশ সন্দেহ করল ব্যবসায়ীর অ্যাসিসটেন্টকে। লোকটার বাসায় গিয়ে হানা দিল একদিন। বেশ কিছু দুর্লভ দলিল বের করল ওখান থেকে। সব চোরাই মাল। দোকান থেকে চুরি করে নিয়ে গেছে। তবে যেটার জন্যে যাওয়া সেই ডায়রিটাই পেল না।
তাই? ডিটেকটিভ বললেন। ওই অ্যাসিসটেন্ট নিশ্চয় আমাদের সিয়েটা।
হ্যাঁ, জবাবটা দিল মুসা। শুরুতে সব অস্বীকার করে সিয়েটা। বলে সে কিছু জানেই না। শেষে চাপে পড়ে বলে একজন আমেরিকান দোকানে ঢুকে ডায়রিটা নিয়ে চলে গেছে। জ্যাকেটের নিচে লুকিয়ে। একথাও বিশ্বাস করেনি পুলিশ। জেলে পাঠিয়ে দিল তাকে।
আসলে কি ঘটেছিল আন্দাজ করতে পারি আমরা, রবিন বলল। কিমের রান্নাঘরে হঠাৎ যেন এক ঝলক হাসির ঝড় উঠল। সেটা মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত। অপেক্ষা করতে হল তাকে। এখনও কেউ মুখ খুলছে না, সিয়েটাও না, লিসটারও না। এলেনার কাছে তার বাবার সম্পর্কে যা শুনেছি তাতে একটা ধারণা করতে। পারি আমরা। এক সময় নাবিক ছিলেন লিসটার, দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতেন। বন্দরে জাহাজ থামলে বসে থাকতেন না। যতটা পারতেন ঘুরে বেড়াতেন দেশের ভেতরে। প্রচণ্ড উচ্চাকাভক্ষা ছিল তার। সব সময় সুযোগ খুজতেন। বোগোটায়। কোন ভাবে পরিচয় হয়েছিল সিয়েটার সঙ্গে। ডায়রিটা, পড়েই হোক কিংবা যে ভাবেই হোক সোগামোলোর পান্নার খনির কথা জেনে ফেলেছিল সিয়েটা। সেটা বলেছিল লিসটারকে। তারপর দুজনে মিলে চুরি করে ডায়রিটা। সিয়েটার সঙ্গে

বিশ্বাসঘাতকতা করেন লিসটার। ফলে সিয়েটা গেল জেলে আর তিনি দেশে ফিরে এলেন বিপুল টাকার মালিক হয়ে।
তার মানে পান্নার খনিটা তিনি পেয়েছিলেন, সাইমন বললেন।
তাই তো মনে হয়, কিশোর বলল। বিশপের ডায়রিতে যে পথের কথা লেখা আছে সে ভাবে চলে আমরাও পৌঁছতে পারব খনির কাছে। পড়া খুব কঠিন।
স্প্যানিশ না জানলে হবে না।
মাথা ঝাঁকালেন মনটাগো। কিছু কিছু জানা থাকলে অবশ্য পারতেও পার। ডিকশনারি আর রেফারেন্স বইয়ের সাহায্য নিয়ে। আমার বিশ্বাস লিসটারও তাই করেছিলেন। গত চারশো বছরে স্প্যানিশ ভাষার ততটা পরিবর্তন হয়নি।
আইলিন লিসটারে গেল কি করে ডায়রিটা? জানতে চাইলেন সাইমন।
মনে হয়, রবিন বলল। পান্নার দরকার হলেই জাহাজ নিয়ে কলাম্বিয়ায় চলে যেতেন লিসটার। ওই ডায়রিটাই হল খনিতে যাওয়ার পথ নির্দেশক। তাই ওটা সঙ্গে রাখতেন। যদি ভুল হয়ে যায় দেখে মিলিয়ে নেয়ার জন্যে। শেষবার যাওয়ার পর আর অনেকদিন যাবেন না বুঝতে পেরেই হয়ত আসল পাতাগুলো ছিঁড়ে নিয়ে এসেছিলেন। লুকিয়ে রেখেছিলেন বাড়িতে। ডায়রিটা ফেলে রেখেছিলেন সাধারণ বইয়ের সঙ্গে। কারণ ওটার আর তখন দাম নেই। তবু কোন জিনিস ফেলে দেয়ার স্বভাব নয় তো, রেখে দিয়েছিলেন।
হুঁ। তাহলে বড় লোক হওয়ার পুঁজিটা তিনি পান্নার খনি থেকেই জোগাড় করেছেন। জানালা দিয়ে সাগরের দিকে তাকালেন সাইমন। আবার মুখ ফিরিয়ে বললেন, তারপর তার অপরাধের সঙ্গী এসে সেদিন মেয়ের পার্টিতে হাজির হল। দেখে ভীষণ চমকে যাওয়ারই কথা।
হয়েছেন মানে। একেবারে অ্যানজিনার অ্যাটাক হয়ে গিয়েছিল। অনেক বছর পরে দেখা। তবু তাকে চিনতে ভুল করেনি সিয়েটা।
মুসা বলল, আমি যখন লিসটারের কাছে বসে ছিলাম, ঘুমের ভান করে পড়ে ছিলেন তিনি। আসলে তার মনে তখন দুশ্চিন্তার ঝড়। বুঝে ফেলেছিলেন সিয়েটা প্রতিশোধ নেয়ার চেষ্টা করবেই। ডায়রিটা চাইবে। কিন্তু তখনও ওটা দেয়ার ইচ্ছে ছিল না লিসটারের। অন্তত আসল পাতাগুলো। তাই পয়লা সুযোগটা পেয়েই আমাকে বাথরুমে আটকে পাতাগুলো বের করে ফায়ারপ্লেসে ফেলে পুড়িয়েছেন। তারপর কমপিউটার রুমে গিয়ে একটা মেসেজ লিখলেন এলেনার জন্যে। খনিটার কথা মেয়েকে বোঝাতে চেয়েছেন তিনি, যদি তার কিছু ঘটে যায় তাহলে এলেনা যাতে গিয়ে খুঁজে বের করতে পারে ওই সম্পদ।
শ্রদ্ধা চলে যাচ্ছে আমার লোকটার ওপর থেকে, বিরক্ত কণ্ঠে বললেন সাইমন। লিসটার ভীষণ লোভী। যা আনার তো এনেছিল, প্রয়োজনের অতিরিক্ত, আর

কেন? ডায়রিটা সিয়েটাকে দিয়ে দিলেই হত। ..
ঠিকই বলেছেন, মাথা ঝাঁকাল মুসা। আমি বাথরুমে আটকা পড়ে আছি। নিশ্চয় ওই সময়টাতেই পা টিপে টিপে দোতলায় উঠে এসেছিল সিয়েটা। আমাকে বাথরুম থেকে বের করতে এসেছিলেন তখন লিসটার, সিয়েটার জন্যে পারেননি। একটা বালিশ এনে তার মুখ চেপে ধরেছিল সিয়েটা, যাতে চেঁচাতে না পারেন। ভয় দেখানোর জন্যেও হতে পারে। টানাটানিতে গেল ওটা ছিঁড়ে। তখন দ্বিতীয়। বালিশটা নিয়ে এল সিয়েটা। বেহুশ করে ফেলল লিসটারকে। বোধহয় খুন করে ফেলেছে বলে ভয় পেয়ে গিয়েছিল সিয়েটা। সে চেয়েছিল ভয় দেখিয়ে ডায়রিটার কথা বের করে নেবে। খুনের ইচ্ছে ছিল না। ঘাবড়ে গিয়ে লাশ সরিয়ে ফেলার। জন্যেই লিসটারকে সরিয়ে নিয়ে যায়, এমন ভাবে, যাতে সবাই ভাবে নিজে নিজেই। চলে গেছেন লিসটার।
বাড়ি থেকে বের করল কিভাবে? জানতে চাইলেন সাইমন।
ঠেলাগাড়িতে করে। ময়লা টেবিলক্লথ দিয়ে ঢেকে।
শেষ পর্যন্ত ময়লার গাড়ি? হাহ।
আগের কথার খেই ধরল কিশোর, পার্টি শেষে ডেকোরেটরের জিনিসপত্র। ফেরত দিয়ে আসার দায়িত্ব ছিল সিয়েটার ওপর। ভেবেছিল তখনই সুযোগ করে। লিসটারের লাশটা নিয়ে গিয়ে গুম করে ফেলবে কোথাও। কিন্তু লাশ বের করতে গিয়ে দেখে মরেননি লিসটার, বেহুশ হয়ে আছেন। অ্যানজিনার অ্যাটাক, এমনিতেই দুর্বল শরীর, তার ওপর ওই ধকলে একেবারে কাহিল হয়ে পড়েছিলেন।
এতে মস্ত সুযোগ পেয়ে গেল সিয়েটা, কিশোরের মুখের কথা টেনে নিয়ে বলল রবিন। লিসটারকে বন্দি করল নিয়ে গিয়ে ওই নির্জন বাড়িটায়। যত চেঁচামেচিই করুন, ওখানে কারও কানে যাবে না। আর পোড়ো বাড়িতেও মানুষ। থাকতে পারে, এতে সন্দেহের কিছু নেই। ভবঘুরেরা যেখানে সেখানে রাত কাটায়। কাজেই বাড়িটা থেকে সিয়েটাকে বেরোতে যদি কেউ দেখেও থাকে, কেয়ারই করেনি। খুঁজেপেতে ভাল বাড়িই বের করেছিল সিয়েটা। যে ঘরে লিসটারকে আটক করেছিল সে, সেটা নিশ্চয় মেশিরুম ছিল। কোন বড় ধরনের মেশিন ছিল ওখানে, যার জন্যে ওই আঙটার প্রয়োজন হত। সিয়েটা সেই আঙটায় শেকল লাগিয়ে বাঁধল লিসটারকে।
তাকে মারতে চায়নি সিয়েটা। তাই নিয়মিত খাবার আর পানি নিয়ে যেত। ডায়রিটার কথা জিজ্ঞেস করাও উদ্দেশ্য ছিল তার। কিন্তু লিসটার এমনই ধড়িবাজ, সিয়েটাকে দেখলেই বেহুশ হয়ে যাওয়ার ভান করতেন। নড়া নেই চড়া নই কোন প্রশ্নের জবাব দেয়া নেই। ভান যে করছেন সেটা সিয়েটাও বুঝতে

পারত। কিন্তু বেশি চাপাচাপি করার সাহস পেত না সে, পাছে মরে যান। খুনের দায় তো চাপবেই ঘাড়ে, খনির ঠিকানাটাও চিরতরে মুছে যাবে।
এখন কেমন আছেন লিসটার? জিজ্ঞেস করলেন সাইমন।
সুস্থ হচ্ছেন, মুসা জানাল। একটা অলৌকিক ব্যাপারই বলা যায়। হাতটা ধসে পড়ল, অথচ একটা আঁচড়ও লাগেনি তার গায়ে।
হুঁ। ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়, হাসলেন ডিটেকটিভ। তবে ভূমিকম্পটা তত বড় ছিল না, তাহলে আর বাঁচতে হত না তোমাদের কারোই। গত হপ্তায় নিউ ইয়র্কে ছিলাম আমি। এখানে যে ভূমিকম্প হয়েছে সেটাকে গুরুত্বই দেয়নি কোন কাগজ।
ওরা যা-ই বলুক, রবিন বলল। আমাদের বারোটা বাজতে যাচ্ছিল আরেকটু হলেই। ভাগ্যিস আমাদের বাড়িটা ধসেনি।
সেজন্যেই তো বলছি, বড় ছিল না। তাহলে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে ফেলত। কেউ বাঁচতে না তোমরা…
নাক কুঁচকালো মুসা। অদ্ভুত একটা গন্ধ আসছে রান্নাঘর থেকে। হঠাৎ করেই নীরব হয়ে গেল চুমাশ ইনডিয়ানদের কোলাহল। ভাগ্যিস ইনডিয়ান হয়ে জনুগ্রহণ করেনি সে। ওরকম বিদঘুঁটে গন্ধ-ওয়ালা খাবার খেয়ে বাঁচার কোন ইচ্ছেই তার নেই। কদিন ধরেই হাসপাতালে আছেন লিসটার, বলল সে। বেড়ালের জান। মরবেন না। ভাল হয়ে উঠছেন দ্রুত। তবে হওয়ার পর আরেকটা ধাকা খাবেন, এলেনা বলেছে আমাদেরকে। বাবা সুস্থ হয়ে উঠলে চিরদিনের জন্যে মায়ের কাছে চলে যাবে সে, আর থাকতে আসবে না। বাবার কাছে। সে বুঝে গেছে, কোন দিনই তার বাবার মেজাজ ঠিক হবে না। ওরকম একটা খেপা লোকের কাছে থাকলে যে কোন সুস্থ মানুষের মাথা খারাপ হয়ে যেতে পারে। এলেনার কথাঃ টাকাই জীবনে সব নয়। টাকার নেশা মানুষের সর্বনাশ করে ছাড়ে।
আর পান্নার খনির ব্যাপারে যা ভেবেছিলাম, রবিন বলল কিছুটা হতাশ কণ্ঠেই। আসলে তা নয়, গোপন নেই আর ওটা। বহু বছর আগেই আবিস্কার হয়ে গেছে। লিসটারই করেছেন। ওটা কোন রহস্য নয়। অযথাই এর পেছনে সময় নষ্ট করলাম।
আরও একটা খবর, মিটিমিটি হাসছেন মনটাগো। লিসটারও জানেন না। অনেক দিন আগে শেষ গিয়েছিলেন তো খনিটাতে, তাই। আমি খোঁজ নিয়ে। জেনেছি কয়েক বছর আগে আরেকটা লোক ওটা আবিষ্কার করে ফেলেছে। কলাম্বিয়ার সরকার দখল করে নিয়েছে এখন ওটা। লিসটার যদি সন্ধান বলতেনও আর সিয়েটা যদি যেতও, কিছুই পেত না। খনির কাছে ঘেঁষতেই দেয়া হত না। তাকে।

আহহা, এটা তাকে জানিয়ে দেয়া উচিত ছিল, জিভ দিয়ে চুকচুক শব্দ করল। মুসা। অযথাই কষ্ট করল বেচারা। খামোকা আবার জেলে গেল।
অপরাধীদের ওরকম সাজাই হয়, সাইমন বললেন।
লিসটারেরও একটা শাস্তি হওয়া উচিত।
আর কি হবে? হয়েছেই ভোস্ত্রী তালাক দিয়ে চলে গেছে। মেয়ে থাকে না। নিজে আধ পাগল। কোটি কোটি টাকা থাকলেই কি না থাকলেই কি। এটা একটা জীবন হল। কেউ তাকে দেখতে পারে না। সম্মান করে না।
আমরাও করি না, ফস করে বলে ফেলল মুসা। বলেই বুঝল কথাটা বলা ঠিক হয়নি। গাল চুলকাতে শুরু করল সে।
মুসার অস্বস্তি বুঝতে পারলেন সাইমন। আসলে সম্মান জিনিসটা জোর করে কাউকে করা যায় না। ভেতর থেকে আসে। তোমাদের আসে না, তো কি করবে।
হাসপাতালে গিয়ে কিশোর যা সব কথা বলে এসেছে না, রবিন বলল। ইজ্জত রাখেনি।
কি বলেছে?
কিশোর আর আমাদেরকে ধন্যবাদ দিচ্ছিলেন লিসটার, আমরা তাকে উদ্ধার করেছি বলে। মুখের ওপর বলে দিল কিশোর, তিনি ওরকম জানলে কখনোই কাজটা করত না। বলেছে, আমরা টাকা নিই না কাজের জন্যে। লোকের উপকার করাই আমাদের ব্রত। কিন্তু যারা অন্যায় করে তাদেরকে সাহায্য করার কোন ইচ্ছে আমাদের নেই।
লিসটার কি বললেন?
চুপ হয়ে গেলেন।
হু! বলবেন আর কি? বলার তো কিছু নেই। এক মুহূর্ত চুপ থেকে জানতে চাইলেন ডিটেকটিভ, আরনি ভিনসেনজোর খবর কি?
একটা ব্যাঙ্কে নতুন চাকরি নিয়েছে, রবিন জানাল। ডি এল ডিপার্টমেন্টাল *স্টোরে*ই বহাল রয়েছে এনথনি, ভাবছে তার, শয়তানীর কথাটা ভুলে যাবেন লিসটার। এলেনার মায়ের সঙ্গে তার একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে বহুদিন থেকেই, সেটা লিসটারকে জানাতে চায়নি বলেই কিশোরকে দেখে লুকিয়ে পড়েছিল। ভদ্রমহিলাও সে কারণেই ভীষণ অস্বস্তিতে পড়ে গিয়েছিলেন। কিশোরকে বের করে। দেয়ার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। মহিলা অবশ্য বলেছেন, তার সঙ্গে...
থাক, হাত তুললেন সাইমন। ওসব কথা শুনতে চাই না। লোকের ব্যক্তিগত ব্যাপার। এইবার আসল কথাটা বল তো। ফাইলে লেখনি। চিলেকোঠার সেই ভুতের ব্যাপারটা। কি ব্যাখ্যা দেবে? কিশোরকে প্রশ্নটা করলেন তিনি।

আমি বুঝতে পারছি না, স্যার, মাথা নাড়ল কিশোর। এটা সত্যিই একটা বড় রহস্য। বের করব একদিন। মিসেস বেকার একটা গল্প বলেছে। মুসা বিশ্বাস করে, আমি করি না। মহিলা বুলে, সেই ছোট্ট মেয়েটা, যে তার ধনী ফুফুর কাছে, বড় হয়েছিল, তাকে একবার সাংঘাতিক মেরেছিল ফুফু। সোনার একটা পিন হারিয়েছিল বলে।

তারপর অনেক ভুগতে হয়েছে মেয়েটাকে। তার পরিবারের সবাই ভাবতে আরম্ভ করে, সে চোরই। আমরা চলে আসার পর চিলেকোঠায় গিয়েছিল মিসেস বেকার, খোঁজাখুজি করতে। যে কোন ব্যাপারে, বিশেষ করে ভূতের, তার খুব কৌতূহল। পুরনো একটা ট্রাঙ্কের ভেতরে লেপের মধ্যে আটকে থাকা এই জিনিসটা বের করে এনেছে, পকেট থেকে একটা সোনার ব্রোচ বের করে টেবিলে রাখল গোয়েন্দাপ্রধান। মিসেস বেকারের ধারণা, এই জিনিসটা চুরির অপবাদ দিয়েই মারধর করা হয়েছিল মেয়েটাকে। কিন্তু আসলে সে চুরি করেনি। ট্রাঙ্কে লেপ ভরার সময় নিশ্চয় টান লেগে বা অন্য কোনভাবে জিনিসটা লেপের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল। সেখানে আর খোঁজেওনি ফুফু, পায়ওনি। মহিলা ওই বাড়িতে থাকতেই মারা গেছে। তার অনেক পুরনো জিনিস এখনও রয়ে গেছে বাড়ির চিলেকোঠায় আর স্টোররুমে। ওই ট্রাঙ্কটাও তারই। বাড়িটা কেনার পর এখন মিস্টার লিসটারের সম্পত্তি হয়ে গেছে।

আমার বিশ্বাস, চিলেকোঠার প্রথম অনুপ্রবেশকারী হল সিয়েটা। এলেনার ওপর ভরসা রাখতে পারেনি সে, তাই নিজেই খুজতে এসেছিল বিশপের বই। দুবার আমার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। একবার বিরোধ বাধে। আরেকবার এসে এলেনার জিসিনপত্র ঘাটাঘাটি করে যায়। কিন্তু দ্বিতীয়জন যে এসেছে সে কে? সেটার জবাব দিয়েছে মিসেস বেকার। খোঁজ নিয়েছিল সে, ব্রোচটা পাওয়ার পর। মোটর দুর্ঘটনায় নাকি মারা গেছে মেয়েটা। এলেনার পার্টি যেদিন হয় সেদিন। মিসেস বেকার জোর গলায় বলছে, নিশ্চয়, সেই মেয়েটার অশান্ত আত্মাই এসে ঢুকেছে চিলেকোঠায়, ব্রোচটা খুঁজে বের করে মানুষকে দেখানোর জন্যে যে সে সত্যিই ওটা চুরি করেনি, চোর ছিল না।

নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্যে, অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন ডিটেকটিভ।

মাথা, ঝাঁকাল কিশোর। সে চোর ছিল না এটা বিশ্বাস করছি। কিন্তু ভূত সেজে চিলেকোঠায় এসেছে একথা আমি বিশ্বাস করব না কিছুতেই। ভূত, প্রেতাত্মা এসব থাকতেই পারে না। ওই শব্দের অন্য কোন ব্যাখ্যা আছে।

আমারও তাই ধারণা। বাতাসের কারসাজি হতে পারে। অনেক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটায় বাতাস, বিশ্বাস করা যায় না। ইঁদুরও হতে পারে। ঠিক আছে, আমিও নাহয়

একদিন যাব তোমাদের সঙ্গে। রহস্যটার সমাধান করতে। অবশ্যই যদি লিসটার অনুমতি দেন।
হঠাৎ প্রতিবাদের ঝড় উঠল রান্নাঘরে। থেমে গেল আবার। একটু পরে দরজায় উঁকি দিল কিম। ঘোষণা করল, খাবার তৈরি। উদ্ভট একটা গন্ধ এসে ঢুকছে রান্নাঘর থেকে, সবার নাকেই লাগছে সেটা। সেদ্ধ করা কাঠের গুড়োর গন্ধ মনে হল মুসার কাছে।
অ্যাক্রন কেক খেতে চাইছে না বাচ্চারা, বিষণ্ন কণ্ঠে জানাল কিম। ওসব খেয়ে চুমাশ ইনডিয়ান সাজার কোন ইচ্ছেই ওদের নেই। কাপড় পরেছে যে এই বেশি।
তাই! ঘাবড়ে গেলেন মিস্টার সাইমন। ওঁদেরকেই না আবার চেখে দেখতে বাধ্য করে কিম। চোখ ফেরালেন আরেক দিকে।
রবিও ঘাবড়ে গেল।
ভয়ে ভয়ে আবার চোখ ফেরালেন সাইমন। তাহলে এগুলোর কি গতি হবে? আর বাচ্চাদেরকেই বা কি খাওয়াবে? ওদেরকে তো অভুক্ত রাখা যায় না।
ওদের নিয়ে ভাবনা নেই, হাসল কিম। হাইওয়েতে একটা পিজার দোকানে নিয়ে যাব। আমেরিকান অ্যাক্রন না খেতে চাইলে কি হবে, আমেরিকান পিজা খুবই পছন্দ ওদের।
ভাল। তাই নিয়ে যাও। আর অ্যাক্রনগুলো ফেলে দাও, কিংবা কোন চুমাশ ইনডিয়ানের সঙ্গে পরিচয় থাকলে তাকে দিয়ে দাও।
চোখে অনেক আশা নিয়ে মুসার দিকে তাকাল কিম।
এদিক ওদিক তাকাল মুসা। আবার তাকাল কিমের দিকে। না, তার দিকেই তাকিয়ে রয়েছে বাবুর্চি, কোন সন্দেহ নেই। খাইছে! বিড়বিড় করল সে। কিমকে জিজ্ঞেস করল, আমার দিকে তাকিয়ে আছেন কেন? আমি কি চুমাশ নাকি?
না, চুমাশ নও। তবে চুমাশের বাপ। পায়ে পায়ে এগিয়ে এল কিম। আচমকা মুসার দুহাত চেপে ধরল। মুসা, প্লীজ, লক্ষ্মী ভাই আমার, একটি বার! শুধু একটা চামচ! তার বেশি বলব না…
মানে?
অ্যাক্রন এই নতুন রান্না করলাম। কেউ না চাখলে তো বুঝতে পারব না কেমন হয়েছে। শুধু এক চামচ…
মাথা চুলকাল মুসা। রাজি হয়ে গেল, বেশ। তবে এক শর্তে।
কি শর্ত? যে কোন শর্তে রাজি কিম।
প্রচুর পরিমাণে স্যাণ্ডউইচ, মাংসের বড়া, ডিম ভাজি, পনির, কেক, সালাদ, আইসক্রীম…
আছে, সব আছে। থালা ভর্তি করে দেব। যত চাও দেব…

ঠিক আছে। নিয়ে এস তোমার অ্যাক্রন, এমন একটা ভঙ্গি করল মুসা, যেন অ্যাক্রনেরই একদিন কি তারই একদিন। দেখে নেবে আজ।
হাসি ফুটল অন্যদের মুখে। নিস্তার পেয়েছে।
নাচতে নাচতে রান্নাঘরের দিকে চলল নিসান জাং কিম।

.

আরও পনের দিন পর। ট্র্যাকে মোটা একটা খাম এসে হাজির হল কিশোরের নামে। ইয়ার্ডের কাজ করছিল সে। এই সময় পিয়ন দিয়ে গেল চিঠিটা। কাজ করতে করতে হাঁপিয়ে উঠেছে গোয়েন্দাপ্রধান। বিশ্রাম নেয়ার কথা ভাবছিল অনেকক্ষণ থেকেই। পেয়ে গেল ছুতো এবং সুযোগ দুটোই। অফিসের সামনের বারান্দায় এসে বসল। ধীরেসুস্থে খুলল খামটা।
ভেতরে বেশ বড় একটা চিঠি। টাইপ করা। আর একটা কার্ড, দাওয়াতের। অবাক হল সে। কে দাওয়াত করল? আগে তাই কার্ডটাই দেখল। পড়ে আরও অবাক। লিসটার দাওয়াত করেছেন। আরেকটা পার্টি দিচ্ছেন তিনি। মেয়ের বিয়ের কথা ঘোষণা করবেন, এনগেজমেন্ট করা হবে, হ্যাঁ, নিক ভিশনের সঙ্গেই। আশ্চর্য!
তিন গোয়েন্দাকেও দাওয়াত করা হয়েছে।
চিঠির নিচের সইটা দেখল কিশোর। লিটারের। ব্যাপার কি? পড়তে আরম্ভ করল সে। তাকেই লেখা হয়েছেঃ
কিশোর
সেদিন তুমি হাসপাতাল থেকে যাওয়ার পর অনেক ভেবেছি। আসলেই, খারাপ লোক আমি। তুমি আমার চোখ খুলে দিয়েছ। জীবনে। অনেক অন্যায় করেছি। সেসব কথা ভেবে ভীষণ, অনুশোচনা হচ্ছে এখন। অনেকগুলো বছর পেছনে ফেলে এসেছি, আর অনেক অন্যায়, সবগুলোর প্রায়শ্চিত্ত তো আর করতে পারব না, তবু যতটা পারি করার চেষ্টা করছি। ঠিকই বলেছ তুমি, শুধু টাকা থাকলেই হয় না, জীবনে ইজ্জত-সম্মানের অনেক দাম। এবং সৎ থাকার।
তোমাকে কয়েকটা কথা জানানোর প্রয়োজন বোধ করছি। আমার মত একটা মানুষকে সাহায্য করেছ বলে রাগ হচ্ছে তোমার, দেখ এসব জানার পর রাগ কিছুটা কমে কিনা। সিয়েটার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করিনি আমি পুলিশের কাছে। বলেছি, আমাকে কিডন্যাপ করেনি সে, নিজের ইচ্ছেতেই আমি তার সঙ্গে গিয়েছিলাম। পুলিশ তখন জিজ্ঞেস করল, আমাকে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখা হল কেন? বললাম, সেটা আমাদের দুই বন্ধুর ব্যাপার। পুলিশ অসন্তুষ্ট হলেও যেহেতু আমি কোন অভিযোগ করিনি, সিয়েটাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। অনেক বুঝিয়ে-শুনিয়ে তাকে নিয়ে এসেছি আমার কাছে। পুরনো বন্ধুত্বটা আবার ঝালাই করার চেষ্টা করছি।

তোমরা নিশ্চয় একটা ভুল ধারণা নিয়ে বসে আছ, পান্নার খনি থেকে পানা তুলে এনে বিক্রি করেই আমি আমার ব্যবসার পুঁজি জোগাড় করেছি। ভুল। আসলে, জীবনে যা করেছি আমি, যেখানে এসে উঠেছি, সব আমার নিজের চেষ্টায়। অনেক পরিশ্রম করে টাকা কামিয়ে দুটো ঝরঝরে স্টীমার কিনেছিলাম। সেই দিয়েই শুরু। বিশ্বাস না করলে এসে দেখে যেতে পার, খনি থেকে তুলে আনা পান্নাগুলো আজও আমার কাছেই আছে। একটাও নষ্ট করিনি কিংবা বিক্রি করিনি। সব সিয়েটাকে দিয়ে। দেব ঠিক করেছি।

ডায়রির পাতাগুলো আমিই পুড়িয়েছি। ঠিকই আন্দাজ করেছ। আর কেউ যাতে যেতে না পারে, সেজুন্যেই পুড়িয়েছিলাম পথের নির্দেশ। এখন ভাবি, ভালই করেছি। কেউ আর সে নির্দেশক পাবে না। পেলেই লোভ হত, আর লোভ থেকেই পাপ। আমি যে অন্যায় করেছি তা আর কেউ করতে পারবে না এখন।

ভাবছি, সিয়েটাকে ব্যবসার অংশীদার করে নেব। সে রাজি হবে। কিনা জানি না। যতদূর জানি, আমার চেয়ে তার আত্মসম্মানজ্ঞান বেশিই।

ও হ্যাঁ, আরনি ভিনসেনজোর সঙ্গেও দেখা করেছিলাম। তার পুরনো চাকরিটা ফেরত দিতে চেয়েছিলাম। রাজি হয়নি। নতুন একটা চাকরি। জুটিয়ে নিয়েছে। শেষে তার বাবার সঙ্গে দেখা করে যে ক্ষতি আমি করেছি তার জন্যে মাপ চাইলাম। ওখানে আমার টায়ারের দোকান বন্ধ। করে দিয়েছি। ভিনসেনজোর দোকানপাট আবার সাজিয়েগুছিয়ে দেয়ার দায়িত্ব নিয়েছি আমি। যা লোকসান হয়েছে সব পুষিয়ে দেয়ার কথাও বলেছি।

তোমাদের কাছে আরও একটা জিনিস নিশ্চয় খুব খারাপ লেগেছে। আমার কমপিউটারে সমস্ত কর্মচারীদের ব্যক্তিগত জীবনের গোপন ফাইল রেখে দেয়ার ব্যাপারটা। সব মুছে ফেলেছি আমি। ওরকম ব্ল্যাকমেল করে। মানুষকে দিয়ে কাজ হয়ত করান যায়, কিন্তু তাদের শ্রদ্ধা মেলে না। স্পষ্ট করে সব কর্মচারীকে জানিয়ে দিয়েছি, ঠিকমত দায়িত্ব নিয়ে আমার এখানে কাজ করলে, কারোরই কোন অসুবিধে হবে না। কাউকে অন্যায় ভাবে চাপ দিয়ে আর কাজ করাব না আমি। তবে যে ফাঁকি দেবে তারও জায়গা হবে না আমার এখানে।

সব শেষে আসি মেয়ের কথায়। তার বিয়েতে আমার কোন অমত নেই আর। জীবনটা তার, কাকে নিয়ে কাটাবে সেটাও তার পছন্দ, আমার নাক গলান ঠিক হয়নি। নিককে নিয়ে যদি সুখী হতে পারে, আমার আপত্তি কি?

কিশোর, তুমি বুদ্ধিমান ছেলে। স্বীকার করতে লজ্জা কিংবা দ্বিধা নেই, আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। আরও আগেই যদি তোমার মত ওভাবে কেউ আমার চোখ খুলে দিতে পারত, অনেক ভাল হত। জীবনটা অনেক সুন্দর হয়ে যেত আমার কাছে। তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।

শেষ কথা, মেয়ের বিয়ের এনগেজমেন্ট হবে, কার্ড পাঠালাম। আসবে, অবশ্যই। তিন গোয়েন্দার দাওয়াত রইল। খুব খুশি হব। না এসে বুড়ো মানুষটাকে আর দুঃখ দিও না, প্লীজ।

ইতি–

ডেভিভ লিসটার।

ভলিউম ১৭ – তিন পিশাচ – তিন গোয়েন্দা – রকিব হাসান – সেবা প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ১৯৯২

রবিনের চোখে পড়ল প্ল্যাস্টিকের ব্যাগটা। সৈকতের বালিতে দেবে রয়েছে। তুলে নিয়ে দেখে হাসল। স্বচ্ছ প্ল্যাস্টিকের ব্যাগের গায়ে লাল রঙে আঁকা রয়েছে কয়েকটা বেড়ালছানা। গলায় নীল রুমাল বাঁধা। ভেতরে অনেক জিনিসের মধ্যে রয়েছে একটা খেলনা ভালুক, কালো কুৎকুতে চোখ মেলে যেন তারই দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

বাচ্চা মেয়ের জিনিস, বলল সে। ভুলে ফেলে গেছে।

সৈকতের এদিক ওদিক তাকাল মুসা। কোন বাচ্চা মেয়েকে চোখে পড়ল না। বেলা পড়ে এসেছে। নির্জন হয়ে গেছে সৈকত। কেবল একজন নিঃসঙ্গ সারফারকে দেখা গেল তার বোর্ড নিয়ে চলেছে রাস্তার দিকে। ওয়াচটাওয়ার থেকে নেমে চলে যাচ্ছে লাইফগার্ড।

যেখানে আছে ফেলে রাখো, বলল মুসা। মেয়েটার মনে পড়লে ফিরে এসে তুলে নেবে।

বয়েস বেশি কম হলে আসতে পারবে না, বলল দলের তৃতীয় সদস্য কিশোর পাশা। তাছাড়া অন্য কেউও তুলে নিয়ে যেতে পারে।

বালিতে বসে পড়ে ব্যাগটার জন্যে হাত বাড়াল সে। দেখি, কিছু মেলে কিনা। তাহলে পৌঁছে দিতে পারব।

ব্যাগটা নিয়ে উপুড় করে সমস্ত জিনিস কোলের ওপর ঢেলে দিল কিশোর। হুম! বলে ভুরু কোঁচকাল। মানিব্যাগ নেই। আইডেনটিটি নেই। রোমশ খেলনা ভালুকটা বাদেও রয়েছে একটা বই, নাম সাকসেস থ্রু ইমেজিং আর পিপল ম্যাগাজিনের একটা কপি। নানা রকম কসমেটিকসের বাক্স আর টিউব আছে। গুনল কিশোর। চার ধরনের লিপস্টিক, আই শ্যাডোর দুটো প্ল্যাস্টিক বক্স, একটা আইলাইনার পেনসিল এবং মেকাপ করার আরও কিছু টুকিটাকি জিনিস। একজোড়া লাল পাথর বসানো কানের টবও পাওয়া গেল।

বাচ্চা মেয়ের নয় ব্যাগটা, বলল সে। বয়স্ক মহিলার। প্রচুর মেকাপ নেয়।

এবং ছোটদের মত খেলনা পছন্দ করে, যোগ করল মুসা।

বইয়ের মলাট উল্টে দেখল কিশোর। লাইব্রেরির বই। পেছনের মলাটের ভেতর দিকে আঠা দিয়ে সাঁটা একটা ম্যানিলা খাম, ফ্রেনসো পাবলিক লাইব্রেরির ছাপ মারা।

সূত্র একটা মিলল, খুশি হয়ে বলল গোয়েন্দাপ্রধান। বই বন্ধ করে বন্ধুদের দিকে তাকাল। কে বইটা নিয়েছে নিশ্চয় খাতায় লেখা আছে। ঠিকানা নিয়ে ব্যাগটা ফিরিয়ে দিতে আর অসুবিধে হবে না।

ফ্রেনসো, না? ঠোঁট ওল্টাল রবিন। ফোন করতে অনেক পয়সা লাগবে।
লাগুক, মুসা হাসল। জিনিস ফেরত পেলে খুশি হয়ে কলের দামটা দিয়ে দেবে মহিলা।
হয়ত আমাদেরকে দাওয়াতও করে বসতে পারে, আশা করল কিশোর। ফ্রেনসোর আঙুরের খেত দেখার জন্যে। চলো, তাড়াতাড়ি করতে হবে। নইলে লাইব্রেরি বন্ধ হয়ে যাবে।
বালির ওপর দিয়ে মেইন রোডের দিকে প্রায় দৌড়ে চলল তিন গোয়েন্দা। সাইকেল তিনটে শুইয়ে রেখে গেছে রাস্তার পাশে। তুলে নিয়ে ছুটল স্যালভিজ ইয়ার্ডে।
ইয়ার্ডে যখন পৌঁছল সূর্য তখন ডুবতে বসেছে। বাড়ির জানালাগুলোয় রোদ পড়ে কাচগুলোকে মনে হচ্ছে চারকোণা সোনার চাদর। সেদিকে নজর দেয়ার সময় নেই ওদের। তাড়াহুড়া করে দুই সুড়ঙ্গ দিয়ে এসে ঢুকল হেডকোয়ার্টারে। ফ্রেনসোর ডিরেকটরি এনকয়ারিতে ফোন করল কিশোর। পাবলিক লাইব্রেরির নম্বর নিয়ে ডায়াল করল লাইব্রেরিতে।
ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মুসা বলল, সময় বেশি নেই।
বেশি সময় লাগলও না। ওপাশ থেকে রিসিভার তুলতেই টেলিফোন লাইনে লাগানো স্পীকারের সুইচ অন করে দিল কিশোর, সবার শোনার জন্যে। ভারিক্কি চালে বলল, হ্যালো, কিশোর পাশা বলছি। তারপর জানাল কেন ফোন করেছে।
কমপিউটারে রেকর্ড করা আছে সব, ওপাশ থেকে জবাব দিল মহিলা কণ্ঠ। দেখি, কি করতে পারি।
কিছুক্ষণ নীরবতার পর আবার শোনা গেল কথা। উত্তেজিত হয়ে উঠেছে মহিলা। তোমাদের নম্বরটা দেয়া যাবে? আবার ফোন করতে হতে পারে–
যাবে।
প্লীজ!
নম্বর দিল কিশোর।
ফোনের কাছ থেকে নোড়ো না, মহিলা বলল। কেটে গেল লাইন।
আস্তে করে রিসিভার নামিয়ে রেখে দুই বন্ধুর দিকে তাকাল কিশোর। ব্যাপারটা কি বলো তো? মহিলাকে বেশ অস্থির মনে হল।
কিছু একটা হয়েছে, মুসা বলল।
কয়েক মিনিট পরেই ফোন বাজল। ওপাশের কণ্ঠটা এবারেও একজন মহিলার, তবে আগের জনের নয়। উত্তেজনায় কাঁপছে, উন্মাদ হয়ে গেছে যেন। ওকে দেখেছ? জিজ্ঞেস করল মহিলা। আমি আসছি। আমার মেয়েটা ...মেয়েটা হারিয়ে গেছে!

ফুঁপিয়ে উঠল লাউডস্পীকার। আরেকটা পুরুষ কণ্ঠ শোনা গেল। শান্ত হও নরিয়া, প্লীজ, ওরকম কোরো না! রিসিভারটা মহিলার হাত থেকে নিয়ে নিয়েছেন তিনি। কিশোর পাশা?
বলছি।
বইটা সৈকতে পেয়েছ?
হ্যাঁ।
ফ্রেনসো পাবলিক লাইব্রেরি থেকে বইটা ধার নিয়েছিল আমার মেয়ে। তার পর পরই হারিয়ে গেছে।
বলুন।
বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল, হলিউডে গিয়ে সিনেমায় অভিনয় করবে বলে।
পেছন থেকে মহিলা বললেন, ওকে বলো, আমরা আসছি।
বলছি, নরিয়া, বলছি।
লম্বা দম নিলেন ভদ্রলোক, টেলিফোনেই বোঝা গেল। বললেন, আমার নাম পিটার ডিকসন। তোমাদের ফোন পেয়ে আশা হচ্ছে, মনে হচ্ছে ডলি ভালই আছে। তোমাদের সঙ্গে দেখা করা দরকার। কথা বললে কিছু বেরিয়ে পড়তে পারে। ব্যাগে কোন ঠিকানা পেয়েছ?
না।
পুলিশ কিছু করতে পারছে না। তোমাদের ঠিকানাটা দাও। কাল সকাল নাগাদ পৌঁছে যাব।
লিখে নিন।
ঠিকানা লিখে নিয়ে কিশোরকে ধন্যবাদ জানিয়ে লাইন কেটে দিলেন মিস্টার ডিকসন।
মেয়ে হারিয়েছে। প্রায় চিৎকার করে বলল মুসা। চমৎকার আরেকটা কেস পেয়ে গেল বোধহয় তিন গোয়েন্দা, কি বলো?
বইটার পাতা ওল্টাতে আরম্ভ করেছে কিশোর। জানি না। কয়েকটা রশিদ বেরোল ভেতর থেকে। দেখে নিয়ে মাথা দোলাল সে, এটা হাই-লো লোন জুয়েলারি কোম্পানির। আর এটা ক্যাশ-ইন-আ-ফ্ল্যাশ, ইক। বন্ধকী কারবার করে। মনে হচ্ছে মেয়েটার টাকার খুব দরকার পড়েছিল।
রশিদগুলো ভেতরে রেখে বইটা বন্ধ করে নামটার দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। সাকসেস গ্রু ইমেজিং। নাম শুনেছি বইটার। লেখক বলতে চান, শুধু কল্পনা করেই মনের জোরে তুমি যা চাইবে তাই পেয়ে যাবে। মনের মত কাজ চাও? পেয়ে যাবে। বাড়ি চাও..
কিংবা সিনেমার অভিনেত্রী হতে চাইলেও হয়ে যাবে, রবিন বলল।

তাই। আবার বইটা খুলল কিলোর। একটা বিশেষ অধ্যায়ের বিশেষ জায়গা পড়তে শুরু করল, কি ভাবে উন্নতি করা যায়। ইচ্ছে শক্তিকে কাজে লাগিয়ে যা ইচ্ছে তাই পাওয়া যায়।

খাইছে! হেসে ফেলল মুসা। এ তো দেখছি আলাউদ্দিনের আশ্চর্য চেরাগ। উইল পাওয়ার খাটাতে খাটাতে বাড়ি যাই। দেখব, একটা আস্ত কেক দিয়ে ফেলে নাকি মা।

.

পরদিন সকালে ইয়ার্ডের অফিসের সামনে জটলা করছে তিন গোয়েন্দা। গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকল একটা টয়োটা। ড্রাইভিং সিট থেকে বেরিয়ে এসে কিশোর পাশাকে খুঁজলেন এক ভদ্রলোক। লম্বা, মাথায় বাদামী চুল পাতলা হয়ে আসছে, চেহারায়। বুদ্ধির ছাপ। পাশের প্যাসেঞ্জার সিট থেকে নামলেন এক মহিলা। কালো চুল। চোখেমুখে প্রচণ্ড উদ্বেগের ছাপ।

মিস্টার ডিকসন? জিজ্ঞেস করল কিশোর।

হ্যাঁ। তুমিই ডলির ব্যাগটা পেয়েছিলে তো?

আমি না, রবিন পেয়েছে। দুই সহকারীর পরিচয় করিয়ে দিল, কিশোর। অফিস থেকে বেরিয়ে এলেন মেরিচাচা। ডিকসনদের মেয়ে হারিয়েছে শুনে তাদেরকে ভেতরে ডেকে নিয়ে গেলেন বসে কথা বলার জন্যে।

টেবিলে ব্যাগটা রেখে দিয়েছে কিশোর। মিসেস ডিকসন দেখে চিনতে পেরে মাথা ঝাঁকালেন। ও রকম ব্যাগ পছন্দ করে ডলি। হালকা। ভেতরের জিনিসগুলো ঢেলে দিলেন টেবিলে। খেলনা ভালুকটার দিকে তাকিয়ে মুখ বাঁকালেন। এটা কিছু বলতে পারবে না।

লাইব্রেরির বইটা তুলে নিলেন তিনি। ভেতর থেকে বের করলেন রশিদগুলো। একবার দেখেই চেঁচিয়ে উঠলেন, পিটার, ও না খেয়ে আছে! পথেঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছে ভিখিরি আর চোর-বদমাশদের সঙ্গে! মরবে তো!

রশিদগুলো দেখে ডিকসনও গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, অনেক কারণেই মানুষ জিনিস বন্ধক রেখে টাকা ধার নেয়। না খেয়ে আছে, এটা জোর দিয়ে বলতে পারো না।

হাতে করে একটা খাম নিয়ে এসেছেন তিনি। টেবিলের ওপর উপুড় করে ঢেলে দিলেন। একগাদা ফটোগ্রাফ। ডলির ছবি। আঠারো বছর বয়েস। সৈকতে বেশি যাওয়ার অভ্যেস থাকলে নিশ্চয় তাকে দেখেছ।

তিন গোয়েন্দার হাতে হাতে ছবিগুলো ঘুরতে থাকল। সুন্দর চেহারার কালো চুল আর সবুজ চোখওয়ালা একটা মেয়ের ছবি। একটা ছবিতে দেখা যাচ্ছে বাজিয়ে দলের ড্রামবাদকের পোশাক পরা। কড়া করে লিপস্টিক লাগিয়েছে। কোনটাতে

ব্যালে ড্যান্সার, কোনটাতে তীর্থযাত্রী। দশ বছর বয়েসে তোলা ছবি আছে, আছে তের বছর বয়েসে তোলা মিস টিন ফ্রেনসো প্রতিযোগিতায় রানার্স আপ হওয়ার ছবি।
ছবিগুলো অবাক করল ছেলেদের।
একেক ছবিতে একেক রকম লাগছে, মুসা বলল। কোনটা যে ওর আসল চেহারা বোঝাই মুশকিল।
চুলের কারণে লাগছে এরকম, বুঝিয়ে দিলেন মিসেস ডিকসন। কখনও লম্বা, কখনও ছোট। কখনও সাদা লিপস্টিক, কখনও গাঢ় লাল, কখনও কমলা। তবে সবুজ আর নীল কখনও লাগাতে দেখিনি। বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে চুলেও রঙ লাগায়নি।
কাঁদতে শুরু করলেন মিসেস ডিকসন।
পুলিশকে জানিয়েছি, ডিকসন বললেন। কিছুই করতে পারছে না। সৈকতে যে জায়গায় ব্যাগটা পেয়েছ, সে জায়গাটা দেখতে চাই। তারপর লাইফগার্ডদের সঙ্গে কথা বলব।
মাথা ঝাঁকাল কিশোর। সার বেঁধে গিয়ে উঠল ডিকসনের গাড়িতে। সারাটা সকাল তিনজনেই বসে বসে দেখল সৈকতময় ঘুরে বেড়াচ্ছেন ডিকসন দম্পতি। লাইফগার্ড আর অল্প বয়েসী রৌদ্র স্নানার্থীদের সঙ্গে কথা বলছেন। বেলা একটা নাগাদ হতাশ এবং ক্লান্ত হয়ে পড়লেন দুজনে।
ছবিটা কেউ চিনতে পারল না, ডিকসন বললেন।
ছবিতে যা দেখাচ্ছে মেয়েটা তার চেয়ে সুন্দর, মিসেস বললেন। গোলমালটা বোধহয় সেখানেই। আবার কাঁদতে শুরু করলেন তিনি।
খুঁজে ওকে বের করবই, বললেন ডিকসন। ছেলেদের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, এ শহরে খুঁজতে কতটা সময় লাগবে, বলতে পার? বাড়ি বাড়ি গিয়ে জিজ্ঞেস করব। সুপারমার্কেটগুলোতে খোঁজ নেব। হ্যাণ্ডবিল বিলি করব। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেব।
এখানকার পুলিশ চীফ ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্লেচারের সঙ্গে কথা বলে দেখতে পারেন, পরামর্শ দিল রবিন। খুব ভাল লোক।
সুতরাং থানায় চললেন ডিকসন দম্পতি। ফ্লেচারের সঙ্গে দেখা করে মেয়ে হারানোর কথা জানালেন।
ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে ক্যাপ্টেন বললেন, আজকালকার ছেলেমেয়েদের নিয়ে এই হলো সমস্যা। একটা ছবিতে টোকা দিয়ে বললেন, এটা রাখতে পারি?
নিশ্চয়ই, মিসেস বললেন।
শেষ কবে তার সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে? জানতে চাইলেন ফ্লেচার।

দুমাস আগে। এর দুদিন আগে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। ফোন করে আমাদেরকে চিন্তা করতে মানা করল। আমরা তাকে বোঝাতে যেতেই কেটে দিল লাইন।
মাথা ঝাঁকালেন চীফ। ডিকসনদের ফোন নম্বর আর ঠিকানা লিখে নিয়ে বললেন, আমার লোকদের জানিয়ে দেব। খেয়াল রাখবে। ইয়ে, ছেলেগুলোকে কাজে লাগাচ্ছেন না কেন?
ছেলেগুলো? বুঝতে পারলেন না মিসেস ডিকসন।
হ্যাঁ, ওরা। তিন গোয়েন্দাকে দেখালেন চীফ। ওরা গোয়েন্দা। ভাল কাজ করে। বহুবার সাহায্য করেছে পুলিশকে।
এই সুযোগটারই যেন অপেক্ষায় ছিল কিশোর। চীফ বলেও সারতে পারলেন না, পকেট থেকে তিন গোয়েন্দার কার্ড বের করে বাড়িয়ে ধরল সে।
কার্ডটা পড়লেন ডিকসন। বললেন, চীফ যখন সুপারিশ করছেন, কোন প্রশ্ন আর করতে চাই না। বুঝতে পারছি তোমরা ভাল কাজ করো। ঠিক আছে, ভাড়া করলাম। চেক লিখে দেব?
না, মাথা নাড়ল কিশোর। টাকা নিই না আমরা। শখে কাজ করি। তবে ডলিকে আগে পেয়ে নিই, খরচাপাতি যা হবে, বিল পাঠিয়ে দেব, দিয়ে দেবেন। এখন আপনার মেয়ের একটা ছবি দরকার আমাদের।
যা চাও, পুরো খামটাই কিশোরকে দিয়ে দিলেন ডিকসন। যখন যা দরকার হবে, শুধু একটা ফোন করবে আমাকে। পেয়ে যাবে।
তো, আমরা এখন কি করব? চীফকে জিজ্ঞেস করলেন মিসেস।
বাড়ি ফিরে যান। টেলিফোনের কাছে বসে থাকবেন। আমরা কিছু জানতে পারলে জানাব।
হায়রে, মেয়েটাকে কত মানা করলাম বেরোতে, গলা ধরে এল মিসেস ডিকসনের, শুনল না। আর দেখব কিনা কে জানে!

.

কাজটা আসলে আমাদেরকে গছিয়ে দিলেন চীফ, মুসা বলল।
তা তো দিলেন, টেবিলে বিছানো ছবির দিকে তাকিয়ে রবিন বলল, কিন্তু শুরু করব কোত্থেকে?
হাসল কিশোর। বন্ধকীর দোকানগুলো থেকে করতে পারি।
হেডকোয়ার্টারে বসে কথা বলছে ওরা।
সোজা হল রবিন। ঠিক।
ওসব জায়গা থেকে টাকা ধার করতে হলে, কিশোর বলল। কোন মূল্যবান জিনিস জমা রাখতে হয়। নাম-ঠিকানা দিতে হয়।
তাহলে তো পেয়েই গেলাম! নিশ্চিন্ত হলো মুসা।

পাব, সব সময় নিরাশ করার প্রবণতা কিশোরের, খারাপ দিকটা চিন্তা করে, যদি রশিদগুলো ডলির হয়। অন্য কারুরটাও রাখতে পারে। দুই সহকারীর মুখের দিকে তাকাল, গোয়েন্দাপ্রধান। রশিদে হলিউডের ঠিকানা দেখা যাচ্ছে। একটু পরেই পিকআপ নিয়ে হলিউডে যাবে বোরিস। লিফট নিতে পারি আমরা।
একমত হয়ে ট্রেলার থেকে বেরিয়ে এল তিনজনে।
হাতের কাজ শেষ করে গাড়ি বের করল বোরিস। মেয়েটা যে বাড়ি থেকে পালিয়েছে, একথা শুনেছে। রাশেদ পাশার কিনে রেখে আসা পুরনো মাল আনতে হলিউডে যাচ্ছে সে। তিন গোয়েন্দাকে নিতে অসুবিধে নেই।
পেছনে উঠে বসল তিন কিশোর। রশিদের ঠিকানা মোতাবেক প্রথম দোকানটার সামনে নামল। ভেতরে আলো খুব সামান্য। কেমন ছাতলা পড়া গন্ধ। কিশোরের বাড়িয়ে দেয়া রশিদটার দিকে গম্ভীর মুখে তাকাল মালিক, তারপর নীরবে খুলল একটা আলমারির তালা। নীল ফিতে লাগানো রূপার একটা মেডেল বের করে আনল। ফেরত নেবে?
হাতে নিয়ে জিনিসটা দেখতে লাগল কিশোর। স্ট্যাচু অভ লিবার্টির মত দেখতে একটা মূর্তি আঁকা রয়েছে মেডেলের একপিঠে। আরেক পিঠে লেখা রয়েছেঃ ফ্রেনসো জেসিজ স্পেলিং বী প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। ডালিয়া ডিকসন।
মেয়েটা ঠিকানা রেখে গেছে? জিজ্ঞেস করল কিশোর। আমরা তার বন্ধু।
বাড়ি থেকে পালিয়েছে নিশ্চয়?
হ্যাঁ। মাস দুই আগে…
হাত তুলে থামিয়ে দিল কিশোরকে দোকানি। আর বোলো না। ওসব পুরানো কেচ্ছা। শুনতে ভাল লাগে না।
একটা রেজিস্টার বের করে কাউন্টারে বিছিয়ে পাতা ওল্টাতে শুরু করল সে। কি নাম বললে?
ডালিয়া ডিকসন।
মাথা নাড়ল লোকটা। না। জিনিসটা বন্ধক রেখে গেছে এলিজা পিলচার।
ঠিক বলছেন তো? রবিনের কণ্ঠে সন্দেহ।
চোখ ভালই আছে আমার।
ঠিকানা আছে? জানতে চাইল কিশোর।
আবার খাতার দিকে তাকাল লোকটা। পশ্চিম লস অ্যাঞ্জেলেস। তেরোশো বিরাশি রিভারসাইড ড্রাইভ।
কিন্তু পশ্চিম লস অ্যাঞ্জেলেসে তো কোন রিভারসাইড ড্রাইভ নেই? রবিনের প্রশ্ন।

মিথ্যে ঠিকানা অনেকেই দিয়ে থাকে, অবাক হওয়ার কিছু নেই। কিশোরের বাড়িয়ে ধরা ছবিটা হাতে নিয়ে দেখল দোকানি। কিছুটা নরম হয়ে বলল, দেখতে তো ভালই। ও মেডেল নিয়ে আসেনি। যে এসেছিল তার চুল সোনালি, গালে একটা তিল আছে। ট্রায়াফে অভিনয় করে যে মেয়েটা তার মত। প্রতি সোমবার টিভিতে দেখে আমার স্ত্রী।
ওই অভিনেত্রীর নাম এলিজা পিলচার, কিশোর বলল।
মাথা ঝাঁকাল দোকানি। কি জানি, অন্য কেউও এসে তার নামে মেডেলটা দিয়ে টাকা নিতে পারে। ছদ্মবেশ ধরাটা তো কঠিন কিছু না। শোনো, এটা কি নেবে তোমরা? আট ডলার পঁচাত্তর সেন্ট লাগবে।
টাকা দিয়ে মেডেলটা নিয়ে নিল কিশোর।
বাইরে বেরিয়ে পিকআপে এসে উঠল তিন গোয়েন্দা।
কেসটা বিশেষ সুবিধের মনে হচ্ছে না আমার, অভিযোগের সুরে বলল মুসা।
খুব তাড়াতাড়ি হতাশ হয়ে যাও তুমি, কিশোর বলল। তদন্ত চালিয়ে যেতে হবে। কোন দোকানে খোঁজ পেয়েও যেতে পারি।
দ্বিতীয় দোকানের মালিক ততটা নিরস নয়। তবে তেমন তথ্যও দিতে পারল। শুধু বলতে পারল, সোনার একটা আংটি নিয়ে এসেছিল একটা মেয়ে। পরনে টিউনিক, পায়ে হাঁটু সমান উঁচু বুট। মহাকাশের গল্প নিয়ে করা ছবি। সার্চ ফর এরিওয়ান-এর অভিনেত্রীর মত পোশাক।
কি নাম বলল? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
শেলি টেনার।
হু। ছবিটার নায়িকার নাম।
আংটিটা নেয়ার প্রয়োজন বোধ করল না কিশোর। নিল না। পিকআপে ফিরে এসে দেখল অস্থির হয়ে উঠেছে বোরিস। বার বার ঘড়ি দেখছে। দেরি হয়ে যাচ্ছে বোধহয়।
তোমাদের হলো? জিজ্ঞেস করল সে।
আর একটা দোকান, জবাব দিল কিশোর। হলিউড বুলভারে যেতে হবে।
দেরি করলে রেগে যাবেন মিসেস পাশা, বলল বটে, তবে গাড়ি নিয়ে চলল বুলভারে। এই রাস্তাটা আমার পছন্দ না।
কেন, সেটা জানা আছে গোয়েন্দাদের। গলিটা নোংরা। দুধারের বাড়িগুলো জীর্ণ, মলিন। মানুষগুলোও তেমনি। হলিউডের চাকচিক্যের ছিটেফোঁটাও নেই এখানে।
যে দোকানটা খুঁজছে কিশোররা, তার এক ব্লক দূরে মোড়ের কাছে গাড়ি রাখার জায়গা আছে। নেমে গেল ছেলেরা। স্যুভনির আর হলিউডের ম্যাপ বিক্রি করে

ওরকম একটা দোকান পার হয়ে আরও দুটো দরজার পর বন্ধকী দোকানটা। আগে আগে চলেছে মুসা।
অহেতুক সময় নষ্ট, বিড়বিড় করে বলল সে। দোকানের দরজায় পা দিল।
হঠাৎ চেঁচামেচি শোনা গেল দোকানের ভেতর। ছুটে বেরোল একটা লোক। মুসার গায়ে এসে পড়ল। কনুইয়ের গুঁতো মেরে তাকে ফেলে দিয়েছিল আরেকটু হলেই।
অ্যাই অ্যাই! করে চেঁচিয়ে উঠল মুসা।
ঘুরে দাঁড়াল লোকটা। তাকিয়ে রয়েছে মুসা। কালো মুখ ঠোঁটের দুই কোণ থেকে বেরিয়ে রয়েছে শ্বদন্ত। নাকের ফুটো বড় বড়। চোখ প্রায় দেখাই যায় না গভীর কোটরের অনেক ভেতরে যেন লুকিয়ে রয়েছে। শয়তানী ভরা চাহনি।
আবার চিৎকার করার জন্যে মুখ খুলল মুসা। শব্দ বেরোল না। লোকটার হাতের দিকে তাকাল। কালো, রোমশ থাবা। বড় বড় নখ বেরিয়ে আছে আঙুলের মাথা থেকে।
দোকানের ভেতরে চিৎকার শোনা গেল। ছুটতে শুরু করল অদ্ভুত লোকটা।
আবার চিৎকার করে উঠল দোকানের ভেতরের লোকটা, ধর! ধর!
গলির দিক থেকে চেঁচিয়ে উঠল এক মহিলা।
সুভনিরের দোকানের ভেতরে দুঃস্বপ্নের মত হারিয়ে গেল কিম্ভুত মানুষটা। আবার শোনা গেল চেঁচামেচি।
এতক্ষণে হুঁশ ফিরল যেন মুসার। দৌড়ে গেল স্যুভনিরের দোকানে। দেরি করে ফেলেছে। পেছন দিক দিয়ে বেরিয়ে চলে গেছে লোকটা।
বন্ধকীর দোকানে ফিরে এল তিন গোয়েন্দা। দোকানদার কাঁপছে এখনও। কিশোরের প্রশ্নের জবাবে সে বলল, ডাকাতি করতে এসেছিল! পালাল!
সাইরেন শোনা গেল গলির মাথায়। ভেতরে এসে ঢুকল একটা পুলিশের গাড়ি। ওটা দোকানের সামনে এসে থামতে না থামতেই পেছনে এসে দাঁড়াল, আরেকটা। ভিড় জমল। দোকানের মালিকের সঙ্গে বেরেলি তিন গোয়েন্দা। পাগলের মত হাত নাড়ছে লোকটা।
জনতাকে পিছে হটিয়ে দিল একজন পুলিশ অফিসার। আরেকজন জিজ্ঞাসাবাদ করতে গেল দোকানদারকে। হাত তুলে মুসাকে দেখিয়ে দিল লোকটা। তৃতীয় আরেকজন অফিসার এসে প্রশ্ন করল মুসাকে, তুমিই লোকটাকে থামানোর চেষ্টা করেছিলে?
মাথা ঝাঁকাল মুসা।
কি হয়েছিল?
দ্বিধা করল মুসা। বলল, বললে তো বিশ্বাস করতে চাইবেন না। পাগল ভাববেন আমাকে।

বলো।
লোকটা…লোকটাকে মানুষ মনে হল না। দানব!
ধৈর্য হারাল না অফিসার। গরিলা? না অন্য কোন ধরনের দানব?
গরিলা-টরিলা নয়। কি বলব?…মায়ানেকড়ের মত লাগল। সিনেমাতে যেগুলো দেখায়।
হুম! নোটবুক বের করল অফিসার। তা মায়ানেকড়েটা কতটা লম্বা হবে?
প্রায় আমার সমান।
কিশোরের দিকে ফিরল অফিসার। তুমি কি জিনিস দেখেছ?
কিশোর জানাল, সে-ও মায়ানেকড়েই দেখেছে। তারপর বলল, অবাক লাগছে না তো আপনার?
হাসল অফিসার। গত হপ্তায় একটা পেট্রল স্টেশনে এরকম ঘটনা ঘটেছে। গরিলা সেজে এসেছিল একজন।
হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে এতক্ষণে, বলে উঠল বন্ধকী দোকানের মালিক। কাগজে দেখেছি। সবুজ মুখওয়ালা মানুষের কথাও পড়েছি। ঘাড় থেকে নাকি কি একটী বেরিয়ে থাকে। সান্তা মনিকায় কি যেন করেছিল।
অফিসার হাসল। এ শহরে কোন কিছুই স্বাভাবিক নয়।
পুলিশ চলে গেলে তিন গোয়েন্দাকে বলল দোকানদার, আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলে?
ডলির কথা বলল তাকে কিশোর। দোকানে ঢুকে রেজিস্টার বের করল লোকটা। তারপর ড্রয়ার খুলে ধনুকের মত, দেখতে একটা সোনার পিন বের করল।
এ রকম একটা জিনিস বন্ধক রাখতে আসে কেউ, বল? লোকটা বলল। খারাপ লাগে না? ইস্কুল থেকে গ্র্যাজুয়েশন নেয়ার পর সাধারণত মানুষ এ ধরনের জিনিস উপহার পায়।
যে মেয়েটা বন্ধক রাখতে এসেছিল তার চেহারা মনে আছে? জিজ্ঞেস করল কিশোর। দেখুন তো ও নাকি?
কিশোরের বারিয়ে ধরা ডালিয়া ডিকসনের ছবিটা দেখল দোকানি। হতে পারে। কড়া মেকআপ করে এসেছিল। চুলের রঙও আরেকটু হালকা ছিল। তবে এ-ই হতে পারে।
আরেকবার রেজিস্টার দেখল লোকটা। জানাল পিনটা বন্ধক রাখতে এসেছিল এনভি নিউম্যান নামে একটা মেয়ে।
আরেকজন অভিনেত্রীর নাম, গুঙিয়ে উঠল কিশোর। নাহ, কোন পথ দেখতে পাচ্ছি না।
.

সেদিন বিকেলে হেডকোয়ার্টারে মিলিত হলো তিনজনে। হাত-পা ছড়িয়ে মেঝেতে বসে পড়েছে মুসা। প্রশ্ন তুলল, এ রকম বহুরূপী একটা মেয়েকে কি করে খুঁজে বের করব আমরা?

একটা মুহূর্ত কেউ কোন জবাব দিতে পারল না। তারপর কিশোর বলল, সিনেমায় ঢোকার চেষ্টা করছে ডলি। কাজেই দালালদের সঙ্গে যোগাযোগ থাকতে পারে। ওদের কাছে গিয়ে খোঁজ নিতে পারি আমরা।

হ্যাঁ, চেষ্টা করতে দোষ কি? খুব একটা আশাবাদী মনে হল না মুসাকে।

পরদিন সকালে বাসে করে হলিউডে চলে এল তিনজনে। একটা তালিকা তৈরি করে নিয়ে এসেছে কিশোর। এক নম্বর নামটা থেকে শুরু করল। প্রথমেই রিসিপশনিস্টের সঙ্গে দেখা। রোগাটে এক মহিলা। ওদের কথা শুনতেই চাইল না। অবশেষে জানিয়ে দিল, মক্কেলদের কথা বাইরের লোকের কাছে বলার নিয়ম নেই।

সে আপনাদের মক্কেল না-ও হতে পারে, মরিয়া হয়ে বলল মুসা।

তাহলে আমাদের কাছে এসেছ কেন? আবার টাইপিঙে মন দিল মহিলা।

দ্বিতীয় এজেন্সীটাতে গোমড়ামুখো মহিলা কড়া গলায় বলল, জানলেও বলতাম না। লজ্জা করে না? এই বয়সেই অভিনেত্রীদের পিছে লেগেছ?

লাল হয়ে গেল কিশোরের মুখ। পিছে লাগিনি। তার বাবা-মা আমাদেরকে পাঠিয়েছেন তাকে খুঁজে বের করতে…

ও, বাড়ি থেকে পালিয়েছে। তাহলে পুলিশের কাছে যায় না কেন? তিনটে ছেলেকে পাঠায়। যত্তসব! ওসব শয়তান ছেলেমেয়ের খোঁজ রাখার দায়িত্ব নিইনি আমরা। যেতে পার।

তৃতীয় এজেন্সীটাতে অতটা খারাপ ব্যবহার করল না রিসিপশনিস্ট। কিশোরকে চিনতে পেরে চিৎকার করে উঠল, আরে, মোটুরাম না! কি কাণ্ড দেখো

ছেলেবেলায় একটা কমেডি সিরিজে অভিনয় করেছিল কিশোর। সেটাতে তার। নাম ছিল বেবি ফ্যাট সো। নামটাকে ঘৃণা করে সে। এবং যে ওই নামে তাকে ভাকে, তাকেও।

ডলির ছবির দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল মহিলা। ও রকম চেহারার অনেকেই আছে। কে ও? বোন? বন্ধু?

তিন গোয়েন্দার একটা কার্ড মহিলাকে দিয়ে কিশোর জানাল, ওর নাম ডালিয়া ডিকসন। ওকে খুঁজে বের করে দেয়ার জন্যে আমাদেরকে অনুরোধ করেছে। ওর বাবা-মা। দুমাস আগে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে।

মনে হয় অহেতুক সময় নষ্ট করছ। ওর মত আরও হাজার হাজার ছেলেমেয়ে আছে। তবে সিনেমায় ঢোকার চেষ্টা করে থাকলে খোঁজ মিলতেও পারে।

টেলিভিশনের জন্যে একটা সিরিজ হচ্ছে, রিচ ফর আ স্টার। তার অডিশনে যোগ দিতে পারে। ওখানে অ্যামেচারদেরকে ডাকা হয়েছে।
যে স্টুডিওতে অডিশন হবে তার ঠিকানাটা দিল মহিলা। তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এল ছেলেরা। স্টুডিওতে পৌঁছে দেখল গেটের সামনে লাইন, লম্বা হয়ে চলে গেছে, সেই ব্লক পেরিয়ে তার পরের ব্লকের কাছে গিয়ে শেষ হয়েছে।
সোজা গেটের দিকে এগোল কিশোর। চিৎকার করে উঠল লাইনে দাঁড়ানো ছেলেমেয়েরা। প্রতিবাদের ঝড় উঠল।
কিশোরের হাত চেপে ধরল মুসা। এভাবে পারবে না। অন্য কোন উপায় বের করতে হবে। এ লাইনে দাঁড়ালে এ জনমে কোনদিন ঢুকতে পারব না।
বাস স্টপেজের একটা বেঞ্চে বসে পড়ল কিশোর। উপায় তো একটা বের করতেই হবে।
তিনজনেই ভাবছে। উজ্জ্বল হলো রবিনের মুখ। এখানে ঢোকা যাবে না। তার চেয়ে আরেক কাজ করতে পারি আমরা। ট্যালেন্ট এজেন্টদের সাহায্য নিতে পারি। ডলির ছবি দিয়ে হ্যান্ডবিল ছেপে ডাকে পাঠিয়ে দেব ওদের কাছে। এ শহরে যতগুলো স্টুডিও আর এজেন্ট আছে সবার কাছে পাঠাব। অনুরোধ থাকবে, এই মেয়েটিকে কেউ দেখে থাকলে দয়া করে তিন গোয়েন্দাকে একটা ফোন করবেন। ঠিকানা এবং ফোন নম্বর দিয়ে দেব আমাদের।
সাড়া দিল না কিশোর।
আমার কিন্তু বেশ ভাল মনে হচ্ছে, আবার বলল রবিন।
আমারও, তার সঙ্গে একমত হলো মুসা। সারা হলিউড চষে বেড়াতে হবে না। যে সব লোক আমাদের সঙ্গে কথাই বলতে চায় না তাদের কাছে গিয়ে ধরনা। দিতে হবে না।
এর চেয়ে ভাল আর কোন উপায় আপাতত কিশোরেরও মাথায় এল না। অগত্যা আবার কি বীচে ফিরে চলল বাসে করে। ইয়ার্ডে ফিরে দেখল, রোভার একা। ভেনচুরাতে মাল কিনতে গেছেন রাশেদ পাশা আর মেরিচাচী। বোরিসকেও নিয়ে গেছেন। কিশোরকে দেখেই রোভার বলল, বাজারে যেতে পারেননি আজ ম্যাম। ফ্রিজে কিছু নেই, বলে গেছেন, খিদে পেলে পয়সা বের করে নিয়ে গিয়ে পিজাটিজা কিছু কিনে খেতে।
খুব ভাল, খুব ভাল, খুশি হয়ে উঠল মুসা। তাই খাব। দেরি করছি কেন?
দাঁড়াও, টাকা নিয়ে আসি, কিশোর বলল। ভালই হল। খেতে খেতে হ্যাঁণ্ডবিলে কি লিখতে হবে সেটার একটা খসড়া করে ফেলতে পারব।
সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল তিনজনে। রকি বীচে কোস্ট, হাইওয়ের পাশের পিজা শ্যাকটা বেশ জনপ্রিয়। ওখানে গিয়ে ভিড় করে কিশোর আর তরুণেরা।

পিজা খায়, ভিডিও গেম খেলে, মিউজিক শোনে, আর বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ জমায়।
তিন গোয়েন্দা ঢুকে দেখল, ভিডিও গেম খেলছে কয়েকজন। কালো চুলওয়ালা হাসিখুশি একটা মেয়ে খেলছে আর মাথা ঝাঁকিয়ে খিলখিল করে হাসছে।
বড় সাইজের তিনটে পিজার অর্ডার দিয়ে কাউন্টারের সামনে বসে অপেক্ষা করতে লাগল ওরা। হুল্লোড় করে উঠল ভিডিও গেম প্লেয়াররা।
মেয়েটা মনে হয় ভাল খেলে, রবিন মন্তব্য করল।
খেলা শেষ। ফিরে তাকাল মেয়েটা। তারপর উঠে এল টুল থেকে। দরজার দিকে এগোল। তাকিয়ে রয়েছে তিন গোয়েন্দা। মেয়েটার স্কার্টের ঝুল এত বেশি। প্রায় মাটি ছুঁই ছুঁই করছে। পুরানো ছাটের একটা ব্রাউজ পরেছে, সামনের দিকটা দোমড়ানো। খুদে একটা ঘড়ি বসানো রয়েছে বুকের একপাশে। কানে দুল। সব কিছু মিলিয়ে তাকে এ যুগের মেয়ে লাগছে না, মনে হচ্ছে একশো বছর আগের। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ওদের দিকে তাকিয়ে হাসল সে। বেরিয়ে গেল।
এ রকম পোশাক পরেছে কেন? অবাক হয়ে বলল রবিন।
কুমড়োর মত মোটা এক মহিলা বেরিয়ে এল রান্নাঘর থেকে। হাতে ট্রে। খাবারে বোঝাই। তিনটে পিজা ছেলেদের সামনে নামিয়ে রেখে কোকা কোলা। আনতে গেল।
খাবারের দিকে হাত বাড়িয়েই থমকে গেল কিশোর। প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, পেয়েছি! তুড়ি বাজাল। ওই মেয়েটাই!
কোন মেয়েটা? বুঝতে পারল না মুসা।
ডলি। ডালিয়া ডিকসন! কোন সন্দেহ নেই।
লাফিয়ে উঠে দৌড় দিল কিশোর। হ্যাঁচকা টানে দরজা খুলে ছুটে বেরোল। পিজা শ্যাকের সামনের পার্কিং স্পেসে এসে দাঁড়িয়ে তাকাল ডানে বাঁয়ে। তারপর মেইন রোডের দিকে। দুদিক থেকেই চলাচল করছে গাড়ি। ওপাশে রাস্তার বাইরে। দাঁড়িয়ে-বসে রয়েছে কয়েকজন ভবঘুরে। কিন্তু পুরানো পোশাক পরা মেয়েটা নেই।

.

এই শুনছ! এই ভাই, খেলাটা একটু থামাবে তোমরা? জরুরী কথা বলতাম। খেলোয়াড়দের উদ্দেশ্যে বলল কিশোর। আবার এসে পিজা শপে ঢুকেছে। খেলা থামিয়ে ফিরে তাকাল সবাই। অবাক হয়েছে। রান্নাঘরে যাচ্ছিল মোটা মহিলা, থমকে দাঁড়াল।
যে মেয়েটা এইমাত্র বেরিয়ে গেল, বলল কিশোর। তাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি আমরা।

পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল খেলোয়াড়েরা। কারও কারও চোখে সন্দেহ ফুটেছে এখন। অস্বস্তি বোধ করছে। একজন জানতে চাইল, কেন?

ডলির ছবি বের করে দিল কিশোর। হাতে হাতে ঘুরতে লাগল ওটা। বলল, ওর বাবা দিয়েছেন ছবিটা। খুঁজে বের করতে অনুরোধ করেছেন। ফ্রেনসোতে বাড়ি। দুই মাস আগে বেরিয়েছে, আর ফিরে যায়নি।

কিন্তু ওর বাবার নাম তো ডিকসন নয়, বলল আরেকটা ছেলে। ওর নামও ডলি নয়।

হয়ত বানিয়ে অন্য নাম বলেছে, রবিন বলল।

অনেক বেশি ডিটেকটিভ ছবি দেখো তোমরা, বলল একটা মেয়ে।

গরম হয়ে বলল মুসা, ছবি দেখলেই ডিটেকটিভ হয়ে যায় নাকি! খালি : এককথা। বোঝে না শোঝে না, একটা বলে দিলেই হলো।

তার ধমকে কাজ হলো। অস্বস্তিতে পড়ে গেল ছেলেমেয়েরা। আরেকটা মেয়ে বলল, ওই মেয়েটা বাড়ি থেকে পালায়নি। এদিকেই থাকে।

চেনো?

চিনি।

দুই মাসের বেশি? কিশোর জানতে চাইল

জবাব দিতে পারল না মেয়েটা।

ঘন ঘন পোশাক পাল্টায়, তাই না? আবার বলল কিশোর। চুলের রঙও বদলায়।

চুপ হয়ে গেছে সবাই। একে অন্যের দিকে তাকাচ্ছে খেলোয়াড়েরা। জবাব দিতে চাইছে না। ভাবছে বোধহয়, এই তিনজন কারা?

তামাটে রঙের একটা গাড়ি এসে থামল বাইরে। ধূসর চুলওয়ালা একজন। লোক ঢুকলেন। কি ব্যাপার, সবাই এত চুপচাপ? কিছু হয়েছে নাকি?

না, মিস্টার জেনসেন, এগিয়ে এল ওয়েইট্রেস। এই ছেলেগুলো ওদের একজন বন্ধুকে খুঁজতে এসেছে।

ও, বলে কাউন্টারের ওপাশে চলে গেলেন মিস্টার জেনসেন। ক্যাশ রেজিস্টার খোলা এবং টাকা গোনা দেখেই বোঝা গেল তিনি ম্যানেজার।

অবশেষে কিশোরকে বলল একটা মেয়ে, ওই মেয়েটা কোথায় থাকে আমি জানি। মেইন রোড ধরে গেলে পুরানো একটা হাউজিং কমপ্লেক্স পাবে, চেশায়ার স্কোয়্যার, ওখানে। নাম বেটসি।

ভাল নাম? রবিন জানতে চাইল।

বেটসি অ্যারিয়াগো।

নাক টানল কিশোর। নামটা ঠিক তো?

না হওয়ার তো কোন কারণ দেখি না, জবাব দিল একটা ছেলে। আর বাড়ি থেকে পালালেই কেউ নাম বানিয়ে বলে না। কেন বলবে? বাড়ি থেকে বেরোনো অপরাধ না। বেরিয়েছে যে তারও নিশ্চয় কোন কারণ আছে। হয়ত ওর মা দুর্ব্যবহার করত…

ও অভিনেত্রী হতে চায়, বাধা দিয়ে বলল মুসা। পালিয়েছে সে জুন্যে। কেউ তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেনি। অন্তত আমাদের জানা নেই।

বেশ, ছেলেটা বলল। ওর সঙ্গে আবার দেখা হলে তোমাদের কথা বলব। ঠিক আছে?

দ্বিধা করল কিশোর। তিন গোয়েন্দার একটা কার্ড বের করে দিয়ে বলল, এই নাম্বারে ফোন করতে বোলো, প্লীজ।

কার্ডের দিকে তাকিয়ে হাসল ছেলেটা। বাহু, গোয়েন্দা। জিনসের প্যান্টের পকেটে রাখতে রাখতে বলল, বলব।

ওদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে দুই সহকারীকে নিয়ে আবার কাউন্টারে ফিরে এল কিশোর।

রান্নাঘরের দিকে রওনা হলো ওয়েইট্রেস মহিলা। পেছনে চললেন ম্যানেজার। ছেলেমেয়েরা ফিরে গেল তাদের খেলায়।

কিশোরের দিকে কাত হয়ে নিচু স্বরে বলল রবিন, মেয়েটা ফোন করবে বলে মনে হয় তোমার?

না, পিজা চিবাতে চিবাতে জবাব দিল কিশোর। তার ফোনের অপেক্ষায় বসেও থাকব না। চেশায়ার স্কোয়্যার আমরাও চিনি। জলদি খাও।

.

চেহারা পুরানো হলেও এখন আর পুরানো নেই কমপ্লেক্সটা। অনেক সংস্কার করা। হয়েছে। পাহাড়ের ঢালে দাঁড়িয়ে আছে, সাগরের দিকে মুখ। নতুন করে রঙ করা হয়েছে। চকচক করছে পেতলের জিনিসগুলো। নতুন লনে নতুন ফুলের বেড তৈরি হয়েছে।

যে লোক সংস্কার করেছেন, তিনি নিজেকে অতিপ্রাকৃত ক্ষমতার অধিকারী বলে দাবি করেন। রসিক লোক। সাংবাদিকদের কাছে সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ভবিষ্যতের প্রত্নতত্ত্ববিদদের ধাঁধায় ফেলার জন্যেই তিনি একাজ করেছেন। মাটি খুঁড়ে বের করবে ওরা আঠারোশো নব্বই সালের বাড়ি, তিনি বলেছেন। দেখবে ভেতরে বোঝাই হয়ে আছে উন্নত কারিগরির যন্ত্রপাতি, যেগুলো তৈরি হয়েছে। আরও একশো বছর পরে। দ্বিধায় পড়ে যাবে ওরা।

ডলি নামের কেউ থাকে না এখানে, পাহারাদার বলল।

তাহলে বেটসি অ্যারিয়াগো? কিশোর জিজ্ঞেস করল।

সতর্ক হলো লোকটা। তোমাকে চেনে?
নিশ্চয়ই।
তোমার নাম?
কিশোর পাশা। ও রবিন মিলফোর্ড, আর ও মুসা আমান। ফ্রেনসোর মিস্টার ডিকসন পাঠিয়েছেন, আমাদেরকে। বেটসির সঙ্গে জরুরী কথা আছে আমাদের।
দ্বিধা করল প্রহরী। টেলিফোনে হাত।
বলেই দেখুন না, খুব খুশি হবে। মিস্টার ডিকসন, মনে রাখবেন। কিন্তু কিশোরের কথা শুনছে না লোকটা। নিচের মেন রোডে পুলিশের সাইরেন বাজছে। দ্রুত ছুটে আসছে।
রাস্তার দিকে তাকাল তিন গোয়েন্দা। রকি বীচ পুলিশের গাড়িটা চিনতে অসুবিধে হলো না। মোড় নিয়ে চেশায়ার স্কোয়্যারে ওঠার গলিতে পড়ল। উঠে আসতে লাগল ওপরে।
বাড়ির ভেতরে তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠল কেউ। রাগ আর ভয় মেশানো চিৎকার।
অ্যাই! অ্যাই! বলে চেঁচিয়ে উঠল রবিন।
দারোয়ানের ছোট ঘর থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল প্রহরী। বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে দৌড়ে আসা লোকটার পথরোধ করে দাঁড়াল। গাঢ় রঙের শার্ট পরনে। একটা মোজা টেনে দিয়েছে মাথার ওপর, যাতে চেহারাটা চেনা না যায়। তবে মাথায় কালো চুল, এটা গোপন করতে পারল না।
ছুটে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল লোকটা। ঝট করে পা বাড়িয়ে দিল প্রহরী। তৈরিই ছিল লোকটা। পা-টা এড়িয়ে গিয়ে এক ঘুসিতে চিৎ করে ফেলল। প্রহরীকে।
মুসাও আটকাতে গেল ওকে। প্রচণ্ড ঘুসি এসে লাগল মুখে। তার মনে হলো হাতুড়ি দিয়ে বাড়ি মারা হয়েছে। বোঁ করে উঠল মাথা। রাস্তার ওপরই বসে পড়ল।
রবিন আর কিশোর কিছু করার আগেই ছুটে চলে গেল লোকটা। লাফাতে লাফাতে গিয়ে ঢুকল পাহাড়ের ঢালের ঝোপঝাড়ের ভেতর।
ঘ্যাঁচ করে এসে গেটের কাছে ব্রেক কষল পুলিশের গাড়ি। লাফিয়ে গাড়ি থেকে নামল দুজন অফিসার, ছুটল লোকটাকে ধরার জন্যে। আরেকটা গাড়ি উঠে এল। ওপরে। আরও দুজন অফিসার নামল। দারোয়ানকে উঠতে সাহায্য করল একজন। আরেকজন ঝুঁকল মুসার ওপর। বেশি লেগেছে?
দাঁত বোধহয় বারো-চোদ্দটা খসে গেছে।
টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল মুসা। দারোয়ানের ঘরের দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। এই সময়ে চোখে পড়ল মেয়েটাকে। সেই লম্বা ঝুলওয়ালা স্কার্ট আর দোমড়ানো ব্লাউজ পরা। হাঁপাতে হাঁপাতে এসে পুলিশকে বলতে লাগল, জোর করে ঢুকল!...

আমি সবে বাড়িতে এসেছি।... দোতলায় উঠে হলের দিকে যাচ্ছি, এই। সময় টের পেলাম কেউ আছে!
সাদা হয়ে গেছে মেয়েটার মুখ। গলা কাঁপছে। পায়ে ব্যথা পেয়েছে দারোয়ান। খোঁড়াতে খোঁড়াতে গিয়ে বসল তার ঘরের সামনে রাখা চেয়ারে।
কোন বাড়িটায়? জিজ্ঞেস করল অফিসার। কোথায় থাকো তুমি?
ছোট পার্কটার দিকে দেখাল মেয়েটা। তারপর হঠাৎ করেই কাঁদতে শুরু করল।
লেসিঙের বাড়ি, হাত তুলে দেখিয়ে বলল দারোয়ান। ওইটা। এগারো নম্বর। পার্কের ওধারের ওই যে বাড়িটা।
মাথা ঝাঁকাল অফিসার। সঙ্গীকে নিয়ে গিয়ে উঠল আবার গাড়িতে। মেয়েটা দাঁড়িয়েই আছে। ডিকসনদের দেয়া ছবির মেয়েটার চেয়ে এই মেয়েটা রোগী, তবে চোখের রঙ মিলে যাচ্ছে। ডালিয়া ডিকসনই? নাকি প্রায় একই রকম দেখতে অন্য কোন মেয়ে?
খানিক বাদেই ফিরে এল পুলিশের গাড়িটা। লোকটার পিছু নিয়েছিল যে, দুজন অফিসার, তারাও ফিরে এল। হাঁপাচ্ছে। কপালে ঘাম। যে অফিসার মেয়েটার সঙ্গে কথা বলেছিল, সে নেমে আবার বলল, এখন একটু ভাল লাগছে, না? আমাদের সাহায্য করতে পারবে? কিছু চুরিটুরি গেল কিনা দেখা দরকার।
ক্লান্ত ভঙ্গিতে ধপ করে বসে পড়ল মেয়েটা।
ঠিক আছে, ঠিক আছে, হাত নেড়ে বলল অফিসার। অত তাড়াহুড়া নেই। জিরিয়ে নাও। পুরো ঘটনাটা খুলে বলতে পারবে?
হলের দিকে যাচ্ছিলাম, মেয়েটা বলল। এই সময় মনে হলো পেছনে কেউ আছে। ফিরে তাকিয়ে দেখি কেউ নেই। তখন মনে হলো, শোবার ঘরে শব্দ হয়েছে। তারপর...
হ্যাঁ হ্যাঁ, বলো।
কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করল মেয়েটা। ভয় পেয়ে গেলাম। যদি চোরটোর হয়? মিসেস লেসিঙের ঘরে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিলাম। আমার গলা ও শুনে ফেলতে পারে, এ জন্যে রেডিওটা জোরে চালিয়ে দিয়ে পুলিশকে ফোন করলাম।
বুদ্ধিমানের কাজ করেছ। ওসব সময়ে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হয়। তারপর?
তারপর আর কিছু না। পুলিশের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। সাইরেনের শব্দ শুনে পালানোর চেষ্টা করল লোকটা। ওর পায়ের আওয়াজ শুনে মাথা খারাপ হয়ে গেল আমার, পালাতে দিতে চাইলাম না। সিঁড়িতে গিয়ে জাপটে ধরলাম। ওকে।
এটা বোকামি হয়ে গেছে। লোকটা কি করল?
ঝাড়া দিয়ে আমাকে ফেলে দিয়ে দৌড় দিল।

ভাগ্যিস ছুরিটুরি মারেনি। ওরকম বোকামি আর করবে না।
উঠে দাঁড়াল মেয়েটা। চলুন। এখন যেতে পারব।
দারোয়ান বলল, তোমার সঙ্গে কারও থাকা উচিত। বন্ধু-বান্ধব কেউ নেই? খবর দাও না।
মাথা নাড়ল মেয়েটা। আমার বন্ধুরা সব শহরের বাইরে।
এগিয়ে গেল কিশোর। ডলি, আপনার মাকে খবর দিতে পারি আমরা।
থমকে গেল মেয়েটা। তারপর আস্তে করে ঘুরে তাকাল কিশোরের দিকে। ডলি? আমার নাম ডলি নয়। বেটসি। বড় জোর বেটি বলতে পারো।
ওকে বিরক্ত কোরো না! কড়া গলায় বলল দারোয়ান। এমনিতেই অসুস্থ হয়ে পড়েছে মেয়েটা। ভয়ে কাবু।
পুলিশের গাড়িতে করে চলে গেল বেটি। একজন অফিসার তিন গোয়েন্দার কাছ থেকে ঘটনাটার বিবরণ লিখে নিতে লাগল।
মুসার চোয়ালের বেগুনী হয়ে যাওয়া জায়গাটার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়তে লাগল দারোয়ান। ব্যাটার গায়ে জোর আছে। তোমারই যখন এ অবস্থা করে দিয়েছে...নাহ, আজকাল আর শান্তি নেই। এত বড় বাড়িতে মেয়েটার একা থাকা একেবারেই উচিত না।
বাড়িটার মালিক কে? জিজ্ঞেস করল রবিন। কোথায় থাকে?
মিসেস আরনি লেসিং। কয়েকদিন আগে ইউরোপ গেছে। কয়েক হপ্তা হল এসেছে বেটি, মিসেস লেসিঙের সঙ্গে আছে। তিনি খুব ভাল। ছেলেমেয়েদের কষ্ট সইতে পারেন না। কেউ অসুবিধেয় আছে দেখলেই তাকে সাহায্য করার চেষ্টা করেন। বেটি বোধহয় কোথাও একটা পার্টটাইম কাজটাজ করে। এখানে মিসেস লেসিঙের বাড়িঘর দেখাশোনা করে যে মহিলা, তাকে সাহায্য করে। বাড়িতে কি একটা জরুরী কাজ পড়ে যাওয়ায় কাল থেকে আসছে না মহিলা। ফলে বেটি একা হয়ে গেছে।
তিন গোয়েন্দার মুখের দিকে তাকাল দারোয়ান। সত্যিই তাকে তোমরা চেন?
ডালিয়া ডিকসনের ছবিটা বের করে দেখাল কিশোর। ডলির বাবা-মা এটা দিয়েছে আমাদেরকে। কি মনে হয়?
সময় নিয়ে ছবিটা দেখল দারোয়ান। ভাবের পরিবর্তন হল না। এই বয়েসের একটা মেয়ে আমারও আছে।
আপনি নিশ্চয় চান, আপনার মেয়ে ভাল থাকুক?
মাথা ঝাঁকাল লোকটা। বেটির সঙ্গে আমি কথা বলব। ও-ই ডলি কিনা জানার চেষ্টা করব। এখন হবে না। মুখ খুলবে না ও। একে তো চোরের ভয়; তার ওপর পুলিশের ঝামেলা। টেনশনে আছে।

কাল সকালে আসি একবার, কি বলেন?
এসো। আমি বেটির সঙ্গে কথা বলে রাখব। কাল সকালে বাড়িতে যাতে থাকে, তারও চেষ্টা করব। অন্তত তোমরা যতক্ষণ না আসো, কাজে বেরোতে দেব না। আশা করি, আমার কথা রাখবে ও।

.

পরদিন সকালে চেশায়ার স্কোয়্যারে একা এল কিশোর। মুসা আর রবিনের সঙ্গে স্ত্র আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, একা আসাই ভাল। বেশি মানুষ দেখলে হয়ত অস্বস্তিতে পড়ে যাবে মেয়েটা, তখন আর মুখ খুলতে চাইবে না।
কিশোরকে দেখেই বলতে শুরু করল দারোয়ান, ওর বাবা-মা যে তোমাদেরকে পাঠিয়েছে একথা বলিনি ওকে। নিজে নিজেই হয়ত আন্দাজ কবে নিয়েছে। আমি শুধু বলেছি, তোমরা তার ভাল চাও। দেখা করতে রাজি হয়েছে।
মিসেস লেসিঙের বাড়িটা দেখিয়ে বলল সে, ওই যে, পার্কের ওপাশের বড় বাড়িটা।
দারোয়ানকে ধন্যবাদ দিয়ে চত্বরে ঢুকল কিশোর। এসে দাঁড়াল ১১ নম্বর বাড়ির সামনে। দোতলা বাড়ি। ভিক্টোরিয়ান আমলের চেহারা। সে আবার পা বাড়াতেই একটা দরজা খুলে বারান্দায় বেরিয়ে এল বেটি। এসেছ। আমি তোমার জন্যেই বসে আছি।
কিশোর পাশা, হাত বাড়িয়ে দিল গোয়েন্দাপ্রধান।
হেসে হাতটা ধরে ঝাঁকিয়ে দিল বেটি। তারপর ঘরে ঢুকে গেল ভেতরে। তাকে অনুসরণ করল কিশোর। ঢুকেই একটা ধাক্কা খেল। একলাফে যেন চলে। এসেছে অন্য এক যুগে। ঘরের চেহারাটা বানিয়ে রাখা হয়েছে একশো বছর আগের। চওড়া সিঁড়ি, দোতলার কাঠের গ্যালারি, দেয়ালের প্যানেলিং, আসবাবপত্র সব পুরানো আমলের। পুরু লাল কার্পেটে গোড়ালি দেবে যায়। দেয়ালে ঝুলছে ভারি ফ্রেমে বাঁধানো পেইনটিং।
কেমন জানি লাগে, তাই না? কিশোরকে বলল বেটি। এসো, রান্নাঘরে। এখানকার চেয়ে ভাল।
মেয়েটার পিছু পিছু সিঁড়ির পাশ কাটিয়ে এল কিশোর। রান্নাঘরটা ভালই। বোদ আসছে। পুরানো আমলের একটা স্টোভে পানি ফুটছে। চেহারাটাই প্রাচীন, জিনিসটা আধুনিক, ইলেকট্রিক হীটার।
দুটো জানালার মাঝের দেয়াল ঘেঁষে রাখা হয়েছে টেবিল। ওখানে চেয়ারে বসতে বলল কিশোরকে বেটি। কিশোরকে কোক বের করে দিল সে। নিজের জন্যে চা ঢেলে নিল।

বেটি কাজ করছে, আর চুপ করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে কিশোর। মেঝে ছুঁয়ে যাওয়া গাউনই পরেছে। কালে ফিতে দিয়ে চুল বাঁধা। তার মনে হলো, বাড়িটার সঙ্গে মানানোর জন্যেই বুঝি এ রকম করে কাপড় পরেছে মেয়েটা।
সত্যি, শুরু করল কিশোর। মিসেস লেসিং খুব ভাল। আপনাকে থাকতে দিয়েছেন।
হ্যাঁ। আসলেই ভাল।
তার সঙ্গে পরিচয় হল কি করে?
একটা বিউটি পারলারে।
পারলারটার নাম?
গোল্ডেন ড্রীম।
মাথা ঝাঁকাল কিশোর। চেনে। রকি বীচেই ওটা।
কাজকর্ম এখনও তেমন শিখতে পারিনি, মেয়েটা বলতে থাকল। কাটতে গিয়ে মিসেস লেসিঙের চুল নষ্ট করে ফেলেছিলাম। অনেকেই এ রকম করে অবশ্য। শিক্ষানবিস অনেক আছে ওখানে। অভিনেত্রী হতে চায় ওরা। যাই হোক, মিসেস লেসিং কিছু বলেননি আমাকে। অভিজ্ঞ একজন বিউটিশিয়ান এসে তখন তার চুল ঠিক করে দিয়েছিল। নিয়মিতই তিনি ওখানে যেতেন। কথা হত আমার। সঙ্গে। হপ্তা দুই আগে আমাকে বললেন, তিনি কিছুদিনের জন্যে ইউরোপে। যাচ্ছেন। হাউসকীপার একা থাকতে ভয় পায়। আমি চাইলে তার বাড়িতে থাকতে পারি। রাজি হয়ে গেলাম।
ভাল করেছেন। থাকাখাওয়ার জায়গা হয়ে গেলে সুবিধে। আপনি নিশ্চয় অভিনয় প্র্যাকটিস করার অনেক সুযোগ পাচ্ছেন।
দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইল মেয়েটা। তার মনের কথাটা কি করে বুঝে ফেলল ভেবে অবাক হয়েছে। লুই গনজাগা বলল তোমরা নাকি বেশ চিন্তায় আছ।
দারোয়ান?
হ্যাঁ। সতর্ক হয়ে কথা বলছে বেটি। কিশোর কে, কতটা জানে তার সম্পর্কে, না জেনে সব কথা ফাঁস করতে চায় না।
ডলির ছবিটা বের করল কিশোর। টেবিলে রেখে ঠেলে দিল বেটির দিকে।
একবার ছবিটা দেখল মেয়েটা। কিছু বলল না। ঘুরে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল।
ডলি, কিশোর বলল। তাহলে ধরে নিতে পারি…
বার বার আমাকে ওই নামে ডাকছ কেন? রাগ করে বলল মেয়েটা। আমি বেটি। বেটসি অ্যারিয়াগো।

অভিনেত্রীরা ওরকম গালভরা নামই বেছে নেয়।
তাতে তোমার কি? কে তুমি?
আমাকে আর আমার দুই বন্ধুকে অনুরোধ করেছেন আপনার বাবা-মা, আপনাকে খুঁজে বের করে দিতে। সাগর সৈকতে পাওয়া ব্যাগটার কথা জানাল। কিশোর। সারা রাত গাড়ি চালিয়ে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন তাঁরা। আপনার মা খুব কাঁদছিলেন।
ওদেরকে তো আমি বলেছি আমি ভাল আছি। চিৎকার করে উঠল ডলি।
স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। যাক, স্বীকার করল এতক্ষণে! আসলে। তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা দরকার ছিল আপনার। তাহলেই আর দুশ্চিন্তা করতেন না।
যোগাযোগ! জোর করে ধরে নিয়ে যাবে তাহলে!
কিন্তু কি যে কষ্ট পাচ্ছেন। তারা কল্পনা করতে পারবেন না। একবার ফোন করেও তো বলে দিতে পারেন…
ঠিক আছে, বাবা, দেব!
ঝটকা দিয়ে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে খানিকটা চা কাপড়ে ফেলে দিল ডলি। সিঙ্কের কাছে একটা দেয়াল টেলিফোন রয়েছে। সেটার বোতাম টিপতে লাগল দ্রুত।
চেয়ে রয়েছে কিশোর। তার কাজ শেষ।
হাল্লো!..হাল্লো! আম্মা?…আরে, হা হা, আমি! ডলি! যে ছেলেটাকে আমাকে খুঁজতে পাঠিয়েছ, এখানেই বসে আছে। …হ্যা…
থেমে ওপাশের কথা শুনতে লাগল ডলি। আবার বলল, না, আমি আসতে পারব না। খুব ভাল আছি। ছেলেটা বলল, তাই…
আবার কথা শুনতে লাগল ডলি। রেগে গেল হঠাৎ। যা বলার বলেছি! আমি আসব না! এখানে একটা চাকরি করছি আমি। থাকার চমৎকার জায়গা পেয়েছি। কিছুদিন ক্লাস করতে হবে আমাকে…
কিছুক্ষণ চুপ করে শুনুল আবার। কিসের ক্লাস জানো না? কতবার বলব! অ্যাকটিং ক্লাস, অভিনয় শেখায় যেখানে। ওসব অ্যালজেব্রা-ফ্যালজেব্রার মধ্যে কোনদিনই যাব না আমি আর।
ওপাশের কথা শুনে খেঁকিয়ে উঠল, আব্বার শরীর খারাপটা কি আমি করেছি। নাকি? তোমাকে ফোন করাটাই একটা গাধামি হয়ে গেছে। খটাস করে ক্রেডলে রিসিভার রেখে দিল ডলি। গজগজ করতে লাগল, যত্তসব! কারও কথা শোনাই উচিত না! কিশোরের দিকে চোখ পড়তে বলল, বাড়ি ফিরে যেতে বলে! গেলে কি হবে জান? আবার ধরে ইস্কুলে পাঠাবে। গলা টিপে মেরে ফেলার অবস্থা করবে। তারপর যখন কতগুলো ছাইপাশ হজম করে ইস্কুল থেকে বেরোব, ওদের পছন্দ করা কোন হাঁদার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেবে! ব্যস, গেল আমার লাইফ!

কি বলবে? জবাব খুঁজে পেল না কিশোর।

.

সেদিন সন্ধেবেলা রকি বীচে পৌঁছলেন ডিকসনরা। মেরিচাচীর সঙ্গে ইয়ার্ডে কাজ করছিল তিন গোয়েন্দা, গাড়ির শব্দে ফিরে তাকাল। বাড়ি ফিরেই আগে *নে*সোতে ফোন করেছিল কিশোর। ডলির ঠিকানা দিয়েছিল, কি কি কথা হয়েছে বলেছিনা। তাহলে এখানে কেন ওরা?

খাইসে! মুসা বলল। কিছু একটা নিশ্চয় হয়েছে!

বেরিয়ে এলেন মিসেস ডিকসন। ডলিকে পেয়েছ! হাসছেন, কিন্তু চোখ লাল। অনেক কেঁদেছেন বোঝা যায়।

হ্যাঁ, জবাব দিল কিশোর। ফোনেই তো সব বললাম।

মুসার দিকে তাকালেন মিসেস ডিকান। চোয়াল এখনও নীল হয়ে আছে, যেখানে ঘুসি খেয়েছিল? আজেবাজে লোকের সঙ্গে মিশছে না তো ডলি?

না, মাথা নেড়ে বলল মুসা।

মিস্টার ডিকসনও বেরিয়ে এলেন। মেয়েটা এখন বাড়ি গেলেই হয়।

আপনাদের তো চেশায়ার স্কোয়্যারে যাওয়ার কথা, কিশোর বলল। কোন গোলমাল?

আসলে, হাসলেন মিসেস ডিকসন। তোমাদেরকে সঙ্গে নিয়েই যাব ভাবলাম। আমরা গেলে হয়ত ভাগিয়ে দেবে। তোমরা যদি একটু বলেকয়ে…

মেয়েকে ভয় পায় ডিকসনরা, বুঝে ফেলল কিশোর। তেতো হয়ে গেল মন। এদের সঙ্গে দেখা না হলেই ভাল হত, ভাবতে লাগল সে।

সরে গেল মুসা। জঞ্জালের কাছে গিয়ে অযথাই কি যেন খুঁজতে লাগল। রবিন একটা চেয়ার পরিষ্কারে মন দিল।

কিন্তু এমন অনুরোধ শুরু করল ডিকসনরা, গাড়িতে উঠতে বাধ্য হল তিন গোয়েন্দা। আবার চেশায়ার স্কোয়্যারে চলল।

লুই গনজাগা নেই গেটে। আরেকজন দারোয়ানের ডিউটি তখন। লেসিং হাউসের মেয়েটার মা-বাবা তাকে দেখতে এসেছেন শুনে খুশি হল সে।

দেখুন, বুঝিয়ে-শুনিয়ে নিয়ে যেতে পারেন কিনা। গেট খুলে দিল দারোয়ান।

ওরকম করে কথা বলল কেন লোকটা! ফিরে দারোয়ানের দিকে তাকিয়ে আছেন মিসেস।

কি বলার জন্যে মুখ খুলেও থেমে গেলেন, ডিকসন। সামনের ছোট পার্কটার দিকে নজর। আরও ডজনখানেক গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে ওখানে। ভিক্টোরিয়ান চেহারার বাড়িটার পাশে ছেলেমেয়েরা ভিড় করছে ওখানে। ষোলো থেকে উনিশের মধ্যে বয়েস।

সবখানেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ছেলেমেয়েরা। একটা ছেলে গিয়ে উঠেছে লেসিং হাউসের ছাতে। চিমনিতে পিঠ দিয়ে বসে পায়রাকে দানা খাওয়াচ্ছে। সামার হাউসের ওপরেও উঠেছে কয়েকটা ছেলে। ড্রাইভওয়েতে ব্রেকড্যান্স করছে একটা ছেলে, ওর দিকে তাকিয়ে চেঁচাচ্ছে ওরা। উৎসাহ দিচ্ছে।
সমস্ত কোলাহলকে ছাড়িয়ে গেছে মিউজিকের আওয়াজ। ড্রাম, বাঁশি, আর আরও নানারকম বাদ্যযন্ত্রের মিশ্র শব্দে কান ঝালাপালা।
পার্টি দিচ্ছে মেয়েটা, মিসেস ডিকসন অনুমান করলেন।
একে পার্টি বলো? মুখ বাঁকালেন ডিকসন। এ তো রায়ট লেগেছে!
লেসিং হাউসের কাছ থেকে চারটে বাড়ি দূরে গাড়ি রাখলেন তিনি। হেঁটে এগোলেন। বাগানে গিজগিজ করছে ছেলেমেয়ের দল। চত্বরে আর বাড়ির পাশেও একই অবস্থা। কয়েকজনকে চিনতে পারল তিন গোয়েন্দা, পিজা শ্যাকে দেখেছিল।
বিকট বাজনার তালে তালে নাচছে কয়েকজন। চিৎকার করছে। কাগজের মোড়ক খুলে পিজা খাচ্ছে। পোশাক-আশাকও উদ্ভট। কেউ কেউ গহনা পরেছে। পরেছে বলেই গহনা বলে মনে হচ্ছে ওগুলোকে, নইলে কি জিনিস চেনাই যেত না। একটা ছেলে শার্ট-প্যান্ট কিছু পরেনি। কতগুলো কাপড়ের টুকরো শরীরে জড়িয়ে নিয়ে একগাদা সেফটিপিন দিয়ে আটকে রেখেছে। গলায় পেঁচিয়ে রেখেছে একটা জীবন্ত সাপ। আরেকটা ছেলে এসব নাচানাচিতে নেই। সে গিয়ে চত্বরের পাশের সুইমিং পুলে ঢেলে, একটা মাছের অ্যাকোয়ারিয়াম খালি করছে।
সামনের সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠে বেলের বোতাম টিপলেন মিসেস ডিকসন। এই সময় আরও জোরালো হয়ে গেল মিউজিক। ছাগলের ডাকের মত মাআঁ মাআঁ করে উঠল কি একটা যন্ত্র।
বাড়ির পাশ ঘুরে বেরিয়ে এল একটা ছেলে। হাতে ডিটারজেন্ট-পাউডারের বাক্স। ডিকসনদের ওপর চোখ পড়তেই চেঁচিয়ে উঠল, অ্যাই, বেবি, লোক এসেছে।
সামনের চত্বরে ছোট ফোয়ারাটায় গিয়ে পুরো বাক্স ঢেলে দিল সে।
বেজে চলেছে বাজনা।
ফোয়ারায় সাবানের ফেনা তৈরি হচ্ছে। ফুলে উঠল। বাইরে উপচে পড়তে লাগল ফেনা, ঘাসের ওপর দিয়ে পানির সঙ্গে বইতে শুরু করল। বাতাস এসে ঝাপটা দিয়ে কিছু ফেনা উড়িয়ে নিল। দেখতে দেখতে সাদা ফেনায় ভরে গেল। কাছের পাতাবাহারের পাতা আর গাছের ডাল।
দারুণ! চিৎকার করে নিজের শিল্পকর্মের প্রশংসা করল ছেলেটা।
তিন গোয়েন্দার মনে হল, সব কটা বদ্ধ উন্মাদ।

দরজায় কিল মারতে শুরু করলেন ডিকসন। মারতেই থাকলেন, মারতেই থাকলেন।
অবশেষে খুলে গেল দরজা। মানুষের আকৃতির আজব একটা প্রাণী যেন বেরিয়ে এল। মেকাপ করে করে ফ্যাকাসে সাদা করে ফেলা হয়েছে চামড়া। কালো লিপস্টিক।
ডলি! চিৎকার করে বললেন মিসেস ডিকসন।
এটা কিসের সাজ? তিক্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন ডিকসন। পেত্নীর?
দরজা বন্ধ করে দিতে গেল ডলি। ঝট করে একটা পা ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে আটকালেন তার বাবা।
ডলি! মা আমার! ককিয়ে উঠলেন মিসেস ডিকসন। মেয়েকে ধরার জন্যে হাত বাড়ালেন তিনি।
থমকে গেছে ডলি। কেঁপে উঠল ঠোঁট। চোখের কোণে পানি টলমল করল। ঝাঁপ দিয়ে এসে পড়ল মায়ের বুকে। জাপটে ধরল। মেয়ের ভুরুতে লাগানো কালো মাসকারা দাগ করে দিল মায়ের সাদা ব্লাউজ, কিন্তু পাত্তাই দিলেন না তিনি।
দরজায় হেলান দিলেন ডিকসন। চুপ করে আছেন। মা মেয়ের মিলন নাটক চলছে, তা-ই দেখছেন নীরবে। মা কাঁদছে, মেয়েও কাঁদছে। মিনিটখানেক পরে ওদের পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকলেন।.স্টেরিও সেটটা দেখতে পেলেন, যেটা থেকে বেরোচ্ছে বিকট শব্দ। বন্ধ করে দিলেন।
আচমকা এই নীরবতা যেন বড় বেশি কানে বাজল।
হৈ চৈ কমে গেল অতিথিদের। ওরা বুঝতে পেরেছে, বয়স্ক মানুষ ঢুকেছে। পিছলে সরে যেতে শুরু করল যেন সকলে।
কয়েক মিনিটের মধ্যেই মা-বাবার সঙ্গে একা হয়ে গেল ডলি। মেঝেতে ছড়িয়ে রয়েছে পিজার মোড়ক, আর খাবারের ভুক্তাবশেষ। নোংরা করে রেখেছে। তিন গোয়েন্দার মনে হল, এই নরকে ঢোকার চেয়ে অন্য কোথাও গিয়ে বসে থাকা অনেক ভাল।
পার্টির লোকজনকে ভোজবাজির মত মিলিয়ে যেতে দেখে কান্না থামাল ডলি। ক্ষোভ জমতে লাগল মনে। শেষে সেটা প্রকাশই করে ফেলল, দিলে তো সব নষ্ট করে। আমার সব কিছুই এরকম করে নষ্ট কর তোমরা! চিৎকার করে উঠল, আমার পার্টি নষ্ট করেছ! তা-ও যদি আমার টাকায় হত, এক কথা ছিল। সব করছে রোজার, আমার সম্মানে। কত কষ্ট করে কন্ট্রাক্টটা...
কন্ট্রাক্ট? মা-ও চেঁচিয়ে উঠলেন। কিসের কন্ট্রাক্ট?
কিসের আর! ড্রাকুলার! কি যে একখান ছবি হবে!..আম্মা, দেখলে তো আমি ভাল আছি। খামোকাই আমার জন্যে চিন্তা কর। অনেক শিখছি আমি। কিছু

পয়সাও জমিয়েছি। ছবিতেও কাজ পেয়েছি। সব চেয়ে ভাল চরিত্রটা। ভ্যাম্পায়ার প্রিন্সেস সাজতে হবে আমাকে।

চোখের পানি মুছে গেছে। ঝকঝক করে জ্বলছে এখন। তাহলে বুঝতেই পারছ, অবশেষে কাজ একটা জোগাড় করেছি আমি।...ওই তো, রোজার। ইয়ান। রোজার। হাত নেড়ে ডেকে বলল, মিস্টার রোজার আসুন, এই যে আমার আব্বা আর আম্মা।...আম্মা, তুমি ভাবতেও পারবে না আমাকে কিভাবে নিয়েছেন মিস্টার রোজার। দেখেই বুঝে গেলেন, ভ্যাম্পায়ার প্রিন্সেসের চরিত্রটা আমাকেই দেয়া উচিত। আমিই পারব।

সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল লোকটা। এক চিলতে হাসি ফুটেই মিলিয়ে গেল ঠোঁটে। তাড়াতাড়ি বলল, গুড ইভনিং।

তাকিয়ে রয়েছেন মিসেস ডিকসন। গোঁ জাতীয় বিচিত্র একটা শব্দ বেরোল ডিকসনের কণ্ঠ থেকে।

রোজারের বয়েস তিরিশ হবে। মসৃণ চেহারা। তেমনি মসৃণ বালিরঙা চুল। কান ঢেকে আছে। পোশাক-আশাকও মসৃণ, একটা ভঁজ নেই কোথাও।

ডলির আম্মা! মিসেস ডিকসনের দিকে তাকিয়ে বলল রোজার। কণ্ঠস্বরও মসৃণ, পোশাক আর চেহারার সঙ্গে মানিয়ে গেছে। মা-মেয়ের চেহারা একেবারে এক। না বললেও চিনতাম।

কতোটা সত্যি বলেছে লোকটা, তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে, তবু খুশি হলেন। মিসেস ডিকসন। আরও খুশি হলেন যখন তার একটা হাত হাতে তুলে নিল রোজার, যেন সাত রাজার ধন পেয়ে গেছে, এমনি ভঙ্গিতে। আপনারা এসেছেন, কি যে খুশি হয়েছি আমি। মনে হচ্ছে, এতদিন কেন দেখা হয়নি। আমিও ভুল করেছি। বেটসির সঙ্গে কন্ট্রাক্ট সই করার আগে আপনাদের অনুমতি নেয়া উচিত ছিল। তাতে দেরি হত অবশ্য। হলে হত।

বিড়বিড় করে কি যেন বললেন মিসেস।

এমন মুখভঙ্গি করলেন ডিকসন, যেন পচা ইঁদুরের গন্ধ পেয়েছেন। ড্রাকুলা, না? ব্রাম স্টোকারের ড্রাকুলা?

ওটারই সীকল। পরের ঘটনা নিয়ে কাহিনী। একজন অভিনেত্রী চাইছিলাম। আমরা, অপরিচিত নতুন একজন, যে মিনার চরিত্রে অভিনয় করতে পারে। ব্রাম। স্টোকারের কাহিনী পড়ে আমার সব সময়েই মনে হয়েছে, ড্রাকুলার চেহারা দেখার পর আর তার ভোঁতা স্বামীর সঙ্গে বনিবনা হবে না। হতে পারে না। জোনাথন হারকারটা কোন কাজেরই না তো, তাই ভ্যাম্পায়ারই হয়ে যেতে চাইবে মিনা। ড্রাকুলার সঙ্গে প্রেম করতে চাইবে। আর তা-ই করাব আমরা আমাদের

ছবিতে। উপায় একটা বের করে ফেলেছি মিনাকে ড্রাকুলার সঙ্গে দেখা করিয়ে দেয়ার।
কি করে? ডিকসনের কণ্ঠে সন্দেহ। যতদূর মনে পড়ে, ধুলো হয়ে গিয়েছিল। ড্রাকুলা।
তাতে কি? আমাদের মত জ্যান্ত মানুষের নিয়ম মানে না ভ্যাম্পায়াররা। ওদের জগতে অন্য রীতি। এমন ভাবভঙ্গি করছে রোজার, যেন গিয়ে বেড়িয়ে এসেছে জীবন্ত ভূতদের ওই জগৎ থেকে। আমাদের ছবিতে ধুলো থেকে ভ্যাম্পায়ারকে ফিরিয়ে আনার কৌশল জেনে যাবে মিনা। তারপর দুজনে মিলে একটা নতুন গল্প তৈরি করবে।
গলা টিপে ধরা হয়েছে যেন, এরকম শব্দ করলেন ডিকসন। ওই মুহূর্তে সিঁড়ি থেকে পড়ে গেল কে যেন।
ও, পরিচয় করিয়ে দিই, মসৃণ কণ্ঠে বলল রোজার। আমার সহকারী হ্যারিসন রিভস। নাটক না করে আসরে আসতে পারে না ও। ঢোকার সময় কিছু একটা করা চাই-ই। তার যুক্তি, এতে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সুবিধে। হ্যারি, এস। ওঁরা বেটসির আব্বা-আম্মা।
গোলগাল চেহারা রিভসের। রোজারেরই বয়েসী। তবে বেশভূষায় একেবারে বিপরীত। রোজার যেমন, মসৃণ, সে তেমনি খসখসে। তার কালো, কোকড়া চুলগুলো খাটো, কান বেরিয়ে আছে। গোল গোল চোখ। নাকটা মুখের তুলনায়। ছোট। সিঁড়ির গোড়া থেকে ওঠার সময় একটা হাসি দিল। বোকা বোকা লাগল। হাসিটা।
ও তাই নাকি, তাই নাকি..., বলতে বলতে এগিয়ে এল রিভস। জুতোর গোড়ালিটা বেধে গিয়েছিল...
এই কিছুদিন আগেও টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি ফক্সের সঙ্গে যুক্ত ছিল রিভস, রোজার জানাল। কয়েক হপ্তা আগে অনেক জোরজার করে রাজি করিয়েছি ওকে ইয়ান ফিল্মসে কাজ করার জন্যে। হরর ছবি তৈরিতে তার জুড়ি কমই আছে। লোককে ভয় দেখাতে, চমকে দিতে ওস্তাদ। মানুষের মনের সমস্ত অলিগলি তার চেনা। পারেও সে জন্যেই। আমাদের ছবির দর্শকরা টের পাবে আতঙ্ক কাকে বলে। ছবি দেখে বেরিয়েই যে ভুলে যাবে, তা পারবে না। ভয়টা অনেক দিন চেপে থাকবে মনের ওপর।
সাংঘাতিক! শুকনো গলায় বললেন ডিকসন।
ডলি, মিসেস ডিকসন বললেন। আয়, একটু বসা যাক। কথা বলি।
আবার কি কথা? মনে হলো আবার রেগে যাবে ডলি। যা বলার তো বলাই হল। আর কি??

অবাক মনে হলো রোজারকে। ডলি? আমি তো ভেবেছিলাম তোমার নাম বেটসিই। কিন্তু ভাবি-অভিনেত্রীর চোখে আগুনের ঝিলিক দেখেই তাড়াতাড়ি সামলে নিল, ও, বুঝেছি বুঝেছি। আমি একটা গাধা। ভুলেই গিয়েছিলাম। আসা নামে অনেকেই পরিচিত হতে চায় না সিনেমায়। বেটসি তোমার স্টেজ নেম। তোমার আব্বা-আম্মার সঙ্গে একলা থাকতে চাও তো? থাক। এতদিন পরে দেখা, ইচ্ছে তো করবেই। আমি দুএক দিনের মধ্যেই যোগাযোগ করব। ডিকসনের দিকে তাকাল রোজার। আমাকে আপনাদের দরকার হলে, কিংবা কোন প্রশ্ন করার থাকলে দয়া করে এই নাম্বারে একটা রিঙ করবেন।
মানিব্যাগ থেকে একটা কার্ড বের করে দিল সে।
আপাতত মেষপালকের জীবন যাপন করতে হচ্ছে আমাকে আর রিভসকে, যেন দুঃখে মসৃণ কণ্ঠটা আরও মসৃণ হয়ে গেল রোজারের। পাহাড়ের ওপরে একটা বাড়িতে থাকি আমরা। বাড়িটা ক্রুগার মনটাগোর। বিশ্বাস করবেন, সকালে বাড়ির পেছনের পাহাড়ে ভেড়ার ডাকে ঘুম ভাঙে আমাদের? নাহ, আর পারা যায় না। বাড়িতে একটা ফোন পর্যন্ত নেই। তবে আপনাদের অসুবিধে হবে না। আমার সেক্রেটারি আপনাদের ফোন ধরবে, খবরটা ঠিকই পৌঁছে দেবে আমাকে।
কার্ডটার দিকে না তাকিয়েই পকেটে রেখে দিলেন ডিকসন। কঠিন কণ্ঠে বললেন, আমার মেয়ের যেন কোন ক্ষতি না হয়, এই বলে দিলাম। তাহলে জেল খাঁটিয়ে ছেড়ে দেব।
আব্বা! চিৎকার করে উঠল ডলি।
আপনার অবস্থাটা আমি বুঝতে পারছি, ডিক্সনের কথা গায়েই মাখল না। রোজার। বাপ তার মেয়ের জন্যে অস্থির হবেই। মসৃণ ভঙ্গিতে বাউ করে সহকারীর হাত ধরে টেনে নিয়ে দরজার দিকে এগোল সে।
সামান্যতম নরম হলেন না ডিকসন। মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, অনেক হয়েছে। কয়েকটা কথা খোলাসা করে নেয়া দরকার!

.

ডলি, মা আমার, মিসেস ডিকসন বললেন। তুই জানিস তোকে আমরা ভালবাসি। বিশ্বাস করি।
কই করি? স্ত্রীকে প্রশ্ন করলেন ডিকসন।
এড়িয়ে গেলেন মিসেস। মস্ত একটা সুযোগ তুই পেয়েছিস। তোকে আমরা সাহায্যই করব, কিন্তু…।
নরিয়া, কি বলছ তুমি? চিৎকার করে উঠলেন ডিকসন।
স্বামীর দিকে তাকালেন মিসেস ডিকসন। ও আমাদের মেয়ে বটে। কিন্তু আজ হোক কাল হোক বাড়ি তো ছাড়তেই হবে। চিরকাল তো আর বাপের ঘরে থাকবে

না। তাছাড়া:তাছাড়া এখন ও বড় হয়েছে। বেশ, তোমার আপত্তি থাকলে আমিই নাহয় এখানে থেকে যাই ওর সঙ্গে।
কোন দরকার নেই! কচি খুকি নই আমি! চেঁচিয়ে উঠল ডলি। তাছাড়া থাকবে কি করে? এটা তোমার বাড়ি না। আমারও না। মিসেস লেসিঙের। আমাকেই থাকতে দেয়া হয়েছে দয়া করে। আরেকটা কথা তোমাদের জানা থাকা দরকার, একটা বিউটি পারলারে চাকরি করি আমি।
ওসব কিছুই করার দরকার নেই, গম্ভীর হয়ে বললেন বাবা। আমরা যা করতে বলব, তাই করতে হবে। বাড়িতে থাকতে হবে তোমাকে।
আহ, থাম না পিটার। আমাকে কথা বলতে দাও। তোমার সঙ্গে ও কখনোই সহজ হতে পারে না।
না পারলে না, পারুক। পারার দরকারও নেই। আমি তার বাবা, ব্যস, যথেষ্ট।
ঘোঁৎ ঘোঁৎ করলেন। কয়েকবার হুমকি দিলেন। তবে আস্তে আস্তে গলার জোর কমে আসতে লাগল তার। সুযোগ বুঝে দরজার দিকে তাকে টেনে নিয়ে চললেন মিসেস ডিকসন। বেরোনোর আগে ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি। মানিব্যাগ বের করলেন। এগিয়ে এসে কয়েকটা নোট মেয়ের হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন, সাবধানে থেক। বেরিয়ে গেলেন গাড়িতে ওঠার জন্যে।
মুসা আর রবিনকে পরিচয় করিয়ে দেয়ার প্রয়োজন বোধ করল না কেউ। এই পারিবারিক ঝগড়ার মাঝে পড়ে অস্বস্তি বোধ করছে তিন গোয়েন্দা। হেডকোয়ার্টারে ফিরে যাওয়ার জন্যে অস্থির হয়ে উঠল। ডলিকে তো পাওয়াই গেছে, আর থেকে কি হবে?
ডিকসন দম্পতিকে অনুসরণ করে ওরাও বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠল। হঠাৎ বলে উঠলেন মিস্টার ডিকসন, ছবি না কচু! ওই ব্যাটা ছবির প্রযোজক হয়ে থাকলে আমি আমার কান কেটে ফেলব।
চলতে আরম্ভ করল গাড়ি। চেশায়ার স্কোয়্যার থেকে বেরিয়ে পাহাড়ী পথ ধরে নেমে চলল মেন রোডের দিকে।
হয়ত তোমার কথাই ঠিক, মিসেস বললেন শান্ত কণ্ঠে।
হয়ত মানে?
মিস্টার রোজারকে চমৎকার লোক মনে হলো আমার। তবে আরেকটু খোঁজখবর নেয়া দরকার তার সম্পর্কে। না নিলেও অবশ্য ক্ষতি নেই।
কি ভেবে ছেলেদের দিকে ঘুরলেন তিনি। একটা কাজ করতে পারবে? ওর কার্ড আছে আমাদের কাছে। কাজটা করতে পারবে? তোমরা চালাক ছেলে, ডলিকে যে ভাবে বের করে ফেললে, তাতেই বুঝেছি। জানতে পারবে মিস্টার রোজার সত্যিই ছবির প্রযোজক কিনা?

গুঙিয়ে উঠল মুসা।
তা বোধহয় পারা যাবে, কিশোর জবাব দিল। ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রিতে খোঁজ নিলেই জানা যাবে। তবে প্রযোজক হওয়ার জন্যে কোন সমিতি কিংবা সংগঠনে যোগ দেয়ার প্রয়োজন পড়ে না। টাকা থাকলেই হলো। আর ছবির ব্যাপারে সামান্য ধারণা। আসল কাজটা পরিচালকই করে দেয়।
ওই লোকটা একটা ধোঁকাবাজ! গোঁ গোঁ করে উঠলেন মিস্টার ডিকসন। ভ্যাম্পায়ার প্রিন্সেস! কি একখান আইডিয়া! গল্পের ব্যাপারে কোন ধারণাই নেই তার। আর ওর সহকারী, ওটা তো আরেক হাঁদা। ইচ্ছে করে সিঁড়ি থেকে পড়ে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ..হাহ! ধরে পাগলা গারদে পাঠানো উচিত।
মেন রোড ধরে চলতে চলতে মোড় নিলেন তিনি। স্যালভিজ ইয়ার্ডের দিকে। চললেন। নরিয়া, এভাবে মেয়েটাকে একলা ছেড়ে দেয়া ঠিক হচ্ছে না। এক কাজ করা যেতে পারে। তুমি থাকো, চোখ রাখো। আমি বাড়ি চলে যাই।
মাথা নাড়লেন মিসেস। না, তা করব না। ডলি এখন বড় হয়েছে। তাকে তার পছন্দমত চলতে দেয়া উচিত। আমরা বেশি নাক গলাতে গেলে অকর্মণ্য বানিয়ে ফেলব শেষে।
আবার কিছুক্ষণ ঘোঁৎ ঘোঁৎ করলেন ডিকসন। নানা রকম ভাবে ভয় দেখানোর চেষ্টা করলেন স্ত্রীকে, মেয়ের ক্ষতি হতে পারে, বোঝানোর চেষ্টা করলেন। কিছুতেই যখন বুঝলেন না মিসেস, তখন হুমকি দিতে লাগলেন। তাতেও কাজ হল না। অবশেষে ইয়ার্ডটা দেখা গেল। গেটের কাছে গাড়ি থামিয়ে পকেট থেকে ইয়ান রোজারের কার্ডটা বের করে কিশোরের হাতে দিয়ে বললেন, কিছু জানতে পারলে ফ্রেনসোতে ফোন কোরো আমাদের। সত্যি কথাটা জানা দরকার। মাথা খারাপ না হলে ডলিকে কেউ কোটি কোটি টাকার একটা ছবিতে স্টার বানাবে না। ও ছবির কি বোঝে?
বোঝে, বোঝে, মিসেস বললেন। বুঝবে না কেন? বড় হয়নি?

.

পরদিন খুব সকালে হেডকোয়ার্টারে মিলিত হলো তিন গোয়েন্দা।
আমাদের কাজ এখন, কিশোর বলল। ইয়ান রোজার সত্যিই প্রযোজক কিনা এটা জানার চেষ্টা করা।
গোলমালের দিকেই যত ঝোঁক মেয়েটার, রবিন মন্তব্য করল। কিশোর, লেসিং হাউসে যে চোর ঢুকেছিল, তার সঙ্গে এই ছবিটবি বানানোর কোন যোগাযোগ নেই তো?
নাহ্, মাথা নাড়ল মুসা। তা বোধহয় নেই। চোর যখন-তখন যার-তার বাড়িতে ঢুকতে পারে। এর মধ্যে কোন রহস্য নেই।

তা ঠিক, মুসার সঙ্গে একমত হল কিশোর। এ সময়ে মিস্টার ক্রিস্টোফার হলিউডে থাকলে কাজ হত। তাকে একটা ফোন করলেই রোজারের খবর জেনে যেতে পারতাম।
নেই তো কি আর করা, হাত ওল্টাল মুসা। অন্য ভাবেই কাজ করতে হবে। আমাদের।
মিস্টার সাইমনের সাহায্য নেয়া যায় না? পরামর্শ দিল রবিন।
বোধহয় যায়। হুম! নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। বিড়বিড় করল আনমনেই। ভিকটর সাইমন! তিনিও যেহেতু গোয়েন্দা...দাঁড়াও, ফোন করি।
আরও একটা কথা ভুলে গেছ, মনে করিয়ে দিল রবিন। সিনেমার সঙ্গে তারও যোগাযোগ আছে। চিত্রনাট্য লেখেন। ইয়ান রোজারের কথা তিনিও শুনে থাকতে পারেন।
ভাল কথা মনে করেছ তো! ডায়াল করতে শুরু করল কিশোর।
ফোন ধরল ভিকটর সাইমনের ভিয়েতনামী কাজের লোক, নিসান জাং কিম। জানাল, তিনি নেই। ইডাহোতে একটা ছবির শুটিঙে দলের সাথে গেছেন। কয়েক দিন লাগতে পারে ফিরতে। কয়েক হপ্তাও হতে পারে। ঠিক করে বলে যাননি। ফিরলে তোমাদের কথা বলব।
কিমকে ধন্যবাদ জানিয়ে লাইন কেটে দিল কিশোর। বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বলল, নেই। ওভাবে সাহায্য পাওয়া যাবে না। রোজারের কার্ডটা আছে। চলো, তার অফিসে চলে যাই।
ওর সেক্রেটারির সঙ্গে কথা বলতে? রবিন বলল। কিন্তু ওদেরকে বেতনই দেয়া হয় বাইরের লোক ঠেকানোর জন্যে। কথা গোপন রাখার জন্যে।
না বললে না বলবে। অফিসে গেলেই অনেক প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাব।
রেন্ট-আ-রাইড অটো রেন্টাল কোম্পানিতে ফোন করল কিশোর। হ্যানসনকে চাইল। আছে। আর রোলস রয়েসটাও আছে। গাড়িটা পাঠাতে অনুরোধ করল সে।
চকচকে রোলস রয়েস নিয়ে হাজির হয়ে গেল হ্যানসন। মেরিচাচীর চোখে, পড়ল প্রথমে। গুঙিয়ে উঠলেন তিনি। তারমানে সারাদিনের জন্যে লাপাত্তা হবি। কিশোর, তোকে যে কাজটার কথা বলেছিলাম তার কি হবে?
কাল করে দেব, চাচী। মিস্টার ডিকসনের একটা জরুরী কাজ করতে যাচ্ছি আমরা।
সব সময় কথা তৈরিই থাকে মুখে, নাক কুঁচকালেন চাচী। এমন কিছুই বলিস, যাতে মানা করা না যায়।

গাড়িতে উঠল তিন গোয়েন্দা। রোজারের কার্ডটায় সানসেট ট্রিপের ঠিকানা। দেয়া আছে। যেতে বলল হ্যানসনকে। যেতে প্রায় আধঘন্টা লেগে গেল। স্ট্রিপে পৌঁছে গতি কমিয়ে দিল হ্যানসন, যাতে অফিটা খুঁজে পাওয়া যায়।
মোড়ের কাছে ওই যে পার্কিঙের জায়গা, বলল সে। রাখব ওখানে? লোকের চোখ পড়ে যায় গাড়িটার ওপর। গোয়েন্দাগিরিতে খুব অসুবিধে। নাকি লোকে দেখুক এখন, এটাই চাও?
অদৃশ্য হয়ে যেতে চাই, রবি বলল। ডলি যদি জানতে পারে, ওর প্রিয় প্রযোজকের পেছনে লেগেছি আমরা, হুলুস্থুল বাধিয়ে ফেলবে।
তাহলে আর কি, হাসল হ্যানসন। যা বললাম কৃরি। মোড়ের কাছে গেল। আরেকটু নিরাপদ হওয়ার জন্যে পাশের একটা গলিতে ঢুকে গাড়ি রাখার জায়গা বের করে নিল।
একসঙ্গে যাব সবাই? মুসার প্রশ্ন।
এক মুহূর্ত ভাবল কিশোর। না, বেশি লোক গিয়ে কাজ নেই। আমি একা যাব।
গাড়ি থেকে বেরিয়ে রওনা হল সে।
দোতলা একটা বাড়িতে রোজারের অফিস। নিচতলায় একটা কফি শপ আছে। তেমন চোখে পড়ার মত আহামরি কোন বিল্ডিং নয়। সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় উঠে আবিষ্কার করল কিশোর, একটা অ্যাকাউন্টিং ফার্মের সঙ্গে শেয়ারে অফিস ভাড়া করেছে ইয়ান ফিল্মস।
দরজার নবে হাত রেখেই চিৎকার শুনল কিশোর। যত্তোসব!
একটা মহিলা কণ্ঠ বলল, একজন স্টান্ট ম্যান না পেলে হবে না। প্রোডাকশন। বন্ধ রাখতে হবে। ডেভিস সাহেব তো আর রাজি হবেন না লাফটা দেয়ার জন্যে।
তাহলে তাই করা হচ্ছে না কেন? তোক জোগাড় করে নিয়ে এলেই হয়, বলল প্রথম কণ্ঠটা। রোজার নয়। অন্য কেউ, যার কণ্ঠটা মসৃণ নয় রোজারের মত। এখানে শুটিং করলে এসব গোলমালে আর পড়তে হত না। গ্রিফিথ পার্কের। পাহাড়ের সঙ্গে মেকসিকান পাহাড়ের কি এমন তফাৎ?
নবে মোচড় দিয়ে ঠেলে পাল্লা খুলে ফেলল কিশোর।
প্রথমেই চোখে পড়ল একজন মহিলাকে। ধূসর, কোকড়া চুল। চোখে রিমলেস চশমা। ডেস্কের সামনে বসে রয়েছে। হাতে টেলিফোন রিসিভার।
টাকমাথা, নীল চোখওয়ালা, একজন পুরুষ কটমট করে তাকালেন কিশোরের দিকে। তারপর গিয়ে ভেতরের আরেকটা ঘরে ঢুকে প্রাম করে লাগিয়ে দিলেন দরজা।
কি চাই? জিজ্ঞেস করল মহিলা। রিসিভার রাখল না।
মিস্টার রোজার আছেন?

এখন অসময়। মিস্টার রোজারকে এসময়ে খুঁজতে এসেছ কেন?
ইয়ে... কাল তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে। এক বন্ধুর বাড়িতে। কথা বলে মনে হল ছবিতে বোধহয় আমাকে ব্যবহার করতে পারবেন।
তোমাকে?
আমার অভিজ্ঞতা আছে। টেলিভিশনে অভিনয় করেছি। আপনাদের ড্রাকুলা ছবিতে কোন হাসির পার্ট থাকলে...
মিস্টার রোজার! চিৎকার করে ডাকল মহিলা।
মিস্টার. রোজার, এই ছেলেটার সঙ্গে নাকি কাল আপনার দেখা হয়েছিল? ড্রাকুলা ছবির কথা বলছে। ব্যাপারটা কি?
এঘরে এসে দাঁড়ালেন মিস্টার রোজার। ড্রাকুলা? এনসিনাডার শুটিং নিয়েই তো মহা ঝামেলায় আছি, আবার কি? ড্রাকুলা নিয়ে ছবি তৈরি হবে কে বলল?
দুটো সেকেণ্ড লোকটার দিকে স্থির তাকিয়ে রইল কিশোর। পকেট থেকে কার্ডটা বের করল। নীরবে সেটা তুলে দিল লোকটার হাতে।
কার্ডের দিকে তাকিয়ে নাক দিয়ে খোঁতখোঁত করলেন ভদ্রলোক।
যে লোক এই কার্ড দিয়েছেন, তিনি বলেছেন আজ এখানে এলে দেখা হবে, কিশোর বলল। তিনি তাঁর নাম বলেছেন ইয়ান রোজার। এখন মনে হচ্ছে সত্যি কথা বলেননি তিনি।
তা তো বলেইনি। ছবিতে তোমাকে কোন কাজ দিয়েছে নাকি?
আসলে, আমাকে নয়। একটা মেয়েকে দিয়েছে। সংক্ষেপে জানাল কিশোর, ডলিকে কাজ দেয়ার কথাটা।
আমার কার্ড দিয়েছে, টাকমাথায় হাত বোলালেন রোজার। ড্রাকুলা নিয়ে ছবি বানাচ্ছি না আমি। ওসব আমি বানাইও না। আমি তৈরি করি ডকুমেন্টারি আর বিজ্ঞাপন। তোমার মত কাউকে আপাতত দরকার নেই আমার। আর মেয়েটাকে গিয়ে বলবে ড্রাকুলা ছবিতে অভিনয় করতে তাকে যে-ই বলে থাকুক, ঠিক বলেনি। মিথ্যে বলেছে। কাজটাজ কিচ্ছু দেবে না, নিশ্চয় ধোকাবজি। কোন রেস্টুরেন্টে গিয়ে কাজ করতে বলগে। টাকার কি খুব দরকার?
বলতে পারেন।
তোমার বন্ধু?
ঠিক তা নয়। চিনি আরকি। সবে পরিচয় হয়েছে।
তাকে একটা কথা বলবে, প্রযোজকের ব্যাপারে যেন হুশিয়ার থাকে। অনেকেই ওরকম মিথ্যে পরিচয় দিয়ে থাকে এখানে। লোক ঠকানোর জন্যে। আর যে লোক অন্যের কার্ড নিজের নামে চালিয়ে দিতে পারে, তার ব্যাপারে তো খুবই সাবধান থাকা দরকার।

বলব। লোকটা কে কিছু আন্দাজ করতে পারেন? আপনার কার্ড নিয়ে এরকম ব্যাপার কি আরও ঘটেছে?
শ্রাগ করলেন মিস্টার রোজার। না। তবে একগাদা কার্ড তোমাকে দিয়ে দিতে পারি আমি। দেয়ার জন্যেই বানানো হয়েছে ওগুলো। যে কেউ এসে নিয়ে যেতে পারে। লোকটা দেখতে কেমন?
এই তিরিশ মত বয়েস। হালকা বাদামি চুল। সব কিছুই মসৃণ। চলন-বলন, পোশাক-আশাক, সব। বলল পাহাড়ের ওপরের একটা বাড়িতে থাকে। বাড়ির মালিকের নাম ক্রগার মনটাগো।
আরামেই আছে দেখা যায়। নিরাপদে। মনটাগো মারা গেছেন। চিন্তিত দেখাল রোজারকে। মেয়েটাকে গিয়ে বলবে, এক্ষুণি যাতে কেটে পড়ে। ওই লোকের ধারেকাছেও আর না যায়। শয়তানগুলো মানুষ ঠকানোর তালে থাকে। নাম্বার ওয়ান ঠগবাজ একেকটা। মাঝে মাঝে ভয়ানক বিপজ্জনক হয়ে ওঠে ওরা।

.

চেশায়ার স্কোয়্যারের গেটে এসে থামল রোলস রয়েস। ডিউটিতে রয়েছে লুই গনজাগা। তার ছোট্ট ঘর থেকে বেরিয়ে হাঁ করে তাকিয়ে রইল বিশাল গাড়িটার দিকে।
ছেলেদের ওপর চোখ পড়তেই প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, আরিব্বাপরে, কি গাড়ি নিয়ে এসেছ! সত্যি বলছি, অবাক করেছ আমাকে! বেটসি জানে এটার কথা? নাকি সারপ্রাইজ দিতে এসেছ?
সারপ্রাইজ তো বটেই, মুসা বলল। আমরা যা বলতে এসেছি, শুনলে রীতিমত ভরকে যাবে। কারেন্টের শক খেলেও অতটা চমকাবে না।
ঘরে আছে? জানতে চাইল কিশোর।
আছে। লম্বা চুলওয়ালা লোকটা আর তার উজবুক সহকারীটা এসেছিল খানিক আগে। চলে গেছে। দাঁড়াও, ডাকছি।
ছোট ঘরে ফিরে গেল দারোয়ান। জানালা দিয়ে দেখা গেল, টেলিফোন করছে। কানে লাগিয়ে দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। আছে তো আছেই। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে অবশেষে নামিয়ে রাখল।
ধরছে না কেউ, জানাল দারোয়ান।
বাইরে-টাইরে যায়নি তো? রবিনের প্রশ্ন।
মাথা নাড়ল গনজাগা। গেলে দেখতাম।
সতর্ক হয়ে উঠল কিশোর। মিস্টার রোজারের সঙ্গে বেরোয়নি তো? ঠিক দেখেছেন?

না, বেরোয়নি। রোজারের সঙ্গে গেছে হাঁদাটা। মোটকা, কোকড়াচুলো। বেটি যায়নি।
উদ্বিগ্ন হলো দারোয়ান। তার ওপর আদেশ রয়েছে, ভালমত না জেনে, না চিনে যাতে স্কোয়্যারে কাউকে ঢুকতে না দেয়। দেখি, আবার চেষ্টা করি।
আবার গিয়ে ঘরে ঢুকল সে। রিসিভার তুলে বোতাম টিপল। কানে ঠেকিয়ে অপেক্ষা করল। এবারেও সেই একই ব্যাপার। ধরল না কেউ। হাত নেড়ে রোলস রয়েসটাকে ভেতরে ঢোকার অনুমতি দিল সে। কিশোররা নিজেই গিয়ে যাতে দেখতে পারে।
দরজায় ধাক্কা দেবে, বলে দিল সে। না খুললে গিয়ে দেখবে সুইমিং পুলে। কোথাও না পেলে সোজা চলে আসবে আমার কাছে। তারপর দেখব কি করা যায়।
ছোট পার্কটার কাছে এনে গাড়ি রাখল হ্যানসন। নীরব হয়ে আছে লেসিং হাউস। আগের সন্ধ্যার মত সরব নয়। তবে পার্টি যে একটা হয়েছিল, তার চিহ্ন এখনও রয়েছে। কাগজের কাপ, প্লেট, মোড়ক আর নানারকম জঞ্জাল পড়ে রয়েছে। এখানে ওখানে, ঝোপঝাড়ের নিচে। হাঁটার সময় পায়ের নিচে পড়ছে।
প্রথমে কলিংবেলের বোতাম টিপল কিশোর। কয়েকবার টিপেও কারও সাড়া পেল না। দরজা খুলতে এল না কেউ।
ডলি নেই, রবিন বলল।
কিছু একটা গোলমাল হয়েছে, বলল কিশোর। আমি শিওর।
আমি গেটে যাচ্ছি, মুসা বলল। দারোয়ানের কাছে নিশ্চয় মাস্টার কী আছে।
দৌড় দিল সে। রোলস রয়েসটার পাশ কাটাল। ভেতরে অপেক্ষা করছে হ্যানসন।
কিশোর আর রবিন বাড়ির পাশ ঘুরে এগোল। দেখল, বাইরে কোথাও আছে কিনা ডলি। পেল না।
আবার সামনের চত্বরে ফিরে এসে দেখল দারোয়ানকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মুসা। হ্যানসনও নেমে এসেছে গাড়ি থেকে। সবাই উৎকণ্ঠিত। মাস্টার কী আছে দারোয়ানের কাছে। দরজার তালা খুলল। হলে ঢুকল সবাই। আগের সন্ধ্যার পার্টির চিহ্ন এখানেও রয়েছে।
ডলি! চিৎকার করে ডাকল কিশোর।
জবাব দিল না কেউ।
খুঁজতে আরম্ভ করল ছেলেরা। নিচতলাটা দেখতে বেশি সময় লাগল না। তারপর ওপরতলায় চলল ওরা। তাদের সঙ্গে চলল লুই গনজাগা। হ্যানসন। নিচতলায় পাহারায় রইল।
ওপরতলার দরজাগুলো বন্ধ। একের পর এক খুলতে লাগল দারোয়ান। ভেতরে উঁকি দিল ছেলেরা। আবছা অন্ধকার, অব্যবহৃত বেডরুমগুলোর পর্দা টানা।

হলের শেষ মাথায় একটা ঘর দেখা গেল, যেটা হরদম ব্যবহৃত হয় বলে। মনে হল। বেশ বড় একটা বিছানা। লাল রঙের চাঁদরের একটা ধার ওল্টানো। একজোড়া চপ্পল যেন ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে চেয়ারের নিচে। বিছানার পায়ের কাছটায়। পড়ে রয়েছে একটা মখমলের আলখেল্লা।
একটা জানালার পর্দা টেনে দিল গজাগা। রোদ এসে পড়ল ভেতরে। আলোকিত হয়ে গেল ঘরটা।
মনে হচ্ছে এটাই মিসেস লেসিঙের ঘর, দারোয়ান অনুমান করল। এই বেডরুমটাই ব্যবহার করেন। ড্রেসিং টেবিলের দিকে তাকাল। ছোট একটা ট্রেতে সাজানো রয়েছে নানারকম পারফিউমের শিশি। বেটি মেয়েটা ভাল। এঘরে নিশ্চয় ঢোকে না সে। জিনিসপত্র ব্যবহার করে না। করে থাকলে ঠিক করেনি।
ঘুরতে শুরু করল মুসা। টান দিয়ে একটা দেয়াল আলমারির পাল্লা খুলল। ভেতরে এত জায়গা, ছোটখাট একটা বেডরুমই বলা চলে। কাপড় বোঝাই
মিসেস লেসিং না ইউরোপে চলে গেছেন? ভুরু কুঁচকে বলল মুসা। কি নিয়ে। গেলেন তাহলে? সবই তো ফেলে গেছেন মনে হচ্ছে?
তার কথার জবাব দিল না কেউ। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর। তাকিয়ে রয়েছে কার্পেটের দিকে। হঠাৎ জিজ্ঞেস করল দারোয়ানকে, আর কোন গেট আছে? স্কোয়্যার থেকে বেরোনোর?
আছে। আবর্জনার গাড়ি আর ডেলিভারি ভ্যানগুলো ঢোকে ও পথে। সব সময় তালা দেয়া থাকে। প্রয়োজনের সময় খুলে দেয়া হয়।
চাবি কার কাছে?
চাবি নেই। ঢোকার দরকার হলে আমাকে খবর পাঠায়। গার্ডহাউসে বসে সুইচ টিপে খুলে দিই।
পাশের বাড়ির কারও সঙ্গে দেখা করতে গেছে হয়ত ডলি, রবিন বলল।
মনে হয় না। এখানে কারও সঙ্গে মেলামেশা নেই ওর।
আরেকটা দরজা খুলল মুসা। আশা করেছিল আরেকটা আলমারি দেখবে। তা। নয়। ওটা বাথরুম। মার্বেল পাথরে তৈরি বাথটাবে উপচে পড়ছে সাবানের ফেনা। সাবানের গন্ধে বাতাস ভারি। মার্বেল পাথরে তৈরি একটা কাউন্টারের ওপর বসানো হয়েছে দুটো সিংক, ওগুলোতে নানারকম শিশিবোতল আর জার। উল্টে রয়েছে একটা বোতল। মার্বেলের কাউন্টারে পড়েছে হলদেটে তরল, সেখান থেকে ফোঁটা ফোঁটা ঝরছে মেঝেতে।
নোংরা স্বভাবের মেয়ে, মন্তব্য করল রবিন।
জিনিসগুলোর দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। চোখ বোলাল পুরো বাথরুমে। ও বাথরুমে থাকতে ফোন বেজেছে। উঠে গিয়ে ধরেছে। জানল, গেটে দাঁড়িয়ে আছে

রোজার। তাকে ছাড়তে বলল দারোয়ানকে। গায়ে কাপড় জড়িয়ে নিচে নামল দরজা খোলার জন্যে। তারপরই কিছু ঘটেছে। বিপজ্জনক কিছু। ফিরে এসে আর বাথরুমটা পরিষ্কার করতে পারেনি।
না, আমার মনে হয় ফিরে এসেছিল। লোকটার তাড়া খেয়ে এখানে এসে ঢুকেছিল। ধস্তাধস্তি হয়েছিল হয়ত। হাত লেগে উল্টে পড়েছে বোতলটা।
অতি কল্পনা করছ তোমরা, দারোয়ান বলল। অস্বস্তি বাড়ছে তার। আসলে অন্য কিছু ঘটেছে। স্বাভাবিক কিছু। মেয়েটা নোংরা। ফলে গোসল করার পর বাথরুম পরিষ্কার করেনি। পারফিউম ব্যবহার করে বোতলটা রেখেছে। উল্টে যে গিয়েছে খেয়ালই করেনি। বাথরুম এভাবে রেখেই মিস্টার রোজারকে দরজা খুলে দেয়ার জন্যে নিচে নেমে গিয়েছিল তারপর..তারপর…
তারপর কি? ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর। তারপর কোথায় গেল? রোজারের সঙ্গেও যায়নি, পাশের বাড়িতেও যায়নি, তাহলে গেলটা কোথায়? কি হয়েছে তার?
ছোট তোয়ালেটা নজরে পড়ল রবিনের। ড্রেসিং টেবিলের কাছে গিয়ে। দাঁড়িয়েছে। পায়ের কাছে রয়েছে ওয়েস্টবাস্কেটটা। তাকিয়ে রয়েছে ওটার দিকে।
এই, দেখে যাও! নিচু হয়ে তোয়ালেটা বের করে আনল সে। সাদা রঙের। এককোণে এমব্রয়ডারি করা একটা প্রজাপতি। মরচে-লাল দাগ লেগে রয়েছে।
এটার কি কোন গুরুত্ব আছে? প্রশ্ন করল রবিন যেন নিজেকেই।
একবার তাকিয়েই চোখ বড় বড় হয়ে গেল গনজাগার। রক্ত! দুই লাফে এগিয়ে এসে হাত বাড়াল তোয়ালেটার জন্যে। এখনও ভেজা। কিছু একটা ঘটেছে আজ সকালে এখানে। পুলিশে খবর দেয়া দরকার।
.
খবর পেয়ে চীফ ইয়ান ফ্লেচার নিজে এসে হাজির হলেন। অগোছালো নোংরা হয়ে থাকা বাথরুমে একবার চোখ বুলিয়েই গম্ভীর হয়ে গেলেন।
ভুরু কুঁচকে তাকালেন দারোয়ানের দিকে। সকালে একজন লোক দেখা করতে এসেছিল বলছ। গাড়ির নম্বর রেখেছ?
রেখেছি। গাডহাউসের লগবুকে লেখা আছে। কসম খেয়ে বলতে পারি, মেয়েটা ওই গাড়িতে করে বেরোয়নি।
কিন্তু কোন ভাবে তো নিশ্চয় বেরিয়েছে। নাহলে নেই কেন? নিচতলায় চললেন চীফ।
পড়শীদের সঙ্গে কথা বলব, আবার বললেন চীফ। কেউ না কেউ কিছু দেখে থাকবেই। এই, তিন গোয়েন্দাকে বললেন, তোমরা বাড়ি চলে যাও।
স্যার…বলতে গেল কিশোর।

চলে যাও। এখন আর কিছু করার নেই তোমাদের। যা করার পুলিশ করবে।
নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও ফিরতে হলো তিন গোয়েন্দাকে, বিশেষ করে গোয়েন্দাপ্রধানকে। তাদেরকে ইয়ার্ডে ফিরিয়ে নিয়ে চলল হ্যানসন। কিছুক্ষণ থমথমে নীরবতা বিরাজ করল গাড়ির ভেতরে।
অবশেষে আর থাকতে না পেরে মুখ খুলল মুসা, রহস্যটা ঘোরালো হয়ে উঠছে।
কি বলতে চাও? রবিনের প্রশ্ন।
প্রথমে সৈকতে একটা ব্যাগ কুড়িয়ে পেলাম। মালিককে খুঁজে বের করার চেষ্টা করলাম। সহজেই হয়ে গেল কাজটা, লাইব্রেরিতে ফোন করে। কি জানলাম? ব্যাগের মালিকই হারিয়ে গেছে। তখন আবার তাকে খুঁজে বের করতে হল। করে। দিলাম। সন্তুষ্ট হতে পারলেন না বাবা-মা। আমাদেরকে তদন্ত চালিয়েই যেতে বললেন। যে লোকটা ওদের মেয়েকে কাজ দিয়েছে, তার সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে হবে। নিতে গিয়ে দেখলাম ভুয়া। গেলাম তখন মেয়েটাকে সতর্ক করতে। পারলাম না। কারণ, এখন মেয়েটাই গায়েব।
এবং এই প্রথম, যোগ করল কিশোর। রহস্যটা জমতে আরম্ভ করেছে। আরও মজা হল, পুলিশ, আমাদের বের করে দিয়েছে। নাক গলাতে নিষেধ করেছে।
করে তো ভালই করেছে। এই রহস্যের সমাধান করতে গেলে মাথাই খারাপ হয়ে যাবে।
এর চেয়ে জটিল রহস্যের সমাধান আমরা করেছি। বলে চুপ হয়ে গেল কিশোর।
আবার নীরবতা।
ছেলেদেরকে ইয়ার্ডে পৌঁছে দিয়ে গাড়ি নিয়ে চলে গেল হ্যানসন। ইয়ার্ডের গেটের দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। বন্ধ করে রাখা হয়েছে পাল্লা। দিনের এই সময়ে, দুপুরবেলা ইয়ার্ডের গেট কখনও বন্ধ থাকে না।
চাচা-চাচী নেই নাকি? নিজেকেই প্রশ্নটা করল কিশোর।
আমি বলি কি হয়েছে, আগ বাড়িয়ে জবাব দিল রবিন। নোমে কতগুলো পুরানো বাড়ি ভেঙে ফেলার খবর পেয়েছেন রাশেদ আংকেল। ছুটে গেছেন দেখার জন্যে পুরানো পাইপ আর সিংক পাওয়া যায় কিনা।
রবিনের অনুমান ঠিক হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ এরকমই করেন রাশেদ পাশা। তবে জায়গার ব্যাপারে ভুল করেছে সে। নোম যাননি তিনি। ডাক শুনে জঞ্জালের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল দুই বেভারিয়ান ভাইয়ের একজন, রোভার। জানাল, লস অ্যাঞ্জেলেসে গেছেন একটা ভাঙা বাড়ির পুরানো মাল কিনে আনতে।
ম্যাম গেছেন রান্নাঘরে, হাত তুলে দেখাল রোভার। ঢুকেছেন অনেকক্ষণ। আমি একা। চোরের তো অভাব নেই। কখন ঢুকে কি হাতে তুলে নিয়ে যায়। কাজ। করছি। দেখতেও পারব না। তাই লাগিয়ে রেখেছি।

গেট খুলে দিল সে। জিজ্ঞেস করল, তোমরা থাকবে তো? না, আবার। বেরোবে?
থাকবে, জানাল কিশোর।
গেট আর বন্ধ করার প্রয়োজন বোধ করল না রোভার। চলে গেল নিজের। কাজে।
রবিন আর মুসা বাড়ি চলে গেল। কিশোর রইল একা। অফিসের বারান্দায়। ওঠার সিঁড়িতে বসে গালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগল ডালিয়া ডিকসনের কথা। কল্পনায় ভাসছে অগোছালো বাথরুম। কি ঘটেছিল? চেশায়ার স্কোয়্যার থেকে মেয়েটাকে বেরিয়ে যেতে দেখেনি দারোয়ান। রোজারের গাড়ির বুটে লুকিয়ে থাকেনি তো? নাকি একাই কোনভাবে বেরিয়ে পালিয়েছে আবার? ভোয়ালেতে রক্তের দাগের কি অর্থ?

খচখচ করছে মন। চাচী এতক্ষণ কি করছেন? এই সময়ে তো তিনি অফিস ফেলে সাধারণত রান্না করতে যান না। আর গেলেও বড় জোর দুই কি তিন মিনিট। তাড়াহুড়া করে ফিরে আসেন। চুলায় চাপিয়ে দিয়েই। তারপর মাঝে মাঝে উঠে যান কতটা কি হল দেখার জন্যে। সাংঘাতিক একটা ব্যস্ত আর উত্তেজনাময় সময় কাটে তখন তার। নাহ, দেখতে হচ্ছে।
রোভার?
জঞ্জালের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল রোভার। ঘামছে।
আমি বাড়ির ভেতরে যাচ্ছি, কিশোর বলল। কাজ আছে। গেট দেখবেন।
আচ্ছা।
রান্নাঘরের খোলা দরজায় এসে দাঁড়াল কিলোর।
ভেতরে কেউ নেই। চুলায়ও কিছু চাপানো নেই। মেঝেতে পড়ে আছে একটা খাবারের টিন, কেউ ফেলেছে। ঢাকনাটা খুলে গড়িয়ে গিয়ে পড়ে আছে এককোণে।
হঠাৎ শীত করতে লাগল কিশোরের।
কান পেতে আছে। নীরব হয়ে আছে বাড়িটা। ডাকবে? মেরিচাচী কি আছে বাড়ির ভেতরে কোথাও? নাকি অন্য কেউ ঢুকে বসে আছে, যে চমকে দিয়েছে চাচীকে, হাত থেকে তখন টিনটা পড়ে গিয়েছিল তাঁর। কে চমকে দিয়েছিল? চাচীই বা এখন কোথায়?
ডাইনিং রুমের দরজার কাছে এসে দাঁড়াল সে। উঁকি দিল ভেতরে। মেঝেতে ছড়িয়ে রয়েছে কয়েকটা বাসন। সেগুলো মোছার কাপড়টাও মেঝেতে। আলমারির তাকের ড্রয়ারগুলো খোলা। নিচে পড়ে আছে আরও বাসন-পেয়ালা আর চামচ।

মুখ শুকিয়ে গেল কিশোরের। জোরে চিৎকার করে ডাকতে ইচ্ছে করল, তবে চাপা দিল ইচ্ছেটা। উচিত হবে না। যে ঢুকেছে সে এখনও বাড়িতেই থাকতে পারে। মেরিচাচীকে ভয় দেখিয়ে আটকে রেখেছে হয়ত। কিশোর উল্টোপাল্টা কিছু করলে এখন চাচীর বিপদ হতে পারে।

ডাইনিং রুমের ভেতর দিয়ে নিঃশব্দে এগোল কিশোর। লিভিং রুমেও একই অবস্থা। তাকের বই আর অন্যান্য জিনিস মেঝেতে ছড়ানো। টেবিলের ড্রয়ার খুলে মেঝেতে ফেলে রেখেছে। লিভিং রুমের পরে হলঘরেরও একটা অংশ চোখে পড়ছে। একটা ওয়ারড্রোব খোলা। কাপড়-চোপড় আর জুতো বের করে ছড়িয়ে ফেলা হয়েছে।

কিন্তু মেরিচাচী নেই। দেখা গেল না কোথাও।

রাশেদ পাশার ব্যক্তিগত ঘরটাকেও রেহাই দেয়া হয়নি। তার ডেকসেট আর টার্নটেবলটা নেই। আগের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে রয়েছে স্পীকারগুলো। বেশি বড় বলেই বোধহয় অসুবিধে হবে মনে করে নেয়নি চোর। নাকি নেয়ার সময় পায়নি? কেউ এসে হাজির হয়েছিল?

হাজির! হ্যাঁ, এটাই হবে! মেরিচাচী এসেছিলেন কোন কারণে। চোরটা বাধা পেয়েছিল।

কেন এসেছিলেন চাচী, সেটাও বুঝতে পারল কিশোর। ক্যাশবাক্সটা নিয়ে এসেছিলেন তিনি। মনে পড়ল, রান্নাঘর দিয়ে আসার সময় ছোট টেলিভিশন সেটটার পাশের কাউন্টারে সেটা দেখে এসেছে। নিশ্চয় চাচীই রেখেছেন ওখানে।

দ্রুত আবার রান্নাঘরে ফিরে এল কিশোর। এখনও রয়েছে বাক্সটা। ডালা খুলে দেখল, ভেতরে টাকাপয়সা ঠিকই আছে। অনেক টাকা। একশো ডলারের বেশি। সেগুলো নেয়নি চোর।

কেন? মেরিচাচীই বা কোথায়?

চাচী! চিৎকার করে ডাকল কিশোর। গলা কাঁপছে।

জবাবে বিচিত্র একটা মিশ্র শব্দ কানে এল। চাপা চিৎকার। সেই সাথে কিল মারার আওয়াজ।

প্রায় উড়ে গেল যেন কিশোর। রান্নাঘরের লাগোয়া আরেকটা ছোট ঘর আছে! অনেকটা স্টোররুমের মত ব্যবহার করা হয় ওটাকে। ওয়াশিং মেশিন আর ড্রাইয়ার মেশিনাগুলো ওখানেই থাকে। এককোণ রয়েছে একটা আলমারি, তাতে ঝাড়, ব্রাশ আর ঘর পরিষ্কারের অন্যান্য জিনিস রাখা হয়। ওটার ভেতর থেকেই এসেছে শব্দটা।

বাইরে থেকে আটকে দেয়া হয়েছে আলমারির পাল্লা, ঝুল ঝাড়নের লম্বা ভাঙা দিয়ে। একটা মাথা দরজার হাতলে ঠেকিয়ে আরেক মাথা আটকে দেয়া হয়েছে

ওয়াশিং মেশিনের সঙ্গে। ফলে ভেতর থেকে যত ঠেলাঠেলিই করা হোক
চাচী, চিৎকার করে বলল কিশোর। ভেতরে আছ তুমি? আমি কিশোর!
আলমারির ভেতর থেকে চাপা কথা শোনা গেল আবার।
হ্যাঁচকা টানে ডাণ্ডাটা সরিয়ে আনল কিশোর। ঝটকা দিয়ে খুলে গেল আলমারির দরজা।
সফট ড্রিংকসের বোতল খুললে যেমন ফস করে আচমকা বেরিয়ে আসে গ্যাস আর তরল পদার্থ, অনেকটা তেমনি ভাবে বিশাল শরীর নিয়ে ছিটকে বেরোলেন মেরিচাচী। তার সঙ্গে বেরোল প্রচুর ধুলো, ব্রাশ আর নানারকম টিন।
কিশোর! এলি শেষতক!
টকটকে লাল হয়ে গেছে তার মুখ। ঘাড়ের কাছে চুলগুলো দাঁড়িয়ে গেছে। মেঝেতে বসে পড়ে হাঁপাতে লাগলেন তিনি। চোখ জ্বলছে।
দাঁড়া, আগে ধরে নিই শয়তানটাকে! তারপর দেখাব মজা!
মনে মনে হাসল, কিশোর। এই মুহূর্তে লোকটা যদি মেরিচাচীর সামনে পড়ে তাহলে ওর জন্যে করুণাই হবে তার।
কয়েক মিনিটের মধ্যেই পুলিশ এল। রান্নাঘরের চেয়ারে বসে কিশোরের বানিয়ে দেয়া কফিতে চুমুক দিচ্ছেন তখন মেরিচাচী।
কি হয়েছিল, সব বলতে পারবেন, এখন ম্যাম? অনুরোধ করল একজন অফিসার।
নিশ্চয় পারবেন তিনি। আর বললেনও বেশ উৎসাহের সঙ্গে। তবে তাতে রাগ আর ক্ষোভ প্রচুর পরিমাণে মিশিয়ে। রান্নাঘরে এসেছিলেন তিনি স্যুপ তৈরি করার। জন্যে। সবে একটা টিন পেড়েছেন তাক থেকে, এই সময় ডাইনিং রুমে নড়াচড়ার শব্দ শুনলেন। ভাবলেন কিশোর এসেছে। ডেকে জিজ্ঞেস করলেন।
জবাব পেলেন না। মুহূর্ত পরেই পেছন থেকে কেউ জাপটে ধরল তাকে। নাকেমুখে চেপে ধরল নরম কোন জিনিস। হাত থেকে টিনটা খসে পড়ে গেল। তার। ঠেলতে ঠেলতে তাকে নিয়ে যাওয়া হল আলমারিটার কাছে। ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে দরজা আটকে দেয়া হলো। এমন ভাবেই ঘটে গেল ঘটনাটা, লোকটাকে দেখতে পর্যন্ত পারেননি তিনি। সারাক্ষণই পেছনে ছিল লোকটা।
আলমারির কাছে একটা পুরানো বালিশ দেখতে পেল অফিসার। ওটাই মেরিচাচীর মুখে চেপে ধরা হয়েছিল বলে অনুমান করা হল। জিজ্ঞেস করল, লোকটা কতক্ষণ ছিল, আন্দাজ করতে পারবেন? ক্যাশবাক্স ছোয়নি সে। দামী আরও অনেক জিনিস আছে, ইচ্ছে করলে নিতে পারত। নেয়নি। যেন কোন কারণে ভয় পেয়ে পালিয়েছে।

ভয়! ভয় তো কাকে বলে জানেই না সে! জানাব! একবার ধরতে পারলে হয়!– ঘোষণা করে দিলেন মেরিচাচী। ঠিক বলতে পারব না, তবে মনে হয় বেশ কিছুক্ষণ ছিল। কিশোর আসার একটু আগে গেছে। কিশোর যে ঢুকেছে, টের পেয়েছি আমি। ভেবেছি, চোরটাই। সে না ডাকলে বুঝতে পারতাম না।
অফিসার আর তার সহকারী সূত্র খুঁজতে শুরু করল। ডাইনিং রুমের জানালার একটা পর্দা খুলে নিচে পড়ে আছে।
এদিক দিয়েই ঢুকেছে মনে হয়, কিশোরের দিকে তাকিয়ে বলল একজন অফিসার। চুরি করতে যা যা সরাতে চেয়েছিল সরানোর আগেই ঢুকে পড়েছিলেন তোমার চাচী। তাকে আটকে ফেলার পরেও আর বেশি সময় পায়নি। কিংবা এত বেশি ভয় পেয়ে গিয়েছিল, কাজটা আর ঠিকমত সারতে পারেনি। চুরি করতে ঢুকলে ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে এমনিতেই চোরের কলজে কাপে। অনেক সময় অকারণেই ভয় পেয়ে পালায়।
চোরাই ডেকসেটটা উদ্ধারের ভরসা দিতে পারল না পুলিশ। তবু মেরিচাচীকে বলল, সাধ্যমত চেষ্টা করবে বের করার। বলে চলে গেল। ওরা যাওয়ার একটু পরেই রাশেদ পাশা এসে ঢুকলেন। কিশোর তখন অগোছাল জিনিসগুলো গুছিয়ে শেষ করেছে। পর্দাটা লাগাচ্ছে রোভার।
কাজ শেষ করে ওয়ার্কশপে চলল কিশোর। ঢুকে দেখল, মুসা এসেছে। সাইকেলটা স্ট্যাণ্ডে তুলে রাখছে।
পুলিশকে যেতে দেখলাম, মুসা বলল। এখানেই এসেছিল নাকি?
হ্যাঁ। রকি বীচে মনে হয় চোরের উপদ্রব বেড়েই গেল। দুদিন আগে মিস লেসিঙের বাড়িতে ঢুকেছিল। আজকে ঢুকেছে আমাদের বাড়িতে। মেরিচাচীকে আলমারিতে আটকে রেখেছিল।
কি বললে?
সংক্ষেপে জানাল কিশোর।
হা হা করে হাসতে লাগল মুসা। আল্লাহ না করুক, চোরটা যদি ধরা পড়ে তবে ওর কপালে দুঃখ আছে। হা হা! আর লোক পায়নি, শেষকালে মেরিচাচীকে..হাহ হা!
কিশোরও হাসল।
তা মেরিচাচীর চোরটাকে খুঁজতে বেরোবে নাকি?
না। পুলিশই যা করে করুক। মনে হচ্ছে সাধারণ চোর।
তার মানে ডালিয়া ডিকসনের কেসেই শুধু আপাতত মাথা ঘামার আমরা?
জবাব দেয়ার আগে ভাবল কিশোর। সেটাও পারব কিনা বুঝতে পারছি না। চীফ তো আমাদেরকে প্রায় তাড়িয়েই দিলেন। তার মানে তিনি চান না ডলিকে নিয়ে

মাথা ঘামাই আমরা। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার সে। উজ্জ্বল হলো মুখ। তবে, তার বাবা-মাকে ফোন করতে পারি আমরা। যা যা ঘটেছে, জানাতে পারি।
আমরা মানে কি? আমাকে এসব থেকে বাদ দিতে পার তুমি। একা পারলে করগে। ডিকসনদেরকে অপছন্দ করি আমি, তা নয়। মিস্টার ডিকসন ঠিকই আছেন, তবে মিসেস একটু বেশি লাই দেন মেয়েকে। আমার মনে হয় তার। জন্যেই খারাপ হয়েছে মেয়েটা। ভাগ্যিস আমার মায়ের ঘরে জন্মায়নি। পিটিয়ে। পিঠের ছাল তুলে ফেলত।
হাসল কিশোর। দুই সুড়ঙ্গের ঢাকনা সরাল। এসো, ভেতরে গিয়ে কথা বলি।
হেডকোয়ার্টারে ঢুকল দুজনে। ডেস্কে বসেই আগে ফ্রেনসোতে ডিকসনদের নম্বরে ডায়াল করল কিশোর। ওপাশে বেজেই চলল ফোন। রিং হচ্ছে... হচ্ছে...দশবার পর্যন্ত গুনল সে। তারপর রিসিভার নামিয়ে রেখে বলল, বাড়ি নেই। কেউ ধরছে না।
চীফ হয়ত ফোন করেছিলেন, মুসা বলল। রওনা হয়ে গেছেন ওরা। রকি বীচে আসার জন্যে।
হতে পারে।...এখন ভেবে দেখা দরকার, কি কি সূত্র আছে আমাদের হাতে? রোজারের কার্ডটা ভুয়া। প্রমাণ হয়ে গেছে। আর তার সহকারী:সহ...
চুপ হয়ে গেলে কিশোর। হাত এখনও রিসিভারে।
কি হল? কিছু ভাবছ মনে হয়?
হ্যারিসন রিভস! রোজার বলেছে, টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি ফক্সে কাজ করেছে নাকি লোকটা। সত্যি বলেছে?
কিশোরের কথা শেষ হওয়ার আগেই টেলিফোন ডিরেক্টরি টেনে নিল মুসা। খুঁজতে শুরু করল। ফিল্ম স্টুডিওর নামটা বের করতে সময় লাগল না। দেখাল। সেটা কিশোরকে।
ডায়াল করল কিশোর। অপারেটরকে জিজ্ঞেস করল হ্যারিসন রিভসের নাম। কিছুক্ষণ খাতা ঘাটাঘাটি করে অপারেটর জানাল, ওই নামে, কেউ নেই। কিশোরকে জিজ্ঞেস করা হল সে কে বলছে। বানিয়ে বলে দিল কিশোর, সে রিভসের খালাত ভাই। লস অ্যাঞ্জেলেসে বেড়াতে এসেছে। ভাইয়ের ঠিকানাটা খুব দরকার।
এত মিথ্যে বলতে পারো! বিড়বিড় করে বলল মুসা।
মাউথপীসে হাত রেখে তার দিকে তাকিয়ে কিশোর জিজ্ঞেস করল, কি বললে?
জবাব শোনার আগেই ওপাশ থেকে মহিলা বলল, আরেকটা রেজিস্টার খুঁজে দেখলাম। নেই। ওই নামের কেউ নেই টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চরি ফক্সে।
তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে লাইন কেটে দিল কিশোর।

নেই। কোন সূত্রও পেলাম না, যা দিয়ে শুরু করতে পারি। দুজন লোক যেমন রহস্যজনক ভাবে দেখা দিল, তেমনি ভাবেই গায়েব হয়ে গেল আবার। সেই সঙ্গে ডলিও গায়েব।
ওই পিজা শ্যাকে আরেকবার গেলে কেমন হয়? খাওয়াও যাবে, শোনাও যাবে। ডলির পার্টিতে যারা গিয়েছিল তাদের কাউকে পেলে জিজ্ঞেস করতে পারতাম, ডলির খোঁজ জানে কিনা। রোজার আর তার হাঁদা সহকারীটার কথাও কিছু জানতে পারে।
সফল হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। তবে একেবারে কিছু না পাওয়ার চেয়ে রাজি হয়ে গেল কিশোর। বেরিয়ে এল দুজনে। সাইকেল নিয়ে চলল পিজা শ্যাকে। রবিনকে ফোন করল না ইচ্ছে করেই। জানে, করলেও লাভ হবে না। কারণ অনেক দিন পর লাইব্রেরিতে গেছে রবিন। সেখান থেকে যাবে তার চাকরির জায়গায়, মিউজিক কোম্পানিতে।
পিজা শ্যাকে পৌঁছল দুজনে।
একই রকম ভাবে মিউজিক বাজছে, জোরে জোরে। ভিডিও গেম খেলছে ছেলেমেয়েরা। হৈ চৈ করছে। ছোট ছোট টেবিল ঘিরে বসে খাচ্ছে অনেকে। অর্থহীন কথার ফুলঝুরি ছোটাচ্ছে।
সেদিন পার্টিতে গিয়েছিল এরকম একটা ছেলে কিশোর আর মুসাকে দেখেই চিনল।
অ্যাই! হাত নেড়ে ডাকল সে। হাসল। তার কাছে গিয়ে বসতে বলল। চিনতে পার? সেদিন পার্টিতে দেখা হয়েছিল। তো, আছ কেমন?
আছি একরকম, জবাব দিল কিশোর। ডলিকে খুঁজতে এলাম।
ডলি? ও আচ্ছা, বেটির কথা বলছ। কি হয় তোমার? বোন?
না। কিছু হয় না।
ও, কিছুটা অবাকই হলো যেন ছেলেটা।
তার পাশের চেয়ারটায় বসল কিশোর। মুসা বসল উল্টো দিকে, ওদের দিকে মুখ করে।
চেশায়ার স্কোয়্যার থেকে নিখোঁজ হয়েছে ভলি, ছেলেটাকে জানাল কিশোর। আমাদের ধারণা, কিডন্যাপ করা হয়েছে।
হাঁ হয়ে গেল ছেলেটা। যাহ,ঠাট্টা করছ।
মাথা নাড়ল কিশোর। আজ সকালেও লেসিং হাউসে ছিল ডলি। দারোয়ানের সঙ্গে কথা বলেছে। রোজার দেখা করতে এল তার সঙ্গে। সাথে করে রিভসকেও এনেছিল। তারপর থেকে আর পাওয়া যাচ্ছে না মেয়েটাকে।

এক সেকেণ্ড চুপ করে রইল ছেলেটা। তারপর চেঁচিয়ে ডাকল, অ্যাই, শুনে যাও তোমরা। এরা কি বলছে শুনে যাও।

বন্ধ হয়ে গেল ভিডিও মেশিন। সরাই এসে ঘিরে দাঁড়াল কিশোরদেরকে, গল্প শোনার জন্যে। কাউন্টারের ওপাশে ওয়েইট্রেস মহিলাও গলা বাড়াল।

ডলির নিখোঁজ হওয়ার ঘটনাটা খুলে বলল কিশোর। খুঁটিনাটি কিছুই বাদ না দিয়ে। শেষে বলল, রোজার আর রিভস তাকে কিডন্যাপ করে নিয়ে যেতে পারে। রোজারের সঙ্গে নিশ্চয় তোমাদের কারও কারও পরিচয় হয়েছে। লোকটা একটা ভুয়া। নামটাও আসল কিনা সন্দেহ আছে। ফলে তাকে ধরাটাও মুশকিল। তোমাদের কারও কি কিছু জানা আছে?

চুপ করে আছে সবাই।

দরজা খুলে ঢুকলেন ধূসর চুলওয়ালা লোকটা। ম্যানেজার। কিশোর আর মুসাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন ছেলেমেয়েদেরকে।

কি হয়েছে? ওয়েইট্রেসকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

ওদের বন্ধুর কথা আলোচনা করছে, মিস্টার জেনসেন, মহিলা বলল। এত সুন্দর একটা মেয়ে, হারিয়ে গেল। কত আসত এখানে। ভিডিও গেম খেলত। সবার সঙ্গে হাসিঠাট্টা করত। ওরা বলছে, ওকে নাকি তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

কিডন্যাপ? ভুরু কুঁচকে গেল ম্যানেজারের।

তাই তো বলছে।

মহিলার দিকে ঘুরে তাকাল কিশোর। রোজার সম্পর্কে আপনি কিছু জানেন? এখান থেকে অনেক পিজা নিয়েছিল।

মাথা ঝাঁকাল মহিলা। বিশেষ কিছু জানি না। তবে ওকে পছন্দ হয়নি আমার। এদের বন্ধু হওয়ার বয়েস নয় ওর।

হলিউডের অনেক বড় প্রযোজক ও, একটা ছেলে বলল। ও নিজেই বলেছে। বেটির অনেক প্রশংসা করে বলেছে, ও নাকি অভিনয়ে সাড়া জাগাতে পারবে।

এখানেই দেখা করেছে? কিশোর জানতে চাইল।

হ্যাঁ। সাথে করে নিয়ে এসেছে বোকা লোকটাকে। আলাদা হয়ে গিয়ে ফিসফাস করে কথা বলেছে রেটির সঙ্গে। এমন ভান করেছে যেন বেটিকে পেয়ে হাতে সোনার বার পেয়ে গেছে।

ভিড় সরিয়ে এগিয়ে এল একটা মেয়ে। একটা চেয়ার খালি রয়েছে, তাতে বসল।

বেটির মাথায়ও বোধহয় ছিটটিট আছে। বাস্তবতা বোঝে না, কল্পনার রাজ্যে ঘুরে বেড়ায়। কি বলছি বুঝতে পারছ? ওর ধারণা, ও ভাল অভিনেত্রী হতে পারবে। কাজেই লোকটা এসে যখন বলল, লাফিয়ে উঠল একেবারে। তারপর আর কি? লোকগুলোর সঙ্গে খাতির করে ফেলল। একসাথে বসে পিজা খেতে লাগল।

লোকগুলো অনেকক্ষণ কথাটথা বলার পর আমাদের সবাইকে ডেকে বলল, বেটসির নতুন কাজটাকে সেলিব্রেট করার জন্যে একটা পার্টি দেবে।
বুঝলাম না,মুসা বলল। সবাইকে দাওয়াত করতে গেল কেন?
ওসব এক ধরনের চালিয়াতি। হয়ত ভেবেছে, এরকম ধুমধাম করলে বেটি তাকে বিশ্বাস করবে। কোন সন্দেহ থাকবে না। সবাইকে নিয়ে হৈ-হুঁল্লোড় করলে। তাড়াতাড়ি সহজ হয়ে আসবে বেটি।
কিশোর আর মুসার মুখের দিকে তাকাল মেয়েটা। কেন যেন মনে হচ্ছে, মিস লেসিঙের বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্যেই ওকাজ করেছে লোকটা। একা নিয়ে যেতে চাইলে নতুন পরিচিত একজনের সঙ্গে যেতে যদি রাজি না হয় বেটি, সে জন্যেই সবাইকে নিয়ে গেছে। পঞ্চাশ জনের কম ছিল না।...ইয়ে, সত্যিই হারিয়ে। গেছে বেটি?
মাথা ঝাঁকাল কিশোর।
চিন্তিত দেখাল মেয়েটাকে। বিউটি পারলারে, যেখানে সে কাজ করে, টেলিফোন করেছিলাম। ওরা জানাল, আজ নাকি যায়নি। আর বেশ গরম গরম কথাই শুনিয়ে দিল। ওর বাবা-মা কোথায় এখন?
তারা ফ্রেনসোতে ফিরে গিয়েছিলেন, কিশোর বলল। আবার হয়ত রওনা হয়ে পড়েছেন এখানে আসার জন্যে। বাড়িতে ফোন করেছিলাম। পাইনি।
লোকটার নাম রোজার নয় কেন মনে হলো তোমার? ভিড়ের মধ্য থেকে জিজ্ঞেস করল একটা ছেলে।
কারণ আজ সকালে আসল ইয়ান রোজারের সঙ্গে দেখা হয়েছে আমাদের।
রোজার? লোকটা তার নাম রোজার বলেছে? কিন্তু তার দোস্ত তো অন্য নামে। ডাকছিল। অদ্ভুত একটা নাম!
ডেগি, বলল আরেকটা মেয়ে। হ্যাঁ, ডেগি বলেই ডাকছিল।
ডেগি? কাউন্টারের ওপাশ থেকে বলে উঠলেন ম্যানেজার।
সবাই ফিরে তাকাল তার দিকে।
ডেগি! গম্ভীর হয়ে গেছেন মিস্টার জেনসেন। এটা কি রকম নাম হলো? মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, ওরকম নামের একটা লোক ভাল হতেই পারে না। খারাপ লোক। খুব খারাপ। এত সুন্দর মেয়েটাকে ধরে নিয়ে গেল! কোন্ দুনিয়ায় বাস করছি আমরা।
তার সঙ্গে একমত হলো অনেকেই।
কিশোর আর মুসা অপেক্ষা করতে লাগল। ভুয়া চিত্র প্রযোজকের সম্পর্কে আর কেউ কিছু মনে করতে পারে কিনা সে সুযোগ দিল।
কেউই কিছু বলতে পারল না আর।

.
রাতেই রকি বীচে পৌঁছলেন ডিকসনরা। ইয়ার্ডে এলেন সকাল আটটায়। বিধ্বস্ত চেহারা। চোখ লাল। চীফ ইয়ান ফ্লেচারের সঙ্গে দেখা করেই এসেছেন।
তাদের অবস্থাটা বুঝতে পারলেন মেরিচাচী। আদর করে বসিয়ে নাস্তা-টাস্তা এনে দিলেন। তবে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করলেন না। মেয়েকে ফিরে না পেলে অহেতুক সান্ত্বনা দিয়ে মা-বাবার মন শান্ত করা যাবে না।
কেউ কিছুই দেখেনি এটা বিশ্বাসই করতে পারছি না, ডিকসন বললেন। পড়শীদের সঙ্গে কথা বলেছেন চীফ। ওই লোকদুটোর সঙ্গে ডলিকে বেরোতে দেখেনি কেউ। রোজার যে গাড়িটা নিয়ে এসেছিল সেটা রেজিস্ট্রি করা হয়েছে জনৈক ডক সাইমারের নামে। সাইমার আবার বিক্রি করে দিয়েছে পিটারের কাছে। পিটার আর নিজের নামে রেজিস্ট্রি করায়নি। কাজেই লাইসেন্স নম্বরে সুবিধে হয়নি। গাড়িটা ধূসর রঙের, এটুকুই জানি আমরা। ডলি যেখানে চাকরি করত সেখানেও খোঁজ নিয়েছি। যে বুড়িটা জবাব দিল, সে ভাল করে কথাও বলতে চায়নি।
শেষ দিকের কথাগুলো তিক্ত শোনাল তাঁর।
মিস্টার ডিকসন, মেরিচাচী বললেন। আপনারা দুজনেই ক্লান্ত। কয়েকদিন এখানেই থেকে যান না? আমাদের ঘর আছে। থাকতে অসুবিধে হবে না। এ
ধন্যবাদ। তার দরকার হবে না, জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন ডিকসন। রকি বীচ ইনে ঘর ভাড়া করেছি আমরা। ওখানেই থাকতে পারব। চীফের ফোনের অপেক্ষা করব। বাড়িতে একজনকে রেখে এসেছি ফোন ধরার জন্যে। কিছু জানলে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জানাবে। কিডন্যাপাররা যদি ফোন করে, খবর দেবে। হয়ত মেয়েকে ছেড়ে দেয়ার বিনিময়ে কিছু টাকাটুকা চাইবে।
ঘোরের মধ্যে রয়েছেন যেন, এমন ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালেন মিসেস।
তুমি আর তোমার বন্ধুরা অনেক করেছ আমাদের জন্যে, কিশোরকে বললেন। ডিকসন। থ্যাঙ্কস।
স্ত্রীর হাত ধরে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি।
ওয়ার্কশপে চলে এল কিশোর। দুই সুড়ঙ্গ দিয়ে ঢুকল হেডকোয়ার্টারে। মুসা আর রবিন এসে বসে আছে।
ফাইলিং কেবিনেটে পিঠ দিয়ে মেঝেতে বসেছে মুসা। চোখে ঘুম। ডিকসনদের গাড়িটা দেখলাম অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। রবিনকে ফোন করলাম সে জন্যেই। আর কিছু ঘটেছে?
না, নিজের ডেস্কের ওপাশে গিয়ে বসল কিশোর। রকি বীচ ইনে উঠেছেন। ডিকসনরা। ডলির খোঁজ না পাওয়া পর্যন্ত যাবেন না।

খোঁজটা পেয়ে গেলেই ভাল, রবিন বলল। নোটবুক বের করল। দেখে নিয়ে। বলল, এ যাবৎ যা যা করেছি আমরা, কোনটাতেই ফল হয়নি। যেখানে শুরু সেখানেই শেষ, এই হয়ে যাচ্ছে অবস্থা।
অনেক কিছুই মিলছে না, কিশোর বলল। ওই লোকদুটো ডলিকে কিডন্যাপ করে নিয়ে যেতে পারে। ঠিক। কিন্তু সব কিছুর জন্যেই একটা মোটিভ লাগে। কেন নিল? উদ্দেশ্যটা কি? কিডন্যাপিং হলে মুক্তিপণ চাইছে না কেন? আর যদি নিয়েই থাকে নেয়ার অনেক সুযোগ পেয়েছে আগেই। কেন একটা পার্টি দিয়ে, লোক জানাজানি করে এরকম একটা কাজ করতে গেল?
দুহাতের আঙুলের মাথা এক করে ছোট একটা খাঁচার মত তৈরি করল সে। তারপর রয়েছে সেই রহস্যময় চোরটা। যে লেসিং হাউসে ঢুকেছিল, ডলির সঙ্গে রোজার আর রিভস দেখা করার আগেই। ওই দুজনেরই একজন চোরটা ছিল কিনা। কে জানে। তাহলে প্রশ্নঃ কেন ঢুকেছিল? ডলির জন্যে? নাকি লেসিং হাউস থেকে কিছু চুরি করতে?
কাকতালীয় না তো? রবিন বলল। সেই বন্ধকী দোকানের মায়ানেকড়েটার মত??
ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল মুসা। সারা দিন ধরে চিবালেও এই রহস্যের মধ্যে ছিবড়ে ছাড়া আর কিছু মিলবে না।
প্ল্যাস্টিকের সেই ব্যাগ, যেটা সৈকতে কুড়িয়ে পেয়েছিল ওরা, এখনও অফিসেই রয়েছে। চেশায়ার স্কোয়ারে ডলির সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার সময় ওটা নিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছিল। ফাইলিং কেবিনেটের ওপর থেকে নামিয়ে এনে ভেতরের জিনিসগুলো টেবিলে ঢেলে দিল রবিন। মেকাপের সরঞ্জাম, লাইব্রেরির বই আর খেলনা ভালুকটার দিকে এমন ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইল, যেন ওগুলো কোন সূত্র বলে দেবে। কিংবা বলবে ডলি এখন কোথায় আছে। কালো নিপ্রাণ দৃষ্টি মেলে ভালকটা তাকিয়ে রয়েছে ওর দিকে।
বইটা তুলে নিয়ে আনমনে পাতা ওল্টাতে লাগল কিশোর। কিছু কিছু পৃষ্ঠায় লেখার নিচে দাগ দেয়া রয়েছে। বিড়বিড় করে ইংরেজিতে যা পড়ল সে, তার বাংলা করলে দাঁড়ায়, প্রতি রাতে ঘুমানোর আগে সাফল্য, ভালবাসা, ধনী এই শব্দগুলো ঘন ঘন আওড়াবে। সূর্য যেমন উঠবেই, তেমনি নিশ্চিত করে জেনে রাখো, সাফল্য, ভালবাসা আর অগাধ সম্পদের মালিক হয়ে যাবে তুমি।
পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসল ওরা।
ভালুকটাকে চোখের সামনে নিয়ে এল মুসা। বলল, তুমিও এই বইয়ের কথা মেনে চলতে পার। ভাবতে থাকো, কাল থেকে গভীর বনের বাতাসে শ্বাস নেবে। বুক ভরে। কে জানে, কাল সকালেই হয়ত খেলনা ভালুক থেকে জ্যান্ত ভালুকে পরিণত হবে তুমি।

আরেকবার হেসে উঠল ওরা।
বাড়ি রওনা হয়ে গেল রবিন আর মুসা।
কিশোর বসেই রইল। বসে বসে ভাবতে লাগল। তাকিয়ে রয়েছে ভালুকটার। দিকে। তার মনে হচ্ছে, কোথাও কিছু একটা সূত্র অবশ্যই রয়েছে, যেটা চোখ। এড়িয়ে যাচ্ছে ওদের। ওটা পেয়ে গেলেই ডলিকে বের করার ব্যবস্থা করতে পারবে।
ব্যাগের ভেতরে আবার জিনিসগুলো ভরতে আরম্ভ করল সে।
হঠাৎ ট্রেলারের বাইরে কি যেন নড়ে উঠল।
থমকে গেল সে। কান পাতল। কি নড়ছে? জঞ্জালের ভেতর কোন ছোট জানোয়ার ঢুকল?
আবার শোনা গেল শব্দটা। এতই মৃদু, বাতাসের ফিসফিসানি বলেই মনে হয়। কিংবা কেউ রোধহয় নিঃশ্বাস ফেলল জোরে। ঘাপটি মেরে রয়েছে কিশোরের বেরোনোর অপেক্ষায়।
নাহ, দেখতে হচ্ছে।
আস্তে করে উঠে দাঁড়াল সে। ধাক্কা লেগে চেয়ারটা যাতে সরে গিয়ে শব্দ না হয়ে যায়, খেয়াল রাখল। ঘুরে চলে এল ডেস্কের আরেক পাশে। আবার কান পাতল।
নীরব হয়ে আছে। আর হচ্ছে না শব্দটা।
কোন জানোয়ারই হবে। ইঁদুর, বেড়াল, কিংবা ছুঁচো। কাঠবেরালিও হতে পারে। মাঝে মাঝেই ওগুলোকে ইয়ার্ডে ঢুকতে দেখেছে সে।
হেডকোয়ার্টার থেকে সব চেয়ে তাড়াতাড়ি বেরোনোর পথটা হল সহজ তিন। সেই পথ ধরে চত্বরে বোরোল সে। ছোট জানোয়ার কিংবা রহস্যময় অনুপ্রবেশকারীকে দেখার আশায় তাকাল এদিক ওদিক। দুই সুড়ঙ্গ দিয়ে আবার এসে ঢুকল হেডকোয়ার্টারে। প্রথমেই তাকাল টেবিলের দিকে, যেখানে ব্যাগটা রেখে গিয়েছে।
ওটা আছে জায়গামতই। কিন্তু একটা পরিবর্তন হয়ে গেছে ডেস্কের ওপর। টেলিফোনের কাছে খুলে রয়েছে একটা নোটপ্যাড। তারমানে সে যখন বাইরে বেরিয়েছিল, চুপ করে এখানে ঢুকে পড়েছিল কেউ। নোটপ্যাডটা খুলে দেখেছে ওটাতে কি লেখা রয়েছে। শিরশির করে উঠল মেরুদণ্ডের ভেতর।
তেমন জরুরী কিছু লেখা নেই। তবে কেউ একজন ঢুকেছিল এটা স্পষ্ট। হঠাৎ করেই টের পেয়ে গেল, যে ঢুকেছে, সে এখনও ভেতরেই রয়েছে।
স্থির হয়ে গেল কিশোর। বুঝতে পারছে, পেছনেই রয়েছে অনুপ্রবেশকারী। ছোট ডার্করুমটার দিকে পেছন করে আছে সে। দরজায় পর্দা ঝুলছে। তার ওপাশেই রয়েছে কেউ অপেক্ষা করছে..নিঃশ্বাস ফেলছে...

নিঃশ্বাসটা এতই ধীর, প্রথমে বুঝতেই পারেনি কিছু সে। আস্তে আস্তে জোরাল হয়েছে। শব্দটা অদ্ভুত। খসখসে। হালকা ভাবে কোন জিনিস সিরিশ কাগজে ঘষা হচ্ছে যেন।
খলখল করে একটা শয়তানী হাসি যেন ফেটে পড়ল ঘরের ভেতরে।
লাফ দিয়ে পর্দার কাছ থেকে সরে গেল কিশোর। চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে তাকাল।
টান দিয়ে সরিয়ে দেয়া হয়েছে পর্দা।
ভয়ঙ্কর একটা জিনিসের ওপর চোখ পড়ল তার। আঁশে ঢাকা শরীর। চোখা। দাঁত। চেহারার কোন আকৃতি নেই। গলে গলে পড়ছে মাংস। যেন হরর ছবি থেকে উঠে আসা জীবন্ত এক আতঙ্ক।
আবার হেসে উঠল ওটা। ঈগলের মত বাঁকা আঙুলওয়ালা একটা থাবা। বাড়িয়ে দিল কিশোরকে ধরার জন্যে।
সরার চেষ্টা করতে গিয়ে ডেস্কের সঙ্গে বাড়ি খেল সে। ঝট করে মাথা নামিয়ে ফেলল।
হাসতে হাসতেই আঘাত হানল বীভৎস প্রাণীটা।
আঘাতটা লাগল কিশোরের গায়ে। মনে হল, ধাতব ফাইলিং কেবিনেটটা ছুটে আসছে তার সঙ্গে মোলাকাত করার জন্যে।
-কপাল ঠুকে গেল ওটাতে। এরপর সব অন্ধকার।

.

ব্যাগটার জন্যেই এসেছিল, কিশোর বলল। হুঁশ ফিরতে দেখি ওটা নেই। চাচীকে যেদিন আলমারির ভেতরে আটক করেছিল, সেদিনও ওটা খুঁজতেই এসেছিল, ব্যাগটা নেই দেখে বুঝলাম। ওটার জন্যেই কিডন্যাপ করা হয়েছে ভলিকে। তারপর, আমাদের হেডকোয়ার্টারে ঢুকে ওটা পেয়ে নিয়ে চলে গেছে।
হুঁশ ফিরে পেয়েই দুই সহকারীকে ফোন করেছে গোয়েন্দাপ্রধান। ছুটে চলে এসেছে ওরা। বসে আছে এখন কিশোরের মুখোমুখি।
চেহারা এখনও ফ্যাকাসে হয়ে আছে কিশোরের। ধাক্কাটা পুরোপুরি. সামলে। উঠতে পারেনি। আর আমি গাধা, আবার বলল সে। কাজটা সহজ করে দিলাম তার জন্যে। সহজ তিনের পথ খুলে দিয়ে। ঘরে ঢুকে লুকিয়ে ছিল ওটা।
ভয়ানক কুৎসিত চেহারাটার কথা মনে হতেই গায়ে কাঁটা দিল তার।
মুসার মনে পড়ল বন্ধকী দোকানের সেই মায়ানেকড়ের চেহারার কথা। জিজ্ঞেস করল, একই চেহারার? ওই যে, সেদিন দেখেছিলাম, মায়ানেকড়ে?
না। অনেকটা শান্ত হয়ে এসেছে কিশোর। তবে একই লোক হতে পারে। মুখের রং ফিরতে শুরু করেছে তার। রোজার আর রিভস হরর ছবির ছাত্র। অন্তত ওদের

কথাবার্তায় সে রকমই মনে হয়েছে। সুতরাং ছদ্মবেশে অপরাধ যদি করতেই আসে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

তবে, রবিন বলল। লেসিং হাউসে যে চোরটা ঢুকেছিল, সে আর দশটা চোরের মতই সাধারণ। মোজা মাথায় গলিয়ে চেহারা ঢেকে অনেক চোরই চুরি করতে আসে।

ওই চোরটাকে সাধারণ ভাবতে পারছি না ডলির জন্যে। তার সঙ্গে কোনভাবে যোগাযোগ থাকতে পারে। কাজেই চোরটাও একই লোক হতে পারে।

ঠিক! একমত হল মুসা। কিন্তু দানবটা ব্যাগ নিল কেন? কি চায়? বন্ধকীর দোকানের রশিদগুলো?

যেগুলো বইয়ের ভেতরে রেখে দিয়েছিল ডলি? ভ্রূকুটি করল কিশোর। আমার তা মনে হয় না। যেসব জিনিস বন্ধক রেখেছে, একেবারেই সাধারণ। দাম আর কত। একটা আংটি, একটা মেডেল, আর একটা সোনার পিন। ওগুলো রেখে মাত্র কয়েকটা ডলার পেয়েছে ডলি। নাহ, ওই রশিদের পেছনে কেউ লাগেনি।

তাহলে কিসের জন্যে? বইটার জন্যে? উফ, মাথাই ধরে যাচ্ছে আমার।

ওই বই যে কোন লাইব্রেরিতে গেলেই মেলে, রবিন বলল। তবে বিশেষ ওই বইটাতে যদি কিছু লেখা থাকে তাহলে আলাদা কথা। নোটফোট লিখে থাকতে পারে ডলি। কিন্তু কিসের নোট? বয়েস কম। কোন অপরাধ করেছে বলে মনে হয় না। লুকানোর নিশ্চয় কিছু নেই। বাড়ি থেকে ওরকম অনেকেই পালায়। সে-ও পালিয়েছে। একটা উদ্দেশ্যও আছে তার। ছবিতে কাজ করতে চায়।

খেলনা ভালুক! আচমকা বলে উঠল কিশোর।

ওর দিকে তাকিয়ে রইল রবিন আর মুসা।

ওটার আবার কি হলো? জিজ্ঞেস করল মুসা।

ওটাই চায় তথাকথিত দানবটা, কিশোর বলল। সাধারণ খেলনা নয় ওটা। অন্যান্য টেডি বিয়ারগুলো বানানো হয় তুলো দিয়ে, কিন্তু ওটা আসল রোম।

তাতেই বা কি? যদি সবচেয়ে দামি মিংক দিয়েও বানানো হত, তাতেই বা কি হত? এমন কিছু দাম হত না যার জন্যে এতসব ঝামেলা করতে চাইবে কেউ।

হয়ত ভালুকটার ভেতর কিছু আছে।

এইবার বলেছ একটা কথা প্রায় চেঁচিয়ে উঠল রবিন। তাই হবে। রত্ন! অলঙ্কার। ড্রাগ! যেকোন জিনিস হতে পারে। রোজার আর রিভস জানে, একটা খেলনা ভালুকের ভেতরে সাংঘাতিক দামি কিছু লুকানো রয়েছে। সেটা খুঁজতে লেসিং হাউসেও গিয়েছিল, ডলির জন্যে পারেনি। সে দেখে ফেলে পুলিশে খবর দিয়েছিল। তারপর অন্যভাবে ঢুকেছে ওই বাড়িতে। খুঁজেছে, পায়নি। তখন ধরে। নিয়ে গেছে ওকে জিজ্ঞেস করার জন্যে। ও বলেছে ওটা আমাদের কাছে থাকতে

পারে। তখন এসেছে ইয়ার্ডে। আমাদের অনুসরণ করেই এখানকার ঠিকানা বের করেছে ওরা।
ওদিকে ডলিকে আটকে রেখেছে, যোগ করল মুসা। যাতে সে পুলিসকে বলে দিতে না পারে।
চমৎকার থিওরি, কিশোর বলল। সব খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে। এখন। বাথরুমের তোয়ালেতে রক্তের কথাটায় আসা যাক।
হ্যাঁ। ওটাও সহজ। জোরাজুরি করতে গিয়ে কেউ জখম হয়েছিল। কেটে গিয়ে রক্ত বেরিয়েছে। তোয়ালে দিয়ে মুছেছে তখন।
টগবগ করে ফুটতে আরম্ভ করেছে কিশোর। রিসিভার তুলে নিল। চকচক করছে চোখ। আমাদের এখন জানতে হবে খেলনাটা ডলির হাতে এল কিভাবে? এটা জানা জরুরী। হয়ত এর সাহায্যেই ওই রহস্যময় দানবকে ধরতে পারব। আমরা।
দ্রুত ডিরেক্টরির পাতা ওল্টাল কিপোর। এই যে, পেয়েছি। রকি বীচ ইন।
ওপাশ থেকে রিসিভার তুলতেই মিস্টার ডিকসনকে চাইল সে। তিনি ধরতে বললেন, কিশোর পাশা বলছি। একটা সূত্র বোধহয় পেয়েছি, যেটা কাজে লাগতে পারে। ডলির ব্যাগের খেলনা ভালুকটার কথা মনে আছে? ফ্রেনসো থেকে আসার সময় কি ওটা সঙ্গে নিয়েছিল? ভালুকটা আসল রোম দিয়ে তৈরি।
কি ভালুক?
টেডি বিয়ার।
এক মিনিট। নরিয়াকে জিজ্ঞেস করে দেখি।
ওপাশে আলোচনা চলছে, কথাগুলো বুঝতে পারল না কিশোর। একটু পরেই লাইনে ফিরে এলেন ডিকসন। না, সে-ও বলতে পারছে না। যতদূর জানি, কাপড় আর মেকআপের জিনিসগুলো ব্যাগে ভরেই বাড়ি ছেড়েছে ও। কেন?
আমরাও শিওর নই, মিস্টার ডিকসন। তবে ভালুকের ব্যাপারে জানাটা জরুরী হয়ে পড়েছে। যাই হোক, নতুন কিছু জানতে পারলে জানাব।
লাইন কেটে দিল কিশোর। সহকারীদেরকে বলল, ভালুকটা এখান থেকেই জোগাড় করেছে ও। কোত্থেকে, সেটা বের করব কিভাবে?
পিজা শ্যাক! রবিন বলল। ওখানকার ওরা কিছু জানতে পারে।
ঠিক বলেছ। ওখান থেকেই শুরু করতে পারি।
কয়েক মিনিট পরেই কোস্ট হাইওয়ে ধরে সাইকেল চালিয়ে চলল তিন। গোয়েন্দা। পিজা শ্যাকে ঢুকে কয়েকজন পরিচিতকে দেখল। ওরা হাত নাড়ল। কাউন্টারের ওপাশের মহিলা হাসল।
ওরা এলে খুব একটা খায়টায় না, হেসে মিস্টার জেনসেনকে বলল মহিলা। তবে ভাল ছেলে। ভদ্র।

মন্তব্য করলেন না ম্যানেজার। নজর রাখলেন তিন গোয়েন্দার দিকে। ওরা। ছেলেমেয়েদেরকে খেলনা ভালুকটার কথা জিজ্ঞেস করছে যে, সেটাও শুনলেন।
টেডি বিয়ার? একটা ছেলে বলল, কি বল! অতবড় একটা মেয়ে ব্যাগের ভেতর খেলনা বয়ে বেড়াবে?
এতে অবাকের কি আছে? গাঢ় লাল লিপস্টিক লাগানো একটা মেয়ে বলল। অনেকেই বয়েস হলেও বাচ্চাই থেকে যায়। অন্তত ছোটদের কিছু কিছু স্বভাব থেকে যায়। বেটিটা একটু পাগলাটে ধরনেরই। ওর পক্ষে সব সম্ভব। আমি দেখেছি ব্যাগে। জিজ্ঞেস করেছিলাম কোথায় পেয়েছে। বলেনি।
অনেক দিন ধরে ছিল তার কাছে? জানতে চাইল কিশোর।
শ্রাগ করল মেয়েটা। দুএক দিন হবে।
আর কেউ কিছু বলতে পারল না। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে পিজা শপ থেকে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা।
এবার? বেরিয়েই প্রশ্ন করল মুসা, আর কাকে জিজ্ঞেস করব?
খেলনার দোকানে যাওয়াই তো উচিত, জবাব দিল কিশোর।
গুঙিয়ে উঠল মুসা। জানো, কটা দোকান আছে?
জানি। গোয়েন্দাদের কাজটাই কঠিন।
পিজা শপ থেকে কোয়ার্টার মাইল দূরেই পাওয়া গেল প্রথম খেলনার দোকানটা। ওখান থেকেই শুরু করল তিন গোয়েন্দা। ওখানে ভালুকের সমাহার দেখে আরেকবার গোঙাল মুসা। খাইছে! কি করে জানব? এত ভালুক যারা বিক্রি করে তাদের কি আর মনে থাকবে?
দেখাই যাক না, কিশোর বলল। তবে এখানে জিজ্ঞেস করে লাভ হবে না। একটাও রোমশ ভালুক নেই। রোম দিয়ে তৈরি নয়, সব তুলো।
তবু, এসেছি যখন জিজ্ঞেস করেই যাই, রবিন বলল।
দোকানের মালিক এক মহিলা। একটা খেলনা ভালুকের খোঁজে বেরিয়েছে ওরা শুনে একটু অবাকই হল। কিশোর বলল, আসল রোম। মিংক হতে পারে।
এতটাই দামি?
কি জানি, বুঝতে পারছি না। গাঢ় রঙের রোম। আমাদের এক বন্ধুর কাছে। দেখেছি। এখান থেকেই কিনে নিল কিনা জানতে এসেছিলাম।
না। এখানে ওরকম জিনিস পাবে না। সান্তা মনিকায় চলে যাও। বন্দরের ধারে কয়েকটা বড় বড় দোকান আছে। দামি খেলনা বিক্রি করে একমাত্র ওরাই। আর ওদের কাছে যদি না থাকে, বলে দিতে পারবে কোথায় পাওয়া যাবে।
সাইকেল রেখে বাসে করে সান্তা মনিকায় এল তিন গোয়েন্দা। বন্দরের কাছে প্রথম যে দোকানটা দেখল, ওটাতেই ঢুকল। পরে এক এক করে বাকিগুলোতে

ঘুরবে। অনেক ধরনের খেলনা ভালুক দেখতে পেল ওখানে। মিংকের তৈরি টেডি বিয়ার অবশ্য পেল না।
অল্প বয়েসী একটা সুন্দরী মেয়ে কাউন্টারে রয়েছে। সে ওদেরকে বলল, বেভারলি হিলের খেলনার দোকানগুলোতে খোঁজ নিতে। ওখানে নাকি মিংকের তৈরি টেডি ভালুক বিক্রি হয়। কয়েকটা দোকানের নাম ঠিকানাও দিল।
তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আবার রাস্তায় বেরোল ছেলেরা। একটা অডি গাড়ি চলে গেল সামনে দিয়ে। তারপর রাস্তা পেরিয়ে বাসস্টপে চলে এল ওরা। ধপাস করে বেঞ্চের ওপর বসে পড়ল মুসা। হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, হবে না এভাবে। বুঝলে, হবে না। সারা জীবন ধরে খুঁজলেও পাব না।
হবে, কিশোর, অতটা নিরাশ হতে পারল না। তবে বাসে করে ঘুরে কূল করতে পারব না। একটা গাড়ি লাগবে।

.

রোলস রয়েস নিয়ে হাজির হয়ে গেল হ্যানসন। তিন গোয়েন্দাকে বেভারলি হিলে নিয়ে গেল। পার্ক করল বেভারলি ড্রাইভের একটা লোডিং জোনে।
আমি এখানেই থাকি, বলল সে। দরকার হলে ডাকবে। বাড়িটা ঘুরেই গাড়ি বের করে নিয়ে যেতে পারব।
দুজন মহিলা হেঁটে চলল। একজনের হাতে একটা গাইডবুক। অন্যজনকে বলল, এই, শোন, এখানকার সব চেয়ে সম্ভ্রান্ত অঞ্চল বেভারলি হিল। অনেক দামি দামি ফিল স্টারের বাড়ি এখানে। দোকানপাটগুলো... সাড়া না পেয়ে পেছনে তাকিয়ে মাঝ পথে কথা থামিয়ে দিল সে।
ইরিনা! চিৎকার করে উঠল সে। গাড়িটা কি দেখেছ! তোলো তোলো, ছবি তোলো।
দেখেও না দেখার ভান করল হ্যানসন। হেঁটে যাচ্ছে তিন গোয়েন্দা। ঝট করে ক্যামেরা তুলে রোলস রয়েসটার একটা ছবি তুলে ফেলল ইরিনা।
যেখানে গাড়িটা পার্ক করা হয়েছে তার কাছেই পাওয়া গেল দুটো খেলনার দোকান। প্রথমটাতে খুঁজে কিছু পেল না গোয়েন্দারা। পরেরটাতে চামড়ার প্যান্ট পরা একজন লম্বা লোক জানাল একটা মিংকের তৈরি টেডি বিয়ার দেখেছে।
বিক্রির জন্যে ছিল না অবশ্য ওটা, লোকটা বলল। আমাদের একজন। কাস্টোমার বোনাস হিসেবে পেয়েছে ওটা। উইলশায়ারের কোণের একটা দোকান। থেকে একটা ফারের জ্যাকেট কিনেছিল। জ্যাকেটটা তার বাড়িতে ডেলিভারি। দেয়ার সময় ভালুকটা চলে গেছে ওটার সঙ্গে। দোকানের তরফ থেকে উপহার।
ও, কিশোর বলল।

ওখান থেকে ইচ্ছে করলে ওরকম ভালুক কিনতে পারো। যদি আরও থাকে।
থ্যাঙ্ক ইউ।
অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস আমাদের কাছেও আছে। দরকার হলে চলে। এসো। এই ধরো না মাউজ হাউসের কথাই। অনেক আছে আমাদের।
কেন? মুসা জানতে চাইল, ইঁদুর পোষার জন্যে?
খেলনা ইঁদুর। বেভারলি হিলে জ্যান্ত ইঁদুর রাখা নিষিদ্ধ।
নাক মুখ কুঁচকে এমন একটা ভঙ্গি করল মুসা, যেন বোঝাতে চাইল, সবখানেই পাগল থাকে। নইলে খেলনা ইঁদুরের আবার বাড়ি কেন?
গাড়িতে ফিরে এল ওরা। একজন পথচারীকে বোঝাচ্ছে হ্যানসন, গাড়িটা, ছবিতে ব্যবহারের জন্য তৈরি হয়নি। বিশ্বাস করাতে পারছে না লোকটাকে। তিন গোয়েন্দাকে দেখে হাঁপ ছেড়ে বাচল। তাড়াতাড়ি ওদেরকে তুলে নিয়ে ছেড়ে দিল। গাড়ি। উইলশায়ারের দিকে যেতে যেতে বলল, বেভারলি ড্রাইভ আস্তে আস্তে পর্যটন কেন্দ্র হয়ে যাচ্ছে। ট্যুরিস্টদের উৎপাত বাড়ছে।
কয়েকবার করে আমাকে সহ গাড়িটার ছবি তুলে নিয়ে গেছে কয়েকজনে, জানাল সে। লোকের ধারণা, আমি ফিল্ম স্টার।
লোকের দোষ নেই, রবিন বলল। গাড়িটা যেমন চোখে পড়ার মত। আপনার ইউনিফর্ম তেমনি। এমনকি বেভারলি হিলের জন্যেও অস্বাভাবিক।
অস্বীকার করছি না, হেসে বলল হ্যানসন।
উইলশায়ারের কোণের দোকানটার নাম উচ্চারণ করাই কঠিনঃ, অনস্কি ফ্রেরিজ। সাদাটে ধূসর দেয়াল, ধূসর কার্পেটে গোড়ালি দেবে যায়। ছেলেরা ঢুকে দেখল, গলায় দরজির ফিতে ঝোলানো একজন লোক যুবক বয়েসী একজনকে বোঝানোর চেষ্টা করছে। কিছুতেই বুঝতে চাইছে না যুবক। মুখ গোমড়া করে একনাগাড়ে অভিযোগ করে চলেছে। ভ্যাকুয়াম ক্লিনার ভাল না হলে সে কিভাবে। কাজ করবে?
টেডি বিয়ার? কিশোরের প্রশ্ন শুনে লোকটা বলল। কিছু ভালুক ছিল আমার কাছে। তবে এখন একটাও নেই। সব নিয়ে গেছে।
নিয়ে গেছে?
চুরি। ও জানো না? জানবেই বা কি করে। পত্রিকায় ছাপা হয়নি। চুরিদারি আজকাল আর কোন ব্যাপারই না।
উত্তেজিত হলো কিশোর। চুরি? কবে?
প্রথমে কিছু ফরি চুরি করেছে। হপ্তাখানেক আগে। তারপর চারদিন আগে কিছু রেকর্ড চুরি করে নিয়ে গেছে। কেন? তোমার এসব জানার আগ্রহ কেন? খেলনা ভালুক চাও তো? খেলনার দোকানে চলে গেলেই পারো।

কিন্তু আমার বন্ধুরটা ছিল ফারের ভালুক। আসল রোমের তৈরি, বুঝতেই পারছেন। আমার কাছে রেখে গিয়েছিল। কে জানি আমাদের বাড়িতে ঢুকে নিয়ে গেছে।
মাথা ঝাঁকাল লোকটা। ঠিক আমার দোকানে যা ঘটেছে। পয়লা বার যখন চুরি করল, ফারের সঙ্গে খেলনাগুলোও নিয়ে গেল। তারপর এল আমার ফাইল ঘাঁটাঘাঁটি করতে। সারা মেঝেতে ছড়িয়ে ফেলে গেল। কিছু কাগজ এখনও পাচ্ছি না। ফারগুলো ভাগ্যিস বীমা করানো ছিল। ওগুলো নিয়েছে, নাহয় বুঝলাম দামি জিনিস বলে। কাগজপত্র ঘাটল কেন? সব শয়তানী। আসলে কাজের লোকের ওপর বোধহয় রাগ আছে। ফলে যারা কাজ করে খেতে চায় তাদের সঙ্গে নষ্টামি শুরু করেছে।
এটা যুক্তির কথা নয়। তবু কিশোর বলল, হবে হয়ত।
সকেট থেকে প্লাগ খুলে যন্ত্র নিয়ে পেছনের ঘরে চলে গেল যুবক।
ওই যে দেখ না, যুবকের কথা বলল লোকটা। এর কথাই ধরো। সে সৎও। হতে পারে আবার অসৎও হতে পারে, কি করে বুঝবে? কেবল অনুমান করতে পার। আর কিছু করার নেই। এ তো কাজটা অন্তত ঠিকভাবে করে, আগেরটা তা ও করত না। ওকে কাজ করতে বলতাম, চুপ করে থাকত। যা-ই বলতাম, কিছুই বলত না। এর চেয়ে কবর থেকে একটা লাশকে তুলে নিয়ে এসে যদি বকাঝকা কুরতাম, কাজ হত। তবে সিনেমার ব্যাপারে বেশ ভাল জ্ঞান ছিল। আমি সিনেমা দিয়ে কি করব, বল?
উত্তেজনা বাড়ল কিশোরের। এমনকি পেছনে মুসাও আগ্রহী হয়ে উঠেছে। গলা বাড়িয়ে দিয়েছে রবিন, যাতে দোকানদারের একটা কথাও কান না এড়ায়।
সিনেমায় কাজ করত? কিশোর জিজ্ঞেস করল, হরর ছবির ব্যাপারে কিছু জানত কি?
তুমি কি করে বুঝলে? জানত! অবশ্যই জানত! ড্রাকুলা! মায়ানেকড়ে! কবর থেকে উঠে আসা নানারকম পিশাচ, যারা মানুষের কলজে খায়! বিচ্ছিরি সব ভাবনাচিন্তা!।
হঠাৎ ভুরু কুঁচকে ফেলল লোকটা। সন্দেহ দেখা দিল চোখে। লোকটাকে চেন নাকি? তোমরা কারা? কি চাও?
আমরা...আমরা আমাদের বন্ধুকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি, সাবধানে বলল কিশোর। ভালুকটা তারই ছিল। হারিয়ে গেছে সে। তাকে উদ্ধার করা খুব। জরুরী। অনুরোধ করল সে। প্লীজ! একটা উপকার করুন। লোকটাকে কিভাবে জোগাড় করেছেন, বলবেন? কোন এজেন্সির মাধ্যমে?

ভ্রূকুটি করল লোকটা। এমনি এসে হাজির হলো একদিন। একটা চাকরি চাইল। খুব নাকি দরকার। যেকোন কাজ করতে রাজি।
চুরির আগে এসেছিল, না পরে? গেছে কবে? কতদিন কাজ করেছে?
দুদিনও করেনি। কোনমতে তাকে দিয়ে কাজ করাতে না পেরে শেষে বিদেয়। করে দিয়েছে। হপ্তা দুই আগের কথা সেটা। ওসব শুনে তোমার লাভ হবে না।
লোকটার ঠিকানা জানেন? চাপাচাপি শুরু করল কিশোর। কোথায় থাকে? কি নাম বলেছে? মিসেস লেসিংকে চেনেন? চেশায়ার স্কোয়্যারে থাকেন? তিনি আপনার কাস্টোমার?
বাহ! এবার আমার কাস্টোমারদের কথাও জানতে চায়? আরও সন্দিহান হয়ে। উঠল লোকটা। মতলবটা কি তোমার? যাবে, না পুলিশ ডাকব?
প্লীজ, আপনি বুঝতে পারছেন না! ব্যাপারটা জানা খুবই জরুরী। গড়গড় করে ডলির গল্প বলতে আরম্ভ করল কিশোর। কি করে বাড়ি থেকে পালিয়ে ছিল, কি করে ওরা খুঁজে বের করেছিল, কি করে লেসিং হাউসে চাকরি নিয়েছে, বলল। ওর ব্যাগের খেলনা ভালুকটার কথাও বলল। বলল তার উদ্বিগ্ন মা-বাবার কথা। শেষে বলল, মনে হয়, মেয়েটাকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। আর এর সঙ্গে ভালুকটার যোগাযোগ থাকতে পারে।
পুরো গল্পটা শোনার পরেও সন্দেহ গেল না লোকটার। বলল, একজন মিস লেসিংকে চেনে। যে লোকটা দুদিন থেকে চলে গেছে তার নাম-ঠিকানা জানার জন্যে চাপাচাপি করতে লাগল কিশোর। কিছুতেই তাকে নিরস্ত করতে না পেরে রেগেমেগে শেষে গিয়ে পেছনের ঘর থেকে কতগুলো কাগজপত্র নিয়ে এল লোকটা।
একটা অফিশিয়াল ফর্ম রয়েছে ফাইলে, যেটা সরকারের কাছে জমা দেয় কর্মচারীরা। নাম আছে, সোশাল সিকিউরিটি নাম্বার আছে। জ্যাক ব্রাউন নামে ফর্ম পূরণ করেছে। আরেকটা কাগজ দেখাল দোকানদার, ওটাতে নিজের হাতে নাম ঠিকানা লিখেছে ব্রাউন।
টাকা নিয়ে যায়নি, লোকটা বলল। যে দুদিন কাজ করেছে, তার চেক ডাকে পাঠিয়ে দিয়েছি।
ফেরত এসেছে?
না।
এই ব্রাউন লোকটা দেখতে কেমন? রোগাপাতলা, কান ঢেকে ফেলা লম্বা। চুল। তাই না?
না। বেঁটে। পেটমোটা, হোঁকাই বলা চলে। ছোট করে হাঁটা কালো চুল। কোকড়া।
দেখ, আমার এসব পছন্দ হচ্ছে না

আর একটা কথা, হাত তুলল কিশোর। টেডি বিয়ারটা কোথায় পেয়েছিলেন? আপনি তৈরি করেননি, তাই না?
না। একজন ডিলারের কাছ থেকে কিনেছি। এইচ. কে. ইমপোর্টারস।
সেটা মিসেস. লেসিংকে দিয়েছিলেন?
আর সহ্য করল না দোকানদার। বেরোও!
দোকান থেকে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা। বেরোনোর আগে লক্ষ্য করল, রিসিভার তুলে ডায়াল করছে লোকটা।
পুলিশকে ফোন করছে, অনুমান করল মুসা।
শুনলই না যেন কিশোর। মোড়ের কাছে পৌঁছল। মেরুন রঙের একটা অডি গাড়িকে দেখল সরে যাচ্ছে। রাস্তা পেরিয়ে অন্য পাশে এল ওরা। রোলস রয়েস। নিয়ে যেখানে অপেক্ষা করছে হ্যানসন।
কিশোর বলল, ফারের একটা পোশাক কিনেছিলেন মিস লেসিং। সেই সাথে গিয়েছিল মিংকের ভালুকটা। তিনি ইউরোপে চলে গেলে ভালুকটা পেয়েছিল ডলি। কিংবা হয়ত চেয়েছিল, দিয়ে দিয়েছেন মিস লেসিং। বিনে পয়সায় পেয়েছেন তিনি। ওটা। খেলনা দিয়ে কি করবেন? মেয়েটা যখন চেয়েছে, দিয়েই দিই, এরকম ভেবেই হয়ত দিয়েছেন। এইবার আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে দোকানদারের অলস কর্মচারীকে।
ঠিকানাটা মনে আছে তো? জিজ্ঞেস করল রবিন। যদিও জানে কিশোর। পাশা একবার কোন জিনিস পড়লে সহজে ভোলে না।
আছে। সান্তা মনিকার একটা গলিতে। একটা অ্যাপার্টমেন্ট নাম্বার রয়েছে। তার মানে কোন অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিঙে তার বাসা।
নামটাও বানিয়ে লিখতে পারে, আশাবাদী হতে পারছে না মুসা, ঠিকানাটাও। অহেতুক গিয়ে ঘুরে আসব তাহলে।
হাসল কিশোর। একটা কথা ভুলে যাচ্ছ। বেতনের চেক পাঠিয়েছিল দোকানদার। সেটা ফেরত আসেনি। তারমানে সান্তা মনিকার ওই ঠিকানায় কেউ আছে যে ওটা গ্রহণ করেছে। হাত নেড়ে বলল, এখন আমাদের কাজ, চেকটা যে নিয়েছে, তাকে খুঁজে বের করা। হয়ত এর ওপর নির্ভর করছে ডলির বাঁচামরা!

.

বাড়িটা খুঁজে বের করতে অসুবিধে হল না। সাগরের তীর থেকে দশ ব্লক দূরে। একটা অ্যাপার্টমেন্ট বাড়ির নিচতলায় জ্যাক ব্রাউনের ঘর।
দ্বিধা করল মুসা। কি করব?
বেল বাজাব, কিশোর বলল।
কিন্তু কলিং বেলের জবাব দিল না কেউ।

মিনিট দুই অপেক্ষা করে জানালার কাছে নাক চেপে ধরল রবিন। বই আর, কাগজপত্রে ঠাসা, গাদাগাদি করে রয়েছে মেঝেতে, পুরানো আসবাবপত্রের ওপরে। ছবির ফিল্ম রাখার কয়েকটা ক্যানূ পড়ে রয়েছে একধারে। বুককেসের ওপর একটা মানুষের খুলি। খুলির ওপরের দেয়ালে একটা পোস্টার। কালচে রঙের একটা কিম্ভুত জীবের ছবি, মুখটা সবুজ। কবর থেকে বেরিয়ে আসছে।

থার্ড অ্যানুয়াল কনভেনশন! বিড়বিড় করে পড়ল রবিন, পোস্টারের ওপরের লেখাটা। হরর ফ্যান ক্লাব অভ নর্থ আমেরিকা। আগস্ট ফোরটিন অ্যাণ্ড ফিফটিন, সান্তা মনিকা সিভিক অডিটরিয়াম!

ফিরে তাকিয়ে বলল, ঠিক জায়গায় এসেছি আমরা!

অ্যাই, কি করছ? সামনের বাগানের কাছ থেকে বলে উঠল একটা কণ্ঠ।

ফিরে তাকাল ছেলেরা। লাল চুল এক মহিলা। মিস্টার রিভসকে খুঁজছ, না? লোকটার ম্যানেজার হবে মনে হয় মহিলা।

তার বন্ধু জ্যাক ব্রাউনকে হলেও চলবে, কিশোর, বলল। উত্তেজিত হয়ে উঠেছে।

ব্রাউন? চিনি না। তবে ওই নামটা নিজের লেটার বক্সে কদিন ধরে লাগিয়ে রেখেছেন মিস্টার রিভস। এখন তো বাড়ি নেই। ছুটিতে বেড়াতে গেছেন। কিছু বলতে হবে?

না। থ্যাঙ্ক ইউ। পকেট থেকে নোটবুক বের করল কিশোর। ব্রাউনের ব্যাপারে কিছুই জানেন না?

মাথা নাড়ল মহিলা। না। কখনও দেখিনি। হতে পারে, কিছু দিন ছিল মিস্টার রিভসের সঙ্গে। ওই মিস্টার কেইনের মত।

মিস্টার কেইন? উত্তেজনায় কাঁপতে আরম্ভ করেছে কিশোর। লম্বা চুলওয়ালা। সেই মানুষটা? চুলে কান ঢেকে যায় যে?

হ্যাঁ। ডেগি কেইন।

ডেগি!

হ্যাঁ। আমার কাজ আছে। মিস্টার রিভসকে কিছু বলতে হবে?

খসখস করে নোটবুকে ফোন নম্বর আর ঠিকানা লিখে বাড়িয়ে দিয়ে কিশোর বলল, আমার কাছে কিছু পুরানো সিনেমার পোস্টার আছে। কিনতে চাইলে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলবেন মিস্টার রিভসকে। তার অফিসের নম্বর আছে?

না, নেই, এখন কোথাও কাজ করেন না। কয়েক হপ্তা আগে একটা স্টুডিওতে। করতেন, চোখে কৌতূহল নিয়ে কিশোরের দিকে তাকাল মহিলা। তাহলে তুমিও ওদেরই একজন?

মানে?

উদ্ভট জিনিস সংগ্রহ কর? মিস্টার রিভসের মত কি যে আজেবাজে জিনিস যোগাড় করে! ওসব কিনে পয়সা খরচ করে ফেলে। অনেক সময় না খেয়েও থাকে। তোমার বয়েস কম। ওসবে জড়িয়ে অহেতুক জীবনটা নষ্ট কোরো না।
বাড়ির ভেতরে টেলিফোন বাজল। জবাব দিতে গেল মহিলা।
রিভস তাহলে একজন সংগ্রাহক, কিশোর বলল। আগেই বোঝা উচিত ছিল। ডেগি কেইন ছিল কিছুদিন ওর সঙ্গে। আর কেইন যদি রোজারের ছদ্মনাম হয়ে থাকে, তাহলে বলতে হবে অগ্রগতি হচ্ছে আমাদের।
পুলিসকে জানাব? মুসার প্রশ্ন। নাকি বসে থাকব। রিভস ফিরতে পারে। সংগ্রাহকরা তাদের জিনিসের জন্যে ফিরে আসে, তাই না?
আসে। ইউ অক্ষরের আকৃতিতে তৈরি বাড়িটার দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। ঢোকার জায়গা খুজছে মনে হয়। এগিয়ে গিয়ে একটা দরজার ফাঁকে সবে চোখ রাখতে যাবে, এই সময় একটা লোককে আসতে দেখল।
মুসা বলল, আরে! ওই তো, মিস্টার রিভস!
কালো কোঁকড়া চুলওয়ালা একজন লোক, রোজারের সঙ্গে ছিল ডলির। পার্টিতে। তিন গোয়েন্দাকে দেখেই চিনল। থমকে গেল মুহূর্তের জন্যে। তারপর এগিয়ে এল। বাহ, আবার দেখা হয়ে গেল। তা কি জন্যে এসেছ?
ডলি ডিকসনের জন্যে, শান্ত কণ্ঠে বলল কিশোর। কিংবা বলতে পারেন। বেটসি আরিয়াগোর জন্যে।
ওর..ওর কি হলো?
হারিয়ে গেছে। আপনি ভাল করেই জানেন। ইয়ান রোজার নামের লোকটা…
রোজার? ওর আবার কি হল?
ওর নাম রোজার নয়। কোথায় আছে দয়া করে যদি বলেন গিয়ে কথা বলে। দেখতে পারি। আর
কিশোরের এসব নরম কথা ভাল লাগল না মুসার। খপ করে লোকটার হাত চেপে ধরে বলল, লোকটা কোথায়? ডলি ডিকসন কোথায়? ভাল চাইলে জলদি বলুন!
কি বলছ তাই তো বুঝতে পারছি না। ঘামতে শুরু করেছে লোকটা। দেখো, হাত ছাড় বলছি। নইলে পুলিশ ডাকব।
ডাকুন। আমরা তো সেটাই চাই।
ইয়ে…মানে… রিভসের কতকতে চোখে অস্বস্তি দেখা দিল। শোন… হাতটা ছাড় না, বলছি। ডলির ট্যালেন্ট আছে। কিছুদিন ট্রেনিং দিলেই হয়ে যাবে। সেই চেষ্টাই করা হচ্ছে। আচমকা কণ্ঠস্বর বদলে গেল লোকটার। বলল, এসো, দেখাচ্ছি একটা জিনিস।
একে অন্যের দিকে তাকাল ছেলেরা।

পকেট থেকে চাবি বের করে গ্যারেজের দরজা খুলল রিভস। ওই দেখ! এমন ভঙ্গিতে বলল লোকটা। যেন পবিত্র কোন কিছু সম্বন্ধে বলছে। দেখে চোখ সার্থক কর। পুরানো দুর্গে যে জোম্বি ঢুকেছিল ব্লাড হারভেস্ট ছবিতে, মনে আছে? তারই দৃশ্য। আর ওই কফিনটা ভিলেজ অভ কার্ড থেকে নেয়া। ওটা লন চ্যানি অভিনীত ফ্যান্টম অভ অপেরা থেকে...
এ তো হরর ছবির একটা মিউজিয়ম! হাঁ করে তাকিয়ে দেখছে রবিন।
কিশোর তাকিয়ে রয়েছে বোরিস কারলফ অভিনীত ফ্রাঙ্কেনস্টাইন ছবির পোস্টারের দিকে। একভাবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে রিভসকে কিছু বলার জন্যে ঘুরেই স্থির হয়ে গেল কিশোর। নেই লোকটা। ওদেরকে কায়দা করে এখানে ঢুকিয়ে দিয়ে পালিয়ে গেছে।
মিস্টার রিভস? চেঁচিয়ে ডাকল সে।
জবাবে ঝটকা দিয়ে লেগে গেল গ্যারেজের দরজা। অন্ধকার হয়ে গেল ঘর।
খাইছে! অ্যাইই! চিৎকার করে ডাকল মুসা।
বাইরে তালা লাগানোর শব্দ হল। চেঁচামেচি জুড়ে দিল তিন গোয়েন্দা। লাভ হল না। কেউ সাড়া দিল না। আটকা পড়ল ওরা।

.

কয়েক মিনিট চিৎকার চেঁচামেচি করে ক্ষান্ত দিল ছেলেরা।
হ্যানসন কতক্ষণ অপেক্ষা করবে? মুসা বলল। বেশি দেরি দেখলে নিশ্চয় খুঁজতে আসবে আমাদের। কিন্তু গ্যারেজে দেখার কথা কি ভাববে?
ওর জন্যে বসে থাকতে পারি না আমরা, কিশোর বলল। রিভস তার সঙ্গীকে নিয়ে ফিরে আসতে পারে। পিস্তল-টিস্তল নিয়ে।
তাই তো!
বোরোনোর চেষ্টা করতে হবে আমাদের। জানালা থাকতে পারে। শেষ মাথায়।
যদি না থাকে? রবিনের প্রশ্ন।
আবার এসে দরজায় ধাক্কা দেব আর চিৎকার করতে থাকব।
অনেক লম্বা ঘরটা। নানা রকম উদ্ভট জিনিসে বোঝাই। হরর ছবি তৈরি করার মালমশলার একটা গুদাম যেন। গন্ধটাও পুরানো কবরস্থানের কফিনের কথা মনে করিয়ে দেয়। অনেক দিন পর পুরানো কবর খুললে যেমন বোটকা গন্ধ বেরোয়, অনেকটা তেমনি।
নরম কিছুতে পা পড়তে কিচ করে উঠল ওটা।
বাবারে! ভূত! বলে চিৎকার করে উঠল মুসা।
দূর! কি কর, ও তো ইঁদুর! রবিন বলল।

অনেক খোঁজাখুঁজি করল ওরা। অবশেষে দেয়ালের এক জায়গায় দেখল হার্ডবোর্ড লাগানো রয়েছে। একধার ধরে হ্যাঁচকা টান মারল মুসা। নড়ে উঠল, বোর্ডটা। আরেকটু জোরে. টানতেই খুলে চলে এল হাতে। বেরিয়ে পড়ল একটা জানালা।
ঠেলা দিতেই খুলে গেল পাল্লা। মাথা বের করল মুসা। পাশে তাকাতেই চোখে পড়ল পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে আছে একজন পুলিশ অফিসার।
বেরিয়ে এস, বলল অফিসার। শয়তানীর চেষ্টা করবে না একদম। এস।
মুসা বেরোল। তারপর বেরোল রবিন। সব শেষে কিশোর।
অফিসারের কাছেই দাঁড়িয়ে রয়েছে লালচুল মহিলা। বলল, হ্যাঁ, এই ছেলেগুলোই। মিস্টার রিভসকে খুঁজতে এসেছিল। একটু পরে গ্যারেজে চেঁচামেচি শুনলাম। ভাবলাম ওরাই হবে।
আমাদের আটকে রেখে পালিয়েছে হ্যারিসন রিভস, অভিযোগের সুরে অফিসারকে বলল কিশোর।
তাই? পাথরের মত কঠিন হয়ে আছে অফিসারের মুখ।
কদিন ধরেই মিস্টার রিভস বাড়িতে নেই, মহিলা বলল। কি করে আটকাল। তোমাদের?
শান্ত কণ্ঠে বিশেষ একটা ভঙ্গি নিয়ে কিশোর বলতে লাগল, একটা মেয়ে। হারিয়ে গেছে। ওর নাম ডালিয়া ডিকসন। রিভস আর তার এক সঙ্গী শেষবার দেখা করেছে মেয়েটার সঙ্গে। গতকাল, চেশায়ার স্কোয়্যারে। আমাদের সন্দেহ, ওরা দুজনই মেয়েটাকে নিয়ে গেছে।
বড় বেশি টিভি দেখ তুমি, গম্ভীর কণ্ঠে বলল অফিসার।
বিশ্বাস না করলে পুলিশ চীফ ইয়ান ফ্লেচারকে জিজ্ঞেস করতে পারেন।
বাড়ির কোণ ঘুরে এগিয়ে এল দুজন লোক। একজন বয়স্ক। পরনে ইউনিফর্ম। নেই, কিন্তু ভাবভঙ্গি আর পুলিশ অফিসারের সম্মান দেখানো থেকেই আন্দাজ করা গেল, ওই দুজনও পুলিশের লোক। সাদা পোশাকে এসেছে। ডিটেকটিভ।
কিশোরের কথা মন দিয়ে শুনল ওরা। তারপর বয়স্ক লোকটা ওদেরকে ওখানে থাকতে বলে চলে গেল। ইউনিফর্ম পরা অফিসার লাল চুল মহিলার সঙ্গে বাড়ির ভেতরে গেল, নিশ্চিত হয়ে আসার জন্যে যে রিভস বাড়িতে নেই। ফিরে এল খানিক বাদেই। তিন গোয়েন্দাকে তিরস্কার করে বলল সিনিয়র অফিসার, অন্যের ব্যাপারে নাক গলানো উচিত নয়। তিন গোয়েন্দার নাম-ঠিকানা লিখে নিতে লাগল।
উঁকিঝুঁকি দিতে আরম্ভ করেছে কৌতূহলী পড়শীরা।

অ্যাই! ট্রাইসাইকেলে বসা একজন জিজ্ঞেস করল পুলিশকে, চোর ধরলেন। নাকি?
না। গম্ভীর হয়ে জবাব দিল অফিসার। আপনারা যান।
তিন গোয়েন্দাকে ছেড়ে দেয়া হলো। দ্রুতপায়ে ওখান থেকে সরে চলে এল। ওরা। আরও লোক জড়ো হওয়ার আগেই। অপমানকর কথা শুনতে ভাল লাগে না। অর্ধেক পথ আসতেই চোখে পড়ল, মোড়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছে মেরুন অডি গাড়ি, সেই গাড়িটা, যেটা আরও দুবার দেখেছে। ওটার পাশে চলে এল তিন গোয়েন্দা। মুখ ফিরিয়ে তাকাল আরোহী, যেন প্যাসেঞ্জার সীটে পড়ে থাকা কিছু দেখছে।
এই! কিশোর বলল ফিসফিস করে।
কী? রবিন জানতে চাইল।
পেছনে তাকাবে না। কোন দিকেই তাকাবে না। গাড়ির ভেতরে যে লোকটা বসে আছে, এখান থেকে সে রিভসের বাড়ির ওপর চোখ রাখতে পারে। রেখেছিল। বলেই মনে হয় আমার।
তাতে কি? মুসার প্রশ্ন। অনেকেই তো এখন রিভসের বাড়ির দিকে তাকিয়ে আছে। এই গাড়িটা আজকে আরও দেখেছি। আর ভেতরের লোকটা মিস্টার জেনসেন, পিজা শ্যাকের ম্যানেজার। আমাদেরকে না দেখার ভান করছে। ও এখানে কি করছে?
তিন গোয়েন্দা গাড়িতে উঠলে হ্যানসন জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাব?
একটা টেলিফোন বক্সের কাছে, কিশোর জবাব দিল।
একটা পেট্রল স্টেশনে গাড়ি ঢোকাল হ্যানসন।
টেলিফোন ডিরেক্টরি ঘেঁটে বের করল কিশোরআর জে. ইম্পোরটারসের ঠিকানা। লং বীচে। দক্ষিণে পয়তাল্লিশ মিনিটের পথ।
রিভসের সঙ্গে ফারের পোশাকের দোকানদারের যোগাযোগ আছে, দোকানদারের সঙ্গে ভালুকটার যোগাযোগ আছে, এবং ভালুকটার সঙ্গে ডলির। যোগাযোগ আছে, নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। সুতরাং, যে কোম্পানি ভালুকটা সাপ্লাই করেছে, তাদের সঙ্গে দেখা করা দরকার।
অনেক দূরে, হ্যানসন বলল। ম্যাপ অবশ্য আছে গাড়িতে। ঠিকানাটা বের করে ফেলতে পারব।
ঠিকানা জেনে নিয়ে আবার গাড়িতে উঠল তিন গোয়েন্দা। লং বীচে চলল। হ্যানসন। পেছনে উত্তেজিত হয়ে পুরো ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করতে লাগল। ছেলেরা।

লং বীচে সাগরের কিনারে বাড়িটা। কেমন বিষণ্ন আর নির্জন মনে হচ্ছে জানালায় আলো নেই। বাড়ির সামনে ট্রাক-লড়ি কিছু নেই, কোম্পানিগুলোর সামনে সাধারণত যেমন থাকে।
এবারেও বাড়ি থেকে দূরে গাড়ি রাখল হানসন। বাড়িতে লোক থাকলে যাতে দেখতে না পায়।
সামনে দাঁড়িয়ে ভুরু কুঁচকে বাড়িটার দিকে তাকাল রবিন। পশ্চিমে সাগরের দিকে মুখ করা। ভেতরে কেউ আছে বলে তো মনে হচ্ছে না।
দেখি, দরজায় টোকা দিয়ে, কিশোর বলল।
দুই ধাপ সিঁড়ি উঠে দরজায় থাবা দিল সে। কেউ সাড়াও দিল না, বেরোলও না। দরজার পাল্লার ওপর দিকটায় কাঁচের প্যানেল লাগানো। সেখানে চোখ রেখে ভেতরে ছোট একটা অফিস দেখতে পেল। ঘরটা শূন্য।
নেই তো কিছু। ফিরে তাকিয়ে বলল কিশোর।
বাড়ির উত্তর পাশে একটা কার পার্ক। ওখানে এসে আবার তাকাল বাড়ির দিকে। জানালাগুলোতে লোহার গ্রিল লাগানো। একটা কাঠের বাক্স পড়ে থাকতে দেখে সেটা এনে একটা জানালার নিচে রেখে তার ওপর উঠল মুসা। জানালা দিয়ে ভেতরে তাকাল।
কি দেখছ? জানতে চাইল রবিন।
স্টোর রুম মনে হচ্ছে। বেশ কিছু ভালুক দেখতে পাচ্ছি। আর প্যাকেট করার জিনিসপত্র। একধারে ছোট একটা ঘর আছে মনে হয়। দরজায় সাইন লাগানো। পড়তে পারছি না।
নেমে এল মুসা। অন্য পাশ দিয়ে গিয়ে দেখি।
কিন্তু অন্য পাশে এসে দেখল, জানালাই নেই।
কিভাবে ঢোকা যায় আলোচনা করছে তিনজনে, এই সময় একটা গাড়িকে থামতে শুনল।
চুপ! ঠোঁটে আঙুল রেখে ইশারা করল কিশোর।
দরজা খুলে নেমে এল কেউ। সিঁড়ি বেয়ে উঠল।
এইবার যাওয়া যাক, ফিসফিসিয়ে বলল রবিন। বলব, একটা ভালুক কিনতে চাই আমরা।
ঘুরে আবার বাড়ির কোণে এসেই থমকে দাঁড়াল তিনজনে। সেই মেরুন। অডি।
পিছিয়ে এল ওরা।
আশ্চর্য! আনমনেই বলল কিশোর। কার ওপর চোখ রাখছে? রিভস? না আমাদের ওপর?
নজর রাখব। দেখি কি করে? রবিন বলল।

অপেক্ষা করতে লাগল ওরা। পনেরো মিনিট গেল... বিশ...তারপর দরজা খুলল বাড়িটার। একটা ব্যাগ হাতে বেরিয়ে এল একজন লোক। গাড়ির বুটে নিয়ে গিয়ে তুলল। গাড়ি চালিয়ে নিয়ে চলে গেল।
জেনসেনই, মুসা বলল। সন্দেহ নেই। মনে হচ্ছে শয়তানের চেলা সে-ই। সব কিছুর হোতা, নাটের গুরু। গাধার মত পিজা শ্যাকে বসে আলোচনা করেছি। আমরা। সব সে শুনেছে। পিছু নিয়েছে আমাদের।
এ বাড়িতে আটকে রাখেনি তো ডলিকে! বলে উঠল রবিন।
জলদি চলো! পুলিশকে ফোন করি!
যদি ডলি ভেতরে, না থাকে, নিরাশ করল ওদেরকে কিশোর। তখন কি জবাব দেব? পুলিশকে খবর দেয়ার আগে শিওর হতে হবে আমাদের।
ওপর দিকে তাকাল মুসা। আচ্ছা, এক কাজ তো করতে পারি। ওখানে উঠে গিয়ে স্কাইলাইটের ভেতর দিয়ে দেখতে পারি আছে কিনা কেউ ভেতরে।
বলেই রওনা হয়ে গেল সে। পিছু নিল কিশোর আর রবিন। কোণের কাছে একটা পাইপ নেমে এসেছে ওপর থেকে। ওটা বেয়ে উঠতে শুরু করল।
জলদি কর! তাগাদা দিল রবিন। কেউ দেখে ফেললে পুলিশকে খবর দেবে। এখানেও কিছু করতে পারব না আমরা।
ছাতে উঠে গেল মুসা। ছটা স্কাইলাইট আছে মোট। ছোট যে ঘরটার কথা সে বলেছিল, বাক্সের ওপর দাঁড়িয়ে দেখেছিল, একটা স্কাইলাইট দিয়ে সেটার ভেতরটা। দেখা যায়। কাঁচে পুরু হয়ে ময়লা লেগে রয়েছে। হাত দিয়ে ডলে ডলে পরিষ্কার করল সে। তারপর ভেতরে উঁকি দিল।
কি দেখছ? নিচে থেকে জিজ্ঞেস করল কিশোর।
কিছুই তো বুঝতে পারছি না। অন্ধকার। কিছু বস্তাটস্তা আছে মনে হয়।
মাটিতে বসে পড়ল কিশোর। নাহ, মনে হয় এখানে নেই!
আরও কয়েক মিনিট চেষ্টা করে ফিরে এল মুসা।
তিনজনে বসে বসে আরও কিছুক্ষণ আলোচনা করল, সমস্যাটার সমাধান করা যায় কিনা। উপায় বের করতে পারল না।
শেষে কিশোর বলল, একটা স্কাইলাইট দিয়ে দেখেই নেমে এলে কেন? বাকিগুলো দেখা দরকার ছিল।
চল না, তিনজনেই উঠে যাই, রবিন প্রস্তাব দিল।
মন্দ বলনি। চলো, আরেকবার দেখি।
তিনজনেই ছাতে উঠে পড়ল। পুরানো ছাত। হঠাৎ এক জায়গায় মড়মড় করে। উঠল। তিনজনের ভার সইতে পারছে না।
খবরদার! নড়বে না! চিৎকার করে উঠল মুসা।

আবার গুঙিয়ে উঠল ছাতের তক্তা। মড়মড় করে উঠল জোরে। দেবে যেতে শুরু করল। থাবা দিয়ে কিছু একটা আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করল কিশোর। পারল না। পড়ে যাচ্ছে নিচের দিকে।

.

অন্ধকারে পড়ে আছে কিশোর। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। কোনমতে উঠে বসল। অনেকটা সহজ হয়ে এল শ্বাস-প্রশ্বাস।

কিশোর? কিশোর, তুমি ঠিক আছ?

মুসা ডাকছে। যে ফোকরটা দিয়ে পড়েছে কিশোর, তার কিনারে গলা বাড়িয়ে দিয়েছে সে। আবার ডাকল, কিশোওর?

আমি ঠিকই আছি, গোঁ গোঁ করে জবাব দিল কিশোর। উঠে দাঁড়াল। ছোট ঘরের পাশের বড় ঘরটায় পড়েছে। নব ধরে মোচড় দিয়ে দরজা খোলার চেষ্টা করল। নড়ল না নবটা। তালা দেয়া।

ঘরে অনেকগুলো ইস্পাতের র‍্যাক। তাকে সাজানো টেডি বিয়ার। আরও নানারকম খেলনা আর পুতুল রয়েছে। বাক্স, প্যাকেট করার কাগজ ছড়িয়ে রয়েছে মেঝেতে। কিছু খেলনা মেঝেতেও পড়ে আছে।

একটা ভালুক হাতে নিল কিশোর। ডলিরটা যেমন ছিল তেমনই দেখতে। নিয়ে এগোল আরেক দিকে। বাড়ির সামনের দিকে। আরেকটা দরজা চোখে পড়েছে। সহজেই খুলে গেল ওটা। ভেতরটা অফিসঘর। দুটো ডেস্ক আছে। ওপাশের দরজাটা খুলতে যাবে এই সময় আবার কানে এল গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ।

দরজার কাচের প্যানেল দিয়ে বাইরে তাকাল সে। ফিরে এসেছে মেরুন অডিটা। দ্রুত আবার স্টোররুমে ফিরে এল কিশোর। অফিসের দরজাটা লাগিয়ে দিল।

ছাতের ওপরে নড়েচড়ে উঠল মুসা। ডেকে জিজ্ঞেস করল, কিশোর, কি করছ?

আস্তে! সাবধান করল কিশোর। সরে যাও! ওই লোকটা ফিরে এসেছে!

কয়েকটা বাক্সের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল সে। দরজায় চাবি লাগানোর শব্দ শুনল। অফিসে ঢুকল কেউ। চেয়ার টানার শব্দ হল। ড্রয়ার খুলল; কাগজপত্রের খসখস হল, কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করল লোকটা।

কি করছে জেনসেন?

বিশাল ঘরটায় চোখ বোলাল কিশোর। একটা ডাবলডোর দেখতে পাচ্ছে। ওটা খুলতে পারলে বেরিয়ে যেতে পারত। নেবে নাকি ঝুঁকিটা? বেরোতে, পারবেই, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। আওয়াজ করে ফেলতে পারে। শুনে ফেললে। দেখতে আসবে জেনসেন। তখন কি করবে কে জানে! লোকটার কাছে পিস্তল থাকতে পারে।

সামনের ঘরে আবার চেয়ার টানার শব্দ হল। তারপর পদশব্দ। আসছে লোকটা। এ ঘরে ঢুকলেই ছাতের ফোকরটা দেখে ফেলবে। তারপর?
খুলে গেল অফিস ঘরের দরজা। অনেকগুলো খেলনা বোঝাই একটা তাকের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল কিশোর। ফাঁক দিয়ে দেখতে পেল লোকটার শরীর, মুখটা চোখে পড়ছে না।
কয়েক কদম এগিয়েই থমকে দাঁড়াল লোকটা। নিশ্চয় ফোকরটা চোখে পড়েছে। মেঝেতে পড়ে থাকা ভাঙা তক্তাও নজর এড়ানোর কথা নয়।
পকেটে হাত ঢুকে গেল জেনসেনের। বের করে আনল পিস্তল। এই ভয়ই করছিল কিশোর। আগ্নেয়াস্ত্রের বিরুদ্ধে কিছু করার নেই। আরও গুটিসুটি হয়ে দেয়ালের সঙ্গে মিশে যেতে চাইল সে।
পালানোর চেষ্টা করবে? একদৌড়ে অফিসের দরজার কাছে যেতে সময় লাগবে না। কিন্তু তার আগেই যদি গুলি করে বসে লোকটা?
এই সময় নিতান্ত অনাকাঙ্ক্ষিত ভাবেই শোনা গেল পুলিশের সাইরেন। এগিয়ে আসছে। দ্বিধায় পড়ে গেছে লোকটা। নড়ছে না। হাতে উদ্যত পিস্তল। আস্তে আস্তে আবার সরে যেতে শুরু করল সাইরেন।
নড়ে উঠল জেনসেন। পা বাড়াল সামনে। এগিয়ে আসছে কিশোর যে র‍্যাকের আড়ালে লুকিয়েছে ওটার দিকে।
ধকধক করছে কিশোরের বুক। এই সময় ঘটল যেন অলৌকিক ঘটনা। সামনের দরজায় থাবা দিতে লাগল কেউ।
চমকে গেল জেনসেন।
থাবা পড়ছেই। ডেকে জিজ্ঞেস করল একটা কণ্ঠ, এই, ভেতরে কে আছেন? আছেন কেউ? আমাকে সাহায্য করতে পারবেন?
ঘুরে অফিসের দিকে রওনা হয়ে গেল জেনসেন। দরজার ওপাশে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, কে?
বাইরে থেকে জবাব এল, ফেরারস মেশিন পার্টসের অফিসটা কোথায় বলতে পারেন?
রাস্তার ওপারে। এক ব্লক পরে।
কিন্তু সাইনবোর্ড তো দেখছি না।
আর দেরি করল না কিশোর। বেরিয়ে সোজা এগোল ডাবলডোরটার দিকে। ছিটকানি লাগানো আছে। টান দিতেই খুলে গেল। পাল্লা খুলে বেরোনোর আগের মুহূর্তেও কানে এল সামনের দরজার কাছে লোকটার কথা, যে মেশিন পার্টসের অফিস খুঁজছে। মুচকি হাসল কিশোর। বুদ্ধিটা ভালই বের করেছে হ্যানসন। কায়দা করে তাকে সুযোগ করে দিল বেরোনোর।

বেরিয়ে এসে আস্তে করে আবার পেছনে দরজাটা লাগিয়ে দিল কিলোর।

.

উত্তরে চলল রোলস রয়েস। রকি বীচে ফিরে চলেছে।

মুসা বলছে কিশোরকে, ছাত থেকে নেমে পড়লাম আমি আর রবিন। ভাবলাম, আমরা গিয়ে ডাকাডাকি করলে চিনে ফেলবে জেনসেন। সে জন্যেই হ্যানসনকে পাঠিয়েছি।

ভাল বুদ্ধি করেছ।

হাতের ভালুকটা টিপেটুপে দেখল কিশোর। বিড়বিড় করল, অদ্ভুত! সাধারণত খেলনা, যে রকম হয় সে রকম নরম নয়। ভেতরটা শক্ত।

কেটে দেখলেই হয়, রবিন পরামর্শ দিল।

পকেট নাইফ বের করে কাটতে শুরু করল কিশোর। দুপাশ থেকে ঝুঁকে এল। অন্য দুজন। নিরাশ হতে হল তিনজনকেই। ভেতরটা প্ল্যাস্টিকে তৈরি। ফাপা। কিছু নেই। প্ল্যাস্টিকের ওপরে রোমশ চামড়া পরিয়ে দেয়া হয়েছে।

দূর! নিরাশ হয়ে হেলান দিল মুসা। এত কিছু করেও কোনই লাভ হল না। একটা কথাই শুধু জানতে পারলাম, ওই রিভসটা শয়তানীতে জড়িত।

পুলিশের কাছে যাব? হ্যানসন জিজ্ঞেস করল।

গিয়ে কি বলব? জেনসেনের কথা বলতে পারি। কিন্তু কি প্রমাণ আছে আমাদের হাতে? কেন বিশ্বাস করবে পুলিশ?

জবাব দিতে না পেরে চুপ হয়ে গেল হ্যানসন।

.

গভীর রাতে ঘুম ভেঙে গেল কিশোরের। কার একটা ভেড়া যেন ছুটে গিয়েছে। বাড়ির কাছে এসে ব্যা ব্যা করে ডেকে চলেছে।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবছে কিশোর, ভেড়াটাকে তাড়াবে? না শব্দ উপেক্ষা করে বালিশে কান ঢেকে আবার ঘুমিয়ে পড়বে?

হঠাৎ বিছানায় উঠে বসল সে। ভেড়া! ঠিক! এই তো পাওয়া গেছে ডলির কিডন্যাপারদের!

ঘড়ির দিকে তাকাল। তিনটে বাজে। এই অসময়ে হ্যানসনকে পাওয়া যাবে। না। রবিন আর মুসাও ঘুমিয়ে। ওদেরকেও ডাকা যাবে না। তার মানে সকালের আগে কিছুই করতে পারছে না।

অন্ধকারে শুয়ে রইল সে। চুপ করে থেকে ভাবছে। ঘুম আসছে, পরক্ষণেই টুটে যাচ্ছে। উত্তেজনার সময় এ রকম হয়। ভোরের আলো ফোঁটার সঙ্গে সঙ্গে বিছানা ছাড়ল সে। হাতমুখ ধুয়ে কাপড় পরে নিচে নামল নাস্তা করার জন্যে।

সাড়ে সাতটায় রবিনকে ফোন করল।

ডলির বাবা-মায়ের সঙ্গে কথা বলার সময় কি বলেছিল রোজার মনে আছে? কিশোর জিজ্ঞেস করল।
বলেছিল ডলিকে ছবিতে নামাতে চায়।
তা তো বলেইছিল। আরও বলেছিল ক্রুগার মনটাগোর বাড়িতে থাকে ওরা। বাড়ির পেছনে ভেড়া চড়ে।
কিছু বলল না রবিন। তাকে হাই তুলতে শোনা গেল ফোনে।
বল তো লস অ্যাঞ্জেলেসের কোন এলাকায় ভেড়া দেখা যায়?
অনেকের বাড়িতেই...আচ্ছা, দাঁড়াও। বসন্তের শুরুতে উপকূলের ধারে পাহাড়ের ঢালে চড়ে বেড়ায় ভেড়ার পাল। তরপর সিয়েরা আর অন্যান্য জায়গায়। রপ্তানি করা হয় ওগুলো।
ঠিক। এমন সব জায়গায় পাঠানো হয়, যেখানে শীত বেশি পড়ে, উলের দরকার হয়। তবে সব তো আর পাঠানো যায় না, কিছু না কিছু থেকেই যায়। সেগুলোকে কোথায় রাখা হয়? পাহাড়ের ওপরেই কোথাও। ওখানে যদি ভেড়া থাকতে পারে, দুতিনজন লোকও তো সহজেই লুকিয়ে থাকতে পারে। পারে না?
তাই তো! সজাগ হয়ে গেছে রবিন।
সেখানেই যাব আমরা। আমি হ্যানসনকে ফোন করছি।
করো। আমি মুসাকে করছি।

.

নটার কয়েক মিনিট আগে হাজির হল হ্যানসন। তবে রোলস রয়েস নিয়ে নয়। এক জীপ নিয়ে। যেখানে যাচ্ছে সেখানে রোলস রয়েসের চেয়ে এ ধরনের জীপই বেশি উপযোগী। বলেই দিয়েছিল কিশোর।
জীপে চড়ে বসল তিন গোয়েন্দা। রওনা হল হ্যানসন। প্যাসিফিক কোস্ট হাইওয়ে ধরে কিছুক্ষণ চলে মোড় নিয়ে একটা সরু পথে পড়ল জীপ। পথটার নাম কটনউডক্রীক রোড। পাহাড়ী পথ ধরে ওপরে উঠে চলল।
ডানে-বাঁয়ে চোখ রেখেছে ছেলেরা।
পনেরো মিনিটের মাথায় পৌঁছে গেল মুলোল্যাণ্ড হাইওয়েতে। পাহাড়ের ভেতর দিয়ে হলিউড পার হয়ে ভেনচুরায় চলে গেছে পথটা।
কিশোরের হাতে বিনকিউলার। আতিপাতি করে দেখছে পথের পাশের। পাহাড়ী অঞ্চল। পাহাড়ের ঢালে মাঠ আর চারণভূমি যেখানেই আছে ভাল করে দেখছে ভেড়া দেখা যায় কিনা। সাইকেল নিয়ে ঘামতে ঘামতে চলেছে একজন লোক। কিশোরের নির্দেশে তার কাছে এনে গাড়ি থামাল হ্যানসন।
এই যে ভাই, কিশোর বলল। এখানে আমার এক বন্ধু ভেড়া পালে। ডারমট নাম। কোথায় থাকে বলতে পারেন?

সরি, হাঁপাতে হাঁপাতে জবাব দিল লোকটা। ও নামে কাউকে চিনি না।
আবার এগিয়ে চলা।
কিছুদূর গিয়ে পাহাড়ের ঢালে কিছু ধূসর জিনিস চোখে পড়ল কিশোরের। প্রথমে ভাবল পাথর, পরে দেখে নড়ছে। ভেড়া! সেদিকে এগিয়ে যেতে বলল। হ্যানসনকে।
আরেকটু কাছে গেলে দেখা গেল, পুরানো একটা ঝরঝরে ভ্যানের পাশে। ফোল্ডিং চেয়ার পেতে বসে রয়েছে একজন লোক। মাউথ অর্গান বাজাচ্ছে আপনমনে।
গাড়ি রাখতে বলল কিশোর।
বড় একটা পাথরের চাঙড়ের পাশে এনে জীপ থামাল হ্যানসন। নেমে পড়ল তিন গোয়েন্দা। লোকটার দিকে চলল।
কাছে এসে কিশোর বলল, কয়েকজন বন্ধুকে খুঁজছি। দুজন লোক, ডারমট আর তার ভাই। আর একটা মেয়ে। পাহাড়ের এদিকটাতেই কোথাও থাকে। ঠিকানা ঠিকমত বলতে পারব না। জানেন, কোথায় থাকে?
চারপাশে চোখ বোলাল রবিন। যতদূর চোখ যায়, কোন বাড়িঘর চোখে পড়ল না।
আমাদেরকে বলা হয়েছে, আবার বলল কিশোর। যেখানে ওরা থাকে, তার পেছনে ভেড়া থাকে। কই, এখানে তো বাড়িঘর দেখছি না। আর কোথাও ভেড়া পালে নাকি?
কাঁধ ঝাঁকাল লোকটা। কি জানি, বলতে পারব না তো। তবে পশ্চিমে গিয়ে দেখতে পার। থাকতেও পারে। এখানে এসেছি আমি কাল রাতে। পথের ওদিকটায় থাকতেও পারে। ভেড়ার ডাক শুনেছি আসার সময়।
লোকটাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আবার এসে গাড়িতে উঠল ছেলেরা।
পশ্চিমে, নির্দেশ দিল কিশোর। রাস্তার যা অবস্থা দেখছি, উঠতে গিয়ে না পড়ে মরি।
কিচ্ছু ভেব না। গাড়ি তো চালাব আমি।
রাস্তার এই অংশটা একেবারে নির্জন। যানবাহন চোখে পড়ছে না, মানুষজন নেই। রকি বীচের এত কাছে যে এরকম একটা জায়গা থাকতে পারে না দেখলে বিশ্বাস হয় না।
মাইল খানেক এগোনোর পর দুভাগ হয়ে গেছে পথ। ধূসর একটা পাথরের টাওয়ার চোখে পড়ল। একঝাঁক গাছের মাথার ওপরে বেরিয়ে আছে।
সেদিকে এগোতে লাগল হ্যানসন।
আরি! মুসা বলল। দুর্গটুর্গ না তো?

একটা কাঁচা রাস্তায় পড়ল গাড়ি। আর এগোনোর দরকার নেই, কিশোর বলল। জীপ থামাল হ্যানসন।
দুর্গের মতই লাগছে, রবিন বলল। একপাশে কয়েকটা কাঠের কেবিন রয়েছে। উঁচু বেড়া দিয়ে ঘেরা।
পুরানো ওয়েস্টার্ন শহরের মত লাগছে, মুসা বলল।
এটাই জায়গা! চোখ চকচক করছে কিশোরের।
আমার কাছে তো ছবির লোকেশনের মত লাগছে।
ঠিক! এরকম জায়গাতেই তো লুকিয়ে থাকতে চাইবে কেইনের মত লোক। এখন ওই ধোঁকাবাজ প্রযোজক আর ডলিকে এখানে পেলেই হয়!

.

হ্যানসন, কিশোর বলল। আপনি থাকুন এখানে। যদি মনে হয় আমরা বিপদে পড়েছি, সাহায্য করতে যাবেন। ঠিক আছে?
নিশ্চয়ই।
অন্যান্য মুভি লোকেশনের মত এই জায়গাটারও অনেক পরিবর্তন হয়েছে, বার বার নতুন করে সাজানো হয়েছে। বড় বেশি চুপচাপ।
কোনখান থেকে শুরু করব? ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করল রবিন। জোরে বলতে ভয় পাচ্ছে যেন।
কিশোরও ভাবছে সে কথা। বাড়িগুলোর ওপর নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে তার দৃষ্টি। কোথায় থাকতে পারে? কোনখানে? শেষে দুর্গটাকেই বেছে নিল সে।
অনেক দিনের অযত্নে ধুলো জমে আছে পুরু হয়ে, প্রতিটি ঘরে। কিন্তু ডলি কোথায়? খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে একটা দরজার সামনে এসে থামল তিনজনে। নতুন করে খিল লাগানো হয়েছে।
এইটাই! নিচু গলায় বলল রবিন।
ঠোঁটে আঙুল রেখে কথা বলতে নিষেধ করল কিশোর।
ভেতরে কি করে দেখা যায়? একটা জানালা চোখে পড়ল। ওটার কাছে চলে এল ওরা। উঁকি দিল ভিতরে। কাঠের পাটাতনের ওপর জড়সড় হয়ে পড়ে আছে। যেন একগাদা কম্বল। কেউ অবহেলায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে গেছে নষ্ট হওয়ার জন্যে, দেখে সে রকমই মনে হয়।
ডলি? নরম গলায় ডাকল কিশোর। ডলি, আপনি আছেন ওখানে?
নড়ে উঠল কম্বলের দলাটা। উঠে বসল ডলি ডিকসন। আবছা অন্ধকারেও দেখা যাচ্ছে ফ্যাকাসে হয়ে আছে ওর চেহারা।
ডলি, আমি। আমি কিশোর পাশা। রবিন আর মুসাও এসেছে। ওরা। কোথায়? রিভস আর কেইন? মানে, রোজার?

মূককীটের মত যেন গুটি থেকে বেরোল ডলি, তেমনি করে কম্বল সরিয়ে বেরিয়ে উঠে এল। পরনে কালো স্কার্ট, সাদা ব্লাউজ। সব কিছুতে ময়লা। হাতে ময়লা, মুখে ময়লা। পা খালি।
আপনাকে বের করে নিয়ে যেতে এসেছি, কিশোর বলল।
সাবধান! ফিসফিস করে বলল ডলি। লোকগুলো ভীষণ পাজি! অনেক চেষ্টা করেছি। কিছুতেই বেরোতে পারিনি। সব সময় পিস্তল নিয়ে পাহারা দেয়।
কোথায় ওরা?
ওদিকে। একটা জেনারেল স্টোর আছে না, ওটাতে।
মাথা ঝাঁকাল কিশোর। জানালায় কাঠ আটকে দেয়া হয়েছে, গরাদের মত করে। সেগুলো খুলতে চেষ্টা করল সে আর মুসা। রবিন বেরিয়ে গেল হ্যানসনকে বলার জন্যে, যাতে পুলিশকে খবর দেয়।
সে ফিরে এসে দেখল, একটা কাঠ খুলে ফেলেছে কিশোর আর মুসা। জায়গাটা সিনেমার শুটিঙের জন্যে তৈরি হয়েছে। তাই সব কিছুতেই আসলের চেয়ে নকলের ছড়াছড়িই বেশি। জানালার শিকগুলোকে শিকের মত দেখতে হলেও আসলে কাঠের তৈরি।
ঘরের ভেতরে বসে কাঁদতে আরম্ভ করেছে ডলি।
পাগল! ওরা পাগল! সব বদ্ধ উন্মাদ! একটা খেলনার জন্যে এত কিছু করছে!
ভালুকটা তো? কিশোর জিজ্ঞেস করল। পেয়ে গেছে। কেন চেয়েছে, জানেন?
না।
আপনাকে আনল কিভাবে এখানে?
বাথরুম থেকে সবে বেরিয়েছি, এই সময় এল ওরা। বলল, আমার সঙ্গে ভাকুলার ব্যাপারে কথা বলতে চায়। লিভিং রুমে বসে রিভসের সঙ্গে কথা বলছি। আমি, রোজার উঠে গেল ওপরে। আমাকে বলল, রান্নাঘরে যাবে পানি খেতে, অথচ গেল ওপরতলায়। অবাক লাগল। কি করছে ওখানে? শেষে আর থাকতে না। পেরে আমিও গেলাম ওখানে। আমাকে থামানোর চেষ্টা করেছে রিভস, পারেনি। গিয়ে দেখি, মিসেস লেসিঙের ঘরে আলমারি, ড্রয়ারে খোঁজাখুঁজি করছে রোজার। ভালুকটার কথা জিজ্ঞেস করল আমাকে। শেষে খপ করে এসে আমার হাত চেপে ধরে ঝাঁকাতে লাগল। চেঁচিয়ে বলতে লাগল, ভালুকটা কোথায় আছে তাকে বলতেই হবে!
আবার ফুঁপিয়ে উঠল ডলি। হ্যাঁচকা টানে হাত দুটিয়ে নিয়ে বাথরুমে গিয়ে ঢুকলাম। ছিটকানি লাগিয়ে দেয়ার আগেই সে-ও ঢুকে পড়ল। থাবড়া মারল আমার নাকেমুখে। নাক থেকে রক্ত বেরোতে শুরু করল আমার। আমার হাত মুচড়ে ধরে শাসাতে লাগল, ভালকুটার কথা না বললে না বললে..

হয়েছে, থাক, বুঝতে পেরেছি। কাঠের আরেকটা শিক খুলে ফেলল কিশোর।
ভাবলাম, ডলি বলল। ভালুকটা পেয়ে গেলেই আমাকে ছেড়ে দেবে। দিল না।
দেয়নি, কারণ যদি পুলিশকে বলে দেন। গাড়ির বুটে ভরে আপনাকে এনেছে, না?
হ্যাঁ। রিভসের কাছে পিস্তল ছিল। আমাকে ভয় দেখাল, টু শব্দ করলেই গুলি করে মারবে। ভয়ে কিছু করলাম না।
শেষ শিকটা খুলে ফেলল মুসা। আসুন। বেরিয়ে আসুন। আমরা আপনাকে সাহায্য করছি।
মুসা আর কিশোরের সাহায্যে জানালা গলে বেরিয়ে এল ডলি। একটা পেরেকে লেগে ছিঁড়ে গেল স্কার্টের কিছুটা। বেরিয়ে এল চারজনে। রওনা হলো জীপের দিকে।
ঠিক এই সময় খুলে গেল জেনারেল স্টোরের দরজা। বেরিয়ে এল হ্যারিসন রিভস। হাতে একটা কাগজের প্লেটে খাবার। স্তব্ধ হয়ে রইল একটা মুহূর্ত। তার পর ঘরের দিকে ফিরে চিৎকার করে ডাকতে শুরু করল, ডেগি! ডেগি!
দৌড় দিতে বলল কিশোর। ভলির হাত ধরে টেনে নিয়ে ছুটল মুসা। হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল ডলি। ব্যথায় কাতরে উঠল। বুড়ো আঙুল মুচড়ে গেছে। টেনেটুনে তাকে তুলল আবার মুসা।
বেরিয়ে পড়েছে রিভস আর রোজার। দুজনের হাতেই পিস্তল। দৌড়ে গাড়ির কাছে পৌঁছতে পারবে না, বুঝতে পেরে পাশের একটা বাড়ির দিকে ঘুরে গেল কিশোর। সবাইকে বলল বাড়িটাতে ঢুকে পড়তে।
কতদিন ওটাতে মানুষ ঢোকে না কে জানে! ভেতরে বাদুড়ের বাসা। ফড়ফড় করতে লাগল ওগুলো, সেই সঙ্গে কিচিক কিচিক করে বিচিত্র ডাক ছাড়তে লাগল।
অন্ধকার একটা ঘরে ঢুকে বসে রইল চারজনে।
রিভস ঢুকে পড়েছে। বাইরের ঘর থেকে চেঁচিয়ে বলল, জলদি বেরিয়ে এসো। যদি গুলি খেতে না চাও!
চুপ করে রইল কিশোর। সবাইকে চুপ থাকতে বলল।
বেরোতে বললাম না! আবার ধমক দিয়ে বলল রিভস। আমি জানি তোমরা। ওখানেই আছ!
ফিসফিসিয়ে মুসা বলল, ব্যাটা ঢুকতে দেখেনি আমাদের! বোধহয় গাছের জন্যে! নইলে ওরকম করে বলত না। সোজা ঢুকে পড়ত।
বাদুড়গুলোই বাঁচিয়ে দিল আমাদের, রবিন বলল।
রোজারও এসে ঢুকল ঘরে। রিভসকে জিজ্ঞেস করল, কোথায়?
কি জানি, বুঝতে পারছি না…

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই ইঞ্জিনের শব্দ হলো। জীপের ইঞ্জিন। নিশ্চয়। পুলিশকে ফোন করে ফিরে এসেছে হ্যানসন। করল কোথা থেকে? পথের পাশের কোন ফোনবক্স থেকে হবে, ভাবল কিশোর।

ঘরের বাইরে জীপ থামল। রোজারকে বোধহয় ঢুকতে দেখেছে হ্যানসন। অনুমান করল তিন গোয়েন্দা। ভেতরে ঢুকে পড়ল হ্যানসন। ধস্তাধস্তি শোনা গেল।

আর চুপ থাকতে পারল না মুসা। কারাতে ব্যবহারের এরকম একটা মোক্ষম। সুযোগ ছাড়তে রাজি নয় সে। এক লাফে উঠে বেরিয়ে গেল।

কিশোর আর রবিনও বসে থাকল না। মুসা আর হ্যানসনকে সাহায্য করতে গেল।

রোজারের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছে হ্যানসন। আর পিস্তল উচিয়ে বার বার তাকে শাসাচ্ছে রিভস। গুলি করছে না।

তবে কি!...চট করে ভাবনাটা খেলে গেল কিশোরের মাথায়। এখানকার সব কিছুই তো নকল। ওদের পিস্তলগুলোও নকল নয় তো? নইলে গুলি করছে না। কেন?

পেছন থেকে পা টিপে টিপে গিয়ে এক থাবায় রিভসের পিস্তলটা কেড়ে নিল কিশোর। ওজন দেখেই বুঝে গেল, নকল।

দুটো মিনিটও আর টিকল না এরপর রোজার আর রিভস। কাবু করে ফেলল। হ্যানসন আর তিন গোয়েন্দা মিলে। সাহস বেড়ে গেছে ডলির! খুঁজেপেতে দড়ি বের করে নিয়ে এল। বেঁধে ফেলল দুই শয়তানকে।

.

কেসের রিপোর্ট লিখে তৈরি হয়ে রয়েছে রবিন। কিন্তু বিখ্যাত চিত্র পরিচালক ডেভিস ক্রিস্টোফার বিদেশ থেকে ফিরলেন না।

ডালিয়া ডিকসনকে উদ্ধারের এক হপ্তা পরে ইডাহো থেকে ফিরে এলেন ভিকটর সাইমন। কিশোরকে ফোন করলেন। কিশোর যে খোঁজ করেছিল, একথা তাকে জানিয়েছে কিম।

একটা কেস শেষ করেছি, কিশোর জানাল। শুনতে চান?

ফ্রেনসোর সেই মেয়েটার ব্যাপার তো?

আপনি কি করে জানলেন?

অনুমান। এতদিন ধরে গোয়েন্দাগিরি করছি, হাসলেন লেখক এবং গোয়েন্দা। পেপারে হেডলাইন হয়ে খবর বেরিয়েছে। কাল বিকেল চারটে নাগাদ চলে এসো না? চা খেতে খেতে শোনা যাবে। আজকাল চা খেতে দিচ্ছে কিম।

দ্বিধা করছে কিশোর। কিমকে বিশ্বাস নেই, খাবারের ব্যাপারে।

সত্যি বলছি, কিশোরের ভাব বুঝে বললেন লেখক। চা-ই দেবে। বিশ্বাস। করো।

বেশ। আরও দুজন বন্ধুকে কি আনব?

একজন নিশ্চয় ডালিয়া ডিকসন?র
হ্যাঁ। তবে ডলি আমাকে কথা দিয়েছে, সিনেমায় যোগাযোগ করিয়ে দিতে অনুরোধ করবে না আপনাকে। শুধু দেখা করতে চায়। নাম শুনেছে তো অনেক। হ্যানসনও আপনার ভক্ত। আপনার সব বই পড়েছে।
তাই নাকি? হ্যানসনের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছেটা কিন্তু অনেক দিনের। তোমাদের প্রথম কেসের কাহিনীটা পড়ার পর থেকেই। হাসলেন তিনি। তা। তোমরা তাকে আনবে, না সে-ই তোমাদেরকে নিয়ে আসবে?
কিশোরও হাসল। লাইন কেটে দিয়ে প্রথমে লেসিং হাউসে ডলিকে ফোন। করল, তারপর করল হ্যানসনকে।
পরদিন বিকেলে কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে তিনটেয় হাজির হল হ্যানসন। অবশ্যই রোলস রয়েস নিয়ে। তবে শোফারের ইউনিফর্ম পরে আসেনি। তার বদলে পরেছে খাঁটি ইংরেজের পোশাক। অভিজাত ইংরেজের মত বেশ গম্ভীর চালে বলল, আজ আমি মেহমান। শোফার নই। তাই ভাবলাম, এই পোশাকটাই পরে যাই।
দারুণ লাগছে আপনাকে, হ্যানসন, উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল মুসা। সত্যি, তুলনা হয় না। ডলি কি পরে আসবে বুঝতে পারছি না।
পরবে হয়ত ড্রাকুলার বৌয়ের পোশাক, রবিন বলল। ভেলকি লাগিয়ে দেবে মিস্টার সাইমনকে।
কিন্তু ডলি অবাক করল ওদেরকে, নিরাশও করল। সাধারণ একটা জিনসের প্যান্ট আর সাদা শার্ট পরে এসেছে।
ডলি, ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল মুসা। আজকে আপনি কি সাজলেন?
যা সাজার সেজেছি। অতি সাধারণ আমি, নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল ডলি।
কোস্ট হাইওয়ে ধরে উত্তরে চলল রোলস রয়েস। ভিকটর সাইমনের বাড়িটা দেখা যেতেই সামনে ঝুঁকল ডলি। ভাল করে দেখার জন্যে।
আরে, সত্যিই তো বলেছ তোমরা! সরাইখানাকে বাড়ি বানানো হয়েছে তোমরা যখন বললে, আমি কিন্তু বিশ্বাস করিনি।
বাড়ির সামনে গাড়ি থামাল হ্যানসন। বারান্দায় বেরিয়ে এলেন সাইমন। পেছনে এসে দাঁড়াল কিম, একগাল হাসি নিয়ে। হ্যানসনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। সম্মান জানাল ব্রিটিশ কায়দায়। পরক্ষণেই ছুটে পালাল যেন লজ্জা পেয়ে।
কিম খুব উত্তেজিত হয়ে ছিল আপনার আসার কথা শুনে, মিস্টার হ্যানসন, সাইমন বললেন।
প্লীজ, স্যার, আমাকে মিস্টার বলার দরকার নেই, বিনীত কণ্ঠে বলল হ্যানসন। তিন গোয়েন্দা আমার বন্ধু। আপনাকেও বন্ধু হিসেবে পেলেই আমি খুশি হব।

নিশ্চয় নিশ্চয়, সাইমনও খুশি হলেন। হ্যাঁ, যা বলছিলাম। টেলিভিশনে অসংখ্য ব্রিটিশ শো দেখেছে কিম। এখন একজন খাঁটি ইংরেজের সঙ্গে দেখা হয়েছে। সারাদিন ধরেই তৈরি হচ্ছিল, আপনার সঙ্গে ইংরেজের মত আচরণ করার জন্যে।...রান্নাঘর থেকে চমৎকার গন্ধ আসছে, না?

হ্যাঁ।

ডলির দিকে তাকিয়ে হাসলেন সাইমন। একটা হাত বাড়িয়ে দিলেন। হাত ধরে মেয়েটাকে নিয়ে এলেন বসার ঘরে।

তিন গোয়েন্দা শেষবার দেখে যাওয়ার পর কিছু রদবদল করা হয়েছে লিভিং রুমটার। ঢুকতেই সেটা চোখে পড়ল ছেলেদের।

মেহমানদেরকে বসতে অনুরোধ করলেন সাইমন। তারপর তিন গোয়েন্দাকে। বললেন, হ্যাঁ, এবার শুরু করতে পার।

কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে নিল রবিন। তারপর বলতে আরম্ভ করল। মাঝে মাঝে নোটবুক দেখে মিলিয়ে নিচ্ছে। কোথাও ঠেকে গেলে তাকে সাহায্য করছে মুসা আর কিশোর। হ্যানসনও করছে। কারণ সে-ও বেশিরভাগ সময়ই ওদের সঙ্গে ছিল এই কেসে।

রবিন থামলে সাইমন জিজ্ঞেস করলেন, ভালুকটার ব্যাপারটা কি? এমন কি জিনিস ছিল?

শুনলে অবাকই হবেন, ডলি বলল।

রিভস আর রোজারকে বেঁধে ফেলে রাখলাম, রবিন বলল। পুলিশের। অপেক্ষায়।

কিশোরের মনে পড়ল ওই দুর্গটা আগেও দেখেছে।

একটা হরর ছবিতে ব্যবহার করা হয়েছিল, কিশোর জানাল। প্রিজনার অভ হন্টেড হিলের শুটিং করা হয়েছিল ওই দুর্গে। মনে পড়ল একটা দৃশ্যের কথা। দেয়ালের গায়ে একটা গোপন কুঠুরির দরজা খুলে রাজকুমারীর মুকুট বের করেছিল। দুর্গের মালিক। আমার মনে হল, এটা নিশ্চয় জানে রিভস আর রোজার।

সুতরাং সোজা হেঁটে গিয়ে আবার দুর্গে ঢুকল কিশোর, মুসা বলল। খুঁজে খুঁজে ঘরটা ঠিক বের করে ফেলল। তার অনুমান ঠিক। ওই কুঠুরিতেই পাওয়া গেল ভালুকটা।

কিশোর পাশার জন্যে এটা কোন ব্যাপার না, হাত নাড়লেন লেখক। তা ছিলটা কি ভেতরে? ড্রাগ? হীরা? রত্ন...

হাসল কিশোর। আপনাকে নিরাশ করতে হচ্ছে, স্যার। ওসব কিছুই ছিল। ছিল একগাদা টাকা।

টাকা! জালনোট?

না, তা-ও না! আসল টাকা। মিস্টার জেনসেনের কাছ থেকে চুরি করেছিল রোজার আর রিভস।
তার মানে তিনজনে একসঙ্গে কাজ করেনি? একদলের নয়?
না। রোজার আর রিভস সিনেমা পাগল লোক। ছবি বানানোর ভীষণ শখ। কিন্তু টাকা নেই। রিভস কিছুদিন একটা স্টুডিওতে কাজ করেছে। আর রোজার একস্ট্রা হিসেবে অভিনয় করেছে হরর ছবিতে। দুজনে বন্ধু। আলাপ আলোচনা করে ঠিক করল একদিন, ছবি বানাবে। কি ছবি? ড্রাকুলার গল্প নিয়ে কিছু। সব প্ল্যান প্রোগ্রাম ঠিকঠাক। বাকি রইল টাকার ব্যবস্থা করা।
ড্রাকুলা? ভুরু কোঁচকালেন লেখক। ওই কাহিনী নিয়ে আর কত ছবি। বানাবে? বানিয়ে বানিয়ে পচিয়ে ফেলা হয়েছে।
হাসল মুসা। সে জন্যেই কেউ ওদেরকে টাকা দিতে রাজি হয়নি।
বাই চান্স, আগের কথার খেই ধরল কিশোর, মিস্টার জেনসেনের খেলনার কোম্পানিতে শিপিং ক্লার্কের একটা চাকরি পেয়ে গেল রোজার। খেলনার গুদামে তালা দেয়া ছোট একটা ঘর আছে, যেটাতে আমরা ঢুকতে পারিনি। ওটার প্রতি কৌতূহল বাড়তে লাগল ওর। একদিন জিনসেনের ড্রয়ার থেকে চাবি চুরি করে। ঢুকে পড়ল ওই ঘরে। দেখে আলমারিতে অনেক টাকা। বেশ কিছু বাণ্ডিল হাতিয়ে নিল সে। কিন্তু সরায় কি করে? শেষে এক বুদ্ধি করল। বড় দেখে একটা খেলনা ভালুকের ভেতরে ভরে ফেলল সেগুলো। ফারের পোশাক বিক্রি করে যে দোকানদার, তার দোকানে আরও খেলনার সঙ্গে চালান করে দিল বিশেষ ভালুকটা। এবং সেদিনই জেনসেনের চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে গেল রোজার।
ফারের দোকানদারের কাছ থেকে ভালুকটা আবার হাতানো দরকার। তাই গিয়ে যেচে পড়ে জোরজার করেই তার দোকানে চাকরি নিল রোজার। কিন্তু সে এতই অকর্মা, ভালুকটা দোকানে পৌঁছার আগেই তাকে বের করে দিল মালিক। খেলনা ভালুকগুলো এল। দোকানে কাজ করে না তখন রোজার, বেছে বেছে যে বের করবে কোনটাতে টাকা ভরেছে, সেই সুযোগ নেই। কাজেই ওই চালানে যে কটা খেলনা এসেছিল সব চুরি করল রোজার আর রিভস। সাধারণ ছুরি হিসেবে দেখানোর জন্যে কয়েকটা ফারের কোটও চুরি করল।
এবারেও ভাগ্য ওদের বিপক্ষে গেল। ওরা চুরি করার আগেই বিশেষ ভালুকটা মিসেস লেসিংকে দিয়ে দিয়েছে দোকানদার। চুরি করা ভালুকগুলো সব খুলেও যখন টাকা পেল না রোজার, মাথায় হাত দিয়ে বসল। খুঁজতে শুরু করল কার কাছে গেছে ভালুকটা। সেটা জানার জন্যেই আরেকবার চুরি করতে ঢুকতে হল দোকানে, কাগজপত্র ঘাটাঘাটি করার জন্যে।
কত টাকা ছিল ভেতরে? জানতে চাইলো সাইমন।

দশ হাজার ডলার। ওই টাকায় ছবিটা শুরু করতে চেয়েছিল ওরা, মুসা, বলল। ভেবেছিল, পরে যা টান পড়বে, কোনভাবে জোগাড় করে নিতে পারবে।
যাই হোক, আবার বলতে লাগল কিশোর। ওরা জেনে গেল ভালুকটা কোথায় আছে। মিসেস লেসিং তখন বিদেশে। আছে শুধু ডলি। তাকেই পটাতে শুরু করল দুজনে। জেনে গেছে ডলি, সিনেমায় অভিনয় করতে আগ্রহী। তার সঙ্গে খাতির করেছে আসলে মিসেস লেসিঙের বাড়িতে ঢোকার সুযোগের জন্যে, যাতে ভালুকটা বের করে নিয়ে যেতে পারে। ওখানে পেল না। জানতে পারল, ওটা আছে আমাদের কাছে। কাজেই ঢুকল গিয়ে আমাদের ইয়ার্ডে।
দানবের সাজে সেজে আমাদের হেডকোয়ার্টার থেকে ওটা কেড়ে নিয়ে এল,. তিক্ত কণ্ঠে বলল মুসা।
ওরকম সাজা ওদের জন্যে কিছুই না, সাইমন বললেন। বিশেষ করে রোজারের জন্যে। হরর ছবিতে এক্সট্রার অভিনয় করেছে সে। দৈত্যদানবই সেজেছে বেশি। তাই না?
হ্যাঁ, মাথা ঝাঁকাল রবিন।
বন্ধকীর দোকানে কেন গিয়েছিল? আরও টাকা লুট করতে?
না, ওরা যায়নি। গেছে আরেকটা পাগল। এই হলিউডে যে কত রকম পাগল আছে। হাত নেড়ে মুসা বলল, আমার তো একেক সময় মনে হয় এখানকার বেশির ভাগ মানুষেরই মাথায় ছিট। লোকটা ছদ্মবেশে গিয়েছিল ভয় দেখিয়ে মজা পেতে। যখন দেখল, লোকে সিটিয়ে যায়, টাকা লুট করার বুদ্ধিটা তখনই মাথায়। এল ওর। কয়েকটা করেছে ওভাবে। রোজার আর রিভস যেদিন ধরা পড়ল, তার পরদিনই ওই ব্যাটাকেও ধরে ফেলেছে পুলিশ।
হাসলেন লেখক। এক মুহূর্ত চুপ করে থাকলেন। তারপর বললেন, আসল কথায় আসি এবার। জেনসেন এত টাকা পেল কোথায়? তোমাদেরকেই বা অনুসরণ করেছে কেন?
পিজা শ্যাকে আমাদেরকে ভালুকটার কথা বলতে শুনেছে, রবিন জানাল। ব্যাপারটা কি ঘটেছে, আন্দাজ করে ফেলল। কারণ আলমারি থেকে যে টাকা চুরি গিয়েছিল, জেনে গেছে তখন সে। কে, কিভাবে চুরি করেছে, বুঝতে পেরেছে আমাদের আলোচনা শুনেই।
পুলিশকে জানাল না কেন?
জানাবে কি করে? সে নিজেই তো চোর, কিশোর বলল।
আমিও সে রকমই কিছু আন্দাজ করছিলাম। তা কোত্থেকে চুরি করেছিল?
গত বছর নভেম্বর মাসে ট্রেজারি থেকে পঞ্চাশ হাজার ডলার চুরি হয়েছিল, জানেন আপনি? কাগজে বেরিয়েছিল।

মাথা ঝাঁকালেন সাইমন।
জেনসেনই সেই টাকা চুরি করেছিল। পুলিশ এতদিন ধরতে পারেনি। সেই টাকা পুঁজি খাঁটিয়ে ড্রাগ আর নানা রকম অবৈধ জিনিসের ব্যবসা করে অনেক কামিয়ে ফেলেছিল। সেগুলো ভরে রেখেছিল আলমারিতে।
হুঁ। তাহলে এই ব্যাপার। তোমাদের পিছু নিয়েছিল নিশ্চয় ভালুকটা কোথায় আছে জানার জন্যে?
হ্যাঁ।
কোথায় এখন? ধরেছে পুলিশ?
না। পালিয়েছে।
কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন লেখক। তারপর মুখ তুলে বললেন, রোজার আর রিভসের জন্যে খারাপই লাগছে। বেচারারা! ছবি আর বানাতে পারল না...
দরজা খুলে ঘরে ঢুকল কিম। হাতে বিশাল এক ট্রে। সামনের টেবিলে এনে
নামিয়ে রেখে হেসে বলল, খাঁটি ইংরেজি চা, মিস্টার হ্যানসন। আশা করি আপনার ভাল লাগবে।
প্লেটগুলোর দিকে তাকিয়ে রয়েছে মুসা। বড় বড় কেক, আর একটা বিরাট প্লেটে পুডিং। জিজ্ঞেস করল, এগুলোও কি ইংরেজি?
নিশ্চয়ই। খেয়ে দেখতে পার। ভাল হয়েছে।
হাসল মুসা।
কিশোর আর রবিন হাসতে পারল না। ভয় কাটেনি। কিমকে বিশ্বাস নেই। বলা যায় না, এগুলো খাওয়া শেষ হলেই হয়ত ইঁদুর কিংবা পোকা নিয়ে এসে হাজির হয়ে বলবে, এগুলো যেদেশের খবরই হোক, খাঁটি ইংরেজি পদ্ধতিতে কাবাব করা।
উঠে দাঁড়াল ডলি। বলল, চা-টা আমিই দিই। কেটলি হোকে কাপে ঢালতে শুরু করল সে। সবাইকে দিতে দিতে বলল, আমি বাড়ি ফিরে যাচ্ছি দুএকদিনের মধ্যেই। বাবাকে বলে দিয়েছি, আবার স্কুলে যাব। পড়ালেখা ভ ল ত শেষ হলে ভর্তি হব অভিনয়ের স্কুলে। ট্যালেন্ট থাকলে আমার অভিনেত্রী হওয়া কেউ ঠেকাতে পারবে না।
এই তো বুদ্ধিমতি মেয়ের মত কথা, লেখক বললেন। ট্যালেন্ট এবং আত্মবিশ্বাস। যে কোন কাজ স্বাভাবিক উপায়েই করা উচিত।
শেষ হয়ে গেল খাওয়া। কোন প্লেটেই তার কিছু নেই।
আতঙ্কের মহর্ত উপস্থিত। ভয়ে ভয়ে কিমের দিকে তাকাতে লাগল কিশোর আর রবিন।

বুঝে ফেলল কিম। জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলল, ভয় নেই, আজ ইংরেজি ছাড়া কিছু করিনি। তবে আমাজানের জংলীদের একটা বিশেষ ডিশ করার ইচ্ছে আছে। সাপের মাংস, বানরের রক্ত আর…
সেটা কবে! আতকে উঠল রবিন।
অবশ্যই জানাব। দাওয়াত করব তোমাদেরকে, আশ্বাস দিয়ে বলল কিম।
অন্তত সাতদিন আগে জানাবেন। যাতে আমেরিকা ছেড়েই পালাতে পারি। রীতিমত আতঙ্ক ফুটেছে রবিনের চোখে।
লেখক বললেন, আমিও পালাব তোমার সঙ্গে। পরের একটা মাস আর বাড়িমুখো হব না।
মুখ বাকাল কিম। এত বেরসিক লোকদের নিয়ে পারা যায় না। বলল, আসলে আপনাদেরকে আমার দরকার নেই। আমি মুসাকে পেলেই খুশি। কি বলো, মুসা?

ভলিউম ১৭ – নকল কিশোর – তিন গোয়েন্দা – রকিব হাসান – সেবা প্রকাশনী
প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ১৯৯২
আরে, গেল কোথায়! এখানেই তো ছিল! চেঁচিয়ে উঠল মুসা আমান।
ঝট করে তার দিকে তাকাল কিশোর আর রবিন। মোবাইল হোমে তিন গোয়েন্দার গোপন হেডকোয়ার্টারে রয়েছে ওরা।
কি গেল কোথায়? জানতে চাইল রবিন।
কড়া চোখে দুজনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে মুসা। কেন, জান না?
নিরীহ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল রবিন।
কি জানি না? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
দেখ, বিরক্ত ভঙ্গিতে হাত নাড়ল মুসা। সাংঘাতিক খিদে পেয়েছে আমার। এসব রসিকতা ভাল্লাগছে না! খেয়ে ফেলে থাকলে বল।
আমরা তোমার খাবার খেতে যাব কোন দুঃখে? আর তোমার মত খাই খাই করি নাকি?
সত্যি বলছ খাওনি?
না।
সরিয়েও রাখনি, মজা করার জন্যে?
না, এবার জবাব দিল রবিন। আমরা তো আমাদের কাজেই ব্যস্ত।
অবাক কাণ্ড! তাহলে গেল কোথায়?
দেখ, কোথায় রেখেছ, কিশোর বলল। একখানে রেখে আরেকখানে খুঁজলে পাবে কি করে? যাকগে, যা বলছিলাম, কিছু একটা করা দরকার আমাদের। রিক্রিয়েশনের জন্যে। ইয়ার্ডে কাজ করতে করতে হাড় কালো হয়ে গেছে আমার। আর ভাল্লাগে না। চল, কাল কোনখান থেকে ঘুরে আসি। কোথায় যাওয়া যায়? ডিজনিল্যাণ্ডে আর না, অনেক হয়েছে। এক কাজ করি, চল, ম্যাজিক মাউনটেইনে যাই। কখনও যাইনি।
আমিও না, মুসা বলল। জায়গাটা কেমন, তা-ও জানি না। রবিন, জান?
শুনেছি তো ভাল। ডিজনিল্যাণ্ডের ধারেকাছেও লাগে না, তবে ভাল। অনেক মজার মজার জিনিস আছে, চড়ার ব্যবস্থা। আসলে বাচ্চাদেরই বেশি ভাল লাগবে। এই যেমন ফেরিস হুইল, চাড রাইড, এসব আর কি।
— হুঁ, মাথা দোলাল মুসা। বাচ্চাদেরই। তবে আমারও খারাপ লাগবে না। অন্তত বাগান সাফ আর গ্যারেজ পরিষ্কারের চেয়ে তো ভাল।
আর মেরিচাচীর মরচে পড়া লোহার চেয়ার ঘষার চেয়ে, যোগ করল কিশোর। তাহলে কি ঠিক হল? ওখানেই যাচ্ছি আমরা। রোলস রয়েসে চেপে যাব। অনেক দিন ওটাতে চড়ি না। হ্যানসনকে ফোন করে দেব নিয়ে আসতে।

ভালই হবে, হেসে বলল রবিন। ওটা থেকে নামতে দেখলে লোকে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে আমাদের দিকে। ভাবে কোনও কোটিপতির ছেলে। বন্ধু বান্ধব নিয়ে হাওয়া খেতে বেরিয়েছে। হাহ হাহ।
যাওয়ার ব্যবস্থা তো হল, অধৈর্য হয়ে বলল মুসা। এখন আমার খাওয়ার কি হবে? খিদেয় তো পেট জ্বলে গেল। সত্যিই তোমরা দেখনি?
আবার সেই এক কথা, হাত নাড়ল কিশোর। তুমি আর রবিন তো তখন ওয়ার্কশপে কাজ করছিলে। ওখানে রাখনি তো? চল, আমিই দেখছি। ওটা বের না করলে আর শান্তিতে থাকতে দেবে না আমাদের।
দুই সুড়ঙ্গ দিয়ে ওয়ার্কশপে বেরিয়ে এল ওরা। রবিন খুঁজে বের করল ওটা, কিংবা বলা যায় তাকাতেই চোখে পড়ল। ওয়ার্কবেঞ্চের ওপর পড়ে রয়েছে লাঞ্চ প্যাকেট। বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছিল মুসা। একটা প্ল্যাস্টিকের ব্যাগে ভরে।
ওই তো, রবিন বলল। নিজেই ফেলে গেছ। আর এদিকে আমাদের মাথা খারাপ করছ।
ব্যাগটা তুলে নিল মুসা। ভেতরে ছেঁড়া প্যাকেট কে জানি খেয়ে ফেলেছে! কে? রবিনের দিকে তাকাল সে।
তুমিই হয়ত খেয়েছ, কিশোর বলল। তারপর ভুলে বসে আছ।
আমি? খেলে ভুলে যাব, কথা হল একটা? তাছাড়া পেটের তো ভোলার কথা নয়।
তাহলে ইঁদুর, ছেঁড়া কাগজটা দেখতে দেখতে রবিন বলল। ইঁদুরে সবই খায়। তোমার চেয়ে রাক্ষস।
ইঁদুর? আমার বিশ্বাস হয় না। স্যালভিজ ইয়ার্ডে ইঁদুর থাকলে ওটার ঘুম হারাম করে ছাড়তেন মেরিচাচী। সেই সঙ্গে নিজের ঘুমও। না মারা পর্যন্ত। মনে নেই গত বছর...
তা আছে, হেসে বলল কিশোর। ওই একটা চোখে পড়েছিল বলে। শেষে ওটাকেই মেরেছে, না অন্যটাকে, সে ব্যাপারেও শিওর নই আমি। যত খুঁতখুতেই হোক, স্যালভিজ ইয়ার্ডের মত একটা জায়গা থেকে ইঁদুর নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার সাধ্য হবে না। ইঁদুর এমন এক জাত একেবারে শেষ করার ক্ষমতা কারও নেই।
এখন তাহলে কি করব? মাথায় হাত দিয়ে বসার অবস্থা মুসার। পেটের মধ্যেই তো ইঁদুর ঢুকে বসে আছে। তিনি
হেসে ফেলল কিশোর। আজ কিছু খাওনি নাকি? এমন করছ। চল, ফ্রিজে কিছু থাকতে পারে। না থাকলে মেরিচাচীকে বললেই রেডি করে দেবে।
ইয়ার্ডের অফিসের দিকে এগোতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল কিশোর। গেটের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। রাস্তা থেকে গেটে ঢোকার মাঝখানে এক চিলতে জায়গা, সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা সবুজ, মার্সিডিজ। কেউ বেরোচ্ছে না ওটা থেকে।

এই, ওই গাড়িটা আগে দেখেছ?
মুসা আর রবিনও তাকাল। মাথা নাড়ল দুজনেই।
আস্তে করে ওখানে এসে দাঁড়িয়ে গেল, কিশোর বলল। দেখলাম।
তাতে কি? মুসার প্রশ্ন। ওখানে কোনও গাড়ি থামতে পারে না নাকি? হয়ত ইয়ার্ডে ঢুকবে, কাস্টোমার।
হয়ত, মাথা দোলাল কিশোর। কিন্তু তাহলে কেউ নামছে না কেন? আজ সকালেও গেটের পাশ দিয়ে যেতে দেখেছি গাড়িটাকে। তখন থামেনি। খুব আস্তে আস্তে চলছিল।
কিশোর, বলে উঠল রবিন। এখন মনে পড়েছে, আমিও দেখেছি! পেছনের বেড়ার কাছে, রাস্তায়। সাইকেল নিয়ে যখন আসছিলাম। এই ঘণ্টাখানেক আগে।
ওরাই হয়ত আমার লাঞ্চ চুরি করেছে! মুসা বলল।
তা তো নিশ্চয়, টিটকারির ভঙ্গিতে বলল রবিন। ইন্টারন্যাশনাল ফুড থিভস। তোমার কয়েকটা স্যাণ্ডউইচ চুরি না করলে কি ওদের চলে?
তোমার এই খাবারের চিন্তা মাথা থেকে নামাও তো, বিরক্ত কণ্ঠে বলল কিশোর। গাড়িটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। বলাই তো হল তুমি ভুলে না খেয়ে থাকলে ইঁদুরে খেয়েছে। ওই গাড়িটা কি চায় দেখা দরকার।
রবিন হাসল। হয়ত আরেক প্যাকেট লাঞ্চ চুরির সুযোগ খুঁজছে।
মনে হয় কিছু চায়, রবিনের কথা যেন শুনতেই পেল না কিশোর। দেখি।
রহস্যের গন্ধ পেয়েছে কিশোর, বুঝতে পারল অন্য দুজন। কি করে জানি পেয়ে যায় সে, অনেকবার দেখেছে রবিন আর মুসা। কখনও ভুল করে না। এখনও সেরকমই আচরণ করছে গোয়েন্দাপ্রধান।
মুসা, ইয়ার্ডের পেছনে চলে যাও, জরুরী কণ্ঠে বলল কিশোর। লুকিয়ে থেকে গাড়িটার ওপর চোখ রাখ। লাল কুকুর চার দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছি আমি আর রবিন। বেড়ার চারপাশে চক্কর দিয়ে আসব। রবিন, তুমি বাঁয়ে যাও, আমি ডানে যাচ্ছি। এতে সব দিক থেকেই নজর রাখতে পারব। মুসা, চলে যাও।
মাথা ঝাঁকাল মুসা। দেখল, তিন গোয়েন্দার গোপন প্রবেশ পথ দিয়ে ঢুকে যাচ্ছে তার বন্ধুরা। সে-ও রওনা হল। জঞ্জালের স্তূপের আড়ালে আড়ালে চলে এল মেইন গেটের কাছে। বেড়ার আড়ালে থেকেই উঁকি দিয়ে দেখল, মার্সিডিজটা আগের জায়গাতেই রয়েছে। ভেতরে দুজন লোক। চট করে মাথা নিচু করে ফেলল সে। হামাগুড়ি দিয়ে এগোল খোলা গেটের দিকে। উপুড় হয়ে পড়ে থেকেই ঘুরে তাকাল আবার।
এই যে, কিছু হারিয়েছ? সাহায্য করব?

ঢোক গিলল মুসা। গাট্টাগোট্টা একজন লোক। রোদে পোড়া চামড়া। হালকা স্যুট। তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। বাদামী কোঁকড়া চুল লোকটার। নীল চোখ। মুখে মোলায়েম হাসি। ইয়ার্ডের ভেতরে মুসাকে ওভাবে হামাগুড়ি দিতে দেখে যেন খুব মজা পাচ্ছে।

আমি...আমি..., নিজেকে বোকা বোকা লাগছে মুসার। ইয়ে-বল হারিয়ে ফেলেছি। সেটাই...খুঁ-খুঁজছি...

এদিকে তো কোনও বল দেখলাম না, লোকটা বলল।

তাহলে অন্য কোনও দিকে চলে গেছে হয়ত, ভোঁতা গলায় বলে উঠে দাঁড়াল মুসা।

হ্যাঁ, তা হতে পারে। লোকটার হাতে একটা লোক্যাল ম্যাপ। সেটা দেখিয়ে মুসাকে বলল, সাহায্য করবে একটু? হারিয়ে গেছি আমরা।

সবুজ মার্সিডিজের দরজা খুলে গেল। ভেতরে আরেকজন লোককে দেখতে পেল মুসা। সেদিকে ফিরে মাথা ঝাঁকিয়ে ইঙ্গিত করল রোদেপোড়া লোকটা, বোঝাতে চাইল দুজনেই হারিয়েছে। বলল, সেই তখন থেকে ঘুরে মরছি। বার বার একই জায়গায় ফিরে আসছি। পুরনো মিশনারিটা খুঁজছি আমরা।

লোকটার কথায় বিদেশী টান। ইংরেজিই বলছে তবে ইংরেজ নয় সেটা স্পষ্ট। তাহলে এই ব্যাপার! ভাবল সে। দুজন পথ হারানো টুরিস্ট। কিশোর পাশার রহস্য খোঁজায় তাহলে শুরুতেই ছাই পড়ল।

নিশ্চয় করব। ম্যাপটা নিয়ে দেখিয়ে দিল মুসা, কোস্ট হাইওয়ের কোন জায়গায় রয়েছে স্প্যানিশ মিশনটা। গোলমেলে রাস্তা। খুঁজে বের করাটা একটু জটিলই।

ঠিকই, মাথা ঝাঁকাল লোকটা। অনেক ধন্যবাদ তোমাকে।

গাড়িতে গিয়ে উঠল লোকটা। চলতে শুরু করল সবুজ মার্সিডিজ। দৌড়ে এল কিশোর আর রবিন। গাড়িটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে গোয়েন্দাপ্রধান।

টুরিস্ট, তিক্ত কণ্ঠে বলল মুসা। লোকটার কাছে কিভাবে ধরা পড়ে গিয়েছিল জানাল। ইংরেজিই বলে, তবে অদ্ভুত টান।

পথ হারিয়েছে? হতাশ গলায় বলল কিশোর। আর কিছু না?

আর কি হবে? হাতে কোনও কেস নেই আমাদের যে পেছনে লাগবে।

গম্ভীর হয়ে আছে কিশোর। চিন্তিত। পথ হারাতেই পারে, যেহেতু বিদেশী, কিন্তু—

এর মাঝে আবার কিন্তু দেখলে কোথায়? ওরা পথ হারিয়েছে। ব্যস।

বাদ দাও, হাত নাড়ল রবিন। চল, ম্যাজিক মাউনটেইনে কখন কিভাবে যাব সেই আলোচনা করিগে।

হ্যাঁ, চল। মনে করিয়ে দিল মুসা। তবে তার আগে আমার খাবারেরও ব্যবস্থা কর। বড্ড খিদে পেয়েছে।

.

পরদিন সকাল সকাল উঠল রবিন। হাতমুখ ধুয়ে কাপড় পড়ে তাড়াহুড়ো করে এসে রান্নাঘরে ঢুকল। গপগপ করে নাস্তা গিলছে, এই সময় খবরের কাগজটা নামিয়ে রেখে তার দিকে তাকিয়ে হাসলেন তার বাবা।
কি ব্যাপার? জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার মিলফোর্ড। জরুরী তদন্ত আছে মনে হয়?
না, বাবা। আজ আমরা ম্যাজিক মাউনটেইনে যাচ্ছি তো, তাই। হ্যানসনকে রোলস রয়েস নিয়ে আসতে বলা হয়ে গেছে। সময়মত হাজির হয়ে যাবে সে। ব্রিটিশ শোফার। খুব সময় জ্ঞান। তার কাছে লজ্জা পেতে চাই না।
ও, শিস দিয়ে উঠলেন মিস্টার মিলফোর্ড। তিনজন সম্ভ্রান্ত বিশিষ্ট ভদ্রলোক। ভাল।
একেবারেই কি অস্বীকার করতে চাও?
আরে না না, হাসলেন মিস্টার মিলফোর্ড। আসলেই তোমরা ভদ্র। রোলস রয়েসে চড়ে যাচ্ছ তো, সেজন্যেই সম্ভ্রান্ত আর বিশিষ্ট শব্দ দুটো যোগ করলাম।
বাবা, দেরি হয়ে যাচ্ছে। আমি যাই। ডিনারের সময় ফিরব, মাকে বোলো। দরজা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে এল রবিন।
রোদ উঠছে। সকালের প্রায় নির্জন রাস্তা দিয়ে দ্রুতবেগে সাইকেল চালাল। সে। ইয়ার্ডের গেট দিয়ে ঢোকার সময়ই দেখল অফিসের সামনে বারান্দায় একটা টুলে বসে রয়েছে মুসা। তাকিয়ে রয়েছে কালো বিশাল রোলস রয়েসটার দিকে। গাড়ি বটে একখান। মনে মনে আরেকবার তারিফ না করে পারল না রবিন।
গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে লম্বা, ফিটফাট শোফারের পোশাক পরা একজন লোক। হ্যানসন। রবিনকে দেখে হাসল। গুড মর্নিং, রবিন।
গুড মর্নিং, জবাব দিল রবিন।
নতুন কোনও কেস?
নাহ। কেন, কিশোর বলেনি?
কথা হয়নি।
ও। ম্যাজিক মাউনটেইনে যাচ্ছি আমরা।
বেড়াতে? চমৎকার জায়গা।
বারান্দা থেকে নেমে এল মুসা। রবিনকে বলল, চল, ওঠ।
গাড়িতে উঠল দুজনে।
কি ব্যাপার, কিশোর আসছে না? অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল রবিন। কোথায় ও?
হেডকোয়ার্টারে। কি জানি করছে। চলে আসবে এখনি।
কিছুক্ষণ বসে থেকে অস্থির হয়ে উঠল রবিন। চল তো দেখি। নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। মুসাও নামল। রবিনের পেছন পেছন এসে ঢুকল দুই সুড়ঙ্গে।

ট্রেলারে ঢুকে দেখল, ডেস্কের ওপাশে বসে রয়েছে কিশোর। অনেকগুলো রঙিন ব্রশিয়ার ছড়ানো টেবিলে।
হ্যানসন বসে আছে, কিশোর, রবিন বলল।
এই হয়ে গেছে। আর একটু, মুখ না তুলেই জবাব দিল গোয়েন্দাপ্রধান। আরও কয়েক মিনিট পরে সন্তুষ্ট হয়ে হেলান দিল চেয়ারে, হ্যাঁ, হয়েছে। চলবে।
কি চলবে? মুসা জানতে চাইল।
আমাদের এক্সকারশনের প্ল্যান করলাম, কিশোর জানাল। ম্যাজিক মাউনটেইনের একটা ম্যাপ জোগাড় করেছি। সবচেয়ে কম সময়ে কত বেশি মেশিনে চড়তে পারব হিসেব করলাম। কোনও মেশিনে বেশি মজা পেলে দুবার করেও যাতে চড়তে পারি সেই সময়ও রেখেছি। আবার কোনটা যদি হঠাৎ খারাপ হয়ে যায়, কিংবা বাতাসের কারণে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে দেরি করিয়ে দেয়…দিতেই পারে, তাই না? কতটা সময় নষ্ট হবে তাতে সেটাও ধরেছি…।
গুঙিয়ে উঠল মুসা। কিশোর, মাঝে মাঝে মনে হয় তোমার মাথায় সত্যি ছিট আছে। চল, ওঠ তো।
রবিন বলল, এতসব ভেবে কি লাভ? সময় যা লাগার লাগবেই।
কি লাভ? ভ্রূকুটি করল কিশোর। হিসেব ছাড়া কিছুই চলে না…
আরে বাবা, দুহাত তুলল মুসা, ওখানে কাজ করতে যাচ্ছি না আমরা। যাচ্ছি নিছক মজা করতে। আনন্দ। তার আবার হিসেব কি?
বেশ, মুখ গোমড়া করে ফেলল কিশোর। আমার প্ল্যান যদি তোমার পছন্দ না হয়, বাদ দিতে পার।
টেবিলের কাগজগুলোর দিকে কয়েক সেকেণ্ড নীরবে তাকিয়ে রইল সে। এত কষ্ট করে অঙ্কগুলো করেছে। কাগজগুলো এক জায়গায় করে দলামোচড়া করে একটা দীর্ঘশ্বাসের সাথে ফেলে দিল ময়লা ফেলার ঝুড়িতে। রবিন আর মুসার মনে হল একটা জ্বালাতন থেকে মুক্তি মিলল, হাসি ফুটল মুখে। উঠে দাঁড়াল কিশোর। ট্রেলার থেকে বেরিয়ে এল তিনজনে।
গাড়িতে উঠে নির্দেশ দিল কিশোর, ম্যাজিক মাউন-টেইনে যান।
ইয়েস, স্যার, হেসে বলল হ্যানসন। ছেলেদের সঙ্গে তার বন্ধুত্বের সম্পর্ক, তবু সৌজন্য ভুলতে রাজি নয় খাঁটি ইংরেজ শোফার।
জায়গাটা রকি বীচের পুবে। দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার পার্বত্য অঞ্চলে। শহর থেকে বেরিয়ে এসে কাউন্টি হাইওয়ে ধরে চলল বিশাল গাড়িটা। শুকনো, ধুলোময়, পাহাড়ের প্রথম ঢালটার কাছে পৌঁছে জিজ্ঞেস করল হ্যানসন, সত্যি বেড়াতে? না কোনও গোপন কেস?
নাহ, কেসটস না, হতাশ কণ্ঠে বলল কিশোর। বেড়াতেই এসেছি। কেন?

কারণ, অনুসরণ করা হচ্ছে আমাদেরকে।
অনুসরণ! প্রায় একই সঙ্গে বলল তিন কিশোর। মাথাগুলো ঘুরে যাচ্ছে পেছন দিকে।
কোথায়, হ্যানসন? রবিনের প্রশ্ন। আমি তো কোনও গাড়ি দেখছি না।
মোড়ের ওপাশে রয়েছে। স্যালভিজ ইয়ার্ড থেকে বেরোনোর পর পরই গাড়িটা চোখে পড়েছে আমার। তারপর থেকে লেগেই রয়েছে পিছে। একটা সবুজ মার্সিডিজ।
সবুজ মার্সিডিজ! প্রায় চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। আপনি শিওর?
গাড়ি চালানো আমার পেশা, কিশোর, দৃঢ়কণ্ঠে বলল হ্যানসন। ওই যে, বেরিয়েছে! আসছে আবার।
পেছনের জানালা দিয়ে তাকিয়ে রয়েছে তিন গোয়েন্দা। ভুল নেই। পিছু নিয়েছে সবুজ গাড়িটা।
সেই গাড়িটাই! মুসা বলল।
তারমানে, কিশোরের কণ্ঠে খুশির আমেজ। টুরিস্ট নয় লোকগুলো। কাল মিথ্যে কথা বলেছে। আমার ধারণাই ঠিক।
তাই তো মনে হচ্ছে। কিন্তু কি চায় ওরা?
বুঝতে পারছি না।
কিন্তু বুঝতে হবে মনে হচ্ছে, রবিন বলল। গতি বাড়িয়ে দিয়েছে ওরা।
হ্যানসন, কিশোর বলল। ওদেরকে খসাতে পারবেন?
চেষ্টা করতে পারি, শান্ত কণ্ঠে বলল হ্যানসন।
একসিলারেটরে চাপ বাড়াতেই লাফ দিয়ে আগে বাড়ল বিশাল গাড়িটা। প্রায় নিঃশব্দে। ইঞ্জিনের আওয়াজ এখনও তেমন বাড়েনি। পর্বতের ভেতরে ঢুকে পড়েছে ওরা এখন। সরু টু-লেন পথটা একেবেকে উঠে গেছে। এক পাশে গভীর খাত। স্টিয়ারিং চেপে ধরেছে হ্যানসন। দক্ষ হাতে মোড় ঘুরছে। একটু এদিক ওদিক হলেই গিয়ে খাতে পড়তে পারে গাড়ি।
গতি বেড়ে গেছে সবুজ মার্সিডিজের। রোলস রয়েসটাকে ধরার জন্যে তেড়ে আসছে ওটা। মোড় ঘোরার সময় গতি কমাচ্ছে না একটা গাড়িও, ফলে কর্কশ শব্দ করছে টায়ার। মাঝে মাঝেই বিপজ্জনক ভাবে রাস্তার কিনারে চলে যাচ্ছে একপাশের চাকা। যত শক্তিশালী ইঞ্জিনই হোক, স্বাভাবিক ভাবেই বড় গাড়ির চলন ভারি হয় ছোটগুলোর চেয়ে। অতটা ক্ষিপ্র হতে পারে না। তাই কাছিয়ে আসতে থাকল মার্সিডিজটা।
ধরে ফেলেছে! চিৎকার করে বলল মুসা।

শান্ত রয়েছে হ্যানসন। এর চেয়ে জোরে চালানো উচিত না। সামনের পথের ওপর দৃষ্টি স্থির। তবে... থেমে গেল সে। সামনে একটা বাঁক। সেটা ঘুরতে ক্ষণিকের জন্যে দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল মার্সিডিজটা। ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষল হ্যানসন। স্কিড করে এগিয়ে গেল গাড়ি। ডানে আর কয়েক ইঞ্চি সরলেই চাকা চলে যেত পথের বাইরে। বন বন করে স্টিয়ারিং ঘোরাচ্ছে সে। ব্রেক ছেড়ে দিয়ে। আবার একসিলারেটরে চাপ দিল। বায়ের একটা সরু কাঁচা রাস্তায় নামিয়ে নিয়ে এল গাড়ি। ওকের বন আর চ্যাপারালের ঝোপের ভেতর দিয়ে চলে গেছে পথটা।
গর্জন করতে করতে চলে গেল মার্সিডিজটা।
দিয়েছেন খসিয়ে! প্রায় চিৎকার করে বলল রবিন।
আপাতত, হ্যানসন বলল। তবে শীঘ্রি ওরা বুঝে যাবে ফাঁকিটা। ফিরে আসবে আমাদেরকে ধরার জন্যে। জলদি পালাতে হবে আমাদের।
একসিলারেটর চেপে ধরল সে। তীব্র গতিতে ছুটল গাড়ি, ধুলো ওড়াতে ওড়াতে। খানিক পরই গতি কমিয়ে ফেলল হ্যানসন। ব্রেক কষে থামিয়ে দিল। গাড়ি। সরি। লাভ হল না। এতক্ষণে হতাশা প্রকাশ পেল তার কণ্ঠে।
কি হয়েছে দেখল ছেলেরা। সামনে পাহাড়ের দেয়াল। দুধারে পাহাড়। পথ। রুদ্ধ। একটা বক্স ক্যানিয়নে ঢুকেছে গাড়ি।
হাইওয়েতে ফিরে চলুন! নির্দেশ দিল কিশোর। জলদি! হয়ত এখনও বুঝতে পারেনি ওরা যে আমরা ফাঁকি দিয়েছি।
গাড়ি ঘোরাল হ্যানসন। ফিরে চলল মেইন রোডের দিকে।
তীক্ষ্ণ একটা মোড় ঘুরতেই সামনে পড়ল মার্সিডিজ। আরেকটু হলেই ওটার। গায়ে গুতো মেরে বসত রোলস রয়েস। ব্রেক কষে গাড়ি থামিয়েই স্টিয়ারিং ঘোরাতে শুরু করল হ্যানসন, পাশ কেটে বেরিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে। কিন্তু তার উদ্দেশ্য বুঝে ফেলল মার্সিডিজের দুই আরোহী। দুপাশ থেকে দরজা খুলে লাফিয়ে। নেমে এল। হাতে পিস্তল।
বেরোও! জলদি! গর্জে উঠল একজন।
সাবধানে রোলস রয়েস থেকে নেমে এল হ্যানসন আর তিন গোয়েন্দা।
দেখুন, হ্যানসন বলল। বুঝলাম না কেন আপনারা
চুপ! ধমক দিয়ে তাকে থামিয়ে দিল লোকটা।
খপ করে বিস্মিত কিশোরের কব্জি চেপে ধরল আরেকজন। তার মুখে কাপড় গুঁজে দিয়ে একটা মোটা থলে নামিয়ে দিল মাথার ওপর। টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে তাকে মার্সিডিজে তোলা হল। পিস্তলের মুখে কিছুই করতে পারল না হ্যানসন, মুসা আর রবিন। নীরব অসহায় দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

খবরদার আমাদের পিছু নেবে না! শাসিয়ে বলল একজন, যদি বন্ধুর জীবন বাঁচাতে চাও। তোমরা গোলমাল করলে ওর বিপদ হবে।
চলতে শুরু করল মাসাজ। হারিয়ে গেল হাইওয়ের দিকে।

.
চরকির মত পাক খেয়ে রোলস রয়েসের দিকে ঘুরল মুসা। আসুন, পিছু নেব!
না, মুসা! বলল রবিন আর হ্যানসন।
ওদের দিকে তাকিয়ে রইল মুসা। কিন্তু ওকে বাঁচাতে হবে তো!
তা তো হবেই, মুসার কাঁধে হাত রাখল হ্যানসন। কিন্তু ওদের পিছু নেয়া চলবে না। কিডন্যাপাররা বিপজ্জনক লোক।
ওদের পিছু নিলে কিশোরের ক্ষতি করতে পারে, রবিন বলল। তবে ওরা। কোন দিকে গেল সেটা আমাদের দেখা দরকার, যাতে পুলিশকে বলতে পারি। ওরা জানে না আমাদের গাড়িতে ফোন আছে। পুলিশকে সতর্ক করে দিতে পারব ভাবেনি। মুসা, জলদি চল। পাহাড়ের ওপরে গিয়ে দেখি। হ্যানসন, আপনি থানায় ফোন করুন। চীফ ইয়ান ফ্লেচারকে পান কিনা দেখুন।
প্রায় ডাইভ দিয়ে গাড়ির ভেতরে ঢুকল হ্যানসন। রবিন: আর মুসা উঠতে শুরু করল ঢাল বেয়ে। তাড়াতাড়ি ওঠার চেষ্টা করতে গিয়ে হাঁপাতে লাগল অল্পক্ষণেই। চূড়ায় যখন উঠল দরদর করে ঘামতে আরম্ভ করে দিয়েছে। হাইওয়ের দিকে তাকাল।
ওই যে! রবিন হাত তুলল।
দক্ষিণে যাচ্ছে! মুসাও দেখতে পেয়েছে। রকি বীচের দিকেই তো। এত আস্তে চলছে কেন?
কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছে না হয়ত।
পুলিশ তাড়াতাড়ি করলে ওদেরকে ধরে ফেলতে পারবে। এস।
ঢাল বেয়ে দ্রুত নামতে গিয়ে পা পিছলাল রবিন। গড়িয়ে নামল কিছুদূর। আবার উঠল। মুসা একবারও না পড়ে দৌড়ে নেমে চলেছে। রোলস রয়েসের কাছে পৌঁছে শুনল পুলিশকে মার্সিডিজের লাইসেন্স নম্বর আর লোক দুটোর চেহারার বর্ণনা জানাচ্ছে হ্যানসন।
চীফকে বলুন, মুসা বলল। দক্ষিণে রকি বীচের দিকে যাচ্ছে ওরা। তাড়াতাড়ি করলে সামনে দিয়ে এসে পথ আগলাতে পারবে।
মুসার কথাগুলোও পুলিশকে জানাল হ্যানসন। ওপাশের কথা শুনল। তারপর বলল, চীফ। আমরা আছি। আসুন।
ফোন রেখে দিয়ে ছেলেদের দিকে তাকাল সে। কিশোরকে নিয়ে গিয়ে কি করতে চায়? ওরা কে সত্যিই চেন না?

কালকের আগে দেখিইনি কখনও, জবাব দিল রবিন।
কিচ্ছু জানি না আমরা! প্রায় ককিয়ে উঠল মুসা।
নিরাশ দৃষ্টিতে একে অন্যের দিকে তাকাতে লাগল ওরা।

.

ধীরে চলছে মার্সিডিজ। ধীরে ধীরে নিচে নামছে পথ। কাউন্টি হাইওয়ে ধরে চলেছে, অনুমান করল কিশোর। তার মানে রকি বীচের দিকে চলেছে। তাকে নিয়ে কি করতে চায় লোকগুলো? ওরা কারা? কোনদেশী লোক?
পেছনের সীটে ফেলে রাখা হয়েছে তাকে। বান মাছের মত শরীর মোচড়াল। সে। পিস্তলের নলের খোঁচা লাগল পাজরে। একজন তার কাছেই বসে রয়েছে।
চুপ করে থাক, আদেশ দিল লোকটা।
কথা বলার চেষ্টা করল কিশোর। প্রতিবাদ করতে চাইল। কথা বেরোল না মুখ দিয়ে, শুধু গোঁ গো শব্দ।
চুপ করতে বললাম না! ধমকে উঠল লোকটা। লক্ষ্মী ছেলে হয়ে থাকবে, বড় বংশের ছেলের মত।
নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে উঠল লোকটা। কুৎসিত হাসি প্রতিধ্বনি তুলল বদ্ধ জায়গায়। অন্য লোকটা নীরবে গাড়ি চালাচ্ছে।
কিন্তু আবার কথা বলার চেষ্টা করল কিশোর। তাকে নিয়ে কি করবে। লোকগুলো জিজ্ঞেস করতে চাইল। কিডন্যাপ লোকে একটা কারণেই সাধারণত করে। জিম্মি রেখে টাকা আদায়ের জন্যে। রাশেদ পাশার কাছে কি টাকা চাইবে! গোঙানি আর কুলকুচা করার মত এক ধরনের মিশ্র শব্দ বেরোল তার গলা থেকে। ছটফট করছে ডাঙায় ভোলা মাছের মত।
চুপ থাকতে বললাম না। বাবাকে নির্বংশ করার ইচ্ছে হচ্ছে নাকি?
স্থির হয়ে গেল কিশোর। বাবা? কিন্তু তার তো বাবা নেই। সে অনেক ছোট থাকতেই মোটর দুর্ঘটনায় মারা গেছে। সেটাই বোঝানোর আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু কথা বেরোল না মুখ দিয়ে।
পাঁজরে পিস্তলের খোঁচা খেল সে। ধমক দিল লোকটা, দেখ ছেলে, আর হুশিয়ার করব না।
তার পরেও থামল না কিশোর। বোঝানোর চেষ্টা করলই।
পিস্তলের খোঁচা না দিয়ে বরং এবার হেসে উঠল লোকটা। একেবারে বাবার মতই হয়েছে। একরোখা। তাই না, জন? হবেই। রক্তের দোষ।
থামাও ওকে ডেভ, সামনের সীট থেকে বলল অন্য লোকটা। ওরকম করতে থাকলে তো দম আটকেই মরে যাবে।
পেটালে পারি এখন। কথা তো শুনছে না।

হুঁ, মুশকিল। কোনও ক্ষতিও করা চলবে না। একটা মুহূর্ত নীরব রইল জন। সুস্থ অবস্থায় বাড়ি নিয়ে যেতে হবে। নইলে লাভ হবে না আমাদের।
আবার হাসল ডেভ। স্যার মনটেরো যখন খবর শুনবে পিটারকে কিডন্যাপ করেছি আমরা, মুখখানা কেমন হবে দেখতে ইচ্ছে করছে এখনই। আমাদের কথা না শুনে পারবে না তখন।
সামনে ঝুঁকে ছিল, সীটে হেলান দিল কিশোর। স্যার মনটেরো? পিটার? বুঝে গেছে আসল ব্যাপারটা কি ঘটেছে। লোকগুলো তাকে অন্য কেউ বলে ভুল করেছে। এমন কেউ যার বাবা একজন নামী দামী ব্যক্তি, হোমড়া চোমড়া কেউ। টাকার জন্যে কিডন্যাপ করেনি। অন্য কারণ। হয়ত ব্ল্যাকমেল করবে। স্যার মনটেরো যে-ই হোন, তাকে তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কিছু করতে বাধ্য করবে। কিন্তু ভুল করে বসেছে ওরা। ভুল লোককে তুলে এনেছে। সেটাই ওদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করল।
পিস্তল দিয়ে খোঁচা মেরে তাকে আর চুপ করাতে চাইল না লোকটা। পাহাড়ী রাস্তার নিচে নেমে এসেছে গাড়ি। সমতল পথ ধরে জোরে ছুটছে এখন। তীক্ষ্ণ মোড় নিল আচমকা। আর্তনাদ করে উঠল চাকা। প্রায় ছিটকে গিয়ে সীটের কিনারে ধাক্কা খেল কিশোর। এই সময় শোনা গেল সাইরেন। পুলিশ! বাড়ছে সাইরেনের শব্দ। ক্ষণিকের জন্যে দম বন্ধ করে ফেলল সে। তাহলে পুলিশ আসছে, তাকে বাঁচাতে..কমে যেতে শুরু করল আবার সাইরেনের ওয়াও ওয়াও। মিলিয়ে গেল দূরে।
ধরে ফেলেছিল আরেকটু হলেই! বলল কিশোরের পাশে বসা লোকটা, ডেভ।
আমাদের পেছনে লেগেছে? সামনের লোকটার প্রশ্ন।
তাই তো। দেখলে না পর্বতের দিকে চলে গেল ওরা। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি জানল কি করে?
কি করে জেনেছে, কিশোর বুঝতে পারছে। রোলস রয়েসে টেলিফোন আছে। নিশ্চয় ফোন করেছে তার বন্ধুরা। কিন্তু লাভ হল না। পার পেয়ে গেল। কিডন্যাপাররা। ধরতে পারেনি পুলিশ। লোকগুলোকে এখন বোঝানো দরকার যে ওরা ভুল করেছে।
কিন্তু আরেকটা কথা মনে পড়তেই ঘামতে শুরু করল সে। ভয়ে। ভুল লোককে ধরে এনেছে ওরা, এবং সেটা এখনও জানে না। পিটার নামে একটা ছেলেকে দরকার ওদের, কিশোর পাশাকে নয়। পিটারকে মারবে না ওরা, তাহলে তার বাবার বিরুদ্ধে অস্ত্রটা হারাবে। কিন্তু ভুলটা যখন বুঝতে পারবে ওরা তখন কি করবে?
.

কাঁচা রাস্তা ধরে গর্জন করতে করতে ছুটে এল দুটো গাড়ি। একটা পুলিশের। অন্যটা শেরিফের। ধুলোর মেঘ উড়িয়ে এসে ব্রেক কষে থামল দুটোই। ঝটকা দিয়ে খুলে গেল দরজা। লাফিয়ে নেমে দৌড়ে এলেন কাউন্টির শেরিফ আর পুলিশ। চীফ ইয়ান ফ্লেচার।
ওদের দেখেছেন? চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল রবিন।
ধরতে পেরেছেন ওদের? জানতে চাইল মুসা।
মাথা নাড়লেন চীফ। হাইওয়ের প্রথম ক্রসরোডটা ব্লক করে দিয়েছি আমরা। তারপর সোজা চলে এসেছি এখানে। গাড়িটা তো দেখলাম না। রেডিব্লকের কাছেও নেই।
তাহলে নিশ্চয় আমরা ব্লক করার আগেই বেরিয়ে গেছে, শেরিফ অনুমান করলেন। হাইওয়ের পাশের কোনও রাস্তায় নেমে যেতে পারে। বেশি দূর যেতে পারেনি নিশ্চয়। আরও লোক লাগাতে হবে আমাদের। দিকে দিকে খুজতে বেরিয়ে যাক।
এটা কাউন্টি এলাকা, ছেলেদেরকে বললেন চীফ। এখানে শেরিফের দায়িত্ব। তবে এরকম কেসে আমরা মিলেমিশেই কাজ করি। লস অ্যাঞ্জেলেসের পুলিশ ডিপাটমেন্টকে সতর্ক করে দিয়েছি।
এখন, শেরিফ বললেন। এখানে সূত্র খুঁজতে হবে আমাদের।
কিছু পাবেন বলে মনে হয় না, স্যার, রবিন বলল। এখানে বেশিক্ষণ থাকেনি কিডন্যাপাররা। সূত্র ফেলে যাওয়ার কথা নয়।
ঠিকই বলেছে সে। কাঁচা রাস্তার প্রতিটি ইঞ্চি খুঁজে দেখলেন শেরিফ আর চীফ মিলে। কিছুই পেলেন না।
অল রাইট। অবশেষে চীফ বললেন, এখানে থেকে আর লাভ নেই। থানায় চলে যাই। এফ বি আইকেই খবর পাঠাতে হবে।
হ্যাঁ, স্যার, ততটা আশা করতে পারছে না রবিন। এভাবে খুঁজে লাভ হবে। না। একটা গাড়ি খুব ছোট্ট জিনিস, তাই না?
হোক ছোট। পুরো কাউন্টি ঘিরে ফেলব আমরা। সমস্ত রাস্তা ব্লক করে দেব। ওদের বেরিয়ে যাওয়ার কোনও পথই খোলা রাখব না।
রোলস রয়েসে গিয়ে উঠল রবিন আর মুসা। একেবারে চুপ। হ্যানসন যখন পুলিশের গাড়িটাকে অনুসরণ করল তখনও কিছু বলল না, ওরা। নীরবে শুধু তাকাল একবার পরস্পরের দিকে। চোখে অস্বস্তি। একই কথা ভাবছে দুজনে।
রোডব্লক যে করা হবে কিডন্যাপাররাও নিশ্চয় জানে সেটা। কি করে বেরোতে হবে প্ল্যানট্যান করেই রেখেছে। বেরিয়ে যাবে। সাথে করে নিয়ে যাবে। কিশোরকে।
.

থেমে গেল মার্সিডিজ।
থলের ভেতরে মুখ লুকানো। স্বাস-প্রশ্বাস নেয়ার জন্যে নাকের ডগার সমান ছোট একটা ফুটো কেবল। কিছুই দেখতে পারছে না কিশোর। অনুমানে বোঝার চেষ্টা করেছে কোন পথে কোন দিকে এগিয়েছে গাড়ি। কয়টা মোড় নিয়েছে মনে। রেখেছে। কান পেতে রয়েছে পরিচিত শব্দের আশায়। এমন শব্দ, যেটা থেকে বুঝতে পারে কোথায় রয়েছে। কিন্তু কোনও শব্দই নেই। শুধু শূন্য নীরবতা। কোথাও কোনও নড়াচড়া নেই। না মানুষের, না যানবাহনের, না সাগরের।
বের কর ওকে, সামনের সীট থেকে বলল ড্রাইভার।
গাড়ির দরজা খোলার শব্দ শুনল কিশোর। শক্ত হাত চেপে ধরল তাকে। ঠেলে বের করল গাড়ি থেকে। মাটিতে দাঁড় করিয়ে দিল। জুতোর নিচে ঝরা পাতা, ঘাস, আর কঠিন মাটি।
ব্যাগটা খুলে নাও। দেখে দেখে নিজেই হাটুক।
একটানে কিশোরের মাথার ওপর থেকে থলেটা খুলে নেয়া হল। ঘন গাছপালার ভেতর দিয়ে আসা আলো চোখ ধাধিয়ে দিল যেন তার। আলো সইয়ে নেয়ার জন্যে চোখ মিটমিট করল সে। মুখ থেকে খুলে নেয়া হল কাপড়।
এখন অনেকটা আরাম লাগছে, না? বলল গাট্টাগোট্টা লোকটা যার নাম ভেজ। খুলে দিলাম বলেই যে চিৎকার করবে তা হবে না। একদম চুপ থাকবে। নইলে…, কিশোরের চোখের সামনে এনে পিস্তলটা নাড়ল সে।
মাথা ঝাঁকাল শুধু কিশোর। কিছু বলল না। যখন থেকেই বুঝতে পেরেছে তার আসল পরিচয় জানালে মারাত্মক বিপদে পড়ে যাবে তখন থেকেই চুপ হয়ে। গেছে সে। কথা বলতেও ভয় লাগছে এখন। লোকগুলো তার ইংরেজি শুনে যদি বুঝে যায় যাকে ধরেছে সে পিন্টার নয়! কিশোরের কথায় লোকগুলোর মত টান। নেই। পিটার ওদের দেশের ছেলে হয়ে থাকলে একই রকম টান থাকার কথা। খুব সাবধান হতে হবে এখন তাকে। ছোট্ট একটা ভুলও মারাত্মক বিপদ ডেকে আনতে। পারে।
এক মুহূর্ত কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইল ডেভ। তারপর ফিরল সঙ্গীর দিকে। ব্যাগ তো খুললাম।
আরও সহজ ভাবে শ্বাস নিতে পারল কিশোর। লোকগুলো তাকে চিনতে পারেনি এখনও কাজেই আপাতত নিরাপদ। দ্রুত চারপাশে তাকাল সে। পর্বতের গোড়ায় ওকের বন আর চাপারালের ঘন ঝোপের মাঝখানে আরেকটা কাঁচা রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। অপরিচিত জায়গা। রকি বীচের একশ মাইলের মধ্যে এরকম জায়গা অনেক আছে।

কিশোরকে হাঁটার নির্দেশ দিল জন, অর্থাৎ ড্রাইভার। ডেভের চেয়ে লম্বা, পাতলা শরীর। কালো চুল। ছোট ছোট চোখ কোটরে বসা। চোখের কোণের চামড়ায় ভাজ। ডেভের মত একই রকম রোদে পোড়া। একটা ব্যাপার স্পষ্ট করে দিচ্ছে, এমন কোনও দেশ থেকে এসেছে লোকগুলো, যেখানে ভীষণ গরম, রোদ খুব কড়া।

পথের পাশের ঘাসের ওপর দিয়ে হেঁটে চলল ওরা। পঞ্চাশ গজ মত এগিয়ে ডানে ঘুরল। পর্বতের দিকে মুখ করে এগোল। রাস্তা দেখা যাচ্ছে না। শুধু ঘন, প্রায় দুর্ভেদ্য ঝোপ।

জন, তুমি আগে যাও, ডেভ বলল। ব্যাগগুলো নিয়ে যাও।

মাথা ঝাঁকাল ড্রাইভার। ব্যাগ মাটিতে নামিয়ে রেখে টেনে ঝোপ ফাঁক করল। বেরিয়ে পড়ল একটা সরু পায়েচলা পথ। তার ভেতরে দুটো ব্যাগ ঠেলে দিয়ে নিজেও ঢুকে পড়ল। গিলে ফেলল যেন তাকে ঝোপ।

এবার তুমি যাও, কিশোরকে আদেশ দিল ডেভ।

এক মুহূর্ত ঝোপটার দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। টেনে ফাঁক করল ঝোপের ডাল। ঢুকে পড়ল ভেতরে। হাত থেকে হঠাৎ ছুটে গেল চ্যাপারালের শক্ত ডাল। কাঁটাঝোপের আঘাত থেকে মুখ বাঁচাতে এক ঝটকায় হাত তুলে নিয়ে এল মুখের কাছে, ঢেকে ফেলল। লাফিয়ে পিছাতে গিয়ে গাছের গোড়ায় পা বেধে উল্টে পড়ে গেল। তাকে টেনে তুলল ডেভ। ঠেলে আবার ঢুকিয়ে দিল ঝোপের ভেতর।

ধমক দিয়ে বলল, এরকম চমকে দিলে কিন্তু ট্রিগারে চাপ লেগে যাবে আমার।

ঢোক গিলল কিশোর। সরু পথ ধরে যতটা সম্ভব জোরে হাঁটতে লাগল। তার পেছনেই লেগে রয়েছে ডেভ, হাতে পিস্তল। কিছুদূর এগোতেই আবার ঘন ঝোপ। পড়ল সামনে। পথটা অদৃশ্য হয়ে গেল। তবে সামনের লোকটাকে দেখতে পাচ্ছে! ঝোপের ভেতর দিয়ে এগোচ্ছে।

তাকে অনুসরণ করল কিশোর। না দেখে ফেলতে গিয়ে পা আবার বেধে গেল। একটা শেকড়ে। পড়ে গেল উপুড় হয়ে। হাপাচ্ছে। উঠে পড়ল আবার পেছনের লোকটা তার গায়ে হাত দেয়ার আগেই।

লোকগুলোর কিছু হচ্ছে না। ঘন ঝোপের ভেতর দিয়ে এমন সাবলীল ভঙ্গিতে এগোচ্ছে, দেখলে মনে হয় জায়গাটা ওদের পরিচিত। আগেও এসেছে এখানে। ওদের সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে যেন হিমশিম খাচ্ছে কিশোর। পথটাই দেখতে পাচ্ছে না। আরও দুবার আছাড় খেল। তারপর এসে ঢুকল পর্বতের গভীরে সরু একটা বক্স ক্যানিয়নে।

দুধারে পাহাড়ের উঁচু দেয়াল। এক দেয়ালের গা ঘেঁষে রয়েছে ছোট একটা পাথরের কেবিন। কেবিনের দরজা খুলল ওদের একজন। আরেকজন ধাক্কা দিয়ে

ঘরের ভেতরে ঢুকিয়ে দিল কিশোরকে। আবার লাগিয়ে দেয়া হল দরজা।
নির্জন কেবিনে ঢুকে শুনতে পেল কিশোর, দরজায় তালা লাগানোর শব্দ।

.

থানায় এসেছে মুসা, রবিন, রাশেদ পাশা আর মেরিচাচী। দেয়াল ঘেঁষা একটা বেঞ্চে বসে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে রেখেছে।
আমাদের ইমারজেন্সি সিগন্যালগুলো যদি সঙ্গে থাকত! আফসোস করল মুস্রা।
থাকবে কি করে? মনে করিয়ে দিল রবিন, ওগুলো তো মেরামতই হয়নি। তবে যোগাযোগের একটা না একটা উপায় বের করেই ফেলবে কিশোর।
কড়া চোখে শেরিফ আর চীফের দিকে তাকালেন মেরিচাচী। সারাদিনই। এখানে বসে থাকব নাকি? কিডন্যাপাররা তো আর খেলা করছে না যে হাসতে হাসতে এসে ধরা দেবে।
মাথা নাড়লেন চীফ। ভাববেন না। সব রকম চেষ্টাই করা হচ্ছে। পুরো শহর আর কাউন্টি এলাকা ঘিরে ফেলা হয়েছে। পালাতে পারবে না কিডন্যাপাররা। এসব কিডন্যাপিঙের কেসে খুব হুশিয়ার থাকতে হয় আমাদের। একটা ভুলচুক হলেই মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। কাজেই তাড়াহুড়া করে রিস্ক তো আর নিতে পারি না।
যা যা করার সবই করা হচ্ছে, শেরিফ বললেন। ক্যালিফোর্নিয়া, নেভাডা, অরিগম, অ্যারিজোনার সমস্ত পুলিশ বিভাগকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। এ বি আইকে খবর দেয়া হয়েছে। মেকসিকান অথরিটিকে জানান হয়েছে। টেলিটাইপ করে মার্সিডিজের লাইসেন্স নম্বর জানিয়ে দেয়া হচ্ছে প্রতিটি পেট্রল কারকে। পুলিশের ডিপার্টমেন্ট অভ দা মোটর ভেহিকলকেও জানানো হচ্ছে।
ল্যাবরেটরি এক্সপার্টদের একটা দল ইতিমধ্যেই রওনা হয়ে গেছে, চীফ, জানালেন। যে জায়গাটায় কিডন্যাপ করা হয়েছে সেখানটায় আবার ভালমত খুঁজবে ওরা। সূত্রটুত্র কিছু না পেলে তো এগোতে পারছি না আমরা।
আপনি নিজে গিয়ে কিছু করছেন না কেন? কিছুতেই বুঝতে চান না। মেরিচাচী।
এখন গিয়ে তো আর লাভ নেই, জবাবটা দিলেন শেরিফ। অযথা অন্ধকারে হাতড়ে বেড়ানোর চেয়ে একটা সূত্র নিয়ে যদি বেরোতে পারি, তাহলে কাজ হতে পারে।
কিছুতেই বোঝান গেল না মেরিচাচীকে। চীফ আর শেরিফ বেরিয়ে গেলেন। সেদিকে জুলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন তিনি। নিষ্ফল হয়ে ফিরে এল ল্যাবরেটরি টীম। শুনে আরও খেপে গেলেন তিনি। তার ধারণা, পুলিশ কোনও কাজের না। নইলে এতগুলো লোক মিলে এত চেষ্টা করেও এখনও কোনও খোঁজ বের করতে পারছে না কেন কিশোরের?

ছেলেটাকে যে কোথায় নিয়ে গেল! ফুঁসে উঠলেন মেরিচাচী। এই, মুসা আর রবিনের দিকে তাকিয়ে ঝাঁঝাল কণ্ঠে বললেন। আবার কিছুর তদন্ত করছ না। তো তোমরা? কোনও কেটেস নয় তো? অন্যের ব্যাপারে নাক গলাতে গিয়েছিলে?

না, আন্টি, জবাব দিল রবিন। সত্যি বলছি, ম্যাজিক মাউনটেইন দেখতে বেরিয়েছিলাম আমরা।
রাশেদ পাশা জিজ্ঞেস করলেন, কেন কিডন্যাপ করা হল কিছুই বুঝতে পারছ না?
ইস, যদি পারতাম! আবার আফসোস করল মুসা।
ব্যাটাদের যদি খালি ধরতে পারতাম, দাঁত কিড়মিড় করলেন মেরিচাচী। চট করে একে অন্যের দিকে তাকাল রবিন আর মুসা। এত দুঃখেও হাসি পেল। ওদের। মেরিচাচীর সামনে যদি এখন পড়ে কিডন্যাপাররা তাহলে তাদের জন্যেই। কষ্ট হবে ওদের।
একটা উপায় বের করতে পারলেও হত, রবিন বলল। খুঁজতে যেতে পারতাম। কিশোর কি কোনই পথ করে রেখে যায়নি?
পারলে তো করবে, মুসা বলল। লোকগুলো সাংঘাতিক চালাক। সুযোগ দেবে বলে মনে হয় না।
কাছে এসে দাঁড়ালেন চীফ। কতটা চালাক শীঘ্রি সেটা বের করব। হেলিকপ্টার নিয়ে বেরিয়েছিল শেরিফের একজন লোক। র‍্যাটলস্নেক রোডের পাশে মার্সিডিজটা দেখতে পেয়েছে সে। শহর থেকে তিন মাইলের বেশি হবে না।
চলুন! চলুন! পেছন থেকে প্রায় চিৎকার করে বললেন শেরিফ, এইবার পেয়েছি ব্যাটাদের!

.
কেবিনে একা বসে আছে কিশোর। বাইরে লোকগুলো কি বলে শোনার চেষ্টা করছে। ভাবছে, সে যে পিটার নয় এটা বুঝতে কতক্ষণ সময় লাগবে। লোকগুলোর?
ওদের কণ্ঠ শুনতে পাচ্ছে সে, তবে কথা ঠিকমত বোঝা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে দূরে কোথাও যাওয়ার পরিকল্পনা করছে লোকগুলো। আরও একজন লোকের। ব্যাপারে কথা বলছে যে তখন ওখানে নেই। বুঝতে অসুবিধে হল না, সেই লোকটার আসার অপেক্ষাতেই রয়েছে ওরা। কেউ একজন আসবে। কিছু একটা ঘটবে।
কিন্তু কে আসবে? আর এই পার্বত্য নির্জন এলাকায় ঘটবেটাই বা কি?
আরও ভাল করে শোনার জন্যে কান খাড়া করল সে। লাভ হল না। মোচড় দিয়ে উঠল পেটের ভেতর। যে আসবে সে যদি আসল পিটারকে চেনে? কেবিন থেকে

বেরোনো দরকার। পালাতে হবে কিডন্যাপারদের কবল থেকে। নইলে কি যে ঘটবে বলা মুশকিল। মুখ বন্ধ করানোর জন্যে মেরেও ফেলা হতে পারে ওকে।
ছোট কেবিনটায় চোখ বোলাল সে। একটি মাত্র শূন্য ঘর। আসবাব নেই বললেই চলে। একমাত্র দরজাটা বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে আটকান। জানালাও একটাই। আড়াআড়ি তক্তা লাগিয়ে পেরেক ঠুকে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। বিপজ্জনক জিনিস রাখা হত বোধহয় এখানে। পাহাড় ভাঙার জন্যে ডিনামাইট হতে পারে। কিংবা তেল তোলার যন্ত্রপাতি।
কিন্তু এখন আর কিছুই নেই কেবিনে। পালানোর পথও দেখতে পাচ্ছে না সে।
পাথরের দেয়ালের ধার ঘেঁষে একবার চক্কর দিল। দুর্বল জায়গা খুঁজল। নেই। প্রায় এক ফুট পুরু দেয়াল। ফাটল-টাটল দেখা গেল না। এই দেয়াল ভেঙে বেরোন সম্ভব না। আর ভাঙার কিছু নেইও কেবিনে। যদি থাকতও, তাতে লাভ হত না। ভাঙতে গেলে বিকট আওয়াজ হবে। সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে এসে উঁকি দেবে লোকগুলো। মোট কথা, দেয়ালের গায়ে বেরোনোর কোনও পথ নেই। অবশেষে মেঝের দিকে নজর দিল সে।
ইঞ্চিখানেক পুরু চওড়া বড় বড় তক্তা দিয়ে মেঝে তৈরি হয়েছে। গায়ে গায়ে ঠেসে বসান। ফাঁকও নেই তেমন। তবে জোরে চাপ দিলে বাঁকা হয়ে যায়। মাটিতে বসান হয়নি তক্তাগুলো। আড়াআড়ি কড়িকাঠের মত তক্তা নিচে পেতে তার ওপর সাজান হয়েছে। নিচে ফাঁক তেমন নেই।
হামাগুড়ি দিয়ে পুরো মেঝেটা ঘুরে দেখল কিশোর। পেছনে দেয়ালের কাছে একটা তক্তা আলগা। এক প্রান্তে পা দিয়ে চেপে ধরে তত্তটা তুলে তার ফাঁকে। হাত ঢুকিয়ে দিল সে। টেনে সরিয়ে আনল ওটা।
নিচে ফাঁক রয়েছে। নীরবে পাশের তক্তাটার ওপরও কাজ করে চলল সে। সরিয়ে ফেলতে পারল অনেক কায়দা কসরৎ করে। নেমে গেল ফাঁকটায়। মেঝে আর মাটির মধ্যখানে যেটুকু ফাঁক রয়েছে, তাতে শুয়ে পড়া যায়। তা-ই করল সে। একধারে ঢালু হয়ে নেমে গেছে মাটি। বুকে হেঁটে ঢাল ধরে এগোল সে। মেঝের মাঝামাঝি পর্যায়ে এসে ফাঁক এত কমে গেছে বুকে হেঁটেও আর এগোন যায় না। চারপাশের দেয়াল তৈরি করা হয়েছে পাথর দিয়ে। বাতাস চলাচলের জন্যে খুব ছোট ছোট ছিদ্র রাখা হয়েছে। সেসব দিয়ে মানুষ বেরোনো অসম্ভব। বেরোনোর পথ পেল না।
বাধ্য হয়ে যে পথে নেমেছিল সে পথে আবার ওপরে উঠে এল সে।
পালানোর কোনই পথ নেই।
.

র‍্যাটলস্নেক রোডে মার্সিডিজটার, পেছনে এসে থামল পুলিশের গাড়ি। গাড়ির। ভেতরটা ভালমত পরীক্ষা করে দেখা হল।
কিছুই নেই, মুখ কালো করে বললেন ইয়ান ফ্লেচার। এখান থেকে কোন দিকে গেছে বোঝার উপায় নেই।
কিন্তু জলজ্যান্ত একটা মানুষ গায়েব হয়ে যেতে পারে না, মেরিচাচী বললেন।
গাড়িটার আশপাশে খুঁজে দেখলেন রাশেদ পাশা, মুসা আর রবিন। রাস্তার পাশের ঘাসে ঢাকা জুমিতে নামিয়ে রাখা হয়েছে ওটা।
কিশোরের কোনও চিহ্নই তো দেখছি না, রবিন বলল।
একটা পায়ের ছাপ পর্যন্ত নেই, বললেন রাশেদ পাশা।
বাতাসে মিলিয়ে গেছে যেন, চীফ বললেন। আশপাশের ঘন ঝোপ আর একধারে মাথা তুলে দাঁড়ানো পর্বতের দিকে নজর। যা অঞ্চল! যেখানে খুশি নিয়ে । সব গিয়ে লুকিয়ে রাখতে পারে কিশোরকে।
তা পারে, মুসা বলল। তবে বেশি দূরে গেছে বলে মনে হয় না আমার।

.
কি করে বুঝলে? ভুরু নাচালেন শেরিফ।
সূত্রটুত্র পেয়েছ নাকি? চীফ জানতে চাইলেন।
মার্সিডিজের কাছে দাঁড়িয়ে কাঁচা রাস্তাটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে মুসা। বসে পড়ে মাটিতে আলগা ধুলোয় হাত বোলাল।
দেখুন, স্যার! সামনের মাটির দিকে দেখাল সে। পুরো রাস্তাটায় ওখানটাতেই যা এক চিলতে নরম মাটি দেখছি। মার্সিডিজের চাকার দাগ আছে। আর কোনও গাড়ি নেই। তার মানে অন্য গাড়ি আসেনি এখানে ওদেরকে তুলে নেয়ার জন্যে। এ পথে হেঁটে যাওয়ারও কোনও লক্ষণ দেখছি না। এর একটাই অর্থ, কাছাকাছিই আছে ওরা।
মুসা যেখানটা দেখিয়েছে সে জায়গাটা চীফও পরীক্ষা করলেন। খটখটে শুকনো মাটি। প্রচুর ধুলো আছে। অথচ পায়ের ছাপ নেই।
তার মানে, রবিন বলে উঠল। মুসা ঠিকই বলেছে। কাছাকাছিই আছে ওরা।
আছে, আবার বলল মুসা। রাস্তাই পেরোয়নি। আমার ধারণা, সোজা নেমে গেছে ঝোপের কাছে। ওই চ্যাপারেলের ঝোপের ভেতর দিয়ে চলে গেছে পর্বতের দিকে পা বাড়াতে গেল সে।
দাঁড়াও! বাধা দিলেন চীফ। পথের একপাশ দেখিয়ে বললেন, এখানে ঘাস আছে, পায়ের ছাপ পড়বে না। এদিক দিয়েও গিয়ে থাকতে পারে।
শেরিফও একমত হলেন তার সঙ্গে। দুজন সহকারীকে বললেন, অ্যাই, এই ঘাস ধরে তোমরা দুজন দুদিকে চলে যাও। পায়ের ছাপ দেখলেই ডাকবে। আমরা

ঝোপগুলোয় খুঁজব। দেখি ঢোকার কোনও পথ আছে কিনা।
আশ্চর্যবোধক চিহ্ন চোখে পড়ে কিনা দেখবেন, রবিন বলল। কিংবা অস্বাভাবিক কিছু। জড় করা পাথর হতে পারে। ভাঙা ডাল হতে পারে। ওরকম চিহ্ন রেখে যেতে পারে কিশোর।
রাস্তার যে পাশে পর্বত সেদিকটায় খুঁজতে চলল পুলিশ আর শেরিফের দুই ডেপুটি। দুই দল দুই দিকে গেল। খানিক পরেই ফিরে এল ওরা। জানাল ঘাস বেশিদূর নেই। তাতে পায়ের ছাপও নেই। একজন খুঁজে পেল পাথরের ছোট একটা স্তূপ। আন্দাজ করল, ওটা কিশোরের রেখে যাওয়া নির্দেশক হতে পারে। পরীক্ষা করে দেখলেন শেরিফ। অনেক পুরনো মাটি বেরোল পাথরের ফাঁক থেকে। অনেক দিন ধরে একরকম ভাবে পড়ে আছে। নতুন নয়। তার মানে এটা কিশোর। রেখে যায়নি। একজন পুলিশ খুঁজে বের করল একটা ঝোপ। ওটার ডাল ভাঙা। ঘন ঝোপে খোঁজাখুজি করা হল। আর কোনও চিহ্ন পাওয়া গেল না। রাস্তা চোখে পড়ল না।
চীফ? ডেকে বলল আরেকজন পুলিশ। দেখুন তো!
ছোট শাদা একটা জিনিস আটকে রয়েছে ঝোপের কাটায়। একটুকরো শাদা শক্ত কাগজ। দৌড়ে গেল রবিন আর মুসা।
দেখে তো..., শুরু করল রবিন।
শেষ করল মুসা, আমাদের কার্ডের মত মনে হচ্ছে। এগিয়ে গিয়ে হাত বাড়িয়ে খুলে আনল কার্ডটা। হ্যাঁ, তিন গোয়েন্দার কার্ডই। কোনও ফাঁকে কিডন্যাপারদের চোখ এড়িয়ে ফেলে গেছে কিশোর।
দেখি, ঝোপটা ফাঁক কর, নির্দেশ দিলেন শেরিফ।
ডেপুটিরা আর পুলিশ মিলে টেনে ফাঁক করল ঝোপের ডাল। সরু পায়ে চলা। পথটা আবিষ্কার করতে বেশিক্ষণ লাগল না।
রাস্তাই। সন্দেহ নেই, তাকিয়ে রয়েছে চীফ। দেখ, হেঁটে গেছে কেউ। পরিষ্কার চিহ্ন রয়েছে।
সরু পথটা ধরে চলল সবাই।
ওই তো! রবিন দেখাল। একটা ঝোপের পাতা ছেঁড়া, ডাল দোমড়ান; যেন কেউ পড়ে গিয়েছিল ওখানে। কাছেই একটা পাথরে খুদে একটা আশ্চর্যবোধক চিহ্ন।
কিশোরই এঁকেছে। প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মুসা। চক ছিল পকেটে।
জলদি! তাগাদা দিলেন রাশেদ পাশা। আছে কাছাকাছিই, পর্বতে...
থেমে গেলেন তিনি। কান পেতে শব্দ শুনছেন। তারপর সকলেই শুনতে পেল শব্দটা। শক্তিশালী মোটরের আওয়াজ ক্রমেই বাড়ছে ঠিক যেন ওদের মাথার ওপর।

আকাশের দিকে হাত তুললেন মেরিচাচী। হেলিকপ্টার!
কপালের ওপর হাত রেখে দেখতে লাগলেন শেরিফ। পুলিশের কিনা বোঝার চেষ্টা করছেন। একশ গজ ওপর দিয়ে উড়ে গেল পর্বতের দিকে।
না, ইঞ্জিনের গর্জনকে ছাপিয়ে চিৎকার করে বললেন চীফ। পুলিশের নয়! কিনডন্যাপারদের! ওটাতে করেই পালাবে!
গাছের আড়ালে হারিয়ে গেল কপ্টারটা। ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল ইঞ্জিনের শব্দ।
আপনি না বললেন কিছুতেই বোরোতে পারবে না! শেরিফের ওপর ভীষণ রেগে গেলেন মেরিচাচী।
থামবে না কেউ, হাঁটো! মেরিচাচীর কথা এড়িয়ে গিয়ে বললেন শেরিফ। সামনেই কোথাও আছে। পালানোর আগেই ধরতে হবে
যদি সময় মত পৌঁছতে পারি! আর ভরসা করতে পারছে না মুসা।
.
ধুলোর ঘূর্ণি তুলে বক্স ক্যানিয়নে নামল হেলিকপ্টার। পরিষ্কার প্রেক্সিগ্লাস বাবলের ভেতর থেকে লাফিয়ে নামল পাইলট। পরনে ফ্লাইং স্যুট, মাথায় হেলমেট, চোখে গগলস, মাথা নিচু করে দৌড়ে এল দুই কিডন্যাপারের কাছে।
ঠিক সময়েই এসেছ, ডেভ বলল।
ওকে নিয়ে এসেছি! হেসে বলল অন্য লোকটা। জন।
জবাবে হাসল না পাইলট। মার্সিডিজটাকে হেঁকে ধরেছে পুলিশ, দেখে। এলাম। ঝোপের ভেতর দিয়ে এদিকে আসছে কয়েকজন।
ঝোপের ভেতর দিয়ে? ভুরু কোঁচকাল ডেভ। এত তাড়াতাড়ি খুঁজে বের করল কিভাবে?
ওই ছেলেটা, জুন বলল। সব ওর শয়তানী। ইচ্ছে করেই পড়েছে কয়েকবার। চিহ্ন রেখে এসেছে।
হেসে উঠল ডেভ। রাখুক। লাভ হবে না। ওরা আসার আগেই উড়ে যাব আমরা।
অত হাসির কি হল! ধমকে উঠল পাইলট। যাও, নিয়ে এস ছেলেটাকে।
আনছি।
ও কোথায়?
ওই কেবিনে।
হুঁ। জলদি কর।
ক্যানিয়নের পাথরের মত শক্ত মাটির ওপর দিয়ে জুতোর শব্দ তুলে এগোল তিনজনে। তালা খুলল জন। ডেকে বলল, বেরিয়ে এস।
ডেভ! চিৎকার করে উঠল জন। ও নেই!
ডেভও উঁকি দিল ভেতরে। শূন্য কেবিন।

ঘাস খেয়েছ নাকি বসে বসে! কর্কশ কণ্ঠে বলল পাইলট, পালাল কিভাবে?
অসম্ভব! বেরোনোর কোনও পথ নেই!
তাহলে গেল কোথায়? জনের প্রশ্ন।
যেভাবেই হোক বেরিয়েছে! চেঁচিয়ে বলল পাইলট। থাকলে তো থাকতই!
হয়েছে, অত ঘাবড়ানোর কিছু নেই, কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করল ডেভ। পালিয়ে যাবে কোথায়? কেবিন থেকে বেরোলেও ক্যানিয়ন থেকে বোরোতে পারবে না। পথ নেই। একটাই পথ, সেটা দিয়ে গেলে আমাদের সামনে দিয়ে যেতে হত। যায়নি। তারমানে আছে। জন, খোঁজ।
নির্জন ক্যানিয়নে ছড়িয়ে পড়ল তিন কিডন্যাপার।

.

হাঁপাতে হাঁপাতে এসে সরু ক্যানিয়নের মুখে পৌঁছল উদ্ধারকারী দলটা। হেলিকপ্টারটাকে দেখার বিশ মিনিট পর।
ওই তো! হাত তুলল রবিন।
ধীরে ধীরে ঘুরছে হেলিকপ্টারের রোটর। ওদের চোখের সামনেই লাফিয়ে গিয়ে বাবলে উঠে পড়ল পাইলট। শক্তি বাড়তে শুরু করল রোটরের।
জলদি! বলেই দৌড় দিল মুসা।
তার পেছনে ছুটল অন্যেরা। কপ্টারটাকে ধরার জন্যে। কেবিনের পেছন থেকে বেরিয়ে এল দুজন লোক। ওরাও দৌড় দিল কপ্টারের দিকে।
এই থাম, থাম! পুলিশ! চিৎকার করে উঠে ওদের দিকে দৌড় দিলেন শেরিফ।
ততক্ষণে কপ্টারের কাছে পৌঁছে গেছে দুজনে। উঠে পড়ল। উদ্ধারকারীদের অসহায় দৃষ্টির সামনেই আকাশে উঠে পড়ল কপ্টার। ধুলোর ঝড় উঠেছে। বিশাল এক ফড়িঙের মত শূন্যে ঝুলে রইল একটা মুহূর্ত, তারপর আগে বাড়ল। দেখতে দেখতে হারিয়ে গেল ক্যানিয়নের দেয়ালের ওপাশে, দক্ষিণে।
বোকা হয়ে সেদিকে তাকিয়ে রয়েছে উদ্ধারকারীরা।
গেল...চলে গেল! বিড়বিড় করলেন রাশেদ পাশা।
ওদেরকে যেতে দিলেন আপনারা! রাগে দুঃখে মাথার চুল ছেঁড়ার অবস্থা হল। মেরিচাচীর। আমার...আমার ছেলেটাকে নিয়ে গেল!
সহকারীদের দিকে ফিরে আদেশ দিলেন শেরিফ, গাড়ির কাছে ফিরে যেতে। টেলিফোনে নির্দেশ দেবেন পুলিশের হেলিকপ্টারকে, যাতে পিছু নিতে পারে।
কিশোরকে কিন্তু দেখলাম, না হেলিকপ্টারে, রবিন বলল।
হয়ত কেবিনেই রয়ে গেছে, মুসা বলল। আমাদেরকে দেখেই পালিয়েছে ব্যাটারা। ওকে নেয়ার আর সময় পায়নি।

কেবিনের দিকে ছুটে গেলেন চীফ। ঠেলা দিয়ে খুলে ফেললেন ভেজানো দরজা। পেছনে ঢুকল অন্যেরা। শূন্য ঘর।
খাইছে! নেই তো! গুঙিয়ে উঠল মুসা।
আগেই হয়ত কপ্টারে তোলা হয়েছিল, রবিন বলল। দেরি করে ফেলেছি আমরা।
না, নথি, যেন গায়েবী আওয়াজ হল। বরং সময়মতই এসেছ।
কেবিনের পেছন দিকের দুটো তক্তা উঠে গেল। বেরিয়ে এল কিশোর পাশা। মুখে হাসি।
কিশোওর! প্রায় একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল সবাই।
হ্যাঁ, কিশোর, নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল গোয়েন্দাপ্রধান। আর কাউকে আশা করেছিলে নাকি?
…বেরোনোর কোনও পথ পেলাম না, পত্রিকার লোকদেরকে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে বলল কিশোর। তাই আর কি করব? ভাবলাম, লুকিয়েই থাকি। তারপর যা হয় হবে। কাজে লাগল ফন্দিটা। ধোঁকা খেল ব্যাটারা। আমিও বেঁচে গেলাম।
বুদ্ধিমান ছেলে, বলল একজন রিপোর্টার।
কিশোর পাশা বুদ্ধিমানই, হেসে বললেন চীফ ইয়ান ফ্লেচার। নইলে কি আর পুলিশকে সাহায্য করতে পারত?
রিপোর্টারদের সঙ্গে কথা বলছে, একই সাথে পুলিশের ফাইলও ঘাঁটছে কিশোর। রকি বীচ পুলিশের হাতে অ্যারেস্ট হওয়া অপরাধীদের সমস্ত ছবি রয়েছে ফাইলে। কিডন্যাপারদের চেহারার লোক আছে নাকি ওখানে দেখছে সে।
কি চায় কিচ্ছু বলেনি? প্রশ্ন করল একজন রিপোটার।
অবান্তর প্রশ্ন, বাধা দিয়ে বললেন চীফ। সেটা পুলিশের ব্যাপার। আপনাদেরকে বলার জন্যে নয়। একটু থেমে বললেন, তবে একটা কথা বলতে পারি, মিস্টার রাশেদ পাশা তেমন বড়লোক নন যে তার ভাতিজাকে কিডন্যাপ করে নিয়ে গিয়ে মস্ত লাভ হবে কিডন্যাপারদের। অন্তত টাকাপয়সার দিক দিয়ে।
মনে মনে চীফের ওপর ভীষণ রেগে গেল রিপোর্টাররা। কিন্তু কিছু করার নেই। কেউ যদি কিছু বলতে না চায় তাকে চাপাচাপি করার অধিকার নেই ওদের। কিশোরের বেশ কিছু ছবি তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল ওরা।
ঠিক কিডন্যাপারদের মত কিন্তু লাগেনি ওদেরকে, রবিন মন্তব্য করল।
নতুন কিছু জেনেছেন, স্যার? চীফকে জিজ্ঞেস করল মুসা। ধরা যাবে?
বুঝতে পারছি না। অতটা সহজ হবে বলে মনে হয় না।
কিন্তু রিপোর্টারদেরকে তো বললেন সাধারণ কিডন্যাপিং।
কিডন্যাপাররা ধরা না পড়া পর্যন্ত মুখ বুজে থাকাই ভাল। এতে কম সাবধান থাকে ওরা। ধরা সহজ হয়।

তা ঠিক, কিশোরও একমত হল। যত কম জানে ততই ধরতে সুবিধে। কিডন্যাপাররা ভাববে আমরা কিছুই জানি না। অসাবধান হবে। সেই সুযোগটা তখন কাজে লাগাতে হবে আমাদের।
ব্যাপারটা কি এখন খুলে বল তো, কিশোর, চীফ অনুরোধ করলেন।
আমাকে অন্য কেউ ভেবে ভুল করেছে ওরা। কোনও দেশের ভি আই পি গোছের কারও ছেলে মনে করেছে। পলিটিক্যাল কারণ হতে পারে। প্রতিশোধ হতে পারে। একজন জিম্মি খুঁজছে ওরা।
হু। নীরবে ভাবলেন কিছুক্ষণ চীফ। তারপর মুখ তুললেন। ভালোয় ভালোয়। যে বেঁচে এসেছ এইই বেশি। ঠিক আছে, এখন যা করার পুলিশই করবে। তোমাকে কয়েক দিন সাবধানে থাকার পরামর্শ দিচ্ছি। ইতিমধ্যে লোকগুলোকে ধরে ফেলতে পারব আমরা, আশা করি। তখন আর তোমার ভয় নেই, নিরাপদ। তোমার চাচা-চাচী তো চলে গেছেন। যাবে কিভাবে? পুলিশের গাড়িতে করে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করব?
মাথা কাত করে সায় জানাল কিশোর।
বাইরে বেরিয়েই দেখা গেল রোলস রয়েসটাকে। চারটে গাড়ির পেছনে। ওটার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে হ্যানসন। দ্রুত তার দিকে এগিয়ে গেল। তিন গোয়েন্দা।
আপনি? কিশোর জিজ্ঞেস করল।
আমাকে যেতে বলা হয়নি, জবাব দিল হ্যানসন। তার মানে ডিউটিতেই রয়েছি আমি। তোমরা যেখানে থাকবে সেখানেই থাকতে হবে আমাকে। তাই আছি। কোথায় যেতে হবে এখন?
বাড়িতে। এক মিনিট দাঁড়ান। বলে দৌড়ে থানার সামনে ফিরে এল। কিশোর। একটা গাড়ি ঘোরানো হয়েছে ওদেরকে নেয়ার জন্যেই। ড্রাইভারকে ধন্যবাদ দিয়ে সে বলল, আর কষ্ট করতে হবে না। ওদের গাড়ি এসে গেছে।
রোলস রয়েসে উঠল তিন গোয়েন্দা। ড্রাইভিং সীট থেকে ঘাড় ঘুরিয়ে ফিরে জিজ্ঞেস করল হ্যানসন, কোথায় যাব?।
র‍্যাটলস্নেক রোড, শান্তকণ্ঠে নির্দেশ দিল কিশোর।
কোথায়? চমকে গেছে মুসা।
সেই বক্স ক্যানিয়নটায় যাব আবার। হ্যানসন, চালান।
প্রতিবাদ করে লাভ হবে না। চুপ করে রইল দুই সহকারী গোয়েন্দা।
র‍্যাটলস্নেক রোডে যখন পৌঁছল ওরা তখনও কড়া রোদ। গাড়িতে তালা লাগিয়ে তিন গোয়েন্দার সঙ্গে হ্যানসনও চলল ঝোপের ভেতরে লুকান পথ ধরে। পঁচিশ

মিনিটের মাথায় পৌঁছে গেল ক্যানিয়নে, যেখানে বন্দি করে রাখা হয়েছিল। কিশোরকে।
আমি ভেতরে খুঁজব, বলল সে। তোমরা কেবিনটার বাইরে খোঁজ। দেখ। কোনও সূত্র পাও কিনা।
আমি কেবিনের ভেতরে অনেকক্ষণ ছিলাম, বলল সে। কিছু থাকলেও এখন। আর চোখে পড়বে না আমার। মুসা, তুমি আর হ্যানসন ভেতরে খোঁজ। বাইরের চারপাশটায়ও ঘুরে দেখবে। আমি আর রবিন যাচ্ছি হেলিকপ্টারটা যেখানে নেমেছিল সেখানে।
কিন্তু খুঁজবটা কি? রবিনের প্রশ্ন।
আমারও সেই কথা, মুসা বলল।
যে কোনও সূত্র, জবাব দিল কিশোর। লোকগুলো কে, কোত্থেকে এসেছে, কি চায়, এখনই বা কোথায় গেল, এসব। এমন কিছু মিলতেও পারে যা থেকে এসব প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে।
ধীরে ধীরে পর্বতের ওপাশে হারিয়ে গেল সূর্য। লম্বা ছায়া পড়ল গিরিখাতের ভেতরে। কেবিনের ভেতরে বাইরে সমস্ত জায়গায় খুজল মুসা আর হ্যানসন। কিছু পেল না। রবিন আর কিশোরও কিছু পেল না হেলিকপ্টার নামার জায়গায়। মনে পড়ল কিশোরের, কেবিন থেকে দূরে তাকে খুঁজতে গিয়েছিল কিডন্যাপাররা। ছড়িয়ে পড়ে আবার শুরু হল খোঁজা। প্রায় নিরাশ হয়ে পড়েছে এই সময় হঠাৎ ঝুঁকল কিশোর। একটা জিনিস তুলে নিল মাটি থেকে। অন্যেরা দৌড়ে এল তার কাছে।
কী? জানতে চাইল রবিন।
বুঝতে পারছি না, আস্তে জবাব দিল কিশোর। দেখ।
গোধূলির ম্লান আলোতেও চকচক করে উঠল জিনিসটা। হাতির দাঁত কুঁদে। তৈরি হয়েছে আরেকটা খুদে হাতির দাঁত। সোনার জালিতে বসিয়ে ছোট একটা আঙটা লাগানো হয়েছে।
কানের দুল? মুসা বলল।
অন্য গহনাও হতে পারে। কিংবা সৌভাগ্যের প্রতীক, রবিন বলল। ওই যে অনেকে বিশ্বাস করে, ওরকম কিছু আরকি।
যা-ই হোক, কিশোর বলল। নিখুঁত নয় জিনিসটা। হাতে বানানো। বিদেশী হস্তশিল্প হতে পারে। পর্বতের গভীরে গিরিখাতে এই জিনিস এল কি করে ভাবছি।
কিডন্যাপাররা ফেলে গেল? মুসার প্রশ্ন।
যেতেই পারে।

কিশোরের কাছ থেকে জিনিসটা নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল হ্যানসন। লোকগুলোর কথার টানটা কোন দেশের বোধহয় বুঝতে পারছি। আফ্রিকায় ব্রিটিশ উপনিবেশ থাকাকালে ইংরেজদেরও কথার টান অনেকটা ওদেশের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। খাঁটি ব্রিটিশদের মত আর কথা বলতে পারত, না ঔপনিবেশিকরা। কোনও দেশে বেশিদিন থাকতে থাকতে ওরকম হয়েই যায়। এই জিনিসটা মনে হচ্ছে আফ্রিকার স্থানীয় অধিবাসীদের গহনা।
উত্তেজিত কণ্ঠে কিশোর বলল, কোন দেশের সেটাই এখন আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে।
কিশোর, মুসার কণ্ঠে অস্বস্তি। আমি ভেবেছিলাম এ কেসটা আমাদের জন্যে বাদ।
লোক ভাল না ওরা, সাবধান করল রবিন।
জানি, জবাব দিল কিশোর। সেজন্যেই তো বাদ দিতে পারছি না। আমাদের বয়েসী একটা ছেলে মহাবিপদের মধ্যে রয়েছে। রকি বীচেই কোথাও আছে সে। আমাদের কাজ তাকে সাহায্য করা।
কেন, দুনিয়ার সব মানুষকে সাহায্যের দায়িত্ব কি শুধু আমাদেরই? গজগজ করল মুসা।
না। তবে অন্তত এই একটি কেসে পিছিয়ে আসতে পারছি না আমরা। আঘাতটা আমার ওপরও এসেছিল। মারাও পড়তে পারতাম। ওই ছেলেটারও একই অবস্থা হতে পারে। ওকে সাহায্য করা আমাদের মানবিক দায়িত্ব। ভুল করেই হোক আর যেভাবেই হোক, আমাকে কিডন্যাপ করা না হলে হয়ত এতে জড়াতাম না।
বক্তৃতার ঢঙে কথাগুলো বলে হ্যানসনের দিকে ফিরল কিশোর। বাড়ি যেতে হবে। আপনারও ডিউটির সময় শেষ হয়ে এল।
চল। মাথা ঝাঁকাল হ্যানসন।
ঝোপের ভেতরের সরু পথ ধরে একসারিতে হাঁটছে ওরা। দ্রুত কমে আসছে গোধূলীর আলো। র‍্যাটলস্নেক রোডের দিকে চলতে চলতে মুসা বলল, কিশোর, ছেলেটাকে বের করব কিভাবে?
উপায় নিশ্চয় আছে। সেজন্যে তাঁর সম্পর্কে আরও কিছু জেনে নেয়া প্রয়োজন। আমাদের। আজ রাতে গবেষণা চালাব আমি। কাল সকালে হেডকোয়ার্টারে দেখা কর তোমরা। তখন বিস্তারিত আলোচনা করব।

.

আরে আস্তে খাও না, মিসেস আমান বললেন। ফুরিয়ে তো আর যাচ্ছে না। গলায় আটকাবে তো।
পরদিন সকালে নাস্তা খেতে বসেছে মুসা। তাড়াহুড়া আছে, মা।।

খবরের কাগজ থেকে মুখ তুললেন মিস্টার আমান। কিশোরের কিডন্যাপিঙের ব্যাপারটা নয় তো? সাবধান। খুব বিপজ্জনক কিন্তু।
জানি।
মিসেস আমান বললেন, কেমন অদ্ভুত ব্যাপার বল তো? ভুল করে একজনের জায়গায় আরেকজনকে নিয়ে যাওয়া।
কিশোর তো তবু চুপ করেছিল। আমি হলে..., বাক্যটা শেষ না করে হাত নেড়ে বুঝিয়ে দিল মুসা।
দ্রুত নাস্তা শেষ করে বেরিয়ে এল সে। সাইকেল নিয়ে স্যালভিজ ইয়ার্ডে রওনা হল। সুন্দর সকাল। ফুরফুরে বাতাস। হেডকোয়ার্টারে ঢোকার গোপন প্রবেশ পথ লাল কুকুর চার দিয়ে এসে ভেতরে ঢুকল মুসা। বাইরের ওয়ার্কশপে কাজ করতে দেখল কিশোরকে। ওয়ার্কবেঞ্চের ওপর তিনটে খুদে যন্ত্র খুলে ছড়িয়ে বসেছে গোয়েন্দাপ্রধান।
জরুরী সংকেতের প্রয়োজন হতে পারে,মুসাকে দেখে বলল কিশোর। এস, হাত লাগাও। রবিন আসতে আসতে সেরে ফেলি।
পিটারের ব্যাপারে খোঁজখবর করার কথা ছিল, ওয়ার্কবেঞ্চের অন্য প্রান্তে। বসল মুসা। তার কি হল? নিয়েছ?
নিয়েছি, হাসল কিশোর। অনেক কিছু জেনেছি কাল রাতে। পিটার মনটেরোকে খুঁজে বের করা কঠিন হবে না।
বল! উত্তেজনা চেপে রাখতে পারছে না মুসা।
রবিন আসুক। এক কথা দুবার বলতে ভাল লাগে না।
জোর করে কিশোরের মুখ খোলান যাবে না। হতাশার একটা ভঙ্গি করে যন্ত্র। মেরামতে লাগল মুসা। পার্টসগুলো সব পরিষ্কার করে আবার জুড়ে দেয়ার জন্যে রেডি করেছে, এই সময় হাজির হল রবিন। সবুজ ফটক এক দিয়ে ঢুকল সে। সরি, জোরে জোরে সাইকেল চালিয়ে আসাতে হাঁপাচ্ছে। মা দেরি করিয়ে দিল। কাজ না সেরে বেরোতে পারলাম না। তা কি খবর, কিশোর? আমাদের কেসের ব্যাপারে আলোচনার কথা ছিল। চীফ ফ্লেচারের কাছ থেকে আর কোনও খবর। পেয়েছ?
পেয়েছি। সকালেই ফোন করেছিলাম। হেলিকপ্টারটাকে পেয়েছে পুলিশ। ভেনচুরার কাছে একটা মাঠে ফেলে দিয়ে চলে গেছে।
আমাদেরকে বোকা বানিয়েছিল? উড়ে গেল দক্ষিণে, অথচ পাওয়া গেল উত্তরে।
মাথা ঝাঁকাল কিশোর। ঠিকই করেছে। আমি হলেও ওরকমই কিছু করতাম। কে আর সেধে গিয়ে পুলিশের হাতে পড়তে চায়। চীফ বলেছেন লোকগুলোকে ধরার মত কোনও সূত্রই ছিল না কপ্টারে। ভাড়া নেয়া হয়েছিল। বলা হয়েছিল জরুরী

ডাক সরবরাহ করবে। এয়ারফিল্ড থেকে নিয়ে গিয়েছিল ওটা পাইলট মাথায় হেলমেট আর চোখে গগলস ছিল তার। ফলে চেহারা কেউ দেখতে পায়নি। আর কাগজপত্র যে সব ভুয়া তাতে তো কোনও সন্দেহই থাকার কথা নয়।
বাহ্, চমৎকার, ব্যঙ্গের সুরে বলল মুসা। অনেক উপকার হবে, আমাদের!
কিডন্যাপারদের খবর কি? রবিন জানতে চাইল।
এখনও সনাক্ত করা যায়নি, কিশোর জানাল। হেলিকপ্টার আর মার্সিডিজে আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে। ওয়াশিংটনের এফ বি আই অফিসে ওই ছাপ রেকর্ড করা নেই। আর মার্সিডিজটাও ভাড়া করা।
বলতে চাও আমাদের হাতে কোনও সূত্রই নেই, ভোতা গলায় বলল মুসা।
না, ঠিক তা নয়, হাসল গোয়েন্দাপ্রধান। বলেছি না কাল রাতে অনেক গবেষণা করেছি। আমার মনে হয়…
এ কথা শেষ হল না তার। পেছনে শোনা গেল জোরাল কণ্ঠস্বর। মেরিচাচী। সবাই তাহলে এখানে। ভালই হল। কিশোর, দুই দিন আগে কথা দিয়েছিলি ছোট স্টোররুমটা পরিষ্কার করে দিবি।
সরি, চাচী।
ঠিক আছে। আজকে করে দে। মাল রাখতে হবে ওখানে। বাইরে থেকে থেকে নষ্ট হচ্ছে জিনিসগুলো। তিনজনে করতে আর কতক্ষণ লাগবে…
আমি একাই পারব, বাধা দিয়ে বলল কিশোর। দুই সহকারীর দিকে তাকিয়ে বলল, এগুলো লাগিয়ে ফেল। আমি আসছি। দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল সে। অনেক বার কথাটা ভেবেছে আগেও, আজ আরেক বার ভাবল, পৃথিবীতে এই কাজ জিনিসটা না থাকলে অনেক ভাল হত। আর যদি খিদেটা না থাকত। অনেক ঝামেলা থেকে মুক্তি পেত মানুষ।
বিষণ্ন দৃষ্টিতে কিশোরের চলে যাওয়া দেখতে লাগল রবিন আর মুসা। কিশোর কি জেনেছে জানার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে। কিন্তু কিছু করার নেই। ছোট যন্ত্রগুলো জোড়া লাগানোয় মন দিল।
শেষ হয়ে গেল লাগানো।
অযথা বসে না থেকে ওয়ার্কশপটা গোছানোয় লেগে গেল দুজনে। সেই কাজও শেষ। অনেকক্ষণ বসে থেকে উসখুস করে হেডকোয়ার্টারে ঢোকার জন্যে যেই দুই সুড়ঙ্গের দিকে এগোল, শোনা গেল একটা কণ্ঠ, দাঁড়াও!
কাজ করতে করতে ঘেমে একাকার হয়ে এসেছে কিশোর। ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে। ওয়ার্কশপে এসে ঢুকল সে।
কাল রাতের কথাটা তাড়াতাড়ি বলে ফেল তো এবার! অস্থিরতা আর চেপে রাখতে পারল না মুসা।

কি জেনেছ? রবিনের প্রশ্ন।
কিশোর! আবার ডাক শোনা গেল মেরিচাচীর। অফিসের কাছ থেকে ডেকেছেন।
খাইছে! আবার! ককিয়ে উঠল মুসা।
চল লুকিয়ে পড়ি! পরামর্শ দিল রবিন। জবাব দিও না।
লাভ হবে না তাতে। ভাল করেই জানে আমরা এখানে আছি। বেরিয়ে যেতে দেখেনি, কিশোর বলল।
তা ঠিক, সাংঘাতিক হতাশ হয়েছে মুসা। মেরিচাচীর কাছ থেকে লুকিয়ে রক্ষা নেই। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড। না, এফ বি আই। না না, ক্যানাডিয়ান মাউনটিজ। উঁহু, তিনটা একসঙ্গেই। এত কড়া নজর ঈগলেরও নেই। চল, বেরোই।
বেরিয়ে এল তিনজুনে। জঞ্জালের পাশ দিয়ে এগোতে এগোতে হঠাৎ হাত তুলল রবিন, কিশোর, দুজন লোক!
কিডন্যাপারগুলো না তো! আঁতকে উঠল মুসা।
না। দেখছ না, একজন কালো চামড়া।
কালো? প্রায় চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। ঠিকই আছে। এরকমই হওয়ার কথা। এস।
হওয়ার কথা? কিছুই বুঝতে পারল না মুসা। কি বলতে চাও?
কিন্তু জবাব দেয়ার অবকাশ নেই যেন কিশোরের। লম্বা লম্বা পা ফেলে এগোচ্ছে। তাকে ধরার জন্যে দ্রুত এগোল দুই সহকারী। কিন্তু অফিসের কাছাকাছি যাওয়ার আগে ধরতে পারল না।
চোখে সন্দেহ নিয়ে তিন গোয়েন্দার দিকে তাকালেন মেরিচাচী। এই ভদ্রলোকরা তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে চান। ভাড়াটাড়া করার ব্যাপার। মনে তো হচ্ছে আগামী পুরো হপ্তাটাই কাজ আটকে থাকবে আমার। কিছুই হবে না।
না, ম্যা ম, মেরিচাচীর আশঙ্কা দূর করার জন্যে তাড়াতাড়ি বলল শ্বেতাঙ্গ লোকটা। লম্বা, সোনালি চুল, মুখটা ওই দুই কিডন্যাপারের মতই রোদেপোড়া। আমাদের হয়ে ছোট্ট একটা তদন্ত করে দিতে হবে ওদের।
লোকটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে তিন গোয়েন্দা। ইংরেজি বলছে ইংরেজদের মত, কিন্তু সেই অদ্ভুত টান।
ছোট হলেই ভাল, মেরিচাচী বললেন। আগামী হপ্তা থেকে ইস্কুল শুরু হবে ওদের। এর মধ্যেই আমার কাজগুলো সব করিয়ে রাখা দরকার।
বলে আর দাঁড়ালেন না তিনি। অফিসে চলে গেলেন। দ্রুত একবার চারপাশে চোখ বুলিয়ে নিল কিশোর। তারপর লোকগুলোকে ইশারা করল সঙ্গে আসার জন্যে। ওয়ার্কশপে নিয়ে এল ওদেরকে।
কিডন্যাপিঙের ব্যাপারে, তাই না? জিজ্ঞেস করল সে, আপনাদের পরিচয়?

আমি হাবার্ট কিং, সোনালি চুল লোকটা বলল। কালো লোকটাকে দেখিয়ে বলল, ওর নাম হ্যারি ম্যাকঅ্যাডাম। কিডন্যাপিঙের ব্যাপারেই আলোচনা করতে এসেছি আমরা।
ভাল গোয়েন্দা দরকার আমাদের, হ্যারি বলল। তোমাদের ব্যাপারে খোঁজ নিয়েছি। খুবই ভাল নাকি তোমরা। অনেক জটিল রহস্যের সমাধান করেছ। সেজন্যেই এলাম। সাহায্য করতে রাজি থাকলে বল, সব কথা খুলে বলছি। কেন কিডন্যাপ করা হয়েছিল তোমাকে। কি চায় ওরা।
খুশি হয়েই করব, মিস্টার ম্যাকঅ্যাডাম, কিশোর জবাব দিল। তবে কেন কিডন্যাপ করা হয়েছিল আমাকে, জানি, আপনাদেরকে আর বলতে হবে না। ওরা কি চায় তা-ও জানি।
জান? মুসা অবাক।
জানি, সেকেণ্ড। আমাকে কিডন্যাপ করা হয়েছিল কারণ আমি দেখতে অনেকটা পিটার মনটেরোর মত। পিটার হল স্যার উইনিফ্রেড মনটেরোর ছেলে। আফ্রিকার একটা ছোট্ট ব্রিটিশ কলোনি নানদার প্রধানমন্ত্রী তিনি। ইংরেজ। বিয়ে করেছেন এক ভারতীয় মহিলাকে। আগামী বছরের মধ্যেই ওটাকে স্বাধীন স্বতন্ত্র দেশ করার চেষ্টা চালাচ্ছেন তিনি। তার সরকারে থাকবে বেশির ভাগই কালো চামড়ার মানুষ। আর শ্বেতাঙ্গ যারা থাকবে, তারা বাইরের কেউ নয়, নানদায় যারা জন্মগ্রহণ করেছে শুধু তারাই। কিন্তু প্রতিপক্ষ আছে। দলটার নাম ব্ল্যাক নানান এলিয়ান্স। গোপনে কাজ করছে এর সদস্যরা, দেশ থেকে সমস্ত শ্বেতাঙ্গদের তাড়াতে চাইছে। আরও একটা দল আছে, শ্বেতাঙ্গ উগ্রবাদী। ন্যাশনাল পার্টির লোক ওরা। ওরা চায়, কোনও কালো লোক থাকবে না সরকারে। সব শাদা। সেনাবাহিনীও গঠিত হবে সব শ্বেতাঙ্গদের দিয়ে, যাতে কালোদের দাবিয়ে রাখতে পারে।
কিশোর, তুমি এত কথা জানলে কি করে? রবিন অবাক।
আর এর সঙ্গে কিডন্যাপিঙেরই বা কি সম্পর্ক? মুসা জানতে চাইল।
অনেক সম্পর্ক, কিশোর বলল। কিডন্যাপাররা ন্যাশনাল পার্টির উগ্রবাদী। শ্বেতাঙ্গদের লোক। পিটারকে ধরে নিয়ে গিয়ে আটকে রেখে তার বাবাকে বাধ্য করতে চায়, যাতে স্যার মনটেরো তাঁর প্ল্যান বাতিল করে তাদের কথায় রাজি হন। মিস্টার কিং আর মিস্টার ম্যাকঅ্যাডাম নিশ্চয় স্যার মনটেরোর সমতাবাদী দলের লোক। পিটারকে বাঁচানোর চেষ্টা করছেন।
হঠাৎ নীরব হয়ে গেল যেন ওয়ার্কশপটা।
বড় বেশি জান তুমি, হ্যারি বলল। অনেক বেশি জেনে ফেলেছ। এতটা ভাল না।
তার কালো থাবায় ধরা ভয়ংকর দর্শন এক পিস্তল।
.

কালো মুখে জ্বলন্ত কয়লার মত জ্বলছে যেন হ্যারির চোখ। সোজা কিশোরের দিকে পিস্তল তাক করে রেখেছে। এসব জানার একটাই উপায়। কিডন্যাপারদের সঙ্গে যোগসাজস আছে তোমার। তুমি স্পাই।
হুট করে কিছু কোরো না, হ্যারি, কিং বলল। তার দৃষ্টিও ভয়ংকর হয়ে উঠেছে। হ্যাঁ, ইয়াং ম্যান, বল তো কি করে এসব জানলে তুমি?
জানা কি এমন কঠিন কাজ নাকি? তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে হাত ওল্টাল কিশোর। আমি ইও নই বোকাও নই। একটা সহজ কথা ভাবছেন না কেন? আমি কিডন্যাপারদের লোক হলে আমাকে ওভাবে ধরে নিয়ে যাওয়া হত নাকি? আর আমিও কি ঢাকঢোল পেটাতাম?
তাকিয়ে রয়েছে হ্যারি। বলে যাও।
কাজটা সহজ হল কি করে বল, আদেশের সুরে বলল.কিং।
বেশ। বড় করে দম নিল কিশোর। ধরে তো নিয়ে যাওয়া হল আমাকে। ওদের আলাপ আলোচনা শুনলাম। কথায় অদ্ভুত টান। আমাকে পিটার বলে ভুল করল। ভাবল স্যার উইনিফ্রেড মনটেরোর ছেলে। যাই হোক, পালিয়ে আসতে পারলাম অবশেষে। তারপর আবার গেলাম কেবিনটার কাছে। এটা পেয়েছি, হাতির দাঁতে তৈরি জিনিসটা বের করে দেখাল সে। আমাদের শোফার হ্যানসনের বিশ্বাস, এটা আফ্রিকার কোনও ব্রিটিশ কলোনি থেকে এসেছে।
জিনিসটা হাতে নিয়ে দেখল কিং। তুলে ধরল হ্যারির জন্য। দেখে মাথা নাড়ল হ্যারি।
চমৎকার একটা লাইব্রেরি আছে আমাদের রকি বীচে, বলে গেল কিশোর। রেফারেন্স বই আর ম্যাগাজিন ঘেটে বের করতে খুব একটা কষ্ট হল না স্যার মনটেরোর নাম। জানতে পারলাম নান্দার ব্রিটিশ কলোনির প্রাইম মিনিস্টার তিনি। স্বাধীনতার জন্যে গোলমাল চলছে এখন দেশটায়। পার্টিগুলোর নাম। জানলাম। তারপর আর বুঝতে কষ্ট হল না কেন পিটারকে কিডন্যাপ করতে চেয়েছিল লোকগুলো। আপনাদের কথায়ও একই রকম টান। এবং দুজন দুরঙের চামড়া হলেও কাজ করছেন একসাথে। অর্থাৎ স্যার মনটেরোর হয়ে। কাজেই বোঝাটা কি এতই কঠিন?
তাই তো, মুসা বলল। একেবারেই সহজ।
হ্যারির দিকে তাকিয়ে হাসল কিং। চলবে?
হ্যাঁ, বলে আবার হোলস্টারে পিস্তল রেখে দিল হ্যারি। সত্যিই বলছে মনে হয়।
এবং খুব ভাল গোয়েন্দা। আশা করি আমাদেরকে নিরাশ করবে না ও। কি বল, কিশোর?
না, করব না, দৃঢ় কণ্ঠে বলল কিশোর।

ভেরি গুড, কিং বলল। মাত্র গতকাল রকি বীচে এসেছি আমরা। বিকেলের কাগজে পড়েছি তোমার কিডন্যাপিঙের খবর। তোমার ছবি দেখেছি। তিন গোয়েন্দা নামে যে একটা গোয়েন্দা সংস্থা খুলেছ তোমরা, এবং সেটার সাংঘাতিক সুনাম, তা-ও জানলাম। ভাবলাম তোমাদেরকে দিয়েই হবে। চলে এলাম।
তাহলে কি আমাদের ভাড়া করছেন? মুসার প্রশ্ন।
হ্যারির দিকে তাকিয়ে যেন আলোচনার উদ্দেশ্যেই বলল কিং, তোমার কি মনে হয়, হ্যারি? ওরা পারবে? এমন গোয়েন্দাই আমাদের দরকার, তাই না? ।
মনে হয় পারবে, হ্যারির মুখেও হাসি।
রবিন আর মুসার মুখেও হাসি। কিন্তু কিশোর গম্ভীর। জিজ্ঞেস করল, পিটারের সঙ্গে চেহারার কতটা মিল আছে আমার, স্যার?
আমাকে শুধু কিং বললেই চলবে। মিল? একেবারে যমজ বলা চলে। আশ্চর্য! বিশ্বাসই হতে চায় না। দুবছর ধরে আমেরিকায় আছে পিটার। এতদিনে নিশ্চয় চেহারা কিছুটা হলেও বদলেছে। ফলে লোকগুলো আর চিনতে পারেনি। তোমাকেই পিটার বলে ভুল করে বসেছে। ওর কথায়ও নানদার টান। একটা। ব্যাপার বুঝতে পারছি না…।
আমার কথা শুনেও কেন বুঝতে পারল না ওরা, এই তো? হাসল কিশোর। মুখে কাপড় গোঁজা ছিল আমার। প্রথমে বলার চেষ্টা করেছি। তারপর যে-ই ওদের উদ্দেশ্য বুঝে গেলাম, চুপ হয়ে গেলাম একেবারে। একটা কথাও আর বললাম না।
ভাল করেছ, হ্যারি বলল। মারাত্মক বিপদে পড়ে যেতে তাহলে। ওদের নাম আর চেহারার বর্ণনা যা পেয়েছি তাতে পরিচিত লাগছে না। তবে উগ্রবাদী। দলের লোক সন্দেহ নেই। ওই দলের লোকরা ভয়ংকর।
দেশে থাকলে নিরাপদ নয়, কিং বলল। সেজন্যেই ছেলেকে আমেরিকায়। পাঠিয়ে দিয়েছিলেন স্যার-মনটেরো। লস অ্যাঞ্জেলেসে থেকে ইস্কুলে পড়ে। খুঁজে খুঁজে এখানেও এসে হাজির হয়েছে উগ্রবাদীরা। হপ্তাখানেক আগে প্রায় ধরেও ফেলেছিল পিটারকে। অনেক কষ্টে পালিয়েছে সে। তারপর তার আর খোঁজ নেই। স্যার মনটেরোর তো প্রায় পাগল হবার জোগাড়। লস অ্যাঞ্জেলেসের নানদার ট্রেড মিশনের মাধ্যমে পিটার খবর পাঠানোর পর গিয়ে তিনি শান্ত হয়েছেন।
কি খবর পাঠিয়েছে? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
ট্রেড মিশনটা কি? মুসা জানতে চাইল।
ট্রেড মিশন হল একটা অফিসিয়াল গ্রুপ, হ্যারি বলল। যাদের কাজ হল দুই দেশের মধ্যে ব্যবসায়ীক সম্পর্ক বৃদ্ধি করা।
আর মেসেজ যেটা পাঠিয়েছে, কিং বলল। সংক্ষিপ্ত। বেশ অদ্ভুত। আমরা। তো এর মাথামুণ্ড কিছুই বের করতে পারিনি। তাতে রকি বীচের কথা বলা হয়েছে।

পিটারের নিশ্চয় ভয় শত্রুদের হাতে পড়ে যেতে পারে তার মেসেজ। সহজ করে লিখলে ওরাও বুঝে ফেলবে।
ওই মেসেজের মানে করে দিতে বলছেন আমাদেরকে? মুসা জিজ্ঞেস করল।
দেখি তো? দেখতে চাইল রবিন।
হোটেলে রয়ে গেছে। ওখানেই নিরাপদ। হ্যারি বলল, যেতে চাইলে এখনি নিয়ে যেতে পারি।
দুজনকে অনুসরণ করে ওয়ার্কশপ থেকে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা। লম্বা, কালো একটা ক্যাডিলাক দাঁড়িয়ে আছে। তাতে চড়ল সবাই। হঠাৎ মুসা বলে। উঠল, কিশোর, দেখ! রাস্তার অন্যপাশে একটা জায়গা দেখাল সে।
কী?
ওই ঝোপের ভেতর কাকে দেখলাম, মুসা বলল।
চল তো দেখি, কিং বলল।
সাবধানে ঝোপটার দিকে এগোল সবাই। রাস্তার কিনার থেকে শুরু করে পরের ব্লক পর্যন্ত এগিয়ে গেছে ঝোপ। পাতলা। ভেতর দিয়ে অনেক দূর দেখা যায়। কাউকে দেখা গেল না সেখানে। তবে ছিল যে তার প্রমাণ মিলল। একটা পোড়া সিগারেটের গোড়া পড়ে রয়েছে।
বললাম না দেখেছি! প্রায় চিৎকার করে বলল মুসা।
জিরাতে কেউ বসে থাকতে পারে, কিশোর বলল। সিগারেট টেনেছে।
হয়ত, কিং বলল।
তা না হলে, নিজেকেই যেন বোঝানোর চেষ্টা করছে কিশোর। স্যালভিজ ইয়ার্ডের ওপর নজর রাখতে আসবে কে? কিডন্যাপাররা এখনও এই এলাকায়। থেকে থাকলে নিশ্চয় খবরের কাগজ দেখেছে। ভুল লোককে ধরেছিল বুঝতে পেরেছে।
আবার ক্যাভিলাকে ফিরে এল ওরা। গাড়ি চালাল হ্যারি।
ছেলেদের দিকে ফিরে কিং বলল, পিটারকে খুঁজে বের করতে হবে। আমাদের। ঝোপের ভেতর যে ছিল, সে হয়ত নজর রাখেনি, কিন্তু আমার ভয় লাগছে কিডন্যাপাররা এখনও এই শহরেই আছে। সহজে হাল ছাড়বে না ওরা।
এগুলো আসলে এক ধরনের জেদ, কিশোর বলল। নিজেরা যা ভাবে সেটাই ঠিক, অন্যদেরটা কিছু না।
হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। আর এই উগ্রপন্থী পলিটিশিয়ানগুলো তো আরও বেশি। আরেকটা ব্যাপার বুঝতে পারছে না ওরা, স্যার মনটেরো ছেলেকে যতই ভালবাসুন, সবার আগে তাঁর কাছে হল দেশ। পিটারকে ধরে নিয়ে গিয়ে হুমকি দিলেই তিনি শুনতেন না, তার কাজ করেই যেতেন। এমনকি পিটারকে মেরে ফেলারও হুমকি যদি দিত ওরা তিনি শুনতেন না।

চুপচাপ শুনল তিন গোয়েন্দা, কিছু বলল না। মোড় নিয়ে সৈকতের ধারে মিরামার হোটেলের ড্রাইভওয়েতে এসে ঢুকল গাড়ি। ছেলেদেরকে নিয়ে কামরায় চলল কিং, আর হ্যারি গেল হোটেলের সেফ থেকে মেসেজটা বের করে আনতে।
মেসেজ আনা হলে দরজায় তালা লাগিয়ে দিল কিং। টেবিল ঘিরে বসল সবাই। জোরে জোরে পড়ল কিশোর, অ্যাটাকড ইন এল. এ.। কেয়ারড। রকি। বীচ। জাঙ্গাস প্রেস।
নিরাশ হয়ে পরস্পরের দিকে তাকাল ছেলেরা।
মুসা বলল, কিছুই তো বলেনি!
এর মধ্যে সংকেতও তো কিছু দেখছি না, বলল রবিন।
না। সংক্ষিপ্ত মেসেজটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। শুধু শেষ দুটো শব্দ বাদে। জাঙ্গাস প্লেস। এটার কি মানে?
সেটা বোঝানোর জন্যই তো তোমাদেরকে ডেকে আনলাম, কিং বলল। রকি বীচের প্রতিটি গাইডবুক দেখেছি আমরা। কিন্তু জ্যাঙ্গার কথা কোথাও কিছু লেখা নেই। ভাবলাম, এখানকার কেউ হয়ত বলতে পারবে।
আমি জীবনেও শুনিনি ওই নাম, রবিন বলল।
আমিও না, বলল মুসা।
কিশোর শুধু নীরবে মাথা নাড়ল।
হবে না, কিং, হ্যারি বলল। তার কাঁধ ঝুলে পড়েছে। এই ছেলেগুলোও আমাদেরকে সাহায্য করতে পারবে না।

.

পারবই না, কিশোর বলল। তা বলতে পারেন না।
চট করে কিশোরের দিকে তাকাল কিং। তুমি... কিছু বুঝতে পেরেছ?
লস অ্যাঞ্জেলেসে তার ওপর হামলা আসায় ভয় পেয়ে গিয়েছে পিটার, কিশোর বলল। পালিয়েছে। চলে এসেছে এখানে। রকি বীচকে লুকানোর জায়গা বেছে নিল কেন সে?
ইস্কুল ছুটি হলে এখানেই আসে, হ্যারি জানাল। গতবার স্যার মনটেরো এসেছিলেন কয়েকটা দিন ছেলের সঙ্গে কাটাতে। তখনও দুজনে একহপ্তা রকি বীচে থেকে গেছে।
তার মানে রকি বীচ তার চেনা, চেনা শব্দটার ওপর জোর দিল কিশোর।
চেনা হতেই পারে, মুসা বলল। এতে অবাক হওয়ার কি আছে? গুরুত্ব কিসের?
আছে, মুসা, আছে। হতে পারে এখানে বিশেষ একটা জায়গা বেছেছে যেখানে লুকানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং সেটাই ইঙ্গিতে বলতে চেয়েছে স্যার মনটেরোকে। জ্যাঙ্গাস প্রেস বলে ওই জায়গাকেই বুঝিয়েছে।

কিন্তু, হ্যারি বলল। স্যার মনটেরো বুঝতে পারেননি।
না পারলেও, কিশোর বলল। এটাই সেই জায়গা যেখানে সে লুকিয়েছে। ওরকম কোনও জায়গার নাম নেই রকি বীচে। তার মানে ইঙ্গিতে কিছু বোঝাতে চেয়েছে। সরাসরি বললে সবাই বুঝে ফেলত, সে জন্যে বলেনি।
হ্যাঁ, মুসা মাথা ঝাঁকাল। উগ্রবাদীরাও দেখে যাতে বুঝতে না পারে।
কিঙের দিকে তাকাল কিশোর। শব্দটা আফ্রিকান নয় তো? ওরকম কোনও শব্দ আছে আফ্রিকান ভাষায়?
তা আছে, নিরাসক্ত কণ্ঠে বলল কিং। একজনের নাম। নানা উপজাতির মহান নেতা ছিলেন তিনি।
হ্যারি বলল, ১৮৮০ সালের দিকে ইউরোপিয়ানরা যখন বসতি স্থাপন করতে আরম্ভ করে তখন জ্যাঙ্গার সঙ্গে ভীষণ লড়াই বাধে ওদের। তিনিই নানদার শেষ নেতা, যার সঙ্গে বিদেশীদের যুদ্ধ হয়। এরপর ওভাবে আর কারও সঙ্গে হয়নি। তার নামের মানে অবশ্য কয়েক রকম হয়, কোন জায়গায় কি অনুবাদ করা হবে তার ওপর নির্ভর করে। এই যেমন কোথাও বলতে গেলে হয় বজ্রময় মেঘ, আবার। কোথাও বৃষ্টির শব্দ।
এই? হতাশ মনে হল গোয়েন্দাপ্রধানকে। জ্যান্সার কোনও বিশেষ জায়গা। ছিল? কোনও বিশেষ ঘটনা, কিংবা কোনও বিশেষ বন্ধু, যার সঙ্গে কিছুটা মিল পাওয়া যায়?
কি বলতে চাও বুঝলাম না, কিং বলল। জ্যাঙ্গা হল নানদার একটা কিংবদন্তী। অসংখ্য গল্পগাথা আছে তার সম্পর্কে। হাজার হাজার মানুষের সঙ্গে পরিচয়। বিশেষ কিছু খুঁজে বের করতে হলে কয়েক মাস লেগে যাবে।
অত সময় নেই আমাদের হাতে, হ্যারি বলল,। মাস তো দূরের কথা। কয়েকটা দিনও নেই।
নাহ, কোনও পথ দেখছি না, হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গি করল রবিন।
পথ তো একটা নিশ্চয় আছে, এত সহজে হাল ছাড়ে না গোয়েন্দাপ্রধান। পিটার তখন মরিয়া। সুতরাং ভালমত চেনে ওরকম একটা সংগঠনের সাহায্য নিয়েছিল। ভাবতেই যেটা প্রথমে তার মনে এসেছে। কিং, জ্যাঙ্গার সঙ্গে সম্পর্ক আছে এরকম জরুরী জায়গা, ঘটনা, যুদ্ধের কথা বলতে পারেন? এমন কিছু, নানদার বেশির ভাগ লোকই যেটা জানে।
চুপ করে কিছুক্ষণ ভাবল কিং। কোনটা বলবে সেটাই ভাবছে বোধহয়। অবশেষে বলল, ইমবালায় ইংরেজ সৈন্যদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড লড়াইয়ে জিতেছিলেন একবার। শেষবার পরাজিত হয়েছিলেন জিয়ালায়। লর্ড ফাউড নামে একজন

জেনারেলকে পরাজিত করেছিলেন তিনি, আবার তাঁকে পরাজিত করেছিল আরেকজন জেনারেল, জেনারেল অডলি।
তাড়াতাড়ি পকেট থেকে নোটবুক বের করে সব লিখে নিতে লাগল রবিন।
জাঙ্গার রাজধানী ছিল উলাগায়, হ্যারি বলল। পরাজিত হওয়ার পর তাকে গিয়ে ফোর্ট জর্জের জেলখানায় বন্দি করল ইংরেজরা।
হ্যারির কথা কেড়ে নিয়ে যেন বলল কিং, সেখান থেকে পালালেন জ্যাঙ্গা। আবার লড়াই শুরু করলেন। হেডকোয়ার্টার করলেন কারগা ভ্যালির দুর্গম এক জায়গায়।
তারপর, উপসংহার টানল হ্যারি। স্মিথস ফোর্ড নামে একগায়ের কাছে লড়াইয়ে অবশেষে মৃত্যুবরণ করলেন।
মাথা ঝাঁকাল কিশোর। তাঁর নামের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সমস্ত নাম এখন জোগাড় করতে হবে আমাদের। তার পর…
জোরে থাবা পড়ল দরজায়। ঝট করে একসঙ্গে সব কটা মাথা ঘুরে গেল সেদিকে। চেঁচিয়ে ডাকল একটা নারীকণ্ঠ, মিস্টার কিং! মিস্টার ম্যাকঅ্যাডাম! আছেন ওখানে?
দরজার কাছে এগিয়ে গেল কিং। বলতে বলতে গেল, ও মিস ডলি জেসাপ। ট্রেড মিশন থেকে এসেছে। স্যার মনটেরোর সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ রক্ষা.. করছে সে।
হয়ত পিটারের খোঁজ পেয়েছেন স্যার মনটেরো, আন্দাজ করল হ্যারি। ।
দরজা খুলল কিং। লম্বা, কালো চুলওয়ালা এক তরুণী দাঁড়িয়ে আছে। গায়ে নেভি সোয়েটার। পরনে ধূসর স্ল্যাকস। তাড়াহুড়ো করে এসে ঘরে ঢুকল।
ওকে পেয়েছেন? জিজ্ঞেস করল ডলি। ফোন করতে মানা করলেন। খবর দিই কি করে। স্যার মনটেরোর কাছ থেকে গোপন মেসেজ এসেছে… হঠাৎ ছেলেদের ওপর চোখ পড়তেই থেমে গেল সে। সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাল ওদের। দিকে।
আমি বুঝিনি আপনারা একা নন, কিংকে বলল সে।
পিটারের সম্পর্কে কিছু? জিজ্ঞেস করল কিং।
তার খবর পাওয়া গেছে? হ্যারির প্রশ্ন।
না, ওসব নয়। অফিসিয়াল মেসেজ।
হুঁ, মাথা ঝাঁকাল কিং। ছেলেদের দিকে ফিরে বলল, অল রাইট, বয়েজ, তোমরা তোমাদের তদন্ত চালিয়ে যাও। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পিটারকে খুঁজে বের করতে হবে আমাদের। কোনও খবর পেলেই সঙ্গে সঙ্গে এখানে জানাবে। আমাদেরকে।
বেরিয়ে যেতে ইঙ্গিত করা হচ্ছে ওদেরকে, বুঝতে পারল ছেলেরা। বেরিয়ে এল হোটেলের কামরা থেকে। নিচে নেমে বাস স্টপের দিকে রওনা হলো।

রবিন জিজ্ঞেস করল, কোত্থেকে শুরু করব, কিশোর?
জ্যাঙ্গা। টেলিফোন বুক, ডিরেকটরি, ম্যাপ, রেফারেন্স বুক, মোটকথা যত জায়গায় ওই নামের সম্পর্ক থাকতে পারে মনে হবে সবখানে খুঁজব। ভাগাভাগি হয়ে খুঁজতে বেরোব আমরা। ম্যাপ খুঁজতে মুসা চলে যাও সিটি হলে। রবিন। লাইব্রেরিতে। সিটি ডিরেকটরি আর টেলিফোন বুক খুঁজবে। আমি যাব হিসটরিক্যাল সোসাইটিতে।
খিদে পেয়েছে, লজ্জিত হাসি হাসল মুসা। বাড়ি থেকে আগে লাঞ্চটা সেরে আসি?
ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। নাহ, তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল। একটা স্ন্যাকসে ঢুকে কিছু খেয়ে নাও। তারপর চলে যাও কাজে। বিকেলের পরে হেডকোয়ার্টারে দেখা হবে।
বাস এল। তাতে চড়ল ওরা। নোট বুক বের করে যেসব জায়গায় গিয়ে লড়াই করেছেন জ্যাঙ্গা, সেগুলোর তিনটে লিস্ট করে একেকজনের হাতে একেকটা। দিল রবিন। তারপর বিশেষ বিশেষ জায়গায় নেমে আলাদা হয়ে গেল তিনজনে।

.

সাড়ে তিনটেয় হিসটরিক্যাল সোসাইটি থেকে বেরিয়ে ইয়ার্ডে ফিরে চলল কিশোর। তেমন কিছুই পায়নি সে। হেডকোয়ার্টারে ঢুকে দেখল রবিন কিংবা মুসা। ফেরেনি। চুপচাপ বসে থাকতে ভাল লাগে না। ইমারজেন্সি সিগন্যালগুলো নিয়ে। বসল সে। নতুন ব্যাটারি ভরল। ফাইন টিউনিং করল। তখনও ফিরল না দুই সহকারী। শেষে ট্রেলারে ঢুকে জ্যাঙ্গার ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে বসল কিশোর।
জবাব একটা নিশ্চয় আছে। তার দৃঢ় বিশ্বাস, জ্যাঙ্গা যেসব জায়গায় গিয়েছেন। ওগুলোর নামের মধ্যেই রয়েছে সূত্র। আর সেটা বের করতে খুব একটা কষ্ট করতে হয়নি পিটারকে।
রবিন আর মুসা যখন এল, তখন পাঁচটা প্রায় বাজে। ওদের গম্ভীর মুখ দেখেই যা বোঝার বুঝে নিল কিশোর।
কিছু না, জোরে নিঃশ্বাস ফেলে হাত নেড়ে বসে পড়ল রবিন।
নামগুলো সব আফ্রিকান, কিশোর, মুসা বলল হতাশ কণ্ঠে। রকি বীচে ওরকম নামের কিছু নেই।
আসলে সব জায়গায় চেষ্টা করিনি আমরা, নিরাশ মনে হলো না। গোয়েন্দাপ্রধানকে। খাওয়ার পর লাইব্রেরিতে গিয়ে জ্যাঙ্গা খুঁজব। আরও কোনও ইমপরট্যান্ট জায়গায় গিয়ে থাকতে পারেন যেটার কথা আমাদেরকে বলতে ভুলে গেছে কিং আর হ্যারি।
বাড়িতে কাজ আছে আমার, রবিন বলল। মাকে কথা দিয়ে এসেছি। তার সঙ্গে এক জায়গায় যেতে হবে।

আমারও আছে, মুসা জানাল।
আমার নেই, কিশোর বলল। আমি একাই যেতে পারব। বই ঘাঁটাটা এমন কোনও কঠিন কাজ না।.
কিশোর, মুসার কণ্ঠে অস্বস্তি। মনে হয়… মনে হয় ভুল পথে খুঁজছি আমরা।
আমারও তাই মনে হচ্ছে, রবিন বলল।
কি জানি! গাল চুলকাল কিশোর। তার বিশ্বাসে চিড় ধরিয়ে দিয়েছে মনে হয় দুই সহকারী। কিন্তু আমার বিশ্বাস, পিটার যা বলার বলে দিয়েছে। ওই মেসেজে জানিয়ে দিয়েছে কোথায় আছে সে।

.
পরদিন সকালে নাস্তার টেবিলে বসে শুধু খাবার খুঁটতে লাগল কিশোর। অন্যমনস্ক। রুচি নেই যেন।
কি রে? ব্যাপারটা নজর এড়াল না মেরিচাচীর। অসুখ নাকি?
নাহ! প্লেটের দিকে চোখ ফেরাল কিশোর। আগের রাতে ঘুম ভাল হয়নি। সকালেও তাড়াতাড়ি উঠে পড়েছে। তার আগে বিছানায় শুয়ে শুয়ে মনে হয়েছে, বোধহয় মুসার কথাই ঠিক। লাইব্রেরিতে নানদার ওপর একটা বই পেয়ে নিয়ে এসেছে। হেডকোয়ার্টারে বসে বসে অনেক রাত পর্যন্ত পড়েছে। পিটারকে খুঁজে বের করতে কাজে লাগে এমন কিছুই চোখে পড়েনি।
আরে কি হলো? খাচ্ছিস না কেন? ডিম নে, মেরিচাচী তাগাদা দিলেন। নাকি পেটে…
ঠিক আছে, দাও একটা, প্লেট বাড়িয়ে দিল কিশোর। কিশোরের এই উদাসীনতা রাশেদ পাশারও নজরে পড়েছে। আড়চোখে তাকালেন তিনি, কিছু বললেন না।
ভাবছে কিশোর। পিটার তার সূত্র ঠিকমতই দিয়েছে। বোঝার জন্যেই। কিন্তু কিশোর বুঝতে পারছে না। কিছু একটা মিস করছে। নাস্তা শেষ হলো। নতুন। কিছুই বের করতে পারল না ততক্ষণেও সে।
এই সময় বাজল টেলিফোন। মুখও তুলল না সে। সমস্যা তার ভাল লাগে। সেগুলোর সমাধান করতে…
কিশোর, ডেকে বললেন মেরিচাচী। রবিন।
নিরাসক্ত ভঙ্গিতে উঠে গিয়ে রিসিভার কানে ঠেকাল কিশোর। বলো।
কিশোর, পেয়ে তো গেলে! আমাদেরকে ফোন করলে না কেন?
কি বললে? চোখ মিটমিট করছে কিশোর। কি পেয়ে গেলাম?
কেন, জবাব। পিটার কোথায় লুকিয়েছে?
মজা করছ তো। করো। ভীষণ গম্ভীর হয়ে গেল কিশোর। সকালে এমনিতেই মেজাজ ভাল নেই আমার। হ্যারি আর কিঙের কাছে গিয়ে আলোচনা। করব

ভাবছি। হয়ত…
তার মানে পাওনি? রবিন অবাক।
পাইনি? কি পাইনি?
লাইব্রেরি থেকে যে বইটা নিয়েছ তাতে?
কি বলছ তুমি? নতুন কিছু তো দেখলাম না। আগাগোড়া পড়েছি।
তাহলে মিস করেছ। চলে এস। আমরা হেডকোয়ার্টারে বসে আছি। রবিন, কী…?
কিন্তু লাইন কেটে দিয়েছে রবিন। গেলাসের দুধটুকু না খেলে উঠতে দেবেন। মেরিচাচী। মাঝে মাঝে এটা অত্যাচার মনে হয় কিশোরের। এখন আবার একটা নতুন অত্যাচার যোগ হয়েছে, কিডন্যাপিঙের পরে, বাইরে বেরোতে গেলেই খালি সতর্ক করেন। দুই ঢোকে দুধটুকু শেষ করে ছুটে বেরোল রান্নাঘর থেকে। হেডকোয়ার্টারে এসে ঢুকল।
গোয়েন্দাকে সব সময় চোখকান সজাগ রাখতে হয়, গম্ভীর হওয়ার ভান করতে গিয়ে হেসে ফেলল মুসা।
টিটকারি রাখ তো এখন…
বাধা দিয়ে রবিন জিজ্ঞেস করল, সত্যি বলছ কিছু পাওনি?
থাকলে তো পাব, বিড়বিড় করল কিশোর।
রবিন, বলেই দাও ওকে, মুসা বলল।
বেশ, শুরু করল রবিন। আমরা ঢুকে দেখি তুমি নেই। টেবিলে বইটা দেখতে পেল মুসা। টেনে নিলাম। চীফ জ্যাঙ্গার ওপর লেখা চ্যাপ্টারটাতেই পেলাম। ওটা।
কি পেলে? অত ভণিতা করছ কেন? জলদি বলো!
বইটা তুলে নিয়ে পাতা ওল্টাল রবিন। পড়তে আরম্ভ করল, নানদা সর্দার জ্যাঙ্গার আশা বেড়ে গেল যখন ইমবালা, অর্থাৎ দা হিল অভ দা রেড লায়নে ইংরেজ বাহিনীকে পরাজিত করলেন। কারণ তিনি বুঝতে পারলেন অন্তত তিনটে বছরের জন্যে ঠেকিয়ে দিতে পেরেছেন ইউরোপিয়ানদের। এটুকু পড়েই থেমে গেল সে। কিশোরের দিকে তাকিয়ে হাসল।
মুসাও হাসল।
হাঁ করে ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। বুঝতে পারছে না। তো? কি পেলে? ইমবালার কথা তো আমরা…
কিশোর, অধৈর্য ভঙ্গিতে হাত নাড়ল রবিন। এখনও বুঝতে পারলে না? তোমার হয়েছে কি? দা হিল অভ দা রেড লায়ন! ইমবালার ইংরেজি মানে, লাল সিংহের পাহাড়। মনে পড়ছে না? এখানেও আছে রেড লায়ন। দা রেড লায়ন র‍্যাঞ্চ। বিখ্যাত পুরনো হোটেলটা, যেখানে হলিউডের বড় বড় অভিনেতারা ছুটি কাটাতে আসে।

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত নীরবে রবিনের দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। তারপর ওপর দিকে মুখ তুলে হো হো করে হেসে উঠল। রবিনের পিঠ চাপড়ে দিতে দিতে বলল, রবিন, কাজই করেছ একটা! ঠিক বলেছ। দা রেড লায়ন র‍্যাঞ্চ। ছেলেকে নিয়ে নিশ্চয় ওখানে থেকেছেন স্যার মনটেরো। ইস, আমি একটা গাধা! লিখেই। দিয়েছে ইমবালার মানে, অথচ আমার চোখেই পড়ল না!
ভুল আমরা সবাই করে থাকি, ভারিক্কি চালে বলল মুসা।
হেসে ফেলল কিশোর। প্রতিশোধ নিচ্ছ, না? নাও। কিছু মনে করছি না। আমি। কাজ হয়েছে এতেই খুশি।
রবিনও হাসল।
হ্যারি আর কিংকে ফোন করা দরকার, কিশোর বলল।
কিন্তু কেউ ফোন ধরল না ওপাশ থেকে।
নাস্তা করতে গেছে হয়ত, রিসিভার রাখতে রাখতে বলল কিশোর। চল, গিয়ে ধরি। একসঙ্গেই নাহয় তখন র‍্যাঞ্চে যাওয়া যাবে।
তাহলে সাইকেল নেয়ার দরকার নেই, রবিন বলল। সাইকেলগুলো আবার কোথায় রাখব? বাসে চলে যাই। তারপর ওদের সঙ্গে গাড়িতে।
গুড আইডিয়া, মুসাও একমত।
মাথা ঝাঁকাল কিশোর। দ্রুত বেরিয়ে পড়ল হেডকোয়ার্টার থেকে। বিশ মিনিট পরে একটা বাস ওদেরকে নামিয়ে দিল মিরামার হোটেলের সামনে। কিরে ঘরে ফোন করল ক্লার্ক। আছে। ছেলেদেরকে পাঠিয়ে দিতে বলল কিং।
ঘরে ঢুকে কিশোর জিজ্ঞেস করল, কিছু শুনেছেন আর?
না, জবাব দিল কিং। নানদায় রাজনৈতিক পরিস্থিতি খুব খারাপ হয়ে আসছে। পিটারকে খুঁজে বের করতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন স্যার মনটেরো, আমাদের নির্দেশ দিয়ে দিয়েছেন।
আমরা বোধহয় এবার সাহায্য করতে পারব আপনাদের। বই পড়ে যা আবিষ্কার করেছে সেটা খুলে বলল কিশোর।
দা হিল অভ দা রেড লায়ন! নিশ্চয়! প্রায় চেঁচিয়ে উঠল হ্যারি। মনে হয়, ঠিকই আন্দাজ করেছ তোমরা।
বলেছিলাম না, তার দিকে তাকিয়ে তিন গোয়েন্দার প্রশংসা করে বলল কিং। ছেলেগুলো চালাক। জলদি চল। গাড়ি বের করতে হবে।
পার্কিং লটে এসে বিশাল ক্যাডিলাক গাড়িটায় চড়ে বসল সবাই। ড্রাইভ করতে বসল কিং। তাকে পথ বাতলে দিতে লাগল রবিন। শহরের উত্তরাঞ্চলের পাহাড়ের পাদদেশে চলে এল ওরা। রেড লায়ন র‍্যাঞ্চের দোতলা বাড়িটা রাস্তা থেকেই চোখে পড়ে। ওটার দুপাশে ছড়িয়ে রয়েছে কয়েক গুচ্ছ হলদে রঙ করা। কাঠের

বাড়ি আর কিছু শাদা রঙের কটেজ। পুরো অঞ্চলটাই ঘিরে দেয়া হয়েছে অলিণ্ডার আর হিবিসকাসের উঁচু বেড়া দিয়ে। গাড়ি পার্ক করে রেখে প্রধান। বাড়িটার দিকে এগোল ওরা।
রেজিস্ট্রেশন ডেস্কে বসে আছে, ধোপদুরস্ত কালো স্যুট পরা ক্লার্ক। মুখ তুলে তাকিয়ে মোলায়েম হাসি হাসল। হঠাৎ ফ্যাকাসে হয়ে গেল হাসিটা। চিৎকার করে উঠল, মিস্টার টিনটন!
ডেস্কের পেছনের দরজাটা খুলে গেল। বেরিয়ে এল একজন খাট, হালকাঁপাতলী লোক। গায়ে চেককাটা জ্যাকেট, পরনে ঢোলা পাজামা। কিশোরের দিকে তাকাল জ্বলন্ত দৃষ্টিতে। আবার এসেছ তাহলে! এবার বিল আদায় করেই ছাড়ব!
তারমানে পিটার মনটেরো এসেছিল! প্রায় চেঁচিয়েই উঠেছিল কিশোর, সময় মত সামলে নিল।
আপনি ম্যানেজার? খাটো লোকটাকে জিজ্ঞেস করল কিং।
হ্যাঁ, আমি ম্যানেজার, কর্কশ জবাব দিল লোকটা। কিশোরের দিক থেকে চোখ সরাচ্ছে না। ইয়াং ম্যান, এখুনি বিল মিটিয়ে না দিলে পুলিশ ডাকতে বাধ্য হব আমি।
তার দরকার হবে না, শান্তকণ্ঠে বলল, হ্যারি। টাকাটা আমরা দিয়ে দেব। একে পিটার ভাবছেন তো? ও পিটার নয়। ওই
নয়? সন্দেহ দেখা দিল ম্যানেজারের চোখে। তাহলে…
দেখতে পিটারের মতই, বুঝিয়ে দিল কিং। তবে পিটার নয়। চেহারা অনেকটা এক রকম।
কেন, খবরের কাগজে আমার ছবি দেখেননি? কিশোর জিজ্ঞেস করল। তাহলে তো এই ভুল করার কথা নয়
মাথা নাড়ল ম্যানেজার। সাংঘাতিক ব্যস্ত আমরা। বিশেষ করে এই হপ্তায়। কয়েকজন মেহমান এসেছে। তাদেরকে সামলাতেই হিমশিম খাচ্ছি। পেপার দেখব। কখন। কিশোরের দিকে তাকিয়েই রয়েছে সে। তার কুঁচকানো কমদামী পোশাক দেখছে। পিটারকে অবশ্য এত বাজে পোশাকে এত অগোছালো অবস্থায় দেখিনি। কিন্তু তুমি যদি পিটারই না হও, তাহলে ওরা তোমার বিল দিতে চাইছে কেন?
আমি আর মিস্টার ম্যাকঅ্যাডাম, হ্যারিকে দেখাল কিং। স্যার মনটেরোর প্রতিনিধি। এই যে আমাদের আইডেনটিটি। লস অ্যাঞ্জেলেসে নানদার ট্রেড মিশন আছে, ইচ্ছে হলে আমাদের ব্যাপারে খোঁজ নিতে পারেন ওখানে। এখন বলুন, পিটারের কাছে কত পান। দিয়ে দিচ্ছি।

একটা বিল বের করে দিল ক্লার্ক। টাকা মিটিয়ে দিল হ্যারি ইতিমধ্যে দুজনের আইডেনটিটি চেক করল ম্যানেজার। মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, কেমন যেন দ্বিধায় ফেলে দেয়।
বুঝতে পারছি কেন এমন লাগছে আপনার, কিং বলল। আরেকটু খোলাসা করে বললেই আর দ্বিধা থাকত না। কিন্তু সেটা করতে পারছি না। অনেক জরুরী। কাজ পড়ে আছে আমাদের। পিটার এখানে না থাকলে কোথায় আছে খুঁজে বের করতে হবে। ও এখানে আসার পর থেকে কি কি ঘটেছে দয়া করে বলবেন কি?
দ্বিধা করতে লাগল ম্যানেজার। তারপর মাথা ঝাঁকাল। ঠিক আছে, বলছি। হপ্তাখানেক আগে এসেছিল সে। এর আগেও এসেছিল তার বাবার সঙ্গে। কাজেই চিনতে পেরেছিলাম। এসে বলল কয়েক দিনের মধ্যেই তার বাবা আসবেন, তার সঙ্গে দেখা করবে। বিশ্বাস করলাম। জায়গা দিলাম তাকে। দুদিন পরে দুজন, লোক এসে বলল স্যার মনটেরোর কাছ থেকে এসেছে। পিটারের রুম নম্বর চাইল ওরা। কেউ এসে বললেই বোর্ডারদের নামধাম বলে দিই না আমরা। ওদের পরিচয়। জানতে চাইলাম। তারপর পিটারকে ফোন করলাম। লোকগুলোকে ঘরে পাঠিয়ে দিতে বলল সে।
লোকগুলো দেখতে কেমন ছিল? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
ততটা ভাল মনে নেই, ম্যানেজার বলল। চারদিন আগে এসেছিল ওরা। একজন বেশ গাট্টাগোট্টা, কোকড়া বাদামী চুল। আরেকজন লম্বা, পাতলা, কালো চুল। ওদের নাম মনে করতে পারছি না।
কিশোরের দিকে তাকাল হ্যারি আর.কিং। মাথা ঝাঁকাল সে। চেহারার বর্ণনায় লোকগুলোকে দুই কিডন্যাপারের মতই লাগল ওদের।
ওরা চলে যাওয়ার পর কি হলো? জিজ্ঞেস করল কিং।
অদ্ভুত কাণ্ডই করেছে, তখন অবশ্য সে রকম মনে হয়নি। লোকগুলো ওপরে যাওয়ার একটু পরেই দেখলাম মেইন গেট দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে ছেলেটা। মিনিট পাঁচেক পরেই লোকগুলো তাড়াহুড়ো করে নেমে এসে বেরিয়ে গেল।
পিটারকে আর দেখেননি? হ্যারি জানতে চাইল।
না। আর আসেনি। বিলের টাকাও দিয়ে যায়নি।
আবার হারালাম, তিক্তকণ্ঠে বলল হ্যারি।
আমরা ভেবেছিলাম পাবই, নিরাশ হয়েছে রবিনও।
চিন্তিত লাগছে কিশোরকে। ওর ঘরটা দেখতে পারি?
কী বক্সের দিকে তাকাল ম্যানেজার। খালিই আছে। হাত বাড়িয়ে চাবিটা তুলে আনল। ঊনত্রিশ নম্বর ঘর। দোতলায়। সামনের দিকে। ডানের এলিভেটর দিয়ে উঠতে পার। কিংবা এলিভেটরের পাশের সিঁড়ি দিয়ে।

এলিভেটরের দিকে এগোতে এগোতে মাথা নাড়ল কিং, যেন বিশেষ ভরসা। করতে পারছে না। কিশোর, ওর ঘর দেখে কি হবে? ওখানে তো নেই। একটা আশাই করতে পারি এখন শুধু, আবার আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে।
লোকগুলোকে সন্দেহ করেছিল, বোঝাই যায়, জবাব দিল কিশোর। এলিভেটরে ঢুকে পড়েছে। বোতাম টিপে দিয়ে বলল, তা না হলে ওভাবে হোটেল থেকে পালাত না। নিশ্চয় লোকগুলোকে চিনতে পেরেছিল, শত্রু হিসেবে। দেখেই আবার পালিয়েছে। লোকগুলো হয়ত তখনও তার ঘরেই ঢোকেনি।
তাতে আমাদের কি লাভ? হ্যারির প্রশ্ন।
সে আশা করছিল, তার মেসেজ পেয়ে স্যার মনটেরো ছুটে আসবেন হোটেলে। পালানোর আগে নিশ্চয় আবার ভেবেছিল সে কোথায় যাচ্ছে তার একটা নির্দেশ রেখে যাওয়া দরকার। কোনও একটা মেসেজ। কিংবা কোনও সূত্র।
এলিভেটর থেকে বেরিয়ে এল ও। রওনা হলো পিটারের ঘরের দিকে। সকলের মনেই আশা, ছোট্ট একটা মেসেজ অন্তত রেখে যাবে পিটার।
ঘরে পা দিয়েই গুঙিয়ে উঠল মুসা, কিশোর, সব সাফ করে ফেলা হয়েছে।
আনমনে মাথা ঝাঁকাল কিশোর। তাকাল বিশাল ঘরটায়। জানালা দিয়ে রোদ আসছে। সেটা দিয়ে হোটেলের সামনের দিকের ড্রাইভওয়ে আর ট্যাক্সি পার্ক করার জায়গা দেখা যায়। তারপরেও বহুদূরে দৃষ্টি চলে যায়, একেবারে নীল প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত।
কিছু রেখে গেলেও আর পাওয়া যাবে না সেটা, রবিন বলল।
ঠিকই বলেছ, একমত হলো কিং। কিশোর, লাভ হবে না। নোটফোট কিছু রেখে গেলে নিশ্চয় ঝাড় দিয়ে ফেলে দিয়েছে ঝাড়ুদার।
হয়ত, স্বীকার করল কিশোর। তার পরেও কথা আছে। ঝাড়ুদাররা ঠিকমত ঝাড়ু দেয় না অনেক সময়। তাছাড়া আমার মনে হয় না এত সাধারণ কিছু রেখে গেছে পিটার যেটা সহজেই ফেলে দেয়া যায়। সহজে চোখে পড়ে এমন কিছু রেখে। গেছে বলেও মনে হয় না। কারণ সে জানে কিডন্যাপাররা খুঁজতে পারে। তাহলে ওরা দেখে ফেলবে। না, অত সহজ কিছু রেখে যায়নি সে। সাংকেতিক কিছু রেখে। গেছে। এমন কিছু যা স্যার মনটেরোর বন্ধুরা চিনতে পারবে, শত্রুরা নয়। কাগজের ওপরও লিখে রেখে যেতে পারে, কিংবা অন্য কিছুতে।
তুমি বলতে চাইছ, রবিন বলল। খুব তাড়াহুড়োর মধ্যে এমন কিছু করেছে, যা ঘর থেকে সরানো যাবে না। কিডন্যাপারদের নজরে পড়বে না। অথচ তার বন্ধুদের চোখে ঠিকই পড়বে।
হ্যাঁ, সে রকমই কিছু।
এসো, তাহলে বের করে ফেলি, কিং বলল।

বাথরুমে খুঁজতে চলে গেল মুসা। অন্যেরা রইল শোবার ঘরেই। ওপরে নিচে, জিনিসপত্র যা আছে সব সরিয়ে, ছবির পেছনে, পর্দার আড়ালে, কার্পেটের নিচে, সব জায়গায় দেখা হতে লাগল। রেডিয়েটরের নিচে আর ছাতের আলোর শেড দেখা হলো। গদির কাভার সরিয়ে দেখল কিশোর, পিটার কিছু লিখে রেখে গেছে কিনা। কিছুই পাওয়া গেল না। এমন কিচ্ছু দেখা গেল না যেটাকে মেসেজ কিংবা সূত্র মনে হয়।
বেশি সহজ জায়গায় খোঁজাখুঁজি করছি আমরা, কিশোর বলল অবেশেষে। প্রথম মেসেজটাতে ডাবল কোড ব্যবহার করেছিল পিটার। জ্যাঙ্গাস প্রেস বলে বুঝিয়েছে ইমবালা। এবং ইমবালা বলে লাল সিংহের পাহাড় বোঝাতে চেয়েছে সে। এখানেও সে রকম কিছু করে রেখে যেতে পারে।
এবং সেটার সমাধান করতে পারবে, যোগ করল রবিন। ও ব্যাপারে বিশেষ জ্ঞান আছে শুধু যাদের, তারাই।
রাইট। তার মানে পিটারকে খুঁজে বের করতে হলে কিছু বিশেষ ব্যাপারে জ্ঞান থাকতেই হবে। সেটার ওপরই নির্ভর করছে সব। কিং, পিটারের কি কোনও বিশেষ স্বভাব ছিল? কোনও কিছুতে আগ্রহ? উদ্ভট কোনও আচরণ?
নানদার ইতিহাসের ওপর তার অসম্ভব আগ্রহ ছিল, হ্যারি জানাল।
কাঠের ওপর খোদাই করা আফ্রিকান শিল্পও সংগ্রহ করত সে, কিং বলল। ছোট ছোট স্কেচ করতে পছন্দ করত। বিশেষ করে দেয়ালে। স্যার মনটেরো একবার রাগ করে বলেছিলেন তাঁর অফিসের দেয়ালে পর্যন্ত আঁকাআঁকি করেছে। পিটার।
ঠিক! তুড়ি বাজাল কিশোর। দেয়ালে স্কেচ আঁকলে সহজে সেটা মোছা। যাবে না, নতুন করে রঙ না করলে। আর কোনও হোটেলের ঘরেই অত তাড়াতাড়ি রঙ করা হয় না। এটাই খুঁজতে হবে আমাদের। এই, খোঁজো খোঁজো সবাই।
কিন্তু এবারেও কিছু পাওয়া গেল না। দেয়ালে কোনও স্কেচ নেই। এমনকি আসবাবপত্রেও নেই কিছু, কোনও চিহ্নও নয়। কিছুই আকেনি।
কিশোর, কিছুই নেই এখানে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল মুসা। আমার বিশ্বাস, কিডন্যাপারদের দেখার পর এখানে কিছু করার সময়ই পায়নি পিটার।
চরকির মত পাক খেয়ে মুসার দিকে ঘুরল কিশোর। ঠিক, ঠিক বলেছ, মুসা! এটাই জবাব!
মানে? মুসা অবাক। কি এমন বললাম?
পিটার খুব চালাক ছেলে, ধীরে ধীরে বলল কিশোর। অথচ ম্যানেজারকে বলল লোকগুলোকে পাঠিয়ে দিতে, বাইরের লোক সম্পর্কে হুঁশিয়ার থাকা সত্ত্বেও। সে তখন পালিয়ে রয়েছে। লোকগুলো শত্রু না বন্ধু জানে না। কিন্তু তবু ম্যানেজারকে বলল পাঠাতে। আমরা হলে বলতাম কি?

না, জবাব দিল রবিন। ম্যানেজারকে বলতাম ওদেরকে আটকাতে। যাতে লুকিয়ে ওদের চেহারা একবার দেখতে পারি।
মাথা ঝাঁকাল কিশোর। নিশ্চয়। পিটারও দেখেছিল। জানালা দিয়ে। তবে, সেটা কাকতালীয় ভাবেই। সে তখন জানালার কাছে দাঁড়িয়েছিল হয়ত। যাই হোক, লোকগুলোকে আটকাতে বলেনি ম্যানেজারকে। প্রয়োজন মনে করেনি। ওদেরকে বুঝতে দিতে চায়নি যে একটা প্ল্যান সে ইতিমধ্যেই করে বসে আছে।
প্ল্যান? ভুরু কোঁচকাল রবিন, কি প্ল্যান?
সব চেয়ে সহজ প্ল্যান, ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে লুকিয়ে পড়া। এমন কোথাও যেখান থেকে লোকগুলোর ওপর চোখ রাখতে পারে। লোকগুলো শত্রু এটা বোঝার সঙ্গে সঙ্গে যাতে পালাতে পারে ওখান থেকে। এসো।
কিশোরকে অনুসরণ করে ঘর থেকে বেরিয়ে এল সবাই।
বেরোনোর পথের কাছেই কোথাও হবে, নিজেকেই যেন বোঝাচ্ছে কিশোর। যেখান থেকে লোকগুলোর ওপর নজর রেখেছে সে। এমন কোথাও... হলওয়েতে নজর বোলাচ্ছে সে। ওই আলমারিটার মত কোনও জায়গা।
লম্বা, সরু একটা দেয়াল আলমারি। সিঁড়ি থেকে কয়েক ফুট দূরে। পর্দা আর বিছানার চাদরটাদরগুলো বোধহয় রাখা হয় ওখানে। ভেতরে ঢুকে দরজা সামান্য ফাঁক করে রাখলেই এলিভেটর আর সিঁড়ির ওপরের অংশ চোখে পড়বে। যে কেউ এসে পিটারের ঘরের দিকে যেতে চাইলে তাকে দেখা যাবেই ওখান থেকে।
পেন্সিলে আঁকা স্কেচ খোঁজ, নির্দেশ দিল কিশোর।
একবার তাকিয়েই দেখে ফেলল মুসা। আলমারির দরজার ভেতর দিকে। এই যে! খাইছে! দারুণ এঁকেছে তো! একটা গাড়ি। ভেতরে ড্রাইভারও আছে। পাশে ব্যাজের মত কি যেন আঁকা। ওপরেও আছে।
ভ্রূকুটি করল কিশোর। গাড়ি? গাড়ি একে কি বোঝাতে চেয়েছে?
সাধারণ গাড়ি নয়, কিশোর! চেঁচিয়ে উঠল রবিন। দেখ, ড্রাইভারের মাথায় ক্যাপ আছে। আর হাতে একটা বাতির মত। তার মানে ট্যাক্সি!
কিং বলল, একটা ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ড তো রয়েছেই হোটেলের সামনে।
সে বোঝাতে চেয়েছে, হ্যারি আন্দাজ করল। সব লোকের ওপরই নজর রেখেছিল সে। আর ট্যাক্সিতে করে পালানোর প্ল্যান করেছে।
বাইরের ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডে একটা মাত্র ট্যাক্সি দেখা গেল। ম্যাগাজিন পড়ছে ড্রাইভার। ওকে জিজ্ঞেস করা হলো। না, চারদিন আগে কোনও কিশোরকে নিয়ে যায়নি সে এখান থেকে। তার আগেও নেয়নি, পরেও না।
কটা ট্যাক্সি আছে এখানে? হ্যারি জানতে চাইল।
অনেক, মিস্টার। তবে সবই আমাদের কোম্পানির। একটাই কোম্পানি।

তোমাদের মেইন গ্যারেজটা কোথায়? জিজ্ঞেস করল কিং।
বলে দিল ড্রাইভার। তার কথা মত ট্যাক্সি কোম্পানির সেন্ট্রাল গ্যারেজে চলে এল হ্যারি। বন্দরের কাছাকাছি। বিরাট এক কাঠের আড়তের পাশ দিয়ে চলে গেছে রেললাইন। গ্যারেজের পেছন দিকে রয়েছে অফিস। সেখানে এসে, দিনের বেলা ডিউটি যে ম্যানেজারের তাকে পেল গোয়েন্দারা। কি চায়, বলল তাকে। একটা তালিকা দেখতে শুরু করল ম্যানেজার।
রেড লায়ন? চারদিন আগে? হ্যাঁ, সেদিন পাঁচজন ড্রাইভার ডিউটি দিয়েছে। ওখানে। দুজন এখন এখানেই আছে। রড আর হেগ। তাদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পার।
তার ট্যাক্সির ইঞ্জিন নিয়ে কাজ করছে হেগ। চারদিন আগে কোনও কিশোরকে কোথাও নিয়ে যায়নি সে।
রডকেও পাওয়া গেল। অলস ভঙ্গিতে বসে কফি খাচ্ছে। সে জানাল, হ্যাঁ, একটা ছেলেকে রেড লায়ন থেকে নিয়ে গিয়েছি। সরাসরি তাকাল কিশোরের দিকে। তোমাকেই তো। জিজ্ঞেস করছ কেন আবার? দুদিন পরই তোমাকে কিডন্যাপ করা হয়েছিল, ঠিক না? পত্রিকায় বেরিয়েছে, দেখেছি। ব্যাপারটা কি বল তো!
বাধা দিয়ে কিশোর বলল, কিডন্যাপ করা হয়েছিল আমাকেই। তবে আপনি যাকে নিয়ে গিয়েছিলেন সে আমি নই। ভাল করে তাকান তো আমার দিকে। দেখুন আলাদা করে চিনতে পারেন কি না।
ভাল করেই তাকাল লোকটা। ওই ছেলেটার মতই লাগছে। শুধু পোশাকের ব্যাপারটা আলাদা। সে অনেক বেশি ফিটফাট ছিল তোমার চেয়ে। তাহলে তুমি বলতে চাইছ তুমি সেই ছেলে নও?
কিশোর জবাব দেবার আগেই হ্যারি জিজ্ঞেস করল, ছেলেটাকে কোথায় নিয়ে গিয়েছিলেন মনে আছে?
নিশ্চয় আছে, মাথা ঝাঁকাল রড়। মনে আছে তার কারণ আজব আচরণ। করছিল ছেলেটা। মনে হচ্ছিল কিছু একটা ঘটাচ্ছে। হোটেল থেকে ছুটে বেরিয়ে এল। আমাকে বলল শহরের আরেক ধারে নিয়ে যেতে। নিয়ে চললাম। বার বার পেছনে তাকাতে লাগল সে। যেন ভূতে তাড়া করেছে। একবার মনে হলো, হোটেল থেকে কিছু চুরি করেনি তো? কিন্তু চোর মনে হলো না। তবে পালিয়েছে যে তাতে কোনও সন্দেহ ছিল না আমার। শেষে গাড়িটা...
কোথায় নিয়ে গিয়েছিলেন? অধৈর্য ভঙ্গিতে হাত নাড়ল কিং।
বলছি বলছি। কেবলই পেছনে তাকাচ্ছিল। সারা শহর ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াল আমাকে। হঠাৎ থামতে বলল। কতগুলো গুদাম আর কারখানার মাঝখানে। আমার পাওনা মিটিয়ে দিয়ে নেমে গেল। দৌড় দিল গলি দিয়ে। টাকা বেশিই

দিয়ে। ফেলেছিল আমাকে, ভাঙতি নেয়ার জন্যেও থামেনি। তারপর এল গাড়িটা, যেটার কথা বলছিলাম। আমার পাশ দিয়ে চলে গেল। মনে হলো ছেলেটারই পিছু নিয়েছে।
কি গাড়ি? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
সবুজ মার্সিডিজ। ভাল গাড়ি। ওরকম একটা গাড়ি পেলে আর কিছু চাইতাম, নাঃ..
যেখানে নামিয়ে দিয়েছিলেন ছেলেটাকে, আমাদেরকে নিয়ে যেতে পারবেন সেখানে? ভাল পয়সা দেব, হ্যারি বলল।
পারব না কেন। নিশ্চয় পারব।
জায়গাটা গ্যারেজ থেকে বেশি দূরে না। শহরের একধারে কতগুলো গুদাম আর কারখানা বাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। নির্জন এলাকা। গুদামগুলোতে লোক আছে। বলে মনে হয় না। আর কারখানাও ছোট ছোট, টুকিটাকি জিনিস তৈরি হয়। বেশির ভাগই খালি অঞ্চল, বাড়িঘর কিছু নেই। দুটো বাড়ির মাঝের একটা গলি দেখাল ড্রাইভার, ওদিক দিয়েই গেছে।
লোকটার ভাড়া মিটিয়ে দিল কিং। অনেক বেশিই দিল। মোড়ের কাছে ক্যাডিলাকটা রাখল হ্যারি।
এখানে আসতে গেল কেন? মুসার প্রশ্ন। নির্জন এলাকাটায় চোখ বোলাচ্ছে। ও কিডন্যাপারদের খসাতে চেয়েছে হয়ত, রবিনের অনুমান। নিশ্চয় বুঝতে পেরেছিল ওরা তাকে অনুসরণ করছে।
তা হতে পারে, কিশোর বলল। লুকানোর আরেকটা জায়গা খুঁজছিল হয়ত। প্রচুর ঘোরপ্যাঁচ রয়েছে এমন কোথাও। চল, গলিটা দেখি। দেখা যাক আর সূত্র আছে কিনা।
সরু গলি। দুধারে ইটের দেয়াল। তিনটে দরজা দেখা গেল। সবগুলোতে বড় বড় তালা ঝোলানো। মরচে পড়া। বেশ কিছুদিন যে ভোলা হয়নি বোঝা যায়। গলির শেষ মাথায় চলে এল গোয়েন্দারা, বিশেষ কিছুই নজরে পড়ল না।
এবার? মুসা জিজ্ঞেস করল, এবার কি করব?
সামনে আরেকটা গলি। যেটাতে রয়েছে ওরা ওটারই মত দেখতে। দুপাশে গুদামঘর, ছোট ছোট কারখানা, আর প্রচুর শূন্য জায়গা, যেখানে স্তূপ করে রাখা হয়েছে জঞ্জাল। ওই গলির একমাথা দিয়ে আরেকটা রাস্তা চলে গেছে আড়াআড়ি, ইংরেজি টি অক্ষর তৈরি করে।
তিন দিকে যেতে পারে সে, হ্যারি বলল। যে কোনও তিনদিক। কোন পথে যে গেছে ঈশ্বরই জানে!
.

যেদিকেই যাক, কিশোর বলল। কোনও একটা দিকে তো গেছে। একবারে সব দিকেই যেতে পারে না।
কি বলতে চাও? রবিনের প্রশ্ন।
কিডন্যাপাররা তার পিছু লেগেছিল। সে সেটা জানত। বেশি দূর যাওয়ার উপায় ছিল না তার। সময়ই ছিল না। নিশ্চয় কোথাও লুকিয়ে পড়তে হয়েছে।
তা ঠিক, একমত হলো কিং। এখন আমাদের কাছেই কোথাও রয়েছে কিনা কে জানে!
ওগুলোর যে কোনও একটাতে লুকাতে পারে। কয়েকটা গুদামঘর দেখাল। কিশোর। কিন্তু এখানে থাকাটা নিরাপদ নয়। তাছাড়া খাবার দরকার। এখানে তা নেই। তার মানে এখানে লুকালেও কিছুক্ষণের জন্যে, সাময়িক। তারপর একটা মোটেল কিংবা রুমিং হাউস খুঁজে নিয়েছে। রাস্তায় থাকাও তার জন্যে নিরাপদ নয়।
তাহলে, হ্যারি প্রস্তাব দিল। ছড়িয়ে পড়ে খোঁজা শুরু করা দরকার আমাদের। ভাগ হয়ে তিনদিকে চলে যাই।
মুসা আর হ্যারি গেল ডানে। কিশোর আর কিং বায়ে। রবিন সামনের দিকে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আবার টি-এর মাথার কাছে মিলিত হবার সিদ্ধান্ত নিল।
সবার আগে ফিরে এল রবিন। সোজা এগিয়ে গিয়েছিল গলি ধরে। একটা মাঠের কিনারে গিয়ে শেষ হয়েছে পথটা।
ধারেকাছে কোনও মোটেল কিংবা রুমিং হাউস চোখে পড়েনি। লাঞ্চটাইম হয়ে গেছে। খিদে পেয়েছে তার। অস্থির হয়ে অন্যদের ফেরার অপেক্ষা করতে লাগল সে।
তারপর এল কিশোর আর কিং।
কাছেই বড় রাস্তা, মোটর চলাচল করে, কিং জানাল। ওখান থেকে পাঁচ ব্লক দূরে একটা মোটেল আছে। সেখানে খোঁজ নিয়েছি। এক হপ্তার মধ্যে কোনও কিশোরকে ঘর ভাড়া দেয়নি ওরা। কিশোরকে চিনতে পেরেছে। খবরের কাগজে তার ছবি দেখেছিল।
বেশির ভাগই খালি জায়গা ওদিকে, কিশোর জানাল। মাঠ আর পতিত জমি।
অবশেষে ফিরে এল মুসা আর হ্যারি। ওরা অনেক দূর গিয়েছিল।
একটা মোটেল আর দুটো রুমিং হাউস পেয়েছি, মুসা বলল। কোনটাতেই কোনও কিশোর একা বাস করছে না।
পিটার যখন পালাচ্ছিল, তার পায়ে পায়ে লেগেছিল কিডন্যাপাররা, কিং বলল ধীরে ধীরে। সূত্র রেখে যাওয়ার সামান্যই সুযোগ পেয়েছে সে। আর আমরা তার

মেসেজ পাব এমন আশাও নিশ্চয় করেনি। নাহ, কোনও উপায়ই দেখতে পাচ্ছি না।
হ্যাঁ, ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল রবিন।
আপাতত সে রকমই লাগছে, ব্যর্থ হয়েছে, এটা কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না কিশোর।
আমি আর হ্যারি হোটেলে ফিরে যাই, কিং বলল। দেখি লস অ্যাঞ্জেলেসে কোনও খবর পাঠিয়েছে কিনা পিটার। আমরা যে তাকে খুঁজছি, এটা বুঝতে পারছে সে। নিশানা হারিয়ে ফেলেছি এটা পারছে কিনা জানি না। তাকে সেটা কোনভাবে বোঝান দরকার। যাতে আরেকটা মেসেজ পাঠায়।
যদি সম্ভব হয় আরকি, তেমন আশা করতে পারছে না হ্যারি।
আমরা হেডকোয়ার্টারে ফিরে যাব, ভোতা গলায় বলল কিশোর। নতুন কোনও বুদ্ধি বের করার চেষ্টা করব। স্যালভিজ ইয়ার্ড এখান থেকে বেশি দূরে না। কিং, আপনি কি আমাদের নামিয়ে দিয়ে যাবেন?
আরিব্বাবা, এত্ত দেরি হয়ে গেছে। ঘড়ি দেখে প্রায় আঁতকে উঠল যেন মুসা। তাই তো বলি, পেটের ভেতর ছুঁচো দৌড়াদৌড়ি করে কেন?
তিন গোয়েন্দাকে বাড়ি পৌঁছে দিল কিং আর হ্যারি। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই হেডকোয়ার্টারে কিশোরের সঙ্গে দেখা করবে বলে চলে গেল মুসা ও রবিন।
কিন্তু এক ঘণ্টার মধ্যে পারল না। বাড়িতে কাজ পড়ে গিয়েছিল। আসতে আসতে দুই ঘণ্টা লেগে গেল দুজনেরই। হেডকোয়ার্টারে ঢুকে দেখে ডেস্কের ওপর। রাজ্যের ম্যাপ ছড়িয়ে নিয়ে বসেছে গোয়েন্দাপ্রধান। স্ট্রীট ম্যাপ। অসংখ্য কাগজ ছড়ানো টেবিলে। স্কেচ করেছে, নানা রকম হিসেব করেছে ওগুলোতে কিশোর।
কিছু বুঝলে? ঢুকেই জিজ্ঞেস করল মুসা।
নাহ, মাথা নাড়ল কিশোর। খুব একটা সুবিধে হচ্ছে না।
কিং ফোন করেছে?রবিন জিজ্ঞেস করল। ট্রেড মিশনের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল পিটার?
আমিই ফোন করেছিলাম হোটেলে, জবাব দিল কিশোর। না, কোনও খবর পাঠায়নি পিটার।
কিশোর, চিন্তিত ভঙ্গিতে মুসা বলল। বোধহয় ওকে ধরে ফেলেছে কিডন্যাপাররা। খবরের কাগজে তোমার ছবি দেখে ভুল বুঝতে পেরেছিল। তারপর খুঁজে খুঁজে বের করে ফেলেছে আসল ছেলেটাকে।
সেকথাও ভেবেছি, মাথা ঝাঁকিয়ে বলল কিশোর। ধরতে তো পারেই। তবে আমার তা মনে হয় না। তাহলে স্যার মনটেরোকে মেসেজ পাঠাত। আরেকটা ব্যাপার, আমাদের ওপর নজর রাখত না। তখন ঝোপে বসে রেখেছিল, মনে নেই?

ঢোক গিলল মুসা। তার মানে এখনও বসে আছে কোনখানে?
আমার তা-ই মনে হয়। হ্যারি আর কিঙের ওপরও নজর রাখছে ওরা। সাবধানে থাকতে হবে আমাদের। তবে পিটারকে যতক্ষণ খুঁজে বের করতে না পারছি ততক্ষণ আমরা নিরাপদ। কিছু করবে না আমাদেরকে।
আরেকটা কথা ভাবছ না কেন? রবিন বলল, কিশোরের কিডন্যাপিঙের খবর পিটারও তো পড়ে থাকতে পারে। এটাই তার সুযোগ, বেরিয়ে এসে পুলিশকে গিয়ে জানানো। জানাচ্ছে না কেন? পুলিশ তাকে সাহায্য করবে তখন। নিরাপদ জায়গায় রেখে দেবে।
তাই তো! মুসা বলল।
তাহলে ধরে নিতে হবে পেপার দেখেনি পিটার, কিশোর বলল। এমন কোথাও লুকিয়েছে যেখানে কাগজ নেই। বেরিয়ে আসতেও সাহস করছে না। সেই জায়গাটা যে কোথায় সেটা বুঝতে পারলেই হত!
এত ভাবনা চিন্তা করেও কিছু বের করতে পারলে না?
ভাবছি খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেব। সাংকেতিক ভাষায়, যাতে শুধু। পিটার বুঝতে পারে। হ্যারি আর কিঙের সঙ্গে কোথাও দেখা করতে বলব তাকে। কিন্তু সেই একই সমস্যা রয়ে যাবে এতেও। খবরের কাগজ দেখার সুবিধেই যদি না পায় সে?
না, হবে না, রবিন বলল।
তাহলে ভূত-থেকে-ভূতে ব্যবহার করে দেখতে পারি। রকি বীচের এত ছেলেমেয়ের মাঝে কেউ না কেউ দেখে থাকতে পারে কথায় অদ্ভুত টানওয়ালা একটা ছেলেকে।
তাতেও বিশেষ সুবিধে হবে বলে মনে হয় না, রবিন বলল। লুকিয়েই যদি থাকে, বেরোতে না পারে, কথা বলবে কিভাবে ছেলেদের সঙ্গে?
তাছাড়া, মুসা যোগ করল। তাকে তুমি মনে করে ভুল করতে পারে রকি বীচের ছেলেরা।
এটাই হলো সমস্যা, তিক্তকণ্ঠে বলল কিশোর। যাকগে, কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করব। তারপর ভূত-থেকে-ভূতে ছাড়া উপায় নেই। এখন আরেকটু ভেবে দেখা যাক। পিটার নিশ্চয় এতক্ষণে বুঝে ফেলেছে যারা তাকে খুঁজছে তারা তার চারদিন আগে রেখে আসা নিশানা হারিয়ে ফেলেছে। শেষ চিহ্নটা রেখে এসেছে রেড লায়ন র‍্যাঞ্চে। সুতরাং...
আবার সেখানে যাওয়ার চেষ্টা করবে! চেঁচিয়ে উঠল মুসা।
করবে। লুকিয়ে ঢোকার চেষ্টা করবে। সে জন্যে নজর রাখতে বলেছি হ্যারি। আর কিংকে। হয়ত এতক্ষণে ওখানে চলে গেছে ওরা। আর, আরেকটা কথা।

কী? জানতে চাইল রবিন।
মনের ভেতর একটা কথা কেবলই খচখচ করছে। আমাকে আবিষ্কার করল কিভাবে কিডন্যাপাররা? পিটার বলে, ভুলই বা করল কেন?
সহজ, সমাধান করে দিলে মুসা। তোমাকে ইয়ার্ডে দেখেছে ওরা।
এখানে আসল পিটার না এসে থাকলে?
হয়ত রাস্তায় কিংবা বাজারে দেখেছে তোমাকে, রবিন বলল। তারপর পিছু নিয়ে চলে এসেছে।
হ্যাঁ, রবিনের সঙ্গে সুর মেলাল মুসা। এটা তো হতেই পারে। ব্যাপারটাকে কাকতালীয় ভেবেছে ওরা। তোমাকে হঠাৎ দেখে ফেলে নিজেদেরকে ভাগ্যবান মনে করেছে।
যুক্তি আছে তোমাদের কথায়, ঠিক মেনে নিতে পারছে না কিশোর। তবু, আমার কেন জানি মনে হচ্ছে জরুরী কিছু মিস করছি আমরা। নিশ্চয় ওই লোকগুলো এমন কিছু পেয়েছে, যা থেকে এখানে এসে খুঁজে বের করেছে আমাকে। রাস্তায় কিংবা বাজারে অ্যাক্সিডেন্টলি দেখে ফেলেনি।
সেটা কি, কিশোর?
জানি না।
নীরব হয়ে গেল তিন গোয়েন্দা। ভাবছে। অনেক ভেবেও কিছু বের করতে পারল না। শেষে বাড়ি ফিরে গেল রবিন আর মুসা। দুই হাত প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে ভাবতে ভাবতে এসে লিভিং রুমে ঢুকল কিশোর। টিভি দেখছেন রাশেদ। পাশা। সে-ও বসে পড়ল। একটা কাজ দিলেন তাকে রাশেদ পাশা। ইয়ার্ডের। অ্যাকাউন্ট বুকে কি একটা গোলমাল হয়েছে, হিসেবের, সেটা মিলিয়ে দিতে হবে। ডিনারের সময় হল। টেবিল সাজিয়ে ডাকতে এলেন মেরিচাচী।
বিরক্তিকর, নিরাশায় ভরা একটা দিন কেটেছে। কিন্তু খেতে বসে কিশোর দেখল, সাংঘাতিক খিদে পেয়েছে। বেশ খেতে পারছে। এক প্লেট শেষ করে আবার বাড়িয়ে দিয়ে হাসল, তোমার গরুর কাবাবটা খুব ভাল হয়েছে, চাচী।
অবাক হলেন মেরিচাচী। তোর কি হয়েছে আজ, বল তো কিশোর? এভাবে তো খেতে চাস না কখনও! আজ আমার ফ্রিজটাই খালি করে দিয়েছিস!
কিশোরও অবাক। আমি খেয়েছি! ছিলামই তো না সারাদিন, খেলাম কখন?
ওই যতক্ষণই ছিলি। খেয়েছিস ভাল করেছিস। আমিও তো চাই তুই খা...
কিশোরের দিকে তাকিয়ে থেমে গেলেন মমরিচাচী। গোল গোল হয়ে গেছে। তার চোখ। হা হয়ে গেছে মুখ। চোখে অদ্ভুত দৃষ্টি।
এই কিশোর, কি হলো? ভুরু কুঁচকে ফেলেছেন রাশেদ পাশী। শরীর খারাপ হয়ে গেল নাকি?

না..না..চাচা, আমি ভাল আছি...এত ভাল অনেকদিন থাকিনি! লাফিয়ে। উঠে দাঁড়াল কিশোর। আসছি!
আরে খেয়ে যা না! ঠেকাতে গেলেন মেরিচাচী।
রওনা হয়ে গেছে ততক্ষণে কিশোর। মিনিটখানেকের বেশি লাগবে না।
দ্রুত এসে লিভিং রুমে ঢুকল সে। রবিনকে ফোন করল। নথি? জলদি মুসাকে নিয়ে হেডকোয়ার্টারে চলে এস। মাকে বলে আসবে সারারাত বাড়ি ফিরবে না। আমাদের সঙ্গে থাকবে।
রবিনকে কোনও প্রশ্ন করার সুযোগ না দিয়ে লাইন কেটে দিল কিশোর। ফিরে এল রান্নাঘরে, খাবার টেবিলে। এত উত্তেজিত হয়ে গেছে, খিদেই নষ্ট হয়ে। গেছে। মেরিচাচীর বিখ্যাত অ্যাপল পাইয়ের টুকরো দুটোর বেশি খেতে পারল না। আর। তারপর চাচীর ভয়ে কোনমতে জোর করে এক গেলাস দুধ গিলে নিয়ে উঠে পড়ল। বেরিয়ে চলে এল ঘর থেকে। দ্রুত এগোল ট্রেলারের দিকে।
পনেরো মিনিট পর দুই সুড়ঙ্গ দিয়ে ট্রেলারে ঢুকল রবিন আর মুসা। দেখল, ডেস্কে বসে তাদের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে কিশোর পাশা। হাসিতে উদ্ভাসিত মুখ।
কি ব্যাপার? রীতিমত হাঁপাচ্ছে রবিন। জোরে জোরে প্যাভাল করে সাইকেল চালিয়ে এসেছে বাড়ি থেকে।
সারা রাত থাকতে হবে কেন? মুসার প্রশ্ন।
কারণ, নাটকীয় ভঙ্গিতে ঘোষণা করল গোয়ন্দাপ্রধান। পিটার মনটেরো কোথায় লুকিয়ে আছে, জানি আমি।
.
কোথায়? চিৎকার করে উঠল রবিন।
কি করে জানলে? মুসাও না চেঁচিয়ে পারল না।
সারাক্ষণ আমাদের নাকের নিচেই রয়েছে, জবাব দিল কিশোর। অন্ধ হয়ে ছিলাম আমরা। বলেছি না একটা কিছু মিস করেছি। রাস্তায় দেখে আমাকে ফলো করে এখানে এসে হাজির হয়েছে কিডন্যাপাররা, কথাটা কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছিল না আমার।
কেন? মুসার প্রশ্ন।
কারণ, তাহলে ওরা সঙ্গে সঙ্গে বুঝে যেত পালানোর চেষ্টা করছি না আমি। লুকানোরও চেষ্টা করছি না। তোমাদের সঙ্গে সহজভাবে মিশছি, রকি বীচের আর দশটা ছেলের মত। আমাকে কথা বলতেও শুনে থাকতে পারে। কথায় যে টান। নেই এটা বুঝতে বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন পড়ে না। ভুল ওরা করত না।
কিন্তু কিশোর, মনে করিয়ে দিল রবিন। ভুল ওরা ঠিকই করেছে।

করেছে। এবং সেটাই হলো জবাব। কারণ ওরা আমাকে এমন জায়গায় দেখেছে যেখানে পিটারকে আশা করেছিল। ওখানেই খুঁজছিল তাকে।
খুঁজছিল? হাঁ হয়ে গেছে রবিন।
হ্যাঁ, নথি। ট্যাক্সি থেকে নেমে বেশি দূর যেতে পারেনি পিটার। লুকিয়ে পড়তে হয়েছে। এমন জায়গায়, যেখানে গত কদিন ধরে খাবার চুরি যাচ্ছে। চকচক করছে কিশোরের চোখ। পিটার আমাদের নাকের নিচে এই ইয়ার্ডেই লুকিয়ে আছে!
ই.ই..ইয়ার্ডে! তোতলাতে শুরু করেছে মুসা।
যেখান থেকে সে গায়েব হয়েছে সেখান থেকে মাত্র এক মাইল দূরে ইয়ার্ড, বোকা হয়ে গেছে যেন রবিন। মুসা, সেদিন তোমার খাবার ইঁদুরে খায়নি। পিটার খেয়েছে।
হ্যাঁ, মাথা ঝাঁকাল কিশোর। কিডন্যাপারদের হাত থেকে পালাতে গিয়ে এই ইয়ার্ডে ঢুকে পড়েছিল সেদিন পিটার। এখানে এত বেশি জঞ্জাল, লুকানোর। জায়গার অভাব নেই। কাজেই এখানেই, থাকবে ঠিক করেছিল সে। খাবার চুরি। করাও এখানে সহজ। প্রায় সারাটা দিনই রান্নাঘর খালি পড়ে থাকে। কিডন্যাপাররা তাকে ইয়ার্ডে ঢুকতে দেখেছে, কিংবা দেখেনি, যা-ই হোক, ওরা আশপাশে ঘুরঘুর করেছে। আমাকে দেখেই মনে করেছে আমি পিটার। আর কিছু বোঝার অপেক্ষা করেনি। পয়লা সুযোগটা পেয়েই ধরে নিয়ে যাচ্ছিল।
সারাক্ষণ এই ইয়ার্ডেই রয়েছে। বিশ্বাস করতে পারছে না এখনও মুসা।
তাতে কোনই সন্দেহ নেই। এখন আমাদের কাজ ওকে খুঁজে বের করা।
খুঁজব আর কি? বাইরে বেরিয়ে চিৎকার করে নাম ধরে ডাকি, বেরিয়ে চলে আসবে।
মাথা নাড়ল কিশোর। না, তাতে কাজ হবে না। আমাদেরকে চেনে না সে। হয়ত দুর থেকেই দেখেছে শুধু। লুকিয়েছে ভালমতই। হ্যারি আর কিংকেও নিশ্চয়। দেখেনি, তাহলে বেরিয়ে আসত। আমরা চেঁচাতে শুরু করলে আবার ভয় পেয়ে গিয়ে পালাতে পারে। তার চেয়ে খুঁজেই বের করি।
এই জঞ্জালের মাঝে সেটাও সহজ না। কিশোর, অপেক্ষা তো করতে পারি। আমরা। বেরোতে তাকে হবেই, এক সময় না একসময়। সারাক্ষণ লুকিয়ে থাকতে পারবে না।
না, তা পারবে না। থাকবেও না। কিছুটা নিরাপদ বোধ করলেই বেরিয়ে চলে যাবে, সম্ভবত রেড লায়নে। ট্রেড মিশনের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করবে। তবে তার আগে পর্যন্ত লুকিয়েই থাকবে। সেটা কত দিন ঠিক বলা যায় না।
তাহলে কি করব? রবিনের প্রশ্ন।

একটা বুদ্ধি করেছি। আমার বিশ্বাস, শুধু রাতের বেলাতেই বেরোয় পিটার। যখন সবাই ঘুমিয়ে থাকে। সব কিছু শান্ত থাকে।
সে জন্যেই সারারাত থাকতে বলেছ, বুঝতে পারল মুসা।
হ্যাঁ।
একটা ফাঁদ পাততে পারি না? রবিন বলল, পেতে অপেক্ষা করে বসে থাকব।
ও বুদ্ধিটা সেটাই। খাবারের দরকার হলেই কেবল বেরোয় পিটার। চালাক ছেলে। যতটা দরকার তার চেয়ে কম নেয়, যাতে ব্যাপারটা কারও নজরে না পড়ে। মেরিচাচীর কড়া নজর তার পরেও এড়াতে পারেনি। তবে চাচী ভেবেছে পরিবারেরই কেউ খেয়েছে। ফাঁদ পাততে অসুবিধে হবে না আমাদের।
খাবারের ফাঁদ, মুসা বলল।
ইয়ার্ড নীরব হলেই বেরিয়ে আসবে সে, বলল কিশোর। বাইরে বেরিয়ে প্রচুর কথা বলব আমরা।
কোন বিষয়ে?
যেন বাইরে চলে যাচ্ছি আমরা। কাল রওনা হব। তিনটে প্যাকেট লাঞ্চ তৈরি করে রাখতে হবে সে জন্যে। ওগুলো রান্নাঘরে না রেখে রাখব পাশের বারান্দায়। যাতে সকালে সহজেই নিতে পারি। কথাগুলো তার কানে যাবেই এমন না-ও হতে পারে। তবে যেতেও পারে। সে জন্যেই বলব।
বুঝলাম। তিনটে প্যাকেটে অনেক সময় পার করতে পারবে সে। কাজেই লোভী হয়ে উঠবেই। আকর্ষণটা এড়াতে পারবে না।
মাথা ঝাঁকাল কিশোর। ভাববে, আমরা কিছু বুঝতে পারব না। ইঁদুরকে দোষ। দেব, কিংবা কোনও ভবঘুরেকে। রাত দশটায় ইয়ার্ড থেকে সরে যাব আমরা। খাবারের তিনটে প্যাকেট রেখে চলে যাব শোবার ঘরে। দুজন ঘরেই থাকব। আরেকজন পা টিপে টিপে নেমে চলে আসব নিচে। রান্নাঘরে বসে নজর রাখব। বারান্দার দিকে, যেখানে টেবিলে খাবারগুলো রাখব। দুই ঘণ্টা পর পর পালা করে পাহারা দেব আমরা।
ইমারজেন্সি সিগন্যালগুলো সঙ্গে রাখতে হবে। পিটারকে দেখলেই সঙ্কেত দেব অন্য দুজনকে। যদি ঘুমিয়েও পড়ি, জোরাল সঙ্কেত জাগিয়ে দেবে। আমাদেরকে।
তারপর? জিজ্ঞেস করল রবিন।
দৌড় দেব দুজনেই। দুদিক থেকে গিয়ে পিটারের পালানোর পথ বন্ধ করে দেব। তিন দিক থেকে ঘিরে ফেলা হবে তাকে। যাওয়ার একটাই পথ থাকবে তার তখন। সামনের দিক। গেট থাকবে তালা দেয়া। যাবে কোথায়? ধরা তাকে। পড়তেই হবে।
তার পর আর কি? উপসংহার টানল মুসা। তাকে আমাদের পরিচয় দেব। শান্ত থাকতে বলব। হ্যারি আর কিংকে ফোন করব।

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। তবে বেশি হৈ চৈ করা চলবে না আমাদের। চাচা চাচী যেন জেগে না যায়। চল এখন। সিগন্যালগুলো বের করে নিয়ে কাজে লেগে। যাই।
ওয়ার্কশপে এসে কাজে লাগল তিন গোয়েন্দা। আসলে কাজের ভান করতে লাগল। অনেক কথা বলল ওরা, জোরে জোরে। শব্দ করল। মেরিচাচী আর রাশেদ চাচা তখনও ঘুমাননি। কাজেই অসুবিধে হল না তাদেরকে নিয়ে। ওয়ার্কশপ থেকে বেরিয়ে লাঞ্চ প্যাকেট তৈরি করতে বসল তিনজনে। সেগুলো নিয়ে গিয়ে রাখল। বারান্দার টেবিলে, এমন জায়গায়, যাতে রান্নাঘর থেকে সহজেই চোখে পড়ে। দশটা বাজার কয়েক মিনিট আগে ইয়ার্ডের বাইরের আলোগুলো সব নিভিয়ে দিল। তারপর রওনা হল কিশোরের শোবার ঘরের দিকে।
প্রথম পাহারা দিতে নামল রবিন। লুকিয়ে রইল এসে অন্ধকার রান্নাঘরে। মেরিচাচী আর রাশেদ পাশা ওপর তলায় শোবার ঘরে চলে গেছেন। সঙ্কেত দেয়ার যন্ত্রগুলো শার্টের পকেটে ভরে নিয়েছে কিশোর আর মুসা। রবিনেরটা তার হাতে।
মাঝরাতে রবিনের জায়গায় এসে বসল কিশোর।
বারান্দায় টেবিলেই পড়ে আছে প্যাকেটগুলো। কোনও নড়াচড়া নেই কোথাও। কোনও শব্দ নেই। শুধু বাইরের রাস্তায় মাঝেসাঝে হুস হুস করে চলে যাচ্ছে দুএকটা গাড়ি।
রাত দুটোয় মুসার পাহারা দেয়ার পালা পড়ল। রান্নাঘরে ঢুকেই হাই তুলল। কয়েকবার। মেরিচাচীর ফ্রিজটায় হামলা চালাবে কিনা ভাবল একবার। বাতিল করে দিল ভাবনাটা। তাতে পাহারার অসুবিধে হতে পারে। ভোর চারটেয় আবার এসে তার জায়গা দখল করল রবিন।
কিশোর মনে হয় ভুল করেছে, ফিসফিস করে বলল মুসা। কিংবা অন্য কোথাও চলে গেছে পিটার। এই রাস্তায় এটাই একমাত্র বাড়ি নয়। আরও আছে। ওগুলোতে লুকানোর জায়গা আছে, খাবারের ব্যবস্থা আছে।
ভোর সাড়ে পাঁচটা। পুবের আকাশে ধূসর আলোর আভাস। তবে ইয়ার্ডের জঞ্জালে অন্ধকার আগের মতই শেকড় গেড়ে রয়েছে যেন, নড়তে চাইছে না। ঠিক এই সময় বাড়ির পেছনের বারান্দার কাছে কি যেন নড়তে দেখল রবিন।
তন্দ্রা এসেছিল। ঝট করে সোজা হলো সে। চোখ মিটমিট করে দৃষ্টি স্বচ্ছ করার চেষ্টা করল। ভাল করে তাকাল বারান্দার দিকে। আবছা একটা ছায়ামূর্তি এসে উঠেছে বারান্দায়। ইমারজেন্সি সিগন্যাল চালু করে দিল রবিন।
এত জোরে লাফিয়ে বিছানা থেকে নামতে গেল কিশোর, পড়েই যাচ্ছিল আরেকটু হলে। মুসার কাধ ধরে নাড়া দিল, এই ওঠ ওঠ, জলদি! বলেই দিল দরজার দিকে

দৌড়। টিইপ টিইপ করছে তার পকেটে ইমারজেন্সি সিগন্যাল।
সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমেই দুজন দুদিকে চলে গেল। লুকিয়ে পড়ল দুটো ঝোপের ভেতরে।
রান্নাঘরে বসে ঘড়ি দেখল রবিন। আবার তাকাল বারান্দার দিকে। বারান্দাটা একেবারে খোলা নয়। অর্ধেকটা বেড়া দেয়া। টেবিলটা রয়েছে সেই ঘেরা অংশের ভেতরে। সেখানে ঢোকার মুখের কাছে চলে গেছে ছায়ামূর্তিটা। একটা ছেলে, কোনও সন্দেহ নেই। আবছা অন্ধকারেও কিশোর পাশার অবয়ব স্পষ্ট হয়ে উঠল যেন। অবিকল একই রকম শরীর দুজনের। টেবিলের কাছে এগিয়ে গেল ছেলেটা। খাবারের প্যাকেটের দিকে হাত বাড়াল।
এই, থামো! চিৎকার করে বলল রবিন। তোমাকেই বলছি, পিটার মনটেরো!
যেন কারেন্টের শক খেয়েছে ছেলেটা, এমন করে ঝটকা দিয়ে পিছিয়ে এল। ঘুরেই দিল দৌড়। সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় আছাড় খেয়ে পড়েই যাচ্ছিল প্রায়। পেছন ফিরে তাকাল একবার। রবিনের দিকে চোখ পড়ল। ঘরের কোণ ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল ওপাশে।
বেরিয়ে পড়েছে কিশোর। শিকারী বেড়ালের মতই এসে লাফ দিয়ে পড়ল যেন ছেলেটার ঘাড়ে।
ঝাড়া দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল ছেলেটা। পালাতে পারল না। ততক্ষণে হাজির হয়ে গেছে মুসা আর রবিন। চেপে ধরল পিটারকে। ছাড়া পাওয়ার জন্যে। ধস্তাধস্তি শুরু করল ছেলেটা।
ভয় নেই, আমরা বন্ধু! বোঝানোর চেষ্টা করল গোয়েন্দারা। স্যার মনটেলোর হয়ে কাজ করছি। তোমাকে সাহায্য করতে চাইছি! কিং আর হ্যারি...!
কিন্তু কোনও কথাই যেন ঢুকছে না ছেলেটার কানে। ছাড়া পাওয়ার চেষ্টা করেই চলেছে। শক্ত করে তাকে চেপে ধরে রাখল রবিন আর মুসা। কিশোর বোঝানোর চেষ্টা করতে লাগল।
হার্বার্ট কিং? অবশেষে যেন কথা কানে ঢুকল ছেলেটার। হ্যারি ম্যাকঅ্যাডাম? ওরা এখানে?
হ্যাঁ, এখানে, কিশোর বলল। তুমি এখন পুরোপুরি নিরাপদ। কোনও ভয় নেই আর। চল, আমাদের হেডকোয়ার্টারে।
প্রায় টেনেহিঁচড়ে পিটারকে নিয়ে এসে ট্রেলারে ঢোকাল তিন গোয়েন্দা।
এটা...এটা কি? জানতে চাইল পিটার।
একটা ট্রেলার, জবাব দিল কিশোর। জঞ্জালের তলায় লুকানো একটা মোবাইল হোম। আমাদের হেডকোয়ার্টার। তোমার জন্যে সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা। কারণ,

যারা তোমাকে কিডন্যাপ করতে চায়, এ মুহূর্তে তারা হয়ত এই ইয়ার্ডের চারপাশেই ঘুরঘুর করছে।
সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিল রবিন।
কিশোরের দিকে তাকিয়ে থ হয়ে গেল পিটার। বড় বড় হয়ে গেল চোখ। মুখ। হাঁ। অনেক কষ্টে যেন কথা খুঁজে পেল, তুমি...তুমি দেখতে একেবারে আমার মত! অবিকল এক! কেন?

.

হেসে বলল কিশোর, একই প্রশ্ন তো আমিও করতে পারি।
পিটারও হাসল। হ্যাঁ, তোমাদের দেশে যখন আমি প্রশ্ন করার অধিকারটা তোমারই বেশি।
তার ওপর আবার কিশোরের পোশাক পরেছ, মুসা বলল।
কিশোরের একটা পুরনো প্যান্ট পিটারের পরনে। গায়ে শাদা শার্ট, কয়েক মাস আগেই ওটা ফেলে দিয়েছিল সে। আর এক জোড়া ছেঁড়া স্যাণ্ডাল।
পালানোর সময় কাপড় ছিঁড়ে শেষ হয়ে গেছে আমার, পিটার বলল। একেবারে পরার অনুপযুক্ত। কি আর করব। জঞ্জালের নিচে হামাগুড়ি দেয়ার সময়। একটা বাক্সের ভেতরে পেয়ে গেলাম এগুলো।
খাইছে! গুঙিয়ে উঠল মুসা। কথাবার্তার ভঙ্গিও দেখি এক। একজন কিশোর পাশার যন্ত্রণায়ই অস্থির, দুজনকে সইব কি করে?
হাসতে লাগল সবাই।
তোমাদের বেকায়দায় ফেলে দিলাম। সরি, পিটার বলল। তবে আমাকে যে, খুঁজে বের করেছ এজন্যে আমি কৃতজ্ঞ। আমি তো ঘাবড়েই যাচ্ছিলাম আদৌ কেউ বের করতে পারবে কিনা ভেবে।
তোমাকে পেয়ে আমিও খুব খুশি, দাঁত বের করে হাসল কিশোর। যমজ তো।
একা থাকার যন্ত্রণা আর সহ্য করতে পারছিলাম না, পিটার বলল। কিন্তু তোমরা কে? পরিচয়ই কিন্তু হয়নি এখনও।
তোমার যমজ ভাইয়ের নাম তো শুনলেই-কিশোর পাশা, গোয়েন্দাপ্রধান, পরিচয় করিয়ে দিল রবিন। আমার নাম রবিন মিলফোর্ড। রেকর্ড রাখা আর রিসার্চের কাজগুলো আমি করি। আর ও হলো মুসা আমান, সহকারী গোয়েন্দা।
গোয়েন্দা? অবাক হয়েছে পিটার। সত্যি?
এই যে আমাদের কার্ড, পকেট থেকে বের করে দিল কিশোর।
দারুণ তো! তোমরা আমেরিকানরা খুব মজার মজার কাণ্ড কর। সত্যিই গোয়েন্দা?

সত্যিই গোয়েন্দা, জবাব দিল রবিন। তোমাকে খুঁজে বের করতে আমাদেরকে ভাড়া করেছে কিং আর হ্যারি। তুমি ভেবে কিডন্যাপাররা কিশোরকে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর।
তাই নাকি? কিশোরকে কিডন্যাপ করেছে?
সংক্ষেপে সব কথা পিটারকে জানাল কিশোর। মন দিয়ে শুনল ছেলেটা। তারপর বলল, তাহলে তোমরাই বের করেছ জ্যাঙ্গাস প্লেস বলে আমি কি বোঝাতে চেয়েছি। বের করেছ রেড লায়নের আলমারিতে আঁকা ট্যাক্সির ছবি। সত্যিই বুদ্ধিমান।
তুমি যে এখানে লুকিয়ে আছ, এটা অবশ্যই বুঝতে পেরেছে আমাদের কিশোর, মুসা বলল গর্বের সঙ্গে।
দারুণ দেখিয়েছ, সত্যি। তো এখন কি হবে? কিং আর হ্যারির সঙ্গে যোগাযোগ করবে, যাতে আমার বাবাকে খবর দিতে পারে?
নিশ্চয়। দুই বন্ধুর দিকে তাকাল মুসা। পিটারকে সোজা মিরামার হোটেলে নিয়ে যেতে পারি আমরা।
সেটা কি উচিত হবে? রবিনের প্রশ্ন। কিডন্যাপারগুলো ইয়ার্ডের বাইরে বসে চোখ রাখতে পারে। হোটেলেও চোখ রাখতে পারে।
তোমার তাই মনে হয়? সতর্ক হয়ে গেল পিটার।
রবিন ঠিকই বলেছে, কিশোর বলল। সেটা হতেই পারে। সহজে হাল ছাড়বে না উগ্রবাদীরা। পিটার এখানেই নিরাপদ। অযথা ঝুঁকি নেয়ার কোনও মানে হয় না। তার চেয়ে বরং হ্যারি আর কিংকে ফোন করি। এখানে চলে আসুক
করব? বলে জবাবের অপেক্ষা না করেই ফোনের দিকে হাত বাড়াল রবিন। মিরায়ার হোটেলে ডায়াল করল। অবাক হয়ে ট্রেলারের ভেতরটা দেখছে পিটার। সাজানো গোছানো চমৎকার একটা ছোটখাট বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার যেন। নানা রকম আধুনিক যন্ত্রপাতি রয়েছে। বিড়বিড় করে আনমনেই বলল, বাইরে থেকে ট্রেলারটা দেখেছি আমি জঞ্জালের নিচে ঘোরার সময়। ভেতরে যে এই অবস্থা কল্পনাই করতে পারিনি!
বাইরে থেকে দেখে যাতে কিছু বোঝা না যায় সেই ব্যবস্থাই করেছি আমরা।
সাংঘাতিক!
রিসিভার রেখে দিল রবিন। কেউ ধরছে না ওদের ঘরে। কোথায় গেছে বলতে পারল না ক্লার্ক। বললাম আবার ফোন করব। মেসেজ দিতে হবে কিনা জিজ্ঞেস করল, দিলাম না। বলা যায় না কার চোখে পড়ে যায়।
ঠিকই করেছ, কিশোর বলল। আমার মনে হয় রেড লায়নে নজর রাখতে গেছে। ফিরে আসবে সময় হলেই। পিটারের দিকে তাকাল সে। তোমাকে আমরা খুঁজে না

পেলে কি করতে?
আরও অপেক্ষা করতাম। তারপর নিরাপদ বুঝলে ফিরে যেতাম রেড লায়নে, দেখতাম, আমার মেসেজ পেয়ে ওখান পর্যন্ত কেউ যেতে পেরেছে কিনা।
ঠিক যা তাবছ আমি।
ট্রেড মিশনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে না? রবিন জিজ্ঞেস করল।
সেটা একেবারে শেষ অবস্থায় গিয়ে পড়লে। অর্থাৎ বাধ্য হলে। রেড লায়নের কিডন্যাপারগুলোকে দেখেই বুঝে গেছিলাম আমার পাঠানো মেসেজ দেখে ফেলেছে ওরা। বুঝে ফেলেছে। তার মানে কোনও একটা যোগাযোগ রয়েছে জানার। স্পাই আছে ওখানে। কাজেই মিশনকে আর বিশ্বাস করতে পারি না পুরোপুরি।
ড্রয়ার থেকে হাতির দাঁতে তৈরি গহনাটা বের করল কিশোর। বক্স ক্যানিয়নে যেটা পেয়েছিল। পিটারকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, চিনতে পারো?
জিনিসটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল পিটার। নানদাতেই তৈরি হয়েছে, সন্দেহ নেই। চেনাও লাগছে। তবে কোথায় দেখেছি মনে করতে পারছি না।
রবিন, মুসা বলল। অনেকক্ষণ তো হলো। করে দেখ আরেকবার।
আবার মিরামার হোটেলের নম্বরে ডায়াল শুরু করল রবিন।
পিটার দেখতে লাগল ট্রেলারের ভেতরটা। সর্ব-দর্শন নামের পেরিস্কোপটা দেখল, ট্রেলারের ছাত ফুঁড়ে যেটা বেরিয়েছে। দেখল টেলিফোন লাইনের সঙ্গে লাগানো লাউডস্পীকার। ক্লোজড সার্কিট টেলিভিশন ক্যামেরাটার ওপর গিয়ে দৃষ্টি স্থির হলো। এত জিনিস কোথায় পেলে?
বেশির ভাগই বাতিল মাল থেকে নতুন করে বানিয়ে নিয়েছি, মুসা জানাল। ইলেকট্রনিকের জাদুকর বলতে পার কিশোরকে...
আর ইঞ্জিনের জাদুকর মুসা, হেসে যোগ করল কিলোর।
রবিন হলো চলমান জ্ঞানকোষ, মুসা বলল।
তোমরা জিনিয়াস! আরেকবার প্রশংসা করল পিটার।
রিসিভারের মাউথপিসে হাত রেখে ফিরে তাকাল রবিন। ক্লার্ক বলছে, হ্যারি নাকি ফিরেছে। ঘরের দিকে যেতে দেখেছে। কথা বলতে চাইলাম। ধরতে বলল।
ধর, মুসা বলল। আমরা পিটারকে ওয়ার্কশপটা দেখিয়ে আনছি।
দুই সুড়ঙ্গ দিয়ে ওয়ার্কশপে বেরিয়ে এল কিশোর, মুসা আর পিটার। পিটার জানাল এটাতে কখনও ঢোকেনি। লোকজনের সাড়া পেয়ে ঢোকার সাহসই হয়নি আসলে। তিন গোয়েন্দার সঙ্গে যখন ট্রেলারে ঢুকেছে তখনও এখান দিয়ে নয়, ঢুকেছে সবুজ ফটক এক দিয়ে। ওয়ার্কশপের চেহারা দেখে আরও তাজ্জব হয়ে গেল। ছোটখাট একটা আধুনিক কারখানা বলেই মনে হল তার। বেলা হয়েছে।

রোদ উঠেছে। পরিষ্কার দিনের আলোয় বেরিয়ে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগল সে। ভয় ভয় করছে। প্রশ্ন করল, আমি এখানে নিরাপদ?
কেন নয়? কিশোর বলল, এখানে কেউ তোমাকে দেখতে পাবে না। ইয়ার্ডের চারপাশ ঘিরে বেড়া আছে দেখেছই তো। তার ওপর রয়েছে জায়গায় জায়গায় জঞ্জালের স্তূপ। এর ভেতরে কেউ দেখতে পাবে না।
হাসল বটে পিটার, তবে তেমন আশ্বস্ত হয়েছে বলে মনে হলো না। তাকিয়ে। তাকিয়ে দেখছে ওয়ার্কশপের জিনিসপত্র। সাজিয়েছ বটে!
সুড়ঙ্গমুখ দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল রবিন। হ্যারির সঙ্গে কথা বললাম, উত্তেজিত কণ্ঠে বলল সে। কিংকে নিয়ে এখুনি চলে আসবে বলেছে। পিটারকে নিতে।
কিন্তু আমি যে যেতে চাই না, পিটার বলল। তোমাদের হেডকোয়ার্টার ভারি পছন্দ হয়েছে আমার। দেখার অনেক কিছু বাকি। ভাবছি আজ সারাদিন ধরে দেখব।
ওয়ার্কবেঞ্চের নিচে ঝুঁকে একটা জিনিস দেখিয়ে বলল, এটা কি?
দেশলাইয়ের বাক্সের সমান কালো একটা বাক্সমত জিনিস বের করল সে।
ওটা? বলতে চাইল মুসা, ওটা-ওটা–কিশোর, কি জিনিস?
ছোট বাক্সটা দেখতে লাগল রবিন। এটা…এটা…
তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জিনিসটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। সতর্ক হয়ে গেছে। এটা আমাদের জিনিস নয়! বাগ!
বাগ? ভুরু কোঁচকাল পিটার। ইংরেজিতে বাগ মানে তো পোকা, গোবরে পোকা, তাই না?
শ্রবণ যন্ত্রকেও বলে, বুঝিয়ে দিল কিশোর। এক ধরনের রিমোট মাইক্রোফোন। দূর থেকে চুরি করে কথা শোনার কাজে ব্যবহার করে স্পাইরা। নিশ্চয় আমাদের কথা শুনছে কেউ। জলদি চল! বেরোতে হবে…
ওয়ার্কশপের বাইরে থেকে কথা বলে উঠল কেউ। পরিচিত কণ্ঠ। তাড়াহুড়ো করে লাভ নেই, বুঝলে। পালাতে পারবে না।
ওয়ার্কশপের দরজায় দেখা দিল লোকটা। বেঁটে, কোকড়া বাদামী চুল। তার পেছনে এসে দাঁড়াল পাতলা লম্বা লোকটা। সেই দুই কিডন্যাপার, কিশোরকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল যারা।
দুজনের হাতেই পিস্তল।

.

গুড, কুৎসিত হাসি হাসল বেঁটে লোকটা। সবাই আমরা এখানে রয়েছি।
ডেভ, লম্বু বলল। মনে হয় আমাদের লোককে পেলাম।
সেরকমই তো লাগছে।

এই ছেলেগুলোর কাছে কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত আমাদের, লম্বা লোকটা বলল, তিন গোয়েন্দার কথা। চালাক ছেলে। ওরা না থাকলে আমরা বেরই করতে পারতাম না। অনেক সহজ করে দিল আমাদের কাজ।
ওদেরকে তাহলে ধন্যবাদ দেয়া দরকার, হেসে উঠল ডেভ।
যেন খুব উপভোগ করছে দুই উগ্রপন্থী।
হ্যারি আর কিং না আসা পর্যন্ত এদের আটকে রাখা দরকার, বুঝতে পারছে। তিন গোয়েন্দা। গরম হয়ে রবিন বলল, এসব করে পার পাবেন না আপনারা!
স্যার মনটেরোকেও বাগে আনতে পারবেন না, ফুঁসে উঠল মুসা।
ছেলেটাকে নিয়ে পার হয়ে যেতে পারলেই আমরা খুশি, ডেভ বলল। তারপর স্যার মনটেরো কথা শোনে কিনা দেখা যাবে।
হাসল খাটো কিডন্যাপার। পিটারের দিকে তাকাল, তারপর কিশোরের দিকে। অন্য লোকটাও দেখছে দুজনকে। কিশোরের চোখ চকচক করছে দেখতে পেল রবিন আর মুসা।
তুমি খুব চালাক, কিশোর পাশা, ডেভ বলল। তোমাদের মধ্যে কে, পিটার সেটা গোপন করতে চাইছ। ভেবেছ আমরা বের করতে পারব না। হেলিকপ্টারটা ফেলে রেখে আবার এখানে ফিরে এসে ভালই করেছি বুঝতে পারছি। খবরের কাগজ দেখেছি। ভুল বুঝতে পেরেছি। জানলাম, মাস্টার মনটেরো এখনও এই এলাকাতেই আছে। পুলিশ কল্পনাই করেনি ওদের নাকের নিচে রয়েছি আমরা। ওরা আমাদেরকে অন্য জায়গায় খুঁজছে, আর আমরা পিটারকে খুঁজতে লাগলাম এখানে। ঠিক জায়গায়।
হ্যারি আর কিংকে দেখে ফেললাম আমরা, হেসে যোগ করল জন। ওদের। সঙ্গে যোগ দিলে তোমরা, তিন গোয়েন্দার কথা বলল সে। বুঝে গেলাম আগে হোক পরে তোক পিটারের কাছে আমাদেরকে নিয়ে যাবেই তোমরা। এই ইয়ার্ডে অনেক লোক আসে। তাদের ভিড়ে ঢুকে পড়াটা কোনও ব্যাপারই না। ঢুকলাম। তোমরা তখন পিটারকে খুঁজতে এতই ব্যস্ত আমাদেরকে লক্ষই করলে না।
আপনাদের দেখেছি। রেগে গেল মুসা।
ঝোপের ভেতর ছিলাম চেহারা তো আর দেখনি। চিনবে কি করে? যাই হোক, তোমাদেরকে আমি ভাল করেই দেখেছি। কি করতে চলেছ বুঝেছি। এক ফাঁকে ঢুকে পড়লাম তোমাদের ওয়ার্কশপে। বাগটা ফেলে রাখলাম বেঞ্চের তলায়। তারপর তোমাদের অনেক আলোচনাই শুনেছি।
বিশাল এক জঞ্জালের স্তূপের দিকে পেছন করে দাঁড়িয়ে রয়েছে দুই কিডন্যাপার। চট করে কিশোরের দিকে তাকাল রবিন। এক ধরনের ফাঁদ পাতা আছে ওই জঞ্জালে। বিপদে পড়লে প্রয়োজনের সময় যাতে শত্রুর ওপর টান মেরে ফেলে

দিতে পারে সেই ব্যবস্থা করে রেখেছে। মাথা নেড়ে নিষেধ করল কিশোর। দুজন পিস্তলধারী লোক, ভয়াবহ বিপজ্জনক, ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে না। তবে তার চোখ জ্বলজ্বল করতে দেখল রবিন। কি প্ল্যান করেছে গোয়েন্দাপ্রধান?
পুলিশ আপনাদেরকে হন্যে হয়ে খুঁজছে, সময় নষ্ট করার জন্যে বলল মুসা।
জানি, জবাব দিল ডেভ। আমাদের টিকিও ছুঁতে পারবে না। আমরা যাকে চাই তাকে পেয়ে গেছি।
আমাদের কিছু করতে পারবে না ওরা, জন বলল দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে।
পিটার, চল, আর দেরি করতে পারছি না, ডেভ বলল।
চালাকির চেষ্টা করবে না কেউ, হুশিয়ার করল জন। গুলি করতে দ্বিধা করব না আমরা বুঝতেই পারছ।
তা পারছি, এগিয়ে গেল পিটার। চলুন, যাচ্ছি।
তার পাশে এসে দাঁড়াল কিশোর, হ্যাঁ, চলুন।
কিশোর, পিটার বলল। আমার জন্যে তোমার এতবড় ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে। ওরা এত বোকা নয়। ঠিক বুঝে গেছে আমিই পিটার।
মস্ত বড় অভিনেতা কিশোর। বিখ্যাত পরিচালক মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফারকে পর্যন্ত বোকা বানিয়ে দিয়েছিল তার ভাতিজা সেজে। জন আর ডেভ তো কিছুই না। পিটারের কথার টান নকল করে ফেলল সে অবলীলায়, তুমি সরো তো কিশোর। আমিও জানি ওরা বোকা নয়। ঠিকই বুঝতে পেরেছে কে পিটার।
কিশোর! প্রতিবাদ করল পিটার। ওদেরকে বোকা বানানোর চেষ্টা করে লাভ নেই। আমি যে পিটার বুঝতে পেরেছে। পেরেছেই।
দুজনের মুখের দিকে তাকাচ্ছে দুই কিডন্যাপার। হাসি হাসি ভাবটা দূর হয়ে গেছে চেহারা থেকে। হঠাৎই আবিষ্কার করেছে, দুটো ছেলের মাঝে কোনজন কিশোর আর কোনজন পিটার, জানে না। কিশোরের চোখ কেন জ্বলজ্বল করছিল। এতক্ষণে বুঝল রবিন। দুজনের পরনে এক ধরনের পোশাক, এক চেহারা, কথাও বলছে একই রকম ভাবে।
শাসানির ভঙ্গিতে পিস্তল নাড়ল ডেভ, অনেক হয়েছে। যথেষ্ট। আসল পিটার কে, জলদি বলো!
প্লীজ, কিশোর, অনুরোধ করল পিটার। আমি চলে যাই ওদের সঙ্গে!
থামো! ধমক দিয়ে বলল, কিশোর, ওরা জানে আমি পিটার। খামোকা আমাকে বাঁচাতে চাইছ কেন? চলুন, আমি যাচ্ছি।
ভয়ংকর হয়ে উঠেছে দুই কিডন্যাপারের চেহারা।
প্রিন্টের শার্ট পরা ছেলেটা পিটার, ডেভ বলল। ও-ই বেশি করে যেতে চাইছে। বেশি ইচ্ছুক। তার মানে নতুন বন্ধুকে বাঁচাতে চাইছে।

আমার তা মনে হয় না, জন বলল। শাদা সার্ট পরা ছেলেটা পিটার। অহেতুক কিশোরকে বিপদে ফেলতে চাইছে না।
পিস্তল হাতে আগে বাড়ল জন।
কাপড় দেখ ওদের, ডেভ বলল পেছন থেকে। ধোপার দোকানের চিহ্ন থাকবেই। বোঝা যাবে।
কিশোরের শার্টের কলারের ভেতরটা উল্টে দেখল জন। ও-ই কিশোর পাশা, ডেভ। এই তো। পাশা : তেরশো বত্রিশ!
শ্রাগ করল কিশোর। আমি কিশোর নই। পালানোর সময় কাপড় ছিঁড়ে গিয়েছিল। আমারগুলো ফেলে তখন কিশোরের কাপড় নিয়ে পরেছি। বিশ্বাস না হলে ওর কলারের ভেতর দেখুন।
পিটারের শার্টের কলারও দেখল জন। তাতেও লেখা রয়েছে পাশা : আঠারোশো তেইশ। গাল দিয়ে উঠল সে।
মাথা ঝাঁকাল পিটার। কিশোর ঠিকই বলেছে। আমি কাপড় ছিঁড়ে ফেলেছিলাম। তখন তার এক সেট কাপড় নিয়ে পরেছি।
তারমানে দুজন পিটার হয়ে গেলাম আমরা, কিংবা দুজন কিশোর, হেসে বলল কিশোর। তাহলে আসল কিশোর কে? আমি? বুড়ো আঙুল নাড়ল সে। মোটেও না।
হাঁ হয়ে গেছে মুসা আর রবিন। কাপড়ের ব্যাপারটা জানা না থাকলে এখন ওরাও দ্বিধায় পড়ে যেত কে কিশোর আর কে পিটার ভেবে।
শুনুন, কিশোর বলল। কিশোরের পকেট দেখুন। একটা জিনিস পাবেন। যেটা প্রমাণ করবে সে কিশোর পাশা।
দ্রুত পিটারের পকেটে হাত ঢোকাল জন। ছোট একটা যন্ত্র বের করল। ঘুরে তাকাল সঙ্গীর দিকে। এ তো আমাদেরই বাগ! এটা পাশাদের ওয়ার্কশপ। নিশ্চয় পাশাই কুড়িয়ে নিয়ে পকেটে রেখেছে। সেটাই স্বাভাবিক।
ইডিয়েট! ধমকে উঠল ডেভ। ওটা পিটার পেয়েছে, শুনলাম না তখন? তারপর হাতে হাতে ঘুরেছে। কার কাছ থেকে কার কাছে গেছে কি করে বুঝব?
ওদের কথার কোনও বিশ্বাস নেই।
রাগে লাল হয়ে গেল জনের মুখ। কিশোরের কাঁধ ধরে ঝাঁকাতে শুরু করল। লোকটার জ্যাকেট খামচে ধরল কিশোর, যেন পতন ঠেকানোর জন্যে। গাল দিয়ে উঠল কিডন্যাপার, এই ছাড়, ছাড়, আমার জ্যাকেট ছাড়!
ছেড়ে দিল কিশোর। তার পকেট ভালমত খুঁজে দেখল জন। তারপর পিটারের সব পকেট দেখল। কিছু নেই! সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে নিরাশ কণ্ঠে বলল সে।
হাসতে আরম্ভ করল কিশোর। দেখাদেখি পিটারও হাসতে লাগল।

এটা বন্ধ করা দরকার! চেঁচিয়ে উঠল ডেভ। পিটারের বাবার একজন। শোফার আছে। আর্মির লোক। তার নাম আর র্যাংক বলতে হবে তোমাদেরকে। যে বলতে পারবে না, ধরে নেব সে-ই কিশোর পাশা। হ্যাঁ, বলে ফেল এখন।
বরফের মত জমে গেল যেন রবিন আর মুসা। এইবার ফাঁদে পড়েছে কিশোর। কি করবে? প্রশ্নের জবাব জানা নেই তার। তাকে বাঁচানোর জন্যে সঠিক জবাবটা দিয়ে দেবে এবার পিটার।
বেশ, হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গি করল পিটার। এবার আটকে ফেলেছেন। বলতে পারলাম না। আমিই কিশোর পাশা।
ভাবান্তর ঘটল না মুসা আর রবিনের চেহারায়। তবে মনে মনে উৎফুল্ল হয়ে উঠল ওরা। কিশোরের খেলাটা ধরে ফেলেছে পিটার। পাকা খেলোয়াড়ের মত খেলতে আরম্ভ করেছে।
হ্যাঁ, আমি স্বীকার করছি, কিশোর বলল। আমি কিশোর পাশা। শোফারের নাম বলতে পারব না।
প্রচণ্ড রাগে জ্বলে উঠল দুই কিডন্যাপার, বিশেষ করে ডেভ। ঝটকা দিয়ে ঘুরল রবিন আর মুসার দিকে। আশা করি তোমরা ওদের মত বোকা নও! মরার ইচ্ছে নেই! বলে ফেল কে কিশোর আর কে পিটার?
ও! পিটারকে দেখাল মুসা।
ও! কিশোরকে দেখাল রবিন।
আস্তে মাথা নাড়ল ডেভ। হুঁ। একটাই উপায় আছে এখন আমাদের। এছাড়া আর কিছু করার নেই। দুই কিশোরের দিকে এগিয়ে এল সে, কিংবা দুই পিটার। কোনটা যে বের করবে এবার।
রেড লায়ন থেকে কিংকে তুলে নিয়ে ইয়ার্ডে চলে এল হ্যারি। উজ্জ্বল রোদ। ভেতরে ঢুকল বিশাল চকচকে ক্যাডিলাকটা। ওদেরকে স্বাগত জানাতে ছুটে গেল না কোনও কিশোর। নীরব চত্বরের চারপাশে চোখ বোলাল ওঁরা।
পিটার! চিৎকার করে ডাকল কিং। কিশোর!
রবিন বলেছে, হ্যারি জানাল। ওদের গোপন হেডকোয়ার্টারে রেখেছে পিটারকে। জঞ্জালের ভেতরে লুকানো। গলা চড়িয়ে ডাকল, কিশোর! কিশোর পাশা!
পিটার! কিশোর! কিংও ডাকল।
এত চেঁচামেচি কিসের! এই সক্কাল বেলা! বাড়ির কোণ ঘুরে বেরিয়ে এলেন মেরিচাচী। ফুলগাছে পানি দিচ্ছিলেন বোধহয়। এখন কটা বাজে? এত সকালে এসে চেঁচামেচি জুড়েছেন!
সরি, ম্যাম, মোলায়েম গলায় বলল কিং। ছেলেগুলোকে খুঁজছি আমরা। কিশোরকে দেখেছেন?

ও, আপনারা, চিনতে পারলেন মেরিচাচী।
কিশোরকে খুঁজছি আমরা, হ্যারি বলল এমন ভঙ্গিতে, যেন মস্ত অপরাধ করে ফেলেছে। ও কোথায়?
জানি না। রাতে রবিন আর মুসা ছিল এখানেই। ভোর হতেই কোথায় যে গায়েব হয়েছে সৃষ্টিকর্তাও বলতে পারবে কিনা সন্দেহ! আমি তো সাধারণ মানুষ!
কিন্তু আমাদেরকে এখানে দেখা করতে বলেছে ওরা, হ্যারি বলল।
তাহলে আছে কোথাও। ওদের ওয়ার্কশপে দেখুন। বায়ের ওই যে বড় জঞ্জালটা…
থ্যাংক ইউ, বাধা দিয়ে বলল, কিং। যাচ্ছি।
প্রায় দৌড়ে চত্বর পেরিয়ে এসে ওয়ার্কশপে ঢুকল দুজনে। কাউকে দেখল না।
নেই তো! কিং বলল।
ও কি? কান পেতে শুনছে হ্যারি।
কাছাকাছি কোনখান থেকে শব্দটা আসছে। ধাতব শব্দ। সেই সাথে চাপা, গোঙানি।
ওদিকটায়,হ্যারি বলল। ওই বড় পাইপটার কাছে।
পাইপের কাছে এসে খোলা মুখ দিয়ে ভেতরে উঁকি দিল ওরা। হাত-পা বেঁধে। তার ভেতরে ঢুকিয়ে রাখা হয়েছে রবিন আর মুসাকে। টেনে ওদেরকে বের করা হল। মুখের কাপড় খুলে নিতেই প্রায় চিৎকার করে বলল মুসা, কিডন্যাপার!
নিয়ে গেছে ওদেরকে! রবিন বলল।
ওদেরকে? কিং বলল, পিটার আর কিশোরকে? কোথায়? কখন?
পাঁচ মিনিটও হয়নি, ককিয়ে উঠল মুসা। হয়ত আরও কম। কে কিশোর আর কে পিটার বুঝতে পারেনি, তাই দুজনকেই ধরে নিয়ে গেছে?
কথা বলতে বলতেই রবিন আর মুসার বাঁধন খুলছে দুজনে। হ্যারি। জিজ্ঞেস করল, কোথায়?
জানি না!
কি গাড়ি? লাইসেন্স নম্বর রেখেছ?
গাড়িটা দেখতেই পারিনি! জবাব দিল রবিন।
বেশি দূর যেতে পারেনি, কিং বলল। পুলিশকে…
মুসা! তাকিয়ে রয়েছে হ্যারি। তোমার বুকে ও কিসের আলো? এত লাল…
ইমারজেন্সি লাইট, মুসা, চেঁচিয়ে উঠল রবিন। নিশ্চয় কিশোর! অন সুইচটা টিপে দিয়ে ডিরেকশনাল ডায়ালটা দেখ!
শার্টের বুক পকেট থেকে খুদে যন্ত্রটা বের করল মুসা। অনিয়মিত ভাবে জ্বলছে নিভছে লাল আলো। সুইচ টিপতেই টিইইপ টিইইপ শুরু করল। ডায়ালের। তীরটা ঘুরে গেল রকি বীচের কেন্দ্রের দিকে।

বেশ জোরাল! মুসা বলল। তার মানে বেশি দূর যেতে পারেনি!
শহরের দিকে চলেছে, বলল রবিন। কিং, জলদি! ওদের পিছু নেয়া যাবে। এখনও সময় আছে।
ওয়ার্কশপ থেকে ছুটে বেরোল চারজনে। ক্যাডিলাকে এসে উঠল। মুসার চোখ সিগন্যাল ডায়ালের দিকে। স্পষ্ট সংকেত দিচ্ছে যন্ত্রটা।
ওদিকে, হাত তুলে দেখাল মুসা। সোজা শহরের দিকে।
দ্রুত গাড়ি চালাল হ্যারি। কিং তাকিয়ে রয়েছে ডায়ালটার দিকে। কি যন্ত্র? কিভাবে কাজ করে?
একই সঙ্গে দুটো কাজ করে এটা, বুঝিয়ে বলল রবিন। ডিরেকশনাল সিগন্যাল আর ইমারজেন্সি অ্যালার্ম। সংকেত পাঠাতেও পারে গ্রহণও করতে পারে। এখন ওটা কিশোরের পাঠান সংকেত ধরছে। টিপ টিপ করছে সে জন্যেই। যতই কাছাকাছি যাব জোরাল হবে, সংকেত। কোনদিক থেকে সংকেত আসছে। সেটা নির্দেশ করবে তীরটা। ইমারজেন্সি অ্যালার্ম হিসেবেও কাজ করে যন্ত্রটা, কণ্ঠস্বরেই চালু হয়ে যায়, ভয়েস কমাণ্ড। আলোটা জ্বলছে তার কারণ কিশোর এখন বলছে...
না না বলো না! চেঁচিয়ে বাধা দিল মুসা, তাহলে কিশোরের সিগন্যাল অফ হয়ে যাবে!
ঢোক গিলল রবিন। তাই তো! হেল্প শব্দটা বলতে পেরেছে হয়ত কিশোর, যন্ত্রের কাছে।
ডানে, হ্যারি, আচমকা নির্দেশ দিল মুসা। বিড়বিড় করল আনমনে, শব্দ বাড়ছে। মনে হয় থেমে গেছে কিডন্যাপাররা।
ভ্রূকুটি করল কিং। যন্ত্রগুলো একাধারে প্রেরক এবং গ্রাহক, তাই তো বললে? রবিন, কিশোর একটা যন্ত্র ব্যবহার করছে, তাই না? যেন নিজেকেই কথাগুলো বোঝাচ্ছে সে। অ্যাক্সিডেন্টালি ওর সিগন্যাল যদি বন্ধ করে দিই আমরা কি ঘটবে?
অফ হয়ে যাবে ওর বীপারটা, রবিন বলল। কিডন্যাপাররা কিছু শুনতে পাবে না। পকেট ভালমত লুকানো থাকলে আলো জ্বলাও দেখতে পাবে না।
আশা করি ভালমতই লুকানো আছে, কিং বলল ধীরে ধীরে। কারণ। সাংঘাতিক ঝুঁকি নিয়েছে ও। মারাত্মক। অ্যাক্সিডেন্টালি আমরা একটা গোলমাল করেও দিতে পারি। তাহলে সংকেত দিতে শুরু করবে ওর যন্ত্র। আর সেটা কিডন্যাপারদের চোখে পড়ে গেলে, ওরা বুঝতে পারলে একটা সংকেত পাঠানোর যন্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে, ভয়ানক বিপদ হবে কিশোরের। বুঝে যাবে কোন ছেলেটা কিশোর!

মুখ শুকিয়ে গেল রবিনের। এ কথাটা ভাবেনি। তাগাদা দিল হ্যারিকে, জলদি, আরও জোরে চালান!

.

কিডন্যাপারদের ভাড়া করে আনা নীল লিংকন গাড়িটা একটা সেলফ-সার্ভিস ফিলিং স্টেশনে ঢুকল। পেছনের সীটে বসে রইল, কিশোর আর পিটার, জনের সঙ্গে। ডেভ নেমে গিয়ে ট্যাঙ্কে পেট্রল ভরতে শুরু করল। কেউ এল না গাড়িটার কাছে।

সত্যি কথাটা বললে তোমাদের দুজনের জন্যেই ভাল হত, জন বলল।

সাহায্য আসছে, কিশোর বলল। আমি জানি, আসছেই। বেশিক্ষণ লাগবে না।

আমিও জানি, একমত হলো পিটার। আমার বন্ধুরা আসবেই।

আসতে দেরি হলেই বুঝবে মজা, খেঁকিয়ে উঠল ডেভ। এখনও সময়। আছে। কিশোর বেরিয়ে যেতে চাইলে তাকে চলে যেতে দেব আমরা। পরে আর সুযোগ দেয়া হবে না। এক সময় না এক সময় জানতে পারবই আমরা কোনজন। কিশোর। তখন তাকে মেরে ফেলা হবে।

কে বিশ্বাস করে আপনার কথা, পিটার বলল।

আমিও না, কিশোর বলল। আমি যে কিশোর, একথা বললেই আপনারা ছেড়ে দেবেন, মোটেও বিশ্বাস করি না আমি। সাপকে বিশ্বাস করা যায়, আপনাদেরকে না। ভয় করি না। সাহায্য আসবেই।

গাধার মত কথা বল না। ধমকে উঠল জন। কোত্থেকে সাহায্য আসবে? আর ভয়টা কিসের পাচ্ছ, শুনি? পিটার কে, সেটা জানলেও আমরা তার ক্ষতি করব না। বাঁচিয়ে রাখব আমাদেরই স্বার্থে। কারণ মেরে ফেললে তাকে দিয়ে আর কোনও কাজ হবে না। বল, কে পিটার?

আগে সাহায্য আসুক তো, কিশোর বলল। তারপর নিজেরাই দেখতে পাবেন।

কপালে দুঃখ আছে, দাঁতে দাঁত চেপে বলল জন। আমরা আর কি করব!

না, আপনাদের কিছুই করার নেই, পিটার বলল। যা ইচ্ছে করবেন। এত বকবক করছেন কেন?

চড় মারার জন্যে হাত তুলেও থেমে গেল জন। ড্রাইভিং সীটে উঠে বসল ডেভ। মাথা গরম কর না। সুযোগ দিয়েছি, কথা শোনেনি। পরে আর আমাদেরকে দোষ দিতে পারবে না। ছেলেগুলোকে চালাক ভেবেছিলাম, এখন দেখছি একেবারে বোকা।

.

রকি বীচের রাস্তা ধরে যতটা সম্ভব জোরে গাড়ি ছুটিয়েছে হ্যারি। তার পাশে বসে সিগন্যাল ডায়ালের দিকে তাকিয়ে রয়েছে মুসা। পেছনের সীট থেকে তার

ঘাড়ের। ওপর দিয়ে ঝুঁকে এসেছে কিং আর রবিন, দেখার জন্যে। হঠাৎ কমে যেতে শুরু করল সিগন্যাল, দুর্বল হয়ে যেতে লাগল।
ডানে! চিৎকার করে বলল মুসা। তীরটা ঘুরে গেছে সাগরের দিকে।
মোড় নিল হ্যারি। চওড়া একটা রাস্তা, চলে গেছে বন্দরের দিকে। সকালে প্রচণ্ড ভিড় রাস্তায়, দুদিকেই ছুটে চলেছে প্রচুর গাড়ি। আরও কমে আসছে। সংকেতের শব্দ, ক্রমেই দুর্বল হচ্ছে।
দক্ষিণে ঘুরেছে! মুসা বলল।
মুসা, রবিন বলল। নিশ্চয় হাইওয়ের দিকে চলেছে ওরা। তীরটা দেখছ? অর্ধেক উত্তরে অর্ধেক দক্ষিণে। তার মানে লস অ্যাঞ্জেলেস।
তুমি…মনে হয় ঠিকই বলেছ, ঘাবড়ে গেছে মুসা।
হাইওয়েটা কদ্দূর? জিজ্ঞেস করল কিং।
মাইলখানেক, জবাব দিল রবিন।
মাথা নাড়ল হ্যারি। যা ভিড়! কিছুতেই জোরে চালাতে পারছি না।
হাইওয়েতে আমাদের চার গুণ জোরে চালাতে পারবে ওবা, কিং বলল। তোমাদের যন্ত্রের রেঞ্জ কতোটা?
তিন মাইল, রবিন জানাল।
জোরে চালানোর চেষ্টা করেও পারছে না হ্যারি। অসহায় লাগছে তার। পারলে গাড়ির ভিড়ের ওপর দিয়ে উড়ে চলে যায়। ডায়ালের তীর দেখছে মুসা। থিরথির করে কাঁপছে ওটা, যেন সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না কোনদিকে ঘুরবে। অনেক দুর্বল হয়ে পড়েছে সংকেত। দূরত্ব বেড়ে যাচ্ছে আসলে, সে জন্যেই হচ্ছে এরকম। এক সময় জিভারোতে চলে এল তীর, কোনও দিক নির্দেশ করছে না আর। থেমে গেল সংকেতের শব্দ। নিভে গেল লাল আলো। রেঞ্জের বাইরে চলে গেছে প্রেরক যন্ত্রটা।
গেল! মাথায় হাত দিয়ে ফেলল কিং। আর ওদেরকে ধরা যাবে না। কি গাড়ি তা-ও জানি না। কি ভাবে অনুসরণ করব? আর কোনও উপায় নেই। পুলিশের কাছেই যেতে হবে।

.

গা ঘেঁষাঘেষি করে বসেছে পিটার আর কিশোর। সীটের আরেক প্রান্তে পিস্তল হাতে বসে রয়েছে জন। চোখ বন্ধ।
কিশোরের কানে কানে বলল পিটার, মনে হচ্ছে বলে দেয়া উচিত, কিশোর। তাহলে তোমাকে ছেড়ে দেবে।
না, দেবে না। আমি গিয়ে সব ফাঁস করে দেব, এই ভয়ে। বিপদ আরও বাড়বে তখন আমাদের। পিটারের কোনও ক্ষতি ওরা করবে না, কিন্তু কিশোর পাশাকে

ওদের কোনও প্রয়োজন নেই। অহেতুক কেন ঝামেলা রাখবে? তাছাড়া। অনেক বেশি জেনে ফেলেছে কিশোর, তাকে চুপ করিয়ে দিতেই চাইবে…
আচমকা চোখ মেলে ধমকে উঠল জন, এই, থামবে! এত কথা কিসের! যত্তোসব! একটাকে খতম করে দিতে পারলেই এখন বাঁচি!
খিকখিক করে হাসল সে। আবার চোখ মুদল। সকালের উজ্জ্বল রোদে তীব্র বেগে ছুটছে লিংকন। কে জানে কোন অজানার উদ্দেশে।

.

থানার লম্বা বেঞ্চটায় বসে রয়েছে দুই গোয়েন্দা, হ্যারি আর কিং। ওদের সঙ্গে রয়েছেন মেরিচাচী আর রাশেদ পাশা। সব কথা শোনার পর মেরিচাচী ভীষণ খেপে যাবেন ভেবেছিল রবিন আর মুসা। কিন্তু ওদেরকে অবাক করে দিয়ে আশ্চর্য রকম শান্ত রয়েছেন তিনি।
ওই যে, কিশোরের মত ছেলেটা, হ্যারিকে বললেন তিনি। পিটার মনটেরো, আপনার দেশের লোকের কাছে খুবই মূল্যবান, তাই না? ভবিষ্যতে দেশটার স্বাধীনতার জন্যে?
হ্যাঁ, মিসেস পাশা, মাথা দোলালো হ্যারি। খুবই দামী। সিভিল ওয়ার ছাড়া একমাত্র ওর বাবাই পারে দেশটাকে স্বাধীন করতে। শান্তি আনতে। কিন্তু ওই কিডন্যাপারগুলো তা চায় না। ওরা চায় ওদের ইচ্ছে মত চালাতে। স্যার মনটেরোর ছেলেকে কিডন্যাপ করে নিয়ে গিয়ে তাকে ওদের কথা শোনাতে বাধ্য করতে। সে জন্যেই পিটারকে উদ্ধার করা এখন এত জরুরী।
কিশোর আর তার বন্ধুরা আপনাদেরকে সাহায্য করেছিল, বলছেন, আর তখনই পিটারকে সহ কিশোরকে তুলে নিয়ে গেছে ওরা?
হ্যাঁ, তাই, জবাবটা দিল কিং।
তাহলে ঠিক কাজই করেছে ছেলেরা, যেন রায় ঘোষণা করলেন মেরিচাচী। ওরা যে আপনাদেরকে সাহায্য করেছে এ জন্যে আমি খুশি। এখন ছেলেদুটো। নিরাপদে ফিরে এলেই আরও বেশি খুশি হই আমি।
বেরিয়ে এলেন ইয়ান ফ্লেচার। গম্ভীর হয়ে আছেন। লস অ্যাঞ্জেলেস পুলিশকে সতর্ক করে দিয়েছি। কিন্তু ওরাই বা কি করতে পারবে বুঝতে পারছি না। গাড়িটা কি গাড়ি জানি না। লাইসেন্স নম্বর জানি না। শুধু কিডন্যাপারদের চেহারার বর্ণনা জানিয়ে দেয়া হয়েছে…
আবার সেই একই ব্যাপার, নাক দিয়ে বিচিত্র শব্দ করলেন মেরিচাচী। কিছুই করার নেই আপনাদের। আগের বারও একই অবস্থা হয়েছিল। আপনাদের নাকের নিচে দিয়ে সব কাণ্ড করে চলেছে লোকগুলো, কিছুই করতে পারছেন না আপনারা।

সাধারণত একই জায়গায় আবার ফিরে আসে না কিডন্যাপাররা, মিসেস পাশা। ওরা যে আসবে কি করে বুঝব?
বোঝা উচিত ছিল, চীফের কথা একটুও পছন্দ হচ্ছে না মেরিচাচীর। কিশোর তো বলেইছিল আপনাদেরকে ও সাধারণ কিডন্যাপার নয়। তার কথা। শোনা উচিত ছিল।
হয়ত ঠিকই বলেছেন আপনি, মিসেস পাশা, তর্ক করলেন না ইয়ান ফ্লেচার। যাই হোক, লস অ্যাঞ্জেলেস পুলিশ তাদের সাধ্যমত চেষ্টা করার কথা দিয়েছে। তবে পেলেও সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকশন নিতে পারবে কিনা সন্দেহ।
কেন নয়? প্রশ্ন করলেন রাশেদ পাশা।
কারণ কিশোর আর পিটারকে জিম্মি হিসেবে ধরে নিয়ে গেছে। কিডন্যাপাররা। ওদের কাছে অস্ত্র আছে। যা শুনলাম, তাতে মনে হয় ওরা সাধারণ কিডন্যাপার নয়, আরমির লোক। আর ওসব লোক বড় ভয়ংকর হয়। উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে নিজের জীবনের পরোয়া করে না। মুখোমুখি হয়ে ওদেরকে ঠেকানো হয়ত যাবে, কিন্তু ছেলেগুলোর মারাত্মক বিপদ হয়ে যাবে। একটাই উপায় আছে। কোনভাবে ওদেরকে চিহ্নিত করে চুপি চুপি গিয়ে ছেলেগুলোকে উদ্ধার করে আনা।
হুঁ! ছেলেদের বিপদটা বুঝতে পেরে আরও গম্ভীর হয়ে গেলেন রাশেদ পাশা।
তবে যতক্ষণ খোঁচাখুঁচি করা না হবে, কিং বলল। ক্ষতি হবে না। ছেলেগুলোর। পিটারকে মারবে না ওরা, তাহলে স্যার মনটেরোকে কথা শোনাতে পারবে না। কিশোরেরও ক্ষতি করবে না। করে কোনও লাভ নেই ওদের। শুধু। আটকে রাখবে দুজনকেই যতক্ষণ না ওদের উদ্দেশ্য সফল হয়।
তা ঠিক, চীফ বললেন। এখন একটাই জিনিস দেখতে হবে আমাদের, ছেলেগুলোকে নিয়ে যাতে আমেরিকা থেকে বেরিয়ে যেতে না পারে ওরা। আচ্ছা, ওদের তো নানায় যাওয়ার কথা। দক্ষিণ লস অ্যাঞ্জেলেসের দিকে গেল কেন? ওখানে কি আছে?
নিশ্চয় বেরিয়ে যাওয়ার প্ল্যান করেছে ওরা, হ্যারি বলল।
চারজনকে বেরোতে হবে! কি ভেবে হঠাৎ বলে উঠল রবিন। নিজেরা। দুজন, আর কিশোররা দুজন। ওরা জানে না কোন জুন পিটার। ওদের প্ল্যান ছিল তিনজনের বেরোতে হবে, চারজনের নয়। এতে কি প্ল্যানের পরিবর্তন করতে হবে না? হ্যারি আর কিং-এর দিকে ফিরল সে। লস অ্যাঞ্জেলেসে যাওয়ার অন্য কারণ নেই তো? হয়ত ওখানে গিয়ে কোনভাবে সনাক্ত করতে পারবে পিটারকে।
আমার জানা নেই, রবিন, কিং বলল।
নানদাতে নিয়ে গেলে হতে পারে, হ্যারি বলল। তবে লস অ্যাঞ্জেলেসে নয়। আমার মনে হয় না কোনও উপায় আছে ওদের।

মুসা বলল, নানদান ট্রেড মিশনে এমন কেউ নেই তো যে পিটারকে চিনতে, পারবে? মানে, মনটেরোদের কোনও ঘনিষ্ঠ বন্ধু? কিংবা আত্মীয়?
চট করে পরস্পরের দিকে তাকাল হ্যারি আর কিং। অবাক হয়েছে। এই সহজ কথাটা কেন ওদের মনে পড়েনি ভেবে।
র‍্যামন রিভস? যেন কিং-এর কাছে জানতে চাইল হ্যারি।
স্যার মনটেরোর অনেক পুরনো বন্ধু অবশ্য তিনি, আনমনে বিড়বিড় করল। কিং। না, তাকে বোধহয় ফাঁকি দিতে পারবে না ছেলেগুলো। কি করে এখন...।
এই র‍্যামন রিভসটি কে? চীফ জানতে চাইলেন, আমেরিকায় কি করছেন?
লস অ্যাঞ্জেলেসে নানান ট্রেড মিশনের প্রধান তিনি, কিং জানাল। তবে ওই উগ্রপন্থীদের কিছুতেই সাহায্য করবেন না রিভস।
ইচ্ছে হয়ত নেই, চীফ বললেন। তবে রবিনের কথাটাও না ধরে পারছি না। পালানোর পরিকল্পনা করেছিল ওরা তিনজন, চারজন নয়। এটা ওদের জন্যে বড় সমস্যা। এর জন্যে বেপরোয়া হয়ে উঠবে ওরা। মিস্টার রিভসকে বাধ্য করতে পারে পিটারকে চিনিয়ে দিতে। কিংবা চালাকি করে জেনে নেবে তার কাছ থেকে। এখুনি হুশিয়ার করে দেয়া দরকার।
তাহলে ফোন করি, কিং বলল। শয়তানগুলোকে বিশ্বাস নেই। আরেকটা ব্যাপার, মিশনের সঙ্গে যোগাযোগ আছে ওদের। ভেতরে নিশ্চয় ওদের স্পাই আছে। ওর সাহায্যও নিতে পারে ওরা। মিস্টার রিভসকে সতর্ক করে রাখলে তিনিও হয়ত আমাদের সাহায্য করতে পারেন। ফাঁদে ফেলে দেয়া যেতে পারে কিডন্যাপারগুলোকে।
করুন। এখুনি। আমার ফোনটাই ব্যবহার করুন, চীফ বললেন।
ফোন করতে গেল কিং। অস্থির হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল অন্যেরা। মেরিচাচী আর বসে থাকতে পারলেন না, উঠে পায়চারি শুরু করলেন।
যদি কিছুতেই বুঝতে না পারে কোন ছেলেটা পিটার? হ্যারিকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।
তাহলে, আমার বিশ্বাস, দুজনকেই নানদায় নিয়ে যেতে চাইবে।
আফ্রিকায়? প্রায় চিৎকার করে বললেন মেরিচাচী। ওই শয়তানগুলো নিয়ে গেলে আর বাঁচিয়ে রাখবে...
ফিরে এল কিং। মিশন অফিসে নেই রিভস। সম্ভবত হলিউডে গেছেন, জরুরী কাজে। প্রায়ই যান। অফিসের কেউ কিছু বলতে পারল না। মেসেজ রাখতে চেয়েছিল। কিন্তু আমিও ওদেরকে কিছু বলতে সাহস করলাম না। কোন লোকটা বিশ্বাসঘাতক কে জানে! এখুনি আমাদের লস অ্যাঞ্জেলেসে চলে যাওয়া উচিত।

হ্যাঁ, তুড়ি বাজাল হ্যারি। লোকগুলো এখনও অফিসে না গিয়ে থাকলে ওদের আগেই আমাদের গিয়ে বসে থাকা উচিত। ঘাপটি মেরে থাকব। ওরা এলেই খপ করে ধরব।
ঠিক আছে, চীফ বললেন। বুদ্ধিটা মন্দ না। আমি লস অ্যাঞ্জেলেস পুলিশকে জানিয়ে দিচ্ছি। মিশন অফিসের ওপর নজর রাখুক ওরা। আপনারা যাওয়ার আগে যদি মিস্টার রিভস ফিরে আসেন তাহলে তাকেও যেন সতর্ক করে দেয়, বলে রাখব।

.

জানালাশূন্য, অন্ধকার, একটা ছোট ঘরে বসে রয়েছে কিশোর আর পিটার! কয়েক ঘণ্টা হলো এখানে এনে ওদেরকে ভরেছে কিডন্যাপাররা। ঘরটা পাহাড়ের ওপর। চারপাশ ঘন গাছপালায় ঘেরা। এই অন্ধকারে প্রায় কিছুই দেখতে পাচ্ছে না ওরা।
কোথায় এনেছে, কিশোর? পিটারের প্রশ্ন।
হলিউড হিলের কোথাও হবে, জবাব দিল কিশোর। কারও বাড়ির স্টোররুম কিংবা সেলার এটা। ঢোকানোর সময় আলো ছিল, ঘরটায় একবার নজর বোলাতে। পেরেছিল সে। শক্ত করে ওদেরকে বেঁধে রেখে গেছে, তাই বেরোনোর পথ। খোঁজার চেষ্টাও করতে পারছে না। যদিও কিশোরের ধারণা, খোলা রেখে গেলেও বিশেষ সুবিধে করতে পারত না। পথ নেই, দেখেছে ঢোকার সময়ই।
মানে আমাদেরকে কি করবে, বল তো? আবার প্রশ্ন করল পিটার।
তোমাকে কি করবে, বলতে পারি। যেভাবেই হোক আমেরিকা থেকে বের করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে, নানদায়। তবে এখানে যে কেন রেখে গেল বুঝতে পারছ না। যদি না…
কী, কিশোর?
যদি না কারও জন্যে অপেক্ষা করে। এমন কেউ, যে তোমাকে সনাক্ত করতে পারবে।
হুঁ, ঠিকই বলেছ। দুজনকে নেয়ার কোনও ইচ্ছেই ওদের নেই। ভাবছি, তখন তোমাকে কি করবে ওরা?
আমিও তাই ভাবছি, কিশোরের কণ্ঠে অস্বস্তি।

.

দুপুরের কড়া রোদ, রেজায় গরম। উইলশায়ার বুলভারের একটা অফিসের সামনে পাকিং লটে গাড়ি সেকালেন ইয়ান ফ্লেচার। বিশাল ক্যাডিলাকটা পুলিশের গাড়ির পাশে রাখল হ্যারি। চীফ গাড়ি থেকে বেরোতেই তাড়াহুড়া করে এগিয়ে এল লস অ্যাঞ্জেলেসের একজন পুলিশ।

মিস্টার রিভস ফেরেননি, চীফ, লোকটা জানাল। সন্দেহজনক কোনও লোককেও অফিসে ঢুকতে দেখিনি সারাক্ষণই চোখ রাখা হয়েছে অফিসের ওপর।
ওরা এখানে আসেনি, চীফ, মুসা বলল। ইমারজেন্সি সিগন্যালের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। কোনও সাড়া নেই যন্ত্রের।
বাড়ির ভেতরে ঢুকলে হয়ত সাড়া দিতে পারে, হ্যারি বলল।
দেখা দরকার, বলল কিং। চীফ, আমার মনে হয় আপনার এখানে থাকাই ভাল। অবশ্যই লুকিয়ে থাকতে হবে। কিডন্যাপাররা যাতে দেখতে না পায়।
দুই গোয়েন্দাকে নিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকল হ্যারি আর কিং। এলিভেটরে করে উঠে এল তিনতলায়, যেখানে রয়েছে মিশনের অফিস। বেশ সম্মান দেখিয়ে হ্যারি আর কিংকে স্বাগত জানাল রিসিপশনিস্ট মেয়েটা। রিভসের কথা জিজ্ঞেস করলে মাথা নাড়ল। কোনও খবর জানে না।
তাঁর অ্যাসিসটেন্ট মিস উলি জেসাপকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন, মেয়েটা জানাল। নানদার হস্তশিল্পের একটা প্রদর্শনী হচ্ছে, সেখানেও যেতে পারেন। তবে সারাদিন তো থাকার কথা নয়। ওরকম থাকেন না কখনও। মিস জেসাপ ফিরে এলেও জানা যেত মিস্টার রিভস কোথায় আছেন। সকাল থেকেই কয়েকবার করে দুজনের কাছে ফোন এসেছে, কোথায় গেছে জানতে চেয়েছে, জবাব দিতে পারিনি।
প্রচণ্ড ক্ষোভ প্রকাশ করার জন্যেই যেন আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল মেয়েটা, এই সময় ফোন রাজল। রিসিভার তুলে নিয়ে কানে ঠেকাল। ওখানে আর থাকার কোনও প্রয়োজন নেই। বেরিয়ে এল গোয়েন্দারা।
আপনারা বললেন মিশনে স্পাই আছে, মুসা বলল। স্পাইয়ের দরকার নেই। ওই একটা মেয়েই যে হারে কথা বলতে থাকে, সব গোপনীয়তা ফাঁস করে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট।
হয়ত, হাসল কিং। মেয়েটা কথা একটু বেশিই বলে। তবে আসল কথাটাই বলতে পারল না। আমরা যা জানতে চাই। রিভস কোথায়?
তার মানে, হ্যারি বলল। মিস্টার রিভস কোথায় আছেন একথা কিডন্যাপারদেরকেও বলতে পারবে না সে।
তা তো বুঝলাম। এখন কি করা? এলিভেটর দিয়ে নামতে নামতে প্রশ্ন রাখল রবিন।
অপেক্ষা আর আশা করা ছাড়া আর কি করার আছে? কিং বলল। বসে থাকব। দেখব কে আগে আসে। মিস জেসাপ, মিস্টার রিভস, নাকি কিডন্যাপাররা। এছাড়া আর তো কিছু ভাবতে পারছি না।

প্রচণ্ড গরমের মধ্যে পার্কিং লটে বসে বসে ঘামতে লাগল দুই গোয়েন্দা, দুজন। নানান আর কয়েকজন পুলিশম্যান। হতাশ হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে। ডায়ালের। দিকে তাকিয়ে থেকে চোখ ব্যথা করে ফেলল মুসা। একবারের জন্যেও জ্বলল না লাল আলো।
আর পারি না! অপেক্ষা অসহ্য হয়ে উঠেছে মুসার কাছে। কিশোর আর পিটারের সাংঘাতিক কিছু ঘটেছে। কি করে জানব, পিটারকে চেনে এরকম আর কাউকে খুঁজে বের করেনি কিডন্যাপাররা?
জানার উপায় নেই, ভয়ানক গম্ভীর হয়ে আছে হ্যারি। শুধু জানি ট্রেড মিশনই ওদের একমাত্র আশা। সেজন্যেই বসে থাকতে হবে।
অবশেষে, দুপুরের পরে, ওপরতলায় বসে যে শাদা পোশাকের পুলিশম্যানটি নজর রাখছিল, সে ওয়াকি টকিতে কথা বলল ইয়ান ফ্লেচারের সঙ্গে। কালো চুলওয়ালা এক মহিলা এই মাত্র ঢুকল। এখানকারই কেউ মনে হচ্ছে। তাকে খুঁজছেন না তো?
মিস জেসাপ! চেঁচিয়ে উঠল কিং। সে-ই হবে! গিয়ে দেখা দরকার।
আবার ওপরতলায় ছুটে এল গোয়েন্দারা। একই রকম হাসি দিয়ে স্বাগত জানাল রিসিপশনিস্ট। হাল্লো, আবার এসেছেন! ভাল। মিস্টার রিভসের কোনও খবর নেই। তবে মিস জেসাপ ফিরেছে। ওর সঙ্গে দেখা করবেন? মিস্টার রিভসের অফিসে আছে।
কোণের দিকে মিস্টার রিভসের অফিস। সেদিকে এগোতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল মুসা। কান পেতে শুনছে।
কি হয়েছে? জানতে চাইল রবিন।
অফিসে কথা শোনা যাচ্ছে। মিস জেসাপই বলছে হয়ত কারও সঙ্গে।
হ্যারিও কান পাতল। কই, আমি তো শুনছি না।
কি জানি, গাল চুলকাল মুসা। আমার ভুলও হতে পারে।
দরজায় টোকা দিয়ে ভেতরে ঢুকল ওরা। মিস্টার রিভসের ডেস্কের কাছে দাঁড়িয়ে কাগজপত্র ঘাঁটছে মিস ডলি জেসাপ। গায়ে সবুজ ব্লাউজ। পরনে ধূসর স্ল্যাকস। ওদেরকে দেখে চকচক করে উঠল চোখ, পিটারকে পেয়েছেন?
পেয়েছি, তিক্তকণ্ঠে বলল কিং। তারপর আবার হারিয়েছি।
হারিয়েছেন? ধীরে ধীরে ডেস্কের ওপর থেকে একটা কানের দুল, তুলে নিয়ে পরতে লাগল মিস জেসাপ।
সারাদিন কোথায় ছিলে, ডলি? হ্যারি জিজ্ঞেস করল। মিস্টার রিভসের সঙ্গে?
মাথা ঝাঁকাল ডলি।
পিটারের কথা কেউ তাকে জিজ্ঞেস করেছে?

না তো। কেন?
কিডন্যাপাররা পিটারকে ধরে নিয়ে গেছে। আমাদের ধারণা, কিং বলল। মিস্টার রিভসের কাছে যাবে ওরা পিটারকে সনাক্ত করার জন্যে…
সর্বনাশ! আঁতকে উঠল ডলি। মিস্টার রিভস তা পারবেন! ওরা তাঁকে ফাঁকি দিতে পারবে না। জলদি হুশিয়ার করে দেয়া দরকার!
তাকে পাব কোথায়?
ঘড়ি দেখল ডলি। দুটো জায়গার কোনও একটাতে হতে পারে। হ্যাঁণ্ডিক্র্যাফট ইমপোর্টার গিল্ড, কিংবা দি আর্টস অভ, আফ্রিকা। ওই দুটো জায়গায়। অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। বিকেল পাঁচটার আগেই সারতে হবে।
দেড় ঘণ্টা বাকি, হিসেব করে বলল হ্যারি। একসঙ্গে গেলে সময় পাব না। ভাগাভাগি হয়ে যেতে হবে।
জলদি চলুন, রবিন বলল।
দুটো জায়গার ঠিকানা লিখে দিল ডলি। দ্রুত অফিস থেকে বেরিয়ে এলিভেটরের দিকে চলল চারজনে। যে মুহূর্তে এলিভেটরের দরজা বন্ধ হলো, ঘুরে। তাকাল মুসা, মিস্টার কিং! ও মিথ্যে বলেছে! গাধা বানানোর চেষ্টা করেছে। আমাদেরকে।
.
মানে? বুঝতে পারল না রবিন।
কি করে বুঝলে? হ্যারির প্রশ্ন।
ভুল করছ তুমি, মুসা, কিং বলল। ওই মেয়েটাকে বহু বছর ধরে চিনি
না, ভুল আমি করছি না, দৃঢ় কণ্ঠে বলল মুসা। ডলি বলেছে মিস্টার রিভস তা পারবেন। আরও বলেছে, ওরা তাঁকে ফাঁকি দিতে পারবে না।
বিস্ময় ফুটল কিং-এর চোখে। ঠিকই তো বলেছে। আমরা সবাই সেটা জানি।
জানি। কিন্তু আমরা একবারও বলিনি ডলিকে যে পিটার আর আরেকটা ছেলেকে নিয়ে কোনও গোলমাল হয়েছে। বলিনি কিডন্যাপাররা দুজনকে ধরে নিয়ে গেছে। তাহলে কি করে জানল সে, বোকা বানানো হয়েছে কিডন্যাপারদেরকে? পিটারকে সনাক্ত করা দরকার?
চুপ হয়ে রইল অন্য তিনজন। এলিভেটর নিচে নামলে বেরিয়ে এল সবাই। অবশেষে হ্যারি বলল, ও ঠিকই বলেছে। ট্রেড মিশনের কেউই জানে না এ খবর। ডলি জানল কিভাবে?
মাথা ঝাঁকাল কিং। রকি বীচের বাইরে একমাত্র পুলিশ জানে। আর তারা নিশ্চয় ঢোল পিটিয়ে বলতে যাবে না ট্রেড মিশনের অফিসে। তার
এর একটাই মানে, মুসা বলল। ডিলির সঙ্গে কির্ডন্যাপারদের যোগাযোগ রয়েছে।

তা কি করে হয়? প্রশ্ন তুলল কিং। সারাটা দিন সে মিস্টার রিভসের সঙ্গে সঙ্গে ছিল।
সেটা তার মুখের কথা। প্রমাণ তো আর নেই।
মিস্টার রিভসকে জিজ্ঞেস করলেই সব জানা যাবে। ডলি মিছে কথা বলে থাকলে ফাঁস হয়ে যাবে।
এক মিনিট হাত তুলল রবিন। মুসার মনে হয়েছিল সে অফিসে কথা বলতে শুনেছে। আমরা শুনিনি। সে ভুল করেছে ভেবেছি। কারণ ডলি অফিসে একা, কার সঙ্গে কথা বলবে? ডেস্ক থেকে একটা কানের দুল তুলে তাকে পরতে দেখেছি। আমি যতটা জানি, কিশোরও অনেকবার বলেছে, টেলিফোনে কথা বলার সময়ই শুধু ওরকম ভাবে দুল খুলে নেয় মহিলারা। অস্বাভাবিক বড় দুল যারা পরে। কানে থাকলে রিসিভার চেপে ধরতে অসুবিধে হয়। হতে পারে টেলিফোনে কিডনাপারদের সঙ্গে কথা বলেছিল সে। মনে আছে, রিসিপশনিস্ট বলেছিল, সকাল থেকে অনেক ফোন এসেছে মিস জেসাপের কাছে? অনেকে নাকি খুঁজেছে। বাজি রেখে বলতে পারি এখন কিডন্যাপাররাই যোগাযোগ করতে চেয়েছে ডলির সঙ্গে।
কিং, মুসা বলে। আপনি বলছেন, অনেক বছর ধরে চেনেল ডলিকে। তার মানে তার সঙ্গে কাজ করেছেন। ডলি কি স্যার মনটেরোর সঙ্গেও কাজ করেছে? পিটারকে দেখলে চিনবে?
আমি শিওর না, ভ্রূকুটি করল কিং। অনেক বছর ধরে স্যার মনটেরোর অফিসে কাজ করেছে অবশ্য, তবে মিস্টার রিভসের মত তার পারিরারিক বন্ধু নয়! পিটারকে চিনতে পারবে কিনা জানি না। তবে বলাও যায় না। চিনেও ফেলতে পারে। ঈশ্বর, তাই তো, এখন মনে হচ্ছে সে-ই। পিটারের মেসেজটা তার হাত দিকেও বেরিয়ে যেতে পারে!
পার্কিং লটের দিকে দৌড় দিল চারজলে। ইয়ান ফ্লেচারকে জানাল সন্দেহের কথা।
ওকে ধরা দরকার। ফুঁসে উঠল হ্যারি। চাপ দিলেই...
না, রাজি হলেন না চীফ। লাভ হবে না। উগ্রবাদীদের দলে হলে ভীষণ শক্ত হবে। কিছুতেই মুখ খুলবে না। আপনাদেরকে ভুল জায়গায় পাঠাতে চেয়েছে। তার মানে সময় চেয়েছে সহকর্মীদের সঙ্গে কথা বলার জন্যে। দেখা করার জন্যেও হতে পারে। আর তা করলে সে-ই পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে আমাদের।
ঠিকই বলেছেন, মুসা বলল। সে ভাববে আমরা মিস্টার রিভসের সঙ্গে দেখা, করতে চলে গেছি। এই সুযোগে সে চলে যাবে কিডন্যাপারদের সঙ্গে কথা বলতে।

হ্যাঁ। আমি পুলিশকে বলে যাচ্ছি এখানে থেকে অফিসের ওপর নজর রাখতে, চীফ বললেন। তারপর আমার গাড়িতে করে তোমাদেরকে নিয়ে সরে যাব এখান থেকে, ডলি ভাববে আমরা চলে গেছি। ঘুরে আবার আরেক দিক দিয়ে চলে আসব। লুকিয়ে উঠে পড়ব ক্যাডিলাকে। ওকে অনুসরণ করব। আমাদেরকে পুলিশ কারে করে চলে যেতে দেখবে সে। কাজেই একটা ক্যাডিলাক পিছু নিলে খেয়াল করবে বলে মনে হয় না।
বুদ্ধিটা ভাল। সবারই মনে ধরল। চীফের কথামতই কাজ করা হলো
পনেরো মিনিট পর বেরিয়ে এল ডলি জেসাপ। একটা লাল পনটিয়াকে উঠল। গাড়িটাকে অনুসরণ করে চলল হ্যারি আর কিং-এর ক্যাডিলাক।

.

দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে চুপ করে বসে রয়েছে কিশোর আর পিটার। অনেকক্ষণ ধরে রয়েছে একই ভাবে।
আর আমাদের খুঁজে পাবে না তোমার বন্ধুরা, পিটার বলল।
পাবেই! আমি জানি, ওরা পাবেই! খুঁজে বের করবেই আমাদের!
হঠাৎ জ্বলে উঠল আলো। ক্ষণিকের জন্যে অন্ধ করে দিল যেন ছেলেদের। ভেতরে ঢুকেছে দুই কিডন্যাপার। কিশোরের দিকে এগিয়ে এল জন, পিটারের দিকে ডেভ। টান দিয়ে ছিঁড়ে ফেলল দুজনের শার্ট।
পিটারের দিকে তাকিয়ে ডেভ বলল, ভেরি গুড। খেল তাহলে খতম, অ্যাঁ?
কিশোরের দিকে তাকাল পিটার। তার পেটে ছোট একটা কাটা দাগ রয়েছে। কিশোরের তেমন দাগ নেই।
এবার কি বলবে? কিশোরের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে জন। ওরকম এক দাগ তোমার করে নেয়া উচিত ছিল।

.

হলিউড হিলের একটা ছোট বাড়ির ড্রাইভওয়েতে ঢুকল লাল পনটিয়াক। থামল। বেরিয়ে এল ডলি। দৌড়ে এগোল সিঁড়ির দিকে। সিঁড়ি বেয়ে উঠে পড়ল বারান্দায়। দুটো বাড়ি আগে একটা মোড়ে থেমে গেল ক্যাডিলাক। ইমারজেন্সি সিগন্যালের দিকে তাকাল মুসা।
না, কিছু নেই, হতাশ কণ্ঠে বলল সে। মনে হয় কিশোরের যন্ত্রটা পেয়ে গেছে কিডন্যাপাররা। অফ করে দিয়েছে। কিংবা ওরা এখানে নেইই।
তাহলে কি আমাদের ভুল হলো? নিজেকেই যেন প্রশ্ন করল হ্যারি।
না, জোর দিয়ে বলল মুসা। ওই মেয়েটা কিডন্যাপারদের দলেরই।
চল, কিং বলল। বাড়িতে ঢুকে পড়ি। তারপর যা হয় হবে।

গাড়ি রেখে হেঁটে এগোল দলটা। নিঃশব্দে দ্রুত চলে এল বাড়ির আঙিনায়। লম্বা লম্বা গাছ, লতা আর ঝোপঝাড়ের জঙ্গল হয়ে আছে বাড়ির চারপাশে। সামনের দরজার কাছে এসে কান পাতল ওরা। কথা শোনা গেল না। শুধু কাঠের। মেঝেতে ডলির হাই হিলের খটখট শব্দ। কলিং বেল বাজাল কিং! দরজা খুলে হাঁ হয়ে গেল ডলি।

এখানে কি? খেঁকিয়ে উঠল সে। পরক্ষণেই হাসল, অস্বস্তি আর ভয় মেশানো হাসি। সরে জায়গা করে দিল সবাইকে ঢোকার জন্যে। একটা লিভিং রুমে নিয়ে এল। মিস্টার রিভসকে পেয়েছেন? কিডন্যাপাররা তার কাছে গিয়েছিল?

তার সঙ্গে দেখা করতে যাইনি আমরা, হ্যারি বলল।

কারণ, কিং বলল। তার সঙ্গে দেখা করতে যাবার দরকার নেই কিডন্যাপারদের। পরে মনে হয়েছে আমাদের।

আপনাকে চুপ থাকতে অনুরোধ করব, শান্তকণ্ঠে ডলিকে সাবধান করলেন চীফ। কারণ বেফাঁস যা কিছু বলবেন এখন আদালতে সব যাবে আপনার বিরুদ্ধে।

ওরা কোথায়? ভুরু নাচাল মুসা। পিটার আর কিশোর?

কিডন্যাপারদের সঙ্গে কথা বলেছেন আপনি, রাগ চাপতে পারল না রবিন। জানি আমরা। ওরা কোথায়? কি করেছে কিশোর আর পিটারকে?

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত ওদের দিকে তাকিয়ে রইল ডলি। নিরাশ ভঙ্গিতে হাত ছড়াল দুপাশে। কি বলছ বুঝতে পারছি না। এই কিশোরটি কে? কোনও কিশোরকে তো চিনি না আমি? আর আমি কি করে জানব পিটার কোথায় আছে?

খুব ভাল করেই জান এখন তুমি, কড়া গলায় বলল কিং। কিশোর কে। আর পিটারের কি হয়েছে তা-ও জান, কারণ কিডন্যাপারদের দলেরই লোক তুমি।

আমি! হাঁ হয়ে গেল ডলি। আমি? মানে আমি পিটারের ক্ষতি করব? বহু বছর আমি স্যার মনটেরোর কাজ করেছি। আমি তার একজন শুভাকাঙ্ক্ষী।

কেন মিথ্যে বলছ? শান্ত কণ্ঠে বলল হ্যারি। চীফ, বাড়িটা খুঁজে দেখা দরকার।

তার জন্যে সার্চ ওয়ারেন্ট লাগবে। কঠিন হয়ে উঠল ডলির কণ্ঠ। তারপর কি ভেবে মনস্থির করে নিয়ে বলল, ঠিক আছে, দেখুন। যত খুশি দেখুন। আমার তো আর কিছু লুকানোর নেই। তবে মনে অনেক কষ্ট দিলেন আমাকে।

আমিও কি দিয়েছি? হ্যারি জিজ্ঞেস করল।

আপনি? পলকের জন্যে রাগে বিকৃত হয়ে গেল ডলির মুখ। তারপর জোর করে হাসল। হ্যাঁ, মিস্টার ম্যাকঅ্যাডাম, আপনিও দিয়েছেন।

কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, চীফ বললেন। খুঁজুন তো।

ছড়িয়ে পড়লেন চীফ, হ্যারি, রবিন, আর মুসা। লিভিং রুমে ডলির সঙ্গে রইল কিং।

এর জন্যে পস্তাতে হবে আপনাকে, কিং, শাসিয়ে বলল ডলি। কিডন্যাপারদের ব্যাপারে কিছু জানি না আমি। কিংবা ওই দুটো ছেলের ব্যাপারে।
ছেলে যে দুটো কি করে জানলে?
একটু আগেই তো বললেন কিশোর নামে আরও একটা ছেলে রয়েছে।
না, কিশোর নামে আরেকটা ছেলে রয়েছে ওভাবে একবারও বলিনি। ছেলে কেন, বয়স্ক মানুষও হতে পারে কিশোর। কিন্তু তুমি একেবারে নিশ্চিত ভাবে বলে দিলে সে ছেলে। তারমানে তুমি জান। এই নিয়ে দুবার মুখ ফসকাল তোমার। একবার অফিসে, একবার এখানে। তা কিডন্যাপারদেরকে চিনিয়ে দিয়েছ নাকি, পিটার কোনজন?
আর একটা কথাও বলতে চাই না আপনার সঙ্গে।
ভেতরের একটা ঘর থেকে বেরিয়ে এল রবিন আর হ্যারি। আরেক দিক থেকে এলেন ফ্লেচার আর মুসা। ডলির মুখোমুখি দাঁড়াল রবিন। কিছু কথার জবাব দিতে হবে আপনাকে, মিস জেসাপ।
ছেলেদেরকে দিয়েও আমাকে অপমান করাতে চান নাকি? কিং-এর দিকে। তাকিয়ে অভিযোগের সুরে বলল ডলি।
কিং কিছু বলল না। রবিন তার কথা বলে গেল, আমার বন্ধু কিশোর বলে, ছোটখাট ব্যাপারও অবহেলা করতে নেই গোয়েন্দাগিরিতে। যাই হোক, আপনি একজন নানদান। এবং আমার বিশ্বাস, ওখানকার জুয়েলারি আপনার খুব পছন্দ।
কি বকবক করছে এই ছেলেটা? কিং-এর দিকে তাকিয়ে ধমকের সুরে বলল ডলি। দেখুন, আমি আপনাকে হুঁশিয়ার করছি…
পকেট থেকে হাত বের করল রবিন। হাতে হাতির দাঁতের তৈরি ছোট একটা গহনা। কানে পরার জন্যে। বলল, এটা আপনার বেডরুমে পেয়েছি, মিস জেসাপ। কানের দুল, তাই না? নানদার মেয়েরা পরে। মাত্র একটাই আছে। আরও একটা থাকার কথা ছিল, নেই। কারণ ওটা হারিয়ে গেছে। আবার পেয়েছি। সেই বক্স ক্যানিয়নে, যেখানে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল কিশোরকে। কিডন্যাপারদেরকে তুলে নেয়ার জন্যে ওখানে নেমেছিল হেলিকপ্টারটা।
হাতির দাঁতের তৈরি খুদে হাতির দাঁতটার দিকে তাকিয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। ডলির মুখ।
কিশোর বলে, বলতে থাকল রবিন। কোনও মহিলাই তার পছন্দের জিনিস ফেলে না, বিশেষ করে গহনা। একটা দুল হারিয়ে গেলে আরেকটা পরা যায় না, তবু রেখে দেয়। মহিলাদের স্বভাব। আপনিও মহিলা। একটা হারিয়ে এসেও আরেকটা ফেলতে পারেননি। আপনি স্যার মনটেরোর শত্রু, মিন্স জেসাপ। সেদিন

ক্যানিয়নে আপনিই হেলিকপ্টার নিয়ে গিয়েছিলেন। পাইলট ছিলেন আপনিই। তখনই কোনভাবে আপনার কান থেকে দুলটা খুলে পড়ে গিয়েছিল।

খাইছে! বলে উঠল মুসা। ফ্লাইং স্যুট আর গগলসের আড়ালে লুকিয়ে ছিল। একজন মহিলা!

ও-ই পাইলট ছিল কিনা, চীফ বললেন। সেটা শিওর হতে হবে আমাদের।

তা হওয়া যাবে, কিং বুলল। যাদের কাছ থেকে হেলিকপ্টার ভাড়া নিয়েছিল তাদের কাছে গেলেই হবে। নিশ্চয় কণ্ঠস্বর চিনতে পারবে ওরা।

আর কানের দুলটা তো আছেই, হ্যারি বলল। প্রমাণ।

জ্বলন্ত চোখে ওদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে ডলি। ঘৃণা আর রাগ ছড়িয়ে পড়েছে মুখে। আচমকা হেসে উঠল খিলখিল করে, বেশ, আমিই পাইলট ছিলাম, হেলিকপ্টার চালিয়েছি। স্বীকার করছি। তাতে দোষের কি আছে? আমি একজন নানদান। দুশো বছর ধরে ওখানে বাস করছে আমার বাপ-দাদারা।

আর আমরা বাস করছি দুহাজার বছর ধরে, বলল কালো চামড়ার নানদান, হ্যারি। আমরা তোমাদেরকে দয়া করে জায়গা দিয়েছি আমাদের দেশে, নানদা বলে মেনে নিয়েছি। কিন্তু ওটা আমাদের দেশ।

–কক্ষণো না! হিঁসিয়ে উঠল ডলি।

চীফ বললেন, আপনাদের দেশ, আপনাদের পলিটিকস, সেটা আপনাদের ব্যাপার। ওসব নিয়ে আমাদের কোনও মাথাব্যথা নেই। এটা নানদা নয়; আমেরিকা। এখানে এসে দুটো ছেলেকে কিডন্যাপ করেছেন। ভলির দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি এখন কিডন্যাপারদের একজন। সেই বিচার হবে, শাস্তি আপনাকে মেনে নিতেই হবে। সাংঘাতিক কঠোর হয়ে উঠল তার কণ্ঠ, ছেলেদুটো কোথায়? পিটার আর কিশোর?

ছিল এখানেই, ডলি জবাব দিল। এখন নেই। জন আর ডেভ এসে নিয়ে গেছে।

কোথায়? জানতে চাইল কিং।

সেটা কোনদিনই তোমাকে বলব না আমি। পিটার এখন আমাদের কব্জায়। স্যার মনটেরোকে যা করতে বলব তাই করতে বাধ্য হবেন তিনি।

না, অত আশা কোরো না। তিনি কোনদিনই তোমাদের কথা শুনবেন না। নিজের ছেলের প্রাণের বিনিময়েও না। যা ভাল বুঝবেন তাই করবেন। তার কাছে সব চেয়ে বড় নানদার ভবিষ্যৎ।

বানিজি একমাত্র ছেলের জীবনের ঝুঁকি নেবেন?

নেবেন। আরও বড় ঝুঁকি হলেও নেবেন, হ্যারি বলল।

চীফ রেগে গেলেন, জাহান্নামে যাক নানদা। আমি এখানকার পুলিশ। আমেরিকার। আমেরিকায় বসে কিডন্যাপিঙের মত মস্ত একটা অপরাধ করেছেন আপনি, মিস জেসাপ। ভাল চান তো ছেলেগুলো কোথায় আছে বলুন।
আমি একজন সৈনিক, দেশপ্রেমিক, জবাব দিল ডলি। কিডন্যাপার নই। কিছুতেই মুখ খোলাতে পারবেন না আমার। ওদেরকে নিয়ে চলে গেছে জন আর ডেভ। ওদেরকে ধরার সাধ্য নেই আর আপনাদের।
চীফের মুখের ওপর হেসে উঠল সে। পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগলেন চীফ হ্যারি, কিং, রবিন আর মুসা। ডলি মুখ না খুললে কি করে জানা যাবে পিটার আর কিশোর কোথায় আছে? সবাই কিছুটা হতাশ, রবিন বাদে। চিন্তিত ভঙ্গিতে তাকিয়ে রয়েছে ডলির দিকে। এখানে কিডন্যাপাররা না এসে থাকলে কি করে জানবে কে কিশোর আর কে পিটার? ধীরে ধীরে বলল সে। নিশ্চয় মিস জেসপি বলেছেন ওদেরকে টেলিফোনে।
হেসে উঠল ডলি। অবশ্যই বলেছি। সহজ ব্যাপার। পিটারের পেটে ছোট একটা কাটা দাগ আছে। কয়েক বছর আগে, অ্যাপেনডিক্স অপারেশন করা হয়েছিল তার।
বুঝলাম, মাথা ঝাঁকাল রবিন। তবে সেটা নিয়ে ভাবছি না। আমি ভাবছি জন আর ডেভ যদি মিস জেসাপ আসার আগেই চলে গিয়ে থাকে তাহলে তিনি এত তাড়াহুড়া করে অফিস থেকে চলে এলেন কেন? আসারই বা কি প্রয়োজন ছিল? জবাব একটাই। ফোনে সঙ্গীদের বলে দিয়েছেন, কিভাবে পিটারকে সনাক্ত করতে হবে। ওরা তখন পিটারকে চিনে নিয়ে পালানোর ব্যবস্থা করতে লাগল। মিস জেসাপও চলে এলেন। নিশ্চয় কোনও জরুরী কাজ আছে।
ঠিক, একমত হয়ে মাথা দোলালেন চীফ। রবিন ঠিক বলেছে। নইলে এত তাড়াহুড়া করে অসময়ে বাড়ি আসতে যাবেন কেন মিস জেসাপ?
এটা আমার বাড়ি, কর্কশ কণ্ঠে বলল ডলি। যখন খুশি আমি আসতে পারি এখানে।
তা পারেন, রবিন স্বীকার করল। তবে, এত তাড়াহুড়া কেন? আমার কি মনে হয় জানেন? পিটারকে নিয়ে চলে যাবে আপনার বন্ধুরা। কিশোরকে ফেলে যাবে। তাকে পাহারা দিতেই আপনার এই আসা।
কিশোর? ভরু কোঁচকালেন চীফ।
হ্যাঁ, ঠিক! তুড়ি বাজাল হ্যারি। অহেতুক নানদায় বয়ে নিয়ে যাবে না ওরা কিশোরকে। ওদের দরকার পিটারকে। একলা তাকেই নেবে। দুটো ছেলেকে নিয়ে যাওয়ার ঝুঁকি বেশি।
তা। তার মানে এখানেই আছে এখনও কিশোর! বলে উঠল মুসা।

খোঁজ, খোঁজ, আবার খোঁজ নির্দেশ দিলেন চীফ।
এবার ডলির পাহারায় রইল হ্যারি। অন্যেরা ছড়িয়ে গেল খোঁজার জন্যে। প্রতিটি ঘর, প্রতিটি আলমারি, মোট কথা একজন মানুষ লুকিয়ে থাকার মত যত জায়গা আছে সব খুঁজে খুঁজে দেখতে লাগল। বেশিক্ষণ লাগল না সব দেখতে। কিশোরের চিহ্নও দেখতে পেল না।
বাইরে দেখা দরকার, কিং বলল। গ্যারেজে। ছাউনি-টাউনিও থাকতে পারে।
ওদেরকে বাইরে বেরোতে দেখে মুচকি হাসল ডলি। গ্যারেজ বাদে ছোট একটা ছাউনি আছে। ছাউনির ভেতরে পাওয়া গেল শুধু বাগান করার যন্ত্রপাতি। গ্যারেজের ভেতরে কিছুই না। বাড়ির আশপাশে পাহাড়ের অনেকখানি জায়গা খুঁজে দেখল মুসা। কিশোরের চিহ্নও পেল না।
আবার ঘরে ফিরে এল দলটা।
টিটকারির সুরে ডলি বলল, বলেছিলাম না, নেই। পাবে না। কিং, হ্যারি স্বীকার করতেই হলো তোমাদেরকে। পরাজয় মেনে নিতে লজ্জা কিসের? দেখো, তোমাদের স্যার মনটেরোকেও কব্জা করে ছাড়ব আমরা।
আবার খোঁজ! কিছুতেই পরাজয় মেনে নিতে রাজি নন ইয়ান ফ্লেচার। রাগে পিত্তি জ্বলছে তাঁর, কিন্তু কিছুই করার নেই। কথা আদায় করা যাচ্ছে না ডলির মুখ থেকে, রাগটা তার এ জন্যেই।
অন্ধকার হয়ে আসছে। বাড়ির চারপাশে গাছপালা ভেতরে ঢুকতে দিচ্ছে না শেষ বিকেলের রোদ। বিছানার নিচে আর আলমারিগুলোতে আবার খোঁজার জন্যে আলো জ্বেলে নিতে হল।
চীফ! চেঁচিয়ে উঠল মুসা।
মিটমিট করতে শুরু করেছে বাল্বগুলো।
কি ব্যাপার? অবাক হয়েছে হ্যারি। বৈদ্যুতিক গোলমাল?
জ্বলছে নিভছে...জ্বলছে নিভছে...কিছুতেই ঠিক হতে চাইছে না যেন আলো।
আকাশ তো ভালই, জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে বলল রবিন। আবহাওয়ার জন্যে এরকম হচ্ছে না। গরমও তেমন নেই যে সার্কিটে ওভারলোড হয়ে যাবে।
জ্বলছে নিভছে...জ্বলছে নিভছে...নিয়মিত।
যেন ইচ্ছে করে করছে কেউ, কিং অনুমান করল। মাস্টার সুইচ নিয়ে কিছু করছে না তো? কিংবা ফিউজ...
নিশ্চয় কিশোর! আবার চেঁচিয়ে বলল মুসা। সংকেত দেয়ার চেষ্টা করছে! আশপাশেই আছে কোথাও!
কিন্তু কোথায়? ঘরের চারপাশে তাকাতে লাগলেন চীফ। সমস্ত জায়গায়ই তো খোঁজা হয়েছে।

ওই মহিলা জানে! ডলির দিকে আঙুল তুলে বলল রবিন।
হাসি মুছে গেছে ডলির মুখ থেকে।
চীফ, মুসা বলল। ঢালের ওপর তৈরি হয়েছে বাড়িটা। পেছন দিকের ভিত মাটিতে গড়া হয়েছে, কিন্তু সামনের দিকটা পিলারের ওপর। মেঝের নিচে ফাঁকা জায়গা আছে। গোপন সেলার-টেলার থাকলে অবাক হব না।
ছুটে বেরিয়ে গেল মুসা। ফিরে এল একটু পরেই। জানাল, কংক্রীটের ভিতের ওপর তৈরি হয়েছে বাড়িটা। বিরাট একটা বাক্সের মত হয়ে আছে নিচেটা। ভেতরে ফাঁকা থাকতেই পারে। তবে ঢোকার পথ দেখলাম না।
বাইরে না থেকে থাকলে, রবিন বলল। ভেতরে আছে।
সরাও! নির্দেশ দিলেন চীফ। সমস্ত কার্পেট সরিয়ে ফেলো। বিছানার নিচে আবার দেখো। ট্র্যাপডোর থাকতে পারে। আলমারির ভেতরেও গোপন দরজা থাকতে পারে।
বেডরুমের সব চেয়ে বড় আলমারিটাতে পথ পেয়ে গেল রবিন। আলমারির নিচে। একটা ট্র্যাপডোর। সরু মই নেমে গেছে নিচের অন্ধকারে।
আলমারির ভেতরেই আলোর সুইচ খুঁজে পেল মুসা। জ্বেলে দিল। নিচের সেলারে জ্বলতে নিভতে আরম্ভ করল একটা বাল্ব। মই বেয়ে দ্রুত নেমে এল ওরা জানালাশূন্য একটা ঘরে। অনেক মদের বোতল আর বাতিল আসবাব পড়ে রয়েছে। আর রয়েছে…
কিশোর! চিৎকার করে বলল রবিন।
কিশোর? মুসাও চেঁচাল।
খুদে সেলারের দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে রয়েছে গোয়েন্দাপ্রধান। পিঠের ওপর নিয়ে গিয়ে হাত বেঁধেছে। মুখে কাপড় গোঁজা। পুরনো ধাচের একটা সুইচ বক্সের হাতলে পা ঠেকানো। মাস্টার সুইচের হাতলে লাথি মারলেই নিভে যাচ্ছে আলো, আবার জ্বলে উঠছে।
আমরা বুঝেছি, মুসা বলল, তুমিই সংকেত দিচ্ছ।
তাড়াতাড়ি কিশোরের মুখের কাপড় খুলে নিল রবিন। বাঁধন খুলে দিল।
তোমাদের কথা অনেকক্ষণ থেকেই শুনছি, কিশোর বলল। খোঁজাখুঁজি করছ তা-ও বুঝতে পারছিলাম। শেষে তো ভয়ই হচ্ছিল, পাবে না ভেবে…
তুমি সংকেত দেয়াতে ভাল হয়েছে, মুসা বলল।
নইলে সত্যিই হয়ত পেতাম না, বলল রবিন। তবে মুসা আন্দাজ করে ফেলেছিল, সেলারে আটকে রাখা হয়েছে তোমাকে।
দুর্বল ভঙ্গিতে হাসল কিশোর। এখন বলে ফেল তো, কি করে এখানে এসে খুঁজে বের করলে আমাকে?

সংক্ষেপে তাকে সব কথা জানাল রবিন আর মুসা।
চমৎকার! প্রশংসা করল কিশোর। ভাল গোয়েন্দা হয়ে উঠেছ তোমরা ইদানীং। ভেরি গুড।
কিশোরের প্রশংসা পাওয়া খুব কঠিন। খুশি হল দুই সহকারী। একনাগাড়ে বসে থেকে থেকে হাত-পা ঝিমঝিম করছে কিশোরের। তাকে মই বেয়ে উঠে বেরোতে সাহায্য করল রবিন আর মুসা। নিয়ে এল লিভিং রুমে। তার পিঠ চাপড়ে দিলেন ইয়ান ফ্লেচার।
তুমি ভাল আছ, কিশোর? কিং বলল, সত্যিই খুব খুশি লাগছে। তোমার কিছু হয়ে গেলে নিজেকে ক্ষমা করতে পারতাম না।
রবিন আর মুসার কাছে তোমার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত, হেসে বললেন চীফ।
হয়েছি। চারপাশে চোঁখ বোলাচ্ছে কিশোর। পিটার কোথায়? তাকে নিয়ে গেছে নাকি কিডন্যাপাররা?
মাথা ঝাঁকাল হ্যারি।
তোমাদের ছাগল পেয়েছ, রবিন আর মুসার দিকে তাকিয়ে কুৎসিত হাসি হাসল ডলি। এবার কেটে পড়তে পারো। জন আর ডেভকে ধরার চেষ্টা করলে অহেতুক সময় নষ্ট করবে। পিটারকে হাতে পেয়েছে ওরা। হাওয়া হয়ে গেছে এতক্ষণে।
সবাইকে নিরাশ মনে হলো, বিশেষ করে কিং আর হ্যারিকে। কেবল কিশোরের মুখে কোনও ভাবান্তর নেই। ডলির দিকে তাকিয়ে হাসল। দাঁড়ান, ছাগলই ভেড়া বানাবে আপনাদের। হাওয়া হয়ে গেছে বলছেন তো। পারবে না। আমি কিশোর পাশা থাকতে অন্তত না।

.

লস অ্যাঞ্জেলেস পুলিশকে খবর দিলেন ইয়ান ফ্লেচার। তারা এসে গ্রেপ্তার করল ডলিকে। তারপর কিশোরের তথ্যের ওপর ভিত্তি করে, স্যান ডিয়েগো পুলিশকে রেডিওতে খবর পাঠাল। নানদানদের ক্যাডিলাকটা ছুটে চলল মেকসিকো সীমান্তের দিকে।
এখন বল তো, কিশোর, চীফ জিজ্ঞেস করলেন। পিটারকে নিয়ে যাওয়া ঠেকাব কি করে?
ঠিক বলতে পারছি না এখনও। তবে সুযোগ আছে। পিটারকে সনাক্ত করার পর তাকে ওপরে তুলে নিয়ে গেল। তারপর ওদেরকে ফোনে কথা বলতে শুনেছি।
কার সঙ্গে?
ওদের সহকর্মীদের সঙ্গে, আমার বিশ্বাস। সহকারীরা রয়েছে মেকসিকোর টিজুয়ানায়। ওরা বলল, এবার পিটারকে ধরেছে, কোনও সন্দেহ নেই। আর প্ল্যান মোতাবেকই বেরিয়ে যাবে।

প্লানটা কি?
জানি না। ও সম্পর্কে কিছু বলেনি ওরা।
তাহলে কি করে…? বলতে গিয়ে বাধা পেল কিং।
কয়েকটা সূত্র আছে আমাদের হাতে, কিশোর বলল। কিডন্যাপাররা মেকসিকো সীমান্তের কাছে টিজুয়ানায় কারও সঙ্গে দেখা করবে। টিজুয়ানা দিয়ে মেকসিকো সীমান্ত পার হবে ওরা।
কিন্তু সেটা কখন? জিজ্ঞেস করলেন চীফ। যে কোনও সময় পেরোতে পারে ওরা।
ওরা বলেছে স্যান ডিয়েগোতে কাজ আছে ওদের। সীমান্ত পেরোনোর আগে কিছুক্ষণ থামবে ওখানে। সীমান্ত পার হবে রাত দশটায়।
আর ঠিক ওই সময় আমরা গিয়ে বসে থাকব ওখানে! কিং বলল। ভালই হবে, খুব ভাল। ভাবছি
ওদের প্ল্যান জানার আমাদের কোনও দরকার নেই, চীফ বললেন। কার সঙ্গে দেখা করবে সেটাও জানা লাগবে না। ওসব ছাড়াই ওদেরকে আটক করতে পারব আমরা।
সে রকমই আশা করছি, কিশোর বলল।
কিশোর, রবিন জিজ্ঞেস করল। পিটারকে নিয়েই সীমান্ত পেরোবে তো? মানে, এতটা খোলাখুলি যাওয়ার সাহস করবে? ছদ্মবেশ নেবে না তো? কিংবা পিটারকে লুকিয়ে রাখার ব্যবস্থা?
তাই তো। মুসা কথাটা ধরল। পুলিশ যে ওদের পিছে লাগতে পারে এটা না বোঝার মত বোকা নিশ্চয় নয় ওরা। সীমান্তেও কড়া নজর রাখা হতে পারে, এই সন্দেহও করতে পারে ওরা।
তা পারে, মাথা দোলাল কিং। তাহলে চিনব কি করে ওদেরকে? পুলিশই বা বুঝবে কিভাবে?
সেটা আমাদের কাজ, আশ্বস্ত করলেন্ত চীফ। ছদ্মবেশী লোককে কি করে চিনতে হয়, সে ব্যাপারে ট্রেনিং আছে আমাদের।
নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। গভীর চিন্তায় ডুবে গেছে। দক্ষিণে ছুটে চলেছে ক্যাডিলাক। স্যান ডিয়েগোতে পৌঁছতে পৌঁছতে অন্ধকার হয়ে গেল। নটার বেশি বেজেছে। সোজা সীমান্তের দিকে যেতে দেখল স্যান ডিয়েগো পুলিশের দুটো পেট্রল কারকে।
আধ ঘণ্টা সময় আছে আমাদের হাতে, ঘড়ি দেখে বলল কিশোর। তার পরে যে কোনও মুহূর্তে সীমান্ত পেরোনোর চেষ্টা করতে পারে কিডন্যাপাররা।
ওরা, কিছুটা হতাশার সুরেই বলল মুসা। এবং আরও হাজারও মানুষ। সব সময়ই পেরোয়।

অনেকগুলো লেন এগিয়ে গেছে সীমান্তের দিকে। অসংখ্য গাড়ি, বাস, আর ট্রাকের সারি যেন স্রোতের মত এগিয়ে চলেছে সেদিকে সবাই সীমান্ত পেরোবে। প্রতিটি গাড়ির প্রায় বাম্পারে বাম্পারে লেগে যাচ্ছে, এতই কাছাকাছি। চেক পয়েন্টের দিকে এগোচ্ছে। চেক হয়ে যাওয়ার পর ঢুকে পড়ছে মেকসিকোতে।
এগুলোর মাঝে কি করে চিনবেন ওদেরকে চীফ? কিং-এর প্রশ্ন।
লোকগুলোর চেহারার বর্ণনা বর্ডার গার্ডকে দিয়ে দিয়েছে স্যান ডিয়েগো পুলিশ। ওদের লিংকন গাড়িটার বর্ণনা। এবং অবশ্যই পিটারেরও। মেকসিকান পুলিশ কড়া নজর রাখবে। সন্দেহজনক লোক দেখলেই প্রশ্ন শুরু করবে।
আর আমরা তখন কি করব? হ্যারি জানতে চাইল।
বসে বসে নজর রাখব।
রাস্তার পাশে এমন জায়গায় গাড়ি রাখা হলো, যাতে একযোগে সমস্ত লেনগুলো চোখে পড়ে। স্যান ডিয়েগো পুলিশের একটা গাড়িকে দেখা গেল সেন্টার বর্ডার বুদের কাছে। আরেকটা বেশ কিছুটা দূরে। সময় কাটছে। দশটা বাজতে দশ।
দেখুন। হাত তুলল কিং.। একটা নীল লিংকন!
সীটের একেবারে কিলারে বসে গলা বাড়িয়ে তাকিয়ে রয়েছে ক্যাডিলাকের দর্শকরা। বিরাট নীল গাড়িটা ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগিয়ে চলেছে চেক পয়েন্টের দিকে। ভেতরে উঁকি দিল সীমান্ত প্রহরীরা। ওদের পেছনে দাঁড়িয়ে সতর্ক নজর রাখল স্যান ডিয়েগো পুলিশ। অনেকক্ষণ কথা বলল প্রহরীরা। তারপর সরে হাত নেড়ে বেরিয়ে যেতে নির্দেশ দিল গাড়িটাকে।
ওরা নয়! গুঙিয়ে উঠল মুসা। কি।
হলে এমন ছদ্মবেশ নিয়েছে, হ্যারি বলল পুলিশ চিনতে পারেনি। ধোঁকা খেয়েছে।
ছদ্মবেশে ওদেরকে ফাঁকি দিতে পারবে বলে মনে হয় না আমার, মাথা নাড়লেন চীফ। বর্ডার গার্ডেরা এমনিতেই ভীষণ সতর্ক আর চালাক। তার ওপর হুঁশিয়ার করে দেয়া হয়েছে। তিনগুণ সতর্ক হয়ে গেছে ওরা। পিটারের বয়েসী কাউকে দেখলে সহজে ছাড়বে না। দরকার হলে গাড়ি থেকে নামিয়ে নিয়ে পরীক্ষা করবে।
কিন্তু কিডন্যাপাররা কি সেটা জানে না? রবিন প্রশ্ন তুলল।
নিশ্চয় জানে, রবিন, জবাবটা দিল কিশোর। সেজন্যেই লুকিয়ে বেরোনোর চেষ্টা করবে। এমন কোনও গাড়িতে করে যেটা নিয়মিত সীমান্ত দিয়ে যাতায়াত করে, এবং যেটার দিকে প্রহরীদের নজর কম।
যেন নিজেকেই প্রশ্ন করল, ওই বাসগুলোর মত?
দুটো বাস এগিয়ে গিয়ে থামল চেক পয়েন্টের কাছে। ওগুলোতে উঠল স্যান ডিয়েগো পুলিশ। ক্যাডিলাকের দর্শকেরা দেখতে পেল সীটের সারির মাঝখান

দিয়ে ধীরে ধীরে এগোচ্ছে পুলিশেরা। প্রতিটি যাত্রীর চেহারা দেখছে। নেমে এল এক সময়। হাত নেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিল বাসদুটোকে।
নাহ, হবে বলে মনে হচ্ছে না, হ্যারির কণ্ঠে হতাশা।
আমি.. আমি আশা ছাড়তে পারছি না, কিশোর বলল। তাকিয়ে রয়েছে গাড়ির লম্বা সারিগুলোর দিকে। একে একে এগিয়ে যাচ্ছে ওগুলো চেক পয়েন্টের দিকে। চেক হয়ে গেলে বেরিয়ে গিয়ে ঢুকে পড়ছে মেকসিকোতে।
দশটা বাজতে দুই মিনিট।
বেরিয়ে যায়নি তো! আর আত্মবিশ্বাস রাখতে পারলেন না চীফ। মেকসিকো পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করা দরকার...
জোরাল একটা টিইপ টিইপ যেন ভরে দিল ক্যাডিলাকের ভেতরটা। চমকে উঠল সবাই। সব কটা চোখ ঘুরে গেছে মুসার দিকে। শব্দটা আসছে তার শার্টের পকেট থেকে।
ইমারজেন্সি সিগন্যাল! চিৎকার করে বলল সে।
অফ কর ওটা, চীফ বললেন। এখন এসব গোলমাল...
না না, কর না! হাসল কিশোর। ওটাই তো আসল। বের করো পকেট থেকে। দেখো, তীরটা কোন দিক নিদের্শ করছে। কিডন্যাপাররা কাছাকাছিই রয়েছে।
যন্ত্রটা বের করে ডায়ালের দিকে তাকাল মুসা। গাড়ির সারির দিকে নির্দেশ করে রয়েছে তীরটা। ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে যানবাহনগুলো। ওগুলোর মাঝে একটাও নীল লিংকন নেই। আর কোনও বাসও নেই। শুধুই গাড়ি আর গাড়ি। চার-পাঁচটা ট্রাক আর ভ্যানও রয়েছে।
আসুন! নামুন সবাই! বলতে বলতে নেমে পড়ল কিশোর।
যানবাহনের সারির দিকে এগোল ওরা। মাঝের লেনে একটা পুরনো ট্রাক রয়েছে। মেকসিকোর লাইসেন্স প্লেট। দুপাশে মলিন অক্ষরে স্প্যানিশ ভাষায়, লেখা রয়েছে মেকসিকোর একটা লেটুস ফার্মের নাম। বর্ডার বুদের দিকে এগোচ্ছে। ওটা। মুসার ডায়ালের কাটা সোজা মুখ করে রয়েছে ওটার দিকে।
ওটাই! চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। জলদি আসুন!
আগে আগে ছুটছেন এখন চীফ। বুদের সামনে গিয়ে থামল ট্রাকটা। তিনিও পৌঁছে গেলেন এই সময়। ট্রাকের পেছনের ক্যানভাসের ঢাকনা তুলল গার্ড। ভেতরে তাকিয়ে মাথা নাড়ল। স্যান ডিয়েগো পুলিশকে ইশারা করল গাড়িটা ছেড়ে দেয়ার জন্যে।
না। চিৎকার করে বলল কিশোর। এই ট্রাকেই আছে ওরা।
মাথা নাড়ল প্রহরী। সরি, ইয়াং ম্যান, ওতে কেউ নেই। পেছন দিকটা খালি। শুধু ড্রাইভিং সীটে ড্রাইভার। মেকসিকোর লোক।

হতেই পারে না, জোর তর্ক শুরু করল কিশোর। শুনছেন, আমাদের সিগন্যাল কত জোরে বাজছে?
যানবাহনের শব্দকে ছাপিয়ে টিপ টিপ করছে যন্ত্রটা। কিং আর ইয়ান ফ্লেচার গিয়ে ক্যানভাস তুলে দেখলেন। পেছনটা পুরো খালি।
তোমার সিগন্যাল নিশ্চয় কোনও গোলমাল করছে, কিং বলল।
ট্রাকের শূন্য পেছনটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। একপাশে চলে এল। দেখল ট্রাকের সে পাশটা চকচক করে উঠল চোখ। না, মিস্টার কিং, আমাদের সিগন্যাল ঠিকই কাজ করছে। ট্রাকের ভেতরটা দেখুন। বেখাপ্পা লাগছে না বডিটা? বাইরের দেয়ালের ভেতরে আরেকটা দেয়াল আছে। মাঝখানটায় ফাঁপা।
স্যান ডিয়েগোর দুজন পুলিশকে নিয়ে লাফিয়ে ট্রাকের পেছনে উঠলেন ইয়ান ফ্লেচার। দেয়ালটা পরীক্ষা করে মাথা নাড়লেন। কিশোর, দরজা-টরজা কিছু নেই।
থাকার কথাও নয়, জবাব দিল কিশোর। এত বোকা নয় কিডন্যাপাররা। ওরা ভেতরে ঢোকার পরই নিশ্চয় ভেতরের দেয়ালটা লাগান হয়েছে। স্যান, ডিয়েগোতে থেমেইছিল সেজন্যে। এটাই ছিল ওদের জরুরী কাজ। দেয়াল খুলে আনতে হবে।
সাবধান, চীফ, হুঁশিয়ার করল হ্যারি। ওরা ভয়ংকর লোক। অস্ত্র আছে।
ট্রাকের দেয়াল ঘেঁষে বসে পড়তে ইশারা করলেন চীফ পুলিশ দুজনকে। পিস্তল বের করলেন। দেয়ালে লাথি দিয়ে বললেন, ব্যস, হয়েছে, এবার বেরিয়ে এসো। হাত তুলে। কিছু করার চেষ্টা করলে মরবে।
কোনও সাড়া এল না। শুধু যানবাহনের ইঞ্জিনের গুঞ্জন চলছে একটানা। আর মুসার সিগন্যালের জোরালো শব্দ।
কড়া গলায় আবার আদেশ দিলেন ফ্লেচার।
কয়েক সেকেণ্ড নীরবতা। তারপর মড়মড় করে কাঠ ভাঙার শব্দ হলো। ভেঙে খুলে গেল দেয়াল। হাত তুলে বেরিয়ে এল জন আর ডেভ। ওই যে কিশোর বলেছিল, ভেড়া বানিয়ে ছাড়বে, ভেড়াই বনে গেছে যেন ওরা।
কিশোরের ওপর চোখ পড়ল ডেভের। জিজ্ঞেস করল, তুমি! এত তাড়াতাড়ি বেরোলে কি করে? ট্রাকটা চিনলে কি করে?
চুপ! ধমক দিয়ে বললেন চীফ। অত কথার দরকার নেই! ওদের পিস্তলগুলো কেড়ে নিলেন তিনি।
ভেতরে হাত-পা বাঁধা আর মুখে কাপড় গোঁজা অবস্থায় পাওয়া গেল পিটারকে। তাকে বের করা হলো। মুখ থেকে কাপড় খুলতেই হাসল সে। অনেক অনেক ধন্যবাদ তোমাদেরকে। বের করলে কিভাবে? তাজ্জব ব্যাপার!

কি করে, কিশোর? হ্যারিও অবাক। সিগন্যালের সাহায্যেই করেছ, বুঝলাম, কিন্তু যন্ত্রটা ওখানে গেল কিভাবে? ট্রাকটা তো আগে কখনও দেখোনি?
ট্রাকে ওই যন্ত্র আমি ঢোকাইনি, হেসে বলল কিশোর। ওরা নিজেরাই ঢুকিয়েছেন।
ওরা? একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল রবিন আর মুসা।
মনে আছে, ওয়ার্কশপে ডেভকে বলেছিলাম, বুঝিয়ে দিল কিশোর। বাগটা রয়েছে পিটারের পকেটে? বলার কারণ ছিল। আমার যন্ত্রটা ছিল আমার প্যান্টের পকেটে। কাজেই চাইছিলাম পিটারের পকেটেই আগে খুঁজুক ও। পিটারের দিকে ঘুরল সে। আমি তার খুব কাছাকাছি ছিলাম। চট করে এক সুযোগে আমার যন্ত্রটা, ফেলে দিলাম ডেভের কোটের পকেটে।
দাঁত বের করে হাসল কিশোর। সারাক্ষণ তার পকেটেই ছিল যন্ত্রটা। ওটার বীপার অফ করা ছিল, কাজেই শব্দ করেনি। কিন্তু সিগন্যাল ঠিকই পাঠাচ্ছিল।
ডেভের দিকে তাকিয়ে রাগ করে বলল জন, গাধা কোথাকার!
জ্বলন্ত চোখে ডেভও তাকাল জনের দিকে, তোমার গাধামী বুদ্ধির জন্যেই এরকম হলো!
নিয়ে যান এগুলোকে বিরক্ত হয়ে পুলিশম্যানদের নির্দেশ দিলেন ফ্লেচার।
একে অন্যকে বকাবকি আর দোষারোপ করতেই থাকল দুই কিডন্যাপার। হাতকড়া পরিয়ে ওদের ট্রাক থেকে নামাল পুলিশ।
কিশোরের দিকে তাকিয়ে কিছুটা রাগ করেই চীফ বললেন, সিগন্যালটার কথা আমাদেরকে বলনি, কিশোর!
ওটা যে কাজ করবে, শিওর ছিলাম না, স্যার, কৈফিয়ত দিচ্ছে যেন কিশোর। ডেভ পকেটে হাত ঢোকালেই তো শেষ হয়ে যেত। কাপড়ও বদল করতে পারত সে। করেনি, তার কারণ, অতিরিক্ত ব্যস্ত ছিল ওরা। আর বাঁ পকেটে ঢুকিয়েছিলাম। সাধারণত ওই পকেটে কমই হাত দেয় লোকে কোনও জিনিস বের করার জন্যে না হলে ঢোকায় না। আসল কথা হলো, আমাদের ভাগ্য ভাল, কাজটা হয়ে গেল।
হাসলেন চীফ। হ্যাঁ, তা বলতে পারো। যাই হোক, যন্ত্রটা ঢুকিয়ে দিয়ে কাজই করেছ একটা!
তিন গোয়েন্দা হাসল। পিটার হাসল। এখন সে পুরোপুরি নিরাপদ। বিপদ কেটে গেছে। আর কোনও ভয় নেই।
বাবারও কাজ করতে আর কোনও অসুবিধে হবে না, বলল সে। ইচ্ছেমত করতে পারবে।
পাশাপাশি দাঁড়িয়েছে সে আর কিশোর। দুই যমজ ভাইয়ের মত। অনেকেই অবাক চোখে তাকাচ্ছে ওদের দিকে। অনেক অবাক ঘটনাই ঘটে এই পৃথিবীতে, যা

বিশ্বাস করা কঠিন। এটাও তেমন একটা ঘটনা।

ভলিউম ১৮ – অবাক কাণ্ড – তিন গোয়েন্দা – রকিব হাসান – সেবা প্রকাশনী

ঘটনাটা কি...? গাড়ির ইঞ্জিনের ওপর থেকে মুখ তুলে তাকিয়েই বলে উঠল কিশোর পাশা। সোজা হতে গিয়ে মাথা বুকে গেল পুরানো সাদা রঙের শেভি ইমপালার হুডে।

মাল নিয়ে ফিরে এসেছেন রাশেদ পাশা। উদ্ভট সব জিনিস কেনায় জুড়ি নেই তার, কিন্তু এবার যেন সব কিছুকে ছাড়িয়ে গেছেন।

ইয়াডের বড় ট্রাকটার ড্রাইভিং হুইল ধরে বসে আছেন তিনি। মাথায় পুরানো একটা রোমশ টুপি, পেছনে ঝুলে রয়েছে র্যাকুনের লেজ। টুপি বটে একখানা! ট্রাকের পেছনে ইয়ার্ডের দুই কর্মচারী, ব্যাভারিয়ান ভাই বোরিস আর রোভার বিচিত্র সব জিনিসের মধ্যে বসে আছে।

বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। বিশ্বাস করতে পারছে না নিজের চোখকে। মাথাটাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি রাশেদ পাশার! সেদিকে তাকিয়ে সরে আসতে গিয়ে কনুই লেগে উল্টে পড়ল ইঞ্জিনের ওপর রাখা একটা মবিলের ক্যান। ক্র্যাংককেসের ভেতর দিয়ে গড়িয়ে ঢুকে যেতে শুরু করল ঘন তেল।

খাইছে! চিৎকার করে উঠল মুসা আমান। গাড়ির চেসিসের নিচ থেকে যেন ছিটকে বেরিয়ে এল। না বলতেই ঢেলে দিলে কেন?

দেখার মত চেহারা হয়েছে তার। চেসিসের নিচে কাজ করতে গিয়ে এমনিতেই কালিতে মাখামাখি হয়ে গিয়েছিল, তার ওপর পড়েছে মবিল। কোঁকড়া চুল বেয়ে গড়াচ্ছে। ইঞ্জিনের মবিল পাল্টাতে নিচে ঢুকেছিল সে। কিশোরকে বানিয়েছিল সহকারী। কিন্তু বলার আগেই তেল ঢেলে দিয়েছে কিশোর।

রেগে গিয়ে মুসা বলল, কি হয়েছে?

ক্যানটা আবার সোজা করে ফেলেছে কিশোর। কিন্তু দেরিতে। সমস্ত তেল পড়ে গেছে ততক্ষণে। বলল, সরি! চমকে গিয়েছিলাম!

কেন? তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ লেগেছে? বলেই চোখ পড়ল মেরিচাচীর ওপর। অফিসের বারান্দা থেকে নেমে গটমট করে এগিয়ে আসছেন ট্রাকের দিকে। রাশেদ পাশার দিকে তাকিয়ে মুসাও চমকে গেল কিশোরের মতই। খাইছে! এ কি কাণ্ড!

রাশেদ পাশা! ফেটে পড়লেন যেন মেরিচাচী। তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে। এসব কি এনেছ! মালগুলোর দিকে হাত নাড়লেন তিনি। এই জঞ্জাল দিয়ে কি হবে!

জঞ্জাল নয় এগুলো, শান্তকণ্ঠে বলল রাশেদ পাশা। ইয়ার্ডের মাল, বিক্রির জন্যে। যারা চিনবে, তারা কিনবে।

তোমার মাথার ওই টুপিটাও? আয়নায় দেখেছ মুখটা?

পেছন থেকে লেজটা সামনে নিয়ে এলেন রাশেদ পাশা। লম্বা বেনিতে যেমন হাত বোলায় মেয়েরা, তেমনি করে বোলাতে বোলাতে বললেন, একেবারে আসল মাল। খাটি জিনিস। ব্যাকুনের চামড়ায় তৈরি ডেভি ক্রিকেট ক্যাপ।
দ্রুত ট্রাকের পেছন দিকে চলে এলেন মেরিচাচী। যারা চিনবে, তারা কিনবে! হতচ্ছাড়া সব জিনিস! ট্রাঙ্কটার মধ্যে কি?
নিজেই উঠে গিয়ে টান দিয়ে ডালা তুলে ফেললেন। এতগুলো কমিকের বই। এর জন্য টাকা নষ্ট করলে!
কয়েক লাফে ট্রাকের পেছনে পৌছে গেল কিশোর। কৌতূহলে ফাটছে। উঠে পড়ল ট্রাকে। ট্রাঙ্কের ভেতর গাদা গাদা কমিকের বই।
মারছে! মুসাও এসে দাঁড়িয়েছে ট্রাকের কাছে। লোকটা সাংঘাতিক কমিক ভালবাসত তো! যার কাছ থেকে এনেছে।
অনেক পুরানো, কিশোর বলল। নিশ্চয় অনেকদিন ফেলে রেখেছিল। মুসার দিকে ঝুঁকল। নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, কত টাকা আছে তোমার কাছে?
বেশি না, পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল মুসা।
অ্যাই, কি হয়েছে? রবিন জিজ্ঞেস করল। সবেমাত্র ইয়ার্ডে ঢুকেছে সে। গায়ে সাদা পোলো শার্ট। পরনে খাকি প্যান্ট। সুন্দর লাগছে ওকে।
দেখে খুশি হলো কিশোর, এই যে, ঠিক সময়ে এসে পড়েছ। দেখো তো পকেটে কত টাকা আছে?
পকেটে হাত ঢোকাল রবিন। বেশি নেই। টানাটানি। কেন?
হাসল কিশোর। কিছু কমিক কিনব।
বইগুলো ঘটছেন মেরিচাচী। আরও কিছু আছে কিনা দেখছেন ট্রাঙ্কের ভেতরে। কি কারণে যে এগুলো আনল। এখন কার কাছে বিক্রি করি? কাস্টোমার কোথায়?
এখানে। রবিনের হাত থেকে টাকাগুলো ছোঁ মেরে নিয়ে নিল কিশোর। নিজের পকেটে যা আছে বের করল। তিনজনেরটা একসাথে করে দ্রুত গুনে ফেলল। নাও, বাড়িয়ে দিয়ে বলল, একুশ ডলার সত্তর সেন্ট। তোমার সমস্ত যন্ত্রণা কিনে নিলাম আমরা। কি বলো, চাচী?
নিয়ে যা! জানে বাঁচলাম! টাকাটা নিতে গিয়েও দ্বিধা করলেন মেরিচাচী। কি করবি ওসব পচা কমিক দিয়ে?
কমিক নিয়ে কি করে মানুষ? পড়ব।
চোখে সন্দেহ দেখা দিল মেরিচাচীর। তোর মতলবটা কি বলো তো? কমিক নিয়ে ডুবে থেকে কাজে ফাঁকি দেয়ার ফন্দি না তো?

হেসে ফেললেন রাশেদ পাশা। টাকা দিচ্ছে নিয়ে নাও। এতক্ষণ তো কোথায় বেচবে কোথায় বেচবে করছিলে। কাস্টোমার পেয়েই দিধা কিসের?
তবু দ্বিধা করছেন মেরিচাণী। কোন উদ্দেশ্য না থাকলে কিশোর টাকা দিয়ে কিনত না। এমনিতেও অবশ্য বিক্রির জিনিস প্রয়োজন হলে কিনে নেয় সে, আর দশজন কাস্টোমারের মতই। আবার নিজে যখন কাজ করে দেয়, তখনও তার পারিশ্রমিক নিয়ে নেয়। কঠোর ভাবে মেনে চলে ব্যবসার নিয়ম কানুন! যদিও পুরো ব্যবসাটা একদিন তারই হবে, তবু নিজের মনে করে কিছু নিয়ে নেয় না। তার এই নিয়মনিষ্ঠায় খুবই খুশি মেরিচাচী। বলেন, সাংঘাতিক উন্নতি করবে একদিন তার ছেলে। কিশোরকে ছেলেই ভাবেন নিঃসন্তান মারিয়া পাশা।
আরে নাও না, টাকাটা চাচীর হাতে গুঁজে দিতে দিতে বলল কিশোর। একলা তো কিনিনি। তিনজনে মিলেই কিনেছি।
সেজন্যেই তো ভয়! কি ফন্দি করেছিস কে জানে!
আর কথা বাড়াল না কিশোর। মুসাকে নিয়ে মাল নামাতে শুরু করল। নিচে দাঁড়িয়ে সাহায্য করল রবিন। এগুলোর জন্যে টাকা নিয়েছ?
মাথা খারাপ হয়ে গেছে আজকে ওর, মুসা বলল। প্রথমে আমার মুখে তেল ঢালল। তারপর টাকা-পয়সা কেড়ে নিয়ে গিয়ে কতগুলো পুরানো কমিক...
মবিল? মুসার মাথা শুকে নাক কুঁচকাল রবিন। আমি তো ভেবেছিলাম, মাথায় তেল দেয়া আরম্ভ করেছ বুঝি।
এসব কথা বাদ দাও তো! অধৈর্য হয়ে হাত নাড়ল কিশোর। রবিনের দিকে তাকাল। বললে তো টাকা-পয়সা কেড়ে নিয়ে কতগুলো পুরানো কমিক কিনেছি। আসলে টাকা খাটালাম, মস্ত লাভের জন্যে।
টাকা খাটালে? ভুরু কুঁচকে গেল রবিনের। যা দিয়েছ তার বহুগুণ ফেরত পাবে।
ট্রাঙ্কটায় টোকা দিল কিশোর।
এই আবর্জনা থেকে? মুসার কণ্ঠে অবিশ্বাস।
অত অবহেলা কোরো না। এর মধ্যে গুপ্তধন লুকানো আছে। জাননা, পুরানো কমিকের দাম মাঝে মাঝে কত বেড়ে যায়? কিছু তো হাজার হাজার ডলারে বিক্রি হয়।
হাজার হাজার...? ট্রাঙ্কটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে রবিন।
নিশ্চয়ই। তবে কয়েকশো ডলার তো পাবই। দুই হাতের তালু এক করে জোরে জোরে ডলল কিশোর। বেশিও হতে পারে। তাতে আমার একটা গাড়ি কেনা হয়ে যাবে হয়তো। তবে যাই লাভ হবে, তিনজনে ভাগাভাগি করে নেব আমরা।
পরের শুক্রবারে মুসার ইমপালায় চড়ে শহরতলীতে রওনা হলো তিন গোয়েন্দা। তিনজনেরই অবসর। মুসার বাড়িতে কাজ নেই, রবিনের ছুটি, আর মেরিচাচীও

কিশোরকে নতুন কাজ গছাতে ব্যর্থ হয়েছেন, কারণ সেদিন কোন কাজই নেই ইয়ার্ডে।
প্রচুর ধোঁয়া বেরোচ্ছে এগজস্ট পাইপ থেকে। রিয়ারভিউ মিররে সেই ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে মুখ বাঁকাল মুসা। তুমি একটা সর্বনাশ করেছ, কিশোর। সেই যে মবিল ফেললে তার জের এখনও চলছে। ইঞ্জিনের গা থেকে পুড়ে শেষ হয়নি।... আমার চুলে তো এখনও গন্ধ আছে!
তেল তো অনেক ভাল, রবিল ফোড়ন কাটল। পুরানো কমিক পড়তে পড়তে যে অন্ধ হয়ে যাইনি এটাই বেশি। বাপরে বাপ! লাইব্রেরিতে পুরানো বই মোছার চেয়ে বিরক্তিকর এটা।
তোমার মত বইয়ের পোকাও একথা বলছ? সামনের রাস্তার ওপর মুসার নজর। তবে যা-ই বলো, কিছু কিছু পড়তে কিন্তু ভালই লেগেছে। ছোটবেলার কথা মনে পড়ে গেছে, যখন ওসব পড়তাম। যেমন ধরো, ক্রিমসন ফ্যান্টমের কথাই। মাথা নেড়ে জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলল সে। ও তো সাংঘাতিক জিনিস। এখনও ভাল্লাগে।
তোমার লাগে, পেছনের সীটে বসেছে রবিন। মেঝেতে পায়ের কাছে পড়ে থাকা মলাটের বাক্সটার দিকে তাকিয়ে বিরক্ত মুখভঙ্গি করল। আমার লাগে না। বাক্সটায় একটা লাথি মেরে বলল, এগুলো আমার পড়তে হয়েছে, ভাল না মন্দ বোঝার জন্যে, ভাবলেই মেজাজ খিচড়ে যায়। কমিকের মধ্যে কিছু আছে নাকি!
সাবধান! ঘাড় ঘুরিয়ে রবিনের দিকে তাকিয়ে বলল কিশোর, এগুলো ব্যবসার মাল। নষ্ট করলে টাকা নষ্ট হবে। মালগুলো খুঁজে বের করতে হবে আগে আমাদের, সব চেয়ে দামিগুলো। ছিঁড়েটিড়ে নিয়ে গেলে হয়তো কিনতেই রাজি হবে না ইন্টারকমিকনের ওরা।
ওরাই যদি বাঁচায়। নইলে এসব আবর্জনা কিনবে কে গাঁটের পয়সা খরচ করে? ভাগ্যিস কাগজে কমিকস কনভেশনের খবরটা পড়েছিলে।
কিশোর হাসল। রবিন, এতটা কিপটে হয়ে গেলে কি করে তুমি? দাঁড়াও, আগে পেয়েনি টাকাটা। গোনার কাজে লাগিয়ে দেব। গুনতে গুনতে শেষে টাকার ওপরই ঘেন্না ধরে যাবে।
এসে গেছি, ঘোষণা করল মুসা। দ্য সেনচুরি গ্র্যান্ড প্লাজা।
কাচ আর ইস্পাতে তৈরি পরিষ্কার আকাশে মাথা তুলে দাঁড়ানো চকচকে টাওয়ারটার দিকে তাকাল রবিন। এরকম একটা জায়গায় কমিক বিক্রি হয়!
আগস্ট মাসের পঁচা গরম পড়ছে। ঘামছে কিশোর। বলল, এই মুসা, গাড়ি এখানেই রাখ কোথাও। গিয়ে দেখা যাক কি ধরনের সম্মেলন হচ্ছে।

ড্রাইভওয়ে দিয়ে হোটলের আন্ডারগ্রাউন্ড পার্কিং গ্যারেজে গাড়ি নিয়ে এল মুসা। আজব এক কংক্রীটে তৈরি জঙ্গলের মত লাগছে জায়গাটাকে। মোটা মোটা থাম ধরে রেখেছে ছাত এবং তার ওপরের বাড়িটাকে। উজ্জ্বল রঙ করে জায়গাটাকে মোটামুটি একটা সুন্দর রূপ দেয়ার চেষ্টা করেছে কর্তৃপক্ষ, কিন্তু কতটা সফল হয়েছে বলা মুশকিল। মুসার অন্তত ভাল লাগছে না। গাড়ির এগজস্টের ধোঁয়া, অল্প আলো, আর অসংখ্য থামের ছায়া কেমন যেন ভূতুড়ে করে তুলেছে পরিবেশ।

খালি একটা জায়গায় গাড়ি ঢুকিয়ে দিয়ে মুসা বলল, নাও, থামলাম। বেরোও সবাই।

বেরোও বললেই কি আর হয়, রবিন বলল। যা একখান বোঝা নিয়ে এলাম। লেখাগুলো যেমন বিচ্ছিরি, ওজনটাও তেমনি বাজে। দেখি, নাও তো।

আবার এটাতেও আমাকে টানছ কেন? প্রতিবাদ জানাল মুসা। তোমাদেরকে ড্রাইভ করে যে এখানে নিয়ে এলাম, সেটা কিছু না?

সেটা আমিও করতে পারতাম।

পারলে তো তোমার ফোক্স ওয়াগেনে করেই আসতাম। ওই গোবরে পোকার ভেতরে জায়গা হলো না বলেই তো...আসলে ওই বাক্সটার জন্যেই হলো না।

বিরক্ত চোখে দুই সহকারীর দিকে তাকাল কিশোর। তোমাদের যখন এতই কষ্ট লাগছে, ঠিক আছে, আমিই নিতে পারব। বাক্সটা ধরে টান দিল সে। আগের মত শুটকি ভাব নাকি আমাকে?

না, তা ভাবব কেন? মুসা বলল। জুডো ক্লাসের ব্যায়াম অনেক মেরামত করে দিয়েছে তোমাকে। শরীর আরও ভাল হয়ে যেত, যদি কারাতে শিখতে।

এমনিতেই যথেষ্ট হয়েছে। ভারি বোঝা নিয়ে এলিভেটরের কাছে পৌঁছতে পৌঁছতেই হাঁপিয়ে উঠল কিশোর।

কল বাটন টিপতেই খুলে গেল এলিভেটরের দরজা।

ঢুকল তিনজনে। পায়ের শব্দ কানে এল। দৌড়ে আসছে কেউ এলিভেটর ধরার জন্যে। ঝট করে একটা হাত ঢুকে গেল দরজার ফাঁকে, পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগেই। আবার ঝটকা দিয়ে খুলে গেল দরজা। একজন লোক। শরীরের মাংস খসে খসে পড়ছে তার।

ভয়ঙ্কর মানুষটাকে দেখে আরেকটু হলেই হাত থেকে কমিকের বাক্স খসে পড়ে যাচ্ছিল কিশোরের।

লাফিয়ে এলিভেটরে উঠে লোকটা বলল, সরি, চমকে দিলাম। গোয়েন্দাদেরকে একধারে সরে যেতে দেখে হাসল। কাঁধের গিঁটলি হয়ে যাওয়া একটুকরো মাংস

দুই আঙুলে টিপে ধরল সে। ল্যাটেক্স সেজেছি আমি। কমিকের মাংস খসা ভূত। প্রতিযোগিতার সাজ। কেমন লাগছে?
একেবারে বা-বাবা, তোতলাতে লাগল কিশোর, বাস্তব!
লবিতে পৌঁছল এলিভেটর। যেমন তাড়াহুড়ো করে উঠেছিল, তেমনি করেই নেমে গেল মাংস খসা ভূত। জনতার ভিড়ে হারিয়ে গেল। লবির আরও অনেকেই নানা রকম সাজে সেজেছে। সবই কমিক বইয়ের চরিত্র। এলিভেটর থেকে নেমে মারবেলের মেঝেতে বিছানো কার্পেটের ওপর দিয়ে ক্রোমের ফ্রেম করা অ্যানাউন্সমেন্ট বোর্ডের দিকে এগোল তিন গোয়েন্দা। ইনটারকমিকন, পড়ল কিশোর, মেইন কনফারেন্স হল। তাকাল দুই সহকারীর দিকে। অনেক বড় মনে হচ্ছে।
সম্মেলন যেখানে হবে সেদিকে এগোল ওরা। সাধারণ একটা কাঠের টেবিলের সামনে একদল মানুষকে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। টেবিলের পেছনে বসে একটা মেয়ে। সোনালি রঙ করা চুল। মাঝখানে কালো রঙের একটা শিং গজিয়েছে, চুলগুলোকেই বাঁধা হয়েছে ওরকম করে। গায়ে কালো রঙের টি-শার্ট, তাতে সাদা অক্ষরে লেখা: ইনটারকমিকন স্টাফ। তিন গোয়েন্দা কাছে যেতেই বলল, দশ ডলার করে প্রতিটি।
ওদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে, কালো কালির বড় একটা ইঙ্ক প্যাড থেকে স্ট্যাম্পে কালি নিয়ে ছাপ দিয়ে দিল গোয়েন্দাদের ডান হাতের উল্টো পিঠে।
কিশোর লক্ষ করল, প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় রবিনের হাতটা ধরে রাখল মেয়েটা এবং এই প্রথম হাসল।
মুসাও ব্যাপরটা লক্ষ্য করেছে। কিশোরের দিকে মাথা কাত করে বলল, রবিনটা যে কি জাদু করে বুঝি না! মেয়েগুলো ওকে দেখলেই আরেক রকম হয়ে যায়...
যা খুশি করুকগে। হাতের ছাপটার দিকে তাকাল কিশোর। লেখা হয়েছেঃ ইন্টারকমিকন-ডে ১। বিড়বিড় করল সে, টিকেটের চেয়ে খরচ কম, ফাঁকিবাজিরও ভয় নেই। ইচ্ছে করলেই আমরা নিয়ে গিয়ে কোন বন্ধুকে দিয়ে দিতে পারব না এটা, টিকেট হলে যেমন পারা যায়। মোট কথা যাকে দেয়া হয়েছে শুধু তার জন্যেই এটা প্রযোজ্য।
রবিনের পেছন পেছন কনফারেন্স হলের দরজায় এসে দাঁড়াল দুজনে। দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে বিশালদেহী এক লোক। ষাঁড় যেন। এর গায়েও কালো টিশার্ট। হাত বাঁড়াল টিকেট চাওয়ার ভঙ্গিতে।
যার যার ডান হাত বাড়িয়ে দিল তিন গোয়েন্দা।
ছাপগুলো পরীক্ষা করল লোকটা। তারপর হাসল। বেরিয়ে পড়ল একটা ভাঙা দাঁত। সরে গেল একপাশে। পা বাড়াল তিন গোয়েন্দা। ঢুকল এসে যেন এক

সাংঘাতিক পাগলখানার মধ্যে।
লবির শান্ত পরিবেশের তুলনায় এই জায়গাটাকে মনে হলো আরব্য রজনীর কোন সরগরম মেলা, কিংবা বাজার। বিশাল হলঘরে পাতা হয়েছে কাঠের শত শত ফোল্ডিং টেবিল। কিছু টেবিল ব্যবহার হচ্ছে কাউন্টার হিসেবে, রাশি রাশি কমিকের বই স্তূপ হয়ে আছে ওগুলোতে। কিছু টেবিলে গায়ে গায়ে লাগিয়ে স্টল তৈরি করা হয়েছে। প্রতিটি স্টলের পেছনে লাগানো হয়েছে তাক আর ডিসপ্লে বোর্ড, ওগুলোতে সাজিয়ে রাখা হয়েছে রঙচঙে কমিকের বই। বইগুলোকে যত্ন করে অয়েল পেপারে মোড়া হয়েছে। সংগ্রাহকের জিনিস। যার পছন্দ হবে অনেক দাম দিয়ে কিনবে।
অনেক মানুষ। যেখানে ফাঁক পেয়েছে গাদাগাদি করে রয়েছে। হাঁটার উপায় নেই। অনেক কষ্টে ঠেলেঠুলে এগোতে হয়। বুড়ো-বাচ্চা, সব বয়েসের মানুষই হুমড়ি খেয়ে পড়েছে কমিকের ওপর, দামদর করছে। পছন্দ হলে কিনছে, না হলে সরে যাচ্ছে আরেক কাউন্টারে। বিচিত্র সব পোশাক পরে রয়েছে অনেকে, ক্রেতাবিক্রেতা উভয় দলেই আছে এই সাজের বাহার। হট্টগোলে কান ঝালাপালা।
পাথর হয়ে যেন দরজায় দাঁড়িয়ে আছে তিন বন্ধু। লম্বা, পাতলা লাল চুলওয়ালা, ইনটারকমিকনের টি-শার্ট পরা একজন মানুষ সরে এলেন ভিড়ের ভেতর থেকে। তিন গোয়েন্দার দিকে তাকিয়ে হাসলেন।
প্রথম এলে বুঝি, বললেন তিনি। তোমাদের অবাক হওয়া দেখেই বুঝেছি। নাটকীয় ভঙ্গিতে বললেন, ইনটারকমিকনে স্বাগতম। আমি লুই মরগান। এই কনভেনশনের চীফ। হাসলেন। পাগলাগারদ মনে হচ্ছে তো? কিশোরের হাতের বাক্সটার দিকে তাকিয়ে বললেন, তো, কি নিয়ে এলে?
ওদের কথা শোনার পর হাসিটা বাড়ল তাঁর। অনেক পাইকার পাবে এখানে। হাত ছড়িয়ে স্টলগুলো দেখালেন তিনি। সব চেয়ে বড় গ্রুপটা হলো সুমাতো কমিকস। তাদের টাকা আছে, ভাল দাম দিতে পারবে। ওই যে, ওদিকটায় ওদের স্টল। লম্বা একটা আঙুল তুলে ঘরের একধারে দেখালেন।
নির্দেশ মত ঘরের ওই পাশটায় চলে এল তিন গোয়েন্দা। ছোট একটা স্ট্যান্ডের কাছে এসে থামল কিশোর, কমিকের সাথে সাথে টি-শার্টও বিক্রি হয় ওখানে। তিনজনের জন্যেই একটা করে শার্ট কিনল সে। ওগুলোতে ছাপ মারা রয়েছেঃ কমিক লাভারস ডু ইট উইথ পিকচারস।
সুমাতো কমিক লেখা স্টলটা চোখে পড়ল ওদের। অনেক বড়। ডান পাশের অর্ধেক জুড়ে দেয়াল ঘেঁষে বিরাট এক দোকান সাজানো হয়েছে। খরিদ্দারও প্রচুর।

টেবিলের কাছে যাওয়ার আগে দ্বিধা করল তিন গোয়েন্দা। সব কিছু দেখে নিয়ে তারপর যেতে চায়।
পাঁচজন অল্পবয়েসী লোক দাঁড়িয়ে টেবিলের ওপাশে। খরিদ্দার সামলাচ্ছে। একজনের এক কানে দুল। সে কথা বলছে একটা ছোট ছেলের সঙ্গে। একটা থান্ডারবীম কমিকের তিন নম্বর সিরিজটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, দিয়ে দিলাম চার ডলারেই। বইটার মলাটে নায়কের ছবি আঁকা। নিজের চোখ থেকে লেজার রশ্মি বের করে ট্যাঙ্ক ফুটো করে ফেলছে। তোমার ভাগ্য ভাল, খোকা। পেয়ে গেলে। এখানে আর কোন দোকানে এই কমিক পাবে না।
তাড়াতাড়ি টাকা বের করে দিল ছেলেটা, যেন দেরি করলেই হাতছাড়া হয়ে যাবে ওই অমূল্য সম্পদ।
নিচু গলায় দুই বন্ধুকে বলল রবিন, আসার সময় এইমাত্র দেখে এলাম আরেকটা স্টলে, এক ডলারের কমিকের স্কুপে ফেলে রেখেছে ওই একই জিনিস।
মুসা বলল, পঞ্চাশ সেন্ট দিয়ে আমি নতুন কিনে পড়েছি।
সুমাতো স্টলের আরও কাছাকাছি এসে তিন গোয়েন্দা দেখল এক জায়গায় একটা টেলিভিশনে ভিসিআর লাগিয়ে রেখেছে একজন সেলসম্যান। শজারুর কাটার মত খাড়া খাড়া চুল, গায়ে কালো টি-শার্ট। অ্যাসট্রোঅ্যাইসেস কমিকের কিছু দৃশ্য দেখাচ্ছে। ইদানীং টিভিতে বেশ গরম করে রেখেছে ওই নতুন সাইন্স ফিকশনটা। বিপুল সাড়া জাগিয়েছে। লোকটা বলছে, এই পার্টটা টিভিতে আসতে আরও দুএক হপ্তা লাগবে। চালাকি করে আগেই জোগাড় করে ফেলেছি আমরা। শহরের কেউ দেখার আগেই পেয়ে যাচ্ছেন। জলদি নিয়ে নিন, শেষ হওয়ার আগেই।
বলে খরিদ্দারদের দিকে কি-করে-ফেলেছিনু-রে এমন একটা ভঙ্গিতে তাকাল সে।
বছর বিশেক বয়েসের এক তরুণ টাকা বাড়িয়ে দিল।
ফিসফিস করে মুসা বলল, অযথা টাকা খরচ করছে। কয়েকদিন অপেক্ষা করলে বিনে পয়সায়ই দেখতে পারত। চাইলে ভিসিআরে রেকর্ডও করে নিতে পারত।
টাকা দিচ্ছে একটা জালিয়াতি করে আনা টেপের জন্যে, রবিন বলল।
নিশ্চয় ঘুষ দিয়ে নিয়ে এসেছে। নয়ত সিন্ডিকেট যখন টিভি কোম্পানিতে পাঠাচ্ছিল ছবিটা, তখন স্যাটেলাইট বীম দিয়ে ধরে রেকর্ড করে ফেলেছে। মহা শয়তান ব্যাটারা!
কত রকমের পাগল যে আছে দুনিয়ায়, কিশোর বলল। টাকাও আছে খরচও করছে। ওরা কিনছে বলেই ঠকানোরও সুযোগ পাচ্ছে। দেখি, আমরা কি করতে পারি?
এগিয়ে গেল কিশোর।

একজন সেলসম্যান মুখ তুলে ওদের দিকে তাকিয়ে বলল, বলো, কি করতে পারি?
দ্বিধা করছে তিন গোয়েন্দা।
ও, তোমরা কিনবে না? বেশ, না কিনলে সরে দাঁড়াও। যারা কিনবে তাদের জায়গা দাও।
না, কিশোর বলল, আমরা কিনব না।
স্টলের কাছ থেকে সরে এসে রবিনের দিকে তাকাল সে। বলল, এরা ডাকাত। বেচতে পারব না এদের কাছে। ওটা কোথায় দেখেছিলে? চার ডলারেরটা যেখানে এক ডলারে বিক্রি করে?
ওদিকে, রবিন বলল। ইমারজেন্সি একজিটের কাছে। কি যেন একটা নাম। পাগল না উন্মাদ, কি যেন।
স্টলের নামের সঙ্গে ম্যাড কথাটা জুড়ে দেয়া হয়েছে অবশ্য, তবে মালিক সত্যি পাগল কি-না কে জানে! যদিও তাঁকে দেখলে পাগল বলেই সন্দহ হবে। এলোমেলো কোঁকড়া কালো চুল, পুরু গোঁফ। দোকানের নাম ম্যাড ডিকসনস ওয়ার্ল্ড। তরুণ সহকারীকে ডেকে বললেন, জনি, চট করে ওপরে গিয়ে আরও কয়েক বাক্স কমিক নিয়ে এসো। তারপর ঘুরতেই চোখ পড়ল লম্বা, বিষন্ন চেহারার একজন মানুষের দিকে। চাঁদিতে টাক। তিনপাশে পাতলা চুল, ধূসর হয়ে এসেছে।
ধমকে উঠলেন ম্যাড, আবার এসেছেন?
ভদ্রলোক বললেন, ফ্যান ফানের কপিটার জন্যে সাড়ে তিনশো দিতে রাজি আছি।
মাথা নাড়লেন ডিকসন। পাঁচ।
আরও বিষন্ন হয়ে গেলেন ভদ্রলোক। দর কষাকষি শুরু করলেন, ঠিক আছে, সাড়ে চার।
ছয়।
কিন্তু লেখা তো রয়েছে মাত্র সাড়ে চারশো! মরিয়া হয়ে উঠলেন যেন ক্রেতা।
এখন আর ছয়ের কমে বেচব না। জনাব পাগলও কম যান না। বুনো দৃষ্টি ফুটেছে চোখে।
হাত মুঠো করে ফেললেন ক্রেতা। বেশ ছয়ই দেব। হাসি ফুটল পাগলের চোখে। বলতে বেশি দেরি করে ফেলেছেন। এখন সাত।
চোয়াল স্কুলে পড়ল লোকটার। সাত! বেচতে চান না নাকি কারও কাছে?
কারও কাছে বেচতে চাই না কথাটা ঠিক নয়। আপনার কাছে চাই না।

ঝটকা দিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন ক্রেতা। গটমট করে চলে গেলেন। সেদিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। মিস্টার ডিকসনের দিকে ফিরে বলল, কাস্টোমারদের সঙ্গে এরকম আচরণই করেন নাকি?

সবার সঙ্গে করি না। যারা বেশি বিরক্ত করে, ঘাড়ে এসে চাপতে চায়, তাদের সঙ্গে করি। বড় একটা কমিক পাবলিশিং কোম্পানিতে চাকরি করে। ভীষণ বিরক্ত করে এসে। কিশোরের বাক্সটার দিকে তাকালেন ডিকসন। তোমরা কি জন্যে এসেছ? কিনবে, না বেচবে?

বেচব। বাক্সটা টেবিলে রেখে ডালা খুলল কিশোর।

ভেতরের জিনিসগুলো দেখলেন ডিকসন। ভাল জিনিস কিছু আছে। চোখ চকচক করছে তার। সিলভার এজ-এর বই দুটো তো বেশ ভাল কন্ডিশনে আছে। তাছাড়া কিছু নাম্বার ওয়ানস...ঠিক আছে, যা আছে, আছে। পুরো বাক্সটাই বেচে দাও। চারশো ডলার দেব।

দাম শুনে কান গরম হয়ে যাচ্ছে টের পেল কিশোর। বুঝল, মুখেও রক্ত জমছে। শুরুতেই এত! তার পরেও বলল, মাত্র চার? অর্ধেকও তো বলেননি। দাম জানা আছে আমার...

বাধা দিয়ে ম্যাডম্যান বললেন, ওভারস্ট্রীট গাইডে দেখিয়েছ তো? ওরা বলবেই। আরও অনেক দাম হাঁকবে, কিন্তু কিনবে না। শয়তানি আরকি। কি লিখে রেখেছে দেখোনি? কেউ যাতে এসে কিছু বলতে না পারে। লিখেছে, আমাদের কাছে যা আছে, ওগুলো আরও অনেকের কাছেই থাকতে পারে। দামেরও তফাৎ হতে পারে। কাজেই কেনার আগে চিন্তা করে নেবেন। আমরা লাভ করার জন্যেই বসেছি, লাভ করব।

সেটা তো সততার পরিচয় দিয়েছে, কিশোর বলল। লাভ করবে বলেছে ডাকাতিও করছে না, ঠকাচ্ছেও না...এর বেশি আর বলতে পারল না সে। টেনে সরিয়ে নিয়ে গেল তাকে রবিন আর মুসা। নিচু গলায় বলল, কি যা-তা বকছ অনেক বেশি দিতে চাইছে, দিয়ে দাও। খরচ করেছি একুশ ডলার, পাচ্ছি চারশো আর কত!

বেশিই পাব, কিশোর বলল। এক কথায়ই যখন চারশো দিতে রাজি হয়েছে, জিনিসের দাম আরও অনেক বেশি। দরাদরি করতে অসুবিধে কী?

ম্যাডম্যানের দিকে ঘুরতে গেল কিশোর। কিন্তু ঘোরা আর হলো না। দৃষ্টি আটকে গেল নীল সোনালি রঙের ওপর।

ওদেরই বয়েসী একটা মেয়ে। বেশ লম্বা। সুন্দর সোনালি চুল প্রায় কোমরের কাছে নেমে এসেছে। নীল সিল্কের আলখেল্লা গায়ে। ভেতরে পরেছে হলুদ রঙের একটা বাদিং স্যুট, রঙটা এতই উজ্জ্বল, সোনালিই লাগছে। হাত আর পা পুরোপুরি বেরিয়ে আছে। পায়ে হলুদ বুট। হাঁটাও খুব সুন্দর। চোখ ফেরানো যায় না।

কিশোরও ফেরাতে পারছে না।
সেটা দেখে হাসলেন ম্যাড। চোখে লেগে যায়, না? কস্টিউম কনটেস্টে স্টেলারা স্টারগার্লের মত পোশাক পরেছে। কেন প্রতিযোগিতায় জিতে যায় এরা, বুঝি…
হ্যাঁ, দামের ব্যাপারটা, কমিক বিক্রির কথায় ফিরে এল কিশোর। বলেই আবার চোখ ফেরাল মেয়েটার দিকে।
দেখি তো আবার, বলে বাক্সে আবার হাত ঢোকালেন ডিকসন। দশটা কমিক টেনে বের করে বললেন, এগুলো আমি সহজেই বেচতে পারব। আসলে দামও এগুলোরই। ঠিক আছে, একটারই দামদর হোক। তিনশো দিতে রাজি আছি।
শুনছে না কিশোর।
তোমাকে দামের কথা বলছে, কিশোর, কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল রবিন।
জোর করে যেন মেয়েটার ওপর থেকে চোখ সরাল গোয়েন্দাপ্রধান। মেয়েদের দিকে এভাবে সাধারণত তাকায় না সে। নিশ্চয় কোন কারণ আছে, বুঝতে পারছে, তার দুই সহকারী।
মোটামুটি ভালই দাম বলেছেন, বলেই আবার মেয়েটার দিকে ঘুরতে শুরু করল কিশোরের মুখ।
এক পলকের জন্যে যেন ঝিলিক দিয়ে উঠল হলুদ রঙ। পরক্ষণেই লাল কস্টিউম পরা একটা মূর্তির আড়ালে চলে গেল মেয়েটা। মঠবাসী ভিক্ষুর আলখেল্লার মতই লাগছে পোশাকটা, রঙ বাদে। মূর্তিটা আরও কাছে এলে কিশোর দেখল, মুখোশ পরেছে লোকটা। সাদা-কালো মড়ার মুখ। না না, কঙ্কালের মুখ।
আনমনেই মাথা নেড়ে আবার ম্যাডম্যানের দিকে ফিরল কিশোর। অন্যমনস্ক অবস্থাটা চলে গেছে। বলল, তিনশো ডলার বললেন, না? আমাদের সব চেয়ে দামি মাল এগুলোই। যে কেউই কিনতে চাইবে, কেবল এগুলোর জন্যেই…
আলখেল্লা পরা মড়াটা তার প্রায় গা ঘেঁষে চলে গেল। বাদুড়ের ডানার মত দুলে উঠল লাল আলখেল্লার প্রান্ত। বিরক্ত হয়ে ঘুরে তাকাল কিশোর।
নাটকীয় ভঙ্গিতে মূর্তিটাকে হাতে তুলতে দেখল সে। ছড়িয়ে দিয়েছে লম্বা লম্বা আঙুল। টান টান হয়ে গেছে হাতের ফ্যাকাসে চামড়া। চারটে ছোট ছোট বল পড়ল মেঝেতে।
ধোঁয়ায় ঢেকে গেল ম্যাড ডিকসনের স্টলটা।
হঠাৎ এই ধোঁয়া দেখে ভয়ে চিৎকার করে উঠল কিছু কমিক ক্রেতা। কিন্তু এই চিৎকার কিছুই না, আসল হট্টগোল শুরু হল ধোঁয়া সরে যাওয়ার পরে।
হায় হায়রে! গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে লাগলেন ম্যাড ডিকসন, আমার সর্বনাশ করে দিয়েছে! ডাকাতি! মাথা ঝাঁকাচ্ছেন বার বার, তাতে এলোমেলো চুল আরও ছড়িয়ে যাচ্ছে। বড় বড় গোঁফ কেমন যেন ফাঁক ফাঁক হয়ে বিকট করে

তুলেছে মুখটাকে। গেল কোথায় ব্যাটা! লাল আলখেলা! ক্রিমসন ফ্যান্টম কস্টিউম! খুন করব আমি ওকে।
উধাও হয়েছে লাল পোশাক পরা লোকটা।
কিশোর বলল, ধোঁয়া দিয়ে ঢেকে ফেলেছিল, যাতে কেউ না দেখে ওকে। টেবিল টপকে গিয়ে দামি কমিকগুলো নিয়ে চলে গেছে।
পেছনের কাঠের ডিসপ্লে বোর্ডটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে সে। সাজানো কমিক বইয়ের মাঝে বড় একটা ফোকর হয়ে আছে। ডিকসনও তাকিয়ে রয়েছেন সেদিকে। ফ্যান ফান নাম্বার ওয়ানের কপিটা নিয়ে গেছে…
সেই কমিকটাই, যেটার জন্যে চাপাচাপি করছিল টেকো লোকটা, নিতে পারেনি, ভাবছে কিশোর।
…আরও নিয়েছে, বলছেন ম্যাড। একগাদা! বিশ থেকে তিরিশ ডলার দাম ওগুলোর। হঠাৎ বদলে গেল বিক্রেতার কণ্ঠস্বর। কেন, দেখতে পেল কিশোর। একটা বই দেখা গেল, তাতে দামের ট্যাগ লাগানো রয়েছেঃ ৪,৫০০ ডলার।
ধোঁয়াটা তেমন স্মার্ট আইডিয়া নয়, কিশোর বলল। এগুলো পুরানো পদ্ধতি। এতে অসুবিধে হলো, চোর নিজেও কিছু দেখতে পায় না। অনেক সময় যেটা নিতে আসে সেটাই ফেলে যেতে হয়। ফেলে গেছে দেখতে পায়নি বলেই।
যা নিয়েছে তা-ই যথেষ্ট, ম্যাড বললেন। আমারগুলো যা পেয়েছে তা তো নিয়েছেই, তোমার যেগুলো আমার হাতে ছিল, সেগুলোও নিয়েছে।
পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল তিন গোয়েন্দা। ক্রিমসন ফ্যান্টম বা লাল ভূত ওদের কমিকগুলোও নিয়ে গেছে, সব চেয়ে দামিগুলো, যেগুলোর প্রাথমিক দামই উঠে গিয়েছিল তিনশো ডলার।
তার মানে সমাধান করার জন্যে একটা কেস পেয়ে গেলাম, বিড়বিড় করল মুসা।
কেস? সমাধান? ভুরু কুঁচকে তার দিকে তাকালেন ম্যাড।
হ্যাঁ, মাথা ঝাকাল কিশোর। পকেট থেকে কার্ড বের করে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, এটা দেখলেই এসব কথার মানে বুঝবেন।
তিন গোয়েন্দা!…দাড়াও, দাঁড়াও! টেবিলের নিচে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে বের করলেন একটা ছোট বাক্স। তার ভেতর থেকে বের করলেন একটা ময়লা প্রায় দোমড়ানো কার্ড। কোণগুলো নষ্ট হয়ে গেছে।
আরি! এ কি কাণ্ড! রবিন বলল, আমাদের কার্ড!
নিশ্চয়, ডিকসন বললেন। অনেক পুরানো। তোমাদের এখনকারটার সঙ্গে মেলে না। এটা বোধহয় প্রথম দিককার ছাপা কার্ডগুলোর একটা। পঁচাত্তর ডলারে বিক্রি করতে পারব।
চোখ মিটমিট করল কিশোর। তার মানে আপনি এটা বিক্রি করবে?

শ্রাগ করলেন ডিকসন। কেন করব না? কিছু কিছু লোক যা পায় তা ই সংগ্রহে রাখে। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত ওদের দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি। তাহলে তোমরাই সেই লোক, যারা যে-কোন রহস্যের সমাধান করে বলে ঘোষণা দাও। বেশ, তোমাদেরকেই আমার এখন সব চেয়ে বেশি প্রয়োজন কেন, বলছি আমার কমিকগুলো খুঁজে বের করে দাও। সেই সাথে তোমাদেরগুলোও করো। ওভারস্ট্রীট যা বলেছে, তখন আমি সেই দাম দিয়েই তোমাদের কমিকগুলো কিনব, যাও, কথা দিলাম।

আবার একে অন্যের দিকে তাকাতে লাগল তিন গোয়েন্দা। অবশেষে কিশোর বলন ডিকসনের দিকে তাকিয়ে, বেশ, আমরা রাজি। যে বইগুলো আছে এখনও সেগুলোসহ বাক্সটা তুলে এক হাতে নিয়ে আরেকটা হাত বাড়িয়ে দিল কমিক বিক্রেতার দিকে।

আমার নাম আসলে জেমস ডিকসন, হাসলেন বিক্রেতা। গোঁফের জন্যে হাসিটা অনেকখানিই ঢাকা পড়ে গেল। ওরকম একটা হাস্যকর নাম নিয়েছি স্রেফ প্রচারের জন্যে।

সেটা বুঝতে পেরেছি আমরা। কিশোরও হাসল। আমি কিশোর পাশা। ও মুসা আমান। আর ও রবিন মিলফোর্ড। তাহলে কাজ শুরু করা যাক। প্রথম প্রশ্ন, মিস্টার ডিকসন, বিশেষ কাউকে কি সন্দেহ হয় আপনার?

কাউকে? এখন তো মনে হচ্ছে সবাইকেই সন্দেহ করি। স্টলের আশপাশে ভিড় জমানো জনতাকে দেখালেন তিনি হাত তুলে। তারপর দেখালেন পুরো হলঘর। তুমি জানো না, কারা এসেছে। ক্যালিফোর্নিয়ার সব চেয়ে বড় পাগলগুলোই এখানে ভিড় জমায়। হাসলেন তিনি আবার। তোমাকে অবশ্য পাগল বলছি না, কারণ তুমি কিনতে আসোনি।

তার মানে, আপনি বলতে চাইছেন, এরা সবাই পাগল?

হাত ওল্টালেন ডিকসন। একটা কথা বলতে পারি, সংগ্রহের নেশায় যখন পেয়ে বসে মানুষকে, হিতাহিত জ্ঞান লোপ পায় অনেকের। বিগড়ে গিয়ে অন্য মানুষ হয়ে যায়। কি সংগ্রহ করল, কিভাবে করল, সেটা নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা থাকে না। আমার বিশ্বাস, অসুস্থই হয়ে পড়ে তখন ওরা।

চুরিও করে বলতে চাইছেন, কিশোর বলল। চোরটা কি বইগুলো বেচবে? কি মনে হয় আপনার?

অত সহজ হবে না। বিশেষ করে ফ্যান ফানের মত জিনিস। ভ্রূকুটি করলেন ডিকসন। যেখানেই বেচতে যাবে, প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে। দোকানদার জানতে চাইবেই, কোথেকে জোগাড় করা হয়েছে ওগুলো।

চোরটা তা বলতে চাইবে না, মুসা বলল।

মাথা ঝাঁকালেন ডিকসন। মুশকিলটা হলো কি, সংগ্রাহকের ব্যাপারে তদন্ত করছ তোমরা। কি যে করবে লোকটা, বলা কঠিন। হয়তো সারাটা জীবনই মাটির তলার ঘরে লুকিয়ে রাখবে কমিকগুলো। বেরই করবে না।
ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করছে তিন গোয়েন্দা। কৌতূহলী দর্শক এসে ভিড় জমিয়েছে স্টলের কাছে, তাদেরকে সরিয়ে দিল হোটেলের কর্মচারীরা। আবার নিয়মিত বেচাকেনা শুরু হলো ঘরে। বারো বছরের একটা ছেলে এগিয়ে এল। হাতে একটা সাদা-কালো ছবি। ছবিটা মলাটে সাটা। একজন বন্ধুকে দেখিয়ে বেশ গর্বের সঙ্গে বলল, দেখ দেখ, কি পেয়েছি। পুরো পাতাটাতেই আইজাক হুফারের আর্ট। ক্রিমসন ক্রিস্টমাস থেকে এঁকেছে। মাত্র সত্তর ডলার দিয়ে নিয়ে ফেললাম।
লম্বা, পাতলা, ধূসর চুলওয়ালা একজন লোক এগিয়ে এল। চামড়ার রঙ বেশি ফ্যাকাসে। কোন সময়েই যেন বাইরে বেরোয় না, খালি ঘরে বসে থাকে। বলল, এই খোকা, আমার কাছে বেচে দাও ওটা। পঁচাত্তর দেব।
না, জবাব দিল ছেলেটা।
একটানে ছেলেটার হাত থেকে ছবিটা নিয়ে নিল লোকটা। ওর হাতে গুঁজে দিল কতগুলো নোট। নাও, একশোই দিলাম। অনেক কিছু কিনতে পারবে।
হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছে ছেলেটা। ফড়াৎ ফড়াৎ করে টেনে ছবিটা ছিড়ে ফেলল লোকটা। বড় একটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে লাইটার বের করে আগুন ধরিয়ে দিল টুকরোগুলোতে।
কে আপনি? চিৎকার করে উঠল ছেলেটা। আমার জিনিস কেন ছিড়লেন?
বেঁটে, মোটা, কালো চুল, কালো দাড়ি এক লোক এগিয়ে এল। ঠিকই করেছে ছিড়ে। ওর নাম আইজাক হুফার। ওটা তারই আঁকা ছিল।
চোয়াল স্কুলে পড়ল ছেলেটার। আপনিই আইজাক হুফার! একটা অটোগ্রাফ দেবেন?
ছেলেটার বাড়িয়ে ধরা নোটবুকে হেসে সই দিয়ে দিল পাতলা লোকটা।
ইস! দুঃখ করে বলল ছেলেটা, যদি ওই ছবিটাতে আপনার-সই নিতে পারতাম!
হুফারের মুখ থেকে হাসি চলে গেল। ক্রিমসন ফ্যান্টমে জীবনে সই দেব না আমি!
মোটা লোকটা ছেলেদের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল। কেন রাগল জানো? তুমি নিশ্চয় জানেন না, ওই সিরিজ থেকে বের করে দেয়া হয়েছে হুফারকে। ঠকিয়েছে। হিরোয়িক কমিকস তার সমস্ত শিল্পকর্ম বিক্রি করে দিয়েছে, অথচ একটা পয়সা দেয়নি ওকে। তাই যেখানে যা পাচ্ছে নষ্ট করে ফেলছে সে, যাতে আরও দামি না হয়ে ওঠে, আরও বেশি রোজগার করতে না পারে হিরোয়িক কমিক।

হুফার! ডাক দিলেন ডিকসন। আপনাকেই আমার দরকার ছিল। একটা জিনিস দেখাতাম। সংগ্রহে রাখার মত। মুখ বাঁকালেন তিনি। কিন্তু এখন আর পারব না। চুরি হয়ে গেছে।
তাই! স্টলের কাছে এগিয়ে এল মোটা লোকটা। চোর বলছে তার দোকানে ডাকাতি হয়েছে। চমৎকার!
জ্বলন্ত চোখে লোকটার দিকে তাকালেন ডিকসন। দেখ এডগার, আমার ব্যাপারে নাক গলাতে এসো না!
তুমি চোর নও বলতে চাও? লোকে পছন্দ করে কিনতে আসে বলে তাদের গলা কাট তুমি। তোমাদের মত লোকেরাই এই কালেকটিং ব্যবসাটাকে মাটি করল! সুযোগ পেয়ে ছিলে ফেল মানুষকে।
স্টলের টেবিল, ঘুরে এডগারের দিকে এগোতে গেলেন ডিকসন। তাঁর হাত চেপে ধরল হুফার। তার হাতের উল্টো পিঠে কনভেনশন স্ট্যাম্প মারা দেখতে পেল কিশোর। ওখানেই থাকুন। এডগার ঠিকই বলেছে। ডাকাতিই চলছে এখানে। কমিক থেকে সবাই লাভবান হয়, কেবল আর্টিস্ট বাদে।
এই যে, ডিকসন! তাড়াহুড়ো করে এগিয়ে এলেন কনভেনশন চীফ ই মরগান। এইমাত্র পেলাম খবরটা। কি যে কাণ্ড! কারও কোন দায়-দায়িত্ব নেই। আমি এখান থেকে সরেও সরতে পারলাম না, ঘটে গেল...! দুঃখজনক। কি নিয়েছে চোর?
বেশি কিছু না। সব চেয়ে দামি যেটা নিয়েছে সেটা ফ্যান ফানের একটা কপি। তাতে হুফারের কিছু কাজ করা ছিল। হুফারের হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে নিলেন ডিকসন। থাকলে এখন ওকে দেখাতে পারতাম।
কমিক বিক্রির ব্যাপারে নানা জনের নানা মত থাকতে পারে, বললেন মরগান। তবে চুরিদারিটা মানা যায় না। এর একটা ব্যবস্থা করতেই হবে।
তা তো হবেই। চোখ খোলা রাখব আমরা, এডগার বলল। হুফার, চলো, যাই। রক অ্যাস্টারয়েড বোধহয় শুরু হয়ে গেল। এখনও গেলে ধরা যায়।
রওনা হয়ে গেল দুজনে।
কয়েকজন ডিটেকটিভকে কাজে লাগিয়ে দিয়েছি আমি, ডিকসন বললেন। তিন গোয়েন্দার পরিচয় করিয়ে দিলেন মরগানের সঙ্গে।
কার্ডে চোখ বোলালেন মরগান। গোয়েন্দা, না? বেশ বেশ। সাহায্যের দরকার হলে জানিও। আমার এখন কাজ আছে, যেতে হবে। আরেক সমস্যা। গোল্ড রুমে রক অ্যাস্টারয়েডের সিরিয়াল দেখানো হবে, সব কটা, ষাট ঘণ্টা ধরে চলবে। অথচ চালানোর মানুষই এখনও আসেনি। প্রোজেকশনিস্ট। এডগারকে অপেক্ষা করতেই হচ্ছে।

জোরে নিঃশ্বাস ফেললেন তিনি। প্রোজেকটর সেট করেই রেখেছি। চালানোর একজন মানুষ পেলেই এখন হয়ে যেত। কস্টিউম প্রতিযোগিতাও শুরু হওয়ার সময় হয়েছে।
কিছুটা উদ্বিগ্ন হয়েই তাড়াহুড়া করে চলে গেলেন তিনি।
রক অ্যাস্টারয়েড? ঠিক বুঝতে পারছে না রবিন।
চল্লিশ দশকের শেষ দিকে একটা বেশ চালু সায়েন্স ফিকশন সিরিজ ছিল, বোধহয় সেটার কথাই বলছে, কিশোর বলল। হাতের বাক্সটা আবার টেবিলে নামিয়ে রেখে প্রায় দৌড় দিল লুই মরগানের পেছনে। রবিন আর মুসাও পিছু নিল।
মরগানকে ধরল কিশোর, স্যার, এক সেকেন্ড। একটা সাহায্য করবেন দয়া করে? ওই লোক দুটো কে, বলতে পারেন, একটু আগে যারা মিস্টার ডিকসনের স্টল থেকে গেল?
পাতলা, লম্বা লোকটার নাম আইজাক হুফার। ছবি আকিয়ে এবং লেখক। মোটা লোকটার নাম এডগার ডুফার। হুফারের হাতের লেখা ভাল না, তাই তার কামিকের কথাগুলো লিখে দিতে হয় ডুফারকে। চমৎকার মিলেছে দুজন হুফার এবং ডুফার। হাসলেন মরগান। ডুফারটা পাজি। নিজের সম্পর্কে অনেক উঁচু ধারণা। সবাইকে বলে বেড়ায়, তার অনেক বড় কিছু হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু কমিক প্রকাশকদের জন্যে সেটা হতে পারেনি। খালি গোলমাল করার তালে থাকে এই লোক।
হুফারের সঙ্গে ভাবসাব তো বেশ ভালই দেখলাম, কিশোর বলল।
তা তো থাকবেই। বললাম না দুজনে একসাথে কাজ করে। মাসখানেক আগে হুফার থাকত ওহায়ওতে। আমার বিশ্বাস, লস অ্যাঞ্জেলেসে এসেছে এখানে তার কমিক কেমন চলে দেখতে। ভাল চললে থেকে যাবে। কিন্তু আসার পর থেকে কোন কমিক আঁকতে দেখিনি।
এক মুহূর্ত চুপ থেকে জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেললেন তিনি। তারপর বললেন, আমি তাকে কনভেনশনে দাওয়াত করেছি। সম্মান দেখিয়ে একটা ঘরও দিয়েছি থাকার জন্যে। মনে হয় ভুলই করে ফেলেছি।
ঘড়ি দেখলেন মরগান। দেরি হয়ে যাচ্ছে। যেতে হবে।
তাড়াহুড়া করে তাকে চলে যেতে দেখল তিন গোয়েন্দা।
ভালই একটা কেস মিলল মনে হচ্ছে, মুসা বলল।
সন্দেহ করার মত একজনকে পেয়েও গেলাম, রবিন বলল।
কার কথা বলছ? জিজ্ঞেস করল কিশোর, ডুফার, না হুফার?

আইজাক হুফার। চুরিটাই সন্দেহজনক। হয়তো সে-ই করিয়েছে, ওই কমিকগুলো তার পছন্দ নয় বলে। ছেলেটার হাত থেকে নিয়ে কিভাবে নষ্ট করে ফেলল দেখলে না। ফ্যান ফানের ছবিগুলোও নিশ্চয় তার পছন্দ ছিল না।
কিন্তু কমিকগুলো চুরি হওয়ার পর পরই এসে উদয় হয়েছিল সে, মনে করিয়ে দিল মুসা। ধোঁয়াও সরে সারেনি তখনও।
হুঁ, মাথা দোলাল কিশোর। লোকটা কোথায় উঠেছে, জানি আমরা। তার ঘরে গিয়ে দেখলেই তো পারি কমিকগুলো আছে কি-না?
রাজি হয়ে গেল অন্য দুজন।
রিসিপশন ডেস্ক থেকে হুফারের রুম নম্বর নিল কিশোর। তিন মিনিট পরেই ৩১৮ নাম্বার ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল তিন গোয়েন্দা।
একবার দেখেই মাথা নাড়ল কিশোর, এই তালা খুলে ঢোকা সহজ হবে না। বিশেষ যন্ত্রপাতি দরকার।
ভুরু কুঁচকে তালাটার দিকে তাকিয়ে রইল সে। পাশের ৩২০ নম্বর ঘরের খোলা দরজার ওপর চোখ পড়তেই উজ্জ্বল হলো চেহারা। ছোট একটা ঠেলাগাড়ি রাখা দরজার পাশে। তার মানে ঘর যে পরিষ্কার করে সে ওটা নিয়ে এসেছে।
দরজায় জোরে জোরে দুবার থাবা দিল কিশোর। ডাক দিয়ে জিজ্ঞেস করল, ভেতরে কেউ আছেন? এপাশ ওপাশ একবার তাকিয়েই ঢুকে পড়ল শূন্য ঘরের ভেতরে। পেছনে ঢুকল দুই সহকারী গোয়েন্দা।
এবার? জানতে চাইল মুসা, ওঘরে যাব কি করে? দেয়াল ফুটো করে?
তার দরকার হবে না, বলতে বলতে স্লাইডিং-গ্লাস ডোরের কাছে এসে দাঁড়াল কিশোর। বেরিয়ে এল ব্যালকনিতে। এখান থেকে হোটেলের ভেতর দিকে চত্বর আর সুইমিং পুল চোখে পড়ে। বাঁয়ে তাকাল সে। ৩১৮ নম্বর ঘরের ব্যালকনির দরজা রয়েছে চার ফুট দূরে। ছোট্ট একটা লাফ দিলেই পৌঁছে যাওয়া যায়, আনমনে বলল। তবে সেই লাফটা দেয়ার মত লোক প্রয়োজন, খেলাধুলায় যে পারদর্শী। বিশেষ করে ফুটবল প্লেয়ার।
না না, তাড়াতাড়ি হাত নাড়ল মুসা। আমি পারব না!
তাকে রাজি করাতে কয়েক সেকেন্ডের বেশি লাগল না কিশোরের। ২২০ নম্বর ঘরের ব্যালকনির রেলিঙে চড়ে বসল মুসা। বিড়বিড় করে বলছে, জ্বালিয়ে মারল! কিছু বলতেও পারি না! গাধার মত রাজি হয়ে যাই! কিশোরের দিকে তাকাল না। জানে, কি দেখতে পাবে। দেখবে, মুচকি হাসছে গোয়েন্দাপ্রধান। চোখে চোখ পড়লে হা হা করে হেসে ফেলবে। ওকে সেই সুযোগটা দিতে চাইল না।
কিন্তু রবিনকে ঠেকানো গেল না। হেসে বলল, দেরি করছ কেন? লাফ দাও। মাত্র তো চার ফুট।

তা তো বটেই, গজগজ করল মুসা। মাত্র চার ফুটই যদি কোনভাবে মিস করি, পড়ব গিয়ে তিরিশ ফুট নিচে।
শক্ত করে রেলিঙ চেপে ধরে আছে সে। বুড়ো আঙুলের ওপর ভর রেখে আচমকা হাত ছেড়ে দিল। চোখ সামনের ব্যালকনির দিকে। নিচে তাকাচ্ছে না। লাফ দিল অনেকটা ব্যাঙের মত করে।
অন্য ব্যালকনিটা যেন উড়ে চলে এল তার কাছে। ডান পা-টা রেলিঙে জায়গামতই বসল, কিন্তু পিছলে গেল বা পা। দম বন্ধ করা ভয়াবহ একটা মুহূর্ত, উল্টে পড়ছে সে। দুহাতে থাবা দিয়ে ধরে ফেলেছে রেলিং। চেপে ধরার ফলে সাদা হয়ে গেছে হাতের পেছনটা। ধীরে ধীরে টেনে তুলতে লাগল শরীরটাকে।
অনেক কষ্টে পতন রোধ করে আবার শক্ত হয়ে বসল রেলিঙে। লাফিয়ে নামল ব্যালকনিতে। ফিরে তাকাল বন্ধুদের দিকে।
অধৈর্য ভঙ্গিতে হাত তুলে কাচ লাগানো দরজাটা দেখাল কিশোর। ঢোকার ইঙ্গিত করল।
বাহ্, চমৎকার, তিক্ত কণ্ঠে বলল মুসা, আমার জন্যে খুব তো চিন্তা করো দেখছি!
দরজার কাছে গিয়ে কাচের ভেতর দিয়ে উঁকি দিল সে। কাউকে দেখতে পেল। দরজা খোলার জন্যে নব ধরে টানতেই নিঃশব্দে খুলে গেল পাল্লা।
ভেতরে ঢুকল মুসা। ভাল মত দেখে নিল হুফার আছে কি-না ঘরে। নেই। অসংখ্য বোর্ডে আঁকা রয়েছে নানা রকম ড্রইং, সম্মেলনে বিক্রির জন্যেই নিশ্চয় একে রেখেছে হুফার। কিছু পত্রপত্রিকাও চোখে পড়ল। বেশির ভাগই কমিক ম্যাগাজিন। ওগুলোতে ফ্যান ফানের কপিটা দেখতে পেল না সে।
আলমারির দরজা খুলে দেখল ভেতরে আলখেল্লাটা আছে কি-না। তা-ও নেই। তারপর ড্রেসারে খুঁজতে এল মুসা। প্রথম ড্রয়ারটা সবে টান দিয়ে খুলেছে, এই সময় নড়াচড়া লক্ষ্য করল পেছনে।
ঝট করে সোজা হয়ে চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরল সে। জমে গেল যেন বরফ হয়ে। বাথরুম থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এসেছে একটা কুৎসিত মূর্তি। শরীরটা মানুষের মত, বিশাল চওড়া বুকের হাতি, পরনে কালো জিনসের প্যান্ট। মুখটা ভয়ঙ্কর। সবুজ রঙের একটা গিরগিটির মুখকে যেন বিকৃত করে দেয়া-হয়েছে। কমিকের ফ্রগ মিউট্যান্ট।
জীবটা যে মানুষ, সেটা বুঝতে সময় বেশি লাগল না মুসার। তবে যতটুকুই লাগল, তাতেই দেরি হয়ে গেল। মানুষটা লাফ দিয়ে সরে এল তার কাছে, ধা করে চোয়ালে ঘুসি মেরে বসল।
টলে উঠল মুসা। ঝটকা দিয়ে পেছনে সরে গেল মাথাটা, বাড়ি লাগল ব্যালকনিতে বেরোনর দরজার ফ্রেমে।

প্রচন্ড ব্যথায় যেন অন্ধ হয়ে গেল মুসা। ওই অবস্থায়ই কারাতের কোপ বসানর চেষ্টা করল লোকটার ঘাড়ে। লাগাতে পারল না। মারটা সহজেই ঠেকিয়ে ফেলল ফ্রগ মিউট্যান্ট, আবার ঘুসি মারল। পেছনে যেন উড়ে গেল মুসার শরীরটা, বেরিয়ে গেল দরজার বাইরে।

ব্যালকনির রেলিঙে ধাক্কা খেল সে, তারপর উল্টে পড়তে শুরু করল। পাগলের মত হাত বাড়িয়ে রেলিং ধরার চেষ্টা করল, কিছুই ঠেকল না হাতে। চারিদিকে সব ফাঁকা, শুধুই শূন্যতা।

মাথা নিচু করে নিচের চত্বরে পড়তে যাচ্ছে মুসা। মরিয়া হয়ে শূন্যেই শরীরটাকে বাঁকাল সে। বান মাছের মত শরীর মুচড়ে সরাসরি চত্বরে পড়া থেকে বাঁচল কোনমতে। ডাইভিং বোর্ড থেকে ঝাঁপ দিতে দিতেই এই কায়দাটা রপ্ত করেছে। সুইমিং পুলের দিকে সরে চলে এসেছে। নামছে তীব্র গতিতে। এই ডাইভ তাকে অলিম্পিকের স্বর্ণপদক এনে দেবে না, কিন্তু পদকের চেয়ে অনেক অনেক দামি জীবনটা তো বাঁচল।

ঝপাং করে পানিতে পড়ল মুসা। যতটা ডোবার ডুবে ভেসে উঠতে শুরু করল। ভুস করে মাথা তুলল পানির ওপরে। জোরে জোরে শ্বাস নিতে লাগল। কাঁপছে এখনও। অল্পের জন্যে বেঁচেছে। পুলের কিনার থেকে ডজনখানেক হাত এগিয়ে এল তাকে টেনে তোলার জন্যে। কিন্তু যেখানে ছিল সেখানেই রইল সে, শকটা হজম করে নেয়ার জন্যে।

আরেক গ্রহে নামল নাকি, ভাবছে মুসা। তার সামনের লোক-গুলোকে মনে হচ্ছে স্টার ওঅরস ছবির এক্সট্রাদের মত। রোবট, সবুজ মানুষ, মূল মাথা ছাড়াও আর দুটো বাড়তি মাথাওয়ালা মানুষ, আর বিচিত্র সব জীব। ওরাও আসলে মানুষ, এই সাজে সেজেছে।

মুসার মনে পড়ল কস্টিউম কনটেস্টের কথা। সম্মেলনে যোগ দিতে এসেছে অনেকে। তাদের ঠিক মাঝখানেই পড়েছে সে। তীরে দাঁড়ানো অনেকের চোখেই বিরক্তি দেখতে পেল। কারণ আছে। আচমকা পানিতে পড়ে ওদেরকে ভিজিয়ে দিয়েছে সে।

তার পরেও কয়েকজন টেনেটুনে তুলল ওকে। ওদের মাঝে তার বন্ধু কিশোর আর রবিনও রয়েছে।

কি হয়েছে? জানতে চাইল রবিন।

ভিড় সরানোর চেষ্টা করছে কিশোর।

দেখলাম ঢুকলে, রবিন বলছে, একটু পরেই দেখি দরজা দিয়ে উড়ে বেরোলে। ব্যাপারটা কি?

উড়তে সাহায্য করা হয়েছিল আমাকে। এমন জোরে ঘুসি মারল…

তোমার মত মানুষও সামলাতে পারল না, কথাটা শেষ করে দিল রবিন। কে মারল? হুফার? না লাল আলখেল্লা পরা লোকটা?
মাথা নাড়ল মুসা। আমার মনে হয় না ভূতটা হুফার। ওর ঘরে কোন কস্টিউম দেখলাম না। আমাকে যে মেরেছে তার গায়ে মোষের জোর। সারা গায়ে পেশী আর পেশী। মুখ দেখতে পারিনি। ফ্রগ মিউট্যান্টের মুখোশ পরা ছিল।
হুঁ, আনমনে বিড়বিড় করল কিশোর। দুজন জুটল এখন। একজন কমিক লিখে হিরো হয়ে গেছে, আরেকজন মুখোশ পরে ভিলেন সেজেছে, চুরি করে ঢুকেছে হুফারের ঘরে। মুখ তুলল। দুজনের মাঝে সম্পর্ক নেই তো?
ওই যে, এসে গেছে, নিচু গলায় বলল রবিন।
হোটেলের ব্লেজার পরা একজন লোক এগিয়ে এলেন। পকেটের মনোগ্রাম দেখে বোঝা গেল, তিনি হোটেলের ম্যানেজার। চেহারাটা রুক্ষ, মোটেও আন্তরিক নয়। পেছনে দৌড়ে আসছেন আরেকজন, লুই মরগান।
কি হয়েছিল? কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন ম্যানেজার।
আমি-ইয়ে...পড়ে...গিয়েছিলাম, আমতা আমতা করে জবাব দিল মুসা। প্লাস্টিকের একটা পুল চেয়ারে বসেছে।
পড়ে গিয়েছিলে? কি করে? কোত্থেকে? মুসার ওপর ঝুঁকে দাঁড়ালেন ম্যানেজার।
আমি... মরিয়া হয়ে যেন চারপাশে তাকাল, মুসা। তাকে উদ্ধার করতে এগিয়ে এল কিশোর।
আপনাদের বিরুদ্ধে মামলা ঠুকে দেয়া দরকার, ম্যানেজারের দিকে তাকিয়ে কড়া গলায় বলল কিশোর। ব্যালকনিতে ওগুলো কি রেলিং লাগিয়েছেন? এত নিচু! পড়ল তো সেজন্যেই। ভাগ্যিস ডাইভ দেয়ার অভ্যেস আছে ওর। নইলে তো...
কেঁপে ওঠার অভিনয় করল গোয়েন্দপ্রধান। দরজার দিকে তাকিয়ে পিছিয়ে এসেছিল আমার বন্ধু। হঠাৎ দিল হাঁচি। তাল সামলাতে না পেরে উল্টে পড়ে গেল।
আপনাদের রেলিংগুলো আরেকটু উচু হলে এই অবস্থা হত না। শুকনোয় পড়ে যদি মরত, পারতেন আর ফিরিয়ে দিতে?
কিশোরের এই ভাষণে থতমত খেয়ে গেছেন ম্যানেজার। সামলে নিয়ে শীতল দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এই হোটেলের গেস্ট?
এগিয়ে এলেন লুই মরগান। হ্যাঁ। রুম নম্বর তিনশো ষোলো। আমার সঙ্গে উঠেছে।
প্রতিবাদ করল না কিশোর। তাকিয়ে রয়েছে মরগানের দিকে।
তাই! কনভেনশন চীফের দিকে ঘুরলেন ম্যানেজার। দিনটাই আজ খারাপ যাচ্ছে, কি বলেন মিস্টার মরগান? প্রথমে হলো ডাকাতি, তারপর এই কাণ্ড আশা করি আর কোন গোলমাল দেখতে হবে না আজ। বলে রওনা হয়ে গেলে।

গটমট করে হেঁটে যাচ্ছেন ম্যানেজার। সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কিশোরকে জিজ্ঞেস করলেন মরগান, তদন্ত করতে গিয়েই নিশ্চয় এটা ঘটল?
হ্যাঁ, স্বীকার করল কিশোর। তদন্ত করতে গেলে অনেক সময় মাথার ঠিক থাকে না মুসার, উল্টোপাল্টা কাজ করে বসে। বোধহয় পানিতে ঝাপ দেয়ার শখ হয়েছিল। যা-ই হোক, সাহায্যের জন্যে ধন্যবাদ। কিন্তু ম্যানেজার যদি তিনশো ষোলোতে আমাদের খোঁজ নিতে যান...?
তাহলে তোমাদের পেয়ে যাবেন। ঘরটা তোমাদেরকে দিতে চাই। পাশের ঘরটাই আমার, দুশো আট নম্বর। আমি বুঝতে পারছি, এই কেসের তদন্ত করতে হলে হোটেলের একটা ঘর তোমাদের লাগবেই। চাবি বের করে দিলেন মরগান। তোমার বন্ধুর কাপড় বদলানোও দরকার। তবে, ভিজে কাপড় গায়ে লেপটে সগিম্যান সেজে থাকার ইচ্ছে যদি হয়ে থাকে আমার আপত্তি নেই। জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, বিচারক মন্ডলীকে বলে দেব, এই কস্টিউম যেন শো করার ব্যবস্থা করা হয়।
এমন ভঙ্গিতে বললেন মরগান, সত্যি ভেবে বসল মুসা। তাড়াতাড়ি হাত তুলে নিষেধ করল, না না, ওকাজ করবেন না!
হাসলেন মরগান। এগিয়ে গেলেন বিচারকের মঞ্চের দিকে।
তিন গোয়েন্দা চলল ৩১৬ নম্বর কামরায়।
ঘরে দুটো ডাবল বেড আছে, একটা ড্রেসার আছে, আর আছে একটা তালা দেয়া দরজা, যেটা খুললে ৩১৪ নম্বরে ঢোকা যায়।
তোয়ালে নিয়ে বাথরুমের দিকে চলে গেল মুসা। এখানে রবিন আর কিশোরের আপাতত কিছু করার নেই। আবার নিচে রওনা দিল দুজনে।
সম্মেলনে যাওয়ার টিকেট চেক করছে এখন অন্য একজন। গোলগাল মুখ, যেন একটা কুমড়ো। এলোমেলো চুল। লোকের টিকেট দেখে হাতের উল্টো পিঠে সীল মেরে দিচ্ছে। দরজা পাহারা দিতে বসেছে এখন সেই মেয়েটা, যার চুল দুই রঙে ডাই করা, যে তিন গোয়েন্দার হাতে সীল মেরেছিল। কিশোরের দিকে একবার চেয়েই মুখ ফিরিয়ে নিল সে। কিন্তু রবিনের দিকে তাকিয়েই রইল। হাসল। বলল, হাই, আমার নাম ডোরা।
রবিন তার মধুরতম একটা হাসি উপহার দিল মেয়েটাকে। ডোরা! চমৎকার নাম! আমার খুব পছন্দ। আচ্ছা, ভোরা, ওই স্মোক বম্ব ফাটার পর কালো আলখেল্লা পরা কোন মানুষকে কি এখান দিয়ে যেতে দেখেছ?
রবিনের চোখের দিকে তাকিয়ে রইল মেয়েটা। মাথা নাড়ল।
এডগার ডুফারের বর্ণনা দিয়ে কিশোর জিজ্ঞেস করল ডোরাকে, ওরকম কাউকে যেতে দেখেছে কি-না।

ভ্রূকুটি করল মেয়েটা। ওরকম মোটকা কত লোক এখানে কমিক কিনতে আসে জানো? হাজার হাজার। ওদের নশো নব্বই জনই যায় এখান দিয়ে। সব দেখতে এক রকম। কতজনের কথা মনে রাখব?
এই লোকটা মোটামুটি পরিচিত, রবিন বলল। কমিকের লেখা লেখে। দাড়ি আছে...
ডুফারের কথা বলছ না তো? তোমার বন্ধু তাহলে ওকথা বললেই পারত, নামটা বললেই বুঝতে পারতাম। হ্যাঁ, দেখেছি। এই তো মিনিট দুই আগে বেরিয়ে রেস্টুরেন্টের দিকে গেল।
রেস্টুরেন্টে এসে লোকটাকে পেল গোয়েন্দারা।
ওদেরকে লাঞ্চের দাওয়াত দিল ডুফার। চলো, বাইরের টেবিলে গিয়ে বসি। তাহলে খেতে খেতে সম্মেলন দেখতে পারব।
সোনালি চুলওয়ালা মেয়েটাকে আরেকবার দেখার আশায় রাজি হয়ে গেল কিশোর।
সুইমিং পুলের কিনারে একটা টেবিলে এসে বসল ওরা। ছাতার নিচে। সম্মেলন চলছে। একজন করে প্রতিযোগীর নাম ঘোষণা করা হচ্ছে, আর সেই ভিড় থেকে বেরিয়ে এসে হাঁটছে সুইমিং পুলের কিনার দিয়ে, চারপাশে এক চক্কর, দর্শক আর বিচারক মন্ডলীকে দেখাচ্ছে তার পোশাক।
দুটো করে চীজবার্গারের অর্ডার দিল ডুফার। একটা করে তুলে নিল কিশোর আর রবিন।
কামড় বসাল কিশোর। চিবিয়ে গিলে নিয়ে বলল, কমিকের ব্যাপারে আমাদের কিছু তথ্য দরকার। আপনি কি বলতে পারবেন?
ভুরু কুঁচকে গেল ডুফারের। দাড়িও যেন উঠে এল সামান্য ওপরে। বলো, কি জানতে চাও?
ওরা কথা বলছে, এই সময় পুলের কিনারে এসে দাঁড়াল আরেকজন প্রতিযোগী। অদ্ভুত এক পোশাক পরেছে। যেন বিশাল একটা টোস্টারের ভেতরে ঢুকিয়ে নিয়েছে শরীরটা। হাত, পা আর মুখ বেরিয়ে আছে শুধু।
কিশোরের প্রশ্নের জবাবে ডুফার বলল, আমি কমিক সংগ্রহ করি, তার কারণ, করতে আমার ভাল লাগে। পাতা উল্টাই ওগুলোর। কোন ছবি ভাল লেগে গেলে, সেগুলোর মাঝের ফাঁকা জায়গায় লিখি নিজের মত করে। লিখতে আমার ভাল লাগে। কমিক অনেকেই পছন্দ করে, তবে শুধু পড়তেই। আঁকাআঁকি কিংবা লেখার ঝোঁক নেই তাদের।
সবার নেই, রবিন বলল। একথা বলা যাবে না।

তা ঠিক। আমার আছে। হুফারেরও আছে। ও অবশ্য লিখতে পারে না, হাতের লেখা ভাল নয় তো। তবে তার ছবিগুলো দেখার মত, কি বলো?
মাথা ঝাঁকাল কিশোর। চোখ অন্যদিকে তাকিয়ে রয়েছে সেই মেয়েটার দিকে। সোনালি চুল।
বলে চলেছে ডুফার, হুফারের কাজগুলো একেকটা ক্ল্যাসিক। দশ বছর আগে, মাত্র আঠারো বছর বয়সেই দুর্দান্ত এক হিরো তৈরি করে বসেছিল সে। গল্প তৈরি করল, ছবি আঁকল, ছাপতে দিল এক কমিক ম্যাগাজিনে। সাংঘাতিক সাড়া জাগাল। রাতারাতি অংসখ্য ভক্ত জুটে গেল তার। কমিকের নায়কের নাম রেখেছিল সে, গ্রে ফ্যান্টম।
হাসল ডুফার। ফ্যানজাইন ম্যাগাজিনে ছাপার ব্যবস্থা হয়েছিল তার কমিক। রঙের ব্যাপারে একটা বাধা ছিল। চার রঙা ছাপার উপায় ছিল না, সাদা-কালোতে ছাপা হত ম্যাগাজিনটা। তৃতীয় আর একটামাত্র রঙে ছাপা যেত, তাহল ধূসর। আর তাই বাধ্য হয়ে নায়কের নাম দিতে হলো হুফারকে, গ্রে ফ্যান্টম বা ধূসর ভূত। ওই রঙেতেই ছাপল তার কমিক। যা-ই হোক, খুবই সাড়া জাগাল গ্রে ফ্যান্টম। হিরোয়িক কমিকস নামে একটা কোম্পানি কাজের অফার দিল হুফারকে, এবং তখন তার হিরোর নাম হয়ে গেল...
ক্রিমসন ফ্যান্টম! প্রায় চিৎকার করে বলল রবিন। টকটকে লাল ওই হিরোর গল্প আমি পড়েছি!
হুফারের এক সাংঘাতিক সৃষ্টি। শুধু যে কাহিনীই ভাল, তা-ই না, আঁকতেও পারে বটে লোকটা। আর সব কমিকের চেয়ে একেবারে আলাদা, গতানুগতিকার বেড়া ডিঙাল ক্রিমসন ফ্যান্টম। তারপরে রয়েছে একটা বিশেষ ব্যাপার...
মাথা ঝাঁকাল রবিন। ঠিকই বলেছেন। গোপন গোপন ভাব। একটা রহস্য। ক্রিমসন ফ্যান্টম যে আসলে কে, তা-ই জানে না লোকে। তার পরিচয় গোপন থাকে। ওভাবেই কাজ করে যায় সে। তিন-চার রূপ, একেক বার একেক রূপে উদয় হয়। কমিকের তিন-চারটে চরিত্রের যে কোন একটা হতে পারে সে, কোনটা আসল ফ্যান্টম, বোঝা মুশকিল। ওই ধাঁধার জবাব খুঁজতে খুঁজতে তো মাথাই খারাপ হয়ে যেত আমার।
এ যাবৎ হাতে গোনা যে কটা ভাল কমিক বেরিয়েছে, তার মধ্যে একটা ছিল ওই ক্রিমসন ফ্যান্টম, ভোঁতা গলায় বলল হুফার। অথচ ধ্বংস করে দেয়া হলো ওটাকে।
ধ্বংস? এতক্ষণে সতর্ক হলো কিশোর, কিভাবে?
নীল বোরাম নামে একজন লোকের সঙ্গে কাজ করত হুফার। লোকটা ছিল তার কমিকের এডিটর। বোরামকে বিশ্বাস করেছিল সে। কপিরাইটের ব্যাপারে কি

জানি একটা ঘাপলা বাধিয়ে ক্রিমসন ফ্যান্টমের কপিরাইট নিজের নামে করিয়ে নিল বোরাম। টেবিলে চাপড় মারল ডুফার। মহা শয়তান। নিয়ে নেয়ার পর সিরিজটাকে আরও জনপ্রিয় করার জন্যে নানা রকম কায়দা করতে লাগল সে। একটা বিশেষ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করল। ক্রিমসন ফ্যান্টম আসলে কোন চরিত্রটা, বলতে পারলে পুরস্কার দেয়া হবে।

রবিন বলল, ওই প্রতিযোগিতার কথা জানি আমি।

তা তো জানবেই। অনেক ছেলেই জানে ক্রিমসন ফ্যান্টম প্রতিযোগিতার কথা। তারপর আরও দুটো নতুন ক্রিমসন ফ্যান্টম বই বের করল বোরাম। একটার নাম দিল সিক্রেটস অভ দি ক্রিমসন ফ্যান্টম, আরেকটা দ্য ব্যাটেলিং ক্রিমসন ফ্যান্টম। নতুন লেখক আর আর্টিস্ট নিয়োগ করল একাজে। ওরা খারাপ করেনি, তবে হুফারের তুলনায় একেবারেই সাধারণ।

রাগে ভুরু কোঁচকাল ডুফার। আসলে চরিত্রটার যা যা বিশেষত্ব ছিল, সব নষ্ট করল বোরাম, খুন করল চরিত্রটাকে। ক্রিমসন ফ্যান্টম এখনও আছে, ভালই বিক্রি হয়, তবে এটা একেবারেই অন্য কমিক। আসলটার ধারেকাছেও লাগে না। অবশ্য বিক্রি হয় প্রচুর। হিরোয়িক কমিকসকে তুলেছে ওটাই, বোরামকেও বড়লোক বানিয়েছে।

এডগার ডুফার কিছুই করতে পারল না? প্রশ্ন করল কিশোর। এই সময় ওদের টেবিলের পাশ দিয়ে গেল কস্টিউম পরা আরেকজন প্রতিযোগী। এই লোকটার পোশাক বিচিত্র। টমেটোর চারপাশে সাজিয়ে রাখা অনেকগুলা লেটুসপাতা যেন বিশাল আকার নিয়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

চেষ্টা অনেকই করেছে, জানাল ডুফার। ঠেকানর চেষ্টা করেছে বোরামকে। পারেনি। আর পারবেই বা কি করে? চালাকি করে ততদিনে ক্রিমসন ফ্যান্টমের কপিরাইট নিজের নামে করে ফেলেছে বোরাম। ডুফার ভাবল, সে কাজ না করলেই কমিকটা বন্ধ হয়ে যাবে, আর কেউ আঁকতে পারবে না। তাই হিরোয়িক কমিকস থেকে বেরিয়ে চলে আসে সে। কিন্তু বোরাম ধুরন্ধর লোক। অন্য লোক দিয়ে কমিক আঁকাতে শুরু করল। কিছুই করতে না পেরে নিজের সৃষ্টির ওপরই ভীষণ রেগে গেল ডুফার। যেখানেই পায় নষ্ট করে ফেলে। তোমাদের সামনেই তো নষ্ট করল। দেখলেই ওরকম করে পোড়ায়।

তার মানে, কিশোর বলল, আপনি বলতে চাইছেন কোম্পানিটা ক্রিমসন ফ্যান্টমের ভক্তদেরকে ঠকাচ্ছে?

ঠকাচ্ছে আসলে অনেকেই, এক বোরাম নয়, হাত ওল্টাল ডুফার। ঘুরে তাকাল পাশের টেবিলে বসা কালো-চুল এক তরুণের দিকে। তাকে বলল, অ্যাই, পিটার, তোমার কাছে ওভারস্ট্রীটের কপি আছে?

বার্গার খাচ্ছিল লোকটা। হাতের খাবার প্লেটে নামিয়ে রেখে কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ থেকে বের করে আনল একটা দোমড়ানো মোটা বই। এই নাও, বলে ছুড়ে দিল ডুফারের দিকে।
লুফে নিল ডুফার। টেবিলে বিছিয়ে পাতা ওল্টাতে শুরু করল। এই যে, পাওয়া গেছে। সেরিবাস। সাদা-কালো কমিক, প্রথম প্রকাশিত হয় উনিশশো সাতাত্তর সালে। আসল একেকটা কপি বিক্রি হবে এখন পাঁচশো ডলারে। এই যে, দেখ, নকলও রয়েছে। জালিয়াতি। যারা চেনে তারা ঠিকই বুঝতে পারবে এটা নকল। নকলগুলো বিক্রি হয় বিশ-তিরিশ ডলার দামে।
হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে গিয়ে বইটা ফেরত দিয়ে এল ডুফার। ছেলেদেরকে বলল, কমিক ভক্তদের ব্যাপারটা বুঝি না। অনেক সময় যারা ঠকায় তাদেরও লাভবান করে দেয়। জাল বলেই কিনে নেয় অনেকে অনেক দাম দিয়ে, সংগ্রহে রাখার জন্যে।
আবার ভ্রূকুটি করল ডুফার। ঠকিয়েও পয়সা কামায়। লোকে আসল ভেবে বেশি দাম দিয়ে কেনে। লাভটা যায় প্রকাশকের পকেটে। সেগুলো বিক্রি করারও মানুষ আছে। আসল বলে গছিয়ে দেয় ক্রেতাকে।
মুখ তুলল কিশোর, যেমন? কার মত বিক্রেতা?
ইঙ্গিতটা বুঝতে পারল ডুফার। লোকে তো প্রায়ই অভিযোগ করে জেমস ডিকসনের নামে। ওর কাছে কিছু কিনতে গেলে সাবধান। হাতে ঘড়ি থাকলে, হাত মেলানর পর ভালভাবে দেখে নেবে বদলে দিল কি-না। নিজের রসিকতায় নিজেই হাসল সে।
প্রতিযোগিতা শেষ হয়েছে। বিজেতার নাম ঘোষণা করার আগে বাঁশি বাজল। ঘোষণা করলেন বিচারক। প্রথম হয়েছে রোমশ পোশাক পরা একজন। ও সেজেছিল স্লোর্জ দ্য প্ল্যানেট ইটার।
পাশের টেবিলে বিরক্তি প্রকাশ করল পিটার। এটা একটা কাজ হলো? আমি তো ভেবেছিলাম ওই সোনালি চুল মেয়েটাই জিতবে!
মেয়েটার দিকে তাকিয়ে কিশোরও একই কথা ভাবছে, তবে সেটা প্রকাশ করল না।
উঠে দাঁড়াল ডুফার। এবার যেতে হয়। রকের জাহাজ ভাঙার তোড়জোড় করছে মাকর্মান। দ্রুত গিয়ে খাবারের বিল দেয়ার জন্যে কাউন্টারের সামনে দাঁড়াল সে।
হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছে দুই গোয়েন্দা। হেসে উঠল পিটার। বুঝলে না? রক অ্যাসটারয়েড ছবির কথা বলল ডুফার। সিনেমার খুব ভক্ত, সাইন্স ফিকশন। অনেক কিছুই মনে রাখে। ভাল ভাল ডায়লগ মুখস্থ করে রাখে, জায়গা মত ঝাড়ে। হাহ হা।

উঠে দাঁড়াল রবিন। বিড়বিড় করে বলল, কি সব মানুষ! সবাই-ই পাগল নাকি এখানকার!
বেরোনোর জন্যে রওনা হল দুই গোয়েন্দা। চোখের কোণ দিয়ে কিশোর দেখতে পেল সোনালি ঝিলিক।
ঘুরে তাকাল সে। রেস্টুরেন্টে ঢোকার মুখের কাছে একটা টেবিলে বসেছে সোনালি চুল মেয়েটা। সঙ্গে আরেকজন বয়স্ক মহিলা, বোধহয় মেয়েটার মা। তৃতীয় আরও একজন রয়েছেন, যাকে চিনতে পারল কিশোর। সেই টাকমাথা লোকটা, ম্যাড ডিকসনের কাছ থেকে যে ফ্যান ফানের কপিটা কিনতে চেয়েছিলেন।
দরজার দিকে এগোনোর সময় কথা কানে এল কিশোরের। টাকমাথা লোকটার সঙ্গে কথা বলার সময় মেয়ের কাঁধে আলত চাপড় দিল বয়স্ক মহিলা। বলল, ফটোকভারের জন্যে আমাদের মিরার মত মেয়ে আর পাবেন না, মিস্টার বোরাম। ও আপনার পারফেক্ট মডেল।
ও, এ-ই তাহলে নীল বোরাম, ভাবল কিশোর, আইজাক হুফারের প্রথম দিককার কাগজগুলোর ব্যাপারে এত আগ্রহী কেন লোকটা?
হঠাৎ রাগী একটা জোরাল কণ্ঠ শুনে ঘুরে তাকাল সে। প্রবেশ পথের একটু দূরে চোখমুখ লাল করে দাঁড়িয়ে রয়েছে হুফার। চিকার করে বলল, হচ্ছেটা কি এখানে, মরগান! আমার ঘরে কে জানি ঢুকে সব তছনছ করে দিয়েছে!
হুফার, মরগান বললেন, এসব নিয়ে কি এখানেই কথা বলতে হবে? দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। অস্বস্তিতে পড়ে গেছেন, মুখ দেখেই অনুমান করা যায়। ইতিমধ্যেই লোক জমা আরম্ভ হয়েছে। কৌতূহলী চোখে তাকাচ্ছে দুজনের দিকে। জনতার ভিড়ে সামিল হলো কিশোর আর রবিন।
চিৎকার করে বলছে তখন হুফার, কে জানি ঢুকেছিল আমার ঘরে! আমার কাপড় কেটেছে, চিরে ফালাফালা করেছে সমস্ত ছবি!
গুঞ্জন উঠল সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে।
ও কাজ কে করতে যাবে? মরগানের প্রশ্ন।
সেটাই তো জানতে চাইছি আমিও। তোমার সিকিউরিটি কোথায়? এটা কি ধরনের সম্মেলন হলো?
আর্টিস্টকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন মরগান, তোমার অবস্থা বুঝতে পারছি। যদি যেতে চাও…
যেতে চাইব? গলা আরও চড়ল হুফারের। আমি যেতে চাই না। আমি চাই ওই লোকটাকে। আপনি জানেন, কি করে আমার জিনিসগুলো নষ্ট করেছে সে! আমি

এখানে টাকা রোজগারের জন্যে এসেছিলাম এবং সেটা করেই ছাড়ব আমি। তার জন্যে যা কিছু করতে হয় করব।
দুপদাপ পা ফেলে চলে যাওয়ার সময় ঘুরল সে। আমাকে প্রয়োজন হলে কনভেনশন ফ্লোরে খোঁজ করবেন।
ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল জনতা। গুঞ্জন করছে। মরগানের পাশে এসে দাঁড়াল কিশোর আর রবিন।
মাথা নাড়ছেন তিনি। দেখলেন কাণ্ডটা? কমিক বুকের আর্টিস্টেরও কত দাপট? শ্রাগ করলেন। হুফারের এখানে আসার উদ্দেশ্য ছবি বিক্রি করা। সেটা করতে না পারলে হোটেলের ভাড়া নিয়েই বিপদে পড়ে যাবে।
মাথা ঝাঁকাল কিশোর। টাকার প্রয়োজন অনেক সময় মানুষকে চুরি করতে বাধ্য করে। আরও কয়েকজনের ব্যাপারে আমার আগ্রহ আছে, প্রশ্ন করতে চাই। সোনালি পোশাক পরা মেয়েটা কে?
হাসলেন মরগান। ও, মিরিনা জরডানের কথা বলছ? মেয়েটা যথেষ্ট চালাক। সম্মেলনে এই প্রথম যোগ দিয়েছে। স্বীকার করতেই হবে, স্টেলারা স্টারগার্লের চমৎকার নকল ওই মেয়েটা। স্টার বানাতে চাইছে ওকে ওর মা।
টেবিলে বসা ওই লোকটা কে? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
ওর নাম নীল বোরাম। হিরোয়িক কমিকসের সিনিয়র এডিটর। স্টেলারা স্টারগার্ল ছাপে ওরাই। মিসেস জরডান মেয়ের চেয়ে আরও চালাক, করিতকর্মা। কোন কাজে কাকে ধরতে হবে খুব ভাল জানে। দুই মাসের মধ্যেই কোন কমিক বইয়ের মলাটে যদি মিরিনার হাসি হাসি মুখ জ্বলজ্বল করে, অবাক হব না।
কিছুটা হতাশ ভঙ্গিতেই মাথা নাড়লেন মরগান। সব মহলের লোকের সঙ্গে জানাশোনা আর খাতির মহিলার। আমার জন্যে যদি কাজ করত, ভাল হত।
পকেটে হাত দিলেন মরগান। ওদের সঙ্গে পরিচয় করতে চাইলে আজ রাতের পার্টিতে এসো, খাওয়া-দাওয়াও হবে। বাড়তি কয়েকটা টিকেট আছে। এই যে নাও, এটা তোমার... রবিনকে দিলেন তিনি। কিশোরকে একটা দিয়ে বললেন, এটা তোমার, আর এই এটা তোমাদের আরেক বন্ধুর জন্যে। হাসলেন। তোমাদের ভেজা বন্ধু।
একটু থেমে যোগ করলেন, পার্টিতে ভিড় হবে খুব। অনেক সময় ধরে চলবে, অনেক রাত পর্যন্ত। তবে অসুবিধে নেই। তোমাদের জন্যে ঘর রেখে দেব আমি, ঘুমাতে পারবে।
ঘড়ি দেখলেন তিনি। এবার যেতে হয়। সাংবাদিকদের কাছে ফ্যান গেস্ট অভ অনারদের পরিচয় করিয়ে দিতে হবে।
প্রায় ছুটে চলে গেলেন মরগান।

ফ্যান গেস্ট অভ অনারটা কি বলো তো? জিজ্ঞেস করল রবিন।
মাথা নাড়ল কিশোর। জানি না। বুঝতে পারছি না সাংবাদিক কেন দরকার মরগানের। নিজে নিজেই তো অনেক কিছু করে ফেলেছেন।
এখন আমাদের কাজটা কি?
চলো, ওপরে যাই। তারপর মুসাকে নিয়ে বাড়ি যাব। শুকনো কাপড় দরকার ওর। আর রাতে আমাদেরকেও অন্য পোশাক পরে আসতে হবে। ব্যাংকোয়েট পার্টিতে এই জিনস আর টি-শার্টে চলবে না।
এখনও শুকায়নি মুসার কাপড়, ভেজা রয়েছে। আর কোন উপায় নেই। ওগুলোই পরল সে। গাড়িতে এসে উঠল তিনজনে।
রকি বীচের দিকে চলতে চলতে কিশোর জিজ্ঞেস করল, বলো তো, কাকে বেশি সন্দেহ হয় তোমাদের?
অবশ্যই আইজাক হুফার, রবিন বলল।
কেন?
সামনের সীট থেকে কিশোরের দিকে ফিরে তাকাল রবিন। ওর নিজের ছবি নিজেই পোড়ানোর দৃশ্যটা মন থেকে তাড়াতে পারছি না আমি। মনে হল যেন জোর করে কিছু প্রমাণের চেষ্টা করছে। এবং আমরা জানি, ফ্যান ফান বইতে তার আঁকা ছবিগুলো চুরি গেছে।
এটা একটা পয়েন্ট, একমত হলো কিশোর।
তারপর রয়েছে আরেকটা ব্যাপার, টাকাপয়সার টানাটানি আছে ওর। কারণ ওর ছবিগুলো নষ্ট হয়ে গেছে দেখে সাংঘাতিক হতাশ হয়ে পড়েছে, আচরণেই বুঝিয়ে দিয়েছে সেটা। অথচ একশো ডলার দিয়ে ছবিটা কিনে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলল! নষ্ট করল কেন অতগুলো টাকা? অদ্ভুত নয় এসব আচরণ?
বেশ, কিশোর বলল। ধরা যাক, হুফারই আমাদের চোর। কিন্তু তার ঘরের জিনিসপত্র তছনছের ব্যাপারটা কিসের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো যায়?
বলতে পারছি না। অনেকগুলো ঘোরপ্যাচ রয়েছে পুরো ব্যাপারটাতে। একবার মনে হচ্ছে হুফারই সব কিছুর হোতা, আবার মনে হচ্ছে তা হতে পারে না। তাহলে তার ঘরে লোক ঢুকে জিনিস নষ্ট করে কেন? তাছাড়া সে চুরি করে থাকলে তার ঘরে চোরাই মালগুলো নেই কেন? প্রমাণ যাতে না থাকে সেজন্যে অবশ্য সরিয়ে রাখতে পারে অন্য কোথাও। আরও একটা কথা ভাবছি, লাল আলখেল্লা পরা জীবন্ত ক্রিমসন ফ্যান্টম আর মুসাকে যে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে, ফ্রগ মিউট্যান্ট, একই লোক নয় তো? আর সেই লোকটা কি আইজাক হুফার?
তা হতে পারে না, ড্রাইভিং সিট থেকে বলল মুসা। হুফারের শরীরের গঠন আর ব্যাঙটার গঠনে তফাত আছে। এক রকম নয়।

এই ক্রিমসন ফ্যান্টমের রহস্যটায় আরও লোক জড়িত রয়েছে, কিশোর বলল। এই যেমন, ডিকসন আর বোরাম। পেছনের সীটে হেলান দিল সে।
একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছ, একজন আরেকজনের ব্যাপারে কেমন পরস্পর বিরোধী কথাবার্তা বলছে? ডুফার ভাবে হুফার একজন জিনিয়াস। ডিকসন ভাবেন পাগল, আর মরগান দুঃখ করেন তার জন্যে। ডিকসন নিজেকে ব্যবসায়ী ভাবেন, অথচ হুফার আর ডুফার বলে লোকটা একটা শয়তান।
হেসে উঠল রবিন। হুফার ভাবে সে কমিকের সংস্কারক, দামি কমিকগুলো বাঁচার চেষ্টা করছে। কিন্তু ডিকসন আর মরগান ভাবছেন, সে কেবল একটা কাজেই পটু, গোলমাল বাধানো। এক সেকেন্ড ভাবল সে। বোরামের ব্যাপারটা কি? আমার তো মনে হয় না কেউ ওকে পছন্দ করে। ডুফার তাকে ঘৃণা করে, কারণ তাকে ঠকিয়েছে এডিটর। হুফারের বিশ্বাস, ক্রিমসন ফ্যান্টমের বারোটা বাজিয়েছে বোরাম। ডিকসনও দেখতে পারেন না। কমিক কেনার জন্যে এত চাপাচাপি করেও তাকে রাজি করাতে পারেনি লোকটা।
যে বইটা সে কেনার এত চেষ্টা করল, সেটাই চুরি হয়েছে, এতে কি কিছু প্রমাণিত হয়? মুসার প্রশ্ন।
হয়, জবাব দিল কিশোর। তাকে সন্দেহ হয়। তোমার ওপর হামলা চালিয়েছে বলেও সন্দেহ করতে পারতাম, যদি শরীরের গঠন মিলে যেত। বোরামকে দেখলে মনে হয় একটা বগা, ভুড়িওয়ালা বগা। আর তোমার ওপর যে হামলা চালিয়েছিল, সে স্বাস্থ্যবান লোক, পেশীবহুল শরীর।
গাড়ির ছাতের দিকে তাকিয়ে ভুরু কোঁচকাল কিশোর। তার সন্দেহের তালিকায় মিরিনা জরডানকেও যোগ করতে চাইছে। কিন্তু মেলাতে পারছে না। ডিকসনের সঙ্গে যখন দরাদরি করছে কিশোর, তখন স্টলের পাশ দিয়ে হেঁটে গিয়ে কি অপরাধ করেছে মিরিনা?
অপরাধ জগতের এটা একটা পুরানো কৌশল। সুন্দরী একটা মেয়েকে ঘটনাস্থলে পাঠিয়ে দিয়ে লোকের নজর সেদিকে আকৃষ্ট করা, এবং সেই সুযোগে ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের মত করে অপরাধটা ঘটিয়ে ফেলা।
কিন্তু মিরিনাকে এই অপরাধের সঙ্গে জড়াতে ভাল লাগছে না কিশোরের। ও এতে জড়িত না থাকলেই সে খুশি হয়।
কেসটা বড়ই অদ্ভুত, অবশেষে বলল কিশোর।
মাথা ঝাঁকাল কিশোর। ডিকসন একটা কথা ঠিকই বলেছেন, সংগ্রহ-টংগ্রহ যারা করে, ওই মানুষগুলোর মাথায় আসলেই কিছুটা ছিট আছে। নইলে কমিক বুক জোগাড়ের মত একটা ছেলেমানুষীতে এত আগ্রহ কেন?

ঠিক, শুকনো গলায় বলল রবিন। চালাক হলে তো ইলেকট্রনিক জিনিসপত্র জোগাড়ের মত বড়মানুষীই করত। কম্পিউটার নিয়ে পাগল হত। হাসিটা চওড়া হল তার। কিংবা পুরানো গাড়ি নিয়ে।
মুসা কিছু বলল না। তবে কিশোর টিটকারিটা হজম করল না। খোঁচা দিয়ে বলল, হ্যাঁ, কিছু কিছু মানুষের মেয়ে দেখলে পাগল হয়ে যাওয়ারও একটা বাতিক আছে।
কেসের ব্যাপারে আলোচনার আপাতত এখানেই ইতি ঘটল।
রকি বীচে পৌছে ইয়ার্ডের কাছে কিশোরকে নামিয়ে দিল মুসা।
ভেতরে ঢুকে অফিসের বারান্দায় চাচা-চাচীকে বসে থাকতে দেখল কিশোর। তাদেরকে জানাল, রাতে বাড়ি ফিরবে না। হোটেলে থাকবে। কাজ আছে। রাশেদ পাশা কিছুই বললেন না। মেরিচাচী জানতে চাইলেন, কাজটা কি। জানাল কিশোর, অবশ্যই অনেক কিছু গোপন করে, ঢেকেঢুকে। তারপর চলে এল নিজের ঘরে। পোশাক পাল্টানোর জন্যে।
আধ ঘণ্টা পরেই ইয়ার্ডে এসে পৌঁছল অন্য দুই গোয়েন্দা। পোশাক পাল্টে এসেছে। বাইরে রাত কাটাতে হবে, তাই ব্যাগে করে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে এসেছে। মুসার ইমপালাতে করেই চলল ওরা, কোস্ট হাইওয়ে ধরে। মুসাকে সান্তা মনিকা হয়ে যেতে বলল কিশোর।
কেন? জানতে চাইল মুসা।
ম্যাড ডিকসনের স্টলে লেখা রয়েছে, তার দোকানটা সান্তা মনিকায়, দেখনি? কিশোর বলল, ফোন বুক দেখে ঠিকানা জেনে নিয়েছি। পথেই পড়বে, বেশি ঘুরতে হবে না আমাদের। দেখেই যাই কি ধরনের বই বিক্রি হয় ওখানে।
ম্যাড ডিকসনের কমিক এমপারিয়ামটা রয়েছে পিকো বুলভারে। বাণিজ্যিক এলাকার একধারে একটা সাধারণ দোকান। দুপাশে আরও দুটো দোকান, দুটোরই করুণ চেহারা, ব্যবসা ভাল না বোঝাই যায়। একটাতে বেতের তৈরি আসবাব বিক্রি হয়, আরেকটাতে নানা ধরনের ভ্যাকিউয়াম ক্লিনার।
ডিকসনের দোকানটায় রঙের ছড়াছড়ি। ডিসপ্লে উইনডোগুলোর কাছে সঁটানো রয়েছে রঙ-বেরঙের ছবি, সবই কোন না কোন কমিকের বিচিত্র হিরোর। দরজার কাছে লাগানো রয়েছে স্টেলারা স্টারগার্লের বিশাল এক ছবি। দেখতে হুবহু মিরিনা জরডানের মত। কিংবা বলা যায় মিরিনাই দেখতে স্টেলারার মত।
বাহ, সবুজ একটা ভ্যানের পাশে গাড়ি রাখতে রাখতে বলল মূসা, দেখো, কে এসেছেন!
গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ডিকসন। দরজার দিকে নজর। দুটো ছেলে কমিক বইয়ের দুটো ভারি বাক্স নিয়ে বেরোচ্ছে। বোঝার ভারে কুঁজো হয়ে

গেছে।
গাড়ি থেকে বেরিয়ে ডাকল কিশোর, মিস্টার ডিকসন?
আরে, তোমরা, এলোমেলো চুলে আঙুল চালালেন ম্যাড। হাতে একগাদা কমিক।
স্টলে বিক্রির জন্যে নিয়ে যাচ্ছেন বুঝি, কিশোর বলল আলাপ জমানো ভঙ্গিতে।
শূন্য জায়গা ভরবেন, চোরে যেগুলো খালি করে দিয়েছে?
হ্যাঁ, হাতের কমিকগুলোর দিকে তাকিয়ে জবাব সিন ডিকসন। তারপর মুখ তুলে হাসলেন। শুনলাম, বাতাসে ওড়ার কায়দা শিখে ফেলেছ? তিন তলা থেকে চত্বরে না পড়ে গিয়ে পড়েছ সুইমিং পুলে? মাথা দুলিয়ে বললেন, তোমরা গোয়েন্দাগিরির সঙ্গে সঙ্গে এসবও প্র্যাকটিস করো নাকি?
ডিকসনের হাতের দিকে তাকাল কিশোর। সবচেয়ে ওপরে কমিকের ছবি দেখল। ফ্যান ফান নাম্বার ওয়ানের আরেকটা কপি। প্রাইস স্টিকারটায় দৃষ্টি আটকে গেল তার। দাম লেখা রয়েছে দুশো পঞ্চাশ ডলার।
ঠিক এরকম একটা কমিকই চুরি হয়েছে দেখেছি, কিশোর বলল। এটার দাম তো অনেক কম। নীল বোরামের কাছে অনেক বেশি চেয়েছিলেন?
ওটা একটা বিশেষ বই ছিল... বলতে গিয়ে থেমে গেলেন ডিকসন। কিশোরের চোখের দিকে তাকালেন। আমাকে এসব প্রশ্ন কেন? বরং ওই চোরটাকে ধরার চেষ্টা করা উচিত তোমাদের।
তা-ই তো করছি। তদন্ত চালাচ্ছি আমরা। জানেন বোধহয়, তদন্ত করতে গেলে অনেক প্রশ্ন করতে হয়।
ভুল লোককে করছ। আমার লোক তোমাদেরকে রেস্টুরেন্টে হুফারের সঙ্গে দেখেছে। শোনো, ওই লোকটাকে পাত্তা দিও না। ওর কথাও শুনো না। হুফার আর ডুফারের মত মানুষের সঙ্গে কারও মেশাই উচিত না। বাজে স্বভাব। ওদের মতই কমিক সংগ্রহ দিয়ে জীবন শুরু করেছিলাম আমিও। কিন্তু আস্তে আস্তে পেশা হিসেবে নিয়ে নিলাম কাজটাকে, ব্যবসা শুরু করলাম। ভালই করছি এখন। ওদের মত শয়তানি করে কাটাচ্ছি না।
ভ্রূকুটি করলেন ম্যাড। এমন সব কাণ্ড করে ওরা, এমন সব ফালতু কারণে রাগ পুষে রাখে, যেগুলোর কোন মানেই হয় না। একবারও ভেবে দেখে না কমিক ডিলার আর কমিকের দোকানদাররাই ওদের বাঁচিয়ে রেখেছে। যেমন হুফার, তেমনি ডুফার। আমাদের মত ব্যবসায়ীদের কষ্ট দিতে পারলেই যেন ওদের যত আনন্দ।
আনমনে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। ম্যাডকে কষ্ট দেয়ার জন্যে কি চুরি করতেও পিছপা হবে না ওরা?

ডিকসনকে তাঁর দোকানের সামনে রেখে আবার রওনা হলো তিন গোয়েন্দা। সেঞ্চুরি যাও ধরে এগোল। ড্রাইভিং হুইল ধরে বসেছে মুসা, সামনের দিকে তাকিয়ে ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলল। ভাবসাবে মনে হলো, আমাদেরকে তিন গোয়েন্দা না ভেবে তিন ভাঁড় ভেবেছেন ম্যাড। থ্রী স্টুজেস।
এবং তাঁর সেই ভাবনাটারই অবসান ঘটাতে হবে আমাদের, গম্ভীর হয়ে বলল পেছনের সীটে বসা কিশোর। আর তা করতে হলে প্রচুর পরিশ্রম করতে হবে। জানতে হবে কমিক চুরির সময়টায় সন্দেহভাজনদের কে কোথায় কি করছিল।
ডিকসন কোথায় ছিলেন, জানি, রবিন বলল। আমাদের সামনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন।
কিশোর ভাবছে, মিরিনা জরডান কোথায় ছিল, তা-ও জানি। ক্রিমসন, ফ্যান্টম যখন এগিয়ে আসছিল, আমাদের কাছ থেকে তখন সরে যাচ্ছিল মেয়েটা। হয়তো ওকে জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল...ভাবনাটা ঠেলে সরিয়ে দিল সে। অন্যান্য সন্দেহভাজনদের কথা ভাবতে লাগল। আমি জানতে চাই, নীল বোরাম কোথায় ছিল তখন। আর এডগার ডুফার। বিশেষ করে, আইজাক হুফারের কথা তো জানতেই চাই। প্রশ্নগুলোর জবাব পেলে অনেক কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে।
মাটির নিচের গ্যারেজে গাড়ি রেখে, এলিভেটরে করে উঠে এসে নিজেদের ঘরে ঢুকল তিন গোয়েন্দা। ব্যাগ নামিয়ে রাখল। তারপর রওনা হলো মেইন কনফারেন্স রুমের দিকে। কনভেনশন ডোরের বাইরে অনেকটা পাতলা হয়ে এসেছে ভিড়, কিন্তু ভেতরে যেন আরও বেড়েছে। ঠাসাঠাসি গাদাগাদি হয়ে আছে। রুক্ষ চেহারার সিকিউরিটি গার্ড, সামনের দুটো দাঁত ভাঙা যার, সে আবার ফিরে এসে বসেছে নিজের জায়গায়। তিন গোয়েন্দাকে আটকাল। ভাল করে ওদের হাতের সিল দেখে তারপর ঢুকতে দিল।
সঙ্গীদের নিয়ে ভিড়ের ভেতর দিয়ে ঘরের একধারে চলে এল কিশোর। সারি সারি টেবিল পাতা হয়েছে। টেবিলের সামনে বসে ভক্তদের বাড়িয়ে দেয়া খাতায় অটোগ্রাফ দিচ্ছে কমিক আর্টিস্টরা। কেউ কেউ পেন্সিল দিয়ে কমিকের হিরোর স্কেচ এঁকে দিচ্ছে। কিছু টেবিলে কমিক বই, ম্যাগাজিন, আর ইলাসট্রেশন বোর্ডের সাথে সাথে উঁচু হয়ে আছে পোস্টারের স্তূপ। সেগুলোও বিক্রি হচ্ছে চড়া দামে।
চুটিয়ে ব্যবসা করে চলেছে আর্টিস্টেরা। শত শত লোক সারি দিয়ে দাঁড়িয়েছে টেবিলের সামনে। ছেলে-বুড়ো-মাঝবয়েসী সব বয়েসের সব ধরনের লোক। মানিব্যাগ ভরে টাকা নিয়ে এসেছে। অকাতরে সেগুলো খরচ করছে কমিকের পেছনে। অনেক ভক্তেরই চোখ চকচক করছে তাদের প্রিয় শিল্পীকে দেখতে পেয়ে, তাদের সঙ্গে কথা বলতে পেরে যেন ধন্য হচ্ছে। কিছু কিছু তো আছে, ওদের কাণ্ড দেখে মাথার স্থিরতা সম্পর্কেই সন্দেহ জাগে। খাতায় তো অটোগ্রাফ নিচ্ছেই, বই, পোস্টার যত পারছে কিনে সেগুলোতে নিচ্ছে, গায়ের শার্টে নিচ্ছে,

কেউ কেউ কাগজের কফি কাপ বাড়িয়ে দিচ্ছে আর্টিস্টের দিকে, সই করে দেয়ার জন্যে।
অটোগ্রাফের অনুরোধের সঙ্গে সঙ্গে চলছে নানা রকম প্রশ্ন, ব্যতিব্যস্ত করে তুলছে আর্টিস্টদের। ধৈর্যের সাথে সই করে দিচ্ছে ওরা, প্রশ্নের জবাব দিয়ে চলেছে, ব্যবসার স্বার্থে। এত মানুষের সম্মিলিত কণ্ঠস্বর কোলাহলে পরিণত হয়েছে।
আপনি না থাকলে স্নাইম ম্যান আর স্নাইম ম্যান থাকত না, জ্যাক, বলল এক ভক্ত। ওকে কেউ আপনার মত করে আঁকতে পারত না।
আরেকজন তরুণ ভক্ত আরেক আর্টিস্টের সামনে এসে চেঁচিয়ে উঠল, রোবট অ্যাভেঞ্জারের বারোটা বাজিয়েছেন আপনি। একমাত্র স্টেবিনস জানত কি করে ওই রোবট আঁকতে হয়। আপনি তো ওটার মাথাকে ভলভো গাড়ির নাক বানিয়ে দিয়েছেন। কিছু হয়েছে ওটা? আপনাকে বের করে দেয় না কেন কোম্পানি?
একটা বই বাড়িয়ে ধরে বলল সে, দিন, এখানে একটা সই করে দিন।
ছেলেটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে আর্টিস্ট। আমার আঁকা ভাল না লাগলে অটোগ্রাফ নিতে এসেছ কেন? বইটাই বা কিনেছ কেন?
কিনেছি বিক্রি করার জন্যে। আপনার সই থাকলে ডবল দামে বেচতে পারব।
বিহ্বল ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে বইটাতে সই করে দিল আর্টিস্ট।
এই কনভেনশন রুমটাকে কেন ম্যাডহাউস বলে বুঝতে পারছে কিশোর। পাগলখানা! বিড়বিড় করল সে, ঠিক নামই দিয়েছে! বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বলল, চলো, আইজাক হুফারকে খুঁজে বের করি।
সব চেয়ে লম্বা লাইন পড়েছে হুফারের টেবিলের সামনে। অন্য আর্টিস্টদের মত তার টেবিলে বই, ম্যাগাজিন কিংবা পোস্টার নেই বিক্রির জন্যে। ভক্তদের বাড়িয়ে দেয়া খাতায় দ্রুত একে দিচ্ছে কমিকের বিভিন্ন চরিত্র। কোন কোন ভক্ত সহানুভূতির সুরে বলছে কি করে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে তার চিত্রকর্মকে, সান্ত্বনা দিচ্ছে। অনুরোধ করছে আরও ভাল কোন চরিত্র তৈরি করার জন্যে, যেটা আগেরটার চেয়ে অনেক বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠবে। শিল্পীর নিজের হাতে এঁকে দেয়া ছবি পেয়ে খুব খুশি ওরা।
কয়েকটা ছেলে এসে ধরল হুফারকে ক্রিমসন ফ্যান্টম এঁকে দিতে হবে, কিংবা ক্রিমসন ফ্যান্টমের বইতে সই করে দিতে হবে।
দেরি করছেন কেন! চিৎকার করে উঠল এক কিশোর, দিন, এঁকে দিন!
হুফারের নাকের কাছে ক্রিমসন ফ্যান্টমের একটা নতুন সংস্করণ দুলিয়ে বলল আরেকজন, এটাতে সই করুন।
ছেলেটার কব্জি চেপে ধরল হুফার। ক্রিমসন ফ্যান্টমে সই আমি করব না। করাতে হলে বোরামের কাছে নিয়ে যাও। আরও বিশটা চরিত্র তৈরি করেছি আমি।

ওগুলোর কোনটা চাও তো বলো, এঁকে দিই।
না, ক্রিমসনেই দিতে হবে, গোঁয়ারের মত বলল অবুঝ ছেলেটা। আঁকতে পেরেছেন, সই দিতে পারবেন না কেন?
ওটা এখন বোরামের সম্পত্তি। তার কাছে যেতে বললাম তো।
না, আপনাকেই দিতে হবে।
আমি পারব না, মাথা নাড়ল হুফার। আর ওভাবে আমার নাকের সামনে ওটা নাড়তে থাকলে মেজাজ ঠিক থাকবে না বলে দিলাম। কালি ঢেলে নষ্ট করে দেব বইটা।
হাত ছেড়ে দিল হুফার।
তার নাকের কাছে বইটা নাড়তেই থাকল ছেলেটা।
ছিরে ফেলব কিন্তু, হুমকি দিল হুফার।
তার মুখের দিকে তাকিয়ে আর বিরক্ত করতে সাহস করল না ছেলেটা। হাত সরিয়ে নিয়ে হারিয়ে গেল ভিড়ের ভেতরে।
দাঁড়াও আমি একবার কথা বলে আসি হুফারের সঙ্গে, ফিসফিসিয়ে দুই বন্ধুকে বলল রবিন। কনুই দিয়ে তো মেরে ভিড় ঠেলে টেবিলের দিকে এগোতে শুরু করল সে। গুঁতো খেয়ে রেগে গিয়ে তার দিকে ঘুরে জ্বলন্ত চোখে তাকাতে লাগল লোকে। পাত্তাই দিল না সে। এগোতেই থাকল। কিন্তু যে হারে ঠেলাঠেলি করছে লোকে, হুফারের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে কিভাবে? কাজেই, সরাসরি পথটাই বেছে নিল সে। নাম ধরে ডাক দিল, মিস্টার হুফার?
মুখ তুলে তাকাল হুফার। আবার কি? রবিনের শুন্য হাত দেখে বলল, ও, আলতুফালতু জিনিস অন্তত সই করতে আননি। তা কি চাই? স্কেচ? কার ছবি আঁকব? তোমাকে দেখে কিন্তু লাগছে তুমি কিলার ব্রেন-এর ভক্ত। ঠিক বলেছি না? ততক্ষণে ওর কলম, কাগজের ওপর ছোটাছুটি শুরু করেছে।
আপনাকে আমি ম্যাড ডিকসনের স্টলের সামনে দেখেছিলাম। দোকানটায় বোমা ফাটার আগে। ছেলেটার হাত থেকে কমিক নিয়ে পোড়ানোর দৃশ্যটা দারুণ লেগেছিল আমার কাছে।
আচমকা ব্রেক কষার পর পিছলে গিয়ে যেন থেমে গেল হুফারের কলম।
কমিকগুলো ডাকাতি হওয়ার সময় আপনি ওখানে থাকলে খুব ভাল হত, আবার বলল রবিন। লোকটাকে হয়তো ধরে ফেলতে পারতেন। কোথায় ছিলেন তখন? লোকটাকে দেখেননি?
নীরবে রবিনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে হুফার। ভক্তরা বিরক্ত হতে আরম্ভ করেছে। একজন চেঁচিয়ে বলল, এই, আগেই এসে বকবক শুরু করলে কেন? লাইনে দাঁড়াও। তোমার পালা আসুক, তারপর জিজ্ঞেস করো।

হুফার, আরেকজন বলল, আমাদের দিকে নজর দিন। ওতো অনেক পরে এল। যেতে বলুন ওকে।
কোথায় ছিলাম? কারও দিকে না তাকিয়ে অবশেষে রবিনের কথার জবাব দিল হুফার। এই চিড়িয়াখানার ভেতরেই। তিক্ত কণ্ঠে কথাটা বলে আবার আঁকতে শুরু করল সে। মুখ না তুলেই বলল, যাও, ভাগ। আমি ব্যস্ত।
স্কেচটা তুলে ধরে বলল, কিলার ব্রেন কিনতে চান কেউ?
তাকিয়ে রয়েছে রবিন। এত তাড়াতাড়ি এভাবে ওর দিক থেকে নজর সরিয়ে নেবে হুফার, কল্পনাও করেনি। এরকম আচরণ করতে না পারলে যে ভক্তদের হাত থেকে রেহাই পেতে পারত না, এ কথাটা ভুলেই গিয়েছিল সে। কানের কাছে, অসংখ্য কণ্ঠের চিৎকার শুনতে পেল, ছবিটা কিনতে চায় ওরা, একজন একটা দাম বললে আরেকজন তার চেয়ে বেশি আরেকটা বলছে। নীলামে চড়ানো হয়েছে যেন ওই সদ্য আঁকা ছবি। কোনমতে দুপাশের দুজনকে সরিয়ে আরেকটু আগে বাড়ল রবিন। তার একটা কার্ড বাড়িয়ে দিয়ে বলল, আশা করি আবার দেখা হবে আমাদের। এর বেশি আর বলতে পারল না। টেনে তাকে পেছনে নিয়ে গেল কয়েকটা হাত।
ঢুকতে যতটা কষ্ট হয়েছিল, বেরোতে তার চেয়ে কম হল না। সবাই হুড়াহুড়ি করছে টেবিলের কাছে যাওয়ার জন্যে।
ভিড়ের ঠিক বাইরেই অপেক্ষা করছে কিশোর আর মুসা। রবিন বেরোতেই মুসা জিজ্ঞেস করল, কি বলল?
কমিক ডাকাতির সময় সে নাকি এই ঘরেই ছিল, পেছনের জনতার দিকে তাকিয়ে জবাব দিল রবিন। এখন যারা আছে, তখনও হয়তো তাদের অনেকেই ছিল। তার মানে অনেকেই তাকে দেখেছে। সাক্ষ্য দিতে পারবে তারা। হাত দিয়ে ডলে পোলো শার্টটা সমান করার চেষ্টা করতে লাগল সে। ভিড়ের চাপে কুঁচকে লেহে জায়গায় জায়গায়।
হু। সরু হয়ে এল কিশোরের চোখের পাতা, তাহলে ডাকাতির পর পরই এত তাড়াতাড়ি স্টলের কাছে পৌছে গেল কি করে?
সে আর ডুফার একই সময়ে হাজির হয়েছে, রবিন বলল। হয়তো একই সাথে ছিল দুজনে।
মাথা ঝাকাল কিশোর। ভাল বলেছ। ডুফারকে পাওয়া যাবে কোথায়?
পরিচিত একটা মুখ দেখা দিল ভিড়ের ভেতরে। পিটার, যে লোকটা ওভারগ্রীপ কমিকের কপি ধার দিয়েছিল ডুফারকে। তিন গোয়েন্দাকে দেখে জানতে চাইল, কি করছে এখানে।

এমনি এসেছে, দেখতে, জানাল কিশোর। তারপর জিজ্ঞেস করল, ডুফারকে দেখেছে কিনা। মাথা নেড়ে পিটার জানাল, গত এক ঘণ্টা ওর সঙ্গে দেখা নেই। হাসল হঠাৎ করেই। গোল্ড রুমে গিয়ে দেখতে পারো। কি করে যেতে হবে পথ বলে দিয়ে বলল, না গেলেও অবশ্য পারো। যে কোন সময়ে এসে পড়তে পারে ডুফার।
কিশোর জিজ্ঞেস করল, নীল বোরামকে দেখেছেন কোথাও?
দেখেছি, হাত তুলে দেখাল পিটার। ওই যে ওখানে। হিরোয়িক কোম্পানির লোক নিয়ে সাংবাদিকদের সাক্ষাৎকার দিচ্ছে বোরাম। নতুন কোন হিরোয়িক ক্লাসিকের ঘোষণা দিচ্ছে মনে হয়।
সেদিকে তাকিয়ে ক্যামেরার আলো ঝিলিক দিতে দেখল কিশোর। আর সোনালি পোশাকের চমক। দ্রুত এগোল দুই সহকারীকে নিয়ে। জায়গাটার স্টল সব সরিয়ে দিয়ে পরিষ্কার করা হয়েছে বিশেষ কাজের জন্যে। হিরোয়িক কমিকের কয়েকজন আর্টিস্ট পোজ দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে লাইফ সাইজ কিছু কার্ডবোর্ডে আঁকা কমিকের বিভিন্ন চরিত্রের ছবির সামনে।
কিন্তু তাদের দিকে নজর নেই ক্যামেরার। আলো ফেলা হয়েছে স্টেলারা স্টারগার্লের ওপর, ক্যামেরার চোখও তারই ওপর আটকে আছে যেন। কারণটা বোঝা শক্ত নয়। ছবির পাশেই দাঁড়িয়ে আছে মিরিনা জরডান, এখনও সোনালি কসটিউম পরনে, সাংবাদিকের দিকে তাকিয়ে উজ্জ্বল হাসি হাসছে।
একটু দূরে তার মা কথা বলছে সাংবাদিকদের সঙ্গে। তার পেছনে নীল বোরাম।
সম্পাদকের কাছে এগিয়ে গেল কিশোর। মিস্টার বোরাম, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?
কেন নয়? টাকে হাত বোলালেন বোরাম। করো, প্রশ্ন করো।
আমি আপনাকে ম্যাড ডিকসনের স্টলের সামনে দেখেছি, ডাকাতির একটু আগে, কিশোর বলল। আপনার কি মনে হয়, যে কমিকগুলো চুরি হয়েছে ওগুলো মূল্যবান?
ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছেন বোরাম। এটা কি ধরনের প্রশ্ন হলো?
আমি আর আমার দুই বন্ধু এই কেসের তদন্ত করছি, ম্যাড ডিকসনের হয়ে। মুসা আর রবিনকে দেখাল কিশোর। তিন গোয়েন্দার একটা কার্ড বের করে দিল বোরামের হাতে। আপনার মতামত জানা দরকার...
বাধা দিয়ে বোরাম বললেন, শুধু মতামত নয়, আরও অনেক কিছুই জানতে চাও তুমি। কার্ডটার দিকে তাকিয়ে বললেন বোরাম। তারপর তাকালেন কিশোরের দিকে। ডাকাতি হওয়ার সময় কনভেনশন ফ্লোরেই ছিলাম না আমি, স্টলের কাছে থাকা তো দূরের কথা। গোল্ড রুমের বাইরে কমিকের এক মাথামোটা পুজারি আটকে ফেলেছিল আমাকে।

পুজারি?
এডগার ডুফার। ভ্রূকুটি করলেন বোরাম। যেন ডুফারের সঙ্গে সাক্ষাতের সেই স্মৃতিটাও বিরক্ত করছে তাঁকে। গোল্ড রুম থেকে বেরিয়ে এল, গাধাগুলো যেখানে সিনেমা দেখাচ্ছিল সেখানে। মনে হলো, প্রোজেকটরের কিছু একটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। মেরামতের চেষ্টা করছিল লুই মরগান। এই সময় ডুফার বেরিয়ে এসে বিরক্ত করতে শুরু করল আমাকে।
তারপর?
কে জানি এসে বলল, ম্যাড ডিকসনের স্টলে গন্ডগোল হয়েছে। দেখতে গেল ডুফার। ভাবলাম, মরগান বোধহয় জানে কিছু, তাই তাকে ধরলাম। সত্যি, বলছি, এভাবে ডুফারের হাত থেকে রেহাই পেয়ে খুশিই হয়েছিলাম। নিজের সম্পর্কে তার উঁচু ধারণা। কুৎসিত ভঙ্গিতে হাসলেন বোরাম। অনেক অনেক উঁচু।
একটু থেমে বললেন সম্পাদক, তোমার প্রশ্ন শেষ হয়েছে? কাজ আছে আমার, যেতে হবে।
লোকটা চলে যাচ্ছেন, তাকিয়ে রয়েছে সেদিকে কিশোর। কেসটার মাথামুন্ড কিছুই বুঝতে পারছে না এখনও।
কাঁধে হাত পড়তে ফিরে তাকাল সে। পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন লুই মরগান।
বোরামের সঙ্গে কথা বললে দেখলাম, জিজ্ঞেস করলেন তিনি, তোমাদের কেসে সে-ও জড়িয়েছে নাকি?
জড়াতেও পারে, অনিশ্চিত শোনাল কিশোরের কণ্ঠ। ডাকাতির আগের মুহূর্তেও ম্যাড ডিকসনের স্টলের সামনে ছিলেন তিনি। কিন্তু এখন অস্বীকার করছেন। অ্যালিবাই রয়েছে বলছেন। সেটাই তদন্ত করে দেখতে হবে আমাদের।
আর কার কার ব্যাপারে তদন্ত করবে?
এডগার ডুফার। আইজাক হারের সঙ্গে ইতিমধ্যেই কথা বলে এসেছি।
আগ্রহ ফুটল মরগানের চোখে। তারও কি অ্যালিবাই আছে নাকি?
বলল তো সেরকমই। আর্টিস্ট সেকশনে নাকি জিনিসপত্র বিক্রি করে বেড়াচ্ছিল। আমার তো বিশ্বাস, নয়শো অটোগ্রাফ শিকারি তার পক্ষে রায় দেবে।
আমার মনে হয় না, ভুরু কুঁচকে মাথা নাড়লেন মরগান। ঢোকার মুখে তোমাদের সঙ্গে যখন দেখা হলো, তখন কিন্তু আমি আর্টিস্ট এরিয়ার ভেতর দিয়েই এসেছি। একটা লোককেও তখন দেখিনি হুফারের টেবিলের সামনে। কারণ, হুফার তখন টেবিলেই ছিল না।
আজ রাতেই আলিবাইগুলো সব যাচাই করে দেখতে হবে, বলল কিশোর। ব্যাংকোয়েট রুমে ঢুকেছে দুই সহকারীকে নিয়ে। ডাকাতির সময় ম্যাড ডিকসনের

স্টলের কাছাকাছি ছিল এরকম কয়েকজনের সঙ্গেও কথা বলব। টাইটা সমান করতে লাগল সে। অস্বস্থি ফুটেছে চোখে।
ভুরু কুঁচকে ফেলল মূসা। কাণ্ডটা কি হলো! এমন করছ কেন? সেই সোনালি চুল মেয়েটাই মাথা গরম করেছে তোমার। এরকম অবস্থা তো দেখিনি! রহস্য রেখে সুন্দরী মেয়ের দিকে ঝুঁকেছে আমাদের কিশোর পাশা! অবিশ্বাস্য!
ফালতু কথা রাখো তো! ঝাঁঝাল কণ্ঠে বলল কিশোর। গাল লাল হয়ে যাচ্ছে। এদিক ওদিক ঘুরছে চোখ, নিশ্চয় মিরিনা জরডানকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে।
দেখা গেল মেয়েটাকে। স্টেলারা স্টারগার্লের অনুকরণে আরেকটা পোশাক পরেছে। এটা আগেরটার চেয়ে অনেক সহনীয়। উঁচু কলারওয়ালা আলখেল্লা। সোনালি চুলগুলোকে সোজা করে আঁচড়ে নিয়ে ঠিক চাঁদিতে বসিয়েছে একটা মুকুট। সোনালি রঙের সিল্কের কাপড়ে তৈরি হয়েছে পরনের স্কার্টটা। হাঁটতে গেলেই আলখেল্লা আর স্কার্টের ঝুলের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে পড়ে সুন্দর লম্বা পা। এই পোশাকে তাকে আগের চেয়েও বেশি আকর্ষণীয় লাগছে।
মিরিনার মা কয়েকজন কমিক ভক্তের সঙ্গে গভীর আলোচনায় ডুবে না যাওয়াতক অপেক্ষা করল কিশোর, তারপর এগিয়ে গেল মিরিনার দিকে, কথা বলার জন্যে।
পরিচয় দিল কিশোর।
ও, তুমি ওদেরই একজন, মিরিনা বলল, চোরাই কমিক খুঁজছে। বড় বড় চোখ জ্বলজ্বল করছে আগ্রহে। কনভেনশন ফ্লোরের সবাই তোমাদের কথা বলাবলি করছে। তোমার বন্ধু সুইমিং পুলে পড়ার পর থেকে।
তাই! ঢোক গিলল কিশোর। কিভাবে শুরু করবে ভাবছে। সোজাসুজি বলাই ভাল, তাই বলল, ডাকাতির সময় তুমি ঘটনাস্থলেই ছিলে।
অদ্ভুত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল মিরিনা।
ম্যাড ডিকসনের স্টলের কাছে, আবার বলল কিশোর। আমি...ওখানে তোমাকে আমি নিজের চোখে দেখেছি।
হাসল মিরিনা। শুধু তুমি নও, অনেকেই আমাকে দেখেছে ওখানে। তাকিয়ে ছিল। এই সম্মেলনে ঢোকার সাহসটা যে কিভাবে করলাম, ভাবলে আমারই অবাক লাগে।
খুব সুন্দর লাগছিল কিন্তু তোমাকে।
এভাবেই কথা বলো নাকি তুমি? আড়চোখে কিশোরের দিকে তাকাল মিরিনা। এত সোজাসাপ্টা?
ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে লাভটা কি? বলল বটে কিশোর, কিন্তু মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হলো, এভাবে বললে লোকে যেমন খুশি হয়, রেগেও যায়। প্রশংসা করছে

বলে রাগছে না মেয়েটা, কিন্তু যদি সমালোচনা করত? সত্যি হলেও রেগে আগুন হয়ে যেত। বহুবার নিজেকে বুঝিয়েছে কিশোর, এভাবে আর বলবে না। কিছু বলার সময় ঠিক রাখতে পারে না। স্বভাব মাফিক সরাসরিই বলে ফেলে সব কথা। মিথ্যে করে বলল, তোমার মত একজন বিশিষ্ট চরিত্রের সঙ্গে এই প্রথম কথা বলছি।

বিশিষ্ট চরিত্র কথাটা কিভাবে নিল মিরিনা বোঝা গেল না। কারণ হাসতে দেরি করল সে। হয়তো বোঝার চেষ্টা করছে কিশোর ব্যাঙ্গ করল কি-না। হাসিটা ছড়িয়ে পড়ল সারা মুখে। ডাকাতটার কথা জিজ্ঞেস করবে তো? না, ভাই আমি ওকে দেখিনি।

অন্য কিছু তো দেখেছ? অস্বাভাবিক কিছু? পরিবেশের সঙ্গে মেলে না এমন?

শ্রাগ করল মিরিনা। নাহ, ওরকম কিছু দেখেছি বলেও মনে পড়ে না। আসলে, ভয়েই অস্থির হয়ে ছিলাম তখন। ওই যে, প্রথম স্টেজে উঠতে গেলে কিংবা বক্তৃতা দিতে গেলে এক ধরনের ভয় ভয় লাগে না। আসলে, ভয় না বলে অস্বস্তি বলাই উচিত। বুঝতেই পারছ, জীবনে প্রথম এতবড় সম্মেলনে যোগ দিতে এসেছি।

ভাবছে মেয়েটা। কপালে হালকা ভাঁজ পড়েছে। হঠাৎ হাত তুলল, দাঁড়াও দাঁড়াও, মনে পড়েছে। ম্যাড ডিকসনের স্টলটার দিকে তাকিয়েছিলাম বটে, নামটা আজব বলেই চোখ আটকে গিয়েছিল। কালো এলোমেলো চুলওয়ালা এক লোক দাঁড়িয়েছিল টেবিলের ওপাশে... কিশোরের দিকে তাকাল সে, তুমি কথা বলছিলে তার সাথে! আবার কি যেন ভাবল মেয়েটা। তোমার পাশে ছিল লম্বা একটা নিগ্রো ছেলে, আর একটা আমেরিকান ছেলে, চুলের রঙ...।

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। মুসা আর রবিনের কথা বলছে। এসব শুনতে চায়নি সে। আর কিছু দেখনি? অস্বাভাবিক কিছু?

মাথা নাড়ল মিরিনা। নাহ। পোশাক প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে চলেছি তখন, সেদিকেই খেয়াল ছিল, আর কোনদিকে নয়। পাশ দিয়ে ছুটে চলে গেল লাল আলখেল্লা পরা লোকটা, তার গায়ের বাতাস এসে লাগল। কমিকের চরিত্রের মতই উড়ছিল আলখেল্লার ঝুল। তবে স্নাইম ম্যান বলা যাবে না তাকে কোনমতেই। বিচ্ছিরি লেগেছে আমার, তার ওভাবে গা ঘেঁষে যাওয়াটা। নাক কুঁচকাল মিরিনা।

ওর কোন কিছু চোখে পড়ার মত ছিল? মানে, খটকা লাগে ওরকম কিছু?।

কি আর লাগবে? ওর পোশাকটাই তো অদ্ভুত, অবশ্য এই কনভেনশন রুমের বাইরে। এখানে কোন কিছুই অস্বাভাবকি নয়। নানা রকম বিচিত্র পোশাক পরে

এসেছে মানুষ প্রতিযোগিতার জন্যে। ও-ও পরেছে। লাল আলখেল্লা। তাড়াহুড়া ছিল অনেক।
ভাব না ভাল করে। ছবিটা মনে গেঁথে নাও। কি কি করছিল মনে করার চেষ্টা কর।
চোখ বন্ধ করল মিরিনা। আলখেল্লার ভেতরে হাত ঢুকিয়েছিল। কি যেন বের করেছিল।
হতে পারে, মিরিনাকে মনে করায় সাহায্য করতে চাইল কিশোর, স্মোক বম্ব বের করছিল লোকটা। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে গোয়েন্দাপ্রধান, মেয়েটার মুখের দিকে। আলখেল্লার নিচে কি পরেছিল মনে আছে? দেখেছ?
না, মাথা নাড়ল মিরিনা। আসলে ওভাবে খেয়ালই করিনি। আমি তখন আমার চিন্তায়। কে কি করছে এত দেখার সময় ছিল নাকি। তাছাড়া কি করে জানব লোকটা বোমা বের করছে?
তা-ও তো বটে, ভাবল কিশোর। বলল, বোমা ফাটার পর অনেক চিৎকার চেঁচামেচি হয়েছে। এটাও কি খেয়াল করোনি?
সেটা তো করতেই হয়েছে। এত চিৎকার করলে কি আর কানে না ঢুকে যায়। তবে একবারই তাকিয়েছি। দেরি হওয়ার ভয়ে থাকতে পারিনি, তাড়াহুড়া করে চলে গেছি। ও, লাল আলখেল্লা পরা লোকটাকে ছুটে যেতে দেখেছি।
সামনে ঝুঁকল কিশোর। আরেকবার তোমার গা ঘেঁষে গেল?
না, দ্বিতীয়বার আর গা ঘেঁষে নয়। মনে হলো, লাল একটা ঝিলিক দেখলাম। ছুটে যাচ্ছে দরজার দিকে, বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে।
তুমি কোন দিকে যাচ্ছিলে?
কেন, দেখোনি? আর্টিস্টরা সব যেখানে বসে ছিল সেদিকে। ঘরের একধারে, ঢোকার দরজা থেকে দূরে। ওখানেই তো প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
দরজার দিকেই যাচ্ছিল, তুমি শিওর?
আবার শ্রাগ করল মিরিনা। শিওর হওয়ার কোন উপায় ছিল না। ধোঁয়া দেখলাম, লাল রঙের ঝিলিক দেখলাম, এর পর আর দেখিনি লোকটাকে।
প্রবেশ পথের কাছে কেউই তাকে দেখেনি, কিশোর বলল। ওরকম লাল আলখেল্লা পরা একজন লোককে দেখেও মনে থাকবে না কারও, এটা হতে পারে। মিরিনার দিকে তাকাল সে। আরও কিছু জিজ্ঞেস করার কথা ভাবছে। কিন্তু আর কোন প্রশ্ন এল না মাথায়। আপাতত আর কিছু মনে পড়ছে না। আমার প্রশ্ন শেষ।
এবার যেতে পারি? হেসে জিজ্ঞেস করল মিরিনা। যেন গোয়েন্দার সঙ্গে কথা বলতে পেরে খুশিই হয়েছে।

নিশ্চয়ই। বলল কিশোর। মেয়েটা যেন কথা বলার জন্যে মুখিয়েই আছে। খটকা লাগল তার।
তোমার ওই যে আমেরিকান বন্ধুটি, অবশেষে বলেই ফেলল মেয়েটা, যেন এটা জিজ্ঞেস করার জন্যেই কিশোরের এত প্রশ্নের জবাব দিয়েছে। ও কি সোনালি চুল পছন্দ করে?
ও, এই ব্যাপার! দীর্ঘ একটা মুহূর্ত নীরবে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। তারপর হাসল। কিছু বলতে যাবে এই সময় ডাক শোনা গেল, মিরিনা, অ্যাই মিরিনা!
ওই যে, তোমার আম্মা ডাকছেন, কিশোর বলল। পকেট থেকে তিন গোয়েন্দার একটা কার্ড বের করে চট করে গুঁজে দিল মিরিনার হাতে। আশা করি আবার দেখা হবে। পকেটে রেখে দাও। প্রয়োজন হতে পারে আমাদেরকে।
হাসল মিরিনা। হয়তো।
আলাদা হয়ে দুজনে দুদিকে এগোল ভিড়ের মধ্যে দিয়ে। কয়েক মিনিট পরেই এসে রবিন খামচে ধরল কিশোরের হাত। বলল, এডগার ডুফারকে পেয়েছি।
কি বলল?
বোরাম যা বলেছে। দুজনে নাকি গোল্ড রুমের বাইরে তর্ক করছিল।
কি নিয়ে? জানতে চাইল কিশোর।
ক্রিমসন ফ্যান্টমের লেটেস্ট বই নিয়ে। নতুন আর্টিস্ট জোগাড় করেছে বোরাম।
ডুফার বলল, ওই আর্টিস্ট কোন কাজেরই না। ছায়া তৈরি করতে পারবে না।
ছায়া?
ক্রিমসন ফ্যান্টমকে সৃষ্টি করে সেটাকে ফোটানর জন্যে নানা রকম বিচিত্র আলোআঁধারি তৈরি করেছিল হুফার। এই যেমন, চরিত্রটার মাথায় কালো ছায়া। এমনিতেই মড়ার খুলির মত মুখোশ পরানো ওটার, তার ওপর ওই ছায়া একটা দুর্দান্ত আবহ তৈরি করে দিল। নতুন আটিস্টরা ওগুলো সব বাদ দিয়ে দিয়েছে। ডুফার বলছে, চরিত্রটার কোন কিছুই রাখেনি ওরা। সব কিছু উড়িয়ে-ফুড়িয়ে একেবারে জলো করে দিয়েছে।
ইনটারেসটিং, কিশোর বলল। চোরের মুখোশটার কথা মনে আছে? মড়ার খুলির মত। তার ওপর হালকা কালো রঙ, যেন ছায়াই তৈরি করা হয়েছে। আশা করি ডুফার সেকথা স্বীকার করবে।
স্বীকার করবে মানে?
ফ্যান্টমের মাথায় কালো ছায়া যাদের পছন্দ, তাদেরই কেউ নিশ্চয় ওরকম মুখোশ পরবে, কিশোর বলল। আরেকটা ব্যাপার, আলখেল্লা অনেক কিছু ঢেকে দেয়। ছদ্মবেশীদের জন্যে এটা এক মহা প্রয়োজনীয় পোশাক। ভেতরে কে আছে,

বোঝা মুশকিল হয়ে পড়ে। পেটে চাপড় দিল কিশোর। খিদে পেয়েছে। চলো, মুসাকে খুজে বের করি।
সীটের ব্যবস্থা হয়েই আছে, জানাল রবিন। ডুফার আমাদেরকে তার টেবিলে খাওয়ার দাওয়াত করেছে।
তাই নাকি? তাহলে তো খুবই ভাল। মুসা গেল কোথায়? ভিড়ের দিকে তাকাতে লাগল কিশোর। চোখে পড়ল নীল বোরামকে। আইজাক হুফারের বুকে হাত ঠেকিয়ে বললেন, তোমার মুখটা বড় বেশি পাজি, হুফার। আমার নামে যা-তা বলে বেড়াচ্ছ। কানে এসেছে আমার।
পাজি! তুমি আমাকে পাজি বলে গাল দিলে! রেগে আগুন হয়ে গেল বদমেজাজী আর্টিস্ট। দাঁড়াও, আমিও ছাড়ব না। বক্তৃতা যখন দেব, তখন বুঝবে।
ঘোড়ার ডিম করবে! জোরে এক ধাক্কা মারলেন হুফারকে বোরাম। ঘুসি মারার জন্যে হাত তুললেন।
ভিড়ের ওপর পড়ল হুফার। সামলে নিয়ে সোজা হলো। সে-ও ঘুসি তুলল।
ঘুসি চালালেন বোরাম। লাগাতে পারলেন না। রেঞ্জের বাইরে রয়েছে হুফার। হুফারও ঘুসি চালাল। সে-ও লাগাতে পারল না। বোঝা গেল, মারামারি করতে জানে না দুজনের একজনও।
দুজনের মাঝখানে এসে দাঁড়াল একজন লোক।
ঘরের দরজায় পাহারারত সেই ষাঁড়ের মত সিকিউরিটি গার্ড। হুফারের কাঁধ চেপে ধরে টেনে সরাতে গেল তাকে, এই সময় আবার ঘুসি মেরে বসলেন বোরাম।
হুফারের চোয়ালে লাগল। রেগে গাল দিয়ে উঠল হুফার। কিন্তু গার্ড ধরে রেখেছে বলে কিছু করতে পারল না। একপাশ থেকে এসে বোরামকে ধরে ফেললেন মরগান।
বোরামের দিকে তাকিয়ে দাঁত খিচাচ্ছে আর গালাগাল করছে হুফার। টেনেটুনে দুজনকেই মঞ্চে নিয়ে যাওয়া হলো। বসিয়ে দেয়া হলো সীটে। একজনের কাছ থেকে আরেকজনকে বহুদুরে, এমাথায় আর ওমাথায়। সম্মেলনে যোগ দিতে আসা অন্য সদস্যরাও বসে পড়তে লাগল চেয়ারে।
মুসাকে খুঁজে পেল রবিন আর কিশোর। কিশোর জিজ্ঞেস করল মুসাকে, হুফারের সম্পর্কে কি জানলে?
ডাকাতির সময় আর্টিস্টদের কোন টেবিলের কাছেই তাকে দেখা যায়নি, মুসা বলল।
সব কিছুই কেমন যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে! মেলাতে পারছি না! পোশাক প্রতিযোগিতায় এরকমই হয় নাকি?

হাত ওল্টাল মুসা। কয়েকজন আর্টিস্টের সঙ্গে কথা বলেছি আমি। ওরা জানিয়েছে, ওখানে তখন ছিল না হুফার।
তাহলে হুফারকেও কিছু প্রশ্ন করা দরকার আমাদের, পরামর্শ দিল রবিন।
আগে খেয়ে নিই, চলো, কিশোর বলল।
চলো।
টেবিলে বসে গেছে ডুফার। তিন গোয়েন্দাকে দেখে হাত নেড়ে ডাকল। খাবারের চেহারা দেখেই মেজাজ খারাপ হয়ে গেল কিশোরের। সালাদটা তো সহ্য করা যায়, কিন্তু মুরগীর যা চেহারা-নিশ্চয় সেদ্ধ হয়নি ঠিকমত, রবার হয়ে আছে। আলুগুলোও পোড়া।
রবিনের কানে কানে বলল মুসা, কিছু বলো না। পয়সা তো আর দিতে হবে আমাদের। মুফতে পেয়েছি। যা পেলাম খেয়ে নেয়া ভাল।
খাওয়ার পরে হুফারের সঙ্গে কথা বলার পরিকল্পনা করেছিল তিন গোয়েন্দা, সেটা সম্ভব হলো না। দেখা গেল, ডিনার শেষের বক্তা হিসেবে তাকেই বেছে নেয়া হয়েছে।
উঠে দাঁড়াল হুফার। আমাকে কিছু বলতে বলা হয়েছে, সে জন্যে প্রথমেই মিস্টার মরগানকে ধন্যবাদ দিয়ে নিচ্ছি। হাসল সে। ক্যালিফোর্নিয়ায় আসার পর এই প্রথম আমাকে এতটা গুরুত্ব দিল কেউ।
তার উদ্দেশ্যে মৃদু হাসল শ্রোতারা।
আমি জানি, কিছু লোকের ধারণা, আমি এখানে এসে কমিক তৈরি একেবারে ছেড়ে দিয়েছি। মাথা নাড়ল হুফার। ভুল। তাদের উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ নেই। নতুন একটা হিরো তৈরির কাজে হাত দিয়েছি আমি। খুব তাড়াতাড়িই সেটাকে দেখতে পাবেন আপনারা।
কেউ হাততালি দিয়ে, কেউবা কথা বলে তার এই কাজকে স্বাগত জানাল।
কার হয়ে কাজ করছেন আপনি? জিজ্ঞেস করল একজন।
সেদিক ঘুরল হুফার। আমি আমার নিজের হয়ে ছাড়া আর কারও জন্যে কাজ করি না। অন্তত এখন। এবার আমার কমিক আমি নিজেই পাবলিশ করব। এতে অনেক ঝামেলা হয় বটে, কিন্তু মানসিক যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। আর, নীল বোরামের দিকে তাকাল সে। হাতছাড়া হওয়ার ভয়ও থাকে অনেক কম। ঠকিয়ে নেয়ার কেউ থাকে না তো।
জ্বলন্ত চোখে আর্টিস্টের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন সম্পাদক। তার চকচকে টাকের চামড়া লালচে হয়ে উঠেছে।
নিজে পাবলিশ করার সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে লাগল হুফার। বক্তৃতা শেষে উৎসাহী অনেক ভক্ত তুমুল করতালি আর চিৎকার-চেঁচামেচি করে আনন্দ

প্রকাশ করল। জানাল, তার নতুন হিরোর আশায় উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করবে তারা।
তিন গোয়েন্দার সঙ্গে এক টেবিলে বসে মাথা দোলাল ডুফার। হুফার নতুন কমিক তৈরি করছে একথাটা আমার কানেও এসেছিল। যাক, সত্যিই করছে তাহলে। খুশি লাগছে। চিন্তিত ভঙ্গিতে দাড়িতে আঙুল চালাতে লাগল সে। ভাবছি, পাবলিশ করার টাকা পেল কোথায়?
আমার বিশ্বাস, কিশোর বলল। সেজন্যেই এখানে এসেছে সে। টাকা। জোগাড়ের জন্যে।
অনেক টাকা দরকার। পাবলিশিং মুখের কথা নয়।
আইজাক হুফারের ব্যাপারে আরেকটা প্রশ্ন জমা হলো! বিড়বিড় করল রবিন।
মাথা ঝাঁকাল কিশোর। ডাকাতির সময়কার কোন অ্যালিবাই নেই হুফারের। এখন মনে হচ্ছে, ডাকাতি করার একটা উদ্দেশ্য থাকলেও থাকতে পারে তার। মোটিভ? তা মোটিভটা হলো, টাকা।
মুসার দিকে তাকাল কিশোর। হাই তুলছে গোয়েন্দা সহকারী। কেমন লাগছে তোমার, বুঝতে পারছি, কিশোর বলল। আপাতত হুফারের সঙ্গে কথা বলা বাদ দিয়ে ঘুমোতে যাই চলো।
তা-ই চলো, রবিন বলল।
মুসা তো রাজি হয়েই আছে। আমিও চলে যাব এখুনি, ডুফার বলল।
তাকে গুড নাইট জানিয়ে রওনা হয়ে গেল তিন গোয়েন্দা।
পথে একটা টেবিলে আবার দেখা হলো মিরিনার সঙ্গে। সাথে তার মা রয়েছেন এবং বরাবরকার মতই টেবিলের অন্যান্য লোকদের সঙ্গে গভীর আলোচনায় মগ্ন হয়ে আছেন।
ওদের দিকে তাকিয়ে হাসল মিরিনা।
কিশোরের মনে হলো, হাসিটা বোধহয় রবিনের উদ্দেশেই। মনে মনে হাসল সে। রবিনকে বড় বেশি পছন্দ করে মেয়েরা।
তবে সেকথা মুহূর্তে ভুলে গেল কিশোর। তার মন জুড়ে রয়েছে কেসটার নানা প্রশ্ন, নানা রকম সমস্যা। বিছানায় শুয়েও ভাবতেই থাকল সে। ঘুম আসছে না। একটু পরেই কানে এল দুই সহকারীর নাক ডাকার শব্দ।
হোটেলের অন্ধকার ঘরে শুয়ে শুয়ে নানা কথা ভাবছে কিশোর। একসময় মনের পর্দায় ভেসে উঠল মিরিনা জরডানের মুখ। মনে হতে লাগল, মেয়েটা মেয়েটা সত্যিই এসবে জড়িত নেই তো? থাকতেও পারে...
ভাবনায় ছেদ পড়ল তার। খুট করে একটা শব্দ হলো দরজায়। লাফ দিয়ে বিছানায় উঠে বসল কিশোর।

কে যেন দরজা খুলে ঢোকার চেষ্টা করছে!
খুলে গেল দরজা।
একটা ছায়ামূর্তিকে দেখতে পেল কিশোর। আবছা আলোয় লোকটাকে চিনতে পারার আগেই পেছনে লেগে গেল পাল্লা। ঘরে ঢুকেছে লোকটা।
বিছানার পাশের টেবিলের দিকে ঝটকা দিয়ে চলে গেল কিশোরের হাত, টেবিল ল্যাম্পের সুইচ টেপার জন্যে। কিন্তু অপরিচিত ঘরে তাড়াহুড়া করতে গিয়ে সব ভন্ডুল করে দিল। নাড়া লেগে উল্টে পড়ে গেল ল্যাম্পটা।
কি! কি হয়েছে! চিৎকার শুরু করল রবিন আর মুসা, জেগে গেছে।
ঘরে লোক ঢুকেছে, মুসা টের পেল প্রথমে। লাফিয়ে বিছানা থেকে নেমে ধরতে গেল ওকে। অন্ধকারে শুরু হয়ে গেল জাপটাজাপটি।
কিশোরও নেমে পড়েছে। ঘুসি মারতে গিয়েও সামলে নিল। সরিয়ে আনল হাত। কার গায়ে লাগবে ঠিক নেই। রবিন কিংবা মুসার গায়েও লাগতে পারে। দ্বিধায় পড়ে গেল সেজন্যে।
কিন্তু লোকটার সেই অসুবিধে নেই। যাকেই মারবে, যার গায়েই লাগবে, সেই শত্রু। কাজেই এলোপাতাড়ি মেরে চলল সে, আর মারতে লাগল গায়ের জোরে।
আগে বাড়তে গিয়ে পেটে লাথি খেল কিশোর। হুঁক করে উঠে চেপে ধরল পেট। প্রচন্ড ব্যথায় হাঁসফাঁস করতে লাগল।
পেট চেপে ধরেই, দেয়ালের দিকে রওনা হলো। সুইচবোর্ডটা খুঁজে বের করতে হবে…
গাঁক করে উঠল একটা কণ্ঠ। তার পরেই শোনা গেল রবিনের চিৎকার, পালাচ্ছে! ব্যাটা পালাচ্ছে!
অন্ধকারে আরও কিছু বিচিত্র শব্দ শোনা গেল।
সুইচবোর্ডটায় হাত ঠেকল কিশোরের।
জ্বলে উঠল ছাতে ঝোলানো ঝাড়বাতি।
আলোয় ভেসে গেল ঘর। দরজা খুলে বেরিয়ে যাচ্ছে তখন লোকটা।
দরজার দিকে দৌড় দিল তিন গোয়েন্দা।
প্রথম মোড়টার কাছে পৌছে গেছে ততক্ষণে রহস্যময় লোকটা। মোড় ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল।
মোড় পেরিয়ে এল ছেলেরাও। গেল কোথায় লোকটা? সামনে লম্বা বারান্দা, এত তাড়াতাড়ি দৌড়ে সেটা পেরোতে পারার কথা নয়।
নিশ্চয় কোন একটা ঘরে ঢুকে পড়েছে! হাঁপাতে হাঁপাতে বলল রবিন। কোমরের কাছটায় চেপে ধরে রেখেছে, লাথি খেয়েছে ওখানে।

মুসা দৌড়ে গেল একজিট সাইন লেখা একটা দরজার কাছে। একটানে পাল্লা খুলতেই কানে এল দ্রুত পদশব্দ।
ইমারজেন্সি সিঁড়ি দিয়ে নামছে ও! চিৎকার করে বলল সে, জলদি এসো!
দুপদাপ করে নামতে শুরু করল তিনজনে। পদভারে কাঁপছে লোহার সিড়ি। ওরা যে পিছু নিয়েছে বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না নিশ্চয় লোকটার। বুঝুক। কি আর করা? নিঃশব্দে তো নামার উপায় নেই।
লোকটাকে যেভাবেই হোক, ধরতে চায় কিশোর। একটা বোঝাপড়া আছে। চোরাই কমিকগুলো উদ্ধারের ব্যাপারটা তো আছেই, এখন যোগ হয়ে হয়েছে পেটের লাথি। আপনা থেকেই হাত মুঠোবদ্ধ হয়ে গেল ওর।
মাটির নিচে প্যারেজের প্রবেশ মুখের কাছে শেষ হয়েছে সিঁড়ি।
প্রায় একযোগ এসে দরজার গায়ের প্যানিক বারে ঝাপিয়ে পড়ল ওরা। ঝটকা দিয়ে খুলে গেল পাল্লা। বড় বড় থামের জন্যে ছাতের আলো ঠিকমত পৌঁছতে পারে না ওখানে। দরজার ওপরের বাল্বটাও ভাঙা। কাজেই অন্ধকারই বলা চলে জায়গাটাকে।
দৌড় দিল মুসা। কংক্রীটের মেঝেতে জুতোর শব্দ হচ্ছে। কেয়ারই করল না সে। বাঁয়ে মোড় নিয়ে চিৎকার করে সঙ্গীদেরকে জানাল, এদিকে!
সামনে ছুটছে মূর্তিটা। গতি বাড়িয়ে দিল মুসা। দেখতে দেখতে পেছনে ফেলে এল রবিন আর কিশোরকে।লম্বা লম্বা পায়ে এগোল মুসা। লোকটার গায়ে গিয়ে পড়ার ইচ্ছে কিন্তু আচমকা ঘুরে দাঁড়াল লোকটা। ঘুসি চালাল।
একটা থামের আড়ালে চলে গেল মুসা।
মুসা! থমকে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠল রবিন। এই মুসা, ঠিক আছ তুমি?
আমার দম বন্ধ করে দিয়েছে! হাঁপাতে হাঁপাতে থামের আড়াল থেকে উঠে দাঁড়াল মুসা। আরিব্বাপরে বাপ!
সবার পেছনে ছিল কিশোর। মুসা অদৃশ্য হওয়ার পর রবিনকে দাঁড়িয়ে যেতে দেখল। সাবধানে থাম ঘুরে এগোল সে। পাঁচ কদম এগোতেই জ্বলে উঠল গাড়ির হেডলাইট, চোখেমুখে পড়ে যেন অন্ধ করে দিল তাকে।
একটা মাত্র আলো, আরব্য রজনীর সিন্দাবাদের গল্পের একচোখো দানব সাইক্লপসের মত। আলোটার আকার দেখে অনুমান করল, ভ্যান জাতীয় গাড়ি।
একটা হেডলাইট কাজ না করলেও ইঞ্জিন ঠিকই কাজ করছে গাড়িটার। গ্যাস বাড়াতেই ভীষণ গর্জন করে খেপা ঘোড়ার মত লাফ দিয়ে ছুটে আসতে লাগল কিশোরের দিকে।
চিৎকার দিয়ে রবিন আর মুসাকে হুঁশিয়ার করেই পাশে লাফ দিল সে। থামের এপাশে বেরোতে গিয়ে হেডলাইট চোখে পড়ল, ওরাও আঁপিয়ে পড়ল মেঝেতে।

টায়ারের তীক্ষ্ণ শব্দ করে পাশ দিয়ে চলে গেল গাড়িটা।
লাফিয়ে উঠেই ওটার পেছনে দৌড় দিল কিশোর। ততক্ষণে একজিট র্যাম্পে উঠে পড়েছে গাড়ি, দ্রুত ডানে ঘুরতে আরম্ভ করেছে। সে র্যাম্পের মাথায় উঠতে উঠতে যানবাহনের ভিড়ে ঢুকে গেল ওটা, হারিয়ে গেল দেখতে দেখতে।
হতাশ ভঙ্গিতে ঝুলে পড়ল তার কাঁধ। অন্য দুজন পৌঁছলে জিজ্ঞেস করল, লাইসেন্স প্লেট দেখেছ? নাম্বার?
ইয়ার্কি করছ নাকি! মুসার জবাব।
রবিন বলল, দেখার জন্যে থেমে থাকলে এতক্ষণে চ্যাপ্টা হয়ে যেতাম, চাকার নিচে পড়ে।
আমিও দেখতে পারিনি, কিশোর বলল। ড্রাইভারকেও না। তোমরা কিছু দেখেছ?
গাড়িটা গাঢ় রঙের ছিল, রবিন বলল। যতদুর মনে হলো, ধূসর।
না, কালো, মুসা বলল।
মাথা নাড়ল কিশোর। আমার কাছে লাগল কালচে সবুজ।
একটা হেডলাইট নষ্ট।
মুসার এই কথাটায় একমত হল কিশোর। ঠিক। তার মানে একটা সাইক্লপস ভ্যান পাওয়া গেল সূত্র হিসেবে। এরকম গাড়ি লস অ্যাঞ্জেলেসে খুব বেশি নেই। জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, খুঁজে বের করতে তেমন সমস্যা হবে না।
সেই সমস্যার কথা পরেও ভাবা যাবে, রবিন বলল। উপস্থিত যে সমস্যা রয়েছে সেটার সমাধান করা দরকার আগে।
কিশোর আর মুসা দুজনেই তাকাল রবিনের দিকে। কি সমস্যা?
আমাদের ঘরের চাবি কেউ এনেছ? পাল্লা বন্ধ করলে তো আপনাআপনি তালা লেগে যায়।
নিজের পরনের পাজামার দিকে তাকাল কিশোর। তারপর মুসা আর রবিনের দিকে। একজন পরেছে দৌড়ের পোশাক, আরেকজন পাজামা। পকেট নেই। চাবি রাখার জায়গা নেই। হুম! মাথা দোলাল সে, রেজিস্ট্রেশন ডেস্কে গিয়ে আরেকটা চাবি চাইতে হবে আরকি। কিন্তু যা পোশাক পরে বেরিয়েছি! লোকে সত্যি সত্যি এবার থ্রী স্টুজেস ভাববে।
সাইডওয়াকে উঠে পড়ল সে। চলো, যাই। রাতের হাওয়া মন্দ লাগবে না।
একপাশে খাড়া হয়ে উঠেছে কংক্রিটের দেয়াল। কিছুদূর এগোতেই শেষ হয়ে এল, দেখা গেল সরু একটা প্রবেশ পথ, তার ওপাশে ছোট বাগান। এখান দিয়ে ঢুকে পড়া যাক, প্রস্তাব দিল মুসা।।
একটা রয়াল পাম গাছের কাছে আসতেই ছায়ার মধ্যে গুঙিয়ে উঠল কে যেন। মাটিতে পড়ে ছিল। উঠে বসল কোনমতে। পাতলা, রাগী চেহারা। চিনতে অসুবিধে

হলো না। এডগার হুফার।
কি হয়েছে আপনার? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
ঠোঁট ফুলে গেছে হুফারের। মুখের একপাশে কাটা দাগ। চোখের কোণে কালশিটে পড়ে গেছে। ভ্রূকুটি করে মুখ বাঁকাতে গেল সে, সাধারণত যা করে, উফ করে উঠল ঠোঁটে ব্যথা লাগতে।
কি হয়েছে বলতে পারব না। ওই হট্রগোল ভাল্লাগছিল না, তাই বেরিয়ে এসেছিলাম খোলা বাতাসে। কে জানি এসে পড়ল গায়ের ওপর। উঠে দাঁড়াল হুফার। ব্যথার ভয়ে আস্তে আস্তে খুব সাবধানে নড়াচড়া করছে। ভালমত পেটাল আমাকে সে। চেহারা দেখার সুযোগ পেলাম না। তবে কে, আন্দাজ করতে পেরেছি।
কে? জানতে চাইল রবিন।
কে আমাকে পেটাতে চেয়েছিল? ঘুসি মেরেছিল হলঘরে? হোটেলে ঢোকার গেটের দিকে পা বাড়াল হুফার। নীল বোরাম।
ভেতরে ঢুকল হুফার। পেছনে তিন গোয়েন্দা। ছেলেদের দিকে বার বার তাকাচ্ছে আর্টিস্ট, ওদের পোশাক অবাক করেছে তাকে।
রিসিপশন ডেস্কের দিকে ঘুরতে গেল রবিন। মাথা নেড়ে তাকে মানা করল কিশোর, আপাতত চাবির কথা ভুলে যাও।
হুফারকে অনুসরণ করে লৰি ধরে চলল ওরা। নজর সামনের দিকে। আশেপাশে কারও দিকে তাকাচ্ছে না। মুখ টিপে হাসছে লোকে, টিটকারি দিচ্ছে, মন্তব্য করছে ওদের উদ্দেশে। এলিভেটরের কাছে এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ওরা।
চারজনেই এলিভেটরে উঠলে তিন নম্বর লেখা বোতামটা টিপল হুফার।
সম্মেলনের বেশির ভাগ অনুষ্ঠানই হচ্ছে দোতলার ঘরগুলোতে, হুফার বলল। আরও ওপরে উঠছে কেন, সেটা জানাল সে, নীল বোরামের ঘরের নম্বর তিনশো পঁয়তিরিশ। শুনে ফেলেছি। ওর সঙ্গে দেখা হওয়া প্রয়োজন এখন আমার। মুঠো হয়ে গেল তার আঙুল।
এলিভেটর থেকে নেমে বারান্দা ধরে এগোল সে। পেছনে ছায়ার মত লেগে রইল তিন গোয়েন্দা।
৩৩৫ নম্বর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাবা দিল হুফার।
ভেতর থেকে সাড়া দিলেন বোরাম। দরজা খুললেন। টাইয়ের নট ঢিলা করা। সুট এখনও পরাই রয়েছে।
সোজা কলার চেপে ধরল হুফার। ঝাঁকাতে শুরু করল। চিৎকার করে বলল, ভেবেছ পার পেয়ে যাবে! সেটি হচ্ছে না!
আরি, হুফার, করো কি! করো কি! চেঁচিয়ে উঠলেন বোরাম।

ভেতর থেকে ডাক শোনা গেল। দুজনকে ছাড়ার চেষ্টা করতে লাগল তিন গোয়েন্দা। দৌড়ে এলেন লুই মরগান। পেছনে কয়েকজন লোক, কমিকের কোন কোন কাজ করে সবাই, হাতে গেলাস।
কি করি! ব্যাঙ্গ ঝরল হুফারের কঠে। এখনই বুঝবে! তোমার চেহারাটাকে আরেক রকম করে না দিয়েছি তো আমার নাম হুফার না! আমারটাকে যেমন করেছ!
কি...কি বলছ তুমি...কিছুই তো বুঝতে পারছি না! গলায় চাপ, দম নেয়ার জন্যে হাঁসফাঁস করছে বোরাম, কলার ছাড়ানোর চেষ্টা করছে।
ন্যাকা! বুঝতে পারছ না! মুখ ভেঙচাল হুফার। আমার গায়ের ওপর এসে পড়েছিলে কেন? মারলে কেন?
বোরাম কিছু বলার আগেই মরগান জিজ্ঞেস করলেন, কখন মারল?
এই তো কয়েক মিনিট আগে! ওকেই জিজ্ঞেস করুন না!
মাথা নাড়তে লাগলেন মরগান। কি করে গেল? ওর ঘরে আমরা এসেছি বেশ কিছুক্ষণ হলো। বেরোয়নি। আমাদের দাওয়াত করে এনেছে।
পার্টি চলেছে, কিশোর মুখ খুলল এবার, কাজেই সবার চোখ এড়িয়ে চট করে বাইরে থেকে ঘুরে আসাটা অসম্ভব নয়।
হয়তো। জোর দিয়ে বললেন মরগান, কিন্তু গত আধ ঘণ্টায় যে বেরোয়নি এটা আমি বলতে পারি। ঘরের মাঝখানের বড় একটা কাউচ দেখিয়ে বললেন, ও আর আমি ওখানে বসে ছিলাম এতক্ষণ। কথা বলছিলাম।
সরাসরি কিশোরের চোখের দিকে তাকালেন তিনি। বাইরে বেরোলে আমার চোখ এড়িয়ে কিছুতেই যেতে পারত না।
পরদিন সকালে তাড়াতাড়ি বিছানা ছাড়ল কিশোর। ভারি নিঃশ্বাস পড়ছে তখনও রবিন আর মুসার, ঘুমোচ্ছে। শব্দ করল না সে, ওদের ঘুম ভাঙাল না। ব্যাগ থেকে সাঁতারের স্যুটের একটা পাজামা বের করে পরল। গায়ে দিল একটা ঢোলা শার্ট। চাবি নিয়ে পা টিপে টিপে এগোল দরজার দিকে।
পুলের কিনারে যাওয়ার জন্যে বেরোচ্ছে। তার ধারণা, ওখানে এই কেসটা নিয়ে ভাবলে জবাব মিলবে তাড়াতাড়ি। মগজটা ভালমত কাজ করবে ওখানে গেলে।
পুলের পানিতে নেমে পড়বে। চুপ করে ভাসতে ভাসতে মনটাকে ছেড়ে দেবে বল্গাহীন ভাবে-যেখানে খুশি ঘুরে বেড়াক। জট ছাড়াক রহস্যগুলোর। আজব এক জটিলতার মধ্যে পড়েছে। এক পা এগোলে দুপা পিছিয়ে আসতে হচ্ছে।
যেমন ধরা যাক আইজাক হুফারের কথা। লোকটাকে কাছে থেকে দেখলে তার সম্পর্কে অন্য একটা ধারণা হয়ে যায়। ওর রাগী রাগী ভাবটা আর ততখানি থাকে না। রাগী, সন্দেহ নেই, তবে হাস্যকর একটা ব্যাপারও রয়েছে ওর মাঝে, কিছুটা ভাঁড়ামি। ওকে চোর হিসেবে কিছুতেই ভাবতে পারছে না কিশোর।

শুধু তা-ই নয়, রাতে ওদের ঘরে ঢুকে পড়েছিল সে, এটাও মানতে পারছে না। একটা ব্যাপার আলোচনা করে তিনজনেই একমত হয়েছে, যতটা জাপটাজাপটি ওরা করেছে ধরার জন্যে, তাতে আর যা-ই হোক, হুফারের চেহারার ওই পরিবর্তন হতে পারে না, ওভাবে মারেইনি ওরা। তাহলে ওসব দাগ কার কাছ থেকে সংগ্রহ করল হুফার?

সন্দেহ অন্য দিকে ঘোরানর জন্যে নিজেই নিজেকে পেটায়নি তো? নাহ। ভ্যানে করে লোকটা পালিয়ে যাওয়া আর তিন গোয়েন্দার ওকে দেখে ফেলার মাঝে এতটা সময় পায়নি সে যে এরকম একটা কাণ্ড করতে পারবে।

আরেকটা কাজ করতে পারে। গাড়ির গায়ে বুকে বুকে মুখে দাগ করে ফেলে তারপর গাড়িটাকে কোথাও রেখে দিয়ে চলে আসা। ভাবতে গিয়ে এতটাই হাস্যকর মনে হলো কিশোরের, হেসেই ফেলল। উঁহুঁ, এই যুক্তি ধোপে টেকে না। ওরকম কাণ্ড আর যে-ই করতে পেরে থাকুক, হুফার পারবে না। ওরকম লোকই নয় সে।

বেশ। তা যদি না হয় তাহলে কে পেটাল তাকে? কেন? কমিক চুরির সঙ্গে এর কি কোন সম্পর্ক আছে? ডাকাতির ব্যাপারে এখনও সন্দেহের বাইরে নয় সে। কিন্তু যেহেতু পিটুনি খেয়েছে, আরও কেউ যে এসবে জড়িত রয়েছে, এটা স্পষ্ট। আরেকটা নতুন রহস্য এসে যোগ হল আগের রহস্যগুলোর সাথে।

এলিভেটরে করে নিচে নেমে এল কিশোর। লবি পেরোতে যাবে, এই সময় নাম ধরে ডাক শুনতে পেল। ঘুরে তাকিয়ে দেখল তাড়াহুড়া করে আসছেন লুই মরগান।

এত সকালে উঠলে, বললেন কনভেনশন চীফ।

আপনিও তো উঠেছেন। কাল রাতে পার্টির পর ঘুমোতে নিশ্চয় অনেক রাত হয়েছে।

বাধ্য হয়েই উঠতে হয়েছে, হাসলেন মরগান। সম্মেলনের কাজ। অনেক ঝামেলা। কত রকম গোলমাল হতে পারে। আগেই সেগুলো বুঝে নিয়ে সাবধান থাকা দরকার। পারলে মিটিয়ে ফেলা দরকার, যাতে না হয়। ভাগ্যটা বরং ভালই মনে হচ্ছে। কিছুটা তো ঘুমিয়ে নিতে পেরেছি। গোল্ড রুমে গিয়ে দেখ, লাল লাল চোখ হয়ে আছে কতজনার। বিশ ঘণ্টা ধরে শুধু তাকিয়েই রয়েছে, রক অ্যাসটারয়েডের দিকে। সম্মেলন করতে এলে ঘুম-নিদ্রা সব বাড়িতে রেখে আসতে হয়।

তবে, মরগানকে দেখে মনে হলো না ঘুমের বিশেষ অসুবিধে হয়েছে। ভালই বিশ্রাম নিয়েছেন। নতুন ধোঁয়া জিনস পরনে, গায়ে নতুন ইনটারকমিকন টি-শার্ট।

বগলে চেপে রেখেছেন একটা ক্লিপবোর্ড। চকচকে চোখ। কাজ করার জন্যে পুরোপুরি তৈরি হয়ে এসেছেন।
নিজের চোহরা না দেখেও আন্দাজ করতে পারছে কিশোর, তার মুখে ক্লান্তির ছাপ ফুটে আছে।
তোমার কেসের খবর কি? জিজ্ঞেস করলেন মরগান, তদন্ত কতটা এগোল?
করছি। নতুন নতুন সব ব্যাপার বেরিয়ে আসছে, অবাক করার মত। নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, হুফারকে সন্দেহ করছি আমরা। বিশেষ করে তার অ্যালিবাইটাকে আপনি যখন ফুটো করে দিলেন। কিন্তু একটা কথা, সে যদি চোরই হবে, তার ঘরের জিনিসপত্র তছনছ করতে গেল কে, কেন? তাকে মারলই বা কেন?
মাথা ঝাঁকালেন মরগান। কৌতূহলী মনে হচ্ছে। তোমার কি মনে হয়?
এখনও কিছু ভেবে ঠিক করতে পারিনি। তবে একটা ব্যাপার পরিষ্কার, হঠাৎ করেই কেউ মরিয়া হয়ে উঠেছে হুফারের জীবনটাকে হেল করে দেয়ার জন্যে। কোন একটা ঘাপলা কোথাও নিশ্চয় আছে, যেটা এখনও ধরা পড়েনি আমাদের চোখে। অবস্থা দেখে তো মনে হয় হুফার শিকারি নয়, শিকার।
ঘড়ি দেখলেন মরগান। দেরি হয়ে যাচ্ছে। যা-ই হোক, তোমার সঙ্গে আমিও একমত। রওনা হয়ে গেলেন তিনি। এক পা গিয়েই ঘুরে তাকালেন। আমার মনে হয়, হুফারকে নিয়ে যা ঘটছে তার অন্য ব্যাখ্যা আছে।
যেমন?
সেই যে পুরানো প্রবাদঃ চোরের সঙ্গে থাকতে থাকতে চোরই হয়ে যায়।
এই শেষ কথাগুলো নাড়িয়ে দিল কিশোরকে। পুলের কাছে পৌঁছল চিন্তা করতে করতে। ঝাপ দিয়ে পড়ে সাঁতার কাটতে শুরু করল।
পানি তার খুব ভাল লাগে। এর একটা কারণ, পানিতে নাক ডুবিয়ে চুপচাপ ভেসে থেকে কিংবা চিত হয়ে চোখ বন্ধ করে ধীরে ধীরে সাঁতরানো যায়, আর এই সময়ে মগজটাকে খাটানো যায় পুরোদমে। জটিল সমস্যার সমাধান করা সহজ হয়, কারণ ভাবনায় একাগ্রতা আসে।
কিছুক্ষণ দাপাদাপি করে শান্ত হলো কিশোর। চুপ করে নাক ডুবিয়ে ভাসতে লাগল। চালু হয়ে গেছে মগজ। ভাবছে। কেউ হামলা করেছিল হুফারকে। তার ঘরে মুসাকেও আক্রমণ করেছিল একটা লোক। তারপর গত রাতে তিনজনকেই এলোপাতাড়ি পিটিয়েছে কেউ। তিনটে ঘটনাই কি একই লোকের কাজ? সেই লাল আলখেল্লা পরা লোকটা করেছে এসব, যে কমিকগুলো ছিনতাই করেছে?
মুখোশের জন্যে লোকটার মুখ দেখতে পারেনি মুসা, তবে শরীরের অনেকটাই দেখেছে। পেশীবহুল শরীর লোকটার। ডাকাতির ব্যাপারে যাদেরকে সন্দেহ করা

যায়, তাদের সঙ্গে এই লোকটার শরীরের মিল নেই। হুফার লম্বা, পাতলা; ডুফার মোটা, বোরাম ভুঁড়িওয়ালা। আর মিরিনা জরডানকে তো মেলানোই যায় না কোনমতে।
কাজেই চোরটা এমন কেউ, যাকে ওরা চেনেই না, কিংবা ওই ডাকাতির সঙ্গে একাধিক লোক জড়িত। জটগুলো ছাড়ার চেষ্টা করছে কিশোর, এই সময় পেছনে ঝপাং করে শব্দ হলো। ডাইভ দিয়ে পড়েছে কেউ।
মাথা তুলল মেয়েটা। পরনে লাল, সাঁতারের পোশাক। খাট বাদামী চুল মাথা এবং গালের সঙ্গে লেপ্টে গেছে। সাঁতরাতে শুরু করল সে। পিছু নিল কিশোর।
সে যখন পুলের প্রান্তে পৌঁছল, মেয়েটা তখন ফিরে সাঁতরাতে শুরু করেছে আরেক প্রান্তের দিকে।
যাবে নাকি আবার? ভাবল কিশোর। যাওয়াই ঠিক করল। জোরে জোরে সঁতরে চলে এল মেয়েটার পাশাপাশি। ভাল করে দেখার জন্যে মুখের দিকে ভাকাল। বেশ সুন্দরী। রোদে পোড়া চামড়া। তার দিকে একবার তাকিয়েই গতি বাড়িয়ে দিল মেয়েটা।
প্রতিযোগিতা করতে চাইছে মনে হলো। লেগে গেল কিশোর কিন্তু কয়েক সেকেন্ড পরই বুঝে গেল পারবে না, মেয়েটার সঙ্গে। অনেক আগেই আরেক প্রান্তে চলে গেল মেয়েটা, ঘুরে আবার আসতে শুরু করল। প্রায় মাঝপথে কিশোরকে পাশ কাটিয়ে উল্টো দিকে চলে গেল।
আর চেষ্টা করল না কিশোর। লাভ নেই। পারবে না। অহেতুক পরিশ্রমে ক্লান্ত হওয়ার কোন মানে হয় না। তাছাড়া ক্লান্ত হলে মগজও ঠিকমত কাজ করতে চায় না। ভেসে থেকে তাকিয়ে রইল মেয়েটার দিকে।
পানি থেকে উঠে পড়ল মেয়েটা। চুলে আঙুল চালিয়ে পানি ঝরাল, তারপর গিয়ে বসল একটা লাউঞ্জ চেয়ারে। তোয়ালে দিয়ে গা মুছতে লাগল। কয়েক ডলা দিয়ে তোয়ালেটা রেখে দিয়ে হেলান দিল চেয়ারে। আরাম হচ্ছে না বোধহয়। আবার উঠে চেয়ারটাকে ঘুরিয়ে রোদের দিকে মুখ করে বসল।
চেয়ারের হেলানে ঝোলানো ছিল ব্যাগটা। নাড়া লেগে মাটিতে পড়ে গেল। মুখ খুলে ছড়িয়ে পড়ল ভেতরের জিনিস। লক্ষ্যই করল না মেয়েটা। সে রোদ নিয়ে ব্যস্ত। কিভাবে ঠিকমত গায়ে লাগে সেটা দেখছে।
কিশোর তাকিয়ে রয়েছে ব্যাগ থেকে বেরোনো জিনিসগুলোর দিকে। কমিকের বই। অনেকগুলো।
খুবই অবাক হয়েছে সে। কি করবে ঠিক করতে পারল না একটা মুহূর্ত। ডুব দিয়ে মাথা ঠান্ডা করে নিল যেন। তারপর সাঁতরাতে শুরু করল তীরের দিকে। পানি থেকেই দেখতে পেল কমিকগুলোর ভেতর থেকে উঁকি দিয়ে আছে তিন

গোয়েন্দার একটা কার্ড। না না, একটা নয়, আরও আছে! আশ্চর্য! ওদের কমিকের বই আর কার্ডগুলো তো থাকার কথা হোটেলের ঘরে, একটাও তো বিক্রি করেনি এখনও। তাহলে মেয়েটা পেল কোথায়?
এর একটাই মানে হতে পারে। এই কমিক ওদের ঘরেরগুলো নয়। ম্যাড ডিসনের স্টল থেকে যেগুলো ছিনতাই হয়েছে সেগুলো। বাক্সে অনেক কার্ড ছিল। কিছু ঢুকে গিয়েছিল হয়তো বইগুলোর মাঝে।
কিন্তু মেয়েটার কাছে এই জিনিস এল কোথা থেকে?
ভূতে তাড়া করেছে যেন, এমন তাড়াহুড়ো করে পানি থেকে উঠে এল কিশোর। তার কাণ্ড দেখে অবাক হলো মেয়েটা। পিঠ সোজা করে বসে তাকিয়ে রইল।
পানিতে নড়াচড়া করছিল বলে ততটা ভাল করে মেয়েটাকে দেখতে পারেনি কিশোর। এবার দেখল। বড় বড় চোখ মেলে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে সে। রোদে শুকানোর পর চুলের রঙও আরেক রকম হয়ে গেছে। বাদামী নেই আর এখন, সোনালি।
মিরিনা! বলে উঠল কিশোর, তুমি এখানে কি করছ?
চারপাশে তাকাল মিরিনা। অপরাধী অপরাধী একটা ভাব। অনুনয়ের সুরে বলল, বলো না, প্লীজ। আমি ভেবেছিলাম কেউ দেখতে পাবে না...
চেয়ারের পায়ের কাছে পড়ে থাকা কমিকগুলোর দিকে তাকাল আবার কিশোর। কেন বলব না?
ওর হাত চেপে ধরল মিরিনা। প্লীজ! জানলে আম্মা আমাকে খুন করে ফেলবে!
এটা আশা করেনি কিশোর। চুপ করে রইল।
আবার বলল মিরিনা, এত সকালে কেউ আসবে এখানে কল্পনাও করিনি। কাজেই ভাবলাম, এই সুযোগে চট করে একবার সাঁতারটা দিয়েই আসি। আম্মা জানতে পারলে...
চোখ মিটমিট করল কিশোর। কিসের কথা বলছ?
ওর সোনালি পরচুলাটার কথা। বিচ্ছিরি জিনিস! খোলার সুযোগ পেলেই খুলে রাখি। এই ফালতু জিনিস কে মাথায় দিয়ে বেড়ায়! ভাবলাম, এভাবে কেউ চিনতে পারবে না আমাকে। ভুল করেছি।
আরও সোজা হয়ে বসতে গিয়ে চেয়ারের একেবারে কিনারে চলে এল সে। তুমি ডুবে ছিলে, তাই পানিতে নামার আগে দেখতেই পাইনি তোমাকে। আশা করি, কাউকে কিছু বলবে না, আমাকে বকা শোনাবে না। কি আর করব! কপালটাই খারাপ! পড়লাম তো পড়লাম, একেবারে গোয়েন্দার সামনে!
মুখ তুলে তাকাল মিরিনা। কিশোরের চোখে চোখ। দৃষ্টিতে অনুনয়। আম্মা যদি শোনে, আমি এই কাণ্ড করেছি, ভীষণ রেগে যাবে। স্টেলারা স্টারগার্লের মডেল

হওয়া আর কোন দিনই হবে না হয়তো আমার। আম্মা সাহায্য না করলে…
বাধা দিয়ে কিশোর বলল, শোনো, আমি এসেছি জিজ্ঞেস করতে, এগুলোর ব্যাপারে।
মাটি থেকে ব্যাগ আর কমিকগুলো কুঁড়িয়ে নিয়ে মিরিনার দিকে বাড়িয়ে ধরল সে।
এগুলো…! বইগুলোর দিকে তাকিয়ে রয়েছে মিরিনা, এগুলো এখানে এল কিভাবে!
আমিও সেটাই জানতে চাই, গম্ভীর হয়ে বলল কিশোর।
ওগুলো আমার নয়! আজব কমিকগুলো দেখে প্রথমে অবাক হলো মিরিনা। কার্ডগুলো দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল, এই ভেবে যে কমিকের মালিকের নাম লেখা রয়েছে। তারপর রেগে গেল যখন দেখল কার্ডে কিশোরের নাম লেখা রয়েছে। এগুলো তো তোমাদের! তোমাদের কার্ড এর মধ্যে গুজে দিয়েছে! আমাকে ভয় দেখালে কেন…!
থেমে গেল আচমকা। গোল গোল হয়ে গেল চোখ। সর্বনাশ! শুনেছি তোমাদের কমিকও চুরি হয়েছে। এগুলো নয় তো?
চিন্তিত ভঙ্গিতে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। এটা যদি অভিনয় হয়ে থাকে, তাহলে ভবিষ্যতে মিরিনার অসকার পাওয়া কেউ ঠেকাতে পারবে না। তবে এতটা বাস্তব অভিনয় করতে পেরেছে বলে মনে হলো না তার। সত্যি কথাই বলছে মেয়েটা।
হ্যাঁ, এগুলোই আমাদের চুরি যাওয়া কমিক, কিশোর বলল। তিনশো ডলার দাম উঠে গেছে। তোমার ব্যাগে এল কি করে?
হেলান দিল মিরিনা। বিস্ময় রয়ে গেছে চোখে। কোলের ওপর রাখা হাতের আঙুল মুঠো হয়ে গেছে। বলল, আমি জানি না। জোর নেই গলায়।
কি বিপদে পড়েছে বুঝতে পারছে মিরিনা। এখন আর কেবল মায়ের বকা শুনেই পার পাবে না, আরও দুর্গতি আছে কপালে। সে চোর, এটা জানাজানি হলে ক্যারিয়ার শেষ। মডেলিঙের এখানেই ইতি।
আবার মুখ তুলে তাকাল মিরিনা। বিধ্বস্ত চেহারা। মেকআপ নেই বলেই যে ওরকম লাগছে, তা নয়।
এটা তোমার ব্যাগ, তাই না? শান্তকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল কিশোর।
চিরুনি বের করল মিরিনা। চুলে চালাতে চালাতে বলল, ব্যাগটা আমার, স্বীকার করছি। তবে ভেতরের জিনিসগুলোর খবর জানি না। কসম খেয়ে বলছি, কমিকগুলো আমি ঢোকাইনি।

আজ সকালে কারও সাথে দেখা হয়েছিল, এখানে আসার আগে? কিংবা ব্যাগটা কোথাও রেখে গিয়েছিলে?
মাথা নাড়ল মিরিনা। না। দেখা যাতে না হয় সেটাই চাইছিলাম। সাবধান ছিলাম। আমি চাইনি কেউ, আমাকে চিনে ফেলুক। ঘর থেকে বেরোনোর পর সারাক্ষণই আমার সঙ্গে ছিল ওটা। একটু থেমে বলল, একটা সময় বাদে। যখন আমি পানিতে ছিলাম।
হ্যাঁ, মাথা দোলাল কিশোর। যে কেউ চুরি করে কমিকগুলো মিরিনার ব্যাগে ঢুকিয়ে রাখতে পারে। এটা এমন কোন কঠিন কাজ না। যেন দেখতে পাবে লোকটাকে, এমন ভঙ্গিতে পুলের চারপাশে নজর বোলাল সে। কেউ নেই। এমনকি লাইফগার্ডও না।
পানিতে মিরিনার তো বটেই, কিশোরেরও নজর ছিল না এদিকে। সে-ও ওর সঙ্গে সাঁতরাচ্ছিল। ওই সুযোগে যে কেউ এসে ওগুলো ব্যাগে ঢুকিয়ে রেখে যেতে পারে ওদের অলক্ষ্যে, এতটাই মগ্ন হয়ে ছিল ওরা। হয়ত তা-ই করেছে লোকটা।
মিরিনার কথায় চমক ভাঙল কিশোরের, তুমি নিশ্চয় এগুলো ফেরত চাও। কমিকগুলো কিশোরের দিকে তুলে ধরল মেয়েটা। জিনিসগুলো তোমার। কিন্তু আমার ব্যাগে রাখল কে?
বিস্মিত ভাবটা কেটে গিয়ে হাসি ফুটল মিরিনার মুখে। ওই পচা স্পাই স্টোরিগুলোর মত ঘটনা। যাকে ফাঁসাতে চায় তার অজান্তে শত্রুপক্ষের লোক এসে বেআইনী জিনিস ঢুকিয়ে রেখে যায়। পুলিশ এসে ধরে তখন লোকটাকে এবং ভুলটা করে।
মিরিনার তোয়ালেটা চেয়ে নিল কিশোর। গা মুছতে লাগল। ভাবছে, আসলেই কি এই ব্যাপার ঘটেছে? মিরিনাকে ফাঁসার জন্যেই একাজ করেছে কেউ?
কমিকগুলো হাতে নিয়ে এক এক করে দেখতে লাগল সে। হুঁ, এগুলোই চুরি হয়েছিল। হতে পারে, অন্যের ব্যাগে ঢুকিয়ে দিয়ে এগুলো সরিয়ে দিতে চেয়েছে চোরটা। হয়তো তার কাজে লাগবে না, কিংবা বিক্রি করার সাহস করতে পারেনি। কিন্তু সরানর জন্যে তোমাকে বেছে নিল কেন?
জবাব দিতে পারল না মিরিনা।
হঠাৎ মনে পড়ল কথাটা। মিরিনার মা! সাংঘাতিক চালাক মহিলা। বিজ্ঞাপনের জাদুকর বলা চলে। বর্ন পাবলিসিটি হাউন্ড। মিরিনার কাছে চোরাই কমিক পাওয়া গেছে, মেয়ের জন্যে এর চেয়ে বড় বিজ্ঞাপন আর কি হতে পারে?
সেটা করার জন্যেই হয়তো কমিকগুলো চুরি করেছেন মিসেস জর্ডান। নিজেও করে থাকতে পারেন।

মিরিনার দিকে তাকাল কিশোর। ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে সে। নিস্পাপ চাহনী। নাহ্, ওই মেয়ে একাজ করেনি। যা বলছে সত্যিই বলছে। মিরিনা আর লাল আলখেল্লাকে একসাথে দেখেছে ম্যাড ডিকসনের স্টলের সামনে। মিসেস জরডান কি ছিলেন তখন ওখানে? থাকলেও হয়ত মেয়ের অলক্ষ্যে। তাঁর পরিকল্পনার কথা কিছুই জানাননি মেয়েকে।
আরেকটা প্রশ্ন করতে যাবে কিশোর মিরিনাকে, এই সময় পেছনে হিসিয়ে উঠল রাগী কণ্ঠ, ও, তাহলে এখানে এসে বসে আছ!
ঘুরে তাকাল কিশোর। জ্বলন্ত চোখে মিরিনার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন মিসেস জড়ান।
এভাবে গায়েব হয়ে যাওয়ার মানেটা কি? কড়া গলায় আবার শুধালেন মিসেস জরডান। আমি ওদিকে সারা হোটেল খুঁজে মরছি। কি করছ এখানে? এই পোশাকে, একটা সো-কলড ডিটেকটিভের সাথে?
নিজের জিনিসপত্র তুলে নিতে লাগল মিরিনা। এই সময়টায় তার মায়ের অগ্নিদৃষ্টি সহ্য করতে হল কিশোরকে। ইতিমধ্যে একবার মুখ তুলে মায়ের দিকে তাকিয়ে মিনমিন করে বলল মিরিনা, সরি, আম্মা, ভুল হয়ে গেছে...
হয়েছে! ধমক দিয়ে তাকে থামিয়ে দিলেন মা, জলদি যাও! নিজের মাথার হ্যাঁট খুলে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, পর এটা! কেউ দেখে ফেলার আগেই। সানগ্লাস পর। ইসসি রে, কেউ দেখেই ফেলল কি-না...।
মেয়ের হাত চেপে ধরলেন মিসেস জরডান। টান দিলেন হাঁটার জন্যে। মিরা, কি যে করিস, কিছু বুঝি না! ভূত চাপে নাকি তোর মাথায়! এত করে বললাম, টেলিভিশনে একটা সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করেছি আজ। বুঝেসুঝে চলবি। সকালে উঠেই তৈরি হবি। তা না করে চলে এসেছিস এখানে! জানিস না, এভাবে ভিজিয়ে উঠে রোদে শুকালে চামড়ার সর্বনাশ হয়ে যায়? কত আর শেখাব! বিরক্ত হয়ে গেছি!
চরকির মত পাক খেয়ে হঠাৎ কিশোরের দিকে ঘুরলেন মহিলা। ইয়াং ম্যান, আমি আশা করব, আমার মেয়ে সম্পর্কে যেন কোন গুজব ছড়ানো না হয়। ওর ভাল হোক, এটাই তোমার চাওয়া উচিত। একটা কথা বিশেষ ভাবে বলে দিচ্ছি, সে রকম কিছু যদি ঘটে, তোমার সঙ্গে বোঝাপড়া হবে আমার। আমি তোমাকে ছাড়ব না। মনে রেখো কথাটা।
মায়ের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে মিরিনা। সরমে মরে যাচ্ছে যেন। আবার তার হাত ধরে টানলেন মিসেস জরডান। কিশোরের দিকে তাকিয়ে জোর করে মুখে হাসি ফোটাল মিরিনা। অসহায়ের হাসি।

জোরে জোরে হাঁটছেন মিসেস জরডান। তাঁর পোশাকের দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। পোশাকের ঝুলটুল সব মিলিয়ে বিচিত্রই লাগছে। আলখেল্লার সঙ্গে অনেক মিল রয়েছে। ওপরের পোশাকের নিচে আরেকটা পোশাক রয়েছে মহিলার। আলখেল্লার মত অনেকটা।
সেদিকে তাকিয়ে কিশোর ভাবছে, লাল আলখেল্লা পরে যে এসেছিল স্টলের কাছে, তাকে পুরুষ হতেই হবে, এমন কোন কথা নেই।
হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকল কিশোর। মূসা আর রবিনের ঘুম তখনও পুরোপুরি ভাঙেনি। শব্দ শুনে দুজনেই চোখ মেলে তাকাল। কিশোরের হাতের কমিকগুলো দেখে পুরো সজাগ হয়ে গেল।
খাইছে! বিছানায় উঠে বসতে বসতে বলল মুসা, কোথায় পেলে?
পানির কাছে। খুলে বলতে যাচ্ছিল কিশোর, তার আগেই ফোন বাজল।
জ্বালাল! গিয়ে রিসিভার তুলল মুসা। কানে ঠেকিয়ে শুনে ভুরু উচু হয়ে গেল। রবিনের দিকে তাকিয়ে বলল, তোমার আব্বা।
উঠে এসে রিসিভার নিয়ে কানে ঠেকাল রবিন। বাবা, কি ব্যাপারও, তাই নাকি?..আচ্ছা, দেখি... রিসিভার নামিয়ে রেখে বন্ধুদের দিকে ফিরে বলল, মিস্টার বার্টলেট লজ। ভ্যান নুইজে একটা ব্যান্ড পার্টি হবে, একটা ক্যাসেট পাঠাবেন, সেজন্যেই বাড়িতে ফোন করেছিলেন আমাকে। যেতে হবে।
দিয়ে আসতে হবে নাকি আমাকে? মূসার প্রশ্ন।
যদি দয়া করো, হেসে বলল রবিন।
আমিও আসছি তোমাদের সঙ্গে, কিশোর বলল। যেতে যেতে বলব সব।
আচ্ছা। আবার রিসিভার তুলে ডায়াল শুরু করল রবিন। মিস্টার লজকে ফোন করে বলল, এক ঘণ্টার মধ্যেই আসছে সে।
কয়েক মিনিটেই তৈরি হয়ে ঘর থেকে বেরোল তিনজনে। নিচে নামার জন্যে রওনা হলো এলিভেটরের দিকে। ৩১৪ নম্বর ঘরের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় দরজা খুলে গেল। বেরিয়ে এল একজন লোক। শজারুর কাঁটার মত খাড়া খাড়া চুল। হাতে কার্ডবোর্ডের একটা বড় বাক্স। কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে ভেতরে তাকিয়ে বলল, আচ্ছা, চলি। নিচে নিয়ে যাচ্ছি এগুলো।
লোকটা ওদের পেছনে পড়ে গেল। এলিভেটর এল। উঠে পড়ল তিন গোয়েন্দা। ডেকে বলল লোকটা, অ্যাই, দাঁড়াও, চলে যেও না।
ওপেন লেখা বোতামটা টিপে দিল মুসা।
ভেতরে ঢুকল লোকটা। থ্যাংকস। এই জিনিস নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। বাপরে বাপ, পাথর!

বাক্সটা পিছলে গেল। খসে পড়ে যাচ্ছিল। তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলল কিশোর। এই সুযোগে ভেতরে তাকানোর সুযোগ হয়ে গেল। ভিডিও টেপে বোঝাই।
আরেকবার ধন্যবাদ দিল লোকটা। জিজ্ঞেস করল, লবিটা একটু টিপবে, প্লীজ?
মাথা ঝাঁকাল কিশোর। টিপে দিল বোতামটা।
লবিতে এলিভেটর থামতেই আর যাতে পিছলাতে না পারে এমন ভাবে বাক্সটা শক্ত করে ধরে বেরিয়ে গেল লোকটা। তিন গোয়েন্দা রয়ে গেল। আন্ডারগ্রাউন্ড গ্যারেজে নামবে ওরা।
বেলা বেশি হয়নি। রাস্তায় যানবাহনের ভিড় কম। দ্রুত গাড়ি চালিয়ে চলে এল ওরা রকি বীচে বার্টলেট লজের অফিসে। বাড়িতেই অফিস করেছেন তিনি। ওরা থামতে না থামতেই ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন ট্যালেন্ট এজেন্ট, পরনে ফুটবল খেলোয়াড়ের জারসি, চোখে সানগ্লাস। ব্যায়াম করতে যাচ্ছিলেন। রবিনকে দেখে বললেন, এসেছ। এক মিনিট। আসছি। আবার ভেতরে চলে গেলেন তিনি। বেরিয়ে এলেন ছোট একটা প্যাকেট নিয়ে। সেটা রবিনের হাতে দিয়ে বললেন, ঘুম থেকে জাগিয়েছে আমাকে ক্লাবের মালিক। এটা চায়। দিয়ে আসতে পারবে? হাই তুললেন তিনি। বলো, সারা রাতে কাজ করে এত সকালে ওঠা যায়? ব্যবসাটাই নিশাচরদের।
যেন তার হাইয়ের জবাবেই হাই তুলল মুসা। রবিনও। দেখে হেসে ফেললেন তিনি। বাহ্, তোমাদেরও দেখি একই অবস্থা! জেগে ছিলে নাকি সারারাত? জবাবের অপেক্ষা না করেই রবিনকে বললেন, প্যাকেটের গায়ে ঠিকানা আছে। যেতে বেশিক্ষণ লাগবে না। কিছু মনে করে না। আর কাউকে...
বাধা দিয়ে মুসা বলল, না না, ঠিক আছে।
প্যাকেটে গানের টেপ রয়েছে, ক্লাবের মালিকের দরকার। পৌছে দিতে বেশিক্ষণ লাগল না ওদের। স্যান ডিয়েগো ফ্রিওয়ে ধরে আবার লজ অ্যাঞ্জেলেসে ফেরার সময় ট্রাফিকের ভিড় দেখতে পেল।
ফ্রিওয়ে থেকে সরে এল মুসা। বিকল্প রাস্তা হিসেবে বেছে নিল সেপুলভেড়া বুলভারকে। সান্তা মনিকার ভেতর দিয়ে যাওয়ার সময় আবার রাস্তা বদল করে পিকো ধরে চলল সে।
কি হলো? জিজ্ঞেস করল রবিন, যাচ্ছ নাকি কোথাও?
এলামই যখন, জবাব দিল মুসা। আরেকবার ম্যাড ডিকসনের দোকানটা ঘুরে যেতে চাই। কাল রাতের একটা ব্যাপার খচখচ করছে মনের মধ্যে।
পুরানো একটা সবুজ ভ্যানের কাছে এসে গাড়ি রাখল সে। সেই গাড়িটাই, আগের দিন যেটাতে করে কমিক নিয়ে গিয়েছিলেন ডিকসন।

কাল রাতে একটা ভ্যান আরেকটু হলেই চাপা দিয়ে মেরে ফেলেছিল আমাদেরকে, নিজেকেই যেন বলছে মুসা। আমার কাছে তখন অন্য রকম রঙ লেগেছে। কিন্তু কিশোর বলল সবুজ, তাই একবার দেখতে এলাম।
লস অ্যাঞ্জেলেসে সবুজ ভ্যান অনেক আছে, কিশোর বলল।
কিন্তু একটা সূত্র আছে আমাদের হাতে। গাড়ি থেকে নেমে ঘুরে গাড়ির সামনের দিকে চলে গেল মুসা। ফিরে এল একবার দেখেই। গম্ভীর হয়ে মাথা ঝাঁকাল, আমাদের সাইক্লপসকে পেয়েছি। একটা হেডলাইট ভাঙা।
বাকি পথটা আলোচনা করল ওরা ব্যাপারটা নিয়ে।
তার মানে, রবিন বলল, কাল রাতে আমাদের ঘরে ঢুকেছিলেন ডিকসনই। কেন? আমরা তো তাঁর হয়েই কাজ করছি, তাই না? তিনি আমাদের মক্কেল।
হতে পারে, কিশোর বলল, আমাদেরকে একটা কভার হিসেবে ব্যবহার করছেন তিনি।
ঝট করে তার দিকে ফিরল রবিন। তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে দৃষ্টি। তুমি বলতে চাইছ, তিনিই কমিকগুলো চুরি করেছেন, আমাদের বোকা বানিয়েছেন, কাজে লাগিয়ে দিয়ে সবাইকে দেখাতে চেয়েছেন তিনি নিরপরাধ। যাতে কেউ সন্দেহ করতে না পারে! মাথা ঝাঁকাল সে। চমৎকার একটা মোটিভও রয়েছে তার। বিজ্ঞাপন।
ডিকসনের স্টলের ডাকাতির কথা কনভেনশনে আসা প্রতিটি মানুষ শুনেছে, কিশোর বলল। বাজি রেখে বলতে পারি, সবাই ওরা স্টলে গিয়েছে দেখার জন্য।
একমত হয়ে মুসাও মাথা ঝাঁকাল। হ্যাঁ। এবং এটাই চেয়েছিলেন ম্যাড। তৈরি থেকেছেন ওদের জন্যে। কাল আরও কত বই আনিয়েছেন, মনে আছে? ভ্রূকুটি করল সে। কিন্তু ডাকাতির সময় স্টলেই ছিলেন। তিনি ক্রিমসন ফ্যান্টম নন।
না। কিন্তু তাঁর সহকারী থাকতে বাধা কোথায়? কাজ শেষ করে লোকটাকে দ্রুত সরে পড়তে বলে রেখেছেন।
হ্যাঁ, এইবার মিলে যাচ্ছে খাপে খাপে, মাথা দোলাল মুসা। আর একটা প্রশ্ন। কোন্ লোকটাকে সহকারী বলে মনে হয় তোমার?
রবিন বলল, জেনেই যখন ফেলেছি, আর তাঁকে ব্যবসার সুযোগ দেব কেন? দুষ্ট হাসি ফুটল তার মুখে। চলো, তার ঘাম ছুটিয়ে দিই। হারিয়ে যাওয়া কমিকগুলো রহস্যময় ভাবে আবার আমাদের হাতে চলে এসেছে, সেটা জানলে ভিড়মি খেয়ে পড়বেন পাগল সাহেব।
হাসল কিশোর। কথাটা মন্দ বলোনি। তাঁর প্রতিক্রিয়া দেখেই অনুমান করতে পারব, কাজটা তিনিই করেছেন কি-না। আবার চোরের সন্ধানে বেরোতে হবে কি না আমাদেরকে। হোটেলের ঘর থেকে কমিকগুলো নিয়ে কনভেনশন ফ্লোরেই চলে যাব, চলো।

হোটেলে পৌছে নিজেদের ঘরে চলল ওরা। এই বার ৩১৪ নম্বর ঘরের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় লুই মরগান স্বয়ং বেরিয়ে এলেন। এই যে, তোমাদেরই খুঁজছিলাম! কথাটা কি সত্যি? মিরিনা জরডান নাকি চোরাই কমিকগুলো খুঁজে পেয়েছে?

সবগুলো নয়, কিছু, মরগানের কথায় হাসি চেপে রাখতে পারছে না কিশোর, কেবল আমাদেরগুলো। তাহলে যা আন্দাজ করেছিল, তা-ই ঠিক। মিসেস জরডান এভাবে বিজ্ঞাপনই করতে চেয়েছিলেন।

কিশোরের মনের কথা পড়তে পেরেই যেন মরগান বললেন, মিরিনার মা কিছুই বলছে না। তবে তার মেয়ের বিজ্ঞাপন হয়ে গেল ভালমত। যা-ই হোক, তোমাদের খুঁজছিল মহিলা। কমিকগুলোর জন্যে, ওগুলো হাতে নিয়ে ক্যামেরার সামনে দাঁড়াবে মিরিনা।

নাক ঘোঁত ঘোঁত করলেন তিনি। খবর পেয়ে ইতিমধ্যেই কয়েকজন সাংবাদিক হাজির হয়ে গেছে। মিসেস জরডানের ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছে গন উইথ দ্য উইন্ডের মত আরেকটা ছবি তৈরি করতে যাচ্ছেন তিনি।

লোকের ভিড় জমে যাবে তো হোটেলে! কিশোর বলল। মিরিনাকে দেখার জন্যে...

এটাই চেয়েছেন মহিলা। কি করে কাজটা করলেন তিনি, জানি না, ম্যানেজারকে রাজি করিয়ে ফেলেছেন। তার মেয়ের জন্যে আলাদা এলিভেটরের ব্যবস্থা হয়েছে, সাথে থাকবে ইউনিফর্ম পরা আর্দালি।

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন তিনি, ভাব একবার অবস্থাটা! এই হোটেলে ঢুকেছিল স্টারগার্লের সাধারণ মডেল হয়ে, ফেরত যাবে রীতিমত স্টার হয়ে।

এই সময় দেখা গেল মিরিনাকে। এলিভেটরের দিকে চলেছে। পরনে আবার সেই স্টেলারা স্টারগার্লের পোশাক। কিশোরের ওপর চোখ পড়তে অস্বস্তি ভরা হাসি হাসল। বুঝতে পারল কিশোর, মঞ্চ-ভীতিতে ধরেছে মেয়েটাকে। আরেকটা ব্যাপার, মিরিনা একা।

আমার মনে হয়, ব্যাপারটা মরগানও লক্ষ্য করেছেন, আগেই নিচে চলে গেছেন মিসেস জরডান। রিপোর্টারদের সঙ্গে আলাপ জমিয়েছেন। একটা বিষয়ে অন্তত শিওর হলাম, আগাগোড়া মিথ্যে বলেননি মহিলা।

ঘরে ফিরে গেলেন মরগান।

অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কিশোর। ভাবছে। ঘটনাটা কি? এরকম করলেন কেন কনভেনশন চীফ? এটা তো তার সম্মেলনের জন্যেও একটা বিরাট বিজ্ঞাপন।

মিরিনাকে কমিকগুলো দেয়া যায়, কি বল? দুই সহকারীর মতামত জানতে চাইল কিশোর।

শ্রাগ করল শুধু মুসা। রবিন বলল, অসুবিধে নেই।
ঘরে ঢুকল ওরা। কমিকগুলো নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে রওনা দিল এলিভেটরের দিকে।
ব্যক্তিগত এলিভেটরের সামনে তখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে মিরিনা। নিঃসঙ্গ। পরনে নীল আলখেল্লাটা শেষ বারের মত টেনেটুনে ঠিক করল। এলিভেটরের দরজার দিকে এমন ভঙ্গিতে তাকাল, যেন আলিবাবার ডাকাতের পাহাড়ের দরজা খুলতে যাচ্ছে। ভেতরে গিয়ে ধনরত্নও পেতে পারে, আবার ডাকাতের তলোয়ারে মুন্ডও কাটা যেতে পারে।
ওর কাছ থেকে দশ ফুট দূরে রয়েছে কিশোর, এই সময় এলিভেটর এল।
মিরিনা, ডাকল কিশোর। মেয়েটা ফিরে তাকাতেই হাতের কমিকগুলো তুলে দেখাল।
কিশোরকে দেখে খুশি হলো মিরিনা। একা যেতে ভয় করছিল যেন। পরিচিত একটা মুখ দেখে সাহস পেল।
এবং এদিকে তাকিয়ে ছিল বলেই এলিভেটরের গোলমালটা চোখে পড়ল না তার। দরজা খুলে গেছে। ভেতরে উজ্জ্বল আলো থাকার কথা। অথচ আলোই নেই। অন্ধকার।
বেরিয়ে এল একটা হাত। আর্দালির নয়। ধরে, এক হ্যাঁচকা টান দিয়ে ভেতরে নিয়ে গেল মিরিনাকে।
এলিভেটরের দিকে ছুটে গেল কিশোর। পেছনে রবিন আর মুসা। ওরা এসে পৌঁছতে পৌঁছতে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। মাঝপথে আটকে গেল মিরিনার চিৎকার।
হাতে কমিকগুলো ধরাই রয়েছে। পাই করে ঘুরল কিশোর। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখ। দুই সহকারীকে বলল, এসো!
ঘোরানো লোহার সিঁড়িটার দিকে দৌড় দিল সে। আগের রাতে এটা দিয়েই পালিয়েছিল ওদের ঘরের চোর। এক টানে দরজা খুলেই ভেতরে ঢুকে পড়ল কিশোর। একেক লাফে দুতিনটে করে ধাপ পেরিয়ে নামতে লাগল।
তার সাথে পাল্লা দিতে মুসার অসুবিধে হল না, তবে রবিন পেরে উঠল না। পিছিয়ে পড়তে লাগল।
পা ব্যথা শুরু হয়েছে কিশোরের। মাংসপেশীতে খিচ ধরছে এভাবে নামতে গিয়ে। কেয়ার করছে না। তার এক চিন্তা, মিরিনাকে ধরতে পারবে তো? নামতে পারবে এলিভেটরের আগে?
অসম্ভবই মনে হলো। তবু হাল ছাড়ল না। গতি কমাল না। নেমে চলল একই ভাবে।

লবিতে পৌঁছেও থামল না কিশোর। টিভির সাংবাদিক সহ অনেকেই রয়েছে এখানে। এতগুলো মানুষের সামনে কিছুতেই বেরোবে না লোকটা মিরিনাকে নিয়ে। অন্য কোন তলায় নামারও সাহস করবে না। এলিভেটরের জন্যে অপেক্ষা করতে পারে যে কেউ দেখে ফেলার ভয় আছে।
লোকটার জন্যে একমাত্র নিরাপদ জায়গা হলো গ্যারেজে নামা।
সিঁড়ির শেষ কয়েকটা ধাপ যেন উড়ে নেমে এল কিশোর। আগের রাতের মতই গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল প্যানিক বারের ওপর। লোকটা বেরিয়ে গিয়ে মিরিনাকে নিয়ে গাড়িতে উঠে পরার আগেই ধরতে না পারলে...
এলিভেটর ব্যাংকের দিকে দৌড় দিল সে। ধস্তাধস্তি আর চিৎকারের চাপা শব্দ যেন মধুবর্ষণ করল তার কানে। এর অর্থ এখনও এলিভেটরের ভেতরেই রয়েছে মিরিনা। মুক্তির চেষ্টা করছে।
তুমি থামবে! ধমক শোনা গেল। গায়ে হাত তুলতে চাই না আমি। আমার জিনিসগুলো কোথায় লুকিয়েছ বলে দাও, ছেড়ে দেব।
পরিচিত কণ্ঠস্বর। দরজা খুলে বেরিয়ে এলে কিশোর দেখল, তার অনুমান ঠিক। মিরিনাকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে বেরিয়ে এলেন ম্যাড ডিকসন।
কমিক হাতে কিশোরকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে চমকে গেলেন তিনি। আপনাআপনি ঢিল হয়ে গেল মিরিনার গলা পেঁচিয়ে ধরা হাতের বাঁধন।
এটাই চেয়েছিল কিশোর। টেনে সরিয়ে আনল মিরিনাকে। এক ধাক্কায় ডিকসনকে ফেলে দিল কংক্রিটের দেয়ালের ওপর। দেয়ালে দুপ করে বাড়ি খেলো কমিক বিক্রেতার শরীর। ক্ষণিকের জন্যে অসাড় হয়ে গেল যেন।
টলমল করছে মিরিনার পা। শরীরের ভার রাখতে পারছে না যেন। একবার দুলে উঠেই পড়তে শুরু করল কাটা কলাগাছের মত।
কমিকগুলো হাত থেকে ছেড়ে দিয়ে তাকে ধরতে গেল কিশোর। এই সময় ঝাঁপিয়ে এসে পড়লেন ডিকসন। জুডোর প্যাচ কষার সময় নেই। সরাসরি ঘুসি মারল তাঁর চোয়ালে কিশোর। আবার গিয়ে দেয়ালে ধাক্কা খেলেন কমিক বিক্রেতা।
রবিন আর মুসা পৌঁছে গেছে। মিরিনাকে ধরল রবিন। মুসা এগোল কিশোরকে সাহায্য করতে। এগিয়ে গিয়ে দেয়ালের সঙ্গে চেপে ধরল ডিকসনকে।
পাশে চলে এল কিশোর। কমিক বিক্রেতার প্রায় কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল, মেয়েমানুষের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করার চেয়ে পুরুষমানুষের সঙ্গে করা অনেক কঠিন, তাই না?
মিরিনাকে আবার সোজা হয়ে দাঁড়াতে সাহায্য করল রবিন। ডিকসনকে ধরে রেখেছে মুসা। মিরিনার কাছে এসে কিশোর সান্তনা দিয়ে বলল, আর ভয় নেই।

সব ঠিক হয়ে যাবে। ও আর কিছু করতে পারবে না তোমার।
ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এল মিরিনা। তারপর হঠাৎই যেন কথাটা মনে পড়তে চিৎকার করে বলল, হায় হায়, ওরা আমার জন্য অপেক্ষা করছে! আম্মা আমাকে মেরে ফেলবে…
বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন ওর শরীরে। রবিনের হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ঝট করে বসে পড়ে কমিকগুলো কুড়াতে লাগল। তুলতে তুলতেই কিশোরের দিকে তাকাল একবার। অনেক ধন্যবাদ তোমাদের।…বলো তো, আমাকে কেমন দেখাচ্ছে? ক্যামেরার সামনে যেতে পারব?
ঠিকই আছে সব, রবিন বলল। পারবে।
যা ঘটল সেটা সবার সামনে আম্মাকে বলা যাবে না। যাই। তোমাদের সঙ্গে পরে দেখা করব।
কমিকের বই হাতে এলিভেটরের দিকে এগোল মিরিনা।
ডিকসনের দিকে নজর দিল আবার কিশোর। অনেক কথা বের করতে হবে পেট থেকে।
এভাবে আমাদের দেখে নিশ্চয় চমকে গেছেন, হেসে বলল রবিন।
চমকাব কেন? আরেক দিকে তাকিয়ে রয়েছেন ডিকসন। চুলগুলো আগের চেয়ে এলোমেলো, সত্যি সত্যিই এখন পাগল মনে হচ্ছে তাঁকে। মাথা নাড়তে লাগলেন। ঝাঁকুনি দিয়ে হাত ছাড়ানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু মুসা কি আর ছাড়ে।
ও, চমকাননি, ব্যাঙ্গ করে বলল কিশোর। তা চমকাবেন কেন? কাল রাতে তো আর আপনি আমাদের ঘরে ঢোকেননি। আমরা যখন পিছু নিয়ে এখানে, নামলাম, তখন আমাদেরকে মারেনওনি।
কি বলছ বুঝতে পারছি না।
তা তো পারবেনই না, মুসা বলল। পেরেছেন কেবল ভ্যানে করে পালাতে। হেডলাইট ভাঙা সবুজ গাড়িটাতে চড়ে। চমৎকার একটা নাম দিয়েছি আমরা ওটার, জানেন। সাইক্লপস।
আমি..মানে…আমি…
মানে মানে না করে ঝেড়ে ফেলুন না, কিশোর বলল। নাকি,আমরাই বলে দেব কি কি অকাজ করেছেন। চুরি, খুনের চেষ্টা, অপহরণের চেষ্টা…
অভিযোগগুলো সব সত্যি নয়! গলা কাঁপছে ডিকসনের। শুনলাম, স্টারগার্লের পোশক পরা মেয়েটা কমিকগুলো খুঁজে পেয়েছে। ভাবলাম, সবই বুঝি পেয়েছে। তারপর শুনলাম, না, শুধু তোমাদেরগুলো পেয়েছে। ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগল আমার কাছে।

রাগত ভঙ্গিতে চোখ মিটমিট করছেন তিনি। কমিকগুলো চুরি যাওয়ার আগে আমার স্টলের সামনে তাকে দেখেছি। তারপর হঠাৎ করেই কয়েকটা কমিক পেয়ে গেল সে। ধরেই নিলাম, সবগুলোই আছে তার কাছে। অল্প কয়েকটা বের করেছে। কাজেই তাকে একা ধরার জন্যে ওত পাতলাম। কোথায় কমিকগুলো লুকিয়েছে বের করার জন্যে। টাকা খাইয়ে কয়েক মিনিটের জন্যে আর্দালিটার কাছ থেকে এলিভেটরটা চেয়ে নিয়েছি। বের করে দিয়েছি তাকে।

একটা মুহূর্তের জন্যে কিশোরের মনে হলো, মিরিনাকে একা ছেড়ে দিয়ে ভুল করল না তো? কমিকগুলো নিয়ে পালাল? হয়তো মিরিনাই আসল চোর। পরক্ষণেই দূর করে দিল সন্দেহটা। কমিকগুলো দেখার পর মিরিনার চমকে যাওয়াটা অভিনয় হতেই পারে না। বলল, ভুল মানুষকে ধরেছিলেন আপনি, মিস্টার ডিকসন। কমিকগুলো পাওয়ার সময় আমি ছিলাম মিরিনার সামনে। কে জানি তার ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিল।

উদভ্রান্ত দৃষ্টি ফুটল ম্যাডের চোখে। পাগলই হয়ে যাচ্ছেন যেন। অনুনয়ের সুরে কিশোরকে বললেন, চুরি করে কমিকগুলো নিয়ে গিয়ে মাথা খারাপ করে দিল আমার লোকটা। তোমরাও সুবিধে করতে পারলে না। বের করতে পারলে না ওগুলো। তখন আমিই খুঁজতে শুরু করলাম। কাল রাতে তোমাদের ঘরে সেজন্যেই ঢুকেছিলাম।

কিন্তু আমাদের ঘরে কেন ঢুকলেন? মুসার প্রশ্ন।

তোমরা যে আছ ওখানে, তা-ই জানতাম না। শুধু জানি, ওটা দিয়ে তিনশো চোদ্দ নম্বরে ঢোকা যায়, তাই ঢুকেছিলাম…

লুই মরগানের ঘরে ঢোকার জন্যে? ভুরু তুলল রবিন।

লুই মরগান! নিজের কপালে চাপড় মারল কিশোর। আজ সকালে ভিডিও টেপের বাক্স নিয়ে বেরোতে দেখলাম একটা লোককে, তার ঘর থেকে। তখনই মনে পড়া উচিত ছিল আমার, কোথায় দেখেছি লোকটাকে। সুমাতো কমিকের স্টলে গরম গরম কার্টুনের ভিডিও ক্যাসেট বিক্রি করছিল।

ডিকসনের দিকে তাকাল সে। কিছুটা শান্ত হয়ে এসেছেন ম্যাড, যেন বুঝতে পেরেছেন জ্যান্ত পোড়ানো হবে না আর তাকে, রেহাই পেয়ে গেছেন।

মরগানের সঙ্গে সুমাতো কমিকের সম্পর্ক কি, বলুন তো? জিজ্ঞেস করল কিশোর।

জায়গাটার মালিক সে, জবাব দিলেন ডিকসন। কেন, তুমি জানো না? এজন্যেই তো কনভেনশনটা করতে পেরেছে এখানে। বহুদিন ধরে কমিকের ব্যবসা করে আসছে লোকটা।

কমিকের ব্যবসা, আমনে বিড়বিড় করল কিশোর। কয়েকটা ছিন্ন সুতো জোড়া দেয়ার চেষ্টা চালাল মনে মনে। একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গেছে, ম্যাড ডিকসন চুরিটা করেননি।
ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। একজন সন্দেহভাজন কমল। তবে রহস্য যেখানে ছিল, মোটামুটি সেখানেই রয়ে গেছে। সমাধান হয়নি।
আরেকটা প্রশ্ন করা দরকার ডিকসনকে। ফ্যান ফানের একটা কপি চুরি যাওয়ার পর আরেকটা যেটা এনে রাখা হল তার জায়গায়, সেটাতে প্রাইস ট্যাগ দেখলাম দুশো পঞ্চাশ ডলার। অথচ যেটা চুরি গেছে সেটা যখন কিনতে এলেন নীল বোরাম, দাম চাইলেন ছশো ডলার, এবং তাতেই তিনি কিনতে রাজি হয়ে গেলেন। কেন? ওটার এত বেশি দাম হওয়ার কারণ কি?
কালো ছায়া নামল ম্যাড ডিকসনের মুখে। ওটাতে আইজাক হুফারের সই ছিল। আসল আইজাক হুফার। সংগ্রাহকের জিনিস। কারও পছন্দ হলে যত দাম হকতাম, তত দিয়েই কিনে নিত।
অটোগ্রাফ দেয়া? কিশোর বলল, আমি কমিক সংগ্রহ করি না, তার পরেও আমি জানি আইজাক হুফার কোন ক্রিমসন ফ্যান্টম বইতে সই করেনি। এডগার ডুফার আমাকে সমস্ত গল্প বলেছে। আমি নিজের চোখে দেখেছি, হুফার সই করেনি।
তুমি ঠিকই বলেছ, ডিকসন বললেন। গোঁফের নিচে দেখা দিল এক চিলতে হাসি। তবে সে যাতে সই করেছে, তাতে ছিল ফ্যান ফান আর গ্রে ফ্যান্টম। ক্রিমসন ফ্যান্টমের অনেক আগে আঁকা হয়েছিল ওই কমিক। আমার মনে হয়, বোরামের সঙ্গে গন্ডগোলের আগে ওই অটোগ্রাফ দিয়েছিল হুফার। হঠাৎ করেই মিলিয়ে গেল হাসিটা। চুরি করে নিয়ে গেল শয়তান চোরটা।
চিন্তিত ভঙ্গিতে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার কিশোর। হুফারকে ওটা দেখানোর সুযোগই আপনি পাননি, তাই না?
মাথা নাড়ল ডিকসন। বইটা চুরি হওয়ার আগে দেখাই হয়নি ওর সঙ্গে আমার। আর যখন হলো, তখনও তার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেলাম না। বরং জড়িয়ে গেলাম ডুফারের সঙ্গে।
কেশে গলা পরিষ্কার করলেন ডিকসন। তিন গোয়েন্দার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তো, আমাকে নিয়ে কি করবে?
কাল রাতের কথা জিজ্ঞেস করছেন তো? কিশোর বলল, ওই যে, যে সব ছোটখাট শয়তানিগুলো করলেনঃ জোর করে লোকের ঘরে ঢোকা, মারধর করা, গাড়ি চাপা দেয়ার চেষ্টা, এসব?
হ্যাঁ, ঘামতে শুরু করেছেন ডিকসন। ওগুলোর কথাই বলছি।

শ্রাগ করল কিশোর। আমরা অভিযোগ করব না। আপনি হেডলাইটটা ঠিক করে নিন। থানায় গিয়ে বড়জোর একটা এন্ট্রি করিয়ে নিতে পারেন, বাড়ি লেগে ওটা ভেঙেছে।
স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন ডিকসন।
কিন্তু রবিন আবার চিন্তায় ফেলে দিল তাঁকে। বলল, তবে মিরিনা যদি পুলিশকে রিপোর্ট করে, বিপদে পড়বেন। আমাদের না জানিয়ে হয়তো যাবে না। কিন্তু যদি যায়, কি বলবেন পুলিশকে, ভেবে ঠিক করে রাখবেন।
কিশোর আশা করল, পুলিশের কাছে না যাওয়ার জন্যে বোঝাতে পারবে মিরিনাকে। তবে সেকথা বলল না ডিকসনকে।
শুকনো হাসি হাসলেন কমিক বিক্রেতা। দেখা যাক, কি হয়। আমি স্টলে যাচ্ছি। প্রয়োজন পড়লে ওখানে দেখা কোরো আমার সঙ্গে। পারলে মিরিনাকেও নিয়ে এসো। সব কথা তাকে বুঝিয়ে বলে মাপটাপ চেয়ে নেব, যাতে পুলিশের কাছে না যায়।
সেটাই করবেন, মুসা বলল। এলিভেটরের বোতাম টিপে দিয়ে কিশোরকে জিজ্ঞেস করল, এরপর কি করছি আমরা?
চলো, হুফারকে খুঁজি। অটোগ্রাফের ব্যাপারটা আলোচনা করা দরকার।
লবিতে উঠে এল ওরা। মেইন কনফারেন্স রুমের দিকে চলল। প্রবেশ পথের কাছে, টেবিলের সামনে কমিক ক্রেতাদের ছোট একটা লাইন। ওদের হাতে সিল মেরে দিচ্ছে দুই রঙা চুলওয়ালা মেয়েটা।
দ্রুত স্টলের দিকে চলে গেলেন ডিকসন। তিন গোয়েন্দা গেট পেরোতে যেতেই ওদেরকে আটকাল বিশালদেহী সেই দারোয়ান। সরি। হবে না।
হাতের ছাপ দেখাল কিশোর।
এটা তো কালকের, দারোয়ান বলল। মুছে গেছে। যাই হোক, চেষ্টাটা ভালই করেছিলে। পারলে না আরকি। আমাকে ফাঁকি দেয়া অত সোজা না।
মানি ব্যাগের জন্যে পকেটে হাত ঢোকাল কিশোর। দেখুন, টিকেটের পয়সা মারার কোন ইচ্ছেই আমাদের নেই। জানতাম না। আমরা মনে করেছিলাম, একদিন টিকেট করে নিলেই হবে।
কয়েক মিনিট পরে, হাতের উল্টোপিঠে ইন্টারকমিকন-২ ছাপ মেরে কনভেনশন রুমের ভেতরে ঢুকল তিন গোয়েন্দা। ভিড়ের ভেতর দিয়ে পথ করে এগোল।
কোথায় পাওয়া যাবে হুফারকে? মুসার প্রশ্ন।
টেবিলের কাছে গিয়ে দেখি, কিশোর বলল। ওখানে না পেলে দোকানদারদের জিজ্ঞেস করব। কেউ হয়তো বলতে পারবে।
হুফারের সীট খালি।

অনেককেই জিজ্ঞেস করা হলো-দোকানদার, হুফারের ভক্ত, কিন্তু কেউ বলতে পারল না লোকটা কোথায় আছে। এমনকি অন্যান্য আর্টিটেরাও জানে না ও কোথায় আছে। পেন্সিল দিয়ে ওয়াকি উডেন্টের ছবি আঁকছেন একজন বৃদ্ধ আটিস্ট। প্রশ্ন শুনে বললেন, একটু আগে তো ছিল। কোথায় যে গেল...কিছুই বলে যায়নি।

এবার? কিশোরকে জিজ্ঞেস করল রবিন।

এসব ক্ষেত্রে, মাথা চুলকে জবাব দিল কিশোর, হোটেলের রিসিপশনিস্টকে জিজ্ঞেস করলে ফল পাওয়া যায়।

না, মাথা নেড়ে বলল রিসিপশন ক্লার্ক, এখন তার সঙ্গে দেখা করতে পারবে না। জরুরি একটা মীটিঙে রয়েছেন।

কখন দেখা করা যাবে, জানতে চাইল কিশোর। বলেছেন কিছু?

হয়তো আজ বিকেলে কোন এক সময়, জানাল রিসিপশনিস্ট।

তার জন্যে কি একটা মেসেজ রেখে যেতে পারব? রিসিপশনিস্ট সম্মতি জানালে তার কাছ থেকেই কাগজ আর কলম নিয়ে নোট লিখে ভাঁজ করে, সেটা দিয়ে বলল, মুখে বলবেন, আমরা তার সঙ্গে ম্যাড ডিকসনের স্টলে দেখা করব।

হুঁ, মাথা দুলিয়ে মুসা বলল, এখন আমরা জানি, বিকেলটা কোথায় কাটাতে হবে।

আবার কনভেনশন হলে ফিরে চলল ওরা। ওদেরকে দেখে অস্বস্তি ফুটল ডিকসনের চোখে। মেয়েটা এল না?

কথা বলিনি এখনও। কোথায় গিয়েছিল, জানাল কিশোর। ডিকসনকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, ভাববেন না, ব্যবস্থা একটা হবেই।

এই সময় একটা ছেলেকে আসতে দেখা গেল। বিরাট একটা বাক্স হাতে, কিশোর যে বাক্সটা এনেছিল, তার চেয়ে অন্তত তিন গুণ বড়। ভারের চোটে বাঁকা হয়ে গেছে ছেলেটা, হাঁটতে পারছে না ঠিকমত। ওদেরকে বললেন ডিকসন, আমার ব্যবসা আসছে মনে হয়।

টেবিলের সামনে এসে বাক্সটা মেঝেতে নামিয়ে রাখল ছেলেটা। চোখে সন্দেহ নিয়ে তাকাল ডিকসনের দিকে। টেবিলে হেলান দিয়ে মৃদু হাঁপাতে লাগল ছেলেটা। স্লাইম ম্যান নম্বর ওয়ান আছে? দ্য আউরেজিয়াস ওজনের নম্বর ওয়ান এবং নম্বর টু পেয়ে গেছি। স্লাইম ম্যানটা দরকার।

মাথা ঝাকালেন ডিকসন, আছে।

পেছনের র্যাক থেকে স্লাইম ম্যানের একটা কপি নামাতে গেলেন তিনি। ছেলেটা বাক্সটা তুলে ধপাস করে ফেলল টেবিলের ওপর। এ কমিকটা ছেলেটার হাতে দিতে গিয়েই চিৎকার করে উঠলেন ডিকসন, ধর, ধর! তবে কিছু করার আগেই পড়ে গেল কোলপসিবল টেবিলটা।

দূর, কাণ্ডটা কি করলাম! দাঁড়ান, আমি ঠিক করে দিচ্ছি, বলে হাঁটু গেড়ে বসে বই তুলতে শুরু করল ছেলেটা।
ডিকসন আর তার সহকারী মিলে আবার টেবিলটা খাড়া করতে লাগলেন।
জমাতে জমাতে এক জায়গায় কমিকের স্তূপ করে ফেলল ছেলেটা। তারপর নিজের বাক্সটা ঠেলে সরাতে গেল।
পা দিয়ে আটকালেন ডিকসন। এক মিনিট। বলেই বাক্সের ডালা ফাঁক করে ভেতর থেকে বের করে আনলেন একটা স্লইম ম্যানের কপি। এটা আমার। ওখানে গেল কি করে? ছেলেটার মুখের কাছে বইটা নাড়তে নাড়তে বললেন, এবার ছেড়ে দিলাম, যাও। আর যদি এদিকে দেখি ঠ্যাঙ ভেঙে দেব।
বিরাট বোঝাটা তুলে নিয়ে দ্রুত সরে পড়ল ছেলেটা, বোঝার তুলনায় খুব তাড়াতাড়ি গেল।
সেদিকে তাকিয়ে আনমনে বিড়বিড় করে বললেন ডিকসন, ভাল করে দেখা উচিত ছিল। আমার আরও বই নিয়ে গেছে কি-না কে জানে! এই জন্যেই, বুঝলে, তিন গোয়েন্দার দিকে তাকিয়ে বললেন, দামি জিনিসগুলো পেছনে সরিয়ে রাখি, হাতের কাছ থেকে দূরে। চোরের অভাব নেই। তিক্ত হাসি হাসলেন। একটা চোরকেও কিছু না বলে ছেড়ে দিলাম। অথচ আমাকেই চোর ভাবে ডুফার, গলাকাটা ডাকাত ভাবে!
এডগার ডুফারের নাম শুনে ঝট করে একটা কথা মনে পড়ে গেল কিশোরের। লোকটার ওপর থেকে সন্দেহ দূর হয়ে গেল তার। টেবিলটা পড়ে যাওয়া থেকেই বুঝেছে। লাল আলখেল্লার আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে আসতে পারলেও বিশাল বপু নিয়ে ওই টেবিল ডিঙিয়ে যেতে পারবে না সে কোনমতেই। তাহলে অবশ্যই ধসে পড়ত টেবিলটা। তাহলে কে কাজটা করল? মিসেস জরডান?
অ্যাই যে, তোমরা এখানে।
ফিরে তাকাল কিশোর। হাতে একগাদা কমিক বুক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মিরিনা। বলল, এখানেই পাব জানতাম। ভাবলাম, ফেরত দিয়েই যাই।
থ্যাংকস। মিরিনার হাত থেকে কমিকগুলো নিল কিশোর। সাক্ষাৎকার কেমন হলো?
ভাল। আম্মা বলল, এতদিনে নাকি আমি কিছু শিখতে পেরেছি। সাংবাদিকদেরকে অপেক্ষা করিয়ে রেখে ভাল করেছি। এরকমই নাকি করতে হয়, তাতে দাম বাড়ে। আমার দেরি হওয়ার আসল কারণটা যদি জানত... ডিকসনের ওপর চোখ পড়তে থেমে গেল সে।
কমিক গোছাচ্ছেন ডিকসন। হাত কাঁপছে। তাকাতে পারছেন না মিরিনার দিকে। হঠাৎ কেন কথা থামিয়ে দিয়েছে বুঝতে অসুবিধে হয়নি। বললেন, মিরিনা, আমি

দুঃখিত, সত্যিই দুঃখিত! বড় অন্যায় করে ফেলেছি!
নরম হয়ে গেল মিরিনা। না না, আমি কিছু মনে করছি না! ভুল হয়েই যায় মানুষের। কিশোরের দিকে তাকাল সে। কিশোর, তোমাকে ধন্যবাদ দেয়া হয়নি তখন। সাংঘাতিক ছেলে তুমি, বাব্বাহ! বলে ওর হাত চাপড়ে দিল সে।
লাল হয়ে গেল কিশোর। এরকম খোলাখুলি প্রশংসায় লজ্জা পায় সে তার ওপর করেছে একটা মেয়ে। ঢোক গিলে বলল, ও কিছু না...আমি...আমরা... চুপ হয়ে গেল সে। দেখল, ওর দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে রবিন আর মুসা। মেয়েদের ব্যাপারে কিশোরের অস্বস্তির কথাটা জানা আছে ওদের।
ওকে আরও অস্বস্তিতে ফেলে দিল মিরিনা। বলল, ফাইট করতে পারো বটে তুমি! কিশোরের হাত ধরে বলল, এসো না, আজ একসঙ্গেই লাঞ্চ খাই? কিশোরের নীরবতাকে সম্মতি ধরে নিয়ে বলল সে, তাহলে ওই কথাই রইল। হোটেলের সাইড গেটের কাছে বাগানে তোমার জন্যে অপেক্ষা করব আমি। বিশ মিনিটের মধ্যে।
চলে গেল মিরিনা।
দুই বন্ধুর দিকে তাকিয়ে মাথা চুলকে কিশোর বলল, কি করা যায়, বলো তো? ও আমাকে একা যেতে বলল!
কি আবার, রবিন বলল। যাবে। কথা বলার এটাই তো সুযোগ। দেখো না, কিছু বের করতে পারো কি-না।
ঠিক, মুসাও একমত। লাল আলখেল্লার সঙ্গে কোন যোগাযোগ থেকে থাকলে...
বেশ,... বিড়বিড় করে আরও কিছু বলল কিশোর, বুঝতে পারল না অন্য দুজন। রওনা হলো নিজেদের ঘরের দিকে, কমিকগুলো রেখে আসার জন্য।
পোশাক বদলে এল মিরিনা। পরনে শর্ট, গায়ে টি-শার্ট, মাথায় উইগ নেই, বেরিয়ে আছে খাট বাদামি চুল। স্বাভাবিক লাগছে তাকে এই পোশাকে, আরও বেশি সুন্দর।
বাহ্, দারুণ লাগছে তোমাকে, প্রশংসা করল কিশোর। এটাই কি তোমার আসল রূপ?
হাসল মিরিনা। কেন, আরও কিছু আছে ভাবছ নাকি? কিশোরের হাতের ভাঁজে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে তাকে সাইডওয়াকের দিকে টেনে নিয়ে চলল সে। পোশাক তো না, পাগলামি! আহ, বাচলাম!
পাশাপাশি হাঁটছে দুজনে।
আবার বলল মিরিনা, কাছেই একটা রেস্টুরেন্ট আছে। বার্গার আর সালাদ খুব ভাল করে। ওখানে গিয়ে আরামে বসতে পারব আমরা, স্টেলারা স্টারগার্লের ব্যাপারে কেউ মাথা ঘামাবে না।

প্রচুর আলোবাতাস রয়েছে রেস্টুরেন্টটার ভেতরে। চারদিকে প্রচুর কাচ, ভেতরে অসংখ্য টবে গাছ। ভিড় কম। খাবারের অর্ডার দিল মিরিনা।
খাওয়ার ফাঁকে একসময় তিন গোয়েন্দার একটা কার্ড বের করে পড়ল। মুখ তুলে জিজ্ঞেস করল, তোমরা সত্যিই গোয়েন্দা? অপরাধী খুঁজে বেড়াও?
কিশোর বলল, বহু বছর ধরে একাজ করছি।
আর এর প্রতিষ্ঠাতা হলে গিয়ে তুমি। অন্য দুজন তোমার সহকারী।
মাথা ঝাঁকাল কিশোর। কাঁটা চামচের মাথায় গেঁথে তোলা মাংসের টুকরোটা খসে পড়ে গেল পিরিচে। আবার গেঁথে নিয়ে মুখে পুরে চিবাতে লাগল।
দারুণ একটা টিম তোমাদের, মিরিনা বলল। অনেক খোঁজখবর নিয়েছি তোমাদের ব্যাপারে। তুমি হলে দলটার মাথা। তোমার নিগ্রো বন্ধুটির গায়ে জোর বেশি, তাই তাকে দেয়া হয় সাধারণত বিপজ্জনক কাজের ভার। আর আমেরিকান বন্ধুটি বইয়ের পোকা, তাই বই ঘেঁটে তথ্য জোগাড় আর গবেষণার ভার পড়ে তার ওপর। ঠিক বলেছি না?
মাথা ঝাকাল কিশোর। হ্যাঁ, খোঁজখবর সত্যিই নিয়েছ।
তারপর কিছুক্ষণ প্রশ্ন করে গোয়েন্দাগিরির ব্যাপারে নানা কথা জেনে নিল মিরিনা। অবশেষে কাজের কথায় এল কিশোর, ওই অদ্ভুত পোশাক কেন পরো তুমি?
কঠিন প্রশ্ন করলে। চিবিয়ে মুখের খাবারটুকু গিলে নিল মিরিনা। এক ঢোক পানি খেলো। তারপর বলল, কমিক খুব পছন্দ আমার। কিন্তু আম্মা একদম দেখতে পারে না। হাতে দেখলেই বকাবকি করে। শেষে একদিন চোখ পড়ল স্টেলারা স্টারগার্লের ওপর। আমাকে দিয়ে মডেলিং করানর ভাবনাটা তখনই এল মাথায়।
তোমার কেমন লাগে মডেল হতে?
ভাল না। আমার ইচ্ছে কমিক আর্টিস্ট হওয়া।
হাসল কিশোর। স্নাইম ম্যানের ছবি আঁকবে?
আঁকলে ক্ষতি কি? তবে স্টেলারা স্টারগার্লকেই আমার বেশি পছন্দ।
আর কোন প্রশ্ন খুঁজে পেল না কিশোর। খাওয়া শেষ করে উঠল।
হোটেলের পাশের গেট দিয়ে আবার বাগানে ঢুকল দুজনে।
কিশোর বলল, ভাল খাবার খাইয়েছ। ধন্যবাদ।
আবার দেখা হবে, হাত বাড়িয়ে দিল মিরিনা। কাল পর্যন্ত থাকছ তো?
মিরিনার হাতটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। কি যেন ভাবছে। তারপর ধীরে ধীরে হাত বাড়াল। বলল, কতদিন থাকব বলতে পারছি না। তবে এ কেসের সমাধান না হওয়াতক আছি, এটা বলতে পারি। চোখ আটকে গেল মিরিনার হাতের দিকে। আরি!

কী? হাতটা টেনে নেয়ার চেষ্টা করল মিরিনা। কিন্তু কিশোর ছাড়ল না। তাকিয়ে রয়েছে হাতের উল্টো পিঠের সিলটার দিকে।
কিশোর, কি হলো?
বিড়বিড় করছে কিশোর, আরও আগেই বোঝা উচিত ছিল! অনেক আগে!
ডাকাতির কথা বলছ?
আরেক হাতে মিরিনার হাতটা চাপড়ে দিয়ে কিশোর বলল, বলছি, ক্রিমসন ফ্যান্টমের কথা। শোক বম্বগুলো ফেলার সময় লোকটার দুটো হাতই আমি দেখেছি।
তাতে কি?
তাতে? অনেক কিছু। প্রথমেই বলা যায়, লোকটার কোন হাতেই সিল ছিল না।
মিরিনার হাত ধরে টানতে টানতে দরজার দিকে ছুটল কিশোর। রবিন আর মুসাকে একথা জানানো দরকার।
আহ, ছাড় না! হ্যাঁচকা টান দিয়ে হাতটা ছাড়িয়ে নিল মিরিনা। এই পোশাকে কনভেনশন ফ্লোরে যেতে পারব না আমি। কেউ আমাকে চিনে ফেলতে পারে। আর তাহলে আম্মা আমার…
ছাল ছাড়াবে, কথাটা শেষ করে দিল কিশোর। হাতে সিল না থাকাটা এমন কি জরুরি?
অনেক জরুরি। এতে প্রমাণ হয়, কাজটা করেছে ভেতরের কোন লোক। তুমি, আমি, দোকানদার, যে-ই ঢুকি না কেন, প্রবেশ মূল্য দিতে হয়, হাতে সিল মেরে নিতে হয়। নইলে দরজায় আটকে দেয় দারোয়ান। কিন্তু যে লোকটা বোমা ফেলল তার হাতে সিল না থাকলেও ঢুকতে পারল। কি করে? কেন তাকে আটকাল না দারোয়ান? একটাই কারণ, ও এখানকার লোক।
হুঁ, বুঝলাম, দ্বিধা করছে মিরিনা। লবিতে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রয়েছে এলিভেটর ব্যাংকের দিকে। দেখ, এই কেসে তোমাদের আমি সাহায্য করতে চাই, যদি সম্ভব হয়। এখন ত আর আমাকে এড়াতে পারবে না, জড়িত হয়ে গেছি। ওপরে গিয়ে পোশাক বদলে আসি। ম্যাড় ডিকসনের দোকানের সামনে থেক, দেখা হবে।
তোমার সাথে আসব?
হাসল মিরিনা। দরকার নেই। এখন আর এলিভেটরে কিছু হবে বলে মনে হয় না। একাই যেতে পারব।
মেইন কনফারেন্স রুমের দিকে রওনা হলো কিশোর। কয়েকবার দেখা হয়েছে, ইতিমধ্যে তাকে চিনে ফেলেছে দারোয়ান, তার পরেও হাতের সিল না দেখে ছাড়ল না। ভিড়ের ভেতর দিয়ে সোজা ডিকসনের স্টলের দিকে এগোল সে। ওটার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে রবিন আর মুসা।

ওকে দেখেই বলে উঠল মুসা, কয়েক যুগ তো লাগল আসতে। লোরা স্টারগার্ল তোমাকে আরেক গ্যালাক্সিতে নিয়ে গিয়েছিল নাকি?
রবিন রসিকতা করল না। কিশোরের চেহারা দেখেই অনুমান করে ফেলেছে কিছু হয়েছে। কি ব্যাপার? ভুরু কোঁচকাল সে। ওখানেও রহস্য পেলে?
একটা সূত্র পেলাম, কিশোর বলল। শুনলে তোমাদেরও চোখ কপালে উঠবে। আইজাক হুফারের দেখা পেলে?
আমাকে কি দরকার? পেছন থেকে বলে উঠল হুফার। সময় মত এসে গেছি, তাই না? হাসল সে। এইমাত্র এলাম। একটা উৎসবের আয়োজন করব ভাবছি। জ্যাকেটের পকেটে চাপড় দিয়ে বলল, একটা কন্ট্রাক্ট আছে এখানে। নতুন একটা কমিকের জন্যে চুক্তি করে এলাম।
কে ছাপছে? সব কথাই কানে গেছে ডিকসনের।
হ্যাঁরিস ডিমলার। এ শহরেই আছেন। কনভেনশনে যোগ দিতে এসেছেন। দেখা হয়ে গেল। আমাকে নিয়ে গেলেন ঘরে। আলাপ-আলোচনা করে পছন্দ হলো, কাজ করতে রাজি হয়ে গেলাম। মীটিং থেকে চলে গিয়েছিলাম সে জন্যেই।
কাল ডাকাতির সময় কি সেখানেই ছিলেন? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
মাথা ঝাকাল হুফার। হ্যাঁ। ওখান থেকে এসে কনভেনশন ফ্লোরে ঢুকে দেখি ধোঁয়া।
আপনার নতুন চুক্তির কথা কেউ জানে?
কেউ না। বকবক করে সবাইকে জানিয়ে দিয়ে মেজর মেহ্যামের বারোটা বাজাতে চাই না এখনই।
মেজর মেহ্যাম? ডিকসনের গোফ কাঁপছে। কি ধরনের হিরো হবে? মুষ্টিযোদ্ধা? ইনটেলিজেন্ট এজেন্ট? মারসেনারি? নাকি স্পেসম্যান?
তার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল হুফার। একটা কপি কিনে নিজেই পড়ে দেখবেন। আগে থেকেই বলতে যাব কেন? কিশোরের দিকে তাকাল সে। চুক্তির কথা কেউ জানে কি-না, এ প্রশ্ন করলে কেন?
কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে কিশোর বলল, আপনার কি ক্ষতি করেছে, জানি আমি। সে কথাই ভাবছি- হবিগুলো নষ্ট করল, হামলা চালাল... যে করেছে, সে জানেই না, যে এখানে থাকার একটা জোরাল কারণ আছে আপনার।
সামনে ঝুকল রবিন। কিশোর, কেবল জটিল করে তুলছ সব কিছু। দয়া করে একটু সহজ করো। এমন ভাবে বলছ, যেন কেউ হুফারকে তাড়াতে চাই এখান থেকে।
ঠিক, তা-ই বলছি। হুফারের দিকে তাকাল কিশোর। এই চুক্তি না হলে কি এখনও এখানে থাকতেন আপনি?

না। এমনকি সেদিন বক্তৃতাও দিতাম না। আমি বুঝতে পেরেছি, ঘটনা কোনভাবে আঁচ করে ফেলেছে বোরাম, তাই তাকে আরেকটু খুঁচিয়ে দিতে চেয়েছি। কিন্তু তুমি বললে…
কেউ জানে না আপনার চুক্তির কথা, কিশোর বলল। তাহলে মিস্টার ডিমলারের ওপরও হামলা চলত। বিরক্ত করা হত তাঁকেও। আঘাতটা শুধু আপনার ওপরই হয়েছে, হুফার। আমার বিশ্বাস এর সঙ্গে ফ্যান ফান চুরির ব্যাপারটার কোন সম্পর্ক আছে। থাকতেই হবে!
ভিকসনের দিকে তাকাল কিশোর। অটোগ্রাফের কথা জিজ্ঞেস করছেন না কেন?
অটোগ্রাফ? সতর্ক হয়ে উঠলেন হুফার। কোন কিছুতে সই করতে বলবেন তো…
সই করে দিয়েছেন, এমন কিছুর কথাই বলব, ডিকসন বললেন।
যদি হুফার করে থাকেন আরকি, মাঝখান থেকে বলল কিশোর।
মানে? হুফারের চোখে সংশয়।
আমি দেখেছি, আপনি ক্রিমসন ফ্যান্টমে সই করেননি। পুড়িয়ে ফেলতেও দেখেছি। আপনার হিরোয়িক কমিক আমলের কোন কিছুতেই সই আপনি আর করতে চান না।
ও, সবই দেখেছ তাহলে। কোন কিছুই চোখ এড়ায় না। খেপামি ভাবতেই পার। তবে কেন এই খেপামি করি কারণটা জানলে আর ওরকম ভাববে না। হিরোয়িক কমিক, বিশেষ করে নীল বোরাম আমার সর্বনাশ করে দিয়েছে।
জানি আমরা, কিশোর বলল। এডগার ডুফার সবই বলেছে আমাদের।
পকেটে দুই হাত ঢুকিয়ে দিল আর্টিস্ট। তার মানে কোন কথাই আর গোপন থাকে না। যা-ই হোক, বুঝতেই পারছ কেন আর আমি ওদের প্রকাশিত কোন কিছুতে সই করি না। আমি সই দিয়ে ওদের ব্যবসা কেন বাড়াব?
সব সময় তো ওদের ওপর খাপ্পা ছিলেন না, ডিকসন বললেন। সে সময় নিশ্চয় সই করতেন।
হেসে উঠল হুফার। সে সময় এত কাজ আমাকে দিত হিরোয়িক কমিক, করতে করতেই জানা বেরোত, সম্মেলনে যোগ দেয়ার আর সময় পেতাম না। সই করব কি?
তার আগে? ফ্যান ফানের আমলে?
গ্রে ফ্যান্টমের কথা বলছেন? মাথা নাড়ল হুফার, না, তখনও দিইনি। এতটা বিখ্যাত হইনি তখনও যে লোকে আমার অটোগ্রাফ চাইতে আসবে।
যা-ই হোক, আপনি নিশ্চয় কথাটা ভুলে গেছেন। একআধটা সই করেই থাকতে পারেন। কাউকে উপহার দেয়া কোন কপিতেঃ মাকে দিতে পারেন, বোনকে দিতে পারেন, বন্ধুকে…কিংবা যেখানে কাজ করতেন সেখানকার কাউকে…

মনে করতে পারছি না। ভুরু কোঁচকাল হুফার। কেন? এটা নিয়ে এত প্রশ্ন কেন?
আপনার সই দেয়া ফ্যান ফানের একটা কপি ছিল আমার কাছে, জোর দিয়ে বললেন ডিকসন।
থাকতেই পারে না, ঠিক একই রকম জোর দিয়ে বলল হুফার। আমি ফ্যান ফানের কোন কপিতে সই করিনি।
দেখুন, আপনার নামটাই ছিল। স্পষ্ট পড়া যায়। যে পৃষ্ঠা থেকে গল্প শুরু হয়েছে...
চোখের পাতা সরু হয়ে এল হুফারের। দেখলে বুঝতে পারতাম।
তা আর পারবেন না। কপিটা চুরি হয়ে গেছে। ডিকসনের দিকে তাকাল হুফার। সইটা দেখতে কেমন, বলতে পারবেন? এখন আমার সই অনেক বদলে গেছে, তখনকার সঙ্গে মিলবে না। ইদানীংকার কোন সই থেকে জাল করতে গেলে ধরা পড়ে যাবে, অন্তত আমি দেখলে বুঝে ফেলব। আমি সই করিনি ওরকম কোন কপিতে, এটা বলতে পারি। মনে থাকতই...
হয়তো মনে করতে চান না এটার কথা। আমি শিওর হচ্ছি, তার কারণ, যে লোকটা ওই কপি আমার কাছে বিক্রি করেছে, সে আপনার সই ভালমতই চেনে।
কে লোকটা? জানতে চাইল মুসা।
নীল বোরাম।
চোখে অবিশ্বাস নিয়ে ডিকসনের দিকে তাকাল তিন গোয়েন্দা।
ওই শয়তানটা! ফেটে পড়ল হুফার। তার কপিতে দেব আমি সই!
দিতেই পারেন। একটা সময় তো বন্ধুত্ব ছিল আপনাদের। যখন একসঙ্গে কাজ করতেন, ডিকসন বললেন।
কোন কালেই ওর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ছিল না, তিক্ত কণ্ঠে বলল হুফার। ওটা একটা ধাড়ি শয়তান, আর আমি ছিলাম অল্পবয়েসী, তার তুলনায় কচি খোকা, যাকে ঠকানোর সুযোগ পেয়েছিল সে। আমাকেই বরং একটা অটোগ্রাফ দিয়েছিল একবার। হিরোয়িক কমিক ছাড়ার পর সেটা পুড়িয়ে ফেলেছি।
তাহলে বইটা পেলেন কোথায় বোরাম? রবিনের প্রশ্ন।
নীল-সোনালি রঙের ঝিলিক তুলে এই সময় সেখানে এসে হাজির হলো মিরিনা।
কিছু মিস করলাম না তো?
না, কিশোর বলল, সময়মতই এসেছ। আলাপটা সবে গরম হলো। নীল বোরামের কথা বলছি আমরা।
ওই হারামজাদার মুখে একটা ঘুসি মারতে পারলে এখন খুশি হতাম আমি! মুঠো তুলে ঝাঁকাল হুফার।

পারলে মারুনগে, আমি আপনাকে আটকাব না, ডিকসন বললেন। লোকটা আপনাকে যদি ঠকিয়েই থাকে, রাগ হবেই। হাজার হোক, আপনারটা ভাঙিয়ে তো আর কম খাচ্ছে না। একটা খবর নিশ্চয় জানেন, পুরানো জনপ্রিয় কমিকগুলো আবার ক্ল্যাসিক হিসেবে ছাপছে হিরোয়িক কমিক।
তার মানে, মুসা বলল। আমরা যেগুলো পড়তাম, সেগুলোই রিপ্রিন্ট করছে?
হ্যাঁ। ক্রিমসন ফ্যান্টম ক্ল্যাসিক খুব চড়া দামে বিক্রি হবে। ব্যাপারটা ডিকসনেরও পছন্দ নয়। এতে আসল বইগুলোর দাম অনেক কমে যাবে। যেগুলো আগে প্রকাশিত হয়েছিল। আমার কাছে অনেক আছে, যেখানে যা পেয়েছি কিনে ফেলেছি। লস দিতে হবে আমাকে।
বোরামের কাছে ফ্যান ফান বিক্রি করেননি কি এই রাগেই? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
হ্যাঁ, তিক্ত হাসি ফুটল ডিকসনের ঠোঁটে। অনেক দিন ধরেই কেনার জন্যে আমার পেছনে লেগে ছিল সে। দিইনি।
নীল বোরামের সঙ্গে কথা বলা দরকার, বলল কিশোর। দেখি, তাঁর কি বলার আছে?
হিরোয়িক কমিকের এলাকায় পৌঁছল ওরা। আরেকটা প্রেস কনফারেন্স দিতে তৈরি হচ্ছে কোম্পানি। মিরিনার দিকে তাকিয়ে হাসলেন বোরাম। পেছনে কারা আসছে, দেখেই হাসিটা মুছে গেল মুখ থেকে।
হুফার! জোর করে পাতলা একটা হাসি দিলেন বোরাম। অভিযোগ করতে এসেছ তো আমার নামে? গালাগাল করবে?
না, জবাবটা দিল কিশোর। কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করতে এসেছি। আপনি যে বইটা কিনতে চেয়েছিলেন ডিকসনের দোকান থেকে, সেটার ব্যাপারে। মনে আছে নিশ্চয়? ফ্যান ফানের কপি। সংগ্রাহকের জিনিস।
কি বলছ বুঝতে পারছি না! টাকের চামড়া লাল হয়ে যাচ্ছে সম্পাদকের। চোখে অস্বস্তি। বার বার তাকাচ্ছেন ডিকসনের দিকে।
ফ্যান ফান নাম্বার ওয়ানের কপিটা, যেটা সেদিন কিনতে চেয়েছিলেন, মনে করিয়ে দেয়ার ভঙ্গিতে বলল কিশোর। মিস্টার ডিকসন বললেন, আপনিই নাকি তাঁর কাছে ওটা বিক্রি করেছিলেন।
তাতে কি? সম্পাদকের গালে দুটো লাল রক্তবিন্দু জমল। এটা কোন অভিযোগ নয়। কমিক আমি বিক্রি করেই থাকতে পারি। ওটাই আমার ব্যবসা। কিশোরের দিকে সরাসরি তাকালেন তিনি। নাকি চোর ভাবছ আমাকেই?
আরে না না, কি যে বলেন, তাড়াতাড়ি বলল কিশোর। বোমা যখন ফাটল, তখন আপনি ছিলেন ডুফারের সঙ্গে, গোল্ড রুমের বাইরে। আমরা কেবল জানতে

এলাম, কপিটার জন্যে এত আগ্রহ কেন আপনার?
শুনতে চাও? আরও বেশি দামের অফার পেয়েছিলাম আমি কপিটার জন্যে। লাভের এই সুযোগ ছাড়ব কেন? তাই কিনতে গিয়েছিলাম। অন্যায় হয়েছে?
তা হয়নি। মিস্টার ডিকসন যা চাইলেন, তা দিয়েই আনলেন না কেন তাহলে? লাভ তো হতই।
না, হত না। দাম বাড়াতে বাড়াতে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল, বেচে লাভ হত না। তাই আর কিনিনি।
কে কিনতে চেয়েছিল? জিজ্ঞেস করল মুসা।
ঠোঁটে জিভ বুলিয়ে ভিজিয়ে নিলেন বোরাম।
চাইলেও এখন আর লোকটার কাছে কপিটা বিক্রি করতে পারছেন না, মিস্টার বোরাম, রবিন বলল।
সে পাট ঘুচে গেছে। কাজেই এখন বলতে আর অসুবিধে কি?
সুমাতো কমিক, ফাঁদে আটকা পড়েছেন যেন বোরাম, ভাবভঙ্গিতে সে রকমই লাগছে।
বইটা পেলেন কোথায়? হুফার জানতে চাইল। আমি তো দিইনি।
হাল ছেড়ে দিলেন বোরাম। বুঝলেন, মিথ্যে বলে সুবিধে হবে না আর। বললেন, সুমাতোর কাছ থেকেই নিয়েছিলাম।
কিশোর বলল, মিটার বোরামকে আর বিরক্ত করার দরকার নেই। চলো।
সারি বেঁধে স্টলটার কাছ থেকে সরে এল ওরা সবাই।
ভেরি, ভেরি ইনটারেসটিং, কিশোর বলল, ঘরের ইঁদুরেই বেড়া কেটেছে। একটা কোম্পানি, যে কমিকটা বিক্রি করেছে, হঠাৎ করে তারাই আবার ফেরত চাইছে ওটা। অবশেষে জোড়া লাগতে আরম্ভ করেছে এক এক করে। আর মাত্র কয়েকটা প্রশ্নের জবাব, তাহলেই আমাদের চোরটাকে ধরে ফেলতে পারব। রহস্যময় কণ্ঠে বলল সে। আমি এখন জানি, কোথায় খুঁজতে হবে তাকে।
দাঁড়াও, কিশোরের হাত ধরে ফেলল মিরিনা। আসলে কোথায় যাচ্ছি আমরা?
যেখান থেকে সমস্ত গোলমালের উৎপত্তি, জবাব দিল কিশোর। সুমাতো কমিকসের খানিক দূরে এসে দাঁড়িয়ে গেল সে।
ভিড়ের জন্যে কাছে যাওয়ার উপায় নেই। গায়ে গায়ে লেগে যেন মানুষের প্রাচীর তৈরি হয়ে গেছে।
ঢোকা যাবে? ভিড়ের দিকে তাকিয়ে রয়েছে রবিন।
যাবে, এদিকে তাকিয়ে বলে উঠল একটা ছেলে, লাল হয়ে গেছে চোখ, ঠেলাঠেলি করার পরিশ্রমেই বোধহয়। কাল ছিল তিরিশ, আজ নিজে কিনেছি, আজ হয়ে গেছে দশ। এখনি সব বিক্রি শেষ হয়ে যাবে।

তারপরেও দাম অনেক বেশি, নিচু গলায় বলল কিশোর। টেপের কথা বলছে ছেলেটা। অন্যান্য জিনিসের দামও কমিয়ে দেয়া হয়েছে জানা গেল। কেন? অবাক লাগছে কিশোরের। হঠাৎ করে কেন এভাবে দাম কমাল?
কারণটা জানার জন্যে এগিয়ে গেল সে। ভিড় ঠেলে ঢোকার চেষ্টা করল। কয়েক মিনিট একটানা মানুষের শরীরের চাপ আর কনুইয়ের গুতো খাবার পর বেরিয়ে আসতে পারল প্রাচীরের অন্যপাশে, কাউন্টারের কাছাকাছি। কমিক আর ভিডিও টেপ বিক্রি করে কুল পাচ্ছে না সেলসম্যানেরা। দাম কমে যাওয়ায় যেন পাগল হয়ে উঠেছে ক্রেতারা। কিনেই চলেছে। সোনালি, শজারুর কাঁটার মত চুলওয়ালা লোকটা জিজ্ঞেস করল কিশোরকে, কি দেব?
ইয়ে...লোরা স্টারগার্ল! প্রথম যে নামটা মনে এল বলে দিল কিশোর।
ভাল জিনিস চেয়েছ। অনেকগুলো আছে আমাদের কাছে, স্পেশাল, এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত। পাঁচ ডলার করে সবগুলোর দাম হয় পঁচিশ, কিশোরের দিকে তাকিয়ে হাসল লোকটা। তবে তোমার জন্যে পনেরো। দশই বাদ, যাও।
টাকা বের করে দেয়া ছাড়া উপায় নেই। দেয়ার সময় লোকটার হাতের দিকে তাকাল। না, এই লোক ক্রিমসন ফ্যান্টম নয়। আঙুলগুলো মোটা মোটা, খাটো, নখের মাথা কামড়ে কেটে ফেলেছে। হাতের উল্টো পিঠে স্পষ্ট ছাপ দেয়া।
টাকাটা নিয়ে আরেক জনের হাতে দিল সোনালি চুল, দাম রেখে বাকিটা ফেরত দেয়ার জন্যে। টাকা গুনছে দ্বিতীয় লোকটা, কিশোর তাকিয়ে রয়েছে তার হাতের দিকে। নাহ, ওর হাতেও ছাপ রয়েছে।
এই যে, নাও, থ্যাংকস, টাকাটা ফিরিয়ে দিতে দিতে বলল দ্বিতীয় লোকটা। তারপর তাকাল সহকারীদের দিকে। একজনকে ডেকে বলল, ডেড, স্পেশাল কিছু নিয়ে এসো তো।
আরেক প্যাকেট স্টেলারা স্টারগার্ল কমিক বের করল ডেভ। এগুলো? দামটা দেখতে পেল কিশোর। দশ ডলার লেখা রয়েছে।
না, গাধা, এগুলো কি স্পেশাল হলো নাকি? না থাকলে দোকান থেকে নিয়ে এসোগে। আজকেই দরকার।
আবার ভিড় ঠেলে ফিরে চলল কিশোর। ঢুকতে যতটা কষ্ট হয়েছিল, বেরোতে তার চেয়ে কিছুটা কম হলো। কি কিনে এনেছে সে, দেখেই হাসতে লাগল মিরিনা।
গম্ভীর হয়ে কিশোর বলল, পরে তোমার অটোগ্রাফ নিয়ে নেব এগুলোতে, যখন তুমি বিখ্যাত হয়ে যাবে স্টারগার্ল হিসেবে। এখন অন্য জায়গায় যেতে হবে।
অন্য জায়গায়?
এখানে সব ফালতু জিনিস বিক্রি করছে সুমাতোরা। হাতের প্যাকেটটা দেখাল কিশোর, এসব জঞ্জাল। তবে দোকানে স্পেশাল কিছু রয়েছে। ভাবছি, ওগুলো

এতই স্পেশাল কিনা, যা চুরি করে জোগাড়ের দরকার পড়ে?
দেখতে চাও তো? চলো, ভ্যান আছে আমার, ম্যাড ডিকসন বললেন। কিছুক্ষণের জন্যে সেলসম্যানদের ওপর দোকানের ভার দিয়ে যেতে পারব।
আমিও যাব, মিরিনা বলল। সোনালি পোশাকের দিকে তাকাল। তবে এই কাপড়ে...
নাও, নিজের গায়ের জ্যাকেটটা খুলে দিল হুফার। এটা গায়ে চড়াও। অনেকখানিই ঢাকতে পারবে।
আন্ডারগ্রাউন্ড গ্যারেজে নেমে এল ওরা। হুফার, মিরিনা আর ডিকসন উঠলেন সবুজ ভ্যানে। তিন গোয়েন্দা উঠল মুসার ইমপালায়।
তা সত্যিই জানো তো দোকানটা কোথায়? গ্যারেজ থেকে বেরিয়ে এলে জিজ্ঞেস করল কিশোর।
জানি, মুসা বলল। ডিকসন কি বলল শুনলে না? ওয়েস্টার্নের কাছে, হলিউডে। বলল তো দেখতে পাবই। আমিও একবার দেখেছিলাম মনে পড়ে। বের করে ফেলতে পারব।
ঠিকই পারল সে। একবারেই। চার তলা একটা পুরানো বাড়ির গ্রাউন্ড ফ্লোরে রয়েছে সুমাতো কমিকস। সামনের দিকটায় উজ্জ্বল রঙে দোকানটার বিজ্ঞাপন লেখা হয়েছে। আর এঁকেছে প্রচুর ছবি। হলুদ পটভূমিতে ফুটে আছে কমিকের নানা রকম হিরোরা। জাপানী হিরোদের সঙ্গে আমেরিকান সুপারম্যানের লড়াইটা চমৎকার।
হেসে ফেলল রবিন। সুমাতো কমিকস যখন, এর চেয়ে ভাল আর কি দেখাতে পারত?
দুটো গাড়িই পার্ক করে নেমে এল সবাই।
ডিকসন বললেন, কমিক জোগাড় যখন শুরু করেছিলাম, তখন প্রায় সারাটা দিনই এখানে কাটাতাম। সব চেয়ে কম দামে বিক্রি করত এরা।
আর সব চেয়ে কম ভাড়ায় দোকান পাওয়া যেত তখন, পাশের মলিন ঘরগুলোর দিকে তাকাল হুফার।
ওই সময়, কথার পিঠে আবার বললেন ডিকসন, বাড়িটার মাটির তলার দোকানগুলোতে সেকেন্ডহ্যান্ড পেপারব্যাক বই বিক্রি হত। এখন আর দোকান নেই, গুদাম করে ফেলা হয়েছে। আমরা যেটার খোঁজে এসেছি, সেটা ওখানে পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। সিড়িটা চিনি, কিন্তু নামতে গেলে ধরা পড়ে যেতে পারি।
হাসল মিরিনা। হুফারের জ্যাকেটটা খুলতে শুরু করল। আমার মনে হয়, ওদের নজর আরেক দিকে সরানোর ব্যবস্থা আমি করতে পারব।

কিভাবে কি করবে দ্রুত একটা ছক ঠিক করে ফেলল কিশোর। কাজ শুরু হলো সেই মত। পরের পাঁচটা মিনিট হুফার, ডিকসন আর কিশোর ঘুরে বেড়াতে লাগল, সাধারণ খরিদ্দারের মত। পাঁচ মিনিট পর পিছু নিল মিরিনা। বাইরে রয়ে গেল মূসা আর রবিন, কোন গন্ডগোল দেখা দিলে সেটা সামলানোর চেষ্টা করবে।
কনভেনশন হলের তুলনায় অর্ধেক বেচাকেনাও এখানে আশা করেনি কিশোর। তবে যা দেখল, সেটাও আশা করেনি। র‍্যাকে কমিক ঘাটাঘাটি করছে চারজন কাস্টোমার। উদাস, শূন্য দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে দুজন সেলসম্যান।
দেয়াল ঘেঁষে প্রচুর বাক্স ছিল, দাগ দেখেই অনুমান করতে পারল কিশোর। মেঝেতে ধুলোর মাঝে মাঝে চারকোণ দাগ, ওসব জায়গায়ও বাক্স ছিল। র‍্যাকেও বই তেমন নেই। ব্যবসা খারাপ হয়ে এলে কিংবা দোকান বিক্রি করে দেয়ার সময় যে অবস্থা হয় সে রকম লাগছে। তবে বেশি তাড়াহুড়া যেন করেছে মালিক।
ঘুরে তাকিয়ে ডিকসনের ওপর চোখ পড়ল কিশোরের। দোকানের পেছনের অংশে একটা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। দোকান খালি হয়ে যাওয়ায় সুবিধেই হয়েছে ওদের। অনেক বাক্স সরিয়ে নিয়ে গিয়ে খোলা হয়েছে, বই বের করে নিয়ে বাক্সগুলো ওখানেই ফেলে রেখেছে। র‍্যাকের কমিক দেখার ভান করতে করতে ওখানে চলে এল কিশোর। হুফারও এল।
খুলে গেল সামনের দরজা, ভেতরে ঢুকল মিরিনা। পোশাকের মতই মুখেও হাসি ঝলমল করছে। কনভেনশন হলে যেভাবে আকৃষ্ট করেছে মানুষকে, এখানেও তার ব্যতিক্রম হলো না। সব কটা চোখ ঘুরে গেল তার দিকে।
এই-ই সুযোগ। মাটির নিচের ঘরে ঢোকার দরজাটা আস্তে করে খুলে ফেললেন ডিকসন। ঢুকে পড়ল তিনজনে। ধুলো পড়া চল্লিশ ওয়াটের একটা বাল্ব জ্বলছে সিঁড়িতে, আলো-আঁধারি তৈরি করেছে।
নিচে নেমে সুইচবোর্ডটা খুঁজল কিশোর। পেল না। সিঁড়ির আলো আবছা ভাবে আসছে এখানে, তাতে ভাল করে জিনিসপত্র চোখে পড়ে না। তবে দেখার তেমন কিছু আছে বলেও মনে হলো না। কয়েকটা ছোট ছোট বাক্স আর খুলে রাখা কোন মেশিনের কিছু যন্ত্রপাতি বাদে।
যন্ত্রাংশগুলোর দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। এরকম জিনিস দেখেছে কোথাও আগেও। কোথায়? ধীরে ধীরে স্মৃতিতে স্পষ্ট হলো। দেখেছে ওদেরই স্যালভিজ ইয়ার্ডে। বন্ধ হয়ে যাওয়া একটা ছাপাখানা থেকে কিনে এনেছিলেন রাশেদ পাশা।
কি মেশিনের জানেন? ফিসফিস করে বলল সে, পুরানো অফসেট প্রিন্টিং মেশিন।
কিন্তু কি ছেপেছে ওরা এই মেশিন দিয়ে?
সামনে পা বাড়াতেই পায়ে লাগল দলামোচড়া করে ফেলে রাখা কাগজ। লাথি লেগে কাগজের বলটা ছুটে গেল হুফারের দিকে। তুলে নিল সে। টেনেটুনে সমান

করল কাগজটা। দেখে বলল, এই ম্যাড, জানেন এটা কি?
সাদা-কালোয় ছাপা হয়েছে কাগজটাতে।
ডিকসনও দেখে চিনতে পারলেন। জানব না কেন? আগে খবরের কাগজে সাদা-কালোয় ছাপা হত কমিক। বইও ছাপত। এই পাতাটা নিশ্চয় পঞ্চাশ বছরের পুরানো।
আমার মনে হচ্ছে নতুন, পাতাটা দেখিয়ে বলল হুফার। পুরানো হলে হলুদ হয়ে যেত, কিনারগুলো হত ফাটা ফাটা। খোলার সময় মুড়মুড় করে ভেঙে যেত।
এখন বুঝতে পারছি, কিশোর বলল, স্পেশাল জিনিস বলতে কি বোঝাতে চেয়েছে।
ভাল কথা, বলে উঠল একটা কণ্ঠ। এখন বলো তো, তোমাদের নিয়ে কি করা যায়?
সিড়ির দিকে তাকাল ওরা। আবছা আলোয় তিনটে মূর্তিকে দেখা গেল। নেমে আসতে লাগল একজন। তাকে চিনতে পারল কিশোর। কনভেনশন ফোরের সেই বিশালদেহী দারোয়ান।
মনে করেছিলাম, লোকটা বলল, তোমার কালো বন্ধুটা উড়াল দিয়ে পুলে নামার পর থেকেই সাবধান হয়ে যাবে। হলে না। ঘুরঘুর করতেই থাকলে, যাকে পেলে তাকেই প্রশ্ন করলে, আরও সহকারী জোগাড় করলে, শেষমেষ এখানেও এসে হাজির হলে। আশা করি, চেঁচামেচি করার কথা ভাবছ না। লাভ হবে না। দোকানটা বন্ধ করে দিচ্ছি আমরা। দেয়ালগুলোও অনেক পুরু। বাইরে থেকে শোনা যাবে না।
নরিস, বলল একজন সেলসম্যান, কণ্ঠে অস্বস্তি, কি করব এদের?
হ্যাঁ, লোকটার সঙ্গে গলা মেলাল কিশোর, কি করা হবে আমাদের? নরিস, জানলেন কি করে আমরা এখানে আসছি?
ওই বোরাম ছাগলটা লাফাতে লাফাতে এল বসের কাছে, তোমরা নাকি নানা রকম কথা জিজ্ঞেস করেছ, এটা বলার জন্যে। সে আন্দাজ করে ফেলেছিল, তোমরা এখানে আসছ। হাসল নরিস। তারপর আর কি? আমাকে এখানে পাঠিয়ে দিল তোমাদের তিন গাধাকে ধরার জন্যে।
অন্ধকারে ভালমত আমাদের দেখতে পাচ্ছে না, ভাবল কিশোর। ডিকসন আর হুফারকে মুসা আর রবিন বলে ভুল করছে ব্যাটা। ও, লুই মরগানের হয়ে অনেককেই ধরতে যান তাহলে আপনি, বলতে বলতে তার দিকে এগোল সে। আলোয় বেরিয়ে এল। পেছনে হাত নিয়ে গিয়ে নেড়ে ইশারা করল ডিকসন আর হুফারকে, যাতে না এগোয়।

এখন আমার মনে পড়ছে, বলছে কিশোর, মুসা যখন ব্যালকনি থেকে পড়ে গিয়েছিল, তখন আপনি ছিলেন না গেটে পাহারায়। আপনার জায়গায় বসেছিল যে মেয়েটা হাতে সিল দেয় সে। ছুটি ছিল নাকি তখন আপনার? নাকি ছুটি দেয়া হয়েছিল আইজাক হুফারের ঘরে ঢোকার জন্যে?
ভয় পাচ্ছে কিশোর, তার কথা শুনে লোকটা মেজাজ না খারাপ করে বসে। সময় চাইছে সে। দেরি করিয়ে দিতে চাইছে। যাতে মুসা আর রবিন চলে আসার সময় পায়। ওপরে মিরিনারই বা কি হলো?
ডিনারের সময়ও আপনি ছিলেন ওখানে, কথা থামাল না কিশোর। বোরাম আর হুফার যখন হাতাহাতি শুরু করলেন, তাদের ছাড়াতে গেলেন। কেন? পরে সুযোগ করে গিয়ে হুফারকে শেষ করে দেয়ার জন্যে? নাকি বোরাম যে কাজটা করতে চেয়েছিলেন, সেটা করার জন্যে? বেচারা হুফারকে দুরমুজ করার জন্যে?
হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে লাগল নরিস। এতক্ষণে বুঝলাম, তোমাদের নিয়ে কেন এত দুশ্চিন্তায় পড়ে গিয়েছেন বস। মাথাটা বড় বেশি পরিষ্কার তোমাদের। অনেক কিছুই বুঝে ফেল।
তবে সব বুঝতে পারি নি। আমি ভেবেছিলাম, আপনিই বুঝি ক্রিমসন ফ্যান্টম সেজেছেন। পরে বুঝলাম, আপনি না। আপনার হাতের আঙুল বেশি মোটা, প্রায় চাঁপাকলার মত। সময় ফুরিয়ে আসছে, বুঝতে পারছে কিশোর। নরিস আর তার দুই সহকারী আর বেশিক্ষণ থাকবে না এখানে, কাজ সেরে সরে, পড়তে চাইবে।
চাঁপাকলা, না? রাগ প্রকাশ পেল নরিসের কণ্ঠে। চাঁপাকলার গাট্টা খাওনি তো মাথায়, খেলে বুঝতে পারবে!
বাধা দেয়ার জন্যে তৈরি হলো কিশোর। বেশি আত্মবিশ্বাস দেখাচ্ছেন না? আমি একা নই। আপনারাও তিনজন, আমরাও তিনজন।
আবার হাসল নরিস। বেরিয়ে পড়ল ভাঙা দাঁত, স্নান আলোতেও দেখতে পেল কিশোর। তাতে কোন অসুবিধে নেই। তোমাদের তিনজনকে একাই কাবু করে ফেলতে পারি...
কথা শেষ করল না সে। পেছন থেকে হাতটা সামনে নিয়ে এল। হাতে একটা বেসবল ব্যাট। ব্যাটের মোটা অংশটায় চাপড় দিল বাঁ হাতে।
ভয় পাচ্ছে তার দুই সহকারী। ওরাও হাত সামনে আনল। দুজনের হাতেই একটা করে ব্যাট।
নরিসের ইঙ্গিতে এগিয়ে আসতে লাগল তারাও।
মুঠো শক্ত করল কিশোর। লড়াই না করে কিছুতেই ধরা দেবে না। হেরে গেলে যাবে, সে পরে দেখা যাবে। কোনমতে নরিসকে কাবু করে ফেলতে পারলেই হলো,

বাকি দুজন আর এগোবে না। লেজ তুলে দৌড় দেবে, বোঝাই যায়। নিজের ইচ্ছেয় আসেনি ওরা, নিশ্চয় জোর করে নিয়ে এসেছে নরিস।
তবে বিশালদেহী লোকটাকে কাবু করা অত সহজ নয়। গায়ে যে শুধু মোষের জোর তাই নয়, কি করে ব্যাট ব্যবহার করতে হয়, তা-ও জানে। ধরার কায়দা দেখেই অনুমান করা যায়। এক পা এক পা করে এগোচ্ছে, পেছনে গা ঘেঁষাঘেষি করে আছে তার দুই সহকারী।
সমস্ত দুশ্চিন্তা আর ভয় জোর করে মন থেকে সরিয়ে দিল কিশোর। জুডো ক্লাসে শেখানো হয়েছে এটা করতে। শত্রুর ওপর কড়া নজর, প্রতিটি নড়াচড়া লক্ষ্য করছে। ধীরে ধীরে ভারি দম নিতে লাগল।
কাছে আসতে নরিসদের আরও অর্ধেক পথ বাকি, এই সময় সিড়ির মাথায় আরও দুটো মূর্তি চোখে পড়ল কিশোরের। সঙ্গে সঙ্গে ডাক দিল সে, মুসা, এই সামনের লোকটাই তোমাকে ঘুসি মেরেছিল! পুলে ফেলে দিয়েছিল!
হেসে উঠল নরিস। ওসব পুরানো কৌশল অনেক দেখা আছে আমার। আমি তাকাচ্ছি না পেছনে।
ওরা কথা বলছে, এই সুযোগে নিঃশব্দে নেমে চলে এল রবিন আর মুসা। ঝাপিয়ে পড়ল দুই সেলসম্যানের ওপর। একটা লোকের কানের সামান্য নিচে ঘাড়ের ওপর কারাতে কোপ মারল রবিন। টু শব্দ করতে পারল না লোকটা। হাত থেকে ব্যাট খসে পড়ল। জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল সে।
অন্য লোকটার ব্যাট ধরা হাতটা চেপে ধরে মুচড়ে পেছনে নিয়ে এল মুসা। হ্যাঁচকা টান দিয়ে ব্যাট কেড়ে নিল বিস্মিত লোকটার হাত থেকে। তারপর সেটা দিয়ে আক্রমণ করল নরিসকে।
বোঝাপড়াটা এই ব্যাটের সঙ্গেই হবে আমার, বলল সে।
চমকটা সামলে নিতে সময় লাগল না নরিসের। চিৎকার করে উঠে ব্যাট তুলল সে, বাড়ি মারল মুসার মাথা সই করে। সেটা ঠেকানোর জন্যে ব্যাট তুলল মুসা। ঠেকালও। তবে ব্যাটটা ধরে রাখতে পারল না, ছুটে গেল। সে যে লোকটার কাছ থেকে ব্যাট কেড়ে নিয়েছিল সে-ও এগিয়ে এল ওকে ধরার জন্যে। রবিন বাধা দিল তাকে।
মুসার দিকে যেই নজর দিয়েছে নরিস, অমনি লাফ দিয়ে আগে বাড়ল কিশোর। তবে টের পেয়ে গেল সেটা বিশালদেহী লোকটা। মুসাকে বাড়ি মেরে তার হাত থেকে ব্যাট ফেলে দিয়েই ঘুরল, সই করার সময় পেল না, কিশোরকে আসতে দেখেই বাড়ি মারল। ঠিকমত লাগাতে পারল না। ব্যাটের মাথা কিশোরের মুখ ছুঁয়ে গেল। তারপর গিয়ে লাগল পুরানো কাঠের রেলিংটাতে। মড়াৎ করে কাঠ ভাঙার

আওয়াজ হলো। আরেক কদম এগোল কিশোর। এক হাতে ব্যাট আটকানোর চেষ্টা করতে করতে আরেক হাতে কব্জি চেপে ধরল নরিসের।
কিন্তু ভারি শরীর দিয়ে ধাক্কা মেরে কিশোরকে সিঁড়ি থেকে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করল সে। রেলিঙে লেগে ব্যথা পেল কিশোর, উফ করে উঠল। কব্জি থেকে আঙুল ছুটে গেল। রেলিং আঁকড়ে ধরে পতন ঠেকাল।
ব্যাটটা টেনে ছাড়িয়ে নিয়ে হেসে উঠল নরিস। আবার ঘুরল মুসা আর রবিনকে বাড়ি মারার জন্যে। ওদের চিত করেই ঘুরবে কিশোরকে কাবু করার জন্যে।
ওদেরকে নাগালের মধ্যে না পেয়ে আবার ঘুরল কিশোরের দিকে। কিন্তু ওকে যেখানে আশা করেছিল, সেখানে পেল না। তার পরেও বাড়ি মারল। ব্যাটের নিচ দিয়ে ডাইভ দিল কিশোর। মাথা নিচু করে উড়ে এসে পড়ল নরিসের ওপর। মাথা দিয়ে ভীষণ জোরে গুতো মারল পেটে।
হুঁক করে উঠল লোকটা। সামনের দিকে বাঁকা হয়ে গেল শরীর। দুদিক থেকে তাকে ধরে ফেলল মুসা আর রবিন। সাংঘাতিক জোর লোকটার গায়ে। প্রচন্ড ব্যথা পেয়েছে, তবু দুজনের ধরার সঙ্গে সঙ্গে এক ঝাড়া দিয়ে মুক্ত করে নিল নিজেকে। শুধু মুক্ত করেই ক্ষান্ত দিল না, পাশে ঘুরে ঘুসি মারল রবিনের ঘাড়ে।
যথেষ্ট হয়েছে, বলেই ঝাপ দিল মুসা। গড়াতে গড়াতে পড়ল নরিসকে নিয়ে। গড়ানো থামল যখন, সে থাকল ওপরে।
কাহিল হয়ে পড়েছে নরিস। তাকে টেনে দাঁড় করাল মুসা। হেসে বলল, তোমার ঘুসিতে দারুণ শক্তি, জানা হয়ে গেছে আমার। এবার দেখ তো, আমারটা কেমন লাগে?
বলেই মেরে বসল।
ইতিমধ্যে দ্বিতীয় সেলসম্যানকে কাবু করে ফেলেছে কিশোর। দুজনেই বসে পড়েছে সিড়ির ওপর। হাঁপাচ্ছে পরাজিত কুকুরের মত। মারপিটের বিন্দুমাত্র ইচ্ছেও আর নেই ওদের।
দারুণ, বুঝলে! হাত ঝাড়তে ঝাড়তে কিশোরকে বলল রবিন, শেষ মারটা বড় চমৎকার দিলে। কি মার? জুডো?
মাথা ডলছে কিশোর। ছাই! একজায়গায় ফুলে উঠেছে, সেখানে আঙুলের চাপ দিয়েই উফ করে উঠল। ছাই হোক আর যা-ই হোক, কাজ হয়েছে, নরিসের ওপর প্রতিশোধ নিতে পেরে সন্তুষ্ট হয়েছে মুসা। তোমাদেরকে মারতে এল কেন?
সংক্ষেপে সব জানাল কিশোর। শুনেটুনে মুসা বলল, ভাল। পুলিশকে খবর দেব?
তাতে এই তিনটেকে জেলে ভরতে পারব বটে, কিশোর বলল, কিন্তু গভীর জলের মাছটা ফসকে যাবে। লুই মরগানকে আটকাতে পারব না আমরা।
কেন নয়? জালিয়াতি যে করেছে এটা তো ঠিক?

কমিক বুক জালিয়াতি, হুফার বলল, এই অপরাধে জেলে ঢোকানো যাবে বলে মনে হয় না। উকিলই ভাল বলতে পারবে।
কিন্তু আইন তো ভঙ্গ করেছে সে?
পাবলিশিং কপিরাইট অমান্য করেছে, এটা বলা যায়, কিশোর বলল। এধরনের অপরাধে লোকের শাস্তি হয় বটে, তবে জেলে যায় না। জরিমানা টরিমানা দিয়েই খালাস পেয়ে যায়।
শহর ছেড়ে চলে যাবে সে, ডিকসন বললেন।
দেশ ছেড়ে চলে যেতে পারে, বলল কিশোর। তাহলে জরিমানাও দিতে হবে না। দেখি, আগে জেনে নিই, কি ধরনের শয়তানি চলছিল এখানে। তারপর বুঝেশুনে কিছু একটা করা যাবে।
ধমক দিতেই যা জানে গড়গড় করে বলে দিল এক সেলসম্যান। এখানে, এই মাটির নিচের ঘরে কমিক বই ছেপে নকল জিনিসটা আসল বলে ধরিয়ে দেয়া হত সংগ্রাহকের হাতে।
ভাল আয় করেছে, হুফার বলল। শ খানেক কমিক ছাপতে ব্ল্যাক অ্যাণ্ড হোয়াইটে বড় জোর হাজার দুয়েক ডলার লাগে। প্রতিটি বই কম করে হলেও পঞ্চাশে গছাতে পারবে বোকা সংগ্রাহকগুলোকে। তাতে লাভ থেকে যাবে তিন হাজার। সোজা কথা নয়। লেখক কিংবা আর্টিস্টকে কমিশনের জন্যে একটা পয়সাও দিতে হবে না। লাভ সবটাই নিজের পকেটে পুরতে পারবে প্রকাশক।
কিন্তু সব কিছু বন্ধ করে দিচ্ছে মরগান, কিশোর বলল। প্রেসও বন্ধ করে দিয়ে এখানকার পাট চুকিয়ে চলে যাওয়ার মতলব। তারমানে আরও কোন ব্যাপার আছে। একজন সেলসম্যানের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপার, বল তো?
আরেক ফন্দি করেছে, লোকটা বলল। এবার কালারে ছাপবে।
কালার? ভুরু কোঁচকাল হুফার। তাতে তো অনেক গল্প। একশো ছাপথেই বেরিয়ে যাবে বারো হাজার! চুরি করে ছাপতে গেলে প্রেস থেকে তো আর পারবে না, নিজেকেই করতে হবে সব কিছু। এসটাবলিসমেন্ট কস্ট অনেক। টাকা পাবে কোথায়?
তাইওয়ান, সিঁড়ির গোঁড়া থেকে জবাব দিল নরিস। হাত-পা বাঁধা হয়ে বসে আছে। চারপাশে তাকাল বিরক্ত চোখে। ওরই মত আরেক শয়তান প্রিন্টারের সঙ্গে ওখানে যোগাযোগ হয়েছে মরগানের, চুক্তিও করেছে। এখানে ছেপে চোরাচালান হয়ে চলে আসবে আমেরিকায়। আপাতত চিনামাটির জিনিসের বাক্সে করে আনার সিদ্ধান্ত নিয়ে মরগান। পুরো উপকুলে ছড়িয়ে দেয়ার ইচ্ছে তার। আমাদের

সবাইকে ব্যবসায় লাগাবে বলে লোভ দেখিয়েছিল। টাকার অঙ্ক হিসেব করে দেখিয়েছিল। রাজি না হয়ে পারিনি।
এখন আর কি, কিশোর বলল, জেলে গিয়ে পচুনগে। বেশি লোভ করলে এরকমই হয়।
সেলারেই তিনজনকে বেঁধে ফেলে রেখে বেরিয়ে এল ওরা। দোকানের দরজায় তালা লাগিয়ে দিল। গাড়িতে বসে আছে মিরিনা। এরকম একটা পরিবেশে এভাবে বসে থাকতে ভাল লাগছিল না ওর। ওদের দেখে অস্বস্তি দূর হলো। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, খবর কি তোমাদের? সব ভাল? চিন্তায়ই পড়ে গিয়েছিলাম। আমাকে বের করে দিল সেলসম্যানগুলো। চুরি করে ঢুকতে হয়েছে তখন মুসা আর রবিনকে।
আমরা ভাল। কি কি ঘটেছে মিরিনাকে জানাল কিশোর। এখন গিয়ে মরগানকে ধরতে হবে, পালানোর আগেই।
কি করে আটকাব? মুসার প্রশ্ন।
ডাকাতির অভিযোগে, সমাধান দিল রবিন। যদি কোনভাবে ওটার সঙ্গে জড়িয়ে ফেলতে পারি ওকে, চোরাই কমিকগুলো খুঁজে বের করতে পারি, তাহলেই হবে।
সন্তুষ্ট হতে পারল না মিরিনা। বলল, অনেকগুলো যদি এসে যাচ্ছে।
কনভেনশনে ফিরে কোলাহল আর লোকের হুড়াহুড়ি যেন জোর একটা ধাক্কা মারল ওদের। আশা করেছিল, সুমাতো কমিকের মতই এখানেও দেখবে ভাঙা মেলা, লোকজন কম, সবাই পোটলাপুঁটলি গোছগাছ করে বাড়ি ফেরার তোরজোর করছে।
দুই রঙা চুলওয়ালা মেয়েটার শোচনীয় অবস্থা। কুলিয়ে উঠতে পারছে না আর বেচারি। একই সাথে দুটো কাজ করতে হচ্ছে। হাতে সিলও মারতে হচ্ছে, দারোয়ানের কাজও করতে হচ্ছে। ফুরসত পেলেই তাকাচ্ছে এদিক ওদিক, নিশ্চয় নরিসকে দেখার আশায়। নরিস যে আর ফিরবে না, জানলেই মুষড়ে পড়বে মেয়েটা, তাই তাকে কিছু বলল না কিশোর।
এবার? কনভেনশন ফ্লোরে ঢুকেই জিজ্ঞেস করল রবিন।
আমাদেরকে দেখে ফেলার আগেই তাকে খুঁজে বের করতে হবে আমাদের, মুসা বলল। গরিলাটাকে পাঠিয়েছে আমাদেরকে বন্দি করার জন্যে। এখন আমাদেরকে ঘুরঘুর করতে দেখলেই সন্দেহ করে বসবে।
ঠিক, একমত হয়ে বলল কিশোর। মরগানকে খুঁজে বের করতে হবে, চোরাই কমিকগুলোও বের করতে হবে।
এই তো, পেলাম, শোনা গেল বাজখাই কণ্ঠ। মোটা শরীর দিয়ে ধাক্কা মেরে ভিড় সরাতে সরাতে এগিয়ে এল ডুফার। খুব উত্তেজিত লাগছে! ব্যাপারটা কি?

খপ করে তার হাত চেপে ধরল হুফার। এড, মরগানকে দেখেছ?
হাসিতে দাঁত বেরিয়ে পড়ল ডুফারের। দাড়ি নেড়ে বলল, ঠিকই আন্দাজ করেছি!
খুব উত্তেজনা। হয়েছেটা কি? আবার কিছুতে হাত দিল নাকি?
সে হাসছে, আর কিশোর ভাবছে মরগানের হাতের কথা। ডাকাতির পর পর হাজির হয়েছে লোকটা, লম্বা আঙ্গুলওয়ালা পাতলা হাতজোড়া ডলতে ডলতে। ওই হাতের উল্টো পিঠে সিল ছিল না। কনভেনশন বস হিসেবে তার টিকেট লাগে না।
মরগানের হাত ডাকাতটার হাতের সঙ্গে মিলে যায়, কিশোর বলল, ওর হাতেও কোন সিল নেই। আমার বিশ্বাস, ডাকাতিটা সে-ই করেছে। কিন্তু দুজন লোক তাকে গোল্ড রুমে যেতে দেখেছে, ভাকাতির সময়। ভুরু কোচকাল কিশোর। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার। ভাবছে।
আমি তাকে গোল্ড রুমে দেখেছি, ডুফার বলল। ঘরে ঢুকে ঘ্যান ঘ্যান করতে লাগল প্রোজেকশনিস্ট তখনও আসেনি বলে। সে নিজেই প্রোজেকটরটা চালানোর চেষ্টা করল, পারল না। যন্ত্রটা এমনকি পর্দায় দিকেও সেট করা ছিল না, যে ছবি ফেলা যাবে। মজার কাণ্ড করেছে। ওটাকে চালানোর জন্যে ব্যাগ ব্যবহার করেছে সে।
ব্যাগ? কিসের ব্যাগ? জানতে চাইল কিশোর।
শ্রাগ করল ডুফার। কাঁধে একটা ক্যানভাসের ব্যাগ ছিল। এই কনভেনশনের অর্ধেক লোকের কাঁধেই ওরকম ব্যাগ আছে।
মুসা বলল, কিন্তু আমাদের সাথে যখন দেখা হলো, তখন ছিল না।
রবিন যোগ করল, আর সেটা ডাকাতির বেশি আগেও নয়।
আসল কথা হলো, কিশোর বলল, কি ছিল ব্যাগটার ভেতর?
তোমার কি মনে হয়? মিরিনার প্রশ্ন। কসটিউম?
হতে পারে, ভ্রূকুটি করল কিশোর। কিন্তু সময়ের ব্যাপারটা মিলছে না। পোশাক খুলে এত তাড়াতাড়ি গোল্ড রুমে পৌঁছল কি করে?
ভাল প্রশ্ন, মুসা বলল। গোল্ড রুমে দেখা দরকার। এসো।
দল বেঁধে রওনা হলো সবাই। কনভেমশন ফ্লোর থেকে বেরিয়ে প্রথমে বাঁয়ে মোড়, তারপর আরেকবার বাঁয়ে মোড় নিতে লম্বা একটা করিডর পড়ল।
একটা ব্যাপার খেয়াল করেছ? হুফার বলল, কনভেনশন ফ্লোরে এদিক দিয়ে যাওয়ার পথটা বড় জটিল। বেশি ঘোরপ্যাচ।
শেষ মাথায়, ডানে গোল্ড রুমের প্রবেশ পথ। বন্ধ দরজার ওপাশ থেকে আসছে জমজমাট বাজনা। চিৎকার করল একটা মহিলা কণ্ঠ, গান নিয়ে একটা মন্তব্য করল।

বাঁয়ে আরেকটা দরজা, তাতে ডোরনব নেই। ঠেলা দিল কিশোর। নড়ল না পাল্লা। এটা দিয়ে কোথায় যাওয়া যায়? নিজেকেই যেন করল প্রশ্নটা।
এটা একটা ইমারজেন্সি একজিট, ডুফার বলল। জরুরি অবস্থায় বেরোনোর পথ। এর অন্য পাশেই কনভেনশন ফ্লোর।
দরজায় কান পেতে ওপাশে অসংখ্য মানুষের নড়াচড়া আর কোলাহল গুনতে পেল কিশোর। চকচক করে উঠল চোখ। তাহলে এই ব্যাপার। এটা দিয়ে সহজেই কনভেনশন ফ্লোর থেকে ডাকাতি করে বেরিয়ে আসতে পেরেছে ক্রিমসন ফ্যান্টম। মিস্টার ডিকসনের দোকান থেকে খুব কাছেই হবে মনে হয়।
তার পরেও কথা থাকে, প্রশ্ন তুলল হুফার। কাপড় বদলাল কোথায় সে?
যেখানে ডাকাতি করেছে সেখানেই, জবাব দিল কিশোর। পোশাক বদলের ঘর তো ওখানেই তৈরি করে নিয়েছিল। ধোঁয়া ধোঁয়ার মধ্যেই কাজটা সেরেছিল।
মিরিনার দিকে তাকাল গোয়েন্দাপ্রধান। ধোঁয়ার ভেতরে তাকিয়ে কি দেখতে পেয়েছিলে তুমি, বলো তো আবার?
শ্রাগ করল মিরিনা। এক ঝলক লাল। মনে হলো কাঁধের ওপর। ধোয়ার ভেতরে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে তখন সে।
মাথা ঝাঁকাল কিশোর। কোন দিকে গিয়েছিল?
ভেবে নিল মিরিনা। তখন তো মনে হয়েছিল, মানে আমি ভেবেছি আরকি, সামনের দরজার দিকেই গেছে। এখন মনে হচ্ছে, এই দরজাটার দিকেও আসতে পারে।
হাসল কিশোর। লাল ঝিলিকের মানে হতে পারে, তখন ওটা খুলে ফেলছিল মরগান, ব্যাগে ঢোকানোর জন্যে। কমিক ভরে আনতে যে ব্যাগটা সাথে করে নিয়ে গিয়েছিল।
ডুফার বলল, কিন্তু ডাকাতির আগের ক্ষণে যে তাকে আমি গোল্ড রুমে দেখেছি..
বাধা দিয়ে বলল কিশোর, তা দেখেননি। ডাকাতির খবর শোনার আগের মুহূর্তে তাকে দেখেছেন, ডাকাতি হওয়ার আগের ক্ষণে নয়।
দ্বিধায় পড়ে গেল ডুফার। তাই তো! এটা তো হতেই পারে…হয়তো ঠিকই বলেছ তুমি বুঝতে পারছি…
আমি পারছি না, মুসা বলল।
সামনের দরজা দিয়ে ডাকাতির খবরটা বাইরে বেরোতে মিনিট দুই লেগে গেছে, বুঝিয়ে দিল রবিন।
ঠিক। কিশোর আরও ব্যাখ্যা করে বোঝাল, পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল মরগান, খবরটা হলরুম থেকে বাইরে বেরোনোর আগেই। ছুটে চলে এসেছিল

গোল্ড রুমের কাছে। যাতে তাকে লোকে দেখতে পায়, অ্যালিবাই তৈরি হয়, তাকে সন্দেহ না করতে পারে কেউ।
থামল কিশোর। এক আঙুল তুলল। আর একটা ভিন্ন সূত্র রয়ে গেল। সাথে করে ব্যাগটা গোল্ড রুমে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা। ভাবছি, এখনও প্রোজেকটরের গায়ে কোথাও ঝুলছে না তো?
হুফার বলল, গিয়ে দেখলেই তো হয়।
সব চেয়ে ভাল হয়, কিশোর বলল, মরগান যদি যায়। গিয়ে বের করে আনুক ওটা। এক কাজ করা যাক। প্রোজেকশনিস্টকে দিয়ে একটা খবর পাঠানো যাক তাকে।
প্রোজেকটর চালাচ্ছে এখন পিটার, আমার বন্ধু, ডুফার বলল। ওই যে, আমাদের পাশে বসে খাচ্ছিল যে লোকটা সেদিন।
বুঝতে পেরেছি, কিশোর বলল।
তাকে দিয়ে কিছু করানো যায় না?
খবর পাঠাতে চাও তো? যাবে। কি বলতে হবে?
প্রোজেকটর ভীষণ গরম হয়ে গেছে, আগুন লেগে যেতে পারে, হাসল কিশোর, এরকম কিছু?
ঝটকা দিয়ে খুলে গেল গোল্ড রুমের দরজা। নাছোড়বান্দা কিছু কমিকের ভক্তের ওপর ছড়িয়ে পড়ল আলো। টেরই পেল না ওরা। গভীর ঘুমে অচেতন। যারা জেগে রয়েছে তারা তাকিয়ে রয়েছে পর্দার দিকে। আলো পড়তেই চিৎকার করে উঠল দুচারজন, এই, বন্ধ করো! দরজা বন্ধ কর!
পর্দায় তখন মাকম্যানের রাজা গুঙের সঙ্গে মরিয়া হয়ে লড়ছে এক অ্যাসটারয়েড।
দর্শকদের আপত্তির পরোয়াই করল না দরজায় দাঁড়ানো লম্বা মানুষটা। সোজা এগোল প্রোজেকটরের দিকে। যাওয়ার সময় ঘষা লাগল পিটারের গায়ে। টেবিলে রাখা ক্যানভাসের ব্যাগটা ধরে টান দিল নিজের দিকে। একপাশে সরে গেল প্রোজেকটর, আলো অর্ধেক পড়ছে এখন পর্দায়, বাকি অর্ধেক বাইরে।
দর্শকরা দেখতে পাচ্ছে রে গান বের করছে রক, কিন্তু যার উদ্দেশে বের করেছে, সেই শত্রুই গায়েব। আলো অর্ধেক সরে যাওয়ায় বাইরে পড়ে গেছে গুঙ।
অ্যাই, কি হলো? ছবির কি হলো? চিৎকার করে উঠল কয়েকজন দর্শক। এমনকি যারা ঘুমিয়ে ছিল তারাও জেগে উঠে চেঁচামেচি শুরু করল। লোকটা যখন টান দিয়ে প্রোজেকটরের নিচ থেকে ব্যাগটা বের করল, তখন চিৎকার চরমে উঠেছে। কারণ প্রোজেকটরের আলো তখন পর্দা থেকে এতটাই নিচে নেমে গেছে, রক

আর গুণ্ডের কেবল মাথাটা দেখা যাচ্ছে। রকের হেলমেট আর গুণ্ডের মাথার অ্যান্টেনা এপাশ ওপাশ করছে প্রোজেকটরের আলো নড়ার সাথে সাথে।
চেঁচামেচিতে ছবির শব্দই শোনা যায় না। কয়েকজন ভক্ত চেঁচিয়ে উঠল যারা চিৎকার করছে তাদেরকে চুপ করানোর জন্যে। তাতে চিৎকার বাড়লই শুধু, কমল না।
সব চিৎকারকে ছাপিয়ে শোনা গেল আরেকটা তীক্ষ্ণ কর্কশ চিৎকার, অ্যাই, তোমরা চুপ করবে! কিছু তো শুনতে পাচ্ছি না!
নিঃশব্দে এগিয়ে এল ওরা সাতজন, ঘিরে ফেলল টেবিলের কাছে দাঁড়ানো মানুষটাকে। এই সাতজন হলো তিন গোয়েন্দা, ম্যাড ডিকসন, আইজাক হুফার, এডগার ডুফার আর মিরিনা জরডান। আবছা আলোতেও স্পষ্ট চেনা গেল লুই মরগানকে।
ব্যাগটা হাতে আঁকড়ে ধরে একটা মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন মরগান। তারপর শ্রাগ করে ব্যাগ থেকে বের করলেন ছোট একটা বল।
থামুন! চিৎকার করে উঠল কিশোর। কিন্তু ততক্ষণে বলটা মেঝেতে পড়ে গেছে।
ঘন ধোঁয়া উঠতে শুরু করল। চিৎকার করে বললেন মরগান, আগুন! আগুন!
আসল ভক্তরা কথাটা কানেই তুলল না। ছবি ঠিক করতে বলছে পিটারকে। ধোঁয়া বাড়ছে, তাতে ঠিক করা ক্রমেই মুশকিল হয়ে উঠছে। যারা একটু কম ভক্ত, তারা গোয়েন্দাদের দলকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দৌড় দিল দরজার দিকে। এই সুযোগটা কাজে লাগালেন মরগান। আক্রমণ করে বসলেন মিরিনাকে। ব্যাগ ঘুরিয়ে বাড়ি মারতে গেলেন।
বাড়ি লাগল না, ধাক্কায়ই টলে উঠে পিছিয়ে গেল মিরিনা। তার পাশ কাটিয়ে খোলা দরজার দিকে দৌড় দিলেন মরগান।
পড়ে যাচ্ছিল মিরিনা, কোমর জড়িয়ে ধরে তাকে আটকাল কিশোর। চিৎকার করে বলল অন্যদেরকে, আসুন! জলদি!
দরজা দিয়ে দৌড়ে বেরোল ওরাও। হলের অর্ধেক পেরিয়ে গেছেন ততক্ষণে মরগান। সামনে কেউ পড়লে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছেন। পিছু নিল তিন গোয়েন্দা। সামনে একটা ছেলেকে দেখে সোজা ঘুসি মেরে বসলেন মরগান, সরানর জন্যে। চরকির মত পাক খেয়ে দেয়ালের দিকে চলে গেল ছেলেটা।
লবিতে বেরোলেন মরগান। কোনদিকে না তাকিয়ে সোজা ছুটলেন, লোকজনকে ধাক্কা দিয়ে, কনুইয়ের গুঁতো মেরে সরিয়ে। সাধারণত যেদিক দিয়ে বেরোনর কথা-সামনের দরজা কিংবা এলিভেটরের দিকে না গিয়ে যাচ্ছেন অন্য দিকে।
বুঝে ফেলল কিশোর। সিড়ি! লোহার সিড়ির দিকে যাচ্ছেন তিনি!

আগে চলে গেল মুসা। দ্রুত কমে আসছে তার আর মরগানের মাঝের দূরত্ব। অবাক হয়ে হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছে লোকে।
মোড়ের কাছে গিয়ে যেন ব্রেক কষলেন মরগান। পরক্ষণেই ঘুরে গেলেন সিড়ির দিকে। একটু পরেই দড়াম করে সিঁড়ির দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ শোনা গেল।
হ্যাঁচকা টানে দরজাটা খুলে ফেলল মুসা। ঢুকে পড়ল ভেতরে। পেছনে বিন্দুমাত্র গতি না কমিয়ে এসে ঢুকল কিশোর আর রবিন। সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করল।
মুসা, চেঁচিয়ে বলল কিশোর। সোজা তোমার গাড়িতে গিয়ে উঠবে। মরগানকে ধরার চেষ্টা কোরো না! আগের বার কিভাবে ওদের দৌড়ে পরাজিত করে দিয়েছিলেন কনভেনশন চীফ, মনে আছে তার।
পার্কিং গ্যারেজে নেমে এল ওরা। ওরাও নামল, মরগানও উঠে পড়লেন লাল একটা করভেট গাড়িতে।
ইমপালার দিকে দৌড় দিল তিন গোয়েন্দা। মুসা ইঞ্জিন স্টার্ট দিতে দিতে চলতে শুরু করল করভেট, ঘুরে রওনা হয়ে গেল একজিট র‍্যাম্পের দিকে। এক্সিলারেটরে পায়ের চাপ বাড়িয়ে গাড়িটার পিছু নিল মুসা।
খোলা রাস্তায় যদি চলে যায়, বলল সে। তাহলে আর ধরতে পারব না। ওর গাড়ির ধুলো খাওয়া ছাড়া তখন আর কিছুই করার থাকবে না আমাদের।
কিন্তু থামাবেই বা কি করে লোকটাকে? র‍্যাম্পে যেতে কোন বাধা নেই।
তারপর, হঠাৎ করেই কর্কশ আর্তনাদ করে উঠল টায়ার। দেখা গেল, একটা থামের আড়াল থেকে বেরোচ্ছে ম্যাড ডিকসনের সবুজ ভ্যান। মরগানের গাড়ির পথরোধ করতে ছুটল একচোখা সাইক্লপস।
গতি বাড়াল করভেট। শাঁই করে একপাশে কেটে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল সাইক্লপসকে। পুরোপুরি পারল না। ধ্রাম করে এসে ওটার পেছনের ডান ফেন্ডারে গুতো মারল সবুজ ভ্যান।
থামলেন না মরগান। গতিও কমালেন না। ভাঙা ফেন্ডার বিচিত্র শব্দ তুলছে।
কয়েক জায়গায় রঙ চটে গেল সাইক্লপসের। কেয়ারই করল না। তীক্ষ্ণ মোড় নিতে গিয়ে কাত হয়েই আবার সোজা হলো। দুলে উঠল একবার। থামল না। করভেটের লেজে লেগে রইল। কাছাকাছি চলে এল ইমপালা।
সেঞ্চরি বুলভারে বেরিয়েই গতি বাড়াল করভেট। যানবাহনের ভেতর দিয়ে পথ করে ছুটতে গিয়ে যেন মাতালের মত দুলছে। খানিক পর পরই কিইচ কিইচ করে প্রতিবাদ জানাচ্ছে টায়ার। রাস্তায় ঘষা লেগে জ্বলে যাচ্ছে। ডানের ফেন্ডারটা চেপে লেগে রয়েছে চাকার সঙ্গে, ক্ষতি করে চলেছে টায়ারের।
মুসার ভবিষ্যতবাণী ঠিক হয়নি। গতি বাড়িয়ে ওদেরকে ধুলো খাইয়ে সরে পড়তে পারেননি মরগান। গতি বাড়ালেই মাতাল হয়ে যায় গাড়ি, নিয়ন্ত্রণ হারানোর ভয়

আছে এভাবে চললে। গতি কমাতে বাধ্য হচ্ছেন তিনি। আশা হলো তিন গোয়েন্দার। ধরার সুযোগ আছে।
করভেটের পেছনে লেগেই রয়েছেন ডিকসন। গালাগাল করছে অন্যান্য ড্রাইভাররা, সরতে বলছে, কানেই তুলছেন না তিনি। থ্রী লেনের দিকে ঘুরে গেল মুসা। সামনে দিয়ে গিয়ে করভেটকে আটকানোর চেষ্টা করল।
আরেকবার গতি বাড়ানোর চেষ্টা করলেন মরগান। আবার বাধা দিল আহত ফেন্ডার। পেছনের বাম্পারে গুতো মারল কয়েকবার সাইক্লপস।
সব রকমে চেষ্টা চালিয়েও করভেটকে থামাতে কিংবা রাস্তা থেকে সরাতে পারল না সাইক্লপস আর ইমপালা। কিছুতেই পাশ কাটিয়ে পেরোতে দিলেন না ওদেরকে মরগান। একবার বাঁ পাশে এগিয়ে প্রায় সমান সমান হয়ে গেল সাইক্লপস। ধা করে এসে ওটাকে বাড়ি মারল করভেট, কয়েক জায়গার রঙ তুলে দিল। তুবড়ে গেল বডির ওসব জায়গা। রাস্তায় এই কাণ্ড চলতে দেখে হতবাক হয়ে গেছে অনেক ড্রাইভার। জোরে জোরে হর্ন বাজাতে শুরু করেছে।
রবিন বলল, করভেট বেচারার স্যালভিজ ইয়ার্ডে যেতে আর দেরি নেই।
ভুল বলেনি সে। চমৎকার গাড়িটার করুণ চেহারা হয়েছে। দুই পাশে রঙ চটে গেছে অনেক জায়গায়, তুবড়ে গেছে শরীর। বাম্পারের একটা পাশ খুলে ঝুলছে, রাস্তায় ঘষা লেগে আগুনের ফুলকি ছিটাচ্ছে। বসে যাওয়া ফেন্ডারের চাপে একনাগাড়ে আর্তনাদ করে চলেছে চাকাটা।
ঘষা লেগে রাবার ক্ষয়ে গিয়ে পাতলা হয়ে এল টায়ার, আর সইতে পারল না। বিকট শব্দ করে ফাটল। পাগল হয়ে গেল যেন করভেট। হুঁশজ্ঞান সবকিছু হারিয়ে রাস্তার গাড়িগুলোকে গুঁতো মারার জন্যে ছুটে যেতে লাগল এদিক ওদিক। সবাই সরে যেতে চাইছে পাগলা গাড়ির নাকের সামনে থেকে। ব্রেক কষার ফলে একাধিক টায়ারের কর্কশ শব্দ হলো। হর্ন বাজল। রাগত চিৎকার শোনা গেল ড্রাইভারদের। অবশেষে গাড়িটাকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এলেন মরগান।
ডান পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল সাইক্লপস। বাঁ পাশে চেপে আসছে ইমপালা। কোণঠাসা করে ফেলল করভেটকে।
এখন আর কিছুই হারানোর নেই মরগানের। দুটো গাড়ির মাঝখান দিয়ে ভয়ানক ভাবে কাঁপতে কাঁপতে চলেছে তাঁর গাড়ি। থামলেন না এত কিছুর পরেও। দুই সারি গাড়িকে মাঝখান দিয়ে কেটে বেরিয়ে চলে যেতে চাইছেন ডানের রাস্তায়। কিন্তু যেতে দিলেন না ডিকসন।
করভেটের গায়ে প্রায় ঘষা লেগে বেরিয়ে গেল সাইক্লপস। সামনে গিয়ে পথ রোধ করে দাঁড়াল লাল গাড়িটার। থামতে বাধ্য হলেন মরগান। তবে সেটা মুহূর্তের জন্যে। পরক্ষণেই শাঁই শাঁই স্টিয়ারিং কেটে নাক ঘোরাতে শুরু করলেন গাড়ির।

ভ্যান থামতে না থামতেই ঝটকা দিয়ে খুলে গেল এক পাশের দরজা। লাফিয়ে রাস্তায় নামল মিরিনা। ভয় পাচ্ছে বোঝা যায়, তবে ছাড়তেও রাজি নয়। টান দিয়ে গা থেকে খুলে ফেলল আলখেল্লা বুলফাইটারদের লাল কাপড়ের মত করে ধরল। তাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল করভেট। সোজা ওটার ডান উইন্ডশীল্ডে আলখেল্লা ছুঁড়ে মারল সে।
সামনের কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না মরগান। মোড় নিতে ব্যর্থ হলেন তিনি। অন্ধের মত রাস্তা হাতড়ে বেড়াতে গিয়ে দড়াম করে লাইটপোস্টে গুতো লাগিয়ে বসল করভেট।
পুলিশ যখন হাজির হলো, দেখল, মরগানকে ঘিরে রেখেছে সাতজন লোক। বিধ্বস্ত চেহারা হয়েছে কনভেনশন চীফের, তবে জখম হয়নি কোথাও। হাতে ধরা রয়েছে তখনও ব্যাগটা, যেটাতে রয়েছে ডাকাতির মাল।
ডাকাতির দায়ে জেলে যেতে হলো মরগানকে। তবে কনভেনশন চীফের জন্যে কনভেনশন থেমে থাকল না। চলল শেষ দিন পর্যন্ত, যতদিন চলার কথা। রবিবারে তো প্রচন্ড ভিড় হলো, সব চেয়ে বেশি ভিড়। সুমাতো কমিকের স্টল খালি, চুটিয়ে ব্যবসা করল অন্য স্টলগুলো।
বেশি ভিড় হলো ম্যাড ডিসনের দোকানের সামনে, লোক জেনে গেছে, একটা অপরাধ চক্রকে ভাঙতে সাহায্য করেছেন তিনি। বিরাট বিজ্ঞাপন হয়ে গেছে এটা তার জন্যে। বই বিক্রি করে অটোগ্রাফ দিতে দিতে হাঁপিয়ে উঠলেন তিনি, তাঁকে সাহায্য করার জন্যে বাড়তি লোক নিয়োগের পরেও।
এরই মাঝে এক ফাঁকে কতগুলো কমিক উল্টেপাল্টে দেখলেন, কেনার জন্যে। বললেন, আরও ভাল অবস্থায় পেলে ভাল হত। দুটো পাতা দুমড়ে গেছে। মলাটটায় একটু টান লাগলেই খুলে চলে আসবে। আরও যত্ন করে রাখা উচিত ছিল তোমার। কিশোরের দিকে তাকিয়ে হাসলেন তিনি।
পারতাম, হেসেই জবাব দিল কিশোর। একটা সুন্দরী মেয়ের বিপদ তো, সাহায্য করতেই হলো। এগুলোর দিকে আর নজর দিতে পারিনি।
বিশ ডলারের তাড়া বের করে নোট গুনতে শুরু করলেন ডিকসন। কয়েকটা বের করে নিয়ে টেবিলে রাখলেন। এই হলো গে কমিকের দাম, বললেন তিনি। আরও কিছু নোট বের করে সেগুলোর সঙ্গে রেখে বললেন, আর এটা হলো গিয়ে বোনাস।
তাকিয়ে রয়েছে তিন গোয়েন্দা। বিশ্বাস করতে পারছে না যেন। যা ইনভেস্ট করেছিল ওরা কমিকগুলোতে, তার অনেক গুণ বেশি ফেরত পেয়েছে। প্রায় আটশো ডলার!

টাকাগুলো পকেটে রাখতে রাখতে কিশোর বলল, মনে হয় অনেক বেশি দিয়ে ফেললেন, মিস্টার ডিকসন। চাইলে এখনও ফেরত নিতে পারেন। ব্যবসা করতে এসেছি আমরা, গলা কাটতে নয়।
কি যে বল! পনেরো মিনিটেই তুলে ফেলব ওই টাকা! হাসিতে দাঁত বেরিয়ে গেল তাঁর। আশা করছি তোমারগুলো থেকেই তুলে ফেলব। আর যদি লাভ তেমন না-ই হয়, কুছ পরোয়া নেই। ফ্যান ফানটা বিক্রি করে দিয়ে টাকা তুলব। যেটাতে জাল অটোগ্রাফ রয়েছে। ওটার জন্যে তো এখন পাগল হয়ে আছে সংগ্রাহকরা। পুলিশের কাছ থেকে ফেরত এলে আর একটা মিনিটও আটকাতে পারব না। চাই কি, বলেকয়ে হুফারের একটা আসল সইও করিয়ে নিতে পারি। তাহলে দাম আরও চড়ে যাবে।
অতটা আশা কোরো না, পাশ থেকে বলে উঠল হুফার। কখন এসে দাঁড়িয়েছে খেয়ালই করেনি তিন গোয়েন্দা কিংবা ডিকসন। অন্য কমিকে সই করে দিতে রাজি আছি, ওটাতে নয়।
হুফার, প্লীজ, অনুরোধ করলেন ডিকসন। এখন তো আর...
তার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে হুফার। মাথা নেড়ে বলল, বেশ, দিতে পারি। তবে লাভের কমিশন দিতে হবে আমাকে।
আজব লোক, এই কমিকের মানুষগুলো, ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেললেন ডিকসন। টাকা ছাড়া আর কিছু বোঝে না। খালি ব্যবসা...
মাঝখান থেকে কিশোর বলল, একমাত্র এডগার ডুফার বাদে। তাকে তো দেখছি না?
হ্যাঁ, মাথা দোলাল হুফার, এডের লোভটোড নেই। গোল্ড রুমে গেলেই পাবে তাকে। রক অ্যাসটারয়েডে ডুবে রয়েছে। প্রোজেকটরটা জায়গামত বসিয়ে ফেলা হয়েছে আবার। গিয়ে দেখগে, লোকের কি ভিড়।
লুকানোর জায়গা খুঁজে বের করেছিল বটে মরগান, রবিন বলল। সব তো ফাঁস হয়ে গেছে। তার দলের এখন কি হবে? বান্দাবাজি করে নিশ্চয় অনেক লোকের পকেট মেরেছে?
তা তো মেরেছেই, ডিকসন বললেন। ভাওতা দিয়ে অনেক লোককে ঠকিয়েছে। টাকা এনেছে অনেক কমিক বিক্রেতা আর সংগ্রাহকের কাছ থেকে। আসল ভেবে সাদা-কালো যে সব কমিক কিনেছিল ওরা, সেগুলোর কথা ভেবে এখন কপাল চাপড়াচ্ছে। ওরা তো ভেবেছিল অনেক কমে অনেক দামি জিনিস পেয়ে যাচ্ছে। এভাবে ঠকবে, কল্পনাও করতে পারেনি।
গম্ভীর হয়ে গেল হুফার। ঠকিয়েই যেত, যদি বেশি লোভ করতে গিয়ে জাল অটোগ্রাফের শয়তানিটা না করত। তবে একটা ব্যাপার ভালই হয়েছে। ধরা না

পড়লে আরও অনেক বেশি ঠকানোর ব্যবস্থা করত। রঙিন কমিক ছেপে তাতে জাল অটোগ্রাফ দিয়ে পাইকারী হারে ঠকাত মানুষকে।
ওদেরও দোষ আছে। অনেকেরই, মুসা বলল। শুনেছি, জেনেশুনেই ঠকে ওরা। কয়েকজনকে নাকি গিয়ে বলেছে মরগান, দেখুন তো সইটা জাল কি-না? ওরা দেখেছে, চিনেছেও। বলেনি। জানে, জাল হলে আসলের চেয়ে দাম বেড়ে যাবে। বেশি দাম যদি চেয়ে বসে আবার মরগান, সে জন্যে বলেছে, না আসলই। তারপর তাড়াতাড়ি তার হাতে দামটা ধরিয়ে দিয়ে কেটে পড়েছে। ভেবেছে, আহা কি লাভটাই না করলাম!
ওদের এই লোভের জন্যেই খেলাটা খেলতে পেরেছে মরগান, কিশোর বলল। অনেককেই দলে টেনেছে সে, এমন কি নীল বোরামকেও। ভুলটা করেছে হুফারকে কনভেনশনে দাওয়াত দিয়ে। অটোগ্রাফ দেয়া ফ্যান ফানটা বিক্রি করে দিয়েছে বোরাম, একথা যদি জানত মরগান তখন, তাহলে ভুলটা আর করত না।
মাথা ঝাকাল হুফার। হ্যাঁ, তাহলে বুঝে যেত, ওই অটোগ্রাফ আমার চোখে পড়লেই সব ভেস্তে যাবে।
বইটা কেনার জন্যে দেখলে না, কি রকম পাগল হয়ে গিয়েছিল বোরাম! হাসলেন ডিকসন।
কিন্তু যেহেতু আপনি বেচলেন না, কিশোর বলল। চুরি করতে বাধ্য হলো মরগান। এভাবে এক ঢিলে দুই পাখি মারতে চেয়েছিল সে। হুফারকেও বের করে দিতে চেয়েছিল কনভেনশন থেকে। ডাকাতি হলে সবাই ভাববে, হুফারই কাজটা করেছে। মানে মানে তখন কেটে পড়বে সে, এই ছিল মরগানের ধারণা। যত ভাবে সম্ভব, হুফারকে ঠেকাতে চেয়েছিল, যাতে অটোগ্রাফটা তার চোখে না পড়ে। সে বুঝতে পেরেছিল, পড়লে তার সমস্ত জারিজুরি ফাস হয়ে যেতে পারে। লাটে উঠতে পারে অবৈধ ব্যবসা।
আমি যে এখানে আমার ধান্দায় এসেছি, এটাও জানত না সে, হুফার বলল।
ভুল আরও করেছে, বলল রবিন। ডাকাতির পর আমাদের তিনজনকে, বিশেষ করে কিশোরকে উৎসাহিত করেছিল কেসের তদন্ত করার জন্যে। কিশোর পাশা যে কি চিজ সেটা কি আর ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পেরেছিল। এ কাজ করেছে সে নিজেকে সন্দেহমুক্ত রাখতে। এবং সবচেয়ে বড় ভুলটা করেছে।
তবে ঘোলা পানি কম খাওয়ায়নি আমাদের, স্বীকার করল কিশোর। মিরিনার ব্যাগে কমিকগুলো রেখে তো মহাদ্বিধায় ফেলে দিয়েছিল আমাকে।
হেসে উঠল মুসা, কিন্তু বেচারা জানত না, দ্বিধায় পড়লে যে খেপা বাঘ হয়ে যায় কিশোর পাশা।

তোমরাও কি আর কম নাকি? এক ঘুসি খেয়েই তো পাগল হয়ে উঠলে প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে।
অনেক সময় নষ্ট করেছেন ডিকসন। ওদিকে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে তার সেলসম্যানেরা। ওদেরকে সাহায্য করতে যেতে চাইলেন তিনি। ছেলেদের বললেন, যা-ই বলো, তোমাদের মত গোয়েন্দা আমি আর দেখিনি। সাংঘাতিক ছেলে তোমরা তোমাদের সঙ্গে কাজ করতে খুব ভাল লেগেছে আমার। ইয়ে, পুরানো কমিক পেলেই চলে আসবে আমার দোকানে। দোকান তো চেনোই। কেনার মত হলে কিনে নেব। এক এক করে তাকালেন ওদের মুখের দিকে। তো, এখন যে মাপ করতে হয় আমাকে?
নিশ্চয়ই, তাড়াতাড়ি বলল কিশোর। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। কমিকগুলো কিনে নেয়ার জন্যে...
জলদি ভাগ, হেসে রসিকতা করল হুফার। নইলে আবার তোমাদের অটোগ্রাফ চেয়ে বসবে। বাপরে বাপ, এমন ব্যবসায়ী আমি আর দেখিনি!
ডিকসন আর হুফারকে গুড-বাই জানিয়ে দরজার দিকে রওনা হলো তিন গোয়েন্দা। ভিড় ঠেলে কিছুদূর এগোতেই দেখতে পেল ক্যামেরার ফ্ল্যাশারের ঝিলিক। মিরিনা জরডানের ছবি তুলছে উৎসাহী তরুণেরা।
কিশোরকে দেখেই উজ্জ্বল হলো মিরিনার মুখ। কিশোর!
উম..হাই! কোনমতে বলল কিশোর। এড়িয়েই যেতে চায়। কেস শেষ, মিরিনার ব্যাপারেও তার আগ্রহ শেষ।
কিন্তু এত সহজে তাকে রেহাই দিল না মিরিনা। এগিয়ে এল। আমাকে বিখ্যাত করে দেয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে ওরা, কিশোর। তবে আমি তো জানি, এ সবের পেছনে আসল ক্রেডিটটা কার। তোমার। নইলে বিখ্যাত হওয়া তো দূরের কথা, অপমানিত হয়ে এই হোটেল থেকে বিদেয় হতে হত আমাকে। তুমি আমাকে চুরির অপবাদ থেকে বাঁচিয়েছ, তুমি আমাকে কিডন্যাপ হওয়া থেকে রক্ষা করেছ। মরগানকে ধরার জন্যে ফাঁদটা তুমিই পেতেছ। কিশোর, কি বলব তোমাকে, তোমার মত মানুষ আমি সত্যিই দেখিনি! তুমি একটা লোক বটে!
প্রমাদ গুনল কিশোর। সবার সামনে এখন প্রেম না নিবেদন করে বসে। তাহলে ভীষণ লজ্জায় পড়তে হবে। কৌতূহলী চোখে অনেকেই তাকিয়ে রয়েছে ওর দিকে। পায়ে পায়ে এগিয়ে আসতে শুরু করেছে দুএকজন। কিশোর বলল, থ্যাংকস, মিরিনা। এখন তো আমার সময় নেই। পরে কথা বলব। তা কোথায় থাক তোমরা?
পোর্টল্যান্ডে।
চোখ মিটমিট করল কিশোর। ওরিগনের পোর্টল্যান্ড?

হ্যাঁ।
অনেক দূর…
অত দূরে যেতে হবে না তোমাকে! আরও কিছুদিন লস অ্যাঞ্জেলেসেই আদি আমরা। আর যদি মডেলিঙের কাজটা পেয়েই যাই, তাহলে তো এখানেই থাকতে হবে। দেখা করতে পারব…
ঘিরে ফেলছে ওদেরকে তরুণেরা। আর একটা মুহূর্তও এখানে নয়, ভাবছে কিশোর। বলল, পরে কথা বলব, ঠিক আছে? চলি, গুড বাই।
হলের বাইরে বেরিয়ে হাঁপ ছাড়ল গোয়েন্দাপ্রধান। বাপরে বাপ! বড়। বেঁচেছি!
তুমি যে কি কিশোর, বুঝি না, রবিন বলল। মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে গেলেই…
ওসব কথা থাক। কিশোরের দিকে হাত বাড়াল মুসা। আমার টাকাটা এখনই দিয়ে দাও। পরে ভুলে যাব।
চলো, গাড়িতে গিয়ে দেব, এলিভেটরের দিকে রওনা হলো কিশোর। এখানে বের করলে আবার কে কোনদিক দিয়ে ডাকাতি করে নেয়, ঠিক আছে।
আমাদের টাকা নিয়ে হজম করবে এতই সহজ? বুকে চাপড় দিয়ে বল মুসা, আমরা তিন গোয়েন্দা। মঙ্গল গ্রহে গিয়েও পার পাবে না ব্যাটা। ঠিক ধরে নিয়ে আসব।
তার কথায় হাসল রবিন আর কিশোর।
***

ভলিউম ১৮ – ওয়ার্নিং বেল – তিন গোয়েন্দা – রকিব হাসান – সেবা প্রকাশনী

এটা একটা পাজল হলো? ঠোঁট বাঁকাল কিশোর পাশা। দশ বছরের ছেলেও বাঁ হাতে সেরে দিতে পারে!

কিন্তু মুসার তা মনে হলো না। তার বয়েস দশ বছরের অনেক বেশি। বাঁ হাত তো দূরের কথা ডান হাতেও সে পারবে না। ড্যাগউডস ওয়াইফ অর্থাৎ ড্যাগউডের স্ত্রীর মানেই তো করতে পারছে না, যদিও ড্যাগউড নামটা পরিচিত লাগছে ওর কাছে।

ডেস্কে পা তুলে দিয়ে আরাম করে বসেছে রবিন। পেন্সিল আর ক্রসওয়ার্ড পাজলের একটা কপি নিয়ে ব্যস্ত। মুসার যতটা লাগছে তার কাছে ততটা কঠিন মনে না হলেও একেবারে সহজও লাগছে না।

হেডকোয়ার্টারে রয়েছে তিনজনে। হাতে কেস নেই। আকাশ খারাপ বলে বেরোতেও পারছে না। নইলে সাঁতার কাটতে যাওয়া যেত। তিন দিন ধরেই আবহাওয়ার ঘোষণা দিয়ে চলেছে টিভিঃ আকাশ মেঘলা থাকবে, যখন-তখন বৃষ্টি নামতে পারে, হালকা ঝড় হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে।

কিশোর বহুবার দেখেছে, বৃষ্টির সময় যখন ঘরে আটকে থাকে, তখন কেবল গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়ে, আর যেই সে বেরোল অমনি ঝুপঝুপ করে নামে।

এটা কোন ব্যাপারই না, বলে তার সামনে রাখা পুস্তিকাটা টেনে নিল। ধাঁধার আরেকটা কপি। পেছনে নির্দেশনা লেখা রয়েছে। সেটাই পড়ল, হাই স্কুলের ছাত্রদের জন্যে এই ধাঁধার ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাদের বয়েস চোদ্দ থেকে আঠারোর মধ্যে। প্রবেশ মূল্য লাগবে না। মুখ তুলে মুসার দিকে তাকাল সে। পেলে কোথায় এটা?

সুপারমার্কেটে বিলি করছিল। অনেকটা জোর করেই তিনটে কপি গছিয়ে দিল আমার হাতে। যেন জানতই, আমরা তিনজন।

তাই নাকি! ইনটারেসটিং! আবার পড়তে লাগল কিশোর, পুরস্কার; উত্তর মেকসিকোর এক র‍্যাঞ্চে দুই হপ্তার চমৎকার একটা ছুটি কাটানো। প্রধান প্রধান আকর্ষণের মধ্যে থাকবে ঘোড়ায় চড়া, লেকে মাছ ধরা, ক্যাম্পিং, মুখরোচক মেকসিকান খাবার...

খাইছে, আর পড়ো না, এখনই জিভে পানি এসে যাচ্ছে! এই কিশোর, তোমার জন্যে তো ওটা কিছু না। করে ফেল না সমাধান। আমি শিওর ফার্স্ট প্রাইজটা তুমিই পাবে।

ভুরু নাচাল রবিন। ও পারলে তো ও যাবে। আমরা যাব কি করে?

ও সমাধান করলেই আমরাও দেখে দেখে বসিয়ে নেব। হয়ে যাবে।

কি জানি! হাত ওল্টাল রবিন। সবাইকে যেতে দিলে হয়। আমার বিশ্বাস, অনেকেই পারবে।
তোমার বিশ্বাস ভুল…
হাত তুলে বাধা দিল কিশোর, খালি তর্ক!
ট্রেলারের ছাতে বড় বড় ফোঁটা পড়ার আওয়াজ হলো।
মুখ বাঁকিয়ে মুসা বলল, মেকসিকোতে নিশ্চয় এরকম পচা আবহাওয়া নয়।
পুস্তিকার দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। মুসার কথা কিংবা বৃষ্টির শব্দ ওর কানে ঢুকছে বলে মনে হলো না। পড়ল, লিখে জবাব দিলে চলবে না। টেপে রেকর্ড করে দিতে হবে। প্রথমে… থেমে গেল সে। দ্রুত চোখ বোলাল পাতার বাকি অংশটায়। তাজ্জব ব্যাপার!
কি? জানতে চাইল রবিন, এতে আবার অবাকের কি দেখলে?
পুস্তিকা ছাপাতে পয়সা লাগে, আনমনে বলল কিশোর, যেন নিজেকেই বলছে। আর মেকসিকোতে ছুটি কাটাতে যেতেও পয়সা লাগে। এরকম একটা প্রতিযোগিতার জন্যে কার এত টাকা খরচ করার ইচ্ছে হলো?
কোন ধরনের বিজ্ঞাপন হবে হয়তো, রবিন অনুমান করল। গানের কোম্পানিতে কাজ করে করে ব্যবসায়িক দিকটাই এখন বেশি নজরে পড়ে তার। আসলে ওরা চায় যাতে ধাঁধার জবাব দেয়ার জন্যে তুমি একটা টেপরেকর্ডার কিনতে বাধ্য হও। আর একটা ব্ল্যাংক ক্যাসেট।
মাথা আঁকাল কিশোর। কি জানি। তাহলে কোন্ স্টোর হতে কিনতে হবে সেটা বলল না কেন? কোন্ কোম্পানির জিনিস কিনতে হবে তা-ও বলেনি।
সুপারমার্কেটে লিফলেট বিলি করছিল যখন, মুসা বলল, হয়তো ওখানকারই কোন দোকানের হবে।
মাথা নাড়ল কিশোর। কোন কিছুই ভাল করে দেখ না তুমি। সুপারমার্কেটে ইলেক্ট্রনিকের দোকান কোথায়?
আবার পুস্তিকাটার দিকে তাকাল সে। বেড়াতে তার খারাপ লাগে না, তবে তার চেয়েও বেশি আকর্ষণ রহস্যের প্রতি। ধাঁধা পেলে তার জবাব না পাওয়া পর্যন্ত স্বস্তি নেই। কেবলই খচখচ করতে থাকল মনে, কে এত টাকা খরচ করছে? কেন?
অনেক লিফলেট হয়তো বিলি করেছে, কিশোর বলল। আর জবাব এতই সহজ অনেকেই সমাধান করে ফেলতে পারবে। সুতরাং অনেকেই মেকসিকো যাওয়ার সুযোগও পাবে। অন্তত আমরা তিনজন তো পাবই।
অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল রবিন। তার মানে তুমি এর জবাব দিচ্ছ!
কেন নয়? ভ্রূকুটি করল কিশোর। ড্রয়ার থেকে একটা টেপরেকর্ডার বের করল। একটা ব্ল্যাংক ক্যাসেট বের করে তাতে ঢোকাল। তারপর রেকর্ড করার বোতামটা

টিপে দিয়ে বলতে শুরু করল সমাধান।
ঘণ্টাখানেক পর তিনটে ক্যাসেটে তিনজনের শুদ্ধ সমাধান রেকর্ড করে নিয়ে তিনটে খামে ভরে সান্তা মনিকার ঠিকানা লিখল, যে ঠিকানায় জবাব পাঠাতে বলা হয়েছে পুস্তিকায়। এক কোণে নিজেদের নাম-ঠিকানাও লিখল।
ট্রেলারের হাতে বৃষ্টির শব্দ থেমে গেছে।
জলদি চলো, তাগাদা দিল রবিন। পোস্ট করে দিয়ে আসি, আবার বৃষ্টি নামার আগেই।

২

পরদিন আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। আবার দেখা দিল ক্যালিফোর্নিয়ার স্বাভাবিক সূর্য। পরের তিনটে হপ্তা যার যার কাজে ব্যস্ত রইল তিন গোয়েন্দা।
রবিন তার চাকরিতে বাড়তি কাজ করল। দিনে বারো ঘণ্টা করে খাটতে হলো তাকে।
মুসা বাড়ির কাজ করল কিছু কিছু। তবে বেশির ভাগ সময়ই সাঁতার কাটল আর ফারিহার সঙ্গে আড্ডা মেরে বেড়াল। সেই সাথে চলল কারাতের প্র্যাকটিস।
আর কিশোর রইল স্যালভিজ ইয়ার্ডের কাজে ব্যস্ত। দিনে দশ-বারো ঘণ্টা খাটুনি। একদিন বিকেলে ওয়ার্কশপে একটা নতুন ধরনের সিকিউরিটি ডিভাইস নিয়ে কাজ করছে সে, একটা তালা, ভয়েস অপারেটেড, সাঙ্কেতিক কথা বললে খুলবে।
মুসাও আছে ইয়ার্ডে। ওয়ার্কশপের বাইরে ওর গাড়ি মেরামত করছে।
হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল কিশোর, কুকুর হইতে সাবধান!
চমকে গেল মুসা। কি বললে?
কিছু না। বললাম, কুকুর হইতে সাবধান।
তালা খোলার কোডওয়ার্ড এটা। কিন্তু মুসা বুঝতে পারল না। কি যে বলো বলো! এখানে কুকুর দেখলে কোথায়?
জবাব দিতে যাচ্ছিল কিশোর, এই সময় টেলিফোন বাজল। ফিরেও তাকাল না। জানে, রবিন রয়েছে হেডকোয়ার্টারের ভেতরে। আরেকটা এক্সটেনশন সেট রয়েছে এখানে। রক কনসার্টের জন্যে লিফলেট তৈরি করছে রবিন। হতে পারে তার কোন বান্ধবী ফোন করেছে, কিংবা পরিচিত অন্য কেউ।
কয়েকবার বেজেই থেমে গেল রিঙ। মুসা আবার কাজে মন দিল।
খানিক পরেই বেরিয়ে এল রবিন। কিশোর, মেরিচাচী ফোন করেছেন।
আমার সঙ্গে কথা বলতে চায়? কিছুটা অবাকই হলো কিশোর। আবার কাজ নয় তো? ইদানীং মেরিচাচীও কিশোরের বিশেষ ব্যবস্থায় যোগ দিতে আরম্ভ করেছেন। বুঝে গেছেন, অহেতুক অফিস থেকে বেরিয়ে কষ্ট করে হেঁটে না এসে ফোন

করলেই হয়ে যায়। হেঁটে আসার আরেকটা কারণ অবশ্য ছিল, পয়সা বাঁচানো। বকেটকে ঠিক করেছে কিশোর। আবার কোন কাজ দেবে নাকি?
কে জানি এসেছে, তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়।
কে?
মিস্টার ডজ, হাসল রবিন। ওই ধাঁধা প্রতিযোগিতা যেটায় দিয়েছিলে তার ব্যাপারে কিছু বলবে।
তাই? কৌতূহলী হলো গোয়েন্দাপ্রধান। প্রতিযোগিতার কথা ভোলেনি। তবে কাজ নিয়ে এতই ব্যস্ত ছিল, ও ব্যাপারে খোঁজ নিতে পারেনি আর। এখন সুযোগ এসেছে। হয়তো জানতে পারবে এত টাকা খরচ করে মেকসিকোতে পাঠাতে কার এমন দায় পড়েছে।
ওরা ঠিক করল, তিনজনেই যাবে মিস্টার ডজের সঙ্গে দেখা করতে। বাড়ির দিকে রওনা হয়েছে, এই সময় বারান্দায় বেরিয়ে এলেন একজন মানুষ। লম্বা, ছিপছিপে। পরনে জিনস, মাথায় একটা দামি স্টেটসন হ্যাট সামান্য কাত করে বসানো।
তিন গোয়েন্দাকে এগোতে দেখে হাত তুলে নাড়লেন। হাই, আমি ডজ মরিস। ওরা কাছে গেলে একে একে তাকালেন সবার মুখের দিকে। তারপর বললেন, কার কি নাম? না না, রাখ, দেখি আমিই আন্দাজ করতে পারি কিনা? মুসার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। দেখি, কণ্ঠস্বর শোনাও তো তোমার?
আমি মেকসিকো যাব! বলল মুসা। কি জানি কেন ডজকে পছন্দ করতে পারছে না। পিজা খাব!
রবিনের দিকে তাকালেন ডজ। তোমার?
আমার যেতে বড়ই অসুবিধে। অফিসে অনেক কাজ।
মাথা ঝাঁকালেন ডজ। জোর করেই যেন হাসলেন। তারপর তাকালেন কিশোরের দিকে।
কিশোরও তাকিয়ে রয়েছে তার দিকে। লোকটার ব্যাপারে তার প্রথম ধারণাঃ একটু যেন অস্বাভাবিক। হাসি, ভাবভঙ্গি সবই কেমন যেন মেকি মেকি।
এবার তোমার গলা শোনাও? কিশোরকে বললেন ডজ।
মেকসিকো যেতে চাই, কিশোর বলল।
চকচক করে উঠল ডজের চোখ। উত্তেজনা ফুটল চেহারায়। এগিয়ে এসে হাত মেলালেন কিশোরের সঙ্গে।
ডজ বললেন, ধাঁধা প্রতিযোগিতায় তুমিই জিতেছ। আমার র‍্যাঞ্চেও যেতে পারবে তুমি।

কিশোর ভাবছে মেকসিকান র‍্যাঞ্চে যাওয়ার জন্যে অস্থির হয়ে আছে একথাটা সহজে বুঝতে দেয়া চলবে না লোকটাকে। তার আগে কিছু প্রশ্নের জবাব জানা সরকার। বলল সেকথা।
কি জানতে চাও? বলে ফেল।
আর কজন জিতেছে এই পুরস্কার?
শুধু তুমি। একলা।
তারমানে শুধু আমিই ঠিক জবাব দিয়েছি?
দ্বিধা করলেন ডজ। হ্যাঁ।
চিন্তিত ভঙ্গিতে লোকটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। বুঝতে পারছে। মিথ্যে কথা বলছেন ডজ। ওর মত একই জবাব পাঠিয়েছে মুসা আর রবিন। তাহলে শুধু তাকেই বিজয়ী ঘোষণা করছেন কেন তিনি?
টাকা আসছে কোত্থেকে? জানতে চাইল সে। এসবের খরচ দেবে কে?
আমি!
কেন?
বিজ্ঞাপনের জন্যে। আমার র‍্যাঞ্চের বিজ্ঞাপন। হ্যাটটা খুলে নিয়ে আবার মাথায় পরলেন ডজ। আত্মবিশ্বাসে ভরা কণ্ঠ। আমার জায়গাটাকে আমি একটা সামার ক্যাম্প বানাতে চাই, যাতে তোমাদের মত সৌখিন টুরিস্টরা গিয়ে বাস করতে পারে। আর এই প্রতিযোগিতাটা সম্পর্কে সানডে পেপারে ভাল একটা আর্টিকেল ছাপতে চাই।
এতক্ষণে বিশ্বাস করার মত একটা যুক্তি শুনল কিশোর। তবে পুরোপুরি নয়।
আরেকটা প্রশ্ন করতে যাবে, এই সময় নীল রঙের একটা শেভ্রলে গাড়ি দেখল ইয়ার্ডের গেটে। কিশোর মনে করল ঢুকবে, কিন্তু ঢুকল না ওটা। মুহূর্তের জন্যে গতি কমিয়েই আবার বাড়িয়ে চলে গেল। উইন্ডশিল্ডে রোদ পড়েছিল বলে ড্রাইভারকে ভালমত দেখতে পায়নি সে। মনে হলো, একজন মহিলা। সোনালি চুল, চোখে কালো কাচের চশমা। গত দশ-পনেরো দিনে ওই গাড়িটাকে আরও কয়েকবার দেখেছে সে।
আবার ডজের দিকে ফিরল সে। ঠিক আছে, আপনার পুরস্কার আমি গ্রহণ করলাম। কিন্তু একটা কথা। আমার এই দুই বন্ধুকে সাথে নিতে পারব?
ভ্রূকুটি করলেন ডজ। তার মানে ওদের খরচও আমাকে দিতে বলছ?
বলছি, দৃঢ়কণ্ঠে বলল কিশোর।
মাথা থেকে হ্যাটটা খুলে নিয়ে চিন্তিত ভঙ্গিতে কানা মোচড়াতে শুরু করলেন ডজ। পায়ের ওপর শরীরের ভার বদল করলেন। তাকিয়ে রয়েছেন জুতোর দিকে। তারপর মুখ তুলে হাসলেন। বেশ, যাবে ওরাও।

খটকা লাগল কিশোরের। এত সহজে রাজি হয়ে গেলেন ভদ্রলোক! যেন তৈরি হয়েই এসেছেন, কিশোরকে নিতে হলে তার দুই সহকারীকেও নিতে হবে। মুসার কথা মনে পড়লঃ অনেকটা জোর করেই তিনটে কপি গছিয়ে দিল আমার হাতে! ব্যাপার কি!

দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার একটা ম্যাপ দিলেন ওদেরকে ডজ। তার র‍্যাঞ্চের কাছাকাছি শহর লারেটোতে কি করে যেতে হবে বলে দিলেন। ছশো ডলার কিশোরের হাতে দিলেন, ওদের রাহা খরচের জন্যে। নিজের ফোন নম্বর দিলেন যাতে সীমান্ত পার হয়েই তাকে ফোন করে জানাতে পারে। ওদেরকে তখন লারেটো থেকে তুলে নিতে পারবেন।

গাড়িতে গিয়ে উঠলেন ডজ। মেকসিকোর নম্বর প্লেট লাগানো। গাড়িটা চেনা চেনা লাগল মুসার। আগেও যেন কয়েকবার দেখেছে। কোথায়? মনে পড়ে গেল। সুপারমার্কেটে একবার। আর একবার দেখেছে ইয়ার্ডের গেটে। সেকথা বলল কিশোরকে।

পরদিন সকালে অন্যান্য দিনের মতই ইয়ার্ডের ডাকবাক্স খুলল কিশোর। চিঠিপত্র কি এসেছে বের করতে গিয়ে দেখল একটা ম্যানিলা খামও রয়েছে। ভেতরে শক্ত চারকোণা একটা জিনিস। ঠিকানায় তার নাম লেখা। ডাক টিকেট নেই। তার মানে ডাকে আসেনি খামটা, কেউ এসে ঢুকিয়ে রেখে গেছে।

হেডকোয়ার্টারে এনে খামটা খুলল সে। একটা ক্যাসেট। আর কিছু নেই। লেবেলে এমন কিছুই লেখা নেই যা দিয়ে বোঝা যায় কি রেকর্ড করা রয়েছে টেপে।

একটা টেপ রেকর্ডারে ভরে বোতাম টিপল সে। নীরবে ঘুরতে লাগল টেপ। অনেক পরে কথা বলে উঠল একটা শান্ত কণ্ঠঃ মেকসিকোতে এসো না, প্লীজ! মারাত্মক বিপদে পড়বে তাহলে! ক্যালিফোর্নিয়াতেই থাকো...

হঠাৎ করেই নীরব হয়ে গেল কণ্ঠটা।

পুরো টেপটা চালিয়ে দেখল কিশোর। আর কোন কথা নেই।

চেয়ারে হেলান দিল সে। মেসেজটা ভাবনায় ফেলে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট। তবে আরেকটা ব্যাপার খচখচ করছে ওর মনে। কণ্ঠস্বর চেনা চেনা লাগল। আগে শুনেছে। কোথায়, মনে করতে পারল না।

কয়েক মিনিট পরে মুসা এসে হাজির। ওকে টেপটার কথা বলল কিশোর। আবার চালিয়ে দিল ওটা।

কিশোরকে অবাক করে দিয়ে হাসতে লাগল মুসা। কেউ মজা করেছে তোমার সঙ্গে। রসিকতা।

রসিকতা?

হ্যাঁ। কেন, নিজের কণ্ঠস্বর চিনতে পারছ না?

নিজের কণ্ঠস্বর? অবাক হলো কিশোর।
হ্যাঁ, অবিকল তোমার নিজের কণ্ঠ। নকল করেছে কেউ। তুমি যেভাবে অন্যেরটা নকল করো। এ এক মস্ত রসিকতা।
আমার কণ্ঠ!
ইচ্ছে হলে বাজি ধরতে পারো। আমার গাড়িটা ধরতে রাজি আছি আমি।
জানালার কাছে বসেছে কিশোর। পুরানো বাসটা যেন গড়াতে গড়াতে চলেছে মেকসিকোর ভেতর দিয়ে। বাইরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে সে।
প্রথমে ভেবেছিল, মুসার গাড়িতে করেই আসবে। কিন্তু পরে বাদ দিতে হলো ইচ্ছেটা, যখন শুনল মেকসিকোতে পেট্রল পাওয়া কঠিন।
নতুন একটা টী-শার্ট পরেছে সে। তাতে বড় বড় করে স্প্যানিশে লেখা রয়েছেঃ হ্যালো, আয়্যাম ফ্রেন্ডলি। সে আশা করছে এতে লোকে তার প্রতি আগ্রহ দেখাবে, স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলবে, যে ভাষাটা মোটামুটি বুঝতে পারে সে। বলতেও পারে কিছু কিছু।
শক্ত প্রাস্টিকের সীট। শরীর বাঁকিয়ে পেছনে ঘুরে তাকাল সে। অন্য দুজন কি করছে দেখার জন্যে। মেকসিকোর ইতিহাসের ওপর একটা বই পড়ছে রবিন। ওর পাশে বসে আছে অল্প বয়েসী একটা সুন্দরী মেকসিকান মেয়ে। বার বার রবিনের দিকে তাকাচ্ছে। একা চুপচাপ বসে থাকতে থাকতে বিরক্ত হয়ে গেছে মনে হয়। সে চাইছে রবিন পড়া থামিয়ে ওর সঙ্গে কথা বলুক।
দুটো সীটের মাঝখানে ফাঁক খুব কম। মুসার লম্বা পা ঠিকমত জায়গা হয় না। কোনমতে গুটিয়ে নিয়ে বসেছে, তাতে বেশ অস্বস্তিই লাগার কথা। কিন্তু কেয়ার করছে না যেন সে। ঘুমিয়ে পড়েছে।
ওরা দুজনেও টী-শার্ট পরেছে। মাগনা পেয়েছে রবিন। রক গ্রুপকে এই শার্টই সরবরাহ করেছে ওর কোম্পানি। রবিনেরটায় লেখা দ্য সারভাইভারস ও মুসারটায় লেখা ওয়াইল্ড ওয়েস্ট।
রবিনের পেছনে বসা মাঝারি বয়সের এক মহিলা। বাসের অন্য সব মেকসিকান মহিলা যাত্রীর সঙ্গে কোন তফাৎ নেই ওর। বাদামী চামড়া। সুতীর ব্লাউজ গায়ে দিয়েছে, উলের স্কার্ট। লাল একটা শাল দিয়ে মাথা ঢেকেছে, দুই পাশ ছড়িয়ে আছে দুই কাঁধে। কালো চুলের লম্বা লম্বা দুটো বেণি। সান্তা মনিকায় বাসে ওঠার সময়ই মহিলাকে দেখেছে কিশোর। এর পর দুবার বাস বদল করতে হয়েছে। মহিলা রয়েছে ওদের সঙ্গেই।
অবশেষে বই রেখে পাশের মেয়েটার সঙ্গে কথা আরম্ভ করল রবিন। ইংরেজি জানে মেয়েটা। ফলে কথা বলা সহজ হলো। আমি স্প্যানিশ ভাল বলতে পারি না, বলল সে। এই বুয়েনাস ডায়াস-টায়াস জাতীয় দুএকটা শব্দ।

মেকসিকো কেমন লাগছে? জিজ্ঞেস করল মেয়েটা।
মনে হয় ভালই হবে। আগেও যে এখানে এসেছে, সে কথা বলল না রবিন।
এরকম মনে হওয়ার কারণ?
ইয়ে... বলতে গিয়ে থেমে গেল রবিন। ভেবে নিয়ে বলল, আমেরিকায় প্রায়ই মেকসিকান স্ট্রীট মিউজিকের সুনাম শুনি। খুবই নাকি ভাল।
শুধু মিউজিকের জন্যেই? হাসল মেয়েটা। আর কিছু না?
আরও অনেক কিছু। বলবে কিনা দ্বিধা করছে রবিন। এই যেমন, মরুভূমি। চলতে চলতে হঠাৎ থেমে যাচ্ছে বাস। লোকজন নামছে। তারপর যেন নির্জন অঞ্চলে হঠাৎ করেই গায়েব হয়ে যাচ্ছে। একেবারে নো ম্যানস ল্যান্ডের মাঝে। অবাক লাগে। এই মরুভূমির মাঝে কোথায় যায়?
যার যার খামারে। কাউকে কাউকে পাঁচ মাইল কিংবা তারও বেশি হাঁটতে হয় বাস থেকে নামার পর।
এতো! অথচ দেখে মনে হয় যেন এই মিনিট পাঁচেকের পথ হাঁটতে যাচ্ছে। হাসিমুখে নামছে বাস থেকে। দিব্যি চলে যাচ্ছে, যেন কিছুই না।
আসলে তা নয়। মরুভূমির ভেতরে হাঁটাটা সত্যিই কঠিন। তবে আমেরিকানদের মত মুখ গোমড়া করে রাখে না মেকসিকানরা। হাসিখুশি থাকতেই পছন্দ করে।
ছোট একটা শহরে ঢুকে একটা দোল দিয়ে থেমে গেল বাস। ম্যাপ দেখল কিশোর। তারপর ফিরে তাকিয়ে মুসা আর রবিনকে ইশারা করল। আবার বাস বদলাতে হবে।
মেকসিকান মেয়েটাকে গুড বাই জানিয়ে র্যাক থেকে ব্যাগ নামাল রবিন।
ব্যস্ত রাস্তার ছোট একটা কাফের সামনে বাস স্টেশন। বেরিয়েই কাফেটাতে ঢুকে পড়ল তিন গোয়েন্দা।
আমার যা খিদে পেয়েছে না! একটা টেবিলে বসতে বসতে মুসা বলল।
সে আর রবিন খাবারের তালিকা ভাল করে দেখেশুনে অর্ডার দিল বীফ বুরিটুস উইথ রাইস অ্যান্ড বীন। এই খাবারগুলো তেমন ভাল লাগে না কিশোরের। সে অর্ডার দিল দুটো চিকেন টাকোর। কিন্তু খাওয়ার পর বুঝতে পারল ভুলটা কি করেছে।
বাপরে বাপ! কাফে থেকে বেরোনোর সময় বলল কিশোর, আগুন লাগিয়ে দিয়েছে জিভে। এত্তো ঝাল! মরিচ গুলে দিয়েছে!
বাসের দিকে এগোচ্ছে, হঠাৎ তার সামনে এসে দাঁড়াল চামড়ার ছেড়া জ্যাকেট পরা এক লোক। লম্বা, ভারি শরীর, বয়েস বিশ হবে। কিশোরের বুকে ধাক্কা দিয়ে কর্কশ কণ্ঠে স্প্যানিশে বলল, যাচ্ছ কোথায়? বাসে জায়গা নেই।

অবাক হয়ে পরস্পরের দিকে তাকাল তিন গোয়েন্দা। লোকটাকে আগেই দেখেছে। তখন তো বেশ আন্তরিক মনে হয়েছিল। এখন এরকম আচরণ করছে। কেন?

কিশোর দেখতে পাচ্ছে, বাসের অর্ধেক সীটই খালি। ভদ্র ভাবে সেকথা বলল লোকটাকে।

একটুও নরম হলো না লোকটা। বরং আরও জোরে ধাক্কা লাগাল, না, হবে না। বাসে উঠতে পারবে না। চলে যাও এখান থেকে। আমেরিকায় ফিরে যাও, তিনজনেই। তোমাদেরকে এখানে চাই না আমরা।

কিন্তু আমরা যাচ্ছি না, দৃঢ় কণ্ঠে বলল কিশোর। আমি ওই বাসে উঠবই। দয়া করে সামনে থেকে সরুন।

সরা তো দূরের কথা, কিশোরের কাঁধ খামচে ধরল লোকটা। ভাল চাইলে, কেটে পড়। নইলে বিপদ হবে বলে দিলাম।

কয়েক হপ্তা ধরে জুডোর প্র্যাকটিস বেশ জোরেশোরে চালিয়েছে কিশোর। অনেক দক্ষ হয়ে উঠেছে। কিন্তু তবু মনে হলো, বিশালদেহী এই মেকসিকানটার সঙ্গে জুডো খাটিয়েও পেরে উঠবে না। সে কিছু করার আগেই এক ঘুসিতে তার দাঁত ভেঙে দেবে লোকটা। এক ঝাড়া দিয়ে দ্রুত পিছিয়ে এল কিশোর, লোকটা ঘুসি মারলেও যাতে তার মুখে লাগাতে না পারে।

চুপ করে সব দেখছিল এতক্ষণ মুসা। চট করে এখন পাশে চলে এল কিশোরের। কি, হচ্ছেটা কি? লোকটা যে ওদেরকে বাসে উঠতে দিতে চায় না একথা মুসাকে বলল কিশোর।

কেন?

কি জানি। হয়তো আমেরিকানদের পছন্দ করে না।

ও, তাই। কিন্তু আমরা যে সব বলে ঠিক করেছি। বলে দাও ওকে।

ঘুসি মেরে বসল লোকটা। লাগলে চিত হয়ে যেত মুসা। কিন্তু চোখের পলকে সরে গেল সে। পরক্ষণেই আঘাত হানল, কাঁধের সামান্য নিচে, কারাতের শুটোউচি। আরেকটা ঘুসি মারার জন্যে তৈরি হচ্ছিল লোকটা, তার আগেই অবশ হয়ে গেল তার কাঁধের কাছটা। প্যারালাইসিস হয়ে যাওয়া মানুষের মত ঝুলে পড়ল তার হাত চেপে ধরল আহত স্থান। মুসার মুখের দিকে তাকাল।

অপেক্ষা করছে মুসা। সামান্য বাঁকা করে রেখেছে পা। দুই হাত সামনে বাড়িয়ে দিয়েছে, হাতের আঙুল একদম সোজা।

অবাক হয়ে গেছে মেকসিকান লোকটা। আহত জায়গায় হাত চেপেই রেখেছে। তারপর কয়েক ডলা দিয়ে যেন সেখানে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করার চেষ্টা চালাল।

ডান হাতটা উঁচু করল মুসা। লোকটা আগে বাড়লেই কারাতের কোপ মারবে।
মাথা নাড়ল লোকটা। বিড়বিড় করে বলল, অনেক হয়েছে। ঘাড় মটকে আর মারা পড়তে চাই না! বাপরে বাপ! দশ লাখ পেসো দিলেও না!
মাথা নাড়তে নাড়তেই সরে পড়ল সে।
হেঁচকি উঠল কিশোরের। হেসে ফেলল রবিন আর মুসা। লাল হয়ে গেল কিশোরের গাল।
কী? ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল রবিন, চিকেন টাকো পেটেও আগুন লাগিয়েছে? খাও আরও।
এই চলো, তাগাদা দিল মুসা। আমাদের বাস রেডি।
বাসে উঠল তিন গোয়েন্দা। কাফেতে সেই লাল শাল পরা মহিলাকে দেখা যায়নি। বাসে উঠে দেখা গেল পেছনের সীটে বসে আছে।
পার্স থেকে কয়েকটা নোট বের করে জানালা দিয়ে বাড়িয়ে দিল। বাদামী একটা হাত দেখতে পেল তিন গোয়েন্দা। পলকের জন্যে চোখে পড়ল পুরানো চামড়ার জ্যাকেটের হাতা।
ওরা সীটে বসতে না বসতেই চলতে শুরু করল বাস।
দীর্ঘ যাত্রার এটাই শেষ পর্যায়। একসময় ঢুলতে শুরু করল তিন গোয়েন্দা। অস্বস্তিকর তন্দ্রা। সারাটা রাতই কাটল প্রায় এই অবস্থায়। জায়গায় জায়গায় পথ ভীষণ খারাপ। ঘুমানো অসম্ভব।
সকাল নটার দিকে লারেটোতে পৌঁছল বাস। গাছে ঘেরা একটা ছোট চত্বরে একসারি বেঞ্চ রাখা, ওটাই বাস স্টেশন।
সীমান্ত পার হয়েই ডজকে ফোন করেছিল কিশোর। বাস থেকে নেমে দেখল, তিনি দাঁড়িয়ে আছেন জীপ নিয়ে। ওদেরকে দেখে খুশি হয়েছেন, তবে বেশ অস্থির। অবাকই লাগল তিন গোয়েন্দার। ওরা গাড়িতে ব্যাগ তোলার সময় বারবার বলতে লাগলেন, র‍্যাঞ্চে পৌঁছতে দেরি হবে না। কিশোরের মনে হলো, ওদেরকে নয়, নিজেকেই বোঝাচ্ছেন যেন।
চত্বর থেকে বেরিয়েই পেছনে তাকাল কিশোর। আছে। একটা সাইডওয়াকের ওপর দাঁড়িয়ে জীপটার দিকেই তাকিয়ে রয়েছে লাল শাল পরা মহিলা। ওর উদ্দেশ্যে হাত নাড়ল কিশোর। তবে মহিলা তার জবাব দিল না।
তাতে কিছু মনে করল না কিশোর। এটাই বরং স্বাভাবিক। কয়েক হাজার পেসো খরচ করেছে মহিলা, সেই মেকসিকান লোকটাকে দিয়েছে ওদেরকে ঠেকানোর জন্যে। পুরো টাকাটাই জলে গেছে। ঠিকই লারেটোতে পৌঁছেছে তিন গোয়েন্দা।
র‍্যাঞ্চে পৌঁছতে দুই ঘণ্টা লাগল।

এঁকেবেঁকে, কখনও ঘুরে ঘুরে চলে গেছে পাহাড়ী পথ। পাহাড়ের ঢাল বনে ছাওয়া। সামনে, দূরে একসারি উঁচু পর্বত। ডজ জানালেন, ওটাই সিয়েরা মাদ্রে।
টেলিভিশনে দেখা পুরানো একটা সিনেমার কথা মনে পড়ল রবিনের। হেসে জিজ্ঞেস করল সে, ওই সিয়েরা মাদ্রে পর্বতেই হামফ্রে বোগার্ট আর তার সাথীরা গুপ্তধন খুঁজতে গিয়েছিল, তাই না?
রবিনের কথায় কেন যেন গম্ভীর হয়ে গেলেন ডজ। মাথা নেড়ে বললেন, দ্য ট্রেজার অভ সিয়েরা মাদ্রে শুধুই একটা ছবি। সত্যি নয়। ওই পর্বতে গুপ্তধন নেই।
চট করে পেছনের সীটে বসা মুসার দিকে তাকাল রবিন।
এর খানিক পরেই র‍্যাঞ্চে পৌঁছল ওরা। কাঠের তৈরি লম্বা, নিচু একটা বাড়ি। চারপাশের খোলা প্রান্তর ঢালু হয়ে নেমে গেছে একটা লেকের ধারে। মাঠে কয়েকটা ঘোড়া চরছে, এছাড়া জীবনের আর কোন চিহ্নই নেই কোথাও।
লেকের দিকে তাকিয়ে রয়েছে মুসা। দুই-তিন মাইল লম্বা আর আধমাইল মত চওড়া হবে লেকটা, আন্দাজ করল সে। ভাবল, মাছ ধরার চমৎকার জায়গা। সাথে করে ছিপ নিয়ে আসায় ভালই হয়েছে। লেকের অন্যপাশে আর কোন বাড়ি-ঘর নেই। কেবল গাছের জটলা। তবে গাছপালার ওপাশে পুরানো একটা বাড়ির টাওয়ার চোখে পড়ছে। গির্জা হতে পারে, কিংবা দুর্গ। হয়তো মানুষ বাস করে ওখানে।
ডজের পিছু পিছু বারান্দায় উঠল ওরা। বড় একটা ঘরে ঢুকল। ফায়ারপ্লেস আছে। আরাম করে বসার জন্যে আছে অনেকগুলো চেয়ার।
খিদে পেয়েছে নিশ্চয়? জিজ্ঞেস করলেন ডজ।
একেবারে মনের কথাটা বলে ফেলেছেন, মুসা বলল।
হাত তালি দিল ডজ। সঙ্গে সঙ্গে এসে ঢুকল একজন মেকসিকান লোক।
ওর নাম পিরেটো, ডজ জানালেন। আমার বাবুর্চি। তিন গোয়েন্দার নাম ধরে ওর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়ার কোন প্রয়োজনই বোধ করলেন না যেন।
পিরেটোর বয়স পঞ্চাশের মত। গাট্টাগোট্টা শরীর। বাদামী মুখের চামড়ায় অসংখ্য ভাঁজ, লম্বা কালো চুল। গায়ে ডেনিম শার্ট, পরনে জিনস, পায়ে কাউবয় বুট। বাবুর্চি না হয়ে র‍্যাঞ্চ হ্যান্ড বা রাখাল হলেই যেন বেশি মানাত তাকে, ভাবল কিশোর।
দ্রুত স্প্যানিশ ভাষায় লোকটাকে নির্দেশ দিতে লাগলেন ডজ। নাস্তা আর এক্ষুণি শব্দ দুটো বুঝতে পারল কিশোর।
মাথা ঝাঁকাল পিরেটো। চোখের মণি বাদামী, তবে এতটাই গাঢ়, প্রায় কালোই মনে হয়। একটা ব্যাপার লক্ষ্য করল রবিন, কথা বলার সময় ডজের দিকে সরাসরি

তাকায় না। কেমন যেন একটা এড়িয়ে চলার প্রবণতা। দুই প্রতিদ্বন্দ্বী রক গায়কের মাঝে যেমন থাকে অনেকটা তেমনি।
ভাল বাবুর্চি পিরেটো। মুসা আর কিশোর শুয়োরের মাংস খায় না, জেনে গেছে। তাই গরুর মাংস ভাজা করে আনল। সেই সঙ্গে প্রচুর ডিম আর গরম গরম রোল।
লম্বা টেবিলটার মাথায় তিন গোয়েন্দার সঙ্গে বসলেন ডজ, তবে খেলেন না কিছু। কাঁটা চামচ দিয়ে একটা রোলকে খোঁচাতে থাকলেন নার্ভাস ভঙ্গিতে। তিন গোয়েন্দার খাওয়া শেষের অপেক্ষা করছেন, যেন কিছু বলার জন্যেই। কিছু একটা ভাবিয়ে তুলেছে মনে হয় তাকে।
পেট ভরল? মুসাকে শেষ টুকরোটা মুখে পুরতে দেখে বললেন তিনি।
বোঝাই হয়ে গেছে। দারুণ লাগল।
উঠে দাঁড়ালেন ডজ। এসো তোমাদেরকে র‍্যাঞ্চটা দেখাব।
বাইরে বেরিয়ে দ্রুত একটা বেড়ার কাছে নিয়ে এলেন ওদেরকে। অনেকখানি জায়গা ঘিরে বেড়া দেয়া হয়েছে। মাঠের এক ধারে ছোট একটা কাঠের ছাউনি।
এসো, আমার বারো দেখাব। ওদের মতামতের অপেক্ষা না করেই ছাউনিটার দিকে এগিয়ে গেলেন ডজ। ওটার কাছে পৌঁছার আগেই ছাউনি থেকে বেরিয়ে এল একটা গাধা, মেকসিকানরা বলে বারো। বেরিয়েই ওদেরকে দেখে থমকে গেল, তারপর যেন লজ্জা পেয়েই ওদের কাছ থেকে সরে গেল।
মেরুদন্ডের ওপর দিয়ে কালো একটা দাগ গিয়ে কাঁধের কাছটায় ছড়িয়ে পড়েছে জানোয়ারটার। চামড়াটাকে প্রায় সাদাই বলা চলে। বড় বড় কান, লম্বা লেজের মাথায় চুলের ঘন গোছা। সামনের একপায়ে দড়ি বাঁধা। সেটা ছুটিয়ে পালানোর চেষ্টা করল।
যে-কোন পোষা জানোয়ার মুসার পছন্দ। গাধাটাকে আদর করার জন্যে এগোতে গেল সে। থামিয়ে দিলেন ডজ। ছুঁয়ো না। বয়স একেবারেই কম, বড়জোর দুবছর। পোষ মানেনি এখনও।
কয়েক গজ দূরে দাঁড়িয়ে মাটিতে পা ঠুকছে গাধাটা। এলোপাতাড়ি কয়েকবার পেছনের পা ছুঁড়ে যেন বুঝিয়ে দিতে চাইল কাছে গেলে ভাল হবে না।
অনেক বুনো গাধা আছে এখানকার পাহাড়ে, ডজ জানালেন। মাস দুই আগে আমার মাঠে ঢুকে পড়েছিল ওটা। ধরে ফেললাম। ওর নাম রেখেছি শারি। মুসার দিকে তাকালেন তিনি। নাম ধরে ডেকে দেখ। বলো, এদিকে এসো, শারি। দেখ কি করে।
ব্যাপারটা কি? ওদেরকে শিশু মনে করছেন নাকি ডজ? এমন ভাবে কথা বলছেন! তবে যেহেতু জানোয়ারটাকে ভাল লেগেছে তার, ডজের কথামত ডাক দিয়ে বলল, এখানে এসো, শারি। এসো।

লম্বা কানদুটোকে পেছন দিকে শুইয়ে ফেলল শারি। প্রায় ঘাড় ছুঁয়েছে কানের ডগা। ঘোড়ার স্বভাব জানা আছে মুসার। তা থেকেই আন্দাজ করল, সতর্ক হয়ে উঠেছে গাধাটা কিংবা রেগে গেছে। আরেকবার ডাকল নাম ধরে। কাছে তো এলই না, আরেকটু সরে গেল ওটা, দড়ি লম্বা হলে আরও সরত।
তুমি ডাকো, রবিনকে বললেন ডজ।
কি হবে ডেকে? এসব ছেলেমানুষী ভাল লাগছে না রবিনের। বললে আরও সরে যেতে চাইবে।
তা ঠিক। হাসলেন ডজ। কিশোরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি ডাকবে?
শারির আসা-যাওয়া নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই কিশোরের। এলেই বা কি, না এলেই কি? কিন্তু যে ভঙ্গিতে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছেন ডজ, কৌতূহল হল তার। বিরক্তি চেপে জোরে ডাক দিল কিশোর, এদিকে আয়, শারি।
অদ্ভুত কান্ড করল শারি। ঝটকা দিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল এদিকে। সরাসরি কিশোরের দিকে। একবার কেঁপে উঠল কানের ডগা। সামনের দিকে বাড়িয়ে দিল।
খাইছে! কান্ডটা কি হলো?
আবার! ফিসফিসিয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন ডজ। আবার ডাকো!
আগ্রহী হয়ে উঠেছে কিশোর। আবার ডাক দিল, এদিকে আয়, শারি!
দড়ি বাঁধা পা দিয়ে বাতাসে লাথি মারল শারি, দড়িটা খুলে ফেলার চেষ্টা করল। তারপর দৌড়ে এল কিশোরের দিকে। ফুটখানেক দূরে এসে দাঁড়িয়ে গেল। গলা লম্বা করে নাক দিয়ে আলতো গুতো দিল ওর বুকে।
তোমার প্রেমে পড়ে গেছে! মেয়ে, গাধা তো! হেসে কিশোরের কাঁধে চাপড় মারল রবিন। কেমন লাগছে, কিশোর? মাত্র তিনটে শব্দ ব্যবহার করলে। আর জলজ্যান্ত একটা গাধাকে পটিয়ে ফেললে।
পিছিয়ে গেল কিশোর। গাধাটার এই আচরণ অবাক করেছে ওকে। রবিনের কথায় লজ্জা পেয়েছে।
আদর করো ওকে! কিশোরের হাত চেপে ধরল ডজ, যাতে সরে যেতে না পারে। দেখ, কি করে?
প্রচন্ড কৌতূহল চাপতে পারল না কিশোর। আস্তে করে হাত বুলিয়ে দিল শারির মাথায়। ঝট করে কান সোজা করে ফেলল গাধাটা। আবার কিশোরের বুকে নাক ঘষল।
চওড়া হাসি ছড়িয়ে পড়েছে ডজের মুখে। যেন এইমাত্র বিরাট অঙ্কের একটা বাজি জিতে গেছেন, এমনি ভাবভঙ্গি। ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে

কিশোরকে অবাক করে দিয়ে বললেন, নাহ, আর কোন সন্দেহ নেই আমার! আমি এখন শিওর, ও তোমাকে পিঠে চড়তে দেবে। যাও। ওঠো। বয়েস কম হলে কি হবে, যা শক্তি আছে তোমার মত একজন মানুষকে সহজেই বইতে পারবে। সাধে কি আর বলে ভারবাহী গাধা। এমন ভঙ্গিতে কথাগুলো বললেন তিনি, যেন মস্ত এক দুশ্চিন্তা থেকে রেহাই পেয়েছেন।
দ্বিধা করছে কিশোর। গাধার পিঠে চড়ার আগ্রহ নেই। কিন্তু ডজের অতি আগ্রহ অসংখ্য প্রশ্নের ভিড় জমিয়েছে ওর মনে। কিছু একটা ব্যাপার নিশ্চয় রয়েছে এসবের পেছনে। গোয়েন্দা হিসেবে এখন তার উচিত সমস্ত সূত্র খতিয়ে দেখা।
ডান পা তুলে দিয়ে লাফিয়ে গাধার পিঠে চড়ে বসল সে। ঘাড় বাঁকা করে বড় বড় কোমল চোখ মেলে ওকে দেখার চেষ্টা করল শারি। টান টান হয়ে গেছে কান, খাড়া হয়ে আছে মাথার ওপর। সওয়ারি হিসেবে কিশোরকে নিতে মনে হয় আপত্তি নেই তার।
হ্যাঁ, এবার চলতে বলো। ফিসফিস করে শিখিয়ে দিলেন ডজ। গলায় উত্তেজনা।
হঠাৎই কথাটা মনে পড়ে গেল কিশোরের। প্রকাশ করল না সেটা। চলতে বলল গাধাটাকে।
টলমল পায়ে আগে বাড়ল ওটা। জিন, লাগাম কিছুই নেই। শারির গলা জড়িয়ে ধরে রাখতে হলো কিশোরকে, যাতে পড়ে না যায়। একটা সূত্র ধরিয়ে দিয়েছেন তাকে ডজ। মেকসিকোতে তো বটেই, আমেরিকার পশ্চিমাঞ্চলেও কাউবয়রা ঘোড়া চালানোর সময় কিছু বিকৃত শব্দ ব্যবহার করে, যেমন, চলতে বললে বলে গিডিআপ, আর থামতে বললে হুয়া। সেটাই পরখ করে দেখার ইচ্ছে হলো তার। কয়েক কদম এগোতেই বলল সে, হয়া, শারি, হয়া!
সঙ্গে সঙ্গে আদেশ পালন করল গাধাটা। থেমে গেল।
বাহ! এগিয়ে এলেন ডজ। কিশোরকে গাধার পিঠ থেকে নামতে সাহায্য করলেন। চমৎকার শিখে ফেলেছ তো তুমি। গাধাটাকেও পোষ মানিয়ে ফেলেছ।
হ্যাঁ, মুসা বলল। মানুষ, জানোয়ার সব কিছুকেই পোষ মানাতে ওস্তাদ কিশোর পাশা। ও যে কোন কাজটা পারে না, সেটাই বুঝি না মাঝে মাঝে।
মজার কান্ড করল, ডজের দিকে তাকিয়ে বলল কিশোর। ভুল করে হয়তো আমাকে অন্য কেউ ভেবেছে শারি, যার কথা সে শোনে।
তা কি করে হয়? মাথা নাড়লেন ডজ। এখানে যখন এসে ঢুকল, পুরোপুরি বুনো ছিল শারি। সারা জীবনে কেবল দুজন লোককে দেখেছে। আমাকে, আর পিরেটোকে।
কিন্তু আপনাদের দুজনের কারও মতই দেখতে নই আমি। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল গোয়েন্দাপ্রধান। জটিল কোন ভাবনা মাথায় ঢুকলেই মাঝে মাঝে এই

কাজটি করে সে। তার ধারণা এতে তার ভাবনার একাগ্রতা আসে।
আধঘণ্টা পরে যখন বিশাল ঘরটায় এসে বসল, তখনও চিমটি কাটা বন্ধ হলো না তার। রবিন আর মুসাও বসেছে ওর সঙ্গে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল সে, মাঠের ধারের ছাউনিটার দিকে। বেড়ার কাছে দাঁড়িয়ে আছে সাদা গাধাটা। এদিকেই তাকিয়ে রয়েছে জানোয়ারটাও। আস্তে করে ডাক দিচ্ছে, যেন চাইছে কিশোর গিয়ে আবার তাকে আদর করুক।
শারি! ছিপটা জোড়া লাগাতে লাগাতে আচমকা চিৎকার করে উঠল মুসা। ঠিক, মনে পড়েছে। শারি হলো গিয়ে ড্যাগউডের স্ত্রীর নাম! যে ধাঁধাটার সমাধান করেছিলে সেদিন, তাতে একটা জবাব ছিল, শারি।
তা ছিল, সায় দিয়ে বলল কিশোর। তবে শুধু শারিই নয়। আরও কিছু জবাব ছিল ওটাতে। আরও সূত্র।
আর কি সূত্র? ব্যাগ খুলতে খুলতে জিজ্ঞেস করল রবিন। কাপড় বের করে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখতে লাগল ওয়ারড্রোবের ড্রয়ারে। ওই গাধাটা কেন তোমার প্রেমে পড়ল, সেই সূত্র?
রসিকতাটা এড়িয়ে গিয়ে কিশোর বলল, গাধাটাকে বলার জন্যে আমাদেরকে যেসব শব্দ বলেছে, ক্রসওয়ার্ড পাজলের উত্তরগুলোই হলো সেসব শব্দ।
তাই? মুসার প্রশ্ন। আর কোনটা?
দেয়ালে হেলান দিয়ে চোখ মুদল কিশোর। ধীরে ধীরে বলতে লাগল, কাম। হিয়ার। গিডি আপ। উওউ। দুর্ভাগ্য কিংবা দুঃখ বোঝাতে ব্যবহার হয় এই উওউ শব্দটা। আর, হুয়া শারি, মানে হলো, থাম। শারি! এবং প্রতিটি কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে গাধাটা।
নিজের বাংকে গিয়ে বসে পড়ল রবিন। চিন্তিত ভঙ্গিতে ভ্রূকুটি করল একবার। বলল, কিশোর, তুমি কিছু একটা ভাবছ।
নীরবে রবিনের দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। জবাব দিল না।
আবার বলল রবিন, মুসাও তো ওই শব্দগুলোই ব্যবহার করেছিল। শারি তো ওর কথা শোনেনি?
জানি, রবিনের মতই অবাক হয়েছে কিশোরও। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে না। তবু বলতে হচ্ছে, ওই গাধাটার সঙ্গে কোথাও দেখা হয়েছে আমার। সে জন্যেই আমাকে চিনতে পারছে। অন্তত আমার গলা যে চিনেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।
সে রাতে পিরেটোর তৈরি প্রচুর পরিমাণে শিক কাবাব আর বনরুটি দিয়ে ডিনার সেরে সকাল সকাল শুতে গেল তিন গোয়েন্দা।
কয়েক ঘণ্টা পরেই ঘুম ভেঙে গেল কিশোরের। তার বাংকের পাশে জানালার বাইরে দেয়ালে গা ঘষার শব্দ। মাথা উচু করে জানালা দিয়ে দেখল, শারি। কাচের

ভেতর দিয়ে নাক ঢুকিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে।
নিচু গলায় ধমক দিল কিশোর। হাত মুঠো করে দেখাল। চলে যেতে বলল গাধাটাকে। কিন্তু গেল না ওটা। এখন মুসা কিংবা রবিন জেগে উঠে যদি ব্যাপারটা দেখে ফেলে, তাহলে টিটকারি দিয়ে দিয়ে তার জান জ্বালিয়ে দেবে। বিড়বিড় করে আপনমনেই গাল দিল গাধাটাকে। তারপর বিছানা থেকে নেমে পেছনের দরজার দিকে রওনা হলো। পাল্লা খোলার সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে মাথা ঢুকিয়ে দিল শারি। তার বুকে নাক ঠেকিয়ে ঠেলতে আরম্ভ করল। সরল না কিশোর। গাধার বুকে ঠেলা দিয়ে ওটাকে বাইরে রাখার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু জানোয়ারটা ছোট হলেও গায়ে ভীষণ জোর, বালির বস্তার মত গাট হয়ে রইল যেন। কিছুতেই নড়ানো গেল না। শেষে বাধ্য হয়ে নিজেই বাইরে বেরিয়ে এল। মোলায়েম গলায় ওটার নাম ধরে কথা বলতে বলতে।
চোখের পলকে ঘুরে গেল গাধাটা। চাঁদের আলোয় কিশোর দেখল, ওটার পায়ের দড়ি নেই। মুক্ত। আবার সে ঘরে ঢোকার চেষ্টা করলেই ওটাও সঙ্গে ঢুকবে। আহ, মহা জ্বালাতন! এর হাত থেকে বাঁচা যায় কিভাবে? জবাব একটাই ওটাকে মাঠে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া।
কয়েক পা এগিয়ে থমকে দাঁড়াল সে। বাড়ির একমাথার বারান্দা থেকে কথা শোনা গেছে। একজন পুরুষ, একজন মহিলা। ডজের সঙ্গে কথা না বললেও তি গোয়েন্দার সঙ্গে বেশ ভাল ব্যবহার করেছে পিরেটো, কথা বলেছে। স্প্যানিশ ভাষায় কিশোরের কাছে আমেরিকার কথা জিজ্ঞেস করেছে। লেকটার কথা বলে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে, ওটাতে যাতে সাঁতার কাটতে না যায়। পর্বত থেকে নেমে আসা পানি নাকি বরফের মত শীতল, কোন মানুষই কয়েক মিনিটের বেশি টিকতে পারবে না। শুনেই এখন পিরেটোর ভারি কণ্ঠ চিনতে পারল কিশোর। তবে বেশ দূরে। অস্পষ্ট। কি বলছে বোঝা যায় না।
মহিলা কে? জানার কৌতূহল হলো কিশোরের। পা টিপে টিপে এগোল দরজার দিকে। পাশে থেকে চলল শারি। ওটার গলায় হাত বুলিয়ে আদর করতে করতে চলল কিশোর, যাতে শব্দ না করে গাধাটা।
মহিলার কথা এখন বোঝা যাচ্ছে। আমাকে সাহায্য করতেই হবে, পিরেটো। স্প্যানিশ ভাষা। পেয়ে যাওয়ার পর কি করবে আন্দাজ করতে পারছ? ওদেরকে খুনও করে বসতে পারে ডজ!
মুখ খারাপ করে মেকসিকান ভাষায় ডজকে কয়েকটা গাল দিল পিরেটো। বেশ, বলল সে। যতটা পারি, তোমাকে সাহায্য আমি করব। এখন থেকে আমি তোমার দলে।
পিরেটোকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিল মহিলা।

দ্রুত সেখান থেকে সরে এসে বাড়ির ছায়ায় অন্ধকারে লুকিয়ে পড়ল কিশোর। হালকা পায়ের শব্দ এগিয়ে যাচ্ছে চত্বরের দিকে। মহিলা চলে যাওয়ার আগে পলকের জন্যে ওকে দেখতে পেল সে। তবে এদিকে পেছন ফিরে থাকায় মুখ দেখা গেল না। চাঁদের আলো পড়েছে সোনালি চুলে।

কিশোরের গায়ে কাঁধ ঘষছে গাধাটা। এখান থেকেই দেখা যাচ্ছে মাঠে ঢোকার গেটটা খোলা। শারিকে সেখানে নিয়ে গেল কিশোর। তারপর চট করে গেটের এপাশে চলে এসে পাল্লা লাগিয়ে হুড়কো আটকে দিল। বেড়া ডিঙিয়ে চলে এল আবার এপাশে। ওপর দিয়ে মাথাটা এপাশে ঠেলে দিয়ে কর্কশ গলায় ডাকতে শুরু করল গাধাটা। লাফিয়ে পেরোতে পারবে না ওটা, বুঝে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর।

ফিরে এল বিছানায়।

পরদিন সকালে ঘর থেকে বেরোনোর আগে সংক্ষেপে সব জানাল দুই সহকারীকে। বলল, জরুরি একটা টেলিফোন করতে হবে। ডজকে ঘণ্টা দুয়েকের জন্যে বের করে নিয়ে যেতে হবে বাড়ি থেকে এবং এই কাজটা করতে হবে রবিন আর মুসাকেই।

কাঁচা মরিচ মিশিয়ে মেকসিকান কায়দায় ডিম ভেজে দিল পিরেটো। কিশোরের খুব পছন্দ এই খাবারটা, কিন্তু পেট ব্যথা করছে, এই ছুঁতো দিয়ে খেল না।

ডজও বসেছেন ওদের সঙ্গে। তাকে জিজ্ঞেস করল মুসা, লেকে মাছ ধরতে যাওয়া যাবে কিনা। ডজ বললেন, যাবে। কিশোর বলে দিল, পেট ব্যথা নিয়ে সে যেতে পারবে না। ঘরেই থাকবে। আধ ঘণ্টা পর ঘরে রইল শুধু সে আর পিরেটো।

কি একটা কাজে সে ঘর থেকে চলে গেল পিরেটো। প্লেটে একগাদা রোল পড়ে আছে। চমৎকার সুগন্ধ। এদিক-ওদিক তাকিয়ে তাড়াতাড়ি তুলে নিয়ে মুখে পুরে চিবাতে শুরু করল সে। একেবারে খালি পেটে থাকা কঠিন। লাঞ্চের সময় হতে অনেক দেরি।

খাওয়া শেষ করে টেলিফোন সেটের সন্ধানে বেরোল সে। পাওয়া গেল লিভিং রুমের পাশে ডজের ছোট অফিসে। পেছনে পাল্লাটা লাগিয়ে দিয়ে এসে ডেস্কের সামনে বসল। ফোন বুক টেনে নিয়ে দেখতে লাগল ক্যালিফোর্নিয়ার ডাইরেক্ট নম্বর কত।

একবার রিঙ বাজতেই তুলে নিলেন ভিকটর সাইমন। বিখ্যাত সেই খোঁড়া গোয়েন্দা এবং লেখক, যার সঙ্গে অনেক কাজ করেছে ওরা।

কোথা থেকে করছে, জানাল কিশোর। তারপর বলল, আমাকে কয়েকটা তথ্য দিতে পারেন? আপনার টার্মিনাল থেকে আমার কম্পিউটার ইনফরমেশন সার্ভিসকে জিজ্ঞেস করলে পেয়ে যেতে পারেন।

করছি।
থ্যাংকস। আমার পাসওয়ার্ডে ঢুকে পড়বেন। ডিটেক্ট লিখতে হবেঃ ডি ই টি ই সি টি। তারপর মেনু উল্টে যাবেন যতক্ষণ এনসাইক্লোপিডিয়া পাওয়া না যায়।
বেশ। সাবজেক্ট কি?
বারো।
কী?
বারো নিশ্চয় চেনেন। ছোট জাতের গাধা। ভারবাহী জন্তু।
বুঝেছি।
বারো সম্পর্কে কি কি জানতে চায়, জানাল কিশোর।
লিখে নিলেন মিস্টার সাইমন। জেনে নিয়ে কিশোরকে জানাবেন বলে কেটে দিলেন লাইন।
কথা বলতে বলতেই ছোট অফিসটা চোখ বুলিয়ে নিয়েছে কিশোর। এমনিতে, অন্য কারও ঘরে হলে ঢোকার আগে অনুমতি নিয়ে নিত সে। কিন্তু এখানে ঢুকে কোন অপরাধবোধ হচ্ছে না তার। শুরু থেকেই ওদের সঙ্গে প্রচুর মিথ্যে কথা বলেছে ডজ। কাজেই সত্য জানার অধিকার রয়েছে তিন গোয়েন্দার।
অনেক প্রশ্ন ভিড় জমাচ্ছে কিশোরের মনে। কেন ক্রসওয়ার্ড পাজল প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করে ওকে এখানে আনা হলো? কেন তার প্রতি এই আগ্রহ? কেন মেকসিকান লোকটা তাকে এখানে আসতে বাধা দিতে চাইল? আর শারিই বা কি করে তাকে এভাবে চিনে ফেলল?
আকর্ষণীয় তেমন কিছু পাওয়া গেল না ডজের ড্রয়ারে, সিয়েরা মাদ্রের বড় বড় কয়েকটা ম্যাপ বাদে। ওগুলোতে পেন্সিল দিয়ে আঁকা প্রশ্নবোধকের ছড়াছড়ি। ডজই এঁকেছে হয়তো। সবচেয়ে ওপরের ড্রয়ারটাতে রয়েছে র‍্যাঞ্চের দলিলপত্র। ওগুলোতে চোখ বোলাতে লাগল সে। নিচের স্বাক্ষরটা দৃষ্টি আকর্ষণ করল তার।
পিরেটো সানচেনজো!
র‍্যাঞ্চটা তাহলে পিরেটোই ডজের কাছে বিক্রি করেছে এবং তারপরে নিজের র‍্যাঞ্চেই নিযুক্ত হয়েছে বাবুর্চি এবং রাখাল। ডজের প্রতি তার রাগের একটা ব্যাখ্যা মিলল।
একেবারে নিচের ড্রয়ারে পাওয়া গেল একটা টেপ-রেকর্ডার। ওটা বের করে ভলিয়ুম কমিয়ে প্লে করে দিল কিশোর।
সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারল নিজের গলা। বার বার শুনল নিজের কণ্ঠঃ কাম। হিয়ার। শারি। গিডি। উত্তউ। শারি। কাম। হিয়ার…
কয়েকবার শোনার পর সাবধানে ক্যাসেটটা রিউইন্ড করে ফিতেটা আবার আগের জায়গায় এনে রেকর্ডারটা ড্রয়ারে রেখে দিল সে।

কয়েক মিনিট পরে টেলিফোন বাজল। মিস্টার সাইমন করেছেন। বললেন, রেডি? হ্যাঁ, বলুন, কিশোর জবাব দিল। কাগজ কলম নিয়ে তৈরি হলো।
এক এক করে প্রশ্নের জবাব বলে গেলেন তিনি, আর প্রতিটি প্রশ্নের নিচে ফাঁকা জায়গায় লিখে নিল কিশোর। লেখা শেষ হলে ধন্যবাদ জানাল লেখককে।
সাইমন বললেন, যে কোন দরকার হোক, টেলিফোন করো। তোমার ওই গাধা, সরি, বারো তোমাকে কোথায় নিয়ে যায় জানার জন্যে আগ্রহী হয়ে রইলাম।
জানাবে, বলে আরেকবার ধন্যবাদ দিয়ে লাইন কেটে দিল কিশোর। মুসা আর রবিনের সঙ্গে এখন আলোচনায় বসতে হবে। কিন্তু ওদের ফিরতে অরও কম করে হলেও ঘণ্টাখানেক লাগবে। অফিস থেকে বেরিয়ে আবার পাল্লাটা লাগিয়ে দিল সে।
সকাল থেকেই শারিকে দেখছে না। প্রশ্নের জবাবগুলো পেয়ে যাওয়ার পর জানোয়ারটা সম্পর্কে আরও আগ্রহী হয়ে উঠেছে। গিয়ে ওটাকে দেখার সিদ্ধান্ত নিল সে।
মাঠেই পাওয়া গেল পিরেটোকে। বারোটার সঙ্গে রয়েছে। পানি ভরছে ওটার গামলায়। কিশোরকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে ছুটে এল জানোয়ারটা। আদর করে ওটার গলায় চাপড়ে দিল সে।
দুপুরের রোদ বড় কড়া। শার্ট খুলে ফেলেছে মেকসিকান লোকটা। কিশোর দেখল, ওর বুক আর পিঠও মুখের মতই একই রকমের বাদামী। বুঝতে পারছে না এটাই কি ওর আসল রঙ, না দীর্ঘদিন রোদের মধ্যে কাজ করার ফলে ওই অবস্থা হয়েছে।
গাধাটাকে দেখিয়ে কিশোর জিজ্ঞেস করল, পায়ের দড়ি খুলে নেয়া হয়েছে কেন?
কারণ তুমি যতক্ষণ আছ আর পালাবে না। অযথা বেঁধে রেখে লাভ কি?
আমি?
স্প্যানিশ ভাষায় যা বলল পিরেটো, তার মানে করলে দাঁড়ায়, ওটা তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ।
কেন, কৃতজ্ঞ কেন?
শারির ধারণা তুমি ওর প্রাণ বাঁচিয়েছ। ওরা খুব ভাল জানোয়ার। বিশ্বাসী। কৃতজ্ঞতা বড় বেশি।
বালতি তুলে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল পিরেটো। পেছনে চলল কিশোর। তার সঙ্গে গাধাটা। কিন্তু আর কোন প্রশ্নের জবাব দিতে রাজি হলো না মেকসিকান। বলে দিল তার কাজ আছে।
বেশ কয়েকটা ট্রাউট মাছ ধরে আনল মুসা আর রবিন। শিকে গেঁথে সেগুলো দিয়ে কাবাব বানিয়ে দিল পিরেটো। দুপুরের খাবার সময় হঠাৎ করেই যেন পেট

ভাল হয়ে গেল কিশোরের, বেশি খেয়ে সকালেরটা পুষিয়ে নিল।
খাওয়ার পর-পরই দুই সহকারীকে বলল, চলো, হেঁটে আসি। বেশি খেয়ে ফেলেছি, হজম করা দরকার।
রবিন আর মুসা দুজনেই বুঝল ওদের সঙ্গে কথা বলতে চায় গোয়েন্দাপ্রধান। কোন প্রশ্ন না করে ওর সাথে চলল ওরা। হাঁটতে হাঁটতে মাঠ পেরিয়ে চলে এল লেকের ধারে ছোট একটা বনের কাছে। ঢুকে পড়ল ভেতরে।
বনের ভেতরে একটুকরো খোলা জায়গা দেখে সেখানে ঘাসের ওপর বসল। মিস্টার সাইমনকে যে ফোন করেছিল সেকথা জানাল কিশোর। পকেট থেকে বের করল প্রশ্নের জবাব লেখা কাগজটা।
দেখে দেখে বলল, বারোদের শ্রবণশক্তি খুব প্রখর। তবে কুকুরের মত চালাক নয়। গন্ধ শুকে চিনতে পারে না। কণ্ঠস্বর শুনে চিনতে পারে। কাউকে পছন্দ করলে তার ভীষণ ভক্ত হয়ে যায়। কণ্ঠ শুনলে সাড়া দেয়।
তারমানে, রবিন বলল, তোমাকে যে পছন্দ করেছে শারি, সেটা সারাজীবনই এক রকম থাকবে? মুচকি হাসল সে।
রেগে গেল কিশোর। বাজে কথা বন্ধ করো তো!..হ্যাঁ, যা বলছিলাম। এই গাধাটার জন্যেই ওই ক্রসওয়ার্ড পাজলের ব্যবস্থা করেছিলেন ডজ। এমন একটা কণ্ঠস্বর খুঁজছিলেন, যেটা একটা বিশেষ মানুষের কণ্ঠের সঙ্গে মিলে যায়। হবে কোন আমেরিকান, আমাদের বয়েসী, যে গাধাটাকে ভালবাসত।
পিরেটো কি বলেছে জানিয়ে বলল সে, সেই মানুষটা বারোটার প্রাণ বাঁচিয়েছিল। সে কে জানি না। টেপে আমার কণ্ঠ শুনে বুঝতে পারলেন ডজ, সেই লোকটার কণ্ঠস্বরের সঙ্গে আমার কণ্ঠের মিল আছে। যে যে শব্দ দরকার সেগুলোই ক্রসওয়ার্ড পাজলের মাধ্যমে কায়দা করে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। টেপে আমি জবাব দিয়ে পাঠিয়েছি। শুধু সেই শব্দগুলো বাদে আর সব মুছে ফেলেছেন। সকালে তার ড্রয়ার খুলে টেপটা পেয়েছি। সেই শব্দ নিয়ে গিয়ে শুনিয়েছেন শারিকে। মনে হয় যান্ত্রিক শব্দ চিনতে পারেনি ওটা। কাজেই জ্যান্ত মানুষটারই প্রয়োজন হয়েছে। ডজের। তখন আমাকে এখানে আনার ব্যবস্থা করেছেন। আমার গলা শোনার আগে পর্যন্ত শিওর হতে পারেননি, কাজ হবে কিনা। সেজন্যেই কাল নার্ভাস হয়েছিলেন। ব্যাপারটা জানার জন্যে আর তর সইছিল না তার। নিয়ে গিয়েছিলেন আমাকে গাধাটার কাছে। তারপর যখন জানলেন, নিশ্চয় খেয়াল করেছ কি পরিমাণ উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন।
নীরবে কিশোরের কথাগুলো ভেবে দেখল মুসা আর রবিন।
হুঁ, অবশেষে মাথা দোলাল রবিন। যুক্তি আছে তোমার কথায়…

হ্যাঁ, মুসাও একমত হলো। কিন্তু এতসব ঝামেলা করতে গেলে কেন? না হয় একটা গাধার বাচ্চা তোমার স্বর চিনে সাড়াই দিল। এর জন্য এতগুলো টাকা খরচ করবেন ডজ?
মাথা নাড়ল কিশোর। এর জবাব আমারও জানা নেই। তবে একটা কথা বড় বেশি খচখচ করছে মনে।
কি? জানতে চাইল রবিন।
একটা ব্যাপার হতেই পারে, বুঝিয়ে বলল কিশোর। দুজন মানুষের কণ্ঠস্বরে মিল থাকা সম্ভব। ইয়ার্ডের ডাকবাক্সে একটা টেপ পেয়েছিলাম, মুসা, মনে আছে? ওটাতে রেকর্ড করা কণ্ঠস্বরের সঙ্গে আমার গলা মিলে যায়।
আবার নোটের দিকে তাকাল কিশোর। বারোদের দৃষ্টিশক্তিও খুব তীক্ষ্ণ। মানুষের চেয়ে অনেক বেশি। শুধু যে গলার স্বর শুনে মানুষকে চিনতে পারে, তাই নয়, চেহারা দেখেও পারে।
মাথা ঝকাল রবিন। হ্যাঁ, তার মানে... থেমে গেল সে।
অন্য দুজনও শুনতে পেল শব্দটা। দ্রুত সরে যাচ্ছে পদশব্দ, বনের গভীরে। উঠে দাঁড়াল তিন গোয়েন্দা। পিছু নিল নিঃশব্দে।
কিন্তু ওদের চেয়ে বনটা অনেক ভাল চেনে যে যাচ্ছে। একটু পরেই ওকে হারিয়ে ফেলল ওরা। আর শুনতে পেল না পায়ের শব্দ। কোন শব্দই নেই আর, পাখির ডাক ছাড়া।
ভাগাভাগি হয়ে গিয়ে পুরো এলাকাটা খুঁজে দেখবে ঠিক করল ওরা।
সেই মতই কাজ করল। খুঁজতে খুঁজতে সবার আগে খোলা জায়গাটায় ফিরে এল কিশোর। তারপর এল মুসা। মাথা নেড়ে ইঙ্গিতে জানাল, লোকটাকে পায়নি। বসে পড়ল ঘাসের ওপর।
আরও মিনিট দশেক পর রবিন ফিরল। পকেটে হাত ঢোকানো। মুখে হাসি। এমন একটা ভঙ্গি, যেন জেনে এসেছে কিছু।
দেখেছ নাকি কাউকে? জিজ্ঞেস করল মুসা
না, জবাব দিল রবিন। একটা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে বলল, তবে এই জিনিসটা পেয়েছি।
পকেট থেকে হাত বের করল সে। আঙুলে ধরা জিনিসটা দেখাল।
দেখল কিশোর আর মুসা। তিন ইঞ্চি লম্বা একটুকরো উল। মেকসিকান শালের। রঙ লাল।
শারিকে নিয়ে ভাবনা হচ্ছে আমার, পরদিন সকালে নাস্তার টেবিলে বললেন ডজ।
ডিম ভাজা মুখে পুরে দিয়ে মুসা বলল, কি হয়েছে? মন খারাপ? মুখ গোমড়া? আকাশের তারা দেখে খালি?

টেবিলের নিচ দিয়ে ওর পায়ে লাথি মারল কিশোর।
মুসার কথা যেন কানেই যায়নি ডজের। আবার নার্ভাস লাগছে তাঁকে। খাবার প্রায় খেলেনই না। মাঠে থাকলে বিপদে পড়ে যাবে বারোটা।
সকালে ওটাকে মাঠে দেখেছে মুসা। তার মনে হয়েছে আরামেই আছে জানোয়ারটা। তাজা চেহারা। ঘাস খাচ্ছিল। চোখ চকচকে, চামড়া উজ্জ্বল, মসৃণ। ছাউনির বাইরে ছিল, কিশোরকে দেখেই ছুটে এসেছে। গাধার তুলনায় জোরেই ছোটে।
সেসব বলল না কিশোর। বলা যায় না, চুপ করে থাকলে রহস্যের আরেকটা সূত্র ধরিয়ে দিতে পারেন ডজ। নিরীহ ভঙ্গিতে বলল, শারি কি খাচ্ছে না?
ওর খুর নিয়ে ভাবনা হচ্ছে আমার। কফির কাপে চুমুক দেয়ার আগে ভ্রূকুটি করলেন ডজ। জানো হয়তো, বারোদের আদি নিবাস ছিল উত্তর আফ্রিকায়। যা শক্ত, পাথুরে মাটিতে হেঁটে আস্ত মানুষের নখের মতই ওদের খুরও দ্রুত বাড়ে। শক্ত মাটিতে ঘষা লেগে ক্ষয়ে গিয়ে স্বাভাবিক থাকে। কিন্তু এখানকার মত নরম মাটিতে থাকলে বেড়ে দ্বিগুণ হয়ে গেলেও অবাক হব না। কাপটা নামিয়ে রাখলেন তিনি। আর এ হারে বাড়তে থাকলে খোঁড়া হতে সময় লাগবে না।
ছেটে ফেলা যায় না? জানতে চাইল মুসা। একবার একজনকে ক্ষুর দিয়ে গাধার খুর চেঁচে দিতে দেখেছিল সে।
নাহ! ভুরু কুঁচকেই রেখেছেন ডজ। ওর মত একটা বুনো বারো কাছেই ঘেষতে দেবে না আমাকে। ওর পা ছোঁয়ার চেষ্টা করলেই লাথি মেরে ঘিলু বের করে দেবে আমার।
কিশোর ভাবল, শারি হয়তো তাকে পা ছুঁতে দেবে। চুপ করে রইল সে। ওর মনে হলো কিছু একটা বলতে যাচ্ছেন ডজ। শারির খুরের ব্যাপার নয়, অন্য কিছু।
মনে হচ্ছে, ডজ বললেন, শেষ পর্যন্ত ছেড়েই দিতে হবে ওকে। যেখান থেকে এসেছে সেই পর্বতেই ফিরে যাক। কিশোরের দিকে তাকাল সে। কিন্তু, গোলমালটা হলো, ও এখন যেতে চাইবে না। কারণ তুমি রয়েছ এখানে।
কিশোরের মনে হলো, বহুদিন ধরেই তো আছে শারি, তার খুরও বেড়েছে, তাহলে এতদিন ওকে ছেড়ে দেয়ার কথা ভাবেননি কেন ডজ? তবে জিজ্ঞেস করল না। আপনা-আপনিই সে কথায় যাবেন। আর ওটা একটা জরুরি সূত্র। তিন গোয়েন্দাকে রহস্য সমাধানে এগিয়ে দেবে একধাপ।
কিশোর, ওকে ছেড়ে আসতে হলে তোমাকে সঙ্গে যেতে হবে, চিন্তিত ভঙ্গিতে বললেন ডজ। আসলে, যেতে হবে আমাদের সবাইকেই। ভাবছি, পর্বতের ওদিকটায় ক্যাম্পিং করতে গেলে কেমন হয়? এক এক করে তিন গোয়েন্দার দিকে তাকালেন তিনি। কি বলো?

কিশোরের কাছে ব্যাপারটা একেবারেই হাস্যকর আর ছেলেমানুষী মনে হলো। একটা গাধাকে ছাড়তে সবাই মিলে যাওয়া! রবিনের দিকে তাকিয়ে দেখল সে-ও ওরই দিকে তাকিয়ে আছে। চোখ টিপল কিশোর।
সাথে সাথে বুঝতে পারল রবিন। তিনজনে মিলে একান্তে আলোচনা না করা পর্যন্ত ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলতে মানা করছে গোয়েন্দাপ্রধান।
ডজের দিকে তাকাল রবিন। ঠিক আছে। আমরা জানাব আপনাকে।
কখন? উদ্বিগ্ন হয়ে জানতে চাইলেন ডজ। কত তাড়াতাড়ি...
যত তাড়াতাড়ি আমরা মনস্থির করতে পারব, জবাব দিল মুসা। উঠে দরজার দিকে রওনা হলো সে। দরজার কাছে গিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, কিশোর, চলো ঘুরে আসি।
ইঙ্গিতটা বুঝতে পারলেন কিনা ডজ, কে জানে। চুপ করে রইলেন।
কিশোর আর রবিনও উঠে মুসার পেছনে চলল। বারান্দা থেকে নেমে মাঠের দিকে এগোল তিনজনে। ঘর থেকে যাতে না শোনা যায় এতটা দূরে এসে থামল।
মনে হয় আসল সময় এসে গেছে, ঘাসের ওপর বসে বলল রবিন। পর্বতে যাওয়ার অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে। কিশোর, তোমার কি মনে হয়?
আছে, মাথা কঁকাল কিশোর। আর সেটার জন্যেই আমাকে প্রয়োজন ডজের। আমার কণ্ঠ তার প্রয়োজন। যাতে শারি পালিয়ে না যায়। কোথাও আমাদেরকে নিয়ে যাবে গাধাটা। পর্বতের কোন জায়গায়, যেখান থেকে এসেছে।
কোনখান থেকে এল? দূরের উঁচু পাহাড় চূড়ার দিকে তাকিয়ে আছে মুসা। কি আছে ওখানে? স্বর্ণ?
কিংবা সিয়েরা মাদ্রের গুপ্তধন, কিছুটা ব্যঙ্গের সুরেই বলল রবিন। একটা ঘাসের ডগা ছিড়ে নিয়ে দাঁতে কাটতে লাগল। তো, কি ভাবছ, কিশোর? যাবে?
আমি তো যাবই, কিশোরের আগেই বলে উঠল মুসা। ক্যাম্পিং ওর ভীষণ ভাল লাগে। রাতে আগুনের ধারে বসে মাংস ঝলসে খাওয়া, খোলা আকাশের নিচে স্লীপিং ব্যাগের ভেতরে ঘুমানো আহ, কি মজা! তোমরা যাবে না? পথ নিশ্চয় খুব খারাপ হবে।
খারাপ মানে? রবিন বলল। খারাপের চেয়ে খারাপ। পাথর আর বালির ছড়াছড়ি। কিশোরের দিকে তাকাল। তুমি কি বলো?
বেড়াতে খারাপ লাগে না কিশোরের। যেতে কষ্ট হবে। কি আর করা। রহস্যের সমাধান করতে গেলে খাটুনি তো একটু লাগবেই। যত কষ্টই হোক, ভাবল সে, এই রহস্যের কিনারা করেই ছাড়বে।
যাব, রবিনের কথার জবাবে বলল কিশোর। চলো, ডজকে গিয়ে জানাই।

ডজের জন্যে এটা সুখবর। মুসা বলতেই চওড়া হাসি হাসলেন। তাহলে কালই রওনা হওয়া যাক, কি বলো? রাজি হলো তিন গোয়েন্দা।
হাসিমুখে বেরিয়ে গেলেন ডজ। গাড়ি নিয়ে চলে গেলেন লারেটোতে, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনার জন্যে। তিন গোয়েন্দা চলে গেল একেক জন একেক কাজে। মুসা গেল লেকে মাছ ধরতে। রবিন বারান্দায় বসল ওর মেকসিকোর ইতিহাস নিয়ে। কিশোর চলল পিরেটোর খোঁজে।
রান্নাঘরে পাওয়া গেল ওকে। একটা ওয়াকি-টকি মেরামত করছে। সব যন্ত্রপাতি খুলে ছড়িয়ে ফেলেছে, কিন্তু জোড়া লাগাতে পারছে না আর।
নাহ, আমাকে দিয়ে এসব হবে না! আনমনেই বিড়বিড় করল লোকটা। আমি রেডিওর কি বুঝি? গাধার মত খুলতে গেছি! আমি হলাম গিয়ে ঘোড়ার রাখাল। ইলেক্ট্রনিক্সের কি বুঝি?
দেখি, আমার কাছে দিন, হাত বাড়াল কিশোর। এসব মেরামত করতে পারি। কি হয়েছিল?
বোবা হয়ে গিয়েছিল। একেবারে চুপ।
ঠিক করে কি করবেন?
ওয়াকি-টকি দিয়ে কি করে? কথা বলব।
এখানে এই জিনিস আর কারও কাছে আছে নাকি? কার সঙ্গে কথা বলতে চায় পিরেটো, ভেবে অবাক হলো কিশোর। লেকের অন্য পাড়ের টাওয়ারটা ছাড়া আশপাশে আর কোন বাড়িই চোখে পড়েনি তার। র‍্যাঞ্চের কয়েক মাইলের মধ্যে নেই।
জানি না, জবাব দিল পিরেটো।
তাহলে ঠিক করতে চাইছেন কেন?
আরে! নষ্ট হলে ঠিক করব না?
তার জবাবে সন্তুষ্ট হতে পারল না কিশোর। আর প্রশ্ন না করে জিনিসটা নিয়ে বসল। গোলমালটা কোথায় খুঁজে বের করার চেষ্টা করল। মেরামত করতে সাধারণত যে ধরনের তার ব্যবহার হয়, সেটা পেল না। তাই ইলেকট্রিকের তারের ভেতরের সরু তার বের করে নিয়ে কাজ চালানোর চেষ্টা করতে লাগল।
অনেক আমেরিকানের সঙ্গেই আপনার পরিচয় আছে মনে হয়, কাজ করতে করতে বলল কিশোর। অল্প বয়েসী কজনের সঙ্গে জানাশোনা আছে?
নেই, গভীর আগ্রহে কিশোরের কাজ দেখছে পিরেটো। দারুণ হাত তো তোমার! আমেরিকার সবাই পারে নাকি?
সবাই পারে না। কেউ কেউ পারে। তথ্য জোগাড়ের জন্যে আবার প্রশ্ন করল কিশোর, অল্প বয়েসী কোন আমেরিকান এই র‍্যাঞ্চে ছিল নাকি? বেড়াতে-টেড়াতে

এসেছিল?
কবে?
তিন-চার মাসের মধ্যে? শারি যখন এল তখন?
হাত ওল্টাল পিরেটো। কত লোকই তো যায় এপথে। মাঝেসাঝে থামে।
ওদের কারও গলার স্বর কি আমার মত ছিল? মনে আছে?
চেহারার কোন ভাবান্তর হলো না মেকসিকান লোকটার। তবে তার কালো চোখজোড়া হাসছে। উত্তর আমেরিকার সমস্ত মানুষকে একরকম লাগে আমার।
আমি গলার স্বরের কথা জিজ্ঞেস করেছি। যাই হোক, আপনার কাছে একরকম লাগলেও শারির কাছে নিশ্চয় তা লাগে না।
মানুষের চেয়ে বারোর কানের ক্ষমতা অনেক বেশি।
নাহ, সুবিধে হচ্ছে না। কিশোর তথ্য জোগাড় করতে চাইছে এটা বুঝে ফেলেছে পিরেটো। কাজেই মুখ খুলছে না। চাপাচাপি করে লাভ নেই।
যন্ত্রটা মেরামত করে জোড়া লাগিয়ে ফেলল কিশোর। সুইচ অন করল। কল সাইন দিয়ে কোন সাড়া মিলল না। অনেক ভাবে অ্যান্টেনা ঘুরিয়ে দেখল, জবাব এল না। তবে ওয়াকি-টকিটা যে কাজ করছে তাতে সন্দেহ নেই। সাড়া যেহেতু মিলছে না, তার মানে আর কারও কাছে ওয়াকি-টকি নেই। কিংবা হয়তো অন করা নেই।
হয়ে গেছে, বলল সে।
তোমরা আমেরিকানরা বড় চালাক।
কিছু কিছু ব্যাপারে আমেরিকানরা চালাক বটে, তবে কিছু ব্যাপারে আবার বোকাও, ভাবল কিশোর। যাই হোক, সে শুধু আমেরিকান নয়, বাঙালীও। আগামী দিন সকালে ওই মেকসিকান লোকটার চালাকি ধরতে চাইলে ওর আগেই ঘুম থেকে উঠতে হবে তাকে।
ওয়াকি-টকিটা তুলে নিয়ে কিশোরকে ধন্যবাদ জানাল পিরেটো। তারপর কিশোরের হাতটা ধরে আন্তরিক ভঙ্গিতে ঝাঁকিয়ে দিল। সময় করে একদিন অনেক কথা বলব তোমার সঙ্গে। একদিন, যখন... ফোন বেজে ওঠায় বাধা পড়ল তার কথায়। জবাব দেয়ার জন্যে অফিসে চলে গেল। ফিরে এল মুহূর্ত পরেই। তোমার ফোন।
নিশ্চয় ভিকটর সাইমন, ভাবল কিশোর। এখানে আর কারও তাকে ফোন করার কথা নয়।
কিন্তু মিস্টার সাইমন নন। সাড়া দিল একটা মহিলা কণ্ঠ। আমেরিকান। কিশোর পাশা?
হ্যাঁ, কে বলছেন?

তা না জানলেও চলবে। বললেও চিনবে না। তোমাকে একটা জিনিস দেখানো দরকার। তোমার জন্যে খুব জরুরি।
উত্তেজিত হয়ে উঠল কিশোর। কোন কেস হঠাৎ করে নতুন মোড় নিলে এরকম হয় তার। এখানে, র‍্যাঞ্চে চলে এলেই পারেন।
না! র‍্যাঞ্চের ব্যাপারে ভীত মনে হলো মহিলাকে। ডজ মরগানের র‍্যাঞ্চে যাওয়া উচিত হবে না আমার। বিপদে পড়ে যাব।
ডজ বাড়িতে নেই। ল্যারেটোতে গেছেন।
না, তবু যেতে পারব না, ভয় কাটাতে পারছে না মেয়েটা। অন্য কেউ দেখে বলে দিতে পারে ডজকে। আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই। লেকের অন্য পাড়ে চলে এসো।
কি করে যেতে হবে বলে দিল মহিলা। র‍্যাঞ্চ ছাড়িয়ে কয়েক শো গজ গেলে লেকের পাড়ে একটা নৌকা দেখতে পাবে কিশোর। দাঁড় বেয়ে অন্য পাড়ে গিয়ে উঠে পড়বে ওপরে। বনের ভেতর দিয়ে গির্জার টাওয়ারের কাছে গেলে ছোট একটা গ্রাম দেখতে পাবে। গ্রামের প্রধান চত্বরে অপেক্ষা করবে মহিলা।
একা আসবে, বলে দিল মহিলা। কেউ যদি তোমার সঙ্গে থাকে, কিংবা আসার সময় কেউ তোমাকে দেখে ফেলেছে বলে মনে হয় আমার, লুকিয়ে পড়ব। আর আমাকে দেখতে পাবে না।
কি দেখাতে চাইছেন? জবাব নেই।
কেটে দিয়েছে লাইন।
বারান্দায় এল কিশোর। একমনে মেকসিকোর ইতিহাস পড়ছে রবিন। সাড়া পেয়ে ফিরে তাকাল।
কি?
মহিলার কথা জানাল কিশোর।
হয়তো সেই আমেরিকানের ছবি দেখাবে, আন্দাজ করল রবিন। শারি যার ভক্ত।
শ্রাগ করল কিশোর। তারও এ কথাই মনে হয়েছে। তবে সেটা শুধুই অনুমান।
আমি আসব? জিজ্ঞেস করল রবিন।
একা যেতে বলেছে, জানাল কিশোর।
হুম! তাহলে তো, আর কিছু করার নেই। যাও। লোকজন জোগাড় করে রাখতে পারে। সেক্ষেত্রে তোমার জুডো ব্যবহার করতে হবে আর কি। হাসল রবিন।
জবাব দিল না কিশোর। নেমে পড়ল বারান্দা থেকে। লেকের দিকে চলল। লেকের পাড়ে এসে মুসাকে দেখতে পেল না। কোথায় বসল?
নৌকাটা খুঁজে পেল সহজেই। কাঠের ছোট একটা ডিঙি। সীটের নিচে ঢুকিয়ে রাখা হয়েছে একটা দাঁড়। নৌকাটাকে পানিতে ঠেলে দিয়ে লাফিয়ে উঠে বসল

তাতে। দাঁড়ের আংটার মধ্যে ঢুকিয়ে দিল দাঁড়টা।
বাইতে শুরু করল সে।
যতটা সহজ হবে ভেবেছিল ততটা হলো না। নাক সোজা রাখতে হিমশিম খেতে হচ্ছে তাকে। কারণটা বুঝতে পারছে। তীরে দাঁড়িয়ে অতটা বোঝা যায় না। পানিতে স্রোতের খুব জোর।
বেশি চাপাচাপি করতে গিয়ে হঠাৎ মট করে ভেঙে গেল দাঁড়টা। একটানে স্রোত ভাসিয়ে নিয়ে গেল ভাঙা অংশটাকে। হাতের টুকরোটার দিকে বোকা হয়ে তাকিয়ে আছে কিশোর। পুরানো মনে হয়েছিল তখনই, কিন্তু পচে যে এতটা নরম হয়ে আছে কল্পনাই করতে পারেনি।
দাঁড় দিয়ে নৌকা সোজা রাখতে কষ্ট হচ্ছিল, এখন তো রাখা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। লেজ চুলকালে সেটাকে কামড়ানোর জন্যে কুকুর যেভাবে এক জায়গায় ঘুরতে থাকে তেমনি করে ঘুরতে লাগল নৌকাটা। নানা ভাবে চেষ্টা করে দেখল কিশোর। কোন কাজ হলো না। স্রোতের টানে ভেসে চলল।
স্রোতের টানে লেকের মাঝামাঝি চলে এসেছে নৌকা, দুই তীরই এখন সমান দূরত্বে। স্রোতের দয়ার ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে। ভাঙা বৈঠা দিয়ে নৌকা বাওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা চালাল কিশোর। লাভ হচ্ছে না।
সাহায্যের জন্যে চিৎকার করবে কিনা ভাবল। কিন্তু তাতেই বা কি লাভ? তার চিৎকার পিরেটো কিংবা রবিনের কানে গেলেও আরেকটা নৌকা ছাড়া ওরা এসে সাহায্য করতে পারবে না তাকে।
ছুটে চলেছে নৌকা। লেক বেয়ে গিয়ে পড়বে নদীতে।
সাঁতার ভাল জানে কিশোর। ডাইভ দিয়ে পড়ে ডুব সাঁতার দিয়ে তীরে ওঠার চেষ্টা করতে পারে। মনে পড়ল পিরেটোর হুঁশিয়ারি। পানিতে গোসল করার চেষ্টা কোরো না, কয়েক মিনিটের বেশি এই পানিতে টিকতে পারবে না কোন মানুষ। পানিতে হাত ডুবিয়ে দিয়ে বুঝতে পারল কিশোর, মিথ্যে বলেনি মেকসিকান লোকটা। বরফের মত ঠান্ডা পানি।
যতক্ষণ নৌকায় রয়েছে ততক্ষণ জমে মরার ভয় অন্তত নেই। স্রোত ভাসিয়ে নিয়ে যাবে নদীতে। কতক্ষণ লাগবে যেতে?
গাছপালার আড়ালে অদৃশ্য গ্রামটার কথা ভাবল সে। হয়তো ওখানে কারও নৌকা আছে।
আর কোন উপায় না পেয়ে শেষে বাঁচাও বাঁচাও বলে চিৎকারই শুরু করল কিশোর। স্প্যানিশ ভাষায়। কিন্তু দুপুরের এই প্রচন্ড গরমের সময় লেকের তীর নির্জন। একটা মানুষকেও চোখে পড়ল না। ঘেউ ঘেউ করে উঠল একটা কুকুর। কোন মানুষ সাড়া দিল না।

মাথা ঠান্ডা রাখার চেষ্টা করল কিশোর। বুদ্ধি একটা বের করতে হবে। নদীতে হয়তো এমন জায়গা আছে, যেখানে পানির গভীরতা কম। তাহলে হয়তো কোনমতে উঠে যেতে পারবে তীরে।
এখান থেকে বোঝা যাবে না পানি কতটা গভীর। নদীতে গেলে তার পর। মোহনা আর বেশি দূরে নেই। দেখা যাচ্ছে। কিন্তু নদীটা কোথায়?
তাই তো! কোথায়! উধাও হয়ে গেছে নাকি!
বুঝে ফেলল হঠাৎ। লেকটা সোজাসুজি নদীতে পড়েনি। কারণ লেকের সমতলে নেই নদীটা। তারমানে জলপ্রপাত হয়ে নদীতে ঝরে পড়ছে লেকের পানি। সর্বনাশ!
কিশোর!
চমকে ফিরে তাকাল কিশোর। তীরে দাঁড়িয়ে আছে মুসা। সে তাকাতেই ছিপ নাড়ল।
দাঁড় ভেঙে যাওয়ার কথা নিশ্চয় জানে না মুসা। কিন্তু বুঝতে পারছে কি ভয়ানক বিপদে পড়েছে তার বন্ধু। কিশোর দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু সে পাচ্ছে, তিরিশ ফুট নিচে রয়েছে নদী। প্রচুর পাথর আছে ওখানটায়। পাক খেয়ে খেয়ে ঘুরছে পানি। নৌকা নিয়ে ওখানে পড়লে আর বাঁচতে হবে না। পাথরে লেগে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে ডিঙি...
দৌড় দিল মুসা। লেকের পাড় ধরে প্রপাতের দিকে। যেখান থেকে ঝরে পড়ছে পানি, তার কিনারে এসে থমকে দাঁড়াল। আর বড় জোর ষাট গজ মত পেরোতে হবে কিশোরকে, তারপরেই পৌঁছে যাবে সে যেখানে রয়েছে সেখানটায়।
সুতোর রিলের ক্যাচটা রিলিজ করে দিল মুসা। ছিপটা তুলে ধরল মাথার ওপর। একটা সুযোগ পাবে সে। মাত্র একটা। দ্বিতীয়বার চেষ্টা করার সময়ই মিলবে না আর। শক্ত হয়ে দাঁড়াল সে। ডিঙিটার অপেক্ষায়।
সামনে চলে এল নৌকা। মাথার ওপর ছিপ ঘুরিয়ে বড়শি আর সীসা বাঁধা সুতোর মাথাটা যত জোরে সম্ভব ছুঁড়ে দিল লেকের পানির ওপর দিয়ে।
কিশোরের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল সীসাটা। পড়ল গিয়ে ওপাশের পানিতে। হাত বাড়িয়ে সুতোটা ধরে ফেলল সে।
টেনো না! সাবধান করল মুসা, ছিড়ে যেতে পারে! সীসাটা ধরে রাখ শুধু। সুতো ধরে পানি থেকে সীসাটা টেনে তুলে ধরে রাখল কিশোর।
খুব হুঁশিয়ার হয়ে আস্তে আস্তে সুতো গোটাতে আরম্ভ করল মুসা। এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে, এমন ভাবে, যাতে টান খুব কম পড়ে। অনেক বড় মাছ যেভাবে খেলিয়ে তোলে অনেকটা তেমনি করে। নাইলনের সুতো যথেষ্ট শক্ত, কিন্তু তারপরেও যে-কোন মুহূর্তে ছিড়ে যেতে পারে।

সুতোয় টান লাগছে, আর একটু একটু করে এদিকে ঘুরে যাচ্ছে নৌকার গলুই।
সুতো আরও কয়েক ফুট গুটিয়ে ফেলতে পারল সে।
মাঝখানের চেয়ে তীরের কাছাকাছি স্রোত অনেক কম। সেখানেই নিয়ে আসার চেষ্টা করছে মুসা।
আরও কিছুটা গোটাল। কমে আসছে নৌকা আর তার মাঝের দূরত্ব। স্রোতের টান থেকে প্রায় বেরিয়ে এসেছে নৌকাটা।
সুতো ছিড়ল নৌকাটা তীর থেকে দশ গজ দূরে থাকতে। তবে এখন আর অতটা ভয় নেই।
ভাঙা দাঁড়টা দিয়ে জোরে জোরে বাইতে শুরু করল কিশোর। কিন্তু দাঁড়ের চ্যাপ্টা মাথার বেশির ভাগটাই ভেঙে যাওয়ায় পানিতে তেমন চাপ রাখতে পারছে না ওটা।
সুতোর টানে যেমন ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগিয়েছিল নৌকা, এখনও তেমনিই এগোতে লাগল।
তারপর হঠাৎ করেই ভাঙা ডান্ডার মাথা দিয়ে মাটি নাগাল পেয়ে গেল কিশোর। লগি দিয়ে বাওয়ার মত করে বাইতে শুরু করল সে। আরেকটু এগোল নৌকা। পানি ওখানে ফুটখানেক গভীর। লাফিয়ে নেমে পড়ল সে। গলুই ধরে টেনে নৌকাটাকে টেনে নিয়ে এল কিনারে।
দৌড়ে এল মুসা। ওকে নৌকাটা ডাঙায় তুলতে সাহায্য করল।
থ্যাংকস! এছাড়া বলার মত আর কিছুই তখন খুঁজে পেল না কিশোর।
আজকে সবচেয়ে বড় মাছটা ধরলাম, হেসে বলল মুসা। পিরেটোকে বলব, তোমাকে যেন শিকে গেঁথে কাবাব বানিয়ে দেয়। লাঞ্চে খেতে পারব।
আরেকটু হলেই কবরে যাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছিল।
পায়ের শব্দ শোনা গেল। দুজনেই দেখল দৌড়ে আসছে রবিন। কিশোর ওকে রেখে চলে আসার পর পড়ায় আর মন বসাতে পারেনি। কৌতূহল চাপতে না পেরে কিশোর কি করে দেখার জন্যে চলে এসেছিল লেকের ধারে। দেখেছে, অসহায় হয়ে নৌকায় করে ভেসে চলেছে গোয়েন্দাপ্রধান। ওকে বাঁচানোর কোন বুদ্ধিই বের করতে পারেনি সে।
দারুণ, মুসা, কাছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল রবিন। একটা কাজ করেছ। হলিউডের পরিচালকরা ওরকম একটা দৃশ্যের শট নিতে পারলে বর্তে যেত।
হাসল মুসা। আমি তো ভেবেছিলাম দ্য ট্রেজার অভ দ্য সিয়েরা মাদ্রের শুটিং হবে, তুমি বানিয়ে দিলে জজ! মুশকিল হলো, এই কথাটা কিছুতেই শোনানো যাবে না মেরিচাচীকে। বাহবা নিতে গিয়ে বকা খেয়ে মরব, কেন তোমাকে একলা যেতে দিলাম এই জন্যে।

কিশোরও হাসল। এই না হলে বন্ধু! বসে পড়ে ভেজা জুতো আর মোজা টেনে টেনে খুলছে সে। পানিতে মাত্র কয়েক সেকেন্ড ছিল, তাতেই নীল হয়ে গেছে ঠান্ডায়। ভাগ্যিস সাঁতরে তীরে পৌঁছার চেষ্টা করেনি।
রিলের হাতল ঘুরিয়ে সুতোটা গুটাতে লাগল মুসা। রবিনকে বলতে লাগল কিশোর, কি ঘটেছে। মুসাও শুনছে ওর কথা। টেলিফোনে অচেনা কণ্ঠ। তারপর দাঁড় ভেঙে যাওয়া। কি যেন একটা রহস্য আছে বলে মনে হচ্ছে তার।
জিজ্ঞেস করল মুসা, স্রেফ ভেঙে গেল?
গেল। এতটাই পচা ছিল। ইচ্ছে করেই হয়তো রেখেছে ওই জিনিস। ডান্ডার মাথা পরীক্ষা করে দেখে বলল কিশোর, যাতে জোরে চাপ লাগলেই ভেঙে যায়। আমাকে খুন করতে চেয়েছে। এমন কায়দা করেছে, সবাই যাতে মনে করে ব্যাপারটা একটা দুর্ঘটনা।
রবিনের দিকে তাকাল সে। কাউকে দেখেছ লেকের পাড়ে?
নৌকার কিনারে বসেছে রবিন। মাথা ঝাকাল। দেখেছি। অন্য পাড়ে। একজন মহিলা। একপলক দেখলাম, তারপরেই হারিয়ে গেল বনের ভেতরে। মনে হচ্ছিল, তোমার ওপর নজর রেখেছিল সে। তুমি তখন প্রপাতের দিকে চলেছ।
দেখতে কেমন? জিজ্ঞেস করল মুসা। বলেই মাথা নাড়ল, না না, বলার দরকার নেই, বুঝতেই পারছি। সেই মেকসিকান মহিলা। লাল শাল পরেছিল যে।
মাথা নাড়ল রবিন। না। ও নয়। আমার কাছে একে আমেরিকান মনে হয়েছে। নীল জিনস পরনে, গায়ে হালকা রঙের শার্ট আর...
আর সোনালি চুল, বলে দিল কিশোর। অবাক হলো রবিন। অতি-মানবিক কোন ক্ষমতা আছে নাকি তোমার!
পরদিন সকালে পর্বতে যাওয়ার জন্যে তৈরি হলো তিন গোয়েন্দা।
জীপের পেছনে বেঁধে লারেটো থেকে একটা হর্স বক্স নিয়ে এসেছেন ডজ। চাকা লাগানো, চারপাশে কাঠের বেড়া দেয়া একটা ঠেলাগাড়ির মত। মাঠ থেকে একটা ঘোড়া ধরে নিয়ে এসেছে পিরেটো। ওটার পিঠে জিন বাঁধতে ওকে সাহায্য করছে মুসা। ঘোড়াটা খুব শান্ত। মুসা যখন ওটাকে টানতে টানতে নিয়ে চলল ট্রেলার হোমে তোলার জন্যে, একটুও বাধা দিল না।
ওটার সঙ্গে রইল সে, পরিচিত হওয়ার জন্যে। গলা চাপড়ে আদর করল, ডলে উলে চকচকে করে দিতে লাগল চামড়া। পিরেটো আর কিশোর এই সময় গেল শারিকে আনার জন্যে। মেকসিকান লোকটার সঙ্গে একা থাকার সুযোগ পেয়ে খুশিই হলো গোয়েন্দাপ্রধান। সাবধানী পিরেটোর কাছ থেকে কোনভাবে যদি কিছু তথ্য জোগাড় করতে পারে।

লেকের ধারে ওই যে নৌকায় উঠেছিলাম আমি, জিজ্ঞেস করল কিশোর। ওটা কি সব সময়ই ওখানে থাকে?
নৌকা তাহলে আর কোথায় রাখবে? রান্নাঘরে?
ওটা কার?
এই র‍্যাঞ্চের।
কেউ কি ব্যবহার করে?
মাঝেসাঝে।
কি কাজে?
মাছ ধরার কাজে।
ভীষণ চালাক লোকটা। এভাবে ওর কাছ থেকে তথ্য জোগাড় করতে পারবে বলে মনে হলো না কিশোরের। তবে একটা কথা জানতে হবে যে করেই হোক।
লেকের অপর পাড়ে সোনালি চুলওয়ালা যে আমেরিকান মহিলাকে দেখেছে, নিশ্চয় সে-ই ফোন করেছিল ওকে, সন্দেহ নেই। হতে পারে ওই মহিলাই পচা দাঁড়টা রেখেছিল। কিন্তু তাহলে ওই দাঁড় দিয়ে নৌকাটাকে এপাড়ে আনল কি করে? আর সে নিজেই বা ফিরে গেল কিভাবে?
ওপাড়ের গায়ে যেতে চাইলে, চেষ্টা চালিয়ে গেল কিশোর, কিভাবে যাবেন?
হেঁটে।
কিন্তু লেক তো অনেক গভীর। হাঁটা যায়?
ওদিকটায় অত গভীর নয়। নদীর উজানের দিকে দেখাল পিরেটো। তাছাড়া বড় বড় পাথর আছে, ওগুলোর ওপর দিয়েই হাঁটা যায়।
মাথা ঝাঁকাল কিশোর। জবাব এটাই হবে। ওই পাথরের ওপর দিয়েই হেঁটে পার হয়ে গেছে আমেরিকান মহিলাটা। আর রাতের বেলা বারান্দায় ওর সঙ্গেই হয়তো কথা বলেছিল পিরেটো। তারমানে ওকে চেনে সে।
গায়ে আপনার কোন বন্ধু আছে নাকি?
একজনকে চিনি। বার আর ক্যানটিনার মালিক, আমার খালাত ভাই।
কোন আমেরিকানকে চেনেন না? সোনালি চুলওয়ালা একজন মহিলা?
শারি যে মাঠে থাকে ওটার গেটের কাছে পৌঁছে গেছে ওরা। ফিরে তাকাল পিরেটো। বোকামি করছে ও। সে কথা বলেছিও ওকে। ভীষণ ভয় পেয়েছে। ভয় পেলে লোকে উল্টোপাল্টা কাজ করে বসে। তোমার যে কোন ক্ষতি হয়নি, তাতে আমি খুশি। কিন্তু…
কিশোরের কাঁধে হাত রাখল পিরেটো। পর্বতে গিয়ে সাবধানে থাকবে। সতর্ক করে দিল সে। ভয়ানক বিপদের জায়গা।
কিশোরকে দেখে উত্তেজিত হয়ে ছুটে আসছে শারি।

দরজা খুলে দেয়া হলো। কিশোরের গায়ে নাক ঘষতে লাগল জানোয়ারটা।
ওটার কানের পেছনটা চুলকে দিল কিশোর। ও-যাই করুক, চুপ করে থাক বারোটা। কিন্তু আর কাউকে কাছেই ঘেঁষতে দেয় না। পিরেটোকেও না। দূর দাঁড়িয়ে আছে সে। কিশোরকে বলল, জিন আর লাগাম ছাড়া চড়তে পারবে। কিন্তু পরানোটাই হলো মুশকিল। যতই পছন্দ করুক তোমাকে, যেই জিন পরাবে মাটিতে গড়াতে শুরু করবে, পিঠ থেকে ওটা খুলে না ফেলে আর থামবে না।
চোখ বড় বড় হয়ে গেল কিশোরের। তাই নাকি?
জীপটা রসদপত্র দিয়ে প্রায় ভরে ফেলেছেন ডজ। বীন আর চালের বস্তা, চিনি, কফি ও প্রয়োজনীয় আরও খাবার নিয়েছেন। ঘোড়ার জন্যে নিয়েছে জই। স্লীপিং ব্যাগ আর রাইফেল নিয়েছেন। মালপত্রের ফাঁকে জায়গা নেই বললেই চলে ওখানেই কোনমতে গাদাগাদি করে বসেছে মুসা আর রবিন। কিশোর বসেছে ডজের পাশে। হাতে লম্বা একটা দড়ি, এক মাথা বাঁধা রয়েছে গাধার গলায় জীপের পেছন পেছন আসছে বারোটা।
গেট থেকে বেরিয়ে এসে ফিরে তাকাল কিশোর। দাঁড়িয়ে রয়েছে পিরেটো কিশোর তাকাতে হাত তুলল। কি বোঝাতে চাইল? সাবধান করল? না গুডবাই?
ঘুরে ঘুরে উঠে গেছে পাহাড়ী পথ। চার-পাঁচ মাইলের বেশি গতি বাড়াচ্ছে না ডজ। যাতে শারির আসতে অসুবিধে না হয়।
বালি আর পাথর বিছানো রয়েছে পথ জুড়ে। এক ঘণ্টা চলার পর সরু হয় এল পথ। ঢুকে গেল পাইন বনের ভেতরে।
আরও এক ঘণ্টা পর জীপ থামালেন ডজ, ইঞ্জিন ঠান্ডা করার জন্যে। পানি পড়ার শব্দ কানে আসছে। দড়ি ছোটানোর জন্যে টানাটানি শুরু করল শারি।
মনে হয় পানি খেতে চাইছে, কিশোর বলল। আমি যাচ্ছি ওর সঙ্গে। নই পালাতে পারে।
বারোটাই ওকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এল ছোট একটা পার্বত্য নালার কাছে। টলটলে পরিষ্কার পানি। দেখার পর কিশোরেরও খেতে ইচ্ছে করল। পিপাসা অবশ্য আগেই পেয়েছে। পিরেটোর কাছে শুনেছে, সিয়েরা মাদ্রের ঝর্না থেকে পানি খেতে মানা নেই, তবে বদ্ধ জলাশয় থেকে খাওয়া একদমই উচিত নয়। হাঁটু গেড়ে বসে আঁজলা ভরে পানি তুলে খেতে শুরু করল সে। তার পাশেই মুখ নামিয়ে খাচ্ছে শারি।
পানি খাওয়া শেষ করে পাতা চিবুতে লাগল বারো। ওর জন্যে সঙ্গে করে কিছু আনা হয়নি। ঘোড়ার মত বেছে খায় না বারো, কাজেই ওগুলোর জন্যে তেমন ভাবনা নেই। ছাগলের মত যা খুশি খেতে পারে। পিরেটো একথা বলেছে, কিশোরকে। ঠিকই বলেছে। এখন তার প্রমাণ পাওয়া গেল।

মিনিট কয়েক ঘাস আর লতাপাতা খেল শারি। এই সময় শোনা গেল ডজের ডাক। অধৈর্য হয়ে উঠেছেন। বারোটাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে টানতে লাগ কিশোর। চেঁচিয়ে বলল, আয়, আয়, দেরি হয়ে গেল! কানেই তুলল না ওটা পেট না ভরা পর্যন্ত খেয়েই চলল।
রেগে গেলেন ডজ, কিন্তু কিছু বলারও নেই। বারোটা আসতে না চাই কিশোর কি করবে? সমস্ত রাগ যেন গিয়ে পড়ল ইঞ্জিনের ওপর। স্টার্ট দিয়ে অযথাই এক্সিলারেটর বাড়িয়ে গোঁ গোঁ করালেন কয়েক সেকেন্ড। খাবার বানিয়ে প্যাকেট করে দিয়েছিল পিরেটো। সেগুলো দিয়ে লাঞ্চ করেছে সবাই। রবিন, মুসা আর ডজ খেয়েছেন। কিশোর কেবল বাকি। তার স্যান্ডউইচগুলো নিয়ে বড় বড় কামড় দিয়ে খেতে শুরু করল। জীপ ততক্ষণে চলতে আরম্ভ করেছে। একহাতে গাধার দড়ি ধরে রেখে আরেক হাতে খাচ্ছে কিশোর।
আরও ঘণ্টা তিনেক চলার পর বালিতে ঢাকা সরু পথও অদৃশ্য হয়ে গেল।
এখানে জীপ রেখে যেতে হবে আমাদের, ডজ বললেন।
মালপত্র নামাতে লাগল ওরা। বাক্স থেকে ঘোড়াটাকে নামিয়ে আনল মুসা। হর্সবক্স সহ জীপটাকে পাইন বনের ভেতরে নিয়ে গেলেন ডজ। ডালপাতা দিয়ে ঢেকে দেয়া হলো দুটো গাড়িকেই। ভারি ভারি বোঝাগুলো তোলা হলো ঘোড়ার পিঠে। শারির কাঁধে স্লীপিং ব্যাগগুলো তুলে দিয়ে বেঁধে ফেলল কিশোর।
তুমি আগে আগে যাও, কিশোরকে বললেন ডজ। বারোটাকে ঢিল দিয়ে দাও। ও যেদিকে যায় সেদিকেই যাবে। ওটাই পথ দেখাক।
চট করে বন্ধুদের দিকে তাকাল একবার কিশোর।
আবার শুরু হলো চলা। শারির পিঠে বসল কিশোর। যার যার ব্যাকপ্যাক পিঠে নিয়ে হেঁটে চলল রবিন আর মুসা। সবার পেছনে ঘোড়ায় চেপে আসছেন ডজ।
কয়েক মিনিট চলার পরেই বুঝে গেল কিশোর, গাধার পিঠে চেপে যাওয়াটা কতটা কষ্টকর। একটা মুহূর্তের জন্যে অসতর্ক হতে পারছে না।
দেখতে দেখতে গাছপালার মাথার ওপরে উঠে এল দলটা। ঢালের গায়ে এখন আর গাছ নেই, বন নিচে পড়ছে ক্রমশ। খাঁড়া পাথুরে ঢালে হাঁটতে ভীষণ অসুবিধে হচ্ছে রবিন আর মুসার। বার বার পা পিছলে যাচ্ছে আলগা পাথরে।
শারির কিছুই হচ্ছে না। পিরেটো বলেছে, পাহাড়ি ছাগলের মতই পাহাড় বাইতে পারে বাবোরা। তা তো হলো, কিন্তু কিশোর তো আর ছাগল নয়, বারোও নয়, কাজেই পিঠ থেকে পড়ে যাওয়া এড়ানোর জন্যে শারির গলা জড়িয়ে ধরে রাখতে হলো ওকে। ছেড়ে দিলে গড়িয়ে পড়ে যাবে পিঠ থেকে এবং তারমানে পাহাড় থেকেও গড়িয়ে পড়া।

কষ্ট হচ্ছে কিশোরের, তবে ডজের চেয়ে কম। বারোর মত পাহাড় বাওয়ায় দক্ষ নয় ঘোড়াটা। ঠিকমত ঠিক জায়গায় পা ফেলতে পারছে না। মাঝে মাঝেই এগোতে না পেরে থেমে যাচ্ছে। পিঠ থেকে নেমে তখন এগোনোর জন্যে ওটাকে ঠেলতে হচ্ছে ডজকে। কখনও বা লাগাম ধরে টেনে কোন উঁচু পাথর পার করিয়ে আনছেন। ফলে সময় নষ্ট হচ্ছে। খানিক পরেই দেখা গেল মুসা আর রবিনের প্রায় আধ মাইল পেছনে পড়ে গেলেন তিনি।

সবার আগে রয়েছে কিশোর। আর সবাই অনেক পেছনে। ওদেরকে এগিয়ে আসার সময় দেয়ার জন্যে শারিকে থামতে বলল সে, হয়া! হুয়া!

শুনতেই পেল না যেন বারোটা।

তখন ওটার কানের কাছে চিৎকার করে বলল কিশোর, হয়া! হুয়া! থামার বিন্দুমাত্র লক্ষণ নেই বারোটার। অনেক দিন পর পাহাড়ে চড়ার সুযোগ পেয়েছে বোধহয়, এগিয়ে চলেছে মহা আনন্দে। কারও জন্যে অপেক্ষা করার প্রয়োজনই বোধ করছে না। লাগাম টেনে বোঝাতে চাইল কিশোর, ওর হুকুম মেনে চলা উচিত। পাত্তাই দিল না বারো।

তারপর কিশোর যখন হাল ছেড়ে দিয়েছে, এই সময় হঠাৎ করেই থমকে দাঁড়াল।

এতই আচমকা, আরেকটু হলেই পিঠ থেকে পড়ে যেত কিশোর। যেন ব্রেক কষে দাঁড়িয়েছে জানোয়ারটা। একটা সমতল জায়গার কিনারে এসে পৌঁছেছে। পাথরের ছড়াছড়ি, তার ফাঁকে ফাঁকে গজিয়ে উঠেছে ঘাস। ঠিক সামনেই মাথা তুলেছে একগুচ্ছ ক্যাকটাস।

কিশোর আন্দাজ করল, আবার খেতে চায় শারি। শরীরটা ঢিল করে দিয়ে লাফিয়ে নামল পিঠ থেকে। তার নিজের বিশ্রামের জন্যেও জায়গাটা চমৎকার। ক্যাকটাসের পাশে একটা চ্যাপ্টা মসৃণ পাথর দেখতে পেল। ওটার দিকে এগোতে গেল সে।

সঙ্গে সঙ্গে গলা বাড়িয়ে দিল শারি, পথ আটকাল কিশোরের। পাশ কাটিয়ে সে যখন এগোনোর চেষ্টা করল, তার শার্টের ঢোলা জায়গায় কামড়ে ধরল ওটা।

রেগেই গেল কিশোর। এই, কি হয়েছে? কি করতে চাস? ঘাস খেতে কি মানা করেছি নাকি তোকে! টেনে শার্টটা ছাড়ানোর চেষ্টা করল সে। কিন্তু ধরে রাখল শারি।

হাল ছেড়ে দিল কিশোর। বারোর সঙ্গে পারবে না। ওটা যখন কিছু করবে বলে গো ধরে, কারও সাধ্য নেই সেকাজ থেকে বিরত করে। আপাতত যেখানে রয়েছে সেখানেই থাকতে চাইছে। কিশোরকেও থাকতে বলছে। কাজেই নড়ানো সম্ভব না।

যখন ওটার ঘাড়ে চাপড় দিয়ে আদর করল কিশোর, তখন ছাড়ল শার্ট। কিন্তু পথ ছাড়ল না। যেতে দিতে চায় না কিশোরকে। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে ক্যাকটাসের জটলাটার দিকে।
এই সময় বারোটার কানের দিকে চোখ পড়ল কিশোরের।
ঘাড়ের সঙ্গে একেবারে লেপটে রয়েছে।
ঘাড়ের বড় বড় রোমগুলো লেপটে নেই, সাধারণত যেভাবে থাকে। দাঁড়িয়ে গেছে। ভয়ে কাঁপছে থিরথির করে।
স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কিশোর। চোখ ক্যাকটাসের দিকে।
হাঁচড়ে-পাচড়ে তার পাশে এসে দাঁড়াল রবিন আর মুসা।
কি হয়েছে? মুসা জিজ্ঞেস করল।
বুঝতে পারছি না। কিছু দেখে ভয় পেয়েছে শারি।
পা বাড়াতে গেল রবিন। ধরে ফেলল তাকে মুসা। বারোর ঘাড়ের রোম যে দাঁড়িয়ে গেছে সেটা সে-ও লক্ষ্য করেছে। দেখি, কি করে ও।
কিছুই করল না শারি। তাকিয়েই রয়েছে ক্যাকটাসের দিকে। পেছনে হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে এল ডজের ঘোড়া। কি হয়েছে?
শব্দটা কানে এল এই সময়। মৃদু একটা খড়খড়। ওদের কানে শব্দ পৌঁছার আগেই জেনে ফেলেছে বারোটা, সামনে মারাত্মক বিপদ।
শব্দটা আসছে ক্যাকটাসের পেছনের একটা পাথরের ওপাশ থেকে। কিসে করছে? আবার হলো শব্দ, আরও জোরাল। এবার আর খড়খড় নয়, অনেকটা মৌমাছির গুঞ্জনের মত।
ঘোড়াটার পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন ডজ। জোরে শ্বাস টানলেন একবার। হাত বাড়ালেন রাইফেলের দিকে। র্যাটল স্নেক! ক্যাকটাসের পেছনেই! ভয় দেখিয়ে খোলা জায়গায় বের করে আনতে হবে, যাতে গুলি করতে পারি।
পাথর কুড়িয়ে নিল তিন গোয়েন্দা। ছোঁড়ার জন্যে তৈরি হলো। ক্যাকটাসের দিকে রাইফেল তুলে ধরলেন ডজ।
মার! বলে উঠল মুসা। একই সঙ্গে পাথর ছুঁড়ল তিনজনে। থেমে গেল গুঞ্জন। তবে নীরব হলো না।
জোরাল খটাখট আওয়াজ করে ক্যাকটাসের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল সাপটা। চার ফুট লম্বা। চ্যাপ্টা মাথাটা ওপরে তোলা। সাংঘাতিক দ্রুত গতি। শরীর মোচড়াতে মোচড়াতে পলক ফেলতে না ফেলতে ছুটে আসছে।
লাফিয়ে পেছনে সরে এল তিন গোয়েন্দা।
গুলি করলেন ডজ।
মনে হলো, লাগেনি। লাফিয়ে একপাশে সরে গিয়ে আবার আসতে লাগল।

তাকিয়ে রয়েছে যেন রবিন। সোজা তারই দিকে আসছে সাপটা। গোল গোল চোখ, লম্বা জিভটা দ্রুত বেরোচ্ছে আর ঢুকছে, লেজটা তুলে ধরা। লেজের ডগায় অনেকগুলো হাড় বোতামের মত একটার ওপর আরেকটা আলগা ভাবে বসানো, বাড়ি লেগে লেগে ওই অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে। সরে যেতে চাইছে, কিন্তু পা উঠছে না। সম্মোহিত করে ফেলেছে যেন তাকে সাপটা।
রাইফেলের বোল্ট টানার শব্দ হলো। রাইফেল তুললেন ডজ।
কিন্তু ট্রিগার টেপার সুযোগ পেলেন না। নলের সামনে রয়েছে শারি, ওটার গায়ে গুলি লাগতে পারে।
চ্যাপ্টা হয়ে একেবারে ঘাড়ের সঙ্গে মিশে গেছে যেন বারোর কান। ঘুরছে। সাপটা যতই এগিয়ে আসছে, চঞ্চল হয়ে উঠছে ওটা। কিন্তু রবিনের মতই যেন সম্মোহিত হয়ে গেছে।
ফনা আরও উঁচু হল সাপটার। ছোবল মারার জন্যে প্রস্তুত।
চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে গেল হঠাৎ শারি। পেছনের দুই পা তুলে লাথি চালাল।
সাপের শরীরের মাঝামাঝি জায়গায় আঘাত হানল এক পায়ের লাথি। উড়ে গিয়ে বিশ ফুট নিচে পাথরের ওপর পড়ল ওটা। একটা সেকেন্ড নিথর হয়ে পড়ে রইল, যেন মরে গেছে। রবিনও তাই ভেবেছিল। কিন্তু ওদেরকে অবাক করে দিয়ে নড়ে উঠল ওটা। পিছলে গিয়ে ঢুকে পড়ল পাথরের ফাঁকে।
স্যাডল হোলস্টারে রাইফেলটা ঢুকিয়ে রাখলেন ডজ।
কেউ কথা বলল না। সবাই চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে, ভারি নিঃশ্বাস পড়ছে। তারপর, নীরবে আবার পা বাড়াল।
সামনের দিকে এগোল না আর শারি। উপরেও উঠল না। সমতল জায়গাটাকে ঘুরে এগোল। আবার জঙ্গল চোখে পড়ল কিশোরের। তাড়াহুড়ো করে সেদিকে এগিয়ে চলল বারো-টা। মূল পথ থেকে সরে যাচ্ছে, কিন্তু থামানোর চেষ্টা করল না কিশোর। যেদিকে খুশি যাক। ডজ বলেছেন ওটাকে ওটার ইচ্ছের ওপরই ছেড়ে দিতে।
বনে ঢুকে কিছুদূর এগিয়ে থেমে গেল শারি। ওটার গলা চুলকে দিল কিশোর।
আর কিছু বলব না তোকে, বলল সে। তোর ইচ্ছে মত চলবি। বুঝে গেছি, এখানে আমার চেয়ে তোর বুদ্ধি অনেক বেশি।
মুসা আর রবিন এল। ওদের পেছনে এলেন ডজ। চারপাশে তাকিয়ে স্বীকার করতে বাধ্য হলেন, রাতে ক্যাম্প ফেলার জন্যে চমৎকার জায়গা বেছেছে বারো। প্রচুর লাকড়ি আছে, সবুজ ঘাস আছে। কাছেই একটা সুন্দর ঝর্না, কিশোরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল সেখানে।

সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে তাপমাত্রা কমে গেল। শার্টের ওপরে সোয়েটার পরে নিল তিন গোয়েন্দা। লাকড়ি জোগাড় করে চমৎকার একটা আগুনের কুন্ড বানিয়ে ফেলল মুসা। তারপর ঘোড়া থেকে মালপত্র নামাতে সাহায্য করল ডজকে।
শারির পিঠ থেকেও বোঝা নামিয়ে ফেলল কিশোর। জিন খুলে নিল। ঘাসপাতা খাওয়াল, ঝর্নার ধারে নিয়ে গেল পানি খাওয়াতে। তারপর সে আর রবিন মিলে রান্না করতে বসল। বড় একটা পাত্রে চাল আর বীন নিয়ে সিদ্ধ করে নিল।
এই জিনিস খাওয়া যায়! বিরস দৃষ্টিতে তাকাল ওগুলোর দিকে কিশোর। কিন্তু কি আর করা। বেঁচে থাকতে হলে খেতেই হবে। এই খাবারে দুজন লোক কিছুই মনে করল না। একজন ডজ, তার অভ্যাস আছে, আরেকজন মুসা, যার কোন খাবারেই অরুচি নেই।
খেতে খেতে ভাবছে কিশোর—আর কোন সন্দেহ নেই, সাংঘাতিক রহস্যময় একটা কেস পেয়ে গেছে তিন গোয়েন্দা। সমাধান করতে ভালই লাগবে। রহস্যটার কথা ভাবতে ভাবতে কোন দিক দিয়ে যে চাল আর বীন সেদ্ধ গিলে শেষ করে ফেলল সে, খেয়ালই রইল না।
খাওয়া শেষ করে জুতো খুলে ফেলল রবিন। পায়ের পাতায় হাত বোলাতে লাগল। ঢাল বেয়ে উঠতে গিয়ে ব্যথা হয়ে গেছে। ফোসকাও পড়েছে।
আর কতদূর যেতে হবে? ডজকে জিজ্ঞেস করল সে।
তীক্ষ্ণ হলো ডজের দৃষ্টি। কেন, তোমার ভাল্লাগছে না?
রবিনের দৃষ্টি আরও বেশি তীক্ষ্ণ হলো। এভাবে এগোনোর কথা কিন্তু ছিল না। ছিল, শারির খুরের ব্যবস্থা করার কথা। ওকে পাহাড়ে ছেড়ে দিয়ে যাওয়ার কথা। এমন কোথাও যেখানে ওর খুর ঠিক থাকবে। এখানে প্রচুর, পাথর আর পাহাড় আছে। জায়গাটা ভালও লাগছে মনে হয় ওর। তাহলে আর দেরি কেন?
রূঢ় কণ্ঠে কথাগুলো বলল সে। ডজের মিথ্যে বলা শুনতে শুনতে বিরক্ত হয়ে গেছে। লোকটাকে বুঝিয়ে দিতে চায় ওরা কচি থোকা নয় যে এভাবে মাথায় হাত বুলিয়ে আর অনর্গল মিথ্যে বলে বলে ধোকা দেবেন। বোঝাতে চায়, শারির খুর নিয়ে যে বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই ডজের, এটা বুঝে গেছে ওরা।
হ্যাঁ, রবিনের কথার প্রতিধ্বনি করল যেন মুসা, এটা শারির জন্যে চমৎকার জায়গা। পাহাড়ের ঢালে কিছু কিছু জায়গা তো দেখলাম লোহা ঘষার উখার চেয়েও ধার। এখানেই ছেড়ে দিচ্ছেন না কেন?
সাথে সাথে জবাব দিলেন না ডজ। কয়েকটা ডাল ছুঁড়ে দিলেন আগুনে। বারোটা নিজেই বুঝিয়ে দেবে কোথায় ওকে ছাড়তে হবে। যেখান থেকে এসেছে সেখানেই চলেছে। সেখানে পৌঁছলেই থামবে।

হোম, সুইট হোম, আনমনে বিড়বিড় করল কিশোর। বাড়ির জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে ও, একথা কেন মনে হচ্ছে আপনার?
বলা কঠিন, অধৈর্য কণ্ঠে জবাব দিলেন ডজ। কখনও কখনও বুনো বারোরা বাড়ির কাছাকাছিই থাকতে চায় সব সময়। কেন, কে জানে!
এখনও যে মিথ্যে বলছেন ডজ, বুঝতে পারছে কিশোর। রবিন আর মুসাও পারছে।
তাহলে বাড়ি থেকে অতদূরে র‍্যাঞ্চে গিয়ে উঠল কেন? ফস করে জিজ্ঞেস করে বসল মুসা।
বুনো বারোরা অনেক সময়ই দলছুট হয়ে দূরে চলে যায়। তারপর আবার একই কথা বললেন ডজ, কেন, কে জানে!
এটাও মিথ্যে কথা, ভাবছে কিশোর। দলছুট হয়ে নিছক খেয়ালের বশে র‍্যাঞ্চে গিয়ে হাজির হয়েছে বারো, কিছুতেই বিশ্বাস করে না সে। কেউ ওকে নিয়ে গিয়েছিল ওখানে। এমন কেউ, যাকে বিশ্বাস করে, পছন্দ করে শারি। সেই লোকের সঙ্গে সঙ্গেই চলে গিয়েছিল। হয়তো ওর প্রাণ বাঁচিয়েছিল ওই লোক এবং যার কণ্ঠ কিশোরের মত।
ঘাস খেতে খেতে আগুনের কাছ থেকে সরে যাচ্ছে বারো-টা। ওটার দিকে তাকিয়ে অস্বস্তি বাড়ছে ডজের। শেষে আর থাকতে না পেরে কিশোরকে বললেন, অনেক খেয়েছে। এবার বেঁধে ফেল। রাতে যেন ছুটতে না পারে। জোর করে হাসি ফোটালেন চেহারায়। নইলে আবার কি খেয়াল হয় কে জানে! র‍্যাঞ্চে ফিরে চলে যেতে পারে। বারোর কথা কিছুই বলা যায় না।
উঠে দাঁড়াল কিশোর। শারির পিঠে চড়ার সময় বুঝতে পারেনি, কতটা ধকল গেছে, এখন পারছে। এত শক্ত হয়ে গেছে পায়ের পেশী, ঠিকমত দাঁড়াতেই পারছে না। পায়ের পাতায় যেন কাঁটা বিঁধেছে, এরকম ভঙ্গিতে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে জানোয়ারটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল সে। আদর করে চাপড় দিল পিঠে। বলল, দূরে যাসনে। আমার কাছাকাছি থাকবি।
ওসব বলে লাভ হবে না, ডজ সন্তুষ্ট হতে পারছেন না। গাধা গাধাই। ওটাকে বেঁধে ফেল, গাছের সঙ্গে।
ঘুরে দাঁড়াল কিশোর। ডজের মুখোমুখি। মাথা নাড়ল। না। রাতে পিপাসা লাগতে পারে ওর। পানি খেতে যেতে পারবে না বেঁধে রাখলে।
পানি আর কত খাবে? যা খাওয়ার খেয়েছে।
রাখঢাকের সময় শেষ হয়ে এসেছে। কাজেই নমনীয় হলো না কিশোর। বেঁধে রাখতে চাইলে আপনি যান। দেখুন ছুঁতে দেয় কিনা।

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত চোখে চোখে তাকিয়ে রইল দুজনে। চলার সময় বস হয়ে যায় বারোটা, কিন্তু এখন বস্ হলো কিশোর। সেটাই বুঝিয়ে দিতে চাইল। সে যা বলবে তাই হবে।
বেশ, অবশেষে নরম হলেন ডজ। হামাগুড়ি দিয়ে গিয়ে ঢুকলেন স্লীপিং ব্যাগের ভেতরে। আমার বিশ্বাস, যতক্ষণ তুমি আছ, কাছাকাছিই থাকবে বারোটা।
কেন? কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল কিশোর, আপনার এ বিশ্বাস হলো কেন? আমার প্রতি কেন এত আকর্ষণ গাধাটার?
কুইয়েন সাবে! মেকসিকানদের ভাষায়ই বললাম। কাত হয়ে শুলেন ডজ। চোখ মুদল। মানে করে দিল কথাটার, কে জানে!
অগ্নিকুন্ডের কাছে ফিরে চলল কিশোর। যাওয়ার সময় তার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল রবিন।
স্লীপিং ব্যাগে ঢুকল কিশোর। ঘুমিয়ে পড়ল চারজনে।
অন্ধকার থাকতেই ঘুম ভেঙে গেল কিশোরের। আগুন নিভে গেছে। চোখে ঘুম। প্রথমে বুঝতে পারল না কি কারণে ঘুমটা ভাঙল। তারপর শুনতে পেল শব্দ।
গাধার ডাক। শারি!
একভাবে পড়ে থেকে শক্ত হয়ে গেছে শরীর। কোনমতে বেরিয়ে এল স্লীপিং ব্যাগের ভেতর থেকে। গাছপালার ভেতর দিয়ে ছুটল ঝর্নার দিকে।
বনের ভেতর থেকে বেরিয়েই চোখে পড়ল টর্চের আলো। ওপরে, নিচে, চক্রাকারে নড়ছে আলোক রশ্মি। সেই আলোয় প্রথমে দেখল শুধু বারো-টাকে। পেছনের পায়ে ভর দিয়ে লাফিয়ে উঠছে বার বার, সামনের পা দিয়ে লাথি মারার চেষ্টা করছে। প্রচন্ড খেপে গেছে।
ক্ষণিকের জন্যে স্থির হল আলো, চোখে পড়ল মহিলাকে। একহাতে টর্চ, আরেক হাতে বারোর দড়ি, টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। দড়িটা ফাসের মত করে পরিয়ে দিয়েছে শারির গলায়। কিশোরের ভয় হলো, দম না আটকে যায় টানাটানিতে।
আবার চিৎকার করে উঠল শারি। গলায় দড়ি আটকানো থাকায় শব্দটা কেমন ভোঁতা হয়ে গেল। আবার লাফিয়ে উঠল ওটা। সামনের পা দিয়ে লাথি মারার চেষ্টা করল অচেনা আগন্তুককে। একই সঙ্গে টেনে ছোটানোর চেষ্টা করছে গলায় লাগানো দড়ি।
সাপটার কি গতি করেছে, দেখেছে কিশোর। আশঙ্কা হলো মহিলার জন্যে। ওই লাথি যদি মাথায় লাগে, খুলি ভেঙে ঘিলু বেরিয়ে যাবে।
ছেড়ে দিন! চিৎকার করে বলল সে।
ছুটতে শুরু করল কিশোর। চেঁচিয়ে বলতে লাগল, শারি, চুপ কর, শারি! শান্ত হ!

দড়ি ছেড়ে দিয়েছে মহিলা।
টান বন্ধ হয়ে যেতেই আবার চারপায়ের ওপর স্থির হলো শারি। ফিরে তাকাল কিশোরের দিকে। ওটার নাকে হাত বুলিয়ে দিল সে। গলার দড়িটা দেখল। আঙুল ঢুকিয়ে দিয়ে হ্যাচকা টানে ঢিল করে দিল ফাঁসের বন্ধনী। আবার স্বাভাবিক ভাবে দম নিতে পারল শারি। মহিলার দিকে তাকাল কিশোর।
নিভে গেছে টর্চ।
অন্ধকার হয়ে গেছে আবার। ছুটন্ত পায়ের শব্দ কানে এল কিশোরের। পালিয়ে যাচ্ছে মহিলা। ঠিক এই সময় কিশোরের পাশে এসে দাঁড়াল মুসা আর রবিন।
কি হয়েছে? জানতে চাইল রবিন। শারি অমন চেঁচামেচি করল কেন?
ওকে চুরি করতে চেয়েছিল, জানাল কিশোর। এক মহিলা…
খাইছে! মুসা বলে উঠল। আবার সেই সোনালি চুল! তোমাকে যে খুন করতে চেয়েছিল! সে এসেছে বারো চুরি করতে?
না। মাথা নাড়ল কিশোর। টর্চের আলোয় আবছাভাবে দেখেছি তাকে। মুহূর্তের জন্যে। তবে চিনতে অসুবিধে হয়নি। সেই মেকসিকান মহিলা, বাসে যাকে দেখেছি। লাল শাল। কালো বেণি।
পরের দুটো দিন প্রথম দিনের মতই একটানা পথ চল ওরা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা, মাইলের পর মাইল, চলে চলে সিয়েরা মাদ্রের আরও গভীরে ঢুকে যেতে লাগল। এই পর্বতমালার যেন আর শেষ নেই, চলেছে তো চলেছেই। অনেক কষ্টে ঢাল বেয়ে যখন ওঠে, ভাবে ওপারে আর কিছু নেই। কিন্তু চূড়ায় উঠে দেখে ঠিকই মাথা তুলে রেখেছে আরেকটা পাহাড়।
মাঝে উপত্যকা। কোনটা সরু, কোনটা চওড়া। এখানে কয়েক মাইল ধরে চলল পাইনের বন। তারপর, সেই বন পেরিয়ে, আরেকটা ঢাল বেয়ে উঠে গাছপালার মাথা ছাড়িয়ে এল একসময়, ওপরে রুক্ষ পাথুরে ঢাল প্রায় খাড়া হয়ে উঠে গেছে।
ভাগ্যিস এখন গরমকাল, মুসা বলল। পাথর মাড়িয়ে ওঠার সময় সামনের দিকে ঝুঁকে থাকতে হচ্ছে অনেকখানি, পর্বতের খাড়াইয়ের জন্যে। শীতকাল হলে তুষারেই ডুবে যেতাম।
তাতে মন্দ হত না, রবিন বলল। দরদর করে ঘামছে পরিশ্রমে। কপাল থেকে একফোঁটা গড়িয়ে নামল চোখের পাতায়। এই গরম তো আর লাগত না।
ওদের দিন শুরু হয় এখানে সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে। সকালে নাস্তা সারে বীন আর চাল সেদ্ধ দিয়ে, দুপুরে লাঞ্চে ঠান্ডা বীন আর চাল সেদ্ধ-সকালে খাওয়ার পর যা বেঁচে যায়, রাতে আবার একই খাবার, গরম গরম, নতুন রান্না করে। মহা বিরক্তিকর। ঘেন্না ধরে গেছে কিশোরের। রবিনের তো এখন দেখলেই বমি আসে। মুসারও আর ভাল লাগছে না।

ফিরে যাওয়ার কথা বলল রবিন আর মুসা। কিন্তু গোঁ ধরে আছে কিশোর। এই রহস্যের শেষ না দেখে সে ছাড়বে না। দেখাই যাক না, কোথায় ওদেরকে নিয়ে যায় শারি। তবে, আর দুচারদিন ওই ভয়াবহ খাবার খেতে হলে তারও মনোবল ভেঙে যাবে।

দিনে তিন-চার বার করে খাওয়ার জন্যে থামে শারি। অন্যদেরকেও থামতে হয় বাধ্য হয়ে। এই থামাটাকে স্বাগতই জানায় তিন গোয়েন্দা। বিশ্রামের সুযোগ পাওয়া যায়। ডজ তো এক মুহূর্তের জন্যেও থামতে নারাজ। তবে একটা সুবিধে হয় তাঁর এতে। ঘোড়াটাকে নিয়ে অনেক পেছনে পড়ে যান তো, এগিয়ে আসতে পারেন। প্রচুর জই খাওয়ানো হয় ঘোড়াটাকে, তার পরেও প্রতিদিনই একটু একটু করে দুর্বল হয়ে পড়ছে ওটা। মাঝে মাঝে মাইল খানেক পেছনে পড়ে যায়। রবিন আর মুসার মত পা টেনে টেনে চলে তখন।

এ রকমই একটা বিশ্রামের সময় হাত-পা ছড়িয়ে চিত হয়ে আছে তিন গোয়েন্দা, ঘাস চিবুচ্ছে শারি। রবিন বলল, ওই মহিলাগুলো কেন এর মধ্যে ঢুকেছে, বুঝতে পারছি না। প্রথমে কিশোরকে ডুবিয়ে মারার চেষ্টা চালাল সোনালি চুলওয়ালা এক মহিলা, তারপর কালো বেনি এসে চুরি করার চেষ্টা করল বারোটাকে।

হয়তো মেকসিকান মহিলার বারোর পা ভেঙে গেছে, আন্দাজ করল মুসা। কাজেই বোঝা টানার জন্যে আরেকটা দরকার হতেই পারে।

রবিন এই যুক্তি মানতে পারল না। বারোর চরিত্র ভাল করেই জানা আছে মেকসিকানদের। জোর করে যে পিঠে সওয়ার হওয়া যায় না, জানে।

ভাবছি, কিশোর বলল। বারো-টাকে নিজের জন্যেই চেয়েছে কিনা মহিলা। কিংবা অন্য কোন কারণে ওটাকে সরিয়ে ফেলতে চেয়েছে।

তাই? মুসা আর কোন যুক্তি দেখাতে না পেরে চুপ হয়ে গেল।

কিশোরেরও আর কিছু বলার নেই।

আবার শুরু হলো পথচলা।

প্রতি সন্ধ্যায়ই একটা করে জায়গা খুঁজে বের করে শারি, যেখানে আগুন জ্বালানোর জন্যে প্রচুর লাকড়ি আছে, আর খাওয়ার পানির ব্যবস্থা আছে। ওখানেই রাতের জন্যে ক্যাম্প ফেলে ওরা। এর মাঝে ওই মহিলাকে ছাড়া আর কোন মানুষ চোখে পড়েনি ওদের। মাঝে সাঝে একআধটা কুঁড়ে চোখে পড়ে, মাটির দেয়াল আর পাতার ছাউনি, অ্যাডাব বলে ওগুলোকে। সবই দূরে দূরে। ওগুলোতে কেউ থেকে থাকলেও গোয়েন্দাদের চোখে পড়ল না।

দ্বিতীয় দিনে কিশোরের পায়ের পেশী শক্ত হয়ে থাকা সেরে গেছে। আড়ষ্টতা দূর হয়ে একেবারে ঝরঝরে হয়ে গেছে। হাঁটতে এখন অনেক সহজ লাগে। কোমরের

বেল্ট ঢিলে হয়ে গেছে, রওনা দেয়ার সময় যে ছিদ্রটায় ঢুকত বাকলেসের কাটা, এখন তার আগের ছিদ্রটায় ঢোকে।
বাপরে বাপ! বন্ধুদেরকে বলল সে, বারোর পিঠে চাপা-ও কম পরিশ্রম নয়!
সেদিন, একটা শৈলশিরার কাছ দিয়ে চলার সময় সামনে সাদা ধোঁয়া দেখতে পেল ওরা। থেমে গেল। তাকিয়ে রইল সেদিকে।
বিড়বিড় করল রবিন, দাবানল না তো!
হলেও অনেক দূরে, মুসা বলল। আমাদের কাছে আসতে পারবে না।
যদি বাতাস এদিকে না বয়।
এ ব্যাপারে কিশোর কোন মন্তব্য করল না। চিন্তিত ভঙ্গিতে তাকিয়ে রয়েছে ধোঁয়ার দিকে।
সেদিন এত বেশি পেছনে পড়ে গেল ডজের ঘোড়া, সন্ধ্যায় তিন গোয়েন্দার এক ঘণ্টা পরে পৌঁছল ক্যাম্পে। খুবই উদ্বিগ্ন ডজ। রাতের খাওয়ার সময় বললেন, একটা দিন বিশ্রাম দিতে হবে ঘোড়াটাকে। নইলে চলতে পারবে না। খোঁড়াও হয়ে যেতে পারে।
খাওয়া শেষ হলে বললেন, তোমরা আমাকে রেখেই এগিয়ে যাও। যত তাড়াতাড়ি পারি তোমাদের কাছে পৌঁছব।
আমাদের খুঁজে পাবেন তো? মুসার গলায় সন্দেহ।
তা পাব। এসব অঞ্চলে চিহ্ন অনুসরণ করে চলা খুব সহজ। দুজন মানুষের জুতো আর একটা বারোর খুরের ছাপ জ্বলজ্বল করবে মাটিতে।
পরদিন সকালে খাবার ভাগ করে দিলেন ডজ। রওনা হয়ে গেল তিন গোয়েন্দা। স্লীপিং ব্যাগের ওপরে আরও কিছু বোঝা, এই যেমন খাবার আর রান্নার সরঞ্জাম, বহন করতে আপত্তি করল না শারি। এবার আর ওটার পিঠে চাপল না কিশোর। হেঁটে চলল। রবিন আর মুসাও রইল সঙ্গে।
সেরাতে ক্যাম্প ফেলার পর প্রচুর কথা বলল ওরা, হাসি-মশকরা করল। ডজ কানের কাছে না থাকায় কথা বলতে পারছে সহজ ভাবে।
রাতে কি খাওয়া যায়, বলো তো? কিশোরকে রান্নার জোগাড় করতে দেখে ঠাট্টা করে বলল রবিন। রাইস আর বীন?
নাহ! জবাব দিল মুসা, বীন আর রাইস।
আসলে, হেসে বলল কিশোর। তোমরা দুজনেই ভুল করলে। রান্না করব বীনস আ লা রাইস। দয়া করে বাসন নিয়ে তৈরি হয়ে যাও।
ডিনারের পর আগুনের কুন্ড ঘিরে বসল তিনজনে। হঠাৎ উত্তেজিত ডাক ছাড়ল শারি। লাফিয়ে উঠল তিনজনে। কান খাড়া।

মুহূর্ত পরেই আগুনের আলোয় একটা বড় বারোকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল গাছের আড়াল থেকে। এল এদিকেই। শারির চেয়ে বয়েস অনেক বেশি। পিঠে জিন নেই। তবে দড়ি দিয়ে বাঁধা রয়েছে কয়েকটা পোঁটলা।
ওটার পেছন পেছন এল কালো বেণি করা সেই মহিলা।
ডাকাডাকি থামিয়ে দিল শারি। স্বজাতীয়কে দেখে খুশি হয়েছে। দুলকি চালে এগিয়ে গেল। নাক ঘষাঘষি করে স্বাগত জানাল পরস্পরকে।
কাছে এল মেকসিকান মহিলা।
ঘাবড়িও না, হাত নেড়ে স্প্যানিশ ভাষায় বলল সে। এবার বারো চুরি করতে আসিনি। তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে চাই। আমার নাম ইসাবেল। তোমরা কে, জানি। তবে, কথা বলার আগে, আমাকে কিছু খেতে দাও। খুব খিদে পেয়েছে।
এক প্লেট রাইস আর বীন দিল ওকে কিশোর। আগুনের ধারে বসল ইসাবেল। ভাল খিদেই পেয়েছে ওর। সমস্ত খাবার শেষ করার আগে মুখই তুলল না।
বাসে বেশ কিছুটা দূর থেকে ওকে দেখেছে কিশোর। এই প্রথম কাছে থেকে ভালমত দেখার সুযোগ পেল। মহিলা খাচ্ছে, আর সে তাকিয়ে রইল তার মুখের দিকে।
বয়েস চল্লিশ মত হবে। মোটামুটি সুন্দরীই বলা চলে। চেহারাই বলে দিচ্ছে আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। পকেট ওয়ালা ঢিলাঢালা একটা উলের স্কার্ট পরেছে। পায়ে মেকসিকান বুট। গায়ে খাটো হাতাওয়ালা একটা ব্লাউজ। চামড়ার রঙ গাঢ় বাদামী, চোখ পিরেটোর মতই কালো। সব মিলিয়ে, কিশোরের মনে হলো, ওই মহিলা ভালর ভাল, মন্দের যম।
খালি বাসনটা সরিয়ে হাতঘড়ির দিকে তাকাল ইসাবেল। পুরুষের ঘড়ি পরেছে। বেল্টটা ঢিলে। হাত খাড়া করতেই নিচের দিকে নেমে গেল ওটা। তাড়াতাড়ি আবার ওপরের দিকে কব্জির কাছাকাছি তুলে দিল সে।
সময় বেশি নেই, ইসাবেল বলল। লেকের কাছে ফিরে যেতে হবে আমাকে। যতটা তাড়াতাড়ি পারি সংক্ষেপে সব বলে যাচ্ছি তোমাদেরকে। কিশোরের দিকে তাকাল সে। আমি ইংরেজি বলতে পারি না। তবে তোমরা স্প্যানিশ জানো, জানি আমি।
পুরানো চামড়ার জ্যাকেট পরা লোকটার কথা মনে পড়ল কিশোরের। যে ওদেরকে বাসে উঠতে বাধা দিচ্ছিল। লোকটার সঙ্গে তর্ক করার সময় নিশ্চয় মহিলা শুনেছে। বুঝতে পেরেছে ওরা স্প্যানিশ জানে।
মাথা ঝাঁকাল কিশোর। বলতে ততটা পারি না। তবে বুঝতে পারি। আস্তে আস্তে বলুন, বুঝব।
গুড। হাঁটু ভাঁজ করে আরাম করে বসল ইসাবেল। টেনে দিল স্কার্ট। পরের পনেরো মিনিট নিচু স্বরে প্রায় একটানা কথা বলে গেল। মাঝে সাঝে একআধটা প্রশ্ন

করল কিশোর। ইতিমধ্যে একবার উঠে চলে গিয়েছিল রবিন। কয়েক মিনিট পর ফিরে এসেছে।
তারপর উঠে দাঁড়াল ইসাবেল। তিন গোয়েন্দাও উঠল।
এক এক করে ওদের সঙ্গে হাত মেলাল ইসাবেল। তারপর, যেমন হঠাৎ করে উদয় হয়েছিল, রহস্যময় ভাবে, তেমনি করেই আবার বারো-টাকে টেনে নিয়ে অশ্য হয়ে গেল রাতের অন্ধকারে।
আগুনে কাঠ ফেলল মুসা। কি বুঝলে?
একটা সাংঘাতিক গল্প বলে গেল! মাটিতে পা ছড়িয়ে বসে বলল কিশোর। রবিন, পঞ্চো ভিলার ব্যাপারে যা যা জানো বলো তো?
আমাকে কি মেকসিকান পাবলিক লাইব্রেরি বলে মনে হচ্ছে?
বাজে কথা রাখ। রকি বীচ থেকেই মেকসিকোর ইতিহাস পড়া শুরু করেছ তুমি। শেষ করোনি এখনও?
করেছি, হাসল রবিন। যেদিন তুমি লেকের পানিতে ডুবে আরেকটা ইতিহাস সৃষ্টি করতে যাচ্ছিলে, সেদিনই।
আমিও জানি, শেষ করে ফেলেছ। হাসিটা ফিরিয়ে দিল কিশোর। উনিশ শো ষোলো সালের ব্যাপারে আমার আগ্রহ। পঞ্চো ভিলার কথা কি জানো?
ওই বছর একটা বিরাট বিদ্রোহ হয়ে গিয়েছিল মেকসিকোতে। সেই বিদ্রোহেরই এক বড় নায়ক ছিল পঞ্চো ভিলা। অনেকের ধারণা, আউট-ল ছিল সে, জেসি-জেমসের মত। ব্যক্তিগত একটা সেনাবাহিনী গড়ে তুলেছিল। অনেকগুলো লড়াই জিতেছে।
এখানে, সিয়েরা মাদ্রেতেও এসেছিল নাকি?
এসেছিল। তার একটা ঘাঁটি তৈরি করেছিল এখানেই। মরুভূমিতে নেমে গিয়ে ট্রেনের ওপর আক্রমণ চালাত। লুটপাট করে ফিরে এসে আবার লুকিয়ে পড়ত এখানে।
চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল কিশোর। এই কথাটা তাহলে সত্যিই বলেছে ইসাবেল।
তারমানে, তুমি বলতে চাইছ ওর ব্যাপারেই যত আগ্রহ মহিলার? মৃত একজন মানুষের ব্যাপারে?
না, তার ব্যাপারে নয়, কিশোর জবাব দিল। মনে হচ্ছে সিয়েরা মাদ্রের গুপ্তধনের পেছনেই ছুটেছি আমরা, না জেনে, যেটার কথা বহুবার বলেছ তুমি। পঞ্চো ভিলার লুটের মাল। শুনলে না, ইসাবেল বলে গেল, একদিন একটা ট্রেন লুট করে হাজার হাজার ডলার দামের সিলভার পেসো নিয়ে এসেছিল পঞ্চো। এখানে উঠে এসে কোন একটা গুহাটুহায় লুকিয়ে রেখে গিয়েছিল সে সব পেসো। ইসাবেলের

বলে যাওয়া গল্প আবার বলতে লাগল কিশোর। নিজেকেই যেন শোনাচ্ছে। খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে কি রহস্য লুকিয়ে রয়েছে এর ভেতরে। একটা ভুল করেছিল পঞ্চো, কিংবা তার দুর্ভাগ্যই বলা যায়, পেসোর সঙ্গে একই গুহায় বারুদ রেখেছিল সে। অসাবধানে দেশলাইয়ের কাঠি ফেলেছিল তার এক সহচর, বিস্ফোরণ ঘটল বারুদে। পর্বতের একটা অংশ ধসে গেল। টন টন পাথরের নিচে চাপা পড়ল পঞ্চোর লুটের মাল, সেই সঙ্গে তার সেনাবাহিনীর একটা বড় অংশ। পাথর পরিষ্কার করতে শুরু করল পঞ্চো। কিন্তু এই সময় তার শত্রুরা এসে আক্রমণ চালিয়ে বসল পর্বতের অন্য পাশ থেকে পালাতে বাধ্য হলো সে।
এক মুহূর্ত চুপ করে রইল কিশোর।
তারপর, গল্পটা শেষ করল সে। ইসাবেল বলে গেল, শুনলেই তো, মুদ্রাগুলো এখনও সেখানে আছে।
নীরবে কিশোরের কথা শুনছিল মুসা আর রবিন।
ইসাবেল জানল কি করে এসব? রবিনের প্রশ্ন। উঠে চলে যাওয়ায় অনেক কিছুই শোনেনি সে।
ও বলল, তার দাদা নাকি তার সৈন্য দলে ছিল। ও-ই গল্পটা শুনিয়ে গেছে। ওদের পরিবারকে, জবাবটা দিল মুসা।
ডজের কথা কি বলল? জানতে চাইল রবিন। ওর নাম বলতে শুনলাম। বারোটার কথাও কি যেন বলল?
কিশোর বলল, মাস তিনেক আগে নাকি ইসাবেলের এক বন্ধু, টনি নামের এক আমেরিকান তরুণ, এখানে এসেছে। সে আর তার বাবা সোনা খুঁজে বেড়িয়েছে এখানকার পর্বতে। আসলে ওরা খুঁজতে এসেছিল পঞ্চো ভিলার গুহা। ওদের ধারণা, গুহাঁটা খুঁজেও পেয়েছিল ওরা। ইসাবেলকে টনি সে কথাই বলেছে।
চুপ করল কিশোর।
বলো, তাগাদা দিল রবিন। কথার মাঝখানে থামলে কেন? ডজ আর শারি এর মধ্যে এল কিভাবে শুনতে চাই।
টনি যখন লেকে গেল, বলল কিশোর। তার সঙ্গে ছিল একটা ছোট সাদা বারো। গুহার কাছে পেয়েছিল ওটাকে। বাচ্চাটার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে ফেলল। যাওয়ার সময় নিয়ে গিয়েছিল ডজের র‍্যাঞ্চে। তারপর আবার ফিরে গিয়েছিল পর্বতে।
কেন? সাথে করে যখন আনতেই পারল, নিতে পারল না কেন? কেন ফেলে গেল র‍্যাঞ্চে?
কারণ টনির ভয়, শারি আবার পর্বতে গেলে মরে যাবে। বারোটার চিকিৎসার দরকার ছিল, আর এখানে সব চেয়ে কাছের পশুচিকিৎসক থাকেন লারেটোতে।

পিরেটো গিয়ে নিয়ে এসেছিল তাঁকে। বারোটাকে চিকিৎসা করে সারিয়ে তোলা হলো।
কি হয়েছিল ওর? এটাই যদি অসুস্থ হবে, ডজের র‍্যাঞ্চ পর্যন্ত গেল কি করে?
চোখে একটা বাজে ধরনের ইনফেকশন হয়েছিল। তাতে প্রায় অন্ধই হয়ে গিয়েছিল বারোটা। ইসাবেলের গল্পের এই জায়গাটায় বিশেষ আগ্রহ কিশোরের। গলা শুনেই যে তাকে চিনেছে বারোটা, তার সঙ্গে ওই চোখের অসুখের কি কোন যোগাযোগ আছে? কেন শারি বুঝতে পারল না, সে টনি নয়, যে তাকে অন্ধত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে বাঁচিয়েছে? অন্ধ হয়ে পর্বতে কোনদিন টিকে থাকতে পারে না কোন বারো। পিরেটোর কথা মনে পড়ল কিশোরের শারি ভাবে, তুমি ওর প্রাণ বাঁচিয়েছ।
মোলায়েম শিস দিল মুসা। হুঁ, মিলতে আরম্ভ করেছে। ডজ জেনে গেছে টনি আর তার বাবা পঞ্চো ভিলার গুপ্তধন খুঁজে পেয়েছে...
তখন, মুসার মুখের কথা টেনে নিয়ে কিশোর বলল, ডজ টনিকে গুহাঁটা চিনিয়ে দেয়ার জন্যে চাপাচাপি করেছে। কিন্তু টনি খুব চালাক। পালাল। চলার পথে নিজের চিহ্ন সব মুছে দিয়ে গেল, যাতে ডজ পিছু নিতে না পারে। ডজের কাছে রয়ে গেল শারি। পথ চেনে যে। পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারে গুহার কাছে। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও শারিকে বাগ মানাতে পারল না সে, কিছুতেই তাকে নিয়ে গেল না বারোটা। ডজ বুঝতে পারল, যাকে পছন্দ করবে একমাত্র তার কথা ছাড়া আর কারও আদেশ মানবে না শারি। এমন কেউ, যাকে কণ্ঠস্বর শুনেই বন্ধু হিসেবে চিনে নেবে।
তখন ওরকম কাউকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করল ডজ, মুসা বলল, যার কণ্ঠস্বরের সঙ্গে টনির স্বরের মিল আছে। এ জন্যেই রহস্যময় ওই ধাঁধা প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল সে।
এবং কিশোরকে খুঁজে বের করল, যোগ করল রবিন। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, ইসাবেল কেন এসব কথা ওকে বলে গেল?
ঠিক, মুসা বলল। আমাদেরকে র‍্যাঞ্চেই যেতে দিতে চায়নি যে, সে কেন এখন যেচে পড়ে সব কথা শুনিয়ে যায়?
কথাটা কিশোরের মনেও খচখচ করছে।
আমাকে কোন প্রশ্ন করতে দেয়নি ইসাবেল, কিশোর বলল। কেবল তার কথা যখন বুঝিনি, জিজ্ঞেস করেছি, বুঝিয়ে দিয়েছে। ব্যস, ওই পর্যন্তই। যা বলার সে নিজেই বলেছে, আমাকে কেবল শুনতে হয়েছে। ডজকে একবিন্দু বিশ্বাস করে না। ওর ঘোড়া খোঁড়া হয়ে যাবে, চলতে পারবে না, এটা বিশ্বাস করেনি। ইসাবেলের ধারণা, ঘোড়ার পা ঠিকই ছিল, ইচ্ছে করেই আমাদের পেছনে পড়েছে

ডজ। কোন উদ্দেশ্য আছে। মহিলার ভয়, টনি আর তার বাবাকে দেখলেই গুলি করে মারবে ডজ। ইসাবেলকে দেখলে তাকেও মারবে। কাজেই লেকে ফিরে যাচ্ছে সে। আমাদেরকে অনুরোধ করেছে গুহায় গিয়ে টনি আর তার বাবাকে যেন সাবধান করে দিই ডজের ব্যাপারে।
আগুনের দিকে তাকিয়ে বসে রইল তিন গোয়েন্দা। দীর্ঘক্ষণ কারও মুখে কথা নেই।
অবশেষে মুখ খুলল মুসা, কিশোর, ইসাবেলকে বিশ্বাস করো তুমি?
বুঝতে পারছি না করব কিনা। তাকে সন্দেহ এবং অবিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে। টনি আর তার বাবাকে খুঁজে বের করার ব্যাপারে এত আগ্রহ কেন? এমনও তো হতে পারে, সে চাইছে আমরা গিয়ে পেসোগুলো খুঁজে বের করি।
হ্যাঁ, হতেই পারে, রবিন বলল। আমাদের পেছন পেছন যাবে সে। তারপর যেই আমরা ওগুলো বের করব, কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করবে।
পরদিন সূর্য ওঠার আগেই ঘুম থেকে উঠে পড়ল তিন গোয়েন্দা। নাস্তা সারতে সারতে আরও আলোচনা করল ইসাবেলের ব্যাপারে।
আমাকে বোকা বানাতে চেয়েছে সে, কিশোর বলল।
কিভাবে? মূসার প্রশ্ন।
লেকে ফিরে যাচ্ছে বলে! বেশ তাড়াহুড়া, এমন একটা ভাব, যেন তক্ষুণি রওনা হয়ে যাবে লেকের উদ্দেশে।
মাথা দোলাল রবিন। রাতের বেলা এসব পাহাড়ে পথ চলাই মুশকিল। যাওয়ার ইচ্ছে থাকলে সকালেও তো রওনা হতে পারত। পুরো ব্যাপারটাই আসলে ভাঁওতাবাজি।
আর ওই ঘড়িটা, কিশোর বলল, বার বার কব্জি থেকে নেমে যাচ্ছিল, ঠেলে ঠেলে তুলতে হচ্ছিল ওপরে। মনে হলো... শ্রাগ করল সে, ...জানি, না, আলোর কারসাজি হতে পারে। ভুলও দেখে থাকতে পারি।
কি? জিজ্ঞেস করল মুসা।
ওর কব্জিতে একটা দাগ দেখেছি। শিওর না।
মুসা দেখেনি, জানাল সে কথা।
রবিন বলল, মহিলা ভীষণ চালাক। ওর অনেক কিছুই খটকা লাগার মত। আমার অবাক লেগেছে, যখন জানলাম, কন্টাক্ট লেন্স পরে। সাধারণত যা পরে না। মানুষ...
কন্টাক্ট লেন্স? বাধা দিল মুসা।
হ্যাঁ। বাসে মুছতে দেখেছি। মাথা নিচু করে রেখেছিল, প্রথমে বুঝতে পারিনি কি করছে। পরে ভালমত দেখে বুঝলাম। আরেকটা ব্যাপার আরও বেশি অবাক

করেছে। চুপ হয়ে গেল রবিন।
সেটা কি? জানতে চাইল কিশোর। বলতে এত দেরি করছে রবিন, এটা সহ্য হচ্ছে না ওর।
আরেকটা ব্যাপার হলো... কিশোরের অবস্থা বুঝে হাসল রবিন। ইচ্ছে করেই দেরি করছে বলতে। তথ্য গোপন করে কিশোরও অনেক সময় ওদেরকে এরকম অস্থিরতার মাঝে রাখে। সুযোগ পেয়ে শোধ তুলছে সে।
কী! বলো না! খেপে গেল কিশোর। ওয়াকি-টকি দিয়ে এই পর্বতের ভেতর কি করে সে? প্লেটের বীন সেদ্ধ শেষ করে কয়েকটা পাইনের পাতা কুড়িয়ে নিয়ে সেগুলো দিয়ে মুছে পরিষ্কার করতে লাগল প্লেটটা রবিন। আবার চুপ।
অস্থির হয়ে উঠেছে কিশোর। এক থেকে দশ পর্যন্ত গুনল। তারপর যখন খেঁকিয়ে উঠতে যাবে তখন রবিন বলল, বারোর পিঠের একটা পোটলা থেকে ওয়াকি-টকির অ্যান্টেনা বেরিয়ে আছে দেখলাম মনে হলো। পঞ্চো ভিলার ব্যাপারে যখন তোমাকে জ্ঞান দিচ্ছে, তখন উঠে গেলাম ভাল করে দেখার জন্যে। ওয়াকিটকি একটা আছে ওর কাছে।
ওয়াকি-টকি দিয়ে এই পর্বতের ভেতর কার সঙ্গে কথা বলে সে? অবাক হলো মুসা। ডজ হতে পারে না। কারণ ওকে দেখতে পারে না মহিলা। তাছাড়া ডজের সমস্ত পোটলা-পাটলি ভাল মত দেখেছি আমি। ওয়াকি-টকি নেই।
পিরেটোর আছে, কিশোর বলল। নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আমি মেরামত করে দিয়েছি। কিন্তু র‍্যাঞ্চ এখান থেকে অনেক দূর। ওয়াকি-টকিতে যোগাযোগ অসম্ভব।
উঠল ওরা। সাবধানে আগুন নেভাল, যাতে ছড়িয়ে গিয়ে দাবানল সৃষ্টি করতে পারে। শারির কাঁধে মালপত্র বাঁধল কিশোর।
লেকে যদি, বারোর পিঠে আলতো চাপড় দিয়ে চিন্তিত ভঙ্গিতে যেন নিজেকেই প্রশ্ন করল কিশোর। সত্যিই না গিয়ে থাকে ইসাবেল, তাহলে কি করবে? হতে পারে, এই মুহূর্তে পাথরের আড়ালে লুকিয়ে আমাদের ওপর নজর রাখুছে সে। আলো বেড়েছে। বাড়ছে ক্রমেই। চারপাশে তাকাল সে। আমরা এগোলেই আমাদের পিছু নেবে, চিহ্ন ধরে ধরে। আমাদেরকে জানতে দিতে চায় না। হয়তো, সে-ও যে ওই পেসোর পেছনে লেগেছে।
হাত ওল্টাল মুসা। যদি সেটা করতেই চায়, করবে, আমাদের কিছু করার নেই। চিহ্ন তো আর লুকাতে পারব না।
তা পারব না। শারিকে চলার নির্দেশ দিল কিশোর। তবে একটা সুবিধা আমাদের আছে।
কি?

কাল রাতে ইসাবেলের বারোর সঙ্গে বন্ধুত্ব করে ফেলেছে শারি। আর মিস্টার সাইমন জানিয়েছেন, বারোরা চেনা বারোকে অনেক দূর থেকেও গন্ধ শুকে চিনতে পারে। একজন আরেকজনকে ডাকাডাকি করে জানান দেয়। তাই, ইসাবেলের বারোটা যদি খুব কাছাকাছি চলে আসে, ডাক দেবেই। শারিও জবাব দেবে। মাইল দুয়েকের মধ্যে থাকলেও জেনে যেতে পারব আমরা।

সেদিনকার পথচলা অন্যদিনের চেয়ে কঠিন হল। সব চেয়ে খাড়া আর উঁচু চূড়ায় উঠতে থাকল শারি। ঢালের গভীর সব খাঁজ আর শৈলশিরার ভেতর দিয়ে একেবেঁকে উঠে চলল অনেক উঁচু চূড়াটার দিকে।

একটি বারের জন্যেও থামল না কিংবা ডাকল না ওটা। বার বার পেছনে ফিরে তাকাল তিন গোয়েন্দা, কিন্তু ইসাবেল বা তার বারোর ছায়াও চোখে পড়ল।

আরেকবার ধোঁয়া দেখতে পেল ওরা। এক জায়গা থেকে লম্বা হয়ে উড়ছে ঘন সাদা ধোঁয়া। মনে হলো, যে চূড়াটায় উঠছে ওরা, তার ওপাশ থেকে উঠছে ওই ধোঁয়া।

অদ্ভুত তো? মুসা বলল। বনই নেই, আগুন লাগল কিসে? ক্যাকটাস ছাড়া আর কিছুই দেখি না।

হুঁ, মাথা দোলাল কিশোর। পাহাড়ের অন্যপাশে আছে হয়তো।

তিক্ত কণ্ঠে রবিন বলল, এখানে যেন সবাই মিথ্যুক। ডজ মিছে কথা বলে, ইসাবেল মিথ্যে বলে, এখন পাহাড়ও দাবানল লেগেছে বলে ফাঁকি দিয়ে চলেছে আমাদের।

আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছে মুসা। ধোঁয়ার রঙও কেমন আজব! সাধারণ ধোঁয়ার মত নয়।

অনেক ওপরে উড়ছে শিকারি পাখিরাঃ শকুন, ঈগল, চিল। সেদিকে তাকিয়ে রবিন বলল, দাবানল পাখিদের কিছু করতে পারে না। বনের সবাই মরলেও ওরা পালায়। আগুন ছুতেও পারে না ওদের। এদিক থেকে ওরা ভাগ্যবান।

এগিয়ে চলেছে ওরা। রহস্য সমাধানের প্রচন্ড নেশাই রুক্ষ দুর্গম পথে শারির পিছু পিছু টেনে নিয়ে চলেছে কিশোরকে। বিকেলের শুরুতে মুসা আর রবিনকে অনেক পেছনে ফেলে এল ওরা।

এই থাম! আচমকা চিৎকার শোনা গেল। এক পা এগোবে না আর!

থেমে গেল রবিন আর মুসা। মুখ তুলে দেখল ওদের অনেক ওপরে হাত তুলছে কিশোর।

এইবার আস্তে আস্তে এগোও, বলল সে। বারোটাকে অনুসরণ করো।

অবাক হয়ে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল দুই সহকারী গোয়েন্দা। তাই তো করছে ওরা। তাহলে কি বলতে চাইছে কিশোর?

ধীরে ধীরে যেন প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে উঠতে আরম্ভ করল আবার রবিন আর মুসা। শারির একেবারে পেছনেই রয়েছে কিশোর। কোন রহস্যময় কারণে হাত তুলেই রেখেছে সে। বুঝতে পারছে না ওরা।
তারপর থেমে গেল গোয়েন্দাপ্রধান।
আর কাছে এসো না, পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি তুলে আবার ভেসে এল কিশোর পাশার কণ্ঠ। কে তোমরা? এখানে কি চাই?
আবার একে অন্যের দিকে তাকাল মুসা আর রবিন। পুরো ব্যাপারটাই কেমন ভূতুড়ে লাগছে এখন ওদের কাছে। হচ্ছেটা কি? পাগল হয়ে যাচ্ছে নাকি ওরা? ওদের মাথায় যেন গোলমাল করে দেয়ার জন্যেই আবার শোনা গেল আমি কিশোর পাশা। তোমার জন্যে খবর নিয়ে এসেছি।
ওর কথা যে কি প্রতিক্রিয়া করছে ওর বন্ধুদের ওপর ভাবল না কিশোর, ভাবার অবকাশও নেই। ওর কাছেও পরিস্থিতিটা বিপজ্জনক। পথের একটা মোড় ঘুরতেই চোখ পড়েছে একটা রাইফেলের নলের ওপর। পাথরের আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে আছে ওটা।
থাম! আবার আদেশ দিল আগের কণ্ঠটা। এগোবে না আর!
ওই কণ্ঠস্বর স্তব্ধ করে দিয়েছে শারিকেও। খাড়া হয়ে গেছে কান। মোলায়েম ডাক ছাড়ল একবার।
আবার ধীরে এগোনোর আদেশ হলো। শারিকে নিয়ে এগিয়ে চলল কিশোর। নলের গজখানেক সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেল। এখনও রাইফেলের নল স্থির হয়ে আছে কিশোরের বুকের দিকে।
পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল কিশোরেরই বয়েসী একটা ছেলে। তবে ওর চেয়ে লম্বা। এলোমেলো সোনালি চুল, রোদে পোড়া তামাটে মুখ। পরনে জিনস, পায়ে মেকসিকান বুট, গায়ে ডেনিম জ্যাকেট। রাইফেল নামাল না। নজর শারির দিকে।
শারি, বলল সে। তুই এখানে এলি কি করে?
কেঁপে উঠল বারোর কান। মুখ ঘুরিয়ে তাকাল ছেলেটার দিকে। তারপর কিশোরের দিকে, তারপর আবার ছেলেটার দিকে। দ্বিধায় পড়ে গেছে।
আদর করে ওর গলা চাপড়ে দিল কিশোর।
আমি নিয়ে এসেছি, শারির হয়ে জবাব দিল সে। কিংবা বলা যায়, আমাকে এনেছে ও। তুমি কি টনি?
জবাব দিল না ছেলেটা। কিশোরের দিকে একই ভাবে রাইফেল তাক করে রেখে সরে এল কিনারে, নিচে তাকাল। তিরিশ গজ নিচে ধীরে ধীরে উঠে আসছে রবিন আর মুসা।

ওরা কারা? ছেলেটার কণ্ঠে সন্দেহ।
অল্প কথায় জানাল কিশোর, ওরা তার বন্ধু, ক্যালিফোর্নিয়া থেকে এসেছে।
তোমাকে সাহায্য করতে এসেছি আমরা। আবার নাম জিজ্ঞেস করল কিশোর, তোমার নাম টনি, তাই না?
হ্যাঁ। রাইফেল নামাল না টনি। কি সাহায্য করতে এসেছ?
তোমাকে সাবধান করে দিতে যে, ডজ মরিস…
ও কোথায়? সহসা শঙ্কা ফুটল টনির চোখে। তোমার বন্ধুদের সঙ্গে আছে?
না। আমাদেরকে নিয়ে একসাথেই বেরিয়েছিল। তারপর তার ঘোড়ার পায়ে অসুখ দেখা দিল। ও তাই বলেছে। কয়েক মাইল পেছনে ফেলে এসেছি ওকে আমরা। কাল নাগাদ হাজির হয়ে যেতে পারে।
থ্যাংকস। আমাকে জানানোর জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাকে। সেফটি ক্যাচ অন করে রাইফেলটা কাঁধে ঝোলাল টনি। তোমরা এলে কি করে এখানে?
বললাম না শারি নিয়ে এসেছে। যেখান থেকে গিয়েছিল ও সেখানেই ফিরে এসেছে।
এত তাড়াতাড়ি ওকে পোষ মানাল কি করে ডজ?
ও পারেনি। এখনও বুনোই রয়ে গেছে বারোটা। কেবল আমাকেই কাছে ঘেঁষতে দেয়। ওর হয়তো ধারণা, আমিই ওর প্রাণ বাঁচিয়েছি। আমাকে তুমি ভেবেছে।
আমি? কেন?
কারণ, আমাদের দুজনের কণ্ঠস্বরই এক রকম মনে হচ্ছে তুমি এটা খেয়াল করনি। শারির কাছে তাই আমরা দুজনেই এক। আমার গলা প্রথমে শুনে ভেবেছে আমিই তুমি। ওর কাছে এটা সেই কণ্ঠ, যে তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেছে লেকের কাছে, যখন সে অন্ধ ছিল। ওকে ভাল করার জন্যে কৃতজ্ঞতা বোধ থেকেই আমাকে পছন্দ করেছে সে। আমার কথা শোনে। তোমার কথা শুনে অবাক হয়েছে। কারণ, একই রকম কণ্ঠস্বর।
বারোটার দিকে তাকিয়ে হাসল টনি। আয়, শারি। লক্ষ্মী শারি।
এখনও কাঁপছে বারোর কান। ঘোরের মধ্যে যেন কথা শুনল টনির, এগিয়ে গেল। তারপর যখন ওকে আদর করল টনি, আস্তে আস্তে ঘোর ভাঙল যেন। টনির বুকে নাক ঘষল।
রবিন আর মুসা উঠে এল সেখানে।
পরিচয় করিয়ে দিল কিশোর, আমার বন্ধু মুসা আমান। আর ও রবিন মিলফোর্ড।…রবিন, ও টনি… পুরো নাম শোনার জন্যে তাকাল ওর মুখের দিকে।
টনি ইয়ালার। হাত বাড়াল সে, হাই, তোমাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম।

রবিন আর মুসা হাসল। এখন বুঝতে পারছে, কিশোরের উল্টো পাল্টা কথার মানে। আসলে কিশোর বলেনি ওসব কথা, বলেছে টনি। তার কণ্ঠকেই কিশোরের কণ্ঠ বলে ভুল করেছে ওরা।
মনে হয় পিপাসা পেয়েছে তোমাদের, টনি বলল। যে রকম পথে হেঁটে এসেছ, পাওয়ারই কথা। এসো। দিচ্ছি। আমার ঘরটাও দেখবে।
শারির দড়ি ধরে নিয়ে চলল টনি। একটা শৈলশিরার পাশের ঘোরানো পথ ধরে ওপরে উঠে পর্বতের গায়ে দেখতে পেল প্রায় লুকানো একটা ফোকর। সুড়ঙ্গ মুখ।
মাথা নুইয়ে রাখ, সরু, নিচু সুড়ঙ্গে ঢোকার আগে সাবধান করে দিল টনি। কিছুদূর এগোনোর পর বলল, ঠিক আছে, এবার সোজা হও।
ভেতরে আবছা আলো। সেই আলোয় তিন গোয়েন্দা দেখল, বিশাল এক গুহায় এসে দাঁড়িয়েছে ওরা। ছাত অনেক উঁচুতে।
দেশলাই দিয়ে মোম ধরল টনি। কিশোর আন্দাজ করল, বেশ কিছুদিন ধরে এখানে বাস করছে সে। মেঝেতে গোটানো রয়েছে একটা স্লীপিং ব্যাগ। বাসন, হাঁড়ি-পাতিল, একটা কেরোসিনের চুলা, আধবোঝাই কয়েকটা বস্তা, গাঁইতি, শাবল রাখা হয়েছে দেয়াল ঘেঁষে। ছাত দেখেই অনুমান করা যায় এখানে কখনও বারুদ বিস্ফোরিত হয়নি। পঞ্চো ভিলার গুহা নয় এটা।
একটা বস্তা তুলে নিয়ে মেঝেতে জই ঢালল টনি। আব্বা এনেছিল, ঘোড়ার জন্যে। ভালই হয়েছে, কিছুটা রয়ে গেছে। এখানে ঘাসপাতার যা আকাল। এই জই না থাকলে না খেয়ে থাকতে হত শারিকে।
একমাত্র স্লীপিং ব্যাগটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে রবিন। তোমার আব্বা কোথায়?
কেন? তার কি দরকার? আবার সন্দেহ জাগল টনির চোখে।
কারণ তাকেও ডজের ব্যাপারে সাবধান করে দিতে চাই।
মাটির জগ তুলে নিয়ে একটা মাটির ছোট গামলায় শারির জন্যে পানি ঢালল টনি।
আব্বা নেই। ঘোড়া নিয়ে গেছে, খাবারদাবার আনার জন্যে। জগটা বাড়িয়ে দিল তিন গোয়েন্দার দিকে। নাও, পানি।
কোনদিকে গেছেন তিনি? জানতে চাইল কিশোর। লেকের দিকে? তাহলে ডজের সামনে পড়ে যেতে পারেন।
না, ওদিকে যায়নি। পর্বতের অন্যপাশে একটা গ্রাম আছে। গোটা দুই দোকান আছে ওখানে। সব জিনিস পাওয়া যায় না। তবে বাস থামে। আর বাস দিয়ে...
থেমে গেল টনি। সন্দেহ যাচ্ছে না। দ্বিধা করছে। মনস্থির করার চেষ্টা করছে, ওদেরকে বিশ্বাস করবে কিনা।
এখানে কেন এসেছ, বলো তো? জিজ্ঞেস করল সে।

ডজের ধারণা...
বলতে গিয়ে চুপ হয়ে গেল কিশোরও। সব কথা টনিকে বলার সময় এসেছে। জোরে একবার দম নিল সে। তারপর শুরু করল। ক্রসওয়ার্ড পাজল প্রতিযোগিতা থেকে। একে একে বলল, কি করে ওরা জানতে পেরেছে পঞ্চো ভিলার পেসোর কথা।
নীরবে শুনছে টনি। মেঝেতে তিন গোয়েন্দার পাশাপাশি বসেছে। পেসোর কথা শুনে হঠাৎ উঠে দাঁড়াল সে। ওগুলোর কথা জজ বলেছে? আর কি বলেছে? পেলে লুটের মাল ভাগাভাগি করে নেবে?
না, মুসা সন্দেহমুক্ত করার চেষ্টা করল তাকে। ভুলেও একবার পেসোর কথা উচ্চারণ করেনি ডজ। ও আমাদেরকে বলেছে, পর্বতে যেতে হবে বারোটাকে ছেড়ে দিয়ে আসার জন্যে। ওটার জন্মভূমিতে। শারির খুর নাকি বড় হয়ে যাচ্ছে, পর্বতের পাথুরে অঞ্চলে ঘষা না খেলে সমান হবে না।
কী!
মুসা আরও বলল, ইসাবেল আমাদেরকে বলেছে রূপার পেসোর কথা।
ইসাবেল? চিনতে না পেরে ভ্রূকুটি করল টনি। এই ইসাবেলটা আবার কে?
চেহারার বর্ণনা দিল রবিন। কালো বেনির কথা বলল। কালো চোখ আর লাল শলের কথা বলল।
মেকসিকান? এখনও ভুরু কুঁচকেই রেখেছে টনি।
মনে তো হলো, জবাব দিল কিশোর। স্প্যানিশ ছাড়া আর কোন ভাষা বোঝে না। ওর চামড়ার রঙও মেকসিকানদের মত বাদামী। নিজেও অবাক হয়ে ভাবতে আরম্ভ করেছে এখন, আসলেই মহিলা মেকসিকান কিনা! ডজের ব্যাপারে তোমাকে সাবধান করে দিতে বলেছে আমাদেরকে। তোমার নাকি বন্ধু। তুমি তাকে চেন?
মাথা নাড়ল টনি। নামই শুনিনি কখনও। আর চেহারার যা বর্ণনা শুনলাম, তাতে বুঝতে পারছি, ওর সঙ্গে জীবনে কখনও দেখা হয়নি আমার।
এই পর্বতে গুহার অভাব নেই, টনি বলল। পঞ্চো ভিলা আর তার সাগরেদরা নিশ্চয় একেক সময় একেক গুহায় ঢুকত, লুকিয়ে থাকার জন্যে। তবে আব্বার ধারণা, সে যেটাতে পেসো লুকিয়েছিল সেটা পেয়ে গেছি আমরা।
সন্ধ্যায় যার যার স্লীপিং ব্যাগ বের করে তার ওপর আরাম করে বসেছে তিন গোয়েন্দা। কেরোসিনের চুলায় এক হাঁড়ি খাবার রান্না করেছে টনি, একঘেয়ে সেই বীন আর চাল সেদ্ধ। তিনটে মোম জ্বলছে এখন। সুড়ঙ্গমুখে একটা কম্বল ঝুলিয়ে দিয়ে এসেছে সে, যাতে বাইরে আলো বেরোতে না পারে। এককোণে জই চিবাচ্ছে শারি।

যার যার প্লেটে খাবার দেয়া হলো।
কি করে জানলে তোমরা, আসল গুহাঁটাই খুঁজে পেয়েছ? মুসা জিজ্ঞেস করল। এত গুহার মধ্যে, আলাদা করে চিনলে কি করে?
কিছু কিছু চিহ্ন দেখে। পাথর পড়ে বন্ধ হয়ে ছিল গুহামুখ। ওগুলো কিছু কিছু সরিয়ে যখন ঢুকলাম, পেয়ে গেলাম ইগনাসিওকে।
ইগনাসিও?
ভিলার এক সিপাহী। উনিশশো ষোলো সাল থেকে গুহায় থেকে থেকে তার চেহারা অবশ্যই আর চেনার জো ছিল না। আসলে, চেহারাই আর অবশিষ্ট নেই। শুধুই কঙ্কাল। ইউনিফর্মের কয়েকটা টুকরো তখনও লেগে ছিল। আর তার খুলিটা…
দয়া করে এখন একটু চুপ করবে, বাধা দিয়ে বলল মুসা। আমি এখন এই রাজকীয় খানা গেলার চেষ্টা করছি।
হাসল রবিন। মরা মানুষের কথা শুনলে ভয় পায় আমাদের মুসা। বিশেষ করে অপঘাতে মৃত্যুর কথা শুনলে। মুসার দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচিয়ে হাসল, খাওয়ার রুচিও মষ্ট হয়ে যায়, তাই না? আবার টনির দিকে তাকাল সে। ভূতের বড় ভয়।
ও, টনিও হাসল। ভাবনা নেই, ভূত হতে পারবে না। খ্রিস্টানদের মত করেই কবর দিয়েছি তাকে। আব্বা তার কবরের ওপর একটা ক্রুশ লাগিয়ে দিয়েছে। লিখে দিয়েছে মেসিকোর মহান মিলিটারি হিরো ইগনাসিওর স্মৃতির উদ্দেশ্যে। ইগনাসিও অ্যালেন্ড ছিল অনেকটা আমেরিকানদের জর্জ ওয়াশিংটনের মত, আর…
গুহার মধ্যে তুমি ঢুকেছিলে? প্রসঙ্গটা ভাল লাগছে না মুসার, অন্য বিষয়ে চলে যাওয়ার জন্যে বলল।
মাথা নাড়ল টনি। গাঁইতি আর শাবল দিয়ে কিছু পাথর সরিয়েছি। ওই পর্যন্তই। এর বেশি আর কিছু করতে পারিনি। পেসোগুলো দেখিনি। সে জন্যেই বিস্ফোরক কিনতে গেছে আব্বা।
কখন ফিরবেন? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
তিন-চার দিনের আগে না। গাঁয়ে যেতে বেশিক্ষণ লাগে না, মাত্র কয়েক ঘণ্টা। ওখানে ঘোড়া রেখে যাবে আব্বা। দুটো ঘোড়া নিয়ে গেছে। দরকার আছে। আসার সময় ভারি বোঝা বয়ে আনতে হবে। যাই হোক, আব্বা চলে যাবে চিহয়া হুয়ায়। ওটাই সব চেয়ে কাছের শহর, যেখানে ডিনামাইট আর দরকারী অন্যান্য জিনিস কিনতে পাওয়া যায়।
তার মানে, রবিন বলল। ডজকে আমাদেরই সামলাতে হবে। হয়তো ইসাবেলাকেও। তবে, আমরা চারজন। দুজন মানুষকে কাবু না করতে পারার

কিছু নেই।
নতুন বন্ধুদের দিকে তাকাল টনি। ভাল লাগছে আমার। একা আর সামলাতে হবে না ওদেরকে। আরও তিনজনের সাহায্য পাব। ডজের ব্যাপারে যে আমাকে সাবধান করে দিলে তার জন্যে আরেকবার ধন্যবাদ দিচ্ছি তোমাদেরকে। তোমরা আমাকে চিনতেও না।
ইয়ে... কিশোরের মনে পড়ল, ওদের পরিচয়ই এখনও দেয়া হয়নি টনির কাছে। শুধু নাম বলেছে। বলল, তোমার জন্যেই যে কেবল একাজ করছি, তা নয়। আমাদেরও আগ্রহ আছে। এটা আমাদের জন্যে আরেকটা কেস।
মানে? টনি বুঝতে পারছে না। ডিটেকটিভের মত কথা বলছ তুমি।
ডিটেকটিভই আমরা। শখের গোয়েন্দা। পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে দিল কিশোর।
অনেকক্ষণ কার্ডটার দিকে তাকিয়ে রইল টনি। ভুরু কোঁচকাল। তারপর বিড়বিড় করল, এটা কি ভাষা?
দেখি? আরে, বাংলাটা দিয়ে ফেলেছি। এটা আমার মাতৃভাষা।
তার মানে তুমি আমেরিকান নও? অবাক হলো টনি।
বাংলাদেশী। তবে আমেরিকার নাগরিকত্বও আছে আমার। ইংরেজিতে লেখা আরেকটা কার্ড বের করে দিল কিশোর।
সেটাও ঠিক মত পড়তে পারল না টনি। ইনভেসটিগেটরের উচ্চারণ করল নিভেসটিগেটর। শেষে কিশোরের হাতে দিতে দিতে বলল, তুমিই পড়ে শোনাও।
কার্ডের দিকে তাকানোর প্রয়োজন বোধ করল না কিশোর। জোরে জোরে বলল, কি লেখা আছে।
ও, আরেক দিকে চোখ ফিরিয়ে নিল টনি। বলল, আমি পড়তে পারি না, তা নয়। আসলে, ডিজলেকজিয়া আছে আমার। ওটা কি জাননা?
জানি, ঘাড় কাত করল রবিন। টনির জন্যে কষ্ট হল তার। এর মানে হল, অক্ষর উল্টোপাল্টা দেখ তুমি। ইটালিতে এই রোগ নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। রঙিন লেন্স দিয়ে এখনও চেষ্টা চলছে, সারানোর উপায় খুঁজছেন বিজ্ঞানীরা।
হ্যাঁ। বাড়ি ফিরলে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে বলেছে আম্মা। সেটা তো বাড়ি যাবার পর। এখানে তো আমি এখন পড়তে পারি না। খুবই কষ্ট হয়। চিঠিও পড়তে পারি না। তাই যোগাযোগ রাখার জন্যে অন্য ব্যবস্থা করেছি। টেপে কথা রেকর্ড করে আদান-প্রদান করি। আম্মা আমাকে টেপ পাঠায়, আমিও আম্মাকে টেপ পাঠাই।
কিছু বলল না কিশোর। মাথার ভেতরের মগজ নামের কম্পিউটারটা তার চালু হয়ে গেছে বেদম গতিতে।

আরেকটা ধাঁধার সমাধান হলো, বসে গেল খাপে খাপে। ইয়ার্ডের ডাকবাক্সে পাওয়া টেপটায় রেকর্ড করা ছিলঃ মেকসিকোতে এসো না, প্লীজ! মারাত্মক বিপদে পড়বে...

নিশ্চয় ওটা টনিরই কণ্ঠ ছিল। ওর মা কে কোন কারণে সতর্ক করে দিয়ে পাঠানো একটা দীর্ঘ চিঠিরই কিছু অংশ আবার রেকর্ড করা হয়েছিল। কিংবা বিশেষ বিশেষ জায়গাগুলো রেখে বাকি সব মুছে ফেলা হয়েছিল। তারপর রেখে আসা হয়েছিল ইয়ার্ডের ডাকবাক্সে। কিশোরকে ভয় দেখানোর জন্যে, হুমকি দেয়ার জন্যে এবং এটা করতে গিয়ে একটা চমৎকার সূত্র রেখে এসেছিল।

টনির দিকে তাকিয়ে হেসে জিজ্ঞেস করল কিশোর, তোমার আম্মা কি এখন লস অ্যাঞ্জেলেসে থাকেন?

হ্যাঁ। মনে হয়। আসলে, কখন যে কোথায়... চুপ হয়ে গেল টনি। আবার অন্য দিকে তাকাল। বলতে চায় না।

চাপাচাপি করল না কিশোর। তবে আরেকটা কথা জানা দরকার। তুমি কি তোমার আম্মার মত দেখতে? তোমার মতই সোনালি চুল?

হ্যাঁ। আমার মত চোখও নীল। কেন?

না, ভাবছি। হাই তুলল কিশোর। শুয়ে পড়ল লম্বা হয়ে। ঘুমালে কেমন হয়?

সবাই রাজি। কয়েক মিনিট পর ফুঁ দিয়ে মোমবাতি নিভিয়ে দিল ওরা। সুড়ঙ্গ মুখের কাছে ঝোলানো কম্বলটা গিয়ে খুলে নিয়ে এল টনি। স্লীপিং ব্যাগে ঢুকল চারজনেই। তারপর ঘুম।

পরদিন খুব সকালে ঘুম ভাঙল কিশোরের। দেখল, বাইরে থেকে সুড়ঙ্গমুখ দিয়ে যেন চুইয়ে চুঁইয়ে ঢুকছে আবছা আলো। প্রথমেই তাকাল, শারি কি করছে দেখার জন্যে। আরে! নেই তো!

তাড়াহুড়ো করে ব্যাগ থেকে বেরিয়ে এল সে। শারিকে খুঁজতে লাগল। গুহায় ঢোকার পথের ওপরই দেখতে পেল ওটাকে, বিশ গজ দূরে। তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। মাথা তুলে মোলায়েম ডাক ডাকল বারোটা। হুঁশিয়ারি নয়, বন্ধুত্বপূর্ণ। মুহূর্ত পরেই আরেকটা বারোর ডাক কানে এল, শারির ডাকের সাড়া দিল ওটা বাইরে থেকে। সুড়ঙ্গমুখের নিচে কোনখানে রয়েছে।

ইসাবেলের বারো, ভাবল কিশোর। দ্রুত সরে এল পেছনে। লুকিয়ে পড়ল পাথরের আড়ালে। মুহূর্ত পরেই তার পাশে চলে এল টনি, মুসা আর রবিন। ওরাও ডাক শুনেছে।

মোলায়েম ডাক বিনিময় চলতেই থাকল শারি আর অন্য বারোটার মধ্যে। তারপর একসময় দেখা গেল দ্বিতীয় বারোটাকে। পর্বতের ঢালের একটা নালা ধরে উঠে আসছে।

দুলকি চালে এগিয়ে গেল শারি। অন্য বারোটা কাছাকাছি এলে ওটার গায়ে গা ঘষতে শুরু করল।
ইসাবেলের ব্যরোর লাগাম এখনও পরানো রয়েছে, কিন্তু পিঠের বোঝাগুলো নেই। সূর্য উঠেছে। রোদ বাড়ছে, বাড়ছে আলো। আশপাশটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এখন। উঁকি দিয়ে দেখতে লাগল চারজনে।
ইসাবেলকে দেখা গেল না।
চলো, দুটোকেই গুহায় নিয়ে যাই, প্রস্তাব দিল মুসা। শারিকে দেখলেই বুঝে ফেলবে ইসাবেল, আমরা এখানে আছি।
কিশোর আর টনি মিলে দুটো বারোকে বলে বলে নিয়ে গেল গুহার ভেতরে। ওদের অনুসরণ করল অন্য দুজন।
ইসাবেলকে তোমরা পছন্দ করো না, তাই না? টনির প্রশ্ন।
ওই মহিলা আরেকটা ধাঁধা, কিশোর বলল। সে আমাদেরকে বলেছে ডজের ব্যাপারে তোমাদেরকে সাবধান করে দিতে। বলেছে, সে তোমাদের পরিচিত। বন্ধু। অথচ তুমি বলছ, কখনও দেখইনি। এর মানেটা কি? মনে হচ্ছে রবিনের কথাই ঠিক। ধাপ্পাবাজ মহিলা।
দুটো বারোই ক্ষুধার্ত। গুহার ভেতরে নিরাপদ জায়গায় এনেই ওগুলোকে খাবার দিল টনি, পানি ঢেলে দিল গামলায়। মুসা বসল রান্না করতে। তাদের সেই একই খাবার, বীন আর চাল সেদ্ধ।
একসাথে খেতে বসল না ওরা। বাসন নিয়ে সুড়ঙ্গমুখের কাছে চলে গেল কিশোর, পাহারা দেয়ার জন্যে। উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল সে, যাতে নিচ থেকে তাকে চোখে না পড়ে। আত্মগোপন করে রইল পাথরের আড়ালে। উঁকি দিয়ে মুখ বাড়িয়ে তাকিয়ে দেখল নিচের অঞ্চল। আঁতিপাতি করে খুঁজেও ইসাবেলকে চোখে পড়ল না।
কম্পনটা প্রথমে টের পেল বুকের কাছে। হৃৎপিন্ডের ঝাঁকি নয়, বাইরে থেকে আসছে। যেন পাহাড়ের অনেক গভীর থেকে আসছে। এতটাই জোরাল হলো, হাত থেকে চামচ পড়ে গেল। ভূমিকম্প নয়। লস অ্যাঞ্জেলেসে আজীবন বাস করে আসছে, ভূমিকম্প হলে কি হয় ভাল করেই জানে। এখনকারটা হঠাৎ কোন ঝাঁকুনি নয়। বরং মহাসড়কের ধারে দাঁড়ালে আর পাশ দিয়ে ভারি কোন লরি চলে গেলে যেমন কাঁপতে থাকে মাটি অনেকটা তেমন।
ঘণ্টাখানেক পরে তার জায়গায় পাহারা দিতে এল রবিন। সেই রকম কথা হয়েছে। এক এক করে সবাই দেবে, এক ঘণ্টা পর পর।
কাঁপুনি টের পেয়েছে কিনা জিজ্ঞেস করল কিশোর।
পেয়েছি, রবিন জানাল। ভূমিকম্পের মত কিন্তু মনে হলো না। অন্য রকম। এই পর্বতমালাকে বিশ্বাস নেই, বইয়ে পড়েছি। এখন তার প্রমাণ পাচ্ছি। কখন যে কি

ঘটে যাবে বলা মুশকিল। আচ্ছা, কাল যে বনে আগুন লাগতে দেখলাম... না, আগুন তো না, ধোঁয়া, এর কি ব্যাখ্যা, বলো তো?
ফিরে তাকাল সে। পেছনে কিছুই দেখতে পেল না। দেয়ালের মত দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়ের উঁচু চূড়া। গুহামুখের ওপর থেকে উঠে গেছে অনেকখানি।
কুইন সাবে? রবিনের প্রশ্নের জবাব দিল কিশোর। অর্থাৎ, জানে না।
পাহারায় বসল রবিন। নিচের দিকে তাকিয়ে ইসাবেলকে খুঁজতে লাগল তার চোখ।
কিশোর যখন এসেছিল, তার দুই ঘণ্টা পরে এসে রবিনকে মুক্তি দিল মুসা। নিচে তাকিয়ে মনে হলো তার, একটা নড়াচড়া দেখতে পেয়েছে। স্পষ্ট বুঝতে পারল না। পাখির ডাক ডেকে গুহার ভেতরে বন্ধুদেরকে জানিয়ে দিল তার সন্দেহের কথা।
কোথায়? সুড়ঙ্গমুখের কাছে আবার উপুড় হয়ে শুয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর।
এই যে, ওখানটায়। বাঁয়ে হাত তুলে দেখাল মুসা।
চারজনেই দেখতে পেল, অনেক নিচে মূর্তিটাকে।
একজন লোক। মাথায় স্টেটসন হ্যাট। হাতে রাইফেল নিয়ে ধীরে ধীরে উঠে আসছে এদিকেই।
ডজ মরিস।
গুহায় লুকিয়ে থাকার কোন মানে নেই, কিশোর বলল। ডজ আসতে চাইলে ঠিকই চলে আসবে চিহ্ন দেখে দেখে। গুলি করতে করতে ঢুকলে তখন আমাদের কিছুই করার থাকবে না...
তাহলে লুকিয়ে থেকে প্রথম আক্রমণটা আমাদেরকেই করতে হবে, বলল রবিন।
হ্যাঁ, মাথা ঝাকাল কিশোর। একটা বুদ্ধি এসেছে মাথায়। এতে কাজ হতেও পারে। বলে ফেল।
চলো, ভেতরে গিয়ে বসি। এখানে প্রাইভেসি নেই। হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে আরম্ভ করল কিশোর। তাকে অনুসরণ করল অনন্যরা।
মিনিটখানেক পরে কিশোর, টনি আর রবিন বেরিয়ে এল আবার। টনির হাতে তার রাইফেল। বুকের কাছে ধরে রেখেছে। অপেক্ষা করে রইল ডজ পথের বাঁকে অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত। তারপর দ্রুত নামতে শুরু করল। পাথরে পা পিছলে যাচ্ছে, পরোয়াই করল না। নেমে চলে গেল একটা বড় পাথরের আড়ালে। তাকে অনুসরণ করে গিয়ে রবিনও লুকিয়ে পড়ল।
সুড়ঙ্গমুখের কাছে পড়ে আছে কিশোর। মাথা নিচু করে রেখেছে। যতটা না হলে ডজকে দেখতে পাবে না তার বেশি তুলছে না। রাইফেল বাগিয়ে সাবধানে উঠে আসছে ডজ, শারির পায়ের ছাপ দেখে দেখে। বিশ গজের মধ্যে চলে এল ডজ।
ডজ! চিৎকার করে বলল কিশোর, ডজ! আমি, টনি!

টনি! ঝট করে ট্রিগার গার্ডের ভেতর আঙুল চলে গেল ডজের। কোথায় তুমি?
এই যে এখানে, ওপরে, চেঁচিয়ে জবাব দিল কিশোর। আমার হাতে রাইফেল আছে। আপনার দিকে তোলা।
হেসে উঠল ডজ। তাহলে করো গুলি। ঠিক কোথায় আছ তুমি, জেনে যেতে পারব তাহলে। তারপর খুলি ছাতু করে দেব।
নালার ঠিক মাঝখান দিয়ে এসেছে পায়েচলা পাহাড়ী পথ। সেটা ধরে আবার এগোতে লাগল সে। উঠে আসতে থাকল ওপরে।
কি চাই আপনার? ভয় পেয়েছে যেন, কণ্ঠস্বরকে এমন করে তুলল কিশোর। এখানে এসেছেন কেন?
কথা বলতে। তুমি আর তোমার বাবার সঙ্গে পঞ্চো ভিলার ব্যাপারে কথা বলতে চাই।
রাইফেল ফেলে দিন! কর্কশ কণ্ঠে আদেশ দিয়ে পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল টনি। ডজের পেছনে। নলের মাথা দিয়ে জোরে গুতো মারল লোকটার পিঠে।
অবাক হয়ে গেল ডজ। বিমূঢ়।
কি হলো? ফেলছেন না কেন? আবার গুতো লাগাল টনি। কিশোরের বুদ্ধি কাজে লেগেছে। তার ফাঁদে পা দিয়ে বোকা বনেছে ডজ। সে ভেবেছিল টনির সঙ্গেই বুঝি কথা বলছে। কি কান্ড! মুহূর্ত আগে ছেলেটার কথা শুনেছে ওপরে, এখন শুনছে পেছনে। রাইফেল ফেলল না সে। তবে দ্বিধায় পড়ে গিয়ে নামাতে বাধ্য হলো।
এদিকে ফিরবেন না। মাথাও ঘোরাবেন না। আবার কঠোর গলায় আদেশ দিল টনি।
কিশোর যা আশা করেছিল তাই ঘটল, অন্তত ঘটার উপক্রম হলো।
লাফ দিয়ে আড়াল থেকে বেরিয়ে এল রবিন।
মাথা না ঘোরাতে বলা হয়েছে, তবু ঘোরাতে গেল ডজ। সবে অর্ধেকটা ঘুরিয়েছে ঘাড়, এই সময় বেরোল রবিন। কাজেই তাকে চোখে পড়ল না ওর।
এক হ্যাচকা টানে ডজের হাতের রাইফেল কেড়ে নিয়ে দশ গজ দূরের একটা ক্যাকটাস ঝোপে ফেলে দিল রবিন।
গর্জে উঠল ডজ।
কারাতে যোদ্ধার পজিশন নিয়ে ফেলেছে রবিন। মুসার মত অতটা ওস্তাদ নয় সে, অত শক্তি কিংবা ক্ষিপ্রতাও নেই, তবে মন্দ বলা যাবে না। তার বিশ্বাস, ডজকে কাবু করে ফেলতে পারবে।
কিন্তু রবিনকে আক্রমণ করল না ডজ। আচমকা চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরল। হাত লম্বা করে দিয়েছে। ধাপ করে খোলা আঙুলের থাবা গিয়ে বাড়ি মারল টনির মাথায়। টলে উঠে পিছিয়ে গেল টনি। লাফিয়ে এগিয়ে গেল রবিন। কিন্তু ততক্ষণে

টনির রাইফেলের নল চেপে ধরেছে ডজ। জোরে এক মোচড় দিয়ে হ্যাচকা টান দিতেই অস্ত্রটা চলে এল তার হাতে। পিছিয়ে গিয়ে সেটা তুলে ধরল রবিনের দিকে। দাঁত বের করে হিসিয়ে উঠল, বিচ্ছুর দল! হাঁটো। নিচের দিকে। রাইফেলের রেঞ্জের বাইরে যাওয়ার আগে থামবে না।
অস্ত্রহীন হয়ে গেছে। কিছুই করার নেই আর দুজনের। টনি কিছু করার চেষ্টা করলেই তাকে গুলি করবে ডজ। ধীরে ধীরে নামতে শুরু করল দুজনে।
পথ ধরে নেমে গেল প্রায় একশো গজ। তারপর ঘুরল ডজ। উঠতে শুরু করল কিশোরের দিকে।
কয়েক গজ উঠে চিৎকার করে ডাকল, বেরিয়ে এসো! নইলে গুলি শুরু করব!
উঠে দাঁড়াল কিশোর। ট্রিগারে আঙুল চেপে বসল ডজের। আরেকটু বাড়লেই গুলি বেরিয়ে যাবে।
বেশ, নেমে এসো এবার। দ্রুত চলে যাও বন্ধুদের কাছে। তবে আগে কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দাও।
লোকটাকে জুডোর প্যাচে ফেলার সুযোগ খুঁজতে লাগল কিশোর। কিন্তু রাইফেলের নল যেভাবে ওর দিকে মুখ করে আছে তাতে কিছু করা সম্ভব নয়।
টনির বাবা কোথায়? জানতে চাইল ডজ।
দ্রুত ভাবনা চলছে কিশোরের মাথায়। ডজকে বিশ্বাস করাতে হবে গুহার ভেতরে কেউ নেই।
মুসাকে নিয়ে পানি আনতে গেছে।
ওদের দেখা পাব কি করে? ঝর্নাটা মাইল দুই দূরে। পাহাড়ের আরেক পাশে। এখন থেকে দেখা যায়।
আলতো করে মাথা ঝাঁকাল একবার ডজ হাসল তালগে পেসোগুলোকে পাহারা দেয়ার এখন কেউ নেই, তুমি ছাড়া। এখন গিয়ে তোমার বন্ধুদের সঙ্গে বসে থাক। লুকিয়ে থাকবে। আমার চোখে যাতে না পড়। পিঠে ওলি খেতে না চাইলে জলদি ভাগ।
হতাশ ভঙ্গি করল কিশোর। পরাজিত, বিধ্বস্ত হয়ে যেন দ্রুত নামতে শুরু করল নালার ভেতর দিয়ে।
ও পাথরের আড়ালে হারিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল ডজ। তারপর মাথা নিচু করে দুহাতে রাইফেল ধরে ঢুকল সুড়ঙ্গের ভেতরে।
ওকে আসতে শুনল মুসা। গুহার ঠিক ভেতরেই অপেক্ষা করছে। আশা করছে, মাথা নিচু করেই ঢুকবে ডজ, ঢুকতে হবে ওভাবেই। ঘাড়ে কারাতের কোপ মারার জন্যে চমৎকার একটা সুযোগ পেয়ে যাবে তাহলে।

হাত তুলল সে। আঙুলগুলো সোজা করে শক্ত করে রেখেছে, গায়ে গায়ে চেপে লেগে রয়েছে একটা আরেকটার সঙ্গে। এভাবে ডজের ঘাড়ে একটা কোপই যথেষ্ট। মাথা তোলার আর সুযোগ পাবে না। ঢলে পড়বে মাটিতে।
গুহায় ঢুকল ডজ। সাপের মত ছোবল হানল যেন মুসার উদ্যত হাত। কিন্তু একটা বারো শব্দ করে ফেলল আর শেষ মুহূর্তে মাথা সোজা করে ফেলল লোকটা। মুসার কোপটা ঘাড়ে না লেগে লাগল তার কাঁধে। হোঁচট খাওয়ার মত ঝাঁকুনি খেয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেল তার শরীরটা। হাত থেকে রাইফেল ছাড়ল না।
লাফ দিয়ে পেছনে চলে এল মুসা। আরেকবার আঘাত হানার জন্যে উঠে গেল হাত। কিন্তু সামলে নিয়েছে ততক্ষণে ডজ। রবিন আর টনিকে পরাজিত করার সময় যেমন বিদ্যুৎ খেলে গিয়েছিল শরীরে, তেমনি খেলল আরেকবার। অসাধারণ ক্ষিপ্র লোকটা। চিতাবাঘকেও হার মানায়। কখন ঘুরল বুঝতেই পারল না যেন মুসা। শুধু দেখল, তার দিকে ঘুরে গেছে ডজ। রাইফেলের নল বুকের দিকে তাক করা।
হাত নামাল মুসা।
পরমুহূর্তে আন্দাজ করল, ডজের তুলনায় তার একটা সুবিধা বেশি। রোদ থেকে ভেতরে এসেছে লোকটা, তীব্র আলো থেকে আবছা অন্ধকারে, চোখে সয়নি এখনও। দ্রুত কিছু করতে পারলে হয়ত কাবু করে ফেলতে পারবে ডজকে, গুলি করার আগেই।
একপাশে সরে গেল সে। বোঝার চেষ্টা করল, ডজ দেখতে পেয়েছে কিনা, কিছু করতে গেলে গুলি খাবে কিনা। কিছুই বুঝতে পারল না। এতগুলো ঘটনা ঘটে গেল মুহূর্তের মধ্যে। ঝুঁকি নিল সে। একপায়ের গোড়ালিতে ভর দিয়ে ঘুরল। পাক শেষ হওয়ার আগেই ঝট করে ওপরে তুলে সোজা বাড়িয়ে দিল ডান পাটা। ডজের বুকের সামান্য নিচে লাগল লাথি।
পুরো একটা সেকেন্ড বাঁকা হয়ে রইল ডজ। শ্বাস নিতে পারছে না।
যথেষ্ট সময় পেল মুসা। লাফিয়ে সামনে এগিয়ে কনুই দিয়ে একেবারে মেপে একটা ভয়াবহ আঘাত হানল ডজের ঘাড়ে। মারটা আরেকটু জোরে হলে মরেই যেত র‍্যাঞ্চার।
ওটোশি-হিজি-অ্যাটি সহ্য করে দাঁড়িয়ে থাকা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়, ডজও পারল না। ঢলে পড়ল মেঝেতে। কিছু সময়ের জন্যে বেঁহুশ।
অন্য তিনজন যখন গুহায় ঢুকল, তখনও মেঝেতেই পড়ে আছে সে। দড়ি বের করে শক্ত করে বাঁধল তাকে টনি। খানিক আগেও রাইফেল হাতে যে হম্বিতম্বি করছিল, সে এখন পুরোপুরি অসহায়। তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে চারজনে।

উত্তেজনা টের পেয়েই বোধহয় খাওয়া থামিয়ে দিয়েছিল বারো দুটো। আবার মুখ নামিয়ে জই তুলে নিয়ে চিবাতে শুরু করল।
মিনিট খানেক পর রবিন বলল, হুঁশ ফেরে না কেন? দশ পর্যন্ত গুনি।
দরকার কি গোনার, কিশোর বলল। যখন ফেরে ফিরবে।
বাইরে বেরিয়ে এল চারজনে।
যেভাবে আশা করেছিলাম ঠিক সেভাবে ঘটল না, হাসল কিশোর। মুসাই শেষ রক্ষা করল। নইলে গিয়েছিল সব ভন্ডুল হয়ে।
হেসে বাতাসেই হাত দিয়ে একটা কোপ মারল মুসা। জিনিস বটে, কারাতে। খালি দুটো হাত আর পা-ই যথেষ্ট, মারাত্মক অস্ত্র হয়ে যায় ব্যবহারের গুণে।
ঠিক, রবিন বলল। কোন দিন ব্রুস লী হয়ে যাও কে জানে! কিশোর, এরপর কি করব আমরা?
প্রথমে ডজের রাইফেলটা বের করে আনব, কিশোরের আগেই জবাব দিল টনি। একটা রাইফেলের চেয়ে দুটো থাকলে অনেক সুবিধে।
দ্রুত সেই ক্যাকটাসের ঝোপে নেমে এল ওরা, যেখানে রাইফেলটা ছুঁড়ে ফেলেছিল রবিন। খুঁজতে শুরু করল।
খুঁজেই চলল, খুঁজেই চলল। প্রতিটি খাঁজ, গর্ত, পাথরের ফাঁকফোকর, কিছু বাদ দিল না। প্রতিটি কাঁটাওয়ালা ক্যাকটাসের পাতা সরিয়ে সরিয়ে দেখল।
পাওয়া গেল না রাইফেলটা।
ইসাবেল! রবিন বলল, ধারেকাছেই কোথাও ছিল। নিয়ে গেছে।
নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে লাগল কিশোর। কয়েকবার জোরে জোরে চিমটি কাটার পর বলল, আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে।
কত বুদ্ধি যে থাকে তোমার মাথায়! গুঙিয়ে উঠল মুসা।
আমার ধারণা, কিশোর বলল, ইসাবেল এখানে কোথাও লুকায়নি। চিন্তিত ভঙ্গিটা রয়ে গেছে। ঘাঁটিতে ফিরে গেছে সে।
ঘাঁটি, ভুরু কোঁচকাল মুসা। সেটা আবার কি?
বারোর পিঠ থেকে মালপত্র নামিয়ে নিয়ে গেছে, যাতে কোথাও ক্যাম্প করতে পারে। মিস্টার সাইমন জানিয়েছেন আমাকে, বারোরা খুব বিশ্বস্ত জানোয়ার। সেটার প্রমাণও পেয়েছি আমরা। মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব হলে তাকে আর ছাড়তে পারে না। ফিরে ফিরে যায় তার কাছে। এখন ইসাবেলের বারোটার আকর্ষণ শারির ওপর বেশি, তাই যেতে চাইছে না। কিন্তু যদি শারিকে ওর সঙ্গে যেতে দিই, তাহলে নিশ্চয় পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে আমাকে ইসাবেলের কাছে। যেখানে ঘাঁটি করেছে মহিলা।

তোমাকে? বাঁকা চোখে কিশোরের দিকে তাকাল রবিন। একাই সব ক্রেডিট নিতে চাও? আমরা বাদ পড়ব কেন? সবাই গেলে অসুবিধে কি?
অসুবিধেটা হলো, চারজন অনেক বেশি। একসাথে গেলে দেখে ফেলতে পারে ইসাবেল। আমি একা হলে সারাক্ষণ বারোগুলোর আড়ালে লুকিয়ে থেকে এগুতে পারব। আর শারিকে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা তোমাদের নেই। কাজেই আমাকেই যেতে হচ্ছে।
চুপ হয়ে গেল রবিন। সঙ্গে যাবার মত জোরাল যুক্তি দেখাতে পারল না আর কেউ।
ইসাবেলের ব্যাপারে অদ্ভুত একটা ধারণা বাসা বাঁধছে কিশোরের মনে। ধারণাটা হয়েছে খুব ক্ষীণ সূত্র থেকে। ক্যাম্পের সামান্য আলোয় দেখা কব্জির দাগ। রবিন বলছে কন্ট্যাক্ট লেন্স পরে মহিলা। সামান্য সূত্র, তবে অবহেলা করা উচিত নয়। অতি সাধারণ জিনিসও মাঝে মাঝে জটিল রহস্যের সমাধান করে দেয়। ইসাবেলের কব্জিতে দাগ সত্যিই আছে কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার একটাই উপায়, আরেকবার কাছে থেকে ভালমত দেখা।
বেশ, যাও, মুসা বলল অবশেষে। তবে সাবধানে থেক। মহিলার কাছে এখন একটা রাইফেল আছে।
বারোদুটোকে গুহা থেকে বের করে আনল টনি। জানাল, ডজের হুঁশ ফিরেছে। আমাকে দেখেই গালাগাল শুরু করল। ছাড়া পেলে আমাকে কি কি করবে, পরিষ্কার করে জানিয়ে দিয়েছে।
ইসাবেলের বারোর পেটে জোরে এক চাপড় মারল কিশোর। চলতে শুরু করল ওটা। পাশে পাশে এগোল শারি। কিশোর ঢুকে পড়ল দুটো জানোয়ারের মাঝখানে। মাথা নুইয়ে রেখেছে, যাতে সহজে কারও চোখে না পড়ে।
ওপরেও উঠল না বারোদুটো, নিচেও নামল না। যতটা সম্ভব সমান্তরাল জায়গা ধরে চলতে লাগল। এখানকার পাহাড়ের এটা এক অদ্ভুত ব্যাপার। খাড়া ঢাল আছে, আবার অনেকখানি জায়গা জুড়ে ঢালের গায়ে সমান জায়গাও আছে, টেবিলের মত।
ওপর দিকে মুখ তুলতে আরও অনেক গুহামুখ নজরে পড়ল কিশোরের। কিন্তু মাটিতে কোন চিহ্ন দেখতে পেল না, যেগুলো বলে দেবে কোন গুহাঁটার দিকে মানুষ গেছে।
চলছেই ইসাবেলের বারো। তারপর কোন রকম জানান না দিয়েই আচমকা থেমে গেল।
ওটার পাশে থমকে দাঁড়াল শারি। মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল কিশোর। শখানেক গজ ওপরে পাহাড়ের গায়ে একটা ফাটল মত চোখে পড়ল। পাথরের

আড়ালে থেকে, যতটা সাবধানে সম্ভব ক্রল করে এগোল সেটার দিকে।
তাকে অনুসরণ করল না ইসাবেলের বারো। তবে নড়লও না। যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। কাছেই হোট একটা সে ঝোঁপ দেখতে পেয়ে সেদিকে এগিয়ে গেল শারি। পাতা ছিড়ে চিবাতে শুরু করল। দেখাদেখি অন্য বারোটাও গিয়ে তাতে মুখ দিল। কোন শব্দ করল না।
ভুল করলাম না তো? ভাবল কিশোর। পাহাড়ের এই সরু ফাটলে নিশ্চয়ই ঢোকার পথ নেই। আর তাহলে ওখানে ক্যাম্প করাও সম্ভব নয় ইসাবেলের পক্ষে। তবু, আরেকটু কাছে এগিয়ে দেখা যাক, কিছু আছে কিনা।
ঘাড়ে হাত পড়ল এই সময়, শীতল স্পর্শ। শক্ত করে চেপে ধরেছে যেন।
তার মুখের কাছ থেকে একটু দূরেই মাটি থেকে যেন গজিয়ে উঠেছে জিনিসটা। আসলে গেড়ে দেয়া হয়েছে। একটা কাঠের ক্রুশ। আড়াআড়ি বাঁধা দুটো কাঠের বাঁধনের কাছের একটা কোণ আটকে গিয়েছিল ওর ঘাড়ে, মাথা তোলার সময়।
নাম খোদাই করা রয়েছে ক্রুশটাতে। ইগনাসিও।
পেয়ে গেল তাহলে! গুহার বাইরেই কবর দেয়া হয়েছে কংকালটাকে। তার মানে কাছেই কোথাও রয়েছে পঞ্চো ভিলার গুহা। যেটাতে লুকানো রয়েছে পেসোগুলো।
ইসাবেল কি দেখে ফেলেছে? ওই গুহাতে গিয়েই ক্যাম্প করেছে সে? নাকি ওপরে উঠে বসে আছে কোনখানে? ওই ফাটলের ভেতর?
ওপরে থেকে থাকলে এতক্ষণে বারোদুটোকে দেখে ফেলার কথা। দেখে থাকলে জানার চেষ্টা করবে কেন এসেছে ওগুলো।
মাটিতে লম্বা হয়ে পড়ে রইল কিশোর। অপেক্ষা করছে।
মিনিটখানেকের বেশি থাকতে হলো না। মেকসিকান মহিলার পরিচিত মূর্তিটা চোখে পড়ল। পশমের তৈরি ঢিলাঢালা স্কার্ট, লাল শাল, কালো বেনি। গুহা থেকে বেরিয়ে তাকিয়ে রয়েছে নিচে বারো দুটোর দিকে।
হাতে রাইফেল। বোল্ট টানার শব্দ কানে এল কিশোরের।
যাও। নিজেকে বলল কিশোর। সময় হয়েছে ইসাবেল সম্পর্কে সমস্ত কথা জানার।
মাথা নামিয়েই রাখল সে। ভাবছে, যদি তার অনুমান ভুল হয়ে যায়? যদি তার সন্দেহের জবাব রাইফেলের বুলেট দিয়ে দেয় ইসাবেল?
ঝুঁকি না নিলে জানা যাবে না। চিৎকার করে বলল সে, আম্মা, আমি! আমি টনি, আম্মা!
কিশোরের জীবনের দীর্ঘতম দশটি সেকেন্ড নড়ল না ইসাবেল।
তারপর রাইফেল হাত থেকে ফেলে দৌড়ে নামতে লাগল কিশোরের দিকে।

টনি! চেঁচিয়ে বলছে মহিলা, টনি! কোথায় তুই, বাবা! ঠিক আছিস? ভাল আছিস? স্প্যানিশ ছাড়া অন্য ভাষা না জানার ভান করছে না এখন। পরিষ্কার ইংরেজিতে বলছে।
উঠে দাঁড়াল কিশোর। হ্যাঁ, টনি ভালই আছে। চালাকিটা করার জন্যে আমি দুঃখিত। তবে এছাড়া আপনার সাহায্য পাওয়ার আর কোন উপায় ছিল না। আমাদের সবারই সাহায্য দরকার। টনিরও।
কয়েক গজ দূরে থমকে দাঁড়িয়েছে ইসাবেল। আরও দশটি সেকেন্ড কিশোরের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। হাসল অবশেষে।
এসো, ডাকল সে। বলো আমাকে, কি হয়েছে।
ফিরে তাকাল কিশোর। শান্ত ভঙ্গিতে পাতা ছিড়ছে বারোদুটো। খাওয়া নিয়ে ব্যস্ত। আর কোনদিকে নজর নেই। মহিলাকে অনুসরণ করে ফাটলটার দিকে এগোল সে।
ডজ কোথায়? রাইফেলটা তুলে নিয়ে জিজ্ঞেস করল মহিলা। পাহাড়ের নিচে যতদূর চোখ যায় তাকিয়ে দেখল লোকটা আছে কিনা।
ওকে নিয়ে ভাবনা নেই, গুহায় কি ঘটেছে জানাল কিশোর।
মাথা ঝাঁকাল ইসাবেল। সেফটি ক্যাচ অন করে দিল। টনি আর ওর বাবার চিন্তায় মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছিল আমার। কাল এই গুহাঁটা দেখেছি আমি। ভেতরে দুজনের জিনিসপত্র পড়ে আছে। কিন্তু ঘোড়ার পায়ের ছাপ সব পুরানো। তাই বুঝতে পারিনি কোথায় গেছে ওরা।
কিশোর জানাল, টনির বাবা গেছে ডিনামাইট কিনতে, যাতে গুহার মুখে পড়ে থাকা পাথরের স্তূপ উড়িয়ে দিতে পারে। পঞ্চো ভিলার গুহায় ঢুকতে চায় দুজনে। কয়েকদিনের মধ্যেই ফিরে আসবেন টনির বাবা।
ডজের রাইফেল পেলেন কি করে? জানতে চাইল কিশোর।
রাতে আমি ঘুমিয়ে থাকার সময় বারোটা ছুটে গেল। আজ সকালে খুঁজতে বেরোলাম। ওটাকে তো পাইনি, পেলাম এই রাইফেলটা, একটা ক্যাকটাসের গোঁড়ায়। এতে ডজের নাম খোদাই করা রয়েছে। ডজকে দেখলাম না কোথাও। মনে হল, এটা একটা ফাঁদ হতে পারে। হয়ত আরেকটা রাইফেল নিয়ে কোথাও ঘাপটি মেরে আছে সে। কিংবা বুটের মধ্যে যে ছুরিটা লুকিয়ে রাখে, সেটা হাতে নিয়ে। তাড়াতাড়ি চলে এলাম তখন এখানে। কারণ এদিক থেকে তাকে বেরোতে দেখেছিলাম।
হাসল কিশোর। ইসাবেল যখন রাইফেল তুলে নেয়, তখন ডজের কি অবস্থা সেটা ভেবে। ওই লোকটা লুকিয়ে ছিল না, ছিল হাত-পা বাঁধা অবস্থায় মেঝেতে পড়ে। আর কয়েক মিনিট আগে গেলেই সব দেখতে পেত ইসাবেল। রবিন যেখানে

রাইফেল ছুঁড়ে ফেলেছিল, সেখান থেকে টনির গুহাঁটা দেখা যায় না। সেজন্যেই ওটাও দেখতে পায়নি ওর মা।
আবার হাসি ফুটেছে ইসাবেলের মুখে। কি করে বুঝলে আমিই টনির মা? স্প্যানিশ ছাড়া আর কিছু বলিনি আমি। আর এই পোশাকে একটুও আমেরিকান মনে হয় না আমাকে।
শালটা হাতে নিয়ে এক বেনি ধরে টান দিল সে। খুলে চলে এল কালো পরচুলা। পকেটে ভরে রেখে আঙুল চালাল সোনালি চুলে।
মনে হচ্ছিল। স্রেফ সন্দেহ। একটা মুহূর্ত চুপ করে রইল কিশোর। দুটো ব্যাপার পরিষ্কার হওয়া দরকার। সেদিন রাতে আগুনের ধারে বসে যখন কথা বলছিলেন, বার বার হাতের ঘড়িটাকে নিচ থেকে ওপরে ঠেলে তুলছিলেন। চামড়ায় হালকা রঙের একটা দাগ দেখেছিলাম…
নিজের হাত দেখাল কিশোর। এই অভিযানে এসে দীর্ঘ সময় রোদে কাটিয়ে চামড়ার রঙ অন্যরকম হয়ে গেছে। হাত ঘড়ি খুলে নিল সে। সর্বক্ষণ ঘড়ি বাঁধা থাকায় কব্জির কাছে একটা রিঙ তৈরি হয়েছে। ওখানটাতে রোদ লাগতে পারেনি, ফলে চামড়ার আসল রঙ রয়ে গেছে। যেখানে যেখানে রোদ পড়েছে ওখানকার চামড়ার রঙ গাঢ়।
মেকসিকানদের চামড়ার রঙ সাধারণত বাদামী হয়, বলল সে। সারাক্ষণ হাতে ঘড়ি বাঁধা থাকলে ওখানকার চামড়ার রঙ বড় জোর বাদামী হবে, সাদা হতে পারে না কিছুতেই। কিন্তু অ্যাংলোদের চামড়া হয়ে যায় ফ্যাকাসে সাদা।
মাথা ঝাকাল ইসাবেল। খুব চালাক ছেলে তুমি, আমার টনির মত।
আমার বন্ধু রবিনের চোখে পড়েছে আরেকটা জিনিস। আপনার কন্টাক্ট লেন্স। অভিনয় করার সময় অনেক সময় ওসব পরে নেয় অভিনেতারা, ছবিতে তাদের চোখের রঙ বদলে দেয়ার জন্যে। সেটা যখন বলল আমাকে রবিন, সন্দেহটা আপনার ওপর বাড়ল আমার। সূত্রও বলতে পারেন এগুলোকে। মনে হতে লাগল, বাদামীটা আপনার শরীরের স্বাভাবিক রঙ নয়, আর চোখের রঙও মেকসিকানদের মত গাঢ় বাদামী নয়।
না, তা নয়। মাথা নিচু করে লেন্স দুটো বের করে আনল ইসাবেল। বেরিয়ে পড়ল চোখের আসল রঙ। একেবারে টনির মত, নীল। লেন্সগুলো একটা প্লাস্টিকের কেসে ভরে রেখে দিল স্কার্টের পকেটে।
তাছাড়া, কিশোর বলল, আপনাকে ইংরেজি বলতেও শুনেছি আমি। তবে, স্প্যানিশে যখন কথা বলছিলেন, তখন সত্যিই আপনার গলা চিনতে পারিনি। আপনিই আমাকে র‍্যাঞ্চে ফোন করে বলেছিলেন লেকের ওপাড়ের গায়ে যেতে।

কিশোরের হাত ধরল ইসাবেল। আমি সত্যি দুঃখিত। পিরেটো আমাকে ওই বুদ্ধি বলেছিল। আমি কল্পনাই করতে পারিনি, দাঁড়টা এতটা পচা। আমি তোমাকে খুন করতে চাইনি। কেবল ভয় দেখানোর চেষ্টা করছিলাম…
যাতে শারিকে নিয়ে এখানে আসতে না পারি?
মাথা ঝাকাল ইসাবেল। আমি আতঙ্কের মধ্যে ছিলাম। ডজ এসে টনি আর ওর বাবাকে খুঁজে পেলে খুন করতে পারে, এই ভয়ে। পেসোগুলো পাওয়ার জন্যে সব করতে পারে সে। থামল মহিলা। এতই ভয় পেয়েছিলাম আমি, আরও বোকামি করেছি। বাসে তোমাদেরকে ঠেকাতে চেয়েছি, যাতে র‍্যাঞ্চে ঢুকতে না পার। তারপর সেদিন রাতে শারিকে চুরির চেষ্টা করেছি। আমার বোঝা উচিত ছিল, ও আমাকে কাছেই ঘেঁষতে দেবে না।
একটা পাথরের আড়াল থেকে ওয়াকিটকি বের করল ইসাবেল। ফিতে আছে ওটার। কাঁধের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাইফেলটা হাতে তুলে নিল আবার। চলো। টনির গুহায়। ওকে দেখার জন্যে অস্থির হয়ে গেছি আমি।
পিরেটোর সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে? জিজ্ঞেস করল কিশোর। ও, তাহলে এটাও জানো! সবই জানো দেখা যায়!
দুটো বারোকে নিয়ে চলেছে কিশোর। হাসল। অনেক কিছুই অজানা আছে এখনও। এই ধরুন; আপনার আসল নাম। ইসাবেল আপনার নাম নয়, তাই না?
না, নেলি। তবে তুমি ইসাবেল বলেই ডাকতে পারো।
আসলে, আমি এমন এক দেশের মানুষ, যেখানে বয়স্কদের নাম ধরে ডাকার নিয়ম নেই। সেটা অভদ্রতা। আমেরিকায় থাকলে কি হবে, রক্তের টান আর সামাজিকতা তো ভুলতে পারি না। আপনাকে আমি আন্টি বলেই ডাকব। নেলিআন্টি।
হাসল ইসাবেল। আচ্ছা, ডেকো।
কিশোর আগের কথার খেই ধরল, আমি জানি পিরেটোর একটা ওয়াকিটকি আছে। নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, আমিই মেরামত করে দিয়েছি। আর সেদিন রাতে যখন আমাদের সঙ্গে কথা বলতে এলেন আপনি তখন রবিন আপনারটা দেখে ফেলেছিল।
উদ্বিগ্ন ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল ইসাবেল। আজ সকালে পিরেটোর সঙ্গে যোগাযোগ করার অনেক চেষ্টা করেছি। জবাব নেই। শেষবার যখন কথা বলেছি, বেশি দূরে ছিল না সে। বড় জোর একদিনের পথ। এতক্ষণে চলে আসার কথা…কিছু হয়েই গেল কিনা… দ্বিধা করল মহিলা। ডজ ওকে দেখে ফেলেছে কিনা কে জানে! তাহলে মেরে ফেলবে!
ডজ জানে পিরেটো ওর পিছু নিয়েছে?

না জানলেও আন্দাজ করতে বাধা কোথায়? হতে পারে, এ কারণেই ঘোড়ার পা খারাপের ছুতো দিয়ে রয়ে গিয়েছিল পেছনে। তারপর ঘুরে চলে গিয়েছিল, পিরেটোর জন্যে ঘাপটি মেরে ছিল কোথাও। আমাকেও দেখে থাকতে পারে। একটা বারো আর একজন মেকসিকান মহিলাকে কেয়ারই করবে না সে। কিন্তু পিরেটোকে করবে। ঠেকানোর জন্যে খুন করবে। আবার দ্বিধা করল ইসাবেল। হয়তো করে ফেলেছেও!

আপনি অযথা ভয় পাচ্ছেন, মহিলাকে অভয় দেয়ার চেষ্টা করল কিশোর। পিরেটোকে আমি চিনেছি। ডজ চালাক, সন্দেহ নেই। পিরেটো তার চেয়েও অনেক চালাক। ও অন্য জিনিস।

হ্যাঁ, নিজেকে সান্ত্বনা দেয়ার ভঙ্গিতেই যেন বলল ইসাবেল। ঠিকই বলেছ।

দ্রুত পা চালিয়েছে ওরা। যেতে যেতে কিশোর জানাল, কি করে ডজ তাকে ব্যবহার করেছে পঞ্চো ভিলার গুহা খুঁজে দেয়ার কাজে।

টনির সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছে ইসাবেল, বলল। টেপে রেকর্ড করা কথার চিঠি নিয়মিত পাঠায় টনির নামে পর্বতের ওপাশের গায়ে। টনিও তার জবাব পাঠায় লস অ্যাঞ্জেলেসে। সুতরাং শারির অন্ধ হওয়া থেকে শুরু করে পশু ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত সব খররই জানে মহিলা। টনি এ-ও জানিয়েছে, সাবধান করে দিয়েছে, ডজ হয়তো শারির সাহায্যে তাকে আর তার বাবাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে পারে পেসোগুলোর জন্যে।

তারপর পিরেটোর কাছ থেকে একটা চিঠি পায় ইসাবেল। তাতে জানিয়েছে, লস অ্যাঞ্জেলেসে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছে ডজ। সেখানে কোথায় উঠবে সে, তা-ও জানিয়েছে পিরেটো। ক্রসওয়ার্ড পাজল প্রতিযোগিতার কথাও জানিয়েছে। খামের ভেতরে ভরে পাজলের একটা কপি পাঠিয়েছে। লারেটোতে প্রিন্ট করেছে ওটা। পাজলে কি লিখেছে, জানা নেই পিরেটোর। তবে সন্দেহ ঠিকই করেছে, ডজ কোন একটা শয়তানীর মতলবে আছে।

আমিও প্রথমে কিছু বুঝতে পারিনি, ইসাবেল বলল। তবে ড্যাগউডস ওয়াইফ কি, বুঝেছিলাম। শারির কথা বলতে চেয়েছে ডজ। হোটেলটার ওপর নজর রাখতে লাগলাম, যেখানে ডজের ওঠার কথা। কয়েক দিন পরেই সেখানে গেল ডজ।

তারপর থেকে র‍্যাঞ্চারের ওপর কড়া নজর রাখতে লাগল মহিলা। একদিন তার পিছু নিয়ে গিয়ে হাজির হলো পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে। গেটের কাছ থেকেই দেখল, অফিসের বারান্দায় দাঁড়িয়ে কিশোরের সঙ্গে কথা বলছে লোকটা। গাড়ি একটা ঝোপের আড়ালে রেখে হেঁটে ফিরে এল ইসাবেল। জঞ্জালের আড়ালে আড়ালে নিঃশব্দে চলে গেল কিশোর আর ডজ কি কথা বলছে শোনার জন্যে।

তোমাদেরকে কথা বলতে শুনলাম, ইসাবেল বলল। চমকে গেলাম তোমার গলা শুনে। একেবারে টনির গলা।
দুয়ে দুয়ে চার যোগ করতে আরম্ভ করল তখন মহিলা। অনেক কথাই আন্দাজ করে ফেলল। মেকসিকান রমণীর ছদ্মবেশে তিন গোয়েন্দাকে অনুসরণ করে চলে গেল লারেটোতে।
তোমাদেরকে জিপে তুলে নিতে দেখলাম ডজকে। তখন আমি চলে গেলাম লেকের ওপাশের গায়ে। একটা ঘর ভাড়া নিলাম। যোগাযোগ করলাম পিরেটোর সঙ্গে। বনের ভেতর তোমাদের ওপর চোখ রাখলাম। শারি যখন তোমার কথা শুনে তোমার ভক্ত হয়ে গেল, কি ঘটতে চলেছে বাকিটা অনুমান করতে আর অসুবিধে হল না আমার।
নীরবে পথ চলল কিছুক্ষণ দুজনে। কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দেবেন? কিশোর জিজ্ঞেস করল।
করো।
পিরেটোর সঙ্গে আপনার পরিচয় হলো কিভাবে? আপনার আর ডজের মাঝে এমন কি ঘটেছে যে…
একজন আরেকজনকে এতটা ঘৃণা করি, এই তো?
হ্যাঁ।
তাহলে অনেক আগের কথা বলতে হয়। আমি ছোট থাকতেই আমার মা মারা যায়। একটা মেকসিকান কোম্পানিতে মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারের কাজ করত আমার বাবা। মা মারা যাওয়ার পর আমাকে মেকসিকোতে নিয়ে গেল। বাবা থাকত খনির কাজে ব্যস্ত, ওই সময়টাতে আমাকে মাঝে মাঝে দেখতে আসত পিরেটো। এই ব্যাঞ্চের মালিক ছিল তখন সে। ভালই অবস্থা ছিল তার। গরু পালত, ঘোড়া পালত। একদিন এল ডজ…
র‍্যাঞ্চটা নিয়ে নিল পিরেটোর কাছ থেকে। ডজের অফিসে দেখা দলিলগুলোর কথা মনে পড়ল কিশোরের।
হ্যাঁ। অনেক র‍্যাঞ্চারের মতই ব্যাংক থেকে টাকা ধার নিয়ে কাজ চালাত পিরেটো। ঋণ-পত্রগুলো কিনে নিল ডজ। শেষ চেষ্টা করতে চাইল পিরেটো। গরু-ঘোড়া বিক্রি করে ধার শোধ করতে চাইল। সে সুযোগ দেয়া হলো না তাকে। র‍্যাঞ্চ দখল করে নেয়া হলো। আমি গেলাম তখন আদালতে, পিরেটোকে সাহায্য করতে। লাভ হলো না। ওখানেও ঘুষখোর লোক আছে। তাদেরকে টাকা দিয়ে বশ করল ডজ। শেষ পর্যন্ত র‍্যাঞ্চটা হারাতেই হলো পিরেটোকে।
নিচের উপত্যকার দিকে তাকাল কিশোর। সেখান থেকে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিল ওপারের পর্বতের দিকে। সে আশা করল, ইসাবেলের অনুমান ভুল, খানিক পরেই

এসে হাজির হবে পিরেটো।
কিন্তু তার কোন চিহ্নই চোখে পড়ল না। আসছে না।
গরম লাগল। যেন আগুনের আঁচ। হঠাৎ করেই ঘটল ঘটনাটা। বাতাসে কোন রকম জানান দেয়নি। বদলে যেতে শুরু করেছে পরিবেশ।
গরম বাড়ছে। অন্ধকার হয়ে আসছে।
ওপরে তাকাল কিশোর। ছড়িয়ে পড়েছে ধূসর রঙের মেঘ কেঁপে উঠল পায়ের নিচের মাটি। পর্বতের চূড়াটা দেখতে পাচ্ছে। তীব্র গতিতে সেখান থেকে ওপরে উঠে গেল একঝলক ধোঁয়া। এর আগে দুবার দেখেছে ধোঁয়া, তার চেয়ে অনেক ঘন এখনকার ধোঁয়া, এবং কালো।
বুঝে ফেলল ব্যাপারটা। ইস, গাধা হয়ে ছিল নাকি এ কদিন! নিজেকেই লাথি মারতে ইচ্ছে করল তার। আরও আগেই বোঝা উচিত ছিল। মুসা তো প্রশ্নই তুলেছিল, মেঘটা অন্য রকম কেন? তারমানে, ওগুলো ধোঁয়া নয়, মেঘও নয়, বাষ্প।
আগ্নেয়গিরি!কথা সরছে না যেন কিশোরের গলা দিয়ে।
ওর হাত আঁকড়ে ধরল ইসাবেল। টেনে দাঁড় করাল। কপালের ওপর হাত নিয়ে এসে সে-ও তাকিয়ে রইল চূড়ার দিকে।
হ্যাঁ, ফিসফিসিয়ে বলল, আগ্নেয়গিরি! সিয়েরা মাদ্রেতেও আছে, জানতাম না। হাওয়াইতে দেখেছি আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত। জানি কি ঘটে। এটা ফাটতে যাচ্ছে!
উকণ্ঠিত হয়ে কিশোরের অপেক্ষা করছে টনি, রবিন আর মুসা। উত্তেজনাটা এতই ভারি লাগছে, ওদের মনে হচ্ছে গাঁইতি দিয়েও ছিদ্র করা যাবে না। বকবক করছিল টনি আর রবিন সময় কাটানোর জন্যে, এখন সেটাও বন্ধ। ভাবছে, কতক্ষণ আর ডজকে ওভাবে রাখতে পারবে? বাঁধন খোলার জন্যে মোড়া-মুড়ি করছে আর চেঁচাচ্ছে লোকটা।
ঘড়ি দেখল মুসা। দুই ঘণ্টা হয়ে গেল! আর কত? সুড়ঙ্গের শেষ মাথায় চলে এল, দেখার জন্যে, কিশোর আসছে কিনা।
চিৎকার থামিয়ে চুপ হয়ে গেল ডজ। যেন বুঝে গেছে, এসব করে কোন লাভ হবে না। যে ভাবে বাঁধা হয়েছে, তাতে শোয়ার চেয়ে বসে থাকাটা সহজ এবং আরামের মনে হলো বুঝি তার কাছে।
টনি, অনুনয় করল ডজ, আমাকে এক গেলাস পানি দেবে? গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। ঢোক গিলতে পারছি না।
পরস্পরের দিকে তাকাল রবিন আর টনি।
মাথা ঝাঁকাল রবিন।

দিচ্ছি, টনি বলল। উঠে গিয়ে মাটির জগটা নিয়ে এল ডজের কাছে।
রবিন যেখানে বসেছে সেখান থেকে ভালমত দেখতে পেল না এরপর যা ঘটল। ডজের মুখের কাছে টনিকে জগটা তুলতে দেখল সে। পরমুহূর্তেই মেঝেতে পড়ে চুরমার হয়ে গেল জগ। টনির গলার পাশে ছুরি চেপে ধরেছে ডজ।
বাঁধন খুলে ফেলেছে ডজ। দড়ির কাটা টুকরো ঝুলছে কব্জি আর গোড়ালি থেকে।
গাধার দল! হা হা করে বুনো হাসি হাসল ডজ। আমাকে ধরার পর সার্চ করা উচিত ছিল। করোনি। বুটের ভেতর ছুরিটা রয়ে গেছে দেখনি।
আরেকটু বাড়াল ছুরির চাপ। নড়লেই গলার প্রধান রক্তবাহী শিরা জুগুলার ভেইন কেটে দেয়ার হুমকি দিল।
রবিন, কর্কশ গলায় ডাকল ডজ। টনির রাইফেলটা নিয়ে এসো। জলদি করো।
খামোকা হুমকি দিচ্ছে না লোকটা। কথা না শুনলে ঠিকই কেটে দেবে টনির শিরা। দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা হয়েছে রাইফেলটা। তুলে নিয়ে ডজের দিকে এগোল রবিন।
রাখ ওখানেই, ডজ বলল। আর এগোনোর দরকার নেই।
ডজের কণ্ঠস্বরে এমন কিছু রয়েছে, বরফের মত জমে গেল যেন রবিনের রক্ত। টনিকে খুন করার একটা ছুতো খুজছে কেবল র‍্যাঞ্চার। রাইফেলটা হাত থেকে ছেড়ে দিল রবিন।
টনির গলায় ছুরি চেপে রেখেই হাত বাড়িয়ে রাইফেলটা তুলে নিল ডজ। লাফিয়ে উঠে পিছিয়ে গেল এক পা। ছুরিটা কোমরের বেল্টে গুঁজে রাখল। সেফটি ক্যাচ অফ করে দিয়ে বোল্ড টানল রাইফেলের। কঠিন গলায় আদেশ দিল, যাও, সরো এবার। দেয়ালের দিকে মুখ করে হাত তুলে দাঁড়াও।
কিশোরকে দেখলাম না। তবে অদ্ভুত কিছু একটা...
বলতে বলতে গুহায় ঢুকল মুসা। মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল। চোখ বড় বড় করে দেখল দেয়ালের দিকে মুখ করে হাত তুলে দাঁড়িয়েছে রবিন।
হচ্ছেটা কি... এবারেও কথা শেষ করতে পারল না মুসা। চোখ পড়ল ডজের ওপর। ওর হাতে রাইফেল। তাক করে রেখেছে মেঝেতে বসা টনির দিকে। মুসার দিকে ঘুরল নলটা। বাহ, এসে গেছ। যাও, তুমিও যাও দেয়ালের কাছে। টনিকে ধমক দিল, এই, তুমি বসে রইলে কেন?
রবিন জানাল মুসাকে, ওর বুটের ভেতর ছুরি ছিল। সেটা দিয়ে...
চুপ! ধমক দিয়ে তাকে থামিয়ে দিল ডজ। মুসা আর টনিকে আবার যেতে বলল দেয়ালের কাছে।

এতই রাগ লাগছে মুসার, একটা মুহূর্তের জন্যে ভাবল, রাইফেলের পরোয়া না করে ছুটে যাবে কিনা। আবছা অন্ধকারে ছুটন্ত একটা নিশানাকে মিস করতেও পারে ডজ। পরক্ষণেই বাতিল করে দিল ভাবনাটা। পায়ে পায়ে গিয়ে দাঁড়াল দেয়ালের কাছে। তার পাশে এসে দাঁড়াল টনি।
এবার কি করব? ফিসফিস করে বলল মুসা।
কিশোর না আসাতক এভাবেই থাক, ফিসফিস করেই জবাব দিল রবিন।
শুনে ফেলল ডজ। হ্যাঁ, থাক ওভাবেই। একদম নড়বে না। খিকখিক করে হাসল সে। নড়েচড়ে দেখতে পারো অবশ্য। তিনজনের খুলিতে তিনটে গুলি ঢোকাতে পারলে খুশিই হব এখন আমি। ঝামেলা শেষ। রাইফেলের বিরুদ্ধে কিছু করার নেই। চুপ হয়ে গেল ওরা।
এখন যা বলি, শোনো, ডজ বলল আবার। যদি বাঁচতে চাও। টনি, তোমাকে প্রশ্ন করব। ঠিকঠিক জবাব দেবে। নইলে গুলি খাবে তোমার বন্ধুরা।
চুপ করে আছে টনি।
তোমার বাবা কোথায়?
দ্বিধা করছে টনি।
এদিকে ফের।
আদেশ হলো কর্কশ কণ্ঠে।
ঘুরল টনি। দেখল, ডজের আঙুল চেপে বসছে ট্রিগারে।
পর্বতের ওপাশের গায়ে গেছে, জবাব দিল টনি।
কখন ফিরবে?
মিথ্যেটা বেরিয়ে গিয়েছিল মুখ থেকে, শেষ মুহূর্তে সামলে নিল টনি। ডজ যদি বুঝে ফেলে মিছে কথা বলছে সে, রবিন আর মুসার বিপদ হয়ে যাবে।
আরও দুদিন লাগবে।
পঞ্চো ভিলার গুহাঁটা পেয়েছ?
পেয়েছি।
ওটাই যে সেই গুহা কি করে বুঝলে?
ভিলার সৈন্যদের একজনের কঙ্কাল পেয়েছি ওখানে।
হুঁ। এক কাজ করো। দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেল তোমার বন্ধুদের। আমাকে যেমন বাধা হয়েছিল, তেমন করে।
গুহার একধার থেকে গিয়ে দড়ি বের করে আনল টনি।
মুসা, আদেশ দিল ডজ, হাঁটু গেড়ে বসো। হাত আন পিঠের ওপর।
নড়ল না মুসা। গটমট করে তার কাছে এসে দাঁড়াল ডজ। রাইফেলের নল ঠেকাল ঘাড়ে। ঠান্ডা ইস্পাতের স্পর্শে শিউরে উঠল মুসা। ঢোক গিলল।

জলদি করো!
বিড়বিড় করে নিজেকেই একটা গাল দিল মুসা, অসতর্ক হয়েছিল বলে। হাঁটু গেড়ে বসে পিঠের ওপর হাত নিয়ে এল।
ঢিল করে বাঁধল প্রথমে টনি। কিন্তু ফাঁকিটা ধরে ফেলল ডজ। শক্ত করে বাঁধার জন্যে ধমক লাগাল ওকে।
রবিনকেও বাঁধা হলো।
ডজ বলল, এবার কিছু প্রশ্নের জবাব জানা দরকার আমার। বাধাই তো আছি, রবিন বলল। আর জবাব দিয়ে কি হবে?
হেসে উঠল টনি আর মুসা।
চুপ! চেঁচিয়ে উঠল ডজ। রাইফেলের নল দিয়ে খোঁচা মারল রবিনের বুকে। রাগে জ্বলে উঠল রবিনের চোখ। কিছু বলল না। দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করল।
কিশোর গেছে কোথায়? জানতে চাইল ডজ।
আমরাও তো সে কথাই জানতে চাইছি, মুসা বলল। বোধহয় পিজা-টিজা কিনতে গেছে।
বাজে কথা রাখ!
ডজের চেহারা দেখতে পাচ্ছে টনি। জবাব না পেলে অনর্থ ঘটাবে ওই লোক, বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না তার। সে তখন বলল, ইসাবেলের খোঁজে।
ইসাবেল কে?
আমরা জানি না। শুধু জানি, মহিলা মেকসিকান। তিন গোয়েন্দার কাছে যা যা শুনেছে, সেভাবে চেহারার বর্ণনা দিল। কয়েক দিন ধরে নাকি ওদেরকে অনুসরণ করে এসেছে। আজ সকালে তার বারোটাকে দেখেছি গুহার বাইরে। কাজেই শারির সাহায্যে ওটাকে নিয়ে গেছে কিশোর ইসাবেলকে খুঁজে বের করার জন্যে।
বন্দুক-টন্দুক আছে মহিলার কাছে?
দ্রুত ভাবছে টনি। আছে, সেটা বলা কি ঠিক হবে? ওরা তো নিশ্চিত নয়। বলল, আমরা জানি না।
বেশ। সতর্ক থাকতে হবে আরকি আমাকে। কালো চুলের বেনি। রাইফেলটা রবিনের দিক থেকে টনির দিকে ফেরাল ডজ। আমাকে ভিলার গুহায় নিয়ে চল। কোন চালাকির চেষ্টা করবে না। আমি তোমার পেছনেই থাকব।
গুহা থেকে বেরিয়ে গেল দুজনে। সুড়ঙ্গে ওদের জুতোর শব্দ শোনা গেল।
পদশব্দ মিলিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঁধন খোলার চেষ্টা চালাল দুই গোয়েন্দা।
হাত খুলতে পারবে? জিজ্ঞেস করল মুসা।
হুডিনির মত জাদু জানলে পারতাম। তুমি?
একই অবস্থা। কিশোরটা যে কোথায় গেল!

চলে আসবে ঠিকমতই, দেখো। ওকে বোকা বানানো কঠিন। সব সময়ই একটা না একটা বুদ্ধি বের করে ফেলে। ডজকে দেখে ফেললেই আন্দাজ করে ফেলবে কি ঘটেছে। তাছাড়া তার সঙ্গে রয়েছে শারি। আগে থেকেই হুঁশিয়ার করে দিতে পারবে কিশোরকে।
তা বটে।...আচ্ছা, একটা গন্ধ পাচ্ছ?
নাক কুঁচকে শ্বাস টানল রবিন। মনে হয় পচা ডিমের।
বাইরে অদ্ভুত কিছু ঘটছে, মুসা বলল। আমি যে তখন বাইরে গিয়েছিলাম, দেখি, কালো হয়ে গেছে সব কিছু। যেন রাত নামছে পর্বতে। ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ছে সমস্ত আকাশে। ...হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ, পচা ডিমের মতই গন্ধ।
আগেও কয়েকবার ধোঁয়া দেখেছি, মনে আছে? আচমকা চিৎকার করে বলল রবিন, পচা ডিম নয়, গন্ধক! আগ্নেয়গিরিতে থাকে! খোদা, একটা জ্যান্ত আগ্নেয়গিরির ওপরে বসে আছি আমরা!
কোটর থেকে বেরিয়ে আসবে যেন মুসার চোখ। খাইছে! এই গুহায় থাকলে আমাদের তো কিছু হবে না! কিন্তু কিশোরের? সে তো রয়ে গেল বাইরে।
শুয়ে পড়ুন! বলে উঠল কিশোর। জলদি! শুয়ে পড়ুন!
আগ্নেয়গিরির মুখ থেকে ভলকে ভলকে উঠছে কালো ধোঁয়া। সেদিকে তাকিয়ে রয়েছে ইসাবেল। কালো কুয়াশার মত ঢেকে ফেলেছে পর্বতের চূড়া। মহিলার হাত ধরে টেনে তাকে একটা বড় পাথরের আড়ালে নিয়ে গেল সে।
কি হয়েছে?
আস্তে বলুন! ফিসফিসিয়ে বলল কিশোর। ডজ!
কিছু ছাই ঝরে পড়ল আকাশ থেকে। জোরাল বাতাস বইছে। ধোঁয়া সরিয়ে নিচ্ছে। বাতাসে রাসায়নিক পদার্থের গন্ধ। সাবধানে মাথা বের করে উঁকি দিল কিশোর। আধ মাইল মত দূরে রয়েছে র‍্যাঞ্চার। এদিকেই আসছে। সে একা নয়।
ওর আগে আগে হাঁটছে টনি। ঘাড়ের পেছনে দুই হাত তোলা। পিঠের দিকে রাইফেল তাক করে রেখেছে ডজ।
টনি! ইসাবেলও দেখেছে ছেলেকে।
হাত চেপে ধরে তাকে আটকে রাখতে হলো কিশোরকে। নইলে ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছিল মহিলা।
ওভাবে হবে না, নিচু স্বরে বলল কিশোর। টনিকে বাঁচাতে পারবেন না। গুলি খাবেন ডজের।
যে-কোন মুহূর্তে, ভাবছে সে, বারো দুটোকে দেখে ফেলতে পারে ডজ। টনির ওপর কড়া নজর না থাকলে এতক্ষণে দেখে ফেলত।

রাইফেল তুলল ইসাবেল। ওর হাতে গুলি করার চেষ্টা করি। বাঁট ঠেকাল কাঁধে। নল রাখল পাথরের ওপর।
সাবধানে নিশানা ঠিক করল সে। ট্রিগারে চেপে বসতে শুরু করল আঙুল। টিপে দিল পুরোপুরি।
গুলির শব্দের অপেক্ষা করছে কিশোর। কিছুই ঘটল না। বেরোল না গুলি।
আবার ট্রিগার টিপল ইসাবেল। হলো না কিছু এবারেও। আবার টিপল। আবার।
সেফটি ক্যাচ! কিশোর বলল। অন করা আছে।
দ্রুত হাতে ক্যাচ অফ করে দিল ইসাবেল। আবার নিশানা করল। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। বারো দুটোকে দেখে ফেলেছে ডজ। লাফিয়ে এসে টনির কাঁধ চেপে ধরল। ওর শরীর দিয়ে আড়াল করল নিজেকে।
রাইফেল নামাল ইসাবেল। মৃদু কণ্ঠে স্প্যানিশ ভাষায় কি বলল, বোঝা গেল। গালই দিল বোধহয়।
বেল্ট থেকে ছুরি খুলে নিল ডজ। টনির পিঠে ঠেকাল। ওকে হাঁটতে বলে নিজেও পা বাড়াল পেছনে।
ইসাবেলের কাঁধের ওয়াকিটকিটা নিজেই খুলে নিল কিশোর। সুইচ অন করল মেসেজ পাঠানোর জন্যে। ঠোঁটের কাছে ধরে বলল, পিরেটো! পিরেটো! শুনতে পাচ্ছেন? স্প্যানিশ ভাষায় বলল সে। পিরেটো! কাম ইন! ওভার।
রিসিভ করার জন্যে সুইচ টিপল। নীরবতা।
পরের একটা মিনিট চেষ্টা চালিয়ে গেল কিশোর। একশ গজ দূরে আছে আর ডজ এগিয়ে আসছে। টনির পিঠে ছুরি ঠেকানো।
ওয়াকিটকি নামিয়ে রেখে ইসাবেলের বাহুতে হাত রাখল কিশোর। আপনার উইগ পরে নিন।
তাড়াতাড়ি পকেট থেকে পরচুলা বের করে পরে নিল ইসাবেল। দশ গজ দূরে এসে দাঁড়িয়ে গেল ডজ।
ইসাবেল, বেরিয়ে আসুন, ডাক দিল সে।
নড়ল না ইসাবেল।
ভয় পাবেন না, স্প্যানিশ ভাষায় বলছে ডজ। আমি জানি ওই পাথরের আড়ালেই আছেন আপনি। ছেলেরা আপনার কথা সব বলেছে আমাকে। আমাদেরকে অনুসরণ করে আপনি এসেছেন এখানে। আমার রাইফেলটাও পেয়েছেন। যা হবার হয়েছে। আসুন। দেখি, একটা রফায় আসতে পারি কিনা আমরা।
উঠে দাঁড়াল ইসাবেল। দুহাতে চেপে ধরেছে রাইফেল।
কিশোর বসেই রইল। ভাবছে, মুসা আর রবিনকে কোন ভাবে কাবু করে ফেলেছে র‍্যাঞ্চার। বোধহয় ওই ছুরি দিয়েই বাঁধন কেটে ফেলেছিল। যেটা ঠেকিয়ে রেখেছে

টনির পিঠে। তবে যতক্ষণ ডজ না জানছে সে এখানে রয়েছে, ততক্ষণ চমকে দেয়ার একটা আশা রয়েছে। হয়ত সুযোগ বুঝে কাবু করে ফেলতে পারবে লোকটাকে।
রাইফেলের ট্রিগারে ইসাবেলের আঙুল।
আপনাকে আমি চিনি, ইসাবেল বলল, সিনর মরিস। পঞ্চো ভিলার পেসের খোঁজে এসেছেন।
ঠিকই ধরেছেন, স্বীকার করল ডজ। আপনিও এসেছেন সেজন্যেই।
মাথা কঁকাল ইসাবেল। আমি জানি কোথায় লুকানো আছে ওগুলো। আপনি জানেন না।
জেনে যাব। টনিকে ঠেলা দিল ডজ চলার জন্যে, নিজেও এগোল। এই ছেলেটা আমাকে নিয়ে যাবে সেখানে ও আর ওর বাবা মিলে জায়গাটা বের করে ফেলেছে।
ভুল বলেছে আগে জানত, এখন আর জানে না। কাল আমি গুহাঁটা পেয়ে গিয়ে পেসোগুলো সরিয়ে ফেলেছি। ছুরিটা সরান। তারপর, আসুন কথা বলি, দেখি কি করা যায়।
বেশ। ছুরিটা বেল্টে গুজল আবার ডজ। দুজনেই আমরা সমান সমান অবস্থায় আছি। দুজনের কাছেই রাইফেল। তবে পেসেগুলো এই এলাকা থেকে সরাতে হলে আপনাকে আমার সাহায্য নিতেই হবে। পর্বতের চূড়ার দিকে তাকল সে। ওটাও আর সময় পেল না আগুন ছিটানোর!
এখনও এগোচ্ছে ডজ, ধীরে ধীরে, টনিকে বর্ম বানিয়ে।
থামুন! কড়া গলায় বলল ইসাবেল। কিন্তু বিপদটা আঁচ করতে দেরি করে ফেলেছে।
ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে ডজ। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, তুমি! ইংরেজিতে বলছে সে এখন, মেকসিকান উইগ দিয়ে বোকা প্রায় বানিয়ে ফেলেছিলে! কিন্তু ওই নীল চোখ লুকাবে কোথায়, নেলি?
কন্টাক্ট লেন্স লাগাতে ভুলে গিয়েছিল ইসাবেল।
তারপর পলকে ঘটে গেল অনেকগুলো ঘটনা।
রাইফেল তুলতে শুরু করল ইসাবেল। লাফিয়ে একপাশে সরে গেল ডজ। নিশানা করল ইসাবেলের দিকে।
গুলির শব্দ শুনল কিশোর।
ডজের হাত থেকে যেন উড়ে চলে গেল রাইফেলটা। পাঁচ গজ দূরে পাথরের ওপর গিয়ে পড়ল।

লাফ দিয়ে বেরিয়ে এসে একটানে লোকটার কোমরে গোঁজা ছুরি কেড়ে নিল কিশোর।
খটাখট খটাখট শোনা গেল খুরের শব্দ।
ঘোড়া ছুটিয়ে এল পিরেটো। হাতে একটা .৪৫ ক্যালিবারের কোল্ট পিস্তল। সেটা তাক করল ডজের দিকে। হুঁশিয়ার করল, পরের বার আর বাঁটে সই করব না, মাথায় করব। ইসাবেলের দিকে তাকাল। মহিলাও তার রাইফেল তাক করে রেখেছে ডজের দিকে। এইবার সেফটি ক্যাচ অফ করা আছে।
গুলি করো না, ইসাবেলকে বলল পিরেটো। ছেড়ে দাও। গুলি করে মারলে লাশ কবর দেয়ার সময়ও পাব না। আর কবর না দিতে পারলে, খোলা জায়গায় শকুনের খাবার বানিয়ে রেখে গেলে অভিশাপ লাগবে আমাদের ওপর।
ডজের দিকে তাকাল সে। চিৎকার করে বলল, যাও, ভাগ! গিয়ে খুঁজে বের করো তোমার পেসো!
কালো হয়ে গেছে ডজের মুখ, রাগে। চোখে তীব্র ঘৃণা।
যাও! যাচ্ছ না কেন? স্প্যানিশ ভাষায় আবার ধমকে উঠল পিরেটো। পঞ্চো ভিলার গুহায় যাও। টনিকে সঙ্গে নেয়ার আর দরকার নেই। ওটাতে যাওয়ার জন্যে যথেষ্ট চিহ্ন দেখতে পাবে। পায়ের ছাপের ছড়াছড়ি এখন ওপথে।
এক সেকেণ্ড পিরেটোর দিকে তাকিয়ে রইল ডজ। ওর চোখে খুনীর দৃষ্টি দেখতে পেল কিশোর। কিন্তু কিছু করার নেই। পুরোপুরি অসহায় এখন। গুলি করে ওর রাইফেলের বাট ভেঙে দিয়েছে পিরেটো। ছুরি কেড়ে নিয়েছে কিশোর। ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল ভিলার গুহাঁটা যেদিকে রয়েছে সেদিকে।
পরস্পরকে জড়িয়ে ধরল মা-ছেলে। ঘোড়া থেকে নামল পিরেটো। হতচ্ছাড়া এই ওয়াকিটকি! কাল রাতে হাত থেকে পড়ে গিয়ে আবার নষ্ট হয়ে গেছে। শব্দই বেরোচ্ছে না।
চূড়ার দিকে তাকাল কিশোর। আরেক ভলক কালো ধোঁয়া বেরোল।
রবিন আর মুসাকে বের করে আনা দরকার, বলল সে। গুহায় আটকা থাকলে মরবে।
মুখের ভেতর দুই আঙুল পুরে জোরে শিস দিল পিরেটো। ঢালের ওপাশ থেকে ছুটতে ছুটতে এল আরেকটা ঘোড়া। চিনতে পারল কিশোর ডজ ওটাতে করেই এসেছিল।
ওটাকে বাঁধা দেখলাম, পিরেটো জানাল। খুলে নিয়ে এসেছি। চলো, জলদি চলো, পালাই এখান থেকে।
কিশোর চড়ল শরির পিঠে। ইসাবেল তার নিজের বারোতে, আর টনি চড়ল ডজের ঘোড়ায়। আগে আগে রওনা হলো কিশোর, টনির গুহার দিকে।

গুহা থেকে শখানেক গজ দূরে থাকতে কি যেন এসে বিধল কিশোরের গালে। তারপর হাতে। কপালে হাত রেখে ওপরে তাকাল সে।
পাথর-বৃষ্টি হচ্ছে!
খুদে পাথর ঝরে পড়ছে আকাশ থেকে। একটা পড়ল কাঁধে। ফেলার চেষ্টা করল ওটাকে সে। ছ্যাকা লাগল হাতে। কিছুতেই শার্ট থেকে খুলতে না পেরে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল। পাথর নয়। ছোট একটা কাচের পুঁতি, আগুনের মত গরম।
পাহাড়ের চূড়ায় ঘটছেটা কি? দেখা যাচ্ছে না এখান থেকে। তবে সাংঘাতিক বিপদ যে আসছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।
শারিকে আরও জোরে চলার তাগাদা দিল কিশোর। পেছনে শুনতে পাচ্ছে ঘোড়াগুলোও চলার গতি বাড়িয়ে দিয়েছে। মিনিট খানেক পরেই দেয়ালের মত ঢালটার কাছে চলে এল ওরা। থামল।
জিনের নিচে ভাঁজ করে রাখা কম্বলটা বের করল পিরেটো। ছুরি দিয়ে কেটে ফালা ফালা করতে লাগল।
ততক্ষণে রওনা হয়ে গেছে কিশোর। তাকে ডেকে বলল পিরেটো, তাড়াতাড়ি আসবে।
সুড়ঙ্গে ঢুকল কিশোর। গুহায় এসে দেখল, পিঠে পিঠ লাগিয়ে বাঁকা হয়ে আছে মুসা আর রবিন। মুসা সবে রবিনের বাঁধনের একটা গিঁট খুলেছে।
ডজের ছুরি দিয়ে দ্রুত ওদের বাঁধন কেটে মুক্ত করল কিশোর।
আমি তো ভেবেছি পিজা কিনতে দেরি করছ। হাত-পা ছড়িয়ে, ঝাড়া দিয়ে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করে নিতে লাগল মুসা। তারপর? কোথায় দোকানটা?
রবিনও মুসার মতই হাত-পা ঝাড়ছে। তাকিয়ে রয়েছে কিশোরের মাথার দিকে। ব্যাপার কি? মাথায় পুঁতি পরার শখ হলো কেন হঠাৎ?
চুলে আঙুল চালিয়ে ওগুলো ফেলার চেষ্টা করল কিশোর। ঠান্ডা হয়ে গেছে পুঁতির মত জিনিসগুলো, কিন্তু আটকে গেছে এমন করে, আঙুল দিয়ে চিরুনি চালিয়ে কিছুতেই সরাতে পারল না। আকাশ থেকে পড়ল। গরম কাচের টুকরো। এসো, বেরোও, জলদি।
সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে মাথা নিচু করে প্রায় দৌড়ে বেরোল ওরা। কাচ-বৃষ্টি বন্ধ হয়েছে আপাতত। কম্বলের লম্বা কয়েকটা টুকরো ওদেরকে দিয়ে বলল পিরেটো, নাও, মাথায় জড়াও। হাতেও পেঁচিয়ে নাও। খোলা রাখবে না। ওর নিজের মাথায় আর হাতে ইতিমধ্যেই জড়ানো হয়ে গেছে।
লাল শালটা দিয়ে মাথা আর কাঁধ ঢেকেছে ইসাবেল।
চলো, এবার যাই, তাগাদা দিল পিরেটো।
কাউকে বলতে হলো না। মুসা চড়ে বসল টনির পেছনে। রবিন পিরেটোর।

এই বার আগে আগে চলল মেকসিকান। আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথে জোরে চলা বিপজ্জনক, কিন্তু পরোয়া করল না সে, বার বার তাগাদা দিতে লাগল ঘোড়াকে। নেমে চলল নিচের উপত্যকার দিকে। যে নালাটা পাহাড়ের ঢালে গভীর খাত সৃষ্টি করে নেমেছে, সেটাতে নেমে আরও তাড়াতাড়ি চলার নির্দেশ দিল পিরেটো। পেছনে ভারি একটা গুড়গুড় শোনা গেল, মেঘ ডাকার মত। বাতাসে গন্ধকের গন্ধ বেড়ে গেছে, শ্বাস নেয়াই কঠিন।

নালায় নামার খানিক পরেই ঘটল ঘটনাটা। আধ মাইল দূরেও নেই আর গুহাঁটা, এই সময় পেছনে ফেটে পড়ল যেন আগ্নেয়গিরি। মুসার মনে হলো, বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হয়ে গেছে গোটা পর্বত।

চূড়া থেকে খাড়া উঠে গেল গরম গলিত লাভা, ফোয়ারার মত ঝরে পড়তে লাগল। আরও লাভা ছিটকে উঠল ওপরে। পড়ল, উঠল। প্রতিবারেই আরও বেশি ওপরে উঠে যাচ্ছে। ওপরে উঠে এমন করে ছড়াচ্ছে, দূর থেকে দেখলে মনে হবে বাজি পোড়ানো হচ্ছে। অসংখ্য বোমা ফাটার মত শব্দ হচ্ছে জ্বালামুখের ভেতরে। কানে তালা লাগানোর জোগাড়। শুধু যে লাভা বেরোচ্ছে তা নয়, সাথে করে পর্বতের গভীর থেকে নিয়ে আসছে পাথর। ঢাল বেয়ে গড়াচ্ছে সেগুলো । গনগনে কয়লার মত গরম। নামতে শুরু করেছে লাভার স্রোত।

ক্রমেই জোর বাড়ছে লাভার। শত শত ফুট ওপরে উঠে যাচ্ছে এখন। ব্যাঙের ছাতার মত ছড়িয়ে গিয়ে ধীরে ধীরে ঝরে পড়ছে পাথরের ওপর। ঢাল বেয়ে নামছে। চলার পথে ঢেকে দিয়ে আসছে পাথর, গাছপালা সব কিছু। বাষ্প উঠছে। এদিক-ওদিক থেকে এসে মিলিত হচ্ছে লাভার একাধিক স্রোত। যতই নামছে চওড়া হচ্ছে আরও গলিত লাভার নদী হয়ে নামছে নিচের দিকে।

গরম ছাই, পাথরের কুচি আর কাচের টুকরোর বৃষ্টি পড়তে লাগল যেন অভিযাত্রীদের ওপর। চমকে চমকে উঠছে ভীত জানোয়ারগুলো। গরম পাথর আর কাচের ছ্যাঁকা লাগছে ওগুলোর তোলা চামড়ায়। আর সইতে না পেরে পিরেটোর ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে গেল হঠাৎ পেছনের দুই পায়ে ভর করে। পরক্ষণেই মাটিতে নেমে লাথি মেরে যেন তাড়ানোর চেষ্টা করতে লাগল অবাঞ্ছিত বিপদকে। পিরেটোও নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না ঘোড়াটাকে। ওর কোমর জড়িয়ে ধরে রেখেছে রবিন।

শারিকে নিয়ে এসো! চেঁচিয়ে উঠল পিরেটো।

বারোটাকে নিয়ে দ্রুত এগোল কিশোর।

ঘোড়াগুলোর মাঝে ঢুকিয়ে দাও ওকে! পিরেটো বলল। শান্ত করুক!

লম্বা দম নিল কিশোর। তারপর প্রায় চোখমুখ বুজে বারোটাকে নিয়ে এগোল আতঙ্কিত দুটো ঘোড়ার মাঝের সরু ফাঁকে ঢোকানোর জন্যে।

ওদের মাঝে একটা শান্ত জানোয়ারকে দেখে ধীরে ধীরে ঘোড়াগুলোও শান্ত হয়ে এল। দুলকি চালে চলছে শারি। ঘোড়াগুলোও একই রকম করে চলতে লাগল।
পাথর-বৃষ্টি পাতলা হয়ে এল জোরাল বাতাসে। নাকে এসে ঝাপটা মারল বাতাস। গন্ধকের গন্ধে দম আটকে যাওয়ার অবস্থা হলো কিশোরের! তাড়াতাড়ি কম্বলের টুকরো দিয়ে নাকমুখ চাপা দিল। আশঙ্কা হতে লাগল তার, এখান থেকে বেঁচে ফিরতে পারবে তো?
পেছনে ফিরে তাকাল রবিন। এগিয়ে আসছে আগুন-গরম, লাল রঙের গলিত লাভা। পাথর গলিয়ে ফেলছে। আগে আগে ছুটছে প্রাণ ভয়ে ভীত ছোট ছোট জানোয়ারের দল, চিৎকার করে উড়ছে পাখিরা। জ্বলে উঠছে ঝোঁপঝাড়। শিল-নোড়া দিয়ে কাচ গুঁড়ো করার মত একটা শব্দ উঠছে কড়কড় কড়কড় করে। লাভার নদী বয়ে আসার সময়ই হচ্ছে শব্দটা।
গেছি, ভাবল সে। এভাবেই তাহলে মরণ লেখা ছিল কপালে! মুসাকে বলল, যাক, আর দশজনের মত সাধারণ মৃত্যু হচ্ছে না আমাদের।
ঠিক, জবাব দিল মুসা। আগ্নেয়গিরির লাভায় চাপা পড়ে মরার ভাগ্য কজনের হয়?
পর্বতের দিকে তাকিয়ে রয়েছে দুজনে। ছুটে আসা লাভার উত্তাপ এসে লাগছে চোখে, জ্বালা করছে। কিন্তু তার পরেও চোখ বন্ধ করল না, জোর করে পাতা মেলে তাকিয়ে রইল সেদিকে।
কাচ ভাঙার শব্দ বাড়ছে। সেই সাথে মারাত্মক ওই আগুনের নদীর ওপর কালো এক ধরনের আস্তর পড়ছে। জমে যাচ্ছে লাভা। ঢাল বেয়ে গড়ানো কমছে। আশা ঝিলিক দিয়ে গেল রবিনের মনে। গড়িয়ে গড়িয়ে যেন অনেক কষ্টে এগোল আরও কয়েক গজ, আগের সে জোর নেই, তারপর থেমে গেল একেবারেই।
ছাই আর গরম পুঁতি-বৃষ্টিও বন্ধ হয়ে আসছে। দেখতে দেখতে সেসব পেছনে ফেলে এল ভীত ঘোড়া আর বারোগুলো।
অবশেষে বিপদসীমা ছাড়িয়ে আসতে পারল ওরা।
আরও আধ মাইল পর পৌঁছল উপত্যকায়। পিরেটো ওদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল পরের পর্বতটার দিকে। কিছুদূর গিয়ে থামল।
বিষাক্ত ধোঁয়া আর গ্যাসের মধ্যে শ্বাস নিয়েছে, এতক্ষণে তার জের শুরু হলো। কাশতে আরম্ভ করল সবাই। নাক উঁচু করে বড় বড় দম নিয়ে টেনে নিতে লাগল তাজা বাতাস। ফিরে তাকাল আগ্নেয়গিরির দিকে।
পিরেটো দেখতে পেল তাকে প্রথমে। হাত তুলে দেখাল অন্যদেরকে। বহু দূরে একটা মূর্তি লাফিয়ে চলেছে পাথর থেকে পাথরে। পড়ে যাচ্ছে, হাঁচড়েপাঁচড়ে উঠছে আবার, সরে আসার চেষ্টা করছে ভিলার গুহার কাছ থেকে।

পর্বতের ওদিকটায় লাভার স্রোত সবে চূড়ার একটা নিচে নেমেছে, তরল রয়েছে এখনও, নেমে আসতে শুরু করল দ্রুত। সামনে এখন জীবন্ত যা কিছু পড়বে, ধ্বংস করে দেবে ওই মৃত্যু নদী!

পর্বতের ভেতরে শব্দ অদ্ভুত সব কান্ড করে। আগ্নেয়গিরির গর্জনকে ছাপিয়েও কি ভাবে জানি শোনা গেল ডজের আতঙ্কিত চিৎকার। একবারই, তারপর হারিয়ে গেল গলিত লাভার নিচে। ঢেকে দিয়ে ছুটে নামতে থাকল মারাত্মক ওই তরল পদার্থ।

চোখ বন্ধ করে ফেলল চার কিশোর। কিশোর ভাবছে, বাজে লোক ছিল ডজ মরিস, সন্দেহ নেই। কিন্তু তার খাবার খেয়েছে ওরা, তার বাড়িতে থেকেছে, এক সঙ্গে অভিযানে বেরিয়েছে। ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। সাধারণ ভাবে মরলে এতটা খারাপ লাগত না। কিন্তু এরকম ভয়াবহ মৃত্যু! মনই খারাপ হয়ে গেল।

নিজের বুকে ক্রুশ আঁকল পিরেটো। বিড়বিড় করে প্রার্থনা করল স্প্যানিশ ভাষায়।

তোমাকে বলেছিলাম না, কিশোরকে বলল সে। বিপদ আছে পাহাড়ে। দেখলে তো।

পাহাড়ের পাদদেশের পথ ধরে এগোল আবার ওরা। পিরেটোর পাশে পাশে চলছে ইসাবেল। পিরেটো, কিছু মনে কোরো না। জানি, তোমার লোভ নেই, কিন্তু পেসেগুলো পেলে অনেক সুবিধে হত। র‍্যাঞ্চটা আবার কিনে নিতে পারতে।

কে জানে? পিরেটো বলল আনমনে, আপনাআপনিই হয়তো আমার র‍্যাঞ্চ আমার কাছে ফিরে আসতে পারে আবার।

হাসল সে। লোভের ছিটেফোঁটাও নেই সে হাসিতে।

ভিলার গুহাঁটার কথা প্রথম শুনি মায়ের কাছে, জানাল মেকসিকান। মা আমাকে বলেছিল, অভিশপ্ত ওই পেসো কেউ কোনদিন পাবে না। ভিলার বহু লোক মারা গেছে এর জন্যে। এখনও মরা সৈন্যদের প্রেতাত্মা পাহারা দিচ্ছে ওগুলোকে। একটা মুহূর্ত থামল সে। তারপর বলল, পাহারা দিয়ে যাবে আজীবন।

বিপদ সীমার বাইরে থেকে, আগ্নেয়গিরিকে বহুদূর দিয়ে ঘুরে চলতে লাগল দলটা। পর্বতের ওপাশের গাঁয়ে যাবে, যেখানে আগ্নেয়গিরির উৎপাত পৌঁছতে পারে না। তাছাড়া ঘনঘন অগ্ন্যুৎপাত হয় বলে কাছাকাছি থাকেনি লোকে, এমন জায়গায় রয়েছে যেখানে লাভা পৌঁছতে পারে না কোনমতেই। এমনকি গরম ছাইও না।

কথাবার্তা তেমন বলছে না ওরা। কিশোরের মন এখন শান্ত। রহস্যের সমাধান হয়ে গেছে।

পিরেটোর কাছে ভিলার গুপ্তধনের কথা প্রথম শুনেছে ইসাবেল। ১৯১৬ সালে, ওর দাদা ছিল পঞ্চো ভিলার সেনাবাহিনীতে। ইসাবেল পিরেটোকে কথা দিয়েছিল, তার স্বামী আর ছেলে যদি পেসোগুলো খুঁজে পায় তাহলে অর্ধেক দিয়ে দেবে ওকে।

ডজ জানত না গুপ্তধনের কথা। তার কাছ থেকে এটা গোপন রাখা হয়। পিরেটো ঘুণাক্ষরেও কখনও তার সামনে উচ্চারণ করেনি। এই সময় টনি এসে একদিন হাজির হলো অন্ধ বারোটাকে নিয়ে। পিরেটোর সঙ্গে পেসোগুলোর কথা আলোচনা করার সময় শুনে ফেলে ডজ। জেনে যায় টনি আর তার বাবা গুহাঁটা আবিষ্কার করে ফেলেছে।

টনিকে রাজি করাতে না পেরে শেষে শারিকে দিয়ে গুহাঁটা খুঁজে বের করার ফন্দি আঁটে ডজ।

র‍্যাঞ্চারের বীভৎস মৃত্যুর ধাক্কাটা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি কিশোর। ডজের লোভই তাকে ওরকম মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে। আগ্নেয়গিরি জেগে উঠেছে এটা দেখার পরেও যদি পেসো আনতে না যেত তাহলে আর এভাবে মরতে হত না।

একটা গর্তের ধারে থামল ওরা, জানোয়ারগুলোকে পানি খাওয়ানোর জন্যে। তারপর আবার এগোনোর পালা। কয়েক মাইল এগিয়ে একটা বিচিত্র শব্দ কানে এল কিশোরের। দূর থেকে আসা অসংখ্য বারোর মিলিত ডাক। সাড়া দিল শারি। বাড়িয়ে দিল চলার গতি।

একটা বন থেকে বেরোতেই জোরাল শোনা গেল আওয়াজ।

বিশাল উপত্যকায় ছড়িয়ে রয়েছে মাইলের পর মাইল তৃণভূমি। শত শত বুনো বারো চরে বেড়াচ্ছে সেখানে। লাফালাফি করছে, খাচ্ছে-দাচ্ছে, চেঁচাচ্ছে।

দাঁড়িয়ে গেছে শারি। খাড়া হয়ে গেছে লম্বা কান, ডগা কাপছে মৃদু মৃদু। হঠাৎ জোরে তীক্ষ্ণ এক ডাক ছাড়ল সে। ওর পিঠ থেকে নেমে পড়ল কিশোর। জিন আর লাগাম খুলে নিল। তারপর আদর করে চাপড় দিল গলায়।

বড় বড় কোমল চোখ মেলে তার দিকে তাকাল শারি। নাক ঘষল গায়ে, যেন বাড়িতে পৌঁছে দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ জানাচ্ছে। তারপর এগিয়ে গেল টনির কাছে। ঘোড়ার পিঠে থাকায় ওর বুক নাগাল পেল না বারোটা, পায়েই নাক ঘষল। নিচু হয়ে শারির মাথা চাপড়ে দিল টনি।

আর দেরি করল না শারি। মহা আনন্দে ছুটল স্বজাতির সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্যে।

ইসাবেলের বারোর পেছনে চড়ে বসল কিশোর।

আবার রওনা হলো দলটা। তাড়াতাড়ি করলে অন্ধকারের আগেই পৌঁছে যেতে পারবে গায়ে। ওখান থেকে চিহুয়াহুয়ায় বাবাকে ফোন করবে টনি। জানাবে সে আর তার মা নিরাপদেই পিরেটোর সঙ্গে গাঁয়ে চলে এসেছে।
পরদিন সকালে বাস ধরে আমেরিকায় রওনা হবে তিন গোয়েন্দা।
লস অ্যাঞ্জেলেসে দেখা করব আমি তোমার সাথে, একসময় রবিনকে বলল টনি। রক কনসার্ট আমার খুব ভাল লাগে। তোমার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে দেখব। কয়েকটা।
চলে এসো, যে-কোন সময়, খুশি হয়েই দেখাব।
পাশাপাশি চলছে মুসা আর কিশোর। পিরেটো আর ইসাবেলের সঙ্গে। মুসা বলল, একটা কথা আমার মাথায় ঢুকছে না, ডজ কি করে জানল কাস অ্যাঞ্জেলেসেই পাওয়া যাবে টনির মত কণ্ঠস্বরের লোক? যেন একেবারে জেনেশুনেই গেছে, ওখানে রয়েছে কিশোর পাশা। আমেরিকার অন্য কোন জায়গায় গেল না কেন?
জেনেশুনেই তো গেছে, জবাব দিল পিরেটো।
জেনেশুনে গেছে?
তাই তো। হাসল মেকসিকান। তোমরা যে কতখানি বিখ্যাত, তা তোমরা নিজেরাও জানো না। অনেকেই চেনে তোমাদেরকে। বিশেষ করে তোমাদের ওই টিভি অনুষ্ঠান পাগল সঙ্ঘ দেখার পর।
অনুষ্ঠানটা ডজও দেখেছিল নাকি? রবিনের প্রশ্ন।
দেখেছিল। আমিও দেখেছি। টনি যখন র‍্যাঞ্চে গেল, ওর গলা শুনে তো আমি চমকেই উঠেছিলাম। আরি, টেলিভিশনের মোটুরাম এল কোথেকে! বলেই চোখ পড়ল কিশোরের ওপর। মুখ কালো করে ফেলেছে গোয়েন্দাপ্রধান। সেটা লক্ষ্য করে তাড়াতাড়ি বলল পিরেটো, সরি, কিশোর, তোমাকে রাগানোর জন্যে বলিনি। টেলিভিশনের সৌজন্যে সে-ও জানে, ওই ডাকনাম একদম পছন্দ নয় কিশোরের।
হাসল মুসা। তাহলে এই ব্যাপার। মোটুরামই ডজকে টেনে নিয়ে গেছে রকি বীচে। আসলে আমাদের জন্যে ফাঁদ পাততেই গিয়েছিল লোকটা।
এবং সেই ফাঁদে দিব্যি পা দিয়ে বসেছে রহস্য পাগল কিশোর পাশা, মুচকি হাসল টনি।
নীরবে পথ চলতে লাগল আবার দলটা।
কিশোর ভাবছে, বীন আর চাল সেদ্ধর কথা। যতদিন বেঁচে থাকবে, আর একটা বীন কিংবা চাল দেখতে চায় না সে। যদিও জানে, চাল ছাড়া থাকতে পারবে না। লস অ্যাঞ্জেলেসে থাকলেও সে ভাতেরই পাগল। সে এবং তার চাচা রাশেদ পাশা। ভাত ছাড়া চলে না। আমেরিকাতে থেকেও পুরোদস্তুর বাঙালী।
চলতে চলতে হঠাৎ মুসার চোখ পড়ল রবিনের টি-শার্টের ওপর। লেখা রয়েছেঃ সারভাইভার।

তাই তো! এর চেয়ে সত্যি কথা আর হতে পারে না ওদের জন্যে। সারভাইভার! অনেক কষ্টেই তো বেঁচে ফিরল।

পেছনে ফিরে তাকাল মুসা। তাকিয়ে রইল পর্বতমালার দিকে। এত বিপদ থেকে বেঁচে ফিরে এসেছে, তবু আবার যদি তাকে ওখানে যেতে বলা হয়, নির্দ্বিধায় রাজি হয়ে যাবে, এর এমনই এক আকর্ষণ। এই আকর্ষণই যুগ যুগ ধরে টেনেছে মানুষকে। সাড়া না দিয়ে পারেনি মানুষ। সমস্ত বিপদ, বাধা, ভয় উপেক্ষা করে ছুটে গেছে ওর কাছে। মুসাও তো মানুষ, প্রচন্ড এই আকর্ষণ এড়ানোর ক্ষমতা তার কোথায়?

***

ভলিউম ১৮ – খাবারে বিষ – তিন গোয়েন্দা – রকিব হাসান – সেবা প্রকাশনী

রকি বীচ মেমোরিয়াল হসপিটালের আউটডোর পার্কিঙের কাছে এসে ঘাঁচ করে ব্রেক কষল মুসা। গাড়ির অভাবে অনেক কষ্ট করেছে। তাই কিনে ফেলেছে আরেকটা। অবশ্যই সেকেন্ড হ্যান্ড এবং পুরানো মডেল। একাশি মডেলের শিরোকো। গোঁ গোঁ করে দুবার গর্জে উঠে বন্ধ হয়ে গেল ইঞ্জিন। উইন্ডশীল্ড ওয়াইপার দুটো চলতে চলতে থেমে গেল মাঝপথে।

খাইছে! বলল সে, বৃষ্টি যা হচ্ছে না!

হ্যাঁ, মাথা ঝাকাল পাশে বসা কিশোর পাশা।

শুধু বৃষ্টি না, ঝড়ো বাতাসও বইছে। ঝমঝম ঝমঝম অবিরত উইন্ডশীল্ডে আঘাত হেনে চলেছে বড় বড় ফোটা। আকাশ চিরে দিল বিদ্যুতের শিখা। বাজ পড়ল বিকট শব্দে।

থামবে না। এরই মধ্যে বেরোতে হবে, মুসা বলল। ভিজিটিং আওয়ারও শেষ হয়ে আসছে।

ফারিহাকে দেখতে এসেছে ওরা। একই স্কুলে একই ক্লাসে পড়ে। ইদানীং ওর সঙ্গে হৃদ্যতা গড়ে উঠছে মুসার।

চুপ করে বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর।

কি হলো, নাম না। ফারিহা অপেক্ষা করছে।

করুক। বৃষ্টি যে হচ্ছে সেটাও নিশ্চয় বুঝতে পারছে। কার ওপর বিরক্ত হয়েছে কিশোর, বোঝা গেল না। সীটবেল্ট খুলল।

আসলে মেয়েদেরকে তুমি দেখতে পারো না।

কথাটা ঠিক না, মুসা। তবে ঘ্যানঘ্যান প্যানপ্যান শুরু করে যখন, তখন আর ভাল্লাগে না। আর যখন কোন ব্যাপারে অহেতুক চাপাচাপি শুরু করে, না বুঝে।

হেসে উঠল মুসা। জিনার সামনে বলে দেখ এসব কথা…

বললে কি হবে? খেয়ে ফেলবে নাকি?

জবাব দিল না মুসা। ঠেলা দিয়ে খুলে ফেলল দরজা। উইন্ডব্রেকারের হুড তুলে দিয়ে বেরিয়ে গেল বৃষ্টির মধ্যে। মাথা নিচু করে দিল দৌড়। কিশোরও বেরোল। দরজাটা লাগিয়ে দিয়ে মুসার পিছু নিল।

বারান্দায় উঠে উইন্ডব্রেকার খুলে ঝেড়ে পানি ফেলল। তারপর ভাঁজ করে। হাতে নিয়ে রওনা হলো রুম নম্বর ১১১১-এর দিকে।

ঢুকে দেখল বিছানায় শুয়ে আছে ফারিহা ডিকটার। ফোনে কথা বলছে। এক আঙুলে বার বার পেঁচাচ্ছে কোঁকড়া চুল। টিভি অন করা। মিউজিক শো চলছে। দেখে মনেই হয় না, মাত্র তিনদিন আগে অ্যাপেনডিক্স অপারেশন হয়েছে তার।

রকি বীচ হাই স্কুলে হাসিখুশি মিশুক মেয়ে বলে সুনাম আছে ফারিহার। মাস ছয়েক আগে হঠাৎ করেই মনে হয়েছে তার, মুসা খুব ভাল ছেলে। ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব করা চলে।
ওদেরকে ঢুকতে দেখে ফোনে বলল ফারিহা, আজ রাখি, শেলি। মুসা আর কিশোর এসেছে... কি বললে?... কিশোর?...জানি না।
নিজের নাম শুনে শূন্য দৃষ্টিতে একবার ফারিহার দিকে তাকিয়েই আরেক দিকে চোখ সরিয়ে নিল কিশোর।
ও তো সব সময়ই মেয়েদেরকে এড়িয়ে চলে, ফারিহা বলল। আচ্ছা, দেখি জিজ্ঞেস করে, কিশোরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, শেলি কথা বলতে চায়।
ঢোক গিলল কিশোর। যত জটিল রহস্যই হোক, তাতে ঝাঁপিয়ে পড়তে ওর কোন আপত্তি নেই। কিন্তু যতই বড় হচ্ছে, বুঝতে শিখছে, অভিজ্ঞ হচ্ছে, ততই যেন মেয়েদেরকে আরও বেশি রহস্যময় মনে হচ্ছে ওর। ওদের কোন কিছুই যেন বোঝা যায় না। না বলতে পারলেই খুশি হত কিশোর, তবু এভাবে মুখের ওপর বলে দেয়াটা অভদ্রতা। তাই হাত বাড়াল, দাও।
রিসিভার কানে ঠেকাল গোয়েন্দাপ্রধান। হ্যালো। কিশোর পাশা বলছি।
খিলখিল করে হাসল শেলি। ঘাবড়ে গেছ মনে হয়? তারপর? চলছে কেমন?
এই তো শুরু হলো ফালতু কথা! মনে মনে বলল কিশোর। জিজ্ঞেস করল, কি চলছে?
বোকা নাকি? কেমন আছ জিজ্ঞেস করছি, বুঝতে পারছ না?
তাহলে কেমন আছি, সেটা সোজা করে জিজ্ঞেস করলেই হয়।
আ মর, জ্বালা! তোমার সঙ্গে কথা বলাই ঝকমারি...
তাহলে বলো কেন?
হাসতে আরম্ভ করেছে মুসা আর ফারিহা। জানে, এরকমই একটা কিছু ঘটবে।
বলি কেন? এটা একটা কথা হলো...
ঘামতে শুরু করেছে কিশোর। ঠিক এই সময় লাল চুলওয়ালা একজন নার্স উঁকি দিয়ে বলল, ভিজিটিং আওয়ার শেষ। বেরিয়ে যেতে হবে। হাঁপ ছেড়ে বাঁচল যেন কিশোর। তাড়াতাড়ি রিসিভারটা ফিরিয়ে দিল ফারিহার হাতে। ফারিহা বলল, শেলি, পরে কথা বলব। এখন রাখি...
বলেই চলে গেছে নার্স। হঠাৎ ঝটকা দিয়ে খুলে গেল দরজা। দুজন আদালী আর দুজন নার্স একটা চাকাওয়ালা বেড ঠেলতে ঠেলতে ঢুকল। সঙ্গে ঢুকলেন একজন ডাক্তার। লাফিয়ে সরে গেল কিশোর।
বেডটাতে একজন রোগী। একটা মেয়ে। কিশোরদেরই বয়েসী হবে। কালো কোঁকড়া চুল। সুন্দর মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। জখম আছে। ব্যান্ডেজ

লাগানো।
ফারিহা, ডাক্তার বললেন। তোমার নতুন রুমমেট। রোগীকে ফারিহার পাশের বিছানাটায় শোয়াতে নার্সদের সাহায্য করলেন তিনি। বেহুঁশ হয়ে আছে রোগী।
বেশি অসুস্থ? ফারিহা জানতে চাইল।
ওর জখমগুলো সুপারফিশিয়াল মনে হচ্ছে, শান্তকণ্ঠে বলল কিশোর। আমার ধারণা, কনকাশন আর মাইল্ড শক থেকে সেরে উঠছে।
হাঁ হয়ে গেছেন ডাক্তার। অবাক হাসি ফুটল মুখে। ডাক্তারি পড়ছ নাকি?
না, মাথা নাড়ল কিশোর। তবে অবসর সময়ে যে কোন বই হাতের কাছে পেলে পড়ে ফেলি।
নার্সেরা কাজ শুরু করে দিয়েছে। মেয়েটার হাতে স্যালাইনের সুচ ঢুকিয়ে দিয়েছে। স্যালাইনের সঙ্গে আরও নানারকম ওষুধ মিশিয়ে দিতে লাগল। কাজ শেষ করে সরে দাঁড়াল। চার্টে নোট লিখে দিতে লাগলেন ডাক্তার।
কি হয়েছে? জিজ্ঞেস করল ফারিহা।
অ্যাক্সিডেন্ট করেছে, ডাক্তার জানালেন। কাউন্টিলাইন ড্রাইভে। ও কিছু না। এ রকম রাতে অ্যাক্সিডেন্ট করবেই। দিনের বেলাতেই করে বসে, যে ভাবে বেপরোয়া চালায় আজ কালকার…
ডাক্তারের কথা শেষ হওয়ার আগেই আবার দরজায় উঁকি দিল লাল চুলওয়ালা সেই নার্স। কিশোর আর মুসার দিকে তাকিয়ে ধমকে উঠল, যাওনি এখনও! বললাম না ভিজিটিং আওয়ার শেষ।
শুনেছি তো, বিরক্ত হয়েই বলল মুসা।
তাহলে যাচ্ছ না কেন? দারোয়ানকে খবর দেব?
ফারিহার দিকে তাকাল মুসা। চলি, ফারিহা। কাল আবার আসব। রাতে ইচ্ছে করলে ফোন কোরো। কিশোরদের বাড়িতেই থাকছি আজ।
নার্সের দিকেও নজর নেই কিশোরের, মুসা আর ফারিহার দিকেও না। সে তাকিয়ে রয়েছে নতুন রোগীর দিকে।
অ্যাই, এসো, ডাকল মুসা। কি দেখছ?
চার্টে নাম লিখে গেছেন ডাক্তার। জুন লারসেন। কে ও?
আমি কি জানি? চলো। ওই নার্সটা যদি এসে দেখে এখনও যাইনি…
চলো।
মেয়েটা কে মিনিটখানেক পরেই জেনে গেল দুজনে। এলিভেটরের দিকে চলেছে। এই সময় বিশালদেহী একজন মানুষ হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন ওটার ভেতর থেকে। ছুটে গেলেন নার্সরা যেখানে বসে সেদিকে। সোজা গিয়ে দাঁড়ালেন লাল

চুলওয়ালা নার্সের ডেস্কের সামনে। মাথা ঝুঁকিয়ে প্রায় মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আমার মেয়ে কোথায়? কোন ঘরে?
আরে এ তো হার্বার্ট লারসেন! চিনে ফেলেছে কিশোর। চিকেন!
হ্যাঁ, মুসাও চিনতে পেরেছে। দি চিকেন কিং! মুরগীর রাজা!
লাল, সাদা, নীল রঙের বিচিত্র সমাহার পোশাকে। বেশির ভাগ সময়েই যা পরে থাকেন সেই জগিং স্যুট। এই পোশাকে টিভিতেও দর্শকদের দেখা দিয়েছেন। দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার প্রায় সবাই চেনে তাঁকে। হাজার হাজার বার দেখেছে। টিভির পর্দায়। যে কোন চ্যানেল খুললেই কোন না কোন সময় চোখে পড়বেই বিজ্ঞাপনটা। ওখান থেকেই তাঁর ডাক নাম হয়ে গেছে চিকেন। আগের দি এবং পরের কিংটা বাদ দিয়ে দিয়েছে লোকে।
জুন লারসেন-হার্বার্ট লারসেন, বিড়বিড় করছে কিশোর। জুন নিশ্চয়ই লারসেনের মেয়ে।
রুম ওয়ান ওয়ান ওয়ান ওয়ান, মিস্টার লারসেন, নার্স বলল।
ওটা কি লাকি রুম? লারসেন বললেন, আমি চাই, আমার মেয়ে লাকি রুমে থাকুক। যেটাতে কোন রোগী মারা যায়নি। কোথায় ওটা? কোন দিকে? কোন ঘরটা?
ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন ভদ্রলোক। তার জন্যে খারাপই লাগল কিশোরের। এগিয়ে গেল নার্সের ডেস্কের কাছে। মিস্টার লারসেন, ওই যে ওই ঘরটা।
লারসেন যেমন লম্বা তেমনি চওড়া। কিশোরকে ক্ষুদ্রই মনে হলো তার কাছে, যদিও সে-ও কম লম্বা নয়। ভুরু কুঁচকে তাকালেন কিশোরের দিকে, তুমি শিওর?
হ্যাঁ, এই মাত্র দেখে এলাম। ওঘরে আমাদের এক বন্ধুও আছে। জুন এখন ঘুমিয়ে।
কিছুটা যেন স্বস্তি পেলেন চিকেন কিং। সোয়েটশার্টের পকেট থেকে দুটো কুপন বের করে কিশোরের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, নাও। দুটো টিকেট। আমার দোকানে গেলে ফ্রী খেতে পারবে চিকেন। আমার নিজের তৈরি সোনালি সসে চুবিয়ে। খেলে ভুলবে না।
নিতে দ্বিধা করছে কিশোর।
আরে নাও নাও, তাড়া আছে আমার, জোর করে কুপন দুটো কিশোরের হাতে গুঁজে দিলেন লারসেন। তোমরা ভাল সংবাদ দিয়েছ। সেজন্যেই দিলাম। আমি তো ভেবেছিলাম মরেই গেছে! থ্যাঙ্ক ইউ।
বিশাল শরীর নিয়ে বেশ দ্রুতই মেয়ের ঘরের দিকে ছুটলেন লারসেন। সেদিকে তাকিয়ে থেকে কুপনগুলো একটানে ছিড়ে ফেলল কিশোর। বাধা দিতে গেল মুসা। কিন্তু দেরি করে ফেলেছে। হায় হায়, এ কি করলে!

গত হপ্তায় ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম, মনে নেই? পেটের অসুখের জন্যে? ভাজাভুজি খেতে মানা করে দিয়েছেন।
সে তো তোমাকে দিয়েছেন। আমাকে নয়।
এখানে আমার তোমার বলে কোন কথা নেই। পেটের জন্যে যেটা খারাপ, সবার জন্যেই খারাপ।
যুক্তি খুঁজে না পেয়ে চুপ হয়ে গেল, মুসা। তবে এত ভাল একটা খাবার এভাবে নষ্ট করা হলো বলে মনে মনে রেগেই গেল কিশোরের ওপর।
আবার বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে দৌড়ে এসে গাড়িতে উঠল দুজনে। স্যালভিজ ইয়ার্ডে রওনা হলো।
অ্যাক্সিডেন্টটা কি করে ঘটল জানতে পারলে হত, কিশোর বলল।
কিছু বলল না মুসা। একমনে গাড়ি চালাচ্ছে। কিশোরের মনে কিসের খেলা চলছে ভাল করেই বুঝতে পারছে সে। পেয়ে গেছে রহস্য।
ইয়ার্ডে ঢুকল গাড়ি। সোজা এসে ওয়ার্কশপে ঢুকল দুজনে। ট্রেলারের ভেতরে তো পুরানো হেডকোয়ার্টার আছেই, ওয়ার্কশপটাকেও এখন আরেকটা হেডকোয়ার্টার বলা যায়। নানা রকম আধুনিক যন্ত্রপাতিতে সাজিয়েছে কিশোর। এককোণে একটা ডেস্কের ওপর রাখা একটা অ্যানারিং মেশিন। ঢুকেই আগে ওটার কাছে এগিয়ে গেল সে। বোতাম টিপতেই মেসেজ টেপে শোনা গেল রবিনের পরিচিত হাসি হাসি কণ্ঠ, ফারিহাকে দেখতে যেতে পারলাম না। সরি। বস চলে গেছে শহরের বাইরে। নতুন আরেকটা ব্যান্ড চেক করতে গিয়েছিলাম। অফিসে ফিরে হাসপাতালে যাব ভাবছি, এই সময় ফোন করল এমিলি। ও আজকে দাওয়াত করেছিল, পার্টিতে, ভুলেই গিয়েছিলাম। এমন চাপাচাপি শুরু করল, না গিয়ে আর পারলাম না। জানোই তো ওর অবস্থা। ওকে কি করে ঠেকানো যায়, বলো তো কিশোর? তোমার কম্পিউটারকে জিজ্ঞেস করে দেখ, কোন একটা পরামর্শ দিতে পারে কিনা, আচ্ছা, কাল দেখা হবে।
ট্যালেন্ট এজেন্সিতে বড় বেশি সময় দিচ্ছে রবিন, গানের কোম্পানিটার কথা বলল কিশোর, যেটাতে পার্টটাইম চাকরি নিয়েছে নথি-গবেষক।
হ্যাঁ, মুচকি হাসল মুসা। আরেকটা চাকরিতেও বড় বেশি সময় নষ্ট করছে আজকাল। মেয়েদের পেছনে। রবিনটা যে এমন হয়ে যাবে, কল্পনাই করতে পারিনি।
কি আর করা যাবে? দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল কিশোর। এটা আমেরিকা। যে দেশের যা সমাজ। ও তো আর আমার মত নয় যে মেয়েদের সঙ্গে ডেটিং অপছন্দ করবে...
তোমাকেই বা কে মানা করেছে?

করেনি। তবে আমার এসব ভাল লাগে না। একটা ব্যাপারেই কষ্ট হয়, রবিনকে আর আগের মত পাচ্ছি না আমরা।
কই, পাচ্ছি না কোথায়? তিন গোয়েন্দার কাজের সময় তো ঠিকই এসে হাজির হয়। আমি একটা কথা লিখে দিতে পারি, দেখ, ট্যালেন্ট এজেন্সিতে বেশিদিন টিকবে না ও। ব্যাপারটা সাময়িক। ও আবার ফিরে যাবে লাইব্রেরিতে, বইয়ের জগতে।
তাই যাওয়া উচিত। যেখানে যাকে মানায়।
আর কথা বাড়াল না। কিছু কাজ আছে ওদের। ছোট একটা যন্ত্র মেরামত করতে বসে গেল কিশোর। ওটা দিয়ে ইলেক্ট্রনিক লক কম্বিনেশন পড়া সম্ভব কিছু যন্ত্রপাতি এদিক ওদিক করে নিলে, কিশোরের অন্তত সে রকমই ধারণা। ওকে বিরক্ত করল না মুসা। একটা ফুয়েল ইনজেকটরের স্পেয়ার পরিষ্কারে লেগে গেল। ওর গাড়ির জন্যে কাজে লাগবে।
বেশিক্ষণ চুপ করে থাকতে পারল না। কথা বলতে বলতে কাজ করে চলল দুজনে। কিশোরের একটা গাড়ি দরকার, সে কথা আলোচনা করল কিছুক্ষণ। আরও খানিকক্ষণ আফসোস করল রবিনকে আগের মত করে পাচ্ছে না বলে। এক সময় চলে এল চিকেন হার্বার্ট লারসেনের কথায়। জুন লারসেনের দুর্ঘটনার ব্যাপারটা এখনও মাথায় ঘুরছে কিশোরের। পুরোপুরি জানতে পারেনি বলে খুঁতখুঁত করছে মনটা।
হঠাৎ বাজল টেলিফোন। চমকে দিল দুজনকেই। ঘড়ির দিকে তাকাল। প্রায় মধ্যরাত। এত রাতে কে করতে পারে, বিশেষ করে শুক্রবারের রাতে?
পুরানো একটা সুইভেল চেয়ারে বসেছে কিশোর। ওটাকে ঘুরিয়ে ফোনের দিকে হাত বাড়াল। হ্যালো, তিন গোয়েন্দা।
কিশোর, ফারিহা বলছি। তোমাদের স্পীকারের সুইচ দিয়ে দাও। দুজনকেই শোনাতে চাই।
ফারিহা, টেলিফোন লাইনের সঙ্গে যোগাযোগ করা সুইচ অন করতে করতে মুসাকে জানাল কিশোর। আরও একটা বিশেষ নতুন ব্যবস্থা করেছে সে, যাতে এপাশে যতজন থাকবে, সবাই ওপাশের লোকের সঙ্গে কথা বলতে পারবে।
মুসাও তারই মত অবাক হলো। জিজ্ঞেস করল, ফারিহা, কি হয়েছে? এত রাতে?
আবার সেই অনুভূতিটা হলো কিশোরের, রহস্যের গন্ধ পেলে যেমন হয়। তবে নিশ্চিত হতে পারছে না।
অদ্ভুত একটা কান্ড করছে জুন, জবাব দিল ফারিহা। ঘুমের মধ্যে গোঙাচ্ছে, আর বিড়বিড় করে কথা বলছে।
ওরকম অ্যাক্সিডেন্টের পর প্রলাপ বকাটাই স্বাভাবিক, কিশোর বলল।

তা ঠিক। তবে যা বলছে, তাতে ভয় লাগছে আমার। বলছে, হাজার হাজার, লাখ লাখ লোক মারা যাবে! বার বার বলছে একই কথা।
চুপ হয়ে গেল কিশোর আর মুসা। জবাব দিতে পারছে না।
ফারিহা বলছে, এই শেষ নয়। ও বলছে, মুরগীতে বিষ মিশিয়ে দেয়া হয়েছে। এটা ঠিক না! এটা অন্যায়! এমন ভঙ্গিতে বলছে, যেন নিজের চোখে বিষ মেশাতে দেখেছে। ঘুমের ঘোরে প্রলাপ বকছে বলে মনেই হয় না!
মৃদু শিস দিয়ে উঠল মুসা। সাংঘাতিক কথা!
ওর দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে কিশোর বলল, কি, বলেছিলাম না? আমার কেমন জানি মনে হচ্ছে?
বলেছ। কিন্তু কে জানত, চিকেন কিং আমার প্রিয় খাবারে বিষ মেশাচ্ছেন?
অ্যাই, শুনছ? কিশোরের ওয়ার্কশপে স্পীকারে ভেসে এল ফারিহার গলা। আছ নাকি ওখানে?
আছে ঠিকই, তবে জিভ যেন জড়িয়ে গেছে। কথা বেরোচ্ছে না মুখ দিয়ে। কতবার খেয়েছে চিকেন কিঙের রেস্টুরেন্টে? শতবার? হাজার বার? কিশোরই খেয়েছে এতবার, খাবারের প্রতি যার ঝোক নেই তেমন। আর মুসা যে কতবার খেয়েছে তার তো হিসেবই করতে পারবে না। চোখে ভাসছে, টিভির পর্দায় দেখা হার্বার্ট লারসেনের চেহারা। চেহারাটাকে নিস্পাপ করে তুলে নিরীহ কণ্ঠে বলেন, আমার মুরগী সেরা মুরগী। খেয়ে খারাপ বলতে পারলে পয়সা ফেরত।
চিকেন লারসেন... খাবারে বিষ মেশায়...? বিড়বিড় করছে মুসা। বিশ্বাস করতে পারছে না। আনমনে মাথা ঝাঁকিয়ে চলেছে। আমার বিশ্বাস হয় না!
হওয়ার কথাও নয়, কিশোর বলল। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার চিন্তিত ভঙ্গিতে। চাচী প্রায়ই বলে, আপাতদৃষ্টিতে যেটা ঠিক মনে হরে সেটা ঠিক -ও হতে পারে। কেন একেবারে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলছি আমরা?
মানে?
মানে, চিকেন লারসেনকে দোষ দিচ্ছি কেন আমরা? ঘোরের মধ্যে তাঁর কথাই বলছে জুন, কি করে জানছি? নাম তো আর বলেনি। অন্য কারও কথাও বলে থাকতে পারে, যে খাবারে বিষ মেশাচ্ছে। মস্ত একটা শক খেয়েছে সে। নানারকম ওষুধ দেয়া হচ্ছে। ওষুধের কারণেও দুঃস্বপ্ন দেখে অনেক সময় রোগী। হতে পারে ব্যাপারটা পুরোই দুঃস্বপ্ন।
অ্যাই, শোনো, ফারিহা বলল। জুনের মুখের কাছেই নিয়ে যেতে পারতাম। তাহলে নিজের কানেই শুনতে পারতে। কিন্তু কর্ডটা অতদূর যায় না। যতটা সম্ভব কাছে নিয়ে যাচ্ছি।...শোননা। শুনতে পাচ্ছ?
মাথা নাড়ল মুসা। কিশোর বলল, না। কি বলে?

আবার সেই একই কথা, ফারিহা বলল। বলছে, না না, দিও না...লোক মারা যাবে! ওকাজ কোরো না!
ও-কে, কিশোর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। কাল সকাল এগারোটায় জুনের সঙ্গে কথা বলব। ভিজিটিং আওয়ার স্টার্ট হলেই চলে আসব। দেখা যাক, ঘুম ভাঙে কিনা, কিছু বলতে পারে কিনা স্বপ্নের ব্যাপারে।
ভালই হয় এলে। তবে আমি বাজি রেখে বলতে পারি, রহস্য একটা আছেই। পেয়ে যাবে।
কাল সকালে দেখা হবে, ফারিহা, মুসা বলল।
লাইন কেটে দিল কিশোর।
সে রাতে ভালমত ঘুমাতে পারল না কিশোর। ভাবছে, কোন লোকটা লক্ষ লক্ষ মানুষকে বিষ খাওয়াতে চায়? কেন? চিকেন লারসেন? নাকি কোন খেপাটে সন্ত্রাসী, যার দলের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে জুন? নাকি লারসেনের ব্যবসার ক্ষতি করার জন্যে কেউ বিষ মিশিয়ে দিচ্ছে মুরগীর মাংসে তৈরি তার বিখ্যাত খাবারগুলোতে?
রাত একটায় রবিনকে ফোন করল কিশোর। পেল না বাড়িতে। তখনও ফেরেনি।
দুটোয় আবার করল। এইবার পেল। সব কথা জানিয়ে বলল, সকালে যেন হাসপাতালে হাজির থাকে।
কিশোরের ফোন পাওয়ার পর রবিনেরও ঘুম হারাম হয়ে গেল। সে-ও ভাবতে লাগল একই কথা, কে এ রকম পাইকারী হারে মানুষ মারতে চায়?
ফারিহাও ঘুমোতে পারছে না। জেগে রয়েছে বিছানায়। কান পেতে রয়েছে। আর কিছু বলে কিনা শোনার জন্যে। যতবারই গুঙিয়ে ওঠে জুন, সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করে সে, জুন, কে? কৈ মুরগীতে বিষ মেশাচ্ছে বলো তো? কিন্তু জবাব দেয় না জুন।
মরার মত ঘুমিয়েছে কেবল মুসা। তার কোন প্রতিক্রিয়া হয়নি।
পরদিন সকালে জানালা দিয়ে যখন হাসপাতালের ঘরে রোদ এসে পড়েছে, তখন সেখানে পৌঁছল কিশোর আর মুসা।
প্রথমেই লক্ষ্য করল কিশোর, ফারিহাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে। ঘরে ফুলদানীর সংখ্যা অনেক বেড়েছে, আর তাতে অনেক ফুল। জুনের বিছানার পাশে একটা চেয়ারে বসে আছে একটা স্টাফ করা মুরগী, মাথায় সোনালি মুকুট। পর্দা টেনে ঘিরে দেয়া হয়েছে জুনের বিছানা।
পর্দা টানা জায়গাটার দিকে আঙুল তুলে জিজ্ঞেস করল কিশোর। জুন কোথায়? এখুনি ওর সঙ্গে কথা বলে রহস্যটার একটা সমাধান করে ফেলতে চায়। আর কেউ আছে?

শশশ! ঠোঁটে আঙুল রেখে কিশোরকে আস্তে কথা বলতে ইঙ্গিত করল ফারিহা। ফিসফিসিয়ে বলল শুধু, জুন ঘুমিয়ে আছে।
এই সময় ঘরে ঢুকল রবিন।
সরি। দেরি হয়ে গেল। গাড়িটা ট্রাবল দিচ্ছিল। পুরানো ফোক্সওয়াগনটা বিক্রি করে দিয়ে আরেকটা গাড়ি কিনেছে রবিন। লম্বা, একহারা শরীর। গায়ের কটন সোয়েটারটা খুলে গলায় পেঁচিয়ে রেখেছে। কয়েক বছর আগেও সে ছিল রোগাটে, হালকা পাতলা এক কিশোর। পায়ে চোট পেয়েছিল। পাহাড়ে চড়তে গিয়ে ভেঙে ফেলেছিল হাড়। সেটা বড় যন্ত্রণা দিত মাঝে মাঝে। এখন সব সেরে গেছে।
অনেক বদলে গেছে রবিন। লম্বা হয়েছে। গায়ে মাংস লেগেছে। চেহারায় চাকচিক্য। ধোপদুরস্ত পোশাক পরে। চাকরি করে বার্টলেট লজের ট্যালেন্ট এজেন্সিতে। কারাতের ট্রেনিং নিচ্ছে। ওকে দেখলে কেউ এখন কল্পনাই করতে পারবে না এই রবিন মিলফোর্ডই পার্ট টাইম চাকরি করত রকি বীচের লাইব্রেরিতে, আর বইয়ে মুখ গুঁজে থাকত। রকি বীচ হাই স্কুলে মেয়েমহলে রবিন এখন একটা পরিচিত প্রিয় নাম।
কোথায় আমাদের কেস? হেসে জিজ্ঞেস করল রবিন। ডানা মেলে উড়ে গেল না তো চিকেন প্রিন্সেস?
কেস ওই পর্দার আড়ালে, মাথা নেড়ে পর্দাটা দেখিয়ে দিল মুসা। ওর সঙ্গে কথা বলতে পারিনা আমরা।
চেষ্টা করলে কিশোর পারবে, হেসে বলল রবিন। তবে যুক্তি দেখাতে গেলে মুখ খুলবে কিনা...
খোলার অবস্থাতেই নেই এখন, নিচু গলায় বলল ফারিহা। অন্তত শান্ত তো হয়ে আছে। কাল রাতে যা করেছে না! কয়েকজন লোকও এসেছিল দেখা করতে।
রাত দুপুরে! অবাক হলো কিশোর। লাল চুলওয়ালা ওই নার্সের চোখ এড়াল কিভাবে?
শ্রাগ করল ফারিহা। রহস্যময় ব্যাপার, তাই না? কারা ওরা?
ঘণ্টায় ঘণ্টায় এসেছে চিকেন লারসেন। গোটা দুই ফ্রী কুপনও দিয়েছে আমাকে। সবাইকেই খালি কুপন বিলাচ্ছে। আর কে এসেছে?
টম হামবার নামে একটা সুন্দর লোক। নাম জানলে কি করে? মুসা জিজ্ঞেস করল।
কেন, গোয়েন্দা কি শুধু তোমরাই? ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল ফারিহা। জিজ্ঞেস করেছিলাম। জুনের বয়ফ্রেন্ড ছিল এক সময়। ভোর চারটের দিকে এসেছিল সে। জুনের দিকে তাকিয়ে বসেছিল। যেন পাহারা দিচ্ছিল ওকে। তারপর ভোরবেলা

এল আরেকজন। নাম বলল হেনা তানজামিলা। জুনের কলেজ হোস্টেলের নাকি রুমমেট সে।
হুমম, মাথা দোলাল কিশোর। ওর কথা ভুলে যেতে পারি আমরা।
কেন? রবিনের প্রশ্ন।
কারণ, জুন বলেছে লোকটা খাবারে বিষ মেশাচ্ছে। আর ওই টমকে নিয়েও মাথাব্যথা নেই আমার। একজন ভূতপূর্ব বয়ফ্রেন্ড লাখ লাখ লোক মারার প্ল্যান করবে বলে মনে হয় না।
প্রতিশোধ নিতে চাইলেও না?
লাখ লাখ লোকের ওপর কিসের প্রতিশোধ নেবে?
আগেই তর্ক শুরু করে দিলে, বাধা দিয়ে বলল ফারিহা। চার নম্বর রহস্যময় লোকটার কথা তো এখনও শোনাইনি। কণ্ঠস্বর যতটা সম্ভব খাদে নামিয়ে রাখার চেষ্টা করছে সে।
জুনের বিছানা ঘিরে টানানো পর্দার দিকে তাকাল চারজনে। যেন শিওর হতে চাইছে, জুন জেগে গেছে কিনা। তারপর লোকটার কথা বলতে লাগল ফারিহা, চার নম্বর ভিজিটরটি একজন লোক বটে! ভীষণ বদমেজাজী। বয়েস তিরিশ মত হবে। বেশ তাগড়া শরীর। একটা আর্মি ক্যামোফ্লেজ জ্যাকেট গায়ে দিয়ে এসেছিল। আমার ওপর চোখ পড়তেই জ্যাকেটের কলার তুলে নিয়ে মুখ আড়াল করে ফেলল। হতে পারে, চেহারাটা বেশি কুৎসিত, সে জন্যেই দেখাতে চায়নি।
নাম জিজ্ঞেস করেছ? মুসা জানতে চাইল।
করেছি। শুয়োরের মত ঘোৎ ঘোঁৎ করে চুপ থাকতে বলল। ধমক দিয়ে বলল, আমি ওর নাম জেনে কি করব? তারপর জুনের বিছানার চারপাশের পর্দাটা টেনে দিল যাতে আমি কিছু দেখতে না পারি।
তারপর? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
নানারকম খুটুরখাটুর শব্দ শুনলাম। মনে হলো, জুনের ওপাশে যতগুলো ড্রয়ার আছে সব খুলে খুলে দেখেছে।
তাড়াহুড়ো করে, না আস্তে আস্তে?
তাড়াহুড়ো করে।
হাসল কিশোর। তারমানে আন্দাজে কিছু করতে আসেনি। যা করতে এসেছে, জেনে বুঝেই এসেছে। কি খুঁজছিল, জানে।
কিন্তু পায়নি। খালি হাতে ফেরত যেতে দেখেছি।
পায়চারি শুরু করল কিশোর। জুন না জাগলে আর কিছুই জানা যাবে না।
আর জাগলে যেন ভিজিটিং আওয়ারে জাগে, মুসা বলল মুখ বাঁকিয়ে। নইলে যে নার্সের নার্স। এক্কেবারে দজ্জাল। একটা মুহূর্তও আর থাকতে দেবে না

আমাদেরকে।
জুনের পর্দার কাছে গিয়ে উঁকিঝুঁকি দিতে আরম্ভ করল রবিন। অবস্থা খুব একটা খারাপ লাগছে না। খবরের কাগজগুলো মন্তব্য করছে, বেঁচে যে আছে এটাই ভাগ্য। অ্যাক্সিডেন্টে গাড়িটার নাকি সাংঘাতিক ক্ষতি হয়েছে, ঘুরে দাঁড়াল সে। দুর্ঘটনার জায়গাটা দেখেছ?
মাথা নাড়ল কিশোর। একভাবে পায়চারি করে চলেছে। এই সময় একগোছা ফুল নিয়ে ঘরে ঢুকল লাল চুলওয়ালা নার্স।
প্রথমে ফারিহার দিকে তাকাল সে, তারপর এক এক করে তিন গোয়েন্দার দিকে। তিনটে ছেলে! ফারিহার দিকে আবার তাকিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, এত বন্ধু জুটিয়েছ কেন? রোগ না সারিয়ে আরও তত বাড়াবে। এতজনে দেখতে আসার কোন দরকার আছে? জুনের বিছানার কাছে ফুলগুলো রেখে দরজার দিকে এগোল সে। বেরোনোর আগে ফিরে তাকিয়ে বলল, আবার আসব আমি, যেন হুমকি দিয়ে গেল।
কেন আসবে? নার্স বেরিয়ে যাওয়ার পর বিড় বিড় করে যেন নিজেকেই প্রশ্ন করল মুসা।
ইনটারেসটিং, রেখে যাওয়া ফুলগুলো দেখতে দেখতে বলল রবিন। হেনরি অগাসটাস পাঠিয়েছে।
তাতে ইনটারেসটিঙের কি হলো? মুসা জিজ্ঞেস করল।
কারণ, অগাসটাস রেস্টুরেন্টের মালিক সে। চিকেন লারসেনের প্রতিযোগী।
তুমি জানলে কি করে? তোমার আর কিশোরের কাছে তো কোন রেস্টুরেন্টেরই কোন মূল্য নেই। আগের রাতে কুপন ছিড়ে ফেলার পর থেকেই বিরক্ত হয়ে আছে মুসা। রাগটা ঝাড়ল এখন।
হেসে ফেলল রবিন। মনে হচ্ছে তোমার খাওয়ায় বাদ সেধেছে কিশোর? ফ্রী কুপন দিয়ে গিয়েছিল নাকি চিকেন লারসেন?
দিয়েছিল, কিশোর জানাল। আজেবাজে জিনিস খেয়ে পেট নষ্ট হয়। সে জন্যে ফেলে দিয়েছি। আর কেউ কিছু মুফতে খেতে দিলেই খেতে হবে নাকি?
শব্দ করে হাসল রবিন। মুসার রাগের কারণ এখন পরিষ্কার। ওর দিকে তাকিয়ে বলল, না, রেস্টুরেন্টে খেতে গিয়ে হেনরির সঙ্গে পরিচয় হয়নি। অগাসটাস রেস্টুরেন্টের শুভ উদ্বোধনী দিনে একটা ব্যান্ড পার্টি পাঠাতে হয়েছিল আমাকে। আমিও গিয়েছিলাম সঙ্গে। টাইম যখন দিয়েছিল তার অনেক পরে এসেছিল হেনরি। ওকে ছাড়া কাজ শুরু করা যায়নি। ঝাড়া চারটে ঘণ্টা রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল আমাদের।
শত্রুর মেয়েকে ফুল পাঠাল কেন কিছু আন্দাজ করতে পারো?

ওরকম করেই থাকে হেনরি। ব্যবসার কোন ট্রিকস হবে। তবে লোকটাকে বোধহয় তোমারও পছন্দ হবে না। শুনেছি, হেনরি আর চিকেন একজন আরেকজনের ছায়া দেখতে পারে না। লারসেন মরে গেলে তার চেয়ে বেশি খুশি আর কেউ হত না। মুখেও বলে সেকথা। লারসেন অতটা খারাপ লোক নন। মুখে কিছু বলেন না বটে, তবে অন্তরের ইচ্ছা একই হবে।
যাক, বাঁ হাতের তালুতে ডান হাতে ঘুসি মারল মুসা। সন্দেহ করার মত কয়েকজন পাওয়া গেল।
তা গেল, বলল কিশোর। কিন্তু কোন অপরাধ তো ঘটেনি। সন্দেহ করে কি হবে?
এই সময় দরজা খুললেন চিকেন লারসেন। ঘরে এত লোক দেখে যেন বরফের মত জমে গেলেন। তবে এক সেকেন্ডের জন্যে।
তার মুখের দিকে তাকাল কিশোর। গোলগাল চেহারা? চোখের কোণে কালি কেন? মেয়ের জন্যে দুশ্চিন্তায়? নাকি উন্মাদের দৃষ্টি? পাগলের চোখেও ও দৃষ্টি দেখেছে সে। খাবারে বিষ মিশিয়ে লাখ লাখ মানুষকে মেরে ফেলার কথা তার মেয়ে বলে ফেলেছে বলেও দুশ্চিন্তা হতে পারে। কোনটা?
দরজায় দাঁড়িয়েই তিনি বললেন, আমি আমার মেয়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ একা থাকতে চাই। সুযোগ পাব?
অনিচ্ছা সত্ত্বেও বেরোতে হলো তিন গোয়েন্দাকে। চলে এল হলঘরে। চারপাশে একবার চোখ বোলাল কিশোর। তারপর হলের মাঝে নার্সরা যেখানে বসে সেদিকে এগোল। ডেস্কের পেছনে মাত্র একজন নার্স রয়েছে। সেই লাল চুলওয়ালা মহিলা। তার নেমট্যাগে লেখা রয়েছেঃ মারগারেট ইলারসন, আর এন।
শুনুন, মোলায়েম গলায় জিজ্ঞেস করল কিশোর। কাল রাতে এখানে কে ডিউটিতে ছিল বলতে পারবেন?
অবাক কান্ড! ভুরু কুঁচকে ফেলল মারগারেট, তুমি জিজ্ঞেস করার কে? শুনতে চাও? আমি ছিলাম। আমি। আরেকজন যার ডিউটিতে থাকার কথা, সে হঠাৎ করে বিয়ে করে বসেছে। কাজেই দিনরাত এখন আমাকে ডিউটি দিতে হচ্ছে। একটানা চব্বিশ ঘণ্টা।
হাসল কিশোর। তাতে উত্তেজনা মিশে আছে। তাই নাকি। তাহলে তো জুন লারসেনকে যারা যারা দেখতে এসেছে সবার কথাই বলতে পারবেন। ওর বাবা বাদে আর যে তিনজন এসেছিল।
মাথা নাড়ল মারগারেট।!না। রোগীর পারিবারিক ব্যাপারে বাইরের লোকের নাক গলানো নিষেধ।
আলাপ শেষ। মহিলার চোখ দেখেই সেটা আন্দাজ করতে পারল কিশোর। একটানা ডিউটি দিয়ে ক্লান্ত হয়ে আছে মারগারেট। মুখ গোমড়া করে রেখেছে।

তাছাড়া কথা কম বলা স্বভাব। মেজাজ ভাল থাকলেও বলত না। এখন তো প্রশ্নই ওঠে না। জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে আরেক দিকে তাকাল গোয়েন্দাপ্রধান।
এগিয়ে এসেছে রবিন। লালচে চুলে হাত বুলিয়ে বলল, ম্যাম, ব্যাপারটা জরুরী।
কড়া চোখে তাকাল মারগারেট। বিনিময়ে মিষ্টি একটা হাসি দিল রবিন। তারপর ভদ্র কণ্ঠে বলল, ট্যালেন্ট এজেন্সিতে যে ভাবে মক্কেলদের পটায় সেভাবে, চব্বিশ ঘণ্টা ডিউটি! এ তো অমানবিক। নাহ, আপনার জন্যে মায়াই লাগছে আমার।
চোখের দৃষ্টি সামান্য নরম হলো মহিলার। রবিনের দিকে তাকিয়ে যেন সিদ্ধান্ত নেয়ার চেষ্টা করছে, ভাগিয়ে দেবে না কথা বলবে। এত ভাল একটা ছেলের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা উচিত হবে না ভেবেই বোধহয় শেষে বলল, তিনজন তো নয়, দুজন এসেছিল। একটা ছেলে, আর একটা মেয়ে।
কেন, আর্মি জ্যাকেট পরা লোকটা? জানতে চাইল কিশোর। আসেনি?
বিস্ময় ফুটল মারগারেটের চোখে। আমি সাফ মানা করে দিয়েছিলাম, ঢুকতে পারবে না। আর বোলো না! লোকটাকে দেখলেই গা শিরশির করে। শুঁয়োপোকা দেখলে যেমন করে!
কেন? রবিনের প্রশ্ন।
দেখতেই জানি কেমন। একের পর এক প্রশ্ন করে চলল। জবাব দিতে দিতে মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার জোগাড় আমার। আর কি সব প্রশ্ন!
যেমন? কিশোর জিজ্ঞেস করল।
মেয়েটা কি বাঁচবে? যেন মরে গেলেই খুশি হয়। ওর জিনিসপত্রগুলো কোথায় রেখেছে, একথাও জানতে চাইল। আরও নানা রকম কথা। লারসেন পরিবারের লোক বলে মনে হলো না ওকে।
চেহারাটা দেখেছেন ভাল করে? জিজ্ঞেস করল রবিন।
মাথা নাড়ল মারগারেট। লোকের মুখের দিকে কখনোই ভাল করে তাকাই না আমি। কেবল তার জ্যাকেট আর কথাগুলো মনে আছে। বদমেজাজী যে এটুকুও বুঝতে পেরেছি। তবে তার চেহারা বলতে পারব না।
অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।
সরে এল তিন গোয়েন্দা। কিশোর বলল, ধরা যাক, লোকটার নাম মিস্টার এক্স। এখন এই এক্সকে বিশেষ সুবিধের লাগছে না আমার। সন্দেহ জাগানোর মত চরিত্র। জুন হয়তো জানতে পারে লোকটার আসল পরিচয়। চলো, রুমে যাই। দেখি, জাগল কিনা।
অ্যাই, ছেলেরা, ওদের কথা শুনে ফেলেছে মারগারেট। জুনের অবস্থা কিন্তু খারাপ। ঘুম দরকার। ওর জাগতে সময় লাগবে।

তাহলে আর গিয়ে লাভ নেই। অহেতুক বসে থাকা। তার চেয়ে কাজের কাজ যদি কিছু করা যায় সেই চেষ্টা করল ওরা। মুসা রয়ে গেল হাসপাতালে। ফারিহাকেও সঙ্গ দেবে, জুনের কাছে কারা কারা আসে দেখবে, আর ওর ঘুম ভাঙে কিনা খেয়াল রাখবে। কিশোর আর রবিন চলল রকি বীচ পুলিশ স্টেশনে, চীফ ইয়ান ফ্লেচারের সঙ্গে কথা বলতে।

আরেকটা ফোক্সওয়াগনই কিনেছে রবিন। গোবরে পোকার মত এই গাড়িগুলোই যেন তার বিশেষ পছন্দ। তার বক্তব্য, এই গাড়ি নাকি পথেঘাটে বন্ধ হয়ে বিপদে ফেলে না। যাই হোক, সেটা পরীক্ষার ব্যাপার। এই গাড়িটার রঙও আগেরটার মতই, লাল। সে বসল ড্রাইভিং সীটে। পাশের প্যাসেঞ্জার সীটে বসল কিশোর।

থানায় পৌঁছতে বেশিক্ষণ লাগল না। চীফ আছেন। ছেলেদের সঙ্গে দেখা করার ফুরসত আছে তার আপাতত। ওরা ঢুকে দেখল, লাঞ্চ প্যাকেট খুলছেন তিনি। চিকেন লারসেনের ফ্রাইড চিকেন।

খাবে? জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

থ্যাংকস, বলে হাত বাড়াল রবিন। তুলে আনল সোনালি মাখন মাখানো এক টুকরো মাংস।

কিশোরের দিকে তাকালেন চীফ। নাও?

নিঃশব্দে মাথা নাড়ল কিশোর। খামচে ধরেছে চেয়ারের হাতল। যেন বিষ মাখানো খাবার খেতে দেখছে দুজনকে।

তারপর? জিজ্ঞেস করলেন ফ্লেচার। কোন কারণ ছাড়া তো নিশ্চয় আসনি। কি কেস? একটা রান তুলে নিয়ে কামড় বসালেন তিনি। চিবাতে লাগলেন। আরাম করে।

জুন লারসেনের অ্যাকসিডেন্টের ব্যাপারে জানতে এলাম, জবাব দিল কিশোর।

ওতে কোন রহস্য নেই, মুখ ভর্তি মুরগীর মাংস নিয়ে কথা বলায় স্পষ্ট হচ্ছে না কথা। কাজেই গিলে নিলেন চীফ। বৃষ্টির মধ্যে কন্ট্রোল হারিয়ে ফেলেছিল। পাহাড়ী পথে এরপর যা হবার তাই হয়েছে।

অস্বাভাবিক কিছু নেই এর মধ্যে?

দুটো প্রশ্ন জেগেছে আমার মনে। তবে অনেক দুর্ঘটনার বেলাতেই এটা ঘটে। অপরিচিত একজন ফোন করে খবরটা দিল। ওই লোকটাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি আমরা। অ্যাক্সিডেন্টটা ঘটতে দেখে থাকতে পারে। তাতে কোন রহস্য নেই। কিন্তু নাম বলল না কেন? আরেকটা ব্যাপার। দুই সেট চাকার দাগ ছিল। একসেট জুনের গাড়ির। সোজা রাস্তা থেকে নেমে গেছে। আরেকটা সেট ছিল তার পাশে। যেখানে অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছে, তার কাছ থেকে আরও খানিকটা নিচে নেমে গেছে।

কি ঘটেছিল, অনুমান করার চেষ্টা করল কিশোর। দুটো গাড়ি আসছিল। একটা আগে, আরেকটা পেছনে। একটা জুনের গাড়ি। অন্যটা কার? নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে আরম্ভ করল সে। ভিন্ন একটা দৃশ্য ফুটতে শুরু করেছে মনের পর্দায়। স্যার, ধীরে ধীরে কথাগুলো বলল সে, যেন নিজেকেই বোঝাল। একটা সম্ভাবনার কথা কি ভেবেছেন আপনি? এমনও তো হতে পারে, জুন লারসেনকে তাড়া করেছিল কেউ?

তাড়া করেছিল? কোল্ড ড্রিংকের গ্লাসটা তুলে নিয়েছিলেন চীফ, আস্তে করে নামিয়ে রাখলেন আবার সেটা। কি ভাবছ তুমি, কিশোর, বলো তো? অতি কল্পনা করছ না তো?

একটা সম্ভাবনার কথা বললাম, স্যার, হতেই তো পারে, সামনে ঝুঁকল কিশোর। ধরুন, পাহাড়ী পথ ধরে নামছেন আপনি। জোরে বৃষ্টি হচ্ছে। আপনার সামনের গাড়িটা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পিছলে গেল। রাস্তা থেকে সরে গিয়ে পড়তে শুরু করল। আপনি তখন কি করবেন?

চীফ বলার আগেই বলে উঠল রবিন, অবশ্যই ব্রেক করব, যত জোরে পারি। থামানোর চেষ্টা করব আমার গাড়িটা। স্কিড করে যতটা যাওয়ার যাবে গাড়ি, তারপর থেমে যাবে।

যেখানে দ্বিতীয় সেট চাকার দাগ দেখেছি সেখানে, রবিনের সঙ্গে একমত হলেন চীফ।

তারপর কি করবে? রবিনকে প্রশ্ন করল কিশোর।

তারপর পিছিয়ে নিয়ে যাব আমার গাড়িটাকে। যাতে ওটাও আগেরটার মত পিছলে পড়তে না পারে এবং তারপর যাব আগের গাড়িটার কি অবস্থা হয়েছে, লোকজন বেঁচে আছে কিনা দেখার জন্যে।

ঠিক তাই, সন্তুষ্টির হাসি হাসল কিশোর। দ্বিতীয় গাড়িটা কি তা করেছে? সাহায্য করতে গেছে জুনকে? বেঁচে আছে কিনা অন্তত সেটুকু দেখার চেষ্টা কি করেছে?

না, স্বীকার করলেন চীফ। যা প্রমাণ পেয়েছি, তাতে ওরকম কিছু করেনি। পথের পাশে নরম মাটি ছিল। বৃষ্টিতে ভিজে কাদা হয়ে গিয়েছিল। ওখানে চাকার দাগ পাইনি। জুতোর দাগ পাইনি। কেউ নামলে জুতোর দাগ পড়তই। আমার বিশ্বাস, প্রথম গাড়িটাকে পড়তে দেখে গাড়ি থামিয়েছিল বটে দ্বিতীয় গাড়িটা, তবে চুপ করে বসে ছিল ওটার আরোহী।

তাহলে কে সেই মানুষ? কিশোরের প্রশ্ন। যে একটা গাড়িকে পড়ে যেতে দেখেও সাহায্যের হাত বাড়ায়নি? বেচারা ড্রাইভারের কি হলো, তা পর্যন্ত দেখার চেষ্টা করেনি? নিজেই জবাব দিল প্রশ্নগুলোর, হতে পারে, সেই লোক জুন লারসেনকে

তাড়া করেছিল। গাড়িটা পড়ে যাওয়ায় খুশিই হয়েছিল। মেয়েটা মরেছে না বেঁচে আছে সেটা দেখারও প্রয়োজন বোধ করেনি।
ভাল বলেছ, চীফ বললেন। তথ্য-প্রমাণ কিছু দেখাতে পারবে?
সেই চেষ্টাই করব, উঠে দাঁড়াল কিশোর। দেখি, বের করতে পারি কিনা। রবিন, এসো।
দরজার কাছে যাওয়ার আগেই ওদেরকে ডাকলেন চীফ। বেশি কষ্ট করার দরকার নেই। জুন বেঁচেই আছে। ও জেগে গেলেই ওর মুখ থেকে সব শুনতে পারব আমরা।
ঠিকই বলেছেন চীফ। কি ঘটেছে জানার জন্যে তদন্তের প্রয়োজন নেই। কেউ তাকে অনুসরণ করছিল কিনা, হয়তো লক্ষ্য করেছে জুন। আর তাড়া করে থাকলে তো কথাই নেই। এমনও হতে পারে, ঠেলে ফেলে দেয়া হয়েছে ওর গাড়ি। হতে পারে, যে ফেলেছে, সেই লোকই খাবারে বিষ মিশিয়ে লাখ লাখ লোককে মারার ফন্দি করেছে।
সব প্রশ্নের জবাবই হয়তো আছে জুনের ঘুমন্ত মাথায়। এখন শুধু তার ঘুম ভাঙার অপেক্ষা। তারপরই জবাব পেয়ে যাবে তিন গোয়েন্দা।
কিন্তু আসল কথাটা হলো, জাগার পর সত্যি কথাগুলো বলবে তো জুন? যদি তার বাবা এসবে জড়িত থাকেন? বলবে? বাবাকে বাঁচানোর জন্যে মুখ বুজে থাকবে না?
থানা থেকে বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠল দুই গোয়েন্দা। খিদে টের পেল কিশোর। সে কথা বলল রবিনকে।
ভুল করলে তো না খেয়ে, রবিন বলল। ডাক্তার তো কত কথাই বলবে। কত কিছু নিষেধ করবে। সব শুনলে কি চলে?
বলাটা সহজ, মুখ কালো করে বলল কিশোর। পেটের যে কি অবস্থা হয়েছিল আমার, তোমার হলে বুঝতে। কি কষ্টটাই যে করেছি! এখন খাবার দেখলেই বিষ মনে হয় আমার!
পেট যখন আছে, ফুড পয়জনিং হবেই। সবারই হয়। তাই বলে কি খাওয়া ছেড়ে দেব?
তা কি দিয়েছি নাকি? বেছে বেছে খাচ্ছি। আর এতে বেশ ভালই লাগছে আমার। পেটে আর কোন অশান্তি নেই।
আচ্ছা, বাদ দাও ওসব কথা। তোমার যা ইচ্ছে খেয়ো। এখন কি করব, বলো।
কাজ একটাই করার আছে। কোন লোকটা জুনকে ফলো করেছিল, তাকে খুঁজে বের করা। কাল রাতে হাসপাতালে যে তিনজন দেখতে এসেছিল তাদের একজনও হতে পারে।

টম, হেনা, আর মিস্টার এক্স, এই তিনজনের একজন?
হ্যাঁ। হেনরি অগাসটাসের ব্যাপারেও খোঁজ নিতে হবে আমাদের, লারসেনের শত্রু যখন। হেডকোয়ার্টারে ফিরে কম্পিউটারেই সেটা করার চেষ্টা করব। জিনিসটা যখন কিনলামই, কাজে লাগাই। ডাটাসার্ভে খোঁজ করে ওদের বিজনেস ফাইলগুলো বের করে নেব। দেখি, হেনরি আর তার রেস্টুরেন্টের ব্যাপারে কি তথ্য দেয় কম্পিউটার। ওদের ডাটাবেজ হলো দি ওয়াল স্ট্রীট জার্নাল। তথ্য জানাতেও পারে।
তুমি তো কম্পিউটার নিয়ে বসবে। আমি…
জানার চেষ্টা করবে, কাল রাতে হাসপাতালে জুনকে দেখতে আসার আগে কোথায় কি করেছে টম।
মাপ চাই। সময় নেই আমার। এজেন্সিতে যেতে হবে।
বেশ। তাহলে মুসাকে ফোন করে বলল, ও-ই চেষ্টা করুক। অহেতুক ফারিহার সঙ্গে বসে বসে বকবক করার চেয়ে একটা কাজ অন্তত করুক।
বেশ। হেনা আর মিস্টার এক্সের ব্যাপারে কি হবে?
হেনার ব্যাপারে আমার মাথাব্যথা নেই, কিশোর বলল। ওর কোন মোটিভ আছে বলে মনে হয় না। তবু, ওকেও একবার ফোন করব সময় করে। আর মিস্টার এক্সকে এভাবে খুঁজে বোধহয় বের করতে পারব না। সে এসবে জড়িত থাকলে এক সময় না এক সময় দেখা আমাদের হয়েই যাবে।
অনেক খিদে পেয়েছে কিশোরের। গুড়গুড় করছে পেটের ভেতর। রবিনকে অনুরোধ করল সুপারমার্কেটে নিয়ে যেতে। কিছু ফল কিনল কিশোর। গাড়িতে এসে বসে খেতে শুরু করল। ইয়ার্ডের দিকে গাড়ি চালাল রবিন। কিশোরকে বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল তার কাজে। অফিসে গিয়ে মুসাকে ফোন করে জানাল কিশোর কি করতে বলেছে।
বিশেষ গুরুত্ব দিল না মুসা। কাজেই ফারিহার কাছ থেকে উঠতে উঠতে অন্ধকার হয়ে গেল। তখন আর টমের ঠিকানা খুঁজে বের করার সময় নেই। অত অন্ধকারে কে একটা গোবেচারা বয়ফ্রেন্ডের ঠিকানা খোঁজার মত ফালতু কাজ করতে যায়? রোববারের আগে আর কাজটা করতে পারল না মুসা। গাড়ি এনে রাখল লরেল স্ট্রীটে, ২৮ নম্বর বাড়ির সামনে, যেখানে বাস করে টমাস হামবার।
রকি বীচের কয়েক মাইল উত্তরে মেলটনের শান্ত সুন্দর পরিবেশে বাড়িটা। পথের পাশে একসারি সাদা কাঠের বাড়ি। সামনে চওড়া বারান্দা আর ছোট আঙিনা।
টমাসদের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটা পুরানো বনেভিল কনভারটিবল গাড়ি। বারান্দার রেলিঙের ওপর পা ঝুলিয়ে বসে আছে সোনালি চুলওয়ালা এক

তরুণ। পরনে রঙচটা নীল জিনস, গায়ে সাদা টি-শার্ট। মুসা আঙিনায় ঢুকতেই লাফ দিয়ে রেলিং থেকে নামল সে।
এসো! চিৎকার করে ডাকল সে। এক হাত সামনে বাড়ানো, আরেক হাত পিঠের পেছনে। দিনটা মাটি হতে বসেছিল আমার! তুমি আসাতে সেটা আর হলো না!
মুসা বারান্দার কাছাকাছি যেতেই পেছনের হাতটা সামনে চলে এল। শক্ত করে ধরা একটা মোটর সাইকেলের চেন।
ব্যাপার কি? গতি বেড়ে গেল মূসার হৃৎপিন্ডের। হঠাৎ করে, কোন কারণ ছাড়াই একটা উন্মাদ হামলা করতে আসছে কেন তাকে! চেনের একটা মাথা হাতে পেঁচানো, আরেক মাথা ঝুলছে সাপের লেজের মত। স্থির হয়ে গেছে মুসা। কারাতের কৌশল ব্যবহার করবে? না পিছিয়ে যাবে?
এবার শুধু তুমি আর আমি, লোকটা বলল। এই তো চেয়েছিলে, তাই না? বলেই শপাং করে বাড়ি মারল কাঠের রেলিঙে।
না, কারাতের কথা ভুলে যাওয়াই উচিত। ওই চেনের এক বাড়ি মাথায় লাগলে সাতদিন হাসপাতালে পড়ে থাকতে হবে। পিছাতে শুরু করল সে।
শিক্ষা আজ ভাল করেই দিয়ে দেব! চিৎকার করে উঠল আবার লোকটা। লাফিয়ে বারান্দা থেকে আঙিনায় নামল। বেশি বড় শরীর না। অর্থাৎ গায়েগতরে মুসার চেয়ে ছোট খাটোও, স্বাস্থ্যও খারাপ। কিন্তু চিৎকার করছে গলা ফাটিয়ে, আর মাথার ওপরে তুলে বনবন করে ঘোরাচ্ছে চেনটা।
আপনি ভুল করছেন, মুসা বলল। সে পিছাচ্ছে আর লোকটা এগোচ্ছে। লোকটার পায়ে চামড়ার বুট। গরিলার মত বাঁকা করে রেখেছে কাঁধ।
আপনি কি ভাবছেন বুঝতে পারছি না, মুসা বলল আবার। আমি এসেছি টমাস হামবারের খোঁজে, মরিয়া হয়ে উঠেছে সে। আমি জুন লারসেনের বন্ধু।
থমকে গেল কালো বুট। থেমে গেল চেনের পাক।
সত্যি বলছ? লোকটা বলল।
কসম, মাথা ঝাকাল মুসা। সতর্ক রয়েছে। লোকটা হঠাৎ আক্রমণ চালালে যাতে ঠেকাতে পারে।
সরি, চেপে রাখা নিঃশ্বাস ফোস করে ছাড়ল লোকটা। ঢিল হয়ে গেল যেন সমস্ত শরীর। আমিই টমাস হামবার। জ্বালিয়ে খাচ্ছে আমাকে। চুরি করে বাড়িতে ঢুকে পড়ে ওরা। ভবঘুরে। একটা লোক তো শাসিয়েই গেছে সুযোগ পেলেই আমার গাড়িটা চুরি করে নিয়ে যাবে।
রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাখা ঝরঝরে বনেভিলটা দেখাল টম।
ওটার দিকে তাকিয়ে রইল মুসা। অবশেষে হেসে রসিকতা করল, এমনিতেই ওটা দিয়ে দেয়া উচিত। হাহ, হাহ! চাকা তো বসে গেছে। আর যে হারে তেল লিক

করছে…
ব্যাটারিও ডাউন হয়ে আছে দুই হপ্তা ধরে, যোগ করল টম। হাসছে সে-ও। তবু, ওদেরকে নিতে দেব কেন? কেড়ে রেখেছি অনেক কষ্টে। ব্যাটারা হাড়-মাংস জ্বালিয়ে দিয়েছে আমার। কি বলছি বুঝতে পারছ? বারান্দার রেলিঙের দিকে চোখ পড়তে বলল, রেলিংটারই সর্বনাশ করলাম!…হ্যাঁ, জুনের সঙ্গে কি করে পরিচয় হলো তোমার, বলো তো?
আসলে, পরিচয় হয়নি এখনও, সত্যি কথাটাই বলল মুসা। আমার বান্ধবী আর ও একই রুমে রয়েছে হাসপাতালে।
ও, হ্যাঁ, দেখেছি একটা মেয়েকে, মুসাকে ঘরের ভেতরে ডেকে নিয়ে এল টম। চেন ঘোরাচ্ছে না। রাগও দূর হয়ে গেছে চেহারা থেকে। ওকে দেখতে আর ভয়ঙ্কর লাগছে না তখনকার মত। বরং ভদ্র, শান্ত একজন কলেজের ছাত্রের মতই লাগছে। ভেতরে আসবাবপত্রের চেয়ে পোস্টারই বেশি।
একটা কথা জিজ্ঞেস করতে এলাম, মুসা বলল। শুক্রবার রাতে অত দেরি করে হাসপাতালে গিয়েছিলেন কেন?
খবরটাই পেয়েছি দেরিতে। জুনের রুমমেট হেনা ফোন করে আমাকে জানাল জুন অ্যাক্সিডেন্ট করেছে। কয়েক মাস হলো ওর সঙ্গে আর ততটা দেখা হয় না, ঘনিষ্ঠতা নেই। তবু, একসময় তো ছিল, সেই সুবাদেই গেলাম দেখতে। হুঁশ ফিরেছে ওর?
না। বেহুশ ঠিক বলা যায় না, নার্স তাই বলল। গভীর ঘুম বলা যেতে পারে। ডাক্তারের কথা, অনেক বেশি ঘুম দরকার এখন ওর।
একটা মুহূর্ত আড়চোখে মুসার দিকে তাকিয়ে রইল টম। হঠাৎ করেই যেন মনে পড়ল, যার সঙ্গে কথা বলছে সে পুরোপুরি অপরিচিত তার। একটা কথা জিজ্ঞেস করি, জুনকে যদি না-ই চেননা, তাহলে এসব প্রশ্ন করছ কেন?
ফারিহা, আমার গার্লফ্রেন্ড বলল, অদ্ভুত একটা কিছু ঘটছে। সেটারই তদন্ত করছি। চিকেন হার্বার্ট লারসেনকে চেনেন?
তাকে চিনব না। জুনের সঙ্গে আমার গোলমালটা বাধানোর জন্যে সে-ই তো দায়ী।
মানে? আপনাকে পছন্দ করতেন না তিনি?
কি করে করবে? সারাক্ষণই তর্ক বেধে থাকলে কি আর পছন্দ করে কেউ? আমি নিরামিষ ভোজী। মাছ খাই না, মাংস খাই না, মুরগীও ভাল লাগে না। খাবার জন্যে প্রাণী হত্যা আমার মতে অপরাধ। আর বেচারা প্রাণীগুলোকে খুন করে যারা ব্যবসা করে তারা তো রীতিমত অমানুষ। লাগত এসব নিয়েই। শেষ দিকে তো আমাকে দেখলেই জ্বলে উঠত লারসেন। আস্তে আস্তে এসব নিয়ে জুনের

সঙ্গেও কথা কাটাকাটি শুরু হলো আমার। শেষে যখন বলল, গ্র্যাজুয়েশন শেষ করে বাপের ব্যবসা দেখবে জুন, ব্যস, হয়ে গেল সব খতম। কাটাকাটি।
আরেকটা কথা। ভোর রাত চারটের সময় আপনি হাসপাতালে ঢুকলেন কি করে? ঢুকতে দিল?
নার্সকে মিথ্যে বলেছি আমি। বলেছি, জুনের সঙ্গে আমার এনগেজমেন্ট হয়েছে, এক মুহূর্ত চুপ থেকে বলল টম। কথাটা সত্যি হলে খুশিই হতাম।
শেষ বিকেলে রবিন আর কিশোরকে তদন্তের ফলাফল জানাল মুসা। স্যালভিজ ইয়ার্ডে রয়েছে তিনজনে। রবিনের ফোক্সওয়াগনের ইঞ্জিন পরীক্ষা করছে সে। কিছু জিনিস খারাপ হয়েছে, যার ফলে গোলমাল করছে ইঞ্জিন, সেটাই দেখছে আর কথা বলছে। ফ্যান বেল্টটা প্রায় বাতিল হয়ে গেছে। বদলানো দরকার। পুরানো বাতিল মালের অভাব নেই ইয়ার্ডে। অন্য একটা ইঞ্জিনের বেল্ট খুঁজে বের করে নিয়ে এসেছে মুসা। লাগিয়ে দিয়ে দেখল চলে কিনা। চলছে। অন্তত আগেরটার চেয়ে ভাল। আঙুল দিয়ে টেনেটুনে দেখে বলল, শ দুই মাইল চালাতে পারবে। তারপর ঢিল হয়ে যাবে। রবিন, নতুন একটা কিনে নিয়ো।
ওসব ফ্যান বেল্টের কথার ধার দিয়েও গেল না এখন কিশোর। বলল, আমার কাছে সব চেয়ে আকর্ষণীয় লাগছে যে ব্যাপারটা, তা হলো, টমের একটা গাড়ি আছে।
কিশোর, রবিন বলল। মাঝে মাঝে এত দুর্বোধ্য লাগে না তোমার কথা, কি বলব! মুসা বলছে এক কথা, তুমি চলে গেলে আরেক কথায়। কেন, কারও গাড়ি থাকতে পারে না?
মাথায় কথা রাখতে পারো না, সে জন্যেই তোমাদের কাছে এত কঠিন লাগে। কেন, ভুলে গেলে, জুনের গাড়িটাকে তাড়া করেছিল আরেকটা গাড়ি?
টমকে বাদ দিয়ে রাখতে পারো। ওর গাড়িটার চলারই ক্ষমতা নেই। টায়ারগুলো বসা। ব্যাটারি ডাউন হয়ে আছে দুই হপ্তা ধরে।
সত্যি কথা না-ও তো বলতে পারে?
বলেছে, জোর দিয়ে বলল মুসা। কারণ আমারও সন্দেহ হয়েছিল। তাই ওর প্রতিবেশীদের সঙ্গে কথা বলেছি।
ও। তার পরেও আরেকটা ব্যাপার বাকি থেকে যায়। লোকটার মেজাজ ভীষণ খারাপ। তোমাকে যে চেন নিয়ে মারতে এসেছিল, সেটাই তার প্রমাণ।
শ্রাগ করল মুসা। ড্রাইভিং সীটে গিয়ে বসল। ইঞ্জিনের থ্রটল পরীক্ষা করার জন্যে ইগনিশনে মোচড় দিল। মিনিট খানেক ঠিকমতই গুঞ্জন করল ইঞ্জিন, তারপরে বিচিত্র একটা শব্দ করল, মনে হলো বলছেঃ প্লা-হুপ্পা-গ্যাক!

এ রকম করছে কেন? রবিনের প্রশ্ন। হেসে বলল, ইঞ্জিনটাকে জিজ্ঞেস করো তো, এ কথার মানে কি?
বলতে চায়, আমাকে কিনে ভুল করেছ। বেচে দিয়ে আরেকটা কেন। আমি বুড়ো মানুষ, আর পারি না।
অনুরোধ করো না, আর কটা দিন যেন আমাকে একটু সাহায্য করে। আর কিছু পয়সা জমিয়ে নিই। ওকে মুক্তি দিয়ে দেব।
চেষ্টা করলে কিছুটা ভাল হয়তো করা যায়, মুসা বলল। তবে সময় লাগবে। আপাতত এভাবেই চালাও আগামী হপ্তায় দেখি। তার পর? আমার কথা তো বললাম। কিশোর, হেনা তানজামিলা আর হেনরি অগাসটাসের খবর কি?
হাসল কিশোর। হেনাকে ফোন করেছিলাম। অ্যাক্সিডেন্টটা যখন হয়, তখন আরও ছজন লোকের সঙ্গে এলিভেটরে আটকা পড়েছিল। চমৎকার অ্যালিবাই। তবে হেনরি অগাসটাসের ব্যাপারটা চমকে দেয়ার মত। ব্যবসায়ে চিকেন লারসেনের সব চেয়ে বড় প্রতিপক্ষ সে। দি ওয়াল স্ট্রীট জার্নাল বলছে, এই কিছুদিন আগে চিকেনের পুরো ব্যবসাটা কিনে নিতে চেয়েছিল হেনরি।
তাই? আশ্চর্য! অবাক হলো রবিন। তাহলে তো রাস্তা থেকে ফেলার কথা লারসেনকে। তার মেয়েকে ফেলতে যাবে কেন?
জানি না, গাল চুলকাল কিশোর। অন্য ভাবে শাস্তি দিতে চেয়েছে হয়তো লারসেনকে। কিংবা ওর মেয়েকে মেরে ফেলে মন ভেঙে দিতে চেয়েছে। যাতে ব্যবসা নিয়ে আর মাথা না ঘামায় লারসেন।
লারসেনের মুরগীতে হেনরিই বিষ মেশাচ্ছে না তো?
না-ও হতে পারে। চিকেন নিজেই মেশাতে পারে। আর আরেকজন চরম সন্দেহভাজন লোক তো রয়েই গেছে। সেই লোকটা, যে হাসপাতালে ঢুকে জিনিসপত্র ঘাটাঘাটি করেছিল। ফারিহাকে নাম বলেনি।
এই সময় হেডকোয়ার্টারে ফোন বাজতে আরম্ভ করল। ধরতে গেল মুসা।
তিন গোয়েন্দা। মুসা আমান বলছি, স্পীকারের সুইচ অন করে দিল সে।
ফারিহা ফোন করেছে হাসপাতাল থেকে। মাত্র তিনটে শব্দ উচ্চারণ করল সে। আর তা-ই তিন গোয়েন্দাকে গাড়ির দিকে ছুটে যেতে বাধ্য করার জন্যে যথেষ্ট। সে বলেছে, জুনের ঘুম ভেঙেছে!
রবিনের ফোক্সওয়াগনে করে হাসপাতালে ছুটল তিন গোয়েন্দা। ভটভট ভটভট করে কোনমতে চলল গাড়ি। যতটা স্পীড দেয়া সম্ভব দেয়ার চেষ্টা করল রবিন। পথে তিনবার বন্ধ হলো ইঞ্জিন। নেমে নেমে ঠিক করতে হলো মুসাকে।
হাসপাতালের সামনে গাড়ি থামতেই লাফিয়ে নেমে পড়ল কিশোর। দিল দৌড়। তার পেছনে ছুটল অন্য দুজন। অ্যাক্সিডেন্টের রাতে কি ঘটেছিল, আজ জানতে

পারবে জুনের মুখ থেকে।
অ্যাই, যাচ্ছ কোথায়! থাম!
তীক্ষ্ণ চিৎকার শুনে ফিরে তাকাল তিন গোয়েন্দা। সেই লাল চুল নার্স, মারগারেট ইলারসন।
সরি, যেতে পারবে না, আজ আর কর্কশ ব্যবহার করল না। হাসলও মৃদু। মেয়ের সঙ্গে রয়েছেন মিস্টার লারসেন। ডাক্তার পরীক্ষা করছেন জুনকে। তোমাদের অপেক্ষা করতে হবে, রবিনের দিকে তাকাল। খারাপ না লাগলে আমার এখানেই এসে বসতে পারো।
হলের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। পাঁচ মিনিট কাটতেই যেন পাঁচটা বছর লাগল। তারপর দশ মিনিট। এই অপেক্ষা যেন পাগল করে দেবে তাকে।
আর বসে থাকতে পারল না। এককোণে নিচু একটা টেবিলে কিছু পত্রপত্রিকা পড়ে আছে। এগিয়ে গেল সেগুলোর দিকে।
এত তাড়া কিসের তোমাদের? নার্স জিজ্ঞেস করল।
আছে। অ্যাক্সিডেন্টের ব্যাপারে জানতে চাই, ঘুরে দাঁড়িয়ে জবাব দিল কিশোর।
কিছুই বলতে পারবে না ও। মনে করতে পারবে না। অ্যামনেশিয়ায় ভুগছে।
অ্যামনেশিয়া! ওই একটি শব্দই যেন হাজার টনী পাথরের মত আঘাত করল কিশোরকে। এত আশা, এত প্রতীক্ষা, সব যেন নিমেষে অর্থহীন হয়ে গেল।
অবশেষে জুনের ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন লারসেন। বাইরে এলেন না, দরজায়ই দাঁড়ালেন। পরনে গাঢ় লাল জগিং স্যুট, হলুদ স্ট্রাইপ দেয়া। বুকের কাছে আঁকা কমলা রঙের মুরগী।
যাই, হ্যাঁ, মেয়েকেই বললেন বোঝা গেল। কাল আবার আসব। বাড়ি নিয়ে যাব তোকে। কিছু ভাবিসনে। সব ঠিক হয়ে যাবে।
হেসে দরজাটা ভেজিয়ে দিলেন লারসেন। হাসিটা মুছে গেল পরক্ষণেই। আনমনে বিড়বিড় করে কি বললেন। মেয়েকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যেই বোধহয় হাসি হাসি করে রেখেছিলেন মুখ। তিন গোয়েন্দার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় একটিবারের জন্যেও ফিরে তাকালেন না।
কি বলছেন শুনতে পারলে হত, নিচু গলায় বলল মুসা।
কি যে করি জাতীয় কিছু বললেন বলে মনে হলো, আন্দাজ করল রবিন।
চলো, জুনের ঘরের দরজার দিকে রওনা হলো কিশোর।
বিছানায় উঠে বসেছে জুন। বয়েস উনিশ-বিশ হবে। পিঠে বালিশ ঠেস দেয়া। এলোমেলো চুল। অনেক সময় একটানা ঘুমানোয় ফুলে আছে মুখ। তবে বড় বড় নীল চোখজোড়া স্বচ্ছ এবং পরিষ্কার।

এসেছ, মুসার দিকে তাকিয়ে যেন ওই একটি শব্দেই হুঁশিয়ার করে দিতে চাইল ফারিহা। রবিন আর কিশোরও বুঝল ওর ইঙ্গিত। জুনের দিকে ফিরল সে, জুন, এই হলো আমাদের তিন গোয়েন্দা। ও কিশোর পাশা, ও মুসা আমান, আর ও হলো রবিন মিলফোর্ড।
হাই, খসখসে নিস্পৃহ কণ্ঠে বলল জুন। তোমাদের কথা অনেক শুনেছি।
হেসে জিজ্ঞেস করল রবিন, এখন কেমন লাগছে?
আর কেমন। মনে হচ্ছে দালানের তলায় চাপা পড়েছিলাম। একটা হাড়ও আস্ত নেই। সারা গায়ে ব্যথা। বাবা যে কাল কি করে বাড়ি নিয়ে যাবে কে জানে।
ও কিছু না। ঠিকই যেতে পারবে। কাল সেরে যাবে, দেখ।
এসব কথা ভাল লাগছে না কিশোরের। আসল কথায় যেতে চায়। কিছুটা অধৈর্য ভঙ্গিতেই ফারিহার বিছানার পাশের চেয়ারটা টেনে নিয়ে এসে বসল জুনের বিছানার পাশে। তোমার অ্যাক্সিডেন্টটার কথা জানতে এসেছিলাম।
ফারিহা বলেছে, তোমরা আসবে। তবে আগেই একটা কথা জানিয়ে রাখি, আমার অ্যামনেশিয়া হয়েছে।
কিছুই মনে করতে পারছ না?
শেষ কথা মনে করতে পারছি, দুদিন আগে সকালে আমার বেড়ালটাকে, খাইয়ে বাবার অফিসে গিয়েছিলাম। আর কিছু মনে নেই। তবে ডাক্তার ভরসা দিয়েছে এই স্মৃতিবিভ্রম সাময়িক। শীঘ্রি আবার সব মনে করতে পারব। যে কোন মুহূর্তে ফিরে আসতে পারে স্মৃতি।
আমরা তোমাকে সাহায্য করতে পারি, রবিন বলল। অনেক সময় কথা মনে করিয়ে দিলে মনে পড়ে যায় এসব অবস্থায়।
তাহলে অ্যাক্সিডেন্টের কথা কিছুই মনে করতে পারছ না? কিশোর তাকিয়ে রয়েছে জুনের মুখের দিকে। তোমার বাবার অফিসে কি জন্যে গিয়েছিলে?
কলেজ থেকে সবে ব্যবসার ওপর ডিগ্রী নিয়েছি, জুন জানাল। তাই বাবার ব্যবসাটায় ঢোকার চেষ্টা করছি। এক ডিপার্টমেন্ট থেকে আরেক ডিপার্টমেন্টে ঘুরে বোঝার চেষ্টা করছি। যতই বই পড়ে শিখে আসি না কেন, হাতে কলমে কাজ করাটা অন্য জিনিস।
গত শুক্রবারে শেষ কোন ডিপার্টমেন্টে ঢুকেছিলে, কিশোর জিজ্ঞেস করল, মনে করতে পারো?
না।
ঘুমের ঘোরে দুঃস্বপ্ন দেখে কিছু কথা বলেছ। মনে করতে পারো?
মাথা নাড়ল জুন।
রবিন আর মুসার দিকে তাকিয়ে কিশোর বলল, চলো, বাইরে গিয়েই কথা বলি।

হলে বেরিয়ে এল তিনজনে। ভোতা গলায় কিশোর বলল, কোন লাভ হলো না।
ফারিহা আশা দিয়েছে, মুসা বলল। হবে।
হবে না। বসে বসে টেলিভিশন দেখা ছাড়া আর কিছু করার থাকবে না ওর।
আমার তো এখন মনে হচ্ছে, কোন রহস্যই নেই, নিরাশ কণ্ঠে বলল কিশোর। ফারিহার কথাই আর বিশ্বাস করতে পারছি না।
ও এমনিতেও বাড়িয়ে কথা বলে, ফস করে বলে বসল রবিন।
রেগে গেল মুসা। ওর মাথায় আমার চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধি। কথা খুব ভাল মনে রাখতে পারে। কয়েক মাস আগেও কোন মেয়ে কোন পোশাকটা পরেছিল, কোন লিপস্টিক লাগিয়েছিল, ঠিক বলে দিতে পারে।
খুব ভাল, আরেক দিকে তাকিয়ে বলল কিশোর। যদি কোনদিন তিন গোয়েন্দা বাদ দিয়ে তিন ফ্যাশন ডিজাইনার হয়ে যাই, তাহলে ওকে আমাদের সহকারী করে নেব।
ভুরু কুঁচকে কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইল মুসা।
রাগ কোরো না, ওকে বোঝানোর চেষ্টা করল কিশোর। জুন একটা বড় অ্যাক্সিডেন্ট করেছে। মাথায় গোলমাল হওয়াটা স্বাভাবিক। ঘুমের ঘোরে প্রলাপ বকাটা আরও বেশি স্বাভাবিক। এখন তো ধরেছে অ্যামনেশিয়ায়। ওর প্রলাপ বিশ্বাস করে রহস্য খুঁজতে যাওয়াটা কি ঠিক?
কেন, তোমার অনুভূতি কি এখন অন্য কথা বলছে...
অ্যাই, রাখ রাখ, হঠাৎ সিরিয়াস হয়ে গেছে রবিন। একটা কথা...
অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল কিশোর। কী?
একটা কথা খেয়াল করোনি? অ্যাক্সিডেন্টের দিনের কথা শুধু মনে করতে পারছে না জুন। কেন পারছে না? কেন একটা দিন স্মৃতি থেকে মুছে গেল?
তাই তো! ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে লাগল কিশোর। তবে মনোযোগ দিতে পারল না। চেঁচিয়ে কথা বলছে নার্স মারগারেট, আমার কাজ আপনি করবেন? হাসালেন। এক ঘণ্টায়ই কান দিয়ে ধোঁয়া বেরোতে আরম্ভ করবে। কানে রিসিভার ঠেকিয়ে মাথা কাত করে কাঁধ উঁচু করে রিসিভারটা ধরে রেখেছে সে। দুই হাত মুক্ত রেখেছে কাজ করার জন্যে। কিছু ফর্মে স্ট্যাম্প দিয়ে সীল মারছে। আপনি আমাকে বিরক্ত করে ফেলেছেন, বুঝলেন। আধ ঘণ্টা পর পরই জিজ্ঞেস করছেন জুন কেমন আছে। আরও তিরিশজন রোগী আছে এখন আমার হাতে। সবার আত্মীয়রাই যদি এভাবে ফোন করত, এতক্ষণে পাগলা গারদে পাঠাতে হত আমাকে। কেমন আছে জানতে চাইছেন তো? বলতে পারব না। হাসপাতালে এসে দেখে যান।

রেগে গেছে মারগারেট। চেহারা দেখেই অনুমান করা যায়। ওপাশের কথা শুনতে শুনতে আরও রেগে গেল, ডাক্তারকেই জিজ্ঞেস করুন। ধরুন। খটাস করে রিসিভারটা টেবিলে নামিয়ে রেখে ঝটকা দিয়ে উঠে দাঁড়াল। গটমট করে হেঁটে রওনা হলো।
জুন কেমন আছে, এবার জিজ্ঞেস করছে কেন? দুই সহকারীর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল কিশোর।
কারণ, বেশি উদ্বিগ্ন, জবাব দিল মুসা।
উদ্বেগটা কি জুনের অসুখের কারণে? না সে মুখ খুলেছে কিনা জানার জন্যে? কেশে গলা পরিষ্কার করল কিশোর। মিস্টার এক্সও হতে পারে।
এক কাজ করো না, পরামর্শ দিল রবিন। গলার স্বর তো নকল করতেই পার। কথা বলো ওর সঙ্গে। লোকটার কণ্ঠস্বর চিনে রাখো। ডাক্তার হয়ে যাও।
ঠিক বলেছ। দুই লাফে টেবিলের কাছে গিয়ে রিসিভার তুলে নিল সে। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল নার্স আসছে কিনা। তারপর রিসিভার কানে ঠেকিয়ে বলল, হ্যালো, ডক্টর পাশা বলছি। হঠাৎ করেই যেন অনেক বেড়ে গেছে তার বয়েস, ভারি হয়ে গেছে কণ্ঠস্বর, কারও বাবারও বোঝার সাধ্যি নেই, তার বয়েস চল্লিশের কম।
কই, এ নাম তো শুনিনি? ওপাশ থেকে জবাব এল। মসৃণ কণ্ঠ। মাঝবয়েসী একজন মানুষ। দ্রুত কথা বলে। এ হাসপাতালে ওই নামের ডাক্তার আছে?
তাহলে আমি এলাম কোথেকে? নতুন এসেছি। আপনি জুন লারসেনের খোঁজ নিতে চাইছিলেন তো মিস্টার…
কিশোর আশা করেছে, নামটা বলবে লোকটা। বলল না। জিজ্ঞেস করল, ও কেমন আছে?
ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছাড়া এ খবর কাউকে জানানো নিষেধ। আপনি ওর কে হন?
এক মুহূর্ত দ্বিধা করে জবাব দিল লোকটা, আমি ওদের পারিবারিক বন্ধু।
ঘনিষ্ঠ?
দেখুন, এত প্রশ্ন করছেন কেন? আমি একটা সহজ কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম, জুন কেমন আছে?
হুঁশ ফিরেছে। বিপদ কেটেছে।
ও, লোকটা খুশি হয়েছে না শঙ্কিত হয়েছে বোঝা গেল না ঠিকমত। তবে উদ্বিগ্ন হয়েছে বলে মনে হলো কিশোরের। জিজ্ঞেস করল, কিছু বলতে হবে জুনকে? কি নাম বলব?
না, কিছু বলতে হবে না, ডক্টর। থ্যাঙ্ক ইউ, লাইন কেটে গেল ওপাশ থেকে।
কি বলল? কিশোরকে চুপ হয়ে যেতে দেখে জিজ্ঞেস করল মুসা।

তেমন কিছুই বলল না, আস্তে করে রিসিভারটা ডেস্কে রেখে দিল আবার কিশোর। তরুণ একজন ডাক্তারকে নিয়ে ফিরে এল নার্স। রিসিভার কানে ঠেকিয়েই মুখ বিকৃত করে ফেলল। রেখে দিয়েছে! লোকটার মাথা খারাপ!

দুই সহকারীকে নিয়ে সরে এল কিশোর। নিচু গলায় বলল, নাহ, রহস্য একটা আছে, মানতেই হচ্ছে। কিছু একটা ঘটছে! কি, সেটাই বুঝতে পারছি না!

তার মানে কেসটা ছাড়ছ না? হেসে বলল রবিন। আরেকটু হলেই হতাশ করেছিলে আমাকে। কোন রহস্যের সমাধান না করে ছেড়ে দেবে কিশোর পাশা, ভাবাই যায় না।

ছাড়ব একবারও বলিনি। মনে হয়েছিল, কোন রহস্য নেই। এখন ভাবছি, ভয়ানক কোন বিপদ ঝুলছে জুনের মাথার ওপর। সেটা জানতে হবে যে, ভাবেই হোক। ওর কাছাকাছি থাকতে হবে আমাদের।

তবে থাকাটা সম্ভব হলো না। তিনজনেরই কিছু না কিছু কাজ আছে। বসে থাকে না ওরা কেউই। মুসা আবার গাড়ির ব্যবসা শুরু করেছে। তবে গাড়ি বেচাকেনার চেয়ে মেরামতের দিকেই নজর দিয়েছে বেশি। নিক ওকে অনেক কিছু শিখিয়ে দিয়ে গেছে ইঞ্জিনের ব্যাপারে (গাড়ির জাদুকর দ্রষ্টব্য)। ওর পাশের বাড়ির ভদ্রলোকের করভেট গাড়িটার ইগনিশন নাকি ঠিকমত কাজ করছে না, মেরামত করে দেবে কথা দিয়েছে সে। বিনিময়ে অবশ্যই পারিশ্রমিক নেবে।

রবিনকে যেতে হবে ট্যালেন্ট এজেন্সিতে। একটা ক্লাব একটা রক ব্যান্ড চেয়ে পাঠিয়েছে। সেটা পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

আর কিশোর কথা দিয়েছে মেরিচাচীকে, পাশের বাড়ির মিসেস ব্যালানটাইনকে বাগানের ঘাস কাটায় সাহায্য করবে। মিসেস ব্যালানটাইন মেরিচাচীর বান্ধবী। কিশোর আগ্রহী হয়েছে অবশ্য অন্য কারণে। ওই মহিলারও পেটের চিরকালীন অসুখ আছে। কি কি খেলে ভাল থাকেন, বলতে পারবেন কিশোরকে।

কাজেই সেদিন আর জুনের কাছে থাকা হলো না কারোরই।

পরদিন সকালে হাসপাতালে মুসার সঙ্গে দেখা হলো কিশোরের। আগেই এসে বসে আছে মুসা। কারণ, ফারিহাকে সেদিন ছেড়ে দেয়ার কথা। আর জুনের বাবা বলেছেন, মেয়েকে এসে নিয়ে যাবেন সেদিনই।

হাসপাতাল ছাড়তে নারাজ ফারিহা। কারণ, জুনের প্রলাপ রহস্য ভেদ করার প্রবল আগ্রহ। কিন্তু থেকেও লাভ নেই। জুন তো আর থাকছে না। তাছাড়া ভাল হয়ে গেলে হাসপাতালই বা ওদেরকে রাখবে কেন?

জুনের শরীর অনেক ভাল হয়েছে। তবে স্মৃতি ফিরে আসেনি। বিছানায় বালিশ ঠেস দিয়ে বসে বাবার আসার অপেক্ষা করছে সে। বকবক করছে, বাবাকে তো চিনি। আসবে সেই জগিং স্যুট পরেই। আজ হয়তো দেখা যাবে গরিলা সেজেই

এসেছে। ওরকম রোমশ পোশাকও অনেক আছে তার। ব্যান্ড পার্টি না নিয়ে এলেই বাঁচি। সব কিছুতেই বাড়াবাড়ি করা স্বভাব।
দশ মিনিট পর দরজায় দেখা দিলেন লারসেন। হাই, খুকি, চিনতে পারছ আমাকে? হেসে জিজ্ঞেস করলেন। বাদামী জগিং স্যুট পরেছেন। একটা প্লাস্টিকের তীর ঢুকিয়ে রেখেছেন চুলের মধ্যে। ওই লোকটাও পাগল, মনে হলো মুসার।
বাবা, জুন বলল। না চেনার কোন কারণ নেই। মাত্র চব্বিশটা ঘণ্টা মনে করতে পারছি না আমি। বিশ বছর নয়। নিশ্চয় চিনতে পারছি তোমাকে। যা আনতে বলেছিলাম এনেছ?
হাতে করে একটা ছোট সুটকেস নিয়ে এসেছেন লারসেন। মেয়ের সামনে এনে রাখলে সেটা। খুলল জুন। নীল সিল্কের একটা পাজামা বের করে তুলে ধরে বলল, এটা কি?
কি আবার, পাজামা, হাসি হাসি গলায় বললেন লারসেন। নীল ব্লাউজটাও নিয়ে এসেছি। দেখ। এগুলো আনতেই তো বলেছিলি, নাকি?
যেটাতে বলেছিলাম সেটাতে খোঁজোনি, হেসে বলল জুন। অন্য ওয়ারড্রোব থেকে এনেছ। এই কাপড় পরে বাইরে বেরোনো যায়? তুমিই বলো?
চোখের সানগ্লাসটা ঠেলে কপালে তুলে দিলেন লারসেন। মেয়ের হাত থেকে নিলেন পাজামাটা। কেন, পরা যাবে না কেন? এ জিনিস পরে পার্টিতেও যেতে পারিস। স্বচ্ছন্দে। খারাপটা কি দেখলি?
মা বেঁচে থাকলে তোমার মাথায় হাতুড়ির বাড়ি মারত এখন। এ জিনিস পরে বাইরেই বেরোয় না মেয়েরা। আর পার্টিতে যাওয়া!
কেন, অসুবিধেটা কি? শরীর ঢাকা থাকলেই হলো, বলতে বলতে ফারিহার দিকে চোখ পড়ল লারসেনের। তুড়ি বাজিয়ে বললেন, ব্যস, মিটে গেল ঝামেলা। ওর একটা কাপড় পরে নিলে পারিস। এই মেয়ে, একশো পনেরো হবে না তোমার ওজন?
থ হয়ে গেল ফারিহা। আপনি জানলেন কি করে?
জানব না মানে? তিরিশ গজ দূর থেকেও যে-কোন মুরগী দেখলে বলে দিতে পারি ওটার ওজন। আর তুমি তো মানুষ। তোমার পোশাক জুনের লাগবেই। একই গড়ন।
বাবা, অস্বস্তি বোধ করছে জুন। চুপ করো তো। ফারিহা, কিছু মনে কোরো না। বাবার ধারণা, দুনিয়ার সবাই এক। কেউ কিছু মনে করে না, আবার বাবার দিকে ফিরল। বাবা, এটা তোমার অফিসের ইন্টারকমের বোতাম নয়, যে টিপে যা বলবে তাই হয়ে যাবে।

আমি কিছু মনে করিনি, হেসে বলল ফারিহা। নাও না। লাগলে নাও আমার একটা কাপড়। অনেক আছে স্যুটকেসে। পরে ফেরত দিয়ে দিয়ো।
আচ্ছাহ! হাঁপ ছেড়ে বাঁচল যেন জুন। তার বাবার আনা পোশাকগুলো পরে বেরোনোর কথা ভাবতেই মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছিল তার। স্যুটকেসের ডালা বন্ধ করল। কিছু মেকআপও ধার দিতে হবে। পারবে? আমার আব্বাজান আমার মেকআপ বক্সটা আনতেও ভুলে গেছেন, নেমে পড়ল বিছানা থেকে। বাবাকে এসে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলো গালে। তোমার তো অ্যাক্সিডেন্ট হয়নি, বাবা। তোমার অ্যামনেশিয়া হলো কি করে?
বোকার হাসি হাসলেন বাবা। আমারটা চিরকালের, জানিসই তো...তোর মা এ জন্যে কত বকাবকি করত...
জানি।
নিজের স্যুটকেসটা বয়ে জুনের এলাকায় নিয়ে এল ফারিহা। বিছানায় নামিয়ে রেখে বলল, নাও, যা ইচ্ছে বেছে নাও।
অনেক ধন্যবাদ তোমাকে। বাড়ি গিয়েই ফেরত পাঠিয়ে দেব।
অত তাড়া নেই। যখন খুশি দিয়ো।
অ্যাই, শোন, জুন বলল। আমি জানি বাড়ি গিয়ে কি করবে বাবা। দুদিনের মধ্যেই একটা পার্টি দেবে। আমার হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফেরার জন্যে উৎসব। এক কাজ করো না, তোমরাও চলে এসো। সবাইকেই দাওয়াত, তিন গোয়েন্দার কথাও বলল সে। পার্টিটা দারুণ হবে, আমি এখনই বলে দিতে পারি। তোমার কাপড়গুলো তখনই নিয়ে যেয়ো।
আচ্ছা।
খারাপ লাগল না তো? এসে নিয়ে যেতে বললাম বলে?
আরে না না, কি যে বলো। বরং খুশি হয়েছি। সত্যি।
হাসতে গিয়েও চেপে রাখল কিশোর। অতি আগ্রহটা প্রকাশ করল না। মনে মনে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে যাওয়ার জন্যে। চিকেন কিং লারসেনের বাড়িতে দাওয়াত পাওয়ার সৌভাগ্য হবে, লোকটাকে আরও কাছে থেকে দেখতে পাবে, কল্পনাই করেনি কোনদিন। কিছুটা দেখেছে যদিও এই হাসপাতালে, আরও অনেক কিছু দেখা বাকি। জুনের পার্টিতে যাওয়ার চেয়ে ভাল সুযোগ আপাতত আর কিছু হতে পারে না।
বিছানার কিনারে বসে পায়ে মোজা টেনে দিল কিশোর। লারসেনের বাড়িতে আজ পার্টির দাওয়াত। অস্বস্তি লাগছে তার। জটিল রহস্যের তদন্ত করতে হবে বলে ভয়টা, তা নয়, ভয় হলো এ ধরনের পার্টিতে অনেক ধরনের মানুষের সমাগম হয়। তাতেও খারাপ লাগত না। কিন্তু পার্টিটা একটা মেয়ের। তাতে ছেলেরা যেমন

আসবে, তেমনি আসবে মেয়েরাও। ওদের সঙ্গে এমন সব কথা বলতে হবে ভদ্রতার খাতিরে, এমন আচরণ করতে হবে, যা সে করতে চায় না। মোটকথা ন্যাকামি এবং ভণিতা তার ভাল লাগে না।

উঠে গিয়ে ওয়ারড্রোব থেকে একটা উজ্জ্বল রঙের পোলো শার্ট বের করে গায়ে দিল। আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। নিজের সুন্দর চেহারা এখন ওর জন্যে বিরক্তির কারণ। কোঁকড়া কালো চুল। গভীর কালো চোখে কেমন এক ধরনের মায়া, যেন স্বপ্ন ভরা। এই চোখের দিকে তাকিয়েই মেয়েরা... ধূর! আর ভাবতে চায় না!

আগে মোটামুটি সহজভাবেই মিশতে পারত মেয়েদের সঙ্গে। ইদানীং যতই বড় হচ্ছে, কেমন জানি হয়ে যাচ্ছে ওর স্বভাব। ভাল অভিনেতা সে, তাতে কোনই সন্দেহ নেই। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অভিনয় শুরু করল। ধরা যাক, একটা মেয়ে এসে আলাপ জমানোর চেষ্টা করল ওর সঙ্গে। বলল, এই যে, কিশোর পাশা। তোমার সঙ্গে পরিচিতি হওয়ার সুযোগ পেয়ে খুশি হলাম। তুমি খেয়াল করোনি। কিন্তু গত আধ ঘণ্টা ধরে তোমাকে লক্ষ্য করছি আমি।

কে বলল লক্ষ্য করিনি? আমি সব দেখি। আমার চোখে কিছুই এড়ায় না, জবাব দেবে কিশোর।

একটা চিকেন নেবে? সৌজন্য দেখিয়ে কাগজের প্লেটে করে চিকেন লারসেনের একটা বিশেষ খাবার বাড়িয়ে ধরল মেয়েটা।

না, ধন্যবাদ, আয়নার দিকে তাকিয়ে কল্পিত মেয়েটাকে বলল কিশোর। আমি খাব না। আজেবাজে জিনিস খেতে মানা করে দিয়েছে ডাক্তার।

তাই নাকি? তোমার ওপর ভক্তি বেড়ে যাচ্ছে আমার, হাসি দিয়ে বলল মেয়েটা। এ রকম মনের জোরওয়ালা মানুষ আমার ভাল লাগে।

তার মানে কিশোরকেও ভাল লাগে, এটাই বোঝাতে চাইল মেয়েটা। ধরা যাক, তখন জিজ্ঞেস করল, তুমি কি জুনের বন্ধু?

আসলে, আমি এসেছি খাবারে বিষ মেশানোর একটা ঘটনার তদন্ত করতে।

চোখ বড় বড় হয়ে গেল মেয়েটার। মানে! উত্তেজিত কণ্ঠে বলল সে। তুমি গোয়েন্দা! কোন খাবারে বিষ মিশিয়েছে?

এখনও হয়তো মেশায়নি। হয়তো মেশানোর পরিকল্পনা করেছে। সম্ভবত মুরগীতে।

আরও অবাক হয়ে গেল মেয়েটা। সর্বনাশ! কঠিন একটা প্রশ্ন করে বসল, কেন মেশাবে? লক্ষ লক্ষ লোককে কে, কি কারণে মারতে চাইছে?

জবাবটা এখনও জানি না। হতে পারে হেনরি অগাসটাস লারসেনকে ব্যবসা থেকে তাড়াতে চাইছে। ওরকম আরও হাজারটা কারণ থাকতে পারে। কোনটা যে

ঠিক, এখনও বলতে পারছি না।
তোমার অনেক বুদ্ধি, কিশোরের কল্পনায় বলল মেয়েটা।
জানি। অনেকেই বলে সে কথা।
গোয়েন্দাগিরি করতে গেলে তো অনেক বিপদে পড়তে হয়। পিস্তল চালাতে জানো? কারাতে, জুডো এসব…
কিছু কিছু আগ্নেয়াস্ত্র চালাতে পারি। জুডো শিখছি। পুরোপুরি শেখা হয়নি এখনও।
কিন্তু হয়ে তো যাবে, থেমে গেল মেয়েটা। দাঁত দিয়ে নখ কাটল। তারপর আসল কথাটা জিজ্ঞেস করল, তোমার কোন গার্লফ্রেন্ড আছে?
এই রে! সেরেছে! আমতা আমতা করে বলল কিশোর, ইয়ে…মানে…
কিশোর! তোমার হলো?
চমকে বাস্তবে ফিরে এল কিশোর। ফিরে তাকাল। দরজায় দাঁড়িয়ে আছে রবিন। নেভি ব্লু কাপড়ে লাল স্ট্রাইপ দেয়া পোলো শার্ট গায়ে। পরনে ধবধবে সাদা প্যান্ট। সুন্দর লাগছে ওকে।
কার সঙ্গে কথা বলছিলে? গাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞেস করল রবিন।
কারও সঙ্গে না, জবাব দিল কিশোর। কেসটা পর্যালোচনা করছিলাম, লাল হয়ে গেছে মুখ।
কোন চিন্তা মাথায় থাকলে একা একা কথা বলে কিশোর, ভাবনাগুলোই বিড়বিড় করে ভাবে, জানা আছে রবিনের। তাই আর এ নিয়ে মাথা ঘামাল না।
বেল এয়ারে চিকেন লারসেনের বিরাট বাড়ি। আগেই হাজির হয়ে গেছে মুসা আর ফারিহা। কিশোরদের জন্যে অপেক্ষা করছে।
বাড়ি দেখেছ! দুই বন্ধুকে দেখেই বলে উঠল মুসা। গেট থেকে পুল পর্যন্ত যেতেই বাস লাগবে! আরিব্বাপরে বাপ!
তিনতলা বিশাল বাড়িটায় আটচল্লিশটা ঘর। আইভি লতায় ছাওয়া দেয়াল। কত কোটি কোটি ডলার কামিয়েছেন চিকেন কিং, বাড়িটা দেখলেই আন্দাজ করা যায়। আরেকটা জিনিস স্পষ্ট, কি ব্যবসা করে টাকা কামিয়েছেন তিনি। সর্বত্র মুরগীর ছবি। যেখানে সুযোগ মিলেছে, মুরগীর ছবি আঁকা হয়েছে। যেখানে আঁকার জায়গা নেই, যেমন লনে, সেখানে রবারের মুরগী বানিয়ে সাজিয়ে দেয়া হয়েছে।
বাড়ির পেছনে পুলের ধারে পার্টির আয়োজন করা হয়েছে। ছেলে-বুড়ো মিলিয়ে কম করে হলেও দুশো জন তো হবেই। পুলটার চেহারাও বিচিত্র। মুরগীর আকৃতিতে তৈরি। তার পাশে ফ্রাইড চিকেন খেতে খেতে হাসাহাসি করছে একদল ছেলেমেয়ে।

আমরা কিন্তু এখানে শুধু মজা করতে আসিনি, ফিসফিস করে বন্ধুদেরকে বলল কিশোর। ফারিহা, গোয়েন্দা হওয়ার খুব শখ তো তোমার। ট্রেনিং নিতে শুরু করো। যা বলব ঠিক তাই করবে। জুনের কাছ থেকে কাপড়গুলো নেবে না, ভুলে যাওয়ার ভান করে থাকবে। তাতে আরেকবার ওর সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পাবে।
আচ্ছা, ঘাড় কাত করে বাধ্য মেয়ের মত বলল ফারিহা। চলো, জুনের কাছে যাই। তোমরা যে এসেছ দেখা করা দরকার।
ভিড়ের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলল চারজনে। সবার হাতেই কাগজের প্লেট। এমন ভঙ্গিতে খাচ্ছে, যেন জীবনে এই প্রথম মুরগীর স্বাদ পেয়েছে। এই আরেকটা জিনিস বিরক্ত লাগে ওর। মানুষগুলো এমন করে কেন? পোশাক-আশাকে তো কাউকেই দরিদ্র বলে মনে হচ্ছে না। তার পরেও অন্যের বাড়ির খাবার পেলে এমন হাংলামো করে! বিরক্তিতে নাক কুঁচকাল সে।
কিশোর, রবিন বলল। একটা অন্তত খাও। একটাতে তো আর মরে যাবে না।
রবিনের দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। ঠাট্টা করছে কিনা বোঝার চেষ্টা করল। মাথা নাড়ল, না, খাব না।
তুমি আসলেই একটা গোঁয়ার...
হাই, খানিক দূর থেকে বলে উঠল একটা মেয়ে। কিশোরদেরই সমবয়সী। খাটো করে ছাঁটা বাদামী চুল। এক হাতে মুরগীর প্লেট, আরেক হাতে খালি একটা কাপ, সোডা ওয়াটার ছিল, খেয়ে ফেলেছে। আঁতকে উঠেছিল কিশোর, তাকেই ডাকছে ভেবে। যখন দেখল রবিনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে মেয়েটা, হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।
তুমি আসার পর থেকেই তোমাকে দেখছি, রবিনের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল মেয়েটা।
রবিনও হাসল। তোমাকে তো চিনলাম না?
চোখ কপালে তুলল মেয়েটা। হায় হায়, বলো কি! আমাকে চেনো না? আরে আমি, আমি, ভাল করে দেখো তো চিনতে পারো নাকি?
ব্যস, শুরু হয়ে গেছে ন্যাকামি। বিরক্তিতে ভুরু কোঁচকাল কিশোর।
কিন্তু রবিন দিব্যি হেসে চলেছে। মেয়েটার কথার জবাব তার মত করেই দিচ্ছে।
মরুকগে! একটা লাউঞ্জ চেয়ারে বসে পড়ল কিশোর। চিকেন লারসেনকে দেখতে লাগল। নাইট ক্লাবের কমেডিয়ানের মত আচরণ করছেন বিশালদেহী মানুষটা। একটু পর পরই গমগম করে উঠছে তাঁর ভারি কণ্ঠ। হা হা করে হাসছেন। পুলের পানির ওপর দিয়ে যেন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে সে হাসি।
হঠাৎ আরেকটা কণ্ঠ কানে আসতেই ঝট করে সেদিকে ফিরল কিশোর। ঠিক তার পেছনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে লোকটা। সাদা স্যুট পরা একটা মানুষ, নিজের

পরিচয় দিচ্ছে সোনালি চুলওয়ালা এক মহিলাকে। একটা বিজনেস কার্ড বাড়িয়ে দিয়ে বলল, আমি ফেলিক্স আরোলা।
নোরা অরলিজ, মহিলা নিজের নাম বলল।
ভালই হলো দেখা হয়েছে, লোকটা বলল।
যতই শুনছে ততই নিশ্চিত হচ্ছে কিশোর, এই কণ্ঠ সে শুনেছে। চিনতে পারছে।
কথায় কথায় নোরা জিজ্ঞেস করল, লোকটা কি করে।
মার্কেট রিসার্চ। কিছু বিশেষ খাবার চালানোর চেষ্টা করছি। খেয়ে দেখবেন? দেব? খুব ভাল লাগবে।
দিন। এতই যখন বলছেন। কাগজে মোড়ানো ছোট একটা ক্যান্ডি বের করে দিল আরোলা। ভাল করে দেখার জন্যে উঠে দাঁড়াল কিশোর।
অদ্ভুত নাম! মিরাকল টেস্ট! মোড়কে লেখা নাম পড়ে বলল মহিলা।
আমাদের কোম্পানির নতুন আবিষ্কার, আরোলা বলল হেসে।
মোড়ক খুলল নোরা। চকলেট রঙের একটুকরো মিষ্টি খাবার। তাতে মাখন মেশানো। দেখতে পাচ্ছে কিশোর।
কিন্তু ক্যান্ডি যে আমি খাই না? নোরা বলল।
ভয় নেই, অভয় দিয়ে বলল আরোলা। এতে ক্যালোরি বাড়বে না। জিরো ক্যালোরি। ওই যে মিরাকল কথাটা লেখা আছে না, খামোকা নয়। খেয়েই দেখুন।
মহিলার হাত ধরে প্রায় জোর করে ক্যান্ডিটা তার মুখে ঠেলে দিল আরোলা। খান। বুঝবেন, না খেলে কি স্বাদ মিস করতেন।
অবশেষে কামড় দিয়ে ছোট একটুকরো ভেঙে মুখে পুরল নোরা। বাহ! দারুণ তো!
খাবার লোভে নয়, কি এমন মজা সেটা বোঝার জন্যে জিভ প্রায় বেরিয়ে পড়ল কিশোরের। রহস্যময় লাগছে। ব্যাপারটা লক্ষ্য করল আরোলা। একটা বিজনেস কার্ড আর একটা ক্যান্ডি কিশোরের হাতেও গুঁজে দিল সে।
মোড়ক খুলে মুখে পুরে দিল কিশোর। মসৃণ, মাখন মাখন এক ধরনের স্বাদ।
কেমন লাগছে? ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল লোকটা।
তিন ধরনের স্বাদ একসঙ্গে, জবাব দিল কিশোর। চকলেট, মার্শম্যালো আর মিন্ট।
সত্যিই ক্যালোরি নেই? কি করে সম্ভব?
সম্ভব। ফ্লেভারটাই আসল। মিরাকল টেস্ট কি আর সাধে বলা হয়েছে। ক্যালোরি ছাড়া ক্যান্ডি, সাংঘাতিক আবিষ্কার, কি বলো?
বড় বড় হয়ে গেছে কিশোরের চোখ। সত্যিই চমৎকার স্বাদ। তারপর বলছে ক্যালোরি ফ্রী। কি করে সম্ভব? এতই আগ্রহী হয়েছে সে, আরোলার কণ্ঠস্বরের কথাই ভুলে গেল ক্ষণিকের জন্যে।

ওর কোন সন্দেহ নেই, এই লোকই ফোন করেছিল হাসপাতালে। নার্সকে বিরক্ত করেছিল। বার বার জুনের খবর জানতে চেয়েছিল।
তোমার কার্ড নেই নিশ্চয়? কিশোরকে জিজ্ঞেস করল আরোলা। সমঝদার খানেওয়ালা তুমি, বুঝতে পারছি। তোমাকে টেস্ট করিয়ে ভাল করেছি। নাম ঠিকানা জানা থাকলে ভাল হত।
হেসে উঠল মহিলা। ওর আর কি কার্ড থাকবে? টিনএজার। হাই স্কুলে পড়ে বোধহয়। ব্যবসা-ট্যবসা কি আর করে?
কে বলেছে কার্ড নেই?—কথাটা প্রায় মুখে এসে গিয়েছিল কিশোরের। সামলে নিল সময়মত। আর যাকেই দিক, এই মুহূর্তে ফেলিক্স আরোলাকে তিন গোয়েন্দার কার্ড দেয়ার কোন ইচ্ছে তার নেই। সতর্ক হয়ে গেলে লোকটা তার কোন প্রশ্নেরই জবাব দেবে না। অনেকগুলো প্রশ্ন করার ইচ্ছে আছে কিশোরের। এই যেমন, কেন হাসপাতালে ফোন করেছিল? কেন রহস্যময় আচরণ করেছে ফোনে? জুন আর লারসেনের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক?
এই সময় সেখানে এসে হাজির জুন। আরোলার হাত ধরল। আরেকটা ক্যান্ডি দিন। এত ভাল ভাবিইনি। একটার পর একটা যে খেতে চাইব, একথা কিন্তু একবারও বলেননি।
তাকে আরেকটা ক্যান্ডি দিল আরোলা। কিশোরকে দেখিয়ে বলল, ওরও ভাল লেগেছে। ও খুব সমঝদার, বুঝে গেছি...
থামুন থামুন, তাড়াতাড়ি হাত তুলল জুন। ওকে আপাতত পাবেন না। কাজে লাগাতে চান তো? হবে না। কারণ এখন ওকে আমি দখল করেছি। ওকে আর ওর দুই বন্ধুকে। ওরা তিন গোয়েন্দা। আমাকে সাহায্য করছে। অ্যাক্সিডেন্টের দিন কি কি ঘটেছিল আমার, বের করার চেষ্টা করছে।
ভেতরে ভেতরে চমকে গেলেও মুখটাকে স্বাভাবিক রাখল কিশোর। তার পরিচয় ফাঁস করে দিয়ে মস্ত ক্ষতি করেছে জুন। তাই নাকি? কিশোরের দিকে তাকিয়ে চোখ সরু সরু হয়ে এল আরোলার। তোমাকে দেখে কিন্তু কিছুই মনে হয়নি।
মুসা আর রবিনকে এখন দরকার। জলদি। কোন ধরনের একটা সূত্র পেতে যাচ্ছে কিশোর, সেটা কি, এখনও বুঝতে পারছে না অবশ্য।
উঠে দাঁড়াল কিশোর। আবোলাকে এক্সকিউজ মি বলে রওনা হলো ভিড়ের ভেতর দিয়ে, দুই সহকারীর খোঁজে। মুরগী পুলের ঠোঁটের কাছে জটলা করছে কিছু লোক, তার মাঝখানে যেন কিং হয়েই মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছেন চিকেন কিং লারসেন। সবার মাথার ওপর দিয়ে চোখে পড়ছে তার মাথা। পড়বেই। সাড়ে হয় ফুট লম্বা মানুষ খুব কমই আছে। চট করে চোখে পড়ার আরেকটা কারণ তার

পোশাক। উজ্জ্বল কমলা রঙের জগিং স্যুট, বুকের কাছে এমব্রয়ডারি করে আঁকা রয়েছে একটা মুরগী।
বললাম তো জানি না, প্রায় চিৎকার করে কথা বলছেন লারসেন। ছাড়া পেলেই কেন যে রাস্তা পেরিয়ে আরেক দিকে দৌড় দিতে চায় মুরগীরা, এ রহস্য আমিও ভেদ করতে পারিনি, তারপর হা হাহ হা করে জোরে জোরে হাসলেন তিনি। কি মজা পেল শ্রোতারা ওরাই জানে, হো হো করে হাসতে লাগল।
মিস্টার চিকেন, একজন বলল। আচ্ছা বলুন তো, মাখন মাখানো মুরগীর মাংসের কেক নিয়ে কবে গোলমালটা হয়েছিল?
উনিশশো ছিয়াশিতে, সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন লারসেন। ওরকম খাবার সহ্য করতে পারছিল না আসলে লোকে, বেশি রিচ…
ছিয়াশি নয়, পঁচাশি, ফস করে বলে বসল কিশোর। জবাবটা মুখে এসে গেছে, না বলে পারল না। আপনার ভুল হয়েছে, স্যার।
একসঙ্গে সবগুলো মুখ ঘুরে গেল কিশোরের দিকে। চিকেন লারসেন সহ।
আমার মনে আছে, আবার বলল কিশোর। সে বছরই আপনি একটা ফোয়ারা বানিয়েছিলেন। তার পাশে হোস পাইপের ব্যবস্থা করেছিলেন। আপনার রান্না করা মুরগী খাওয়ার পর বাচ্চারা যাতে পানি ছিটিয়ে মজা করতে পারে।
তুমি তো একটা জিনিয়াস হে! এগিয়ে এলেন লারসেন। ভালুকের থাবার মত বিশাল থাবায় চেপে ধরলেন কিশোরের হাত।
ঝাঁকাতে গিয়ে কিশোরের মনে হলো, ওই হাত নাড়ার সাধ্য তার নেই।
তোমার স্মৃতিশক্তি খুব ভাল, বুঝতে পারছি, লারসেন বললেন। এক কাজ করো না। আমি কি কি করেছি, সেই ইতিহাসগুলো তুমিই বলে দাও। সবাই শুনুক। আমিও শুনি। নিজের পুরানো দিনের কথা শুনতে ভালই লাগে মানুষের।
বেশ, ছোট্ট কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে নিল কিশোর। উনিশশো ছিয়াশি সালে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই অয়েলে চিনি মিশিয়েছিলেন আপনি। আপনার রেস্টুরেন্টের সামনে দিয়ে লম্বা একটা মুরগীর মিছিল পার করিয়েছিলেন। মুরগীগুলোর গলায় ঝুলছিল লাল রঙের মলাটের টুকরো। তাতে সোনালি অক্ষরে লেখা ছিলঃ চিকেন লারসেনের জন্যে আমি সব করতে রাজি।
নাহ, এই ছেলেটাকে আমি পালকপুত্র করে নেব! জনতার দিকে তাকিয়ে ঘোষণা করলেন লারসেন। চেঁচিয়ে ডাকলেন মেয়েকে, জুন, তোর একটা নতুন ভাই জোগাড় করেছি!
মুরগীর ইতিহাস নিয়ে যখন আলোচনায় মগ্ন কিশোর আর লারসেন, মুসা আর ফারিহা তখন জুনের সঙ্গে আলাপ করছে। পুলের নিচু ডাইভিং বোর্ডের ওপাশে রয়েছে ওরা।

দারুণ পার্টি দিয়েছ, ফারিহা বলল। এত্তো লোক! কারা ওরা?
জানি না। কোথেকে দাওয়াত করে এনেছে বাবা, বাবাই জানে, জুতো খুলে পানিতে পা ডোবাল জুন। যাকে পায় তাকেই দাওয়াত করে বসে বাবা, কিংবা ফ্রী কুপন দিয়ে দেয়, স্বভাবই এরকম। আমি হয়েছি ঠিক উল্টো। ভালমত না জেনে না বুঝে কিছু করতে পারি না। এই স্মৃতিবিভ্রমের ব্যাপারটা খেপিয়ে দিচ্ছে আমাকে। কেবলই মনে হয়, কেন মনে করতে পারি না! লোকে এসে সান্ত্বনা দিয়ে বলেঃ তুমি ভাল হওয়ায় খুশি হয়েছি। যারা বলে তাদেরকে চিনতে পারি না। অসহ্য লাগতে থাকে!
লম্বা একটা লোককে দেখেছ কখনও, মনে পড়ে? মুসা জিজ্ঞেস করল। কুৎসিত চেহারা। আর্মি ক্যামোফ্লেজ জ্যাকেট পরে?
মাথা নাড়ল জুন। নাহ। কেন?
তোমাকে ওর কথা বলতেই ভুলে গেছি, ফারিহা বলল। আমরা ওর নাম রেখেছি মিস্টার এক্স। যে রাতে তোমার অ্যাক্সিডেন্ট হয়, সে রাতে হাসপাতালে তোমার ঘরে এসেছিল সে। আমার কেন যেন মনে হচ্ছিল, লোকটা তোমার অপরিচিত হওয়ার কারণ আছে। আর একটিবারও আসেনি সে এরপর।
ভুরু কুঁচকে গেল জুনের। চোখে ভয় দেখা দিল বলে মনে হলো মুসার।
থাক অসব কথা, হাত নেড়ে বলল সে। তোমার গাড়িটার কি অবস্থা, জুন? আমি ইঞ্জিনের কাজ জানি। চাইলে আমার সাহায্য নিতে পারো।
আমার গাড়ি? সোজা ওটাকে জাংকইয়ার্ডে পাঠিয়ে দিয়েছে বাবা। একবার চোখের দেখাও দেখতে দেয়নি আর আমাকে। তার ধারণা, অপয়া গাড়ি।
অ্যাক্সিডেন্টের দিন যা ঘটেছিল কিছুই মনে করতে পারছ না? ফারিহা জিজ্ঞেস করল।
না। দিন গেলে হয়তো মনে পড়বে। আগামী হপ্তায়ও পড়তে পারে।
সেদিন বিকেলে হেডকোয়ার্টারে ফিরে কিশোরের ওয়ার্কশপে আলোচনা করতে বসল তিন গোয়েন্দা। মুসা আর রবিন পিজ্জা চিবুচ্ছে। কিশোর এক টুকরো ফুটকেক নিয়ে এসেছে ফ্রিজ থেকে, মেরিচাচীর তৈরি। তাতে পেটের ক্ষতি হবে না।
হাসপাতালে ঘন ঘন ফোন না হয় করলই ফেলিক্স আরোলা, মুসা বলল একসময়। তাতে কি?
ওর বলার ধরনটাই পছন্দ হয় না আমার, সুইভেল চেয়ারে হেলান দিল কিশোর। সেজন্যেই সন্দেহটা জেগেছে।
বেশ, তার ব্যাপারে খোঁজখবর নেব আমরা, রবিন বলল। লম্বা চুমুক দিল। কোকাকোলার বোতলে। তো, কাল তাহলে যাচ্ছ চিকেন লারসেনের ওখানে?

যেতে তো বলেই দিয়েছে, কিশোর বলল। পালকপুত্রই প্রায় করে নিয়েছে পার্টিতে। আমিও যতটা সম্ভব খাতির জমিয়েছি। কায়দা করে অনুমতি আদায় করে নিয়েছি, তার রিসার্চ ল্যাব আর মেইন অফিসে ঢোকার।
কি পারে বলে মনে হয়? মুসার প্রশ্ন। বিষের বাক্স? আঙুলে লেগে থাকা মাখন চেটে খেতে লাগল সে।
কি পাব জানি না। সব নির্ভর করে কতটা গভীরে ঢোকার সুযোগ পাব আমরা, কতখানি দেখতে পারব, তার ওপর।
যেতে পারলে খুবই ভাল হত, রবিন আফসোস করল। কিন্তু...
পারছ না, এই তো? ট্যালেন্ট এজেন্সিতে যেতে হবে। তা যাও।
আজকাল আর আমাকে দিয়ে কিছু কাজ হচ্ছে না তিন গোয়েন্দার, জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলল রবিন। ভাবছি এজেন্সির চাকরিটা ছেড়েই দেব...
তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নিয়ো না। দেখাই যাক না, কি হয়?
খাওয়া শেষ করে বেরিয়ে এল তিনজনে। ওয়ার্কশপ বন্ধ করে দিল কিশোর। রবিন আর মুসাকে এগিয়ে দিতে চলল লোহার বিশাল গেটের দিকে। ওদের গাড়িগুলো পার্ক করা রয়েছে ওখানে। লালচে হয়ে এসেছে আকাশ। তবে বেশিক্ষণ সে রঙ থাকল না।
অ্যাই, দেখো, হাত তুলল মুসা। রাস্তার ওপারে! বুকের শেষ মাথায় দাঁড়িয়ে আছে একটা কালো রঙের পোরশে কনভারটিবল। কম করে হলেও ষাট হাজার ডলার দাম। দুর্দান্ত জিনিস।
গাড়ি দেখছে না কিশোর, তাকিয়ে আছে লোকটার দিকে। বনেটের ওপর ঝুঁকে রয়েছে যে। শান্ত কণ্ঠে বলল, দেখেছ। আর্মি ক্যামোফ্লেজ জ্যাকেট। আমাদের মিস্টার এক্সও ওই পোশাকই পরেছিল...।
তাই তো! গাড়ির দিকেই নজর ছিল কেবল মুসার, আর কোনদিকে নয়। বরফের মত জমে গেল যেন সে। একটা মুহূর্ত। পরক্ষণেই দৌড় দিল সেদিকে।
পায়ের শব্দ শুনেই বোধহয় ফিরল লোকটা। মুসাকে দেখেই বনেট নামিয়ে গিয়ে টান দিয়ে খুলল ড্রাইভিং সীটের পাশের দরজা।
অ্যাই, শুনুন! দাঁড়ান! চেঁচিয়ে বলল মুসা।
কিশোর আর রবিনও ছুটতে শুরু করেছে তার পেছনে।
কিন্তু থামল না আর্মি জ্যাকেট পরা লোকটা। তাড়াতাড়ি গাড়িতে বসে ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে রওনা হয়ে গেল।
চোখের পলকে ঘুরে গেল মুসা। ছুটল তার নিজের গাড়ির দিকে। একটানে দরজা খুলে ভেতরে বসেই ইঞ্জিন স্টার্ট দিল। সাঁই সাঁই করে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে গাড়িটাকে তুলে নিয়ে এল রাস্তায়। পিছু নিল পোরশের।

চল বেটা, জলদি কর, নিজের শিরোকোকে অনুরোধ করল মুসা। ওটাকে ধরা চাই। পালাতে না পারে।
কিন্তু মোড়ের কাছে পৌঁছে ব্রেক চেপেই বোকা হয়ে গেল সে। কিছুই হলো না। কাজ করছে না ব্রেক। প্যাডাল চেপে অযথাই পাম্প করে চলেছে সে, কিন্তু চাপ লাগছে না কোন কিছুতে।
পঞ্চাশ মাইল তুলে ফেলেছিল গতিবেগ। তীব্র গতিতে ছুটে চলেছে গাড়ি সামনের চৌরাস্তার দিকে। ট্রাফিক পোস্টের লাল আলো জ্বলছে।
একটা মুহূর্তের জন্যে প্যাডাল চাপা বন্ধ করছে না মুসা। কাজ তো করা উচিত! সে নিজে সব কিছু চেক করে। ব্রেক ফ্লুইড ঠিক আছে কিনা নিয়মিত দেখে।
কিন্তু, কথাটা সত্যি, ব্রেক কাজ করছে না। কোনমতেই চাপ দিচ্ছে না চাকায়। গতিরোধ করার চেষ্টা করছে না। পথটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে। ফলে গতি তো কমছেই না, আরও বাড়ছে। আর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই চৌরাস্তায় গিয়ে পড়বে ভাগ্য ভাল হলে কোন গাড়ির গায়ে তো না লাগিয়ে বেরিয়ে যেতে পারবে। তবে লাগার সম্ভাবনাই বেশি। কারণ লাল আলো জ্বলছে তার দিকটায়। অন্যদিকের গাড়িগুলো চলাচল করছে। ওগুলোর চালকদের জানার কোনই উপায় নেই যে মুসার গাড়ি ব্রেক ফেল করেছে।
মুসার মনে হচ্ছে তার গলার ভেতরে একটা আস্ত আপেল ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। বেরও করতে পারছে না, গলা দিয়ে নামাতেও পারছে না। ঘেমে ভিজে গেছে হাতের তালু।
কিন্তু মাথাটা এখনও ঠান্ডাই রেখেছে। ভেজা তালু দিয়ে চেপে ধরল গিয়ারশিফট নব। একটানে নামিয়ে নিয়ে এল ফোর্থ গিয়ার থেকে সেকেন্ড গিয়ারে। গতি কমানোর জন্যে। ইতিমধ্যে সামনের পোরশেটা মোড় নিল গতি না কমিয়েই। রাস্তায় ঘষা খেয়ে আর্তনাদ তুলল টায়ার। ঘুরে গেল গাড়িটা। দ্রুত সরে যেতে লাগল।
গতি কমছে শিরোকোর, তবে যথেষ্ট নয়। চৌরাস্তাটা আর মাত্র একশো গজ দূরে। হস হস করে বেরিয়ে যাচ্ছে ওপাশের গাড়িগুলো। এপাশের হলুদ সিগন্যাল এখনও জ্বলেনি।
জোরে হর্ন বাজিয়ে সতর্ক করার চেষ্টা করল একটা নীল হোন্ডা।
ধপ ধপ করে লাফাচ্ছে মুসার হৃৎপিন্ড। গিয়ার আরও নিচে নামাল সে। তারপর চেপে ধরল হ্যান্ডব্রেক। একই সঙ্গে ডানে কাটল স্টিয়ারিং।
নিমেষে রাস্তা থেকে একটা শূন্য জায়গায় নেমে এল গাড়ি। কিছু বাড়িঘর উঠবে ওখানে, তারই প্রস্তুতি চলছে। মাটি এবড়োখেবড়ো হয়ে আছে। তাতে আরও

কিছুটা গতি কমল গাড়ির। লম্বা ঘাসের ভেতরে পড়ে আছে কয়েকটা সিমেন্টের স্ল্যাব, সেগুলোতে ধাক্কা লেগে থেমে গেল শিরোকো।
প্রচন্ড ঝাঁকুনি লাগল। সীটবেল্ট বাঁধা না থাকলে উইওশীল্ডে গিয়ে বাড়ি লাগত মুসার মাথা।
মরতে মরতে বাঁচলাম! ভাবল সে। লম্বা দম নিতে লাগল নিজেকে শান্ত করার জন্যে। তারপর দরজা খুলে নেমে এল টর্চ হাতে। গাড়ির পাশে বসে পড়ে নিচে আলো ফেলে দেখতে লাগল ক্ষতিটা কোথায় হয়েছে। হুম, তাহলে এই ব্যাপার! ব্রেকের ফ্লুইড লাইন কাটা! ইগনিশন থেকে চাবিটা খুলে নিয়ে দড়াম করে লাগিয়ে দিল দরজা। তারপর ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল ওপরে। গোধূলি শেষ হয়ে অন্ধকার নামতে আরম্ভ করেছে তখন। স্যালভিজ ইয়ার্ডে ফিরে চলল সে।
দুই ক্যান সোডা ওয়াটার গেলার পর অনেকটা শান্ত হলো মুসার কাঁপুনি। হেডকোয়ার্টারের ট্রেইলারটা যে জঞ্জালের স্তুপের ভেতর লুকানো, তার বাইরে তিনটে পুরানো লোহার চেয়ারে বসেছে রবিন আর কিশোরের সঙ্গে।
যাক, কিশোর বলল। অবশেষে মিস্টার এক্সের দেখা মিলল।
ব্যাটা শয়তান, এখনও রাগ কমেনি মুসার। ব্রেকের লাইন ও-ই কেটে রেখেছিল। এমন ভান করছিল, যাতে আমি ওকে ফলো করি। কিংবা আমরা সবাই করি। এবং করলেই গিয়ে বাড়ি খাই পাহাড়ে।
তিন গোয়েন্দার নাম মুছে যেত তাহলে। কিংবা দুই গোয়েন্দা হয়ে যেত এতক্ষণে।
আমি ভাবছি, রবিন বলল। লোকটা কে? আমাদের পিছে লেগেছে কেন?
আর কি করেই বা জানল, যে আমরা তদন্ত করছি? যোগ করল কিশোর।
এটা আরেক রহস্য। পার্টিতে কিন্তু দেখিনি ওকে।
আর্মি জ্যাকেট পরা ওরকম কাউকে চেনে না জুন, মুসা বলল। তারমানে...
সে লারসেন পরিবারের কেউ নয়, কথাটা শেষ করে দিল কিশোর। কারও হয়ে কাজ করছে।
কার?
জবাব দিতে পারল না কেউ। তিনজনেই প্রশ্নটা মাথায় নিয়ে ঘুমাল সে রাতে।
পরদিন সকালে ইয়ার্ডের গেটের বাইরে একটা অপরিচিত গাড়ি হর্ন দিতে লাগল, আর টেলিফোনটাও বেজে উঠল একই সঙ্গে। অনেক আগেই ঘুম থেকে উঠে পড়েছে কিশোর। ওসিলোস্কোপ দিয়ে ওর ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করছিল সে। ফোনের রিসিভার কানে ঠেকিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। একটা রহস্যের সমাধান হলো। অপরিচিত হর্নটা মুসার গাড়ির। অচেনা, তার কারণ শিরোকোটা আনেনি মুসা। নিয়ে এসেছে আরেকটা, ওর মায়েরটা।
টেলিফোনটাও অবাক করল কিশোরকে।

কিশোর, আমি জুন লারসেন বলছি। আমার ব্রিফকেস!
ইঙ্গিত কিংবা সঙ্কেত খুব ভালই বোঝে কিশোর, কিন্তু জুনের কথা তাজ্জব করে দিল ওকে। তবে সে প্রশ্ন করার আগেই জুন বলল, এক ঘণ্টা আগে ঘুম থেকে উঠেছি আমি। তখন থেকে খুঁজে বেড়াচ্ছি আমার ব্রিফকেসটা, পাচ্ছি না, লম্বা দম নিল সে। এর আগে পর্যন্ত ওটার কথা ভুলেই ছিলাম। আজ ঘুম থেকে ওঠার পর মনে পড়েছে।
উত্তেজিত হয়ে উঠল কিশোর। তোমার স্মৃতি ফিরতে আরম্ভ করেছে।
মনে হয়, জুন বলল। যাই হোক, ব্রিফকেসটা পাচ্ছি না। কেন ওটা এত খুঁজছি তা-ও বুঝতে পারছি না। ভেতরে বোধহয় জরুরী কিছু ছিল।
আমি আর মুসা তোমার আব্বার অফিসে যাওয়ার কথা ভাবছিলাম।
অফিসেও ফেলে রেখে আসতে পারি। খুঁজতে যেতে চাইছিলাম, কিন্তু কদিন যেতে বারণ করে দিয়েছে বাবা। বলেছে রেস্ট নিতে। আচ্ছা, একটা কথা, শুক্রবারে অ্যাক্সিডেন্টটা হওয়ার আগে আমি কোথায় ছিলাম, বের করতে পারবে?
ঠিক এই কাজটা করার কথাই ভাবছিলাম, মনে মনে বলল কিশোর। জুনকে বলল, দেখি, খোঁজখবর করব। কখন কোথায় যাও, লিখেটিখে রাখার অভ্যাস আছে, ক্যালেন্ডারে? থাকলে ভাল হত। একটা সূত্র পেতাম।
রাখি। নীল রঙের মরক্কো লেদারে মোড়া একটা সুন্দর ডায়েরীতে। ব্রিফকেসেই রাখি ওটা।
গাড়ির হর্ন বাজাতে আরম্ভ করল আবার মুসা, তালে তালে, একটা বিশেষ ছন্দ সৃষ্টির চেষ্টা করছে।
ঠিক আছে। ব্যাপারটা নিয়ে সব রকমে ভেবে নিই, কিশোর বলল জুনকে। রাতে ফোন করব।
আচ্ছা। আমারও কিছু মনে পড়লে জানাব তোমাকে, লাইন কেটে দিল জুন।
বাইরে বেরোল কিশোর। ততক্ষণে বনেট খুলে ইঞ্জিনের ওপর ঝুঁকে পড়েছে মুসা। ইঞ্জিন সামান্যতম গোলমাল করলে সেটা দেখা এখন অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে তার।
জুন ফোন করেছিল, কিশোর জানাল। ওর ব্রিফকেসটা নাকি পাচ্ছে না। জরুরী কিছু ছিল বলে মনে হচ্ছে ওর।
কিশোরের দিকে না তাকিয়েই মুসা বলল, আমি শিওর, মিস্টার এক্স ওটাই খুঁজছিল হাসপাতালে।
মুখ তুললে দেখতে পেত উত্তেজনায় চোয়াল স্কুলে পড়েছে কিশোর পাশার। একটা সাতিক কথা বলেছ তো! মনেই হয়নি আমার!

গাড়িতে উঠে বসল দুজনে। রওনা হলো চিকেন লারসেনের স্যান ফারনানদো ভ্যালির অফিসে। যাওয়ার পথে দেখতে পেল ঢালের নিচে তরাইয়ে তেমনি পড়ে আছে মুসার গাড়িটা।
একটা পেট্রল স্টেশনে থামল মুসা। মেরিচাচীর বোনপো নিকি পাঞ্চকে ফোন করার জন্যে। যাকে এক ভীষণ বিপদ থেকে রক্ষা করেছিল তিন গোয়েন্দা। গাড়ির জাদুকর বলা যায় লোকটাকে। দিন কয়েক হলো আবার ফিরে এসেছে রকি বীচে। গাড়ি মেরামতের একটা গ্যারেজ করার কথা ভাবছে এখানে। উঠেছে ম্যালিবু বীচে এক বন্ধুর সঙ্গে একটা কটেজ ভাড়া করে। গরমকালটা কাটাবে এখানে, গাড়িটাড়ি মেরামত করবে, ব্যবসাটা জমে গেলে চিরস্থায়ীই হয়ে যাবে।
নিকিভাই? ফোনে বলল মুসা। মুসা। আমার গাড়িটা একটু দেখবেন?
কোনটা? শিরোকোটা?
হ্যাঁ। গাড়িটা পড়ে আছে। তুলে নিয়ে গিয়ে মেরামত করে নিন, কয়েক দিনের জন্যে চালাতে দেব। একটা গাড়ি আপনার দরকার বলেছিলেন না?
নিকির সঙ্গে আলোচনা করে গাড়ির একটা ব্যবস্থা করে আবার গাড়িতে ফিরে এল মুসা।
চিকেন লারসেন করপোরেশনের পার্কিং লটে এনে গাড়ি রাখল। ছয়তলা একটা আধুনিক বাড়িতে লারসেনের অফিস।
চিকেন করপোরেশনের পার্কিং লটে এনে গাড়ি ঢোকাল মুসা। জায়গাটা দেখে হাসি পেল দুজনেরই। এখানেও লারসেনের বিচিত্র রুচির নিদর্শন স্পষ্ট। আধুনিক ছতলা একটা বাড়ি আর এক চিলড্রেন পার্কের মিশ্রণ যেন। ভিজিটরস গেটে তালা দেয়া। ঢোকার আগে অনুমতি নিতে হয়। ইন্টারকমে কথা বলতে গেল মুসা। মুরগীর আকৃতিতে তৈরি ইন্টারকম দেখে হাসি পেল। কেন ঢুকবে, প্রশ্ন করা হলে খাবারের অর্ডার দিল সে। চিকেন লারসেন রেস্টুরেন্টে ঢোকার কথা বলল। ভাবল, আগে ভেতরে ঢুকি তো, তারপর দেখা যাবে কোথায় যাওয়া যায়।
ইলেক্ট্রনিক সিসটেমে হাঁ হয়ে খুলে গেল গেট। লাল-হলুদ রঙ করা বাড়িটার দিকে গাড়ি চালাল মুসা।
ঘণ্টার পর ঘণ্টা একটানা কাজ করেন লারসেন। চওড়া হাসি দিয়ে স্বাগত জানালেন ওদের। পরনে লাল জগিং স্যুট। কিশোরকে দেখেই বললেন, একটা ধাধার জবাব দাও। বলো তো কোন্ সালে পেষানো মুরগীর মাংসে গাজর মেশাতে আরম্ভ করেছি?
উনিশশো সাতাশি সালে। ছোট ছোট টিনে ভরে সাপ্লাই দিতেন।
অ্যাই, কি বলেছিলাম। বলিনি, ছেলেটা পারবেই! কাছাকাছি যত লোক আছে সবাইকে শোনানোর জন্যে চেঁচিয়ে বললেন লারসেন। গলা তো নয়, মাইক। তুমি

একটা পাগল, পুত্র, সন্দেহ নেই, তবে আমার মত পাগল। দাঁড়াও, আইডেনটিফিকেশন ট্যাগ দিয়ে দিচ্ছি। তোমরা দুজনে যে কোন সময় ঢুকতে পারবে। আমাদের এখানে সিকিউরিটি খুব কড়া, চাপড় মেরে কিশোর আর মুসার পিঠে স্টিকার লাগিয়ে দিলেন তিনি।
কিশোরের পিঠে কি লাগানো হয়েছে, দেখে মুসা তো থ। সন্দেহ হতে নিজের পিঠেরটা দেখাল কিশোরকে। হো হো করে হেসে উঠল কিশোর। লেখা রয়েছেঃ মুরগীর ঠোকর। জিজ্ঞেস করল, আমার পিঠে কি? মুসা জানাল, মুরগীর খামচি। ওদের সঙ্গে সঙ্গে লারসেনও হাসতে লাগলেন।
হাসি থামলে বললেন, খেতে এসেছ বলে তো মনে হয় না। তা কি দেখতে এসেছ, বলো তো? মুরগী বেচে লাভ করা আমার প্রথম ডলারটা? ফ্রেমে বাঁধিয়ে রেখেছি। আমার অফিসে। আমার প্রথম স্ত্রীর ছবিটাও বাঁধিয়ে ঝুলিয়ে রেখেছি। হাহ হাহ হা!
আসলে, কিশোর বলল। অফিসগুলো দেখারই লোভ। আপনারটা। আরও কিছু এবং বিশেষ করে জুনের নতুন অফিসটা।
আমি দেখতে চাই খাবার কি করে বানানো হয়, মুসা বলল। আর কি কি জিনিস দেয়া হয় মাংসের সঙ্গে।
ও, আমার পাগল বিজ্ঞানীগুলোকে দেখার শখ তোমার? হাসলেন লারসেন। বেশ। খাঁচা থেকে বের করার ব্যবস্থা করছি ওদেরকে। তারপর, কিশোরের দিকে তাকালেন তিনি। একটা স্পেশাল খাবার দেব তোমাকে। চেখে দেখার জন্যে।
ভয় পেয়ে গেল কিশোর। তাড়াতাড়ি বলল, না না, আমি খাবারের কিছু বুঝি! বুড়ো আঙুল দিয়ে মুসাকে দেখিয়ে বলল, ওকে দেবেন।
কিশোর আর মুসাকে প্রায় ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে চললেন লারসেন। আমার নতুন জিনিসটা দেখলে বুঝবে। বিশ্বাসই করতে চাইবে না। আমি নিজেই পারিনি। অথচ আমারই আবিষ্কার।
এলিভেটরে করে উঠে এল তিনজনে। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাতে লাগলেন লারসেন। মাঝে মাঝে কর্মচারীদের সঙ্গে কথা বলার জন্যে থামছেন। এই সুযোগে যাকে পাচ্ছে তার সঙ্গেই কথা বলার চেষ্টা করছে কিশোর, জুনের অ্যাক্সিডেন্টের ব্যাপারে। একজন অ্যাকাউনটেন্ট জানাল, সে সেদিন ওকে দেখেছে। তবে ব্রিফকেসের ব্যাপারে কিছু বলতে পারল না। কয়েকজন জানাল, কাজ শেষে বেরিয়ে যাওয়ার সময় পার্কিং লটে জুনের মাসট্যাং গাড়িটা দেখেছিল। তবে জোরাল কোন সূত্র কেউই দিতে পারল না।
অবশেষে দুই গোয়েন্দাকে মাটির তলার ঘরে নিয়ে এলেন লারসেন। বন্ধ কাচের দরজার ওপাশে বিশাল গবেষণাগার। ঢোকার অনেকগুলো দরজা। যারা ঢুকছে

তাদেরকে চিহ্নিত করার জন্যে ইলেক্ট্রনিক ব্যবস্থা রয়েছে। অপরিচিতজন কিংবা যাদের ঢোকার অনুমতি নেই তাদেরকে ঢুকতেই দেবে না। সাবধান বাণী লেখা রয়েছে দরজার কপালে।
একটা ইলেকট্রনিক বক্সে একটা প্লাষ্টিকের কার্ড ঢুকিয়ে দিলেন লারসেন। খুলে যেতে লাগল কাচের দরজা। মুসা আর কিশোরকে বললেন, আমি যা বলব, সঙ্গে সঙ্গে তাই বলবে। কোড। হ্যাঁ, বলো, মুরগীর বাচ্চার কথা কাউকে বলব না।
তোতাপাখির বুলি আওড়ানোর মত করে বলল দুজনেই।
হ্যাঁ, হয়েছে, তারপর গলা চড়িয়ে ডাকলেন লারসেন, গমগম করে উঠল তার কণ্ঠ, কেঁপে উঠল যেন গবেষণাগারের কাচের দেয়াল, ডন!
এগিয়ে এল একজন বেঁটে, মোটা, টাকমাথা লোক। চোখে গোল্ডরিম চশমা। গায়ে ল্যাবরেটরির সাদা পোশাক। পকেটে একসারি মুরগীর মডেল ঝোলানো, সামরিক বাহিনীর লোকে মেডেল যেভাবে ঝোলায় সে ভাবে। কাছে এসে অনেকটা মিলিটারির মতই স্যালুট করল।
পরিচয় করিয়ে দিলেন লারসেন, ডন বারোজ, বিশাল থাবা দিয়ে চাপড় মারলেন লোকটার পিঠে। বাঁকা হয়ে গেল লোকটা। কল্পনাই করতে পারবে না আমার এখানে আসার আগে কোথায় কাজ করত ডন।
নিশ্চয় ডিজনিল্যান্ডে, ভাবল মুসা। জিজ্ঞেস করল, কোথায়?
পেনটাগন, জবাব দিলেন লারসেন। ওয়াশিংটনে ছিল ওর ল্যাবরেটরি, পেনটাগনের পাঁচ ব্লক দূরে। তাহলে পেনটাগনই ধরা যায়, যদিও ওখানে কাজ করেনি। কাছাকাছি ছিল তো। হাহ হাহ।
আসলে, পেন্টাগন রয়েছে ভারজিনিয়ার আরলিংটনে, পটোম্যাক নদীর ধারে। চুপ করে রইল কিশোর। ভুলটা ধরিয়ে দিল না।
কাঁচুমাচু হয়ে গেছে বেচারা ডন। ভয়ে ভয়ে রয়েছে আবার কখন পিঠে আন্তরিকতার চাপড় পড়ে। একে একে গোয়েন্দাদের নাম বলে গেলেন লারসেন। হাত মেলাল ডন। ঘেমে গেছে হাতের তালু। ঠান্ডা।
ডন একজন সুগন্ধ বিশারদ, লারসেন বললেন। আমার আর অ্যান্ড ডি-র হেড, ভুরু কোঁচকালেন তিনি। বুঝলে না? রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট। খুব ভাল কাজ জানে। আমি যা জানি তা-ও শেখাব। ওস্তাদ বানিয়ে ছেড়ে দেব। চিকেন ডন বারোজ হয়ে যাবে তখন। হাহ হাহ হা! ডন, ধর, ছেলেরা ড্রিপিং চিকেন খেতে চায়? দিতে পারবে?
কিশোর আর মুসার দিকে তাকিয়ে সন্দেহ দেখা দিল ডনের চোখে। ওরা সিভিলিয়ান, স্যার?

তাতে কোন অসুবিধে নেই, অভয় দিলেন লারসেন। কোন বছর সেই খাবারটা বানিয়েছিলাম, যেটার নাম দিয়েছিলাম উইং অন আ স্ট্রিং? একটুকরো সাবানের ওপর দড়ি পড়ে থাকতে দেখে যে খাবারটা তৈরির ভাবনা মাথায় এসেছিল আমার?
নাইনটিন এইটি ফাইভ, জবাব দিল ডন।
তারিখ?
মাথা নাড়ল ডন।
সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল কিশোর, বাইশে জুন, উনিশশো পঁচাশি।
দেখলে তো? হেসে বললেন লারসেন। কাকে নিয়ে এসেছি? ওকে আমি পালকপুত্র বানিয়েছি এ জন্যেই। জুনকেও বলে দিয়েছি। ছেলেটা একটা চলমান রেফারেন্স বুক। একেবারে কম্পিউটারের মেমোরি। ডনের দিকে তাকালেন, আর সন্দেহ নেই তো তোমার? যাও, ড্রিপিং চিকেন নিয়ে এসো।
যাচ্ছি, স্যার, এবার আর স্যালুট করল না ডন, তবে ভাব সাব দেখে মনে হলো করতে পারলেই খুশি হত। সেই সঙ্গে খটাস করে বুট ঠুকতে পারলে তো আরও। তবে ঘুরে যখন রওনা হলো, সাধারণ মানুষের মত হেঁটে মার্চ করে এগোল। ল্যাবরেটরির রান্নাঘরের দরজায় গিয়ে চাবি বের করে তালা খুলল।
ড্রিপিং চিকেনটা কি জিনিস? জানতে চাইল মুসা।
বললে বুঝবে? আচ্ছা, বলি, লারসেন বুঝিয়ে দিলেন, মুরগীর মাংস থেকে পুরোপুরি হাড় আলাদা করে ফেলে, মেশিনে পিষে ফেলা হয়। বিস্কুটের গুঁড়ো মিশিয়ে ভেজে পুরো বাদামী করে ফেলে তার ওপর মাখিয়ে দেয়া হয় সোনালি রঙ করা মাখন। বুঝলে?
ছবি দেখতে পাচ্ছি, কিশোর জবাব দিল।
ছবি?
ও কিছু না।
আরও কিছু জিনিস মেশানো হয়, লারসেন বললেন। যেগুলো বললেও বুঝবে না। কাজেই, থাক।
আমার আর শোনারও দরকার নেই, জিভে পানি এসে গেছে মুসার।
আমার এই নতুন খাবারে বিশেষ একটা জিনিস মেশানো থাকবে, প্রতিটি বড়ার মধ্যে, লারসেন বললেন। লোকে মজা করে খাবে। তারপরই খাবে ধাক্কা। বুঝতেই পারবে না কিসে আঘাত করল ওদেরকে।
খাওয়া লাগল না, কথাটা শুনেই ধাক্কা খেলো দুই গোয়েন্দা। ভীষণ চমকে গেল। ঠান্ডা শিহরণ বয়ে গেল মেরুদন্ড বেয়ে। পরস্পরের দিকে তাকাল। এক মুহূর্ত আগেও ড্রিপিং চিকেন খাওয়ার জন্যে লোভ ছিল দুজনের। এমনকি কিশোরও

ভাবছিল, পেট এখন ভাল হয়ে গেছে, খানিকটা খাবার চেখে দেখবেই। লারসেনের কথা শোনার পর ইচ্ছেটা উবে গেছে। লোকে কেন ধাক্কা খাবে? কেন বুঝতে পারবে না... কিসে আঘাত করেছে ওদেরকে? আর খাওয়ার মধ্যে আঘাতের কথা আসে কেন? ড্রিপিং চিকেনে বিষ মেশানো হবে না তো?
খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে। নতুন একটা খাবার আবিষ্কার করেছেন লারসেন। তার পরপরই ঘুমের ঘোরে দুঃস্বপ্ন দেখল জুন। কাকতালীয় হতে পারে...কিন্তু কিশোরের মনে হতে লাগল, এই খাবারটাই জুনের আতঙ্কের কারণ। কোথাও একটা যোগাযোগ আছে। কানের পর্দায় যেন ভাসতে লাগল কিশোরেরঃ মুরগীতে বিষ মেশাচ্ছে সে! লাখ লাখ লোক মারা যাবে!
রান্নাঘর থেকে চেঁচিয়ে বলল ডন, খুব সুন্দর হয়েছে! আর বেশ গরম!
এসো, দুই গোয়েন্দাকে বললেন লারসেন। আমার গিনিপিগ বানাতে চাই তোমাদেরকে। তোমরাই প্রথম চেখে দেখো, কেমন হলো ড্রিপিং চিকেন।
চোখে অনেক আশা নিয়ে কিশোর আর মুসার দিকে তাকালেন লারসেন। যেন বোঝার চেষ্টা করছেন, ওদেরকে যে সম্মানটা দেয়া হচ্ছে সেটা ওরা বুঝতে পারছে কিনা।
ঘড়ি দেখল মুসা। লাঞ্চটাইম তো হয়নি এখনও।
ডাক্তার বলেছেন, কিশোর বলল। কোন রকম রিচ ফুড না খেতে। ভাজাভুজি তো একেবারে বারণ। পেটের অবস্থা ভাল না আমার।
ওই ডাক্তার ব্যাটাদের কথা শুনো না! প্রায় গর্জে উঠলেন লারসেন। ওরা তো কত কথাই বলে। সব শুনলে না খেয়ে উপোষ করে মরতে হবে রোগীকে। এসো। এখনও গরম গরম রয়েছে ড্রিপিং চিকেন। এই সুযোগ হারালে পরে পস্তাবে... বুঝতে পারছ না, কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তোমাদেরকে। কোথায় পাঠানো হবে।
ঠিকই পারছি! নরকে! ভাবল মুসা।
তর্ক করে লাভ হবে না। সন্দেহ না জাগিয়ে লারসেনকে কোন কিছু বলেই নিরস্ত করা যাবে না এখন। কি আর করে? ধীরে ধীরে তার সঙ্গে এগোল দুজনে।
একটা ট্রে হাতে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল ডন। দুই গোয়েন্দাকে ইশারা করল তার অফিসের দিকে যেতে। সে এগোল সেদিকে। লারসেন গেলেন না। ডনকে বললেন, ট্রেটা রেখেই যাতে চলে আসে। কাজ আছে।
ডনের অফিসে ঢুকল কিশোর আর মুসা। স্টেইনলেস স্টীল আর কাচের তৈরি সুদৃশ্য আধুনিক টেবিলে ট্রে নামিয়ে রেখে বেরিয়ে গেল ডন। স্যান্ডউইচের মত দেখতে চমক্কার খাবার। গরম। ধোয়া উড়ছে। দেখতে তো খুবই ভাল, কিশোর বলল।

পাগল হয়ে গেলে নাকি? মুসা বলল, ওগুলো বিষাক্ত! খাওয়া একদম উচিত হবে না। এক কাজ করি, পকেটে ভরে ফেলি।
নিজের প্যান্টের দিকে তাকাল কিশোর। আঁটো জিনস। পকেটে ঢোকানো যাবে না, আর জোরজার করে কোনমতে ঢোকালেও উঁচু হয়ে থাকবে। স্পষ্ট বোঝা যাবে। মাথা নাড়ল, হবে না।
তাহলে? ওয়েস্টবাস্কেটেও তো ফেলতে পারব না। দেখে ফেলবে।
উঁচু হয়ে থাকলেও পকেটেই ঢোকাতে হবে। আর কোন উপায় নেই। আমি পরেছি জগিং স্যুট, পকেটই নেই।
কাউচের নিচে ফেলে দিলে কেমন হয়?
তাতেও লাভ হবে না। যে হারে গন্ধ বেরোচ্ছে, ওরা গন্ধ পেয়ে যাবে। বের করে ফেলবে। পকেটেই রাখতে হবে। ঢোকাও। জলদি!
আর কোন উপায় না দেখে পকেটেই ঢোকাতে বাধ্য হলো কিশোর। আঠাল ঝোলের মত জিনিস পকেটের কাপড় ভেদ করে পা বেয়ে গড়িয়ে নামতে শুরু করল। আমি দরজায় চোখ রাখছি, মুসা বলল। তুমি খোঁজ। দেখো, কিছু বেরোয় কিনা।
খুঁজতে লাগল কিশোর। জুনের ব্রিফকেসটা। ডেস্কের পেছনে, নিচে, ড্রয়ারে, কোথাও পাওয়া গেল না। ফাইল কেবিনেটে তালা দেয়া। ওর ভেতরে দেখা গেল না।
ব্রিফকেস খোঁজা বাদ দিয়ে অন্য সূত্র মেলে কিনা দেখতে শুরু করল সে। ডনের ডেস্ক ক্যালেন্ডারের পাতা ওল্টাতে গিয়ে দেখল একটা পাতা নেই, ছয় দিন আগের তারিখের।
মুসা শুনে বলল, সেদিন শুক্রবার। জুন যে দিনের কথা মনে করতে পারছে, যে দিন অ্যাক্সিডেন্ট করেছে।
হ্যাঁ, মাথা ঝাকাল কিশোর। যোগাযোগ আছে কিনা বের করা দরকার, এই সময় পায়ের শব্দ শুনতে পেল। এগিয়ে আসছে।
ঠোঁটে আঙুল রেখে কিশোরকে চুপ করতে ইশারা করল মুসা।
একটু পরেই ঘরে ঢুকল ডন। প্রথমেই তাকাল ট্রের দিকে। শূন্য। বেশ বেশ, খেয়েছ তাহলে? কেমন লাগল আমাদের ড্রিপিং চিকেন?
ওই জিনিস জীবনে খাইনি, সত্যি কথাটাই বলল কিশোর।
আমাদের জেনারেল শুনে খুব খুশি হবেন, লারসেনের কথা বলল ডন। একটা জরুরী কাজে চলে গেছেন। তোমাদেরকে বলতে বলেছেন। ড্রিপিং চিকেন কার আবিষ্কার? আপনার?

না, মাথা নাড়ল ডন। ডেস্কের ওপাশে গিয়ে বসল। এই একটা আইটেমের জন্যে বাইরে গিয়েছিলেন জেনারেল। যেতে অনেক মানা করেছিলাম, শুনলেন না। বলেছি, চেষ্টা করলে এখানেই বানাতে পারব আমরা। সোজা আমাকে বলে দিলেন, তিনি বস, যা করার তিনিই করবেন। গেলেন ফেলিক্স আরোলার কাছে, মিরাকল টেস্টের মালিক। অথচ আমরা দুজনে, চিকেন কিং আর কেমিক্যাল কিং মিলেই বানিয়ে ফেলতে পারতাম।
তার মানে কি আছে এতে আপনি জানেন না? জিজ্ঞেস করল মুসা।
নিশ্চয় জানি। গবেষণা করাই তো আমার কাজ। পরীক্ষা করে বের করে ফেললাম কি কি মেশানো হয়েছে। সে কথা জানালাম জেনারেলকে। খুশি হয়ে আরেকটা মোরগ আমাকে পুরস্কার দিয়ে দিলেন জেনারেল, পকেটে ঝোলানো দশ নম্বর রুপার মুরগীটা দেখাল ডন। তবে স্বীকার করতেই হবে, যা আছে সব ক্লাসিক জিনিস। তোমাদেরকে অবশ্যই বলব না। বিজনেস সিক্রেট।।
আমরা শুনতে চাইও না, কিশোর বলল। যা দেখলাম তাতেই খুশি আমরা। চিকেন লারসেনের সঙ্গে পরিচয় হওয়াটাই তো একটা সৌভাগ্য। কি বলো, মুসা? আট দিন আগেও তো আমরা চিনতাম না, তাই না?
শূন্য দৃষ্টিতে কিশোরের দিকে তাকাল মুসা। দেখল, কিশোরের নজর ডেস্ক ক্যালেন্ডারের দিকে। ভুল করলে। আট নয়, ছয় দিন আগে, হাসল সহকারী গোয়েন্দা।
আট দিন, জোর দিয়ে বলল গোয়েন্দাপ্রধান।
ভুল, ডনের ডেস্কের সামনে গিয়ে দাঁড়াল মুসা। ক্যালেন্ডার উল্টে যে পাতাটা নেই সেখানটায় এসে থামল। ছয়দিন। গত শুক্রবার। আমি শিওর... আরে, পাতাটা কোথায়?
নেই, এমন ভঙ্গিতে বলল ডন, যেন জানাই আছে নেই যে। মুদী দোকান থেকে আনা জিনিসের লিস্ট লিখে রাখি ক্যালেন্ডারে। মাঝে মাঝে পাতা ছিড়ে সাথে করে নিয়ে যাই।
ঠিক আছে, যা দেখার দেখলাম, কিশোর বলল। চলি। বাড়ি গিয়ে কাপড় বদলানো দরকার।
হাসি চাপতে গিয়ে কেশে ফেলল মুসা। নিশ্চয় কিশোরের কাপড়ে ছড়িয়ে পড়েছে রস, আঠা লাগছে চামড়ায়, ভীষণ অস্বস্তিকর। রসের রঙ এখন বাইরে থেকে দেখা না গেলেই হয়। পকেটের উঁচু জায়গাটা চেপে ধরে রেখেছে কিশোর।
বেরিয়ে এল দুজনে। প্রথমেই ময়লা ফেলার যে ড্রামটা পেল তাতে ফেলে দিল ড্রিপিং চিকেন। তারপর বাড়ি রওনা হলো।

সেই বিকেলে ছয় বাক্স চীনা খাবার নিয়ে আসা হলো। চীনের দেয়ালের মতই যেন সাজিয়ে রাখা হলো কিশোরের ওয়ার্কশপে বাক্সগুলো। তিন গোয়েন্দাই হাজির। চিকেন লারসেনের অফিসে গিয়ে কি কি করে এসেছে রবিনকে বলছে মুসা, মাঝে মাঝে কথা জুগিয়ে দিচ্ছে কিশোর।
তারপর চলল খাবারে বিষ মেশানো নিয়ে আলোচনা।
ড্রিপিং চিকেনে বিষ মেশানোর উদ্দেশ্যটা মোটামুটি আঁচ করা যায়, রবিন বলল। তার পরেও চারটে প্রশ্ন থেকে যায়। কে মেশাল, কোথায় মেশাল, কখন মেশাল, কেন মেশাল? আরেকটা সম্ভাবনাও থেকেই যায়। হেনরি অগাসটাস এতে জড়িত এবং খারাপ কিছু করছে।
জুনের ব্রিফকেসটা পেলে হত, কিশোর বলল। কিছু না কিছু পাওয়া যেতই ওতে।
গত শুক্রবারে জুনকে কেউ দেখেছে বলেও বলল না, মুসা বলল। একজন বুড়ো লোক বাদে। তবে তার কথাও বিশ্বাস করা যায় না। কথাবার্তা কেমন অগোছাল। ভুল করে একদিনের কথা আরেকদিন বলে দিয়েছে কিনা তাই বা কে জানে।
এই খাবার এনেছ কেন? আচমকা প্রশ্ন করল রবিন। কেন, খেতে ইচ্ছে করে না বুঝি? প্রশ্নের জবাব প্রশ্ন দিয়েই সারল মুসা। কোন রেস্টুরেন্ট থেকে? যেটা থেকে সব সময় আনি। ডেই ডং। তাহলে আর বসে আছি কেন? খেয়ে ফেলি।
একটা বাক্স টেনে নিয়ে খুলল। খুলে একটা প্যাকেট হাতে নিয়েই স্থির হয়ে গেল।
কি ব্যাপার? কি হয়েছে? জানতে চাইল মুসা। ফরচুন কুকির বিজ্ঞাপন করেছে নাকি বড় বড় কথা বলে?
মোড়কের কাগজটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে রবিন। নীরবে বাড়িয়ে দিল মুসার দিকে। হাতে লেখা একটা নোট। দেখার জন্যে কিশোরও বুকে এল। লেখা রয়েছেঃ
এইমাত্র যে খাবার খেলে, তাতে বিষ মেশানো থাকতে পারত। এবার নেই। পরের বার থাকতেও পারে। কাজেই সাবধান! অন্তত চিকেন কিঙের খাবার থেকে দূরে থাকবে!
পড়ার পরেও অনেকক্ষণ কেউ কথা বলল না। তাকিয়েই রয়েছে কাগজটার দিকে। তারপর হঠাৎ নড়ে উঠল কিশোর। প্রায় খাবলা দিয়ে তুলে নিয়েছে বাক্সের বাকি দুটো ফরচুন কুকি। দুটোর মোড়কেই একই হুঁশিয়ারি লেখা রয়েছে।
চিংড়ি মেশানো ফ্রাইড রাইসের বাক্সটা টেনে নিয়েছিল রবিন, এই হুঁশিয়ারি পড়ার পর ঠেলে সরিয়ে দিল টেবিলের কোণে। খিদে গেছে! বিষ খেয়ে মরার চেয়ে না খেয়ে থাকা ভাল!
টেলিফোনের দিকে হাত বাড়াল মুসা।
কাকে করবে? জিজ্ঞেস করল কিশোর।

ডেই ডং রেস্টুরেন্ট। কার কাজ জানা দরকার।
করা উচিত, রবিন বলল।
না, নিষেধ করল কিশোর। দরকার নেই।
কেন? মুসার প্রশ্ন।
কারণ আমি জানি কি ঘটেছে।
কী?
চুপ করে আছ কেন? অধৈর্য ভঙ্গিতে হাত নাড়ল রবিন।
রেস্টুরেন্টের কোন একজন ওয়েইটার ওই কাগজ দিয়ে কুকি মুড়ে দিয়েছে। এবং সেটা করেছে, কেউ একজন এসে তাকে পাঁচটা ডলার হাতে গুঁজে দিয়ে করতে বলেছে বলে। ওয়েইটারকে বলেছে, এটা একটা রসিকতা। ওয়েইটারও কিছু বুঝতে পারেনি। করে দিয়েছে কাজটা।
তুমি কি করে জানলে? জিজ্ঞেস করল মুসা।
জানি, ব্যস। বিশ্বাস করতে পারো আমার কথা।
নিশ্চয় করি... রবিন শুরু করল।
মুসা শেষ করল, কারণ তোমার অনুমান সাধারণত ভুল হয় না। আরও একটা ব্যাপার জানি, কথা লুকাতে তুমি ওস্তাদ।
বেশ, দোষই যখন দিলে, বলেই ফেলি, কিশোর বলল। আমি জানলাম, অর্থাৎ বুঝতে পারলাম, তার কারণ এ রকম রসিকতা আমিও করেছি। ফরচুন কুকিতে।
কি লিখেছিলে? রবিন জিজ্ঞেস করল।
ভাল কথাই লিখেছিলাম। লোককে হাসানোর জন্যে। এটার মত হুশিয়ারি নয়। বিষ খাওয়ানোর ভয় দেখাইনি লোককে। একটা মুহূর্ত নীরব হয়ে রইল কিশোর। ভাবছি, এই নিয়ে দ্বিতীয়বার সাবধান করা হলো আমাদেরকে। প্রথমবার করল মুসার গাড়ির ব্রেক নষ্ট করে দিয়ে। আর এবার তো লিখেই হুমকি দিল। প্রথমে মনে করেছিলাম, ব্রেক নষ্ট করার ব্যাপারটার সঙ্গে খাবারে বিষ মেশানোর যোগাযোগ নেই। এখন মনে হচ্ছে, আছে। অদ্ভুত কিছু একটা ঘটছে, বিশ্বাস না করে আর পারা যাচ্ছে না। আরও সতর্ক থাকতে হবে। নজর রাখা হচ্ছে আমাদের ওপর।
যে-লোক এই কাজ করছে, মুসা অনুমান করল। সে আর্মি ক্যামমাফ্লেজ জ্যাকেট পরে, পোরশে কনভারটিবল গাড়ি চালায়। ঠিক?
হলে অবাক হব না। আমাদের ব্যাপারে খোঁজখবর রাখে সে।
কিশোরের কথা শেষ হতে না হতেই ফোন বেজে উঠল। চমকে দিল তিনজনকেই। রিসিভার তুলে নিল কিশোর। কানে ঠেকিয়ে বলল, তিন গোয়েন্দার কিশোর পাশা বলছি।

তোমাকেই খুঁজছি! অন্য প্রান্তে গমগম করে উঠল একটা কণ্ঠ। চিকেন হার্বার্ট লারসেনের সঙ্গে কথা বলছ তুমি, পুত্র।
রিসিভারের মাউথপিসে হাত চাপা দিয়ে দুই সহকারীকে ফিসফিস করে জানাল গোয়েন্দাপ্রধান, চিকেন!
কি জন্যে করেছে জিজ্ঞেস কর, মুসা বলল। কুকির মোড়কের লেখাটার কথাটা জানে কিনা তা-ও জিজ্ঞেস কর।
মাথা নেড়ে মুসাকে চুপ থাকতে বলল কিশোর।
শোননা, লারসেন বললেন। একটা সুখবর আছে তোমাদের জন্যে। কাল ড্রিপিং চিকেনের বিজ্ঞাপন তৈরি হবে। টিভিতে যাবে। চিকেন হিস্টরি নিয়ে আলোচনা হতে পারে। হলে তোমাকে ছাড়া পারব না।
নিজের সৌভাগ্যকে বিশ্বাস করতে পারছে না যেন কিশোর। ঠিক এ রকম সুযোগই চাইছিল সে। চিকেন লারসেনের কাছাকাছি থেকে তাঁর ওপর নজর রাখতে পারে এমন কিছু।
কখন? কোথায়? জিজ্ঞেস করল সে।
আল্টা ভিস্টা ড্রাইভের মালটিন মিক্স স্টুডিওতে। একটায়। সময়মত হাজির হয়ে যাবে আমার টিম।
কেটে দেয়া হলো লাইন।
সেদিন অনেক রাতে, মুসা আর রবিন চলে যাওয়ার পর চিকেন লারসেনের বিজ্ঞাপনগুলো রেকর্ড করে রাখা একটা ভিডিও ক্যাসেট চালিয়ে দেখতে বসল কিশোর। বড় একটা ডেস্কে বসেন তিনি। ওপরে জিনিসপত্র ছড়ানো ছিটানো, খুবই অগোছাল। যেন একাধারে ওটা একটা অফিস, লাইব্রেরি আর গেম রুমের মিশ্রণ। নানা ধরনের বেশ কিছু বিজ্ঞাপন আছে। কিশোরের পছন্দ হেট আ হ্যাঁমবারগার উইক নামের বিজ্ঞাপনটা, যেটাতে একটা গরুর মুখে গলিত মাখন ছিটিয়ে দেন লারসেন। আরেকটা ভাল বিজ্ঞাপন আছে। সেটাতে ক্যামেরার দিকে, সারাক্ষণ পিঠ দিয়ে থাকেন, কারণ তিনি বোঝাতে চান রেগে গেছেন, জন্মদিনের তারিখ ভুল করে ফেলেছেন বলে।
তবে তার সব চেয়ে পছন্দ, যেটাতে লারসেন দুটো নতুন ধরনের খাবার পরিবেশন করেন। একটার নাম ক্র্যাকলিন ক্রাঞ্চি, আরেকটা বার্নিং বারবে। লাস ভেগাস-এর এক মন্ত্রীর বিবাহবার্ষিকীতে ভোজ দেয়া হয়। তাতে আস্ত দুটো মুরগীকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় রান্না করে টেবিলে সাজিয়ে দেয়া হয়। একটাকে পরানো থাকে বরের পোশাক, আরেকটাকে কনের। কাপড় দিয়ে নয়। মাখন আর খাবার উপযোগী অন্যান্য মালমশলা দিয়ে। সেখানে উপস্থিত থাকেন চিকেন লারসেন। নানা রকম মজার মজার কথা বলেন।

টেপটা শেষ হয়ে গেলে ভিসিআর বন্ধ করে শুতে গেল কিশোর। কিন্তু অস্থির একটা রাত কাটাতে হলো। ভাবনার মধ্যে কেবলই ঘুরে ফিরে আসতে লাগল জুনের কথা। ঘোরের মাঝে কি বাবার কথাই বলেছিল সে? লারসেনই খাবারে বিষ মেশানোর পরিকল্পনা করেছেন? তিনিই যদি করে থাকেন, লক্ষ লক্ষ মানুষ মারার সিদ্ধান্ত তিনি কেন নিয়েছেন?
পরদিন কাঁটায় কাঁটায় একটায় বেভারলি হিলের কাছে মালটিন মিক্স স্টুডিওতে হাজির হলো রবিন আর কিশোর। দুই মিনিট পরে মায়ের গাড়িটাতে করে এল মুসা আর ফারিহা।
এই দেখ, কিশোরকে বলল রবিন। গাড়ি নেই দেখে তোমার কত অস্থিরতা। মুসারটা যে থেকেও নেই? খালি খালি তো গজগজ করো..
ও তো ওর মায়েরটা নিয়ে এসেছে।
তুমিও ইয়ার্ডেরটা নিয়ে আসতে পারো।
ওই ভাঙা পিকআপ কে চালাতে যায়, এক মুহূর্ত চুপ থাকল কিশোর। বেশ, মুসার গাড়িটা যতদিন ঠিক না হয়, চুপ থাকব। হলেই আবার শুরু করব।
তোমাকে কে কিনে নিতে মানা করেছে?
এই প্রশ্নটা করলেই চুপ হয়ে যায় কিশোর। কারণ সে যেভাবে যে জিনিস চায়, সেটা অল্প পয়সায় জোগাড় করা কঠিন। ও চায়, এমন একটা গাড়ি, যাতে অনেক ধরনের আধুনিক যন্ত্রপাতি সাজানো থাকবে। গোয়েন্দাগিরির অনেক সুবিধে হবে। অর্ডার দিয়ে বানাতে হবে সে সব। অত টাকাও নেই, আপাতত কিনতেও পারছে না। কিন্তু ক্ষোভটা ঠিকই প্রকাশ করতে থাকে। কিংবা হয়তো ক্ষোভের মাধ্যমেই অটো সাজেশন দেয় নিজেকে, আর কিছুদিন ধৈর্য ধর, কিনব, কিনব!
স্টুডিয়োয় ঢোকার মুখে দেখা হয়ে গেল জুনের সঙ্গে। মাথায় একটা রূপার মুকুট পরেছে। আর মুকুটের ওপর অবশ্যই বসে আছে একটা রূপার মুরগী।
এসেছ, কিশোরকে দেখে হেসে বলল জুন। বাবা তোমার কথা জিজ্ঞেস করছিল। নতুন কোন খবর আছে?
না। তবে কাল রাতে কিছু ফরচুন কুকি কিনে নিয়ে গিয়েছিলাম। তাতে বুঝেছি, ঠিক পথেই এগোচ্ছি আমরা।
গুড। আমার ব্রিফকেসটা যত তাড়াতাড়ি পারো বের করে দাও। ভেতরে কি ছিল এখনও মনে করতে পারছি না। তবে ওটা আমার চাই। মনে হচ্ছে ওটাতে জরুরী কিছু আছে।
তারপর তিন গোয়েন্দা আর ফারিহাকে নিয়ে চলল স্টুডিওর কাচে ঘেরা একটা অংশে, প্রোডাকশন বুদে। চিকেন লারসেনের অফিসের অনেকেই আছে ওখানে, ডন বারোজ সহ।

বিজ্ঞাপনের জন্যে সেট সাজানো হয়েছে। টেবিলে চিঠির স্তূপ, শূন্য কফির কাপ, রবারের মুরগী, রোস্ট করা মুরগীর ছবি–তৃতীয় শ্রেণীর আর্টিস্ট দিয়ে। আঁকানো হয়েছে ইচ্ছে করেই, আর হ্যালোউইন চিকেন কস্টিউম পোশাক পরা জুনের শিশুকালের একটা ছবি।

অবশেষে মাইক্রোফোনে পার্সোন্যাল অ্যাসিসটেন্টকে ডাকলেন পরিচালক, আমরা রেডি। চিকেন লারসেনকে ডেকে আনাও। দেখো, মেকআপ হয়েছে কিনা।

মিনিটখানেক পরে ঢুকলেন লারসেন। পরনে লাল জগিং স্যুট, সাদা এবং নীল স্ট্রাইপ দেয়া। ওপরের ঠোঁট আর নাক জুড়ে আটকানো রয়েছে রবারের তৈরি একটা মুরগীর ঠোঁট। হাতে রূপার তৈরি বড় একটা অ্যানটিকের ট্রে, রূপার ঢাকনা দেয়া। তীব্র আলোয় এসে সামান্য কুঁকড়ে গিয়ে বুদের ভেতরটা দেখার চেষ্টা করলেন।

আমার লোক আছে? ডেকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

আছে, মিস্টার লারসেন, পরিচালক বললেন। সুইভেল চেয়ারে বসেই ঘুরে তাকালেন কিশোরের দিকে। চিকেন লারসেনের অফিশিয়াল টেন ইয়ার অ্যানিভারসারি টি-শার্ট গায়ে দেয়ানো হয়েছে তাকে। শার্টে একটা মুরগীর ছবি আঁকা, মাথার জায়গায় মুরগীর মাথার পরিবর্তে আঁকা হয়েছে লারসেনের মুখ।

ডন বলেছে, কিশোরকে বললেন লারসেন। ড্রিপিং চিকেনের স্যাম্পল খেয়ে খুব খুশি হয়েছে। আজ সবার জন্যেই প্রচুর পরিমাণে নিয়ে আসা হয়েছে।

ফিসফিস করে মুসা বলল কিশোরের কানে, অত ভাল প্যান্টটা পরে আসা উচিত হয়নি আজ।

আরাম করে চেয়ারে বসে টেবিলের ওপর পা তুলে দিলেন লারসেন।

পরিচালক ঘোষণা করলেন, দয়া করে চুপ করুন সবাই। ড্রিপিং চিকেন। টেক ওয়ান!

ক্যামেরার চোখের দিকে তাকিয়ে যেন টিভি দর্শকদের সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করলেন লারসেন।

বন্ধুরা, বলছেন তিনি। আমি, আপনাদের প্রিয় চিকেন লারসেন বলছি। আপনারা জানেন, অহেতুক আপনাদের সামনে হাজির হই না আমি। হই তখনই, এখন আপনাদের পকেট খালি করে আমার পকেট ভরানোর কোন একটা উপায় বের করে ফেলি। বিশ্বাস করুন, এই বার আগের চেয়ে অনেক বেশি খসাব আমি, কিছুতেই ধরে রাখতে পারবেন না। চাকা আবিষ্কারের সময় আমি সেখানে হাজির ছিলাম না। পেনিসিলিন আবিষ্কারের সময় ছিলাম না। এমনকি পেপার ক্লিপ জাতীয় জিনিসগুলো যখন আবিষ্কার হয়, তখনও সেখানে হাজির ছিলাম না। ইতিহাসের অইসব বিস্ময়কর মুহূর্তগুলোতে আমার কোন প্রয়োজন পড়েনি

কিংবা হয়তো প্রয়োজন হয়েছিল, খবরও দেয়া হয়েছিল, কিন্তু সেই খবর আমাকে বলতে ভুলে গেছে আমার সেক্রেটারি। আর এই সন্দেহেই আমি তাকে চাকরি থেকে বিদেয় করে দিয়েছি। হাহ হাহ হা! তবে আজকে আমি আর শুধু ইতিহাস তৈরি করতেই যাচ্ছি না, ইতিহাসকে খেয়ে ফেলতে চলেছি।
রূপার ট্রের ওপর থেকে ঢাকনা সরালেন লারসেন। ধোঁয়া উঠতে লাগল স্তূপ করে রাখা ড্রিপিং চিকেন থেকে। খাবারের চেহারা দেখেই উহ আহ শুরু করে দিন প্রোডাকশন বুদের লোকেরা।
একটা স্যান্ডউইচ তুলে নিয়ে মুখের কাছে নিয়ে গেলেন লারসেন। এগিয়ে গেল ক্যামেরা, কাছে থেকে ছবি তোলার জন্যে। ঢোক গিলল তিন গোয়েন্দা সত্যিই কি তিনি খাবেন?
সেই সভ্যতার গোড়া থেকেই যে কাজ করার চেষ্টা করে এসেছে মানুষ পারেনি, সেটাই সফল করেছি আমি। সৃষ্টি করেছি ড্রিপিং চিকেন। প্রতি কামড় খাবার রসময় করে তুলবে রসনাকে। আরও ব্যাপার আছে। প্রতিটি স্যান্ডউইচে ভেতরে একটা বিশেষ জিনিস ভরে দিতে বলেছি আমার রাঁধুনিকে। এমন কিছু, যা লোকে কল্পনাই করতে পারবে না। দেয়া হয়েছে। আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না, দেখতে চাইছি, এখনই দোকানে ছুটছেন কেনার জন্যে। কিনে গপগপ করে গিলতে থাকুন। এই ভাবে...
বলেই হাঁ করে বিরাট এক কামড় বসালেন লারসেন। বড় একটুকরো স্যান্ডউইচ কেটে নিয়ে চিবাতে লাগলেন। রঙিন রস গড়াতে শুরু করল ঠোঁটের দু কোণ থেকে। ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে দরাজ হাসি হাসলেন।
কাট! চিৎকার করে আদেশ দিলেন পরিচালক। দারুণ হয়েছে!
কয়েকটা আলোর উজ্জ্বলতা কমিয়ে দেয়া হলো। উত্তেজনা কমে গেল বুদের লোকের। ফারিহা বলল গোয়েন্দাদেরকে, ঐতিহাসিক একটা লেকচার দিলে লারসেন!
কিন্তু ওর কথায় কান নেই তিন গোয়েন্দার। স্টুডিওর কাচের দেয়ালের ভেতর দিয়ে তাকিয়ে রয়েছে লারসেনের দিকে। চিবানো ড্রিপিং চিকেন গেলেননি তিনি মুখ থেকে বের করে ফেলে দিলেন ওয়েস্ট বাস্কেটে।
মনে হলো, যেন তিনি জানেন বিষ রয়েছে ওই খাবারে। মানুষের শরীরে জন্যে ক্ষতিকর, মারাত্মক বিষ।
টেলিভিশনের ব্যাপারে ভালই জ্ঞান আছে কিশোরের। বুঝতে পারছে, ডিপি চিকেনের শুটিং শেষ হয়নি। তাই বলে এটাও ভাবেনি, আরও পাঁচ ঘণ্টা ধরে চলবে। আরও বিশবার অভিনয় করলেন লারসেন। প্রতিবারেই বড় করে কামড়

বসালেন স্যান্ডউইচে, প্রতিবারেই পরিচালক কাট বলার পর মুখ থেকে বের করে ফেলে দিলেন।
সব শেষ হওয়ার পর লারসেন চিৎকার করে বললেন, এসো, এবার পার্টি হোক! উপস্থিত সবাইকে আমন্ত্রণ জানালেন ড্রিপিং চিকেন চেখে দেখার জন্যে। একপাশে একটা মাইক্রোওয়েভ রাখা আছে। খাবার গরম করে নেয়ার জন্যে। টেকনিশিয়ান থেকে শুরু করে বুদে যত ধরনের লোক আছে সবাই ছুটে এল ওই খাবার খাওয়ার জন্যে। তাকিয়ে রয়েছে কিশোর।
কেউ মারা গেল না। কারও পেট ব্যথা করল না, পেট চেপে ধরল না কেউ। বিষক্রিয়ার কোন লক্ষণই দেখল না। এক ধরনের গোঙানিই শোনা যাচ্ছে মাঝে মাঝে, আহ উহ করছে লোকে, সেটা খাবারের স্বাদের কারণে।
ধীরে ধীরে ডেস্কের দিকে এগিয়ে গেল কিশোর, যেখানে রূপার ট্রেতে রাখা আছে ড্রিপিং চিকেন। আর মাত্র দুটো স্যান্ডউইচ বাকি। একটা নেয়ার জন্যে সবে হাত বাড়িয়েছে, কাঁধের ওপর দিয়ে রবিন বলল ফিসফিসিয়ে, কে কে স্যান্ডউইচ নেয়নি, লক্ষ্য করেছ?
ঘুরে তাকাল কিশোর। ডন বারোজ আর চিকেন লারসেন, রবিন বলল। কেন খাচ্ছে না? দ্বিধা করতে গিয়েই সুযোগটা হারাল কিশোর। অল্প বয়েসী এক মহিলা এগিয়ে এসে এক্সকিউজ মী বলে সরিয়ে দিল তাকে প্রায় ছোঁ মেরে নিয়ে নিল প্লেটের অবশিষ্ট দুটো স্যান্ডউইচ। ভাবছিলাম, একটা নিয়ে যাব, আমার এক বন্ধুর জন্যে। কিন্তু এতই মজা, নিতে ইচ্ছে করছে না, বলে কিশোরের মুখের ওপরই কামড় বসাল একটাতে। আরেকটাও খাবে, বোঝা যাচ্ছে।
পরস্পরের দিকে তাকাল রবিন আর কিশোর। নিরাশার দৃষ্টিতে।
কোনমতে কণ্ঠস্বর শান্ত রেখে বলল, থাক, অত ভাবনা নেই। খেতে ইচ্ছে করলে যখন তখন গিয়ে লারসেনের রেস্টুরেন্ট থেকে খেয়ে আসতে পারব।
শেষ হয়ে আসছে পার্টি। বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা। বদ্ধ জায়গায় থেকে দম আটকে আসছিল, খোলা বাতাসে বেরিয়ে যেন বাঁচল। গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে অপেক্ষা করছে ফারিহা আর জুনের জন্যে।
বেরিয়ে এল দুজনে। কথা বলতে বলতে আসছে। কিশোরদের কাছে এসে ফারিহা তার চুলে হাত বোলাতে বোলাতে বলল, আমি জুনদের বাড়িতে যাচ্ছি। কাপড়গুলোর জন্যে।
এটা ভাল লাগল না কিশোরের। সে চায়, কোন একটা ছুতে রেখে দিক ফারিহা, যাতে দরকার পড়লেই জুনের ওখানে যেতে পারে। জুন আরেক দিকে ফিরতেই মাথা নেড়ে ফারিহাকে ইশারা করল সে। বুঝল মনে হলো ফারিহা। কারণ কিশোরের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাকাল। তারপর গিয়ে উঠল জুনের গাড়িতে।

গাড়ি বটে একখান, মুসা বলল। চিকেনমোবাইল নাম রেখে দেয়া যায়। অর্ডার দিয়ে তৈরি করা হয়েছে ক্যাডিলাক কনভারটিবলটা। হলুদ আর কমলা রঙের বডি। হুডের ওপর বড় করে আঁকা রয়েছে মুরগীর ছবি আর চিকেন লারসেন রেস্টুরেন্টের নাম। সামনের গাড়িকে সরার জন্যে হর্ন টিপলেন লারসেন। কুকুরুককুক করে মোরগের ডাক দিয়ে উঠল বাঁশিটা।
যাচ্ছেন কোথায়? কিশোরের প্রশ্ন।
হয়তো ডিনার খেতে, জবাব দিল মুসা।
মুসা, পিছু নেয়া দরকার, গাড়িটার দিকে তাকিয়েই রয়েছে কিশোর। তুমি যাও। আমি আর রবিন ডন বারোজের পিছু নেব। দেখি কে কোথায় যায়? মুসা রওনা হয়ে গেল। রবিনের ফোক্সওয়াগনে উঠল কিশোর। ডন গাড়ি নিয়ে রওনা হতেই তার পিছু নিল। ওর গাড়িটাও বিচিত্র। লম্বা শরীরের একটা লিঙ্কন টাউন কার। দুই পাশে আঁকা লারসেন রেস্টুরেন্টের মনোগ্রাম।
কয়েক ঘণ্টা ধরে তার পেছনে লেগেই রইল রবিন আর কিশোর। প্রথমে সাগরের ধারের একটা রেস্টুরেন্টে গিয়ে ডিনার খেলো ডন। একা। তারপর গেল শুগারলোফ ক্যানিয়নে পাহাড়ের কোলে তৈরি একটা ছোট বাড়িতে। অন্ধকার হয়ে গেছে তখন। আরও বাড়িঘর আছে ওখানে। কিন্তু এত দূরে দূরে, দেখে মনে হয় ওখানে যারা বাস করে তারা পড়শীদের এড়িয়ে চলে। কিংবা নিঃসঙ্গ থাকতে ভালবাসে। ডনের বাড়ির নিচে পাহাড়ের উপত্যকায় গাড়ি রাখল রবিন। দুজনেই ভাবছে, এরপর কি করবে?
ভেতরে তো ঢুকছে না, রবিন বলল। দুজনেই গাড়ি থেকে নেমে একটা ঘন ঝোপে ঢুকে নজর রাখছে। পেছনে চলে যাচ্ছে কেন?
চলো, দেখি, উঠে দাড়াল কিশোর।
আরেকটা মিনিট সময় দিল ওরা ডনকে। তারপর এগোল। লম্বা ড্রাইভওয়ে। পেরিয়ে বাড়ির পাশ ঘুরে সরু একটা পথ ধরে চলল ডন যেদিকে গেছে। বাড়ির ভেতর অন্ধকার। পেছন দিকে এসে দেখল, বাইরেটা আলোকিত করার ব্যবস্থা রয়েছে গাছের ডালে বাল্ব ঝুলিয়ে।
বেড়া, দেখতে দেখতে বলল কিশোর। আকার-আকৃতি দেখে মনে হচ্ছে। ওপাশে সুইমিং পুল আছে।
তার কথা শেষও হলো না, ঝপাং করে শব্দ হলো পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ার।
আয়, জলদি আয়, ডনের গলা শোনা গেল। ওরকম করছিস কেন?.. ওয়ান-টু-থ্রী..নাম!
আরেকবার ঝপাং শোনা গেল। ওর সঙ্গে কারা আছে? রবিনের প্রশ্ন। তাকাল কিশোরের দিকে। চলো, দেখি।

মাথা ঝাকিয়ে সায় জানাল রবিন। এগোল দুজনে। আস্তে করে গেট খুলে ঢুকে পড়ল ভেতরে। একটা আউটডোর শাওয়ার আর স্নানের উপযোগী ছোট্ট একটা ঘর আড়াল করে রেখেছে পুলের গভীরতম অংশটা। পা টিপে টিপে ঘরটা দিকে এগোল দুজনে। পাশ থেকে উঁকি দিয়ে দেখার ইচ্ছে।

হঠাৎ প্লাস্টিকের একটা হোস পাইপে পা বেধে গেল কিশোরের। হুমড়ি খেয়ে পড়ল। চোখের পলকে আবিষ্কার করে ফেলল দুই গোয়েন্দা, কাদেরকে গোসল করাচ্ছিল ডন। প্রচন্ড ঘেউ ঘেউ শোনা গেল। পানিতে দাপাদাপি করে দ্রুত সাঁতরে উঠে এল কুকুরদুটো। যা তা কুকুর নয়। ডোবারম্যান পিনশার!

ধর! ধর! চিৎকার করে আদেশ দিল ডন। নিশ্চয় চোর!

হাঁচড়েপাঁচড়ে উঠে গেটের দিকে ছুটল কিশোর। কনুই যে ছড়ে গেছে খেয়ালই করল না। ওর আগেই ছুটতে শুরু করেছে রবিন। ছুটছে আর চিৎকার করছে সাহায্যের জন্যে। কিন্তু কে শুনবে ওদের চিৎকার? সব চেয়ে কাছের পড়শী রয়েছে মাইলখানেক দূরে।

বাড়ছে কুকুরের ঘেউ ঘেউ। গেটটা কোথায়? সরিয়ে ফেলল নাকি কেউ? আসলে, এতই ভয় পেয়েছে ওরা, সামনে কয়েক ফুট দূরের গেটটাও যেন চোখে পড়ছে না। ওদের মনে হচ্ছে যুগ যুগ ধরে কেবল দৌড়েই চলেছে, পথের শেষ আর মিলছে না।

অবশেষে গেটের কাছে পৌঁছল রবিন। কিশোর বেরোতেই ধাক্কা দিয়ে লাগিয়ে দিল ওটা। ভেতরে আটকা পড়ল কুকুরগুলো। একটা মুহূর্ত নষ্ট করল না ওরা। গাড়ির দিকে ছুটল।

এবারও আগে পৌঁছল রবিন। ড্রাইভিং সীটে বসেই ঠেলে খুলে দিল প্যাসেঞ্জার সীটের দরজা। কিশোর উঠে দরজা লাগানোর আগেই ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে স্টিয়ারিং ঘোরাতে শুরু করে দিল।

চলতে শুরু করল গাড়ি। ওফ, বড় বাঁচা বাঁচলাম! এখনও হাঁপাচ্ছে রবিন।

কথা বলতে পারছে না কিশোর, এতই হাঁপাচ্ছে। মনে হচ্ছে বুকের খাঁচা ভেঙে বেরিয়ে পড়বে হৃৎপিন্ডটা।

পুরোপুরি শান্ত হতে হতে গাড়িটা সরে চলে এল কয়েক মাইল দূরে। বলল, লাভ হলো না। দেখতে পারলাম না কিছু। একটা কথাই জেনে এলাম, ডনের বাড়িতে সিকিউরিটি খুব কড়া। কেন? চলো, হেডকোয়ার্টারে। ওখানে বসেই আলোচনা করব।

অনেকক্ষণ পর ওয়ার্কশপে বসে ডনের বাড়িতে ঢোকার ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা মুসা এবং ফারিহাকে জানাল কিশোর আর রবিন।

এরপর মুসার রিপোর্ট করার পালা এল। সে বলল, চিকেন লারসেনকে অনুসরণ করে তো গেলাম। ভেগ আউট রেস্টুরেন্টটা চেনো তো? ওখানে ঢুকল। একটা শেফস সালাদ কিনে নিয়ে সোজা গেল ফেলিক্স আরোলার অফিসে।
মিরাকল টেস্টে? ভুরু কোঁচকাল কিশোর।
হ্যাঁ। আরোলার অফিসটা লং বীচে। ল্যাবরেটরি আছে, একটা গুদামঘর আছে।
নিরাপত্তার ব্যবস্থা কেমন?
দারোয়ানগুলোকে তো তেমন কড়া মনে হলো না। নিরীহ, গোবেচারা চেহারা। তবে ঢোকার মুখে সিকিউরিটি সিসটেম ভীষণ কড়া। অনেকগুলো অ্যালার্ম আর একটা কম্পিউটার কীপ্যাড পেরিয়ে যেতে হয়।
ফারিহার দিকে তাকাল কিশোর। কিছু জিজ্ঞেস করল না, তবে ভঙ্গিটা তোমার-কি-খবর?
ব্যবস্থা করে এসেছি, মাথা কাত করে হাসল ফারিহা। কাপড়গুলো আমাকে ফিরিয়ে দিল জুন। কি করি ভাবতে লাগলাম। শেষে কায়দা করে ওগুলোতে কফি ফেলে দিলাম। যেন হঠাৎ করে হাত ফসকে পড়ে গেছে এমন ভাব করলাম। ও কিছু বোঝেনি। আহা উহু করল খানিক। শেষে বলল, ধুয়ে দেবে। কিছুতেই আমাকে আনতে দিল না। কাল আবার যাব আনার জন্যে।
পরের দিন গেলেও পারো, কিশোর বলল। কিংবা তার পরের দিন। যাক, ভাল কাজই করে এসেছ, হঠাৎ ওয়ার্কশপের দরজার দিকে ঘুরে তাকাল সে। ঠোঁটে আঙুল রেখে চুপ থাকতে ইশারা করল মুসাকে। তার সঙ্গে যেতে বলল। দ্রুত এগিয়ে গেল দুজনে। দুপাশের দরজার কাছে পজিশন নিয়ে দাঁড়াল। তারপর হ্যাঁচকা টানে তার কাছের দরজাটা খুলে ফেলল কিশোর।
বাইরে অন্ধকার। কেউ নেই। জুতোর বাক্সের চেয়ে বড় একটা বাক্স পড়ে আছে। বাদামী কাগজে মোড়া। লাল সুতো দিয়ে বাঁধা। হাতে লেখা একটুকরো কাগজ লাগানো রয়েছে; কিশোর পাশার জন্যে।
পাশে এসে দাঁড়াল মুসা। জুতোর ডগা দিয়ে ছুঁয়ে দেখল। তারপর ঠেলে সরিয়ে দিল।
বেশ ভারি।
ঝুঁকে তুলে নিল বাক্সটা কিশোর। হ্যাঁ, ভারিই।
খুলবে নাকি? কিশোরকে ওটা বয়ে আনতে দেখে জিজ্ঞেস করল রবিন।
না, খুলো না! বাধা দিল ফারিহা। বোমাটোমা থাকতে পারে! একটা মিনিট চুপ করে রইল কিশোর। কান পেতে শুনছে বাইরে কোন শব্দ শোনা যায় কিনা। অনুমান করার চেষ্টা করছে বাক্সের ভেতর কি আছে। বাইরে কি কেউ অপেক্ষা

করছে এখনও? সতর্ক রয়েছে মুসা আর রবিন। টান টান হয়ে আছে স্নায়ু। বিপদ দেখলেই প্রতিরোধ করার জন্যে ঝাপিয়ে পড়তে প্রস্তুত।
অবশেষে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল কিশোর। সুতোটা খুলল। হাতের তালুতে রেখে আরেকবার আন্দাজ করার চেষ্টা করল। যা-ই আছে, বাক্সটা কাত করলেই নড়ছে ভেতরে। আস্তে আস্তে বাদামী কাগজের মোড়ক খুলল সে। বুঝতে পারেনি, মুখের দিকটা কাত করে রেখেছিল। টপ টপ করে কয়েক ফোঁটা তরল পদার্থ পড়ল পায়ের ওপর।
চিৎকার করে উঠল ফারিহা।
কিশোরের মুখ সাদা হয়ে গেল।
কিশোরের জুতোয় পড়েছে কালচে লাল রক্তের ফোটা। বাক্সের ভেতর থেকে বেরোল একটা মরা মুরগী, সদ্য গলা কেটে খুন করা হয়েছে। ভেতরে একটুকরো কাগজ পাওয়া গেল, রক্তের ছোপ লেগে আছে।
কাগজটার ভাঁজ খুলল কিশোর। লেখা রয়েছেঃ
কিশোর পাশা-
তোমার স্বাস্থ্য যথেষ্ট ভাল। বেশ মোটাতাজাও হয়েছ, জবাই করার উপযুক্ত। মুরগী মোটাতাজা হলেই তো জবাই করে লোকে।
খাঁচার বাইরে আছ, বাইরেই থাকো। ঢোকার চেষ্টা কোরো না।
অন্যের ব্যাপারে নাক গলিও না। শেষবারের মত সতর্ক করলাম!
থ্রপ! থ্রপ! থ্রপ! গ্যারেজের দরজায় বার বার বলটা ছুঁড়ে মারছে মুসা। সুন্দর সকাল। উজ্জ্বল রোদ। কয়েকবার ওরকম করে দৌড়ে গিয়ে লাফিয়ে উঠে জালের ভেতর দিয়ে বলটাকে গড়িয়ে দিল সে। ফিরে তাকাল কিশোরের দিকে। অ্যাই, কিশোর, কি ভাবছ? খেলবে?
আমি ভাবছি কাল রাতের কথা। গলাকাটা মুরগীর কথা।
জানি আমি। হপ্তাখানেক দুঃস্বপ্ন দেখার জন্যে যথেষ্ট। সে জন্যেই তো খানিকটা ব্যায়াম করছি। ব্যায়াম দুশ্চিন্তা দূর করে। তোমার জুতো থেকে রক্ত মুছেছ?
বীভৎস দৃশ্যটার কথা মনে পড়ল আবার কিশোরের। কাটা গলা থেকে টপ টপ ঝরছে রক্তের ফোটা। মানুষের গলা কাটলেও ওরকম করেই ঝরবে। যেমন ধরা যাক, তার...।
আরেকবার বলটা নিয়ে নেটের দিকে দৌড়ে গেল মুসা।
দুশ্চিন্তাটা আপাতত থাক না, কিশোর বলল। ব্যায়াম না হয় না-ই করলাম। ভাবছি, কে পাঠাল ওটা? চিকেন লারসেনের কাছ থেকে দূরে থাকতে কে বলছে আমাকে? লারসেন নিজে এই কাজ করেছে এটা বিশ্বাস করতে পারছি না। তিনি

বরং আমাদেরকে কাছে ঘেঁষতেই বলেন। আমাকে দিয়ে বিজ্ঞাপন করানোরও ইচ্ছে আছে।
কিশোর, জবাবগুলো কি আমার কাছে চাইছ? মাথা নাড়ল, আমাকে মাপ করে দাও। ওকাজগুলো তুমিই সার। ধাঁধা সমাধানের ব্যাপারে যে আমি কত বড় এক্সপার্ট, ভাল করেই তো জানো।
ওর দিকে তাকিয়ে হাসল কিশোর। হঠাৎ হাত বাড়িয়ে বলটা নিল মুসার হাত থেকে। তারপর ছুঁড়ে মারল জাল সই করে। নেটের ধারেকাছে গেল না বল।
হচ্ছে, ভরসা দিল মুসা। একটু প্র্যাকটিস করলেই পারবে...
এক মাইল দূর দিয়ে গেল, আর তুমি বলছ পারব...
ড্রাইভওয়েতে ঢুকল রবিনের ফোক্সওয়াগন। ভটভট ভটভট করছে ইঞ্জিন। হর্ন বাজাল একবার সে। তারপর ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল।
অ্যাই, কেমন আছ তোমরা? এগিয়ে এসে বলল সে। সকালের কাগজ দেখেছ? ভাঁজ করা একটা খবরের কাগজ কিশোরের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, পয়লা পাতার বিজনেস সেকশনটা দেখো।
বল নিয়ে ব্যস্ত হলো মুসা। বার বার জালের মধ্যে ছুঁড়ে দিতে লাগল।
কিশোর পড়তে লাগল লেখাটা।
চমৎকার, কয়েক মিনিট পর মুখ তুলে বলল সে। একেবারে সময়মত দিয়েছে। তাহলে এই ব্যাপার। লারসেনের রেস্টুরেন্ট কেনার জন্যে খেপেই গেছে মনে হচ্ছে হেনরি অগাসটাস। হমম...একটা ফোন করা দরকার।
পাঁচ মিনিট পর মুসাদের বসার ঘর থেকে বেরিয়ে এল কিশোর। মুখে বিচিত্র হাসি।
কাকে করেছিলে? জানতে চাইল মুসা।
হেনরি অগাসটাসকে। মনে হলো, ওর ব্যাপারে খোঁজখবর নেয়ার সময় হয়েছে। চিকেন লারসেনের রেস্টুরেন্ট কিনে নিতে না পারলে খাবারে বিষ মিশিয়ে সে তার ব্যবসা নষ্ট করার চেষ্টা করতেই পারে। এটা খুবই স্বাভাবিক।
সে কি বলল?
তার সঙ্গে কথা হয়নি। নেই অফিসে। সেক্রেটারি বলল, শহরের বাইরে গেছে।
কোথায়, জানো?
আমি জানব কি করে? আমি তো এখানে বল খেলছিলাম।
পিটালুমায়, ঘোষণা করল যেন কিশোর। স্যান ফ্রান্সিসকোর উত্তরে। ওখানেই চিকেন লারসেনের মুরগীর খামার।
ঘণ্টাখানেক পরেই স্যান ফ্রান্সিসকো যাওয়ার প্লেনে চাপল কিশোর আর মুসা। জুনকে ফোন করেছে রওনা হওয়ার আগে। তদন্ত করতে যা খরচ হবে, দিতে

রাজি হয়েছে জুন। ও কল্পনাও করতে পারেনি, ওর বাবার ব্যাপারেও খোঁজ নিচ্ছে তিন গোয়েন্দা।
রবিন সঙ্গে আসতে পারেনি। সেই একই কারণ। অফিসে কাজ বেশি, ঝামেলা। দুটো বিবাহ উৎসবে একই ব্যান্ডের বাজনা বাজানোর কথা একই দিনে, ব্যবস্থা করাটা বেশ কঠিন। সময়ের একটু হেরফের হলেই সব পন্ড হয়ে যাবে। আর ব্যর্থতার দোষটা তখন এসে পড়বে ওর ঘাড়ে। এসব চাপ যখন পড়ে, তখনই ভাবতে আরম্ভ করে সে, ট্যালেন্ট এজেন্সির চাকরিটা ছেড়েই দেবে।
স্যান ফ্রান্সিসকো ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে নেমে একটা ট্যাক্সি ভাড়া করল কিশোর। মুসাকে নিয়ে চেপে বসল। ওখান থেকে উত্তরে ঘণ্টাখানেকের পথ পিটালুমা। চিকেন লারসেনের খামার খুঁজে বের করতে বিন্দুমাত্র বেগ পেতে হলো। বিরাট এক র‍্যাঞ্চ ছিল একসময়ে ওটা। ওই এলাকার সবাই চেনে।
দেখতে মোটেও মুরগীর খামারের মত লাগল না। বরং মোটরগাড়ির কারখানা বললেই বেশি মানায়। বড় বড় দুটো বাড়ি আছে, দুটোই দোতলা, আর অনেক বড়। ঘিরে রেখেছে তারের বেড়া।
বেড়ার বাইরে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রয়েছে দুই গোয়েন্দা। শনিবার বলেই বোধহয় কাউকে দেখা গেল না। গেটে পাহারা নেই। নিজেরাই গেটের পাল্লা খুলে ভেতরে ঢুকল। প্রথম বাড়িটার দিকে এগোল পঞ্চাশ গজ মত। চট করে তাকিয়ে দেখে নিল এদিক ওদিক, কেউ দেখছে কিনা। তারপর ঢুকে পড়ল ভেতরে।
নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না ওরা। কিংবা বলা যায় নিজের কানকে। ভেতরে অনেক মুরগী থাকবে জানত। কিন্তু এত বেশি থাকবে, আর ওগুলোর মিলিত কক কক এত জোরাল হবে, কল্পনাই করতে পারেনি। কানে তালা লেগে যাবার জোগাড়। গ্রীন হাউসের মত কাচের ছাত দিয়ে আলো আসছে। পুরো এয়ারকন্ডিশন করা। ফলে তাপমাত্রার কোন হেরফের হচ্ছে না।
দরজার কাছে দেয়ালে অনেকগুলো হুক লাগানো। তাতে ঝুলছে লারসেন কোম্পানির পোশাক। যারা মুরগীর সেবা-যত্ন করে তাদের ইউনিফর্ম। দুটো নামিয়ে নিয়ে পরে ফেলল দুজনে। কোম্পানির কর্মচারীর ছদ্মবেশে শুরু হয়ে গেল খোঁজাখুঁজি।
প্রথমেই যেটা বুঝতে পারল, তা হলো, এই বিল্ডিঙে মানুষের চলাফেরার বড়ই অসুবিধে। মুরগীর পাল তো আছেই, তার চেয়ে বেশি অসুবিধে করছে মেঝেতে বসানো লাল প্লাস্টিকের পাইপ। কয়েক ইঞ্চি পর পরই। যেন লাল খুঁটির মত বেরিয়ে আছে, কিংবা গজিয়ে আছে। হাঁটার সময় ওগুলো ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে যেতে হয়। খাবার সরবরাহ করা হয় ওসব পাইপ দিয়ে। প্রতিটি পাইপের মুখের কাছে কায়দা করে লাগানো রয়েছে লাল প্লাস্টিকের পাত্র, আঠারো ইঞ্চি পর পর।

পানির ব্যবস্থাও করা হয়েছে পাইপের সাহায্যে। পানি খেতে অসুবিধে হয় না মুরগীগুলোর। পুরো ব্যবস্থাটাই এমন, খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারটা মুরগীগুলো নিজেই সারতে পারে, বাইরের কারও সাহায্য প্রয়োজন হয় না। সে জন্যেই কোন লোককে দেখা গেল না আশপাশে।
অনেকগুলো ভাগে ভাগ করা হয়েছে ঘরটাকে। একেক ভাগে রয়েছে একেক বয়েসের আর আকারের মুরগী। এক জাতের সঙ্গে আরেক জাত মিশতে পারছে না কোনমতেই। এক বিভাগ থেকে আরেক বিভাগে ঘুরে বেড়াতে লাগল দুজনে।
কিছু কিছু মুরগী খুব অদ্ভুত, তাই না? মুসা বলল। ওই যে ওটাকে দেখো। ডানা কি রকম ছোট। এত ছোট ডানার মুরগী আর দেখিনি।
একটা বিশেষ প্রক্রিয়ায় এটা করা হয়, কিশোর বলল। একে বলে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং। এক জাতের সঙ্গে আরেক জাতের প্রজনন ঘটিয়ে, খাবারের পরিবর্তন করে ওরকম করা হয়। এতে ডানা ছোট হয়ে যায়, বুকের মাংস যায় বেড়ে। অনেক বেশি মাংস পাওয়া যায় ওগুলো থেকে।
এমন ভারি করা করেছে, নড়তেই তো পারছে না…
এই সময় তিনজন লোক ঢুকল ঘরে। চার পাশে তাকাতে শুরু করল। খানিক আগে যে ছোট জাতের মুরগীগুলোর কাছে ছিল কিশোর আর মুসা, সেখানটায় এসে দাঁড়িয়েছে ওরা।
কুইক, কিশোর বলল। কাজ করার ভান কর!
কিছুই তো করার নেই। মেশিনেই করছে।
তাহলে লুকিয়ে পড়!।
বেড়া দিয়ে আলাদা করা এক বিভাগ থেকে আরেক বিভাগকে। একটা বেড়ার আড়ালে লুকিয়ে পড়ল দুজনে। বেড়াটা নিচু। ইচ্ছে করলে মাথা তুলে দেখতে পারে লোকগুলো কি করছে। বিরক্ত করতে লাগল মুরগীগুলো। কেবলই পায়ের ওপর এসে পড়ছে। অযথাই ঠোকর মারছে, খাবার আছে মনে করে।
বেরোতে হবে এখান থেকে, আচমকা বলে উঠল। যতবার সাদা মুরগীগুলো দেখছি, কাল রাতের ওটার কথা মনে হয়ে যাচ্ছে আমার।
এগিয়ে আসছে লোকগুলো। একজনের গায়ে লাল শার্ট, খাকি প্যান্ট। মাথায় সাদা ক্যাপ, তাতে লারসেন মনোগ্রাম আর সুতো দিয়ে তোলা লাল অক্ষরে নাম লেখা রয়েছে ডরি। অন্য দুজনকে এই পরিবেশে একেবারেই মানাচ্ছে না। গাঢ় নীল স্যুট পরনে, একজনের চোখে বৈমানিকের সানগ্লাস। এই লোকটার বয়েস কম। খাটো করে ছাঁটা কালো চুল। সানগ্লাসটা খুললে দেখা গেল নীল চোখ যেন জ্বলছে।
ডরি বলল, মিস্টার অগাসটাস, আর কিছু দেখার প্রয়োজন আছে আপনার?

হেনরি অগাসটাস? কান খাড়া করল কিশোর। একটা কথাও এড়াতে চায় না।
ডরির দিকে তাকাল হেনরি। তারপর অন্য লোকটার দিকে। না, অনেক দেখেছি, কণ্ঠস্বরেই বোঝা যায় সন্তুষ্ট হতে পারেনি। নোট লেখ। অনেক কিছু বদলাতে হবে এখানকার। দেখতেই পাচ্ছি।
লিখছি, বলে তাড়াহুড়ো করে পকেট থেকে নোটবুক আর কলম বের করল নীল স্যুট পরা অন্য লোকটা।
আবার সানগ্লাসটা নাকের ওপর বসাল হেনরি। ডরিকে জিজ্ঞেস করল, প্রোডাকশন কেমন তোমাদের?
হপ্তায় পঞ্চাশ হাজার করে জবাই করার উপযোগী পাওয়া যায়।
নাহ, যথেষ্ট নয়, হেনরি বলল। দ্বিগুণ করা দরকার।
কথাটা লিখে নিল তার সহকারী।
মিস্টার লারসেন বলেন ভিড় বাড়িয়ে ফেললে মুরগীর অসুবিধে হবে, ডরি বলল।
এটা মুরগীদের রেস্ট হাউস নয়, হাসল হেনরি। কুৎসিত লাগল হাসিটা। এটা কারখানা। যত বেশি প্রোডাকশন দেয়া যাবে, তত বেশি টাকা আসবে।
আরেকবার ঘরটায় চোখ বোলাল হেনরি। মাথা নাড়ল। তারপর নিচু হয়ে খাবারের পাত্র থেকে একমুঠো দানা তুলে নিয়ে দেখল। ডরির দিকে তাকাল আবার। খাবারও বদলাতে হবে। আমি নিজে দেখব সেদিকটা। কি দেব ভেবেই রেখেছি।
লেখা শেষ করে তাড়াতাড়ি দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল তার সহকারী। দরজা খুলে ধরল। লম্বা লম্বা পায়ে হেঁটে গিয়ে বাইরে দাঁড়ানো একটা মার্সিডিজ গাড়িতে উঠল হেনরি। গাড়িটা ঘুরে চলে যাওয়ার সময় ওটার লাইসেন্স প্লেটের দিকে তাকাল কিশোর।
লেখা রয়েছেঃ প্লাকার-১।
লোকটার মধ্যে মানবিকতার ছিটেফোঁটাও নেই, কিশোর বলল। দক্ষিণে স্যান কাউন্টারের ফ্র্যান্সিসকোর দিকে চলেছে ওরা। প্রচন্ড স্বার্থপর।
যা বলেছ। তবে সঙ্গে জানোয়ার শব্দটা যোগ করতে পারতে।
আর তেমন কোন কথা হলো না। নীরবে গাড়ি চালাল মুসা। সাতটা বাজে। শহর থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে রয়েছে। আচমকা চিৎকার করে উঠল কিশোর, রাখ! রাখ!
কি হয়েছে? পথের পাশে গাড়ি নামিয়ে এনে জিজ্ঞেস করল মুসা। তারপর চোখে পড়ল নির্দেশকটা। একটা বাড়ির লাল রঙ করা ছাতে বসানো একটা মুরগী। ভেতরে জ্বলছে নিয়ন আলো। চিকেন লারসেন রেস্টুরেন্টের চিহ্ন।

সেদিকে গাড়ি এগিয়ে নিয়ে গেল মুসা। সে পার্ক করে বেরোতে বেরোতে রওনা হয়ে গেছে কিশোর। একটা সেকেন্ড দেরি করেনি।
দরজায় দাঁড়িয়ে লম্বা দম নিল। খাবারের সুগন্ধে ভুরভুর করছে বাতাস।
আরে সর না, মুসা বলল। জায়গা দাও। লোকে ঢুকবে তো।
কাউন্টারের কাছে এগিয়ে গেল দুজনে। সতেরো-আঠারো বছরের একটা মেয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে হাসল। গায়ে লাল শার্ট। পরনে খাকি প্যান্ট। মাথায় সাদা ক্যাপ। সামনের দিকের বাড়তি অংশটা মুরগীর ঠোঁটের মত। ক্যাপে লাল সুতোয় তোলা লেখা পড়ে বোঝা গেল ওর নাম নেলি।
মোলায়েম ভদ্র গলায় ওদেরকে জিজ্ঞেস করল মেয়েটা, কি দেব?
বিষাক্ত খাবার, বিড়বিড় করল মুসা অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে।
কী?
আঁ! ও, মুরগী। আর কি। এখানে তো ওটাই স্পেশাল। কিশোরের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল মুসা, খাবে তো? তোমার পেট…
চুলোয় যাক পেট। অনেক সয়েছি। আর না। এত সুগন্ধ, না খেয়ে আর পারব না।
জানালার কাছে একটা টেবিল বেছে নিল দুজনে। খাবার এল। কিন্তু আসার সঙ্গে সঙ্গে যার ঝাপিয়ে পড়ার কথা সে-ই ছুঁল না। হাত গুটিয়ে বসে রইল মুসা।
কি ব্যাপার? ভুরু নাচাল কিশোর।
বলা যায় না। এখানকার খাবারেই হয়তো বিষ মিশিয়েছে। যদি থাকে?
তা থাকতেই পারে। তবে জীবনটাই ঝুঁকিপূর্ণ। রিস্ক তো নিতেই হবে, বলে আর কথা না বাড়িয়ে মুরগীর মাংসে কামড় বসাল কিশোর।
শ্রাগ করল মুসা। তারপর সে-ও আর দ্বিধা করল না।
এই কেসের সমস্ত রহস্যের সূত্র লুকানো রয়েছে জুনের ব্রিফকেসে, চিবাতে চিবাতে বলল কিশোর। আমার বিশ্বাস। কি ছিল জানতে পারছি না। ওর অ্যামনেশিয়া না কাটলে বলতে পারবে না। যে লোকটা বিষ মেলাতে চায় সে জানে আমরা এ কেসের তদন্ত করছি। আমাদেরকে ভয় দেখিয়ে সরাতে না পারলে তার পরিকল্পনা বদল করবে। সময়টা এগিয়ে নিয়ে আসবে।
তো?
তো, আমাদেরকেও তাড়াতাড়ি রহস্যটা ভেদ করতে হবে। তিনজনকে সন্দেহ করি আমরা আপাতত। ওদের নিয়েই আলোচনা করা যাক।
করো। মুসা জানে, আলোচনা এবং বিশ্লেষণ দুটোই কিশোর করবে, সে শ্রোতা মাত্র।
প্রথমেই ধরা যাক, কেন অপরাধ করে লোকে। কোন একটা বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে। ধরলাম, এ ক্ষেত্রে চিকেন লারসেন কাজটা করতে চাইছেন। তার পক্ষে

বিষ মেশানো খুব সহজ। মুরগীর খাবারে কিছু মিশিয়ে দিতে পারেন। কিংবা মুরগী দিয়ে খাবার তৈরি করার সময় মাংসে মেশাতে পারেন।
মাংস মুখে পুরতে গিয়ে মাঝপথে থেমে গেল মুসা। তাকিয়ে রইল সেটার দিকে। তারপর রেখে দিল প্লেটে।
কিন্তু চিকেন লারসেনের উদ্দেশ্য কি? নিজেকেই যেন প্রশ্ন করল কিশোর। মোটিভ?
কি আর? পাগল!
এতটাই পাগল, যে লাখ লাখ মানুষকে মারবেন? নিজের মেয়েকে অ্যাক্সিডেন্ট করিয়ে মেরে ফেলতে চাইবেন?
আমি কি করে জানব? কিন্তু গলা কেটে আর কে মুরগী পাঠাতে যাবে আমাদের কাছে?
যে কেউ পারে। বাজার থেকে কিনে নিলেই হলো। হেনরি অগাসটাসের কথা ধরতে পারি আমরা। তার মোটিভ খুব জোরাল। লারসেনের বদনাম করে দিয়ে তাকে ধ্বংস করে দিতে চায়। নিজের ব্যবসা বাড়ানোর জন্যে। পিটালুমায় মুরগীর ঘরে ঢুকে আজ একটা কথা বলেছিল, খেয়াল করেছ? মুরগীর খাবারের ব্যাপারটা সে নিজে দেখবে। হতে পারে, খাবারে বিষ মেশানোর কথাই বলেছে। এমন কিছু, যেটা মুরগীর তেমন ক্ষতি না করলেও মানুষের করবে। খামারটা না কিনেও যে কেউ করতে পারে কাজটা। যে কেউ ঢুকতে পারে। ইচ্ছে করলে আমরাও মিশিয়ে দিতে পারতাম। কেউ বাধা দেয়ার ছিল না।
বেশ, দুজন গেল। আরেকজন কে?
মিস্টর এক্স। যাকে আমরা চিনিই না এখনও।
সন্দেহভাজনদের নিয়ে আরও কিছুক্ষণ আলোচনা করল ওরা। খাওয়া শেষ করে বেরিয়ে এল। গাড়ির দিকে এগোল।
স্যান ফ্রান্সিসকোতে পৌঁছতে পৌঁছতে অন্ধকার হয়ে গেল। জায়গাটা কুয়াশার জন্যে বিখ্যাত। ইতিমধ্যেই নামতে আরম্ভ করেছে। ঘিরে ফেলেছে গোল্ডেন গেট ব্রিজকে। চোখে পড়ছে কেবল ব্রিজের দুটো টাওয়ারের ওপরের অংশ আর একেবারে নিচে চলমান যানবাহন। মাঝখানটা ফাঁকা, কুয়াশার জন্যে চোখে পড়ে না, যেন কিছুই নেই ওখানটায়।
স্যান ফ্রান্সিসকোর সাতটা পাহাড়েরও একই অবস্থা। চূড়া আর গোড়ার উপত্যকা চোখে পড়ে, মাঝখানটা অদৃশ্য। আরও অনেকবার দেখেছে মুসা। তার কাছে ব্যাপারটা একটা বিরাট রহস্য। এরকম কেন হয়? মধ্যগ্রীষ্মের প্রতি রাতেই ঘটে এই একই কান্ড।
রেডিও অন করে দিল সে। রক মিউজিক বাজছে একটা স্টেশনে।

বিমান বন্দর থেকে মাইল পনেরো দূরে থাকতে অস্বস্তিতে পড়ল। বার বার রিয়ারভিউ মিররের দিকে তাকাচ্ছে। বলল, পেছনে দেখো। একটা লাল রঙের ক্যাভেলিয়ার।
তাতে কি? কিশোরের প্রশ্ন।
মনে হয় আমাদের অনুসরণ করছে।
কে করবে? ভাবতে লাগল কিশোর। ওরা যে স্যান ফ্রান্সিসকোয় এসেছে একথা কেউ জানে না। কিন্তু মুসার সন্দেহ গেল না কিছুতেই। অবশেষে কিশোর বলল, রাখ তো। দেখি।
গতি কমাল মুসা। দ্রুত এগিয়ে এল লাল গাড়িটা। আরেকটু হলেই বাম্পারে বাম্পারে লেগে যাবে। ভেতরে কে আছে দেখার চেষ্টা করল কিশোর। পারল না। হেডলাইটের আলো এসে পড়ে চোখে। ডানে কাটছে গাড়িটা। পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল। জানালা নামিয়ে দিল কিশোর। ওর দিকেই তাকিয়ে রয়েছে। লোকটা। একেবারে মুখোমুখি।
অস্ফুট একটা শব্দ করে প্রায় ছিটকে জানালার কাছ থেকে সরে এল কিশোর। মিস্টার এক্স! সেই আর্মি ক্যামোফ্লেজ জ্যাকেট। মুখে গর্ত গর্ত দাগ। গুটি বসন্ত হলে কিংবা ব্রণের ক্ষত হলে যেমন হয় অনেকটা সে রকম। শীতল একটা হাসি যেন জমাট বেঁধে রয়েছে ঠোঁটে। সাপের চোখের মত ঠান্ডা চোখ জোড়ার দিকে তাকিয়ে মনে হলো, খুনীর চোখের দিকে চেয়ে আছে।
চলো! পালাও! চিৎকার করে মুসাকে বলল কিশোর।
কেন চিৎকার করল কিশোর, দেখার জন্যে রাস্তা থেকে চোখ সরিয়ে দেখতে চাইল মুসা। হেসে উঠল মিস্টার এক্স। স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে গুঁতো মারতে এল ওদের গাড়িকে।
কিন্তু ততক্ষণে গ্যাস প্যাডালে চাপ বাড়িয়ে দিয়েছে মুসা। খেপা ঘোড়ার মত, লাফিয়ে আগে বাড়ল ওদের গাড়ি।
অনুসরণ নয়, রিয়ারভিউ মিররে চট করে একবার দেখে নিয়ে বলল সে, আমাদেরকে রাস্তার সঙ্গে মিশিয়ে দিতে এসেছে ব্যাটা!
ঠিক পেছনে লেগে রইল মিস্টার এক্স। সামনে গাড়িটাড়ি কিছু পড়লে, কিংবা অন্য কোন কারণে মুসা গতি কমাতে বাধ্য হলে শাঁ করে পাশের লেনে সরে যায় লাল গাড়িটা, ধেয়ে এসে ভ্রাম করে বাড়ি লাগিয়ে দেয়। তবে এখনও বডিতে লাগাতে পারেনি, কেবল বাম্পারে লাগিয়েছে।
বেরোও, কিশোর বলল। ওকে আটকে রেখে বেরিয়ে যাও কোনখান দিয়ে। খসাতেই হবে!

দ্রুত মহাসড়ক থেকে নেমে পড়ল মুসা। লাল গাড়িটাও নামল। মুসা যত জোরেই চালাক না কেন, ঠিক পেছনে লেগে থাকে। আর সুযোগ পেলেই এসে গুতো মারে। কিছুই করার নেই আর, চালানো ছাড়া। কিন্তু এভাবে কতক্ষণ?
এই অন্ধকারে কি করবে?
মুসার একবার মনে হলো, রুখে দাঁড়ায়। সে-ও ধাক্কা মারে। কিন্তু ওই গাড়িটা অনেক বেশি শক্ত, ওটার সঙ্গে পারবে না। পালিয়ে বাঁচা ছাড়া আর কোন পথ নেই।
পাহাড়ের কোলে একটা আবাসিক এলাকায় চলে এল ওরা। নামেই আবাসিক, বাড়িঘরগুলো এত দূরে দূরে, জনবসতিশূন্যই মনে হয়। হঠাৎ তীক্ষ্ণ মোড় নিয়ে পাহাড়ের ওপর দিকে উঠতে শুরু করল মুসা। ভ্রাম করে গুঁতো লাগল পেছনে। একটা নির্দেশকে দেখা গেল স্যান ফ্রান্সিসকোর বিখ্যাত ট্যুরিস্ট স্পট টুইন পিকসের দিকে চলেছে ওরা। পর্বতের চূড়াদুটোর ওপরে দাঁড়িয়ে নিচের চমৎকার দৃশ্য চোখে পড়ে। সুন্দর উপত্যকা, জলরাশি, শহরের আলো, সব দেখা যায়।
মোড় নিয়ে উঠে গেছে পথটা। আরেকটু উঠতেই খেয়াল হলো মুসার, সামনের কুয়াশার ভেতরে ঢুকতে হবে। ভ্রাম করে বাড়ি লাগল আবার।
বাপরে বাপ, এমন কুয়াশা জিন্দেগিতে দেখিনি, গাড়ির গতি কমিয়ে ফেলল সে। দিশেহারা হয়ে পড়েছে। কি করবে বুঝতে পারছে না। এতই ঘন কুয়াশা হেডলাইটের তীব্র আলোও সামনে ফুটখানেকের বেশি ভেদ করতে পারে না। একবার ভাবল, গাড়ি ঘুরিয়ে ফিরে যায় আবার যে পথে এসেছে। কিন্তু ঘোরানোর জায়গা নেই। আর মিস্টার এক্সও ওদেরকে সে সুযোগ দেবে না।
ধ্রাম!
পেছনে তাকাল কিশোর। কুয়াশার জন্যে দেখাই যাচ্ছে না ক্যাভেলিয়ারটাকে। এমনকি হেডলাইটও দেখতে পাচ্ছে না। গুতো মারছে বলেই বুঝতে পারছে, ওদের পেছনে রয়েছে মিস্টার এক্স।
তারপর একসময় থেমে গেল গুতো মারা। কয়েক মিনিট পেরিয়ে গেল, একটিবারও আর তো লাগল না।
কি ব্যাপার? ফিসফিস করে বলল মুসা।
বুঝতে পারছি না। কিছুই দেখতে পাচ্ছি না পেছনে। চালাতে থাকো।
আরও শক্ত করে স্টিয়ারিং চেপে ধরল মুসা। একটা মোড় এগিয়ে আসছে। বুঝতে পারছে না সে। কিছুই দেখার জো নেই। পথের কিনারে হঠাৎ করে কোনখান থেকে খাড়া নেমে গেছে ঢাল, তা-ও জানে না।
মোড়ের কাছাকাছি চলে এসেছে সে...মোড় পেরোচ্ছে... এই সময় কুয়াশার ভেতর থেকে উদয় হলো আবার লাল কনভারটিবলটা, বাঁ দিক থেকে ঠেলে

ফেলে দেয়ার চেষ্টা করল ওদের গাড়িটাকে।
চিৎকার করে উঠল কিশোর।
বাঁয়ে কাটল মুসা। টায়ারের কর্কশ আর্তনাদ তুলে সরে এল গাড়ি। মোড়টা পেরিয়ে এসেছে। এমনিতেও মরবে ওমনিতেও, কাজেই ঝুঁকিটা নিতে আর বাধল না ওর। তীব্র গতিতে কুয়াশার ভেতরে অন্ধের মত চালিয়ে দিল গাড়ি।
পাহাড়ের ওপরে উঠতেই নেমে গেল কুয়াশা। আসলে বেরিয়ে এসেছে কুয়াশার ভেতর থেকে।
ধড়াস ধড়াস করছে বুক। সামনে একটা পার্কিং লট। ওখানে গাড়ি রেখে নিচের দৃশ্য দেখে দর্শকরা। সোজা সেখানে গাড়ি ঢুকিয়ে দিল সে। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে ঘাম মুছল কপালের।
এইবার আসুক দেখি ব্যাটা! সমস্ত ক্ষোভ ঝরে পড়ল কণ্ঠ থেকে। বাপের নাম ভুলিয়ে ছেড়ে দেব!
হ্যাঁ, কিশোরের কণ্ঠও কাঁপছে, যদি পিস্তল না থাকে!
চুপ করে বসে আছে দুই গোয়েন্দা। গাড়ির ইঞ্জিন চলছে। বেশ কিছু দর্শক রয়েছে। ওখানে। কিছু করার সাহস পাবে না মিস্টার এক্স। ভয় চলে যেতেই রাগে ফুটতে আরম্ভ করেছে মুসা।
সাহস আছে হারামজাদার, দাঁতে দাঁত চাপল সে। কুয়াশার মধ্যে ঠিকই গুতোগুতি করল। গাড়ি নিয়ে শয়তানী করেছে বলে পার পেয়ে গেছে। এখন আসুক…আসে না কেন? এত দেরি? করছেটা কি?
জানি না, চিন্তিত ভঙ্গিতে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। অনেক কারণ থাকতে পারে…
আধ ঘণ্টা পেরিয়ে গেল। ক্যাভেলিয়ারের দেখা নেই।
হঠাৎ ড্যাশবোর্ডে চাপড় মারল কিশোর। এখুনি এয়ারপোর্টে যেতে হবে আমাদের, প্লেন ধরতে হলে!
কিন্তু মিস্টার এক্স?
ও আসবে না। বুঝতে পেরেছে, এখানে আমাদের কিছু করতে পারবে না। কাজেই ফিরে চলে গেছে।
হতাশ হলো মুসা। সমস্ত রাগ যেন গিয়ে পড়ল স্টিয়ারিঙের ওপর। ওটাকেই কিল মারল। তারপর গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে বের করে আনল পার্কিং লট থেকে।
সাবধানে থাকবে, কিশোর বলল। বলা যায় না, ঘাপটি মেরে থাকতে পারে। কোথাও। মহা পাজি লোক।
তবে পথে আর বিপদ হলো না। নিরাপদেই বিমান বন্দরে পৌঁছল ওরা। যেখান থেকে গাড়িটা ভাড়া করেছে সেখানে ফিরিয়ে দিতে গেল। গাড়িতেই চাবি রেখে

অফিসের দিকে পা বাড়াল দুজনে। ভাড়া মিটিয়ে দেবে। কিন্তু ঢোকার আগেও মুহূর্তে কিশোরের হাত ধরে টান মেরে ঘুরিয়ে ফেলল মুসা। ওই যে! লাল ক্যাভেলিয়ার!
কিশোরও দেখল। কিন্তু ওটাই কি আমাদের পিছে লেগেছিল? চলো, দেখি।
গাড়িটার কাছে এল ওরা। শূন্য। ভেতরে কেউ নেই। চারপাশে ঘুরে দেখল। লাইসেন্স প্লেট দেখে কিশোর বলল, এটাই! জলদি অফিসে যাও! এখনও থাকতে পারে ব্যাটা! না পেলে ক্লার্ককে জিজ্ঞেস করবে, লাল কনভারটিবলটা যে ভাড়া করেছিল তার নাম কি। যাও, আমি আসছি।
চলে গেল মুসা। লাল গাড়িটার দরজা খুলে ভেতরে উঁকি দিল কিশোর। ভেতরে এমন কিছু কি আছে যেটা সূত্র হতে পারে? খুঁজতে লাগল সে। কার্পেটের পেছনে দেখল, উল্টে নিচে দেখল, সামনের সীটের নিচে ওপরে সবখানে দেখল। অ্যাশট্রে, গ্লাভ কম্পার্টমেন্ট কিছু বাদ দিল না। এমনকি আঙুল আর হাত ঢোকে ওরকম কোন ফাঁকফোকরই বাদ রাখল না।
তবে কষ্ট বিফলে গেল না। মিস্টার এক্স কে, তা জানা যাচ্ছে না, তবে কোথায় পাওয়া যাবে একথা জানা গেল। অফিসের দিকে দৌড় দিল কিশোর। বেরিয়ে আসছে তখন মুসা।
ক্লার্ক কি বলল? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
হ্যাভ আ নাইস ডে, জবাব দিল মুসা। বাংলা করে বলল-ভাল বাংলা বলতে পারে আজকাল, দিনটা ভাল কাটুক।
লাল গাড়িটার কথা কি বলল? অধৈর্য ভঙ্গিতে হাত নাড়ল কিশোর।
হ্যাভ আ নাইস ডে। মানুষ নয়। একটা কম্পিউটার।
দেখো, আমি কি পেয়েছি। এক টুকরো দোমড়ানো কাগজ বের করে দেখাল কিশোর। একপাশ চকচকে প্লাস্টিকের মত, আরেক পাশ সাদা, সাধারণ কাগজ।
ক্যানডির মোড়ক। হাতে ডলে কাগজটা সমান করল মুসা। লেখাগুলো যাতে পড়া যায়। রূপালি রঙে লেখা রয়েছে, পড়ল, মিরাকল টেস্ট! আরে ওই রকম ক্যানডির মোড়ক, চিকেন লারসেনের পার্টিতে যে জিনিস বিতরণ করেছিল। ফেলিক্স আরোলা!
ঠিক। ফ্রী স্যাম্পল। মার্কেটে ছাড়েনি এখনও। দুটো সম্ভাবনা ধরা যায়। এক, পার্টিতে উপস্থিত ছিল মিস্টার এক্স, আমাদের মতই ফ্রী স্যাম্পল পেয়েছিল। নয় তো, একসঙ্গে কাজ করছে আরোলা আর মিস্টার এক্স।
করুকগে, মুসা বলল। সেটা পরেও আলোচনা করা যাবে। প্লেন ধরতে হবে আমাদের, বাড়ি যেতে হবে, ভুলে গেছ?

জাংক ইয়ার্ডে ফিরতে ফিরতে মধ্যরাত হয়ে গেল। বাইরে গিয়ে তদন্ত করার সময় নেই আর তখন। মুসা চলে গেল ওদের বাড়িতে। এত তাড়াতাড়ি ঘুম আসবে না কিশোরের। তাই লক কমবিনেশন ডিকোডার নিয়ে কাজে বসল সে। অনেকক্ষণ পর, ক্লান্ত হয়ে উঠে বাতি নিভিয়ে ওঅর্কশপ বন্ধ করতে যাবে, এই সময় বাজল টেলিফোন।
অন্ধকারেই রিসিভার তুলে নিয়ে কানে ঠেকাল সে, হ্যালো?
কিশোর, মুসার কণ্ঠ। ফারিহা কথা বলতে চায়।
আবার আলো জ্বালল কিশোর।
হাই, কিশোর, এত রাতেও ফারিহার গলার জোর শুনে অবাক হলো কিশোর, বিন্দুমাত্র ক্লান্তির ছাপ নেই। শোননা, কি হয়েছে। জুন লারসেন আজ লাঞ্চ খাওয়াতে নিয়ে গিয়েছিল আমাকে…
কল্পনায় পরিষ্কার দেখতে পেল কিশোর, ফারিহা এখন কি করছে। লম্বা চুলের একটা গোছা আঙুলে পেঁচাচ্ছে আর কথা বলছে। বকবক করে যাবে, করেই যাবে এক গল্প শেষ করতেই রাত কাবার। কম কথায় আর শেষ করতে পারে না। অতক্ষণ কানে রিসিভার ঠেকিয়ে রাখার ধৈর্য নেই কিশোরের। তাই স্পীকারের লাইন অন করে দিয়ে রিসিভার নামিয়ে রাখল সে। যাতে প্রয়োজনে শুনতে শুনতে পায়চারিও করতে পারে।
… অনেক কথাই বলেছে, জুন বলে যাচ্ছে। তবে এখনও মনে করতে পারছে না অ্যাক্সিডেন্টের দিন কোথায় গিয়েছিল আর ব্রিফকেসটা কোথায় রেখেছিল। একটা কথা অবশ্য আবছাভাবে মনে করতে পারছে, সেদিন একটা গাড়ি পিছু নিয়েছিল ওর।… যাই হোক, লাঞ্চের পর আমাকে গাড়িতে করে বাড়ি পৌছে দিয়েছে সে। দারুণ একটা গাড়ি। নতুন একটা মাসট্যাং কনভারটিবল কিনে দিয়েছেন তাকে চিকেন লারসেন।
আর জানো কি ইঞ্জিন? পেছন থেকে বলে উঠল মুসা, ফাইভ-লিটার ভি এইট ইঞ্জিন…
মুসা, প্লীজ, ওকে থামতে অনুরোধ করল ফারিহা। কিশোর আমার গল্পটা শুনতে চাইছে। এক কথার মাঝে আরেক কথা ঢুকিয়ে দিও না। হ্যাঁ, কিশোর, কি যেন বলছিলাম? ও, মনে পড়েছে। গাড়িতে ওঠার আগে ট্রাঙ্ক খুলে পার্সটা ভেতরে ছুঁড়ে দিল সে। অদ্ভুতই লাগল আমার কাছে। জিজ্ঞেস করলাম, ওরকম করল কেন? লোকে পার্স রাখে হাতে। গাড়ি চালানোর সময় পাশের সীটে রাখে, কিংবা কোলের ওপর রাখে। জবাব দিল ওটা ওর স্বভাব। ভাবলাম, এখন যদি ওর গাড়িটাকে পাহাড় থেকে উল্টে ফেলে দেয় কেউ, তাহলে সহজেই ট্রাঙ্ক থেকে পার্সটা বের করে নিতে পারে। নেয়ার ইচ্ছে থাকলে। কি বললাম, বুঝতে পেরেছ?

উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে কিশোরের চোখ। ট্রাঙ্ক! ব্রিফকেসটা ট্রাঙ্কে থাকতে পারে!
হ্যাঁ, বুঝেছি, জবাব দিল সে। বুদ্ধি আছে তোমার। শিখতে আরম্ভ করেছ।
হেসে উঠল ফারিহা।
দেখি, লাইনটা মুসাকে দাও। মুসা ধরলে কিশোর বলল, শোননা, কাল সকালে উঠেই চলে আসবে। অটো স্যালভিজ ইয়ার্ডে যাব। জুনের গাড়ির ট্রাঙ্কটা দেখার জন্যে।
জানতাম, একথাই বলবে। ঠিক আছে, আসব।
পরদিন সকাল নটায় রবিনের ফোক্সওয়াগনে করে হাজির হলো রবিন আর মুসা। কিন্তু কিশোর তখনও তৈরি হতে পারেনি। রিসিভার তুলে ডায়াল করল থানায়। চীফ ইয়ান ফ্লেচারকে চাইল। তিনি ধরলে জানাল, জুনের ব্রিফকেস খুঁজতে যাচ্ছে।
ব্রিফকেসের কথা তো নতুন শুনলাম, চীফ বললেন।
হ্যাঁ। অ্যাক্সিডেন্টের জায়গায় নিশ্চয় পাননি। খোজাখুঁজি তো করেছেন। গাড়ির ভেতর থেকে কিছু পড়ে গেল কিনা দেখেছেন।
নিশ্চয়, অসহিষ্ণু হয়ে উঠছেন চীফ।
গাড়ির ভেতরে খুঁজেছেন?
কিশোর, আমার পুলিশে চাকরির বয়েসই তোমার বয়েসের চেয়ে বেশি। আমি আমার কাজ জানি। যাদেরকে পাঠিয়েছিলাম তারাও জানে। রিপোর্ট করেছে, গাড়ির ভেতরটা খালি ছিল।
আসলে শিওর হতে চাইছি আমি, কোথাও কিছু বাদ পড়ে গেল কিনা।
বাদ পড়েনি। এই একটা কেসে তুমি সুবিধে করতে পারবে না, হাসলেন চীফ।
না পারলে, রহস্যময় কণ্ঠে কিশোর জবাব দিল, কোন দিন আর চিকেন লারসেনের মুরগী আপনি খেতে চাইবেন না। পরে সব বলব, লাইন কেটে দিল সে।
গাড়িতে এসে উঠল কিশোর। দুই সহকারীর সঙ্গে রওনা হলো মিলার অটো রেকেজ ইয়ার্ডে।
বিশাল এলাকা নিয়ে ইয়ার্ড। কাঠের বেড়া দিয়ে ঘেরা। একধারে স্তূপ করে রাখা হয়েছে নতুন নষ্ট হওয়া গাড়িগুলো। টুকরো টুকরো হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে যেন। সবখানে ছড়িয়ে রয়েছে গাড়ির নানা জিনিস। কোথাও টায়ারের স্তূপ, কোথাও ফেনডার, কোথাও বা বডির অন্যান্য অংশ। ইয়ার্ডের পেছনে বাঁ দিকে রয়েছে বিশাল এক কমপ্যাক্টর মেশিন আর দুশো ফুটের ক্রেন।
একেবারে গল্পের মত ঘটে গেল ঘটনা। টেলিভিশনের থ্রিলারের গল্পে যে রকম হয়।-তিন গোয়েন্দা ইয়ার্ডে ঢুকতেই কাকতালীয় ভাবে জুনের ছোট নীল

মাসট্যাংটা তুলে নিল ক্রেন।
ম্যাশারে নিয়ে গিয়ে ফেলবে! চিৎকার করে উঠল মুসা। চাপ দিয়ে চ্যাপ্টা বানিয়ে ফেলবে!
ট্রাঙ্কের চিহ্নই আর থাকবে না! দৌড় দিল রবিন। কিচ্ছু বের করতে পারব না!
ক্রেনের দিকে দৌড়াচ্ছে তিনজনে। চিৎকার করে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছে ক্রেন অপারেটরের। কাছে গিয়ে দেখল ক্রেন চালাচ্ছে পল মিলার। ইয়ার্ডের মালিকের ছেলে। বছরখানেক আগে রকি বীচ হাইস্কুল থেকে গ্র্যাজুয়েশন করেছে।
মোটর বন্ধ করে দিয়ে, অপারেটরের খাচার চারপাশে ছড়ানো হলুদ রং করা প্লাটফর্মে বেরিয়ে এল পল। নিচে তাকিয়ে চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে।
গাড়িটা জুন মিলারের? জানতে চাইল কিশোর।
হ্যাঁ। কেন?
একটু দেখতে চাই।
লাভ হবে না। একটা স্পেয়ারও পাবে না। সব গেছে।
তবু। বেশিক্ষণ লাগবে না।
বেশ, ওদিকটায় যাও, নামিয়ে দিচ্ছি, পড়ে থাকা অনেকগুলো বাতিল ট্রাকের পাশের খালি জায়গা দেখাল পল।
মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানিয়ে সেদিকে এগোল কিশোর। পিছে পিছে চলল রবিন আর মুসা।
আবার চালু হলো ক্রেনের ইঞ্জিন। কাঁধের ওপর দিয়ে তাকিয়ে দেখল কিশোর, এপাশ ওপাশ দুলছে গাড়িটা। তারপর বিরাট একটা চক্র সৃষ্টি করে যেন এগোতে শুরু করল।
অত ওপর থেকে যদি কোনভাবে মাটিতে খসে পড়ে, মুসা বলল। ভর্তা হয়ে যাবে।
প্রায় মাথার ওপর চলে এসেছে গাড়িটা। সরে গেল ওরা। কিন্তু গাড়িটা চলল ওদের সঙ্গে, ওপরে ওপরে, যেন অনুসরণ করতে চাইছে। বিপজ্জনক ভঙ্গিতে দুলছে।
মজা করছে নাকি? ইঞ্জিনের শব্দকে ছাপিয়ে প্রায় চিৎকার করে বলল মুসা।
না, মজা নয়! আরও জোরে চেঁচিয়ে উঠল রবিন। ওই দেখো!
ক্রেনের গোড়ায় পড়ে থাকতে দেখা গেল পলকে। পেট চেপে ধরেছে, বাঁকা হয়ে গেছে ব্যথায়। ক্রেন অপারেটরের বুদে ঢুকে পড়েছে অন্য কেউ, সে-ই চালাচ্ছে। তিন গোয়েন্দার মাথার ওপরে চলে এসেছে গাড়িটা।
কে চালাচ্ছে? কিশোরের প্রশ্ন।

কিন্তু জবাব পেল না। দেবেই বা কে? গোল, চ্যাপ্টা একটা বড় চুম্বকের সাহায্যে তোলা হয় গাড়ি। ইলেকট্রোম্যাগনেট। অফ করে দেয়া হলো সুইচ।
কিন্তু জবাব খোঁজার সময় নেই। গাড়িটা এখন একেবারে মাথার ওপর। আচমকা ছেড়ে দিল ওটাকে ক্রেন। পড়তে আরম্ভ করল তিন হাজার পাউন্ড ওজনের গাড়িটা।
তিন দিকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল তিন গোয়েন্দা। বিকট শব্দে মাটিতে পড়ল গাড়ি।
ভাঙা কতগুলো গাড়ির আড়ালে লুকিয়ে পড়ল ওরা। দেখছে, শূন্যে দুলছে ভারি ইলেকট্রোম্যাগনেট, যে চুম্বকটার সাহায্যে গাড়ি তোলা হয়। ওটার এক বাড়ি খেলেই মরে যাবে মানুষ। বোঝাই গেছে, অপারেটরের বুদে যে রয়েছে এখন সে ওরকম কিছু ঘটানোরই চেষ্টায় আছে।
বিশাল চুম্বকটার দুলুনি বন্ধ হলে আড়াল থেকে বেরিয়ে এল মুসা। উঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করল ক্রেনের বুদে কে আছে।
আগেই বোঝা উচিত ছিল, ফিসফিস করে বলল সে। আমাদের মিস্টার এক্স!
পুরানো গাড়ির আড়াল থেকে বেরিয়ে এল তিনজনে। দেখল, ক্রেনের কেবিন থেকে বেরিয়ে আসছে লোকটা। গায়ে আর্মি ক্যামোফ্লেজ জ্যাকেট। লাফিয়ে নামল পলের কাছে। তার ঘাড়ে এক রদ্দা মেরে তাকে চিৎ করে দিল আবার, যাতে কিছুক্ষণ আর না উঠতে পারে।
এদিকেই আসছে, দুই সহকারীকে পিছিয়ে যেতে ইশারা করল মুসা। আবার গাড়ির আড়ালে লুকিয়ে পড়ল তিনজনে। এমনভাবে থাকার চেষ্টা করল, লোকটা দেখতে না পায়।
জুনের গাড়িটা দেখতেই এসেছে হয়তো, কিশোর বলল। আমাদের মত।
কানে এল কাচ ভাঙার শব্দ। ধোঁয়ার গন্ধ নাকে এলো আর চুপ করে বসে থাকতে পারল না মুসা। মুখ বের করে তাকাল। দেখল, দ্বিতীয় মলোটভ ককটেলটা ছুঁড়ছে মিস্টার এক্স। বোতল ভাঙার শব্দই তখন কানে এসেছে।
সমস্ত প্রমাণ নষ্ট করে ফেলছে! হতাশ কণ্ঠে বলল মুসা।
তাহলে এই ব্যাপার, কিশোর বলল। লোকটা চায় না, গাড়িতে যা আছে আমরা দেখি।
পেট্রল আছে কিনা কে জানে! তাহলে বোমার মত ফাটবে!
আগুন ধরে যেতেই দৌড় দিল মিস্টার এক্স। ইয়ার্ডের গেটের কাছে রাখা তার পোরশেতে গিয়ে উঠল। পিছু নিতে চাইল মুসা। হাত ধরে তাকে টেনে আটকাল কিশোর আর রবিন।
ওকে ধরার দরকার নেই, রবিন বলল। গাড়ির ট্রাঙ্ক দেখতে হবে! যে কাজে এসেছি!

কুইক! তাড়া দিল কিশোর। গাড়িটা পুড়ে যাওয়ার আগেই... পুড়বে তো না, ফাটবে!
গাড়িটার দিকে আরেকবার তাকাল মুসা। তারপর দিল দৌড়। পুরানো জঞ্জালের মধ্যে খুঁজতে আরম্ভ করল। জিনিসটা খুঁজে বের করতে বেশিক্ষণ লাগল না। একটা শাবল। তারপর ছুটল জুনের তোবড়ানো মাসট্যাঙের দিকে। ভেতরের গদিটদি অনেকখানিই পুড়ে গেছে ইতিমধ্যে। পেছনের দিকে এগোচ্ছে আগুন, যেখানে পেট্রল ট্যাংকটা রয়েছে।
শাবল দিয়ে ট্রাঙ্ক খোলার চেষ্টা শুরু করল মুসা। ঘামে ভিজে গেছে কপাল। একটা চোখ সারাক্ষণ রেখেছে আগুনের ওপর। অবশেষ খুলে গেল ট্রাঙ্ক।
পেয়েছি! আনন্দে চিৎকার করে উঠল সে। ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে বের করে আনল চামড়ার ব্রিফকেসটা। হাতে তুলে নেড়ে দেখাল কিশোর আর রবিনকে। জলদি ভাগ! ফাটবে এখুনি! ট্যাংকের কাছে পৌঁছে গেছে আগুন।
কিন্তু নড়ল না কিশোর। হাসছে। বলল, গাড়ি ভাঙার আগে পেট্রল বের করে নেয়া হয়, যাতে কোনরকম দুর্ঘটনা ঘটতে না পারে। জ্বলবে গাড়িটা, কিন্তু ফাটবে না।
আগে অকথা বলেনি কেন? অভিযোগের সুরে বলল মুসা। তাহলে অত তাড়াহুড়া করতাম না...।
সে জন্যেই বলিনি। ওই তাড়াহুড়াটা না করলে হয়তো সময়মত খুলতে পারতে না ট্রাঙ্কটা। ঠেকায় পড়লেই কেবল মানুষ মরিয়া হয়ে ওঠে।
তুমি যে একটা কি...! জ্বলন্ত চোখে গোয়েন্দাপ্রধানের দিকে তাকাল মুসা।
ফোন করে অ্যামবুলেন্স ডাকা হলো। তারপর পলকে দেখতে চলল তিন গোয়েন্দা, ওর অবস্থা কতটা খারাপ।
তোমরা গোয়েন্দা, শুনেছি, পল বলল। কিন্তু জানতাম না সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধেও লাগতে যাও।
সব সময় লাগি না, কৈফিয়তের সুরে বলল কিশোর।
পলের ব্যবস্থা করে চিকেন লারসেনের বাড়ি রওনা হলো তিন গোয়েন্দা। ওখানে ওদের অপেক্ষায় আছে জুন আর ফারিহা। লারসেন বাড়ি নেই। ফিরতে দেরি হতে পারে।
সদর দরজায় বেল শুনে খুলেই তিন গোয়েন্দাকে দেখে একসঙ্গে বলে উঠল দুজনে, পেয়েছ?।
নীরবে ব্রিফকেসটা তুলে ধরল কিশোর। কি করে এসেছে, তার প্রমাণ দিতে চাইল যেন।
হাসল জুন। ওদেরকে নিয়ে এল বসার ঘরে।
কাচের কফি টেবিলে ব্রিফকেসটা রাখল কিশোর।

অস্থির হাতে সামনের খোপের চেনটা তুলে ভেতর থেকে মরক্কো লেদারে বাঁধাই অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুকটা বের করল জুন। কাঁপা হাতে খুলল শুক্রবারের সেই পাতাটা, যেদিন অ্যাক্সিডেন্ট করেছিল। যেদিনকার ঘটনা স্মৃতি থেকে মুছে গেছে। এই যে, নিঃশ্বাস দ্রুত হয়ে গেছে ওর।

পুরো একটা মিনিট পাতাটার দিকে তাকিয়ে রইল সে। তারপর নিরাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল, কিছুই নেই। কেবল আর অ্যান্ড ডি।

রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, কিশোর বলল। ডন বারোজের ডিপার্টমেন্ট, তাই না? ওর সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছিলে কেন? কি আলোচনা করেছিলে?

কাজ শেখার চেষ্টা করছি আমি। সব বিভাগেই কাটিয়েছি একদিন করে। এর বেশি আর কিছু মনে করতে পারছি না।

ব্রিফকেসের ভেতরে কি আছে দেখলে হয়তো মনে করতে পারবে, আশা করল কিশোর।

ভেতর থেকে একটা তিন রিঙের বাইন্ডার বের করল। প্রায় দুশো ফটোকপি করা কাগজ রয়েছে তাতে। কয়েক মিনিট কাগজগুলো ওল্টাল, তারপর রেখে দিল টেবিলে। চিনতেই পারছি না! ওগুলো দেখে স্মৃতি ফেরত আনার চেষ্টা করছিল সে, ব্যর্থ হয়েছে। ভীষণ হতাশ হয়েছে।

আমি দেখি? অসুবিধে আছে? নোটবুকটার দিকে হাত বাড়াল কিশোর। পয়লা পাতাতেই ডন বারোজের নাম। দ্রুত রিপোর্টটা পড়তে শুরু করল সে। কয়েক মিনিট নীরবে পড়ার পর মুখ তুলল। বলল, সেই শুক্রবারে কি ঘটেছিল বোধহয় বুঝতে পারছি। ডন বারোজের লেখা একটা রিপোর্টের কপি এটা। মালটিসরবিটেন নামে খাবারে মেশানোর একটা উপাদান সম্পর্কে। কয়েক বছর আগে জিনিসটা আবিষ্কার করেছিল ডন। বলছে, মালটিসরবিটেন মেশালে খাবারের স্বাদ অনেক বেড়ে যায়, তবে একটা অসুবিধেও করে। এতই সুস্বাদু হয় খাবার, নেশাগ্রস্ত করে ফেলে মানুষকে।

ভাল খাবার তো লোভী করবেই মানুষকে, রবিন বলল। তাতে অসুবিধেটা কোথায়?

অসুবিধেটা? মালটিসরবিটেনের বেলায় আছে। এফ ডি এ, অর্থাৎ ফেডারেল ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এই উপাদানটা পরীক্ষা করেছিল। নতুন যে কোন খাবার আর ড্রাগ পরীক্ষা করে দেখা ওদের দায়িত্ব। উনাকে মালটিসরবিটেন বাজারে ছাড়ার অনুমতি দেয়নি ওরা। কারণ পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে, ক্যারসিনোজেন হতে পারে ওই জিনিসে।

কি জেন? মুখ বাঁকাল মুসা।

ক্যারসিনোজেন। বুঝিয়ে দিল রবিন, ক্যানসার হয় ওতে।

কেশে গলা পরিষ্কার করে নিল কিশোর। বলতে থাকল, দুর্ঘটনার দিন শুক্রবারে তুমি ডনের সঙ্গে দেখা করেছ। ওই রিপোর্টের কপি পেয়ে গেছ, কাগজটায় টোকা দিল সে। সে দেয়নি। আমার বিশ্বাস, ওর অফিসে ঢুকে কোনভাবে দেখে ফেলেছিলে কাগজটা। অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছে রাতের বেলা। কাজেই অনুমান করছি, বিকেলের দিকে পেয়েছ তুমি। পড়ে অস্থির হয়ে গিয়েছিলে।
জুনের দিকে তাকাল কিশোর। সবকথা মনে করিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে যেন। বলল, এতই ঘাবড়ে গিয়েছিলে, কাগজটা নিয়েই ছুটে বেরোলে ডনের অফিস থেকে দেখে ফেলেছিল সে। তাড়া করেছিল তোমাকে। তোমার গাড়িতে গিয়ে উঠলে। নিজের গাড়িতে করে তোমাকে অনুসরণ করল সে। দুর্ঘটনার জায়গায় আরেক সেট চাকার দাগ যে পাওয়া গেছে সেটা ওরই গাড়ির।
মুসা প্রশ্ন করল, ওই একটা রিপোর্ট অতটা উত্তেজিত করবে কেন জুনকে?
করবেই তো, হাসল কিশোর। জুন হয়তো বুঝে ফেলেছিল, চিকেন লারসেনের নতুন খাবার ড্রিপিং চিকেনে ওই মালটিসরবিটেন মিশিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ডন।
কথাটা সবাইকে হজম করার সুযোগ দিল গোয়েন্দাপ্রধান। তারপর জুনের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি বুঝে ফেলেছিলে, ডন, কিংবা আরোলা, কিংবা তোমার বাবা ইচ্ছে করেই জেনেশুনে ওই বিষ মেশাতে চলেছেন খাবারে। ড্রিপিং চিকেনে। ওই বিষের ক্রিয়া টের পেতে পেতে রোগীর কয়েক বছর লেগে যাবে। কাজেই সহজে ধরা পড়বে না যে মেশাবে। ইতিমধ্যে লক্ষ লক্ষ লোক নিয়মিত খেয়ে যাবে মালটিসরবিটেন, বুঝতেই পারবে না ক্যানসারে আক্রান্ত হতে যাচ্ছে ওরা। যখন বুঝবে, তখন অনেক দেরি হয়ে যাবে। হয়তো তখনও বুঝবে না কিসের কারণে হয়েছে তাদের ওই মরণ ব্যাধি।
ঠোঁট কাঁপছে জুনের। প্রায় চিৎকার করে বলল, অসম্ভব! আমার বাবা ওরকম পাষন্ড হতেই পারে না!
আমরা এখনও জানি না সেটা। প্রমাণ করতে হবে যে তিনি এতে জড়িত নেই। আর সেটা করায় আমাদেরকে সাহায্য করতে হবে তোমাকে।
মনে মনে ইতিমধ্যেই কিছু একটা করার পরিকল্পনা করে ফেলেছে কিশোর, বুঝতে পারল তার দুই সহকারী। রবিন জিজ্ঞেস করল, কি করতে চাইছ তুমি?
জানতে চাই, ড্রিপিং চিকেনে মালটিসরবিটেন মেশানোর ব্যাপারটা জানেন কিনা মিস্টার লারসেন। কি করে জানব, কেউ কোন পরামর্শ দিতে পারো?
পারি, জুন বলল। বাবা তার সমস্ত কাজের ফিরিস্তি কাগজে লিখে অফিসের আলমারিতে রেখে দেয়।
আঙুল মটকাল কিশোর। আমিও তাই আশা করেছি। বের করে আনতে পারবে?

তালার কম্বিনেশন জানি না।
ও। তাকে না জানিয়ে কাগজগুলো বের করতে হবে। সন্দেহ করলেই সরিয়ে কিংবা নষ্ট করে ফেলতে পারেন।
এক মুহূর্ত ভাবল জুন। তারপর হাসল। বাবার সেক্রেটারির সাহায্য নিলে কেমন হয়? অনেক কিছুই হয়তো জানে ও। কম্বিনেশন জানলেও অবাক হব না। বসের অনেক গোপন খবরই রাখে তার সেক্রেটারি। এটা নতুন কিছু না।
চলো, তখুনি যেতে চাইল মুসা।
না, বাধা দিল জুন। আমি একা যাব। তোমাদেরকে দেখলে মুখ খুলবে না। বাবার বিরুদ্ধে একাজ করছি, ঠিক হচ্ছে কিনা বুঝতে পারছি না...
হচ্ছে, দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করল যেন কিশোর। লক্ষ লক্ষ মানুষকে বাঁচানোর জন্যে কাজটা করছি আমরা। একে অন্যায় বলা যাবে না। কতক্ষণ লাগবে। তোমার?
এই ঘণ্টা দুয়েক।
দুই ঘণ্টা কেটে গেল। ওদেরকে যা যা করতে বলে গেছে জুন, তাই করল। ওর বাড়িতে বসে ওদের ফ্রিজের খাবার খেল, টিভি দেখল, কথা বলল। বিশ্রাম নিল, কিশোর বাদে। এই কাজটা সে কিছুতেই করতে পারল না। ঢিল দিতে পারল না শরীর।
আরেক ঘণ্টা পেরোল।
অবশেষে দরজা খুলে ঘরে ঢুকল জুন। হাতের কাগজ দেখিয়ে সবার দিকে চেয়ে হাসল।
পেয়েছি, ফিসফিস করে জানাল সে। চারপাশে তাকাল, যেন দেখে নিতে চাইছে ওর বাবা শুনে ফেলছেন কিনা। আলমারি খুলে সব কাগজ দেখেছি। কোথাও লেখা নেই মালটিসরবিটেনের কথা। দেখলে তো? আমার বাবা খুনী নয়।
জুনের কাগজটা নিয়ে পড়তে লাগল কিশোর।
মনে হচ্ছে, মুসা বলল। লোকটাকে আর ধরতেই পারলাম না। কেসের এখানেই ইতি।
কাগজটা ভাজ করে পকেটে রেখে দিল কিশোর। মুখ তুলে তাকাল জুনের দিকে। কেউ যদি খাবারে বিষ না-ই মিশিয়ে থাকে, ঘোরের মধ্যে বললে কেন একথা? ব্রিফকেসটার জন্যেই এত অস্থির হয়ে গিয়েছিলে কেন? আর ডন বারোজের নাম ছাপা এই মালটিসরবিটেনের রিপোর্টই বা তোমার কাছে কেন?
জানি না, মাথা নাড়ল জুন।
আমরাও জানি না, কিশোরও মাথা নাড়ল। তবে কয়েকটা ব্যাপার জানি। আমাদের সন্দেহের তালিকা দ্রুত ছোট হয়ে আসছে। তোমার বাবাকে বাদ দেয়া যায়। হেনরি অগাসটাসও বাদ, কারণ তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই তোমার।

যোগাযোগও নেই। মালটিসরবিটেনের সঙ্গে তাকে জড়াতে পারছি না কোনভাবে। বাকি থাকল ডন বারোজ। সে সহজেই ওই খাবারে বিষ মেশাতে পারে। তবে সে নির্দোষও হতে পারে। অন্য কেউও করে থাকতে পারে কাজটা। যে লোকটাকে বেশি সন্দেহ করছি, যার ব্যাপারে বেশি আগ্রহ আমার এখন, যে রিপোর্টটা আমাদের হাতে পড়তে দিতে চায়নি, সে হলো রহস্যময় মিস্টার এক্স। যে আমাদেরকে ভয় দেখিয়ে সরিয়ে রাখতে চেয়েছিল।
ওই লোকটা কে?, মুসা জিজ্ঞেস করল। বুঝতে পারছ?
আন্দাজ করতে পারছি। ফেলিক্স আরোলা।
তাহলে? ভুরু কোঁচকাল ফারিহা। পুলিশকে ফোন করব?
না। প্রমাণ দরকার। মিরাকল টেস্টে গিয়ে খোঁজ নিতে হবে আমাদের। কি গোপন করার চেষ্টা করছে আরোলা, জানতে হবে।
কিশোর, হুঁশিয়ার করল মুসা। জায়গাটা একটা দুঃস্বপ্ন! সিকিউরিটি ভীষণ কড়া!
বেশ, তাহলে রাতের বেলা যাব। যখন গার্ডেরা সতর্ক থাকবে না। ঘুম থাকবে চোখে।
তাহলে আজ রাতেই করতে হবে কাজটা, জুন বলল। বাবার সেক্রেটারি আরেকটা কথা বলেছে আমাকে, বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। আজ সন্ধ্যায় বিরাট এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। ড্রিপিং চিকেনের খবর দুনিয়াবাসীকে জানিয়ে দিতে চায় বাবা। বাজারে ছাড়তে যাচ্ছে।
তাই নাকি! সর্বনাশ! বলে উঠল ফারিহা।
চিকেন লারসেনের কথা মনে পড়ল কিশোরের। তিনি বলেছেনঃ লোকে জানতেও পারবে না কিসে আঘাত করেছে ওদেরকে!
বিকেল পাঁচটা। রবিনের গাড়িতে বসে আছে গোয়েন্দারা। লং বীচে মিরাকল টেস্টের অফিস আর গুদাম থেকে কিছু দূরে। জুনদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে যার যার বাড়ি গিয়েছিল। কালো শার্ট প্যান্ট পরে এসেছে। কিশোরের হাতে কালো চামড়ার একটা হাতব্যাগ। কোলের ওপর রেখেছে। জিনিসটা নতুন দেখছে রবিন আর মুসা।
আরোলা বেরোলেই আমরা ঢুকব, ব্যাগটা আঁকড়ে ধরে বলল কিশোর।
ও আছে কি করে জানলে? রবিনের প্রশ্ন।
আছে, জবাবটা মুসাই দিয়ে দিল। ওর গাড়ি দেখছ না? ওই যে। চিনি।
তুমি চিনলে কি করে? রবিন অবাকই হলো।
সেদিন চিকেন লারসেনের বাড়িতে পার্টির পর ওকে অনুসরণ করেছিলাম। ওই গাড়িতে করে মিরাকল টেস্টে এসেছিল সে।

আস্তে আস্তে মিরাকল টেস্টের পার্কিং লট খালি হয়ে যেতে লাগল। ছটার সময় বেরোল আরোলার ধূসর রঙের ক্যাডিলাক অ্যালানটে গাড়িটা। চলে গেল লস অ্যাঞ্জেলেসের দিকে।
চিকেন লারসেনের সাংবাদিক সম্মেলনে গেল হয়তো, অনুমানে বলল মুসা।
গাড়ি থেকে নামল তিনজনে। প্রায় দৌড়ে চলে এল মিরাকল টেস্টের পার্কিং লটে। ঢোকার মুখে এসে দাঁড়িয়ে গেল রবিন। পাহারায় রইল। দরজাটা পরীক্ষা করতে গেল মুসা আর কিশোর।
সিকিউরিটি দেখেছ? গুঙিয়ে উঠল মুসা।
দেখছে। তিনজনেই তাকিয়ে রয়েছে ছোট একটা ইলেকট্রনিক প্যানেলের দিকে। আলোকিত একটা কীপ্যাড রয়েছে সেখানে। কাচের দরজার পাশে ক্রোমের দেয়ালের মাঝে। দরজার ওপাশে গার্ডের ঘর। কাউকে চোখে পড়ছে না।
টহল দিতে গেছে হয়তো, রবিন বলল। এইই সুযোগ। ঢুকে পড়া দরকার।
কীপ্যাডের দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। নিশ্চয় ওর মধ্যে কোন বিশেষ কোড ঢোকাতে হয়। তাহলেই খুলবে। কিন্তু ভুল কোড যদি ঢোকে, কি আচরণ করবে? দারোয়ানকে সতর্ক করার জন্যে সিগন্যাল দিতে আরম্ভ করবে না তো?
কোড না দিলে বোঝা যাবে না। ঝুঁকি নিতেই হবে। চামড়ার ব্যাগটা খুলতে লাগল কিশোর। বলল, একটা ইলেকট্রনিক লক কম্বিনেশন ডিকোডার নিয়ে এসেছি। কীবোর্ডে লাগিয়ে দিলেই কম্বিনেশন পড়ে ফেলতে পারবে। কেমন যেন অবিশ্বাস্য মনে হয়, তাই না? সার্কিট ডায়াগ্রাম দেখে দেখে বানিয়ে ওঅর্কশপে পরীক্ষা করে দেখেছি। কাজ করেছে। এখানে কি করবে কে জানে!
স্ক্রু-ড্রাইভার দিয়ে দ্রুত কীপ্যাডের কভার প্লেট খুলে ফেলল সে। ডিকোডারের দুটো অ্যালিগেটর ক্লিপ লাগিয়ে দিল দুটো বিশেষ তারের সঙ্গে। উত্তেজনায় দুরুদুরু করছে ওর বুক। কাজ করবে তো? সুইচ টিপল। বেশ কিছু টিপটিপ শব্দ আর আলোর ঝলকানির পর যন্ত্রটা কতগুলো নম্বর দিল ওকে।
হয়েছে? দরজার দিকে পা বাড়াল মুসা। চলো, দেখি...
ওর কাঁধ খামচে ধরল কিশোর। দাঁড়াও। কিছু একটা গোলমাল হয়ে গেছে! কালো যন্ত্রটায় হাত বোলাল সে। ঠিকমত কাজ করছে না। যে নম্বরটা দিয়েছে ওটা এখানকার কমবিনেশন নয়। ওঅর্কশপে যে রিডিং দিয়েছিল, সেটা।
ইলেক্ট্রনিক এই যন্ত্রপাতি এ জন্যেই দেখতে পারি না আমি, বিরক্ত হয়ে বলল রবিন। কখন যে বিগড়ে যাবে ঠিকঠিকানা নেই!
সব যন্ত্রই বিগড়ায়, এগুলোর আর দোষ কি? ইলেকট্রনিকস যতটা সুবিধে করে দিয়েছে তার তুলনায় ছোটখাট এসব গোলমাল কিছুই না। হয়তো কোন

ক্যাপাসিটর খারাপ পড়েছে, গেছে বাতিল হয়ে, বদলে নিলেই ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু এখন তো আর সময় নেই...
না, নেই। ওই যে, গার্ডও চলে আসছে।
তাড়াতাড়ি যন্ত্রটা ব্যাগে ভরে শার্টের ভেতরে লুকিয়ে ফেলল কিশোর। গোবেচারা মুখ করে রইল। তার ডেস্কের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে দারোয়ান, এই সময় গিয়ে বেল বাজাল রবিন।
দরজা সামান্য ফাঁক করে তিনজনেরই পা থেকে মাথা পর্যন্ত নজর বোলাল দারোয়ান। তারপর জিজ্ঞেস করল, কি চাই?
কিশোর বলল, আমরা ব্ল্যাক মেসেঞ্জার সার্ভিস থেকে এসেছি। নিজেদের কালো পোশাকের ব্যাখ্যাও দিয়ে ফেলল এক কথাতেই। মিস্টার আরোলার অফিস থেকে কিছু একটা বের করে নিতে হবে আমাদেরকে। তিনি বলেছেন, খুবই নাকি জরুরী।
একটা জিনিস নিতে তিনজন দরকার? দারোয়ানের সন্দেহ গেল না।
আমি কি জানি? হাত ওল্টাল কিশোর। আসতে বললেন, এসেছি। আমাকে তার প্রয়োজন।
ওর গাড়ি নেই, কিশোরকে দেখাল রবিন। তাই আমাকেও আসতে হলো।
আর ওরা কেউ অফিসটা চেনে না, রবিন আর কিশোরের কথা বলল মুসা। আমি চিনি। না এসে আর কি করব?
তাই তো, না এসে কি করবে! অকাট্য যুক্তি! আমি তো জানতাম থ্রী স্টুজেসরা মরে ভূত হয়ে গেছে, বিড়বিড় করল দারোয়ান। তবে আর কথা না বাড়িয়ে দরজা খুলে দিল। যাও। কি নেবে নিয়ে জলদি বিদেয় হও, হলের দিকে দেখিয়ে অধৈর্য ভঙ্গিতে হাত নাড়ল সে।
দারোয়ানের নির্দেশিত দিকে এগোল তিন গোয়েন্দা। সমস্ত পথটায় কার্পেট বিছানো রয়েছে। বাঁয়ের পথ ধরল ওরা। ওদিকেই অফিসটা, বলেছে দারোয়ান। ডান দিকে চলে গেছে আরেকটা পথ। পথের শেষ মাথায় ওয়াল নাট কাঠের তৈরি একটা দরজার সামনে এসে থামল ওরা। দরজায় লেখা রয়েছেঃ একজিকিউটিভ সুট।
বেশ বড় সাজানো গোছানো ঘর আরোলার। দুধারে বিশাল জানালা, একেবারে মেঝে থেকে ছাত পর্যন্ত। বাতাসে তাজা ফুলের সুবাস, যদিও একটাও ফুল চোখে পড়ছে না কোথাও। ঘরের মাঝখানে রোজউড কাঠের মস্ত টেবিল। তাতে রয়েছে বিল্ট-ইন টেলিফোন আর কম্পিউটার। এককোণে গোছানো রয়েছে নটিলাস কোম্পানির ব্যায়ামের যন্ত্রপাতি। দেয়ালে ঝোলানো আর তাকে সাজানো রয়েছে অসংখ্য স্মারকচিহ্ন আর পুরস্কার। সুগন্ধ বিশারদ সে। অতীতে কাজের জন্য

ওগুলো পেয়েছে। নানা রকম ক্যানডির মোড়ক, আর অন্যান্য খাবারের মোড়ক সুন্দর করে ফ্রেমে বাঁধিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে দেয়ালে। বোঝা যায়, ওগুলো সব তার নিজের আবিষ্কার।
ওসব জিনিস কোনটাই চমকৃত করতে পারল না কিশোরকে, করল কেবল আরোলার ফাইলিং সিসটেম।
কি খুঁজতে এসেছি আমরা? টেবিল টেনিস খেলা যায় এতবড় ডেস্কের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল মুসা।
মালটিসরবিটেনের একটা জার হলেই চলবে, কিশোর বলল। ফাইলিং কেবিনেট খুলতে লাগল সে। ড্রিপিং চিকেনে মেশানো হয়েছে, ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে, এ রকম যে কোন জিনিস হলেও চলবে। যে যে উপাদান মেশানো, নিশ্চয় লিখে রেখেছে কাগজে, ফোল্ডারগুলোর পাতা ওল্টাতে শুরু করল সে।
এখানেও একটা কম্পিউটারের টার্মিনাল রয়েছে, বাথরুম থেকে জানাল রবিন। দামী একটা কোলোনের শিশি খুলে বলল। বাহ, চমক্কার গন্ধ!
কি চমৎকার? জানতে চাইল মুসা।
আচমকা চেঁচিয়ে উঠল কিশোর, ব্রোমিনেটেড সিউডোফসফেট!
কি বললে? বাথরুমের দরজায় উঁকি দিল রবিন। ইদানীং আরও জটিল হয়ে গেছে তোমার কথাবার্তা!
সহজ কথাটা বুঝতে না পারলে আমি কি করব? বলছি, ড্রিপিং চিকেনে ব্রোমিনেটেড সিউডোফসফেট মেশানো হয়েছে। কাগজপত্রে তা-ই লেখা রয়েছে। জুন আমাকে যেসব কাগজপত্র এনে দিয়েছে ওগুলোতে।
মুসাও আজকাল ওরকম করে কথা বলে, মুখ বাঁকাল রবিন। গাড়ির ইঞ্জিনের ব্যাপারে ও যে কি বলে, কিচ্ছু বুঝতে পারি না! এই তো, গত হপ্তায় মেরামত করে দেয়ার সময় কি জানি কি হয়েছিল, বলল!
ঠেলে ফাইল কেবিনেটটা লাগিয়ে দিল কিশোর। গত দুই বছরের পারচেজ অর্ডার, ইনভয়েস আর ইনভেনটরি লিস্ট ঘাটলাম। তাতে মিরাকল টেস্ট কোম্পানি কোন উপাদান কিনেছে বা তৈরি করেছে, এ রকম কথা লেখা নেই। গুদামে গিয়ে খুঁজতে হবে। এখনই!
কার্পেট বিছানো পথ ধরে প্রায় ছুটতে ছুটতে হলঘরে ফিরে এল ওরা। দারোয়ান বসে বসে ঢুলছে। ওদের সাড়া পেয়ে চমকে জেগে গেল, পেয়েছ। তোমাদের জিনিস? জিজ্ঞেস করল সে।
কিশোরের দিকে তাকাল রবিন আর মুসা। জবাব দেয়ার ভারটা ওর ওপরই ছেড়ে দিতে চায়।

না, কিশোর বলল। বললেন তো এখানেই আছে, কিন্তু পেলাম না। গুদামঘরের অফিসে বললেন।
গুদামঘর? দূর, মাথা খারাপ এগুলোর! এই, ওটাকে কি গুদামের অফিস মনে, হয়েছে? তোমাদের কি কমনসেন্স বলেও কিছু নেই!
কমন সেন্স আছে আমাদের দলের চার নম্বর লোকটার, নিরীহ কণ্ঠে জবাব দিল রবিন। কিন্তু সে আজকে আসেনি।
যাও। ডানের পথটা ধরে যাও, যেটাতে কার্পেট বিছানো নেই। তিনটে লাল দরজা পেরিয়ে যাবে। তারপরেই পাবে গুদামঘর। যত্তোসব! ওদের দিকে তাকাল দারোয়ান। দরজা দেখতে কেমন সেটা জানো তো?
ও জানে, কিশোরকে দেখাল মুসা।
হলঘর থেকে বেরিয়ে কার্পেট ছাড়া পথটা ধরল ওরা। একে একে পেরিয়ে এল তিনটে লাল রঙ করা দরজা। ঢুকল বিরাট এক ঘরে। নিঃশ্বাস ফেলতে ভুলে গেল যেন। একটার ওপর আরেকটা সাজিয়ে রাখা হয়েছে অসংখ্য কেমিক্যালের ড্রাম।
লেবেল পড়ে দেখ, নির্দেশ দিল কিশোর। জলদি।
কটা বাজে? ভুরু নাচাল রবিন।
প্রায় সাতটা।
নটায় সম্মেলন শুরু হবে, ভুলে গেলে চলবে না। তাড়াতাড়ি সারতে হবে আমাদের।
ছড়িয়ে পড়ে খুঁজতে শুরু করল তিনজনে। একটু পরেই চিৎকার করে ডাকল রবিন, অ্যাই, দেখে যাও!
ড্রামের সারির ফাঁক দিয়ে ওর দিকে এগিয়ে গেল কিশোর আর মুসা। কংক্রীটের মেঝেতে মচমচ করছে জুতো, চেষ্টা করেও শব্দ না করে পারছে না ওরা। একগাদা টিন আর কাঠের পিপার সামনে দাঁড়িয়ে আছে রবিন। প্রতিটির গায়ে লেবেল লাগানোঃ ব্রোমিনেটেড সিউডোফসফেটস।
পেয়ে গেলাম, যা খুঁজছিলে, রবিন বলল কিশোরকে। এতে কি প্রমাণ হলো?
জবাব না দিয়ে লেবেলে লেখা তারিখ দেখল কিশোর। তারপর বলল, দেখ, কবে এসেছে?
পড়ে মুসা বলল, দুই মাস আগে।
কি ভাবে এল? কিশোরের প্রশ্ন। ভাল করে ইনভয়েসগুলো দেখেছি আমি। দুমাস তো দূরের কথা, গত দুই বছরেও কেনা হয়নি ব্রোমিনেটেড সিউডোফসফেট। এক আউন্সও না।... ছোট টিনও আছে। নিয়ে যাব একটা। ভেতরে আসলে কি আছে দেখা দরকার।

দেখার আর দরকার কি? বলে উঠল একটা কণ্ঠ, আমাকে জিজ্ঞেস করলেই তো বলে দিতে পারি।
পাই করে ঘুরে দাঁড়াল তিন গোয়েন্দা। দাঁড়িয়ে আছে ফেলিক্স আরোলা।
এভাবে মুখখামুখি হয়ে যাব, ভাবতে পারিনি, বলল সে। ভেবেছিলাম, তদন্তটা বাদই দিয়ে দেবে তোমরা। ভুল করেছি। শেষে আমার পেছনেই লাগলে।
পাথর হয়ে গেছে যেন গোয়েন্দারা।
সরি, পিস্তলটা আরেকটু সোজা করে ধরল আরোলা। খরচের খাতায় তোমাদের নাম লিখে ফেলা ছাড়া আর কোন উপায় নেই আমার।
পিস্তল উদ্যত রেখেই চট করে হাতঘড়ি দেখল আরোলা। আর বেশি সময় নেই। একটু পরেই বেভারলি হিলটনে লারসনের সম্মেলন শুরু হবে, জ্যাকেটের অন্য পকেটে হাত ঢোকাল সে।
কি করবে এখন লোকটা? ভাবছে কিশোর।
জ্যাকেটের পকেট থেকে হাতটা বের করল আরোলা। মুঠো বন্ধ। কয়েক মিনিটের মধ্যেই যা করার করে ফেলব। মরার আগে খানিকটা মার্কেট রিসার্চ করতে চাও?
মানে? তীক্ষ্ণ চোখে লোকটার হাতের দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর।
মুঠো খুলল আরোলা। মোড়কে মোড়া ক্যানডি। খেয়ে দেখবে একটা?
না, কিশোর, খেয়ো না! হুঁশিয়ার করল মুসা, বিষ!
আরোলার দিকে তাকাল কিশোর। তারপর তার পিস্তলের দিকে, তারপর ক্যানডির দিকে এবং সবশেষে ঘড়ির দিকে। এমনিতেও মরবে ওমনিতেও। খেয়ে দেখলে ক্ষতি কি? পুলিশকে জানিয়ে আসেনি। কেউ উদ্ধার করতে আসবে না ওদের।
তোমার কথার দাম দিই আমি, আরোলা বলল। বুদ্ধিমান ছেলে। অনেক কিছুই বোঝ। সেদিন পার্টিতেই বুঝেছি। তোমাকে মেরে ফেলতে হচ্ছে বলে সত্যিই কষ্ট হচ্ছে আমার। খেয়ে বলো, কেমন লাগে। বলবে?
দিন। কি আর করা? এত করে যখন বলছেন...
এই তো। বলেছিলাম না, তুমি বুদ্ধিমান ছেলে। জীবনে যদি একটা কাজ করে যেতে না পারলে, তো জন্মই বৃথা। ওই পচা বিজ্ঞানীগুলোর মত। কেবল আবিষ্কারই করতে পারে, জিনিসের মার্কেট ভ্যালু আর বুঝতে পারে না কোনদিন।
মনে হচ্ছে আপনি খুব বোঝেন, লোকটার কথা সহ্য করতে পারছে না রবিন। ওকে এত চাপাচাপি করছেন কেন? আপনি খেয়ে টেস্ট করে নিলেই পারেন...
দেখ ছেলে, বেশি ফরফর করবে না! হঠাৎ রেগে গেল আরোলা। তোমার কপাল ভাল যে তোমার বন্ধুর স্বাদ যাচাই করার ক্ষমতা আছে। বাঁচিয়ে রেখেছি সে কারণেই, সকলকে, নইলে এতক্ষণে লাশ হয়ে যেতে, নিজেকে শান্ত করার জন্যে

জোরে জোরে দুবার শ্বাস টানল সে। বিড়বিড় করল, লাশের গন্ধও আমার ভাল লাগে।
চিন্তিত ভঙ্গিতে লোকটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। মনে হচ্ছে, আরোলার মাথায় গোলমাল আছে। কি জানি, গত কয়েক বছরে হয়তো অনেক মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে সে, খাবারে মালটিসরবিটেন মিশিয়ে। আর অপরাধ বোধের কারণেই চাপ পড়েছে মাথায়, গেছে গড়বড় হয়ে।
দিন, একটা ক্যানডি, শান্ত কণ্ঠে বলল কিশোর। খেয়ে দেখি। তবে এক শর্তে। আমার প্রশ্নের জবাব দিতে হবে।
মাথা ঝাকিয়ে সায় জানাল আরোলা। একটা ক্যানডি দিল কিশোরের হাতে।
মুখে ফেলল কিশোর। তিনটে স্বাদ। লেবু-আসল লেবুর গন্ধ পাচ্ছি, নকল। আর রয়েছে ম্যারাং এবং গ্রাহাম ক্র্যাকারের সর। তিনটে মিলিয়ে লেমন ম্যারাং পাই। চমকার।
এবার আমার পালা, কিশোর বলল। ওই যে ব্রোমিনেটেড সিউডোফসফেটস লেখা রয়েছে, ওই টিমগুলোতে আসলে রয়েছে মালটিসরবিটেন, তাই না?
হ্যাঁ। তাতে কি?
কিসে ব্যবহার করতে এনেছেন। আমার বিশ্বাস, আপনি নিশ্চয় জানেন ওই জিনিস খাবারে মেশানোর অনুমতি দেয়নি এফ ডি এ।
আরেকটা প্রশ্নের জবাব চাও তো? তাহলে আরেকটা ক্যানডি খেতে হবে। যে কোন একটা তুলে নাও, শয়তানী হাসি হেসে হাত বাড়িয়ে দিল আরোলা।
খেয়ো না, কিশোর, আরেকবার বাধা দিল মুসা। কায়দা করে খাইয়ে নিচ্ছে।
কিশোরের ধারণা হলো, ক্যানডিগুলোতে অন্য বিষ না থাকলেও মালটিসরবিটেন থাকতে পারে। দুএকটা ক্যানডি খেলে তেমন কোন ক্ষতি হবে না। আর হলেই বা কি? কিছু তো আর করতে পারছে না। বরং যতক্ষণ খেয়ে যাবে ততক্ষণ মারবে না আরোলা। আর ওর কাছ থেকে কথা আদায় করারও সুযোগ মিলবে। আরেকটা ক্যানডি নিয়ে মোড়ক খুলে মুখের ভেতর ছুঁড়ে ফেলল।
চেরি জেল-ও। সেই সঙ্গে রয়েছে ব্যানানা ফ্লোটার আর মাখন, চুষতে চুষতে জানাল কিশোর। আপনার জবাব পেয়েছেন। এবার আমার প্রশ্নের জবাব দিন। মালটিসরবিটেনগুলো দিয়ে কি করবেন?
জবাব দিতে সময় নিল আরোলা। দ্বিধা করছে মনে হলো। অবশেষে বলল, বেশ, বলছি। তোমরা তো আর বেঁচে থাকবে না, বেরিয়ে গিয়ে সব বলতেও পারবে না। গোড়া থেকেই বলি, নইলে পরিষ্কার হবে না। বছরখানেক আগে চিকেন লারসেন এসেছিল আমার কাছে। নতুন একটা খাবার তৈরি করতে আমার সাহায্য চাইল। এমন কিছু, যেটার মত সুস্বাদু জিনিস আর কেউ কখনও খায়নি। শুধু খায়নি তা

নয়, ভাবতেই পারেনি কেউ, বিশেষ করে হেনরি অগাসটাসের মত লোকে। বলল, লাভের টাকা আমার সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিতে রাজি আছে। তবে, যে কোন খাবার হলে চলবে না। মুরগীর মাংস দিয়ে তৈরি হতে হবে।
সুস্বাদু করে দিতে বলেছেন, ফোড়ন কাটল রবিন। কিন্তু মিস্টার লারসেন নিশ্চয় বিষ মিশিয়ে দিতে বলেননি।
তুমি চুপ করো! ধমকে উঠল আরোলা। ভেঁপো ছোকরা!, আবার জোরে জোরে দম নিয়ে নিজেকে শান্ত করল সে। মুরগী দিয়ে খাবার তৈরি করা সহজ। সেটা অনেকেই পারে। কিন্তু লোকে বার বার খেতে চাইবে, অর্থাৎ, নেশা হয়ে যাবে, এ রকম কি উপাদান মেশানো যায়? ভাবতে লাগলাম। ফ্লেভার মিশিয়ে যতভাবে সম্ভব সুস্বাদু করার চেষ্টা করলাম। হলো-ও। কিন্তু লারসেন যা চেয়েছে। তা হলো না।
তারপর দিলেন মালটিসরবিটেন মিশিয়ে? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
তৃতীয় আরেকটা ক্যানডি খেতে বলল আরোলা। ঘড়ি দেখে বলল, সময় শেষ হয়ে আসছে।... কি মেশালে যে তেমন সুস্বাদু হবে ভেবেই পেলাম না। আমার সাধ্যমত... ও-কি, খাচ্ছ না?
খাব। পরে। বলুন আগে।
কিশোর, সাবধান করল রবিন। খেয়ো না। ড্রিপিং চিকেনে যেমন ক্যারসিনোজেন মিশিয়েছে, ওই ক্যানডিতেও মিশিয়ে থাকতে পারে।
মেশালেই বা কি? ও তো এখনই মরবে এমনিতেই, আরোলা বলল। দশ বিশ বছরের মধ্যে টের পাবে না লোকে, ক্ষতি হবে না। অনেক লম্বা সময়। অনেকে অতদিন বাঁচবে না এমনিতেই। যাই হোক, খাবার যে বিষাক্ত, এটা কোনদিনই টের পাবে না লোকে। ভেবে দেখলাম, ক্যান্সার হয়ে মারা গেলে ধরা পড়ারও কোন আশঙ্কা নেই। ওই রোগ তো আজকাল হরদম হচ্ছে। আমার বানানো খাবার খেয়ে যে হয়েছে, সেটা বোঝার সাধ্য ডাক্তারেরও হবে না। তাই ঠিক করলাম, দেব মিশিয়ে। লারসেনও কিছু জানতে পারবে না। কারণ, তৈরি করা অবস্থায় খাবার আমার কাছ থেকে নিতে হবে তাকে, আগেই বলে দিয়েছি। প্যাকেট করে পাঠিয়ে দেব তার রেস্টুরেন্টে।
ঘড়ির দিকে তাকাল কিশোর। আটটা বাজতে দেরি নেই। সময় ফুরিয়ে আসছে দ্রুত। সেই সঙ্গে ফুরিয়ে আসছে ওদের আয়ু।
আরেকটা প্রশ্ন, বলল সে। আজ রাতে এখানে ফিরে এলেন কেন হঠাৎ করে?
দারোয়ানদেরকে ভাল বেতন দিই আমি। তোমরা ওর সঙ্গে কথা বলে অফিসে ঢোকার পর পরই ফোনে আমার সঙ্গে কথা বলেছে সে। আমার গাড়িতে ফোন

আছে, কিশোরের হাতের ক্যানডিটার দিকে তাকাল সে। খেয়ে ফেল। দেরি করলে আর কোনদিনই খেতে পারবে না। স্বাদটা বলে যাও মরার আগে।
মোড়ক খুলল কিশোর। এটা অন্য দুটোর চেয়ে আলাদা। ভারিও বেশি। মিস্টার এক্স আপনার দলের লোক, তাই না? ওই যে, সারাক্ষণ আর্মি ক্যামমাফ্লেজ জ্যাকেট পরে থাকে?
মিস্টার এক্স? হেসে উঠল আরোলা। নামটা তো ভালই দিয়েছ। অবশ্য তোমার সব কিছুই অন্য রকম। ওর নাম জেনার। আমার পাশের বাড়িতেই থাকে। সেনাবাহিনীতে ছিল, বদ স্বভাবের জন্যে বের করে দিয়েছে। মেজাজও খুব খারাপ। অযথাই লোকের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে। ওকে দলে নেয়া বিপজ্জনক। তবে তার সাহায্য নিই মাঝে মাঝে। টাকার বিনিময়ে। যে মুহূর্তে শুনলাম জুনের কাছে তোমরা ডিটেকটিভ, লারসেনের পার্টিতে, মনে হলো, ওই লোককে দিয়ে তোমাদের ভয় দেখাতে পারি, যাতে আমার ব্যাপারে আর নাক না গলাও। ওকে বললাম। সে প্রথমে টেপ করল তোমাদের টেলিফোন।
হুঁ, মাথা দোলাল কিশোর। এ ভাবেই জেনেছে, চাইনিজ রেস্টুরেন্টে আমরা খাবার কিনতে যাচ্ছি। পিটালুসে যাচ্ছি।
হ্যাঁ। কাজের লোক। খুব চালাক। তবে তোমরা ওর চেয়ে বেশি। তোমাদের সঙ্গে চালাকি করে সুবিধে করতে পারেনি, কিশোরের দিকে পিস্তল নাড়ল। আরোলা। ক্যানডিটা খাও!
খেয়ো না, কিশোর, মুসা বলল।
শুনল না কিশোর। মুখে পুরে দিয়ে চুষতে লাগল। বলল, ক্যারামেল।
অত তাড়াহুড়া কোরো না, আরোলা বলল। আরেকটু খাও। ভাল করে বোঝ। তারপর বলো, হাসছে সে।
আরও কিছুক্ষণ চুষল কিশোর। বলল, আরি, তাই তো! বেশ চালাকি করা হয়েছে! ক্যারামেল আপেল। এখন মনে হচ্ছে আপেলের রসই খাচ্ছি।
তোমার কথা মনে রাখব আমি, আরোলা বলল। তোমার সম্মানেই এই ক্যানডির নাম দেব মিস্টার এক্স। ওরকম গালভরা একটা নামই খুঁজছিলাম। দিয়ে সাহায্য করলে আমাকে। থ্যাংক ইউ।
আপনি একজন ব্রিলিয়ান্ট সাইনটিস্ট, বুদ্ধিমান মার্কেটিং ম্যান, কিশোর বলল। কিন্তু ভয়ঙ্কর খুনী।
যা দিনকাল পড়েছে। কাকে যে কখন কি হয়ে যেতে হবে, ঠিকঠিকানা নেই। যাই হোক, আসল কথা হলো, তোমাদেরকে এখন শেষ করে দিতে হবে। কষ্ট লাগছে আমার।
পিস্তলের সেফটি ক্যাচ তো লক করা, কিশোর বলল। অন করে নিন আগে।

তাই নাকি? ওটার দিকে তাকাল আরোলা।
একটা মুহূর্ত দেরি করল না মুসা। সুযোগটা কাজে লাগাল। চোখের পলকে পাশ থেকে এক লাথি ঝেড়ে দিল, কারাতের ভাষায় একে বলে ইওকো-টোবিগেরি। আরোলার হাতে লাগল। উড়ে গিয়ে মেঝেতে আছড়ে পড়ল ওর হাতের পিস্তল।
কিশোর আর রবিনও আক্রমণ করে বসল। কিন্তু লোকটার গায়ে বেজায় শক্তি। কিছু কারাতে-টারাতেও জানে মনে হলো। রবিনের হাঁটুতে লাথি মেরে তাকে বসিয়ে দিল। ঝট করে ঘুরে মুসাকে ঠেকানোর চেষ্টা করল। পারল না। আঘাতটা আটকে ফেলে গন্ধ-বিজ্ঞানীর বুকে প্রচন্ড এক ঘুসি মারল মুসা। নাক কুঁচকে গেল আরোলার। পিছিয়ে গেল।
সময় দিল না মুসা। শূন্যে লাফিয়ে উঠল। মোচড় দিয়ে ওপরে তুলে ফেলেছে ডান পা, একেবারে সোজা। আইইআহ করে কারাতের বিকট চিৎকার করে প্রচন্ড লাথি লাগাল আরোলার বুকে, একই জায়গায়, যেখানে ঘুসি মেরেছিল।
পড়ে গিয়েও উঠে দাঁড়াল আবার আরোলা। পাগলের মত চারপাশে তাকাচ্ছে। কিশোরের এক সেকেন্ড আগে পিস্তলটা চোখে পড়ল তার। দৌড় দিল তুলে নেয়ার জন্যে।
ডাইভ দিয়ে পড়ল আরোলা। একই সঙ্গে কিশোরও ঝাপ দিল। দুজনেই হাত বাড়াল পিস্তলটা তোলার জন্যে। আগে ধরল আরোলা। তুলে নিয়ে হাসতে আরম্ভ করল হা হা করে। তিন গোয়েন্দার মুখোমুখি হওয়ার জন্যে ঘুরল।
এতক্ষণে লক্ষ্য করল আরোলা, পিস্তলের দিকেই নজর ছিল তার বেশি, যাদের সঙ্গে লড়াই করছে তারা কি করছে খেয়াল করেনি। করার সময়ও ছিল না অবশ্য। ব্রোমিনেটেড সিউডোফসফেটের একটা ভারি পিপা উড়ে এল তার দিকে।
মুসা আর রবিন দুজনে মিলে তুলে ছুঁড়ে মেরেছে। দড়াম করে আরোলার গায়ে লাগল ওটা, পড়ে গেল সে। মেঝেতে পড়ে ফেটে ভেঙে গেল পিপাটা। ভেতরের শত শত পাউন্ড মালটিসরবিটেন ছড়িয়ে গেল মেঝেতে, কিছু পড়ল আরোলার ওপরও।
নিন শিস দিয়ে উঠল রবিন। নিজের ওষুধ নিজেই খানিকটা খেয়ে চাঙা হোন।
ওর কথা শুনতে পায়নি আরোলা। বেঁহুশ হয়ে গেছে মাথায় বাড়ি খেয়ে। ইলেকট্রিকের এক্সটেনশন কর্ড ছিড়ে তার হাত-পা বেঁধে ফেলল মুসা আর কিশোর মিলে।
হুঁশ ফিরল আরোলার। গোঁ গোঁ করে জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে?
তেমন কিছু না, কিশোর বলল। আমাদেরকে মানসিক অশান্তিতে রেখেছিলেন খানিকক্ষণ। তারপর সামান্য মারপিট হলো। চিত হয়ে গেলেন আপনি। এখন

বাঁধা আছেন।
পুলিশকে ডাকার সময় নেই এখন, রবিন বলল। পরে ওদের সঙ্গে দেখা হবে আপনার।
পুলিশ? প্রতিধ্বনি তুলল যেন আরোলা।
হ্যাঁ, কিশোর বলল। আপনার বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ করব আমরা। আমাদের পেছনে ভাড়াটে গুন্ডা লাগানো, খাবারে অবৈধভাবে বিষাক্ত উপাদান মেশানো এবং অবশ্যই আমাদেরকে খুন করতে চাওয়ার কথা রিপোর্ট করব। এর যে কোন একটা অভিযোগই আপনাকে জেলে ঢোকানোর জন্যে যথেষ্ট। যাক, সেটা পরে করব, যেন বক্তৃতা দিচ্ছে, এই ভঙ্গিতে বলল গোয়েন্দাপ্রধান। এখন তাড়াতাড়ি আমাদেরকে বেভারলি হিলটন হোটেলে যেতে হবে। বন্ধ করতে হবে সম্মেলনটা। এই, এসো তোমরা।
আধ ঘণ্টা লাগল। মুসা চালিয়েছে বলেই, রবিন চালালে আরও বেশি লাগত। সে মুসার মত বেপরোয়া চালাতে পারে না। হোটেলের সামনে গাড়ি রেখে দৌড়ে ঢুকল ওরা। কোথায় কি হচ্ছে নির্দেশ রয়েছে নিচের লবিতে। পড়ে জানা গেল এমপায়ার বলরুমে সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন চলছে।
প্রথমেই টেলিফোন করে পুলিশ প্রধানকে খবর দিল কিশোর, জানাল ফেলিক্স আরোলার অবস্থা। তারপর ছুট দিল।
বলরুমে ঢুকল না গোয়েন্দারা। দরজার পাশ দিয়ে দৌড়ে গেল রান্নাঘরে। সেখানে দেখতে পেল চিকেন লারসেনকে। পরনে হলুদ জগিং স্যুট। বুকের কাছে লাল আর কমলা পালক আঁকা। অবশ্যই মুরগীর। পাশে দাঁড়িয়ে আছে জুন আর ডন বারোজ। রান্নাঘরের প্রতিটি কাউন্টারে ট্রেতে স্তূপ করে রাখা ধূমায়িত ড্রিপিং চিকেন।
অ্যাই যে, এসে গেছ, ভালুকের মত বিশাল থাবা তুলে এগিয়ে এলেন লারসেন। বাহু দিয়ে পেঁচিয়ে ধরলেন কিশোরের গলা। সত্যি কথাটা বলবে এর জন্যে জীবনে যদি আর তোমার সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছে না হয়, কথা বলতে ইচ্ছে না করে আমার, যদি ধ্বংস হয়ে যাই, যাব। তবু, সত্যি কথাটা জানতে হবে।
আপাতত এই সম্মেলনের কথা ভুলে যান, কিশোর বলল। মারাত্মক বিষ মেশানো রয়েছে ড্রিপিং চিকেনে। ভয়াবহ ক্যারসিনোজেন ভরে দেয়া হয়েছে। পার্টি ক্যানসেল করুন। বাজারে ছেড়ে থাকলে এখুনি সেগুলো ফিরিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা করুন। নইলে লক্ষ লক্ষ লোক মারা যাবে।
হাঁ করে কিশোরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে লারসেন। রান্নাঘরের সমস্ত খুটুরখাটুর বন্ধ হয়ে গেছে, একেবারে চুপ। তারপর হঠাৎ অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন তিনি,

হাহ হাহ হাহ হা! বলেছিলাম না! ওকে আমি পালকপুত্র করে নেবই! আমাকে কেমন বাঁচিয়ে দিল, দেখলে তো ডন…
ডন পালাচ্ছে! চিৎকার করে উঠল রবিন।
সবাই ফিরে তাকাল। লাফাতে লাফাতে দরজার দিকে ছুটেছে ডন বারোজ।
প্রথমেই যে জিনিসটা চোখে পড়ল সেটা তুলে নিল কিশোর আর মুসা মিলে। লম্বা বড় একটা ট্রে। ড্রিপিং চিকেনে বোঝাই। এক দুলুনি দিয়েই ছুঁড়ে মারল ডনকে সই করে। থ্যাপাত করে তার পিঠে গিয়ে লাগল ট্রেটা। সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল ড্রিপিং চিকেন।
ট্রেটা ছুড়েই ডাইভ দিল মুসা। কাঁধ খামচে ধরল ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাওয়া লোকটার। এক হ্যাঁচকা টানে চিত করে ফেলল মেঝেতে। যেখানে ড্রিপিং চিকেন আর ওগুলোর রস গড়াচ্ছে। মাখামাখি হয়ে গেল ডনের শরীরে।
ভয়াবহ অবাধ্যতা! চেঁচিয়ে উঠল ডন, মুসার হাত থেকে ছাড়া পাওয়ার জন্যে ছটফট করছে। এর জন্যে কোর্ট মার্শাল হওয়া উচিত তোমার!
কোর্টে তো আপনি যাবেন, বারোজ সাহেব, হেসে বলল কিশোর। ড্রিপিং চিকেনে বিষ মেশানোর অপরাধে।
যা খুশি করতে পারো আমাকে নিয়ে। টরচার করতে পারো। নাম, র‍্যাংক, সিরিয়াল নাম্বার সব ছিনিয়ে নিতে পারো। কিন্তু মুখ খোলাতে পারবে না, বেশ গর্বের সঙ্গেই বলল ডন। আত্মবিশ্বাসে ভরপুর।
আপনার মুখ খোলানোর দরকারও নেই। যা বলার আরোলাই বলে দিয়েছে আমাদেরকে। পুলিশ চেপে ধরলে আবারও বলবে। চিকেন লারসেনের খাবারে বিষ মিশিয়ে দেয়ার জন্যে যে আপনি ওকে টাকা খাইয়েছেন, সে কথাও বলবে।
মিথুক! বিশ্বাসঘাতক! গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল ডন। আমি নাকি! সে-ই তো আমাকে টাকা দিল!
হাসি বাড়ল কিশোরের। তাই নাকি? তাহলে আমি ভুল বলেছি। মানে, ভুল আন্দাজ করেছি।
বলে কি? চোখ বড় বড় হয়ে গেছে লারসেনের। বিশ্বাস করতে পারছেন না। অ্যাই, ভাল চাইলে স্বীকার করো সব কথা! ডনকে আদেশ দিলেন তিনি।
জেনারেল, ডন বলল। আপনার ড্রিপিং চিকেনে এমন এক উপাদান মেশানো আছে, কয়েক বছর আগে যা বিষাক্ত বলে ঘোষণা করে দিয়েছে এফ ডি এ। কেমন লাগছে শুনতে?
তুমি আমার সঙ্গে বেঈমানী করেছ! গর্জে উঠলেন লারসেন।
করবই তো। আপনি তো আর আমাকে দশ লাখ ডলার দেননি, ডনও জবাব দিল সমান তেজে। কিন্তু ফেলিক্স আরোলা দিয়েছে।

আর সেই টাকা খেয়ে আপনি খাবারে বিষ মিশিয়েছেন, কিশোর যোগ করল।
দশ লাখ অনেক টাকা। বিশ্বাসী সৈনিককেও বেঈমান বানিয়ে দেয়। আসলে, এসব করতে না এসে অনেক আগেই মারসেনারিতে যোগ দেয়া উচিত ছিল আমার।
আর সহ্য করতে পারলেন না লারসেন। ছুটে গেলেন ডনের কাছে। টান দিয়ে দিয়ে ছিড়ে ফেলতে লাগলেন পকেটে লাগানো মেডেলগুলো, যেগুলো তিনি দিয়েছিলেন কাজের পুরস্কার হিসেবে। তোমার ঘাড়টা মুরগীর ঘাড়ের মত মুচড়ে ভাঙতে পারলে এখন আমি খুশি হতাম! চিৎকার করে উঠলেন তিনি।
এগিয়ে এল কিশোর। আর একটা প্রশ্ন। সে রাতে জুনকে আপনিই তাড়া করেছিলেন, তাই না?
করেছিলাম, স্বীকার করল ডন।
কেন করেছিলেন? বাবার হাত আঁকড়ে ধরে রেখেছে জুন। নইলে যেন পড়ে যাবে।
রিপোর্টটা ছিল আমার ডেস্কের ওপর। ড্রিপিং চিকেনে মেশানোর উপাদানের লিস্ট সহ। অফিস ছুটি হওয়ার পরই সেদিন থেকে গিয়েছিলে তুমি। আমার ঘরে ঢুকে টেবিলে দেখে ফেলেছিলে কাগজগুলো। চেঁচামেচি শুরু করেছিলে। কাগজগুলোতে টপ সিক্রেট লেখা ছিল। অন্যায় ভাবে অনুমতি না নিয়ে পড়ার অপরাধে গুলি করে মারা উচিত ছিল তোমাকে। এ তো রীতিমত গুপ্তচরগিরি।
রিপোর্টটা নিয়ে পালাতে চেয়েছিল জুন, কিশোর বলল। আর আপনি ওকে তাড়া করলেন?
করলাম। তবে ওর ক্ষতি করার কোন ইচ্ছে আমার ছিল না, জুনের দিকে তাকাল ডন। বৃষ্টির মধ্যে তোমার গাড়িটা ঢাল বেয়ে পিছলে পড়ে গেল। ওটা নিছকই দুর্ঘটনা। আমার ব্যাংকের কসম খেয়ে বলছি।
ওকে সাহায্য করলে না কেন তুমি? জিজ্ঞেস করলেন লারসেন।
থেমেছিলাম...সাহায্য করার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু সবার আগে আমার আইডেনটিটি। ওটা তো বাঁচাতে হবে। কাজেই নিজে কিছু না করে পুলিশকে ফোন করলাম। দুর্ঘটনার পুরো বিবরণ জানালাম। নামটা অবশ্যই গোপন রেখে।
বাবা, হাঁপাচ্ছে জুন। এখন আমার মনে পড়ছে। অ্যাক্সিডেন্ট...ভয়ঙ্কর...! কাঁদতে শুরু করল সে। সান্ত্বনা দেয়ার ভঙ্গিতে একহাতে মেয়েকে জড়িয়ে ধরলেন লারসেন।
একটা সময় তো আমরা ধরেই নিয়েছিলাম, কিশোর বলল। এ সবের পেছনে হেনরি অগাসটাসের হাত রয়েছে। তাকে অনুসরণ করে আপনার মুরগীর খামারে চলে গিয়েছিলাম আমরা। ওখানে তাকে বলতে শুনলাম, খামারটা সে কিনে নেবে, মুরগীর খাবার বদলে দেবে।

ওই দুষ্ট মুরগীর ছানাটা কিছু বোঝে না। কোনটা চিকেন ফিড আর কোনটা চিকেন স্যালাড বিন্দুমাত্র ধারণা নেই তার। নিজের খামারের মুরগীদের খাবার কিছুদিন পর পরই বদলাতে থাকে। কতটা ক্ষতি যে করে, বুঝতেই পারে না, লারসেন বললেন। বাজারে গুজব ছড়ায়, আমার ফার্ম সে কিনে নেবে। এসব বলে বলে বোঝাতে চায়, আমি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছি। ও ভাল করেই জানে, খাবার বানিয়ে আমার সঙ্গে পারবে না। আর আমার ব্যবসা কিনে নেয়ার মত অত টাকাও তার নেই। শুধু শুধু শয়তানী করা আরকি।

কিশোর, জুন বলল। এখন তো বুঝতে পারলে, আমার বাবা নির্দোষ। বলো?

হ্যাঁ, অস্বস্তি বোধ করছে কিশোর। লারসেনকে সন্দেহ করেছিল এবং সে কথা বলেছিল বলে। একটা কথা বলবেন? সেদিন স্টুডিওতে কিছুতেই বুঝতে পারছিলাম না, ড্রিপিং চিকেন কামড়ে নিয়েও সেটা বার বার ফেলে দিচ্ছিলেন কেন? আমি ভেবেছি, বিষ মেশানো আছে সেটা বুঝতে পেরেই আপনি খাচ্ছেন না।

খাবারের বিজ্ঞাপনের শুটিঙে সবাই ওরকম করে, লারসেন বললেন। ধর তিরিশ বার তোলা হলো এক ছবি। তিরিশবারই যদি তুমি এক কামড় করে খাও, তাহলে তো গলা পর্যন্ত উঠে আসবে খাবার। একতিরিশ নম্বর কামড়টা বসাতেই ইচ্ছে করবে না আর।

বাবার দিকে ফিরল জুন। বাবা, ওদিকে তো লোক বসে আছে। একশোজন সাংবাদিক নিশ্চয় অস্থির হয়ে উঠেছে ড্রিপিং চিকেনের আশায়। কি করা যায়?

বুকের কাছে আঁকা পালকে হাত বোলালেন লারসেন। উপায় খুঁজছেন মনে মনে। হাসলেন। ব্যবস্থা একটা করেই ফেলব।

ছুটে গেলেন তিনি বলরুমে। দাঁড়ালেন গিয়ে স্পটলাইটের নিচে মাইক্রোফোনের সামনে। গুড ইভনিং, লেডিজ অ্যাণ্ড জেন্টেলম্যান, বলতে লাগলেন তিনি। আপনারা নিশ্চয় ভাবছেন, আজ রাতে কেন আপনাদেরকে দাওয়াত করে এনেছি আমি। আপনারা জানেন, আপনাদের মধ্যে অনেকেই ভাবেন আমি দ্রুত টাকা কামানোর তালে থাকি, আর খবরের হেডলাইন হতে চাই। হাহ হাহ হা!

তার হাসিতে যোগ দিল পুরো কক্ষ। চিকেন লারসেনের স্বভাব আর কথাবার্তার ধরন জানা আছে তাদের। কেউ কিছু মনে করল না।

ভদ্রমহোদয়গণ, আমি আজকে আপনাদের দাওয়াত করেছি আমার বিখ্যাত ফ্রাইড চিকেন খাওয়ানোর জন্যে। আর আমি যে ধোকা দিইনি, সেটা প্রমাণ করার জন্যেই কিছুক্ষণের মধ্যে আসছে... পরের শব্দটা বলতে সময় নিলেন তিনি, ভাবতে হয়েছে বোধহয়, পিজা! ঠিক। পিজা! আর শুনে নিশ্চয় আমার মতই আপনারাও অবাক হয়েছেন। কি খাওয়াতে এনে কি খাওয়াচ্ছি ভেবে।

হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছলেন লারসেন। তবে কদ্রমহোদয়গণ, নতুন কিছুর ঘোষণা দিতে পারব বলে গর্ব হচ্ছে আমার। আজ রাতে আমি ঘোষণা করছি চিকেন লারসেন সিটি স্নিকার অ্যাওয়ার্ড। প্রতি বছরই কোন না কোন পুরস্কার ঘোষণা করি, জানা আছে আপনাদের। এবারও করছি। আমাদের আজকের বিজেতারা হলো কিশোর পাশা, মুসা আমান, আর রবিন মিলফোর্ড। রকি বীচের অনেকেই চেনেন তাদের, অন্তত নাম শুনে থাকবেন। ওরা তিন গোয়েন্দা বলে নিজেদের পরিচয় দেয়। ওদের সম্মানেই আজকের আমার এই পার্টির আয়োজন। কেন পুরস্কারটা দিলাম ওদের, তা নাহয় গোপনই থাক। আড়ালে আড়ালে অনেক বড় কাজ করে ফেলেছে ওরা, লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত মানুষকে অকাল মৃত্যু থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। ওদের প্রতি আমি বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ, সেই মানুষদেরও কৃতজ্ঞ থাকা উচিত, যদিও ওরা জানেই না কেন থাকতে হবে। ঘুরে তাকালেন তিনি। দরজার কাছে দাঁড়ানো বিস্মিত তিন গোয়েন্দাকে হাত নেড়ে ডাকলেন।

এক এক করে মঞ্চে উঠে এল কিশোর, মুসা, রবিন। স্পটলাইটের নিচে এসে দাঁড়াল। আলোর নিচে থাকার জন্যে গাদাগাদি করে দাঁড়াতে হলো ওদের, কারণ বেশির ভাগটাই জুড়ে রয়েছেন চিকেন লারসেন।

বার বার হাত মেলালেন ওদের সঙ্গে। অনেকগুলো ফ্রী কুপন বিতরণ করলেন, যাতে বিনে পয়সায় গিয়ে লারসেন রেস্টুরেন্টে খেতে পারে। টেলিভিশন ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে হাসলেন, হাত নাড়লেন।

শোন, কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে তিন গোয়েন্দাকে বললেন তিনি, বিরাট বিজ্ঞাপন হলো। কয়েক মাস ধরে চলবে এটা টিভিতে।

আপনি খুশি থাকলেই আমরা খুশি, জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর।

হ্যাঁ, আমরা ধন্য, বিড়বিড় করল রবিন। ঠিক, বলল মুসা।

অমন পেঁচার মত মুখ করে রেখেছ কেন? লারসেন বুললেন। প্রতিদিন আমার সঙ্গে তোমাদেরকেও দেখানো হবে টিভিতে। লোকে চিনে ফেলবে। ভাল হলো না?

না, গম্ভীর হয়ে বলল কিশোর হলো না। চেনা হয়ে গেলে গোয়েন্দাগিরিতে খুব অসুবিধে হয়। সুবিধেও হয় অবশ্য, কিছু কিছু ক্ষেত্রে, তবে সেটা কম। এনিওয়ে, মেনি মেনি থ্যাংকস! যা হবার তা তো হয়েই গেছে।

***

ভলিউম ১৯ – গোরস্তানে আতঙ্ক – তিন গোয়েন্দা – রকিব হাসান – সেবা প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল, ১৯৯৩

রাস্তার পাশে গাড়ি নামিয়ে আনল মুসা। অসমতল পথে ঝাঁকুনি খেতে খেতে গোরস্থানটার সামনে এসে থামল ওর ছোট ১৯৭৭ মডেল কমলা রঙের ভেগা গাড়িটা। বেরিয়ে এসে ট্রাংক খুলে একটা হাত চেপে ধরল। লম্বা, রোমশ, ভারি হাতটা। আঙুল নেই, আছে থাবা। কাঁধে নিয়ে ওটা রওনা হলো সে।

খানিক দূর এগিয়ে থামল। ঘড়ি দেখল। নটা বাজে। দেরি হয়ে গেছে! আরও এক ঘণ্টা আগে কিশোরের সঙ্গে দেখা করার কথা।

চট করে একটা ফোন করে আসবে নাকি? কাছাকাছি আছে টেলিফোন? আছে। শখানেক গজ দূরে রাস্তার মাথায় একটা পুরানো নির্জন গ্যাস স্টেশনে।

হাতটা বয়ে নিয়ে দ্রুত স্টেশনটার দিকে এগোল সে। ফোনের স্লটে মুদ্রা ফেলে দিয়ে ডায়াল করল। দুবার রিঙ হতেই ওপাশ থেকে রিসিভার তুলে বলল, তিন গোয়েন্দা, কিশোর পাশা বলছি।

কিশোর, মুসা। সকাল থেকেই তোমাকে ধরার চেষ্টা করছি।

আমি জানি।

কি করে জানলে? অ্যানুসারিং মেশিনটা চালাতে ভুলে গিয়েছিলে। সারা সকাল আমি কোন জবাব পাইনি।

ভুলিনি। মেশিনটা জবাব দিতে পারেনি, তার কারণ ওঅর্কশপের সমস্ত ফিউজ উড়িয়ে দিয়েছি আমি। পুরানো সিসটেমে আর কত? সার্কিট ব্রেকার লাগানর সময় হয়েছে। তোমার দেরি দেখে অবশ্য বুঝতে পারছি কিছু একটা হয়েছে।

কিশোরের এখনকার চিত্রটা কল্পনা করতে পারছে মুসা। ট্রেলার হোমের ভেতরে তিন গোয়েন্দার অফিসে পুরানো একটা ধাতব টেবিলের সামনে পুরানো সুইভেল চেয়ারে বসে আছে, টেবিলে পা তুলে দিয়ে। বলল, ঠিকই আন্দাজ করেছ। কল্পনা করতে পার কোথায় আছি? গোরস্থানে। হান্টিংটন বীচের ড্যালটন সিমেট্রিতে। সাথে রয়েছে স্পেশাল ইফেক্টস হাতটা, দা সাফোকেশন টু ছবিটায় যেটা নিয়ে কাজ করছে বাবা।

হুমম।

নিয়ে যাচ্ছি পরিচালক জ্যাক রিডারের কাছে। বাবা বলেছে, মিস্টার রিডার আমাকে একটা কাজ দেবেন। কেমন লাগছে শুনতে?

ভাল। তবে সাবধান।

কেন?

প্রথম সাফোকেশন ছবিটা করার সময় অনেক অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল।

যেমন?
কথা বলার সময় শেষ হয়ে গেল। সঙ্কেত দিতে লাগল যন্ত্র। পকেট হাতড়ে আর কোন মুদ্রা পেল না মুসা।
পরে কথা বলব, বুঝতে পেরে বলল কিশোর। তোমার কাছে পয়সা নেই বুঝেছি। রিসিভার নামিয়ে রাখল সে।
পকেট বোঝাই করে মুদ্রা রাখবে এরপর থেকে, রেগে গিয়ে প্রতিজ্ঞা করল মুসা। রওনা হলো গোরস্থানের দিকে। কিশোরকে ফোন করে মানসিক যন্ত্রণা বাড়িয়েছে। কি ঘটনা ঘটে ছিল সাফোকেশন ছবিটা করার সময়?
রাস্তা পেরিয়ে এসে গোরস্থানে ঢুকল মুসা। ঘাসে ঢাকা ঢাল বেয়ে নামতে লাগল। গোরস্থান তার কাছে আতঙ্কের জায়গা, দেখলেই গা শিরশির করে ভূতের ভয়ে, তবে এখন অতটা লাগছে না। লোকে গিজগিজ করছে।
প্রথম ঢালের নিচে এক চিলতে সমতল জায়গায় অনেকগুলো কবর, পাথরের ফলক লাগানো রয়েছে। তারপর আবার নেমেছে ঢাল। আরেকটা সমতল জায়গায়। আরও কতগুলো কবর। তার পরে আবার ঢাল, আবার কবর, আবার ঢাল ... এভাবেই নামতে নামতে নেমে গেছে উপত্যকায়। সিনেমার লোকজন রয়েছে ওখানে। খানিকটা ওপরে ঢালে দাঁড়িয়ে রয়েছে কিছু উৎসাহী দর্শক, শুটিং দেখতে এসেছে।
দর্শকদের ভেতর দিয়ে যাওয়ার সময় দুটো মেয়েকে দেখতে পেল মুসা, ওরই বয়েসী। একজন বিনোকিউলার দিয়ে নিচের দৃশ্য দেখছে।
এখন কি করছে? জিজ্ঞেস করল অন্য মেয়েটা।
কবর খুঁড়ছে আর কথা বলছে, আগের মতই।
ওকে দেখা যায়? বেন ডিলনকে? আমি আসলে ওকে দেখতেই এসেছি। যা নীল চোখ না, তাকালেই কেন জানি ধক করে ওঠে বুক!
তাহলে তোর কপাল খারাপ, ওকে না দেখেই ফেরত যেতে হবে।
আপনমনেই হাসল মুসা। ছবির শুটিং কখনও দেখেনি নাকি মেয়েগুলো? কথাবার্তায় সে রকমই লাগছে। হলিউডের নতুন মুভি সুপারস্টার বেন ডিলনও দেখেনি বোঝা যাচ্ছে। এই মুভি স্টারদের নিয়ে সমস্যা, জানে মুসা। ওর বাবা বলেন, কিছুতেই ওদেরকে সময়মত সেটে হাজির করানো যায় না।
শুটিং স্পটের কাছে নেমে এল মুসা। সাফোকেশন-২ হরর ছবি। মরে গেছে। ভেবে ভুল করে একটা লোককে কবর দিয়ে ফেলা হয় এই গল্পে, তারপর লোকটা বেরিয়ে এসে জোম্বি হয়ে যায়। ভীষণ রোমাঞ্চকর।
শুটিং স্পটেই ৩৮ বছর বয়স্ক ৫ ফুট ৮ ইঞ্চি লম্বা পরিচালক জ্যাক রিডারের দেখা পেল মুসা। মস্ত একটা পাথরের ফলকের ওপর পা তুলে দিয়ে ক্যানভাসের

চেয়ারে বসে পোর্টেবল টেলিফোনে কথা বলছেন। কালো কুচকুচে চুলের সঙ্গে মানিয়ে গেছে পরনের কালো টার্টলনেক সোয়েটার আর কালো প্যান্ট।
বেন কোথায়? টেলিফোনে গর্জে উঠলেন রিডার। বার বার কথা দিল আসবে, অথচ...এগুলোর কোনটাকে বিশ্বাস নেই! ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ওপাশের কথা শুনলেন। তারপর বললেন, তুমি তার এজেন্ট, সে জন্যেই তোমাকে বলছি। দুঘণ্টা ধরে বসে আছি, দেখা নেই। এমন করলে কেমন লাগে! জলদি পাঠাও! লাইন কেটে দিয়ে টেলিফোনটা ছুঁড়ে দিলেন কাছেই দাঁড়িয়ে থাকা একটা মেয়ের দিকে। লাল চুল পনি টেল অর্থাৎ ঘোড়ার লেজের মত করে বেঁধেছে মেয়েটা।
রিডার সম্পর্কে বাবা যা বলেছেন, সব ঠিক– এসেই প্রমাণ পেয়ে গেল মুসা। বদমেজাজী, নিজে যা ভাল বোঝেন তাই করেন, কাজ আদায় করে নিতে চান। তবে দর্শকদের মতে ছবি ততটা ভাল হয় না, জনপ্রিয়তা পায়নি কোনটাই, একটা বাদে। ছবিটার নাম মণ্ডো এসো। বক্স অফিস হিট করেছে।
লাল চুল মেয়েটাকে আদেশ দিলেন রিডার, পাম, ব্যাটার বীচ হাউসে ফোন করে দেখো। আছে হয়তো ওখানেই... মুসার দিকে চোখ পড়তে থেমে গেলেন। কী?
রোমশ হাতটা কাঁধ থেকে নামিয়ে মুসা বলল, আমি মুসা আমান। এটা পাঠিয়েছে বাবা। আপনাকে বলতে বলে দিয়েছে, পোড়ালে এক এক করে তিনটে পরতে খুলে যাবে হাতটা। প্রথমে দেখা যাবে মাংসের রঙ, তারপর সবুজ রঙ গোটা গোটা বেরিয়ে থাকবে, সব শেষে লাল একটা স্তর, অনেকগুলো রগ বের হওয়া।
হাতটার দিকে তাকিয়ে এই প্রথম হাসি ফুটল রিডারের মুখে। চমৎকার! খুব। সুন্দর! তোমার বাবা সত্যি কাজ বোঝে। হাতটা একজন প্রোডাকশন। অ্যাসিসটেন্টকে দিয়ে আবার মুসার দিকে ফিরলেন তিনি।
স্কুল নেই আজ তোমার?
না। স্যারেরা জরুরি মিটিঙে বসবেন।
ও। তোমার বাবার কাছে শুনলাম, গাড়িটাড়ি নাকি খুব ভাল চেনো তুমি? সত্যি?
মাথা ঝাঁকাল মুসা।
গুড। গাড়ির একটা বিশেষ দৃশ্য দেখাতে চাই ছবিতে। সাহায্য করতে পারবে?
আবার মাথা ঝাঁকাল মুসা। আমার এক বন্ধু আছে, নিকি পাঞ্চ, সে আর আমি মিলে যে কোন গাড়িকে কথা বলাতে পারি।
কথা বলানোর দরকার নেই আপাতত। রক্ত বের করতে পারবে?
তৃতীয়বার মাথা ঝাঁকাল মুসা।
উইশীল্ড ওয়াশার থেকে রক্ত বের করতে হবে, বললেন পরিচালক। চুঁইয়ে চুঁইয়ে হলে চলবে না, বেরোতে হবে ভলকে ভলকে, ধমনী কেটে গেলে যেমন হয়। ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসে, আবার কমে যায়, বেরিয়ে আসে, কমে যায়।

মুসার ঘাড়ের একটা জায়গায় আঙুল ঠেসে ধরলেন তিনি। শিউরে উঠল মুসা।
গলার শিরা কেটে গেলে কি হয়? বললেন তিনি, হৃৎপিণ্ডের রক্ত পাম্প করার সঙ্গে সঙ্গে পিচকারি দিয়ে পাম্প করার মত রক্ত বেরোয়, কমে যায়, আবার বেরোয়। তেমনি করে বের করতে হবে। প্রথমে অনেক বেশি, আস্তে আস্তে কমে আসবে। পারবে?
কি গাড়ি? শান্তকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল মুসা।
জাগুয়ার এক্স জে সিক্স।
চেহারা স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করছে মুসা। পঁয়তাল্লিশ হাজার ডলার দাম হবে একটা গাড়ির!
পারব, জবাব দিল সে।
ও-কে। হলিউডের এক্সক্লুসিভ কারসের সঙ্গে কথা হয়ে আছে আমার। গিয়ে শুধু বলবে কি জিনিস চাও। পেয়ে যাবে। সোমবারের মধ্যে গাড়ি নিয়ে তোমাকে হাজির দেখতে চাই। পামের দিকে ফিরলেন পরিচালক।
পাচ্ছি না, মিস্টার রিডার, জানাল মেয়েটা, লাইন এনগেজ।
পামের হাত থেকে সেটটা কেড়ে নিয়ে প্রায় আছাড় দিয়ে নামিয়ে রাখলেন। রিডার। আরেক অ্যাসিসটেন্টের দিকে ফিরে ধমকের সুরে বললেন, মারফি, আমার গাড়িটা নিয়ে তুমি আর পাম চলে যাও বেনের বাড়িতে, ম্যালিবু কোর্টে। প্রয়োজন। হলে জোর খাটাবে। ইয়ার্কি পেয়েছে! কন্ট্রাক্ট সই করে এখন তালবাহানা! আর যে-ই করুক, আমি সহ্য করব না!
যাচ্ছি। চশমাটা ঠিক করে নাকের ওপর বসাতে বসাতে বলল মারফি, ম্যালিবু কোর্ট কোথায়? বীচ হাইওয়ের উত্তরে, না দক্ষিণে?
কটমট করে সহকারীর দিকে তাকালেন রিডার। মুখ দেখে মনে হচ্ছে, এখুনি ঝাঁপিয়ে পড়ে কামড়ে টুটি ছিঁড়ে ফেলবেন মারফির। হরর ছবির আরেকটা দৃশ্য সৃষ্টি করে ফেলবেন।
আমি চিনি, মুসা বলল। ম্যালিবুর কাছেই থাকি আমরা। কোস্ট হাইওয়ের ধারে, রকি বীচে। বেন ডিলনের সাথে দেখা করার প্রবল আগ্রহ তার।
তাই? রিডার বললেন, চলে যাও। উড়িয়ে নিয়ে এস ব্যাটাকে। খসখস করে একটা কাগজে ঠিকানা লিখে মুসাকে দিয়ে বললেন, এই দুটোকেও সাথে করে নিয়ে যাও। দরকার লাগতে পারে। বাড়িটা দেখিয়ে দিয়ে, চাইলে ওদের। ঘাড়ে বাকিটা চাপিয়ে দিয়ে কেটে পড়তে পার। যাও। হাত দিয়ে যেন মাছি তাড়ালেন পরিচালক।
রিডারের লাল মার্সিডিজ ৫৬০ এস ই এল গাড়িটাতে উঠল মুসা। কোমল চামড়ায় মোড়া গদি। চমৎকার গন্ধ। সামনের সিটে বসেছে পাম আর মারফি। পেছনের

সিটে মুসা। নরম গদিতে দেবে গেছে শরীর। খুব আরাম। ভেতরে নানারকম যন্ত্রপাতি, অনেক সুযোগ সুবিধে। থ্রি-লাইন টেলিফোন, টিভি, ভিডিও ক্যাসেট প্লেয়ার, ২০০ ওয়াটের অ্যামপ্লিফায়ার আর ডলবি সাউণ্ডযুক্ত স্টেরিও সেট, ছোট রেফ্রিজারেটর, আর আরও অনেক জিনিস। মুসার দুঃখ হচ্ছে মাত্র এক ঘণ্টার পথ যেতে হবে বলে। অনেক দূরের ইনডিয়ানায় এই গাড়িতে চড়ে যেতে পারলেই সে খুশি হত।

প্যাসিফিক কোস্টের ছোট সৈকতের কাছাকাছি এসে গতি কমাল মারফি।

দারুণ জায়গা তো, সৈকতের ধারের সুন্দর বাংলোগুলোর দিকে তাকিয়ে পাম বলল। আমার যদি এরকম একটা বাড়ি থাকত!

কোন দিকে যাব? মুসাকে জিজ্ঞেস করল মারফি।

বাঁয়ে।

মাইলখানেক চলার পর বেন ডিলনের বাড়িটা দেখা গেল। সিডার কাঠে তৈরি একতলা বাড়ি। নেমে গিয়ে বেল বাজাল মারফি। সাথে রয়েছে পাম। মুসা খানিকটা পেছনে। এতবড় একজন অভিনেতার সাথে দেখা করতে যেতে কেমন সঙ্কোচ লাগছে। কি বলবে? আপনি খুব ভাল অভিনয় করেন? অ্যাডভেঞ্চার আর থ্রিলার কাহিনী ছাড়া তো অভিনয় করেন না, হরর ছবিতে করছেন কেন হঠাৎ? টাকার জন্যে? নাহ, এসব বলা ঠিক না। তবে হ্যাঁ, গাড়ি নিয়ে আলোচনা করতে পারে ফেরার পথে।

কয়েকবার বেল বাজিয়েও সারা পেল না মারফি। দরজায় থাবা দিতে লাগল পাম। কাজ হল না। পরস্পরের দিকে বিশেষ দৃষ্টিতে তাকাল দুজনে। অর্থাৎ, ব্যাপার কি?

ডোরনবে মোচড় দিল মারফি। দিয়েই অবাক হয়ে গেল। খোলা। পাল্লা খোলার আগে দ্বিধা করল। ঠেলা দিয়ে খুলে চৌকাঠে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ডাকল, বেন!

জবাব নেই।

ঘরে ঢুকল মারফি আর পাম।

মুসা ভাবছে, কি হল? আরেকবার মারফিকে ডাকতে শুনল, অ্যাই, বেন!

বাড়ির ভেতরের কোন ঘর থেকে ডাকটা শোনা গেল, তারপর নীরবতা। বড় বেশি চুপচাপ হয়ে গেল যেন সব কিছু। সতর্ক হয়ে উঠল মুসার গোয়েন্দামন। কোন গণ্ডগোল হয়েছে। ঢুকে পড়ল সে। ঢুকেই থমকে গেল।

লিভিংরুমটা দেখতে পাচ্ছে। মনে হচ্ছে, ঝড় বয়ে গেছে ঘরটাতে। সমস্ত আসবাবপত্র উল্টোপাল্টা, কিছু কিছু ভাঙা। কাত হয়ে পড়ে আছে একটা ভাস্কর্য। লম্বা টেবিল ল্যাম্প আর টবে লাগান গাছের চারাগুলোও কাত হয়ে আছে মেঝেতে। জিনিসপত্র ভেঙেচুরে তছনছ। থ্রিলার ছবির দৃশ্যের মতই লাগছে।

ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে মারফি আর পাম। মূর্তির মত স্থির। কি করবে বুঝতে পারছে না।
হলোটা কি? বিড়বিড় করল পাম।
বাকি ঘরগুলোও দেখা দরকার, মুসা বলল।
কেন? মারফির প্রশ্ন।
কি দেখব? জিজ্ঞেস করল পাম।
আরেকবার পুরো ঘরটায় চোখ বোলাল মুসা। গম্ভীর হয়ে বলল, লাশ!
.
যাহ, লাশ থাকবে কেন? বিশ্বাস করতে পারছে না পাম।
জবাব দিল না মুসা। গণ্ডগোল যে হয়েছে সে তো দেখতেই পাচ্ছে। প্রচণ্ড লাফালাফি করছে হৃৎপিণ্ডটা। দম নিতে কষ্ট হচ্ছে। মাথার ভেতরটা হালকা লাগছে। অক্সিজেনের ঘাটতি পড়েছে যেন ঘরে।
মাথা ঝাড়া দিয়ে মাথার ভেতরটা পরিষ্কার করতে চাইল সে। বলল, আসুন, ঘুরে দেখি।
মুসার জুতোর তলায় পড়ে কাচের টুকরো গুড়ো হচ্ছে। ছড়িয়ে রয়েছে। ওগুলো। কোন জিনিস না ছুঁয়ে, যেটা যেভাবে রয়েছে না নড়িয়ে, সতর্কতার সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে লাগল সে। ভাবছে, কি হয়েছিল এখানে? বেডরুমে ঢুকল। ফোনের তার ছেঁড়া। ফোন করে তখন কেন জবাব পায়নি পাম, বোঝা গেল।
বেন নেই! ডাকাতি-টাকাতি হয়নি তো? মুসার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। মেয়েটা।
জানি না। ডাকাতেরা ড্রয়ার আর আলমারি ঘাটে শুনেছি, চেয়ার-টেবিল উল্টে ফেলতে শুনিনি। কিছু চুরি গেল কিনা দেখে বলতে পারবেন?
উঁচু একটা আলমারির দুটো ড্রয়ার খুলে দেখল পাম। ছোয়ওনি কিছু।
তোমার কথাবার্তা যেন কেমন লাগছে? ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল মারফি। মনে হচ্ছে এ লাইনে অভিজ্ঞতা আছে...।
আমি গোয়েন্দা, বলতে গিয়েও থেমে গেল মুসা। এখনই সেটা জানান। বোধহয় ঠিক হবে না। তবে কিছু একটা বলা দরকার। বাঁচিয়ে দিল পাম, চলে যাওয়া উচিত...।
এখনই কি? আবার কাচের টুকরো মাড়িয়ে লিভিংরুমে ফিরে এল মুসা। এত কাচ এল কোথা থেকে? ভাবতে গিয়ে কিশোরের একটা কথা মনে পড়লঃ কি ভেঙেছে সেটা যদি বের করতে না পার, কি ভাঙেনি সেটা দেখো।
কাচ এল কোথা থেকে বের করার জন্যে রান্নাঘরে এসে ঢুকল মুসা। আলমারি খুলে সেগুলোর অবস্থা দেখতে লাগল।

এই, করো কি? মুসার কাঁধ খামচে ধরল মারফি। বিখ্যাত অভিনেতার ঘর থেকে স্যুভনির নেয়ার মতলব?
কাচ ভাঙা এল কোত্থেকে দেখতে চাইছি।
কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে নিল মারফি। লজ্জিত কণ্ঠে বলল, সরি! মাথার ভেতরটা কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।
কাচের সব জিনিসই মনে হলো ঠিক আছে, কিছু ভাঙেনি। জানালাগুলো দেখল মুসা। ভাঙা নেই একটাও। ফুলদানীও সব আস্ত। মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছে না ফুল কিংবা পানি।
কয়েকবার করে ঘরগুলো দেখল মুসা। কিছু বুঝতে পারল না। পারলে ভাল হত! রহস্যের সমাধান করে অবাক করে দিতে পারত কিশোর আর রবিনকে।
কিন্তু পারল না।
গোরস্থানে ফেরার পথে চুপচাপ রইল মুসা। শুনছে মারফি আর পামের উত্তেজিত আলোচনা। নানা রকম যুক্তি খাড়া করছে ওরা। ওদের ধারণা, বাড়িটাতে ওসব ঘটার আগেই বেরিয়ে গেছে বেন। কিংবা মাতাল হয়ে এসে নিজেই ওই অবস্থা করেছে ঘরবাড়ির, শেষে রাত কাটাতে গেছে কোন মোটেলে।
ওদের এসব যুক্তি হাস্যকর লাগছে মুসার কাছে। শুনলই শুধু, কিছু বলল না। বলতে গেলে ওরাও তার মতামত শুনতে চাইবে। বলতে পারবে না সে। কিছুই ভেবে বার করতে পারেনি এখনও। কাজেই চুপ থাকতে হলো।
রিয়ার-ভিউ মিররে মুসার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল মারফি, ঠিক পথেই যাচ্ছি তো?
না। ডানে মোড় নিয়ে তারপর দক্ষিণে।
গোরস্থানে রিডারকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল সদ্য খোঁড়া একটা কবরের মধ্যে। ধমক দিয়ে একজন অভিনেতাকে বোঝাচ্ছে কি করে বেলচা দিয়ে কবরের মাটি সরাতে হবে।
কবরের পাশে দাঁড়িয়ে এক বৃদ্ধ। ছিপছিপে শরীর, বেশ সুঠাম, নিয়মিত টেনিস খেলেন বা অন্য ব্যায়াম করেন বোঝা যায়। পরনের সাদা প্যান্ট আর গায়ের পিচ রঙের পোলো শার্ট রোদেপোড়া চামড়া ও ধবধবে সাদা চুলের সঙ্গে মানিয়েছে বেশ।
বেন কই? তিনজনকে ফিরতে দেখে ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন রিডার।
আপনার সঙ্গে একটু একা কথা বলা যাবে? কবরের দিকে তাকিয়ে বলল মুসা।
কবর থেকে উঠে এলেন রিডার। মুসা, মারফি আর পামের সঙ্গে সরে যেতে লাগলেন একটা নির্জন জায়গায়। পেছনে আসতে লাগলেন বৃদ্ধ ভদ্রলোক। পায়ের শব্দে মুসা ফিরে তাকাতেই হেসে আন্তরিক গলায় বললেন, আমি ব্রাউন

অলিংগার। সাফোকেশন টু-র প্রযোজক। চেকগুলো যেহেতু আমাকেই সই করতে হবে, জানা দরকার টাকাগুলো সব পানিতে ফেলছে কিনা জ্যাক।
দ্বিধা করল মুসা। রিডার কিছুই বললেন না। বলল সে, ডিলন নেই।
মুসার চোখের দিকে তাকালেন অলিংগার। হাত বাড়িয়ে কাঁধ খামচে ধরলেন। শক্তি আছে। কানের কাছে বিপবিপ করল তার হাতঘড়ির অ্যালার্ম। আমাকে ভয় দেখানর চেষ্টা, না? এমনিতেই তো চুল সব পেকে গেছে, আর কি। পাকাবে? কে তুমি?
মুসা বলার আগেই রিডার বলে দিলেন, ও রাফাতের ছেলে।
বেনের ঘরে সব তছনছ! পাম বলল, যুদ্ধ করে গেছে যেন!
যুদ্ধ? হাসলেন রিডার। বেন? একটা মাছি মারার ক্ষমতাও নেই ওর। বাহাদুরি যা দেখায় সবই ছবিতে, অভিনয়ে। পর্দায় দেখলে তো মনে হয় ওর মত নিষ্ঠুর লোক আর নেই।
তাহলে অন্য কেউ ওই অবস্থা করেছে বেনের ঘরের, অলিংগার বললেন। ও তখন ছিল না।
আমারও সে রকমই ধারণা, মারফি বলল।
বেন সারারাত বাড়ি আসেনি, মুসা বলল।
অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল সবাই।
তুমি কি করে জানলে? পামের প্রশ্ন।
শোবার ঘরেও তো ঢুকেছি আমরা। বিছানাটা দেখেননি? কেউ ঘুমায়নি ওতে, দেখেই বোঝা যায়।
চালাক ছেলে। বাপের মত। অলিংগার বললেন, যাই বলো, ঘটনাটা স্বাভাবিক লাগছে না।
অলিংগারের প্রশংসায় বুক ফুলে গেল মুসার। ভাবল, কিশোর যতই আমাকে মাথামোটা বলুক, গোয়েন্দা হিসেবে খারাপ নই আমি। তিন গোয়েন্দার একটা কার্ড বের করে দিয়ে বলল, মিস্টার অলিংগার, আশা করি আপনাকে সাহায্য করতে পারব। এখানে আরও দুটো নাম দেখছেন, ওরা আমার বন্ধু...;
তিন গোয়েন্দা? হাসলেন প্রযোজক। না, আপাতত সাহায্য লাগবে না। প্রয়োজন হলে পরে দেখা যাবে। আগে দেখি ও আসে কিনা। এখানে তার জন্যে চব্বিশ ঘণ্টা অপেক্ষা করব আমরা।
চব্বিশ ঘণ্টা? আঁতকে উঠলেন রিডার, খরচ কত বাড়বে জানেন? বরং আরেক কাজ করতে পারি। বসে না থেকে অন্য দৃশ্যের শুটিং করি, মানুষের হৃৎপিণ্ড ছুঁড়ে বের করার দৃশ্যটা।
স্ক্রিপ্টে ওটা নেই, জ্যাক।

তাতে কি? ভাল আলো আছে। লোকজন আছে। গ্যালন গ্যালন রক্ত জোগাড় করা আছে। লোকে রক্তপাত দেখতে পছন্দ করে।
স্ক্রিপ্টে নেই, কাজেই বাজেটেও নেই। বাড়তি খরচ করতে পারব না।
ব্রাউন, ডিরেক্টর আপনি নন, আমি। কাজেই ছবি বানানোর ব্যাপারে আমার সিদ্ধান্তই মেনে নিতে হবে আপনাকে।
অলিংগার জবাব দেয়ার আগেই রওনা হয়ে গেলেন রিডার। কয়েক পা এগিয়ে ফিরে তাকিয়ে মুসাকে বললেন, রক্তাক্ত গাড়ির কথা ভুলো না। সবুজ জাগুয়ার চাই আমি, কালচে সবুজ।
লোকজন যেখানে অপেক্ষা করছে সেদিকে চলে গেলেন রিডার। মুসা, পাম আর মারফির দিকে তাকিয়ে হাসলেন অলিংগার। কণ্ঠস্বর নামিয়ে বললেন, একমাত্র আমরাই জানলাম বেন ডিলন বাড়ি নেই। আর কেউ যেন না জানে। লোকে জানলে ছবির বদনাম হবে। কোন স্ক্যাণ্ডাল চাই না। এমনিতেই আলসারের রোগী আমি, দুশ্চিন্তায় থেকে সেটা আর বাড়াতে চাই না। কাল পর্যন্ত অপেক্ষা। করব। তার পরেও বেনের খোঁজ না পেলে একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। তবে তখনকারটা তখন। বুঝতে পেরেছ?
কেউ জানবে না,কথা দিল পাম।
আমরা অন্তত বলব না, বলল মারফি।
বেশ, অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজি হলো মুসা। তার ইচ্ছে ছিল চমৎকার একটা রহস্যের তদন্ত করে একাই বাজিমাত করে দিয়ে হিরো হয়ে যাবে।
তাহলে কথা দিলে, হাত বাড়িয়ে দিলেন অলিংগার।
বেনের উধাও হওয়ার কথা কাউকে বলতে না পারলেও এখানে শুটিং দেখায় কোন দোষ নেই। রকি বীচে ফেরার তাড়া নেই মুসার।
লাঞ্চে বসেছে কয়েকজন টেকনিশিয়ান।
আজকে আর শুটিং হবে বলে মনে হয় না, একজন বলল খাবার চিবাতে চিবাতে। বেন আসছে না। অহেতুক বসে আছি আমরা।
আরেকজন বলল, মনে হচ্ছে, এই ছবিটাতেও গোলমাল হবে। ওর নাম ডজ।
মানে?
মানে আর কি? তোমরা তো প্রথম সাফোকেশনে কাজ করনি, করলে বুঝতে।
কি বুঝতাম?
কি কাণ্ডটাই যে হয়েছিল! জিনে ধরেছিল যেন ছবিটাকে।
আরে বাবা খুলেই বল না! অধৈর্য হয়ে বলল প্রথম টেকনিশিয়ান।
মুখের খাবারটা চিবিয়ে গিলে নিল ডজ। তারপর বলল, যতবারই জ্যান্ত কবর দেয়ার দৃশ্যটা নেয়ার চেষ্টা করলাম, কথা আটকে যেতে লাগল। পরিচালকের।

কিছুতেই আর বলতে পারেন না। এক অদ্ভুত কাণ্ড! যা তা ডিরেক্টর নন, শ্যাডো জিপসন। আজেবাজে প্রযোজকের কাজ করেন না তিনি, জ্যাক রিডারের মত যা পান তাই করেন না। সেজন্যেই সাফোকেশন টু করতে রাজি হননি তিনি। প্রথম ছবির হিরো কোয়েল রিকটারও ছবিটা শেষ করার পর পরই অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, স্নায়বিক রোগে। পুরো একটা বছর ভুগেছে। কাজ করার সময় আমারও খারাপ লাগত। শুটিঙের সময় মাথা ঘুরত। কেন, বুঝতে পারতাম না।
ওসব কিছু না, বলল অল্প বয়েসী একটা মেয়ে, সে-ও টেকনিশিয়ান, সব ছবির শুটিঙেই কমবেশি গোলমাল হয়।
তা হয়। তবে ওটার মত না। ওটাকে জিনে ধরেছিল! শুরুটা এটারও সুবিধের লাগছে না।
এরপর অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল ওরা। একসারি কবরের কাছে সরে এসে একটা ফলকে পিঠ ঠেকিয়ে বসল মুসা। ভেসে আসছে ক্যাসেট প্লেয়ারে বাজান বিটলসের গান। রবিন আর কিশোর থাকলে এখন কি কি কথা হত, কল্পনা করতে পারছে সে। রবিন বলত বিটুলস্ কি ধরনের গান, কোন অ্যালবামে পাওয়া যাবে। তারপর শুরু করত বস বার্টলেট লজের কথা, তিনি কি কি গান শুনতে পছন্দ করেন, বিটলস কতটা ভালবাসেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিশোর এসব গানবাজনার ধার দিয়েও যেত না, সে বলত মুসাকে শান্ত হয়ে চোখ খোলা রাখতে, যাতে সব কিছু চোখে পড়ে। বোঝাত, জিন বলে কিছু নেই।
কিন্তু ওরা আজ নেই এখানে। আমাকে একাই সামলাতে হবে এই কেস। একা! ক ছায়া পড়ল গায়ে। ফিরে তাকিয়ে দেখল, একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে।
খুব চিন্তিত মনে হচ্ছে? বলল লোকটা। লম্বা, বয়েস চল্লিশের কোঠায়, মাথার ওপরের অংশের চুল খাটো করে ছাটা, ঘাড়ের কাছেরগুলো লম্বা লম্বা। পরনে ঢিলাঢালা সাদা পোশাক। অনেকগুলো বেল্ট, নেকলেস আর ব্রেসলেট লাগিয়েছে। গলায়, হাতে, কোমরে। সেগুলোতে লাগানো রয়েছে নানা ধরনের স্ফটিক।
রহস্যময় গলায় বলল লোকটা আবার, মাঝে মাঝে ঢেউয়ের সঙ্গে লড়াই না। করে গায়ের ওপর দিয়ে চলে যেতে দিতে হয়। মুসার মুখোমুখি ঘাসের ওপর আসনপিড়ি হয়ে বসল সে। দুহাত দিয়ে মুসার ডান হাতটা চেপে ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে নিজের নাম বলল, আমি পটার বোনহেড।
আমি মুসা আমান। আপনি কি অভিনেতা?
হেসে উঠল লোকটা, আন্তরিক হাসি, তাতে কুটিলতা নেই। সারাটা সময় আমি আমি হতেই পছন্দ করি, অভিনেতা নয়। অন্য কোন চরিত্র নয়। তোমার ব্যাপারটা কি? এই সিনেমা- রোগীদের সঙ্গে মিশলে কি করে?

আমি সিনেমার লোক নই, মুসা বলল। তবে এই ছবিতে একটা কাজ পেয়েছি।
গলায় ঝোলানো রূপার চেনে লাগানো লম্বা চোখা মাথাওয়ালা গোলাপী একটা স্ফটিকে আঙুল বোলাতে লাগল বোনহেড। এটাতে কাজ করার মানে জানো? দোরাস্তার কাছে থমকে যাওয়া। কোন দিকে যাবে বুঝতে পারবে না।
লোকটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে মুসা। আশ্চর্য! এ রকম করে কথা বলে। কেন?
আবার বলল বোনহেড, এরকম পরিস্থিতিতে কোন দিকেই তোমার যাওয়া উচিত না। বিপদ কাটানোর ওটাই সব চেয়ে সহজ পথ।
সন্দেহ জাগতে আরম্ভ করেছে মুসার। এসব উক্তি কোথা থেকে ধার করেছে সে? চীনা জ্যোতিষির সাগরেদ নয় তো?
গলা থেকে রূপার চেনটা খুলে নিয়ে মুসার হাতে দিতে গেল সে।
নো, থ্যাঙ্কস, মানা করে দিল মুসা, গহনা-টহনা পরতে আমার ভাল লাগে না।
এটা গহনা নয়, বোনহেড বলল, নাও। এর সঙ্গে কথা বলো, শব্দের কাঁপুনিতেই সাড়া দেবে। চেন থেকে স্ফটিকটা খুলে নিয়ে জোর করে মুসার হাতে গুঁজে দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। শুনবে, বুঝলে, কথা শুনবে স্ফটিকটার। আমি শুনেছি। এটা আমাকে বলল, এখানে একজনের ব্যাপারেই মাথা ঘামাতে। কার। কথা জানো? তুমি।
সাবধান করছেন, না হুমকি দিচ্ছেন?
কঠিন স্বরে বলল মুসা। লোকটাকে বুঝতে দিল না বুকের ভেতর কাঁপুনি শুরু হয়ে গেছে ওর। অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছে। বেন ডিলনের ঘরেও এরকম হয়েছিল। যেন সমস্ত অক্সিজেন শুষে নেয়া হয়েছে বাতাসের। শ্বাস নিতে কষ্ট হয়।
মুসার দিকে তাকাল বোনহেড। ওরকম কিছু বলছি না। আমার তৃতীয় নয়ন। যা দেখেছে তাই কেবল জানাতে এলাম।
দেখুন, সহজ করে জবাব দিন দয়া করে। আমি কি কোন বিপদে পড়তে যাচ্ছি?
স্ফটিকটাকে জিজ্ঞেস করো। আর দাঁড়াল না বোনহেড।
মুঠো খুলে তালুতে রাখা গোলাপী জিনিসটার দিকে তাকিয়ে রইল মুসা। রোদ লেগে চকমক করছে। গরম হয়ে গেছে। আর বসে থাকতে পারল না। লাফিয়ে উঠে গাড়ির দিকে রওনা হলো।

.

যেন ঘোরের মধ্যে গাড়িটার দিকে এগোচ্ছে মুসা। এমন সব ঘটনা ঘটছে, একা আর সমাধান করতে পারবে বলে মনে হচ্ছে না। আত্মবিশ্বাস কমে আসছে। নিজের ওপর ভরসা নেই আর তেমন।
কবরগুলোর কাছ থেকে সরে এসে দেখল, একজন অভিনেত্রীর গলা টিপে ধরেছেন রিড়ার। দম বন্ধ করে দিয়ে বোঝাতে চাইছেন, বাতাসের জন্যে ছটফট

করে কিভাবে মরতে হবে। পরিচালকের ভাবভঙ্গি দেখে ঘাড়ের চুল দাঁড়িয়ে গেল ওর। ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে রিডারের চেহারা। যেন অভিনয় নয়, সত্যি সত্যিই মেয়েটাকে মেরে ফেলছেন তিনি।
ঘড়ি দেখল মুসা। আজ আর জাগুয়ারটাকে আনতে যাওয়ার সময় নেই। আগামী দিন ছাড়া হবে না।
বাড়িতে এসে সোজা বেডরুমে ঢুকল। রিসিভার নামিয়ে রাখল। ফোন ধরারও মানসিকতা নেই। কিশোর আর রবিনের সঙ্গে কথা বলতে চায় না। শুটিং স্পটের। রহস্যগুলো মাথা গরম করে দিয়েছে ওর। ফারিহার সাথে কথা বলতেও ইচ্ছে করছে না। তার চেয়ে রেডিও নিয়ে পড়ে থাকা ভাল। শুনতে চায়, কোনো স্টেশন। বেন ডিলনের নিরুদ্দেশ হওয়ার সংবাদ দেয় কিনা। কিন্তু ওই ব্যাপারে একটা শব্দও উচ্চারণ করল না কেউ।
পরদিন শনিবার। ঘুম ভাঙার পর প্রথমেই মনে হল মুসার, কেসটা, এখনও বহাল আছে তো? কাজে যোগ দিতে এসেছে ডিলন? নাকি রহস্যটা রহস্যই থেকে গেছে? তৈরি হয়ে বাড়ি থেকে বেরোল সে। গাড়ি নিয়ে রওনা হল পঞ্চাশ মাইল। দক্ষিণের ড্যালটন সিমেট্রিতে। পৌঁছে দেখল অবিকল আগের দিনের মতই দৃশ্য। পরিচালক, অভিনেতা-অভিনেত্রী, টেকনিশিয়ান, শ্রমিক সবাই হাজির। কিছুই করার নেই তাদের। ডিলনের জন্যে অপেক্ষা করছে।
অনেক বড় একটা ফলকের ওপাশ থেকে জগিং করতে করতে বেরিয়ে এলেন ব্রাউন অলিংগার। পরনে টেনিস খেলার সাদা হাফপ্যান্ট, গায়ে সাদা শার্ট। মুসাকে দেখেই বলে উঠলেন, এই যে, এলে। বাবা কেমন আছে তোমার?
ভাল। বেন ডিলনের কোন খবর পেলেন?
নাহ, হাসিটা মিলিয়ে গেল অলিংগারের।
পুলিশে খবর দেবেন তো?
এক জায়গায় দাঁড়িয়ে জগিং করতে লাগলেন অলিংগার। হাতঘড়িটা বিপ বিপ করে অ্যালার্ম দিতে শুরু করতেই চাবি টিপে সেটা বন্ধ করে দিলেন। বললেন, না। এসব অনেক দেখেছি। নাম করে ফেললেই এরকম শুরু করে। সবাইকে টেনশনে রেখে যেন মজা পায়। অবশ্যই অন্যায় করে, তবে অপরাধ নয় যে পুলিশে খবর দিতে হবে।
তাহলে কি করবেন?
আর সবাই যা করে। অপেক্ষা করব, ওর আসার। গোয়েন্দাগিরি লাগবে না। দয়া করে কিছু করতে যেও না। আমার আপত্তি আছে।
চুপ করে ভাবতে লাগল মুসা, কি করা উচিত? কিশোর হলে কি করত? ডিলনের বাড়িতে যে সব কাণ্ড হয়ে আছে, তার কি জবাব? আর ভাঙা কাচ? তার মতে,

তদন্ত একটা অবশ্যই হওয়া দরকার। এবং এখনই। কিন্তু অলিংগার যেভাবে মানা করছেন...

আবার সঙ্কেত দিতে লাগল অলিংগারের ঘড়ি। চাবি টিপে বন্ধ করে বললেন, আমাকে যেতে হচ্ছে। পরে কথা বলব।

দ্বিধায় পড়ে গেল মুসা। হাঁটতে হাঁটতে ফিরে এল নিজের গাড়ির কাছে। অলিংগার প্রযোজক, অনেক ছবিরই প্রযোজনা করেছেন, অভিজ্ঞতা আছে, তার চেয়ে অনেক বেশি চেনেন অভিনেতাদেরকে। হয়ত ঠিকই বলেছেন, সময় হলেই এসে হাজির হবে ডিলন। ওসব নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে এখন তার গাড়ি আনতে যাওয়া উচিত। ওটাই তার আসল কাজ।

গাড়ি চালিয়ে রাস্তার মাথায় ফোন বুদে চলে এল সে। মেরিচাচীর বোনের ছেলে, নিকি পাঞ্চকে ফোন করার জন্যে। রকি বীচে এসেছে বেশিদিন হয়নি নিকি। একেক জনের কাছে সে একেক রকম। মুসার কাছে মোটর গাড়ির জাদুকর।

রবিনের কাছে এক বিরাট প্রশ্ন। কখন যে বিশ্বাস করা যাবে নিকিকে বলার উপায় নেই।

কিশোরের কাছে। একটা আগাগোড়া চমক। একদিন যেন আকাশ থেকে রকি বীচের মাটিতে খসে পড়েই বোমার মত ফাটল বুউউউম! সৃষ্টি করল এক জটিল রহস্য।

সেই নিকি পাঞ্চ উধাও হয়ে গিয়ে আবার হাজির হয়েছে ক্যালিফোর্নিয়ায়, অর্ধেক সময় ব্যয় করে পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে, পুরানো গাড়ির পার্টস খোঁজে আর মুসাকে শেখায় কি করে ইঞ্জিন ফাইন-টিউন করতে হয়, বাকি অর্ধেক সময় কোথায় থাকে সে-ই জানে।

একটা গ্যারেজের ওপরের ঘরে থাকে নিকি। সপ্তমবার রিং হওয়ার পর ফোন তুলল। যাক, আজ তাড়াতাড়িই ধরল। সাধারণত বারোবারের মাথায় ছাড়া সে ধরে না। ধরেই জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে?

আমি, মুসা। একটা জাগুয়ার আনতে যাচ্ছি।

নিকির মুখে কফি, বরবর আওয়াজ হল, গিলে ফেলল তাড়াতাড়ি। জাগুয়ারের তালা খোলা খুব সহজ, কিন্তু চাবি ছাড়া স্টার্ট দেয়া বড় কঠিন।

নিকি ভাই, চুরি নয়, কিনে আনতে যাচ্ছি।

হেসে উঠল নিকি। জাগুয়ার কিনবে? আর লজ্জা দিও না। জান কত...?

বাধা দিয়ে মুসা বলল, জানি। সত্যিই কিনব। আমার জন্যে না। একটা ফিল্ম। কোম্পানি...

ও, তাই বলো। যাব। গাড়ি পছন্দ করতে ভাল লাগে নিকির, খুশি হয়েই রাজি হল।

সকালটা শেষ হওয়ার আগেই এক্সকুসিভ কারসের শোরুমে এসে ঢুকল মুসা আর নিকি। দোকানটার আরেকটা ডাকনাম রয়েছে ওখানে, এক্সপেনসিভ কারস, অর্থাৎ অনেক দামি গাড়ি।
হলিউডে ব্রাউন অলিংগারের নাম শুনলেই অনেক বড় বড় দোকানদার গদগদ। হয়ে যায়। গাড়ির দোকানদারও তাদের মধ্যে একজন। নতুন গাড়ি, পছন্দ করতে সময় লাগল না। ঘন্টাখানেক বাদেই কালচে সবুজ একটা জাগুয়ার এক্স জে সিক্স নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ওরা।
রকি বীচে এসে ঘন্টার পর ঘন্টা ঘুরে বেড়াল। নিকি ঘুরল গাড়িটার কোথাও কোন গোলমাল আছে কিনা বোঝার জন্যে, আর মুসা ঘুরল ওখানকার পরিচিত মানুষকে দেখানর জন্য যে সে একটা জাগুয়ার চালাচ্ছে। ঘোরার আরও একটা কারণ, বেন ডিলনের ব্যাপারে খোঁজখবর নেয়া। ঘরময় ছড়ান ভাঙা কাচ, স্ফটিক, আর বোনহেডের রহস্যময় হুশিয়ারির ব্যাপারগুলোও ওর মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে।
এসব কথা তোমার দুই দোস্তকে না বলে আমাকে বলছ কেন? নিকি বলল।
আমি একাই সারতে চাই।
হেসে মাথা ঝাঁকিয়ে নিকি বলল, বেশ, দেখো চেষ্টা করে।
চালিয়ে-টালিয়ে অবশেষে মুসার গুহায় এসে ঢুকল ওরা। মুসার গুহা নামটা দিয়েছে কিশোর। ইয়ার্ডের জঞ্জালের ভেতরে লুকান ট্রেলার যেটাতে তিন গোয়েন্দার হেডকোয়ার্টার, তার পাশেই তৈরি করা হয়েছে মুসার এই ব্যক্তিগত গ্যারেজ। গাড়িটাড়ি সব এখানে এনেই মেরামত করে সে।
অনেক সময় আছে কাজটা সারার, পুরো দেড় দিন, মুসা বলল।
অত সময় লাগবে না, একটা স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে উইশীল্ড-ওয়াশারের ফ্লুইড ট্যাঙ্কটায় টোকা দিয়ে বলল নিকি। এটা সরিয়ে প্রথমে আরও বড় একটা লাগাতে হবে।
লাগাতে বেশিক্ষণ লাগল না। চাপ বাড়ানোর জন্য ছোট একটা এয়ার পাম্পও লাগিয়ে দিল। তারপর, শেষ বিকেলে বাড়িতে ছুটল মুসা, ওর বাবার কাছ থেকে কিছু কৃত্রিম রক্ত নেয়ার জন্যে। ছবির প্রয়োজনে এই রক্ত রাখতে হয় মিস্টার আমানকে।
রক্ত আনার পর নিকি বলল, দেখো লাগিয়ে, কাজ হয় কিনা।
ওয়াশার বাটন টিপে দিল মুসা। ওয়াশার নজল দিয়ে পিচকারির মত ছিটকে বেরোল রক্ত। কিন্তু উইণ্ডশীল্ডে না লেগে লাগল গিয়ে ছাতে।
হলো না! বলে উঠল সে। গাড়িটার এই অবস্থা দেখলে আমাদের হৃৎপিণ্ড টেনে ছিঁড়বেন রিডার। হঠাৎ করেই মুসা অনুভব করল আবার তার দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, ভারি কিছু চেপে বসছে বুকে। দুহাতে স্টিয়ারিং আঁকড়ে ধরল সে।

কি হলো? জিজ্ঞেস করল নিকি।
জানি না, বলে গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল মুসা, দম নেয়ার জন্যে। তার মনে হতে লাগল এটা সেই জিন, সাফোকেশনের জিন। স্ফটিকটার কারসাজিও হতে পারে। প্যান্টের পকেট থেকে বের করল ওটা। হাতে আবার গরম লাগল।
কি ওটা? জানতে চাইল নিকি।
মুসার পেছন থেকে জবাব এল, স্ফটিক। কোয়ার্জ কিংবা টুরম্যালাইন হবে, ভালমত পালিশ করা। এক মাথা চোখা তাই একে বলা হয় সিঙ্গল-টারমিনেটেড ক্রিস্টাল।
এভাবে কথা কেবল একজনই বলে। ঝট করে ফিরে তাকাল মুসা। কিশোর পাশা দাঁড়িয়ে রয়েছে। কোঁকড়া চুল এলোমেলো হয়ে আছে। গায়ে টকটকে লাল টি-শার্ট, বুকের কাছে বড় বড় করে লেখা রয়েছেঃ লাভ টয়, সাম অ্যাসেম্বলি রিকয়ার্ড। পাশে দাঁড়িয়ে আছে রবিন।
মুসাকে জিজ্ঞেস করল কিশোর, কিন্তু এই জিনিস তোমার কাছে কেন?
ইয়ে...একজন...একটা লোক আমাকে দিয়েছে, আমতা আমতা করে বলল মুসা। ছবির লোকেশনে।
নিশ্চয় ফারিহার জন্যে উপহার, রবিন বলল। তার গায়ে একটা বাটন-ডাউন অক্সফোর্ড শার্ট, পরনে চিনোজ আর পায়ে মোকাসিন, মোজা বাদে। এককালের মুখচোরা, রোগাটে রবিন এখন সারা স্কুলে দারুণ জনপ্রিয়। অনেক লম্বা হয়েছে, সুদর্শন, কিশোর প্রায় শেষ, যুবকই বলা চলে।
আরে নাহ, হাত নাড়ল মুসা। ফারিহার জন্যে হতে যাবে কেন?
কিছু বলতে যাচ্ছিল রবিন, হা হা করে উঠল নিকি, আরে সর সর, ওভাবে ঘেঁষে দাঁড়িও না! ক্রোমের চকচকানি নষ্ট করে দেবে তো।
আমার ফোক্সওয়াগেনটাকে ফকিরা লাগছে এটার কাছে, জাগুয়ারটাকে দেখিয়ে রবিন বলল। মুসাকে জিজ্ঞেস করল, কার এটা?
জ্যাক রিডারের। হরর ছবির পরিচালক।
আহ্, এরকম একটা জিনিস যদি পেতাম! পরক্ষণেই ঠোঁট ওল্টাল, থাকগে, সবার তো আর সব হয় না। শোন, আইস ক্রিমারিতে যাচ্ছি আমরা। যাবে?
নাহ, সময় নেই, দুই বন্ধুকে অবাক করে দিয়ে মাথা নাড়ল মুসা। কিশোর, অভিনেতাদের ব্যাপারে তো অনেক কিছু জান তুমি। টাইমলি আসা নিয়ে গোলমাল করে?
করে মানে? হেসে উঠল কিশোর। যত বড় অভিনেতা, তত বেশি ভোগাবে, অপেক্ষা করিয়ে রাখবে, এটাই যেন নিয়ম হয়ে গেছে।

আরেকটা কথা। ধরো, কোন বাড়িতে প্রচুর কাচ ছড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। অথচ গ্লাস, জানালার কাচ কিংবা ফুলদানী সব ঠিকঠাক রইল। কোত্থেকে আসতে পারে?
একটা ভুরু উঁচু হয়ে গেল কিশোরের। ব্যাপারটা কি বলো তো?
কিছু না। চট করে একবার নিকির চোখে চোখে তাকাল মুসা। মানে, জরুরী কিছু না। পরে বলব।
কিশোর আর রবিন চলে গেলে গাড়িটা নিয়ে পড়ল আবার দুই মেকানিক কয়েক মিনিট পরেই ঝামেলা এসে হাজির। মুসার গার্লফ্রেণ্ড ফারিহা। পরনে নীল জিনস, গায়ে পুরুষের ঢোলা শার্ট। এসেই মুসার হাতটা ধরে ঝাঁকিয়ে দিতে দিতে অপরিচিত মানুষের ভঙ্গিতে বলল, শুনুন, আমি ফারিহা গিলবার্ট। আপনি নিশ্চয় মুসা আমান?
কি হলো? মুসা অবাক, এরকম করে কথা বলছ কেন?
ভুলেই তো যাওয়ার কথা, তাই না? পুরো দুটো দিন দুটো রাত তোমার কোন খোঁজ নেই। চিনতে পেরেছ তাহলে?
পারব না কেন? কাজ ছিল।
হু। সে তো বুঝতেই পারছি। কিশোর আর রবিনকে যেতে দেখলাম। জিজ্ঞেস করেছিলাম, বলল আইসক্রীম খেতে যাচ্ছে। চলো না, আমরাও যাই?
দেখছ না ব্যস্ত?
তা তো দেখছি। কিন্তু আমার যে একলা যেতে ভাল লাগে না। কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়েছে ফারিহা। লম্বা চুল ছড়িয়ে পড়েছে কাঁধে। ওকে এভাবে খুব সুন্দরী লাগে।
কি করব বলো? কাজটা সত্যি জরুরী। নইলে আমিও কি আর আইসক্রীম ছাড়ি?
তা বটে। গাড়িটার ওপর দৃষ্টি ঘুরছে ফারিহার। কার এটা? এত সুন্দর?
সিনেমার লোকের। ছবিতে কাজ করছি তো।
তাই নাকি? গাড়িটার ওপর থেকে দৃষ্টি সরছে না ফারিহার। মুসা, গাড়িটা দাও না, একটা ঘোরান দিয়ে আনি? ইস, জাগুয়ার চালাতে যা মজা!
সরি, অন্যের জিনিস…
তাহলে তুমি চলো?
আমার সময় নেই বললামই তো।
কাল সকালে?
ফারিহা, তুমি বুঝতে পারছ না, আমি ব্যস্ত। তাছাড়া একটা কেসের কিনারা করতে… বলেই থেমে গেল মুসা। লাথি মারতে ইচ্ছে করল নিজেকে, পেটে কথা রাখতে পারে না বলে।

মুখ বাঁকাল ফারিহা। কেস? ছাগল পেয়েছ আমাকে? কেসের কিনারা করছ, অথচ আলাদা হয়ে আছ দুই দোস্তের কাছ থেকে, একথা আমাকে বিশ্বাস করতে বলো? একা পারবে?
কেন পারব না? রেগে গেল মুসা। মাঝে মাঝে সত্যিই রাগিয়ে দাও তুমি...
ফারিহাও রেগে গেল। ওরকম আচরণ করছ কেন আমার সঙ্গে?
কি করলাম? তুমিই তো এসেতক টিটকারি দিয়ে চলেছ!
আরও রেগে গেল ফারিহা। গটমট করে গিয়ে নিজের গাড়িতে উঠল। দড়াম করে দরজা লাগিয়ে জানালা দিয়ে মুখ বের করে বলল, চললাম! গুড বাই!
জবাব দিল না মুসা।
গাড়ির নাক ঘুরিয়ে নিয়ে ইয়ার্ড থেকে বেরিয়ে গেল ফারিহা।
নিকি বলল, মেয়েটাকে অযথা রাগালে।
আমি কি করলাম? হাত ওল্টাল মুসা, নিজেই আজেবাজে কথা বলল, বাগল। আসল কথা, নিয়ে বেরোলাম না কেন। আমার জায়গায় আপনি হলে কি করতেন?
মাথা চুলকাল নিকি। জবাব দিতে না পেরে হাত নেড়ে বলল, বাদ দাও। এসো, কাজটা সেরে ফেলি।
প্যান্টে হাত ডলে মুছতে গিয়ে পকেটের স্ফটিকটা হাতে লাগল মুসার। ডলনের কথা ভাবল। আবার দম আটকে আসা অনুভূতিটা হলো।
হ্যাঁ, সেরে ফেলা দরকার, মুসা বলল। শুটিং স্পটে যেতে হবে আবার। তদন্তটা বাকি এখনও।
যতটা সহজ হবে ভেবেছিল, তত সহজ হলো না কাজটা। পুরোটা রাত খাটাখাটনি করল ওরা, পরদিন সকাল আটটা নাগাদ শেষ হলো কাজ। সেদিন রোববার। শুটিং হবে না, কর্মচারীদের ছুটি। সারাদিন ধরে ফোনে ফারিহার সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করল মুসা, পেল না ওকে। বাড়িতে নেই। আর কোন কাজ না থাকায় বাবাকেই একটা স্পেশাল ইফেক্ট জিনিস তৈরির কাজে সাহায্য করল।
পরদিন সোমবার। স্কুল খোলা। কাজেই স্কুল শেষ করার আগে আর জাগুয়ারটা নিয়ে বেরোতে পারল না।
হলিউডের মুভি স্টুডিওতে সেট সাজিয়েছেন সেদিন জ্যাক রিডার। গেটে মুসাকে আটকাল গার্ড। একবার মাত্র ওয়াশার দিয়ে রক্ত ছড়িয়ে দিতে হলো উইন্ডশীল্ডে, আর বাধা দিল না গার্ড। ছেড়ে দিল ওকে।
সাত নম্বর স্টেজে সেট সাজান হয়েছে। কালো পোশাক পরে দাঁড়িয়ে আছেন রিডার। হাতে কোন কিছুর খোঁচা খেয়েছেন। টিপে ধরে আছেন জায়গাটা।
মুসা ভেবেছিল গাড়িটা দেখলে খুশি হবেন তিনি, কিন্তু তাকালেনই না।

মিস্টার রিডার, ডেকে বলল মুসা, আপনার গাড়ি…
হ্যাঁ, খুব ভাল, একবার তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিলেন রিডার। অলিংগারের সঙ্গে কথা বলতে হবে। চাইলে আসতে পারো।
পিছে পিছে চলল মুসা। আরও কয়েকজন চলল সাথে। রিডারের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছে। দোতলা একটা কাঠের বাড়ির দিকে চলেছে। বাড়িটা কাছে এসে দাঁড়িয়ে গেল অন্যেরা, মুসা আর রিডার এগিয়ে চলল।
ব্রাউন অলিংগারের অফিসে এসে ঢুকল ওরা। অনেক বড় একটা ঘর। দেয়ালে দেয়ালে সিনেমার পোস্টার, স্টিল, আর বিখ্যাত তারকাদের ছবি সাঁটা। মিটিং শুরু হয়ে গেছে।
ওয়ালনাট কাঠে তৈরি বিশাল টেবিলের ওপাশে বসেছেন অলিংগার। আর পাঁচজন লোক রয়েছে ঘরে। ছবির কাহিনীকার, ডিরেকটর অভ ফটোগ্রাফি, স্টাফ কোঅরডিনেটর, কসটিউম ডিজাইনার, মেকআপ আর্টিস্ট।
এসো, এসো, মুসাকে দেখে বললেন অলিংগার, বসো। কেমন আছ? জ্যাক বসো। ক্লান্ত শোনাল তার কণ্ঠ।
রিডারের পাশে একটা চামড়ায় মোড়া চেয়ারে বসল মুসা।
অলিংগার বললেন, ডিলন তো মনে হয় ভালমতই ডুব দিয়েছে। কেন যে একাজ করল! কিন্তু আমরা তো আর বসে থাকতে পারি না। তার যখন ইচ্ছে হয় আসবে। আমরা ইতিমধ্যে দুর্গের কাজগুলো সেরে ফেলতে পারি।
ওখানকার সেট সাজাতেই তিন দিন লেগে যাবে, বলল খাড়া খাড়া কালো চুল এক মহিলা।
হতাশ হয়েই চেয়ারে হেলান দিল মুসা। গাড়ির দৃশ্য গেল! এখন কয়েক হপ্তা আর জাগুয়ারটার দিকে ফিরেও তাকাবেন না রিডার।
তাতে আর কি? জাল কণ্ঠে বললেন রিডার। এমনিতেই দেরি হয়েছে আমাদের। নাহয় লাগল আরও তিন দিন।
সঙ্কেত দিতে আরম্ভ করল অলিংগারের ঘড়ি। মিনিটখানেক পরেই ট্রেতে করে একগাদা চিঠিপত্র নিয়ে ঢুকল তার সেক্রেটারি। একটা খামের ওপরে পার্সোন্যাল লেখা রয়েছে। সেটা তুলে নিয়ে ধীরে সুস্থে খুলতে লাগলেন অলিংগার। পোড়া মাংসের কথায় আসতেই গুঙিয়ে উঠলেন তিনি, সর্বনাশ!
কি হলো? রিডার জিজ্ঞেস করলেন, ভয় লাগছে? অত রক্তপাত সহ্য হবে না?
ওসব না! ডিলন! ওকে কিডন্যাপ করা হয়েছে!
ঘরে পিনপতন নীরবতা। হাতের কাগজটা টেবিলে নামিয়ে রাখলেন অলিংগার হাত দিয়ে ডলে সমান করতে লাগলেন অস্বস্তিভরে। ঘরের কারও মুখে কথা নেই।
কি লিখেছে? অবশেষে জিজ্ঞেস করল একজন।

টাকা চায়, জবাব দিলেন অলিংগার। অনেক টাকা। নইলে খুন করল বেচারা ডিলনকে।
কত টাকা? জানতে চাইলেন রিডার।
বলেনি। নিজেরাই দেখ। কাছে বসেছেন লেখক। উঠে নোটটা তার দিকে ঠেলে দিলেন প্রযোজক। হাতে হাতে ঘুরতে লাগল ওটা। সব শেষে এল রিডারের হাতে। তিনি সেটা পড়ে মুসাকে না দেখিয়েই আবার ফিরিয়ে দিলেন অলিংগারকে। ডেস্কের ড্রয়ারে রেখে দিলেন প্রযোজক।
ডিলন কিডন্যাপ হয়েছে! কথাটা ভীষণ চমকে দিয়েছে মুসাকে। যদিও এরকমই একটা কিছু ঘটেছে ভেবে খুঁতখুঁত করছিল তার মন। কি লিখেছে। নোটটাতে…
খাম থেকে একটা ফটোগ্রাফ টেনে বের করলেন অলিংগার। সর্বনাশ!
সবাই উঠে হুড়াহুড়ি করে ছুটে গেল দেখার জন্যে। মুসা এক পলকের বেশি। দেখতে পারল না, ছবিটা ড্রয়ারে রেখে দিলেন প্রযোজক।
ফোনের দিকে হাত বাড়াল কালো চুল মহিলা, পুলিশকে ফোন করা দরকার।
ওর হাত চেপে ধরলেন অলিংগার। না না! পুলিশকে জানালে খুন করে। ফেলবে ওকে! ওগুলো মানুষ নয়, জানোয়ার। নিশ্চয় রসিকতা করেনি!
রসিকতা যে করেনি তাতে মুসারও সন্দেহ নেই।
মিস্টার অলিংগার, বলল সে, আমরা কি কিছু করতে পারি? এসব কাজ…
না! মানা করে দিলেন প্রযোজক, পুলিশও দরকার নেই, গোয়েন্দাও না!
বুঝতে পারছেন কি বলছেন? রিডার বললেন।
পারছি। এক গাদা টাকা যাবে আরকি আমার!
তা তো যাবেই। আমি বলছি ছবিটার কথা। সব কাজ বন্ধ করে দিয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে হবে এখন আমাদের। শ্রমিকদের জানাতে হবে। আমি পারব না! মাথায় বাড়ি মারতে আসবে ওরা! কিছুদিন কাজ বন্ধ থাকছে এটা জানান প্রযোজকের দায়িত্ব।
ক্লান্ত দৃষ্টি রিডারের ওপর স্থির হয়ে রইল কয়েক সেকেণ্ড, তারপর মাথা। ঝাঁকালেন অলিংগার। ঠিক আছে, দায়িত্ব যখন, জানাব। চলো, সেটে যাই।
ডেস্কটার দিকে তাকাল মুসা, যেটাতে নোট আর ছবি রাখা হয়েছে।
প্রথমে এগোলেন অলিংগার, পেছনে রিডার, এবং তার পেছনে অন্যেরা। মুসা ইচ্ছে করে রয়ে গেল পেছনে। সবাই বেরোলেও সে বেরোল না। দরজা লাগিয়ে কয়েক লাফে চলে এল ডেস্কের কাছে। ড্রয়ার খুলে নোটটা বের করল।
খবরের কাগজের অক্ষর কেটে আঠা দিয়ে লাগিয়ে লিখেছেঃ আমরা বেন ডিলনকে নিয়ে গেছি। ফেরত চাইলে অনেক টাকা খরচ করতে হবে। পুলিশকে জানালে তাকে আর জ্যান্ত দেখার আশা নেই। পরবর্তী নির্দেশ আসছে।

ছবিটা দেখল মুসা। ধাতব একটা ফোল্ডিং চেয়ারে বসিয়ে তোলা হয়েছে। হাত মুচড়ে পেছন দিকে নিয়ে গিয়ে বাধা হয়েছে। মুখে চওড়া সাদা টেপ লাগান। পা বাঁধা হয়েছে গোড়ালির কাছে। ডিলনের বিখ্যাত নীল চোখজোড়ায় আতংক, যেন সামনে মূর্তিমান মৃত্যু দাঁড়ানো।
দেরি করল না মুসা। নোট আর ছবিটা পকেটে নিয়ে রওনা হলো হলের দিকে, সেখানে ফটোকপি মেশিন আছে, আসার সময় লক্ষ্য করেছিল। কপি করে রাখবে দুটোরই।
নোট এবং ছবিটার কয়েকটা করে কপি করে অলিংগারের অফিসে ফিরে এল আবার। সেক্রেটারির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কৈফিয়ত দিল, একটা জিনিস ফেলে এসেছি। মেয়েটা বিশ্বাস করল, মাথা ঝাঁকিয়ে তাকে যেতে দিল, নিজে সঙ্গে এল না। আগের জায়গায় জিনিসগুলো রেখে দিল মুসা।
এবার কি? শুধুই রহস্য নয় আর এখন, অপহরণ কেস, একজনের জীবন মরণ সমস্যা। কাজটা একা করার যতই আগ্রহ থাকুক, ঝুঁকি নেয়াটা আর ঠিক হবে না কোনমতেই। একটাই করণীয় আছে এখন, এবং সেটাই করল সে। রিসিভার তুলে ডায়াল করল।
কিশোর? মুসা। কোথাও যেও না। থাক। জরুরী কথা আছে। আমি আসছি। রিসিভারটা নামিয়ে রাখতে না রাখতেই দরজা খুলে গেল।
মুসার দিকে তাকিয়ে রয়েছে অলিংগারের সেক্রেটারি। চোখে সন্দেহ। কি করছ?
জরুরী একটা ফোন। সরি। পকেট থেকে জাগুয়ারের চাবির গোছাটা বের করে ডেস্কে রাখা একটা বাক্সে ছুঁড়ে দিয়ে দ্রুত দরজার দিকে এগোল মুসা। সেক্রেটারির দিকে তাকাল না আর।
গাড়ি নেই। সিনেমার একজন কর্মীর গাড়িতে লিফট নিয়ে রকি বীচে এল সে। বাড়িতে পৌঁছে নিজের গাড়িটা বের করে নিয়ে চলে এল ইয়ার্ডে। গাড়ি থেকে নেমে ওঅর্কশপের দিকে ছুটল। দরজায় হাত দেয়ার আগেই কিশোরের কণ্ঠ শোনা গেল, মুসা, সবুজ টি-শার্ট, নীল জিনস, আর বাস্কেটবল শু পরেছ।
কি করে জানলে?
ট্রেলারের দরজা খুলে দিয়ে রবিন বলল, ওপরে দেখো।
ছাতে বসান হয়েছে একটা ভিডিও ক্যামেরা। পুরানো টেলিস্কোপ সর্বদর্শনটা যেখানে ছিল সেখানে। এপাশ থেকে ওপাশে ঘুরছে, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আশপাশের সব কিছু দেখে চলেছে। ক্যামেরার চোখ। এটা কিশোরের নতুন সিকিউরিটি সিসটেম। এটার নামও সর্বদর্শনই রাখা হয়েছে। পুরানো পদ্ধতি সরে গিয়ে নতুনকে ঠাই করে দিয়েছে জিনিসটা, কিশোরের সামনে ডেস্কে রাখা আছে মনিটর।

খুব ভাল করেছ, হেডকোয়ার্টারে ঢুকে বলল মুসা। শোন, যে জন্যে থাকতে বলেছিলাম। খবর আছে। বেন ডিলন কিডন্যাপ হয়েছে তার মালিবু বীচের বাড়ি থেকে। একটু আগে সাফোকেশন টু ছবির পরিচালক অলিংগারের সঙ্গে মিটিঙে বসেছিলাম। তখনই এল র‍্যানসম নোট।
সময় নষ্ট না করে ভাল করেছ, কিশোর বলল। খুলে বলো।
রভিন মনিটরটা একপাশে ঠেলে সরিয়ে ডেস্কের ওপরই উঠে বসল মুসা। জিনসে হাত ডলছে, অস্বস্তিতে। ইয়ে...সব কথা তোমাদের ভাল লাগবে না। রেগে যাবে আমার ওপর। আসলে, সময় অনেকই নষ্ট করেছি। কারণ...
আরে দূর! অধৈর্য ভঙ্গিতে হাত নাড়ল রবিন, অত ভণিতা করছ কেন? বলে ফেলো না।
ডিলন সম্ভবত তিন দিন আগে কিডন্যাপ হয়েছে।
তিন দিন আগে হয়েছে, কিশোর বলল, আর তুমি জেনেছ খানিক আগে?
ঠিক তা নয়। আমি তিন দিন আগেই সন্দেহ করেছি, মুসা বলল। দেখল, কিশোরের ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে আস্তে আস্তে গোল হয়ে যাচ্ছে। প্রথমে ভেবেছিলাম তোমাদেরকে জানাবই না। একা একাই কেসটার সমাধান করে তাক, লাগিয়ে দেব। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে আমার।
ঠোঁট দিয়ে ফুট ফুট শব্দ করল কিশোর। শ্রাগ করে বলল, তাতে আমি মাইণ্ড করিনি। বরং আগেই কিছু তদন্ত সেরে ফেলে ভাল করেছ।
মুখ তুলে তাকাতে পারল না মুসা। লজ্জিত ভঙ্গিতে বলল, মাইণ্ড করবে, এখুনি। আমি ব্রাউন অলিংগারকে বলেছি তিন গোয়েন্দার হেড হলাম আমি। আর তোমরা দুজন আমার সহকারী। তোমাদেরকে ডাকব কিনা জিজ্ঞেস করেছিলাম।
হো হো করে হেসে উঠল রবিন। নতুন কার্ডে গোয়েন্দা প্রধান কে লেখা নেই। বলেই সুযোগটা নিতে পেরেছ।
শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল কিশোর, র‍্যানসম নোটটা দেখেছ?
কপি করেই নিয়ে এসেছি। পকেট থেকে নোট আর ছবির কপি বের করে দিল মুসা।
ছবিটা দেখে আফসোস করে বলল রবিন, আহারে, বেচারার বড়ই কষ্ট।
ডিলনের কষ্টের কথা বলছ? কিশোর বলল, অযথা দুঃখ পাচ্ছ। ভাল করে দেখ, বুঝতে পারবে। যতটা সম্ভব খারাপ অবস্থা দেখানর ইচ্ছেতেই এরকম ভঙ্গিতে রেখে ভোলা হয়েছে এই ছবি। হাতটা কতটা পেছনে নিয়ে গেছে দেখ। এই অবস্থায় বেশিক্ষণ থাকা সম্ভব নয়, শ্বাস নিতে কষ্ট হয়, বেহুশ হয়ে যেতে বাধ্য। ওকাজ কিছুতেই করতে যাবে না কিডন্যাপাররা। যদি সত্যিই ডিলন ওদের কাছে দামি হয়ে থাকে।

আরেকটা ইনটারেসটিং ব্যাপার, নোটটা দেখতে দেখতে রবিন বলল, খবরের কাগজ থেকেই কাটা হয়েছে অক্ষরগুলো, তবে লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমস কিংবা হেরাল্ড এক্সামিনার থেকে নয়। অন্য কোন কাগজ। অক্ষর দেখলেই আন্দাজ করা যায়।
তোমার ধারণা, মুসা জিজ্ঞেস করল, লস অ্যাঞ্জেলেসের বাইরে কোথাও থেকে পাঠানো হয়েছে নোটটা?
সূত্র তো তাই বলে, জবাব দিল কিশোর।
এক এক করে রবিন আর কিশোরের দিকে তাকাতে লাগল মুসা। স্বীকার করল, আসলেই আমি গোয়েন্দাপ্রধান হওয়ার অনুপযুক্ত। বার বার দেখেছি। এগুলো, অথচ কিছুই বুঝতে পারিনি।
পারতে, কিশোর বলল, তুমিও পারতে, মাথা ঠাণ্ডা করে দেখলে। যাকগে। আর কিছু?
অদ্ভুত আরও কতগুলো ঘটনা ঘটেছে। শুটিং স্পটে যাওয়ার পর থেকে যা যা ঘটেছে সব খুলে বলল মুসা। প্রথম সাফোকেশন ছবির শুটিঙের সময় যেসব গোলমাল হয়েছে শুনেছে, সেসবও বাদ দিল না। সব শেষে বলল পটার বোনহেডের দেয়া স্ফটিকটার কথা। বলল, আমাকে সাবধান করে দিয়েছে সে। তৃতীয় নয়নের মাধ্যমে নাকি দেখতে পেয়েছে আমার বিপদ। বলেছে, স্ফটিকের নির্দেশ আমার শোনা উচিত।
শোনা শুরু করলেই বরং বিপদে পড়বে, কিশোর বলল, মানসিক ভারসাম্য হারাবে।
কথা বলতে বলতে কখন যে রাত হয়ে গেল টেরই পেল না ওরা। আচমকা বলে উঠল মুসা, আমার খুব খিদে পেয়েছে।
ট্রেলার থেকে বেরিয়ে এসে ওর ভেগাতে উঠল তিনজনে। অন্ধকার রাত। এতক্ষণ ভূত-প্রেত, ডাইনী নিয়ে আলোচনা করে এখন সর্বত্রই ওসব দেখতে লাগল। ডাইনী, ভূত, কঙ্কাল….
অ্যাই, ভুলেই গিয়েছিলাম, মুসা বলল, আজকে হ্যালোউইন উৎসব।
কিছুক্ষণ উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে ঘুরে বেড়াল ওরা। স্কুলের কোন ছেলের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় কিনা দেখল। দেখা গেল অনেককেই, ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে আছে। নানারকম সাজে সেজেছে ওরা। সাফোকেশন ছবির জোম্বি আর ভয়ঙ্কর ভূতপ্রেতগুলোর কথাই মনে করিয়ে দিল মুসার।
একটা পিজা শ্যাকে ঢুকে পিজা খেয়ে নিয়ে আবার বেরোল ওরা। একটা স্টপ। সাইনের কাছে এসে ব্রেক করল মুসা। চালু করে দিল উইণ্ডশীল্ড ওয়াইপার। এপাশ ওপাশ নড়তে লাগল ওয়াইপার আর কাঁচে লাগতে শুরু করল ঘন রক্ত।

এটা কি? অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর।
অবিশ্বাস্য! রবিন বলল, ওই জাগুয়ারটার মত তোমার গাড়িতেও এই কাণ্ড করেছ?
হাসল মুসা। গাড়িটা ঘুরিয়ে কাচটা এমন ভঙ্গিতে রাখল, যাতে রাস্তায় চলমান। গাড়ির আলো এসে পড়ে আর চালকদের চোখে পড়ে সেই রক্ত। চমকে যেতে লাগল লোকে।
বহু মানুষকে ভয় পাইয়ে দিয়ে একসময় হেডকোয়ার্টারে ফিরে এল ওরা।
দেখো দেখো! চিৎকার করে বলল রবিন, ট্রেলারের দরজার অবস্থা!
শুধু দরজাই না, সতর্ক হয়ে উঠেছে কিশোর, জানালাগুলো ভেঙে দিয়ে গেছে!
তখনই বলেছিলাম, ট্রেলারটাকে জঞ্জালের নিচ থেকে বের করার দরকার নেই,মুসা বলল, এখন হলো তো! ঢুকল কি করে ব্যাটারা?
গেট বন্ধ হওয়ার আগেই হয়ত ঢুকে বসেছিল, অনুমান করল রবিন।
গাড়ি থেকে নেমে ট্রেলারের দিকে দৌড় দিল তিনজনে। ঢুকে পড়ল ভেতরে। মেঝেতে নামিয়ে স্কুপ করে রাখা হয়েছে তিন গোয়েন্দার ফাইলপত্র। ছড়িয়ে রয়েছে কাগজ।
ব্যাটারা এখানে কিছু খুঁজতে এসেছিল! রবিনের কণ্ঠে চাপা রাগ।
মুসার মনে হতে লাগল, দেয়ালটা বুঝি তার দিকে এগিয়ে আসছে। গুঙিয়ে। উঠল সে।
কি হলো, মুসা?
দম আটকে আসছে আমার! শ্বাস নিতে পারছি না!
দেয়ালে টেপ দিয়ে লাগান রয়েছে মেসেজ। খবরের কাগজের অক্ষর কেটে সেই একই ভাবে লিখেছে, অলিংগারের কাছে যেভাবে নোট পাঠান হয়েছিল। এগিয়ে গেল কিশোর। পড়ে দুই সহকারীর দিকে ফিরে বলল, ডিলনের ব্যাপারেই লিখেছে!
এগিয়ে এল রবিন আর মুসা। ওরাও পড়ল মেসেজটাঃ
বেন ডিলনের রক্তপাতের জন্যে তোমরা দায়ী হবে!

.
শ্বাস নিতে পারছি না! গলায় হাত দিয়ে ঢোক গিলতে লাগল মুসা। দম আটকে যাচ্ছে আমার! নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে।
সব তোমার কল্পনা, দ্রুত গিয়ে ট্রেলারের দরজার পাল্লা হাঁ করে খুলে দিল। কিশোর অক্টোবর রাতের তাজা বাতাস ঢোকার জন্যে। আকাশের অনেক উঁচুতে উঠে গিয়ে বুমম করে ফাটল দুটো বাজি।

এগুলো সাফ করতে কয়েক বছর লেগে যাবে! গুঙিয়ে উঠে ছড়ানো জিনিসপত্রগুলো দেখাল রবিন।
তা না হয় করলাম, কিশোর বলল। সেটা নিয়ে ভাবি না। ভাবছি আমাদের সমস্ত গোপন ফাইল দেখে গেল ব্যাটারা!
আসলে, রবিন বলল, এই হেডকোয়ার্টারে আর চলবে না আমাদের। বহু বছর তো কাটালাম পুরানো জায়গায়। এভাবে আর চলবে না। নতুন জয়িগায় নতুন নতুন যন্ত্রপাতি বসাতে হবে আমাদের, চোর-ডাকাত ঠেকানর ব্যবস্থা। রাখতে হবে…
হাঁসফাস করতে করতে মুসা বলল, কিছুই করতে হত না! ট্রেলারটা যেমন লুকান ছিল তেমনি থাকলেই ভাল হত! এত বছর তো আরামেই ছিলাম
ছিলাম, রবিন বলল, আমাদের বয়েস কম ছিল, সেটা একটা কারণ। তেমন। মাথা ঘামাত না কেউ। ভাবত, ছেলেমানুষের খেয়াল। এখন আর আমাদেরকে দেখলে সেটা মনে করে না কেউ। সিরিয়াসলি নেয়। বড় হওয়ার এই এক যন্ত্রণা…
ব্যাটারা জানল কি করে এই কেসে কাজ করছি আমরা?
চুপ করে ভাবছে কিশোর। জবাব দিল, নিশ্চয় কিডন্যাপাররা ছবিটার সঙ্গে জড়িত সবার ওপর নজর রেখেছে। তুমিও বাদ যাওনি।
পুরানো একটা ধাতব ফাইল কেবিনেট তুলে সোজা করে রাখতে কিশোরকে সাহায্য করল মুসা। বিশ্বাস করতে পারছি না! র‍্যানসম নোটটা আজকেই এল। ভাবতেই পারিনি, আমাকেও ফলো করতে আরম্ভ করবে।
ঘরটাকে আগে গুছিয়ে ফেলি, কিশোর বলল। তারপর ভালমত আলোচনা করতে বসব কার চোখ পড়ল আমাদের ওপর।
শুধু আলোচনায় তো কাজ হবে না, রবিন বলল, ওদেরকে বের করতে হবে। কি করে করবে?
পরে ভাবব। এখন জরুরী, ভিডিও সিকিউরিটি সিসটেমটা দেখা।
ঠিক! তুড়ি বাজাল মুসা। ক্যামেরা! লোকগুলোর ছবি নিশ্চয় উঠে গেছে ভিডিও টেপে!
তাহলে তো কাজই হবে, রবিন বলল। কিন্তু টেপ কি অতটা লম্বা ছিল? ওরা যখন এসেছে তখনও রেকর্ড করছিল?
দেখাই যাক না। টেপ রিউইণ্ড করার বোতাম টিপে দিল কিশোর। দুই সহকারীকে জানাল, সারাক্ষণ চলার মত করে সিসটেমটা তৈরি করিনি। ওই পদ্ধতি ভাল না। অন্য ব্যবস্থা করেছি। বাইরে একটা ইলেকট্রিক আই লাগিয়েছি। হেডকোয়ার্টারের কাছাকাছি কেউ এলে চোখে পড়ে যাবে যন্ত্রটার, চালু হয়ে যাবে ভিডিও রেকর্ডার। লোকটা চলে গেলেই অফ হয়ে যাবে ক্যামকর্ডার। আবার কেউ এলে আবার চালু হয়ে যাবে..

প্লে বাটন টিপে দিল কিশোর। মনিটরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে তিন জোড়া চোখ। ছবি ফুটতেই আরও ভাল করে দেখার জন্যে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে এল ওরা। ছবি দেখে ছিটকে পেছনে সরে গেল আবার।
লম্বা, পাতলা একটা মূর্তি ঝিলমিল করতে করতে বেরিয়ে এল অন্ধকার থেকে, ভরে দিল পর্দা। ট্রেলারের দিকে এগিয়ে আসছে যেন ভেসে ভেসে, হেঁটে নয়। লম্বা কালো আলখেল্লার কোণ ধরে টানছে বাতাস, বাদুড়ের ডানার মত ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে।
পঅজ বাটনটা টিপে দিল কিশোর। স্থির হয়ে গেল মূর্তি। ভয়াবহ মুখটার দিকে মন্ত্রমুগ্ধের মত তাকিয়ে রইল সে।
মুখের রঙ ফসফরাসের মত সবুজ, তেমন করেই জ্বলে। লাল চোখ। গলার কাছে কালো গর্ত। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় যেন অস্থির, দেহের ভেতরের সমস্ত যন্ত্রপাতি বেরিয়ে আসতে চাইছে, সেই ব্যথারই ছাপ পড়েছে মুখে।
খাইছে! নিচু গলায় বলল মুসা। জোরে বলার সাহস হারিয়েছে।
পঅজ রিলিজ করে দিল কিশোর। পেছনে, আশেপাশে তাকাতে লাগল মূর্তিটা। কয়েকবার করে তাকিয়ে যখন নিশ্চিত হল তাকে কেউ লক্ষ করছে না, তখন একটা পা তুলে জোরে এক লাথি মারল ট্রেলারের দরজায়। ঝটকা দিয়ে খুলে গেল দরজা। ভেতরে ঢুকল লোকটা। ক্যামেরার চোখ থেকে সরে যাওয়ায় দেখা গেল না তাকে। কয়েক মিনিট পর বেরিয়ে আলখেল্লার কোণ উড়িয়ে হারিয়ে গেল অন্ধকারে।
লোকটা কে? রবিনের প্রশ্ন।
মানুষ তো? মুসার প্রশ্ন।
কয়েকবার করে টেপটা চালিয়ে দেখল ওরা। প্রতিবারেই নতুন কিছু না কিছু চোখে পড়ল।
ব্যাটার শ্বদন্ত আছে, রবিন বলল।
ডান হাতের আঙুলে একটা আঙটি, বলল কিশোর। বড় একটা পাথর বসান।
অদ্ভুত মূর্তিটার সব কিছুই যখন দেখা হয়ে গেল, আর কিছুই বাকি রইল না, যন্ত্রটা অফ করে দিল কিলোর।
চালাকিটা ভালই করেছে, মুসা মন্তব্য করল। হ্যালোউইনের রাতে ভ্যাম্পায়ারের সাজ সেজে এসেছে, কেউই লক্ষ্য করবে না ব্যাপারটা। আজকের রাতে ওরকম ছদ্মবেশ পরে খুন করেও পার পাওয়া যাবে, ধরা পড়তে হবে না।
এবার একটা প্ল্যান করা দরকার, কিশোর বলল। মুসা, কাল আমাদেরকে স্টুডিওতে নিয়ে যাবে তুমি। লোকের সঙ্গে কথা বলে দেখব, ডিলনকে কে বেশি

চেনে। শেষ কে দেখেছিল, জানব। বোঝার চেষ্টা করব, কার কার নাম সন্দেহের তালিকায় ফেলতে হবে।
পরদিন স্কুল শেষ করে স্টুডিওতে গিয়ে প্রথম যে মানুষটার সামনে পড়ল তিন গোয়েন্দা, তিনি মুসার বাবা রাফাত আমান। ভয়ঙ্কর একটা মুখোশ পরে স্টুডিও লট ধরে হেঁটে চলেছেন।
তোমরা? একেবারে সময়মত এসেছ, আমান বললেন। আমার ইফেক্টগুলো কেমন আসবে, দেখতে যাচ্ছি। দেখার ইচ্ছে আছে? ডেইলি।
না বলার কোনই কারণ নেই। আমানের পিছু পিছু একটা প্রাইভেট স্ক্রিনিং রুমের দিকে চলল ওরা। রবিন জিজ্ঞেস করল, ডেইলিটা কি? দৈনিক কোন ব্যাপার না তো?
তা-ই। শুটিং করা প্রতিদিনকার অংশকে ডেইলি বলে ফিল্মের লোকেরা, বাবার হয়ে জবাবটা দিল মুসা। দিয়ে গর্বিত হলো, রবিনের চেয়ে এ ব্যাপারে বেশি জানে বলে। এডিট করা হয় না তখনও, প্রচুর ভুলভাল থেকে যায়।
স্ক্রিনিং রুমটাকে খুদে একটা সিনেমা হলই বলা চলে। ছয় সারি সীট। লাল মখমলে মোড়া গদি। সামনের সারির প্রতিটি সীটের ডান হাতলে রয়েছে। ইনটারকমের বোতাম। ওখানকার একটা সীটে বসে বোম টিপে দিলেন আমান। প্রেজেকশনিস্টকে ছবি চালাতে বললেন।
হলের আলো কমিয়ে দিয়ে ছবি চালানো হলো।
আগের হপ্তায় ভোলা স্পেশাল ইফেক্টের ছবিগুলো দেখতে লাগল তিন গোয়েন্দা। প্রতিটি দৃশ্যেই জ্যাক রিডারের ছাপ স্পষ্ট, ভয়ঙ্কর বীভৎস করে তোলার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন।
একটা দৃশ্যে একটা বাচ্চা ছেলে বার বার হেঁচকি তুলছে।
কি করে সারাতে হয় জানি আমি, বলল বাচ্চাটার মা, স্বাভাবিক মানুষ নেই। আর, জোম্বি হয়ে গেছে। ভয় দেখাতে হবে। আর কোন উপায় নেই।
বলেই একটানে বাচ্চাটার একটা হাত ছিঁড়ে ফেলল। ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠল ছেলেটা। কাঁধের কাছের ছেঁড়া জায়গা থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল।
দেখলে তো? হেঁচকি বন্ধ।
কাট! শোনা গেল রিডারের কণ্ঠ, ক্যামেরার চোখের বাইরে থেকে। আর কবে শিখবে? কিছুই তো বলতে পারো না।
আরেকটা দৃশ্যে নাকে রুমাল চেপে হাঁচি দিল একটা লোক। তারপর আতঙ্কিত চোখে তাকিয়ে রইল রুমালের দিকে, হাচির চোটে তার নিজের মগজই নাক দিয়ে বেরিয়ে এসে রুমালে লেগে গেছে।

রবিনের দিকে কাত হয়ে তার কানে কানে কিশোর বলল, জ্যাক রিডার একটা চরিত্র বটে!
স্যাডিস্ট! ফিসফিসিয়ে জবাব দিল রবিন।
তারপর বেন ডিলনের অভিনীত কয়েকটা দৃশ্য চলল। সে নিজেই জোম্বিতে পরিণত হল, চোখের কোণে কালো দাগ পড়ল। রঙ দিয়ে করা হয়েছে ওগুলো।
বাবা, পর্দায় বলছে ডিলন, তুমি আমাকে হার্ভার্ডে পাঠাতে চাও তো। যেতে ইচ্ছে করে না। আমার ভাল লাগে লোকের গলা কামড়ে ছিঁড়ে মাথা আলাদা করতে।
স্ক্রিপ্ট লিখেছে কে? জোরে জোরেই বলল মুসা, মাথায় খালি কুৎসিত চিন্তা...
চুপ, থামিয়ে দিলেন ওকে আমান। আমার চাকরিটা খাবে নাকি?
নতুন আরেকটা দৃশ্যে দেখা গেল ডিলন আর একজন সুন্দরী অভিনেত্রীকে। মেয়েটা খাট, কোঁকড়া কালো চুল, চোখের পাপড়িও কোকড়া।
অ্যাঞ্জেলা ডোভার না? সামনে ঝুঁকে আমানকে জিজ্ঞেস করল কিশোর।
হ্যাঁ। এই ছবির সহ-অভিনেত্রী। তবে অনেক দেখান হয় ওকে, শুরুতেই টানা বিশ মিনিট। ডেটিং করে ডিলনের সঙ্গে। এই দৃশ্যে দেখান হবে নিরীহ, গোবেচারা, ভালমানুষ, কিছুটা বোকাও। ভাবতেই পারেনি ওপরতলা থেকে দুটো। মানুষের বাচ্চাকে খেয়ে এসেছে ডিলন।
বিশ্বাস কর, ডানা, ডিলন বলছে, কেমন জানি হয়ে গেছি আমি। অদ্ভুত অনুভূতি। দম নিতে কষ্ট হয়। মনে হয়, কবরে শুয়ে আছি, বেলচা দিয়ে মাটি ছিটান হচ্ছে আমার ওপর, ঢেকে দেয়ার জন্যে। মনে হয়, একের পর এক মানুষ খুন করি।
বেন, ডিলনের বাহুতে থেকে বলল ডানা, ওসব কিছু না। শুধুই কল্পনা। একটা মাছি মারারও ক্ষমতা নেই তোমার।
কাট! চেঁচিয়ে উঠলেন রিডার, অ্যাঞ্জেলা, ওকে বেন বলছ কেন?
শিওর, এ ছবি থ্যাঙ্কসগিভিডের দিনে মুক্তি দেয়া হবে, রবিন বলল।
কেন? মুসার প্রশ্ন।
তখন খেতে ব্যস্ত থাকবে সবাই। এই ঘোড়ার ডিমের দিকে নজর থাকবে না। এ একটা দেখার জিনিস হলো!
হাসতে শুরু করল কিশোর আর মুসা।
এতই খারাপ? জিজ্ঞেস করলেন আমান।
রবিন আর মুসা চুপ করে রইল। ভাবছে, জবাবটা কিশোরই দিক। কিশোরের বুদ্ধি বেশি, সিনেমার ব্যাপারে জ্ঞান বেশি, ঠিক জবাব সে-ই দিতে পারবে।
স্ক্রিপ্টের কোন হাতমাথা নেই, ডিরেক্টরের হয়ে আছে মাথা গরম, কিশোর বলল। রিডারের মত কম দামি পরিচালক বেশি বাজেটের ছবিতে হাত দিতে গেলে হবেই এরকম। মাথা গরম হয়ে গেছে লোকটার। মণ্ডে এসোই এখনও মাথা– থেকে

নামেনি। ওই একই কাণ্ড করছে। আঙ্কেল, আপনি সত্যি কথাটা শুনতে চাইলেন, তাই বললাম।
ভাবনায় ফেলে দিলে আমাকে তুমি, কিশোর, আমান বললেন। কিশোর বুঝল, ভাবনায় তিনি আগেই পড়েছেন, তার সঙ্গে আলোচনা করে নিজের ধারণাগুলো মিলিয়ে দেখলেন আরকি।
সবগুলো ডেইলি দেখার পর উঠে দাঁড়াল তিন গোয়েন্দা। বাইরে গিয়ে লোকের সঙ্গে আলাপ করে ডিলন অপহরণ কেসের সূত্র খোঁজার ইচ্ছে। আটকালেন ওদেরকে আমান।
আজ সকালে ব্রাউন অলিংগার ফোন করেছিলেন, বললেন তিনি। তিনি ভয় পাচ্ছেন, তোমরা তদন্ত করতে গিয়ে ডিলনের বিপদ বাড়িয়ে দেবে।
বাবা...
জানি, তোমরা খুব ভাল গোয়েন্দা, আমান বললেন বাধা দিয়ে, আমার চেয়ে তো আর বেশি জানে না কেউ। কিন্তু অলিংগার কিডন্যাপারদের নির্দেশ মেনে চলতে চান। তিনি বলেছেন টাকা গেলে তার যাবে, বাইরের কেউ, মানে তোমরা যাতে এতে নাক না গলাও। তোমাদেরকে চলে যেতে বলছি আমি। সরি।
কোন প্রতিবাদেই আর কাজ হবে না। রাজি করাতে পারবে না ওরা রাফাত আমানকে। অলিংগারের ওপরই রাগ হতে লাগল ওদের। গটমট করে বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠে রওনা হল মুসার গাড়িতে করে। সমস্ত লস অ্যাঞ্জেলেসে লাল আলো লেপ্টে দিয়েছে যেন অস্তমিত সূর্য। অন্ধকারের দেরি নেই।
ড্রাইভিং হুইলে বসেছে মুসা, রবিন তার পাশে, হাতে রেডিও, আর পেছনের সিটে বসে বকবক করে বলে যাচ্ছে কিশোর, জ্যাক রিডার কি কি ভুল করেছেন।
হঠাৎ করেই বলল, অ্যাঞ্জেলা ডোভারের সঙ্গে ডিলনের অভিনয় তাকে জেলাস করে তুলেছে।
নাকি তুমিই জেলাস হয়ে গেছ? রসিকতা করল রবিন, সেজন্যেই রিডারকে দোষ দিচ্ছ।
রবিনের কথা কানে তুলল না কিশোর। মেয়েটার চোখে ভয়াবহ আলো ফেলে শুটিঙের ব্যবস্থা করেছেন পরিচালক, ভুল অ্যাঙ্গেলে ছবি তোলা হয়েছে।
একটা রেস্টুরেন্টের সামনে গাড়ি রাখল মুসা। রেডিওর ডায়াল ঘোরাচ্ছিল। রবিন, জিজ্ঞেস করল, কি হলো?
খিদে পেয়েছে, বলল মুসা। চলো, কিছু খাই।
রবিন বলল, আমাকে তাড়াতাড়ি বাড়ি যেতে হবে। মা বাইরে যাবে। চলো, বাড়ি গিয়েই খাব।

আধ ঘণ্টা পর রবিনদের বাড়িতে এসে রান্নাঘরে ঢুকল তিন গোয়েন্দা। প্রচুর খাবার রয়েছে টেবিলে। সেগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ওরা।
পেট কিছুটা ঠাণ্ডা হয়ে এলে পকেট থেকে র‍্যানসম নোটের কপিটা বের করে টেবিলে রাখল কিশোর।
সেটা দেখে রবিন বলল, কি মনে হয় তোমার? পরবর্তী নির্দেশ কি পাঠিয়েছে মিস্টার অলিংগারের কাছে?
ঠিক এই সময় রান্নাঘরে ঢুকলেন রবিনের বাবা। ওদেরকে দেখে হাত নেড়ে বললেন, খাও তোমরা। আমি শুধু কফি খাব। কাপ নিতে গিয়ে নোটটার ওপর। চোখ পড়ল তাঁর। জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি?
একটা কেসের তদন্ত করছি আমরা, বাবা, রবিন বলল।
কফিতে চুমুক দিতে দিতে নোটটা দেখতে লাগলেন মিলফোর্ড। হঠাৎ বললেন, রবিন, ডেইলি ভ্যারাইটি থেকে কাটা হয়েছে অক্ষরগুলো, বুঝতে পেরেছ?
আপনি শিওর? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
নিশ্চয়ই।
কফি শেষ করে উঠে চলে গেলেন মিলফোর্ড।
নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে আরম্ভ করেছে কিশোর। গভীর চিন্তায় ডুবে গেছে।
শান্ত কণ্ঠে আনমনেই বলতে লাগল একসময়, এর মানে জান তো? বেন। ডিলনকে যে কিডন্যাপ করেছে সে ফিল্মের সঙ্গে জড়িত। সাফোকেশন টু-র। কর্মচারী হলেও অবাক হব না।

.

পুরো একটা মিনিট চুপ হয়ে রইল তিনজনেই। তাকিয়ে রয়েছে র‍্যানসম নোটটার দিকে। যেন ওটাতেই রয়েছে সমস্ত রহস্যের জবাব।
কিশোরের কথার প্রতিধ্বনি করেই যেন অবশেষে রবিন বলল, কর্মীদের কেউ বেন ডিলনকে কিডন্যাপ করেছে?
কিংবা কোন অভিনেতা, বলল কিশোর। সিনেমার লোক, এ ব্যাপারে আমি শিওর। সাধারণ চোরডাকাতে ভ্যারাইটি পড়ে না। বেশি পড়ে সিনেমার লোকে। তাদের কাছে ওটা বাইবেল। খুব জরুরী সূত্র এটা। বড় একটা ধাপ এগোলাম। T_
তার মানে, মুসা বলল, এমন একজন লোক দরকার, যার ওপর সন্দেহ হয়, যার মোটিভ আছে। আর দরকার জানা, কোথায় আটকে রাখা হয়েছে ডিলনকে।
আস্তে আস্তে, কিশোর বলল, তাড়াহুড়া করলে ভুল হয়ে যাবে। শান্ত হয়ে মাথা খাঁটিয়ে একেকটা প্রশ্নের জবাব বের করতে হবে। তদন্ত চালিয়ে যেতে হবে। সাফোকেশন টু-র শ্রমিক কর্মী অভিনেতা সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে।

জানতে হবে কে ডিলনের শত্রু, কে মিত্র। আমি অ্যাঞ্জেলা ডোভারকে দিয়ে শুরু করতে চাই।
করো। কিশোরের দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচাল রবিন, কিন্তু আগে ওকে কেন?
ডিলন নিখোঁজ হওয়ার আগের দিন তার সঙ্গে অভিনয় করেছে সে। আরও একটা ব্যাপার আছে। মুসার বাবা বললেন ওদের মাঝে মন দেয়ানেয়ার ব্যাপার থাকতে পারে।
পারে?
হ্যাঁ। তিনি শিওর নন।
তোমার জন্যে একটা দুঃসংবাদ আছে, কিশোর, মুসা বলল। অ্যাঞ্জেলা ডোভার বড়ই মুখচোরা স্বভাবের, বাবা একথাও বলেছে। সহজে কথা বলতে চায়। না। ছদ্মবেশে থাকতে পছন্দ করে। এমন ভাবে থাকে, যাতে কেউ তাকে চিনতে না পারে। ফিল্ম স্টারদেরকে লোকে জ্বালাতন করে তো, বেরোতে পারে না। ঠিকমত...
বাধা দিয়ে কিশোর বলল, ছদ্মবেশ, না? ভাবছি, হ্যালোউইনের রাতে কোথায় ছিল সে?

.

পরদিন বিকেলের আগে সময় করতে পারল না মুসা। কমলা ভেগাটা চালিয়ে নিয়ে। এল পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে। হর্ন বাজাতে বাজাতে ডাকল, এই কিশোর! বেরোও! ওকে পেয়েছি!
ইলেকট্রনিক ওঅর্কশপ থেকে বেরিয়ে এল কিশোর। কি হয়েছে?
এসো, গাড়িতে ওঠ। এইমাত্র একটা গরম খবর শোনাল বাবা। অ্যানহেইমের বাড়িতে গিয়ে ডুব দিয়েছে অ্যাঞ্জেলা ডোভার, পরের ছবিটা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করার জন্যে।
অ্যাঞ্জেলা ডোভার? দাঁড়াও, এখনি আসছি! বাড়ির দিকে দৌড়ে চলে গেল কিশোর। দশ মিনিট পরেই ফিরে এল পরিষ্কার জামাকাপড় পরে। নতুন জিনসের প্যান্ট, ইস্ত্রি করা অক্সফোর্ড ড্রেস শার্ট। চল। রবিনদের বাড়িতে গিয়েছিলে?
ও আসতে পারবে না। ট্যালেন্ট এজেন্সিতে জরুরী কাজ আছে, খবর পাঠিয়েছেন বার্টলেট লজ। সেখানে চলে গেছে।
হু! গুঙিয়ে উঠল কিশোর। মাঝে মাঝে মনে হয়, তিন গোয়েন্দা আর নেই আমরা, দুই গোয়েন্দা হয়ে গেছি! ওর এই ট্যালেন্ট এজেন্সির চাকরিটা বাদ দিতে পারলে ভাল হত!
ছেড়ে দেয়ার কথা ভাবছে। ইঞ্জিন স্টার্ট দিল মুসা। না দিলে নেই। আমরা দুজনেই চালাব। ও তো আজকাল আর তেমন সাহায্য করতে পারে না, আমাদেরকে।

তা ঠিক, কিশোর বলল, সবাইকেই একসময় একলা হয়ে যেতে হয়। সব সময় তো আর সবাই একসঙ্গে থাকতে পারে না। এমনও হতে পারে, অন্য কোন কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে তুমিও চলে যাবে। তখন একলা চলতে হবে না আমাকে? গোয়েন্দাগিরি তো ছাড়তে পারব না কোনদিনই। আনমনা হয়ে গেল সে। ওই যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখে গেছেন না, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলরে... বেসুরো গলায় গুনগুন করে গাইতে লাগল সে।

পুরো একটা ঘন্টা চালানর পর একটা তিনতলা বাড়ির সামনের পার্কিং লটে এনে গাড়ি ঢোকাল মুসা। একটা রিটায়ারমেন্ট কমপ্লেক্স। সাইনবোর্ড লেখা রয়েছেঃ সিলভান উডস রেস্ট হোম। কিশোর বলল, সব ফাঁকিবাজি, মিথ্যে বিজ্ঞাপন। উডস মানে তো বন, এখানে বন কোথায়? সিলভানই বা কই? ওরকম। বনদেবতা থাকার প্রশ্নই ওঠে না। একটা ফ্রিওয়ে শুধু দেখতে পাচ্ছি।

বন, দেখতে তো আর আসিনি আমরা, মুসা বলল, নায়িকার সঙ্গে কথা বলতে এসেছি। অ্যাঞ্জেলা ডোভারকে পেলেই হলো। তাকিয়ে রয়েছে কিছু লোকের দিকে, সবাই বৃদ্ধ, চুল সাদা হয়ে গেছে। এখানে ছদ্মবেশে লুকিয়ে থাকা কঠিন হবে ওর জন্যে।

মনে হয়।

খুঁজতে লাগল ওরা। গেম রুম, টিভি রুম, কার্ড রুম, সব জায়গায় উঁকি দিল। হোমের বয়স্ক বাসিন্দারা হয় চেয়ারে বসে খেলছে, কথা বলছে, নয়ত ছড়ি হাতে হাঁটাচলা করছে শরীরটাকে আরও কিছুদিন সচল রাখার অদম্য আকাঙ্ক্ষায়। যতই বুড়ো হোক, মরতে তো আর চায় না কেউ। মহিলারা কেউ সেলাইয়ের কাজ করছে, কেউ বই পড়ছে, দুএকজন গিয়ে ফুল গাছের যত্ন করছে বাগানে। কিশোর আর মুসাকে সবাই দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু কেউ কথা বলছে না। অন্তত শুরুতে বলতে চাইল না।

তারপর ডাক দিল একজন, এই ছেলেরা, শোনো।

ঘুরে তাকাল দুজনে। বড় একটা পাম গাছের ছায়ায় বেঞ্চে বসে আছে এক বৃদ্ধা। ধূসর চুল ছড়িয়ে রয়েছে বিশাল এক হ্যাঁটের নিচে। আঙুল বাকা করে ওদেরকে কাছে যেতে ইশারা করছে মহিলা। কোলের ওপর ফেলে রেখেছে হালকা একটা কম্বল, পা ঢেকে রেখেছে।

এগিয়ে গেল দুই গোয়েন্দা।

বেঞ্চে চাপড় দিয়ে ওদেরকে পাশে বসতে ইশারা করল মহিলা। মুখের চামড়ায় অসংখ্য ভাঁজ। হাসলে সেগুলো আরও বেশি কুঁচকে গম্ভীর হয়ে যায়। বলল, আমার নাম পলি। কাউকে খুঁজছ মনে হয়?

একজন মহিলাকে খুঁজছি, কিশোর বলল।

আমিও তো মহিলা, হেসে বলল পলি। দ্রুত ওঠানামা করল কয়েকবার চোখের পাতা।
রসিকতায় কিশোরও হাসল। তা তো নিশ্চয়। আরও কম বয়েসী একজনকে খুঁজছি।
অ্যানিটার কথা বলছ না তো? ওর বয়েস কম, আটষট্টি।
আমরা খুঁজছি একজন তরুণীকে, অভিনেত্রী।
সাংবাদিক-টাংবাদিক নাকি তোমরা?
না, আমরা গোয়েন্দা, জবাব দিল মুসা।
ও, গোয়েন্দা? সাথে হিটার আছে? রড? গ্যাট? পিস্তল-বন্দুকের পুরানো সব নাম ব্যবহার করল মহিলা। চোর-ডাকাতেরা এখনও কেউ কেউ এই নাম বলে, বিশেষ করে রড।
না, আমরা টিভি ডিটেকটিভ নই।
আমরা তাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই, কিশোর বলল। আমাদের সাহায্য চেয়েছে একজন। তার ব্যাপারেই আলোচনা করতাম। মহিলার চোখের দিকে তাকাল সে। আপনি আমাদেরকে সাহায্য করবেন, মিস ডোভার?
হ্যাটটা ঠেলে পেছনে সরাল পলি, ধূসর উইগ সরে গিয়ে বেরিয়ে পড়ল নিচের কোকড়া কালো চুল। অল্প বয়েসীদের চুল আর বুড়ো মানুষের মুখ নিয়ে এখন। অদ্ভুত লাগছে তার চেহারা। কি করে বুঝলে? গলার স্বর তরুণ হয়ে গেল হঠাৎ করেই।
আপনার ডায়লগ শুনে। হিটার আছে? রড? গ্যাট? দি ফ্রেঞ্চ অ্যাজেন্ট ছবিতে আপনি ওই ডায়লগ বলেছিলেন। ছবিটা আমি দেখেছি।
চোখ কান খোলা রাখো তুমি! সোজা হয়ে বসেছে অ্যাঞ্জেলা, বুড়ো মানুষের মত কুঁজো হয়ে বসার আর প্রয়োজন নেই। কোলের ওপর থেকে কম্বলটা সরিয়ে নিয়েছে। নীল জিনস পরেছে।
আমার পরের ছবিটায় আমি পল্লির রোল করব, আশি বছর বয়েস। আশি বছর হলে কি করে মানুষ, না জানলে অভিনয় করতে পারব না, সে জন্যেই এখানে। এসেছি কাছে থেকে দেখার জন্যে। এখানে ওই বয়েসের প্রচুর মানুষ আছে। ভাল অভিনয় করতে হলে দেখার ক্ষমতা খুব ভাল থাকা লাগে। কিশোরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, অভিনয় করার কথা কখনও ভেবেছ?
ভেবেছে মানে? মুসা বলল, কিশোর তো•..
জোরে কেশে উঠল কিশোর। মুসাকে শেষ করতে দিল না কথাটা। মোটুরামের অভিনয় করেছে, এটা নিয়ে কোন গর্ব তো নেইই, শুনতেও ভাল লাগে না তার।

মুসাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে বলল, বেন ডিলনের ব্যাপারে কথা বলতে চাই আমরা, মিস ডোভার।..
মাথা নাড়ল অ্যাঞ্জেলা। ব্যক্তিগত আলোচনা হয়ে যাবে।
স্ক্যাণ্ডাল নয়, আমরা চাই তথ্য। শেষ কখন ডিলনের সঙ্গে দেখা হয়েছে আপনার? কি কি কথা হয়েছে? কেউ তাকে হুমকি দিচ্ছে এরকম কি কিছু বলেছে? আপনাদের মাঝে রোমান্টিকতা কর কি আছে না আছে জানতে চাই না আমরা।
বেঞ্চে নড়েচড়ে বসল অ্যাঞ্জেলা। আঙটি দিয়ে আলতো টোকা দিতে দিতে বলল, এক বছর ধরে আমার সঙ্গে প্রেম করার পর আমাকে ফেলে গেল সে। এটা নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা হয়েছিল। খুব কষ্ট পেয়েছি আমি। এতটাই মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল, কাজকর্মই বাদ দিয়ে দিয়েছিলাম।
তারমানে, কিশোর বলল, ডিলন মারাত্মক বিপদে পড়লেও আপনার কিছু এসে যায় না?
তা বলিনি। বিপদ সে ইচ্ছে করে টেনে আনে। মানুষকে ভোগায়। আমাকে ভুগিয়েছে। সিনেমা কোম্পানিকে ভুগিয়েছে। মুসার দিকে তাকাল অ্যাঞ্জেলা, কি ব্যাপার, তুমি কিছু বলছ না?
কিশোরই তো বলছে। গাল চুলকাল মুসা। গত শুক্রবার সকালে ডিলনের বাড়িতে গিয়েছিলাম। ও বিপদে পড়েছে, বুঝতে পেরেছি।
অ্যাঞ্জেলা বলল, এর আগের রাতে আমি গিয়েছিলাম।
গিয়েছিলেন? ভুরু কুঁচকে তাকাল কিলোর।
ডিনার খেয়েছি ওর বাড়িতে। সেদিন সাফোকেশন ছবিতে আমার কাজ শেষ হয়েছিল। তো, আমাকে জিজ্ঞেস করতে এসেছ কেন? শেষ দেখেছি বলে?
আপনি শেষ দেখেননি। শেষ দেখা হয়েছে কিডন্যাপারদের সঙ্গে।
কিডন্যাপার! আঁতকে উঠল অ্যাঞ্জেলা, অলিংগার জানে?
তার কাছেই পাঠানো হয়েছে র‍্যানসম নোট, মুসা জানাল।
বেচারা অলিংগার। মরেছে!
ডিলনের সঙ্গে কেমন কাটল আপনার সন্ধ্যাটা, বলবেন? অনুরোধ করল কিশোর। চমৎকার ডিনারের ব্যবস্থা করেছিল সে। আমার সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে ভুল করেছে, একথা শুনিয়ে, বোকার মত রসিকতাও করেছে। মনমেজাজ ভালই ছিল তার।
ডিলনের বন্ধু এবং শত্রুদের কথা কিছু বলবেন?
শত্রুর নাম বলতে শুরু করলে তো মাইলখানেক লম্বা হয়ে যাবে তালিকা। তবে বেশি রেগে যাওয়ার কথা ডট কার্লসনের। সাফোকেশন টু-র নায়কের রোলটা পাওয়ার কথা ছিল তার। হঠাৎ করে ডিলনকে দিয়ে দেয়া হল। ফলে রেগে গিয়ে

কিছু একটা করে বসাটা ডটের পক্ষে বিচিত্র নয়। ডিলনের গুরুটাকেও সন্দেহ করতে পার। পটার বোনহেডের কথায় ওঠবস করে ডিলন। যা করতে বলে তাই করে। বোনহেডই কিছু করেছে কিনা কে জানে।
খুব একটা সাহায্য আপনি করতে পারছেন না, কিশোর বলল।
সরি। তেমন কিছু জানিই না, কি করব বল? উইগটা ঠিক করে তার ওপর হ্যাটটা বুসিয়ে দিল আবার অ্যাঞ্জেলা, পলি সাজল। বুড়ো মানুষের গলা নকল করে বলল, ঠিক আছে, কোন কিছুর প্রয়োজন পড়লে এস আবার। দেখি তখন কোন সাহায্য করতে পারি কিনা।
ওর কথার ধরনে হেসে উঠল কিশোর আর মুসা। গুডবাই জানিয়ে চলে এল নিজেদের গাড়ির কাছে। গাড়িতে উঠে কিশোর বলল, কাল স্কুল শেষ করে প্রথমেই স্টুডিওতে যাব, তোমার বাবা যা-ই বলুন।
আমি যেতে পারব না, মুসা বলল। ফারিহার সঙ্গে দেখা করতেই হবে। ও রেগে আছে।
ফারিহার সঙ্গে দুদিন পরে দেখা করলেও চলবে। কিডন্যাপারদের কাছ থেকে হয়ত পরবর্তী নির্দেশ পেয়ে গেছেন অলিংগার। তোমার কাজ তাঁর সঙ্গে কথা বলে তাঁকে ব্যস্ত রাখা।
ব্যস্ত রাখব? কেন?
কারণ স্টুডিওতে আমার কিছু কাজ আছে। জানিয়ে করা যাবে না কিছুতেই।
অলিংগারকে ব্যস্ত রাখবে, পরদিন প্রযোজকের অফিসের বাইরে বসার ঘরে বসে কথাটা ভাবছে মুসা, কিন্তু কিভাবে? কথা বলে, নানা রকম কৌশল করে? সেটা রবিন আর কিশোরের কাজ, ওরাই ভাল পারে। জেদ চেপে গেল তার। ওরা পারলে সে পারবে না কেন?
আপাতত অলিংগারকে ব্যস্ত রাখার জন্যে মুসার দরকার নেই। নিজের ঘরে। ব্যস্তই রয়েছেন তিনি। রিসিপশন রুমের চারপাশে চোখ বোলাল সে। আরেকজন লোক বসে আছে, অলিংগারের সঙ্গে দেখা করার জন্যে। ঘন কাল চুল, উজ্জ্বল নীল ফ্রেমের সানগ্লাস পরেছে। আঙুল দিয়ে কখনও চেয়ারের হাতলে টাট্টু বাজাচ্ছে, কখনও নিজের উরুতে। লম্বা বেশি নয়। গায়ে শক্তি আছে বোঝা যায়। মাঝে মাঝে জুতোর ডগা দিয়ে যেন ঠেলে সরানর চেষ্টা করছে পুরু কার্পেট।
বেঞ্চের ফাইট কটায়? মুসাকে জিজ্ঞেস করল লোকটা, দুটো দশে?
দুটো বিশ।
কয়েক মিনিট চুপচাপ থেকে আবার তাকাল মুসার দিকে। পাঞ্জা লড়ার অভ্যেস আছে?
আছে।

এসো, হয়ে যাক…
প্রডিসারের অফিসে?
অসুবিধে কি? বসে থাকার চেয়ে তো ভাল… বলতে বলতেই সামনের টেবিল থেকে কফি কাপ আর ম্যাগাজিন সরিয়ে পরিষ্কার করে ফেলতে লাগল। লোকটা। সোফা থেকে নেমে কার্পেটে হাঁটু গেড়ে দাঁড়িয়ে ডান কনুইটা রাখল টেবিলে, হাতের পাঞ্জা খোলা। ডাকল, এসো।
গিয়ে টেবিলের অন্য পাশে হাঁটু গেড়ে একই ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ডান হাতের কনুই টেবিলে রেখে চেপে ধরল লোকটার পাঞ্জা। চোখে চোখে তাকাল।
শুরু! বলল লোকটা।
লোকটা চেষ্টা করছে মুসার হাতকে চেপে শুইয়ে দিতে চাপের চোটে কাঁপছে টেবিলটা। মুসা বেশি চাপাচাপি করছে না, শক্তি ধরে রেখে সোজা করে রেখেছে হাত। লোকটার শরীরে শক্তি আছে বটে, কিন্তু বেশিক্ষণ টিকে থাকার ক্ষমতা নেই, এটা বুঝে ফেলেছে সে।
চোখ মিটমিট আরম্ভ হয়ে গেল লোকটার।
ক্লান্ত হয়ে এসেছে, ঢিল পড়ছে হাতের চাপে। সময় হয়েছে! আচমকা হাতের চাপ বাড়িয়ে দিল মুসা। হাত সোজা রাখতে পারছে না লোকটা। কয়েক সেকেণ্ড আপ্রাণ চেষ্টা করল সোজা রাখার, পারল না, কাত হয়েই যাচ্ছে, তারপর পড়ে গেল টেবিলের ওপর। ককিয়ে উঠল সে, ব্যথায় নয়, পরাজিত হওয়ায়।
ঠিক এই সময় দরজায় দেখা দিলেন অলিংগার। রিসিপশন রুমে দুজন লোককে ওই অবস্থায় দেখে দ্বিধায় পড়ে গেলেন।
লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল লোকটা। ছুটে গেল অলিংগারের দিকে। কত আর অপেক্ষা করবে, ব্রাউন? অনেক তো হলো।
শান্ত হও, ডট, শান্ত হও, অলিংগার বললেন। আমার সঙ্গে ঝগড়া করে কোন লাভ হবে তোমার?
ভেবে দেখো, ব্রাউন, সময় থাকতে, বলল তরুণ লোকটা। ও-ই ডট কার্লসন, বুঝতে পারল মুসা। শুনলাম, ডিলন কেটে পড়েছে। ছবিটাকে ডোবাতে চাও?
এই অভিনেতার কথাই অ্যাঞ্জেলা ডোভার বলেছিল, প্রথমে যাকে দি সাফোকেশন টু ছবির জন্যে পছন্দ করা হয়েছিল।
ডট, আমার হাতে আর কিছু নেই এখন। তুমি জানো না। পরে কথা বলব।
ইশারায় মুসাকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল ডট, এ কে? ছবিতে অভিনয় করবে?
না।
আরেকবার মুসার দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করল ডট, আসলেই তাকে অভিনয় করতে আনা হয়েছে কিনা। শ্রাগ করল। তারপর রওনা হয়ে গেল

দরজার দিকে।
ক্লান্ত দৃষ্টি ফুটেছে অলিংগারের চোখে। রক্তশূন্য লাগছে চেহারা। কেমন আছ? চমৎকার কাজ করেছ গাড়িটাতে, আমাদের খুব পছন্দ হয়েছে। আমার সঙ্গে কথা বলতে চাও?
ভারি দম নিয়ে প্রযোজকের পিছু পিছু তার অফিসে ঢুকল মুসা। টেবিলে পড়ে রয়েছে ওর বাবার হাতের আরেকটা কাজ। একটা চোখ, মণিতে কাঁটাচামচ গাঁথা। যতরকম বীভৎসতা সম্ভব, সব যেন ঢোকানোর চেষ্টা হয়েছে এই একটা ছবিতেই।
মিস্টার অলিংগার, বলল সে, কিডন্যাপাররা আর কোন খবর দিয়েছে?
মাথা নাড়লেন প্রযোজক। টেবিলে পড়ে থাকা তিন গোয়েন্দার কার্ডটা তুলে নিয়ে দেখতে দেখতে বললেন, তোমাদেরকে এই কেস থেকে দূরে থাকতে বলেছিলাম, তাই না? তাহলে ভাল হয়। কিডন্যাপাররা যা যা করতে বলে তাই আমাদের করা উচিত, তাহলে ডিলন ভাল থাকবে।
মাথা ঝাঁকাল মুসা, যেন সব বুঝতে পেরেছে। ব্যাপারটা বড়ই অদ্ভুত। সাধারণত তাড়াতাড়ি যোগাযোগ করে কিডন্যাপাররা, টাকাটা নিয়ে সটকে পড়তে চায়। এরা এত দেরি করছে কেন?
কিডন্যাপারদের ব্যাপারে অনেক কিছু জানো মনে হয়? হাসির ভঙ্গিতে ঠোঁটগুলো বেঁকে গেল অলিংগারের, মুসার কাছে সেটাকে হাসি মনে হলো না।
কিডন্যাপ কেসের সমাধান আরও করেছি আমরা, কিছুটা অহঙ্কারের সঙ্গেই বলল মুসা। আপনি আমাকে সরে থাকতে বলেছেন। কিছু মনে করবেন না, আমার বন্ধু কিশোর পাশাকে নিয়ে এসেছি আজ স্টুডিওতে। ডিলনের পরিচিত কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলতে চাইছিলাম। কিছু বেরিয়েও যেতে পারে।
পুরু একটা মিনিট ছাতের দিকে তাকিয়ে ভাবলেন অলিংগার। তারপর মুখ। নামালেন। মুসা ভেবেছিল মানা করে দেবেন, তা করলেন না। আইডিয়াটা ভাল। তা করতে পার। পটার বোনহেডকে দিয়ে শুরু করগে। ওই লোকটাকে আমার বিশ্বাস হয় না।
পকেটের স্ফটিকটার কথা মনে পড়ে গেল মুসার। মনে হতে লাগল, আবার গরম হয়ে উঠছে ওটা।
অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। অলিংগারের অফিস থেকে বেরিয়ে কিশোরকে খুঁজতে লাগল মুসা।
এক ঘণ্টা খোঁজাখুঁজি করেও ওকে পেল না সে। সাউণ্ড স্টেজে নেই, ক্যাফেটেরিয়ায় নেই। কোথায় গেল? একটা সিনারি শপের মোড় ঘুরে আরেকটু হলেই ওর গায়ে হোঁচট লেগে হুমড়ি খেয়ে পড়ছিল মুসা। খাইছে! বলে চিৎকার। করে উঠল।

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। মেঝেতে চিত হয়ে আছে কিশোর পাশা। গলায় লাল, মোটা একটা গভীর ক্ষত। জবাই করলে যেমন হয়।
একটা মুহূর্তের জন্যে বিমূঢ় হয়ে গেল মুসা। বুঝতে পারছে না দৌড়ে যাবে সাহায্য আনতে, না দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে কোন অলৌকিক ক্ষমতায় আবার জ্যান্ত হয়ে ওঠে কিনা কিশোর? আরেকবার চিৎকার করে উঠল সে। বুক ভেঙে যাচ্ছে কষ্টে। কিশোরের এই পরিণতি সহ্য করতে পারছে না সে।
হাটু গেড়ে বসে পড়ল বন্ধুর বাকা হয়ে পড়ে থাকা দেহের পাশে। দুহাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠল, কিশোর, কে তোমার এই অবস্থা করল!...বলো কে, কে করল-... ওকে আমি, আমি... মেঝেতে কিল মারতে শুরু করল সে।
লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল আবার মুসা। পাগল হয়ে গেছে যেন। কিশোরের কাটা গলার দিকে তাকাতে পারছে না। কাউকে ডেকে আনবে কিনা ঠিক করতে পারছে না এখনও। নড়ছে না কিশোর, মরেই গেছে সম্ভবত...
মুসার মনে হতে লাগল, দেয়াল চেপে আসছে চারপাশ থেকে, নিচে নেমে আসছে ছাত। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। আবার চিৎকার করে উঠল, কিশোর, বলো কিশোর, কে?... তাকাল কিশোরের গলার দিকে। আরি, রক্ত বেরোচ্ছে না। কেন?
বসে পড়ল আরেকবার। গলার পাশের মাটিতে আঙুল ছোঁয়াল। এক ফোঁটা রক্ত নেই, ধুলো লাগল আঙুলে। কাঁপা কাঁপা হাতে কিশোরের কাটা জায়গাটা ছুঁয়ে। দেখল।
ভেজা নয়! রবার!
মেকাপ! আরেকবার চিৎকার করল মুসা, দুঃখে নয় এবার, রাগে। কিশোরের গায়ে জোরে একটা ঠেলা মেরে খেঁকিয়ে উঠল, অনেক হয়েছে! এবার ওঠো! এত শয়তানী করতে পারো...
নড়ল না কিশোর। আরেকবার ঠেলা দিল মুসা। একই ভাবে পড়ে রইল গোয়েন্দাপ্রধান। সন্দেহ হতে লাগল মুসার। রসিকতা নয়। সত্যিই কিছু হয়েছে। কিশোরের। ভাড়াতাড়ি ওর গলার নাড়িতে আঙুল চেপে ধরে দেখল ঠিক আছে। কিনা। নাড়ি চলছে ঠিকই। নড়ছে না যখন, তার মানে বেহুঁশ হয়ে গেছে কিশোর।
কি ঘটেছিল?
বসে রইল মুসা।
আস্তে আস্তে ঘুরতে শুরু করল কিশোরের মাথা, একপাশ থেকে আরেক পাশে। মৃদু গোঙানি বেরোল শুকনো ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে। চোখ মেলল অবশেষে।
জেগেছ, এতক্ষণে হাসি ফুটল মুসার মুখে। ওঠো ওঠো।
মুসার দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। নড়ছেও না কথাও বলছে না।
কথা বলতে ভুলে গেছ নাকি?

শশশ, চুপ করতে ইঙ্গিত করল মুসাকে কিশোর। কি ঘটেছিল, মনে করার চেষ্টা করছি।
জোরে জোরেই করো না, আমিও শুনি।
উঠে বসল কিশোর। টলছে। দাঁড়াও... জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে ভিজিয়ে নিল সে। ইনডোর শূটিঙের জন্যে যেখানে সেট ফেলেছেন রিডার, সেখানে ঘোরাঘুরি করছিলাম। কয়েকজন শ্রমিকের সঙ্গে কথা বললাম। কিছু মূল্যবান তথ্য দিল ওরা আমাকে।
বেন ডিলনের ব্যাপারে?
না, শরীর ঠিক রাখার ব্যাপারে। সিনেমায় যারা অভিনয় করে, শরীরটাই তাদের প্রধান পুঁজি, নষ্ট হয়ে গেলে মরল।
ধূর! ওসব কথা শুনতে চায় কে? আমাকে জিজ্ঞেস করতে, কিভাবে ফিট রাখতে হয় আমিই বলে দিতাম।
মুসার দিকে তাকিয়ে হাসল কিশোর। প্রোটিন মিল্ক শেক খায় ওরা, মুসা। এটা খেয়েই শরীরের ওজন কমিয়ে রাখে। ওরা বলে, সাংঘাতিক নাকি কাজের জিনিস। মনে হলো, আজ থেকেই আমিও শুরু করি না কেন? পেটে মেদ জমাকে আমার ভীষণ ভয়। চলে গেলাম স্টুডিওর কমিশারিতে এক গ্লাস মিল্ক শেক খাওয়ার জন্যে। ড্রিংক আসার অপেক্ষায় আছি, এই সময় খেয়াল করলাম বিশালদেহী, একজন লোক আমার প্রতিটি নড়াচড়া লক্ষ্য করছে। এমন ভাব করে রইলাম, যেন তাকে দেখিইনি। মিল্ক শেক নিয়ে বেরোতে যাব, দরজায় দাঁড়িয়ে আমার পথ আটকাল সে।
একটা মুহূর্ত একে অন্যের চোখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তারপর সে বললঃ জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, আমরা যেটা খুঁজে পেয়েছি সেটা নয়, যেটা আমরা খুঁজতে যাচ্ছি সেটা।
বলল ওরকম করে? মাথা নাড়তে নাড়তে বলল মুসা, তোমাকেও ধরেছে! বুঝতে পেরেছি, কে। পটার বোনহেড।
হ্যাঁ। উঠে দাঁড়াল কিলোর। এগোতে গিয়ে টলমল করে উঠল পা। কয়েক কদম এগিয়েই থেমে গেল। পড়ে গেলে যাতে ধরতে পারে সে জন্যে হাত বাড়িয়ে। দিল মুসা।
ঠিকই আছি, আমি পারব, কিশোর বলল, ধরতে হবে না। যা বলছিলাম। মিল্ক শেক নিয়ে তখুনি বেরোলাম না আর। মনে হলো, এই লোক আমাকে অনেক, খবর দিতে পারবে। প্রশ্ন শুরু করলাম তাকে। অনেক কথাই বলল সে, তবে। আমার প্রশ্নের জবাব দিল না। শেষে কিছুটা বিরক্তই হয়ে গেলাম। ওরকম ঘুরিয়ে

পেঁচিয়ে কথা বললে কি ভাল্লাগে নাকি! জিজ্ঞেস করলাম, শেষ কখন ডিলনকে দেখেছে। জবাব দিল, রোজই।
বললাম, কি আবল-তাবল বকছেন? শেষ কোথায় দেখেছেন?
জবাব দিল, আমার তৃতীয় নয়ন সারাক্ষণই দেখে তাকে।
বলো, কি রকম যন্ত্রণা! তৃতীয় নয়ন! নিজের কপালে যে দুটো আছে সে দুটোই ভালমত ব্যবহার করতে শেখেনি, আবার তৃতীয় নয়ন। হুহ! রাগ হতে লাগল। তার পরেও জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় আছে এখন বেন ডিলন? ঘুরিয়েই হয়তো কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, এই সময় সেখানে এসে হাজির হলেন ব্রাউন অলিংগার। চিনে ফেললেন আমাকে। কি কুক্ষণেই যে মোটুরামের অভিনয় করতে গিয়েছিলাম! বললেন, হরর ছবিতে নতুন চরিত্র যোগ করতে যাচ্ছেন তিনি, আমি ইচ্ছে করলে তার সঙ্গে কাজ করতে পারি। কাজ মানে অভিনয়, বুঝতে পারলাম। গলা থেকে কুৎসিত কাটার দাগ আঁকা রবারটা টেনে খুলে ফেলল কিশোর। চামড়া থেকে এবার সিমেন্ট ছাড়াতে বেশ জোরাজুরি করতে হলো। কি করতে হবে জিজ্ঞেস করলাম। বলল, কয়েকটা শট নেয়া হবে, তারই একটা মহড়া। চলবে। আমাকে দিয়ে হলে আমাকেই নেবে, নয় তো অন্য কাউকে। অলিংগারের সঙ্গে কথা বলা যাবে, এই লোভেই কেবল ওদের গিনিপিগ সাজতে রাজি হয়ে গেলাম। ভুল করেছি। মেকআপের ঘরে আমাকে নিয়ে গিয়ে রেখে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে এলেন কাজ কতটা এগোল দেখার জন্যে। আমি কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই অ্যালার্ম দিতে শুরু করল ঘড়ি, প্রায় দৌড়ে চলে গেলেন তিনি।
তুমি তখন কি করলে? জানতে চাইল মুসা।
কমিশারিতে ফিরে গেলাম। যেখানে বোনহেড আর আমার গ্লাসটা রেখে। এসেছিলাম। গ্লাসটা ঠিকই আছে, কিন্তু বোনহেড নেই। খেয়ে গ্লাসটা খালি করে রেখে চলে এলাম এখানে। তারপর কি ঘটল, মনে নেই। চোখ মেলে দেখি তোমাকে।
ওষুধ মিশিয়ে দেয়া হয়েছিল মিল্ক শেকে, কিশোর। বাজি রেখে বলতে পারি বোনহেডই করেছে এই অকাজ। চট করে চারপাশে চোখ বোলাল একবার মুসা।
মিল্ক শেকের গ্লাস খুঁজছ? কিশোর বলল, পাবে না। এখানে আনিইনি। কমিশারিতে বেঞ্চের ওপর রেখেছিলাম। এখন গেলে পাবে না। পটার বোনহেডের সঙ্গে আরেকবার কথা বলতে হবে, যত তাড়াতাড়ি পারা যায়।
পটার বোনহেডকে খুঁজে বের করা কঠিন হলো না। ডিরেকটরির হলুদ পাতাগুলোর একটাতে নিচের দিকে রয়েছে ওর বিজ্ঞাপন, লস অ্যাঞ্জেলেসের ঠিকানায়। ইংরেজিতে লেখা বিজ্ঞাপন। হেডিঙের বাংলা করলে দাঁড়ায় আধিভৌতিক পরামর্শদাতা। নিচে ফলাও করে লিখেছে, কত রকমের অলৌকিক

ক্ষমতা রয়েছে তার। মানুষের মনের কথা পাঠ করা থেকে শুরু করে জটিল রোগের চিকিৎসা করা পর্যন্ত সব নাকি পারে। লিখেছে পৃথিবী হল আমার জবাব জানার যন্ত্র। আমার জন্যে মেসেজ রেখে দেয়। আমার প্রশ্নের জবাব দেয়। আমি তার সঙ্গে কথা বলতে পারি।

ঠিকানা দেখে বেভারলি হিলের একটা র‍্যাঞ্চ হাউসে এসে পৌঁছল কিশোর আর মুসা। সাদা রঙের একটা লম্বা বাড়ি। সামনের দরজাটা খুলে আছে হাঁ হয়ে। ভেতরে দামি দামি আসবাবপত্র, ছবি রয়েছে। চোরের লোভ হতে পারে, কিন্তু পরোয়াই করে না যেন বাড়ির মালিক।

খোলা দরজার পাল্লায় টোকা দিল দুই গোয়েন্দা, সাড়া এল না। থাবা দিল, তাতেও জবাব নেই। শেষে ঢুকেই পড়ল ভেতরে, চলে এল পেছন দিকে। একটা সুইমিং পুলের কিনারে বসে সন্ধ্যার উষ্ণ বাতাস উপভোগ করছে বোনহেড। খোলা গা। সাদা একটা লিনেনের প্যান্ট পরনে। পদ্মাসনে বসেছে। চাঁদ উঠছে। বড় একটা তারা ঝিলমিল করছে আকাশে, যেন সুইমিং পুলের পানির মতই।

কিশোর, লোকটাকে কোথাও দেখেছি, মুসা বলল ফিসফিসিয়ে।

তা তো দেখেছই। কয়েক দিন আগে, শুটিং স্পটে। একটা স্ফটিক দিয়েছিল তোমাকে।

না, ওখানে নয়, অন্য কোথাও দেখেছি।

শ্রাগ করল কিশোর। পেশীবহুল শরীর লোকটার। সোনালি চুল। আস্তে আস্তে ওর দিকে এগোতে লাগল সে।

চারটে বড় নীল স্ফটিক নিজের চারপাশে রেখে দিয়েছে বোনহেড। ওগুলোর একেকটাকে একেকটা কোণ কল্পনা করে কল্পিত বাহু আঁকলে নিখুঁত একটা বর্গক্ষেত্র তৈরি হয়ে যায়। হাতের তালুতে লাল একটা পাথর। কানের ফুটোতে দুটো সাদা পাথর, আর নাভিতে একটা সোনালি পাথর বসিয়ে দিয়েছে। চোখ বন্ধ।

মিস্টার বোনহেড, কিশোর বলল, যে আলোচনাটা শেষ করতে পারিনি। আমরা, সেটা এখন শেষ করতে চাই।

চোখ না মেলেই বোনহেড বলল, তোমার কথা বুঝতে পারছি না। কানে স্ফটিক ঢোকানো রয়েছে।

নতুন যুগ। পুরানো রসিকতা, বিড়বিড় করল কিশোর।

আমার কানের স্ফটিকগুলো সমস্ত না-বোধক কাঁপন সরিয়ে রাখছে, তাতে মনের গভীরের সব বোধ সহজেই বেরিয়ে আসার সুযোগ পাচ্ছে। বলে দিচ্ছে, এখন যা আছি তা না হয়ে অন্য কেউ হলে কি হতে পারতাম। ওই বোধই আমাকে জানিয়ে দিচ্ছে, বিষ ঢুকেছে তোমার শরীরে।

স্ফটিক আপনাকে একথা বলছে, আমাকে অন্তত বিশ্বাস করাতে পারবেন না, কিশোর বলল। আমি ভাল করেই জানি, আপনিই বিষ মিশিয়ে দিয়েছিলেন। মিল্ক শেকের গ্লাসে কি মিশিয়েছিলেন বলুন তো?
শব্দ করে হাসল বোনহেড। পদ্মাসন থেকে উঠে নতুন করে সাজাতে লাগল চারপাশে রাখা স্ফটিকগুলো। ছটা বাজে। আমার সাঁতারের সময় হয়েছে। বলেই পুলের কিনারে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল পানিতে।
তাকিয়ে রয়েছে দুই গোয়েন্দা।
পানিতে দাপাদাপি করছে বোনহেড। একবার ডুবছে, একবার ভাসছে। চোখ। বড় বড় হয়ে যাচ্ছে, মুখ গোল, মুখের ভেতরে পানি ঢুকে যাচ্ছে।
সাঁতার ভাল জানে না লোকটা, কিশোর বলল।
একেবারেই জানে না! বুঝে ফেলেছে মুসা। একটানে জুতো খুলে ফেলেই ডাইভ দিয়ে পড়ল পানিতে। কয়েক সেকেণ্ডেই পৌঁছে গেল খাবি খেতে থাকা লোকটার কাছে। পেছন থেকে গলা পেঁচিয়ে ধরে টেনে আনতে লাগল কিনারে। পানিতে ডোবা মানুষকে কি করে উদ্ধার করতে হয়, ভালই জানা আছে তার।
ভারি শরীর। দুজনে মিলে কসরৎ করেও বোনহেডকে পানি থেকে তুলতে কষ্ট হলো কিশোর আর মুসার।
বোনহেড কথা বলার অবস্থায় ফিরে এলে কিশোর জিজ্ঞেস করল, একাজ করতে গেলেন কেন? আমরা না থাকলে তো ডুবে মরতেন।
গতকাল তো তোমরা ছিলে না। ঠিকই সাঁতার কেটেছি। কই, মরিনি তো।
আপনার মাথায় দোষ আছে! রাগ করে বলল কিশোর, আর একটা মিনিটও আমরা থাকব না এখানে! যাওয়ার আগে একটা কথা বলে যাই, শুনুন, বেন ডিলনকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। আমার সন্দেহ, আপনি এ ব্যাপারে কিছু জানেন। আমাদেরকে বলছেন না। না বললে নেই, আপনার ইচ্ছে। কিন্তু ভাববেন না, এতে করে আটকাতে পারবেন আমাদেরকে। ঠিক খুঁজে বের করে ফেলব। আমরা ডিলনকে।
বোনহেডের চেহারার পরিবর্তনটা মুসারও নজর এড়াল না। ঠিক জায়গায় ঘা মেরেছে কিশোর। কিন্তু মুহূর্তে সামলে নিল ভবিষ্যদবক্তা। হাসি ফুটল ঠোঁটে। ডিলন কোথায় আছে আমি তোমাদেরকে বলতে পারব না। তবে ডিলন আমাকে বলতে পারবে সে কোথায় আছে।
আপনার সঙ্গে সে যোগাযোগ করবে আশা করছেন নাকি? কিশোর জিজ্ঞেস করল।
ডিলন আমার ছাত্র। ছাত্র হলেই প্রথমে আমি ওদেরকে প্রয়োজনীয় স্ফটিক দিয়ে দিই। স্ফটিকগুলো সব আমার দিকে টিউন করা। কিংবা বলা যায়, আমরা। যারা

এই গ্রুপে আছি, তাদের সবার দিকে টিউন করা। আমাদেরকে চেনে ওগুলো। আমাদের চিন্তা পড়তে পারে, আমাদের স্বপ্ন বুঝতে পারে। কি পোশাক আমাদের পরা উচিত তা-ও বলে দিতে পারে। আমরা বহুদূরে চলে গেলে আমাদের জন্যে মন কেমন করে ওগুলোর। নিঃসঙ্গ বোধ করে।
এতগুলো কথা তো বললেন, কিছুই বুঝলাম না! ফেটে পড়ার অবস্থা হয়েছে। কিশোরের।
ডিলনের স্ফটিকগুলো নিয়ে এসো। আমি ওগুলোকে টিউন করে, প্রোগ্রাম করে চ্যানেল করে দেব। দেখবে কি ঘটে।
যেন ক্যাবল টিভি টিউনিং করছে আরকি! আনমনে বিড়বিড় করল মুসা।
চোখ মুদল বোনহেড। স্ফটিকগুলো এনে দাও। বোনহেড কোথায় আছে বের করে দিচ্ছি।
স্ফটিক আপনাকে ডিলনের সন্ধান দেবে? মুসারও অসহ্য লাগতে আরম্ভ করেছে এ ধরনের কথাবার্তা। যদি না জানে? যদি মন খারাপ থাকে, কিংবা রেগে গিয়ে থাকে আপনার ওপর, বলতে না চায়?
স্ফটিক বলবেই।
এ ব্যাটাকে ধরে নিয়ে গিয়ে পাগলা গারদে ভরা উচিত এখনই! ভাবল মুসা।
ওকে অবাক করে দিয়ে হঠাৎ বলে বসল কিশোর, ঠিক আছে, ওই কথা রইল। তাহলে। আমরা স্ফটিকগুলো বের করে এনে দেব আপনাকে। যত তাড়াতাড়ি পারি।

.

গাড়িতে ফেরার পথে সারাটা রাস্তা ঘোঁৎ ঘোঁৎ করল মুসা। বোনহেডের ওপর রাগ। বলল, কিশোর, ওই ব্যাটাকে আমি চিনি। দেখেছি কোথাও। মনে করতে পারছি না। আর তুমিই বা চট করে রাজি হয়ে গেলে কি করে, স্ফটিকগুলো খুঁজে দেবে? ওরকম পাগলকে শায়েস্তা করাই তো তোমার স্বভাব। ফালতু কথা তুমি কখনই বিশ্বাস করো না।
গাড়িতে উঠল কিশোর। সীটবেল্ট বাঁধল। হেসে বলল, এখনও করি না। আমাদেরকে কিছু একটা বোঝাতে চেয়েছে পটার বোনহেড, ইঙ্গিতে। কিংবা উল্টোপাল্টা কথা বলে আমাদের কাছে কিছু লুকাতে চেয়েছে। যা-ই করুক, আমি তার সঙ্গে খেলা চালিয়ে যাব। দেখিই না কি বেরোয়। এমনও হতে পারে, ডিলনের স্ফটিকগুলো সত্যি কোন একটা সূত্র দিয়ে বসল আমাদের।
ডিলনের ম্যালিবু বীচের বাড়ি থেকে স্ফটিকগুলো খোঁজা শুরু করবে ঠিক করল দুজনে। মুসা গাড়ি চালাচ্ছে, কিশোর কথা বলছে। আপনমনেই বকর বকর করতে থাকল বোনহেড, রিডার, ডিলন আর অ্যাঞ্জেলাকে নিয়ে।

একটা চিকেন লারসেন রেস্টুরেন্টের সামনে এসে ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষল মুসা। সেই যে লারসেন, মুরগীর রাজা, যার কাহিনী বলা হয়েছে খাবারে বিষ বইতে। কিশোর জিজ্ঞেস করল, খিদে পেয়েছে?
না। তবে খেতে বসলে তোমার বকবকানিটা তো বন্ধ হবে। আরিব্বাপরে। বাপ, কানের পোকা নাড়িয়ে ফেলল!
চুপ হয়ে গেল কিশোর।
আবার ডিলনের বাড়িতে চলল মুসা। বাড়িতে পৌঁছে ভেতরে ঢোকার সময় আর ভাল লাগল না তার। তবু কিশোরের সঙ্গে এগোতে লাগল, অনিচ্ছাসত্ত্বেও। সাবধানে সদর দরজার দিকে এগোল দুজনে। এখনও খোলা, তালা নেই।
ভেতরে উঁকি দিল মুসা। আসবাবপত্র যেখানে যেভাবে পড়ে ছিল, সেভাবেই। রয়েছে, ঠিক করা হয়নি। করবেই বা কে?
কেউ কিছু ছোঁয়নি,বলল সে।
এগোও।
আবার এগোল দুজনে। মুসা আগে আগে। পায়ের তলায় মড়মড় করে কাচ গুড়ো হওয়া শুরু হয়েছে। কাচের গুঁড়োর সঙ্গে এখন মিহি বালি মিশেছে। সৈকত থেকে উড়ে এসে পড়েছে ওই বালি।
সাংঘাতিক একটা লড়াই হয়ে গেছে এখানে, মুসা বলল।
বুঝতে পারছি, কিশোর বলল। চোখ বোলাচ্ছে ঘরে। মেঝেতে পড়ে থাকা কাচের গুড়ো পরীক্ষা করে বলল, স্ফটিকের গুড়ো নয় এগুলো। অসমান। স্ফটিক ভাঙলে ছোট স্ফটিকই হয়ে যায় আবার।
তাহলে কোত্থেকে এল?
রহস্য।
ডিলনের স্ফটিক খুঁজতে লাগল ওরা। মুসা চলে এল শোবার ঘরে। খানিক পরে বাড়ির পেছন দিক থেকে কিশোরের ডাক শোনা গেল, দেখে যাও!
হল পেরিয়ে দৌড়ে পেছনের বেডরুমে চলে এল মুসা, এখান থেকে সাগর দেখা যায়। বুকশেলফের সামনে ঝুঁকে রয়েছে কিশোর, একটা বইয়ের দিকে তাকিয়ে।
মুসার সাড়া পেয়ে বলল, পটার বোনহেডের অটোগ্রাফ দেয়া তারই লেখা। বই।
এই দেখো, অনেক বই লিখেছে, জোরে জোরে নাম পড়তে লাগল কিশোর, ইনফিনিটি স্টপস হিয়ার, আউট অভ বডি এক্সপিরিয়েনসেস, হাউ টু বি ইউর অউন বেস্ট ট্র্যাভেল এজেন্ট, দি থার্ড আই বুক অভ অপটিক্যাল ইলিউশন, গেটিং রিচ বাই গোইং ব্রোকঃ অ্যান অটোবায়োগ্রাফি।
দম নিতে কষ্ট হওয়ার অনুভূতিটা হলো আবার মুসার। বলল, স্ফটিকগুলো এখানে নেই, কিশোর। আমি গাড়িতে গিয়ে বসি। তুমি দেখে তাড়াতাড়ি চলে

এসো, অন্য কোথাও খুঁজব।
গাড়িতে বসে আছে তো আছেই মুসা, কিশোরের আর দেখা নেই। তিরিশ মিনিট পরে এল সে।
এত দেরি করলে?
অ্যাঞ্জেলা ডোভারকে ফোন করেছিলাম। কিশোর জানাল, ও বলল, স্ফটিক ছাড়া কখনও কোথাও যায় না ডিলন। ভয়ের দৃশ্যগুলোতে অভিনয় করার দিন। পুষ্পরাগমণি সাথে করে নিয়ে যায় সে। রোমান্টিক দৃশ্যে নীলকান্তমণি। কোয়ার্জ নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল যেদিন জ্যান্ত কবর দেয়ার দৃশ্যটা নেয়ার কথা। সেই দিনই গায়েব হয়ে গেল ডিলন। আগের দিন নাকি ওর ক্লোজ-আপ নেয়া হয়েছিল।
কোথায় যাব? মুভি স্টুডিওতে?
গোরস্থানে।
গোরস্থান! কিশোর, কি জানি কেন, আমাদের কেসগুলো খালি গিয়ে গোরস্থানে শেষ হতে চায়! অনেক কেই তো হল! এবারেরটাও কি তাই হবে? এক মুহূর্ত চুপ থেকে বলল, একেক সময় মনে হয়, গোরস্থানে থাকার জন্যেই যেন আমাদের জন্ম হয়েছিল। আর কোথাও গেলে হয় না এখন? কাল দিনের বেলা নাহয় যাব।
রাতে যেতে ভয় লাগছে তো? হাসল কিশোর। সাথে করে স্ফটিক নিয়ে। যাওয়ার অভ্যেস ডিলনের। অ্যাঞ্জেলার কাছে জানলাম, ছোট একটা বাক্সতে ভরে ওগুলো নিয়ে যেত সে। গত বিদ্যুৎ বারেও নিয়েছিল। অ্যাঞ্জেলা বলল, শুটিঙের সরঞ্জাম নিয়ে যাওয়ার ট্রাকগুলো এখনও গোরস্থানেই রয়েছে।
থাক। এতদিনে যদি কিছু না হয়ে থাকে, আজকে এক রাতে আর হবে না। পঞ্চাশ মাইল দূর। এখন রওনা হলেও যেতে যেতে মাঝরাত হয়ে যাবে।
কিন্তু মুসার কথা শুনল না কিশোর।
রাত এগারোটা উনষাট মিনিটে ড্যালটন সিমেট্রির পাশে এনে গাড়ি রাখল। মুসা। হেডলাইট নিভাল। নভেম্বরের শুকনো বাতাস চাবুক হেনে গেল যেন ডালে ডালে, পাতায় পাতায়। এমন ভাবে দুলে উঠে কাছাকাছি হতে লাগল ডালগুলো, মনে হল মাথা দুলিয়ে আলাপে ব্যস্ত ওরা।
আমি এখানেই থাকি, মুসা বলল। ইঞ্জিনটা চালু থাক। রেডিও অন করে দিই।
গ্রাভ কম্পার্টমেন্ট থেকে টর্চ বের করে মুসার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল। কিশোর, তোমার তো ভয় থাকার কথা নয়। নিরাপত্তার জন্যে সাথে স্ফটিক রয়েছে...
নেই। বাড়িতে রেখে এসেছি। পকেটে রাখতে পারি না। গরম লাগে।
গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল ওরা। অন্ধকার রাত। আকাশে চাঁদ আছে, মেঘও আছে। পাগলা ঘোড়ার মত যেন ছুটে চলেছে মেঘগুলো। ফলে ক্ষণে ক্ষণে ঢাকা পড়ছে

চাঁদ, আবার বেরিয়ে আসছে। ঝিঁঝি ডাকছে। ছোট জানোয়ারেরা হুটোপুটি করছে ঝোপের ভেতর। ঢাল বেয়ে নামতে নামতে হঠাৎ পা পিছলাল কিশোর, গড়িয়ে পড়তে লাগল। ধরার জন্যে হাত বাড়িয়েছিল মুসা, ফসকে গেল।
গড়ান থামল একসময়। উঠে বসে কিশোর বলল, ধাক্কা মারলে কেন?
কই? আমি তো ধরতে চেষ্টা করলাম। কিসে হোঁচট খেলে?
দ্বিধায় পড়ে গেল কিশোর। কি জানি, বুঝতে পারলাম না!
দূরে ঘেউ ঘেউ শুরু করল একটা কুকুর। ব্যথা পেয়ে কেউক করে উঠে চুপ হয়ে গেল। তারপর স্তব্ধ নীরবতা।
টর্চ হাতে আগে আগে চলল মুসা। গোরস্থানের আরেক ধারে চলে যেতে হবে। সার্ভিস রোডের ধারে দেখেছিলাম ট্রাকগুলোকে। হয়তো ওখানেই আছে।
দুজনেই টর্চ জ্বেলে রেখেছে। কিশোর ধরে রেখেছে সামনের দিকে। মুসা সামনেও ফেলছে, আশপাশেও ফেলছে আলো। মাঝে মাঝে ঘুরে পেছনেও দেখছে। কাজেই, ওটা যখন ছুটে এল, দেখতে পেল না সে, ওই সময় পেছনে তাকিয়ে ছিল। বাতাসের ঝাঁপটা লাগল দুজনের গায়েই। তীক্ষ্ণ ডাক ছাড়ল ওটা।
বাপরে! বলে বসে পড়ল মুসা। ভূ-ভূ-ভূ-ত!
আরে দূর, পেচা! কি যে কাণ্ড করো না! খাবার পায়, দেখে চুপচাপ এলাকা, পেঁচা তো এখানে থাকবেই।
লেকচার দিতে কে বলেছে তোমাকে? থামো। সার্ভিস রোডের দিকে আলো ফেলল মুসা। একটা গর্ত পেরিয়ে যেতে হবে। কবরের মত করে খোঁড়া। ওখানে শুটিঙের বন্দোবস্ত করেছিল ওরা। আমার বিশ্বাস, থাকলে স্পেশাল ইফেক্ট লেখা ট্রাকটাতেই আছে বাক্সটা।
পথ দেখাও।
দাঁড়াও। কি যেন শুনলাম।
এসো, সামনে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর।
নরম কার্পেটের মত পায়ের নিচে পড়ছে ঘাস। বাতাসে ভেসে আসছে মিষ্টি, ভারি এক ধরনের গন্ধ, কাপড়ে লেগে আটকে যাচ্ছে যেন।
দাঁড়াও! কিশোরের হাত আঁকড়ে ধরে তাকে থামাল মুসা। বললাম না, শব্দ শুনেছি!
দাঁড়িয়ে গেল কিশোর। কান পেতে রইল দুজনেই। বাতাসের শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দই কানে এল না।
ভুল শুনেছ, কিশোর বলল। কল্পনা।
তুমি নিজেও শিওর নও, কিশোর, তোমার কণ্ঠস্বরই বলছে।
চলো।

যেতে ইচ্ছে করছে না মুসার, কিশোরের চাপাচাপিতেই কেবল এগোচ্ছে। পাহাড়ী পথ। অন্ধকারে ঠিকমত দেখে চলতে না পারলে আছাড় খেয়ে পড়তে হবে। ঠিক জায়গার দিকেই এগোচ্ছে তো? সন্দেহ হলো তার।
না, ঠিকই এসেছে, খানিক পরেই বুঝতে পারল। নতুন খোঁড়া কবরটা দেখতে পেল সে। ওটার পাড়ে এসে দাঁড়াল দুজনে। ভেতরে আলো ফেলল। টর্চের আলোয় যেন হাঁ করে রইল গভীর করে খোঁড়া শিশিরে ভেজা গর্তটা। আশেপাশে কোন ট্রাক দেখা গেল না। সার্ভিস রোডটা শূন্য।
গেল কোথায়? কিশোরের প্রশ্ন।
এখানেই তো ছিল। সরিয়ে ফেলেছে বোধহয়।
খুব খারাপ হয়ে গেল। এত কষ্ট করে এসে শেষে কিছুই না। ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার কিশোর। শব্দ শুনেছ বললে না…
কথা শেষ হলো না। মাথার পেছনে প্রচণ্ড আঘাত লাগল। চিৎকার করে উঠল সে। মুসাকেও চিৎকার করতে শুনল। তারপরই কালো অন্ধকার যেন গিলে নিল তাকে।

.

মাথার ভেতরে কেমন জানি করছে মুসার। কি হয়েছে কিছু বুঝতে পারছে না। কোথায় পড়েছে? কি হয়েছিল? মনে পড়ল আস্তে আস্তে। মাথায় বাড়ি লেগেছিল। শক্ত কিছু দিয়ে বাড়ি মারা হয়েছে, ডালটাল দিয়ে। কিশোর কোথায়?
মাথা তোলার চেষ্টা করল মুসা। দপদপ করছে। ভীষণ যন্ত্রণা। কোনমতে তুলে দেখল কবরটার ভেতরে পড়ে আছে সে। কিশোর রয়েছে তার পাশে। অনড়। শক্তি পাচ্ছে না। আবার মাথাটাকে ছেড়ে দিল মুসা, থপ করে পড়ে গেল ওটা নরম মাটিতে। চোখের সামনে কালো পর্দা ঝুলছে যেন। ওটাকে সরানোর আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল সে। বেহুঁশ হতে চাইছে না। কি হয়েছিল? আবার ভাবল। ওঠো, হুশ হারাবে না, নিজেকে ধমক লাগাল সে।
একটা শব্দ হলো। শিউরে উঠল মুসা। নিজের অজান্তেই। যে লোকটা বাড়ি মেরেছে ওদেরকে, এখনও রয়েছে কবরের পাড়ে। মাথা তুলে দেখার চেষ্টা করল মুসা, পারল না।
গায়ে এসে পড়ল কি যেন।
খাইছে! মাটি! বেলচা দিয়ে কবরের পাড়ের আলগা মাটি ফেলা হচ্ছে ভেতরে! জ্যান্ত কবর দিয়ে ফেলার ইচ্ছে!
কবরের পাড় থেকে উঁকি দিল একটা মুখ। চেহারাটা দেখতে পেল না মুসা, তবে চাঁদের আলোয় চকচক করা বেলচাটা ঠিকই চিনতে পারল। সরে গেল মুখটা। আবার এসে মাটি পড়তে লাগল কবরের ভেতরে।

চিৎকার করে উঠল মুসা। নাআআ! নিজের কানেই বেখাপ্পা, অপার্থিব শোনাল চিৎকারটী।
যত ব্যথাই করুক, কেয়ার করল না আর সে। জোরে জোরে গালমুখ ডলে আর মাথা ঝাড়া দিয়ে মাথার ভেতরটা পরিষ্কারের চেষ্টা করল। হাতে লেগে থাকা কাদা মুখে লেগে গেল। ভেজা মাটির গন্ধ।
ওপর থেকে মাটি পড়া থেমে গেল।
হাঁটুতে ভর দিয়ে সোজা হল মুসা। উঠে দাঁড়ানর চেষ্টা করতে লাগল। কবরের ভেজা দেয়াল ধরে ধরে উঠল অবশেষে। চেঁচিয়ে ডাকতে লাগল, কিশোর, ওঠ! এই কিশোর, উঠে পড়ো! কিশোর.আমাদের বেরিয়ে যেতে হবে এখান থেকে...
নড়ে উঠল কিশোর। তাকে উঠতে সাহায্য করল মুসা। শার্টের বুক খামচে ধরে টেনে টেনে তুলল।
হয়েছে...হয়েছে..., হাঁপাতে হাঁপাতে বলল কিশোর। কোথায়...কি... কথা বলার শক্তি নেই যেন। দাঁড়িয়ে আছে। কাঁধ ঝাড়া দিয়ে মাটি ফেলার চেষ্টা করছে শরীর থেকে।
কিশোরকে ছেড়ে দিয়ে এর পরের জরুরি কাজটায় মন দিল মুসা। কবরের দেয়ালে হাতের আঙুল আর জুতোর ডগা ঢুকিয়ে দিয়ে বেয়ে ওঠার চেষ্টা চালাল। খুব একটা কঠিন কাজ না। মাথায় যন্ত্রণা না থাকলে এটা কোন ব্যাপারই ছিল না। তবে এখন যথেষ্ট কষ্ট হলো।
বাইরে বেরিয়ে কাউকে চোখে পড়ল না। নির্জন গোরস্থান। ঝিঁঝির একটানা শব্দ, মাঝে মাঝে পেঁচার ডাক শোনা যাচ্ছে আগের মতই। ও হ্যাঁ, আরেকটা ডাকো, কুকুরটা ডাকতে আরম্ভ করেছে আবার।
কবরের পাড়ে উপুড় হয়ে শুয়ে নিচের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল মুসা। প্রায় টেনে তুলল কিশোরকে। হাঁপাতে লাগল দুজনেই। মাথার ভেতরটা ঘোলাটে হয়ে আছে।
জলদি এসো, মুসা বলল, ব্যাটাকে ধরতে হবে। নিশ্চয় পালাতে পারেনি এখনও।
না, শার্ট থেকে মাটি সরাতে সরাতে বলল কিশোর, আড়ালে থেকে নজর রাখব আমরা। তাতে ওকে অনুসরণ করা যেতে পারে। পিছু নিয়ে দেখতে পারব কোথায় যায়।
পাহাড়ের চূড়ায় উঠে এল আবার দুজনে। একটা ক্যামারো গাড়িকে ছুটে যেতে দেখল হেডলাইট জ্বেলে, লস অ্যাঞ্জেলেসের দিকে। মিনিট খানেক পরেই। ভেগাটা চালিয়ে মুসাও রওনা হয়ে গেল। পাশে বসেছে কিশোর। ছোট গাড়িটাকে যতটা সম্ভব দ্রুত ছোটানোর চেষ্টা করল মুসা, কিছুতেই চোখের আড়াল করতে চায় না ক্যামারোটাকে।

হান্টিংটন বীচ, লং বীচ পেরিয়ে এসে লস অ্যাঞ্জেলেসে ঢুকল গাড়ি। বেভারলি হিলের দিকে এগোল।

এলাকাটা পরিচিত লাগল মুসার কাছে। বলল, কয়েক ঘণ্টা আগেও না। এখানে ছিলাম?

স্ট্রীট লাইটের আলোয় পলকের জন্যে ক্যামারোর ড্রাইভারকে দেখতে পেল সে। বয়েস খুব কম মনে হলো, বড় জোর উনিশ, সাদা একটা হেডব্যাণ্ড লাগিয়েছে মাথায়। বায়ে মোড় নিল লোকটা। এই রাস্তাও মুসার পরিচতি। পটার বোনহেডের বাড়ির দিকে যাচ্ছে গাড়িটা।

আগের মতই এখনও খুলে রয়েছে বোনহেডের বাড়ির সদর দরজা। ক্যামারো থেকে নেমে সোজা ভেতরে ঢুকে গেল লোকটা। কিশোর আর মুসাও ছুটল। পেছনে।

ভোর হয়ে আসছে। তাজা বাতাসে অনেকটা ঠিক হয়ে গেছে দুজনের মাথার যন্ত্রণা, ঘোলাটে ভাবটা দূর হয়ে গেছে। মোমের আলো জ্বলছে বিরাট বাড়িটার ঘরে। আলো লেগে ঝিকঝিক করছে ফটিক। এক ঘর থেকে আরেক ঘরে ঢুকতে লাগল গোয়েন্দারা, বোনহেডকে খুঁজছে।

ইঁদুর মনে হচ্ছে নিজেকে, মুসা বলল, ফাঁদের দিকে যাচ্ছি।

যাইই না। পনির থাকতেও পারে।

হঠাৎ একটা দরজা খুলে গেল। বড় একটা ঘরের ভেতর শত শত মোম। জ্বলছে। সাথে করে এক যুবক আর এক মহিলাকে নিয়ে বেরিয়ে এল বোনহেড। দুজনের বয়েসই বিশের কোঠায়।

এত রাতে আমাদের সাথে দেখা করেছেন, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, লোকটা বলল। একটা চেক বাড়িয়ে দিয়েছে বোনহেডের দিকে। যাই। আরও মক্কেল এসেছে দেখি?

সত্য সন্ধানীরা তাদের হাতঘড়ি হারিয়ে ফেলেছে, বোনহেড বলল রহস্যময়। কণ্ঠে, তাকিয়ে রয়েছে কিশোর আর মুসার দিকে, চোখে বিচিত্র দৃষ্টি।

আপনার কথা অক্ষরে অক্ষরে যদি লিখে রাখতে পারতাম, মহিলা বলল, ভবিষ্যতে কাজে লাগত। যাই হোক, আপনি যে আমার স্বামীর সঙ্গে দেখা করেছেন, তাতে আমি কৃতজ্ঞ। ওর জন্মদিনটা আনন্দে কাটুক, ও খুশি থাকুক, এটাই আমি চেয়েছি। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। গুড নাইট।

দুজনে বেরিয়ে গেলে গোয়েন্দাদের দিকে তাকিয়ে স্বাভাবিক হাসি হাসল বোনহেড। স্ফটিকগুলো পাওনি তোমরা। বুঝতে পারছি।

না, পাইনি, নিজের কণ্ঠস্বরে নিজেই অবাক হলো মুসা, কেমন খড়খড়ে হয়ে। গেছে। গোরস্থান থেকে এলাম।

এখন এসেছি অন্য জিনিস খুঁজতে, কিশোর বলল, সাদা হেডব্যাণ্ড পরা একজন লোককে।
চারপাশে তাকাল বোনহেড। ওরকম কাউকে তো দেখছি না।
তৃতীয় নয়ন ব্যবহার করুন, মুসা বলল।
ওর পেছন পেছন এখানে ঢুকেছি আমরা, বলল কিশোর।
মুখের ভাব বদলে গেল বোনহেডের, যেন মিথ্যে বলে ধরা পড়ে গেছে। ও, তোমরা নিকের কথা বলছ বোধহয়। আমার ছাত্র। ওকে কি দরকার?
একটু আগে আমাদেরকে জ্যান্ত কবর দিতে চেয়েছিল, ভারি গলায় বলল কিশোর। ড্যালটন সিমেট্রিতে গিয়েছিলাম ডিলনের স্ফটিকগুলো খুঁজতে। মাথার পেছনে বাড়ি মেরে আমাদের বেহুশ করে ফেলে দেয় আপনার ছাত্র, তারপর মাটি দিয়ে ভরে দিতে চায়।
নিক? মোলায়েম গলায় ডাকল বোনহেড। শুনে যাও তো?
হলের দরজায় এসে দাঁড়াল সাদা হেডব্যাণ্ড পরা যুবক।
এই লোকই, বলে উঠল মুসা। মুঠো হয়ে গেল হাত। ভদ্রতার ধার দিয়েও গেল না। চেঁচিয়ে উঠল, এই, আমাদের পিছু নিয়েছিলে কেন? বাড়ি মেরেছিলে কেন?
কি বলছ? নিক অবাক। সারারাত তো ঘরেই ছিলাম আমি। একটা মুহূর্তের জন্যে বেরোইনি।
মিথ্যে কথা! আমরা আগের বার যখন এসেছিলাম, তখনই আমাদের পিছু নিয়েছিলে!
সারারাত ঘরে ছিলাম, একই স্বরে বলল নিক। তোমরা ভুল করছ। একটি বারের জন্যেও বোনহেডের চোখ থেকে চোখ না সরিয়ে পিছু হেঁটে বেরিয়ে গেল
হচ্ছেটা কি এখানে? রেগে গিয়ে বোনহেডকে জিজ্ঞেস করল মুসা।
তোমার বোঝার সাধ্য হবে না, বলল বোনহেড। যতক্ষণ না মনের খোলা অংশকে আরও খুলতে না পারবে।
চোখ উল্টে দেয়ার উপক্রম করল কিশোর। গুঙিয়ে উঠে বলল, প্লীজ, আবার শুরু করবেন না ওসব কথা! বোনহেড চুপ করে আছে দেখে বলল, অনেকেই আমাদের কাছ থেকে কথা লুকানোর চেষ্টা করেছে, আগে। পারেনি। প্রতিবারেই ওদের কথা টেনে বের করেছি আমরা, মুখোশ খুলে দিয়েছি। আপনিও পারবেন না। বেন ডিলনের ব্যাপারে কিছু একটা লুকানোর চেষ্টা করছেন আপনি।
শ্রাগ করল বোনহেড। হ্যাঁ-না কিছু বলল না। আরেক কথায় চলে গেল, ডিলনের এই গায়েব হয়ে যাওয়াটা যারা তাকে চেনে তাদের সবার কাছেই বেদনাদায়ক, ওর নিজের কাছেও। মনের খোলা অংশ আবিষ্কার করে ফেলেছিল সে। ও হলো

ফাইন্ডিং দা পাথ নামের চমৎকার সেই ভাস্কর্যটার মত। ভাস্কর্যটার। চারটে পা, একেকটা একেক দিক নির্দেশ করছে।
ফস করে জিজ্ঞেস করে বসল মুসা, শেষ কবে আপনি ডিলনের ম্যালিবু বীচের বাড়িতে গিয়েছিলেন?
প্রশ্নটা অবাক করল বোনহেডকে। বীচের বাড়ি? কখনও যাইনি। আমি যাব কেন? ছাত্ররাই শিক্ষকের বাড়ি আসে।
তাহলে ভাস্কর্যটার কথা কি করে জানলেন? ওটা দেখেছি ডিলনের বাড়িতে। পা উল্টে পড়ে থাকতে। আসবাবপত্রের সঙ্গে সঙ্গে ওটাকেও ভাঙা হয়েছে।
ওটার কথা আপনি জানলেন কি করে? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
প্রশ্নের জবাবেই যেন বিশাল থাবার মুঠো খুলল বোনহেড। হাতের তালুতে একটা বড় বেগুনী পাথর। আবার শক্ত করে বন্ধ করে ফেলল মুঠো। মূল্যবান কাঁপুনি শুরু হয়েছে স্ফটিকের। আমি যাই।
ওদেরকে বেরিয়ে যেতে বলল বোনহেড, ঘুরিয়ে। ভারি পায়ে থপথপ করে হেঁটে চলে গেল যে ঘরে মোমবাতি জ্বলছে সেদিকে। কিশোর আর মুসা দাঁড়িয়ে আছে। ওদের চারপাশের মোমগুলো নিভে যাচ্ছে একের পর এক।
ডিলনের বাড়ির ভাস্কর্যটার কথা বলে একটা ভাল কাজ করেছ, কিশোর বলল।
থাক আমার সঙ্গে, রসিকতা করে বলল মুসা, দিনে দিনে আরও কত কিছু দেখতে পাবে।
প্রায় দুটো বাজে। বোনহেডের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল দুজনে। আরেকবার মুখে লাগল রাতের তাজা হাওয়া। হাই তুলতে শুরু করল ওরা। বিশ্রাম চায়, বুঝিয়ে দিল শরীর।
সোজা এখন বিছানায়, ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে বলল মুসা। তোমাকে নামিয়ে দিয়েই চলে যাব।
নিকের ব্যাপারে কি করবে? ডানের সাইড-ডোর মিররের দিকে তাকিয়ে। রয়েছে কিশোর। নিক বসে আছে ওর গাড়িতে। আমরা কোথায় যাই দেখার জন্যেই বোধহয়।
রিয়ার-ভিউ মিররের দিকে তাকাল মুসা। বেশ কয়েক গজ পেছনে ছায়ায়, দাঁড়িয়ে রয়েছে নিকের ক্যামারো। মুসার মুখ থেকে হাসি চলে গেল। বেশ, পিছু নেয়ারই যদি ইচ্ছে হয়ে থাকে, নিতে দেব ব্যাটাকে। আসতে থাকুক। ক্যারাবুঙ্গায় গিয়ে খসিয়ে দেব।
হ্যাঁ, তাই কর। আরাম করে সিটে হেলান দিল কিশোর।
পেছনে, কেউ লেগেছে জানলে ভুলভাল ড্রাইভিং শুরু করে লোকে, মুসা বলল।
হু! মিররের দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। নিকের গাড়ির দিকে চোখ।

যে তোমাকে ফলো করছে তার সঙ্গে খুব রহস্যময় আচরণ করা উচিত তোমার। বলতে থাকল মুসা, এই যেমন ধর, হলুদ লাইট দেখলে জোরে চালিয়ে পার হয়ে যাওয়া উচিত নয়। যদি পেছনের লোকটা পেরোতে না পারে? তোমাকে হারিয়ে ফেলবে সে। মজাটাই নষ্ট। আর ব্যাঙের মত লাফ দিয়ে বারবার লেনও বদল করা চলবে না। তোমার সঙ্গে থাকার চেষ্টা করতে গিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে দিতে বাধ্য হবে সে…

আহ, বকবকটা থামাও না! ক্যারাবুঙ্গার তিন ব্লক দূরে খসাবে।

তাহলে এখুনি গুড নাইট বলে নিতে পার নিকি মিয়াকে। একবারেই একসিলারেটর অনেকখানি চেপে ধরল মুসা। একটা ওয়ান-ওয়ে পথ ধরে ছুটল। একটা ব্লকের দিকে। ভুল পথে যাচ্ছে সে, উল্টো দিক থেকে কোন গাড়ি আসতে দেখল না, তাই রক্ষা। নইলে অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে যেতে পারত। আচমকা ডানে মোড় নিয়ে একটা গলিতে ঢুকে পড়ল। এবড়োখেবড়ো কাঁচা রাস্তায় লাফাতে শুরু করল গাড়ি। কয়েক গজ এগিয়েই ইঞ্জিন বন্ধ করে হেডলাইট নিভিয়ে দিল। মাথা নিচু করে রইল সে আর কিশোর।

আপন গতিতেই নিঃশব্দে এগিয়ে ক্যারাবুঙ্গা মোটরসের পুরানো গাড়ির সারিতে এসে ঢুকে পড়ল মুসার ভেগা। ব্রেক কষল সে। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখল, ব্লকটা ঘুরে আসছে নিক।

আমাদেরকে পাবে না, কিশোর বলল। খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরি করে না পেয়ে ফিরে যাবে।

মিস্টার নিক, খিকখিক করে শয়তানী হেসে বলল মুসা, এইবার আমাদের পালা। তুমি কোথায় যাও আমরা দেখব। কোন ইন্টারেস্টিং জায়গায় নিয়ে চলো আমাদেরকে।

.

নিকের সঙ্গে চলল দুই গোয়েন্দার ইঁদুর-বেড়াল খেলা। ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠছে খেলাটা। রাত দুটোর বেশি। এই সময় রাস্তায় যানবাহনের ভিড় খুব কম। নিকের অগোচরে থাকার জন্যে কয়েক ব্লক দূরে থেকে অনুসরণ করতে হচ্ছে মুসাকে।

এত কষ্ট তো করছি, হাই তুলে বলল সে, ফল পেলেই হয় এখন।

আমি কি ভাবছি জানো? কিশোর বলল, নিক আমাদেরকে ডিলনের কাছে নিয়ে যাবে। যেখানে লুকিয়ে রাখা হয়েছে তাকে।

সোজা হয়ে বসল মুসা। গতি বাড়িয়ে ক্যামারোর দিকে কিছুটা এগিয়ে গেল। বোনহেড আর নিক এই কিডন্যাপে জড়িত?

শীতল, ভোতা গলায় জবাব দিল কিশোর, ওরা মিথ্যুক।

লস অ্যাঞ্জেলেসের সম্ভ্রান্ত এলাকা বেল এয়ারে এসে ঢুকল ওরা। তিনতলা গোলাপী রঙ করা একটা কাঠের বাড়ির সামনে গাড়ি থামাল নিক। টালির ছাত বাড়িটার। চাঁদের আলোয় উইলো গাছ বিচিত্র ছায়া ফেলেছে, যেন বাড়িটার পটভূমিতে ঘাপটি মেরে রয়েছে একটা বেড়াল।
গাড়ি থেকে বেরোল নিক। ঘুমন্ত অঞ্চলটার ওপর চোখ বোলাল। গাড়ি থেকে কালচে রঙের একটা ব্যাকপ্যাক বের করে পিঠে বেঁধে সাবধানে এগোল অন্ধকার বাড়িটার দিকে। ওর আচরণেই বোঝা যাচ্ছে, সিকিউরিটি সিসটেমে পা দিয়ে। বসার ভয় করছে।
চুরি করে ঢোকার তালে আছে, ফিসফিস করে বলল মুসা। নইলে দরজায় টোকা দিত।
ওরাও বেরোল গাড়ি থেকে। অনেক বেশি সতর্ক হয়ে আছে। সিকিউরিটি সিসটেম চালু করে বিপদে পড়তে চায় না ওরাও। নিকের হাতে ধরা পড়তে চায় না।
বাড়ির সামনের দিকে এগোল নিক, প্রতিটি জানালা দেখতে দেখতে।
পুরানো মোটা একটা গাছের আড়ালে লুকাল কিশোর আর মুসা।
কি করছে? মুসার প্রশ্ন।
জানালা দিয়ে দেখার চেষ্টা করছে, কিশোর বলল। বাড়িতে কেউ আছে বলে তো মনে হচ্ছে না। দেখো, ঘোট একটা জিনিস ধরে রেখেছে মুখের কাছে। নিশ্চয় টেপ রেকর্ডার। কথা বলছে।
কথা বলা শেষ করে একটা ক্যামেরা বের করে অন্ধকার জানালার ভেতর দিয়ে ছবি তুলতে লাগল নিক। তারপর গিয়ে গাড়িতে উঠে চলে গেল। যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে।
বোনহেডের ওখানেই গেল, হতাশ ভঙ্গিতে বলল মুসা। যেখানে ছিলাম সেখানেই রয়ে গেলাম আমরা। এগোতে আর পারলাম না।
চুপ করে রয়েছে কিশোর। কিছু বলছে না।
গাড়িতে উঠেও চুপ হয়ে রইল সে। সীটে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল একসময়।
পরদিন বিকেলে হেডকোয়ার্টারে বসেছে তিন গোয়েন্দা। রবিনও এসেছে। আগের রাতের ঘটনাগুলোর কথা তাকে বলছে অন্য দুজন।
সাংঘাতিক কাণ্ড করে এসেছ, রবিন বলল। কিন্তু ডিলনের হলোটা কি? তাকে কি বের করা যাবেই না?
কাল রাতে পাইনি বলে যে কোনদিনই পাব না, তা হতে পারে না, কিশোর বলল। একটা জরুরী কথা জানতে পেরেছি কাল। ডিলনের ওপর বোনহেডের খুব প্রভাব।

এবং বোনহেড মিছে কথা বলেছে, যোগ করল মুসা। বলেছে, ডিলনের বাড়িতে কখনও যায়নি, অথচ ওই বাড়িতে যে একটা ভাস্কর্য আছে সেটা জানে।
ছাতের দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। কিছু ভাবছে। বিড়বিড় করে বলল, মনে হয় ভুল লোকের পিছে ছুটেছি আমরা…
ট্রেলারের দরজায় টোকা পড়ল। ক্ষণিকের জন্যে জমে গেল যেন সবাই। দরজা খোলার আগে শার্টটা প্যান্টের ভেতরে গুঁজে নিল কিশোর।
হাই, বলল একটা মেয়ে। ওর লম্বা, সোনালি চুল এলোমেলো হয়ে মুখ ঢেকে দিয়েছে। সবুজ চোখ। রবিন আছে?
অ্যাঁ! অস্বস্তি আরম্ভ হয়ে গেছে কিশোরের। পেছনে তাকিয়ে রবিনের মুখ দেখে নিল একবার। তারপর মেয়েটার দিকে ফিরে ডাকল, এসো, ভেতরে।
আই, রবিন, একটা হাসি দিয়ে বলল মেয়েটা, বেশি তাড়াতাড়ি চলে এলাম?… বাপরে, কি জায়গা!
তাড়াতাড়ি? না না, আসলে আমিই ভুলে গিয়েছি। জরুরী আলোচনা চলছে। তো…পরিচয় করিয়ে দিই। আমার বন্ধু কিশোর পাশা…
সুন্দর নাম তো, মেয়েটা বলল। নিশ্চয় আমেরিকান নয়?
না। বাংলাদেশী..আর ও মুসা আমান।
হাই, বলল মুসা। কোন হাই স্কুল?
হলিউড হাই, হেসে বলল রবিন, মেয়েটার হয়ে। ওর নাম চায়না।
মেয়েটাও হাসল। হাসার সময় নিচের ঠোঁটে কামড় লাগে তার। রবিনকে জিজ্ঞেস করল, আরও দেরি হবে?
না, অস্বস্তি বোধ করছে রবিনও। যাওয়ারও ইচ্ছে আছে, আবার এখানেও থাকতে চায়। আমতা আমতা করে শেষে বলে ফেলল, কিশোর, আজ রাতে চায়নাদের বাড়িতে পার্টিতে একটা ব্যাণ্ড গ্রুপ পাঠাতে হবে। আমাকে যেতে হচ্ছে এখন।
যেতে হলে যাও, ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর।
আর কদিন পরে তোমার চেহারাই ভুলে যাব আমরা, বিষণ কণ্ঠে বলল মুসা। কেন যে বড় হতে গেলাম! ছোট ছিলাম আগে, সে-ই ভাল ছিল…
হ্যাঁ, সময় তো আর সব সময় এক রকম যায় না, কষ্ট রবিনেরও হচ্ছে। ভাবছি ট্যালেন্ট এজেন্সির চাকরিটাই ছেড়ে দেব। আমার লাইব্রেরিই ভাল। দেখি…
অবাক হয়ে ওদের মুখের দিকে তাকাচ্ছে চায়না। কথাবার্তা ঠিক বুঝতে পারছে না।
তোমরা চালিয়ে যাও, বেরোনোর আগে বলল রবিন। জরুরী প্রয়োজন পড়লে ফোন করো আমাকে।

দুজনে বেরিয়ে গেলে কিশোর বলল, মেয়েটাকে দেখলে?
ভালমত, জবাব দিল মুসা।
ভাবতে অবাক লাগে, বুঝলে, এই সেই আমাদের মুখচোরা রবিন! কি স্মার্ট হয়ে গেছে। আর মেয়েগুলোও যেন সব ওর জন্যে পাগল। আচ্ছা, আমাদের দিকে তাকায় না কেন, বলো তো?
ভুল বললে। তোমার দিকে তো তাকায়ই, তুমিই তাকাও না। মেয়েদের সামনে মুখ ওরকম হাঁড়ির মত করে রাখলে কি আর পছন্দ করবে ওরা? তোমার কথাবার্তাও বড় বেশি চাছাছোলা। আসলে একমাত্র জিনাই সহ্য করতে পারে তোমাকে, তুমিও পারো। দুজনেরই স্বভাব এক তো...
হাত নাড়ল কিশোর। বাদ দা ও মেয়েদের আলোচনা। আসল কথায় আসি... আমাদের কেস...
পরদিন শনিবার। সৈকতে সাঁতার কাটতে গেল তিন গোয়েন্দা। নভেম্বর সাঁতারের মাস নয়। কেবল মুসার মত পানি-পাগল কিছু মানুষ ছাড়া সাগরে যেতে চায় না। আবহাওয়াটা সেদিন ভাল বলে কিশোর আর রবিনকে রাজি করাতে পেরেছে সে। কিন্তু সৈকতে এসে মত পরিবর্তন করল দুজনে। শেষে একাই গিয়ে। পানিতে নামতে হলো মুসাকে। খানিকক্ষণ দাপাদাপি করে ভাল না লাগায় উঠে এল। ইয়ার্ডে ফিরে চলল ওরা।
পরদিন শনিবার। হেডকোয়ার্টারের বাইরে দুটো পুরানো চেয়ারে বসে কথা বলছে কিশোর আর মুসা। এই সময় রবিনের গাড়িটা ঢুকতে দেখা গেল।
গাড়ি থেকে নামল রবিন আর চায়না।
এই সেরেছে রে! বলে উঠল মুসা, একেবারে বান্ধবীকে নিয়েই হাজির!
বিরক্ত ভঙ্গিতে মুখ বাঁকাল কিশোর। কিছু বলল না। তাকিয়ে রইল রবিন আর, চায়নার দিকে।
এগিয়ে এল রবিন। বুঝলে কিশোর, খুব ভাল গাইতে পারে চায়না। গত রাতে পার্টি ও একাই মাত করে রেখেছিল।
তাই নাকি? খুব ভাল, দায়সারা জবাব দিয়ে চুপ হয়ে গেল কিশোর।
আরও একটা ভাল ব্যাপার আছে, হেসে বলল রবিন। কিশোরের চুপ হয়ে যাওয়ার কারণ বুঝতে পেরেছে। পটার বোনহেডের ব্যাপারে আর আগ্রহ আছে?
ঝট করে মুখ তুলল কিশোর। কেন? কিছু জেনেছ নাকি?
চায়নার দিকে তাকিয়ে রবিন বলল, তুমিই বলো?
বোনহেডের সমস্ত বই আমি পড়েছি। একটা চেয়ারে বসল চায়না। ঝুঁকি দিয়ে মুখ থেকে চুল সরাল। একটা মেটাফিজিক্যাল মিনিকিউব। তবে এই বয়েসেও বাদিং সুটে ভালই লাগে ওকে।

হ্যাঁ, একমত হয়ে মাথা ঝকাল রবিন। দুই বন্ধুর দিকে তাকিয়ে বলল, কাল রাতে চায়নাদের বাড়ির সুইমিং পুলে সাঁতার কাটতে নেমেছিল বোনহেড।
পুরো সতর্ক হয়ে গেছে কিশোর।
প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মুসা, কিন্তু ও তো সাঁতার জানে না!
সেটা কি আর মানতে চায়, রবিন বলল। মনের খোলা অংশ না কি ঘোড়ার ডিম নিয়ে লম্বা এক লেকচার ঝেড়ে দিল। ছয় জন লোক গিয়ে তুলে এনেছে তাকে, নইলে ডুবেই মরত। ওস্তাদ শোম্যান বলতে হবে। একজন বৃদ্ধার দিকে তার নজর, মহিলা সাংঘাতিক ধনী। আরও কি করেছে, শোনো। দাঁড়াও, দেখাই, একটা ছোট নুড়ি কুড়িয়ে আনল রবিন। একটা স্ফটিককে এরকম করে হাতের তালুতে রেখে বিড়বিড় করে কি পড়ল। তারপর মহিলার কপালে ছোঁয়াল, এমনি করে, বলে চায়নার কপালে পাথরটা ছুঁইয়ে দেখিয়ে দিল কি ভাবে চুঁইয়েছে। বোনহেড। ভারি গলায় বলতে লাগল, লোকটার স্বর নকল করে বলার চেষ্টা করল রবিন, মিসেস অ্যাণ্ডারসন, আপনার সঙ্গে আগে কখনও দেখা হয়নি আমার। অথচ আমি অনুভব করছি, আমাদের পথ দুদিক থেকে এসে এক জায়গায় মিলিত হতে যাচ্ছে।
আর চুপ থাকতে পারল না চায়না। মিসেস অ্যাণ্ডারসনের অনুকরণে বলল, কি যে বলছেন, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।
আমি দেখতে পাচ্ছি, আপনার বাড়ির দেয়ালে, বোনহেডকে অনুকরণ করল। রবিন, শুগলের আঁকা একটা ছবি ঝুলছে। কাঠের ফ্রেম। ডান দিকে নিচের কোণটা ভাঙা। পড়ে গিয়েছিল হয়তো।
ঠিক, ঠিক বলেছেন! আপনি জানলেন কি করে? চায়না বলল।
ওর কপালে নুড়িটা আলতো করে চুঁইয়ে চোখ মুদল রবিন। আরও অনেক কিছুই জানি আমি। একটা অ্যানটিক সিরামিক বাউলে একটা বেড়াল ছানা ঘুমিয়ে আছে!
আশ্চর্য! অবিশ্বাস্য! চিৎকার করে উঠল চায়না, দক্ষিণাঞ্চলীয় টানে। অবশ্যই টানটা মিসেস অ্যাণ্ডারসনের।
আবার চায়নার কপালে পাথর ছোঁয়াল রবিন। উইলো গাছটাও দারুণ। বাড়ির ওপর ছায়া ফেলেছে এমন করে, মনে হচ্ছে একটা বেড়ালের ছায়া।
উইলো গাছ? বেড়ালের ছায়া? চিৎকার করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল মুসা। নিক!
তার দিকে তাকাল না রবিন। অভিনয় চালিয়ে গেল। চায়নার দিকে মাথা সামান্য নুইয়ে বাউ করে বলল, আশা করি ঠিক ঠিক বলতে পেরেছি সব।
তাহলে এই ব্যাপার, মাথা দুলিয়ে বলল কিশোর। সে রাতে মিসেস অ্যাণ্ডারসনের বাড়িতেই গিয়েছিল নিক, তথ্য জোগাড় করতে, চায়নাদের পার্টিতে মহিলাকে

তাজ্জব করে দেয়ার জন্যে।
করতে পেরেছে, রবিন বলল। গেঁথে ফেলেছে মহিলাকে। পরামর্শ দাতা হিসেবে বোনহেডকে বহাল করতে রাজি হয়ে যাবে মিসেস অ্যাণ্ডারসন। বললেই মোটা অংকের চেক লিখে দেবে।
শয়তান লোক! ঠগবাজ!
ডিলনের বাড়িতে না গিয়েও এভাবেই ভাস্কর্যটার কথা জেনেছে বোনহেড, মুসা বলল। নিশ্চয় ছবি তুলে নিয়ে এসেছিল নিক।
আমিও তখনই বুঝতে পেরেছি, ঠকাচ্ছে, রবিন বলল। মুখের ওপর বলার সাহস হয়নি। গায়ের জোরে পারতাম না। কারাত-ফারাত কিছু খাটত না ওর সঙ্গে, পিষে ফেলত আমাকে।
আমি হলাম একটা গাধা! জোরে জোরে কপালে চাপড় মারল মুসা। রামছাগল! নইলে ভুললাম কি করে!
কি ভুলেছ?
বলেছি না, কিশোরের দিকে তাকিয়ে বলল মুসা, বোনহেডকে আগেও কোথাও দেখেছি, শুটিং স্পটে দেখার আগে। ও হল টমি দা টু-টন টিটান! অনেক বছর আগে টিভিতে দেখতাম ওকে, রেসলার ছিল। রিঙে উঠত দুটো কাল ধাতুর টুকরো নিয়ে। গুল মারত একেকটা টুকরো একেক টন। সে জন্যেই নাম হয়েছে টু-টন। আরও চাপাবাজি করত। বুকে চাপড় মেরে বলত, আমি হলাম পৃথিবীর সব চেয়ে শক্তিশালী রেসলার।
ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রয়েছে ওর দিকে কিশোর। রবিন আমার বিশ্বাস, মুসা কাল রাতে ভজঘট করে দেয়ার পর আর ফোন ধরবে না ডিলন। তার সঙ্গে। যোগাযোগ করতে হলে তখন অলিংগারকে বেরোতেই হবে। যেখানে লুকিয়ে আছে ডিলন। আমরা তখন তার পিছু নেব।
১১ ?
১২ ?
১৩ ?
দুপুর নাগাদ মুভি স্টুডিওর পার্কিং লট থেকে বেরিয়ে পড়ল ব্রাউন অলিংগারের চকচকে কালো পোরশি ক্যাব্রিওলে গাড়িটা। দ্রুত চলছে। হাত নাড়ল গার্ড, জবাব। দেয়ারও প্রয়োজন বোধ করলেন না প্রযোজক। বড় বেশি তাড়াহুড়া আছে মনে হয়। রাস্তায় বেরিয়ে বেপরোয়া ছুটতে শুরু করলেন। মোড়ের কাছে গতি কমালেন না। টায়ারের কর্কশ আর্তনাদ তুলে নাক ঘোরালেন গাড়ির। আতঙ্কিত হয়ে পথ ছেড়ে দিয়ে সরে যেতে লাগল অন্যান্য গাড়ি।

ভেগার স্টিয়ারিং হুইলে হাত রেখে বসে আছে মুসা। রাস্তার অন্য পাশে গাড়ি রেখেছে। অলিংগারের গাড়িটাকে ওরকম করে ছুটে যেতে দেখে বলল, নিশ্চয় আমাদের মেসেজ পেয়েছে।
এবং বিশ্বাস করে বসেছে, হাসতে হাসতে বলল কিশোর।
ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে মুসাও রওনা হলো। বেশ খানিকটা দূরে থেকে অনুসরণ করে চলল পোরশিকে। রাস্তায় যানবাহনের ভিড় বেশি। ফলে চেষ্টা করেও গতি তুলতে পারছেন না অলিংগার। লস অ্যাঞ্জেলেস শহরের সীমা ছাড়িয়ে আসার আগে। আর পারলেনও না।
পেছনে পড়ল শহরের ভিড়। তীব্র গতিতে ছুটছেন এখন অলিংগার। মুসাও পাল্লা দিয়ে চলেছে। পথের দুপাশে এখন সমতল অঞ্চল, বেশির ভাগই চষা খেত। কিছুদূর চলার পর মোড় নিয়ে মহাসড়ক থেকে একটা কাঁচা রাস্তায় নেমে পড়ল পোরশি। ধুলো উড়িয়ে ছুটল আঁকাবাকা রুক্ষ পাহাড়ী পথ ধরে। ঢুকে যেতে লাগল পর্বতের ভেতরে। সামনে ছড়িয়ে রয়েছে পাইন আর রেডউডের জঙ্গল।
এই পথে পিছু নিলেই চোখে পড়ে যেতে হবে। গাড়ি থামাতে বাধ্য হলো মুসা। লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে তিন ঘন্টার পথ চলে এসেছে। এতদূর এসে শেষে বিফল হয়ে ফিরে যেতে হবে? অসম্ভব। প্রয়োজন হলে গাড়ি রেখে হেঁটে যাবে, তা-ও ফেরত যাবে না।
তা-ই করল ওরা। পাঁচ মিনিট চুপ করে বসে রইল গাড়িতে, পোরশিটাকে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ দিল। তারপর নেমে পড়ল। জোর কদমে ছুটল। হাঁটাও নয়, দৌড়ানও নয়, এমনি একটা গতি। ডবল মার্চ বলা যেতে পারে।
পথের প্রথম বাকটার কাছে একটা কাঠের কেবিন চোখে পড়ল। চিমনি থেকে কালো ধোয়ার সরু একটা রেখা উঠে যাচ্ছে পরিষ্কার আকাশে। ওখানেই ঢুকেছে নিশ্চয়? কি করছে ওটার ভেতরে দুজনে, ভাবল মুসা। ডিলন কি বলে ফেলেছে সে অলিংগারকে ফোন করেনি?
ভেতরে আগুন জ্বলছে, ভালই, মুসা বলল। যা শীত। আগুন পোয়াতে ইচ্ছে করছে আমার। দুই হাত ডলতে শুরু করল সে। পর্বতের ভেতরে ঠাণ্ডা খুব বেশি। আর শুধু টি-শার্ট পরে এসেছে ওরা। শীত লাগবেই।
পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকব? রবিন জিজ্ঞেস করল।
না, কিশোর বলল, সামনে দিয়ে ঢুকেই চমকে দেব।
সামনের দরজায় এসে দাঁড়িয়ে গেল তিনজনে। তারপর রেডি-ওয়ান-টু-থ্রী করে একসঙ্গে ঝাঁপ দিয়ে গিয়ে পড়ল পাল্লায়। ধাক্কা দিয়ে খুলে ফেলে ভেতরে ঢুকল। প্রথমেই ডিলনকে দেখার আশা করেছে।
কিন্তু ডিলনকে দেখল না।

বড় একটা ঘর। আসবাবপত্রে সাজানো। কেবিনটা যে কাঠে তৈরি সেই একই কাঠে তৈরি হয়েছে ডাইনিং টেবিল, চেয়ার, কাউচ, বুককেস। জগিং করে শীত তাড়ানর চেষ্টা করতে দেখা গেল অলিংগারকে। উদ্বিগ্ন, বিধ্বস্ত, ক্লান্ত চেহারা, পরাজিত দৃষ্টি সব দূর হয়ে গিয়ে অন্য রকম লাগছে এখন তাকে। তিন গোয়েন্দাকে দেখে খুশিই হলেন।

আরি, তোমরা? এখানে কি? ঘড়ি অ্যালার্ম দিতেই জগিং থামিয়ে দিলেন। তিনি। কপালের ঘাম মুছতে লাগলেন একটা তোয়ালে দিয়ে। ঘাড়েও ঘাম। কপাল মোছা শেষ করে ঘাড়ে চেপে ধরলেন তোয়ালে।

জবাব দেয়ার প্রয়োজন বোধ করল না তিন গোয়েন্দা। তিনজন তিন দিকে ছড়িয়ে গিয়ে ডিলনকে খুঁজতে শুরু করল। ডিলন যে নেই সেটা জানতে বেশিক্ষণ লাগল না।

এখানে কি? প্রশ্নটা আবার করলেন অলিংগার। তিন গোয়েন্দাকে দেখে চমকাননি, যেন জানতেন ওরা আসবে। আমাকেই ফলো করছ, সন্দেহ হয়েছিল। এখন দেখি ঠিকই।

পাহাড়ে বেড়াতে এসেছি আমরা, ভোঁতা গলায় মুসা বলল।

সাপ খুঁজতে! শীতল কঠিন দৃষ্টিতে অলিংগারের দিকে তাকিয়ে রয়েছে রবিন।

ডোনাট খাবে? হাসি হাসি গলায় জিজ্ঞেস করলেন অলিংগার।

ডোনাট? অবাক হয়ে কিশোরকে জিজ্ঞেস করল মুসা, কিশোর, হচ্ছেটা কি?

শ্রাগ করল কিশোর। বিমল হাসি হাসলেন অলিংগার। আগের চেয়ে অনেক বেশি আন্তরিক হয়ে উঠেছে আচরণ। খেলে খেতে পার। অতিরিক্ত ফ্যাট। সে জন্যে আমার খেতে ভয় লাগে। তবু মাঝে মাঝে লোভ সামলাতে পারি না। মেহমান আসবে বুঝতে পেরেছি। তাই বেশি করেই নিয়ে এসেছি। কমিশারি থেকে। আর ঠিক এসে গেলে তোমরা। চমৎকার কোইনসিডেন্স, তাই না?

কেবিনটা কার? জানতে চাইল কিশোর।

সঙ্কেত দিতে লাগল অলিংগারের ঘড়ি। আবার জগিং শুরু করলেন তিনি। আমার। এখানে এসেই শরীরের ব্যাটারি রিচার্জ করি আমি।

একা?

মোটেও না।

দম বন্ধ করে ফেলল মুসা। দ্রুত তাকাল এদিক ওদিক।

প্রকৃতির কোলে এসে কখনও একা হবে না তুমি, বললেন অলিংগার। তাজা। বাতাস। সুন্দর সুন্দর গাছ। বুনো জানোয়ার। সব সময় ঘিরে থাকবে তোমাকে। এত বেশি, ছত্রিশ ঘন্টার বেশি সহ্যই করতে পারি না আমি। আবার পালাই শহরে।

ঘড়ির সঙ্কেতের সঙ্গে সঙ্গে আরেকবার জগিং থামালেন তিনি। মুখের ঘাম মুছে ভোয়ালেটা সরিয়ে আনার পর মনে হল তোয়ালে দিয়ে ঘষেই মুখের চওড়া হাসিটা ফুটিয়েছেন। তোমাদেরকে কিন্তু খুব একটা খুশি মনে হচ্ছে না। ব্যাপারটা কি?

আজ আপনার অ্যানসারিং মেশিনে একটা মেসেজ পেয়েছেন, গম্ভীর হয়ে বলল কিশোর। আপনি ভেবেছেন, বেন ডিলন আপনার সাহায্য চেয়ে ডেকে পাঠিয়েছে। সে জন্যেই এখানে এসেছেন আপনি। আপনি জানেন, ডিলন এখানেই লুকিয়ে আছে।

ডিলন এখানে? হা হা করে হাসলেন অলিংগার। চমৎকার। দারুণ। দেখো। তাহলে। বের করতে পার কিনা। যাও, দেখো।

এত আত্মবিশ্বাস কেন? মনে মনে অবাক হলেও চেহারায় সেটা ফুটতে দিল কিশোর। মেঝে, আসবাব, সব কিছুতে পুরু হয়ে ধুলো জমে আছে। মাথা চুলকাতে লাগল সে।

ধুলো ছড়ানোটা কোন ব্যাপার না, মুসা বলল। ডজনখানেক স্প্রে ক্যান। আছে আমাদের বাড়ির বেসমেন্টে, বাবার জিনিস। এই স্পেশাল ইফেক্ট দেখিয়ে আমাকে বোকা বানাতে পারবেন না।

কল্পনার জোর আছে তোমাদের মানতেই হবে, মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললেন অলিংগার। তবে ভুল করছ। আমি কোন মেসেজ পাইনি আজ। চাইলে গিয়ে আমার অ্যানসারিং মেশিন চালিয়ে দেখতে পারো তোমরা। কোন মেসেজ নেই। এখানে সেলিব্রেট করতে এসেছি আমি।

কিসের সেলিব্রেট? মুসার প্রশ্ন।

অবশ্যই ডিলনের মুক্তির। অবাক হলে মনে হচ্ছে? খবরটা শোননি? টাকা। মিটিয়ে দেয়া হয়েছে। ওকে ছেড়ে দিয়েছে কিডন্যাপাররা। এটাই আশা করেছিলাম আমি।

কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে অলিংগারের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। তারপর আস্তে করে জিজ্ঞেস করল, কখন ছাড়ল?

কয়েক ঘন্টা আগে। প্যানট্রিতে গিয়ে ডোনাটের বাক্স খুললেন অলিংগার। গ্লাস বের করতে করতে জিজ্ঞেস করলেন, দুধ খাবে নিশ্চয়? দুধ তোমাদের দরকার। বেড়ে উঠতে, বুদ্ধি বাড়াতে সাহায্য করে দুধ। তোমাদের এখন খুব দরকার।

তার মানে এখন সাফোকেশন টু শেষ করতে পারবেন?

হাসলেন অলিংগার। তবে এই প্রথম তার চোখে বিস্ময়ের আলো ঝিলিক দিয়ে যেতে দেখল কিশোর। নাহ্, আর পারলাম না। অনেক দেরি হয়ে গেছে, অনেক সময় নষ্ট হয়েছে। এখন আর সাফোকেশন টুর শুটিং শেষ করা সম্ভব না। তাছাড়া

এত বড় একটা বিপদ থেকে এসে ডিলনেরও মনমেজাজ শরীর কোনটাই ভাল না। এই অবস্থায় অভিনয় করতে পারবে না। শ্রমিক কর্মচারী আর অন্য অভিনেতাদেরও মন খারাপ হয়ে গেছে। ছবি এইটা খতম। কেউ যদি না যায়। কাকে পরিচালনা করবে জ্যাক রিডার?

তাই। ছবিটা তাহলে আর করতে চান না। আপনি বুঝে ফেলেছেন, এই অখাদ্য গিলবে না দর্শকেরা। তাই যা খরচ হয়েছে সেটা তুলেই সন্তুষ্ট থাকতে চান। খরচ হয়ে যাওয়া দুই কোটি ডলার।

দুই কোটি? দুধ ঢালতে ঢালতে বললেন অলিংগার, আরও অনেক বেশি খরচ হয়েছে।

হয়তো। এবং সেটাই আপনি ফেরত চান। ছবি শেষ না করলে ইনসিওরেন্স কোম্পানি টাকা দেবে না...

অলিংগারের হাত থেকে গ্লাসটা মেঝেতে পড়ে ভেঙে গেল।

ভাঙা কাচ...ভাঙা কাচ...ভাঙা কাচ...মুসার মগজে যেন তোলপাড় তুলল। ভাঙা কাচের শব্দ।

ছবির ব্যাপারে অনেক বেশি জানো তোমরা, প্রযোজক বললেন। এতটা, ভাবতে পারিনি। ঠিকই আন্দাজ করেছ। ছবিতে লোকসান হলে সেটা দিতে বাধ্য বীমা কোম্পানি, বীমা সে জন্যেই করান হয়। টাকাটা আদায় করার মধ্যে কোন অন্যায় দেখি না আমি।

কিন্তু কিডন্যাপিঙের খেলা খেলে, কর্কশ গলায় বলল কিশোর। টাকা আদায় করাটা কেবল অন্যায় নয়, পুলিশের চোখে ঠগবাজি।

হাসি হাসি ভাবটা চলে গেল অলিংগারের চেহারা থেকে। ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। দৃষ্টি। অস্বীকার করছি না। তবে পুলিশকে সেটা প্রমাণ করতে হবে। তোমরা এখন যেতে পার। আলোচনা শেষ।

শহরে ফেরার পথে গাড়ির হিটার চালু করে দিল মুসা। তবু ঠাণ্ডা যাচ্ছে না। তার, শরীর গরম হচ্ছে না। বার বার ঘড়ি দেখছে কিশোর, পাঁচটার খবরটা শোনার জন্যে অস্থির। পাঁচটা বাজার দশ মিনিট আগে, রকি বীচ থেকে তখনও অনেক দূরে রয়েছে ওরা, পথের ধারে পুরানো একটা খাবারের দোকান চোখে পড়ল কিশোরের। বাড়িটার সব কিছুই জীর্ণ মলিন, কেবল একটা স্যাটেলাইট ডিশ অ্যান্টেনা ছাড়া।

অ্যাই, রাখো তো। গাড়িটা পুরোপুরি থামার আগেই লাফ দিয়ে নেমে পড়ল।

দোকানে একজন খদ্দেরও নেই। বাবুর্চি দাঁড়িয়ে আছে একহাতে প্লেট আর আরেক হাতে কাটাচামচ নিয়ে। প্লেটে ডিম ভাজা।

খবর দেখবেন না? জিজ্ঞেস করল কিশোর, অনেকটা অনুরোধের সুরেই।

এক চামচ ডিমভাজা মুখে পুরে দিয়ে টেলিভিশনের দিকে মাথা ঝাঁকিয়ে ইঙ্গিত করল লোকটা। প্রায় ছুটে গিয়ে টিভি অন করে দিল কিশোর। পর্দায় ফুটল ফাইভ-অ্যালার্ম নিউজ।

কিছু কিছু অভিনেতা হিরোর অভিনয় করে, কিন্তু আজ একজন অভিনেতা প্রমাণ করে দিয়েছেন বাস্তবেও তিনি হিরো, ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে বলছে টিভি অ্যাংকারপারসন। আজ সকালে জনপ্রিয় অভিনেতা বেন ডিলনকে রাস্তায় ঘোরাঘুরি করতে দেখে পুলিশ। কেমন একটা ঘোরের মধ্যে ছিলেন তিনি। পুলিশকে বলেন, এগারো দিন বন্দি থাকার পর মুক্তি পেয়েছেন। একটু আগে সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁর এই বন্দি থাকার কাহিনী তিনি শোনান সাংবাদিকদেরকে। একজন ফাইভ-অ্যালার্ম নিউজ রিপোর্টারও ছিল সেখানে...

ই চলতে আরম্ভ করল ভিডিওটেপ। পর্দায় দেখা গেল বেন ডিলনকে। উত্তেজিত হয়ে আছে, থানায় বসে আছে মাইক্রোফোনের সামনে। সানগ্লাসের আড়ালে ঢাকা। পড়েছে তার বিখ্যাত নীল চোখ। সাংবাদিকদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার না করার দুর্নাম আছে এমনিতেই ডিলনের, আর এখন তো সে মানসিক চাপেই রয়েছে।

কিডন্যাপারের চেহারা কেমন জানিয়েছেন পুলিশকে? জিজ্ঞেস করল একজন রিপোর্টার।

নিশ্চয়ই। এক্কেবারে আপনার মত, অভদ্রের মত বলল ডিলন। আন্দাজেই তো বলে ফেললেন। কি করে জানাব? আমি কি ওদের চেহারা দেখেছি নাকি? দিনের বেলা সব সময় চোখ বেঁধে রাখত আমার। রাতে খুলে দিলেই বা কি? আলো জ্বালত না। ঘর থাকত অন্ধকার। কাউকে দেখতে পেতাম না।

ডিলন, অ্যাঞ্জেলা ডোভারের সঙ্গে আপনার সম্পর্কটা কি আবার ভাল হবে মনে হয়?

এটাকে এখানে ঢুকতে দিয়েছে কে? আরে মিয়া, আমি কি এসব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি নাকি এখন? এগারো দিন আটকে থেকে আসার পর মেয়েমানুষের কথা কে ভাবে?

কজন কিডন্যাপার ছিল?

বললাম না, আমি ওদের দেখিইনি।

গলা শুনেই লোক গুনে ফেলা যায়, আনমনে বিড়বিড় করল কিশোর, এটা কোন কঠিন ব্যাপার নয়। ব্যাটা মিথ্যে বলছে। অভিনয় করে ধোকা দিচ্ছে।

লোকগুলোও তো ধোকায় পড়ছে, তিক্তকণ্ঠে বলল রবিন।

ওরা আপনাকে মারধর করেছে? জিজ্ঞেস করল আরেকজন রিপোর্টার।

না, করবে না। পিকনিকে নিয়ে গিয়েছিল তো! মুখ বাঁকিয়ে হাসল ডিলন। যত্তসব! সব কথা শোনা চাই। আমাকে বেঁধে রেখেছে, পিটিয়েছে, গলা ফাটিয়ে চিৎকার করেছি ব্যথায়। তা-ও ছাড়েনি। এখন তো মনে হচ্ছে, আপনাদেরকে ধরে পিটাল না কেন, তাহলে কিছুটা শিক্ষা হত। আপনারা যেমন খবরের জন্যে খেপে গেছেন, ওরাও তেমনি টাকার জন্যে খেপে গিয়েছিল।

আরও কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দিয়ে যেন বিরক্ত হয়েই মাইক্রোফোনের কাছ থেকে উঠে চলে গেল ডিলন। পুলিশ বিশ্বাস করেছে তার কথা, রিপোর্টাররাও করেছে। তাদের ভাবভঙ্গিতেই বোঝা গেল সেটা। পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে তিন গোয়েন্দা, মিথ্যে বলেছে লোকটা, ঠকিয়েছে, ফাঁকি দিয়েছে। কিন্তু সেটা প্রমাণ। করার কোন উপায় নেই।

ফেরার পথে অনেকক্ষণ চুপ করে রইল মুসা। আচমকা ফেটে পড়ল, ব্যাটা বদমাশ! রাগে টেবিলে চাপড় মারার মত চাপড় মারল স্টিয়ারিঙে, চাপ লেগে হর্ন বেজে উঠল। পুলিশ বিশ্বাস করেছে যখন, পারই পেয়ে গেল ওরা! এত্তবড় একটা শয়তানী করে। ভুলটা হল কোথায় আমাদের?

কিশোর জবাব দিল, ভুল আমাদের হয়নি। ওরা আসলে আমাদের ফাঁদে পা দেয়নি। কোন ভাবে সতর্ক হয়ে গেছে।

তার মানে আমরা কিছু করতে পারলাম না ওদের? পরাজয়টা রবিনও মেনে নিতে পারছে না। কিশোর আর রবিনকে যার যার বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে গাড়ি নিয়ে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরল কিছুক্ষণ মুসা। শেষে রওনা হলো ফারিহাদের বাড়িতে। কিছুতেই কেসের ভাবনাটা মন থেকে সরাতে পারছে না। মনে হচ্ছে। পরাজয়ের আসল কারণ সে। শোনার সঙ্গে সঙ্গে যদি কিশোরকে জানাত, তাহলে এরকমটা ঘটত না। কিন্তু আসলেই কি তাই? এখন আর জানার কোনই উপায় নেই।

ভাবতে ভাবতেই ফারিহাদের বাড়িতে পৌঁছে গেল। হেডলাইট জ্বেলে রেখেই গাড়ি থেকে নেমে এল সে। বাড়িতে ঢুকে সোজা চলে এল ফারিহার ঘরের সামনে। দরজায় টোকা দিল। বারান্দার আলোটা জ্বলল। খুলে গেল দরজা। ফারিহা দাঁড়িয়ে আছে।

হাই, মুসা বলল।

হাল্লো, কাকে চাই? তোমাকে চিনি বলে তো মনে হয় না? পথ হারালে নাকি? এটা আমাদের বাড়ি। তিন গোয়েন্দার হেডকোয়ার্টারও নয়, গাড়ির গ্যারেজও নয়।

বাইরে চল। কথা আছে।

বলো না এখানেই। আমি শুনছি। রেগে আছে ফারিহা। তবে বেরোল মুসার

দেখো ফারিহা, ঝগড়াঝাটি করার মত মানসিক অবস্থা নেই আমার এখন। ফারিহার হাত ধরল মুসা, মাঝে মাঝে কি যে হয়ে যায় আমার, কি পাগলামি যে

করে বসি…
সরাসরি ওর দিকে তাকাল ফারিহা। মুসা, কি হয়েছে তোমার? এরকম ভেঙে পড়তে তো তোমাকে দেখিনি কখনও?
পকেট থেকে স্ফটিকটা বের করল মুসা, পটার বোনহেড যেটা দিয়েছিল। তাকে। ফারিহার হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, এটা রাখ।
কি এটা?
এমন একটা জিনিস, যা আর রাখতে চাই না আমি।
কেন?
কারণ এটা থাকলেই বার বার মনে হবে, একটা রহস্য আমি একা একা সমাধান করতে চেয়েছিলাম। শেষে পুরোটা ভজঘট করে দিয়েছি।

.
চব্বিশ ঘণ্টা পরেও পরাজয়ের কথাটা ভুলতে পারল না মুসা। পারল না কিশোরও। চিকেন লারসেনের স্পেশাল মুরগীর কাবাব দিয়ে সেটা ভোলার চেষ্টা করছে।
চুপচাপ তাকিয়ে ওর খাওয়া দেখছে মুসা। ঘন ঘন ওঠানামা করছে কিশোরের হাতের চামচ। দেয়াল কাঁপিয়ে বাজছে হাই ফাঁই স্টেরিও, পঞ্চাশের দশকের রক মিউজিক।
কিশোর, তিন নম্বরটা খাচ্ছ, মুসা বলল।
কিশোরের চোখ ক্ষণিকের জন্যে উঠল। কিন্তু চামচের ওঠানামা বন্ধ হল না। চিবান বন্ধ হলো না। মাথা নাড়ল না।
হঠাৎ সামনের দরজার বেল বাজল। ঘরে ঢুকল রবিন। একটা চেয়ার টেনে। বসল সে। শোনো, খবর আছে একটা। ভোর বেলায় মিস্টার বার্টলেটের কাছে। ফোন এসেছে। জরুরী তলব। জানো কে?
শ্রাগ করল কিশোর। আজকাল মাথা আর খেলে না আমার। রহস্যের সমাধান করতে পারি না।
শোনই আগে কে ফোন করেছিল। দেখো, এটার সমাধান করতে পার কিনা। জ্যাক রিডার ফোন করেছিলেন। ডিলানের সম্মানে কাল রাতে তার বাড়িতে একটা পার্টি দিচ্ছেন। মরগানস ব্যাণ্ড দরকার।
তাহলে মরগানের খুশি, আমাদের কি? মুখ গোমড়া করেই রেখেছে মুসা।
রবিন বলল, কিছুই বুঝতে পারছ না তোমরা। ডিলনের মুখ থেকে সত্যি কথা আদায়ের এটা একটা মস্ত সুযোগ।
কেন? আরেকটু মাংস মুখে পুরল কিশোর, আমাদেরও দাওয়াত করেছে। নাকি?

করলেই কি না করলেই কি, হাসল রবিন। শোনো, আমার বুদ্ধি শোনো। সাদা শার্ট, সাদা প্যান্ট, কালো বো টাই আর সানগ্লাস পরে চলে যাব আমরা। যে ক্যাটারিং সার্ভিসকে ভাড়া করেছেন রিডার, ওরা এই পোশাক পরেই যাবে। পার্টি চলাকালে ঢুকে পড়ব, কেউ আমাদের আলাদা করে চিনতে পারবে না।
এতক্ষণে হাসি ফুটল মুসার মুখে। কিশোরও চিবান বন্ধ করল।
পরদিন রাত নটায়, পুরোদমে পার্টি চলছে, এই সময় রিডারের বেল এয়ারের বাড়িতে ঢুকল তিন গোয়েন্দা। পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল রান্নাঘরে। তিনজনে তিনটে খাবারের ট্রে তুলে নিয়ে চলে এল মেহমানরা যেখানে ভিড় করে আছে সেখানে। ক্যাটারিং সার্ভিসের ওয়েইটারেরা খুব ব্যস্ত, ছোটাছুটি করছে এদিক ওদিক, বাড়তি তিনজন যে ঢুকে পড়েছে ওদের মধ্যে খেয়ালই করল না।
ডিলন কোথায়? কিশোরকে জিজ্ঞেস করল মুসা।
হরর অথবা ভূতের ছবি তৈরি করার মত করেই যেন সাজানো হয়েছে রিডারের বাড়িটা। মধ্যযুগীয় কায়দায় ভারি ভারি করে তৈরি হয়েছে আসবাব, খোদাই করে অলঙ্করণ করা হয়েছে। রক্তলাল মখমলে মোড়া গদি। দেয়ালে ঝাড়বাতি। লোহার বড় বড় মোমদানীতে জ্বলছে বড় বড় মোম। কালো কাপড়ে লাল রঙে লেখা, ইংরেজিতে লেখা হয়েছে ব্যানার, যার বাংলা করলে দাঁড়ায়ঃ মুক্তি পেয়ে বাড়ি ফিরেছ বলে স্বাগতম, ডিলন। আঁকাবাঁকা করে আঁকা হয়েছে অক্ষরগুলো, দেখে মনে হয় নিচ থেকে রক্ত ঝরে পড়ছে। লিভিংরুমের মাঝখানে, ঝোলানো হয়েছে ব্যানার। তার নিচে বিশাল কাচের ফুলদানীতে রাখা হয়েছে লাল গোলাপ।
সুইমিং পুলের দিকে মুখ করা বারান্দায় বাজনা বাজাচ্ছে মরগানের দল। হলিউডের সিনেমা জগতের বড় বড় চাঁইয়েরা অতিথি হয়ে এসেছে। খাচ্ছে, নাচছে, আনন্দ করছে।
ওই যে অলিংগার, দেখাল রবিন। বাজনার শব্দকে ছাপিয়ে জোরে জোরে কথা বলতে হচ্ছে, নইলে বোঝা যায় না। আমাদের দিকে তাকালেই সরে যেতে হবে।
ডিলন কোথায়? একজন ওয়েইটারকে এগিয়ে আসতে দেখে আরেক দিকে মুখ করে দাঁড়াল কিশোর।
পেছন থেকে এগিয়ে এসে প্রায় ছোঁ মেরে মুসার চোখ থেকে সানগ্লাসটা খুলে নিলেন রিডার। ঘটনাটা কি?
ইয়ে...ইয়ে...মানে...ইয়ে... থেমে গেল মুসা। কথা আটকে গেছে। কি বলবে জানে না।
তাকে উদ্ধার করতে এগিয়ে গেল রবিন। হেসে বলল, গোয়েন্দাগিরির ব্যবসায় আর পোষাচ্ছে না। তাই ক্যাটারিং ধরেছি।

খুব ভাল করেছ, হরর ছবির সংলাপ বলছেন যেন পরিচালক। তবে মুভি বিজনেস থেকে দূরে থাকবে। যদি হৃৎপিণ্ডে কাঁচির খোঁচা খেতে না চাও। হিরোকে নিয়েই বড় বিপদে আছি এমনিতেই। আর ঝামেলা বাড়িও না।
বুঝলাম না, মিস্টার রিডার? কিশোর বলল।
ডিলনের জন্যে এই পার্টি দিয়েছি। যাতে সে আসে। মন ভাল হয়। আবার অভিনয় করে সাফোকেশন টু-তে। কি জবাব দিয়েছে জান? সিয়াও। আউ রিভোয়া। হ্যাসটা লুয়েগো। শ্যালম। নানা ভাষায় এই কথাগুলোর একটাই মানে, বিদায়।
ডিলন কোথায় জানেন?
পুলের পানির তলায় থাকতে পারে। কিংবা আমার টরচার চেম্বারে। অ্যাঞ্জেলাকে নিয়ে ওদিকটাতেই যেতে দেখেছি।
গোল একটা ঘোরান সিঁড়ি দেখালেন রিডার। নিচে একটা ঘর রয়েছে। সেখানে অত্যাচার করার প্রাচীন সব অ্যানটিক যন্ত্রপাতি সাজিয়ে রাখা হয়েছে। পাশাপাশি বসে কথা বলতে দেখা গেল অ্যাঞ্জেলা আর ডিলনকে।
বেন, তিন গোয়েন্দাকে চিনতে পেরে হেসে বলল অ্যাঞ্জেলা, ওরা গোয়েন্দা। তোমাকে অনেক খুঁজেছে।
তাই নাকি? হাসি মুখে বলল বটে ডিলন, কিন্তু কণ্ঠস্বর তেমন আন্তরিক মনে হল না।
ওই কিডন্যাপিংটা নিশ্চয় খুব বাজে ব্যাপার হয়েছে, রবিন বলল আলাপ জমানর ভঙ্গিতে।
কথাটার জবাব না দিয়ে কর্কশ গলায় ডিলন বলল, তোমরাই পটারকে অপমান করতে গিয়েছিলে?
অপমান? আকাশ থেকে পড়ল যেন মুসা, বলেন কি? আমি তার রেসলিঙের মস্ত বড় ভক্ত। অপমান করতে পারি?
টেলিভিশনে আপনার সাক্ষাৎকার দেখার পর থেকেই কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করার জন্যে মরে যাচ্ছি, মিস্টার ডিলন, কিশোর বলল নিরীহ কণ্ঠে। আপনি বলেছেন, অন্ধকারে আপনি বুঝতে পারেননি কিডন্যাপাররা কজন ছিল। তাদের কথা শুনেছেন নিশ্চয়। গলা শুনেও মানুষ গণনা করা যায় অনেক সময়।
মাথা নাড়ল ডিলন। ওই ব্যাটারা অনেক চালাক। কেবলই কণ্ঠস্বর বদল করেছে। আমার মাথা খারাপ করে দিয়েছে। অনেক বড় অভিনেতা ওরা, আমার ওস্তাদ। চোখের পাতা সামান্যতম কাপল না ওর। শান্ত, স্বাভাবিক রয়েছে।
একটা স্বর নকল করে শোনাতে পারেন?
দেখ, বেশি চালাকি... লাফ দিয়ে একটা পুরানো উঁচু চেয়ার থেকে নেমে পড়ল ডিলন, ওটাতে বসিয়ে অত্যাচার করা হত মানুষকে।

তার হাত চেপে ধরল অ্যাঞ্জেলা। আরে থামো থামো, ওরা তোমার উপকারই করতে চেয়েছে।
আপনার জন্যে খুবই সহজ কাজ, ডিলনের ওই আচরণ যেন দেখেও দেখেনি। কিশোর, এমনি ভঙ্গিতে বলল, কারণ আপনি বড় অভিনেতা। যে কোন লোকের স্বর নকল করে ফেলতে পারবেন। এভাবেই বলুন না, হাল্লো, পটার? কেমন আছ, পটার? তারপর এই কথাগুলো আবার আপনার স্বাভাবিক স্বরে বলুন। শুনতে খুব। ইচ্ছে করছে।
বলো না, বেন, অ্যাঞ্জেলা বলল। ছেলেগুলো এত করে যখন বলছে।
বলল ডিলন। একবার অন্য স্বরে, একবার নিজের আসল স্বরে। গায়ে কাঁটা দিল মুসার। এই কণ্ঠ তার চেনা। অলিংগারের অফিসে রেডিয়াল বাটন টিপে ফোন। করার সময় ওপাশ থেকে এই স্বরই শুনতে পেয়েছিল। কিশোরের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল সে। জবাবে কিশোরও ঝাঁকাল।
আপনার ছবি দেখেছি। সিনেমা, কিশোর বলল। তাতে বেঁধে রাখতে দেখেছি। কিডন্যাপাররাও কি বেঁধে রেখেছিল সারাক্ষণ?
ঢিলেঢালা একটা হাফ-হাতা টারকুইজ শার্ট পরেছে ডিলন। চট করে একবার কব্জির দিকে তাকাল। দাগটাগ কিছু নেই। আড়চোখে তাকাল কিশোরের দিকে। মাথা নেড়ে বলল, না, ঘরে তালা দিয়ে রেখেছিল কেবল।
সাংঘাতিক চালাক তো ব্যাটা, ভাবল মুসা। কাচের ব্যাপারটা কি বলুন তো? এত কাচ?
কিসের কাচ? জিজ্ঞেস করল ডিলন।
আপনার সৈকতের ধারের বাড়িতে। সারা ঘরে কাচ ছড়িয়ে ছিল।
হঠাৎ ঘরের সমস্ত আলো মিটমিট করতে শুরু করল, জ্বলে আর নেভে, জ্বলে আর নেভে।
এই, সবাই স্ক্রিনিং রুমে চলে আসুন, মাইক্রোফোনে বললেন রিডার। সব ঘরেই স্পিকার লাগান রয়েছে, তাতে শোনা গেল তার কথা। আপনাদের জন্যে একটা সারপ্রাইজ আছে।
চলো, অ্যাঞ্জেলাকে বলল ডিলন। ছেলেগুলো বিরক্ত করে ফেলেছে। আমাকে।
কাচের ব্যাপারটা বললেন না তো মিস্টার ডিলন? মুসা নাছোড়বান্দা।
আমি কি করে বলব? খেঁকিয়ে উঠল ডিলন। আমি কি দেখেছি নাকি? ধরেই আমার মাথায় একটা বস্তা টেনে দিয়ে ঢেকে ফেলল। ঠেলে মুসাকে সামনে থেকে সরিয়ে দিয়ে অ্যাঞ্জেলার হাত ধরে টানল সে। কাচ নিয়ে কে মাথা ঘামায়? আমি তো ভেবেছি আর কোনদিনই ফিরতে পারব না। একটা কথা শোনো, কাজে

লাগবে। বড় বেশি ছোঁক ছোঁক কর তোমরা। ভাল নয় এটা। অ্যাঞ্জেলাকে নিয়ে ঘোরান সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল সে। বেরিয়ে গেল টরচার চেম্বার থেকে।
এটাই চেয়েছিলাম, কিশোর বলল। ওকে নার্ভাস করে দিতে পেরেছি।
অত্যাচার করার ভয়াবহ যন্ত্রগুলোর দিকে তাকাল মুসা। এ ঘরে এসে কে নার্ভাস হবে না!
নার্ভাস হলে লাভটা কি? কিশোরের দিকে তাকিয়ে বলল রবিন, আমরা চেয়েছি ও ভুল করুক। বেস কিছু বলুক। যাতে কাঁক করে টুটি টিপে ধরতে পারি। তা তো করল না। পুরোপুরি ঠাণ্ডা রইল। ওর কিছু করতে পারব না।
ওরা তিনজনও উঠে এল ওপরতলায়। স্ক্রিনিং রুমে বড় একটা সিনেমার পর্দার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন জ্যাক রিডার।
বক্তৃতা দেয়ার ঢঙে বলছেন, ...আমরা সবাই একটা উদ্দেশ্যেই এখানে জমায়েত হয়েছি। ডিলন যে নিরাপদে মুক্তি পেয়ে ফিরে এসেছে এটা জানানোর জন্যে। দুনিয়া কোন দিনই জানতে পারবে না, মৃত্যুর কতটা কাছে চলে গিয়েছিল এতবড় একজন অভিনেতা। তার সঙ্গে কাজ করতে পেরে আমি সত্যি আনন্দিত। আরও খুশি হব যদি ছবিটা শেষ করতে পারি।
কেউ হাসল, কেউ কাশল, কেউ কেউ দৃষ্টি বিনিময় করল পরস্পরের দিকে।
এসব তো আমরা জানি, চিৎকার করে বলল একজন। সারপ্রাইজটা কি?
সারপ্রাইজ? হাসছেন রিডার। হাত কচলাচ্ছেন। সেটা একটা গোপন ব্যাপার। আমাদের সবারই কিছু না কিছু গোপনীয়তা আছে। ডিলনেরও আছে। সেটা গোপন রাখাই ভাল।
কাছেই দাঁড়িয়ে রয়েছে মুসা, ভাল করে তাকাল ডিলনের মুখের দিকে। ভাবের কোন পরিবর্তন দেখতে পেল না। লোকটা সত্যিই বড় অভিনেতা, মনে মনে স্বীকার না করে পারল না সে।
ডিলন এই প্রথম আমার ছবিতে কাজ করছে না, রিডার বলছেন, আরও করেছে। তার প্রথম ছবিটাই পরিচালনা করেছি আমি।
আর বলবেন না! দুহাতে মুখ ঢেকে হতাশ হওয়ার অভিনয় করল ডিলন। ভ্যাম্পায়ার ইন মাই ক্লোজেটের কথা বলছেন তো? ছবিটা মুক্তিই দিতে দিল না স্টুডিও। ওই ভয়ঙ্কর বোমা ফাটানোর দৃশ্যটাই এর জন্যে দায়ী। ওফ বিচ্ছিরি!
হ্যাঁ, একমত হয়ে মাথা ঝাঁকালেন রিডার। আমারও একই অবস্থা হয়েছিল ওই ছবি করতে গিয়ে। লোকে আমার দিকে ফিরেও তাকাত না তখন। বড় পরিচালক বলা তো দূরের কথা, এখন যেমন বলে। থামলেন তিনি। তাকালেন। শ্রোতাদের দিকে। হাততালি আর প্রশংসা আশা করলেন যেন। লেডিজ অ্যাণ্ড জেন্টলম্যান,

ডিলন জানে না কথাটা, ওই ছবির একটা প্রিন্ট আমার কাছে আছে। সেটাই দেখান হবে এখন।
এইবার হাততালি আর চিল্কারে ফেটে পড়ল শ্রোতারা।
লাইটস! ক্যামেরা! অ্যাকশন! শুটিঙের সময় যেভাবে চেঁচানো সে রকম করে চেঁচিয়ে উঠলেন রিডার।
আলো নিভে গেল। রোম খাড়া করে দেয়া বাজনা বেজে উঠল। পর্দায় ফুটল ছবি। এক ভয়াবহ ছবি। বোর্ডিং স্কুলে ছাত্ররা বার বার ভ্যাম্পায়ারের শিকার হতে লাগল। পিশাচটাকে জ্যান্ত করে তুলেছিল কয়েকটা ছেলে। বহুদিন বন্ধ করে রাখা পাতাল ঘরে গিয়ে ঢুকেছিল, পেয়ে গিয়েছিল একটা প্রাচীন পাণ্ডুলিপি আর একটা কঙ্কাল, ওই পাণ্ডুলিপিতে লেখা ছিল কি করে জ্যান্ত করে তুলতে হয় ভ্যাম্পায়ারকে। খেলার ছলে ওরা করে ফেলেছিল কাজটা, সত্যিই যে জেগে উঠবে। পিশাচ কল্পনাই করতে পারেনি।
প্রথমেই ভ্যাম্পায়ারের কামড় খেল ডিলন। হয়ে গেল ভ্যাম্পায়ার। ফ্যাকাসে চেহারা, তাতে সবুজ আভা, চোখের চারপাশে কালো দাগ, চোয়াল বসা, কালো আলখেল্লা পরা ভয়ঙ্কর ভ্যাম্পায়ার আতঙ্কের ঝড় তুলল যেন পর্দায়।
হঠাৎ আঙুল দিয়ে রবিন আর কিশোরের পিঠে খোঁচা মারল মুসা। কিশোরেরটা এতই জোরে হয়ে গেল, উফ করে উঠল সে।
আমি যা দেখেছি তুমিও দেখেছ? ওর কানে কানে বলল মুসা, মনে করতে পার?
অন্ধকারেই উজ্জ্বল হলো কিশোরের হাসি। ভাল মত। এই পোশাকই পরেছিল সে, হ্যালোউইনের রাতে আমাদের হেডকোয়ার্টারে ঢোকার সময়।

.

একটা মুহূর্ত; দীর্ঘ, স্তব্ধ হয়ে যাওয়া একটা নীরব মুহূর্ত অনড় হয়ে রইল তিন গোয়েন্দা। নড়তে পারল না। চোখ আটকে রইল পর্দায়, যেখানে ভ্যাম্পায়ারের সাজে সাজা বেন ডিলন নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। রক্ত শোষণ করছে একের পর এক মানুষের।
আমি চেয়েছিলাম, রবিন বলল। একটা ভুল করুক ডিলন। মাত্র একটা। তাহলেই ধরতে পারতাম।
করে ফেলেছে, উত্তেজিত কণ্ঠে মুসা বলল। হ্যালোউইনের দিনে আমাদের হেডকোয়ার্টারে ঢুকে। সেরাতে কোথায় ছিল প্রমাণ করতে পারব আমরা। কিডন্যাপারটা আটকে রাখেনি, এটা তো শিওর।
উত্তেজিত কিশোরও হয়েছে, তবে অনেক বেশি সতর্ক রয়েছে সে। ভিডিও টেপে রেকর্ড করা রয়েছে, চুরি করে আমাদের হেডকোয়ার্টারে ঢুকেছিল একজন।

লোক। সেই লোকই যে ডিলন, প্রমাণ করতে পারছি না আমরা। তবে তাড়াহুড়া করলে হয়তো বিশেষ একজনকে ভড়কে দিতে পারব।
কেসটা আবার ভাল লাগতে আরম্ভ করেছে আমার, মুসা বলল।
লাগবেই। কারণ একটা মেজর রোল প্লে করতে হবে তোমাকে।
মুসার মেজর রোলটা হল হেডকোয়ার্টারে পৌঁছে ভিডিও টেপটা নিয়ে আবার বেপরোয়া গাড়ি চালিয়ে পার্টিতে ফিরে আসা। ছবিটা শেষ হওয়ার আগে।
রকি বীচের দিকে তীব্র গতিতে গাড়ি ছুটিয়েছে মুসা। বুকের মধ্যে কাপন শুরু হয়ে গেছে তার। ব্রেকটা গোলমাল করতে আরম্ভ করেছে, অ্যাকসিলেরেটর পুরোটা না নেমে মাঝপথেই আটকে যাচ্ছে। বিরক্ত লাগে মুসার। এত সময় ব্যয় করে গাড়িটার পেছনে, সব কিছু ঠিকঠাক রাখতে চায়, তারপরেও প্রয়োজনের সময় গোলমাল করতে থাকে। সন্দেহ হতে লাগল তার, পৌঁছতে পারবে তো সময়মত?
ইয়ার্ডে পৌঁছে একলাফে গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে ঢুকল হেডকোয়ার্টারে। ক্যাসেটটা বের করে শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে আবার লুফে নিল। যেন প্রার্থনা করল সৌভাগ্য বয়ে আনার জন্যে।
তারপর বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠে ছুটল আবার বেল এয়ারের দিকে।
ভূতুড়ে চেহারার ছমছমে পরিবেশের সেই বাড়িটাতে যখন পৌঁছল, দেখল তখনও ছবি চলছে। নিঃশব্দে স্ক্রিনিং রুমের পেছনে প্রোজেকশন বুদে ঢুকে পড়ল মুসা। ঘরটা খালি। প্লেয়ারে ক্যাসেটটা ভরল সে। কয়েকটা বোতাম টিপতেই বন্ধ হয়ে গেল প্রোজেকটরের ফিল্ম। ছবি চলে গেল পর্দা থেকে। কয়েক সেকেণ্ড পরেই। সেই জায়গা দখল করল ভিডিও প্লেয়ার, কয়েকটা বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে আবার ছবি ফোঁটাল পর্দায়।
ক্যাসেটটা চালু করে দিয়েই দৌড়ে স্ক্রিনিং রুমে চলে এল মুসা, রবিন আর কিশোরের পাশে।
হাসাহাসি শুরু করেছে দর্শকরা।
একজন বলল, দারুণ এডিটিং করেছ তো হে জ্যাক। কোত্থেকে তুললে এটা?
ঘুমিয়ে ছিলে নাকি তখন? বিরক্ত হয়ে বলল আরেকজন। মনে হচ্ছে ক্যামেরাকে ছেড়ে দিয়ে আরেক জায়গায় চলে গিয়েছিলে? ফোকাসিঙের এই অবস্থা কেন?
ট্রেলারের দরজায় লাথি মারতে দেখা গেল ডিলনকে।
কি ব্যাপার, ডিলন? বলে উঠল এক মহিলা। এরকম করলে কেন? ঢুকতে বাধা দিয়েছিল নাকি কেউ? দেখা তো যাচ্ছে না।
খুশি হয়ে উঠল তিন গোয়েন্দা। ডিলনের নাম বলেছে মহিলা। তার মানে ওরা। সফল হতে চলেছে।
কার কথা বলছেন? গলায় জোর নেই ডিলনের, ওটা আমি নই…

জ্বলে উঠল ঘরের সব আলো। ডিলনের দিকে ঘুরে তাকালেন রিডার। চোখে খুনীর দৃষ্টি। এগুলো কখন তুললে?
নীল একটা স্ফটিক হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরে মরিয়া হয়ে বলল ডিলন, আমি নই! ওই লোকটা আমি নই, বলছি না!
তুমি নও মানে? নিশ্চয় তুমি! কানা হয়ে গেছি নাকি আমরা!
আমি নই, দুর্বল কণ্ঠে আবার বলল ডিলন।
তাহলে কে? কোমল গলায় জানতে চাইল অ্যাঞ্জেলা ডোভার। ছবিটা শেষ করার পরেও ওই পোশাক তোমার কাছে রেখে দিয়েছিলে। কেন অস্বীকার করছ?
পার্টিতে পটার বোনহেডকেও দাওয়াত করা হয়েছে। উঠে দাঁড়াল সে। দুহাত দুপাশে ডানার মত ছড়িয়ে দিয়ে চিৎকার করে শান্ত হতে বলল দর্শকদের। বলল, অনেক সময় আমাদেরকে আমাদের মত লাগলেও আসলে আমরা নই।
চমৎকার, বোনহেড, তীব্র ব্যঙ্গ ঝরল মুসার কণ্ঠে। ঠিকই বলেছেন। এই যেমন, এখনও গা থেকে টু-টন টিটানের গন্ধ ধুয়ে ফেলতে পারেননি আপনি।
তাড়াহুড়ো করে আবার চেয়ারে বসে পড়ল বোনহেড।
অস্বস্তিতে কেবলই চেয়ারে উসখুস করছে ডিলন।
হচ্ছেটা কি কিছুই তো বুঝতে পারছি না! রিডার বললেন।
দ্রুত ঘরের সামনের দিকে চলে এল কিশোর, রবিন আর মুসা, যেখানে ওদেরকে সবাই দেখতে পাবে। পর্দাটার কাছে।
মিস্টার রিডার, বলতে লাগল কিশোর, যে টেপটা দেখলেন ওটা আমাদের। নয় দিন আগে হ্যালোউইনের রাতে ভোলা। রকি বীচে আমাদের ট্রেলারে ঢুকেছিল ডিলন, চুরি করে।
মৃদু গুঞ্জন উঠল দর্শকদের মাঝে। অবিশ্বাসের হাসি হাসল কেউ কেউ।
অসম্ভব, প্রতিবাদ জানাল অ্যাঞ্জেলা। হ্যালোউইনের তিন দিন আগে কিডন্যাপ করা হয়েছে বেনকে।
কোন কিডন্যাপিংই হয়নি, জোর গলায় বলল কিশোর। পুরোটাই ধাপ্পাবাজি।
হঠাৎ ব্রাউন অলিংগারের ঘড়ি অ্যালার্ম দিতে শুরু করল, উঠে দাঁড়ালেন তিনি। এসব ফালতু কথা শোনার কোন মানে হয় না। নিশ্চয় নেশা করে এসেছে ছেলেগুলো। কিডন্যাপ অবশ্যই হয়েছিল। জ্যাক, দেখছ কি? বের করে দাও ওগুলোকে। দরজার দিকে এগোনোর চেষ্টা করলেন তিনি। পথ আটকাল মুসা।
একটু দাঁড়ান, মিস্টার অলিংগার, কিশোর বলল, আপনিও জড়িত আছেন
মানে? ভুরু কুঁচকে গেছে রিডারের।
বেন ডিলনকেই জিজ্ঞেস করুন না, মুসা বলল।

উঠে দাঁড়াল ডিলন, যেন বেরিয়ে যাওয়ার জন্যেই। কিন্তু সবগুলো চোখ তার দিকে ঘুরে যাওয়ায় বেরোতে আর পারল না। অলিংগারের দিকে তাকাল। তারপর একে একে কিশোর, মুসা আর রবিনের দিকে। ভঙ্গি আর দৃষ্টি দেখে মনে হলো। কোণঠাসা হয়ে পড়েছে খেপা জানোয়ার।
এদিক ওদিক তাকিয়ে শেষে বসে পড়তে বাধ্য হলো আবার, তবে চেয়ারে না বসে বসল চেয়ারের হাতলের ওপর। বেশ, স্বীকার করছি, ওটা কিডন্যাপ ছিল না। কিডন্যাপ করা হয়নি আমাকে। জোক। রসিকতা।
জোক! রাগে চিৎকার করে উঠলেন রিডার, আমার ছবিটাকে স্যাবোটাজ করে দিয়ে রসিকতা! এরকম একটা কাজ কি করে করতে পারলে!
বসে পড়লেন অলিংগার। চোখে আগুন। পরিচালকের দিকে তাকিয়ে বললেন, এসব ঝামেলা না করে আসলে তোমাকে খুন করা উচিত ছিল, জ্যাক। যাতে আর কোন দিন কোন ছবি বানানোর পাগলামি করতে না পারো!
বোঝার চেষ্টা করুন, রিডার, ডিলন বলল, ছবির সব চেয়ে ভাল অংশগুলোও কিছু হচ্ছিল না। এ জিনিস পুরোপুরি ফ্লপ হতে বাধ্য। সাফোকেশন টু মুক্তি পেলে হাসাহাসি করত লোকে। বেশি বাজেটের ছবি করার ক্ষমতাই আপনার নেই, এটা মেনে নেয়া উচিত।
কে বলে? আরও রেগে গেলেন রিডার।
ডিলন বলে, আমি বলছি, দুজন তো হয়ে গেল, অলিংগার বললেন। খুঁজলে আরও অনেককে পেয়ে যাবে।
কঠিন হাসি হাসল ডিলন। তাকাল ওর নীল স্ফটিকের দিকে। কি কি গোলমাল হয়েছে, খুলেই বলি, তাহলেই বুঝতে পারবেন। হপ্তা দুই আগে আমি আর ব্রাউন কয়েকটা ডেইলি দেখছিলাম। অসুস্থ হয়ে যাচ্ছিল সে। শেষে ঠিকই, করে ফেলল, এ ছবি করা যাবে না। আফসোস করে বলতে লাগল, অনেক টাকা। ইতিমধ্যেই বেরিয়ে গেছে। ছবি শেষ করতে গেলে আরও অনেক বেশি যাবে। তখন আর মাথার চুল ছেঁড়া ছাড়া গতি থাকবে না। আগেভাগেই বন্ধ করে দেয়া উচিত, নইলে ভ্যাম্পায়ার ইন মাই ক্লোজেটের মতই আলমারিতে পড়ে থাকবে। আমিও বুঝলাম, ওই ছবি মুক্তি পেলে আমারও ক্যারিয়ার শেষ। কাজেই ব্রাউন যখন প্ল্যানটা করল, আমিও তাতে যোগ দিতে রাজি হয়ে গেলাম। মন খারাপ করবেন না, রিডার, আর কোন উপায় ছিল না।
করব না, শীতল কণ্ঠে চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন রিডার, যখন তুমি আর অলিংগার জেলে যাবে।
জেল? চেয়ার থেকে উঠে পর্দার সামনে গিয়ে দাঁড়াল ডিলন। কোন সম্ভাবনা। নেই। কাজটা ভাল করিনি, ঠিক, কিন্তু অপরাধ করেছি বলে মনে হয় না। আমিই

ভিকটিম, আমিই কিডন্যাপার। আমার বাড়ি আমিই তছনছ করেছি। পুলিশ কাকে ধরবে?
কাচ, বলে উঠল মুসা। মনে হচ্ছে, আবার দম আটকে আসছে। কাচগুলো ভাঙল কে? এল কোত্থেকে?
ওটা ভাঙতেই হলো। স্ফটিকগুলো ছাড়া নড়ি না আমি। সাথে করে নিতে হল। ওগুলো একটা কাচের বাক্সে রাখতাম। কিডন্যাপের খবর জানাজানি হলে পুলিশ আসবে, বাক্সটা দেখে সন্দেহ করবে কি ছিল ওটাতে। জেনে যাবে স্ফটিক রাখা হত। আরও সন্দেহ হবে। স্কটিকগুলো গেল কোথায়? আমাকে নিশ্চয় নিয়ে যেতে দেবে না কিডন্যাপাররা?
কাজেই সন্দেহের অবকাশই রাখলেন না আপনি, কিশোর বলল, বাক্সটা ভেঙে রেখে গেলেন। পুরো দৃশ্যটা আরও ভয়াবহ হয়ে উঠবে, ওদিকে সন্দেহ থেকে মুক্তি পাবেন আপনি। বুদ্ধিটা মন্দ না।
এই কিডন্যাপিঙের বুদ্ধিটা ভাল হয়নি, যাই বল, মুখ বাঁকাল ডিলন। র‍্যানসমের টাকা আনতে প্লে গ্রাউণ্ডে যেতে হল। সত্যিই ওটা কিডন্যাপিং এটা বোঝানর জন্যে করতে হয়েছিল এসব। ঠিকঠাক মতই সব করে বেরিয়ে আসতে পারতাম, বাগড়া দিয়ে বসলে তোমরা। পিছু নিলে। ঠেকানোর জন্যে মারামারিটা করতেই হলো। বাড়ি মেরে বসলাম সুটকেস দিয়ে কাকে যেন।
হ্যাঁ, আমাকেই মেরেছেন, মুসা বলল।
তা নাহয় হলো, কিশোর বলল। কিন্তু হ্যালোউইনের রাতে আমাদের হেডকোয়ার্টারে কেন ঢুকেছিলেন? কেসটা হাতে নিয়েছি তখনও কয়েক ঘণ্টাও হয়নি।
ব্রাউন বলেছে তোমাদের কথা। ঘাবড়ে গেলাম। কারণ তোমাদের নাম শুনেছি আমি। শুনেছি, তিন গোয়েন্দা কারও পিছু নিলে শেষ না দেখে ছাড়ে না। কাজেই শুরুতেই তোমাদের ভয় দেখিয়ে থামানোর চেষ্টা করেছিলাম।
তখনই মানা করেছি! রাগে খেঁকিয়ে উঠলেন অলিংগার। এটা করতে গিয়েই ধরাটা পড়লে! সব সময়ই বাড়াবাড়ি করে বসো তুমি!
করেছি, ভুল করেছি, কি আর করব। তবে অপরাধ করিনি। একটা ছবি মুক্তি না পেলে হলিউডের ক্ষতি হবে না, দর্শকরা পাগল হয়ে যাবে না। বরং ছবিটা বন্ধ করে দিয়ে নিজের ক্যারিয়ার আর কয়েক কোটি টাকা বাঁচালাম।
র‍্যানসমের টাকাগুলো কোথায়? মুসার প্রশ্ন।
আমার কাছে। ইনসিওরেন্স কোম্পানি ব্রাউনকে যত টাকা পে করেছে ওটা তার অর্ধেক। ফিরিয়ে দিলেই হবে এখন।

মাথা নাড়ল মুসা, না, হবে না। অপরাধ যা করার করে ফেলেছেন। শাস্তি ভোগ করতেই হবে। টেলিভিশনেও লক্ষ লক্ষ দর্শকের সামনে, রিপোর্টার আর পুলিশের সামনে মিথ্যে কথা বলেছেন। পুলিশ আপনাকে ছাড়বে ভেবেছেন? ইনসিওরেন্সকে ফাঁকি দেয়ার চেষ্টার অপরাধে অলিংগারও পার পাবেন না।
অলিংগারের দিকে ঘুরে গেল রিডারের চোখ। প্রযোজকদের বিশ্বাস নেই যে বলে লোকে, এমনি এমনি বলে না। সব সময় ঠকানর চেষ্টা করে, দরকারের সময় টাকা দিতে চায় না, অথচ ছবি কেন শেষ হয় না সেটা নিয়ে চাপাচাপির সীমা নেই। অ্যাকটরগুলোও সব ফাঁকিবাজ। কিছুতেই কথা রাখবে না।
আর পরিচালকগুলো সব পাগল, তিক্তকণ্ঠে বলল ডিলন।
নীরব হয়ে ছিল ঘরটা। হঠাৎ একজন লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে।
অ্যাঞ্জেলা, কোথায় যাও? ডেকে জিজ্ঞেস করল ডিলন।
প্রায় দরজার কাছে চলে গেছে অ্যাঞ্জেলা। ফিরে তাকিয়ে বলল, এখানে আর একটা সেকেণ্ড থাকতে চাই না। এরপর কি হবে জানি। পুলিশ আসবে, অপরাধীদের হাতকড়া দিয়ে নিয়ে চলে যাবে। সব ভজঘট করে দিয়েছ, বেন। সিনেমার লোক তুমি, সিনেমাতে থাকলেই ভাল করতে।
অ্যাঞ্জেলা বেরিয়ে যেতে অন্যেরাও উঠে পড়তে লাগল। বেরিয়ে যেতে লাগল দ্রুত। পার্টি ভেঙে গেল। চিৎকার করে সবাইকে থামানোর চেষ্টা করলেন অলিংগার, তার কথা শুনে যেতে বললেন। কেউ থাকল না। তার কৈফিয়ত শোনার আগ্রহ নেই কারও।
আর কেউ না শুনলেও আপনার কথা পুলিশ শুনবে, মিস্টার অলিংগার, শান্তকণ্ঠে বলল কিশোর। ঘড়ি দেখল। ফোন করে দিয়েছি। চলে আসবে।
সব কথা বলতে অনেক সময় লেগে গেল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জিজ্ঞেস করল পুলিশ, জবাব লিখে নিল। ভূতুড়ে চেহারার বাড়িটা থেকে যখন বেরোল তিন গোয়েন্দা, পুবের আকাশে তখন সূর্য উঁকি দিয়েছে। রকি বীচে ফিরে চলল ওরা। কয়েক ঘণ্টা বাদেই স্কুল শুরু হবে। স্কুলের শেষে জরুরী কাজ আছে মুসা আর রবিনের।

.

কয়েকদিন পর ব্রাউন অলিংগারের একটা চিঠি নিয়ে হেড-কোয়ার্টারে ঢুকল মুসা। ডেস্কের ওপর বিছিয়ে দিল, যাতে রবিন আর কিশোর পড়তে পারে। লেখা রয়েছেঃ
মুসা
প্রথমেই স্বীকার করে নিই, তোমাদের অবহেলা করে ভুল করেছিলাম। অন্যায় যে

করেছি সেটাও স্বীকার করছি। তোমরা শুনলে হয়ত খুশিই হবে, উকিলকে দিয়ে বীমা কোম্পানির সঙ্গে একটা মিটমাটে আসতে পেরেছি আমি। রিডারের সঙ্গেও রফা করে নিয়েছি। আগামী তিন-চার মাস আর কোন কাজ করতে পারব না, তবে আশার কথা, ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রিতে কেলেঙ্কারির কথা বেশিদিন মনে রাখে না লোকে। আগামী বসন্ত থেকেই আবার কাজ শুরু করতে পারব। চিঠিটা সে কারণেই লেখা। অবশ্যই ছবি তৈরি করতে হবে আমাকে, এটাই যখন ব্যবসা। ঠিক করেছি, পরের ছবিটা করব তিন গোয়েন্দার গল্প নিয়ে। রহস্য গল্প। কিডন্যাপিঙের গল্প। সত্যি ঘটনা যেটা এবার আমরা ঘটালাম। ছবিটার কি নাম দেয়া যায়, বল তো? টেরর ইন দা গ্রেভইয়ার্ড? ভালই হয়, কি বলো? হ্যাঁ, একটা দাওয়াত দিচ্ছি। আগামী সাপ্তাহিক ছুটির দিনে এসপেটোতে চলে এস, লাঞ্চ খাওয়াব। বিশ্বাস কর, এবার আর ওষুধ মেশান মিল্ক শেক খাওয়াব না।

—ব্রাউন অলিংগার।

চিঠি পড়া শেষ করে বলল রবিন, ওই লোককে আমি আর বিশ্বাস করি না।

আমিও না, চিঠিটা তুলে নিয়ে ছিঁড়ে ঝুড়িতে ফেলে দিল মুসা।

কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারল না সে। আবার শুরু হয়েছে দম আটকে আসার ব্যাপারটা। ওফ, শ্বাস নিতে পারছি না! যতবারই এই কেসটা নিয়ে। বেভাবতে যাই, এরকম হয়। দম আটকে আসতে চায়।

শান্ত হও, শরীর চিল করে দেয়ার চেষ্টা করো, কিশোর বলল। কেন এরকম হয়, বুঝতে পারবে এখনই।

কি, কিশোর? জলদি বলো! হিপনোটিক সাজেশন? স্ফটিকের কারসাজি?, বোনহেড জিন চালান দিতে জানে? কেন হয়?

ডেস্কের ভেতর থেকে একটা খবরের কাগজের কাটিং বের করল কিশোর। তুলে দিল মুসার হাতে। এটা পড়েই রহস্যটার সমাধান করে ফেলেছি। তুমিও পারবে। পড়ো।

হেডলাইন পড়ল, নিচের লেখাটাও পড়ল মুসা। ঝুলে পড়ল চোয়াল। বিড়বিড় করল, বাতাসে পোলেন বেশি! অনেককেই ধরেছে!

হ্যাঁ, মাথা ঝাঁকাল কিশোর, বলছে তো পঞ্চাশ বছরের মধ্যে এত বেশি আক্রান্ত আর হয়নি লোকে।

তার মানে জিনটিন কিছু না! হে-ফিভারে ধরেছে! আমাদের ভয় দেখিয়ে ঠেকানোর জন্যেই বোনহেড পাথর দিয়েছে, হুমকি দিয়েছে, গোরস্থানে মাটি চাপা দেয়ার ভান করেছে?

আবার মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

তাহলে যখনই কেসটার কথা ভাবি তখনই দম আটকানো ভাবটা হয় কেন?

সব সময় হয় না। আবার যখন না ভেবেছ তখনও হয়েছে এই অসুবিধে। ভালমত খেয়াল রাখলেই মনে থাকত।
স্ফটিকটা ধরলে তাহলে হাতে গরম লাগত কেন?
ওটাও বেশির ভাগই কল্পনা। আরেকটা ব্যাপার অবশ্য আছে। ওরকম পাথর। পকেটে রেখে দিলে গায়ের গরমে গরম হয়ে থাকে। হাত দিয়ে চেপে ধরলে আরও গরম হয়ে যায়। মনে হয়, অলৌকিক ক্ষমতাই আছে ওটার। আর যদি কেউ মাথায়। ঢুকিয়ে দেয়, আছে, তাহলে তো কথাই নেই।
হু! বলতে বলতেই গলা চেপে ধরল মুসা, হাঁসফাঁস করতে লাগল।
কি, আবার আটকাচ্ছে?
মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল মুসা।
তাহলেই বোঝো।

ভলিউম ১৯ – বিমান দুর্ঘটনা – তিন গোয়েন্দা – রকিব হাসান – সেবা প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ : মার্চ, ১৯৯৩

সকালের রোদে গুঞ্জন তুলে উড়ে চলেছে সেসনা। ছোট্ট বিমানটার নিচে ছড়িয়ে রয়েছে ক্যালিফোর্নিয়ার সিয়েরা নেভাডা রেঞ্জের পাহাড়ী অঞ্চল। সবুজ পাইন বনের ভেতর থেকে মাথা তুলেছে অসংখ্য লাল পাহাড়ের চূড়া।

ককপিটের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল রবিন। চোখে বিনোকিউলার। পাশে পাইলটের সীটে বসে তার বাবা রোজার মিলফোর্ড। সিঙ্গল-ইঞ্জিন টার্বোপ্রপেলার বিমানটাকে স্বচ্ছন্দে উড়িয়ে নিয়ে চলেছেন গ্র্যানিটের পাহাড় আর পান্না-সবুজ উপত্যকার ওপর দিয়ে।

নিচে ওটা কি? রবিন বলল। ওই তৃণভূমিটার ওপারে। দেখতে পাচ্ছ?

কিশোরকে কনুইয়ের তো মেরে চৌখ টিপল মুসা। রবিন আর তার বাবার পেছনে প্যাসেঞ্জার সীটে বসে দুজনে। ওরাও তাকিয়ে নিচে। তবে খালি চোখে। সব কিছু ভাল দেখা যাচ্ছে না বলে পালা করে বিনোকিউলারটা নিয়ে দেখছে। নিচে একের পর পার হয়ে যাচ্ছে পাহাড়ের চূড়া।

কি আর, মুসা বলল রবিনকে। মেয়েটেয়ে হবে। সুন্দরী। তোমার মুখটা, দেখতে পেলেই হাত নাড়বে।

এবং পরক্ষণেই ফোন নম্বর চাইবে, হেসে যোগ করল কিশোর।

জিজ্ঞেস করবে, মুসা বলল, আজকে সন্ধেয় তোমার কোন কাজ আছে কি না।

আঙ্কেল, মিস্টার মিলফোর্ডকে জিজ্ঞেস করল কিশোর, ডায়মণ্ড লেকে সিনেমা হল আছে? শান্ত, নিরীহ ভঙ্গি। সন্ধ্যায় রবিনকে তো আর পাব না। মুসার আর আমার সময় কাটাতে হবে।

শব্দ করে হাসলেন মিলফোর্ড।

চোখ থেকে দূরবীন সরাল রবিন। মেয়েটেয়ে কিছু না, ওটা কুগার। ফিরে তাকাল দুই বন্ধুর দিকে। সুন্দর চেহারা, সোনালি ঘন চুল, কালচে নীল চোখ, আর। আকর্ষণীয় হাসি। যেখানেই যায়, কোথা থেকে যেন এসে উদয় হয় মেয়েরা, পিছে লাগে তার। টিটকারি তো খুব মারলে আমাকে। আমি কি একা নাকি?

আর কে? ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল মুসা।

কেন, কমিক গার্লকে ভুলে গেলে? মিরিনা জরডান? ও আমার পিছে লেগেছিল?

কিশোরের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল মুসা। কিশোর মিয়া, এইবার তোমাকে পেয়েছে...

আর আমি যা করি, মুসার কথা শেষ হওয়ার আগেই বলল রবিন, সেটা স্বাভাবিক। মেয়েদের নিয়ে বেড়াতে যাই, রেস্টুরেন্টে খেতে যাই, ছবি দেখি... অ্যাটমের স্ট্রাকচার বোঝাতে বোঝাতে বিরক্ত করে ফেলি না।

মুখ তুলল কিশোর। পিস্তলের নলের মত করে রবিনের দিকে চোখা থুতনি। নিশানা করল যেন। রেগে গেছে। জিনা জানতে চাইল, আমি কি করব? ও-ই তো বলল, ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতে…

ছেলেদের এই ঝগড়া দারুণ উপভোগ করছেন মিলফোর্ড। হো হো করে হেসে উঠলেন। লাল হয়ে গেল কিশোর। রবিন আর মুসাও হাসছে। শেষে সবার সঙ্গে তাল মেলাতেই যেন অল্প একটু হাসল সে-ও। মেয়েরা তাকে পছন্দ করে। কিন্তু ওদের সঙ্গে সহজ হতে পারে না সে। তার প্রখর বুদ্ধিমান মগজের কাছেও যেন মেয়েরা একটা বিরাট রহস্য।

উঠে দাঁড়াল সে। সেসনার ছাত নিচু, সোজা হয়ে দাঁড়ানো যায় না। মাথা নুইয়ে রেখেই লেজের দিকে এগোল সে। ওখানে মালপত্র আর নানা রকম যন্ত্রপাতি গাদাগাদি করে ফেলে রাখা হয়েছে।

কোথায় যাচ্ছ? জিজ্ঞেস করল মুসা।

আরেকটা বিনোকিউলার দরকার, না তাকিয়েই জবাব দিল কিশোর। নিচে কে আছে দেখব। এমন কেউও থাকতে পারে, যে আগে থেকেই ই ইকোয়্যাল টু এম সি টু দি পাওয়ার টু-এর মানে জানে। আমাকে আর শেখাতে হবে না।

আরেকবার হাসল সবাই। এবার কিশোরের হাসিটা সবার চেয়ে জোরাল শোনাল।

গ্রীষ্মের এই উইক এণ্ডের শুরুটা বড় চমৎকার। উজ্জ্বল রোদ। আকাশ ঝকঝকে পরিষ্কার, গাঢ় নীল। তিন দিন লাগতে পারে মিস্টার মিলফোর্ডের কাজ শেষ হতে হতে। চুটিয়ে আনন্দ করে ছুটি কাটাতে পারবে তাহলে তিন গোয়েন্দা। খবরের কাগজের একটা স্টোরি করার জন্যে ডায়মণ্ড লেকে চলেছেন তিনি।

কাজ অনেক পেছনে ফেলে এসেছে ওরা, রকি বীচে। কোন বাধা নেই, কোন দায়িত্ব নেই। মুক্ত, স্বাধীন, কয়েকটা দিনের জন্যে। হেসেখেলে কাটাতে পারবে ক্যালিফোর্নিয়ার সবচেয়ে দামি মাউনটেইন রিসোর্টে। ডায়মণ্ড লেকে গলফ কোর্স আছে, বিশাল সুইমিং পুল আছে, টেনিস কোর্ট আছে। ঘোড়ায় চড়া, ক্যাম্পিং এসবের ব্যবস্থা আছে। রানওয়ে আছে, যাতে প্লেন নামতে পারে, কারণ। মাঝেসাঝেই এখানে পালিয়ে এসে নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচেন ভীষণ ব্যস্ত ব্যবসায়ী কিংবা সরকারী কর্মকর্তারা। কিছু দিন নির্বিঘ্নে কাটিয়ে চাঙা হয়ে আবার ফিরে যান। তাদের নৈমিত্তিক কাজে।

এটাওটা সরিয়ে জিনিসপত্রের মাঝে বিনোকিউলার খুঁজতে লাগল কিশোর। লোকটাকে হয়ত দেখতে পাব। আনমনা হয়ে বলল সে। কয়েকটা যন্ত্রপাতি তুলে নিয়ে একপাশে ফেলে রাখল, একটা খালি ফলের রসের ক্যান, একটা দোমড়ানো নার্ফ বল, এবং আরও কিছু বাতিল জিনিস সরাল। হঠাৎ মিস্টার মিলফোর্ডের

দিকে মুখ তুলে জিজ্ঞেস করল, আঙ্কেল, যার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন, লোকটার নাম যেন কি বললেন?
কই, বলিনি তো!
হুম, তাহলে যার কাছ থেকে সংবাদ জোগাড় করতে যাচ্ছেন, সে একজন, পুরুষ।
আমি বললাম, লোকটা, আপনি বললেন বলিনি। তার মানে স্বীকার করে। নিয়েছেন, আপনার সংবাদদাতা একজন পুরুষ। যাক, একটা সূত্র মিলল।
আরেক দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসিটা লুকালেন মিলফোর্ড।
বাবা, চাপাচাপি শুরু করল রবিন, বল না। লোকটা কে? কাউকে বলব না, সত্যি।
সরি। মাথা নাড়লেন মিলফোর্ড। সুদর্শন, ভাল স্বভাবের লোক তিনি। প্রায় ছয় ফুট লম্বা। রবিন এখনও তার উচ্চতায় পৌঁছাতে পারেনি। চোখে কালো সানগ্লাস, মাথায় লস অ্যাঞ্জেলেস ডজারস বেসবল ক্যাপ, গায়ে নেভি ব্লু রঙের উইণ্ডব্রেকার, বুক পকেট থেকে বেরিয়ে আছে আধ ডজন পেন্সিল। বয়েস এত কম লাগছে, মনে হচ্ছে তিনি রবিনের বাবা নন, বড় ভাই।
কি ধরনের স্টোরি করতে যাচ্ছেন? মুসার প্রশ্ন। কোন সুপার অ্যাথলিটকে নিয়ে? ডায়মণ্ড লেকে পাহাড়ে ওঠার রেকর্ড ভাঙছে না তো কেউ? জাত অ্যাথলিট মুসার প্রথমেই মনে আসে খেলাধুলা আর ব্যায়ামের কথা। না না, বুঝেছি, ওসব না! আগামী মাসে স্টেট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইন্যাল যেটা শুরু হতে যাচ্ছে, তারই কোন ব্যাপার…
কিচ্ছু বলব না, আমি, মুসাকে থামিয়ে দিলেন মিলফোর্ড। পত্রিকায় বেরোনোর আগে খবর গোপন রাখা সাংবাদিকের দায়িত্ব।
সে আমরা জানি, রবিন বলল। গোপন সূত্রের সাহায্য ছাড়া,বহুবার শোনা কথাটা যেন উগড়ে দিল সে, পুরো স্টোরি জোগাড় করা কঠিন হয়ে যায় সাংবাদিকের জন্যে।
আর, সুর মেলাল মুসা, সাংবাদিকরা যদি সূত্রদের নাম ফাস করত, তাহলে কেউই আর ভয়ে একাজ করতে আসত না। সূত্ররা সব শুকিয়ে যেত।
হ্যাঁ, গোপন রাখাটা যে কত জরুরী, কিশোর বলল, জানি আমরা। আমাদের বিশ্বাস করতে পারেন আপনি। পেটে বোমা মারলেও মুখ খুলব না।
হাসলেন মিলফোর্ড। ঠিক। যা জানবে না তা বলতেও পারবে না।
গুঙিয়ে উঠল তিন গোয়েন্দা। কঠিন লোক মিলফোর্ড। লস অ্যাঞ্জেলেসের এতবড় একটা নামকরা পত্রিকার সিনিয়র রিপোর্টার খামোকা হননি। কোন স্টোরির ওপর কাজ করছেন এখন, কিছুতেই সেটা জানার উপায় নেই।
কাগজ কোম্পানির ছোট্ট একটা বিমান নিয়ে তিনি ডায়মণ্ড লেকে যাবেন, এটা নিয়ে ফোনে কার সঙ্গে যেন আলাপ করছিলেন, শুনে ফেলেছিল রবিন। গরম

কোন খবর, নইলে বিমান নিয়ে এভাবে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ত না, বুঝতে পেরেছে। সে। কিন্তু কার ওপর, কেন স্টোরিটা করা হচ্ছে, বিন্দুমাত্র ধারণা করতে পারেনি।
কি করলে আমাদের সঙ্গে নিতে বাধ্য করা যাবে তোমাকে? ফোন রাখতেই বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিল রবিন।
মায়া, হেসে বলেছেন মিলফোর্ড। পঞ্চাশ ফুট দূর থেকেই যে মায়াজালে সুন্দরী মেয়েগুলোকে জড়িয়ে ফেলো তুমি, সেই মায়া দিয়ে। তবে আপাতত তোমাদের নিজেদের চরকায় তেল দেয়াটাই ভাল মনে করছি আমি। এটা তিন গোয়েন্দার ব্যাপার নয়।
ওই সময় রবিনদের বাড়িতেই ছিল কিশোর আর মুসা। আরেক ঘরে। তিন গোয়েন্দা নামটা শুনেই কান খাড়া করল কিশোর। মুসাকে নিয়ে চলে এল হলঘরে। কি হয়েছে জিজ্ঞেস করল রবিনকে। জানাল রবিন।
দয়া করুন আমাদের ওপর, মিনতি করে বলেছে মুসা। খাটাতে খাটাতে তো মেরে ফেলেছেন পুরো হপ্তাটা। কত কিছু করে দিলাম। বাগান সাফ করলাম, গ্যারেজ পরিষ্কার করলাম…
হ্যাঁ, অনেক কাজই করেছ, স্বীকার করলেন মিলফোর্ড।
তাহলে দয়া করুন, আবার বলল মুসা। নিয়ে চলুন আমাদের। ছুটি কাটানোর এত সুন্দর জায়গা শুনেছি আর নেই।
নেই কথাটা ভুল, শুধরে দিল কিশোর। আছে, তবে কম। হ্যাঁ, আঙ্কেল নিয়ে চলুন। বিশ্রামটাও হয়ে যাবে আমাদের, সেই সঙ্গে রিক্রিয়েশন।
ছেলেদের অনুরোধ ফেলতে পারলেন না মিলফোর্ড। রাজি হয়ে গেলেন। তবে শর্ত দিলেন একটা। তার কাজে ওরা নাক গলাতে পারবে না। এবং এটা বলেই কৌতূহলী করে তুললেন কিশোরকে। ওই সময় আর কিছু বলল না সে। রাজি হয়ে গেল শর্তে।
গরমের ছুটির সময় কাজ করে কিছু পয়সা জমিয়েছে তিন গোয়েন্দা। এতে হোটেলের শস্তা ঘর ভাড়া আর খাওয়ার খরচ হয়ে যাবে। সুইমিং পুলটা বিনে। পয়সায়ই ব্যবহার করা যাবে। অল্প পয়সা দিয়ে আরও যা যা চিত্তবিনোদন করা সম্ভব, করবে।
এই, দেখ, জানালা দিয়ে নিচে তাকিয়ে রয়েছেন মিলফোর্ড। সামনের উপত্যকার দিকে চোখ। ওদিকে দেখ কি দেখা যায়।
বিনোকিউলার দিয়ে দেখল রবিন। তাঁরপর নীরবে সেটা তুলে দিল মুসার হাতে।
আরও কাছে থেকে দেখা দরকার, মিলফোর্ড বললেন। ডায়মণ্ড লেকের কাছাকাছি এসে গেছি আমরা।

সামনের দিকে নিচু হয়ে গেল বিমানের নাক। বদলে গেল ইঞ্জিনের গুঞ্জন।
বিনোকিউলার খোঁজা বাদ দিয়ে মিলফোর্ডের সীটের পেছনে চলে এল কিশোর। সামনের সরু সবুজ উপত্যকাটার দিকে তাকাল। উপত্যকার কিনারে গ্র্যানিটের খাড়া দেয়াল লম্বা হয়ে ছড়িয়ে গেছে উত্তর দক্ষিণে। দেয়ালটার দক্ষিণ মাথায় কয়েক মাইল লম্বা একটা পাহাড়, পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত। ওপর থেকে গড়িয়ে পড়ছে রূপালি ঝর্না।
বাহ, দারুণ! কিশোর বলল।
উপত্যকাটার নাম কি? রবিনের প্রশ্ন।
আমারও জানতে ইচ্ছে করছে, জবাব দিলেন মিলফোর্ড। খুব সুন্দর। সামনে দেখ। সুন্দর, না? ডায়মণ্ড লেক এখান থেকে উত্তরে। চল্লিশ-পঞ্চাশ মাইল হবে আর।
ডায়মণ্ড লেক দেখা গেল। ঘন নীল, উজ্জ্বল রোদে যেন নীলা পাথরের মত জ্বলছে। একধারে একগুচ্ছ বাড়ি, পিঁপড়ের সমান লাগছে এখান থেকে। লেকের পাড় আর পাহাড়ের ভেতর দিয়ে দিয়ে চলে গেছে একটা কংক্রীটের রাস্তা, সাদা সরু একটা ফিতের মত দেখাচ্ছে।
মুগ্ধ দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে শিস দিয়ে উঠল রবিন।
সময় মতই এসেছি, কিশোর বলল। লাঞ্চ ওখানে গিয়েই করতে পারব।
এইবার একটা কথার মত কথা বলেছ, মাথা দোলাল মুসা।
এই সময় ছোট্ট একটা ঝাঁকি দিল সেসনা। কিশোরের সে রকমই মনে হলো। প্রায় টেরই পাওয়া যায়নি…
তোমরা কি… কথা শেষ করতে পারল না সে।
একে অন্যের দিকে তাকাল তিন গোয়েন্দা। পরক্ষণেই একযোগে তাকাল। সামনের দিকে, যেখানে সেসনার একমাত্র ইঞ্জিনটা রয়েছে।
বদলে গেছে ইঞ্জিনের গুঞ্জন।
আঙ্কেল… চিৎকার করে উঠল কিশোর। এবারেও কথা শেষ করতে পারল না সে। থেমে গেছে ইঞ্জিন।
কন্ট্রোলের ওপর পাগলের মত ছোটাছুটি করছে মিলফোর্ডের আঙুল। দুই বছর হল পাইলটের লাইসেন্স পেয়েছেন তিনি, বহুবার আকাশে উঠেছেন বিমান নিয়ে, কখনও কোন গোলমালে পড়েননি।
অসংখ্য সুইচ টেপাটিপি করলেন তিনি, গজগুলো চেক করলেন, তারপর যখন দেখলেন কোনটাই কাজ করছে না, শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন ওগুলোর দিকে। কাটাগুলো সব নিথর হয়ে আছে, নড়ে না, ডিজিটাল নম্বরগুলো যেখানে ছিল সেখানেই আটকে গেছে। অলটিচিউড, এয়ার স্পীড, ফুয়েল…

ইলেকট্রিক্যাল সিসটেমটা গেছে! বিড়বিড় করল রবিন।
ইঞ্জিন? জবাব জানা হয়ে গেছে কিশোরের, তবু প্রশ্নটা করল।
ডেড! মিলফোর্ড বললেন।

.

কাগজের খেলনা বিমানের মত ভেসে চলেছে সেসনা। ইঞ্জিন স্তব্ধ। চারপাশে শিস দিচ্ছে যেন বাতাস, গোঙাচ্ছে। ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেল থেকে থাবা দিয়ে। মাইক্রোফোনটা তুলে নিয়ে সুইচ টিপলেন মিলফোর্ড।
মে-ডে! মে-ডে! তার কণ্ঠস্বর শান্ত, কিন্তু জরুরী। সেসনা নভেম্বর থ্রি সিক্স থ্রি এইট পাপা থেকে বলছি। আমাদের ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেছে। নিচে পড়ছি। পজিশন জিরো ফোর সেভেন রেডিয়াল অভ ব্যাকারসফিল্ড ভি ও আর অ্যাট সেভেন্টি ফাইভ ডি এম ই।
মাইক্রোফোনটা রবিনের হাতে গুঁজে দিয়ে আবার স্টিক ধরলেন তিনি।
একই কথা বলতে লাগল রবিন, সেসনা নভেম্বর…
হঠাৎ ফ্যাকাসে হয়ে গেল মিলফোর্ডের চেহারা। রবিন, লাভ নেই! রেখে দাও!
মানে?
অহেতুক কথা বলবে, বুঝে ফেলেছে কিশোর, লাভ হবে না। মেসেজ যাবে না কোথাও। বিদ্যুতই নেই। রেডিও অচল।
আরি, ভুলেই গিয়েছিলাম, রবিন বলল, ইমারজেন্সি লোকেটর বিকন আছে একটা। প্লেন ক্র্যাশ করলে আপনা-আপনি চালু হয়ে যায় ওটা।
অনেক ধন্যবাদ, আমি ক্র্যাশ করতে চাই না, দুই হাত নাড়ল কিশোর। দ্রুত হয়ে গেছে হৃৎপিণ্ডের গতি। নিরাপদে এখন কোনমতে মাটিতে নামতে পারলে…
হ্যাঁ, আমারও এই কথা, মুসা বলল।
নীরবে সিটবেল্ট বাঁধতে লাগল ওরা।
গ্র্যানিটের একটা চূড়ার দিকে নাক নিচু করে ধেয়ে চলেছে বিমান। বাড়ি লাগলে ডিমের খোসার মত গুঁড়িয়ে যাবে।
মোচড় দিয়ে উঠল কিশোরের পেট। ভয় পেলে যা হয়। ঘামতে আরম্ভ করেছে।
মুঠো খুলে-বন্ধ করে আঙুলের ব্যায়াম করতে লাগল মুসা, আনমনে, যেন পতনের পর পরই কোন কিছু আঁকড়ে ধরে বাঁচার জন্যে তৈরি হচ্ছে। উত্তেজনায় শক্ত হয়ে গেছে পেশী।
ঢোক গিলল রবিন। সহজ ভাবে শ্বাস নেয়ার চেষ্টা করছে। যাচ্ছি কোথায় আমরা? স্বর শুনে মনে হলো গলায় ফাঁসি লাগিয়ে দেয়া হয়েছে।
ওই তৃণভূমিটায় নামার চেষ্টা করব, মিলফোর্ড বললেন।
তৃণভূমিটা বেশ বড়, উপত্যকার পুব ধারে।

কতক্ষণ লাগবে? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
আর মিনিট তিনেক।
পাথর হয়ে গেছে যেন ছেলেরা। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রয়েছে। বাতাস চিরে নিচে নামছে বিমান। দ্রুত বড় হচ্ছে গাছপালা, গ্র্যানিটের চাঙড়। তৃণভূমির উত্তরের পাহাড়টা লম্বা হচ্ছে, সাদা হচ্ছে, মাথা তুলছে যেন দানবীয় টাওয়ারের মত।
মায়ের কথা ভাবল রবিন। কাগজে যখন পড়বেন, সে আর তার বাবা মারা। গেছেন বিমান দুর্ঘটনায়, দুঃখটা কেমন পাবেন? নিশ্চয় ভয়াবহ।
মাটির যত কাছাকাছি হচ্ছে ততই যেন গতি বেড়ে যাচ্ছে বিমানের।
মাথা নামাও! চিৎকার করে বললেন মিলফোর্ড। হাত দিয়ে মাথা চেপে ধরো। শক্ত করে!
বাবা…
জলদি করো! কথা বলার সময় নেই!
মাথা নুইয়ে হাত দিয়ে চেপে ধরল, কিংবা বলা যায় বাহু দিয়ে পেঁচিয়ে ধরল তিনজনে।
যাই হোক, চাকাগুলো ঠিকই আছে, বিড়বিড় করে নিজেকেই সান্ত্বনা দিল রবিন। ধাক্কা কিছুটা অন্তত বাঁচাবে।
ব্রেকের কথা উল্লেখ করল না কেউ। লাভ নেই। ইলেকট্রিক সিসটেম বাতিল, কাজেই ব্রেক কাজ করবে না।
বিমানের চারপাশে বাতাসের গর্জন বাড়ছে।
হয়েছে! এইবার! ভাবতে গিয়ে গায়ে কাটা দিল রবিনের।
মাটিতে আছড়ে পড়ল বিমান।
প্রচণ্ড বেগে সামনের দিকে ছিটকে যেতে চাইল ওদের শরীর, সীট বেল্টে টান। লেগে আবার ফিরে এসে পিঠ বাড়ি লাগল সিটের হেলানে। রবিনের মনে হলো, তীক্ষ্ণ ব্যথা যেন লাল সাদা স্ফুলিঙ্গ ছিটিয়ে গেল চোখে।
পড়েই বলের মত ড্রপ খেয়ে লাফিয়ে উঠল বিমান, ভয়ঙ্কর গতিতে আবার আছাড় খেল। সীট বেল্টে আটকানো মানুষগুলোকে এলোপাতাড়ি ঝাঁকিয়ে দিল। আবার লাফিয়ে উঠল।
শক্ত হয়ে থাক! চিৎকার করে হুঁশিয়ার করলেন মিলফোর্ড।
তৃতীয় বার মাটিতে পড়ল বিমান। কাপল, ঝাঁকি খেল, দোল খেল, গোঙাল। তবে আর লাফ দিল না। সামনের দিকে দৌড়াল মাতালের মত টলতে টলতে।
সীট আঁকড়ে ধরেছে রবিন। মাথা নিচু করে রেখেছে। ভীষণ ঝাঁকুনি লাগছে। মনে হচ্ছে, শরীরের ভেতরের যন্ত্রপাতি সব ভর্তা হয়ে যাচ্ছে। বেঁচে আছে এখনও, তবে

আর কতক্ষণ?
হঠাৎ শোনা গেল বিকট শব্দ, ধাতুর শরীর থেকে ধাতু ছিঁড়ে, খসে আসার আর্তনাদ। কলজে কাঁপিয়ে দেয়।
আরেকবার সামনে ঝাঁকি খেয়ে পেছনে ধাক্কা খেল ওদের দেহ, তারপর খেল। পাশে, মাথা ঠুকে গেল দেয়ালের সঙ্গে। বাতাসে উড়ছে বই, খাতা, কাগজ। কানের পাশ দিয়ে উড়ে গেল যন্ত্রপাতি আর ইলেকট্রিকের তার। কি যেন এসে লাগল রবিনের হাতে। ব্যথায় উহ করে উঠল সে। পাগল হয়ে গেছে যেন বিমান, এ পাশে দোল খাচ্ছে, ওপাশে দোল খাচ্ছে, শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে এর মাঝে।
তারপর নামল নীরবতা। স্তব্ধ নীরবতা। দাঁড়িয়ে গেছে সেসনা।
আস্তে মাথা তুলল রবিন।
বাবা!
ইনস্ট্রমেন্ট প্যানেলে মাথা রেখে উবু হয়ে আছেন মিলফোর্ড।
তার কাধ ধরে ঠেলা দিল রবিন। বাবা! ঠিক আছ তুমি?
কিন্তু নড়লেন না তিনি।
ওখান থেকে বের করে নিয়ে আসা দরকার! সামনের দুটো সীটের মাঝের ফাঁকে এসে দাঁড়াল মুসা।
দ্রুতহাতে বাবার কানে লাগানো হেডফোন খুলে নিল রবিন। মুসা খুলল সীটবেল্ট। মিলফোর্ডের কপালে রক্ত। বাড়ি লেগে গোল হয়ে ফুলে উঠেছে একটা জায়গা, লালচে বেগুনী হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই।, মুসার পেছন পেছন দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়ল রবিন, বেসামাল পায়ে দৌড়ে বিমানের সামনে দিয়ে ঘুরে চলে এল আরেক পাশে। সে ভাল আছে। মুসা আর। কিশোরও ভাল আছে। নেই কেবল তার বাবা। বেহুশ হয়ে গেছেন। আঘাত কতটা মারাত্মক এখনও বোঝা যাচ্ছে না। হাতল ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে পাইলটের পাশের দরজাটা খুলল সে।
তার পাশে চলে এল মুসা। রবিনকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে পাজাকোলা করে বের করে আনল মিলফোর্ডকে। নিজের গায়েও জখম আছে, ব্যথা আছে, তবে গুরুত্ব দিল না। আগে মিলফোর্ডের সেবা দরকার।
কিশোর কই? অচেতন দেহটা কোলে নিয়েই সামনের একটা উঁচু পাথরের চাঙড়ের দিকে প্রায় দৌড়ে চলল সে। ওর পাশে রইল রবিন। বাবার দিকে কড়া দৃষ্টি।
এই যে, এখানে! দুর্বল জড়ানো কণ্ঠে জবাব দিল কিশোর। বিমানের ভেতরেই রয়েছে। ধীরে ধীরে হাত-পা নেড়েচেড়ে দেখছে ভেঙেছে কি-না। নড়ছে। স্বাভাবিক ভঙ্গিতেই, তার মানে ঠিকই আছে…

বেরোও ওখান থেকে! গ্র্যানিটের চাঙড়টার দিকে ছুটতে ছুটতে চেঁচিয়ে উঠল মুসা। পাথরের কাছে পৌঁছে ঘাসের ওপর শুইয়ে দিল মিলফোর্ডকে।
হাঁটু গেড়ে বাবার পাশে বসে পড়ল রবিন। নাড়ি দেখল। ডাক দিল, বাবা, শুনতে পাচ্ছ? বাবা?
মিলফোর্ডকে নামিয়ে দিয়েই আবার বিমানের দিকে দৌড় দিল মুসা, কিশোরের কাছে।
আসছি! দরজায় দাঁড়িয়ে বোকা বোকা চোখে মুসার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। কিশোর।
নাম না জলদি, গাধা কোথাকার! ধমকে উঠল মুসা। কিশোরের হাত ধরে টান মারল। ফুয়েল ট্যাঙ্ক...
বড় বড় হয়ে গেল কিশোরের চোখ। ফুয়েল ট্যাঙ্ক! ভুলেই গিয়েছিলাম...! আতঙ্ক ফুটল কণ্ঠে। আগুনের মত গরম হয়ে আছে ইঞ্জিন। ট্যাঙ্কের পেট্রল এখন তাতে গিয়ে লাগলে দপ করে জ্বলে উঠবে।
লাফ দিতে যাচ্ছিল কিশোর, এই সময় হাতে টান দিল মুসা, তাল সামলাতে না পেরে উপুড় হয়ে পড়ে গেল সে। উঠে দাঁড়াল আবার। কোথাও হাড়টাড় ভেঙেছে কিনা দেখার সময় নেই আর। দৌড়াতে শুরু করল মুসার পেছনে। যে পাথরটার আড়ালে শুইয়ে দেয়া হয়েছে মিলফোর্ডকে, রবিন রয়েছে, সেখানে চলেছে। বিমাটা বিস্ফোরিত হলেও ওখানে টুকরোটাকরা ছিটকে গিয়ে ক্ষতি করার আশঙ্কা নেই।
মিলফোর্ডের কাছে এসে ধপ করে বসে পড়ল কিশোর। পর মুহূর্তেই চিত। জোরে জোরে হাঁপাচ্ছে। ঘামে চকচক করছে মুখ। তার পাশে বসে পড়ল মুসা।
বিস্ফোরণের অপেক্ষা করছে ওরা। প্রচণ্ড শব্দের পরক্ষণেই এসে গায়ে লাগবে। আগুনের আঁচ, বাতাস ভরে যাবে পোড়া তেলের গন্ধে।
গায়ের ডেনিম জ্যাকেট খুলে ফেলল রবিন। গুটিয়ে নিয়ে বালিশ বানিয়ে ঢুকিয়ে দিল বাবার মাথার নিচে। আরেকবার নাড়ি দেখে বন্ধুদের দিকে মুখ তুলে তাকাল। বলল, নাড়ি ঠিকই আছে।
মাথা ঝাঁকাল কিশোর। বেহুশ হয়ে গেছেন। আর কিছু না। প্রচণ্ড শক লেগেছে তো।
খুব শক্ত মানুষ! মুসা বলল।
নিজের জ্যাকেট খুলে মিলফোর্ডের গায়ে ছড়িয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। হাত টান টান করে ঝাঁকি দিল, পা ঝাঁকি দিল, পেশীগুলোকে ঢিল করে নিয়ে আবার বসল। বিমানটা এখনও ফাটছে না কেন? ঠাণ্ডা হয়ে যায়নি তো ইঞ্জিন? বার বার সীটে ধাক্কা লাগায় পিঠ ব্যথা করছে, বুক ব্যথা করছে সীট বেল্টের টান লেগে।

গুঙিয়ে উঠলেন মিলফোর্ড।
বাবা? ডাক দিল রবিন। চোখ মেল, বাবা?
আঙ্কেল, শুনছেন? উঠে বসে কিশোরও ডাকল।
চোখ মেললেন মিলফোর্ড রবিনের মুখে চোখ পড়ল।
হাসি ফুটল রবিনের মুখে। ল্যাণ্ডিংটা দারুণ হয়েছে, বাবা।
দুর্দান্ত হয়েছে, একমত হলো কিশোর।
তাহলে আবার কখন উড়ছি আমরা? রসিকতা করল মুসা।
মলিন হাসি হাসলেন মিলফোর্ড। তোমরা ঠিক আছ তো?
প্লেনটার চেয়ে যে ভাল আছি, কিশোর জবাব দিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই।
উঠে বসতে গেলেন। ঠেলে আবার শুইয়ে দিল রবিন।
প্লেনটার কি অবস্থা! উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন মিলফোর্ড। ডানাটানা আছে?
ডানা?
তাই তো! লক্ষ্যই করা হয়নি! তিনজনেই উঠে দাঁড়াল। পাথরটার পাশে এসে তাকাল। অসংখ্য মেঠো ফুল জন্মে রয়েছে তৃণভূমিতে। মাঠের বুক চিরে চলে গেছে। একটা লম্বা দাগ, বিমানটার হিঁচড়ে যাওয়ার চিহ্ন। সেসনার ডানায় লেগে মাথা। কেটে গেছে অনেক চারাগাছের। কাণ্ডগুলো দাঁড়িয়ে রয়েছে রোদের মধ্যে, ওপরের অংশটা যেন মুচড়ে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। প্রপেলারের চার ফুট লম্বা একটা ডানা খসে গেছে, কয়েক টুকরো হয়ে এখন পড়ে আছে শখানেক ফুট দূরে। বিমানের। চলার পথে পড়ে আছে দুটো চাকা। ধারাল পাথরে লেগে ছিঁড়ে গেছে একটা ডানা। ওই পাথরটাতে বাড়ি খেয়েই অবশেষে থেমেছে বিমানটা। ডানা ছাড়া উড়তে পারবে না আর সেসনা।
জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে রবিন বলল, গেছে!
নামতে যে পেরেছি, এটাই বেশি, মুসা বলল।
কিশোর বলল, হ্যাঁ, অল্পের ওপর দিয়ে গেছে। আমি তো ভেবেছিলাম, জীবনটা এখানেই খোয়াতে হবে। অথচ একটা হাড়িডও ভাঙল না, আশ্চর্য!
আমার ক্যাপটা কোথায়? মিলফোর্ড বললেন। ছেলেদের বাধা দেয়ার তোয়াক্কা করলেন না আর, পাথরের একটা ধার খামচে ধরে টেনে তুললেন শরীরটাকে।
বাবা!
আঙ্কেল!
পাথরে হেলান দিলেন মিলফোর্ড। সোজা রাখলেন মাথাটা। তিক্ত হাসি ফুটল ঠোঁটে। মাথায় সামান্য ব্যথা, আর কোন অসুবিধে নেই।
বসে পড়ো! রবিন বলল।
উপায় নেই, মিলফোর্ড বললেন। প্লেনটার অবস্থা দেখতে হবে।

কিন্তু ইঞ্জিন গরম…
মুসাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন তিনি, আগুন লাগার ভয় করছ? এখনও যখন লাগেনি, আর লাগবে না। বিমানটার দিকে তাকালেন। এক পা বাড়ালেন সামনে, তারপর আরেক পা। নাহ, পারছি হাঁটতে। পারব। অতটা খারাপ না। টলে উঠলেন তিনি।
খপ করে এক হাত ধরে ফেলল রবিন। মুসা ধরল আরেক হাত।
বড় বেশি গোয়ার্তুমি করো তুমি, বাবা!
তোর মা-ও একই কথা বলে, হেসে বললেন মিলফোর্ড। আমাদের এডিটর সাহেবও। সব সময়ই বলেন। আবার পা বাড়ালেন তিনি। তবে ছেলেদের সাহায্য নিতে অমত করলেন না।
পাশে পাশে চলল কিশোর। বিমানের কাছে পৌঁছে পাইলটের সীট থেকে বাবার সানগ্লাস আর ক্যাপটা তুলে নিল রবিন।
এ নীল উইণ্ডব্রেকারের পকেটে চশমাটা রেখে দিলেন মিলফোর্ড। ক্যাপটা মাথায়। দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঠিকমত বসার চেষ্টা করলেন, যাতে কপালে না লাগে। বসিয়ে, হাসলেন। যেন বোঝাতে চাইলেন, আমাকে অত অসহায় ভাবছ কেন? আমি এখনও সবই পারি।
আশপাশটায় চোখ বোলাল ওরা। পাহাড়ের ঢালে ঢালু হয়ে নেমে গেছে তৃণভূমি। তার পরে ঘন বন। তিন পাশেই, বেশ কিছুটা দূরে মাথা তুলেছে গ্র্যানিটের পাহাড়। রোদে চকচক করছে। পেছনে প্রায় দুশো ফুট উঁচু আরেকটা পাহাড়, দুই প্রান্তই ঢালু হয়ে গিয়ে ঢুকেছে পাইন বনের ভেতরে। উত্তরের পাহাড় চূড়ার জন্যে দেখা যাচ্ছে না তার ওপাশে কি আছে।
লোকালয়ে কোন চিহ্নই চোখে পড়ল না। ডায়মণ্ড লেক এখান থেকে কম করে হলেও তিরিশ-চল্লিশ মাইল দূরে হবে। উত্তরের চূড়াটা না থাকলে হয়তো চোখে পড়ত। তবে আকাশ থেকে নিচের জিনিস যতটা ভালভাবে দেখা যায়, নিচে থেকে যায় না।
তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে রবিন নিচের তরাই অঞ্চল। অন্য কোন সময় হলে, অর্থাৎ পরিস্থিতি ভাল থাকলে জায়গাকে খুব সুন্দর বলত সে। চোখা হয়ে উঠে যাওয়া চূড়া, নিচের সবুজ উপত্যকা, ঘন বন। এখন সে সব উপভোগ করার সময়। নেই। একটা কথাই বার বার পীড়িত করছে মনকে, ওরা এখানে একা। নির্জন এক পার্বত্য এলাকায় নামতে বাধ্য হয়েছে ওরা। সাথে খাবার নেই, পানি নেই। রেডিও, ক্যাম্প করার সরঞ্জাম কিছুই নেই। বাঁচবে কি করে?
যেন তার মনের কথাটাই পড়তে পেরে ক্লান্ত স্বরে মিলফোর্ড বললেন, শোনো। তোমরা, এসব বুনো এলাকায় কি করে বেঁচে থাকতে হয় জানা আছে তো?

.
কতটা বেশি ঠাণ্ডা পড়বে এখানে? বাবাকে জিজ্ঞেস করল রবিন।
উষ্ণ রোদে আরাম করে বসে আছ দুজনে। কিশোর আর মুসা পানি রাখার জন্যে একটা পাত্র পাওয়া জায় কি-না খুঁজে দেখতে গেছে বিমানের ভেতরে। মেডিক্যাল কিটও দরকার।
আবহাওয়া এখন ততটা খারাপ হবে না, মিলফোর্ড বললেন। আগস্ট মাস তো, ঠাণ্ডায় জমে মরার ভয় নেই। রাতে তাপমাত্রা চল্লিশের নিচে নামবে বলে মনে হয় না।
চল্লিশ! ভুরু ওপর দিকে উঠে গেল রবিনের। ঠাণ্ডাই তো!
তা একরকম ধরতে পারো, হাসলেন মিলফোর্ড। হাজার হোক ক্যালিফোর্নিয়া…
হ্যাঁ, ক্যালিফোর্নিয়া তো বটেই, মুসা বলল। বিমানের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে এগোনোর সময় মিলফোর্ডের কথা কানে গেছে তার। যত সব গণ্ডগোলের আখড়া। আবহাওয়ার কোন ঠিকঠিকানা নেই। মুসার হাতে একটা ধাতব বাক্স।
শীত সহ্য করার মত শরীর নয় আমাদের, কার বিরুদ্ধে অভিযোগ করল রবিন সে-ই জানে।
মুসার পেট গুড়গুড় করে উঠল। ক্ষুধা সহ্য করার মতও নয়। ভাবছিলাম, ডায়মণ্ড লেকে গিয়ে পেট পুরে ভেড়ার কাবাব খাব। দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাত নাড়ল সে। গেল সব!
একমত হয়ে মাথা জাঁকালেন ফিলফোর্ড আর রবিন। খিদে তাঁদেরও পেয়েছে।
ডায়েট কন্ট্রোল করা ছাড়া আর কিছু করার নেই আপাতত, বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল রবিন।
দেখো, কিশোর কি বলে? করুণ হাসি ফুটল মুসার ঠোঁটে। কিছু একটা আবিষ্কার করেই ফেলবে–মনে নেই, প্রশান্ত মহাসাগরের মরুদ্বীপে…
হ্যাঁ, তা তো আছেই। পিঁপড়ের ডিম আর শুয়াপোকা খাওয়াবে আর কি শেষে… বিমান দুর্ঘটনা।
বাধা দিয়ে মিলফোর্ড বললেন, অতটা নিরাশ হচ্ছ কেন? বেরিয়ে যাওয়ার একটা না একটা ব্যবস্থা হবেই। আমাদের মে-ডে কারও কানে যেতেও পারে। ওয়ান টোয়েন্টি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মেগাহার্টজে এখন ব্রডকাস্ট চলছে।
আপনি শিওর? ভরসা করতে পারছে না মুসা। সত্যিই চলছে রেডিওটা?
চলার তো কথা। ব্যাটারিতে চলে। জোরে ধাক্কা কিংবা বাড়ি খেলেই আপনাআপনি চালু হয়ে যায়। এমনও শোনা গেছে, হাত থেকে টেবিলের ওপর। পড়ে গেলেও চালু হয়ে যায়।

নীল আকাশের দিকে তাকালেন তিনি। অনেক ওপরে ধোয়ার হালকা একটা সাদা রেখা চোখে পড়ছে। একটা জেট বিমান যাওয়ার চিহ্ন। সেদিকে তাকিয়ে থেকে মিলফোর্ড বললেন, ওখান থেকে আমাদেরকে দেখতে পাবে না, ঠিক, তবে আমাদের এস ও এস শুনতে বাধা নেই।

অনেক দূরে চলে গেছে বিমানটা। ছোট হয়ে এসেছে, মিলিয়ে যাবে যে কোন মুহূর্তে। সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে বাবার দিকে তাকিয়ে হাসল রবিন। অনেকটা স্বস্তি পাচ্ছে এখন। পরিস্থিতি খারাপ সন্দেহ নেই, কিন্তু তার বাবা এমন সহজ ভঙ্গিতে কথা বলছে, হতাশা অনেকটাই কেটে গেছে ওর। আশা হচ্ছে এখন, ওদেরকে উদ্ধার করতে আসবেই কেউ না কেউ। মুসার হাতের বাক্সটার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, কি ওটা?

ইমারজেন্সি কিট। অনেক জঞ্জালের ভেতর থেকে বের করেছি। দেখো না, কি ধুলো লেগে আছে।

হু।

বাক্সটা খোলা হলো। ভেতরে রয়েছে অ্যাসপিরিন, বায়োডিগ্রেডেবল সোপ, ব্যাণ্ডেজ, মসকুইটো রিপেলেন্ট, স্কিন অ্যানটিবায়োটিক, পানি পরিশোধিত করার আয়োডিন পিল, এক বাক্স দিয়াশলাই, আর ছয়টা হালকা স্পেস ব্ল্যাঙ্কেট। চকচকে এক ধরনের জিনিস দিয়ে এত পাতলা করে বানানো, ভাঁজ করে নিলে খুব অল্প জায়গার ভেতরে ভরে রাখা যায়।

দিয়াশলাই! খুশি হয়ে উঠেছে রবিন, যাক, আগুনের ব্যবস্থা হয়ে গেল।

আয়োডিন পিল আছে যখন, মিলফোর্ড বললেন, খাবার পানিও পেয়ে যাব।

এগুলো দেখে তো মনে হচ্ছে মহাকাশচারীদের কাজে লাগে, একটা স্পেস ব্ল্যাঙ্কেট খুলল মুসা। একটা ধার ঢুকিয়ে দিল টি-শার্টের গলা দিয়ে। ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল, কি মনে হয়? রক স্টারের মত লাগছে?

জবাব দিল না রবিন। ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। বাবার কপালের জখমটায় পরিষ্কার করে ব্যাণ্ডেজ বাধল। কাটাটা খুব বেশি না, তবে বাড়িটা লেগেছে বেশ জোরেই। অনেকখানি উঁচু হয়ে ফুলে গেছে। বেগুনী রঙ।

ফোলা মাংসে আঙুল দিয়ে চাপ দিল রবিন। উহ করে উঠলেন মিলফোর্ড। বেশি ব্যথা লাগছে? জিজ্ঞেস করল রবিন। বেশি খারাপ লাগলে শুয়ে পড়ো। মাথায় বাড়ি লাগা ভাল না! বমি বমি লাগছে? মাথা ঘোরে...

একেবারে ডাক্তার হয়ে গেলি যে রে! হেসে বললেন মিলফোর্ড। রেড ক্রসের ট্রেনিং নিয়ে ভালই হয়েছে...।

আমারও তাই বিশ্বাস। এখন চুপ কর তো! খারাপ লাগলে শুয়ে পড়।

ব্ল্যাঙ্কেটটা আবার আগের মত ভাজ করে রেখে দিল মুসা। তারপর রওনা। হলো তৃণভূমির কিনারে, আগুন জ্বালানোর জন্যে লাকড়ি জোগাড় করতে। প্রথমে। যেখানটায় আশ্রয় নিয়েছিল, বিমান বিস্ফোরিত হলে আত্মরক্ষার জন্যে, সেখানটায় এসে জড় করল কাঠকুটো। আগুন যদি জ্বালতেই হয়, জ্বালবে বিমান আর ট্যাঙ্কের পেট্রোল থেকে দূরে। সাবধান থাকা ভাল।
সেসনার ভেতরে রয়েছে এখনও কিশোর। একটা পানির পাত্র খুঁজছে। আচমকা চিৎকার উঠল, অ্যাই, শুনছ তোমরা, একটা গোলমাল হয়ে গেল!
বিমানের কাছে দৌড়ে এল মুসা আর রবিন। ওদের পেছনে এলেন মিলফোর্ড।
যন্ত্রটা, গম্ভীর হয়ে বলল কিশোর, কাজ করছে না। মে-ডে পাঠানোর কথা যেটার।
কেন? জানতে চাইলেন মিলফোর্ড।
বাক্সটা খুলল কিশোর। লাল একটা আলো জ্বলে-নিভে সঙ্কেত দেয়ার কথা। ওটা দেখে বোঝা যায় যে, সঙ্কেত দিচ্ছে যন্ত্রটা। তারটার আর কানেকশনগুলো। ঠিকই আছে। গোলমালটা ব্যাটারির। মনে হয় ডেড।
ডেড? হতাশার ভঙ্গিতে প্রতিধ্বনি করল যেন রবিন।
তার মানে সাহায্য চেয়ে সিগন্যাল পাঠাচ্ছে না? মুসাও খুব হতাশ। বড় বড় হয়ে গেছে চোখ।
ব্যাটারি না থাকলে পাঠাবে কি করে? প্রশ্নটা যেন নিজেকেই করল কিশোর।
খাইছে! হাতের আঙুলগুলো মুঠোবদ্ধ হয়ে গেল মুসার। বেড়ে যাচ্ছে। হৃৎপিণ্ডের গতি, অ্যাড্রেনালিন পাম্প করতে আরম্ভ করেছে। কি সাংঘাতিক বিপদে পড়েছে বুঝতে পারছে।
প্রথমে গেল ইলেকট্রিক সিসটেম, আনমনে মাথা নাড়ছে রবিন, এখন ব্যাটারি! অসুস্থই বোধ করছে সে।
গেলাম তাহলে আমরা! মুসা বলল।
ইলেকট্রিক্যাল সিসটেম মাঝে মাঝে খারাপ হয়, মিলফোর্ড বললেন, যদিও খুব রেয়ার। কানেকশনে গোলমাল থাকলে হয়। তবে ব্যাটারি খারাপ হয় না, ফুরিয়ে যায়। বদলে নিলেই হয়। আসলে, চেক করেনি, নতুন ব্যাটারিও আর লাগায়নি। ভুলের জন্যেই এটা ঘটল।
আর এই ভুলের কারণেই মরতে বসেছি আমরা, তিক্ত কণ্ঠে বলল মুসা।
কিন্তু কিছু করার নেই। পাইনের বন থেকে শিস কেটে বেরিয়ে আসছে বাতাস, বয়ে যাচ্ছে বিশাল ঘেসো প্রান্তরের বুকে ঢেউ খেলিয়ে। ওদের পেছনে ঝকঝকে পরিষ্কার নীল আকাশে মাথা তুলে রেখেছে পর্বতের চূড়া।
বেহশত, আবার আনমনে মাথা নাড়তে লাগল রবিন সেদিকে তাকিয়ে।

দেখেই মজে যাওয়ার কোন কারণ নেই, সাবধান করলেন মিলফোর্ড। শোননি, স্বর্গেও সাপ থাকে।
আমি মজিনি, কিশোর বলল। এখানে কি কি থাকতে পারে, ভাল করেই জানি। বিষাক্ত সাপ, হিংস্র মাংসাশী জানোয়ার, ভূমিধস, দাবানল, বজ্রপাত, আর আরও হাজারটা বিপদ ওত পেতে আছে। ফল ধরে থাকতে দেখা যাবে গাছে গাছে, দেখলেই খেতে ইচ্ছে করবে, কিন্তু খেলেই মরতে হবে, এতই বিষাক্ত।
আচ্ছা, হঠাৎ যেন আশার আলো দেখতে পেল রবিন, বাবা, ডায়মণ্ড লেকে যার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছ, সে কি করবে? সময়মত তুমি না পৌঁছলে কিছু করবে না?
হয়তো করবে। ফোন করবে আমার অফিসে। ও না করলে আর কেউ করবে না। বাড়িতে বলে এসেছি আমরা সবাই, দিন তিনেক লাগতে পারে। তিন। দিন না গেলে কেউ খবর নেয়ার কথা ভাববেই না।
বাহ, চমৎকার! বিড়বিড় করল মুসা।
মুসা, অত ভেঙে পড়ছ কেন? এ রকম পরিস্থিতিতে অনেক পড়েছ তোমরা। দুর্গম জায়গায় আটকা পড়েছ, বেঁচে ফিরেও এসেছ। এসব অবস্থায় প্রথমে কি করা উচিত?
প্রথমে দেখা দরকার, কি কি জিনিস আছে আমাদের কাছে। আমার কাছে আছে গায়ের এই পোশাক।
মুসার পরনে জিনস, পায়ে টেনিস শু, গায়ে কালো টি-শার্ট, বুকে সোনালি অক্ষরে বড় বড় করে লেখাঃ পিঙ্ক ফ্লয়েড। একটা জ্যাকেট আছে, একটা ছোট ছুরি আছে, সুটকেসে আরও কিছু কাপড় আছে। রবিন আর কিশোরকে জিজ্ঞেস করল, তোমাদের কাছে কি আছে?
আমার কাছেও এইই, রবিন বলল। ওর জিনসে রয়েছে ক্যালভিন ক্লেইন, আর টি-শার্টে ব্যানানা রিপাবলিক মিনিস্টার অভ কালচার-এর মনোগ্রাম। ছুরিটা বাদ।
আমার কাছেও ছুরি নেই, মিলফোর্ড বললেন। তার পরনে জিনসের প্যান্ট আর শার্ট, মাথায় ক্যাপ।
ক্যাম্পিঙের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সহ একটা ব্যাকপ্যাক থাকলে এখন খুবই ভাল হত, ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। তবে মনে হয় তিনটে দিন কাটিয়ে দিতে পারব কোনমতে। প্রতিকূল পরিবেশ, খাওয়াও তেমন জুটবে বলে মনে হয় না, তবু...
তেমন জুটবে, না মানে? কথাটা ধরল রবিন। তার মানে কিছু খাবার তোমার কাছে আছে?
মাথা নাড়ল কিশোর, না, খাবার আমার কাছে নেই, তবে...

তবে কি? তর সইছে না মুসার। জলদি বল!
যে ভাবে বলছ, কিশোর বলল, ধরেই নিয়েছ, খাবার আছে আমার কাছে।
না হলে বললে কেন?
হ্যাঁ, বাবাআ, মিলফোর্ডও অধৈর্য হয়ে উঠছেন, থাকলে বের কর না!
শ্রাগ করল কিশোর। আসছি, বলে গিয়ে ঢুকে পড়ল বিমানের ভেতরে।
এত দেরি কেন? বাইরে থেকে ডেকে বলল মুসা, মাইক্রোওয়েভে খাবার তৈরি করছ নাকি?
একটা ডাফেল ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে এল কিশোর। টকটকে লালের ওপর সাদা সাদা ডোরা। চট করে চোখে পড়বার জন্যে বেশ কায়দা করে লেখা রয়েছেঃ আই কেম ফ্রম, পিজা হ্যাঁভেন, ই। কাগজে মোড়া কিছু হালকা খাবার আর ক্যাণ্ডি বের করল সে।
দাও দাও, জলদি দাও! হাত বাড়াল মুসা। আর পারি না...
খাবারগুলো ভাগাভাগি করে নিল ওরা। সাধারণ জিনিস, এখন সেগুলোই রাজকীয় মনে হলো।
এগুলো আনতে গেলে কেন? ক্যাণ্ডিতে কামড় বসিয়ে জিজ্ঞেস করল রবিন।
মনে করলাম, কিশোরের জবাব, প্লেনে যদি খিদে লাগে। নিয়ে নিলাম।
খুব ভাল করেছ, মুসা বলল। জীবনে যে কটা সত্যিকারের ভাল কাজ করেছ, তার মধ্যে এটা একটা।
তার কথার ধরনে হাসলেন মিলফোর্ড। হ্যাঁ, বি থাকলে বুদ্ধিটাও খোলে।
সেটা খোলানর জন্যেই যেন খাওয়া শেষ করার পর বিমানের গায়ে হেলান দিয়ে চোখ মুদে ভাবতে শুরু করল কিশোর।
নিজের ভাগের খাবার চেটেপুটে খেয়ে মিলফোর্ড বললেন, থ্যাঙ্ক ইউ, কিশোর। খাবার যা বাকি আছে, যত্ন করে রেখে দাও। তিনদিন ধরে অল্প অল্প। করে খেতে হবে। বলা যায় না, তিনদিনের বেশিও থাকতে হতে পারে আমাদের।
ওঠা যাক এবার, মুসা বলল। বসে থাকলে হবে না। ঘুরে দেখে আসা। দরকার, আশেপাশে ঘরবাড়ি, আছে কি-না। রেঞ্জারের কেবিন থাকতে পারে। কিংবা ক্যাম্পগ্রাউণ্ড, কিংবা রাস্তা। পানিও লাগবে আমাদের। লাকড়ি কুড়ানোর সময় পানির শব্দ শুনছিলাম। কাছেই কোথাও ঝর্না আছে। হাত তুলে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে দেখাল সে। ঝর্নার ধারেই করা হয় ক্যাম্পগ্রাউণ্ডগুলো, কাজেই...
..থাকলে ওদিকটায় থাকতে পারে, কথাটা শেষ করে দিল কিশোর। বিমানের ভেতর থেকে দুই কোয়ার্টের একটা প্লাস্টিকের বোতল বের করে এনে মুসাকে দিয়ে বলল, এটা নিয়ে যাও। পানি আনতে পারবে।

কমলার রস ছিল বোতলটায়, এখন খালি। আগ্রহের সঙ্গে সেটা হাতে নিয়ে মুসা বলল, গুড। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল ওটা, ফুটোটুটো আছে কিনা। নেই। রবিনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, নাও। সাবান দিয়ে ভাল করে ধুয়ে তারপর পানি ভরবে। আয়োডিন পিল ফেলে দেবে ভেতরে, যাতে নিশ্চিন্তে খাওয়া যায়।
বোতলটা নিল রবিন। তুমি কি করবে?
দক্ষিণে হাত তুলল আবার মুসা। ওদিকে বনের ভেতরে একটা পায়েচলা পথ। ঢুকে গেছে দেখেছি। বুনো জানোয়ার চলার পথ হতে পারে। বলা যায় না, কপাল। খুলেও যেতে পারে। হয়ত মানুষেই তৈরি করেছে ওটা।
ভাল বলেছ, মিলফোর্ড বললেন। যাও, দেখ গিয়ে। আমি ওটাতে চড়ব। তৃণভূমির উত্তর ধার দিয়ে চলে যাওয়া গ্র্যানিটের দেয়ালটা দেখলেন তিনি। একপাশে বেশ ঢালু, চূড়ায় চড়া সহজ। ওপর থেকে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যাবে। কি আছে না আছে দেখতে পারব।
পারবে? রবিন বলল, ভাল লাগছে কিছুটা?
পারব।
কিশোর কি করবে সেটা জানার জন্যে তার দিকে তাকাল তিনজনে।
প্রশ্ন করতে হলো না, কিশোর নিজে নিজেই বলল, আ-আমার মনে হয়...আমার এখানে থাকাই ভাল। কেউ যদি চলে আসে, তাকে বলতে হবে তো আমরা আছি এখানে, চলে যাইনি।
আরও লাকড়ি দরকার আমাদের, মুসা বলল। ভেজা লাকড়ি। বেশি করে জমিয়ে আগুন ধরিয়ে দিলে অনেক ধোয়া বেরোবে। সঙ্কেত দিতে পারব। স্মোক সিগন্যাল। এই কাজটা তুমি করতে পার, প্লেনের কাছ থেকে দূরে যাওয়া লাগবে না। আরও একটা কাজ, আমাদের সবার সুটকেস থেকেই কিছু কাপড় বের করে তিন-চারটা গাছের মগডালে পতাকার মত উড়িয়ে দিতে পার। আরেক ধরনের সিগন্যাল হয়ে যাবে।
মুসার কথা কিশোর শুনছে বলে মনে হলো না, বিমানের গায়ে হেলান দিয়ে তাকিয়ে রয়েছে শূন্য দৃষ্টিতে কাজ করার ইচ্ছে নেই, না গভীর চিন্তায় ডুবে গেছে, বোঝা গেল না। মুসা বলেই চলেছে, তারপর, পাথর টেনে মাঠের মাঝে সেগুলো সাজিয়ে এস ও এস লিখবে, যাতে ওপর থেকে কোন প্লেনের চোখে পড়লে বুঝতে পারে এখানে গোলমাল হয়েছে।
গুঙিয়ে উঠল কিশোর। কাঠ দিয়ে একটা কেবিন বানানোর কথাটা আর বাকি রাখলে কেন?
হেসে উঠল অন্য দুজন, রবিন আর তার বাবা।

লাকড়ি কুড়াতে রাজি আছি আমি, নিস্পৃহ কণ্ঠে বলল কিশোর। আর কিছু পারব না।
তাহলে অনেক বেশি করে আনতে হবে, মুসা বলল। কম হলে চলবে না। অনেক বড় ধোয়া হওয়া চাই...
আসলে আমার বসে থাকাটা সহ্য করতে পারছ না তুমি...
কিছু বলতে যাচ্ছিল মুসা, হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিয়ে রবিন বলল, মুসা, তুমি আসল কথাটাই ভুলে যাচ্ছ। আমাদেরকে খাইয়েছে ও। কাজেই এখন ওর কাজগুলো ভাগাভাগি করে আমাদেরই করে দেয়া উচিত। না কি বলো?
তাই তো। এতক্ষণে যেন টনক নড়ল মুসার। চুপ হয়ে গেল। মাথা চুলকে আমতা আমতা করতে লাগল, ইয়ে...মানে...ইয়ে...
হেসে ফেলল এবার কিশোর। মুসাও হাসল। চলি।
হুঁশিয়ার করলেন মিলফোর্ড, চিহ্ন দিয়ে দিয়ে যেও কিন্তু। নইলে বনের ভেতর পথ হারিয়ে ফেলবে।
তৃণভূমির কিনারে এসে আলাদা হয়ে গেল রবিন আর মুসা। দক্ষিণ-পশ্চিমে ঘুরে পাইন বনে ঢুকে পড়ল রবিন। পানির মৃদু শব্দ কানে আসছে তার। সেদিকেই চলল। মুসা ঢুকল দক্ষিণ-পুবের সরু পায়ে চলা পথটা ধরে।
মা বাবার কথা মনে আছে রবিনের। চিহ্ন রেখে যাওয়া দরকার। আশপাশে কোথায় কি আছে না আছে ভাল করে দেখে দেখে চলতে হয়, বনে চলার এটাই নিয়ম, বিশেষ করে অপরিচিত এলাকায়। একটা ট্রিপল পাইন চোখে পড়ল তার। একই জায়গা থেকে তিনটে চারাগাছ গজিয়েছিল, একই গোড়া থেকে, গায়ে গায়ে লেগে সেগুলো এখন একটা হয়ে গেছে। এটা একটা ভাল চিহ্ন। ওরকম ট্রিপল পাইন খুব কম দেখা যায়। তারপর সে পেরোল একটা চ্যাপ্টা পাথর, মাঝখানটা। গামলার মত, বেশ বড়। আদিম ইণ্ডিয়ানরা সম্ভবত পাথর দিয়ে ওখানে কোন ধরনের বাদাম গুড়ো করে আটা তৈরি করত। আরও কিছু চিহ্ন মনে গেঁথে রাখল। সে। অবশেষে খুঁজে পেল পথটা। দেখেটেখে মনে হল জানোয়ারই চলাচল করে। সেই পথ ধরে এগোল সে। কানে আসছে পানির শব্দ, বাড়ছে ক্রমেই।
তারপর হঠাৎ করেই চোখে পড়ল ওটা, বিশ ফুট চওড়া অগভীর একটা নদী। পানিতে বড় বড় পাথর আর ডালপালার ছড়াছড়ি, নদীর বুকে বিছিয়ে রয়েছে নুড়ি। যেখানটায় রোদ পড়ছে চকচক করছে পানি, আর বনের ভেতর দিয়ে যেখানে গেছে, গাছপালার ছায়া পড়েছে, কালো হয়ে আছে সেখানে। টলটলে পরিষ্কার পানি, নিশ্চিন্তে খাওয়া যায় মনে হয়।
বায়োডিগ্রেডেবল সাবান দিয়ে কমলার রসের বোতলটা ভালমত ধুয়ে নিল রবিন। ঝাড়া দিয়ে ভেতরের পানির কণা যতটা সম্ভব ফেলে দিয়ে পরে রোদে শুকিয়ে

নিল। পানি ভরে তাতে আয়োডিন পিল ফেলে দিল।
উঠে দাঁড়িয়ে পাহাড়ী নদীর এপাশ ওপাশ ভাল করে দেখতে লাগল সে। লোকজন কি আছে? ক্যাম্পগ্রাউণ্ড থাকলে নদীর পাড়েই কোথাও আছে। কোথায়? উজানে, না ভাটিতে?
বিমান থেকে দেখা উপত্যকাটার কথা ভাবল সে। তৃণভূমির পশ্চিমেই কোথাও রয়েছে। ওর অনুমান ঠিক হলে এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তার উত্তরে থাকবে উপত্যকাটা। এত সুন্দর একটা জায়গায় ক্যাম্পগ্রাউণ্ড থাকাটা স্বাভাবিক।
উজানের দিকে রওনা হল রবিন। নদীর তীর ধরে। বড় পাথর আর গাছপালা পড়ছে মাঝে মাঝেই, ঘুরে ওগুলো পার হয়ে আসছে। কোথাও কোথাও জন্মে আছে কাটাঝোপ, কোথাও বা জলজ উদ্ভিদ পানি থেকে উঠে এসেছে পাড়ের ভেজা মাটিতে। যতই এগোচ্ছে পানির শব্দ বাড়ছে।
কয়েকটা লাল ম্যানজানিটা গাছ জটলা করে জন্মে রয়েছে এক জায়গায়, সেটার পাশ ঘুরে একটুকরো খোলা জায়গায় বেরোল সে। নদীতে এখানে তীব্র স্রোত। ওপর থেকে অনেকটা জলপ্রপাতের মত ঝরে পড়ছে পানি।
অপরূপ দৃশ্য। কোটি কোটি মৌমাছির মিলিত গুঞ্জন তুলে পড়ছে পানি, অসংখ্য ঘূর্ণিপাক তৈরি করে ছুটে চলেছে ভাটির দিকে।
বাতাসে পানির কণা। ভেজা বাতাসে শ্বাস নিতে হচ্ছে রবিনকে। জলপ্রপাত থেকে ধীরে ধীরে ওপর দিকে দৃষ্টি ভুলতে লাগল সে। নাটকীয় ভঙ্গিতে প্রপাতের দুদিক থেকে উঠে গেছে উঁচু পাহাড়ের চূড়া। কঠিন পাথরে গভীর নালা কেটে দিয়েছে পানি।
বিমান থেকে দেখা প্রপাতটা যদি এটাই হয়, তাহলে উপত্যকাটা রয়েছে। পাহাড়ের ওই পাশেই। দেখতে হলে ওই পাহাড়ে চড়তে হবে, পাথরের দেয়াল বেয়ে। প্রশ্ন হলো, কোনখান থেকে শুরু করবে?
গ্র্যানিটের দেয়ালে একটা জায়গা দেখা গেল, যেখানে পাথরে চিড় ধরে আছে, পা রাখা যাবে ওখানটায়। পানির বোতলটা রেখে, পাথরের একটা স্তূপ পেরিয়ে চিড়টার কাছে চলে এল সে। উঠতে শুরু করল দেয়াল বেয়ে। পা লাগলেই খসে যাচ্ছে আলগা পাথর, ঠোকর খেতে খেতে নেমে যাচ্ছে নিচে। পা ফসকালে রবিনকেও ওভাবেই পড়তে হবে, কাজেই সাবধান রইল। খুব ধীরে, দেয়ালের গা থেকে বেরিয়ে থাকা শেকড় ধরে, পাথরের খাঁজে পা রেখেই উঠে চলল সে।
হঠাৎ করেই ঘটল ঘটনাটা।
ওপর থেকে কয়েকটা ছোট ছোট নুড়ি এসে পড়ল তার মাথায়। গুমগুম শব্দ কানে এল।

ওপরে তাকাল সে। বিশাল এক পাথর নেমে আসছে, সঙ্গে নিয়ে আসছে ছোট বড় আরও একগাদা পাথর, মাটি, ধুলো, ওর সামান্য ডানে।
ধস নেমেছে পাহাড়ে! ধেয়ে আসছে তাকে থেঁতলে দেয়ার জন্যে।
গতি বাড়ছে ধসের। পিছানর উপায় নেই, আতঙ্ক চেপে ধরল যেন রবিনকে। ধসের পথেই রয়েছে। জলদি সরে যেতে না পারলে নিশ্চিত মৃত্যু। ভাবনারও সময় নেই।
থাবা দিয়ে বায়ের একটা খাঁজ আকড়ে ধরল সে। সরে যেতে শুরু করল। কপালে ঘাম। চোখ জ্বালা করছে। নাকে ঢুকছে বালি।
মরিয়া হয়ে উঠেছে রবিন। যত দ্রুত সম্ভব সরে যাওয়ার চেষ্টা করছে।
বাড়ছে গুমগুম শব্দ।
অনেকটা সরে এসেছে সে। এই সময় পাশ দিয়ে ভারি গর্জন করতে করতে নেমে যেতে লাগল ধস। পাথরের খুদে কণা। তীব্র গতিতে এসে সুচের মত বিধছে চামড়ায়।
ধসটা নেমে গিয়ে জমা হল নিচের পাথরের স্তূপের সঙ্গে। তার মানে মাঝে মাঝেই ধস নামে ওই জায়গাটায়, স্থপটা ওভাবেই হয়েছে। পাহাড়ের চূড়াটা ওখানে নড়বড়ে, যে কোন ধরনের চমক ধসিয়ে দিতে পারে ওটাকে–একটা, পার্বত্য সিংহ লাফিয়ে উঠলে, একটুখানি ভূকম্পন হলে, কিংবা রোদ-বাতাস বৃষ্টিতে ক্ষয়ে যাওয়া একটা পাথর, চূড়ার নিচ থেকে খসে গেলেই টলে উঠবে চূড়াটা। ওখানে চড়তে যাওয়াটা মোটেও নিরাপদ নয়।
ধড়াস ধড়াস করছে রবিনের বুক। চোখ মুদল সে। একটু আগের আতঙ্কের রেশ পুরোপুরি কাটেনি এখনও।
কিন্তু চিরকাল তো আর এখানে এভাবে থাকা যাবে না।
চোখ মেলল সে। আশপাশে তাকাল। কি করবে? ওপরে উঠবে? নিচে নামবে?
এই সময় অদ্ভুত একটা দৃশ্য চোখে পড়ল তার। হাত রাখার জায়গা, না পা রাখার জায়গা? দুটোই মনে হচ্ছে। পাথর কুঁদে তৈরি প্রাকৃতিক নয়। প্রাকৃতিক কারণে ওভাবে তাক তৈরি। হতে পারে না। ঠিক তাকও বলা যাবে না। পাথরের দেয়ালে এমন ভাবে তৈরি হয়েছে ওগুলো, যাতে হাত দিয়ে চেপে ধরে পা রেখে বেয়ে ওঠা যায়।
এখনও কাঁপুনি থামেনি রবিনের। হাত বাড়ালেই তাক ধরতে পারে সে। তা ই করল। যেখানে ছিল, সেখান থেকে সরে চলে এল তাকের সারিতে। সুন্দর ভাবে ওপরের একটা খাজ ধরে নিচের একটায় পা রাখতে পারল। দেয়ালে ওঠার এক ধরনের সিঁড়ি। আরও ভালমত দেখতে পাচ্ছে এখন। বিপজ্জনক জায়গা ধরে। বহুদূর পর্যন্ত উঠে গেছে, বাঁয়ের খাড়া চুড়ার কাছাকাছি। গ্যানিট কেটে যে

ইনডিয়ানরা বাদাম গুড়ো করার গর্ত করেছে তারাই হয়ত পাহাড়ে চড়ার জন্যে তৈরি করেছিল এই সিঁড়ি।
ঘড়ি দেখল রবিন। দেরি হয়ে যাচ্ছে। অন্যেরা নিশ্চয় তার ফেরার অপেক্ষায় আছে।
দেয়ালে পেট ঠেকিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল সে। পৌঁছে গেল জলপ্রপাতের সামান্য ওপরের একটা জায়গায়। বাতাসে পানির কণা এখানে অনেক বেশি, প্রপাত থেকে উঠছে। মনে হয় হালকা বাষ্প ভাসছে বাতাসে।
আরেকটু পাশে সরে একটা নালার কাছে চলে এল সে। পানির ঘষায় সৃষ্টি হয়েছে ওটা। উঠে গেছে ওপর দিকে। ওখানে আসতেই চোখে পড়ল উপত্যকাটা। বিমান থেকে যেটা দেখেছিল সেটাই। ঘন গাছের জঙ্গল। কিছু কিছু জায়গায় অনেক চওড়া, কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে এখান থেকে দেখতে পাচ্ছে না সে। মাথার ওপরে গ্র্যানিটের গায়ে রোদ চমকাচ্ছে। উপত্যকার বুক চিরে চলে গেছে পাহাড়ী নদী। কিন্তু ওটার পাড়ে ক্যাম্পগ্রাউণ্ড চোখে পড়ল না তার, যেটা আশায় এসেছিল।
উত্তর থেকে বাতাস বইছে। বয়ে আনছে গন্ধকের কটু গন্ধ, যার অর্থ, পর্বতের ভেতরে গরম পানির ঝর্না আছে কোথাও। চোখ জ্বালা করছে এখনও ওর, বোধহয় গন্ধকের জন্যেই। হাত দিয়ে ডলে মুছে নিয়ে আবার তাকাল উপত্যকার দিকে।
মনে হচ্ছে, যেন বহুকাল আগে বিমান থেকে দেখেছিল জায়গাটা। তার পর কত ঘটনা ঘটে গেছে। কপালজোরে বেঁচে রয়েছে এখনও।
আর দেখার কিছু নেই আপাতত। সিঁড়ি বেয়ে আবার নামতে শুরু করল সে। যেখানে আরেকটু হলেই ধসের আঘাতে মরতে চলেছিল সেই জায়গাটা পেরিয়ে। এল। তারপর পেরোল সরু একটা শৈলশিরা, ঘন ঝোপঝাড় জন্মে রয়েছে ওখানে।
সিঁড়িটার কথা ভাবছে সে। নিচে থেকে চোখে পড়ে না। কোন্ রহস্যময় কারণে লোকচক্ষুর আড়ালে রাখার মত করে তৈরি করেছিল ইনডিয়ানরা কে জানে! প্রপাতের আশপাশের খোলা অঞ্চলে দাঁড়ালে সামনে বাধা হয়ে থাকে পাইন বন, ওই বনের জন্যেই ওখান থেকে দেখা যায় না সিঁড়িটা।
কয়েক ফুট ওপর থেকে লাফিয়ে বনতলে নামল রবিন। আবার ঘড়ি দেখল। এবার সত্যি অনেক দেরি হয়ে গেছে।
দৌড়ে এল পানির বোতলটা যেখানে রেখেছিল সেখানে। তুলে নিয়ে আবার দৌড়ে চলল বনের ভেতর দিয়ে। চিহ্ন ভুল করল না।

অবশেষে চোখে পড়ল তৃণভূমিটা, যেখানে নামতে বাধ্য করা হয়েছে সেসনা। সূর্য ডুবতে আর ঘণ্টাখানেক বাকি। ক্লান্তি লাগছে রবিনের। উত্তেজিত। কি দেখেছে, কি ভাবে ধস থেকে বেঁচে এসেছে সবাইকে বলার জন্য অস্থির।

.

রবিনের কাছ থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে সরু পথটা ধরে এগোল মুসা। যা অনুমান। করেছিল, তা-ই। দক্ষিণ-পুবের ঘন বনের ভেতরে ঢুকে গেছে পথটা।

উঁচু গাছের ডালপালার ভেতর দিয়ে চুঁইয়ে নামছে সূর্যালোক, বনতলে উষ্ণ আলো আর শীতল ছায়া সৃষ্টি করেছে। বিচিত্র এক আলোআঁধারির খেলা চলছে। ওপরে গাছের মাথা, কোথাও এত গায়ে গায়ে লেগে গেছে যে আকাশই চোখে পড়ে না। মাটি আর পাইনের তাজা সুগন্ধে ভুরভুর করছে বাতাস।

পথটা ধরে প্রায় আধ ঘণ্টা চলল মুসা। বালুতে মানুষের পায়ের ছাপ খুঁজল। হরিণ, ব্ল্যাকুন আর কুগারের ছাপ দেখতে পেল। পথের ওপরে আর পথের ধারে হরিণ ও ভালুকের নাদা পড়ে আছে। হতাশ হল হাইকিং বুট কিংবা টেনিস–এর ছাপ না দেখে। ক্যাম্পফায়ারের ধোয়ার গন্ধ আশা করেছিল, পেল না। কান খাড়া রেখেছে জীপের ইঞ্জিনের শব্দ শোনার জন্যে, শুনল না। টেলিফোনের থাম দেখল না। মানুষের অস্তিত্ব ঘোষণা করে এরকম কিছুই নেই।

হঠাৎ কি যেন নড়ে উঠল। টের পেল সে। পেছন থেকে দ্রুত এগিয়ে আসছে। ওর দিকে। মানুষ, না জানোয়ার?

খসখস শব্দ কানে এল।

থমকে দাঁড়াল সে। কান পেতে রইল আরও শব্দের আশায়। সতর্ক হয়ে উঠেছে। আস্তে করে সরে চলে এল পথ থেকে, একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে তাকিয়ে রইল পথের দিকে।

এগিয়ে আসছে শব্দটা।

চলেও গেল এক সময়।

কিছুই দেখতে পেল না মুসা। ঘাড়ের রোম দাঁড়িয়ে গেল তার। কি…কি ওটা!

অ্যাই! আর থাকতে না পেরে চিৎকার করে ডাকল সে। জানোয়ার হলে ডাক: শুনে ছুটে পালাবে। মানুষ হলে থামবে, দেখতে আসবে কে ডাকছে। অ্যাই, শুনছেন?

জবাবের আশায় রইল মুসা। কেউ দৌড় দিল না। ঝোপঝাড় ভেঙে ছুটে পালাল না কোন জানোয়ার। সেই একই ভাবে খসখস শব্দ হয়েই চলেছে, মুসার ডাক যেন কানেই যায়নি।

শব্দের দিকে দৌড় দিল সে। কিছুদূর এগিয়ে গতি কমিয়ে কান পাতল শোনার জন্যে। আছে শব্দটা। থামেনি।

রাস্তা থেকে নেমে গাছপালার ভেতরে ঢুকে পড়ল সে। মুখে লাগছে পাইন নীডল। কেয়ারই করল না মুসা।
আরেকটু এগিয়েই দেখতে পেল মূর্তিটাকে। মানুষ। গাছপালার ভেতর দিয়ে ঘন ছায়ায় থেকে হাঁটছে, ফলে ভাল করে না তাকালে চোখেই পড়ে না।
অ্যাই, শুনুন! জোরে চিৎকার করে ডাকল মুসা, দৌড় বন্ধ করেনি। শুনুন, কথা আছে! সাহায্য দরকার আমাদের!
দ্বিধা করল লোকটা। গতিও কমাল ক্ষণিকের জন্যে। পর মুহূর্তেই আরও বাড়িয়ে দিয়ে প্রায় ছুটতে শুরু করল। হারিয়ে যেতে চাইছে গভীর বনের ভেতরে।
মুসাও গতি বাড়িয়ে দিল। কি ধরনের লোক? সাহায্যের কথা শুনেও থামেনি, বরং পালিয়ে যেতে চাইছে?
কয়েকটা গাছের ওপাশে অদৃশ্য হয়ে গেল লোকটা।
ছুটতে ছুটতে গাছগুলোর কাছে পৌঁছে গেল মুসা। ঘুরে অন্য পাশে এসে তাকিয়েই থমকে গেল। নেই! উধাও হয়ে গেছে ভূতুড়ে মূর্তিটা। মানুষ? নাকি ভূতপ্রেত! গায়ে কাঁটা দিল তার।
চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে মুসা। কান খাড়া। চোখের দৃষ্টিতে তীক্ষ্ণ। না শুনল আর কোন শব্দ, না দেখতে পেল লোকটাকে। গেল কোথায়? শুয়ে পড়ল না তো মাটিতে? ঘন ঝোপের ভেতরে ঢুকে গেল?
আবার ডাক দিল সে, এই যে ভাই, শুনছেন! বিপদে পড়েছি আমরা! আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই! শুনছেন?
সাড়া নেই।
ও ভাই! আমি কিছু করব না আপনাকে...!
নীরবতা! খুঁজে বের করতেই হবে লোকটাকে, ভাবল মুসা।
খুঁজতে আরম্ভ করল সে। গাছপালার আড়ালে, ছায়ায়, ঝোপের ভেতরে।
মনে পড়ল সময়ের কথা। ঘড়ি দেখল। আরি, অনেক দেরি হয়ে গেছে! তাড়াতাড়ি ফেরা দরকার। কিন্তু কোনদিকে ফিরবে!
হায় হায়, কি গাধা আমি! নিজেকেই বকা দিল সে। পথটা যে কোথায়, কোন দিকে আছে, তা-ও বলতে পারবে না। উত্তেজিত হয়ে ছুটে আসার সময় নিশানা রাখতেও ভুলে গিয়েছিল।
পেটের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠল ওর। ভয়ে। কি বোকামিটা করেছে বুঝতে পারছে।
পথ হারিয়েছে সে!
.

আস্তে আস্তে শ্বাস নিচ্ছে মুসা। শান্ত হও, বোঝাল নিজেকে। মাথা ঠাণ্ডা করো। নইলে বিপদ থেকে মুক্তি পাবে না। আসতে যখন পেরেছ এখানে, যেতেও পারবে। কি করে যাবে কেবল সেইটাই ভেবে বের কর এখন।

আবার ঘড়ি দেখল সে। সরে চলে এল এমন একটা জায়গায়, যেখানে বন মোটামুটি পাতলা, গাছের মাথার ফাঁক দিয়ে আকাশ চোখে পড়ে। এদিকে সরে ওদিকে সরে, এপাশে মাথা কাত করে ওপাশে মাথা কাত করে সূর্যটা দেখল সে। তারপর হিসেব শুরু করল।

তৃণভূমি থেকে রাস্তায় উঠে এসে দক্ষিণ পুবে রওনা হয়েছিল। রোদ পড়ছিল। তখন তার ডান কাঁধে। এখন নেমে গেছে সূর্য। উত্তর-পশ্চিমে যাওয়ার সময় তার বাঁ কাঁধের নিচের দিকে, প্রায় বুকে রোদ পড়ার কথা।

ঘন গাছপালায় ছাওয়া এই তরাই থেকে বেরিয়ে তৃণভূমিটা খুঁজে বের করা খুব মুশকিল। তবু, চেষ্টা তো করতে হবে।

সাবধানে হাঁটতে শুরু করল সে। বার বার মুখ তুলে তাকাচ্ছে সূর্যের দিকে। পাখি ডাকছে, গাছের পাতায় শিরশির কাঁপন তুলে বইছে বাতাস, ঝোপের ভেতর, হুটোপুটি করছে ছোট ছোট জীব। পায়ের কাছ থেকে সড়াৎ করে সরে যাচ্ছে। কাঠবেড়ালি, ইঁদুর, লাফিয়ে উঠে ছুটে পালাচ্ছে খরগোশ।

এক ঘণ্টা ধরে হাঁটল সে। কোন কিছুই তো চিনতে পারছি না, নিরাশ হয়ে নিজেকে বলল। একটা চিহ্ন, একটা নিশানা দেখছি না যেটা দেখে বোঝা যায় ঠিক পথেই চলেছি।

আরও নেমেছে সূর্য। বড় জোর আর এক ঘণ্টা, তার পরেই ডুবে যাবে। এই সময় বনের ভেতরে আবার শব্দ শুনতে পেল সে। ডেকে উঠতে যাচ্ছিল আবার, সময় মত সামলে নিয়ে চুপ হয়ে গেল। আগের বারও ডাকাডাকি করতে গিয়ে হুঁশিয়ার করেছে লোকটাকে, পালিয়েছে সে।

পা টিপে টিপে শব্দের দিকে এগোল এবার।

উত্তরে এগোচ্ছে সে। বাড়ছে শব্দ। লোকটা প্রথমবার যে রকম শব্দ করেছিল, তার চেয়ে বেশি লাগছে এখন।

থেমে গেল শব্দটা।

পাগল হয়ে গেলে নাকি! নিজেকে ধমক লাগাল মুসা। কোথায় তৃণভূমিটা খুঁজে বের করে নিরাপদ হবে, তা না, আবার এগিয়ে চলেছে শব্দ লক্ষ্য করে আরেকবার পথ হারানর জন্যে।

দ্বিধা করল সে। তবে একটা মুহূর্ত। তারপর আবার এগোল শব্দের দিকে।

হঠাৎ করেই থেমে গেল, যেন ব্রেক কষে।

খাইছে! রবিন! চিৎকার করে উঠল সে।

ফিরে তাকাল রবিন। সে-ও চমকে গিয়েছিল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল, ও, মুসা!
হাসতে লাগল মুসা। হো হো করে। পরিচিত একটা মানুষকে সামনে দেখে খুশি আর ধরে রাখতে পারছে না।
কি হয়েছে, মুসা? ওরকম করছ কেন?
জবাবে আরও জোরে হাসতে লাগল মুসা।
আরে কি হলো! পাগল হয়ে গেলে নাকি! ভুরু কুঁচকে বলল রবিন।
না! মাথা নাড়তে লাগল মুসা। আরও কিছু হো-হো-হো। না, পাগল হইনি। তোমাকে দেখে কি যে ভাল লাগছে!
কেন, আমাকে কি নতুন দেখলে নাকি?
নতুন না হলেও পরিচিত তো। ভূত নও যে গায়েব হয়ে যাবে।
এখানে আবার ভুত এল কোত্থেকে? আরও অবাক হয়েছে রবিন।
চলো, যেতে যেতে বলছি। তুমিও যখন এদিকেই আছ, তার মানে পথ ভুল করিনি। ঠিকই এগোচ্ছি। চলো।
হাঁটতে হাঁটতে সব কথা বলল মুসা।
ভূত? ভুল দেখনি তো? রবিন বলল।
না। ঠিকই দেখেছি।
হু! বনের ভূতে পেল শেষ পর্যন্ত তোমাকে, চিন্তিত ভঙ্গিকে বলল রবিন।
তোমার কথা বললে না? তুমি কি করে এলে? বলল রবিন।
ধস! বলো কি? বিশ্বাস করতে পারছে না মুসা। পাহাড়ে যেখানে সেখানে। তো এভাবে ধস নামে না! ভাগ্যিস সরে যেতে পেরেছিলে! নইলে ভর্তা হয়ে যেতে!
আলোচনা করতে করতে চলল দুজনে। হঠাৎ হাত তুলে রবিন বলল, দেখো দেখো, কিশোর আমাদের চেয়ে আরামে আছে। কোন রকম বিপদে পড়তে হয়নি। তো। যা ধোয়া করছে, কাছাকাছি কেউ থেকে থাকলে চোখে পড়বেই।
মুসাও দেখতে পাচ্ছে। কালো ধোয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠে যাচ্ছে ওপরে।
আগুনের কাছ থেকে কিছু দূরে বসে রয়েছে কিশোর। সূর্য ঢলে যেতেই শীত পড়তে আরম্ভ করেছে। জ্যাকেট গায়ে দিয়েছে সে। চেন টেনে দিয়েছে একেবারে গলা পর্যন্ত। ধোয়া করেই শুধু ক্ষান্ত হয়নি। রাতে শোয়ার ব্যবস্থাও করে ফেলেছে। আগুনের কুণ্ড ঘিরে ছয় ফুট জায়গার পচা পাতা, ঘাস আর পড়ে থাকা অন্যান্য জিনিস সাফ করেছে। লতাপাতা জোগাড় করে এনে রেখেছে বিছানা পাতার জন্যে।
কি ব্যাপার? মুসা আর রবিনের দিকে তাকাতে লাগল কিশোর। হাটুরে। কিল খেয়ে এসেছ মনে হয়? মুখ ওরকম কেন?

আমাকে দেখে খুশি হয়েছে মুসা, আরেক দিকে তাকিয়ে জবাব দিল রবিন।
চোখ সরু হয়ে এল কিশোরের। মুসার দিকে দৃষ্টি স্থির। খুশির তো কোন লক্ষণ দেখছি না?
কি করলে লক্ষণটা বোঝা যাবে? রেগে গেল মুসা। দাঁত বের করে হি হি করে হাসতে হবে?
না, তা বলছিনে। তবে মনে হচ্ছে ভূতের তাড়া খেয়ে এসেছ।
তা অনেকটা ওই রকমই, রবিন বলল।
জ্যাকেট গায়ে দিয়ে এসে আগুনের পাশে বসে পড়ল মুসা আর রবিনও। হাত সেঁকতে সেঁকতে বলতে লাগল কি করে এসেছে। বেশ ভাল ঠাণ্ডা পড়ছে এখন।
চারপাশে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল রবিন, বাবা কই?
ফেরেনি তো, কিশোর জানাল।
অনেক আগেই চলে আসার কথা, উদ্বিগ্ন হলো রবিন। পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে বাবার কথা ভাবল। কপালের জখমটার কথা ভেবে উঠে দাঁড়াল সে। রওনা হয়ে গেল।
মুসাও উঠে দাঁড়াল। দাঁড়াও, আমিও আসছি।
জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। এখানে বসে একজনকে ক্যাম্পের ওপর নজর রাখতেই হবে। নইলে বিপদ হতে পারে। দেখার কেউ না থাকলে অনেক সময় ক্যাম্পে ফায়ার ছড়িয়ে পড়ে দাবানলের সৃষ্টি করে। মুসা আর রবিনের। সঙ্গে এবার যাওয়ার ইচ্ছেটা প্রবল হয়ে উঠেছে তার। মিস্টার মিলফোর্ডের জন্যে তারও দুশ্চিন্তা হচ্ছে। কিন্তু কিছু করার নেই। বসে থাকতেই হবে।
পশ্চিম আকাশের দিকে তাকাল মুসা। সূর্য ডোবার আর আধ ঘণ্টা বাকি। তার পরে আলো আর বেশিক্ষণ থাকবে না, ঝুপ করে নামবে অন্ধকার, এসব পাহাড়ী এলাকায় যেমন করে নামে।
পাহাড় বেয়ে উঠতে শুরু করল রবিন। তবে প্রপাতের ধারের পাহাড়ের মত দেয়ালের গায়ে এখানে খোঁচা খোঁচা পাথর বেরিয়ে নেই। পরতের পর পরত এ্যানিট এমন ভাবে পড়েছে, যেন পাহাড়ে চড়ার উপযুক্ত করেই। কোথাও কোথাও খুবই মসৃণ, প্রায় হাত পিছলে যাওয়ার মত, হাজার হাজার বছর আগে। বরফের ধস নামার সময় বরফের ঘষায় এরকম হয়েছে।
চূড়ায় উঠে এল দুজনে। জোরে জোরে দম নিচ্ছে।
উৎকণ্ঠিত হয়ে চারপাশে তাকাল রবিন। কই, গেল কোথায়? দেখছি না।
বসে আছেন হয়ত কোথাও। বিশ্রাম নিচ্ছেন, মুসা বলল।
নিচে শত শত মাইল জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে চড়াই উতরাই। ঘন বনে ছাওয়া। ডুবন্ত সূর্যের লম্বা লম্বা ছায়া পড়ছে বনের ওপর, এক অপরূপ দৃশ্যের সৃষ্টি করেছে।

সবুজ বনের মাথায় লাল রোদ, যেখানে রোদ পড়তে পারেনি সেখানে গভীর কালো গর্তের মত লাগছে। পাহাড়ের চূড়াগুলোকে মনে হচ্ছে সোনায় তৈরি। কিন্তু এসব দেখার আগ্রহ নেই এখন দুই গোয়েন্দার। ওরা যা দেখতে এসেছে সেই ফায়ার টাওয়ার কোথাও চোখে পড়ল না।

নজর ফেরাল ওরা। যেখানে রয়েছে পাহাড়ের সেই চূড়াটা দেখতে লাগল। লম্বা, গ্র্যানিটে তৈরি একটা মালভূমি। এখানে সেখানে ছড়িয়ে আছে বড় বড় পাথরের চাঙড়। পাথরের মধ্যেই যেখানে সামান্যতম মাটি পেয়েছে সেখানেই গজিয়ে উঠেছে কাঁটাঝোপ। রুক্ষ পাথরের মাঝে টিকে থাকার জন্যে প্রাণপণ লড়াই করে যাচ্ছে। মালভূমির সবটাই দেখতে প্রায় একই রকম। কোথাও কোন বৈচিত্র নেই। উত্তরে আধ মাইল দূরে ঘন হয়ে জন্মেছে পাইন। আরেকটা জঙ্গল, এই মালভূমির সঙ্গে সম্পর্ক নেই। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উঠে গেছে একটা শৈলশিরার কাছে, দ্বিগন্ত আড়াল করে দিয়ে লম্বা হয়ে পড়ে আছে যেন শিরাটা। ওই শিরাটারই কোন প্রান্তে রয়েছে ডায়মণ্ড লেক।

মিলফোর্ডকে খোঁজার জন্যে আলাদা হয়ে দুদিকে সরে গেল মুসা আর রবিন। চিৎকার করে ডাকতে লাগল।

বাবা!

আঙ্কেল!

বাবা!

ঠাণ্ডা একঝলক জোরাল হাওয়া বয়ে গেল মালভূমির ওপর দিয়ে। কেঁপে উঠল রবিন। ওর বাবা কোথায়? ওদেরকে কিছু না বলে দূরে কোথাও যাওয়ার কথা। নয়। যাবেন না।

চোখে পড়ল জিনিসটা। তার বাবার নীল ডজারস ক্যাপ।

বাবা! জোরে চিৎকার করে ডাকল আবার রবিন। দৌড়ে এল ক্যাপটার কাছে। পাশেই একটা ম্যানজানিটা ঝাড়। ঝড় তো নয়, যেন ঝাড়ের কঙ্কাল। বাবা! কাছাকাছি কোথাও রয়েছেন তিনি, অনুমান করল সে। কোথায় তুমি?

এই রবিন, পেলে নাকি কিছু? দৌড়ে আসছে মুসা।

কি পেয়েছে দেখাল রবিন। এই ক্যাপটার ওপর বাবার দুর্বলতা আছে। ফেলে যাওয়ার কথা নয়। নিশ্চয় কিছু হয়েছে। খারাপ কিছু। জখম-টখম হয়ে এমনিতেই শরীর কাহিল, পাহাড়ে উঠে আরও খারাপ হয়েছে। মাথা ঘুরে কোথাও পড়ে আছে হয়ত। কিংবা পথ হারিয়েছে।

দেখি তো। ক্যাপটা হাতে নিয়ে দেখতে লাগল মুসা। কোন দুর্ঘটনায় মাথা থেকে পড়ে গেলে যেমন হয়, ছিঁড়ে যায়, ময়লা কিংবা রক্ত লেগে থাকে, সে রকম কিছুই নেই। ঠিকই তো আছে!

বাবা! আবার ডাকল রবিন।
অযথা ভয় পাচ্ছ। মাথা থেকে খুলে পড়ে গেছে। খেয়াল করেননি।
মাথা নাড়ল রবিন। অসম্ভব! মাথা থেকে ক্যাপ খুলে পড়ে যাবে আর খেয়াল করবে না এটা হতেই পারে না। তাছাড়া এটা তার লাকি ক্যাপ।
একটা পাথর কুড়িয়ে নিল মুসা। বলল, একটা পিরামিড বানাই। টুপিটা কোথায় পেলাম তার চিহ্ন। তুমি খোঁজা চালিয়ে যাও।
মাথা ঝাঁকিয়ে সরে গেল রবিন।
পশ্চিমে তাকাল মুসা। উজ্জ্বল কমলা রঙ হয়ে গেছে সূর্যটার। ডুবে যাচ্ছে। দ্রুত হাত চালাল সে। পাথর দিয়ে পিরামিড তৈরি করে চিহ্ন রাখা বনচারী মানুষ আর অভিযাত্রীদের একটা পুরানো কৌশল। বানাতে দেরি হল না। উঠে সে-ও খুঁজতে শুরু করল আবার। কতটা উদ্বিগ্ন হয়েছে, সেটা রবিনকে জানাতে চায় না। তাহলে মন আরও খারাপ হয়ে যাবে বেচারার।
মুখের সামনে হাত জড় করে জোরে জোরে মিলফোর্ডকে ডাকতে লাগল দুজনে। চিৎকার বেরোতে না বেরোতেই সেটাকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে বাতাস, যেন পছন্দ না হওয়ায় ঝেটিয়ে বিদেয় করতে চাইছে ওই শব্দকে। সব জায়গায় খুঁজতে লাগল ওরা। পাথরের আড়ালে, গাছের ছায়ায়, ভূমিকম্পে ফেটে যাওয়া গ্র্যানিটের খাজের ভেতরে।
অবশেষে হাল ছেড়ে দিয়ে মুসা বলল, ফিরে যাওয়া দরকার!
আরও পরে! উত্তরের বনের দিকে এগিয়ে চলেছে রবিন।
গিয়ে লাভ হবে না। এতক্ষণে নিশ্চয় ক্যাম্পে ফিরে গেছেন আঙ্কেল। আমাদের দেরি দেখলে রাগ করবেন।
না, যায়নি! রবিনের বিশ্বাস, কাছাকাছিই কোথাও রয়েছেন তার বাবা।
এই, শোনো, পথ হারাব আমরা। তাহলে আরও বেশি রাগ করবেন তিনি।
থেমে গেল রবিন। ঝুলে পড়ল কাধ।
সূর্য ডুবে গেছে দেখছ না, পাশে চলে এল মুসা। এখনও বাইরে ঘোরাফেরা করছেন না নিশ্চয় আঙ্কেল। চলো। গিয়ে দেখব, বসে আছেন। আমাদের জন্যেই দুশ্চিন্তা করছেন।
পশ্চিম আকাশের দিকে তাকাল রবিন। গোধূলীর বিচিত্র রঙে রঙিন হয়ে গেছে আকাশ। মুসার কথায় যুক্তি আছে, যদিও মানতে পারছে না রবিন। তার ধারণা, ফিরে যাননি তার বাবা। গিয়ে দেখবে নেই। তাহলে আবার বেরোতে হবে খুঁজতে। কিন্তু এই রাতের বেলা কি ভাবে কোথায় খুঁজবে? কাল সকালের আগে আর হবে না।

যেতে ইচ্ছে করছে না। নিরাশ হয়ে প্রায় খোঁড়াতে খোঁড়াতে হাঁটতে লাগল। সে মুসার সঙ্গে। যেখান দিয়ে চূড়ায় উঠেছিল, চুড়ার সেই ধারটায় এসে থামল। নিচে তাকাল একবার। তারপর নামতে শুরু করল। বেগুনী আকাশ থেকে দ্রুত মিলিয়ে যাচ্ছে দিনের আলো। বিশাল একটা চাঁদ উঠছে, পূর্ণিমার বেশি বাকি নেই। আলো যথেষ্টই ছড়াবে, তবে এতটা বেশি নয় যাতে বনের ভেতর খোঁজা যায়।
তৃণভূমিতে নেমে শীতে কাঁপা শুরু করল ওরা। ছুটে চলল ক্যাম্পের দিকে। এতে শরীর গরম হবে, শীতটা একটু কম লাগবে। অন্ধকার হয়ে গেছে। আগুনের দিকে তাকিয়ে মনে হতে লাগল ওদের, চারপাশে কিছুদূর পর্যন্ত উষ্ণ একটা চক্র তৈরি করে জ্বলছে যেন আগুন।
মিলফোর্ডকে দেখা গেল না আগুনের পাশে। কিশোর একা।
পেলে না? জিজ্ঞেস করল গোয়েন্দাপ্রধান।
শুধু ক্যাপটা, জবাব দিল মুসা।
ধপ করে একটা পাথরের ওপর বসে পড়ল রবিন। বিষণ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল আগুনের দিকে।
মুসার চোখে চোখে তাকাল কিশোর। একটা ভুরু সামান্য উঁচু করল। ইঙ্গিতটা বুঝতে পারল মুসা। রবিনকে সান্ত্বনা দিতে হবে এখন, ওর মন হালকা করার চেষ্টা করতে হবে।
এই, রবিন, আচমকা কথা বলল মুসা, শুনেছি, হট পিসটন নাকি সাংঘাতিক। যে ট্যালেন্ট এজেন্সিতে কাজ করে রবিন, সেখানকারই একটা নতুন রক গ্রুপ হট পিসটন। রবিনের খুব পছন্দ।
হ্যাঁ, ভালই, দায়সারা জবাব দিল রবিন।
আমিও শুনেছি ভাল, কিশোর বলল। যদিও গানবাজনা তার বিশেষ পছন্দ নয়, রবিনের খাতিরেই বলল। ওদের নতুন মিউজিকটা কি?
আমি জানি, মুসা বলল, লো দা গ্রাউণ্ড। দারুণ! আমার খুবই ভাল লেগেছে...।
শোনো, আমি বলি কি...
বাবার কথাই বলতে যাচ্ছে রবিন, বুঝতে পেরে তাকে থামিয়ে দিয়ে আরেক কথায় চলে গেল মুসা, রবিন, বিশ্বাস করবে না, কি ভয়টাই না তখন পেয়েছি! লোকটা ভূতের মত এল, ভূতের মতই হারিয়ে গেল। বনের মধ্যে আমার মনে হয়েছিল-মনে হয়েছিল...কি জানি মনে হয়েছিল? মাথা চুলকাতে লাগল সে।
তোমার কি মনে হয়েছিল, সেটা কি আমরা জানি নাকি? হেসে ফেলল কিশোর।
দাঁড়াও, কি মনে হয়েছিল মনে করি...
হয়েছে, আর মনে করতে হবে না। আমিই বলে দিচ্ছি। প্যান্ট খারাপ হয়ে যাচ্ছিল, আর তুমি টের পাচ্ছিলে না...

খাইছে! তুমি জানলে কি করে?
এতে জানাজানির আর কি আছে? ভূত দেখলেই তো তুমি প্রথমে ওই একটি কাজ করে ফেলো…
হাসল মুসা।
রবিনের ঠোঁটেও এক চিলতে হাসি ফুটেই মিলিয়ে গেল।
সুযোগটা কাজে লাগাল কিশোর, বেসুরো গলায় গেয়ে উঠল রবীন্দ্রনাথের গান, আমি চিনি গো চিনি তোমারে ওগো বিদেশীনী…
ওই গান থেকে যে কখন ওয়েস্টার্ন বাফেলো গালসে (গার্ল) চলে গেল। খেয়ালই রইল না। যখন খেয়াল হলো, দেখল তিনজনে গলা মেলাচ্ছে। বন্য রাতের আকাশ যেন ভরে দিল তিনটে কণ্ঠ, একেকটা একেক রকম। তিনজনের মাঝে রবিনের গলাই কেবল ভাল। মুসারটা খসখসে, আর কিশোরেরটা শুনলেই লেজ গুটিয়ে পালাবে নেড়ি কুকুর। একটা বাদ্যযন্ত্র হলে ভাল হয়। আর কিছু না পেয়ে দুটো ডাল তুলে নিয়ে ভুটানিদের মত একটার সঙ্গে আরেকটা পিটিয়ে শব্দ করতে লাগল মুসা। ওকে আর রবিনকে অবাক করে দিয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। কোমর দুলিয়ে নাচতে শুরু করল। গলা যেমন বেসুরো, পা-ও তেমনি বেতাল। বাজনা বাজানো আর হল না মুসার। হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল। রবিনও না হেসে পারল না। মনে দুর্ভাবনা না থাকলে তারও মুসার দশাই হত। তবে কিছুক্ষণ আগের মত আর ভার হয়ে নেই মন, অনেক হালকা হয়েছে।
মুসা গাইল, আর কয়েক রকমের নাচ নাচল কিশোর। ভুটানি, বাংলাদেশী খেমটা, আফ্রিকান আদিবাসীদের উন্মাদ নৃত্য, আর রক স্টারদের দাপাদাপি, কোনটাই বাদ রাখল না। শেষে ক্লান্ত হয়ে আগুনের ধারে বসে প্রায় জিভ বের করে। হাঁপাতে লাগল।
নাচের শেষ পর্যায়ে তার সঙ্গে মুসা আর রবিনও যোগ দিয়েছে।
রাত হয়েছে। এবার শোয়া দরকার। সেই ব্যবস্থাই করতে লাগল তিনজনে।
মুসা বলল, গায়ের শার্ট খুলে নাও। ঘামে ভিজে গেছে। রাতে কষ্ট পাবে। খুলে শুকনো শার্ট যতগুলো আছে সব পরে নাও।
খুলতে ইচ্ছে করছে না কিশোরের। কিন্তু জানে, মুসা ঠিকই বলেছে। রাতে তাপমাত্রা আরও কমে যাবে, আর ওরা ঘুমিয়ে থাকতে থাকতে যদি আগুন নিভে যায় তাহলে তো সাংঘাতিক অবস্থা হবে গায়ে কাপড় বেশি না থাকলে।
দ্রুত শার্ট বদলে নিল ওরা। তার ওপরে চড়াল জ্যাকেট। চেন টেনে দিয়ে মুসা বলল, মোজাও খোলো। ভেজা মোজা শরীরের তাপ শুষে নেয়।
জুতো খুলে মোজায় টান দিতেই দুর্গন্ধ বেরেতে শুরু করল। নাক কুঁচকে ফেলল তিনজনেই। মোজা বদলে জিনসের প্যান্টের নিচটা মোজার ভেতরে গুঁজে দিল।

শার্ট জল প্যান্টের ভেতরে। মোটকথা বাতাস ঢোকার কোন পথই রাখল না।
রাতের জন্যে রাখা খাবার ভাগ করে দিল কিশোর। খুব সামান্য খাবার। কিছু পপকর্ন আর ক্যাণ্ডি। ধীরে ধীরে খেল ওরা। তারপর ডালপাতা বিছিয়ে পুরু করে ম্যাট্রেস তৈরি করল।
পপকর্নের খালি প্যাকেটগুলো নিয়ে গিয়ে বিমানের ভেতরে রেখে এল মুসা। বলল, এসব ছড়িয়ে ফেলে রাখলে গন্ধে গন্ধে এসে হাজির হবে বুনো জানোয়ার। আর কিছু না পেয়ে শেষে আমাদেরকেই ধরে খাবে।
মাইলার স্পেস ব্লাঙ্কেট মুড়ি দিয়ে আগুনের পাশে গুটিশুটি হয়ে শুয়ে পড়ল। ওরা। আগুনের নিচের অংশটা নীল, ওপরের কমলা রঙের শিখা যেন লকলক করে বেড়ে উঠে লাফ দিয়ে দিয়ে কালো তারাজ্বলা আকাশ ছুঁতে চাইছে।
চোখ মুদল ওরা। বিশ্রাম দরকার, আগামী দিনের পরিশ্রমের জন্যে। মিস্টার মিলফোর্ডকে খুঁজে বের করতে হবে।
হঠাৎ করেই কথাটা মনে এল কিশোরের। ঘুমজড়িত গলায় জিজ্ঞেস করল, রবিন, তোমার কন্ট্যাক্ট লেন্সের কি খবর? কবে খুলতে হবে?
কি একটা অসুবিধে দেখা দিয়েছে রবিনের চোখে। কন্ট্যাক্ট লেন্স পরার পরামর্শ দিয়েছেন ডাক্তার।
আরও হপ্তাখানেক পরে থাকতে হবে।
ও। তাহলে সময় আছে। এখান থেকে বেরিয়ে যেতে সাতদিনের বেশি লাগবে না আমাদের। অসুবিধেয় পড়তে হবে না তোমাকে। সময় মতই গিয়ে খুলতে পারবে।
রবিন চুপ করে রইল। তিক্ত হাসি হাসল মুসা। নিঃশব্দে। আদৌ কোন দিন। এই দুর্গোম বুনো এলাকা থেকে বেরিয়ে যেতে পারবে কি-না, যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তার।
ঘুমিয়ে পড়ল কিশোর আর মুসা। অস্বস্তি নিয়ে ঘুমিয়েছে, ফলে গাঢ় হচ্ছে না ঘুম। রবিন ঘুমাতেই পারল না। চোখ খোলা। তাকিয়ে রয়েছে আকাশের দিকে। তারা দেখছে। ওই যে বিগ ডিপার, ওটা উরসা মেজর, আর ওটা বাবা, কোথায় তুমি!
প্রায় নিঃশব্দে ককিয়ে উঠল সে। ভেব না, বাবা, কোনমতে রাতটা কাটাও। কাল তোমাকে খুঁজে বের করবই আমরা!
চোখ মুদল অবশেষে রবিন। একটা পেঁচা কিরর কিরর করল। হউউ হউউ করল কোট। বনের ভেতরে ঘুরে বেড়াতে লাগল একটা বড় জানোয়ার। বহুদূরে পাহাড়ী পথে ট্রাকের ভারি ইঞ্জিনের শব্দ মৃদুভাবে কানে এল বলে মনে হল তার। রাতের বেলা শব্দ অনেক দূরে ভেসে যায়, আর অনেক সময় নীরবতার মাঝে থেকে নানা রকম অদ্ভুত কল্পনাও করতে থাকে মানুষ, ভুল শোনে...

ভারি হয়ে এল রবিনের নিঃশ্বাস। জেগে থেকে এখন রাবার কোন উপকারই। করতে পারবে না, বুঝতে পারছে। নিজের শরীরেই ক্ষতি করবে। তাতে পরোক্ষভাবে তার বাবার ক্ষতিই হবে, যদি কাল খুঁজতে বেরোতে না পারে সে। ধীরে ধীরে ঢিলে করে দিল শরীর। স্নায়ু ঢিল করতেই চেপে ধরল এসে সারাদিনের পরিশ্রমের ক্লান্তি। ঘুমিয়ে পড়ল। মুসা আর কিশোরের মতই তার ঘুমও গাঢ় হতে পারছে না। ঘুমের মধ্যেই অবচেতন মনে একটা প্রশ্ন ঘোরাঘুরি করছে, কোথায় রয়েছে সে?

.

ঠাণ্ডা, শীতল সূর্য উঠল পর্বতের ঢালের ওপরে। বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল তিন গোয়েন্দা। হাত ডলে, মাটিতে লাথি মেরে পা গরম করতে লাগল। আগুন নিভে গেছে। রাতে আর আগুনে কাঠ ফেলা হয়নি। তবে ঠাণ্ডা লাগেনি ওদের। স্পেস ব্ল্যাঙ্কেট আর শার্টগুলো শরীর গরম রেখেছে।

যাক, আমরা ভাল থাকাতে, রবিন বলল, বাবার উপকার হবে।

অবশিষ্ট পপকর্নগুলো দিয়ে নাস্তা সারল ওরা। ক্যাণ্ডি বাঁচিয়ে রাখল রাতের জন্যে। ঝোপের ওপর শুকানোর জন্যে ছড়িয়ে দিল ব্ল্যাঙ্কেট। বাড়তি মোজা আর শার্ট খুলে নিল থেকে।

সেসনা থেকে ছোট একটা নোটবুক হাতে বেরিয়ে এল রবিন। বন্ধুদেরকে দেখিয়ে বলল, এটা বাবার। প্রথম পাতায় কালকের তারিখ আর একটা লোকের নাম লেখা রয়েছে। হ্যারিস হেরিং। চেনো নাকি?

না, একসাথে জবাব দিল কিশোর আর মুসা।

ওর সঙ্গে দেখা করতেই বোধহয় যাচ্ছিল বাবা, অনুমান করল রবিন। তারিখটা ঠিক আছে। এই একটা নোটবুকই সঙ্গে এনেছে। বইটা পকেটে রেখে বিমান থেকে নেমে এল সে। তিনজনে মিলে রওনা হল তৃণভূমি ধরে পাহাড়ের দিকে।

গ্র্যানিটের দেয়ালে প্রথমে চড়ল রবিন। অন্য দুজনের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল। কোমরে হাত, চিবুক উঁচু, তাকিয়ে তাকিয়ে চারপাশের রুক্ষ, নির্জন পাহাড় দেখছে সে। বাবার নীল ক্যাপটা মাথায়। বয়েস আরও বেশি আর স্বাস্থ্য আরেকটু ভাল হলে রোজার মিলফোর্ড বলেই চালিয়ে দেয়া যেত তাকে।

ছড়িয়ে পড়ব আমরা, বলল সে। কাল রাতে আমি আর মুসা এখানে খুঁজেছি। আরও উত্তরে চলে যাব আমি, গাছগুলোর দিকে। তোমরা একজন বায়ে যাও, আরেকজন ডানে। এক ঘন্টা পর ফিরে এসে এখানে এই পিরামিডের কাছে মিলিত হব। ঠিক আছে?

তিনজনের ঘড়ি মিলিয়ে নিয়ে রওনা হয়ে গেল ওরা। মিস্টার মিলফোর্ডকে ডাকতে ডাকতে চলল। মানুষ লুকিয়ে থাকতে পারে এরকম কোন জায়গাই দেখা

বাদ দিল না।
অনেকখানি জায়গা নিয়ে খুঁজল ওরা। তারপর ফেরার জন্যে ঘুরল। তিনজনেই ভাবছে, অন্য দুজন হয়ত কিছু দেখতে পেয়েছে। ফিরে এল ওরা।
পিরামিড়টাকে আর দেখতে পেল না।
কোথায় গেল? অবাক হয়ে প্রশ্ন করল মুসা।
ধূসর গ্র্যানিটের ওপর ঘুরতে লাগল ওরা।
ছিল তো এখানেই, রবিন বলল।
না, মনে হয় ওখানে, মুসা বুলল।
দুজনেই ভুল করছ তোমরা, কিশোর বলল। এখানেই ছিল ওটা। গ্র্যানিটের গায়ে ওই যে গোল শ্যাওলার দাগ ওটা তখনও দেখে গেছি। এখান থেকেই রওনা হয়েছিলাম আমরা।
নিচু হয়ে একটা সিগারেটের গোড়া তুলে নিল সে। অন্য দুজনকে দেখিয়ে ৪ বলল, দেখ। কাগজটা কি রকম সাদা দেখেছ? তার মানে বেশি পুরানো নয়। আজ সকালে আমরা রওনা হওয়ার সময় এটা এখানে ছিল না। তাহলে চোখে পড়তই।
কি বোঝাতে চাইছ? মুসার চোখের পাতা সরু হয়ে এসেছে।
বোঝাতে চাইছে, চিন্তিত ভঙ্গিতে রবিন বলল, কেউ এসেছিল এখানে। যে সিগারেট খায়। আমাদের চিহ্ন নষ্ট করেছে। হয়ত আমাদের ওপর নজর রাখতে এসেছিল, তিনজন তিনদিকে চলে যাওয়ায় পারেনি। একসাথে আর কজনের ওপর রাখবে। তাছাড়া গাছপালা ঝোপঝাড় তেমন নেই যে আড়ালে থেকে পিছু নেবে।
কিংবা হয়ত এমনিতেই ঘুরতে এসেছিল, সিগারেটের গোড়াটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছে কিশোর। লম্বা ফিল্টারের সঙ্গে যেখানে সাদা কাগজ জোড়া দেয়া হয়েছে, সেখানে সরু একটা সবুজ রঙের ব্যাণ্ড। দামি জিনিস। গোড়াটা শার্টের পকেটে রেখে দিল সে।
সময় নষ্ট করা উচিত না, রবিন বলল। বাবা এখানে নেই। মুসা কাল যেখানে গিয়েছিল সেখানে গিয়ে দেখা দরকার। একজন লোককে দেখেছিল সে। হয়ত বাবাকেই দেখেছে।
আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে, মুসা বলল।
কিন্তু হতে তো পারে। ভাল করে দেখনি তুমি। হয়তো মাথা ঘুরে পড়ে গিয়ে। আবার কপালে ব্যথা পেয়েছিল বাবা। ফলে মাথার ঠিকঠিকানা ছিল না, তোমার। ডাক চিনতে পারেনি।
চিনতে পারুক বা না পারুক, জবাব দিল না কেন? শুনতে পাননি, এটা বলতে পারবে না।

এ কথার জবাব দিতে পারল না রবিন। বলল, একটা কাজ অবশ্য করতে পারি। কাকে দেখেছিলে, সেটা জানার চেষ্টা করা যায়। ফরেস্ট সার্ভিসের লোক হতে পারে। তাদের পেলে তো বেঁচেই গেলাম। আমাদের চেয়ে অনেক বেশি জায়গায় খুঁজতে পারবে তারা। এখানকার বনও তাদের চেনা।

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল কিশোর আর মুসা। ঠিকই বলেছে। রবিন। ফরেস্ট সার্ভিসের লোক পেলে অনেক সহজ হয়ে যাবে খোঁজা। বুনন এলাকায় তল্লাশি চালানোর মত যন্ত্রপাতি এবং লোকবল আছে তাদের।

তাড়াহুড়ো করে ক্যাম্পে ফিরে এল ওরা। একেবারেই নিভে গেছে ক্যাম্পফায়ারের কয়লা। তবু আরও নিশ্চিত হওয়ার জন্যে তার ওপরে মাটি ছড়িয়ে দিল কিশোর। তৃণভূমির মাঝখানে পাথর সাজিয়ে বড় করে এস ও এস লিখল রবিন আর মুসা। যাতে ওপর দিয়ে গেলে বিমানের চোখে পড়ে। পপকর্ন আর ক্যাণ্ডি পকেটে ভরল তিনজনে। পানির বোতলটা নিল রবিন।

স্পেস ব্ল্যাঙ্কেটগুলোও নিতে হবে, মুসা বলল। আর ইমারজেন্সি কিটটা। বিপদে তো পড়েই আছি, আরও বাড়তে পারে। তৈরি হয়ে যাওয়াই ভাল।

মুসার সঙ্গে একমত হয়ে মাথা নাড়ল কিশোর আর রবিন। রবিনের আফসোস হতে লাগল, ইস, তার বাবা যদি সাথে করে একটা স্পেস ব্লাঙ্কেট অন্তত নিয়ে যেতেন! ভাল হত।

উঁচু গাছের মাথার ফাঁকফোকর দিয়ে ঢুকছে রোদের বর্শা, গোল গোল হয়ে এসে পড়ছে মাটিতে। পায়ে চলা সরু পথ ধরে একসারিতে এগিয়ে চলেছে ভিন গোয়েন্দা। আগের দিন এই পথ ধরেই গিয়েছিল মুসা। রবিনের মাথায় নীল টুপিটা পরাই আছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে চলেছে কোথাও তার বাবার চিহ্ন আছে কিনা।

এক চিলতে ভোলা জায়গা দেখা গেল। বিমানের ইঞ্জিনের শব্দ কানে এল এই সময়।

হায় হায়, চলে গেল তো! খোলা জায়গাটার দিকে দৌড় দিল কিশোর।

অন্য দুজনও এল পেছনে। তিনজনেই হাত তুলে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগল, নাচতে লাগল, বিমানটার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে। অনেক ওপর দিয়ে উড়ছে ওটা।

হয়তো আমার জানে, অন্য দুচোখে পড়ার সম্ভাবনা

চিৎকার করতে করতেই পকেট থেকে একটানে ওর স্পেস ব্ল্যাঙ্কেটটা বের করে খুলে নাড়তে লাগল মুসা। রবিন আর কিশোরও একই কাজ করল। জোরে জোরে ওপর দিকে লাফ মারতে লাগল রবিন। যে কোন ভাবেই হোক, বিমানটার চোখে পড়তে চায়। বাবাকে সাহায্য করার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে।

এই যে এখানে! আমরা এখানে! চেঁচিয়ে চলেছে।

আরে দেখো না, আমরা এখানে! বলল কিশোর।
কিন্তু বিমানটা ওদেরকে দেখতে পেয়েছে বলে মনে হলো না। একই গতিতে সোজা এগিয়ে যেতে লাগল। ছোট হয়ে যাচ্ছে। আরও ছোট।
হয়তো আমাদের এস ও এস দেখতে পেয়েছে। আশা করল রবিন।
কিন্তু সে যেমন জানে, অন্য দুজনও জানে, অত ওপর থেকে ঘাসের মধ্যে তৈরি পাথরের এস ও এস-টা বিমানের চোখে পড়ার সম্ভাবনা খুবই কম।
আবার রাস্তা ধরে হাঁটতে শুরু করল রবিন। এখানে আর সময় নষ্ট করতে চায় না। বাবাকে খুঁজে বের করতেই হবে!
অন্য দুজনেরও একই সংকল্প। বের করতেই হবে।
গুড়গুড় করে উঠল মুসার পাকস্থলী। কিশোরেরও একই অবস্থা।
হাই-ফাই স্টেরিও হয়ে গেছে পেট, রসিকতা করার চেষ্টা করল মুসা, কিন্তু নিমের তেতো ঝরল কণ্ঠ থেকে।
হাসল রবিন। বাজাতে থাক। কি আর করবে?
হঠাৎ থমকে দাঁড়াল মুসা। ঠোঁটে আঙুল চেপে ধরেছে। কয়েকটা পাইন। গাছের ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে রয়েছে, বাঁয়ে।
ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে রবিনও তাকাল। ছায়ার ভেতরে ডাল নড়ছে। ওর বাবা না তো! মৃদু খসখস শব্দ হলো। অবশেষে দেখা গেল যে ডাল নাড়িয়েছে। তাকে। ছায়ায় ছায়ায় এগোচ্ছে। সাংঘাতিক হতাশ হলো রবিন। ওর বাবা নয়।
ইশারায় রবিন আর কিশোরকে ওখানেই থাকতে বলে রওনা হয়ে গেল মুসা। যেন পিছলে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল গাছপালার আড়ালে।
কি ভেবে দাঁড়াল না কিশোর। রবিনকে নিয়ে রাস্তা ধরে দ্রুত পা চালাল। মুসার সঙ্গে সঙ্গে থাকার চেষ্টা করল। পাতায় ঘষা লাগার খসখস কানে আসছে। ওদের, মাঝে মাঝে চোখেও পড়ছে মুসাকে। কিন্তু যে লোকটার পিছু নিয়েছে, তাকে আর দেখতে পেল না।
তবে মুসা দেখতে পাচ্ছে। লোকটার সঙ্গে একই গতিতে এগিয়ে চলেছে। গাছপালার আড়ালে আড়ালে। সেই লোকটাই, আগের দিন যাকে দেখেছিল, কোন সন্দেহ নেই। নিঃশব্দে চলার চেষ্টা করছে সে।
বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর বোধহয় সন্দেহ হলো লোকটার, শব্দটব্দ কানে। গেছে হয়তো। দেখে ফেলল মুসাকে। ঝট করে ডানে ঘুরে ঘন গাছের জটলার ভেতরে ঢুকে পড়ল সে। দৌড়াতে শুরু করল। আগের দিনের মতই খসাতে চাইছে।
কিন্তু আর ছাড়ল না মুসা। চোখের পলকে পেরিয়ে এল জটলাটা। যেন হোঁচট খেয়ে দাঁড়িয়ে গেল। অবাক হয়েছে। সামনে দাঁড়িয়ে আছে তারই বয়েসী একটা ইনডিয়ান ছেলে। চকচকে কালো চোখ।

চামড়ার ফতুয়া গায়ে, পরনে জিনস।
গাছের ঘন ছায়ায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ছেলেটা। এতটাই চুপচাপ, মনে। হয় গাছ হয়ে যেতে চাইছে। গাছের সঙ্গে মিশে গিয়ে আত্মগোপনের একটা চমৎকার কৌশল এটা ইনডিয়ানদের। চট করে চোখে পড়ে না। মুখের একটা পেশী কাঁপছে না, এমনকি চোখের পলকও পড়ছে না।
ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে মুসার। বলল, এই, আমাদের সাহায্য দরকার...
জবাব দিল না ইনডিয়ান ছেলেটা। গোড়ালিতে ভর দিয়ে চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরল, তারপর নিঃশব্দে ছুটে ঢুকে পড়ল গাছের আরেকটা জটলায়।
পিছু নিল মুসা। দেখতে পাচ্ছে না আর ছেলেটাকে। গাছপালা যেন গিলে নিয়েছে তাকে। শব্দ না করে এত দ্রুত যে কেউ ছুটতে পারে না দেখলে বিশ্বাস করত না মুসা।
ইতিমধ্যে থেমে থাকেনি কিশোর আর রবিন। রাস্তা ধরে এগিয়েই চলেছে। হাঁপাচ্ছে দুজনেই। শেষ যেন হবে না এই সীমাহীন পথ। বার বার তাকাচ্ছে ওরা। মুসাকে দেখার জন্যে। দেখতে পাচ্ছে না।
তারপর হঠাৎ করেই একশো ফুট সামনে বনের ভেতর থেকে বেরিয়ে রাস্তায় উঠল মুসা। জোরে জোরে হাঁপাচ্ছে। ঘামে চকচক করছে কালো মুখ।
দৌড়ে কাছে এল কিশোর আর রবিন।
ওকে দেখেছ? জিজ্ঞেস করল মুসা।
কাকে?
ইনডিয়ান ছেলেটাকে?
কী? রবিন অবাক।
দেখেছি। হারিয়েও ফেলেছি। চলো।
বুনো পথ ধরে এগোল আবার তিনজনে। সামনে পাহাড়ের কারণে উঁচুনিচু হতে আরম্ভ করেছে পথ। চলতে চলতেই জানাল মুসা, কি হয়েছে।
তাহলে এদিকেই যাচ্ছিল সে! চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল রবিন।
সামনে কি আছে আল্লাহই জানে,মুসা বলল।
বেশি সামনে যাতে যেতে না হয় আর! বিড়বিড় করে বলল কিশোর। পা ব্যথা হয়ে গেছে!
মাটিতে বসে গাছের গায়ে হেলান দিয়ে পাঁচ মিনিট বিশ্রাম নিয়ে নিল ওরা। তারপর আবার উঠে চলতে লাগল।
অনেক ওপরে উঠেছে সূর্য। গরম বাড়ছে। ডানা মেলে যেন ভেসে রয়েছে। প্রজাপতি। কিচ কিচ করে তীক্ষ্ণ ডাক ছাড়ছে নীল জে পাখি। বাতাসে পাইনের গন্ধ।

অধৈর্য, অস্থির হয়ে পড়ছে মুসা। সামনে চলে যাচ্ছে সে। রবিন আর কিশোর পড়ে যাচ্ছে পেছনে। ওদের এগিয়ে আসার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে তাকে। চিৎকার করে বলছে ওদেরকে তাড়াতাড়ি করার জন্যে।
কয়েকবার এরকম হলো। আরও একবার আগে চলে গেল মুসা। পথের বাঁকে হারিয়ে গেল। ওখান থেকেই চেঁচিয়ে ডাকতে লাগল ওদের।
রবিন জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে?
নিশ্চয় কিছু দেখতে পেয়েছে, কিশোর বলল। আল্লাহ, ভাল কিছু যেন হয়! অ্যাই, আরেকটা রাস্তা!
যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব মুসার কাছে চলে এল অন্য দুজন। সরু আরেকটা কাঁচা রাস্তার কিনারে দাঁড়িয়ে রয়েছে মুসা। উত্তর-পুবের বন থেকে বেরিয়ে আবার দক্ষিণ-পশ্চিমের জঙ্গলে ঢুকে গেছে পথটা। জন্তু-জানোয়ারের পায়ের ছাপের মাঝে নতুন আরেকটা দাগ দেখতে পেল ওরা, গাড়ির চাকার দাগ।
কই, আকাশ থেকে তো দেখিনি পথটা? রবিনের প্রশ্ন।
এই এলাকায় আসার পর দেখার সুযোগই পেলাম কই?
কিশোর বলল। এখানকার আকাশে ঢোকার পর তো কেবল ভয়ে ভয়েই কাটিয়েছি, কখন আছড়ে পড়বে প্লেন।
রাস্তার এদিক ওদিক তাকাতে লাগল ওরা। দুই ধারে প্রচুর গাছপালা ঝোপঝাড় আছে, দুটো গাড়ি পাশাপাশি পার হতে পারবে,, একটা ঢুকলে আর অর্ধেকটার জায়গা হবে বড়জোর।
ভাটির দিকেই যাই? নিজেকেই যেন প্রশ্ন করল কিশোর। নিচের দিকে গেলে হাঁটতে সুবিধে। শ্রান্ত পা চলতে চাইছে না। ওপরে ওঠা বড় কঠিন।
চলো, মুসাকে যেদিকেই যেতে বলা হোক, রাজি।
চলো, দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে? তাগাদা দিল রবিন। সাহায্য এখন ভীষণ প্রয়োজন ওদের। নিজেদের জন্যে যতটা না হোক, তার বাবাকে খোঁজার জন্যে বেশি।
নিচে নামাটা অনেক সহজ। প্রায় দৌড়ে নামতে লাগল ওরা। একটু পরেই দেখতে পেল তীক্ষ্ণ বাঁক নিয়ে পশ্চিমে চলে গেছে রাস্তাটা।
মাটি শুকনো, কঠিন। গভীর দাগ হয়ে আছে। শরৎকালে আর বুসন্তে বৃষ্টিতে ভিজে নরম হয়েছিল মাটি, তখন পড়েছে দাগগুলো, পরে রোদে শুকিয়ে ওরকম হয়ে গেছে।
পাশাপাশি হাঁটছে এখন ওরা। যেমন খিদে পেয়েছে, তেমনি ক্লান্ত। কথা প্রায় বলছেই না। এগিয়ে যাওয়ার দিকেই কেবল ঝোঁক। ডালে ডালে অসংখ্য পাখি দেখা যাচ্ছে। উড়ছে, বসছে, ডাকছে। ক্রমেই আরও, আরও ওপরে উঠছে সূর্য। গরম হচ্ছে রোদ।

খুব মৃদু প্রতিধ্বনির মত করে এসে কানে বাজল শব্দটা। থেমে গিয়ে পরস্পরের দিকে তাকাল ওরা। কিসের শব্দ? কয়েক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে থেকে শব্দটা ভাল করে শুনে আবার এগোল। খানিক পরেই চিনতে পারল। অনেক মানুষের কথাবার্তা, কুকুরের ডাক আর ছেলেমেয়ের চিৎকার। বিচিত্র কলরব।
শহরের কোলাহল নয়। শহর বা গ্রাম যা-ই হোক, মানুষ তো! আশায় দুলে উঠল ওদের বুক।
চলার গতি আপনাআপনি বেড়ে গেল।
হাসি ফুটল রবিনের মুখে।
আরেকটা মোড় ঘুরে চওড়া হয়ে গেল পথটা। পথের মাথায় কতগুলো কাঠের পুরানো নরবড়ে কুঁড়ে। চারপাশ ঘিরে আছে রেডউড গাছ। কুঁড়ের বাইরে উঠানে পড়ে আছে মাছ ধরার আর শিকারের সরঞ্জাম, মুরগীর খাবার দেয়ার গামলা। চারাগাছে তৈরি লম্বা ফ্রেমে, ঝোলানো রয়েছে চামড়া, শুকানর জন্যে। শরীর তোবড়ানো, পুরানো ঝরঝরে পিকআপ ট্রাক আর জীপ মরে পড়ে আছে যেন, কিংবা মরার প্রহর গুনছে।
ইনডিয়ানদের ছোট একটা গ্রাম। খেলা করছিল দুটো ছেলে, পরনে শার্ট, গায়ে টি-শার্ট। খেলা থেকে মুখ তুলে হাঁ করে তাকিয়ে রইল তিন গোয়েন্দার দিকে। চোখ লাল, নাক থেকে পানি গড়াচ্ছে। ওদের পাশের বাদামী রঙের কুকুরটা লাফাতে লাফাতে ছুটে এল গোয়েন্দাদের জুতো শোকার জন্যে।
কি কারণে যেন খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছে গাঁয়ের লোক। ছড়ানো একটা উঠানে জড় হতে আরম্ভ করেছে মহিলা আর বাচ্চারা।
দ্রিম দ্রিম করে বাজতে শুরু করল ঢাক।
অ্যাই, তুমি! আঙুল তুলে চিৎকার করে বলল মুসা, শোনো! দাঁড়াও!
একটা কুঁড়ের দিকে দৌড় দিল সে। চামড়ার ফতুয়া আর জিনস পরা এক ইনডিয়ান ছেলের কাঁধ খামচে ধরল এসে। হ্যাঁচকা টান দিয়ে ছেলেটাকে ঘুরিয়ে ফেলল নিজের দিকে। আরেকটু হলেই পড়ে যাচ্ছিল ছেলেটা। জ্বলন্ত চোখে তাকাল সে মুসার দিকে। কঠিন, ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে চেহারা।
তুমিই! জ্বলন্ত দৃষ্টিতে ফিরিয়ে দিয়ে বলল মুসা, হ্যাঁ, তোমাকেই দেখেছিলাম তখন! পিছু নিয়েছিলাম!
কেমন লোক তুমি? অভিযোগের সুরে বলল মুসা। ছুটে পালালে কেন অমন করে?
কালো লম্বা চুল, চকচকে কালো চোখ, ঠোঁট সামান্য কুঁচকানো, সব মিলিয়ে ইনডিয়ান ছেলেটার চেহারা দেখলে ভয় লাগে। মুসাকে চিনতে পেরে চোখ বড় বড় হয়ে গেল তার। নরম হয়ে এল মুখের ভাব। ঝকঝকে দাঁত বের করে হাসল।

এখানে এলে কি করে? ছেলেটা জিজ্ঞেস করল। আমার পিছু নিয়ে?...না না, তা হতে পারে না।...যা-ই হোক পেয়ে তো গেছ। অবশ্য আবার ফিরে যেতাম তোমাদের কাছে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। তোমাদেরকে ওভাবে ফেলে রেখে আসতে হলো। সরি।
এবার অবাক হওয়ার পালা মুসার। আসতে হলো মানে?
বলছি। গায়ের ফতুয়া টেনে সোজা করল সে। পুরানো হয়ে রঙ চটে গেছে জিনসের। কোমরের বেল্টের বাকলসটা খুব সুন্দর, সচরাচর দেখা যায় না ওরকম। রূপা দিয়ে তৈরি, ডিম্বাকৃতি, মাঝখানে বসানো একটা নীলকান্তমণি। বাকলসটায় হাত বোলাতে বোলাতে বলল, আমি গিয়েছিলাম ভিশন কোয়েস্টে...
এই সময় সেখানে এসে হাজির হলো রবিন আর কিশোর।
আমার নাম নরম্যান জনজুনস, ভদ্র গলায় নিজের নাম জানাল ইনডিয়ান ছেলেটা। আমি...
তোমাদের এখানে টেলিফোন আছে? বাধা দিয়ে বলল রবিন, ফরেস্ট সার্ভিসকে খবর দিতে হবে। পাহাড়ের ভেতরে ভেঙে পড়েছে আমাদের প্লেন। আমার বাবা হারিয়ে গেছে। অনেক খুঁজেছি, পাইনি।
মাথা নেড়ে জন বলল, সরি, টেলিফোন নেই। এমনকি রেডিওও নেই। কোন জিনিসের প্রয়োজন হলে গাড়ি নিয়ে চলে যাই আমরা।
সবচে কাছের রেঞ্জার স্টেশনটায় নিয়ে যেতে পারবে?
এখন কারও বেরোনো চলবে না, পেছন থেকে বলে উঠল ভারি, খসখসে একটা কণ্ঠ। জন, ছেলেগুলো কে?
ফিরে তাকাল তিন গোয়েন্দা। মাঝারি উচ্চতার একজন মানুষ। বিশাল চওড়া কাঁধ, পেশীবহুল শরীর। চোখের মণি ঘিরে রক্ত জমে লাল একটা রিং তৈরি করেছে। মনে হয় মণিতে পানি টসটস করছে, নাড়া লাগলেই গড়িয়ে পড়বে।
চাচা, এদের কথাই তোমাকে বলেছিলাম, জন বলল।
ওদের সঙ্গে কথা বলেছ?
জঙ্গলে বলিনি।
ভাল। জনের দিকে তাকিয়ে হাসলেন তার চাচা। তিন গোয়েন্দার দিকে ফিরতেই আবার গম্ভীর হয়ে গেল মুখ, হাসিটা মিলিয়ে গেছে।
নিজেদের পরিচয় দিল কিশোর, রবিন আর মুসা।
গাঁয়ের মোড়ল আর সর্দার শিকারি তার চাচা ডুম সবলের পরিচয় দিল জন।
আমার বাবা হারিয়ে গেছে। কি হয়েছে অল্প কথায় জানাল রবিন। তাড়াতাড়ি খুঁজতে বেরোনর জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে সে।
চাচা, ডুমকে জিজ্ঞেস করল জন, ওদের কি সাহায্য করতে পারি আমরা?

উদ্বিগ্ন হয়ে মোড়লের দিকে তাকিয়ে রয়েছে রবিন।
সমস্যাই! বললেন মোড়ল। বুঝতে পারছি না কি করা উচিত। কথা বলতে হবে।
যেমন নিঃশব্দে আচমকা এসেছিলেন ডুম, তেমনি করেই চলে গেলেন। আবার। হতাশায় কালো হয়ে গেল রবিনের মুখ।
জোর করে কিছুই করার উপায় নেই আমাদের। সান্ত্বনা দিয়ে জন বলল, গাঁয়ে পঞ্চায়েত আছে। শামান আছে। চুপ করে থাকো। আশা করি ভাল খবরই আসবে।
মাথা ঝাঁকাল রবিন। খুব একটা সান্ত্বনা পেয়েছে বলে মনে হলো না।
হ্যাঁ, তখন মুসার সঙ্গে কি যেন বলছিলে? আগের কথার খেই ধরল। কিশোর। ভিশন কোয়েস্টে গিয়েছিলে... জনের দিকে তাকাল সে। কি দেখতে? মোচড় দিয়ে উঠল ওর পেট। রান্না হচ্ছে কোথাও, সুগন্ধ এসে নাকে লেগেছে।
বলব, সবই বলব, জন বলল। আগে কিছু খেয়ে নাও।
নিশ্চয়ই! অধৈর্য কণ্ঠে বলে উঠল কিশোর, মুসার আগেই।
আসছি, বলে চলে গেল জন। খোলা জায়গাটার দিকে, যেখানে ঢাক বাজছে।
বাপরে বাপ! ভুরু কুঁচকে ইনডিয়ান ছেলেটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে মুসা, চলে কি! হাঁটে না তো, মনে হয় পিছলে চলে যায়!
রবিন ওসব কিছু দেখছে না। তার একটাই ভাবনা। সাহায্য করবে তো ওরা?
তা করবে, যতটা জোর দিয়ে বলল কিশোর, ততটা আশা অবশ্য করতে পারল না। এদিক ওদিক তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করল, ঢাক বাজছে কেন।
তাড়াতাড়িই ফিরে এল জন। এসো। খাবার দেয়া হয়েছে। প্রথমে নাচব। আমরা, তারপর খাওয়া। সব শেষে অনুষ্ঠান। তোমরা আমাদের অতিথি, কাজেই তোমাদের আগেই খেয়ে ফেলতে হবে।
তোমরা পরে খাবে? রবিন বলল, সেটা উচিত না।
আমরাও অপেক্ষা করি, মুসা বলল। তোমাদের ফেলে রেখে একলা খাব, তা হয় না।
ঢোক গিলল কিশোর। এত খিদে পেয়েছে তার, অপেক্ষা করাটা কঠিন। তবু মুসার টিটকারি শুনতে চায় না বলে কোনমতে বলল, ঠিক। পরেই খাব।
জন হাসল। অত ভদ্রতার দরকার নেই। খাবার তৈরি। তোমাদেরও খুব। খিদে পেয়েছে, আমি জানি। আগে খেয়ে নিলেই বরং সম্মান দেখানো হবে। এটাই নিয়ম।
পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল তিন গোয়েন্দা।
ওদের অপমান করা উচিত হবে না আমাদের, কিশোর বলল, কি বলো?
তাই তো মনে হচ্ছে, একমত হলো মুসা।

থ্যাংকস, জন, ভদ্রতা দেখাল রবিন। সে ভাবছে বাবার কথা। কোথায় কি ভাবে পড়ে আছেন কে জানে! খাওয়া নিশ্চয় হয়নি। ইস্, তাঁকেও যদি কেউ এখন। খাবার দিত!

জনের পেছন পেছন এগোল তিন গোয়েন্দা। কৌতূহলী চোখে ওদের দিকে তাকাচ্ছে গাঁয়ের লোক, বিশেষ করে বাচ্চারা। খোলা জায়গায় জমায়েত হয়েছে নারী-পুরুষ-শিশু। পুরুষদের খালি গা, মাথায় পাখির পালকের মুকুট, গলায় পাখির পালক আর পাথরে তৈরি মালা। মেয়েদের গলায় পুঁতির মালা। পুঁতি আর ছোট পাথর খচিত জামা পরেছে। ঢাকের সঙ্গে তাল রেখে দুটো করে কাঠি বাজাচ্ছে কয়েকজন লোক।

ওগুলোকে বলে ক্ল্যাপ স্টিক, জন বলল। বাজনার এখনও কিছুই না। জোর অনেক বাড়বে। এদিকে এসো। বাসন নিয়ে যার যার খাবার নিজেরাই তুলে নাও। খেতে খেতে দেখ। যেটা না বুঝবে, আমি বলে দেব।

বড় বড় কাঠের পাত্রে খাবার রাখা। বাঁশের তৈরি ঢাকনা দিয়ে ঢাকা। সরিয়ে নিল মেয়েরা। কয়েক পদের ভাজা মাংস, আলু, সীম আর রুটি। খাবার দেখে এতটাই খুশি হল কিশোর, ভাবনাচিন্তা আর করল না, তুলে নিতে লাগল প্লেটে।

মুসা অতটা অস্থির হয়নি, খাবার দেখলে যে সব চেয়ে বেশি হয় সাধারণত। মাংসের একটা পাত্র দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, শুয়োর?

মাথা ঝাঁকাল জন। হ্যাঁ।

থমকে গেল কিশোর। একবার চিন্তাও করেনি, মাংসটা সুন্দর দেখে ওটার দিকেই হাত বাড়িয়েছিল নেয়ার জন্যে। আর কিছু নেই? হতাশ হয়েছে সে।

থাকবে না কেন? জন বলল, শুয়োর খাও না নাকি?

মাথা নাড়ল মুসা, কিশোর দুজনেই।

অসুবিধে নেই, জন আরেকটা পাত্র দেখিয়ে বলল, ওটা খরগোশ। আর ওটা কাঠবোলি। এগুলোও পছন্দ না হলে, একটা পাত্রের ঢাকনা তুলতে তুলতে বলল সে, মাছ নাও। অনেক আছে। টুয়ক থেকে ধরেছি। আমাদের ভাষায় টুয়ক বলে নদীকে।

হাসি ফুটল আবার মুসা আর কিশোরের মুখে। মাংস নিয়ে রবিনের কোন অসুবিধে নেই। সে শুয়োরও খায়।

বিশাল এক রেডউড গাছের নিচে নিচু বেঞ্চিতে বসেছে ওরা। টেবিল হল বড় বড় কাঠের বাক্স। গায়ে লেখা রয়েছেঃ ইঞ্জিন পার্টস, জোনস ট্রাকিং কোম্পানি। কাছেই দাঁড়িয়ে আছে একটা শেভ্রলে ট্রাক, বনেট তোলা। ইঞ্জিন খুলে ছড়িয়ে রাখা হয়েছে কয়েকটা বাক্সের ওপর। তার ওপাশে, বেশ কিছুটা দূরে টুয়ক,

যেটাকে নদী না বলে বরং চওড়া বড় ধরনের নালা বললেই ঠিক হয়। গাঁয়ের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে কুলকুল করে। টলটলে পানি। গভীরও বেশ।
উত্তরের বিশাল উপত্যকা থেকেই কি এসেছে ওই নদী? জিজ্ঞেস করল রবিন।
চেনো নাকি তুমি উপত্যকাটা? জনের কণ্ঠে সন্দেহ।
চিনি, মানে, সতর্ক হয়ে গেল রবিন। একটুকরো মাংস চিবিয়ে গিলল। দূর থেকে দেখেছি আরকি।
বাইরের কেউ যেতে পারে না ওখানে। ওটা পবিত্র জায়গা। আমরা ওর নাম দিয়েছি পূর্বপুরুষের উপত্যকা। জায়গাটা সংরক্ষিত করে রেখেছি আমরা। ইনডিয়ানদের গোরস্থান। মাঝে মাঝে ওখানে গিয়ে অনুষ্ঠানও করি।
আমি যাইনি, জনকে নিশ্চিন্ত করল রবিন। আরেক টুকরো মাংস মুখে পুরল। তোমরা নিশ্চয় অনেক কাল ধরে আছ এখানে?
কি করে জানলে?
পাহাড়ে সিঁড়ি, দেখেছি আমি। বেয়ে ওঠার জন্যে পাথর কেটে তৈরি করা হয়েছে। ওখান দিয়ে উঠতে গিয়ে আরেকটু হলেই ধসের কবলে পড়েছিলাম। ধস না নামলে অবশ্য সিঁড়িটা দেখতে পেতাম না। অনেক কাল আগে কাটা হয়েছে।
হ্যাঁ, অনেক অনেক আগে এখানে এসেছিল আমাদের পূর্বপুরুষেরা, স্রষ্টা ওদের সৃষ্টি করার পর পরই। অজ্ঞান লোকেরা পাহাড়ে চড়তে চেষ্টা করলে ঈশ্বরই ধস নামিয়ে ওদের সরিয়ে দেন, কিংবা মেরে ফেলেন। তিনিই উইলো গাছ তৈরি করেছেন, যাতে আমরা বুড়ি বানাতে পারি, সেই ঝুড়িতে করে লাশ নিয়ে যেতে পারি উপত্যকায়। সব কিছুই সৃষ্টি করেছেন ঈশ্বর। হাসল জন। ওহহো, ভুলে গিয়েছিলাম, তুমি তোমার বাবাকে খুঁজছ। ভেব না। গাঁয়ের বুড়ো জ্ঞানী লোকেরা সেটা বুঝবেন।
কিন্তু বাইরের মানুষের সমস্যা তারা বুঝতে চান না।
চান না, তার কারণ টুরিস্টদের পছন্দ করেন না তো। বড় বিরক্ত করে।
একটা কথাও বলেনি এতক্ষণ কিশোর। চুপচাপ খেয়েছে। পেট কিছুটা শান্ত হলে বলল, কিছু একটা ঘটছে নিশ্চয় এখন তোমাদের গায়ে।
ঘটছে। অসুস্থ হয়ে পড়ছে লোকে, জন জানাল। চোখ লাল হয়ে যায়, কাশি হয়, বুক ব্যথা করে। কারও কারও পেটে যেন আগুন জ্বালানো শয়তান ঢুকেছে। ভীষণ জ্বালাপোড়া করে পেটে। তাই জ্ঞানীরা ভেবেচিন্তে ঠিক করেছে, ভয়াবহ ওই রোগ তাড়ানর জন্যে একটা উৎসব করা দরকার। গ্রাম থেকে বেরোনো নিষিদ্ধ। করে দেয়া হয়েছে। কাল দুপুরের আগে কেউ বেরোতে পারবে না।
ডাক্তারের কাছে যাও না কেন তোমরা? মুসার প্রশ্ন। রোগ হলে ডাক্তারই তো-..
মুসার পায়ে লাথি মারল কিশোর।

আউ করে উঠে থেমে গেল মুসা। ইঙ্গিতটা বুঝতে পারল।
একটা মুহূর্ত অবাক হয়ে মুসার দিকে তাকিয়ে রইল জন। মুসাকে হাসতে দেখে আরও অবাক হলো। তবে ব্যাপারটা নিয়ে বেশি মাথা ঘামাল না। বলতে লাগল, তোমাদের ডাক্তারের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন নেই, আমাদেরও তেমন ডাক্তার আছে। গান গাওয়া ডাক্তার, শামান। এখনকার যে শামান, আমার জন্মের। আগে থেকেই আছে, চিকিৎসা করছে বহু বছর ধরে। অনেক জানে, অনেক জ্ঞানী। মাঝে মাঝে অবশ্য বেকারসফিল্ডের ক্লিনিকে পাঠায় আমাদের, তবে সব সময় না। স্বাস্থ্যটাস্থ্য ভালই থাকে আমাদের, রোগ বালাই তেমন হয় না, আর হলেও অল্পতেই সেরে যায়। মানে যেত আরকি। এবারের অসুখটা আর সারতে চাইছে না। কয়েক মাস ধরে চলছে।
গা থেকে যে বোরোনো যাবে না বললে, শঙ্কিত হয়ে উঠেছে রবিন, সেটা কি আমাদের বেলায়ও? জরুরী অবস্থায়ও কি বেরোনো যাবে না?
সেটাই শামানের কাছে জানতে গেছেন চাচা।
হঠাৎ ঢাকের আওয়াজ বেড়ে গেল। সেই সঙ্গে বাড়ল ক্ল্যাপ স্টিকের খটাখট। সম্মিলিত বিকট চিৎকার উঠল, মানুষের গলা থেকে যে ওরকম শব্দ বেরোতে পারে না শুনলে বিশ্বাস করা কঠিন, ছড়িয়ে গেল গাঁয়ের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে। তাকিয়ে রয়েছে তিন গোয়েন্দা।
নাচ আরম্ভ হয়েছে। অনেক বড় চক্র তৈরি করে নাচছে নর্তকেরা। কাঁচা চামড়ায় তৈরি মোকাসিন পায়ে থাকায় পায়ের শব্দ তেমন হচ্ছে না। আরেকটা ব্যাপার অবাক করল গোয়েন্দাদেরকে। চক্রের এক প্রান্তের লোকেরা যখন নাচছে, আরেক প্রান্ত চুপ থাকছে। কারণটা জিজ্ঞেস করল জনকে।
ও, জান না। বুঝিয়ে দিল জন, পৃথিবীটা হলো একটা নৌকার মত। পানিতে ভাসার সময় নৌকার এক পাশে যদি ভার বেশি হয়ে যায়, তাহলে কাত হয়ে যায়। আর সবাই একসাথে একপাশে চলে গেলে তো উল্টেই যাবে। সে জন্যে দুই দিকেই সমান ভার রাখতে হবে। নাচের বেলায়ও তাই। সবাই একধারে গিয়ে একসাথে নাচলে চলবে না।
তাহলে কাত হয়ে যাবে নাকি পৃথিবীটা? ফস করে জিজ্ঞেস করে বসল। মুসা। আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, আবার লাথি খেল পায়ে। চোখের ইশারায়। বুঝিয়ে দিল কিশোর, যা বলছে চুপচাপ শুনে যাও না, এত কথা বলার দরকার কি?
ঘুরতে ঘুরতে কয়েকজন নর্তক এসে ঢুকে পড়ল চক্রের মাঝখানে। যতটা জোরে সম্ভব লাফাতে লাগল। যেন কার চেয়ে কে কত বেশি উঁচুতে উঠতে পারবে সেই প্রতিযোগিতা চলছে।

এরও কারণ ব্যাখ্যা করে দিল জন, আগে একবার ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল পৃথিবী। তারপর আবার সৃষ্টি করলেন ঈশ্বর। কাঠঠোকরার ওপর ভার দিলেন, কোথায় কেমন চলছে, সেই খবর নিয়মিত দিয়ে আসার। কাজেই আমাদের মধ্যে যাদের অন্তর খুব ভাল, ঈশ্বরের ভক্ত, তাদের রাখা হয়েছে কাঠঠোকরার অনুকরণ করার জন্যে। দেখছ না, মাথা আগেপিছে করছে কেমন ভাবে? কাঠঠোকরা ওরকম করেই গাছ ঠোকরায়, নিশ্চয় দেখেছ। কাঠঠোকরা যেভাবে ডানা ছড়িয়ে দিয়ে গান গায়, ওরাও তেমন করেই গাইছে। এর কারণ জানো? কাঠঠোকরারা এই গান শুনতে পেয়ে ঈশ্বরকে গিয়ে খবর দেবে, এখানে কিছু মানুষের বড় দুর্ভোগ, অসুখ করেছে তাদের। ঈশ্বর শুনলে একটা ব্যবস্থা করবেনই। যাদের তৈরি করেছেন, তাদের তো আর কষ্টে রাখতে পারেন না। হয় রোগ সারিয়ে দেবেন, নয় তো শামানের ওপর ভার দিয়ে দেবেন, তাকে শক্তিশালী করে দেবেন যাতে মানুষের এই রোগ সারিয়ে দিতে পারে।

নাচ চলছে। দরদর করে ঘামছে নাচিয়েরা। মেয়েরা আর বাচ্চারা নাচে অংশ। নিচ্ছে না, তারা বসে বসে দেখছে, মাঝে মাঝে হাততালি দিচ্ছে, গানের সঙ্গে গলা মেলাচ্ছে। এর বেশি আর কিছু করণীয় নেই তাদের। বেশি অসুস্থ রোগীদেরকে মাদুরে শুইয়ে রাখা হয়েছে। কম্বল পাকিয়ে তাদের মাথার নিচে দিয়ে দেয়া হয়েছে, যাতে আরাম করে শুতে পারে, আর মাথাটা কিছুটা উঁচু হয়ে থাকায় নাচ দেখতে সুবিধে হয়। বেশ জমজমাট উৎসব, আন্তরিকতার অভাব নেই।

একসময় শেষ হলো নাচ।

ঢাক বাজানো বন্ধ হলো। নর্তক এবং দর্শকেরা খাবারের দিকে এগিয়ে এল। তাড়াতাড়ি এসে খাবারের পাত্রের ওপর থেকে ঢাকনা সরিয়ে দিল মেয়েরা। কিশোর লক্ষ করল, নর্তকদের অনেকেরই চোখ লাল, কেউ কেউ কাশছে।

জনের চাচা মোড়ল আরেকজন বুড়ো মানুষকে নিয়ে হাজির হলেন। দুজনেরই পরনে উৎসবের পোশাক। লোকে যেভাবে ভক্তিতে গদগদ হয়ে সরে। জায়গা করে দিচ্ছে বুড়ো মানুষটাকে, শ্রদ্ধার চোখে তাকাচ্ছে, তাতে বুঝতে অসুবিধে হয় না এ লোকই গাঁয়ের শামান, গান গাওয়া ডাক্তার।

কথা বলতে বলতে তিন গোয়েন্দার দিকে এগিয়ে এল দুজনে।

কাছে এসে থামল।

মোড়ল ডুম সবল ঘোষণা করলেন, তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারছি না। আমরা। একাই যেতে হবে তোমাদের। এটাই আমাদের সিদ্ধান্ত।

.

বেরোলে ঝুঁকিটা বেশি হয়ে যাবে, গান গাওয়া ডাক্তার বলল। অনুষ্ঠানটা নির্ভেজাল রাখতে হবে। অনেক মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়েছে আমাদের এখানে।

বুড়ো হতে হতে কুঁচকে গেছে শামানের মুখের চামড়া। যেতে পারছে না বলে সত্যিই দুঃখিত, এটা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না তিন গোয়েন্দার। কিন্তু তার এই দুঃখিত হওয়ায় মিস্টার মিলফোর্ডের কোন উপকার হচ্ছে না।
তোমরা এখানে থেকে গেলেই ভাল করবে, পরামর্শ দিলেন মোড়ল ডুম সবল। কাল গাড়িতে করে দিয়ে আসা যাবে তোমাদের।
আজই যেতে হবে আমাদের, রবিন বলল। আমার বাবা নিশ্চয় ভীষণ বিপদে পড়েছে।
বিশাল এলাকা এটা, মোড়ল বলল। কল্পনাও করতে পারবে না কতটা বড়। ডায়মণ্ড লেক কি করে খুঁজে বের করবে?
রাস্তা ধরে যাব, মুসা জবাব দিল।
চল্লিশ মাইল হাঁটতে হবে তাহলে।
চল্লিশ মাইল! ঢোক গিলল মুসা।
নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর। স্থির দৃষ্টিতে মোড়লের দিকে তাকিয়ে রইল এক মুহূর্ত। বলল, আপনাদের একটা পিকআপ ভাড়া নিতে পারি আমরা।
গাঁয়ে আসার পর এই প্রথম উজ্জ্বল হলো রবিনের মুখ। এই না হলে কিশোর পাশা! আসল কথাটা ঠিক তার মাথায় এসে যায়। অথচ এই সহজ কথাটাই মনে। পড়েনি রবিন কিংবা মুসার।
তাড়াতাড়ি রবিন বলল, আমাদের ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে।
টাকাও আছে, বলতে বলতে পকেট থেকে টাকা বের করে ফেলল রবিন। ডায়মণ্ড লেকে গিয়ে খরচ করার জন্যে রেখেছিল। ভাড়া দিতে পারব।
আপনি যেখানে রেখে যেতে বলবেন, আমাদের কাজ শেষ হয়ে গেলে সেখানেই রেখে যাব গাড়িটা, কিশোর বলল। খুব যত্ন করে চালাব, কিচ্ছু নষ্ট করব না। এই যে নিন, আমাদের কার্ড। লোকে আমাদের বিশ্বাস করে রকি বীচে। একটা উপকার চাইছি, করবেন না?
একটা করে তিন গোয়েন্দার কার্ড মোড়ল আর শামানের হাতে গুঁজে দিল কিশোর।
কার্ডটার দিকে তাকিয়ে রইলেন মোড়ল। শামান তাকালেনও না, তুলে দিলেন জনের হাতে। জোরে জোরে পড়ল জন।
মাথা নেড়ে মোড়ল বললেন, প্রস্তাবটা ভাল মনে হচ্ছে না।
ভ্রূকুটি করল গান গাওয়া ডাক্তার। তা ঠিক। তবে তাতে কোন ক্ষতি হবে না।
প্রশংসার দৃষ্টিতে ছেলেদের দিকে তাকাল শামান। ঘোলা হয়ে আসা চোখে বুদ্ধির ঝিলিক। এই তিনজন এমনিতেই চলে যাচ্ছে, থাকছে না, যা নিতে চায়। দিয়ে দিতে পারি আমরা।

ঠোঁট গোল করলেন মোড়ল। ব্যাপারটা তার পছন্দ হচ্ছে না। কিন্তু শামানের সিদ্ধান্তের ওপর কথাও বলতে পারেন না। বললেন, বেশ, ব্যবস্থা করছি। বলে খাবার খেতে বসা লোকগুলোর দিকে চলে গেলেন তিনি।
থ্যাংক ইউ, শামানের দিকে তাকিয়ে কৃতজ্ঞ গলায় বলল রবিন।
বুড়ো মানুষটাও হাসল। একটা মুহূর্তের জন্যে নেচে উঠল তার চোখের তারা। আজকালকার ছেলেছোকরাগুলোকে নিয়ে এই এক অসুবিধে। সব সময় একটা না একটা গণ্ডগোল বাধাবেই, বিড়বিড় করে বলল সে। জনের দিকে তাকিয়ে বলল, তাই না?
আপনার কথা অমান্য করি না আমি, জন জবাব দিল।
কি করে এসেছ বলো ওদের, আদেশ দিল গান গাওয়া ডাক্তার। শোনাও।
তিন গোয়েন্দার দিকে ফিরে বলল জন, দৈব আদেশ পাওয়ার জন্যে বেরিয়েছিলাম আমি। ভিশন কোয়েস্টে। চব্বিশ ঘণ্টা বনের ভেতরে ছুটে বেড়িয়েছি। কেবল প্রার্থনার জন্যে থেমেছি। রাতে ঘুমিয়েছি ঈশ্বরের নির্দেশ পাওয়ার জন্যে।
কি স্বপ্নে দেখলে, নাতি? জিজ্ঞেস করল শামান।
নাতি? সবাই তোমার আত্মীয় নাকি এখানে, জন? মুসার প্রশ্ন।
হেসে উঠল জন আর শামান।
আমরা এভাবেই বড়দের সম্মান জানাই, জন জবাব দিল। মাথা ঝাঁকিয়ে তার কথায় সায় দিল শামান।
তার মানে মোড়ল তোমার চাচা নন, রবিন বলল।
না। আর শামানেরও আমি নাতি নই। তবে তিনি এখানে আমার বয়েসী সবার কাছেই দাদার মত।
মাথা ঝাঁকাল তিন গোয়েন্দা। বুঝেছে।
অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি আমি, দাদা, শামানের প্রশ্নের জবাবে বলল জন। শুরু হলো হ্রদ দিয়ে। দেখি, সবুজ একটা হ্রদের ধারে গিয়ে পড়েছি আমি। ঝাঁপিয়ে পড়লাম তাতে। দাপাদাপি করতে লাগলাম। একটা মাছ আপনাআপনি এসে হাতে ধরা দিল। ভাগ্যবান মনে হলো নিজেকে। মাছটা দিয়ে চমৎকার খাবার হবে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলাম। আরও অনেক মাছ এসে পড়তে লাগল আমার হাতের কাছে, এত বেশি, ধরলে হাতে রাখার জায়গা পাব না। ওরা কেবলই আমার গায়ে এসে পড়তে লাগল, আমার পিঠে, আমার বুকে, আমার মুখে লাফিয়ে পড়তে লাগল। আরও এল, আরও, আরও জোরে জোরে গুতো মারতে লাগল আমাকে। ঠোকর মারতে লাগল।
কি মনে হলো তোমার? শামান জিজ্ঞেস করল, তোমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছে?

মাথা ঝাঁকাল জন। হাতের মাছগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে এলাম পানি থেকে।
ঠিক কাজটাই করেছ। কি শিখলে?
শিখলাম, বিনা কষ্টে যা হাতে আসবে তার কোন মূল্য নেই। মাঝে মাঝে ক্ষতিকর হয়ে ওঠে ওসব জিনিস।
খুশি হয়ে মাথা ঝাঁকাল গান গাওয়া ডাক্তার। ঈশ্বর তোমাকে কি নির্দেশ দিলেন?
ঠিক জায়গায়, কিন্তু আর্শীবাদ ছাড়া!
মানে বুঝেছ?
না।
কৌতূহলী হয়ে জনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে তিন গোয়েন্দা।
কিছুই তো বুঝলাম না, বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল জন। তার দেখাই পাইনি।
যা-ই হোক, ঈশ্বর তোমার প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন, শামান বলল। সেটাকে কাজে লাগাবে।
চোখ নামিয়ে ফেলল জুন। লাগাব, দাদা।
পরের অনুষ্ঠানে অবশ্যই উৎসবের পোশাক পরবে তুমি।
পরব, দাদা। তিন গোয়েন্দার দিকে ফিরে হাসল জন। ঝকঝকে উজ্জ্বল হাসি। গুড লাক। বলেই রওনা হয়ে গেল সে। দৌড়ে চলে গেল, দমকা হাওয়ার মত।
গুড বাই, তরুণ যোদ্ধারা, তিন গোয়েন্দাকে বলল শামান। পৃথিবীতে। কেবল নিজেকে বিশ্বাস করবে, আর কাউকে না।
ভিড়ের দিকে চলে গেল সে। হাসিমুখে কথা বলতে লাগল তার ভক্তদের।
ওই দেখো, মোড়ল, পঞ্চাশ গজ দূরের একটা টিনের কুঁড়ে দেখাল মুসা।
ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে হালকা-পাতলা এক ইনডিয়ানের সঙ্গে কথা বলছেন, ডুম। জিনসের সামনের দিকে হাত মুছছে লোকটা। মাথা ঝাঁকাচ্ছে। তারপর মোড়ল চলে এলেন খাবার টেবিলের দিকে, লোকটা চলে গেল ঘরের ভেতরে।
জোনস ট্রাকিং কোম্পানি লেখা বাক্সগুলোর সামনে থেকে সরেনি এখনও কিশোর। তার সামনের বাক্সটায় প্লেট রাখা। তাতে কিছু আলুভাজি রয়ে গেছে। শেষ করে ফেলার জন্যে চামচ দিয়ে তুলতে যাবে এই সময় চোখে পড়ল। সিগারেটের গোড়াটা। একটা বাক্সের কাছে পড়ে আছে। মাটিতে।
ঝুঁকে গোড়াটা তুলে নিল সে। হলদে হয়ে গেছে কাগজ, দোমড়ানো। একই রকমের সবুজ রঙের বন্ধনী লাগানো ফিল্টারের জোড়ার কাছে, সকালে যেটা পেয়েছিল সেরকম।
কিশোর, মুসা জিজ্ঞেস করল, কি ওটা?

দেখো। সকালের পাওয়া গোড়াটা পকেট থেকে বের করে ফেলেছে। কিশোর। পরে যেটা পেয়েছে সেটাও একই সাথে হাতের তালুতে রেখে বাড়িয়ে ধরল।
খাইছে!
এর মানে কি? রবিনের প্রশ্ন।
জানি না, জবাব দিল কিশোর। রেখে দিই। কাজে লেগেও যেতে পারে। কখন যে কোন জিনিসটা দরকার হয়ে পড়ে, আগে থেকে বলা যায় না।
ভিড় থেকে বেরিয়ে কিশোরদের দিকে এগিয়ে এল এক কিশোরী। আমি মালটি জনজুনস। জনের বোন। হেসে একটা চাবি বের করে ফেলে দিল রবিনের হাতে, মোড়ল বললেন পিকআপটা পাবে। চালানোর জন্যে তৈরি করা হচ্ছে। খেয়েছ তো ভালমত?
খেয়েছি, জবাব দিল রবিন। মেয়েটাকে দেখছে। চেহারাটা খুব সুন্দর। লম্বা। চুল। ঢিলাঢালা সাদা পোশাক পরেছে। গলায় নীলকান্তমণির মালা। তার চোখও লাল। আসলেই কি তুমি জনের বোন? না এটাও সম্মান দেখানোর জন্যে বলা?
একটা মুহূর্ত অবাক হয়ে রবিনের দিকে তাকিয়ে রইল মালটি। তারপর বুঝতে পেরে হাসল। না না, আমি সত্যিই তার বোন।
আর কোন অনুষ্ঠান হবে তোমাদের?
এবার শামান গান গাইবে আর নাচবে। তারপর প্রার্থনা করবে। ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলার জন্যে তৈরি হচ্ছে। ঈশ্বরকে জিজ্ঞেস করবে, কি কারণে অসুখ হয়েছে আমাদের। কি করলে সারবে। সেই মত কাজ করে আমাদের সারিয়ে তুলবে তখন।
আবার নিশ্চয় নাচ-গান?
হ্যাঁ। ওষুধের ব্যবস্থাও আছে।
কিশোর জানতে চাইল, ভিশন কোয়েস্টটা কি জিনিস?
মনোযোগী হলো মালটি। জনের কোয়েস্টের কথা শুনেছ তাহলে? কি মেসেজ দিলেন ঈশ্বর?
ভাবল কিশোর। বলল, ঠিক জাগায়, কিন্তু আশীর্বাদ ছাড়া। এ কথাগুলোর মানে বুঝতে না পেরে মাথা নাড়ল মালটি। ঈশ্বরই জানেন কি বলেছেন। জন বুঝতে পেরেছে?
না। গান গাওয়া ডাক্তার তাকে এটা নিয়ে ভাবতে বলেছে, রবিন বলল। কেন, এমন কি জরুরী, এটা?
কারণ... চুপ হয়ে গেল মালটি। চোখ মুদল। খুলল। আমাদের চাচা, আমাদের সত্যিকারের চাচা হারিয়ে গেছে। বাবা চলে যাওয়ার পর আমাকে আর জনকে বড় করেছে এই চাচাই। বাবা হারিয়ে গেছে বহু বছর আগে। এখন হারাল

আমাদের চাচা। এক মাস হয়েছে। সমস্ত জঙ্গলে খোঁজাখুঁজি করেও তাকে বের করতে পারেনি জন।

অদ্ভুত কিছু একটা ঘটছে এই এলাকায়, রবিন বলল। আমার বাবাও হারিয়ে গেছে।

মাথা ঝাঁকাল মালটি। চোখে বিষণ্নতা। জনতার দিকে চোখ পড়তে তাকিয়ে রইল সেদিকে। হালকাপাতলা সেই লোকটা, যার সঙ্গে কথা বলেছিলেন মোড়ল, হাত নেড়ে মালটিকে ইশারা করছে।

তোমাদের পিকআপ রেডি, লাল চোখ ডলতে ডলতে বলল মালটি।

পথ দেখিয়ে গায়ের আরেক প্রান্তে তিন গোয়েন্দাকে নিয়ে এল সে। পথে। কয়েকটা বেঁধে রাখা কুকুর দেখতে পেল ওরা, আর উঁচু উঁচু মাটির দেয়ালে একটা জায়গা ঘেরা। ওটা হলো শোধনাগার। দেহকে ওখান থেকে পবিত্র করে আনে লোকে।

একটা কথা বলতে পারবে? পকেট থেকে সিগারেটের গোড়া দুটো, বের। করে মালটিকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর, এই জিনিস এখানে কে খায়?

না, অবাক হয়েছে মেয়েটা।

হতাশ হয়ে আবার ওগুলো পকেটে রেখে দিল গোয়েন্দাপ্রধান।

পুরানো ট্রাক আর জীপের মাঝে ঝকঝকে নতুন লাল একটা পিকআপ দেখে ওটা কার জিজ্ঞেস করল মুসা।

মোড়ল চাচার, মালটি বলল। খুব ভাল মানুষ। রাইফেলে দারুণ নিশানা। নতুন কাপড়, কাজের যন্ত্রপাতি আর গাড়ির পার্টস ভেঙে গেলে এনে দেন। আমাদের।

টাকা পান কোথায়? কিশোরের প্রশ্ন।

ত্যাগ করল মালটি। জানি না। ডায়মণ্ড লেকে পার্ট-টাইম কোন কাজ করেন বোধহয়। ওসব আমার ব্যাপার নয়, মাথাও ঘামাই না। রঙচটা, মরচে পরা একটা পুরানো ফোর্ড ফ-১০০ গাড়ির ফেণ্ডারে চাপড় দিল সে। এটাই তোমাদের দেয়া হয়েছে। যত্ন করবে। কাজ শেষে ডায়মণ্ড লেকে রেঞ্জার স্টেশনে রেখে যেও, তাহলেই হবে।

জিনিসপত্র যা সঙ্গে আনতে পেরেছে সেগুলো গাড়ির পেছনে রেখে সামনের সীটে উঠে বসল তিনজনে। সীটবেল্ট নেই। স্টিয়ারিঙে বসল মুসা। তিনজনের মাঝে সব চেয়ে ভাল ড্রাইভার সে।

উত্তর দিকে যাবে, বলে দিল মালটি। কিছু দূর গেলে একটা দোরাস্তা দেখতে পাবে, কাঠ ব্যবসায়ীরা তৈরি করেছে। পশ্চিমের কাঁচা রাস্তাটা ধরবে, তাহলেই পৌঁছে যাবে হাইওয়েতে। ডানে যাবে, ডায়মণ্ড লেকে চলে যেতে পারবে।

মালটিকে ধন্যবাদ দিল ওরা। ইঞ্জিন স্টার্ট দিল মুসা। হেসে, হাত নেড়ে ওদেরকে বিদায় জানাল মেয়েটা। রওনা হয়ে গেল ওরা। ব্যাকফায়ার করছে। পুরানো ইঞ্জিন। তবে চলছে। চাকার পেছনে ধুলো উড়ছে। ঘেউ ঘেউ করছে কুকুর।
যাক, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল মুসা, একটা গাড়ি পেলাম শেষ পর্যন্ত। পায়ে না হেঁটে চাকার ওপর গড়ানো।
হ্যাঁ, রবিন বলল। ধন্যবাদটা কিশোরেরই পাওনা। ও কথাটা মনে করেছিল। বলেই পেলাম।
সীটে হেলান দিয়ে আছে কিশোর। চুপচাপ।
পথের দিকে নজর দিল মুসা। সরু রাস্তা। উঁচু-নিচু। যেখানে-সেখানে মোড়। একটু অসতর্ক হলেই বিপদে পড়তে হবে। রেডউডের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে পাইনের বনে ঢুকল গাড়ি। পাহাড়ী উপত্যকায় ঢেউ খেলে যেন এগিয়ে গেছে পথ, একবার উঠছে একবার নামছে, একবার উঠছে একবার নামছে।
মোড়ল আমাদের পছন্দ করেনি, একসময় মুসা বলল।
শামান করেছে, বলল কিশোর। ও রাজি হওয়াতেই গাড়িটা পেলাম আমরা। ওর চেহারা দেখেছ, ভাবসাব, যখন দৈব নির্দেশ পাওয়ার কথা বলল জন? মেসেজের মানে বুঝতে পেরেছে, এবং বুঝে খুশি হতে পারেনি।
মালটির চাচার কি হয়েছে, বলো তো?
এক মাস অনেক সময়। রহস্য বলা চলে। আরেকটা রহস্য হলো ওই মানুষগুলোর আজব অসুখ। ভাইরাসের আক্রমণ হতে পারে, কিন্তু ভাবছি... আচমকা নীরব হয়ে গেল কিশোর। চিমটি কাটতে লাগল নিচের ঠোঁটে। কোন কিছু ভাবিয়ে তুলেছে ওকে।
যেখান থেকে রওনা হয়েছে, তার মাইল দুয়েক আসার পর চড়াই বাড়তে লাগল। অনেক খাড়া হয়ে এখানে উঠে গেছে পথ। সুগন্ধী পাইনের বনে ঝলমল করছে বিকেলের রোদ।
পাহাড়ের ওপরে উঠে জোরে জোরে ব্যাকফায়ার করতে লাগল ইঞ্জিন। থামল না। ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল গাড়ি। চড়াইটা যেমন খাড়া ছিল উতরাইটা তেমনি ঢালু। দ্রুত গতি বাড়ছে গাড়ির।
ব্রেক চাপল মুসা। গতি কমল গাড়ির। ব্রেক ছেড়ে দিতেই আবার বাড়তে লাগল, দ্রুত, আরও দ্রুত। পাশ দিয়ে সাঁ সাঁ করে সরে যাচ্ছে গাছপালা ঝোপঝাড়।
ব্রেক চাপল আবার মুসা। গতি কমল গাড়ির। হঠাৎ মেঝেতে গিয়ে লেগে গেল ফুট পেডাল। নিচের দিকে ছুটতে লাগল আবার গাড়ি। অকেজো হয়ে গেছে। ব্রেক।
খাইছে! চিৎকার করে উঠল মুসা, ব্রেকটা গেল?
.

ক্রমেই গতি বাড়ছে পিকআপের। মাটিতে গভীর খাঁজ, অনেকটা রেল লাইনের মত কাজ করছে। তাতে ঢুকে গেছে চাকা। ফলে খাজ যেভাবে এগিয়েছে সেভাবেই চলতে হচ্ছে গাড়িটাকে, আর কোন দিকে ঘোরানোর উপায় নেই।
শক্ত করে স্টিয়ারিং ধরে রেখেছে মুসা। প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে ঝাঁকি খাচ্ছে পাশে বসা কিশোর। তার পাশে বসা রবিন আঁকড়ে ধরে রেখেছে প্যাসেঞ্জার ডোরের আর্মরেস্ট। মাঝে মাঝেই লাফিয়ে উঠছে তিনজনের শরীর, ছাতে মাথা বুকে যাওয়ার অবস্থা।
ইমারজেন্সি ব্রেক! চেঁচিয়ে বলল কিশোর।
সাংঘাতিক জোরে চলছে, জবাব দিল মুসা। কোন কাজই করবে না এখন!
তাহলে? রবিনও চিৎকার করেই বলল।
সামনে রাস্তা হয়তো ভাল, আশা করল কিশোর। ঝকির চোটে দাঁতে দাতে বাড়ি লাগছে তার।
গিয়ার নামানোর চেষ্টা করে দেখি, মুসা বলল।
ঘাম ফুটেছে মুসার কপালে। শক্ত করে চেপে ধরল স্টিকটা। দ্বিধা করল। পরক্ষণেই একটানে তৃতীয় গিয়ার থেকে নামিয়ে নিয়ে এল দ্বিতীয় গিয়ারে।
হঠাৎ এই পরিবর্তনে চাপ পড়ল ইঞ্জিনে, বিকট আর্তনাদ করে প্রতিবাদ জানাল। জোরে একবার দুলে উঠল গাড়ি, গতি কমে গেল।
খবরদার! চিৎকার করে উঠল রবিন, বাঁক! সামনে ডানে মোড় নিয়ে। পাহাড়ের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেছে পথটা।
তীব্র গতিতে মোড় নেয়ার সময় গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল তিনজনেই। বৃষ্টিতে ধুয়ে মাটি ক্ষয়ে গিয়ে গাছের শেকড় বেরিয়ে আছে পাহাড়ের গা থেকে, লম্বা আঙুল বাড়িয়ে দিয়ে যেন চাকা আটকে গতি রোধ করতে চাইছে গাড়ির।
ডানে কাটল মুসা, পাহাড়ের দিকে।
কি করো! আঁতকে উঠে বলল রবিন।
পাহাড়ের গায়ে লাগিয়ে দিই! দেখি থামে কি না! জবাব দিল মুসা।
ঝটকা দিয়ে খাজ থেকে উঠে এল চাকা।
দেখো, আস্তে আস্তে! কিশোর বলল।
পথের কিনারে স্তূপ হয়ে আছে ধসে পড়া মাটি, ছোট ছোট পাথর। ঘ্যাঁচ করে ওগুলোর মধ্যেই ঢুকে গেল গাড়ি।
স্টিয়ারিং নিয়ে পাগল হয়ে গেছে যেন মুসা। হাত থেকে ছুটে যেতে চাইছে। বার বার। লাফাচ্ছে, ঝাঁকি খাচ্ছে, থরথর করে কাঁপছে পিকআপ।
আবার পাহাড়ের দেয়ালের দিকে গাড়ির নাক ঘোরানোর চেষ্টা করল মুসা। দেরি করে ফেলল। আলগা পাথরে পিছলে গিয়ে আবার খাজের মধ্যে পড়ল চাকা।

মরলাম আবার! মুসা বলল।
খাঁজ ধরে ছুটতে ছুটতে পরের বাকটার কাছে চলে এল গাড়ি, উড়ে পেরিয়ে এল যেন।
আরি! বলে উঠল রবিন, ওড়াল দেবে নাকি!
সামনে একটা ছোট পাহাড় দেখা গেল। ঢালটা খুব ধীরে ধীরে ওপরে উঠেছে, খাড়াই কম।
এইবার আরও মরলাম! ঘামে চকচক করছে কিশোরের মুখ।
গর্জন করতে করতে তীব্র গতিতে পাহাড়ের গোড়ার দিকে ধেয়ে গেল গাড়ি। উঠতে শুরু করল ঢাল বেয়ে। যেন সাগরের উথাল পাথাল ঢেউয়ে পড়েছে, দোল খেতে লাগল। ভয়াবহ গতিবেগ অব্যাহত রেখেছে।
স্টিয়ারিং ছাড়ছে না মুসা। চেপে ধরে রেখেছে প্রাণপণে। খোলা জানালার কিনার খামচে ধরেছে রবিন, যেন সারা জীবনের জন্যে ধরেছে, ছাড়ার ইচ্ছে নেই। দুজনের মাঝে বসে দরদর করে ঘামছে কিশোর। এক হাতে ড্যাশবোর্ডে, আরেক হাত ছাতে ঠেকিয়ে চাপ দিয়ে আটকে রাখার চেষ্টা করছে নিজেকে।
অনেক পেছনে সরে গেছে আগের পাহাড়টা। সামনে পথের দুধারে ঘন হয়ে জন্মেছে ঝোপঝাড়। ওপরে উঠতে গিয়ে ধীরে ধীরে গতি কমে আসছে পিকআপের।
কিছুটা স্বস্তি বোধ করল তিন গোয়েন্দা। চূড়াটা.মালভূমির মত সমতল হয়ে। থাকলে হয়তো থেমে যাবে গাড়ি…
সর্বনাশ! গাড়ি চূড়ায় পৌঁছতেই চিৎকার করে উঠল কিশোর।
গতি অনেকটা কমেছে, কিন্তু তারপরেও যা রয়েছে, অনেক। চূড়াটা সমতল নয়। লাফ দিয়ে চূড়া পেরোল গাড়ি, আঁকুনিতে হাড়গোড় সব আলাদা হয়ে যাবে বলে মনে হলো অভিযাত্রীদের, ওপাশের ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল। গতি বেড়ে গেছে আবার। সাট সাট করে পাশ দিয়ে উড়ে চলে যাচ্ছে যেন গাছপালা।
গাড়িটাকে বাগে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করছে মুসা। এরই মাঝে চিৎকার করে সঙ্গীদেরকে হুঁশিয়ার করল, শক্ত হয়ে বসে থাকার জন্যে।
কিন্তু থাকাটা মোটেও সহজ নয়। সীটবেল্ট নেই। ঝটকা দিয়ে দিয়ে এদিকে কাত হয়ে পড়ছে, ওদিকে কাত হয়ে পড়ছে, লাফ দিয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে। গাড়িটার যেন ম্যালেরিয়া হয়েছে, এমনই কাঁপুনি। সেই সঙ্গে নাচানাচি তো আছেই। আবার খাজের মধ্যে পড়ে গেছে চাকা।
নাহ, আর বাঁচোয়া নেই! কিশোর বলল, খুলে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। বডি!
তাই তো মনে হচ্ছে! জানালার ধার থেকে হাত সরায়নি রবিন।

হঠাৎ রাস্তার ডানপাশটা অদৃশ্য হয়ে গেল। গাছের মাথা চোখে পড়ছে, বেরিয়ে আছে নিচে থেকে, পথের ওপরে এসে পড়েছে ডাল পাতা। খানিক পরে আর তা-ও থাকল না। একশো ফুট নিচে খাড়া নেমে গেছে ওখানে পাহাড়ের দেয়াল, ঢাল নেই যে গাছ জন্মাবে। নিচে জন্মে রয়েছে পাইন, কাঁটাঝোপ। মাঝে মাঝে বেরিয়ে আছে পাথরের চাঙড়। ওগুলোর কোনটায় গিয়ে যদি আছড়ে পড়ে গাড়ি, ছাতু হয়ে যাবে।

যে খাজকে এতক্ষণ গালাগাল করছিল মুসা, সেটাকেই এখন আশীর্বাদ বলে। মনে হচ্ছে। বের করার তো এখন প্রশ্নই ওঠে না, ভেতরে রাখার জন্যেই যেন যত চিন্তা।

এই দেখো দেখো! উত্তেজিত হয়ে চিৎকার করল মুসা।

সামনেই দেখা গেল ওটা, ওদের এই দুঃস্বপ্ন-যাত্রার অবসান ঘটাতেই যেন। মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে গ্র্যানিটের উঁচু দেয়াল। পুব থেকে পশ্চিমে বিস্তৃত। ডানে মোড় নিয়ে ওটার পাশ দিয়ে চলে গেছে পথ। যে গতিতে চলছে, যদি নাক ঘোরাতে না পারে, যদি সোজাসুজি গিয়ে...আর ভাবতে চাইল না মুসা। বলল, গাড়ির পাশটায় ঘষা লাগালে কেমন হয়? থেমেও যেতে পারে।

পাগলামি! স্রেফ পাগলামি! বিড়বিড় করে বলল কিশোর। গাড়ির পাশ ছিঁড়ে খুলে রয়ে যাবে!

আর ঘষা লাগলেই আগুনের স্ফুলিঙ্গ ছুটবে, বলল রবিন। একটা কণা যদি গিয়ে লাগে ট্যাঙ্কে, ব্যস, ভ্রম!

আর কোন ভাল বুদ্ধি দিতে পার? রেগে গিয়েই বলল মুসা।

চুপ হয়ে গেল রবিন আর কিশোর। গাড়িটাকে রোখার আর কোন উপায়ই বলতে পারল না। পথের বাঁয়ে যেন আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে গ্র্যানিটের দেয়াল, চোখ বড় বড় করে সেদিকে তাকিয়ে রয়েছে দুজনে।

খেপা জানোয়ারের মত গর্জন করতে করতে ছুটছে ফোর্ড। জোরাজুরি করে আরও একবার খাজ থেকে চাকা তুলে আনল মুসা।

ঘাঅ্যাস করে দেয়ালে ঘষা লাগল পিকআপের এক পাশ। ঝনঝন করে উঠল। শরীর। আগুনের ফুলকি ছিটাল একরাশ।

চেঁচিয়ে উঠল রবিন।

আর কোন দিকে নজর নেই মুসার, দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে ধূসর দেয়ালের দিকে। আবার সামান্য বাঁয়ে স্টিয়ারিং কাটল সে। এ্যানিটে ঘষা খেল পিকাপের নাক। আবার ফুলকি ছুটল। আবার লাগাল। আবার ফুলকি।

গাড়ির ভেতরে টানটান উত্তেজনা।

যা করছ করে যাও, কিশোরও বুঝতে পারছে এছাড়া আর কোন উপায় নেই।

পারবে! আশা বাড়ছে রবিনের। মনে হচ্ছে পারবে এভাবেই। চালিয়ে যাও।
সাহস পেল মুসা। আবার কাটল স্টিয়ারিং। দেয়ালে তো লাগাল পিকআপ, এ্যানিটে ঘষা লেগে ছেড়ে যাওয়ার সময় তীক্ষ্ণ আর্তনাদ তুলল গাড়ির ধাতব শরীর, নাগাড়ে ফুলকি ছিটিয়ে চলেছে।
দরদর করে ঘামছে তিন গোয়েন্দা।
গতি কমে এল পিকআপের। এগোনর চেষ্টা করেও পারছে না। প্রচণ্ড চাপে গুঙিয়ে উঠছে বডি।
অবশেষে থামতে বাধ্য হলো গাড়ি। ইঞ্জিন চলছে। বন্ধ করে দিল মুসা। বা দিকের সামনের ফেণ্ডার ঠেকে রয়েছে দেয়ালে।
সীটে হেলান দিয়ে জোরে জোরে দম নিচ্ছে তিন গোয়েন্দা। হঠাৎ যেন বড় বেশি নীরব হয়ে গেছে সব কিছু। বাতাসে ধুলোর ঘূর্ণি। কেউ নড়ছে না, কোন, কথা বলছে না।
শেষে ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে কিশোর বলল, মুসা, গাড়িটা তো গেল!
দামটা দিয়ে দিতে হবে! বলল রবিন।
ভাল ড্রাইভার বলে তোমার সুনাম আর থাকবে না!
কোন কথারই জবাব দিল না মুসা। কেবল ঘুরে তাকাল দুই বন্ধুর দিকে।
তবে যত যা-ই হোক, হেসে মুসার কাঁধ চাপড়ে দিয়ে বলল কিশোর, তোমাকে ধন্যবাদ দেয়ার ভাষা আমাদের নেই।
দেখালে বটে! রবিনও হাসল। চাপড় দিল মুসার বাহুতে।
হাসতে আরম্ভ করল মুসা। বাচলাম তো, কিন্তু বাঁচার আনন্দে সারাদিন বসে থাকলে চলবে না। কতটা ক্ষতি হয়েছে দেখা দরকার।
নেমে পড়ল ওরা।
বডির বাঁ পাশে রঙ বলতে আর কিছু নেই, ঘষা খেয়ে উঠে গেছে। মরচেও নেই। চকচক করছে ইস্পাত। লম্বা কাটা রয়েছে অনেকগুলো। ধারাল পাথরে লেগে ওই অবস্থা হয়েছে। দরজার হাতলটা গায়েব। সামনের ফেণ্ডারের একটা মাথা বেঁকে গেছে।
চমৎকার! ফিরে এসে আবার গাড়িতে উঠল মুসা।
তার পেছনে এল কিশোর।
মেঝেতে প্রায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল মুসা। মাথা চলে গেছে স্টিয়ারিং হুইলের নিচে। ফুট পেড়ালের রডটা পরীক্ষা করল। একটা বোল্ট তুলে নিল মেঝে থেকে।
কি ব্যাপার? অধৈর্য কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল কিশোর।
স্টিয়ারিঙের নিচ থেকে বেরিয়ে এসে মাথা তুলল মুসা। নীরবে বোল্টটা তুলে দিল কিশোরের হাতে।

কিশোরও ভাল করে দেখল জিনিসটা। লোহাকাটা করাতের দাগ দেখতে পেল ওতে। অনেকটাই কেটেছে। দেখে তুলে দিল রবিনের হাতে। ব্রেক কেন কাজ করছিল না, বোঝা গেল এতক্ষণে।
ঠিক, আঙুল তুলল মুসা। ব্রেক পেডাল একটা শ্যাফটের সঙ্গে লাগানো থাকে, যেটার সঙ্গে মাস্টার সিলিণ্ডারের যোগাযোগ। পেডালে চাপ দিলেই সিলিণ্ডারের পিস্টন ব্রেক লাইনের ব্রেক ফ্লুইডের ওপর চাপ বাড়ায়...
আসল কথা বলো, বাধা দিয়ে বলল রবিন, কি বলতে চাও?
বলছি, বলছি। শ্যাফটের সাথে পেডালটাকে আটকে রাখতে এই বোল্টটা দরকার।
এবং কেউ এটাকে এমন ভাবে কেটে রেখেছে, যোগ করল কিশোর, যাতে বেশি জোরে চাপ পড়লেই ভেঙে যায়।
তা-ই করেছে, মাথা দোলাল মুসা।
গুঙিয়ে উঠল রবিন। ওর বাবাকে খুঁজতে যাওয়ার পথে আবার বিরাট বাধা এসে হাজির।
একে অন্যের দিকে তাকাতে লাগল তিনজনে।
কে করল কাজটা? রবিনের প্রশ্ন।
ইনডিয়ানদেরই কেউ হবে, জবাব দিল কিশোর।
মোড়ল? নিজেকেই যেন প্রশ্ন করল মুসা। আমাদের পছন্দ করেনি, এটা বোঝা গেছে তখনই। কিন্তু এতটাই অপছন্দ যে খুন করার চেষ্টা করল?
জন করেনি তো? ভুরু কোঁচকাল রবিন।
কিংবা মালটি? বলল কিশোর।
নাহ, ও করবে বলে মনে হয় না, মুসা বলল।
যে-ই করে থাকুক, রবিন বলল, সাহায্যের জন্যে আর ওখানে যাওয়া যাবে না।
প্রশ্নই ওঠে না, বলল কিশোর। খুন করতে চেয়েছিল আমাদের, আবার যাব? যেতে হবে ডায়মণ্ড লেকে, যে করেই হোক। ব্রেকটা ঠিক করতে পারবে?
নতুন একটা বোল্ট পেতে পারি। কিন্তু পাব কোথায়?
ট্রাকের ভেতরে খুঁজে এল সে আর রবিন। কিছুই পেল না। একটা জ্যাকও না, সাধারণত যে টুলসটা সব গাড়িতেই রাখা হয়।
সেসনাতে পাওয়া যাবে না তো? মুসার দিকে তাকিয়ে বলল কিশোর, পেছনের জিনিসপত্রের মাঝে টুলস দেখেছি বলে মনে পড়ে। বলেই আর দাঁড়াল না। পাহাড়ের দিকে রওনা হয়ে গেল।
হাঁ করে ওর দিকে তাকিয়ে রইল মুসা আর রবিন।
আরি, ওই পাহাড়টাই তো! অবাক হয়ে প্রায় চিৎকার করে বলল মুসা।

মনে তো হচ্ছে, ওর দিকে না তাকিয়েই বলল কিশোর। ওটা ধরে তৃণভূমিতে যেতে পারব আমরা, বোল্ট নিয়ে ফিরে এসে ব্রেক মেরামত করে চলে যাব ডায়মণ্ড লেকে, সাহায্য নিয়ে খুঁজতে বেরোব আঙ্কেলকে। খুব সহজ ভাবেই কথাগুলো বলল বটে কিশোর, কিন্তু আবার পাহাড় ডিঙিয়ে যাওয়ার কথা ভাবতেই সিটিয়ে গেল মন। আরেকবার ওই ভয়ানক পরিশ্রম করতে মন চাইছে না।

ট্রাকের পেছন থেকে পানির বোতলটা নামিয়ে আনল রবিন। যার যার জ্যাকেট কোমরে জড়িয়ে নিল, ঠাণ্ডা পরলে গায়ে দেবে। এগিয়ে গেছে কিশোর। তার পেছনে চলল দুজনে। যে পথে এসেছে ওই পথ ধরেই পাহাড় বেয়ে উঠতে হবে। পিকআপের ঘষায় গ্র্যানিটের দেয়ালের গভীর আঁচড়গুলো দেখতে পেল ওরা। এক জায়গায় পড়ে থাকতে দেখল দরজার হাতলটা। এক লাথিতে রাস্তার পাশের এক ঝোপে পাঠিয়ে দিল ওটাকে রবিন।

কিছুদূর এগোনোর পর যেখানে রাস্তাটা দক্ষিণে ইনডিয়ানদের গায়ের দিকে চলে গেছে, সেখানে এসে পশ্চিমে মোড় নিয়ে বনের ভেতরে ঢুকে পড়ল ওরা।

খানিক পরেই ঘন হয়ে এল পাইন, উঁচু মাথাগুলোর ওপরটা বাঁকা হয়ে আছে। ধনুকের মত। পাখি ডাকছে প্রচুর। হালকা বাতাস দোলা দিয়ে গেল ডালে ডালে। বাইরে বিকেলের রোদ, অথচ বনের ভেতরে এখানে বেশ ছায়া, ঠাণ্ডাও।

হঠাৎ গুলির শব্দ হলো।

মুসার কানের পাশ দিয়ে চলে গেল বুলেট। থ্যাক করে বিধল একটা গাছে। কলরব করে উড়ে গেল একঝাঁক পাখি।

গুলির পর পরই ঝাঁপ দিয়েছে তিনজনে। উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েছে মাটিতে।

আবার গুলি হলো। মাথার ওপর দিয়ে বাতাস কাটার শব্দ তুলে বেরিয়ে গেল বুলেট। শুয়ে শুয়েই তাকাল ওরা পরস্পরের দিকে।

কেউ গুলি করছে ওদের লক্ষ করে!

গেল কোথায়? পেছনের বন থেকে বলল একটা কর্কশ কণ্ঠ।

দাঁড়িয়ে পড়লে কেন আবার? এস...অ্যাই ডক, বলল আরেকটা কণ্ঠ, খুঁজে বের করতে হবে ওদের। ঘন গাছপালার ভেতরে কথা বললে শব্দটা ঠিক কোনখান থেকে আছে বোঝা মুশকিল।

আমাদের গুলি করল কেন? মাটিতে গাল ঠেকিয়ে ফিসফিস করে বলল রবিন।

জানি না, ফিসফিস করেই জবাব দিল কিশোর। সেটা জানার চেষ্টা করতে যাওয়াটাও এখন গাধামি। এক মুহূর্ত চুপ থেকে বলল, এখানে পড়ে থাকাটা ঠিক না। খুঁজে বের করে ফেলবে।

অন্য দুজনও একমত হয়ে মাথা ঝাঁকাল। নিঃশব্দে উঠে পড়ল তিনজনে।

জলদি করো! পাইনের ভেতর দিয়ে চলার জন্যে তাগাদা দিল মুসা।

শব্দ না করে যতটা জোরে চলা সম্ভব তার পেছনে পেছনে চলল রবিন আর কিশোর। একপাশে রয়েছে এখন পাহাড়টা। তৃণভূমিটা পড়বে সামনে। সেদিকেই চলেছে ওরা।
আবার হলো গুলির শব্দ। ঝরঝর করে ওদের মাথায় ঝরে পড়ল পাইন নীড়ল।
ঝট করে বসে পড়ল আবার গোয়েন্দারা। চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে সরে এল বিরাট এক পাথরের চাঙরের আড়ালে।
গেল কই? ঘোৎ ঘোঁৎ করে উঠল আবার ডকের কণ্ঠ। পেছনের ঘন জঙ্গলে রয়েছে।
বিচ্ছু! একেবারে বি্চছু একেকটা! বলল দ্বিতীয় কণ্ঠটা।
ভারি পায়ে হাঁটছে লোক দুজন। সাবধান হওয়ার প্রয়োজনই বোধ করছে না। পায়ের চাপে মট করে ভাঙল শুকনো ডাল।
এদিকেই আসছে দেখে আবার উঠে পড়ল মুসা। পাইনের ভেতর দিয়ে প্রায় ছুটে চলল।
ওই, ওই যে! চেঁচিয়ে উঠল ডক। মার, মার!
গুলির শব্দ হলো। ছুটে এসে গোয়েন্দাদের আশপাশের মাটিতে বিধতে লাগল। বুলেট। ছিটকে উঠল মাটি।
দৌড় দাও! চেঁচিয়ে উঠল মুসা।
ছায়ায় ছায়ায় ছুটছে সে। পেছনে লেগে রয়েছে কিশোর আর রবিন। যাতে পথ না হারায় সেজন্যে পাহাড়টাকে নিশানা করে রেখেছে। সব সময়ই এক পাশে রেখেছে ওটাকে। হাঁপাতে আরম্ভ করেছে কিশোর। মনে মনে গাল দিচ্ছে নিজেকে। কয়েক দিন ব্যায়াম করেনি, অবহেলা করে, তার ফল পাচ্ছে এখন।
ঘন একটা ম্যানজানিটা ঝোপ দেখে তার আড়ালে এসে লুকাল ওরা।
ওদের দেখেছ? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
না, মাথা নাড়ল রবিন। মাথা থেকে বাবার ক্যাপটা খুলে একহাতে নিল, আরেক হাতে মুখের ঘাম মুছল। তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে, না কিশোর? টমেটোর মত লাল হয়ে গেছে মুখ।
আক্কেল হচ্ছে! ব্যায়াম বাদ দিয়েছি, আনফিট হয়ে গেছে শরীর। যাবেই।
চলো, আবার তাড়া দিল মুসা। এখানে থাকলে ধরা পড়ে যাব।
ছায়ায় ছায়ায় আবার ছুটতে লাগল তিনজনে।
খসাতে পেরেছি? আরও কিছু দূর আসার পর রবিন বলল।
হয়তো, জবাব দিল কিশোর, ঠিক বলা যাচ্ছে না!
ছেড়ে দেয়ার পাত্র নয় ওরা, মুসা বলল, কথা শুনে তো তাই মনে হলো।

পশ্চিমে এগিয়ে চলল তিন গোয়েন্দা। পাহাড়টাকে আগের মতই এক পাশে। রেখেছে। যতটা সম্ভব গাছপালার ভেতরে থাকার চেষ্টা করছে। খোলা জায়গায় একদম বেরোচ্ছে না।
আরও মাইল দুই একটানা হাঁটল ওরা। পেরিয়ে এল প্রচুর বুনো ফুল, ঘন পাইনের জটলা, পাথরের চাঙড়, আর সেই টলটলে পানির ঝর্নাটা, যেটা থেকে পানি ভরেছিল রবিন।
আর কদ্দূর? মুসা জানতে চাইল।
ঠিক পথেই এগোচ্ছি মনে হচ্ছে, কিশোর বলল। আর বেশিক্ষণ লাগবে না।
মিনিটখানেক জিরিয়ে নিয়ে আবার হাঁটতে লাগল ওরা।
ওই যে! হাত তুলে দেখাল মুসা।
বিশাল তৃণভূমিটার দক্ষিণ পাশ দিয়ে বন থেকে বেরোল ওরা।
প্লেনটা কোথায়? বলে উঠল কিশোর।
তাকিয়ে রয়েছে তিনজনেই। চমকে গেছে। সেসনাটা নেই। ভাঙা ডানাটাও গায়েব! এ কি করে হয়?
দাঁড়াও, হাত তুলে অন্য দুজনকে এগোতে বারণ করল মুসা। সাবধানে গলা লম্বা করে তাকাল সামনের দিকে। আছে। লুকিয়ে রাখা হয়েছে ওটাকে!
তাই তো! বলল রবিন, ডালপাতা দিয়ে ঢেকে ফেলেছে! দেখো, আমাদের এস ও এসটাও নেই!
ওপর থেকে যাতে কেউ না দেখতে পায়, মুসা বলল।
বুঝলে, ধীরে ধীরে বলল কিশোর, কেউ আছে এখানে, যে আমাদেরকে পছন্দ করতে পারছে না।
তা তো বুঝতেই পারছি, রবিন বলল। কিন্তু কে? কেন?
পথ হারিয়েছ নাকি তোমরা? বলে উঠল ভারি একটা কণ্ঠ।
চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরল তিনজনে।
বিশালদেহী একজন মানুষ দাঁড়িয়ে। সোনালি চুল, চোখে বড় বড় কাঁচওয়ালা একটা সানগ্লাস। দক্ষিণ-পুবের বন থেকে বেরিয়ে ওদের দিকেই আসছেন।
সাহায্য লাগবে? আন্তরিক হাসি হাসলেন তিনি। পরনে খাকি পোশাক, পিঠে বাধা ব্যাকপ্যাক, ডান কাঁধে ঝোলানো চামড়ার খাপে পোরা রাইফেল। খাপের ঢাকনাটা খোলা, হাঁটার তালে তালে গায়ের সঙ্গে বাড়ি খাচ্ছে।
কোত্থেকে এলেন আপনি? জানতে চাইল মুসা। বেশ অবাক হয়েছে।
শিকারে বেরিয়েছি, জবাব দিলেন লোকটা। কপালটা আজ খারাপ, কিছুই পাইনি। এদিকটায় আগে আর. আসিনি। সিয়েরার এই এলাকা আমার কাছে। নতুন। মোটা, মাংসল একটা হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি। মুসার মনে হলো

ভালুকের থাবা। আমার নাম ফ্রাঙ্কলিন জোনস। আবার হাসলেন তিনি। হাত মেলালেন তিন গোয়েন্দার সঙ্গে। ওরা পরিচয় দিল নিজেদের।
পরিচয়ের পর প্রথম কথাটাই জিজ্ঞেস করল রবিন, আপনার গাড়ি আছে, মিস্টার জোনস?
আছে, মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন জোনস। উঁচু পাহাড়টা দেখালেন হাতের ইশারায়, ওদিকটায়। অনেক দূরে। কাঠ নেয়ার একটা কাঁচা রাস্তা আছে উত্তরে। ডায়মণ্ড লেকে যাওয়ার হাইওয়েতে গিয়ে পড়েছে।
হোক দূর, হেঁটে যেতে কোন আপত্তি নেই আমাদের। চলুন।
এক মিনিট, জোনস বললেন, তোমাদেরকে লিফট দিতে আমারও আপত্তি নেই। কিন্তু জানতে হবে, দেয়াটা কতখানি জরুরী।
বিমান দুর্ঘটনা আর তার বাবার নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার কথা জানাল রবিন। শেষে বলল, তাড়াতাড়ি চলুন। বাবা কি অবস্থায় আছে কে জানে!
আর কিছু ঘটেনি তো? একটু আগে বুনের ভেতর গুলির শব্দ শুনেছি।
চট করে দুই সহকারীর দিকে তাকিয়ে নিল কিশোর। ওদের পেছনেই লেগেছিল লোকগুলো, গুলি করে মারতে চেয়েছিল, জোনসকে একথা বললে হয়তো তিনি ভয় পেয়ে যাবেন, ওদের আর লিফট দিতে রাজি হবেন না। তাই মিথ্যে কথা বলুল কিশোর, হবে হয়তো কোন শিকারি-টিকারি।
তাড়াতাড়ি করা দরকার, তাগাদা দিল রবিন।
দ্বিধা করলেন জোনস। মনে হচ্ছে, আরও ব্যাপার আছে, তোমরা লুকাচ্ছ আমার কাছে। ঠিক আছে, বলতে না চাইলে নেই। সাহায্য আমি করব তোমাদের।
তৃণভূমির মাঝখান দিয়ে আগে আগে রওনা হলেন জোনস। সোজা এগিয়ে। চলেছেন পাহাড়ের দিকে। ডানে রয়েছে রবিন, বায়ে কিশোর, আর মুসা রয়েছে পেছনে।
আপনার নামটা পরিচিত লাগছে, কিশোর বলল, বিখ্যাত লোক মনে হয় আপনি?
নাহ, তেমন কিছু না, হাসলেন জোনস। বেকারসফিল্ডে গোটা দুই ছোট রেস্টুরেন্ট আছে আমার। এখানে তোমার বাবা কেন এসেছিল, রবিন?
মিস্টার মিলফোর্ড একজন সাংবাদিক, সেকথা জোনসকে জানাল রবিন। ডায়মণ্ড লেকে খবর সংগ্রহ করতে যাচ্ছিল, সেকথাও বলল।
সিগারেট বের করলেন জোনস। আঁতকে উঠল মুসা, এরকম অঞ্চলে সিগারেট ধরানো ভয়ানক বিপজ্জনক, দাবানল লেগে যেতে পারে। বলতে যাচ্ছিল সেকথা। কিন্তু ইশারায় তাকে চুপ থাকতে বলল কিশোর। যে সিগারেটটা বের করেছেন। জোনস, সেটাতে লম্বা ফিল্টার লাগানো, সাদা কাগজ, আর জোড়ার কাছে সবুজ বন্ধনী। যে দুটো গোড়া কুড়িয়ে পেয়েছে কিশোর, ঠিক একই রকম সিগারেটের।

জোনস নামটাও চেনা চেনা লাগছে, কিন্তু মনে করতে পারছে না কোথায় শুনেছে।
যে লোকটার কাছে যাচ্ছিল বাবা, বলছে রবিন, সম্ভবত তার নাম হ্যারিস হেরিং। পকেট থেকে বাবার নোটবুক বের করে দেখে নিল নামটা। হ্যাঁ, এই নামই। শুনেছেন নাকি নামটা কখনও?
আশ্চর্য! জোনস বললেন, সত্যিই অবাক লাগছে। ওকে চিনি না। কিন্তু আজ সকালে রেডিওতে শুনলাম, গতকাল ডায়মণ্ড লেকে যাওয়ার পথে গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করে মারা গেছে হ্যারিস হেরিং নামে এক লোক। ছুটি কাটাতে এসেছিল সে। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললে পাশের খাদে পড়ে গিয়ে আগুন ধরে যায়। গাড়িতে। সঙ্গে সঙ্গে মারা গেছে বেচারা!
তাই নাকি! নিঃশ্বাস ভারি হয়ে গেছে রবিনের।
চুপ হয়ে গেল তিন গোয়েন্দা। ভাবছে হেরিঙের মৃত্যুর কথা। জোনসের কাঁধে ঝোলানো রাইফেলের খাপের দিকে চোখ পড়ল কিশোরের। ঢাকনাটা বাড়ি খাচ্ছে বার বার। ঢাকনা ওপরে উঠলেই দেখা যাচ্ছে ভেতরের কালো ধাতব জিনিসটার শরীর। ফায়ার আর্মস সম্পর্কে আগ্রহ আছে তার। পড়াশোনা করেছে। রাইফেলটার আকারটা আর দশটা রাইফেলের মত নয়, পেটের কাছটায় ফোলা। শক্তিশালী অস্ত্র।
বুঝতে পারছি তোমরা আর মিস্টার মিলফোর্ড ইমপরট্যান্ট লোক, জোনস বললেন। তোমরা যে এখানে আছ কে কে জানে?
রবিন আর কেউ না বলে দেয়ার আগেই তাড়াতাড়ি জবাব দিয়ে দিল কিশোর, অল্প কয়েকজন। তাদের মধ্যে খবরের কাগজের লোকও রয়েছে।
তাই নাকি, রবিন? রবিনের দিকে ফিরে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন জোনস।
তার মাথাটা যখন আরেক দিকে ঘুরে গেছে, খাপের ডালা তুলে ভেতরের জিনিসটা ভালমত দেখার চেষ্টা করল কিশোর।
খচখচ করছে তার মন। সিগারেটের ব্যাপারটা কাকতালীয়, একথা কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। মনে পড়েছে, ইনডিয়ানদের গায়ে লাঞ্চ খাবার সময় যে বাক্সগুলোকে ডিনার টেবিল হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল, ওগুলোতে জোনস। ট্রাকিং কোম্পানির নাম লেখা ছিল দেখেছে। একটা কুঁড়ের সামনে ফেলে রাখা সমস্ত বাক্সতে দেখেছে একই নাম ছাপ মারা। ওই কুঁড়েতে দেখা গেছে হালকাপাতলা লোকটাকে, যার সঙ্গে কথা বলেছিলেন মোড়ল, যে ইশারায় মালটিকে জানিয়েছে গাড়ি তৈরি। তার মানে মিথ্যে কথা বলেছেন জোনস, এর আগেও তিনি এসেছেন এই অঞ্চলে। ঘন ঘন এসেছেন।

আড়চোখে কিশোরের দিকে তাকাল রবিন। রাইফেল কেসের ভেতরে দেখার চেষ্টা করছে কিশোর, এটা দেখে অবাক হলো সে। দ্রুত একবার চোখ মিটমিট করেই সামলে নিল। কিশোরকে সাহায্য করা দরকার এখন। মুখে মধুর হাসি ফুটিয়ে তুলে জোনসের দিকে তাকাল সে। কিশোরের কথাই সমর্থন করে জবাব দিল তার প্রশ্নের, হ্যাঁ, জানে। আমাদের যাওয়ার কথা সিটি এডিটরকে জানিয়েছে। বাবা। ম্যানেজিং এডিটরকেও জানিয়ে রেখেছে, কারণ হোটেলের বিলগুলো ওই মহিলাকেই শোধ করতে হবে।

পাশে কাত হয়ে ঝুঁকে এসেছে, খাপের ভেতর উঁকি দেবে এই সময় আচমকা দাঁড়িয়ে গেলেন জোনস।

ঝট করে খাপ থেকে হাত সরিয়ে আনল কিশোর। ঝুঁকে জুতোর ফিতে বাঁধার ভান করল, যেন খুলে গেছে ওটা।

শেষবারের মত লম্বা একটা টান দিয়ে জ্বলন্ত সিগারেটটা মাটিতে ফেলে জুতো দিয়ে পিষে মারলেন জোনস। এরকম জায়গায় সিগারেটের গোড়া ফেলাটা যেন সইতে পারল না মুসা, অনেক সময় জুতো দিয়ে থেঁতলানো সিগারেটেও আগুন থেকে যায়, পুরোপুরি নেভে না, আর সেটা থেকে সৃষ্টি হয় আগুন, বিড়বিড় করে এসব কথা বলে নিচু হয়ে গোড়াটা তুলে নিয়ে পকেটে রেখে দিল, নিরাপদ জায়গায় নিয়ে গিয়ে ফেলবে বলে।

তোমরা কখন যাচ্ছ বলা হয়েছে? আবার হাঁটতে আরম্ভ করেছেন জোনস। উঁচু, ধূসর দেয়ালটার কাছে প্রায় পৌঁছে গেছেন তারা।

গতকালই যাওয়ার কথা ছিল, রবিন বলল। বুঝে ফেলেছে, জোনসকে বিশ্বাস করতে পারছে না কিশোর, কাজেই সেই মতই কথা বলতে লাগল গোয়েন্দা সহকারী।

রবিনের দিকে তাকিয়ে তার সঙ্গে কথা বলছেন জোনস, এই সুযোগে আরেকবার ডালা তুলে ভেতরে দেখার চেষ্টা চালাল কিশোর। হেসে ঠাট্টা করে মাঝে মাঝেই মুসা বলে ওকে, পকেটমার হলেও তুমি উন্নতি করতে পারতে। বাপরে বাপ, কি হাত সাফাই! আসলেই, কাজটা খুব ভাল পারে গোয়েন্দাপ্রধান। অনেক সময় বাজি ধরে মুসা আর রবিনের পকেট মেরে দিয়েছে, টেরই পায়নি। ওরা।

তাহলে তো তোমাদেরকে খুঁজতে কাউকে পাঠাবেই ওরা, জোনস বললেন।

খাপের ভেতরে দেখার জন্যে সাবধানে পাশে ঝুঁকে এল কিশোর।

যে-কোন মুহূর্তে সার্চ পার্টি চলে আসতে পারে, রবিন বলল।

আরও তাড়াতাড়ি করা দরকার, মুসা বলল। ওরা এসে পড়ার আগেই আমরা চলে যেতে পারলে ঝামেলা বাঁচত। বলতে বলতে জোনসের একেবারে পাশে চলে এল সে, কিশোরের কাছে, সে-ও দেখার চেষ্টা করল খাপের ভেতরে কি আছে।

রাইফেলের ওপরের ক্যারিইং হ্যাঁণ্ডেল দেখতে পেল কিশোর। অস্ত্রটার অস্বাভাবিক আকৃতির মানে বুঝে ফেলল।
হঠাৎ আরেকবার দাঁড়িয়ে গেলেন জোনস।
এই কি করছ! রাগত গলায় বললেন তিনি। বলেই কিশোরের হাতটা চেপে ধরে এক ঝটকায় সরিয়ে দিলেন। পিছিয়ে গেলেন এক পা। সরু হয়ে এল চোখের পাতা। খাপ থেকে টান দিয়ে বের করে নিলেন রাইফেল।
হু, যা ভেবেছি, বিড়বিড় করল কিশোর, এম সিক্সটিন! খাপটা তৈরিই হয়েছে এভাবে, যাতে এম-১৬ রাইফেলের বিশেষ হ্যাঁণ্ডেল, পিস্তল গ্রিপ আর ফোলা ম্যাগাজিন জায়গা হয়ে যায়।
কি বলো? কিশোরের দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচাল রবিন।
এম সিক্সটিন প্রথম ব্যবহার করা হয়েছিল ভিয়েতনামের যুদ্ধে, বলতে থাকল। কিশোর, দুরুদুরু করছে বুক। এখন পৃথিবীতে বেশ জনপ্রিয় অস্ত্র এটা। তবে এগুলো ব্যবহার হয় মানুষ শিকারের জন্যে, জানোয়ার নয়। কে আপনি, মিস্টার, জোনস? আমাদেরকে নিয়ে কি করার ইচ্ছে?
চেয়েছিলাম ভাল কিছুই করতে, জবাব দিলেন জোনস, তোমরা তা হতে দিলে না। বেশি ছোঁক ছোঁক করলে তার ফল ভাল হয় না কোনদিনই। আর কোন উপায় রাখলে না আমার জন্যে। যাও, পাহাড়ে চড়। আমার সঙ্গেই যেতে হচ্ছে। তোমাদের।

.

এই, এসো তোমরা, মিনমিন করে বলল কিশোর, মিস্টার জোনসের মাথা গরম করে দিয়ে লাভ নেই। পাহাড়ের দিকে এগিয়ে চলল সে।
কিশোরের দিকে তাকিয়ে তার এই আচমকা পরিবর্তনে অবাক হয়ে গেল রবিন আর মুসা। কি করতে চাইছে? ভাল অভিনেতা কিশোর পাশা। ছোট বেলায় মোটোরামের অভিনয় করে বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিল। অভিনয় যে করছে বোঝাই মুশকিল, মনে হয় এক্কেবারে স্বাভাবিক। তবু, যেহেতু চেনে ওকে, দুই সহকারীর মনে হলো, এই মুহূর্তে অভিনয়ই করছে সে।
হাঁট! শীতল কঠিন গলায় আদেশ দিল সোনালিচুল লোকটা।
হাঁটতে লাগল রবিন আর মুসা। পেছনে রাইফেল তাক করে ধরে এগোল জোনস।
মিস্টার মিলফোর্ডের কাছেই নিয়ে যাচ্ছেন তো আমাদের? ফিরে না তাকিয়েই জিজ্ঞেস করল কিশোর।
চুপ! ধমক দিয়ে বলল জোনস, কোথায় নিয়ে যাব সেটা আমার ব্যাপার। একদম চুপ!।

আপনিই তাহলে আমার বাবাকে কিডন্যাপ করেছেন? বিশ্বাস করতে পারছে না রবিন। কেন করলেন?
তোমাদের মতই ছোঁক ছোঁক করছিল, বিশেষ করে তোমার ওই বন্ধুটির মত, কিশোরকে দেখিয়ে বলল জোনস। সেজন্যেই আটকাতে হল। লাভ হয়নি কিছুই। একটা কথাও বের করতে পারিনি মুখ থেকে।
নীরবে পশ্চিমমুখো হেঁটে চলল ওরা। পাহাড়ে চড়ার জন্যে একটা সুবিধেমত জায়গা খুঁজছে। জোরে জোরে হাঁপাচ্ছে কিশোর, জিভ বের করে ফেলবে, যেন কুকুরের মত। এত জোরে হাঁটাবেন না আমাদেরকে, প্লীজ! অনুনয় করে বলল।
হাঁট! আবার ধমক লাগাল জোনস। আস্তে যাওয়া চলবে না!
হাউফ! করে মুখ দিয়ে বাতাস ছাড়ল কিশোর। শেওলায় ঢাকা একটা পাথরে পা ফেলল ইচ্ছে করেই, সড়াৎ করে পিছলে গেল পা, চিত হয়ে পড়ে গেল রবিনের গায়ে।
টলে উঠল রবিন। তাল সামলাল কোনমতে।
চোখ মিটমিট করল মুসা। পরক্ষণেই বুঝে ফেলল কি চালাকি করেছে কিশোর আর রবিন।
ভ্রূকুটি করল জোনস। দ্বিধায় পড়ে গেছে।
একটা মুহূর্তের দ্বিধা। সেটাই কাজে লাগাল মুসা। পাই করে ঘুরল। কারাতের প্রচুর প্র্যাকটিস চিতার মত ক্ষিপ্র করে তুলেছে ওকে। চোখের পলকে সোজা হয়ে গেল ভাজ করা কনুই, থাবা লাগল রাইফেলে। কারাতের হাইশু-ইউঁকি। জোর। থাবা খেয়ে একপাশে সরে গেল ভারি রাইফেলের নল।
ভাগ! ভাগ! চিৎকার করে বলল রবিন আর কিশোরকে।
পলকে যেন পায়ে হরিণের গতি চলে এল দুই গোয়েন্দার। তৃণভূমির ওপর দিয়ে ছুটল পশ্চিমের বনের দিকে।
এক লাফে সামনে চলে এল মুসা। শক্ত ঘুসি লাগাল জোনসের পুরু বুকে, কারাতের ওই-জুকি।
টলে উঠল যেন পাহাড়। পিছিয়ে গেল জোনস। ভারসাম্য হারাল। হাত থেকে রাইফেল ছাড়ল না।
বনের দিকে দৌড় দিল মুসা।
শট শট করে গাছে বিধল একঝাঁক বুলেট। বাতাসে উড়তে লাগল পাইনের নীড়ল, বাকল আর ধুলো। ভয়ে চিৎকার করে, আকাশে উড়ল পাখি। ঝাঁপ দিয়ে পড়ল তিন গোয়েন্দা। বুকে হিঁচড়ে চলে এল ঝোপের ভেতর।
ডক! হিলারি! চেঁচিয়ে ডাকল জোনস। কোথায় গেলে? আলসের দল! জুলদি বেরোও! ধর ব্যাটাদের! পালানর চেষ্টা করছে!

মাথা তুলল মুসা। তৃণভূমিতে রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে থাকা জোনসকে দেখতে পাচ্ছে। লোকটার হাতে বেরিয়ে এসেছে একটা ওয়াকি-টকি। সেটাতেই কথা বলে আদেশ দিচ্ছে।
ডক সেই দুজনের একজন, রবিন বলল ফিসফিসিয়ে, যারা বনের ভেতর তাড়া করেছিল আমাদের। গলা খুবই কর্কশ।
তাহলে হিলারি নিশ্চয় অন্য লোকটা, কিশার অনুমান করল। ওরা আমাদের খেদিয়ে নিয়ে গিয়ে জোনসের মুখে ফেলেছিল। তখনই বোঝা উচিত ছিল আমার, এত সহজে পিছ ছেড়ে দিল দেখেই। জোনসের সিগারেট আর প্যাকিং বাক্সের গায়ে লেখা নাম বিশ্লেষণ করে কি বের করেছে, দুই সহকারীকে জানাল সে।
অসম্ভব, মানতে পারল না রবিন। পিকআপটাকে স্যাবোটাজ সে করেনি। ছিলই না গাঁয়ে, কি করে করবে?
আমার বিশ্বাস, মুসা বলল, শয়তানীটা মোড়লের।
আপাতত ওসব চিন্তা বাদ, কিশোর বলল, পরে ভাবা যাবে। চলো, চলো।
বাবার কি হবে? রবিন জিজ্ঞেস করল।
একটা ব্যাপারে আমরা এখন শিওর, কিশোর বলল, জোনসের কথা থেকে। আঙ্কেল জীবিতই আছেন। আগে আমাদের এই বিপদ থেকে মুক্তি পেতে হবে। তারপর খুঁজে বের করব তাকে।
তুণভূমির দিকে তাকাল তিনজনেই। বনের দিকে তাকিয়ে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে জোনস।
গুলি বাঁচাচ্ছে ব্যাটা, কিশোর বলল। আমাদের না দেখে শিওর না হয়ে গুলি করবে না।
আস্তে করে উঠে দাঁড়াল তিনজনে। মাথা নিচু করে পা টিপে টিপে এগোল বনের দিকে।
ওই যে! ওই তো! ডকের কর্কশ কণ্ঠ শোনা গেল।
ছয় কদম দৌড়ে গিয়ে যেন হোঁচট খেয়ে দাঁড়িয়ে গেল গোয়েন্দারা।
তাকিয়ে রয়েছে আরেকটা এম-১৬ রাইফেলের দিকে।
এবার রাইফেল তাক করেছে কালো চুল, রোদে পোড়া চামড়া, নীল চোখওয়ালা একটা লোক। নলের মুখ ঘোরাচ্ছে একজনের ওপর থেকে আরেকজনের ওপর।
ধীরে ধীরে হাসি ফুটল ঠোঁটে, ঠোঁটেই রইল, মুখে ছড়াল না হাসিটা।
ধরেছি, বলল লোকটা। ওর কণ্ঠস্বরেই বুঝতে পারল গোয়েন্দারা, হিলারি।
বাঁ দিক থেকে বেরিয়ে এল আরেকজন। তার হাতেও একটা এম-১৬।
পালিয়ে বাঁচতে আর পারলে না, তিন গোয়েন্দার দিকে তাকিয়ে বলল ডক। ছোটখাট শরীর, খাটো করে ছাঁটা বাদামী চুল, ঘন ভুরু। মাথায় বুদ্ধিশুদ্ধি তেমন

নেই ছেলেগুলোর। বেপরোয়া, এই যা।
পেছন থেকে শোনা গেল জোনসের কথা, যাও, নিয়ে চল ওদের। অনেক পথ যেতে হবে।
কি বলল শুনলে তো? গোয়েন্দাদেরকে বলল ডক। হট।
শ্রাগ করল মুসা। চুপ করে রইল রবিন আর কিশোর। আদেশ পালন না করে আর উপায় নেই।
কি হলো! ধমকে উঠল ডক, দাঁড়িয়ে আছ কেন?
বলেই ভুলটা করল। মুসার পিঠে চেপে ধরল রাইফেলের নল।
গোড়ালিতে ভর দিয়ে পাক খেয়ে ঘুরে গেল মুসা। একপাশ থেকে থাবা দিয়ে ধরে ফেলল নল। ওভাবে ধরেই জোরে এক ঠেলা দিয়ে বাঁটের গুতো মারল ডকের। পেটে। হুক করে উঠল লোকটা। হা হয়ে গেছে মুখ। হাসফাস করছে বাতাসের জন্যে।
দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। পড়তে আরম্ভ করল।
রবিনও চুপ করে রইল না। ঝট করে পা সোজা করে অনেক উঁচুতে তুলে হফেলল। লাথি চালাল, কারাতের ইওকো-গেরিকিয়াজ হিলারির চোয়ালে লাগল লাথিটা। টলে উঠে পিছিয়ে গেল হিলারি। এক লাফে আগে বেড়েই আবার একই কায়দায় লাথি মারল রবিন। কাটা কলাগাছের মত ঢলে পড়ে গেল হিলারি।
এক দৌড়ে পাইনের জটলায় ঢুকে পড়ল কিশোর। বনের প্রান্তে থাকা জোনসের ওপর তার জুডোর প্র্যাকটিসটা করার ইচ্ছে। তবে শেষ মুহূর্তে পরিকল্পনা বাতিল করে দিল সে। জুডো কারাত কোনটারই দরকার পড়ল না। গাছের আড়াল থেকে শুধু একটা পা হঠাৎ বাড়িয়ে দিল সামনে। কিছুই আন্দাজ করতে পারেনি জোনস, সতর্ক ছিল না, কিশোরের পায়ে হোঁচট খেল।
ততক্ষণে মুসাও পৌঁছে গেছে সেখানে। কনুই দিয়ে অতোশি হিজি-আতি মারল জোনসের ঘাড়ে। হাত-পা ছড়িয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল মাটিতে বিশালদেহী। লোকটা।
মুহূর্ত দেরি করল না তিন গোয়েন্দা। এক ছুটে ঢুকে পড়ল জঙ্গলে।
পেছনে, গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে লাগল জোনস, ধর, ধর ওদেরকে! পালিয়ে গেল তো!
থামল না ছেলেরা। গাছের পাশ কাটিয়ে, পাথর ডিঙিয়ে ছুটে চলেছে দক্ষিণে। পেছনে শোনা যাচ্ছে ভারি জুতো পায়ে ছুটে আসার শব্দ।
ক্লান্ত হয়ে পড়ছে ওরা। হতাশা বাড়ছে, যখন দেখছে জুতোর শব্দ থামছে না, কাছেই আসছে আরও।
পশ্চিমে ঘুরে একটা কাঁচা রাস্তা ধরে ছুটল মুসা। রাস্তাটা চিনতে পারল রবিন। ঝর্না থেকে পানি ভরতে এসেছিল সেদিন এই পথেই।

একটা বুদ্ধি বের করতে হবে,হাঁপাতে হাঁপাতে বলল কিশোর। এভাবে চলে পারব না!
বাবাকেও বাঁচাতে হবে! বলল রবিন।
পেছনে উত্তেজিত চিৎকার শোনা গেল।
রাস্তাটা পেয়ে গেছে ব্যাটারা, মুসা বলল।
রাস্তা ধরে ছুটলে ঠিক এসে আমাদেরকে ধরে ফেলবে, বলল রবিন।
পিকাপের কথা ভুলে যেতে হবে আমাদের, ছুটতে ছুটতেই বলল কিশোর। মুসা, জোনস যে রাস্তাটার কথা বলেছে সেটা খুঁজে বের করতে পারবে?
কাঠ নেয়ার রাস্তা, বিড়বিড় করল মুসা, হাইওয়েতে গিয়ে যেটা পড়েছে। মালটি বলেছিল অবশ্য ওটার কথা। ইনডিয়ানদের রাস্তাটা বোধহয় ওটাতেই পড়েছে।
হ্যাঁ, মাথা দোলাল কিশোর। বনের ভেতর কিভাবে বাঁচতে হয়, জানা আছে তোমার। ইস, কেন যে তোমার মত ট্রেনিংটা নিলাম না, কাজে লাগত! বাঁচলে ফিরে গিয়ে নিশ্চয় নেব এবার…
কি করতে হবে সেকথা বলো? বাধা দিয়ে বলল মুসা।
তুমি বেশি দৌড়াতে পার। তোমার গায়ে শক্তি বেশি। বনে বেঁচে থাকার। ট্রেনিং আছে। ডায়মণ্ড লেকে গিয়ে কেউ যদি পৌঁছতে পারে, সেটা তুমি।
হয়তো পারব। কি বলতে চাও?
আমি বুঝেছি, রবিন বলল, জোনস আমাদের পিছে লেগে থাকুক, এই তো চাও?
হ্যাঁ,সায় জানাল কিশোর।
দ্রুত একবার হাত মিলিয়ে নিয়ে, গুড বাই আর সি ইউ এগেন বলে পথ থেকে সরে গেল মুসা। হারিয়ে গেল গাছপালার আড়ালে। জোনসের লোকেরা কিশোর আর রবিনকে তাড়া করে নিয়ে যাওয়ার পর আবার এসে পথে উঠবে সে, চলতে থাকবে ডায়মণ্ড লেকের উদ্দেশে।
ছুটে চলেছে কিশোর আর রবিন।
লুকিয়ে পড়ার জায়গা খোঁজা দরকার, কিশোর বলল।
উপত্যকায় চলে গেলে কেমন হয়? বিপদে পড়েছি আমরা, ইচ্ছে করে তো যাচ্ছি না। আশা করি ইনডিয়ানদের মরা দাদারা কিছু মনে করবে না।
ভাল বলেছ! ভীষণ হাঁপাচ্ছে কিশোর।
পথের একটা চওড়া জায়গায় এসে থামল রবিন। এবার আর জোনসও আসছে কিনা না দেখে যাচ্ছি না। আর গিয়ে ওর মুখে পড়তে রাজি নই।
হাসল কিশোর। তারপর হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, রবিন, আমি আর পারছি না! বসতে আমাকে হবেই!

তোমার তো সব সময়ই খালি বসা লাগে! চিৎকার করেই জবাব দিল রবিন। তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না! এরকম সময়েও...।
একটা ভুরু উঁচু হয়ে গেল কিশোরের। ভাবল, আসলেই বলছে না তো? অভিনয় বলে মনেই হলো না। বলল, পার আর না-ই পার, আমি বসছি!
চুপ হয়ে গেল দুজনে। কান পেতে রইল। তিনজনই আসছে, সন্দেহ নেই। দুপদাপ দুপদাপ শোনা যাচ্ছে ওদের পায়ের শব্দ।
সর্বনাশ হয়ে গেছে! বলে উঠল রবিন।
কী?
বোতলটা উঁচু করে ধরল রবিন।
ও, দেয়া হয়নি!
না, মাথা নাড়ল রবিন। পানির অভাবেই শেষে মরে কিনা কে জানে!
.
লুকিয়ে থেকে কিশোর আর রবিনের কথা সবই শুনতে পেল মুসা। একটু পরেই ভারি পায়ের শব্দ ছুটে চলে গেল তার পাশ দিয়ে।
মুসার কল্পনায় ভেসে উঠল, ভয়ঙ্কর এম-১৬ রাইফেলের চেহারা, যেগুলো বহন করছে জোনস আর তার সহকারীরা। দুই বন্ধুর জন্যে ভাবনা হতে লাগল। তার। জোর করে ঠেলে সরাল মন থেকে দুশ্চিন্তা। ভাবলে কাজ কিছু হবে না। এখন তাকে যা করতে হবে, তা হলো ডায়মণ্ড লেকে পৌঁছানো। নিজেদের কাঁধে। বিপদ নিয়ে তাকে মুক্ত করে দিয়েছে কিশোর আর রবিন, মস্ত ঝুঁকি নিয়েছে, এখন সে যদি কিছু করতে না পারে, সবই বিফলে যাবে।
সারাদিনে অনেক পরিশ্রম করেছে। বিশ্রাম নিতে পারলে ভাল হত। কিন্তু সময় নেই। আর এই মুহূর্তে আলস্যকে প্রশ্রয় দিলে পস্তাতে হবে। গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। পায়ের শব্দ আরেকটু এগিয়ে যাওয়ার সময় দিল। তারপর চলতে শুরু করল একটা বিশেষ ভঙ্গিতে, লাফ দিয়ে দিয়ে, এভাবে চললে গতিও বাড়বে, ক্লান্তও হবে কম। দুর্গম অঞ্চলে টিকে থাকার জন্যে ট্রেনিং নেয়ার সময় এটা শেখানো হয়েছে ওকে।
ঠাণ্ডা হয়ে আসছে আবহাওয়া। বাতাস বাড়ছে। শরশর কাঁপন তুলছে গাছের পাতায়।
জন্তুজানোয়ার চলার সরু একটা পথ ধরে এগোল সে। তৃণভূমিতে বেরিয়ে ওটার ধার দিয়ে এগোল পাহাড়ের দিকে। সাবধান থাকল। দেখেছে, ডক আর হিলারি ছাড়া জোনসের সঙ্গে আর কোন সহকারী নেই, তবু বলা যায় না। খোলা জায়গায় বেরোল না কিছুতেই, গাছের আড়ালে আড়ালে থাকল।

পাহাড়ের কাছে পৌঁছেই ওপরে উঠতে শুরু করল। নিচে থাকার চেয়ে এখন ওপরে থাকা নিরাপদ। নির্জন মালভূমিটার ওপরে উঠে হাঁপ ছাড়ল। দম নিতে নিতে তাকিয়ে দেখল নিচে কোথাও কিছু দেখা যায় কিনা। এখানেই কোথাও রবিনের বাবার ক্যাপটা পড়ে ছিল। সম্ভবত এখান থেকেই ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তাকে। কিন্তু কেন? জবাব খুঁজে পেল না।

বনে ছাওয়া পর্বতের ঢালের দিকে তাকাল সে। বাতাসের বেগ আরও বেড়েছে। এত ওপরে এমনিতেই বেশি থাকে। পাতলা টি-শার্ট ভেদ করে যেন। ছুরির ফলার মত বিধতে লাগল। জ্যাকেট কোমরে জড়ানো রয়েছে, স্পেস ব্ল্যাঙ্কেটটা পকেটে। দুটোই লাগবে, তবে পরে। রবিনের কাছ থেকে বোতলটা না এনে ভুল করেছে। মনে পড়েছে অনেক দেরিতে। ফিরে যাওয়ার উপায় ছিল না। তখন আর। খাবার বলতে সাথে রয়েছে কিছু ক্যাণ্ডি, তবে এটুকু আছে যে এর জন্যেই ধন্যবাদ দিল ভাগ্যকে।

উত্তরে ঘুরল সে। কাঁধে আর পিঠে পড়ছে রোদ। লক্ষ্য রাখতে হবে এটা। এখন সূর্যই তার একমাত্র কম্পাস।

ঘন হয়ে জন্মে থাকা কতগুলো গাছের কাছে উঠে গেছে পাহাড়ের একটা চূড়া। সেখানে উঠে এল সে। পথ খুঁজতে লাগল। কিছুই নেই, কোন পথই চোখে পড়ল না। শেষে গাছের ফাঁক দিয়ে এগিয়ে চলল উত্তরে।

খাড়া হয়ে আসছে ঢাল। চলার গতি আপনাআপনিই কমে গেল ওর। দিগন্তের দিকে দ্রুত নেমে চলেছে সূর্য। খাড়াই বেয়ে ওঠার পরিশ্রমে ঘামে ভিজে গেছে ওর শরীর।

একটা জায়গায় এসে সমান হয়ে এগিয়ে গেল কিছুদূর পথ, তারপর আবার। উঠে গেল। _ একটা শৈলশিরায় এসে পড়ল মুসা। দাঁড়িয়ে গেল। তাকিয়ে রয়েছে নিচের দিকে।

অবাক কাণ্ড! অলৌকিক ব্যাপার মনে হচ্ছে ওর কাছে।

পুবে-পশ্চিমে চলে গেছে একটা কাঁচা রাস্তা, ইনডিয়ানদের পথটার দ্বিগুণ চওড়া। মনে হয় এটাই সেই রাস্তা, কাঠ চালান করার জন্যে তৈরি করা হয়েছে, মালটি যেটার কথা বলেছিল।

শৈলশিরা থেকে নেমে এসে পথের ওপর দাঁড়াল মুসা। একটা কাজের কাজ হয়েছে পথটা পেয়ে গিয়ে। দারুণ খুশি লাগছে ওর। অন্ধের মত আর বনের ভেতরে পথ হাতড়ে মরতে হবে না। এখন একটা গাড়ি যদি পেত, ইস্...

হাঁটতে হাঁটতে পা ব্যথা হয়ে গেছে। যেতে হবে আরও অনেক দূর। পঁচিশ তিরিশ মাইলের কম না। হাইওয়েতে পৌঁছে একটা গাড়ি পেলে বেঁচে যেত।

পশ্চিমে চলতে লাগল সে। ডুবন্ত সূর্যের শেষ আলোর উজ্জ্বল বর্শাগুলো এসে লাগছে চোখেমুখে। হাঁটতে হাঁটতেই কোমর থেকে খুলে নিল জ্যাকেটটা। দ্রুত নেমে যাচ্ছে তাপমাত্রা।
ডুবে গেল সূর্য। দেখা দিল ভরা চাঁদ। একটা পুলের কাছে পৌঁছল সে। দুটো সরু নদী পরস্পরকে ক্রসের মত কেটেছে যেখানে, ঠিক তার ওপরে তৈরি হয়েছে পুল। ঠাণ্ডা বাতাসে কুয়াশার মত এক ধরনের বাষ্প উড়ছে। পাইনের গন্ধে বাতাস, ভারি। পানি দেখে পিপাসা টের পেল, কিন্তু খাওয়াব সাহস করতে পারল না।
পুলের অন্য পাশে এসে থামল সে। চাঁদের আলোয় মনে হলো, মূল রাস্তাটা থেকে আরেকটা রাস্তা নেমে চলে গেছে। ভাল করে তাকাতে বুঝল, রাস্তাই। হবে। হয়তো ফরেস্ট সার্ভিসের ফায়ার রোড। নিচের দিকে নেমে গিয়ে এগিয়ে গেছে নদীর ধার ধরে। ঘুরতে আসা মানুষকে ঠেকানোর জন্যেই বোধহয় একটা গেট তৈরি করা হয়েছে এক জায়গায়, নতুন খিল লাগানো, চাঁদের আলোয় চকচক করছে ওটার রূপালি রঙ। সরু রাস্তা আর নদীটা পাশাপাশি এগিয়ে গিয়ে ঢুকেছে। পাহাড়ের মাঝের একটা গিরিপথের মত ফাঁকের ভেতরে।
রাস্তাটা উত্তেজিত করে তুলল মুসাকে। আশা হলো। তবে সেটা মিলিয়ে গেল অচিরেই, যখন মনে পড়ল, এসব জায়গায় ফরেস্ট সার্ভিসের লোক সব সময় থাকে না। ক্বচিত কদাচিৎ দেখতে আসে, সব কিছু ঠিকঠাক আছে কিনা। এসব রাস্তা তৈরি করে রাখা হয়েছে দাবানল লাগলে নিভাতে যাওয়ার জন্যে। জরুরী অবস্থা না দেখলে ফরেস্ট সার্ভিসের কর্মীদের এখানে আসার কোন কারণ নেই।
যা করছিল তা-ই করতে লাগল মুসা। আবার এগিয়ে চলা। চলতে চলতেই ক্যাণ্ডি খেয়ে নিল সে। ক্লান্তি বাড়ছে, সেই সঙ্গে বাড়ছে ঠাণ্ডা। পর্বতের দিক থেকে ভেসে আসছে কয়োটের ডাক, মন ভারি করে দেয় ওই শব্দ। ভীষণ নিঃসঙ্গতা বোধ চেপে ধরে যেন।

.

মুসা যখন বনের ভেতরে ঢুকে ঘাপটি মেরে ছিল, রবিন আর কিশোর তখন ছুটছে। পেছনে ধাওয়া করছে ভারি পায়ের শব্দ। ওরা যত জোরে ছুটছে, পেছনের লোকগুলো আরও জোরে ছুটছে। না ধরে আর ছাড়বে না।
ওই শব্দ শোনার ভাল দিকও আছে, মন্দ দিকও আছে। ভাল দিকটা হল, লোকগুলো মুসাকে দেখতে পায়নি। আর মন্দ দিকটা হলো ধরা পড়তে যাচ্ছে দুজনে, যদি ওদের চোখে ধুলো দেয়ার কোন ব্যবস্থা এখনই করতে না পারে।
নদীর কাছে পৌঁছে গেল ওরা, ইনডিয়ানদের টুয়ক। নদীর ধার ধরে উজানের দিকে ছুটল। শেষ বিকেলের জোরাল বাতাস নদীর পানি ছুঁয়ে এসে ঝাঁপটা

মারছে ওদের মুখে। সালফারের গন্ধ জ্বালা ধরাচ্ছে চোখে।
আগে আগে ছুটছে রবিন। আগের দিন যে পাথুরে পথটা ধরে গিয়েছিল, যতটা সম্ভব সেটাকে এড়িয়ে থাকতে চাইছে। দম ফুরিয়ে গেছে ওদের। ক্লান্তিতে পা আর চলতে চাইছে না। সগর্জনে ঝরে পড়ছে জলপ্রপাত, অনেকগুলো নালা দিয়ে গড়িয়ে চলেছে পানি, রোদ পড়ে চিকচিক করছে।
বাআহ, চমৎকার! প্রপাতের দিকে তাকিয়ে বলল কিশোর, এখানেই ধসের কবলে পড়ে মরতে বসেছিলে নাকি?
হ্যাঁ, ভাটির দিকে তাকিয়ে রয়েছে রবিন। ওই যে, আসছে!
কিশোরও তাকাল সেদিকে। প্রায় আধ মাইল দূরে বড় একটা পাথরের চাঙড়–ঘুরে আসছে তিনজন লোক। সবার আগে রয়েছে জোনস। কাঁধে ঝোলানো এম ১৬ রাইফেল। ওপরের দিকে তাকিয়েই দেখে ফেলল গোয়েন্দাদের। ডক বোধহয় বলল কিছু, এতদূর থেকে তার কর্কশ কণ্ঠ শোনা গেল না, কেবল মুঠি পাকিয়ে নাড়াচ্ছে যে সেটা দেখা গেল।
আর এখানে থাকা চলবে না! কিশোর বলল।
দ্রুত আবার জঙ্গলে ঢুকে পড়ল রবিন। পেছনে রইল কিশোর। কিছুদূর এগিয়ে থামল রবিন। পাহাড়ের খাড়া দেয়ালের দিকে মুখ। হাত বাড়িয়ে একটা খাজ চেপে ধরল। আরেকটা খাজে পা রাখল। বেয়ে উঠতে লাগল সে।
কিশোরও রবিনের মত একই ভাবে এক খাজে আঙুল বাধিয়ে আরেক খাঁজে পা রেখে উঠতে শুরু করল। ককিয়ে উঠল। সারাদিনের দৌড়াদৌড়ির পর এখনকার এই পরিশ্রমটা অসহনীয় লাগছে। কপালের ঘাম চোখের পাতায় পড়ে অস্বস্তি লাগছে, মুখেও ঘাম। হাতের তালু ঘামছে। আঙুল পিছলে না গেলেই হয় এখন।
রবিনের অতটা কষ্ট হচ্ছে না। পাহাড় বেশ ভালই বাইতে পারে সে। ছোট বেলা থেকে এই অভ্যেস। পাহাড়ে চড়তে গিয়ে গড়িয়ে পড়ে পা-ও ভেঙেছে। তার। পরেও লোভটা ছাড়তে পারে না সে। তবে এই মুহূর্তে ভাল না লেগে বরং বিরক্তিই লাগছে। কোন ব্যাপারে বাধ্য করা হলে যা হয় আর কি মানুষের।
নিশ্চিত ভঙ্গিতে উঠে চলেছে রবিন। একটি বারের জন্যে আঙুল ছুটছে না, পা ফসকাচ্ছে না।
কিশোর অতটা সহজ ভাবে পারছে না। অনেক নিচে রয়ে গেছে সে।
খাড়া দেয়াল বেয়ে প্রপাতের ওপরে উঠে গেছে রবিন। এর ওপাশেই রয়েছে। ইনডিয়ানদের প্রাচীন সমাধি উপত্যকা।
হাত-পা ভীষণ ভারি লাগছে কিশোরের। টনটন করছে। থরথর করে কাঁপছে হাত। মনে হচ্ছে অবশ হয়ে যাবে। এখন হাত অবাধ্য হয়ে গেলে…আর ভাবতে পারছে

না সে। গালাগাল করছে নিজেকে, এই পাহাড়ে চড়া আরম্ভ করেছিল বলে। বাঁচতে চাইলে উঠতেই হবে এখন, হাল ছেড়ে দেয়ার আর কোন উপায় নেই।
ঠিক এই সময় ডান পা পিছলাল তার। এতই আচমকা, বুঝতেই পারেনি এরকমটা ঘটবে। মাটি থেকে পঞ্চাশ ফুট ওপরে রয়েছে, প্রপাতের পানির কণা উড়ে এসে আশপাশের পাথরকে ভিজিয়ে বরফের মত পিচ্ছিল করে রেখেছে। ডান পা-টাকে তুলে আনার চেষ্টা করতেই পিছলে যেতে শুরু করল ডান হাত।
মরিয়া হয়ে আঙুলগুলোকে আটকে রাখতে চাইল সে। বুকের খাঁচায় পাগল হয়ে গেছে যেন হৃৎপিণ্ডটা, ধড়াস ধড়াস করে লাফ মারছে, বেরিয়ে আসার ষড়যন্ত্র! অনেক চেষ্টা করছে কিশোর, কিছুতেই আটকে থাকছে না আঙুলগুলো। হাতের দিকে তাকাল একবার। ছুটে গেল আঙুল।
সময় যেন স্থির হয়ে গেছে।
জায়গামত রয়েছে কেবল এখন ওর বাঁ হাত আর বাঁ পা।
নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে শরীর। ভয়ে দেয়ালের উঁচুতে একপাশের কজা খুলে যাওয়া দরজার পাল্লার মত ঝুলছে সে। এইবার আর আমার মৃত্যু কেউ ঠেকাতে পারল না, ভাবল। নিচের পাথরে পড়ে ছেচে ভর্তা হয়ে যাব!
কিশোর! ওর অবস্থা দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে রবিন।
সাদা হয়ে গেছে কিশোরের মুখ।
জলদি মুখ চেপে ধর দেয়ালে! চিৎকার করে বলল রবিন। নিচের দিকে তাকাবে না! ভয় যেন অক্টোপাসের বাহু দিয়ে জড়িয়ে চাপ দিচ্ছে ওর বুকে। কিশোরকে বাঁচাতেই হবে। ডান কাঁধটা নাড়াও! ডান পা সরিয়ে নিয়ে যাও দেয়ালের দিকে। খুব আস্তে।
কিন্তু নড়লও না কিশোর।
কি ব্যাপার? শুনতে পায়নি নাকি? আরও জোরে চিৎকার করে ডাকল রবিন, কিশোর! সাড়া পেল না এবারেও। সাহায্য করতে হলে ওর কাছে যেতে হবে। নামতে শুরু করল সে।
রবিন যে আসছে বুঝতে পারল কিশোর। তবে দেখতে পাচ্ছে না। মৃদু খসখস কানে আসছে। নিজে তো বিপদে পড়েছেই, আরেকজনকেও বিপদে ফেলতে যাচ্ছে মনে হতেই বিদ্রোহী হয়ে উঠল মন। ধমক দিল নিজেকে, এই গর্দভ! ভয় দূর কর। এভাবে মরার কোন অর্থ হয় না!
পৌঁছে গেল রবিন। কিশোরের ফ্যাকাসে মুখে বেপরোয়া ভাব দেখতে পেল সে। তাকিয়ে রইল রবিন। বুঝতে পারল, আবার চালু হয়ে গেছে কিশোরের খুলির ভেতরে সাংঘাতিক সজাগ ক্ষুরধার মগজটা। এইবার ঠিকমত শ্বাস নিতে পারল রবিন। আশা হল, বেঁচে যাবে এযাত্রা ওর বন্ধু।

হঠাৎ ঝটকা দিয়ে আগে বাড়ল কিশোরের মুখ। কেঁপে উঠল ডান, কাঁধটা, আস্তে আস্তে এগিয়ে যেতে শুরু করল দেয়ালের দিকে। তারপর এগোতে শুরু করল ডান পা।
ডান হাতটা নড়ে উঠল। পাথরের গা হাতড়ে হাতড়ে আঁকড়ে ধরার জায়গা। খুঁজছে। পেলও। পা-টা ঢুকিয়ে দিল আরেকটা খাজে। দেয়ালে বুক ঠেকিয়ে বিশ্রাম নেয়ার চেষ্টা করল, যদিও এই অবস্থায় বিশ্রাম হয় না।
হয়ে গেছে, কিশোর, পেরেছ! আনন্দে চোখ দিয়ে পানি এসে যাওয়ার জোগাড় হলো রবিনের। আর ভয় নেই। এসো, ওঠো আমার পিছে পিছে। ওপরে চ্যাপ্টা একটা জায়গা আছে, ঝোপ আছে, লুকিয়ে থাকতে পারব। আমাদেরকে দেখতে পাবে না ওরা। এসো, কিশোর, আর বেশি ওপরে নেই।
শক্ত হয়ে গেছে যেন বাঁ হাত। নড়াতে পারবে না আর কোনদিনই, পাথরের সঙ্গে থেকে থেকে পাথরই হয়ে গেছে। দুত্তোর বলে জোর করে হাতটা সরিয়ে নিয়ে এল কিশোর। ওপরে বাড়াল। ধরল আরেকটা খাঁজ। আত্মবিশ্বাস বাড়ল। আবার উঠতে লাগল।
ওপরে ওপরে উঠছে রবিন। অবশেষে উঠে গেল সরু একটা শৈলশিরায়। শিরার কিনারে গজিয়ে আছে কাঁটাঝোপ। মাথা কাত হয়ে আছে নিচের দিকে। ওই ঝোপের ওপাশে কোনমতে চলে যেতে পারলেই হল, লুকিয়ে বসতে পারবে, নিচে থেকে দেখা যাবে না ওদেরকে।
এসে গেছে ওরা! বলল রবিন, আরেকটু তাড়াতাড়ি করো!
পারল না কিশোর। সেই একই রকম শামুকের গতি। হাত-পা যে আর ফসকাচ্ছে না, এতেই খুশি সে। তাড়াহুড়া করার ক্ষমতাই নেই। দীর্ঘ অনেকগুলো যুগ পার হয়ে যেন অবশেষে রবিনের কাছে উঠে আসতে পারল সে। ওপরে উপুড় হয়ে শুয়ে নিচের দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিল রবিন। কিশোরের একটা হাত চেপে ধরে তাকে শৈলশিরায় উঠতে সাহায্য করল।
যাক, পারলে শেষ পর্যন্ত! স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রবিন।
কিছু বলল না কিশোর। গড়িয়ে গড়িয়ে কোনমতে ঢুকল ঝোপের ভেতর। চুপ করে বসে চোখ মুদল।
কতটা কাছে এল? খসখসে গলায় জিজ্ঞেস করল সে।
অনেক কাছে, রবিন জানাল। দেখো না।
প্রপাত থেকে ওঠা শীতল বাষ্প উড়ছে বাতাসে। উপত্যকার দিক থেকে আসা বাতাসের ঝাঁপটায় উড়ে চলে যাচ্ছে, সেই জায়গায় ঠাই নিচ্ছে নতুন বাষ্প। চোখ মেললেই জ্বালা করে। তবু জোর করে তাকিয়ে রয়েছে জোনস আর তার সঙ্গীদের। দিকে। প্রপাতের কাছে প্রায় পৌঁছে গেছে ওরা।

শয়তানগুলো গেল কোথায়? ফোঁস করে উঠল জোনস। কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে তাকাতে লাগল পাহাড় আর বনের দিকে।
প্রপাতের গর্জনকে ছাপিয়েও তার কথা শোনা যাচ্ছে। চিৎকার করে বলল, তোমাদের দোষ! গাধা কোথাকার! আটকাতে পারলে না!
এখানেই কোথাও আছে ওরা, বসো! হিলারি বলল।
বের করে ফেলব! বলল ডক।
তাহলে করছ না কেন? খেঁকিয়ে উঠল জোনস। কিছুতেই পালাতে দেয়া চলবে না। ওই খুঁতখুঁতে সাংবাদিকটাকে আটকেই ভেবেছিলাম সব ঠিক হয়ে। যাবে। ছেলেগুলো যে এতটা বিচ্ছু কল্পনাই করতে পারিনি!
সাংবাদিক কথাটা শুনে পরস্পরের দিকে তাকাল দুই গোয়েন্দা।
মনে হচ্ছে, ফিসফিস করে বলল কিশোর, কোন কিছুর তদন্ত করে রিপোর্ট লিখতে এসেছিলেন আংকেল, সে জন্যেই তাকে আটকানো হয়েছে। ডায়মণ্ড লেকের গল্পের সঙ্গে এসবের কোন সম্পর্ক আছে।
ভাবছি, হেরিং লোকটা কে? কি জানে?
এমন ভাবে সারতে হবে, জোনস বলছে, যাতে মনে হয় অ্যাক্সিডেন্ট।
তা করা যাবে। হেরিংকে যা করেছি তা-ই করব। পাথরে মাথা ঠুকে আগে বেহুশ করে নেব। তারপর ফেলে দিলেই হবে, ডক বলল।
আবার একে অন্যের দিকে তাকাল কিশোর আর রবিন। খুব চমকে গেছে। জোনসের লোকেরা খুন করেছে হেরিংকে!
না, একই কাজ করতে গেলে সন্দেহ করবে পুলিশ, জোনস বলল। ধরে নিয়ে গিয়ে প্লেনের ভেতরে ভরতে হবে সব কটাকে। ধাড়িটাকে সহ। তারপর দেবে আগুন লাগিয়ে। যাতে মনে হয় ল্যাণ্ড করার সময় পুড়ে মরেছে। আরেকটা অ্যাক্সিডেন্ট। কেউ ধরতে পারবে না।
তা পারবে না, প্রতিধ্বনি করল যেন ডক।
আগে ধর ওদের, জোনস বলল। ডক, তুমি চলে যাও। বিচ্ছুগুলোকে ধরতে সময় লাগবে মনে হচ্ছে। আজ রাতে আরেকটা চালান আসবে। ওটা তুমি সামলাও গিয়ে।
আমি! হতাশ হয়েছে মনে হল ডক।
হ্যাঁ, তুমি। ছেলেগুলোকে ধরে আনব আমরা। তারপর ইচ্ছে হলে আগুন লাগানোর কাজটা তুমিই করো।
উজ্জ্বল হলো ডকের মুখ। ঠিক আছে। ঘুরে জোর কদমে নদীর দিকে রওনা হয়ে গেল সে।
কিসের চালান? রবিনের প্রশ্ন।

হবে কোন কিছু, কিছু ভাবছে কিশোর, রবিনের কথায় মন নেই।
চলো, হিলারি, সঙ্গীকে বলল জোনস, এই প্রপাতের ওপাশে একটা উপত্যকা আছে। ওখানে লুকানোর কথা ভাবতে পারে ছেলেগুলো।
দেয়াল বেয়ে উঠতে শুরু করল সে।
হাসল হিলারি, বেরিয়ে পড়ল বেকাতেড়া কুৎসিত দাঁত। কাঁধে ঝোলানো এম-১৬টা একবার টেনেটুনে দেখে বসের পিছু নিল সে-ও। উঠতে আসতে লাগল রবিন আর কিশোর যেখানে লুকিয়েছে।
পাথর হয়ে গেল যেন দুই গোয়েন্দা। লোকগুলো উঠে এলেই দেখে ফেলবে ওদেরকে।
সাবধানে বেয়ে বেয়ে উঠে আসছে জোনস আর হিলারি। আগের দিন যে সিঁড়িটা দিয়ে উঠেছিল রবিন, সেটা দেখে ফেলল জোনস। ওঠা অনেক সহজ হয়ে গেল তার জন্যে।
হিলারির কাছে বোধহয় অতটা সহজ লাগছে না। ওর ভঙ্গি দেখেই বোঝা যাচ্ছে।
উঠে আসছে দুজনে। জানে না, ওদের মাথার ওপরেই লুকিয়ে রয়েছে যাদেরকে খুজছে।
কিশোর, এবার? ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল রবিন।
এখনও হাত-পা কাঁপছে কিশোরের। তবে মগজটা ঠিকমতই কাজ করছে। বেরিয়ে থাকা একটা গাছের শেকড় ধরে টান দিল। কিছু হল না। আরও জোরে টানল। উঠে এল শেকড়, সাথে করে নিয়ে এল ধুলো, মাটি, পাথর।
ওপর দিকে তাকাল জোনস আর হিলারি। কয়েকটা পাথর গড়িয়ে গেল ওদের দিকে। সাথে করে নিয়ে নামতে লাগল আলগা পাথর আর মাটি। বাড়ি লেগে বড় পাথরও নড়ে উঠল। আরেকবার বাড়ি লাগতেই খসে গিয়ে ধসের সৃষ্টি করল।
তাড়াতাড়ি দুপাশে সরে গেল দুজন লোক।
ধসটা নেমে গেল ওদের মাঝখান দিয়ে।
বস... শুরু করতে যাচ্ছিল হিলারি, ওর গলা কাঁপছে। নিশ্চয় হাতও কাঁপছে।
হয়েছে, আর উঠতে হবে না, জোনস বলল। এখানে ওঠেনি ওরা। ওঠার উপায় নেই। যে হারে ধস নামে! নিশ্চয় বনের মধ্যে লুকিয়েছে। আজ রাতটা নদীর কিনারে কাটাব আমরা। কাল সকালে আবার খুঁজতে বেরোব।
চেপে রাখা নিঃশ্বাসটা আস্তে আস্তে ছেড়ে বুক খালি করল রবিন। তারপর বলল, বাঁচালে, কিশোর!
নেমে যাচ্ছে জোনস আর হিলারি।
ওরা দৃষ্টির বাইরে চলে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল কিশোর আর রবিন। তারপর উঠে এগিয়ে চলল শৈলশিরা ধরে। যতই এগোচ্ছে, চওড়া হচ্ছে শিরাটা।

ওপর থেকে এখন উপত্যকাটা দেখতে পাচ্ছে ওরা। গাছগাছালিতে ছেয়ে আছে, ঘন সবুজ।
সূর্য ডুবছে। লম্বা লম্বা ছায়া ছড়িয়ে দিয়েছে উপত্যকার ওপর। মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে নদীটা, বেশ চওড়া হয়ে। দুধারে গজিয়ে উঠেছে লম্বা ঘাস, ঘন ঝোপঝাড়। এখানে ওখানে বাষ্প উড়ছে, নিশ্চয় গরম পানির অনেক ঝর্না রয়েছে ওখানে। উপত্যকার আরেকটা প্রান্ত এত দূরে, চোখেই পড়ে না।
রবিনের দিকে তাকিয়ে কিশোর বলল, তোমার চোখ তো লাল। আমার কি অবস্থা?
কিশোরের চোখের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল রবিন। একেবারে গায়ের লোকের মত। কি যেন মনে পড়তে বলল, এই শোনা শোনো, জনের চোখ কিন্তু লাল ছিল না। যেদিন আমরা তাকে দেখেছি সেদিন গাঁয়ের বাইরে থেকে এসেছিল। মনে হচ্ছে গন্ধই ওদের ক্ষতিটা করে। ওরা রয়েছে ভাটিতে, নদীর কিনারে। বাতাস গন্ধকের গন্ধ উড়িয়ে নিয়ে যায় সোজা ওদের দিকে।
তা নেয়, কিশোর বলল। তবে যে হারে অসুস্থ, মনে হয় শুধু গন্ধকের গন্ধে নয়। আরও কোন কারণ আছে। তার হাত-পায়ের কাপুনি এখনও রয়েছে। পাহাড় বেয়ে নামার কথা ভাবতেই মুখ কালো হয়ে গেল। ইস, রাতটা এখানেই থেকে যেতে পারলে ভাল হত! কিন্তু উপায় নেই। আবার নামতে আরম্ভ করল। রবিনের পিছু পিছু। ওঠাটা যত কঠিন, নামা ততটা নয়, তাই কোন রকম বিপদ না ঘটিয়ে নিরাপদেই পা রাখতে পারল নিজের ঘাসে। ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল। স্বস্তির।
নেমেই চারপাশে চোখ বোলাল সে। কাছাকাছি যে কটা ফার্ন জাতীয় গাছ দেখল, সবগুলোর পাতা, ডাল, ফুল বাদামি হয়ে গেছে। নদীর পানির রঙ ধূসর, তীরের কাছে পানিতে পাতলা সরের মত জমে রয়েছে।
দেখো, রবিনকে বলল সে।
দেখল রবিন। কি মনে হচ্ছে?
অস্বাভাবিক লাগে, তাই না?
পানির দুষণ?
হতে পারে। আমার চোখ জ্বালা করছে। চলো এখান থেকে চলে যাই।
উঁচু পাহাড়ের ওপাশে ডুব দিয়েছে সূর্য। সোনালি রশ্মি আর ঢুকতে পারছে না, এখানে। ঠাণ্ডা, কালো কালো ছায়া ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। জ্যাকেট গায়ে দিয়ে নদীর ধার ধরে এগোল দুজনে। পানির ধারে ঘন হয়ে জন্মে থাকা ঘাস, লতাপাতা, ঝোপ সব বাদামী হয়ে গেছে, পানির একেবারে লাগোয়াগুলো মরেই গেছে প্রায়।
ঢালের ওপরেই রয়েছে ওরা, তবে এত কম ঢালু, অন্য প্রান্তের দিকে না, তাকালে বোঝাই যায় না। ওপাশটা এখান থেকে উঁচুতে। পাহাড়ের পাথুরে দেয়াল জায়গায়

জায়গায় ক্ষয়ে গেছে অগণিত ধসের ঘষায়।
এখন তো মনে হচ্ছে, আমাদের প্লেন অ্যাক্সিডেন্টটাও অ্যাক্সিডেন্ট নয়, চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর, ঘটানো হয়েছে। পকেট থেকে একটা ক্যাণ্ডি বের করে খেতে লাগল সে।
তা কি করে হয়? পানি খাওয়ার জন্যে বোতলের মুখ খুলল রবিন।
তা-ই হয়েছে। প্রথমে ইলেকট্রিক সিসটেম নষ্ট হয়ে গেল, ক্যাণ্ডি চিবাতে চিবাতে বলল কিশোর। নামতে বাধ্য হলাম আমরা। তোমার বাবাকে কিডন্যাপ করার জন্যে তৈরি হয়ে ছিল ফ্র্যাঙ্কলিন জোনস।
তাই তো! চোখ বড় বড় করে ফেলল রবিন। তার মানে স্যাবোটাজ করা হয়েছে প্লেনটাকে?
হ্যাঁ। জোনস কিংবা তার কোন সহকারী করেছে কাজটা।
নীরবে খেল কিছুক্ষণ দুজনে। তারপর রবিন জিজ্ঞেস করল, এখন কি করা? বাবাকে বের করতেই হবে।
আপাতত হাঁটতে হবে আমাদের। আমার বিশ্বাস, উপত্যকাটা উত্তর-দক্ষিণে ছড়ানো। তার মানে কাঠ পারাপারের রাস্তাটা রয়েছে সামনে। গেলে হয়তো মুসার সঙ্গেও দেখা হয়ে যেতে পারে আমাদের। কিংবা ফরেস্ট সার্ভিসের সঙ্গে।
তা ঠিক। এদিক দিয়ে গেলে অবশ্য আরেকটা সুবিধে, জোনস আমাদের পিছু নিতে পারবে না। দেয়াল ডিঙানোর সাহস নেই ওর।
আরেকটা কাজ হতে পারে, যোগ করল কিশোর, হয়তো জানতে পারব কি কারণে অসুস্থ হয়ে পড়ছে ইনডিয়ানরা।
খাওয়া শেষ করে ক্যাণ্ডির মোড়কগুলো পকেটে রেখে দিল ওরা। বুনো এলাকার প্রতিবেশগত ভারসাম্য নষ্ট করতে চায় না, যেমন আছে তেমনি থাক।
অন্ধকার হয়ে আছে উপত্যকা। ওপরে তারা ঝিলমিল করছে। ধীরে ধীরে পাহাড়ের কিনারে উঁকি দিল বিশাল চাঁদ।
পরিশ্রমে ভেঙে পড়ছে শরীর, কিন্তু বিশ্রামের উপায় নেই। চাঁদের আলোয়। পথ দেখে দেখে এগিয়ে চলল ওরা। নদীর ধার ধরে। সামনে বড় পাথর কিংবা ঝোপঝাড় পড়লে সেগুলো ঘুরে এসে আবার আগের রাস্তা ধরছে। আধ মাইল মত চলার পর একটা জলাভূমি পড়ল, সরে আসতে বাধ্য হলো ওরা, একদিকের দেয়ালের কাছে। জলাভূমি শেষ হয়ে গেছে কিছুটা এগিয়ে, আবার নদীর দিকে ঘুরতে গিয়েই বরফের মত জমে গেল যেন রবিন। যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে গেল স্থির হয়ে। ঘাড়ের রোম খাড়া হয়ে গেছে।
কি হয়েছে? অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

নীরবে হাত তুলে দেখাল রবিন। ফুট বিশেক দূরে মাটিতে পড়ে জ্বলছে সাদা সাদা কি যেন।
কিশোরের হৃৎপিণ্ডের গতি বেড়ে গেল।
আমি যা ভাবছি তা-ই ভাবছ? তোতলাতে শুরু করল রবিন।
কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে ধীরে ধীরে এগোল ওরা। যতই কাছে এগোল আরও ভাল করে দেখতে পেল, সাদা জিনিস অনেক বেশি জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে আছে। ঘাস আর ঝোপের ভেতর থেকে ফুটে বোরোচ্ছে ফেকাসে আলো। বাতাস বয়ে গেলে ঘাসে ঢেউ জাগে, তাতে মনে হয় ভেতরের সাদা রঙটাই বোধহয় কাঁপছে।
আরেকটু এগিয়ে থামল দুজনে। থরথর করে কাঁপছে রবিন। কিশোরেরও কাঁপুনি শুরু হয়েছে, তবে সেটা ঢাকা দেয়ার চেষ্টা করছে সে।
ওদের প্রায় পায়ের কাছেই পরে রয়েছে একচিলতে সাদা রঙ, দূর থেকে এটাকেই দেখেছিল।
দে-দেখ, কত লম্বা! কোনমতে বলল রবিন।
একটা টিবিয়া, হাড়টার দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। বয়স্ক লোকের। ইনডিয়ানদের সমাধিতে চলে এসেছি আমরা।
দেখার কোন ইচ্ছেই ছিল না আমার! বিকৃত হয়ে গেছে রবিনের কণ্ঠ। ধসটস নেমে বোধহয় মাটির নিচ থেকে বের করে দিয়েছে হাড়গুলোকে। কতগুলো আছে, আন্দাজ করতে পারো? পাথর আর মাটির একটা বড় স্কুপের কাছে জড় হয়ে আছে হাড়গুলো, ধসটা নেমেছিল পাশের পাহাড় থেকে।
ওই আরেকটা টিবিয়া, কিশোর বলল। ওই যে ওটা ফিমার, ওগুলো পাজরের হাড়, ওটা মেরুদণ্ড ভাঙা। চাঁদের আলোয় চকচক করছে হাড়গুলো। পুরো একটা কঙ্কালই বোধহয় রয়েছে এখানে।
ওই যে খুলিটা! গায়ে কাটা দিল রবিনের।
খুলির চোখের জায়গায় কালো কালো বড় দুটো গর্ত। ছোট কালো একটা তিনকোনা গর্ত, নাক ছিল যেখানটায়। হাঁ হয়ে আছে চোয়াল, দুই সারি দাঁত নীরব বিকট হাসিতে ফেটে পড়ছে যেন।
দাঁড়াও তো দেখি! এগিয়ে গিয়ে ঝকঝকে একটা জিনিস তুলে নিল কিশোর। কোমরের বেল্টের রূপার একটা বাকস, মাঝখানে ইয়া বড় এক নীলকান্তমণি বসানো।
দেখেটেখে রবিন বলল, একেবারে জনেরটার মত দেখতে।
কঙ্কালটা তার হারিয়ে যাওয়া চাচারও হতে পারে, বাকলসটা পকেটে রেখে দিল কিশোর।
কিন্তু চাচা তো নিখোঁজ হয়েছে একমাস আগে। এত তাড়াতাড়ি হাড়ের এই দশা…

জানোয়ারে খেয়ে সাফ করে দিয়ে যেতে পারে।
খুলিটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। ভয়টা চলে গেছে। তার জায়গায়। ঠাই নিয়েছে বিষণ্নতা। অসুস্থ বোধ করছে সে। এটা দেখো। গোল একটা ছিদ্র দেখাল সে।
বুলেটের ছিদ্র?
হ্যাঁ। খুন করা হয়েছে লোকটাকে।
.
এগিয়ে চলেছে মুসা। ক্লান্ত হয়ে আসছে ক্রমেই। শেষে আর পারল না। খোলা রাস্তা থেকে সরে চলে এল বনের ভেতরে। স্পেস ব্লাংকেটটা বের করে গায়ে। জড়িয়ে শুয়ে পড়ল একটা পাইনের গোড়ায়। একটু পরেই কানে এল ট্রাকের ইঞ্জিনের শব্দ। এগিয়ে চলেছে ভুল দিকে, যেদিক থেকে সে এসেছে, পর্বতের দিকে। ওদিকে কেন? ডায়মণ্ড লেক তো ওদিকে নয়?
উঠে বসল সে। পাশের রাস্তা দিয়ে চলে গেল ট্রাক। হেডলাইট নিভানো। আবার শুয়ে পড়ল সে, ঘুমে জড়িয়ে আসছে চোখ। সেই অবস্থায়ই ভাবল, হেডলাইট জ্বালেনি কেন? শুধু পার্কিং লাইট জ্বেলে চলেছে?
মনে হলো সবে চোখ মুদেছে, এই সময় আবার শুনতে পেয়েছে ট্রাকের শব্দ। হাতের ডিজিটাল ঘড়ি দেখল। মধ্যরাত হয়ে গেছে। ঘুমিয়েছে ভালমতই।
উঠে দাঁড়াল সে। এইবার ট্রাকগুলো ঠিক দিকেই চলেছে, হাইওয়ের দিকে। চলে যায় মিস্টার মিলফোর্ড, রবিন আর কিশোরের সাহায্য...ভাবতে ভাবতে দৌড়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল সে। স্পেস ব্লাংকেটটা নেড়ে চিৎকার করতে লাগল, থামো! থামো!
সামনের ট্রাকটার গতি কমে গেল। ফলে পেছনেরগুলোও কমাতে বাধ্য হলো।
উত্তেজিত হয়ে ট্রাকের কাছে ছুটে এল মুসা।
আগের ট্রাকটা থেমে গেছে। ঝটকা দিয়ে খুলে গেল প্যাসেঞ্জার সাইডের দরজা। রানিং বোর্ডে লাফিয়ে উঠল সে।
ভেতরে চোখ পড়তেই স্থির হয়ে গেল। সোজা তার কপালের দিকে তাক করে রয়েছে এম-১৬ রাইফেলের নল। মেরুদণ্ড বেয়ে শীতল শিহরণ নেমে গেল। তার। মনে পড়ল কিশোরের কথা জানোয়ার নয়, মানুষ শিকারের কাজে ব্যবহর হয় এম-১৬।
ঢোকো! নেকড়ের মত গরগর স্বর বেরোল ডকের গলা থেকে, শয়তানী হাসি ফুটেছে ঠোঁটে। তোমার বন্ধুরা কোথায়?
.

আর পারা যায় না, এবার বিশ্রাম নিতেই হবে, ঠিক করল রবিন আর কিশোর। কুঙ্কালটা যেখানে পেয়েছে তার কাছ থেকে দূরে উজানে এসে স্পেস ব্লাংকেট মুড়ি দিয়ে ঘাসের ওপরই শুয়ে পড়ল। আগুন জ্বালতে সাহস করল না জোনসের লোকদের ভয়ে।

ভোরের আগেই উঠে পড়ল আবার। খিদেয় মোচড় দিচ্ছে পেট, কিন্তু সাথে রয়েছে কেবল পপকর্ন, সেদ্ধ করারও ব্যবস্থা নেই। অনেক ধরনের গাছ জন্মে রয়েছে, ফুলফল সবই আছে, তবু খেতে সাহস করল না। বুনো অঞ্চলের মানুষের জন্যে সেই পুরানো প্রবাদ; যেটা তুমি চেনো না, সেটা খেয়ো না। খেয়ে মরার। চেয়ে না খেয়ে বেঁচে থাকা অনেক ভাল। কাজেই খিদেটা সহ্য করতে লাগল ওরা।

আবার এগিয়ে চলা। নদীটা বাঁয়ে রেখে হাঁটছে দুজনে। পথ নেই, ঘাস আর রুক্ষ পাথরের ছড়াছড়ি, ফলে গতি হয়ে যাচ্ছে ধীর। গন্ধকে বোঝাই গরম পানির ঝর্না পেরিয়ে আসতে লাগল একের পর এক, পার হওয়ার সময় দম বন্ধ করে রাখে, দৌড়ে পার হয়ে যায় যত দ্রুত সম্ভব। নদীর পানিতে মাঝে মাঝেই চোখে পড়ছে ধূসর রঙের সর, কোথাও কোথাও ভাসমান তেল।

একটা উঁচু জায়গায় উঠে এল ওরা।

থামল। অনেক কষ্টে অবশেষে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছাতে পেরেছে, মনে হলো। সামনে ছড়িয়ে রয়েছে উপত্যকার অন্য প্রান্ত, সবুজ ঝলমল করছে দুপুরের রোদে। উপত্যকাটা অনেক চওড়া। ধীরে ধীরে উঠে গেছে ওপর দিকে। গাছপালায় ছাওয়া। ওখান থেকেই নেমে আসছে সরু নদী।

ওই যে, রাস্তা! টুপিটা পেছনে ঠেলে দিয়ে বলল রবিন।

পাহাড়ের যেখান থেকে জলধারাটা বেরিয়েছে, সেই একই ফাঁক দিয়ে পাশাপাশি বেরিয়েছে সরু পথটা। কয়েক শো গজ এগিয়ে গিয়ে শেষ হয়েছে। সমতল একটা জায়গায়।

কাঠ বয়ে নেয়ার রাস্তা বলে তো মনে হচ্ছে না, রবিন বলল, মালটি যেটার কথা বলেছিল।

না।

সরু নদীটার কাছে চলে এল ওরা। ভয়াবহ দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে। শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। পানিতে দেখা গেল কালো আলকাতরার মত জিনিস। আটকে রয়েছে নদীর কিনারে এসে ছোট ছোট খাড়িতে। খাড়ির কিনারের উদ্ভিদ হয় মরে গেছে, কিংবা মরছে।

নোংরা পানির দিকে তাকিয়ে রইল দুজনে। ঝর্নার পানি যে রকম টলটলে থাকার কথা সে রকম নয়, বরং পুকুরের বদ্ধ পানির মত ময়লা। তেল ভাসছে। রোদ লেগে চিকচিক করছে রামধনুর সাত রঙ সৃষ্টি করে।

বেশিক্ষণ থাকতে পারল না ওরা। বাতাসের জন্যে হাঁসফাস করছে ফুসফুস। ওই বাতাসে শ্বাস নেয়া যায় না। তাড়াতাড়ি সরে চলে এল সেখান থেকে।
তেল অথবা অ্যাসফল্ট, রবিন বলল। কিংবা হয়তো দুটোই আছে।
অন্য কিছু। দুর্গন্ধটা বেশি খারাপ, কিশোর বলল। জঘন্য।
তোমার একটা পরীক্ষার কথা মনে পড়ছে, কেমিস্ট্রি ল্যাবরেটরিতে করেছিলে। সেটা থেকেও এরকমই গন্ধ বেরোচ্ছিল।
জটিল একটা থার্মো-রিঅ্যাকটিভ এক্সপেরিমেন্ট ছিল সেটা, কিশোর বলল। হাসি ফুটল পরক্ষণেই। মনে পড়ে, স্যার কি রকম কুঁকড়ে গিয়েছিলেন, ফেটে গিয়ে জিনিসটা যখন ছড়িয়ে গিয়েছিল?
হাসতে লাগল দুজনেই। চলে এল সরু পথের শেষ মাথায় চ্যাপ্টা গোলাকার জায়গাটাতে। চাকার অসংখ্য দাগ দেখা গেল।
ট্রাক! নিচু হয়ে মাটি থেকে একটা সিগারেটের গোড়া কুড়িয়ে নিল রবিন, কিশোর যে দুটো পেয়েছিল সেরকম।
গম্ভীর হয়ে মাথা ঝকাল কিশোর। হ্যাঁ, চালানের কথা বলেছিল না জোনস?
নদী, ঝোপ, গাছপালা আর শৈলশিরার দিকে তাকাতে লাগল ওরা। গোলাকার সমতল জায়গাটা থেকে আরেক দিকে আরেকটা পথ বেরিয়ে গেছে, হারিয়ে গেছে উত্তর-পশ্চিমের বার্চ আর পাইন গাছে ভরা একটা বনের ভেতর।
দেখো, হাত তুলে দেখাল কিশোর।
গোলাকার জায়গাটার দক্ষিণ-পশ্চিমে শৈলশিরার নিচে পাহাড়ের গায়ে কতগুলো গুহা। ওগুলোর কাছে এগিয়ে গেছে চাকার দাগ। সেদিকে রওনা হলো দুজনে।
বাবা! চিৎকার করে ডাকল রবিন। উত্তেজনায় গলা শুকিয়ে গেছে।
গুহার সারির কাছে এসে দাঁড়াল ওরা। ভেতর থেকে আসছে দুর্গন্ধ। চোখে জ্বালা ধরাল। ঝাজ লাগল গলায়। কাশতে শুরু করল ওরা, সেই সঙ্গে ঘন ঘন হাঁচি। শেষে আর টিকতে না পেরে ফিরে আসতে লাগল আগের জায়গায়।
পথের ধারে আরেকটা গুহামুখ দেখে ওটার সামনে দাঁড়াল।
কিশোর বলল, এটার গন্ধ এত খারাপ না।
ভেতরে উঁকি দিল রবিন। জানাল, চারকোনা গুহা।
ঢুকে পড়ল দুজনে। ভেতরে আলো খুবই কম, চোখে সয়ে আসার সময় দিল। ওরা। দেখতে পেল অবশেষে। দেখে হা হয়ে গেল। মেঝে থেকে ছাত পর্যন্ত একটার ওপর আকেরটা সাজিয়ে রাখা হয়েছে শত শত ৫৫-গ্যালনের ড্রাম।
লেবেলে পড়ল কিশোর, পিসিবি এস।
রবিন পড়ল আরেকটার, অ্যাসিড।
পড়তে থাকল কিশোর, অ্যালকালাইন, অক্সিডাইজারস, সালফার স্লাজ।

আতঙ্ক ফুটেছে দুজনের চোখে। রাসায়নিক বর্জ্য পদার্থ! মারাত্মক বিষাক্ত!
সহসা ছায়া ঘন হল গুহার ভেতরে, সূর্যের মুখ কালো মেঘে ঢাকা পড়েছে। যেন। ঝট করে ফিরে তাকাল ওরা। গুহামুখে এসে দাঁড়িয়েছে একজন মানুষ, আলো আসা ঢেকে দিয়েছে। আটকা পড়ল ওরা!

.

তোমরা! রাগত গলায় বলল কণ্ঠটা, তোমরা এখানে কি করছ?
জন, তুমি? কিশোর বলল।
আমরা এখানে কি করে জানলে? জিজ্ঞেস করল রবিন।
আরও রেগে যাচ্ছে জন। বেরোও! বাইরের লোকের এখানে ঢোকা নিষেধ! এটা আমাদের পবিত্র জায়গা। কেউ ঢোকে না এখানে।
ভুল করছ, কিশোর বলল, এস, দেখাচ্ছি, কিসে তোমাদের অসুস্থ করে –তুলছে।
দ্বিধা করল জন। তারপর ভেতরে এসে ঢুকল।
ড্রামগুলো দেখাল কিশোর। একটা ড্রামের তলা ফুটো হয়ে গিয়ে ভেতরের আঠাল পদার্থ চুঁইয়ে পড়ছে মেঝেতে। তীব্র রাসায়নিক গন্ধ।
চুপচাপ দেখল জন। তারপর কিশোর আর রবিনের সঙ্গে চুপচাপ বেরিয়ে এল। বাইরে, খোলা হাওয়ায়, যেখানে ঠিকমত শ্বাস নেয়া যায়।
ড্রামগুলোতে কি আছে বলল কিশোর।
রাসায়নিক বর্জ্য! জন বলল, আমাদের বাতাস আর পানি দুষিত করছে!
করছে। তোমার চোখ লাল হয়ে গেছে, রবিন বলল। আমাদেরও হয়েছে। এটাও এই বর্জ্যের কারণেই।
দুজনের চোখের দিকে তাকাল জন। তাহলে তো ট্রয়কের পানি খাওয়া নিরাপদ নয় আমাদের জন্যে। ওটার মাছও নিশ্চয় বিষাক্ত হয়ে যাচ্ছে।
বনের জানোয়ারও। নদীতে পানি খেতে আসে ওরা।
এই গুহাটাতে তো গন্ধ কমই, কিশোর বলল। অন্যগুলোর কাছে যাওয়া যায় না, এতই বেশি। ওগুলোতে নিশ্চয় বোঝাই হয়ে আছে ফুটো হয়ে যাওয়া ড্রামে। বর্জ্যের ডাস্টবিন হিসেবে ব্যবহার করছে তোমাদের পবিত্র উপত্যকাকে।
কঠিন হয়ে গেছে জনের মুখ। ভাবছে রাসায়নিক বর্জ্যের ভয়াবহতার কথা। রাগে আগুন হয়ে ফুঁসে উঠল, আমাদের পবিত্র জায়গার এই সর্বনাশ কে করছে?
ফ্র্যাঙ্কলিন জোনস। জোনস ট্র্যাকিং কোম্পানির মালিক। চেনো?
নিশ্চয়। আমাদের মোড়ল মাঝে মাঝে গিয়ে তার কাজ করে। আমাদের অনেক সাহায্য করেন মিস্টার জোনস…
সেটা কাছাকাটি থাকার জন্যে, রবিন বলল। এই এলাকায় ঢুকতে যাতে সুবিধে হয়। জোনসই আমার বাবাকে কিডন্যাপ করেছে। কোথায় রাখবে, আন্দাজ

করতে পারো?
না। এদিকটায় এর আগে আসিইনি আমি। তবে চেষ্টা করলে খুঁজে বের করে ফেলতে পারব।
গোলাকার জায়গাটার দিকে হাঁটতে হাঁটতে কিশোর জিজ্ঞেস করল, আমাদেরকে বের করলে কি করে? পায়ের ছাপ দেখে?
কাঁধ সামান্য কুঁজো করে হাঁটছে জন। নজর নিচের দিকে। চাকার দাগগুলো দেখছে। দাদা, আমাকে আজ সকালে গান গাওয়া অনুষ্ঠান থেকে মুক্তি দিয়েছেন। তোমাদের জন্যে চিন্তা করছেন তিনি। আমার চাচীর গাড়িটা নিয়ে বেরিয়ে। পড়লাম। রাস্তায় দেখলাম তোমাদের যে পিকআপটা দেয়া হয়েছিল সেটা নষ্ট হয়ে। পড়ে আছে। তোমাদের জুতোর ছাপ অনুসরণ করে আসাটা কিছুই না। প্রথমে চোখে পড়ল দুই জোড়া জুতোর ছাপ তোমাদের পিছু নিয়েছে, তারপর তিন জোড়া। তাড়া করেছিল তোমাদের। তোমরা দৌড়ে পালিয়েছ, দুবার লড়াই করেছ, এক জায়গায় মুসার কাছ থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছ। বুটের দাগ শুধু তোমাদের পিছু নিয়েছে তারপর থেকে, মুসার পিছু নেয়নি।
এত কিছু বলতে পারলে শুধু চিহ্ন দেখেই? অবাক হয়ে বলল কিশোর।
এ-তো সহজ কাজ। আমি বনের ছেলে, এমনিতেই বন আমার পরিচিত। তার ওপর ট্র্যাকিং শিখেছি চাচার কাছে। সাংঘাতিক ভাল ট্র্যাকার ছিল আমার চাচা।
ট্র্যাকিং করে অনুমান করতে পেরেছ আমাদের পিকআপটাকে কে স্যাবোটাজ করেছে?
কি বললে? চমকে গেল জন।
বোল্টটা করাত দিয়ে কেটে কিভাবে ওদেরকে খুন করার চেষ্টা করা হয়েছিল বলল কিশোর।
মাথা নোয়াল জন। এরকম একটা কাজ কে করল? মুখ তুলল। তোমরা বেঁচে আছ দেখে খুব ভাল লাগছে আমার। মুসা নিশ্চয় ওস্তাদ ড্রাইভার।
একসাথে মাথা ঝাঁকাল রবিন আর কিশোর।
কিশোর, দেখাও না..., কিশোরের দিকে তাকিয়ে চোখের ইশারা করল রবিন।
অ্যাঁ, হ্যাঁ! ইঙ্গিতটা বুঝতে পারল কিশোর। প্রিয়জনের মৃত্যুসংবাদ দেয়াটা কঠিন। তবু সত্যি কথাটা জানাতেই হবে। পকেট থেকে রূপার বাকলসটা বের করে জনকে দেখাল সে, দেখ তো, চিনতে পার কিনা?
হাত বাড়িয়ে জিনিসটা নিল জুন। সে যেটা পরেছে অবিকল সেটারই মত দেখতে। আমার চাচার। মুখ তুলে জিজ্ঞেস করল, কোথায় পেলে?
উপত্যকায়, হাত তুলে একটা দিক দেখাল কিশোর। একটা কঙ্কালের পাশে। আসার পথে নিশ্চয় হাড়গুলো দেখে এসেছ?

চোখ বন্ধ করে মাথা ঝাঁকাল জন। শক্ত হয়ে গিয়ে আবার ঢিলে হয়ে গেল চোয়াল।
এইবার আমি বুঝতে পেরেছি, আমার ভিশন কোয়েস্টের মানে কি ছিল? কি বোঝাতে চেয়েছেন ঈশ্বর! ঠিক জায়গায়, কিন্তু আশীর্বাদ ছাড়া। ঠিক জায়গায়, অর্থাৎ ইনডিয়ানদের পবিত্র এলাকাতেই রয়েছে, কিন্তু তার আত্মা অশান্তই থেকে গেছে, পরপারের ঠিক জায়গায় যেতে পারেনি।
একটা মুহূর্ত নীরব হয়ে রইল তিনজনে।
হাড়গুলো দেখার জন্যে থেমেছিলে? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
না। তোমাদের জন্যে ভাবনা হচ্ছিল।
আরও খারাপ খবর আছে তোমার জন্যে। খুলিটাতে বুলেটের ফুটো দেখেছি।
গুলি করা হয়েছে? কে করল? কেন করল?
হ্যারিস হেরিং-এর দুর্ঘটনার কথা বলল কিশোর। তিন গোয়েন্দা আর রবিনের বাবাকে খুন করে যে দুর্ঘটনার মত করে সাজাতে চায়, সেকথাও বলল।
তুমি বোঝাতে চাইছ, জন বলল, তোমাদের মতই চাচাও কিছু সন্দেহ করেছিল, এই জায়গাটা দেখে ফেলেছিল বলেই তাকে মরতে হয়েছে?
হতে পারে।
চুপ করে ভাবল জন। বলল, অনুষ্ঠানে দাদা জেনেছেন, বিদেশী ডাইনী এসে আমাদের অসুস্থ করে তুলেছে। ডাইনীর লোভ খুব বেশি, সে যা চায় সেটা দিয়ে দিলেই কেবল তাকে ধ্বংস করা সম্ভব।
তাহলে জোনসই সেই ডাইনী।
কিন্তু যা চায় সেটা দিয়েই ধ্বংস করতে হবে, এর মানে কি? বুঝতে পারছে না রবিন।
জানি না, হাত ওল্টাল জন। চাচার বাকলসটা পকেটে রেখে দিল। চলো, খুঁজে বের করি। চওড়া একটা চাকার দাগ দেখিয়ে বলল, এটা মিস্টার জোনসের উইনিব্যাগোর দাগ। এসো। দাগটাকে অনুসরণ করে দুলকি চালে ছুটতে আরম্ভ করল সে।
ওর পেছনে ছুটল কিশোর আর রবিন। জনের ট্র্যাকিঙের ক্ষমতা দেখে বিস্মিত হয়েছে। সরু রাস্তা ধরে এসে বার্চ আর পাইনের জঙ্গলে ঢুকল ওরা। গতি কমাল জন। সতর্ক হয়ে চলতে লাগল এখন থেকে।
বাতাসে পাইনের সুগন্ধ বেশিক্ষণ খাঁটি থাকতে পারল না, ভেজাল ঢুকে নষ্ট হয়ে গেল, গুহার কাছে যে দুর্গন্ধ পেয়েছে, সেই একই দুর্গন্ধ এখানেও।
এ থেমে গেল জন। পাওয়া গেছে। মিস্টার জোনসের উইনিব্যাগো। ওটা নিয়েই আমাদের গাঁয়ে যায়, খাবার, গুলি, দিয়ে আসে। বাচ্চাদের জন্যে খেলনা নিয়ে

যায়।
পথের শেষ মাথায় দাঁড়িয়ে আছে দামি অনেক বড় গাড়িটা। গুহার কাছ থেকে সরিয়ে এনে বর্জ্য পদার্থের বিষক্রিয়া-সীমানার বাইরে এনে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। গাছপালার ভেতরে।
ওটার দিকে পা বাড়াতে গেল জন।
দাঁড়াও! ওর হাত ধরে ফেলল কিশোর। ভেতরে লোক থাকতে পারে। ওদের কাছে রাইফেল আছে।
মাটিতে জুতোর ছাপ দেখাল জন। সোলের নিচে চারকোনা খোপ খোপ করা। সেই ছাপ পড়েছে ধুলোতে। গাড়ির দিকে এগিয়ে গেছে।
চিনতে পেরেছ? জিজ্ঞেস করল সে।
মাথা নাড়ল কিশোর আর রবিন। পারিনি।
মুসা। ওকে রেখে সবাই চলে গেছে। এই যে দেখো, বুটের দাগ।
মুসাকে ধরে ফেলেছে! গুঙিয়ে উঠল কিলোর।
জনের দিকে উদ্বিগ্ন চোখে তাকাল দুই গোয়েন্দা। এসো, পা বাড়াল আবার জন।
সাবধানে যাও, হুঁশিয়ার করল কিশোর। জোনস কাছাকাছিই থাকতে পারে।
পা টিপে টিপে গাড়ির কাছে চলে এল তিনজনে। জানালা দিয়ে ভেতরে উঁকি দিল। দুজন মানুষকে দেখা গেল ভেতরে। ধাতব কিচেন চেয়ারে বেঁধে রাখা হয়েছে। মুখে কাপড় গোঁজা। একজন মুসা। আরেকজন...
বাবা! চিৎকার করে উঠল রবিন।

.

প্রথমেই মুসা আর মিলফোর্ডের মুখের কাপড় টেনে বের করা হলো।
বাবা, ঠিক আছ তুমি?
এখন হলাম, মলিন হাসি ফুটল মিলফোর্ডের ঠোঁটে। কপালের জখমটার ফোলা কমেনি, আরও লাল হয়েছে। ডাক্তার ছাড়া হবে না। এখান থেকে বেরিয়ে গিয়েই আগে ডাক্তার ডাকবে, কোমল গলায় বাবাকে কথা দিল রবিন।
তোমাকে ধরল কি করে, মুসা? বাঁধন খুলতে খুলতে জিজ্ঞেস করল কিশোর।
নেতিয়ে রয়েছে সহকারী গোয়েন্দা। গাধা যে আমি, মাথায় গোবর পোরা, সে জন্যেই ধরেছে! বনের ভেতর দিয়ে কোন শর্টকাট রয়েছে, ডক চেনে, আমার অনেক আগেই এসে ওর ট্রাকগুলো বের করে নিয়েছে।
বাঁধনমুক্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন মিলফোর্ড আর মুসা। হাত-পা ঝাড়া দিয়ে, ডলে ডলে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করতে লাগলেন।
থ্যাঙ্কস, বলতে বলতেই হাত বাড়িয়ে রবিনের মাথা থেকে নীল ক্যাপটা নিয়ে মাথায় চাপালেন মিলফোর্ড। কিছু মনে করলে না তো?

আরে না না, কি যে বলো। তোমার জন্যেই তো রেখেছিলাম, হাসতে হাসতে বলল রবিন। এতদিন পর খুশির হাসি ফুটেছে তার মুখে। তারপর মনে পড়ল জনের সঙ্গে বাবার পরিচয় নেই। পরিচয় করিয়ে দেয়া দরকার।
দ্রুত সেরে উঠল মুসা। হাত-পা ঝাড়া দিয়ে, কয়েকটা লাফ দিয়ে, শরীরের আড়ষ্টতা বিদেয় করে দিয়ে এগিয়ে গেল গাড়িতে রাখা রেফ্রিজারেটরের দিকে। খিদেয় মরে যাচ্ছি আমি। ডালা খুলে বের করল মাখন, রুটি আর ফলের রস।
সবাই গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল খাবারের ওপর।
ভেতরে জায়গা বেশি নেই, জিনিসপত্রে ঠাসাঠাসি, তারই ভেতরে কোনমতে হেঁটে বেড়াতে লাগলেন মিলফোর্ড। মাথা ঘুরে উঠল। টলে পড়ে যাচ্ছিলেন, কোনমতে তাক ধরে সামলালেন। ধপ করে বসে পড়লেন আবার চেয়ারে। তোমাদেরকে দেখে খুশি লাগছে। আমি যখন ছিলাম না তখন কি কি ঘটেছে বলো তো?
সব কথা খুলে বলল রবিন। শেষে বলল, হ্যারিস হেরিং মারা গেছে, বাবা। জোনস তাকে খুন করেছে।
আদেশ দিয়েছে জোনস, মিলফোর্ড বললেন, আর কাজটা সেরেছে ডক। হেরিঙের পিছে লেগে ছিল, জেনে গিয়েছি সে আমার সঙ্গে কথা বলতে চায়। হিলারি সেসনার ইলেকট্রিক্যাল সিসটেমে গোলমাল করে দিয়েছিল আমাকে খুন করার জন্যে। কেবিনের ফায়ার ওয়ালের পেছনে জট পাকিয়ে থাকা একগাদা তারের মধ্যে ছোট একটা বোমা রেখে দিয়েছিল। স্বীকার করেছে সব।
ইলেকট্রনিক ফিউজ ব্যবহার করেছিল নিশ্চয়, মুখভর্তি খাবারের ফাঁক দিয়ে কোনমতে বলল কিশোর। ফলে মাটিতে থেকেই ওটা ফাটাতে পেরেছে জোনস।
তা-ই করেছে। এমন জায়গায় নামাতে চেয়েছে আমাকে, যেখানে নির্ঘাত মারা পড়ব। আর যদি ক্র্যাশ ল্যাণ্ড করে মারা না-ও যাই, আমাকে হাতে পেয়ে যাবে সে। খুন করতে পারবে। তাতে বরং সুবিধে বেশিই তার, মারার আগে জেনে নিতে পারবে খবরটা আর কে কে জানে। তারপর দেখল, প্লেনে অনেক লোক ঢুকে বসে আছে। ভয় পেয়ে গেল সে। ভাবল, বুঝি আমরা চারজনেই খবরটা জানি। এটা তার জন্যে খুবই খারাপ। পুরো পাঁচ লাখ ডলারের মামলা, কিছুতেই এটা হাতছাড়া করতে চাইল না। দরকার হলে সবাইকে খুন করবে, তবু যেন কোন রকম তদন্ত না হয় এখানটায়।
ওই সাংঘাতিক কেমিক্যাল জমিয়ে রেখে এত টাকা আয় করবে সে? মুসা অবাক।
হ্যাঁ। ছোট ব্যবসায়ী সে, এত টাকার লোভ সামলাতে পারল না। এনভায়রনমেন্টাল প্রোটেকশন এজেন্সি বহু কোম্পানিকে জরিমানা করেছে। কেন করেছে জান? বর্জ্য পদার্থ বৈধ উপায় নিয়ে গিয়ে ফেলে দিয়ে আসাটা অনেক খরচের ব্যাপার। কাজেই অনেক কোম্পানিই টাকাটা বাঁচাতে অসৎ পথ

ধরে। তারপর ধরা পড়ে জরিমানা দেয়। হপ্তা দুই আগে ইপিএ একটা কোম্পানিকে হাতেনাতে ধরে ফেলেছিল। ওরা এতই বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল, শহরের নর্দমায় বর্জ্য ঢেলে দিতেও দ্বিধা করেনি।

সর্বনাশ! আঁতকে উঠল কিশোর। ভয়ানক ব্যাপার ঘটে যেত তো তাহলে! নর্দমার মুখ বন্ধ, সিউয়ারেজু শ্রমিকের মৃত্যু, চাষের খেতের ক্ষতি, সবই হতে পারত। টাকার জন্যে এতটা নিচে নামতে পারে মানুষ!

এর চেয়েও নিচে নামে। যা-ই হোক, ওই ঘটনার পর সম্পাদক সাহেব আমাকে একটা বিশেষ দায়িত্ব দিলেন। বর্জ্য পদার্থ কোথায় কোথায় ঢালা হয় তার ওপর সচিত্র প্রতিবেদন করতে হবে, ধারাবাহিকভাবে ছাপা হবে ওটা। হ্যারিস হেরিং কাগজকে টেলিফোন করে বলেছে একজন সাংবাদিক পাঠাতে, কথা বলতে চায়। প্রথমে তো নামই বলতে চায়নি আমাকে, এতটা ভয় পেয়ে গিয়েছিল। ওর আশঙ্কা ছিল, নাম ফাঁস হয়ে গেলে ওকে খুন করে ফেলা হবে। শুধু বলল, একটা। অটো কোম্পানিতে চাকরি করে। খরচ কমানর জন্যে বেআইনী ভাবে বর্জ্য সরিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করেছে কোম্পানিটা। জোনসের ট্রাকের পিছু নিয়ে কোথায় বর্জ্য ফেলা হয়, দেখেও এসেছে হেরিং। সেটা গোপনে সংবাদপত্রকে জানিয়ে দিয়ে জনসাধারণকে হুশিয়ার করে দিতে চায়।

দরজার গায়ে হেলান দিয়ে কথা শুনছিল জন। মিলফোর্ড থামলে বলল, আমাদের উপত্যকাটার সর্বনাশ করে দিয়েছে ব্যাটারা! মাটি নষ্ট করেছে, পানি নষ্ট করেছে, মাছ জন্তুজানোয়ার খাওয়ার অযোগ্য করে দিয়েছে, বিষাক্ত করে দিয়েছে বাতাস, শ্বাস নিতে পারি না আমরা। অসুস্থ হয়ে পড়ছি। আমার চাচাকে খুন করেছে ওরা।

বিষাক্ত বর্জ্যের ব্যাপারে অনেক কথাই যেতে আরম্ভ করেছে সরকারের কানে, মিলফোর্ড বললেন। ব্যবস্থা একটা করবেই। তবে তোমার চাচার ব্যাপারে কোন কথা কানে আসেনি আমার। বুঝতে পারছি না ওরাই করেছে কিনা কাজটা।

গাড়ির সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে ড্রাইভারের আসনে বসল কিশোর। বলল, আঙ্কেল, আপনার প্রতিবেদনের জন্যে যথেষ্ট তথ্য জোগাড় হয়ে গেছে?

অনেক কিছুই পেয়েছি, বললেন তিনি। শুরুটা ভালই হয়েছে। এখানে। জোনসের অনেক রেকর্ডপত্র রয়েছে, ড্রয়ারে, বের করে কেবল পড়ার অপেক্ষা। এই গাড়িটাই ওর অফিস। সব সময়ই ঘুরে বেড়ায়। সচল অফিস বলে ওকে সন্দেহ করে ধরাটা কঠিন হয়ে পড়েছিল।

এখন তো সহজ হয়ে গেছে, মুসা বলল। কিশোর, সরো ওখান থেকে। ব্যাটার অফিসটাই চালিয়ে নিয়ে চলে যাব।

আমি চালাব, চেয়ার থেকে উঠতে গেলেন মিলফোর্ড।

না, আপনার শরীর ভাল না। আমিই পারব।
রবিনও বাবাকে উঠতে দিল না। মুসা ঠিকই বলেছে, বাবা।
আমি ঠিকই আছি, আবার উঠতে গেলেন মিলফোর্ড। চক্কর দিয়ে উঠল মাথা। চেয়ারের পেছনটা খামচে ধরলেন। বসে পড়তে হল আবার। নাহ্, মনে। হচ্ছে সত্যিই খারাপ আমার শরীর।
চাবিগুলো কোথায়? পাচ্ছি না তো। মিলফোর্ডের দিকে তাকাল কিশোর, জানেন, কোথায় রেখেছে?
জোনসের কাছেই আছে বোধহয়।
নিরাশ হলো কিশোর। ড্রয়ারের চাবির কথা জিজ্ঞেস করেছে সে।
মুসা জিজ্ঞেস করল গাড়ির চাবিটার কথা। সেটা কোথায় তা-ও বলতে পারলেন না মিলফোর্ড। তবে তাতে একটুও দমল না সহকারী গোয়েন্দা। চাবি ছাড়াই কি করে স্টার্ট দিতে হয় জানা আছে তার। দরজার দিকে পা বাড়াল সে, হুড তুলে কিছু কাজ করতে হবে ইঞ্জিনের তারে।
দাঁড়াও! বদলে গেছে জনের কণ্ঠস্বর। মুসাকে দেখে সেদিন গাছের ছায়ায় যেমন অনড় হয়ে গিয়েছিল, সেরকম ভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। চোখ বন্ধ করে শব্দ শোনার চেষ্টা করছে। লোকের সাড়া পাচ্ছি।
হুড়াহুড়ি করে জানালার কাছে চলে এল গোয়েন্দারা। বাইরে তাকাল। ঠিকই বলেছে জন। গাছপালার ভেতরে নড়াচড়া দেখা যাচ্ছে। ঝিক করে উঠল ধাতব কিছুতে রোদ লেগে। রাইফেলের নলে লেগেছে, একথা বলে দিতে হল না ওদেরকে।
অ্যামবুশ করেছে ওরা! নিঃশ্বাস ভারি হয়ে গেছে কিশোরের।
ঢোক গিলল রবিন।
জোনসকে দেখলাম মনে হল! মিলফোর্ডও জানালা দিয়ে তাকিয়ে রয়েছেন।
শয়তান ডকটাকেও দেখেছি! মুসা বলল।
ওই লোকটা সব চেয়ে বিপজ্জনক! রবিনের কণ্ঠে অস্বস্তি। খুন করতে ওর একটুও হাত কাঁপে না!
আরি, আমাদের মোড়লচাচাকেও দেখছি! চোখ বড় বড় হয়ে গেছে জনের। নিওমো কয়েলও আছে?
হালকাপাতলা লোকটার কথা মনে পড়ল কিশোরের, যে মালটিকে ইশারা করেছিল পিকআপ রেডি হয়েছে জানিয়ে। জিজ্ঞেস করল, নিওমো মোড়লের সহকারী, তাই না?
সব সময় না, জন বলল। মাঝে মাঝে কাজে সাহায্য করে। দুজনের। হাতেই ওয়াকি-টকি আছে। রাইফেল আছে! মোড়লচাচার হাতে রাইফেল থাকাটা

মারাত্মক। নিশানা বড় সাংঘাতিক!
রাগার টেন বাই টোয়েন্টি টু হান্টিং রাইফেল! বিড়বিড় করল কিশোর। আতঙ্কিতই হয়ে পড়েছে প্রায়। এতগুলো লোক আর শক্তিশালী অস্ত্রের মুখ থেকে বেঁচে বেরোবে কি করে?
মালটি বলেছে, তোমাদের মোড়ল নাকি গাঁয়ের জন্য নানা রকম জিনিস কিনে নিয়ে আসে, রবিন বলল। মোটর ইঞ্জিনের পার্টসের মত দামি জিনিসও আনে। তার একটা নতুন গাড়ি দেখেছি, অনেক দামি। এখন বোঝা যাচ্ছে। জোনসের কাছ থেকে ভাল টাকা পায় সে, মুখ বন্ধ রাখার জন্যে।
কালো হয়ে গেছে জনের মুখ। বিশ্বাসই করতে পারছি না! এত ভাল একজন মানুষ...
গাড়ির ভেতরে টানটান উত্তেজনা।
এই ভাল মানুষদের নিয়েই সমস্যা, মিলফোর্ড বললেন। দেখে মনেই হয় না। এরা খারাপ কিছু করতে পারে। মোড়লকে ফাঁসানোর মত কোন প্রমাণ নেই আমাদের হাতে। নিওমোকে ধরার মতও নেই।
তাহলে কে আমাদের ব্রেক নষ্ট করে দিয়ে মেরে ফেলেছিল আরেকটু হলেই? রেগে গিয়ে বলল মুসা।
ওর দিকে তাকিয়ে রইল জন। তারপর ঘুরে তাকাল আরেক দিকে, জানি না। এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না মোড়ল কিংবা নিওমো এরকম কাজ করতে পারে।
ওসব আলোচনার অনেক সময় পাব, আবার ড্রাইভারের সীটের দিকে রওনা হলো কিশোর। এখন একটাই কাজ, বেরিয়ে যেতে হবে এখান থেকে।
একটা ঝাড়ু রাখার আলমারি দেখিয়ে নিজেকেই যেন জিজ্ঞেস করল মুসা, ওর মধ্যে বন্দুক-টক আছে?
থাকলেও লাভ নেই, মিলফোর্ড বললেন, এম সিক্সটিনের বিরুদ্ধে বন্দুক দিয়ে কিছুই করতে পারবে না। তাছাড়া ওখানে কিছু রেখেছে বলেও মনে হয় না। অন্য উপায় করতে হবে আমাদের।
ড্যাশবোর্ডের নিচে হাতড়াচ্ছে কিশোর। ঝড়ের গতিতে ভাবনা চলেছে। মাথায়। মেরিচাচী প্রায়ই বলেনঃ সব রকম বিপদের জন্যে সব সময় তৈরি থাকলে মানুষের বিপদ অনেকটাই কমে যায়। কিশোরও মানে সেকথা। জোনসকে দেখে যা মনে হয়েছে, অনেকটাই মেরিচাচীর স্বভাব। সব কিছুর জন্যেই যেন তৈরি থাকে সব সময়। এই গাড়িটাকে যখন অফিস বানিয়েছে, অনেক কিছুর জন্যই তৈরি করে রেখেছে:হ্যাঁ, এই তো, যা ভেবেছিল। পেয়ে গেল জিনিসটা। হাতটা ড্যাশবোর্ডের নিচ থেকে বের করে এনে মুঠো খুলল। ছোট একটা ম্যাগনেটিক

কেস, যার মধ্যে লোকে গাড়ির বাড়তি চাবি রাখে, একটা হারিয়ে গেলেও যাতে প্রয়োজনের সময় দ্বিতীয়টা পেয়ে যায়।
গাড়ির ভেতরের উত্তেজনা মুহূর্তের জন্যে সহজ হলো। হাসি-মুখে চাবিটা মুসার হাতে তুলে দিল কিশোর। প্রায় লাফ দিয়ে গিয়ে ড্রাইভিং সীটে বসল মুসা।
মুসা, দুর্বল কণ্ঠে বললেন মিলফোর্ড, তোমাকে যে রাস্তা দিয়ে এনেছে ডক, সেই রাস্তা দিয়েই চলে যাও। গুলি করে টায়ার ফাটিয়ে দিলেও থামবে না, বসা টায়ার নিয়েই চালাবে। মোট কথা, কোন কারণেই থামবে না। তোমার একমাত্র লক্ষ্য হবে, চালিয়ে যাওয়া। ডায়মণ্ড লেকে যাব আমরা!
বাবার দিকে তাকিয়ে রয়েছে রবিন। সহজে ভয় পান না তার বাবা। এখন পেয়েছেন। পরিস্থিতি খুবই খারাপ।
মুসা বলল, সবাই মাথা নামিয়ে রাখো। শক্ত করে ধরে থাকো কিছু।
মেঝেতেই শুয়ে পড়ল সকলে, মিলফোর্ড সহ। জন সতর্ক, সাংঘাতিক সতর্ক, গভীর দুর্গম বনে চলার সময় যেমন থাকে। রবিন ভাবছে, রকি বীচে আর কি কোনদিন ফিরে যেতে পারবে? যেতে পারবে ট্যালেন্ট এজেন্সি কিংবা পাবলিক লাইব্রেরিতে? বার দুই ঢোক গিলল কিশোর। মনে মনে বলছে, খোদা, এবার যেন। ফোর্ড পিকআপটায় চড়ার মত দুর্গতি না হয়।
আর মুসা, ভারি একটা দম নিয়ে আস্তে মোচড় দিল ইগনিশনে। জেগে গেল ইঞ্জিন।

.
স্টিয়ারিঙের ওপর ঝুঁকে রয়েছে মুসা। যতটা সম্ভব গুলির নিশানা থেকে সরে থাকতে চাইছে। কয়েকটা মোচড় দিয়েই গাড়ির নাক ঘুরিয়ে ফেলল, ছুটল খোলা জায়গাটার দিকে। জোনসের চওড়া মুখে বিস্ময় দেখতে পেল সে।
তারপরই ছুটে আসতে লাগল বুলেট। বিধতে লাগল গাড়ির শরীরে। একপাশ দিয়ে ঢুকে আরেক পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল।
এই, সবাই ঠিক আছ? চিত্তার করে জিজ্ঞেস করল মুসা।
আছি! চারটা কণ্ঠই জবাব দিল।
আরও একঝাঁক বুলেট এসে বিধল গাড়ির শরীরে। আরেক ঝাঁক ধুলো ওড়াল রাস্তায় লেগে। মাটির কণা লাফিয়ে উঠল। চাকা ফুটো করতে চাইছে।
বার্চ আর পাইন বনের ভেতর থেকে বেরিয়ে গেছে সরু রাস্তাটা, সেটা ধরে ছুটেছে মুসা।
জোনসের পাশে এসে দাঁড়ালেন গভীর চেহারার মোড়ল, উত্তেজিত হয়ে কথা বলছেন। হাত তুলে গুলি থামানর নির্দেশ দিল জোনস। বেল্ট থেকে ওয়াকি-টকি খুলে নিয়ে কথা বলতে শুরু করল।

পাশ দিয়ে গাড়িটা ছুটে বেরোনর সময় এদিকে তাকিয়ে একটা অদ্ভুত কাণ্ড করল সে, রাগ দেখানর পরিবর্তে একটা হাসি দিল। রহস্যময়, শয়তানি হাসি। কারণটা বুঝতে পারল না মুসা। ওরা পালিয়ে যাচ্ছে। ধরে রাখতে পারছে না। তাহলে হাসল কেন লোকটা?

আমাদেরকে কিছু করছে না ওরা! চেঁচিয়ে সঙ্গীদেরকে জানাল মুসা।

আঁকাবাঁকা সরু পথ ধরে তীব্র গতিতে চলেছে গাড়ি। অ্যাক্সিলারেটর চেপে ধরে রেখেছে মুসা। গতিবেগ আর বাড়ানোর সাহস করতে পারছে না। রাস্তায় একটু পর পরই বাঁক, বিশ-পঁচিশ গজের বেশি দেখা যায় না মোড়ের জনে) রাস্তাও খারাপ। এপাশ ওপাশ ভীষণ দুলছে গাড়ি। গাছের ডালে ঘষা লাগছে।

এতক্ষণে জোনসের হাসির কারণটা বুঝতে পারল মুসা। ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষল।

কি হলো? চিৎকার করে উঠল কিশোর।

সামনে রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে জোনস কোম্পানির বিশাল এক ট্রাক। হিলারি কিংবা অন্য কেউ চালান দিয়ে এসেছিল বোধহয়, তাকে রেডিওতে নির্দেশ দিয়েছে জোনস। মুসা যেটা চালাচ্ছে সেটাও অনেক বড় গাড়ি। ট্রাকটা যেভাবে। পথ জুড়ে রয়েছে, তাতে ছোট ফোক্সওয়াগেনকেও পাশ কাটিয়ে নেয়ার জো নেই।

এটা তো অসম্ভব।ট্রাকের সামনে পেছনের বাম্পারের সঙ্গে গাছ ছুঁয়ে আছে।

ফাঁদে পড়েছি! চিৎকার করে জানাল মুসা।

স্কিড করে থেমে গেল গাড়ি। ট্রাকের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল হিলারি, হাতে এম-১৬, মুসার দিকে তাক করা। বেল্টে ঝুলছে ওয়াকি-টকি।

জানালার কাছে উঠে এল গাড়ির ভেতরের চারজন।

এবার? গুঙিয়ে উঠল রবিন।

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে আরম্ভ করেছে কিশোর।

অ্যাই, ঘটে যদি কিছুটা বুদ্ধিও থাকে, চেঁচিয়ে আদেশ দিল হিলারি, আর খেপামি কোরো না। ভালয় ভালয় নেমে এসো। তোমাদেরকে মারতে মানা করেছে। বস্, বেঁচে গেলে। তাই বলে গোলমাল সহ্য করব না।

দলবল নিয়ে এখুনি চলে আসবে জোনস, মিলফোর্ড হুঁশিয়ার করলেন।

একটা বুদ্ধি এসেছে মাথায়, শান্তকণ্ঠে বলল কিশোর। আমি হিলারির নজর সরিয়ে রাখি, তোমরা সব সারি দিয়ে নেমে একেকজন একেকদিকে পালাও…

অ্যাই, কথা কানে যায় না! ধমক দিয়ে বলল হিলারি। জলদি নাম!

সাবধান! মিলফোর্ড বললেন।

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। দরজার হাতল ধরে দ্বিধা করল। তারপর লম্বা দম নিয়ে টান দিয়ে খুলে ফেলল পাল্লা। দুহাতে মাথা চেপে ধরে প্রচণ্ড মাথা ব্যথার অভিনয়

শুরু করল। ওওওহ! ওওওহ! ককাতে লাগল সে। মাটিতে নেমে টলতে টলতে এগোল হিলারির দিকে। মরে যাচ্ছি! ব্যথায় মরে যাচ্ছিরে বাবা!
ভুরু কুঁচকে ফেলেছে হিলারি। মোরগের মত গলা লম্বা আর মাথা কাত করে তাকিয়ে রয়েছে। চোখে সন্দেহ। কিশোরের দিকে তাক করেছে এখন রাইফেল।
আমি মরে যাচ্ছি! টলতে টলতে আরও দুই পা আগে বাড়ল কিশোর। বাঁচান আমাকে! মরে গেলাম!
সরো! চেঁচিয়ে উঠল হিলারি।
আরেকটু এগোল কিশোর। টলে পড়ে যাচ্ছে যেন এরকম ভঙ্গি করে প্রায় পায়ের ওপর গিয়ে পড়ল হিলারির। ধরে সামলানর জন্যে চেপে ধরল ওর রাইফেল ধরা হাত। ঠেলে রাইফেলের নল সরিয়ে দিল আরেক দিকে।
তাকিয়েই ছিল মুসা। লাফিয়ে নামল মাটিতে। পেছনে রবিন, জন আর মিলফোর্ড।
জুডোর এক প্যাঁচে হিলারিকে মাটিতে ফেলে দিল কিশোর। শরীর দিয়ে চেপে ধরল।
সরো! সরো! চেঁচাতে লাগল হিলারি।
পালাচ্ছে! পেছন থেকে জোনসের চিৎকার শোনা গেল! ধরো ওদেরকে!
দলবল নিয়ে ছুটে আসতে লাগল সে।
লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। বনের দিকে দৌড় দিয়েছে রবিন আর মিলফোর্ড। মুসা যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে বনে ঢোকার মুখটার দিকে। সেদিকেই ছুটল গোয়েন্দাপ্রধান। ঝড়ো হাওয়ার মত ছুটছে জন, জোনস কোম্পানির একটা ট্রাকের দিকে।
মোড়লও ছুটছেন, কিশোরকে ধরার জন্যে। জনের চেয়ে কম ছুটতে পারেন না। দ্রুত কমছে দুজনের মাঝের দূরত্ব। সাঁ করে ঘুরে গিয়ে গুহার দিকে ছুটল কিশোর। আরেকটা বুদ্ধি করেছে। একটু আগে জোনসের ওপর কতটা রেগে গিয়েছিলেন মোড়ল, দেখেছে। সেই রাগটাকেই কাজে লাগাতে চায়।
সব চেয়ে কাছে যে গুহাটা রয়েছে সেদিকে ছুটল কিশোর। পেছনে তাড়া করছেন মোড়ল।
ঢুকে পড়ল কিশোর।
চিৎকার করে ডাকলেন মোড়ল, বেরোও! জলদি বেরোও! ওটা পবিত্র জায়গা! তোমাদের ঢোকার অধিকার নেই।
তাহলে জোনস আর তার লোকেরা ঢুকল কি ভাবে? চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

ওরা আমাদের মানুষকে সাহায্য করে। ঈশ্বর সেটা বুঝবেন। আমাদের টিকে থাকাই কঠিন হয়ে উঠেছিল। মিস্টার জোনস আসাতে বেঁচেছি।
বাঁচলেন আর কই? অসুখে তো মরতে চলেছেন।
সেটা মিস্টার জোনসের দোষ নয়। বেরোও!
আসুন ভেতরে, ডাকল কিশোর। দম নিয়ে দেখুন, কেমন নাক আর গলা জ্বালা করে। মারাত্মক বিশাক্ত বর্জ্য পদার্থ রয়েছে এই ড্রামগুলোতে।
ড্রামগুলোর দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লেন মোড়ল, না, তা হতে পারে না। মিস্টার জোনস বলেছেন, এগুলোতে বিস্ফোরক রয়েছে। আমাকে রেখেছেন পাহারাদার। এখানে বাইরের কেউ ঢোকার চেষ্টা করলে তাকে জানাতে বলেছেন। ব্যবসায় প্রতিযোগিতা এখন বেশি, অনেক প্রতিযোগী আছে তার। ওরা তার ক্ষতি করার চেষ্টা করছে। সে জন্যেই সব কথা বাইরের লোকের কাছে গোপন রাখতে বলেছেন। ওয়াকি-টকি দিয়েছেন যোগাযোগ করার জন্যে। জায়গাটার ভাড়া দেন। তিনি, সেই টাকায় গাঁয়ের লোকে.দরকারী জিনিস কিনতে পারে। এখানে জিনিস রাখার অধিকার তার আছে। যা খুশি রাখুক, আমাদের নাক গলানর কিছু নেই। থামলেন মোড়ল। বিষণ্ন স্বরে বললেন, ভাড়ার টাকাটা এখন আমাদের খুবই দরকার। গাঁয়ের দুঃসময় যাচ্ছে।
কিন্তু বিষাক্ত বর্জ্য যে অসুস্থ করে ফেলছে আপনাদেরকে একথাটা ভেবেছেন?
কিশোরের চারপাশে একপাক ঘুরলেন মোড়ল। রাইফেলের নল নেড়ে আদেশ দিলেন, বেরোও!
জোনস হল সেই বিদেশী ডাইনী, যার কথা বলেছেন শামান, গুহামুখের দিকে এগোতে এগোতে বলল কিশোর। আবার রোদের মধ্যে বেরিয়ে বলল, আপনি আসলে ভয় দেখাচ্ছেন আমাকে। আমি জানি, গুলি করতে পারবেন না।
দ্বিধা করলেন মোড়ল। তারপর রাইফেলের নল কিশোরের পিঠে ঠেসে ধরে ঠেলে নিয়ে চললেন জোনসরা যেখানে অপেক্ষা করছে সেখানে।
বনের ভেতরে রবিন আর মিলফোর্ডের পিছু নিয়েছে নিওমো।
ডকের সঙ্গে নদীর কিনারে লড়ছে মুসা। এম-১৬টা কেড়ে নিতে চায়।
ভাতিজা! চিৎকার করে জনকে ডাকলেন মোড়ল।
ট্রাকের ড্রাইভিং সিটে চেপে বসেছে জন। ইঞ্জিন স্টার্ট দেয়ার চেষ্টা করছে।
খোলা দরজার কাছে গিয়ে তার দিকে রাইফেল তাক করল হিলারি।
ভাতিজা, বোকামি কোরো না! আবার বললেন মোড়ল। নেমে এস!
আটকা পড়েছে সবাই, বুঝতে পারছে কিশোর। যে কোন মুহূর্তে এখন। ওদেরকে গুলি করে মেরে ফেলার আদেশ দিতে পারে জোনস। ওদের বাঁচিয়ে রাখার আর কোন কারণ নেই।

ওদেরকে সরিয়ে দেয়ার পর নিশ্চিন্তে আবার এই উপত্যকার রাজা হয়ে বসবে। জোনস। বাধা দেয়ার কেউ থাকবে না। দুষিত করতে থাকবে উপত্যকার পরিবেশ, অসুস্থ হতে থাকবে গাঁয়ের লোক। মরবে। ডাইনী খোঁজা চালিয়ে যাবে ইনডিয়ানরা, কিন্তু খুঁজে আর পাবে না। ঠেকাতেও পারবে না। গান গাওয়া উৎসব চালিয়ে যেতে থাকবে ওরা, একের পর এক মেসেজ পাঠাতে থাকবে ঈশ্বরের কাছে, লাভ হবে না কিছুই।

মেসেজ! অনুষ্ঠানের সময় জনকে দিয়ে মেসেজ পাঠিয়েছে গান গাওয়া ডাক্তারঃ ডাইনী যা চায়, তাকে তাই দিয়ে দাও, ধ্বংস হয়ে যাবে সে!

দ্রুত চারপাশে তাকাল কিশোর। জোনস ডাইনী হয়ে থাকলে এখন সে চাইছে ওরা সবাই ধরা পড়ুক। আশার আলো উঁকি দিল তার মনে...মস্ত ঝুঁকি হয়ে। যাবে..কিন্তু আর কোন উপায়ও নেই।

জন! মুসা! রবিন! চিৎকার করে ডাকল কিশোর। সবাই চলে এস! ধরা দাও!

কক্ষণো না! বলেও শেষ করতে পারল না মুসা, ধা করে তার পেটে রাইফেলের বাঁট দিয়ে বাড়ি মারল ডক।

জনেরও নামার ইচ্ছে নেই। কিন্তু হিলারির রাইফেলের দিকে তাকিয়ে ইচ্ছেটা করতেই হল।

ঝোপের ভেতর থেকে মিলফোর্ডের কলার ধরে টেনে বের করে আনল নিওমো। রবিন বেরোল তার পাশে। বাধাও দিল না, কিছু করতেও গেল না।

এই, চলে এসো তোমরা! আবার ডাকল কিশোর। আর কোন উপায় নেই আমাদের!

অবাক হয়েছে সবাই। রেগে গেছে মুসা আর জন। কেবল রবিন বুঝতে পারছে, কোন ফন্দি করেছে কিশোর পাশা। ধীর পায়ে এগিয়ে আসছে সবাই জোনস যেখানে দাঁড়িয়ে আছে।

আপনি জানেন, মোড়লকে বলল কিশোর, জোনস আমাদের মেরে ফেলবে!

না, মোড়লের এখনও ধারণা, কিশোর ঠিক কথা বলছে না, মারবে না। কেবল বের করে দেবে এই এলাকা থেকে।

বের করে দেয়ার জন্যেই কি আমাদের যে পিকআপটা দিয়েছিলেন, তার ব্রেক নষ্ট করে দিয়েছিল?

কি বললে? জবাবের অপেক্ষা না করেই বললেন মোড়ল, পিকআপটাকে পড়ে থাকতে দেখে এসেছি। কিন্তু... চৌকোনা গম্ভীর মুখটাতে এই প্রথম সন্দেহ ফুটল।

খোলা জায়গাটায় হাজির হলো সবাই। জোনের বাকসটা দেখিয়ে মোড়লকে জিজ্ঞেস করল কিশোর, ওরকম বাকলস আর কে পরত, বলুন তো?

জনের চাচা, জবাব দিলেন মোড়ল।

জন, দেখাও, কিশোর বলল।
পকেট থেকে বাকলস বের করে মোড়লকে দেখাল জন। উপত্যকায় পেয়েছে। এটা কিশোর। একটা কঙ্কালের পাশে। কঙ্কালের খুলিতে গুলির ফুটো।
চমকে গেল ডক। জোনসের দিকে ফিরে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, আমি বার বার বলছি এগুলোকে শেষ করে দেয়া দরকার, ওই বুড়ো ইনডিয়ানটার মত, নইলে গোলমাল করবেই! আপনি শুনছেন না! আমি আর এসবের মধ্যে নেই, চললাম!
ট্রাকের দিকে দৌড় দিল ডক।
এই, দাঁড়াও, গাধা কোথাকার! জোনস বলল।
থামল না ডক। জোনস আর কিছু বলার আগেই রাইফেল তুললেন মোড়ল। গুলির শব্দ হলো একবার।
হাত থেকে উড়ে চলে গেল ডকের এম-১৬। ওটাতেই গুলি করেছেন তিনি। ডকের দিকে ছুটল মুসা।
পাঁই করে ঘুরলেন মোড়ল। রাইফেল তাক করলেন জোনসের দিকে।
দাঁড়ান! দাঁড়ান! হাত থেকে রাইফেল খসে পড়ল জোনসের। পিছিয়ে গেল।
শয়তান! রাগে চেঁচিয়ে উঠলেন মোড়ল, এগিয়ে গেলেন জোনসের দিকে, তুমি আমার ভাইকে খুন করেছ! এখন এই ভাল মানুষগুলোকে খুন করতে যাচ্ছিলে!
ধাম করে রাইফেলের বাঁট দিয়ে বাড়ি মারলেন লোকটার পেটে।
ব্যথায় ককিয়ে উঠল জোনস। বাঁকা হয়ে গেল শরীর। থামলেন না মোড়ল। প্রচণ্ড এক ঘুসি মারলেন জোনসের চোয়ালে। একটা মুহূর্ত বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে রইল লোকটার চোখ। তারপরই বুজে এল চোখের পাতা। বেহুশ হয়ে পড়ে গেল মাটিতে।
কারাতে-লাথি মেরে বসল রবিন, হিলারির চোয়ালে। মেরেই গোড়ালিতে ভর দিয়ে পাক খেল একবার, যে পা-টা ভোলা ছিল ভোলাই রইল, সোজা, টানটান। আরেকবার কারাতের মাই-গেরি লাথি খেল হিলারি, হজম করতে পারল না, টু শব্দটি না করে ঢলে পড়ল বসের পাশে।
ডকের হাত চেপে ধরে হ্যাঁচকা টানে তাকে ঘুরিয়ে ফেলেছে মুসা। ভারসাম্য হারাল লোকটা। কনুই দিয়ে তার বুকে কষে এক মাই হিজি-আতি লাগাল সে। আরেকটা লাগাতে যাচ্ছিল, ত্রাহি চিৎকার শুরু করল ডক, থাম! থাম! দোহাই তোমার, আর মের না! আমার কোন দোষ নেই! জোনস যা করতে বলেছে, করেছি! কসম!
এত অনুনয় করলে আর মারে কি করে? লোকটাকে টেনে নিয়ে এল মুসা, ধাক্কা দিয়ে বসিয়ে দিল মাটিতে, বেহুশ বসু আর তার সহকর্মীর পাশে।
তোমাদের কাছে ঋণী হয়ে গেলাম, তিন গোয়েন্দার দিকে তাকিয়ে বললেন মোড়ল ডুম সোবল। মিস্টার জোনস যে এত বড় শয়তান, কল্পনাই করতে

পারিনি!
করবেন কি করে? মিলফোর্ড বলল। ভীষণ ধূর্ত লোক। আপনাদেরকে সাহায্য করছে বলে বলে ভুলিয়ে রেখেছিল। ঠেকার সময় উপকার পেয়েছেন, ফলে আপনারাও তার ওপর নরম ছিলেন।
আসলে, কিশোর বলল, ঋণী যদি হতে হয় কারও কাছে, গান গাওয়া ডাক্তারের কাছে হোন। শামানের মেসেজটা কি ভাবে কাজে লাগিয়েছে বুঝিয়ে বলল সে।
এদিক ওদিক তাকাতে লাগল জন। নিওমো কোথায়?
নিঃশব্দে কখন বনে ঢুকে গেছে ইনডিয়ান লোকটা, খেয়ালই করেনি কেউ।
ওকেও টাকা খাইয়েছে জোনস, মোড়ল বললেন জনকে, টাকা খাইয়ে দলে নিয়ে নিয়েছে। ওই ব্যাটাই পিকআপের ব্রেকটা খারাপ করে রেখেছিল। আরেকটু হলেই মেরে ফেলেছিল বেচারাদের।
তাহলে তো পালানোর চেষ্টা করবে।
যাবে কোথায়? ধরবই আমি ওকে, দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করলেন মোড়ল। এগুলোকে বেঁধেছেদে এখন ট্রাকে তোলো...
জোনসের গাড়িটায় তুলতে হবে, মিলফোর্ড বললেন। ওটাতে জরুরী দলিলপত্র আছে। নিয়ে যাব পুলিশের কাছে। প্রমাণ এবং আসামী একসাথে পেয়ে গেলে পুলিশের সুবিধে হবে।
মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানালেন মোড়ল। জন যাবে আপনাদের সাথে। কাছের থানাটা কোথায় দেখিয়ে দেবে।
নিওমোর কি হবে? জানতে চাইল মুসা।
আমাদের নিজেদেরও পুলিশ আছে, মোড়ল বললেন।
চাচা হলেন আমাদের পুলিশ প্রধান, বলল জন।
আমেরিকান সরকারের সঙ্গে আমাদের যে চুক্তি হয়েছে, তাতে কিছু শর্ত দেয়া আছে, মোড়ল জানালেন। তার মধ্যে একটা হল, আমাদের সমাজে যেসব অপরাধ ঘটবে, সেগুলোর সাজা দেবার ভার আমাদের, পুলিশ নাক গলাতে আসবে না। আসামীদেরকে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার ক্ষমতাও আছে আমাদের।
দাদা হলেন আমাদের বিচারক, জানিয়ে দিল জন।
জোনস আর দুই সহচরের হাত-পা বেঁধে গাড়িতে ভোলা হলো। মোড়ল গিয়ে বড় ট্রাকটাকে রাস্তা থেকে সরালেন। গাড়ির ড্রাইভিং সীটে বসল মুসা। জানালা দিয়ে মুখ বের করে ফিরে তাকাল। বিদায় জানিয়ে হাত নাড়লেন ডুম। এই প্রথম তার গম্ভীর মুখে হাসি দেখতে পেল সে।
ঘুরে দাঁড়ালেন মোড়ল। হালকা পায়ে ঢুকে পড়লেন বনের ভেতর।
.

ডায়মণ্ড লেকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল গোয়েন্দাদেরকে জন। এই রাস্তাটার কথাই তিন গোয়েন্দাকে বলেছিল তার বোন মালটি, মাত্র আগের দিন, অথচ ছেলেদের মনে হল সেটা হাজার হাজার বছর আগের কথা।
ডায়মণ্ড লেকে পৌঁছল ওরা। ছোট, সুন্দর একটা পার্বত্য শহর। চকচকে সুইমিং পুল পেরিয়ে এল ওরা, গল্ফ কোর্সের পাশ কাটাল। টেনিস কোর্ট, ঘোড়া রাখার জায়গা, ব্যাকপ্যাক কাঁধে পাহাড়ে ঘুরতে বেরোনো ভ্রমণকারী, ছবির মত সুন্দর দামি দামি বাংলো দেখল। ব্যক্তিগত বিমানবন্দরের ওপর ঘুরছে বড় একটা লিয়ারজেট বিমান।
যাক, জোরে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল মুসা, এলাম শেষ পর্যন্ত।
আমার খিদে পেয়েছে, ঘোষণা করল কিশোর।
হায় হায়, আমার খিদেটা তোমার পেটে চলে গেল কি করে! হেসে বলল সহকারী গোয়েন্দা! খিদে খিদে তো কেবল আমি করতাম!
মিস্টার মিলফোর্ড বললেন, আমার একটা টেলিফোন দরকার প্রথমে। তারপর গোসল।
রবিন বলল, আমার ডাক্তার দরকার। বলে জানালা দিয়ে মুখ বের করতেই দেখল পথের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে তিনটি সুন্দরী কিশোরী মেয়ে। ওর দিকে চোখ পড়তেই হাসল। হাত নাড়ল একজন। রবিনও তার জবাব দিল। শিস দিয়ে উঠল একটা মেয়ে।
জন তো অবাক। মেয়েরা শিস দেয়? উল্টো হয়ে গেল না ব্যাপারটা?
মুচকি হাসল মুসা। রাস্তার দিকে তাকিয়ে বলল, তিন গোয়েন্দার অভিধানে উল্টো বলে কোন কথা নেই। এই তো, আমার খিদে কিশোরের পেটে চলে গেল, যে খেতেই চায় না। রবিনের দিকে তাকিয়ে মেয়েরা শিস দেয়, অথচ চিরকাল জেনে এসেছি মেয়েদের দিকে তাকিয়েই ছেলেরা শিস দেয়…
তোমরা আসলেই স্পেশাল, জন বলল। একটা কাজ করা দরকার। দাদাকে গিয়ে বলতে হবে, তোমাদের জন্যে যাতে একটা অনুষ্ঠান করে। তোমাদের ওপর অশুভ শক্তির নজর পড়েছে, সে জন্যেই এত বিপদ গেল। সেটা কাটানো দরকার। তোমরা যাবে তো?
নিশ্চয়ই! সাথে সাথে জবাব দিল মুসা। তোমাদের রান্না সত্যিই চমৎকার! আর তোমার বোন মালটি খুব ভাল মেয়ে!
কি ব্যাপার, মুসা, পেছন থেকে ডেকে জিজ্ঞেস করল রবিন। ঘটনাটা কি?
না, কিছু না! লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি বলল মুসা।
কিশোর তাকিয়ে রয়েছে সিয়েরা মাদ্রের বরফে ঢাকা নীলচে সাদা চূড়ার দিকে। স্বপ্নিল হয়ে উঠেছে তার সুন্দর মায়াময় চোখ। বিড়বিড় করে আনমনে বলল,

প্রেমে যদি সত্যিই পড়তে হয় কারও, তাহলে ওগুলোর…ওই বরফে ছাওয়া পাহাড়, রূপালি ঝর্না, নীল আকাশ, চিল…
অ্যাই, কি বিড়বিড় করছ? জিজ্ঞেস করল রবিন।
চমকে যেন স্বপ্নের জগৎ থেকে ফিরে এল গোয়েন্দাপ্রধান, অ্যাঁ!…না, কিছু না!… ও, থানা এসে গেছে?
‘ডায়মণ্ড লেক পুলিশ স্টেশন’ লেখা বাড়িটার ওপর চোখ পড়েছে তার।

ভলিউম ১৯ – রেসের ঘোড়া – তিন গোয়েন্দা – রকিব হাসান – সেবা প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ : মে, ১৯৯৩

এসে গেছি, জীপের পেছনের সিট থেকে বলল কিশোর পাশা। রুক্ষ পথে ঝাঁকুনি খেতে খেতে চলেছে গাড়ি। মাথা থেকে খুলে স্টেটসন হ্যাটটা কোলের ওপর রাখল সে। তাকিয়ে রয়েছে তীর চিহ্ন দেয়া নির্দেশকের দিকে। তাতে লেখাঃ ডাবল সি র‍্যাঞ্চ।

এলাম তাহলে, গুঙিয়ে উঠল মুসা। কিশোরের পাশে সীট খামচে ধরে রেখেছে। যা রাস্তা। হাড্ডিমাংস সব এক হয়ে গেছে।

সামনের প্যাসেঞ্জার সীটে বসেছে রবিন। ড্রাইভ করছে ব্রড় জেসন। হেসে বলল, আমরা কিন্তু সব সময়ই চলি এই রাস্তায়। আমাদের কিছু হয় না।

আপনাদের তো অভ্যাস হয়ে গেছে, মুসা বলল। মনে হচ্ছে সেই কোন যুগে রকি বীচ থেকে বেরিয়েছি। এতদিনে এসে পৌঁছলাম।

মিস্টি ক্যানিয়নে স্বাগতম, ব্রড বলল। ডাবল সি র‍্যাঞ্চের কর্মচারী সে, র‍্যাঞ্চ হ্যাণ্ড। শুকনো খড় রঙা চুল। বয়েস পঁচিশ-টচিশ হবে, আন্দাজ করল কিশোর।

মিস্টি ক্যানিয়ন, বিড়বিড় করল সে। তাকিয়ে রয়েছে পাহাড়ের দিকে। রবিন আর মুসারও চোখ সেদিকে। মনটানার একটা র‍্যাঞ্চে ঢুকছে ওরা। ঘিরে থাকা পাহাড়ের কোল পর্যন্ত ছড়িয়ে গেছে র‍্যাঞ্চের জমি। রোদ খুব গরম। বাতাস শুকনো, পরিষ্কার।

এই পাহাড়ের কোলে অনেক র‍্যাঞ্চ আছে, ব্রঙ জানাল। ডাবল সি তারই একটা। মিস্টি ক্যানিয়ন কেন নাম হয়েছে জান? একটা ঝর্নার জন্যে। পাহাড়ের গোড়ায় বইছে গরম পানির ওই ঝর্নাটা, বাষ্প ওঠে ওটা থেকে। দূরের একটা শৈলশিরার দিকে হাত তুলে দেখাল সে।

নৌকার মত দুলে উঠল জীপ। তিক্ত কণ্ঠে মুসা বলল, রাস্তারই এই অবস্থা। গরম পানির ঝর্না কেমন হবে কি জানি। পা দিলেই হয়তো ফোঁসকা পড়ে যাবে, হট বাথ আর হবে না।

বাতাসে লম্বা সোনালি চুল এসে পড়ছে রবিনের চোখে মুখে। সরিয়ে দিতে দিতে বলল, এই ঝাঁকুনিতেই এই? আসল ব্রোঙ্কোতে তো এখনও চড়ইনি।

চড়েছি। ঠোঁট কামড়ে ধরে বলল মুসা, যে কোন ঘোড়ায় চড়লেই হলো।

না, হলো না। ঘোড়ার নানা রকম জাত আছে, একেকটায় চড়তে একেক রকম লাগে। টাট্টু ঘোড়ায় চড়া আর মনটানার মাসট্যাঙে চড়া এক কথা নয়, ওই যেমন তোমার ঝরঝরে ভেগা আর চকচকে মার্সিডিজ কিংবা জাগুয়ার

হয়েছে হয়েছে, রেগে উঠল মুসা, আর খোঁচা মারতে হবে না!

ওদের ঝগড়া থামানোর জন্যে হাসল কিশোর। রবিন, তুমিও ভুল করছ। র‍্যাঞ্চের সব ঘোড়াই বুনো কিংবা খেপা নয়।
ঠিক বলেছ, কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে তাকিয়ে বলল ব্রড। হেসে অভয় দিল মুসাকে, সব রকমের আরোহীর জন্যেই ঘোড়া রাখি আমরা। একেবারে আনাড়ির জন্যেও আছে।
ভাল! নাক কুঁচকাল মুসা। আনাড়ি শুনতে ভাল লাগেনি। তবে আমার জন্যে ভাল ঘোড়াই দরকার। চড়তে জানি। বহুবার চড়েছি। নবিস নই।
বুনো মাসট্যাংও নিশ্চয় আছে আপনাদের? ব্রডকে জিজ্ঞেস করল রবিন।
সরু হয়ে এল লোকটার চোখের পাতা। বুনো?
ঝড়ো বাতাসের মত জোরাল বাতাস এসে ঢুকছে জানালা দিয়ে। বইয়ের পাতা মেলা মুশকিল। অনেক কায়দা করে ডাবল সি র‍্যাঞ্চের ঝলমলে কভার ওয়ালা ব্রশিয়ারটা খুলে দেখাল রবিন, একটা কালো ঘোড়ার ছবিতে আঙুল রাখল। সামনের পা তুলে দিয়ে পেছনের দুপায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছে ঘোড়াটা, যেন পক্ষিরাজের মত আকাশে উড়াল দেয়ার মতলব।- এই যে এটার মত? ইউনিকর্ন?
ইউনিকর্ন? চোখ গোল গোল হয়ে গেল মুসার। গ্রীক মিথলজির দানব এল কোত্থেকে এখানে? এটারও শিং আছে নাকি?
বাস্তব ঘোড়ার শিং থাকে না, বলে আবার ব্রডের দিকে তাকাল রবিন, চোখে জিজ্ঞাসা নিয়ে।
ওতে চড়ে না কেউ, কাটা কাটা শোনাল ব্রডের কণ্ঠ।
ব্রশিয়ারেও অবশ্য তাই লেখা রয়েছে। কেউ নাকি চড়তে পারে না।
কিশোর জিজ্ঞেস করল, দেখতে পাব তো ওকে?
রিয়ারভিউ মিররে কিশোরের চোখে চোখে তাকাল ব্রড। একটা পরামর্শ দিচ্ছি, কিশোর, ইউনিকের কাছ থেকে দূরে থাকবে। মরতে না চাইলে। গ্যাস প্যাডালে চাপ বাড়াল সে। খেপা ঘোড়ার মতই যেন লাফ দিয়ে আগে বাড়ল গাড়ি। এবড়োখেবড়ো পথে ঝাঁকি খাওয়া বাড়ল, পেছনে বাড়ল ধুলোর ঝড়।
বিষণ্ন হাসি ফুটল মুসার মুখে। গাড়ি তো নয়, মনে হচ্ছে নাগরদোলায় চড়ছি।
কিশোর চুপ। ইউনিকর্নের কথা ভাবছে। ব্রডের হুঁশিয়ারি ঘোড়াটার প্রতি কৌতূহল বাড়িয়ে দিয়েছে ওর। কয়েকটা কোরাল পেরিয়ে এল গাড়ি। অনেক ঘোড়া দেখা গেল। তাকিয়ে রয়েছে সেদিকে কিশোর। ইউনিকর্নকে দেখার জন্যে। মায়ের পাশে ছোটাছুটি করতে দেখল অস্বাভাবিক লম্বা পা-ওয়ালা বাচ্চা ঘোড়াকে। ধুলোয় ঢেকে রয়েছে ঘোড়াগুলোর শরীর। তৃণভূমিতে ঘোড়ার পাশাপাশি চড়ছে সাদা চৌকোণা মুখওয়ালা লাল গরু। ওগুলোর গায়েও ধুলো।
কালো ঘোড়াটাকে দেখা গেল না।

র‍্যাঞ্চের মূল বাড়িটার সামনে এনে গাড়ি রাখল ব্রড়। এক সময় সাদা রঙ করা। হয়েছিল দোতলা বাড়িটাকে। রঙ চটে গেছে এখন, জানালার কাছগুলোতে ফাটা ফাটা হয়ে আছে। লাল রঙ করা শার্সির অনেকগুলো কজা ছুটে গিয়ে কাত হয়ে। রয়েছে বিচিত্র ভঙ্গিতে। টালির ছাত মেরামত করা হয়েছে বহু জায়গায়। সামনের বারান্দা বাড়িটার সমান লম্বা, এককোণ থেকে মোড় ঘুরে পাশ দিয়েও এগিয়ে। গেছে। রেলিঙের খুটি জায়গায় জায়গায় খুলে পড়ে গেছে, রেলিঙের ওপরটা দেবে। রয়েছে ওসব জায়গায়।

ধুলো ঢাকা মাটিতে লাফিয়ে, নামল গোয়েন্দারা। চত্বরে থেকেই আস্তাবল, গোলাঘর আর বাঙ্কহাউস দেখতে পাচ্ছে কিশোর। সবগুলো ঘরই সাদা রঙ করা হয়েছিল। মলিন ফেকাসে হয়ে গেছে এখন, ধূসর হয়ে গেছে কোথাও কোথাও। কাত হয়ে রয়েছে বেড়া। পুরো জায়গাটারই কেমন বিবর্ণ দরিদ্র চেহারা।

সাংঘাতিক মোটা, ধূসর রঙের চুলওয়ালা এক মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন সামনের দরজার কাছে। তিনিই কেরোলিন হোফারসন, এই র‍্যাঞ্চের হাউসকীপার, রবিনের মায়ের ছোটবেলার বান্ধবী, স্কুলে একসাথে পড়েছেন। তিন গোয়েন্দাকে দাওয়াত করেছেন, র‍্যাঞ্চে এসে ছুটি কাটানোর জন্যে।

ফিসফিস করে মুসা বলল, কিশোর, এ-কি! ব্রশিয়ারে কি দেখলাম, আর এসে কি দেখছি? এই অবস্থা তো কল্পনা করিনি।

রবিন! বারান্দায় দাঁড়ানো মহিলা এগিয়ে এলেন। বিশাল মুখে হাসি।

ব্যাগ হাতে দ্রুত এগিয়ে গেল রবিন। আন্টি, কেমন আছেন? আমি...

আর বলতে হবে না, তুমিই রবিন। দেখেই চিনেছি।...আর তুমি কিশোর পাশা। তুমি মুসা।

গর্জন তুলে চত্বরে ঢুকল একটা ভ্যান। বারান্দার সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেল। জীপটার মতই এটার গায়েও সবুজ রঙে লেখা রয়েছে র‍্যাঞ্চের নামঃ ডাবল সি র‍্যাঞ্চ। পাশে পা তুলে দেয়া একটা কালো ঘোড়ার ছবি, র‍্যাঞ্চের মনোগ্রাম।

কয়েকজন নামল ভ্যান থেকে, তাদের মধ্যে রয়েছে এক তরুণী। বয়েস বিশ মত হবে, লাল চুল, মুখে হাসি। এগিয়ে এসে হাত বাড়াল প্রথমেই কিশোরের দিকে, হাই, আমি লিলি মরগান। তুমি নিশ্চয় কিশোর পাশা?

মাথা ঝাঁকিয়ে অন্য দুজনের পরিচয় করিয়ে দিল কিশোর।

খুব খুশি হলাম তোমাদেরকে দেখে, হাসি এবং আন্তরিকতায় উজ্জ্বল হয়ে আছে লিলির চোখ। তবে ঠোঁটের কোণে ক্লান্তির হালকা ছাপও স্পষ্ট। যাও, ভেতরে যাও। আমাদের আরও মেহমান আছে, তাদেরকে খাতির যত্ন করতে হবে আমাকে। আন্টির সঙ্গে তো পরিচয় হয়েই গেছে তোমাদের। রাঁধুনী, নার্স, অ্যাকাউনটেন্ট, হাউসকীপার, সব এক হাতেই করেন। আন্টি না থাকলে যে

আমার কি দুর্গতি হত! আরেক বার হেসে দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নেমে চলে গেল লিলি ভ্যানের কাছে দাঁড়ান অন্য মেহমানদের দিকে।
সবই করেন তাহলে আপনি, কেরোলিনের দিকে তাকিয়ে বলল কিশোর।
হাত দিয়ে ডলে অ্যাপ্রনের ভাজ সমান করতে লাগলেন তিনি। এভাবে সামনাসামনি প্রশংসায় লজ্জা পেয়েছেন। লিলির কথা আর বল না। এসো, তোমাদের ঘর দেখিয়ে দিই। হাতমুখ ধুয়ে এসো। লেমনেড খেতে দেব।
আউফ, দারুণ কথাটা বলেছেন আন্টি, মুসা বলল। এটাই চাইছিলাম এখন।
মাটিতে নামিয়ে রাখা ওর ডাফেল ব্যাগটার দিকে হাত বাড়াল কিশোর। বাধা দিয়ে কেরোলিন বললেন, থাক, তোমাদের নিতে হবে না। ব্রড আর টিম আছে, দিয়ে আসবে।
হাউসকীপারের পিছু পিছু ভেতরে ঢুকল তিন গোয়েন্দা। প্রবেশপথের মুখ থেকেই চার দিকে চলে গেছে চারটে শাখাপথ। সিঁড়ি উঠে গেছে ওগুলোর মাথা থেকে। একটা সিঁড়ির গোড়া থেকে বড় একটা হলঘর চলে গেছে বাড়ির পেছন দিকে, রান্নাঘর পর্যন্ত। বায়ে রয়েছে ডাইনিং রুম, লম্বা লম্বা টেবিল পাতা। ওই ঘর আর রান্নাঘরের মাঝে দরজা রয়েছে, সুইংডোর লাগান। ডানে লিভিং রুম। পাইন। কাঠের প্যানেলিং করা। আসবাবপত্র সব পুরানো, মলিন, কাঠের মেঝেতে পাতা কার্পেটটাও বিবর্ণ। ছাত ধরে রেখেছে বড় বড় কড়িকাঠ। দেয়ালে আঁকা রয়েছে। ওয়াগনের ছবি। এক কোণে একটা রিভার-রক ফায়ারপ্লেস, ওটার ম্যানটেল বোঝাই হয়ে আছে নানারকম ট্রফিতে।
এসব পুরস্কার কি সব লিলি জিতে এনেছে? দেখতে দেখতে জিজ্ঞেস করল মুসা।
সঅব। এখানে ওর মত ঘোড়ায় চড়তে পারে না আর কেউ, গর্বের সঙ্গে বললেন কেরোলিন। হাঁটতে শেখার আগেই ঘোড়ায় চড়তে শিখেছে মেয়েটা, তা ও জিন ছাড়া, ইনডিয়ানদের মত ঘোড়ার খালি পিঠে। বারো বছর বয়েসে স্থানীয় সমস্ত রোডিও প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছে। এর কয়েক বছর পরেই ঘোড়ার পিঠে চেপে বেরিয়ে পড়েছিল দেশভ্রমণে। তাতেও পুরস্কার জিতে নিয়ে শেষে এসে এই–র‍্যাঞ্চের কাজে লেগেছে।
কাজে লেগেছে মানে? জানতে চাইল কিশোর।
কেশে গলা পরিষ্কার করে নিলেন কেরোলিন। ওর সাহায্য দরকার হয়েছিল ওর বাবার, অ্যাক্সিডেন্টের পর। প্রসঙ্গটা চাপা দেয়ার জন্যে তাড়াতাড়ি বললেন, এসো। ঘরে চলো। চওড়া একটা সিঁড়ি বেয়ে ওদেরকে দোতলায় নিয়ে চললেন তিনি।
সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে পাশের দেয়ালে টানানো ছবিগুলো দেখল কিশোর। ল্যাণ্ডিঙে পৌঁছে থামল, ফ্রেমে বাঁধাই একটা সাদা কালো ছবি দেখে। কার ছবি?

লিলির বাবার? কাউবয়ের পোশাক পরা একজন মানুষের ছবি, সেদিকে হাত তুলল সে।
হাসি মলিন হয়ে এল কেরোলিনের। হ্যাঁ, লিলির বাবা। মেয়েটাকে একাই মানুষ করেছেন। লিলির মা মারা গেছে ওর পাঁচ বছর বয়েসে।
মা বলে, রবিন বলল, লিলি নাকি আপনার মেয়ের মত।
বিষণ্নতা ফুটল কিশোরের চেহারায়। তারও মা নেই। ছোটবেলায় এক মোটর দুর্ঘটনায় বাবা-মা দুজনকেই হারিয়েছে। তারপর থেকে বড় হয়েছে মেরিচাচীর কাছে। লিলির বাবার দুর্ঘটনাটা কিভাবে ঘটেছিল, জানতে ইচ্ছে করছে তার। জিজ্ঞেস করল, বাপ-মেয়ের খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল, না?
ছিল, সিঁড়ির মাথা থেকে জবাব দিলেন কেরোলিন।
লম্বা করিডরে মলিন কার্পেট পাতা। দোতলায়ও হলঘর আছে। এক প্রান্ত থেকে নেমে গেছে আরেকটা সিঁড়ি।
কিশোরকে সেদিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে কেরোলিন জানালেন, ওটা দিয়ে রান্নাঘরে যাওয়া যায়। আর এই যে দরজাগুলো দেখছ, এগুলো বেডরুম। মেহমানদের থাকার। সিঁড়ির ডানের একটা দরজা খুলে বললেন, এটা তোমাদের ঘর।
একটা জানালা খুললেন কেরোলিন। হুড়মুড়িয়ে যেন ঘরে ঢুকল গরম বাতাস, তাজা খড়ের গন্ধে ভারি হয়ে আছে। মুসা বলল, বাহ্, গন্ধটা তো চমৎকার।
হ্যাঁ, কেরোলিন বললেন। ভালই ছিল সব কিছু। নষ্ট করে দিল ওই শয়তান ঘোড়াটা।
শয়তান ঘোড়া? ইউনিকর্নের কথা বলছেন? ভুরু কোঁচকাল কিশোর।
ওটাকে যে এখনও কেন রেখেছে লিলি বুঝি না। ঠোঁট কামড়ে ধরলেন। কেরোলিন। কাঁধ দিয়ে ঠেলে আরেকটা দরজা খুললেন। এখানে আরেকটা ঘর আছে। দুটো ঘরে থাকতে পারবে তো তিনজনে?
নিশ্চয়ই, রবিন বলল। একটা হলেও পারতাম।
প্রথম ঘরটা ছোট, একটা সিঙ্গল বেড, পুরানো কার্পেট, একটা রকিং চেয়ার, আর একটা আলমারি আছে। পরের ঘরটা বড়, সবই একটা করে আছে, কেবল বিছানা দুটো। যে কোন একজনকে থাকতে হবে ছোট ঘরটায়। ওয়েস্টার্ন প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি ঝোলানো রয়েছে দেয়ালে। জানালায় লাগানো হয়েছে ভারি কাপড়ের পর্দা।
ঘর দেখিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন কেরোলিন।
এখন কে কোনটাতে থাকবে ঠিক করতে বসল তিনজনে। মুসা প্রস্তাব দিল, টস করা হোক। কিশোর টসে জিতল। সে থাকবে ছোট ঘরটায়, একা। বড়টায় অন্য

দুজন।
রবিন বলল, আমি থাকব জানালার কাছে। বলতে বলতে গিয়ে যেন নিজের জায়গা দখলের জন্যেই উঠে পড়ল দেবে যাওয়া ম্যাট্রেসে। রাতে ঝিঁঝি আর কয়োটের ডাক শুনতে পাব এখান থেকে। আমার খুব ভাল লাগে।
থাকো, আমার আপত্তি নেই, মুসা বলল।
জানালা দিয়ে মুখ বের করল রবিন। তোমরা যাই বলো, আমার কাছে। এটাকে লাগছে গোস্ট টাউনের মত। ওই যে, ওয়েস্টার্ন শহরে ভূতুড়ে শহরের কথা শোনা যায় না, সে রকম।
ঠিকই বলেছ, একমত হলো কিশোর, ও রকমই। কেমন যেন পোড়ো পোড়ো লাগে। বিছানায় উঠে এসে রবিনের পাশে বসে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল সে। কাজ করছে কয়েকজন র‍্যাঞ্চ হ্যাণ্ড, র‍্যাঞ্চের শ্রমিক ওরা। ঘোড়াকে ব্যায়াম করাচ্ছে কেউ, কেউ জিন আর লাগাম পরিষ্কার করছে, কেউ বা বেড়া পরিষ্কারে ব্যস্ত। তবে এতবড় একটা র‍্যাঞ্চে যত লোক থাকার কথা, যতটা সরগরম থাকার কথা, সে রকম নেই। হলোটা কি এখানে, বলো তো?
পুরোপুরি সব জানি না, রবিন বলল। মার কাছে যতটা শুনেছি। ঘোড়ায় চড়তে গিয়ে মারাত্মক জখম হয়েছিলেন লিলির বাবা। অকর্মণ্য হয়ে যান। র‍্যাঞ্চের কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যায় তদারকির অভাবে। শেষে মারাই গেলেন। বাধ্য হয়ে রোডিও খেলা বাদ দিয়ে সাহায্য করতে আসতে হয় লিলিকে। চিন্তিত ভঙ্গিতে ভ্রূকুটি করল রবিন। তবে তখন দেরি হয়ে গেছে। আরেকটা র‍্যাঞ্চে চলে যেতে শুরু করেছে তখন মেহমানরা, টুরিস্ট, যারা এখানে বেড়াতে এলে থাকে।
বিড়বিড় করে কি বলল কিশোর বোঝা গেল না।
আমাদের পরে যে ভ্যানটা এল, দেখেছ? মুসা বলল, অনেক বড়, অনেক লোক ধরবে। অথচ নামল পাঁচজন, তা-ও একজন ড্রাইভার। ব্রশিয়ারে পড়লাম এই র‍্যাঞ্চে মেহমানই থাকতে পারে ষাটজন...আছে কজন এখন? আমাদেরকে নিয়ে বড় জোর দশ-এগারো?
কাছাকাছি হয়ে এল কিশোরের ভুরু। ভাঁজ পড়ল কপালে। এই কথাটা সে-ও ভেবেছে। বলল, হয়তো আসবে, পরে। ডিনারের এখনও দুই ঘণ্টা বাকি।
হয়তো, মাথা ঝাঁকাল রবিন। তবে বিশ্বাস করতে পারছে না কথাটা।
ওদের মালপত্র নিয়ে দরজায় দেখা দিল ব্রড।
দেখি, দিন ওটা আমার হাতে, নিজের ব্যাগটা নিয়ে লোকটাকে সাহায্য করার জন্যে নেমে গেল কিশোর।
রবিন আর মুসাও এগোল।

বাপরে বাপ, কি ভারি, অল্প অল্প হাঁপাচ্ছে ব্রড। সারা গরমটাই কাটাতে চলে এসেছ মনে হয়।
না, কিছু কাপড়চোপড় তো লাগেই, মুসা বলল, লাগে না?
রবিন বলল, তাছাড়া আরও কিছু টুকিটাকি জিনিস দরকার হয়। অল্প অল্প নিতে গেলেও ভারি হয়ে যায়।
বেরিয়ে গেল ব্রড।
ব্যাগ খুলে তোয়ালে বের করল মুসা। তোমরা কি করবে জানি না, আমি গোসল করতে চললাম।
করগে, কিশোর বলল। আমি যাচ্ছি জায়গাটা ঘুরে দেখতে।
রবিন বলল, আমিও যাব।
ব্যাগটা তুলে নিয়ে নিজের ঘরে এনে রাখল কিশোর। তারপর রবিনকে নিয়ে রওনা হলো নিচতলায়।
রান্নাঘরে ঢুকতেই ওদেরকে লেমোনেড দিলেন কেরোলিন।
খেতে খেতে র‍্যাঞ্চটার ব্যাপারে নানা খবর নিতে লাগল কিশোর। কেরোলিনও সব প্রশ্নের জবাব দিলেন। জানালেন, কোথায় কোথায় রয়েছে। আস্তাবল, বাঙ্কহাউস, ট্যাকরুম আর ঘোড়ার বাচ্চা রাখার ছাউনি। বিশ্রাম নিয়েছে, লেমোনেড খেয়েছে। অনেকটা তাজা হয়ে বাইরে বেরোল দুই গোয়েন্দা, র‍্যাঞ্চ দেখার জন্যে।
ঘুরেটুরে দেখে এসে দাঁড়াল কাত হয়ে থাকা একটা বেড়ার কাছে। খুঁটিতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল একজন শ্রমিক কি করে ধূসর রঙের একটা ঘোড়ার বাচ্চাকে ট্রেনিং দিচ্ছে।
অনেক অবাধ্যতা করল বাচ্চাটা। লাফালাফি করল, ঘাড় বেঁকিয়ে এদিক ওদিক সরে যাওয়ার চেষ্টা করল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পিঠে জিন বাধতে দিতেই হলো।
কি দেখছ? ওদেরকে তাকিয়ে থাকতে দেখে বলল লোকটা। এটাকে এখন পোষ মানান হচ্ছে। পিঠে চড়ব। চেষ্টা করে দেখতে চাও? ও, আমি শেপ
আপত্তি নেই, এগিয়ে গেল কিশোর। হেসে বলল, দেখিই না পারি কিনা।
দেখো। খুব শয়তান, বলে দিলাম। হ্যাটটা ঠেলে পেছনে সরিয়ে হাত দিয়ে। কপালের ঘাম মুছল শেপ।
ইউনিকর্নের বংশধর নাকি?
শক্ত হয়ে গেল শেপের চোয়াল। না।
ইউনিকর্ন তো এখানে বিখ্যাত, তাই না?
কুখ্যাত। হ্যাটটা আবার আগের জায়গায় নিয়ে এসে ঘোড়ার গলার রশি ধরে টান দিল। গোলাঘরের দিকে রওনা হয়ে গেল কিশোরকে অবাক করে দিয়ে। কয়েক পা এগিয়ে ফিরে তাকিয়ে বলল, পোষ মানান আরেক দিন শেখ। আজ আর

এটাকে কষ্ট দিয়ে লাভ নেই। কাহিল হয়ে পড়েছে। খুব ভাল লাগল তোমার সঙ্গে কথা বলে।
তাকিয়ে রয়েছে রবিন। সে-ও কম অবাক হয়নি। লোকটা দূরে চলে গেলে বলল, ইউনিকর্নের কথা কেউই আলোচনা করতে চায় না এখানে।
ভাবছি, কেন? আস্তাবলের দিকে তাকিয়ে গাল চুলকাল কিশোর। বিনা অনুমতিতে মেহমানদের ওখানে ঢাকার নিয়ম নেই। গেট বন্ধ। হুট করে যাতে কেউ ভেতরে ঢুকে পড়তে না পারে সেই ব্যবস্থা করা আছে। ঘোড়াটাকে দেখার বড় লোভ হচ্ছে।
রবিনকে নিয়ে আবার র‍্যাঞ্চ হাউসে ফিরে চলল সে। পোশাক বদলে ডিনারের জন্যে তৈরি হতে হবে।
রহস্যের গন্ধ পাচ্ছ মনে হয়? হাঁটতে হাঁটতে বলল রবিন।
জবাব দিল না কিশোর। ভাবছে। ইউনিকনের ব্যাপারে ব্রড, কেরোলিন, এমনকি শেপের আচরণ কৌতূহল বাড়িয়ে দিয়েছে তার।
.
দ্রুত গোসল সেরে নিয়ে ধোয়া টি-শার্ট আর জিনস পরে নিচে রওনা হলো কিশোর। কয়েক ধাপ নেমেই থমকে দাঁড়িয়ে গেল।
নিচ থেকে শোনা যাচ্ছে একজন লোকের ভারি কণ্ঠ, রেগে গিয়ে বলছে, সময় শেষ হয়ে আসছে, লিলি, বোঝার চেষ্টা করো!
সিঁড়ির রেলিঙের কাছে এসে নিচে উঁকি দিল কিশোর। সামনের দরজায়। দাঁড়িয়ে আছে লিলি। কোমরে হাত, এদিকে পেছন করে আছে। যে লোকটা কথা বলছে সে রয়েছে বাইরে বারান্দায়, দেখা যাচ্ছে অবশ্য। বেঁটে, গোলগাল শরীর, লাল মুখ, পাতলা হয়ে এসেছে কালো চুল।
আপনার কাছ থেকে ওকথা শোনার কোন প্রয়োজন নেই আমার। লিলিও রেগে গেছে। গলা কাঁপছে ওর।
সেটা তোমার ইচ্ছে। তবে আর কোন উপায়ও নেই তোমার, লোকটার চোখজোড়ায় শীতল, কঠিন দৃষ্টি। কুকুর যেভাবে মাড়ির ওপর থেকে ঠোঁট সরিয়ে ভেঙচি কাটে, অনেকটা তেমনি করেই ভেঙচি কাটল লোকটা। বলল, দেখো, ডবসি কুপার আর হারনি পাইকের কাছে তুমি একটা মশা। টিপ দিলেই মরে যাবে। কি আছে তোমার? ছিলে রোডিও রাইডার, এখানে এসে হয়েছ একটা ধসে পড়া র‍্যাঞ্চের মালিক। সেটাও আবার বন্ধক দেয়া। তোমার ওই শয়তান ঘোড়াটারও কানা কড়ি দাম নেই। কেউ চড়তেই পারে না ওটার পিঠে, কে দাম দিতে যাবে? ভেবে দেখ আমার কথা। লিলিকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই

জুতোর গোড়ালিতে ভর দিয়ে পাক খেয়ে ঘুরল সে। গটমট করে নেমে চলে গেল বারান্দা থেকে।

এতক্ষণ সোজা করে রাখলেও লোকটা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঁকা হয়ে গেল লিলির কাঁধ, যেন ভার বইতে পারছে না আর। ঘুরল। ঘুরতেই কিশোরের চোখে চোখ পড়ল।

সরি, আড়ি পেতে শুনতে চাইনি, কৈফিয়ত দেয়ার ভঙ্গিতে বলল কিশোর। তাড়াতাড়ি নেমে গেল নিচতলায়। কানে এল ইঞ্জিন স্টার্ট নেয়ার শব্দ। যেন বিশেষ কারও ওপর ঝাল দেখার জন্যেই টায়ারের শব্দ তুলে, গর্জন করে ছুটতে শুরু করল। জানালা দিয়ে লম্বা একটা সাদা গাড়ি দেখতে পেল সে।

কিছুই হয়নি এরকম একটা ভঙ্গি করল লিলি। কিন্তু চেহারার ফেকাসে ভাব দূর করতে পারল না। ওর নাম ফিলিপ নিরেক। গলা কাঁপছে মেয়েটার। ঢোক গিলল। আমার সর্বনাশ করতে চায়।

কেন? জিজ্ঞেস করল কিশোর।

এই র‍্যাঞ্চটা চায় ও। কয়েক বছর আগে অনেক টাকা ঋণ নিয়েছিল আব্বা। ঘোড়ার খেলা দেখিয়ে আমিও কিছু কামিয়েছিলাম। দুজনের টাকা দিয়ে কিছু গরুঘোড়া কিনলাম, ব্যবসার জন্যে। এই র‍্যাঞ্চটা কিনলাম। অনেক বেশি খরচ করে ফেললাম আমরা। ভাবলাম, কি আর হবে, আস্তে আস্তে তুলে নেব টাকাটা। জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলল লিলি। কিন্তু অ্যাক্সিডেন্ট করে বসল আব্বা। কাজ করার ক্ষমতা রইল না। রোডিও খেলা বাদ দিয়ে চলে আসতে হলো আমাকে। তবু সামাল আর দিতে পারলাম না। একের পর এক গোলমাল হতেই থাকল।

এই ফিলিপ নিরেক লোকটা কে?

ব্যাংকের লোন অফিসার। ঋণ শোধ করার সময় শেষ হতে আরও কিছুদিন। বাকি, অথচ এখনই এসে হুমকিধামকি শুরু করেছে। বলছে কোনদিনই পারব না। র‍্যাঞ্চ বন্ধ করে দিতে।

লিলির উদ্বিগ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। লিভিং রুমের দিকে চলল মেয়েটা। ওর পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বলল কিশোর, আরও দুজন। লোকের নাম বলল শুনলাম?

হ্যাঁ। ডবসি কুপার আর হারনি পাইক। দুজনেই র‍্যাঞ্চার, ডাবল সির সব চেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী।

ডবসি কুপার? নামটা পরিচিত লাগল কিশোরের। বেনি কুপারের কিছু হয় না তো? রোডিও স্টার?

বেনির বাবা। কাচের বাক্সে রাখা ট্রফিগুলোর দিকে তাকাল লিলি। আমি সরে আসতেই ও ওপরে উঠে গেল। নাম করে ফেলল। আমি থাকতে ট্রিক রাইডার

আর বেয়ারব্যাক রেসার হিসেবে আমার পর পরই ছিল ও।
রোডিও খেলা দেখেছে কিশোর। রিঙের ভেতরে জিন ছাড়াই ঘোড়ার খালি। পিঠে বসে বেদম গতিতে ছুটতে থাকে খেলোয়াড়েরা। আরও নানারকম বিপজ্জনক খেলা দেখায়, প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়।
এগিয়ে গিয়ে একটা ট্রফিতে হাত বোলাল লিলি। ফিলিপের বক্তব্য, ওই দুজন র‍্যাঞ্চারের সঙ্গে কোনমতেই এঁটে উঠতে পারবে না ডাবল সি। বিক্রি করে। দিতে বলছে হারনি পাইকের কাছে। অনেক জায়গাজমি কিনছে পাইক, মিস্টি ক্যানিয়নে হোটেল পাইকের কাছে। অনেতে পারবে না ডাবল সি বক্তব্য, ওই
জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল কিশোর। সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য। এ রকম একটা জায়গাকে কিছু বানিয়ে নষ্ট করা উচিত না।
প্রাণ থাকতে দেবও না আমি! ফুঁসে উঠল লিলি।
কি করে বাধা দেবেন?
ঝিক করে উঠল লিলির সবুজ চোখ। আবার কাজ শুরু করব।
কাজ তো করছেন... থেমে গেল কিশোর। ও, আবার রোডিও?
কেন নয়? জুলাইয়ের চার তারিখে ইডাহোর বয়েসে একটা বিরাট রোডিওর আয়োজন করা হয়েছে। এতবড় আয়োজন এই এলাকায় আর হয়নি। পুরস্কারের টাকাও অনেক বেশি। জিততে পারলে ব্যাংকের ঋণ সহজেই শোধ করে দিতে পারব। শুধু তাই নয়, যে জিতবে তাকে বিজ্ঞাপনে এমনকি সিনেমায়ও অভিনয়ের সুযোগ দেয়া হবে। টাকার আর অসুবিধে হবে না তখন। র‍্যাঞ্চের খরচ সহজে জোগাতে পারব। এভাবে দুচারটা টুরিস্ট মৌসুম টিকিয়ে রাখতে পারলেই বেঁচে যাবে র‍্যাঞ্চটা। নিজের আয়েই চলতে পারবে তখন।
হ্যাঁ, ভালই হবে, কিশোর বলল। আইডিয়াটা মন্দ না।
ঘণ্টা শোনা গেল বাড়ির ভেতর থেকে।
ঘড়ি দেখল লিলি। খাবার সময় হয়েছে। লিলিকে দেরি করিয়ে লাভ নেই। ওকে কথা দিয়েছি, আজকে খাবার টেবিলে সাহায্য করব। কিশোরের দিকে তাকাল, তোমাকে এত কিছু বলে ফেললাম, কিছু মনে করনি তো?
লিলির সঙ্গে ডাইনিংরুমে এসে ঢুকল কিশোর। ঢোকার মুখেই দেখা হয়েছে ফোরম্যান লুক বোলানের সঙ্গে, পরিচয় করিয়ে দিয়েছে লিলি। কিশোরের হাসির জবাব দিয়েছে লোকটা সামান্য একটু মাথা নুইয়ে।
লম্বা একটা টেবিলে বসে পড়েছে রবিন।
আরি, তুমি আগে? কিশোর জিজ্ঞেস করল, মুসা কোথায়?
বলতে পারব না। আমি বাথরুমে থাকতেই ও ডেকে বলল, বাইরে ঘুরতে যাচ্ছে। দেখি, খুঁজে নিয়ে আসিগে। দেরি করলে তো ডিনার মিস করবে।

দরজার দিকে ঘুরল কিশোর, বেরোনর জন্যে। আচমকা, বিকেলের শান্ত বাতাসকে চিরে দিল যেন তীব্র একটা আতঙ্কিত চিৎকার। রেসের ঘোড়া।

.

চত্ত্বর ধরে ছুটতে ছুটতে আরেকটা চিৎকার শুনতে পেল কিশোর। আস্তাবলের দিক থেকে আসছে।

বিপদে পড়েছে মুসা, ভীষণ বিপদ। কোণঠাসা করে ফেলা হয়েছে তাকে। কোরালের বেড়ায় পিঠ ঠেকিয়ে বাঁকা হয়ে আছে। আক্রমণের ভঙ্গিতে ওর দিকে এগিয়ে চলেছে বিরাট কালো একটা ঘোড়া। ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে কালো চোখের তারা, ঘামে ভেজা চামড়া চকচক করছে সিকিউরিটি ল্যাম্পের আলোয়, নীলচে দেখাচ্ছে।

ধড়াস করে এক লাফ মারল কিশোরের হৃৎপিণ্ড। ইউনিকর্ন।

পেছনের দুপায়ে ভর দিয়ে লাফিয়ে উঠল ঘোড়াটা। সামনের দুই পা গেঁথে ফেলতে চায় মুসার বুকে। কিছুই করার নেই তার। আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে মাথার ওপর দুহাত তুলে তাকিয়ে রয়েছে আতঙ্কিত অসহায় দৃষ্টিতে।

কোন রকম দ্বিধা না করে লাফিয়ে কোরালের বেড়া ডিঙাল কিশোর।

সাবধান! পেছন থেকে চেঁচিয়ে হুশিয়ার করল লিলি।

মাথা ঝাড়া দিল ঘোড়াটা। পা চালাল। সামনের দুটো খুর অল্পের জন্যে লাগল না মুসার মুখে।

চিৎকার করে হাত নাড়তে নাড়তে ছুটল কিশোর। ঘোড়াটার নজর এদিকে ফেরাতে চাইছে, যাতে মুসাকে আর আক্রমণ না করে।

ফিরেও তাকাল না ঘোড়াটা। আরেকবার লাফিয়ে উঠল পেছনের পায়ে ভর দিয়ে। ততক্ষণে পৌঁছে গেছে কিশোর। মুসার এক হাত ধরে হ্যাঁচকা টান মারল। সরো, সরে যাও!

পেছনে এসে চিৎকার শুরু করল লিলি। ঘোড়াটার নাম ধরে ডাকতে লাগল। এই সুযোগে মুসাকে নিয়ে সরে এল কিশোর। গেটের দিকে দৌড় দিল দুজনে। ঘোড়াটা আবার এদিকে নজর দেয়ার আগেই দৌড়ে গেট পেরিয়ে এল।

লিলি লাগিয়ে দিল গেট।

থ্যা-থ্যাঙ্কস! গলা কাঁপছে মুসার।

কিছু হয়নি তো তোমার? জিজ্ঞেস করল কিশোর।

ন-না! ভয়ে ভয়ে ঘোড়াটার দিকে তাকাল আবার মুসা, এখনও ফোঁস ফোঁস করছে ওটা। আরি পরে, কি জানোয়ার…

কি হয়েছে? খোয়া বিছান পথে বুটের শব্দ তুলে দৌড়ে আসছে লুক, বোলান। মুসার কাছে এসে ঝাঁজাল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, এখানে কি করছিলে?

কয়েকজন মেহমানও এসে ঘিরে দাঁড়াল ওদেরকে।
গেট খোলা দেখে ঢুকে পড়েছিলাম, মুসা বলল। ভাবলাম বাড়িতে যাওয়ার এটা শর্টকাট…
গেট খোলা ছিল? তুমি শিওর?
হ্যাঁ।
মুসার হয়ে কিশোর বলল, হয়তো হুড়কো লাগাতে ভুলে গিয়েছিল…
অসম্ভব! মানতে পারল না লুক। গেট ঠিকমত বন্ধ রাখার ব্যাপারে কড়া নির্দেশ রয়েছে এখানে। কিছুটা শান্ত হয়ে এসেছে ফোরম্যান। মুসাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি ঠিক আছ তো?
আছি।
গুড। মেহমানরা সব কৌতূহলী হয়ে তাকিয়ে আছে দেখে জোর করে হাসল লুক। আপনারা যান। ডিনারের দেরি হয়ে যাচ্ছে।
অন্যান্য মেহমানদের নিয়ে সরে গেল ব্রড জেসন, তিন গোয়েন্দার দিকে তাকাল লুক, তোমরা দাঁড়িয়ে আছ কেন?
ঘোড়াটাকে শান্ত করার চেষ্টা করছে লিলি। সেদিকে তাকিয়ে কিশোর জবাব দিল, দেখি, ঘোড়াটাকে।
আর কিছু না বলে লুকও কোরালে ঢুকল, লিলিকে সাহায্য করার জন্যে।
লিলির সঙ্গে কথা আছে, ফিসফিস করে দুই বন্ধুকে বলল কিশোর।
কি? রবিনের প্রশ্ন।
আমার কেন যেন মনে হচ্ছে গেটটা ইচ্ছে করেই খোলা রাখা হয়েছিল, কোন কারণে। ভাবছে কিশোর। ঘোড়াটার সম্পর্কে সবারই খুব খারাপ ধারণা। সেটাই যেন প্রমাণ করার চেষ্টা হয়েছে জানোয়ারটাকে দিয়ে মুসাকে আক্রমণ করিয়ে।
কে গেট খোলা রাখতে যাবে?
সেটাই জানার চেষ্টা করব। অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে মুসা, ওকে জিজ্ঞেস করল কিশোর, সত্যিই তোমার কোথাও লাগেনি তো?।
নাহ্, মাথা নাড়ল মুসা। তবে তোমরা আসতে আরেকটু দেরি করলেই হগেছিলাম। বাপরে বাপ, এরকম সাংঘাতিক জানোয়ার আর দেখিনি! এমন ভাবে আটকে ফেলল আমাকে কিছু করতে পারলাম না। হাসল মুসা। বড্ড খিদে পেয়েছে। কি দিয়েছে টেবিলে, দেখেছ? ডাবল চিজ আর পেপারোনি পিজা হলে খুব ভাল হত।
পুরোপুরিই স্বাভাবিক হয়ে গেছে মুসা, কথাতেই বোঝা গেল। হাসল রবিন। মুসাকে হতাশ করার জন্যেই যেন বলল, না, ওই জিনিস এখানে পাবে না। খেতে হবে মোষের কাবাব আর কালো কফি, ওয়েস্টার্ন কাউবয়দের মত।

মুখ বাঁকাল মুসা। আরে না, কি যে বলো। তার চেয়ে ভাল জিনিস নিশ্চয় বানাবেন কেরোলিন আন্টি। মেহমানরা কি আর অত বাজে খাবার খেতে পারে নাকি।
কিশোরও হাসল। তোমার জন্যে একলা যদি বানায়। আন্টির সঙ্গে বেশ খাতির জমিয়ে ফেলেছ এসেই, খেয়াল করেছি।
ও, রান্নাঘরে কাজ করেছি দেখে? তা তো করতেই হবে। আমাদেরকে তো বলাই হয়েছে, যতদিন থাকব, র‍্যাঞ্চের কাজ করতে হবে। তাহলে থাকা-খাওয়া ফ্রি... তোমরা দুজন বেরিয়ে গেলে, আমিই তোমাদের হয়ে...
কেন যে রাজি হলাম, গুঙিয়ে উঠল রবিন। ওসব রান্না-ফান্না এখন ভাল লাগে না আমার...।
কেন রাজি হয়েছি, খুব ভাল করেই জান তুমি, বাধা দিয়ে বলল কিশোর। তুমিই তো অনুরোধ করলে আমাদেরকে আসতে...
করলাম তোমার কথায়। আমি কি আর জানি নাকি এতটা খারাপ অবস্থা। বেহমার বাল্যবন্ধুর অনুরোধ রাখতে এসে শেষে কোন্ হেনস্তা হতে হয়। কে জানে!
চোখ মিটমিট করল কিশোর। তা বোধহয় হব না। আর অবস্থা অতটা। খারাপও বোধহয় নয়, খালি রান্নাঘরেই বসে থাকতে হবে না।
ভুরু কুঁচকে তাকাল রবিন, কেন, রহস্য পেয়ে গেলে নাকি এরই মধ্যে?
প্রশ্নের জবাব না দিয়ে দুজনকে বলল কিশোর, এক কাজ করো, তোমরা চলে যাও। আমি আসছি।
কি করবে? মুসা জানতে চাইল।
কাজ আছে। তোমরা যাও। পরে বলব সব।
অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাড়ির দিকে রওনা হয়ে গেল রবিন আর মুসা।
কোরালের বেড়ার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল কিশোর। তার দিকে কড়া চোখে তাকাল একবার লুক। কেয়ারই করল না কিশোর, তাকিয়েই রয়েছে। খেপা ঘোড়াটাকে কিভাবে সামলাচ্ছে লিলি, দেখছে। কিছুতেই দড়ির বাঁধনে আটকা পড়তে চাইছে না ইউনিকর্ন, লাথি মারছে মাটিতে, মাথা ঝাড়ছে, ফোঁস ফোঁস। করছে। মোলায়েম গলায় কথা বলছে লিলি।
অবশেষে ধরা দিতেই হলো ঘোড়াটাকে।
কিশোরের দিকে এগিয়ে এল লুক। সাংঘাতিক বোকামি করে ফেলেছিল তোমার বন্ধু। ওটা ঘোড়া তো না, একটা শয়তান। খুনী।
খুনী? মানে?
লুক জবাব দেয়ার আগেই ঘোড়ার দড়ি ধরে ফিরে তাকিয়ে লিলি বলল, অহেতুক দোষ দিচ্ছ কেন? ইউনিক কাউকে খুন করেনি।
নাকি সুরে ডেকে উঠল ঘোড়াটা।

সরু হয়ে এল লুকের চোখের পাতা। কিশোরকে বলল, একটা কথা বিশ্বাস, করতে পারো, ভয়ানক বদমেজাজী জানোয়ার ওটা। একটু আগে নিজের চোখেই। তো দেখলে। ওটার কাছ থেকে দূরে থাকবে। লিলির দিকে এগিয়ে গেল সে। ওর হাত থেকে দড়িটা নিয়ে বলল, এই শয়তানটাকে আমি সামলাচ্ছি। তুমি যাও। কিশোর তোমার সঙ্গে কথা বলার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে।
দড়ি হাতবদল হতেই দ্বিধায় পড়ে গেল ইউনিকর্ন। নেচে উঠল। দড়ি ধরে জোরে ঝাঁকি দিয়ে ওকে শান্ত হওয়ার ইঙ্গিত করল লুক। টেনে নিয়ে চলল।
বেড়ার বাইরে এসে কিশোরের কাছে দাঁড়াল লিলি। মুসার কিছু হয়নি তো?
না। ভয় পেয়েছিল, সেরে গেছে।
পাবেই। বড় বড় র‍্যাঞ্চ হ্যাণ্ডদের ভয় পাইয়ে দেয় ইউনিক, আর মুসা তো... কথা শেষ না করেই কিশোরের দিকে তাকিয়ে হাসল লিলি। তবে খুনী নয়। ঘোড়াটা, একথা বিশ্বাস করতে পার। লুক বাড়িয়ে বলেছে। এটা ওর স্বভাব। কিছু গড়বড় হয়ে গেলেই ওর মেজাজ খারাপ হয়ে যায়, অযথা দোষ দিতে থাকে একে ওকে। তাছাড়া ইউনিককে ও দেখতে পারে না।
দেখতে পারে না কেন?
আব্বার মৃত্যুর জন্যে ও ইউনিককে দায়ী করে। কিশোরের মতই লিলিও বেড়ায় হেলান দিয়ে তাকাল লুকের দিকে, জোর করে টেনে টেনে ঘোড়াটাকে আস্তাবলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।
কেন? আবার প্রশ্ন করল কিশোর।
সে অনেক কথা। ভীষণ বদমেজাজ ঘোড়াটার। কয়েক বছর আগে, রোডিও খেলার জন্যে নেয়া হয়েছিল ওটাকে। প্রচুর বদনাম কামিয়ে বিদেয় হতে হয়েছে। কারোরই চড়ার সাধ্য হয় না ওটার পিঠে। আব্বা তো ঘোষণা করে দিয়েছিল, যে। এক মিনিট ইউনিকনের পিঠে চেপে থাকতে পারবে, তাকে মোটা টাকা পুরস্কার দেয়া হবে। অনেক কাউবয় চেষ্টা করেছে, কেউ পারেনি। উড়তে শুরু করে ঘোড়াটা। ধোয়াটে হয়ে এল লিলির চেহারা। শেষে আব্বা নিজেই একদিন চেষ্টা করল। ছুঁড়ে ফেলে দিল ওকে ইউনিক। জন্মের মত পঙ্গু হয়ে গেল আব্বা।
তাই? বিড়বিড় করল কিশোর। তারপরই বুঝি আপনাকে রোডিও ছাড়তে হল?
মাথা ঝাঁকাল লিলি। আমাকে আসতে বাধ্য করেছে আসলে লুক। ওকে এমনি দেখে যাই মনে হয়, মনটা ওর খুবই ভাল।
এ ব্যাপারে একমত হতে পারল না কিশোর। তাহলে অ্যাক্সিডেন্টের জন্যে ইউনিককেই দায়ী করে লুক?
হ্যাঁ। কিন্তু ঘোড়াটাকেও দোষ দেয়া যায় না পুরোপুরি। আব্বা তো জানতই ওটা বদমেজাজী, কাউকে পিঠে চড়তে দেয় না, তারপরেও বোকামি করতে গেল

কেন? লুকের তো একেবারেই ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু আব্বা শুনল না ওর কথা। অ্যাক্সিডেন্টের পর লুক চেয়েছিল ওরকম একটা বাজে জানোয়ারকে মেরেই ফেলা হোক। খামাখা বিপদ পুষে রেখে লাভ কি। যুক্তি আছে অবশ্য ওর কথায়। এই যেমন আজ আরেকটু হলেই মারা পড়েছিল মুসা। বাতাসে উড়ে এসে পড়া চুল। মুখের ওপর থেকে সরিয়ে দিল লিলি। আব্বা লুকের কথায় কানই দেয়নি। তার ধারণা ছিল, ইউনিক এই র‍্যাঞ্চের জন্যে একটা অ্যাসেট। চড়তে না দিলে না দিল, প্রজনন তো করতে পারবে। ওর যেসব বাচ্চা হবে, একেকটা সোনার টুকরো।

হয়েছে নাকি?

নিশ্চয়ই। ওর কয়েকটা বাচ্চার বয়েস তিন বছর হয়ে গেছে। ট্রেনিং দেয়া হচ্ছে ওগুলোকে। ঘোড়া যারা চেনে তাদের ধারণা রোডিও খেলার জন্যে খুবই ভাল জানোয়ার হবে ওগুলো। আব্বার আশা ছিল, ইউনিকের বাচ্চা বিক্রি করেই র‍্যাঞ্চের ধার শোধ করে দেয়া যাবে। কিন্তু তার আশা পূরণ হওয়ার আগেই চলে গেল অন্য দুনিয়ায়। দীর্ঘশ্বাস ফেলল লিলি।

সরি, সহানুভূতি জানাল কিশোর।

র‍্যাঞ্চিং ব্যবসা খুব ভাল বুঝত আব্বা। তার কাছেই কাজ শিখেছে লুক। সে ও ভাল বোঝে। হঠাৎ কি মনে হতেই সোজা হয়ে দাঁড়াল, লিলি। চলো, তোমাকে। একটা জিনিস দেখাব। রেসের ঘোড়া

লিলির পিছু পিছু আস্তাবলে ঢুকল কিশোর। আলো জ্বালল লিলি। নাক দিয়ে শব্দ করল কয়েকটা ঘোড়া। স্টলের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় গলা বাড়িয়ে দিতে লাগল ওগুলো, ওদের নাম ধরে ডাকল সে, আদর করে হাত বুলিয়ে দিল। মাথায়। কিশোরও কোন কোনটাকে আদর করল, দেখল ওগুলোর টলটলে বাদামী চোখ।

স্টলের শেষ মাথায় এসে দাঁড়াল ওরা। খড়ের বিছানার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। অবিকল ইউনিকর্নের মত দেখতে আরেকটা ঘোড়া। শান্ত সুবোধ, চোখে আগুন নেই। ওর নাম হারিকেন, ঘোড়াটার গলায় হাত বোলাতে লাগল লিলি। ইনডিপেনডেন্স ডে রেডিওতে এটার পিঠেই চড়ব আমি। হারিকেন নামটা ওর জন্যে ঠিকই হয়েছে, ঝড়ের মতই গতি। ওকে ছাড়া জেতার আশা কমই আমার।

দেখতে তো একেবারে…

ইউনিকের মত।

যমজ।

রেয়ার, তবে হয়। মেজাজ একেবারে বিপরীত দুটোর। এমনিতে খুব চুপচাপ থাকে হারিকেন, কিন্তু খেলার সময়… ওরিব্বাপরে, না দেখলে বিশ্বাসই করবে না।

পকেট থেকে একটা আপেল বের করে ঘোড়াটাকে খেতে দিল লিলি।
আলাদা করে চেনেন কি করে দুটোকে?
চেনা খুবই কঠিন, তবে আমি পারি। সামনের ডান পায়ের খুরটা দেখো। সামান্য ওপরে একটুখানি জায়গার নোম সাদা দেখতে পাচ্ছ না? শুধু এটারই আছে, ইউনিকের নেই।
গলা বাড়িয়ে দেখল কিশোর। খুব ভাল করে না তাকালে চোখেই পড়ে না, সাদা অংশটা। হারিকেন নিশ্চয় খুব দামি?
তা তো বটেই। কিন্তু আমার মতে ইউনিকের দাম আরও বেশি হওয়া উচিত। ওর একেকটা বাচ্চা যা হয় না, আগুন।
এক পা এগিয়ে এসে রেইলের ওপর দিয়ে মাথা বাড়িয়ে দিল হারিকেন। কুচকুচে কালো রঙ, অনেক উঁচু, একটা দেখার মত জানোয়ার। ওর মসৃণ গলায় হাত বোলাতে লাগল কিশোর। ঘোড়াটাও বাহুতে নাক ঠেকিয়ে দিয়ে আদর নিতে লাগল।
লিলি হাসল। ও তোমাকে পছন্দ করেছে।...চলো, আর দেরি করব না। আলো নিভিয়ে দিল সে।
চত্বর ধরে হাঁটতে হাঁটতে কিশোর জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, গেটটা কে খুলে রাখল, বলুন তো?
কি জানি, মাথা নাড়ল লিলি।
এরকম আর হয়েছে?
হয়েছে, দুএকবার। নিষেধ থাকা সত্ত্বেও মেহমানরা ঢোকে, তারপর লাগাতে ভুলে যায়। ব্যাপারটা নিছকই অ্যাক্সিডেন্ট। বলল বটে লিলি, কিন্তু তার কণ্ঠস্বরে মনে হল না একথা বিশ্বাস করে সে। যত যাই বলো, আমার ভাই সাহস হচ্ছে না, ভয়ে ভয়ে ঘোড়াটার দিকে তাকিয়ে। রয়েছে মুসা। আগের সন্ধ্যার কথা ভুলতে পারছে না।
ভয় নেই, হেসে বলল কিশোর। ভাল ঘোড়াই দেয়া হবে তোমাকে। শয়তানী করবে না।
পরদিন সকালে আস্তাবলের কাছের বড় কোরালের বেড়ায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছে ওরা। অন্য মেহমানরাও রয়েছে কাছাকাছি।
যার যার দায়িত্বে চড়বেন, ব্রড বলল। কি করে জিন পরাতে হয়, লাগাম লাগাতে হয় শিখিয়ে দেব। কারও চড়ার অভ্যেস আছে?
চড়েছে, জানাল তিন গোয়েন্দা। ওদেরকে সরিয়ে দেয়া হল বোসটনের ডক্টর কাপলিঙের পাশে। ডক্টরের স্ত্রী এবং কন্যাকে সরিয়ে আনা হলো কানসাসের

একটা পরিবার আর শিকাগোর দম্পতি মাইক ও জেনি এজটারের পাশে, এরা কেউই চড়তে জানে না।
সবাইকেই একটা করে ঘোড়া আর জিন দিল ব্রড। কিশোরকে দেয়া হলো। একটা জেলডিং ঘোড়া। হরিণের চামড়ার মত ফুটফুটে চামড়া। নামটা বিচিত্র, জেনারেল উইলি। সবচেয়ে ভাল ঘোড়াগুলোর একটা দিলাম তোমাকে, ব্রড বলল। দেখো চড়ে, মজা পাবে। লিলি বলছিল ঘোড়ারা নাকি তোমাকে পছন্দ করে।
ব্রডকে ধন্যবাদ দিয়ে ঘোড়াটার মণ চামড়ায় হাত বোলাতে লাগল কিশোর।
জিন পরাতে শুরু করল সে। রবিন, মুসা আর ডক্টর কাপলিংও যার যার ঘোড়ায় জিন পরাতে লাগলেন।
রবিনকে দেয়া হয়েছে একটা মাদী ঘোড়া, কিছুটা চঞ্চল স্বভাবের, জিন। পরাতে গেলে কেবলই পাশে সরে যেতে চায়। নাম, স্যাণ্ডি। মুসার ঘোড়াটাও একটা প্যালোমিনো মাদী ঘোড়া, শান্ত, নাম ক্যাকটাস।
নিজের ঘোড়ায় পিঠ সোজা করে বসল ব্রড। পথ দেখিয়ে সবাইকে নিয়ে চলল ধুলোঢাকা একটা আঁকাবাঁকা পথ ধরে। দুধারে পাইনের ঘন জঙ্গল। কিছুদূর। এগিয়ে একপাশে দেখা গেল একটা পাহাড়ী নালা বয়ে চলেছে। পানি বেশি না। পরিচিত পথ ধরে সহজ ভঙ্গিতে এগিয়ে চলেছে ঘোড়ার মিছিল।
ফেরার পথে যার যেভাবে ইচ্ছে ঘোড়া চালানর অনুমতি দিল ব্রড।
লাফ দিয়ে আগে বাড়ল কিশোরের জেনারেল উইলি। মসৃণ গতি। সামনের দিকে ঝুঁকে রইল কিশোর। বাতাসে উড়ছে ঘোড়ার ঘাড়ের লালচে চুল। অন্যদের, এমনকি ব্রডেরও অনেক আগেই কোরালের কাছে পৌঁছে গেল ঘোড়াটা। গর্ব হতে লাগল কিশোরের।
ভাল চালাতে পার তো তুমি, পাশে এসে ওর প্রশংসা করল ব্রড।
আসলেই ঘোড়াটা ভাল, জেনারেলের পিঠে আলতো চাপড় দিয়ে বলল কিশোর।
কোরালের ভেতরে একটা নড়াচড়া চোখে পড়ল তার। ভেতরে ছোটাছুটি করছে ইউনিকর্ন। পিঠে আরোহী নেই। এই দিনের আলোয়ও ভয়ঙ্কর লাগছে। ঘোড়াটাকে। ব্রডকে জিজ্ঞেস করল, কাল কে গেট খোলা রেখেছিল জানেন?
হাসি মলিন হয়ে গেল ব্রডের। আমি কি করে জানব? আমি তো ডিনারে বসেছিলাম।
সব মেহমানরাই বসেছিল।
নতুন কয়েকটা ছেলেকে আনা হয়েছে কাজ করতে, ওদের কেউ হতে পারে। কিংবা তোমার বন্ধুও খুলতে পারে।
পাশে এসে দাঁড়াল রবিনের ঘোড়া, স্যাণ্ডি। লাফিয়ে নামল রবিন। নাচতে লাগল চঞ্চল ঘোড়াটা, কিছুতেই যেন স্থির থাকতে পারে না।

মুসা কোথায়? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
থাবা দিয়ে কাপড় থেকে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে রবিন বলল, পেছনে। মুসা আর ডক্টর, দুজনকেই পেছনে ফেলে এসেছে স্যাণ্ডি। ধুলো খাচ্ছে ওরা।
কপালে হাত রেখে শুকনো মাঠের ওপর দিয়ে তাকাল ব্রড। হলোটা কি? ওদের তো এতক্ষণে চলে আসার কথা। যাই, দেখি কি হলো? তোমরা তোমাদের ঘোড়াগুলোকে ঠাণ্ডা করতে পারবে?
তা পারব। আমরা আসব, দরকার হবে? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
না। লিলি জিজ্ঞেস করলে বল কোথায় গেছি। এখনই চলে আসব। ঘোড়া চালিয়ে রওনা হয়ে গেল ব্রড।
ঘোড়ার লাগাম ধরে টানতে টানতে ওগুলোকে গোলাঘরের কাছে নিয়ে চলল দুই গোয়েন্দা। কিশোর বলল, রবিন, বলো তো কাল কে কোরালের গেট খুলে রেখেছিল? এ ব্যাপারটা কি? কিশোরের দিকে তাকাল রবিন, সত্যিই রহস্য পেয়ে গেলে মনে হচ্ছে?
হচ্ছে, যদিও নিশ্চিত হতে পারছে না কিশোর। সোনালি চুল, লম্বা, বেনিরই বয়েসী একটা মেয়েকে আসতে দেখল। পরনে জিন্স, গায়ে সিলভার-ট্রিম ওয়েস্টার্ন শার্ট, গলায় লাল রুমাল, মাথায় সাদা হ্যাট।
হাই, আরেকটু কাছে এসে ঝকঝকে সাদা দাঁত বের করে হেসে বলল মেয়েটা, ব্রডকে দেখেছ? আমি বেনি কুপার, ওর বন্ধু।
নিজের আর রবিনের পরিচয় দিল কিশোর। তারপর বলল, এই একটু ওদিকে গেছে। এখুনি চলে আসবে।
গামলার কাছে এনে জেনারেলকে পানি খেতে দিল সে। খাওয়া হয়ে গেলে কোরালে ঢুকিয়ে দিয়ে এল অন্যান্য ঘোড়ার সঙ্গে।
অপেক্ষা করছে বেনি। ঘড়ি দেখল। সময় নেই আমার। আব্বাকে বলে এসেছি, শিগগিরই গিয়ে প্র্যাকটিস করব। মাঠের ওপাশে তাকাল ব্রডকে দেখার আশায়।
স্যাণ্ডিকে ঢোকানর জন্যে গেট খুলছে রবিন। ফিরে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, ইনডিপেনডেন্স ডে রোডিওতে আপনিও খেলবেন নাকি?
খেলব। কোমরের বেল্টের রূপার বাকলসের মতই চকচক করল বেনির হাসিটা।
এই সময় লিলিকে আসতে দেখা গেল।
হাই, বেনিকে বলে কিশোর আর রবিনের দিকে ফিরল লিলি। আর সবাই কোথায়?
আসছে। কিশোর তাকিয়ে রয়েছে বেনির দিকে, লক্ষ্য করল, কি করে দ্রুত মিলিয়ে গেল মেয়েটার হাসি। ব্রড চলে এসেছিল আমার সঙ্গে। আবার গেছে দেখতে কোন গোলমাল হলো কিনা।

তাই নাকি?
কি শুনছি, লিলি? বেনি জিজ্ঞেস করল, আবার নাকি ব্লেডিওতে ঢুকবে?
আর কোন উপায় নেই, উদ্বিগ্ন হয়ে দিগন্তের দিকে তাকাচ্ছে লিলি। বয়েসের ইনডিপেনডেন্স ডে রোডিও দিয়েই শুরু করব আবার। বিকেলের উজ্জ্বল রোদ থেকে চোখ বাঁচাতে চোখের পাতা মিটমিট করছে সে। যাই। দেখা দরকার, কি হলো।
আবার ঘড়ি দেখল বেনি। ওকে বল আমি এসে খুঁজে গেছি। গুডবাই না বলেই ঘুরে দাঁড়াল বেনি, গটগট করে হাঁটতে লাগল তার পিকআপের দিকে।
আপনি আবার খেলবেন শুনে খুশি হতে পারেনি ও, কিশোর বলল।
হবে কি করে? আমার কাছে হেরে যাওয়ার ভয় আছে না। ছোটবেলা থেকেই আমরা প্রতিদ্বন্দ্বী। নাকের ডগা চুলকাল লিলি। ব্রডের সাথে বেশ ভাব মনে হয়! ও আসার পর থেকে প্রায়ই আসে আমাদের এখানে।
ওই যে, আসছে, চিৎকার করে বলল রবিন।
মাথা ঘুরিয়ে কিশোরও দেখতে পেল। আসছে দলটা।
এগিয়ে এল মুসা। চোখ বড় বড়। মুখ দিয়ে বাতাস ছাড়ছে। উত্তেজিত লাগছে তাকে।
কি ব্যাপার? জানতে চাইল রবিন।
ডক্টরের জিন ঢিল হয়ে গিয়েছিল, কাছে এসে বলল মুসা। ক্যাকটাসের পিঠ থেকে নেমে ডলে দিতে শুরু করল ওর চামড়া। তার জন্যে থামতেই হলো আমাদের।
চড়লে কেমন? জিজ্ঞেস করল।
দারুণ! ক্যাকটাসের জিন খোলায় ব্যস্ত হল মুসা। ঘোড়াটাও খুব ভাল। জিন খুলে নিয়ে ওটার পেছনে চাপড় দিয়ে বলল সে, যা, যা। কোরালের দিকে দুলকি চালে এগিয়ে গেল প্যালেমিনো।

.

আগের দিনের চেয়ে আধঘন্টা পরে ডিনারের ঘন্টা পরল এদিন। টেবিলে রবিন আর মুসার পাশে বসল কিশোর। দেখল, লিলির চেয়ারটা খালি। নিচু গলায় নিজেদের মধ্যে কথা বলছে কয়েকজন শ্রমিক। স্পষ্ট শোনা যায় না সব। কান। খাড়া করে শোনার চেষ্টা করল কিশোর।
এখনও আসছে না কেন? ফোরম্যান লুক বোলান বলল।
আসবে, বলল ব্রড। ও তো আর শিশু নয়, ঠিকই চলে আসবে। কাজেটাজে গেছে হয়তো কোথাও।

বড় বেশি উল্টোপাল্টা ব্যাপার ঘটছে ইদানীং র‍্যাঞ্চে, বলল আরেকজন র‍্যাঞ্চ হ্যাণ্ড। আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিশোরের চোখে চোখ পড়তেই থেমে গেল।
গোলমাল হয়েছে, ফিসফিস করে বন্ধুদেরকে বলল কিশোর। দেখতে যাচ্ছি।
বেশি চিন্তা করছ, মুসা বলল। দেখগে, কোথায় কি কাজ করছে।
ডিনারের পরও করতে পারত। কেরোলিনকে জিজ্ঞেস করব। তোমরা এখানে থাক, আর কিছু বলে কিনা ওরা শোন।
রান্নাঘরে চলে এল কিশোর। অস্থির লাগছে কেরোলিনকে। কিছু করতে হবে নাকি? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
পারবে? সত্যিই সাহায্য চান মহিলা। বার বার জানালা দিয়ে তাকাচ্ছেন। বাইরে। রাতের অন্ধকার নামছে। এভাবে এতক্ষণ তো দেরি করে না কখনও লিলি?
শহরে যায়নি তো? বড় একটা ট্রেতে চকলেট কেকের প্লেট সাজাতে সাজাতে বলল কিশোর।
না, গেলে বলে যেত। ঘণ্টা দুই আগে হারিকেনকে নিয়ে বেরিয়েছে। এক্সারসাইজ করাতে। বলেছে, খাওয়ার আগেই চলে আসবে। দুশ্চিন্তার ভাঁজ পড়ল মহিলার মুখে। কি যে করবে বুঝতে পারছি না... থেমে গেলেন আচমকা। এ কি হয়েছে দেখার জন্যে ঘুরে তাকাল কিশোর। সাদা হয়ে গেছে কেরোলিনের মুখ। জানালার বাইরে তাকিয়ে রয়েছেন। কি দেখেছে দেখার জন্যে ছুটে এল সে জানালার কাছে। ধক করে উঠল বুক। ঠাণ্ডা হয়ে আসছে হাত-পা।
একটা গাড়ি আসছে। পেছনে আসছে কালো একটা ঘোড়া। পিঠে জিন বাঁধা, অথচ আরোহী নেই।
একটানে পেছনের দরজাটা খুলেই লাফিয়ে বাইরে নামল কিশোর। ছুটল চতুর ধরে, ভয় খাওয়া ঘোড়াটার দিকে। ঘ্যাচ করে ব্রেক কষল গাড়িটা।
ঘোড়াটার কাছে চলে এল কিশোর। জিন আঁকড়ে ধরতে গেল। মাথা ঝাড়া দিয়ে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল ওটা, চাবুকের মত শপাং করে এসে ওর মুখে বাড়ি লাগতে যাচ্ছিল ঘোড়ার মুখের লাগাম। সময়মত হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলল ওটা।
লুক বোলান। ধমকে উঠল কিশোরের উদ্দেশ্যে, সরো! সরে যাও!
তীক্ষ্ণ ডাক ছাড়ল হারিকেন। লাফিয়ে উঠল পিছনের পায়ে ভর দিয়ে। চোখে বন্য দৃষ্টি।
দৌড়ে আসছে ব্রড জেসন। লিলি কোথায়, লিলি? যেন ঘোড়াটাকেই জিজ্ঞেস করছে সে। কাছে এসে হারিকেনকে সামলাতে লুককে সাহায্য করল সে।
কে জানে, কোথায়! লুক বলল।
আরেকবার সাদা গাড়িটার দিকে তাকাল কিশোর। দুজন লোক বেরিয়ে এল। একজনকে চিনতে পারল, খাট ফিলিপ নিরেক। লম্বা অন্য লোকটাকে চিনল না।

দৌড়ে আসছেন কেরোলিন। এই, লিলিকে খুঁজতে যাও না কেউ! কিশোরের কাছে এসে দাঁড়ালেন। এমন ভঙ্গিতে তাকালেন, যেন চাইছেন কিশোরই যাক। অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। এরকম করে তো কখনও বাইরে থাকে না মেয়েটা! র‍্যাঞ্চে ইদানীং বড়ই গোলমাল চলছে। কিশোর, রবিনের আম্মা তোমাদের কথা সবই বলেছে আমাকে। সে জন্যেই তোমাদেরকে পাঠাতে বলে দিয়েছিলাম ওকে। প্লীজ, লিলিকে খুঁজে আন!

চেষ্টা করব। হারিকেনকে নিয়ে কোথায় গিয়েছিল লিলি, আন্দাজ করতে পারেন?

মাথা নাড়লেন কেরোলিন। জোরে জোরে হাত ডলতে লাগলেন। জানলে তো ভালই হত। অনেক জায়গা আছে এখানে যাওয়ার, ডজনখানেক পথ আছে। কোনটা দিয়ে কোথায় গেছে কে বলবে?

বেশ, তাহলে এক কাজ করি, ঝড়ের গতিতে চলছে কিশোরের মগজ। একটার পর একটা উপায় বের করার চেষ্টা করছে। টর্চ আর ঘোড়া নিয়ে কয়েকজন চলে যাই আমরা। বনের ভেতরে খুঁজব। কয়েকজন যাক গাড়ি নিয়ে। মাঠ আর অন্যান্য খোলা জায়গাগুলোতে খুঁজবে। কোথাও হয়তো পিঠ থেকে ফেলে দিয়ে এসেছে তাকে ঘোড়াটা। হাত-পা ভেঙে পড়ে আছে, আসতে পারছে না।

ওহ, গড! প্রায় কেঁদে ফেললেন কেরোলিন।

আস্তাবল থেকে বেরিয়ে এসে কিশোরের শেষ কথাগুলো শুনেছে লুক। বারান্দায় জমায়েত হওয়া মেহমানদের দিকে তাকাল একবার। কিশোরকে বলল, তোমরা মেহমান। এসব তোমাদের কাজ নয়। আমরাই যাচ্ছি খুঁজতে। ফিলিপ নিরেকের ওপর চোখ পড়তে উদ্বিগ্ন হল সে।

আমি সাহায্য করতে চাই, কিশোর বলল।

দেখো, শোনো আমার কথা! কর্কশ হয়ে উঠল লুকের কণ্ঠ। এদিককার পাহাড়গুলো ভীষণ খারাপ। তোমরা আমাদের দায়িত্বে রয়েছ। কিছু একটা হয়ে গেলে জবাব আমাদেরকেই দিতে হবে। এই রিস্ক নিতে পারি না। আমরা এখানে অনেক লোক, আমরাই পারব। মেহমানদের দিকে তাকিয়ে জোরে জোরে বলল, আপনারা সব ভেতরে যান। দাবা আছে, তাস আছে, খেলুনগে। ব্রড ভাল গিটার বাজাতে পারে। বাজিয়ে শোনাবে আপনাদের।

মেহমানদের যাবার ইচ্ছে নেই, তবু এক এক করে ঢুকে গেল ভেতরে।

কিশোর দাঁড়িয়েই রইল। আমি সত্যিই সাহায্য করতে পারব।

এগিয়ে আসছে নিরেক। তার সঙ্গের লম্বা লোকটার চেহারাটা রুক্ষ। মাথায় রুপালি চুল।

আরেকটু হলেই গাড়ির ওপরই এসে পড়েছিল ঘোড়াটা! এখনও গলা কাঁপছে নিরেকের। লুকের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, লিলি কোথায়?

নেই।
ঝুলে পড়ল ব্যাংকারের চোয়াল। নেই মানে? আমি আর পাইক তো ওর সঙ্গেই দেখা করতে এলাম…
লম্বা, কঠিন চেহারার লোকটার দিকে আবার তাকাল কিশোর। এই তাহলে হারনি পাইক। লিলির সম্পত্তি যে কেড়ে নিতে চায়।
আজ বিকেলেও ফোন করেছি, নিরেক বলল। ওকে মনে করিয়ে দেয়ার জন্যে।
বারান্দার রেলিঙে হেলান দিল লুক। অন্য সময় আসতে হবে তাহলে। খাট লোকটার ওপর থেকে লম্বাজনের ওপর সরে গেল তার নজর। লিলি নিখোঁজ।
নিখোঁজ! রেগে গেল নিরেক। আমাকে বিশ্বাস করতে বল একথা?
করলে করবেন না করলে নেই, আপনার ইচ্ছে।
আমাদের ফাঁকি দেয়ার জন্যেই লুকিয়েছে।
কেন করবে একাজ? কিশোর জিজ্ঞেস করল।
কিশোরের কথায় কানই দিল না নিরেক, তাকিয়ে রয়েছে লুকের দিকে। র‍্যাঞ্চটা যে শেষ, একথা আমার মতই তুমিও জানো। মিস্টার পাইক একটা লোভনীয় প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন।
পরেও লোভটা দেখাতে পারবেন তিনি, ভোঁতা গলায় বলল লুক। মেয়েটার সঙ্গে গণ্ডগোল করবেন না আপনারা, বলে দিলাম। ভাল হবে না।
রাগ ঝিলিক দিল পাইকের চোখে, দরজা দিয়ে আসা আলোয় সেটা দেখতে পেল কিশোর। ভ্রূকুটি করল। অস্বস্তিভরে আঙুল বোলাল তার ওয়েস্টার্ন টাইতে। বলল, চল, ফিলিপ। এখানে আর দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই।
এই তো, ভাল কথা, লুক বলল। নিরেক কিছু বলার আগেই কিশোরের দিকে ফিরে বলল, যাও, ঘরে যাও। তোমার বন্ধুদের সঙ্গে খেলগে বসে। আমি লিলিকে খুঁজতে যাচ্ছি। লম্বা লম্বা পায়ে বাঙ্কহাউসের দিকে রওনা হয়ে গেল সে।
বনের ভেতর কোথায় কোন বিপদে পড়ে আছে লিলি, কে জানে! ঘরে বসে থাকতে ইচ্ছে করছে না কিশোরের। সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠেই কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে তাকাল।
গাড়িতে উঠছে নিরেক আর পাইক। পাইকের খসখসে কণ্ঠ শুনতে পেল, ভেব না, ফিলিপ। নিজের কষ্টই কেবল বাড়াচ্ছে লিলি। কাজ হবে না এতে। র‍্যাঞ্চটা আমি দখল করবই।
ডাইনিং রুমেই রবিন আর মুসাকে বসে থাকতে দেখল কিশোর। এখন ওদের সঙ্গে রয়েছেন কেরোলিন।
লিলি ফেরেনি? জিজ্ঞেস করল মুসা।
মাথা নাড়ল কিশোর। না। আমাদের এভাবে বসে থাকাটা বোধহয় উচিত হচ্ছে না।

আমারও তাই মনে হয়, কেরোলিন বললেন। মেহমানদেরকে বলিগে। যারা যেতে রাজি হয়, যাবে।
আমি তো যাবই, মুসা বলল।
আমিও, বলল রবিন।
ঝটকা দিয়ে খুলে গেল সুইং ডোরের পাল্লা। ভেতরে ঢুকল লুক। চোখে। উল্কণ্ঠার ছায়া। কেরোলিনকে বলল, আমরা লিলিকে খুঁজতে যাচ্ছি। মেহমানরা যেন কেউ ঘর থেকে না বেরোয়। এরাও।
তিন গোয়েন্দাকে দেখাল সে। এমনিতেই যথেষ্ট দুশ্চিন্তায় আছি। আবার কেউ কিছু করে বসুক…
কিন্তু এরা গোয়েন্দা…
গোয়েন্দা-ফোয়েন্দা আমাদের দরকার নেই! রেগে উঠল লুক। এখানে খুন হয়েছে নাকি, যে তদন্ত করবে? এখন আমাদের দরকার ভাল ট্র্যাকার, যে বনের ভেতরে চিহ্ন দেখেই হারান মানুষকে খুঁজে বের করতে পারবে, গোয়েন্দা লাগবে না। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইল সে। তারপর কেরোলিনকে। বলল, জন কয়েকজনকে নিয়ে দক্ষিণের পাহাড়ে চলে যাবে। আমি আর ব্রড বেরোব গাড়িতে করে। ঘন্টা দুয়েকের মধ্যেই ফিরে আসব। কিশোরের দিকে আঙুল তুলল সে। তোমরা ঘরে থাক। সাহায্য যদি করতেই হয়, বসে থাক ফোনের কাছে। বলা যায় না, লিলির ফোনও আসতে পারে। বেরিয়ে গেল সে।
কয়েক মিনিট পরে একটা গাড়ির ইঞ্জিন স্টার্ট নেয়ার শব্দ শোনা গেল।
লুক যা-ই বলে যাক, মানতে রাজি নয় কিশোর। ওই লোকটার আদেশ শুনবে কেন সে? এখানে বসে বসে আঙুল চুষতে একেবারেই ভাল লাগছে না তার। দুই সহকারীর দিকে তাকাল।
বসেই থাকবে? রবিনের প্রশ্ন।
মাথা নাড়ল কিশোর। না। জেনারেলকে নিয়ে বেরিয়ে যাব পাহাড়ে খুঁজতে।
জানতাম, হাসি ফুটল রবিনের মুখে।
কিশোরও হাসল। বলল, তবে লুক একটা কথা ঠিকই বলেছে, ফোনের কাছে কাউকে থাকতে হবে।
কে থাকবে? হাসি মিলিয়ে গেল রবিনের।
তুমিই থাকো না?
হ্যাঁ, থাক, প্লীজ! অনুরোধ করলেন কেরোলিন। মেহমানদেরকেও সঙ্গ দেয়া। দরকার, মাতিয়ে রাখা দরকার, যাতে অহেতুক দুশ্চিন্তা না করে। একাজটা তোমার চেয়ে ভাল আর কেউ পারবে না।

কাঁধ ঝুলে পড়ল রবিনের। হতাশ হয়েছে। জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, আচ্ছাহ!
গুড বয়। উঠে গিয়ে প্যানট্রিতে ড্রয়ার ঘাটাঘাটি শুরু করলেন কেরোলিন। কয়েকটা পুরানো ম্যাপ এনে টেবিলে বিছালেন। আঙুল রেখে রেখে দেখিয়ে দিতে লাগলেন কোন কোন রাস্তা লিলির পছন্দ। শেষে বললেন, যে পথ ধরেই যাক, হট স্প্রিঙের দিকেই যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। ওদিকটাতেই যায়। গরম পানির ঝর্নাটার কথা বললেন তিনি।
দেখেছি ওটা আজকে, ম্যাপের দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার। ভাবছে, ঠিক কোন জায়গাটায় হারিকেনকে নিয়ে গিয়েছিল লিলি?
ধরো ফোন এল, কিংবা লিলি ফিরে এল, কি করব তখন? জিজ্ঞেস করল রবিন।
একজন র‍্যাঞ্চ হ্যাণ্ডকে বলবে ফাঁকা গুলি করতে। তাহলেই আমি আর মুসা বুঝব, লিলি নিরাপদে আছে। ফ্লেয়ার থাকলে ভাল হত, জ্বালতে পারতে।
আছে তো, কেরোলিন বললেন। এখানে ওঁসক জিনিসের দরকার হয়। তাই রাখি। ট্যাক রুমে আছে। ফাঁকা গুলি করার জন্যে অন্য কাউকে দরকার নেই, আমিই পারব।
হাসল কিশোর। তাহলে খুবই ভাল। হট স্প্রিঙের দিকেই যাব আমরা। চল, মুসা। চেয়ারের হেলানে ঝোলান জ্যাকেটটা তুলে নিয়ে দরজার দিকে চলল সে।
চাঁদ উঠেছে। হলুদ আলো ছড়িয়ে দিয়েছে। র‍্যাঞ্চের এখানে ওখানে বিচিত্র নীল আর ধূসর ছায়ার খেলা। দূরে লাল আলো নেচে নেচে এগিয়ে যেতে দেখা। গেল, নিশ্চয় লুকের গাড়ির। দক্ষিণের মাঠের দিকে চলেছে ও।
কয়েক মিনিটেই ঘোড়া বের করে জিন পরিয়ে ফেলল কিশোর আর মুসা, সকালে যে দুটো নিয়েছিল ওরা সেগুলোকেই নিল। ক্যাকটাসের পিঠে চড়ল মুসা। জিজ্ঞেস করল, ওরাতো গেছে দক্ষিণে। আমরা?
উত্তরে, জবাব দিল কিশোর।
জেনারেলের পিঠে চড়ল সে। রাশ টেনে ইঙ্গিত দিতেই ছুটতে শুরু করল ঘোড়া। পিছু নিল ক্যাকটাস।
সকালে যে পথে গিয়েছিল ওরা সেপথেই এগোল।
ঠিক পথেই যাচ্ছি তো? মুসার প্রশ্ন। গাছপালার দিকে তাকাচ্ছে বার বার। রাতের বেলা এসব জায়গা ভাল না, শুনেছি…
দোহাই তোমার, মুসা, ভূতের কথা শুরু করো না আবার!
চুপ হয়ে গেল মুসা।

তবে রাতের বেলা বনের চেহারাটা কিশোরেরও ভাল লাগছে না। টর্চের আলোয় কেমন ভূতুড়ে লাগছে পাইন গাছগুলোকে। ঠিক পথেই যাচ্ছি। সকালে এদিক দিয়েই গিয়েছিলাম।
ভাবতে ভাবতে চলেছে কিশোর। একসময় আনমনেই বলল, আশ্চর্য!
কি? জিজ্ঞেস করল মুসা।
এখানে আসার পর থেকেই একটার পর একটা অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটে চলেছে। কাল রাতে ইউনিকর্নের কোরালের গেট কেউ খুলে রেখেছিল। এখন হারিয়ে গেল লিলি। হারনি পাইক এসে হুমকি দিয়ে গেল। লুক বোলান, এমনকি ব্রডও এমন আচরণ করছে, মনে হচ্ছে যেন কিছু লুকাতে চায়।
কিছু সন্দেহ করছ নাকি?
এই, কি হলো তোর? জেনারেলের ঘাড়ের লোম দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, বুঝতে পেরে জিজ্ঞেস করল কিশোর। কোন কারণে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে ঘোড়াটা।
কর্কশ একটা ডাক শোনা গেল। ডানা ঝাঁপটে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল। বিরাট এক পেঁচা। মাথা ঝাড়ল জেনারেল, নাক দিয়ে শব্দ করল, লাফ দিল। সামনের দুপা তুলে। এক হাতে লাগাম ধরে ওকে শান্ত করার চেষ্টা করল কিশোর, আরেক হাতে টর্চ। হাত নড়ার সঙ্গে সঙ্গে আলোটাও সামনের পথের ওপর নড়তে লাগল।
কি হলো? মুসার ক্যাকটাসও অস্থির হয়ে উঠেছে।
বলতে গিয়েও বলতে পারল না কিশোর, গলা টিপে ধরা হয়েছে যেন, এরকম একটা শব্দ করল। সামনের পথের ওপর পড়ে রয়েছে একটা মূর্তি। নড়ছে না।
.
লাফ দিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে দৌড়ে গেল কিশোর। বসে পড়ল পড়ে থাকা দেহটার পাশে। প্রথমেই নাড়ি দেখল। তারপর মুসাকে বলল, লিলি!
লিলির ওপর ঝুঁকল মুসা। বেঁচে আছে?
আছে। কাঁধ ধরে ঠেলা দিতে দিতে কিলোর ডাকল, লিলি, শুনতে পাচ্ছেন? এই লিলি?
উ! গোঙাল লিলি। কয়েকবার কেঁপে কেঁপে খুলে গেল চোখের পাতা, আবার বন্ধ হয়ে গেল। কিশোর? শুকনো ঠোঁটের ভেতর দিয়ে কোনমতে ফিসফিস করে বলল সে। আবার চোখ মেলল। উঠে বসার চেষ্টা করতে করতে জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে... হাত চেপে ধরল কপালে।
নড়বেন না, কিশোর বলল। হাড়টাড় কিছু ভেঙে থাকতে পারে।
না, ভাঙেনি। টর্চের আলোয় ফ্যাকাসে লাগছে ওর চেহারা। ইস্, মনে হচ্ছে গায়ের ওপর দিয়ে ট্রাক চলে গেছে। নড়াতে পারছি না। নড়লেই ব্যথা লাগে... চোখমুখ

কুঁচকে ফেলল সে।
বাড়িটাড়ি লাগিয়েছেন বোধহয় কোথাও। শুয়ে থাকুন। আমি ডাক্তার কাপলিংকে নিয়ে আসি।
লাগবে না। এই প্রথম যেন অন্ধকার লক্ষ্য করল। অনেকক্ষণ ধরে এখানে আছি মনে হচ্ছে? ধরো, আমাকে, তোলো, তাহলেই হবে।
কিশোর আর মুসার কাঁধে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল লিলি। পা কাঁপছে। ওরা ছেড়ে দিলেই টলে পড়ে যাবে।
যেতে পারবেন? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
পারব না কেন? কোনমতে উঠে বসতে পারলেই হয় ঘোড়ায়, কাঁপা গলায় বলল লিলি।
ক্যাকটাস শান্ত, তাই ওটার পিঠেই ওকে তুলে দিল মুসা আর কিশোর মিলে। ওরা উঠল জেনারেলের পিঠে। টর্চের আলোয় পথ দেখে দেখে এগোল পাহাড়ী পথ ধরে।
হারিকেন কোথায়? জিজ্ঞেস করল লিলি।
র‍্যাঞ্চে। একেবারে খেপে গিয়েছিল। অনেক কষ্টে শান্ত করেছে লুক আর ব্রড।
আশ্চর্য! বিড়বিড় করল লিলি। সামনের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বলল, ইদানীং ঘোড়াগুলো কেমন অদ্ভুত আচরণ করছে। কিছু বুঝতে পারছি না।
কি করছে? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
অদ্ভুত সব কাণ্ড। গত হপ্তায় খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল হারিকেন। মনে হচ্ছিল, ভয়ে ভয়ে আছে। সাধারণত ওরকম থাকে না। আজকে করল এই কাণ্ড... থেমে গেল লিলি।
আপনার কি হয়েছিল কিছু মনে আছে?
হারিকেনকে নিয়ে এখানে এসেছিলাম। শুরু থেকেই কেমন নার্ভাস হয়ে ছিল ও, ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলছিল। মনে হল, কোন কারণে লাগাম সহ্য করতে পারছে না। খুলে দিলাম। তারপরই মাঠের ওপর দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে এল আমাকে এখানে। বনের ভেতরে ঢুকে আরও অস্থির হয়ে গেল। কিছু শুনেছিল বোধহয়, বিপদ-টি পদ আঁচ করেছিল। একটা পাইনের জটলার কাছে গিয়ে লাথি মারতে শুরু করল মাটিতে, পিঠ বাকা করে আমাকে ফেলে দিতে চাইল। শেষে পেছনের পায়ে ভর দিয়ে খাড়া হয়ে উঠল। মাথায় বোধহয় ডালের বাড়িটাড়ি লেগেছিল আমার। তারপর আর কিছু মনে নেই। চোখ মেলে দেখলাম তোমাদেরকে। দুজনের দিকে তাকাল সে। থ্যাঙ্কস।
র‍্যাঞ্চের আলো চোখে পড়ল। খানিক পরে অনেকগুলো কণ্ঠ শোনা গেল অন্ধকারে। একজন শ্রমিকের চোখে পড়ে গেল লিলি। ফ্লেয়ার জ্বালল লোকটা।

হাউই বাজির মত আকাশের অনেক ওপরে উঠে গেল ফ্লেয়ার, তীব্র নীল আলো। লিলিকে নিয়ে কিশোর আর মুসা চত্বরে ঢুকতে অনেকে এগিয়ে এল স্বাগত জানাতে।

কয়েক মিনিট পরে লিলি যখন ঘোড়া থেকে নামছে, চত্বরে এসে ঢুকল লুকের গাড়ি। দরজা খুলে লাফ দিয়ে নেমে এল সে। লিলিকে দেখে স্বস্তির হাসি হাসল। এসেছ! কি ভয়টাই না পাইয়েছিলে...! সব ঠিক আছে তো?

মনে হয়, জবাব দিল লিলি।

কিশোরের দিকে তাকাল লুক। মনে হচ্ছে তোমার ব্যাপারে ভুল ধারণা করেছিলাম আমি, কিশোর পাশা। বেরিয়ে ভালই করেছ। তবে, এর পরের বার আমি যা বলব, শুনবে। যা করেছ, করেছ, পরের বার আর করবে না। মারাত্মক বিপদে পড়তে পারতে, তখন?

জবাব দিল না কিশোর।

হাঁ হয়ে খুলে গেল রান্নাঘরের দরজা। দুহাতে অ্যাপ্রন তুলে সিঁড়ি বেয়ে। দৌড়ে নেমে এলেন কেরোলিন। পেয়েছে! যাক! লিলিকে জড়িয়ে ধরলেন তিনি। তারপর ঠেলে সরিয়ে মুখ দেখতে লাগলেন। ইসসি, এক্কেবারেই তো সাদা হয়ে গেছে! যাও, সোজা ঘরে...আমি ডাক্তারকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।... কি ভয়টাই না দেখালে

যার যার ঘোড়ার জিন খুলে ঘোড়াগুলোকে আগের জায়গায় রেখে এল কিশোর আর মুসা। লিভিং রুমে ঢুকে দেখল, পুরানো একটা কাউচে বসে ডক্টর কাপলিঙের মেয়ের সঙ্গে মিউজিক নিয়ে আলোচনা করছে রবিন। ওদেরকে দেখেই জিজ্ঞেস করল, পেয়েছ?

পেয়েছি। দোতলায় চলে গেছে। ভালই আছে, জানাল কিশোর। লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল রবিন। চলো। শুনব।

কিশোর আর মুসাকে নিয়ে রান্নাঘরে চলে এল সে। কাপে গরম কোকা নিয়ে একটা নিজে নিল, অন্য দুটোর একটা দিল কিশোরকে, একটা মুসাকে। বলো, কোথায় পেলে?

সব শোনার পর জিজ্ঞেস করল, হারিকেন এই শয়তানীটা কেন করল বলো। তো?

জানি না, কোকার কাপে চুমুক দিল কিশোর।

কিশোর এতে রহস্যের গন্ধ পেয়েছে, রবিনকে বলল মুসা।

সে আমি আগেই জানি, রবিন বলল। কাল রাতেই বুঝতে পেরেছি।

শ্রাগ করল কিশোর। দেখো, একটা কথা কি অস্বীকার করতে পারবে, কাল। থেকে কয়েকটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে? লিলিও তাই বলছে। সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে নিরেক আর পাইকের কথা আগের দিন যা যা শুনেছিল, সব দুই সহকারীকে খুলে বলল সে।

কোকা শেষ করে ওপরতলায় চলল তিন গোয়েন্দা। নিজেদের ঘরে যাওয়ার আগে লিলিকে দেখতে গেল। আস্তে করে ওর ঘরের দরজায় টোকা দিয়ে পাল্লা ঠেলে খুলল কিশোর। নাইটগাউন পরে বিছানায় বসে আছে লিলি।
ডাক্তার কি বললেন? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
ইঙ্গিতে ওদেরকে চেয়ারে বসতে বলে লিলি বলল, ডাক্তাররা আর কি বলে? রেস্ট নিতে হবে কয়েক দিন। কিছু হলেই এছাড়া আর যেন কিছুই করার থাকে না মানুষের। আমি থাকব বসে? অসম্ভব! রোডিওর জন্যে তৈরি হতে হবে আমাকে। র‍্যাঞ্চটাকে বাঁচানর এটাই শেষ সুযোগ।
রবিন হেসে বলল, অত ভাবছেন কেন? আপনি যা এক্সপার্ট, কয়েকদিন প্র্যাকটিস করলেই আবার চালু হয়ে যাবেন।
হাসি ফুটল লিলির মুখে। তা পারব।
হারিকেনকে নিয়ে খেলতে গেলে, মুসা বলল, কার এমন ক্ষমতা, আপনাকে হারায়?
চুপ! আস্তে বলল, কৃত্রিম ভয়ে চোখ বড় বড় করে ফেলল লিলি, বেনি শুনতে পেলে মূর্ছা যাবে।
বাইরে মচ করে একটা শব্দ হলো। কাঁধের ওপর দিয়ে দরজার দিকে ঘুরে তাকাল কিশোর। না, কেউ দরজা খুলছে না। আবার লিলির দিকে ফিরল সে। এই সময় বুটের শব্দ কানে এল, হালকা পায়ে হাঁটছে কেউ। কে? আড়ি পেতে ওদের কথা শোনার চেষ্টা করছিল নাকি কেউ?
রবিন আর মুসাও শুনেছে শব্দটা। ঠোঁটে আঙুল রেখে ওদেরকে চুপ থাকতে ইশারা করে পা টিপে টিপে দরজার দিকে এগোল কিশোর। একটানে খুলে ফেলল পাল্লা। বাইরে উঁকি দিয়ে কাউকে চোখে পড়ল না।
কি হয়েছে? জিজ্ঞেস করল লিলি।
সেটাই তো জানতে চাই আমি, মনে মনে বলল কিশোর। সন্দেহের কথাটা লিলিকে জানাল না। বলল, কিছু না। মনে হলো কেউ এসেছিল। দরজার কাছ থেকে সরছে না কিশোর। এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। অন্যান্য ঘরে মেহমানদের কথা শোনা যাচ্ছে, চলাফেরার শব্দ হচ্ছে। লিলির দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, সব ঘরেই লোক আছে নাকি?
ভাবল লিলি। বেশির ভাগ ঘরেই আছে। কেন?
রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি, রহস্যময় কণ্ঠে বলল কিশোর।
দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কিশোরের চোখে চোখে তাকিয়ে রইল লিলি। তারপর বলল, কেরোলিন তোমাদের কথা সবই বলেছে আমাকে। অনেক জটিল রহস্যের। সমাধান নাকি করেছ তোমরা।

তা করেছি, ফিরে এসে আবার চেয়ারে বসল কিশোর।
রহস্যের গন্ধ যখন পেয়েই গেছ, সাহায্য করো না আমাকে।
কিভাবে?
এই যে অদ্ভুত কাণ্ডগুলো ঘটল, এগুলোর জবাব চাই আমি।
আমিও চাই। আপনি বলাতে আরও সুবিধে হলো আমাদের। দুই সহকারীর দিকে তাকাল কিলোর। কি বলো?
একমত হয়ে মাথা ঝাঁকাল রবিন আর মুসা।
হয়তো দেখা যাবে কোন রহস্যই নেই, সব কাকতালীয় ঘটনা, লিলি বলল। তবে জানা দরকার, মন থেকে খুঁতখুতানি তো দূর হবে।
তা হবে, মাথা কাত করল কিশোর।
আচ্ছা, র‍্যাঞ্চটাকে স্যাবটাজ করতে চাইছে না তো কেউ?
অসম্ভব কি? চাইতেই পারে, শত্রু যখন আছে... কথাটা শেষ করল না। কিশোর। তাকাল লিলির দিকে। হারিকেনের কথা বলুন। এরকম আচরণ কেন করল কিছু আন্দাজ করতে পারছেন?
আবার মচমচ শব্দ হলো। তারপর টোকা পড়ল দরজায়। খুলে গেল পাল্লা। দরজায় দাঁড়িয়ে আছে লুক বোলান। মুখে কাদা লেগে আছে। কাপড় ছেঁড়া। রাগে জ্বলছে চোখ।
কেন ওরকম করছে, আমাকে জিজ্ঞেস করো, আমি জবাব দিচ্ছি, রাগে প্রায় চিৎকার করে বলল লুক, সমস্ত ভদ্রতা দূর হয়ে গেছে কণ্ঠ থেকে, ওটা শয়তান! ভাইয়ের মত! সে জন্যেই করেছে! দুটোই শয়তান! আস্তাবলটাকে তছনছ করে। দিয়েছে! হ্যাঁ, যা বলতে এসেছি। ইউনিক শয়তানটা বেরিয়ে গেছে। ধরতে যাচ্ছি, সে কথাই বলতে এলাম।
লিলি কিছু বলার আগেই দড়াম করে দরজা লাগিয়ে দিল সে। বুটের শব্দ ও তুলে চলে যেতে লাগল।
দুই লাফে দরজার কাছে চলে এল কিশোর। পাল্লা খুলে দেখল সিঁড়ি বেয়ে নেমে যাচ্ছে ফোরম্যান। পেছনে এসে দাঁড়াল রবিন আর মুসা। রবিন জিজ্ঞেস করল, ও ওরকম করল কেন?
ঘোড়াদুটোর ওপর ভীষণ খেপে গেছে, কিশোর বলল। শুনলে না, আস্তাবল তছনছ করে দিয়েছে বলল।
কি করবে এখন? মুসার প্রশ্ন।
তোমরা গিয়ে লিলির কাছে বসো, কিশোর বলল, আমি আসছি।
র‍্যাঞ্চ হাউসের বাইরে চত্বরে যেন পাগল হয়ে উঠেছে সবাই। বাঙ্কহাউস, আস্তাবল আর গোলাঘরে ছোটাছুটি করছে শ্রমিকরা।

এগিয়ে গেল কিশোর। একটা পিকআপে উঠতে দেখল লুককে। ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে তীব্র গতিতে ছুটে গেল গাড়িটা।
কি হয়েছে? একজন র‍্যাঞ্চ হ্যাণ্ডকে জিজ্ঞেস করল কিশোর।
বেড়ার কাছে দাঁড়িয়ে আছে ব্রড। শার্টের একটা হাতা গুটিয়ে ওপরে তুলে রেখেছে। কনুইয়ের কাছে নীল একটা দাগ, ব্যথা পেয়েছে। জায়গাটা ডলছে সে। বিষণ্ন কণ্ঠে জানাল, ইউনিক পালিয়েছে! মাঠ পেরিয়ে পাহাড়ের দিকে ঘোড়ার খুরের শব্দ চলে যেতে শুনলাম।
আর শোনার অপেক্ষা করল না জনি আর আরেকজন তরুণ শ্রমিক। লাফ দিয়ে গিয়ে উঠল একটা জীপে। লুকের গাড়ির পিছু নিল। কিশোরও দেরি করল না। ছুটে এসে ঢুকল ট্যাক রুমে। টান দিয়ে একটা জিন নামিয়ে নিয়েই দৌড় দিল বেড়ার দিকে। ওকের জটলার কাছে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটা ঘোড়া, গোলমাল শুনে কান খাড়া করে রেখেছে।
চাঁদের আলোয় জেনারেলকে চিনতে বিন্দুমাত্র বেগ পেতে হল না কিশোরের। হাত নেড়ে ডাকল, এই জেনারেল, আয়, আয়। মুখ ফিরিয়ে কিশোরের দিকে তাকাল ঘোড়াটা। তারপর দুলকি চালে এগিয়ে এল। ওটার পিঠে জিন পরাল কিশোর। লাগামটা বেড়ার সঙ্গে বেধে আবার ছুটল ট্যাক রুমে। একটা টর্চ নিয়ে এল। ঘোড়ার পিঠে চড়ে কানে কানে ফিসফিস করে বলল, চলো, জলদি চলো। ওদেরকে ধরা চাই।
মাঠের ওপর দিয়ে ঘোড়া ছোটাল কিলোর। অনেকটা এগিয়ে গেছে নিশ্চয় এতক্ষণে ইউনিকর্ন। কিন্তু সে যাচ্ছে কোণাকুণি, পথ বাঁচবে, ধরে ফেলতে পারবে হয়ত ঘোড়াটাকে। দূরত্ব আর জেনারেলের গতির ওপরই নির্ভর করছে এখন সে।
জীপের হেডলাইট দেখতে পাচ্ছে। আরও আগে সামনের অন্ধকারকে চিরে দিয়েছে লুকের পিকআপের আলো।
ছুটে চলেছে জেনারেল। এদিক ওদিক ঘুরছে কিশোরের চঞ্চল দৃষ্টি। হঠাৎ চোখে পড়ল ওটাকে। একটা বিশাল ঘোড়ার অবয়ব, ছুটে চলেছে পাহাড়ের দিকে। চাঁদের আলোয় পাহাড়ের পটভূমিতে কেমন ভূতুড়ে লাগছে ইউনিকর্নের চকচকে কালো শরীর।
চল, জেনারেল, চল, তাড়া দিল কিশোর। আরও জোরে। নইলে ধরতে পারবি না।
তীর বেগে ছুটল জেনারেল।
গাছপালার ভেতরে ঢুকে পড়ল ইউনিকর্ন।
বনের কিনারে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেল লুকের পিকআপ।
জনও ব্রেক কষল।

পেছনে আরও ঘোড়ার পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। ডেকে বলল লুকের খসখসে কণ্ঠ, এই কিশোর, যেও না! আর যেও না! ওদিকে পথ ভাল না! খানাখন্দে ভরা। যেও না...

শুনল না কিশোর। জেনারেলের পিঠে প্রায় শুয়ে পড়ে হাঁটু দিয়ে চাপ দিতে লাগল আরও জোরে ছোটার জন্যে। ঢুকে পড়ল বনের ভেতরে। চাঁদের আলো এখানে ঠিকমত পৌঁছতে পারছে না। গিলে নিল যেন তাকে রাতের অন্ধকার।

টর্চ জ্বেলে ইউনিকর্নকে খুঁজতে শুরু করল সে। পলকের জন্যে দেখতে পেল। ঘোড়াটাকে, মিলিয়ে যাচ্ছে গাছের আড়ালে। পিছু নিল জেনারেল। এরপর যতবারই ঘোড়াটার ওপর আলো ফেলে কিশোর, ততবারই দেখে মিলিয়ে যাচ্ছে ওটা। কিছুতেই কাছে আর যেতে পারছে না। খুরের ঘায়ে ধুলোর মেঘ উড়িয়ে রেখে যাচ্ছে ইউনিকর্ন। নাকমুখ দিয়ে সেই ধুলো গলায় ঢুকে আটকে যাচ্ছে। কিশোরের, দম নেয়াটাই অস্বস্তিকর করে তুলেছে।

জেনারেল ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছে। একই দিনে তিন তিনবার এভাবে ছুটতে হয়েছে তাকে। ওর ঘামে ভেজা গলা চাপড়ে দিল কিশোর। সামনে অনেকটা ফাঁকা হয়ে এসেছে গাছপালা। আবার খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল ওরা। পাহাড়ের গায়ে এখন কেবল শুকনো ঘাস।

হালকা ছায়া পড়েছে এখানে চাঁদের আলোয়, আশপাশের পাহাড় আর বনের জন্যেই বোধহয় হয়েছে এরকমটা। পাহাড়ী অঞ্চলে নানা রকম অদ্ভুত কাণ্ড করে আলো আর বাতাস, অনেক দেখেছে কিশোর, খোলা জায়গায় যেটা হয় না। সামনে দেখতে পেল এখন ইউনিকর্নকে। থমকে দাঁড়াল একবার ঘোড়াটা। বাতাস। উকে কিছু বোঝার চেষ্টা করল যেন। লাফিয়ে উঠল পেছনের দুপায়ে ভর দিয়ে। আবার ছুটল তীব্র গতিতে।

আগে বাড়ার জন্যে লাফ দিল জেনারেলও। দম আটকে গেল যেন কিশোরের। তার মনে হলো, ইউনিকনের পিঠে চড়ে বসে আছে একজন মানুষ। মানুষটাকে দেখতে পায়নি। আন্দাজ করেছে চাঁদের আলোয় কোন ধাতব জিনিস ঝিক করে উঠতে দেখে। ওই একবারই। আর দেখা গেল না।

আবার মনে পড়ল পাহাড়ী অঞ্চলে আলোর বিচিত্র কারসাজির কথা। চোখের ভুল না তো? ইউনিকনের পিঠে আরোহী? অসম্ভব।

কিশোরের মুখ ছুঁয়ে দামাল বেগে ছুটছে রাতের বাতাস। কোন দিকেই খেয়াল নেই ওর, তাকিয়ে রয়েছে ইউনিকনের পিঠের দিকে। আবার যদি দেখতে পায়। লোকটাকে? শিওর হতে পারবে তাহলে, সত্যিই আছে।

কিন্তু গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে ছুটছে ইউনির্কন। হোঁচট খেল জেনারেল। হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল আরেকটু হলেই, অনেক কষ্টে সামলে নিল। শেষ মুহূর্তে জিনের

একটা শিং খামচে ধরে উড়ে গিয়ে পড়া থেকে বাঁচল কিশোর। পড়লে আর রক্ষা ছিল না। এত গতিতে এরকম উঁচুনিচু শক্ত জায়গায় পড়লে ঘাড় কিংবা। কোমর ভাঙা থেকে কোন অলৌকিক কারণে রক্ষা পেলেও, হাত-পা বাঁচাতে পারত না। ভয় পেয়ে গেল সে। আর ঝুঁকি নিল না। রাশ টেনে গতি কমাল ঘোড়ার।
পাহাড়ের ঢালের পথ ধরে ছুটছেই ইউনিকর্ন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। কিশোর। কোনমতে, শুধু একবার যদি কোন ভাবে দেখতে পেত আরোহীটাকে...
আরেকটা ব্যাপার চোখে পড়ল কিশোরের। আরোহী দেখার জন্যে মনযোগ সেদিকে দিয়ে না রাখলে এটা আরও আগেই চোখে পড়ত। ইউনিকনের কিছুটা সামনে বেশ অন্ধকার, ঘাসে ঢাকা জমি থাকলে যেমন দেখায় তেমন নয়। কেমন একটা শূন্যতা।
তাকিয়ে থাকতে থাকতে বুঝে ফেলল, ওখানে কিছু নেই! হঠাৎ করেই শেষ হয়ে গেছে পাহাড়, তারপরে বিশাল খাদ! এবং সেদিকেই ছুটে চলেছে ইউনিকর্ন!
গলার কাছে হৃৎপিণ্ডটা উঠে চলে এল যেন কিশোরের। জেনারেলের গায়ে। হাঁটু দিয়ে গুতো মারল জলদি ছোটার জন্যে। লাফ দিয়ে ছুটল ঘোড়াটা। চিত্তার করে উঠল কিশোর, থাম! থাম! বাতাসে হারিয়ে গেল তার চিৎকার। কানে ঢুকল না যেন ইউনিকনের।
খাদের কাছে পৌঁছে ব্রেক কষে দাঁড়ানর চেষ্টা করল ঘোড়াটা। পিছলে গেল পা। এত গতি এভাবে থামানো সম্ভব হলো না বোধহয়।
আতঙ্কিত চোখে তাকিয়ে দেখল কিশোর, অন্ধকারে হারিয়ে গেল ইউনিকর্ন।

.

খাদের পাড়ে এসে দাঁড়িয়ে গেল জেনারেল। নিচে তাকাল কিশোর। খাদটা তেমন গভীর নয় দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। তবে ওইটুকু লাফিয়ে পড়েও আহত হতে পারে ইউনিকর্ন। খাদের পাশ দিয়ে এঁকেবেঁকে রুপালি সাপের মত চলে গেছে নদী।
জেনারেলের পিঠ থেকে নেমে একটা গাছের সঙ্গে বাঁধল ওকে কিশোর। টর্চ জ্বেলে নামতে লাগল খাদের ঢাল বেয়ে। নদীর পারে এসে ইউনিকর্নের চিহ্ন খুঁজতে লাগল। কিন্তু কিছুই পেল না।
কান পেতে খুরের শব্দ শোনার চেষ্টা করল। শুনতে পেল না। ইউনিকর্ন কি নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল? তারপর ভাটি অথবা উজানে গিয়ে উঠে পড়েছে ডাঙায়? ওর পিঠের আরোহী ওকে টেনে নিয়ে গিয়ে ঝোপের ভেতরে লুকিয়ে রেখেছে?
দুই দিকেই টর্চের আলো ফেলে দেখল সে। শেষে হতাশ হয়ে উঠে এল। আবার ওপরে। জেনারেলকে খুলে নিয়ে ফিরে চলল র‍্যাঞ্চে ঘটে যাওয়া অদ্ভুত ঘটনাগুলোর কথা ভাবছে।

বনের কিনারে যেখানে রেখে এসেছিল লুক বোলানকে, সেখানেই রয়েছে। ঘোড়ার পিঠে বসে আছে ব্রড় জেসন। কিশোরকে দেখে এগিয়ে এল। যাক, এসেছ। তোমার পিছে যাওয়ার চেষ্টা করেছি। ধরতে পারলাম না। ইউনিক কোথায়?
হারিয়ে ফেলেছি। কি করে খাদের মধ্যে লাফিয়ে পড়ে গায়েব হয়ে গেছে। ইউনিকর্ন, খুলে বলল কিশোর।
হু, চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল লুক। আজ আর কিছু করার নেই। অন্ধকারে পাব না। কাল দিনের বেলা খুঁজতে বেরোতে হবে। কিশোরের দিকে তাকিয়ে শীতল গলায় বলল, পরের বার এসব ব্যাপারে তুমি নাক গলাতে আসবে না। আমাদের কাজ আমাদের করতে দেবে।
লিলি আমাকে সাহায্য করতে বলেছে, গম্ভীর গলায় জানিয়ে দিল কিশোর।
বিড়বিড় করে কি সব বলতে বলতে গিয়ে গাড়িতে উঠল লুক। মোটামুটি যা বুঝতে পারল কিশোর তা হলো, এসব অল্পবয়েসী ছেলেমেয়েদের নিয়ে সমস্যা। এদেরকে কিছু বোঝানো যায় না। নিজের ভালমন্দ বোঝে না।
ব্রডের পাশাপাশি র‍্যাঞ্চে ফিরে চলল কিশোর।
একসময় জিজ্ঞেস করল ব্রঙকে, আপনার সামনেই আস্তাবল থেকে পালিয়েছে ঘোড়াটা?
না।
আমি মনে করলাম...
বাধা দিয়ে ব্রড বলল, লাথি মেরে ফেলে দিল আমাকে। জখমটা দেখার জন্যে ওয়াশরুমে গিয়েছিলাম। আমি ওখানে থাকতেই পালাল ওটা।
তার মানে আপনি পালাতে দেখেননি?
কৌতূহল ফুটল ব্রডের চোখে। কিশোরের দিকে তাকিয়ে বলল, না, তা দেখিনি।
অন্য কেউ দেখেছে?
বলতে পারব না। কেন?
না, ভাবছি, কেউ ওটাকে চালিয়ে নিয়ে গেল কিনা।
ইউনিকর্নকে? হেসে ফেলল ব্রড। অসম্ভব। ওর পিঠে কোন মানুষ চড়তে পারে না।
সে কথা আমিও শুনেছি। আবার ভাবনায় ডুবে গেল কিশোর।
চত্বরে ঢুকে ব্রড় বলল, দাও, জেনারেলকে আমিই রেখে আসি।
লাগবে না, তাড়াতাড়ি বলল কিশোর। ও এখন আমার দায়িত্বে আছে। আমিই দেখাশোনা করতে পারব। বহুবার বহু র‍্যাঞ্চে বেড়াতে গেছি। ঘোড়া। আমার অপরিচিত নয়।

শ্রাগ করল ব্রড। বেশ, যা ভাল বোঝে। মেহমানদের কথা আমাদেরকে রাখতেই হয়। তবে লুক যা বলেছে, মনে রেখ... উত্তেজিত ঘোড়ার পদশব্দ শুনে চুপ হয়ে গেল সে। আস্তাবলের দিকে তাকাল। আবার কি হল?
ব্রডের পিছু পিছু এগোল কিশোর। আস্তাবলে ঢুকল। আলোয় আলোকিত হয়ে আছে পুরানো বাড়ির ভেতরটা। হারিকেনকে শান্ত করার চেষ্টা করছে কয়েকজন। শ্রমিক।
কি হয়েছে ওর? জিজ্ঞেস করল ব্রড।
বুঝতে পারছি না, বলল একজন চোয়াড়ে চেহারার ব্র্যাঞ্চ হ্যাণ্ড। মনে হচ্ছে। লুকের কথাই ঠিক। বদ রক্ত বেটাদের শরীরে।
কথাটা মানতে পারল না কিশোর। কিছু বলল না।
এই থাম, থাম, চুপ কর, মোলায়েম গলায় ঘোড়াটাকে বলল ব্রড়। ধীরে ধীরে ঢুকল স্টলের ভেতর।
সেই যে খেপেছে আর থামছে না, জানাল র‍্যাঞ্চ হ্যাণ্ড।
এরকম করছে কেন বুঝতে পারছি না! অবাকই হয়েছে ব্রড।
লাথি মেরে মেরে খড় ছিটাচ্ছে হারিকেন।
খারাপ কিছু খেয়ে ফেলেছে বোধহয়, বলল কিশোর। ক্ষতি হয় এরকম কিছু।
ঝট করে তিনজোড়া চোখ ঘুরে গেল তার দিকে। হতেই পারে না! বলল একজন, ঘোড়াকে খাওয়ানো হয় সব চেয়ে ভাল আর দামি খাবার, ঘোড়ার জন্যে যা পাওয়া যায়। নিজের হাতে খাওয়াই আমরা।
তা তো বুঝলাম। কিন্তু হারিকেনের এই মেজাজের তো একটা ব্যাখ্যা থাকবে?
আছে, আরেকজন র‍্যাঞ্চ হ্যাণ্ড বলল, বরক্ত। আর কোন কারণ নেই।
রাতারাতি ঘোড়ার স্বভাব বদলে যেতে পারে না।
তা পারে না, ঘোড়াটাকে শান্ত করার চেষ্টা চালিয়েই যাচ্ছে ব্রড। তবে। একেবারেই ঘটে না এটা ঠিক নয়।
হয়ত ওর খাবারে কেউ কিছু মিশিয়ে দিয়েছে, বলল আবার কিশোর।
এই র‍্যাঞ্চের কেউই কোন ঘোড়ার সামান্যতম ক্ষতি করবে না, জোর দিয়ে কথাটা বলল ব্রড। আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, লাথি মেরে থামিয়ে দিল হারিকেন।– ঠিকমত লাগেনি, সামান্য একটু ছুঁয়ে চলে গেল লাথিটা। সরে গেল সে। পরিষ্কার দেখতে পেল এবার কিশোর ঘোড়ার ডান খুরের ওপরে সাদা লোম।
ও যে একেবারে ইউনিকর্নের মত আচরণ করছে! বলল আরেকজন শ্রমিক।
আরে দূর, কি যে বলো, হাত নেড়ে বলল অন্য আরেকজন। ইউনিকর্ন। হ। ইউনিকর্ন যখন শান্ত থাকে তখনই এরকম শয়তানী করে।

এই, অত বকর বকর করো না, ধমক দিয়ে বলল ব্রড। কিশোরের দিকে তাকিয়ে বলল, আমাদের কাজ করতে হবে। লুক তোমাকে বলল না ঘোড়াটোড়া নিয়ে অত মাথা ঘামাবে না? আমাদের কাজ আমাদের করতে দাও।
কথা কানেই তুলল না কিশোর। রহস্যময় ঘটনাই ঘটছে, তাতে আর কোন সন্দেহ নেই তার।
এর সমাধান করতেই হবে। সোজা এগিয়ে গেল ইউনিকর্নের স্টলের দিকে। ওটা খালি। লাথি মেরে চারপাশে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে খড়। ভেঙে ফেলা হয়েছে একটা স্টলের দরজা। ভাঙা কাঠে লেগে রয়েছে কালো কয়েকটা লোম, ঘোড়ার লোম। নাল পরান খুরের দাগ পড়েছে কয়েক জায়গায়। তবে যে বাক্সটায় খাবার। দেয়া হয় সেটা ঠিকই আছে দেখা যাচ্ছে। খড়, একটা ফিড ব্যাগ, একটা পানির বালতি, আর অর্ধেক খাওয়া একটা আপেল।
সব কিছুই স্বাভাবিক। কিন্তু কিছুতেই সন্তুষ্ট হতে পারল না কিশোর। তাড়াতাড়ি রওনা হলো জেনারেল উইলি কেমন আছে দেখার জন্যে।
দিগন্তের দিকে হেলে পড়ছে চাঁদ। ঠাণ্ডা বাতাস লাগছে মুখে। অবাক হয়ে ভাবছে, কেন ওরকম খারাপ হয়ে গেল একটা ঘোড়া? কি কারণে হতে পারে? অসুখ-টসুখ করেছে? নাকি কেউ আতঙ্কিত করে দিয়েছে হারিকেনকে।
ভালই আছে জেনারেল। ঘরে চলল কিশোর।
রান্নাঘরের দরজা ঠেলে খুলে দেখল টেবিল ঘিরে বসে রয়েছে রবিন, মুসা, লিলি আর কেরোলিন। ওকে দেখে হাসল সবাই। রবিন বলল, এতক্ষণে এলে।
লিলিকে জিজ্ঞেস করল কিশোর, আপনার তো এখন শুয়ে থাকার কথা?
ঠিক বলেছ, সুর মেলালেন কেরোলিন। ডাক্তার কাপলিং জানলে রেগে। যাবেন।
ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল লিলি। সবই বুঝি, কিন্তু বিছানায় থাকতে যে ইচ্ছে করে না!ইউনিকর্নকে ছাড়া রেখে কি ঘুম আসে? উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে জানালার বাইরে অন্ধকারের দিকে তাকাল সে। টেবিলে রাখা চায়ের কাপটা তুলল, হাত কাঁপছে। কিশোরকে বলল, এইমাত্র এসেছিল লুক। বলল, তুমি নাকি ইউনিকের। পিছু নিয়ে বনে ঢুকেছিলে। খাদের মধ্যে লাফিয়ে পড়ে গায়েব হয়ে গেছে ও।
সে রকমই মনে হলো, একটা চেয়ার টেনে বসল কিশোর। কি কি করে। এসেছে বলতে লাগল। বলা শেষে ঘরে ফিরে যেতে বাধ্য করল লিলিকে। নিজেও গেল সঙ্গে। বিছানায় শুয়ে কম্বলে গা ঢেকে লিলি বলল, কি বলে যে ধন্যবাদ দেব। তোমাকে…
শেষ করতে দিল না ওকে কিশোর, কি আর দেবেন? ধন্যবাদ পাওয়ার কাজ এখনও তো করতেই পারলাম না। ইউনিককে হারানো উচিত হয়নি আমার।

ওকে খুঁজে বের করবই আমরা, ফিসফিস করে নিজেকেই যেন বলল লিলি। করতেই হবে।
নিজের ঘরে ফিরে এল কিশোর। অনেকক্ষণ ধরে গরম পানি দিয়ে গোসল করে ক্লান্তি অনেকটা দূর করে এসে ঢুকল রবিন আর মুসার ঘরে।
ওরা তখনও ঘুমায়নি।
কি ব্যাপার? ঘুম আসছে না? জিজ্ঞেস করল রবিন।
তোমরাও তো জেগে আছ।
তা আছি, হাই তুলল মুসা। আর বেশিক্ষণ থাকব না। তা কি ভেবে আবার এলে?
এলাম। মনে উত্তেজনা থাকলে ঘুম আসতে চায় না তো, তাই...
তা বটে। ও, হ্যাঁ, ভুলেই গিয়েছিলাম, রবিন বলল, তুমি যাওয়ার পর ফিলিপ নিরেক ফোন করেছিল। লিলিকে চেয়েছিল। ওকে কি বলল সে জানি না, তবে মুখ কালো হয়ে যেতে দেখলাম লিলির। কি হয়েছে, জিজ্ঞেস করেছি, বলল না। বলল, ও কিছু না। শুধু বলল, আগামী দিন পাইককে নিয়ে নিরেক এখানে আসবে কথা বলতে।
আরও খবর আছে, চোখ নাচিয়ে বলল মুসা।
তার মানে তোমরাও বসে থাকোনি, খুশি হয়ে বলল কিশোর। কি খবর?
কেরোলিনের আন্টির সঙ্গে অনেক কথা বলেছি আমি, রান্নাঘরে, মুসা বলল। ব্রড জেসন নাকি মহিলার বোনের ছেলে।
তাতে কি? রবিনের প্রশ্ন।
গাল চুলকাল মুসা। হয়তো কিছুই না। কিন্তু ডবসি কুপারের ওখানে কাজ করে এসে যদি আবার এখানে ঢোকে, খটকা লাগে না মনে? শুরু থেকেই তো ওর খালা ছিল এখানে, তখন ঢুকল না কেন?
হ্যাঁ, সত্যি খটকা লাগে, মুসার সঙ্গে একমত হয়ে বলল কিশোর।
কেরোলিনের আন্টি আরও বলেছেন, নিজের আঙুলের নখ দেখতে দেখতে বলল মুসা, কিছু দিন ধরেই নাকি অদ্ভুত আচরণ করছে ঘোড়াগুলো।
শুধু ঘোড়াই না, কিছু কিছু শ্রমিকও করছে, হাই তুলল কিশোর। এমন ভাব করছে, বোঝানর চেষ্টা করছে, যেন এক রাতেই নষ্ট হয়ে গেছে হারিকেন। ওদের এই কথা মানতে রাজি নই আমি। এবং ওরা যে ভুল করছে এটা প্রমাণ করে ছাড়ব।

.

পরদিন সকালে নাস্তা সেরে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল তিন গোয়েন্দা। কোরালের বেড়ায় হেলান দিয়ে দেখতে লাগল ব্রডের কাজ। একটা ঘোড়ার বাচ্চাকে

আরোহী নিতে শেখাচ্ছে। পিঠ বাঁকিয়ে, নেচেকুদে, ঝাড়া দিয়ে অনেক চেষ্টা করছে ঘোড়াটা ওকে পিঠ থেকে ফেলার, পারছে না।
কয়েক বছর আগে ব্রড ব্রংকো রাইডার ছিল, মুসা বলল। কিছু কিছু লোকাল রোডিওতে ফার্স্ট প্রাইজও পেয়েছে। কেরোলিন আন্টি বলেছেন আমাকে।
ছেড়ে এল কেন? জানতে চাইল কিশোর।
বলেনি, আমিও জিজ্ঞেস করিনি। জানার চেষ্টা করব নাকি?
কর। আস্তাবলের দিকে তাকাল কিশোর। ওখানে ঢুকে তদন্ত করে দেখতে খুব ইচ্ছে করছে। কিন্তু এখন গিয়ে সুবিধে করতে পারবে না। অনেক লোক কাজ করছে ভেতরে বাইরে। ইউনিকনের স্টলে তদন্ত করতে হলে একা একা গিয়ে করতে হবে। কাউকে দেখান চলবে না। লুক আর জন গিয়ে ইউনিককে পেল কিনা কে জানে।
এই সময় দেখল লম্বা পাওয়ালা একটা মাদী ঘোড়ার পিঠে চেপে আসছে বেনি কুপার।
ব্রডের দিকে হাত নেড়ে ঘোড়া থেকে নামল বেনি। লাগামটা বাঁধল বেড়ায়। কিশোরের দিকে তাকিয়ে হেসে জিজ্ঞেস করল, লিলি কোথায়?
ঘরে।
গিয়ে ওকে বলা দরকার, ইউনিকর্নকে দেখেছে আব্বা।
কোথায়? একসাথে জিজ্ঞেস করল তিন গোয়েন্দা।
আজ সকালে, আমাদের র‍্যাঞ্চের পশ্চিম ধারে। পাহাড়ে চলেছিল আব্বা তখন।
ও পালিয়েছে জানলেন কি করে? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
ব্রডের দিকে তাকাল বেনি। কিশোরের দিকে ফিরে বলল, লুক বোলান ফোন করেছিল। ইউনিকর্নই কিনা শিওর না আব্বা, তবে ওরকমই, কালো, বিরাট একটা ঘোড়া।
চলো, রবিন আর মুসার দিকে তাকিয়ে বলল কিশোর।
গিয়ে কি করবে? ব্রড বলল, কয়েকজনকে নিয়ে লুক চলে গেছে অনেক আগেই। আরও কয়েকজন গিয়ে খুঁজলে ক্ষতি হবে না।
কপালের ঘাম মুছল ব্রড। চলো, আমিও যাব।
তুমি থাক না? বেনি অনুরোধ করল।
দ্বিধায় পড়ে গেল ব্রড। ইতস্তত করে বলল, না, যাওয়াই উচিত। হাজার হলেও এই র‍্যাঞ্চে চাকরি করি আমি, যাওয়াটা আমার দায়িত্ব।
মিনিট বিশেক পরে পশ্চিমে কুপারদের র‍্যাঞ্চের দিকে রওনা হয়ে গেল কিশোর, মুসা আর ব্রড। কুপার র‍্যাঞ্চের পশ্চিমের পাহাড়ে কয়েক ঘন্টা ধরে খুঁজেও পেল না ঘোড়াটাকে। হাল ছেড়ে দিয়ে ব্রড বলল, বুঝতে পারছি না। গেল কোথায়?

সীমাহীন পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। যে দিকেই তাকায়। সেদিকেই ঘন বন। এরকম জায়গায় সহজেই লুকিয়ে থাকতে পারে একটা ঘোড়া। মিস্টার কুপারের সঙ্গে কথা বলা দরকার।
ওসব করতে যেও না, তাড়াতাড়ি বলল ব্রড। যা করার লিলিই করবে।
কেন, আমি করলে দোষ কি?
অস্বস্তিতে পড়ে গেছে যেন ব্রড। চোয়াল ডলল। তারপর বলল, কয়েক বছর ধরেই দুটো র‍্যাঞ্চের সম্পর্ক খারাপ। ডাবল সির কোন মেহমান গিয়ে কথা বলবে, এটা নিশ্চয় ভাল চোখে দেখবেন না মিস্টার কুপার। পারলে লিলি কিংবা লুক গিয়ে বলুকগে, তোমার দরকার নেই।
র‍্যাঞ্চে ফিরে এল ওরা। লুক ফিরছে। ইউনিকর্নকে আনতে পারেনি। কুপারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে আগেই, বেনি যা বলেছে মিস্টার কুপারও একই কথা বলেছে।
লুককে বলল ব্রড, কিশোর মিস্টার কুপারের সঙ্গে কথা বলতে চায়।
শক্ত হয়ে গেল লুকের ঠোঁট। দেখো, কিশোর, তুমি সাহায্য করতে চাইছ বুঝতে পারছি, কিন্তু এটা তোমার কাজ নয়। আমার। কাজেই যা কিছু করার দায়িত্ব আমারই। লিলির আব্বা মরার সময় আমাকে এ-দায়িত্ব দিয়ে গেছেন। আরেকটা কথা, আমি চাই না, এখানে যে গোলমাল হচ্ছে এটা কুপার জেনে ফেলুক।
কেন?
তাহলে পেয়ে বসবে। আমাদের এখানে গোলমাল আছে শুনলে ঘাবড়ে যাবে মেহমানরা, থাকতে চাইবে না। কুপারের র‍্যাঞ্চে গিয়ে উঠবে। এটা হতে দিতে পারি না আমরা।
কিশোরকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ঘুরে বাঙ্কহাউসের দিকে রওনা হয়ে গেল লুক।

.

সেদিন বিকেলে ডাক্তারের আদেশ অমান্য করে নিচে নেমে এল লিলি। ঠিকমত পা ফেলতে পারে না, শক্ত হয়ে গেছে যেন জোড়াগুলো। ক্লান্তি আর উল্কণ্ঠায় চেহারা ফেকাসে। তবে আগের রাতের তুলনায় ভালই মনে হচ্ছে তাকে।
চলো, বারান্দায় বসে লেমোনেড খাই, তিন গোয়েন্দাকে প্রস্তাব দিল সে। বিছানায় আর যেতে পারব না।
বারান্দায় চেয়ার পেতে বসল চারজনে। গ্লাসে কয়েকবার চুমুক দিয়ে মুখ ফেরাল লিলি। বলল, শেরিফকে ফোন করে ইউনিকের কথা বলতে হবে। কারও চোখে পড়লেই তাহলে খোঁজ পেয়ে যাব আমরা।

যদি সেই লোকটা গিয়ে শেরিফকে বলে, কিশোর বলল। ডবসি কুপারের সঙ্গে কথা বলেছেন?
বলেছি। তবে আমার মনে হয় না ইউনিককে দেখেছ। কিশোরের চোখ দেখেই যেন তার মনের কথা পড়ে ফেলল লিলি, মাথা নেড়ে বলল, না না, যা ভাবছ তা নয়। মিথ্যে বলেনি। তবে যেটাকে দেখেছে সেটা ইউনিক নয়, হয়তো কোন বুনো মাসট্যাংকে দেখেছে।
নাহ, কোন আলো দেখতে পাচ্ছি না, বিড়বিড় করে বলল রবিন। ইঞ্জিনের শব্দ শুনে তাকাল রাস্তার দিকে। ওইযে আসছে, আরও গোলমাল!
লম্বা সাদা একটা গাড়িকে আসতে দেখা গেল। ছুটে এসে বারান্দার কয়েক ফুট দূরে ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষল। গাড়িটা দেখেই লিলির চেহারা আরও ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।
দরজা খুলে নামল ফিলিপ নিরেক আর হারনি পাইক। সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল একজনের পেছনে আরেকজন।
লিলির সঙ্গে কথা বলার আগে কিশোরদের দিকে তাকিয়ে নিল একবার নিরেক, সুস্থ হয়ে গেছ নাকি।
অনেকটা, লিলি বলল।
নিরেকের পেছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে পাইক। স্টেটসন হ্যাটের কানাটা যেন ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর আর তার বন্ধুদের দিকে, চোখে ঠাণ্ডা দৃষ্টি। কত হলে জায়গাটা কিনতে পারব, শোনা যাক, জ্যাকেটের পকেট থেকে চেক বই বের করল সে। একলা কোথাও কথা বলা যাবে?
লিলিকে উদ্দেশ্য করেই কথাটা বলেছে সে, বুঝতে পারল লিলি। বলল, দরকার হবে না। আমার কোন আগ্রহ নেই।
কঠিন হয়ে গেল পাইকের চোয়াল। কিন্তু দামটা এখনও শোনইনি।
শুনতে চাইও না, চাঁছাছোলা জবাব দিল লিলি। এটা আমার বাপ-দাদার জায়গা, কোন কিছুর বিনিময়েই কারও কাছে বেচব না, যত দামই দিক না কেন।
কাজটা কিন্তু ঠিক করছ না, হুমকি দেয়ার ভঙ্গিতে বলল নিরেক।
উঠে দাঁড়াল লিলি। আপনাকে আমি বলেছি, ব্যাংকের ধার আমি শোধ করে দেব। সময় শেষ হয়নি, এখনই চাপাচাপি করছেন কেন? যান, জুলাইর পাঁচ তারিখে দিয়ে দেব।
কি করে দেবে? ঘোড়ায় চড়ার অবস্থা আছে নাকি তোমার?
আজ নেই, তবে যেদিন দরকার সেদিন ঠিকই থাকবে, সেটা নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না, রেগে গেল লিলি। চোখ থাকলেই দেখতে পাবেন। অনেক ধন্যবাদ

আপনাদেরকে। কঠোর কণ্ঠে নিতান্ত অভদ্র ভাবেই বলল, যান, বেরিয়ে যান আমার বাড়ি থেকে! এক্ষুণি!
গটমট করে ঘরে ঢুকে গেল লিলি। পেছনে দড়াম করে লাগিয়ে দিল দরজাটা।
এটাই তোমার শেষ সুযোগ! চিৎকার করে বলল পাইক।
বোকা মেয়ে! শুয়োরের মত ঘোঁৎ ঘোঁৎ করল নিরেক। তিন গোয়েন্দার দিকে তাকিয়ে বলল, ওকে বোঝাও গে। তোমাদের তো বন্ধুই মনে হয়। বলো, পাইকের প্রস্তাব মেনে নিতে। এরকম একটা জায়গা থেকে এর বেশি আর কি আশা করে ও? শুনলাম, ঘোড়াটাও নাকি হারিয়েছে?
খারাপ কথা বাতাসের আগে চলে, আনমনেই বলল রবিন।
রাগে ঠোঁটে ঠোঁট চাপল নিরেক। দামি যেটা ছিল সেটাও গেল। শুকনো কয়েকটা গর্ত আর ধসে পড়া বাড়ি ছাড়া শেষে আর কিছুই থাকবে না। ব্যাংক আর একটা কানাকড়িও দেবে না। সময় ফুরিয়েছে ওর।
ইউনিকর্নের কথা ভাবল কিশোর। সাংঘাতিক দামি একটা জানোয়ার।
সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে থামল নিরেক, ঘুরে তাকাল কিশোরের দিকে। শীতল এক চিলতে হাসি ঠোঁটে ফুটেই মিলিয়ে গেল। আরেকটা কথা, ঘোড়াটা পালিয়েছে একথা আমি বিশ্বাস করি না। লিলি নিজেই চালাকি করে এ কাজটা করেছে, যাতে ওটা পালাতে পারে।
কেন একাজ করবে? প্রশ্ন করল মুসা।
পাইকের দিকে তাকাল একবার নিরেক। বীমার টাকার জন্যে। অনেক টাকা বীমা করান হয়েছে ঘোড়াটার। কিন্তু লাভ হবে না। আমি নিজে চেষ্টা করব, যাতে সমস্ত শয়তানী ফাঁস হয়ে যায়, টাকা আদায় করতে না পারে কোম্পানির কাছ থেকে। জালিয়াতিটা ব্রা পড়লে জায়গা-সম্পত্তি তো যাবেই, জেলেও যেতে হবে। ওকে।
স্থির দৃষ্টিতে লোকদুটোর নেমে যাওয়া দেখল কিশোর।
ওগুলো মানুষ না কি! ঘৃণায় মুখ বাঁকাল রবিন।
জায়গাটা ওর এত দরকার কেন? নিজেকে প্রশ্ন করল যেন কিশোর। র‍্যাঞ্চের কি অভাব পড়ল নাকি এই এলাকায়? জায়গা তো আরও আছে।
হয়ত এরকম আর নেই, মুসা বলল।
হু! দুজনের দিকে তাকাল কিশোর। ইউনিকর্ন যেখানে লাফিয়ে পড়েছিল সে জায়গাটা দেখতে যাচ্ছি আমি। আসতে চাও?
নিশ্চয়, বলতে এক মুহূর্ত দেরি করল না রবিন।
মুসা মাথা নাড়ল। যাওয়ার তো খুবই ইচ্ছে। কিন্তু কেরোলিন আন্টিকে যে কথা দিয়ে ফেলেছি, বিকেলে রান্নাঘরে তাকে সাহায্য করব। পরে গেলে হয় না?
দেরি করা উচিত না, কিশোর বলল।

তাহলে আর কি করা, নিরাশ ভঙ্গিতে হাত ওল্টাল মুসা। তোমরাই যাও।
রওনা হলো কিশোর আর রবিন। গোলাঘরের দিকে হাঁটতে হাঁটতে রবিন বলল, লুক যদি দেখে ফেলে কি বলব?
জানি না। তবে ওর কাছে কৈফিয়ত দিতে বাধ্য নই আমরা।
.
ঘোড়ায় করে সেই শৈলশিরায় চলে এল ওরা, যেখান থেকে হারিয়েছে ইউনিকর্ন। মাটিতে নিজের বুটের আর ঘোড়াটার খুরের ছাপ দেখা গেল। গর্তের কিনারে যেখান থেকে লাফ দিয়েছে সেখানেও রয়েছে, কিন্তু তার পরে আর নেই। একেবারে যেন বাতাসে মিলিয়ে গেছে।
মুসা হলে এখন জিনভূতের কাজ বলেই চালিয়ে দিত, কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বলল রবিন।
নদীটা না থাকলে সত্যিই অবাক হতাম। নদীর কিনার দিয়ে হাঁটতে শুরু করল কিশোর। পানি খুব কম। এটাতে লাফিয়ে পড়ে পানিতে পানিতে হেঁটে চলে যাওয়াটা ওর মত ঘোড়ার পক্ষে একেবারে অসম্ভব নয়।
এই চালাকি একটা ঘোড়া করল? প্রশ্ন তুলল রবিন। তীরে উঠে আবার মুছে দিয়ে গেল সব চিহ্ন?
হোঁচট খেয়ে যেন দাঁড়িয়ে গেল কিশোর। তাই তো! ভাল কথা বলেছ! এই কাজ মানুষ ছাড়া আর কারও পক্ষেই সম্ভব না!
এরপর ভালমত খুঁজতে শুরু করল ওরা। ঘোড়ার চিহ্ন যতটা না খুঁজল তার চেয়ে বেশি খুঁজল মানুষের চিহ্ন। নদীর পাড়ে উজান ভাটিতে বহুদূর পর্যন্ত দেখল। আশপাশের ঝোপ দেখল। কিছুই পাওয়া গেল না। কিছু না। কাপড়ের একটা ছেঁড়া টুকরোও না। কাটা ঝোপে লেগে নেই ঘোড়ার লোম। নদীর পাড়ের নরম মাটিতেও নেই কোন চিহ্ন।
ইউনিকর্নকে বোধহয় এতক্ষণে পেয়ে গেছে লুক, যেন কথার কথা বলল রবিন, গলায় জোর নেই।
কিছুই পেল না ওরা। হতাশ হয়ে ফিরে এল র‍্যাঞ্চে। রান্নাঘরে মুসা তো আছেই, লিলিও আছে। গলা শুকিয়ে গেছে। দুই গ্লাস সোডা নিয়ে বসল কিশোর আর রবিন। লিলিও সঙ্গ দিল ওদেরকে। একথা সেকথা থেকে চলে এল রোডিও খেলার কথায়। রোডিও রাইডিঙের আশ্চর্য রোমাঞ্চকর সব গল্প লিলির মুখে শুনতে লাগল তিন গোয়েন্দা।
খাইছে! দারুণ খেলা তো! মুসা বলল, আমারও খেলতে ইচ্ছে করছে!
শুনতে যতটা মজা লাগছে, রবিন বলল, নিশ্চয়ই ততটা নয়। খুব কঠিন খেলা।

আসলে এগুলো একেক জনের কাছে একেক রকম। নেশার মত। নইলে এর চেয়ে বিপজ্জনক খেলা খেলে না লোকে? মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও খেলে।
জানালার বাইরে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। আস্তাবলের কাছে দেখা যাচ্ছে লুক। আর জনকে। ইউনিকর্ন নেই ওদের সঙ্গে। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে লিলিও তাকাল। তার ঘোড়ার লাগামটা জনের হাতে দিয়ে হাঁটতে শুরু করল লুক।
রান্নাঘরের দরজা ঠেলে ফোরম্যান ঢুকতেই লিলি বলল, তাহলে পাওয়া যায়নি ওকে? রেসের ঘোড়া
নাহ! বুঝতেই পারছি না কোথায় গেল! রুমাল বের করে ভুরুতে লেগে থাকা ঘাম আর ধুলো মুছল লুক। রোদে শুকিয়ে গেছে চামড়া। কিশোরের দিকে তাকিয়ে বলল, আর তো খুঁজতে যাওয়ার চেষ্টা করবে না, নাকি? বুঝতেই পারছ এসব তোমাদের কাজ নয়। নদীর পাড়ে তোমার বুটের ছাপই মনে হয় দেখেছি, কাল রাতের...
ও আমাদের সাহায্য করতে চাইছে লুক, লিলি বলল। আমি সাহায্য। চেয়েছি। শেরিফের অফিসে গিয়েছিলে?
না। ফোনও করিনি।
ভুরু কুঁচকে ফেলল লিলি। কেন?
করে কোন লাভ হত না। বরং খারাপ হত। গুজব ছড়াত বেশি, অনেক বেশি লোকে জানত, বদনাম বেশি হত র‍্যাঞ্চের।
কিন্তু কারও চোখে পড়লে...।
আশপাশের সব র‍্যাঞ্চারদের খবর দিয়ে দিয়েছি। কাজ হলে ওদেরকে দিয়েই হবে। লিলির দিকে তাকিয়ে কোমল হলো লুকের দৃষ্টি। ভেব না। সব ঠিক হয়ে যাবে। ওকে পাবই আমরা।
পেলেই ভাল। কোলের ওপর রাখা হাতের দিকে তাকিয়ে বলল লিলি।

.
ডিনার শেষে সেদিন ক্যানু রেসের জন্যে তৈরি হতে লাগল মেহমানেরা। এই সুযোগে আস্তাবলে গিয়ে একবার তদন্ত চালিয়ে আসা যায়, ভেবে খুশি হয়ে উঠল। কিশোর। সুর্য তখনও ডোবেনি। ইতিমধ্যেই কাজের গতি কমে এসেছে। শ্রমিকদের। কয়েকজন ছুটি নিয়ে শহরেও চলে গেছে। শান্ত হয়ে গেছে র‍্যাঞ্চ। মুসার কানে কানে বলল কিশোর, আমাকে কভার দাও।
কি করবে?
পাহারা দাও তুমি। কয়েক মিনিট লাগবে আমার। ইউনিকর্নের স্টলটায় ভাল করে দেখতে চাই একবার।

ছায়ার মত এসে নিঃশব্দে আস্তাবলটাতে ঢুকল কিশোর। ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল কয়েকটা ঘোড়া। ভেতরে আলো কম, কিন্তু বাতি জ্বালল না সে। বরং পকেট থেকে টর্চ বের করে জ্বালল।
আগের বার যেমন দেখেছিল তেমনি রয়েছে ইউনিকর্নের স্টল। কোন সূত্র নেই। সাবধানে সিমেন্টের মেঝেতে আলো ফেলে দেখতে লাগল সে। আলো ফেলল দেয়ালে, ঘরের আড়ায়। অস্বাভাবিক কিছুই চোখে পড়ল না। বেরিয়ে এসে পাশের অন্য স্টলগুলোতে অনুসন্ধান চালাল। নাকি স্বরে ডাকল কয়েকটা ঘোড়া, নাল লাগান খুর ঠকল কঠিন মেঝেতে।
ঘড়ি দেখল কিশোর। পনের মিনিট পার করে দিয়েছে। বেরিয়ে যাওয়া দরকার, নইলে সে কোথায় গেল ভেবে সন্দেহ করে বসতে পারে কেউ।
ফেরার জন্যে ঘুরল কিশোর। হারিকেনের স্টলটার সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেল। অস্থির হয়ে আছে ঘোড়াটা। মাটিতে পা ঠুকছে রাগত ভঙ্গিতে।
ঘাড়ের কাছটায় শিরশির করে উঠল কিশোরের। রোম খাড়া হয়ে যাচ্ছে। এরকম করছে কেন ঘোড়াটা? ওকে দেখে? নাকি অন্য কেউ আছে ভেতরে? টর্চ নিভিয়ে দিয়ে দম বন্ধ করে অপেক্ষা করতে লাগল সে। কান খাড়া করে রেখেছে।
বাঙ্কহাউসে হাসছে কেউ। খুর দিয়ে খড় সরাচ্ছে হারিকেন, মাঝে মাঝে নাকি ডাক ছাড়ছে মৃদু স্বরে। এছাড়া আর কিছু নেই। কাউকে দেখা গেল না আস্তাবলে।
কয়েক সেকেণ্ড পরে টর্চ জ্বালল কিশোর। আলো ফেলে তাকাল হারিকেনের স্টলের ভেতর। মাথার সঙ্গে কান লেপ্টে ফেলেছে ঘোড়াটা, বড় বড় করে ফেলেছে। নাকের ফুটো, পেছনে সরে গেছে যতটা সম্ভব। ওর মুখে আলো ফেলল কিশোর, তারপর পায়ে, আরও সরে যাওয়ার চেষ্টা করল হারিকেন।
পেছনে একটা শব্দ হলো। ধক করে উঠল কিশোরের বুক। ফিরে তাকাতে গেল। প্রচণ্ড আঘাত লাগল মাথায়। একই সময়ে খুলে যেতে লাগল স্টলের দরজা। চোখের সামনে হাজারটা তারা জ্বলে উঠল যেন তার।
ফিরে তাকাল সে। মুখে এসে লাগল রুপার বালসওয়ালা একটা বেল্টের বাড়ি। লাফিয়ে পাশে সরে যাওয়ার চেষ্টা করেও আঘাতটা এড়াতে পারল না।
বেহুশ হয়ে স্টলের ভোলা দরজা দিয়ে ভেতরে পড়ে যাওয়ার আগের মুহূর্তে দেখতে পেল, পেছনের দুই পায়ে ভর দিয়ে খাড়া হয়ে উঠছে ঘোড়াটা। প্রবল। বেগে সামনের দুই পা নামিয়ে আনবে হয়ত তার ওপর, খুর দিয়ে গেঁথে ফেলবে পেট, বুক। কিন্তু কিছুই করার নেই তার।

.

কিশোর! কিশোর! বহুদূর থেকে যেন ভেসে এল মুসার কণ্ঠ।

চোখ মেলার চেষ্টা করল কিশোর। তীক্ষ্ণ ব্যথা ছড়িয়ে পড়ল মাথার একপাশে। দুর্বল কণ্ঠে বলার চেষ্টা করল, মুসা, আমি এখানে! স্বর বেরোল না। চোখ মেলল। আস্তাবলের একধারে উজ্জ্বল আলোর নিচে পড়ে আছে সে, মুখের ওপর ঝুঁকে আছে মুসা আর রবিন।

যাক, খুলেছে, মুসা বলল। কি হয়েছিল, কিশোর?

মাথার পেছনটা ডলতে ডলতে কিশোর বলল, কে জানি বাড়ি মেরেছে।

কে? জানতে চাইল রবিন।

চোখ কুঁচকাল কিশোর। মাথা ঝাঁকাল। জানি না। কেবল একটা রুপার বাস দেখেছি। হারিকেনের স্টলের সামনে ছিলাম। দরজা খুলে গেল। ভেতরে পড়ে গেলাম।

মুসা বলল, দরজাটা এখন লাগানো। ঘোড়াটাও ভেতরেই রয়েছে।

যে মেরেছে তাহলে সেই টেনে সরিয়ে এনেছে।

তার মানে খুন করার ইচ্ছে ছিল না, বিড়বিড় করল রবিন। ঠিক আছে, থাক, আমি ডাক্তার কাপলিংকে ডেকে আনি।

না, লাগবে না। আমি ভাল হয়ে যাচ্ছি। মিথ্যে বলেনি কিশোর। চোখে। আলো সয়ে আসতেই মাথার দপদপানিটা কমতে লাগল। কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠে বসল। আরও পরিষ্কার হয়ে এল মাথার ভেতরটা।

সত্যি লাগবে না? ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে রবিন।

না। মাথার ব্যথাটা থাকবে কিছুক্ষণ, বুঝতে পারছি। এক-আধটা ট্যাবলেট খেয়ে নিলেই সেরে যাবে।

ডাক্তারে দেখলে অসুবিধে তো কিছু নেই? জোর করতে লাগল রবিন। কিছুতেই কিশোরকে রাজি করাতে না পেরে উঠে গিয়ে আলো নিভিয়ে দিল। তিনজনে বেরিয়ে এল আস্তাবল থেকে। বিকেলের বাতাস একগোছা কোঁকড়া চুল উড়িয়ে এনে ফেলল কিশোরের মুখে। সরানর চেষ্টা করল না সে। বাতাসটা ভাল লাগছে। বলল, কেন মারা হলো আমাকে বুঝতে পারছ তো? কেউ একজন চাইছে না, আমরা তদন্ত করি। হয়ত সূত্রটুত্র রয়ে গেছিল, সরিয়ে ফেলতে এসেছে।

কে? মুসার প্রশ্ন।

সেটা তো আমারও জিজ্ঞাসা। ব্রড জেসন নয়। ক্যানু রেসের জোগাড় করতে লেকে চলে গেছে সে।

কিন্তু গেছে যে দশ মিনিটও হয়নি, রবিন জানাল। আমাদেরকে অপেক্ষা করতে বলে গেছে।

কেন? ভুরু কুঁচকে তাকাল কিশোর।

বাঙ্কহাউসে গিয়েছিল কিছু সেফটি ইকুযইমেন্ট আনার জন্যে। কেউ পানিতে পড়লে নিরাপত্তার ব্যবস্থা। বাড়তি লাইফ প্রিজারভার আর প্লেয়ারও নিয়েছে। সাথে গিয়েছিল বেনি আর ওর বাবা। ওরা অবশ্য এখন চলে গেছে।
চমৎকার, দাঁড়িয়ে গেছে কিশোর। লুকের খবর কি?
মাথা নাড়ল মুসা। কেরোলিনের আন্টির সঙ্গে বসে তাড়াহুড়ো করে এক কাপ কফি খেয়ে বেরিয়ে গেল, জরুরী কাজ নাকি আছে। এক প্লেট পাই সাধাসাধি। করলাম, নিল না। তাকালই না বলতে গেলে।
আরও চমৎকার। ওরকম করে দেখতে গেলে সবাইকেই সন্দেহ করতে হবে। কাউকে বাদ দেয়া চলবে না। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। তারমানে অনেক বেশি জটিল করে তুলছে রহস্যটা সবাই মিলে।
কিশোর, হেসে বলল রবিন, গোয়েন্দাগিরি যে কঠিন কাজ তোমার চেয়ে বেশি তো কেউ আর জানে না। আর যত জটিল হয় রহস্য ততই মজা, তুমিই বল?

.

পরদিন সকাল সকাল বিছানা ছাড়ল কিশোর। গোসল সেরে নিয়ে এসে নীল জিনস পরল, গায়ে চড়াল টি-শার্ট, পায়ে রানিং শু। নাস্তা করতে চলেছে, এই সময় দেখা হয়ে গেল লিলির সঙ্গে।
আমাকে ছাড়পত্র দিয়ে দিয়েছেন ডাক্তার, লিলি জানাল। আর বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে না।
ভাল খবর।
আবার প্র্যাকটিস শুরু করতে পারব, উজ্জ্বল হাসিতে বেরিয়ে পড়ল ওর ঝকঝকে সাদা দাঁত।
একসাথে নিচে নামল দুজনে। সামনের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে গেল লিলি, বলল, যাবে নাকি? শ্রমিকদের কাজ দেখবে।
যাব।
গোলাঘরের কাছে এল ওরা। গরুঘোড়াগুলোকে ঠিকমত খাওয়ানো হয়েছে কিনা জিজ্ঞেস করে জেনে নিল লিলি। আরেক দিকে চলল। চোখেমুখে রোদ লাগছে, আপনাআপনি কুঁচকে গেল কিশোরের চোখ। ইতিমধ্যেই গরম হয়ে। উঠেছে সকালটা। ঘোড়ার ওষুধপত্র কোথায় রাখেন? জিজ্ঞেস করল সে।
বেশির ভাগই ট্যাক রুমে, লিলি বলল। এককোণে একটা আলমারি আছে।
কি কি রাখেন?
সব ধরনের ওষুধ, জন্তু জানোয়ারের জন্যে যা যা লাগে–ভিটামিন, অয়েন্টমেন্ট, লিনিমেন্ট, ব্যাণ্ডেজ, আরও অনেক জিনিস। জখম হলে যা দরকার, সবই আছে।
সবুজ চোখের তারা স্থির হল কিশোরের মুখে। কেন বলো তো?

ভাবছি, হারিকেনের এই যে মেজাজ বদলে গেল, ওষুধের জন্যে নয় তো? ড্রাগ?
হেসে উঠল লিলি। আমার তা মনে হয় না। একাজ করতে যাবে কেন?
যাবে আপনি যাতে রোডিও খেলায় যোগ না দিতে পারেন।
আমার তা মনে হয় না। এতবড় পাষণ্ড হবে না কেউ, আমাকে ঠেকানোর জন্যে ঘোড়ার সর্বনাশ করবে।
মানুষের পক্ষে সবই সম্ভব। আর সেই লোকই হয়তো চুরি করে নিয়ে গেছে ইউনিকর্নকে।
চুরি? কে বলল? সে তো পালিয়েছে। ব্রড নিজের চোখে দেখেছে।
না দেখেনি, শব্দ শুনেছে। আমি যখন পিছু নিলাম, বনের মধ্যে ওর পিঠে মানুষ দেখলাম বলে মনে হলো।
অন্ধকার ছিল। তোমার ভুলও হতে পারে।
সেজন্যেই তো জোর দিয়ে বলতে পারছি না কিছু।
মাথা ঝাঁকি দিল লিলি। ছড়িয়ে পড়ল লাল চুল। রোদে ঝিকমিক করে উঠল। এই কথাটা আমি বিশ্বাস করতে পারলাম না, কিশোর। ইউনিকের পিঠে কোন। মানুষ চড়তে পারে না। চল, নাস্তাটা সেরে নিই। তারপর পাহাড়ে যাব। কোন জায়গায় হারিয়েছে ঘোড়াটা, দেখব।

.

শৈলশিরার নিচে দিয়ে বয়ে যাওয়া, নদীটাকে এই দিনের বেলাতেও রুপালিই লাগছে। খাদের কিনারে দাঁড়িয়ে সেটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে লিলি আর তিন গোয়েন্দা।
তুমি বলছ, গোল গোল হয়ে গেছে রবিনের চোখ, ঘোড়াটা এখান থেকে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে পালিয়েছে? জখম হয়নি?
তা হতে পারে, জবাবটা দিল লিলি। স্টেটসন হ্যাট মাথায় দিয়েছে। কানার নিচে কাছাকাছি হল ভুরুজোড়া। তবে ওর আন্দাজ খুব ভাল। হুঁশিয়ার হয়ে পা ফেলে। আজ পর্যন্ত ওকে উল্টোপাল্টা পা ফেলতে দেখিনি। কিন্তু গেল কোথায়? মাথা ঠাণ্ডা হওয়ার পর তো ফিরে আসার কথা। যত বদমেজাজীই হোক, বাড়ি ছেড়ে থাকার কথা নয়।
ফিরত, যদি চুরি না হত, কিশোর বলল।
কিন্তু কেন চুরি করবে?
আপনি না বললেন, ও আপনার র‍্যাঞ্চের সব চেয়ে দামি সম্পদ?
লিলির চোখের পাতা সরু হয়ে এল। তাতে কি? নাহয় নিয়ে যাওয়ার কুমতলব হলই কারও, কিন্তু নিয়ে গিয়ে তো সামলাতে পারবে না। ডাবল সির হাতে গোনা

কয়েকজন মানাতে পারে ওকে। তাছাড়া ইউনিকের মত একটা জানোয়ারকে চুরি করে নিয়ে বেশিদিন লুকিয়ে রাখাও অসম্ভব।
নতুন কিছু দেখার নেই। লাঞ্চের জন্যে ফিরল ওরা।
দুপুরের খাওয়ার পর ঠিক করল কিশোর, কুপারের সাথে দেখা করতে যাবে। লুকের নিষেধ মানবে না। তাকে জিজ্ঞেস করবে, সত্যিই ঘোড়াটাকে দেখছে। কিনা। দুই সহকারীকে জিজ্ঞেস করল, যেতে চাও?
মুসা বলল, পরে গেলে হয় না? আমি আর রবিন ভাবছিলাম লেকে গিয়ে সাঁতার কাটব।
প্রস্তাবটা কিশোরের কাছেও লোভনীয় মনে হলো। এই গরমে লেকের ঠাণ্ডা পানিতে বেশ আরাম লাগবে। কিন্তু কাজটা আগে করা দরকার। একাই কুপারের র‍্যাঞ্চে চলল।
চত্বর দিয়ে যাওয়ার সময় দেখল গটমট করে দুজন মেহমান এগিয়ে যাচ্ছে একটা কোরালের দিকে, যেখানে একটা ঘোড়া নিয়ে প্র্যাকটিস করছে লিলি। লাল হয়ে গেছে ওদের মুখ। হাত নাড়ল রাগত ভঙ্গিতে।
হলটা কি, ভাবল কিশোর। জানার জন্যে এগোল কোরালের দিকে।
বেড়ার কাছে এসে দাঁড়াল লিলি, সে রয়েছে ভেতরে, বাইরের দিকে দাঁড়াল মেহমানরা। একজন বলল, তুমি কি করবে না করবে জানি না। তবে এই চুরির কথা পুলিশকে জানাবই আমরা।
চুরি?
হ্যাঁ, বলল আরেক মেহমান, সে মহিলা, আমার পার্স চুরি হয়েছে, আমার স্বামীর মানিব্যাগ চুরি হয়েছে।
সত্যি?
তো কি মিথ্যে বলছি নাকি! জ্বলে উঠল মহিলার চোখ। আজ সকালেও আলমারির ড্রয়ারে দেখেছি। নিশ্চয় তোমার কোন কাউবয় ঢুকে চুরি করে নিয়ে গেছে।
ছাই হয়ে গেল লিলির মুখ। মিসেস ব্যানার, একটা কথা আমি জোর দিয়ে বলতে পারি। এখানকার সবাই খুব ভাল মানুষ।
তাহলে কে নিল? প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মহিলা।
দরজা খোলার শব্দে ফিরে তাকিয়ে কিশোর দেখল, রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে দৌড়ে আসছেন কেরোলিন। মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ। এগিয়ে এসে হাতের জিনিসগুলো দেখিয়ে বললেন, এগুলো খুঁজছেন তো আপনারা?
হ্যাঁ, কেরোলিনের বাড়ান হাত থেকে ছোঁ মেরে পার্স আর মানিব্যাগটা নিয়ে নিল মিসেস ব্যানার। কোথায় পেলেন?

দ্বিধা করলেন কেরোলিন। অস্বস্তিভরে তাকালেন প্রথমে কিশোরের দিকে, তারপর লিলির দিকে। কিশোরের ঘরটা পরিষ্কার করছিলাম। বিছানায় রাখা ছিল ওর ব্যাগটা। সরাতে যেতেই কাত হয়ে গেল, আর ওটার ভেতর থেকে পড়ল এদুটো।
বলেন কি? চমকে গেল কিশোর।
শয়তানটা তাহলে তুমিই! কিশোরের দিকে তাকিয়ে চোখে আগুন জ্বলে উঠল মিসেস ব্যানারের। এসব করে পার পাবে ভেবেছ? পুলিশকে অবশ্যই জানাব, যাতে তোমাকে ধরে নিয়ে যায়।
.
এতটাই অবাক হয়েছে কিশোর, কথাই সরল না কয়েক সেকেণ্ড। তারপর কোনমতে বলল, আ-আমি কিছু জানি না....আপনার জিনিস আমার ঘরে গেল কি করে?...আশ্চর্য!
দুর থেকে দেখেই কিছু সন্দেহ করেছিল রবিন আর মুসা, এগিয়ে এল শোনার জন্যে। সব শুনে রেগে গিয়ে রবিন বলল, কিশোর চোর না! ওকে যে ফাঁসানোর চেষ্টা করা হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।
রবিনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল মিসেস ব্যানার। তারপর পার্স আর মানিব্যাগের টাকা আর জিনিসপত্র দেখে নিয়ে বলল, সব ঠিকই আছে মনে হয়। যাই হোক, একথা আমি ভুলব না। মানিব্যাগটা স্বামীর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, দেখ, ঠিক আছে কিনা।
টাকা গুনে নিয়ে মাথা কাত করল মিস্টার ব্যানার, ঠিকই আছে।
ওরা দুজন চলে গেলে লিলি বলল, এর একটা বিহিত হওয়া দরকার। কে ঘটাচ্ছে এসব ধরতেই হবে। পিঠ সোজা করে হেঁটে চলেছে মিস্টার আর মিসেস ব্যানার, সেদিকে তাকিয়ে বলল, এমন কাণ্ড এই র‍্যাঞ্চে কোনদিন হয়নি। কিছু বুঝতে পারছি না।
আমি পারছি, মুসা বলল। নিশ্চয় সত্যের খুব কাছাকাছি চলে গেছে কিশোর, তাই তাকে বিপদে ফেলার চেষ্টা চলছে।
কিশোরের বাহুতে হাত রাখলেন কেরোলিন, বিশ্বাস করো, তোমাকে দোষ দিইনি আমি। আমিও বিশ্বাস করি না তুমি একাজ করেছ।
হাসল কিশোর। আমি কিছু মনে করিনি। তবে যে একাজ করেছে তাকে আমি ছাড়ব না। ধরবই।
তাই কর, লিলি বলল।
ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠলেন কেরোলিন, সর্বনাশ! এখুনি গিয়ে রান্না বসাতে হবে, নইলে রাতে ঠিকমত খাবারই দিতে পারব না।

সাহায্য-টাহায্য লাগবে আজকে? কেরোলিনকে জিজ্ঞেস করল রবিন। তাহলে আমি আর মুসা করতে পারি…
বাধা দিয়ে মুসা বলল, আসলে, আমার আজ…
করতে ভাল লাগছে না তো? মুসার ইচ্ছে বুঝতে পেরে হাসলেন কেরোলিন। কিন্তু বাবা, আজকে যে আমার সাহায্য দরকার। এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে। বেতার ওপর স্পেশাল একটা ডিশ করতে যাচ্ছি। একা সামলাতে পারব না। একজন অন্তত এসো।
এই অনুরোধের পর আর কথা চলে না। রবিন, মুসা দুজনেই চলল কেরোলিনের সঙ্গে। ওরা রওনা হয়ে গেলে ডেকে বলল কিশোর, যাও তোমরা। আমিও আসছি।
লিলি বলল, মিসেস ব্যানারের ব্যবহারটা দেখলে? কিশোর বলল, ওরকম চুরি হলে আমিও করতাম। তাকে দোষ দিতে পারছি না। আমার কথা ভেবে যদি লজ্জা পেয়ে থাকেন, ভুলে যান। এসব অভ্যাস আছে আমার। এর চেয়ে বেশি অপমানও হয়েছি। তবে শেষ পর্যন্ত জবাব দিয়ে তারপর ছেড়েছি। এবারেও তাই করব। আসলে, কারও বিপদের কারণ হয়ে উঠেছি আমি। সেজন্যেই চাইছে না আমি তদন্ত করি। ভয় পেয়ে গেছে। থামাতে চাইছে। ইউনিকর্নকে কে পালাতে সাহায্য করে থাকতে পারে কিছু আন্দাজ করতে পারেন?
ও একা একা পালিয়েছে এটা মেনে নিতে পারছ না?
আপনি পারছেন?
শ্রাগ করল লিলি। না, আমিও অবশ্য পারছি না। তবে পুরো ব্যাপারটাই যেন কেমন! কোন চিহ্ন নেই, কিছু নেই…একেবারে হাওয়া!
বনবন করে ঘুরছে যেন কিশোরের মগজের চাকাগুলো। দুটো ব্যাপার হতে পারে। হয় আপনাআপনিই পালিয়েছিল ইউনিকর্ন, সেটাকে কাজে লাগিয়েছে যে ওকে চুরি করেছে। পালানর পর কোনভাবে ধরে তার পিঠে চেপেছে। নয়তো পালাতে সাহায্য করেছে প্ল্যান করেই।
কাকে সন্দেহ করছ? ব্রড জেসন? নিচের ঠোঁটে কামড় দিল লিলি।
হতে পারে। কিংবা এমন কেউ হতে পারে, যে আপনাকে ইনডিপেনডেন্স ডের রোডিওতে শরিক হতে দিতে চায় না। আমার ধারণা, ইউনিকর্নের পালান আর হারিকেনের খেপে যাওয়ার পেছনে একই কারণ। দুটো ঘটনার মধ্যে সম্পর্ক। আছে।
কি?
এখনও জানি না। কিন্তু ইউনিক আর হারিকেনকে ছাড়া আপনি না পারবেন ঘোড়ার বাচ্চা বিক্রি করে টাকা দিতে, না পারবেন রেডিওতে জিতে টাকা জোগাড়

করতে। ধার আর শোধ করা হবে না আপনার। ধার যাতে শোধ করতে না পারেন তার জন্যেও এসব করা হয়ে থাকতে পারে।
হু, জোরে নিঃশ্বাস ফেলল লিলি।
বেড়ায় হেলান দিল কিশোর। পাইককে বলতে শুনেছি, যেভাবেই হোক, র‍্যাঞ্চটা আপনার কাছ থেকে কেড়ে নেবেই। নিরেকের কাছে বলেছে।
সে-ই এর পেছনে নয় তো?
সরাসরি হ্যাঁ না বলে কিশোর বলল, ওর সম্পর্কে আরও জানতে হবে আমাকে।
মুখ বাঁকাল লিলি। আমি আর জানতে চাই না। যত কম জানি ততই ভাল। আমার জন্যে। ওই লোকটাকে দেখলেই ভয় লাগে আমার। কেঁপে উঠল সে। কোনদিনই র‍্যাঞ্চ আমি ওর কাছে বেচব না। আকাশের দিকে তাকাল। এক রত্তি মেঘ নেই কোথাও। আজ রাতেই আমি ঘোষণা করে দেব, আবার রোডিও খেলব। আমি। এখন কেবল ইউনিকর্নকে দরকার আমার। ওকে পেতেই হবে।
পাব। খুঁজে বের করব, কথা দিল ওকে কিশোর। ডবসি কুপারের র‍্যাঞ্চে যাব। আমি। তাকে জিজ্ঞেস করব সত্যিই ইউনিকর্নকে দেখেছে কিনা।
আমার বিশ্বাস হয় না, লিলি বলল। অন্য কোন ঘোড়া দেখেছে কুপার। ইউনিককে নয়।
তবু, কথা আমি বলতে যাবই।
যাওয়ার দরকার নেই। আজ রাতে বারবিকিউ পার্টিতে দাওয়াত করেছি, আসবে।
বেড়ার ওপরের রেইলে চাপড় মারল লিলি। যাই, কাজ করিগে। পরে কথা হবে।
বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করল কিশোর। কিছুদূর যাওয়ার পর আস্তাবলের দিক থেকে ব্রডকে যেতে দেখে সেদিকে এগোল। কাঁধের ওপর দিয়ে একবার ঘুরে তাকিয়ে গিয়ে একটা স্টেশন ওয়াগনে উঠে চালিয়ে নিয়ে চলে গেল লোকটা। আরেকবার আস্তাবলের ভেতরে দেখার সিদ্ধান্ত নিল কিশোর।
আস্তাবলের ভেতরে অন্ধকার, শান্ত, কেমন একটা তেলতেলে গন্ধ। ঘোড়াগুলো সব বাইরে। সোজা ইউনিকনের স্টলের দিকে এগোল কিশোর। সব আগের মতই রয়েছে, কিছুই বদল হয়নি। খড় ছড়ানো, খাবারের বাক্সটা অর্ধেক ভরা, হুকে ঝোলান পানির বালতি, দরজার পাল্লা ভাঙা। মেরামত করা হয়নি। একবার দেখে। ঘুরতে যাবে এই সময় মনে হলো কি যেন একটা বাদ পড়েছে। কিংবা কিছু একটা গোলমাল হয়েছে, সব ঠিকঠাক নেই। ভাল করে আরেকবার দেখল সে। কই, সবই তো ঠিক আছে? সত্যিই আছে তো?
আনমনেই একবার ভ্রূকুটি করে হারিকেনের স্টলের দিকে তাকাল সে। ওটাও একই রকম রয়েছে, কেবল খড়ের রঙটা অন্য রকম লাগছে। বদলানো হয়েছে। বোধহয়।

কিশোরের মন বলছে, মূল্যবান একটা সূত্র রয়েছে আস্তাবলের ভেতরে। নজরে পড়ছে না। গভীর ভাবনায় ডুবে থেকেই আস্তাবল থেকে বেরিয়ে এল সে, রওনা হল বাড়ির দিকে। রান্নাঘরে ঢুকে দেখল কাজ করছে মুসা আর রবিন।
ময়দা মাখাচ্ছে মুসা। রবিন পেঁয়াজ কুচি করছে। সসপ্যানে মাংস ভাজছেন। কেরোলিন।
আমি কোন সাহায্য করতে পারি? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
নিশ্চয়, জবাব দিল রবিন। বাকি পেঁয়াজগুলো যদি কেটে দিতে... চোখ ডলতে লাগল সে। লাল হয়ে গেছে। পানি বেরোচ্ছে পেঁয়াজের ঝাঁজে।
মাংসে টমেটো সস আর বীন মেশাতে মেশাতে কেরোলিন অনুরোধ করলেন, কনগুলো যদি পরিষ্কার করে আন, খুব ভাল হয়।
যাচ্ছি। প্যানট্রিতে এসে ঢুকল কিশোর। কর্ন বের করার জন্যে হাত বাড়াতেই ঠেলা লেগে ছড়িয়ে পড়ল একগাদা খবরের কাগজ। পুরানো হতে হতে হলদে হয়ে গেছে।
দূর! কাগজগুলো আবার তুলে ঠিক করে রাখতে লাগল সে।
আধ ঘন্টা পরে ডিনার তৈরি হয়ে গেল। রান্নাঘরে এসে ঢুকল লুক বোলান। থমথমে চেহারা। জিজ্ঞেস করল, লিলি কোথায়?
মনে হয় দোতলায়, কেরোলিন বললেন।
না, এই তো, দরজার কাছ থেকে বলল লিলি। পরনে কালো জিনস, গায়ে লাল-সাদা চেক শার্ট, মাথায় টকটকে লাল হ্যাট।
খারাপ খবর আছে, লুক বলল। ইউনিককে পাইনি। মনে হয়, চিরকালের জন্যেই গেল।
ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল লিলি। বিড়বিড় করে বলল, বিশ্বাসই করতে পারি না!
বিশ্বাস তো আমিও করতে পারছি না, লুক বলল। শেষ পর্যন্ত শেরিফকে জানাতে বাধ্য হয়েছি। দশ মাইলের মধ্যে পাড়াপ্রতিবেশী যত আছে, সবাইকে জিজ্ঞেস করেছি। কেউ কিছু বলতে পারল না। কেউ দেখেনি ওকে।
লুকিয়ে রয়েছে হয়তো কোথাও, কিশোর বলল।
কোথায়? ভুরু কোঁচকাল লুক। কোনখানে?
এখনও জানি না। তবে কেউ ইচ্ছে করে লুকিয়ে রেখেছে ওকে।
পাগল! ফেটে পড়ল লুক, তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, ছেলে! শহরে তোমরা কিভাবে গোয়েন্দাগিরি কর, জানি না, তবে এখানে আমরা কোন কিছু চুরি যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করি, তারপর চোরকে ধরার চেষ্টা করি।

কিশোর তো সেটাই করতে চাইছে, লিলি বলল। ওর ধারণা, ইউনিককে চুরি করা হয়েছে।
হায় হায়, বলে কি! চোখ বড় বড় হয়ে গেল কেরোলিনের।
লুকের চোখে অবিশ্বাস ফুটল। এসব অতি কল্পনা। ঘোড়াটা পালিয়েছে, এটাই সহজ জবাব।
তাহলে পাচ্ছি না কেন ওকে? ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর। আটকে রাখা না হলে ও এতক্ষণে চলে আসত। গৃহপালিত কোন জানোয়ারই বাড়ি ছেড়ে বেশিক্ষণ থাকে না।
পাগল হয়ে গেছে! মাথা নাড়তে নাড়তে বেরিয়ে গেল লুক।
এক এক করে সবার মুখের দিকে তাকাতে লাগলেন কেরোলিন। তারপর বললেন, এখানে আমিই সামলাতে পারব। তোমরা গিয়ে ঘরটর গোছগাছ কর।
স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মুসা। অ্যাপ্রন খুলতে একটা মুহূর্ত দেরি করল না। তবে রবিন বলল, তোমরা যাও। আমি আসছি।
ঘরে এসে হাতমুখ ধুয়ে কাপড় বদলে নিল কিশোর। এসে বসল মুসার বিছানায়। বলল, সেই অনুভূতিটা হচ্ছে আবার আমার। কোন কিছু মিস করলে, ধরি ধরি করেও ধরতে না পারলে যেটা হয়। জরুরী কোন একটা সূত্র।
কি? মুসা জিজ্ঞেস করল।
সেটাই তো বুঝতে পারছি না। হাতের তালুতে থুতনি রাখল কিশোর। যদি খালি বুঝতে পারতাম কে ইউনিকর্নকে চুরি করেছে আর ব্যানারদের জিনিসগুলো। আমার ব্যাগে রেখেছে...।
এবং কে হারিকেনকে ওষুধ খাইয়েছে,মুসা বলল। এই তো?
যদি খাইয়ে থাকে। যাই হোক, এই মুহূর্তে এটাও প্রমাণ করতে পারছি না। আমরা। তারমানে যেখানে ছিলাম সেখানেই রয়ে গেছি, এগোতে পারিনি একটুও?
আলমারির আয়নায় নিজের দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। আনমনে মাথা দোলাল, অনেকটা সেই রকমই।
ঝটকা দিয়ে খুলে গেল দরজা। হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকল রবিন। চকচক করছে। চোখ। চিৎকার করে বলল, পেয়ে গেছি। ধরে ফেলেছি ব্যাটাকে!
সতর্ক হল কিশোর। আহ, আস্তে! দরজা লাগাও!
দরজাটা লাগিয়ে দিল রবিন। গলার স্বর খাদে নামিয়ে বলল, কে সব কিছুর পেছনে বুঝে ফেলেছি!
.
কে? একসাথে জিজ্ঞেস করল কিশোর আর মুসা।

ব্রড জেসন! অ্যাপ্রনের পকেট থেকে হলদে হয়ে আসা একটা খবরের কাগজ বের করল রবিন। স্থানীয় কাগজ, নাম ক্রনিকল। বাড়িয়ে ধরল সেটা কিশোরের দিকে।
গল্পটা ছয় মাসের পুরানো। কুপার র‍্যাঞ্চের মেহমানদের টাকা আর জিনিসপত্র চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছিল ব্রডকে। র‍্যাঞ্চ থেকে বের করে দিয়েছিলেন তাকে কুপার। কুপার র‍্যাঞ্চের কথাও বিশদ লেখা রয়েছে স্টোরিটায়। অনেক বড় জমজমাট র‍্যাঞ্চ। ওটার মালিক বিখ্যাত রোডিও খেলোয়াড় বেনি কুপারের বাবা ডবসি কুপার। টুরিস্ট জায়গা দেয়া ছাড়াও রোডিও খেলার উপযোগী ঘোড়ার প্রজনন করেন। বিচিত্র সব সরীসৃপের ছোটখাট একটা চিড়িয়াখানাও আছে র‍্যাঞ্চে।
বের করলে কি করে ওটা? জিজ্ঞেস করল মুসা।
বিছানার পাশে বসল রবিন। হাসল। প্যানট্রিতে একগাদা কাগজ দেখে কৌতূহল হল। গিয়ে দেখতে লাগলাম কাগজগুলো। কিছু পেয়ে যাব ভাবিনি, এমনিই দেখছিলাম। চোখে পড়ে গেল হেডলাইনটা।
ব্রড কেন ইউনিকর্নকে ছেড়ে দেবে? তার কি লাভ?
যেহেতু বেনি কুপার তার গার্লফ্রেণ্ড।
উজ্জ্বল হলো কিশোরের মুখ। ঠিক। লিলি প্রতিযোগিতায় নামলে বেনির সর্বনাশ। জিততে পারবে না।
কেরোলিন আন্টির কাছে শুনলাম প্রতিযোগিতাটা টেলিভিশনে দেখাবে, রবিন জানাল। যে জিতবে, তাকে নাকি সিনেমায় অভিনয়ের সুযোগ দেয়া হবে।
বাপরে! গাল ফুলিয়ে ফেলল মুসা, বিরাট টাকার ব্যাপার!
সেই সঙ্গে সম্মান এবং খ্যাতি, কিশোর বলল।
সহজেই ধরে নেয়া যায়, রবিন বলল, বান্ধবীর জন্যে এসব অকাজ করছে। ব্রড। স্যাবোটাজ করে চলেছে ডাবল সিকে।
ওরকম জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না অবশ্য, চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। কারণ কিছুই প্রমাণ করতে পারিনি আমরা এখনও।
রহস্যময় হাসি হাসল রবিন। পারিনি, করে ফেলব। ধবধবে সাদা একটা স্টেটসন হ্যাট খাঁটি কাউবয় কায়দায় মাথায় বসিয়ে দিয়ে বলল, চলো।
কোথায়? মুসার প্রশ্ন। পার্টিতে?
উঠে দাঁড়াল কিশোর। আমি যাচ্ছি ব্রড জেসন আর ডবসি কুপারের সঙ্গে কথা বলতে।
.

এক ঘণ্টা পরে বারবিকিউ সস, সদ্য বেক করা কর্নব্রেড আর স্ট্রবেরি পাইয়ের সুবাস ভুর ভুর করতে লাগল বাতাসে। খোলা একটা নিচু জায়গায় হাজির হল মেহমানেরা, যেখানে এই বিশেষ পার্টির আয়োজন করা হয়েছে। বারবিকিউ হয় খোলা জায়গায়। মূল খাবার হয় আস্ত গরু, ভেড়া কিংবা শুয়োরের ঝলসান মাংস। গাছের ডালে ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে চামড়া ছাড়ানো, নাড়িভুড়ি বের করে ফেলে দেয়া আস্ত এক গরু। নিচে আগুন জ্বলছে। সেই আঁচে সেদ্ধ হচ্ছে মাংস, চর্বি গলছে চড়চড় শব্দ করে, কাবাবের জিভে-পানি-আসা গন্ধ ছড়িয়ে দিচ্ছে। গাছের ডালে ঝুলছে অনেকগুলো লণ্ঠন। সেই সাথে অনেক মানুষের কথাবার্তার গুঞ্জন এক বিচিত্র পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।

ওখানে হাজির হলো তিন গোয়েন্দা। ডাবল সির মেহমানরা তো রয়েছেই, আশেপাশের অনেক র‍্যাঞ্চ থেকেও অনেকে এসেছে। নিয়ম হলো যার যার খাবার। প্লেটে তুলে নিয়ে খেতে হবে। কিশোরও নিল। চঞ্চল দৃষ্টি ঘুরে বেড়াচ্ছে পরিচিতি অপরিচিত মানুষের ওপর। বেনিকে দেখতে পেল। লণ্ঠনের আলোতেও ঝলমল করছে চুল। পাশে দাঁড়িয়ে আছেন লম্বা, বলিষ্ঠ একজন মানুষ। চুল সাদা। ভারি কণ্ঠস্বর, হাসিটাও তেমনি ভারি।

আমি যাচ্ছি, রবিনের কানে কানে বলল কিশোর। লোকজনের ভেতর দিয়ে এগোল বেনির দিকে। কাছে গিয়ে হেসে হাত নেড়ে স্বাগত জানানোর ভঙ্গিতে বলল, হাই।

হাই। কিশোর পাশা না? এমন ভঙ্গিতে তাকাল, বেনি, যেন চিনতে পারছে না কিশোরকে।

হ্যাঁ, জবাব দিয়ে পাশের ভদ্রলোকের দিকে তাকাল কিশোর।

আমি ডবসি কুপার, বেনির বাবা, গমগম করে উঠল ভদ্রলোকের গলা। হাত বাড়িয়ে কিশোরের হাতটা চেপে ধরে ঝাঁকি দিলেন। ওয়েলকাম টু মনটানা।

থ্যাঙ্ক ইউ।

শুনলাম, তুমি ডিটেকটিভ?

ঝট করে বাবার দিকে তাকিয়েই চোখ সরিয়ে নিল আবার বেনি।

ঠিকই শুনেছেন, দরাজ হাসি হাসল কিশোর। ইউনিকর্নকে খুঁজে বের করার চেষ্টা চালাচ্ছি আপাতত। রাতের বেলা আস্তাবল থেকে পালিয়েছে।

শুনেছি, কুপার বললেন। বেনির কাছেই শুনলাম। পরে আমার র‍্যাঞ্চের পশ্চিম ধারে ওরকম কালো একটা ঘোড়াকে দেখেছিও। এখন মনে হচ্ছে ওটা ইউনিকর্ন নয়। অন্য ঘোড়া। ভুলটা কিভাবে করলাম বুঝতে পারছি না। ঘোড়ার ব্যাপারে তো এরকম ভুল আমি করি না। তবে, ইউনিকর্ন আর হারিকেনকে আলাদা করে

চিনতে পারব না, এটা ঠিক। দুটো ঘোড়াই অবিকল এক রকম। এত মিল কমই দেখা যায়।
আপনি কেন, বাইরের কেউই পারবে না, কখন পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে ব্রড, কিশোর কিংবা কুপার কেউই টের পাননি। ঘুরে তাকাল কিশোর। ব্রডকে যেন আর এখন চেনাই যায় না। পরিষ্কার জিনস, প্রেইড শার্ট আর রুপার বাক্স ওয়ালা বেল্ট পরেছে। ঠিক এরকম বাকলসওয়ালা বেল্টের বাড়িই সেদিন আস্তাবলে খেয়েছিল কিশোর, মনে আছে। তাহলে কি ব্রডই তাকে মেরেছিল? নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না। এখানে অনেকেই বেল্টে রুপার বাস লাগায়। ইউনিকনের চুরির দায়টা ওর ওপর চাপানর মতও কোন প্রমাণ তার হাতে নেই।
ব্রডকে দেখেই কঠিন হয়ে গেল কুপারের চেহারা। কিন্তু তোয়াক্কা করল না ব্রড।
মুসা তোমাকে খুঁজছে, কিশোরকে বলল সে। বেনির দিকে তাকিয়ে কোমল হল দৃষ্টি। দ্রুত হেঁটে চলে গেল আরেক দিকে।
কিশোরও সরে গেল ওখান থেকে। তবে মুসার কাছে না গিয়ে পিছু নিল ব্রডের। আস্তাবলের দিকে চলেছে লোকটা। ডাক দিল সে, এই যে, শুনুন।
থেমে গেল ব্রড। বুটের গোড়ালিতে ভর দিয়ে ঘুরল। কর্কশ গলায় বলল, এখানে নয়, তোমার বন্ধু পার্টিতে।
জানি। আমি আপনার সঙ্গেই কথা বলতে চাইছি।
কথা বলার মোটেও ইচ্ছে নেই ব্রডের। কি কথা?
সেদিন রাতে, আমি যখন আস্তাবলে..
মনে আছে। অনেক প্রশ্ন করেছিলে। আমি তখন হারিকেনকে ঠাণ্ডা করছিলাম।
না না, তার পরে। আমি যখন আবার একা গেলাম…
ভয়ানক বোকামি করেছ! এবারেও কথা শেষ করতে দিল না কিশোরকে ব্রড। হারিকেনের মেজাজ তখন চরমে!
হাল ছাড়ল না কিশোর, সেদিন রাতে ওই সময় আপনার লেকে থাকার কথা, ক্যানু রেস হচ্ছিল।
শক্ত হয়ে গেল ব্রডের চোয়াল। সরু হয়ে এল চোখের পাতা। তুমি তখন। আস্তাবলে কি করছিলে?
সূত্র খুঁজছিলাম।
অ্যাঁ! ও, শুনেছি, তোমার নাকি ধারণা ইউনিক চুরি হয়েছে, কে করেছে সেটা জানার জন্যে তদন্ত চালাচ্ছ। হেসে উঠল ব্রড। বড়ই যেন মজা পাচ্ছে এরকম। একটা ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, এখানে কোনই রহস্য নেই কিশোর পাশা, কাজেই রহস্যভেদের চেষ্টা বৃথা। আমার পরামর্শ শুনলে, বাদ দাও এসব…

ব্রডের বেশি কথাও ভাল লাগছে না কিশোরের, বলল, মেরে আমাকে বেশ করে ফেলা হয়েছিল। পেছন থেকে কে জানি এসে মাথায় বাড়ি মারল।
এতক্ষণে হাসি বন্ধ হল ব্রডের। বলো কি? কই, আমি তো কিছু শুনিনি?
কার কাছে শুনবেন? কাউকে বলিনি তো।
এরকম কিছু ঘটতে পারে না, এটাই বোধহয় বলার জন্যে মুখ খুলেও থেমে গেল ব্রড। জিজ্ঞেস করল, তারপর?
আমার বন্ধুরা গিয়ে বেহুশ দেখতে পেল আমাকে।
লোকটাকে দেখেছ?
না। তবে রুপার বাল্সওয়ালা বেল্ট দিয়ে বাড়ি মেরেছিল, দেখেছি, আপনি যেটা পরেছেন সে রকম।
রেগে গেল ব্রড, তুমি বোঝাতে চাইছ আমি মেরেছি? নিজের বেল্টের দিকে আঙুল তুলে বলল, এটা আমি পুরস্কার পেয়েছি কয়েক বছর আগে রোডিও খেলায়। অনেকেই পেয়েছে। আজ রাতে পার্টিতেই অন্তত দশবারোজনের কোমরে দেখতে পাবে।
কার কার?
লিলি, জন, লুক, ভাবছে ব্রড, এই র‍্যাঞ্চের দুজন শ্রমিক। বাইরের তো আছেই।
কুপার র‍্যাঞ্চের?
আছে।
বেনি কুপারের?
কয়েকটা আছে। বেনির কথা বলার সময় কোমল হল ব্রডের কণ্ঠ, পরের কথাটা বলতে গিয়েই নিমের তেতো ঝরল যেন, ওর বাবারও আছে।
চমৎকার, ভাবল কিশোর। ব্রডের কথা ঠিক হলে এ এলাকার অর্ধেক মানুষেরই আছে রুপার বাক্স। ওটাকে সূত্র হিসেবে ধরে তদন্ত করতে যাওয়া আর খড়ের গাদায় সুচ খোঁজা একই কথা।
আস্তাবলের দিকে আবার পা বাড়িয়ে ব্রড বলল, দেখো, আমার সত্যিই কাজ আছে। ঘোড়াগুলোকে খাবার দিতে হবে…
আর একটা কথা, তাড়াতাড়ি হাত তুলল কিশোর, আপনি কুপারের ওখানে চাকরি করতেন, তাই না?
থমকে গেল ব্রড। ফিরে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, তুমি কি করে জানলে?
কাগজে পড়েছি।
পুরানো ইতিহাস! বিড়বিড় করল ব্রড। তাহলে নিশ্চয় জানো, চুরির অপরাধে অভিযুক্ত করা হয়েছিল আমাকে?
বড় শাস্তি দিতে পারেননি বলে নিশ্চয় হতাশ হয়েছিলেন মিস্টার কুপার?

আঙুল মুঠো করে ফেলল ব্রড। ওর সঙ্গে আমার কোনদিনই বনিবনা ছিল না। আমাকে পছন্দ করেনি। বেনির সঙ্গে নাকি আমাকে একেবারেই মানাবে না। মেহমানদের জিনিস চুরি করি আমি, একথাটা যেই জানল, সুযোগ পেয়ে গেল। বের করে দিল আমাকে র‍্যাঞ্চ থেকে। শাসিয়ে বলল; আর যেন কখনও বেনির। সঙ্গে দেখা না করি।
রাগটা ঘৃণায় রূপান্তরিত হয়েছে ব্রডের।
কিশোর জিজ্ঞেস করল, তারপর এখানে চাকরি নিলেন?
দেখ, উল্টোপাল্টা কিছু ভেবে বসো না। লিলির সঙ্গে আমার কোন মন। দেয়ানেয়ার ব্যাপার নেই। আমাকে আর দশজন কর্মচারীর মতই কাজে নিয়েছে। কেরোলিন আন্টি বলেকয়ে রাজি করিয়েছে তাকে। তারপর থেকে আমি সৎ হয়ে গেছি। ঠিকমত কাজ করছি। সবাইকে বোঝানোর জন্যে যে, যা করেছি তার জন্যে আমি অনুতপ্ত, আর কোনদিন করব না ওরকম কাজ।
লোকটাকে বিশ্বাস করতে পারছে না কিশোর। তাহলে আপনি বলতে পারবেন না ব্যানারদের জিনিস চুরি করে কে আমার ব্যাগে রেখে গেল?
তোমার ধারণা আমি করেছি? মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি তোমার? এখানেও ওরকম কোন বদনাম হলে র‍্যাঞ্চে চাকরির আশা আমার শেষ। কেউ আর আমাকে কাজ দেবে না। তাছাড়া এই চাকরিটা খুব ভাল। বোকামি করে মরার কোন ইচ্ছেই আমার নেই। ইয়ে, ওদের ব্যাগ থেকে টাকাপয়সা চুরি গেছে নাকি কিছু?
প্রশ্নটার জবাব না দিয়ে কিশোর বলল, আমাকে ফাঁসানোর চেষ্টা করেছিল।
আমি নই, এটুকু বলতে পারি। আর দাঁড়াল না ব্রড। দুপদাপ পা ফেলে আস্তাবলের দিকে রওনা হয়ে গেল।
দরজা দিয়ে ওকে ঢুকে যেতে দেখল কিশোর। ভাবছে, সত্যি বলেছে লোকটা? চুরির অভ্যাস ছিল একসময়। ইউনিকর্নকে ও-ই চুরি করল? তাহলে হারিকেনের ব্যাপারটা কি? ঘোড়াকে সত্যিই ভালবাসে ব্রড, এরকম একজন লোক ওষুধ খাইয়ে ক্ষতি করবে একটা ঘোড়ার, আতঙ্কিত করে তুলতে চাইবে? নাকি লুক বোলানের কথাই ঠিক, বদ রক্ত রয়েছে শরীরে তাই খারাপ হয়ে গেছে। হারিকেন? ইউনিকর্ন এখন কোথায়? পাহাড়ে, বনের ভেতরে লুকিয়ে আছে, নাকি কোথাও আটকে রাখা হয়েছে তাকে?
কি ব্যাপার, পার্টিতে ফিরে আসার পর মুসা জিজ্ঞেস করল কিশোরকে, মনে হয় এই দুনিয়ায় নেই?
না, আছি। ভাবছিলাম, আশপাশের র‍্যাঞ্চ মালিকদের সঙ্গে কথা বলা দরকার।

ওর কথার শেষ অংশটা শুনে ফেলল লিলি। বলল, যাওয়ার আর দরকার কি? এখানেই অনেকে আছে। বলে ফেললেই পারো।
কয়েকজনের সাথে কথা বলল কিশোর, লাভ হলো না, জানতে পারল না। নতুন কিছু। পালিয়ে যাওয়ার পর ইউনিকর্নকে দেখেইনি কেউ। তবে এলসা কারমল নামে এক বিধবা মহিলা একটা মূল্যবান কথা বললেন। স্বামীর রেখে যাওয়া বিশাল সম্পত্তির মালিক। কুপার র‍্যাঞ্চের পশ্চিমে তাঁর জমি। বললেন, দেখো, ইউনিকর্নের মত শয়তানেরও দিনে দুবেলা খাবার দরকার পড়ে। বড় জানোয়ার, বেশি খাবার দরকার। ওদিকে, যেদিকে ঘোড়াটা লুকিয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে, সেদিকে হাত তুলে তিনি বললেন, খাবার খুবই কম। ঘোড়ারা বুদ্ধিমান জানোয়ার, লুকিয়ে পড়ার ওস্তাদ, কোথায় গিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে, কে জানে। ওই যে, ব্যাণ্ড শুরু হলো।
একটা কাঠের মঞ্চে উঠে বাজনা শুরু করেছে তিনজন স্থানীয় বাজনদার। সেদিকে এগিয়ে গেল কিশোর। বেনির সঙ্গে কথা বলছে ওখানে লিলি। বেনি বলছে, সত্যিই আবার রোডিওতে ফেরত যাবে?
চাইছি তো। ভাবছি, ইনডিপেনডেন্স ডে থেকে শুরু করব।
বেশি তাড়াতাড়ি হয়ে গেল না? এক বছর ধরে প্র্যাকটিস নেই, পারবে?
পারতে হবে। টাকা দরকার আমার।
বড় বেশি ঝুঁকি নিতে যাচ্ছ। একটা পাগলা ঘোড়ার পিঠে চড়ে…
হারিকেন পাগল নয়।
আব্বাকে লুক বলেছে ঘোড়াটা পাগল হয়ে গেছে। ব্রডও বলেছে। আমি হলে ওরকম একটা বদমেজাজী ঘোড়ার পিঠে কখনই চড়তাম না।
আর কোন কথা হল না। চলে গেল বেনি।
কিশোরের ওপর চোখ পড়ল লিলির। বলল, দেখলে, কেমন করে চলে গেল?
দেখলাম। বেনির ওপর নজর কিশোরের। ব্রডের হাত ধরেছে গিয়ে মেয়েটা। কাছেই রয়েছেন তার বাবা, পরোয়াই করল না। গম্ভীর হয়ে গেছেন কুপার, ভূতপূর্ব কর্মচারীর সঙ্গে নিজের মেয়ের এই আচরণ সহ্য করতে পারছেন না। তিনি। লিলির দিকে ফিরল কিশোর। শুনলাম, কুপার র‍্যাঞ্চে নাকি কাজ করত ব্রড।
মাথা ঝাঁকাল লিলি। কেন বের করে দিয়েছে জানো?
জানি।
ও, জান। আমি আরও ভাবলাম, তোমাকে বলব, ওর চুরির স্বভাব ছিল। তবে এখন ও ভাল হয়ে গেছে। ব্যানারদের জিনিস ও চুরি করেনি। ইউনিকের নিখোঁজ

হওয়ার পেছনেও তার হাত নেই। অহেতুক আর এখন ওর অতীত নিয়ে ঘাটাঘাটি করাটা ঠিক হবে না।
পুরোদমে শুরু হয়ে গেছে বাজনা। আঞ্চলিক গানের সুর বাজাচ্ছে। কয়েক সেকেণ্ড চুপচাপ শুনে আবার বলল লিলি, এই বাজনার পরেই আমি রেডিওতে যোগ দেয়ার কথা ঘোষণা করব।
গুড লাক, শুভেচ্ছা জানাল কিশোর। হঠাৎ বলে উঠল, আরি!
কি? কিশোরের দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকিয়ে লিলিও দেখতে পেল লম্বা সাদা সেডান গাড়িটা, র‍্যাঞ্চে ঢুকছে। আবার এল!
আরও খানিকটা এগিয়ে থামল গাড়িটা। বেরিয়ে এল ফিলিপ নিরেক। অন্য পাশের জানালা দিয়ে মুখ বের করে রেখেছে পাইক, নামল না। সোজা লিলির দিকে এগিয়ে এল নিরেক। কাছে এসে একটা খাম বাড়িয়ে দিয়ে বলল, যা বলেছিলাম। এটাই ঘটবে।
কি হয়েছে? জিজ্ঞেস করল লিলি।
কি আর? ব্যাংক সময় দিতে পারবে না। এক মাসের সময় আছে আর। এর। মধ্যে হয় সব টাকা শোধ করবে, নয়ত জায়গা ছাড়বে। এই যে, চিঠি।
এসব আপনি করেছেন! সব আপনার শয়তানী! লিলির চিল্কারে বাজনা থামিয়ে অবাক হয়ে চেয়ে রইল বাদর্কেরা। মেহমানদের চোখও ঘুরে গেল এদিকে।
বেশ, আমি করেছি, তাতে কি? নির্লজ্জের মত বলল নিরেক। ইনসিওরেন্স কোম্পানির সঙ্গেও কথা বলেছি। ওরা বলেছে, ইউনিকনের জন্যে পয়সা দেবে না। যে যে কারণে টাকা দেয়ার কথা তার কোনটাই ঘটেনি বলে তাদের বিশ্বাস। মরেনি, জখম হয়নি, চুরি যায়নি। ওদের ধারণা, তুমিই কোথাও নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রেখেছ।
শক্ত হয়ে গেছে লিলির কাঁধ। টাকা কি চাইতে গেছি নাকি আমি ওদের কাছে? কথাই বলিনি।
বললেও দেবে না। ঘুরে গাড়ির দিকে রওনা হলো নিরেক।
তাড়াহুড়া করে লিলির কাছে এসে দাঁড়ালেন কেরোলিন। একটা গোলমাল হয়ে গেছে। বিকেলে দোকান থেকে সোডা আনতে ভুলে গেছে ব্রড। চা-ও নেই। ডেরিককে ফোন করেছিলাম। দোকান বন্ধ করে দিচ্ছিল, বলেছে আমাদের জন্যেই খোলা রাখবে।
মেহমানদের ওপর চোখ বোলাল লিলি। বেশ, যাচ্ছি।
যেতে আসতে কতক্ষণ লাগে? জানতে চাইল কিশোর।
এই মিনিট বিশেক।

তাহলে আমিই যাই। আপনার বাড়িতে দাওয়াত খেতে এসেছে, আপনার। এখানে থাকা দরকার।
তুমি যাবে?
যাই না, অসুবিধে কি?
বেশ। দোকানদারের নাম ডেরিক লংম্যান। শহরের ধারেই দেখতে পাবে। মার্কেটটা। জিনসের পকেট থেকে চাবি বের করে দিয়ে লিলি বলল, আমার স্টেশন ওয়াগনটা নিয়ে যাও। ফিরে তাকিয়ে বাদকদেরকে ইশারা করল। মাথা ঝকাল দলপতি। আবার শুরু হল বাজনা।
রবিনকে কাছাকাছি দেখে সেদিকে এগোল কিশোর। তোমরা থাকো, আমি আসছি।
কোথায় যাচ্ছ?
দোকানে। কয়েকটা জিনিস ফুরিয়ে গেছে।
চলো, আমিও যাব।
যাবে? ঠিক আছে। মুসাকে বলে এসো। নইলে আবার খোঁজাখুঁজি শুরু করবে। আর আসতে চাইলে আসুক। আমি গাড়ি বের করিগে।
মুসা এল না। খেতে ব্যস্ত। রবিন আর কিশোরই চলল। পার্টির জায়গা থেকে বেশ অনেকটা দূরে রাখা হয়েছে গাড়িটা। পুরানো ঝরঝরে একটা স্টেশন ওয়াগন। গায়ে আঁকা রয়েছে ডাবল সি র‍্যাঞ্চের নাম আর মনোগ্রাম–একটা কালো ঘোড়ার ছবি।
ভাবছি, কিশোর বলল, ইচ্ছে করে ভুল করেনি তো ব্রড? সোডা আনতে ভুলে যায়নি তো?
তা কেন করবে?
জানি না, গাড়িতে উঠতে উঠতে বলল কিশোর। হয়তো গোলমাল আরও বাড়ানর জন্যেই। ইগনিশনে মোচড় দিল সে।
কেশে উঠে চালু হয়ে গেল ইঞ্জিন। গিয়ার দিল কিশোর। একটা অদ্ভুত শব্দ কানে এল। মাথার ভেতর বেজে উঠল ওয়ার্নিং বেল। খপ করে রবিনের হাত চেপে ধরে আরেক হাত বাড়াল দরজা খোলার জন্যে। চেঁচিয়ে উঠল, জলদি বেরোও...!
তার কথা শেষ হওয়ার আগেই বোমা ফাটার মত আওয়াজ হলো।
গাড়ির দরজা খুলে মাটিতে লাফিয়ে নেমেই আবার চেঁচাল কিশোর, পালাও!
একপাশে আগুন ধরেছে গাড়ির, ভাগ্য ভাল, ওদের কিছু হয়নি। মথা নিচু করে ছুটে পালিয়ে যেতে লাগল দুজনে গাড়িটার কাছ থেকে। ছুটতে ছুটতেই একবার ফিরে তাকিয়ে কিশোর দেখল, লাল আর কমলা রঙের আগুন দাউ দাউ করে

উঠছে ওপরে। কুণ্ডলী পাকিয়ে রাতের আকাশে উঠছে কাল ধোয়া। আতঙ্কিত মেহমানরা এদিক সেদিক ছোটাছুটি শুরু করেছে।
গেছিলাম আরেকটু হলেই! গলা কাঁপছে রবিনের।
ট্যাক রুম থেকে দৌড়ে বেরোল লুক বোলান, হাতে একটা ফায়ার এক্সটিংগুইশার। পথ থেকে চিৎকার করে লোকজনকে সরিয়ে দিতে লাগল, সরুন, সরে যান! গাড়ির কাছে গিয়ে যন্ত্র থেকে রাসায়নিক পদার্থ ছিটাতে লাগল আগুনের ওপর। চেঁচিয়ে নির্দেশ দিল কয়েকজন শ্রমিককে। জ্বলন্ত গাড়িটার কাছে এগিয়ে আসছিল ওরা।
কিশোর! রবিন! চিৎকার করতে করতে ছুটে এল মুসা। তোমরা ভাল আছ?
আছি, জবাব দিল রবিন।
কি হয়েছিল? উদ্বিগ্ন গলায় জানতে চাইল মুসা।
বলতে পারব না, বিহ্বলের মত মাথা নাড়তে লাগল কিশোর। আরেকটা আগুন নেভানর যন্ত্র নিয়ে দৌড়ে আসতে দেখল ব্রডকে। বাগানে পানি দেয়ার মোটা একটা হোসপাইপ এনে পানি ছিটাতে শুরু করল জন।..
গ্যাস পেডালে চাপ দিতেই কি যেন গড়বড় হয়ে গেল, আবার বলল কিশোর। বোমাটোমাই হবে!
তিন গোয়েন্দার দিকে দৌড়ে এল লিলি। পেছনে রয়েছেন কেরোলিন।
তোমরা…ভাল আছ? হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করল লিলি।
আছি, জবাব দিল কিশোর।
কপাল ভাল আরকি তোমাদের। কেন এমন হলো কিছুই তো মাথায় ঢুকছে না। বিকেলে যখন গাড়িটা নিয়ে দোকানে গিয়েছিল ব্রড তখনও তো ভাল ছিল।
তারপর আর কেউ চালিয়েছে?
মাথা নাড়ল লিলি। না। চাবি আমার কাছেই এনে দিয়েছিল সে।
কমে এসেছে আগুন। সেদিকে তাকিয়ে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। মনে হয় কেউ বোমা লাগিয়ে রেখেছিল।
সর্বনাশ! কে তোমাকে মারতে চাইল?
আমাকে নয়, ধীরে ধীরে বলল কিশোর, তাকে, যে সব সময় গাড়িটা চালায়।
চালাই তো আমি, চমকে গেছে লিলি, কিন্তু…
তাহলে আপনাকেই মারতে চেয়েছে।
ও মাই গড! চোখ বন্ধ করে ফেলল লিলি।
পোড়া গাড়িটার দিকে হাত তুলে রবিন বলল, মারতে যে চেয়েছে ওটাই তার প্রমাণ।
মুসা বলল, বেপরোয়া হয়ে গেছে লোকটা।

পুলিশকে ফোন করা দরকার, কিশোর বলল।
গাড়িটাকে জ্বলতে দেখেই করে দিয়েছি আমি, কেরোলিন বললেন। দমকলকেও করেছি। এসে যাবে।
কয়েক মিনিট পর সাইরেন শোনা গেল। দমকলের একটা ট্রাক আর শেরিফের একটা গাড়ি ঢুকল চত্বরে। লাফিয়ে মাটিতে নেমে পোড়া গাড়িটার দিকে ছুটল দমকল কর্মীরা। শেরিফের গাড়ি থেকে নামল গোয়েন্দারা। যাকে সামনে পেল তাকেই প্রশ্ন করতে লাগল।
হ্যারিসন ফোর্ড নামে একজন লালমুখো ডেপুটি জিজ্ঞেস করলেন লিলিকে, গাড়িটার কাছে কাউকে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছ?
না…ব্রডকে দেখে থেমে গেল লিলি।
ব্রড এসে বলল, গাড়িটা নিয়ে বিকেলে শহরে গিয়েছিলাম। আসার পর ওখানেই রেখেছিলাম।
চালানর সময় কোন গোলমাল করেনি? জিজ্ঞেস করলেন ফোর্ড। টের পাওনি?
না, একটুও না, ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ব্রডের মুখ।
বাজি দিয়ে একাজ করা হয়েছে, ডেপুটির কাছে এসে দাঁড়াল একজন দমকল কর্মী। হাতে একটা কালো খোসা। গাড়ির নিচে লম্বা ফিউজ লাগিয়ে মাথায় জুড়ে দেয়া হয়েছিল বাজিটা। ইঞ্জিনের গড়িয়ে পড়া তেলে লেগে আগুনটা ধরেছে।
তার মানে অ্যাক্সিডেন্ট নয়? আতঙ্কিত স্বরে জিজ্ঞেস করল লিলি।
মাথা নাড়ল লোকটা। না। আমার তা মনে হয় না। ওখানে এভাবে বাজি যাবে কি করতে?
কিশোরের দিকে তাকাল লিলি, কিশোর, আর দরকার নেই। তদন্ত বাদ দাও। আর কোন ঝুঁকি নিতে দেব না তোমাদের।
তদন্ত? ভুরু কোঁচকালেন ডেপুটি। কিসের তদন্ত?
হারানো ঘোড়াটার কথা বলল লিলি।
নাক দিয়ে শব্দ করলেন ফোর্ড। ওটা এমন কোন ব্যাপার নয়। মাঝেমধ্যেই বাড়ি থেকে পালায় ঘোড়ারা।
কিশোর বলল, আমার ধারণা ওটা চুরি হয়েছে।
ভোতা গলায় ব্রড বলল, সেটা প্রমাণ করতে পারবে না।
পারব। মিলির দিকে তাকাল কিশোর। এখন থেকে খুব সাবধানে। থাকবেন। ভয়ানক শত্রু আছে এখানে আপনার। ওরা আপনাকে মেরে ফেলতেও দ্বিধা করবে না।
না, কি যে বলো? আমাকে কেউ মারবে না।

সব কথা লিখে নিচ্ছেন ডেপুটি। নোটবুকের দিকে তাকিয়ে বললেন, একজন। মেহমানের কাছে শুনলাম, একটু আগে ব্যাংকের একজন লোক এসে হুমকি দিয়ে গেছে তোমাকে?
ফিলিপ নিরেক আর হারনি পাইকের কথা বলল লিলি। লিখে নিলেন ডেপুটি। কয়েক মিনিট পর চলে গেলেন অন্যদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে। আরেকজন ডেপুটি গিয়ে তল্লাশি চালাচ্ছে আস্তাবল আর বাড়িতে।
তিন গোয়েন্দার দিকে ফিরে লিলি বলল, তোমাদেরকে এতে জড়িত করে ভাল করিনি আমি। তোমরা আমার মেহমান। মেহমানের মতই থাকো এখন। থেকে। ওসব তদন্ত-ফদন্ত বাদ দাও।
অসম্ভব! জোর গলায় বলল কিশোর। এত কিছুর পর আর চুপ থাকতে পারব না আমি। এর একটা সুরাহা করেই ছাড়ব। বুঝতে পারছেন না কেন মরিয়া হয়ে উঠেছে শয়তানটা? আমরা অনেক এগিয়ে গেছি, বুঝে ফেলেছে সে। তার। জারিজুরি ফাঁস হওয়ার পথে।
কিন্তু ভয়ঙ্কর লোক ও, জোরে নিঃশ্বাস ফেলল লিলি। আমার জন্যে তোমরা কেন মরতে যাবে? সমস্যাটা আমার, তোমাদের নয়। তোমরা ছুটি কাটাতে এসেছ, ছুটি কাটাও।
বললামই তো, এর পর আর থেমে থাকতে পারব না আমি। আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে ইউনিকর্নের চোর। যেভাবেই হোক ঠেকাতে চাইছে এখন, যাতে ধরা না, পড়তে হয়। আমি এর শেষ দেখে ছাড়ব।
পোড়া গাড়িটার কাছে গিয়ে উঁকিঝুঁকি মারছে একজন ডেপুটি। সেদিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে লিলি বলল, বেশ। বাধা দেব না। তবে খুব সাবধান। দয়া করে আর বদনাম করো না আমার!
***
পরদিন সকালে এসে ভাল করে পোড়া গাড়িটাকে দেখল কিশোর, যদি কোন সূত্রটুত্র পেয়ে যায় এই আশায়। পেল না। সেরাতে মেহমানদের ক্যাম্পিঙে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে। কাজেই সারাটা দিন জিনিসপত্র গোছগাছ আর পশ্চিমের পাহাড়ে ইউনিকর্নকে খুঁজে বেড়াল তিন গোয়েন্দা।
কোন চিহ্ন পেল না।
বিকেলে বাড়ি ফিরে কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিয়ে আবার বেরোনোর জন্যে তৈরি হলো ওরা।
দল বেঁধে বেরিয়ে পড়ল মেহমানেরা। পাহাড়ের ভেতরে নদীর ধারে ছোট এক চিলতে খোলা জায়গায় ক্যাম্পিঙের ব্যবস্থা হয়েছে।

উফ, এক্কেবারে ব্যথা হয়ে গেছে শরীর, ঘোড়ার পিঠ থেকে বেডরোল নামাতে নামাতে বলল রবিন। টেনে নামাল জিনটা। সারাটা দিন ঘোড়ার পিঠে থেকে থেকে একেবারে শেষ হয়ে গেছি।
হাসল মুসা। বাড়ি গিয়ে একবারে ঘুমিও। এখানে মজার জন্যে এসেছ মজা। লোট। রাতে পাহাড়ে কাটানর মজাই আলাদা। আগুনের ধারে বসে সাওয়ারডো বিস্কুট খাওয়া, গল্প করা, তারপর কম্বলের তলায় গুটিসুটি হয়ে পড়ে থেকে নানারকম শব্দ শোনা, নিশাচর পাখি আর জন্তু জানোয়ারের ডাক, বাতাসের। ফিসফিসানি, নদীর কূলকুল….
বাপরে! একেবারে কবি হয়ে গেলে দেখি?
মালপত্রগুলো নিয়ে গিয়ে মাটিতে ছড়িয়ে থাকা পাইন নীডলের ওপর রাখল দুজনে। কিশোরও তারটা নিয়ে গিয়ে রাখল ওদেরগুলোর পাশে। আশেপাশে জটলা করে রয়েছে পাইন গাছ।
এজটার পরিবার আর কয়েকজন মেহমানকে নিয়ে ক্যাম্প সাজায় লাগল ব্রড। কাপলিংকে নিয়ে তিন গোয়েন্দা আগুন জ্বালানোর জন্যে শুকনো কাঠ জড় করতে লাগল।
মিসেস ব্যানার সাফ মানা করে দিল, কোন কাজ করতে পারবে না। একটা গাছের গুঁড়িতে গিয়ে বসে বলল, আমি এখানে এসেছি আরাম করতে, কাজ করতে নয়।
এটা কাজ নয়, ঘোড়া বাধতে বাঁধতে বলল লুক, মজা।
থাকো, হাত উল্টে জবাব দিল মিসেস ব্যানার, ওরকম মজার আমার দরকার নেই।
মুচকি হাসল রবিন। নিচু গলায় বলল, স্বামী বেচারাকে নিশ্চয় জ্বালিয়ে খায় মহিলা।
মাথা থেকে চাপড় মেরে একটা মাছি তাড়াল মুসা। বলল, মহিলা ঠিকই। করছে। কে যায় অত কাজ করতে?
তাহলে গিয়ে বসে থাক মহিলার সঙ্গে..
মিসেস ব্যানার বলছে, জঙ্গলের মধ্যে রাত কাটান! দূর! ভাল লাগবে বলে মনে হয় না। আছে তো যত হতচ্ছাড়া জিনিস, বোলতা, মাছি, মশা, কয়োট! ঈশ্বরই জানে, আরও কি কি আছে!
মুখ তুলে রবিন বলল, অনেক কিছু আছে। কুগার, ভালুক, নেকড়ে।
মুসা বলল, যা খুশি থাকুক। হাতি-গুণ্ডার থাকলেও আপত্তি নেই আমার, ভূত না থাকলেই হল…
বলে কি! আঁতকে উঠল মহিলা, ভূতও আছে নাকি! বাপরে! তাহলে বাপু আমি এখানে নেই! সারারাত চোখের পাতা এক করতে পারব না!

হেসে আবার নিচু গলায় মুসাকে বলল রবিন, যাও, একজন দোসর পেলে।
তাড়াতাড়ি কিশোর বলল, আরে না না, ভূত বলে কিছু নেই। অহেতুক ভয় পাচ্ছেন…
তুমি কিচ্ছু জান না, রেগে গেল মহিলা। কিশোর যে ওদের মানিব্যাগ চুরি করেছে, কথাটা ভুলতে পারেনি মিসেস ব্যানার। সেই যে সেবার, গিয়েছিলাম আমাদের বাড়ির কাছের এক বনে, রাতে থাকতে। তারপর…
হয়েছে কাজ! বলল কিশোর, শুরু হল এবার ভূতের গল্প। চলো, পালাই।
সবাই মিলে কাজ করল, মিসেস ব্যানার ছাড়া। ক্যাম্প করল, আগুন জ্বালল, রান্না করল। ডিনারের পর বাসনপেয়ালা কে ধোবে এটা নিয়ে কথা উঠল। সমাধান করে দিলেন মিস্টার এজটার। টস করা হোক। টসে তাঁরই ওপর দায়িত্ব পড়ল ধোয়ার। কিছুই মনে করলেন না তিনি। শার্টের হাতা গুটিয়ে কাজে লেগে গেলেন। নিজের ইচ্ছেতেই স্বামীকে সাহায্য করতে গেলেন জেনি এজটার।
থালাবাসন ধুতে ভালই লাগে আমার, কিশোরের চোখে চোখ পড়তেই হেসে বললেন মহিলা।
খাওয়ার পরেও কাজ আছে অনেক। সেগুলো করতে লাগল সবাই। বলা বাহুল্য এবারেও মিসেস ব্যানার কিছু করলেন না। রেগে গিয়ে মুসা বলল, বেটিকে খেতেই দেয়া উচিত হয়নি।
চুপ! শুনবে! থামিয়ে দিল ওকে রবিন।
বনের ভেতর লম্বা হতে লাগল ছায়া। গিটার বের করল ব্রড। সাঁঝের গান ধরল ঘরেফেরা পাখিরা, শান্ত একটানা সুরে কুলকুল করে চলেছে পাহাড়ী নদী। গাছের ডালে ডালে ফিসফিস করে গেল একঝলক হাওয়া। গোধূলির আকাশে প্রথম তারাটা মিটমিট করতে দেখল কিশোর।
রাত নামল। আগুনের লাল আলো বিচিত্র ছায়া সৃষ্টি করল। চাঁদ উঠল একটু পরেই। উজ্জ্বল জ্যোৎস্নার বন্যায় ভেসে গেল যেন বন, পাহাড়, নদী। মুসার মনে হতে লাগল, ডালপাতার ফাঁকফোকর দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে গলে পড়ছে হলুদ আলো।
আরেক কাপ করে কফি সরবরাহ করা হল, আর কেরোলিনের তৈরি চমৎকার ওটমিল কুকির একটা করে প্যাকেট।
যাই বল, রাতটা বড় সুন্দর, কফিতে চিনি মেশাতে মেশাতে বলল মুসা। আসনপিড়ি হয়ে বসেছে আগুনের ধারে।
কয়েক মিনিট পরে হাতমুখ ধোয়ার জন্যে আঁকাবাকা বুনো পথ ধরে নদীতে চলল কিশোর আর মুসা। সাথে টর্চ নিয়েছে কিশোর। আগে আগে নেচে নেচে চলেছে তার টর্চের আলো।

হঠাৎ আলো নিভিয়ে দিয়ে মুসার বাহুতে হাত রাখল সে। চুপ থাকার ইঙ্গিতটা। বুঝতে পারল গোয়েন্দা সহকারী। দাঁড়িয়ে গেল দুজনেই। শব্দ করল না।
গাছের ফাঁক দিয়ে দেখল ওরা, একটা মেয়ের সঙ্গে কথা বলছে ব্রড জেসন। ডালের ফাঁক দিয়ে এসে পড়া জ্যোৎস্নায় মেয়েটার চুল রুপালি লাগছে। বেনি কুপারকে চিনতে অসুবিধে হলো না ওদের। এখানে কি করছে সে? তাকে আসতে দাওয়াত করা হয়নি।
মুসার হাতে আলতো চাপ দিয়ে পা টিপে টিপে এগোল কিশোর। পাইন। নীডল ঢেকে দিল তার জুতোর শব্দ। কান খাড়া করে আছে। কিন্তু ক্যাম্পের কথাবার্তা আর নদীর গুঞ্জনে দুজনের কথা ঠিকমত শুনতে পেল না। বেনির বলা কয়েকটা শব্দ বুঝতে পারল, হারিকেন, রোডিও।
বেশি ভাবছ, ব্রড বলল। বেনির কাঁধ চাপড়ে দিল।
দম বন্ধ করে রেখে আরও কয়েক পা এগোল কিশোর। গাছের আড়াল থেকে সামনে মাথা বের করে দিল। ...আমার খারাপ লাগতে শুরু করার আগেই চলে যাও, ব্রডের কথা শোনা গেল। আর দাঁড়াল না সে। গাছপালার ভেতর দিয়ে ছুটে চলে গেল।
বেনির পিছু নিল কিশোর। আশা করল, ইউনিকনের কাছে তাকে নিয়ে যাবে। মেয়েটা। ওটার পিঠে চড়েই এল নাকি?
নদীর সরু অংশে একটা গাছ পড়ে আছে আড়াআড়ি, সাঁকো তৈরি করে দিয়েছে। সেটা দিয়ে নদী পেরিয়ে ওপারে চলে গেল বেনি। ইউনিকর্ন নয়, অন্য একটা ঘোড়া নিয়ে এসেছে সে। সেটার পিঠে চেপে রওনা হয়ে গেল ওদের র‍্যাঞ্চটার দিকে।
আবার মুসার কাছে ফিরে এল কিশোর।
কিছু দেখলে? জানার জন্যে অস্থির হয়ে আছে মুসা।
তেমন কিছু না। কথাও ঠিকমত শুনতে পারলাম না। তবে যা মনে হল, অনেক কথা চেপে রেখেছে ব্রড আর বেনি। রোডিও খেলা আর হারিকেনকে নিয়ে। আলোচনা করছিল ওরা।
জানতাম! যত শয়তানী ওদেরই।
প্রমাণটমাণ থাকলে এখন ধরতে পারতাম, নিজেকেই যেন বলল কিশোর।
ক্যাম্পে ফেরার পথে দেখা হয়ে গেল রবিনের সঙ্গে। ওদের দেরি দেখেই দেখতে আসছিল কিছু হলো কিনা। বলল, লুক আমাকে পাঠিয়েছে দেখার জন্যে।
চলতে চলতে সব কথা তাকে জানাল কিশোর।
পাইক আর নিরেকের ব্যাপারটা কি তাহলে? রবিনের প্রশ্ন। ওরাও কি ব্রড আর বেনির সঙ্গে জড়িত? নাকি ওদের সঙ্গে এরা দুজন গিয়ে হাত মিলিয়েছে?

জানি না, আসলেই কিছু বুঝতে পারছে না কিশোর। ওই ঘোড়া চুরির ব্যাপারে হয়ত কিছুই জানে না পাইকেরা। ব্রড আর বেনিই করেছে।
তবে মোটিভ দুই দলেরই আছে। হতে পারে, না জেনেই একদল আরেক। দলের সাহায্য করে চলেছে।
এর মানে, মুসা বলল, ব্রড আর বেনি দুজনেই চাইছে লিলি রোডিওতে যোগ দিতে না পারুক, যাতে বেনির জেতাটা নিশ্চিত হয়…
কিংবা নিরেক আর পাইক চাইছে, রবিন বলল, গোলমাল বাধিয়ে দিয়ে লিলিকে সরাতে, যাতে র‍্যাঞ্চটা ওরা দখল করতে পারে।
কিশোর কিছু বলছে না। চিমটি কাটছে নিচের ঠোঁটে।
ওদেরকে দেখে লুক বলল, অনেক দেরি করে ফেললে। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইল চোখে সন্দেহ নিয়ে। তারপর বলল, রাত হয়েছে। এবার শুতে যাও।
স্লীপিং ব্যাগটা যেখানে রেখেছিল সেখানে পেল না কিশোর। টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে খানিক দূরে, গাছের জটলার ভেতরে। আশ্চর্য! বিড়বিড় করল
কি? জিজ্ঞেস করল মুসা।
আমার স্লীপিং ব্যাগ। মালপত্র থেকে খুলে নিয়ে গিয়ে ওখানে ফেলে রেখেছে।
ভুলে নিজের মনে করে কেউ খুলেছিল হয়ত। চলো, নিয়ে আসি।
চলো।
ব্যাগ তোলার জন্যে হাত বাড়িয়েই থমকে গেল কিশোর। পরিচিত একটা শব্দ। তবে কোথায় শুনেছে ঠিক মনে করতে পারছে না। ছোট ছোট নুড়ি থলেতে রেখে ঝাঁকালে যেমন শব্দ হয় অনেকটা তেমনি।
ধুকধুক করছে তার বুক। কি আছে ব্যাগের ভেতরে? খুব সাবধানে ব্যাগটা খুলে দুই কোণ ধরে উপুড় করল, ঝাঁকি দিল জোরে জোরে।
ভেতর থেকে পড়ল একটা সাপ। মাটিতে পড়েই হিসহিস করে ফণা তুলল। ছোবল মারার জন্যে। মারাত্মক বিষাক্ত র‍্যাটল স্নেক।

.
চেঁচিয়ে উঠল মুসা।
ছুটে এল ব্রড। কি হয়েছে? চেঁচাও কেন?
ব্যাগটা সাপটার ওপর ছুঁড়ে মারল কিশোর। বলল, সাপ!
কি?
সাপ ঢুকিয়ে দিয়েছে আমার ব্যাগে।
ঝনঝন আওয়াজটা শুনতে পাচ্ছে ব্রড। তাড়াতাড়ি একটা লাঠি কুড়িয়ে এনে ব্যাগ তুলে সাপটাকে মারতে লাগল। তারপর জিজ্ঞেস করল, ঢুকল কি করে?

কি হয়েছে? এত চেঁচামেচি কিসের? ঘোড়াগুলোকে যেখানে বাঁধা হয়েছে, সেখানে শুয়েছিল লুক, পাহারা দেয়ার জন্যে। দৌড়ে এল।
কিশোরের স্লীপিং ব্যাগে সাপ।
অবাক মনে হলো লুককে। সাপ? কে ঢোকাল? এটা কি ধরনের রসিকতা?
যেন দোষটা কিশোরেরই, সে-ই ঢুকিয়েছে। কে ঢুকিয়েছে কি করে বলব? ব্যাগটা সরিয়ে নিয়েছে, তারপর সাপ ঢুকিয়ে ওখানে ফেলে রেখেছে।
অসম্ভব...
আর একটা মিনিটও আমি থাকছি না এখানে! পেছন থেকে বলে উঠল মিসেস ব্যানার। র‍্যাঞ্চে ফিরে যাব।
এত রাতে? লুক বলল, কে নিয়ে যাবে?
তার আমি কি জানি? আমি থাকব না। তুমি র‍্যাঞ্চের ফোরম্যান, মেহমানদের দেখাশোনা করা তোমার দায়িত্ব। আমি কোন কথা শুনতে চাই না, এই জঙ্গল। থেকে বেরোতে চাই।
বেশ, লুক বলল, যেতে আপত্তি নেই আমার। তবে যে ভয়ে আপনি যেতে চাইছেন, বনের ভেতর দিয়ে এখন যাওয়ার সময় এরকম ভয় অনেক পড়বে পথে। আরও বড় বড় ভয়ও আছে। পুরো দুটো ঘণ্টা লাগবে বন থেকে বেরোতেই। ভেবে দেখুন, থাকবেন, না যাবেন?
ঢোক গিলল মিসেস ব্যানার। ভয়ে ভয়ে তাকাল চারপাশের বনের দিকে। চাঁদের আলো আছে বটে, কিন্তু গাছপালার ভেতরে প্রচুর ছায়া। বোধহয় ভূতের ভয়েই গায়ে কাটা দিল তার। কাঁপা গলায় বলল, ঠিক আছে, কষ্ট আর দিলাম না তোমাকে। থেকেই যাই।
অনেকেই উঠে এসেছে। সবাইকে বলল লুক, আবার ব্যাগে ঢোকার আগে। ভাল করে দেখে নেবেন। একটা যখন ঢুকছে আরও ঢুকতে পারে।
টর্চ জ্বেলে ভাল করে যার যার ব্যাগ দেখে নিতে লাগল সবাই। কারও ব্যাগেই কিছু নেই। থাকবে কি, এইমাত্র বেরিয়ে এসেছে ওরা ভেতর থেকে।
রবিন আর কিশোরের মাঝখানে শুয়ে চোখ মুদল কিশোর। ঘুমানোর চেষ্টা করল। কিন্তু আসতে চাইছে না ঘুম। মাথার মধ্যে ঘুরছে অসংখ্য প্রশ্ন। কে রাখল সাপটা? ব্রড? নাকি বেনি? এত লোকের চোখ এড়িয়ে কিভাবে রাখল? কখন?

.

পরদিন সকালে আর নতুন কিছু ঘটল না। নাস্তা সেরে র‍্যাঞ্চে ফিরে চলল দলটা। মুসা, রবিন আর কিশোর ঘোড়া নিয়ে কাছাকাছি রইল। মুসা বলল, নদীটায় গোসল করার ইচ্ছে ছিল। চলো না, ফিরেই যাই। একাই র‍্যাঞ্চে ফিরতে পারব। আমরা।

কিশোর বলল, পরে। অনেক সময় পাবে গোসলের। আগে ইউনিকর্নকে খুঁজে বের করতে হবে। মনে হচ্ছে, সমস্ত চাবিকাঠি রয়েছে ব্রডের কাছে।
র‍্যাঞ্চে ফিরে ঘোড়া রেখে ঘরে ফিরে এল তিন গোয়েন্দা, গোসল করে পরিষ্কার হওয়ার জন্যে। হারনি পাইকের ব্যাপারে খোঁজ নিতে যেতে চায় কিশোর, বলল সেকথা। রবিন বলল, তাহলে সে-ও যাবে শহরে। লাইব্রেরিটা দেখার জন্যে।
মুসাও ওদের সঙ্গে যেতে চাইল। কিন্তু কেরোলিনের অনুরোধে তাকে সাহায্য করার জন্যে থেকে যেতে হল ওকে।
লিলির পিকআপটা চেয়ে নিল কিশোর। ভয়ে ভয়ে গাড়িতে উঠল সে আর রবিন। তবে এবার আর কোন অসুবিধে হলো না। গাড়িটাকে নষ্ট করার জন্যে কোন কৌশল করে রাখেনি কেউ।
ছোট শহরের প্রধান রাস্তাটার পাশেই পাকা বাড়িটা। সামনের পার্কিং লটে গাড়ি রাখল কিশোর।
রবিন বলল, আমি ভেবেছিলাম হারনি পাইকের ওপর থেকে সন্দেহ চলে গেছে তোমার।
শিওর হয়ে নিতে তো আপত্তি নেই, গাড়ির চাবি পকেটে রাখতে রাখতে বলল কিশোর। আমার ধারণা, ব্রড কোনভাবে জড়িত আছেই। আরও অনেকে থাকতে পারে, আর পাইকের যেহেতু মোটিভ আছে, তারও থাকার সম্ভাবনাটা উড়িয়ে দেয়া যায় না। লুকের ভাবসাব দেখে তো তাকেও সন্দেহ হয়। তবে তার কোন মোটিভ খুঁজে পাই না।
এয়ার কণ্ডিশন করা লাইব্রেরি। পুরানো সংবাদপত্র আর মাইক্রোফিল্ম করা খবর ঘেঁটে ঘেঁটে পাইকের সম্পর্কে অনেক কথা জানতে পারল ওরা। বেশ কয়েকটা আর্টিকেল করা হয়েছে তাকে নিয়ে। মনটানার উন্নতি কিভাবে করতে চায় সে, সে কথা ফলাও করে লেখা হয়েছে যতভাবে সম্ভব। তবে পড়েটড়ে মনে হল লোকটা মোটামুটি পরিষ্কার। বদনাম নেই। কিছু লোকে অবশ্য পছন্দ করে না, এটা ঠিক।
আবার সেই দেয়াল, চোখের নিচে ডলতে ডলতে বলল রবিন। এগোনোর পথ বন্ধ।
মনে তো হচ্ছে, কিশোর বলল। তবে নিজে গিয়ে কিছু না করলেও টাকা খাইয়ে অন্যকে দিয়ে করাতে পারে। ইউনিকর্নকে চুরি করাতে পারে, গাড়িটা উড়িয়ে দিতে পারে, আমার ব্যাগে সাপ ঢুকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করতে পারে।
ব্রডকে দিয়ে?
মাথা ঝাঁকাল কিশোর। কিংবা ওরকম অন্য কেউ। তবে দুজনকে একসাথে দেখিনি একবারও, সেজন্যেই ঠিক মেলাতে পারছি না। ধাতব ফাইল কেবিনেটে মাইক্রোফিলুগুলো আবার রেখে দিল সে। চিন্তাগুলো জট পাকিয়ে রয়েছে

মাথায়, ছাড়াতে পারছে না। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার। পাইককে বাদ দিয়ে দিলে নিরেককেও দিতে হয়। তাহলে বাকি থাকে ব্রড আর বেনি।
ওরা দুজন একসাথে করছে এসব ভাবছ?
করতেই পারে। দুটো বইয়ের তাকের মাঝখান দিয়ে এগোতে এগোতে থমকে দাঁড়াল কিশোর। এক মিনিট, বলে এস লেখা একটা ভলিউম টেনে বের করল।
কি চাইছ?
কাল রাতের সাপটার কথা মনে নেই? পাতা ওল্টাতে লাগল কিশোর।
সে কি আর ভুলি নাকি?
ওটার ব্যাপারেই খচখচ করছে মনে।
রবিনও তাকাল বইটার দিকে।
র‍্যাটল স্নেক খুঁজে বের করল কিশোর। অনেক জাতের রয়েছে, বিড়বিড় করে পড়ল সে, ডায়মণ্ড ব্যাক, টিম্বার স্নেক, সাইডউইণ্ডার। একই প্রজাতির সাপের মধ্যেও আবার পুব অঞ্চল আর পশ্চিম অঞ্চলের সাপে তফাত রয়েছে।
যাই হোক, রবিন বলল, আমাদের ইনি এসেছিলেন একটা রাজ পরিবার থেকে।
চকচক করছে কিশোরের চোখের তারা। দুদিকে চাপ দিয়ে ঝটাৎ করে বন্ধ করল বইটা। বুঝলাম!
বলে ফেলো, শুনি?
আমাদের সাপটা এই অঞ্চলের নয়, রবিন। মনে পড়ে, কিভাবে পাশে লাফ দিয়ে দিয়ে চলছিল? ওটা মরুভূমির সাপ! রবিনের চোখে চোখে তাকাল কিশোর, মিস্টি ক্যানিয়নে মরুভূমি নেই।
ভুরু ওপরে উঠে গেল রবিনের। বেশ, ধরলাম এটা একটা সূত্র। কিন্তু তাতে কি?
এখুনি কিছু বলতে পারছি না। তবে জবাবটা বের করতে হবে। লাইব্রেরির শীতল পরিবেশ থেকে বেরিয়ে আসতেই গায়ে ঝাঁপটা মারল যেন গরম। গাড়িতে উঠল ওরা। ঠিক মিলছে না, বুঝলে। ঘোড়ার ওপর যথেষ্ট মায়া ব্রডের। সে জেনেশুনে ইউনিকর্ন কিংবা হারিকেনের ক্ষতি করবে, এটা বিশ্বাস হয় না।
ফিরে চলল দুজনে। একটা মোড়ের কাছে এসে ডাবল সির দিকে না গিয়ে আরেক দিকে ঘুরল কিশোর।
এই, কোথায় যাচ্ছ? রবিনের প্রশ্ন।
বেনি কুপারের সঙ্গে কথা বলতে।
বলবে?
দেখাই যাক না। না গেলে জানব কি করে?
ডাবল সির সঙ্গে কুপার র‍্যাঞ্চের অনেক পার্থক্য। প্রথমটা রাত হলে এটা দিন, এতটাই অন্য রকম। সমস্ত বাড়ি নতুন রঙ করা। মূল বাড়িটা ধবধবে সাদা,

অন্যগুলো রেডউড কাঠের রঙ। বিকেলের রোদে ঝলমল করছে। থাম আর জানালার খড়খড়ি সব সবুজ রঙের।
জায়গা বটে, মৃদু শিস দিতে লাগল রবিন।
চত্বরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অনেক গাছ। ওগুলোর ছায়ায় কাজ করছে। শ্রমিকেরা। মেহমানরা ঘোরাফেরা করছে। বাচ্চারা খেলছে, হাসছে। মুরগীর রোস্টের গন্ধে খিদের কথা মনে পড়ে গেল কিশোরের।
বাপরে বাপ! গাড়ি থেকে নামতে নামতে রবিন বলল, এরকম জায়গা ছেড়ে লিলির ফকিরা র‍্যাঞ্চে কেন থাকতে যাবে লোকে?
মূল বাড়ির সদর দরজায় গিয়ে বেল বাজাল কিশোর। খুলে দিল রুক্ষ হচেহারার ধূসরচুল এক পঞ্চাশ বছর বয়েসী মহিলা। নিজের পরিচয় দিল এলিনা কুপার বলে, বেনির ফুফু। দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। জিজ্ঞেস করল, কি চাই?
বেনির সঙ্গে কথা বলব, কিশোর বলল।
ওর বন্ধু, নাকি ভক্ত?
আসলে, আমরা ডাবল সির মেহমান। ইউনিকর্নকে খুঁজে বের করতে আমাদের অনুরোধ করেছে লিলি।
ঘোড়াটা পালিয়েছে শুনছি, ঠোঁট বাঁকাল মহিলা। হবেই এরকম। ওরকম একটা পাগলা ঘোড়া কি আর আটকে থাকে বেশিদিন। কিন্তু বেনিকে কেন? ও তো কিছু জানে না। ঘড়ি দেখল এলিনা। চলে আসবে।
কোথায় গেছে?
তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিশোরের মুখের দিকে তাকাল মহিলা। প্র্যাকটিস করতে। আলাদা নিরালা জায়গায় গিয়ে করে সে। র‍্যাঞ্চের গণ্ডগোল পছন্দ করে না। ইচ্ছে নেই তবু যেন জোর করেই বলল, চাইলে ভেতরে বসতে পারো?
বেনির আব্বার সঙ্গে কথা বলা যাবে?
ভ্রূকুটি করল এলিনা। শহরে গিয়েছিল, এল কিনা বলতে পারছি না। এক কাজ কর। অনেক হ্যাণ্ড আছে, ওদের কারও কাছে খোঁজ নাও।
থ্যাংকস, বলে কিশোর সরে আসার আগেই তার মুখের ওপর দরজাটা লাগিয়ে দিল মহিলা।
অল্প বয়েসী একটা স্ট্যাবল বয়কে ধরল দুই গোয়েন্দা। বেড়া মেরামত করছে। বেনির আব্বার কথা কিশোর জিজ্ঞেস করলে সে হাত তুলে লম্বা, নিচু চালাওয়ালা। একটা বাড়ি দেখিয়ে বলল, চিড়িয়াখানায় আছে।
চিড়িয়াখানা? রবিনের প্রশ্ন।
হ্যাঁ, সাপখোপ পোষে তো, ছেলেটা বলল। তোমরা শোনোনি? যেতে চাইলে যাও, তবে বাইরে থাকবে। আজ যেন কেউ না ঢোকে মানা করে দিয়েছেন। মিস্টার

কুপার।
চট করে রবিনের দিকে তাকাল কিশোর। আবার ছেলেটার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, কেন?
হাত ওল্টাল ছেলেটা, জানি না। ফোরম্যান আমাদেরকে জানিয়ে দিল, শুনলাম, ব্যস। তোমরা ঘরে গিয়ে বস। মিস্টার কুপার বেরোলে আমি বলব।
আচ্ছা।
রবিনকে নিয়ে র‍্যাঞ্চ হাউসে ফিরে যাওয়ার ভান করল কিশোর। যেই ছেলেটা আরেক দিকে ফিরল অমনি লুকিয়ে পড়ল একটা বাড়ির আড়ালে। তারপর বেড়ার আড়ালে আড়ালে দুজনে এগিয়ে চলল চিড়িয়াখানার দিকে।
মরুভূমির র‍্যাটলস্নেক নিশ্চয় রাখে না এখানে, কি বলো? রবিনের দিকে তাকিয়ে বলল বটে কিশোর, কিন্তু প্রশ্নটা করেছে নিজেকেই।
চলো, গেলেই দেখতে পাব।
আস্তে করে ঠেলা দিয়ে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়ল কিশোর। পেছনে রবিন। এগিয়ে চলল কাচের বাক্সগুলোর পাশ দিয়ে। বিচিত্র সব প্রাণী ওগুলোর ভেতরে। সাপ, শিংওয়ালা ব্যাঙ, গিরগিটি, কচ্ছপ আর মরুভূমির কয়েক ধরনের ইঁদুর জাতীয় জীব। পেছনে আচমকা হিসহিস শব্দ হতেই থমকে দাঁড়িয়ে গেল কিশোর। দেখল, ছোট একটা গিলা মনস্টার তাকিয়ে রয়েছে তার দিকে।
এই, দেখে যাও, হাত তুলে ডাকল রবিন। একটা কাচের বাক্স দেখাল। খালি। ভেতরে কে বাস করত নেমপ্লেট দেখেই বোঝা যায়। মরুভূমির একটা র‍্যাটলস্নেক।
খুলে গেল দরজা। দড়াম করে গিয়ে বাড়ি লাগল দেয়ালে। রেগে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন কুপার, যাও, ভাগ! লাল হয়ে গেছে মুখ। কে ঢুকতে বলেছে? একটা সাপ ছুটে গেছে, কখন কামড়ে দেয়...
আমি জানি, শান্তকণ্ঠে জবাব দিল কিশোর। কাল রাতে আমার স্লীপিং ব্যাগের ভেতরে পেয়েছি ওটাকে।
হাঁ হয়ে গেলেন কুপার। এই সময় কিশোরের নজরে পড়ল তার কোমরের বেল্টে রূপার বাকলস, হারিকেনের স্টলের বাইরে যে জিনিস দিয়ে বাড়ি মারা হয়েছিল তাকে, সে রকম। জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় পেয়েছ?
ক্যাম্পিঙে গিয়ে কিভাবে সাপটাকে পেয়েছে কিশোর, সব খুলে বলল, কেবল বাদ রাখল ব্রডের সঙ্গে বেনির গোপন সাক্ষাৎকারের কথাটা।
চুপ করে সব শুনলেন কুপার। সন্দেহ যাচ্ছে না। জিজ্ঞেস করলেন, সত্যিই পেয়েছ? রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছলেন তিনি।
পেয়েছি।
ঘাড় লাল হয়ে গেছে কুপারের। তোমার ব্যাগে গেল কি করে?

নিশ্চয় কেউ নিয়ে ঢুকিয়ে দিয়েছে। এমন কেউ, সাপ নাড়াচাড়া করার অভ্যাস আছে যার।
দ্বিধায় পড়ে গেলেন কুপার। জবাব দিতে অস্বস্তি বোধ করছেন। তাহলে আর কে হবে? আমার র‍্যাঞ্চের অনেকেই সাপ নাড়াচাড়া করে। কিন্তু প্রতিটা লোককে চোখ বুজে বিশ্বাস করতে পারি আমি। ব্রড় যাওয়ার পর থেকে সামান্যতম গোলমালও হয়নি আর।
ব্রড জেসনের কথা বলছেন?
শক্ত হয়ে গেল কুপারের চোয়াল। ওটা একটা ক্রিমিন্যাল। চাকরি থেকে বের করে দিয়েছিলাম তো, প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ খুঁজছে। আমার যাতে দোষ হয়, সেজন্যে নিয়ে গিয়ে সাপ ঢুকিয়ে দিয়েছে ডাবল সির মেহমানের ব্যাগে।
অনেকেই তাহলে সাপ নাড়াচাড়া করে এখানে? কুপারের চোখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে রবিন।
করেই তো। সাপে কামড়ালে কি করতে হয় তা-ও জানে। জানতে হয়, কারণ র‍্যাটলের বিষ মারাত্মক।
কয়েক দিনের মধ্যে এখানে ঢুকেছিল ব্রড? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
মাথা খারাপ! কালো হয়ে গেল কুপারের মুখ। এখানে আর তাকে পা রাখতে দিই আমি। নিলে চুরি করে নিয়েছে।
শুনেছি আপনার মেয়ে বেনির সঙ্গে তার খাতির ছিল। এখনও আছে?
আরে দূর! যখনই বুঝে গেছে ব্যাটা একটা চোর, অমনি সরে এসেছে। ব্রডটা। তো ওর সঙ্গে খাতির করেছে সম্পত্তির লোভে, জানে তো, সবই একদিন বেনির হবে। লাভ হল না। ওরকম একটা চোরের জন্যে কোন দুর্বলতা থাকতে পারে না। বেনির। তাছাড়া এখন ওসব মন দেয়ানেয়ার সময়ও নেই ওর। রোডিও নিয়ে। ব্যস্ত। জিততে পারলে অনেক সুবিধে। বিজ্ঞাপন এমনকি ছবিতে অভিনয় করারও সুযোগ পাবে, একটা জাতীয় রোডিও সফরে যেতে পারবে।
তার মানে জেতাটা তার জন্যে খুব জরুরী, বিড়বিড় করল কিশোর।
খুবই। ওর জীবনই বদলে দেবে এটা, গর্বের সাথে বললেন কুপার। রবিন আর কিশোরকে নিয়ে চললেন বাইরে। পশ্চিমের পাহাড়ের ওপরে যেন ঝুলে রয়েছে সূর্যটা, তাকালেন সেদিকে। ভাবছি, এখনই যাব ডাবল সিতে। সাপের দাম চাইতে। দেখি, লুক বোলান কি বলে?
কিছু বলল না রবিন কিংবা কিশোর। সাপের দাম চাইবেন কি চাইবেন না সেটা কুপারের সমস্যা। ওরা এগোল পিকআপের দিকে।
তাহলে বোঝা যাচ্ছে ব্রডই আমাদের লোক, নিচু স্বরে বলল রবিন।
হয়তো।

গাড়িতে উঠে ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে রওনা হলো কিশোর। খোয়া বিছানো পথ থেকে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, এক বোতল কোক খেলে কেমন হয়?
চমৎকার।
গলা শুকিয়ে গেছে দুজনেরই। কাজেই ডেরিক লংম্যানের দোকানে এসে দুই বোতল কোক কিনল। গলা ভিজিয়ে নিয়ে ফিরে চলল ডাবল সিতে।
কিশোর বলল, ব্রড যদি সত্যিই বেনিকে চায়, তাহলে জিততে সাহায্য করবে।
কেন? জিতলে তো চলে যাবে বেনি, হারাবে তাকে ব্রড।
তাতে কি? মনের মিল থাকলেই হয়। ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে পড়বে ব্রডও, চলে যাবে বেনির সাথে। ভালই হবে। কুপারের আওতা থেকে সরে যেতে পারবে। এমনও হতে পারে, বেনি গিয়ে তার সাহায্য চেয়েছে। ব্যস, সাহায্য করছে সে। কিশোরের দিকে তাকাল রবিন, হয় না এরকম?
হাসল কিশোর, হয়।
ডাবল সিতে ঢোকার মুখে কুপারের গাড়িটা বেরোতে দেখল ওরা। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় হাত নাড়লেন তিনি। তবে হাসি নেই, মুখ কাল করে রেখেছেন।
নিশ্চয় ভাল কিছু হয়নি? রবিনের প্রশ্ন।
মনে তো হচ্ছে না, সামনের রাস্তার দিকে তাকিয়ে জবাব দিল কিশোর। সে ও গাড়িটা পার্ক করল, ডিনারের ঘন্টাও বাজল।
উফ, খিদে যে পেয়েছে বুঝতেই পারিনি, রবিন বলল।
আমিও না। র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে এগোল দুজনে। সিঁড়ি দিয়ে উঠছে এই সময় দরজা খুলে ছুটে বেরোল মুসা। রক্ত সরে গেছে মুখ থেকে। চেঁচিয়ে উঠল, তোমরা এলে! ইউনিকর্ন! ইউনিকর্ন!
ইউনিকর্ন? জিজ্ঞেস করল কিশোর, কি হয়েছে ওর?
রান্নাঘরের দরজার নিচে একটা নোট পেয়েছে লিলি। তাতে লেখা হয়েছে...
লিলি কোথায়?
ওপরে। ঘরে।
একটা মুহূর্ত আর দেরি করল না কিশোর। দৌড় দিল। একেক লাফে দুতিনটে করে সিঁড়ি ডিঙিয়ে উঠতে লাগল। পেছনে রয়েছে রবিন আর মুসা। জানালার চৌকাঠে লিলিকে বসে থাকতে দেখল ওরা। তাকিয়ে রয়েছে মাঠের দিকে। কাঁধ ঝুলে পড়েছে। হাতে একটুকরো সাদা কাগজ।
তিন গোয়েন্দার সাড়া পেয়ে মুখ ফেরাল সে। কিশোরের চোখে পড়তে বলল, তুমি ঠিকই অনুমান করেছ। চুরিই করেছে। হাতের কাগজটা দলামোচড়া করে ফেলল।
কিন্তু আমার এত বড় সর্বনাশ করলটা কে?
কিছুটা আন্দাজ করতে পারি আমি, জবাব দিল কিশোর।

কাগজটা কিশোরের হাতে দিল লিলি।
খুলল কিশোর। টাইপ করে লেখা রয়েছে, লিলি, ইনডিপেনডেন্স ডে রোডিওতে তুমি যোগ দিতে গেলে মারা যাবে ইউনিকর্ন। তোমার ঘোড়া আমিই চুরি করেছি, গাড়িতে বাজি রেখে পুড়িয়ে দিয়েছি। তারমানে ঘোড়াটাকে মারতে যে আমার হাত কাঁপবে না বুঝতেই পারছ।
দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল কিশোর। লিলি, ব্রড জেসনের ব্যাপারে কতখানি জানেন আপনি?
বড় বড় হয়ে গেল লিলির সবুজ চোখ। ব্রড এতে জড়িত নয়।
সেটা জোর দিয়ে বলতে পারেন না। এমন কেউ ইউনিকর্নকে চুরি করেছে যে এই র‍্যাঞ্চের সব কিছুই চেনে। যে আপনার গাড়ি ব্যবহারের সুযোগ পায়।
সে রকম তো অনেকেই আছে এই র‍্যাঞ্চে।
সেই অনেকে কি জ্যান্ত ব্যাটলস্নেক নাড়াচাড়া করতে পারে? বাজি বিশেষজ্ঞ? আমার ব্যাগে যে সাপটা পাওয়া গেছে ওটা বনের সাপ নয়, মরুভূমির। নিয়ে আসা হয়েছে কুপারের চিড়িয়াখানা থেকে। কুপারের ধারণা, ব্রডই চুরি করেছে।
দাঁতে দাঁতে ঘষল লিলি। এইমাত্র গেল কুপার। সাপের দাম চাইতে এসেছিল। সোজা ভাগিয়ে দিয়েছে তাকে লুক। কুপারকে দুচোখে দেখতে পারে না। অনেকটা শান্ত হয়ে এসেছে লিলি। ওর ধারণা, ডাবল সিতে গোলমাল লাগানর মূলে ওই কুপার র‍্যাঞ্চ।
আপনার কি ধারণা?
কাকে দায়ী করব বুঝতে পারছি না। তবে ইউনিক আব্বাকে ফেলে দেয়ার পর অনেকগুলো অঘটন ঘটেছে এই র‍্যাঞ্চে।
আরেকবার নোটটা পড়ল কিশোর। ব্রডকে চাকরি দেয়ার পর থেকে অঘটনগুলো ঘটতে শুরু করেনি তো? ভাল করে ভেবে দেখুন।
না। ব্রডকে আমার সন্দেহ হয় না।
কিন্তু ওর ক্রিমিন্যাল রেকর্ড রয়েছে, রবিন বলল। চুরি করত।
এখন করে না। ইউনিকের ক্ষতিও করবে না। এই র‍্যাঞ্চের জন্যে ও একটা বিরাট সাহায্য। ভাল হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে সে।
কিন্তু ঘোড়াটাকে নিয়ে প্রচুর আজেবাজে কথা বলেছে সে, রবিন বলল।
ও কিছু না। বাবাকে পিঠ থেকে ফেলে দিয়েছে বলে রাগ। তাই বলে পছন্দ করে না এটা ঠিক নয়। উঠে দাঁড়িয়ে কিশোরের হাত থেকে নোটটা নিল লিলি। আরেকবার পড়ল। আমাকে খুন করার চেষ্টা সে কেন করবে?
গাড়ি পুড়িয়ে দেয়ার কথা বলছেন তো? কিশোর বলল, করেছেহয়তো বেনিকে সাহায্য করার জন্যে। আপনাকে ঠেকাতে চাইছে যাতে রোডিওতে যোগ দিতে না

পারেন, যাতে বেনির প্রতিদ্বন্দ্বী হতে না পারেন। আপনি গেলে তার হেরে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি।
মাথা নাড়ল লিলি, বুঝতে পারছি না কি করব?
আর, যাই করেন, রোডিওতে যোগ না দেয়ার চিন্তা করবেন না। এখন বলুন, র‍্যাঞ্চে টাইপরাইটার আছে?
একটা। তবে নোটের লেখা আর ওটার লেখা এক নয়। হরফ মেলে না।
নোটটা নিয়ে গিয়ে ডেপুটি হ্যারিসন ফোর্ডকে দেখান। ইউনিকর্নের চুরির ব্যাপারটা সিরিয়াসলি নিতে পারে এবার।
আবার বাজল ডিনারের ঘণ্টা। মুসা বলল, চলো, আমার খিদে পেয়েছে।
আমার খিদে নষ্ট হয়ে গেছে, লিলি বলল। তোমরা যাও। একটু পরেই আসছি। কেরোলিন আন্টিকে চিন্তা করতে মানা করো।
করিডরে বেরিয়ে রবিন বলল, করতে মানা করলেই কি আর চিন্তা করা বন্ধ করে দেবেন। উদ্বেগ নিয়েই যেন জন্মেছেন মহিলা, সবার জন্যেই খালি চিন্তা।
বোনপোর কথা শুনুক আগে, মুসা বলল, তারপর দেখবে চিন্তা কাকে বলে। সত্যি, ব্রডটা যে কেন একাজ করতে গেল। ভীষণ কষ্ট পাবেন মহিলা। আরও বেশি কষ্ট লাগবে চাকরিটা তিনিই দিয়েছেন বলে।
কিশোর কিছু বলল না। চুপচাপ এসে ঢুকল ঘরে। বাথরুমে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে এল। কাপড় পাল্টাল। চুল আঁচড়াল। কি যেন মনে পড়ি পড়ি করেও পড়ছে না ওর। ঠিক করল, খাওয়ার পর ভাবতে বসবে। প্রথম থেকে যা যা ঘটেছে সব খতিয়ে দেখবে। বোঝার চেষ্টা করবে কোন ব্যাপারটা মিস করেছে। যদি তা-ও বুঝতে না পারে, সরাসরিই গিয়ে ব্রডকে বলবে তার সন্দেহের কথা।

.

খাওয়ার পরে সবাইকে শান্ত দেখা গেল। কেউ আয়েশ করে চেয়ারে হেলান দিল, কেউ ঢেকুর তুলল, কেউ বা খিলাল দিয়ে দাঁত খোঁচাতে লাগল। কেবল কিশোরই অস্থির। উসখুস করছে আর বারবার জানালা দিয়ে তাকাচ্ছে মিস্টি ক্যানিয়নের দিকে। ওখানে, ওখানেই কোথাও নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখা হয়েছে ইউনিককে। ব্রড হয়ত জানে, কোথায়।
এমন কিছু কি আছে বাঙ্কহাউসে কিংবা ট্যাক রুমে যা ওর চোখ এড়িয়ে গেছে? থাকলে, গিয়ে খুঁজে বের করার এটাই সুযোগ। রবিনকে একধারে নিয়ে। গিয়ে তার পরিকল্পনার কথা বলল। তারপর উঠে এল ওপরে। একটা স্টেটসন হ্যাট মাথায় বসিয়ে, টর্চ হাতে বেরিয়ে এল। নিঃশব্দে পেছনের সিঁড়ি দিয়ে নেমে রান্নাঘরের ভেতর দিয়ে চলে এল চত্বরে।

আকাশে মেঘ জমেছে। গায়ে লাগল ঠাণ্ডা বাতাস। দ্রুতপায়ে বাঙ্কহাউসের দিকে এগোল সে। কাছে এসে টোকা দিল দরজায়, ভেতরে কেউ আছে কিনা জানার জন্যে। সাড়া পেল না।

দম বন্ধ করে আস্তে ঠেলা দিয়ে খুলে ফেলল পাল্লা।

বড় একটা স্লিপিং রুম, একটা বাথরুম আর লকার রয়েছে বাঙ্কহাউসে। লকারগুলোতে আলো ফেলল। কাগজে নাম লিখে লিখে লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। ওগুলোর পাল্লায়, কার কোনটা বোঝানোর জন্যে। একটাতে দেখা গেল ব্রড জেসনের নাম। হ্যাঁণ্ডেল ধরে টান দিল কিশোর। জোরে ক্যাচকোচ করে খুলে গেল পাল্লা।

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লোকটার জিনিসপত্র দেখতে লাগল সে। সন্দেহজনক আর কিছুই পেল না, একটা রূপার বাকলসওয়ালা বেল্ট বাদে। এক বাণ্ডিল চিঠিপত্র আর কাগজ দেখে সেগুলোতে চোখ বোলাল। এমনকি বুটের ভেতরেও খুঁজল। কিছু পেল না।

লকারের দরজা লাগিয়ে দিয়ে বাঙ্কহাউস থেকে বেরিয়ে এল কিশোর। বাড়ির দিকে তাকাল, চত্বরে চোখ বোলাল। কাউকে দেখতে পেল না। তাকে না পেয়ে খোঁজাখুঁজি চলছে এরকম কোন লক্ষণও নেই। লিভিং রুমের জানালা দিয়ে মেহমানদের দেখা যাচ্ছে। পাতাবাহারের একটা বেড়ার আড়ালে চলে এল সে। বেড়াটা চলে গেছে ট্যাক রুমের কাছে। আড়ালে থেকে এগিয়ে চলল।

জানালা নেই ট্যাক রুমের। বাতাসে চামড়া আর তেলের গন্ধ। ঝুলিয়ে রাখা। জিনিসগুলোর ওপর আলো ফেলল সে। কোন কিছু অস্বাভাবিক লাগছে না, কিছু খোয়া গেছে বলেও মনে হচ্ছে না। ব্রডের ঘোড়ায় চড়ার সরঞ্জামগুলো খুঁজে কিছু পেল না।

হতাশ হল কিশোর। ঘড়ি দেখল। আধ ঘন্টা হয়েছে বেরিয়েছে। আর বেশি দেরি করা যাবে না, তাহলে কেউ লক্ষ্য করে বসবে যে অনেকক্ষণ ধরে সে নেই ওদের মাঝে। খোঁজ পড়তে পারে।

ভাবতে ভাবতেই গিয়ে মেডিক্যাল কেবিনেট খুলল সে। প্রতিটি টিউব আর শিশি-বোতলের লেবেল পড়তে লাগল। যদি কিছু পেয়ে যায়, এই আশায়। কিন্তু এখানেও নিরাশ হতে হলো তাকে।

কিন্তু আছেই, নিজেকে বোঝাল সে, থাকতেই হবে। না থেকে পারে না। নইলে হারিকেন অস্বাভাবিক আচরণ করল কেন? আরেকবার ভাল করে দেখতে গিয়ে একটা শিশির গায়ে চোখ আটকে গেল। আগের বার খেয়াল করেনি। একটা পারঅক্সাইডের বোতলের ওপাশে রাখা হয়েছে। লেবেল দেখার জন্যে বের করতে গেল ওটা, এই সময় পেছনে শোনা গেল বুটের শব্দ।

আরেকটু হলেই হাত থেকে ফেলে দিয়েছিল শিশিটা। লেবেল দেখার সময় নেই। পকেটে রেখে দিল। সাথে করে নিয়ে যাবে। টর্চ নিভিয়ে দিল সে। দেয়ালের গায়ে সেঁটে গেল, চোখে না পড়ার জন্যে। নিঃশ্বাস ফেলতেও ভয় পাচ্ছে। আওয়াজটা কোথায় হলো? ট্যাক রুমের ভেতরে, না বাইরে?
ধক ধক করে লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ড। কি মনে হতে আস্তে করে ঘুরে তাকাল দরজার দিকে। বিশালদেহী একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে, ছায়ামূর্তির মত। হাত তুলল লোকটা।
দম আটকে গেল যেন কিশোরের। লোকটার হাতে একটা চাবুক। এগিয়ে আসতে শুরু করল, যেন জানে কোথায় লুকিয়ে আছে কিশোর।
ঝট করে বসে পড়ল সে। শপাং করে উঠল লোকটার হাতের চাবুক। বাতাস কেটে বেরিয়ে গেল কিশোরের মুখের কাছ দিয়ে।

.

লোকটার মুখে টর্চের আলো ফেলল কিশোর। ব্রড জেসন।
কে তুমি? বলতে বলতেই হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিল ব্রড। কিশোর? সত্যি সত্যি অবাক মনে হলো তাকে। এখানে কি করছ?
হারিকেনের মেজাজ যে খারাপ করানো হয়েছে তার প্রমাণ খুঁজছি।
আবার? তা তো খুঁজবেই। গোয়েন্দা যে তুমি একথাটা ভুলেই যাই।
টিটকারিটা গায়ে মাখল না কিশোর। চাবুকটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস কর, এটা নিয়ে এখানে কি কাজে এলেন?
রাগ কিছুটা গলে গেল ব্রডের। তুমি ঢুকেছ, বুঝতে পারিনি। ভাবলাম, ব্যানারদের চোরটা ঢুকেছে। চুপি চুপি ঢুকতে দেখলাম তো। তবে, বাড়ি লাগাতে চাইলে ঠিকই লাগাতে পারতাম। মিস করেছি ইচ্ছে করেই। সেটা প্রমাণ করার জন্যেই আলোটা নিভিয়ে দিল সে। আরেকবার হিসিয়ে উঠল চাবুক। বন্ধ হয়ে গেল মেডিসিন কেবিনেটের দরজা।
আবার আলো জ্বেলে বুকে আড়াআড়ি হাত রেখে দাঁড়াল মাইক। তুমি জানলে আসতাম না। কিন্তু অযথা খুঁতখুঁত করছ। ঘোড়াটা চুরি হয়নি।
হয়নি? লোকটার চোখে চোখে তাকিয়ে এক কদম আগে বাড়ল কিশোর, তাহলে ইউনিকর্নের কি হয়েছে বলে আপনার ধারণা?
পালিয়েছে।
আপনি কিছু করেননি?
শক্ত হয়ে গেল ব্রডের চোয়াল। তার মানে আমাকে বিশ্বাস করতে পারছ না তুমি। ভাবছ, যেহেতু একসময় চুরি করতাম, স্বভাবটা এখনও ভাল হয়নি। অকাজ। কুকাজ এখনও করে বেড়াই। ভুল করছ। আর দশজন সৎ কর্মীর মতই কাজ

করি। আমি এখানে। ইউনিককেও চুরি করিনি, হারিকেনকেও ওষুধ খাওয়াইনি। কেনই বা করব এসব কাজ?
লিলি যাতে রোডিও জিততে না পারে, সেজন্যে।
কিসের জন্যে? ভুরু কুঁচকে গেল ব্রডের। তোমার কথা বুঝতে পারলাম না। আমি তো চাই লিলি জিতুক।
তাতে যদি বেনি হেরে যায় তাহলেও?
জ্বলে উঠল ব্রডের চোখ। আঙুল শক্ত হলো চাবুকের হাতলে। তুমি ভাবছ লিলিকে স্যাবটাজ করছি আমি?
করছেন না? বেনির জন্যে?
দেখো, অনেক ভুল করেছি জীবনে, আর করতে চাই না। বেনির জন্যে দুর্বলতা আছে আমার, অস্বীকার করছি না। কিন্তু জিততে হলে বেনিকে নিজের ক্ষমতায় জিততে হবে। নিজের বুকে থাবা দিয়ে বলল ব্রড, আমিও রোডিও রাইডার। আমি বিশ্বাস করি, ষড়যন্ত্র করে এসব খেলায় কিছু হয় না। যদি ক্ষমতা থাকে, লিলিকে হারাতে পারবেই বেনি।
বেনিও কি তাই মনে করে?
ওকে নিয়ে আলোচনা করতে চাই না আমি। আরেক দিকে তাকিয়ে বলল ব্রড।
দরজার কাছে চলে এল কিশোর। বেনির জন্যে ইনডিপেনডেন্স ডের রোডিও কতটা জরুরী?
ঢোক গিলল ব্রড। অনেক।
কেন?
সেটা তোমার জানার দরকার নেই।
আছে। একটা নোট এসেছে লিলির কাছে। তাতে লেখা হয়েছে সে ওই দিন। রোডিওতে যোগ দিলে ইউনিকর্ন মারা যাবে।
নিরেকের কাজ হতে পারে। কিংবা পাইকের। দুটো শয়তানই তো মেয়েটাকে জ্বালিয়ে মারছে, বলতে সামান্যতম দ্বিধা করল না ব্রড।
মাথা নাড়ল কিশোর। ওরা আমার ব্যাগে সাপ রাখতে যায়নি। সাপ। নাড়াচাড়া করতে পারে কিনা ওরা সে ব্যাপারেও আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। গাড়ির নিচে বাজি রাখার সুযোগও ওরা পায়নি।
কিন্তু বেনিই বা কি ভাবে...? থেমে গেল ব্রড। কাঁধ ঝুলে পড়ল। তুমি হভাবছ আমি করেছি? তোমাকে খুন করার চেষ্টা করেছি?
বেনিকে সাহায্য করার চেষ্টা করছেন।
অবাক কথা শোনালে।
তাহলে বোঝান, বেনির জন্যে এই রোডিও কেন এত জরুরী?

বড় বড় হয়ে গেল ব্রডের নাকের ফুটো। বেশ। তাহলে বাপের থাবা থেকে বেরিয়ে যেতে পারবে, মুক্তি পাবে। বিজ্ঞাপনে, সিনেমায় অভিনয় করতে পারবে। রোডিও পুরস্কার হিসেবেই পাবে অনেক টাকা। কেন জরুরী, সেটা বোঝা কি এতই শক্ত?

বাবার সঙ্গে বেনির সম্পর্ক খারাপ নয়, কিশোর অন্তত সে রকম কিছু দেখেনি, সে কথা ভেবেই বলল, টাকার কি দরকার? বাপের তো অনেক টাকা আছে। একমাত্র সন্তান হিসেবে বেনিই সব পাবে।

পাবে তো ঠিক, পুতুল হয়েও থাকতে হবে। যা করতে বলবে কুপার, তাই করতে হবে ওকে। নিজের কোন ইচ্ছে থাকবে না, ভালমন্দের বিচার থাকবে না। এভাবে কি গোলামি করা যায় নাকি?

আপনাকে নিয়েও নিশ্চয় বেনির নিজস্ব ইচ্ছে আছে?

অবশ্যই আছে।

বাপের থাবা থেকে বেরোতে নিশ্চয় সব করতে রাজি বেনি? রেসের ঘোড়া

সব নয়, কিশোর, ভুল করছ। নিজের এবং বাপের সুনাম নষ্ট হয় এরকম কিছুই করবে না সে। তুমি কি ইঙ্গিত করছ বুঝতে পারছি। বিশ্বাস না হলে বেনিকেই গিয়ে জিজ্ঞেস কর। এই তো, মিনিট দশেক আগেও আমার সাথে ছিল।

অবাক হলো কিশোর। উদ্বিগ্নও। যত বার বেনি ডাবল সিতে ঢুকেছে, একটা না একটা অঘটন ঘটেছে। কোথায়?

লেকের ধারে। চুরি করে আমার সাথে দেখা করতে আসে। আমার সাথে ওর মেলামেশা কুপারের পছন্দ নয়। অনেক বলা হয়েছে, আর বলার ইচ্ছে নেই, একথা ভেবেই যেন গটমট করে কিশোরের পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল ব্রড। বাইরের খোয়ায় তার বুটের চাপে খচমচ শব্দ হলো।

আলো নিভিয়ে দিয়ে এল কিশোর। দরজা দিয়ে বাইরে তাকাতে চোখে পড়ল। আকাশ ঢেকে গেছে মেঘে। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। জ্যাকেটের কলার তুলে দিয়ে দৌড় দিল সে, লেকের দিকে। ওখানে পৌঁছে বেনিকে পেল না।

ফিরে এল আবার। বাড়ির পেছনের সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল ওপরে, লিলির ঘরে। বালিশে পিঠ দিয়ে বসে আছে লিলি। পকেট থেকে ছোট শিশিটা বের করল কিশোর। অর্ধেক ভরা। এটা হারিকেনকে খাওয়ালে কি ঘটবে বলুন তো?

লেবেল পড়ে লিলি বলল, ঘুমিয়ে পড়বে। এটা ডিপ্রেসেন্ট। খুব কমই। ব্যবহার করতে হয়। কোন কারণে ঘোড়া খেপে গেলে কিংবা ব্যথায় অস্থির হয়ে উঠলে খাইয়ে দেয়া হয়। শান্ত হয়ে যায় তখন।

বোধহয় কিশোরের সাড়া পেয়েই ঘরে ঢুকল মুসা। এত দেরি করলে। আমি আর রবিন তো ভাবনায়ই পড়ে গিয়েছিলাম। আর পাঁচ মিনিট দেখতাম, তারপর

খুঁজতে বেরোতাম। ওর হাতে একটা আপেল। গেঞ্জিতে সেটা মুছে নিয়ে কামড় বসাল।
উজ্জ্বল হয়ে গেল কিশোরের চোখ। চিৎকার করে বলল, মুসা, এক্কেবারে ঠিক সময়ে আপেলটা নিয়ে হাজির হলে!
বোকা হয়ে গেল মুসা। মানে?
আপেলে করেই ওষুধ খাওয়ান হয়েছে ইউনিকর্নকে। আধ খাওয়া একটা আপেল দেখেছি ওর স্টলে। পরদিন গিয়ে দেখি ওটা নেই।
আরে বুঝিয়ে বল না! হাত তুলল মুসা। চোখের কোণ দিয়ে দেখল রবিনও ঢুকছে। বলছ তো উল্টো কথা। ইউনিকনের মেজাজ খারাপ হয়নি, হয়েছে। হারিকেনের। ইউনিকর্ন চুরি হয়েছে।
প্রচণ্ড উত্তেজনায় কাঁপছে তখন কিশোর। একটা ভুল করেছি আমি। ইউনিকর্ন চুরি হয়নি, হয়েছে হারিকেন। কেউ একজন বেরোতে সাহায্য করেছে। ঘোড়াটাকে। তারপর তার পিঠে চেপে চালিয়ে নিয়ে গেছে। ইউনিকর্নের পিঠে কেউ চাপতে পারে না, কিন্তু হারিকেনের পারে। সে রাতে এই ওষুধ খাওয়ানো। হয়েছিল ইউনিকর্নকে, শিশিটা দুই সহকারীকে দেখাল কিশোর।
কোটর থেকে বেরিয়ে আসবে যেন লিলির চোখ। তারমানে আমি সে রাতে। ইউনিকর্নের পিঠে চড়েছিলাম! এই জন্যেই ফেলে দিয়েছিল ঝাড়া মেরে!
হ্যাঁ, হঠাৎ করে হারিকেনের মেজাজ খারাপ দেখা যাওয়ার জবাবও এটাই, মাথা দুলিয়ে বলল রবিন।
কিশোর বলল, আমার বিশ্বাস বেনিই একাজ করেছে, লিলির দিকে তাকাল সে, আপনাকে থামানোর জন্যে অদলবদল করে রেখেছিল ঘোড়াদুটোকে, একটার স্টলে আরেকটাকে ঢুকিয়ে রেখেছিল।
বেনি? বিড়বিড় করল লিলি, বিশ্বাস করতে পারছি না!
ওর মোটিভ আছে, সুযোগও ছিল। ক্যাম্পিং করেছি যে রাতে সে রাতে বনের মধ্যে ব্রডের সঙ্গে দেখেছি ওকে। সাপটা নিশ্চয় সে-ই এনে ছেড়ে দিয়েছিল আমার। ব্যাগে। ব্যানারদের জিনিস যেদিন চুরি হয় সেদিনও বেনি এখানে এসেছিল।
বারবিকিউতেও ছিল, মুসা বলল।
আজও ব্রডের সাথে দেখা করতে এসেছিল। দরজার নিচে নোটটা ফেলে রেখে যেতে পারে সে, রবিন বলল।
কিন্তু বাজি রেখে গাড়ি পোড়াতে পারে না, প্রশ্ন তুলল লিলি।
ব্রড তাকে সাহায্য করে থাকতে পারে, মুসা বলল। আর বেনিরও না পারার কোন কারণ তো দেখি না।

তোমরা তাহলে এখনও সন্দেহ করো তাকে?
না করার কোন কারণ নেই, কিশোর বলল। বরং করার পক্ষেই যথেষ্ট কারণ আছে।
ঠিক, রবিন বলল। কিশোর, একটা ব্যাপার বুঝলাম না। তুমি বলছ, হারিকেন আর ইউনিকর্নকে বদল করে ফেলা হয়েছে। তাহলে তফাতটা বুঝলাম না কেন আমরা? হারিকেনের খুরের কাছে না সাদা লোম আছে?
ওরকম সাদা সহজেই করে দেয়া যায়, হাসল কিশোর। পারঅক্সাইড ওষুধ। খাইয়ে ইউনিকর্নকে শান্ত করেছে বেনি, তারপর তার পায়ের লোম সাদা করেছে। সেজন্যেই ঘোড়াটার স্টলের কিছু কিছু খড় সাদাটে লেগেছে। ঘোড়ার পায়ে ঢালতে গিয়ে খড়ে পড়ে গিয়েছিল পারঅক্সাইড।
তার পর, কিশোরের মনের কথাগুলোই যেন পড়ছে রবিন, হারিকেনকে বের করে নিয়ে গিয়ে ওর স্টলে ঢোকানো হয়েছে ইউনিকর্নকে।
এবং সবাই মনে করেছে, যোগ করল কিশোর, হারিকেনেরই মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে।
বেশ, চলো, বালিশ সরিয়ে বিছানা থেকে নামল লিলি। আমি দেখলেই বুঝব, সত্যিই আসল সাদা, না পারঅক্সাইড দিয়ে করা হয়েছে।
চলুন, কিশোর বলল। শিওর হয়ে নিয়ে বেনির সঙ্গে গিয়ে কথা বলব। আমার ধারণা, ডাবল সির আশেপাশেই কোথাও আছে সে।
চলো। এসব সত্যি হলে বেনিকে আমি ছাড়ব না। জ্বলে উঠল লিলির সবুজ চোখ।
পেছনের সিঁড়ি দিয়ে নেমে চত্বরে বেরোল চারজনে। বাতাস বেড়েছে। ফোঁটা, ফোঁটা বৃষ্টিও পড়ছে।
আকাশের এক প্রান্ত চিরে দিয়ে গেল বিদ্যুতের শিখা। বিকট শব্দে বাজ পড়ল। পাহাড়ের মাথায়। আস্তাবলের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল লিলি। সুইচ টিপে আলো জ্বালল। হারিকেনের স্টলের দিকে তাকিয়েই থমকে গেল। অস্ফুট একটা শব্দ বেরোল মুখ থেকে।
স্টলটা খালি!
পাক দিয়ে উঠল কিশোরের পেট।
এবার? রবিনের জিজ্ঞাসা।
স্টলের কাছে দৌড়ে গেল কিশোর। তার ওপাশের আস্তাবল থেকে বেরোনোর দরজাটা খোলা। জোর বাতাসে দড়াম করে বাড়ি খেল পাল্লা। ঝটকা দিয়ে খুলে গেল আবার। বাইরে ঝমঝম করে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। বৃষ্টির ছিটে এসে ভিজিয়ে দিতে লাগল কংক্রীটের মেঝে।

এই দরজা দিয়েই ইউনিকর্নকে বের করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বুঝতে অসুবিধে হলো না কারও।

.

এটাও গেল? বিড়বিড় করতে করতে দেয়ালে হেলান দিল লিলি। দাঁড়িয়ে থাকার জোর পাচ্ছে না যেন।

বেশিক্ষণ হয়নি, কিশোর বলল। দরজাটা লাগিয়ে দিয়ে ফিরে তাকিয়ে দেখল আরেকটা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে ব্রড় জেসন। ওকে বলল সে, ইউনিকর্ন আর হারিকেন দুটোকেই চুরি করেছে বেনি।

হারিকেনের খালি স্টলটার দিকে তাকাল ব্রড়। কি বলছ?

লিলি বলল, কিশোরের ধারণা, ঘোড়াদুটোকে অদলবদল করা হয়েছিল। হারিকেনকে নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল, বেনি, ইউনিকর্নকে হারিকেনের স্টলে ঢুকিয়ে রেখে। যেটাকে হারিকেন ভাবা হয়েছে আসলে সেটা ছিল ইউনিকর্ন।

অসম্ভব! দুটো ঘোড়ার স্বভাবই আলাদা!

কিশোর যা বলেছে সব ব্রডকে খুলে বলল লিলি। শেষে বলল, কিশোর বলছে, এসবে তুমিও জড়িত আছ।

ওকে আগেই বলেছি আমি এসবে নেই, জোর গলায় বলল ব্রড়। বেনিও নেই।

বেশ, তাহলে প্রমাণ করুন, এগিয়ে এল কিশোর। কোথায় ঘোড়া লুকিয়ে রেখেছে বেনি, আন্দাজ করার চেষ্টা করছে সে। চলুন, ঘোড়াগুলোকে বের করে আনি।

বলতে দ্বিধা করল না ব্রড়, চলো।

গুড। এবার বলুন তো, বেনির প্রাইভেট কোরালটা কোথায়? যেখানে সে প্র্যাকটিস করে?

কিশোরের চোখের দিকে তাকিয়ে এই বার দ্বিধা করল ব্রভ। বেনি রাগ করবে। আমি ওকে ঘোড়ার কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম, ও বলেছে দেখেনি।

প্র্যাকটিস কোথায় করে? ব্রডের কথার গুরুত্বই দিল না কিশোর।

আবার দ্বিধা করল ব্রড। মিস্টি ক্যানিয়নের পশ্চিম ধারে। পাহাড়ের ভেতরে। একটা প্রাকৃতিক ঘের রয়েছে, একেবারে বেড়া দেয়া কোরালের মতই।

ওদিকটায় তো গিয়ে খুঁজে এসেছে লুক, কিশোরকে জানাল লিলি, পায়নি। বেনির সাথেও কথা বলেছে…

শুনল না কিশোর। ব্রডকে জিজ্ঞেস করল, ঘোড়া রাখার কোন জায়গা আছে ওখানে? ঘরটর?

খড়ের একটা ছাউনি শুধু, ব্রড জবাব দিল। তবে দুটো ঘোড়া সহজেই জায়গা হয়ে যাবে।

রবিন বলল, হয়তো ভেতরে লুকিয়ে রেখেছিল হারিকেনকে বেনি। লুকের লোকেরা খেয়াল করেনি। কিংবা কল্পনাই করতে পারেনি বেনি নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখবে। অনুমতি ছাড়া প্রাইভেট এলাকায় ঢুকে বিপদে পড়তে চায়নি।
শোনো… বলতে গিয়ে বাধা পেল ব্রড।
কিশোর তাকে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, সেখানে কি করে যেতে হয়?
তুমি পারবে না। রাস্তা নেই। ঝড়বাদলার রাত। খুঁজেই পাবে না।
ও ঠিকই বলেছে, লিলি বলল কিশোরকে। পাহাড়গুলো তো আমি চিনি। এমন রাতে যাওয়াই মুশকিল। বনের ভেতর দিয়ে, পাহাড়ের ঢাল বেয়ে, নদীর ধার দিয়ে যেতে হয়।
কোন নদী? জানতে চাইল কিশোর, যেটার কাছে গিয়ে হারিকেনকে হারিয়ে যেতে দেখেছি?
হ্যাঁ। ওটার কাছ থেকে মাইল দুয়েক দূরে একটা খড়িমত আছে, ওখানেই।
আর কিছু জানার নেই আমার। বলেই রবিনের দিকে ঘুরল কিশোর, শেরিফের অফিসে ফোন করো। বলবে এখানে আর কুপার র‍্যাঞ্চে যেন অফিসার পাঠান।
তুমি কি করবে? জিজ্ঞেস করল ব্রড।
আমি যাচ্ছি বমাল চোর ধরতে। মুসার দিকে তাকিয়ে বলল কিশোর, মুসা, চলো জলদি।
ওদের পিছে পিছে এল লিলি। কিশোর, দাঁড়াও। এখন যাওয়াটা ঠিক হচ্ছে না। ওই পাহাড়গুলোকে তোমরা চেনো না। সাংঘাতিক বিপদে পড়বে।
বিপদকে ভয় করলে চোর ধরতে পারব না। তাছাড়া এরকম কাজ করে অভ্যাস আছে আমাদের। আকাশ চিরে দিল বিদ্যুৎ শিখা। সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে কিশোর বলল, এমনিতেই হয়ত দেরি হয়ে গেছে। ঘোড়াসহ চোর ধরতে না পারলে আর তাকে ধরা যাবে না। প্রমাণও করতে পারব না কিছু। এই একটাই সুযোগ আমাদের।
আস্তাবলে ঢুকল কিশোর আর মুসা। যার যার ঘোড়ায় জিন পরাতে লাগল। আগেরগুলোই নিল, কিশোরের জেনারেল উইলি, মুসার ক্যাকটাস। বেল্টের বাকলস আঁটতে আঁটতে কিশোর বলল, তাড়াতাড়ি করতে হবে আমাদের। একটাই ভরসা, ইউনিকনের পিঠে চড়তে পারবে না চোর। যতই ওষুধ খাওয়ানো হোক।
ইউনিকর্নকে মেরেটেরে ফেলবে না তো?
কিছুই বলা যায় না। রাশ ধরে টেনে জেনারেলকে বাইরে নিয়ে এল। কিশোর। পিঠে চেপে বসল।

প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে ছুটল দুই ঘোড়সওয়ার। আগে আগে চলেছে কিশোর, হাতে টর্চ। মুসার কাছেও টর্চ আছে, কিন্তু জ্বালছে না। তেমন প্রয়োজন না পড়লে জ্বালবে না। অহেতুক ব্যাটারি খরচ করতে চায় না।
বৃষ্টি ভেজা মাঠ পেরিয়ে বনে ঢুকল দুটো ঘোড়া। বনের ভেতরে ঘুটঘুঁটে অন্ধকার। চেনা পথ, তবুও ভুল হয়ে যেতে চায়। এসব কাজে মুসা কিশোরের চেয়ে পারদর্শী। কাজেই এখন আগে আগে চলল সে।
গাছের ডালে শিস কেটে যাচ্ছে বাতাস। পাহাড়ের ঢালে উঠে কয়েকবার করে। পা পিছলাল দুটো ঘোড়াই। বন পেরিয়ে খোলা জায়গা। চলে এল ওরা সেই শৈলশিরাটায়, যেখানে অদৃশ্য হয়েছিল হারিকেন। ঢাল বেয়ে নদীর পাড়ে নামাটাই হল সবচেয়ে কঠিন। জেনারেল উইলির মত ভাল ঘোড়াও নামতে রাজি হতে চাইল না। জোরজার করেই নামাতে হলো।
তবে নামল নিরাপদেই।
নদীর পাড়ে ঘোড়ার পায়ের তাজা ছাপ দেখে আশা বাড়ল কিশোরের। তবে পাশে মানুষের পায়ের ছাপ নেই। অবাক কাণ্ড! তাহলে কি ইউনিকনের পিঠে চড়েই গেছে? সেটা করে থাকলে মস্ত ঝুঁকি নিয়েছে। যেভাবেই যাক, তার অনুমান। ঠিক, বেনির কোরালের দিকেই গেছে চোর।
নদীর পাড় ধরে পশ্চিমে এগোল দুজনে। ঘন ঘন বাজ পড়ছে পাহাড়ের মাথায়। মুষল ধারে ঝরছে বৃষ্টি। কিশোরের মনে হলো হাড়ের মধ্যে গিয়ে ঢুকছে। ঠাণ্ডা।
নদীর কাছ থেকে সরে এল পথ। তবে চিহ্ন দেখে এগোতে তেমন অসুবিধে হচ্ছে না। বৃষ্টিতে ভিজে নরম হয়ে গেছে মাটি। তাতে স্পষ্ট বসে আছে খুরের তাজা দাগ।
ঘন বনের ভেতরে ঢুকল আবার ওরা।
হঠাৎ কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে গেল ক্যাকটাস। জেনারেল উইলি থামল তার পেছনে। নিশ্চয় কিছু আঁচ করেছে। টর্চের আলোয় কিছু দেখা গেল না। ঘোড়া। দুটোকে আবার আগে বাড়ার নির্দেশ দিল দুজনে।
তবে বেশি দূর আর যেতে হলো না। গিরিখাতের ভেতরে বেড়া আর গেট দেখা গেল। তিনপাশে পাহাড়ের দেয়াল, আরেক পাশে বেড়া দিয়ে ঘিরে কোরাল তৈরি করা হয়েছে। গাছপালা নেই ভেতরে। জানা না থাকলে জায়গাটা সহজে খুঁজে পাওয়া যাবে না, কল্পনাই করবে না কেউ এখানে এরকম একটা কোরাল রয়েছে।
আরও কাছে গিয়ে র‍্যাসিংট্রাক দেখা গেল। কিছু তেলের খালি ড্রাম রয়েছে, ব্যারেল রেসিঙে ব্যবহারের জন্যে। আর একধারে পাহাড়ের গা ঘেষে ঘন গাছের জটলার ফাঁক দিয়ে বিদ্যুতের আলোয় চোখে পড়ল খড়ের ছাউনির চালার সামান্য একটুখানি।

ফোঁস ফোঁস করছে জেনারেল। ঘোড়াটাকে আর এগোতে বলল না কিশোর। নেমে পড়ে লাগাম বাধল বেড়ার একটা খুঁটিতে। মুসাও নামল।
পা টিপে টিপে এগোল দুজনে কাদা মাড়িয়ে।
গাছগুলোর কাছাকাছি আসতেই ভেতরে শোনা গেল ঘোড়ার ডাক। আর। কোন সন্দেহ রইল না কিশোরের, ঠিক জায়গাতেই এসেছে। জোরে এক ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলে ফেলল সে। তেলচিটে গন্ধ এসে লাগল নাকে।
প্রথমেই টর্চের আলো পড়ল একটা কালো ঘোড়ার ওপর। ভেজা শরীর। টপটপ করে পানি ঝরে পড়ছে গা থেকে। ইউনিকর্ন। মুসার টর্চের আলো পড়ল আরেকটা ঘোড়ার ওপর। ওটার গা শুকনো। হারিকেন। আরও একটা ঘোড়া দেখা গেল, ওটাও পরিচিত, ওটারও গা ভেজা।
একটা ড্রামের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল একজন মানুষ।
ডেকে বলল কিশোর, আর লুকিয়ে লাভ নেই, বেনি, বেরিয়ে আসুন।
বেরিয়ে এল বেনি। পরনে সাধারণ জিন্স আর শার্ট। ঘোড়সওয়ারের পোশাক নয়, যাতে লোকের সন্দেহ হতে পারে। তবে কোমরের বেল্টটা নজর এড়াল না। কিশোরের। রুপার বাকলসওয়ালাটাই পরেছে।
মুখের পানি মুছে হেসে জিজ্ঞেস করল কিশোর, এটা দিয়েই আমাকে বাড়ি মেরেছিলেন, তাই না?
জবাব দিল না বেনি। বিমূঢ় হয়ে গেছে। চোখে ভয়। কল্পনাই করতে পারেনি এই বাদলার রাতে তার পিছু নেবে দুই গোয়েন্দা।

.

পালানর চেষ্টা করেনি বেনি। বুঝতে পেরেছে, পালিয়ে লাভ নেই। দুর্ভাগ্যটা মেনে নিল। তাকে আর চোরাই ঘোড়াদুটোকে নিয়ে ফিরে চলেছে কিশোর আর রবিন। নদীর পাড় থেকে ওপরে উঠতেই চোখেমুখে এসে পড়ল উজ্জ্বল আলো। দাঁড়িয়ে রয়েছে একদল ঘোড়সওয়ার।
রবিন এসেছে স্যাণ্ডির পিঠে চড়ে, অস্থির ভঙ্গিতে মাটিতে পা ঠুকছে ঘোড়াটা। বড় একটা ঘোড়ায় চড়ে এসেছে লিলি। ব্রড আর লুকও এসেছে ওদের সাথে। আরও একজন আছেন, ডেপুটি হ্যারিসন ফোর্ড।
ব্রড বলল, বেনি, আমি কল্পনাই করতে পারিনি... কথা আটকে গেল তার।
জবাব দিল না বেনি। পাথর হয়ে গেছে যেন। চোখ তুলে তাকাতে পারছে না।
লিলি বলল ব্রডকে, থাক, এখন আর কথা বলে লাভ নেই। বাড়ি চলো।

.

পরদিন ডাবল সিতে আবার এলেন ডেপুটি হ্যারিসন ফোর্ড। আকাশে মেঘ আছে এখনও, তবে আর বৃষ্টি হবে বলে মনে হয় না। ফাঁক দিয়ে উঁকি দিচ্ছে সূর্য। মাটি

ভেজা। বাতাস খুবই তাজা আর পরিষ্কার। সামনের বারান্দায় বসে আছে লিলি আর তিন গোয়েন্দা। লেমোনেড খাচ্ছে।
সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় উঠে চোখ থেকে সানগ্লাস খুলে নিলেন ফোর্ড। ভাবলাম, তোমাদেরকে খবরটা দিয়েই যাই। শোনার জন্যে অস্থির হয়ে আছ হয়তো। বেনিকে ধরা হয়েছে। সব কথা স্বীকার করেছে সে। ব্রড জেসন এতে জড়িত নেই।
আমি জানতাম, খুশি হলো লিলি। ও আমাকে সত্যি কথাই বলেছে।
ঘোড়াগুলোকে অদলবদল লিলি একাই করেছে, হারিকেনের পিঠে চড়ে নিয়ে গেছে, ঠিক কিশোর যা সন্দেহ করেছিল। গাড়ির নিচে বাজিও সে-ই রেখেছে, কিশোরের ব্যাগে সাপ ঢুকিয়েছে। রোজই এখানে আসত ব্রডের সাথে দেখা করতে, ওই সময়ই করেছে অকাজগুলো। ঘোড়াকে ওষুধ খাওয়ার সময় আরেকটু হলেই ওকে ধরে ফেলেছিল কিশোর, বেল্ট দিয়ে বাড়ি মেরে যদি তোমাকে বেহুশ করে না ফেলত সে।
ব্যানারদের জিনিসগুলো কে চুরি করেছিল? জিজ্ঞেস করল রবিন।
ও-ই। তোমরা সবাই তখন বাইরে ছিলে। নোটটাও সে-ই টাইপ করেছে। তার বাবার টাইপরাইটার দিয়ে। স্বীকার করেছে।
ফিলিপ নিরেক আর ডবসি কুপার তার মানে কিছুই করেনি?
গ্লাসে লেমোনেড ঢেলে বাড়িয়ে দিল লিলি। হাত বাড়িয়ে সেটা নিলেন। ফোর্ড। করেনি কথাটা ঠিক না। শয়তানী তো কিছু করেছেই লিলির সঙ্গে। তবে ঘোড়া চুরির ব্যাপারে ওদের কোন হাত ছিল না। নিরেকের ওপর ভীষণ অসন্তুষ্ট হয়েছেন ব্যাংকের ম্যানেজার। সে যেভাবে যা করছিল পছন্দ হচ্ছিল না তার। আরও অনেকের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে, কানে এসেছে ম্যানেজারের। দুএকজন গিয়ে রিপোর্টও করেছে। এমনিতেই নিরেকের ওপর একটা অ্যাকশন নিতেন ম্যানেজার, এখন তো কথাই নেই। পাইকও অনেক শত্রু তৈরি করে। ফেলেছে এই এলাকায়। শেষ পর্যন্ত টিকতে পারবে কিনা সন্দেহ। এক চুমুকে প্রায় অর্ধেক, গ্লাস খালি করে ফেললেন ডেপুটি। লিলির দিকে ফিরলেন। বেনি কুপারের বিরুদ্ধে নালিশ করতে চাও?
কাল রাতে ভেবেছি ব্যাপারটা নিয়ে, লিলি বলল। নালিশ করলেই তাকে জেলে ভরবেন। প্রতিযোগিতায় আর নামতে পারবে না। আমি চাই, ও আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হোক। জিততে পারলে জিতবে।
হাসলেন ডেপুটি। বড় বেশি আত্মবিশ্বাস মনে হয় তোমার?
কপালের ওপর এসে পড়া চুলগুলো সরিয়ে দিল লিলি। ওর সাথে একটা বোঝাঁপড়া করার ইচ্ছে আছে আমার। সেটা রোডিওতেই ভাল হবে। হারিকেনকে

ফিরে পেয়েছি যখন, আমার বিশ্বাস ভালমতই একটা মার দিয়ে দিতে পারব। সুযোগটা করে দেয়ার জন্যে কিশোরের কাছে আমি ঋণী হয়ে থাকলাম।

ভলিউম ০২৫ – কুকুর খেকো ডাইনী – তিন গোয়েন্দা – রকিব হাসান
প্রথম প্রকাশ: সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪

জুনের এক রৌদ্রোজ্জ্বল বিকেল। শক্তিশালী। একটা লাল কনভারটিবল গাড়ি চালাচ্ছে রবিন, এখানে আসার জন্যে ভাড়া নিয়েছে গাড়িটা। পাশে বসে তন্ময় হয়ে জানালার বাইরে তাকিয়ে আছে কিশোর। দু-ধারে চষা খেত। দূরে দেখা যাচ্ছে পকোনো পর্বতমালার সবুজ ঢাল। পেনসিলভানিয়া ডাচ এলাকার মধ্যে দিয়ে চলেছে ওরা।

পেছনের সীটে বসে ঝিমাচ্ছে মুসা।

হঠাৎ রসিকতার সুরে বলে উঠল রবিন, মুসা, ওই দেখো একটা। সাইনবোর্ড। ডাইনী তাড়ানোর জন্যে বসানো হয়েছে। ডাইনী আছে। এখানে।

চমকে চোখ মেলল মুসা, কই, কোথায়? দেখতে পেল নিজেই। চাষীর এক গোলাঘরের ওপর বিরাট একটা গোল জিনিস। এ রকম গোল কেন?

একে বলে হেকস্ সাইন। ডাইনী আর বজ্রপাতকে তাড়ানোর জন্যে বসানো হয়।

ডাইনী! আজকের দিনে?

কেন, ভূত যদি থাকতে পারে, ডাইনী থাকবে না কেন? কিছু কিছু ডাইনীর ক্ষমতা কিন্তু ভূতের চেয়ে বেশি, মুসাকে ভয় দেখানোর জন্যে বলল রবিন। তোমার গরুকে যদি জাদু করে দেয়, দুধ শুকিয়ে যাবে ওটার, আর দুধ দেবে না। আরও অনেক কুমন্ত্র জানে ডাইনীরা। ওসব শয়তানি যাতে না। করতে পারে সেজন্যেই বসানো হয়েছে ওটা।

ঘুম দূর হয়ে গেল মুসার চোখ থেকে। পরের দুটো গোলাবাড়ির দিকে ভয়ে ভয়ে তাকাল। নিজেকেই যেন বোঝাল, দূর, কি যে বলো, আজকাল। আর ওসব বিশ্বাস করে না কেউ! এটা বিংশ শতাব্দী। আমাকে আর ভয়। দেখানোর চেষ্টা কোরো না, বুঝলে, আমি এখন আর ডাইনী-ফাইনী বিশ্বাস। করি না।

তাই নাকি? হেসে বলল কিশোর, তাহলে ভয় পাচ্ছ কেন?

কই পাচ্ছি?

যাই বলো, আমার কাছে অদ্ভুত লাগছে ব্যাপারটা। সত্যি বলেছ, টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরিতেও হেক্স সাইন লাগায় লোকে?

খাইছে! দোহাই তোমার, কিশোর, এর মধ্যে আর রহস্য খুঁজো না তো! এই একটিবার অন্তত রক্ষা করো। এই ছুটিতে কোন গোয়েন্দাগিরি করব না আমরা, খাব-দাব আর ঘুরে বেড়াব।

শুধু ঘুরে বেড়ানোর জন্যে তোমাকে এতদূরে এত খরচ করে পাঠানো হয়েছে ভাবছ কেন?

তুমি না বললে বেড়াতে যাচ্ছি আমরা।

বেড়াতেই তো এসেছি, তবে বিনিময়ে একটা কাজ করে দিতে হবে। খামোকা কি আর কেউ কাউকে টাকা দেয়। আর আমরাই বা নেব কেন?
তা তো নেব না। কিন্তু ঘটনাটা কি খুলে বলো তো?
মিস্টার সাইমনের এক বন্ধু ক্যাপ্টেন ডেভিড রিচটনকে সাহায্য করার জন্যে পাঠানো হয়েছে আমাদের। ওই পর্বতের ভেতরে ব্ল্যাক হোলো নামে একটা জায়গায় তার কেবিন।
ক্যাপ্টেন রিচটন? কিসের ক্যাপ্টেন? সেনাবাহিনীর?
না, পুলিশের। পাঁচ-ছয় বছর আগেও পুলিশ চীফ ছিলেন। এখন রিটায়ার করেছেন।
হু, বুঝেছি, আমি একটা গাধা! মুষড়ে পড়ল মুসা, এলিয়ে পড়ল আবার পেছনের সীটে, শান্তি নষ্ট হয়ে গেছে। আর কোন কাজ নেই কিছু নেই, শুধু বেড়াতে যাওয়ার এত আগ্রহ কেন তোমার, সেটা আগেই সন্দেহ করা উচিত ছিল আমার। তোমরাও কিন্তু বলোনি আমাকে।
তুমিও তো জিজ্ঞেস করোনি। বেড়ানোর নাম শুনেই লাফিয়ে উঠেছ।
চুপ হয়ে গেল মুসা। ভিকটর সাইমন যেদিন তিন গোয়েন্দাকে তার বাড়িতে ডেকেছিলেন, সেদিন গ্যারেজে জরুরী কাজ ছিল মুসার। নিজেদের গাড়িগুলো ধুয়েমুছে সাফ করছিল। সেজন্যে যেতে পারেনি। কিশোর আর রবিন গিয়েছিল। বিকেলে খবর জানিয়েছে রবিন, আগামী দিনই নিউ জারসিতে রওনা হচ্ছে ওরা। খরচ-খরচা সব মিস্টার সাইমন বহন করবেন। বোকার মত সে ভেবেছিল, শুধু বেড়াতেই বুঝি যাওয়া হচ্ছে। তিক্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, আর কি কি জানো বলে ফেলো তো?
আর? অদ্ভুত কিছু ঘটনা ঘটছে ব্ল্যাক হোলোতে। এ কথা মিস্টার সাইমনকে লিখে জানিয়েছেন ক্যাপ্টেন রিচটন। সাহায্যের অনুরোধ করেছেন। তাঁকে। কিন্তু তিনি এখন ভীষণ ব্যস্ত, আরেকটা অত্যন্ত জরুরী তদন্ত করছেন। ব্ল্যাক হোলোতে যাওয়া এখন তাঁর পক্ষে অসম্ভব। সেজন্যেই আমাদের ডেকে পাঠিয়েছেন...
তার দায়িত্বটা আমাদের ঘাড়ে চাপানোর জন্যে!
তোমার কি খুব রাগ হচ্ছে? খোঁচা দিয়ে বলল রবিন। বলো তো ফিরে যাই। কি বলো, কিশোর?
কিশোর হাসল। তাড়াতাড়ি মুসা বলল, না না, যাওয়ার আর কি দরকার, এসেই যখন পড়েছি। তা ছাড়া এতগুলো খাবার-দাবার কিনে আনলাম। সব নষ্ট হবে।
ঝলমলে বিকেল। প্যানসিলভানিয়া ডাচের চমৎকার উপত্যকা ধরে চলছে গাড়ি। সবুজে সবুজে ছেয়ে আছে। পেছনে পড়েছে চাষের খেত। এঁকেবেঁকে ধীরে ধীরে

ওপরে উঠছে পথ, পাহাড়ের ঢালের গভীর বনের দিকে। এখানে ওখানে সবুজের মধ্যে থেকে মাথা তুলেছে ধূসর পাথরের চাঙড়।
পর্বতে ঢুকলাম, ঘোষণার মত করে বলল রবিন।
একটা শৈলশিরা পেরিয়ে এসে হঠাৎ করে নেমে গেছে পথটা, পরের পাহাড়শ্রেণীতে পৌঁছে আবার সোজা উঠেছে। সামনে তাকিয়ে আছে কিশোর। বাড়িঘর চোখে পড়ল, একটা শহর।
আচমকা কানে এসে লাগল লাউড-স্পীকারে বাজানো মিউজিক আর কথার শব্দ। কান খাড়া করে ফেলল তিনজনেই, কোথা থেকে আসছে দেখার চেষ্টা করল।
দেখে ফেলেছি! বলে উঠল মুসা। কান ও চোখের ক্ষমতা অন্য দু-জনের চেয়ে তার বেশি।
ররিন আর কিশোরও দেখল, একসারি তাঁবু। উজ্জ্বল রঙের ব্যানারে লেখা রয়েছেঃ
হ্যারিজ কার্নিভ্যাল
এই, থামো তো, মুসা বলল। এদিকের কার্নিভ্যাল দেখার শখ আমার অনেক দিনের। পপকর্নের গন্ধও পাচ্ছি। টেস্টটা দেখি কেমন।
কিশোরের দিকে তাকাল রবিন। হেসে মাথা ঝাঁকাল গোয়েন্দাপ্রধান।
গাড়ি পার্ক করে নেমে এল তিন গোয়েন্দা। কান ঝালাপালা করে ঝমঝম বাজছে মিউজিক, সেই সঙ্গে ঘোষকের চিৎকার, কোলাহল। প্রচুর দর্শকের ভিড়। বনবন ঘুরছে নানারকম নাগরদোলা, বিচিত্র ওগুলোর নাম–হুঁইপ, অকটোপাস, ম্যাড় হর্স। ওগুলোতে বসা মানুষগুলো সমানে চেঁচাচ্ছে, বাচ্চা বুড়োতে কোন ভেদাভেদ নেই। একপাশে অনেকগুলো স্টল, চিৎকার করে ক্রেতা ডাকছে মালিক আর সেলসম্যানেরা।
অন্য কোনদিকে না তাকিয়ে সোজা একটা খাবারের দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল মুসা। কিনল এক কার্টন পপকর্ন, এক ব্যাগ পানাট, একগাদা ক্যান্ডি।
একটা সাইনবোর্ড দেখিয়ে রবিন বলল, ওই ভাবুটাতে ঢুকলে কেমন হয়?
মুসা আর কিশোরও পড়ল সাইনবোর্ডটাঃ
কর্নেল ডুম হুমবা
নির্ভীক অ্যানিমেল ট্রেনার
মাশাআল্লাহ! পপকর্ন চিবাতে চিবাতে বলল মুসা, নাম বটে। জন্তুর শিক্ষক যখন, হুমবা না রেখে হামবা রাখলেই হত, গরু, মানাত ভাল।
তাঁবুর ভেতর থেকে হিংস্র জানোয়ারের ডাক শোনা গেল। তারমানে বাঘ-সিংহ জাতীয় কিছু আছে। হুমবা কতটা নির্ভীক দেখার জন্যে টিকিট কেটে ভেতরে

ঢুকে পড়ল তিনজনে। এ
গোলাকার তাঁবুর কেন্দ্রে একটা গোল জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে আঁটসাট সাদা পোশাক পরা একজন মানুষ, পায়ে গোড়ালি ঢাকা চকচকে কালো বুট। ঘন, ঝাঁকড়া কালো চুল, পুরু গোঁফ, মোটা ভুরু, তীক্ষ্ণ চোখ, হাতে কালো লম্বা চাবুক যেন কর্তৃত্ব জাহির করছে। এর দরকারও আছে, কারণ কাছেই একটু পর পর সাজানো ছোট টুলে তাকে ঘিরে বসে আছে চারটে ভয়ানক জন্তু, দুটো হলদেটে, আর দুটো কালো। চারটেই জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে। লম্বা লেজের মাথা থিরথির করে কাঁপছে, বুঝিয়ে দিচ্ছে। মানুষকে পছন্দ করে না ওরা।
পুমা, নিচু স্বরে বলল রবিন। কি বিরাট দেখেছ!
সপাং করে উঠল চাবুক। চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরছে ট্রেনারের শক্তিশালী দেহটা, প্রতিটি জানোয়ারকে টুল থেকে নেমে আবার লাফিয়ে উঠে বসতে বাধ্য করছে।
নাহ, লোকটা সত্যি নির্ভীক, প্রশংসা না করে পারল না কিশোর। যে ভাবে পেছন করে দাঁড়াচ্ছে জানোয়ারগুলোকে, ঘাড়ে লাফিয়ে পড়লে দেখতেই পাবে না।
কিন্তু ভুল অনুমান করেছে সে। একটা কালো পুমা লাফিয়ে পড়ার জন্যে তৈরি হলো। এক্কেবারে সময়মত কি করে টের পেয়ে পাক খেয়ে ঘুরে গেল ট্রেনার, হিসিয়ে উঠল চাবুক, থমকে গেল জানোয়ারটা, লাফ দেয়া আর হলো না।
খাইছে! এ তো সাংঘাতিক মানুষ! বলে উঠল মুসা।
হ্যাঁ, পাশের সীটে বসা অপরিচিত একজন দর্শক বলল, সাহস আছে। এখনও বুনোই রয়ে গেছে জানোয়ারগুলো, ওগুলো নিয়েই খেলা দেখাচ্ছে। এগুলোর সঙ্গে আরেকটা ছিল, হলুদ রঙের, এমন শয়তানের শয়তান, হুমবাও বাগ মানাতে পারেনি। একদিন আরেকটু হলেই দিয়েছিল ঘাড় মটকে, শেষমেষ ওটাকে বিদেয় করতে হয়েছে।
অবাক হয়ে হুমবার খেলা দেখল তিন গোয়েন্দা। তারপর তার প্রশংসা করতে করতে বেরোল তাঁবু থেকে। আবার চড়ল গাড়িতে।

.

দুই ঘণ্টা পর, শেষ বিকেলে খাড়া কাঁচা রাস্তা বেয়ে উঠে চলল ওপর দিকে লাল গাড়িটা। দু-পাশের বনের গোড়ায় তখন কালো ছায়া পড়েছে।
মনে হচ্ছে ঠিক পথেই যাচ্ছি, কিশোর বলল। তবু, শিওর হওয়া দরকার। ওই যে একটা বাড়ি।
বাড়িটার সামনে এনে গাড়ি থামাল রবিন। অনেক পুরানো, কাঠের তৈরি ঘর। সামনের বেড়ার রঙ উঠে গেছে বহু আগে। নীরব, নির্জন।

কেউ আছে বলে তো মনে হচ্ছে না, আশপাশটা দেখতে দেখতে বলল রবিন।
কুকুর খেকো ডাইনী
গেটের দিকে এগোল তিনজনে। হাত তুলে বাড়ির পাশে গাছপালার ভেতর দিয়ে যাওয়া একটা রাস্তা দেখাল কিশোর। ওই যে, মানুষ আছে।
রোগাটে, ছোটখাট একজন মহিলা বেরিয়ে এল গাছের আড়াল থেকে। হাত ধরে টেনে আনছে বছর সাতেকের একটা ছেলেকে। চিৎকার করে, কাঁদছে ছেলেটা। গোয়েন্দাদের দেখে এগিয়ে এল মহিলা, আমি মিসেস ভারগন। তোমাদেরকে তো কখনও দেখিনি? কি চাও?
এটা কি রিম রোড? জানতে চাইল কিশোর। ক্যাপ্টেন রিচটনের বাড়িটা খুঁজছি।
রঙ ফ্যাকাসে হয়ে আসা একটা সুতার পোশাক পরেছে মহিলা। আরেকটু এগিয়ে এসে ভালমত দেখল ছেলেদের। রিচটন? সোজা সামনে, পথের মাথার শেষ বাড়িটা। একেবারে ব্ল্যাক হোলোর কিনারে বলে আরেকবার দেখল ছেলেদের।
ছেলেটার দিকে তাকিয়ে মুসা বলল, কাঁদছে কেন ও? মন খারাপ? এই বাবু, একটা চকলেট খাবে? নাও।
কোন লাভ হবে না, মিসেস ভারগন বলল, ওর কান্না থামবে না। কাল রাতে ওর কুত্তা হারিয়ে গেছে। ওটা না পাওয়া পর্যন্ত আর কোন কিছু দিয়েই বন্ধ করা যাবে না।
তাই নাকি? দেখলে জানাব। কি কুকুর?
এই ছোট জাতের, বাদামী রঙ। একটা কান সাদা। গলায় কলার পরানো। তাতে ট্যাগে নাম লেখা আছে, ডব।
যাওয়ার জন্যে ঘুরল ছেলেরা। শুনতে পেল, ছেলেটাকে ধমক দিয়ে। মিসেস ভারগন বলছে, পটি, তুই কান্না থামাবি! মরে যাবি নাকি একটা কুত্তার জন্যে! তারপর আবার ডাকল গোয়েন্দাদের, এই, শোনো।
তা কিছুটা অবাক হয়েই ঘুরে তাকাল তিন গোয়েন্দা। গেটের কাছে এসে দাঁড়াল মহিলা। এদিক ওদিক তাকিয়ে, কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে বলল, তোমরা এখানে নতুন, বুঝতে পারছি। সাবধান করে দেয়া দরকার। ব্ল্যাক হোলোর কাছে যেয়ো না।
কৌতূহলী হয়ে উঠল কিশোর, কেন?
জায়গাটা ভাল না। ডাইনীর আসর আছে। দুশো বছর আগে এখানকার এক সুন্দরী মেয়ে ডাইনী হয়ে যায়। কুত্তা দেখতে পারত না সে, মন্ত্র পড়ে ওগুলোকে গায়েব করে দিত। তারপর কি যে করল কে জানে, জোয়ান জোয়ান মানুষগুলো হঠাৎ অসুখ হয়ে মরে যেতে শুরু করল।

ঘাবড়ে গেছে মুসা। চোখ বড় বড় করে জিজ্ঞেস করল, কেউ কিছু করতে পারল না তার?
চেষ্টা কি আর কম করেছে। লোকে ধরে আটকে রেখে দিল ডাইনীটাকে। ভাবল, এইবার শয়তানি বন্ধ হবে। কিন্তু তা কি আর হয়। একদিন উধাও হয়ে গেল সে, ঢুকে পড়ল গিয়ে ব্ল্যাক হোলোর কাছে বনে।
রাতে বেরিয়ে এসে ঘুরে বেড়াত গায়ের পথে পথে, মন্ত্র পড়ে গরুকে শুকিয়ে মারত, কুত্তা ধরে নিয়ে যেত, আর ফিরে আসত না ওগুলো। লোকের ধারণা, কুত্তা খেত ডাইনীটা। আরও যত রকমের শয়তানি আছে করত। তারপর এক রাতে ভয়ানক চিৎকার শোনা গেল। গায়ের সবচেয়ে সাহসী দু-চারজন লোক গিয়ে দেখল, একজায়গায় একটা গর্ত হয়ে আছে। মাটি পুড়ে কালো হয়ে। গেছে।
কি-ক্কি হয়েছিল! ভয়ে তোতলাতে শুরু করল মুসা।
লোকের ধারণা, স্বয়ং শয়তান বেরিয়ে এসে ডাইনীটাকে ধরে নিয়ে। গেছে মাটির তলে! ভয়ে ভয়ে আবার এদিক ওদিক তাকাল মিসেস ভারগন। এর প্রায় একশো বছর পর আবার রহস্যজনক ভাবে কুত্তা হারাতে আরম্ভ করল। গর্তটার কাছে রাতে শোনা যেতে লাগল ডাইনীর চিৎকার। যেমন হঠাৎ করে আরম্ভ হয়েছিল, কিছুদিন পর আবার হঠাৎই বন্ধ হয়ে গেল। আরও একশো বছর পর এখন আবার যখন কুত্তা হারাতে শুরু করেছে, রাতে চিৎকার শোনা যায় শোনো, তোমাদেরকে ভাল ছেলে বলেই মনে হচ্ছে আমার, সেজন্যেই সাবধান করছি, নইলে আমার কি।
নিগ্রো ছেলেটার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে যেতে দেখল মিসেস ভারগন। শ্বেতাঙ্গ ছেলেটার বিশেষ কোন ভাবান্তর হলো না। আর তৃতীয় ছেলেটার চোখ জুলজুল করছে।
বাড়ির ভেতরে টেলিফোনের শব্দ শোনা গেল।
কে আবার করল? যাই, দেখি। ভেবেছিল, ডাইনীর কথা শুনে ভয়ে একেবারে কাবু হয়ে যাবে ছেলেগুলো, সঙ্গে সঙ্গে ফিরে যাবে। হলো না। দেখে খানিকটা হতাশই হলো মহিলা। ভোতা স্বরে বলল, আমার সাবধান করা দরকার করলাম, শোনা না শোনা তোমাদের ইচ্ছে।

.

আমার রোম খাড়া করে দিয়েছে। মুসা বলল।
লো গীয়ারে গাড়ি চালাচ্ছে রবিন, ওপরের দিকে উঠছে। তুমিই না তখন বললে এই যুগে আর ডাইনী-ফাইনী বিশ্বাস করে না কেউ, তুমিও কোরো না।
কিন্তু এ জায়গাটা ভাল না। বলা যায় না, এখানে থাকতেও পারে। ঘন বন, একটা-দুটো.বাড়ি..এই কিশোর, মহিলা বানিয়ে বলেনি তো এ সব কথা? কি মনে হয়

তোমার? পটির কুত্তাটা যে হারিয়েছে সেটাও তো ঠিক, নইলে অত কাদবে কেন?
হেসে বলল রবিন, এ সব গল্প এ ভাবেই ছড়ায়। রহস্যময় ঘটনা ঘটতেই পারে। আসল কারণটা না খুঁজে রঙ চড়িয়ে যার যা ইচ্ছে বানিয়ে বলে দেয়। যত দোষ ফেলে নিয়ে গিয়ে ডাইনী কিংবা ভূতের ওপর।
কিশোর বলল, কিছু বুঝতে পারছি না। চিৎকারটাকে উড়িয়ে দেয়া যায় না, রবিন নিজে না শুনলে আমাদের আগ বাড়িয়ে এ ভাবে বলত না মিসেস ভারগন।
পাহাড়ের ওপরে উঠে প্রথম যে জিনিসটা চোখে পড়ল, তা হলো নতুন। রঙ করা একটা লেটার-বক্স। নাম লেখা রয়েছে: ডি. রিচটন। তার ওপাশে ঘাসে ঢাকা ছোট্ট একটুকরো খোলা জায়গা। জায়গাটাকে দু-পাশ থেকে ঘিরে এসেছে ঘন পাতাওয়ালা হার্ডউড আর দেবদারু গাছের জঙ্গল। ঠিক মাঝখানটায় দাঁড়িয়ে আছে কাঠের তৈরি ছোট একটা কেবিন। বাড়ির ওপাশ থেকে উঁকি দিয়ে আছে পুরানো একটা গাড়ির নাক।
বাহ, গাড়ির যত্ন করেন ক্যাপ্টেন, চিনতে পারল রবিন। পনেরো বছর আগের মডেল, অথচ একেবারে ঝকঝকে রেখেছেন।
বাড়ির পেছনে কিছুদূর গিয়ে হঠাৎ করেই যেন শূন্যে মিলিয়ে গেছে ঘাসে ঢাকা জায়গাটা। ওটা আসলে একটা বিরাট গর্তের কিনারা। কিনারে গিয়ে দাঁড়ালে দেখা যাবে, ঘাস শেষ, তার জায়গা দখল করেছে ওখানে ধূসর, মসৃণ পাথর, প্রায় খাড়া হয়ে নেমেছে বাটির মত দেখতে একটা উপত্যকায়, ঢুকে পড়েছে লতায় ছাওয়া ঘন জঙ্গলের মধ্যে।
এটাই ব্ল্যাক হোলো, শান্তকণ্ঠে বলল কিশোর। আশ্চর্য! ওখানকার গাছগুলো পর্যন্ত কালো লাগছে। অথচ এ রকম লাগার মত এতটা অন্ধকার কিন্তু হয়নি এখনও।
কিন্তু ক্যাপ্টেন কোথায়? বাড়িটার দিকে তাকিয়ে আছে রবিন। আমাদের গাড়ির শব্দ নিশ্চয় শুনেছেন। আসছেন না কেন? চিৎকার করে ডাকল, ক্যাপ্টেন রিচটন, আমরা এসেছি! তিন গোয়েন্দা!
কোন সাড়া পাওয়া গেল না। অবাক হলো ওরা। আসার খবর চিঠি লিখে, জানিয়েছে ক্যাপ্টেনকে, তবে কি চিঠি পাননি? সেটা তো হতে পারে না। আর চিঠি পান বা না পান, ডাক শুনে এসে দেখার তো কথা?
এগিয়ে গিয়ে দরজায় টোকা দিল রবিন। ক্যাপ্টেন! ক্যাপ্টেন রিচটন।
জবাব এল না এবারও।
দরজায় তালা নেই। ঢুকে পড়ল ওরা। সুন্দর, সাজানো-গোছানো একটা ঘর, এককোণে ছোট একটা বাংক। শুধু গাড়িরই যত্ন করেন না ক্যাপ্টেন, সব জিনিসেরই করেন, বোঝা গেল। কিন্তু তিনি গেলেন কোথায়?

ওপাশের ছোট রান্নাঘরটায় ঢুকল মুসা। মুহূর্ত পরেই তার চিৎকার শোনা গেল, অ্যাই, দেখে যাও! বন্যা হয়ে গেছে!
দৌড়ে গেল কিশোর আর রবিন। অনেক পানি জমে আছে মেঝেতে, তার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে মুসা। ওই পানিটুকু বাদ দিলে রান্নাঘরটাও শোবার ঘরের মতই গোছানো, যেখানে যেটা থাকা দরকার, ঠিক সেখানেই আছে। চকচক করছে প্যান, চামচ, বাসন-পেয়ালা। পরিষ্কার পর্দাগুলোর কোথাও এতটুকু দাগ নেই।
মেঝেতে পানি এল কোত্থেকে? রবিনের কণ্ঠে বিস্ময়। এ রকম হওয়ার কথা নয়। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে ভালবাসেন ক্যাপ্টেন। পানি পড়লে সঙ্গে সঙ্গে মুছে ফেলার কথা।
নুয়ে আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে দেখল কিশোর। বরফের মত শীতল। এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল এককোণে রাখা একটা পুরানো আমলের আইস-বক্সের কাছে। নিচ থেকে টেনে বের করল একটা বেসিন, পানিতে টইটম্বুর, ওটা থেকেই পানি উপচে পড়ে মেঝে ভাসিয়েছে।
দুই সহকারীর দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল সে, বরফ গলে এই পানি। জমেছে।
ভুরু কুঁচকে বলল রবিন, জমতে তো অনেক সময় লেগেছে নিশ্চয়। পরিষ্কার করলেন না কেন ক্যাপ্টেন?
বেসিনের পানিটা সিংকে ঢেলে খালি করল কিশোর। বিড়বিড় করল, ব্যাপারটা অদ্ভুত!
মুসা বলল, মানুষ তো আর সারাক্ষণ ঘরে বসে থাকে না। হয়তো তিনি। যাওয়ার পর পড়েছে।
বিছানাটাও এলোমলো, চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল রবিন। বাইরে গেলে এ ভাবে ফেলে যাওয়ার কথা নয়। যে রকম গোছগাছ করা স্বভাব তার, গুছিয়েই রেখে যেতেন। পানি নাহয় পরে পড়তে পারে, কিন্তু বিছানাটা তো আর। আপনাআপনি অগোছাল হতে পারে না।
হয়তো তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে গেছেন, অনুমান করল মুসা। গোছানোর সময় পাননি?
তাহলে কি এমন কাজে চলে গেলেন, যে বিছানা গোছানোরও সময় পাননি? নিজেকেই প্রশ্নটা করল যেন কিশোর।
ব্যাপারটা খাপছাড়া লাগল গোয়েন্দাদের কাছে। বেরিয়ে এসে বাটির মত জায়গাটার কিনারে দাঁড়াল, যেখান থেকে উপত্যকায় নেমে গেছে ঢাল। মুখের কাছে হাত জড় করে চিৎকার করে ডাকল, ক্যাপ্টেন রিচটন! ক্যাপ্টেন রিচটন!
জবাবের আশায় কান পেতে রইল ওরা। কিন্তু কোন সাড়া এল না বিরাট কালো গর্তটা থেকে, এমনকি কোন প্রতিধ্বনিও নয়।

গুরুতর কিছু একটা হয়েছে মনে হয়, নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার কিশোর। বলা যায় না, কোথাও জখম হয়েও পড়ে থাকতে পারেন। খুঁজতে যাব। একপাশের জঙ্গল দেখিয়ে বলল, মুসা, তুমি আর রবিন ওদিকে যাও, আমি এদিকে যাচ্ছি।

বনে ঢুকে পড়ল দুই সহকারী গোয়েন্দা। অনেক বড় বড় গাছের মাথা এতটাই ছড়িয়ে পড়েছে, রোদ আটকে ফেলে, গোড়ায় আগাছা জন্মাতে দেয় না। ফলে হাঁটা সহজ। গোধূলির কালচে-ধূসর ছায়া নেমেছে বনতলে, আর আধঘণ্টার মধ্যেই পুরোপুরি অন্ধকার হয়ে যাবে।

কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি করার পর মুসা বলল, রাত তো হয়েই গেল। আর খুঁজে লাভ নেই। চলো, ফিরে যাই।

আবার খোলা জায়গাটায় ফিরে এল দু-জনে। কিশোরের নাম ধরে ডাকল মুসা। জবাব পেল না।

খাইছে! গুঙিয়ে উঠল সে, এ-কি ভূতুড়ে কাণ্ড! প্রথমে ক্যাপ্টেন, এখন কিশোরও গায়েব...

খসখস শব্দ শুনে থেমে গেল সে।

শশশ! ফিসফিস করে বলল রবিন, কিসের শব্দ?

খোলা জায়গাটায়ও এখন অন্ধকার। বনের ভেতরে আবার শোনা গেল শব্দটা, নড়ছে যেন কিছু। পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দুজনে।

মুসা? রবিন? ডাক শোনা গেল বনের কিনার থেকে।

ও, কিশোর! স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মুসা।

কাছে এসে জানাল কিশোর, কোন চিহ্নই পেলাম না ক্যাপ্টেনের। উপত্যকায় নামার একটা পথ পেয়েছি। ওটা ধরে এগিয়েছিও কিছুদূর। এ জন্যেই দেরি হয়েছে। কিন্তু কিছু পেলাম না।

আশ্চর্য! বিড়বিড় করল রবিন। এক রহস্যের কিনারা করতে এসে আরেক রহস্য...চলো, আমাদের মালপত্রগুলো ভেতরে নিয়ে যাই। এখানে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই।

.

খানিক পরেই ছোট্ট কেবিনের রান্নাঘর থেকে মাংস আর ডিমভাজার গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল বাতাসে। খেতে বসে গেল তিন গোয়েন্দা। গোগ্রাসে গিলছে মুসা। রিচটনের উধাও হওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করছে তিনজনে।

ঘরের দরজায় তালা নেই, গাড়িটাও রয়েছে, নিজেকেই যেন বোঝাল কিশোর, দুটো সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি।

হ্যাঁ, মাথা ঝকাল রবিন। হয় কেউ তাঁকে গাড়িতে করে নিয়ে গেছে, নয়তো তিনি নিজেই হেঁটে গেছেন। এত তাড়াহুড়া করে গেছেন, দরজায় তালা লাগানোরও সময় পাননি। হেঁটে গেলে এমন কোন জায়গায় গেছেন, যেখানে গাড়ি চলে না।
ওরকম জায়গা একটাই দেখেছি। গর্তের মত উপত্যকাটা, ব্ল্যাক হোলো।
প্লেটের খাবার চেটেপুটে শেষ করে ফেলল মুসা। রহস্য নিয়ে যত খুশি মাথা ঘামাও তোমরা, সূত্র খুঁজতে থাকো, আমি এই সুযোগে বাসন পেয়ালাগুলো ধুয়ে ফেলি। তারপর আরও কাজ আছে। তবে সেগুলো করতে পারি এক শর্তে।
কী? কিছুটা অবাক হয়েই জানতে চাইল কিশোর।
কিছু লাকড়ি এনে দিতে হবে।
মুসার বলার ভঙ্গিতে হেসে ফেলল কিশোর আর রবিন, ভেবেছিল কি না জানি বলবে। উঠে গেল রিচটনের জড় করে রাখা লাকডির স্তূপ থেকে লাকডি আনার জন্যে। ফিরে এল দু-জনে দুই বোঝা নিয়ে।
হ্যান্ডপাম্পটা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল মুসা। বসে না থেকে ঘরের ভেতরে খুঁজতে শুরু করল অন্য দু-জনে–কি খুঁজছে জানে না, তবে ক্যাপ্টেনের উধাও হওয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত কিছু।
কিশোর, লিভিংরুম থেকে ডাকল রবিন। গানরাকে একটা বন্দুক কম। রাইফেলও হতে পারে সেটা, কিংবা শটগান। জায়গাটা খালি।
রান্নাঘরের টেরিলে আরও মূল্যবান একটা সূত্র খুঁজে পেল কিশোর। ডাকল, রবিন, দেখে যাও।
রান্নাঘরে দৌড়ে এল রবিন।
টেবিলের ড্রয়ারে পাওয়া বুকসাইজ ক্যালেন্ডারটা দেখাল কিশোর। গত দুই মাসের তারিখগুলো দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তার। একটা বিশেষ তারিখের নিচের লেখা দেখিয়ে বলল, এই যে দেখো, কোন জাতের কুকুর, মালিকের নাম, পরিষ্কার করে লিখেছেন। জুনের দশ, বর্ডার টেরিয়ার, মালিকের নাম জন হিগিনস।
ক্যালেন্ডারটা হাতে নিল রবিন। আরও কয়েকটা কুকুরের নাম দেখল বিভিন্ন তারিখের নিচে। একটা তারিখের দিকে তাকিয়ে থমকে গেল। এটা দেখেছ। লিখেছেন: চিৎকার শুনলাম!
মাথা ঝাঁকাল কিশোর।
বাসন ধুতে ধুতে ফিরে তাকাল মূসা, বাহ; চিৎকারটা তাহলে ক্যাপ্টেনও শুনেছেন! আর তো হেসে উড়িয়ে দেয়া যায় না!
ঠিকই বলেছ। একজন পুলিশ অফিসার, ভালমত না শুনলে লিখতেন, কিশোর বল। আনমনে বিড়বিড় করল, চিৎকার শুনেছেন, কুকুরের কথা লিখেছেন:

লোকে বলে ডাইনীটা চিৎকার করে, কুকুরও ধরে নিয়ে। যায়...
পটির কথা লিখেছেন নাকি দেখো তো?
দ্রুত দেখে নিল রবিন। না। এটা মাত্র কাল রাতের ঘটনা। না লেখার আরেকটা মানে হতে পারে, তিনি এখানে তখন ছিলেন না, হয়তো আজ সারাদিনেও ফেরেননি।
হতে পারে, একমত হলো কিশোর। আমি এখন আরও শিওর হচ্ছি, বিপদেই পড়েছেন তিনি। কাল সকালে উঠেই তাকে খুঁজতে বেরোব।
আমার কাজ শেষ, টেবিলের কাছে এসে দাঁড়াল মূসা। হাই তুলতে তুলতে বলল, রাতে নিশ্চয় আর কিছু করবে না। আমি ঘুমাতে যাচ্ছি। বাংকে কে শোবে? দাঁড়াও, টস করে নিই।
টসফস লাগবে না, হেসে বলল রবিন। ইচ্ছে হলে তুমি ঘুমাওগে। আমি আর কিশোর মেঝেতেই শুতে পারব, স্লীপিং ব্যাগে।
মৃদু একটানা হিসসস আওয়াজ করে জ্বলছে হ্যাজাক লাইট। আলো জ্বেলে রাখা প্রয়োজন মনে করল না কিশোর। চাবি ঘুরিয়ে তেল বন্ধ করে দিল। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কমলা রঙ হয়ে রইল ম্যানটেলটা, তারপর নিভে গেল। গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে গেল কেবিন। একেবারে নীরব হয়ে গেল। অনেক পথ গাড়ি চালিয়ে এসেছে ওরা, তারপর বনের মধ্যে খোঁজাখুঁজি, ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তাই শোয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুম।
মাঝরাতে ভয়াবহ একটা শব্দে চমকে জেগে গেল তিনজনেই। চোখ মেলে, কান পেতে চুপ করে পড়ে রইল অন্ধকারে, আরেকবার শব্দটা শোনার আশায়।
শোনা গেল আবার। রাতের নীরবতা খান খান করে দিল তীক্ষ্ণ, তীব্র চিৎকার, যেন ভীষণ আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল কোন মহিলা। কেবিনের পেছনে গর্তের নিচ থেকে এল বলে মনে হলো।
চিৎকারটা মিলিয়ে গেলে ফিসফিস করে মুসা বলল, ক্যাপ্টেন কাল এই চিৎকার শুনেই দেখতে যাননি তো?
জানি না, লাফিয়ে উঠে বসল কিশোর। মনে হয় কেউ বিপদে পড়েছে। এই, জলদি কাপড় পরে নাও, দেখতে যাব।
দুই মিনিটের মধ্যেই বেরিয়ে পড়ল তিন গোয়েন্দা। সন্ধ্যায় যে বুনোপথটা দেখে এসেছে কিশোর, সেটা ধরে দৌড়ে নেমে চলল উপত্যকায়। ঘন ঝোপঝাড় আর বড় বড় পাথরে পড়ে বিচিত্র ছায়া সৃষ্টি করছে টর্চের আলো,। একে তো অচেনা পথ, তার ওপর বেরিয়ে থাকা গাছের শেকড় বাধা দিয়ে গতি কমিয়ে দিচ্ছে।
কাউকে চোখে পড়ল না ওদের। একটা জায়গায় এসে থেমে দাঁড়াতে হলো। সামনে একটা পাহাড়ী নালা। পাথরে পাথরে বাড়ি খেয়ে যেন টগবগ করে ফুটতে

ফুটতে, সাদা ফেনা তৈরি করে তীব্র গতিতে বয়ে যাচ্ছে স্রোত।
তখন এই পর্যন্ত এসেই ফিরে গেছি, পানির প্রচণ্ড শব্দকে ছাপিয়ে চিৎকার করে বলল কিশোর। পেরোবে নাকি?
নিশ্চয়, বলেই বোকার মত পানিতে পা দিয়ে বসল রবিন। কিন্তু। স্রোতের শক্তি আন্দাজ করতে পারেনি সে, একটানে তাকে চিৎ করে ফেলল। নিজেকে সামলানোরও সময় পেল না। নিতান্তই একটা খড়কুটোর মত ভাসিয়ে নিয়ে চলল তাকে পানি।

.
আলো সরাবে না! চিৎকার করে বলল কিশোর। ধরে রাখো!
রবিনের ওপর টর্চের আলো ধরে রেখে পাড় ধরে নিচের দিকে দৌড়ে নামতে লাগল দুজনে।
জবাব না দিয়ে তার টর্চটাও কিশোরের হাতে গুঁজে দিয়ে ওই স্রোতের মধ্যে নেমে গেল মুসা। বরফের মত শীতল পানি, কিন্তু গভীরতা বেশি নয়। উঠে দাঁড়াল সে, পানি বেশি না এখানে, মাত্র কোমর পানি, কিন্তু সাংঘাতিক টান, পেছন থেকে ঠেলা মেরে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করছে।
প্রায় বেহুশ হয়ে গেছে ততক্ষণে রবিন। নিচে নেমে যাচ্ছে। তাড়াহুড়ো। করে যে নেমে যাবে মুসা, তার উপায় নেই। নালার নিচটা খুব পিচ্ছিল। পা রাখাই মুশকিল। নিজেকে বোঝাল, উল্টে পড়ে বিপদ আরও বাড়ানোর চেয়ে আস্তে নামাই ভাল।
কিশোরের হাতের দুটো টর্চের আলোয় পথ দেখে দেখে রবিনের কাছে পৌঁছে গেল সে। একটা পাথরে ঠেকে আটকে আছে রবিন। বেহুঁশ। নাকটা কেবল রয়েছে পানির ওপরে।
পা দুটো একটা খাঁজে শক্ত করে আটকে দিল মুসা, যাতে পিছলে না পড়ে। উবু হয়ে পাজাকোলা করে তুলে নিল রবিনকে। আগুন লাগলে দমকল কর্মীরা যে ভাবে কাঁধে তুলে নেয় আক্রান্ত মানুষকে, সে-ও তেমন করে কাঁধে ফেলল অচেতন দেহটাকে।
এদিক দিয়ে উঠে এসো! আলো ফেলে পথ দেখিয়ে চিৎকার করে ডাকল কিশোর।
পাশ ফিরে দাঁড়িয়ে খুব সাবধানে ইঞ্চি ইঞ্চি করে উঠে আসতে লাগল মুসা। কাঁধে বোঝা নিয়ে এখন পা পিছলালে সর্বনাশ হয়ে যাবে।
তবে আর কোন অঘটন ঘটল না। তীরে উঠে রবিনকে চিৎ করে শুইয়ে দিয়ে বসে হাঁপাতে লাগল সে।
চোখের পলকে রবিনের ওপর এসে ঝুঁকে বসল কিশোর। অবস্থা কতটা গুরুতর দেখতে শুরু করল। নাড়ি দেখল, ঠিকই আছে। নিজের গা থেকে শার্ট খুলে নিয়ে

ওটাকেই তোয়ালে বানিয়ে মুখ থেকে পানি মুছতে লাগল।
টর্চের আলোয় মাথায় একটা জখম চোখে পড়ল, রক্ত বেরোচ্ছে, পাথরে। বাড়ি খেয়ে হয়েছে ওটা। টেনে টেনে রবিনের ভেজা জামাকাপড় খুলে ফেলল সে। ভেজা গা মুছিয়ে দিল।
একটু পরেই চোখ মিটমিট করল রবিন। তাকাল টর্চের আলোর দিকে। দুর্বল কণ্ঠে বলল, আলো সরাও।...আরি, আমার কাপড় কি করেছ তোমরা? ন্যাংটো বানিয়ে ফেলেছ...
এখানে আমরাই কেবল, অসুবিধে নেই, হাসল কিশোর। নিজের অর্ধেক ভেজা শার্টটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, নাও, এটা পরে ফেলো। এক্ষুণি কেবিনে ফিরে গিয়ে গা গরম না করলে মরবে দু-জনেই।
চিৎকারটা কে করল...
জাহান্নামে যাক চিৎকার! কাল সকালেও সেটা জানা যাবে। ওঠো, জলদি চলো।
সে-রাতে আর চিৎকার শোনা গেল না। সকালে সোনালি রোদ এসে পড়ল কেবিনের চারপাশে ঘাসের ওপর। তখনও নীরব রইল কেবিনটা। রাতের ধকলের পর নিথর হয়ে ঘুমাচ্ছে তিন গোয়েন্দা।
আরও অনেকক্ষণ পর রান্নাঘরে কেটলি আর বাসন-পেয়ালার টুংটাং শোনা গেল। বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল ডিমভাজা, প্যানকেক, আর কফির সুবাস।
একটা বাসন আর চামচ হাতে বেডরুমের দরজায় এসে দাঁড়াল কিশোর। বাসনটাকে ঘন্টার মত করে ধরে চামচ দিয়ে বাড়ি মারতে মারতে ডাকল, অ্যাই আলসেরা, ওঠো। দশটা বাজে।
নড়েচড়ে উঠল ঘুমন্ত দুটো শরীর।
আঁউ। আমার মাথাটা গেছে! উঠে বসতে গিয়ে গুঙিয়ে উঠল রবিন। বজ্জো ব্যথা!...ক্যাপ্টেন এখনও ফেরেননি, তাই না?
না, শুধু আমি আছি, আর প্যানকেক, হেসে জবাব দিল কিশোর। সারাদিন খালিপেটে থাকতে না চাইলে জলদি উঠে এসো। প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে আমার, একাই সাবাড় করে দেব দেরি করলে।
তার হুমকিতে রবিনের কিছু হলো না, কিন্তু বিছানায় তড়াক করে উঠে বসল মুসা। দৌড় দিল বাথরুমের দিকে।
খিদে তিনজনেরই পেয়েছে। রাতের ধকলই এর জন্যে দায়ী। রাক্ষসের মত গিলতে শুরু করল। খেয়েদেয়ে, তৈরি হয়ে আধঘন্টার মধ্যেই বেরিয়ে। পড়ল ক্যাপ্টেন রিটনকে খুঁজতে। মাথার যন্ত্রণা অনেক কমেছে রবিনের।
আগে আগে চলেছে কিশোর, গলায় ঝোলানো একটা শক্তিশালী দূরবীন। প্রায় খাড়া ঢাল বেয়ে পথটা নেমেছে একেবেকে। বড় বড় গাছপালার মধ্যে ঢুকতেই

রোদ সরে গেল গা থেকে, পাতার ফাঁকফোকর দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে। একটু আধটু যা নামছে, ব্যস। বিশাল সবুজ চাদোয়া তৈরি করেছে যেন গাছের মাথাগুলো। তবে দিনের বেলা তো এখন, যথেষ্ট আলো আছে বনের তলায়। ক্যাপ্টেন রিচটনের যাওয়ার চিহ্ন খুঁজতে খুঁজতে এগোল ওরা।
জায়গাটার নাম ব্ল্যাক হোলো কেন হয়েছে, বুঝতে পারছি, রবিন, বলল এত কালো একটা গর্তের নাম আর কি হবে?
চারপাশে পাহাড়ের দেয়াল, সহজে বাতাসও যেন ঢুকতে পারে না এখানে। অস্বাভাবিক নীরবতা। একটা পাতা কাপে না, কোন জানোয়ারের নড়াচড়া চোখে পড়ে না। রবিনের কথাটা এই স্তব্ধতার মাঝে বড় বেশি হয়ে কানে বাজল। অস্বস্তি বোধ করতে লাগল তিনজনেই।
হঠাৎ থমকে দাঁড়াল মুসা। দাঁড়াও! কান পেতে কি যেন শোনার চেষ্টা করতে লাগল। চোখ ঘুরছে আশপাশের গাছপালার মধ্যে।
কাকের ডাক, রবিন বলল। মাইলখানেক।
নাহ, অন্য একটা শব্দ শুনলাম বলে মনে হলো।
সেই নালাটার কাছে এসে কাধ থেকে দড়ির বান্ডিল খুলে নিল মুসা। আজ আর বোকামি করল না কেউ, অসাবধান হলো না। মোটা গাছের সঙ্গে দড়ি বেঁধে চলাচলের জন্যে একটা লাইফ-লাইন তৈরি করল।
নিরাপদে পার হয়ে এল অন্য পাড়ে। এগিয়ে চলল। পেছনে ফেলে এল পানির গর্জন। আবার ওদেরকে গিলে নিল যেন থমথমে নীরবতা।
আবার দাঁড়িয়ে গেল মুসা, দাঁড়াও!
কি শুনছ? অধৈর্য ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল রবিন।
কি রকম একটা খসখসানি!
তুমিই করছ শব্দটা। জিনসের প্যান্টের পায়ে পায়ে ঘষা লাগছে...এসো। এ ভাবে বার বার থামতে হলে গর্তের তলায় আর নামতে পারব না।
এগিয়ে চলল ওরা। সন্তুষ্ট হতে পারল না মুসা। খুঁতখুতানি থেকেই গেল মনে।
দাঁড়াও? এবার থমকে গেল কিশোর।
তুমিও শুনেছ? জানতে চাইল মুসা।
তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারপাশের বনের দিকে তাকাতে তাকাতে নিচু স্বরে বলল কিশোর, দেখিনি, তবে অদ্ভুত একটা অনুভূতি হচ্ছে। মনে হচ্ছে কেউ... কিছু একটা আমাদের পিছে পিছে আসছে।
তাহলে এখন কোথায় শব্দটা? রবিনের প্রশ্ন। আমরা থামলেই কি থেমে যায়? আমি তো কিছু শুনছি না!

আবার এগোল ওরা! আগে চলে এসেছে রবিন, কারণ কিশোর আর মুসা প্রতিটি ঝোপঝাড়, গাছের আড়ালে নজর রেখে চলেছে। কর অবশেষে শেষ হলো ঢাল। সমতল হলো পথটা। চলার গতি বেড়ে গেল। জোরে জোরে পা চালিয়ে চলল রবিন। কিছু বোঝার আগেই একটা কাঁটা ডালে আটকে গেল প্যান্ট। খুদে খুদে কাঁটা কাপড় ফুটো করে খোঁচা দিতে লাগল চামড়ায়। নিচু হয়ে সেটা ছাড়াতে যেতেই অন্য ডালের কাটায় আটকে গেল সোয়েটারের পিঠ, হাতা, হাতের খোলা চামড়ায়ও খোঁচা লাগল! একটা ছাড়াতে গেলে আরও দশটা বিঁধে যায়।
পেছন থেকে হেসে বলল কিশোর, বনগোলাপের কাঁটা, তাড়াহুড়ো করলে আরও আটকে যাবে। খুব আস্তে আস্তে ছাড়াও, একটা একটা করে।
কিশোরের পরামর্শে কাজ করে কাঁটার ফাঁদ থেকে মুক্ত হলো রবিন। তবে বেশ কিছু খোঁচা সহ্য করার পর। সতর্ক হয়ে এগোল, আর আটকাতে চায় না। কিন্তু কয়েক পা এগোতে এগোতেই থমকে দাঁড়াতে হলো। কিশোর! মুসা!
কি হলো? আবার আটকেছ? জিজ্ঞেস করল মুসা।
হাসিমুখে ফিরে তাকাল রবিন। আমাকেও শুধু বোকা বানায়নি ওই কাঁটা, আরও একজনকে বানিয়েছে। হাত বাড়িয়ে কাঁটা থেকে একটুকরো ছেঁড়া কাপড় খুলে আনল সে। উজ্জ্বল রঙ, চেককাটা ছাপ। দেখো। শার্ট ছেঁড়া। ক্যাপ্টেনেরও হতে পারে। পুরানো নয়, তাহলে রঙ চটে যেত।
দেখি, হাত বাড়াল মূসা।
কিশোরও দেখল। একটা চিহ্ন পাওয়াতে আশা হলো ওদের, এদিক দিয়েই গেছেন হয়তো ক্যাপ্টেন। কাঁটাঝাড়ের পাশ কাটিয়ে এসে বুনোপথ ধরে প্রায় ছুটতে লাগল এখন তিনজনে।
আবার চিৎকার করে উঠল রবিন। সামনে পাথরের গা কেটে, উপত্যকার এপাশ থেকে ওপাশে বয়ে চলেছে একটা সরু নদী। নদীটার পাড়ে একটা ছোট খড়ির পাড়ে বসে পড়ল সে। তুলে আনছে কিছু।
মুসা আর কিশোর কাছাকাছি হলো তার।
কি পেয়েছে দেখাল রবিন। একটা দেশলাইয়ের বাক্স। ভেজা, কিন্তু। রঙটা তাজা। তারমানে বেশি সময় পড়ে থাকেনি পানিতে। আজ যেন রবিনেরই দিন। একের পর এক সূত্র চোখে পড়ছে তার।
দারুণ! কিশোর বলল, ক্যাপ্টেন যদি না-ও গিয়ে থাকেন, এ পথ দিয়ে যে একজন মানুষ গেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। নদীর পাড় ধরে হাঁটব। দেখি, আর কি পাই?
নরম মাটিতে পুরু হয়ে পড়ে আছে বাদামী পাইন নীড়ল, পা পড়লে দেবে। যায়, মনে হয় কার্পেটের ওপর দিয়ে হাঁটছে। পায়ের ছাপ পড়ছে না। তারমানে এখানে মাটি ভেজা থাকলেও কারও ছাপ পাওয়ার আশা নেই। রাস্তা জুড়ে এক জায়গায়

পড়ে আছে একটা গাছ। তার কাছে চকচকে একটা জিনিসের ওপর দৃষ্টি আটকে গেল কিশোরের। ছুটে গেল সে। পাতার নিচ থেকে একটা নয়, দুটো চকচকে জিনিস বের করে আনল। শটগানের গুলির খোসা। শুকটুকে বলল, বারুদের গন্ধ আছে এখনও। যে-ই গুলি করে থাকুক, বেশি আগে করেনি।
কাপের আকৃতির দুটো গর্ত হয়ে আছে। একটাতে হাঁটু রেখে দেখল, খাপে খাপে বসে যায়। বলল, হাটু গেড়ে বসে গুলি করেছিল। ক্যাপ্টেন রিচটনের একটা বন্দুক গানর‍্যাকে নেই। তিনিও গুলি করে থাকতে পারেন। কিন্তু কাকে সই করে?
আমি কি জানি? হাত উল্টাল মুসা।
রবিন বলল, গরম হয়ে উঠছে কিন্তু ব্যাপারটা!
ওখানে আর কিছু পাওয়া গেল না। নদীর ধারের পথ ধরে এগোতে লাগল ওরা। কিছুদূর গিয়ে আবার বুনোগোলাপের ঝাড় পড়ল, পথের ওপর উঠে এসেছে, সেখানে আরেক টুকরো কাপড় পাওয়া গেল, প্রথম টুকরোটার মত। একই পোশাক থেকে ছিঁড়েছে। এ মাটিতে চোখ বোলাতে লাগল কিশোর। এক জায়গায় দেবে গেছে অনেকগুলো বিছুটি, কোন কোনটার গোড়া ভাঙা, ভারী কিছুর চাপে অমন হয়েছে।
খাইছে! বলতে বলতে নিচু হয়ে একটা টর্চ তুলে নিল মুসা। কাঁচটা ভাঙা। টুকরোগুলোও পাওয়া গেল ওখানেই। ক্যাপ্টেন রিচটনের, কোন সন্দেহ নেই! উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল সে। এই দেখো, তাঁর নামের আদ্যক্ষর লেখা রয়েছে, ডি আর!
বিছুটিগুলো ভাল করে দেখার জন্যে বসে পড়ল কিশোর। সিরিয়াস ব্যাপার, বুঝলে, পাতায় দেখো কিসের দাগ লেগে আছে!
রক্ত! উদ্বিগ্ন শোনাল রবিনের কণ্ঠ।
এই সময় একটা খসখস শোনা গেল! ঝট করে ফিরে তাকাল মুসা। দেখল, একটা পাথরের চাঙড়ের আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে আছে একটা মুখ। রোদেপোড়া বাদামী চামড়া, লম্বা লম্বা চুল, কালো উজ্জ্বল চোখের তারা কেমন বন্য করে তুলেছে চেহারাটাকে। সামান্য ফাঁক হয়ে আছে ঠোঁট, বড় বড় দাঁত বেরিয়ে পড়েছে।
জ্বলন্ত দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে সে!

.

একটা মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ছেলেরা, যেন জ্বলন্ত ওই চোখজোড়া সম্মোহন করছে ওদের। তারপর হঠাৎ করেই পাথরের ওপাশে অদৃশ্য হয়ে গেল মুখটা।

ডাইনী! ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুসার মুখ। ওটাই খেয়েছে ক্যাপ্টেন রিটনকে! আমাদের পিছু নিয়েছিল! বললাম না, শব্দ শুনেছি।
লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল, কিশোর। এখনও বেশিদূর যেতে পারেনি! জলদি এসো!
আগে আগে দৌড় দিল সে। তার পেছনে রবিন, সবশেষে মুসা। ছায়াঢাকা, প্রায় অন্ধকার বনের ভেতর দিয়ে ছুটল তিনজনে। আঁকাবাকা অচেনা পথ। কখনও সামনে পড়ছে গাছের নিচু ডাল, কখনও ঝোপঝাড়, কখনও কাঁটাঝাড়। ওগুলো এড়িয়ে চলতে গিয়ে নানা রকম কৎ করতে হচ্ছে।
সামনে ছুটন্ত পায়ের শব্দ কানে আসছে। হুড়মুড় করে ঝোপে ঢুকে পড়ল কেউ। থামল না গোয়েন্দারা। বন এক জায়গায় সামান্য হালকা, ওখানে এসে কিশোরের নজরে পড়ল, গাছের আড়ালে ঢুকে গেল গাঢ় বাদামী ফ্ল্যানেলের, ট্রাউজার আর সবুজ সোয়েটার পরা লম্বা একটা দেহ। বড় বড় গাছগুলোকে। পাশ কাটিয়ে এঁকেবেঁকে ছুটল।
ডাইনী না, হাঁপাতে হাঁপাতে বলল কিশোর। তবে ছুটতে পারে বটে!
মুসা ডাইনীর ভয়েই এগোচ্ছে না, নইলে হয়তো কাছাকাছি চলে যেতে পারত মানুষটার, কিন্তু কিশোর আর রবিন ওর সঙ্গে পারছে না। আচমকা বায়ে মোড় নিয়ে রাস্তা থেকে সরে ঘন বনে ঢুকে পড়ল সে। ভঙ্গি দেখেই বোঝা যায়, বনে চলতে অভ্যস্ত।
চোখের আড়াল কোরো না! চিৎকার করে বলল কিশোর। পাহাড়ের কাছে গিয়ে কোণঠাসা করব ওকে!
কিন্তু গর্তের মত উপত্যকার গাছে ছাওয়া ঢালের কাছে পৌঁছেও থামল না। মানুষটা। গাছের শেকড়, ডাল, আর গোড়া ধরে ধরে দ্রুত উঠে চলল ঢাল বেয়ে।
কিন্তু অভ্যাস না থাকায় ওই পথে অত তাড়াতাড়ি উঠতে পারল না। গোয়েন্দারা। দূরত্ব বাড়ছে ক্রমেই।
দেয়ালের নিচের অর্ধেকটায় গাছপালা আছে, তার ওপরে ফাঁকা, শুধু। পাথর আর পাথর। ওখানে পৌঁছে খোলা জায়গায় বেরোতে হলো লোকটাকে। গায়ে রোদ পড়ল। থামল না সে। কোণাকোণি চলে, পাথরের। পর পাথর ডিঙিয়ে হারিয়ে গেল গর্তের ওপরে উঠে।
খোলা জায়গাটায় বেরিয়ে আর পারল না গোয়েন্দারা। পাথরের ওপর। বসে পড়ে হাঁপাতে লাগল।
শুনেছি, ঝাড়ুর ডাণ্ডাকে হাউই বাজি বানিয়ে তাতে বসে উড়ে চলে ডাইনীরা, মাথা নাড়তে নাড়তে বলল রবিন, কিন্তু একি! এ তো পা-কেই হাউই বানিয়ে ফেলেছে!
গলা থেকে দূরবীন খুলে নিল কিশোর। চোখে লাগিয়ে দেখতে লাগল গর্তের কিনারে উঠে লোকটা যেখানে অদৃশ্য হয়েছে সেখানটা। সন্দেহজনক কিছুই

চোখে পড়ল না। শেষে ব্ল্যাক হোলোর নিচের দিকে দূরবীনের চোখ নামাল।
কিছু দেখছ? জানতে চাইল মুসা।
প্রচুর গাছপালা, আর কিছু না।
একপ্রান্ত থেকে ধীরে ধীরে আরেক প্রান্তে নজর সরাচ্ছে কিশোর। ছোট্ট একটু খোলা জায়গার ওপর চোখ পড়তেই স্থির হয়ে গেল হাত।
দেখেছ মনে হচ্ছে কিছু? প্রশ্নটা করল এবার রবিন।
তার হাতে দূরবীন তুলে দিল কিশোর। যেদিকে খোলা জায়গাটা আছে নীরবে সেদিকে হাত তুলে দেখাল।
প্রথমে শুধু গাছ চোখে পড়ল রবিনের। কই, কিছু তো দেখছি না।
গর্তের দেয়ালের গোড়ায় দেখো।
রবিনও দেখতে পেল। শুরুতে যেগুলোকে কেবল পাথর মনে হয়েছিল, সেগুলোকেই এখন অন্য রকম লাগল, মনে হচ্ছে কাঠ আর পাথরকে যত্ন করে সাজিয়েছে কেউ। চেঁচিয়ে উঠল হঠাৎ, আরি, এ তো ঘর। দরজাও দেখতে পাচ্ছি। এমন করে ক্যামোফ্লেজ করে রেখেছে, যাতে নজরে না পড়ে।
রবিনের হাত থেকে দূরবীনটা প্রায় কেড়ে নিল মুসা। দেখে বলল, ওরকম বাড়িতে কে বাস করে, বলো তো? ওই ডাইনীমুখো লোকটা?
হতে পারে। যে-ই করুক, ক্যাপ্টেন রিচটনের খবর হয়তো জানাতে পারবে আমাদের। কিশোর, যাবে নাকি?
চলো।
আবার নামা! আঁতকে উঠল মুসা, এই পথে নামতে গেলে এবার হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাবে।
তুমি কি ভেবেছিলে চিরকালই থাকব আমরা এখানে? হেসে বলল কিশোর।
ততক্ষণে নামতে শুরু করে দিয়েছে রবিন, পাহাড়ে চড়ায় অন্য দু-জনের চেয়ে দক্ষ সে।
নিচে নেমে পায়েচলা পথটা আবার খুঁজে বের করল ওরা।
আধঘণ্টা পর বন থেকে বেরিয়ে এল খোলা জায়গাটুকুতে। হাত তুলে থামার ইঙ্গিত করল কিশোর। এত কাছে থেকেও রহস্যময় ছোট্ট বাড়িটাকে চেনা কঠিন। আগে থেকে না জানা থাকলে হয়তো চোখেই পড়ত না, অথচ রয়েছে মাত্র দশ-বারো গজ তফাতে।
তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে লাগল ওরা। পাথর আর কাঠ দিয়ে তৈরি ঘর। জানালা নেই, সামনের দিকে কেবল একটা দরজা। কাউকে চোখে পড়ল না। পা টিপে টিপে বাড়িটার দিকে এগোতে শুরু করল কিশোর, পেছনে দুই সহকারী। সামনের

খোলা চত্বরটুকু পেরিয়ে এসে কাঠের দরজার সামনে। দাঁড়াল সে। একমুহূর্ত দ্বিধা করে টোকা দিল দরজায়।
বার বার টোকা দিয়েও সাড়া মিলল না।
মুসা বলল, ভেতরে কিছু নড়েছে মনে হলো।
সরে গিয়ে এককোণ থেকে উঁকি দিল সে। কাউকে দেখতে পেল না। বাড়িটার গঠন দেখে অবাক হলো। আরেক পাশে সরে গিয়ে অন্য কোণ থেকে তাকাল। কাঠ আর পাথর দিয়ে তিনদিকে বেড়া তৈরি করা হয়েছে। বাকি একদিকের বেড়া হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে পাথরের দেয়ালটাকে। একধারে একটা খোয়াড়, ভেড়া রাখা হত বোধহয়, এখন শূন্য। একটা জানোয়ারও নেই।
দেখলে কিছু? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
না। কেউ নেই।
তাহলে নড়ল কি?
কি জানি!
বাড়িটার গঠন কিশো; আর রবিনও দেখল। রবিন বলল, আরেকটা। দেয়াল বানাতে কি এমন কষ্ট হত? আলসে নাকি লোকটা? নাকি কোন কারণ আছে এ ভাবে বানানোর?
একটা কারণ হতে পারে, ক্যামোফ্লেজ, দেখতে দেখতে বলল কিশোর। এভাবে তৈরি করাতে দেয়ালের সঙ্গে এমনভাবে মিশে আছে, সহজে চোখে পড়ে না।
হু। এখানে আর দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে, তারচেয়ে চলো বাড়িটা কার জানার চেষ্টা করি। ব্ল্যাক হোলোর মালিক কে, সেটা জানাও বোধহয় জরুরী।
বেরিয়েছি কিন্তু রিটনকে খুঁজতে, মনে করিয়ে দিল কিশোর। এই বাড়ির মালিক, কিংবা যে লোকটা আমাদের ওপর চোখ রাখছিল, তার সঙ্গে ক্যাপ্টেনের নিখোঁজ হওয়ার কোন সম্পর্ক না-ও থাকতে পারে। একটা ব্যাপারে এখন শিওর হয়ে গেছি আমরা, এখানে, এই গর্তের মধ্যে কিছু একটা ঘটেছে তার। শেরিফকে জানাতে হবে খবরটা।
একঘণ্টা জোরকদমে চলার পর গর্তের উল্টোধারের দেয়ালের ওপরে। এসে উঠল ওরা আবার, রিচটনের কেবিনের কাছে। একবাক্স বিস্কুট আর তিনটে আপেল বের করে নিল মুসা। ইতিমধ্যে ছোট্ট একটা নোট লিখে টেবিলে চাপা দিয়ে রাখল কিশোর, ক্যাপ্টেন ফিরে এলে দেখতে পাবেন; জানবেন, ওরা এসেছে।
আবার এসে গাড়িতে উঠল ওরা। ফরেস্টবার্গে শেরিফের সঙ্গে দেখা করতে যাবে।
.

গাড়ি চালাচ্ছে মুসা। ভারগনদের বাড়ির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখল সামনের চত্বরে গালে হাত দিয়ে চুপ করে বসে আছে পটি।
ওর কুত্তাটা খোঁজার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম আমরা।
রবিন বলল, যাবে আর কোথায়, হয়তো ফেরত চলে এসেছে।
আমার মনে হয় না, কিশোর বলল। এলে ওভাবে মন খারাপ করে বসে থাকত না। কুকুরটাও থাকত তার সঙ্গে।
বাকি কুত্তাগুলোর ব্যাপারে কি মনে হয় তোমার? হারিয়েছে যে বলল। মিসেস ভারগন? কোনও পশু চোরের কাজ?
চোরটা কে, জানি আমি, জবাব দিল মূসা। সেই ডাইনী।
রবিন ভেবেছিল, উড়িয়ে দেবে কিশোর, কিন্তু তাকে অবাক করে দিয়ে। বলল গোয়েন্দাপ্রধান, আমার ধারণা, ডাইনী আর কুকুর-নিখোঁজ রহস্যের। মধ্যে যোগাযোগ আছে। ক্যাপ্টেনও এটা সন্দেহ করেছেন। নইলে ক্যালেন্ডারে লিখে রাখতেন না।
কিশোরের কথায় মুসাও অবাক, ডাইনী আছে তুমি বিশ্বাস করো?
না।
আমিও না, রবিন বলল। তবে এখানকার লোকে যে করে তাতে সন্দেহ নেই। করার কারণ, পেনসিলভানিয়া ডাচেরা আসলে ডাচ নয়, জার্মান। দু-তিনশো বছর আগে ধর্মীয় স্বাধীনতার জন্যে দেশ ছেড়ে এসে বসতি করেছিল এখানে। সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল ডাইনী, রক্তচোষা ভুত, জাদুমন্ত্র এসবের গল্প। ওদের অনেকেই এখনও এসব উদ্ভট গল্প সত্যি বলে মানে, মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে ওসব আছে।
হ্যাঁ, মাথা দোলাল মুসা, মিসেস ভারগনও তো করে।
ডাইনীর গল্প অবশ্য আরও অনেক দেশে আছে। নিউ ইংল্যান্ডের পিউয়ারিটনরাও বিশ্বাস করে ডাইনী আছে।
চুপ করে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর।
কিছু ভাবছ মনে হচ্ছে? জিজ্ঞেস করল রবিন।
অ্যাঁ! হ্যাঁ। রবিন, তোমার কি মনে হয়নি, কুত্তা চুরি করে কেউ ডাইনীর এই কিংবদন্তীটাকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করছে?
করতে পারে। তবে কেন করবে এই কাজ, কিছু বুঝতে পারছি না।
সরু একটা পথ চলে গেছে ফরেস্টবার্গের দিকে। আশোঁপাশে বসতি খুব কম। প্রায় দুই ঘণ্টা একটানা চলার পর পাহাড়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে একটা চৌরাস্তা পড়ল। অন্য যে পথটা আড়াআড়ি কেটে চলে গেছে মূল রাস্তাটাকে, তার একটা প্রান্ত উঁচু হয়ে পাহাড়ে উঠে গেছে, অন্য প্রান্তটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে একটা

পার্বত্য নদীর দিকে। নেমে যাওয়া দিকটার দু-দিকে অনেকগুলো। কাঠের তৈরি বাড়িঘর চোখে পড়ল। পুরানো একটা আঁতাকলও আছে।
ম্যাপ দেখে কিশোর বলল, ওটাই ফরেস্টবার্গ। ঘোরো।
গাড়ি ঘোরাল মুসা।
আগের দিনে ওটা দিয়ে গম ভাঙাত লোকে, আঁতাটা দেখিয়ে রবিন বলল। তখন ইলেকট্রিসিটি ছিল না, নদীর স্রোতকে কাজে লাগিয়ে ওটা ঘোরানো হত।
একটা বাড়ির ডিসপ্লে উইন্ডোতে বড় বড় করে লেখা রয়েছে: অ্যাংগাস জেনারেল স্টোর। আকৃষ্ট করল মুসাকে। ছাউনি দেয়া বারান্দায় পড়ে আছে দড়ির বান্ডিল, হাতুড়ি-বাটাল, খন্তা-কুড়াল জাতীয় যন্ত্রপাতি, আর গম-আটার। বস্তা।
আমি ঢুকব ওখানে, ঘোষণা করল সে। গোয়েন্দাগিরিতে অনেক পরিশ্রম, অনেক ক্যালোরি খরচ হয়, ঠিকমত না খেলে শরীর টিকবে না।
হেসে ফেলল রবিন। মুসা দোকানের সামনে গাড়ি থামিয়ে নেমে গেলে সে বসল ড্রাইভিং সীটে। ড্রাইভ কিশোরও করতে পারে, কিন্তু গাড়ি চালাতে ভাল লাগে না তার। ছুটন্ত গাড়িতে আরাম করে বসে দু-ধারের দৃশ্য দেখাই, তার বেশি পছন্দ।
কেনাকাটা করার জন্যে মুসাকে রেখে কাউন্টি কোর্টহাউসে রওনা হলো। অন্য দু-জন। সাদা একটা কাঠের বাড়ি, সামনে ছড়ানো বারান্দার ওপরে। কাঠের খুঁটি দিয়ে ধরে রাখা চালা।
কাউন্টি ক্লার্কের অফিসে ঢোকার আগে দরজায় থাবা দিতে গেল কিশোর। কিন্তু পাল্লাটা ভোলা, চাপ লাগতেই ফাঁক হয়ে গেল। ভেতরে ঢুকল
সে আর রবিন। বিশাল, পুরানো আমলের একটা রোল-টপ ডেস্ক রয়েছে। ঘরে, ওটার খোপগুলোতে ঠেসে ভরা রাখা হয়েছে দলিলপত্র। টেবিলের ওপরেও গাদা গাদা কাগজ, বড় বড় পেপারওয়েট দিয়ে চাপা দেয়া।
কেউ নেই ঘরটায়। ওপাশের দরজাটার কাছে এসে সবে টোকা দিতে যাবে কিশোর, এই সময় খুলে গেল ওটা। বেরিয়ে এল চশমা পরা এক মধ্যবয়েসী মহিলা। কি চাই? ক্লার্ক মিস্টার রেনসন বাইরে গেছেন। আমাকে দিয়ে কোন সাহায্য হবে?
ব্ল্যাক হোলোতে ক্যাম্পিং করতে যেতে চাই আমরা, জবাব দিল কিশোর। জায়গাটার মালিক কে জানতে পারলে তার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে নিতাম।
বহুবছর ধরে মহিলা এই এলাকার বাসিন্দা, এক অফিসে কাজ করতে করতে অনেক কিছু মুখস্থ হয়ে গেছে। ফাইল কিংবা রেজিস্টার দেখার প্রয়োজন বোধ করল না। জবাব দিয়ে দিল, পুরো উপত্যকাটারই মালিক আরিগনরা। যদূর জানি, এখনও যারা বেঁচে আছে, সবাই যার যার মত অন্য জায়গায় চলে গেছে। ওদের কেউ ওখানে এখন বাস করে কিনা বলতে পারব না।

আরিগন নামটা নোটবুকে টুকে নিল রবিন।
মহিলাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এল দু-জনে।
শেরিফের অফিসের দরজায় গিয়ে টোকা দিল কিশোর।
ভেতর থেকে ভারি গলায় ডাক শোনা গেল, আসুন।
খাটো, ভারি শরীর, ধূসর রঙের পুরু গোঁফওয়ালা একজন মানুষ টেলিফোনের রিসিভার নামিয়ে রাখলেন। ওয়েস্টকোটের বোতাম খোলা, বলিষ্ঠ বাহুর ওপরে গুটিয়ে রাখা শার্টের হাতা। খুব ব্যস্ত মনে হচ্ছে তাকে। সুইভেল চেয়ার ঘুরিয়ে নিয়ে ডেস্কের ওপর দিয়ে তাকালেন ছেলেদের দিকে।
দ্রুত নিজেদের পরিচয় দিল কিশোর। শেরিফের নাম জানতে পারল, টোনার।
কি দরকার? জানতে চাইলেন শেরিফ।
সংক্ষেপে ক্যাপ্টেন রিচটনের নিখোঁজ সংবাদ জানাল কিশোর। তার যে খারাপ কিছু হয়েছে, এই সন্দেহের কথাও বলল।
ভুরু কুঁচকে নীরবে সব শুনলেন শেরিফ। কথা শেষ হলে জিজ্ঞেস করলেন, আমাকে কি করতে বলো?
ব্ল্যাক হোলোতে গিয়ে খুঁজে দেখার জন্যে যদি কাউকে পাঠাতেন...
মাথা নাড়লেন শেরিফ, সম্ভব না। আজ তো নয়ই, কালও পারব কিনা? জানি না। আমার সমস্ত লোক এখন হাইজ্যাকারদের পেছনে ব্যস্ত। ইন্টারস্টেট ট্রাক থেকে মাল হাইজ্যাক হয়ে গেছে। কদিন ধরেই উৎপাত। করছে খুব, মাঝে মাঝেই মালবাহী গাড়ির ওপর চড়াও হয়ে লুটপাট চালাচ্ছে। ব্যাটাদের ধরতেই হবে।
কিন্তু স্যার, মিস্টার রিচটনের ব্যাপারটাও কম জরুরী না, আবার বলল কিশোর। দেরি হলে আরও ক্ষতি হয়ে যেতে পারে তার। প্রাণের ওপরও আঘাত আসতে পারে।
শোনো, ভারিক্কি ভঙ্গিটা কোমল করার চেষ্টা করলেন শেরিফ, এত ভাবার কিছু নেই। এসব এলাকায় মাঝে মাঝেই উধাও হয়ে যায় লোকে। বেড়াতে বেরোয়, ঘুরতে ঘুরতে চলে যায় বহুদূরে, আবার একদিন ফিরে আসে। ক্যাপ্টেনও হয়তো তাই করছেন। শুধু সন্দেহের বশে আমার লোকদের জরুরী কাজ থেকে সরিয়ে আনতে পারি না, কোন প্রমাণ নেই...
আছে স্যার, প্রমাণ আছে, জোর দিয়ে বলল রবিন। তার ভাঙা টর্চটা আমরা পেয়েছি। গুলির খোসা, পাতায় রক্ত, শার্টের ভেঁড়া কাপড়..এসবকে কি প্রমাণ বলবেন না?
চুপ করে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত রবিনের দিকে তাকিয়ে রইলেন শেরিফ। ভুরু কুঁচকে বললেন, এত কিছু পেয়েছ! তাহলে তো সিরিয়াস ব্যাপারই মনে হচ্ছে। কিন্তু

তারপরেও... অসহায় ভঙ্গিতে নিঃশ্বাস ফেললেন তিনি, আজ লোক দেয়া সম্ভব নয়। কাল একটা সার্চ পার্টি নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব, তবে কথা দিতে পারছি না।
এখানে আর এমন কেউ কি আছে, যে আমাদের খুঁজতে সাহায্য করতে পারে? জানতে চাইল কিশোর।
সামনের রিপোর্ট পড়তে শুরু করে দিয়েছেন ততক্ষণে শেরিফ, কিশোরের কথায় চোখ তুলে তাকালেন, মিস্টার আরিগনের কথা ভাবছি। ওই হোলোতে বাস করে। ওখানকার প্রতিটি ঝোপ, প্রতিটি পাথর তার চেনা। জন্মের পর থেকে বাস করেছে ওই অঞ্চলে। তোমরা গিয়ে বললে খুশি হয়েই তোমাদের সাহায্য করবে। ওই রকমই মানুষ, সবাইকে সাহায্য করার জন্যে যেন তৈরি হয়েই থাকে। ভাল লোক।
আরেকবার দৃষ্টি বিনিময় করল দুই গোয়েন্দা। আবার টোনারের দিকে তাকাল কিশোর। ওই উপত্যকাতেই থাকে বলছেন?
হ্যাঁ, সে-রকমই তো শুনেছি, একটা কেবিনে। আমি কখনও যাইনি। তোমরা গিয়ে খোঁজো, বের করে ফেলতে পারবে।
কোর্টহাউস থেকে বেরিয়ে এল দুই গোয়েন্দা। গাড়ি নিয়ে চলে এল জেনারেল স্টোরের সামনে। বাইরে অপেক্ষা করছে মুসা। পায়ের কাছে নানারকম প্যাকেট, টিন আর বোতলের স্তূপ। পারলে পুরো দোকানের সব খাবারই যেন কিনে ফেলত। গাড়িতে উঠেই বলল, আগে কোথাও গাড়ি রেখে খেয়ে নেব।...তো, কি জেনে এলে তোমরা?
ভোঁতা গলায় জানাল রবিন, শেরিফ সাংঘাতিক ব্যস্ত। মনে হচ্ছে আমাদেরই সব করতে হবে। কিশোর, মিস্টার সাইমনের সাহায্য চাইব?
মন্দ হয় না। সাহায্য না দিতে পারেন, পরামর্শ হয়তো দিতে পারবেন।
টেলিফোনে কথা বলতে চাও তো? সে আশা বাদ রাখো, মুসা বলল। দোকানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাজারই করেছি শুধু ভেব না, গোয়েন্দাগিরিও করেছি। এই শহরের অনেক কথা জেনেছি। জানো, সবচেয়ে বেশি আলোচনা হয় এখানে কাকে নিয়ে? মিসেস অ্যাংগা, জেনারেল স্টোরের মালিকের স্ত্রী। বেশি বকর বকর করে কে? মিসেস অ্যাংগা। টেলিফোন অপারেটর কে জানো? মিসেস অ্যাংগা। এখান থেকে টেলিফোনে যত গোপন কথাই বলো সেটা আর গোপন থাকবে না, চোখের পলকে ছড়িয়ে পড়বে। সারা শহরে।
হুঁ, বুঝেছি, মাথা ঝাঁকাল কিশোর। রবিন ঠিকই বলেছে, যা করার সব আমাদের করতে হবে। শেরিফ বলেছেন, কাল সকালে সার্চ পার্টি পাঠানোর চেষ্টা করবেন। যদি না পাঠান, মিস্টার আরিগনকে খুঁজে বের করব আমরা। তার সাহায্য চাইব।
আচ্ছা, রবিন বলল, গর্তের নিচের ওই আজব ঘরটাতে থাকেন না তো তিনি?

থাকতে পারেন। আর কোন বাড়ি তো চোখে পড়েনি ওখানে।
ইঞ্জিন স্টার্ট দিল মুসা। একটা কাফের সামনে এনে গাড়ি রাখল। বলল, টিনের খাবার পরেও খেতে পারব। রান্না করা কিছু খেয়ে নিই এখন।
খাবার খুব ভাল কাফেটার। স্থানীয় পত্রিকাটা টেনে নিয়ে চোখ বোলাতে লাগল কিশোর। আচমকা চিবানো বন্ধ হয়ে গেল তার। বলল, জন্তু জানোয়ারের নিলাম হবে, সেখানে যাব আমরা।
অবাক হলো রবিন, জানোয়ার নিলাম!
কোথায়? মুসাও অবাক।
পরের শহরে। এই যে, বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে। আজকেই হবে, এবং আধঘণ্টার মধ্যেই।
কিন্তু ওখানে আমরা কি কিনতে যাব? গরুর মাংস, ভেড়ার মাংস দুটোই নিয়েছি, জ্যান্ত পশু আমাদের দরকার নেই।
আছে। কুকুর। ডাইনীর জন্যে ফাঁদ পাততে হলে কুকুরের টোপ দরকার। ক্যাপ্টেন রিচটনের কেবিনে নিয়ে যাব ওটাকে আমরা। কুত্তা চোর যদি থেকেই থাকে ওখানে, নিতে আসুক আমাদেরটা, তৈরি হয়ে বসে থাকব আমরা।
হাসি ছড়িয়ে পড়ল রবিনের মুখে, ভাল বুদ্ধি করেছ!
চোরটা যদি সত্যি ডাইনী হয়? মুসা খুশি হতে পারছে না। অহেতুক একটা জানোয়ারকে…
বাধা দিয়ে কিশোর বলল, ভয় নেই, পাহারায় থাকব আমরা। কুকুরটার ক্ষতি করতে দেব না ডাইনীকে। বরং ডাইনী ধরার চেষ্টা করব। হেসে রসিকতার সুরে বলল, একটা ডাইনীকে যদি ধরে নিয়ে যেতে পারি আমরা, ভাবতে পারো কি ঘটবে? ওটা শো করার ব্যবস্থা করব। টিকেট বেচেই বড়লোক হয়ে যাব আমরা।
খাওয়া শেষ হলো। কয়েক মিনিট পর আবার গাড়িতে এসে উঠল ওরা।
ম্যাপ দেখে রাস্তা বলে দিতে লাগল কিশোর। শহর ছাড়িয়ে আসতে খুব খারাপ হয়ে গেল পথ। এবড়োখেবড়ো কাঁচা রাস্তা, প্রচণ্ড ঝাঁকুনি লাগছে।
খাইছে! শক্ত করে স্টিয়ারিং ধরে রেখেছে মুসা, কবে বানিয়েছিল এই রাস্তা! আমার তো বিশ্বাস, সেই ওয়াইল্ড ওয়েস্টের যুগে, ঘোড়ার গাড়ি ছাড়া যখন আর কিছু চলত না।
একেই খারাপ, তার ওপর প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে রাস্তার অবস্থা আরও করুণ হয়ে আছে। মাটি গলে সরে গিয়ে নিচের পাথর বেরিয়ে পড়েছে। টায়ারে নিষ্ঠুর আঘাত হেনে চলেছে ওগুলো।
চুলের কাঁটার মত অনেকগুলো তীক্ষ্ণ বাঁক নেয়ার পর আরেকটা বাকের কাছে এসে একটা সাইনবোর্ড চোখে পড়ল:

গতি কমান!
সামনে পুল
ভারি গাড়ি নিষিদ্ধ।
মোড় পেরোলে কাঠের ব্রিজটা চোখে পড়ল। দু-পাশে লোহার রেলিঙ আছে বটে, তবে এতই হালকা, কোন গাড়ির পতন রোধ করতে পারবে না ওগুলো। নিচে তীব্র গতিতে বয়ে চলেছে পাহাড়ী নদীর স্রোত।
বোকামি করে বসল মুসা। ভাবল, পেরিয়ে যেতে পারবে, কিশোর বাধা দেয়ার আগেই গাড়ি তুলে দিল ব্রিজে। অর্ধেক যেতে না যেতেই মড়মড় করে উঠল নিচের তক্তা, গাড়িটার ভার সহ্য করতে না পেরে ভেঙে পড়ছে।
চিৎকার করে উঠল কিশোর, থেমো না, থেমো না, চালিয়ে যাও!
.
চমকে গিয়ে ব্রেক চেপে ফেলছিল মুসা, কিশোরের চিৎকারে সেটা ছেড়ে দিয়ে আরও জোরে চেপে ধরল অ্যাক্সিলারেটর। লাফ দিয়ে এগোতে গেল ভারি গাড়িটা। পারল না, পেছনের অংশ বসে যাচ্ছে।
পড়ে যাচ্ছে, পড়ে যাচ্ছে! বলে পেছনের সীটে বসা রবিন চেঁচাতে শুরু করল।
অ্যাক্সিলারেটর ছাড়ল না মুসা। ভীষণ গোঁ গো শুরু করল ইঞ্জিন। পড়ে যাবেই, আর বাঁচানো গেল না!–যখন ভাবছে সে, এই সময় সামনের কাঠে কামড় বসাল টায়ার। টেনে তুলল গাড়ির পেছনের অংশটাকে। নিরাপদে টেনে আনল ব্রিজের অন্যপ্রান্তে, রাস্তার ওপর।
কখন যে অ্যাক্সিলারেটর ছেড়ে দিল মুসা, বলতে পারবে না। ঝাঁকুনি দিয়ে বন্ধ হয়ে গেল ইঞ্জিন। কেয়ার করল না সে। কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বলল, বেঁচেছি, উফ! থরথর করে কাঁপছে সে।
কাঁপছে অন্য দুজনও।
ব্রিজের কতটা ক্ষতি হয়েছে দেখার জন্যে নেমে এল তিনজনে। মাঝখানের দুটো তক্তা ঝুলে আছে নিচের কালো পানির দিকে, আরেকটা গায়েব।
কোন গাড়ি উঠলেই এখন মরবে, গম্ভীর স্বরে কিশোর বলল। সাবধান করার ব্যবস্থা করা দরকার।
কি করে করব? রবিনের প্রশ্ন।
লোহার কাঠামোতে পা রেখে আর রেলিঙ ধরে প্রায় ঝুলে ঝুলে আবার। অন্যপাশে চলে এল ওরা। পাহাড় থেকে শুকনো ডাল এনে পথের ওপর বিছিয়ে, তার সামনে বড় বড় পাথর রেখে দিয়ে ব্যারিকেড তৈরি করল। এপাশটাতেও একই ভাবে প্রতিবন্ধক তৈরি করে দিল।
আবার গাড়িতে ওঠার পর রবিন বলল, একটা ফোন পেলেই রিপোর্ট করতে হবে।

বনে ঢাকা পাহাড়ের ঢালের নিচ দিয়ে প্রায় মাইলখানেক এগোনোর পর পথের ধারে একটা খামারবাড়ি চোখে পড়ল। নেমে গেল তিন গোয়েন্দা। লেটার বক্সে নাম লেখা: হুফার কট। দরজা খুলে দিলেন বাড়ির মালিক, সবে। খেতে বসেছিলেন, ঘণ্টা শুনে উঠে এসেছেন। খবরটা শুনে ফোনের দিকে। দৌড় দিলেন তিনি।

মিসেস কট বললেন, ওখানে বহুবার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, পথের মোড়টার জন্যেই এমন হয়। একবার একটা গাড়ি স্পীড না কমিয়েই উঠে পড়েছিল ব্রিজে, আর সামলাতে পারেনি, রেলিং ভেঙে পড়ে গিয়েছিল, একজনও বাঁচেনি। তোমাদের ভাগ্য খুব ভাল, বেঁচে এসেছ?...এসো না, বসে যাও আমাদের সঙ্গে, খাও।

খুব ভদ্রভাবে প্রত্যাখ্যান করল কিশোর। বলল, ওরা খেয়ে এসেছে, তা : ছাড়া পাশের শহরে নিলাম দেখতে যাচ্ছে। দেরি করলে গিয়ে আর পাবে না।

কটদেরকে গুডবাই জানিয়ে ফিরে এসে গাড়িতে উঠল ওরা।

পনেরো মিনিট পর সাইনবোর্ডটা চোখে পড়ল। তীর চিহ্ন এঁকে দেখিয়ে দেয়া হয়েছে কোন দিকে যেতে হবে। বড় বড় অক্ষরে লেখা:

পশু নিলাম

একশো গজ সামনে।

বেশ কয়েকটা লাল রঙ করা বাড়ি আর খোয়াড়ের সামনে পার্কিঙের জায়গা। ওখানে গাড়ি রাখল মুসা। তিনজনেই নেমে এগোল উঁচু ছাতওয়ালা একটা বাড়িতে। সারি সারি বে রাখা। অনেক লোক বসে আছে ওগুলোতে। সামনের কাঠের মঞ্চে দাঁড়িয়ে আছে ওয়েস্টকোট পরা একজন। রোগা টিংটিঙে লোক, শরীরের তুলনায় অস্বাভাবিক ভারি কণ্ঠে একটা বাদামী সাদা বাছুরের গুণগান করছে। বাছুরটাকে ধরে রেখেছে তার সহকারী।

এটা বড় জানোয়ারের জায়গা, কিশোর বলল। কুকুর অন্য কোন ঘরে।

আবার বেরোনোর দরজার দিকে এগোল তিন গোয়েন্দা। হঠাৎ কিশোরের হাত খামচে ধরল রবিন। একটা বেঞ্চে চাষীদের মাঝখানে বসে আছে লম্বা এক লোক। সতর্ক, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, পুরু গোফ। চওড়া কানাওয়ালা একটা হ্যাট মাথায়। গায়ে সুন্দর ছাঁটের স্পোর্টস জ্যাকেট।

চিনতে পারো? জিজ্ঞেস করল রবিন।

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত লোকটার দিকে তাকিয়ে রইল মুসা ও কিশোর। চেনাই লাগছে। হঠাৎ লম্বা মানুষটার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ঘুরে গেল ওদের দিকে। অস্বস্তি বোধ করতে লাগল তিনজনেই। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে চলে এল।

কর্নেল হুমবার মত লাগল না? রবিন বলল। এখানে কি করছে?

জবাব দিতে পারল না কেউ।

লম্বা, সরু একটা ঘরের ভেতর থেকে বিচিত্র কোলাহল আসছে। মুসা বলল, কুকুর ওটাতে।
ঢুকল ওরা! মুরগি, কুকুর, শুয়োর, ভেড়া, ছাগল, খরগোশের খাঁচায় বোঝাই এ ঘরটা। ঘরের শেষ মাথায় রয়েছে কুকুরের খাঁচা। বেশির ভাগ কুকুরই দেখা গেল শ্রমিক কিংবা শিকারী জাতের। পশু খেদানোর কোলি কুকুরগুলোর পাশ কাটিয়ে এল মুসা, এগোল লম্বা কান, কোমল, আকর্ষণীয় চোখওয়ালা হাউন্ডগুলোর দিকে।
হাউডই আমার পছন্দ, বলল সে। পছন্দ করতে শুরু করল, কোনটা নেব? কুন হাউন্ড? উই, বেশি বড়। ব্লাড হাউন্ড? বেশি গোমড়া। ব্যাসিট? মোটুকরাম, পা এত খাটো, মনে হয় জন্মদোষ।
সবারই তো এ দোষ না সে দোষ, মুচকি হেসে বলল রবিন। তাহলে নেবেটা কি?
শোনার অবস্থা নেই মুসার। কোণের দিকে হাত তুলে বলল, চলো তো ওগুলো দেখি?
এগারো-বারো বছরের একটা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে ওখানে। ছয়টা নাদুসনুদুস বাচ্চা ঘুরঘুর করছে তার পায়ের কাছে।
বাহ, বিগলস, চওড়া কাঁধ, সেই তুলনায় খাটো পা আর চোখা লেজওয়ালা বাচ্চাগুলোর দিকে তাকিয়ে খুশি হয়ে উঠল মুসা। হঠাৎ একটা বাচ্চা লাফাতে লাফাতে ছুটে এল তার কাছে। তার পায়ে গা ঘষতে লাগল। নিচু হয়ে হাত বাড়াতেই মা জিভ বের করে তার হাত চেটে দিল।
বাচ্চাটাকে তুলে নিয়ে হাসিমুখে বলল সে, এটাই নেব।
ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করল কিশোর, কত?
দশ ডলার।
নিলাম। মাব্যিাগ বের করুল কিশোর।
আবার তার বাহুতে হাত রাখল রবিন। তাকানোর ইঙ্গিত করল। ভেড়ার খাঁচার সামনে দেখা গেল সেই লোকটাকে, কর্নেল হুমবা। একটা ভেড়া দামদরকরছে।
তোমাদের সঙ্গে এসেছে? ছেলেটা জিজ্ঞেস করল।
না, জবাব দিল রবিন। তবে চিনি।
ওটা নিলে ঠকবে। এত বুড়োর বুড়ো, দাঁড়াতেই পারে না। এই পশু দিয়ে কি করবে?
আমিও তো সে-কথাই ভাবছি, বিড়বিড় করল কিশোর। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে নিজেকেই যেন প্রশ্ন করল, ভেড়া কিনতে এল কেন হুমবা? পুমাকে খাওয়াবে?
গাড়িতে উঠল ওরা। থরথর করে কাঁপছে কুকুরের বাচ্চাটা। রবিনের জিজ্ঞাসু দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে মুসা বলল, সেরে যাবে। এই প্রথম ভাইবোনদের কাছ থেকে

সরে এল তো, ভয় পাচ্ছে। কোলে নিয়ে ওটাকে আদর করল সে।
গাড়ির ড্রাইভিং সীটে বসল এবার রবিন। কিশোর, কেবিনে ফিরে যাব?
হ্যাঁ।
গাড়ি চালাল রবিন। কাঁচা এবড়োখেবড়ো রাস্তাটা ধরে কয়েক মাইল এগোনোর পর খেয়াল করল ব্যাপারটা, আরি, গাধা নাকি! এই রাস্তা দিয়ে চলেছি কেন? ব্রিজ না ভাঙা?
অন্যমনস্ক হয়ে ছিল কিশোর। চমকে গিয়ে বলল, তাই তো! আমিও খেয়াল করিনি!
আর মুসা তত কুকুরের বাচ্চাটাকে নিয়েই ব্যস্ত, রাস্তার দিকে তাকায়নি সে।
কয়েক মিনিট ধরে ম্যাপ দেখল কিশোর। বলল, আবার ফিরে যেতে হবে। যেখানে নিলাম হচ্ছে সেখান থেকে আরেকটা রাস্তা গেছে ব্ল্যাক হোলোর দিকে। চলো।
দূর, গাধার মত কাজ করলাম!
নতুন রাস্তাটা আগেরটার মত অত খারাপ না। প্রায় সাতটা বাজে। এখনও সূর্য আছে, কিন্তু বাতাস ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। বেশ আরাম। রাস্তায় যানবাহনের ভিড়। বেশ কিছু গাড়ি কেবল একটা দিকেই চলেছে।
যাচ্ছে কোথায় ওরা? কিশোরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল রবিন। প্রতিটি গাড়িতেই তো মনে হচ্ছে ফুল ফ্যামিলি। সেজেগুঁজে বেরিয়েছে।
মোড় নিতেই কিশোর বলল, ওই যে তোমার জবাব।
বাতাসে ভেসে এল মিউজিক। আরও এগোতে চোখে পড়ল সারি সারি তাঁবু। হ্যারিজ কার্নিভাল নতুন জায়গায় খেলা দেখাতে এসেছে।
ভাল, খুশি হয়ে বলল মুসা, থামব এখানে। আবার পপকর্ন আর পানাট খেতে ইচ্ছে করছে।
থামো!
অবাক হয়ে কিশোরের দিকে তাকাল মুসা, তোমারও ওসব খেতে ইচ্ছে করছে!
না। পুমার খেলা আবার দেখতে ইচ্ছে করছে।
রবিন বুঝে গেল, খেলা দেখাটা আসল ব্যাপার নয়, অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে কিশোরের। কিছু জিজ্ঞেস করল না। গাড়ি রাখল পার্কিঙের জায়গায়। তিনজনে নেমে এগোল পুমার তাঁবুর দিকে। দলে এখন আরও একজন আছে, মুসার বাহুতে গুটিসুটি হয়ে থাকা কুকুরের বাচ্চাটা।
যাচ্ছি তো, বলল মুসা, কিন্তু খেলা দেখাবে কে? হুমবাকে তো দেখে এলাম নিলামের জায়গায়।
এতক্ষণে নিশ্চয় চলে এসেছে, রবিন বলল। উল্টো দিকে গিয়ে সময় নষ্ট করলাম না আমরা।

চলে তো এসেছেই, তিন গোয়েন্দা যখন তাঁবুতে ঢুকল, দেখল খেলাও আরম্ভ হয়ে গেছে। আগের বারের মতই টাইট পোশাক পরেছে হুমবা। সাদা খেলা দেখানোর পোশাকে কিছুটা অন্য রকম লাগছে তাকে, একটু আগে নিলামের জায়গায় যাকে দেখে এল ওরা, তার চেয়ে যেন সামান্য আলাদা। কঠিন শাসনে রেখেছে ভয়ঙ্কর জানোয়ারগুলোকে। তেমনি ঘৃণা দেখা যাচ্ছে ওগুলোর চোখে।
খেলা শেষ হলে, দর্শকরা যখন বেরোনোর গেটের দিকে হুড়াহুড়ি করে এগোল, কিশোর তখন দুই সঙ্গীকে নিয়ে চলল পুমাগুলোকে কাছে থেকে দেখতে। অল্পবয়েসী জানোয়ার, তেল চকচকে শরীর, খাওয়ার কষ্ট পায় না। বোঝা গেল।
আরেকটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে খাঁচার কাছে দাঁড়াল কর্নেল হুমবা।
দারুণ জানোয়ার পোষেণ, হেসে খাতির করার ভঙ্গিতে বলল কিশোর। কী খেতে দেন?
কাঁচা মাংস, কসাইয়ের দোকান থেকে আনা। শান্তকণ্ঠেই জবাব দিল কর্নেল, তবে কিছুটা অন্যমনস্ক, তাড়াহুড়ো করে সরে গেল ওখান থেকে।
কিন্তু তাকে আমরা ভেড়া কিনতে দেখেছি! ব্ল্যাক হোলোর দিকে আবার গাড়ি চালাতে চালাতে বলল রবিন। পুমাকে খাওয়াতে যদি কিনে থাকে, বলল না কেন?
কেবিনে পৌঁছতে পৌঁছতে রাত নটা বেজে গেল। সূর্য ডুবে গেছে, বনের মধ্যে অন্ধকার, কিন্তু আকাশ এখনও পুরোপুরি কালো হয়নি, কেমন একধরনের উজ্জ্বল আভা ছড়িয়ে দিয়েছে।
ছেলেরা আশা করল, এইবার কেবিনে ঢুকে গৃহকর্তাকে দেখতে পাবে। কিন্তু নীরব হয়ে রইল বাড়িটা। কেউ বেরিয়ে এল না ওদের স্বাগত জানাতে। ঘরে ঢুকে টেবিলের ওপর তার নোটটা পড়ে থাকতে দেখল কিশোর। ফেরেননি ক্যাপ্টেন রিচটন।
হলো কি তার? উদ্বেগে ফেটে পড়ল রবিন, খুঁজে বের করতেই হবে, যত জলদি পারা যায়!
হঠাৎ হাত তুলল কিশোর, শোনো, গাড়ি!
ক্যাপ্টেন এসেছেন মনে করে দরজার কাছে দৌড়ে এল ছেলেরা। খোলা জায়গায় ঢুকেছে গাড়িটা, সব আলো নেভানো, কেবল পার্কিং লাইট জ্বলছে। মোটাসোটা, খাটো একজন মানুষ নামল। পরনে বিজনেস স্যুট। দড়াম করে। দরজা লাগিয়ে গটমট করে এসে দাঁড়াল ওদের সামনে।
রিচটন কোথায়? খসখসে কণ্ঠস্বর, অধৈর্য ভাবভঙ্গি।
তিনি নেই, জবাব দিল কিশোর।
নেই? কোথায় গেছে?
জানি না। এলে কিছু বলতে হবে?

আমি টাকা পাই ওর কাছে। দেয় না কেন?
এলে বলব। আপনার নামটা?
অ্যাঁ?.. হুগারফ। আর্নি হুগারফ। বললেই হবে ওকে, চিনবে। আমি ফরেস্টবার্গের অ্যাটর্নি।
অ্যাটর্নি? এক পা এগোল কিশোর, মনে হয় আপনি জানবেন, মিস্টার হুগারফ: ব্ল্যাক হোলোর মালিকের নাম কি? আরিগন?
হ্যাঁ। একটা সামার কটেজ ছিল এখানে ওদের, আগুন লেগে ছাই হয়ে গেছে। চলে গেল সব। তারপর আর কোন হুগারফকে দেখিনি।
ডাইনীর গল্প আপনি বিশ্বাস করেন? ফস করে জিজ্ঞেস করে বসল কিশোর।
প্রশ্নটায় যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল অ্যাটর্নি। তিনজনের ওপর ঘুরতে লাগল চোখ। তারপর বলল, কিসের ডাইনী! ওই গর্তটাই যত নষ্টের মূল। অদ্ভুত প্রতিধ্বনি তোলে। ওই ধারটা তত কয়েক মাইল দূরে, কিন্তু ওখানে গিয়ে চিৎকার করলেও এখান থেকে স্পষ্ট শোনা যাবে।
তাই নাকি! আচ্ছা, ক্যাপ্টেন রিচটন এলে আপনার কথা বলব।
গাড়িটা বেরিয়ে যেতেই মুসা বলল, লোকটাকে একবিন্দু পছন্দ হয়নি আমার। কেমন খটখট করে কথা বলে দেখেছ?
মাথা ঝাঁকাল কিশোর। আমি এখনই পরীক্ষা করে দেখব। কয়েক মাইল দূর থেকে শোনা যায়, এ কথা বিশ্বাস হয় না আমার। গাড়ি নিয়ে হোলোর অন্যপাশে চলে যাচ্ছি। বাতাস এখন এদিকে বইছে। গিয়ে চিৎকার করব, দেখো, তোমরা শোনো কিনা। ওখানে পৌঁছে হেডলাইট জ্বেলে-নিভিয়ে সঙ্কেত দেব।
বারান্দা থেকে নেমে গেল সে।

.

ব্ল্যাক হোলোর কিনারে এসে দাঁড়াল মুসা আর রবিন। অন্ধকার হয়ে গেছে। খানিক পর দেখতে পেল দুটো উজ্জ্বল আলো এগিয়ে যাচ্ছে গর্তের অন্য প্রান্তের দিকে। প্রায় দুই মাইল দূরে।
ওটাই কিশোর, দূরবীন চোখে লাগাতে লাগাতে বলল রবিন। কিছুক্ষণের জন্যে অদৃশ্য হয়ে গেল আলোটা। তারপর আবার দেখা গেল, জ্বলছে নিভছে, জ্বলছে নিভছে।
আমাদের দিকে গাড়ি ঘুরিয়েছে কিশোর, আবার বলল রবিন।
চিৎকার শোনার জন্যে কান খাড়া করে রাখল দুজনে। নিঃশ্বাস বন্ধ করে শোনার চেষ্টা করল। গাড়িটার দিক থেকে এসে গালে পরশ বোলাচ্ছে বাতাস, কিন্তু কোন শব্দ শোনা গেল না। স্থির হয়ে গেল আলো দুটো, ঘুরল, তারপর আবার চলতে আরম্ভ করল। ফিরে আসছে কিশোর।

কেবিনে ফিরে জানাল সে, গলা ফাটিয়ে চিৎকার করেছি। হর্নও বাজিয়েছি।
আমরা কিছুই শুনিনি, রবিন বলল।
হ্যাজাক লাইট জ্বেলে রান্নার জোগাড় করছে মুসা।
টেবিলে কনুই রেখে কুটি করল কিশোর। কই, তেমন কোন প্রতিধ্বনিইতো হয় না হোলোতে। তারমানে হুগার মিথ্যে কথা বলেছে। কেন?
কিছু ঢাকার চেষ্টা করছে না তো? রবিনের প্রশ্ন। লুকাচ্ছে কিছু?
ক্যাপ্টেন রিচটন যে নিখোঁজ হয়েছে, কাজ করতে করতে বলল মুসা, এ কথা কিন্তু জানে না।
বলা যায় না, ভানও হতে পারে তার। হয়তো এসেছিল আমরা কতখানি জানি, জানার জন্যে।
একমত হয়ে মাথা ঝাঁকাল কিশোর। ডাইনীর চেয়েও রহস্যময় কিছু একটা ঘটছে এখানে। ক্যাপ্টেনের ভাগ্যে খারাপ কিছুই ঘটেছে। কাল আবার খুঁজতে বেরোব।
পরদিন ভোরে ঘুম থেকে ওঠার সিদ্ধান্ত নিল ওরা। তাই কুকুরটাকে টোপ হিসেবে বাইরে রেখে জেগে থাকার চিন্তাটা বাদ দিল সে-রাতের জন্যে। ঘুমানো দরকার।
কিন্তু ঘুম আসতে চাইল না। তিনজনেই কান পেতে আছে ডাইনীর। চিৎকার শোনার আশায়। চোখ লেগে এসেছিল, মাঝরাতে তন্দ্রা টুটে গেল তীক্ষ্ণ চিঙ্কারে। ব্ল্যাক হোলোর নিচ থেকে উঠে এল যেন চিৎকারটা, আগের দিনের চেয়ে অন্যরকম। লম্বা, তীক্ষ্ণ, কাঁপা কাঁপা। গোঙাতে শুরু করল বাচ্চাটা, কাঁপছে। ভয়ে।
আজকেরটা আরেক রকম কেন? মুসার প্রশ্ন।
হঠাৎ হাসতে শুরু করল রবিন।
এত হাসির কি হলো! রেগে উঠল মুসা। দেখছ না, কুত্তাটাও ভয় পেয়েছে?
পাবেই তো, হাসতে হাসতে বলল রবিন। যে ডাকছে সে যে তার শত্রু। কুকুরের বাচ্চার অনেক শত্রু থাকে। ডাইনী নয় ওটা, বুঝলে, পেঁচার ডাক। অনেক বড় পেঁচা।
পেঁচা! ওরকম করে ডাকে নাকি?
ডাকে। অনেক জাতের পেঁচা আছে। একেকটার ডাক একেক রকম।
বাংকে উঠে বসল মুসা। তোমার ধারণা এটা পেঁচার ডাক? আর কিছু না?
মাথা ঝাঁকাল রবিন। না আর কিছু না। তবে কাল রাতে যেটা ডেকেছিল সেটা পেঁচা ছিল না। মুসাকে ভয় দেখানোর জন্যে বলল, পেঁচাকে কিন্তু অশুভ পাখি বলা হয়, ডাইনী আর ভূতের সঙ্গে নাকি সম্পর্ক আছে ওদের।
আহ, রাত-বিরেতে ওসব অলক্ষুণে কথা বোলো না তো!

এসব রসিকতার মধ্যে গেল না কিশোর, বলল, পেঁচা কিন্তু কুত্তা চুরি করতে পারে না, রবিন।..রাত দুপুরে ওসব আলোচনা থাক। এসো, ঘুমাই। কাল ভোরে উঠতে হবে।

.

খুব ভোরে উঠল ওরা। কুয়াশা পড়ছে ঘন হয়ে। বিষণ্ন, ধূসর আলো। রোদের দেখা নেই। নাস্তা খাওয়া শেষ করে স্যান্ডউইচ বানাতে বসল মুসা। সঙ্গে করে নিয়ে যাবে। যাতে খিদের জন্যে কাজের অসুবিধে না হয়।

কিশোর অপেক্ষা করতে লাগল শেরিফের লোকের জন্যে।

ঘণ্টাখানেক পর জোরাল বাতাস এসে হঠাৎ করেই সরিয়ে নিয়ে গেল। কুয়াশা। রোদ উঠল। ঝলমল করে হেসে উঠল যেন প্রকৃতি। মুহূর্তে দূর করে দিল সমস্ত বিষণ্নতা।

ওরা আসবে না, বলল কিশোর। চলো, আমরা বেরিয়ে যাই। বসে থাকার মানে হয় না। আগে মিস্টার আরিগনকে খুঁজে বের করব।

কেবিনের দরজা খোলা দেখে একছুটে বেরিয়ে যেতে চাইল কুকুরের বাচ্চাটা, কিন্তু হ্যাঁচকা টান লেগে আটকে গেল। দড়ির একমাথা তার গলায় বাধা, আরেক মাথা মুসার হাতে ধরা। পিঠে বাঁধা একটা ব্যাগ। এই ফগ,. জোরাজুরি করিসনে। ব্যথা পাবি।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল রবিন। ফগ? বাচ্চাটার নাম রাখলে নাকি?

হ্যাঁ, সকালে কুয়াশা দেখেই নামটা মনে পড়ে গেল হঠাৎ।

ভাল। বেশ ধোঁয়াটে ধোঁয়াটে একটা ভাব আছে।

কেবিনের পাশের খাড়া সেই পথটা ধরে আবার নিচে নামতে শুরু করল। গোয়েন্দারা। আগের দিনের মতই নিথর, নীরব হয়ে আছে চারপাশের বন। ওর মধ্যে যাওয়ার ইচ্ছে এমনকি কুকুরটারও নেই, প্রজাপতি কিংবা ফড়িঙ খুঁজতেও নয়।

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল কিলোর। নিচু স্বরে বলল, কালকের মতই অনুভূতি হচ্ছে! মনে হচ্ছে কেউ পিছু নিয়েছে আমাদের।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে কান পেতে রইল তিনজনে। কিন্তু কিছুই শোনার নেই। আবার হাঁটতে লাগল ওরা। নিজেদের অজান্তেই যেন চলে এল সেই ঘরটার কাছে। দরজায় থাবা দিল কিশোর।

সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল দরজা। দেখা দিল একজন লম্বা, চওড়া কাঁধ, ভারি ভুরু, পুরু গোঁফওয়ালা নোক। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল গোয়েন্দাদের দিকে।

মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল রবিনের, কর্নেল হুমবা!

কর্নেল? ভারি কণ্ঠস্বর মানুষটার। জীবনেও কখনও আর্মিতে ছিলাম না, ওই র‍্যাঙ্ক পাব কি করে?
তারমানে, তোতলাতে শুরু করল মুসা, আ-আপনি বলতে চাইছেন, আপনি কর্নেল ডুম হুমবা নন? অ্যানিমেল ট্রেনার?
ভারি গলায় হাহ হাহ করে হাসলেন তিনি। ওসব কিছুই না আমি। আমি অতি সাধারণ ডোবার আরিগন।
হতবাক হয়ে তাকিয়ে আছে কিশোর। সাধারণ পোশাকে আবার কিছুটা অন্যরকম লাগছে তাকে, ভেড়া কেনার সময় যেমন লেগেছিল। বলল, মিস্টার হুম...সরি, আরিগন, আপনাকেই খুঁজছি আমরা। ক্যাপ্টেন রিচটন নামে একজনের ওখানে বেড়াতে এসেছি, কিন্তু তাকেই পাচ্ছি না। দুই রাত ধরে। তিনি নিখোঁজ।
হাসিখুশি মুখটা মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে গেল আরিগনের। এসো, ভেতরে এসো। কুত্তাটাকে আনার দরকার নেই, বাইরে রেখে এসো।
ছোট একটা ঘরে ঢুকল তিন গোয়েন্দা। পুরানো কয়েকটা চেয়ার আর একটা টেবিল আছে। আরিগন বললেন, দরজাটা খোলা রাখো, নইলে অন্ধকার লাগবে। তোমরা বসো, আমি আসছি। মাথা নুইয়ে নিচু একটা দরজা দিয়ে ওপাশের রান্নাঘরে চলে গেলেন। বালতি নড়ার শব্দ হলো, দরজা বন্ধ হলো যেন একটা, তারপর ফিরে এলেন তিনি।
হ্যাঁ, বলো এবার। ক্যাপ্টেন রিচটন কে, তার কি হয়েছে, সব শুনতে চাই।
আগে নিজেদের পরিচয় দিল ছেলেরা। তারপর রবিন জানাল, তিনি আমাদের একজন বন্ধুর বন্ধু। আমরা চিঠি দিয়েছিলাম, আসছি। কিন্তু এসে দেখি তিনি নেই। একেবারে উধাও। এই হোলোতে অনেক খোঁজাখুঁজি করেছি। তার ভাঙা টর্চটা পেয়েছি বনের মধ্যে, আর দুটো শটগানের গুলির খোসা। তিনিই ফায়ার করেছেন সম্ভবত।
হ্যাঁ, আরিগন বললেন, সেদিন রাতে গুলির শব্দ শুনেছি। প্রথমে ভাবলাম কেউ শিকার করতে এসেছে। এখানে কেবল কুন শিকারের অনুমতি আছে, আর কুন শিকার করতে কুকুর সঙ্গে আনে শিকারীরা। কিন্তু কুকুরের ডাক শুনলাম না। তখন ভাবলাম চুরি করে হরিণ মারতে ঢুকেছে কেউ। নাহ্, তোমাদের বন্ধুর কথা জানি না, কি হয়েছে বলতে পারছি না। সরি।
কিশোর জিজ্ঞেস করল, আরেকটা কথা কি বলতে পারবেন? এখানে নাকি কুত্তাও হারিয়ে যাচ্ছে। বনের মধ্যে কোনটাকে একা একা ঘুরে বেড়াতে দেখেছেন?
না, দেখিনি, চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন আরিগন। কুত্তা হারাচ্ছে, সেটা কুত্তা চোরের কাজ হতে পারে। এদিকে কুকুর বিক্রির একটা চোরাই মার্কেট আছে।

ওখান থেকে কারা কেনে জানো, ডাক্তারের দালালেরা। কিছু কিছু ডাক্তার কুকুরকে গিনিপিগ বানিয়ে গবেষণা করে, বড়ই নির-অবলা জানোয়ারের ওপর এই অত্যাচার, ধরতে পারলে মজা দেখাতাম–
কাল একটা লোককে দেখলাম, আমাদের ওপর নজর রাখছে। এক্কেবারে বুনো মনেহলো। পিছু নিয়েছিলাম, ধরতে পারুলাম না, পালাল।
হ্যাঁ, এ ব্যাপারে আমি সাহায্য করতে পারি, একটা আঙুল তুললেন আরিনি। ওর নাম পিচার। বোবা। আর লোক কোথায় দেখলে, বয়েস তো বেশি না। পাশের উপত্যকায় থাকে ওর বিধবা মায়ের সঙ্গে। জন্ম থেকে বোবা নয় সে, কানে শোনে, একটা দুর্ঘটনায় কণ্ঠনালীতে ব্যথা পেয়ে বাকশক্তি হারিয়েছে। সারাটা গরমকাল বনের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। বুনো ফলমূল আর আশপাশের খামার থেকে চেয়েচিন্তে যা জোগাড় করতে পারে, খায়।
বিপজ্জনক? প্রশ্ন করল মুসা, মানে, ওর কাছ থেকে বিপদের ভয় আছে?
আমি ওকে এড়িয়েই চলি। কিছু হলেই পাথর ছুঁড়ে মারে, হাতের নিশান বড় সাংঘাতিক, বন্দুকের গুলিকেও হার মানায়। কুর্তগুলোকে সে-ও নিয়ে যেতে পারে। জন্তু-জানোয়ার, পাখি, এসবে ওর ভীষণ আগ্রহ।
আশ্চর্য জায়গায় মানুষ এখানে বুনো হয়ে ঘুরে বেড়ায়, রাতে ডাইনী এসে চিৎকার শুরু করে অবাক কাণ্ড না?
চোখের তারায় হাসি ফুটল আরিগনের। ডাইনী-ফাইনী আমি বিশ্বাস করি না। তবে রাতে চিৎকারটা ঠিকই শুনি। লোম খাড়া করে দেয়।
রান্নাঘরে পুটপুট শব্দ হলো। লাফিয়ে উঠলেন আক্লিান, আমার কফির পানি পড়ে যাচ্ছে! এসো না তোমরা, রান্নাঘরেই চলে এসো।
প্রচণ্ড কৌতূহল নিয়ে নিচু দরজাটা পেরিয়ে অন্যপাশে এসে ঢুকল তিন গোয়েন্দা। জানালাবিহীন ছোট একটা ঘর, দুটো লণ্ঠন জ্বলছে। ঠাণ্ডার সময় ঘর গরম রাখার জন্যে ছোট একটা স্টোভ আছে। চুলায় কফির পানি ফুটছে। কেটলি থেকে কাপে কফি চলতে গেলেন আরিগন।
আমি এখানে ক্যাম্প করেই আছি বলতে পারো, বললেন তিনি। ছোট একটা টেবিল ঘিরে বসেছে সবাই। এখানে বিশ্রাম নিতে আসি। ইচ্ছে হলে ভেড়াটেভা পালি। খুব শান্তির জায়গা।
তা বটে, স্বীকার করল মুসা। একেবারেই নিরিবিলি।
আরও একটা ব্যাপার, পাগলামিও বলতে পারো। সন্ন্যাসীরা কেমন করে বাস করে, একা থাকতে কেমন লাগে তাদের, জানার খুব আগ্রহ আমার। সে জন্যেই এখানে এসে নিজের ওপরই পরীক্ষা চালাচ্ছি। এ ছাড়া জানার আর তো কোন উপায় নেই।

এই কেবিনটা আমার খুব পছন্দ। আশপাশটা কি চমৎকার দেখেছ? পেছনের দেয়াল একেবারে অরিজিন্যাল, নকল-টকল নয়। নিরেট পাথর। এই কেবিনটাও অনেক পুরানো, একশো বছরেরও বেশি। সে-সময় কি ঘটছিল এই এলাকায়, জানো?
স্মৃতি ঘেঁটে তথ্য বের করার চেষ্টা চালাল রবিন, সে-সময়? নিশ্চয় গৃহযুদ্ধ চলছিল। তাই না?
হ্যাঁ। পড়ালেখা করো তুমি, বোঝা যাচ্ছে। তখন এটা ছিল স্মাগলারদের একটা ঘাটি। মানুষ চোরাচালান করত ওরা। পালিয়ে আসা গোলামরা লুকিয়ে থাকত এখানে, তারপর তাদের পাচার করে দেয়া হত কানাডায়। এ জন্যেই এত লুকোছাপা, পাহাড়ের দেয়াল ঘেষে তৈরি, জানালা নেই, রাতে ঘরের ভেতর থেকে বাইরে আলো যাওয়ারও পথ নেই। জায়গাটা ছোট হতে পারে, কিন্তু খুব নিরাপদ, আরামদায়কও বটে।
নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে আর ভাবছে কিশোর: বিচিত্র এই ছোট্ট কেবিনটাতে মাত্র একটা দরজা, সামনেরটা; তাহলে কোন গোলাম যদি এসে লুকিয়ে থাকে এখানে, তারপর দেখে তাকে ধরতে আসা হচ্ছে, পালাবে কোন পথে? এমন একটা জায়গায় কি লুকাতে চাইবে ওরা যেখান থেকে পালানোর গোপন পথ থাকবে না? তা ছাড়া খানিক আগে যে আরেকটা দরজা লাগানোর আওয়াজ শুনল, সেটা কি সত্যি শুনেছে, না তার কল্পনা?
ঠিক এই সময় থাবা পড়ল সামনের দরজায়।

.

দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে রোদ আসা আটকে দিল একটা মোটাসোটা শরীর। লম্বা মানুষটাকে দেখে বললেন, মর্নিং, মিস্টার আরিগন। অনুমতি না নিয়েই ঢুকে পড়লাম, সরি। আপনার সাহায্য দরকার আমাদের।
রান্নাঘর থেকে বাইরের ঘরে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা। গলা শুনেই চিনতে পেরেছিল আগন্তুককে, শেরিফ টোনার। ওদের দেখে বলে উঠলেন, ও, তোমরা আগেই চলে এসেছ। তার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে আরও তিনজন। লোক। এই যে, তোমাদের সার্চ পার্টি নিয়ে এলাম। তিনজনের বেশি। পারলাম না, এই দিয়েই কাজ চালাতে হবে। তবে তোমরা তিন, মিস্টার আরিগন, আর আমরা মিলে আটজন হয়ে যাচ্ছি, কম না, কি বলো? একটা কুত্তা থাকলে আরও ভাল হত।
আছে, মিস্টার টোনার, মুসা জানাল। আমাদের ফগ।
কালই কিনলাম বিগলের বাচ্চাটা, রবিন বলল।
সার্চ পার্টি কেন, শেরিফ? জানতে চাইলেন আরিগন, সিরিয়াস কিছু ঘটেছে মনে হচ্ছে?

দ্রুত একবার আরিগনের হাসি হাসি মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে নিলেন শেরিফ, কেন, ছেলেরা কিছু বলেনি আপনাকে?
বলেছে। ওদের এক ক্যাপ্টেন বন্ধুর নাকি খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। আমার ধারণা, বনের মধ্যে লম্বা সফরে বেরিয়েছে। সার্চ পার্টি নিয়ে খোদ শেরিফ এসে হাজির হয়ে যাবেন তাকে খুঁজতে, এতটা সিরিয়াস ভাবিনি, হেসে কথাটা শেষ করলেন আরিগন।
ভ্রূকুটি করলেন শেরিফ-যেন বলতে চাইছেন, আরও কত জরুরী কাজ ফেলে এসেছি সেটা তো জানেনই না! কিন্তু বললেন না। কিশোর আর রবিন বুঝতে পেরে চট করে তাকাল পরস্পরের দিকে। ঘাবড়ে গেল, মত বদলে শেষে না খোঁজা বাদ দিয়েই চলে যান।
কিন্তু তা করলেন না তিনি, শান্তকণ্ঠে বললেন, মিস্টার আরিগন, এই এলাকা সবচেয়ে ভাল চেনেন আপনি, আপনার সাহায্য পেলে খুশি হব।
নিশ্চয় করব। খুঁজতেই যখন এসেছেন, আমার এই ঘরটা থেকেই শুরু হোক। কারণ একসময় লুকানোর জায়গা হিসেবেই ব্যবহার করা হত এটাকে। আপনি আসার আগে ছেলেদের এই গল্পই শোনাচ্ছিলাম।
শেরিফকে রান্নাঘর দেখাতে নিয়ে গেলেন আরিগন, ছেলেরা বাইরের ঘরে অপেক্ষা করতে লাগল। চুপ করে বসে না থেকে তিনজন ডেপুটির সঙ্গে পরিচয়ের পালাটা শেষ করে ফেলল ওরা।
বাচ্চাটা কি করছে দেখার জন্যে বাইরে বেরোল মুসা। ভেড়ার খোয়াড়ের কাছে গিয়ে উঁকিঝুঁকি মারছে ওটা। ওটাকে ডেকে ফিরিয়ে আনতে যাবে, হঠাৎ চোখ পড়ল ঘাসের ওপর। কি যেন একটা চকচক করছে। তুলে নিয়েই থমকে গেল, কুঁচকে গেল ভুরু। রেখে দিল পকেটে।
শেরিফ আর অন্যদের নিয়ে ঘর থেকে বেরোলেন আরিগন। মাথায় নরম হ্যাট। সামনের দিকটায় উজ্জ্বল রঙের একটা প্লাস্টিকের প্রজাপতি বসানো। ছেলেদের দেখিয়ে দেখিয়ে লম্বা নলওয়ালা, কারুকাজ করা সাদা বাঁটের একটা পিস্তল জলেন কোমরের বেল্টে, যেন খুব মজা পাচ্ছেন। হেসে বললেন, জীবনে কখনও ডেপুটি হওয়ার সুযোগ পাইনি।
সার্চ পার্টির নেতৃত্ব নিয়ে নিলেন তিনি। তাঁর নির্দেশিত পথেই চলতে লাগল সবাই। কিছুদূর এগিয়ে মুসাকে বললেন, কুত্তাটাকে নিয়ে তুমি আগে আগে থাকো। গন্ধেই অনেক কিছু বুঝতে পারবে ওটা। সবার উদ্দেশ্যে জ্ঞান। বিতরণ করলেন, দুই ধরনের তরাই আছে ব্ল্যাক হোলোতে, নিচে বন, আর ঢালের গায়ে পাথর। প্রথমে বনে ঢুকব আমরা, সেখানে কিছু না পেলে পাথুরে এলাকায় খুঁজতে যাব।

সবাইকে যতটা সম্ভব ছড়িয়ে পড়ার নির্দেশ দিলেন শেরিফ। প্রতিটি লোক তার ডান পাশের লোককে নজরের মধ্যে রাখবে। তাহলে দলছুট হয়ে পড়ার ভয় থাকবে না কারও।
ফগকে নিয়ে মুসা রইল দলটার ঠিক মাঝখানে। সারির বা প্রান্তের শেষ লোকটি হলেন শেরিফ, ডান প্রান্তে কিশোর। তার পাশের লোকটি রবিন। মুসার পাশে আরিগন। ঘন বনে ক্যাপ্টেন রিচটনের খোঁজ চালাল সার্চ পার্টি।
লতায় ছাওয়া ঝোপঝাড়, স্বল্প আলো, আর ঘন হয়ে জন্মানো বড় বড় গাছ বাধা দিয়ে কঠিন এবং ধীর করে তুলল খোঁজার কাজ।
শেরিফ! চিৎকার করে বললেন আরিগন, আপনার সামনে একটা খাত পড়বে। ওটাতে ভাল করে দেখবেন। হাড়গোড় ভেঙে ওতে পড়ে থাকতে পারেন ক্যাপ্টেন।
এক মিনিট পরেই জবাব এল, নেই এখানে।
খানিক পরে রসিকতার সুরে কিশোরদের বললেন আরিগন, তোমাদের সামনে একটা বড় গাছ পড়বে। তাতে মস্ত ফোকর। ভাল করে দেখো, ওর মধ্যে লুকিয়ে বসে আছেন কিনা তোমাদের বন্ধু।
আরিগন ব্যাপারটাকে এত হালকা ভাবে নিয়েছেন দেখে রাগ হতে লাগল কিশোরের। রবিনেরও ভাল লাগছে না এ ধরনের আচরণ। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মাটি আর আশপাশের সব কিছু দেখতে দেখতে চলেছে দু-জনে। মূসা আর ফগও খুব সতর্ক।
বিষণ্ন বনের মধ্যে চলল একঘেয়ে খোঁজার কাজ। হঠাৎ কোন কিছু চমকে দিল ফগকে, সামনের দিকে তাকিয়ে চিৎকার শুরু করল।
মানুষ! চেঁচিয়ে বলল মূসা, একটা লোক পড়ে আছে!
দুই পাশ থেকে দৌড়ে এল সবাই। হাত তুলে দেখাল-মুসা। সবাই দেখল, আবছা অন্ধকার বনের মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আছে কালো কোট, কালো টুপি আর ধূসর ট্রাউজার পরা একটা দেহ।
সবার আগে ছুট লাগাল ফগ। তার পেছনে দৌড় দিল সবাই। পড়ে থাকা দেহটার কাছে আগে পৌঁছল তিন গোয়েন্দা।
দূর! মানুষ কোথায়? হতাশ কণ্ঠে বলে উঠল রবিন, ক্যাপ্টেনের লাশ দেখতে হয়নি বলে খুশিও হয়েছে, এ তো গাছ!
রসিকতা করে ফগকে বললেন আরিগন, কেমন কুত্তারে তুই? গাছকে মানুষ ভেবে বসিস?
কিন্তু সে যে মানুষ ভেবে চিৎকার করেনি তার আচরণেই বোঝা গেল। ছোঁক ছোঁক করছে গাছটার কাছে। নাক নামিয়ে শুকছে। ইঁদুর বা বেজি জাতীয় কোন প্রাণীর গন্ধ পেয়েছে মনে হয়, খোড়লে ঢুকে পড়েছে ওটা।

ওর আর দোষ কি? আমরাও তো ভেবেছি, মুখ কালো করে বলল একজন ডেপুটি। নিরাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে লাগল অন্য দুজন।
দূর থেকে কিন্তু এক্কেবারে মানুষ মনে হয়েছে, কৈফিয়তের ভঙ্গিতে বলল মুসা। এমন একটা ভুল করাতে লজ্জা লাগছে তার।
শেরিফ বললেন, থামি এখানে। একটু জিরিয়ে নিই।
খুশিমনে ব্যাগ খুলে খাবার বের করতে লাগল মুসা। হাতে হাতে তুলে দিল টিউনা মাছ, ডিমের সালাদ, আর ভেড়ার মাংস ও পনিরে তৈরি স্যান্ডউইচ। যে গাছের গুঁড়িটা বোকা বানিয়েছে ওদের, তার ওপর বসেই চিবাতে লাগল তিন ডেপুটি। নিচে বসল তিন গোয়েন্দা ও শেরিফ। খানিক দূরে একটা গাছের গায়ে ঠেস দিয়ে বসেছেন আরিগন।
ঘড়ি দেখে মুখ বাকিয়ে শেরিফ বললেন, এখন যে দুপুর, বনের মধ্যে এই অন্ধকার দেখলে কে বিশ্বাস করবে!
খাওয়ার পর আবার উঠে আগের মতই ছড়িয়ে গেল দলটা। আবার চলল খোঁজা। বিকেল নাগাদ বনে ছাওয়া উপত্যকার নিচেটা পুরো দেখা হয়ে গেল। পাওয়া গেল না কিছু। বন থেকে বেরোতে সামনে পড়ল হোলোর পাথুরে দেয়াল।
ওই যে ওখানে একটা গুহা আছে, হাত তুলে একটা পাথরের চাঙড় দেখিয়ে বললেন আরিগন। ওর মধ্যে পড়ে থাকলে অবাক হব না। গোয়েন্দাদের বললেন, তোমরা যাও। উঠে গিয়ে দেখো। আমি পেছনেই আছি। পা-টাতে যে কি হলো আজ, চাপই দিতে পারছি না।
তরতর করে উঠে যেতে লাগল রবিন। তার পেছনে মূসা, সবশেষে কিশোর। কিছুদূর উঠেই গুহার কালো মুখটা নজরে এল। পাশ দিয়ে চলে গেছে একটা শৈলশিরা। খাড়া ঢাল থেকে ওটার ওপর সবে নিজেকে টেনে তুলেছে রবিন, এই সময় শাঁ করে কি যেন একটা চলে গেল তার কানের পাশ দিয়ে।
খবরদার! তোমার ওপরে! নিচ থেকে চিৎকার করে উঠলেন আরিগন।
একের পর এক পাথর ছুটে আসতে লাগল ছেলেদের দিকে। কিন্তু। কোনটাই গায়ে লাগল না। অল্পের জন্যে মিস হতে লাগল। মুখ তুলে ওরা দেখল, লম্বা, পাতলা একটা মূর্তি উঁকি দিয়ে আছে দেয়ালের একেবারে কিনার থেকে। পাথরগুলো সে-ই ছুড়ছে।
পিচার! ও-ই পিচার! আবার চিৎকার করে উঠলেন আরিগন।
মুঠো পাকিয়ে ওপর থেকে হাত ঝাঁকাতে লাগল বোবা ছেলেটা। কিশোরের মনে হলো, কিছু বোঝানোর চেষ্টা করছে। সরে যেতে বলছে যেন।
ওপরে উঠতে মানা করছে আমাদের, রবিন বলল। কে শোনে তার কথা! আমরা উঠবই, দেখি কি করতে পারে!

পাথর ছুঁড়েও ঠেকাতে না পেরে যেন হাল ছেড়ে দিল ছেলেটা। উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে নিচের দিকে তাকিয়ে বসে রইল।
গর্তের কাছাকাছি চলে এসেছে রবিন আর মুসা। কিনারে এসে ভেতরে তাকিয়েই থমকে গেল। ধড়াস করে উঠল বুক।
মাত্র তিনফুট দূরে কুণ্ডলী পাকাচ্ছে মারাত্মক বিষাক্ত একটা র‍্যাটল স্নেক। ছোবল হানতে প্রস্তুত। চোখের পলকে পাথরের আড়াল থেকে ওটার কাছে চলে এল আরও দুটো সাপ। উদ্দেশ্য ওগুলোরও ভাল না!

.

ঝট করে যে পিছিয়ে যাবে ওরা, তারও উপায় নেই, শৈলশিরাটা এতই সরু। আটকে দিয়েছে ওদেরকে ভয়াবহ সরীসৃপগুলো। খাড়া ঢাল বেয়ে দ্রুত নেমে সরে যাওয়া যাবে না, তার আগেই ছোবল খেতে হবে। তাড়াহুড়ো করতে গেলে আরও বিপদ আছে, হাত ফসকে যেতে পারে, তাহলে আছড়ে পড়তে হবে অনেক নিচের পাথরে। ভাল বিপদেই পড়া গেছে! ওদিকে লেজের খড়খড় আওয়াজ তুলে এগিয়ে আসছে অন্য দুটো সাপ। যে কোন মুহূর্তে কামড়ে দেবে।
বিপদ থেকে উদ্ধারের কোন পথই দেখছে না দুই গোয়েন্দা, এই সময় টাশশ করে উঠল পিস্তল। ছোবল মারতে তৈরি হয়েছিল যে সাপটা, নিমেষে গায়েব হয়ে গেল ওটার মাথা। শরীরটা পাথরে আছড়ে পড়ে মোচড় খেতে লাগল। গুলির শব্দে ভাঁড়কে গিয়ে পালাতে শুরু করল অন্য দুটো।
জলদি সরে এসো ওখান থেকে। চিৎকার করে ডাকল কিশোর।
শৈলশিরা ধরে যত দ্রুত সম্ভব গর্তের কাছ থেকে সরে গেল মুসা আর রবিন। ওদের কাছে উঠে এলেন আরিগন আর কিশোর। আরিগনের পিস্তলের নল থেকে এখনও ধোঁয়া বেরোচ্ছে।
ওরা চারজন নিরাপদে মাটিতে নামার পর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন শেরিফ। ভুরুর ঘাম মুছতে মুছতে বললেন, ওখানে যাওয়াটা উচিত হয়নি তোমাদের! গলা কাঁপছে তার।
এক্কেবারে সময়মত গুলিটা করেছিলেন, মিস্টার আরিগন, কৃতজ্ঞ কণ্ঠে বলল রবিন। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। আপনি থাকাতে আজ বাঁচলাম।
হাসি মুছে গেছে আরিগনের মুখ থেকে। গম্ভীর স্বরে বললেন, এখানে আমি ছিলাম বলে রক্ষা, এটা অন্য কোথাও ঘটতে পারত। সাবধান না হয়ে অত তাড়াহুড়ো করে গর্তের কাছে যাওয়া উচিত হয়নি তোমাদের। অচেনা জায়গায় আরও দেখেশুনে যেতে হয়।
আন্তরিক ভঙ্গিতে একটা হাত মুসার কাঁধে, আরেক হাত রবিনের কাঁধে রাখলেন তিনি। শোনো, আমি যা বলি মন দিয়ে শোনো। বনে চলার অভিজ্ঞতা নেই

তোমাদের, বুঝতে পারছি। এখানে আরও অনেক সাবধান থাকতে হয়। কোথায় যে কোন বিপদ ঘাপটি মেরে থাকে কল্পনাও করতে পারবে না। এই সাপগুলোর কথাই ধরো না, ওরা যে ওখানে আছে ভাবতে পেরেছিলে? অথচ ভাবা উচিত ছিল। গর্তের কাছে পাথুরে জায়গায় শুয়ে রোদ পোয়ায় সাপেরা, কাজেই গর্তের কাছে যাওয়ার আগে সাবধান থাকতে হয়। বুনো এলাকা এটা, এখানে বনের ভেতরে যেমন বিপদ, বাইরেও বিপদ।
তার কথায় সায় জানাল একজন ডেপুটি।
আরেকজন নীরবে মাথা ঝাঁকাল।
শেরিফ বললেন, বনের মধ্যে এ ধরনের বিপদে আনাড়ি লোকেরাই সাধারণত পড়ে। শহরে বাস করা মানুষকে এনে এই পর্বতের মধ্যে ছেড়ে দিলে মুহূর্তে পথ হারিয়ে বসে থাকবে। বেরোতেই পারবে না আর।
হাসি ফুটল আবার আরিগনের মুখে, হালকা হয়ে এল কণ্ঠস্বর, যাই হোক, বুদ্ধিমান লোকেরা একবারই বোকামি করে। ছেলেদের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি বুঝতে পারছি তোমরা বুদ্ধিমান। আশা করব, ব্ল্যাক হোলোর ধারেকাছেও আসবে না আর। এখানে পদে পদে বিপদ যে ওঁত পেতে থাকে, নিজের চোখেই তো দেখলে।
ক্যাপ্টেন রিচটনকে খোঁজার এখানেই ইতি হলো। আরিগন, শেরিফ আর তাঁর তিন ডেপুটিকে ধন্যবাদ জানিয়ে হতাশ হয়ে কেবিনে ফিরল তিন গোয়েন্দা। সাপের কবল থেকে বাঁচার পর থেকেই শরীরটা দুর্বল লাগছে। রবিনের, ধপ করে শুয়ে পড়ল বাংকে। কুকুরের বাচ্চাটাকে কিছু খাবার দিয়ে। মুসা গেল রান্নাঘরে। আবার রিচটনের ক্যালেন্ডারটা নিয়ে বসল কিশোর। দেখতে লাগল মনোযোগ দিয়ে।
শিক কাবাব, পটেটো চিপস আর ভেজিটেবল সুপ রান্না করে সবাইকে খেতে ডাকল মুসা। তখনও চুপ করে আছে রবিন। কিশোর গম্ভীর। এই পরিস্থিতি ভাল লাগল না মুসার। হালকা করার জন্যে বলল, ব্যাপারটা খারাপ লাগেনি তোমাদের?
মুখ তুলল কিশোর, কোনটা?
এই যে খোকাবাবু মনে করে আমাদের লেকচারটা দিয়ে দিলেন আরিগন। আমার তো রাগই হচ্ছিল। বনেবাদাড়ে ঘুরতে ঘুরতে ঝানু হয়ে গেলাম, আর আমাদের কিনা বলে বন চিনি না। আরে বাবা ক্যাম্প করেই তো থাকলাম কত শতবার।
চিবাতে চিবাতে রবিন বলল, আমারও ভাল লাগেনি। কিছু বললাম না, আমাদের প্রাণ বাঁচিয়েছে বলে। গাধামি তো সত্যিই করেছি আমরা।

কিশোর বলল, না, সেটা আমাদের দোষ নয়। নাহয় ধরলামই আমরা আনাড়ি, বন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নেই, কোথায় সাপ শুয়ে রোদ পোহায়, জানি না, কিন্তু আরিগন তো জানতেন। আর জানতেনই যদি আমাদের ওখানে যেতে বললেন কেন?

তাই তো, এভাবে তো ভাবিনি! চিবানো বন্ধ করে দিল রবিন। ক্যাপ্টেনকে খোঁজা বন্ধ হয়ে গেল…আমাদের হোলোতে না যাওয়ার পরামর্শ দিলেন…কিশোর, যা-ই বলো, ওই বাড়িটা যেমন রহস্যময়, তার মালিকও তেমনি রহস্যময়। একটা দরজা বন্ধ হতে শুনেছি আমি, অথচ রান্নাঘরে ঢুকে আর কোন দরজা চোখে পড়েনি।

ব্যাপারটা আমারও খটকা লেগেছে। একমুহূর্ত চুপ করে ভাবল কিশোর। তারপর বলল, ইচ্ছে করেই সাপের বাসায় আমাদের পাঠিয়ে দিয়েছেন তিনি। ওখানে সাপ আছে জানেন, তাই সঙ্গে সঙ্গে পিস্তল নিয়ে এসেছেন, যাতে গুলি করতে পারেন। এ সব করে শেরিফকে বোঝাতে চেয়েছেন, কয়েকটা নির্বোধ, অপোগণ্ড ছেলে আমরা, আমাদের কথায়। ভবিষ্যতে কান না দেয়াই উচিত।

আচ্ছা, মুসা বলল, আমাদের খুন করতে চায়নি তো? সাপে কামড়ে আমাদের মেরে ফেললে কারও দোষ হত না। শেরিফ আর তার ডেপুটিদের চোখের সামনে ঘটত ব্যাপারটা। কোন রকম সন্দেহ জাগত না কারও মনে।

কি জানি, বুঝতে পারছি না, অনিশ্চিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল কিশোর।

আরও একটা প্রশ্ন, পিচার আমাদের পাথর ছুঁড়ল কেন? সে-ও কি আরিগনের দলের লোক?

না-ও হতে পারে। সাপের গুহার দিকে এগোচ্ছি দেখেও ছুঁড়তে পারে, আমাদের ঠেকানোর জন্যে। তবে শিওর হতে পারছি না।

ভুরু কুঁচকে রবিন বলল, এই আরিগন লোকটা এক বিরাট রহস্য হয়ে দাঁড়াল! কর্নেল হুমবার সঙ্গে অবিকল মিল, এটাই বা হয় কি করে? যমজ ভাই নাকি…

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই চিৎকার করে উঠল মুসা, এই দাঁড়াও দাঁড়াও, একটা জিনিস দেখাব তোমাদের! ভুলেই গিয়েছিলাম! পকেট থেকে একটা ধাতব চাকতি বের করে টেবিলে ফেলল সে।

কি জিনিস? হাতে নিয়ে একবার দেখেই ভুরু কাছাকাছি হয়ে গেল কিশোরের, আরি এ তো কুকুরের গলার ট্যাগ! ডবের নাম! পটির কুকুর! কোথায় পেলে?

আরিগনের বাড়ির দরজার সামনে, ঘাসের ওপর।

তবে কি আরিগনই কুকুর চুরি করছেন? আগ্রহে বকের মত সামনে গলা বাড়িয়ে এসেছে রবিন, কিশোরের হাতের তালুতে রাখা ট্যাগটা দেখছে। কোন ধরনের অপরাধে জড়িত? নিজেই তো বললেন, এই এলাকায় একটা বেআইনী কুকুরের মার্কেট আছে।

কিছুই বুঝতে পারছি না, মাথা নাড়তে নাড়তে বলল কিশোর। ক্রমেই জটিল হয়ে উঠছে রহস্য। তাঁর বাড়িতে কুকুরের ছায়াও তো দেখলাম না।
তার ভেড়ার খোয়াড়টা দেখে এসেছি আমি, মুসা জানাল, ভেড়া নেই, অন্য কোন প্রাণীও নেই। এমন হতে পারে, ডব গিয়ে বাড়িটার সামনে ঘুরঘুর করছিল, ওই সময় কোনভাবে তার গলা থেকে খুলে পড়ে যায় ট্যাগটা।
চুকচুক শব্দ করে দুধ খেতে লাগল ফগ। সেদিকে তাকিয়ে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার কিশোর। বলল, আজ রাতেই ফাঁদ পাতব।
রাখবে কোথায়?
বারান্দার নিচে, বেঁধে। দরজার কাছে লুকিয়ে থাকবে তুমি আর রবিন। আমি থাকব বাইরে, বাড়ির কোণে। যেদিক থেকেই আসুক চোর, আমাদের চোখে না পড়ে যাবে না।
রাত দশটায় আলো নিভিয়ে দেয়া হলো। গাঢ় অন্ধকারে ডুবে গেল ছোট্ট কেবিনটা। আকাশে মেঘ করেছে। বাতাস গরম। নিথর হয়ে আছে প্রকৃতি। ঝড়ের সঙ্কেত জানাচ্ছে।
নিঃশব্দে দরজা খুলে ফগকে নিয়ে বেরোল মুসা। বারান্দার রেলিঙের সঙ্গে বাঁধল কুকুরটার গলার দড়ি। ঘরে ফিরে গেল আবার। পাল্লাটা খোলা রেখে দুপাশে বসে পড়ল সে আর রবিন।
অন্ধকারে যাতে দেখা না যায়, এ জন্যে গাঢ় রঙের পোশাক পরে বেরোল কিশোর। ক্যাপ্টেনের গাড়ি আর ঘরের দেয়ালের মাঝের ফাঁকে লুকিয়ে বসল, চত্বরের কাছ থেকে কয়েক কদম দূরে।
তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইল সে। কান খাড়া। ধীরে ধীরে চোখে সয়ে এল অন্ধকার। তারপরেও বন থেকে বেরিয়ে কেউ যদি এগিয়ে আসে, তাকে দেখতে পাবে না পেছনে গাছগুলো কালো হয়ে থাকায়।
ক্রমেই যেন আরও ভারি, আরও গরম হয়ে উঠছে বাতাস। দিগন্তে ঝিলিক দিতে আরম্ভ করল বিদ্যুতের সরু সরু শিখা। গুমগুম আওয়াজ বেরোতে থাকল মেঘের ভেতর থেকে। হঠাৎ পুরো আকাশটাকে চিরে দিয়ে ঝিলিক দিয়ে উঠল বিদ্যুৎ, ক্ষণিকের জন্যে সবকিছুকে উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত করেই নিভে গেল, অন্ধকারকে ঘন করে তুলল আরও। দশদিক কাঁপিয়ে কানফাটা শব্দে বাজ পড়ল।
ঘড়ি দেখল কিশোর। এখন মধ্যরাত।
আবার বিদ্যুৎ চমকাল। বজ্রপাতের শব্দ আগের বারের চেয়ে দীর্ঘায়িত হলো। বারান্দার নিচে ভীতকণ্ঠে কুঁই কুঁই করতে লাগল বাচ্চাটা।
ঝড়ের আর দেরি নেই, ভাবল কিশোর।

আবার বিদ্যুতের চমক, আবার বজ্রপাত…তার পর পরই বড় বড় ফোঁটা কয়েক মিনিটের মধ্যেই শুরু হলো মুষলধারে বৃষ্টিপাত। আচমকা গোঙানো বাদ দিয়ে তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠল ফগ। কয়েকটা চিৎকার দিয়েই থেমে গেল, মুখ চেপে ধরা হয়েছে যেন, যাতে ডাকতে না পারে।
ঝড় মুহূর্তের জন্যে অমনোযোগী করে দিয়েছিল তিনজনকেই, কুকুরটার ওপর নজর রাখতে ভুলে গিয়েছিল, এই সময়টুকুতেই ঘটে গেল ঘটনাটা। স্প্রিঙের মত লাফিয়ে উঠে দৌড়ে এল মুসা ও রবিন, বাড়ির পাশ থেকে ছুটে
এল কিশোর।
দেখল, ফগ নেই!
মুখ চেপে ধরলেও বাচ্চাটার গোঙানি শোনা যেত, কিন্তু ঝড়ের শব্দ ঢেকে দিল সেটা। বিদ্যুৎ চমকাল, তীব্র নীলচে আলোয় আলোকিত করে দিল বনভূমি, সেই আলোতে তিনজনেরই চোখে পড়ল হোলোতে নামার পথটা ধরে ছুটে যাচ্ছে একটা মূর্তি।
ধরো ওকে! চিৎকার করে বলল কিশোর।
টর্চ হাতে ছুটল তিনজনে।
.
কয়েক লাফে খোলা জায়গাটুকু পেরিয়ে বনে ঢুকে পড়ল তিন গোয়েন্দা। টর্চের আলো থাকা সত্ত্বেও গতি কমিয়ে ফেলতে বাধ্য হলো। বৃষ্টিতে ভেজা ঢালু এই পথ ধরে জোরে ছোটা ওদের পক্ষে অসম্ভব।
সামনে অন্ধকারের মধ্যেই দৌড়ে চলেছে কুত্তাচোর। তার চলা দেখেই অনুমান করা যায়, এই এলাকা তার অতিপরিচিত। ফগের চিৎকার শোনা গেল আবার, তার মুখ ছেড়ে দেয়া হয়েছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, গাছের পাতা থেকে টুপটাপ ঝরছে বৃষ্টি। বিদ্যুতের আলোয় প্রায় তিরিশ গজ নিচে ছুটন্ত মূর্তিটাকে দেখতে পাচ্ছে ছেলেরা।
হঠাৎ অন্ধকারে মানুষের আর্তনাদ শোনা গেল। ডান দিকে পাথরের মধ্যে একটা ভারি কিছু গড়িয়ে যাচ্ছে। মুহূর্তের জন্যে বোধহয় থেমেছিল, আবার শোনা যেতে লাগল ছুটন্ত পায়ের শব্দ।
কিশোর, তোমরা দেখো তো কি হলো! আগে আগে ছুটতে ছুটতে বলল মুসা। আমি চোরটার পিছে যাচ্ছি!
টর্চের আলো ফেলে ঘন ঝোপের দিকে দৌড় দিল কিশোর আর রবিন। ঝোপঝাড় ভাঙার শব্দেই বোঝা গেল তার মধ্যে দিয়ে ছুটছে কেউ। কিন্তু আর গোঙানি কানে এল না। খানিক পর ঝড়বৃষ্টির শব্দ ছাড়া শোনা গেল না আর কিছুই।
পালিয়েছে, হাঁপাতে হাঁপাতে বলল রবিন। ধরতে পারব না।

মুসা ওদিকে গতি আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। নেমে যাচ্ছে উপত্যকায়। টর্চ হাতে থাকলেও ওই আলোয় পথ দেখে দৌড়াতে অসুবিধে, কারণ দৌড়ানোর। সময় নাচানাচি করে আলো, এ জন্যে নিভিয়ে দিয়ে বিদ্যুতের আলোয় যতটা পারা যায় দেখে দৌড়াচ্ছে। পথটা তারও মোটামুটি চেনা।
বড় করে বিদ্যুৎ চমকাল। আলো রইল বেশিক্ষণ। তাতে তিরিশ গজ। দূরের ছুটন্ত মূর্তিটাকে স্পষ্ট নজরে পড়ল তার। বগলে চেপে ধরে আছে কিছু।
পিচার! চিৎকার করে ডাকল সে, দাঁড়াও!
কিন্তু দাঁড়াল না আজব ছেলেটা। হোলোর পাথুরে এলাকার দিকে দৌড় দিল। পায়ে ব্যথা পেয়েছে মনে হলো, অল্প অল্প খোঁড়াচ্ছে, কিন্তু গতি কমছে না। পাথরে ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল। কিন্তু সমতল জায়গায় রয়েছে মুসা, তার সঙ্গে পারল না ছেলেটা। কয়েক লাফে কাছে পৌঁছে গেল সে। পা সই করে ঝাঁপ দিল। গোড়ালি ধরে ফেলল ছেলেটার। উপুড় হয়ে পড়ে গেল। পিচার, বগলের নিচ থেকে ছিটকে পড়ল দূরে ফগ, ব্যথা পেয়ে কেউ কেউ করতে লাগল।
চরমে পৌচেছে ঝড়। বৃষ্টির বেগ আরও বেড়েছে। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকে আলোকিত করে রেখেছে উপত্যকা।
ছেলেটার গায়ের ওপর চলে এল মুসা, কুস্তির কায়দায় চেপে ধরল। কিন্তু পিচারের গায়েও কম জোর না, তার ওপর ভেজা শরীর, ভেজা হাত, তাকে ধরে রাখতে পারল না মুসা। পিছলে নিচ থেকে সরে গিয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল ছেলেটা। একটা বড় পাথর তুলল মারার জন্যে।
নিচ থেকে চিৎকার শোনা গেল, খবরদার, ফেলো ওটা!
চমকে ফিরে তাকাল পিচার, এই সুযোগে গড়িয়ে সরে গেল মুসা। আবার ছেলেটার পা ধরে হ্যাঁচকা টান মারল। আরেকবার ফেলে দিল মাটিতে।
পৌঁছে গেল রবিন আর কিশোর। তিন জনের সঙ্গে পারল না ছেলেটা, কাবু করে ফেলা হলো তাকে। তুলে দাঁড় করিয়ে দেয়া হলো। দু-দিক থেকে দুই হাত চেপে ধরে রেখেছে দু-জনে। এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে মুসা। বলল, আমার কুত্তাটা কোথায়? এই ফগ, ফগ?
ডাক শুনে কুঁই কুঁই করতে করতে এসে হাজির হলো বাচ্চাটা। ভিজে চুপচুপে হয়ে গেছে, ভয় আর ব্যথা ভুলে গিয়ে মুসার পা ঘেষে দাঁড়িয়ে লেজ নাড়তে লাগল। ওটার গলার দড়ি খুলে নিয়ে পিছমোড়া করে হাত বাধা হলো পিচারের। বন্দিকে নিয়ে কেবিনে ফিরে চলল তিন গোয়েন্দা।
খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলল বুনো ছেলেটা, পালানোর চেষ্টা করল না আর।
ভিজে গোসল করে ওরাও কেবিনে পৌঁছল, বৃষ্টিও থেমে গেল। ঝড়ো বাতাসে মেঘ উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে পরিষ্কার করে দিল আকাশ।

আমার খিদে পেয়েছে, ঢুকেই ঘোষণা করল মুসা। উফ, যা দৌড়ানটা দৌড়েছি!
পেয়েছে তো আর কি, রবিন বলল, খাবার বানাও, মানা করছে কে।
গা মুছে, কাপড় বদলে রান্নাঘরে চলে গেল মুসা। বিরাট এক পাত্রে স্যুপ বসাল। সেই সঙ্গে চলবে স্যামন মাছের স্যান্ডউইচ।
বন্দির বাঁধন খুলে দিয়েছে কিশোর আর রবিন। কিছু শুকনো কাপড় এনে দিয়ে ভেজাগুলো বদলে নিতে বলল।
কেবিনের উজ্জ্বল আলোয় এই প্রথম কাছে থেকে ভাল করে ছেলেটাকে দেখতে পেল গোয়েন্দারা। বয়েস চোদ্দ হবে, তবে সেই তুলনায় অনেক লম্বা, গঠনও বড়দের মত। কালো লম্বা চুল লেপ্টে রয়েছে ঘাড়ে, কপালে, কতদিন কাটে না কে জানে। টারজানের বাচ্চা সংস্করণ মনে হলো ওকে রবিনের কাছে।
কাপড় বদলে চুপ করে বসল পিচার। পায়ে একটা গভীর কাটা থেকে রক্ত বেরোচ্ছে। ফার্স্ট এইড বক্স নিয়ে এল কিশোর। কাটাটা আইয়োডিন। দিয়ে মুছে, ওষুধ লাগিয়ে ব্যান্ডেজ করে দিল। বাধা দিল না ছেলেটা। আইয়োডিন লাগানোর সময় যখন ছ্যাৎ করে জ্বলে উঠল জখমটা, তখনও মুখ বিকৃত করল না। ভয় অনেকটা দূর হয়ে গেছে চোখ থেকে, বুঝে গেছে তার কোন ক্ষতি করবে না কিশোররা।
ট্রে বোঝাই খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকল মুসা। হাসিমুখে কয়েকটা স্যান্ডউইচ আর একবাটি স্যুপ এগিয়ে দিয়ে বলল, নাও পিচার, খেয়ে ফেলো।
দ্বিতীয়বার আর বলতে হলো না, গপ গপ করে গিলতে শুরু করল পিচার। দেখতে দেখতে শেষ করে ফেলল। আরও কিছু খাবার তার দিকে বাড়িয়ে দিল মুসা। হেসে বলল, বাহ, আমার সঙ্গে পাল্লা দেয়ার মত একজনকে পাওয়া গেল।
পিচার আর মুসাকে খাওয়ায় ব্যস্ত রেখে ইশারায় রবিনকে ডেকে নিয়ে রান্নাঘরে চলে এল কিশোর। নিচু স্বরে বলল, ছেলেটাকে একটুও বিপজ্জনক লাগছে না আমার কাছে। কাল নদীর ধারে আমাদের ওপর চোখ রেখেছিল। যে, সে পিচার নয়। ওই লোকটা এর মতই লম্বা, তবে চেহারা মেলে না, অন্য রকম।
একমত হয়ে মাথা কঁকাল রবিন। আমরা তো আর সন্দেহ করিনি, আরিগন বলেছেন পিচার হতে পারে।
আর কিছু বলার সুযোগ পেল না ওরা, পিচারকে নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকল। মুসা। ফগকেও খাবার দেয়া হয়েছে। তাকে আদর করতে লাগল মুসা।
স্টোভের আগুনে গরম হয়ে উঠেছে রান্নাঘর, বেশ আরাম। বৃষ্টিতে ভিজে এসে শুকনো কাপড় পরে, পেট ভরে খাওয়ার পর বুনো ভাবটা চলে গেছে পিচারের মুখ থেকে। মুসা আর ফগের দিকে তাকিয়ে লাজুক হাসি হাসল, বুঝিয়ে দিল কুকুর ভালবাসে সে।

কিশোর ভাবল, ছেলেটার সঙ্গে কথা বলা দরকার। কিন্তু পিচার বোবা, জবাব তো দিতে পারবে না, কি করে বলবে? শেষে বসার ঘরে চলে গেল। কিশোর, কাগজ আর পেন্সিল নিয়ে এল। ছেলেটার হাতে দিয়ে বলল, আমি কয়েকটা কথা জানতে চাই, জবাব দেবে?

ওদের ব্যাপারে ভীতি আর সন্দেহ চলে গেছে পিচারের। মাথা ঝাঁকাল।

বেশ, ধীরে ধীরে স্পষ্ট করে বলল কিশোর, বলো, আমাদের কুকুরটা নিয়ে যেতে চেয়েছিলে কেন?

বিস্ময় ফুটল ছেলেটার চোখে। টেবিলে কাগজটা বিছিয়ে নিয়ে পেন্সিল দিয়ে স্কেচ করতে লাগল। লম্বা, চওড়া কাধ একজন মানুষের চেহারা ফুটে উঠল কাগজে। ভুরু আর গোঁফ ভারি করে দিল সে।

এ তো আরিগন! অবাক কণ্ঠে বলে উঠল রবিন। কিন্তু ছবি এঁকে কেন? লিখলেও আরও সহজ হয়ে যায়।

লিখতে জানে না বোধহয়। হাত তুলল কিশোর, দাঁড়াও, পিচারের আঁকা এখনও শেষ হয়নি।

টেবিল ঘিরে এসেছে তিন গোয়েন্দা, তাকিয়ে রয়েছে কাগজটার দিকে। লম্বা একজন মানুষ আঁকল পিচার, হাত আঁকল, ফগের চেহারার একটা বাচ্চা কুকুর ধরেছে হাতটা।

আবার চেঁচিয়ে উঠল রবিন, ও বলতে চায়, আরিগন চুরি করেছেন বাচ্চাটাকে!

.

দাঁড়াও, আবার বলল কিশোর, ওর আঁকা এখনও বাকি আছে।

আরও কয়েকটা কুকুরের ছবি আঁকল পিচার–একটা ককারেল স্প্যানিয়েল, একটা জার্মান শেফার্ড, আর দুটো হাউন্ড।

ওটা আবার কি আঁকছে? পিচারের পেন্সিলের দিকে তাকিয়ে বলল রবিন, একটা ধূসর কুকুর?

ধূসর কিংবা বাদামী, কিশোর বলল। দেখো, বা কানটা সাদা রেখে দিয়েছে।

খাইছে! বলে উঠল মুসা, ওটা তো পটির কুকুর! তারমানে ডবকেও চুরি করেছেন আরিগন!

বার বার আরিগন নামটা শুনেই বোধহয় মুখ তুলে একটা রাগত ভঙ্গি করল পিচার। তারপর রেখা টেনে টেনে সবগুলো কুকুরকে যোগ করে দিল মানুষটার ছবির সঙ্গে। চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল ছেলেটা। দৃষ্টি আর ভঙ্গি দেখে মনে হলো আরও কিছু বলতে চায়। আরিগনের ছবিতে আঙুল রাখল, তারপর ফগকে দেখাল। হঠাৎ একটা চেয়ারের নিচে চলে গিয়ে মুখ বের করে উঁকি দিল।

ও বলতে চায়, ব্যাখ্যা করল কিশোর, গাছের আড়ালে কিংবা ঝোপের। মধ্যে লুকিয়ে ছিল।
হাত টান টান করে দিল পিচার, আঙুলগুলো ছড়িয়ে দিয়ে আবার বন্ধ করে বোঝাতে চাইল ভারি কিছু চেপে ধরেছে। লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল চেয়ারের নিচ থেকে। হাতের অদৃশ্য জিনিসটা দিয়ে ডোনারের ছবির মাথায় বাড়ি মারল, পরক্ষণেই হাতের কুকুরের বাচ্চাটাকে ছো মেরে কেড়ে নিয়ে ঘুরে দৌড় দেয়ার ভঙ্গি করল।
কি বোঝাতে চাইল বুঝল তিন গোয়েন্দা। সে লুকিয়ে বসে চোখ রাখছিল, আরিগন আসতেই তার মাথায় বাড়ি মেরে বাচ্চাটাকে কেড়ে নিয়ে দৌড় দিয়েছে।
হু, চোরের ওপর বাটপাড়ি! মন্তব্য করল উত্তেজিত রবিন।
কিশোরের প্রশ্ন তখনও শেষ হয়নি, আজ বিকেলে আমাদেরকে পাথর ছুঁড়লে কেন?
আবার চেয়ারে বসল পিচার। কয়েক টানেই এঁকে ফেলল তিনটে ব্যাটল। সেক। ওগুলো দেখিয়ে মুসা আর রবিনের বুকে হাত রেখে ওদেরকে ঠেলে সরানোর ভঙ্গি করল।
হেসে বলল কিশোর, বলেছিলাম না, ও তোমাদের বাঁচাতে চেয়েছিল। সাপগুলো দেখেছিল। তার মানে আরিগনের দলে নয় সে।
আচমকা প্রশ্নটা জাগল রবিনের মাথায়, কুত্তাচোরের পেছন নিয়েই বিপদে পড়েননি তো ক্যাপ্টেন রিচটন?
পড়তে পারেন। তারও তো একটা কুকুর ছিল। আরিগন হয়তো চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিল, ক্যাপ্টেন পিছু নিয়েছিলেন তার। তারপর গোপন এমন কিছু দেখে ফেলেছিলেন, যেটা কাল হয়েছিল তার।
তখন তাকে পথ থেকে সরিয়ে দেয়া হলো! পাতায় লেগে থাকা রক্তের কথা ভেবে বলল রবিন।
নতুন সম্ভাবনাটা নিয়ে এতই মজে গেল তিনজনে, নিঃশব্দে কখন যে দরজার কাছে চলে গেল পিচার, খেয়াল করল না। করল সে বেরিয়ে যাওয়ার পর। লাফিয়ে উঠে তার পিছু নিতে গেল মুসা, ধরে ফেলল কিশোর। যাক। ও আমাদের পক্ষেই আছে।
ওর জন্যে কিছু করতে পারলে ভাল হত, রবিন বলল। ছবি আঁকার। হাত দেখেছ? ট্যালেন্ট একটা! আর্ট স্কুলে ভর্তি হলে ফাটিয়ে ফেলবে।
মাথা ঝাঁকাল কিশোর। সে-সব পরের ভাবনা। আগে এই রহস্যের একটা কিনারা করা দরকার। বুঝলে, কর্নেল হুমবাকে মন থেকে তাড়াতে পারছি না আমি,

আরিগনের সঙ্গে চেহারার এত মিল কেন? ভাবছি, কাল আবার কার্নিভ্যালে গিয়ে হুমবার সঙ্গে কথা বলব। জিজ্ঞেস করব, তার কোন যমুজ ভাই আছে কিনা।
ফরেস্টবার্গে গেলেও তথ্য মিলতে পারে। আরিগন পরিবার সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানা দরকার।
রাতের ঝড়বৃষ্টির পর খুব ঝলমলে হয়ে দেখা দিল সকাল। গাছের সবুজ পাতা চকচক করছে কাঁচা রোদে। ফুরফুরে মন নিয়ে কেবিন থেকে বেরোল তিন গোয়েন্দা। কিন্তু বাইরে বেরিয়েই থমকে গেল মুসা, বলে উঠল, খাইছে! দেখো!
কনভারটিবলের টপ তুলে দিতে ভুলে গিয়েছিল ওরা, বৃষ্টির পানি জমে আছে গাড়ির মেঝেতে। সীট, সীটের কভার, সব ভেজা। পানি মুছে নিয়েও। তাতে বসে যাওয়া যাবে না।
ক্যাপ্টেনের গাড়িটাই নিয়ে যাই, রবিন বলল। এতে আরেকটা কাজ হবে। তার শত্রুরা দেখলে মনে করতে পারে তিনি পালিয়েছেন, বাধা দেয়ার জন্যে তখন সামনে বেরিয়ে আসতে পারে ওরা।
বুদ্ধিটা ভাল, পছন্দ হলো কিশোরের। এ ছাড়া আর কিছু করারও নেই, তাদের এত ভেজা গাড়ি নিয়ে যাওয়া যাবে না। পানিটানিগুলো মুছে, শুকানোর জন্যে ফেলে রেখে ক্যাপ্টেনের গাড়িটা নিয়েই রওনা হলো ওরা।
রবিনই চালাল, কিশোর তার পাশে, কুকুরের বাচ্চাটাকে নিয়ে পেছনে বসল মূসা। ফরেস্টবার্গে পৌঁছে দেখা গেল সীটে এলিয়ে পড়ে ঘুমাচ্ছে মুসা, বাচ্চাটা কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে তার কোলে। হেসে ফেলে কিশোর বলল, কাল রাতে দু-জনের ওপরই খুব ধকল গেছে। ঘুমাক। চলো, আমরাই যাই।
কোর্টহাউসের দিকে হেঁটে এগোল ওরা। মাত্র আটটা বাজে, রাস্তায় লোকজন কম। আগের দিন ভাল করে দেখা হয়নি, আজ দেখতে দেখতে চলল ওরা। বেশির ভাগ দোকানেরই ওপরতলায় অফিস করা হয়েছে। একটা সাইনবোর্ডে দেখা গেল:
আর্নি হুগারফ
অ্যাটর্নি-অ্যাট-ল
ঢুকবে কি ঢুকবে না দ্বিধা করতে লাগল। সে কি ভেবে না ঢোকাই স্থির করল।
রাস্তা পেরিয়ে কোর্টহাউসের সামনে এসে দাঁড়াল দু-জনে। এত সকালে কেউ কাজে আসেনি।
এক কাজ করি চলো, কিশোর বলল। দোকানগুলোতে খোঁজ নিই। আরিগনদের কেউ চিনতেও পারে।
পরের একটা ঘণ্টা দোকানে দোকানে ঘুরে বেড়াল দুই গোয়েন্দা। দু একজনের কাছে নামটা পরিচিত হলেও কোথায় শুনেছে মনে করতে পারল। কেউ কোন

তথ্য দিতে পারল না। অনেকেই এখানে নতুন, তারা চেনেই না আরিগনদের। আর পুরানো যারা, চিনতে পেরেছে, তারা চেপে গেছে; বাইরের কারও কাছে নিজেদের ঘরের কথা বলতে রাজি না ওরা।
পথের মাথার একটা দরজির দোকান দেখিয়ে কিশোর বলল, চলো, ওইটাই শেষ। সে-ও বলবে না।
এবার অন্য বুদ্ধি করব। ভাব দেখাব, যেন কাজ করাতে এসেছি।
দরজির দোকানে আবার কি কাজ? অবাক হলো রবিন।
হেসে প্যান্টের একটা ছেঁড়া দেখাল কিশোর। কাল রাতে পাথরে টাতরে খোঁচা লেগে বোধহয় ছিঁড়েছে। রিপু করাব।
দরজা খোলার শব্দ শুনে মুখ তুলে তাকাল বুড়ো দরজি। ছোটখাট মানুষ, মাথা জুড়ে টাক। কাউন্টারে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, কী?
ছেঁড়াটা দেখিয়ে কিশোর অনুরোধের সুরে বলল, এটা রিপু করে দেয়া যাবে? আমরা দাঁড়াই।
হাসল বুড়ো। সোনায় বাঁধানো দুটো দাঁত দেখা গেল। খুলে দাও।
দোকানের পেছনের ড্রেসিং রুমে ঢুকে প্যান্টটা খুলে ওখানে রাখা অন্য কাপড় পরে এল কিশোর। টেবিলে বসে কাজ শুরু করল দরজি। দুটো টুলে বসে দেখতে লাগল কিশোর আর রবিন।
পুরানো কাপড় মেরামত করার জন্যে দিয়ে গেছে অনেকেই, মেঝেতে স্তূপ করে ফেলে রাখা হয়েছে সেগুলো। সুন্দর একরোল স্যুটের কাপড় দৃষ্টি আকর্ষণ করল কিশোরের। জিজ্ঞেস করল, নতুন কাপড়ের অর্ডার কেমন পান?
এখানে আর কাজ কোথায়? ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল দরজি। খালি ফুটোফাটা মেরামতের জন্যে নিয়ে আসে।
ওই যে, নতুন কাপড় রেখেছেন?
রেখেছি, যদি কেউ আসে স্যুট করাতে। কিন্তু আসে না, রেডিমেড পোশাকের দিকেই লোকের ঝোঁক, প্যান্টের ফুটোর চারপাশে সুচ চালাতে, চালাতে দুঃখ করে বলল বুড়ো, চল্লিশ বছর ধরে আছি এখানে। এখন আমার। প্রধান ব্যবসা হলো ধোপাগিরি। কিন্তু দশ বছর আগেও অবস্থা এমন ছিল না। অনেকেই আসত পোশাক বানাতে। কাজ করতে করতে একেক সময় অস্থির হয়ে যেতাম। হ্যারিসনরা আসত, মবাররা আসত, আসত আরিগনরা। কত সুন্দর সুন্দর স্যুট যে ওদের বানিয়ে দিয়েছি আমি। আজ আর সে-সব দিন। কোথায়!
আরিগন?
হ্যাঁ, আরিগন, একটা চমৎকার পরিবার। এই এলাকার অনেক পুরানো বাসিন্দা। টাকাও ছিল, বিলাসিতাও ছিল। বুড়ো আরিগন, লম্বা, সুদর্শন একজন মানুষ।

আর তার স্ত্রীর কথা কি বলব, খুবই শৌখিন ছিল। সুন্দরী একটা মেয়ে ছিল তাদের, দুটো যমজ ছেলে ছিল–লমা, সুন্দর, একেবারে বাপের মত। চেহারায় এত মিল, কে যে কোনটা আলাদা করাই মুশকিল।
যমজ! উত্তেজনা দেখাতে গিয়েও তাড়াতাড়ি সেটা সামলে নিল রবিন, বুড়োকে সন্দিহান করে তোলা যাবে না, দারুণ তো? কি হলো পরিবারটার? এখন আর কাপড় বানাতে আসে না কেন?
দুঃখের সঙ্গে মাথা নাড়ল দরজি, থাকলে তো আসবে। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে কে কোথায় চলে গেছে কে জানে। মেয়েটার খবর জানি না। যমজদের একজন, নুবার আরিগন শহর ছেড়ে একেবারেই চলে গেছে। আরেকজন, ডোবার, কালেভদ্রে আসে। আবার জোরে নিঃশ্বাস ফেলল বুড়ো। তবে কাপড় আর বানাতে আসে না সে-ও। হাতে তৈরি জমকালো পোশাক পরা ছেড়েই দিয়েছে। পরে কেবল সাদাসিধা কাপড়, যেগুলো পরলে হাঁটাচলার সুবিধে হয়।...নাও, তোমার এটা হয়ে গেছে।
প্যান্টটা পরে নিল কিশোর। ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে, তবে রবিনের মতই সেটা চেপে রেখে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, হ্যারিজ কার্নিভ্যালটা এখন কোথায়, বলতে পারবেন? একবার দেখেছি। কিন্তু আমার বন্ধুর, রবিনকে দেখিয়ে বলল, আরেকবার দেখার ইচ্ছে।
ওয়েস্টবাস্কেট থেকে খুঁজে পেতে দোমড়ানো একটা পোস্টার বের করে আনল বুড়ো। দিল কিশোরকে। কবে কোনখানে যাবে কার্নিভ্যালটা, তার শিডিউল করা আছে। বুড়োর মজুরি মিটিয়ে দিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে এল। দুই গোয়েন্দা।
আরও চমক অপেক্ষা করছিল তাদের জন্যে। কয়েক গজ এগোতে না এগোতেই একটা ওষুধের দোকান থেকে লম্বা একজন মানুষকে বেরোতে দেখল ওরা। আরিগন! মাথায় ব্যান্ডেজ বাধা। ফিসফিস করে রবিন বলল, বাড়িটা জোরেই মেরেছে পিচার!
তাই তো মনে হচ্ছে। ইনি কোন জন, নুবার, নাকি ডোবার, জানতে পারলে ভাল হত। দেখা যাক, কার্নিভ্যালের হুমবা নতুন কিছু জানাতে পারে নাকি আমাদের।

.

তখনও ঘুমাচ্ছে মুসা, কিন্তু বাচ্চাটা জেগে গেছে। কিশোর আর রবিনের সাড়া পেয়ে খেউ খেউ শুরু করল।
জেগে গেল মুসা। লাল চোখ মেলে হাই তুলতে তুলতে জিজ্ঞেস করল, এখনও কি ফরেস্টবার্গেই আছি?
দুই ঘণ্টা ধরে আছি, জবাব দিল রবিন। তোমার স্বপ্ন দেখা শেষ হয়েছে?
হয়েছে। তোমাদের কি খবর?

বলতে লাগল রবিন। শুনে চোখ বড় বড় হয়ে গেল মুসার, ঘুম চলে গেল বহুদূরে। একটা ম্যাপের ওপর ঝুঁকে পড়েছে কিশোর।
স্টার্ট দিল রবিন। শহর থেকে বেরিয়ে কিশোরের নির্দেশে পশ্চিমে যাওয়ার একটা রাস্তা ধরল।
যাচ্ছি কোথায়? জানতে চাইল মুসা।
রিভারভিল, জবাব দিল কিশোর। ওখানেই আছে এখন কারনিভ্যালটা। মেইন রোড দিয়ে যাওয়ার চেয়ে এই রাস্তায় গেলে সময় অর্ধেক, লাগবে। আমাদের।
সরু, এবড়োখেবড়ো কাঁচা পথটার জন্যে উপযুক্ত ক্যাপ্টেনের গাড়িটা। সাবধানে গাড়ি চালাচ্ছে রবিন। পথের মাঝে মাঝে গর্ত, আগে থেকে খেয়াল না করলে ওগুলোতে পড়ে দুর্ঘটনা ঘটাবে। দুই ধারে ঘন বন। কখনও নালা এগিয়ে যাচ্ছে পথের সমান্তরালে, কখনও শৈলশিরা। একটা বাড়িঘরও চোখে পড়ল না কোথাও।
কয় মাইল এসেছে মিটারে দেখে নিয়ে কিশোর বলল, আর বোধহয় বেশি দূরে নেই। হায় হায়, ওটার আবার কি হলো? এমন জায়গায় গাড়ি খারাপ হলে তো সর্বনাশ! নিজেদের কথাও ভাবল সে। পথের পাশে একটা ভ্যান দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এই মন্তব্য করল সে। গাড়িটার বনেট ওপরে তোলা। দুপাশ থেকে ঝুঁকে তার নিচে মাথা ঢুকিয়ে দিয়েছে দু-জন লোক, ইঞ্জিন পরীক্ষা করছে। মুখ দেখা যাচ্ছে না একজনেরও।
কি হলো দেখা দরকার, কিশোর বলল। বিপদে পড়েছে মনে হয়। দেখি, কোন সাহায্য করতে পারি কিনা।
কিশোর, সন্দেহ জেগেছে রবিনের, ওরা আমাদের গাড়ি থামানোর। জন্যে এই বাহানা করছে না তো? ক্যাপ্টেনের গাড়ি দেখে হয়তো দেখতে এসেছে, ব্যাপারটা কি?
সেটা কথা না বললে বোঝা যাবে না। ওরা দু-জন, আমরা তিনজন, সাবধান থাকব, তাহলেই কিছু করতে পারবে না।
গাড়ি থামাল রবিন। ওরা তিনজন বেরোতে না বেরোতেই লাফ দিয়ে এগিয়ে এল বিরাট এক কুকুর। গাড়ির ওপাশে ছিল এতক্ষণ।
খাইছে! তাড়াতাড়ি মূসা বলল, এই ফগ বেরোবি না, বেরোবি না, খেয়ে ফেলবে!
কিন্তু আকারের তুলনায় কুকুরটা ভদ্র, কৌতূহলী ভঙ্গিতে তার হাত শুকতে লাগল।
সোজা হয়ে দাঁড়াল একজন লোক। হালকা-পাতলা গঠন, লাল চুল। কুকুরটাকে ডাকল, এই মবি, আয় এদিকে। মুসাকে বলল, ভয় পেয়ো না। ও কামড়ায় না।
কি হয়েছে গাড়ির? জানতে চাইল কিশোর।

চলতে চলতে বন্ধ হয়ে গেল। বুঝতে পারছি না।
এগিয়ে গেল মুসা। ইঞ্জিনের ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে বলল, আমি একবার দেখি?
গাড়ির কাজ জানো নাকি? জিজ্ঞেস করল উজ্জ্বল রঙের প্রিন্টের শার্ট পরা অন্য লোকটা।
কিছু কিছু।
তাহলে দেখো কিছু করতে পারো কিনা। কি যে বিপদে পড়লাম।
শার্টের হাতা গোটাতে লাগল মুসা, দেখি, টুলস কি আছে দেন?
টুলস বক্স বের করে দিল লালচুল লোকটা।
একটা স্প্যানার নিয়ে ইঞ্জিনের ওপর ঝুঁকল মুসা। কয়েক মিনিট পর হাসি মুখে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, যান, ঠিক হয়ে গেছে। কন্ডোরে গোলমাল ছিল।
এত তাড়াতাড়ি ঠিক হয়ে গেছে, বিশ্বাস করতে পারল না লোকগুলো। প্রিন্টের শার্ট পরা লোকটা গিয়ে ড্রাইভিং সীটে বসে ইগনিশনে মোচড় দিল। সঙ্গে সঙ্গে স্টার্ট হয়ে গেল গাড়ি।
বিস্ময় দেখা দিল লালচুল লোকটার চোখে। মুসার দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি তো দেখি গাড়ির জাদুকর হে! কতক্ষণ ধরে চেষ্টা করছিঃ বাঁচালে। অনেক ধন্যবাদ তোমাদেরকে।
জানা গেল, গাড়িটা একটা স্কুলের। ফরেস্টবার্গে যাওয়ার পথে ইঞ্জিন বিকল হয়ে গেছে। তিন গোয়েন্দাকে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে আবার নিজের পথে রওনা হয়ে গেল লোকগুলো।
তারমানে ওরা শত্রুপক্ষ নয় আমাদের? গাড়ি চালাতে চালাতে প্রশ্ন। তুলল রবিন।
মনে হয় না, জবাব দিল কিশোর। আচরণে তো সে-রকম মনে হলো না।
হতে পারে, পেছন থেকে মুসা বলল, ওরা ভেবেছিল, ক্যাপ্টেন রিচটন আছেন গাড়িতে। তাকে দেখলেই অন্য রকম আচরণ করত। আমাদের দেখে আর কিছু করার প্রয়োজন বোধ করেনি…
কি জানি। আমার সে-রকম মনে হয়নি।
তবে ইঞ্জিনে কিন্তু সত্যি গোলমাল হয়েছিল। ওটা বাহানা কিংবা সাজানো নয়।
রিভারভিলে পৌঁছল গাড়ি। তৃতীয়বারের মত হ্যারিজ কার্নিভ্যালে এল গোয়েন্দারা। খেলা শুরু হয়নি এখনও। একজন টিকেট কালেক্টরকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল, হুমবাকে কোনখানে পাওয়া যাবে।
কর্নেল যে তাঁবুতে খেলা দেখায় তার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে ছোট সাদা রঙের একটা ক্যারাভান ট্রেলার। ওটাতেই থাকে অ্যানিমেল ট্রেনার। ছেলেরা কাছে এসে দাঁড়াতেই খুলে গেল দরজা। বেরিয়ে এল খেলা দেখানোর পোশাক পরা হুমবা।

এগিয়ে গেল কিশোর। বিনীত ভঙ্গিতে বলল, মিস্টার আরিগন, আপনার সঙ্গে কথা আছে। একটু দাঁড়াবেন, প্লীজ।
আরিগন নামটা শুনেই থমকে গেছে হুমবা। কিশোর দাঁড়াতে মা বললেও দাঁড়াত। ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, এই নাম জানলে কি করে তুমি?
আরিগন নামে আরেক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়েছে আমাদের, চেহারার এত মিল, আপনার ভাই বলেই চালিয়ে দেয়া যায়। খুব ভাল করে খুঁটিয়ে না দেখলে কেউ বুঝতেই পারবে না যে দু-জন দুই লোক। যখন জানলাম, ওই ভদ্রলোকের একজন ভাই আছে, দুইয়ে দুইয়ে চার মিলিয়ে ফেলতে অসুবিধে হলো না। একটা কথা বুঝতে পারিনি, নুবার কে, আর ডোবার কে?
দ্বিধা করল হুমবা, তারপর বলল, আমি নুবার। সঙ্কোচ বোধ করছে। লোকটা। হাসল, তাতেও সঙ্কোচ। আসলে নিজের পরিচয় দিতেই এখন লজ্জা লাগে, বিলাসিতা করে ফকির হওয়া মানুষদের কেউ দেখতে পারে না। এতে যদিও আমাদের খুব একটা দোষ ছিল না, আমাদের বাবাই দায়ী..যাই হোক, আসল নামটা রাখলে এই এলাকায় বেকায়দায় পড়ে যেতাম, কে যায় লোকের অহেতুক মন্তব্য শুনতে, তাই বদলেই ফেললাম। অনেক আগে চলে গেছি তো আমরা এই এলাকা ছেড়ে, এখন নিজে থেকে পরিচয় না দিলে সহজে কেউ আর চিনতে পারবে না। কিন্তু তোমাদেরকে এত কথা বলছি কেন? তোমরা কারা?
আমরা ইতিহাসের ছাত্র, অনেক দুরে লস অ্যাঞ্জেলেসের রকি বীচ থেকে বেড়াতে এসেছি। ভাবলাম, এসেছি যখন, এই এলাকার ইতিহাস যতটা সম্ভব জেনে যাই, পরীক্ষার সময় কাজে লাগবে। ডাচ পেনসিলভ্যানিয়া সম্পর্কে এমনিতেও আমাদের কৌতূহল আছে।
ও, কিছু সন্দেহ করল না নুবার।
আপনাদের তো শুনলাম অনেক জায়গা-সম্পত্তি আছে এখনও, ফকির বলছেন কেন? পুরো ব্ল্যাক হোলোটাই আপনাদের।
মাথা ঝাঁকাল নুবার, অনেক বড় সম্পত্তি, তা ঠিক। কিন্তু সেটা নিয়ে মারামারি করলে তো আর ভোগ করা যায় না। বাবা মারা যাওয়ার পর। জায়গাটা নিয়ে কি করব আমরা, এই একটা সামান্য ব্যাপারেই একমত হতে পারিনি এখনও তিন ভাইবোন। কেস চলছে। তর্কের পর তর্ক করে চলেছে। তিন পক্ষের উকিল। কেউ কোন সমাধানে আসতে পারেনি।
সম্পত্তি থেকে একটা কানাকড়িও পাই না। বসে থাকলে তো আর পেট চলে না, তাই এই কাজ নিয়েছি। জন্তু-জানোয়ারে আমার ছোটবেলা থেকেই আগ্রহ। শখের বশে জানোয়ারকে ট্রেনিং দেয়ার কাজটাও শিখে ফেললাম। সেই শিক্ষাই এখন আমার রুটিরুজির উপায়। এই কাজকে ভাল চোখে দেখে না আমার অন্য

দুই ভাইবোন। না দেখুক, আমিও তাদের কাছে যাই না... সরাসরি কিশোরের দিকে তাকাল নুবার। ডোবারের সঙ্গে তাহলে ব্ল্যাক হোলোতেই দেখা হয়েছে তোমাদের? সে যে এই এলাকায় এসেছে আবার, জানতাম না। অনেকদিন দেখা-সাক্ষাৎ নেই। ওখানে কি করছে?

তেমন কিছু না। সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করছে ব্ল্যাক হোলোর পুরানো কেবিনটায়।

সন্ন্যাসী! বিস্ময়ে কাছাকাছি হয়ে গেল নুবারের ঘন ভুরুজোড়া। অসম্ভব! ও টাকা ছাড়া চলতে পারে না! বিলাসিতা ছাড়া বাঁচতে পারে না!

দেখে তো মনে হলো, বেশ সুখেই আছে, খোঁচা দিয়ে কথা বের করার চেষ্টা করল কিশোর।

কি জানি? নাক চুলকাল মুবার। আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। পাগলই হয়ে গেল না কি...সত্যি যদি তার এই পরিবর্তন হয়ে থাকে, খুশিই হব।

খাওয়া-দাওয়ায়ও বিলাসিতা তেমন আছে বলে মনে হয় না, মুসা বলল। সেদিন একটা আধমরা ভেড়া কিনে নিয়ে যেতে দেখলাম। ওই বুড়ো ভেড়ার মাংসই বোধহয় খান।

খবরটা হজম করতে সময় লাগল নুবারের। আনমনে মাথা ঝাঁকিয়ে বিড়বিড় করে বলল, এতটা পরিবর্তন! নাহ, কিছু বুঝতে পারছি না! ভেড়ার মাংস দু-চোখে দেখতে পারে না ও। এখন সেই মাংসই খায়, তা-ও আবার বুড়ো ভেড়ার...

পুষতে-টুষতে নেননি তো? জিজ্ঞেস করল কিশোর।

মাথা খারাপ! জন্তু-জানোয়ার তার শত্রু। একটা কুত্তা পর্যন্ত পালতে পারল না কোনদিন।

কুত্তার কথাই যখন উঠল কি ভাবে নেবেন আপনি জানি না, মিস্টার আরিগন– তবু বলেই ফেলি, কিশোর বলল। যদি বলি আপনার ভাই কুত্তা কিডন্যাপিঙের সঙ্গে জড়িত?

কি ভাবে নিয়েছে নুবার, সেটা তার চেহারা দেখেই অনুমান করা গেল, বজ্রাহত হয়ে পড়েছে যেন। সামলে নিতে সময় লাগল। বলল, এই পরিণতিই হবে, আমি জানতাম! লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু! আর আমাদের পরিবারের পাপ হলো ভয়াবহ বিলাসিতা! এতক্ষণে বুঝতে পারছি, ওই কেবিন কেন থাকছে ও। সন্ন্যাসীর মত থাকার ছুতোয় নিশ্চয় কোন কুকাজ করে বেড়াচ্ছে। হায়রে, জমিদারের ছেলের শেষে এই পরিণতি! জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলল সে। যাই, দেরি হয়ে যাচ্ছে। টিকেট কেটে লোকে বসে থাকলে বিরক্ত হয়।

তাঁবুর দিকে ধীরপায়ে হেঁটে চলে গেল অ্যানিমেল ট্রেনার।

রবিন বলল, সত্যি কথাই তো বলল বলে মনে হলো। কিশোর, কি মনে হয়, ভাইয়ের সঙ্গে সে-ও জড়িত নয় তো?

মাথা নাড়ল কিশোর। না, দেখলে না, খবর শুনে সত্যি সত্যি দুঃখ। পেয়েছে। এই লোক কোন খারাপ কাজে জড়িত নয়।
হু, চুপ হয়ে গেল রবিন।
কথা তো বলা হলো, মুসা বলল, এরপর কি কাজ? কি করব এখন? আজও ঢুকব পুমার খেলা দেখতে?
নাহ, এক খেলা কবার দেখে। আর কোন কাজ নেই এখানে। চলো, ব্ল্যাক হোলোতে ফিরে যাই।
ডোবারের ওপর কড়া নজর রাখার সিদ্ধান্ত নিল কিশোর। রাত্রে কি করে লুকিয়ে থেকে দেখবে। কেবিনে ফিরে তাই আর কোন কাজ না পেয়ে, খাওয়াদাওয়ার পর শুয়ে পড়ল। ঘুমিয়ে নিল পুরো বিকেলটা। রাতে আবার জাগতে হবে, হয়তো সারারাতই, কে জানে?
সূর্য ডোবার পর তাকে আর রবিনকে ডেকে তুলল মুসা। ডিনার তৈরি করে ফেলেছে।
পেট ভরে খেয়ে নিল তিনজনে। বারান্দায় বেরিয়ে দেখল, পরিষ্কার, ঝকঝকে আকাশে তারা জ্বলছে। আজ রাতে আর ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঠতে দেরি আছে। রাতের অভিযানের জন্যে তৈরি হতে লাগল ওরা। গাঢ় রঙের পোশাক পরে নিল, যাতে অন্ধকারে ভালমত লুকিয়ে। থাকতে পারে।
বেরিয়ে পড়ল ওরা। শব্দ করে ওদের অস্তিত্ব ফাঁস করে দিতে পারে, এই ভয়ে ফগকে বেঁধে রেখে এল রান্নাঘরে। হোলোর, পথঘাট এখন মোটামুটি পরিচিত। রাতে টর্চ নিভিয়ে চলতেও আর তেমন অসুবিধে হচ্ছে না। নিরাপদেই চলে এল ডোবারের কেবিনটার কাছে। ঘন অন্ধকারে আবছামত চোখে পড়ল ওটার আকৃতি। বন্ধ দরজার ফাঁক দিয়ে আসছে খুব সামান্য কমলা রঙের আলো।
পা টিপে টিপে দরজার দিকে এগোল ওরা।
কথা শোনা যাচ্ছে ঘরের মধ্যে। ডোবার না একা থাকে বলল, তাহলে কথা বলছে কার সঙ্গে? মনোযোগ দিয়ে শুনে অন্য কণ্ঠটা কার চিনে ফেলল কিশোর, উকিল আনি হুগারফ। অবাক হয়ে ভাবল, এই লোক এখানে কি করছে!
...বললাম না, ডরোথির সঙ্গে দেখা করেছি আমি! হুগারফ বলছে, একচুল নড়াতে পারিনি ওকে। তার সেই এক কথা।
অধৈর্য ভঙ্গিতে চেয়ার ঠেলে সরানোর শব্দ হলো। শোনা গেল ডোবারের ভারি গলা, অসহ্য! এ একটা জীবন হলো নাকি! এ ভাবে বাঁচা যায়! আর দেরি করতে পারব না, আমি আমার সম্পত্তির ভাগ এখনই চাই!
চাইলেই তো আর হলো না, মীমাংসা করতে হবে আগে..আমিও বিরক্ত হয়ে গেছি। অনেক টাকা পাওনা হয়ে গেছে তোমার কাছে, সেটা যে কবে পাব কে

জানে! আসল কথা বলো এখন, এদিকের খবর কি?
জবাব শোনার আশায় কান খাড়া করে রইল দুই গোয়েন্দা। কিন্তু কথা শোনা গেল না, তার পরিবর্তে চেয়ার টানাটানি..
কথা বলছে না কেন? ভাবল কিশোর। নাকি হুগারফকে কিছু দেখাচ্ছে। ডোবার?
হঠাৎ তার কাঁধ খামচে ধরল মুসা। কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, কেউ আসছে? একদম নড়বে না!
পদশব্দ শুনতে পাচ্ছে এখন কিশোর আর রবিনও। দেয়ালের সঙ্গে মিশে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। আশা করল, এ ভাবে থাকলে, যে আসছে তার চোখে পড়বে না ওরা এই অন্ধকারে। কিন্তু যদি টর্চ জ্বালে? আর আসছেটাই বা কে? ভাইয়ের পরিস্থিতির খবর পেয়ে তাকে দেখতে এসেছে নুবার? নাকি পিচার? পিচার হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি, কারণ এখানে ডোবারের পিছে লেগে থাকে সে; নিশ্চয় কারা আসে কারা যায় লক্ষ করে।
হঠাৎ করেই থেমে গেল পদশব্দ। পনেরো মিনিট চুপ করে একই ভাবে দাঁড়িয়ে রইল গোয়েন্দারা। কিন্তু আগন্তুকের আর কোন সাড়া নেই।

.

অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থেকে থেকে চোখ ব্যথা করে ফেলল ওরা, কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না।
কেবিনের ভেতর আবার ভারী গলায় কথা বলে উঠল ডোবার, খুব শীঘ্রি কিছু টাকা পেয়ে যাব। না পেলে আমারও চলবে না আর। কিছু একটা করতেই হবে!
হ্যাঁ, ভাল কথা, ছেলেগুলোর কি খবর? আচমকা প্রশ্ন করল হুগারফ।
যায়নি এখনও। আমার মনে হয় রিচটনের ভাবনাটা এখনও মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারেনি।
ওদের কথাই আলোচনা হচ্ছে, বুঝতে পারল কিশোর।
ভাগাতে হবে তো। নইলে কখন কোন বিপদে ফেলে দেবে কে জানে! সাংঘাতিক ছোঁক ছোঁক করা স্বভাব।
বুঝতে পারছি না কি করব? দেখা যাক!
দরজা খোলার ক্যাচকোচ শব্দ হলো। দেয়ালের সঙ্গে গা চেপে ধরে মিশে রইল তিন গোয়েন্দা, পারলে পাথরের মধ্যে ঢুকে পড়তে চায়।
খোলা দরজা দিয়ে আলো পড়ল ঘাসের ওপর। বেরিয়ে এল উকিল। পেছনে আবার দরজা লাগিয়ে দিল ডোবার। বনে গিয়ে ঢুকল হুগারফ, পায়ের শব্দ ঢাকার কোন চেষ্টাই করল না।
পথের ধারের একটা কালো ঝোপ নড়ে উঠল বলে মনে হলো কিশোরের, মুসারও চোখে পড়ল ব্যাপারটা। তারমানে এতক্ষণ কেউ লুকিয়ে ছিল ওখানে।

এগিয়ে গেল হুগারফের পদশব্দ। যে ঝোপটা নড়েছে তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একটা লম্বা ছায়ামূর্তি। পিছু নিল উকিলের।
আমাদের ওপর নয়, ফিসফিস করে মুসা বলল, হুগারফের ওপর নজর রাখছিল। কোথায় যায় দেখব?
দেখো তো, জবাব দিল কিশোর। আমরা এখানেই আছি। দেখি, আর কি ঘটে, আর কেউ আসে কিনা?
কয়েক মিনিট পরই ফিরে এল মুসা। জানাল, পিচারের মতই মনে হলো। ও আসলে চোখে চোখে রাখছে লোকগুলোকে।
কেন? রবিনের প্রশ্ন।
স্বাভাবিক কৌতূহল হতে পারে। নিশ্চয় সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়েছে।
বসে আছে তো আছেই ওরা। খুব ধীরে কাটছে একঘেয়ে সময়, স্থির হয়ে আছে যেন। কিন্তু আকাশের তারাগুলোর স্থান পরিবর্তন প্রমাণ করে দিল, না, ধীরে হলেও সময় কাটছে। পুবের আকাশে হালকা একটা আভা ফুটল। অবশেষে গাছপালার মাথার ওপর বেরিয়ে এল কাস্তের মত বাকা হলুদ চাঁদ। হালকা, কনকনে ঠাণ্ডা একঝলক বাতাস যেন লাফ দিয়ে এসে নামল বদ্ধ উপত্যকাটায়।
আবহাওয়া পরিষ্কার হলে কি হবে, পার্বত্য এলাকার ঘন শিশির ঠিকই পড়তে লাগল। ভিজিয়ে দিল ছেলেদের চুল, কাপড়। সেঁতসেঁতে কাপড় পরে। থাকাটা এমনিতেই অস্বস্তিকর, তার ওপর এই ঠাণ্ডা বাতাস কাপুনি ধরিয়ে দিল শরীরে। একভাবে বসে থেকে থেকে পায়ের পেশীতে খিল ধরে গেছে।
এতক্ষণ ডোবারের কেবিনের দরজায় যে হালকা আলোটা ছিল, সেটাও নিভে গেল। শুয়ে পড়েছে বোধহয় সে। আর বসে থাকার কোন মানে হয় না। উঠল ওরা। ফিরে চলল নিজেদের কেবিনে।
খাড়া পথ বেয়ে ওপরে উঠতে উঠতে হঠাৎ কিশোরের হাত আঁকড়ে ধরল মুসা, শুনছ!
অবশ্যই শুনছে কিশোর আর রবিনও। কাঁপা কাঁপা একটা টানা তীক্ষ্ণ চিৎকার।
নিশ্চয় সেই পেঁচাটা! রবিন বলল। এল কোনখান থেকে?
হোলোর ওপার থেকে, জবাব দিল কিশোর। মনে তো হলো, ডোবারের ঘরের কাছেই ডাকল।
ভালই হয়েছে, কণ্ঠস্বর নামিয়ে বলল মুসা, জোরে বলতে ভয় পাচ্ছে, আমরা ওখানে থাকতে ডাকেনি। তাহলে বারোটা বাজত! ভূতের সঙ্গে
পেঁচার বড় ভাব! একসঙ্গে উড়ে চলে ওরা আকাশপথে!
হোলোর ওপর উঠে এল ওরা। কেবিনের আলোর দিকে তাকিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। অন্য এক জগৎ থেকে যেন বেরিয়ে এল পরিচিত পৃথিবীর অভ্যস্থ

পরিবেশে। ভূত বিশ্বাস না করলেও, মুসার মত ভয় না পেলেও পেঁচার ডাকটা অন্য দু-জনেরও ভাল লাগেনি।
কেবিনে ঢুকে দেখল, ভালই আছে ফগ। মুসাকে দেখে আদুরে গলায় কুঁই কুঁই শুরু করল। এগিয়ে গিয়ে ওটাকে আদর করল সে।
ঘুমানোর আগে ঠাণ্ডা দূর করার জন্যে মগে গরম চকলেট ঢেলে নিয়ে বসল তিনজনে।
মগে চুমুক দিয়ে রবিন বলল, তাহলে বোঝা গেল, হুগারফ ডোবারের উকিল। এবং দু-জনেই টাকার পাগল।
কিছু টাকা আসবে বলল ডোবার, কিশোরের দিকে তাকাল মুসা। কোত্থেকে আসবে বলো তো?
আর যেখান থেকেই আসুক, সম্পত্তি বিক্রি করে নয় এটা ঠিক, কিশোর বলল। এখনও জায়গাটার কোন মীমাংসাই হয়নি।
বেআইনী কিছু করছে না তো? রবিনের প্রশ্ন।
কি জানি! তবে টাকার যখন এত লোভ, করলে অবাক হব না। তার ভাইয়েরও তো সে-রকমই সন্দেহ।
কিশোর, মুসা বলল, হুগারফের পাওনা টাকা দেয়ার ভয়ে কোথাও গিয়ে লুকাননি তো ক্যাপ্টেন?
মাথা নেড়ে রবিন বলল, আমার মনে হয় না। একজন পুলিশ অফিসার, মিস্টার সাইমনের বন্ধু, হুগারফের মত একটা হেঁচড়া লোক তার কাছে টাকা। পাবে, এ কথা আমার বিশ্বাস হয় না। কিশোরের দিকে তাকাল সে, ডোরারের কথা শুনে কিন্তু মনে হলো; টাকার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে। কিছু একটা ঘটাবে মনে হলো। কি, বলো তো?
এটা জানলে তো অনেক প্রশ্নেরই জবাব পাওয়া যেত। চলো, শুয়ে পড়ি, রাত প্রায় শেষ। এখন মাথা ঘামিয়ে কিছু করতে পারব না, কাজ করবে না মগজ। তবে একটা কথা বলে রাখি, কাল সকালে উঠেই ডরোথি আরিগনের খোঁজে বেরোব আমরা। দুই ভাইয়ের সঙ্গেই দেখা হলো, বোনকে বাদ দেয়া উচিত না। হয়তো ওখানে জরুরী কোন তথ্য পাওয়া যাবে।
পাবে কোথায় তাকে? জিজ্ঞেস করল মুসা।
দেখি, সে-কথা সকালে উঠে ভাবব।
.
অনেক বেলা করে ঘুম ভাঙল ওদের। কুকুরের বাচ্চাটা খুব শান্ত, ডাকাডাকি করে অহেতুক বিরক্ত করেনি বলেই ওরা ঘুমাতে পারল।

নাস্তার টেবিলে বসে ঘোষণা করল কিশোর, খেয়ে ফরেস্টবার্গে রওনা হব। প্রথমে ডরোথি আরিগনের নামটা খুঁজব টেলিফোন গাইডে। না পেলে তখন অন্য ব্যবস্থা করা যাবে।
কি ব্যবস্থা? জানতে চাইল রবিন।
খোঁজখবর করব। মহিলাদের খবর মহিলারাই বেশি রাখে। মহিলারা চালায় এমন সব দোকানে ঢুকে তাদেরকে জিজ্ঞেস করব। পুরুষেরা মুখ বন্ধ রাখলেও মহিলারা অতটা রাখতে পারবে না। কিছু না কিছু ফাঁস করে দেবেই।
সুতরাং নাস্তা সেরেই বেরিয়ে পড়ল ওরা।
ফরেস্টবার্গে এসে সহজেই পেয়ে গেল ডরোথি আরিগনের ঠিকানা। কোর্টহাউসে পাবলিক টেলিফোনের ব্যবস্থা আছে যেখানে, সেখানে একগাদা ফোনবুক পাওয়া গেল। ফরেস্টবার্গের আশেপাশে আরও যে কটা শহর আছে, সবগুলোর ফোন নম্বর আছে একটা বইতে। দেখা গেল, ডরোথি বাস করে উডে।
ম্যাপ দেখে রাস্তা বের করে ফেলল কিশোর। গাড়ি চালাল রবিন।
দুপুরের একটু আগে লাল গাড়িটা এসে ঢুকল ব্রুকউডের শান্ত, প্রায় নির্জন মেইন রোডে। দুই পাশে বড় বড় সাদা বাড়ি, সামনে সুন্দর লন আর বাগান। প্রচুর গাছপালা আছে।
সুন্দর শহর, দেখতে দেখতে বলল কিশোর। পুরানোও।
এক কাজ করলে হয় না? রবিন বলল, ডরোথির সঙ্গে দেখা করার আগে তার সম্পর্কে বাইরের লোকের কাছে একটু খোঁজখবর নিয়ে নিই। কথা বলতে সুবিধে হতে পারে।
মন্দ বলনি।
একজায়গায় বেশ কয়েকটা পুরানো বাড়ি প্রায় গায়ে গায়ে লেগে থাকতে দেখা গেল। বাণিজ্যিক এলাকা, আন্দাজ করল কিশোর। গাড়ি রাখতে বলল। রবিনকে।
সাইনবোর্ড দেখে একটা চায়ের দোকানে ঢুকল তিন গোয়েন্দা। কুকুরের বাচ্চাটাকে গাড়িতে রেখে এসেছে,। দোকানের ভেতরের চেহারা দেখে দমে গেল মুসা। বলল, এখানে ঢুকে লাভটা কি হলো? খাওয়ার জিনিস পাব বলে তো মনে হয় না। সবই বুড়োবুড়ি; দেখগে, সবগুলো ডায়েট কন্ট্রোল করে।
এদের কাছেই তো খবরটা পাওয়া যাবে, হেসে বলল কিশোর। কাজ নেই কর্ম নেই, মানুষের সমালোচনা করা ছাড়া আর কিছু করার নেই ওদের।
ওরা টেবিলে গিয়ে বসতেই লম্বা, মাঝবয়েসী অ্যাপ্রন পরা এক মহিলা এগিয়ে এল।

গুড মর্নিং বলল কিশোর। আমরা বহুদূর থেকে এসেছি, বেড়াতে। খিদে পেয়েছে। ভাল কিছু দিতে পারেন?
কিশোরের ভদ্রতায় খুশি হলো মহিলা। হেসে বলল, বসো, আনছি।
মুসাকে অবাক করে দিয়ে ডিমের ওমলেট, ভেজিটেবল সালাদ আর বরফ ও তাজা মিন্টের ফ্লেভার দেয়া কোল্ড টী এনে দিল মহিলা। জিজ্ঞেস করল, চলবে?
চলবে মানে! এখানে এলে এই দোকান ছাড়া আর চা খেতেই ঢুকব,তাড়াতাড়ি ডিমের প্লেটটা টেনে নিল মুসা।
আস্তে খাও, রসিকতা করে বলল রবিন। বুড়োবুড়িদের খাবার, গলায় আটকে ফেলো না।
চলে গেল মহিলা। ফিরে এল বড় এক প্লেট স্ট্রবেরি পাই নিয়ে। টেবিলে নামিয়ে রাখল।
আন্তরিক খুশি হলো মুসা। ঢোকার আগে যে অনীহাটা ছিল, একেবারে দূর হয়ে গেছে।
খেতে খেতে কিশোর জিজ্ঞেস করল, ডরোথি আরিগন নামে কাউকে চেনেন? ব্ল্যাক হোলোতে বিশাল সম্পত্তি আছে তাদের। আমার মার বান্ধবী। বলেছে দেখা করে যেতে। কিন্তু আমি চিনি না।
চিনব না কেন? অনেক বড় দরজির দোকান দিয়েছে। আশপাশের সব শহর থেকে লোকে কাপড় বানাতে আসে তার কাছে।
কাছেই থাকে?
না।
হ্যাঁ। মহিলা বেশ ভাল, তবে অহঙ্কারী। এই অহঙ্কারটা অবশ্য আরিগনদের রক্তের দোষ, ওদের সবার মধ্যেই আছে। আর এই নিয়েই তো গণ্ডগোলটা বেধেছে, কেউ কারও কথা মানতে চায় না, নিজের ইচ্ছেটাকেই প্রাধান্য দিতে চায়। পরিবারটাই ভেঙে গেল এ কারণে।
নতুন কয়েকজন ঢুকল দোকানে। তাড়াহুড়ো করে সেদিকে চলে গেল। মহিলা, আর কোন কথা জিজ্ঞেস করার সুযোগ পেল না গোয়েন্দারা। খাওয়া শেষ করে বেরিয়ে এল দোকান থেকে। ডরোথির বাড়িতে যাওয়ার সময় রবিন বলল, কি ভাবে কথা শুরু করবে তার সঙ্গে? ছুতোটা কি?
দেখি, জবাব দিল কিশোর, একটা কিছু বের করেই ফেলব।
পুরানো আমলের একটা বাড়ির সামনে গাড়ি রাখল রবিন। এখানেই থাকে ডরোথি। একসঙ্গে সবাই ঢুকলে বিরক্ত হতে পারে মহিলা, সেজন্যে কিশোর একাই চলল। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে কাঁচের দরজায় লাল রঙে লেখা দেখতে পেল:

ড্রেস ডিজাইনার
ডরোথি আরিগন
খোলা দরজা। ভাল রকম সাজানো গোছানো একটা সিটিং রুমে ঢুকল। কিশোর। কেউ নেই। হয়তো ভেতরে গেছে, আসবে ভেবে একটা সোফায় বসে পড়ল সে। চোখ বোলাতে লাগল সারা ঘরে। পুরু কার্পেট, চকচকে পালিশ করা আসবাবপত্র, চমৎকার ডেকোরেশন। ব্যবসা ভালই চলছে।
প্রায় নিঃশব্দে খুলে গেল একটা দরজা। ঘরে ঢুকল লম্বা, সুন্দরী এক মহিলা, বয়েস চল্লিশের কোঠায়, কালো চুল। গর্বিত ভঙ্গিই প্রমাণ করে দেয়, আরিগনদের বংশধর। তার পেছনে ছাগলছানার মত লাফাতে লাফাতে বেরোল হাসিখুশি একটা ছোট কুকুর। এগিয়ে এল কিশোরের দিকে।
ওটার মাথা চাপড়ে দিতে গিয়ে হাত থেমে গেল তার। মনে পড়ল। বাদামী রঙের কুকুর, একটা কান সাদা! গলায় কলার নেই, নাম লেখা ট্যাড নেই। পটির ডব নয় তো এটা?
উঠে দাঁড়াল কিশোর, হেসে বলল, সুন্দর কুকুর। অবিকল একই রকমের আরেকটা কুকুর দেখেছি আমার এক বন্ধুর বাড়িতে। মনে হয় এটার ভাইই হবে। পেলেন কোথায়, মিস আরিগন?
আমার ভাই দিয়েছে, মহিলা গোমড়ামুখো নয়, তবে ততটা আন্তরিকও নয়। বনের মধ্যে নাকি একা একা ঘুরছিল। মালিককে খুঁজে পায়নি। সে কুকুর পছন্দ করে না। তাই আমাকে দিয়ে গেছে।
ব্ল্যাক হোলোতে থাকেন যে, মিস্টার ডোবার আরিগন, তিনি নন তো?
চেনো নাকি?
পরিচয় হয়েছে। ওখানে আমার এক বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। বনের মধ্যে দেখা হয়ে গেল, একটা পাথরের কেবিনে সন্ন্যাসী হয়ে আছেন মিস্টার আনি।
স্থির দৃষ্টিতে কিশোরের দিকে তাকিয়ে আছে ডরোথি, যেন বিশ্বাস করতে পারছে না, সন্ন্যাসী!
সে-রকমই তো মনে হলো। তিনিও তাই বললেন।
কি জানি? অনিশ্চিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল ডরোথি। হ্যাঁ, বলো কি জন্যে। এসেছ?
ডিজাইন। আপনার অনেক নামটাম শুনে মা বলছিল, আপনার কাছ। থেকে পোশাকের একটা নতুন ডিজাইন নিতে পারলে ভাল হত। এদিকে একটা কাজে এসেছি, আপনার বাড়ির সামনে নেমপ্লেটটা দেখে হঠাৎ মনে পড়ল মার কথা। ঢুকে পড়লাম।

হাসল মহিলা। তুমি খুব ভাল ছেলে, কবে কি বলল ঠিক মনে রেখে দিয়েছ। মায়ের কথা শোনে নাকি আজকালকার ছেলেরা! ঠিক আছে, তোমার মাকে গিয়ে বোলো আমার কাছে চিঠি লিখতে। কি চায় বুঝে দেখি।
তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মহিলাকে লক্ষ করছে কিশোর। তাকে সন্দেহ করছে না তো? কিন্তু ডরোথির হাসিমুখ দেখে তার মনের কথা কিছুই আঁচ করতে পারল না সে। আর কোন প্রশ্ন খুঁজে না পেয়ে বলল, আচ্ছা, যাই।
চিন্তিত ভঙ্গিতে গাড়িতে এসে উঠল সে। কি জেনেছে জানার জন্যে উৎসুক হয়ে আছে দুই সহকারী গোয়েন্দা। কিশোর বলল, পটির কুকুরটাকে খুঁজে পেয়েছি। চুরি করে এনে বোধহয় বোনকে দিয়ে দিয়েছে ডোবার।
মুসা বলল, বলো কি? দান করার জন্যে চুরি করে, এমন কথা তো শুনিনি।
কি জানি, বুঝতে পারছি না!
আর কি জানলে? জিজ্ঞেস করল রবিন।
আমাদের কাজে লাগার মত কিছু না। মহিলার ব্যবসা খুব গরম, এটা বুঝলাম। টাকার জন্যে সম্পত্তি বিক্রি কিংবা বেআইনী কাজ করার কোনই প্রয়োজন নেই।
তারমানে এগোনো আর গেল না, নিরাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল মুসা। রহস্যের জট থেকেই গেল!
জট ছাড়াতে হলে একটা জায়গারই খুব কাছাকাছি থাকতে হবে, ব্ল্যাক হোলো। ভাবছি, আজ রাতে কেবিনে না থেকে বনের মধ্যেই ক্যাম্প করে থাকব কিনা। রাত হলে ফিরব আমরা। ঘরেও ঢুকব না, আলোও জ্বালব না। আমরা চলে গেছি মনে করে এমন কিছু করে বসতে পারে ডোবার, যা সব রহস্যের সমাধান করে দেবে।
এতটা সময় তাহলে কি করব?
ঘুরে বেড়াব। এলাকাটা দেখব।

.

ক্যাপ্টেনের কেবিনের কাছে গাড়ি নিল না ওরা। পথের পাশে কয়েকটা গাছের আড়ালে পার্ক করে রেখে অন্ধকারে নিঃশব্দে এসে ঢুকল কেবিনে। কুকুরটাকে বাধল রান্নাঘরে, তাকে সঙ্গে নেয়া যাবে না, কিছু দেখলে চিৎকার শুরু করবে। একা তাকে এ ভাবে ফেলে যেতে ভাল লাগছে ওদের, তবু কিছু করার নেই। স্লীপিং ব্যাগগুলো বের করে নিয়ে ঢুকে পড়ল পাশের বনে, পায়েচলা পথ ধরে নেমে এল উপত্যকায়। একটা ঘন ঝোপের ধারে শোয়ার ব্যবস্থা করল।
চিৎ হয়ে শুয়ে শুয়ে আকাশ দেখতে লাগল কিশোর। কয়েকটা তারা মিটমিট করছে। পাতার ফাঁকফোকর দিয়ে আকাশ খুব একটা চোখে পড়ে না; পড়লে দেখত, দিগন্তের কাছে ইতিমধ্যেই জমে গেছে একটুকরো কালো মেঘ।

ঘুমিয়ে পড়েছিল, হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল তার।
অন্ধকারে মুসার ফিসফিসে কণ্ঠ শোনা গেল, শুনছ!
হ্যাঁ, জবাব দিল রবিন, পেঁচা ডাকছে।
কয়েক মিনিট পর আবার ডাক শোনা গেল, এবার অন্য রকম। কয়েকবার ডেকে থেমে গেল।
এটা পেঁচা নয়! গলা কাঁপছে মুসার। ডাইনী!
হ্যাঁ, কিশোর বলল, পেঁচার মত ঠিক না, বরং মানুষের চিৎকারের সঙ্গে মিল আছে। প্রথম রাতে যেটা শুনেছিলাম, তার সঙ্গে এগুলোর একটারও মিল নেই।
সেজন্যেই তো বলছি পেঁচা, জোর দিয়ে বলল রবিন। তবে দু-রকম পেঁচা।
প্রথম দিনেরটা তাহলে কি ছিল..? অন্ধকারে গাছের আড়াল থেকে। লম্বা একটা ছায়ামূর্তিকে বেরোতে দেখে চমকে উঠে বসল মুসা, কে!
চোখের পলকে দুটো টর্চের আলো বিদ্ধ করল মূর্তিটাকে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রবিন, ও, তুমি, পিচার!
কি চাও? জিজ্ঞেস করল মুসা, তারপর মনে পড়ল পিচার বোবা, জবাব দিতে পারবে না।
বসে পড়ল পিচার। কিশোর, রবিন, আর মুসার দিকে আঙুল তুলে হাত নাড়ল জোরে জোরে।
মনে হয়, তাড়াতাড়ি এখান থেকে আমাদের পালাতে বলছে, রবিন বলল। নিশ্চয় কোন বিপদ! কি বিপদ, পিচার? পকেট থেকে নোট্রবুকের পাতা ছিঁড়ে দিল সে। পেন্সিল বের করে দিল কিশোর।
টর্চের আলোয় দ্রুত একটা জানালাবিহীন কেবিন এঁকে ফেলল ছেলেটা। একমাত্র দরজা দিয়ে বেরিয়ে আছে একটা বন্দুকের নল।
ডোবারের কেবিন, উত্তেজনায় ফিসফিস করে বলল রবিন। তার কাছে। বন্দুক আছে। কি করছে…
দাঁড়াও, বাধা দিল কিশোর আরও কিছু আঁকছে।
দুটো পেঁচার মাথা আঁকল পিচার। কিন্তু একটা পেঁচার খাড়া খাড়া কান, আরেকটার কান নেই বললেই চলে। পেঁচার চেয়ে বানরের মুখের সঙ্গেই ওটার মিল বেশি।
আঁকিয়ে বটে! আবারও প্রশংসা করতে হলো রবিনকে, দারুণ হাত! দেখলে, বলেছিলাম না পেঁচার ডাক? দুটো দুরকম পেঁচা। একটার ডাকের সঙ্গে মানুষের গলার মিল বেশি, সেটাকেই ডাইনী ভাবে লোকে।
এঁকেই ক্রস চিহ্ন দিয়ে দুটোকে কেটে দিল পিচার। হাত নেড়ে আবার চলে যেতে বলল তিন গোয়েন্দাকে।

বুঝলাম না, কিশোর বলল। পেঁচাকে ভয় পাও তুমি?
উত্তেজিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল পিচার।
ডাইনীর সঙ্গে পেঁচার সম্পর্ক আছে বলছ? ওগুলোর কবল থেকে বাঁচাতে চাও আমাদের?
জোরে মাথা ঝাঁকাল ছেলেটা।
মনে হয়, মুসা বলল, পেঁচাগুলোকে গুলি করার কথা বলছে ডোবার।
মাথা নাড়ল পিচার, মুসার অনুমানও ঠিক না।
নাহ, কিছু বুঝতে পারছি না, রবিন বলল। তবে ডাইনীই হোক, পেঁচাই হোক, কিংবা ডোবার, কারও ভয়েই এখান থেকে যাচ্ছি না আমরা। বুঝলে?
দীর্ঘ একটা মুহূর্ত চুপ করে তাকিয়ে রইল পিচার। তারপর নিরাশার ভঙ্গি করল।
কিশোর বলল, বরং একটা উপকার করতে পারো আমাদের। কুকুরের বাচ্চাটা একটা ঝামেলা হয়ে গেছে। ওকে তোমার কাছে নিয়ে যাও, তাতে আমাদের কাজ করতে সুবিধে হবে। একলা ওকে ঘরের মধ্যে ফেলে রাখাটা নিষ্ঠুরতা।
মাথা ঝাঁকাল পিচার। যেমন নিঃশব্দে এসেছিল, তেমনি করেই হারিয়ে। গেল গাছের আড়ালে।
আলো নিভিয়ে দিয়ে আবার শুয়ে পড়ল তিন গোয়েন্দা। অন্ধকারে বিড়বিড় করল কিশোর, সারাক্ষণই ডোবারের পেছনে লেগে আছে! নিশ্চয় তার সঙ্গে কোন দুর্ব্যবহার করেছে লোকটা… পেঁচা এঁকে কি বোঝাতে চাইল, বুঝতে পারলে ভাল হত…
বিদ্যুৎ চমকাল এই সময়।
সর্বনাশ, বৃষ্টি আসবে নাকি? শঙ্কিত হয়ে উঠল রবিন, তাহলে তো আর বাইরে থাকা যাবে না।
মনে হচ্ছে আজ কিছু একটা ঘটবেই, কিশোর বলল। ঝড় এখনও অনেক দূরে, আসতে দেরি আছে। দেখি, যতক্ষণ থাকতে পারি থাকব।
কয়েক মিনিট পর খুট করে একটা শব্দ হলো।
কি ব্যাপার? আবার ফিরে আসছে নাকি পিচার? মুসার প্রশ্ন।
ছেলেটা যেদিকে গেছে সেদিকে তাকাল কিশোর। আরও গাঢ় হয়েছে। অন্ধকার। মেঘ জমেছে আকাশে, তারার আলোও নেই।
আবার হলো শব্দটা।
তারপরই ভারি নীরবতাকে খান খান করে দিল ভয়াবহ, তীক্ষ্ণ চিৎকার। পরক্ষণে আবার। কয়েক সেকেন্ড বিরতি দিয়ে আরও একবার। কেমন যেন মানুষের চিৎকারের মত।

প্রথম রাতে এই চিৎকারই শুনেছি! নিশ্চয় কেউ বিপদে পড়েছে! লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। জলদি ওঠো!
ডাইনীটা তো আছেই দেখা যাচ্ছে, গল্প নয়! জুতো পায়ে গলাতে গলাতে বলল মুসা। কাউকে ধরে এনে রক্ত খাওয়ার তাল করছে নাকি?
জবাব দিল না কেউ। এই সময় আবার বিদ্যুৎ চমকাল।
কিশোরের জুতো পরা শেষ। বলল, কাছেই কোথাও। চলো।
টর্চ জ্বেলে দৌড় দিল ওরা। কিছুদূর গিয়ে থমকে দাঁড়াল কিশোর, কারণ আবার শোনা গেল চিৎকার। কোনখান থেকে আসছে বোঝার চেষ্টা করল। উপত্যকার নিচে নয়, ওপরে, ঢালের গায়ে রয়েছে, বলল সে। বনের ভেতর দিয়ে যাওয়া পায়েচলা পথটা ধরে ছুটল আবার।
ঢালের মাঝামাঝি জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে গেল আবার।
হাঁপাতে হাঁপাতে রবিন বলল, আর তো শোনা যাচ্ছে না! যাব। কোনদিকে?
আমি কিন্তু আরেকটা শব্দ শুনছি, কান পেতে আছে মুসা,। তোমার শুনছ না?
শোনাটা কঠিনই। কারণ এখন আর নীরব হয়ে নেই রাতটা। ঝড় আসার সঙ্কেত জানিয়ে শুরু হয়ে গেছে প্রবল বাতাস, দমকে দমকে ঢেউয়ের মত আসছে। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, সেই আলোয় চোখে পড়ছে দুলন্ত গাছের মাথা, পাগল হয়ে উঠেছে যেন গাছগুলো। এদিকে মাথা নোয়াচ্ছে, ওদিকে হেলে পড়তে চাইছে, মড়মড় করে উঠছে ডাল, পাতার মধ্যে দিয়ে শিস কেটে যাচ্ছে বাতাস। কিন্তু এত কিছুর মধ্যে দিয়েও শব্দটা ঠিকই কানে আসছে মুসার। স্বর
কিসের শব্দ? জিজ্ঞেস করল রবিন।
মানুষের চিৎকার বলে মনে হলো কিন্তু বাতাস যা আরম্ভ করেছে, বুঝতে পারছি না…
বড় করে বিদ্যুৎ চমকাল, থাকল অনেকক্ষণ। হাত তুলে কাছের একটা গাছ দেখাল রবিন। চুপ করে বসে আছে একটা পেচা, বাতাসের পরোয়া করছে না, বড় বড় চোখগুলো কেমন ভূতুড়ে লাগল। ক্ষণিকের জন্যে দেখা, গেল দৃশ্যটা, আলো নিভে যেতেই আবার অদৃশ্য হয়ে গেল।
আচমকা উপত্যকার নিচ থেকে ভেসে এল ভয়াবহ চিৎকার। ভীষণ চমকে দিল তিন গোয়েন্দাকে। মনে হলো এগিয়ে আসছে শব্দটা। তাড়াতাড়ি কাছের একটা বড় পাথরের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল ওরা। নজর বাঁয়ের–একটুখানি ঘাসে ঢাকা খোলা জায়গার দিকে।
হঠাৎই চোখে পড়ল ওটাকে। কালো, ভারী একটা শরীর, বিশাল বেড়ালের মত চারপায়ে ভর করে বেড়ালের মতই হেলেদুলে বন থেকে বেরিয়ে এল খোলা

জায়গাটায়। তারপর নিঃশব্দে, যেন বাতাসে ভেসে পার। হয়ে গিয়ে ঢুকল অন্য পাশের কালো বনের মধ্যে।
বনবেড়াল! ফিসফিসিয়ে বলল উত্তেজিত রবিন। এই তাহলে ডাইনী! চিৎকার ওটারই!
কিন্তু এখানে বনবেড়াল আসবে কোত্থেকে? প্রতিবাদ করল কিশোর, এই অঞ্চলে ওই জীব বাস করে না। তাছাড়া বনবেড়াল এত বড় হয় না।
চুপ! ওদের থামতে বলল মুসা, এখনও আগের ক্ষীণ শব্দটা শোনার চেষ্টা করছে।
এইবার শুনতে পেল তিনজনেই। বাতাসের গর্জন আর বজ্রের শুড়গুড়ুকে ছাপিয়ে শোনা গেল পাতলা, কাঁপা কাঁপা গলায় চিৎকার, বাচ্চা ছেলের কণ্ঠ, ডব! ডঅব! ডবিইইই!
খাইছে! এ তো পটি! বলে উঠল মুসা, এত রাতে বনের মধ্যে এসেছে। কুকুর খুঁজতে!
সামনেই আছে কোথাও! কিশোর বলল।
তার কথা শেষ হতে না হতেই সেই ভীষণ চিৎকারটা আবার শোনা গেল। থেমে যেতেই কানে এল বাচ্চা ছেলের ভীত ফোপানোর শব্দ, ডব, ডবি, কোথায় তুই?... আমার ভয় লাগছে।
আর শোনার অপেক্ষা করল না তিন গোয়েন্দা। লাফিয়ে উঠে দৌড় দিল শব্দ লক্ষ্য করে। আবার চিৎকার করে উঠল বিশাল জন্তুটা।
পটারের কান্নার শব্দ জোরাল হচ্ছে, আমার ভয় লাগছে। আমি বাড়ি যাব! মা, মাগো, কোথায় তুমি!
চিৎকার করে মুসা বলল, পটি, যেখানে আছো দাঁড়িয়ে থাকো! নোড়ো না!
সামনে হঠাৎ পথ আটকে দিল একটা গাছের মাথা, চারপাশে ছড়িয়ে রয়েছে ডালপাতা। নিচের উপত্যকায় গোড়া ওটার, মাথাটা উঠে এসেছে এখানে। তারমানে গর্তের কিনারে পৌঁছে গেছে গোয়েন্দারা, সামনে খাড়া হয়ে নেমেছে দেয়াল।
কিনারে এসে টর্চ জ্বেলে মরিয়া হয়ে পথ খুঁজল ওরা। প্রথমে চোখে পড়ল শুধু ঝড়ে দুলন্ত গাছপালার মাথা।
ওই যে? চেঁচিয়ে উঠল কিশোর।
অবশেষে সবকটা টর্চের আলোই খুঁজে পেল ছোট্ট ছেলেটাকে। জারসি আর শর্ট ট্রাউজার পরনে, ওদের নিচে বড় একটা গাছের গোড়ায় দাঁড়িয়ে। থরথর করে কাঁপছে। একহাতে মুখ ঢেকে রেখেছে, আরেকটা হাত তুলে রেখেছে অনিশ্চিত ভঙ্গিতে।

কয়েক গজ দূরে টর্চের আলোয় ঝিক করে উঠল ভয়ঙ্কর দুটো সবুজ চোখ। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে শিকারের দিকে। কেশে ওঠার মত শব্দ করল জানোয়ারটা। ধীরে ধীরে শরীরের সামনের অংশ নিচু হয়ে যাচ্ছে। লেজ নাড়ছে এপাশ ওপাশ। শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে তৈরি হচ্ছে ওটা।
বিশাল এক পুমা। হলুদ রঙ।
মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল মুসা। গর্তের কিনারের একটা বড় পাথর দেখিয়ে বলল, কিশোর, ওই পাথরটা গড়িয়ে দাও আমি পটিকে তুলে আনছি!
জানোয়ারটার চোখে টর্চের আলো নাড়ছে রবিন, ওটাকে দ্বিধায় ফেলে দেয়ার জন্যে। তাতে আক্রমণ চালাতে দেরি করবে, সময় পাবে মুসা। কিশোর ছুটে গেল পাথরটার দিকে।
কোন রকম দ্বিধা না করে শূন্যে ঝাঁপ দিল মুসা। পড়ল বড় গাছটার মাথায়। একটা ডাল ধরে ফেলল। তারপর এ ডাল থেকে সে-ডালে দোল খেতে খেতে নেমে চলে এল পটির মাথার ওপরের একটা নিচু ডালে।
টর্চের আলো দেখে ওপরে তাকিয়ে আছে পটি।
দড়াবাজিকরের মত হাঁটু ভাজ করে ভেতরের দিকটা ডালে আটকে দিয়ে নিচের দিকে ঝুলে পড়ল মুসা। দুহাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, জলদি হাত ধরো!
ভয়ে, বিস্ময়ে বোবা হয়ে গেছে পটি। মূসার কথা যেন বুঝতেই পারল না। তাকিয়ে আছে নীরবে। তারপর যেন যন্ত্রচালিতে মত ধীরে ধীরে ওপর দিকে তুলে দিতে লাগল দুই হাত।
গর্জন করে সামনে ঝাঁপ দিল পুমাটা। একই সময়ে ডাল আর ঝোপঝাড় ভেঙে ওটার ওপর নেমে আসতে লাগল পাথর। মাটি ভিজে গোড়া আলগা হয়ে ছিল, কাজেই ঠেলে ফেলতে খুব একটা অসুবিধে হয়নি কিশোরের।
থমকে গেল জানোয়ারটা। এই সুযোগে পটির হাত দুটো চেপে ধরে ওপর দিকে তুলে ফেলল মুসা। তাকে নিয়ে উঠে বসল ডালের ওপর।
লাফিয়ে উঠে দুজনকেই ধরে ফেলতে পারত জানোয়ারটা। কিন্তু ওপর থেকে খসে পড়া বিরাট পাথর ঘাবড়ে দিল তাকে, একলাফে ঢুকে পড়ল ঝোপের মধ্যে। আর বেরোল না।
পটিকে নিয়ে গাছ বেয়ে ওপরে উঠে আসতে যথেষ্ট কসরত করতে হলো মুসাকে। গাছের মাথার কাছে পৌঁছে একটা ডাল বেয়ে চলে এল খাদের কিনারে। হাত বাড়িয়ে ছেলেটাকে টেনে নিল কিশোর আর রবিন।
মুসাও নেমে উঠে এল খাদের কিনারে। প্রচণ্ড পরিশ্রমে দরদর করে ঘামছে।
উত্তেজনা শেষ হয়ে যেতে হঠাৎ করেই যেন ক্লান্তিতে হাঁটু ভেঙে আসতে লাগল তিনজনের। খাদের কিনার থেকে সরে গিয়ে বসে পড়ল মাটিতে।

রবিন বলল, একটা খেলা দেখালে বটে তুমি, মুসা! টারজান ছবিতে হীরোর রোলটা চাইলেই তোমাকে দিয়ে দেবে পরিচালক।
মুসা বলল, কাজে লেগেছে কিশোরের পাথর ফেলাটা। ওটা না পড়লে ভয়ও পেত না, যেও না জানোয়ারটা। পটি আর আমি দুজনেই মরতাম!
ফোঁপাচ্ছে এখনও পটি। তার মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিল রবিন, কেঁদো না, আর ভয় নেই। বাড়ি নিয়ে যাব তোমাকে। কুকুরটাকে খুঁজতে এসেছিলে তো? ওটাকেও পেয়ে গেছি আমরা। শীঘ্রি এনে দেব।
সত্যি পেয়েছ?
হ্যাঁ।
এ ভয়ে, ক্লান্তিতে অবশ হয়ে গেছে ছেলেটা, হাঁটারও শক্তি নেই। তাকে কোলে তুলে নিল মুসা। টর্চ জেলে আগে আগে চলল কিশোর, পেছনে রইল রবিন। সতর্ক রইল, অন্য কোন দিক দিয়ে ঘুরে এসে যাতে আক্রমণ চালাতে না পারে জানোয়ারটা। ঢাল থেকে নেমে, উপত্যকা পার হয়ে কেবিনে ওঠার পথটায় পড়ল ওরা। নিরাপদেই উঠে এল ওপরে। বিদ্যুতের বিরাম নেই, থেকে থেকেই চমকাচ্ছে। বনের বাইরে বেরিয়ে এসে এখন আকাশ চোখে পড়ছে। দেখা গেল, ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ, একখানে জড় হতে পারছে না, তীব্র বাতাসে ছড়িয়ে দিচ্ছে ইতিউতি।
কেবিনের পাশের খোলা জায়গাটায় দাঁড়িয়ে দূরে হাত তুলে দেখাল রবিন, ওই দেখো, ওটা কি?
আলো! হোলোর অন্যপ্রান্তের দিকে তাকিয়ে আছে মুসা।
তা তো বুঝলাম। কিন্তু কিসের আলো?
ডোবারের কেবিনটার ওপর থেকে আসছে না?
সে-রকমই লাগছে, কিশোর বলল। কিছু একটা ঘটছে ওখানে।
চলো, আগে পটিকে বাড়ি দিয়ে আসি। তারপর দেখতে যাব। সব কিছুর একটা হেস্তনেস্ত করেই ছাড়ব আজ 1 রহস্যের মধ্যে এ ভাবে লটকে থাকতে ভাল লাগছে না আর।
পথ বেয়ে তাড়াতাড়ি নেমে এসে গাড়িতে উঠল ওরা। মিসেস ভারগনের বাড়ির সামনে এসে থামল। সব ঘরে আলো জ্বলছে। গাড়ির শব্দ শুনে পাগলের মত ছুটে বেরোলেন মহিলা। চিৎকার করে বলতে লাগলেন, আমাকে সাহায্য করো! পৃটিকে খুঁজে পাচ্ছি না! নিশ্চয় বনের মধ্যে হারিয়ে গেছে! সেই ভয়ঙ্কর ডাক শুনলাম…
জানালা দিয়ে মুখ বের করে ডাকল পটি, মা, এই যে আমি!
হাঁ হয়ে গেল বিস্মিত মা।

দরজা খুলে দিতেই পটি নেমে গেল। ছুটে এসে তাকে কোলে তুলে নিল মা। বুকে চেপে ধরে চুমু খেতে লাগল।
কুত্তা খুঁজতে বনে চলে গিয়েছিল সে, মুসা জানাল মিসেস ভারগনকে। ওকে তো পেয়েছিই, ওর কুত্তাটাকেও পেয়ে গেছি আমরা। দু-একদিনে মধ্যেই এনে দেব।
ব্ল্যাক হোলোতে পেয়েছ ওকে? এই অন্ধকারে ঝড়ের মধ্যে ওই ভয়ঙ্কর জায়গায় চলে যাওয়ার মত দুঃসাহস করেছে তার ছেলে, এ কথা বিশ্বাস করতে পারছে না যেন মহিলা।
হ্যাঁ, ওখানেই পেয়েছি।
কুত্তাটাকে না পেয়ে অস্থির হয়ে গিয়েছিল। আর থাকতে না পেরে আজ... ডাইনীর কথা ভেবেই বোধহয় থমকে গেল মহিলা। শঙ্কিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, কিছু হয়নি তো তোর, পটি?
অভয় দিয়ে বলল কিশোর। না, কোন ক্ষতি হয়নি। নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিন। সকালে সব কথা ও-ই বলবে আপনাকে। ডাইনীটা আসলে কি, তা-ও জানাবে।
আবার এসে গাড়িতে চড়ল তিন গোয়েন্দা। এতটাই অবাক হয়েছে মিসেস ভারগন, ওদেরকে ধন্যবাদ জানানোর কথাও ভুলে গেল। ছেলেকে কোলে নিয়ে হাঁ করে তাকিয়ে রইল গাড়িটার দিকে।
মূসাকে নির্দেশ দিল কিশোর, ডোবারের কেবিনটা যে পাশে আছে, ঘুরে ওখানটায় চলে যাও।
রাস্তা নেই, উঁচুনিচু জমির ওপর দিয়ে ঝাঁকুনি খেতে খেতে এগোল গাড়ি। খাদের একেবারে কিনার ঘেষে চলছে। ছোট ছোট ঝোপ মাড়িয়ে যাচ্ছে। নিচু ডাল বাড়ি লাগছে উইন্ডশীল্ডে। গতি, একেবারে কমিয়ে রেখেছে মুসা। শক্ত হাতে ধরেছে স্টিয়ারিং। সামান্য একটু এদিক ওদিক হলেই, স্টিয়ারিং ভুল। ঘোরালেই পড়বে গিয়ে খাদে।
হেডলাইটের আলো পড়ল আরেকটা গাড়ির ওপর। খাদের, একেবারে কিনারে দাঁড়িয়ে আছে, পুরানো একটা জেলপি। রবিন বলল, খারাপ হয়ে গেছে বোধহয়। ফেলে রেখে গেছে।
এগিয়েই চলল মুসা, রহস্যময় আলোটার সন্ধানে, খানিক আগে কেবিনের কাছে দাঁড়িয়ে যেটা দেখা গেছে।
আরও কিছুদূর এগোতেই মোটামুটি চওড়া খোলা একটুকরো জায়গায় ঢুকল গাড়ি। আরেকটু এগোলেই ডোবারের কেবিনের ওপর চলে যাবে, যেখানটায় আলো দেখেছে। থেমে গেল মুসা। কি করবে জিজ্ঞেস করল কিশোরকে।

আর এগিও না। এখানেই গাড়ি ঘুরিয়ে রেডি রাখো, কিশোর বলল। দরকার পড়লে যাতে এসেই দৌড় দিতে পারি। তখন হয়তো আর ঘোরানোর সময় থাকবে না।

বাতাসের বেগ বেড়েছে। যে কোন মুহূর্তে বনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। ঝড়। অনেক ডালপালা ছড়িয়ে আকাশের এমাথা ওমাথা চিরে দিয়ে গেল। বিদ্যুৎ-শিখা, সঙ্গে সঙ্গে কানফাটা শব্দে বাজ পড়ল। তারপর এত ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল, টর্চ জ্বালার আর প্রয়োজন হলো না।

সরু পথে চলতে চলতে থমকে দাঁড়াল ওরা। কথা শোনা গেল, এই যে, ধরো তো এটা।

চট করে ঝোপের আড়ালে ঢুকে গেল গোয়েন্দারা। যেদিকে কথা শোনা গেছে তাকিয়ে রইল সেদিকে। আবার বিদ্যুৎ চমকালে দেখল, একটা ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। পেছন থেকে লম্বা একটা বাক্স নামাচ্ছে দু-জন লোক। নামিয়ে নিয়ে ঢুকে পড়ল গাছপালার মধ্যে, হোলোর কিনারের দিকে।

কোথায় গেল? ফিসফিস করে বলল রবিন, ওদিকে তো জায়গা নেই। না জেনে এগোলে পড়ে যাবে নিচে।

উত্তেজিত হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল গোয়েন্দারা, কিন্তু লোকগুলো ফিরল না।

গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে আছে কিশোর। অনেকগুলো প্রশ্নের জবাব যেন মিলতে আরম্ভ করেছে। সমাধান হয়ে আসছে ধাঁধার। বলল, শোনো, পিচার দুটো পেচা একে কেন কেটে দিয়েছিল, বুঝে গেছি। ও বোঝাতে চেয়েছে, চিৎকারগুলো পাখিতে করেনি, করেছে মানুষে। এক ঢিলে দুই পাখি মারে কেউ। যারা ট্রাক নিয়ে আসে পেঁচার ডাক ডেকে তাদেরকে সঙ্কেতও দেয়, আবার আশপাশের মানুষকে হুঁশিয়ারও করে: খবরদার, এদিকে এসো না; এখানে ডাইনী আছে! সেটাকে আরও জোরদার করার জন্যে কুকুর চুরি করে। ভয় পেয়ে কেউ এদিকে না এলে নিরাপদে মাল খালাস করতে পারে ওরা।

কুকুরগুলোকে এনে কি করে তা-ও বুঝে ফেলেছি! রবিন বলল, নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দেয় চোরাই মার্কেটে। পটিরটা বোধহয় তাড়াহুড়োয় বেচতে পারেনি, দিয়ে এসেছে ডরোথির কাছে।

তারমানে বেআইনী কিছু করছে ওরা এখানে? মুসার প্রশ্ন।

তাতে কোন সন্দেহ আছে কি? পাল্টা প্রশ্ন করল কিশোর।

কি করছে?

আমার তো মনে হচ্ছে, হঠাৎ করে এই এলাকায় যে শুরু হয়েছে, সেটা এদেরই কাজ। ডোবারও এতে জড়িত।

ঠিক, রবিন একমত হলো। সেটা কোনভাবে জেনে গিয়েছিলেন হয়তো ক্যাপ্টেন রিচটন, ওদেরকে মাল খালাস করতে দেখে ফেলেছিলেন, সে জন্যেই তাকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে।
মেরে ফেলেনি তো? শঙ্কিত হয়ে উঠল মুসা।
কতটা বেপরোয়া ওরা, সেটা এখনও জানি না, জবাব দিল কিশোর। তবে খুনের ঝুঁকি নেয়ার চেয়ে আটকে রাখাটাই নিরাপদ মনে করবে। কিন্তু কোথায় আটকাল? আরেকটা কথা মনে আছে, সেদিন ডোবারের সঙ্গে কথা বলার সময় দরজা লাগানোর শব্দ শুনেছিলাম, কিন্তু রান্নাঘরে ঢুকে কোন দরজা দেখিনি?
আছে, জানাল দু-জনেই।
কোথায় সেই দরজাটা?
জবাব দিতে পারল না কেউ।
আমার বিশ্বাস, কিশোরই বলল, রান্নাঘরের মধ্যেই কোথাও আছে ওটা, লুকানো, গুপ্তদরজা।
আর কোন কথা হলো না। চুপ করে অপেক্ষা করতে লাগল তিনজনে। করতে করতে অস্থির হয়ে উঠল, কিন্তু ওরা আর আসে না।
দেখা দরকার কোথায় গেল, কিশোর বলল। তোমরা এসো আমার পেছনে। দূরে দূরে থাকবে। ধরা পড়লে যাতে একজন পড়ি, অন্য দুজন, পালাতে পারি।
ঝোপের আড়ালে আড়ালে পা টিপে টিপে এগোল সে। তার পেছনে বেশ খানিকটা দূরত্ব রেখে রবিন, সবশেষে রইল মুসা।
লোকগুলোকে দেখা গেল না কোথাও। খাদের কিনারে গাছের সারির কাছে এসে দাঁড়াল কিশোর। একটু পর মুসা আর রবিনও চলে এল তার পাশে। খোলা জায়গায় না থেকে বসে পড়ল ঝোপের আড়ালে। নিচে উঁকি দিল।
তাদের সামনে কোন গাছপালা নেই, পাথরের দেয়ালটা প্রায় খাড়া হয়ে নেমে গেছে উপত্যকায়।
শাঁই শাঁই করে বইছে ঝোড়ো বাতাস। তাদের পেছনে সাংঘাতিক দুলছে গাছপালাগুলো। এই ঝোপের কাছেও বাতাসের শক্তি অনুভব করতে পারছে ছেলেরা। বিদ্যুতের আলোয় ব্ল্যাক হোলোর অনেক কিছুই স্পষ্ট হয়ে উঠছে।
ডোবারের কেবিনটাও দেখা যাচ্ছে। কিন্তু লোকগুলোকে চোখে পড়ল। অবাক কাণ্ড! গেল কোথায় ওরা?
ওপরেও নেই, নিচেও নেই, বিড়বিড় করল রবিন, তাহলে গেল কোথায়? আর নিচেই যদি গিয়ে থাকে, নামল কোনখান দিয়ে? যা দেয়ালের দেয়াল, নিচে নামাই মুশকিল, সঙ্গে আছে আবার ভারী বাক্স!

ওরা যেখানে রয়েছে তার ঠিক নিচে নয় কেবিনটা, ওটার ওপরে যেতে হলে একপাশে আরও খানিকটা সরতে হবে। ওখানটায় গেলে লোকগুলোকে দেখা যেতে পারে ভেবে উঠে দাঁড়াল কিশোর। পেছনে আগের মত দূরত্ব রেখে আসতে বলল রবিন আর মুসাকে।
খাদের কিনার ধরে এগোল তিনজনে, একজনের পেছনে আরেকজন।
হঠাৎ চিৎকার করে উঠল কিশোর। বিদ্যুৎ চমকাল এই সময়। অবাক হয়ে রবিন আর মুসা দেখল, খানিক আগেও যেখানে ছিল গোয়েন্দাপ্রধান, সেখানে নেই সে, অদৃশ্য হয়ে গেছে!

.

কিশোর কিশোর! বলে চিৎকার দিয়ে দৌড় মারল রবিন। মুসা ছুটল তার পেছনে। কিশোর, কোথায় তুমি?
সাড়া নেই। বিদ্যুৎ চমকাল বড় করে, দীর্ঘ একটা মুহূর্ত সবকিছু আলোকিত করে রেখে দপ করে নিভে গেল। আশপাশটা পরিষ্কার চোখে পড়ল ওদের। এবারও দেখা গেল না কিশোরকে। ওই লোকগুলোর মতই সে-ও গায়েব হয়ে গেছে।
গেল কোথায় ও! ককিয়ে উঠল রবিন। তার কথা ঢেকে দিল প্রচণ্ড বজ্রপাতের শব্দ।
আবার চমকাল বিদ্যুৎ। আকাশটাকে যেন ফেড়ে ফেলে তার ভেতরটা দেখিয়ে দিতে চাইল। মনে হলো, এতক্ষণ মেঘগুলোকে ধরে রেখেছিল যে চাদরটা, সেটাকেও চিরে দিল বিদ্যুৎ। অঝোরে নেমে এল বৃষ্টি। গাছপালার মাথায়, পাথরের গায়ে আঘাত হানার শব্দ উঠল ঝমঝম, ঝমঝম।
কিন্তু বৃষ্টি শুরু হওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে আরেকটা শব্দ ঢুকল মুসার তীক্ষ্ণ শ্রবণযন্ত্রে, মনে হলো তার পায়ের নিচ থেকে এসেছে।
চিৎকার না? ওদিকে! চেঁচিয়ে উঠে বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে একটা বড় ঝোপের দিকে দৌড় দিল সে। আরেকটু হলে সে-ও পড়ে যাচ্ছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্তে বিদ্যুতের আলোয় দেখল সামনে মাটিতে গোল একটা কিছু, ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে গেল সে।
টর্চের আলো ফেলল দুজনে। মাটিতে একটা গর্ত। ঝোপটার আড়ালে থাকায় দূর থেকে চোখে পড়ে না। উঁকি দিয়ে দেখল, একধার থেকে একটা কাঠের স্লাইড নেমে গেছে। আরেকধার থেকে উঠেছে একটা কাঠের সিঁড়ি।
নিচ থেকে ওদের নাম ধরে ডাকছে কিশোর।
তাড়াতাড়ি নামার জন্যে সাবধানে সাইডের ওপর বসে দুহাতে দু-ধার খামচে ধরল মুসা। পার্কের স্লিপারে বসলে যেমন হয়, তেমনি সড়াৎ করে নেমে চলে এল নিচে। তার পেছনে বসেছিল রবিন, সে এসে পড়ল তার গায়ের ওপর।

মাটিতে পড়েই লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল দু-জনে।
অন্ধকারে কিশোরের গলা শোনা গেল, টর্চ জ্বালো! আমারটা হারিয়ে ফেলেছি!
হলুদ আলো পড়ল পাথরের দেয়ালে। একটা কুয়ার মধ্যে রয়েছে ওরা। সুড়ঙ্গমুর্খ দেখা গেল।
নিশ্চয় এটা চোরের আড্ডা, নিচু স্বরে বলল রবিন। ওই কাঠের সাইডে মালগুলো রাখে, পিছলে নেমে আসে ওগুলো কুয়ার নিচে। পরে অন্য কোথাও সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।
সেটাই দেখতে হবে, কিশোর বলল।
সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়ল ওরা। সাবধানে এগোল। কিছুদূর এগোতে সামনে দেখা গেল একটা কাঠের দরজা।
খুলব? রবিনের প্রশ্ন।
না খুললে দেখব কি করে?
এগিয়ে গিয়ে ঠেলা দিল কিশোর। ভেতরের দিকে খুলে গেল পাল্লাটা।
ওপাশে তাকিয়েই থ হয়ে গেল ওরা। পাথর কুঁদে তৈরি চারকোনা একটা ঘর, একটা প্যারাফিনের ল্যাম্প জ্বলছে। মাথায় ব্যান্ডেজ বাধা একজন মানুষ। পড়ে আছে একটা ক্যাম্পখাটে। এলোমেলো ধূসর চুল। শব্দ শুনে দুর্বল ভঙ্গিতে মুখটা ঘুরল এদিকে।
ক্যাপ্টেন রিচটন? ছুটে গেল রবিন।
কে তোমরা? দুর্বল কণ্ঠস্বর মানুষটার।
জানাল কিশোর, আমরা গোয়েন্দা। মিস্টার সাইমন আপনার চিঠি পেয়েছেন।
আশার আলো ঝিলিক দিল রিচটনের চোখে, সে কোথায়? মাথা তুললেন তিনি।
তিনি জরুরী কাজে ব্যস্ত। সেজন্যেই আমাদের পাঠিয়েছেন।
আলো নিভে গেল আবার চোখ থেকে। গড়িয়ে পড়ে গেল মাথাটা। একজন দক্ষ গোয়েন্দার পরিবর্তে তিনটে ছেলেকে দেখে নিরাশ হয়েছেন রিচটন, সেটা বুঝে কিশোর বলল, কদিন ধরেই এখানে আপনাকে খোঁজাখুঁজি করছি, ক্যাপ্টেন। আজকে পেলাম। এখন সাবধান থাকতে হবে আমাদের, নইলে বিপদে পড়ব। ডোবার আর তার চ্যালারা কোথায় আছে, এখনও জানি না।
আমি জানি ওরা কোথায়, কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠে বসলেন ক্যাপ্টেন। পাথরের কেবিনটাতে। এই ঘর থেকেও যাওয়া যায়, ওই দরজা দিয়ে। কিশোররা যেদিক দিয়ে ঢুকেছে তার উল্টো দিকের আরেকটা দরজা দেখালেন তিনি।
তার শার্টের ছেঁড়া জায়গাগুলো চোখ এড়াল না কিশোরের। ঝোপের কাটায় আটকে থাকা কাপড়ের টুকরোগুলো এটা থেকেই ছিঁড়েছে, বুঝতে পারল।

তোমরা একা কিছু করতে পারবে না, গিয়ে শেরিফকে জানাও, পুলিশ নিয়ে এসো। ওরা ডাকাত, ভয়ঙ্কর লোক। দলটা লুটপাট করে বেড়ায় বাইরে বাইরে, মাল এনে লুকিয়ে রাখে এখানে। ডোবার ওদের নেতা, উকিল হুগারটাও আছে তার দলে। তোমাদেরকে এখানে দেখে ফেললে বিপদ হবে।
চলুন আপনাকে বের করে নিয়ে যাবে, মুসা বলল। কুয়াটাতে একটা সিঁড়ি আছে। সেটা বেয়ে ওপরে ওঠা যাবে। ওই পথেই ঢুকেছি আমরা, পালাতেও পারব। ওরা কিছু জানবেই না।
নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার কিশোর। বলল, কিন্তু ওরা যখন দেখবে, ক্যাপ্টেন নেই, বুঝবে খেল খতম। গা ঢাকা দেবে। ধরতে আর পারব না।
তুমি ঠিকই বলেছ, একমত হলেন ক্যাপ্টেন। তার চেয়ে যা বললাম, তাই করো, গিয়ে পুলিশ নিয়ে এসো…
বরং এক কাজ করো, রবিনকে বলল কিশোর। তুমি চলে যাও। শেরিফকে খবর দাও। আমি আর মুসা থাকছি এখানে।
কি ভেবে তর্ক করল না রবিন, বেরিয়ে গেল।
কিশোর আর মুসাকেও যাওয়ার জন্যে চাপাচাপি করে করে হাল ছেড়ে দিলেন ক্যাপ্টেন, যাবে না ওরা। শেষে কিশোরের প্রশ্নের জবাবে তার কাহিনী বলতে আরম্ভ করলেন, চিৎকারটা প্রথম যখন শুরু হলো, বিশেষ মাথা ঘামালাম না আমি। তারপর কুকুর হারাতে লাগল। মনে পড়ল ডাইনীর কিংবদন্তীর কথা। ক্যালেন্ডারে লিখে রাখতে লাগলাম ডাক কবে শোনা যায়, আর কুকুর কবে হারায়। কোনটা কি কুকুর, মালিক কে, তা-ও লিখলাম, পরে যাতে ভুলে না যাই সে-জন্যে। দুটো ঘটনার মধ্যে একটা যোগাযোগ লক্ষ করলাম। সেজন্যেই ভিকটরকে চিঠি লিখেছিলাম, জানি, এ সব উদ্ভট রহস্যগুলোতে কাজ করে আনন্দ পায় সে। শেরিফকে গিয়ে বলতে পারতাম, কিন্তু অবসরপ্রাপ্ত একজন পুলিশ অফিসার এ সব গুজবে বিশ্বাস করে তদন্তের সাহায্য চাইতে গেছি দেখলে মনে মনে হাসত সে। ভাবত, বুড়োটার মাথায় দোষ পড়ে গেছে।
আপনি কি ডাইনী বিশ্বাস করেন? ফস করে জিজ্ঞেস করে বসল মুসা।
না। তবে ব্যাপারটা বেশ দ্বিধায় ফেলে দিয়েছিল। তলে তলে সিরিয়াস কিছু একটা ঘটছে বুঝতে সময় লাগল। হাইজ্যাকারদের কথা আগেই শুনেছি, সন্দেহ করলাম, ওরাও এসে আস্তানা গেড়ে থাকতে পারে এখানে। তারপর একরাতে আমার ককার স্প্যানিয়েল কুকুরটাও চুরি হয়ে গেল। আর কারও অপেক্ষা না করে নিজেই তদন্ত করব ঠিক করলাম।
মাথা ঝাঁকাল কিপোর। এবং সেদিন বেরিয়েই ধরাটা পড়লেন।

হ্যাঁ, বিষণ্ন কণ্ঠে বললেন ক্যাপ্টেন। সঙ্গে বন্দুক নিয়েছিলাম। হোলোতে নেমে খুঁজতে শুরু করলাম। ঝোপের মধ্যে একটা রহস্যজনক শব্দ শুনে এগিয়ে গেলাম সেদিকে, ভেতরে কে জিজ্ঞেস করলাম? জবাব পেলাম না। তারপর দেখি দুটো জ্বলন্ত চোখ, পরক্ষণেই ভয়ঙ্কর এক চিৎকার। একটা পুমা। এখানে ওই জানোয়ার দেখে খুব চমকে গিয়েছিলাম, কখনও শোনা যায়নি এই এলাকায় পুমা আছে। গুলি করতে দেরি করে ফেললাম। আমি নিশানা করার আগেই লাফ দিল ওটা। দুটো গুলির একটাও লাগাতে পারলাম। আমাকে ধরার জন্যেই লাফ দিয়েছিল, কিন্তু গুলির শব্দে ভয় পেয়ে পালাল। মনে হলো, পুরোপুরি বুনো নয়। তা ছাড়া কেমন একটা ঘোরের মধ্যে ছিল।
গুলির খোসাগুলো পেয়েছি আমরা, মুসা বলল।
গুলির শব্দ শুনে চুপি চুপি দেখতে এল ডোবার। পেছন থেকে মাথায় বাড়ি মেরে বেহুশ করে ফেলল আমাকে। জ্ঞান ফিরলে দেখি, ডোবারের কেবিনটাতে শুয়ে আছি। রান্নাঘরের দেয়ালে পাথরের একটা গোপন দরজা খুলছে সে। আগে থেকে জানা না থাকলে দরজাটা আছে ওখানে বোঝাই যায় না।
বেহুঁশের ভান করে পড়ে রইলাম। আমাকে হিঁচড়ে হিঁচড়ে একটা গলি পার করে আনল সে, তারপর একটা ঘর–একধারে অনেকখানি জায়গায় শিক লাগিয়ে আলাদা করা, হাজতের মত; এবং সবশেষে নিচু একটা দরজা দিয়ে বের করে নিয়ে এনে ফেলল এই ঘরটায়। তারপর থেকেই আছি। একটাই ভরসা ছিল আমার, ভিকটরকে চিঠি লিখেছি, সে আসবেই। কেবিনে আমাকে না পেলে খুঁজে বের করবে।
অথচ তিনি কল্পনাও করেননি আপনি এই বিপদের মধ্যে আছেন,. কিশোর বলল। তাহলে সব কাজ বাদ দিয়ে নিজেই ছুটে আসতেন।
ওরা এসে কি কি করেছে রিচটনকে বলতে লাগল সে। হুগারফ তার। কাছে টাকা পায় বলেছে শুনে রেগে উঠলেন ক্যাপ্টেন, মিথ্যে কথা! আমার কাছে কেউ টাকা পায় না। ওই বাহানা করে ও তোমাদের খোঁজ নিতে। গিয়েছিল। ওর মত একটা চোরের কাছে টাকা নিতে যাব কেন আমি?
হে আমরাও বিশ্বাস করিনি একথা। বরং বলে তার ওপর আমাদের সন্দেহ জাগিয়েছে।
পেঁচার ডাকটা যে আসলে পেঁচার নয়, মানুষই ওরকম করে ডেকে সঙ্কেত দেয়, তার এই সন্দেহের কথা জানাল কিশোর।
ঠিকই অনুমান করেছ তুমি। দুই রকম পেঁচার ডাক ডাকে সে। একভাবে ডেকে হাইজ্যাকারদের বোঝায়, রাস্তা পরিষ্কার, চলে এসো। আরেক ভাবে ডেকে বলে, বিপদ, চলে যাও। এই দ্বিতীয় ডাকটা শুরু করেছে। তোমরা আসার পর।

তারমানে আমাদের ভয় পায় সে? মুসার প্রশ্ন।
হ্যাঁ, পাই, দরজার কাছ থেকে বলে উঠল একটা পরিচিত, ভারী কণ্ঠ।
ঝট করে ঘুরে তাকাল দুই গোয়েন্দা। হাতে লম্বা নলওয়ালা সেই পিস্তলটা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ডোবার। নিঃশব্দে দরজা খুলে কখন ঢুকে পড়েছে টেরই পায়নি কেউ। তার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে দু-জন লোক, একজনকে চেনে গোয়েন্দারা– উকিল আর্নি হুগার। আরেকজনের বিশাল দেহ, রুক্ষ চেহারা।
স্বাগতম, রসিকতার ঢঙে বলল ডোবার, সুন্দরভাবে সমাধান করে ফেলেছ কেসটার। এমনকি পেঁচার ডাকের রহস্য ভেদ করে ফেলেছ, ভাল গোয়েন্দা তোমরা, বুদ্ধি আছে। ডাকগুলো আমিই ডেকেছি, একেবারে আসলের মত হয়েছিল, তাই না? কিন্তু বুদ্ধিটা খারাপ জায়গায় খাঁটিয়েছ, এর জন্যে খেসারত দিতে হবে তোমাদের। কিংবা পুরস্কারও বলতে পারো, জ্যান্ত ডাইনীর সাক্ষাৎ পাবে। তো, তোমাদের আরেক বন্ধু কোথায়?
চুপ করে রইল মুসা আর রবিন।
হুঁ, এরা বলবে না। হঠাৎ বদলে গেল তার কণ্ঠস্বর, হাসি হাসি ভাবটা চলে গিয়ে কঠিন হয়ে উঠল চেহারা। কর্কশ কণ্ঠে বিশালদেহী লোকটাকে বলল, ফেরেল, নিশ্চয় বাইরে কোথাও আছে। ধরে নিয়ে এসো। ও পালালে মুশকিল হয়ে যাবে আমাদের।
মাথা ঝাঁকিয়ে বেরিয়ে গেল ফেরেল।
হুগারফ রইল রিচটনের পাহারায়, আর পিস্তলের মুখে দুই গোয়েন্দাকে নিয়ে চলল ডোবার।, একটা গলিপথ পেরিয়ে আরেকটা ঘরে এসে ঢুকল, যেটাতে হাজতের দরজার মত শিক লাগানো আছে বলেছিলেন রিটন।
ডোবারের টর্চের আলোয় পাথরের ঘরটা দেখতে পাচ্ছে দুই গোয়েন্দা। পেছনের দেয়ালের কাছটায় তেরপল দিয়ে ঢাকা রয়েছে কিছু। বাতাস ভারী আর ভেজা ভেজা এখানে মাটির নিচের ঘর বলেই বোধহয়; কিন্তু তার সঙ্গে মিশে আছে কেমন একটা বোঁটকা গন্ধ!
কোয়ার্টার পছন্দ হয়েছে? হেসে ছেলেদের জিজ্ঞেস করল ডোবার। প্রাকৃতিক গুহাই ছিল এগুলো, খুড়ে খুঁড়ে বড় করেছে ক্রীতদাসপ্রথার। বিরোধিতা করেছিল যারা, তারা। এখানে এসে লুকিয়েছিল। খুব চালাক ছিল ওরা স্বীকার করতেই হবে। কুত্তা চুরি আর রাতে বিকৃত চিৎকার করে করে : ডাইনীর কিংবদন্তীটাকে জাগিয়ে তুলেছিল ওরা, লোকে ভয় পেয়ে আর হোলোর কাছে ঘেঁষত না। ক্রীতদাসদের লুকিয়ে থাকার সুবিধে হত। ইতিহাসের সেই অধ্যায়টাকেই আবার কাজে লাগিয়েছি আমি এত বছর পর, প্রশংসা করবে না?

করতাম, যদি ওদের মত সৎ উদ্দেশ্য থাকত আপনার, কিশোর বলল। কিন্তু আপনি তো করছেন অপরাধ, হাইজ্যাকিঙের মত জঘন্য অপরাধ। ভাল কথা, ভব কোথায় আছে জেনে গেছি আমরা।

মুহূর্তের জন্যে বিস্ময় দেখা দিল ডোবারের চোখে, তারপর সামলে নিল, কি বলছ বুঝতে পারছি না।

বন্য মানুষের মুখোশ পরে আমাদের ফাঁকি দেয়ার ব্যাপারটাও নিশ্চয় বুঝতে পারছেন না?

না, তা পারছি, হাসিমুখে স্বীকার করল ডোবার। আমিই পিচার সেজেছিলাম, রবারের মুখোশ আর কালো পরচুলা পরে। এ মহাপুরুষের কাজ করেছেন, ডোবারের এই হাসি হাসি ভাবটা সহ্য করতে না পেরে রেগে উঠল মুসা। আমাদের নিয়ে এখন কি করবেন, সেটা শুনতে চাই।

ডোবার বুঝতে পারল অসাধারণ স্নায়ুর জোর এই ছেলেগুলোর, এত সহজে ভয় ধরাতে পারবে না ওদের মনে। কঠিন পথটাই বেছে নিল সে। এগিয়ে গেল তেরপলে ঢাকা জায়গাটার দিকে।

ডাইনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হোক এবার! নাটকীয় ভঙ্গিতে কথাটা বলে একটানে তেরপল সরিয়ে নিল। বেরিয়ে পড়ল একটা লোহার খাঁচা। ভেতরে শক্তিশালী একটা জানোয়ার। ম্লান আলোতে ঝিক করে উঠল ওটার সবুজ চোখ।

ডাইনীর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর চিৎকারগুলোর জন্যে এটাকে দায়ী করতে পারো, ডোবার বলল। যখন শুনলাম আমার ভাই নুবার একটা পুমাকে কিছুতেই কন্ট্রোল করতে না পেরে বিক্রি করে দিতে চায়, টরিকে পাঠালাম–ওটা কিনে নিয়ে আসতে। তবে আমি যে কিনছি জানতে দিলাম না নুবারকে। ভাবলাম, জানোয়ারটা পেলে অনেক কাজে লাগাতে পারব। আমার আন্দাজ ভুল হয়নি।

আধমরা ভেড়া কেন কিনেছিল ডোবার, এখন নিশ্চিত হলো গোয়েন্দারা। পুমাকে খাওয়ানোর জন্যেই।

মুসা বলল, আপনার ভাইই যে জানোয়ারকে কন্ট্রোল করতে পারেনি, সেটাকে আপনি করছেন কি করে?

মিটিমিটি হাসছে ডোবার। জন্তু-জানোয়ারকে কন্ট্রোল করার একটাই উপায়, পিটুনি দেয়া, নিষ্ঠুর ভাবে পেটাতে হবে। পুমাটা এখন বুঝে গেছে কে তার মনিব। আমার সঙ্গে তো কই গোলমাল করে না, ভয় পায়।

আজ রাতে ওটাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন, তাই না? জিজ্ঞেস করল কিশোর।

হ্যাঁ। খাঁচার পেছনে ওই দরজাটা দেখছ না, ওটা খুলে দিই, বেরিয়ে যায়। পাহাড়ের ভেতর দিয়ে একটা সুড়ঙ্গ আছে, ও পথে বেরোয়। তবে বেরোতে দেয়ার

আগে ঘুমের বড়ি মেশানো খাবার খাইয়ে দিই, যাতে বেশি গোলমাল না করে। পালানোর বুদ্ধি না হয়। প্রতিবারেই ফিরে এসেছে ওটা।
তবে আজ রাতে ডোজ বোধহয় কম হয়ে গিয়েছিল, কিংবা অন্য কোন কারণে তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে গেছে ওষুধের ক্ষমতা, ফলে খেপে উঠেছিল। সে জন্যেই পর পর দুবার পেঁচার ডাক ডাকতে হয়েছিল, সব ঠিক আছে জানানোর পর পরই জানাতে হয়েছিল আমার লোকদের, ঠিক নেই, সাবধান হও। তবে ভাগ্য ভাল, কারও কোন ক্ষতি না করেই খাঁচায় ফিরেছে পুমাটা। হয়তো তার সামনে পড়েনি কেউ। পড়লে ছাড়ত বলে মনে হয় না।
ছাড়েন কেন? মূসার প্রশ্ন।
কে ওটার গু সাফ করবে? বাইরেই সেরে আসতে পাঠাই। আরেকটা কারণ আছে, যেদিন আমাদের কাজ থাকে সেদিন পাহারা দেয়ার কাজটাও অনেকটা ওকে দিয়ে করাই। ব্ল্যাক হোলোতে অচেনা কেউ ঢুকলে ঠেকাবে। ও বাইরে বেরোলে আরও একটা উদ্দেশ্য সফল হয় আমাদের, ওই যে বললাম, ডাইনী। চিৎকার করে। ওর ভয়াবহ ডাক শুনে লোকে ভাবে ডাইনীর। চিৎকার। ভয়ে আর এ পথ মাড়ায় না কেউ। সাধারণ একটা পুমার কাছে আর। কত কাজ চাও?
আজকে অবশ্য নতুন একটা কাজ করাব ওকে দিয়ে। রহস্যময় কণ্ঠে বলল ডোবার। খাঁচার এদিকেও একটা দরজা আছে, শেকল টেনে তুলে। নেয়া যায়। পালাতে যদি চাও, মুচকি হেসে আবার চোখ টিপল সে, সহজ একটা পথ বাতলে দিতে পারি। এদিককার দরজাটা তুলে ফেলবে, তারপর ওদিকেরটা, আর কোন বাধা থাকবে না, পুমাটাকে ডিঙিয়ে কেবল ওপাশের সুড়ঙ্গে গিয়ে ঢুকবে। ব্যস, বেরিয়ে যেতে পারবে।
ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে দরজা লাগাল সে। বাইরে থেকে ভারি খিল তুলে দিল। চেঁচিয়ে বলল, ও, নতুন কাজটা কি, বলতে ভুলে গেছি। আরও একটা শেকল আছে আমার এখানে। এটা টেনেও খাঁচার তোমাদের দিকের দরজাটা ভোলা যায়। ভাবছি, আজই রাতে কোন একসময় সেটা তুলে নেব। গুডবাই।
টর্চ নিয়ে গেছে ডোবার। ঘর অন্ধকার হয়ে গেছে। তবে নিজের টর্চটা শার্টের মধ্যে লুকিয়ে ফেলেছিল মুসা, সেটা বের করে নিয়ে আলো জ্বালল। পরীক্ষা করে দেখতে লাগল তাদের বন্দিশালাটা।
নাহ, কোন পথ নেই, দেখেটেখে নিরাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল সে। আমাদের একমাত্র ভরসা এখন রবিন। নিরাপদে বেরিয়ে গিয়ে পুলিশ নিয়ে যদি ফিরে আসতে পারে!
অহেতুক ব্যাটারি নষ্ট না করে আলোটা নিভিয়ে দিল মুসা। গভীর অন্ধকারে ঢেকে গেল ঘর। মাত্র কয়েক ফুট দূরে খাঁচার মধ্যে অস্থির ভঙ্গিতে পায়চারি করছে

পুমাটা।
অনেকক্ষণ পর বাইরের করিডরে কথা শোনা গেল। ডোবার বলছে, ছেলেটাকে পেলে না?
না, বস, জবাব দিল ফেরেলের খসখসে কণ্ঠ। কুয়ার বাইরে বেরিয়েই শুনলাম গাড়ির শব্দ। লাল কনভারটিবলটা চলে যাচ্ছে। বুঝলাম, কোন কারণে ছেলেটা পালাচ্ছে। ট্রাক নিয়ে পিছু নিলাম। কিন্তু সাংঘাতিক গাড়ি ওর, চালায়ও ভাল, কাছেই যেতে দিল না আমাকে…
আর তুমিও পরাজিত হয়ে ফিরে এলে, গর্দভ! গর্জে উঠল ডোবার। জানো, এখন আমাদের কি হবে…
কিছুই হবে না, বস, ও আর কিছু করতে পারবে না আমাদের হাসি শোনা গেল বিশালদেহী লোকটার। আমিও যতটা সম্ভব গতি বাড়ালাম। এত্তবড় ট্রাক নিয়ে কি আর ওই গাছপালার মধ্যে জোরে চলা যায়, বলুন? তবে। থামলাম না। মোড় নিয়ে চোখের আড়ালে চলে গেল গাড়িটা। একটু পরেই শুনলাম সাংঘাতিক শব্দ। গিয়ে দেখি, নিচে পড়ে আগুন ধরে গেছে গাড়িতে। ওই গাড়ি থেকে বেরিয়ে বাচবে ও? অসম্ভব!
গুড! শান্ত হয়ে এল ডোবার। একটা ঝামেলা নিজে নিজেই কমল!
অন্ধকারে যেন বরফের মত জমে গেছে কিশোর আর মুসা, অবশ হয়ে আসতে চাইছে হাত-পা।

.
দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কথা ফুটল না ওদের মুখে। তারপর বিড়বিড় করল মুসা, এ হতে পারে না, কিশোর! এটাস্পত্যি হতে পারে না!
গল্পটা আমিও বিশ্বাস করতে পারছি না, গলা কাঁপছে কিশোরের। বেরোতেই হবে আমাদের, যে ভাবেই হোক, সত্যিটা জানতে হবে!
বেরোনোর একমাত্র পথ, খাঁচার দরজাটার কাছে এসে দাঁড়াল ওরা।
শিকের কাছে এসে মাথা ঠেকিয়ে ভয়ঙ্কর সুরে গরগর করে উঠল পুমাটা।
মোজা, শার্ট, বেল্ট, সোয়েটার সব খুলে ফেলল, কিশোর বলল। একটা বুদ্ধি এসেছে মাথায়।
মুহূর্তে সব খুলে খাঁচার সামনে স্তূপ করে ফেলল দুজনে।
একটা জিনিসকে সব জানোয়ারই ভয় করে, বিড়বিড় করল কিশোর। দুটো বেল্টকে এক করে পাকিয়ে নিল সে, তার ওপর জড়াল সোয়েটার আর শাট। মোজা দিয়ে পেঁচিয়ে শক্ত করে বাঁধল, যাতে সহজে না খোলে কাপড়গুলো।
কি করছ? বুঝতে পারছে না মুসা।

জবাব না দিয়ে পকেট থেকে লাইটার বের করল কিশোর। বুঝে গেল মুসা, আগুন!
হ্যাঁ, মাথা ঝাঁকাল কিশোর। আগুনকে ভয় পায় না এমন জানোয়ার নেই।
লাইটার জেলে কাপড়ে তৈরি বিচিত্র মশালটার মাথায় আগুন ধরল সে। আগুন দেখেই চাপা গর্জন করতে করতে খাঁচার দরজার কাছ থেকে সরে গেল পুমাটা। টর্চ নিভিয়ে দিল মুসা। কিন্তু অন্ধকার হলো না আর ঘরটা, মশালের আলোয় আলোকিত। বিহূত ছায়া নাচছে দেয়ালে।
কি ঘটে পরীক্ষা করে দেখার জন্যে মশালটা খাঁচার মধ্যে ঢুকিয়ে। পূমাটাকে খোঁচা মারার ভঙ্গি করল কিশোর। গর্জে উঠে একলাফে সরে গেল ওটা। মুচকি হাসল সে। বুঝল কাজ হবে। মুসাকে বলল, শেকল টেনে আস্তে আস্তে দরজাটা তোলে।
লোহায় লোহায় ঘষা লাগার শব্দ তুলে উঠে যেতে শুরু করল দরজাটা। সামনে মশাল বাড়িয়ে ধরে ঢুকে গেল কিশোর। এগোল পুমাটার দিকে। ভয়ে, রাগে হিসিয়ে উঠে খাঁচার দেয়ালে নিজেকে ঠেসে ধরল ওটা। বিশাল থাবা বাড়িয়ে ঠেকানোর চেষ্টা করতে চেয়েও আবার পিছিয়ে যাচ্ছে।
ধীরে ধীরে ওটাকে পেছনের দরজাটার কাছে নিয়ে গেল কিশোর। জানোয়ারটার ওপর থেকে মুহূর্তের জন্যে চোখ না সরিয়ে মুসাকে বলল, এই দরজাটাও তোলো।..
সবে অর্ধেক উঠেছে দরজাটা, এই সময় চিৎকার শোনা গেল পেছনে। পুমার চিৎকার আর শেকলের শব্দ কানে গেছে ডোবারের, দেখতে এসেছে কি হয়েছে। চেপে ধরল মুসাকে।
পেছনে তাকাল না কিশোর, ঝটকা দিয়ে মশালটা বাড়িয়ে দিল পুমার দিকে। গর্জন করে পিছিয়ে গেল ওটা, খোলা দরজা দিয়ে চলে গেল সুড়ঙ্গমুখে। আগুনের ভয় ক্ষুব্ধ করে তুলেছে ওটাকে। সাহস সঞ্চয় করে থাবা তুলল কিশোরকে মারার জন্যে।
মরিয়া হয়ে ওটার হাঁ করা মুখে মশালটা ঠেসে ধরল কিশোর।
পুরোপুরি সাহস হারাল পুমাটা। আগুনের আঁচে ঝলসে গেছে মুখ। বিকট চিৎকার করে একলাফে ঘুরে দাঁড়িয়ে দিল দৌড়। হারিয়ে গেল সুড়ঙ্গের অন্ধকারে। মশাল হাতে কিশোরও ঢুকে পড়ল সুড়ঙ্গে। চেঁচিয়ে উঠে তার পিছু নিল ফেরেল।
বেশি লম্বা না সুড়ঙ্গটা। অল্পক্ষণেই বেরিয়ে চলে এল কিশোর। পুমাটাকে চোখে পড়ল না কোথাও। বনে ঢুকে পড়েছে।
কিশোরও ঢুকে পড়ল। হাতে যতক্ষণ আগুন আছে, জানোয়ারটাকে ভয় নেই। কিন্তু বেশিক্ষণ রাখতে পারল না ওটা। পিস্তলের গুলি ফুটল টাশশ করে। কানের

পাশ দিয়ে শিস কেটে বেরিয়ে গেল বুলেট। মশালটা হাত থেকে ছেড়ে দিয়ে ডাইভ দিয়ে গিয়ে একটা ঝোপের মধ্যে পড়ল সে।
ছুটে আসছে পদশব্দ। লাফিয়ে উঠে দৌড় দিল সে। গাছের আড়ালে আড়ালে ছুটতে লাগল। আরেকবার গুলি হলো পেছনে। তার হাতখানেক তফাতে গাছের গায়ে বিধল বুলেট। গতি আরও বাড়িয়ে দিল সে। ছুটতে ছুটতে চলে এল পাথরের ঢালের কাছে। থমকে দাঁড়াল। মুহূর্ত পরেই তার পাশের দেয়াল থেকে চলটা তুলে দিয়ে বিইঙ করে চলে গেল বুলেট।
ঢাল বেয়ে উঠতে গেলে গুলি খাবে, খোলা জায়গায় তাকে মিস করবে না ফেরেল। আর কোন উপায় না দেখে একটা পাথরের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল কিশোর।
ভোর হয়ে আসছে। ধূসর আলোয় পা টিপে টিপে লোকটাকে এগিয়ে আসতে দেখল সে। যে রকম বিশালদেহী, খালি হাতে এলেও তার সঙ্গে পারত না সে, তার ওপর হাতে রয়েছে পিস্তল। আত্মসমর্পণ না করলে গুলি খেতে হবে।
পাথরটার কাছে চলে এসেছে ফেরেল। হাত তুলে বেরিয়ে আসবে কিনা ভাবছে কিশোর, এই সময় উড়ে এল একটা পাথর। নিখুঁত লক্ষ্যভেদ, এই অল্প আলোতেও একটু এদিক ওদিক হলো না, ঠিক এসে ফেরেলের হাতের পিস্তলে লাগল ওটা। হাত থেকে খসে পাথরে পড়ল পিস্তলটা, গড়িয়ে চলে গেল কয়েক হাত। পরমুহূর্তে ওপর থেকে উড়ে এল একটা দেহ, ফেরেলকে নিয়ে গড়িয়ে পড়ল মাটিতে।
পিচার! চিৎকার করে উঠল কিশোর। তুমি কোত্থেকে…
কিন্তু জবাব দিতে পারল না বোবা ছেলেটা। কিশোরের দিকে তাকানোরও সময় নেই। ধস্তাধস্তি শুরু করছে লোকটার সঙ্গে। বেশিক্ষণ যুঝতে পারবে না সে, বোঝাই যাচ্ছে। যা করার তা-ই করল কিশোর। তাড়াতাড়ি গিয়ে তুলে নিল ফেরেলের পিস্তলটা। অপেক্ষা করতে লাগল।
পিচারের বুকের ওপর উঠে এল ফেরেল। দু-হাতে গলা টিপে ধরে ছেলেটাকে শ্বাসরুদ্ধ করে মারার চেষ্টা করল।
তার মাথার পেছনে পিস্তলের নল ঠেকিয়ে ধমকে উঠল কিশোর, খবরদার!
ফিরে তাকাল ফেরেল। থামল না। কিশোর যে গুলি করবে না এটা বুঝে হাত বাড়াল ধরার জন্যে। যা থাকে কপালে ভেবে পিস্তনটা তুলে গায়ের জোরে লোকটার চাদিতে বসিয়ে দিল কিশোর।
টুঁ শব্দ করল না ফেরেল। আস্তে ঢলে পড়ে গেল পিচারের গায়ের ওপর।
ঠিক এই সময় দুপদাপ করে একটা শব্দ শুনে ফিরে তাকাল কিশোর। অবাক হয়ে দেখল, পড়িমরি করে দৌড় দিয়েছে ডোবার, ভঙ্গি দেখেই বোঝা যায় পালাচ্ছে।

দেয়ালের কাছে পৌঁছেও থামল না, বেয়ে উঠতে শুরু করল।
কেন পালাচ্ছে বুঝতে পারল না কিশোর। বোঝার চেষ্টাও করল না, চেঁচিয়ে বলল, পিচার, জলদি ওটাকেও পালাতে দেয়া যাবে না! বলে সে ও পিছু নিল ডোবারের।
হরিণের গতিতে কিশোরের পাশ কাটাল পিচার। অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে দেয়াল বেয়ে উঠতে লাগল।
কিশোরও বসে রইল না, তবে পিচারের তুলনায় তার ওঠাটাকে শামুকের গতিই বলা চলে।
একটা শৈলশিরায় পৌঁছে পেছন ফিরে তাকাল ডোবার। দেখল, বোবা ছেলেটাও পৌঁছে গেছে। তাকে ঘুসি মারার জন্যে হাত তুলল সে।
একসঙ্গে কয়েকটা ঘটনা ঘটে গেল! ডোবারের পা সই করে ডাইভ দিল পিচার। তাকে নিয়ে গড়িয়ে পড়ল চ্যাপ্টা পাথরের ওপর। অনেক ওপরে। শোনা গেল একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার। পরক্ষণেই উড়ে এল দুশো পাউন্ড ওজনের। একটা ভারী শরীর। ডোবার আর পিচারের ওপর দিয়ে পার হয়ে গেল, পড়ল গিয়ে কয়েক গজ নিচের পাথরে। উঠে দাঁড়ানোর সাধ্য হলো না আর পুটার, গড়িয়ে পড়তে লাগল নিচে। ডোবারকে সই করেই ঝাঁপ দিয়েছিল ওটা। ওই মুহূর্তে পিচার তাকে ফেলে না দিলে এতক্ষণে শেষ হয়ে যেত আরিগনদের বংশধর।
ঘটনাটা স্তব্ধ করে দিল ডোবারকে। উঠে বসল কোনমতে, থরথর করে কাঁপছে। পালানোর চেষ্টা করল না আর, ক্ষমতাই নেই যেন শরীরের।
শৈলশিরায় পৌঁছে গেল কিশোর। পিস্তল তাক করল ডোবারের দিকে। কিন্তু তার দিকে নজর নেই লোকটার, তাকিয়ে আছে নিচের দিকে। পরাজিত ভঙ্গি।
এতক্ষণে হই-হট্টগোল খেয়াল করল কিশোর। ফর্সা হয়ে গেছে পুবের আকাশ। নিচে তাকিয়ে দেখল সে, অনেক পুলিশ। জাল দিয়ে আটকে ফেলেছে পুমাটাকে। ঢাল বেয়ে উঠে আসতে লাগল কয়েকজন পুলিশ। প্রথম যে লোকটা কাছে এল তাকেই জিজ্ঞেস করল কিশোর, রবিন ঠিক আছে? আমার বন্ধু?
আছে, জবাব দিল লোকটা।
স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর, গাড়িতে পুড়ে মরেনি তাহলে!
অবাক হলো পুলিশম্যান, কিসের গাড়ি!
জবাব দেয়ার প্রয়োজন বোধ করল না কিশোর। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নামতে শুরু করল ঢাল বেয়ে। নিচে নেমে দৌড় দিল ডোবারের কেবিনের দিকে।
হাঁ হয়ে খুলে আছে একমাত্র দরজাটা। একছুটে ভেতরে ঢুকে পড়ল সে। থমকে দাঁড়াল।
রান্নাঘরের গোপন পাথরের দরজাটার কাছে দাঁড়িয়ে আছে মুসা, ওটা এখন খোলা। চেয়ারে বসে আছে রবিন, রিচইন আর শেরিফ ইকার।

শব্দ শুনে মুখ ফিরিয়ে তাকালেন শেরিফ। হেসে বললেন, এসো কিশোর। তোমাদের পাত্তা না দিয়ে, ডোবারের কথায় গুরুত্ব দিয়ে ভুল করেছিলাম, সরি। যাই হোক, কেসটার কিনারা করার জন্যে অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ।
হাঁটু ভেঙে এল যেন কিশোরের। সমস্ত উত্তেজনা শেষ হয়ে যেতে এতক্ষণে টের পেল ক্লান্তি। ধপ করে বসে পড়ল একটা চেয়ারে।
পুরো আধমিনিট কথা বলল না সে, জিরিয়ে নিয়ে মুখ তুলে তাকাল রবিনের দিকে, এত তাড়াতাড়ি পুলিশকে খবর দিলে কি করে?
হাসল রবিন, তারপর খুলে বলল সব, বেরিয়েই গাড়ি নিয়ে রওনা হলাম। হঠাৎ মনে পড়ল, মিসেস ভারগনের বাড়িতে টেলিফোনের তার দেখেছি। ফরেস্টবার্গে যেতে-আসতে অনেক সময় লাগবে। তাই ভাবলাম শেরিফকে একটা ফোন যদি করতে পারি অনেক সময় বাচবে।
হঠাৎ পেছনে শুনলাম চিৎকার। তারপর ট্রাকের ইঞ্জিন চালু হলো। আসতে লাগল আমার পেছন পেছন। কেন আসছে বুঝতে পারলাম। নিশ্চয় আমাকে দেখে ফেলেছে, ধরতে আসছে। ট্রাকে কয়জন আছে জানি না। আমাকে ধরার জন্যে বেপরোয়া হয়ে গাড়ি চালাবে ওরা। রাস্তা যতক্ষণ খারাপ থাকবে ততক্ষণ ধরতে পারবে না জানি, কিন্তু তারপর? ওরা পিছে লেগে থাকলে পুলিশকে খবর দিতে পারব না। কি করি, কি করি, ভাবছি, এই সময় চোখে পড়ল পুরানো গাড়িটা। দেখেই একটা বুদ্ধি এল মাথায়, সিনেমায় দেখা একটা দৃশ্যের কথা মনে পড়ল কি করে তেড়ে আসা ডাকাতদের ফাঁকি দিয়েছিল একজন লোক।
তাড়াতাড়ি আলো নিভিয়ে গাড়িটা ঢুকিয়ে রাখলাম একটা ঝোপে। দৌড়ে ফিরে এসে পুরানো গাড়িটায় আগুন ধরিয়ে ঠেলে ফেলে দিলাম পাড়ের ওপর থেকে। পেট্রোল ছিল ওটার ট্যাঙ্কে। দাউ দাউ করে যে ভাবে জ্বলে। উঠল, ওটার মধ্যে নিজেকে কল্পনা করে শিউরে উঠলাম। রাস্তাটা ঘোরাল আর গাছপালা ছিল বলে আমাকে এ সব করতে দেখতে পায়নি লোকটা, আসতেও দেরি হয়েছে তার। ঝোপে লুকিয়ে দেখলাম, গাড়ি থেকে নামল সে, আগুন লাগা গাড়িটা দেখল, তারপর ট্রাক নিয়ে ফিরে গেল। বুঝলাম, আমার ফাঁকি কাজে লেগেছে।
সে চলে গেলে আবার রওনা হলাম মিসেস ভারগনের বাড়িতে। খুশি। হয়েই ফোন করতে দিলেন তিনি। শেরিফকে পেতেও অসুবিধে হলো না। তিনি বললেন, এখুনি আসছি। বার বার মনে হতে লাগল, কেবিনে ফিরে আসি, তোমাদের কোন সাহায্য লাগতেও পারে। কিন্তু ভয়ও হলো, সাহায্য করতে এসে না বিপদে ফেলে দিই। দ্বিধায় দ্বন্দে ভুগতে ভুগতে মিসেস ভারগনের, বাড়িতেই বসে রইলাম পুলিশ না আসা পর্যন্ত।

দারুণ একখান কাজ করেছ, হাসল মুসা। মস্ত ফাঁকি দিয়েছ ব্যাটাকে। তবে টেলিফোনটা করে সবচেয়ে ভাল করেছ। এত তাড়াতাড়ি পুলিশ না এলে আমাদের কি হত কে জানে! ডোবার ভয়ঙ্কর লোক! ও আমাকে আর ক্যাপ্টেন রিটনকে খুন করার মতলব করছিল।

কিশোর পুমাটার পেছনে বেরিয়ে যাওয়ার পর কি হলো, জানাল মুসা। তাকে ধরে ফেলল ডোবার। গায়ে অসম্ভব জোর লোকটার, তাছাড়া হাতে পিস্তল ছিল, কাবু করতে মোটেও বেগ পেতে হয়নি। ওকে নিয়ে গিয়ে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে একই ঘরে হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখল। ফেরেল ফিরে এলে একটা ব্যবস্থা করবে বলছিল।

এই সময় কেবিনের দিকের দরজা খুলে পুলিশ নিয়ে ঘরে ঢুকল রবিন।

ডোবার আর ফেরেলকে ধরে নিয়ে গিয়ে গাড়িতে ভোলা হয়েছে, এসে খবর দিল একজন পুলিশ। হুগারফকে আগেই তোলা হয়েছে। এখানে আর কোন কাজ নেই। ওঠার আগে তিন গোয়েন্দাকে একটা খবর জানালেন শেরিফ, ডাকাতদের খোঁজ কেউ দিতে পারলে পুরস্কার দেয়া হবে ঘোষণা করেছে একটা কোম্পানি। তাদের অনেক মাল লুট করেছে ডাকাতেরা। এখন একেবারে বমাল ওদের ধরে দেয়াতে নিশ্চয় ভাল একটা অঙ্কের টাকা পাবে। তিন গোয়েন্দা। শীঘ্রি সেটার ব্যবস্থা করে দেয়ার কথা দিয়ে, কয়েকবার করে ওদের ধন্যবাদ দিয়ে, উঠলেন তিনি। যাওয়ার আগে বললেন, হ্যাঁ, একবার আমার অফিসে দেখা কোরো, পারলে আজই। তোমাদের কেসের রিপোর্ট লিখে নিতে হবে।

তিনি বেরিয়ে যাওয়ার পর রবিন বলল, যাক, একটা কাজের কাজ হলো। ওকে কি করে সাহায্য করা যায়, ভাবছিলাম। আমার ভাগের পুরস্কারের টাকাটা ওকে দিয়ে দেব। আর্ট স্কুলে যাতে ভর্তি হতে পারে।

আমারটাও, সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করল মুসা।

পুরোটাই দিয়ে দেয়া হবে। তাতেও না কুলালে অন্য ব্যবস্থা করার কথা ভাবব। চলো, ওকে খুঁজে বের করি। সুখবরটা জানাই, বলে উঠতে গেল কিশোর।

কিন্তু ওঠার আগেই দরজায় দেখা দিল পিচার। হাসিমুখে ভেতরে ঢুকল কুকুরের বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে।

ভলিউম ১৩ – গুপ্তচর শিকারি – তিন গোয়েন্দা – রকিব হাসান – সেবা প্রকাশনী
প্রথম প্রকাশ: আগস্ট, ১৯৯৬
দেখতে এমন সাধারণ হলে কি হবে, হাতের যন্ত্রটা দেখিয়ে বলল মুসা, সাংঘাতিক জিনিস। যে কোন জিনিস খুঁজে বের করতে পাররে এটা দিয়ে, ধাতু হলেই হলো।
যেমন? জানতে চাইল রবিন।
গহনা, মুদ্রা, সোনার কলম…
বলো কি হে, কৃত্রিম বিস্ময়ে চোখ বড় বড় করে ফেলল রবিন, বাড়ির আশপাশের গুপ্তধন তো আর রাখবে না তুমি..
দেখো, অত ইয়ার্কি মেরো না, আদর করে পুরানো যন্ত্রটায় হাত বুলাল মূসা, আসলেই রাখব না। এর ক্ষমতা তুমি জানো না।
আমি জানি, কিশোর বলল, এ সব মেটাল ডিটেক্টর সত্যিই কাজের জিনিস। কিনে ফেলেছ নাকি? দাম দিয়ে দিয়েছ?
হ্যাঁ, পানির দাম বলতে পারো। নষ্ট ছিল। কিনে নিয়ে নিজেই মেরামত করেছি। চমৎকার কাজ করে এখন। কিন্তু পরীক্ষাটা কোথায় চালাব বুঝতে পারছি না।
কেন, তোমাদের বাড়ির আশেপাশে? রবিন বলল, ওখানে তো গুপ্তধন আছে বলে গুজব রয়েছে।
চেনা জায়গায় অনুসন্ধান চালাতে ভাল্লাগে না।
তা বটে, মাথা দোলাল রবিন, চেনা জায়গায় গুপ্তধন আছে, ভাবা যায়। না। গুপ্তধন শব্দটা শুনলেই মনে হয় অচেনা, ভয়ানক দুর্ম কোন জায়গা…
মেরিচাচীর ডাক শোনা গেল, কিশোর কোথায় তোরা? একটা মেয়ে দেখা করতে এসেছে তোদের সঙ্গে।
অর্কশপ থেকে বেরিয়ে এল কিশোর।
জঞ্জালের স্তূপের পাশে মেরিচাচীর সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে একটা মেয়ে। কালো চুল, বাদামী উজ্জ্বল চোখে রাজ্যের উদ্বেগ। কিশোরকে দেখে এগিয়ে। এল, আমি ইভা গেনার। জিনার বন্ধু! ওর কাছে তোমাদের কথা শুনেছি।
চুপ করে রইল কিশোর। মেয়েটা কি বলে শোনার অপেক্ষা করছে।
রবিন আর মুসাও বেরিয়ে এল।
মেরিচাচীর তাড়া আছে, চলে গেলেন।
ইভা বলল, তোমাদের কাছে সাহায্য চাইতে এসেছি… জিনা বলল…
এসো, ভেতরে এসো, ওঅর্কশপের দরজা দেখাল কিশোর।
ইভাকে ভেতরে নিয়ে এল সে। চারপাশে তাকাতে লাগল মেয়েটা। অবাক হলো না। তিন গোয়েন্দার ওঅর্কশপে কোথায় কি আছে জিনার কাছে শুনে শুনে মুখস্থ হয়ে গেছে।

একটা টুল দেখিয়ে ওকে বসতে বলল কিশোর।
বসল ইভা। কোন রকম ভূমিকার মধ্যে গেল না। বলল, একটা সাংঘাতিক বিপদে পড়েছি...তোমরা কি আমাকে সাহায্য করবে? বলেই কেঁদে ফেলল।
এ সব পরিস্থিতিতে বিব্রত বোধ করে কিশোর। কি করে কান্না থামাবে বুঝতে পারছে না। মুসা তাড়াতাড়ি ওর মেটাল ডিটেক্টরে হাত দিল। কেবল রবিন স্বাভাবিক রইল, শান্তকণ্ঠে বলল, কেঁদো না। কি হয়েছে, বলো, সাহায্য আমরা অবশ্যই করব।
হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ ডলল ইভা। ফোপাতে ফোঁপাতে বলল, আমার মা-বাবা কেউ নেই। দুজনেই মরে গেছে।
এইবার থমকে গেল রবিন। কি করে সাহায্য করবে মেয়েটাকে? কারও বাবা-মা মরে গেলে তো আর এনে দেয়া যায় না।
সহানুভূতির সুরে কিশোর বলল, কেঁদে আর কি হবে? তোমার কষ্ট আমি খুব বুঝতে পারছি, আমিও তোমার মতই এতিম।
ওদের জন্যে কাঁদছি না আমি, আরেকবার চোখ ডলল ইভা। ওরা অনেক ছোটবেলায় মারা গেছে, চেহারাও ভালমত মনে নেই। কাঁদছি আমার ভাইয়ের জন্যে।
খাইছে! সে-ও কি মারা গেছে নাকি? ফস করে বলে ফেলেই পস্তাতে শুরু করল মুসা, এ ভাবে বলাটা বোকামি হয়ে গেছে।
মাথা নাড়ল ইভা, জানি না! ওকে খুঁজে বের করে দেয়ার জন্যেই এসেছি তোমাদের কাছে।
কি হয়েছে ওর? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
চোখের পানি মুছতে মুছতে ইভা বলল ওর ভাইয়ের নাম হ্যারিস গেনার। আরলিংটন কলেজের ফরেন অ্যাফেয়ার্সের ইনস্ট্রাক্টর ছিল। হঠাৎ করে নিখোঁজ হয়ে গেছে। এবং আমি চাই তোমরা ওকে খুঁজে বের করো, অনুরোধের সুরে বলল সে। পুলিশকে জানিয়েছি। কিন্তু কিছুই করতে পারছে ওরা।
জানা গেল, আরলিঙটন কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্রী ইভা। স্প্রিঙ টার্ম সবে শেষ হয়েছে। ভেবেছিল গরমের ছুটিতে ভাইকে নিয়ে ওয়েস্ট কোস্টে। আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে যাবে। এই সময় হঠাৎ করে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল ওর ভাই।
কি করব, বুঝতে পারছি না আমি, কিশোর, ককিয়ে উঠল ইভা। প্লীজ, কিছু একটা করো আমার জন্যে!
দুই সহকারীর মতামতের জন্যে ওদের দিকে তাকাল কিশোর।
ইভার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল রবিন, দাঁড়াও দাঁড়াও, তোমার ভাই কিছুদিন আগে বিদেশে পলিটিক্যাল মেথড নিয়ে পড়াশোনা করতে গিয়েছিল, তাই না?

অবাক হলো ইভা, তুমি জানলে কি করে?
পত্রিকায় পড়েছি। তোমার ভাইয়ের নিরুদ্দেশের খবর ছাপা হয়েছে। ওখানেই লিখেছে কথাটা।
মাথা ঝাঁকাল ইভা। কোন দেশে পড়তে গিয়েছিল ওর ভাই, জানাল। দেশটার সঙ্গে আমেরিকার সদ্ভাব নেই। ওখানে থাকতে নাকি একদিন সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে মাথায় খুব আঘাত পেয়েছিল হ্যারিস গেনার। দেশে ফেরার পর ওকে স্বাভাবিকই মনে হয়েছে, ইভা বলল, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ছিল না। নিশ্চয় স্মৃতিশক্তি নষ্ট হয়ে গেছে দাদার। পথ ভুলে কোনদিকে চলে গেছে কে জানে।
ওই আঘাতের কারণে নষ্ট হয়েছে ভাবছ? প্রশ্ন করল কিশোর।
হ্যাঁ। ডাক্তারের কাছে শুনেছি এ ধরনের আঘাতের প্রতিক্রিয়া আঘাত পাওয়ার বেশ কিছুদিন পরেও হয়ে থাকে।
কিশোর, মুসা বলল, আমার মনে হয় কেসটা নিয়ে ফেলা উচিত আমাদের।
হাসল কিশোর। তা তো নেবই...
উজ্জ্বল হলো ইভার মুখ। কৃতজ্ঞ ভঙ্গিতে বলে উঠল, ওহ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ!...কেঁদেকেটে একটা বিচ্ছিরি কাণ্ড করে ফেলেছি, সরি!
না না, ঠিক আছে, ও কিছু না, তাড়াতাড়ি বলল রবিন। আর বিব্রত হতে চায় না।
কিশোর জিজ্ঞেস করল, ইভা, তোমার ভাইয়ের কোন ছবি আছে তোমার কাছে?
হাতব্যাগ থেকে একটা ফটোগ্রাফ বের করে দিল ইভা। এই একটাই ছিল আমার কাছে, হাসল সে, হারালে আর পাব না। উঠে দাঁড়াল। তো, চলি আজ।
কোথায় থাকো, ঠিকানা দিয়ে যাও। তোমার সঙ্গে যোগাযোগের প্রয়োজন হতে পারে।
ইভা বেরিয়ে গেলে দুই সহকারীর দিকে তাকিয়ে কিশোর বলল, যাক, অনেক দিন পর কেস একটা পাওয়া গেল।
তেমন জটিল কোন রহস্য বলে তো মনে হচ্ছে না, মুসা বলল। একজন মাথা খারাপ লোককে খুঁজে বের করতে হবে, ব্যস। এ আর এমন কি কঠিন।
পুলিশ যে রহস্যের সমাধান করতে পারেনি, ওটাকে এত সহজ ভাবছ কেন? বলা যায় না কি খুঁজতে গিয়ে কি বেরোয়।
তাহলে আরলিংটনে যাচ্ছি আমরা?
অবশ্যই। ইভাকে কথা দিয়ে দিলাম না আমরা। তুমিও তো বললে কাজটা নেয়া উচিত আমাদের।
তা তো বলেছি, কিন্তু আমার গুপ্তধন খোঁজার কি হবে? যন্ত্রটা কেনার পর ব্যবহারই করতে পারলাম না।

গাড়িতেই রেখে দাও, হেসে বলল রবিন। গুপ্তধন বাদ দিয়ে আপাতত মানুষ খুঁজতে কাজে লাগাবে।
মানুষের ব্যাপারে সঙ্কেত দেয় না। শুধু ধাতব জিনিস।
মানুষও অনেক ধাতুতে গড়া। আমাদের শরীরে কত রকমের ধাতু আছে, শুনতে চাও?
না, চাই নাওসব শুনতে এ মুহূর্তে ভাল লাগবে না আমার!

.

পরদিন সকালেই বেরিয়ে পড়ল তিন গোয়েন্দা মুসার পুরানো জেলপি গাড়িটাতে করে। দ্রুত ছুটল সাগরতীরের রাস্তা ধরে।
রবিন বলল, তোমার এই ভটভটি নিয়ে তো বেরোলাম, শেষে রাস্তাঘাটে না আটকে পড়ি। চলবে তো?
চলবে না মানে! দেখতে খারাপ, আওয়াজও করে, কিন্তু কোনদিন কোথাও বিপদে ফেলেনি আমাকে, আদর করে স্টিয়ারিঙে হাত বোলাল মুসা।
ওর কথা ঠিক। এবারও ওদের ঝামেলায় ফেলল না গাড়িটা। ঠিকমতই পৌঁছে দিল আরলিংটনে। শহরে ঢোকার পর কিশোর বলল, ভালমত নজর রাখো। থাকার জায়গা দেখলেই থামতে হবে।
কয়েকটা মোটেল পেরিয়ে এল ওরা। কোনটাই পছন্দ হলো না। হয় বেশি দামী, নয়তো একেবারে সাধারণ। অত সাধারণ জায়গায় থাকতে ইচ্ছে করে না কিশোরের। ওর মতে ওগুলোতে থেকে কষ্ট করার চেয়ে বাইরে তাঁবু খাটিয়ে রাত কাটানো অনেক আরামের!
অ্যাই, কিশোর, ওটা কেমন মনে হয়? হাত তুলে একটা সাইনবোর্ড দেখাল রবিন।
রিজ মোটেল, নাম লেখা রয়েছে। নিজেদের গুণকীর্তন সবিস্তারে লিখে রেখেছে নিচে।
মনে হয় খারাপ হবে না, কিশোর বলল। মুসা, ঘোরাও তো। যাও ওদিকে।
ড্রাইভওয়েতে গাড়ি ঢোকাল মুসা। পাতার ছাউনি দেয়া একটা সুন্দর কটেজ দেখা গেল। সাইনবোর্ড লেখা রয়েছে: অফিস। বাঁয়ে লম্বা একটা নিচু একতলা বাড়ি। প্রতিটি ঘরের সামনে একটা করে পামগাছ লাগানো হয়েছে। ডানে রয়েছে একসারি কটেজ। মোট বারোটা, সব একই রকম দেখতে। অফিস বাড়িটার মত ওগুলোরও পাতার ছাউনি।
কোথায় উঠলে ভাল হয়? রবিনের প্রশ্ন। লম্বা বাড়িটাতে ঘর নেব, নাকি একটা কটেজ ভাড়া করব।
চলো, আগে দাম জিজ্ঞেস করে দেখি, কিশোর বলল। অফিসের দিকে যেতে বলল মুসাকে।

অফিসে ডেস্কের ওপাশে বসে থাকতে দেখা গেল মাঝবয়েসী এক লোককে। পুরো মাথা জুড়ে গোল টাক, কেবল কান আর ঘাড়ের ওপরে অল্প কিছু পাতলা ফুরফুরে চুল বাদে। টাকে হাত বুলিয়ে হাসি দিয়ে ছেলেদের স্বাগত জানাল সে, এসো এসো। বেড়াতে এসেছ? ছাত্র নিশ্চয়? বেড়াতে এলে ছাত্ররা এই মোটেল ছাড়া আর কোথাও ওঠে না।
প্রশ্নের জবাব দিয়ে মোটেলে রুম খালি আছে কিনা, ভাড়া কত জানতে চাইল কিশোর। একটা ঘরই খালি আছে, জানাল ম্যানেজার। রেজিস্টারে নাম সই করে, ক্লার্কের হাতে টাকা গুণে দিল কিশোর। ঘরের চাবি দিল ওকে লোকটা।
সাত নম্বর রুম। চাবি দিয়ে দরজা খুলে মালপত্র নিয়ে ঘরে ঢুকল ওরা।
রবিন বলল, কিছু মানুষ আছে অতিরিক্ত কথা বলে, অহেতুক।
মাথা ঝাঁকাল কিশোর, তা ঠিক। দেখলে না কেমন খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আমাদের কাছ থেকে কথা বের করার চেষ্টা করছিল। কেন এসেছি আমরা। এটা যত কম লোকে জানবে, ততই ভাল।
ওদের কথায় কান দিল না মুসা, সুটকেস খুলতে খুলতে বলল, আমার খিদে পেয়েছে। তোয়ালে বের করে নিয়ে বাথরুমে ঢুকে গেল সে।
হাতমুখ ধুয়ে, কাপড় পরে, আবার বেরোল ওরা। দরজায় তালা দিয়ে গিয়ে গাড়িতে উঠল। মুসা বলল, রেস্টুরেন্টে যাচ্ছি তো, নাকি?
হ্যাঁ, কিশোর বলল, আগে খাওয়া। তারপর থানায় যাব পুলিশের সঙ্গে কথা বলতে।
হ্যারিস গেনারের ব্যাপারে কতটা জানে ওরা জানার জন্যে? রবিনের প্রশ্ন।
মাথা ঝাঁকাল কিশোর।
খাওয়া সেরে নিয়ে থানায় রওনা হলো ওরা।
নতুন তৈরি একটা বিল্ডিঙের মাটির নিচে পুলিশ হেডকোয়ার্টার। ওপরটায় টাউন হল। পুলিশ চীফ অফিসে নেই, সুতরাং ডেস্ক সার্জেন্টের কাছে নিজেদের পরিচয় দিল কিশোর। রকি বীচের পুলিশ চীফ ইয়ান ফ্লেচার তিন গোয়েন্দাকে একটা সার্টিফিকেট দিয়েছেন, শহরের বাইরে অন্য অঞ্চলে কাজ করতে গেলে সেটা দেখালে যাতে পুলিশ ওদের সহায়তা করে। সেটা দেখিয়ে সার্জেন্টের কাছে গেনারের কেসটার কথা জানতে চাইল কিশোর।
ও কিছু না, গুরুত্বই দিল না সার্জেন্ট, অন্যমনস্ক হয়ে কলেজ থেকে হেঁটে বেরিয়ে গায়েব হয়ে গেছে হ্যারিস গেনার। ওয়াল্ট ডিজনির অ্যাবসেন্ট মাইন্ডেড প্রফেসর দেখোনি, ওরকম ব্যাপার আরকি।
কোন সূত্র পাওয়া যায়নি? জিজ্ঞেস করল রবিন।

না, কিছুই না। আশা করছি দুচারদিনের মধ্যেই ওর খবর পাব। সামনে ঝুঁকল সার্জেন্ট, একটা গোপন কথা বলি তোমাদের, আমার ধারণা লোকটা পাগল। অতিরিক্ত মাথা ঘামিয়ে অনেক বিজ্ঞানী আছে না পাগল হয়ে যায়, মগজে চাপ পড়ে বলে, এরও হয়েছে ওরকম।

মন্তব্য করল না গোয়েন্দারা। চুপচাপ বেরিয়ে এল থানা থেকে। বাইরে বেরিয়েই ফুঁসে উঠল মুসা, এই সার্জেন্ট নোকটাও পাগল! জ্ঞান দিতে আসে!

জ্ঞান আর উপদেশ বিতরণ করা অনেক মানুষের স্বভাব, কি আর করা, আনমনে মাথা চুলকাল কিশোর।

এরপর কলেজের ডিনের সঙ্গে কথা বলার সিদ্ধান্ত নিল সে।

কলেজটা কোথায় একজন পথচারীকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিল মুসা। গাড়ি চালাল সেদিকে। শহরের একধারে ছোট্ট একটুকরো বনের মাঝে কলেজটা। অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিল্ডিঙের সামনে এনে গাড়ি রাখল সে।

একসঙ্গে সবার যাওয়ার দরকার নেই। গাড়িতে বসে রইল মূসা। কিশোর আর রবিন নেমে মার্বেল পাথরে তৈরি সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল। একটা হলওয়েতে ঢুকল।

ডিনের অফিসটা খুঁজে পেতে দেরি হলো না। দরজার গায়ে লেখা রয়েছে:

DEAN WALTER FOLLETT.

ডিনের ঘরে ঢুকতে হলে অনুমতি নিতে হয়। একজন রিসেপশনিস্টকে বুঝিয়ে বলল কিশোর, জরুরী কারণে দেখা করতে এসেছে ওরা। ব্যাপারটা গোপনীয়। সবাইকে বলা যাবে না, কেবল ডিনকেই বলবে।

অনুমতি মিলল। ওদেরকে ডিনের অফিসে ঢুকিয়ে দিয়ে নিজের চেয়ারে ফিরে গেল রিসেপশনিস্ট।

বড় ডেস্কের ওপাশে বসে আছেন লম্বা একজন মানুষ, ঝাঁকড়া চুল বয়সের কারণে ধূসর হয়ে এসেছে। উঠে দাঁড়ালেন মিস্টার ফলেট। হাত বাড়িয়ে দিলেন। করমর্দন হয়ে গেলে বললেন, বসো। কি নাকি গোপন কথা আছে আমার সঙ্গে? বেশ রহস্যময় মনে হচ্ছে।

ডেস্কের অন্যপাশে ডিনের মুখোমুখি বসল তিন গোয়েন্দা।

হ্যারিস গেনারকে খুঁজতে এসেছে, জানাল কিশোর।

ভাল করেছ, ডিন বললেন, আমরা সবাই তাকে খুঁজছি। তা তোমরা কে, তাই তো জানা হলো না।

পকেট থেকে তিন গোয়েন্দার কার্ড বের করে দিল কিশোর।

হাতে নিয়ে দেখলেন ফলেট। তারপর কার্ডটা টেবিলে রেখে দিয়ে। বললেন, বুঝলাম। হ্যাঁ, তা আমার কাছে কি জানতে চাও, বলো?

হ্যারিস গেনারের নিরুদ্দেশের ব্যাপারে যতটা জানাতে পারেন।
আশা করি আমাদের চেয়ে অনেক বেশি জেনে যাবে তোমরা শিগগিরই, গোয়েন্দা যখন। আনমনে মাথা নেড়ে বিড়বিড় করলেন তিনি, অদ্ভুত! ভারি অদ্ভুত!
কি? জানতে চাইল কিশোর।
ওই তো, যেভাবে গায়েব হয়ে গেল গেনার। কি করে নিরুদ্দেশ হয়েছেন লেকচারার, জানালেন ফলেট। পরদিন নাকি ছেলেদের পরীক্ষা ছিল, এর জন্যে প্রশ্নপত্রও তৈরি করেছেন গেনার। তারপর রহস্যজনক ভাবে সেটা ডেস্কের ওপর ফেলে রেখে রাতের বেলা কোথায় চলে গেছেন।
পরদিন সকালে কাগজগুলো পাওয়া গেছে, ডিন বললেন। পেয়েছে। ওরই একজন সহকারী। সেই সব প্রশ্ন ছেপে পরীক্ষাও নেয়া হয়েছে। ছেলেদের।
অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে একটা পেন্সিল তুলে নিয়ে ডেস্কে ঠুকতে লাগলেন তিনি। কিন্তু সেই যে গেল, আর ফিরে এল না গেনার। ব্যাপারটা কেমন অদ্ভুত!
সহকারীর নাম কি, যিনি কাগজগুলো পেয়েছেন? জানতে চাইল রবিন। বলতে অসুবিধে আছে?
প্রশ্নটায় অবাক হলেন যেন ডিন। একটা ভুরু সামান্য উঁচু হলো। না, অসুবিধে থাকবে কেন? ওর নাম মেরিন ডিগ। গেনারের সহকারী এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু।
পরস্পরের দিকে তাকাল কিশোর আর রবিন। একই কথা খেলে গেল দুজনের মনে, মেরিন ডিগের সঙ্গে দেখা করতে হবে।
ও-কে, বয়েজ, আর কিছু বলার নেই আমার, যা যা জানি, বলেছি, উঠে দাঁড়ালেন ডিন। আমার ধারণা, মাথায় কোন গোলমাল দেখা দিয়েছে গেনারের। স্মৃতিবিভ্রমও ঘটে থাকতে পারে।
মিস্টার ডিগের সঙ্গে দেখা করতে চাই আমরা, অনুরোধ করল কিশোর, আপনি কি কোন সাহায্য করতে পারেন? আর, মিস্টার গেনারের ঘরটাও একবার দেখতে চাই।
একটা কাগজে ঠিকানা লিখে ওর দিকে বাড়িয়ে দিলেন ফলেট। জানালার কাছে গিয়ে হাতের ইশারায় কিশোরকে ডাকলেন। মাঠের শেষধারে কতগুলো বাড়ি দেখিয়ে বললেন, বড় বিল্ডিঙটাতে গ্র্যাজুয়েট ছাত্ররা থাকে। আর তার ওপাশের ছোট ছোট বাড়িগুলোতে ইনস্ট্রাক্টর আর লেকচাররা।
ডিনকে ধন্যবাদ জানিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে এল দুজনে। গাড়িতে উঠে মুসাকে বলল, মাঠের ধারের বাড়িগুলোর কাছে নিয়ে যেতে।

.

গাড়ি চালাল মুসা। ডিনের কাছে কি জেনে এসেছে, সব জানাল ওকে রবিন আর কিশোর। পথে বেশ কিছু ছাত্রছাত্রীকে দেখা গেল-সামার সেশনের জন্যে নাম

রেজিস্ট্রি করতে এসেছে।
বাড়িটা থেকে খানিক দূরে গাড়ি রেখে বসে রইল মুসা। কিশোর আর রবিন নেমে গেল আগেরবারের মত। সামনে বেটেমত এক লোক হেঁটে যাচ্ছে। বয়েসে তরুণ। ওকে চোখে পড়ে যায় তার কারণ গাঢ় রঙের জ্যাকেট গায়ে দিয়েছে, আর হাস্যকর ভঙ্গিতে লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটে। দ্রুত হেঁটে ওর পাশকাটিয়ে এল দুজনে। পাশ কাটানোর সময় রবিনের গায়ে আলতো খোঁচা দিল কিশোর। ইঙ্গিত করল লোকটার দিকে। একবার পেছনে ফিরে তাকানোর কৌতূহল সামলাতে পারল না রবিন। গোলগাল, বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা লোকটার।
বাড়িটাতে পৌঁছে ১৭ নম্বর রুম খুঁজে বের করুন কিশোর। দরজার পাশে বসানো কলিং বেলের সুইচ টিপল। কান পেতে রইল ভেতরের শব্দ শোনার আশায়। নেই, কোন শব্দ নেই। আবার বেল টেপার জন্যে হাত বাড়াল কিশোর, এই সময় পেছন থেকে বলে উঠল একটা হাসিখুশি কণ্ঠ, আমাকে খুঁজছ?
চমকে গিয়ে ঘুরে তাকাল কিশোর আর রবিন। সেই লোকটা।
মেরিন ডিগ? আপনা থেকেই প্রশ্নটা বেরিয়ে গেল কিশোরের মুখ থেকে।
হ্যাঁ। কি সাহায্য করতে পারি?
নিজের আর রবিনের পরিচয় দিল কিশোর।
দরজা খুলে ওদেরকে নিজের ঘরে নিয়ে এল ডিগ।
কেন এসেছে, জানাল কিশোর। হারিস গেনার সম্পর্কে যা যা জেনেছে, ভিগকে জানিয়ে জিজ্ঞেসকরুল সে এর বেশি আর কিছু জানে কিনা।
জানি, জবাব দিল ডিগ, তবে পুলিশের ধারণা, ওগুলো জরুরী কোন বিষয় নয়।
কি জানেন? আগ্রহে সামনেকে এল রবিন।
দাঁড়াও, বলছি, ওদের বসতে বলে একটা চেয়ার টেনে এনে মুখোমুখি কুসল ভিগ। খুব শীঘ্রি বিয়ে করতে যাচ্ছে হারিস, এই খবরটা কি জানো তোমরা?
অবাক হলো দুজনেই। মাথা নাড়ল।
ডিগ জানাল, ইয়োরোপের যে দেশটায় লেখাপড়া করতে গিয়েছিল গেনার, ওখানে একটা মেয়ের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠত হয়। ওই মেয়েটাকেই নাকি বিয়ে করবে সে। যেহেতু দেশটার সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্ক ভাল না, ওই দেশের মেয়েকে বিয়ে করার কথা তার বোনকেও বলতে অস্বস্তি বোধ করেছে গেনার।
তারমানে আপনি বলতে চান স্মৃতি হারানো কি পাগল হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা ঠিক না? জিজ্ঞেসকরুল কিশোর।
মাথা নাড়ল ডিগ, একেবারেই না।
এটা অবশ্য নতুন তথ্য; তবে এর বেশি আর কিছু জানাতে পারল না। ডিগ। গেনারের সুরটা দেখিয়ে দেয়ার জন্যে ওকে অনুরোধ করল কিশোর।

এসো, উঠে দাঁড়াল ডিগ, এই তো, পাশের ঘরটাই।
গেনারের ঘরের চাবি আছে তার কাছে। খুলে দিল। দুই গোয়েন্দার সঙ্গে ভেতরে ঢুকে বলল, দেখেছ, কি রকম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন? সব ঠিকঠাক। বোঝাই যায় না পালানোর প্ল্যান করছিল গেনার। আমিও কিছু বুঝতে পারিনি।
কিন্তু বিয়ে করার জন্যে একটা লোক পালাবে কেন, এটাও তো মাথায় ঢুকছেনা, রবিন বলল।
আমার মাথায়ও না।
এগুলো কি? টেবিলে হাত রেখে কুঁকে দাঁড়িয়ে কতগুলো কাগজের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর। আপনি বলতে পারবেন?
অবশ্যই পারব। পরীক্ষার প্রশ্ন। নিরুদ্দেশ হওয়ার আগে এগুলো তৈরি করেছিল গোনার…
কিশোর আর রবিন মিলে পুরো ঘরটা তন্নতন্ন করে খুঁজল। সঙ্গে সঙ্গে থেকে চিলের নজর রাখল ডিগ, তার সামনে অস্বস্তি বোধ করতে লাগল ওরা। কিন্তু লোকটাকে সরানোর কোন ছুতো বের করতে পারল না। অগত্যা ওর সামনেই খুঁজতে হলো। কোন সূত্র পেল না। পাওয়ার আশাও অবশ্য করেনি, কারণ এর আগে পুলিশ এসে খুঁজে গেছে।
থ্যাংক ইউ, কিশোর কলল, এখন যাই। সময় করে আবার আসব। আরেকবার খুঁজে দেখব ঘরটা।
যখন খুশি এসো, নির্দ্বিধায় স্বাগত জানাল ডিগ। এক কাজ করো না বরং, আমার এখানেই থেকে যাও। আলাদা বিছানা আছে, থাকার অসুবিধে হবে না।
হেসে মাথা নেড়ে বলল কিশোর, না, না, ঠিক আছে, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। লোক বেশি আমরা, সঙ্গে আরও একজন আছে। যাই। পরে আসব।
গাড়িতে ফিরে এল ওরা। উদিত হয়ে অপেক্ষা করছে মুসা, ওরা কি খবর আনো শোনার জন্যে। যা জানল, তাতে তেমন খুশি হতে পারল না। তদন্তের অগ্রগতি হয়নি প্রায় কিছুই। এখনও এমন কোন জরুরী সূত্র পায়নি যেটা গেনারকে খুঁজে বের করতে সাহায্য করবে।
মোটেলে ফিরে চলল ওরা।
হঠাৎ জিজ্ঞেস করল রবিন, ডিগলোকটাকে কেমন মনে হলো তোমার?
উ। চিন্তিত ভঙ্গিতে ফিরে তাকাল কিশোর, কি জানি, ঠিক বুঝতে পারছি না।
আজব চরিত্র মনে হয়নি?
আজব কিনা জানি না, তবে হাঁটার ভঙ্গি দেখলে ভাঁড় বলবে ওকে লোকে, আবার চিন্তায় ডুবে গেল কিশোর।

ঘরে যাওয়ার আগে কোথাও কিছু খেয়ে নিলে হয় না? গাড়ি চালাতে চালাতে আচমকা প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল মুসা।
তা যায়, রাজি হলো কিশোর।
রবিন বলল, আমারও খিদে পেয়েছে।
একটা ফার্স্টফুড শপ থেকে হালকা খাবার খেয়ে নিল ওরা। ফিরে এল মোটেলে। ঘরের দরজা খুলেই থমকে দাঁড়াল কিশোর। দুজন বয়স্ক মানুষ বসে আছে–একজন পুরুষ, আরেকজন মহিলা। লোকটা খবরের কাগজ পড়ছে, মহিলা ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে বসে চুল আঁচড়াচ্ছে।
মাফ করবেন, ভদ্রকণ্ঠে রবিন বলল, আপনারা বোধহয় ভুল জায়গায় ঢুকে পড়েছেন।
হ্যাঁ, এটা আমরা ভাড়া নিয়েছি, বলল কিশোর। সাত নম্বর।
ফিরে তাকিয়ে হাসল মহিলা, তোমরা নিশ্চয় তিন গোয়েন্দা? তোমাদের মালপত্র বের করে নিয়ে গেছে ম্যানেজার। অসুবিধে নেই, সব পাবে ওর কাছে।
কেন, নেবে কেন? কিশোর অবাক। আমরা এটা ভাড়া নিয়েছি। রেজিস্টারে নাম সই করে চব্বিশ ঘণ্টার ভাড়াও অগ্রিম দিয়েছি।
বলেই বুঝল, এদেরকে, প্রশ্ন করে লাভ নেই, ঠিকও হবে না, কারণ দোষটা এদের নয়। যা করার ম্যানেজার করেছে। চাবি না দিলে এরা খুলতে পারত না। নিশ্চয় কোন গোলমাল হয়েছে, কিছু একটা ঘটেছে, নাহলে ম্যানেজারও এ রকম করত না। কি ঘটল?
জানার জন্যে উত্তেজিত হয়ে ম্যানেজারের অফিসে ছুটল তিন গোয়েন্দা।
ওদের দেখে চওড়া হাসি হাসল টেকো লোকটা। এসো, এসো, সব ব্যবস্থা করে দিয়েছি আমি। মালপত্র তোমাদের ঘরে পৌঁছে গেছে। ভাল জায়গা পছন্দ করেছ। আগেই বলেছিলাম, কটেজ নাও…তুবে আগে সাধারণ রুমটা দেখে নিয়ে ভালই করেছ, নিজেরা বুঝে নিয়েছ, আমি চাপাচাপি করলে। ভাবতে জোর করে গছাতে চাইছি…
মানে? অবাক হয়ে লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর।
যা করতে বলেছ তাই করেছি। তোমাদের মেসেজ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কটেজ ঠিক করে, রুম থেকে তোমাদের মালপত্র বের করে এনে ওখানে পাঠিয়ে দিয়েছি, টাকে হাত বোলাতে বোলাতে বলল ম্যানেজার। যাও, সব ঠিকঠাক পাবে। একটা জিনিসও খোয়া যাবে না। এ সব দিকে আমার কড়া নজর। ম্যানেজারি করতে করতে চুল পাকিয়ে ফেললাম…
টাকমাথা লোকটার মুখে চুল পাকানোর কথা শুনতে কেমন হাস্যকর লাগল। মুসার তো শুধরেই দিতে ইচ্ছে করল–বরং বলুন, চুল খসিয়ে ফেললাম; কিন্তু

বলল না কিছু, চুপ করে রইল।
বোকা হয়ে লোকটার দিকে তাকিয়ে রইল তিনজনে। কি বলছে কিছুই বুঝতে পারছে না।
বকবক করে চলেছে ম্যানেজার, কটেজ, নিয়ে ভাল করেছ। আরামে থাকবে, শান্তিতে থাকবে, রুমের চেয়ে ভাড়াও তেমন বেশি না, অথচ দুটো জায়গায় পার্থক্যটা অনেক। যে তিনজন বন্ধুকে পাঠালে তোমরা, ওরা এসে মেসেজটা দিয়ে বলল, আগের ঘরটা পছন্দ হয়নি তোমাদের, নিরিবিলি থাকতে চাও, একটা কটেজ যেন রেডি করে রাখি আমি। তা রেখেছি। তোমাদের আসতে দেরি হবে জেনেও একমুহূর্ত সময় নষ্ট করিনি। বোর্ডাররা বিরক্ত হয় এমন কোন কাজ আমাকে দিয়ে হবে না…
তা কটেজটা কোথায়? কিছুটা রেগে গিয়েই জানতে চাইল মুসা।
ওর রাগটা বোধহয় ধরতে পারল না ম্যানেজার। হাত তুলে ছোট ছোট বাড়িগুলো দেখিয়ে বলল, অসুবিধে নেই, খুব সুন্দর, গিয়ে দেখোই না…
আবার ছুটল তিন গোয়েন্দা। কটেজের কাছে এসে জানালা দিয়ে দেখল ভেতরে দাঁড়িয়ে আছে গাট্টাগোট্টা এক তরুণ, ওদের চেয়ে কয়েক বছরের বড় হবে। ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকেই রেগে চিৎকার করে উঠল মুসা, এ সবের অর্থ কি?
ঘুরে দাঁড়াল তরুণ। কালো একটা মুখোশে মুখের ওপরের অংশ ঢাকা, বড় বড় ফুটো দিয়ে চোখ দুটো বেরিয়ে আছে। ঝটকা দিয়ে খুলে গেল একটা বড় আলমারির দরজা। তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল আরও চারটে মুখোশধারী ছেলে।
আরি, হচ্ছেটা কি! কে আপনারা? চিৎকার করে উঠল রবিন।
তার কথার জবাব দেয়ার কোন প্রয়োজন মনে করল না ছেলেগুলো। তিনজনকে মেঝেতে ফেলে চেপে ধরে বেধে ফেলল। বয়ে এনে তুলল একটা গাড়িতে। মোটেল থেকে বেরিয়ে মহাসড়ক ধরে কয়েক মাইল এগোল গাড়িটা। তারপর মোড় নিয়ে একটা সরু রাস্তায় নামল। সেটা ধরে মাইলখানেক এগোতে দেখা গেল রেললাইন।
তিন গোয়েন্দাকে বয়ে আনা হলো লাইনের ধারে। ছোট ছোট ঝোপঝাড় জন্মে আছে ওখানে। ওগুলোর জন্যে রাস্তা থেকে লাইনটা ভালমত চোখে পড়ে না। তিনটে তক্তায় ওদেরকে চিত করে বেঁধে ওগুলো লাইনের ওপর আড়াআড়ি ফেলে চলে গেল ছেলেগুলো।
বিকেল শেষ হয়ে সন্ধ্যা নেমেছে অনেক আগেই। রাতের অন্ধকার। এগিয়ে আসছে। ছেলেগুলো সরে যেতেই বাধন খোলার আপ্রাণ চেষ্টা চালাল তিন

গোয়েন্দা। টানাটানি করতে করতে ঘেমে গেল, কপাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল ঘাম। কিন্তু বাধন ঢিল করতে পারল না একচুল।
ঠিক এই সময় কলজে কাঁপিয়ে দিয়ে দূরে শোনা গেল রেলইঞ্জিনের বাঁশি।

.

মাথা ঘুরিয়ে অসহায় দৃষ্টিতে একে অন্যের দিকে তাকাতে লাগল তিনজনে। প্রাণপণে আরেকবার বাধন খোলার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিল। আর কোন আশা নেই। কপালে মৃত্যুই আছে বুঝি এবার।
এগিয়ে আসছে ইঞ্জিনের ভারি শব্দ। ওদের ধ্বংস করে দিতে ছুটে আসছে যেন এক ভয়াল দানব। আতঙ্কে অবশ হয়ে আসছে হাত-পা।
এসে গেছে। আর একশো গজ দূরেও নেই। শেষবারের মত পরস্পরের দিকে তাকাল ওরা। যেন নীরবে শেষ বিদায় জানাল একে অন্যকে।
এসে গেল ইঞ্জিন। তারপর যেন কোন অলৌকিক কারণে ওদের গায়ের ওপর দিয়ে না গিয়ে কানফাটা ভয়ানক শব্দ আর প্রবল কম্পন তুলে পাশ দিয়ে। চলে গেল। বেঁচে আছে, বিশ্বাস হতে চাইল না ওদের। কি করে ঘটল ঘটনাটা? ঘটারং-ঘট ঘটারং-ঘট করে এখনও পার হচ্ছে একের পর এক মালবাহী ওয়্যাগন।
থরথর করে কাঁপছে শরীর। বেঁচে গেছে এটা যখন বিশ্বাস হলো মুসার, বাঁধন খোলার চেষ্টা চালাল আবার সে। বড় ধাক্কাটা কেটেছে, ওদেরকে লাইনের ওপর ফেলে রেখে যাওয়ার পর এই প্রথম মাথাটা আবার ঠিকমত কাজ করতে আরম্ভ করেছে। আড়চোখে অস্পষ্টভাবে দেখল লাইনের একটা মোটা পেরেকের চোখা মাখা বেরিয়ে আছে। শরীরটা আঁকাবাকা করে ঝাঁকাতে লাগল সে। তিল তিল করে ওর মাথার দিকটা এগিয়ে চলল পেরেকের দিকে। অনেক কষ্ট করে, লাইন আর পাথরের ঘষায় শরীরের কয়েক জায়গার চামড়া ছিঁড়ে-কেটে অবশেষে হাতের বাঁধন পেরেকটার কাছে নিয়ে যেতে পারল। দড়ি ঘষতে লাগল পেরেকের সঙ্গে। এক সুতা এক সুতা করে কাটতে লাগল দড়িটা।
আবার শোনা গেল ট্রেনের শব্দ। আরেকটা ট্রেন আসছে। একবার বেঁচেছে বলেই যে আবার বাচবে এমন সম্ভাবনা নেই। তাড়াহুড়া শুরু করল। সে। অবশেষে যেন দীর্ঘ কয়েক যুগ পর দড়িটা কাটতে সক্ষম হলো।
দড়িটা ছাড়িয়ে নিয়েই উঠে পড়ল সে। পকেটনাইফ বের করে পায়ের বাঁধন কাটল। তারপর কেটে দিল কিশোরের হাতের বাঁধন।
তিনজনেই মুক্ত হয়ে সরে গেল লাইনের ওপর থেকে। অনেক কাছে এসে গেছে দ্বিতীয় ট্রেনটা।
বিমূঢ় ভাব কাটেনি এখনও রবিনের। কব্জি ডলতে ডলতে বলল, এপারে আছি তো? না মরণের ওপারে চলে গিয়ে অদ্ভুত সব দৃশ্য দেখছি?

চলে যেতাম, যদি পাশের লাইনটা দিয়ে না যেত ট্রেনটা, কিশোর বলল। রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করার জন্যে হাত-পা ঝাড়ছে।
চাঁদের আলোয় চকচক করছে কয়েক গজ দূরের আরেকটা লাইন। সেদিকে তাকিয়ে তারপর আবার ওদের পায়ের কাছের লাইনটার দিকে চোখ ফিরিয়ে বলল সে, দেখো, এটায় মরচে পড়া।
তাতে কি? মুসার প্রশ্ন।
এটা সাইডলাইন, জবাব দিল কিশোর, পুরানো। ব্যবহার হয় না।
তারমানে আমাদের ভাগ্যের জোরে ওরা ভুল করে বাতিল লাইনে ফেলে গেছে আমাদের।
আমার তা মনে হয় না, ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল কিশোর, জেনেশুনে ইচ্ছে করেই ফেলে গেছে। হয়তো কেবল ভয় দেখানোর জন্যে। মারতে চায়নি।
দাঁতে দাঁত চাপল মুসা, কায়দা মত পেয়ে নিই! ভয় দেখানো ওদের আমি বের করব!
পাঁচজনের সঙ্গে পারব না আমরা, মুসা, মনে করিয়ে দিল রবিন।
সে দেখা যাবে। ওরা আমাদের সঙ্গে এ রকম করতেই থাকবে আর আমরা মুখ বুজে সহ্য করব, কিছুই না করে ছেড়ে দেব, এটা ভাবলে মহাভুল করবে ওরা।
কি করবে তাহলে?
আপাতত মোটেলে ফিরে যাব, জবাব দিল কিশোর।
লাইন ধরে কয়েক মিনিট হাটার পর সরু রাস্তাটা চোখে পড়ল ওদের। সেটা ধরে এগিয়ে এসে উঠল মহাসড়কে। রাতের বেলা জোয়ান ছেলেছোকরা হাত তুললে গাড়িগুলো থামতে চায় না। সবাই বা ডাকাতিকে ভয় পায়। তবে একজন ট্রাক ড্রাইভারের মনে হলো, ছেলেগুলো খারাপ নয়। থামল সে। কোথায় যাবে জানতে চাইল। লিফট দিতে রাজি হলো।
ড্রাইভারের পাশে গাদাগাদি করে বসল তিনজনে। মুসার পাশের দরজাটা খোলা রাখতে হলো, নইলে বসা যায় না। তার অর্ধেকটা শরীরই বেরিয়ে রইল।
ড্রাইভার যখন গাড়ি চালাচ্ছে, নিচুস্বরে কিশোরের সঙ্গে কথা বলল রবিন, আচ্ছা, ওরা কোন ভুল করেনি তো? ভুল করে আমাদের শাস্তি দিয়েছে হয়তো। স্কুলের দলাদলি হতে পারে।
ভ্রূকুটি করল কিশোর। অন্ধকারে কারও চোখে পড়ল না সেটা। বলল, উঁহু, ভুল ওরা করেনি। ভয় দেখাতে চেয়েছে আমাদের, যাতে গেনারকে খোঁজাখুঁজি না করে আরলিংটন থেকে কেটে পড়ি আমরা।
তারমানে তোমার ধারণা গেনারকে কিডন্যাপ করা হয়েছে?
হওয়াটা কি অসম্ভব? হয়নি যে তেমন কোন সূত্র তো এখনও পাইনি আমরা।

ওদের আলোচনায় যোগ দিল না ড্রাইভার। বেশি কথা বলার মানুষ না সে। নীরবে গাড়ি চালিয়ে পৌঁছল আরলিংটনে। তাকে ধন্যবাদ দিয়ে নেমে পড়ল তিন গোয়েন্দা। সোজা রওনা হলো ম্যানেজারের অফিসে।
টেকোকে ভালমত চেপে ধরার সময় হয়েছে এখন, ভারি গলায় বলল কিশোর। আমার কিছু প্রশ্নের জবাব দিতে হবে ওকে।
দরজা বন্ধ। বেল টিপে ধরল কিশোর। কয়েকবার করে টেপার পর আলো জ্বলল ভেতরে। দরজা খুলে দিল ম্যানেজার। ঘুমে জড়ানো ফোলা ফোলা চোখ, চকচকে টাক, পায়জামা আর গেঞ্জি পরা পৈটমোটা লোকটাকে হাস্যকর লাগছে এখন। মেজাজ খারাপ না থাকলে হেসে ফেলত মুসা।
রাত দুপুরে ঘুমন্ত মানুষকে বিছানা থেকে টেনে তোলার অর্থ কি, আঁ? কর্কশ স্বরে জিজ্ঞেস করল ম্যানেজার। অফিসের চেয়ারে বসা বিগলিত হাসিওয়ালা সেই লোকটার সঙ্গে একে মেলানো যায় না। যেই মনে করেছে, ওরা কটেজ ছেড়ে দিচ্ছে, ওদের সঙ্গে ব্যবসা শেষ, অমনি বদলে গেছে আচরণ। মোটেল ছেড়ে চলে যাওয়ার ইচ্ছে হলে সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এখন কিছু করতে পারব না।
আর কিছু না পারেন, আমার কিছু প্রশ্নের জবাব আপনাকে দিতে হবেই, কিশোরও সমান তেজে বলল আমাদেকে দুনিয়া ছেড়ে চলে যাওয়ারই ব্যবস্থা করা হয়েছিল।
থমকে গেল ম্যানেজার। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কিশোরের দিকে তাকিয়ে থেকে মাথা নেড়ে ইঙ্গিত করল ঘরে ঢোকার জন্যে। সব শোনার পর বলল, ছেলেগুলোকে চিনতে পেরেছে। আরলিঙটন কলেজে পড়ে। এই এলাকারই ছেলে খুব পজি মারামারি, দলাদলি এ সূর্ব করে বেড়ায়।
মনে হয় নতুন মুখ দেখে তোমাদের সঙ্গে একটু মজা করতে চেয়েছিল ওরা, ম্যানেজার বলল।
মনে করা ওদের বের করব এবার গজগজ করতে লাগল মুসা।
পুলিশকে খবর দিতে যাচ্ছি আমরা, কিশোর কাল। নাম কি ওদের? কোথায় থাকে?
সুব্রার নাম জানে না ম্যানেজার। দুতিনজনের জানে, ওদের নাম আর ঠিকানা একটা কাগজে লিখে দিল। পুলিশের কাছে যাওয়ার আগে একটা বাড়িতে ঢু মেরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল কিশোর। মুসাকে বলল সেদিকে যেতে। নীরব রাতে বিকট শব্দ তুলে ছুটল জেলপি। পর্ব আকাশে অন্ধকার কাটতে শুরু করেছে। ভোর হতে দেরি নেই।

বাড়ির সামনে এসে আগের মতই গাড়িতে বসে রইল মুসা, রবিন আর কিশোর নেমে গেল। কলিং বেলের বোতাম টিপল কিশোর। সাড়া না পেয়ে দরজায় থাবা মারতে লাগল রবিন।
অবশেষে দরজা খুলে দিল পায়জামা পরা একটা ছেলে। খালি পা। ঘুমজড়িত কণ্ঠে বলল, মাঝরাতে এত ডাকাডাকি কিসের? আমরা তো আর পালিয়ে যাচ্ছি না।বলে দরজা লাগিয়ে দিতে গেল।
চট করে একটা পা ঢুকিয়ে দিয়ে আটকাল কিশোর, মজা করতে আসিনি আমরা। বব বোম্যান কোথায়?
বড় করে হাই তুলল ছেলেটা, ওকে জাগানো যাবে না।
যাবে না কেন? কিশোরের কাঁধের কাছ থেকে বলে উঠল মুসা, গাড়িতে বসে থাকতে পারেনি, কি ঘটছে এখানে দেখার জন্যে চলে এসেছে। জোরেজোরে ধাক্কা দাওগে, জেগে যাবে।
কিন্তু তোমরা বুঝতে পারছ না, ও আমাদের প্রেসিডেন্ট…
কিশোরকে সরিয়ে তার জায়গায় চলে এল মুসা, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নাকি ও? যাও, জুলদি গিয়ে উঠতে বলো নাকি থানায় যাওয়ার ইচ্ছা হয়েছে?
ভেতরে চলে গেল ছেলেটা। উত্তেজিত কথা আর ধমক শোনা গেল। বেরিয়ে এল গাট্টাগোট্টা আরেকটা ছেলে। পরনে লাল-সাদা স্ট্রাইপের পায়জামা। তিন গোয়েন্দার ওপর চোখ পড়তেই থমকে গেল। দুচোখে বিস্ময়।
তোমরা…
ওকে কথা শেষ করতে দিল না মুসা, বলল, হ্যাঁ, আমরা। নরক থেকে প্রেতাত্ম হয়ে বেরিয়ে এসেছি তোমার চোয়ালের হাড্ডি কখান ভাঙার জন্যে। আরও কাছে এসো, কোনখান থেকে শুরু করা যায় বুঝে দেখি..
ওর কাঁধে হাত রেখে বাধা দিল কিশোর, দাঁড়াও, পেটে কি কি কথা লুকিয়ে আছে, আগে বের করি, তারপতেমাকে একটা চান্স দেয়া যাবে…
অনিশ্চিত ভঙ্গিতে আরও এক পা এগিয়ে এল বব। কি করবে বুঝতে পারছে না।
ওর দিকে এগিয়ে গেল কিশোর। ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল, রেললাইনের ওপর আমাদের ফেলে আসার মানেটা কি? মোটেলে আমাদের ঘর থেকে তাড়ানোর ব্যবস্থা করেছ কেন?
এমন ভঙ্গি করছ তোমর, যেন আমি তোমাদের শত্রু, ছেলেটা বলল। একটু পরখ করতে চেয়েছিলাম, যে যাচাই করে নেয়া, আর কিছু তো না। এত রাগীর কি হলো?
রেললাইনের ওপর ফেলে এসেছ মরার জন্যে, আর বলছ যে যাচাই? মানেটা কি এসবের?

মারার জন্যে ফেলে আসিনি, বব বলল, যেটাতে রেখে এসেছিলাম, ওটা বাতিল লাইন, ট্রেন চলাচল করে না। তারপরেও আড়াল থেকে নজর রেখেছিলাম, বাই চান্স যদি কোন বিপদ ঘটে যায় সাহায্য করার জন্যে। দেখলাম, তোমরা নিজেরাই নিজেদের জন্যে যথেষ্ট, সাহায্যের কোন প্রয়োজনই নেই। তোমরা আরলিংটনে ভর্তি হতে এসেছ, তাই না?

না, জবাব দিল রবিন।

আমাদের কি পরখ করছিলে? আবার প্রশ্ন করল কিশোর। কার হুকুমে?

প্রশ্নটা দ্বিধায় ফেলে দিল ববকে পেছনে পায়ের শব্দ শোনা গেল। ফিরে তাকাল সে। এই অসময়ে কার সঙ্গে কথা বলছে দেখার জন্যে আরও কয়েকটা ছেলে নেমে আসছে দোতলা থেকে।

কিশোরের দিকে ফিরল বব, এর জবাব তোমাকে দিতে পারব না আমি।

যদি কথা দিই, মুখ খুলব না? কাউকে বলব না ওর কথা?

কিশোরের প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে বব বলল, আমরা ভেবেছি তোমরা লায়ন কাবসে যোগ দিতে এসেছ, কসম—

লায়ন কাবসটা কি?

আমাদের তরুণদের একটা সংঘঠন। তোমাদের পরীক্ষা নিতে চেয়েছিলাম। আমরা ভেবেছি তোমরা আরলিঙটনে ভর্তি হবে, তাই আগে থাকতেই আমাদের দলে টানতে চেয়েছি।

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত ববের দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। ওর মনে হলো সত্যি কথাই বলছে ছেলেটা। মুসার দিকে তাকিয়ে বলল, তোমার হাতের সুখ মেটাতে পারলে না, মুসা। অন্য সময় দেখা যাবে। চলো এখন, যাই।

সারারাত ঘুমায়নি, তার ওপর নানা উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা আর পরিশ্রম, ঘুমে ভেঙে আসতে চাইছে চোখ। তবু মোটেলে ঘুমাতে যাওয়ার আগে আরও খাকিটা তদন্ত সেরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল কিশোর।

বাইরে এসে সঙ্গীদের বলল, ডিগ ঘুম থেকে ওঠার আগেই গেনারের ঘরটা আরেকবার দেখব, চলো।

হাতঘড়ি দেখল রবিন, ছটা বাজে। এত সকালে নিশ্চয় ঘুম থেকে ওঠেনি ডিগ। মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, চলো।

গেনারের কোয়ার্টারের দিকে রওনা হলো ওরা। পথে কয়েকটা দুধের গাড়ি আর একজন খবরের কাগজের হকারকে ছাড়া আর কাউকে দেখতে পেল না। এত ভোরে অন্য কেউ নেই রাস্তায়। কলেজের কোয়ার্টার গুলোতেও প্রাণের সাড়া নেই, ঘুমন্ত।

কোয়ার্টারের সামনে এসে আগের মতই গাড়ি থামিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল মুসা। কিশোর আর রবিন নেমে গেল।
সোজা গেনারের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল কিশোর। পকেট থেকে মাস্টার কী বের করে তালা খুলতে একটা মিনিটও লাগল না তার। রবিনকে নিয়ে ভেতরে ঢুকেই দরজা লাগিয়ে দিল। ডিগ যে পাশে থাকে সেপাশের দেয়ালে কান ঠেকিয়ে শুনল। নীরব।
এখনও স্বপ্নের জগতেই আছে, ফিসফিস করে রবিনকে বলল সে।
কি দেখতে এসেছ?
জানি না। এসো, খুঁজি।
বাতি জ্বালতে হলো না। সামনের দুটো জানালা দিয়ে দিনের আলো ঢুকছে। এখনও অস্পষ্ট, তবে ঘরের জিনিসপত্র সব দেখা যায়। রবিনকে আসবাবগুলো পরীক্ষা করতে বলে নিজে ডেস্কে রাখা নোট আর বইগুলো দেখতে এগোল কিশোর।
অনেক খোঁজাখুঁজি করেও নতুন কিছু পেল না ওরা, গেনারের কি হয়েছে বা ও কোথায় গেছে এ ব্যাপারে সামান্যতম সুত্র পাওয়া গেল না।
পুলিশ এত করে খুঁজে যাওয়ার পর আর কিছু পাওয়ার কথাও না, হাল ছেড়ে দিয়ে বলল রবিন। আসলে কি খুজছ তুমি, কিশোর?
জবাব না দিয়ে একটা প্রশ্নপত্রের দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। ঘনঘন চিমটি কাটছে নিচের ঠোঁটে। গভীর মনোযোগ। কি যেন বোঝার চেষ্টা করছে। ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর চেহারা।
এগিয়ে গেল রবিন। কিছু পেয়েছ মনে হচ্ছে?
দেখো এটা! উত্তেজনায় গলা কেঁপে উঠল কিশোরের।
.
ওর কাঁধের ওপর দিয়ে তাকাল রবিন। কই, কি আছে এতে? কয়েকটা প্রশ্ন ছাড়া তো আর কিছু দেখছি না।
হ্যাঁ, এই প্রশ্নগুলোর মধ্যেই রয়েছে একটা জরুরী সূত্র, কিশোর বলল।
আমি কিছুই দেখছি না।
প্রথম প্রশ্নটা দেখো…
দেখলাম। রাশিয়ার বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই আমার।
আমারও না। পরের প্রশ্নটা দেখো।
আফ্রিকায় কি ঘটছে..তাতেই বা আমার কি?

আমারও না, নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল কিশোর। রবিন বুঝতে পারছে না দেখে মজা পাচ্ছে সে।
দেখো, কিশোর, অধৈর্য হয়ে বলল রবিন, দোহাই তোমার, যা বুঝেছ, বলে ফেলো! না বোঝালে বুঝব না!
মোট কটা প্রশ্ন আছে?
দশটা।
প্রতিটি প্রশ্নের প্রথম অক্ষরটা নিয়ে পর পর সাজাও কি হয়?
দ্রুত ওপর থেকে নিচে চলে গেল রবিনের চোখ। অক্ষরগুলো সাজালে হয়:
S-H-E-E-P-R-I-D-G-E
শিস দিয়ে উঠল সে, শিপরিজ! কোনও শহরের নাম!
হ্যাঁ, কিশোর বলল, বেশ চালাকি করে সূত্র রেখে গেছে গেনার। আমার ধারণা পুলিশ এটা বের করতে পারেনি। সম্ভবত গেমারের নিরুদ্দেশের ব্যাপারে তেমন গুরুত্বই দেয়নি পুলিশ।
তাতে আমাদেরই ভাল হয়েছে, রহস্যটার মীমাংসা করতে পারব। কিন্তু, আর তো দাঁড়াতে পারছি না, চোখ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কোন রকম চিন্তা-ভাবনা করতে পারব না এখন। মাথা কাজ করছে না।
ঘুমাতে যাওয়ার আগে নাস্তা খেয়ে নিতে হবে, খালি পেটে ঘুম ভাল হবে না, কিশোর বলল। ঘুম থেকে উঠে পোস্ট অফিসে যাব শিপরিজটা কোথায় জানতে।
কমন নেম। পুরো আমেরিকায় অন্তত পঁচিশটা শিপরিজ পাওয়া যাবে। কটাতে খুঁজব? সবগুলোতে খুঁজতে গেলে খোঁজা শেষ হতে হতে আশি বছরের বুড়ো হয়ে যাবে গেনার। বড় করে হাই তুলল রবিন। তাড়াতাড়ি গিয়ে কান পাতল দেয়ালে।
শুনেছ নাকি কিছু? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
মনে হয় ডিগ উঠে পড়েছে। জলদি পালানো দরকার। ধরা পড়লে প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে জান খারাপ হয়ে যাবে।
বেরিয়ে এল দুজনে। দরজার তালাটা আবার লাগিয়ে দিল কিশোর। নিচে নেমে দেখল স্টিয়ারিঙে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে মুসা। ধাক্কাধাক্কি করেও তাকে জাগানো গেল না। তবে নাস্তার কথাটা কানের কাছে বলতেই মুহূর্তে পুরো সজাগ হয়ে গেল। স্টার্ট দিল গাড়িতে।
ক্যামপাসের ক্যাফেটেরিয়া এখনও খোলেনি। তাই শহরের একধারে একটা অল-নাইট কাফের সামনে গাড়ি রাখল মুসা।
ভরপেট খেয়ে কাফে থেকে বেরোল ওরা। মোটেলে ফিরে চলল।
ঘরে ফিরে একটানে জুতো খুলেই চিত হয়ে শুয়ে পড়ল রবিন। কাপড় বদলানোর কষ্টও সহ্য করতে রাজি নয়। বলল, আমি গেলাম, আর পারছি না!

অন্য দুজনেরও একই অবস্থা। বিছানায় শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল তিনজনেই।
কয়েক ঘণ্টা টানা ঘুম দিয়ে জাগল ওরা। ঝরঝরে লাগছে এখন শরীর। হাতমুখ ধুয়ে, তৈরি হয়ে রওনা হলো ওরা। দরজা দিয়ে বেরিয়েই থমকে দাঁড়াল রবিন। ঘোষণা করল, ঝামেলা আসছে! লড়াইয়ের জন্যে তৈরি হও!
কি হয়েছে? রবিনের কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি দিল কিশোর।
মুসা এসে দাঁড়াল তার পেছনে।
রিজ মোটেলের চওড়া লন পেরিয়ে হেঁটে আসছে চারজন তরুণ। দলপতি বব বোম্যান।
লায়ন কাবস, বিড়বিড় করল মুসা। আজ যদি আবার সিংহগিরি দেখাতে এসে থাকে, ভাল হবে না। কেশর কেটে দিয়ে তবে ছাড়ব।
আগেই মারামারি শুরু করে দিয়ো না, সাবধান করল কিশোর, কি জন্যে এসেছে দেখি।
দরজা দিয়ে আগে বেরোল সে।
এগিয়ে এসে হাসিমুখে বলল বব, হাই! তোমাদের চমকে দিতে এলাম।
কিশোরের দুপাশ দিয়ে বেরোল মুসা আর রবিন।
মুসার মারমুখো ভঙ্গি ভাল ঠেকল না ববের, ওর হাতের কিলবিলে। পেশীগুলোর দিকে তাকাল চোখে সন্দেহ নিয়ে। বলল, দেখো, মারামারি করতে আসিনি আমরা।
তাহলে কি করতে এসেছ? জিজ্ঞেস করল রবিন।
কি জন্যে এসেছে, বলল বব। তিন গোয়েন্দাকে ওর পছন্দ হয়েছে। সে চায় ওরা লায়ন কাবসে যোগ দিক।
কাজ নেই তো আর খেয়েদেয়ে, মানুষ থেকে শেষে পশুর বাচ্চা হতে যাই... বলে ফেলল মুসা।
অহেতুক ঝগড়া বাধাতে চায় না এখন কিশোর, তাই মুসাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, যোগ দিতে পারি, এক শর্তে। কাল রাতে কে আমাদেরকে লাইনের ওপর ফেলে আসতে বলেছিল, যদি তার নাম বলো।
দ্বিধায় পড়ে গেল বব। তার মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে, বলতে চায় সে, কিন্তু কোন কারণে পারছে না। শেষে বলল, দেখো, বলতাম, সত্যি। কিন্তু একজন বন্ধুকে ফাঁসিয়ে দেয়া কি ঠিক?
তাহলে বোলো না।
কিন্তু তোমরা তো তাহলে আমাদের দলে আসবে না।

শর্ত না মানলে কি করে আসব। এলে খুব ভাল হত। মুসার দিকে তাকাল বব, তোমাকে আমি চিনতে পেরেছি, মুসা আমান। দারুণ বাস্কেটবল খেলো। তোমার খেলা দেখেছি। আরলিংটনের যে কোন টিম তোমাকে পেলে লুফে নেবে।
ধন্যবাদ, মুসা বলল, আপাতত আরলিঙটনের কারও লোফালুফির পাত্র হবার ইচ্ছে আমার নেই, এমনিতেই খুব ভাল আছি।
কোনমতেই তিন গোয়েন্দাকে লায়ন কাবসে ঢোকাতে রাজি করতে না পেরে হতাশ হয়েই ফিরে চলল বব। তবে বোঝা গেল, আশা ছাড়েনি সে। আবার আসবে চাপাচাপি করতে।
বেরিয়ে পড়ল তিন গোয়েন্দা। পোস্ট অফিসে ঢুকে একজন ক্লার্ককে অনুরোধ করতেই একটা পোস্টাল ডিরেক্টরি বের করে কাউন্টারের ওপর দিয়ে ঠেলে দিল। তার ওপরহুমড়ি খেয়ে পড়ল কিশোর আর রবিন।
অনেকক্ষণ পাতা ওল্টানোর পর নিশ্চিত হলো, শিপরিজ অনেকগুলো আছে আমেরিকায়, তবে লস অ্যাঞ্জেলেসে আছে মাত্র একটা। কাজ সহজ হয়ে যাওয়ায় খুশি হলো ওরা। ডিরেক্টরিটা ক্লার্ককে ফেরত দিয়ে, তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে পোস্ট অফিল থেকে বেরিয়ে এল।
মুসা জিজ্ঞেস করল, এবার কোথায়?
জবাব দিল কিশোর, অবশ্যই শিপরিজে, তবে তার আগে ক্যাম্পাসে যাও। ডিন আর মেরিন ডিগেরকাছ থেকে বিদায় নিতে হবে।
তার কোন প্রয়োজন আছে?
আছে।
আগেরবারের মতই শীতলভাবে ওদেরকে গ্রহণ করলেন ডিন ফলেট। ওরা চলে যাচ্ছে শুনে জানতে চাইলেন কোথায় যাচ্ছে।
জানাল কিশোর।
কোন ভাবান্তর হলো না তার। গেনারকে খোঁজার জন্যে ওদের একটা শীতল ধন্যবাদ জানিয়ে আবার কাজে মন দিলেন।
বেরিয়ে এল ওরা। ডিগের সঙ্গে দেখা করতে চলল।
ঘরেই পাওয়া গেল তাকে।
কিশোর বলল, আমরা চলে যাচ্ছি। এখানে আমাদের কাজ শেষ।
হাত মেলাতে মেলাতে রবিন বলল, আপনার সাহায্যের জন্যে অনেক ধন্যবাদ।
দুঃখ একটাই, বলল কিশোর, আপনার বন্ধুকে খুঁজে বের করতে পারলাম না।
তাতে দুঃখ পাওয়ার কিছু নেই, বিন্দুমাত্র উদ্বিয় মনে হলো না ডিগকে, বরং তিন গোয়েন্দা চলে যাচ্ছে শুনে যেন খুশিই হলো। আমার এখনও। বিশ্বাস,

ইয়োরোপেই গেছে সে, বিয়ে করতে, হয়তো এতক্ষণে করেও ফেলেছে। হানিমুন করছে নতুন বউকে নিয়ে। হাহ হাহ হা! নিজের রসিকতায় নিজেই হাসল।
সেটা হলে তো ভালই। যাই হোক, অনেক সাহায্য করেছেন আমাদের। থ্যাংক ইউ। তা কোথায় যাচ্ছ তোমরা? বাড়ি?
না, ইচ্ছে করেই সত্যি কথাটা জানিয়ে দিল কিশোর, ডিগের চোখের দিকে তাকিয়ে, ভাবছি শিপরিজটা একবার ঘুরে যাব-..
চমকে গেল মনে হলো ডিগ, কেন? ওখানে কেন? গুহাটা দেখতে নাকি?
গুহা! সতর্ক হলো কিশোর।
ও, জানো না। একটা বিখ্যাত গুহা আছে ওখানে, নাম ব্ল্যাকহোল। তবে বিখ্যাত না বলে কুখ্যাত বলাই ভাল…
আপনি দেখেছেন নাকি গুহাটা?
উ! থমকে গেল ডিগ। হাসল। দেখেছি। আমার এক চাচা থাকে ওখানে, তার কাছে বেড়াতে গিয়েছিলাম তো, ঠিক আছে, যাও। দেরি করিয়ে দিচ্ছি। আমারও কাজ আছে। লেকচারের জন্যে কিছু কাগজ রেডি করতে হবে।
কিশোরের মনে হলো, কোন কথা চেপে যাচ্ছে ডিগ। ওরা যে মেরিনকে খুঁজতে যাচ্ছে ওখানে সন্দেহ করেছে নাকি? সন্দেহ কাটানোর জন্যে বলল, শুনেছি, শিপরিজটা সুন্দর জায়গা, দেখার মত। গুহাটা যাওয়ার আকর্ষণ আরও বাড়িয়ে দিল। গুহার ভেতরে রাত কাটানো খুব মজার, কি বলেন?
মোটেলে ফেরার পথে রবিন বলল, শিপরিজের কথা শুনে অমন চমকে উঠল কেন? আমার মনে হয় কিছু লুকাচ্ছে ডিগ।
কি জানি, চিন্তিত ভঙ্গিতে কিশোর বলল, হতে পারে গেনারের প্রশ্নপত্রে শিপরিজের নামটা সেও আবিষ্কার করে ফেলেছে। কিন্তু কথা হলো, সে জানে আমরা গোয়েন্দা, আবিষ্কারই যদি করে থাকে, আমাদের সেকথা জানাল না কেন?
নিজেই যেতে চায় হয়তো ওখানে। বন্ধুকে খুঁজে বের করে সবাইকে চমকে দেয়ার জন্যে।
মাথা নাড়ল কিশোর, আমার তা মনে হয় না। লোকটার ব্যাপারে সাবধান থাকা দরকার।
কি করে থাকব? মুসার প্রশ্ন। আমরা তো চলেই যাচ্ছি এখান থেকে।
জবাব দিল না কিশোর। ভাবনায় ডুবে গেল।
মোটেলে ফিরে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে লাগল রবিন আর মুসা, কিশোর ফোন করল রকি বীচে, গোয়েন্দা ভিকটর সাইমনের পাইলট ল্যারি কংকলিনকে। বাড়িতেই পাওয়া গেল ওকে। মেরিন ডিগের কথা তাকে। জানিয়ে অনুরোধ করল

কিশোর, লোকটার ওপর সন্দেহ হচ্ছে আমাদের, ওর ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়ে আমাদের জানাবেন?
তোমাদের ঠিকানা বলো।
শিপরিজে যাচ্ছি। কোথায় উঠব বলতে পারছি না। আপনি খোঁজখবর নিন, আমি আবার ফোন করব।
টাকমাথা বাচাল ম্যানেজারকে অফিসে পাওয়া গেল। বিল মিটিয়ে দিল কিশোর। আবার তিনজনে গাড়িতে উঠতে মুসা বলল, তাহলে শিপরিজেই যাচ্ছি?
কেন, কোন সন্দেহ আছে নাকি তোমার? প্রশ্ন করল কিশোর।
না না, বলছিলাম কি ব্ল্যাকহোল গুহায় যাব নাকি?
দরকার পড়লে যাব।
হেসে বলল রবিন, ভয় করছে নাকি তোমার?
তা একটু-আধটু যে করে না তা নয়। আমি ভাবছি, আমার মেটাল ডিটেক্টরটা এবার কাজে লাগানো যাবে কিনা?
গুহার মধ্যে কি খুঁজবে? ভূত?
আরে দূর! জোরে হাত নাড়ল মুসা, এটা কি গোস্ট ডিটেক্টর নাকি? আমি বলছি গুপ্তধনের কথা। সোনার মোহর-টোহর যদি লুকানো থাকে…
তাহলে বড়লোক হয়ে যাবে, বাধা দিয়ে বলল কিশোর। নাও, বকবকানি থামিয়ে এখন গাড়ি চালাও।
রওনা হওয়ার সময় আকাশটা ভালই ছিল, এখন যতই সামনে এগোচ্ছে ধূসর হয়ে আসছে আকাশের রঙ। একসময় কুয়াশায় ঢেকে গেল সবকিছু। হেডলাইট জ্বেলে খুব সাবধানে গাড়ি চালাতে হচ্ছে মুসাকে। ঘন্টাখানেক পরই কুয়াশা কেটে গেল, হেসে উঠল উজ্জল রোদ। আবহাওয়ার এই যখন তখন পরিবর্তনে অবাক হলো না ওরা, এদিকে এ রকমই হয়, জানা আছে।
সাগর সমতল থেকে এখানে দুশো ফুট ওপরে রাস্তা। পাহাড়ের গা বেয়ে চলে গেছে। সাগরের দিকটায় কোথাও খাড়া, কোথাও ঢালু হয়ে নেমেছে পাহাড়ের দেয়াল। ঢালু অংশগুলোতে সাগর আড়াল করে দিয়ে ঘন হয়ে জন্মেছে গাছপালা, ঝোপঝাড়।
কিছুদূর এগোনোর পর সামনে ঢালু হয়ে এল পথ। লম্বা একটা পাহাড়ের কিনার দিয়ে নিচে নামতে নামতে একসময় চোখে পড়ল শিপরিজ। মহাসড়কের পাশে গড়ে ওঠা অতি খুদে একটা গ্রাম। সৈকতের ধারে ছোট্ট জেটি তৈরি করেছে জেলেরা। শান্ত, সুন্দর গ্রাম। দেখে মনে হয় ঘুমিয়ে আছে। চমৎকার প্রাকৃতিক দৃশ্য। রাস্তার পাশে একটা পুরানো বাড়ি দেখা গেল। রোদ-বৃষ্টি আর নোনা

হাওয়ায় রঙ এমন চটেছে, যতটা না পুরানো তার চেয়ে অনেক বেশি পুরানো মনে হয়।
দরজায় বড় করে সাইনবোর্ড লেখা:
HARRYS GENERAL STORE.
মুসাকে বলল কিশোর, থামো, কয়েকটা জিনিস কিনতে হবে ক্যাম্প করার জন্যে।
বাড়িটার সামনে গাড়ি রেখে মুসা বলল, একটা করে বার্গার খেয়ে নিলে কেমন হয়?
মন্দ হয় না।
কাউন্টারের ওপাশেবসে আছে মাঝবয়েসী, ঝাড়ুর শলার মত খাড়া খাড়া গোঁফওয়ালা এক লোক। পত্রিকা পড়ছে।
সাড়া পেয়ে কাউন্টারের ওপর কাগজটা নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল সে। চশমার ভারি লেন্সের ওপাশ দিয়ে গভীর কৌতূহলের সঙ্গে তাকাল ওদের দিকে। ভঙ্গি দেখে মনে হয় যেন বহুদিন বাদে এই প্রথম মানুষ চোখে পড়েছে।
আপনিই মিস্টার হ্যারি? জানতে চাইল কিশোর।
হ্যাঁ, খসখসে গলায় জবাব দিল লোকটা, কি সাহায্য করতে পারি?
ব্ল্যাকহোলটা কতদূরে, বলতে পারেন?
চোখ বড় বড় হয়ে গেল হ্যারির, ব্ল্যাকহোল! ওখানে যাওয়ার জন্যে এসেছ নাকি?
হ্যাঁ, গুহার কাছে ক্যাম্প করতে চাই।
কাউন্টারের ওপর ঝুঁকে সামনের দিকে গলা বাড়িয়ে দিল হ্যারি। ক্যাম্প করবে? ব্ল্যাকহোলে?
কেন, অসুবিধে আছে নাকি?
আনমনে মাথা নাড়তে নাড়তে জিজ্ঞেস করল লোকটা, এখানে এই প্রথম এলে নাকি?
হ্যাঁ, রকি বীচ থেকে। বেড়াতে বেরিয়েছি।
শিপরিজ বেড়ানোর জন্যে খুব ভাল জায়গা।
গুহাটা কতদূরে, বলেননি কিন্তু।
এই রাস্তা ধরেই চলে যাও পাঁচ মাইল। তারপর খানিক হাঁটতে হবে।
কাউন্টারে কনুই ঠেকাল মূসা। বার্গার আছে নাকি?
আছে,হ্যারি বলল, খুব ভাল বার্গার। তাজা। তাজা জিনিস ছাড়া বেচি আমি।
দিন তাহলে। তিনটা।
প্লেটে করে বার্গার এনে দিল হ্যারি।
বার্গারের কাগজের মোড়ক ছাড়াতে ছাড়াতে জিজ্ঞেস করল রবিন, গুহার কাছে ক্যাম্প করার জায়গা আছে নাকি?

আছে। কাছেই একজন জেলে থাকে, নাম রিক ভেলভার। খাতির করে নিতে পারলে ওর বাড়ির কাছে তোমাদের থাকতে দেবে সে। তোক ভাল। গুহার কাছে না গিয়ে ওর বাড়ির কাছাকাছি থাকলেই ভাল করবে। এক মুহূর্ত বিরতি দিয়ে মুখ খুলল হ্যারি, আমি হলে অন্তত ওই গুহার কাছে ক্যাম্প করতে যেতাম না কিছুতেই।
শুধু ক্যাম্প করা নয়, আমরা তো ভাবছি গুহাটাতেই ঢুকব।
পাগল! ঢোক গিলল হ্যারি।
কেন, বেআইনী নাকি?
না। তবে সুস্থ মস্তিষ্ক কোন লোক এখন আর ওই গুহায় ঢুকতে চাইবে না।
কেন?
বললাম তো, মাথা খারাপ না হলে ওই গুহায় ঢোকার কথা ভাববে না কেউ, এমন ভঙ্গি করল হ্যারি, যেন এতেই সর প্রশ্নের জবাব হয়ে গেছে।
আপনার কথা কিছুই বুঝলাম না! রবিন বলল।
কিশোর জিজ্ঞেস করল, গুহায় ঢোকাটা বিপজ্জনক নাকি?
নাহলে এত কথা বলব কেন? আমার পরামর্শ শুনলে, ওই গুহার ধারেকাছে যেয়ো না।
কাউন্টারে কনুই রেখে অধৈর্য হয়ে বলল রবিন, দয়া করে কারণটা কি আমাদের খুলে বলা যায়?
এক মুহূর্ত চিন্তা করে নিল হ্যারি। বেশ, না শুনে যখন ছাড়বে না..ইদানীং অদ্ভুত সব কাণ্ড ঘটছে গুহার মধ্যে।
এইবার টনক নড়ল মুসার। খাড়া করে ফেলেছে কান। বার্গার চিবানো বন্ধ হয়ে গেল। খাইছে! ভূত নাকি?
তা বলতে পারব না, মাথা নাড়ল হ্যারি। কয়েক দিন আগে আমার পরিচিত এক জেলে গিয়েছিল গুহার কাছে। এত ভয় পেয়েছিল, আরেকটু হলে হার্টফেল করেই মরত বেচারা। নেহাত হাটটা শক্ত আর নীরোগ বলে বেঁচে গেছে। গুহার ভেতরে আর আশোঁপাশে নাকি আজব আলো দেখা যায়, শব্দ শোনা যায়, গোলাগুলি চলে।
গোলাগুলি! ভুরু কুঁচকে ফেলল কিশোর।
হ্যাঁ। দুজন অতি উৎসাহী লোক গুহার আলোক-রহস্য জানতে গিয়েছিল, তাদের লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়া হয়। আততায়ীকে দেখতে পায়নি ওরা।
কিছুটা নিশ্চিন্ত হলো মুসা, আর যাই করুক, ভূতে গুলি ছোড়ে না। গলা টিপে ধরে, নয়তো ঘাড় মটকে দেয়। কোন কোন ভূত জীবন্ত মানুষের শরীর থেকেই চুপচাপ রক্ত খেয়ে চলে যায়।

আবার বার্গার খাওয়ায় মন দিল সে।
চট করে ভাবনাটা খেলে গেল কিশোরের মাথায়–ওই গুহার মধ্যেই ঢোকেনি তো হ্যারিস গেনার? জিজ্ঞেস করল, লোক দুজন কারা, এই এলাকার কেউ?
না, চিনি না। আগে নাকি কখনও এখানে দেখা যায়নি ওদের।
ওদের চেহারার বর্ণনা দিতে পারেন? তাদের মধ্যে কি হ্যারিস গেনার নামে একজন কলেজের লেকচারার আছেন?
তা বলতে পারব না। ওদের সঙ্গে দেখা হয়নি আমার। যে জেলের কাছে গুহার কথা শুনেছি, লোকগুলোর কথাও সেই বলেছে।
জেলের নাম কি? ওকে কোথায় পাওয়া যাবে?
আপাতত পাওয়া যাবে না ওকে। ওর মায়ের শরীর খারাপ, তাকে দেখতে গেছে। অনেক দূরে থাকে ওর মা। কিশোরের চোখের দিকে তাকাল। হ্যারি। মনে হচ্ছে নোক দুজনকে তোমাদের দরকার?
না না, এমনি, গুহাটার ব্যাপারে কৌতূহল হচ্ছে তো, ওদের মুখ থেকেই সক শুনতাম, কোনমতে দায়সারা জবাব দিয়ে হ্যারির প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল। সে।
ক্যাম্প করার জন্যে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো চাইল কিশোর। এগুলো নিয়ে, খাবার আর জিনিসের দাম মিটিয়ে, হ্যারিকে ধন্যবাদ দিয়ে দরজার দিকে এগোল।
গুহার কাছে না যাওয়ার জন্যে আরেকবার ওদেরকে সতর্ক করল দোকানদার।
.
মহাসড়ক ধরে মাইল পাঁচেক এগোনোর পর ডানে একটা সরু কাঁচা রাস্তা দেখা গেল। এবড়োখেবড়ো, নুড়িতে ভরা রাস্তাটা চলে গেছে সৈকতের ধারে তৈরি একসারি বাড়ির দিকে। জেলেদের বাড়ি ওগুলো।
রাস্তাটা ধরে গাড়ি চালাল মুসা। দুশো গজ দূরে পাহাড়ের গোড়ায় গিয়ে সৈকতটা যেখানে আচমকা শেষ হয়েছে সেখানে একটা ছোট বাড়ি। ওটার খানিক দূরে পাহাড়ের পাথুরে দেয়ালে আছড়ে পড়ছে ঢেউ। বাড়ির পেছনে পাহাড়, একটা আঁকাবাঁকা পথ উঠে গেছে চুড়ার দিকে।
ওটাই সভবত রিক ডেলভারের বাড়ি, হাত তুলে দেখিয়ে কিশোর বলল।
যাব নাকি ওদিকে? জানতে চাইল মুসা।
যাও।
বাড়ির কাছ থেকে সামান্য দূরে এনে গাড়ি রাখল মুসা। নেমে গেল। কিশোর আর রবিন। ড্রাইভিং সীট থেকে মুসাও নেমে এসে এগোল ওদের পেছন পেছন।
দরজায় টোকা দিল কিশোর।

খুলে দিল একজন বেঁটে লোক। বুড়ো হয়ে গেছে। ভাঁজ পড়া, খসখসে মুখের চামড়া। তিন গোয়েন্দাকে দেখে অবাকই হলো। যেন ওদের মত কাউকে এখানে দেখতে পাবে আশা করেনি।
আপনি রিক ডেলভার? প্রশ্ন করল কিশোর।
মাথা ঝাঁকাল লোকটা। হাসল।
মূসার গাড়িটা দেখিয়ে কিশোর বলল, গাড়িটা রাখলাম। কোন অসুবিধে হবে?
না, অসুবিধে হবে না। ঘুরতে যাবে নাকি? কতক্ষণ লাগবে তোমাদের? ঘণ্টাখানেক?
আসলে কয়েকদিন থাকব ভাবছি। যদি আপনার কোন অসুবিধে না হয়...
গুহা দেখতে আসোনি তো? মুখের ভাব বদলে গেছে বুড়োর। চোখ পিটপিট করে একবার এর দিকে, একবার ওর দিকে তাকাচ্ছে।
ঠিকই ধরেছেন, গুহা দেখতেই এসেছি।
হাসি চলে গেছে বুড়োর। ভারী গলায় বলল, ভাল চাও তত বাড়ি ফিরে যাও। গুহার অবস্থা ভাল না। খামোকা কেন প্রাণটা খোয়াতে যাবে।
কে, রিক? ঘরের ভেতর থেকে প্রশ্ন করল একটা মহিলাকণ্ঠ, কার সঙ্গে কথা বলছ?
এই তো, কয়েকটা ছেলে, বেড়াতে এসেছে, ফিরে তাকিয়ে জবাব দিল রিক। গুহা দেখতে যেতে চায়।
বলে কি! ভেতর থেকে বেরিয়ে এল গোলগাল এক মহিলা।
এত ভয় পাচ্ছেন কেন আপনারা? জিজ্ঞেস করল কিশোর। কি আছে গুহায়?
আলো আর গুলি! রহস্যময় স্বরে জবাব দিল বুড়ো।
লোকজন দেখেছেন? আছে ভেতরে?
কারও ছায়াও নেই।
তাহলে গুলি করে কারা?
জানি না!
অবাক কাণ্ড!
অবাক বলে অবাক! এক্কেবারে ভূতুড়ে কাণ্ড! খোদাই জানে এ কোন ধরনের ভূত, গুলিও চালায়!
হাঁ হয়ে গেছে মুসা। চট করে তাকাল চারপাশে। গায়ে কাঁটা দিল ওর। মনে হলো, গুহা থেকে বেরিয়ে এই বুঝি ওর ঘাড় মটকাতে এল কোন ভূত।
ওই গুহায় কখনও ঢুকেছেন আপনি, মিস্টার ডেনভার? জানতে চাইল কিশোর।
এত লম্বা নামের দরকার নেই, আমাকে শুধু রিক ডাকলেই চলবে, বুড়ো বলল। জানাল কয়েকদিন আগে নাকি রাতে মাছ ধরতে বেরিয়েছিল। আবহাওয়া ভাল

ছিল না। বাতাস আর সেই সঙ্গে বড় বড় ঢেউ। তীর থেকে কিছুদূর যাওয়ার পর হঠাৎ দেখল আলো। বুড়ো বলল, গুহার কাছে দুটো আলো দেখলাম। খানিক পর দুতিনটে গুলির শব্দ। চিৎকার করে উঠল কে যেন।
চিৎকারটা কেমন? আর্তনাদ? মানে কাউকে খুন করা হচ্ছে, এমন?
সে বলে বোঝানো যাবে না। এমন চিৎকার জীবনে শুনিনি আমি। ভয়ঙ্কর!
তারমানে বোঝা যাচ্ছে, বিড়বিড় করল রবিন, ভেতরে কেউ আছে। দোকানদার হ্যারির কাছেও শুনলাম এই গপ্পো। পুলিশকে জানালেই পারেন?
জানানো হয়েছে। পুলিশ এ সব বিশ্বাস করে না। বুড়ো জেলেদের কুসংস্কার বলে হেসে উড়িয়ে দেয়। একটিবার দেখতেও আসেনি গুহাটা।
ভয় দেখিয়ে নিরস্ত করা গেল না তিন গোয়েন্দাকে।
কিশোর জিজ্ঞেস করল, গুহায় যাওয়ার সবচেয়ে সহজ পথটা বলতে পারেন?
কোনভাবেই নিরস্ত করতে না পেরে হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গি করল বুড়ো। জেলে। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তাকিয়ে রইল ওদের দিকে। তারপর নেমে এল দরজা থেকে। ওদেরকে নিয়ে সৈকত ধরে কিছুদূর চলার পর হাত তুলে পাহাড়ে উঠে যাওয়া রাস্তাটা দেখিয়ে বলল, ওটা ধরে চূড়ায় উঠে যাও। নিচে তাকালে ওপাশে একটা খাদ দেখতে পাবে। ওই খাদ ধরে এগোতে থাকলে পেয়ে যাবে গুহাটা।
গাড়ির কাছে ফিরে এল ওরা। ক্যাম্প করার জিনিসপত্র বের করে কাঁধে তুলে নিল। জেলে দম্পতিকে ধন্যবাদ জানিয়ে রওনা হয়ে গেল পাহাড়ের দিকে।
দূর থেকে যতটা মনে হয়েছিল, তারচেয়ে খাড়া পাহাড়টা। চূড়ায় উঠতে পুরো একটা ঘণ্টা লেগে গেল।
এক অপূর্ব দৃশ্য দেখা গেল ওপর থেকে। অনেক নিচে সৈকতে জেলেদের ঘরগুলোকে খেলনার মত লাগছে। সাগরকে মনে হচ্ছে বিশাল এক নীল রঙের মেঝে, ঘরের মেঝের মতই সমান।
চুড়ার অন্যপাশে সাগরের দিকটার একেবারে কিনারে গিয়ে নিচে তাকাল রবিন। পাথরের খাড়া দেয়াল নেমে গেছে। নিচে আছড়ে পড়ছে। উত্তাল ঢেউ। শক্ত জাতের কিছু ঝোপঝাড় জন্মে রয়েছে এখানে ওখানে।
সৈকত ধরে হেঁটে গুহায় যাওয়া অসম্ভব, অনুমান করল সে। সাগরের দিক দিয়ে যেতে হলে নৌকায় করে যেতে হবে।
ঝোড়ো বাতাসে ভর করে ভেসে এল মেঘের শুড়গুড়ু। আকাশের দিকে তাকিয়ে মুসা বলল, জলদি চলো। ঝড় আসছে। এখানে থাকলে মরব।
বড় বড় পাথরের চাঙড়ের মধ্যখান দিয়ে চলে গেছে সরু পায়ে চলা পথ। সেটা ধরে হাঁটতে শুরু করল ওরা। একটু পর পরই সরে গিয়ে নিচে তাকাচ্ছে রবিন। গিরিখাদটা দেখতে পাচ্ছে না। অবিশ্বাস্য দ্রুত মেঘে ঢেকে ফেলছে। আকাশ।

অন্ধকার করে ফেলেছে। এর মধ্যে খাদটা চোখে পড়বে কিনা তাতেও সন্দেহ আছে। হয়তো দেখা যাবে হঠাৎ করেই ওটাতে নেমে পড়েছে। ওরা।
মুখে এসে পড়ল বৃষ্টির কয়েকটা ফোঁটা। কালো আকাশকে চিরে দিয়ে ছুটাছুটি শুরু করল বিদ্যুতের তীব্র উজ্জ্বল নীলচে-সাদা সাপগুলো। কানফাটা বিকট শব্দে ঘন ঘন বাজ পড়তে লাগল। শুরু হলো ঝমঝম করে মুষলধারে বৃষ্টি।
তা বাড়ছে বাতাসের বেগ। অনেক নিচে পাথুরে দেয়ালে কামানের গর্জন তুলে ভাঙছে ঢেউ। চলতে গিয়ে বার বার হোঁচট খাচ্ছে গোয়েন্দারা। সামনের পথ ঠিকমত চোখে পড়ছে না। ভোতা গোঁ গোঁ শব্দ তুলছে বাতাস, আকাশে বিদ্যুতের চমক, আর চলছে একনাগাড়ে বজ্রপাত।
আগে আগে চলেছে মুসা। মাঝে কিশোর, সবার শেষে রবিন। বৃষ্টি আর বাতাসের অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্যে মাথা নুইয়ে রেখেছে। বুঝতে পারছে না এই দুর্যোগের মধ্যে আদৌ খুঁজে পাবে কিনা গিরিখাদটা।
হঠাৎ কি মনে হতে ফিরে তাকাল কিশোর। ধড়াস করে উঠল বুক। চিৎকার করে উঠল, আরি, রবিন গেল কোথায়!
উধাও হয়েছে রবিন। শত চিৎকার করেও তার সাড়া পাওয়া গেল না।

.

গেল কোথায়? বিমূঢ় হয়ে গেছে মুসা।
প্রবল বৃষ্টি আর অন্ধকারের মধ্যে দৃষ্টি চলে ভালমত। কয়েক গজ দূরের জিনিসও দেখা যাচ্ছে না।
ফিরে যাওয়া দরকার, কিশোর বলল। কোন কারণে আমাদের কাছ থেকে পিছিয়ে গিয়ে থাকতে পারে। কিংবা ক্লান্ত হয়ে গিয়ে কোথাও বসে বিশ্রাম নিচ্ছে।
বলল বটে, কিন্তু কথাটা সে নিজেও বিশ্বাস করল না।
প্রায় গা ঘেষাঘেঁষি করে ভেজা পিচ্ছিল পাথরের ওপর দিয়ে ফিরে চলল দুজনে। বার বার চিৎকার করে রবিনের নাম ধরে ডাকছে। জানে, ঝড়ের গর্জনের মধ্যে এই চিৎকার রবিনের কানে পৌঁছার সম্ভাবনা খুব কম।
অ্যাই, শঙ্কিত হয়ে বলল মুসা, পা পিছলে পড়েটড়ে যায়নি তো! হাত পা ভেঙে পড়ে পড়ে কাতরাচ্ছে হয়তো কোথাও এখন।
থমকে দাঁড়াল কিশোর। হতে পারে। দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল দীর্ঘ একটা মুহূর্ত। ফ্যাকাসে হয়ে যাওয়া গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে বৃষ্টির পানি। কান পেতে শুনতে লাগল কোথাও কিছু শোনা যায় কিনা।
বাতাসের শব্দকে ছাপিয়ে আগে মুসার কানে ঢুকল শব্দটা। অতি মৃদু চিৎকার।
খাইছে! শুনছ!
কিশোরও কান পাতল।

আবার শোনা গেল চিৎকার, মুসা! কিশোর!
পিছলে পড়ার ভয়কে পরোয়া না করে পাহাড়ের কিনারে ছুটে গেল দুজনে। উঁকি দিয়ে নিচে তাকাল। ফুট চারেক নিচে একটা কালো দেহ চোখে পড়ল।
রবিন, কোন সন্দেহ নেই। একটা ঝোপ আঁকড়ে ধরে ঝুলছে। ওদেরকে উঁকি দিতে দেখে প্রায় ককিয়ে উঠল, জলদি করো! গাছের গোড়া উপড়ে আসছে।
ধরে রাখো! মুসা বলল। রবিনকে ধরে তুলে আনার চেষ্টা করল। নাগালই পেল না। দমে গেল সে।
এ ভাবে পারবে না, কিশোর বলল। দাঁড়াও, ব্যবস্থা করছি।
দড়ি বের করল সে। এক মাথা পাথরের সঙ্গে বেঁধে আরেক মাথা ঝুলিয়ে দিল রবিনের নাগালের মধ্যে।
এক হাত বাড়িয়ে থাবা দিয়ে দড়িটা ধরে ফেলল রবিন। একেবারে শেষ মুহূর্তে। সেও দড়ি ধরল, ঝোপের গোড়াটাও উপড়ে এল পাহাড়ের গা থেকে। ধক করে উঠল বুক। একটা হার্টবীট মিস হয়ে গেল তার।
দড়ি ধরে টেনে ওকে ওপরে তুলে আনল মুসা আর কিশোর।
ওপরে উঠে ভেজা মাটিতেই গড়িয়ে পড়ল রবিন। জোরে জোরে হাঁপাচ্ছে। ভীষণ ক্লান্ত।
ওখানে গেলে কি করে? জানতে চাইল মুসা।
একটু শান্ত হওয়ার পর রবিন বলল, জুতোর ফিতে ছিঁড়ে গিয়েছিল। হাঁটতে অসুবিধে হচ্ছিল বলে বসে ছেঁড়া মাথাটা বাধলাম। উঠে দেখি তোমরা নেই। ধরার জন্যে দৌড়াতে শুরু করলাম। এত কিনারে যে চলে গিয়েছিলাম, বুঝতে পারিনি। হঠাৎ একটা পাথর ভেঙে সরে গেল পায়ের নিচ থেকে। পিছলে পড়ে গেলাম। গাছটা কখন কিভাবে ধরেছি বলতে পারব না।
কয়েক মিনিট বিশ্রাম নিয়ে আবার এগিয়ে চলল তিন গোয়েন্দা। এবার আর কেউ পেছনে পড়ে রইল না। দেয়ালের বেশি কিনারেও গেল না।
আচমকা চিৎকার করে উঠল মুসা, পেয়ে গেছি। খাদ!
হুড়াহুড়ি করে তার দুপাশে চলে এল অন্য দুজন। সামনে গলা বাড়িয়ে তাকাল। পাহাড়ের গায়ে গভীর একটা ক্ষতের মত হয়ে আছে খাদটা।
সাবধানে তিনজনেই পা রাখল ওটাতে। অনেক নিচে আবছাভাবে চোখে পড়ল সৈকত। বড় বড় ঢেউ আছড়ে ভাঙছে তীরে। চওড়া একটা বিরাট ফাটলের মত পাহাড়ের গা বেয়ে ঘুরে ঘুরে নেমে গেছে গিরিখাদ। পথ গেছে তার মধ্যে দিয়েই। নামতে শুরু করল তিনজনে।
সবার আগে নিচে নামল রবিন।
ওই দেখো! গুহা! হাত তুলে চিৎকার করে বলল সে।

কিশোর আর মুসাও দেখল। সাগরের আছড়ে পড়া ঢেউয়ের সামান্য দূরে পাহাড়ের খাড়া দেয়ালে একটা কালো ফোকর।
গুহার দিকে আগে এগোনোর সাহস হলো না মুসার। কোমরে ঝোলানো টর্চ খুলে পা বাড়াল কিশোর। আগে আগে চলল। তার পেছনে এগোল অন্য দুজন।
গুহামুখে দাঁড়িয়ে ভেতরে আলো ফেল কিশোর। তিনজনেই দেখল, গুহা না বলে ওটাকে সুড়ঙ্গ বলা ভাল। কালো কক্ষটার পেছন দিকটা হারিয়ে গেছে ভেতরের ঘন কালো অন্ধকারে।
ইচ্ছে করলে কি আছে ভেতরে এখনই দেখা যায়, কিশোর বলল।
মাথা খারাপ! আঁতকে উঠল মুসা। রাতের বেলা এই ঝড়বৃষ্টির মধ্যে যাব গুহায় ঢুকতে!
গুহার ভেতরে তো আর বৃষ্টি নেই।
তাতে কি? বাইরে তাঁবু পাতব আগুন জ্বালতে হবে। ভিজে একেবারে হাত-পা সিটিয়ে গেছে।
দেখো, গুহায় থাকলে আরামে থাকতে পারতাম...
এখন আমি ঢুকতে পারব না, সাফ মানা করে দিল মুসা।
আগুন জ্বালার লাকড়ি পাবে কোথায়? প্রশ্ন করল রবিন।
তাই তো? একথা তো ভাবেনি। জবাব দিতে পারল না মুসা। আশোঁপাশে গাছপালা আছে, লাকড়ির অভাব হত না, কিন্তু সব ভিজে চুপচুপে।
লাকড়ির যা হোক একটা ব্যবস্থা করো তোমরা, কিশোর বলল, আমি আসছি।
গুহায় ঢোকার জন্যে পরদিন সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারল না সে। টর্চ হাতে ঢুকে পড়ল। কয়েক পা এগিয়েই চিৎকার করে উঠল, অ্যাই, দেখে যাও কাণ্ড!
তার চিৎকারে মুসাও সাবধান হবার কথা ভুলে গেল। রবিনের সঙ্গে ছুটে এল।
কি দেখেছে টর্চের আলো নেড়ে দেখাল কিশোর, লাকড়ি! শুকনো?
সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা লাকড়ির স্তূপটা দেখল রবিন। কে রাখল?
সেটাই তো বুঝতে পারছি না!
আ-আমি জানি...
ভূতে...
তাড়াতাড়ি রবিনের মুখে হাতচাপা দিল মুসা, খবরদার, ওই নাম মুখে এনো না!
ভয়ে ভয়ে চারপাশে তাকাতে লাগল সে।
ওদের কথায় কান না দিয়ে এগিয়ে গেল কিশোর। একটা লাকড়ি হাতে তুলে নিল। খটখটে শুকনো। হাসিমুখে ফিরে তাকিয়ে বলল, এবার আর আগুন জ্বালতে কোন অসুবিধে নেই।

কিন্তু কার লাকড়ি? জোরে কথা বলতে সাহস করছে না মুসা।
যারই হোক, আমাদের এখন দরকার, নিয়ে আগুন জ্বালব। তারপর দেখা যাবে।
তারমানে গুহাতেই থাকবে তুমি?
তো কি বাইরে গিয়ে সারারাত ধরে ভিজব নাকি? বোকামি করতে ইচ্ছে করলে তুমি করোগে, আমি যাচ্ছি না।
আমিও না,বলে দিল রবিন।
অগত্যা আর কি করে মুসা। বাইরে একা থাকার চেয়ে ভূতের ভয় নিয়েও গুহায় থাকা ভাল। সঙ্গে অন্তত দুজন সঙ্গী তো থাকছে। কোন কথা না বলে লাকড়ি জড় করে আগুন জালার ব্যবস্থা করতে লাগল সে। খিদে পেয়েছে।
ব্যাকপ্যাক খুলে ভেজা কাপড় খুলতে শুরু করল রবিন।
আগুন ধরিয়ে ফেলল মুসা। ধোঁয়া উঠছে অগ্নিকুণ্ড থেকে। ভুরু কুঁচকে সেদিকে তাকিয়ে রইল কিশোর আগুন তো জ্বালা হলো, ধোঁয়া যাবে কোথায়? বেরোনোর পথ না থাকলে অক্সিজেন শেষ করে দিয়ে দম আটকে মারবে ওদের।
কিন্তু স্বস্তির সঙ্গে দেখল, সোজা ওপরে উঠে কোথাও হারিয়ে যাচ্ছে ধোঁয়া। তারমানে ফাটল আছে পাহাড়ের গায়ে, চিমনির কাজ করছে।
ভেজা কাপড় বদলে, শরীরে কম্বল জড়িয়ে, আগুনে হাত-পা সেকে গরম করতে লাগল ওরা। কিশোর ভাবছে, কে লাকড়ি রাখল এখানে? এর সঙ্গে কি রহস্যময় চিৎকার আর গুলির কোন সম্পর্ক আছে?
উঁকি দিয়ে গিয়ে গুহার বাইরেটা দেখে এল রবিন। বৃষ্টি একবিন্দু কমেনি। কিশোরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, এখানে কি জোয়ারের পানি ঢোকে?
মনে হয় না। মেঝে তো শুকনোই দেখছি।
খাবারের টিন আর ফ্রাইং প্যান বের করে রান্না করতে বসল মুসা। তাকে সাহায্য করল রবিন। মাংস ভাজার সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ল বাতাসে। মুসার ক্ষুধা দশগুণ বাড়িয়ে দিল। চমৎকার জমল খাওয়া। গুহার মাঝখানে অগ্নিকুণ্ড, দেয়ালে আর ছাদে লালচে আলোয় ছায়ার নাচন, বাইরে ঝড়বৃষ্টি। দারুণ এক পরিবেশ। আগুনের সামনে বসে গোগ্রাসে গিলতে শুরু করল তিনজনেই।
রবিন বলল, কম্বলের বদলে এখন পশুর ছাল পেলে ভাল হত। গুহামানব হয়ে যেতাম।
খাওয়ার পর কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়ল ওরা। সারাদিনে প্রচুর পরিশ্রম করেছে। বুজে আসছে চোখ। কথা বলতে বলতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়ল বলতে পারবে না।
চড়চড়, ফুটফাট, নানা রকম বিচিত্র শব্দ করে পুড়তে থাকল লাকড়ি।
এক ঘণ্টা কাটল।
দুই ঘন্টা।

হঠাৎ জেগে গেল রবিন। অলস ভঙ্গিতে ঘুরে পাশ ফিরে শুতে গিয়ে পুরো সজাগ হয়ে গেল। পায়ের শব্দ শুনতে পেয়েছে।
কনুইয়ে ভর দিয়ে মাথা তুলে কে আসছে দেখার চেষ্টা করল। আগুন নিভে গেছে। পুড়ে শেষ হয়ে গেছে কাঠ। কেবল কয়লার আগুন লালচে একটা আভা তৈরি করে অতি সামান্য আলো দিচ্ছে।
কাউকে না দেখে ভাবল রবিন, কিশোর উঠেছে বুঝি, প্রাকৃতিক কর্ম সারার জন্যে। ডেকে জিজ্ঞেস করুল, কে, কিশোর?
সাড়া দিল না কিশোর। জবাবে চাপা শব্দ করে উঠল কে যেন। মনে হলো খুব অবাক হয়েছে। মেঝের ওপর দিয়ে দ্রুত ছুটে গেল পদশব্দ।

.
কে? লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল রবিন।
জবাব নেই।
কিশোর! মুসা! জলদি ওঠো! অন্ধকারে টর্চটার জন্যে হাতড়াতে শুরু করলা সে।
কি হয়েছে? ঘুমজড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল মুসা। সকাল হয়ে গেল নাকি? এত তাড়াতাড়ি
ওঠো, জলদি! কে জানি ঢুকেছে!
কি করে বুঝলে?
হাঁটতে শুনলাম।
কিশোর হবে হয়তো। টয়লেট করতে বেরিয়েছিল।
আমি বেরোইনি, জবাব দিল কিশোর।
খাইছে? তাহলে কে? চমকে উঠে বসল মুসা। বদলে গেছে কণ্ঠস্বর। আগুনটার কি হলো টর্চ জালছ না কেন?
হাতের কাছেই টর্চ রেখেছে কিশোর তুলে নিয়ে জালল। আলোর রশ্মি ঘুরিয়ে আনল গুহার দেয়ালে, ছাদে। অপরিচিত কাউকে দেখা গেল না।
চোখ পিটপিট করছে মুসা। রবিনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, কি শুনেছিলে, বলো তো?
খুলে বলল রবিন।
সামনের দিকে গেছে? জানতে চাইল কিশোর।
মাথা নাড়ল রবিন, না, পেছনে। সুড়ঙ্গের ভেতরে।
ওঠো, দেখে আসি।
এই এখন, অন্ধকারের মধ্যে..চোখ বড় বড় হয়ে গেল মুসার।
সুড়ঙ্গের মধ্যে দিনের বেলাও যা রাতেও তাই, সব সময়ই অন্ধকার, ভোরের জন্যে বসে থেকে লাভ নেই।

উঠে পড়ল কিশোর। টর্চ হাতে এগোল গুহার পেছন দিকে।
তিরিশ কদম এগোনোর পর সামনে একটা খিলান দেখা গেল, ওপরটা ধনুকের মত বাকা। গুহা থেকে সুড়ঙ্গে ঢোকার প্রবেশপথ। পেছনে তাকিয়ে দুই সহকারীর দিকে নীরবে মাথা ঝাঁকিয়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে। সামনে টর্চ অব্রে রেখে সাবধানে এগোল। খেয়াল রাখল যাতে চোরা গর্তে না পড়ে।
খুব খাটো সুড়ঙ্গ, লম্বায় বড়জোর পনেরো ফুট, মেঝে থেকে ছাদ ছয় ফুট উঁচু কঠিন পাথুরে মেঝেতে পায়ের ছাপ পড়ে না। সুতরাং কেউ এসে থাকলেও ছাপ দেখে বোঝার উপায় নেই।
সুড়ঙ্গটা দিয়ে আরেকটা গুহায় ঢোকা যায়।
রবিন বলল, মনে হয় অনেক গুহা আছে এখানে। সুড়ঙ্গ দিয়ে যুক্ত। কোনটা দিয়ে কোনটায় ঢুকে গেছে লোকটা কে জানে।
আলো ফেলে দেখতে লাগল কিশোর। বিশাল এক গুহায় ঢুকেছে। চারপাশের দেয়ালে অনেক গর্ত, সুড়ঙ্গমুখ ওগুলো, বুঝতে অসুবিধে হলো না।
ঠোঁট কামড়াল কিশোর। আনমনে বিড়বিড় করল, একডজন গর্ত। কোনটা দিয়ে ঢুকেছে লোকটা, কি করে বুঝব?
চলো, প্রথমে সবচেয়ে বড়টা ধরেই যাই, পরামর্শ দিল মুসা। না পেলে ফিরে এসে বাকিগুলোতে ঢুকে দেখব।
ভাল বলেছ। চলো।
সোজা এগিয়েছে বড় সুড়ঙ্গটা। কিছুদূর এগিয়ে থমকে দাঁড়াল কিশোর।
আরেকটু হলে তার গায়ের ওপর এসে পড়ত মুসা। কি হলো?
দেখো! মাটির দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর।
ওর কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখে বলে উঠল মুসা, আরি, পায়ের ছাপ।
পাহাড়ের গভীরে সুড়ঙ্গের মেঝেতে এখানে পাথর নেই, বালি। তার ওপর ভেজা ভেজা। সুতরাং ছাপ পড়েছে। স্পষ্ট বসে গেছে বুটের ছাপ।
মনে হয় ঠিক পথেই এগোচ্ছি আমরা, কিশোর বলল। এসো।
উত্তেজিত হয়ে উঠেছে তিনজনেই। ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে ঢুকল আরেকটা গুহায়। এটাও বিশাল। এখানে যতগুলো দেখেছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বড়। তিনটে টর্চের মিলিত আলোতেও দেয়াল বা ছাদের সমস্ত জায়গী একবারে দেখা গেল না।
পাথরের ছড়াছড়ি এখানে। মেঝেতে পাথর স্তূপ হয়ে আছে। দেয়ালে অসংখ্য সুড়ঙ্গমুখ।
আলো আরও বেশি হলে ভাল হত, রবিন বলল, ভাল করে দেখতে পারতাম।

আলোর ব্যবস্থা হয়তো করা যায়, চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। কিন্তু কত সুড়ঙ্গ দেখেছ? পাহাড়ের নিচে জালের মত বিছিয়ে আছে। সবগুলো দেখতে হলে অনেক সময় লাগবে। ততক্ষণ বসে থাকবে না লোকটা, যার পেছনে লেগেছি।
তবু আরেকটু খুঁজে দেখা দরকার।
আলোর ব্যবস্থা কি করে করবে? জানতে চাইল মুসা।
লাকড়ি দিয়ে মশাল বানাতে পারি, জবাব দিল কিশোর। তিনজনের হাতে তিনটে মশাল থাকলে অনেক আলো হবে। তা ছাড়া টর্চের ব্যাটারি ফুরানোরও ভয় থাকবে না।
চলো তাহলে, বানিয়ে নিয়ে আসি।
প্রথম গুহাটায় ফিরে এল ওরা।
লাকড়ির স্তূপের দিকে এগোতে গিয়ে ভুরু কুঁচকে গেল রবিনের। চেঁচিয়ে উঠল, একি!
কি হলো? একসঙ্গে জিজ্ঞেস করল কিশোর আর মুসা।
তাকিয়ে আছে রবিন। টর্চের আলো ফেলেছে যেখানে ওদের জিনিসপত্র রেখেছিল সেখানে। খাবারের টিনগুলো সব গায়েব। পড়ে আছে কেবল খাওয়া পাউরুটির খানিকটা অবশিষ্ট আর মাছের একটা খালি টিন।
নিয়ে গেছে! কিশোর বলল।
নিশ্চয় সেই লোকটা, বলল রবিন, যার পেছনে আমরা লেগেছি। আমরা জেগে যাওয়ায় লুকিয়ে পড়েছিল। যেই আমরা গুহা থেকে বেরিয়েছি, চুপচাপ বেরিয়ে এসে খাবারগুলো সব চুরি করে নিয়ে পালিয়েছে।
খাবার আমাদের দরকার নেই আপাতত, কিশোর বলল, ওব্যাপারে চিন্তা না করলেও চলবে। চলো, যা করছিলাম, করি। লোকটাকে খুঁজে পেলে খাবারগুলোও ফেরত পাব।
ওর সঙ্গে কথা আছে আমার, রাগ চেপে বলল মুসা।
কথা আমাদেরও আছে।
কিন্তু গেল কোনদিকে? রবিনের প্রশ্ন।
জুতোর ছাপ যেখানে পেয়েছি, তার আশোঁপাশেই আছে হয়তো। যেখান থেকে এইমাত্র ফিরে এলাম ওদিকেই খুজব।
বাইরে চলে গিয়ে থাকে যদি?
মাথা নাড়ল কিশোর, মনে হয় না। এই ঝড়বৃষ্টির মধ্যে বোঝা নিয়ে বাইরে বেরোবে না সে। লুকিয়ে আছে এই পাহাড়ের নিচেই কোথাও।
হাতে কয়েকটা করে লাকড়ি নিয়ে বড় গুহাটায় আবার এসে ঢুকল তিনজনে। মশালের আলোয় ভাল করে দেখতে লাগল গুহাটা। এত বেশি সুড়ঙ্গমুখ আর

ফাটল দেখা গেল, সবগুলোতে ঢোকার কথা ভেবে দমে গেল ওরা।
তবে হাল ছাড়ল না। একধার থেকে খোঁজা শুরু করল। কোনটা ছোট সুড়ঙ্গ, কোনটা বেশ লম্বা। কোন কোন ফাটলের ওপাশে কয়েক হাত দূরেই দেয়াল।
কোনখানেই লোকটার আর কোন চিহ্ন দেখা গেল না।
হতাশ হয়ে মুসা বলল, অহেতুক খুঁজে আর লাভ নেই। চলো, চলে যাই।
প্রথম গুহাটায় ফিরে চলল আবার ওরা।

.

বাকি রাতটা নিরাপদেই কাটল।
ঘুম ভাঙতে দেখল ওরা, ঝড়বৃষ্টি থেমে গেছে। গুহা থেকেই চোখে পড়ল সাগরের রোদ ঝলমলে নীল জল! পর
পেটে মোচড় দিল মুসার। জিজ্ঞেস করল, কি করব? খাবার তো একদম নেই। আনতে যেতে হবে না?
হবে, বলে চুপ করে ভাবতে লাগল কিশোর।
রবিন বলল, লোকটাকে এখন আরেকবার খুঁজতে বেরোলে কেমন হয়?
ওকে পেলেই সমস্যা চুকে যায়, খাবারগুলো আদায় করে নিতে পারব।
মাথা নাড়ল কিশোর। লাভ হবে বলে মনে হয় না। রাতেই যখন পাইনি, ও কি আর এখন আমাদের জন্যে বসে আছে নাকি?
মুসা বলল, অ্যাই, কিশোর, এক কাজ তো করতে পারি, আমার মেটাল ডিটেক্টরটাকে কাজে লাগাতে পারি…
তাতে কি হবে? বাধা দিল রবিন। তুমিই তো সেদিন বললে এই যন্ত্র মানুষ খুঁজে বের করতে পারে না…
মানুষ না পাক, সূত্র তো খোঁজা যায়। এমনও তো হতে পারে, টিনগুলো সঙ্গে না নিয়ে আশপাশেই কোথাও লুকিয়ে রেখে গেছে লোকটা? ভারী বোঝা, একার পক্ষে বয়ে বেশিদুর নেয়া কষ্টকর।
ওর কথায় যুক্তি আছে। তবে অতটা আশা করতে পারল না বলে চুপ করে রইল কিশোর।
রবিন বলল, দেখো আধাঘণ্টা, তারপর না পেলে অহেতুক সময় নষ্ট না করে খাবার আনতে যাওয়াই উচিত হবে আমাদের। শরীরে শক্তি থাকতে থাকতে যাওয়া ভাল, এই পাহাড় পেরোনো চাট্টিখানি কথা না। কি বলো, কিশোর?
মাথা ঝাঁকিয়ে তার সঙ্গে একমত হলো কিশোর।
মেটাল ডিটেক্টর নিয়ে কাজে লেগে গেল মুসা। তার ইচ্ছে কোনভাবে যন্ত্রটাকে ব্যবহার করা, খাবার পাক আর না পাক।

তবে কয়েক মিনিট যেতে না যেতেই ওদেরকে অবাক করে দিয়ে সঙ্কেত দিতে শুরু করল যন্ত্রটা। গুহামুখের কাছে যেখানে সঙ্কেত দিল সেখানে হুমড়ি খেয়ে পড়ল মুসা। একটা পাথরের আড়াল থেকে বের করল জিনিসটা। তুলে দেখাল সঙ্গীদের।
তাকিয়ে আছে রবিন, কি জিনিস?
পিস্তল! খুশিতে দাঁত বেরিয়ে পড়েছে মুসার। জলদস্যুর জিনিস, কোন সন্দেহ নেই। নিশ্চয় জাহাজডুবি হয়ে এখানে এসে উঠেছিল ওরা। বহুদিন আগে।
দেখি তো? হাত বাড়াল কিশোর।
হাতে নিয়ে ভাল করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে আবার মুসাকে ফেরত দিতে দিতে বলল, বেশি পুরানো তো মনে হচ্ছে না।
রবিনও দেখল। তাই তো। একেবারেই মরচে পড়েনি। কোম্পানির নামটাও পড়া যাচ্ছে-স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন।
হ্যাঁ, স্পেনের তৈরি, কিশোর বলল।
আচ্ছা, এটা দিয়েই গুলি করা হয়নি তো? কিশোরের দিকে তাকাল রবিন। গুহার মধ্যে রহস্যময় যে গোলাগুলির কথা বলল জেলেরা?
ওদের কথাবার্তায়, অবাক হয়ে দুজনের মুখের দিকে তাকাতে লাগল। মূসা। এ সব বলে কি বোঝাতে চাইছ তোমরা?
বোঝাতে চাইছি, পিস্তলটা অত পুরানো নয়, যতটা তোমার মনে হচ্ছে।
তারমানে জলদস্যু নয়? আধুনিক পিস্তল দিয়ে আধুনিক কাজকারবার করছে কোন আধুনিক মানুষ?
মাথা ঝাঁকাল কিশোর।
কাকে সন্দেহ হয় তোমার? মুসার প্রশ্ন 1 রহস্যময় হ্যারিস গেনার? মেরিন ডিগ?
হতে পারে, এখনও জানি না। তবে ডিগকেই বেশি সন্দেহ হয়।
সেই পিস্তলটা ফেলে গেছে এখানে?
তাও জানি না।
কেন ফেলবে?
সেটা জানলে তো অনেক প্রশ্নের জবাবই পেয়ে যেতাম।
দারুণ! একটা জটিল রহস্যের সূত্র খুঁজে বের করে দিলাম, দেখা যাক। আরও পারি কিনা। ক্ষুধার কথা ভুলে গিয়ে মেটাল ডিটেক্টর নিয়ে আবার কাজে লেগে গেল মুসা।
খুঁজতে খুঁজতে গুহা থেকে বেরিয়ে সৈকতে চলে এল। বালিতে ঢাকা জায়গাটা সরে গেছে বিশাল কালো একটা পাথরের টিলার দিকে। সেটা ঘুরে আসতেই পাহাড়ের গায়ে একটা ফোকর দেখা গেল।

আরেকটা গুহা! ভুরু কুঁচকে ফেলল কিশোর।
ডিটেক্টর হাতে হাসিমুখে ওটার দিকে এগোল মুসা। এক গুহার মুখে পেয়েছে পিস্তল, আরেকটার মুখেও যদি কিছু পাওয়া যায়, এই আশায়।
গেল পাওয়া, সত্যিই! তবে ওটা পেতে ডিটেক্টর লাগল না, খালি চোখেই দেখা গেল গুহামুখের ঠিক ভেতরে একটা কাঠের তক্তা পুতে তাতে কাগজে কি যেন লিখে আঠা দিয়ে সাটিয়ে দেয়া হয়েছে। নিচের দিকের আঠা ছুটে গিয়ে বাতাসে ফড়ফড় করছে কাগজটা। তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে টেনে সোজা করে পড়ল রবিন। কালো কালি দিয়ে বড় বড় করে লেখা হয়েছে:
প্রবেশ নিষেধ।
বিনা অনুমতিতে ঢুকলে সেটাকে
বেআইনী বলে গণ্য করা হবে।
লেখাটা তিনজনকেই অবাক করল। মুসা বলল, শিপরিজের পুলিশ চীফ হয়তো লাগিয়ে দিয়ে গেছে।
পুলিশের কি ঠেকা পড়েছে? রবিন বলল। মজা করেছে কেউ। ট্যুরিস্ট হতে পারে।
ভেতরে উঁকি দিল কিশোর। ঢুকবে কি ঢুকবে না ঠিক করতে পারছে না যেন। শেষে বেআইনী বলে গণ্য হওয়ার প্রতিই ঝোঁক বেড়ে গেল তার। কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে বলে উঠল, রসিকতা নয়, সত্যি এখানে নোক বাস করে!
অনুমতি নেয়ার জন্যে কাউকে দেখা গেল না। কৌতূহল না ঠেকাতে পেরে শেষে বেআইনী কাজ করে বসল তিনজনেই। ঢুকে পড়ল ভেতরে। গুহায় আলো তেমন নেই, গুহামুখ দিয়ে সামান্য যা ঢুকছে। আনাড়ি হাতে তৈরি একটা কাঠের টেবিল পড়ে আছে এককোণে। মাটিতে বিছানো একটা মলিন গদি, তার ওপর কম্বল পাতা। সাবানের বাক্সের কাঠ দিয়ে তৈরি একটা আলমারি রাখা হয়েছে একটা চ্যাপ্টা পাথরের ওপর। তাতে ভরা টিনের খাবার।
যাক বাবা, বাঁচা গেল, খুশি হয়ে বলল মূসা, আমাদের একজন পড়শী আছে, তার কাছে খাবারও আছে। খালি পেটে পাহাড় পেরোতে হলো না আর।
আস্তে! সাবধান করল রবিন। ফিসফিস করে বলল, ওই যে, আসছে আমাদের পড়শী।
সৈকত ধরে হাঁটতে দেখা গেল একজন লম্বা মানুষকে। ধূসর চুল। গায়ে নীল শার্ট, পরনের ওভারঅলের পা দুটো ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে উঁচু গোড়ালিওয়ালা রবারের বুটের ভেতরে। বা হাতে একটা বিউগল। সাগরের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে গেল। বিউগল ঠোঁটে লাগিয়ে ফুঁ দিল জোরে। একবার বাজিয়ে বিউগল নামিয়ে হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে ঠোঁট মুছল, তারপর ঘুরে এগিয়ে আসতে শুরু করল গুহার দিকে।

গুহামুখে বেরিয়ে এসেছে তিন গোয়েন্দা। ওদের দেখে থমকে দাঁড়াল সে। নিজের অজান্তেই যেন বিউগল বাজাল আরেকবার। আবার পা বাড়াল।
আমি কমান্ডার জিন মরিস, কুইন্স নেভি, অবসরপ্রাপ্ত, ছেলেদের কাছে এসে ঘোষণা করল সে। আমাকে তোমাদের স্যালুট করা উচিত ছিল। বুঝতে পারছি, নেভির নিয়ম-কানুন কিছুই জানেন না তোমরা। স্যালুট করতে জানো?
নিখুঁত ভাবে স্যালুট করল তিন গোয়েন্দা।
খুশি হলো লোকটা, জিজ্ঞেস করল, বাহ, জানো তো দেখি। কিন্তু নাবিক বলে তো মনে হচ্ছে না।
হেসে জবাব দিল কিশোর, নাবিকরাই কি শুধু স্যালুট দেয়?
তাও বটে। তা ছাড়া সবাইকেই নাবিক হতে হবে, এমনও কোন কথা নেই।
এই গুহাতে আপনিই বাস করেন নাকি? জানতে চাইল রবিন।
হ্যাঁ, ডাঙায় আপাতত এটাই আমার ঘর। তোমাদেরকে তো চিনলাম না?
পরিচয় দিল তিন গোয়েন্দা।
হাত মেলানোর পালা শেষ করে কমান্ডার বলল, সচরাচর এখানে কেউ আসে না। আর না এলেই ভাল। আমি একা থাকতেই ভালবাসি। লোকের কোলাহল আমার ভাল লাগে না।
জায়গাটা একেবারেই নিরিবিলি, কিশোর বলল।
আছে, তবে অতটা না। যাতায়াতের অসুবিধে খুব বেশি নেই তো, পাহাড়টা পেরোলেই হলো, মাঝেসাঝে চলে আসে লোকে। গুহা দেখতে আসে টুরিস্ট, জেলেরা নামে বিশ্রাম নিতে। আমার জন্যে সবচেয়ে ভাল জায়গা ছিল দক্ষিণ সাগরের সেই দ্বীপটা, যেখানে নির্বাসিত হয়েছিলাম আমি।
মানুষটার ব্যাপারে নতুন করে কৌতূহল দেখা দিল তিন গোয়েন্দার।
খাইছে! মুসা বলে উঠল। নির্বাসিত হয়েছিলেন?
কোন অপরাধে? কে দিল নির্বাসন? প্রশ্ন করল রবিন।
কেউ দেয়নি। নিজে নিজেই হয়ে গেলাম। বেশ কয়েক বছর আগে একটা ডেস্ট্রয়ারে কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করছিলাম। দক্ষিণ সাগর দিয়ে চলছিল জাহাজ। খাওয়ার পানি নেয়ার জন্যে একটা ছোট দ্বীপে নোঙর করলাম। ম্যাপে নেই ওই দ্বীপ, নাম খুঁজে পাবে না। গরমও পড়েছিল সেদিন, সাংঘাতিক গরম। ছায়ার মধ্যেও একশো ডিগ্রির বেশি। আমার লোকেরা যখন পানি তুলছে জাহাজে, আমি বসলাম একটা ক্যাকটাসের ছায়ায় জিরাতে। কখন ঘুমিয়ে গেলাম বলতে পারব না।
আপনাকে ওখানে ফেলেই চলে গেল নাবিকেরা? আন্দাজ করল রবিন।
হ্যাঁ।

কিন্তু কমান্ডারের খোঁজ করল না একবারও?
ওরা জানতই না আমি নিচে নেমেছি। গাছের গোড়ায় বসে ঘুমিয়ে পড়েছি এটা কল্পনাই করতে পারেনি কেউ। ঘুম ভাঙলে দেখলাম, জাহাজটা চলে গেছে, সিন্দবাদ নাবিকের মত আমি একা পড়ে আছি ওই দ্বীপে।
দারুণ ব্যাপার তো! তারপর? জানতে চাইল মুসা। বাচলেন কি করে?
কি করব বুঝতে পারলাম না প্রথমে। প্রাথমিক ধাক্কাটা কাটার পর মনে হলো, ফেলে গেছে, ভালই হয়েছে। রবিনসন ক্রুসো হয়ে কাটাব। একটা কুঁড়ে বানিয়ে ছয়টা মাস একা কাটিয়েছি ওই দ্বীপে। একেবারে একা, শুধু আমি।
আপনাকে নিতে ফিরে যায়নি জাহাজটা?
যায়নি। পরে জেনেছি দ্বীপটা নাকি খুঁজে পায়নি ওরা। তবে আমার বিশ্বাস, মিথ্যে কথা বলেছে। যায়ইনি ওরা! জাহাজের কোয়ার্টার মাস্টার, যে আমার জায়গাটা দখল করেছিল সে আর খুঁজে বের করতে যায়নি। তাহলে আবার তাকে কমান্ডারের পদটা হারাতে হত।
দ্বীপে থাকতে খেয়েছেন কি?
খাওয়ার অভাব ছিল না। শুয়াপোকা থেকে শুরু করে পাখি আর কচ্ছপের ডিম, যা পেয়েছি সব খেয়েছি। আদিবাসীরা যদি এ সব খেয়ে তাগড়া জোয়ান হয়ে বেঁচে থাকতে পারে, আমি পারব না কেন?
তা বটে। অথৈ সাগর অভিযানে বেরিয়ে দক্ষিণ সাগরের দ্বীপে নির্বাসিত হয়ে বেচে থাকার জন্যে এ সব আজেবাজে জিনিস খাওয়ার অভিজ্ঞতা তিন গোয়েন্দারও আছে। অবাক হলো না ওরা।
তবে খাবারের কথা উঠে পড়ায় সুযোগটা ছাড়ল না মুসা, বলে বসল, আমাদের খাবার ফুরিয়ে গেছে। আপনার কাছে কি কিছু ধার পাওয়া যাবে?
চুপচাপ উঠে চলে গেল কমান্ডার। ফিরে এল একটা পাউরুটি আর একটিন মাছ নিয়ে। মুসার হাতে দিতে দিতে বলল, চলবে এতে?
চলবে মানে! কৃতজ্ঞ হয়ে গেলাম! অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।
আরও দুচারটা টুকটাক কথাবার্তার পর তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজেদের গুহার দিকে রওনা হলো গোয়েন্দারা। সকালে নাস্তাটা তেমন জমেনি, খিদে পেয়ে গেছে। টিন থেকে মাংস বের করে রান্না করতে বসে গেল মুসা।
খাওয়ার পর বলল সে, এখন নিশ্চিন্তে রওনা হওয়া যায়।
কোথায়? আনমনা হয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর।
কোথায় আবার, খাবার আনতে। একবেলা খেয়েই কি শেষ হয়ে গেল নাকি? খানিক পরেই তো আবার খিদে লাগবে।

ওর দিকে তাকিয়ে ঘন ঘন দুতিনবার নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। এখনই যাব? অন্যমনস্ক হয়ে আছে ওর ভঙ্গি দেখেই বোঝা গেল।
এখনই তো যাওয়া উচিত। দেরি করলে রোদ চড়বে, খিদে লাগবে…
আচ্ছা লোকটাকে তোমাদের কেমন লাগল?
জিন মরিসের কথা বলছ? রবিন বলল, মোটেও ইংরেজ মনে হয়নি। আমার। ব্রিটিশ নেভিতে চাকরি করার কথাটা বিশ্বাস করতে পারছি না।
আমিও না, কিশোর বলল। চিন্তাটা সেজন্যেই হচ্ছে
আচ্ছা, আমাদের খাবার এই লোকই চুরি করেনি তো?
কথাটা আমারও মনে হয়েছিল। ভাল করে দেখেছি। তার খাবারের ভাঁড়ারে আমাদের টিনগুলো নেই।
লোকটাকে অবশ্য এতটা খারাপ মনে হয়নি আমার।
তবু কয়েকটা প্রশ্ন করতে পারলে ভাল হত। বলা তো যায় না কার মনে কি আছে।
চলো তাহলে, যাই আবার।
এখনই?
গেলে এখনই। দেরি করলে আমাদের রওনা হতে দেরি হয়ে যাবে।
বেশ। চলো।
আবার কমান্ডারের সঙ্গে দেখা করতে চলল ওরা। গুহার ভেতরে আগুনের ধারে বসে আছে সে। পাশে পড়ে আছে একটা ফ্রাইং প্যান। এইমাত্র খাওয়া শেষ করেছে বোঝা গেল।
শব্দ শুনে মুখ তুলে তাকাল কমান্ডার। ভোঁতা গলায় ধমকে উঠল, কে তোমরা?
আমরা! অবাক হয়ে বলল কিশোর, আরে আমরা, চিনতে পারছেন না? তিন গোয়েন্দা, একটু আগেই তো দেখা হলো…
যাও, ভাগো এখান থেকে! এখানে ঘুরঘুর করা আমার পছন্দ না।
কমান্ডারের এহেন আচরণে চমকে গেল তিন গোয়েন্দা। হাঁ করে তাকিয়ে রইল তার দিকে।
কিন্তু, স্যার, বলল রবিন, এই খানিক আগে অপিনিই…
স্যার স্যার করতে হবে না আর! লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল কমান্ডার। মুঠো চাল ছেলেদের দিকে। যাও এখন। বেরোও। আমাকে একা থাকতে দাও।
রবিনের দিকে তাকিয়ে নীরবে মাথা নেড়ে বুঝিয়ে দিল কিশোর, কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, বোঝানো যাবে না কমান্ডারকে।
ফিরে চলল তিনজনে।
গুহার কাছ থেকে সরে এসে মুসা বলল, ও ব্যাটা পাগল। বদ্ধ উন্মাদ! একা থাকতে থাকতে মাথাটা পুরোপুরিই গেছে!

হুঁ! কিশোর বলল, যতই দেখছি নোকটাকে, ততই অবাক হচ্ছি। সন্দেহ বাড়ছে আমার।
কোন ব্যাপারে? জিজ্ঞেস করল রবিন।
তা জানি না। তবে মন বলছে, রহস্য একটা অবশ্যই আছে এখানে।
সে তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু আমাদের আসল রহস্যের তো কিনারা হলো না। একটা করতে এসে আরেকটাতে জড়িয়ে পড়ছি। হ্যারিস গেনারের খোঁজ নেয়ার দরকার না?
কার কাছে নেব?
তার আমি কি জানি? হাত ওল্টাল রবিন।
একটা ব্যাপার কিন্তু হতে পারে, হয়তো শিপরিজে এ সব গুহাতে খোঁজ নেবার কথাই বলেছে গেনার। গুহাগুলোতে যে রহস্য আছে, তার প্রমাণ তো ইতিমধ্যেই পেয়ে গেছি আমরা। একটা মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল কিশোর, ঠিক আছে, চলো আগের কাজ আগে সারি, তারপর অন্য কথা। প্রথমে রিক ডেলভারের কাছে যাব খাবার চাইতে। তার কাছে না পেলে শিপরিজে দোকানে যেতে হবে।
মনে কোরো তো এবার, বড়শিটা নিয়ে আসব এবার, মুসা বলল। ঝড়-বৃষ্টির পর মাছে খায় ভাল। মাছ পেলে খাবারের সমস্যা অনেকটা মিটবে।
কেন, আসার সময় বড়শি তো নিলে দেখলাম? রবিনের প্রশ্ন। কোথায় ফেললে?
আমারও মনে হচ্ছে এনেছি, কিন্তু সকালবেলা খুঁজতে গিয়ে দেখি নেই। হয় খাবার চোরই ওগুলো গাপ করে দিয়েছে, নয়তো ভুলে আনিইনি। গাড়িতে ফেলে এসেছি। ঠিক মনে করতে পারছি না। গুহার কাছে এসে জিজ্ঞেস করুল মুসা, আমাদের জিনিসপত্রগুলো কি করব? এখানে ফেলে গেলে না ওগুলোও চুরি হয়ে যায়।
মনে হয় না, কিশোর বলল, তাহলে রাতেই চেষ্টা করত। কেবল খাবারের ওপরই নজর ছিল চোরের।
ঠিক আছে, সব জিনিস ফেলে গেলেও ডিটেক্টরটী ফেলে যাচ্ছি না। যাওয়ার সময় খুঁজতে খুঁজতে যাব, খোঁজাও হবে, সময়ও কাটবে।
কি খুঁজবে তুমি? রবিনের প্রশ্ন।
কি করে বুলব? মাটির নিচে, পাহাড়ের খাঁজে কত জিনিসই থাকতে পারে। জলদস্যুর গুপ্তধনও থাকতে পারে। এই যে খানিক আগে একটা নতুন পিস্তল পেয়ে গেলাম, এটা কি কম কথা?
পিস্তলের কথায় মনে পড়ল কিশোরের, ওহহো, কোথায় ওটা?
লুকিয়ে রেখেছি, মুসা জানাল। কেন, দরকার?
না। লুকানো আছে, থাক। বলা যায় না, ওটা একটা জরুরী সূত্র হতে পারে।

রওনা হলো ওরা। ডিটেক্টরটাকে লাঠির মত করে সামনে বাড়িয়ে ধরে হাঁটছে মূসা। কয়েক মিনিট যেতে না যেতেইবিকট চিৎকার করে উঠল।
আগে আগে হাঁটছিল রবিন আর কিশোর। চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে তাকাল।
পাহাড়ের দেয়ালের কাছে উন্মাদ নৃত্য জুড়েছে মু। কড়কড় কড়কড় করছে ওর যন্ত্র। যেন পাল্লা দিয়ে চিৎকার করছে মনিবের সঙ্গে।
চিৎকার করে বলল সে, এখানে একটা-দুটো পিল নয়, পুরো এক অস্ত্রাগার রয়েছে। যন্ত্রটাকি ভাবে চিৎকার করছে দেখো।
যন্ত্রের চেয়ে তো বেশি চেঁচাচ্ছ তুমি, কিশোর কাল। চুপ করো না। দেখোই না আগে কি আছে।
পাহাড়ের গোড়ায় একটা পাথরের কাছে যন্ত্রটা নিয়ে গেলেই শব্দ করছে। পাথরটা সরানোর জন্যে হাত বাড়াল কিশোর আর রবিন। যন্ত্র ধরে রেখেছে মুসা, ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে লুকানো হাড়ের সন্ধান পেয়েছে ক্ষুধার্ত ককর।
পাখরটা সরাতেই দেখা গেল একটা গর্ত। ভেতরে একটা বস্তা। তার ভেতর থেকে বেরোল ওদের খাবারের টিনগুলো। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল তিন গোয়েন্দা।
এই তো আমার বড়শি বলে উঠল মুসা। তারমানে ঠিকই এনেছিভুলিনি, খাবারের সঙ্গে এগুলোও চুরি করেছিল ব্যাটা।
জিনিসগুলো তাহলে বের করেই ছাড়লে, হাসতে হাসতে বলল কিশোর।
যন্ত্রটার গায়ে আদর করে হাত বুলিয়ে মুসা বলল, পয়সা উসুল। এত ... উপকার করবে এটা কল্পনাও করিনি। বাঁচালি তুই, ডিটেক্টর। উফ, পাহাড় ডিঙানোর কথা ভাবতেই হাত-পা সেধিয়ে যাচ্ছিল আমার পেটের মধ্যে।
খাবার দেখেই খিদে মাথা চাড়া দিল ওর। গুহায় ঢুকে আগুন জ্বেলে, ফ্রাইং প্যান বের করে রাখতে বসে গেল। মাংস ভাজার গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল বাতাসে।
রবিন আর কিশোর আলোচনা করছে বস্তাটা গর্তে কে রাখল, সেটা নিয়ে। কমান্ডারের প্রসঙ্গ উঠল।
তাকে প্রশ্নগুলো করা হলো না, কিশোর বলল, দাঁড়াতেই দিল না আমাদের।
দেবে কি? পাগল তো। মুসার কথাই ঠিক–ওর মাথায় বড় রকমের গোলমাল আছে, তাতে আমারও কোন সন্দেহ নেই।
হতে পারে, আবার নাও হতে পারে, রহস্যময় স্বরে বলল কিশোর। যাই হোক, প্রশ্নগুলো ওকে করতেই হবে, যেভাবেই হোক।
মাংস ভাজা সেরে ডিম ভাজছে মুসা।
সেদিকে একবার তাকিয়ে কিশোরকে জিজ্ঞেস করল, কি প্রশ্ন করবে? মেরিন ডিগকে এদিকে ঘোরাফেরা করতে দেখেছে কিনা?
খাবার রেডি, ঘোষণা করল মুসা। দেরি করলে ভাগে কম পাবে।

তাড়াতাড়ি যার যার প্লেট মেলে দিল কিশোর আর রবিন। খাবার তুলে দিল মুসা। এক চামচ ডিম মুখে ফেলে আগের প্রশ্নটাই করল কিশোরকে রবিন, কই, বললে না কি প্রশ্ন করবে?

কিন্তু জবাব দিল না কিশোর। অন্যমনস্ক হয়ে রইল।

মুসা বলল, ডিগ আর কমান্ডারকে নিয়ে যত খুশি গবেষণা করো তোমরা, খাওয়ার পর আমি আর এসবে নেই। আমি যাব মাছ ধরতে। খাবার চুরি করে নিয়ে গিয়ে আমাদেরকে শাস্তি দেয়ার সুযোগ আর দেব না চোরটাকে।

কোথায় ধরবে? জানতে চাইল রবিন।

ঢালের নিচে চলে যাব। অনেক লম্বা সুতো; ঢালের ওপরে বসলেও বেড় পাওয়া যাবে।

আবার চোরের আলোচনায় ফিরে এল রবিন। নিজে খাওয়ার জন্যে নিয়ে যায়নি, বোঝাই যাচ্ছে। তাহলে চুরি করল কেন?

আমাদের এখান থেকে তাড়ানোর জন্যে; সহজ জবাব, কিশোর বলল। সে চায় না আমরা এখানে থাকি।

কমান্ডারকে সন্দেহ হয় তোমার? মুসার প্রশ্ন।

এক মুহূর্ত চুপ থেকে জবাব দিল কিশোর, ওই লোক হতে পারে, কিংবা অন্য কেউ। একজন হতে পারে, কিংবা একাধিক।

এটা তো কোন জবাব হলো না।

ঠিক। জবাবটা জানলে তো দেব।

যাই হোক, রবিন বলল, দ্বিতীয়বার আর চুরি করতে দিচ্ছি না ওকে। খাদের পাশে পাহাড়ের গায়ে একটা খাজ দেখে এসেছি। ওর মধ্যে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখব। হাজার খুঁজলেও আর পাবে না ব্যাটা।

খাওয়া শেষ করে আগুন নেভাল ওরা। বেরিয়ে পড়ল। ছিপ নিয়ে মাছ ধরতে চলল মুসা। কিশোর আর রবিন খাবারের টিনগুলো নিয়ে চলল খাদের ধারে পাহাড়ের খাজে লুকাতে।

লুকানো সেরে রবিন জিজ্ঞেস করল, কমান্ডারের ওখানে যাবে নাকি। আবার?

মাথা ঝাঁকাল কিশোর, যাব।

যদি মারতে আসে?

পালিয়ে আসব। তবে প্রশ্নগুলো না করা পর্যন্ত আমার স্বস্তি নেই।

কমান্ডারের গুহায় রওনা হলো দুজনে।

দূর থেকেই দেখল, গুহার সামনে কি যেন করছে বুড়ো নাবিক। কাছে গিয়ে দেখল, একটা কাঠি দিয়ে মাটিতে কিছু আঁকছে সে। ওদের সাড়া পেয়ে জুতো

দিয়ে ডলে তাড়াতাড়ি মুছে ফেলল। হাক দিল, এই যে ছেলেরা, আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছ?
পরস্পরের দিকে তাকাল দুই গোয়েন্দা। আরেকবার অবাক করেছে। ওদের কমান্ডার।
কিশোর জবাব দিল, হ্যাঁ। আমাদের চিনতে পেরেছেন?
পারব না কেন, নিশ্চয় পেরেছি।
কই, তখন তো পারলেন না?
পারিনি নাকি? কি জানি! মাথা চুলকাল কমান্ডার, মাঝে মাঝে মাথাটার মধ্যে কি যে হয়ে যায়…যাকগে, তোমাদের আরেক বন্ধু কোথায়?
মাছ ধরতে গেছে। পাহাড়ের ঢালের নিচে।
ও। ওদিকটায় যাওয়া ঠিক হয়নি। জায়গা ভাল না।
কেন ভাল না, জিজ্ঞেস করল রবিন। জবাব পেল না।
আনমনে মাথা নাড়তে নাড়তে, পিঠের ওপর দুহাত নিয়ে গিয়ে, একহাত দিয়ে আরেক হাতকে আঁকড়ে ধরে গুহামুখের সামনে পায়চারি শুরু করল কমান্ডার।
কমান্ডার মরিস, ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর, আপনার গুহার সামনে কোন লোককে ঘোরাফেরা করতে দেখেছেন?
যেন দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে দাঁড়িয়ে গেল কমান্ডার। চোখ সরু করে তাকাল কিশোরের দিকে। দেখো, আমি একজন সন্ন্যাসী, জায়গাটা অতিরিক্ত নির্জন দেখে একা বাস করতে এসেছি এখানে। আমার কাছাকাছি কেউ আসে না। ওরা ভাবে আমি পাগল।
গেনার আর ডিগের চেহারার বর্ণনা দিয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর, এ রকম কাউকে দেখেছেন?
বললাম না কেউ আসে না!
তবু, একটু ভাল করে ভেবে যদি বলেন…চোখে হয়তো পড়েছিল, ভুলে
না, ভুলিনি…দাঁড়াও, দাঁড়াও… ভাবতে গিয়ে কপাল কুঁচকে ফেলল কমান্ডার।
তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল দুই গোয়েন্দা। ভাবছে, গেনারকে কি দেখেছে সত্যি?
কাকে দেখেছেন? জানতে চাইল কিশোর। যে দুজনের কথা বললাম, তাদের কোনজন?
প্রথমজন।
গেনার?
হ্যাঁ, একবার ওরকম চেহারার একজনকে দেখেছিলাম বটে। ফিলিপাইনে আমার ক্রুজারের মেট হয়েছিল।

হতাশায় মুখ বাঁকাল রবিন। এই পাগলের কাছ থেকে কোন তথ্য আদায় করার চেষ্টা বৃথা।
কমান্ডার বলতে থাকল, ওর নাম মনে পড়েছে আমার, গেনারই ছিল। আমাকে জাহাজ ছাড়তে বাধ্য করেছিল সে। জংলীরা এসে ঢাক বাজানো। শুরু করল। ওদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে শেষে আনারস গাছে চড়ে বাঁচলাম।
কিশোরের কানের কাছে ঠোঁট নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বলল রবিন, আবার গেছে ওর মাথাটা। আর কথা বলে লাভ নেই।
বকবক করেই চলেছে কমান্ডার। কোন দিকে খেয়াল নেই।
পাগলকে প্রশ্ন করে কি হবে!। কিশোর বলল, ঠিক আছে, কমান্ডার, আমরা এখন যাই।
ওর কথার জবাব না দিয়ে বিড়বিড় করতে লাগল কমান্ডার, সাঁতার। কাটতে যেতে হবে আমাকে। প্রচণ্ড গরম। আফ্রিকার কাছাকাছি এলেই এ রকম গরম লাগে। কারও দিকে তাকাল না সে। আর একটাও কথা না বলে ঘুরে গিয়ে ঢুকল তার গুহায়।
সৈকতে ফিরে চলল দুই গোয়েন্দা। শুহামুখের কাছ থেকে সরে এসে রবিনের হাত ধরে একটা বড় পাথরের আড়ালে তাকে টেনে নিয়ে এল কিশোর।
অবাক হলো রবিন। কি ব্যাপার?
দাঁড়াও, ও কি আসলেই পাগল, না আমাদের দেখলে ভান করে, সেটা বুঝতে চাই।
পাথরের আড়াল থেকে উঁকি দিল কিশোর।
কি দেখছ?
ও বেরোয় কিনা।
বেরোলে কি করবে?
জবাব দিল না কিশোর। তাকিয়ে আছে গুহার দিকে।
কয়েক মিনিট পরই গুহা থেকে বেরিয়ে এল কমান্ডার। পরনে শুধু হাফপ্যান্ট। এদিক ওদিক তাকাল। তারপর এগিয়ে আসতে শুরু করল। ভাবভঙ্গিতে এখনও বোঝা যাচ্ছে না পাগল না ভালমানুষ।
রবিনকে নিয়ে পাথরের আড়ালে আরেকটু সরে গেল কিশোর।
পাশ দিয়ে চলে গেল কমাণ্ডার। দেখতে পেল না ওদের।
ফিসফিস করে রবিন বলল, যাচ্ছে কোথায়, বলো তো? সত্যি সাঁতার কাটবে নাকি?
যাক যেখানে খুশি। এসো। এত তাড়াতাড়ি সুয়োগ দেবে কল্পনাই করিনি।
কিসের সুযোগ।
ওর গুহায় ঢোকার। চলো, জলদি!

পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে একছুটে কমান্ডারের গুহার কাছে চলে এল ওরা। ঢুকে গেল ভেতরে।
বাপরে! গভীর কত! রবিন বলল। পেছনের কিছুই দেখা যায় না।
কিশোর খুঁজছে একদিকে, রবিন আরেক দিকে। পাথরের একটা তাকের কাছে চলে এল সে। চিৎকার করে বলল, দেখে যাও!
রবিনের পাশে এসে দাঁড়াল কিশোর। একনজর তাকিয়েই বলে উঠল, বাহ, বন্দুকও আছে! রহস্যময় গুলির শব্দের রহস্য ভেদ হলো। এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল তাকের কাছে। শটগানটার কাছে পড়ে আছে পুরানো একটা নোটবুক আর একটা ক্যাপ। ক্যাপটা হাতে নিয়ে কি যেন ভাবল সে। আগের জায়গায় রেখে দিয়ে নোটবুকটা তুলে নিল।
কোডবুক! পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বলল সে। দূর, আলো এত কম, কিচ্ছু দেখি না। বাইরে চলো।
কি লেখা আছে জানার জন্যে অস্থির হয়ে গেল রবিনও।
গুহামুখের দিকে রওনা দিল দুজনে।
কিন্তু বেরোনোর আগেই মুখ জুড়ে দাঁড়াল কমান্ডার। আলো আসার একমাত্র পথটা আটকে দিয়ে আরও অন্ধকার করে দিল গুহা। ওদের দেখে চিৎকার করে উঠল, চোর! চোর কোথাকার! চুরি করতে ঢুকেছ আমার গুহায়! নোটবুকের জন্যে হাত বাড়াল, দাও ওটা!
দিল না কিশোর। চট করে সরে গেল ভেতরে।
ওকে ধরার চেষ্টা করল না কমান্ডার। দৌড় দিল তাকের দিকে।
সাবধান, কিশোর, চেঁচিয়ে বলল রবিন, বন্দুক আনতে যাচ্ছে ও!
.
গুহামুখের দিকে দৌড় দিল কিশোর। পেছনে রবিন।
ওরা বেরোনোর আগেই তাকের কাছে পৌঁছে গেল কমাণ্ডার। বন্দুক তুলে হুমকি দিল, খবরদার, এক পা নড়লেই গুলি খাবে?
হোঁচট খেয়ে যেন দাঁড়িয়ে গেল কিশোর। তার গায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল রবিন।
ফিরে তাকাল দুজন।
ওদের দিকে বন্দুক তাক করে রেখে এগিয়ে এল কমান্ডার। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, তাহলে এই নোটবই চুরি করার জন্যেই আমার গুহায় ঢুকেছিলে। আস্তে করে মাটিতে রেখে দাও ওটা। চালাকি করতে গেলে মরবে।
চালাকি করতে গেল না কিশোর। পাগলের হাতে শটগান-ভয়ানক ব্যাপার, কোন রকম ঝুঁকি নিতে চাইল না সে। যা করতে বলা হলো, করল।

রবিন বলল, নোটবই চুরি করতে না, এমনি ঢুকেছিলাম। স্রেফ কৌতূহল।
আচমকা প্রশ্ন করল কিশোর, ক্যাপটা কার, কমাণ্ডার?
ভুরু কুঁচকে ফেলল কমান্ডার। মানে?
মানে, ওটা কার জিজ্ঞেস করছি। আপনার বলে তো মনে হয় না। নাবিকেরা এ জিনিস পরে না।
তাহলে কে পরে?
আর কেউ আছে নাকি এখানে?
থাকলে সে এখন কোথায় গেল? ধমকে উঠল কমাণ্ডার।
সেটা তো আপনি বলবেন।
আমি কিছুই বলতে পারব না, কারণ আমি কিছু জানি না।
এই ক্যাপটা কোথায় পেলেন?
একমুহূর্ত চিন্তা করে নিল কমাণ্ডার। জবাব দেবে কিনা ভাবল বোধহয়। বলল, শিপরিজে হ্যারির দোকান থেকে কিনেছি। কুইন্স নেভি রসদ পাঠাতে ভুলে গিয়েছিল। শেষে দোকান থেকে জিনিসপত্র কিনে আনতে বাধ্য হলাম।
ওর কথার একবর্ণ বিশ্বাস করল না কিশোর। প্রকাশ করল না সেটা। পাগল খেপালে বিপদ। কি করে বসে ঠিকঠিকানা নেই।
আবার গুহায় ঢুকলে ভাল হবে না–শাসিয়ে দিয়ে, ওদের বেরিয়ে যেতে বলল কমান্ডার।
বেরোতে সামান্যতম দেরি করল না দুজনে। নিজেদের গুহার দিকে এগোচ্ছে, এই সময় দেখল মুসাও আসছে। হাতে ছিপ আর কাঁধে বিশাল এক মাছ ঝুলিয়ে নিয়ে এগিয়ে এল সে। কাছে এসে বলল, দেখো কি ধরেছি!
হেসে বলল রবিন, কি এটা, তিমির বাচ্চা?
সী ব্যস।
কি করে মাছটা ধরেছে সেই বীরত্বের কাহিনী বিস্তারিত বর্ণনা করতে গিয়ে খেয়াল করল মুসা, তার কথায় বিশেষ মনোযোগ নেই কিশোরের। কি হয়েছে জানতে চাইল সে।
জানাল কিশোর।
মাথা নেড়ে মুসা বলল, আজব লোক। এখানে করছে কি আসলে লোকটা?
সেটাই তো বুঝতে পারছি না, কিশোর বলল।
ক্যাপটা কার? গেনারের না তো?
সে রকমই সন্দেহ করছি।
তুমি বলতে চাও, সে এখানেই কোন গুহার মধ্যে আটকে আছে?

অসম্ভব কিছু না। তবে যেটা ধারণা করছি সেটা হলো, সে আর ডিগ এসেছিল এখানে। দেখতে পেয়ে গুলি করেছিল মরিস। পালিয়েছিল দুজনে। পালানোর সময় তাড়াহুড়োতে ক্যাপটা খুলে পড়ে যায় গেনারের মাথা থেকে, তুলে নিয়ে যাওয়ার সময় পায়নি।
এটা যে ওরই ক্যাপ, কি করে বুঝলে?
গুহায় ফিরে ছবিটা দেখে নিয়ো, ব্যাগের মধ্যে রেখেছি, তাহলেই বুঝবে।
হুঁ, নাটক তাহলে জমে উঠেছে, মাথা দোলাল মুসা। জানো, আরেকটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে। দেখলে তোমরাও অবাক হয়ে যাবে। মনে হচ্ছে একটা ধাতুর খনিটনি আবিষ্কার করে বসেছি।
শুনেই অবাক হয়ে গেল রবিন, ধাতুর খনি!
সোনার খনিও হয়ে যেতে পারে, মুসা বলল। এমন হতে পারে, খনিটার খোঁজ পেয়েই এখানে এসে হাজির হয়েছে কমান্ডার। সোনা তুলে নিয়ে যেতে চায়। অন্য কাউকে আসতে দেখলে রেগে যায় সেজন্যে। নোটবইটাতে হয়তো খনির নকশা আঁকা আছে।
ওর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে কিশোর আর রবিন।
কি ঘটেছে, খুলে বলল মুসা। মাছটা ধরার পর মেটাল ডিটেক্টরটা ব্যবহারের ইচ্ছে হয়েছিল ওর। মাটির নিচে বিশাল কিছু থাকার সঙ্কেত দিয়েছে যন্ত্র।
কিশোর বলল, চলো তো দেখি।
আগে খনি দেখবে, না মাছের কাবাব খাবে?
খাওয়া-টাওয়া পরে। চলো আগে, তোমার খনি দেখব।
এক মিনিট দাঁড়াও। চট করে মাছটা গুহায় রেখে আসি আমি।
ডিটেক্টরটা কোথায়?
পাহাড়েই ফেলে এসেছি। জানি তো, তোমরা দেখতে যাবে।
কয়েক মিনিটের মধ্যেই খাদ পেরিয়ে আবার পাহাড়ের ওপর এসে উঠল তিনজনে। জায়গাটা দেখিয়ে দিল মুসা।
ইয়ারফোন কানে লাগিয়ে যন্ত্রটা মাটির কয়েক ইঞ্চি ওপরে ধরল রবিন। শুনতে শুনতে চোখ বড় বড় হয়ে গেল তার। ইয়ারফোনটা কান থেকে খুলে কিশোরের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, সাংঘাতিক কাণ্ড! সত্যি কিছু আছে। এখানে। কানের মধ্যে মনে হলো মেশিনগানের গুলি ফুটল।
যন্ত্রটা হাতে নিয়ে কিশোরও পরীক্ষা করে দেখল। ডান থেকে বাঁ দিকে সরে যেতে লাগল। সরতে সরতে কয়েক গজ চলে গেল, তাও শব্দ বন্ধ হয় না। কান থেকে ইয়ারফোন খুলে দুই সহকারীর দিকে তাকিয়ে বলল, আশ্চর্য! ঘটনাটা কি? কি আছে এখানে? মাটির তলা দিয়ে সোজাসুজি চলে, গেছে লম্বা কোন জিনিস।

পাইপটাইপ না তো? রবিন বলল।
কিসের পাইপ? মুসা বলল। এমন একটা জায়গায় পানির পাইপ কসাতে আসবে কে? আভাউড ড্রেনেরও কোন প্রয়োজন নেই এখানে।
যাই থাক, নিচের ঠোঁট কামড়াল কিশোর, জিনিসটা গেছে পুর থেকে পশ্চিমে, সাগরের তীর থেকে মহাসড়কের দিকে।
দাঁড়াও, কি আছে ওদিকে রাস্তার ধারে, দেখছি, রবিন বলল।
কয়েকটা পাইন গা ঘেঁষাঘেঁষি করে জমে আছে একজায়গায়। তারই একটাতে চড়ল সে। পশ্চিমে তাকাল।
কি আছে? নিচে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর।
একটা বাড়ি। ডিশদেখেমনে হচ্ছে রাডার স্টেশন।
আর কিছু না?
আর কিছু না।
নেমে এল রবিন।
খুড়ে দেখলে হত নিচে কি আছে, মুসা বলল।
তার জন্যে শাবল-কোদাল দরকার। কোথায় পাবে? রবিন বলল।
সেটা অত সমস্যা নয়। ব্রিক ডেলভারের কাছে গেলেই পাওয়া যাবে। রবিনের দিকে তাকাল কিশোর। চলো, গিয়ে নিয়ে আসি। মুসা ততক্ষণে মাছটার একটা ব্যবস্থা করে ফেলক।
মুসা চলে গেল গুহার দিকে। কিশোর আর রবিন রওনা হলো ডেলভারের কেবিনে।
আসার সময় অচেনা পর্ব ছিল, তার ওপর ঝড়বৃষ্টি, সেজন্যে বড় বেশি দাম আর অনেক লম্বা মনে হয়েছিল পথ। এখন তার অর্ধেকও লাগল না। অল্প সময়েই চলে এল ডেলভারের কেবিনে।
বুড়োকে পাওয়া গেল না। মাছ ধরতে গেছে। তবে মহিলা আছে বাড়িতে। চমৎকার একটা হাসি উপহার দিয়ে তার কাছ থেকে একটা শাবল আর একটা কেলচা চেয়ে নিল রবিন। আবার রওনা হলো গুহার দিকে।
গুহায় ফিরে দেখল গনগনে আগুনের সামনে বসে আছে মুসা। মাছের কাবুব ঝমানো হয়ে গেছে প্রায়। গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে বাতাসে।
দুই দুইবার পাহাড় ডিঙিয়ে এসে প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে কি, মার রবিনের। গপ গপ করে খেতে শুরু করল ও।
খাওয়ার পর আগুন নিভিয়ে দিয়ে তিনজনে মিলে রওনা হলো জায়গাটা খুঁড়ে দেখতে।
খুঁড়তে খুঁড়তে তিন ফুট খুঁড়ে ফেলেও ধাতব জিনিসটার দেখা মিলল না।

বেলচায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রবিন বলল, কই, মুসার খনির তো চিহ্নও নেই। কিশোর, ঘটনাটা কি বলো তো? ধাতব জিনিস না থাকলে তো সাড়া দিত না যন্ত্র।
চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর, আমিও বুঝতে পারছি না। বিদ্যুতের তার গেছে হয়তো মাটির নিচ দিয়ে। সেসবের পাইপ হতে পারে। কত নিচে আছে কে জানে। অহেতুক কষ্ট না করে শিপরিজে গিয়ে খোঁজ নেয়া দরকার।
সুতরাং রওনা হলো ওরা।
শাবল আর বেলচা ফেরত দিতে প্রথমে ডেলভারের বাড়িতে এল। এবার পাওয়া গেল ওকে। হাসিমুখে বেরিয়ে এসে স্বাগত জানাল ছেলেদের, ভূতের। গুহা থেকে তাহলে ভালয় ভালয়ই ফিরলে।
হ্যাঁ, হেসে জবাব দিল কিশোর, দেখতেই পাচ্ছেন।
এগুলো নিয়েছিলে কেন? হাত তুলে শাক আর বেলচা দেখাল বুড়ো। বাড়ি ফিরে বেগম সাহেবের কাছে শুনলাম তোমরা এসেছিলে।
মুসার একটা মেটাল ডিটেক্টর আছে। পাহাড়ের ওপর খুঁজতে গিয়ে ওর মনে হয়েছে মাটির নিচে সোনার খনি আছে। তাই খুঁড়ে দেখলাম আরকি।
বুড়োর চোখে অবিশ্বাস। এই এলাকায় সোনার খনি? অভিব! থাকলে কবে বেরিয়ে যেত।
আমারও তাই ধারণা, বলল কিশোর। মনে হয় মাটির নিচ দিয়ে বিদ্যুতের তারটার গেছে, সেগুলোর পাইপ..
হুঁ, তাই হবে। এখন কোথায় যাচ্ছ?
হ্যারির দোকানে। কয়েকটা জিনিস দরকার।
জিনিস দরকার মানে? আবার গুহায় যাবে নাকি?
বলতে পারি না। তবে গেলেও আর বোধহয় ভয়ের কিছু নেই। রাতে তে থাকলাম, গুহাতেই, ভূতে তো কিছু করল না।
বুড়োকে গুডবাই জানিয়ে গাড়িতে চড়ল ওরা। রওনা হলো হ্যারির স্টোরে।
দোকানেই আছে হ্যারি। তিন গোয়েন্দাকে দেখে চেয়ার থেকে উঠে এল, কি, বলেছিলাম না? নিশ্চয় বিপদে পড়েছিলে গুহায় ঢুকে।
কে বলল বিপদে পড়েছি, হাত নেড়ে বলল কিশোর।
বেশ, বিপদে হয়তো পড়েনি। কিন্তু কিছুই ঘটেনি এ কথা আমাকে অন্তত বিশ্বাস করাতে পারবে না। তোমাদের মুখ দেখেই বুঝতে পারছি। উত্তেজিত হয়ে আছ। কিছু একটা তো নিশ্চয় ঘটেছে।
মিথ্যে বলব না, ঘটনা সত্যিই ঘটেছে। তবে ভুতুড়ে কিছু নয়, হ্যারির টেলিফোন্টা দরকার, তাই তার কাছে সব কিছু চেপে গেল না কিশোর। আচ্ছা, টাউন

ইঞ্জিনিয়ারের অফিসটা কোথায়, বুলবেন? কয়েকটা ম্যাপ আর সার্ভে রিপোর্ট দেখতে চাই।
ম্যাপ? ভুরু কোঁচকাল হ্যারি। ব্যাপারটা কি, বলো তো?
মুসার সোনার খনি আবিষ্কারের সম্ভাবনার কথা জানলি কিশোর।
ডেলভারের মতই অবিশ্বাসের হাসি হাসল হ্যারি। বলল, দেখো, ভাগ্য খোলে নাকি! তবে ম্যাপ দেখার জন্যে ইঞ্জিনিয়ারের বাড়িতে যাওয়া লাগবে। না। আমি শিপরিজের মেয়র। এখানেই আর্কাইভ আছে, ডান হাতের বুড়ো। আঙুল দিয়ে দোকানের পেছনের একটা দরজা দেখাল সে।
ওখানে? অবাক হলো রবিন।
ওটা মেয়র আর টাউন ইঞ্জিনিয়ারের অফিস।
হ্যারির পেছন পেছন ঘরটায় এসে ঢুকল তিন গোয়েন্দা। ছিমছাম সাজানো-গোছানো। একটা ডেস্ক, একটা ফাইলিং কেবিনেট আছে। দেয়ালে ঝোলানো একটা বড় ম্যাপ।
ওটার সামনে এসে দাঁড়াল তিনজনে। খুঁটিয়ে দেখতে লাগল রবিন আর কিশোর। মুসা এ সব বোঝে না, ওর ভালও লাগে না।
পাহাড়টা বের করতে দেরি হলো না কিশোরের। মাটির নিচ দিয়ে যাওয়া পানির পাইপ বা বিদ্যুতের পাইপের চিহ্ন নেই ম্যাপে। মাথা নেড়ে সরে এল ওটার কাছ থেকে।
অফিসের বাইরে বেরোতে হ্যারি জিজ্ঞেস করল, কই, পেলে তোমাদের সোনার খনি?
মাথা নাড়ল কিশোর, নাহ। রসিকতার সুরে বলল, আবিষ্কারই করলাম। আমরা আজ, ম্যাপে থাকবে কোত্থেকে। তবে এরপর ম্যাপ আকলে থাকবে অবশ্যই।
জবাবে হ্যারিও হাসল। হুঁ, তা বটে। আর কি করতে পারি তোমাদের জন্যে?
কিছু জিনিস লাগবে। মূসা আর রবিনের দিকে তাকিয়ে বলল কিশোর, তোমরা নাও ওগুলো, আমি একটা ফোন সেরে নিই। হ্যারিকে জিজ্ঞেস করল, অসুবিধে নেই তো?
না না, অসুবিধে কিসের? করো।

.

ল্যারি কংকলিনকে ফোন করল কিশোর।
ওকে বাড়িতেই পাওয়া গেল। মেরিন ডিগের ব্যাপারে খোঁজ নিয়েছে। কিনা জিজ্ঞেস করল কিশোর। ওপাশের কথা শুনতে শুনতে কপাল কুঁচকে গেল তার।
ব্যাপারটা চোখ এড়াল না রবিনের। কিশোরের দিকে তাকিয়ে আছে। তবে এত নিচু স্বরে কথা বলছে কিশোর, কিছুই শুনতে পেল না সে। দোকান। থেকে

বেরিয়েই জিজ্ঞেস করল কি জেনেছে।
সাংঘাতিক তথ্য, বলল কিশোর। ভাল ছাত্র ছিল মেরিন ডিগ। ভাল ফ্যামিলির লোক। ওর বিরুদ্ধে কোন খারাপ রিপোর্ট নেই। বেড়াতে ভালবাসে। তিন বছর বেড়িয়ে বহুদিন কাটিয়ে এসেছে বিদেশে।
কিশোর চুপ করতে রবিন বলল, এর মধ্যে সাংঘাতিক তথ্যটা কোথায়?
বলিনি এখনও। গত গ্রীষ্মে একটা বিশেষ দেশে বেড়াতে গিয়েছিল সে।
কোন দেশ?
হ্যারিস গেনার যেখানে পড়তে গিয়েছিল সেখানে।
তাতে কি? বুঝতে পারল না মুসা।
রবিন বলে উঠল, আমি বুঝেছি! ওই দেশের কোন প্রতিষ্ঠান ওদের দুজনকে ধরে ব্রেন ওয়াশ করে দিয়েছে, যাতে ওরা ওদের হয়ে কাজ করে।
গুপ্তচরগিরি?
এ ছাড়া আর কি? কিশোর, ঠিক না?
আমি ভাবছি, ধীরে ধীরে বলল কিশোর, মতের অমিল হয়নি তো দুজনের?
মানে?
মানে, একজনকে ব্রেন ওয়াশ করেছে–ধরা যাক, ডিগের; গেনারের করতে পারেনি, কিন্তু ব্যাপারটা সে জানে। তাকে দলে আনার চেষ্টা করেছে ডিগ। পারেনি। হয়তো কথা ঁ থেকে ঝগড়া। শেষমেষ গায়েব করে দেয়া হয়েছে গেনারকে। ওর নিরুদ্দেশের এটা একটা জোরাল যুক্তি হতে পারে।
হুঁ, তা পারে, একমত হয়ে মাথা দোলাল রবিন। তবে কি লায়ন। কাবসদের দিয়ে ভয় দেখিয়ে ডিগই আমাদের তাড়াতে চেয়েছে যাতে গেনারের ব্যাপারে তদন্ত করতে না পারি?
হয়তো। তোমরা এখানে দাঁড়াও, আমি আরেকটা ফোন সেরে আসি।
আবার কাকে?
আরলিঙটনের পুলিশ চীফকে। তাকে অনুরোধ করব ডিগের ওপর নজর রাখার ব্যবস্থা করার জন্যে।
মুসা আর রবিনকে গাড়ির কাছে রেখে আবার গিয়ে দোকানে ঢুকল কিশোর। কয়েক মিনিট পর বেরিয়ে এল উত্তেজিত হয়ে। খবর জানাল, এইবার মেরিন ডিগ গায়েব! তাকে নাকি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।
শিস দিয়ে উঠল মুসা, দারুণ! তার সঙ্গে আবার কার মতের মিল হলো না?
তাকে না ধরতে পারলে আর সেটা জানা যাবে না।
কি করে ধরা যায়?
সেটা পুলিশ জানে। তাদের কাজ।

তা ঠিক। তো আমাদের কাজ তাহলে এখন কি? আবার গুহায় ফিরে যাওয়া?
তা তো বটেই। আর কি করব? আমাদের মিশন এখনও শেষ হয়নি। গেনারকে খুঁজে পাইনি আমরা।
কিন্তু গুহায় ফিরে লাভ কি? ওখানে তো নেই গেনার। দুটো গুহার একটাতেও লুকিয়ে রাখা হয়নি তাকে, তাহলে কি আর দেখতাম না?
কমাণ্ডারের গুহাটার ব্যাপারে সন্দেহ এখনও যায়নি আমার। মন বলছে, সব রহস্যের চাবিকাঠি লুকিয়ে আছে ওই গুহায়। ভেতরে ঢুকে ভালমত খুঁজে দেখতে পারলে কিছু না কিছু পাবই।
তোমার কি মনে হয় গেনারের গায়েব হওয়ার পেছনে কমান্ডারের কোন। হাত আছে? প্রশ্ন করল রবিন।
হাত না থাকলেও যোগাযোগ যে একটা আছেই, তাতে কোন সন্দেহ নেই। নইলে গেনার শিপরিজের কথা লিখে রেখে গায়েব হবে কেন? আর গুহার মধ্যে রহস্যময় কাণ্ডকারখানাই বা ঘটবে কেন? দুটোর মধ্যে মিল দেখতে পাচ্ছি আমি।
তাহলে ফিরে যেতে বলছ? জানতে চাইল মুসা।
হ্যাঁ, যাও।
গাড়ি স্টার্ট দিল মুসা।
রিক ডেলভারের বাড়ির সামনে পৌঁছে গাড়ি থামাল সে। মালপত্র নিয়ে নেমে পড়ল তিন গোয়েন্দা।
শব্দ শুনে বেরিয়ে এল ডেলভার। ওরা আবার গুহায় ফিরছে শুনে বাধা
কিন্তু শুনল না ওরা। জোর দিয়ে বলল কিশোর, গুহার রহস্য ভেদ না করে কিছুতেই নিরস্ত হবে না সে।
আগের বারের মত ডেলভারের বাড়ির সামনে গাড়ি রেখে হেঁটে রওনা হলো তিন গোয়েন্দা।
রাত হয়ে গেছে।
সৈকত থেকে আকাশের পটভূমিতে বিশাল দৈত্যের মত লাগছে পাহাড়ের চুড়াটা। এগিয়ে গিয়ে ওপরে উঠতে শুরু করল ওরা।
আকাশে কয়েক দিনের চাঁদ, আলো এখনও উজ্জল হয়নি, ঘোলাটে কমলা রঙ। সেই আলোয় পথ দেখে এগেল ওরা।
গিরিখাতটা চোখে পড়ল একসময়। আরও এগিয়ে কালো গুহামুখটা চোখে পড়ল। সেদিকে তাকিয়ে গা ছমছম করে উঠল মুসার। মনে হলো যেন কোন দানবের খুলি থেকে চেয়ে আছে কালো অক্ষিকোটর।
গুহামুখটার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল কিশোর, কি করছে এখন। আমাদের কমান্ডার মরিস? নিশ্চয় নাক ডাকিয়ে ভয় পাওয়াচ্ছে গুহার ইদ্রগুলোকে।

কিংবা ভূতকে, আড়চোখে মুসার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল রবিন। গুহায় ভূত থাকে। ইঁদুরদের মতই রাত জাগে ওরাও। আর আমার তো ধারণা ওই রকম একটা কমান্ডারকে ভূতেও ভয় করে চলবে।
কেঁপে উঠল মুসার কণ্ঠ, চুপ! চুপ! কি যে বলো আর না বলো, তাও এমন জায়গায় এসে…
জোরে হেসে উঠল রবিন।
হঠাৎ আলো জ্বলে উঠল। ঝট করে বসে পড়ল ওরা। হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গিয়ে দেখল, কমান্ডারের গুহার কাছ থেকে জ্বলেছে আলোটা, তীব্র উজ্জ্বল আলোর রশ্মি গিয়ে পড়েছে সাগরের পানিতে।
ফিসফিস করে কিশোর বলল, সার্চলাইট!
বার দুই জ্বলল-নিভল আলোটা, তারপর নিভে গিয়ে আর জ্বলল না।
আরেকটু হলেই দেখে ফেলত আমাদের, মুসা বলল।
চিন্তিত ভঙ্গিতে কিশোর বলল, আর কত চমক জমা আছে কমান্ডারের ভাঁড়ারে? সার্চলাইট! একজন সন্ন্যাসীর কি দরকার এই জিনিস? সন্দেহ আরও জোরাল হচ্ছে আমার।
সন্ন্যাসী না ছাই, ঝাঁজের সঙ্গে বলল রবিন, ব্যাটা আস্ত ভণ্ড। পাগলামিটাও তার অভিনয়।
আলো জ্বালল কেন? মূসার প্রশ্ন। কি দেখল?
চিন্তিত ভঙ্গিতে কিশোর বলল, যে ভাবে আলোটা নাড়ল, মনে হলো কোন রকম সঙ্কেত দিল।
কাকে? রবিনের প্রশ্ন।
কি জানি। কোন জাহাজ হয়তো নোঙর করেছে এখন তীর থেকে দূরে। ওটাকে সঙ্কেত দিয়েছে।
কেন?
কারণ তো নিশ্চয় আছে। আরও তথ্য না পেলে সেটা জানা যাবে না। তবে সবার আগে দেখতে হবে, জাহাজ সত্যি আছে কিনা।
উঠে পড়ল ওরা। চুপচাপ এসে গুহায় ঢুকল।
রান্না করে খেয়ে নিয়ে আলোচনায় বসল। কিভাবে কি করা যায়, তার নানারকম ফন্দি আঁটতে লাগল।
মুসা বলল, বাইরে কোথাও লুকিয়ে থেকে সাগরের দিকে নজর রাখলে কেমন হয়?
মন্দ হয় না, কিশোর বলল। চলো যাই। জাহাজ থেকে বোটটোট পাঠালে দেখতে পারব।

কিন্তু গুহা থেকে বেরিয়েই ওরা পড়ে গেল কমান্ডারের সামনে। মনে হলো যেন আড়ি পেতে ওদের কথা শোনার চেষ্টা করছিল লোকটা। ওদেরকে দেখে কেমন থতমত খেয়ে গেল। আমতা আমতা করে বলল, তোমাদের কাছেই যাচ্ছিলাম…
কেন? জানতে চাইল কিশোর।
এই এমনি…ইয়ে, তোমরা আর কতদিন আছ এখানে… কথা শেষ না করেই চুপ হয়ে গেল কমান্ডার।
আমরা চলে গেলে খুশি হন মনে হয় আপনি? ফস করে বলে বসল মুসা।
না না…তা কেন? কয়েকজন পোড় খাওয়া নাবিক পড়শী হলে বরং ভালই লাগে। মনে নেই সেই দ্বীপটার কথা? তোমাদের নিয়ে নামলাম…তারপর..তারপর কি যেন ঘটল?
কি আর ঘটবে? মগজে গোলমাল! বলে দিল মুসা। মাথার ছিটে খোঁচা লাগল।
মানে? রেগে উঠল কমান্ডার।
তাড়াতাড়ি বলল কিশোর, না না, আপনি রাগবেন না। আমরা কাল সকালেই চলে যাচ্ছি।
চুপ হয়ে গেল কমান্ডার। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তাকিয়ে রইল কিশোরের মুখের দিকে। যেন তার কথা বুঝতে পারছে না। তারপর আনমনে মাথা নাড়তে নাড়তে চলে গেল নিজের গুহার দিকে।
বড় একটা পাথরের আড়ালে লুকিয়ে বসল তিন গোয়েন্দা।
রাত দুটো পর্যন্ত বসে থেকেও সাগরের দিক থেকে কোন জাহাজ বা বোট আসতে দেখল না। ঘন ঘন হাই তুলছে তিনজনেই। প্রচণ্ড ঘুম পেয়েছে।
মুখের কাছে হাত নিয়ে গিয়ে রবিন বলল, নাহ, আজ রাতে আর কিছু ঘটবে বলে মনে হয় না।
ঘটার আশাও করিনি।
তবে শুধু শুধু বসে রইলে কেন?
শিওর হয়ে নিলাম, আমার সন্দেহ ঠিক আছে কিনা।
কি বুঝলে?
ঠিকই আছে।
তোমার কথার মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে পারছি না আমি, কিশোর, মূসা বলল। এই ভোররাতে অত হেয়ালি ভাল্লাগছে না। যা বলার পরিষ্কার করে বলো।
একটা ব্যাপার তো অবশ্যই খেয়াল করেছ, কিশোর বলল, কমান্ডার চায় না আমরা এখানে থাকি। কায়দা করে জানতে এসেছিল, আমরা কখন যাব। বলে দিলাম, কাল যাব। সুতরাং আজ রাতে যেটা ঘটাতে চেয়েছিল, সেটা কাল ঘটাবে সে। আজ আমরা আছি বলে অপেক্ষা করবে। কাল আর থাকব না…

না থাকলে দেখব কি করে কি ঘটাচ্ছে?
বুড়ো ডেলভারের সাহায্য নিতে হবে।
কিভাবে?
সেটা কালই দেখো। চলো, এখন আর বকবক না করে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি।
.
পরদিন খুব সকালে ওর মালপত্র গুছিয়ে নিয়ে বাইরে বেরোতেই দেখে কমান্ডার দাঁড়িয়ে আছে সৈকতে। ওদের দেখে হেসে জিজ্ঞেস করল, তাহলে চলেই যাচ্ছ?
হ্যাঁ, জবাব দিল কিশোর, একজায়গায় আর কত। দেখারও নেই তেমন কিছু।
আমার কিন্তু ভালই লাগে এখানে।
আমাদেরও লাগা শুরু করেছিল, কিন্তু থাকতে আর দিলেন কই?-বলার ইচ্ছে ছিল মুসার, কিন্তু চেপে গেল। মুখে বলল, দূর, এই পাগলের আড্ডায় কে থাকে। তা ছাড়া খাবার নেই, কিছু না, আনতে গেলেও বিরাট ঝামেলা…
কমান্ডারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গিরিখাতের দিকে এগোল ওরা। পেছনে ফিরে তাকালে দেখতে পেত মুখে মুচকি হাসি নিয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে কমান্ডার।
পাহাড় পেরিয়ে ডেলভারের বাড়িতে পৌঁছল ওরা। তখনও মাছ ধরতে বেরোয়নি বুড়ো। ওদের দেখে অবাক হলো। কি ব্যাপার? এত সকাল সকাল? চোখমুখের অবস্থা দেখে তো মনে হয় না রাতে ভাল ঘুম হয়েছে। ভূতের পাল্লায় পড়েছিলে নাকি?
মুসা জবাব দিল, ভূত নাহলেও পাগলের পাল্লায় পড়েছিলাম…
কনুইয়ের গুঁতো মেরে ওকে থামিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি বলল কিশোর, গুহাটার একটা রহস্য আছে, মিস্টার ডেলভার, ঠিকই বলেছিলেন আপনি। রোখ চেপে গেছে আমার। এর রহস্য ভেদ না করে ছাড়ব না। এ জন্যে আপনার সাহায্য দরকার আমাদের।
চোখ কপালে উঠল বুড়োর। আমার সাহায্য! দেখো বাবা, আর যাই করতে বলো, গুহার কাছে যেতে বোলো না আমাকে, দুহাত নেড়ে বলল সে, আমি সেটা পারব না।
না, গুহার কাছে যেতে বলব না আপনাকে আশ্বস্ত করল কিশোর। মাছ ধরতে বেরোবেন না আজ?
বেরোব। নাস্তাটা সেরেই। তোমরা খেয়েছ?
না।
তাহলে এসো, বসে যাও আমার সঙ্গে।
হ্যাঁ। বসব। আপনার সঙ্গে মাছ ধরতে বেরোব আজ আমরাও আপত্তি আছে?

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কিশোরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল বুড়ো। তারপর মাথা নাড়ল, না, আপত্তি নেই। আরও অনেক কথা আছে তোমার পেটে, বুঝতে পারছি। এসো, খেতে খেতে ঢেলে দাও।

.

অতি পুরানো একটা মোটর বোট। ইঞ্জিনটাও আদিম। তবু ওটারই গায়ে আদর করে হাত বোলাল বুড়ো ডেলভার। গর্ব করে বলল, এটা আমার তিরিশ বছরের সঙ্গী। একসঙ্গে সাগরে বেরিয়েছি আমরা, কত মাছ ধরেছি!

ডোবাবে না তো আমাদের? মুসা বলল।

আহত হলো ডেলভার। কি যে বলো! তোমাদের কাজ যদি কেউ উদ্ধার করে দিতে পারে, আমার এই বোটটাই পারবে।

আর কথা না বলে দড়ি ধরে টান দিল সে। একটানেই স্টার্ট হয়ে গেল ইঞ্জিন। মৃদু হেসে গর্বিত চোখে মুসার দিকে তাকাল বুড়ো। নীরব ইশারা করে বুঝিয়ে দিল, কেমন বুঝলে?

ঢ্যাঙ্ক- ঢ্যাঙ্ক – ঢ্যাঙ্ক -ঢ্যাঙ্ক করে ইঞ্জিনের বিচিত্র আওয়াজ তুলে ঢেউ কেটে এগিয়ে চল বোট। কোনদিকে যেতে হবে বলে দিয়েছে কিশোর। সেদিকেই চালাল বুড়ো।

উপকূল একপাশে রেখে তীরের বেশ খানিকটা দূর দিয়ে এগিয়ে চলল বোট। ডেকের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে রইল তিন গোয়েন্দা। গুহা থেকে নজর রাখলেও ওদের দেখতে পাবে না কমান্ডার।

গুহার কাছ থেকে অনেক দূরে নোঙর ফেলল বোট, যাতে কমান্ডারের সন্দেহ না হয়। বুড়ো ডেলভার মাছ ধরতে লাগল, আর বিনকিউলার দিয়ে গুহার দিকে নজর রাখল গোয়েন্দারা।

আচমকা শক্ত হয়ে গেল রবিন। অ্যাই কয়েকজন লোক!

পাশ থেকে কিশোর বলল, আমিও দেখতে পাচ্ছি।

মুসা বলল, সামনের লোকটা কে? কমান্ডার মরিস না?

মনে হয়। ব্যাঙের মত লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটছে।

কমান্ডারের সঙ্গে আরও তিনজন লোক রয়েছে। একটা বাক্স ধরাধরি করে নিয়ে গুহার ভেতর চলে গেল।

এরপর দুই ঘন্টা পেরিয়ে গেল। বিনকিউলার ধরে রাখতে রাখতে হাত ব্যথা হয়ে গেল তিন গোয়েন্দার। কিন্তু নোকগুলো আর বেরোয় না।

রবিন বলল, নেমে গিয়ে দেখব নাকি ভেতরে কি করছে ওরা?

না, এভাবে যাওয়া ঠিক হবে না, কিশোর বলল, দেখে ফেলতে পারে।

আকাশের অবস্থা ভাল না। বারবার দিগন্তের দিকে তাকাচ্ছে ডেলভার। পানির রঙ গাঢ় সবুজ হয়ে গেছে। বড় হচ্ছে ঢেউগুলো। বাতাস বাড়ছে। দিগন্তেরকালো

মেঘের ভেতরে বিদ্যুৎ চমকাল একবার।
ঝড় আসছে, ঘোষণা করল বুড়ো। ফিরে যেতে হবে আমাদের।
আর কয়েক মিনিট থাকা যায় না? অনুরোধ করল রবিন।
না, লক্ষণ খুব খারাপ। এখুনি রওনা হতে হবে আমাদের।
ইঞ্জিন স্টার্ট দিল ডেলভার।
ঠিক এই সময় গুহা থেকে বেরিয়ে এল কমান্ডার। লোকগুলো নেই সঙ্গে। সৈকত দিয়ে পানির দিকে এগেলি সে।
কিন্তু কি করে সে, দেখার সুযোগ হলো না গোয়েন্দাদের। তার আগেই বাঁকের আড়ালে সরে এল বোট।
ঢ্যাঙ্ক-ঢ্যাঙ্ক করে এগিয়ে চলেছে বোট। বাতাস আর ঢেউ যে হারে বাড়ছে তাতে সময়মত জেটিতে পৌঁছতে পারবে কিনা সন্দেহ হলো মূসার। জিজ্ঞেস করল, স্পীড আর বাড়ানো যায় না?
না, মাথা নাড়ল ডেলভার, সাধ্যমত চলছে এটা।
বিশাল এক ঢেউ এসে ভেঙে পড়ল বোটের ওপর। পানির ছিটে ভিজিয়ে দিল আরোহীদের।
ঢেউয়ের সঙ্গে প্রাণপণ লড়াই করে খোঁড়াতে খোঁড়াতে যেন এগিয়ে চলেছে বৃদ্ধ জল্যানটা। দমছে না কোনমতেই।
আকাশে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে কালো মেঘ। কয়েক মিনিট পর আঘাত হানল বৃষ্টি।
মুসার মনে হতে লাগল, আজ ওদের ডুবিয়েই ছাড়বে বোট। সাগরের যা অবস্থা, এখন বোট ডুবলে মরতে হবে, বাঁচার কোনই আশা নেই।
কিন্তু বুড়োর কথাই ঠিক, ডুবল না বোট। ধুকতে ধুকতে প্রায় ডুবন্ত অবস্থায় এসে তীরে ভিড়ল। দড়ি আর শেকল দিয়ে শক্ত করে বোট বেধে নেমে পড়ল ডেলভার আর তিন গোয়েন্দা। বৃষ্টির মধ্যে মাথা নিচু করে দৌড়ে এসে ঘরে ঢুকল।
বিকেলের দিকে ঝড় থামল, কমে এল বৃষ্টি। পরিষ্কার হতে লাগল। আকাশ। পেটভরে খেয়ে আয়েশের ঢেকুর তুলে চেয়ারটা ঠেলে পেছনে সরাল ডেলভার। পাইপ ধরাল। ছেলেদের দিকে তাকিয়ে বলল, ঝড় তো থামল। এবার কি করার ইচ্ছে?
গুহার কাছে যাব, কিশোর বলল, কি ঘটে ওখানে দেখব।
দাঁতের ফাঁকে পাইপটা চেপে ধরল ডেলভার। ধোঁয়া টানা থামিয়ে দিয়েছে। চোখে ভয়। রাতের বেলা!
হ্যাঁ। অন্ধকার নামলেই বেরিয়ে পড়ব আমরা। রাত বারোটার মধ্যে ফিরে আসব।
টর্চটা বের করে ব্যাটারিগুলো খুলে নিয়ে পরীক্ষা করতে লাগল কিশোর।

যা বলছে তাই করবে ছেলেগুলো, এতদিনে বুঝে ফেলেছে ডেলভার, ওদের ঠেকানো যাবে না। তাই বাধা দেয়ার চেষ্টা করল না আর। তবে কয়েকবার করে সাবধান করল। বলল, যেতে বাধা দেব না, তবে আমার একটা পরামর্শ শোনো। সবার একসঙ্গে গিয়ে কাজ নেই। যে কোন দুজন। যাও। একজন আমার এখানে থাকো। সময়মত যদি না ফেরো তোমরা, সাহায্য করতে পারবে সে।
পরামর্শটা মনে ধরল কিশোরের। রাজি হলো।
সন্ধ্যা হতেই তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়ল সে আর মুসা। রবিন রয়ে গেল ডেলভারের বাড়িতে। যদিও এভাবে একা পড়ে থাকার ইচ্ছে তার ছিল না। তবু নেতার নির্দেশ, মানতেই হয়।
পাহাড়ে উঠতে শুরু করল দুই গোয়েন্দা। বৃষ্টিতে ভিজে পিচ্ছিল আর নরম হয়ে আছে মাটি। অন্ধকার হলে এ পথে চলার সাহস করত না ওরা। চাঁদের আলো আছে বলে এগোতে পারছে।
নিরাপদেই ওপরে উঠে পাহাড়ী পথ ধরে হেঁটে চলল দুজনে। গিরিখাতটা দেখা গেল একসময়। ওটা ধরে চলে বেরিয়ে এল সৈকতে।
পৌঁছে গেছে। ওখানে বসে জিরিয়ে নিল কয়েক মিনিট। তারপর উঠে পাহাড়ের দেয়ালে গা মিশিয়ে পা টিপে টিপে এগোল কমান্ডারের গুহার দিকে।
হঠাৎ থমকে দাঁড়াল কিশোর।
তার গায়ের ওপর এসে পড়ল মুসা। কি হলো!
হাত তুলে দেখাল কিশোর।
মুসাও দেখল। বড় বড় হয়ে গেল চোখ। নিজের অজান্তেই মুখ থেকে অস্পষ্টভাবে বেরিয়ে এল, খাইছে!
তীর থেকে তিনশো গজ দূরে সমুদ্রের পানিতে মিটমিট করে জ্বলছে একটা লাল আলো, যেন কোন একচোখো সাগর-দানবের চোখ। কিন্তু চাঁদের আলোয় লাল আলোর নিচের কালো অবয়বটাকে চিনতে ভুল হলো না। একটা সাবমেরিনের কনিং টাওয়ার।

.

প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেল দুজনে। এই তাহলে ব্যাপার। কমান্ডার মরিস কোন ধরনের গোপন দলের নেতা, বেআইনী কিছু করছে এই পাহাড়ের গুহায় থেকে। সাবমেরিনে করে রসদপত্র নিয়ে আসা হয়েছে।
গুহামুখের কাছ থেকে আগের রাতের মত সার্চলাইট জ্বলে উঠল। সাবমেরিনের দিকে তাকিয়ে দুবার জলল-নিভল আলোটা।
ধীরে ধীরে পানির ওপর ভেসে উঠল সাবমেরিনের পুরো পিঠ, অতিকায়। একটা মাছের মত। লাল আলোর নিচে কালো শরীর, অন্ধকারে ভয়ঙ্কর লাগছে

অবয়বটা।
আলোর সাহায্যে ওটাকে সঙ্কেত দিল কমান্ডার, কিশোর বলল। ইস্, একটা বোট যদি পেতাম গিয়ে দেখে আসতাম সাবমেরিনে কি ঘটছে।
মুসা বলল, এক কাজ করি, সাঁতরে চলে যাই আমি ওটার কাছে। বেশি দূর তো না। তুমি বসে থাকো এখানে।
কিশোর বাধা দেয়ার আগেই কাপড় খুলতে আরম্ভ করল সে।
সাবধানে যেয়ো, শুধু বলল কিশোর।
পাহাড়ের দেয়ালের সঙ্গে মিশে এগোল মুসা। পানির কাছে এসে ফিরে তাকাল একবার। কিশোরকে দেখা যায় না। পাথরের আড়ালে লুকিয়ে বসে আছে সে। ধীরে ধীরে পানিতে নেমে এল মুসা। মাথাটা কেবল ভাসিয়ে রেখে নিঃশব্দে সাঁতরে চলল সাবমেরিনের দিকে।
সেও পৌঁছল ওটার কাছে, সাবমেরিনের হ্যাচও খুলে গেল। পিচ্ছিল খোলসের গায়ে ধরার মত কিছু পেল না মুসা। ওটার গায়ে গা ঠেকিয়ে শুধু নাকটা পানির ওপরে ভাসিয়ে তাকিয়ে রইল হ্যাঁচের দিকে।
ছয়জন মানুষ বেরোল। কথা বলছে একটা অপরিচিত ভাষায়।
দশ ফুট দূর থেকে দেখছে মুসা। দুরুদুরু করছে বুক। ওদের কথা কিছুই বুঝতে পারছে না। হঠাৎ ইংরেজিতে বলে উঠল একজন, আমার মনে হয়। এখানে আমাদের মাতৃভাষায় কথা বলা উচিত না। কেউ শুনে ফেললে সন্দেহ করবে।
কে আর আসছে এখানে দেখতে, ইংরেজিতেই বলল আরেকজন।
তবু...এটা আমেরিকা, আমাদের সমঝে চলাই উচিত। অভ্যাস বদলাতে হবে।
ওদের সঙ্গে একটা রবারের ভেলা। ভেলাটা পানিতে ভাসিয়ে তাতে চড়ে বসল লোকগুলো। দাঁড় তুলে নিল দুজন। বেয়ে চলল তীরের দিকে।
বন্ধ হয়ে গেল হ্যাচ।
আর কিছু দেখার নেই এখানে। ভেলার পিছু পিছু মূসাও আবার তীরে ফিরে চলল। সাবধান রইল যাতে কোনমতেই লোকগুলোর চোখে পড়ে না। যায়।
কিছুদূর এসে কি মনে হতে ফিরে তাকাল। দেখল, পানির নিচে তলিয়ে যাচ্ছে কনিং টাওয়ার। লোকগুলোকে নামিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে সাবমেরিন।
আবার জ্বলে উঠল সার্চলাইট। ভেলার দিকে মুখ করে জ্বলল-নিভল দুবার।
মাথা যতটা সম্ভব নিচে নামিয়ে ফেলল মূসা। আলো নেভার পর আবার মাথা তুলে শুনল ভেলার একজন বলছে, মরিস জ্বেলেছে।
আরেকজন জবাব দিল, হ্যাঁ। তা ছাড়া এই পাহাড়ের মধ্যে লুকিয়ে থেকে আর সঙ্কেত দিতে আসবে কে?

তীরে পৌঁছল ভেলা। লোকগুলোকে চলে যাওয়ার সময় দিল মুসা। তারপর সেও উঠে এল সৈকতে। পাহাড়ের গা ঘেষে ফিরে এল পাথরটার কাছে, যেখানে কিশোর লুকিয়ে আছে। সবকথা জানাল ওকে।
পা টিপে টিপে কমান্ডারের গুহার কাছে চলে এল দুজনে। ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখল, লোকগুলোকে স্বাগত জানাচ্ছে মরিস। এক এক করে হাত মেলাচ্ছে ওদের সঙ্গে।
একটা ব্যাপার দৃষ্টি আকর্ষণ করল দুজনেরই, বদলে গেছে মরিসের চেহারা। অনেক বেশি তরুণ মনে হচ্ছে তাকে। কেন এমন দেখাচ্ছে সেটা কিশোর প্রথম বুঝতে পারল। ওদের সঙ্গে যতবার দেখা হয়েছে লোকটার, ততবার পরচুলা পরে ছিল। এখন কুচকুচে কালো ওর মাথার চুল। এগুলোই আসল, পরচুলা খুলে ফেলেছে। মুখের ভাজও এখন অদৃশ্য, তারমানে মেকআপও নিত দিনের বেলা।
হাত মেলানো শেষ করে লোকগুলোকে নিয়ে গুহার পেছন দিকে চলে গেল কমান্ডার। সুড়ঙ্গের ভেতর ঢুকে যাওয়াতেই বোধহয় মিলিয়ে গেল ওর হাতের আলো।
চলো, আমরাও ঢুকে পড়ি, কিশোর বলল।
ভেতরে ঢুকল দুজনে। গুহার গভীর থেকে ভেসে আসছে কথা বলার মৃদু শব্দ। অনেকটা গুঞ্জনের মত শোনা যাচ্ছে। খুব সাবধানে এগোল ওরা। ফিসফিস করে মুসাকে বলল কিশোর, দেখো তো, সুড়ঙ্গের মুখে কেউ আছে। কিনা? গার্ড রেখে যেতে পারে।
ভাল করে দেখল মুসা, অন্ধকারে কাউকে চোখে পড়ল না। কোন নড়াচড়া নেই। কাউকে দেখছি না।
আবার এগোল দুজনে। মিলিয়ে গেল কথার শব্দ। আলো ছাড়া আর এগোনো অসম্ভব। আরও কয়েক মিনিট অপেক্ষা করে লোকগুলোকে আরও ভেতরে চলে যাওয়ার সময় দিয়ে যা থাকে কপালে ভেবে কোমর থেকে টর্চ খুলে নিয়ে জ্বালল কিশোর। আলোর রশ্মি ঘুরিয়ে আনল একবার চারপাশে।
তাকের ওপর আগের মতই পড়ে আছে শটগানটা। পাশে নোটবইটাও আছে, তবে ক্যাপটা নেই। বোধহয় সরিয়ে ফেলেছে কমান্ডার। নিচে জড় করে রাখা খাবারের টিন।
লোকগুলো যেদিকে গেছে সেদিকে এগোল দুজনে। যতই ভেতরে ঢুকল বিস্ময়ে হা হয়ে গেল মুখ। গুহার পেছন থেকে বৈদ্যুতিক তারের মোটা পাইপ চলে গেছে সুড়ঙ্গের ভেতরে।
তোমার কথাই ঠিক, মুসা বলল। এই পাইপই আমার যন্ত্রে ধরা পড়েছিল। কিন্তু এ সব দিয়ে এখানে কি করছে ব্যাটারা?

চলো, গেলেই দেখতে পাব। আমার মনে হয় ওরা কোন দেশের স্পাই। রাডার স্টেশনটার দিকে লক্ষ। ওটাকে কিছু করতে চায়। ও কিন্তু ডিগ আর গেনারের ব্যাপারটা তাহলে কি? ওরা এর মধ্যে আসছে কি করে?
এখনও বুঝতে পারছি না। চলো, এগোই…
কিন্তু কিশোরকে কথা শেষ করতে দিল না একটা কণ্ঠ, অন্ধকার থেকে বলে উঠল, আর এগোনোর দরকার নেই। থাকো ওখানেই।
চমকে গেল কিশোর। আপনাআপনি টর্চ ধরা হাতটা ঘুরে গেল, আলো গিয়ে পড়ল লোকটার হাসি হাসি মুখের ওপর।
মেরিন ডিগ!
বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন মুসার শরীরে। তিন লাফে চলে গেল তাকের কাছে। আবছা অন্ধকারে আন্দাজেই থাবা দিয়ে তুলে নিল শটগানটা। তাক করল ডিগের দিকে।
কিন্তু পরক্ষণেই আকাশ ভেঙে পড়ল যেন ওর মাথায়। পেছন থেকে শক্ত কিছু দিয়ে সজোরে বাড়ি মারা হয়েছে। অন্ধকারে আরও একজন লোক লুকিয়ে ছিল। টলে পড়ে গেল মুসা।

.

জ্ঞান ফিরলে দেখল সে, হাত-পা বাঁধা অবস্থায় গুহার মেঝেতে পড়ে আছে। কিশোরকে একইভাবে বেধে ফেলে রাখা হয়েছে ওর পাশে। কাছেই পিস্তল হাতে বসে আছে ডিগ। একটা ল্যাম্প জ্বলছে, তার আলোয় কুৎসিত লাগছে। ওর মুখটা।
যাক, ঘুম তাহলে ভাঙল, হেসে বলল ডিগ। আমি জানতাম তোমরা এমন কিছু একটা করবে, আসবে, তাই লুকিয়ে ছিলাম তোমাদের অপেক্ষায়।
তা তো বুঝলাম, নিজের কণ্ঠ শুনে নিজেই অবাক হয়ে গেল মুসা, কোলাব্যাঙের স্বর বেরোচ্ছে তার গলা দিয়ে। কিন্তু এ ভাবে কতক্ষণ আটকে রাখবেন আমাদের?
বেশিক্ষণ না। এই আর কয়েক ঘণ্টা, ততক্ষণে আমাদের কাজ শেষ হয়ে যাবে।
তারপর ছেড়ে দেবেন? ফিরে গিয়ে যদি পুলিশকে সব কথা বলে দিই আমরা?
সেজন্যেই তো ছাড়ব না। আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাব। তোমাদের দিয়ে কাজ হবে। বুদ্ধিমান ছেলে তোমরা, ব্রেন ওয়াশ করে নিলে অনেক কাজ করাতে পারব।
কোথায় নিয়ে যাবেন আমাদের? জানতে চাইল কিশোর।
সেটা বলা যাবে না। গেলেই দেখতে পাবে।
এখানে কি, করছেন আপনারা, সেটা তো বলা যাবে? রাডার স্টেশনটাতে কিছু করছেন, তাই না?
হাসল ডিগ। অতটা আন্দাজ করে ফেলেছ! হ্যাঁ, ওখানেই…

কথা শেষ হলো না তার। একসঙ্গে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল অনেক লোক। কঠিন গলায় আদেশ হলো, খবরদার, নড়বে না কেউ! পুলিশ!

স্তব্ধ হয়ে গেল ডিগ। হাত থেকে আস্তে করে মাটিতে নামিয়ে রাখল পিস্তলটা।

উজ্জ্বল আলো জ্বলে উঠল কয়েকটা, পুলিশের ব্যাটারি চালিত বৈদ্যুতিক ল্যাম্প।

হাসিমুখে মুসা আর কিশোরের পাশে এসে বসল রবিন। এগিয়ে এল ডেলভার।

বাঁধনের দড়ি কাটতে কাটতে রবিন বলল, সময়মতই এসে পড়েছি, তাই? তোমাদের জন্যে কাটায় কাটায় বারোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করেছি আমরা। তারপর থানায় গেছি।...তা ভাল আছ তো তোমরা? মারধর করেনি?

করেনি বললে ভুল হবে, তিক্তকণ্ঠে বলল মুসা। মাথায় বাড়ি দিয়ে বেঁহুশ করে ফেলেছিল আমাকে...

.

পরদিন বিকেল। রকি বীচে তিন গোয়েন্দার ওঅর্কশপে বসে আছে ওরা। এই সময় একটা গাড়ি ঢুকল ইয়ার্ডে। গাড়ি থেকে নামল একজন লম্বা, সুদর্শন, লোক। গোয়েন্দাদের খোঁজ করল। নিজের পরিচয় দিল-ফিন রিগসন, এফ বি আইয়ের লোক। জানাল, হ্যারিস গেনারের নিরুদ্দেশের ব্যাপারে কথা বলতে এসেছে।

তিন গোয়েন্দাও আগ্রহী হলো। ডেকে নিয়ে গিয়ে বসাল ওঅর্কশপের ভেতর।

ভদ্রলোককে দেখে সেরাতে গুহায় ঢোকার কথা মনে পড়ল কিশোরের। একজন স্পাইও পালাতে পারেনি। দল বেঁধে সুড়ঙ্গে ঢুকেছে পুলিশ। ঢোকার আগে হেডকোয়ার্টারে ওয়্যারলেস করে বলে দিয়েছে একজন অফিসার, বাইরে থেকে যাতে রাডার স্টেশনটা ঘিরে ফেলা হয়।

সেইমত কাজ করেছে হেডকোয়ার্টার থেকে আসা পুলিশ বাহিনী। অতএব কেউ পালাতে পারল না। স্টেশনের নিচের একটা গুপ্তকক্ষ থেকে সব কজন স্পাইকে গ্রেপ্তার করা হলো। গুহাটা থেকে প্রাকৃতিক সুড়ঙ্গ বেরিয়ে চলে গেছে স্টেশনের দিকে। মূল সুড়ঙ্গ থেকে আরেকটা শাখা-সুড়ঙ্গ খুঁড়ে স্টেশনের নিচে চলে আসার ব্যবস্থা করেছে স্পাইরা। একটা কক্ষ বানিয়ে নিয়েছে যাতে ওখান থেকে ওপরে উঠে গোপনে স্টেশনের কাজকর্ম দেখতে পারে।

সাবমেরিন থেকে আসা সব কজনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ, সেই সঙ্গে কমান্ডার মরিস আর মেরিন ডিগকেও। যাকে উদ্দেশ্য করে এই তদন্তের শুরু, তন্ন তন্ন করে খুঁজেও তাকে গুহা বা সুড়ঙ্গের কোথাও পাওয়া গেল না।

ডিগকে বার বার করে জিজ্ঞেস করা হলো, কিন্তু জবাব পাওয়া গেল একটাই–সে কিছু জানে না।

কিন্তু নিরাশ হলো না অফিসার। থানায় নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে কথা আদায়ের চেষ্টা করা যাবে।

সে ব্যাপারেই হয়তো কিছু বলবে, ভাবল কিশোর। জিজ্ঞেস করল, হ্যারিস গেনারের কোন খোঁজ পাওয়া গেছে?
মাথা ঝাঁকাল রিগসন, গেছে। ওকেও পাওয়া গেছে। হাসপাতালে আছে এখন।
তাই নাকি! খুব খারাপ অবস্থা?
শরীর ঠিকই আছে, তবে বোধহয় মাথায় কোন গোলমাল হয়েছে। একটা ঘোরের মধ্যে রয়েছে। ওষুধের রিঅ্যাকশনও হতে পারে।
তার বোন ইভা গেনারকে খবর দেয়া হয়েছে?
সেজন্যেই তো তোমাদের কাছে এলাম, ঠিকানা জানার জন্যে।
ও, চলুন তাহলে, আগে তাকে গিয়ে খবরটা দিই। তারপর একসঙ্গে হাসপাতালে যাব গেনারকে দেখতে। তা কোথায় পেলেন ওকে?
সাবমেরিনের মধ্যে, রিগসন জানাল। ওকে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল ওটা। স্পাইগুলোকে ধরার পর তোমাদের কথামত সাবধান করে দেয়া হয়েছিল কোস্টগার্ডকে। নৌবাহিনীর সহায়তায় সাবমেরিনটাকে ধরে ফেলা। হয়েছে। তার ভেতর থেকে উদ্ধার করা হয়েছে গেনারকে। গুহাতেই রাখা। হয়েছিল ওকে। ওখান থেকে সাবমেরিনে পাচার করা হয়েছে।
ও তো নিশ্চয় কিছু বলতে পারেনি? জানতে চাইল রবিন।
আবার মাথা নাড়ল রিগসন।
কিশোর জিজ্ঞেস করল, রাডার স্টেশনটাতে কি করছিল ওরা জানা। গেছে?
দুটো উদ্দেশ্যে ব্ল্যাক হোল কেভে আস্তানা গেড়েছিল ওরা। ওই উপকূলে গুপ্তচরদের একটা ঘাটি বানিয়েছিল। ওখানে লুকিয়ে থেকে নানা রকম ধ্বংসাত্মক কাজকারবার চালানোর পরিকল্পনা করেছিল ওরা দেশের ভেতর। সেই সঙ্গে রাডার স্টেশনটাকেও অকেজো করে রাখার চেষ্টা চালাত। তাতে বিমান আর নৌবাহিনীর অনেক বড় ধরনের ক্ষতি হতে পারত।
রাডার স্টেশন অকেজো করত কিভাবে? জানতে চাইল মুসা।
একটা বিশেষ যন্ত্র গুহার ভেতর থেকে রাতের বেলা বাইরে ঠেলে দিত, রিগসন জানাল, তাতে বাধা পেত রাডার সিগন্যাল, জ্যাম হয়ে যেত।
বাপরে বাপ, কত্তবড় শয়তান, ব্যাটারা!
হ্যাঁ, লোক খুব খারাপ ওরা। মজার ব্যাপার হলো, কমান্ডার জিন মরিস নিজেকে জাহাজের কমান্ডার বলে পরিচয় দিলেও কোনদিন নাবিক ছিল না সে। অল্প বয়সে কিছুদিন এক তৃতীয় শ্রেণীর থিয়েটারে অভিনয় করেছে। বিদেশে একটা সাংস্কৃতিক ভ্রমণ করার সময় স্পাইয়ের খপ্পরে পড়ে খারাপ হয়ে যায়, বিদেশী সংস্থার হয়ে নিজের দেশের বিরুদ্ধে বেঈমানী শুরু করে…
বাধা দিল রবিন, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে?

আরে নাহ, ইংল্যান্ড কোথায়? আমেরিকা। ও আমেরিকান। কোনকালেই ইংরেজ ছিল না, শরীরে কোনভাবেই ইংরেজ রক্ত আসেনি, মায়ের দিক থেকেও না, বাপেরও না। ব্রিটিশ জাহাজের কমান্ডার বলে ফাঁকি দিয়েছে তোমাদেরকে। আরও বহুজনকে দিয়েছে। পাগলের অভিনয় করাও তার আরেকটা ফাঁকিবাজি। মহাধড়িবাজ লোক।

হ্যাঁ, মুসা বলল, আমরা তো সত্যি সত্যি পাগল ভেবে বসেছিলাম। ভেবেছি একলা থাকতে থাকতে মাথাটা ওর বিগড়ে গেছে।

পাগলামি করাতে অবশ্য সুবিধেই হয়েছে আমাদের, কিশোর বলল, সন্দেহটা তাড়াতাড়ি জেগেছে। আচ্ছা, মুসা যে পিস্তলটা পেয়েছে, ওটার। ব্যাপারে কিছু জেনেছেন নাকি? অস্ত্রটা মরিসেরই, তাই না?

হ্যাঁ, রিগসন বলল, মরিস সব স্বীকার করেছে। তোমাদের গুহা থেকে যে রাতে খাবার চুরি করেছে, সে রাতে ওটা হারিয়ে ফেলেছিল। অন্ধকারে তাড়াহুড়োয় আর খুঁজে পায়নি। খাবার চুরি করেছিল তোমাদের তাড়ানোর জন্যে। ভেবেছিল, খাবার না পেলে আপনিই চলে যাবে তোমরা।

সেটা তখনই বুঝতে পেরেছি।

ক্যাপটা কার? নিশ্চয় গেনারের?

মাথা ঝাঁকাল রিগসন। হ্যাঁ।

সে ওই গুহায় কি করে গিয়েছিল, কিছু জেনেছেন?

ডিগের কথাবার্তায় সন্দেহ হয়েছিল তার, ব্ল্যাক হোল গুহায় কিছু ঘটছে। একরাতে গোপনে ওর পিছু নিয়ে চলে যায় সেখানে। কিন্তু মরিসের চোখে পড়ে যায়। পালানোর চেষ্টা করে গেনার। কিন্তু বন্দুকের ফাঁকা গুলি করে তাকে ভাঁড়কে দেয় মরিস। আটকে ফেলে।...যাই হোক, কথা তো অনেক হলো। চলো এবার, গেনারের বোনকে খবরটা দেয়া যাক।

রিগসনের সঙ্গে বেরোল তিন গোয়েন্দা।

খবর শুনে তো কেঁদেই ফেলল ইভা। তখুনি ওদের সঙ্গে রওনা হলো হাসপাতালে।

ঘোর কেটেছে গেনারের। তবে অতিরিক্ত দুর্বল। দুজন পুলিশ অফিসার বসে আছে, তার সাক্ষাৎকার নেয়ার জন্যে।

তিন গোয়েন্দা কি করেছে শুনে কৃতজ্ঞতায় চোখে পানি চলে এল তার। ধরা গলায় বলল, তাহলে তোমরাই আমাকে বাঁচিয়েছ! সময়মত সাবমেরিনটাকে আটকাতে না পারলে আমাকে কোথায় যে নিয়ে যেত ওরা কে জানে! সারাজীবনে হয়তো আর দেশের মুখ দেখতাম না। হয়তো ব্রেন ওয়াশ করে মাথাটাই বিগড়ে দিত চিরকালের জন্যে। কি বলে যে ধন্যবাদ দেব তোমাদেরকে...

ভলিউম ১৩ – জিনার সেই দ্বীপ – তিন গোয়েন্দা – রকিব হাসান – সেবা প্রকাশনী
প্রথম প্রকাশ: জুলাই, ১৯৯৪
০১.
বাস থেকে নেমেই কুকুরটার ওপর চোখ পড়ল তিন গোয়েন্দার। কিংবা বলা যায় কুকুরটাই ওদেরকে তার দিকে তাকাতে বাধ্য করল, দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে একনাগাড়ে ঘেউ ঘেউ করছে।
ওই যে রাফি, মুসা বলল। জিনা কোথায়?
কেন, রাফির পাশে দেখতে পাচ্ছ না? হেসে বলল কিশোর।
কই?...ও, আবার ছেলে সাজার ভূত চেপেছে মাথায়।
মালপত্রগুলো ভাগাভাগি করে হাতে তুলে নিয়ে সেদিকে এগোল তিনজনে। কাছে গিয়ে মুসা বলল, আর গম্ভীর হয়ে থাকার ভান করে লাভ নেই, জিনা, চিনে ফেলেছি।
ম্লান হাসল জিনা। তোমরা এলে তাহলে। খুব খুশি হয়েছি।
তুমি অমন মুখ গোমড়া করে রেখেছ কেন? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
আম্মার শরীরটা ভাল না।
কি হয়েছে? উদ্বিগ্ন হয়ে প্রায় একসঙ্গে জিজ্ঞেস করল তিন গোয়েন্দা। কেরিআন্টিকে খুব ভালবাসে ওরা।
কি জানি, গরমটা বোধহয় সহ্য করতে পারেনি।
হু, গম্ভীর হয়ে মাথা দোলাল কিশোর। হতে পারে। যা গরম পড়েছে।
রবিন জানতে চাইল, আংকেলের কি খবর?
— কি আর হবে, জবাব দিল জিনা। আম্মার শরীর খারাপ হলে যা হয়। দুশ্চিন্তা করে করে মেজাজ আরও চড়ে গেছে। কাউকে দেখলেই খেঁকিয়ে ওঠে।
খাইছে! শঙ্কিত হয়ে পড়েছে মুসা, ও-বাড়িতে থাকব কি করে তাহলে?
অত ভাবছ কেন? হেসে আশ্বাস দিল জিনা, থাকার কি আর জায়গা নেই? বাড়িতে থাকতে না পারলে আমার দ্বীপটায় চলে যাব। ছুটি কাটাতে কোন অসুবিধে হবে না।
গরমের লম্বা ছুটি শুরু হয়েছে। ছুটি কাটাতে গোবেল বীচে জিনাদের বাড়িতে এসেছে তিন গোয়েন্দা। এখানে এলে খুব আনন্দে সময় কাটে ওদের। কিন্তু আসার সঙ্গে সঙ্গে এমন একটা দুঃসংবাদ শুনবে এবার, ভাবেনি। শুরুতেই কেমন গড়বড় হয়ে গেল।
কিশোর বলল, তা নাহয় গেলাম। কিন্তু আন্টির শরীর খারাপ থাকলে আমাদের আনন্দ জমবে না।
চলো আগে, বাড়ি তো যাই। তারপর দেখা যাবে।

জোরে জোরে লেজ নাড়ছে রাফি। তার দিকে কারও নজর নেই বলে খ করে অভিযোগ করল। এই
মুসা হেসে জিজ্ঞেস করল, কেমন আছিস রে, রাফি?
রাফি জবাব দিল, ঘউ, অর্থাৎ, ভাল।
ট্যাক্সি নিল ওরা।
গোবেল ভিলায় পৌঁছল। দরজা খুলে দিল এক মাঝবয়েসী গোমড়ামুখো মহিলা। চেহারা দেখে মনে হয়, হাসতে শেখেনি। এমন দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকাল যেন, ওরা একেকটা শুঁয়াপোকা।
দরজা খুলে দিয়েই চলে গেল সে।
বাপরে বাপ, কি ভঙ্গি! কে? নিচু গলায় জিনাকে জিজ্ঞেস করল মুসা।
আমাদের নতুন রাঁধুনী।
কেন আইলিন কোথায়?
ওর মায়ের পা ভেঙেছে। মাকে দেখতে গেছে। কদিনের জন্যে মিসেস টোডকে রেখেছে আম্মা।
যেমন নাম তেমন চেহারা! হুহ। বেঙই বটে! বেশিদিন থাকবে না তো? আইলিন কবে আসবে?
ঠিক নেই।
ট্যাক্সি বিদেয় করে দিয়ে মালপত্র নিয়ে ঘরে ঢুকল ওরা। বসার ঘরে সোফায় শুয়ে আছেন মিসেস পারকার। ওদের দেখে হাসলেন।
চেহারা দেখে চমকে গেল কিশোর। এ-কি হাল হয়েছে! চোখ বসা, মুখ শুকনো, ফ্যাকাসে, এক ছটাক রক্ত নেই যেন শরীরে।
কি হয়েছে, আন্টি? এ-অবস্থা হলো কি করে?
ও কিছু না, সেরে যাবে। তোমরা কেমন আছ?
ভাল…
ওপরে যাও। ব্যাগট্যাগগুলো রেখে, হাতমুখ ধুয়ে এসো। আমি চা দিতে বলছি।
– আব্বা কোথায়? জানতে চাইল জিনা।
হাঁটতে বেরিয়েছে। গুহা ছেড়ে কি আর যেতে চায়। জোর করে পাঠালাম।
গুহা হলো জিনার বাবার স্টাডি, যেখানে ঢুকলে আর বেরোতে চান না তিনি, গবেষণা করে কাঁটান–জানা আছে তিন গোয়েন্দার।..
ওপরে উঠে পরিচিত সেই পুরানো শোবার ঘরে ঢুকল ওরা। জানালা দিয়ে সাগর চোখে পড়ে। অতি মনোরম দৃশ্য। কিন্তু এ-মুহূর্তে সাগর ওদেরকে খুশি করতে পারল না। কেরিআন্টির অসুখ মন খারাপ করে দিয়েছে।
*

পরদিন সকাল। কিশোরের ঘুম ভাঙল সবার আগে। জানালা দিয়ে রোদ। এসে পড়েছে। কানে আসছে সৈকতে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের একটানা ছলাৎ ছল, ছলাৎছল। বিছানা থেকে উঠে জানালায় এসে দাঁড়াল সে। ঘন নীল আকাশের ছায়া সাগরকেও নীল করে দিয়েছে। প্রণালীর মুখে যেন ফুটে রয়েছে জিনার সেই দ্বীপটা; গোবেল আইল্যান্ড।

খুব সুন্দর, না? পাশে এসে দাঁড়িয়েছে মুসা। আমি সাঁতার কাটতে যাচ্ছি।

নাস্তা না করেই?

এসে করব।

তিনজনে এসে দাঁড়াল জিনার ঘরের সামনে। একবার ডাকতেই সাড়া এল। দরজা খুলল জিনা। সে আগেই উঠেছে। ওদের অপেক্ষাতেই ছিল।

কিশোর বলল, চলো, আন্টিকে দেখে যাই।

উঠেই দেখতে গেছি আমি, জিনা বলল। দরজা খোলেনি। ঘুমাচ্ছে।

ও, তাহলে থাক। ঘুম ভাঙানো ঠিক না।

বাড়ির পেছন দিয়ে একটা পথ আছে সৈকতে যাওয়ার। সেটা ধরে চলল। চারজনে। পেছনে লেজ নাড়তে নাড়তে চলল রাফি। লম্বা জিভ বের করে দিয়েছে খুশিতে। সে জানে, মজা হবে এখন।

প্রচুর সাঁতার-টাতার কেটে বাড়ি ফিরল ওরা। খুব খিদে পেয়েছে। বাগানের কোণে বসা ছেলেটাকে নজরে পড়ল রবিনের। বোকা বোকা চেহারা। তেরো-চোদ্দ বছর বয়েস।

ও কে?

বেঙাচি, জবাব দিল জিনা।

মানে!

বেঙের পোনা তো বেঙাচিই হয়, নাকি?

মিসেস টোডের ছেলে? জানতে চাইল কিশোর।

হ্যাঁ। টেরি।

খাইছে! আঁতকে উঠল মুসা। আবার টেরি! শুঁটকি টেরির মত শয়তান না তো?

তার চেয়ে খারাপ। আমাকে দেখলেই ভেঙচি কাটে, আজেবাজে ছড়া বলে খেপায়।

মারছে রে! শুঁটকি থেকে শেষে বেঙাচি টেরির পাল্লায় এসে পড়লাম...

মুসার কথা শেষ হতে না হতেই সুর করে বলে উঠল ছেলেটা:

জিনা, ঘিনা; জিনার মুখে ছাই

দাঁড়কাকে ঠুকরে দিলে আর রক্ষা নাই!

রাগে লাল হয়ে গেল জিনার মুখ। তিন গোয়েন্দা মনে করল, ছুটে গিয়ে ঠাস করে এখন ছেলেটার গালে চড় কষাবে সে। কিন্তু ওদেরকে অবাক করে দিয়ে কিছুই করল না। বরং রাফির কলার ধরে আটকাল, ছেলেটার কাছে। যেতে দিল না। করুণ কণ্ঠে বলল, আমাকে দেখলেই এই ছড়া বলে! আর সহ্য হয় না।
মুসা ধমক দিয়ে বলল, এই ছেলে, খেপাও কেন?
টকটকে লাল মুখ ছেলেটার। মুসার কথায় মুখ বাঁকিয়ে হাসল। আবার শুরু করল, জিনা, ঘিনা…
দেখো, ভাল হবে না কিন্তু! এগিয়ে গেল মুসা।
কিন্তু মুসা তার কাছে পৌঁছার আগেই একছুটে রান্নাঘরে ঢুকে গেল ছেলেটা।
জিনার দিকে ফিরে বলল বিস্মিত মুসা, জিনা, ওর অত্যাচার সহ্য করো! এখনও কিছু করোনি!
চড়িয়ে সবগুলো দাঁতই তো ফেলে দিতে ইচ্ছে করে, নিতান্ত অসহায় ভঙ্গিতে হাত ডলল জিনা, কিন্তু উপায় নেই। আম্মার শরীর খারাপ। টেরিকে কিছু করলে ওর মা যদি কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে যায়, ভীষণ বিপদে পড়ে যাবে আম্মা। সেজন্যেই কিছু করতে পারি না।
জিনা, সত্যি অবাক করলে, কিশোর বলল। তোমার যে এতটা সহ্যশক্তি, জানতাম না।
আম্মা নিশ্চয় উঠে পড়েছে এতক্ষণে। বিছানায় নাস্তা দিয়ে আসতে হবে। তোমরা দাঁড়াও এখানে, আমি আসছি। রাফিকে আটকে রাখো, টেরিকে দেখলেই কামড়াতে যাবে।
জিনা ঘরে ঢুকে যেতেই অস্থির হয়ে উঠল রাফি। নাক তুলে কি যেন শুঁকছে।
রান্নাঘরের দরজায় বেরিয়ে এল একটা ছোট কুকুর। সাদা রঙ, ময়লা, যেন বহুদিন ধোঁয়া হয়নি। মাঝে মাঝে বাদামী ছোপ। দেখতে একটুও ভাল না। রাফিকে দেখেই দু-পায়ের ফাঁকে লেজ গুটিয়ে ফেলল।
ওটাকে দেখেই গলা ফাটিয়ে ঘাউ ঘাউ করে উঠল রাফি। কিশোরের হাত থেকে হ্যাঁচকা টানে কলার ছুটিয়ে নিয়ে দিল দৌড়।
রাফি, রাফি, আয় বলছি! চিৎকার করতে করতে তার পেছনে ছুটল কিশোর।
কিন্তু কে শোনে কার কথা। কুকুরটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল রাফি। ভয়েই আধমরা হয়ে গেছে কুকুরটা। চার পা শূন্যে তুলে দিয়ে কেউ কেউ করছে। তার কান কামড়ে দেয়ার চেষ্টা করতে লাগল রাফি।
কুকুরটার চিৎকারে রান্নাঘরের দরজায় বেরিয়ে এল মিসেস টোড। হাতে একটা সসপ্যান।
হেই কুত্তা, হেই! বলে লাফ দিয়ে নামল নিচে। সসপ্যান দিয়ে বাড়ি মারল রাফিকে।

ঝট করে সরে গেল রাফি। বাড়িটা তার গায়ে না লেগে লাগল অন্য কুকুরটার গায়ে। আরও জোরে চেঁচিয়ে উঠল ওটা।
টেরিও বেরিয়ে এল। একটা পাথর তুলে নিয়ে রাফিকে ছুঁড়ে মারার সুযোগ খুঁজতে লাগল।
চেঁচিয়ে উঠল মুসা, খবরদার! মেরে দেখো খালি! শয়তান ছেলে কোথাকার!
ভীষণ চেঁচামেচি শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন পারকার আংকেল। ধমক দিলেন, অ্যাই, কি হচ্ছে! হচ্ছে কি এসব!
দমকা বাতাসের মত যেন ঘর থেকে উড়ে বেরোল জিনা। ছুটে গেল রাফির দিকে। আবার কুকুরটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে রাফি। কান না ছিঁড়ে আর ছাড়বে না।
অ্যাই, সরাও, সরাও কুত্তাটাকে! ধমকে উঠলেন মিস্টার পারকার।
কাছেই একটা কল আছে। পাইপ লাগানো। বাগানে পানি দেয়া হয়। ছুটে গিয়ে পাইপটা তুলে নিয়ে কুকুর দুটোর ওপর পানি ছিটাতে শুরু করল রবিন। হঠাৎ এভাবে গায়ে পানি পড়ায় চমকে গিয়ে লাফিয়ে সরে দাঁড়াল রাফি। এই সুযোগে উঠে সোজা রান্নাঘরের দিকে দৌড় দিল অন্য কুকুরটা।
ইচ্ছে করেই পাইপের মুখ সামান্য সরিয়ে টেরিকেও ভিজিয়ে দিল রবিন। ছেলেটাও চেঁচিয়ে উঠে দৌড় দিল তার কুকুরের পেছনে।
কড়া চোখে রবিনের দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচিয়ে ধমক লাগালেন আংকেল, ওকে ভেজালে কেন?...জিনা, তোকে না কতবার বলেছি। কুত্তাটাকে বেঁধে রাখতে!... মিসেস টোড, তুমিও বাপু কথা শোনে না। রান্নাঘর থেকে বেরোতে দাও কেন কুত্তাটাকে? বেঁধে রাখলেই হয়। সবাইকে শাসিয়ে বললেন, আর যেন এমন না হয়।
চুপ করে আছে সবাই।
মিসেস টোডের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, নাস্তা হয়েছে? বেলা তো দুপুর হয়ে গেল। রোজই এক অবস্থা!
গজগজ করতে করতে রান্নাঘরে চলে গেল মিসেস টোড।
পারকারও ঘরে চলে গেলেন।
রাফির গলায় শেকল বাঁধতে বাঁধতে খেঁকিয়ে উঠল জিনা, কতবার মানা করেছি ওটার সঙ্গে লাগতে যাবি না। তা-ও যাস। আটকে থেকে এখন মজা বোঝ... বাবাকে রাগিয়েছিস, সারাটা দিনই আজ রেগে থাকবে। বুড়িটাকেও খেপিয়েছিস। চায়ের জন্যে কেক-টেক কিছু বানাবে না আর।
বেচারা রাফি। খুব লজ্জা পেয়েছে। মাথা নিচু করে, লেজ গুটিয়ে মৃদু কুঁই কুঁই করল। থুক করে কয়েকটা লোম ফেলল দাঁতের আগা থেকে। কুকুরটার কান

ছিঁড়তে পারেনি, তবে কানের ডগার লোম ছিঁড়তে পেরেছে। আপাতত তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে।
পুরো ঘটনাটার জন্যেই নিজেকে দায়ী মনে করছে কিশোর। বলল, কি করে যে ছুটে গেল...আসলে অনেক জোর ওর, ধরে রাখতে পারলাম না...
ওর গায়ে বাঘের জোর, খুশি হয়ে বলল জিনা। বেঙাচির কুকুরটাকে দুই কামড়ে খেয়ে ফেলতে পারে ও।
নাস্তা দেয়া হলো। কেরিআন্টি নেই টেবিলে। তার বদলে রয়েছেন পারকার আংকেল, যেটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার ছেলেমেয়েদের জন্যে। এমনিতেই তাঁর সঙ্গে খেতে বসতে চায় না কেউ, আজ তো মেজাজ আরও সপ্তমে চড়ে রয়েছে। কি যে করে বসবেন ঠিক নেই। শুরুতেই কয়েকটা বকা দিলেন। জিনাকে। কড়া নজর বুলিয়ে আনলেন সবার ওপর একবার। কুঁকড়ে গেল রবিন। এখানে বেড়াতে এসেছে বলে এবার আফসোসই হতে লাগল তার।
পরিজের প্লেট এনে ঠকাস করে টেবিলে ফেলল মিসেস টোড।
এটা কি রকম হলো? ধমকে উঠলেন আংকেল, আস্তে রাখতে পারো না!
তাঁকে ভয় পায় মহিলা। তাড়াতাড়ি চলে গেল। এরপর অন্যান্য প্লেট এনে যতটা সম্ভব ভদ্রভাবে শব্দ না করে রাখল।
কয়েক মিনিট নীরবে খাওয়ার পর ছেলেমেয়েদের বিষণ্ন মুখগুলো দেখে মায়া হলো পারকারের। কণ্ঠস্বর কোমল করে জিজ্ঞেস করলেন, আজ তোমাদের কি কি করার প্ল্যান?
ভাবছি কোথাও পিকনিকে চলে যাব, জবাব দিল জিনা।
যাও না, মন্দ কি। বাড়িটা শান্ত থাকবে।
যাব যে, খাব কি? মিসেস টোড কি স্যান্ডউইচ বানিয়ে দেবে?
দেবে না কেন, নিশ্চয় দেবে। তাকে রাখাই হয়েছে খাবার তৈরির জন্যে। না দিলে আমার কথা বলবে।
চুপ হয়ে গেল জিনা। মিসেস টোডকে স্যান্ডউইচ বানিয়ে দেয়ার কথা বলার সাহস বা মানসিকতা কোনটাই নেই তার। মহিলার সামনে যেতেই ইচ্ছে করে না তার।
কুত্তাটাকে কিছু কোরো না, তাহলেই আর রাগবে না তোমাদের ওপর, পারকার বললেন।
ডার্টিটাকে যে কেন আনতে গেল...
ডার্টি! ভুরু কোঁচকালেন পারকার, ছেলেটার নাম বুঝি? এটা একটা নাম হলো।
ছেলে নয়, কুত্তাটার নাম। ওরা ডাকে ডারবি। এক্কেবারে নোংরা তো; গোসল করায় না, গায়ের গন্ধে ভূত পালায়, উকুনে ভরা, তাই আমি রেখেছি ডার্টি।

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত নীরবে মেয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন পারকার। হঠাৎ সবাইকে অবাক করে দিয়ে হো হো করে হেসে উঠলেন। মাঝপথেই হাসি থামিয়ে আবার গম্ভীর হয়ে গেলেন। খবরদার, মিসেস টোডের সামনে ডার্টি বলবে না। আর যেন ঝগড়াঝাটি না শুনি। আমি কাজ করতে চললাম।
নিজে বলতে গেল না জিনা, স্যান্ডউইচ বানিয়ে দেয়ার কথা মাকে দিয়ে বলাল।
মুখ কালো করে মিসেস টোড বলল, আরও তিনজনের খাবার রান্না করার কথা কিন্তু ছিল না আমার।
ছিল না, তো কি হয়েছে, জিনার আম্মা বললেন। এসেছে ওরা, তাড়িয়ে দেব নাকি? তোমাকে যা করতে বলা হয়েছে করো, বেতন দেয়ার সময় বিবেচনা করব আমি। আমার শরীর ঠিক হয়ে গেলে তোমাকে আর কষ্ট করতে হবে না। ওদের যেন কোন অসুবিধে না হয়।
খাবারের প্যাকেট নিয়ে বেরোল গোয়েন্দারা।
বাগানে টেরির সঙ্গে দেখা। জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাচ্ছ?
তাতে তোমার কি দরকার! ঝাঁঝাল জবাব দিল জিনা।
আমিও যাব তোমাদের সঙ্গে, খাতির করতে চাইছে ছেলেটা। চলো না, ওই দ্বীপটায় যাই?
না! চাবুকের মত শপাং করে উঠল জিনার কণ্ঠ। ওটা আমার দ্বীপ তোমার মত ছেলেকে ওখানে নিয়ে যাব ভাবলে কি করে…
কে তোমার দ্বীপ? হি-হি! গুল মারার আর জায়গা পাও না! উনার দ্বীপ, ছাগল পেয়েছে আমাকে।
ছাগল না, বেঙাচি। এই চলো, এটার সঙ্গে কে কথা বলে…
তিন গোয়েন্দাকে নিয়ে গেটের দিকে এগোল জিনা।
পেছনে সুর করে গেয়ে উঠল টেরি, জিনা, ঘিনা… ঘুরে দাঁড়াল মুসা।
খপ করে তার হাত চেপে ধরল জিনা, না না, মুসা, যেয়ো না। কিছু করলেই ভ্যা করে কেঁদে ফেলবে, আর ওর মা এসে হাউকাউ শুরু করবে।
এত্তবড় ছেলে কাঁদে! রবিন অবাক।
এই বেঙাচিটা কাঁদে।
অ্যাই, এভাবে কথা বলবে না… রেগে উঠল ছেলেটা।
তুমিও তাহলে খেপাবে না, মুসা বলল।
কি করবে?
খেপিয়েই দেখো! গেয়ে উঠল টেরি, জিনা, ঘিনা…
তাকে শেষ করারই সুযোগ দিল না মুসা। সুর করে পাল্টা জবাব দিল

ব্যাঙাচি করে ঘ্যানর-ঘ্যান
চাইরডা পয়সা ভিক্ষা দ্যান!
হেসে ফেলল জিনা।
রবিন আর কিশোরও হাসতে লাগল।
লাল মুখ আরও লাল হয়ে গেল টেরির, চিৎকার করে মাকে ডাকল, মা, দেখো, কেমন করে! জিনার সেই দ্বীপ।
ভুরু নাচাল মুসা, এখন কেমন লাগে? অন্যকে যে খেপাও?
বেশি বেশি করলে তোমাকেও খেপাব।
আমি অত সহজে খেপি না।
এই, চলো চলো, এটার পেছনে সময় নষ্ট করে লাভ নেই, গেটের দিকে পা বাড়াল কিশোর।
পেছনে চেঁচিয়ে বলতে শুরু করল টেরি
মুসা, ঘুসা, রামছাগলের ডিম...
চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে গেল মুসা। তবে রে, শয়তান ছেলে...
একটা মুহূর্ত দেরি করল না আর টেরি। লাফিয়ে উঠে. একদৌড়ে একেবারে রান্নাঘরে, মায়ের কাছে। জানালা দিয়ে মুখ বের করে ভেঙচাল।
ঘুসি তুলে শাসাল মুসা, ধরতে পারব তো একবার না একবার, হাড্ডি গুড়ো করে দেব তখন!
আবার মুখ ভেঙুচাল টেরি।
গর্জে উঠল মুসা, কান ছিঁড়ে ফেলব কিন্তু বলে দিলাম!
আহ, কি শুরু করলে! ওর হাত ধরে টান দিল কিশোর, তুমি নাকি সহজে খেপো না?
কিন্তু ওটা একটা শয়তান! বিতিকিচ্ছি জন্তু! ইঁদুর, বিড়াল, বেঙ, ছুঁচো, হনুমান...
.
কোথায় যাবে ঠিক করলে? বাগান থেকে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল রবিন।
রাগ এখনও পড়েনি মুসার। ফোঁস ফোঁস করছে।
কিশোর প্রস্তাব দিল, চলো, দ্বীপে চলে যাই।
আমার নৌকাটা রঙ করতে দিয়েছি, জিনা বলল। হলো নাকি দেখি। হলে যাওয়া যাবে।
নৌকা মেরামতের কারখানায় এসে দেখা গেল রঙ করা হয়েছে। লাল রঙ। দাঁড়গুলোর রঙও লাল।.
যে লোকটা মেরামত করে তার নাম ডক হুফার। জিনাকে দেখে বলল, ও, জর্জ, এসে গেছ। কেমন লাগছে রঙ?

জিনা যে ছেলে সেজে থাকতে পছন্দ করে, হুফার একথা জানে। জর্জ বলে ডাকলে যে খুশি হয় তা-ও জানে।
খুব সুন্দর হয়েছে, আংকেল, মাথা দুলিয়ে জিনা বলল। নিতে পারব?
মাথা নাড়ল হুফার। রঙ তো শুকায়নি। কাল নাগাদ হয়ে যাবে।
আজ বিকেলেও হবে না?
না। পানিতে নামালেই নষ্ট হবে।
কি আর করা। সৈকতে হাঁটতে লাগল ওরা।
মুসা বলল, সকালেই বুঝেছি, আজ দিনটা ভাল যাবে না। শুরুতেই গণ্ডগোল।
হাঁটতে হাঁটতে উঁচু একটা পাড়ের কাছে চলে এল। বড় বড় ঘাস বাতাসে দোল খাচ্ছে। পাড়ের নিচের ঝকঝকে সাদা বালিতে পা ছড়িয়ে বসল সবাই। ও, না, ভুল হয়ে গেছে, সবাই না; রাফি বসল লেজ ছড়িয়ে।
মুসা জিজ্ঞেস করল, তোমাদের খিদে পেয়েছে?
মোটামুটি হ্যাঁ-ই করল সবাই।
খাবারের প্যাকেট খোলা হলো। কিন্তু স্যান্ডউইচে কামড় দিয়েই মুখ বাকাল কিশোর, এহহে, বাসি রুটি দিয়েছে!
ইচ্ছে করে শয়তানিটা করেছে মিসেস টোড, বুঝতে অসুবিধে হলো না কারও। বাসি রুটি, গন্ধ হয়ে গেছে। ভেতরে মাখন দেয়নি বললেই চলে। ফেলে দিল কিশোর, খেতে পারল না।
জিনা আর রবিনও খেল না।
জোরজার করে দুটো স্যান্ডউইচ গিলল কোনমতে মুসা।
কেবল রাফির কোন ভাবান্তর নেই। সে এসব পচা-বাসি সবই খেতে পারে। গপগপ করে গিলতে লাগল। নিজের ভাগেরগুলো তো খেলই, অন্যদেরগুলোও খেয়ে চলল।
মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে সকলের।
খানিকক্ষণ ঝিম মেরে থাকার পর মুসা বলল, দূর, এভাবে বসে থাকতে ভাল্লাগছে না! ওঠো।
কোথায় যাব? রবিনের প্রশ্ন।
ওই টিলাটার চূড়ায় গিয়ে বসি। দ্বীপে যখন যেতে পারলামই না, বসে বসে দেখিই এখান থেকে।
হু, বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল কিলোর, দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো আরকি। চলো।
টিলার মাথায় এসে বসল ওরা। চারপাশে অনেক দূর দেখা যায় এখান থেকে। চমৎকার বাতাস।

জিনার দ্বীপটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে রবিন জিজ্ঞেস করল, জিনা, সেই ভাঙা জাহাজটা এখনও আছে?
কোন জাহাজের কথা বলছে, বুঝতে পারল জিনা। সেই যে সেবার, প্রথম যখন তাদের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল তিন গোয়েন্দা, তখন এক সাংঘাতিক অ্যাডভেঞ্চারে জড়িয়ে পড়েছিল ওরা। দ্বীপে গিয়েছিল বেড়াতে। প্রচণ্ড ঝড় হলো। ঝড়ে সাগরের নিচ থেকে উঠে এল পুরানো আমলের একটা ভাঙা কাঠের জাহাজ ম্যাপ পাওয়া গিয়েছিল। সোনার বার পেয়েছিল।
আছে, জানাল জিনা।
চকচক করে উঠল কিশোরের চোখ, আছে! আমি তো ভেবেছি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে তলিয়ে গেছে এদ্দিনে।
না যায়নি। পাথরের মধ্যে তেমনি আটকে আছে। বড় বড় ঢেউও ছাড়িয়ে নিতে পারেনি। দ্বীপে গেলেই দেখতে পাবে।
একেবারেই ভাঙেনি?
একেবারে ভাঙেনি তা নয়। খুলে খুলে পড়ছে তক্তা। দু-চারটে ঝড়ের বেশি আর হজম করতে পারবে বলে মনে হয় না।
দ্বীপের পুরানো ভাঙা দুর্গটার দিকে তাকিয়ে আছে মুসা। দাঁড়কাকের বাসা ছিল যে টাওয়ারটাতে সেটা এখনও তেমনি দাঁড়িয়ে আছে।
জিজ্ঞেস করল, কাকগুলো এখনও আছে, না?
আছে, জানাল জিনা। প্রতি বছরই বাসা বানায়। কমেতেনিই, আরও বেড়েছে।
এই দেখো, দেখো, ধোঁয়া, মুসা বলল। দ্বীপে কেউ উঠেছে।
না, কে উঠতে যাবে। স্টীমারের ধোঁয়া হবে। দ্বীপের ওপাশে আছে, তাই দেখতে পাচ্ছি না আমরা।
ওরকম স্টীমার এখনও আছে নাকি এ-অঞ্চলে? জিজ্ঞেস করল রবিন। ফকফক করে ধোঁয়া ছাড়ে যেগুলো?
তার চেয়ে প্রাগৈতিহাসিকগুলোও আছে। জেলেরা মাছ ধরতে যায় ওসব নিয়ে।
পুরানো জলযান নিয়ে আলোচনা চলল।
ঘড়ি দেখল কিশোর। এবার ওঠা যাক। চায়ের সময় হয়ে এসেছে। গিয়ে যদি দেখতাম আন্টি ভাল হয়ে গেছে, একটা চিন্তা যেত।
হ্যাঁ, মাথা দুলিয়ে মুসা বলল, আন্টি খাবার টেবিলে না থাকলে সবই বিস্বাদ।
উঠল ওরা।
কিছুদূর এসে আবার ঘাড় ঘুরিয়ে দ্বীপটার দিকে তাকাল কিশোর। ঘুরে ঘুরে উড়ছে কয়েকটা সীগাল। ধোঁয়া মিলিয়ে গেছে। ঠিকই বলেছে বোধহয় জিনা, স্টীমারই। সরে চলে গেছে, ফলে আর ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে না।

কিন্তু একটা খুঁতখুঁতানি থেকেই গেল তার সন্দেহপ্রবণ মনে।
ব্যাপারটা লক্ষ করল জিনা। কি হলো? ধোঁয়াতে রহস্য খুঁজে পেলে নাকি?
নাক চুলকাল কিশোর। কি জানি!
ভেবো না, কালই চলে যাব। স্টীমারের ধোঁয়া ছিল, না কেউ দ্বীপে উঠে। আগুন জ্বেলেছে, জানাটা কঠিন হবে না।
বাড়ি ফিরে এল ওরা। বসার ঘরে ঢুকে দেখে মহাআরামে সোফায় বসে জিনার একটা বই পড়ছে আর পা নাচাচ্ছে টেরি।
এই ছেলে, এখানে কি? ধমক দিল জিনা। আমার বই ধরলে কেন?
তাতে ক্ষতিটা কি হলো? বইই তো পড়ছি, নষ্ট তো আর করছি না কিছু।
না বলে তুমি ধরলে কেন? সাহস তো তোমার কম না! আমার ঘরে ঢোকো…
ঘরে ঢোকা কি অন্যায়?
নিশ্চয় অন্যায়। না বলে যে অন্যের ঘরে ঢুকতে নেই এই শিক্ষাটাও দেয়নি তোমাকে কেউ? যা করেছ, করেছ। আব্বার স্টাডিতে যেন ঢুকতে যেয়ো না, পিঠের ছাল ছাড়াবে তাহলে
ওখানেও ঢুকেছি, নির্দ্বিধায় স্বীকার করল ছেলেটা। কি সব বিচ্ছিরি যন্ত্রপাতি। ওসব দিয়ে কি করে?
রাগে ক্ষণিকের জন্যে কথা হারিয়ে ফেলল জিনা। চেঁচিয়ে উঠল, বলো কি! ওখানেও…আমরাই যেখানে সাহস পাই না…আব্বা কিছু বলেনি?
না।
ঘরে ছিল না বোধহয়, তাই বেঁচে গেছ। বলবে না আবার! দাঁড়াও গিয়ে বলছি, তারপর বুঝবে মজা…
বলোগে, তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে হাত নাড়ল টেরি। পাবে কোথায় তাকে? জিনাকে আরও রাগানোর জন্যে সামনে-পেছনে শরীর দোলাতে লাগল। বইটা চোখের সামনে এনে গভীর মনযোগে পড়ার ভান করল।
ওর এই বেপরোয়া ভাবভঙ্গি সন্দেহ জাগাল জিনার মনে। পাব কোথায় মানে?
পাব কোথায় মানে, পাবে না।
হঠাৎ শঙ্কিত হয়ে উঠল জিনা। আম্মা কোথায়?
ডাকো না। থাকলে তো সাড়াই দেবে, একই রকম তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে জবাব দিল ছেলেটা।
ভয় পেয়ে গেল সবাই। টেরি এমন করে কথা বলছে কেন?
আম্মা, আম্মা! বলে ডাকতে ডাকতে ওপরতলায় দৌড় দিল জিনা। কিন্তু মায়ের বিছানা খালি। সব কটা বেডরুমে ছুটে বেড়াতে লাগল সে। কোথাও পাওয়া গেল না মাকে। সাড়াও দিলেন না মিসেস পারকার।

সিঁড়ি বেয়ে লাফাতে লাফাতে নিচে নামল জিনা। রক্ত সরে গেছে মুখ। থেকে।
দাঁত বের করে হাসল টেরি। চোখ নাচিয়ে বলল, কি, বলেছিলাম না? যত খুশি চিল্লাও এখন, কেউ আসবে না।
টেরির কাছে গিয়ে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল জিনা। কোথায় ওরা? জবাব দাও, কোথায়!
নিজেই খুঁজে বের করো।
ঠাস করে চড় মারল জিনা। যতটা জোরে পারল।
লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল টেরি। গাল চেপে ধরেছে। বিশ্বাস করতে পারছে না যেন। একটা মুহূর্ত তাকিয়ে রইল জিনার দিকে। তারপর সে-ও চড় তুলল।
চোখের পলকে সামনে চলে এল মুসা, আড়াল করে দাঁড়াল জিনাকে। মেয়েমানুষের গায়ে হাত তুলতে লজ্জা করে না? মারতেই যদি হয়, আমাকে মারো, দেখি কেমন জোর?
টেনে তাকে সরানোর চেষ্টা করল জিনা। চিৎকার করে বলল, সরো তুমি, মুসা, সরো! অনেক সহ্য করেছি! পেয়েছে কি! আজ আমি ওর বাপের নাম ভুলিয়ে ছাড়ব!
কিন্তু সরল না মুসা।
তার গায়ে হাত তোলার সাহস করল না টেরি। পিছিয়ে যেতে লাগল দরজার দিকে।
পথ আটকাল কিশোর। দাঁড়াও। আন্টি কোথায়, বলো।
এই সময় টেরির বিপদ বাড়াতেই যেন ঘরে ঢুকল রাফি। এতক্ষণ বাগানে ছিল। ঢুকেই আঁচ করে ফেলল কিছু একটা ঘটেছে। দাঁতমুখ খিঁচিয়ে গরগর করতে করতে এগোল।
আরে, ধরো না কুত্তাটাকে! কাঁপতে শুরু করল টেরি। কামড়ে দেবে তো!
রাফির মাথায় হাত রাখল কিশোর। চুপ থাক্।-হ্যাঁ, টেরি, এবার বলল, আন্টি কোথায়?
রাফির ওপর থেকে চোখ সরাল না টেরি। জানাল, হঠাৎ করে পেটব্যথা শুরু হলো। ডাক্তারকে খবর দিল জিনার আব্বা। ডাক্তার এসে দেখে বলল, হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। তখনই তাড়াহুড়া করে নিয়ে গেল।
ধপ করে সোফায় বসে পড়ল জিনা। দু-হাতে মুখ ঢেকে ডুকরে কেঁদে উঠল, আম্মা..ও আম্মা, তোমার কি হলো- কেন আজ বেরোলাম ঘর থেকে... আম্মাগো...
তাকে সান্ত্বনা দিতে লাগল সবাই, এই সুযোগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল টেরি। রাফি একবার খেক করে উঠল, কিন্তু ততক্ষণে রান্নাঘরের দরজার কাছে চলে গেছে

সে। দরজা পেরিয়েই দড়াম করে লাগিয়ে দিল পাল্লা।
ফিরেও তাকাল না গোয়েন্দারা।
জরুরী কণ্ঠে কিশোর বলল, নিশ্চয় নোট রেখে গেছেন আংকেল।
খুঁজতে শুরু করল তিনজনে।

.

চিঠিটা খুঁজে পেল রবিন। জিনার আম্মার বড় ড্রেসিং টেবিলে চিরুনি চাপা দেয়া। ওপরে জিনার নাম লেখা।
তাড়াতাড়ি খুলে জোরে জোরে পড়ল রবিন:
জিনা
তোমার মাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলাম। ভাল না হওয়া পর্যন্ত আমি তার সঙ্গে থাকব। সেটা দু-দিনও হতে পারে, দুই হপ্তাও হতে পারে। রোজ সকাল নটায় ফোন করে তার খবরাখবর জানাব তোমাদের। চিন্তা কোরো না। মিসেস টোড তোমাদের খেয়াল রাখবেন। বাড়িঘর দেখেশুনে রাখবে। –তোমার বাবা।
বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়ে হু-হু করে কাঁদতে লাগল জিনা। বলতে লাগল, আম্মা, আম্মাগো, তুমি আর আসবে না। আমি জানি! তোমাকে ছাড়া কি করে থাকব আমি!
তাকে সান্ত্বনা দিয়ে, বুঝিয়ে-শুনিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করতে লাগল তিন গোয়েন্দা। সহজে কাঁদে না জিনা। তাকে এভাবে বিলাপ করতে দেখে অস্থির হয়ে পড়ল ওরাও।
রাফিও জিনাকে কাঁদতে দেখেনি। প্রথমে অবাক হলো, তারপর অস্থির হয়ে উঠল তিন গোয়েন্দার মতই। জিনার হাঁটুতে মুখ রেখে কুঁই কুঁই করতে লাগল।
অনেকক্ষণ কেঁদেকেটে অবশেষে কিছুটা শান্ত হলো জিনা। মুখ তুলে বলল, আমি আম্মাকে দেখতে যাব।
কোথায় যাবে? কিশোর বলল, কোন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে জানি না। আর আমরা গেলেও ঢুকতে দেবে না। সারাদিন কিছু খাওনি। চায়ের সময় হয়ে গেছে। চলো, কিছু খেয়ে নিলে ভাল লাগবে।
আমি কিচ্ছু খাব না! প্রায় ফুঁসে উঠল জিনা। তোমাদের ইচ্ছে হলে যাও! আবার মুখ গুঁজল বিছানায়।
চুপ করে রইল কিশোর। জিনার মনের অবস্থা বুঝতে পারছে।
কয়েক মিনিট পর আবার মুখ তুলল জিনা। চোখ মুছল। মলিন হাসি ফুটল ঠোঁটে। বলল, সরি! কিছু মনে কোরো না! যাও, চায়ের কথা বলে এসো।
কিন্তু কে যাবে মিসেস টোডকে চায়ের কথা বলতে? বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধতে যাওয়ার অবস্থা হলো যেন দূরদের। মুসা রাজি হলো না। রবিনও আমতা আমতা

করতে লাগল। শেষে কিশোরই উঠল যাওয়ার জন্যে।
রান্নাঘরের দরজা খুলে উঁকি দিল সে। টেরি বসে আছে গুম হয়ে। গালের একপাশ লাল, যেখানে চড় মেরেছিল জিনা।
মুখ ভয়ানক গভীর করে মিসেস টোড বলল, আরেকবার খালি আমার ছেলেকে মেরে দেখুক, ওর অবস্থা কাহিল করে দেব আমি!
চড় খাওয়ার কাজ করেছে, খেয়েছে, শান্তকণ্ঠে বলল কিশোর। ওসব আলোচনা করতে আসিনি আমি।
তাহলে কি জন্যে এসেছ?
চা দিতে হবে।
পারব না।
কিশোরের দিকে তাকিয়ে গরগর করে উঠল ঘরের কোণে বসে থাকা ডারবি, কিন্তু কাছে আসার সাহস করল না।
কুকুরটাকে পাত্তাই দিল না কিশোর। আপনি না দিলে আমিই নেব। রুটি কোথায় রেখেছেন? কেক?
জ্বলন্ত দৃষ্টিতে কিশোরের দিকে তাকাল মিসেস টোড। কিশোরও তাকিয়ে রইল একই ভঙ্গিতে। এরকম বাজে মহিলার সঙ্গে ভদ্রতা করার কোন প্রয়োজন মনে করল না সে।
দৃষ্টির লড়াইয়ে হার মানল মিসেস টোড। বলল, বেশ, এবারকার মত দিচ্ছি। কিন্তু এরপর শয়তানি করলে খাওয়া বন্ধ করে দেব।
অত সহজ না। সোজা পুলিশের কাছে যাব, কথাটা কিছু ভেবে বলেনি কিশোর, আপনাআপনি মুখ থেকে বেরিয়ে গেছে।
চমকে গেল মিসেস টোড। তাড়াতাড়ি বলল, থাকগে, যা হওয়ার হয়েছে, কিছু মনে কোরো না। এই ডাক্তার, হাসপাতালে অস্থির করে দিয়েছে সবাইকে...যাও, আমি চা নিয়ে আসছি।
মহিলার এই হঠাৎ পরিবর্তন অবাক করল কিশোরকে। পুলিশের কথায় এমন চমকে গেল কেন? ভাবতে ভাবতে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল সে। একটা কারণ হতে পারে, পুলিশ এলে পারকার আংকেলকে খবর দেবে। ভয়ানক রেগে যাবেন তিনি। মিসেস টোডকেও ছাড়বেন না। তাঁকে ভয় পায় মহিলা।
সবাইকে এসে খবর দিল কিশোর, চা আসছে।
চা খাওয়া জমল না। কান্না থামালেও মন খারাপ করে রেখেছে জিনা। রবিন আর মুসা তাকে নানা ভাবে খুশি করার চেষ্টা করে করে হাল ছেড়ে দিয়েছে। চায়ের সঙ্গে কি দিয়ে গেল মিসেস টোড, খেয়ালই করল না কেউ।

যদি কোন কারণে মিস্টার পারকার ফোন করেন, এ-জন্যে খাওয়ার পর দূরে কোথাও গেল না ওরা, বাগানে বসে রইল।
রান্নাঘর থেকে হঠাৎ শোনা গেল:
জিনা, ঘিনাঃ..
উঠে দাঁড়াল কিশোর। জানালার কাছে এসে দাঁড়াল। একা বসে আছে টেরি।
এই, বেরিয়ে এসো! কঠিন কণ্ঠে ডাকল,কিশোর।
নড়ল না টেরি। গানও গাইতে পারব না?
নিশ্চয় পারবে। সেজন্যেই তো ডাকছি। এটা পুরানো হয়ে গেছে, এসো, নতুন আরেকটা শিখিয়ে দিই।
বেরোলেই আমাকে মারবে।
না না, মারব কেন, আদর করব! একটা মেয়ের মায়ের অসুখ, তার এমনিতেই মন খারাপ, তাকে খেপাতে লজ্জা করে না! বেরোবে, না কান ধরে বের করে আনব?
কিশোরের পাশে এসে দাঁড়াল মুসা।
ভয় পেয়ে গেল টেরি। চিৎকার করে ডাকল, মা, ও মা! কোথায় তুমি!
জানালা দিয়ে আচমকা হাত ঢুকিয়ে দিল মুসা। টেরির কান চেপে ধরে হ্যাঁচকা টান মারল।
ছাড়ো, ছাড়ো!…ওহ, কান ছিঁড়ে ফেলল-মা!
ঘরে ঢুকল তার মা। এক চিৎকার দিয়ে দৌড়ে এল জানালার দিকে।
কান ছেড়ে হাতটা বের করে আনল মুসা। পালাতে গিয়েও পালাল না। কিশোরকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে দাঁড়িয়ে রইল।
চেঁচাতে লাগল মিসেস টোড, কত্তবড় সাহস! আমার ছেলেকে চড় মারে…কান টানে! কি, ভেবেছ কি তোমরা!
কিছুই না, শান্তকণ্ঠে জবাব দিল কিশোর। তবে আপনার ছেলের খানিকটা শিক্ষা দরকার। আপনারই সেটা দেয়া উচিত ছিল। পারেননি যখন আমাদেরই দিতে হচ্ছে।
তুমি..তুমি একটা শয়তান!
গাল দেবেন না। যদি কাউকে দিতেই হয়, আপনার ছেলেকে দিন। ও ওই ডার্টি কুত্তাটার চেয়েও খারাপ।
আরও রেগে গেল মিসেস টোড, ওর নাম ডার্টি নয়, ডারবি।
ডার্টি। অত নোংরী কুত্তার এটাই ঠিক নাম। গা-টা ধোঁয়ান, উকুন পরিষ্কার করান, গন্ধ যাক, তারপর ভাবব ডারবি বলা যায় কিনা।
প্রচণ্ড রাগে ফুঁসতে লাগল মিসেস টোড।

কেয়ারই করল না কিশোর। মুসাকে নিয়ে ফিরে এল জিনা আর রবিন যেখানে বসে আছে।
যুদ্ধ ঘোষণা হয়ে গেছে, ঘাসের ওপর বসতে বসতে বলল কিশোর।
কি হয়েছে? জানতে চাইল রবিন।
মুসা টেরির কান টেনেছে। সেটা দেখে ফেলেছে ওর মা। এরপর আর আমাদের খেতে দেবে কিনা সন্দেহ আছে।
না দিলে নিজেরাই নিয়ে খাব, জিনা বলল। শয়তান মহিলাটাকে যে কেন জায়গা দিতে গেল মা…
ওই দেখো, ডার্টি, বলে উঠল মুসা।
রাফি, যাসনে, যাসনে! কলার ধরে আটকানোর জন্যে থাবা মারল কিশোর। ধরতে পারল না।
কেউ নেই ভেবে বেরিয়ে পড়েছিল ডারবি। রাফিকে দেখেই এমন এক চিৎকার দিল, মনে হলো মেরে ফেলা হচ্ছে ওকে।
তার ঘাড় কামড়ে ধরে ঝাঁকাতে শুরু করল রাফি।
লাঠি নিয়ে বেরোল মিসেস টোড। এলোপাতাড়ি বাড়ি মারতে শুরু করল। কোন কুকুরটার গায়ে লাগছে, দেখল না। রাগে অন্ধ হয়ে গেছে।
পানির পাইপের দিকে দৌড় দিল রবিন।
দরজায় দেখা দিল টেরি। রবিনকে পাইপের দিকে যেতে দেখেই ঘরে ঢুকে গেল আবার। গা ভেজাতে চায় না।
গায়ে পানির ঝাপটা লাগতে লাফিয়ে সরে দাঁড়াল রাফি। চোখের পলকে লাফিয়ে উঠে গিয়ে মিসেস টোডের স্কার্টের নিচে লুকাল ডারবি।
বিষ খাওয়াব আমি কুত্তাটাকে! মুখচোখ ভয়ঙ্কর করে গজরাতে লাগল। মিসেস টোড। এত্তবড় শয়তান! বিষ খাইয়ে না মেরেছি তো…
গজগজ করতে করতে রান্নাঘরে চলে গেল সে।
আগের জায়গায় এসে বসল গোয়েন্দারা।
উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিনা বলল, সত্যিই কি বিষ খাওয়াবে?
বলা যায় না, কিশোর বলল, ওই মহিলাকে বিশ্বাস নেই। চোখে চোখে রাখতে হবে রাফিকে। আমাদের নিজেদের খাবার থেকে ভাগ দিতে হবে।
কুকুরটাকে কাছে টেনে নিল জিনা। গলা জড়িয়ে ধরল। ইস, আম্মা আব্বা যে কবে আসবে! এই যন্ত্রণা থেকে তাহলে মুক্তি পাই!
হঠাৎ টেলিফোনের শব্দ চমকে দিল সবাইকে। লাফিয়ে উঠে দৌড় দিল ওরা। প্রায় উড়ে এসে ঘরে ঢুকল জিনা। থাবা দিয়ে তুলে নিল রিসিভার।
জিনা? বাবার গলা শুনে দুরুদুরু করে উঠল জিনার বুক।

আব্বা, আম্মা কেমন আছে? জলদি বলো!
পরশুর আগে বলা যাবে না। নানা রকম টেস্ট করছে ডাক্তাররা।
তুমি কবে আসছ?
বলতে পারছি না। তোমার মাকে ফেলে আসি কি করে? চিন্তা কোরো না। কাল সকালে আবার ফোন করব।
আব্বা, ককিয়ে উঠল জিনা, তোমরা নেই, খুব অশান্তিতে আছি। মিসেস টোড একটুও ভাল না।
শোনো, জিনা, অধৈর্য হয়ে বললেন মিস্টার পারকার, নিজে ভাল তো জগৎ ভাল। তোমরা তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার কোরো, সে-ও তোমাদের সঙ্গে করবে। এসব ফালতু কথা নিয়ে বিরক্ত করবে না আমাকে। এমনিতেই অনেক ঝামেলায় আছি।
আমি আসব। আম্মাকে দেখতে ইচ্ছে করছে।
না, আসবে না, বাড়িতে থাকো। বাড়ি থেকে যাবে না কোথাও। আরও হপ্তা দুয়েকের আগে তোমার আম্মাকে ছাড়বে বলে মনে হয় না। দেখি, ঝামেলা কেটে গেলে আমি একবার এসে দেখে যাব তোমাদের। গুড-বাই।
লাইন কেটে দিলেন তিনি।
রিসিভার রেখে বন্ধুদের দিকে ফিরল জিনা। হতাশ কণ্ঠে বলল, পরশুর আগে ওরা বলতেই পারবে না আম্মার কি অবস্থা। আব্বার আসারও কোন ঠিক নেই। ততদিন আমাদের কাটাতে হবে মিসেস টোডের সঙ্গে। ওই বুড়িটার সঙ্গে থাকার কথা ভাবতেই এখন কেমন লাগছে আমার।

.

এতটাই রেগেছে মিসেস টোড, সেদিন সন্ধ্যায় ওদেরকে খাবারই দিল না। রাতের খাওয়া বন্ধ। বলতে গিয়ে কিশোর দেখে, রান্নাঘরে তালা লাগানো।
ফিরে এসে সবাইকে জানাল খবরটা। তালা লাগিয়ে দিয়েছে, যাতে আমরা কিছু বের করে আনতে না পারি। এত্তবড় শয়তান মহিলা জীবনে দেখিনি আমি। কিন্তু ঘুমাক, তারপর ভাঁড়ারে গিয়ে খুঁজে দেখব কিছু আছে কিনা, জিনা বলল।
খিদেয় পেট জ্বলছে। কান পেতে শুনছে কিশোর, মিসেস টোড আর টেরি ঘুমাতে গেল কিনা। ওপরতলায় উঠে গেল ওরা, দরজা লাগানোর শব্দ হলো, তারও কিছুক্ষণ পর পা টিপে টিপে নামল সে, রান্নাঘরের দিকে এগোল।
ঘর অন্ধকার, আলো জ্বালতে যাবে, হঠাৎ কানে এল ভারী নাক ডাকানোর শব্দ। কে? ডাটি? না, কুকুর তো ওরকম করে নিঃশ্বাস ফেলে না! মানুষের মত লাগছে।
সুইচে হাত রেখে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে কিশোর। চোর-টোর ঢুকল না তো?
নাহ, দেখতেই হচ্ছে। আলো জ্বেলে দিল সে।
ছোটখাট একজন মানুষ শুয়ে আছে সোফায়। গভীর ঘুম। হাঁ করে শ্বাস টানছে।

দেখতে মোটেও ভাল না লোকটা। কতদিন শেভ করেনি কে জানে, খোঁচা খোঁচা দাড়ি। গোসল করে না, এমনকি হাতমুখও বোধহয় ঘোয় না, হাতে ময়লা, নখের ভেতর ময়লা ঢুকে কালো হয়ে আছে। মানুষ এত নোংরা হতে পারে ভাবা যায় না। চুল আর নাক টেরির মত।

ও, তাহলে এই ব্যাপার, ভাবল কিশোর। ইনি তাহলে টেরি মিয়ারই বাপ। বাপ-মা যার এরকম, সে আর ভাল হবে কি।

নাক ডাকিয়েই চলেছে লোকটা। কি করবে ভাবতে লাগল কিশোর। ভাঁড়ারে ঢুকতে গেলে যদি শব্দ শুনে জেগে যায় নোকটা? চেঁচামেচি শুরু করে দেবে না তো? অন্যায় ভাবে ঢুকেছে বলে যে বেরিয়ে যেতে বলবে তারও উপায় নেই। তার স্ত্রী চাকরি করে এখানে। তাকে দেখতে আসতেই পারে স্বামী। আংকেল-আন্টিও এতে দোষের কিছু দেখবেন না। বিপদেই পড়া গেল!

খুব খিদে পেয়েছে তার। এবার জিনাদের বাড়িতে আসার পর থেকেই খাওয়া মোটেও সুবিধের হচ্ছে না। ফলে পেটের চাহিদা রয়েই যাচ্ছে। ভঁড়ারে লোভনীয় খাবার আছে ভাবতেই জিভে পানি এসে গেল তার। আলো নিভিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে এগোল আবার।

দরজা খুলল। অন্ধকারেই হাত বাড়িয়ে তাক হাতড়াতে শুরু করল। হাতে ঠেকল একটা পাত্র, খাবার আছে। গন্ধ শুকে বুঝল, মাংস।

আরেকটা পাত্র রয়েছে ওটার পাশে। বেশ বড়। এটা আর শুঁকতে হলো না, আঙুল ছুঁইয়েই বুঝল, ভেজিটেবল। বাহ, চমৎকার! মাংস, ভেজিটেবল, আর কি চাই? রুটি হলেই হয়ে যায় এখন। সেটা পেতে দেরি হলো না। ট্রেতে অনেক আছে।

পাত্রগুলো ট্রেতে গুছিয়ে নিয়ে ভাঁড়ার থেকে বেরিয়ে এল সে। পা দিয়ে ঠেলে আস্তে লাগিয়ে দিল পাল্লা।

অন্ধকারে এগোতে গিয়ে পথ ভুল করে ফেলল। সোজা এসে হোঁচট খেল সোফায়। ঝাঁকি লেগে ছলকে পড়ল তরকারির ঝোল, কয়েক টুকরো তরকারিও পড়ল। আর পড়বি তো পড় একেবারে মিস্টার টোডের হাঁ করা মুখে।

চমকে জেগে গেল লোকটা।

তাড়াতাড়ি পিছিয়ে গেল কিশোর। কোন শব্দ না শুনলে আবার ঘুমিয়ে পড়বে লোকটা। হয়তো পড়তও, কিন্তু গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়া তরকারির ঝোল বিরক্ত করছে তাকে। ঝটকা দিয়ে উঠে বসল। কে? কে ওখানে? টেরি? কি করছিস?

জবাব দিল না কিশোর। আন্দাজে দরজার দিকে সরে যেতে লাগল।

সন্দেহ হলো নোকটার। লাফ দিয়ে সোফা থেকে নেমে গিয়ে দেয়ালে সুইচবোর্ড হাতড়াতে লাগল। পেয়েও গেল।

অবাক হয়ে কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইল সে। তাকাও এদিকে! কি করছ?

আমিও তো সে-কথাই জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম। আপনি এখানে কি করছেন?
তুমি কে? হাত দিয়ে মুখে লেগে থাকা তরকারির ঝোল মুছতে মুছতে বিড়বিড় করে বলল, তাকাও এদিকে!
বললে তো আর চিনবেন না। এটা আমার আংকেলের বাড়ি।
আমার স্ত্রী এখানে চাকরি করে, খসখসে গলায় বলল লোকটা। আমার জাহাজ বন্দরে ভিড়েছে। ছুটি পেয়েছি। দেখতে এসেছি তাকে। তোমার আংকেলের সঙ্গে কথা বলে নিয়েছে আমার স্ত্রী, আমাকে আসার অনুমতি দিয়েছেন।
এই ভয়ই করছিল কিশোর। মহিলা টোড, আর একটা পুঁচকে টোডের জ্বালায়ই অস্থির হয়ে উঠেছিল, সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এখন জলজ্যান্ত এক পুরুষ টোড! বাড়িতে আর টিকতে দেবে না ওদেরেকে।
অনুমতি দিয়েছেন, না? বেশ, কাল সকালে তো আংকেল ফোন করবেন, তখন তাকে জিজ্ঞেস করব। এখন সরুন সামনে থেকে। দোতলায় যাব।
দরজা জুড়ে দাঁড়িয়েছে টোড। কিশোরের হাতের ট্রে-র দিকে চোখ সরু করে তাকাল। আংকেলের বাড়ি, না! ভাড়ার থেকে খাবার চুরি করছ কেন তাহলে? চোর কোথাকার…
বাজে কথা বলবেন না, সরুন! ধমকে উঠল কিশোর। কাল সকালেই একটা ব্যবস্থা করব আপনার। চুরি করে অন্যের বাড়িতে রাতদুপুরে শুয়ে থাকা বের করব।
ধমকে কাজ হলো না। ঠায় দাঁড়িয়ে রইল টোড। সরার কোন লক্ষণ। নেই। কিশোরের সমানই লম্বা। মুখে শয়তানি হাসি।
ওর খোঁচা খোঁচা দাড়িওয়ালা নোংরা চেহারাটা সহ্য করতে পারছে না কিশোর। ঠোঁট গোল করে জোরে শিস দিয়ে ডাকল রাফিকে।
লাফ দিয়ে জিনার বিছানা থেকে নামল রাফি। সিঁড়ি বেয়ে দৌড়ে নেমে এল। দরজার কাছে এসেই গন্ধ পেল টোডের। একটুও পছন্দ হলো না। গেল খেপে। দাঁতমুখ খিঁচিয়ে গরগর করতে করতে দরজায় এসে দাঁড়াল।
তাকাও এদিকে!একটানে পাল্লা লাগিয়ে দিল টোড। বাইরে রয়ে গেল রাফি। কিশোরের দিকে তাকিয়ে নোংরা হলদেটে দাঁত বের করে হেসে বলল, এখন?
এই তরকারিগুলো তোমার মাথায় ঢালব! ভেজিটেবলের পাত্রটা তুলে এগিয়ে এল কিশোর। মেজাজ পুরো খারাপ হয়ে গেছে।
ঝট করে মাথার ওপর দু-হাত তুলে নিচু হয়ে গেল টোড। না না, এমনি…দুষ্টুমি করছিলাম তোমার সঙ্গে!…তাকাও এদিকে খাবারগুলো নষ্ট কোরো না। ওপরতলায় যাবে তো, যাও
সোফার কাছে সরে গেল আবার সে।

দরজা খুলল কিশোর।
গরগর করছে রাফি। শয়তান লোকটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার অনুমতি চাইছে।
তার দিকে ভয়ে ভয়ে তাকাল টোড। ওটাকে আটকাও! কুত্তা দেখতে পারি না আমি!
ডারবিটাকে সহ্য করো কিভাবে তাহলে? বৌকে ভয় পাও বুঝি? রাফি, ছেড়ে দে। তোর গরগরানি শোনার যোগ্যও না ও।
ওপরে উঠে এল কিশোর। নিচতলায় কথা কাঁটাকাটির শব্দ শুনেছে, কি, হয়েছে শোনার জন্যে তাকে ঘিরে এল সবাই।
জানাল কিশোর। টোডের মুখে তরকারি পড়ার কথা শুনে হেসেই অস্থির সব। রাফি পর্যন্ত কিছু না বুঝে খেক খেক করে হাসল।
হাসতে হাসতে বলল রবিন, সবটা তরকারি মাথায় না ফেলে ভালই করেছ। তাহলে আমাদের খাওয়াটা যেত। মিসেস টোড শুনলে কি করবে ভাবছি।
কি আর করবে, খাওয়া শুরু করে দিয়েছে মুসা। বড়জোর নিজের মাথার চুল ছিড়বে যা-ই বলো, রাধে কিন্তু ভাল। মাংসটা চমৎকার হয়েছে।
চেটেপুটে সব সাফ করে ফেলল ওরা।
এরপর টোড পরিবারকে নিয়ে আলোচনায় বসল।
বেঙনি আর বেঙাচির জ্বালায়ই মরছি, আবার এসেছে একটা বেঙ, মুসা বলল তিক্তকণ্ঠে। এবার বাড়ি ছেড়ে পালাতে হবে আমাদের। জিনা, কাল তোমার আব্বাকে বুঝিয়ে বলো সব।
বলব। তবে শুনবে বলে মনে হয় না। কিছু শুনতেও চায় না, বুঝতেও চায় না, আব্বাকে নিয়ে এই হলো সমস্যা, হাই তুলতে শুরু করল জিনা। ঘুম পাচ্ছে আমার। রাফি, চল।
ছেলেদেরকে তাদের ঘরে রেখে নিজের ঘরে শুতে চলে গেল সে।
পেটে খিদে ছিল বলে এতক্ষণ ছটফট করেছে। কিন্তু এখন শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল চারজনেই।
সকালে ওদেরকে অবাক করে দিয়ে নাস্তা তৈরি করে দিল মিসেস টোড।
কিশোর অনুমান করল, আংকেল ফোন করবেন তো, আমরা যদি কিছু বলে দিই, এ-জুন্যে বানিয়ে দিয়ে গেল। মহা ধড়িবাজ মহিলা।
খাওয়ার পর ঘড়ি দেখল মুসা। মাত্র আটটা বেজেছে। বলল, ফোন তো করবেন নটায়। এখনও একঘণ্টা বাকি। চলো, সৈকত থেকে হেঁটে আসি।
বেরিয়ে পড়ল ওরা। বাগানে বসে আছে টেরি। জিনাকে দেখে মুখ ভেঙচাল। রাফি ঘাউ করে উঠতেই কুঁকড়ে গেল।

বাগানের বাইরে বেরিয়ে এল ওরা। রবিন বলল, আমার মনে হয় মাথায় দোষ আছে ছেলেটার নইলে এরকম করে না।
বাদ দাও ওর কথা, তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে হাত নাড়ল কিশোর।
নটা বাজতে দশ মিনিট বাকি থাকতে বাড়ি ফিরল ওরা। বাগানে ঢুকতেই কানে এল টেলিফোনের শব্দ।
দৌড় দিল জিনা। তার আগেই মিসেস টোড ধরে ফেলুক, এটা চায় না।
কিন্তু কাছেই ছিল মহিলা, যেন ফোন ধরতেই তৈরি হয়ে ছিল, ধরে ফেলল।
হলে ঢুকতেই গোয়েন্দাদের কানে এল, মিসেস টোড বলছে, হ্যাঁ, স্যার, সব ঠিক আছে, স্যার।...না, কোন অসুবিধে নেই, স্যার। আমার স্বামীও চলে এসেছে, ছুটি পেয়েছে জাহাজ থেকে। আমাকে সাহায্য করতে পারবে। আপনি একটুও চিন্তা করবেন না, স্যার। সব সামলে রাখব। আপনার যখন ইচ্ছে আসুন...না না, বাচ্চাদের নিয়ে একটুও ভাববেন না...
আর সহ্য করতে পারল না জিনা। বন্য হয়ে উঠেছে সে। এক থাবায় কেড়ে নিয়ে রিসিভার কানে ঠেকাল, আব্বা, আম্মা কেমন আছে?
আর খারাপ হয়নি। কিন্তু কালকের আগে কিছুই বলা যাচ্ছে না। তোমাদের জন্যে খুব চিন্তায় ছিলাম। মিস্টার টোড এসেছে শুনে বাঁচলাম। আর কোন অসুবিধে হবে না তোমাদের। বাড়িঘরের জন্যেও চিন্তা নেই। তোমার আম্মাকে বলব সব ঠিক আছে।
না, নেই! ভয়ানক অবস্থা এখানে। আব্বা, শোনো, টোডদের বিদেয় করে দিই, আমরাই সব সামলাতে পারব...
বলো কি! আঁতকে উঠলেন যেন মিস্টার পারকার। অসম্ভব। তোমরা পারবে নাঃ..যা বলি শোনো...
আব্বা, কিশোর কথা বলবে।
অসহায় ভঙ্গিতে কিশোরের হাতে রিসিভার গুঁজে দিল জিনা। যদি সে কিছু করতে পারে, বোঝাতে পারে তার আব্বাকে।
হ্যালো, আংকেল, আন্টি কেমন?
আগের মতই। তবে আর খারাপ হয়নি।
ভাল। শুনে খুশি হলাম। আংকেল, শুনুন, মিসেস টোডরা বড্ড জ্বালাচ্ছে...
আরে, তুমিও তো জিনার মতই কথা বলছ দেখছি! রেগে গেলেন মিস্টার পারকার। মহিলার বয়েস হয়েছে, সেটা দেখবে না? জোয়ান মানুষের মত কি আর সব ঠিকমত পারে? কোথায় জিনাকে বোঝাবে, তা না, তোমরাও অভিযোগ শুরু করলে। দেখো, যদি থাকতে পারো থাকো, বেশি কষ্ট হলে বাড়ি চলে যাও। তোমার আন্টি ভাল হলে আবার এসো। আমার আর কিছু বলার নেই।

অন্য কেউ এভাবে কথা বললে স্তব্ধ হয়ে যেত কিশোর। কিন্তু পারকার আংকেলকে চেনা আছে। তাই রাগল না। বোঝানোর চেষ্টা করল, আংকেল, আপনি বুঝতে পারছেন না, ওরা লোক ভাল না…
যত খারাপই হোক, বারো-চোদ্দ দিনে আর কিছু এসে যাবে নাঃ.. রাখলাম…
কিশোরকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে লাইন কেটে দিলেন তিনি।
আস্তে করে রিসিভার নামিয়ে রাখল কিশোর। কাছেই যে দাঁড়িয়ে আছে মিসেস টোড, ভুলে গিয়ে, জিনার দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে বলল, না, হলো না…
মিস্টার পারকার কি বলেছেন আন্দাজ করে ফেলেছে কুটিলা মহিলা। হাসিমুখে বলে উঠল, আমরা ভাল না, না? খারাপের কিছু তো দেখোনি এতদিন, এইবার দেখবে। মিস্টার পারকার থাকার অনুমতি দিয়ে দিয়েছেন, আমরা থাকব, দেখি তোমরা কি করো?
গটমট করে গিয়ে রান্নাঘরে ঢুকল মিসেস টোড। চেঁচিয়ে কথা বলে সুখবরটা শোনাতে লাগল স্বামী আর ছেলেকে।
বসার ঘরে সোফায় বসে রইল ছেলেমেয়েরা। সবারই মুখ কালো। নীরবে তাকাচ্ছে একে অন্যের দিকে।
আব্বাটাকে যে দেখতে পারি না আমি, এ-জন্যেই! হঠাৎ ফুঁসে উঠল জিনা। কোন কথা কখনও শুনতে চায় না!
আসলে আন্টিকে নিয়ে খুব অস্থির হয়ে পড়েছেন তো, মুসা বলল। আমাদের কপালই খারাপ, নটার আগেই ফোন করেছেন। কোন আক্কেলে যে বেরিয়েছিলাম!
আব্বা তোমাকে কি বলেছে, বলো তো? কিশোরকে জিজ্ঞেস করল জিনা।
বলেছেন, বেশি কষ্ট হলে বাড়ি চলে যেতে। আন্টি ভাল হলে আবার আসতে…
তুমি তো খালি আব্বাকে ভাল ভাল বললো, বোঝো এখন কার সঙ্গে বাস করি! শোনো, এখানে থেকে তোমাদের কষ্ট করার কোন দরকার নেই। চলে যাও। বেড়াতে এসে অযথা কেন অত্যাচার সহ্য করবে।
কি যে বলো না। তোমাকে একা বিপদের মধ্যে ফেলে রেখে চলে যাব ভাবলে কি করে? যা-ই ঘটে ঘটুক, আমরা থাকছি। মাত্র তো দুটো হপ্তা, দেখতে দেখতে কেটে যাবে।
না, যাবে না! এত শয়তান লোকের সঙ্গে থাকতে গেলে দুই হপ্তা দুশো বছরেও শেষ হবে না। বাড়ি সামলে রাখার জন্যে ওদেরকে জায়গা দিয়েছে তো আব্বা, রাখুক ওরা। তোমরা বাড়ি চলে যাও, আমিও আমার মত চলব।
ঘাবড়ে গেল কিশোর। খেপিয়ে দেয়া হয়েছে জিনাকে। কি করে বসবে এখন, তার ঠিক নেই।

বোকার মত কথা বোলো না। কিভাবে চললে ভাল হবে, সবাই মিলে আলোচনা করে একটা উপায় বের করে ফেলতে পারব।
দেখো, টিকতে পারবে না এখানে, চলে তোমাদের যেতেই হবে।...রাফি, চলো, ঘুরে আসি।
আমরাও যাব তোমার সঙ্গে, মুসা বলল।
বাধা দিল না জিনা।
সৈকতে এসে বসল ওরা।
গুম হয়ে আছে জিনা। মায়ের জন্যে দুঃখ, বাবার ওপর রাগ-অভিমান, টোডদের ওপর ঘৃণা, সব মিলিয়ে অস্থির করে তুলেছে তাকে। চিরকাল সুখে থেকে থেকে মানুষ, এসব সহ্য করতে পারছে না।
কোমল গলায় জিজ্ঞেস করল কিশোর, আমরা চলে গেলে কি করার ইচ্ছে তোমার, বলো তো? কিছু একটা প্ল্যান তো নিশ্চয় করেছ।
না, বলব না। বললে আমাকে করতে দেবে না তোমরা।
কেন দেব না? রবিন বলল, খারাপ তো আর কিছু করবে না...
যদি করিই, তোমাদের কি? রেগে উঠতে গিয়ে সামলে নিল জিনা, সরি, ঝগড়া করতে চাই না। অহেতুক দাওয়াত দিয়ে এনে তোমাদের ছুটিটা পণ্ড করলাম।
পণ্ড হতে দিচ্ছি না, নিশ্চিন্ত থাকো, জোরগলায় বলল মুসা। দরকার হয় পিটিয়ে বের করব বেঙগুলোকে...বাড়িঘর যদি ঠিকঠাক রাখতে পারি আমরা, আংকেলের কিছু বলার থাকবে নাঃ..
ওই বাড়িটাতে ঢুকতেই ইচ্ছে করছে না আমার আর। বাইরেই ভাল।
চলো তাহলে, কিশোর বলল, দূরে কোথাও চলে যাই। তোমরা এখানে বসো, আমি খাবার নিয়ে আসি।
হুহ, গেলেই দেবে আরকি...
দেখোই না দেয় কিনা, উঠে বাড়ি রওনা হলো কিশোর।
রান্নাঘরে তখন হাসাহাসি চলছে, কথা বলছে তিন টোড। কিশোরকে ঢুকতে দেখেই গম্ভীর হয়ে গেল।
পাত্তাই দিল না কিশোর। ভারী গলায় বলল, স্যান্ডউইচ বানিয়ে দিন। বেড়াতে যাব আমরা।
বা-বা, আব্দার! মুখ ঝামটা দিয়ে বলল মিসেস টোড। রাতের বেলা সব চুরি করে নিয়ে গিয়ে খেয়ে ফেলেছে, এখন এসেছে স্যান্ডউইচের জন্যে। শুধু রুটি আছে ওখানে, নিলে নাও, নইলে বিদেয় হও।
সোফায় শুয়ে আছে টেরি। হাতে একটা কমিকের বই। সুর করে বলে উঠল, কিশোর, বিশোর...

এক চড় মেরে দাঁত ফেলে দেব, শয়তান ছেলে কোথাকার!
কিশোরকে ভয় পায় টেরি। ধমক খেয়ে চুপ হয়ে গেল।
খেঁকিয়ে উঠল মিসেস টোড, মারো তো দেখি চড়, কত্তবড় সাহস!
মারলে ধরে রাখতে পারবেন না। বজ্জাত বানিয়েছেন, আবার বড় বড় কথা…
গলা খাঁকারি দিল এককোণে বসা মিস্টার টোড। দেখো ছেলে, তাকাও এদিকে...
আপনার দিকে কে তাকায়!
দেখো, তাকাও এদিকে, রেগে গেছে টোড। বসা থেকে উঠল।
বার বার তাকাও এদিকে, তাকাও এদিকেকরছেন কেন? বললাম না। তাকাব না। দেখার মত আহামরি কোন চেহারা নয়।
চেঁচিয়ে উঠল মিসেস টোড, খবরদার, মুখ সামলে…
মুখ সামলে আপনি কথা বলবেন, শান্তকণ্ঠে বলল কিশোর। কঠোর দৃষ্টিতে তাকাল মহিলার দিকে।
কয়েক মুহূর্তের বেশি তার চোখে চোখে তাকিয়ে থাকতে পারল না মিসেস টোড। ছেলেটার মধ্যে এমন কিছু আছে, যা অস্বস্তিতে ফেলে দেয় তাকে। শান্তকণ্ঠে কথা বলে, কিন্তু জিভে যেন বিছুটির জ্বালা। সসপ্যান দিয়ে মাথায় একটা বাড়ি মারতে ইচ্ছে করছে তার, কিন্তু অতটা সাহস করল না। এই ছেলে বিপজ্জনক ছেলে।
কিশোরের মাথায় তো মারতে পারল না, টেবিলেই থ্রম করে সসপ্যান আছড়ে ফেলল মিসেস টোড।
আচমকা এই শব্দে ভাঁড়কে গিয়ে গোওও করে উঠল ডারবি।
হাল্লো, ডার্টি! তীব্র ব্যঙ্গ ঝরল কিশোরের কণ্ঠে, আছিস কেমন? গোসল করানো হয়েছে তোকে? মনে তো হচ্ছে না…
ওর নাম ডার্টি নয়! ঝাঁঝিয়ে উঠল মিসেস টোড।
ধুয়েমুছে গন্ধ দূর করুন, ডারবিই বলব। যতক্ষণ গন্ধে বমি আসবে, ততক্ষণ ডার্টি…যাকগে, ফালতু কথা বলার সময় নেই। আপনি ব্যস্ত, বুঝতে পারছি। ঠিক আছে, স্যান্ডউইচই তো কটা, লাগবে না। বাইরে থেকেই কিনে খেয়ে নেব। তবে রাতের খাওয়াটা যেন ভাল হয়, বলে দিলাম।
বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে ঘুরল কিশোর। শিস দিতে দিতে এগোল দরজার দিকে। বেরিয়ে যাবে, ঠিক এই সময় আবার বলে উঠল টেরি, কিশোর, বিশোর…
চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরল কিশোর, কি বললে!
কুঁকুড়ে গেল টেরি। গোওও করে উঠল ডারবি।
বরফের মত শীতল কণ্ঠে বলল কিশোর, বলো তো আবার শুনি?
কিন্তু আর বলার সাহস করল না টেরি। কুকুরটাও ভয় পাচ্ছে। কিশোরকে। মিসেস টোড চুপ। মিস্টার টোড স্তব্ধ।

সবার ওপর একবার করে কড়া নজর বোলাল কিশোর। মিস্টার পারকার থাকার অনুমতি দিয়েছেন বলেই সাত খুন মাপ হয়ে যায়নি; ওদের সঙ্গে খারাপ। আচরণ করলে ওরাও ছাড়বে না, বুঝিয়ে দিল এটা। তারপর যেন কিছুই হয়নি, এমন ভঙ্গিতে আবার শিস দিতে দিতে বেরিয়ে এল।
বন্ধুদেরকে সব জানাল সে।
জিনা বলল, কিন্তু এভাবে মুখ কালাকালি করে বাড়িতে বাস করা যায়!
সারাটা দিন চুপচাপ রইল সে। অনেক চেষ্টা করেও কিছুতেই তার মুখে। হাসি ফোঁটাতে পারল না তিন গোয়েন্দা।
কিশোর বলল, জিনা, চলো, তোমার দ্বীপ থেকে ঘুরে আসি।
মাথা নাড়ল জিনা। ভাল লাগছে না। বাড়ির কাছাকাছি থাকতে চাই। আব্বা আবার ফোন করতে পারে। বুড়িটাকে ধরতে দেব না। ধরলেই সাতখান করে লাগাবে আব্বার কাছে।
চায়ের সময় বাড়ি ফিরল ওরা। রুটি, মাখন আর জ্যাম দিল ওদেরকে মিসেস টোড, কেকটেক কিচ্ছু না। রুটিও এত কম, শুধু ওদের চারজনেরই হবে, রাফির জন্যে নেই। দুধ টক হয়ে গেছে, খাওয়া গেল না। চায়ে যে মিশিয়ে খাবে, তারও উপায় নেই। বাধ্য হয়ে দুধ ছাড়াই চা খেল ওরা।
জানালায় দেখা দিল টেরি। হাতে একটা বাসন। বলল, এই যে, কুত্তাটার খাবার।
জানালার নিচে ঘাসের ওপর ওটা নামিয়ে রেখে পালাল সে।
মাংসের গন্ধ পেয়ে ছুটে বেরোল রাফি।
তড়াক করে লাফিয়ে উঠল জিনা। যাসনে, রাফি, যাসনে!
বেরিয়ে দেখল বাসনের মাংস শুকছে কুকুরটা।
খেয়ে ফেলিসনি তো!
জানালা দিয়ে রবিন বলল, না, খায়নি। কেবল এঁকেছে। আমি দেখেছি।
জিনার পিছু পিছু বেরিয়ে এসেছে কিশোর। বাসনটা তুলে নিয়ে শুকল। কাঁচা মাংসের গন্ধ। আর কোন গন্ধ পাওয়া গেল না।
রবিন আর মুসাও বেরোল।
খাইছে! মুসা জিজ্ঞেস করল, বিষটিষ দেয়নি তো?
দাঁড়াও, দেখি। গলা চড়িয়ে ডাক দিল কিশোর, ডারবি! ডারবি!
লেজ নাড়তে নাড়তে বেরিয়ে এল ছোট্ট কুকুরটা। মাংস দেখাতেই দৌড়ে আসতে লাগল।
আরেক দরজা দিয়ে ছুটে বেরোল টেরি। ডারবি, যাবি না, ডারবি! খবরদার, ওই মাংস খেতে দেবে না ওকে!
কেন দেব না? বলো, কেন দেব না?

ও মাংস খায় না। কেবল কুকুরের বিস্কুট।
মিথ্যে কথা! চেঁচিয়ে উঠল জিনা, কালও ওকে মাংস খেতে দেখেছি। এখনও তো মাংস দেখে ছুটে এল!
হঠাৎ একটান দিয়ে কিশোরের হাত থেকে বাসনটা কেড়ে নিয়ে দৌড় দিল টেরি। রান্নাঘরে ঢুকে গেল।
পেছনে দৌড় দিতে গেল মুসা, হাত ধরে তাকে থামাল কিশোর। যেয়ো না। গিয়ে দেখবে আগুনে ফেলে দিয়েছে। ওই মাংস আর পাবে না।
নিশ্চয় বিষ দিয়েছিল। শিউরে উঠল জিনা।
ইঁদুরের বিষটিষ হবে, চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। যাকগে, ভয় পেয়ো না। মুখে তো আর দেয়নি রাফি।
কিন্তু দিতে তো পারত..আবার খাওয়ানোর চেষ্টা করবে ওরা..
আমাদের আরও সতর্ক থাকতে হবে। শুধু হুমকি দিয়েছে ভেবেছিলাম। কিন্তু সত্যিই যে দেবে ভাবিনি।
আমাদেরও খাইয়ে দেবে না তো! শঙ্কিত হয়ে পড়েছে রবিন।
কুকুরকে যখন দিয়েছে, মানুষকেও দিতে পারে:
অত সাহস করবে না। চার-চারজন মানুষকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলবে, অতই সোজা!

.

রাত হলো।
অপেক্ষা করতে করতে অস্থির হয়ে পড়ল মুসা। বলল, রাতে খেতে দেবে বলে তো মনে হয় না। কিশোর, আজও কি চুরি করতে হবেনাকি?
যতই কঠোরতা দেখাক, গালাগাল করুক, আরেকবার টোডের মুখোমুখি হতে ইচ্ছে করছে না কিশোরের। ভয় পেয়েছে, তা নয়, আসলে বিরক্ত লাগছে। হঠাৎ করেই রাগ হতে লাগল নিজের ওপর। জিনাদের বাড়ি মানে ওদেরও বাড়ি, টোডদের চেয়ে এখানে তাদের অধিকার অনেক অনেক বেশি, ওদের ভয়ে চুরি করতে যায় কেন সে? খাবারের জন্যে অনুরোধই বা করতে যায় কেন?
উঠে দাঁড়াল সে, রাফি, আয় তো আমার সঙ্গে।
আমি আসব? জিজ্ঞেস করল মুসা। বেশি বাড়াবাড়ি করলে আজ বেঙের বাচ্চার নাক ফাটিয়ে দেব।
না, তুমি থাকো। নাক ফাটানোর সময় এখনও হয়নি।
প্যাসেজ ধরে রান্নাঘরের দিকে এগোল কিশোর। রেডিও বাজছে। তাই ঘরের কেউ কিশোরের পায়ের আওয়াজ শুনল না। সে দরজায় গিয়ে দাঁড়ানোর আগে

জানতে পারল না কিছু। সবার আগে চোখ পড়ল টেরির। দেখে দরজায় কিশোর, তার পেছনে রাফি।
এ বিশাল কুকুরটাকে বাঘের মত ভয় পায় সে। তাকে দেখে রাফি ঘাউ ঘাউ করে উঠতেই লাফ দিয়ে নেমে গিয়ে সোফার পেছনে লুকাল।
রেডিও অফ করে দিয়ে কড়া গলায় জিজ্ঞেস করল মিসেস টোড, কি চাই?
রাতের খাবার দিতে এত দেরি হচ্ছে কেন?
রুটি আর কিছু পনির পাবে, ব্যস, আর কিছু না। নিয়ে যাও।
কেন, আপনার বাবার টাকায় কেনা খাবার, ভাল কিছু দিতে এত কষ্ট হয়?
ক্ষণিকের জন্যে স্তব্ধ হয়ে গেল মিসেস টোড। চেঁচিয়ে উঠল, গাল দিচ্ছ কোন সাহসে!
কথা না শুনলে আরও খারাপ কিছু করব, কোনও বয়স্ক মহিলার সঙ্গে এতটা অভদ্র আচরণ জীবনে করেনি কিশোর। সহ্যের শেষ সীমায় চলে গেছে সে। রাফি, খেয়াল রাখ। সোজা কামড়ে দিবি, বলে রাখলাম তোকে।
ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল রাফির চেহারা। গরগর করে গজরাতে লাগল।
জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন বোধ করল না কিশোর, মৃদু শিস দিতে দিতে এগোল ভাঁড়ারের দিকে। জানে তার এই আচরণ আরও খেপিয়ে দেয় মিসেস টোডকে, সেজন্যেই আরও বেশি করতে লাগল এরকম। বাহ, ভাড়ার কি করে বোঝাই করে রাখতে হয় আপনি জানেন, মিসেস টোড। মুরগীর রোস্ট। আহ, গন্ধেই পানি এসে যাচ্ছে জিভে। মনে হচ্ছে কত বছর খাই না। নিশ্চয় আজ সকালে জবাই করেছে মিস্টার টোড। অনেক কঁক-কঁক শুনেছি। আরে, টমেটো! চমৎকার! গাঁয়ের সবচেয়ে ভালটা নিয়ে আসা হয়েছে, বুঝতে পারছি। আরি সব্বেনাশ, আপেল-পাইও আছে। আপনি সত্যি ভাল রাঁধেন মিসেস টোড, স্বীকার করতেই হবে।
বড় একটা ট্রে নিয়ে এক এক করে তাতে পাত্রগুলো তুলতে শুরু করল সে।
চিৎকার করে বলল মিসেস টোড, জলদি রাখো! ওগুলো আমাদের খাবার!
ভুল করলেন, মোলায়েম স্বরে বলল কিশোর। এগুলো আমাদের খাবার। আজ সারাদিন খাওয়াটা ভাল হয়নি, রাতেও না খেয়ে থাকতে পারব না।
দেখো ছেলে, এদিকে তাকাও!এত সুস্বাদু খাবারগুলো হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে দেখে ঘোৎ-ঘোৎ করে উঠল মিস্টার টোড।
আপনার দিকে তাকাব? কেন? যেন সাংঘাতিক অবাক হয়েছে। কিশোর, এমন কি মহামানব হয়ে গেছেন আপনি? শেভ করেছেন? গোসল করেছেন? মনে তো হয় না। না, মিস্টার টোড, আপনার দিকে তাকানোর রুচি হচ্ছে না।
বাকহারা হয়ে গেল মিস্টার টোড। একটা ছেলের জিভে যে এতটা ধার থাকতে পারে, কল্পনাই করেনি। আরও দু-বার আনমনেই বিড়বিড় করল, দেখো, এদিকে

তাকাও,এদিকে তাকাও!
উফ, আবারও সেই একই কথা! অসহ্য! আচ্ছা মিস্টার টোড, দুনিয়ায় এত নাম থাকতে আপনার নাম টোড রাখতে গিয়েছিল কেন? টোড কাকে। বলে জানেন তো? রেঙ। তা-ও ভাল জাতের হলে এককথা ছিল, গড়িয়ে গড়িয়ে যেগুলো চলে সেগুলো:
চুপ করো পাজি ছেলে কোথাকার! আর সহ্য করতে না পেরে ধমকে উঠল মিসেস টোড।
কিশোরকে কিছু বলতে হলো না, ঘাউ করে বিকট হাঁক ছাড়ল রাফি।
চমকে উঠে পিছিয়ে গেল মিসেস টোড। কণ্ঠস্বর নরম করে বলল, সব নিয়ে গেলে আমরা কি খাব, বলো?
কেন, রুটি আর পনির রয়েছে না, যেগুলো আমাদের জন্যে রেখেছিলেন। তাই খেয়ে নিন।
কুকুরের কথা ভুলে গিয়ে একটা চামচ তুলে কিশোরকে বাড়ি মারতে গেল মিসেস টোড।
আবার ঘাউ করে লাফিয়ে এসে সামনে পড়ল রাফি। কামড়ে দিতে গেল।
বাবাগো! বলে লাফ দিয়ে সরে গেল মিসেস টোড। কি শয়তান কুত্তারে বাবা! আরেকটু হলেই আমার হাত কেটে নিয়েছিল!
আপনাকে তো বলেছি, গোলমাল করবেন না, করছেন কেন?
দাঁড়াও, এমন শিক্ষা দেব একদিন.. ফোঁস ফোঁস করতে লাগল মিসেস টোড।
চেষ্টা তো আজও কম করেননি, পেরেছেন? আজকে মাপ করে দিলাম, আবার যদি এরকম করেন, ওই যে বলেছি, সোজা পুলিশের কাছে যাব।
আগের বারের মতই পুলিশের কথায় ভয় পেয়ে গেল মহিলা। চট করে একবার স্বামীর দিকে তাকিয়ে পিছিয়ে গেল।
সন্দেহ হলো কিশোরের, কোন অপরাধ করে এসে এখানে লুকায়নি তো লোকটা? নইলে পুলিশের কথা শুনলেই ঘাবড়ে যায় কেন? আসার পর থেকে একটিবারের জন্যে ঘরের বাইরেও যায়নি, এটাও সন্দেহজনক।
খাবারের ট্রে হাতে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল সে। পেছনে রাফি; খুব হতাশ হয়েছে কারও পায়ে একটা অন্তত কামড় বসাতে পারেনি বলে।
যুদ্ধজেতা বীরের ভঙ্গিতে বসার ঘরে ঢুকল কিশোর। ট্রে-টা টেবিলে নামিয়ে রাখতে রাখতে বলল, এসো, দেখে যাও, কি নিয়ে এসেছি।
সব কথা শুনে হুল্লোড় করে উঠল সবাই।
রবিন বলল, সাহস আছে তোমার, কিশোর। ওই মহিলাটার সামনে যেতেই ভয় করে আমার।

ভয় কি আমারও কম করছিল। কেবল সঙ্গে রাফি থাকাতেই পার হয়ে এলাম।
ছুরি-চামচ-প্লেটের অভাব হলো না। সাইডবোর্ড থেকে বের করে আল জিনা। চায়ের সময় খাওয়ার পর রুটি বেঁচে গিয়েছিল, তারপরেও রান্নাঘর থেকে বড় আরেকটা নিয়ে এসেছে কিশোর। কারোরই কম পড়ল না, এমন কি রাফিরও পেট ভরল।
খাওয়ার পরই হাই তুলতে শুরু করল রবিন। আমি আর বসে থাকতে পারছি না।
আজকাল বড় বেশি ঘুমকাতুরে হয়ে পড়েছ তুমি, রবিন, অভিযোগ করল মুসা।
কি আর করব, বলো, হেসে বলল রবিন। সারাদিন থাকি খাবারের চিন্তায়। কখন পাব, কখন পাব এই টেনশনেই শরীর হয়ে থাকে ক্লান্ত। খাওয়ার পর আর থাকতে পারি না।
বিষণ্নকণ্ঠে জিনা বলল, তোমাদের আসতে বলে এবার ভুলই করলাম...
সববারই তো শুদ্ধ হয়, এবার নাহয় একটু ভুল হলোই, পরিবেশটা হালকা করার জন্যে বলল রবিন, তাছাড়া তুমি তো আর জানতে না আন্টির শরীর এতটা খারাপ হয়ে যাবে।
শুতে গেল ওরা। গোয়েন্দারা তাদের ঘরে, জিনা তার ঘরে। রাফি শুয়ে থাকল জিনার বিছানার কাছে। কান পেতে রইল সন্দেহজনক শব্দ শোনার জন্যে। টোডদেরকে শুতে যেতে শুনল সে। দরজা বন্ধ হতে শুনল। ডারবি গোঙলি একবার, তারপর সব নীরব।
থুতনি নামিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল রাফি। তবে একটা কান খাড়াই রইল ঘুমের মধ্যেও। টোড পরিবারকে একবিন্দু বিশ্বাস করে না সে।
রাতে তাড়াতাড়ি শুয়েছে, পরদিন খুব সকালে বিছানা ছাড়ল। ছেলেমেয়েরা। জানালার কাছে এসে দাঁড়াল কিশোর। সুন্দর দিন। আকাশের রঙ ফ্যাকাসে নীল, মাঝে মাঝে ভেসে বেড়াচ্ছে গোলাপি মেঘ। সাগর শান্ত, আকাশের মতই নীল। মনে হচ্ছে যেন এইমাত্র ধোপাখানা থেকে ধুয়ে এনে বিছানো হয়েছে বিশাল এক নীল চাদর।
নাস্তার আগে সাগরে গোসল করতে গেল ওরা। বাড়ি ফিরে এল সাড়ে আটটার মধ্যে। আগের দিনের মত যদি নটার আগেই ফোন করেন মিস্টার পারকার, তাহলে যাতে ধরতে পারে। আজ আর মিসেস টোডকে ফোন ধরার সুযোগ দিতে চায় না।
মহিলাকে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল কিশোর, আংকেল ফোন করেছেন?
না, মেজাজ দেখিয়ে বলল.মিসেস টোড। সে আশা করেছিল, আজও আগেই ফোন ধরে ফেলবে। পারল না বলেই এই রাগ।

নাস্তা দিতে হবে। ভাল জিনিস। আংকেলকে যাতে বলতে পারি ভাল খাবারই খাওয়ানো হচ্ছে আমাদের।
ছেলেটাকে বিশ্বাস নেই। খারাপ কিছু দিলে সত্যি বলে দিতে পারে। বানিয়েও বলতে পারে অনেক কিছু। তাই শুকনো রুটি আর মাখন দেয়ার ইচ্ছে ত্যাগ করতে হলো মিসেস টোডকে।
খানিক পরেই রান্নাঘর থেকে মাংস ভাজার গন্ধ পেল কিশোর।
মাংস, ডিম ভাজা, টমেটোর সালাদ আর রুটির ট্রে ধাম করে টেবিলে নামিয়ে রাখল মিসেস টোড। মুচকি হাসল শুধু কিশোর, কিছু বলল না। যত খুশি মেজাজ দেখাক, খাবার না দিয়ে তো পারল না।
টেরি ঢুকল আরেকটা ট্রে হাতে। তাতে চায়ের সরঞ্জাম।
বাহ, এইতো লক্ষ্মী ছেলে, হেসে বলল কিশোর।
বিড়বিড় করে কি যেন বলল টেরি, বোঝা গেল না। মায়ের মতই আছাড় দিয়ে ট্রে রাখল টেবিলে। ঝনঝন করে উঠল কাপ-পিরিচ। এই শব্দ সহ্য করল না রাফি, হউক! করে ধমক লাগাল।
প্রায় উড়ে পালাল টেরি।
খবর শোনার জন্যে অস্থির হয়ে আছে জিনা। খাবারের দিকে নজর নেই। তার প্লেটে মাংস, ডিম বেড়ে দিল কিশোর।
খাওয়ার মাঝপথে বাজল টেলিফোন। হাতের চামচটা প্লেটে ফেলে দিয়ে লাফ দিয়ে উঠে গেল জিনা। দ্বিতীয়বার রিঙ হওয়ার আগেই ছোঁ মেরে তুলে নিল রিসিভার। আব্বা?...আম্মার খবর কি?
শুনল ওপাশের কথা।
তিন গোয়েন্দাও খাওয়া থামিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে।
তাই নাকি? জিনা বলল, উফ, বাঁচলাম। আম্মাকে বোলো, তাকে দেখার জন্যে পাগল হয়ে আছি আমি! তুমি তো আবার ভুলে যাবে, বলবে না কিছু! বলবে কিন্তু বলে দিলাম! আব্বা, আমি আসতে চাই, কিছু হবে?
আবার ওপাশের কথা শুনতে লাগল সে।
শোনার পর আস্তে নামিয়ে রাখল রিসিভার।
রবিন বলল, নিশ্চয় যেতে মানা করেছেন?
মাথা ঝাঁকাল জিনা। আবার টেবিলে এসে বসল। আম্মার অপারেশন হয়েছে। ব্যথা নেই। ডাক্তাররা বলছে, দিন দশেকের মধ্যেই সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরতে পারবে। আব্বা আম্মাকে নিয়েই একবারে আসবে।
যাক, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর, এতদিনে একটা সুখবর পাওয়া গেল।

কিন্তু কুখবর যে ঘাড়েই চেপে আছে এখনও, মুখ বাঁকাল মুসা। বেঙ পরিবার। দশটা দিন ওদের সহ্য করব কি ভাবে?

.

জিনা ফোন ধরার সময় কাছেই ছিল মিসেস টোড। সব শুনল। মিসেস পারকার আসতে আসতে আরও দিন দশেক লাগবে। এ কদিন নিশ্চিন্তে কাটাতে পারবে এ-বাড়িতে।

হঠাৎ করেই যেন রাক্ষুসে খিদে পেয়ে বসল জিনাকে। এতক্ষণ কেবল চামচ নাড়াচাড়া করছিল, এখন গপ গপ করে গিলতে শুরু করল।

আমার যে কি ভাল লাগছে। আবার হাসি ফুটেছে তার মুখে।

এরপর যে কথাটা বলল জিনা, সেটা আর ভাল লাগল না কিশোরের।

জিনা বলল, আম্মা ভাল হয়ে যাচ্ছে, টোডের গোষ্ঠীকে আর ভয় পাই না আমি। তোমরা রকি বীচে ফিরে যাও, খামাকা ছুটিটা নষ্ট কোরো না। আমি আর রাফিই সামলাতে পারব ওদের।

গম্ভীর হয়ে গেল কিশোর, দেখো, জিনা, এসব নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। একবার কিছু ঠিক করলে তুমি যেমন না করে ছাড়ো না, আমিও ছাড়ি না, ভাল করেই জানা আছে তোমার। আমাকে কিন্তু রাগিয়ে দিচ্ছ।

বেশ, জিনা বলল, তাহলে আমি যা ঠিক করেছি তাই করব। বাড়ি না যেতে চাইলে এখানেই থাকো, আমার কোন আপত্তি নেই। তবে আমি যে প্ল্যান করেছি, সেটা আমার একার। তোমরা এতে থাকছ না।

কি প্ল্যান তোমার? বলতে অসুবিধে কি? আমাদের বিশ্বাস করো না?

করি। কিন্তু বললে আমাকে করতে দেবে না, ঠেকাতে চাইবে।

তাহলে তো আরও বেশি করে শোনা-দরকার, শঙ্কিত হয়ে উঠল কিশোর। জিনাকে বিশ্বাস নেই, কারও ওপর রেগে গেলে যা খুশি করে বসতে পারে।

কিন্তু কোনভাবেই জিনার মুখ থেকে তার প্ল্যান সম্পর্কে একটা কথা আদায় করা গেল না।

গোপনে তার ওপর নজর রাখার সিদ্ধান্ত নিল কিশোর।

জিনাও কম চালাক নয়। অস্বাভাবিক কিছুই করল না। তিন গোয়েন্দার সঙ্গে সৈকতে বেড়াল, সাঁতার কাটল, খেলল। তার মায়ের শরীর ভাল হওয়ার খবর শুনেছে, আজ তার মন ভাল। দ্বীপে যাওয়ার কথা বলল একবার মুসা, এড়িয়ে গেল জিনা। তাকে আর চাপাচাপি করা হলো না এ-ব্যাপারে।

দিনটা ভালই কাটতে লাগল। বাড়ি গিয়ে খাবারের জন্যে মিসেস টোডের সঙ্গে ঝগড়া করতে ইচ্ছে হলো না কারও, তাই বেকারি থেকে স্যান্ডউইচ কিনে খেল।

বিকেলে জিনা বলল, বাজারে যেতে হবে। আমি কয়েকটা জিনিস কিনব। চায়ের সময় হয়েছে, তোমরা বাড়ি যাও। আমি যাব আর আসব।
আমিও যাব তোমার সঙ্গে। রাফিকে নিয়ে রবিন আর মুসা চলে যাক। তিনজনে মিলে ভালই সামলাতে পারবে মিসেস টোডকে।
না, আমি একা যাব। তোমরা যাও।
শেষ পর্যন্ত সবাইকে সঙ্গে নিতে বাধ্য হলো জিনা। কারণ, কিশোর। তাকে একা যেতে দেবে না, ওদিকে মুসা আর রবিনও মিসেস টোডের মুখোমুখি হতে রাজি নয়।
এক একটা দোকানে ঢুকে টর্চের জন্যে নতুন ব্যাটারি কিনল জিনা। দুই বাক্স দিয়াশলাই, আর এক বোতল মেথিলেটেড স্পিরিট কিনল।
এসব কেন? জিজ্ঞেস করল রবিন।
কাজে লাগে না এসব? এড়িয়ে গেল জিনা, দরকারী জিনিস।
জিনার কেনাকাটা এ-পর্যন্তই। বাড়ি ফিরে এল ওরা। অবাক হয়ে দেখল, টেবিলে চা দেয়াই আছে। যদিও আহামরি কিছু নয়-রুটি, জ্যাম আর চা, তবু আছে তো। দেয়ার জন্যে যে মিসেস টোডকে কিছু বলতে হয়নি এতেই খুশি ওরা। যা পেল খেয়ে ফেলল।
সন্ধ্যার দিকে বৃষ্টি নামল। ঘর থেকে বেরোনোর উপায় নেই। বসে বসে কেরম খেলতে লাগল ওরা। কেরিআন্টির খবর শুনে মন অনেকটা হালকা ওদের।
এক সময় উঠে গিয়ে বেল বাজাল কিশোর।
অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল জিনা, বেল বাজালে কেন?
মিসেস টোডকে ডাকলাম, খাবার দিতে বলব।
কিন্তু তার ঘণ্টার জবাব দিতে এল না কেউ।
আবার বাজাল সে। আবার। যতক্ষণ না রান্নাঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এল মিসেস টোড। মুখ কালো করে, চোখ পাকিয়ে, কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল সে।
বেল বাজাচ্ছ কেন? তোমার বেলের জবাব দিতে যাচ্ছে কে?
আপনি, শান্তকণ্ঠে বলল কিশোর, আর কে আছে বাড়িতে? খাবার দিন। ফালতু জিনিস আনলে ভাল হবে না। কাল রাতে কাউকে কামড়াতে পারেনি বলে খুব বিরক্ত হয়ে আছে রাফি।
আজ যদি কিছু করতে আসো রান্নাঘরে...আমি..আমি...
কি করবেন? পুলিশে খবর দেবেন তো? আমিও সেটাই চাইছি। পুলিশকে বেশ কিছু কথা বলার আছে আমার। ডাকবেন নাকি এখনই?
চোখের দৃষ্টিতে কিশোরকে ভস্ম করে দেয়ার চেষ্টা চালাল যেন মিসেস টোড, ব্যর্থ হয়ে ক্ষুব্ধ আক্রোশে হাত মুঠো করে ফেলল। বিড়বিড় করে কি বলতে বলতে,

বোধহয় তাকে অভিশাপ দিতে দিতেই চলে গেল রান্নাঘরে। বাসন-পেয়ালা আছড়ানোর শব্দ পাওয়া গেল বসার ঘর থেকেও।
বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে হাসল কিশোর।
আগের দিনের মত এতটা ভাল খাবার পেল না ওরা, তবে তেমন খারাপও না। ঠাণ্ডা মাংস, পনির আর খানিকটা পুডিং। রাফির জন্যেও খানিকটা রান্না করা মাংস এনে দিল মিসেস টোড।
তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল জিনার দৃষ্টি। কড়া গলায় বলল, ওটা লাগবে না, নিয়ে যান। বিষ মিশিয়ে দিয়েছেন তো? আপনাকে বিশ্বাস নেই...
না, থাক, বাধা দিল কিশোর, নিতে হবে না। কাল এই মাংস কেমিস্টের কাছে নিয়ে যাব পরীক্ষা করাতে। দেখি, কি জিনিস মেশানো আছে ওতে। তারপর পুলিশের কাছে যাওয়ার আরও একটা ছুতো পেয়ে যাব।
একটা কথা বলল না মিসেস টোড। কারও দিকে তাকালও না। নীরবে বাসনটা তুলে নিয়ে চলে গেল।
খাইছে! বিশ্বাস করতে পারছে না যেন মুসা, কি ভয়ঙ্কর মেয়েমানুষরে বাবা?
মেঘ জমেছে জিনার মুখে। রাফিকে কাছে টেনে নিতে নিতে বলল, সাংঘাতিক অবস্থা! রাফিকে তো মেরে ফেলবে! কতক্ষণ পাহারা দিয়ে রাখব!
এই ঘটনা দিল ওদের সন্ধ্যাটাকে মাটি করে। .
খেলা তো নয়ই, আলাপ-আলোচনাও আর তেমন জমল না। হাই তুলল কিশোর। ঘড়ি দেখে বলল, রাত দশটা। বসে থেকে লাভ নেই। ঘুমাতে যাই।
সারাদিন প্রচুর পরিশ্রম করেছে, সাঁতার কেটেছে, হাঁটাহাঁটি করেছে, শোয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ল সবাই, এমন কি কিশোরও।
হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল তার। মনে হলো, কোন একটা শব্দ শুনেছে। সব চুপচাপ। মুসা আর রবিনের নিঃশ্বাসের শব্দ কানে আসছে। কেন ঘুমটা ভাঙল? টোডদের কেউ শব্দ করেছে? না, তাহলে চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করত রাফি। তাহলে?
বিদ্যুৎ চমকের মত মনে পড়ল জিনার কথা, প্ল্যান করেছে! লাফিয়ে উঠে দৌড় দিল তার ঘরের দিকে।
দরজা খোলা। জিনা, জিনা বলে ডাকল সে। জবাব নেই। উঁকি দিল ঘরে। খালি ঘর। খুব অল্প পাওয়ারের একটা সবুজ আলো জ্বলছে। জিনাও নেই, রাফিও না।
আবার দৌড়ে ঘরে ফিরে এল কিশোর। ডেকে তুলল মুসা আর রবিনকে।
ঘুমজড়িত কণ্ঠে মুসা বলল, আবার কি হলো? টোডের মুখে তরকারি ফেলেছ?
জলদি ওঠো! জিনা নেই ঘরে!
গেল কোথায়? লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নামল রবিন।
সেটা তো আমারও প্রশ্ন। তোমরা এসো। আমি ওর ঘরে গিয়ে খুঁজে দেখি।

সুইচ টিপে উজ্জ্বল আলো জ্বালল কিশোর। বালিশে পিন দিয়ে আটকানো চিঠিটা চোখে পড়ল। তাড়াতাড়ি খুলে আনল সেটা। জিনা লিখেছে?

কিশোর

রাগ কোরো না। রাফিকে নিয়ে আর ঘরে থাকার সাহস পেলাম না। ওর কিছু হলে যে আমি বাঁচব না তোমরা জানো। মিসেস টোডকে বিশ্বাস নেই। রাফিকে মেরে ফেলবে ও। আমি কয়েক দিনের জন্যে চলে যাচ্ছি, আব্বা আম্মা না এলে ফিরব না। তোমরা কাল বাড়ি চলে যেয়ো। আমাদের বাড়ি পাহারা দেয়ার দরকার নেই। টোডদেরকে যখন এতই বিশ্বাস আব্বার, ওরাই থাকুক, পাহারা দিক। ধ্বংস করে দিক বাড়িঘর, আমার কিছু না। আবার অনুরোধ করছি, রাগ কোরো না।

—জিনা।

ঘরে ঢুকল মুসা ও রবিন।

নীরবে রবিনের দিকে চিঠিটা বাড়িয়ে দিয়ে আনমনে বলল কিশোর, ইস, এরকম কিছু যে করবে আগে ভাবলাম না কেন! নিচের ঠোঁটে ঘন ঘন চিমটি কাটতে শুরু করল সে। পুরোদমে চালু হয়ে গেছে মগজ।

চিঠিটা দ্রুত পড়ে ফেলল রবিন। নিজেকেই জিজ্ঞেস করল যেন, কোথায় যেতে পারে?

বিড়বিড় করছে কিশোর, টর্চ...স্পিরিট...দেশলাই... তুড়ি বাজাল দুই সহকারীর দিকে তাকিয়ে। বুঝে গেছি! জলদি এসো আমার সঙ্গে!

কিছুই জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন মনে করল না দু-জনে, করার সময়ও নেই, দরজার কাছে চলে গেছে কিশোর। তার পেছনে ছুটল ওরা।

নিজেদের ঘরে এসে টর্চটা বের করে নিল কিশোর। ছুটল সিঁড়ির দিকে।

বাগানে বেরিয়ে এল ওরা। বৃষ্টি থেমেছে, কিন্তু মেঘ জমে আছে এখনও। সহসা কাটবে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। অন্ধকার রাত।

গেটের দিকে দৌড় দিল কিশোর। তার পাশে ছুটতে ছুটতে মুসা জিজ্ঞেস করল, কোথায় গেছে?

এখনও বোধহয় যেতে পারেনি। দ্বীপে যাবে ও।

তাহলে আর অসুবিধে কি? যাক না। কাল আমরাও গিয়ে হাজির হব।

ভয় তো সেটা নয়, ভয় হলো অন্ধকারের। সাগরের অবস্থাও ভাল না, বড় বড় ঢেউ। এই ঢেউয়ে দ্বীপে নৌকা ভেড়াবে কি করে সে? ডুবে মরবে।

সৈকতে বেরিয়ে এল ওরা। নৌকাটা কোথায় রাখে জিনা, জানা আছে। সেদিকে তাকাতে টর্চের আলো চোখে পড়ল।

কিছু বলতে হলো না মুসাকে। ভেজা বালি মাড়িয়ে ছুটল। দেখতে দেখতে অনেক পেছনে ফেলে এল কিশোর ও রবিনকে।

জিনা, জিনা, থামো, যেয়ো না! চিৎকার করে বলল সে।
জোরে এক ধাক্কা মেরে নৌকা পানিতে ঠেলে দিল জিনা। ফিরেও তাকাল না। লাফিয়ে উঠে বসল। আগেই চড়ে বসে আছে রাফি। কিশোরদের আসতে দেখে ভাবল, রাতদুপুরে এ-এক মজার খেলা, খেক খেক করে চেঁচাতে শুরু করল।
ঝপাৎ করে পানিতে দাঁড় ফেলল জিনা।
একটুও দ্বিধা করল না মুসা। ড্রেসিংগাউন নিয়েই নেমে পড়ল পানিতে। চিৎকার করে বলছে, জিনা, শোনো, এই অন্ধকারে গেলে মরবে..
না, আমি যাবই। বাড়ি আর যাচ্ছি না, জোরে জোরে দাঁড় বাইতে শুরু করল জিনা।
নৌকার একটা গলুই ধরে ফেলল মুসা। টানতে লাগল। কিশোর আর রবিনও পৌঁছে গেল। ওরাও ধরে ফেলল নৌকাটা।
আর এগোতে পারল না জিনা।
লাফিয়ে নৌকায় উঠে পড়ল মুসা। জিনার হাত থেকে দাঁড় কেড়ে নিল।
আমার সর্বনাশ করে দিলে তোমরা! গুঙিয়ে উঠল জিনা। যা-ই করো, আমি আর ও-বাড়িতে ফিরে যাব না…
শোনো, জিনা,বোঝানোর চেষ্টা করল কিশোর, না যাও, নেই। কিন্তু তোমার প্ল্যানের কথাটা আমাদের বলতে কি অসুবিধে ছিল? আমরা কি বাধা . দিতাম? তুমি যদি বাড়ি ছাড়তে চাও, আমরাও ছাড়ব। দ্বীপেই চলে যাব।
এভাবে তোমার একা একা যাওয়ার চেয়ে, চলো, সবাই মিলেই যাই।
এক মুহূর্ত ভাবল জিনা। বেশ, চলো।
এখন না। এই অন্ধকারে গিয়ে মরার কোন মানে হয় না। কাল যাব আমরা। দরকারী জিনিসপত্র নিয়ে, তৈরি হয়ে, যাতে আরামে থাকতে পারি। খালি হাতে গিয়ে শুধু শুধু কষ্ট করব কেন?

.

টেনে নৌকাটাকে আবার বালিতে তুলল ওরা।
জিনা বলল, কিছু জিনিস আছে। নিয়ে নেব, নাকি নৌকায়ই থাকবে?
টর্চের আলো ফেলল কিশোর। বাহ, অনেক খাবার নিয়েছ তো। রুটি, মাখন, মাংস…টোডদের চোখ এড়িয়ে বের করলে কি করে?
রান্নাঘরে কেউ নেই। টোডও না। বোধহয় সে-ও আজ ওপরতলায় শুতে গেছে।
থাক এগুলো এখানেই। আরও আনতে হবে। অনেক। অন্তত দশদিনের খাবার।
কোথায় পাবে? রবিনের প্রশ্ন। কিনে নেবে?
আর কোন উপায় না থাকলে তাই করতে হবে।

জিনা বলল, আরেক কাজ করতে পারি কিন্তু। আম্মার ঘরে একটা বিশাল আলমারি দেখেছ না? ওটাতে কি আছে জানো? খাবার। সব টিনের খাবার। পর পর দু-বছর শীতকালে সাংঘাতিক অবস্থা হয়েছিল গোবেল বীচে। এমন তুষারপাত শুরু হয়েছিল, লোকে ঘর থেকে বেরোতে পারেনি অনেকদিন। খাবারের এত অভাব হয়ে গিয়েছিল, না খেয়ে থেকেছে অনেকে। তারপর থেকেই সাবধান হয়ে গেছে আম্মা। আলমারিটাতে প্রচুর খাবার জমিয়ে রাখে, যাতে আর বিপদে না পড়তে হয়।
ভেরি গুড, খুশি হয়ে বলল কিশোর, তাহলে তো কোন কথাই নেই। যা যা নেব লিখে রাখব আমরা। কেরিআন্টি এলে বাজার থেকে কিনে এনে আবার ভরে রাখব ওসব জিনিস।
তালা দেয়া দেখেছি, মুসা বলল। চাবি পাবে কোথায়?
আমি জানি আম্মা কোথায় রাখে, জবাব দিল জিনা।
বাড়ি ফিরল ওরা। পা টিপে টিপে চলে এল জিনার মায়ের ঘরে। শব্দ করলে টোডরা উঠে যেতে পারে, তাই রাফিকেও চুপ থাকতে বলে দিল জিনা।
চাবি দিয়ে তালা খুলে আলমারি খুলল সে।
মৃদু শিস দিয়ে উঠল মুসা। পরক্ষণেই চুপ হয়ে গেল, টোডদের কানে শিসের শব্দ চলে যাওয়ার ভয়ে। জেগে উঠলে আবার কোন গণ্ডগোল বাধাবে ওরা, কে জানে।
গাদাগাদি, ঠাসাঠাসি করে রাখা হয়েছে খাবার। সব টিনে ভর্তি। স্যুপ, মাংস, ফল, দুধ, মাছ, মাখন, বিস্কুট, সব্জি, কিছুরই অভাব নেই।
বড় দেখে দুটো কাপড়ের থলে বের করে আনল জিনা। তাতে খাবার ভরতে শুরু করল সবাই মিলে।
সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল খাবারের, সেটা মিটে যাওয়াতে খুশি হলো কিশোর।
বৃষ্টি হলে গোবেল দ্বীপে খাবারের পানির সাধারণত অভাব হয় না। তবু প্ল্যাস্টিকের কয়েকটা বোতল ভরে বিশুদ্ধ খাবার পানি নিয়ে নেয়া হলো, বাড়তি সাবধানতা।
ভাড়ার থেকে নিয়ে আসা হলো ভেড়ার মাংসের দুটো আস্ত রান। পরিষ্কার কাপড়ে পেচিয়ে নেয়া হলো ওগুলো।
এছাড়া প্রয়োজনীয় আরও অনেক টুকিটাকি জিনিস নিল ওরা; যেমন, মোম, দড়ি, বালিশ হিসেবে ব্যবহারের জন্যে সোফার কুশন, বিছানো আর গায়ে দেয়ার জন্যে কম্বল। জিনা মাত্র দুটো দেশলাই কিনেছে, তাতে হবে না, তাই আরও কিছু দেশলাইও নিয়ে নিল কিশোর।
মুসা বলল, সবই তো হলো। আসল জিনিসই বাকি।
কী? জানতে চাইল রবিন। রু

টি।
ও নিয়ে ভাবনা নেই, কিশোর বলল। সকালে বেকারি থেকে নিয়ে নিলেই হবে।
কিন্তু এত সকালে দোকান খুলবে?
না খুললে ঘর থেকে ডেকে বের করে এনে খোলাব, জিনা বলল, অসুবিধে হবে না।
বেঙের গোষ্ঠী যখন দেখবে আমরা নেই, হেসে বলল মুসা, আকাশ থেকে পড়বে। তাজ্জব হয়ে ভাববে, কোথায় উধাও হলাম আমরা। ভয়ও পাবে নিশ্চয়।
উঁহু, ভয় পাওয়ানো চলবে না, কিশোর বলল। ওরা পারকার আংকেলকে বলে দেবে তাহলে। হয়তো ছুটে আসবেন তিনি। আমাদের বাড়ি ফিরতে বাধ্য করবেন।
করলে কি? আমরা না গেলেই হলো।
তার মুখের ওপর না বলতে পারবে না। থাক, এসব নিয়ে ভাবার অনেক সময় আছে। জরুরী কাজটা আগে সারি। অন্ধকার থাকতে থাকতেই মালপত্রগুলো নিয়ে নৌকায় তুলতে হবে।
মালের বোঝার দিকে তাকিয়ে আছে রবিন। এত জিনিস নেব কি করে? নিতে নিতেই ভোর হয়ে যাবে তো। কবার যেতে-আসতে হবে ভেবে দেখেছ?
একমুহূর্ত চিন্তা করে জিনা বলল, ছাউনিতে দুটো ঠেলাগাড়ি আছে আমাদের। একটাতে করেই সব নেয়া যাবে। গাড়িটা আবার জায়গামত রেখে দিয়ে গেলেই হবে।
গাড়ি বের করা হলো। চাকার অতি মৃদু শব্দও ঠিকই কানে গেল। ডারবির, কিন্তু একবার চাপা গলায় গোওও করে. উঠল শুধু। রাফির ভয়ে জোরে চিৎকার করার সাহস পাচ্ছে না। তার গোঙানিটা মিসেস টোডের কানে গেল না। গভীর ঘুমে অচেতন। নাক ডাকছে জোরে জোরে। জানতেই পারল না, নিচে কি চলছে।
নৌকায় মাল বোঝাই করা হলো। গাড়িটা রেখে দেয়া হলো আবার ছাউনিতে। রাত এখনও বাকি। এত জিনিস এভাবে নৌকায় ফেলে সবার চলে যাওয়াটা ঠিক হবে না ভেবে মুসাকে পাহারায় থাকতে বলল কিশোর।
মুসারও আপত্তি নেই। কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়ল নৌকার পাটাতনে।
সব নেয়া হয়েছে তো? প্রয়োজনীয় কিছু নেয়া বাকি আছে কিনা দেখছে কিশোর।
নাহ্, হয়েছে...ওহহো, আসল জিনিসটাই তো ভুলে গেছি, টিন ওপেনার। টিনের মুখ কাটব কি দিয়ে?
রাফির জন্যে একব্যাগ ডগ-বিস্কুটও নিতে হবে, জিনা বলল।
তা নেয়া যাবে। মুসা, চলি। আরামসে ঘুমাও। ভোরেই চলে আসব আমরা।
বাড়ি রওনা হয়ে গেল কিশোররা, সঙ্গে গেল রাফি।

সাগরের পাড়ে বেশ ঠাণ্ডা, শীত লাগে। কম্বল মুড়ি দিয়ে আকাশের তারা গুণতে লাগল মুসা। কখন জড়িয়ে এল চোখ, বলতে পারবে না।

.

হাঁটতে হাঁটতে কিশোর বলল, সকাল আটটায় একটা ট্রেন আছে। রেলওয়ের একটা টাইম-টেবল নিয়ে ডাইনিং টেবিলে খুলে ফেলে রাখব। টোডদের। দেখিয়ে দেখিয়ে চলে যাব স্টেশনের দিকে। তারপর ঘুরে আরেক দিক দিয়ে গিয়ে উঠব নৌকায়।

ওরা ভাববে আমরা রকি বীচে ফিরে গেছি, হেসে বলল রবিন। কল্পনাই করবে না, খাবার-দাবার নিয়ে দ্বীপে চলে গেছি পিকনিক করার জন্যে।

চমৎকার বুদ্ধি, জিনা বলল, এতে খানিকটা দুশ্চিন্তায়ও থাকবে ওরা। পুলিশকে ভয় পায়, ওদের সাহায্য নিতে পারবে না। আব্বাকেও কিছু বোঝাতে পারবে না। বোরতে গেলেই তো নিজেদের শয়তানির কথা ফাঁস। করতে হবে। কিন্তু দশদিনের আগেই যদি আব্বা-আম্মা চলে আসে, জানব কি করে?

তা-ও তো কথা, কিশোর বলল। এখানে এমন কেউ আছে, যাকে বিশ্বাস করে সব কথা বলে যেতে পারো?

একমুহূর্ত ভাবল জিনা। আছে। ফগ। ওই যে, সেই জেলের ছেলেটা, যার কাছে রাফিকে লুকিয়ে রেখেছিলাম…

হ্যাঁ, মনে আছে। তাহলে তাকে বলে যেতে হবে।

বাড়ি ফিরে মায়ের লেখার টেবিলের ড্রয়ার থেকে একটা টাইম-টেবল বের করে আনল জিনা।

কোন ট্রেনটায় যাচ্ছে ওরা, মোটা করে তার নিচে দাগ দিয়ে রাখল কিশোর। বইটা খোলা রেখেই উপুড় করে ফেলে রাখল টেবিলে।

এরপর একটা টিন ওপেনার বের করে পকেটে ভরল কিশোর।

শেষ হয়ে আসছে রাত। ঘুমানোর আর সময় নেই। বসার ঘরেই বসে রইল ওরা।

.

ফর্সা হয়ে এল পুবের আকাশ। সোনালি রোদ এসে পড়ল বাগানে।

এত সকালে কি বেকারি খুলবে, জিনা? জানতে চাইল কিশোর।

ছটা তো বাজে। চলো, গিয়ে দেখি।

দোকান খোলেনি রুটিওয়ালা। সামনের রাস্তায় পায়চারি করছে। ছেলেমেয়েদের চেনে। হেসে জিজ্ঞেস করল, এত সকালে এদিকে? কি ব্যাপার?

রুটি লাগবে, জিনা বলল।

ক'টা?

ছটা। বড় দেখে।

এত রুটি! কি করবে?
খাব, হেসে জবাব দিল জিনা।
অবাক হলেও আর কিছু বলল না রুটিওয়ালা। দিয়ে দিল।
দোকান খুলে সবে ঝাড়পোছ করছে এক মুদী। তার কাছ থেকে একব্যাগ কুকুরের বিস্কুট কিনল জিনা।
জিনিসগুলো নৌকায় রাখতে চলল ওরা।
কম্বল মুড়ি দিয়ে কুঁকড়ি-বুকড়ি হয়ে তখনও ঘুমাচ্ছে মুসা।
ডাক দিল রবিন, এই মুসা, ওঠো। আরামেই আছো দেখি…
আরাম আর কই, হাই তুলতে তুলতে জবাব দিল মুসা, উফ, শীতে মরে গেছি।
কিশোর বলল, এত মালপত্রসহ নৌকাটা এখানে থাকলে লোকের চোখে পড়ে যাবে। জিনা, কি করা যায়? এটাকে লুকাতে হবে।
হাত তুলে একদিক দেখিয়ে জিনা বলল, ওদিকে একটা সরু খালমত আছে, একটা গুহার ভেতরে ঢুকেছে। গুহাটাতে লুকানো যেতে পারে। মুসা, বেয়ে নিয়ে যেতে পারবে?
আশা তো করি।
তাহলে যাও, কিশোর বলল।
খিদে পেয়েছে। কিছু খেয়ে নিলে কেমন হয়?
খিদে পেলে খাবে। খাবারের কি অভাব আছে নাকি? আগে নৌকাটা। এখান থেকে সরাও, তারপর খেয়ো।
তোমরা খাবে না?
পরে এসে। আগে কাজ সেরে নিই।
সবাই মিলে ঠেলে নৌকাটা পানিতে নামাল। দাঁড় তুলে নিল মুসা।
বাড়ি ফিরে এল কিশোররা। পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকল। টোডরা কেউ ঢুকতে দেখল না ওদের।
ওপরতলায় উঠে জোরে জোরে কথা বলতে লাগল, নানা রকম শব্দ শুরু করল, যেন এইমাত্র উঠল ঘুম থেকে। হুড়ুম-ধাড়ুম করে নামল নিচতলায়। বাগানে বেরিয়ে গেটের দিকে এগোল।
রান্নাঘরের জানালার দিকে তাকাল রবিন। নিচু স্বরে বলল, বেঙাচিটা চেয়ে আছে।
থাকুক, কিশোর বলল। দেখুক, আমরা কোনদিকে যাচ্ছি।
গেট খুলে বেরিয়ে এল ওরা।
শান্ত সাগর। এই আবহাওয়ায় রাত থাকতেই মাছ ধরতে বেরিয়ে পড়ে জেলেরা। সুতরাং পরিচিত কোন জেলের সঙ্গে দেখা হওয়ার ভয় নেই। হলোও না। গোবেল

দ্বীপের যে প্রাকৃতিক বন্দরটা আছে, প্রণালী দিয়ে ঢুকতে হয়, নিরাপদেই তাতে নৌকা নিয়ে এল ওরা।
টেনে নৌকাটাকে তুলে আনল সৈকতের অনেক ওপরে। ঢেউয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার ভয়ে। এখানকার সাগরে যখন-তখন ঝড় ওঠে, কোন ঠিকঠিকানা নেই। আর সে ঝড়ও যে-সে ঝড় নয়, ভয়ঙ্কর অবস্থা হয়ে যায় সাগরের।
দাড় টেনে টেনে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে মুসা ও জিনা। মসৃণ সাদা বালিতে হাত-পা ছড়িয়ে প্রায় শুয়েই পড়ল।
শুয়ে পড়লে যে, রবিন বলল।
কি করব? পাথরের টিলায় বসা একটা সীগালের দিকে তাকিয়ে আছে মুসা।
খাওয়া লাগবে না? তোমার তো পেট ভরা, কিন্তু আমরা এখনও নাস্তাই করিনি।
আমিও খাইনি। ভাবলাম, একবারেই খাব।
টিন ওপেনার বের করে খাবারের টিন কাটতে বসল কিশোর।
ঘেউ ঘেউ করে একটা খরগোশকে তাড়া করে গেল রাফি। ধমক দিয়ে তাকে ডেকে ফিরিয়ে আনল জিনা। চুরি
আহ, হাত-পা টানটান করতে করতে বলল কিশোর, মনে হচ্ছে জেলখানা থেকে বেরিয়ে এলাম।
আমারও সে-রকমই লাগছে, রবিন বলল। আসলে, খারাপ মানুষের সঙ্গে বাস করা যায় না।
তাড়াতাড়ি খেয়ে নিতে হবে।
কেন, তাড়াতাড়ি কেন? ভুরু নাচাল মুসা, কি কাজ আছে আমাদের? সময় তো অফুরন্ত।
অনেক কাজ। প্রথমেই রাতে থাকার একটা জায়গা খুঁজে বের করতে হবে। ঝড়বৃষ্টির মধ্যে তো আর বাইরে থাকা যাবে না। সেখানে সরিয়ে রাখতে হবে মালপত্রগুলো। তারপর আমরা ঝাড়া হাত-পা। চুটিয়ে আনন্দ করব তখন।
রুটি, মাখন, ঠাণ্ডা মাংস, টমেটো আর কেক দিয়ে নাস্তা সারল ওরা। তারপর রওনা হলো দুর্গে।
প্রথমবার এসে যেখানে রাত কাটিয়েছিল, সে জায়গাটা এবার আর পছন্দ করতে পারল না কিশোর। দেয়াল আরও অনেকখানি ধসে পড়েছে, ছাত প্রায়। নেই বললেই চলে। এখানে থাকা যাবে না।
জিনা প্রস্তাব দিল, পাতালঘরে থাকলে কেমন হয়?
সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ জানাল মুসা, ওই অন্ধকারে! আমি বাপু এর মধ্যে নেই। ভূতের আড্ডায় কে যায়…

মুসার কথা কানে তুলল না কিশোর, আর কোন জায়গা না পেলে থাকতেই হবে ওখানে। তবে খুব গরম লাগবে।
কথা বলতে বলতে দুর্গটার একধারে পাথরের চত্বরে এসে দাঁড়াল ওরা। এখান থেকে সাগর দেখা যায়।
হাত তুলে জিনা দেখাল, ওই দেখো, আমাদের জাহাজটা।
দেখল তিন গোয়েন্দা। ঝড়ে ভেসে উঠেছিল যেটা। একটা নকশা পেয়েছিল ওরা, খুঁজে বের করেছিল সোনার বার।
পাথরের খাঁজে আটকে রয়েছে জাহাজটা, বড় বড় ঢেউও সরিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি।
এক কাজ করলে কেমন হয়! ওটার দিকে তাকিয়ে চোখ চকচক করে উঠল কিশোরের। ওটাতেই গিয়ে থাকি না কেন? চমৎকার একটা অভিজ্ঞতা হবে..
খাইছে, বলে কি! আঁতকে উঠল মুসা। পোড়ো জাহাজে বাসা! ও তো মেছো ভূতের আড্ডা! জলদস্যুরা মরে গিয়ে সব ভূত হয়ে ওতে বাসা বেঁধেছে।
দেখো মুসা, তোমার এই ভূতের কথা শুনতে শুনতে কান পচে গেছে। আর ভাল্লাগে না। দয়া করে ভূতটুতগুলোকে মাথা থেকে একটু বের করো।...এই, চলো সবাই। দেখে আসি জাহাজটা।
কিছুদূর এগিয়েই থমকে দাঁড়াল জিনা।
কি হলো? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
ওই যে কুয়াটা!
সেদিকে তাকাল তিন গোয়েন্দা। জানে ওরা, এই কুয়া নেমে গেছে অনেক নিচে, সাগর সমতলেরও নিচে, মিষ্টি পানি আছে ওটাতে। লোহার আঙটা বেয়ে নিচে নামা যায়। বেশ কিছুটা নামার পর একটা ফোকর আছে, ওটা দিয়ে ঢোকা যায় পাতালঘরে।
চমকালে কি দেখে? বুঝতে পারছে না মুসা।
দেখছ না, কুয়ার মুখের কাঠের ঢাকনাটা সরানো?
তাতে কি?
কে সরাল? আমি তো সরাইনি। নিশ্চয় কারও পানি খাওয়ার দরকার হয়েছিল!
কত লোক আছে এ কাজ করার ব্যাপারটাকে গুরুত্বই দিল না মুসা। আমরা সোনার বারগুলো খুঁজে পাওয়ার পর তো সাড়া পড়ে গিয়েছিল। বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিল দ্বীপটা। নিশ্চয় লোকে দেখতে এসেছে। তাদেরই কেউ করেছে একাজ।
সেটা তো অনেক আগের কথা, রবিন বলল। জিনা, তারপর কি আর দ্বীপে এসেছ তুমি?
কতবার? সে জন্যেই তো বলছি...আরে, এই ঢাকনাটাও তো সরানো!

কোথায়? এদিক ওদিক তাকাচ্ছে কিশোর। জিনার দৃষ্টি অনুসরণ করে সে-ও দেখে ফেলল। দুর্গের নিচে পাতালঘরে নামার একটা সিঁড়ি আছে, কুয়ার মুখের মতই সিঁড়ির গর্তের মুখটাও ঢাকা থাকে ঢাকনা দিয়ে। সেটা সরানো। অর্ধেক বেরিয়ে আছে গর্তের মুখ।

আমার দ্বীপে আমার অনুমতি ছাড়া নামে কার এতবড় সাহস! জিনিস উলট-পালট করে! ধরতে পারলে…

চিন্তিত ভঙ্গিতে কিশোর বলল, আচ্ছা, সেদিন যে ধোঁয়া দেখলাম, এসব তার জবাব নয় তো?

কৃত্রিম হতাশায় মাথা নাড়ল মুসা, এই তো, শুরু করল গ্রীক ভাষা!

খালি কথা ভুলে যাও, সেজন্যেই তো এত কঠিন লাগে। সেদিন যাকে আমরা স্টীমারের ধোঁয়া ভেবেছি সেটা হয়তো ক্যাম্পফায়ারের ধোঁয়া। দ্বীপে নেমে আগুন জ্বেলেছিল কেউ।

কিশোরের সন্দেহই যে ঠিক, তার আরও প্রমাণ মিলল। একজায়গায় পাওয়া গেল আগুন জ্বালানোর চিহ্ন। রান্না করে খেয়েছে কেউ। একটা সিগারেটের গোড়াও পড়ে আছে। দিন কয়েকের মধ্যে যে কেউ দ্বীপে উঠেছিল, তাতে আর সন্দেহ রইল না কারও।

তবে ব্যাপারটা নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাল না তিন গোয়েন্দা। নির্জন দ্বীপ, যে কেউ উঠতে পারে এখানে, পিকনিক করার জন্যেও আসতে পারে। জিনা তো আর পাহারা দিয়ে রাখে না।

কিন্তু জিনা এত সহজে মেনে নিতে পারল না, ফুসতে লাগল, তাকে না বলে তার দ্বীপে লোকটা উঠেছিল বলে।

ভাটার সময় এখন। পানি নেমে যাওয়ায় মাথা উঁচু করে রয়েছে অসংখ্য পাথর। একটা থেকে আরেকটায় লাফিয়ে লাফিয়ে জাহাজটার কাছে পৌঁছানো যাবে।

তবে কাজটা মোটেও সহজ নয়। ক্রমাগত ভিজে ভিজে, শ্যাওলা জমে পিচ্ছিল হয়ে আছে পাথরগুলো। পা পিছলানোর সম্ভাবনা প্রচুর।

খুব সাবধানে এগোল ওরা। নিরাপদেই এসে পৌঁছল জাহাজের পাশে। দূর থেকে যতটা মনে হয়, কাছে এলে তার চেয়ে অনেক বেশি বড় লাগে ওটা। আগের বার যেমন দেখেছিল, প্রায় তেমনি আছে, খুব একটা বদলায়নি। নিচের দিকটা পানিতে তলিয়ে আছে। শ্যাওলায় ঢাকা। কাঠ আঁকড়ে রয়েছে নানা রকম শামুক-গুগলি। কেমন একটা আঁশটে গন্ধ বেরোচ্ছে জাহাজের গা থেকে। (সঙ্গে করে দড়ি নিয়ে আসা হয়েছে। বার তিনেক চেষ্টা করে জাহাজের ভাঙা মাস্তুলের গোড়ায় দড়ির ফাঁস আটকে ফেলল মুসা। দড়ি বেয়ে উঠে গেল ওপরে।

একে একে উঠে এল অন্য তিনজন। রাফিকে কিনারে রেখে আসা হয়েছে। চুপচাপ থাকতে নির্দেশ দিয়েছে তাকে জিনা। এদিকেই তাকিয়ে চুপ করে বসে আছে সে, আসতে পারেনি বলে মন খারাপ।
আগের চেয়ে করুণ অবস্থা জাহাজটার। ফোকরের সংখ্যা বেড়েছে। গন্ধও যেন আগের চেয়ে অনেক বেশি। হাত নেড়ে রবিন বলল, অসম্ভব! এখানে বাস করা যাবে না। নিচেই নামব না আমি।
জলজ প্রাণী, শ্যাওলা আর কাঠ পচে হয়েছে এই ভয়াবহ গন্ধ। নিঃশ্বাস নিতেই যেন কষ্ট হয়।
কিশোর বলল, এসেছি যখন না দেখে যাব না। তোমার সহ্য না হলে। এখানেই থাকো। আমরা নেমে দেখে আসি।
এখানে যে থাকা যাবে না, বোঝা হয়ে গেছে। তবু পুরানো স্মৃতির আকর্ষণই যেন নিচে টেনে নামাল কিশোরকে। ক্যাপ্টেনের ঘরটা সবচেয়ে। বড়। তবে তাতে ঘুমানো তো দূরের কথা, জিনিসপত্র রাখারও প্রশ্ন ওঠে না। পুরো জায়গাটাই দুর্গন্ধে ভরা, ভেজা ভেজা। কাঠ এত পিচ্ছিল হয়ে আছে কোথাও কোথাও, পা রাখাই মুশকিল।
চলো, যাইগে, মুসা বলল। ইকটুও ভাল লাগছে না।
মই বেয়ে ওপরে উঠছে ওরা, এই সময় কানে এল রবিনের চিৎকার, কিশোর, দেখে যাও, দেখে যাও!
তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে আরেকটু হলেই পিছলে পড়ে হাঁটু ভাঙত মুসা। ডেকে উঠে এল সবার আগে। কি হয়েছে? কি দেখেছ?
চোখ চকচক করছে রবিনের। হাত তুলে দেখাল। আগের বার যখন এসেছিলাম, ওটা ছিল না!
ডেকের একধারে একটা লকার, হাঁ হয়ে খুলে আছে। তার মধ্যে একটা কালো ট্রাংক।
তাই তো? রবিনের মতই অবাক হয়েছে কিশোর। আগের বার তো, এটা ছিল না! একেবারে নতুন জিনিস! কে রেখে গেল? কি আছে এর মধ্যে?
ডেকও পিচ্ছিল। সাবধানে লকারটার দিকে এগোল ওরা। দরজাটা বন্ধই থাকার কথা, কিন্তু বাতাসেই হোক, কিংবা ঢেউয়ের দোলায়ই হোক, খুলে গেছে।
ট্রাংকটা ছোট। বের করে আনল কিশোর।
ওখানে এই জিনিস রাখতে গেল কে? মুসার প্রশ্ন। চোর-ডাকাত নয় তো? স্মাগলার?
হতে পারে, ট্রাংকটার দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। চোরাই মাল লুকানোর দারুণ জায়গা এই জাহাজ। কেউ আসে না এখানে। হঠাৎ করে দেখে ফেলারও

ভয় নেই।
যদিও আমরা দেখে ফেললাম, জিনা বলল।
আমাদের মত তো আর ছোঁক ছোঁক করে না কেউ, মুসা বলল।
কি আছে ভেতরে? ঝুঁকে ট্রাংকটার দিকে তাকিয়ে আছে রবিন। এই কিশোর, কোকেন-টোকেন নয় তো? স্মাগল করে এখানে এনে লুকিয়ে রেখেছে।
দুটো নতুন তালা লাগানো রয়েছে। চাবি ছাড়া খোলা যাবে না।
ভেঙে ফেললেই হয়, জিনা বলল।
না। এটার কথা যে আর গোপন নেই, তালা ভাঙা দেখলেই বুঝে যাবে। চোরই হোক, আর চোরাচালানিই হোক, তাকে বুঝতে দেব না যে আমরা দেখে ফেলেছি। ধরার ইচ্ছে?
নয় কেন? নিজেকেই যেন বোঝাচ্ছে কিশোর, আমরা যে দ্বীপে উঠেছি, কেউ জানে না। লুকিয়ে থেকে চোখ রাখব। কোনও বোট আসে কিনা দেখব।
মন্দ হয় না, মুসা বলল। একটা কাজ পেয়ে গেলাম। একঘেয়ে লাগবে আর এখানে
এমনিতেও লাগত না, বাধা দিয়ে বলল জিনা।
এখন আরও বেশি লাগবে না।
সাগরের দিকে চোখ পড়তেই বলে উঠল কিশোর, জোয়ার আসছে! জলদি নেমে যাওয়া দরকার।
ট্রাংকটা আবার আগের জায়গায় রেখে দিল সে।
সমস্যা কিন্তু একটা হবে, রবিন বলল। দড়িটা রেখে যেতে হবে আমাদের। লোকটা এসে এই দড়ি দেখলেই তো বুঝে যাবে, কেউ উঠেছিল।
ভাল কথা মনে করেছ! ঘুরে তার দিকে তাকাল কিশোর, কি করা যায়?
সমাধান করে দিল মুসা, তোমরা নেমে যাও। দড়িটা খুলে নিয়ে লাফিয়ে নেমে পড়ব আমি।
না না, পা ভাঙবে।
ভুলে যাচ্ছ কেন, আমি মুসা আমান। টারজানের চেয়ে কম যাই কিসে? নামো তোমরা।
আর কিসে কম যাও বলতে পারব না, তবে খাওয়ার ব্যাপারে যে যাও না, গলাবাজি করে বলতে পারব, হেসে বলল রবিন।
অন্যেরাও হাসল।
টারজানের চেয়ে কম যে যায় না, প্রমাণ করে ছেড়ে দিল মুসা। সবাই নেমে যেতেই মাস্তুলের গোড়া থেকে দড়িটা খুলে নিল। সেটা কিশোরের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে জাহাজের কিনার ধরে ঝুলে পড়ল। নিচে ওখানটায় পাথর আছে কিনা দেখে

নিয়েছে আগেই। আলগোছে ছেড়ে দিল হাতটা। ঝপ করে পড়ল পানিতে। পানি ওখানে নেহায়েত কম নয়, পাথরও নেই, কিছুই হলো না ওর।
এবারও নিরাপদেই কিনারে ফিরে এল সবাই। পিছলে পড়ে কোন দুর্ঘটনা ঘটাল না।
এতক্ষণ একা বসে থেকে অস্থির হয়ে পড়েছিল বেচারা রাফি। আনন্দে হাত চেটে দিতে লাগল সবার।
কিশোর বলল, জাহাজে তো জায়গা হলো না, রাতে থাকি কোথায় বলো তো? জিনা, তোমার কোন জায়গা জানা আছে? গুহাটুহা হলে ভাল হত,..
আছে! তুড়ি বাজাল জিনা। উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে চেহারা। এসো আমার সঙ্গে।
.
একটা পাহাড়ের কাছে ওদেরকে নিয়ে এল জিনা। ঢালে ঝোপঝাড় যেমন ঘন, পাথরেরও ছড়াছড়ি। হাত তুলে দেখাল, ওই যে।
কিছুই দেখতে পেল না তিন গোয়েন্দা।
রবিন জিজ্ঞেস করল, কই?
ওই তো। চলো, আরও কাছে, তাহলেই দেখবে।
ঝোপঝাড় আর লতায় প্রায় ঢাকা পড়ে আছে গুহামুখটা। এখানে আছে ওটা জানা না থাকলে চোখেই পড়ে না।
আগে আগে ঢুকল জিনা। পেছনে অন্যেরা।
খাইছে! ঢুকেই বলে উঠল মুসা, দারুণ তো!
গুহার ভেতরটা আসলেও সুন্দর। সাদা পাউডারের মত মিহি, শুকনো বালিতে ঢাকা মেঝে। সমুদ্র সমতল থেকে অনেক ওপরে, সাংঘাতিক জলোচ্ছাসের সময়ও এখানে পানি ঢোকে কিনা সন্দেহ। একধারের দেয়ালে একটা তাকমত রয়েছে।
বাহ, খুশি হয়ে বলল রবিন, এক্কেবারে যেন আমাদের জন্যে বানিয়ে রাখা হয়েছে। জিনিসপত্র রাখতে পারব ওটাতে। কিশোর, ওই দেখো, স্কাইলাইটও আছে।
গুহাটা অনেক বড়। ছাতের একধারে একটা ফোকর। আলো আসছে সে পথে। ফোকর দিয়ে বৃষ্টির পানি গুহায় ঢোকে, তবে সরাসরি মেঝেতে না পরে দেয়াল বেয়ে গড়িয়ে চলে যায় একটা গর্তের দিকে। দীর্ঘদিন পানি পড়ে পড়েই বোধহয় তৈরি হয়েছে গর্তটা। নিশ্চয় নালাও আছে পাহাড়ের ভেতরে।
কিশোর বলল, নৌকা থেকে আমাদের জিনিসগুলো এনে দড়িতে বেধে ওখান দিয়ে নামিয়ে দেয়াটা সহজ হবে, বার বার পাহাড়ের খাড়া দেয়াল। বাইতে হবে না আর। যে দিক দিয়ে ঢুকেছে সে পথটা দেখিয়ে বলল, সৈকত থেকে এ পথ দিয়ে আসা কঠিন।

গুহা থেকে বেরিয়ে প্রায় খাড়া দেয়াল বেয়ে পাহাড়ে চড়তে শুরু করল। ওরা। প্রথম কাজ, বাইরে থেকে স্কাইলাইটের ফোকরটা খুঁজে বের করা।
ঢাল বেয়ে উঠতে সবচেয়ে অসুবিধে হলো রাফির। মানুষের মত হাত নেই তার, ঝোপ কিংবা লতা ধরে যে পতন ঠেকাবে, সে উপায়ও নেই। হড়হড় করে পিছলে পড়ে যেতে চায়। হাস্যকর ভঙ্গিতে শরীরটাকে বাকিয়ে নখ দিয়ে মাটি খামচে ধরে উঠতে লাগল সে।
ওপরে উঠে এল ওরা। ফোকরটা কোনখানে, মোটামুটি আন্দাজ থাকায় খুঁজে বের করা কঠিন হলো না। জানা না থাকলে গুহামুখের মতই এটাও সহজে দেখতে পেত না। এক ধরনের কাঁটাঝোপে ঢেকে রেখেছে।
কাঁটাডাল সরিয়ে নিচে উঁকি দিল কিশোর। ফোকরটা একটা সুড়ঙ্গমুখ। মাত্র কয়েক ফুট লম্বা সুড়ঙ্গ, ওপর থেকে মোটা একটা পাইপের মত নেমে গেছে ঢালু হয়ে। গুহার ছাতে গিয়ে শেষ হয়েছে। দেখেটেখে মাথা দুলিয়ে বলল, হুঁ, বেশি নিচে না। কিন্তু বিপজ্জনক। না দেখে এই গর্তে পা দিলে নিচে পড়ে হাত-পা ভাঙতে পারে।
সবাই মিলে গর্তের মুখের কাছের ঝোপ আর লতা পরিষ্কার করে ফেলল। কাঁটার আঁচড় লাগল হাতে।
নিচের দিকে তাকিয়ে মুসা বলল, দড়ি ছাড়াও কিন্তু লাফিয়ে নামা যায়।
দরকারটা কি ঝুঁকি নেয়ার, কিশোর বলল। চলো, মালগুলো নিয়ে আসি।
সৈকতে চলে এল ওরা। যে যতটা পারল, জিনিসপত্র হাতে তুলে নিল। নিয়ে এল ফোকরের কাছে। সেগুলো রেখে আরও মাল আনতে ফিরে গেল। এভাবে কয়েকবারে সমস্ত মাল এনে জমা করল একজায়গায়। এইবার নিচে নামানোর পালা।
লম্বা একটা দড়িতে এক ফুট পর পর গিট দিল কিশোর। দড়ির একমাথা বাধল একটা বড় ঝোপের গোড়ায়। গাছটার শেকড় অনেক গভীরে, ভার রাখতে পারবে। দড়ি বেয়ে নেমে যেতে বলল জিনা আর রবিনকে। ওপর থেকে সে আর মুসা দড়িতে মাল বেধে নামিয়ে দেবে, নিচে থেকে ওরা দু জনে খুলে নেবে। তারপর আবার মাল পাঠানো হবে।
নেমে গেল রবিন ও জিনা। দড়িতে গিট থাকায় সুবিধে হলো, হাত পিছলে গেল না।
মাল নামানোটা আরও সহজ কাজ।
সমস্যা হলো রাফিকে নিয়ে।
মুসা জিজ্ঞেস করল, ওকে নামাব কি ভাবে?
বেঁধে নামাতে হবে, আর তো কোন উপায় দেখি না।

তবে সমস্যার সমাধান রাফি নিজেই করে দিল। হঠাৎ ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল একটা খরগোশ। কুকুরটাকে দেখে ভয় পেয়ে বিরাট লাফ দিয়ে ফোকর পেরিয়ে চলে গেল অন্যপাশে।
তাড়া করল রাফি। উত্তেজিত না হলে, সাবধান থাকলে সে-ও ফোকরটা পেরিয়ে যেতে পারত, কিন্তু তাড়াহুড়োয় কোন কিছু খেয়াল না করে লাফ দিয়ে বসল, পড়ল একেবারে ফোকরে। নিমেষে ঢালু সুড়ঙ্গ গলে পিছলে নেমে গেল নিচে। ধপ করে পড়ল মেঝেতে।
ওপর থেকে জিনার তীক্ষ্ণ চিৎকার শুনতে পেল মুসা আর কিশোর।
রাফির কিছু হয়েছে কিনা দেখার জন্যে তাড়াতাড়ি দড়ি বেয়ে নেমে গেল মুসা।
তার পেছনেই নামল কিশোর।
রাফির কিছু হয়নি দেখে হাঁপ ছাড়ল। মিহি নরম বালি বাঁচিয়ে দিয়েছে কুকুরটাকে। হাড়টাড় ভাঙেনি।
প্রচুর পরিশ্রম করেছে। খিদে পেয়েছে সবারই। খাবারের টিন খুলে খেতে বসে গেল ওরা।
পেট কিছুটা শান্ত হয়ে এলে কিশোর বলল, কাজ কিন্তু আরও আছে। বিছানার জন্যে লতাপাতা জোগাড় করে আনতে হবে।
মুসা বলল, কি দরকার কষ্ট করার। যা মিহি আর নরম বালি, এর ওপরই কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়ব।
সন্ধ্যা হয়ে আসছে। সবাই ক্লান্ত। গুহা থেকে এখন আর বেরোতে ইচ্ছে করল না কারও।
মোম জ্বালল রবিন। গুহার দেয়ালে ছায়ার নাচন। কেমন রহস্যময় হয়ে উঠল গুহার পরিবেশ।
আরও কিছুক্ষণ জেগে রইল ওরা। কম্বলের বিছানায় শুয়ে শুয়ে গল্পগুজব করল। ঘুমে কখন জড়িয়ে এল চোখ, বলতে পারবে না।
গলে গলে শেষ হলো মোম, নিভে গেল আলো; কেউ দেখল না সেটা একমাত্র রাফি ছাড়া...।

.

পরের দিনটাও যেন ফুড়ুৎ করে উড়ে গেল। হেসেখেলে, সাঁতার কেটে, আর দ্বীপে ঘুরে বেড়িয়ে কাটিয়ে দিল ওরা। সঙ্গে খাবার নিয়ে বেরিয়েছিল, ফলে আর একবারও গুহায় ঢোকার প্রয়োজন বোধ করেনি। ঢুকল একেবারে সন্ধ্যাবেলায়। মোম জ্বেলে খাওয়া সারল।
দেয়ালে ছায়া নাচছে। সেদিকে তাকিয়ে গায়ে কাঁটা দিল মুসার। বলল, আগুন জ্বলতে পারলে ভাল হত। আলো আরও বেশি পেতাম...

হেসে ফেলল রবিন, ভুতের ভয় পাচ্ছ তো? আগুনে আলো বেশি পাবে বটে, কিন্তু গরম হয়ে যাবে গুহার ভেতর। ধোঁয়ায় যাবে দম আটকে। বেরোনোর তো পথ নেই।
আছে, ওপর দিকে আঙুল তুলল মুসা। ফোকরটা চিমনির কাজ করবে।
তা করবে, কিশোর বলল, কিন্তু বাইরে থেকে ধোঁয়া দেখা যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। স্মাগলারদের চোখে পড়ে যেতে পারে। ভুলে যাচ্ছ কেন, আমরা এখানে লুকিয়ে আছি। এমন কিছু করা চলবে না, যাতে ওদের চোখে পড়ে যাই।
আগুন জ্বালানো আর হলো না। আগের দিনের মতই গল্প করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ল ওরা। জেগে রইল কেবল রাফি। কান খাড়া।
হঠাৎ গরগর করে উঠল।
ঘুম ভেঙে গেল পাশে শোয়া জিনার। ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, রাফি, কি হয়েছে?
রবিনও জেগে গেছে। মুসা আর কিশোর অনেকটা দূরে, তাই রাফির চাপা গরগর ওদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাতে পারেনি।
নিচু স্বরে রবিন বলল, মনে হয় স্মাগলাররা এসেছে!
চলো, দেখি!
চলো।
দড়িটা বাঁধাই আছে, ঝুলে আছে ফোকর থেকে। সেটা বেয়ে প্রথমে উঠে এল রবিন। সাবধানে মাথা বের করল ফোকরের বাইরে। শরীরটা বের করার আগে উঁকি দিয়ে দেখে নিল কিছু আছে কিনা।
রাফিকে চুপ থাকার নির্দেশ দিয়ে তার পেছনে উঠল জিনা।
সাগরের দিকে তাকাল ওরা। কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার রাত। চাঁদ ওঠেনি এখনও। কোন জাহাজ চোখে পড়ল না। এমন কি ভাঙা জাহাজটাও না।
চাঁদ থাকলে ভাল হত, রবিন বলল।
নেই যখন, কি আর করা।
হঠাৎ রবিনের চোখে পড়ল আলোটা। দেখেছ!
হ্যাঁ। উত্তেজিত হয়ে বলল জিনা, ভাঙা জাহাজটার কাছ থেকে আসছে! কেউ উঠেছে ওটাতে! হ্যারিকেনের আলো!
স্মাগলারই! আরও মাল এনে লুকাচ্ছে।
কিংবা ট্রাংকটা নিতে এসেছে।...দেখো, নড়ছে আলোটা। নৌকা নিয়ে এসেছে ওরা। জাহাজের গায়ে বেঁধে রেখে উঠেছে।
যতটা সম্ভব কান খাড়া করে রেখেছে দু-জনে, শব্দ শোনার আশায়। কিছুই শুনল না। জাহাজটা অনেক দূরে।

কয়েক মিনিট পর নিভে গেল আলো।
দাঁড়ের শব্দ শোনার অপেক্ষায় রইল ওরা। কিন্তু ঢেউয়ের একটানা শব্দের জন্যে আর কিছুই কানে ঢুকল না।
আরও মিনিট পনেরো অপেক্ষা করে নেমে চলে এল ওরা। কিশোর আর মুসা ঘুমিয়েই আছে। খবরটা ওরা জানল পরদিন সকালে।
আমাদের ডাকলে না কেন? অনুযোগের সুরে বলল মুসা।
তেমন কিছু তো আর দেখিনি, জিনা বলল, শুধু হ্যারিকেনের আলো। এটা দেখানোর জন্যে আর কি ডাকব। ভাবলাম, ঘুমিয়ে আছ, থাকো।
তারমানেই মানুষ, নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার কিশোর। খেয়ে নাও। দেখতে যাব।
ভাটার সময় জাহাজটা দেখতে চলল ওরা। আগের বারের মতই পিচ্ছিল পাথর টপকে টপকে এসে দাঁড়াল জাহাজের ধারে। দড়ির সাহায্যে ডেকে উঠল।
লকারের দরজাটা বাতাসে আপনাআপনি খুলে যায় বলে ফাঁকে একটা কাঠের গোজ ঢুকিয়ে দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে।
গোঁজটা খুলে নিল কিশোর। দরজা খুলতে অসুবিধে হলো না।
পিচ্ছিল ডেকের ওপর সাবধানে পা ফেলে এগোতে এগোতে জিজ্ঞেস করল জিনা, ট্রাংকটা আছে?
আছে। অবাক কাণ্ড! আরও কি সব রেখে গেছে, দেখো! খাবারের টিন, কাপ, প্লেট, মোমবাতি, হ্যারিকেন, কম্বল, আমাদের মতই যেন দ্বীপে বাস করতে এসেছে কেউ! বার দুই ঘন ঘন নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। নিশ্চয় কেউ থাকতে এসেছে। চোরাই মাল আসার অপেক্ষায় থাকবে বোধহয়। দিন-রাত নজর রাখতে হবে আমাদের।
উত্তেজিত হয়ে জাহাজ থেকে নেমে এল ওরা। লুকিয়ে থেকে বাস করার চমৎকার একটা জায়গা পেয়ে গেছে বলে খুশি। এখানে থাকলে ওরা কারও চোখে পড়বে না, কিন্তু কেউ এলে ওদের চোখে ঠিকই পড়বে।
নৌকাটা লুকিয়ে ফেলতে হবে! হঠাৎ বলে উঠল জিনা। ও পথে ঢোকার সম্ভাবনাই বেশি। জাহাজটার এদিক দিয়ে ঢোকা ডেঞ্জারাস। বোকা না হলে এদিক দিয়ে দ্বীপে ওঠার কথা ভাববে না কেউ।
ভাববে, দক্ষ নাবিক হলে, চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। সামান্য একটু সরে গেলেই নৌকা ভেড়াতে পারবে।
কিন্তু ঝুঁকি নেয়ার দরকার কি? মুসা বলল, নৌকাটা লুকিয়ে ফেলাই ভাল। চলো, এক্ষুণি।
কিন্তু লুকাব কোথায়? রবিনের প্রশ্ন, এতবড় একটা নৌকা?

জানি না, চিন্তায় পড়ে গেছে কিশোর। চলো আগে, যাই।–এখানে বসে কিছু বোঝা যাবে না।
দল বেধে সৈকতে চলে এল ওরা। সাগর থেকে এসে প্রণালীটা যেখানে খাঁড়িতে ঢুকেছে, তার একধারে পাহাড়ের গায়ে একটা ছোট গুহা আছে। সব সময় পানি থাকে। সেটা দেখিয়ে জিনা বলল, এর মধ্যে লুকানো যেতে পারে। ভেতরে অনেক বড় একটা পাথরের চাঙড় আছে। তার ওপাশে রাখলে সহজে চোখে পড়বে না। তবে ঝড় এলে, পানি ফেপে উঠলে আছাড় মেরে চুরমার করে দিতে পারে নৌকাটা।
ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে লাগল সবাই। কিন্তু আর কোন উপায়ই দেখল
শেষে ওই গুহাতেই নৌকা ঢোকানো হলো। চাঙড়ের ওপাশে নেয়ার পরও পুরোটা আড়াল হলো না নৌকার। উজ্জ্বল লাল রঙের জন্যে হয়েছে বিপদ। তবে এই সমস্যারও সমাধান হলো। ডুব দিয়ে দিয়ে জলজ আগাছা আর শ্যাওলা তুলে ঢেকে দিল জিনা আর মুসা।
গুড। এপাশ থেকে ওপাশ থেকে দেখে মাথা ঝাঁকাল কিশোর, দেখা যায় না। চলো, চায়ের সময় হয়েছে। গুহা থেকে বেরিয়ে আসার পর বলল, একটা বোকামি কিন্তু করে ফেলেছি। পাহারা দেয়ার জন্যে একজনকে পাহাড়ের চুড়ায় বসে থাকা উচিত ছিল।
তাই তো! একমত হয়ে বলল রবিন, বোকামিই হয়ে গেছে। কি আর, করা। তবে আমার মনে হয় না দিনে কেউ উঠবে। স্মাগলাররা এলে আসবে রাতের বেলা।
নিজেদের আস্তানায় ফিরে চলল, ওরা।
কিছুদূর এসে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল রাফি। গরগর শুরু করল।
দুর্গের দিকে এগোচ্ছিল ওরা, ওখান দিয়ে ঘুরে এসে ফোকর দিয়ে গুহায় নামার ইচ্ছে ছিল। এই সময় হুঁশিয়ার করল রাফি।
কিশোরের নির্দেশে তাড়াতাড়ি একটা ঝোপে ঢুকে পড়ল ওরা। রাফিকে চুপ থাকতে বলল জিনা।
আস্তে ডাল সরিয়ে ফাঁক করে উঁকি দিল কিশোর। কাঁটার খোঁচা লাগল। কিন্তু উত্তেজনায় খেয়ালই করল না সেটা। চত্বরে মানুষ দেখতে পেয়েছে। সে–তাকাতে না তাকাতেই অদৃশ্য হয়ে গেল লোকগুলো।
জিনাও দেখতে পেয়েছে। ফিসফিস করে বলল, কিশোর, পাতালঘরে চলে গেল না তো?
মনে হয়। ঢাকনা ওরাই সরিয়েছে। চোরাই মাল জমা করে রেখেছে হয়তো নিচে। মানুষ লুকিয়ে থাকতেও অসুবিধে নেই। চোর-ডাকাতের জন্যে স্বর্গ। ভাবল একমুহূর্ত। এখান থেকে ভালমত দেখতে পারব না। চলো, গুহায়। নিচের মুখটা

দিয়ে ঢুকব। তারপর একজন উঠে বসে থাকব ফোকরের কাছে। দেখব, ব্যাটারা কি করে।রাফি, একদম চুপ, একটা শব্দ করবি না!
ওপর দিয়ে আর গেল না ওরা। নিচে নেমে দ্বীপের কিনার ঘুরে চলে এল গুহামুখের কাছে। ভাল করে তাকাল একবার আশপাশে। কেউ নেই। দেখছে না ওদেরকে। তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়ল ভেতরে।
ঢুকেই রবিনকে পাঠিয়ে দেয়া হলো নজর রাখার জন্যে।
দড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এল রবিন। ফোকর দিয়ে মাথা বের করে তাকিয়ে রইল দুর্গের দিকে। ঝোপের ডাল তার মাথা আড়াল করে রেখেছে, ওদিক থেকে কেউ দেখতে পাবে না।
নিচে হঠাৎ এক কাণ্ড করে বসল রাফি। ঘেউ ঘেউ করে দু-বার ডাক দিয়েই বেরিয়ে গেল গুহা থেকে। তাকে আটকানোর চেষ্টা করেও পারল না। জিনা।
গুহামুখের কাছে এলে ডাকল সে, রাফি! কোথায় গেলি তুই! এই রাফি?
সাড়া দিল না কুকুরটা।
একটু পরেই তাকে দেখতে পেল রবিন। এক ঝোপ থেকে বেরিয়ে দৌড়ে গিয়ে আরেক ঝোপে ঢুকল রাফি। যেন শিকারের সন্ধান পেয়েছে। চিতাবাঘ, ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছে এখন।
কিসের সন্ধান পেয়েছে সেটা জানতে ও দেরি হলো না। চত্বরের দিক থেকে ল্যাগব্যাগ করতে করতে বেরিয়ে এল একটা ছোট্ট কুকুর। চোখের পলকে ঝোপ থেকে বেরিয়ে গিয়ে ওটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল রাফি।
এমন চিৎকার জুড়ে দিল ছোট কুকুরটা, যেন খুন করে ফেলা হচ্ছে। তাকে। কউউ উউ করে যেন চেঁচিয়ে বলছে, বাবাগো! মেরে ফেললগো! বাঁচাওগো!
শঙ্কিত হলো রবিন। সর্বনাশ করে দিল রাফি। চেঁচামেচি শুনে এখন বেরিয়ে আসবে স্মাগলাররা। রাফিকে সরে আসার জন্যে ডাক দিতে গেল
কিন্তু মুখ খোলার আগেই যারা বেরিয়ে এল, তাদের দেখবে কল্পনাই করেনি সে। টোড পরিবার–মা, বাবা, ছেলে, তিনজনেই আছে। ও, এ কারণেই কুত্তাটাকে চেনা চেনা লাগছিল!
ঝট করে ফোকরে মাথা নামিয়ে ফেলল রবিন। তার ধারণা, নিশ্চয় কোনভাবে টোডরা জেনে গেছে ওরা দ্বীপে পালিয়ে এসেছে। ধরে নিতে এসেছে এখন। খবরটা বন্ধুদের জানানোর জন্যে তাড়াতাড়ি নেমে এল নিচে।
কুকুরের ঝগড়া গুহার ভেতর থেকেও শোনা যাচ্ছে। রবিন বলল, জিনা, রাফিকে জলদি ডাকো! ডারবির সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়েছে।
অবাক হলেও প্রশ্ন করল না জিনা। আগে রাফিকে ডেকে আনা দরকার। দুই আঙুল মুখে পুরে তীক্ষ্ণ শিস দিল। ডাকটা শুনতে পেল রাফি। এই আদেশ না

মানার অর্থ তার জানা আছে। ভীষণ রাগ করবে জিনা। পিটুনিও লাগাতে পারে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ডারবির কান কাঁটা স্থগিত রেখে ফিরে আসতে হলো তাকে। প্রথমবার যে ভাবে ঢুকেছিল, সে ভাবেই ফোকর গলে ধপ করে এসে পড়ল গুহার মেঝেতে। আরেকটু হলেই পড়েছিল মুসার মাথায়।
রাফির পিছু পিছু ছুটে এসেছে টেরি। হঠাৎ দেখল, কুকুরটা নেই। চোখের সামনে হাওয়া। একেবারে ভোজবাজি! চোখ ডলল। বিশ্বাস করতে পারছে না।
তার কাছে এসে দাঁড়াল তার বাবা-মা।
মিসেস টোড জিজ্ঞেস করল, কুত্তাটা গেল কোথায়? দেখতে কেমন?
মা, বললে বিশ্বাস করবে না, টেরি বলল, কুত্তাটা দেখতে ঠিক জিনার শয়তান কুত্তাটার মত!
গুহায় বসে তাদের কথা স্পষ্ট শুনতে পেল গোয়েন্দারা। ফিসফিস করে রাফিকে সতর্ক করল জিনা, শব্দ না করার জন্যে।
তা কি করে হয়! মিসেস টোড বলছে, ওরা তো গেছে রকি বীচে। কুত্তাটাকেও নিয়ে গেছে। নিজের চোখেই তো দেখলাম স্টেশনের দিকে যেতে। নিশ্চয় এটা অন্য কুত্তা। কেউ ফেলে গেছে।
তা তো বুঝলাম, শোনা গেল টোডের খসখসে কণ্ঠ, কিন্তু গেল কোথায়?
মাটিতে তলিয়ে গেছে! জবাব দিল টেরি।
তোর মাথা! ধমকে উঠল টোড। গাধা যে গাধাই রয়ে গেছে! মাটিতে তলায় কি করে! তুই তলাতে পারবি? মাটি কি পানি? এক হতে পারে, চুড়া থেকে নিচে পড়ে যেতে পারে। পড়লে মরবে। না মরলেও হাড্ডিগুড্ডি ভাঙবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।
চূড়ার কাছে গর্তটর্তও থাকতে পারে, মিসেস টোড বলল। হয়তো তাতে লুকিয়েছে। এসো না, দেখি।
নিথর হয়ে বসে রইল গোয়েন্দারা। রাফির কলার চেপে ধরে রাখল জিনা। ঝোপঝাড়ের ডালপাতা সরানোর শব্দ কানে আসছে। সেই সঙ্গে কাঁটার আঁচড় খেয়ে উহ-আহ। ফোকরের মুখের কাছ থেকে দূরে রইল ওরা। বলা যায় না, যে কোন মুহূর্তে না জেনে গর্তে পা দিয়ে বসতে পারে কোন টোড, গুহায় এসে পড়তে পারে।
কিন্তু কাঁটার জন্যেই বোধহয়, গর্তটার বেশি কাছে এল না ওরা। ফলে দেখতেও পেল না।
মিসেস টোডের কথা শোনা গেল, টেরি, সত্যি ওই কুত্তাটাকেই দেখেছিস তো? তোর তো আবার কথার কোন ঠিকঠিকানা নেই।
খোদার কসম, মা, ওটার মতই লাগল!

হুঁ! বাড়ি থেকে পালিয়ে এখানেই এসে লুকিয়েছে হয়তো বিচ্ছুগুলো। আমাদের বুঝিয়েছে, ট্রেনে করে চলে গেছে। এখানে এসে থাকলে আমাদের কাজ সব গড়বড় করে দেবে। নৌকা ছাড়া তো আসতে পারবে না, সেটা কোথায় আছে বের করা দরকার।
অত অস্থির হওয়ার কিছু নেই, টোড বলল। এসে থাকলে খুঁজে পাবই। এত ছোট দ্বীপে লুকানোর জায়গা কম। বিশেষ করে নৌকাটা পেয়েই যাব।
এখন খুঁজতে অসুবিধে কি?
অসুবিধে নেই। টেরি, তুই ওদিক দিয়ে ঘুরে যা। ডোরিয়া, তুমি দুর্গের দিকে যাও। আমি এদিকটায় খুঁজছি।
গুহার মধ্যে গা ঘেষাঘেঁষি করে বসে রইল ছেলেমেয়েরা, যেন এভাবে থাকলেই আর খুঁজে পাবে না ওদেরকে। আল্লাহ আল্লাহ করছে, যাতে নৌকাটা চোখে পড়ে না যায়।
তিন গোয়েন্দা, জিনা, রাফি; এদের কারও সামনেই পড়তে চায় না। টেরি। ভয়ে ভয়ে এগোল। চলে এল ছোট্ট সৈকতে। বালিতে নৌকার দাগ দেখতে পেল বটে, কিন্তু চিনতে পারল না। জোয়ারের সময় পানি এসে অনেকখানিই মুছে দিয়ে গেছে দাগ। পানি ঢুকে থাকা ছোট গুহাটার দিকে তাকাল ভয়ে ভয়ে। একবার এগোয় একবার পিছোয়, এরকম করতে করতে শেষমেষ এসে উঁকি দিল ভেতরে। অন্ধকার। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল তার। ভেতরে ঢোকার আর সাহস করতে পারল না। ভাবল, কাজ কি বাবা ঢুকে! কোন জলদানব লুকিয়ে আছে এখানে কে জানে! ফিরে এল তার বাবা যেখানে খোঁজাখুজি করছে সেখানে।
ওদিকটায় কিছু নেই, জানাল টেরি।
তার মা-ও সন্দেহজনক কিছু খুঁজে পেল না, ফিরে এল।
টোডও কিছু না পেয়ে বলল, না, ওই ছেলেমেয়েগুলো নয়। তাহলে নৌকা থাকতই। ওটা অন্য কুত্তা। কেউ ফেলে গেছে এখানে। আস্তে আস্তে বুনো হয়ে উঠেছে। সে জন্যেই কামড়াতে এসেছে ডারবিকে।
তাহলে তো ভয়ের কথা, মিসেস টোড বলল। আবারও আসতে পারে। আমাদেরকেই যে কামড়ে দেবে না তার ঠিক কি?
সাবধান থাকতে হবে। দেখলেই গুলি করে মারব এবার।
হাঁপ ছাড়ল গোয়েন্দারা। যাক, আপাতত ফাড়া কাটল। ফোকরটা দেখতে পায়নি কানাগুলো। নৌকাটাও না। তবে রাফির জন্যে শঙ্কিত হয়ে উঠল জিনা। তার বাড়ি থেকে পালিয়ে আসার একটা বড় কারণ, টোডেরা বিষ খাইয়ে রাফিকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। কিন্তু এখানে এসেও নিশ্চিত হওয়া গেল না। সেই মেরে ফেলার ভয়। এখন বলছে, গুলি করে মারবে!

কথা বলতে বলতে সরে গেল টোডেরা। শেকল দিয়ে রাফিকে বেঁধে ফেলল জিনা। গুহা থেকেই বেরোতে দেবে না আর। ডারবির গন্ধ পেলেই ও খেপে যায়, এ এক অদ্ভুত কাণ্ড! সাধারণত এমন করে না রাফি। অন্য কুকুর দেখলে বরং বন্ধুতই করতে যায়।
খিদে পেয়েছে। টিন খুলে খাবার বের করতে লাগল রবিন। তাকে সাহায্য করল মুসা।
কিশোর বলল, একটা ব্যাপার পরিষ্কার, আমাদের খোঁজে আসেনি ওরা। ট্রেনে করে রকি বীচে চলে গেছি, এটাই বিশ্বাস করেছে।
তাহলে কেন এল? মুসার প্রশ্ন।
সেটাই তো বুঝতে পারছি না।
আমরা পালিয়েছি বলেই হয়তো ওরাও ভয়ে পালিয়েছে, আনারসের টিন খুলে রেখে মাংসের টিন টেনে নিল রবিন। পারকার আংকেলকে কি জবাব দেবে?
জবাব তো সহজ। বলবে, আমরা বাড়ি ফিরে গেছি। আংকেলও কিছু সন্দেহ করবেন না। তিনিই তো আমাদের চলে যেতে বলেছেন।
ভয়ে পালিয়েছে, না মরতে এসেছে, ওসব জানার দরকার নেই আমার। ফুঁসে উঠল জিনা, এটা আমার দ্বীপ! এখানে আসার কোন অধিকার নেই ওদের! চলো, ঘাড় ধরে গিয়ে বের করে দিয়ে আসি!
উঁহু, মাথা নাড়ল কিশোর, ওদের সামনে যাওয়া যাবে না। আমাদের দেখলেই এখন গিয়ে বলে দেবে আংকেলকে। আংকেলেরও বিশ্বাস নেই। রেগেমেগে এসে হাজির হতে পারেন, আমাদের কান ধরে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্যে। টিন থেকে চামচ দিয়ে আনারসের একটা টুকরো বের করে মুখে পুরল সে। চিবিয়ে গিলে নিয়ে বলল, তাছাড়া, আরও একটা কারণে ওদের সামনে যাব না এখন আমরা।
কি কারণ? গলা বাড়াল মুসা।
অন্য দু-জনও আগ্রহ নিয়ে তাকাল।
কেন, সন্দেহটা ঢোকেনি তোমাদের মাথায়? কিশোর বলল, টোডরাও হয়তো স্মাগলিঙে জড়িত। ওরা এখানে আসে স্মাগলারদের রেখে যাওয়া মাল সরিয়ে নিয়ে গিয়ে দেশের ভেতর চালান দিতে। টোড নাবিক। নৌকায় করে এখানে যাতায়াত করা তার জন্যে কোন ব্যপারই না। কি, খুব একটা অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে?
না, মাথা নাড়ল জিনা, মোটেও অসম্ভব না। উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। টোডরা চলে যাক, তারপর গিয়ে পাতালঘরে ঢুকব আমরা। দেখব, কিছু আছে কিনা। ব্যাটাদের শয়তানি বন্ধ করতেই হবে!
.

গেল না টোডেরা।
ফোকর দিয়ে মুখ বের করে দুর্গের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখ ব্যথা করে ফেলল গোয়েন্দারা, কিন্তু টোডদের যাওয়ার কোন লক্ষণই দেখতে পেল না। চত্বরে এক-আধবারের জন্যে বেরোনো ছাড়া তেমন একটা বাইরে বেরোতেও দেখা গেল না ওদের। যেন ছুচো হয়ে গেছে, পাতালঘরের অন্ধকারে বসে থাকাটাই বেশি আরামের, দিনের আলো সহ্য করতে পারে না।
ইতিমধ্যে আরেকটা কাজ করে এসেছে রবিন। পাহাড়ে চড়ায় ওস্তাদ সে। তাই তাকেই পাঠিয়েছিল কিশোর, টোডরা কিসে করে এসেছে দেখে আসার জন্যে। এ পাহাড় সে পাহাড় করে ঘুরে ঘুরে একটা পাহাড়ের গোড়ায়। যেই নেমেছে, অমনি একটা পাথরের আড়ালে দেখতে পেয়েছে ছোট নৌকাটা।
প্রণালী দিয়ে ঢোকেনি টোডরা, সেজন্যেই জিনার নৌকাটা দেখতে পায়নি। তবে ওস্তাদ নাবিক বলতে হবে টোডকে। দ্বীপের যেখানে এনে নৌকা ভিড়িয়েছে, সেখানে আনাটা সত্যি কঠিন। ভাঙা জাহাজটার কাছাকাছিই, কিশোর যেখানে সন্দেহ করেছিল।
বিকেল পেরিয়ে গেল। আরেকটু পরেই সন্ধ্যা হয়ে যাবে। ইতিমধ্যেই ছায়া নামতে শুরু করেছে পাহাড়ের গোড়ায়।
কিশোর বলল, মনে হচ্ছে রাতটা এখানেই কাঁটাবে ওরা।
বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে কোন লাভ হলো না, তিক্তকণ্ঠে বলল মুসা। যাদের যন্ত্রণায় পালালাম, তারাই এসে হাজির। ধুর!
গুহার ভেতরে অন্ধকার হয়ে এসেছে। মোম জালল রবিন। বলল, চলো, ভয় দেখাই ব্যাটাদের।
মানে? ভুরু কুঁচকে তাকাল মুসা।
আছে তো পাতালঘরে। তোমার মত ওদেরও ভূতের ভয় থাকতে পারে।
রবিনের পরিকল্পনা কিছুটা আন্দাজ করে ফেলেছে কিশোর। মুচকি হাসল।
মুসা বুঝল না। খুলেই বলো না ছাই!
রবিন বলল, বুঝলে না? দুর্গের নিচে কিছু কিছু জায়গায় প্রতিধ্বনি খুব বেশি হয়, ভুলে গেছ? পাতালঘরের কাছে গিয়ে চেঁচামেচি শুরু করব আমরা। ভূতের ভয় দেখাব ওদের।
চটাস করে নিজের উরুতেই চাটি মারল মুসা, দারুণ আইডিয়া! এক্ষুণি চলো! ব্যাটাদের কলজে শুকিয়ে না দিয়েছি তো আমার নাম মুসা আমান নয়!
এখন না, মুচকি হাসল কিশোর, আরেকটু রাত হোক।
জিনা বলল, রাফিকে কি করব? ও তো গিয়েই ঘেউ ঘেউ শুরু করবে। ভূত যে নয়, বুঝে ফেলবে টোড। ভাববে, বুনো কুকুরটাই, মারতে বেরোবে।

ওকে সিঁড়ির মুখে পাহারায় রেখে যাব। স্মাগলারদের কেউ এলে সতর্ক করতে পারবে আমাদের।
আরও প্রায় ঘণ্টাখানেক পর রওনা হলো ওরা। চলে এল দুর্গের চত্বরে। টোডদের ছায়াও দেখা যাচ্ছে না। আগুন নেই, আলো নেই। পাতালঘরে নামার সিঁড়ির মুখের পাথরগুলো সরানো, তাতে বোঝা গেল নিচেই রয়েছে ওরা।
রাফি, একদম চুপ করে থাকবি, কড়া নির্দেশ দিল জিনা। কেউ এলে আমাদের হুঁশিয়ার করবি। মানুষ না দেখলে চেঁচাবি না, খবরদার!
ও কি আর বুঝবে নাকি কিছু? কিশোর বলল, খরগোশ দেখলেও চেঁচানো শুরু করবে। একজনকে এখানে থাকা দরকার।
কে থাকবে? ভয় পেয়ে টোডরা কি করে, মজা দেখার লোভ সবারই। শেষে জিনা নিজেই বলল, তোমরাই যাও। আমি থাকি। রাফিকে একা একা ছেড়ে রাখতে ভরসা পাচ্ছি না আমি।
সিঁড়ি বেয়ে পাতালঘরে নেমে এল তিন গোয়েন্দা। নিচে অনেক ঘর, কোনওটা সেলার, কোনওটা ডানজন। বদ্ধ বাতাসে একধরনের ভাপসা গন্ধ।
বড় একটা ঘরে ঢুকল ওরা। টর্চের আলোয় দেয়ালে গাথা লোহার সারি সারি আঙটা দেখা গেল। একসময় এটা বোধহয় জেলখানা ছিল, কিংবা টর্চার চেম্বার। দুর্ভাগা বন্দিদের ধরে এনে এখানে বন্দি করে রাখা হত, লোহার আঙটায় শেকল দিয়ে বেধে অমানুষিক অত্যাচার চালানো হত তাদের ওপর। মধ্যযুগীয় এসব বর্বতার ইতিহাস অনেক পড়েছে রবিন। মুসারও জানা আছে কিছু কিছু। তার মনে হতে লাগল, ভয়াবহ যন্ত্রণা পেয়ে মারা যাওয়া সে সব মানুষের প্রেতাত্মারা এখনও ঘুরে বেড়ায় পাতালের এসব ঘরে ঘরে, করিডরে। গায়ে কাঁটা দিল তার।
সঙ্গে টর্চ আছে। কিন্তু পারতপক্ষে সেটা জ্বালছে না কিশোর। প্যাসেজ ধরে যাওয়ার সময় দেয়ালে চক দিয়ে একে চিহ্ন দিয়ে রাখল, যাতে ফেরার। সময় অসুবিধে না হয়।
হঠাৎ কথার শব্দ কানে এল। আরেকটু আগে বাড়তেই একটা ফোকর। দিয়ে আলো চোখে পড়ল। সেই ঘরটায় আস্তানা গেড়েছে টোডরা, যেখানে সোনার বারগুলো খুঁজে পেয়েছিল তিন গোয়েন্দা।
ফিসফিসিয়ে মুসা বলল, আমি গরু।
মানে! চমকে গেল রবিন। ভাবল, ভূতের ভয়ে মাথা খারাপ হয়ে গেছে। সহকারী গোয়েন্দার।
আমি গরুর ডাক ডাকব।
ও, তাই বলো। আমি তো ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম। বেশ, আমি তাহলে ছাগল। কিশোর, তুমি? গাধা?

জন্তু-জানোয়ারের ডাক আমি ভাল পারি না। তবু দেখি, পারি কিনা।
একটা পাথরের থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে গরুর ডাক ডেকে উঠল মুসা। শব্দ শুনে সে নিজেই চমকে গেল। বিকট শব্দ হয়েছে বদ্ধ জায়গায়, সেই সঙ্গে প্রতিধ্বনি; মূল শব্দটাকে ভয়াবহ করে তুলেছে।
ফোকর দিয়ে তাকিয়ে আছে রবিন ও কিশোর। টোডদের প্রতিক্রিয়া দেখছে।
ভীষণ চমকে গিয়ে প্রায় ককিয়ে উঠল টেরি, মা, কিসের শব্দ!
তার কুকুরটা তার চেয়েও ভীতু। গিয়ে লুকাল ঘরের কোণে।
গরু, বলেই টোড নিজেও থমকে গেল। এখানে গরু আসবে কোত্থেকে।
মুসা সরে এল থামের আড়াল থেকে। সেখানে চলে গেল রবিন। মা-মা। করে উঠল ছাগলের মত। থামল না, ডেকেই চলল।
আরিসব্বোনাশ! চোখ বড় বড় করে ফেলল মিসেস টোড। এসব এল কোত্থেকে।
লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল টোড। কাগজের মত সাদা হয়ে গেছে মুখ।
কয়েকবার ডেকে চুপ হয়ে গেল রবিন।
কিশোরের গায়ে গুঁতো দিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত করল মুসা। নীরব হাসিতে ফেটে পড়ছে।
কিশোর ব্যাঁ-ব্যাঁ করে যে ডাকটা ডাকল, সেটা গাধায় শুনলেও চমকে যেত, এতটাই বিকৃত আর ভয়ঙ্কর, পিলে চমকে দেয়ার মত; এবং সত্যি সত্যি চমকেও দিল টোড পরিবারের।
শুধু ডাকাডাকি করেই থামল না কিশোর, এমন করে লাথি মারতে লাগল, মনে হচ্ছে সাংঘাতিক, রেগে গিয়ে মেঝেতে পা ঠুকছে সাংঘাতিক জানোয়ারটা।
ঘরের দরজার কাছে সরে এল মিসেস টোড। ভয়ে ভয়ে বলল, হেই হেই, যাহ, যাহ্!
ফিক করে হেসে ফেলল রবিন। কিন্তু তার হাসিটা শুনতে পেল না মিসেস টোড, কিশোরের চিৎকারে। নাকি স্বরে চেঁচিয়ে টেনে টেনে বলল গোয়েন্দাপ্রধান, সাঁব-ধাঁন! তারপর আবার গাধার ডাক, মেঝেতে পা ঠোকাঠুকি।
লাফ দিয়ে গিয়ে ঘরের ভেতরে পড়ল মিসেস টোড। দড়াম করে লাগিয়ে দিল ভারি কাঠের দরজাটা। কাঁপা গলায় বলল, রোজ রাতেই যদি এই কাণ্ড চলে, এখানে থাকা যাবে না!
দাঁতাল শুয়োর রেগে গেলে যেমন করে তেমনি ভাবে ঘোৎ-ঘোৎ করে উঠল মুসা।
হা-হা করে হেসে ফেলল রবিন। ভীষণ প্রতিধ্বনি উঠল।
কিশোরও হাসছে। বলল, আর পারি না! চলো এখান থেকে! বেরোও!
বিকৃত হয়ে প্রতিধ্বনিত হলো তার কথা ও পারি না! পারি না। পারি না!...খান থেকে! খান থেকে! খান থেকে!...বেরোও! বেরোও! বেরোও।

সিঁড়ির ওপরে উঠেও তাদের হাসি থামল না।
সব শুনে জিনাও হেসে গড়িয়ে পড়ল।
গুহায় ফিরে চলল, ওরা। কিন্তু হাসি আর থামতে চায় না। কিছুই না বুঝে ঘউ ঘউ করল কয়েকবার রাফি।
আস্তে আস্তে কমে এল হাসি।
কিশোর বলল, ওরা যে আমাদের খুঁজতে আসেনি, তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। স্মাগলারদের সঙ্গে জড়িত। এ কাজে সুবিধে হবে বলেই হয়তো মিসেস টোড চাকরি নিয়েছিল জিনাদের বাড়িতে।
এবার তো তাহলে বাড়ি ফেরা যায়, রবিন বলল।
চোরগুলোকে হাতেনাতে না ধরেই?
কথা বলতে বলতে পাহাড়ের চূড়ায় চলে এল ওরা। ফোকর দিয়ে গুহায়। নামবে। টর্চ জ্বালতে যাবে কিশোর, এই সময় তার হাত খামচে ধরল মুসা। ফিসফিস করে বলল, ওই দেখো!
সাগরের মাঝে একটা আলো, জ্বলছে নিভছে।
কিশোরের মনে হলো, কোন বোট কিংবা জাহাজ থেকে টর্চের সাহায্যে সঙ্কেত দেয়া হচ্ছে। আবার বোধহয় পুরানো জাহাজের লকারে চোরাই মাল রেখে যাওয়া হয়েছে। সঙ্কেত দিচ্ছে টোডকে সে কথা জানানোর জন্যে।
অনেকক্ষণ ধরে চলল এই সঙ্কেত দেয়া।
এতক্ষণ কেন? রবিনের প্রশ্ন।
হয়তো এপাশ থেকে জবাব আশা করছে। না পেয়ে সঙ্কেত দিয়েই চলেছে।
আবার হাসতে শুরু করল মুসা, তাহলে জবাবের আশা আজ ওদের ছাড়তে হবে। মেরে ফেললেও জনাব বেঙ আজ আর গর্ত থেকে বেরোবে না।
একসময় থেমে গেল আলোর সঙ্কেত। আর জ্বলল না।
গুহায় ঢুকল গোয়েন্দারা।
কোন রকম অঘটন ঘটল না আর। নিরাপদে কাটিয়ে দিল রাতটা।

.

পরদিন সকালে নাস্তা খেতে বসেও প্রথমেই টোডদের কথা উঠল।
রেগে উঠল জিনা, বুড়িটা নাম্বার ওয়ান চোর! আমাদের ঘরের জিনিসপত্র সব ডাকাতি করে নিয়ে এসেছে, দেখোগে!
তা তো কিছু এনেছেই, জকুটি করল কিশোর। আন্টি এসে তাঁর ঘরের এ হাল দেখলে খুব কষ্ট পাবেন।
ভালমত একটা শিক্ষা দিয়ে দেয়া দরকার, গজগজ করতে লাগল মুসা।
হ্যাঁ, একমত হয়ে মাথা ঝাঁকাল রবিন।

নৌকায় করে এনেছে, সেটা তো বোঝাই গেছে, বলল কিশোর। মালগুলো কোথায় রেখেছে দেখা দরকার। নিশ্চয় পাতালঘরে।
চলো, দেখে আসি।
ওরা যদি থাকে? মুনার প্রশ্ন।
আছে তো জানা কথাই, রবিন বলল। নজর রাখব। তারপর যেই দেখব সরেছে, অমনি নেমে যাব পাতালে।
বুদ্ধিটা মন্দ না, কিশোর বলল। চলো।
রাফিকে কি করব? জিজ্ঞেস করল জিনা।
এখানেই রেখে যেতে হবে। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে সব ভজঘট করে দিতে পারে।
একা থাকবে? কেঁদেই মরে যাবে ও। এক কাজ করো, তোমরা যাও। আমি বরং ওর সঙ্গে থেকে যাই, আসলে গুহার মধ্যেও রাফিকে একা রেখে যেতে ভয় পাচ্ছে জিনা। যদি কোন কারণে ডাকতে শুরু করে কুকুরটা? আর তার ডাক শুনে এসে হাজির হয় টোড?
থাকবে? ঠিক আছে, থাকো।
দড়ি বেয়ে ফোকরের কাছে উঠে এল তিন গোয়েন্দা। বড় একট ঝোপে ঢুকে চোখ রাখল দুর্গের ওপর।
উফ, কি কাঁটার কাঁটারে বাবা! কনুই ডলতে ডলতে গুঙিয়ে উঠল মুসা, সব ছিলে ফেলেছে!
চুপ! সাবধান করল রবিন, বেঙের গোষ্ঠী বেরোচ্ছে।
একে একে বেরিয়ে এল তিন টোড। পাতালঘরে অমাবস্যার অন্ধকার। সূর্যের উজ্জ্বল আলোয় বেরিয়ে খুশি হয়েছে, ভাবভঙ্গিতেই বোঝা যায়।
এদিক এদিক তাকাতে লাগল ওরা। ডারবি রয়েছে মিসেস টোডের পা ঘেষে। পায়ের ফাঁকে ঢোকানো লেজ।
গরু-ছাগল খুজছে! হেসে ফেলল মুসা।
চুপ। আস্তে! সাবধান করল তাকে কিশোর, শুনে ফেলবে!
দু-তিন মিনিট কথা বলল মিসেস আর মিস্টার টোড, তারপর এগিয়ে গেল দুর্গের কিনারের দিকে, যেখান থেকে ভাঙা জাহাজটা দেখা যায়। টেরি গেল দেয়াল ধসে পড়া একটা ঘরের দিকে। ছাতও বেশির ভাগই নেই ওটার।
আমি টোডদের পিছে যাচ্ছি, কিশোর বলল। টেরি কি করে দেখো তোমরা।
ঝোপের আড়ালে আড়ালে এগিয়ে গেল সে।
মুসা আর রবিনও ঝোপ থেকে বেরিয়ে নিঃশব্দে চলে এল, দুর্গের কাছাকাছি, টেরি দেখে ফেলার আগেই চট করে বসে পড়ল আরেকটা ঝোপের আড়ালে।

খোলা চত্বরে ছোটাছুটি করছে ডারবি। শিস দিতে দিতে ভাঙা ঘরটা থেকে বেরিয়ে এল টেরি। দু-হাতে বুকের সঙ্গে জাপটে ধরে রেখেছে কয়েকটা গদি।
জিনাদের জিনিস! দাঁতে দাঁত চেপে বলল মুসা,সবচেয়ে ভালগুলো নিয়ে এসেছে!
দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা, বলে একটা মাটির ঢেলা তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারল রবিন। টেরি এবং ডারবির মাঝখানে পড়ে ভাঙল ওটা।
হাত থেকে গদিগুলো ছেড়ে দিয়ে আকাশের দিকে তাকাল টেরি। ভয় পেয়েছে।
আরেকটা ঢেলা নিয়ে আবার ছুঁড়ে মারল রবিন। নিশানা ঠিক হলো, পড়ল ডারবির ওপর। ঘেউক করে উঠে একলাফে গিয়ে সিঁড়ির গর্তে ঝাঁপ দিল কুকুরটা।
আবার আকাশের দিকে তাকাল টেরি। তারপর চারপাশে তাকাতে লাগল। ঢিল কোনখান থেকে আসছে বুঝতে পারছে না।
মুচকি হাসল মুসা। বুদ্ধিটা ভালই করেছে রবিন। টেরি ওদের দিকে পেছন করতেই অনেক বড় একটা ঢেলা তুলে ছুঁড়ে মারল সে। টেরির পায়ের কাছে পড়ে ভাঙল ঢেলাটা।
অবাক হয়ে নিচের দিকে তাকাল টেরি। তাকে কিছু বোঝার সামান্যতম সময় না দিয়ে ঢিল ছুঁড়ল রবিন।
কাঁধে পড়ল টেরির। মা-গো! করে চেঁচিয়ে লাফ দিয়ে সরে গেল সে।
চিৎকার করে গরুর ডাক ডেকে উঠল মুসা।
আর সহ্য করতে পারল না টেরি। দুই হাত তুলে চিৎকার করতে করতে গিয়ে তার কুকুরটার মতই লাফ দিয়ে পড়ল সিঁড়িতে।
শেষ চিলটা ছুঁড়ল মুসা। নিখুঁত নিশানা। সিঁড়ির গর্তে গিয়ে পড়ল ওটা। ভেতর থেকে আর্তচিৎকার শোনা গেল। নিশ্চয় মাথায় পড়েছে টেরির।
জলদি! লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল রবিন, এটাই সুযোগ!
একদৌড়ে দু-জনে গিয়ে চত্বর থেকে গদিগুলো কুড়িয়ে নিয়ে ছুটে চলে এল ঝোপের কাছে।
ভেতরে কি আছে দেখে আসতে পারি, রবিন বলল। তুমি এক কাজ করো। সিঁড়ির মুখের কাছে গিয়ে বসে থাকো। টেরির মাথা দেখলেই গরু হয়ে যাবে। ব্যস, আর কিছু করা লাগবে না। মাটি ফেড়ে ভেতরে ঢুকে যেতে চাইবে ও। আমি গিয়ে কুয়ার ভেতর দিয়ে পাতালঘরে নামব। দেখে আসি, কি কি জিনিস চুরি করেছে ধাড়ি বেঙগুলো।
আঙটা ধরে নামতে মোটেও অসুবিধে হলো রবিনের। এই কাজ আগেও একাধিকবার করেছে সে। দুর্গের নিচে নামা লাগতে পারে, এ জন্যে তৈরিই হয়ে

এসেছে ওরা। কোমর থেকে টর্চ খুলে জ্বালল। রাতে যে ঘর থেকে ভয় দেখিয়েছে টোডদের, তার পাশের ঘরটায় এসে ঢুকল।
জিনিসপত্র কম আনেনি টোডেরা, তিনজনের সাধ্যে যা কুলিয়েছে, এনেছে। কম্বল, তৈজসপত্র, খাবার তো আছেই, হাতে করে আনা যায় দামী এরকম যা যা পেয়েছে নিয়ে এসেছে। বেশ কিছুদিন থাকার ইচ্ছে এখানে ওদের।
কুয়া থেকে উঠে এসে দেখল রবিন, সিঁড়ির মুখের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে মুসা। তাকে নিয়ে সরে চলে এল ঝোপের কাছে। জানাল, কি দেখে এসেছে।
ফিসফাস করে কথা বলছে ওরা, এই সময় সেখানে এসে হাজির হলো কিশোর। বলল, পাথরের আড়ালে নৌকা লুকিয়ে রাখে টোড। বের করে নিয়ে ভাঙা জাহাজটায় গেছে, বোধহয় ট্রাংকটা আনতে। তীরে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে মিসেস টোড।
মুসা আর রবিনও জানাল, ওরা কি কি করেছে।
শুনে হাসল কিশোর। তাহলে এটাই সুযোগ।
কিসের? ভুরু কোঁচকাল রবিন।
জিনিসগুলো নিয়ে আসার। মুখ বাঁকাল কিশোর, আস্ত চোর! কেন যে এগুলোকে জায়গা দিয়েছিলেন কেরিআন্টি দাঁড়াও, সব নিয়ে আসব। একটা জিনিসও রেখে আসব না।
মুসাকে আবার সিঁড়ির মুখে পাহারায় রেখে নিচে নেমে গেল কিশোর আর রবিন। টেরি আর তার ভীতু কুকুরটার ছায়াও চোখে পড়ল না। নিশ্চয় সিঁড়ির নিচে কোথাও লুকিয়ে বসে আছে।
ব্যাগে ভরে জিনিসগুলো এনেছে টোডেরা। সেই সব ব্যাগে ভরেই আবার দড়িতে বেধে কুয়া দিয়ে বের করে আনল গোয়েন্দারা। একটা জিনিসও রাখল না।
দুই টোড এখনও ফেরেনি। এখানে আর থাকার প্রয়োজন মনে করল না তিন গোয়েন্দা। জিনিসগুলো সব বয়ে নিয়ে এল ফোকরের কাছে। দড়িতে বেধে গুহায় নামাল।
সর্বনাশ করে দিয়েছিল শয়তানগুলো! ফুসতে লাগল জিনা। তবে তার রাগ বেশিক্ষণ থাকল না। টেরিকে কি ভাবে ভয় দেখিয়েছে রবিন ও মুসা, শুনে হেসে গড়াগড়ি খেতে লাগল।
কিশোর বলল, ট্রাংকটাও রাখতে দেব না ওদেরকে। মুসা, চলো, দেখি। এনে থাকলে ওটাও কেড়ে আনব।
ফোকর দিয়ে আবার বেরোল দু-জনে দেখে, ট্রাংকটা দূর্গের দিকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে দুই টোড! চত্বরের কাছে গিয়ে ওটা নামিয়ে রেখে এদিক ওদিক তাকাল মিসেল, টেরি গেল কোথায়?...টেরি। টেরি!

মায়ের ডাক শুনে গর্ত থেকে বেরিয়ে এল টেরি।
তোকে না বললাম এখানে থাকতে? নিচে কি করছিস?
এখানে থেকে মরব নাকি!
মরব নাকি মানে?
আবার সেই ভূতুড়ে গরু এসে হাজির! ডাকাডাকি করল, আমাদের ঢিল মারল…
ভয়ানক জানোয়ার! ওরা কি ওপরে থাকতে দেয়?
ভুরু কুঁচকে ছেলের দিকে তাকিয়ে আছে টোড, যেন বোঝার চেষ্টা। করছে পাগল-টাগল হয়ে গেল নাকি। গরু তোকে ঢিল ছুড়ল?
ছুঁড়লই তো, মিথ্যে বলছি নাকি? ডারবিকে জিজ্ঞেস করে দেখো। কি আর বলব তোমাকে, বাবা, একটা-দুটো না, হাজারে হাজারে গরু! একেক শিঙ কি! আট-দশ হাত করে লম্বা। দেখো না, ভয়ে ডারবিটা আর বেরোচ্ছেই না।
ভীতুর ডিমটাকে তো খামোকা খাওয়াস
এই, ডারবিকে কিছু বলবে না বলে দিলাম! রেগে উঠল মিসেস টোড। ওর কি দোষ? গরুর সঙ্গে কুকুর কখনও পারে নাকি?
না পারলে ওটাকে রাখার কি দরকার? ছেলের দিকে তাকাল আবার টোড, গদিগুলো কোথায়? নিচে রেখে এসেছিস?
রাখলাম আর কখন। সবে এনেছি, গর্তে নামব, এই সময় গরুগুলো এসে হাজির।
কোথায় ফেলেছিস? আশপাশে তাকাল টোড।
এখানেই তো ছিল। ওরাই হয়তো নিয়ে গেছে!
গরুতে ঢিল ছোঁড়ে, গদি ছিনিয়ে নিয়ে যায়, একথা পাগলেও বিশ্বাস করবে না, টোডও করল না। কেউ আছে এই দ্বীপে, আমি এখনও বলছি। সে-ই এই কাণ্ড করছে।
তা তো আছেই, ওই গরুগুলো
চুপ, গাধা কোথাকার!
নিচ থেকে ডারবির করুণ চিৎকার শোনা গেল।
মিসেস টোড বলল, বেচারা! ওপরে আসতেও ভয় পাচ্ছে। এই ডারবি, ডারবি, আয়, আয়। কেউ কিচ্ছু করবে না।
কিন্তু মিসেস টোডের কথায় ভরসা করতে পারল না কুকুরটা। এল না ওপরে।
যাই, নিয়ে আসিগে। খাবারও আনতে হবে। এখানে বসেই খাব, নিচে নেমে গেল মিসেস টোড। একটু পর গর্তের মুখ দিয়ে প্রায় ছিটকে বেরোল সে। উত্তেজিত কণ্ঠে চেঁচিয়ে বলল, এই শোনো, কিছুই নেই কিছু না..সব নিয়ে গেছে
বললাম না, গরুগুলোর কাজ! টেরি বলল, তোমরা তো বিশ্বাস করতে চাও না…

তার কথায় কান দিল না তার বাবা। নেমে গেল গর্তের ভেতর। পেছনে গেল অন্য দুজন।
মুসার গায়ে কনুই দিয়ে গুঁতো মেরেই উঠে দৌড় দিল কিশোর।
চত্বরে ফেলে রাখা ট্রাংকটা বয়ে নিয়ে এল দু-জনে। গুহায় এনে রাখল। এরপর কি ঘটে দেখার জন্যে আবার বাইরে বেরিয়ে এল কিশোর।
গর্ত থেকে বেরিয়ে এল টোড। ট্রাংকটা যেখানে ছিল সেদিকে চোখ পড়তেই হাঁ হয়ে গেল। চিৎকার করে বলল, ডোরিয়া, দেখে যাও, ট্রাংকটাও নেই!
দেখে মিসেস টোডও হাঁ। টেরির ভঙ্গি দেখে তো মনে হলো অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবে।
তার মা বলল, দ্বীপে যে, মানুষ আছে, আর কোন সন্দেহ নেই। ভূতেরা দিনের বেলা বেরোয় না। জন, তোমার পিস্তলটা আছে?
আছে, পকেটে চাপড় দিল টোড।
এসো, পুরো দ্বীপ খুঁজে দেখব আজ। বের করেই ছাড়ব।
তাড়াতাড়ি গুহায় ঢুকে বন্ধুদের খবরটা জানাল কিশোর। গুহার মধ্যে চুপ করে বসে থাকা ছাড়া আপাতত আর কিছু করার নেই। রাফিকে চুপ থাকতে বলল জিনা।
খুঁজতে খুঁজতে গুহার ওপরে চলে এল টোডেরা।
টেরির গলা শোনা গেল, বাপরে বাপ, কি কাঁটার কাঁটা!
টোড বলল, ডোরিয়া, দেখো, এই ঝোপটায় কেউ বসেছিল! ঘাস দুমড়ে গেছে, দেখেছ? ডালও ভেঙেছে।
তাহলে সেই কেউটা এখন কোথায়?
সেটাই তো বুঝতে পারছি না!
আস্তে আস্তে সরে গেল দুই টোডের কণ্ঠ।
যাক, এবারেও দেখতে পায়নি ফোকরটা। সবে শরীর ঢিল করে বসেছে গোয়েন্দারা, এই সময় ঘটল ঘটনাটা। ওপর থেকে ধুড়ুম করে এসে মেঝেতে পড়ল টেরি। ঝোপে ঢুকে খুঁজতে খুঁজতে ফোকরে পা দিয়ে ফেলেছিল সে। আর ঠেকাতে পারেনি। ঢালু সুড়ঙ্গ দিয়ে পড়েছে এসে গুহার ভেতরে। নরম বালিতে পড়েছে বলে রাফির মতই সে-ও ব্যথা পায়নি। তবে অবাক হয়েছে খুব।
বিমূঢ় অবস্থাটা কাটতে সময় লাগল তার। কিশোরদের এখানে দেখতে পাবে কল্পনাই করতে পারেনি। চিৎকার করে মাকে ডাকার জন্যে মুখ খুলতেই মুসার থাবা এসে পড়ল তার মুখে। চেপে ধরল। কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, টু শব্দ করলেই রাফিকে ছেড়ে দেব। তোমাকে খাওয়ার জন্যে অস্থির হয়ে আছে ও।
কথাটা বিশ্বাস করল টেরি। চিৎকার করল না। ভয়ে ভয়ে তাকাচ্ছে রাফির দিকে।

টেরির মুখ থেকে হাত সরিয়ে আনল মুসা।
সবার মুখের দিকে তাকাতে লাগল টেরি। মিন মিন করে জিজ্ঞেস করল, এখানে কি করছ তোমরা?
তোমার মুণ্ডু কাটতে এসেছি! ধমকে উঠল জিনা। এটা আমাদের দ্বীপ, ইচ্ছে হলেই আসব, কিন্তু তোমরা এসেছ কোন সাহসে? কাকে বলে এসেছ?
তার সঙ্গে সুর মিলিয়েই কড়া গলায় ধমক দিল রাফিও, খউ, অর্থাৎ, *জবাব দাও!*
এই, তুই থাম! বেঙগুলো শুনে ফেলবে!
ভয়ে কেঁচো হয়ে গেছে টেরি।
দ্বীপে এসেছ কেন তোমরা? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
তা তো জানি না, ভোঁতা গলায় জবাব দিল টেরি। বাবা আসতে বলল, এলাম।
দেখো, মিথ্যে বলে পার পাবে না। স্মাগলিঙের সঙ্গে জড়িত না তোমার বাবা?
বিস্ময় ফুটল টেরির চোখে। স্মাগলিঙ!
হ্যাঁ, স্মাগলিঙ। চোরাচালান।
কি বলছ, কিছুই বুঝতে পারছি না। দেখো, আমাকে ছেড়ে দাও…
এহ, মামার বাড়ির আবদার! মুখ ভেঙচে বলল মুসা, ছেড়ে *দা*ও! দিই, তারপর গিয়ে বলো বাপ-মাকে, পিস্তল নিয়ে তেড়ে আসুক…ওসব ঘ্যানর ঘ্যানর করে লাভ নেই, বেঙাচি, ছাড়া তোমাকে হবে না। এসেই যখন পড়েছ, এখানেই থাকতে হবে।
আমার বাবা আমাকে খুঁজে বের করবেই…
যেন তার কথায় সাড়া দিয়েই ডেকে উঠল টোড, টেরি, টেরি, কোথায় গেলি? এই টেরি!
জবাব দিতে যাচ্ছিল, রাফির ওপর চোখ পড়ে গেল টেরির। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে কুকুরটা। হাঁ করা মুখটা হাঁ-ই থেকে গেল তার, শব্দ আর বেরোল না। ঢোক গিলল সে।
খানিকক্ষণ ডাকাডাকি করে সেখান থেকে সরে গেল টোড।
অনেকক্ষণ পরও যখন আর কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না, কিশোর। বলল, ট্রাংকে কি আছে এবার দেখতে হয়।
রবিন বলল, তালা কি করবে?
একটা পাথর তুলে নিল মুসা, এই তালা কিছু না।
কয়েক বাড়িতেই তালা দুটো ভেঙে ফেলল সে।
ডালা তুলল।
ভেতরে কি আছে দেখার জন্যে হুড়াহুড়ি করে এগিয়ে এল সবাই, টেরি বাদে। এসবে তার কোন আগ্রহ নেই। মুখটাকে করুণ করে রেখেছে সে। মনে হচ্ছে,

ধমক দিলেই ভ্যা করে কেঁদে ফেলবে এখন।
ট্রাংকের একেবারে ওপরে রয়েছে একটা ছোটদের কম্বল, এমব্রয়ডারি করে তাতে সাদা খরগোশ আঁকা। টেনে বের করল ওটা কিশোর, নিচে কি আছে দেখার জন্যে। দেখে অবাক হয়ে গেল। এক এক করে জিনিসগুলো বের করে রাখল বালিতে।
দুটো নীল রঙের জার্সি, দুটো নীল স্কার্ট, একটা গরম কোট, এবং আরও কিছু জামা-কাপড়। কাপড়ের নিচে রয়েছে চারটে পুতুল আর একটা খেলনা– ভালুক।
এগুলোর মধ্যে করেই হেরোইন পাচার করে, মুসা বলল। দেখো কেটে, কাটলেই পেয়ে যাবে।
কিন্তু কিশোরের সন্দেহ হলো। টিপেটুপে দেখল। ভেতরে কিছু আছে বলে মনে হলো না। তবু আরও নিশ্চিত হওয়ার জন্যে কেটে দেখল একটা পুতুল। অতি সাধারণ খেলনা। ভেতরে কিছুই নেই হীরা, মাদকদ্রব্য, কিংবা চোরাচালানি করে আনার মত কোন জিনিস, কিচ্ছু না।
অবাক হয়ে পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল গোয়েন্দারা।
আনমনে নিচের ঠোঁটে বার দুই চিমটি কাটল কিশোর। বিড়বিড় করে বলল, এই জিনিস এত কষ্ট করে ভাঙা জাহাজে এনে লুকানোর অর্থ কি?
অনেক ভাবে জিজ্ঞেস করেও টেরির কাছ থেকে কোন তথ্য আদায় করা গেল না। আসলেই কিছু জানে না সে।
কিশোর জিজ্ঞেস করল, রাতে যে একটা জাহাজ এসে সঙ্কেত দেয়, এ ব্যাপারেও কিছু জানো না?
মাথা নাড়ল টেরি। সঙ্কেতের কথা কিছু জানি না। তবে মাকে বলতে শুনেছি, আজ রাতে যোগাযোগ করার কথা মারিয়ার।
মারিয়া!কি ওটা? জাহাজ, বোট, না কোন মানুষ?
জানি না। জিজ্ঞেস করতে গিয়েছিলাম, মাথায় গাট্টা মারল বাবা।
তারমানে গুরুত্ব আছে। গোপন ব্যাপার, তোমাকে জানাতে চায়নি। বেশ, আজ রাতে নজর রাখব আমরা।
সারাটা দিন গুহা থেকে বেরোল না ওরা, বেরোতে পারল না, টোডদের চোখে পড়ে যাওয়ার ভয়ে।
বহুযুগ পরে যেন অবশেষে সন্ধ্যা হলো। রাত নামল। তাড়াতাড়ি খাওয়ার পাট চুকিয়ে নিল সবাই। ভাল খাবার পেয়ে এত খাওয়া খেলো টেরি, পেট ভারী করে ফেলল। তারপর আর বেশিক্ষণ জেগে থাকতে পারল না। বালিতেই শুয়ে নাক ডাকাতে শুরু করল, অনেকটা বাপের মত করে।

দু-জন দু-জন করে পালা করে পাহারা দেবে, চোখ রাখবে সাগরের ওপর, ঠিক করল কিশোর। প্রথম উঠে গেল সে আর জিনা। রাত সাড়ে বারোটায় নেমে এসে মুসা আর রবিনকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দিয়ে জানাল, কিছু দেখেনি। ওদেরকে যেতে বলল।

টেরি গভীর ঘুমে অচেতন। তার কাছেই শুয়ে আছে রাফি। পাহারা দিচ্ছে।

ফোকরের বাইরে বেরোল দুই গোয়েন্দা।

চাঁদ উঠেছে। ঘোলাটে জ্যোৎস্না ছড়িয়ে দিয়েছে সাগরের ওপর। আকাশে প্রচুর হালকা মেঘ, ছুটছে দিগ্বিদিক, আপাতত বৃষ্টি হওয়ার কোন লক্ষণ নেই।

আধঘণ্টা মত গেছে, হঠাৎ কানে এল কথার শব্দ।

রবিনের কানে কানে বলল মুসা, টোডরা বেরিয়েছে। ভাঙা জাহাজে যাচ্ছে বোধহয়।

দাঁড়ের শব্দ শোনা গেল। খানিক পরেই নৌকাটাও নজরে এল দু জনের।

মুসার গায়ে কনুই দিয়ে গুঁতো মারল রবিন। নীরবে হাত তুলে দেখাল সাগরের দিকে।

বেশ অনেকটা দূরে দেখা যাচ্ছে আলো। আগের রাতের মতই জ্বলছে নিভছে। চাঁদের আলোয় বড় একটা বোটের অবয়বও দেখা যাচ্ছে, সঙ্কেত দেয়া হচ্ছে ওটা থেকেই।

মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেল চাঁদ। অন্ধকার হয়ে গেল সাগর। আর কিছু চোখে পড়ছে না।

একটু পরেই মেঘ সরে গেল।

ওই যে, আরেকটা নৌকা, মুসা বলল। বোটের কাছ থেকে আসছে।

নিশ্চয় দেখা করবে একটা আরেকটার সঙ্গে। মাল পাচার করে এভাবেই।

ঠিক এই সময় নিতান্ত বেরসিকের মত আবার মেঘের আড়ালে চলে গেল চাঁদ। কিছুই দেখতে পাচ্ছে না গোয়েন্দারা। দেখার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে। গলা বাড়িয়ে দিয়েছে বকের মত। কিন্তু আলো না থাকলে কিছু করেই লাভ নেই।

কোন জায়গায় মিলিত হলো নৌকাদুটো, দেখতে পেল না ওরা। আবার যখন চাঁদ বেরোল, তখন দেখল, বোটের কাছ থেকে আসা নৌকাটা চলে যাচ্ছে।

বসেই রইল ওরা।

প্রায় বিশ মিনিট পর টোডদের নৌকাটাকে তীরে ভিড়তে দেখল।

কোন পথে ওপরে উঠল ওরা, দেখতে পেল না গোয়েন্দারা। দেখল, যখন একেবারে দুর্গের কাছে চলে এসেছে।

টোডের হাতে বড় বান্ডিলের মত একটা জিনিস।

অনেক মাল এনেছে আজ, ফিসফিস করে বলল মুসা।

এই সময় দুজনকেই চমকে দিয়ে শোনা গেল একটা চিৎকার, অনেকটা আর্তচিৎকারের মত। ভয়ে, বিরক্তিতে, যন্ত্রণায় কেঁদে উঠেছে যেন কোন ছোট্ট মেয়ে।

.

গুহায় ফিরে জিনা আর কিশোরকে সব জানাল দুজনে।
বুঝতে পেরেছি, বলে উঠল কিশোর, আর কোন সন্দেহ নেই!
কি বুঝেছ? জিজ্ঞেস করল মুসা।
বাচ্চাদের কম্বল, পুতুল, এসব।
আবার গ্রীক!
খুব সহজ করেই বলেছি। স্মাগলিং নয়, কিডন্যাপি।
তুমি বলতে চাইছ, রবিনের কণ্ঠে উত্তেজনা, কোন বাচ্চা মেয়েকে কিডন্যাপ করে এনেছে টোডরা?
কিডন্যাপটা সম্ভবত জাহাজের লোকগুলো করেছে। মারিয়া ওটার নামও হতে পারে, মেয়েটার নামও হতে পারে। এনে তুলে দিয়েছে টোডদের হাতে। লুকিয়ে রাখার জন্যে। মেয়েটা যাতে শান্ত থাকে, সে জন্যে আগেই তার পুতুলগুলো এনে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। কাপড়-চোপড়ও দরকার, সে জন্যে ওগুলো এনেছে।
খাইছে। তার মানে টোডের হাতের বান্ডিলটা মানুষ!
হ্যাঁ। আমার অনুমান ঠিক হলে, ছোট্ট মেয়েটা। তাকে বের করে আনতে হবে আমাদের।
অনেক ঘুমিয়ে ঘুম পাতলা হয়ে গেছে টেরির। কথাবার্তায় জেগে গেল। কিশোরের শেষ কথাটা কানে গেছে। জিজ্ঞেস করল, কাকে বের করে আনবে?
সেটা তোমার জানার দরকার নেই।
ধাড়ি বেঙগুলো নিশ্চয় পাহারায় থাকবে, মুসা বলল। আনব কি করে?
একটা উপায় বেরিয়ে যাবেই।
রাত এখনও অনেক বাকি। আর কিছু করার নেই। রাফির ওপর টেরিকে পাহারা দেয়ার ভার দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল তিন গোয়েন্দা ও জিনা। কয়েক মিনিট জেগে জেগে মা-বাবার কথা ভাবল টেরি। ভীষণ কান্না পেতে লাগল তার। শেষে কাঁদতেই শুরু করল, নীরবে। রাফির ভয়ে জোরে কাঁদার সাহস পেল না।

.

পরদিন সকালে সবার আগে ঘুম ভাঙল কিশোরের। দড়ি বেয়ে উঠে এল ফোকরের বাইরে। সময়মতই বেরিয়েছে। দেখল, সিঁড়ির গর্ত দিয়ে বেরিয়ে আসছে দুই টোড। ঝোপের আড়ালে আড়ালে ওদের কাছাকাছি চলে গেল সে, কি বলে শোনার জন্যে।

টেরির জন্যে অস্থির হয়ে আছে দু-জনে।
মিসেস বলল, ও পাতালঘরে নেই, কতবার বলব! খোঁজা কি আর বাকি রেখেছি?
অনেক ঘর অনেক গলিঘুপচি আছে ওর মধ্যে, উত্তেজনা আর দুশ্চিন্তায় অনেক বেশি খসখসে হয়ে গেছে টোডের কণ্ঠ। বাকি থাকলেও জানছি কি করে?
যে ভাবে চিৎকার করে ডেকেছি, তার কানে শব্দ যেতই।
না-ও যেতে পারে। মাটির নিচের এসব ঘরগুলো ভয়ানক…
তোমার মাথায় গোবর ভরা আছে, মিস্টার টোড! রেগে গেল মিসেস। আমি বলছি ও এ দ্বীপে নেই। ওকে গায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।
কারা নিল?
যারা জিনিসগুলো নিয়ে গেছে। গুরু-ছাগলের ডাক ডেকে ভয় দেখিয়েছে। নৌকায় তুলে ওরাই নিয়ে গেছে আমার টেরিকে…
নৌকাটা তাহলে কোথায় ছিল?
সেটা আমি কি জানি? ছিল নিশ্চয় কোথাও। লুকিয়ে রেখেছিল। পুরো। দ্বীপের কোথায় কি আছে না আছে সব কি আমরা জানি নাকি?
কি করতে বলছ তাহলে?
গাঁয়ে গিয়ে খুঁজতে হবে। ভয় লাগছে আমার, জন। টেরির যদি কিছু হয়ে যায় আমি বাঁচব না…
তেতো হয়ে গেল কিশোরের মন। নিজের ছেলেকে যখন খুঁজে পাচ্ছে না, তখন কান্নাকাটি শুরু করেছে। যে মেয়েটাকে নিয়ে এসেছে ওরা, তার মায়ের কি অবস্থা, মা হয়েও একবার ভাবেনি।
এখুনি চলো, তাগাদা দিল মিসেস।
ডারবিকে কি করব?
এখানেই থাকবে। মেয়েটাকে পাহারা দিক।
অন্ধকারে একা থাকবে মেয়েটা, ভয় পাবে না?
ডারবি তো থাকছেই, ভয় কিসের? চলো, চলো, দেরি করলে কি হয়ে যায় কে জানে!
কি মহিলারে বাবা!–ভাবছে কিশোর। ছোট্ট একটা মেয়েকে অন্ধকার পাতালঘরে রেখে যেতে এতটুকু মন কাঁপছে না। তবে একদিক থেকে ভালই হবে। ওরা চলে গেলে নির্বিবাদে গিয়ে মেয়েটাকে বের করে আনা যাবে, ঝামেলা হবে না।
কুকুরটাকে রেখে চলে গেল টোডেরা।
দু-পায়ের ফাঁকে লেজ গুটিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে ওদের চলে যেতে দেখল ডারবি। তারপর দৌড়ে ফিরে গেল চত্বরে, অলস ভঙ্গিতে শুয়ে পড়ল। দিনের আলোয় রোদের মধ্যে থেকেও ভারি অস্বস্তি বোধ করছে কুকুরটা। কান খাড়া, সারাক্ষণ

তাকাচ্ছে এদিক ওদিক। আজব এই দ্বীপটাকে মোটেও পছন্দ করতে পারছে না সে।
তাড়াতাড়ি এসে গুহায় ঢুকল কিশোর। বলল, বাইরে এসো সবাই। জরুরী কথা আছে। টেরি, তুমি বসে থাকো। এগুলো আমাদের কথা, তোমার শোনার দরকার নেই।
টেরির পাহারায় রইল রাফি। অন্যেরা কিশোরের সঙ্গে গুহার বাইরে বেরিয়ে এল।
শোনো, বলল কিশোর, টোডেরা নৌকায় করে গায়ে চলে গেছে। টেরিকে খুঁজতে। বাচ্চা মেয়েটাকে রেখে গেছে পাতালঘরে, ডার্টির পাহারায়। মিসেস টোড সাংঘাতিক দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছে। তার ধারণা, কেউ তার সোনামানিককে ধরে নিয়ে চলে গেছে, তার দুধের শিশুটা ভয়েই আধমরা হয়ে এখন তার জন্যে কান্নাকাটি করছে।
আহারে! জিভ দিয়ে চুকচুক করল মুসা।
শয়তান মেয়েমানুষ! ফুঁসে উঠল জিনা। ছোট্ট মেয়েটাকে যে ধরে এনেছে, কষ্ট পাচ্ছে অন্ধকার পাতালঘরে বসে, সেটা একবার তাবেনি! ওটা, মহিলা না, ডাইনী!
ঠিকই বলেছ, মাথা কাত করল কিশোর। আমার প্ল্যান শোনো। এখুনি গিয়ে মেয়েটাকে বের করে আনব। তারপর গুহায় ফিরে নাস্তা সেরে নৌকায় করে তাকে নিয়ে যাব থানায়। পুলিশই তার বাবা-মাকে খুঁজে বের করবে।
টেরিকে কি করব? জানতে চাইল রবিন।
টেরিকে! একেবারে তিন গোয়েন্দার মনের কথাটা বলে ফেলল জিনা, ওকে রেখে যাব পাতালঘরে। মেয়েটার জায়গায়। ফিরে এসে তার জায়গায় ছেলেকে দেখে আক্কেল গুড়ুম হয়ে যাবে ধাড়ি বেঙগুলোর।
টেরির একটা ঠ্যাং-ঠুং ভেঙে দেব নাকি? পরামর্শ চাইল মুসা, য়াতে সারাজীবন খুঁড়িয়ে চলতে হয়…
না না, হাত নাড়ল কিশোর, ওসব ভাঙাভাঙির মধ্যে গিয়ে কাজ নেই। এমনিতেই যথেষ্ট শিক্ষা হয়ে যাবে, দেখোই না খালি। এসো, দেরি হয়ে যাচ্ছে।
গুহায় ঢুকে টেরিকে বলল কিশোর, এই, এসো আমাদের সঙ্গে। রাফি, তুইও যাবি।
সন্দেহ ফুটল টেরির চোখে, কোথায়?
চমৎকার একটা জায়গায়, যেখানে এখানকার চেয়ে আরাম অনেক বেশি। মহাআনন্দে থাকতে পারবে। এসো।
সেখানে গরুগুলোও তোমাকে কামড়াতে পারবে না, হেসে বলল মুসা। নাও, ওঠো।
আমি যাব না।

রাফি, ওঠো তো, আদেশ দিল কিশোর।
গরগর করতে করতে এগিয়ে এল রাফি। নাক ঠেকাতে গেল টেরির পায়ে।
একলাফে উঠে দাঁড়াল সে।
দড়ি বেয়ে আগে আগে উঠে গেল মুসা ও জিনা। টেরিকে উঠতে বলল কিশোর। কিন্তু ভয়ে উঠতে চাইল না সে। আবার এগিয়ে এল রাফি। খাউ করে পায়ে কামড়ে দেয়ার ভঙ্গি করল। লাফিয়ে উঠে দড়ি ধরে ফেলল টেরি। অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে চলে গেল রাফির নাগালের বাইরে। তারপর চুপচাপ ঝুলে থেকে চেঁচাতে থাকল। বাধ্য হয়ে ওপর থেকে টেনে তাকে তুলে নিতে হলো মুসা ও জিনাকে।
রবিন আর কিশোরও উঠল।
জলদি করো, তাগাদা দিল কিশোর। ওরা ফিরে আসার আগেই কাজ সারতে হবে।
ঝোপঝাড়ের ফাঁক দিয়ে প্রায় দৌড়ে এগোল ওরা। রাফি উঠে আসতে লাগল ঢাল বেয়ে। সবাই এসে দাঁড়াল দুর্গের চত্বরে।
ওদেরকে সিঁড়ির দিকে এগোতে দেখে ভয় পেয়ে গেল টেরি, আমি নিচে নামব না!
কেন, এত কিসের ভয়? তার মুখের সামনে হাত নেড়ে বলল মুসা, গরুর? কিন্তু গরু তো বেঙাচি খায় না।
উদ্বিগ্ন হয়ে চারপাশে তাকাচ্ছে টেরি, আমার বাবা-মা কোথায়?
আছে, আছে, ভয় নেই। বাজারে গেছে তোমার জন্যে দুধের বোতল আনতে। চলে আসবে।
হেসে উঠল অন্য তিনজন। টেরির চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। এমন বিপদে আর পড়েনি।
গর্তের মুখের ঢাকনাটা চাপা দিয়ে গেছে টোডেরা। তার ওপর চাপিয়ে দিয়ে গেছে বড় বড় পাথর।
তোমার বাবা-মা কত্তবড় শয়তান, দেখো, জিনা বলল। ছোট্ট একটা মেয়েকে অন্ধকার ঘরে তো রেখেই গেছে, তার ওপর গর্তের মুখও বন্ধ করে গেছে, যাতে কোনমতেই বেরোতে না পারে। তোমার বিপদের জন্যেও ওরাই দায়ী, আর কাউকে দোষ দিতে পারবে না।
এটাকে দিয়েই পাথরগুলো সরানো যাক, টেরিকে দেখিয়ে প্রস্তাব দিল। মুসা। বাবা-মায়ের কাজ ছেলেরাই তো করে দেয়...
মাথা নাড়ল কিশোর, ও করে দেবে, আর লোক পেলে না। ও তো জানে খালি খাওয়া আর শয়তানি, অকাজের ধাড়ি। সময় নেই, এসো, হাত লাগাও সবাই।
পাথর সরানোর কাজে সাহায্য করতে টেরিকেও বাধ্য করল রাফি।

সিঁড়িতে পা রাখতে যাবে কিশোর, এই সময় একটা ঝোপের দিকে হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠল টেরি, ওই যে, ডারবি!
রাফির ভয়ে গিয়ে ওখানে ঢুকেছে নোংরা কুকুরটা। টেরিকে দেখে বেরিয়ে আসতে চাইছে, কিন্তু সাহস পাচ্ছে না। একবার মুখ বের করছে, আবার ঢুকে পড়ছে।
যেমন মনিব, তার তেমন কুকুর, হুহ! তীব্র ঘৃণা জিনার কণ্ঠে।. এই রাফি, ছেড়ে দে। ওটাকে কামড়ে মজা পাবি না। নিজের শরীরই দুর্গন্ধ করবি।
কিন্তু রাফি জানে, জিনা ভুল বলেছে, কামড়ে খুব মজা পাবে সে। বাধা দেয়ার কেউ নেই এখন, সহজেই কেটে নিতে পারে কুকুরটার একটা কান। মাঝে মাঝে জিনার এসব নির্দেশের কারণ বুঝতে পারে না সে। শত্রু কুকুরকে কামড়াতে মানা করে, খরগোশ তাড়া করতে দেয় নাঃ..এসব সময় মনে হয়, তার কুকুর-জন্মই বৃথা। মুখটাকে করুণ করে ফেলল সে।
কিন্তু তার অভিমান দেখার সময় নেই এখন জিনার। তাড়াহুড়ো করে অন্যদের সঙ্গে পাতালঘরে নেমে যেতে লাগল। দেয়ালে যে চকের চিহ্ন দিয়ে . রেখেছে কিশোর, তা দেখে সহজেই এগোতে পারছে ওরা।
যে ঘরে রাত কাটায় টোডরা সেটার সামনে এসে দাঁড়াল দলটা। দরজা লাগানো। বাইরে থেকে খিল তুলে দেয়া। ভেতরে কোন শব্দ নেই। দরজার গায়ে নখের আঁচড় দিতে দিতে মৃদু গোঁ গোঁ করতে লাগল রাফি। বুঝে গেছে, ভেতরে মানুষ আছে।
চিৎকার করে কিশোর বলল, কেউ আছ ভেতরে? আমরা তোমাকে বের করে নিয়ে যেতে এসেছি।
খসখস শব্দ হলো। উঠে দাঁড়াল যেন কেউ। দৌড়ে এল দরজার দিকে। জবার দিল একটা ছোট্ট কণ্ঠ, কে তোমরা! আমাকে বের করে নিয়ে যাও! আমার খুব ভয় লাগছে!
কথা শেষ হওয়ার আগেই খিল খুলতে শুরু করেছে কিশোর। ধাক্কা দিয়ে খুলে ফেলল পাল্লা। ভেতরে একটা হ্যারিকেন জ্বলছে। সেই আলোয় দাঁড়িয়ে। থাকতে দেখল ছোট্ট মেয়েটাকে। কাগজের মত সাদা হয়ে গেছে মুখ। বড় বড় বাদামী চোখে আতঙ্ক। কাঁদছিল, গালে পানির দাগ, তাতে ময়লা লেগে কালচে হয়ে আছে।
সোজা গিয়ে তাকে কোলে তুলে নিল মু। হেসে বলল, আর ভয় নেই, আমরা এসে গেছি। কেউ আর কিছু করতে পারবে না তোমার।
আমি মার কাছে যার! ফুঁপিয়ে উঠল মেয়েটা। আমাকে এখানে। রেখেছে কেন? এখানে আমার ভাল লাগে না!

তা তো লাগবেই না। এমন জায়গায় কি কারও ভাল লাগে? কোমল গলায় বলল কিশোর। তোমার মার কাছেই নিয়ে যাব আমরা। আগে চলো আমাদের গুহায়। নাস্তা খাবে। তারপর নৌকায় করে চলে যাব আমরা।
তোমাদের সঙ্গে যাব আমি, চোখ ডলতে ডলতে বলল মেয়েটা। তোমরা খুব ভাল। তোমাদেরকে আমার ভাল লাগছে। অন্য মানুষগুলোর মত খারাপ না তোমরা। ওদেরকে আমার ভাল লাগে না।
ওদেরকে কারোরই ভাল লাগে না, রবিন বলল।
রাফির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল জিনা, দেখো, ও হলো রাফি, আমাদের কুকুর। ও তোমার বন্ধু হতে চায়।
শরীর মুচড়ে মুসার কোল থেকে নেমে গেল মেয়েটা। রাফির গলা জড়িয়ে ধরে বলল, খুব ভাল কুকুর, লক্ষ্মী কুকুর ও। কুকুর আমার খুব ভাল লাগে। আমারও আছে একটা।
গাল চেটে মেয়েটার মুখের পানি মুছিয়ে দিল রাফি।
তোমার নাম কি? জিজ্ঞেস করল রবিন।
ডরোথি হুবার্টসন। মা ডাকে, ডল।
ডলই তুমি, এক্কেবারে পুতুল। আদর করে ওর গাল টিপে দিল জিনা।
তুমিও খুব ভাল ছেলে।
হাসল জিনা। আমি ছেলে নই, মেয়ে, তোমার মতই।
তাহলে ওরকম ছেলেদের মত কাপড় পরে আছ কেন?
পরে থাকতে আমার ভাল লাগে।
দাঁড়াও, আমিও পরব ওরকম। বাড়ি গিয়ে মাকে বলব এই কাপড় দিতে। তোমরা কে?
এক এক করে নিজেদের পরিচয় দিল গোয়েন্দারা।
ও কে? টেরিকে দেখাল ডল।
ও? বেঙাচি, মুসা বলল। ও আমাদের কেউ নয়। ওর বাবা-মাই তোমাকে এনে আটকে রেখেছে এখানে। তোমার জায়গায় এখন ওকে রেখে যাব আমরা। ওর বাবা-মার জন্যে একটা সারপ্রাইজ।
পাতালঘরে একা থাকার কথা শুনেই চেঁচিয়ে গলা ফাটাতে শুরু করল টেরি। সরে যাওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু মুসার সঙ্গে কি আর পারে। একটানে তাকে ঘরের মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে দিল।
তোমাদের মত শয়তানদের এই শাস্তিও খুব কম হয়ে গেল। তবু যা হোক, তোমার বাবা-মার ছোট্ট একটা শিক্ষা অন্তত হবে। অন্যের বাচ্চাকে ধরে এনে আটকে

রাখলে তাদের কেমন লাগে, বুঝতে পারবে। থাকো এখানে। একা থাকতে ডলের কেমন লেগেছিল, বুঝিয়ে বোলো বাবা-মাকে। চলি। গুডবাই।
অন্যেরা আগেই বেরিয়ে গেছে। বেরিয়ে এসে দরজা লাগিয়ে দিল মুসা।
পাল্লার ওপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল টেরি। কিল মেরে মেরে চেঁচিয়ে কাঁদতে লাগল, দোহাই তোমাদের, আমাকে বের করো! ভুতে খেয়ে ফেলবে আমাকে!
ভূতের আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই, তোমাকে খেতে আসে! আর যদি তোমার মত কোন ছ্যাচড়া ভূত চলেই আসে, পচা পচা ছড়া শুনিয়ে দেবে। তোমার ওই জঘন্য ছড়া ভূতেরাও সইতে পারবে না।
গরুগুলো আসবে…
না, আসবে না। মানা করে দেব।
খিদেয় মারা যাব।
দু-একদিন না খেয়ে থাকলে মানুষ মরে না। চলি। যত খুশি চিল্লাও ওখানে বসে।
ফিরে চলল ওরা।
চিৎকার করে কাঁদতে লাগল টেরি।
লজ্জাও নেই! জিনা বলল, ঘেন্না লাগে এসব ছেলেকে দেখলে! এত্তবড় ছেলে, বাচ্চাদের মত কাঁদে, দেখো!
জলদি চলো, এতক্ষণে খিদে টের পাচ্ছে মুসা, আমার পেট জ্বলে গেল, খিদেয়।
আমারও খিদে পেয়েছে, মূসার হাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে বলল ডল। ঘরটাতে যখন ছিলাম, তখন পায়নি। এখন খেতে ইচ্ছে করছে। তোমরা খুব ভাল, আমাকে বের করে এনেছ।
তোমাকে বের করে বেঙাচিটাকে যে রেখে আসতে পেরেছি, এতে আমরাও খুশি।
যেমন কুকুর তার তেমনি মুগুর, রবিন বলল। পাতালঘরে এসে ছেলেকে দেখলে আক্কেল হবে টোডদের।
যদি আক্কেল থাকে, জিনা বলল।
অনেক গলি-ঘুপচি আর ঘর পেরিয়ে অবশেষে সিঁড়ি বেয়ে আবার ওপরে উঠে এল ওরা।
উজ্জল রোদে বেরিয়ে যেন হা করে আলো-বাতাস গিলতে লাগল উল। ওহ, কি সুন্দর, কি সুন্দর! কোথায় আনা হয়েছে আমাকে?
একটা দ্বীপে, জবাব দিল জিনা, আমাদের দ্বীপ। এই যে ভাঙা দুর্গটা, এটাও আমাদের। কাল রাতে একটা নৌকায় করে তোমাকে এখানে আনা হয়েছিল। তোমার চিৎকার শুনতে পেয়েছি আমরা। তাতেই বুঝেছি, তোমাকে জোর করে ধরে আনা হয়েছে।

একের পর এক বিস্ময় অপেক্ষা করছে যেন ডলের জন্যে। ফোকর দিয়ে ঢুকে দড়ি বেয়ে গুহায় নেমে তাজ্জব হয়ে গেল।
কিশোরের কানের কাছে ফিসফিস করে বলল রবিন, সাহস আছে মেয়েটার! দেখলে, কেমন দড়ি বেয়ে নেমে পড়ল। ইকটু বাধাও দিল না। ভয় পেল না!
মুসা বলল, জিনার বোন হলে ভাল মানাত। এক্কেবারে এক চরিত্র মনে হচ্ছে।
জিনা নামটা কানে গেল জিনার। ঘুরে জিজ্ঞেস করল, আমার কথা কি বলছ?
না, কিছু না, তাড়াতাড়ি হাত নাড়ল মুসা, তোমাকে কিছু বলছি না!

.

ট্রাংকটার দিকে চোখ পড়ল ডলের। দেখল, পুতুলগুলো পড়ে আছে মাটিতে। চেঁচিয়ে উঠল, আমার পুতুল! কোথায় পেলে তোমরা? ইস, কত কেঁদেছি ওগুলোর জন্যে। ছুটে গিয়ে কুড়িয়ে নিতে নিতে বলল, আমার টিনা, আমার রুবি, আমার শেলিতোমরাও কেঁদেছ, না? ...পিটার দুষ্টুটাও আছে দেখি, খেলনা ভালুকটাকে আদর করল সে। এ কি! জেনির পেট কে কাটল! হায় হায়!
কাটা পুতুলটাকে তুলে নিল ডল।
প্রমাদ গুণল কিশোর। এমন জানলে কি আর ফেলে রাখে ওখানে। তাড়াতাড়ি ঢলের পাশে এসে বুঝিয়ে বলল, আমিই কেটেছি। ওকে না কাটলে তোমাকে বের করে আনা যেত না...
কেন, যেত না কেন?
ওকে কেটে সূত্র বের করার চেষ্টা করেছি আমরা।
সূত্র তো বের করে গোয়েন্দারা। মা বলেছে আমাকে।
আমরা গোয়েন্দা।
চোখ বড় বড় হয়ে গেল ডলের। জেনির শোক ভুলে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, তোমরা গোয়েন্দা! কি মজা! তোমাদের সঙ্গে দেখা হয়ে ভাল হলো। ইস্কুলের সবাইকে গিয়ে বলতে পারব। ...আমার খিদে পেয়েছে। খাবার দাও।
হাঁপ ছেড়ে বাঁচল কিশোর। দাঁড়াও, এখনই দিচ্ছি।
খাবারের টিন কাটতে বসল রবিন। একটিন স্যামন, দুই টিন পিচ, একটিন দুধ কেটে রেখে, বড় একটা রুটি টেনে নিয়ে স্লাইস করল। মাখন মাখাল। বড় এক জগ কোকা গুলল।
খেতে বসল সবাই। গপ গপ করে গিলতে লাগল ডল। আস্তে আস্তে গালের ফ্যাকাসে ভাব কেটে গিয়ে গোলাপী হয়ে উঠল।
কিশোর জিজ্ঞেস করল, ডল, এখানে কি করে এলে তুমি, বলতে পারবে?
আমার নার্সের সঙ্গে বাগানে খেলছিলাম আমি। আমার দুধ আনতে ঘরে গেল নার্স। হঠাৎ একটা লোক দেয়াল টপকে ঢুকে, আমার গায়ে একটা কম্বল ফেলে

দিল। সেটা দিয়ে আমাকে জড়িয়ে তুলে নিয়ে চলে গেল। একটু পরে সাগরের ঢেউয়ের শব্দ শুনতে পেলাম। সাগর আমি চিনি। ছুটির দিনে আব্বা সৈকতে নিয়ে যায় আমাকে। আমার গা থেকে কম্বল সরিয়ে ফেলল লোকটা। তারপর একটা বোটে তুলল। একটা ঘরে বন্ধ করে রাখল দুদিন। খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম আমি। কত কাঁদলাম, কেউ শুনল না।

লোকটাকে তুমি চেনো?

না। আগে কখনও দেখিনি। এখানে আনার পর মহিলাটাকে চিনলাম। আমাদের বাড়িতে রান্না করত। মিসেস টোড। খুব খারাপ। আমার কোন কথাই শুনল না। আমাকে বের করে বাড়িতে নিয়ে যেতে বললাম। ধমক মারল। মারবে বলেও ভয় দেখাল।

হুঁ, তাহলে এই ব্যাপার! আসল কিডন্যাপার তাহলে অন্য লোক, যার একটা বোট আছে। তোমাকে কিডন্যাপ করতে তাকে সাহায্য করেছে টোডেরা। তোমাকে ওদের কাছে তুলে দিয়েছে লোকটা, এখানে এনে লুকিয়ে রাখার জন্যে।

তারমানে, রবিন বলল, সেদিন যে দ্বীপে ধোঁয়া উঠতে দেখেছিলাম, ওই লোকই নেমেছিল এখানে। জায়গাটা দেখেছে। এখানে ডলকে লুকিয়ে রাখা যাবে কিনা বুঝতে চেয়েছে। শলা-পরামর্শ করেছে টোডের সঙ্গে।

ধরতে পারলে ওকে আমি দ্বীপে নামা বার করব! দাঁতে দাঁত চেপে বলল জিনা।

নাস্তা শেষ হলো।

কিশোর বলল, ডলকে থানায় নিয়ে যেতে হবে। পত্রিকাগুলো নিশ্চয় ওকে নিয়ে খবর ছেপে গরম করে ফেলেছে। পুলিশ দেখলেই চিনতে পারবে।

কিন্তু ডলকে বের করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে শুনলেই তো পালাবে টোডেরা। একেবারে নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে, রবিন বলল। ওদের ধরা দরকার।

দেখি, বুদ্ধি একটা বের করেই ফেলব।

চলো তাহলে, মুসা বলল। দেরি করে লাভ কি?

এখানে আমার খুব ভাল লাগছে, ডল বলল। গুহাটা খুব সুন্দর। আমার থাকতে ইচ্ছে করছে। আমাকে রেখে তোমরা আবার এখানে আসবে?

হাসল জিনা। আসব। কেন?

আমিও আসব তোমাদের সঙ্গে। উত্তেজনায় জ্বলজ্বল করছে তার চোখ। কোনদিন গুহায় থাকিনি তো, থাকতে ইচ্ছে করছে। কি সুন্দর গুহা, দ্বীপ, রাফির মত ভাল কুকুর...জিনাআপু, আমি তোমার মত প্যান্ট-শার্ট পরে আসব।

লও ঠ্যালা! চট করে কিশোরের দিকে তাকাল মুসা। চোখে চোখে কথা হয়ে গেল। মুচকি হাসল তিন গোয়েন্দা।

কিন্তু তোমার আব্বা-আম্মা তো তোমাকে আসতে দেবে না, জিনা বলল। তবু, বলে দেখতে পারো। তুমি এলে আমাদের কোন আপত্তি নেই। বরং মজাই হবে। তুমি খুব ভাল মেয়ে।
রতনে রতন চেনে, ফস করে বলে ফেলেই জিভ কামড়াল মুসা।
ভুরু কোঁচকাল জিনা, কি বললে?
না, কিছু না, আরেক দিকে তাকিয়ে বলল মুসা।
জিনা রেগে গেলে কি পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে বলা যায় না। তাড়াতাড়ি রবিন বলল, বসে আছি কেন আমরা এখনও, যেতে হবে নাঃ..
খাঁড়ির গুহা থেকে নৌকাটা বের করা হলো। সেটা দেখে আরও উত্তেজিত হয়ে উঠল ডল। বার বার বলতে লাগল, যে ভাবেই হোক, এই দ্বীপে সে ফিরে আসবেই।
নৌকায় উঠল সবাই। পঁাড় তুলে নিল মুসা ও জিনা।
অবাক হয়ে ডল বলল, জিনাআপু, তুমি নৌকাও চালাতে পারো! দাঁড়াও, আমি তোমার কাছে দাঁড় বাওয়া শিখব।

.

ঘাটের কাছেই দেখা হয়ে গেল জেলের ছেলে ফগের সঙ্গে। জিনার নৌকাটা দেখে দৌড়ে এসে ওটা তীরে টেনে তুলতে সাহায্য করল।
আমি এখনই রওনা হতাম, বলল সে। দ্বীপে যেতাম, তোমাদের খবর দেয়ার জন্যে। মাস্টার জর্জ, তোমার আব্বা চলে এসেছেন। কাল রাতে। তোমার আম্মা আসেননি। তবে তার শরীর এখন অনেক ভাল, তোমার আব্বাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। ছয়-সাতদিনের মধ্যেই বাড়ি চলে আসবেন।
আব্বা এসেছে কেন? জানতে চাইল জনা।
আসবেন না? তোমাদের কাছে টেলিফোন করেন, কেউ ধরে না। চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলেন। আমার কাছে তোমাদের খবর জানতে এসেছিলেন। আমি বলিনি। কি রাগা যে রেগেছেন তোমাদের ওপর। বাড়ি ফিরে দেখেন, জিনিসপত্র সব তছনছ। তোমরা নেই, টোডেরা নেই। এখন গেছেন থানায়, রিপোর্ট করতে।
ভাল হয়েছে, ওখানেই দেখা হবে আমাদের সঙ্গে। আমার কথায় কান না দিয়ে মিসেস টোডকে বিশ্বাস করার ফল তো পেল। আক্কেল হয়েছে।
ডলকে জিনাদের সঙ্গে দেখে খুব অবাক হয়েছে ফগ। বার বার তার দিকে তাকাতে লাগল।
জিনা বলল, সব তোমাকে বলব, ফগ। এখন সময় নেই। আমরাও থানায় যাচ্ছি।
সারি দিয়ে থানার গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকল গোয়েন্দাদের বিচিত্র দলটা। গেটে ডিউটিরত সেন্ট্রি ওদের চেনে। ভুরু কুঁচকে তাকাল। কি ব্যাপার, জিনা? তোমার

আব্বা এল একটু আগে, তুমিও…।
জবাব না দিয়ে জিজ্ঞেস করল জিনা, আব্বা কোথায়?
শেরিফের রুমে।
আর কিছু বলার প্রয়োজন মনে করল না জিনা। সোজা এসে ঢুকল শেরিফের ঘরে।
দরজা খোলার শব্দে ফিরে তাকালেন মিস্টার পারকার। লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। এসেছ, না! ছিলে কোথায়? বাড়িঘর সব খালি ফেলে..ডাকাতি করে তো সব নিয়ে গেছে…
করেছে তো তোমার সেই অতি বিশ্বাসী বেঙের দল
কার দল!
বেঙ, বেঙ! বাবার ওপর প্রচণ্ড অভিমানে খেপে আছে জিনা। টোড মানে যে বেঙ, ভুলে গেছ!…জাহান্নামে যাক ঘরবাড়ি! আম্মা কেমন আছে, বলো!
ভাল। আগের চেয়ে অনেক ভাল, জিনাকে রেগে উঠতে দেখে শান্ত হয়ে গেলেন মিস্টার পারকার। জিনা যেমন তাকে ভয় পায়, তিনিও তাকে ভয় পান। ও রেগে গেলে ওর মা ছাড়া আর কেউ ঠাণ্ডা করতে পারবে না, জানেন। ঝামেলার মধ্যে গেলেন না। বসে পড়লেন আবার। তোমার মা-ই তো আমাকে পাগল করে দিল। আসতে বাধ্য করল। খালি এককথা, ছেলেমেয়েগুলো কেমন আছে, কি খাচ্ছে না খাচ্ছে…আমি এদিকে ফোন করে জবাব পাই না। তাকে কি জবাব দেব? মিথ্যেই বলতে হলো, ভাল আছ। কিন্তু কত আর মিথ্যে বলা যায়। শেষে দেখতে এলাম। এসে তো দেখি এই অবস্থা। ছিলে কোথায়?
দ্বীপে। কিশোরের মুখেই সব শোনো।
বাপ-মেয়ের এই ঝগড়া খুব উপভোগ করেন শেরিফ লিউবার্তো জিংকোনাইশান। জিনার বাবার বন্ধু তিনি, বাড়িতে যাতায়াত আছে। মুচকি মুচকি হাসছেন।
পাল্লা আবার ঠেলে খুলে ডাক দিল জিনা, কিশোর, এসো।
নাটকীয় ভঙ্গিতে ডলের হাত ধরে ঘরে ঢুকল গোয়েন্দাপ্রধান। পেছনে তার দলবল।
ডলকে দেখে হাঁ হয়ে গেলেন শেরিফ। লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। একে কোথায় পেলে! এই খুকি, তুমি ডরোথি না?
ডরোথি হুবার্টসন, জবাব দিল সে। আম্মা ডাকে ডল।
খোদা! পুরো এলাকা চষে ফেলেছে পুলিশ, হন্যে হয়ে খুঁজছে একে, আর ও নিজেই এসে হাজির।
কি বলছ, কিছুই তো বুঝতে পারছি না! অবাক হয়ে মেয়েটার দিকে তাকাচ্ছেন মিস্টার পারকার। কেন খুঁজছ?

খবরের কাগজ পড়ো না নাকি…
না, কদিন ধরে পড়তে পারছি না..জিনার মাকে নিয়েই ব্যস্ত…
এ জন্যেই জানো না। কোটিপতি হুবার্টসনের মেয়ে ও। সাংঘাতিক প্রভাবশালী লোক। গরম করে ফেলেছে সব। ধমক দিয়ে দিয়ে অস্থির করে ফেলেছে আমাদের। মেয়েটাকে কিডন্যাপ করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। নোট পাঠিয়েছে, দশ লক্ষ ডলার দিলে ফিরিয়ে দেয়া হবে।…কিশোর, তোমরা একে পেলে কোথায়?
জিনার দ্বীপে, শান্তকণ্ঠে জবাব দিল কিশোর।
ছেলেমেয়েদের বসতে বললেন শেরিফ। একজন সহকারীকে ডাকলেন নোট নেয়ার জন্যে।
গোড়া থেকে সমস্ত কাহিনী বলে গেল কিশোর। কিছুই বাদ না দিয়ে। লিখে নিল শেরিফের সহকারী।
শুনতে শুনতে এমন অবস্থা হলো মিস্টার পারকারের, কোটর থেকে যেন ছিটকে বেরিয়ে আসবে চোখ।
শেরিফ জিজ্ঞেস করলেন, যে বোটটা দিয়ে আনা হয়েছে ডলকে, সেটার ক্যাপ্টেনের নাম কি?
বলতে পারব না, মাথা নাড়ল কিশোর। টেরি কেবল বলেছে, তার মাকে নাকি মারিয়া নামটা বলতে শুনেছে।
মারিয়া! ঠিকই সন্দেহ করেছিলাম, জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে চেয়ারে হেলান দিলেন শেরিফ। পুলিশের খাতায় নাম আছে ওটার, বদনাম। ক্যাপ্টেনের নাম হিউগো ব্রোকার, মারিয়া তার বোটের নাম। ডাকাতির দায়ে জেল খেটেছে বহুবছর হিউগে। বেরিয়েই আবার শুরু করেছে। টোডদের সঙ্গে জোট পাকিয়ে মেয়েটাকে তুলে নিয়ে গেছে। কদিন ধরে এদিকের সাগরে তার বোটটাকে ঘোরাফেরা করতে দেখা গেছে, রিপোর্ট পেয়েছি। কিডন্যাপের খবরটা শুনেই সন্দেহ হয়েছিল আমার, তার কাজ হতে পারে। হলোও তাই।
ওকে ধরা দরকার, কিশোর বলল। টোডদেরকেও।
বোটটা আটকানো কোন ব্যাপারই না। এখনই অর্ডার দিয়ে দিচ্ছি, আমি। টোডরাও পালাতে পারবে না। কিন্তু ওরা তো সব অস্বীকার করবে। প্রমাণ করব কি করে এই কিডন্যাপিঙে ওরা জড়িত?
আমরা সাক্ষি দেব। তবে স্বীকারোক্তির সহজ একটা পথ আমি বাতলে দিতে পারি…
কিশোরের দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচালেন শেরিফ, কি ভাবে?

চমকে দিয়ে। ওদের ছেলেকে পাতালঘরে আটকে রেখে এসেছি আমরা। সেই খবরটা কোনভাবে ওদের কানে তুলে দিতে হবে। ওরা তখন ছেলেকে বের করে আনতে পাতালঘরে নামবে। ডলকে যে নিয়ে এসেছি। আমরা, সেটা ওদেরকে জানানো হবে না। ওখানে ছেলেকে দেখে, ভীষণ চমকে যাবে ওরা। ডল কোথায় জিজ্ঞেস করবে। কাছেই লুকিয়ে থাকবে পুলিশ। আড়াল থেকে সব শুনবে। পুলিশ অফিসারের সাক্ষি নিশ্চয় আদালত গ্রহণ করবে।
দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইলেন শেরিফ। হাসি ফুটল মুখে। ধীরে ধীরে চওড়া হলো হাসিটা। প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে দিলেন তাঁর সহকারীকে।
পুলিশকে সহায়তা করার জুন্যে বার বার ছেলেমেয়েদের ধন্যবাদ দিলেন তিনি। হাত বাড়ালেন ফোনের দিকে, ডলের বাবাকে খবর জানানোর জন্যে।
জিনার দিকে তাকিয়ে মিস্টার পারকার জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি বাড়ি ফিরে যাবে?
গিয়ে আর কি করব এখন? কাজের মানুষ নেই, কিছু নেই...
আইলিনকে খবর পাঠিয়েছি। ও আজই চলে আসবে।
আম্মা না আসা পর্যন্ত আমরা দ্বীপেই থাকতে চাই, আব্বা। আম্মার ঘর খালি দেখলে ভাল লাগে না আমার। আইলিন যখন আসছে আর তো কোন চিন্তা নাই। ঘরদোর সে-ই দেখেশুনে রাখবে।
রাজি হয়ে গেলেন পারকার, বেশ। তবে তোমার আম্মা আসার পর আর একদিনও দেরি করতে পারবে না।
দেরি করব মানে? তাকে দেখার জন্যে পাগল হয়ে আছি আমি।
খবর পাবে কি করে?
হাসল জিনা। সে তোমাকে ভাবতে হবে না। আম্মা আসার সঙ্গে সঙ্গে খবর পৌঁছে যাবে আমার কাছে।
পারকারের দিকে তাকিয়ে হাসলেন শেরিফ। গোয়েন্দাগিরি করে ওরা, ভুলে যাচ্ছ কেন, জনাথন। একআধজন স্পাই থাকবে না, এটা কি হয়?

.

সবাইকে নিয়ে বাড়ি ফিরে এলেন মিস্টার পারকার। ডল ইচ্ছে করেই চলে এসেছে তাদের সঙ্গে। শেরিফকে অনুরোধ করে এসেছে, তার বাবা-মা এলে যেন গোবেল ভিলায় পাঠিয়ে দেন।
হাসিমুখে বাগানের গেট খুলে দিল আইলিন। জরুরী তলব পেয়ে ছুটতে ছুটতে চলে এসেছে। কি ব্যাপার, কিছুই জানতে চাইল না। সবাইকে হাত মুখ ধুয়ে এসে আগে খেতে বসতে বলল, রান্না শেষ।

খুশিতে তাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে ইচ্ছে করল ছেলেমেয়েদের। গোবেল বীচে আসার মজা এতদিনে আরম্ভ হয়েছে।
খেতে খেতে আইলিনকে তাদের অ্যাডভেঞ্চারের গল্প শোনাল ওরা।
অবাক হলো না আইলিন। এরকম অ্যাডভেঞ্চার অনেক করেছে ওরা। এসব দেখতে দেখতে গা-সওয়া হয়ে গেছে তার।
হঠাৎ জানালার বাইরে চোখ পড়ল রবিনের। মুখের কাছে থেমে গেল চামচ। পাতাবাহারের বেড়ার ওপাশে উঁকিঝুঁকি মারছে একজন লোক।
এই, দেখো দেখো!
মুখ ফিরিয়ে তাকিয়েই মুসা বলে উঠল, খাইছে! বড়-বেঙটা এখানে কি করছে।
লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। তোমরা বসো এখানে। আমি আসছি। ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে।
বেড়ার কাছে এসে ডাক দিল, মিস্টার টোড, শুনুন। টেরিকে খুঁজছেন?
চমকে গেল টোড। তাকিয়ে রইল কিশোরের দিকে। কথা খুঁজে পাচ্ছে না।
দুর্গের নিচে পাতালঘরে আছে ও, জানাল কিশোর। গেলেই পাবেন।
তাকাও এদিকে!ওর কথা তুমি জানলে কি করে? ছিলে কোথায় এ কদিন? বাড়ি যাওনি?
ওসব আপনার জানার দরকার নেই। টেরিকে পেতে চাইলে দ্বীপে চলে যান। পাতালঘরে আটকা পড়ে কান্নাকাটি করছে বেচারা।
চোখে চোখে তাকাল টোড। কিশোরের মনে কি আছে বোঝার চেষ্টা করল। তারপর ঘুরে হাঁটতে শুরু করল।
দৌড়ে ঘরে ফিরে এল কিশোর, থানায় ফোন করার জন্যে। সে নিশ্চিত, মিসেস টোডকে গায়ের ভেতর কোথাও রেখে এসৈছে টোড, টেরিকে খুঁজতে খুঁজতে নিজে চলে এসেছে এখানে। কিশোরদের এখানে দেখতে পাবে কল্পনাও করেনি। এখন গিয়ে মিসেসকে বলবে সব, যত তাড়াতাড়ি পারে চলে যাবে। দ্বীপে, টেরিকে বের করে নিয়ে পালানোর চেষ্টা করবে।
খাওয়া শেষ করেই মিস্টার পারকার বললেন, হাসপাতালে চলে যাচ্ছেন। তিনি। খবর জানার জন্যে অস্থির হয়ে অপেক্ষা করছেন জিনার আম্মা।
তাকে বলব, পারকার বললেন, দ্বীপে চলে গেছ তোমরা। খুব ভাল আছ। তবে তোমাদের অ্যাডভেঞ্চারের কথা এখন বলা যাবে না, দুশ্চিন্তা করতে পারে। বাড়ি এলেই বলব সব।
গাড়ি নিয়ে চলে গেলেন তিনি।
তখুনি দ্বীপে চলে যাবে কিনা, এ নিয়ে আলোচনা শুরু করল। গোয়েন্দারা। যেতে কোন বাধা নেই, অসুবিধে হলো ডলকে নিয়ে। তাকে কি করবে বুঝতে পারছে না।

সমস্যাটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে ওরা, এই সময় বিরাট একটা গাড়ি এসে থামল গেটের বাইরে। লাফ দিয়ে নামলেন লম্বা একজন ভদ্রলোক, সঙ্গে খুব সুন্দরী একজন মহিলা।
জিনা বলল, ডল, দেখো তোমার আব্বা-আম্মা বোধহয় এলেন।
.
আদরের চোটে দম বন্ধ হয়ে আসার জোগাড় হলো ডলের। জোর করেই শেষে বাবা-মা দুজনের কাছ থেকে সরে এল।
তাঁদেরকে জানানো হলো সব। মিনিটে অন্তত বিশবার করে গোয়েন্দাদেরকে ধন্যবাদ দিতে লাগলেন মিস্টার হুবার্টসন, তাতেও যেন মন ভরছে না, আরও বেশি করে দিতে চাইছেন।
যে কোন একটা পুরস্কার চাও তোমরা, বললেন তিনি। যা ইচ্ছে। কি খুশি যে হয়েছি আমি তোমাদের ওপর, বলে বোঝাতে পারব না।
আপনি যে খুশি হয়েছেন, এতেই আমরা খুশি, কিশোর বলল, এটাই আমাদের পুরস্কার। ডলকে শয়তানদের হাত থেকে বের করে আনতে পেরেছি, আর কি চাই।
কিন্তু আমার কাছ থেকে তোমাদের কিছু নিতেই হবে!
কি যেন ভাবছে জিনা। তার গা ঘেঁষে বসে আছে ডল। বাবা-মায়ের অলক্ষ্যে কনুই দিয়ে গুঁতো মারল জিনার পেটে।
সত্যিই দিতে চান? হঠাৎ প্রশ্ন করল জিনা।
চাই! কি চাও, বলো?
দেবেন তো?
দেব।
বেশ, ডলকে কয়েক দিন আমাদের সঙ্গে দ্বীপে থাকতে দিন।
থমকে গেলেন হুবার্টসন। বলো কি! কিডন্যাপ করে নিয়ে গেল...এতদিন পর ফিরে পেলাম মেয়েকে, ছেড়ে দেব... না দেখে থাকব কি করে?
আব্বা, তুমি কথা দিয়েছ ওদেরকে, যা চায় দেবে। ছুটে এসে বাবার হাত চেপে ধরল ডল, আব্বা, আমাকে থাকতে দাও! দ্বীপটা যে কি সুন্দর। আর গুহাটা, উফ! দাও না, আব্বা! ওখানে যা একটা দুর্গ আছে না, মাটির নিচে ঘর...
রাফিকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব আমরা, সুপারিশ করল রবিন, কোন ভয় নেই। বড় বড় চোর-ডাকাতকেও ঘায়েল করে ফেলতে পারে সে। ডলের কিছু করতে পারবে না কেউ। কি রে রাফি, পাহারা দিয়ে রাখতে পারবি না?
মাথা দোলাল রাফি। বলল, হাউ!

অবশেষে রাজি হলেন হুবার্টসন, এক শর্তে দিতে পারি। কাল আমি আর তোমার আম্মা দ্বীপে যাব দেখতে, জায়গাটা সত্যি থাকার মত কিনা। দিনটা তোমাদের সঙ্গে কাটাব। আমাদেরকে উৎপাত মনে করা চলবে না।
করব না আব্বা, করব না! খুশিতে হাততালি দিয়ে উঠল ডল। বাপের গা বেয়ে কোলে উঠে চপাৎ চপাৎ করে চুমু খেলো দুই গালে।
কিশোর জিজ্ঞেস করল, আপনারা তো নিশ্চয় হোটেলে উঠবেন? ডল তাহলে আমাদের কাছেই থাক, নাকি?
এতক্ষণে কথা বললেন ডলের আম্মা, সঙ্গে নিতে পারলেই খুশি হতাম। কিন্তু তোমাদের অখুশি করি কি করে। ঠিক আছে, থাক… হাসলেন তিনি।
গোয়েন্দাদের আরও কয়েকবার ধন্যবাদ জানিয়ে, গুডবাই জানিয়ে বেরিয়ে গেলেন ডলের আব্বা-আম্মা।
মিনিটখানেক পর দরজায় টোকা পড়ল।
খুলে দিল জিনা। দেখে, একজন পুলিশ অফিসার দাঁড়িয়ে আছেন। বললেন, একটু আগে নৌকা নিয়ে দ্বীপে রওনা হয়েছে টোডরা। আমিও যাব। দ্বীপে ঢোকার রাস্তা চিনি না, পথটাও নাকি ভাল না শুনেছি। মিস জর্জিনা, তুমি তো সবচেয়ে ভাল চেনো। এলে ভাল হত।
আমি মাস্টার জর্জ, নট মিস জর্জিনা, গম্ভীর হয়ে বলল জিনা।
মুহূর্তের জন্যে অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন পুলিশ অফিসার। সামলে নিয়ে বললেন, সরি, মাস্টার জর্জ। তো, আসবে?
খুশি হয়েই আসব। তবে একা নয়। আমার বন্ধুদেরও নিতে হবে।
কোন অসুবিধে নেই। এসো।
জিনার বোটে করে চলল সে আর তার বন্ধুরা। অফিসারও চললেন সেটাতে করেই। পেছনে বেশ কিছুদূর থেকে ওদেরকে অনুসরণ করে এল পুলিশের বোট।
দ্বীপের একটা ধারে নৌকা নিয়ে এল জিনা, যেখান দিয়ে ডাঙায় উঠতে কষ্ট হয়, তবে ওঠা যায়। সহজ পথ গোপন সৈকতটা অফিসারকে চেনাল না। ওটা ওদের নিজস্ব বন্দর।
টোডরা নামল ভাঙা জাহাজটার কাছ দিয়ে ঘুরে গিয়ে, যেখানে ওরা নেমেছে এ কদিন। পুলিশকে দেখতে পেল না।
অফিসারকে নিয়ে নিঃশব্দে দুর্গের কাছে চলে এল গোয়েন্দারা।
সিঁড়িমুখে আগে নামল জিনা। টর্চ হাতে আগে আগে চলল। পেছনে
পুরো দলটা। এখানকার গলিঘুপচি সবচেয়ে বেশি চেনে সে।
যে ঘরটায় আটকে রেখে গেছে টেরিকে, সেখানে এসে দেখল, দরজা। বন্ধই আছে। খিল লাগানো।

ফিসফিস করে কিশোর বলল, টোডরা এখনও আসেনি। লুকিয়ে পড়তে হবে।
লুকানোর জায়গার অভাব নেই। প্রচুর থাম আছে, দেয়াল আছে।
রাফিকে চুপ থাকতে বলল জিনা।
কয়েক মিনিটের বেশি অপেক্ষা করতে হলো না। কথা বলতে বলতে আসছে টোডরা।
টেরিকে যদি ওখানে সত্যি আটকে রাখে, মিসেস টোড বলছে, যে রেখেছে, তার কপালে খারাপি আছে। দেখে নেব আমি! কিন্তু আটকাল কে, বলো তো? মেয়েটাই বা তাহলে কোথায়? আমার কি মনে হয় জানো, বস আমাদের সঙ্গে বেঈমানী করেছে। আমাদের যে দশ হাজার ডলার দেবে বলেছিল, দেবে না। বোটে যে তল্লাশি চালাবে পুলিশ, বুঝে গিয়েছিল। সে জন্যেই সরিয়ে ফেলেছিল মেয়েটাকে। পুলিশ দেখেটেখে সন্দেহমুক্ত হয়ে চলে গেছে। ও এসে চুরি করে নিয়ে গেছে মেয়েটাকে। মাঝখান থেকে আমার ছেলেটাকে আটকে রেখে গেছে। আমি বসকে ছাড়ব না!
কি করবে? খসখসে গলায় বলল টোড, ওর সঙ্গে পারা যাবে না। কিন্তু আমি ভাবছি, কিশোর ছেলেটা জানল কি করে টেরি কোথায় আছে? মাথায়ই কিছু ঢুকছে না আমার!
ঘরে ঢুকল ওরা। বন্ধ দরজার দিকে এগোল। পায়ে পায়ে রয়েছে ডারবি। লুকিয়ে থাকা গোয়েন্দাদের গন্ধ পেয়ে মৃদু গোঁ গোঁ করে উঠল।
লাথি মেরে ওকে সরিয়ে দিল টোড। শয়তান কুত্তা, কাজের কাজ কিচ্ছু নেই, খালি ভয়ে কেঁৎ-কোৎ করে!
বাবার গলা শুনেই ভেতর থেকে ককিয়ে উঠল টেরি, বাবা! এসেছ! জলদি খোলো! মরে গেলাম!
পাল্লার ওপর গিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল মিসেস টোড। টান দিয়ে খুলে ফেলল খিল।
মাকে এসে জড়িয়ে ধরল টেরি। হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করল।
কে রেখে গেছে তোকে এখানে! জলদি বল! তোর বাবা ওদের গুলি করে মারবে!
মারবে না, জন? ছোট্ট একটা দুধের শিশুকে এভাবে আটকে রেখে যায়, কোন শয়তান! মায়াদয়া নেই প্রাণে!
থামের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন পুলিশ অফিসার। টর্চের আলো ফেললেন টোডের মুখে। এমন চমকান চমকাল দুই টোড, যেন ভূত দেখেছে।
ঠিকই বলেছ, ডোরিয়া টোড, ভারি গলায় বললেন তিনি, একটা দুধের শিশুকে এভাবে আটকে রেখে যাওয়াটা শয়তানের পক্ষেই সম্ভব, যাদের প্রাণে বিন্দুমাত্র মায়াদয়া নেই। তোমরা সেই শয়তান, তাই না? ডলের মত একটা শিশুকে এনে

আটকে রেখেছিলে, টাকার লোভে। তারপর তাকে একা ফেলে রেখে চলে গিয়েছিলে। একবারও ভাবনি, বাচ্চাটা এরকম জায়গায় একা থাকবে কি করে।
মাছের মত নিঃশব্দে মুখ হাঁ করে আবার বন্ধ করল মিসেস টোড। কথা। আটকে গেছে।
ফাঁদে আটকা পড়া ইঁদুরের মত চি-চি করে উঠল টোড, তাকাও এদিকে!
চার বছরের শিশুর মত কাঁদতে শুরু করল টেরি। এত্তবড় ছেলেকে এভাবে কাঁদতে দেখে ঘৃণায় আরেকবার মুখ বাকাল গোয়েন্দারা।
হঠাৎ ওদের ওপর চোখ পড়তেই হিসিয়ে উঠল মিসেস টোড, তোমরা! মেয়েটাও আছে দেখি! ও, তাহলে বসকে খামোকা দোষ দিয়েছি। সব শয়তানি তোমাদের! টেরিকে কে আটকেছিল, বলো, জলদি বলো!
থানায় চলে আগে, ধমকের সুরে বললেন অফিসার, সব প্রশ্নের জবাব পাবে।
টোডের পিস্তলটা কেড়ে নিলেন তিনি।
আর কিছু করার নেই। বাধ্য হয়ে তার সঙ্গে যেতে হলো টোডদের।
ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে টেরি। বুঝতে পারছে, তার মা আর বাবাকে জেলে দেয়া হবে। তাকে পাঠানো হবে হয়তো কোন কঠিন স্কুলে, যেখানকার নিয়ম-কানুন ভীষণ কড়া। কত বছর বাবা-মায়ের সঙ্গে দেখা হবে না, জানে না। ওদের কাছ থেকে আলাদা হয়ে যাওয়াটা এক হিসেবে ভালই হবে ওর জন্যে, স্কুলে গেলে অন্তত মানুষ হওয়ার সুযোগ পাবে, কাছে থাকলে, যেটা হত না। ক্রিমিন্যালই হত বাবা-মার মত।
বাইরে বেরিয়ে অফিসারকে বলল কিশোর, আমাদের আর সঙ্গে যাওয়ার দরকার নেই নিশ্চয়। টোডদের বোটে করেই চলে যেতে পারবেন।
কুত্তাটাকেও নিয়ে যান, জিনা বলল। ওই নোংরা জানোয়ার আমার দ্বীপে রাখব না।
টোডদের নৌকাতেই তোলা হলো ওদেরকে। বলতে হলো না, টেরিকে উঠতে দেখেই লাফিয়ে তাতে চড়ে বসল ডারবি। রাফির জ্বলন্ত দৃষ্টির কাছ থেকে দূরে যেতে পারলে বাঁচে সে।
পুলিশের বোটের সঙ্গে নৌকাটা বাঁধা হলো, টেনে নিয়ে যাবে।
ঠেলা দিয়ে নৌকাটা পানিতে নামিয়ে দিল তিন গোয়েন্দা।
হাত নেড়ে বিদায় জানাল মুসা, বিদায় জনাব বেঙ, জেলে গিয়ে আবার কোনও বাচ্চাকে কিডন্যাপ করার প্ল্যান করুন। বিদায় জনাবা বেঙনি, বেঙাচিকে কোলে বসিয়ে রাখবেন, যাতে আরও বেশি করে কাঁদতে পারে সে। বিদায় বেঙচি, স্কুলে গিয়ে মন দিয়ে পড়াশোনা করে ভাল ছেলে হওয়ার চেষ্টা কোরো। বিদায় ডার্টি,

তীরে নেমেই ভাল করে আগে গোসল করে নিবি। তোর গন্ধ রাস্তার কুত্তাও সহ্য করবে না, দূর দূর করে খেদাবে।
মুসার কথা আর বলার ভঙ্গি দেখে পুলিশরাও হাসতে শুরু করল।
হাত নেড়ে বিদায় জানালেন পুলিশ অফিসার।
গোমড়া মুখে নৌকায় বসে আছে দুই টোড, চোখ নামানো, তাকাতে পারছে না কারও দিকে।
পাহাড়ের একটা মোড়ের ওপাশে অদৃশ্য হয়ে গেল বোট দুটো।

ভলিউম ২৮ – ডাকাতের পিছে – তিন গোয়েন্দা – রকিব হাসান – সেবা প্রকাশনী
প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর, ১৯৯৫
ঝটকা দিয়ে খুলে গেল রান্নাঘরের দরজা। দড়াম করে বন্ধ হলো। গটমট করে ভেতরে ঢুকলেন। মিসেস আমান। চোয়াল কঠিন। ঠোঁটের সঙ্গে ঠোঁট চেপে বসা। হ্যান্ডব্যাগটা টেবিলে ছুঁড়ে ফেলে ধপ করে বসে পড়লেন চেয়ারে।
আর সহ্য হয় না এই অত্যাচার! কপাল চাপড়ে বললেন তিনি। ইচ্ছে করছে গুলি করে শেষ করে দিই। তারপর আমার জেল-ফাঁসি যা হয় হোক!
কি হয়েছে, মা? শঙ্কিত হয়ে উঠেছে মুসা।
কি আর! তোর নানা! আবার একটা অঘটন ঘটিয়েছে!
আবার কি করল?
জ্বলন্ত দৃষ্টিতে প্রথমে মুসার দিকে তাকালেন মিসেস আমান। তারপর একে একে তার দুই বন্ধু কিশোর আর রবিনের দিকে। ডাইনিং টেবিলে বসে বিস্কুট খাচ্ছে ওরা।
পানি ছিটানোর জন্যে একটা ফোয়ারা বসিয়ে দিয়ে এসেছে গির্জার হলরুমে। নতুন ধরনের একটা স্প্রিঙ্কলার সিসটেম। ঘর ধোয়ার জন্যে। ভালমানুষী করে দান করেছে। করেছে, ভাল কথা, কিন্তু সেই সঙ্গে নিজের আরও একখান আবিষ্কার লাগিয়ে দিয়ে এসেছে। ফোয়ারা চালু করার একটা যন্ত্র। সুইচ টিপলে হালকা ধোয়া তৈরি করে যন্ত্রটা, সেই ধোয়া গিয়ে লাগে সিসটেমে, চালু হয়ে যায়। তাতেই হয়েছে সর্বনাশ। হলঘরটা ভাড়া নিয়ে মহিলারা ফ্যাশন শো করছিল। এই সময় জ্বালানো সিগারেট নিয়ে সেখানে ঢুকে পড়লেন পাদ্রী সাহেব। ব্যস, কোন দিক থেকে যে কি ঘটে গেল, ভিজে চুপচুপে হয়ে গেল ঘরের সমস্ত লোক। ফ্যাশন শো মাথায় উঠল। মোটা টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি করে বসেছে কোম্পানি। টাকাটা বাবাকে দিতে হবে। হুমকি দিয়েছে, নইলে কেস করে দেবে তার নামে। বাজারে গিয়েছিলাম। মিসেস গিলবার্ট আমাকে এ খবর জানাল। কেন বাপু, দুনিয়ায় এত জিনিস থাকতে ধোয়াকে ট্রিগার করার কুবুদ্ধি কেন? আর কি কিছু ছিল না?
হাসি দমন করার অনেক চেষ্টা করেও পারল না মুসা। বলল, নানা হয়তো ভেবেছিল এখন দুনিয়া জুড়ে সিগারেট বিরোধী আন্দোলন চলছে, ধোয়া কোন সমস্যা নয়। তা ছাড়া গির্জার ভেতর তো কেউ সিগারেট খায় না। স্বয়ং পাদ্রী সাহেবই যে এই কাণ্ডটা করে বসবেন, তা কি আর নানা ভেবেছিল।
দেখ, অত হাসবি না! গুরুত্ব বোঝার চেষ্টা কর! ধমকে উঠলেন মিসেস আমান। কিন্তু বেশিক্ষণ তিনিও গভীর থাকতে পারলেন না। ঠোঁটের কোণে হাসি দেখা দিল। আর ঠেকানো গেল না ছেলেদের। হাসির রোল পড়ে গেল।

কিশোর বলল, কাজটা তিনি ভালই করতে গিয়েছিলেন। দোষটা তো। পাদ্রী সাহেবের।
মোটেও তা নয়, আবার গম্ভীর হয়ে গেলেন মিসেস আমান। দোষটা আমার বাবারই। অত সেনসিটিভ একটা ট্রিগার কেন বানাতে গেল? আর সেটা বসাতেই বা গেল কেন ওরকম একটা জায়গায়, যেখানে পাবলিক মীটিঙ চলে? প্রার্থনার সময় কেউ খায় না বটে, কিন্তু অন্য অনুষ্ঠান চলার সময় যে কেউ সিগারেট খেতে পারে ওখানে। সরকারী চাকরিতে যতদিন ছিল, ভাল। ছিল। অকাজ করার সময় পেত না তখন। রিটায়ার করার পরই ধরেছে। ভূতে। খালি আবিষ্কারের চিন্তা। উদ্ভট সব ভাবনা মাথায় ঘোরে। একবার বানাল তেরপলের ছাতওয়ালা একটা বাড়ি। ভাজ করে সরিয়ে রাখা যায় ওই ছাত। কিন্তু তার নিচে আর বাস করার সাধ্য হলো না কারও। টানা-হেঁচড়ায় এত ছিদ্র হয়ে গেল, বাইরে বৃষ্টি পড়ার আগেই ভেতরে পড়ে।
আবার একচোট হাসাহাসির পর মিসেস আমান বললেন, আরও কত কাণ্ড যে করেছে, যদি জানতে! সারাজীবনে জরিমানা যা দিয়েছে, সেগুলো। জমিয়ে রাখতে পারলে এখন বড়লোক থাকতাম আমরা। বাবা ভীষণ বদমেজাজী। কথায় কথায় লোকের সঙ্গে ঝগড়া বাধায়, হাতাহাতি করতেও ছাড়ে না। আমাদের বাড়ির সামনে একটা এলম গাছ আছে। কি নাকি রোগ হয়েছে ওটার, রেখে দিলে আশপাশের অন্য গাছেরও হতে পারে এই ভয়ে একদিন পার্ক ডিপার্টমেন্টের লোকেরা এসে সেটা কাটতে চাইল। বেকে বসল বাবা। কিছুতেই কাটতে দেবে না। কথা কাটাকাটি হতে হতে একসময় ঘর থেকে গিয়ে হকি স্টিক নিয়ে এল। এলোপাতাড়ি পেটানো শুরু করল। পুলিশ ধরে নিয়ে গিয়ে হাজতে ভরে দিল বাবাকে। উকিলের পেছনে অনেক টাকা খরচ করে শেষে বের করে আনা হলো। মোটা টাকা জরিমানা তো করলেনই জজ সাহেব, শাসিয়ে দিলেন, ফের এ রকম করলে জেল-জরিমানা কোনটাই আর মাপ হবে না।
চুপ করে দম নিলেন মিসেস আমান। তারপর বললেন, এখন ধরেছে নিউ ইয়র্ক যাবার বাতিক!
খাইছে! হাসি চলে গেল মুসার মুখ থেকে। রকি বীচ থেকে নাকি আর কোথাও নড়বে না?
একেবারে যাচ্ছে না তো। একটা বিশেষ কাজে যেতে চায়। তার মতে কাজটা খুবই জরুরী। কি একটা আবিষ্কার করেছে। জিনিসটা কি, এ ব্যাপারে কোন ধারণা দিতেও নারাজ। নিউ ইয়র্ক যাওয়া ছাড়া নাকি ওটার গতি করা যাবে না। অনেক ভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেছি–না গিয়ে কিছু করা যায়। কিনা, শোনে না। বলে

টেলিফোন কিংবা চিঠিতে কাজ হবে না, নিজেকেই যেতে হবে। সামনাসামনি প্রচুর আলোচনার দরকার।
গেলে যাক না। অসুবিধেটা কি?
অসুবিধে আছে। কার কাছে যাচ্ছে, কিছু জানি না। যাওয়ার পর সেই লোক যদি দেখা করতে রাজি না হয়? যদি কাউকে দিয়ে বলিয়ে দেয়-বাড়ি যান, চিঠিতে যোগাযোগ করুনগে? কাণ্ডটা কি করবে জানিস না? জোর করে ঢোকার চেষ্টা করবে!
দূর, বেশি বেশি দুশ্চিন্তা করছ তুমি।
দেখ, আমার বাপকে আমি চিনি! না শব্দটা শুনতে রাজি নয় বাবা। তার হলো বদমেজাজ। যার কাছে যাচ্ছে যদি সে দেখা করেও, বাবার ধারণার সঙ্গে একমত হতে না পারে, তাহলেও যাবে রেগে। তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে বসতে পারে।
মা, তুমি শুধু শুধু...
মুসার কথায় কান দিলেন না মিসেস আমান। আমি জানি এইই ঘটবে! খেপে গিয়ে অনর্থ ঘটাবে বাবা। ওরা তখন পুলিশ ডাকবে। মনে নেই, সৌরশক্তির সাহায্যে পানি ফুটানোর যন্ত্র আবিষ্কার করে কি গোলমালটাই না পাকিয়েছিল? ঘরের আর্দ্রতা দূর করার যন্ত্র নিয়েও একই অবস্থা। যন্ত্রটা ঠিকমতই কাজ করছিল, ভাঁজ করা ছাতের মত হয়নি। তবে বাবার আগেই নাকি ওই যন্ত্র আবিষ্কার করে বসেছিল আরেকজন। বাবা গেল খেপে। বলে। বেড়াতে লাগল, তার ফর্মুলা চুরি করেছে ওই লোক। ভাবো একবার! সেই লোক থাকে আইওয়ায়। কোথায় রকি বীচ আর কোথায় আইওয়া। এত দূরে বসে কি করে চুরিটা করল? এ সব ফালতু কথা বলার কোন মানে আছে? সেই লোকের কানে গেলে নির্ঘাত কেস ঠুকে বসত, দিত মানহানির মামলা করে।
চুপ হয়ে গেল মুসা।
পরস্পরের দিকে তাকাল কিশোর আর রবিন। বিস্কুট খাওয়া ভুলে গেছে।
মিসেস আমান বললেন, বুঝতে পারছি না, রওনা হয়েই না আরেকটা অঘটন ঘটিয়ে দেয়!
দেবে না, এদিক ওদিক মাথা নাড়ল মুসা। অর্থাৎ তাকে করতে দেয়া হবে না। তুমি কিছু ভেব না, মা। আমরা পাহারা দিয়ে নিয়ে গিয়ে তাকে প্লেনে তুলে দিয়ে আসব।
প্লেনে গেলে তো! ঠিক করেছে, মোটরগাড়িতে যাবে। নিজে গাড়ি চালিয়ে। মনটানার ভেতর দিয়ে নাকি যায়নি কখনও। ওরিগন আর ওয়াশিংটনও দেখেনি। এবার সব দেখতে চায়। আরও যুক্তি আছে, গাড়ি চালানোর সময় নাকি তার মগজ সবচেয়ে বেশি কাজ করে। তার বিশ্বাস, সাংঘাতিক কোন আবিষ্কারও করে বসতে পারে ওই সময়! এ সুযোগ। কোনোমতেই হারাতে রাজি নয়।

হেসে ফেলল মুসা। মা, এতই যখন দুশ্চিন্তা, নানার সঙ্গে তুমিও চলে যাও না কেন? ঘর নিয়ে ভেব না। আমি আর বাবা মিলে সামলে নিতে পারব।
আমি! মাথা খারাপ! ভাল করেই জানিস, বাবার সঙ্গে দশটা সেকেন্ডও বনে না আমার! গাড়িতেই খুনোখুনি বেধে যাবে! তার চেয়ে এক কাজ কর, তুইই চলে যা। বেড়াতে খারাপ লাগবে না।
চোখ বড় বড় হয়ে গেল মুসার। মা, সত্যি বলছ!
বলছি। যাওয়ার ব্যবস্থা আমি করব। তবে একটা শর্ত আছে–বাবাকে সব গোলমাল থেকে দূরে রাখতে হবে। পুলিশ তাকে ধরবে না, সে কারও মাথা ফাটাবে না, তুই সব ঠেকাবি।
আমার সাধ্যমত চেষ্টা আমি করব। কিন্তু নানাকে একা সামলানো…
খুব কঠিন, এই তো? আমিও সেটা জানি। সেজন্যেই ভাবছি, আরেক কাজ করা যেতে পারে–তোরা তিনজনেই চলে যা। ঘোষণা করলেন তিনি, তিন গোয়েন্দাকে ভাড়া করতে রাজি আছি। প্রয়োজনে খরচাপাতিও দেব। আমার বাবাকে পাহারা দিয়ে নিরাপদে নিউ ইয়র্ক পৌঁছে দিতে হবে। সেখানেও তার নিরাপত্তার দিকে লক্ষ রাখতে হবে।
হাসল কিশোর। চকলেট মেশানো বড় একটা বিস্কুটের আধখানা কামড়ে কেটে নিয়ে বলল, কিন্তু, আন্টি, আমরা গোয়েন্দা, বডিগার্ড নই।
তা ঠিক, গোয়েন্দা আর বডিগার্ড এক নয়, মেনে নিলেন মিসেস আমান। কিন্তু গোয়েন্দারা আর কোন কাজ করতে পারবে না, এমনও কোন বিধিনিষেধ নেই। বডিগার্ডই ভাবছ কেন? বেড়াতে যাচ্ছ, সেই সময়ে একজন লোকের কিছুটা খেয়াল রাখছ, এই তো। বিনিময়ে বেড়ানোর খরচটা পাবে।
বডিগার্ডের চেয়ে খারাপ, ফোড়ন কাটল মুসা, মানুষের কেয়ারটেকার। তবে গাড়িতে করে নিউ ইয়র্ক যাওয়া সত্যি লোভনীয়। এ দিক বিবেচনা করে যে কোন কাজ করতে রাজি আছি আমি। কিশোরের দিকে তাকাল সে। কি বলো?
কিশোর তাকাল রবিনের দিকে। নথি-গবেষকের মতামত চায়।
আমি রাজি, বলে দিল রবিন। মুসার নানা আমাদেরও নানা। তাঁর কেয়ারটেকার হতে আপত্তি নেই আমার।
কিন্তু নানাটা কি জিনিস ভাবতে হবে! চিন্তায় পড়ে গেছে মুসা। বেরিয়ে না শেষে পস্তাতে হয়!
কেন? ভুরু নাচাল কিশোর।
নানার কেয়ারটেকার হওয়ার চেয়ে খেপা গণ্ডারের কেয়ারটেকার হওয়া অনেক সহজ। সব কিছুতে সন্দেহ। মেজাজের ঠিকঠিকানা নেই। এই ভাল তো এই খারাপ। প্রতি মুহূর্তে কত আর সামলানো যায়!

তা বটে, একমত হলেন মা। বাবার ধারণা, তার মত সৃষ্টিশীল মানুষদের পেছনে সব সময় লোক লেগে থাকে–বলে, পাগল, মাথায় ছিট। আড়চোখে তাকায়, ব্যঙ্গ করে, উল্টোপাল্টা কথা বলে। রেগে গিয়ে তাদের। সঙ্গে ঝগড়া বাধালে দোষ দেয়া যায় না। আরেক ধরনের লোক আছে, তারাও পিছে লাগে, তারা আবিষ্কারের ফর্মুলা ছিনিয়ে নিতে চায়। সেজন্যেই এত সন্দেহ…
টেলিফোন বাজল।
সেদিকে তাকিয়ে ভ্রূকুটি করলেন মিসেস আমান। কে আবার করল?
উঠে দাঁড়াল মুসা। তুমি বসো। আমি ধরছি।
রিসিভার কানে ঠেকিয়ে হালো বলল সে। নীরবে শুনতে লাগল। ওপাশের কথা। তারপর বলল, মাকে বলছি!
রিসিভার রেখে ঘুরে দাঁড়াল সে। মা, মিস্টার পেইত্রি। নানার বাড়ির। উল্টোদিকে যার বাড়ি। আজ নাকি নানার সঙ্গে তার দাবা খেলার কথা ছিল। গিয়ে দেখেন নানা নেই। সারা বাড়ি খুঁজেছেন, কোথাও পাননি। পেছনের দরজা খোলা। রান্নাঘরে সিঙ্কের কল খোলা, পানি পড়ছে। এখুনি পুলিশকে খবর দিতে বললেন।
হয়তো ঘুরতে বেরিয়েছে। চলে আসবে। এত তাড়াতাড়ি পুলিশে খবর দেয়ার দরকার নেই।
মা, গাড়িটা নাকি ড্রাইভওয়েতেই আছে। হাঁটতে গেলেও কি দরজা খোলা রেখে যেত? কলই বা খোলা কেন?
হু! তা-ও কথা! চল, যাই!
উঠে দাঁড়াল কিশোর। আপনার যাওয়া লাগবে না, আন্টি, আগে আমরাই যাই। তিন গোয়েন্দার আসল কাজ পাওয়া গেছে, রহস্য। দরকার হলে আপনাকে ফোন করব।

.

মিস্টার রাবাতের বাড়ির সামনে পায়চারি করছেন মিস্টার পেইত্রি। রোগাটে শরীর, চুলের অনেকখানি ধূসর হয়ে এসেছে, মুখের বাদামী চামড়া কুঁচকানো। বসন্তের এই উজ্জ্বল আলোকিত দিনেও মুখ বাদলের মেঘলা আকাশের মত অন্ধকার।
মুসাকে বললেন, তোমার নানার স্বভাবের সঙ্গে একেবারেই মেলে না! দাবা খেলার কথা দিয়ে কখনও মিস করেনি। তা ছাড়া আগের খেলায় হেরে গিয়ে খেপে আছে আমাকে হারানোর জন্যে। কোন ব্যাপারেই হার সহ্য করতে পারে না সে।
জানি, পেইত্রির সঙ্গে মুসাও একমত।
সামনের দরজায় তালা নেই। ভেতরে ঢুকল তিন গোয়েন্দা। পেছন পেছন এলেন পেইত্রি। নিশ্চয় খারাপ কিছু ঘটেছে। এ ভাবে দরজা খুলে, কল ছেড়ে রেখে দূরে

যাওয়ার কথা নয়। কোন কারণে তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে গেছে। হয়তো এমন কিছু চোখে পড়েছিল, কল বন্ধ করার কথাও মনে ছিল না।
রান্নাঘরে ঢুকল গোয়েন্দারা।
সিঙ্কের ওপরে কলটার দিকে তাকাল কিশোর। ভঙ্গি দেখে মনে হলো, তার প্রশ্নের জবাব চাইছে ওটার কাছে। বিড়বিড় করে বলল, পানি গরম। করতে যাচ্ছিলেন। কেটলির ঢাকনা খোলা। সিঙ্ক থেকে পানি নেয়ার সময়। জানালা দিয়ে সত্যি কিছু চোখে পড়েছিল তার? কি?
জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল সে। ভাবছে, কি দেখেছিলেন রাবাত? লনের একটা অংশ চোখে পড়ছে। তার ওপারে সুন্দর করে ছাটা পাতাবাহারের বেড়া আলাদা করে দিয়েছে পাশের বাড়ির সীমানাকে। এ পাশটা যেমন পরিচ্ছন্ন, ওপাশটা তেমনি নোংরা। আগাছা হয়ে আছে, কেউ কাটে না। বাড়িটাও মেরামত হয় না কতদিন কে জানে। দরজার পাল্লা আর জানালার ফ্রেমের রঙ মলিন হয়ে গেছে, উঠে গেছে অনেক জায়গায়। ছাতের অবস্থা আরও খারাপ। বাড়ি ছেড়ে দেয়ার কথা ভাবছে নাকি বাড়ির মালিক? নাহলে এত অযত্ন কেন?
ওটা কার বাড়ি? পেইত্রিকে জিজ্ঞেস করল কিশোর।
হ্যারিস মিলারের।
হাত নেড়ে মুসা বলল, নানা ওখানে যায়নি। ছায়া দেখতে পারে না। একজন আরেকজনের। দেখলেই ঝগড়া।
কিন্তু কেউ একজন গেছে ওই পাতাবাহারের বেড়া ফাঁক করে। দেখো, ডাল ভেঙে আছে। ভাঙা গোড়াটা এখনও সাদা, তারমানে গেছে যে বেশি দেরিও হয়নি।
রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে উঠান দিয়ে বেড়ার দিকে এগোল ওরা।
বিড়বিড় করে নিজেকেই বোঝাল যেন কিশোর, বেড়াটা বেশি উঁচু না। মিস্টার রাবাতের পক্ষে ডিঙিয়ে যাওয়া সম্ভব। তার পায়ে লেগেই ডালগুলো ভেঙে থাকতে পারে।
গুঙিয়ে উঠলেন পেইত্রি। আবারও ঢুকল। আগের বার কি কাণ্ডটাই না। করল! গুলি করার জন্যে বন্দুক বের করে ফেলেছিল মিলার। পাশের বাড়ির মিসেস ডনিগান পুলিশকে ফোন না করলে খুনই হয়ে যেত একটা। পুলিশের কাছে অভিযোগ করেছে রাবাত-মিলার নাকি তার ঘাস কাটার মেশিন চুরি করেছে। আর মিলার বলেছে, রাবাত তার গ্যারেজের তালা ভেঙে ঢুকেছে। পুলিশ একটা মিটমাট করে ক্রিয়ে গেছে বটে, তবে তাতে কোনই সমাধান হয়নি। শত্রুতা বন্ধ হয়নি দুজনের। হবেও না।
তাই নাকি! চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। আবারও ঢুকে থাকলে তো খুব খারাপ কাজ করেছেন। ধরে আনা দরকার।

গেলে তো আনবে।
দেখি গিয়ে।
বেড়া ডিঙানোর সময় আরও কয়েকটা ডাল ভাঙল কিশোর। তার সঙ্গী হলো মুসা আর রবিন। দ্বিধা করতে লাগলেন পেইত্রি। তবে শেষ পর্যন্ত থাকতে না পেরে তিনিও ঢুকলেন মিলারের বাড়িতে।
অনেক ঘুরে পুরানো বিল্ডিঙটার দিকে এগোল চারজনে।
বেশি দূর যেতে হলো না। বাড়ি ছাড়িয়ে একটা গ্যারেজ, তার ওপাশে কাচ আর কাঠের তৈরি একটা গ্রীনহাউস। বাড়িটার মত অবহেলার শিকার নয়। এটা। কাঠের ফ্রেমগুলোতে নতুন সাদা রঙ করা। দেয়াল আর ছাতের কাচগুলোও পরিষ্কার, তবে কুয়াশা পড়েই বোধহয় ঘোলা হয়ে আছে।
হঠাৎ গ্রীনহাউসের আরেক প্রান্ত থেকে দরাজ গলায় ছড়া গান শোনা গেল:
এবার তুমি কোথায় যাবে
পাজির রাজা মিলার?
ঘাড়টি তোমার মটকে দেবে
পুলিশ ক্যাপ্টেন ফ্লেচার!
খাইছে! বলে উঠল মুসা, নানা!
কথা শুনে ওপাশ থেকে প্রশ্ন হলো, কে? গ্রীনহাউসের পাশ দিয়ে। বেরিয়ে এলেন রাবাত। লম্বা, ছিপছিপে শরীর। বয়েসের তুলনায় অনেক শক্ত সমর্থ এখনও। মুসার চুলের মতই খুলি কামড়ে আছে কুঁচকানো তারের মত কোকড়া চুল। তবে অত কালো নয়, বয়েসের রঙ লেগেছে তাতে, ধূসর হয়ে গেছে। ঝকঝকে সাদা দাঁত বের করে হেসে বললেন, আরি, তুই, মুসা! ও, তোমরাও এসেছ, রবিন আর কিশোরকে বললেন। পেইত্রি, মাপ করে দাও, ভাই। তোমার সঙ্গে দাবা খেলার কথা ছিল। দাঁড় করিয়ে রাখলাম।
দাড় করিয়ে রেখেছ তাতে কিছু মনে করছি না, কিন্তু ভয়টা পাওয়ালে কেন? আর কিছুক্ষণ না দেখলে পুলিশকে ফোন করতাম। তোমার মেয়েই দেরি করতে বলল।
এখানে মরতে এলে কেন? আগের বারে আক্কেল হয়নি?
মরতে নয় মরতে নয়, মারতে, হাসিমুখে জবাব দিলেন রাবাত, মিলারকে। হাতের পেন্সিল কাটার ছুরিটা দেখালেন, এটা দিয়ে।
সর্বনাশ! খুন করতে এসেছিলে!
মাথা নাড়লেন রাবাত, না, গ্রীনহাউসের তালা খুলতে। জানালা দিয়ে দৈখলাম, ও বেরিয়ে যাচ্ছে। সুযোগটা ছাড়লাম না।
অদ্ভুত দৃষ্টিতে নানার দিকে তাকাল মুসা। মিলারকে খুন করার সঙ্গে গ্রীনহাউসের তালা খোলার কি সম্পর্ক, বুঝতে পারল না। ভাবল, নানার মাথাটা বোধহয়

পুরোপুরিই গেছে। গ্রীনহাউস খুলতে গেছিলে কেন?
দেখে আয় উঁকি দিয়ে। তাহলেই বুঝবি।
গ্রীনহাউসে আর কি থাকবে? শাকসজি নয়তো অন্য কোন ধরনের উদ্ভিদ। দেখার আগ্রহ হলো না মুসার। যা-ই বললো, নানা, মিস্টার মিলার ইচ্ছে করলে এখন তোমাকে হাজতে পাঠাতে পারেন–চুরি করে তার বাড়িতে ঢুকে তালা ভাঙার অপরাধে।
কচু করবে! আমি কিচ্ছু ভাঙিনি। দরজাটা খোলার চেষ্টা করেছি কেবল, আমার জিনিসটা বের করে নেয়ার জন্যে। ওই টিনটা দেখেছিস? ওতে ম্যালাথিয়ন আছে। গত হপ্তায় বেকারের দোকান থেকে কিনেছিলাম। আমার। চীনা এলম গাছটাতে স্প্রে করার জন্যে। হঠাৎ দেখি টিন গায়েব। আরও একটা জিনিস নেই, একটা কর্নিক। ওই যে, গ্রীনহাউসের মধ্যে পড়ে আছে। আমারটাই। পুলিশের কাছে গিয়ে এখন বললে কোমরে রশি বেঁধে নিয়ে যাবে না! আগের বার চুরি করেছিল ঘাস কাটার যন্ত্র, এবার করেছে কনিক আর পোকা মারার ওষুধ। এ সব কেনার টাকা তার যথেষ্ট আছে, শয়তানিটা করে শুধু আমাকে খেপানোর জন্যে। আমার কাজে অসুবিধা হতে দেখলে মজা পায়। অত্তবড় শয়তান, অথচ অর্কিড ক্লাবে গিয়ে কি ভালমানুষটিই না সেজে থাকে! আহাহা, যেন ভাজা মাছ উল্টে খেতে জানে না! বাড়ির বাগানে ঘাস হয়ে থাকে আধহাত লম্বা, কাটার নাম নেই, ওদিকে সারাদিন গ্রীনহাউসে পড়ে থেকে অর্কিড জন্মায়। ছাগল আর কাকে বলে!
ঘাস না কেটে অর্কিড জন্মালে দোষটা কোথায়, ছাগল হয় কি করে, সেটাও মাথায় ঢুকল না মুসার। নানার মাথার স্থিরতা সম্পর্কে সন্দেহ আরও বাড়ল। বলল, নানা, ওগুলো তোমার জিনিস কি করে বুঝলে?
রেগে উঠলেন রাবাত, তোর মত গাধা নাকি আমি নিজের জিনিস চিনব না। ছাউনিতে ঢুকে দেখি জিনিসগুলো নেই। তারপর দেখি পাতাবাহারের ডাল ভাঙা। মগজটা এখনও এত বুড়ো হয়নি যে কি ঘটেছে বুঝতে পারব না!
মিলারের ড্রাইভওয়েতে গাড়ির শব্দ হলো। থামল গাড়িটা। শঙ্কিত হলেন। পেইত্রি। রাবাতের হাত ধরে টানলেন, ওই বুঝি এলো! চলো, চলে যাই!
ঝাড়া দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিলেন রাবাত। যাব কেন? ওর মত চোর নাকি? আমার জিনিস না নিয়ে যাব না!
গ্যারেজের কোণ ঘুরে বেরিয়ে এল গাট্টাগোট্টা এক লোক। ঘন পুরু ভুরুর নিচে কোটরে বসা চোখে যেন আগুন জ্বলছে।
তাকে দেখেই বলে উঠলেন রাবাত, হ্যারিস মিলার, আবার চুরি করেছ। তুমি! গ্রীনহাউসে আছে। জলদি বের করে দাও! ম্যালাথিয়নের টিন আর কর্নিকটা

আমার!
কি প্রমাণ আছে, তার? সমান তেজে জবাব দিলেন মিলার। তুমি বেরোও আমার বাড়ি থেকে, নইলে পুলিশ ডাকব!
চাপ দিয়ে কটাত্ করে ছুরির ফলা বন্ধ করে ফেললেন রাবাত। বন্ধ ছুরির মাথা মিলারের দিকে তুলে ধরে শাসালেন, প্রমাণ, না? আবার যেয়ো চুরি করতে! বুঝবে মজা! এখন থেকে তক্কে তক্কে থাকব আমি। খালি ধরতে পারলে হয় একবার! ঘাস কাটার যন্ত্র দিয়ে তোমার চুল ছেটে না দিয়েছি তো আমার নাম রাবাত নয়!
আরে যাও যাও, যা পারো কোরো! এখন বেরোও! নইলে
কি করবে? কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়ালেন রাবাত। কি করবে? চোর কোথাকার! চুরি তো চুরি, আবার সিনাজুড়ি।
মিলারের চোখে ভয়ের ছায়া দেখতে পেল কিশোর। বুঝল, মুখে যতই বড় বড় কথা বলুক, রাবাতকে ভয় পায় সে। অবশ্য সেজন্যে মিলারকে দোষ। দেয়া যায় না। খেপা মোষ বা গণ্ডারকে কে না ভয় পায়।
মারামারি বেধে যাওয়ার ভয়ে তাড়াতাড়ি নানার হাত ধরে টান দিল মুসা, নানা, দোহাই তোমার, থামো! এসো, যাই!
ঝাড়া দিয়ে আবার হাত ছুটিয়ে নিলেন রাবাত, এই, সর, কথার মাঝখানে কথা বলতে আসবি না!
মুসাও দমল না। তুমি আসবে, না মাকে ফোন করব?
ঝাঁঝিয়ে উঠলেন রাবাত। হ্যাঁ হ্যাঁ, করগে না! তোর মাকে কি আমি ডরাই! তবে আর দাঁড়ালেন না তিনি। গটমট করে গ্রীনহাউসের কাছ থেকে সরে এসে বেড়ার দিকে এগোলেন। পিছু নিল তিন গোয়েন্দা।
পেইত্রি রয়েছেন সবার পেছনে। দুর্বল ভঙ্গিতে হাঁটছেন। খুনোখুনির ভয়ে কুঁকড়ে গিয়েছিলেন। যা কাণ্ড করো না, তোমার কাছে আসাই বাদ দিতে হবে! অনুযোগ করলেন তিনি। আমি বলে দিলাম, এ রকম চলতে থাকলে খুনের দায়ে জেলে যাবে একদিন!
আমি কি ইচ্ছে করে করি নাকি? আশেপাশে বদ লোক থাকলে এই হবে! পাতাবাহারের বেড়া ডিঙিয়ে নিজের সীমানায় ঢুকলেন রাবাত। তাই তো বলি, একটা পড়শী-প্রতিরোধ সংগঠন করা উচিত আমাদের। তাহলে ভোটাভোটির মাধ্যমে ঠিক করা যাবে, কাকে রাখব, কাকে নয়।
তখন তোমাকে নিয়েও ভোট হতে পারে, মুখের ওপর বলে দিলেন পেইত্রি। নিজেকে অত ভাল ভাবার কোন কারণ নেই। ভোট দিয়ে তোমাকেও তাড়াতে পারে!

বাজে বোকো না! গজগজ করে বললেন রাবাত। খেললে এসো, নইলে ভাগো! অহেতুক সময় নষ্ট কোরো না!
কেটলিতে ফুসা বাষ্পের ফোঁস ফোঁস শব্দ বেরোল পেইত্রির নাক থেকে। তবে চলে গেলেন না। রাবাতের পিছু পিছু লিভিং রুমে ঢুকলেন।
রান্নাঘরে রাখা টেলিফোনের দিকে এগোল মুসা। রিসিভার তুলে বাড়ির নম্বরে ডায়াল করল।
মাকে উৎকণ্ঠা মুক্ত করে রিসিভার রেখে দিল সে। কিশোরের দিকে তাকাল। মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করল, কি বুঝলে? যাবে নানার সঙ্গে? তাকে সামলানো সম্ভব?
সন্দেহ ফুটল কিশোরের চোখে। তারপর উজ্জ্বল হলো। হেসে বলল, সহজ হবে না কাজটা। তবে একঘেয়েমিতে ভুগতে হবে না আমাদের, এটা বলতে পারি।

.

পরের হপ্তায় বাবাকে বাড়িতে, দাওয়াত করলেন মিসেস আমান। বাবার পছন্দের সমস্ত খাবার তৈরি করে তার সামনে দিলেন। কাপে কফি ঢালতে ঢালতে বাবাকে পটানোর চেষ্টা করলেন। মুসা, কিশোর আর রবিন তার। সঙ্গে নিউ ইয়র্কে বেড়াতে গেলে যে মন্দ হয় না ইনিয়ে বিনিয়ে বললেন সে কথা। বোঝালেন, ওদের জন্যে এটাকে শিক্ষা সফর হিসেবে ধরে নেয়া যেতে পারে।
ওপরে পুরু করে মাখনের স্তর দেয়া চকোলেট কেকে বড় বড় কামড় বসাচ্ছেন রাবাত। কথা বলতে অসুবিধে। ভুরু কুঁচকে মেয়ের দিকে তাকালেন।
অমন করো কেন, বাবা? কণ্ঠস্বর আরও কোমল করলেন মিসেস। আমান। ছোটদের জন্যে বেড়ানো একটা বিরাট শিক্ষা, তুমিই তো বলতে আমাকে। বই পড়ে এ জ্ঞান অর্জন করা যায় না। আমাকে নিয়ে যেতে। সবচেয়ে মনে পড়ে কার্লসব্যাড ক্যাভানে বেড়াতে যাওয়ার কথা। কি যে ভাল লাগে ভাবতে! আমার সঙ্গে, মার সঙ্গে কত ভাল ব্যবহার করতে তুমি, মনে আছে, বাবা? মা মারা যাওয়ার পরই তুমি গেলে বদলে। সেই আগের তুমি আর এখনকার তুমিতে যে কত তফাৎ, যদি বুঝতে! তখন তোমাকে ঋষি, মনে হত আমার, বাবা, আর এখন পাগল!
না না, তা নয়! তাড়াতাড়ি বললেন মিসেস আমান। তবে মেজাজটা যে তোমার ভাল থাকে না, এটা ঠিক। শোনো, বাবা, আমার একটা কথা রাখো, ওদেরকে তুমি নিয়ে যাও। আমি কথা দিতে পারি, ওরা তোমার। বিরক্তির কারণ হবে না। খুব ভাল ছেলে ওরা। দায়িত্বশীল।
নীরবে কেক খাওয়া শেষ করলেন রাবাত। কফির কাপে চুমুক দিয়ে নামিয়ে রাখলেন। চিনি হয়নি। আরও এক চামচ চিনি মেশালেন। তারপর তাকালেন

মেয়ের দিকে।
কুঁকড়ে গেলেন মিসেস আমান। ওই দৃষ্টি তার চেনা। কারও মনের ভেতরটা পর্যন্ত দেখে নেয়ার ক্ষমতা আছে ওই দৃষ্টির। অস্বস্তিতে নড়েচড়ে বসলেন তিনি।
তোর ধারণা দারোয়ান দরকার আমার? রাবাত বললেন, দারোয়ান। তুই ভালই জোগাড় করেছিস, নাক টিপলে এখনও দুধ বেরোয়! আমাকে কি পাহারা দেবে ওরা?
সে কি আমি জানি না? বিশ্বাস করো, পাহারা দেয়ার জন্যে ওদেরকে সঙ্গে দিচ্ছি না, বাবা। বরং ওদের দেখেশুনে নিয়ে যাওয়ার জন্যেই তোমার। সঙ্গে দিতে চাইছি। গাড়িতে করে সেই নিউ ইয়র্ক যাওয়া, আমারই লোভ হচ্ছে! সংসারের ঝামেলা না থাকলে:
হাত নেড়ে মেয়েকে থামিয়ে দিলেন রাবাত। কাটা কাটা স্বরে বললেন, থাক, অত কথা বলতে হবে না! আমি বুঝে গেছি!
মিস্টার আমানের দিকে ফিরলেন তিনি।
একেবারে চুপ করে আছেন মুসার বাবা। শ্বশুরের সঙ্গে তর্ক করতে রীতিমত ভয় পান। তর্কটা শুধু তর্কে সীমাবদ্ধ থাকলে এতটা পেতেন না, কিন্তু লড়াই বেধে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। সেজন্যে পারত পক্ষে কথা বলতে চান না শ্বশুরের সঙ্গে, এড়িয়ে চলেন।
এই মিয়া, তোমার কি বক্তব্য? জামাইকে প্রশ্ন করলেন রাবাত। দারোয়ান দরকার আছে আমার?
সেরেছে রে! এই ভয়টাই তিনি করছিলেন, তাকে না কোন প্রশ্ন করে বসেন। বড় করে ঢোক গিললেন। লম্বা দম নিলেন। সাবধানে শব্দ বাছাই করে বললেন, না না, দারোয়ান লাগবে কেন! তবে মাঝেমধ্যে সবারই কমবেশি অন্যের সাহায্য প্রয়োজন হয়...
আমার হয় না! কর্কশ কণ্ঠে বললেন রাবাত। তোমরা ভাবছ রাস্তায় গণ্ডগোল করে আমি জেলে যাব, সেটা ঠেকাবে তোমাদের দারোয়ানেরা! তোমাদের ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছে, রোজই একবার করে জেলে যাই আমি। অ্যারেস্ট হয়েছিলাম যে সে-কথা মনে করিয়ে দিতে চাও। কিন্তু কেন গিয়েছিলাম? নিজের গাছ বাঁচাতে প্রতিবাদ করতে গিয়ে। একে তুমি মারামারি বলতে পারো না। ধরো এখন তোমার সামনে থেকে জোর করে এই টেলিভিশনটা কেউ তুলে নিয়ে যেতে চাইল, বাধা দেবে না? সেই বাধাটাই আমি দিয়েছিলাম। পুরো দোষটা ছিল পার্ক ডিপার্টমেন্টের। আমার গাছ পোকায় খেয়ে মারুক, না ঝড়ে উড়ে যাক, তাতে ওদের কি? সেটাই বলতে গিয়েছিলাম। তাতে আমি হয়ে গেলাম পাগল, বদ্ধ উন্মাদ!

শ্বশুড়ের মারমুখো মূর্তি দেখে ঘাবড়ে গেলেন আমান। চুপ করে রইলেন। এখন তর্ক করতে যাওয়ার ফল হবে ভয়ঙ্কর।
জ্বলন্ত চোখে মুসার দিকে তাকালেন রাবাত
দম বন্ধ করে ফেলল মুসা।
ধমক দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন রাবাত, এই, সত্যি করে বল, তোদেরকে দারোয়ান হিসেবে আমার সঙ্গে দেয়ার কথা ভাবা হচ্ছে না?
ঢোক গিলল মুসা।
আসল কথা ফাস হয়ে যাওয়ার ভয়ে রেগে গেলেন মিসেস আমান। গলা চড়ে গেল তাঁর, তাতে কি হয়েছে? তোমাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথাই যদি ভাবা হয়, ক্ষতিটা কি? তোমার পাকা খেতে মই দেয়া হচ্ছে নাকি! তুমি ভেবেছ তুমি ধমকাতে থাকবে আর সবাই তা সহ্য করবে? আমি বলছি, ভাল করে শুনে রাখো, আমি বলছি ওরা যাবে তোমার সঙ্গে। হয় ওরা যাবে, নয়তো তোমার নিউ ইয়র্ক যাওয়া বন্ধ। এতক্ষণ ভাল ভাবে বলেছি, শোনোনি। এই আমি বাকা হলাম, দেখি তুমি কি করতে পারো!
আতঙ্কিত হয়ে পড়ল মুসা। বাবা আর মেয়ে কেউ কারও চেয়ে কম যায়, না! মনে মনে আল্লাহকে ডাকতে লাগল, আল্লাহরে, বাঁচাও! কি জানি কি ঘটে যায়! নানার মেয়ে খেপেছে!
কারও দিকে তাকালেন না আর রাবাত। চুপচাপ কাপের কফি শেষ করলেন। তারপর মুখ তুললেন। মেয়ের দিকে তাকালেন না। কণ্ঠস্বরও নরম। করলেন না। খসখসে গলায় বললেন, আমার যা ইচ্ছে আমি তাই করব। কারও বাধা মানতে আমার বয়ে গেছে। আমি ঠিক করেছি, ছেলেগুলোকে আমি সঙ্গে নেব। তবে দারোয়ান হিসেবে নয়। এত লম্বা পথ, মুখ বুজে থাকা যাবে না। কথা বলার জন্যেও কাউকে দরকার। তার জন্যে ছোটরাই উপযুক্ত। বুড়োগুলোর নানা ফেঁকড়া, নানা ঝামেলা। তর্ক ছাড়া কিছু বোঝে না, বেশি পেকে যায় তো! আড়চোখে মেয়ে আর জামাইয়ের দিকে তাকালেন তিনি। পেইত্রি কিংবা কক বিলার্ডকে নিতে পারতাম। কিন্তু বেড়াতে বেরোলেই বিশাল এক সুটকেস সঙ্গে নেবে পেইত্রি, তাতে থাকবে। হাজার রকমের ওষুধপত্র। কক হলো বীমার লোক। চাকরি থেকে অবসর নিয়েছে, তবু শুধু বীমা, বীমা। দুনিয়ায় যেন এ ছাড়া আর কোন বিষয়ই নেই। সুতরাং মুসা এবং তার দুই দোস্ত আসতে পারে আমার সঙ্গে। মুসা, স্কুল ছুটি হতে আর কদ্দিন? দুই হপ্তার বেশি না নিশ্চয়? ঠিক আছে, অপেক্ষা করতে পারব আমি। তোদের স্কুল ছুটি হলেই রওনা হব। জুনের শুরুতে যাত্রা করব। আমরা। অতিরিক্ত গরম পড়ার আগেই খোলা অঞ্চল পেরিয়ে যেতে পারব। ফিরে আসব ক্যানাডার ভেতর দিয়ে। ভাবতে কেমন লাগছে রে তোর?

লাফিয়ে উঠল মুসা। আর বোলো না, নানা! দম আটকে আসছে। আমার! স্কুলটা যে কবে ছুটি হবে! সহ্য করতে পারছি না!
রবিন আর কিশোরকে সুখবরটা জানানোর জন্যে ফোনের দিকে প্রায় উড়ে গেল সে।
স্কুলের ফাঁকে ফাঁকে এরপর দীর্ঘ যাত্রার প্রস্তুতি চলল। বাড়িতে জরুরী কোন কাজ নেই, তাই মা-বাবার কাছ থেকে অনুমতি নিতে রবিনের তেমন অসুবিধে হলো না। তবে কিশোরকে নিয়ে ঘাপলা বাধাতে চাইলেন মেরিচাচী। ইয়ার্ডে প্রচুর কাজ। তিনি ভেবেছিলেন, স্কুল ছুটি হলে বাড়তি কাজগুলো কিশোরকে দিয়ে করিয়ে নেবেন।
কিশোর তাকে বোঝাতে চাইল, শোনো, কাজ তো সারাজীবনই করা যাবে, করতে হবে। কিন্তু এ রকম সুযোগ আর আসবে না। তা ছাড়া এ সব ভ্রমণে অভিজ্ঞতা বাড়ে। বুদ্ধি বাড়ে। চিন্তাশীল হতে শেখায় মানুষকে।
তোর কি চিন্তা করার অসুবিধে নাকি? বুদ্ধিও কম না! যা আছে তাতেই একেক সময় ভয় হয়, মাথাটা না বিগড়ে যায়!
চিলেকোঠা থেকে একটা স্লীপিং ব্যাগ বের করে আনলেন মেরিচাচী। রোদে শুকাতে দিলেন।
সেটা দেখে আশা হলো কিশোরের। তারমানে যেতে দিচ্ছ তুমি আমাকে?
জবাব না দিয়ে প্রশ্ন করলেন চাচী, জুন মাসে মিনেসোটার আবহাওয়া কেমন থাকে জানিস?
বিউটিফুল! জবাব দিয়ে দিলেন কাছে দাঁড়ানো রাশেদ পাশা। দাঁতের ফাঁক থেকে পাইপ সরিয়ে বললেন, চমৎকার!
চাচার সমর্থন পেয়ে চোখ উজ্জ্বল হলো কিশোরের। চাচীকে বলল, তুমি হিসেবগুলোর কথা ভাবছ তো? যাও, বেড়াতে যাওয়ার আগেই সব শেষ করে দেব। আর কোন অসুবিধে আছে?
এতক্ষণে হাসি ফুটল মেরিচাচীর মুখে। কিশোর যখন কথা দিয়েছে, ধরে নেয়া যায় কাজটা হয়ে গেছে। হিসেব মেলানোটা সাংঘাতিক ঝামেলার কাজ মনে হয় তার কাছে।
অবশেষে ছুটি হলো স্কুল।
জুনের এক কুয়াশা ঢাকা সকালে নিজের গাড়িতে করে তিন গোয়েন্দাকে মিস্টার রাবাতের বাড়ি নামিয়ে দিয়ে গেলেন আমান। সুটকেস এনেছে ওরা, তবে স্লীপিং ব্যাগ আনেনি। সাফ মানা করে দিয়েছেন রাবাত, বাইরে ক্যাম্প করে ঘুমানো চলবে না। বলেছেন, বাইরে রাত কাটানোর বয়েস আমার নেই। এটাই হয়তো

জীবনের শেষ অ্যাডভেঞ্চার। অতএব কিপটেমি করে দীনহীনের মত দিনগুলো না কাটিয়ে হোটেলে থাকব, মোটেলে থাকব। যতটা সম্ভব আরামে কাটাব।
নানার মত অত বয়েস না হলেও বয়েস হয়েছে তার পুরানো, বিশাল বুইক গাড়িটার। তবে যথেষ্ট সমর্থ এখনও। দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে পারবে।
রওনা হলো ওরা। গেটের কাছে দাঁড়িয়ে রইলেন আমান। শেষবারের মত বাবাকে বিদায় জানানোর জন্যে পেছনে ফিরে হাত নাড়ল মুসা। কিশোরও তাকাল। দুজনেরই চোখে পড়ল, রাবাতের বাড়ির কোণ থেকে চুপি চুপি বেরিয়ে আসছে গাট্টাগোট্টা একজন মানুষ। ঝোপের আড়ালে অর্ধেক শরীর আড়াল করে তাকিয়ে দেখছে রাবাত সত্যি সত্যি চলে যাচ্ছেন কিনা।
হ্যারিস মিলারকে চিনতে পারল দুই গোয়েন্দা।
খালি পেয়েই ঢুকে পড়েছে। একটা সেকেণ্ডও নষ্ট করেনি। বিড়বিড় করল মুসা। মতলবটা কি?
কিশোর জবাব দেয়ার আগেই সামনের সীট থেকে গাঁক করে উঠলেন নানা, কি বলছিস?
কিছু না, তাড়াতাড়ি বলল মুসা। ভাবছি, সান্তা বারবারার ওই রেস্তোরাঁটায় থামবে কিনা? ওই যে, যেটাতে ঘরের বাইরে টেবিল, পেতে খাওয়ার ব্যবস্থা আছে।
ভাল বলেছিস, খুশি হয়ে উঠলেন রাবাত। নাতির মতই খাওয়ার ব্যাপারে তারও প্রবল আগ্রহ। হয়তো তাঁর কাছ থেকেই উত্তরাধিকার সূত্রে ক্ষমতাটা পেয়ে গেছে মুসা। আমার তো খিদেয় পেট জ্বলছে। নাস্তা না খেয়ে আর পারব না।
অবাক হলো মুনা নাস্তা না খেয়েই বেরিয়েছ!
মনে নেই!
প্যাসিফিক কোস্ট হাইওয়ে ধরে নতুন উদ্যমে গাড়ি হাঁকালেন রাবাত।
মুচকি হাসল কিশোর। মেজাজ ভাল আছে রাবাতের। তবে বেশি আশা করা ঠিক না। কখন যে কি কারণে খেপে যাবেন, আন্দাজ করাও সম্ভব নয়।

.

নাস্তা নয়, ভরপেট ভোজন হলো সান্তা বারবারায় পৌঁছে। পুরানো একটা বাড়ির চত্বরে টেবিল পেতে খাওয়ার ব্যবস্থা। ক্যালিফোর্নিয়ার সেই স্প্যানিশ কলোনির যুগে, তৈরি হয়েছিল বাড়িটা। কুয়াশা তাড়িয়ে বেরিয়ে এসেছে। রোদ। বাতাস পরিষ্কার, তাজা।
খুব সুন্দর! রাবাত বললেন। যতই এগোব, আবহাওয়া আরও ভাল। হবে।
যতই উত্তরে এগোল ওরা, শুধু আবহাওয়া নয়, প্রকৃতিরও রূপ বদল হতে থাকল। কখনও সাগরের কিনার দিয়ে গেছে পথ, তীরে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের একেবারে ধার ঘেষে; কখনও পাহাড়ের চূড়ার কাছ দিয়ে, ওখান থেকেও সাগর চোখে পড়ে।

গ্যাভিয়োটা ছাড়িয়ে কয়েক মাইল এসে পাওয়া গেল একটা সুড়ঙ্গ, রাস্তা গেছে তার ভেতর দিয়ে। সুড়ঙ্গের অন্য পাশে বদলে গেল। প্রকৃতি। সাগরের ঢেউয়ের বদলে এখানে দেখা গেল গরু-বাছুরের পাল। শীতের বর্ষণের শেষে মাঠের ঘাস এখন সবুজ। ছড়ানো সর্ষে খেতে সবুজের মাঝে বিছিয়ে থাকা হলুদ ফুলকে লাগছে বিশাল হলুদ চাদরের মত। ঢালের গায়ে তৃণভূমিতে চরছে গরু-ঘোড়া, মহা আনন্দে ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছে বাছুর আর ঘোড়ার বাচ্চা।
দুপুরের পর, বিকেলের শুরুতে আবার সাগরের দেখা পাওয়া গেল।
ওই যে পিজমো বীচ! রাবাত বললেন। মুসা, তোর মা তখনও হয়নি, তোর নানীকে নিয়ে বেড়াতে আসতাম এখানে। সাগরের পাড়ে ঝিনুক খুঁজে বেড়াতাম। বহু বছর আগের কথা, অথচ মনে হচ্ছে এই সেদিন! এখন তোর নানী নেই, আছে শুধু ঝিনুক! একা একা কুড়াতে আর ভাল লাগে না রে, তবে সৈকতের পানিতে গাড়ি চালাতে এখনও মজা পাই।
পানিতে! বিশ্বাস করতে পারল না রবিন। পারবেন? চাকা আটকে যাবে না?
না, পিজমোতে যাবে না। কোন্ জায়গাটাতে নামতাম আমরা, দেখি বের করতে পারি কিনা?
হাইওয়ে থেকে একটা সরু রাস্তায় গাড়ি নামিয়ে আনলেন রাবাত। সাগরের দিকে নামতে নামতে পথের শেষ মাথায় চলে এলেন। তারপরে রয়েছে একটা র‍্যাম্প। সেটার পর সৈকত।
বালির দিকে তাকিয়ে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল মুসা, সত্যি বলছ, নানা, কাদায় চাকা দেবে যাবে না? চোরাবালি যদি থাকে?
দূর বোকা, এ সব জায়গায় থাকে না। ওই দেখ, আরেকটা গাড়ি নেমেছে।
একেবারে পানি ঘেঁষে ছুটে যাচ্ছে একটা ফোক্সওয়াগেন। তীরে আছড়ে ভাঙছে ঢেউ। কোন কোনটা এতবড়, গাড়ির চাকা আর নিচেটা ভিজিয়ে দিয়ে। এ পাশে চলে আসছে।
খাইছে! বলে উঠল মুসা, ফোক্সওয়াগন বলেই চলছে এখনও। বুইক পারবে না, ইঞ্জিনে পানি ঢুকে বন্ধ হয়ে যাবে।
থাম তো! অধৈর্য হয়ে নানা বললেন, দেখই না কি করি।
ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল মুসা। অন্য কেউ এখানে গাড়ি চালালে ভয় পেত না। কিন্তু তার নানাকে বিশ্বাস করতে পারছে না এখনও। এত ঘনিষ্ঠভাবে কোনদিন মেশার সুযোগ পায়নি। বদমেজাজী বলে এড়িয়েই থেকেছে। নানার হাতে নিজের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারছে না।
র‍্যাম্প পার হয়ে এসে বালিতে নেমে পড়ল বুইক। মসৃণ গতিতে এগিয়ে চলল সৈকত ধরে। তীর থেকে খানিকটা দূরে পানির ওপরে কুয়াশা জমছে। রাবাত

বললেন, এই এক যন্ত্রণা! খালি কুয়াশা পড়ে এখানে। ভৌগোলিক কারণ একটা নিশ্চয় আছে। কিন্তু কি, কে জানে!
গাড়ি থামিয়ে, হ্যান্ডকে সেট করে দিয়ে ফিরে তাকালেন তিনি। আমি এখানে নামব। পা আড়ষ্ট হয়ে গেছে। তোরা?
নামব, একটানে পাশের দরজা খুলে ফেলল মুসা।
চোখের পলকে খুলে গেল চারটে দরজাই। গাড়ি থেকে প্রায় ছিটকে বেরোল চারজনে। দরজায় তালা লাগালেন রাবাত। তিন গোয়েন্দাকে নিয়ে সৈকত ধরে হেঁটে চললেন।
কয়েক মিনিটেই পিজমা বীচের শহর ছাড়িয়ে এল ওরা। লম্বা একটা দেয়াল ঘেঁষে প্রায় গায়ে গায়ে লাগানো কয়েকটা বাড়ি-ঘর, এই হলো শহর। পাহাড়ের চূড়া আর ঢালে দাঁড়িয়ে আছে হোটেল ও মোটেলগুলো।
কাছে এসে গেছে কুয়াশা। ধীরে ধীরে যেন জড়িয়ে ধরতে আরম্ভ করেছে ওদের। চোখের আড়াল করে দিয়েছে একপাশের সৈকত। কেমন ভূতুড়ে নীরবতা গ্রাস করছে সমস্ত পরিবেশকে। চুড়ার ওই হোটেলগুলোর ওপাশে রয়েছে হাইওয়ে। কাছেই। অথচ একটা গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দও কানে আসছে না।
সামনে বিছিয়ে আছে প্রায় নির্জন সৈকত। একজন লোককে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। ঘন হয়ে গেল কুয়াশা। তার মধ্যে হারিয়ে গেল। লোকটা। ওদের চারপাশে এখন শীতল, শূন্য, ধূসর এক পৃথিবী।
বিচিত্র অনুভূতি হলো কিশোরের। মনে হচ্ছে, ভয়ানক বিপজ্জনক কি যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে কুয়াশার মধ্যে। এমন কিছু, যা অক্টোপাসের মত উড় বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরে নিয়ে চলে যাবে অজানা কোন জগতে, চিৎকার করে সাহায্য চাওয়ারও ক্ষমতা হবে না ওদের।
মাথা ঝাড়া দিয়ে ভয় তাড়ানোর চেষ্টা করল সে। মনকে বোঝাল, অহেতুক ভয় পাচ্ছে। কিছুই নেই এখানে। কেবল ঘন কুয়াশা সূর্যকে ঢেকে দিয়ে জায়গাটাকে অন্ধকার, বিষণ্ন আর অপার্থিব করে তুলেছে।
অনেক দূর চলে এসেছি আমরা, তাই না, নানা? জিজ্ঞেস করল রবিন।
কিশোরের আগে রয়েছে সে। মূসার সঙ্গে তাল রেখে হাঁটতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছে। প্রশ্নটা করে জবাবের আশায় ডানে তাকাল সে। কিন্তু কোথায় রাবাত?
মুসাও থমকে দাঁড়াল। নানা! কোথায় তুমি?
জবাব নেই।
মিস্টার রাবাত! চিৎকার করে ডাকল কিশোর।
কয়েক সেকেন্ড কান পেতে রইল সে। রাবাত গেলেন কোথায়? কুয়াশার মধ্যে জলজ্যান্ত একজন মানুষ অদৃশ্য হতে পারে, গায়েব হয়ে যেতে পারে না!

মুসাও ভয় পেয়েছে। চাপা স্বরে বলল, এই, কাছাকাছি থাকো সবাই। রবিনের কাঁধে হাত রাখল। যেন তাকেও গায়েব হওয়া থেকে ঠেকাতে চায়।
নানা! গলা চড়িয়ে ডাকল আবার রবিন।
নানা, কোথায় তুমি? আরও জোরে ডাকল মুসা। জবাব দিচ্ছ না কেন?
চুপ! এতক্ষণে শোনা গেল একটা ভোতা, খসখসে কণ্ঠ।
এক ঝলক বাতাস আচমকা ফাঁকা করে দিল কুয়াশার খানিকটা। রাবাতকে চোখে পড়ল গোয়েন্দাদের। পাহাড়ের গোড়ায় বড় একটা পাথরের কাছে হুমড়ি খেয়ে আছেন। সতর্ক, উত্তেজিত, কোন কিছুর দিকে নজর। রাখছেন মনে হচ্ছে।
নানা, কি হয়েছে? ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল মুসা।
তাকে চুপ থাকতে ইঙ্গিত করলেন রাবাত। খানিক পর রাগত স্বরে বলে উঠলেন, যা সন্দেহ করেছিলাম!
নিঃসঙ্গ সেই লোকটাকে দেখা গেল আবার, যে কুয়াশার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। অনেক কাছে চলে এসেছে। ছায়ার মত দেখা যাচ্ছে এখন। সাবধানে পা ফেলছে। যেন কুয়াশার জন্যে ঠিকমত দেখতে পাচ্ছে না।
লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন রাবাত। ঝাঁপিয়ে পড়লেন লোকটার ওপর।
চিৎকার করে উঠল লোকটা।
লোকটার কলার চেপে ধরে চিৎকার করতে লাগলেন রাবাত, এত্তবড় সাহস তোমার, আমার পিছু নিয়েছ!
ছাড়ো, পাগল কোথাকার! নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করল লোকটা।
খাইছে! দম আটকে যাবে যেন মুসার।
রাবাত, তুমি একটা উন্মাদ! বলল লোকটা। পুরোপুরি মাথা খারাপ! জলদি ছাড়ো বলছি, নইলে ভাল হবে না!
কণ্ঠ শুনেই লোকটাকে চিনতে পেরেছে মুসা। হ্যারিস মিলার। তার নানার পড়শী, যার সঙ্গে সাপে-নেউলে সম্পর্ক।
হুমকির পরোয়া করলেন না রাবাত। কলার তো ছাড়লেনই না, আরও জোরে চেপে ধরে ঝাঁকাতে শুরু করলেন। চোর কোথাকার! আমি জানি তুমি কিসের জন্যে এসেছ! রাতে চুরি করে আমার ঘরে ঢুকেছিলে, নতুন আবিষ্কারটার কথা জেনে গেছ। যন্ত্রপাতি চুরি করেই পেট ভরেনি, ফর্মুলাও চুরি করতে এসেছ...।
ঝাড়া দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল মিলার। পিছিয়ে গিয়ে চিৎকার শুরু করল, বাঁচাও! বাঁচাও! পুলিশ! পাগলে খুন করে ফেলল আমাকে!
লাফ দিয়ে গিয়ে পড়ল মুসা। মিলারের হাত আঁকড়ে ধরে বলল, চেঁচাবেন না, মিস্টার মিলার, প্লীজ! নানা এমনি কথার কথা বলেছে, সত্যি সত্যি খুন করতে চায়নি আপনাকে...

চুপ! গর্জে উঠলেন রাবাত। স এখান থেকে! আমার জন্যে মাপ চাইতে হবে না! যা বলেছি ঠিকই বলেছি, মোটেও কথার কথা নয়! মেরুদণ্ডহীন এই পোকাটা কি করতে চাইছে আমি জানি। কিছুতেই সেটা করতে দেব না ওকে। ল্যাঙ মেরে ফেলে ওর কোমর ভেঙে না দিয়েছি তো। আমার নাম...
আবার মিলারকে ধরার চেষ্টা করলেন রাবাত।
ঝট করে সরে গেল মিলার। আর চিৎকার করল না। সতর্ক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রাবাতের দিকে।
ইঁদুর! ছুঁচো! শুয়াপোকা! গাল দিতে লাগলেন রাবাত। এই জন্যেই, এতক্ষণে বুঝলাম! এই জন্যেই বিষবার থেকে কাজে যাচ্ছ না তুমি! বাড়িতে থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে আমার ওপর চোখ রেখেছ। যেই আমি বেরিয়েছি, আমার পিছু নিয়েছ। কেন নিয়েছ, মনে করেছ বুঝব না! অত বোকা পাওনি!
পাগলের সঙ্গে কে কথা বলে! বলেই ঘুরে সৈকত ধরে প্রায় ছুটতে শুরু করল মিলার।
সত্যি কথা বলেছি তো, সহ্য করতে পারলে না, তাই না! পেছনে চিৎকার করে বললেন রাবাত।
ফিরল না মিলার। জবাবও দিল না। খেপা মানুষটার কবল থেকে পালাতে পারলে যেন বাঁচে। আবার অদৃশ্য হয়ে গেল কুয়াশার মধ্যে।
অসহ্য! নাক দিয়ে ঘোৎ-ঘোৎ করতে লাগলেন রাবাত। জঘন্য লোক! আবার যদি আসে, বাপের নাম ভুলিয়ে ছেড়ে দেব আমি ওর!
এতক্ষণে খেয়াল করল মুসা, কাঁপছে ও। একটা দুঃস্বপ্ন থেকে যেন জেগে উঠেছে। এ কার সঙ্গে এসেছে! মারাত্মক অবস্থা! স্যান ফ্রান্সিসকোতে পৌঁছার আগেই হয়তো ভয়ানক বিপদে ফেলে দেবে। উপকূলের কোন জেলখানায় হবে শেষ ঠাই। এমনও হতে পারে, নানার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে। তাকে সামলানো অসম্ভব ভেবে রকি বীচে ফিরে যেতে পারে কিশোর আর রবিন। নিউ ইয়র্ক যাওয়া আর হবে না।
নানা, বলল সে, আমার মনে হয় অহেতুক মিস্টার মিলারকে গালাগাল করছ। পিজমো বীচটা বেড়ানোর জায়গা, যে কেউ আসতে পারে এখানে। মিলারের আসতেও বাধা নেই। এমনও হতে পারে, এখানে কোন বন্ধু আছে তার, দেখা করতে এসেছে।
তোর মাথা! খেঁকিয়ে উঠলেন রাবাত। ওর আবার বন্ধু আছে নাকি! দুনিয়ায় কেউ ওর বন্ধু হবে না! শুনে রাখ, তার সঙ্গে এই শেষ দেখা নয় আমাদের। না হলে তখন বলিস। কিন্তু যেটার জন্যে এসেছে সেটা পাবে না সে। অত কাঁচা কাজ করি না আমি। ওর মত ছুঁচোরা যে পিছে লাগতে পারে, সেটা আগেই ভেবে রেখেছি।

কি নিতে এসেছে? এমন নিরীহ ভঙ্গিতে প্রশ্নটা করল কিশোর, যেন কথার পিঠে কথা, জানার কৌতূহল নেই।
আমার ফর্মুলা! জবাব দিলেন রাবাত।
যেটা আবিষ্কার করেছ? মুসার প্রশ্ন। যেটা নিউ ইয়র্কে নিয়ে যাচ্ছ?
তোরাও এমন ভঙ্গি করছিস যেন আমি একটা পাগল! আবিষ্কার যেটা করেছি, জানলে নিউ ইয়র্কের বড় বড় বিজ্ঞানীরাও…
থেমে গেলেন তিনি। ফাস করে দিতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ খেয়াল হলো যেন। না, তোদের না জানাই ভাল। হয়তো মিলার একাই চায় না ওটা, আরও কেউ আছে। চল। আর দেরি করলে অন্ধকার হওয়ার আগে মনটিরেতে পৌঁছতে পারব না।
শান্ত ভঙ্গিতে বালি মাড়িয়ে হেঁটে চললেন তিনি। কয়েক মিনিট আগে যে একটা সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে গেল বেমালুম ভুলে গেছেন যেন।
পেছনে এগোল তিন গোয়েন্দা। মনে ভাবনা। দীর্ঘ যাত্রায় বেরিয়েছে ওরা। শেষ হতে এক মাস কিংবা তারও বেশি লেগে যেতে পারে। এ রকম একজন মানুষের সঙ্গে টিকতে পারবে অতদিন? শুধু কি খামখেয়ালী, না। আসলেই পাগল? একজন বদ্ধ উন্মাদের সঙ্গে অজানা পথে পাড়ি দেয়ার চেষ্টা করছে না তো ওরা!

.

কারও সঙ্গে একঘরে থাকতে আমি পারব না, ঘোষণা করে দিলেন রাবাত, নিজের নাতি হলেও না! পোলাপানকে বিশ্বাস নেই। কখন কি করে বসবে ঠিক নেই। হয়তো দেখা যাবে রাত দুপুরে উঠে পনির দিয়ে রুটি খেতে বসল। হই-চই করে, শব্দ করে আমার ঘুমের বারোটা বাজাবে।
অতএব ঘুমের সুবিধার জন্যে মনটিরের ফিশারম্যান ওআর্ফ থেকে কয়েক ব্লক দূরে একটা মোটেলে দুটো কামরা ভাড়া করলেন তিনি। তারপর ক্যানারি রো-র একটা রেস্টুরেন্টে খাওয়াতে নিয়ে গেলেন ছেলেদের। চমৎকার রান্না করা নানা রকম মাছের স্বাদ বহুদিন মনে থাকবে তিন গোয়েন্দার। খেতে খেতে মনটিরে আর স্প্যানিশ ক্যালিফোর্নিয়ার অনেক ইতিহাস বললেন। মেজাজ একেবারে ফুরফুরে। মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে মিলারের সঙ্গে ঘটে যাওয়া ঘটনাটা যেন বহুযুগ আগের ব্যাপার। কোনই গুরুত্ব নেই ওটার। মন থেকে দূর করে দিয়েছেন বেমালুম।
সে-রাতে সকাল সকাল ঘুমাতে গেল সবাই। কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারল তিন গোয়েন্দা, আলাদা ঘরে শোয়ার ব্যবস্থা করে একটা কাজের কাজ করেছেন রাবাত। তাতে তার চেয়ে ওদের উপকার হয়েছে বেশি। একঘরে থাকলে সারারাত জেগে থাকতে হত। এত জোরে নাক ডাকাচ্ছেন, দুটো ঘরই কাঁপতে শুরু করল।
সাইনাসের সমস্যা আছে, অনুমান করল রবিন।

মা বলে ওসব কিছু না, মুসা বলল, রোগটোগ নেই। আসলে ঘুমের মধ্যেও নানা চান না তাকে অগ্রাহ্য করা হোক।
মাঝখানে একটা দেয়াল থাকলে সাংঘাতিক বিপদে পড়ে যেত তিন গোয়েন্দা। অন্য ঘর থেকে আসছে বলে রক্ষা। তা-ও যা শব্দ! তবে একবার ঘুমিয়ে পড়ার পর আর অসুবিধে হলো না, একটানা ঘুমাল সকাল পর্যন্ত।
জানালার পর্দার ফাঁক দিয়ে ঘরে ঢুকল সকালের রোদ। ঘুম ভাঙল ওদের। শুনতে পেল, উঠে পড়েছেন রাবাত। বাথরুমে তার শাওয়ারের শব্দ। পাওয়া যাচ্ছে। ওরাও উঠে পড়ল। হাত-মুখ ধুয়ে কাপড় পরে তৈরি হলো। দরজায় খটখটানির শব্দ। রাবাত ডাকছেন।
জেটির ধারে একটা রেস্টুরেন্টে নাস্তা করতে বসল ওরা। ভাজা মাংস, কেক আর এক জগ কমলার রসের অর্ডার দিলেন রাবাত। ঘুম ভাল হওয়ায় শরীরটা ঝরঝরে লাগছে কিশোরের। খাবারে আনন্দ পাচ্ছে তাই। খেতে খেতে সাগর দেখার জন্যে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। স্থির হয়ে গেল দৃষ্টি। রেস্টুরেন্টের পাশ দিয়ে চলে যাওয়া রাস্তা ধরে হেঁটে যাচ্ছে একজন লোক। তাড়াতাড়ি আবার প্লেটের দিকে নজর ফেরাল, যাতে তার চমকে যাওয়া রাবাতের চোখে না পড়ে। কেকের একটা টুকরো ভেঙে সিরাপে চুবিয়ে মুখে পুরল।
নানার পাশে, কিশোরের মুখোমুখি বসেছে মুসা। ব্যাপারটা দৃষ্টি এড়াল না তার। প্রশ্ন করার জন্যে মুখ খুলেও থেমে গেল। ভ্রুকুটি করে আর সামান্য মাথা নেড়ে তাকে চুপ থাকতে ইশারা করেছে কিশোর।
তার দিকে তাকিয়ে রাবাত জিজ্ঞেস করলেন, আর কিছু খাবে তোমরা?
মাথা নাড়ল কিশোর, না, অনেক হয়েছে। পেট ভরে গেছে।
খুব ভাল খাবার, রবিন বলল।
চেয়ার পেছনে ঠেলে উঠে দাঁড়ালেন রাবাত। খাবারের দাম দেয়ার জন্যে ক্যাশিয়ারের ডেস্কের দিকে এগোলেন।
সামনে গলা বাড়িয়ে নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল মুসা, কি দেখেছিলে, কিশোর?
হ্যারিস মিলারকে, ক্যানারি রো-র দিকে যাচ্ছে।
ফিরে এলেন রাবাত। ওয়েইটারের জন্যে প্লেটে টিপস রেখে দিয়ে ছেলেদের জিজ্ঞেস করলেন, পানির কিনারটা ঘুরে দেখতে চাও? বেশি দেরি করা যাবে না। আজ রাতেই স্যান ফ্রান্সিসকো পেরোতে চাই। সম্ভব হলে সান্তা রোজাতে চলে যাব। কালকের দিনটা তাহলে রেডউডের বনে ঘুরে। কাটাতে পারব।
তার পেছন পেছন রেস্টুরেন্ট থেকে রাস্তায় বেরিয়ে এল ছেলেরা। রবিনের কাঁধে ঝোলানো একটা আনকোরা নতুন ক্যামেরা। রকি বীচে কেনার পর একটা ছবিও তোলা হয়নি ওটা দিয়ে। এখান থেকে শুরু করার ইচ্ছে তার।

সবাইকে নিয়ে জেটির কাছে চলে এলেন রাবাত। ঘাটে বাঁধা ছোট-বড় অনেক নৌকা ঢেউয়ে দুলছে। জাহাজ বেরিয়ে যাচ্ছে খোলা সাগরে।

এখনও খুব সকাল, কিন্তু জেটিতে পুরোপুরি ব্যস্ততা শুরু হয়ে গেছে। রাতে ধরে আনা মাছ নামাচ্ছে জেলেরা। দোকানে দোকানে টুরিস্টদের ভিড়। বিশেষ করে ঝিনুক-সামগ্রীর দোকানগুলোতে। খটাখট ক্যামেরার শাটার টিপতে লাগল রবিন। মুসার চোখ আকাশে চক্কর দেয়া সী-গালের খেলা। দেখছে। অলস ভঙ্গিতে রাবাত তাকিয়ে আছেন একটা দোকানের দিকে।

ধীরে ধীরে নজর সরে গেল রাস্তার দিকে। মুহূর্তে সতর্ক হয়ে গেলেন। তিনি। শক্ত হয়ে গেল কাধ।

কি বলেছিলাম! শয়তানটা এখানেও এসেছে!

না তাকিয়েও বলে দিতে পারবে কিশোর কার কথা বলছেন রাবাত। হ্যারিস মিলার ছাড়া আর কেউ না। আবার এসেছে যেন রাবাতের হাসিখুশি মেজাজটাকে পলকে বিগড়ে দেয়ার জন্যে। আগুন বানিয়ে দেয়ার জন্যে।

নানা, তাড়াতাড়ি দুহাত তুলে এগিয়ে এল মুসা, দোহাই তোমার, চুপ করে থাকো! কিছু বোলো না!

ভয়ানক ভঙ্গিতে নাক দিয়ে ঘোৎ-ঘোৎ করলেন রাবাত। বেশ! তবে এখানে আমি আর একটা সেকেন্ডও দাঁড়াব না!

ঝিনুকের দোকানটায় ঢুকে পড়লেন তিনি। বিশাল এক দানবীয় ঝিনুকের খোলার ওপাশে মুখ লুকিয়ে ফেললেন। জানালার কাচের ভেতর দিয়ে গোয়েন্দারা শুধু তার কোকড়া চুলগুলো দেখতে পেল।

ধীরে সুস্থে এগিয়ে এল মিলার। তার ওপর যে নজর রাখা হচ্ছে, বুঝতে পারেনি। কাঁধে ঝোলানো নতুন ক্যামেরার ব্যাগ, ক্যামেরাটা হাতে। অবিকল রবিনেরটার মত, একটা Canon II. রবিনের মতই জেটির দৃশ্যের ছবি তোলায় আগ্রহী মনে হলো তাকে। তবে তুলছে না। সকালের ট্যুরিস্টদের ভিড়ে মিশে গেছে। সবই নতুন তার। গায়ের সাদা শার্টটা নতুন–গলার কাছে দুটো বোতাম খোলা, পরনে নতুন জিনসের প্যান্ট। পায়ে রবার সোলের নতুন জুতো। রকি বীচ থেকে বেরোনোর পর পথে কোনখান থেকে একটা নতুন স্ট্র হ্যাটও কিনেছে। হ্যাঁটের চওড়া কানা ছায়া ফেলেছে মুখে।

দ্বিধা করতে লাগল মুসা। তার নানা যে ওত পেতে আছেন ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে এ কথা বলে সাবধান করে দেবে মিলারকে? করতে গেলে এবং সেটা দেখে ফেললে তার ওপর খেপে যাবেন নানা। সেটা চায় না সে। মিলারের সঙ্গে আবার একটা বিচ্ছিরি এটে যাক, এটাও চায় না। কি করবে তাহলে? মুশকিলে পড়ে গেল।

ঘুরে তাকাল সে। দেখল, কিশোরও তাকিয়ে আছে। বুঝল, তার মত একই সমস্যায় পড়েছে কিশোরও।
কয়েক পা হেঁটে গিয়ে একটা বেঞ্চে বসল রবিন। ক্যামেরাটা ব্যাগে ভরে পাশে রেখে সাগরের দিকে তাকাল। মিলারকে না দেখার ভান করল।
ক্যামেরা হাতে হেঁটে এল মিলার। মুসার এত কাছে দাঁড়াল, আরেকটু হলে কাঁধে কাধ ঠেকে যেত, অথচ লক্ষ করল না তাকে। ভয়ানক অন্যমনস্ক। বার বার পেছনে ফিরে তাকাচ্ছে আর ঘড়ি দেখছে। কারও আসার অপেক্ষা করছে বোধহয়।
মিনিট দুয়েক পর এল সে। সতর্ক দৃষ্টিতে চারদিক দেখতে দেখতে ধীর পায়ে এগিয়ে এল। কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, মিলার?
কেমন একটু বিস্ময় আর অবজ্ঞা প্রকাশ পেল লোকটার কণ্ঠে। ফিরে। তাকাল কিশোর। বয়েস চল্লিশের কোঠায়, মাথায় মসৃণ কালো চুল, মুখটাও মসৃণ। পরনে সিল্কের পাজামা, গায়ে নরম কাপড়ের দামী শার্ট। চোখে বিরাট সানগ্লাস মুখের অনেকখানি ঢেকে দিয়েছে। চোখা পাতলা নাক। পাতলা ঠোঁটে ব্যঙ্গের হাসি। ছোট ছোট কান মাথার সঙ্গে প্রায় লেপ্টে আছে। তার পাশে কেমন আড়ষ্ট আর নগণ্য লাগছে জিনস আর সাদা শার্ট পরা গাট্টাগোট্টা মিলারকে।
জবাবে মাথা ঝাঁকিয়ে মিলার বলল, এনেছি।
কিশোরের দিকে তাকাল আগন্তুক।
নিরীহ ভঙ্গি করে সাগরের দিকে চোখ ফেরাল কিশোর।
আসুন, বলে হাঁটতে শুরু করল লোকটা।
নতুন জিনসের খসখস শব্দ তুলে তার পেছনে এগোল মিলার।
আবার ওদের দিকে ফিরল কিশোর। রবিনের কাছাকাছি চলে গেছে দুজনে। কেমন সন্ত্রস্ত লাগছে মিলারকে। স্বাভাবিক থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। বার বার তাকাচ্ছে এদিক ওদিক। যেন লক্ষকোটি চোখ রয়েছে তার। ওপর। সেগুলোকে এড়ানোর চেষ্টা করছে। অমন করছে কেন লোকটা?
রবিন যে বেঞ্চটায় বসেছে তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল সানগ্লাস পরা লোকটা। ফিতে ধরে ক্যামেরাটা ঝোলাতে ঝোলাতে তার সঙ্গে সঙ্গে গেল মিলার। তাকে লোকটা বলল, বসুন এখানে।
বসতে যাবে মিলার, এই সময় চোখ পড়ল রবিনের মুখের দিকে।
কুকড়ে গিয়ে যেন নিজেকে অদৃশ্য করে ফেলতে চাইল রবিন।
কিন্তু চিনে ফেলেছে মিলার। চমকে গিয়ে বলল, তুমি!
কিশোর দেখল, ফ্যাকাসে হয়ে গেছে তার মুখ।

বসা আর হলো না মিলারের। সোজা হয়ে চারপাশে তাকাল। কিশোর আর মুসাকেও দেখতে পেল এতক্ষণে। তবে তার চোখ ওদের খুঁজছে না। কাকে খুঁজছে, বুঝতে পারল কিশোর। বিশাল ঝিনুকের খোলার ওপর দিয়ে সেই মুখটাকে দেখতে না পেলেও ধূসর কোকড়া তারের মত চুল বেরিয়ে থাকতে দেখল।

ধরা পড়ে গেছেন বুঝে আর লুকানোর চেষ্টা করলেন না রাবাত। সোজা হলেন। রাগে জ্বলছে চোখ।

মড়ার মুখের মত সাদা হয়ে গেল মিলারের মুখ।

খাইছে! আঁতকে উঠল মুসা। মিলারের দিকে ছুটল। কিন্তু দেরি করে ফেলেছে।

তীব্র গতিতে দোকান থেকে ছুটে বেরোলেন রাবাত। মুঠো করে ফেলেছেন হাত। পিটিয়ে বালির সঙ্গে মিশিয়ে দেবেন বুঝি আজ মিলারকে!

হাতের ক্যামেরাটা বেঞ্চে প্রায় ছুঁড়ে ফেলে আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে দুই হাত তুলে ফেলল মিলার। পিছিয়ে গেল বেঞ্চের কাছ থেকে। তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল যে লোকটা, বিপদ বুঝতে পারল সে-ও। যেন পিছলে বেরিয়ে চলে গেল।

তার দিকে নজর নেই তিন গোয়েন্দার, রাবাত আর মিলারকে দেখছে।

মিলারের কলার খামচে ধরলেন রাবাত। চেঁচাতে লাগলেন, দেখে ফেলব ভাবোনি, না! আশা ছাড়তে পারোনি। বলেছি না, পাবে না। আমার কাছ থেকে জিনিস নেয়া অত সহজ না।

জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজাল মিলার। কথা বলার চেষ্টা করল, কিন্তু বেরোল কেবল ঘড়ঘড় শব্দ। কণ্ঠনালীতে চাপ পড়ায় কাশতে শুরু করল। বাধা দেয়ার চেষ্টা করল না, রাবাতকে ঠেলে সরাল না; এমনকি পিছিয়ে যাবার কিংবা দৌড় দেয়ার চেষ্টাও করল না–প্রচণ্ড ভয়েই বোধহয় আড়ষ্ট হয়ে গেছে। হাঁ করে তাকিয়ে রইল মারমুখো কালো মুখটার দিকে। নিজের মুখের যে কি ঘনঘন পরিবর্তন হচ্ছে জানতে পারল না।

মিলারকে ভয় দেখাতে পেরে সন্তুষ্ট হলেন রাবাত। শার্ট ছেড়ে দিয়ে বললেন, যাও, ছেড়ে দিলাম এবারও! আবার যদি পিছে লাগতে দেখি...! কথাটা শেষ না করে ইঙ্গিতেই বুঝিয়ে দিলেন কি করবেন। ছেলেদের কাছে। সরে এসে বললেন, চলো, ভিড় জমে যাচ্ছে।

দম বন্ধ করে ফেলেছিল মুসা। বিপদ কেটে যেতে নিশ্বাস ছাড়ল।

গা ঘেষাঘেঁষি করে পড়ে আছে দুটো ক্যামেরার ব্যাগ। ছোঁ মেরে একটা তুলে নিয়েই রওনা হয়ে গেল উত্তেজিত রবিন। ভিড় জমে গেলে মিলার কি করবে, কে জানে! পুলিশ ডাকার জন্যে অনুরোধ করলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। কাজটা

ঠিক করেননি রাবাত। পুলিশ এলে তিনিই ফাসবেন। লোকে দেখেছে, মিলার কিছু করেনি, তিনিই দোকান থেকে ছুটে এসে তাকে আক্রমণ। করেছেন। অতএব যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পালানো দরকার।
রাবাতের পেছনে প্রায় উড়ে চলল তিন গোয়েন্দা। খুব জোরে হাঁটতে পারেন তিনি। পানির ধার ধরে পার্কিং লটের দিকে এগোলেন। বুইকটা আছে ওখানে।
গাড়ির দরজা খুলতে খুলতে আপন মনে হাসলেন তিনি। স্টার্ট দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসার পর বেড়ে গেল হাসি। মিলারের ভড়কে যাওয়া চেহারার কথা মনে করেই হয়তো হাসছেন।
পেছনে চিৎকার শোনা গেল। এত কিছুর পরও আবার এসেছে হ্যারিস মিলার। ছুটে আসছে পেছন পেছন। মনে হলো কিছু বলতে চায়। এক হাতে স্ট্র হ্যাট, আরেক হাতে ক্যামেরার ব্যাগ। চিৎকার করে বলল, রাবাত, প্লীজ, একটা মিনিট দাঁড়াও!
দাঁড়ানো তো দুরের কথা, গাড়ির গতিও কমালেন না রাবাত, বরং এক্সিলারেটর চেপে ধরলেন আরও। লাফ দিয়ে আগে বাড়ল গাড়ি।
থামলে না কেন, নানা? মুসা বলল, কি বলতে এসেছে, শুনলে পারতে।
হু, কাজ নেই আর। থামি। ওই চোরটার সঙ্গে আবার কিসের কথা? নতুন কোন ফন্দি করে এসেছে নিশ্চয়। অত কাঁচা লোক নই আমি, আমার ফর্মুলা চুরির সুযোগ দেব তাকে। তার আগেই জেলে ঢোকাব!
রাগ হয়ে গেল মুসার। যা কাণ্ড শুরু করেছ, জেলে তো ঢুকবে তুমি, দেখতেই পাচ্ছি! মাথা গরম করে কখন মেরে বসবে বেচারাকে; সে মরবে, আর গোষ্ঠীসুদ্ধ আমাদেরকে নিয়ে জেলে ভরবে পুলিশ! তোমার সঙ্গে আসাটাই বোধহয় ঠিক হয়নি!
কিশোর আর রবিন মনে করেছিল রেগে যাবেন রাবাত। কিন্তু ওদের অবাক করে দিয়ে হাসলেন তিনি। বাকা চোখে মুসার দিকে তাকিয়ে বলল, এক্কেবারে দেখি তোর মায়ের মত কথা বলিস! নাকি নানীর মত!
পাগলামি শুরু হলেই বিপদ! নইলে নানা এমনিতে মানুষ খারাপ না। যখন ভাল থাকে, তখন তো খুবই ভাল! মুসা বলল। কজন লোক আছে, আমাদের বয়েসী ছেলেদের সহ্য করতে পারে, বলো? তারপর আবার গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাওয়া! আসলে আমাদেরকে ভাল লেগে গেছে তার।
মাথা ঝাঁকাল কিশোর। মুসার নানাকে অনেক আগে থেকেই চেনে সে, তবে এ রকম ঘনিষ্ঠ ভাবে মেশার সুযোগ হয়নি। মুসারই হয়নি, তার আর কি হবে। তার আচরণে ক্রমেই অবাক হচ্ছে। ভাল না মন্দ, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না ভদ্রলোকের।

এই ভাল তো এই খারাপ। তবে একটা কথা ঠিক, মিলারকে না দেখলে মেজাজ ভালই থাকে তার। অন্তত এতদিন থেকেছে। ভবিষ্যতে কি হবে বলা যায় না।
দুপুর দেড়টা বাজে। বুইকের গায়ে হেলান দিয়ে কথা বলছে দুজনে। তাকিয়ে আছে রবিন আর রাবাতের দিকে। ঘাসে ঢাকা একটা ঢালের গা বেয়ে কিছু দূর উঠে গেছে ওরা। ক্যামেরা উঁচিয়ে ছবি তুলছে রবিন। স্যান ফ্রান্সিসকো বে আর গোল্ডেন গেট ব্রিজের দিকে তাকিয়ে আছেন রাবাত। মহাসুখী মনে হচ্ছে তাকে। মেজাজ অত্যন্ত ভাল। মুসা ভাবল, ইস, এ রকম মেজাজ যদি শেষ পর্যন্ত থাকত।
রাবাতের মেজাজ সেদিন খারাপ হচ্ছে না। সকালে মিলারের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় সামান্য একটুক্ষণ খারাপ ছিল, আনমনে বিড়বিড় করেছেন, ঘোৎ-ঘোৎ করেছেন। হাইওয়ে ১০১-এ ওঠার পর মিলারের কথা উধাও হয়ে গেছে তার মন থেকে। শিস দিতে আরম্ভ করেছেন। উত্তরে স্যান। ফ্রান্সিসকোয় পৌঁছে কিছুক্ষণের জন্যে থেমেছিলেন। লাঞ্চ খাওয়ার জন্যে। কিছু সুভনিরও কেনা হয়েছে। লাঞ্চ খেতে খেতে শুনিয়েছেন ১৯০৬ সালে স্যান ফ্রান্সিসকোর ভয়াবহ ভূমিকম্পের কথা।
পুরো শহরটাতেই আগুন লেগে পুড়ে গিয়েছিল, তাই না? কিশোর বলেছে।
মাথা ঝাঁকিয়েছেন রাবাত। পানি আর গ্যাসের পাইপগুলো আগেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল ভূমিকম্পে। তারপর যখন গ্যাসে আগুন ধরে গেল, নেভানোর জন্যে পানি আর পাওয়া গেল না।
বেলা দুটোয় গোল্ডেন গেট ব্রিজ পেরোল ওরা। সাউস্যালিটোতে এসে হাইওয়ে ছেড়ে পাহাড়ী রাস্তায় ঢুকে পড়লেন রাবাত। এক জায়গায় থেমে রবিনকে আরও কিছু ছবি তোলার সুযোগ দিলেন।
আড়াইটা বাজল। ফিল্ম শেষ হয়ে গেল রবিনের। অবাক হলো সে। এত তাড়াতাড়ি তো শেষ হওয়ার কথা নয়! এত ছবি কি তুলেছে? সন্দেহ হতে লাগল।
পাহাড় বেয়ে দৌড়ে নেমে এল সে। গাড়ির পেছন থেকে ক্যামেরার ব্যাগটা বের করে নতুন ফিল্ম নিয়ে ক্যামেরায় ভরল। কি যেন একটা পরিবর্তন হয়েছে কোথাও, ঠিক ধরতে পারছে না। চাপ লেগেই বোধহয় বেশি চ্যাপ্টা হয়ে গেছে ব্যাগের ওপরটা, ময়লাও লেগেছে বেশ। চিন্তিত মনে ফিরে গিয়ে আরও কয়েকটা ছবি তুলল।
আবার হাইওয়েতে ফিরে এল ওরা। আরও উত্তরে এগিয়ে চলল। রাস্তার দুধারে সুন্দর অঞ্চল। আস্তে আস্তে পশ্চিমে ঢলতে শুরু করল সূর্য।
ডিনারের সময় সান্তা রোজাতে পৌঁছল ওরা। একটা মোটেলে উঠে দুটো রুম ভাড়া করলেন রাবাত। পাশাপাশি ঘর। মাঝের দরজা দিয়ে একঘর থেকে আরেক

ঘরে যাওয়া যায়। দরজাটার কোন প্রয়োজন পড়বে না ওদের, ভাল আর কোন ঘর পাওয়া গেল না বলেই নেয়া।
মোটেলের পুলে সাঁতার কাটার প্রস্তাব করলেন রাবাত। সাতারের পর মোটেলের ডাইনিং রুমে খাওয়া সারলেন। ঘরে এসে রবিন আর কিশোর টিভি দেখতে লাগল, মুসার পেল ঘুম।
এত তাড়াতাড়ি বিছানায় যেতে ইচ্ছে করল না তার। ঘুম তাড়ানোর জন্যে নিচে পুলের ধারে বসানো সোডা মেশিন থেকে একটা সোডা কিনতে চলল। জানালার ধার দিয়ে দরজার কাছে যেতে হয়। জানালার বাইরে চোখ পড়তেই সোডা খাওয়ার কথা ভুলে গেল সে।
ওদের ঘরটা দোতলায়। পার্কিং এরিয়াটা দেখা যায়। নিচে সারি সারি গাড়ি পার্ক করা আছে। নানার বুইকটাও আছে, ওদের ঘরের বেলকনির ঠিক নিচেই। পেছনে খানিক দূরে একটা চকচকে লিংকন গাড়ি। সেটা থেকে হ্যারিস মিলারকে বেরিয়ে আসতে দেখল মুসা।
দম বন্ধ করে ফেলল সে। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল নিথর হয়ে। স্তব্ধ, বিস্মিত। তারপর চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে গিয়ে বলল, কিশোর, দেখে যাও!
চোখের পলকে তার পাশে চলে এল অন্য দুই গোয়েন্দা। জানালা দিয়ে ওরাও দেখতে পেল মিলারকে। রাবাতের গাড়িটার চারপাশে ঘুরছে। একটা জানালার কাছে থেমে কাঁচে নাক ঠেকিয়ে ভেতরে উঁকি দিল। সরে গেল। পেছনে, বুটের ঢাকনা টেনে তোলার চেষ্টা করল। না পেরে ফিরে তাকাল। মোটেলের অফিস এবং তার ওপরের জানালাগুলোর দিকে।
ঝট করে নিচু হয়ে গেল তিন গোয়েন্দা, যাতে চোখে না পড়ে।
দ্বিধা করল মিলার। চিন্তিত ভঙ্গিতে বুইকটার দিকে তাকাল আরেকবার। তারপর লিংকনে উঠে স্টার্ট নিয়ে চলে গেল।
একটা মুহূর্ত চুপ করে রইল তিনজনে।
নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার কিশোর। বলল, মুসা, মনে হচ্ছে তোমার নানার সন্দেহই ঠিক, তার ফর্মুলা চুরির চেষ্টা করছে মিলার।
মাথা নেড়ে মুসা বলল, বুঝতে পারছি না। তবে কিছু একটা যে খুজতে এসেছিল মিলার, তাতে কোন সন্দেহ নেই। যা হোক, মিলারের কথা নানাকে বলার দরকার নেই। কি ঘটাবে কে জানে। শেষে পুলিশ তাকেই ধরে নিয়ে গিয়ে হাজতে ভরবে।
হু, আনমনে মাথা নাড়ল কিশোর।
মিলারের ব্যাপারটা কাকতালীয়ও হতে পারে, রবিন বলল, বিষ্যত্বর থেকে নাকি ছুটিতে আছে। হয়তো আমাদের মতই বেড়াতে বেরিয়েছে। এ দিকে এসেছিল মোটেলের খোঁজে। রাবুনানার গাড়িটা দেখেছে। ভাল করে দেখে যখন বুঝেছে

এটা তারই, এই মোটেলে ওঠার সাহস করেনি আর, পালিয়েছে। পাগলকে সবাই ভয় পায়।
তোমার কথায় যুক্তি আছে। তর্জনী তুলল মুসা, কিন্তু একটা কথা। নতুন গাড়ি কোথায় পেল মিলার? তার তো একটা ঝরঝরে পুরানো শেভি গাড়ি ছিল দেখেছি।
ভাড়া নিয়েছে হয়তো, কিশোর বলল। অত পুরানো গাড়ি নিয়ে দূরের যাত্রায় বেরোনো ঠিক হবে না, তাই।
জবাব না পেয়ে চুপ হয়ে গেল মুসা। তবে সন্তুষ্ট হতে পারল না। মনটা খুঁতখুঁত করতেই থাকল।
আবার টেলিভিশন দেখায় মন দিল তিন গোয়েন্দা।
কিছুক্ষণ পর ছেলেরা কি করছে দেখতে এলেন রাবাত।
রাত সাড়ে দশটায় বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়ল ওরা।
শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লেন রাবাত। তাঁর নাক ডাকানোর বিকট গর্জন পাশের ঘরে অন্যদের কানে এসে পৌঁছল। ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল। রবিন। হেসে উঠল কিশোর। উঠে গিয়ে মাঝখানের দরজাটা লাগিয়ে দিল মুসা। তারপরেও পুরোপুরি বন্ধ হলো না শব্দ, পাল্লার ফাঁক দিয়ে আসতে লাগল এ পাশে। তবে ঘুমাতে আর অসুবিধে হলো না।
একটা আজব স্বপ্ন দেখল মুসা। হোটেলের লবিতে নানাকে অনুসরণ করে যাচ্ছে সে। অনেক বড় লবি। সুদৃশ্য কাপড় পরা মানুষেরা সব ভিড় করে আছে সেখানে, নানা-নাতিকে দেখছে আর হো-হো করে হাসছে। কেন। হাসছে প্রথমে বুঝতে পারল না মুসা। নানার দিকে চোখ পড়তে দেখল তার। পরনে শুধু লাল গেঞ্জি আর লাল জাঙ্গিয়া। তারপর চোখ পড়ল নিজের দিকে। নানার তো তা-ও কিছু পোশাক আছে, তার পরনে একেবারেই নেই। পুরোপুরি দিগম্বর।
চমকে জেগে গেল মুসা। ঘামে নেয়ে গেছে। পানি খাওয়ার জন্যে উঠে বাথরুমের দিকে চলল সে। জানালা দিয়ে চোখ পড়তে থমকে দাঁড়াল।
পার্কিং লটের উজ্জ্বল আলোগুলো নেভানো। পাশের প্যাসেজ থেকে এসে পড়া আলোয় দেখা গেল বুইকের কাছে ঘাপটি মেরে আছে একটা ছায়ামূর্তি।
কিশোরের বিছানার পাশে প্রায় উড়ে চলে এল মুসা। তাকে ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে, বলল, কিশোর! জলদি ওঠো! গাড়ির কাছে আবার। এসেছে ও!

.

খালি পায়েই ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির দিকে দৌড় দিল তিনজনে।
দুপদাপ করে নামতে গিয়ে হোঁচট খেলো কিশোর। উল্টে পড়তে পড়তে কোনমতে রেলিঙ ধরে সামলে নিল।

গাড়ির পাশে ঝুঁকে থাকা মূর্তিটা ঝট করে সোজা হলো। সিঁড়িতে চোখ পড়তেই আর দাঁড়াল না, দৌড় মারল রাস্তার দিকে মুখ করে রাখা গাড়িগুলোর দিকে।
তাড়া করল তিন গোয়েন্দা। খালি পা বলে সুবিধে করতে পারল না। কিশোর তো খোঁড়াতেই শুরু করল। সবার আগে রাস্তায় পৌঁছল মুসা। কিন্তু লোকটাকে ধরতে পারল না!
ধূর! বিরক্তিতে বাতাসে থাবা মারল সে।
গেল! দাঁড়িয়ে গিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল রবিন।
মিলারকেই দেখেছ তো? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
কোন সন্দেহ নেই, জবাব দিল মুসা। পালাচ্ছিল যখন তখনও দেখেছি। বারান্দার আলো পড়েছিল তার মুখে।
বুইকের কাছে ফিরে এল ওরা। ঘুরতে শুরু করল চারপাশে। দরজা টান দিয়ে দেখল। তালা লাগানো। বুটের ঢাকনায়ও তালা। চার হাত-পায়ে ভর রেখে উবু হয়ে গাড়ির নিচে উঁকি দিল কিশোর। নিচেটা অন্ধকার বলে কিছু দেখতে পেল না।
টর্চ লাগবে, উঠে দাঁড়িয়ে হাত ঝেড়ে বালি ফেলল কিশোর।
এই সময় মাথার ওপরে একটা দরজা খুলে গেল। ব্যালকনিতে বেরিয়ে এলেন রাবাত। কি ব্যাপার? চারটেই বাজেনি এখনও, এত সকালে গাড়ির। কাছে কি?
সমস্ত হোটেল ঘুমিয়ে আছে। কেউ যাতে বিরক্ত না হয় সেজন্যে আস্তে করে বললেন তিনি। কিন্তু সেই আস্তেটাই আধ মাইল দূর থেকে শোনা গেল। গলা বটে একখান। পটাপট আলো জ্বলে উঠল জানালায়, দরজা খুলে উঁকি দিল কয়েকজন গেস্ট।
কে জানি ঘোরাফেরা করছিল এখানে, নানাকে জানাল মুসা।
মিলার না তো!
জবাব দিল না মুসা।
তার চুপ করে থাকাকেই হ্যাঁ ধরে নিয়ে ওদেরকে ঘরে ফিরে আসতে বললেন রাবাত। ওরা এলে ঘোঁৎ-ঘোৎ করে বললেন, ও সন্দেহ করেছে, আমার কাছেই আছে জিনিসটা। খুঁজুক। যত ইচ্ছে উৎপাত করুক, নিতে আর পারবে না।
কি আছে তোমার কাছে, নানা? জানতে চাইল মুসা।
ও সব জেনে কাজ নেই তোদর। যত কম জানবি তত ভাল থাকবি। যা, শুয়ে পড়গে। রাত এখনও অনেক বাকি। ওই শেয়ালটার জন্যে ঘুম নষ্ট করার কোন মানে নেই। চেষ্টার কমতি করছে না, তবে ক্ষতি কিছু করতে পারেনি। কি বলিস?
তা পারেনি, জবাব দিল কিশোর।

মাথা ঝাঁকালেন রাবাত। পারবেও না। ওর স্বভাবই ওরকম। চোরের মত আসে যায়। মুখোমুখি হওয়ার সাহস নেই।
নিজের ঘরে চলে গেলেন রাবাত। গোয়েন্দাদের অবাক করে দিয়ে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই নাক ডাকানো শুরু করলেন।
মুসা বলল, নানার কথা সত্যি বলেই মনে হচ্ছে এখন। তার আবিষ্কারের পেছনেই লেগেছে মিলার। নিতে যখন পারেনি, আবারও আসতে পারে। তালা কিংবা জানালা ভেঙে গাড়িটার ক্ষতি করতে পারে। বাকি রাতটা আমি গাড়িতে ঘুমাব।
রাবাতের ঘরে ঢুকল সে। নাসিকা গর্জনের সামান্যতম ব্যাঘাত না ঘটিয়ে আলগোছে টেবিল থেকে গাড়ির চাবি তুলে নিয়ে ফিরে এল। নিজের বিছানা থেকে কম্বলটা তুলে নিয়ে কিশোরকে সহ নেমে এল নিচে, গাড়ির কাছে। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল দুজনে। গ্লাভ কম্পার্টমেন্ট থেকে টর্চ বের করল মুসা। কিন্তু সুইচ অনেক টেপাটেপি করেও আলো জ্বালতে পারল না।
দূর! ব্যাটারি শেষ মনে হয়। দেখা গেল না!
হতাশ খানিকটা কিশোরও হলো। বলল, যার জন্যে এসেছিল, নিতে পারেনি মিলার। আবার আসতে পারে। এলে একা কিছু করতে বেরিও না। আমাদের ডেকো।
মুসাকে গাড়িতে রেখে ঘরে ফিরে এল কিশোর।
পেছনের সীটে গুটিসুটি হয়ে শুয়ে গায়ে কম্বল টেনে দিল মুসা। মনে হলো মুহূর্তের জন্যেও আর দুচোখের পাতা এক করতে পারবে না।
কিন্তু পারল। তবে গাঢ় হলো না ঘুম। একের পর এক দুঃস্বপ্ন দেখতে লাগল। আবার দেখল সেই স্বপ্নটান্যাংটো হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে আর তার নানা। লোকে হাসাহাসি করছে। সরে যাওয়ার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে, কিন্তু নানা তাকে যেতে দিচ্ছে না।
ঘুম ভেঙে গেল তার। সবে সূর্য উঠছে তখন। গাছের ডালে কলরব করছে পাখিরা। মুসা দেখল, লাল জগিং স্যুট পরা মোটা এক মহিলা গাড়ির জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখছে তাকে।
মুসা চোখ মেলতেই জিজ্ঞেস করল, এখানে কি?
উঠে বসল মুসা। পরনে কেবল জাঙ্গিয়া। নামার সময় তাড়াহুড়োয় অন্য কাপড় না পরে কোমরে শুধু কম্বল জড়িয়ে বেরিয়েছিল। স্বপ্নটা সত্যি হয়ে যাচ্ছে দেখে ধক করে উঠল বুক। পিছলে সীট থেকে মেঝেতে নেমে গেল সে।
সন্দেহ হলো মহিলার। চোর-টোর নাকি? দরজার হাতল ধরে টান দিল।
খাইছে! ভাগ্যিস ঘুমানোর আগে তালা লাগিয়ে রেখেছিলাম। মরিয়া হয়ে চিৎকার করে বলল, আপনি যান! সরুন!

ভাল করে কম্বল টেনে শরীরের নিচের অংশ ঢেকে দিল সে। গেল না মহিলা। জানালার কাছে নাক ঠেকিয়ে আরও বেশি করে উঁকি দিতে লাগল। আর কোন উপায় না দেখে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল মুসা। কোমরে কম্বল জড়ানো।
গাড়িতে কি করছিলে? তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানতে চাইল মহিলা।
ঘুঘুমাচ্ছিলাম। এটা আমাদেরই গাড়ি!
কেন, হোটেলে কি জায়গার অভাব?
না, তা নয়… কোমরে পেঁচানো কম্বল চেপে ধরে হাঁটতে শুরু করল। মুসা।
ভুরু কুঁচকে ফেলল মহিলা, ব্যাপার কি, অমন করছ কেন? তোমার বাবা-মা সঙ্গে আসেনি? এ ভাবে ছেলেকে গাড়িতে ঘুমাতে ছেড়ে দিল? কাজটা কি ঠিক করেছে?
না, ম্যাম, কোনমতে দায়সারা জবাব দিয়ে মোটেলের দরজার দিকে দৌড় দিল মুসা।
হাঁ হয়ে তাকিয়ে রইল মহিলা। বিড়বিড় করে বলল, কি সাংঘাতিক কিপটেরে বাবা! পয়সা বাঁচাল! ছেলেকে গাড়িতে পাঠিয়ে নিজেরা ঘরে শুয়ে আছে আরাম করে! আরেকটা ঘর ভাড়া নিতে এমন কি-ই বা খরচ হত!
সিঁড়ি দিয়ে প্রায় ব্যাঙের মত লাফাতে লাফাতে ওপরে উঠে এল মুসা। দরজায় ধাক্কা দিল। খুলে দিল রবিন।
ভেতরে ঢুকে সব বলল মুসা। শেষে বলল, নানাকে বলার দরকার নেই। শুনলেই যাবে মহিলার সঙ্গে ঝগড়া করতে!
হাসতে লাগল রবিন।
রেডউড হাইওয়ে ধরে সেদিন আরও উত্তরে এগিয়ে চলল ওরা। ফুরফুরে মেজাজে আছেন রাবাত। পথের দুই ধারে রেডউডের জঙ্গল তার স্মৃতিকে নাড়া দিয়ে চলেছে। মনে পড়ছে বহুদিন আগের কথা। সেদিন এ পথে যাওয়ার সময় বয়েস ছিল অনেক কম, পাশে ছিল তরুণী স্ত্রী। আর আজ!
জিজ্ঞেস করলেন, মুসা, তোর নানীর কথা মনে আছে?
নানার এই আচমকা প্রশ্নে অবাক হয়ে গেল মুসা। আছে, অল্প অল্প। খুব ভাল অ্যাপল কেক বানাতে পারত নানী।
আরও অনেক কিছু পারত, বিষণ্ন হয়ে গেলেন রাবাত। আমাকে ছাড়া একটা মুহূর্ত থাকতে পারত না। আর এখন! মানুষ মরে গেলে কত দূর হয়ে যায়!
স্থির দৃষ্টিতে বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। এক খোলসে যেন দুজন মানুষ। একজন অতি কোমল হৃদয়ের স্নেহপ্রবণ স্বামী এবং নানা, যিনি তার মৃত স্ত্রীর কথা ভেবে বিষণ্ন হয়ে যান, নাতিকে ভালবাসেন, ভালবাসেন তার বন্ধুদেরও। আরেকজন সাংঘাতিক বদমেজাজী পাগলাটে এক বৃদ্ধ, পড়শীকে যিনি সারাক্ষণ

সন্দেহ করেন, দুচোখে দেখতে পারেন না, একবিন্দু সহ্য করতে পারেন না। যদিও সহ্য করার মত লোক নয় হ্যারিস মিলার। তারও দোষ আছে। বাগান করার যন্ত্রপাতি চুরি করে খামখেয়ালী একজন মানুষকে খেপানোর কি দরকার?
আচ্ছা, পেছনে লেগেছে কেন মিলার? কাকতালীয় ঘটনা বলে আর মেনে নিতে পারছে না কিশোর। রাতে দ্বিতীয়বার এল কেন মিলার? তবে কি রাবুনানার কথাই ঠিক? তার আবিষ্কারের ফর্মুলা কেড়ে নিতে চায় মিলার? আবিষ্কারটা কি? কোন সূত্র নেই, সুতরাং কি জিনিস হতে পারে আন্দাজও করতে পারছে না সে। জিজ্ঞেস করে লাভ নেই। ইচ্ছে করে না বললে তার মুখ থেকে কিছু বের করতে পারবে না।
মিলারের আচরণ যেহেতু সন্দেহজনক হয়ে উঠেছে, তার ব্যাপারে জানা দরকার। আলোচনা শুরু করার জন্যে বলল, অর্কিডের কথা ভাবছি।
কিশোরের এই অপ্রাসঙ্গিক কথায় অবাক হলো রবিন। অর্কিড! কিসের অর্কিড?
কেন, ভুলে গেছ, মিস্টার মিলার অর্কিডের চাষ করে?
হ্যাঁ, করে, জবাব দিলেন রাবাত। তার কথায় যোগ দেবেন তিনি, এটাই চাইছিল কিশোর। বলল, কিন্তু বাগান করার মত ধৈর্য তার আছে বলে তো মনে হয় না। লনের ঘাস কাটার ইচ্ছে হয় না যার, সে অর্কিডের চাষ করে, ভাবতে কেমন অবাক লাগে না?
লনের ঘাস কাটলে তো আর পয়সা আসে না, কাটবে কেন? গাছ, ফুল, কিংবা বাগানের প্রতি কোন আগ্রহ নেই মিলারের, তার একমাত্র আগ্রহ–টাকা। অর্কিডের পেছনে সময় ব্যয় করে টাকা আসে বলে। ফুল বিক্রেতারা তার কাছ থেকে কিনে নিয়ে যায়। একটা অর্কিড ক্লাবের সদস্য সে। মাসে একবার করে মিলিত হয় সবাই। তখন ওর মতই কিছু পাগলকে অর্কিড দেখাতে বাড়ি নিয়ে আসে মিলার। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বিনা লাভে আনে না। ওদের কাছ থেকেও কিছু না কিছু হাতিয়ে নেয় সে। অন্য কিছু আদায় করতে না পারলে কায়দা করে ওদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেয়। মাঝেমধ্যেই দেখি অপরিচিত একজন ওর গ্রীনহাউসে কাজ করছে।
কারা ওরা?
হবে ওর ক্লাবের কোন বোকা লোক।
এখন কেউ আছে নাকি? জানতে চাইল কিশোর।
কি জানি। ও সব নিয়ে মাথা ঘামাই না। অত পাজি মানুষ আমি জীবনে দেখিনি! অভদ্র! এই ব্লকে যখন প্রথম এল, কি করেছিল জানো? একবার আমার পানির পাইপে গোলমাল দেখা দিল। পানি সরবরাহ বিভাগকে খবর দিলাম। এসে দেখল মেইন লাইনে ছিদ্র হয়ে গেছে, সেটা দিয়ে সব পানি বেরিয়ে যায়। সারানোর সময়

আমার বাড়িতে পানি সরবরাহ বন্ধ রাখতে হয়েছিল। খাওয়ার পানি নেই ঘরে। ভাবলাম, কি আর হবে, পড়শীই তো, একটা কেটলি নিয়ে মিলারের বাগানের কলে গেলাম পানি আনতে। কি করল সে জানো?
নিশ্চয় পুলিশ ডাকল? অনুমানে বলল রবিন।
ডাকার হুমকি দিল। অবাক হয়ে গেলাম। আরও অভিযোগ করল, আমি নাকি তার লাইনের সঙ্গে হোস পাইপ লাগিয়ে পানি চুরি করে নিয়ে যাই বাগানে দেয়ার জন্যে। যেন ওই কটা টাকার পানি চুরি করার জন্যে পাগল হয়ে গিয়েছি আমি!
মিলারের কথা বলতে গিয়ে রেগে যাচ্ছেন রাবাত। এই প্রথম রেডউডের জঙ্গলের ওপর থেকে নজর সরে গেল তার।
মিলারটা একটা প্যারানয়েড, কোন সন্দেহ নেই, বললেন তিনি। এই জন্যেই ওরকম ভাবনা মাথায় ঢোকে। প্যারানয়েড কাকে বলে জানো? মগজের এক ধরনের রোগ। এ সব রোগীরা সব মানুষকেই সন্দেহের চোখে দেখে। ভাবে, এই বুঝি কেউ তার সব জিনিস চুরি করে নিয়ে গেল, তার ক্ষতি করতে এল। মিলার একটা প্যারানয়েড! কথাটা আবার বললেন তিনি।
রাবাতের রাগ চরমে পৌঁছার আগেই তাকে থামানো দরকার। আপাতত মিলারের ভাবনা তার মাথা থেকে দূর করতে না পারলে অবস্থা কোন দিকে গড়াবে বলা যায় না। তাই চুপ হয়ে গেল কিশোর। ও ব্যাপারে আর কোন প্রশ্ন করল না।
নীরবে গাড়ি চালালেন রাবাত। দিনটা চমৎকার, রেডউডের জঙ্গলেরও এক ধরনের আকর্ষণ আছে, যা খুব তাড়াতাড়িই রাগ কমিয়ে দিল তার।
পথে কোন অঘটন ঘটল না। ক্যালিফোর্নিয়ার সাগর তীরের ছোট্ট শহর ক্রিসেন্ট সিটিতে নিরাপদে পৌঁছল ওরা। সূর্য তখন দিগন্ত সীমার প্রায় কাছাকাছি নেমে গেছে। একটা মোটেলে ঘর ভাড়া নিয়ে আগে গোসল সেরে নিল সবাই। তারপর বেরোল শহরটা ঘুরে দেখতে।
মনটিরের ফিশারম্যান ওআর্ফ জেটির তুলনায় এখানকার জেটিটা অনেক ছোট। তবে বেশ ছিমছাম। পানির ধারে পার্কিঙের জায়গা আছে, কয়েকটা রেস্টুরেন্ট আর গোটা দুই বড় ধরনের দোকানও আছে। রেস্টুরেন্টগুলোর কাছ থেকে কিছুটা দূরে নৌকা বাঁধার জায়গা। ছোট জেটি হলেও যথেষ্ট সরগরম। নৌকা পরিষ্কার করছে কয়েকজন মাল্লা। কেউ পরিষ্কার করছে, কেউ বা ছেঁড়া পাল মেরামতে ব্যস্ত। সী-গাল উড়ছে। বেড়াতে আসা দম্পতিরা অলস ভঙ্গিতে হাঁটছে পাকা চত্বরে, সূর্যাস্ত দেখছে।
মিলারকে বোধহয় এড়ানো গেল, আচমকা বলে বসলেন রাবাত।
এই রে, সেরেছে! শঙ্কিত হয়ে পড়ল মুসা। ভেবেছিল, অর্কিড ব্যবসায়ীর কথা ভুলে গেছেন নানা। কিন্তু না, ভোলেননি। মেজাজ এখন কেমন হয়ে যায়, কে জানে!

আসার সময় রিয়ারভিউ মিররে চোখ রেখেছিলাম, রাবাত বললেন, কোন গাড়িকে আমাদের লেজে লেগে থাকতে দেখিনি। কাল রাতে তোদের তাড়া খেয়ে ভয় পেয়েছে শেয়ালটা, তাতেই মুরগী চুরির লোভ উবে গেছে।
হবে হয়তো, হেসে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আলোচনাটা ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করল মুসা।
রাস্তায় অনেকগুলো ইঞ্জিনের শব্দ আর হই-চই শোনা গেল।
সাতটা মোটর সাইকেল ছুটে আসছে জেটির দিকে। আরোহীরা সবাই তরুণ, কালো চামড়ার জ্যাকেট পরা।
হুমম! মাথা দোলালেন রাবাত। চালচলন ভাল মনে হচ্ছে না!
আসলেই ভাল নয় ওরা। বেশির ভাগেরই দাড়ি আছে। কারো ঘন চাপদাড়ি বিচিত্র ছাঁটে কাটা হয়েছে, কারও বা পাতলা ফিনফিনে, লম্বা লম্বা দাড়ি। সেগুলো এমনিতেই বিচিত্র, কাটার আর প্রয়োজন পড়েনি। কোমরে চওড়া চামড়ার বেল্ট, কব্জিতে রিস্টব্যান্ড, হাতে গ্লাভস–সব কিছুতেই ছোট বড় নানা আকারের লোহার কাটা বসানো। হলিউডের ছবিতে দেখানো। ভয়ঙ্কর মোটর সাইকেল গ্যাঙের এ যেন বাস্তব রূপ।
হাই, কালু নানা! কাছে এসে চিৎকার করে উঠল এক আরোহী। মোটর সাইকেলের সামনের চাকা রাবাতের গায়ে তুলে দেয়ার ভঙ্গি করে সরে গেল। হি-হি করে গা জ্বালানো হাসি হাসল।
তিন গোয়েন্দা ভাবল এখনই ভীষণ রাগে ফেটে পড়বেন রাবাত। কিন্তু। পড়লেন না। ওদের অবাক করে দিয়ে বরং দলটার দিকে তাকিয়ে রহস্যময় হাসি হাসলেন। বললেন, এদের মধ্যে একটা ছেলেও ভাল নেই। সব পচা ডিম।
নানা, চলো চলে যাই! ঘাবড়ে গিয়ে বলল মুসা।
চত্বরের শেষ মাথায় চলে গেছে দলটা। প্রায় একসঙ্গে ঘুরে গিয়ে পাশাপাশি দাঁড়াল। ক্লাচ চেপে ধরে, এক্সিলারেটর বাড়িয়ে দিয়ে ইঞ্জিনের বিকট গোঁ-গোঁ শব্দ তুলে রাবাতকে ভয় পাওয়ানোর চেষ্টা করল। তিন কিশোর আর একজন বুড়োর ক্ষমতা কতখানি আন্দাজ করছে।
হাত ধরে টানল মুসা, নানা, চলো!
ইইইই-ইআআআ! বলে তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠল এক আরোহী। দলটার দলপতি।
গর্জে উঠল তার ইঞ্জিন। সোজা ছুটে আসতে লাগল রাবাত আর ছেলেদের লক্ষ্য করে।
কাছাকাছি থাকো, ছেলেদের আদেশ দিলেন রাবাত, নড়বে না! আগে চলে গেলেন তিনি, লোকটার আক্রমণের মোকাবেলা করার জন্যে।

ভয়ে পেটের ভেতরে খামচি দিয়ে ধরল যেন কিশোরের।
নেতার পেছনে ভয়ানক গতিতে ছুটে আসছে বাকি ছয়জন। দাঁত বের করে হাসছে। একটা জিনিস শূন্যে ছুঁড়ে দিল একজন। কাটা বসানো একটা বেল্ট। ওটার বাড়ি শরীরে পড়লে কি অবস্থা হবে কল্পনা করে শিউরে উঠল কিশোর।
গোয়েন্দাদের চারপাশে জেটির লোক আর ট্যুরিস্টরা ছুটাছুটি করে সরে যাচ্ছে। কে যেন চিৎকার করে বলল, পুলিশকে ফোন করো।
ইঞ্জিনের গর্জন তুলে রাবাতের পাশ কেটে চলে গেল মোটর সাইকেলগুলো। কয়েক গজ গিয়ে ঘুরে আবার ছুটে আসতে লাগল। আরোহীদের অট্টহাসি তুঙ্গে উঠেছে।
রাবাত আর তিন গোয়েন্দাকে ঘিরে ফেলল ওরা। ঘুরতে ঘুরতে ছোট করে আনছে বৃত্ত। ভেতরে আটকা পড়েছে ওদের শিকার। এক মারাত্মক খেলায় মেতেছে।
আচমকা বৃত্ত ভেঙে দিয়ে রাবাতের দিকে সাইকেলের নাক ঘোরাল দলপতি। তীব্র গতিতে ছুটে এল রাবাতের দিকে। মাত্র হাতখানেক দূরে এসে ঘ্যাচ করে ব্রেক কষল। ওর ফিনফিনে দাড়ির ওপরে চৌকো একটা চোয়াল, বড় বড় দাঁত, কালো কুতকুতে চোখ। সাতটা ইঞ্জিনের গর্জনকে ছাপিয়ে হা হা করে হেসে উঠল সে।
নড়ে উঠলেন রাবাত। নড়াটা এত সামান্য, প্রায় চোখেই পড়ল না গোয়েন্দাদের। মনে হলো, কি যেন ছুঁড়ে দিলেন।
পিস্তলের গুলি ফোঁটার মত টাসস করে শব্দ হলো। দেখা দিল এক ঝলক, কালো ধোয়া। মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ে ঢেকে দিতে লাগল মোটর সাইকেল আরোহীকে।
কুতকুতে চোখে ভয় দেখা দিল। হাসির বদলে মুখ থেকে বেরিয়ে এল চিৎকার। মেঘের ভেতর থেকে সরে যাওয়ার জন্যে এত জোরে মোটর সাইকেল ঘোরাতে গেল, চাকা পিছলে পড়ে গেল কাত হয়ে।
আবার নড়ে উঠলেন রাবাত। আবার শোনা গেল তীক্ষ্ণ শব্দ, এবং তারপর ধোয়া।
পিছিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল বিমূঢ় আরোহীরা। দিশেহারা হয়ে গেছে। যেন। পাগলের মত এদিক ওদিক তাকিয়ে খুঁজছে অদৃশ্য রহস্যময় পিস্তলধারীকে। কার গায়ে গুলি লেগেছে বোঝার চেষ্টা করছে।
হাইওয়েতে সাইরেন শোনা গেল। পুলিশ আসছে।
ছাতের ওপরে আলো ঘোরাতে ঘোরাতে জেটির দিকে ছুটে এল। পুলিশের দুটো গাড়ি।
মোলায়েম হাসি হেসে রাবাত বললেন, চলো, ছেলেরা, খিদে পেয়েছে।
পানির কিনারের একটা রেস্টুরেন্টের দিকে পা বাড়ালেন তিনি। তাকে অনুসরণ করল তিন গোয়েন্দা।

রেস্টুরেন্টের দরজায় লোকের ভিড়। রাবাত কাছাকাছি হতেই সরে গিয়ে ঢোকার জায়গা করে দিল।
তার কাঁধে হাত রেখে সহানুভূতির সুরে জিজ্ঞেস করল একজন, কোথাও লাগেনি তো?
ওদের সঙ্গে লাগতে যাওয়া উচিত হয়নি আপনার, আরেকজন বলল। নরকের ইবলিস একেকটা। পুলিশ আসাতে বাচলেন!
পুলিশ আসাতে আমি নই, শান্তকণ্ঠে জবাব দিলেন রাবাত, ওরা বেঁচেছে। কতটা ক্ষতি যে করতে পারতাম জানেই না!

.

রেস্টুরেন্টের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছেন রাবাত। মোটর সাইকেল গ্যাঙের লোকগুলোকে ধরেছে পুলিশ। লাইসেন্স দেখছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও দেখাতে বাধ্য হচ্ছে আরোহীরা।
তাড়া না থাকলে ওদের বিরুদ্ধে নালিশ করতাম, বললেন তিনি। জেলের ভাত খাইয়ে ছাড়তাম ব্যাটাদের। কিন্তু এখন ওসব করার সময় নেই। খাবারের একটা মেনু খুললেন।
একে একে স্টার্ট দিতে আরম্ভ করল লোকগুলো। একসঙ্গে দল বেঁধে। পাশাপাশি এগিয়ে চলল পানির কিনার ধরে। গাড়িতে উঠল পুলিশ অফিসারেরা। দলটার পেছনে চলল।
হাজতে নিয়ে যাচ্ছে নাকি? রবিনের প্রশ্ন।
মনে হয় না, রাবাত বললেন। শহর থেকে বের করে দিয়ে আসতে যাচ্ছে হয়তো।
নানা, শব্দটা কি করে হয়েছিল? জিজ্ঞেস করল মুসা।
শব্দ? কিসের শব্দ? মেন্যুতে মনোযোগ রাবাতের, মোটর সাইকেল। আরোহীদের কথা যেন ভুলেই গেছেন।
ওদের দিকে কিছু একটা ছুঁড়ে দিয়েছিলে তুমি। পিস্তল ফোঁটার মত শব্দ হয়েছিল। কিসের শব্দ? বাজি?
না না, বাজি হবে কেন! বাজি পোড়ানো অনেক শহরে নিষেধ। আমার খুদে আবিষ্কারগুলোর একটা ব্যবহার করেছি। বাজারে ছাড়লে খুব জনপ্রিয়তা। পাবে। চলবে ভাল। অতি সাধারণ একটা জিনিস, অথচ ভয়াবহ শব্দ করে, ধোয়া ছড়ায়, কিন্তু শরীরের ক্ষতি করে না; সুতরাং বেআইনী বলতে পারবে না পুলিশ। বরং অপরাধীদের হাত থেকে বাঁচতে সাহায্য করবে নিরীহ মানুষকে। দেখলেই তো, কি করে ভয় ঢুকিয়ে দিলাম শয়তানগুলোর মনে।
হাসল মুসা। দেখলাম। কিন্তু বাজারে ছাড়লেই তো অপরাধীদের জানা হয়ে যাবে ওটা কি জিনিস, আর ভয় পাবে না। তখন কি হবে?

তখন আমি ওগুলো ডাকপিয়নদের কাছে বিক্রি করব, হাসিমুখে জবাব দিলেন রাবাত। কল্পনা করতে পারবি না চিঠি বিলি করতে গিয়ে কি বিপদে পড়ে ওরা। জঘন্য সব কুত্তা পালে আজকাল লোকে।
আবার মেন্যুতে মন দিলেন তিনি।
পরদিন দুপুর একটা নাগাদ অরিগনের পোর্টল্যান্ড পেরোল ওরা। রাস্তার পাশে সাইনবোর্ড দেখে মুসা বলল, নানা, এখানে থামবে? সেইন্ট হেলেনস পর্বতমালা দেখার ইচ্ছে আমার বহুদিনের।
থামব তো বটেই, রাবাত বললেন। একসঙ্গে অতগুলো জীবন্ত আগ্নেয়গিরি দেখার ভাগ্য কজনের হয়? সুযোগ যখন পাওয়া গেছে সেটা অবশ্যই কাজে লাগানো উচিত।
হাইওয়ে থেকে সরে এলেন তিনি। মোচড় খেয়ে খেয়ে উঠে যাওয়া পাহাড়ী পথ ধরে উঠতে আরম্ভ করলেন। আস্তে আস্তে ধূসর হয়ে আসতে লাগল দিনের আলো। ঝপাঝপ করে যেন গাড়ির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল। মেঘের ভেলা। আকাশময় এখানে উড়ে বেড়াচ্ছে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ।
শেষ মাথায় উঠে এল ওরা। ভেবেছিল এখানে উঠলেই চোখে পড়বে। মাউন্ট সেইন্ট হেলেনস। মেঘের ওপরে উঠে এসেছে, অনেক নিচে ভাসছে মেঘের ভেলাগুলো। পুবে তাকাল। পর্বতমালাটা ওদিকেই থাকার কথা। কিন্তু প্রচণ্ড বিস্ময় অপেক্ষা করছে ওদের জন্যে। পর্বত চোখে পড়ল না। কেবল ঘন ধূসর ধোয়া ভলকে ভলকে ওপরে উঠছে, ছেয়ে দিয়েছে আকাশ।
খাইছে! কোনমতে বলল মুসা।
হেসে তার নিরাশা দূর করার চেষ্টা করলেন রাবাত, অত মন খারাপ করছিস কেন? পুরো দেশটাই আমাদের সামনে পড়ে আছে। ভাল ভাল দৃশ্য প্রচুর দেখতে পাবি।
গাড়ি ঘুরিয়ে আবার নামতে লাগলেন তিনি। কিছুদূর নামার পর হঠাৎ নামল ঝমঝম করে বৃষ্টি। ভিজিয়ে দিল গাড়ির কাচ। অস্পষ্ট হয়ে গেল সামনের আর আশপাশের সব কিছু।
হাইওয়ে ফাইভ-এ পৌঁছে দেখা গেল অনেক গাড়ি হেডলাইট জ্বেলে দিয়ে চলছে। বৃষ্টিতে অন্ধকার হয়ে গেছে। সিদ্ধান্ত নিলেন রাবাত, সেদিন এর বেশি আর এগোবেন না, ওয়াশিংটনের লঙভিউতে রাত কাটাবেন। নিজের পরিকল্পনা নিয়ে এতই মগ্ন রইলেন, রাস্তার ধারে থেমে থাকা লিংকন গাড়িটাকে শুরুতে খেয়াল করলেন না। আলো জ্বালেনি ওটা। ওয়াইপার চলছে। এগজস্ট থেকে একঝলক সাদা ধোয়া বেরিয়ে মিশে গেল ভেজা বাতাসে।
গাড়িটা চোখে পড়তেই শক্ত হয়ে গেল কিশোর।

লিংকনের ড্রাইভিং হুইলে ঝুঁকে রয়েছে একজন লোক। কে? হ্যারিস মিলার? সান্তা মনিকায় এ রকম একটা গাড়ি দেখেছিল, ওটাই কিনা নিশ্চিত হতে পারল না। এ পথে ধূসর লিংকনের অভাব নেই। তার মধ্যে কোনটা মিলারের কে বলবে? নম্বর প্লেট একবার দেখেই মুখস্থ করে ফেলল নম্বরটা : 111-XTJ.

মিলার! আচমকা সবাইকে চমকে দিয়ে হিসহিস করে উঠলেন রাবাত। চোখে পড়ে গেছে লিংকনটা। ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষলেন। বেজে উঠল একঝাক। হর্ন। তীব্র প্রতিবাদ জানাতে লাগল পেছনের গাড়িগুলো।

জলদি চালাও, নানা! চেঁচিয়ে উঠল মুসা।

রাস্তার মাঝখানে এ ভাবে ব্রেক কষা মারাত্মক বিপদ ডেকে আনতে পারে। ঠিক পেছনের গাড়িটা এসে বাম্পারে গুতো মারার আগেই আবার এক্সিলারেটরে পায়ের চাপ বাড়ালেন রাবাত। লাফ দিয়ে আগে বাড়ল বুইক। অল্পের জন্যে গুতো খাওয়া থেকে বেচে গেল। দুর্ঘটনাটা ঘটল না। গায়ে কাপুনি উঠে গেছে ছেলেদের। কিন্তু রাবাতের কোন ভাবান্তর নেই, তিনি স্বাভাবিক রয়েছেন।

ভয় পেয়েছ! সরি! বললেন তিনি। গাড়িটা দেখে আর সামলাতে পারলাম নাঃ শিওর ওটাতে মিলার বসে আছে।

ফিরে তাকাল ছেলেরা। রাস্তার পাশে তেমনি দাঁড়িয়ে আছে লিংকন, বৃষ্টিভেজা ধূসরতার মাঝখানে ধূসর একটা অবয়বের মত।

থাকুক না, আমাদের কি? কিশোর বলল, অনুসরণ তো আর করছে না। রাস্তার ধারে পার্ক করে হয়তো রোড ম্যাপ দেখছে...গাড়ি খারাপ হয়েও থাকতে পারে।

আমাদের অনুসরণ করার জন্যে পিছে পিছে আসার দরকার পড়বে না তার। এই রাস্তা ধরে কতদূর যেতে পারব আমরা, জানে। সীটলের বেশি যে যেতে পারব না, তা-ও জানে। এ ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে হয়তো আমাদের সন্দেহ দূর করার চেষ্টা করছে, বোঝাতে চাইছে পেছনে আসছে না।

আর কোন কথা হলো না। উত্তরমুখো গাড়ির ভিড়ে মিশে রাবাতও এগিয়ে চললেন। লংভিউতে পৌঁছে শহরের গভীরে ঢুকে গেলেন। হাইওয়ে থেকে দরে একটা মোটেলের ড্রাইভওয়েতে গাড়ি ঢুকিয়ে দিলেন। এখানে উঠলে তাদের খুঁজে বের করতে কষ্ট হবে মিলারের। অবশ্য যদি সে আদৌ বের করতে চায়।

ব্যাপারটা আমার পছন্দ হচ্ছে না, রাবাত বললেন। জীবনে কখনও কোন লড়াই থেকে পালিয়ে আসিনি। এখন যে এড়িয়ে থাকতে চাইছি, সেটাও সামান্য সময়ের জন্যে। শিক্ষা ওকে আমি একটা দিয়েই ছাড়ব, তবে সেটা পরে। আপাতত নিরাপদে নিউ ইয়র্কে পৌঁছতে চাই; আর চলার পথে যতটা সম্ভব আনন্দ। এখনই ঝগড়া বাধিয়ে সব পণ্ড করতে চাই না।

সমস্যা আর বিপদ থেকে পালানোর স্বভাব তিন গোয়েন্দারও নয়, বরং মুখোমুখি হতেই ওরা ভালবাসে। কিন্তু এই কেসটাতে এখন পর্যন্ত কেবল পালিয়েই চলেছে ওরা। মিলার যদি পেছনে লেগে থাকে, সামনাসামনি এসে কিছু না করা পর্যন্ত ওদের কিছু করার নেই। আক্রমণটা আগে তার তরফ থেকেই আসতে হবে। মিলার পেছনে লেগেছে, এ ব্যাপারে নিশ্চিত কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি এখনও। কেবল সন্দেহের ওপর নির্ভর করে একজন। ভদ্রলোকের সঙ্গে খারাপ আচরণ করাটা ঠিক নয়।

মাঝরাতের পর হঠাৎ করে ঘুম ভেঙে গেল কিশোরের। কানে এল পাশের ঘরে রাবুনোর বিকট নাক ডাকানোর শব্দ। তবে এই শব্দ আর এখন বিরক্ত করে না ওকে, গা সওয়া হয়ে গেছে, এর জন্যে ঘুম ভাঙেনি ওর। ভেঙেছে জানালায় হেডলাইটের উজ্জ্বল আলো পড়ায়। মোটেলের ড্রাইভওয়েতে ঢুকে চলতে চলতে যেন থেমে গেল একটা গাড়ি।

দরজা খোলার শব্দ হলো। ইঞ্জিন বন্ধ করল না ড্রাইভার। দ্রুত পদশব্দ থমকে গেল আচমকা, তারপর আবার শোনা গেল।

বিছানা থেকে নামল, কিশোর।

সে জানালার কাছে পৌঁছতে পৌঁছতে গাড়ির দরজা বন্ধ হয়ে গেল। জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখল, বড় একটা গাড়ি ঘুরে নেমে যাচ্ছে রাস্তায়।

লিংকনটাই? নিশ্চিত হতে পারল না।

বিছানায় ফিরে এল আবার সে বুঝতে পারছে, রাবুমানার মত সে-ও মিলারকে সন্দেহ করতে আরম্ভ করেছে। অথচ এখন পর্যন্ত মিলার কোন ক্ষতি করেনি ওদের। বুইকটার ক্ষতি করেনি। রাতের বেলা চুপি চুপি ঘরে ঢুকে খোঁজাখুজি করেনি। পিছু পিছু আসার ব্যাখ্যা সহজেই দেয়া যায় হয়তো সে ও বেড়াতে বেরিয়ে একই দিকে চলেছে।

আচ্ছা, কি জিনিস আবিষ্কার করেছেন রাবুমানা? কি নিয়ে চলেছেন নিউ ইয়র্কে? কোথায় রেখেছেন ওটা? ছোট জিনিসই হবে, যা সুটকেসে ভরে রাখা যায়। বড় কিছু লুকানোর জায়গা নেই, গাড়িটাতেও না, তাহলে ওদের চোখে পড়তই। আর গাড়িতে রাখার জায়গাই বা কোথায়?

ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল সে। সকালে ঘুম ভাঙলে দেখল তার অনেক আগে উঠে পড়েছে মুসা আর রবিন। কাপড় পরে তৈরি হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি করতে হবে ওকে।

ওয়াশিংটনের ভেতর দিয়ে সেদিন পুবে এগোল ওরা। ওপরে উঠছে পথ। কাসকেড মাউনটেইন রেঞ্জ পার হয়ে এসে পড়ল খোলা অঞ্চলে। দুই পাশে রুক্ষ ছড়ানো প্রান্তর।

হায় হায়, এ যে মরুভূমি! নিরাশা ঢাকতে পারল না মুসা। আমি তো। ভেবেছিলাম পুরো ওয়াশিংটনটাই শুধু পাইনের জঙ্গল।
বোকার মত ভাবলে তো কত কিছুই ভাবা যায়, নানা বললেন।
স্পোক্যানি পার হয়ে আবার পার্বত্য অঞ্চলে ঢুকল ওরা। পাহাড় থেকে নেমে আসা ঝর্না রাস্তার পাশ দিয়ে বইছে, থেকে থেকেই দুপাশ থেকে চেপে আসছে জঙ্গল।
ইডাহোর কয়েউর ডিঅ্যালিনিতে রাত কাটানোর জন্যে থামল ওরা। লংভিউতে শহরের অনেক ভেতরে অখ্যাত ছোট মোটেলটার মতই কোন মোটেলে ওঠার ইচ্ছে। অবশ্যই মিলারের ভয়ে। যাতে সে খুঁজে বের করতে না পারে।
সারাদিনে অবশ্য ছায়াও দেখিনি, বললেন তিনি। রিয়ারভিউ মিররে। পলকের জন্যেও দেখিনি গাড়িটাকে। তবু ঝুঁকি নেব না। লুকিয়েই থাকব। আমাদের খুঁজে না পেলে সে ভাববে হয় আমরা স্পোক্যানিতে রয়েছি, নয়তো আরও এগিয়ে মিসৌলাতে চলে গেছি।
যদি আমাদের পিছু নিয়ে থাকে, তবেই, মিলারের কথা শুনতে আর ভাল লাগছে না মুসার। মনেপ্রাণে চাইছে লোকটাকে নিয়ে আলোচনা বন্ধ হোক।
খাওয়ার টেবিলে পড়শীর কথা আর তুললেন না রাবাত। খাওয়ার পর গলফ খেলতে বেরোলেন। সামান্য সময় খেললেন। তখনও কিছু বললেন না। সবচেয়ে বেশি স্কোর করলেন তিনি। ছেলেদের নিয়ে মোটেলে ফিরে এলেন। বেশ হাসিখুশি লাগছে তাকে।
রাতের বেলা ওদের গভীর ঘুম ভাঙিয়ে দিল সাইরেনের তীক্ষ্ণ চিৎকার। সারা বাড়িতে আলোড়ন তুলে বেজেই চলল, বেজেই চলল।
খাইছে! বিছানায় উঠে বসে মুসা বলল, ঘটনাটা কি?
থামছে না সাইরেন। কানের পর্দা ছিদ্র করে দিয়ে যেন ঢুকে যাচ্ছে মগজে।
হঠাৎ জবাবটা পেয়ে গেল সে। চিৎকার করে উঠল, কিশোর, রবিন, জলদি ওঠো! লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নেমে নিচে নামল। স্মোক অ্যালার্ম! আগুন লেগেছে মোটেলে!

.

রাতের নীরবতা চিরে দিয়ে যেন বেজে চলেছে ধোয়ার সঙ্কেত।
লোকের ছুটাছুটি আর হট্টগোল কানে এল গোয়েন্দাদের। দড়াম দড়াম করে বন্ধ হলো গাড়ির দরজা। ধোয়ায় ভারী হয়ে গেছে বাতাস।
দমকলকে ফোন করল কিশোর।
পাজামা পরেই ছুটে বেরোল মুসা। নানার দরজায় থাবা দিয়ে চিৎকার করে বলল, নানা! নানা! ওঠো জলদি! মোটেলে আগুন লেগেছে!

কাশতে কাশতে টলোমলো পায়ে এসে দরজা খুলে দিলেন রাবাত।
সাইরেন বাজছে।
ইতিমধ্যে প্যান্ট পরে ফেলেছে রবিন। বেরিয়ে গিয়ে মোটেলের গেস্টদের দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডেকে তুলতে শুরু করল তাদের।
লাল গাউন পরা এক মহিলা দরজা খুলল। চোখ জ্বালা করছে। ডলতে ডলতে জানতে চাইল, কি হয়েছে?
মোটেলে আগুন লেগেছে, জানাল রবিন।
যেন আঁকুনি খেয়ে জেগে গেল মহিলা। ভেতরে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, পিটার, জলদি ওঠো! তখনই বলেছিলাম এই খোয়াড়ের মধ্যে থাকার দরকার
রাবাত আর অন্য দুই গোয়েন্দাও কাপড় পরে ফেলেছে। একপাশ থেকে দরজা ধাক্কাতে শুরু করল সবাই, বোর্ডারদের জাগিয়ে দিতে লাগল। ওদের চারপাশে ধোয়া উড়ছে। বাড়িটা U প্যাটার্নে তৈরি। মনে হচ্ছে U-র একটা মাথা থেকে আসছে।
কি যেন পড়ার শব্দ হলো। তারপর ঝনঝন করে কাচ ভাঙল। গাড়ির কাচ। চত্বরের পার্কিং লটে ইনডিয়ানার নম্বরপ্লেট ওয়ালা একটা গাড়ি তাড়াহুড়ো করে পিছাতে গিয়ে ওরিগনের প্লেট লাগানো একটা গাড়িকে গুতো মেরে দিয়েছে। জানালা দিয়ে মুখ বের করে চেঁচিয়ে উঠল ওরিগনের ড্রাইভার, এই গাধা, দেখও না নাকি!
জবাব দিল না ইনডিয়ানা। গাড়ি সরাতে ব্যস্ত।
ঘর থেকে পিলপিল করে বেরিয়ে আসছে বোর্ডাররা। কাশছে, চোখ ডলছে। ঠাণ্ডা থেকে বাঁচার জন্যে বিছানার কম্বল তুলেই গায়ে জড়িয়ে নিয়েছে অনেকে। কেউ কেউ গাড়ির দিকে ছুটছে, গাড়িতে করে নিরাপদ জায়গায়। পালাতে চায়। অন্যেরা চত্বরে জড়ো হলো কি ঘটে দেখার জন্যে।
দমকলকে খবর দেয়া হয়েছে? জানতে চাইল এক মহিলা।
দিয়েছি, জবাব দিল কিশোর, আসছে।
কিশোর, দেখো, হাত তুলল মুসা।
বাড়িটার শেষ মাথার একটা দরজায় লেখা রয়েছে: EMPLOYEES (ONLY. ধোয়া আসছে ওই দরজার ফাঁক দিয়ে।
ওই ঘরেই লেগেছে, বলে উঠল কিশোর। সরুন, সরুন সবাই; আগুনের কাছ থেকে সরে যান।
দরজাটার কাছ থেকে সবাইকে সরিয়ে দিতে লাগল মুসা আর রবিন।
দমকলের সাইরেন শোনা গেল। দেখতে দেখতে সেটা বেড়ে গেল, তার সঙ্গে যুক্ত হলো ভারী ইঞ্জিনের শব্দ। এসে গেছে দমকল।

কোথায় লাগল? পুরানো বাথরোব পরা টাকমাথা ছোটখাট একজন লোক জিজ্ঞেস করল। পরিচয় দিল, আমি মোটেলের ম্যানেজার। একহাতে চাবির গোছা, আরেক হাতে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র।
ওই যে দেখুন দরজাটা, হাত তুলে দেখিয়ে দিল কিশোর।
দ্রুত এগিয়ে গেল ম্যানেজার। খুলে ফেলল তালা। পাল্লা খোলার জন্যে নব চেপে ধরতেই বাধা দিল কিশোর, দাঁড়ান! খুলবেন না!
কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। টান দিয়ে ফেলেছে ততক্ষণে ম্যানেজার। হাঁ হয়ে খুলে গেল পাল্লা। ভেতর থেকে ঝাঁপিয়ে এল যেন আগুনের চাদর, ঝটকা দিয়ে পিছিয়ে গেল ম্যানেজার, হাত থেকে খসে পড়ল ফায়ার এক্সটিংগুইশার। দুহাত উঠে গেল মুখ ঢাকার জন্যে। প্রচণ্ড গরম বাতাসের ঢেউ এসে লাগল। গোয়েন্দাদের ওপরও।
লোকটাকে সাহায্য করতে ছুটল মুসা। এক্সটিংগুইশার তুলে নিল রবিন। আগুনের দিকে তাক করে টিপে দিল ট্রিগার। তরল রাসায়নিক ফেনা ফিনকি দিয়ে বেরোল, পড়তে লাগল আগুনের মধ্যে।
দমকলের দুটো গাড়ি এসে দাঁড়াল মোটেলের সামনে। হুড়াহুড়ি করে গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল ফায়ারম্যানেরা, মুহূর্তে রবিনকে সরিয়ে দিল একপাশে। একজন একটা হোস তাক করে ধরল, তীব্র বেগে পানি গিয়ে পড়তে শুরু করল ঘরের মধ্যে। নিভে গেল আগুন। যেমন স্বয়ংক্রিয় ভাবে চালু হয়েছিল স্মোক অ্যালার্ম, আগুন নিভে যেতে ওটাও বন্ধ হয়ে গেল আপনাআপনি। ছোট ঘরটা একটা স্টোররুম। তেমন কিছু ছিল না। কয়েকটা পোড়া ন্যাকড়া, ঝাড়, একটা প্লাস্টিকের বালতি–পুড়ে গলে বিকৃত হয়ে। গেছে, আর একগাদা কঙ্কল পুড়ে ছাইয়ের স্তূপ হয়ে আছে।
ঘরে ঢুকল একজন ফায়ারম্যান। ভেজা ছাইয়ের স্তূপের দিকে তাকিয়ে রইল একটা সেকেন্ড, তারপর লাথি মেরে ছড়িয়ে দিল। পোড়া কম্বলের একটা টুকরো তুলে নিয়ে শুকল। আনমনেই বলল, তেল তেল গন্ধ। তারপিন হবে। রঙ করা হচ্ছিল নাকি এখানে? ম্যানেজারের দিকে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল সে।
আগুনের আঁচ লেগে ম্যানেজারের একটা ভুরু পুড়ে গেছে। সেখানে হাত বোলাতে বোলাতে জবাব দিল, না, রঙ করবে কে! কয়েক মাস ধরে রঙের। কাজ হয়নি মোটেলে।
নাক কুঁচকে আবার শুকল ফায়ারম্যান। কাঠের জিনিস বার্নিশ করা হয়েছে?
না! প্রার্থনা করার ভঙ্গিতে এক হাতের সমস্ত আঙুল আরেক হাতে গুঁজে দিল ম্যানেজার। আর করলেও এ ভাবে তারপিন ভেজানো ন্যাকড়া এখানে ফেলতে দিতাম না।
কি জানি! অনিশ্চিত শোনাল ফায়ারম্যানের কণ্ঠ। ফেলে দিল পোড়া টুকরোটা।

কয়েক ফুট দূরে দাঁড়িয়ে শুনছেন রাবাত। নাক দিয়ে খেত-খোত করে বললেন, ফারগ্লো ব্যবহার করলেই আর এ সমস্যা হত না।
ফারগ্লোটা আবার কি জিনিস? জানতে চাইল রবিন।
নানার একটা আবিষ্কার, মুসা বলল। ফেলে দেয়া কাগজের প্যাড দিয়ে তৈরি। কাঠের জিনিস বার্নিশ করতে এর তুলনা হয় না। তারপর যেখানে ইচ্ছে ছুঁড়ে ফেলো, আগুন লাগার ভয় নেই। আগুন ধরে না ওতে।
আইডিয়াটা একটা সোপ কোম্পানির কাছে বিক্রি করেছিলাম আমি, তিক্তকণ্ঠে বললেন রাবাত। ওরা কাজে লাগায়নি, আলমারিতে ভরে রেখে দিয়েছে। সেই রাগেই যেন দুপদাপ পা ফেলে ঘরে ফিরে এলেন। ঢুকেই এমন চিৎকার দিয়ে উঠলেন যেন বোলতায় হুল ফুটিয়েছে।
চোর! বদমাশ! চেঁচিয়ে ডাকতে লাগলেন তিনি, কিশোর! রবিন! মুসা! দেখে যা! চোরটার কাণ্ড দেখে যা!
ছুটে এল তিন গোয়েন্দা।
জলদি গিয়ে নিজেদের ঘর দেখো! কিছু নিয়েছে কিনা! দরজায় দাঁড়িয়ে নিজের বিছানার দিকে তাকিয়ে আছেন রাবাত। ম্যাট্রেস উল্টে ফেলা হয়েছে। চাদর আর কম্বলগুলো মেঝেতে। ছড়িয়ে ফেলা হয়েছে তার কাপড়-চোপড়। মোজা আর আন্ডারওয়্যারগুলোও বাদ পড়েনি। শেভ করার আর দাঁত মাজার। সরঞ্জাম ছিল যে বাক্সটায়, সেটাও উল্টে ভেতরের জিনিস ঝেড়ে ফেলা হয়েছে।
হা হয়ে গেছে কিশোর। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত নড়তে পারল না। তারপর রাবাতের পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকে বাথরুমে চলে গেল। পেছনের দেয়ালে বাথটাবের বেশ ওপরে একটা জানালা। সেটা খোলা। বাথটাবে জুতোর ছাপ দেখে বোঝা গেল জানালা দিয়ে এটাতে কেউ নেমেছিল।
টাবের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে জানালার হুড়কো পরীক্ষা করল সে। এক জায়গার রঙ চটে গেছে সামান্য।
হুড়কো সরিয়ে কেউ জানালা খুলে ঢুকেছিল, পেছনে দরজায় এসে দাঁড়ানো রাবাতকে বলল কিশোর। বেরিয়েছেও হয়তো একই পথে। দরজা। দিয়েও বেরোতে পারে। আগুনের দিকে খেয়াল ছিল সবার, তাকে কেউ দেখেনি নিশ্চয়।
পাশের ঘর থেকে দৌড়ে এল রবিন। জানো কি কাণ্ড হয়েছে?
মুসা বলল, জানি, আমাদের ঘরেও ঢুকেছিল, সব তোলপাড় করে ফেলেছে।
মাথা ঝাঁকাল রবিন, হ্যাঁ। কিন্তু যতটা দেখলাম, কিছু খোয়া গেছে বলে মনে হলো না।
মিলার! মিলার! ওই ব্যাটা ছাড়া কেউ না! চেঁচিয়ে উঠলেন রাবাত। এখানেও এসেছে!

কি করে, নানা? প্রশ্ন তুলল মুসা। পিছুটা নিল কি করে? কাল রাস্তার ধারে যেটা দেখেছি সেটা কার গাড়ি জানি না। যদি মিলারেরও হয়, কালকের পর আর দেখা যায়নি ওটাকে। পিছে পিছে এলে আমরা যে এখানে আছি জানবেই বা কি করে?
পিছে আসাটা তেমন কঠিন না, রাবাত বললেন। লিংকনটা ভাড়া করা গাড়ি, ওর নিজের না। যেহেতু আমাদের চেনা হয়ে গেছে, ফেরত দিয়ে অন্য আরেকটা নিয়ে নিতে পারে। আমাদের একেবারে লেজে লেগে থাকলেও তখন আর চিনতে পারব না।
কিশোরের মনে পড়ল, লংভিউতে মোটেলে রাতে একটা বড় গাড়ি চলে যেতে দেখেছিল। কিন্তু বলল না রাবাতকে, চেপে গেল। শুনলেই খেপে যাবেন।
ঘরের ছড়ানো জিনিসপত্রের দিকে তাকিয়ে মুসা বলল, নানা, তোমার আবিষ্কারটা খোয়া গেছে কিনা দেখছ না?
জবাব দিলেন না রাবাত। দেখার প্রয়োজন বোধ করলেন না। যেন তিনি। জানেন, খোয়া যায়নি। লম্বা লম্বা পা ফেলে আবার চত্বরে বেরিয়ে এলেন। অনুসরণ করল ছেলেরা।
কিছু বোর্ডার তখনও আছে ওখানে। খেপে যাওয়া ম্যানেজারের লম্ফ ঝম্প দেখছে। আগুন লাগিয়েছে যে, তাকে হাতে পেলে এখন কি কি করত, গলাবাজি করে বলছে। নিষ্ফল আক্রোশ। রাস্তায় অপেক্ষা করছে দমকলের গাড়ি। ইঞ্জিন চলছে। ড্রাইভওয়েতে ঢুকেছে একটা পুলিশের গাড়ি। ছাতের বাতিটা ঘুরছে। ঝিলিক ঝিলিক করে কমলা আলো ছিটিয়ে দিচ্ছে যেন বাড়িটার সামনের দেয়ালে।
স্টোররুমের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে একজন পুলিশ অফিসার। কথা বলছে। ফায়ারম্যানের সঙ্গে।
গটমট করে সেদিকে এগিয়ে গেলেন রাবাত। বললেন, কি করে লাগল সেটা নিয়ে অত মাথা ঘামানোর কিছু নেই। আগুনটা লাগানো হয়েছে, ইচ্ছে করে।
ফিরে তাকাল অফিসার আর ফায়ারম্যান। চোখে কৌতূহল। ফায়ারম্যান জিজ্ঞেস করল, আপনি কি করে জানলেন?
জানি!
ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল মুসা। কিশোর, শুরু হলো আবার!
হ্যারিস মিলার লাগিয়েছে ওই আগুন, বলতে কোন রকম দ্বিধা করলেন না রাবাত। লাগিয়েছে যাতে আমার ঘরে ঢুকে জিনিসপত্র ঘাটতে পারে। আমার আর ওদের, তিন গোয়েন্দাকে দেখালেন তিনি, ঘর দুটোকে তছনছ করে ফেলেছে। আগুন লাগালে যে সারা বাড়িতে লেগে যেতে পারে, এতগুলো লোক বিপদে

পড়বে, ভাবলও না একবার; নিজের উদ্দেশ্য সাধনটাই তার কাছে বড়। ভীষণ স্বার্থপর। পুরো বাড়িটা পুড়ে ছাই হয়ে যেতে পারত!
রাবাতের দিকে তাকিয়ে হাসল ম্যানেজার। সব দাঁত বেরিয়ে পড়ল। এই প্রথম একজনকে পেল, তার পক্ষে বলছেন। চেঁচিয়ে বলল, সেই তখন থেকেই বলছি, তেল লাগানো ন্যাকড়া আমি ফেলতে দিই না! কাজের লোকদের কড়া হুকুম দেয়া আছে। অসাবধানতার জন্যে লেগেছে এ কথা কিছুতেই বলতে পারবেন না। বাইরে থেকে কেউ এসে যদি লাগিয়ে দেয়, আমি কি করতে পারি বলুন?
স্টোর রুমে ঢুকল অফিসার। পেছনের দেয়ালে একটা জানালা। রাবাতের বাথরুমের জানালার মতই এটাও বাইরে থেকে খোলা হয়েছে, তবে খুলতে গিয়ে এটার হুড়কোটা ভেঙে ফেলেছে।
এটা এ ভাবে ভাঙা আছে কদ্দিন? জানতে চাইল অফিসার।
ভাঙা থাকবে কেন? জোর প্রতিবাদ জানাল ম্যানেজার, ভাঙা জিনিস আমি থাকতে দিই না! এটা ভাল ছিল। আজ রাতে খোলা হয়েছে। হুড়কো ভেঙেছে জানলে সঙ্গে সঙ্গে মেরামত করিয়ে ফেলি। একটুও দেরি করি না।
রাবাতের দিকে তাকাল অফিসার, আপনার ঘরটা দেখব।
সানন্দে দেখাতে রাজি হলেন তিনি। নিয়ে এলেন অফিসারকে। তার ঘরটা দেখার পর গোয়েন্দাদেরটাও দেখল সে।
নোটবুকে লিখে নিল অফিসার। গাড়ি থেকে নেমে এসে দরজায় নক করল তার সহকারী। দুজনে মিলে তখন বোর্ডারদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগল। তদন্ত শেষ করার পর জানা গেল, কেবল রাবাত আর গোয়েন্দাদের ঘরেই ঢুকেছিল চোর।
হোটেলের লোকও হতে পারে, অবশেষে অফিসার বলল। কিন্তু এ ভাবে ঢুকে কোন কিছু না নিয়ে চলে গেল কেন...
অফিসারের কথা শুনে রেগে গেলেন রাবাত। খসখসে গলায় বললেন, কারণ হোটেলের লোক নয় ও! আমি বলছি, হ্যারিস মিলার! রকি বীচ থেকে আমাদের অনুসরণ করে এসেছে ও!
রকি বীচ?
কেন, চেনেন না? নাম শোনেননি? ক্যালিফোর্নিয়াতেই তো। শুনুন, পিজমো বীচে ওর সঙ্গে মোলাকাত হয়েছে আমাদের, তারপর মনটিরেতে। আমি এখন শিওর, মোটর সাইকেলওয়ালা গুণ্ডাবাহিনীকেও সে-ই আমাদের পেছনে লাগিয়েছিল। ওকে গিয়ে গ্রেপ্তার করুন। ভয়ানক লোক ও!
তাই নাকি! কিন্তু সে আপনাদের ফলো করবে কেন? আপনাদের ঘর তল্লাশি করবে কেন? কি খুঁজেছে?
আমার আবিষ্কার।

তাই! সেটা কি?
সতর্ক হয়ে গেলেন রাবাত। চোখের তারায় ধূর্ত একটা হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। সে-কথা তো আপনাকে বলা যাবে না। কাউকেই বলা যাবে না এখন।
ও! এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে অফিসার বলল, ঠিক আছে, হ্যারিস মিলারের চেহারার বর্ণনা দিন। কি গাড়িতে করে এসেছে...
প্রথম একটা লিংকনে করে পিছু নিয়েছিল। এখন সম্ভবত গাড়িটা বদলে ফেলেছে। তবে এখন আর ওসব আলোচনা করে লাভ নেই। ওকে ধরতে পারবেন না। পালানোর ইচ্ছে থাকলে বহুদূরে চলে গেছে!
মাথা ঝাঁকাল অফিসার। মসৃণ হাসি ফুটল ঠোঁটে। রাবাত আর তিন। গোয়েন্দার নাম আর বাড়ির ঠিকানা লিখে নিল। কিশোরের কাছ থেকে লিংকন গাড়িটার লাইসেন্স নম্বরও লিখে নিল। তারপর সহকারীকে নিয়ে গিয়ে পুলিশ কারে উঠল।
গাধা কোথাকার! বলে উঠলেন রাবাত। অহেতুক সময় নষ্ট করে গেল! কিছু করবে না ও! করার চেষ্টাও করবে না!
করবে কি, ও তো তোমাকে পাগল ভেবে গেছে! মুখ ফসকে বলে ফেলল মুসা।
নানা রেগে যাচ্ছেন বুঝে তাড়াতাড়ি সামাল দিল, কারোর কিচ্ছু করা লাগবে না। মিলার যদি পিছু নেয়, আমরাই ওর ব্যবস্থা করব!

.

দুই দিন পর। ইডাহোর ভেতর দিয়ে চলেছে ওরা, মনটানার লিভিংস্টোনের দিকে। আরও দক্ষিণে এগোলে পড়বে ওয়াইয়োমিঙের ইয়েলোস্টোন ন্যাশনাল পার্ক। টুরিস্ট মৌসুম এখনও শুরু হয়নি। রাস্তায় যানবাহনের ভিড় তাই কম।
ইয়েলোস্টোনে পৌঁছে মাটিতে ফাটল থেকে ধোয়া উঠতে দেখল ওরা। এখানে ওখানে ফোয়ারার মত পানি ছিটকে উঠছে ওপরে, কোন কোনটা একশো ফুটের বেশি ওপরে উঠে যাচ্ছে। পানির রঙ লোহার মরচের মত লাল। তাজ্জব হয়ে দেখল, রাস্তার ধারে ডোবা, তাতে গলিত কাদা থেকে বুদ্বুদ উঠছে–যেন ওগুলোর তলায় বিশাল সব চুল্লিতে আগুন জ্বলছে, কাদা। ফুটতে শুরু করবে খানিক পরই। সুন্দর সুন্দর লেক আর ঝর্নার ছড়াছড়ি। এক সময় এটা ছিল আগ্নেয়গিরির এলাকা, এখন সেগুলো মরে গেছে। এত সুন্দর দৃশ্য কিছুক্ষণের জন্যে মিলারের ভাবনা ওদের মন থেকে মুছিয়ে দিল।
তারপর পার্ক রোড ধরে এগোতে গিয়ে পেছনে ফিরে তাকাল রবিন আর মুসা। জোরে নিঃশ্বাস ফেলল রবিন। নীরবে শত্রু খুঁজছে মুসার চোখ।
মাউন্ট সেইন্ট হেলেন পেরোনোর পর থেকে সন্দেহজনক আর কিছু দেখিনি, রবিন বলল।

জানানোর সময় এসেছে, ভাবল কিশোর। লংভিউর মোটেলে ড্রাইভওয়েতে বড় গাড়িটা দেখার কথা বলল সে। হ্যারিস মিলারই গাড়িটা চালাচ্ছিল কিনা, বলতে পারব না।

হয়তো এতক্ষণে রকি বীচে চলে গেছে মিলার, রবিন বলল, অর্কিড গাছে পানি দিচ্ছে। মোটেলে আগুন লাগাটা হয়তো নেহায়েত কাকতালীয় ঘটনা। কোন ছিঁচকে চোর স্টোর রুমে আগুন লাগিয়ে দিয়ে ঘর থেকে। আমাদের বের করেছিল...

আরে দূর! মুসা যে ভঙ্গিতে বলে, সেভাবে বলে উঠলেন রাবাত। সাধারণ চোর হতেই পারে না। হলে চুরি করল না কেন? প্রচুর জিনিস ছিল, সুযোগও ছিল। আমার মানিব্যাগটাই তো পড়ে ছিল টেবিলের ওপর। দুয়েও দেখেনি। তোমার ক্যামেরাটা দামী, ওটাও নিতে পারত।

পেলে হয়তো নিত। কাল রাতে গাড়িতে ছিল ওটা। ঘরে নিতে ভুলে গিয়েছিলাম।

কিন্তু টাকা? সামনে পেলে টাকা নেয় না এমন চোরের কথা শুনিনি। চালাকি করে স্টোর রুমে আগুন লাগিয়ে বোর্ডারদের বের করে জিনিস চুরি করার কথাও ভাবে না সাধারণ চোর। সুযোগ পেলে চট করে ঘরে ঢুকে পড়ে। কিছু পেলে নিয়ে চলে যায়।

পুরানো হয়ে এল ফোয়ারা। প্রথম দেখার পর যেমন লেগেছিল, অতটা ভাল লাগছে না আর। উত্তেজনাও কমে গেল।

রাবাত বললেন। জায়গাটা বেশি খালি! অত শূন্যতা ভাল লাগে না!

নানার অস্বস্তিটা মুসার মাঝেও সঞ্চারিত হলো। মনে করিয়ে দেয়ার পর এখন কেমন ভূতুড়েই লাগছে এলাকাটা তার কাছে। বলল, তাড়াতাড়ি করো, নানা, সরে যাই! দেখার কিছু আর নেই এখানে!

শেষ বিকেলে মনটানা-ওয়াইয়োমিং সীমান্তের কাছে একটা ছোট শহরে ঢুকল ওরা। মোটেল খুঁজে বের করল। মালপত্র ঘরে রাখার পর বুইকটা নিয়ে চলে গেলেন রাবাত। পার্কিং লট থেকে দূরে রাস্তার ধারে গাড়ি রেখে এলেন। ইচ্ছে করেই রাখলেন, মিলারের জন্যে টোপ। দেখতে চান, সে আসে কিনা, খোলার চেষ্টা করে কিনা। বাকি বিকেলটা কাটালেন গাড়ির কাছে যাতায়াত করে।

পঞ্চমবার যখন গাড়িটা দেখতে চললেন তিনি, আর থাকতে পারল না মুসা। বলল, এ ভাবে গিয়ে লাভটা কি হচ্ছে? ক্ষতি করছ আরও। মিলার এলে তোমার এই ঘনঘন যাওয়া-আসা দেখলে সতর্ক হয়ে যাবে। জেনে যাবে আমরা কোথায় উঠেছি। রাতে এসে হানা দেবে।

মুসার কথায় যুক্তি আছে। আর গেলেন না রাবাত। ঘরে ফিরে এলেন। খানিক পরই তার নাক ডাকানোর শব্দ কানে এল।

জেগে রইল তিন গোয়েন্দা। কয়েউর ডিঅ্যালিনির মোটেলে আগুন লাগার ঘটনাটা নিয়ে আলোচনা করতে লাগল।
মিলারকে সন্দেহ করতে পারছি না আমি, মুসা বলল। সে এল কি করে মোটেলে? জানল কি করে আমরা ওটাতে উঠেছি? আমাদের পিছে আসতে দেখিনি তাকে। অন্য গাড়ি নিয়ে অনুসরণ করলেও চোখে পড়ে যেত আমাদের। এত দীর্ঘ পথ কিছুতেই লুকিয়ে থাকতে পারত না।
আচ্ছা, হেলিকপ্টারে করে আসেনি তো? রবিনের প্রশ্ন।
নাহ! সম্ভাবনাটা একেবারেই ঝেড়ে ফেলে দিল মুসা। হেলিকপ্টার পাবে কোথায়? ভাড়া করতে অনেক টাকা লাগে। তা ছাড়া অতিরিক্ত শব্দ করে হেলিকপ্টার। নিঃশব্দে অনুসরণ করা একেবারে অসম্ভব।
চুপ হয়ে গেল রবিন।
হঠাৎ বিছানায় সোজা হয়ে বসল কিশোর। ওকে ফোন করব! ইস, আরও আগে এ কথাটা ভাবলাম না কেন? রকি বীচে ওর বাড়িতে ফোন করলে যদি জবাব দেয় তাহলে বুঝব আমাদের সঙ্গে তার দেখা হয়ে যাওয়াটা কাকতালীয় ঘটনা ছিল। আবার ফিরে গেছে। আমাদের দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই।
কি করে করবে? নম্বর জানো? রবিনের প্রশ্ন।
না। তবে আনলিস্টেড নাম না হলে ডিরেক্টরি এনকয়ারিতে ফোন করলেই বলে দেবে।
বিছানার পাশে টেবিলে রাখা ফোনের দিকে হাত বাড়াল কিশোর। মিনিট খানেকের মধ্যেই জেনে নিল মিলারের নম্বর। ফোন করল।
ও পাশে ফোন বাজতে লাগল।
এত রাতে বিছানা থেকে ডেকে তুলছ, হেসে বলল রবিন, রেগে আগুন হবে।
রকি বীচে এখন রাত এক ঘণ্টা কম। পার্বত্য এলাকায় রয়েছি আমরা, এখানে ওখানকার তুলনায় সময় বেশি।
তিনবার রিঙ হওয়ার পর খুট করে একটা শব্দ হলো, যেন কেউ রিসিভার তুলেছে ওপাশে। কয়েকটা মুহূর্ত সব শূন্য, তারপর আবার খুট। রেকর্ড করা একটা কণ্ঠ বলল, হ্যারিস মিলার বলছি। সরি, এখন ফোনের কাছে আসতে পারছি না। আপনার নাম আর ফোন নম্বর রেখে দিন। পরে যোগাযোগ করব। মেসেজ দেয়ার আগে টোন আসার অপেক্ষা করুন। কথা শেষ হওয়ার পর পরই ভেড়ার ডাকের মত একটা চিৎকার শোনা গেল।
ঝট করে কানের কাছ থেকে রিসিভার সরিয়ে ফেলল কিশোর। উফ, আরেকটু হলেই কান ফাটিয়ে দিয়েছিল। যন্ত্র! অ্যানসারিং মেশিন জবাব দিয়েছে।
তারমানে আছে কি নেই জানা গেল না, মুসা বলল।

সকালে আবার করব। দেখা যাক, তখন কি বলে?
সকাল আটটায় আবার মিলারের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করল কিশোর। সেই একঘেয়ে জবাব দিল অ্যানসারিং মেশিন। হাল ছেড়ে দিল কিশোর। মিলার বাড়ি আছে কিনা, রোঝা গেল না।
সেদিন ওয়াইয়োমিঙের ভেতর দিয়ে চলল ওরা। পরিষ্কার, সুন্দর দিন, যদিও নীল আকাশের এখানে ওখানে পেঁজা মেঘ ভাসছে। সেই মেঘে বৃষ্টি হবে না। দুধারে ঘাসে ঢাকা মাঠ, তাতে গরু চরছে। দক্ষিণ ডাকোটার র‍্যাপিড সিটিতে পৌঁছে রাবাত ঘোষণা করলেন, তাদের ছুটি মাটি করতে দেবেন না মিলারকে।
ওই ড্রামটার কথা মাথায়ই আনব না আর, বললেন তিনি। ওর কথা ভেবে দুশ্চিন্তা আর টেনশনের মধ্যে থেকে দেখার আনন্দ মাটি করব না।
এতে অস্বস্তি কমল ছেলেদের। র‍্যাপিড সিটিতে লাঞ্চ খাওয়ার সময় অনেক হই-হুল্লোড় করল। সেখান থেকে দক্ষিণে এগোনোর সময় একটিবারও আর পেছনে ফিরে তাকাল না। তবে কিশোর লক্ষ করল, বার বার রিয়ারভিউ মিররের দিকে চোখ যাচ্ছে রাবাতের।
মাউন্ট রাশমোরে পৌঁছল ওরা। পাহাড়ের ওপরে খানিকটা জায়গা সমতল করে চারপাশের দৃশ্য দেখার জন্যে পর্যবেক্ষণ মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে। ঘুরে ঘুরে উঠে গেছে পাহাড়ী পথ। কয়েক মাইল পেরিয়ে এসে পার্কিং লট দেখা গেল। ওখানে গাড়ি রেখে পায়ে হেঁটে এগোল ওরা। চওড়া পথ। সিকি মাইল পর রয়েছে মঞ্চ। সহজেই পৌঁছানো যায়। পঞ্চাশটা রাজ্যের পতাকা উড়ছে ওখানে।
মঞ্চে এসে দাঁড়াল ওরা। পাইনে ছাওয়া ঢাল নেমে গেছে নিচে। গাছের ফাঁকে মাথা তুলে আছে আমেরিকার মহান চার প্রেসিডেন্ট ওয়াশিংটন, জেফারসন, লিংকন, থিয়োডোর রুজভেল্ট। দক্ষিণ ডাকোটার পর্বতের পাথর কেটে তৈরি হয়েছে ওই বিশাল মুখগুলো।
খাইছে! কি জিনিস বানিয়েছে! অবাক হয়ে দেখতে দেখতে বলল মুসা।
সঙ্গে গাইডবুক এনেছে কিশোর। কিন্তু সেটা দেখার প্রয়োজন হলো না। আগেই পড়ে নিয়েছে। বলল, গুটজন বরহ্লামের নির্দেশে তৈরি হয়েছে ওগুলো। একেকটা মুখ ষাট ফুট উঁচু।
হেসে ফেলল মূসা, গুম যখন ছোট ছিলেন, নিশ্চয় তার মা বলেছিলেন–বড় হয়ে বিশাল কোন কাজ করবে বাবা, যা তোমাকে স্মরণীয় করে রাখবে। সেই বিশাল কাজটাই করেছেন তিনি।
বাহ, খুব মজার কথা বলে তো ছেলেটা! পেছন থেকে বলে উঠল একটা কণ্ঠ।
ফিরে তাকাল মুসা।
রাবাতও তাকালেন।

মোটাসোটা, মাঝবয়েসী এক মহিলা। পরনে আঁটো জিনসের প্যান্ট। রাবাতের দিকে তাকিয়ে হাসল। এরা আপনার নাতি?
একজন।
বাচ্চারা বড় মজার জিনিস! ঝর্নার বহমান পানির মত কলকল করে হাসল মহিলা। সব সময় তাজা। নতুন নতুন কথা খেলে মাথার মধ্যে, কখনও পুরানো হয় না।
এমন ভঙ্গিতে ওদের দিকে তাকালেন রাবাত, যেন তাজা আর নতুনত্ব সত্যি আছে কিনা দেখতে চাইছেন। মুসার চোখ উজ্জল। রবিন লাল হয়ে গেল।
নিজেকে বাচ্চা ভাবতে মোটেও ভাল লাগে না কিশোরের। কঠিন। দৃষ্টিতে তাকাল মহিলার দিকে। বয়েস পঞ্চাশের কাছাকাছি। গায়ের শার্টে এমব্রয়ডারি করা বড় বড় গোলাপী রঙের ফুল। কানে ম্যাচ করা গোলাপী, রঙের দুল, ঠোঁটে গোলাপী লিপস্টিক। হেসে রাবাতের দিকে দুই কদম এগিয়ে এল।
কখনও সন্তান হয়নি আমার, মহিলার কণ্ঠে খুব হালকা হতাশা আছে। কি নেই। সবাই বলে, ডরোথি, খুব ভাল মা হতে পারতে তুমি। কিন্তু কারও কথায় কান দিইনি। অন্যের বাচ্চাকে আদর করতেই ভাল লাগে আমার।
সরাসরি মহিলার চোখের দিকে তাকালেন রাবাত। তাঁর চোখের খুব কাছাকাছি চলে এসেছে চোখজোড়া। মহিলার অন্তর ভেদ করে ঢুকে গেল তার দৃষ্টির ছুরি। এক পা পিছিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেন। টান লাগল হাতে। দেখেন, শার্টের হাতা আঁকড়ে ধরেছে মহিলার আঙুল। বড় বড় নখে গোলাপী রঙের নেলপলিশ।
নানার বিপদ বুঝতে পারল মুসা। ঘড়ি দেখল। খুক করে কেশে গলা পরিষ্কার করল। বলল, নানা, জলদি চলো। ভুলে গেছ, নানীকে বসিয়ে রেখে এসেছ মোটেলে? দেরি দেখলে রেগে কাঁই হবে, আস্ত রাখবে না আর।
চমৎকার একটা মিথ্যে বলেছে মুসা। মনে মনে বাহবা না দিয়ে পারল না। কিশোর। এই মুহূর্তে নানাকে বাঁচানোর এর চেয়ে ভাল কোন বুদ্ধি সে-ও বের করতে পারত না। পলকে উধাও হয়ে গেল মহিলার গোলাপী হাসি। রাবাতের হাত ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে গেল, যেন বিদ্যুতের শক খেয়েছে। শুকনো গলায় বলল, ও, তাই নাকি, তাই নাকি! যান, তাড়াতাড়ি যান! আপনার সঙ্গে কথা বলে খুব ভাল লাগল!
হু, আমারও! ভদ্রতা করার জন্যে কোনমতে বলে তাড়াতাড়ি পার্কিং লটের দিকে হাঁটতে শুরু করলেন রাবাত। তার তিন পাশে বডিগার্ড হয়ে এগোল তিন গোয়েন্দা।
গাড়িতে উঠে মুসা যখন বুঝল এতক্ষণে নিরাপদ, নানার দিকে চেয়ে হেসে। বলল, নানা, মহিলা তোমাকে ধরে নিয়ে যাওয়ার পায়তারা করছিল। আমরা না থাকলে

মরতে! সোজা ধরে নিয়ে যেত।
নিলে নিত, রসিকতার জবাব রসিকতা দিয়েই দিলেন রাবাত, আরেকটা নানী পেয়ে যেতি। চিবুকটা সামনে ঠেলে দিয়ে বললেন, তাহলে বুঝলি তো, এখনও বুড়ো হইনি। মেয়েরা তাকায়।
হ্যাঁ, পঞ্চাশ বছরের মেয়ে।
এ কথার আর জবাব দিলেন না নানা।
পার্কিং লট থেকে বেরিয়ে ঢাল বেয়ে নেমে এল আবার ওরা। গাড়ি ঘুরিয়ে কাস্টার স্টেট পার্কের দিকে এগোলেন রাবাত।
কাস্টার পার্কে বাইসন থাকে, কিশোর বলল। একসঙ্গে এত নাকি খুব। কমই দেখা যায়। চিড়িয়াখানার বাইসন আর বুনো বাইসনে অনেক তফাৎ। বুনোগুলো অনেক বেশি ভয়ঙ্কর। এড়িয়ে চলা ভাল।
হেসে রাবাত বললেন, কিশোর, বেরোনোর আগে গাইড-বুকটাকে গুলে খেয়েছ নাকি? রাতে বসে বসে পাতা মুখস্থ করো?
মুখস্থ করা লাগে না, রবিন বলল, একবার পড়লেই যথেষ্ট। কম্পিউটারের মেমোরি ওর, কখনও ভোলে না।
আমারও এ রকম থাকলে ভাল হত। কাজে লাগত। মাঝে মাঝে তো মনে হয় নিজের নামই ভুলে যাচ্ছি। বললেন রাবাত।
বেশি ব্যস্ত থাকো বোধহয়, ফোড়ন কাটল মুসা। মহিলার কথা দিয়েই বলি–সব সময় তাজা, নতুন নতুন বুদ্ধি খেলে মাথার মধ্যে। সেজন্যে পুরানো কথা আর ধরে রাখতে পারো না, ভুলে যাও।
মেজাজ ভাল আছে নানার। মুসার কথায় কিছু মনে করলেন না।
ঢালু হয়ে গেছে এখন পথ। পথের মাথায় গেট পেরিয়ে কাস্টার স্টেট পার্কে ঢুকল গাড়ি।
হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন রাবাত, আরি, ওগুলো কি! গাড়ি থামি?, দিলেন।
রাস্তার ধারে জটলা করছে কতগুলো বুনো গাধা। গাড়িটাকে দেখে পাকা রাস্তায় খুরের খটাখট আওয়াজ তুলে এগিয়ে এল। নাক বাড়িয়ে দিল জানালার কাছে।
মনে হয় খাবার চায়! মুসা বলল।
রাবাত বললেন, খাবার দিয়ে দিয়ে অভ্যাস খারাপ করে ফেলেছে লোকে। বাইসনেরাও এসে চাইবে না তো? তাহলেই সর্বনাশ। না দিলে হয়তো রেগেমেগে শিং দিয়ে গুতানোই শুরু করবে।
কিন্তু গাধার মত হ্যাংলামি করল না বাইসনেরা। রাস্তা থেকে বেশ দুরে রইল। গাড়ি থামিয়ে ভাল করে দেখার জন্যে নামলেন রাবাত, তখনও ফিরে তাকাল না জানোয়ারগুলো। আপনমনে ঘাস খেতে থাকল।

এক সময় এত বাইসন ছিল এখানে, মাঠই দেখা যেত না, কালো হয়ে থাকত, কিশোর বলল। দল বেঁধে রেললাইনের কাছে চলে আসত। দাঁড়িয়ে থাকত লাইনের ওপর। গাড়ি আটকে দিত।
ক্যামেরা তুলে খটাখট শাটার টিপে যাচ্ছে রবিন। যতটা কাছে যাওয়া সভব, যাব। এতদূর থেকে লম্বা ঘাসের মধ্যে বাইসনগুলোকে আর বাইসন। মনে হচ্ছে না, পাথরের চাঙড়ের মত লাগছে।
খবরদার, সাবধান করল মুসা, ওই কাজও কোরো না। সাংঘাতিক বদমেজাজী জানোয়ার।
হ্যাঁ, মুসার কথায় সুর মেলালেন রাবাত, প্রায়ই অ্যাক্সিডেন্টের খবর শোনা যায়। সাহস দেখিয়ে ওগুলোর কাছে চলে যায় লোকে, বোকামির জন্যে মরে। শিঙের গুতোয় ভর্তা হয়। যে ভাবে আছে ওভাবেই থাকতে দাও, বিরক্ত করার দরকার নেই। কোন বুনো জানোয়ারকেই অতটা বিশ্বাস করা উচিত না।
বাইসনের পালকে পেছনে ফেলে এল ওরা। পথের পাশে গাড়ি রাখার জায়গা পাওয়া গেল।
রাবাত বললেন, আমি একটু ঘুরে আসতে চাই। একটা রাস্তা দেখালেন তিনি। পাইন-ছাওয়া পাহাড়ের ঢালের দিকে চলে গেছে। পথের মাথায় কোন রাজপুরী, দেখার ইচ্ছে আছে কারও? এতদূর এসে না দেখে চলে যাওয়াটা বোকামি হয়ে যাবে।
আপত্তি নেই, জবাব দিল রবিন, যদি রাজপুরীতে রাক্ষস না থাকে।
ইগনিশন থেকে চাবি খুলে নিলেন রাবাত। কিশোরের দিকে তাকালেন, তুমি?
আমার হাঁটতে ইচ্ছে করছে না। এখানেই থাকি।
রবিন আর মুসাকে নিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন রাবাত। কয়েক মিনিটেই হারিয়ে গেলেন ঘন বনের মধ্যে।
গাড়ি থেকে বেরিয়ে কান পাতল কিশোর।
আরেকটা গাড়ির ইঞ্জিনের আওয়াজ পেয়েছে। এগিয়ে আসছে। সেদিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল কিশোর। মনে হচ্ছে, যে কোন মুহূর্তে গাছপালার ওপাশ থেকে বেরিয়ে আসবে একটা ধূসর লিংকন।
কিন্তু লিংকন নয়, এল একটা ক্যাম্পার। হুইলে বসা একজন বুড়ো লোক। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কিশোরের উদ্দেশে হাত নাড়ল।
হাসল কিশোর। অতি-কল্পনা করে ফেলেছিল। কেউ অনুসরণ করছে না ওদের। মিলার পিছু নিয়ে থাকলে সারাক্ষণ লুকিয়ে থাকতে পারত না, এক না একসময় বেরিয়ে আসতেই হত। দেখা দিত। কিন্তু গত কয়েকশো মাইলের মধ্যে মিলারের চেহারাও দেখেনি ওরা। তারপরেও লোকটার কথা কেন যে মন থেকে তাড়াতে

পারছে না, কে জানে! আসলে সন্দেহ করার মত আর কেউ নেই বলেই হয়তো এ রকম হচ্ছে।
কিশোরের মাথার ওপরে একটা গাছে পাখি ডেকে উঠল, ডানার শব্দ তুলে বেরিয়ে এল ওটা। বসতে বসতে বিরক্ত হয়ে গেল কিশোর। আর থাকতে ইচ্ছে করছে না। থেকেছে আসলে দেখার জন্যে, ওদের গাড়িটার কাছে কেউ আসে কিনা। সেই কেউটা আর কেউ নয়, মিলার। কিন্তু এখন ব্যাপারটা হাস্যকর মনে হচ্ছে। প্রয়োজন ছিল না। এই অতি সন্দেহের কোন মানে নেই। মুসার আসতে কতক্ষণ লাগবে কে জানে। তাড়াতাড়ি গেলে এখনও ওদের ধরা যায়।
প্রায় দৌড়াতে শুরু করল কিশোর। চারপাশ থেকে ঘিরে এল জঙ্গল। প্রথম মোড়টার কাছে এসে ফিরে তাকাল। পেছনে রাস্তাটা দেখা যায় না। হারিয়ে গেছে গাছের ওপাশে।
আবার কানে এল গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ। থামল গাড়িটা। দরজা খুলে বন্ধ হলো। রাস্তার পাশে বুইকটার কাছে গাড়ি রেখেছে কেউ।
তবে কি তার সন্দেহই ঠিক ছিল? মিলারই এসেছে? শ্বাস টানা বেড়ে গেল কিশোরের। ঘাড়ের চুল দাঁড়িয়ে গেছে। খানিকটা পিছিয়ে পাশে সরে গেল সে। এখন দেখা যাচ্ছে রাস্তাটা। রাস্তা ধরে এগিয়ে আসতে শুরু করেছে। আগন্তুক। ভয় পেয়ে গেল কিলোর। মনে হলো খামচি দিয়ে ধরেছে কেউ হৃৎপিণ্ডটাকে। লুকিয়ে পড়তে হবে।
গাছপালার কারণে পাহাড়ের গোড়ায় বেশ ছায়া, অন্ধকারই বলা চলে। প্রচুর ঝোপঝাড় আছে। তবে ওগুলো বেশ দূরে। সে যেখানে রয়েছে সেখানে পথের ডান পাশে কয়েক গজ দূরে ম্যানজানিটা জাতীয় একধরনের গাছের ঝোপ, দেখতে পেল। বেশি বড় না। কাছাকাছি আর কিছু না দেখে ওটার দিকেই দৌড় দিল সে। প্রায় ডাইভ দিয়ে পড়ে ভেতরে ঢুকে গেল। লুকিয়ে গেল ডালপাতার আড়ালে। আস্তে করে ডাল সরিয়ে ফাঁক করে উঁকি দিল রাস্তার দিকে।
লোকটার মুখ দেখতে পেল না। পা চোখে পড়ল কেবল। শোনা যাচ্ছে নিঃশ্বাসের খসখসে শব্দ। দাঁড়িয়ে গেল লোকটা। পাহাড়ের দিকে মুখ। পায়ে বাদামী রঙের লোফার, পরনে জিনস। পাহাড়-জঙ্গলে আসার অভিজ্ঞতা নেই বোধহয়–অনুমান করল কিশোর, তাহলে এই পোশাক পরে আসত না। লোফারটা নতুন, জিনসেও ভাজ নেই তেমন, রঙ জ্বলেনি।
এখানে এসে দাঁড়িয়ে গেল কেন? এগোচ্ছে না কেন? কিছু দেখেছে? রাস্তা। থেকে সরে আসার আগে কোন চিহ্ন রেখে এসেছে কিশোর?
ঘাবড়ে গেল সে। মনে হতে লাগল, বড় বেশি খোলামেলা জায়গায় রয়েছে। কেউ আছে সন্দেহ করে যদি ঘুরে ভাল করে ঝোপের দিকে তাকায়। লোকটা, তাকে

দেখে ফেলবে।
বাঁ পাশের ঝোপের ভেতর শব্দ হলো। ঘুরে তাকাল লোকটা। হুড়মুড় করে বেরিয়ে এল একটা বুনো জানোয়ার।
কি বেরোল দেখতে পেল না কিশোর, তবে সুযোগটা কাজে লাগাল। হাতের থাবা আর হাঁটুতে ভর দিয়ে মাথা উঁচু করল লোকটাকে দেখার জন্যে।
ধক করে উঠল বুক। দম বন্ধ করে ফেলল। লোকটার হাতে পিস্তল!
হাই! ডাকল কে যেন রাস্তা থেকে।
পথের দিকে তাকাল আগন্তুক। চওড়া কানাওয়ালা ঐ হ্যাটের নিচে তার চেহারা এখন দেখতে পাচ্ছে কিশোর। হ্যারিস মিলারকে চিনতে ভুল করল না।
মাথা নামিয়ে ফেলল কিশোর। আগের চেয়ে বেশি। মাটিতে শরীর। মিশিয়ে ফেলার চেষ্টা করল, যাতে মিলারের চোখে না পড়ে। ঘামছে। উঠে দৌড় দেবে? না, উচিত হবে না। বেরোলেই তাকে দেখে ফেলবে মিলার।
হাই, আবার বলল মহিলা, আমাকে মনে আছে? কাছে চলে এসেছে।
নীরবে হাসল কিশোর। গলা শুনেই চিনতে পেরেছে। সেই মহিলা, ডরোথি, মাউন্ট রাশমোরে রাবাতকে পাকড়াও করেছিল যে।
আমি ভেবেছি আর দেখা হবে না আপনার সঙ্গে, মহিলা বলছে। লাঞ্চের পর দেখি আপনি নেই! কত খোঁজা খুঁজলাম। নেই তো নেইই। যেন হাওয়া! এখানে কি করছেন? পাহাড় দেখতে এসেছেন বুঝি?
মিলারের হাত দেখতে পাচ্ছে না কিশোর। পিস্তলটা কি করেছে বুঝতে পারল না। নিশ্চয় পকেটে ঢুকিয়ে ফেলেছে। মহিলা দেখেনি। দেখলে প্রশ্ন শুরু করে দিত। বিড়বিড় করে কি যেন বলল মিলার, ঠিক বোঝা গেল না–পেট্রল ফুরিয়ে গেছে, এ রকমই কি যেন বলল। মহিলা বকবক করতে লাগল। মিলারকে আবার খুঁজে পাওয়ার আনন্দে বিভোর। নিজের গাড়িতে তাকে লিফট দেয়ার প্রস্তাব দিল। মিলার যদি পাহাড়ের দিকে হাঁটতে যেতে চায়, তাহলে সঙ্গ দেবে। হাঁটার ব্যাপারেই আগ্রহ বেশি মহিলার।
রাজি হলো না মিলার। বলল, অনেক ঘোরাফেরা করেছে, এবার ফিরে যেতে চায়। গাড়ির দিকে এগোল সে। মহিলা ছাড়ল না। সঙ্গে সঙ্গে চলল। কথা বলার নেশায় পেয়েছে যেন। অনর্গল বকছে।
আবার মাথা তুলল কিশোর।
মিলারের হাত চেপে ধরেছে মহিলা। শক্ত করে ধরেছে, যেন আর হাওয়া। হতে না পারে মিলার।
হাসি পেল কিশোরের। মিলারের মনের অবস্থা কল্পনা করে হাসিটা বাড়ল। ভাল বিপদেই পড়েছে বেচারা। ওই মহিলার হাত থেকে ছাড়া পাওয়া বড় কঠিন

ব্যাপার।
গাছের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল দুজনে।
মিনিট দুই পরে প্রথমে একটা, তারপর আরেকটা গাড়ি স্টার্ট নেয়ার শব্দ কানে এল। চলে গেল গাড়ি দুটো।
ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল কিশোর। মুসাদের পিছু নেয়ার সময় নেই আর এখন। একটা পাথর দেখে তাতে বসে পড়ল। সঙ্গীদের আসার অপেক্ষা করতে লাগল।
মুসারা এসে তাকে ওভাবেই পথের পাশে বসে থাকতে দেখল।
কি ব্যাপার, এ ভাবে বসে আছ কেন? মুসার প্রশ্ন।
ভ্রূকুটি করল রবিন। কিছু ঘটেছে? তোমার মুখ অমন শুকনো কেন?
পিস্তল নিয়ে ও আমাদের পিছে পিছে আসবে কল্পনাও করতে পারিনি, মাথা নাড়তে লাগল কিশোর। প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেলাম। রাবুনো, আপনার। কাছে আমাদের সবার মাপ চাওয়া উচিত।
তাই নাকি? কেন?
এখানেও এসে হাজির হয়েছে মিলার। পিস্তল আছে তার কাছে। একটু আগেও আপনার কথায় বিশ্বাস ছিল না আমার। কিন্তু এখন হয়েছে। আপনি ঠিকই বলেছেন, আমাদের পিছু নিয়েছে সে।
সব খুলে বলল কিশোর।
মহিলার কথায় আসতেই হাসতে শুরু করলেন রাবাত। চমৎকার! অচেনা কাউকে দেখলেই খাতির করতে আসে মেয়েমানুষটা। যাক, কিছুক্ষণের জন্যে নিশ্চিন্ত, মিলারকে আটকে রাখবে সে।
নানার দিকে তাকাল মুসা। নানা, অত হাসার কিছু নেই। ওর কাছে। পিস্তল আছে। পেছন থেকে গুলি মেরে দিলে গেছি। পুলিশকে জানানো দরকার।
আরও যাব পুলিশের কাছে মাথা নাড়লেন রাবাত। মোটেলে আগুন লাগলে যে অফিসারটা এসেছিল, মনে নেই? কি ভঙ্গিটাই না করল? যেন আমি একটা পাগল! নিজের চামড়া নিজেদেরই বাঁচাতে হবে আমাদের, কারও সাহায্য পাব না। এখানে দাঁড়িয়ে থেকে অহেতুক আর সময় নষ্ট করে লাভ নেই। চল, যাই।
বড় করে দম নিলেন তিনি। বনের তাজা বাতাস টানলেন বুক ভরে। এই প্রথম তাকে নিশ্চিন্ত মনে হলো। এতদিনে ভার নামল আমার। মিলার যে পিছু নিয়েছে, এখন আমরা শিওর। তোদের সবার হাবভাব দেখে আমিও কিন্তু ভয় পেতে আরম্ভ করেছিলাম, সত্যি সত্যি পাগল হয়ে যাচ্ছি না তো!
পরস্পরের দিকে তাকাল মুসা আর কিশোর। দুজনের চোখেই বিস্ময়।
আগে আগে চললেন রাবাত। পেছনে ছেলেরা।

গোধূলি বেলায় র‍্যাপিড সিটিতে পৌঁছল ওরা। একটা মোটেলে ঘর নিল। কাছের একটা ফাস্ট ফুডের দোকান থেকে বার্গার খেয়ে এসে বিছানায় শুয়ে মহা আনন্দে নাক ডাকাতে শুরু করলেন রাবাত।
বিছানায় চিত হয়ে ছাতের দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। কি করে কাজটা করছে? কার কথা বলছ? জানতে চাইল মুসা, মিলার, না নানা?
মিলার। যেখানেই যাচ্ছি ঠিক পিছে পিছে লেগে আছে। বের করে নিচ্ছে কোথায় আছি আমরা। কি ভাবে?
জবাব দিতে পারল না কেউ।
এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল ওরা।
পরদিন সকালে সবাই উত্তেজিত হয়ে রইল। রাস্তায় কড়া নজর। সামনে পেছনে দুদিকেই চোখ রেখেছে। সাউথ ডাকোটা ব্যাডল্যান্ড ধরে চলার সময় পথে দর্শনীয় কিছু দেখার জন্যে যেখানেই নামছে, গাড়ির কাছাকাছি থাকছে ওরা, চোখে চোখে রাখার জন্যে। ব্যাডল্যান্ডের নানা রকম পাথরের স্তূপ। মুসার অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠেছে। তার মনে হচ্ছে, অন্য কোন গ্রহে এসে হাজির হয়েছে, এটা পৃথিবী হতে পারে না! সব কিছুতেই যেন ভূতের ছোঁয়া দেখতে পাচ্ছে সে। অস্বস্তির আরও একটা বড় কারণ, তার সন্দেহ, ওসব পাথরের আড়ালে লুকিয়ে থেকে গুলি চালাতে পারে মিলার।
নানা, কি এমন আবিষ্কার করলে, যার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে সে? এই নিয়ে শতবার প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করেছে মুসা।
খুব জরুরী জিনিস, একই জবাব দিলেন রাবাত। না জানবি যতক্ষণ, ততক্ষণ নিরাপদ। নইলে বলতে আর অসুবিধে কি ছিল।
ছোটবড় নানা আকারের, নানা ধরনের পাথরের চাঙড় আর আলগা পাথরের স্তূপ পেরিয়ে এল গাড়ি। প্রেইরি ডগ নামে এক ধরনের প্রাণীর এলাকায় এসে ঢুকল। মাটিতে সর্বত্র ছড়িয়ে আছে ওদের গর্ত। মুখের কাছে শুয়ে, রোদ পোয়াচ্ছে বিশাল ইঁদুরের মত দেখতে প্রাণীগুলো। গাড়িটাকে আসতে দেখলে বিচিত্র ভঙ্গিতে পেছনের দুই পায়ে ভর দিয়ে সটান সোজা করে দিচ্ছে শরীরটাকে, তীক্ষ্ণ টিইং টিইং ডাক ছেড়ে সতর্ক করছে একে অন্যকে, গাড়ি বেশি কাছে চলে এলে সুড়ুৎ করে ঢুকে পড়ছে গর্তের ভেতর। পরক্ষণেই আবার মাথা বের করে উঁকি দিচ্ছে।

.

বেলা বারোটার মধ্যেই ব্যাডল্যান্ড দেখা হয়ে গেল ওদের। হাইওয়েতে ফিরে এসে পুবে রওনা হলো। ভূমি এখন সমতল। সামনে মাইলের পর মাইল রাস্তা লম্বা হয়ে পড়ে আছে। বাঁক নিয়েছে খুবই সামান্য, ওঠানামা নেই। বললেই চলে। সামনেও

গাড়ি আছে প্রচুর, পেছনেও আসছে অনেক, কিন্তু লিংকনটাকে দেখা গেল না। দ্রুত চালাচ্ছেন রাবাত। একের পর এক গাড়িকে ওভারটেক করে পিছে ফেলে আসছেন। পাশ কাটানোর সময় দেখছেন ড্রাইভারের চেহারা।
বেশ কিছুটা এগিয়ে এসে গতি কমিয়ে দিলেন তিনি। পেছনের গাড়িগুলোকে আগে চলে যেতে দিলেন। ড্রাইভারদের চেহারা দেখলেন। ওদের মধ্যে হ্যারিস মিলার নেই।
বুঝলাম না, অবশেষে বললেন তিনি, সামনেও নেই, পেছনেও নেই; আমরাও ওর পাশ কাটিয়ে আগে যাইনি, সে-ও আমাদের পাশ কাটিয়ে পেছনে যায়নি। কিন্তু বাজি ধরে বলতে পারি আশেপাশেই কোথাও আছে। কোথায়?
পেছনের জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে মুসা। হঠাৎ শক্ত হয়ে গেল। খাইছে! মোটরসাইকেল! নানা, ক্রিসেন্ট সিটির সেই গ্যাঙটা আসছে!
রিয়ারভিউ মিররের দিকে তাকালেন রাবাত। ক্রিসেন্ট সিটি এখান থেকে বহুদূর। কোথায় চলেছে ওরা? বখাটেদের সভা হচ্ছে নাকি কোথাও, যোগ। দিতে চলেছে?
সামরিক শৃঙ্খলায় দুই সারিতে এগিয়ে আসছে ওরা। পিঠ সোজা, দৃষ্টি সামনে স্থির। ক্রিসেন্ট সিটির সেই দলটাই। পরনে কালো চামড়ার পোশাক, বেল্ট আর দস্তানায় কাটা বসানো।
দ্রুত এগিয়ে আসছে ওরা। বুইকটাকে ধরে ফেলছে।
নানা, জোরে চালাও না কেন? উদ্বিগ্ন হয়ে বলল মুসা।
কারও ভয়ে পালাতে যাচ্ছি না আমরা, শান্তকণ্ঠে জবাব দিলেন রাবাত।
এত সাহস কেন? আগের বার দলটাকে কি করে নাকানি-চোবানি খাইয়েছেন রাবাত, মনে করে হাসল রবিন। এবারও তেমন কোন খেল দেখানোর অপেক্ষায় আছেন নাকি?
আমাদের ক্ষতি করতেই আসছে, এমন ভাবার কোন কারণ নেই, রাবাত বললেন। ক্রিসেন্ট সিটির দলটা হলেও এতদিনে নিশ্চয় আমাদের কথা ভুলে গেছে।
কাছে চলে এল বাইকগুলো। ইঞ্জিনের গর্জন শোনা যাচ্ছে। বুইকটাকে পাশ কাটানোর জন্যে বায়ে সরল দলপতি।
নানা! চেঁচিয়ে উঠল মুসা, এই লোকটাই তোমাকে সেদিন ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে চেয়েছিল।
নাক দিয়ে শব্দ করলেন রাবাত। হুঁ! চেহারাটা কি করে রেখেছে। সারামুখে দাড়িগোফ! এগুলো মানুষ না বনমানুষ, তাই কেবল ভাবি!
গাড়ির পাশ কাটানোর সময় ফিরে তাকাল দলপতি। আর ঠিক সেই মুহূর্তে তার দিকেও তাকালেন রাবাত। চোখে চোখ আটকে গেল দুজনের। চোখ বড় বড় হয়ে

গেল লোকটার। গোল হয়ে গেল মুখ। ধীরে ধীরে বিকৃত হাসিতে রূপ নিল সেটা। রাবাত আর ছেলেদের দেখিয়ে সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে কিছু বলল।
হয়েছে কাজ, বলে উঠল রবিন, ধরবে এবার আমাদের! সেদিন হেরে যাওয়ার প্রতিশোধ নেবে আজ!
বুইকটাকে ঘিরে ফেলল সাইকেলগুলো। গতি কমিয়ে ফেলেছে।
আচমকা গতি বাড়িয়ে দিলেন রাবাত। লাফ দিয়ে আগে বাড়ল বুইক। তোয়াক্কাই করল না সামনের সাইকেলগুলো। গতি বেড়ে গেল ওদেরও। আগে আগে চলেছে। যেন ওদেরকে ধরার চ্যালেঞ্জ করেছে গাড়িটাকে।
ওরা জানে ধাক্কা দিয়ে ফেলতে পারব না ওদেরকে, তিক্তকণ্ঠে বললেন রাবাত, ঠিকই আন্দাজ করছে।
ব্রেক চেপে গতি কমিয়ে ফেললেন তিনি। বাঁয়ে তাকালেন। ধীরে ধীরে পাশে সরতে লাগলেন। জায়গা করে দিল পাশের সাইকেলটা। আরও সরালেন তিনি। আরেকটু জায়গা দিল সাইকেল। তাঁর মতলব বুঝতে পারল না।
হাইওয়ের পাশে মাঠ থেকে ধোয়া উঠছে। শুকনো ঘাস পুড়িয়ে ফেলা হচ্ছে। বাতাস প্রায় নেই, তাই উড়ে না গিয়ে জমির ওপরই স্থির হয়ে আছে ধোয়া, রাস্তার ওপরেও উঠে এসেছে একটা অংশ। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই তার ভেতরে ঢুকে যাবেন রাবাত। ছেলেদের বললেন, শক্ত হয়ে বোসো!
কি করতে যাচ্ছেন বলার সময় নেই। ধোয়ার মধ্যে ঢুকে গেল গাড়ি। অদৃশ্য হয়ে গেল মোটরসাইকেল আরোহীরা। চারপাশে কিছুই দেখা যাচ্ছে না কেবল কুণ্ডলী পাকানো ধূসরতা ছাড়া। এক মোচড়ে স্টিয়ারিঙের অনেকখানি বায়ে ঘুরিয়ে দিলেন রাবাত।
রাস্তা থেকে প্রায় উড়ে সরে এল গাড়িটা। একটা মুহর্তের জন্যে শূন্যে ঝুলে রইল যেন। তারপর প্রচণ্ড ঝাঁকুনি। রাস্তার ডিভাইডারের মাঝে নেমে এসেছে গাড়ি। মুসার মনে হলো, উল্টে যাবে। চিৎকার করে উঠল সে। কিন্তু অহেতুক ভয় পেয়েছে। গাড়ি ওল্টাল না। নিরাপদেই নেমে দাঁড়িয়ে গেল।
ভারী দম নিলেন রাবাত। পায়ের চাপ বাড়ালেন অ্যাক্সিলারেটরে। বনবন করে ঘুরতে লাগল চাকা। কয়েকবার পিছলে গিয়ে অবশেষে মাটি কামড়ে ধরল। ডিভাইডারের সমান্তরালে খাদের পাড় ধরে ছুটতে শুরু করল নাক বরাবর। ধোয়ার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল।
আবার স্টিয়ারিং অনেকখানি ঘুরিয়ে দিলেন তিনি। কঁকুনি খেতে খেতে রাস্তায় উঠে এল গাড়ি। আগের রাস্তা থেকে সরে চলে এসেছে আরেকটা রাস্তায়।
চিৎকার করে বলল মুসা, নানা, তুমি একটা জিনিয়াস!

এখনই চেঁচাবি না, সতর্ক করলেন রাবাত, আমরা কি করেছি বুঝতে দেরি হবে না ওদের। চলে আসবে তখন।
সামনে একটা এগজিট র‍্যাম্প দেখা গেল। সেটার দিকে ছুটলেন তিনি। সোজা নিচে নেমে এসে ছুটলেন আধ মাইল দূরের একটা গাছের জটলার দিকে। জটলার কাছে পৌঁছে গাড়ি ঢুকিয়ে দিলেন ভেতরে। রাস্তা থেকে আর দেখা যাবে না এটাকে।
আমাদের দেখবে না ওরা, বললেন তিনি। ওরা ভাববে ধোয়া পার হয়ে সোজা সামনে চলে গেছি আমরা, সেদিকেই নজর দেবে।
ভারী হয়ে এসেছে তার নিঃশ্বাস। তবে মৃদু হাসি ফুটেছে ঠোঁটের কোণে। হাইওয়ের দিকে চোখ।
মিনিটখানেক পরেই দেখা গেল ওদের। সারি দিয়ে চলেছে পশ্চিমে। নজর সামনের দিকে। বুইকটাকে খুঁজছে।
খুব খারাপ লোক, রাবাত বললেন। আরও জ্বালাবে মনে হচ্ছে!
কিন্তু আমাদের পেছনে লেগেছে কেন? রবিনের প্রশ্ন।
বর্ণবাদী হতে পারে, অনুমানে বলল মুসা।
মাথা নাড়ল কিশোর, আমার তা মনে হয় না। ওদের দলে কালো। লোকও আছে। শিওর, মিলার লাগিয়েছে। আমাদের কাবু করতে বলেছে ওদের। তারপর সে এসে ফর্মুলাটা কেড়ে নেবে। এর জন্যে নিশ্চয় টাকাও দিয়েছে ওদেরকে।
দূরে হারিয়ে গেল দলটা।
হঠাৎ হাত তুলল কিশোর, ওই, দেখুন! বললাম না, সব শয়তানি মিলারের!
ধূসর একটা লিংকন গাড়ি। কিশোর বলার মুহূর্ত পরই গতি কমিয়ে ফেলল।
বাহ, এসে গেছে, রাবাত বললেন।
রবিন বলল, আর কোন সন্দেহ নেই, গ্যাঙকে টাকা খাইয়েছে মিলার।
তাকে সামনে চলে যেতে দেয়া উচিত, মুসা বলল। ও এগিয়ে গেলে আমরা এগোব। পেছনে থেকে যাব তখন।
কিন্তু তাকে সে-সুযোগ দিল না লিংকন। গেল না। পথের ধারে কাঁচা জায়গায় নেমে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে গেল। মুসারা যেখানে রয়েছে তার থেকে খুব বেশি দূরে নয়।

.

পার্কিং লাইট জ্বেলে দিয়ে অপেক্ষা করছে লিংকন।
শয়তানটা জানে আমরা এখানে আছি, রাবাত বললেন। কি করে জানল?
একটা পেট্রল কারকে আসতে দেখা গেল। লিংকনের কাছে গিয়ে থামল গাড়িটা। ইউনিফর্ম পরা একজন পুলিশ অফিসার বেরিয়ে এল। দরজা খুলল মিলার।

অফিসারের সঙ্গে কথা বলল। দুজনে এগিয়ে গেল লিংকনের সামনের দিকে। হুড তুলে ইঞ্জিন দেখতে লাগল।
ওসমস্ত অভিনয়, কিশোর বলল। গাড়ি খারাপ হয়ে যাওয়ার ভান করছে। মিলার। গাড়ি থেকে বেরোল সে। কি করে আমাদের পেছনে লেগে রয়েছে, বোঝা দরকার।
কি করে? মুসার প্রশ্ন।
কোন ধরনের যন্ত্র রয়েছে আমাদের গাড়িতে, যেটা সঙ্কেত পাঠাচ্ছে। সেই সঙ্কেত ধরে জেনে যাচ্ছে সে, আমরা কোথায় আছি। সামনে না এসে আড়ালে থেকেও আমাদের অনুসরণ করতে পারার এটাই একমাত্র ব্যাখ্যা।
কিশোরের কথা বুঝে ফেললেন রাবাত। তারমানে বলতে চাইছ কোন ইলেকট্রনিক যন্ত্র লাগিয়ে দিয়েছে গাড়িতে!.
সোজা গাড়ির ট্রাংকের দিকে রওনা দিলেন তিনি। সুটকেসগুলো বের করে এনে মাটিতে ফেললেন। হ্যাঁচকা টানে সীটগুলো সরিয়ে নিয়ে এলেন সামনের দিকে।
সামনের সীটের নিচে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে দেখতে লাগল কিশোর। তারপর হাত দিল ড্যাশবোর্ডের নিচে।
জিনিসটা খুঁজে বের করল অবশেষে রবিন। হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে গেল গাড়ির নিচে। সাবানের সমান একটা প্লাস্টিকের বাক্স বের করে আনল। পেট্রোল ট্যাংকে টেপ দিয়ে আটকানো ছিল।
ওর একটা দাঁতও রাখব না আমি! ভীষণ রাগে একটা পাথর তুলে নিলেন রাবাত। আমার ওপর গুপ্তচরগিরি!
যা দাঁড়ান, দাঁড়ান! বাধা দিল কিশোর। একটা গাছের ডালে রেখে দিল। যন্ত্রটা। হেসে বলল, থাক এটা এখানে, সঙ্কেত পাঠাক মিলারের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, থাকুক ব্যাটা ওখানে বসে।
সুটকেসগুলো আবার আগের জায়গায় তুলে রাখল তিন গোয়েন্দা। গাড়ি স্টার্ট দিলেন রাবাত। রাস্তায় উঠলেন না। মাঠের ওপর দিয়ে এগিয়ে চললেন উত্তরে। ক্রমে সরে যেতে থাকলেন হাইওয়ে থেকে
ফিরে তাকাল রবিন। এখনও অফিসারের সঙ্গে কথা বলছে মিলার মাথা চুলকাচ্ছে অফিসার। মনে হচ্ছে, কোন কিছু অবাক করেছে তাকে।
কিছুদূর এগিয়ে একটা রাস্তা দেখা গেল। সেটাতে উঠে পড়লেন রাবাত। কয়েকটা গায়ের ভেতর দিয়ে গেছে পথটা। দুই ধারে মাঝে মাঝেই পড়ছে বিস্তৃত পশুচারণভূমি। গরু-ঘোড়া চরছে। দক্ষিণ ডাকোটার পিয়েরিতে পৌঁছে মিসৌরি নদী পার হয়ে এল ওরা। তারপর কয়েকটা ছোট ছোট শহর। পশুচারণভূমি অনেক আছে এখানেও।

মিনেসোটা সীমান্তের মাইল পঞ্চাশেক দূরে একটা ছোট সরাইয়ে রাত কাটাতে উঠল ওরা। গ্যারেজ আছে। তাতে তালা দেয়ার ব্যবস্থাও আছে। গাড়ি ঢুকিয়ে রাখলেন রাবাত। সরাইয়ের মালিক এক হাসিখুশি মহিলা। নাম মিসেস আরগন। প্রচুর কথা বলে। সারাক্ষণ বকবক করে গেল। একাই কথা বলল। তার প্রশ্নের জবাব দিল কিনা কেউ, সেটাও লক্ষ করল না।

রাতে চমৎকার রান্না করে খাওয়াল মহিলা। সকালে দিল আঞ্চলিক নাস্তা।

আবার বেরিয়ে পড়ল ওরা। বাতাস কোমল, ভেজা ভেজা। গালে এসে লাগছে।

মিনেসোটা পেরোনোর সময় হাইওয়ে থেকে দূরে রইল। তবে রোচেস্টারে এসে আবার হাইওয়েতে উঠল। উইসকনসিনের লা ক্রসের দিকে এগোল।

রাবাতের মেজাজ ভাল বললেন, মিলার আসুক আর না-ই আসুক, লা ক্রসে থামব আমরা। এখানে বড় হয়েছিল মুসার নানী। এত সুন্দর শহর খুব কমই আছে।

তা থাকা যায়। মিলারের চিন্তা মাথা থেকে দূর করে দিলেই পারি, মুসা বলল। তার যন্ত্রটা খুলে ফেলে দিয়েছি। আর পিছু নিতে পারবে না সে।

ওই শেয়ালটাকে বিশ্বাস নেই। আরেকটা বুদ্ধি বের করে ফেলতে পারবে। পিছু নেয়ার জন্যে তৈরি হয়েই বেরিয়েছে সে। আমার বাড়িতেও নিশ্চয় ওধরনের যন্ত্র অনেক লাগিয়েছে। তাতে করে জেনে গেছে, আমি কি করছি।

আগে হলে এ সব কথায় গুরুত্ব দিত না কিশোর। কিন্তু এখন বিশ্বাস করল। মিলার ওদের পিছু নিয়েছে রাবাতের আবিষ্কৃত জিনিসটা ছিনিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যেই।

জিনিসটা কি? অনুমানও করতে পারল না কিশোর। কারণ করার মত কোন সূত্রই নেই তার হাতে। যন্ত্রটা খোঁজার সময় আবিষ্কারটাও পাওয়ার আশায় ছিল সে। নজর রেখেছিল। কিছুই চোখে পড়েনি। তবে কি রাবাতের পকেটে আছে? নাকি মাথায়? মাথায় থাকলে মিলার ওটা চুরি করবে কি করে?

মনটিরেতে ওই লোকটার সঙ্গে কি জন্যে দেখা করেছিল মিলার? ফিশারম্যান ওআর্ষে সেই যে লোকটা, দামী পোশাক ছিল যার পরনে, গণ্ডগোলের সম্ভাবনা দেখেই যে কেটে পড়েছিল, উধাও হয়ে গিয়েছিল মুহূর্তে। রাবাতের প্রতি তার তেমন নজর ছিল বলে মনে হয়নি, কোন আকর্ষণ ছিল না। মিলারের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল কেন?

ওই যে! রাবাতের আচমকা চিল্কারে ভাবনার জগৎ থেকে ফিরে এল কিশোর।

সামনে একটা নদী। ওপরে ব্রিজ। রাবাত জানালেন, নদীটা মিসিসিপি। নদীর মাঝখানে অনেক চড়া, দ্বীপের মত হয়ে আছে। ঘন গাছে ছাওয়া। নদীর অন্য পাড়ে একটা শহর।

ওইটাই লা ক্রস, বললেন তিনি। আজ রাতে ওখানে থাকব।
বিকেলে সেদিন নদীর পাড়ের একটা রেস্টুরেন্টে খাবার খেলো ওরা। বেরিয়ে এল আশপাশের অঞ্চল ঘুরে দেখার জন্যে। কাদার মধ্যে খোঁচাখুঁচি করছে মাড সোয়ালো পাখি। একটা দ্বীপের ধারে ধ্যানমগ্ন হয়ে আছে একটা বড় বক।
মার্ক টোয়েনের সময়ও নিশ্চয় এমনই ছিল মিসিসিপি, রাবাত বললেন। মনে আছে, হাকলবেরি ফিনের সঙ্গে একটা দ্বীপে গিয়ে লুকিয়েছিল টম সয়্যার? নিশ্চয় ওরকমই কোন দ্বীপ ছিল সেটা।
একটা কাজ করলে তো পারি, রবিন বলল, একটা জাহাজে চড়ে বসি। মোটেলের ডেস্কে লেখা দেখলাম এক ঘণ্টা পর পরই লা ক্রস থেকে বোট ছাড়ে, ভাটির দিকে যায়।
ঠিক! তুড়ি বাজালেন রাবাত। আমরাও যাব! তবে রাতে নয়, কাল সকালে।
পরদিন সকাল পৌনে এগারোটায় লা ক্রস কুইন নামে একটা জাহাজে চড়ে বসল ওরা। ওটা ডিজেল ইঞ্জিনে চলবে শুনে হতাশ হলেন রাবাত। তিনি আশা করেছিলেন, পুরানো ধরনের বাষ্পীয় ইঞ্জিনে দুই পাশে বড় বড় গরুর গাড়ির চাকার মত হুইল দিয়ে চালানো হবে। মিসিসিপির পুরানো ঐতিহ্য। যাত্রাটাই না বাতিল হয়, এই ভয়ে তাড়াতাড়ি মুসা বোঝানোর চেষ্টা করল, ডিজেল ইঞ্জিন অনেক বেশি নিরাপদ। আগের বাষ্পীয় ইঞ্জিনগুলো তো দুর্ঘটনা ঘটাত। বিস্ফোরিত হয়ে গিয়ে কত বোট ডুবিয়ে দিয়েছে নদীতে।
খুশি করা গেল না রাবাতকে। তবে জাহাজ থেকে নেমে গেলেন না। ছেলেদের নিয়ে ওপরের ডেকে রেলিঙের ধারে এসে দাঁড়ালেন। বন্দরের দৃশ্য দেখতে লাগলেন। প্রচুর লোকজন নানা কাজে ব্যস্ত। একটু দূরের একটা পার্কে খেলা করছে বাচ্চারা। খুব উপভোগ করছিলেন তিনি। হঠাৎ একটা দৃশ্য রাগিয়ে দিল তাকে।
হাত তুলে চিৎকার করে উঠলেন, দেখো! দেখো, ওই দ্বিতীয় লোকটা!
তার নির্দেশিত দিকে তাকাল তিন গোয়েন্দা। বন্দরে জেটির কাছে রেখে আসা বুইকটা দেখা যাচ্ছে। পেছনে দাঁড়িয়ে আছে একজন লোক। কৌতূহলী হয়ে গাড়িটা দেখছে।
চোখ বড় বড় করে ফেলল কিশোর। সেই লোকটা, মনটিরেতে যার সঙ্গে দেখা করেছিল মিলার।
ওই ব্যাটাই, তাই না? রাবাত বললেন। দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা!
মেইন ডেকে নামার সিঁড়ির দিকে দৌড় দিলেন তিনি। কিন্তু লোকজন। ভিড় করে উঠে আসছে। ইঞ্জিনও চালু হয়ে গেছে। কাঁপতে শুরু করেছে লা ক্রস কুইন।

রাবাত মেইন ডেকে নেমে আসার আগেই চলতে শুরু করল জাহাজ। দূরত্ব বাড়ছে জেটির সঙ্গে।

.

জাহাজটার আবার জেটিতে ফিরতে এক ঘণ্টার বেশি লেগে গেল। সবার আগে নামলেন রাবাত আর তিন গোয়েন্দা। দৌড় দিলেন বুইকের দিকে।

গাড়ির কোন ক্ষতি করা হয়নি। তালা ভেঙে দরজা খোলারও চিহ্ন নেই। হামাগুড়ি দিয়ে নিচে ঢুকে গেল মুসা, আবার যন্ত্রটন্ত্র কিছু লাগিয়ে দিয়েছে কিনা। দেখার জন্যে। ট্রাংক খুলে সুটকেসগুলো বের করে আনল রবিন আর কিশোর। ওগুলোর ভেতরও দেখল। রাবাত দেখলেন সীট আর ড্যাশবোর্ডের নিচে। হুড তুলে ইঞ্জিনের চারপাশের খালি জায়গায়ও দেখলেন।

নেই! ঘোষণা করলেন তিনি। তাহলে ওই ইবলিসটা এসেছিল কেন? আবার আমাদের খুঁজে বের করল কি ভাবে? যন্ত্রটা তো খুলে ফেলে দিয়েছি!

হয়তো অপেক্ষা করে করে, রবিন বলল।

অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল অন্যেরা।

আমার কথাই বলি। ধরা যাক, যাকে ধরতে চাই তার গন্তব্য জানা আছে আমার। পথের মাঝে তাকে হারিয়ে ফেললাম। বুঝলাম অন্য কোন ঘুরপথে পালিয়েছে। তখন তাকে ধরতে হলে কি করব? তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে এমন কোথাও বসে থাকব, যেখান দিয়ে ট্যুরিস্ট যাতায়াত করে। টুরিস্ট স্পট। অপেক্ষা করতে থাকব। নজর রাখব। লা ক্রসে এসে অবশ্যই আমি জাহাজঘাটায় খোঁজ নেব, আমার লোকটা জাহাজে উঠে বেড়াতে যাচ্ছে কিনা দেখার জন্যে। কারণ বেশির ভাগ ট্যুরিস্টই এখানে এসে এই কাজ করে। এ মাথা ঝাঁকালেন রাবাত। ঠিক। এটাই ঘটেছে। চালাক ছেলে তুমি, রবিন। তোমরা তিনজনই খুব চালাক।

এখান থেকে কেটে পড়া উচিত আমাদের, রবিন বলল। এখন থেকে টুরিস্টরা যে সব জায়গায় যায়, সে-সব এড়িয়ে চলব আমরা। মেইন রোডে যাব না পারতপক্ষে। তাহলেই আর খুঁজে পাবে না আমাদের।

হ্যাঁ, তাই করতে হবে। তাড়াতাড়ি কেটে পড়া উচিত এখন। একবার নিউ ইয়র্কে পৌঁছে গেলে আর কিছু করতে পারবে না মিলার। ওর সুযোগ শেষ হয়ে যাবে।

পনেরো মিনিটের মধ্যেই লা ক্রস থেকে বেরিয়ে এল ওরা। বেশ কিছু ছোট ছোট রাস্তা দক্ষিণ-পশ্চিমে চলে গেছে। সেগুলো ধরে এগোল। রাত কাটাল ইলিনয় রাজ্যের রকফোর্ড শহরের বাইরে একটা সরাইখানায়।

পরদিন সকালে শিকাগো শহরে পৌঁছল ওরা। ছেলেদের লেক শোর ড্রাইভ দেখাতে নিয়ে গেলেন রাবাত। লেক মিশিগানের দিকে মুখ করা প্রচুর। দামী দামী সৌখিন বাড়ি আর বহুতল অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং দেখা গেল।

বাড়ি ফিরে বলতে পারবে এখন, মিশিগান হ্রদ দেখতে গিয়েছিলাম, হেসে বললেন রাবাত।
শহরের সবচেয়ে লম্বা একটা বাড়ির ওপরের তলার রেস্টুরেন্টে দুপুরের খাওয়া সারল ওরা। তারপর পাড়ি জমাল ইনডিয়ানার ভেতর দিয়ে।
রাত কাটাতে থামল স্টারজিসে। রবিনের ক্যামেরার ফিল্ম ফুরিয়ে গেছে। শহরের প্রধান সড়কের ধারে ক্যামেরার দোকান আছে, তবে বন্ধ হয়ে গেছে। সেটা। সুপারমার্কেটে গেল রবিন।
দোকানে ঢুকে কোণের দিকে একটা কাউন্টার দেখতে পেল। যে লোকটা তার কাছে ফিল্ম বিক্রি করল, সে অ্যাসিসট্যান্ট ম্যানেজার। টাকা। দিয়ে দরজার দিকে এগোল রবিন। হঠাৎ পথরোধ করা হলো তার।
সেই সুবেশী লোকটা, মনটিরেতে মিলারের সঙ্গে দেখা করেছিল যে, লা ক্রস বন্দরে ওদের গাড়ির কাছে দাঁড়িয়েছিল।
চোখে চোখে তাকিয়ে রইল রবিন। কথা বেরোল না। নড়তে পারল না।
তোমার সঙ্গে নেই ওটা, ভোতা, খসখসে গলায় বলল লোকটা। তবে। অসুবিধে নেই। আদায় করে নিতে পারব।
রবিনের হাত চেপে ধরল সে। এসো। ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল।
সরে যাওয়ার চেষ্টা করল রবিন। পারল না। কব্জিতে ইস্পাতের মত শক্ত হয়ে চেপে বসেছে লোকটার আঙুল। স্বয়ংক্রিয় দরজার দিকে ওকে টেনে নিয়ে চলল লোকটা। দরজার কাছাকাছি আসতেই হুশ করে খুলে গেল পাল্লা। দরজার ওপাশে পার্কিং লট, তার ওপাশে…
ঝড়ের গতিতে ভাবনা চলেছে রবিনের মাথায়। লোকটার সঙ্গে নিশ্চয় মিলারও এসেছে। লুকিয়ে আছে কোথাও। রবিনকে আটকে রেখে দুজনে মিলে মুক্তিপণ হিসেবে রাবাতের কাছ থেকে তার আবিষ্কারটা কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করবে। যদি দিতে অস্বীকার করেন রাবাত? ওকে কি করবে ওরা?
চিৎকার করে উঠল রবিন। লোকটার পায়ে গোড়ালি দিয়ে লাথি মেরে নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করল। লাগাতে পারল না। ঝট করে পা সরিয়ে নিয়েছে লোকটা। তারমানে জুডো-কারাত জানা আছে তারও। সহজ লোক নয়।
দরজার কাছে একটা ওয়াটার কুলার দেখতে পেয়ে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল রবিন। পানি বের করার হাতলটা চেপে ধরল। তাকে সরানোর জন্যে টানাটানি শুরু করল লোকটা। পারল না। টান লেগে পানি বেরিয়ে আসতে লাগল। পানি পড়তে লাগল রবিনের মুখে, গলায়; শার্ট ভিজে গেল। কিন্তু বোতাম ছাড়ল না। চিৎকারও বন্ধ করল না।

দেখো, ধমক দিয়ে বলল লোকটা, বন্ধ করো এ সব! জোরে বলল না সে, কণ্ঠস্বর দাবিয়ে রাখল। যেন অবাধ্য ছেলেকে শাসন করছে বাবা।
চেঁচামেচি শুনে সেখানে এসে হাজির হলো অ্যাসিসট্যান্ট ম্যানেজার। কি হয়েছে?
না, কিছু না, শান্তকণ্ঠে বলল লোকটা। রবিনের কব্জি ছাড়েনি। তার হাতল ধরা হাতটাও ছাড়ানোর চেষ্টা করতে লাগল। ম্যানেজারকে বলল, রাগ করে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে ছেলেটা…
মিথ্যে কথা! আরও জোরে চিৎকার করে উঠল রবিন। এই লোক আমার বাবা নয়! জীবনে চোখেও দেখিনি একে! ও একটা ডাকাত! হোটেলে আগুন লাগিয়েছে! কিডন্যাপার! জলদি পুলিশ ডাকুন!
ছোটখাট ভিড় জমে গেল। চার-পাঁচজন দোকান-কর্মচারী ঘোট ঠেলাগাড়িতে করে মাল নিয়ে চলেছিল, দাঁড়িয়ে গেল। ওদের মধ্যে একজন তরুণ ক্লার্কও রয়েছে, লাল জ্যাকেট পরা।
হ্যারি, ওকে বলল ম্যানেজার, যাও তো, শেরিফের অফিসে ফোন। করো। এখানে কি হয়েছে বলবে। ওরা এসে যা করার করুক।
আশ্চর্য! ধমকে উঠল মিলারের সঙ্গী। এর মধ্যে আবার পুলিশ ডাকাডাকি কেন?
গলার স্বর খাদে নামিয়ে ম্যানেজারকে বলল, আসল কথা। কি জানেন? নেশা ধরেছে ও। বাড়ি থেকে পালিয়েছে। শেষ হয়ে যাওয়ার আগেই ছেলেটাকে…
ও আমার বাবা নয়! জোরে চিৎকার করে উঠল রবিন। আমার নাম পর্যন্ত জানে না, জিজ্ঞেস করে দেখুন?
লোকটার দিকে তাকাল ম্যানেজার।
জিজ্ঞেস করুন ওকে! আবার বলল রবিন। আমার নাম বলতে বলুন। বলতে পারবে না।
মসৃণ হাসি হাসল লোকটা। নিজের ছেলের নাম আবার বলতে পারে না কেউ? বনেট। ওর নাম বনেট।
কুলারের হাতল ছেড়ে দিল রবিন। পকেট থেকে বের করে আনল মানিব্যাগ। তার ভেতর থেকে স্টুডেন্ট আইডেনটিটি কার্ড বের করে বাড়িয়ে দিল ম্যানেজারের দিকে, দেখুন, আমার নাম আসলে কি? ছবিও আছে। চিনতে অসুবিধে হবে না আপনার।
কার্ডটা হাতে নিল ম্যানেজার।
মিলারের সঙ্গী ভাবেনি রবিনের সঙ্গে কার্ড আছে। আর একটা মুহূর্ত দাঁড়াল না সে। দোকান থেকে বেরিয়ে পালাল।
.

সুপারমার্কেটের ডেইরি সেকশনের পেছনে সেঁতসেঁতে ছোট ঘরটায় বসে ডেপুটি শেরিফের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে রবিন। কিন্তু বোঝানো সহজ হচ্ছে না।
কেন তোমাদের পেছনে লোক লাগবে? জিজ্ঞেস করল অফিসার।
মিস্টার রাবাত বলেছেন, তার আবিষ্কৃত একটা জিনিসের ফর্মুলা নিয়ে। চলেছেন। সেটাই ছিনিয়ে নিতে চাইছে লোকটা।
রাবাত কে জানতে চাইল অফিসার। তার বন্ধুর নানা, জানাল রবিন। কি জিনিস আবিষ্কার করেছেন রাবাত, জানে না সে। তাদেরকে বলেননি তিনি। নিউ ইয়র্কে নিয়ে যাবেন। বিশেষ কারও কাছে বিক্রি করবেন ওটা। সেই বিশেষ লোকটি কে, তা-ও জানে না সে। শেষে বলল, মিস্টার রাবাত বলেন, আমাদের জন্যে জানাটা নাকি বিপজ্জনক। না জানলেই ভাল।
কিন্তু বিপদটা তো এড়াতে পারলে না, অফিসার বলল।
মাথা ঝাঁকাল রবিন। অফিসার তাকে মোটেলে পৌঁছে দেয়ার প্রস্তাব দিলে খুশি হয়েই রাজি হলো।
গাড়িতে করে তাকে পৌঁছে দিল অফিসার।
কি ঘটেছে শুনে রেগে আগুন হলেন রাবাত। কি আবিষ্কার করেছেন, অফিসারকে জানাতে রাজি নন মোটেও। রকি বীচ থেকে যে তাদের পিছু নেয়া হয়েছে, সব খুলে বললেন। কোন কথা বাদ দিলেন না। মোটেলে আগুন লাগার কথাও নয়। পেট্রোল ট্যাংকের নিচে যন্ত্র আটকে দেয়ার কথা বললেন। এমনকি লা ক্রসে লোকটা যে বুইকের কাছে এসে দাঁড়িয়ে ছিল সে-কথাও।
চুপচাপ শুনল অফিসার। শৈষ দিকে অবিশ্বাসের ভঙ্গি দেখা দিল তার চোখেমুখে। বলল, তাই নাকি? আর কিছু ঘটেছে?
কেন, যথেষ্ট হয়নি? আরও কিছু ঘটুক, চান নাকি? রেগে উঠলেন রাবাত।
না না, তা বলিনি।
মাউন্ট সেইন্ট হেলেনে দেখা গাড়িটার নম্বর অফিসারকে জানাল কিশোর। রিপোর্ট লিখে নিল অফিসার। তার নিচে সই করলেন রাবাত আর রবিন।
বেরিয়ে গেল অফিসার। চেহারা দেখেই বোঝা গেল, ওদের কথায় সন্তুষ্ট হতে পারেনি সে।
ওই দুই ব্যাটাকে ধরতে পারবে না পুলিশ, রাবাত বললেন। এতক্ষণে শহর ছেড়ে পালিয়েছে ওরা।
তার কথার প্রতিবাদ করল না কেউ।
রাতে বিছানায় শুয়ে কিশোর বলল, একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না।
মুসা কেবল গোঙাল। ঘুমে ভারী হয়ে এসেছে চোখ।
রবিন জিজ্ঞেস করল, কি?

তোমাকে কিডন্যাপ করতে চাইল কেন?
রাবুনানার আবিষ্কার আদায় করার জন্যে।
সেটা তো বুঝেছি। আমি বলতে চাইছি, তোমাকে কেন? আমাকে আর মুসাকে নয় কেন?
কি জানি। হয়তো তক্কে তক্কে ছিল, যাকে একা পেয়েছে তাকেই ধরেছে। আমাদের আগে তোমাদের পেলে তোমাদেরও ধরত।
তন্দ্রা টুটে গেছে মুসার, শান্তশিষ্ট দেখেছে তো, হয়তো, ভেবেছে ওকে ধরাটাই নিরাপদ।
হাসল কিশোর। শান্ত যে কি পরিমাণ, সেটা তো বুঝিয়ে দিয়েছে। চিন্তায় ডুবে গেল সে। আনমনে বিড়বিড় করতে লাগল, লোকটা বলেছে–তোমাদের সঙ্গে জিনিসটা নেই। আমরা ধারণা করছি, জিনিসটা রাবুনোর আবিষ্কার। কিন্তু অন্য কিছুও হতে পারে।
কিশোর, রবিন বলল, ব্যাপারটা নিয়ে কালও আলোচনা করা যাবে। এখন আর পারছি না। আমার ঘুম পাচ্ছে।
আমারও, মুসা বলল। আমি ভেবেছিলাম, ছুটি কাটাতে বেরিয়েছি। কিন্তু ছুটি যে এত টেনশনের, কল্পনাও করিনি।
এত তাড়াতাড়ি ঘুমাতে ইচ্ছে করছে না কিশোরের। বলল, ঠিক আছে, তোমরা ঘুমাও।
ঘুমিয়ে পড়ল রবিন আর মুসা। চুপচাপ ছাতের দিকে তাকিয়ে রইল। কিশোর। কোন শব্দ নেই। পাশের ঘর থেকে ভেসে আসছে কেবল রাবুনানার নাসিকা গর্জনের শব্দ।

.

পরদিন ভোর হওয়ার আগেই ওদেরকে ডেকে তুলে বেরিয়ে পড়লেন রাবাত। ভ্রমণটা আর ভ্রমণ নেই এখন ওদের জন্যে, তাড়া খেয়ে পালানোর অবস্থা হয়েছে। গায়ের ভেতর দিয়ে যাওয়া রাস্তা ধরে চলা বাদ দিয়েছে, কারণ, লাভ নেই। যে পথে যত সতর্ক থেকেই ওরা চলুক না কেন, শত্রুরা ঠিক বুঝে ফেলছে। ওদের পিছু নিয়ে চলে আসছে। সুতরাং হাইওয়ে ধরে যাওয়াই ভাল। তাতে ঝামেলা কম হবে, তাড়াতাড়ি চলা যাবে, সময়ও বাঁচবে। আরও একটা ব্যাপার, হাইওয়েতে যানবাহনের ভিড় থাকায় দিনে-দুপুরে আক্রমণ করতেও দ্বিধা করবে শত্রুরা।
ইনডিয়ানার পর ওহাইওর ভেতর দিয়ে ছুটতে লাগল ওরা। একটানা চালিয়ে সন্ধ্যাবেলা কাহিল হয়ে পড়লেন রাবাত। মেজাজ গেল বিগড়ে। এ সবের জন্যে দায়ী করতে লাগলেন মিলারকে। তাকে এখন পেলে কি করবেন, উত্মার সঙ্গে সে-

কথা বলতে লাগলেন। পেনসিলভানিয়ায় এসে আর চালানোর সাধ্য হলো না। হাইওয়ে থেকে দুশো গজ দূরে একটা মোটেলে রাত কাটানোর জন্যে থামলেন।
তোমরা গিয়ে সাঁতার কাটো, টেলিভিশন দেখো, যা ইচ্ছে করো, বললেন তিনি। আমি পেট্রোল আনতে যাচ্ছি। চলে আসব এখনই।
আমরাও যাব তোমার সঙ্গে, মুসা বলল।
কি দরকার? বডিগার্ড লাগবে না আমার! ধমকে উঠলেন রাবাত। মেজাজ খারাপ হয়েছে ভালমতই। রাস্তার ওপরই একটা পেট্রোল স্টেশন দেখে এসেছি। নিয়ে আসি। যাব আর আসব।
আর কিছু বলার সাহস পেল না মুসা।
ঘরে এসে টেলিভিশন চালু করে দিল ওরা। পর্দায় চোখ আছে, মন নেই। চিন্তিত। রাবুনোর ফেরার অপেক্ষায় উদ্বিগ্ন হয়ে রইল।
বিশ মিনিট গেল। আধঘণ্টা।
মুসা বলল, এত দেরি! নিশ্চয় কিছু ঘটেছে।
ঘরের মধ্যে পায়চারি শুরু করল কিশোর। জানালার কাছে উঠে গেল রবিন। বাইরে তাকিয়ে রইল। ছোট একটা শহরের প্রান্তে ঠাঁই নিয়েছে ওরা। গাছপালার ভেতর দিয়ে শহরের আলো দেখা যাচ্ছে।
হঠাৎ করেই হয়তো কোন জিনিস কেনার কথা মনে পড়েছে, বলল সে। শহরে চলে যাননি তো?
কিংবা এখানে পেট্রোলের দাম বেশি দেখে অন্য কোন পাম্পে গেছেন, বলল কিশোর। কিন্তু কেন যেন কথাটা বিশ্বাস হতে চাইল না নিজেরই।
আরও পনেরো মিনিট পেরোল। আর অপেক্ষা করতে পারল না ওরা। জ্যাকেটগুলো আবার গায়ে চড়িয়ে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। রাস্তায় নামল।
মোটেলে সবচেয়ে কাছের পাম্পটায় পাওয়া গেল না তাঁকে। কর্মচারী জানাল, ওরকম কাউকে দেখেনি। তবে, বলল সে, ক্যালিফোর্নিয়া থেকে আসা একটা গাড়ি দেখেছি। এত দূর থেকে গাড়িতে করে সাধারণত আসে না। কেউ কালেভদ্রে হয়তো দুএকটা চোখে পড়ে।
পরের স্টেশনটায় চলল গোয়েন্দারা। ঘন হয়ে আসছে তখন অন্ধকার। দ্বিতীয়টাতেও পাওয়া গেল না রাবাতকে। তৃতীয় স্টেশনটা রয়েছে পথের মোড়ে। সেখানকার কর্মচারী ছেলেদের বয়েসী। সে জানাল, বুইক গাড়িওয়ালা একজন বুড়ো মানুষকে দেখেছে।
আধঘণ্টা আগে, ছেলেটা বলল, কিংবা আরও কিছুটা বেশি হবে, বুড়ো লোকটা তেল নিতে এল। ট্যাংক ভরে তেল নিল। তেল আর পানি চেক করে দিলাম। টায়ারের হাওয়াও।

এখান থেকে বেরিয়ে কোনদিকে গেছে দেখেছ? জিজ্ঞেস করল মুসা।
যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকেই, মোটেলের দিকে দেখাল ছেলেটা। তারপর কোথায় গেল, খেয়াল করিনি। দুটো মোটর সাইকেল ঢুকল তখন। ওদের তেল দিতে গেলাম।
মোটর সাইকেল?
ভুরু কুঁচকে ফেলল কিশোর। ছেলেটা মুসার প্রশ্নের জবাব দেয়ার। আগেই জিজ্ঞেস করল, কয়টা বললে?
দুটো। কেন?
নাঃ ইয়ে..অনেক পশ্চিমে একটা মোটর সাইকেল গ্যাঙের সঙ্গে গণ্ডগোল বেধেছিল আমাদের। ওরাই কিনা বুঝতে চাইছি। ওরা কোন দিকে গেছে, দেখেছ?
ওদিকেই, বুড়ো লোকটা যেদিকে গেল। রাতে এখানে কোথায় ক্যাম্প করলে ভাল হয় আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল ওরা। পার্সনস উডের পিকনিক গ্রাউন্ডের কথা বলে দিলাম। শোনো, একটা কথা বলি, গোয়েন্দাদের উদ্বেগ দেখে সন্দেহ হয়েছে ছেলেটার, তোমাদের কি মনে হচ্ছে লোকগুলো বুড়ো মানুষটার ক্ষতি করবে? বলো তো পুলিশে ফোন করতে পারি।
দ্বিধা করতে লাগল গোয়েন্দারা। নানার বদমেজাজের কথা ভাবল মুসা। অতি সামান্য কারণেও রেগে ওঠেন অনেক সময়। আজ বিকেলে মেজাজ খুবই খারাপ। ছেলেরা তার জন্যে অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা করছে ভাবলেই ফেটে পড়বেন।
থ্যাংকস, বলল মুসা, লাগবে না। সাহায্যের দরকার হলে তোমাকে জানাব।
পিকনিক গ্রাউন্ডে কি করে যেতে হয়? জিজ্ঞেস করল রবিন।
ছেলেটা জানাল, ওখান থেকে বড়জোর আধ মাইল দূরে। অফিস থেকে একটা শূন্য ওঅর্ক অর্ডারের ফর্ম নিয়ে তার উল্টো দিকের সাদা অংশে নকশা একে দেখাল কি করে যেতে হবে ওখানে। তাকে ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে এল। গোয়েন্দারা। ফিরে এল হাইওয়েতে। নকশাটা রবিনের হাতে।
মোটেলের দিকে এগোনোর সময় দেখল মেইন রোড থেকে একটা রাস্তা নেমে গেছে বায়ে। নকশায় এই রাস্তাটাই একে দিয়েছে পাম্পের ছেলেটা। সেটা ধরে এগোল ওরা। সামনে বাড়িঘর কিংবা দোকান চোখে পড়ল না। খানিক পর পর ল্যাম্পপোস্ট আছে রাস্তায়। কিছুদূর গিয়ে আর তা-ও নেই। অন্ধকার। তবে চাঁদ উঠছে। তার ফ্যাকাসে আলো ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে।
এগোতে থাকল ওরা। খানিক পর সামনে আলো দেখা গেল। পথের বায়ে খোলা জায়গায় ক্যাম্প করেছে কেউ। আগুনের কাঁপা কাঁপা আলোয় দুটো লোককে দেখতে পেল ওরা। সতর্ক হয়ে পা টিপে টিপে এগোল। আরেকটু এগোতে বুইকটাও চোখে পড়ল। রাস্তা থেকে নামিয়ে আগুন থেকে সামান্য দূরে নিয়ে

যাওয়া হয়েছে। গাড়িটার কাছ থেকে কিছু দূরে, আগুন থেকে কাছে একটা কাঠের টেবিলের সামনে পিকনিক বেঞ্চে বসে আছেন রাবাত। আগুনের কাছে নড়াচড়া করা লোকগুলোর দিকে চোখ।
তার মুখ দেখা যাচ্ছে না, তবে পাথরের মত কঠিন যে হয়ে আছে, আন্দাজেই বুঝতে পারছে মুসা। ওই মোটর সাইকেল গ্যাঙেরই লোক! ফিসফিস করে বলল সে। নানাকে ধরে নিয়ে এসেছে।
চুপ থাকতে ইশারা করল তাকে কিশোর।
রাস্তা থেকে খোয়া বিছানো একটা পথ বেরিয়ে চলে গেছে পিকনিক গ্রাউন্ডের ভেতর দিয়ে। ওটা ধরে এগোল তিন গোয়েন্দা। লোকগুলোর দিকে চোখ থাকায় মোটর সাইকেল দুটো দেখতে পায়নি রবিন, আরেকটু হলে ওগুলোর ওপরই হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল। সাইকেল দুটোর আড়ালে বসে পড়ল ওরা।
আগুনের কাছে কথা বলছে লোকগুলো। এখান থেকে স্পষ্ট কানে আসছে।
এখনও তোমার কিছুই করিনি আমরা, বুড়ো বাদুড়, হুমকির সুরে বলল একজন, এমন জায়গায় ধরে নিয়ে যাব, এমন অবস্থা করে ছাড়ব, কেঁদে পার পাবে না তখন।
একটা ক্যান থেকে চো চো করে কিছু গিলল লোকটা কোন ধরনের। ড্রিংকস হবে। শেষ করে ক্যানটা আঙুলে চেপে দুমড়াল, কাঁধের ওপর দিয়ে ছুঁড়ে ফেলল পেছনে। মাটিতে রাখা একটা কাগজের থলে হাতড়ে আরেকটা ক্যান বের করল। আগেরটার মতই টান দিয়ে শেষ করে ফেলল এটাও। ফেলে দিয়ে, গুড়ুক করে ঢেকুর তুলে, শার্টের হাতা দিয়ে ঠোঁট মুছল।
নাক দিয়ে বিচিত্র শব্দ করলেন রাবাত। অসহ্য লাগছে তার, বোঝা গেল। আরেক দিকে মুখ ফেরালেন।
এই বুড়ো, ধমকে উঠল লোকটা, আরেক দিকে তাকাচ্ছ কেন? আমি কথা বলার সময়, আমার দিকে তাকাবে।
রাগে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল মুসা। হাত ধরে টেনে আবার তাকে বসিয়ে দিল কিশোর।
অই বাদুড়, বলল লোকটা, পাহাড় বেয়ে দৌড়ে উঠেছ কখনও, এমন পাহাড় যেটাতে চড়ার সাধ্য নেই কারও?
হেসে উঠল দ্বিতীয় লোকটা। খুব ভাল লাগবে তোমার, ভাম–ওঠার আগেই যদি অবশ্য মরে না যাও।
হাসতে লাগল দুজনে।
মুসার হাত ছেড়ে দিয়েছিল কিশোর। হঠাৎ খেয়াল করল সে নেই তার। পাশে। অন্ধকারে কখন উঠে চলে গেছে! রেগে গেলে মুসার মাথার যে ঠিক থাকে না, কি

না কি করে বসে, ভেবে মুখ শুকিয়ে গেল তার।
কিন্তু অঘটন না ঘটিয়ে ফিরে এল মুসা। দুজনের মাথা টেনে এনে কানে কানে বলল, শোনো, ওদের সাইকেলের চাবি লাগিয়ে রেখে গেছে। নানারটাও ইগনিশনেই ছিল, নিয়ে এসেছি। দেখাল সে। একে একে মোটর সাইকেলের চাবি দুটোও খুলে নিল।
নানাকে কোথাও আর নিয়ে যেতে পারবে না ওরা, বলল সে। এগুলো নিয়ে পাম্পটায় চলে যাও তোমরা। পুলিশকে ফোন করো। আমি পাহারা দিচ্ছি। নানার গায়ে হাত তোলার চেষ্টা যদি করে...আমি ওদেরকে...আমি ওদেরকে... ভয়ানক রাগে ফুঁসতে লাগল সে।
অন্ধকারে হাসল কিশোর। আরেকটা চমৎকার বুদ্ধি এসেছে তার মাথায়।
দুটো সেকেন্ড চুপ করে বুদ্ধিটা মনে মনে খতিয়ে দেখল সে। কোন ভুল আবিষ্কার করতে পারল না। তবে এতে কাজ হবে। নিরাপদে সরিয়ে নিয়ে। যেতে পারবে রাবাতকে। গুণ্ডাদুটোরও খানিকটা শায়েস্তা হবে।
তার চেয়ে আমার বুদ্ধি শোনো, ফিসফিস করে বলল সে, মোটর সাইকেল চালাতে জানো না?
প্রশ্নটা করে অন্য কিছু বোঝাতে চাইছে কিশোর। মুসা বলল, ওদের একটা বাইক সরিয়ে নিতে বলছ? পাগল নাকি?
না। পরিকল্পনার বাকি অংশটা বলল কিশোর।
সত্যি চমৎকার প্ল্যান, স্বীকার করতেই হলো মুসাকে। খুঁত না থাকলেও বিপদ আছে, তাতে সন্দেহ নেই। সাইকেল সে সরিয়ে নিতে পারবে, কিন্তু তাকে বাদ দিয়ে কিশোর আর রবিন কি পেরে উঠবে দুটো বিশালদেহী গুণ্ডার সঙ্গে?
ভাবার সময় নেই। যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে। দেরি করলে। হয়তো রাবাতের ওপর অত্যাচার শুরু করে দিতে পারে লোকগুলো।
বেশ, উঠে দাঁড়াল মুসা, তা-ই করব আমি!
অন্ধকারে গা ঢেকে ছায়ার মত নিঃশব্দে আবার বুইকের কাছে চলে গেল। মুসা। শব্দ না করে ট্রাংক খুলে কয়েকটা যন্ত্রপাতি বের করে আনল। ওগুলো নিয়ে কাজে লেগে গেল তিনজনে।
একের পর এক বিয়ারের ক্যান খালি করছে দুই গুণ্ডা। পেট ঢোল করে ফেলছে। নেশা ধরতে আরম্ভ করেছে। জিভ ভারী হয়ে আসছে। কথা কেমন। আড়ষ্ট আর এলোমেলো। মুসা ভাবল, কাজ করতে গিয়ে সামান্য শব্দ যদি হয়েও যায় এখন, খেয়াল করবে না ওরা। তবে শব্দ করল না। খুব সাবধানে। কাজ করতে লাগল।
ভাগ্যিস মাত্র দুজন এসেছে, কিশোর বলল। সবগুলো একসঙ্গে থাকলে মুশকিল হয়ে যেত। এ সব করতে পারতাম না।

একটা বাইকের ইগনিশনে চাবি ঢোকাল আবার কিশোর। দ্বিতীয় চাবিটা দিল মুসার হাতে। অন্য বাইকটার সীটের দুপাশে পা দিয়ে দাঁড়িয়েছে এখন ও।
বাইকটা বিশাল। সন্দেহ নেই, ক্ষমতাও নিশ্চয় সাংঘাতিক। হ্যাঁভেল ধরে ঠেলে স্ট্যান্ড থেকে নামাল ওটাকে। ইগনিশনে চাবি ঢুকিয়ে লম্বা দম নিল। কিক মারল স্টার্টারে।
রেগে যাওয়া জন্তুর মত গর্জন করে উঠল ইঞ্জিন, পরক্ষণে বন্ধ হয়ে গেল।
আতঙ্কিত হয়ে পড়ল মুসা।
চিৎকার করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল দুই গুণ্ডা।
আবার কিক মারল মুসা।
আবার গর্জে উঠল ইঞ্জিন। আর বন্ধ হলো না। গিয়ার দিয়েই এক্সিলারেটরে মোচড় দিল মুসা। খেপা ঘোড়ার মত লাফ মারল বাইক। এত শক্তিশালী মোটর সাইকেল আর চালায়নি সে। এতটা যে ক্ষমতা থাকতে পারে কল্পনাই করেনি। হ্যাঁচকা টান লেগে আরেকটু হলেই হাত থেকে ছুটে যাচ্ছিল হ্যান্ডেল। মনে হলো, কাঁধ থেকে বুঝি খসে গেল বাহু দুটো।
অসমান জমিতে ঝাঁকি খেতে খেতে একটা খাদের পাশ দিয়ে ছুটল বাইক, উঠে এল খোয়া বিছানো পথে। উড়ে চলল যেন। ভীষণ উত্তেজনায় গলা ফাটিয়ে জানোয়ারের মত চিৎকার করে উঠল মুসা। শক্তিশালী বাইক চালানোর মজাই আলাদা–মনে হয় ইঞ্জিন থেকে বাইকের গা বেয়ে আরোহীর শরীরেও এসে ঢোকে প্রচণ্ড ক্ষমতা। উন্মাদনা জাগে রক্তে। এক অদ্ভুত স্বাধীনতা বোধ। সেজন্যেই বোধহয় মোটর সাইকেল গ্যাঙ তৈরি হয়, গাড়ি বা আর কোন যানবাহনের গ্যাঙ হয় না।
পড়িমরি করে ছুটে এল দুই গুণ্ডা। অন্য বাইকটায় চড়ল, একজনের পেছনে আরেকজন। সামনের লোকটা স্টার্টারে কিক দিল। গর্জে উঠল ইঞ্জিন। অভ্যস্ত হাত ওদের। এক্সিলারেটরে মোচড়ের তারতম্য হলো না, ফলে ইঞ্জিনও বন্ধ হলো না। চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে আরম্ভ করল। কিন্তু মাত্র কয়েক গজ। খাদটার কাছে আসতে না আসতেই খুলে গেল সামনের চাকা।
শোনা গেল চিৎকার-চেঁচামেচি, খিস্তি করে গালাগাল। খাদে পড়ে গেছে। দুই গুণ্ডা।
দৌড় দিয়েছে ততক্ষণে রবিন আর কিশোর। রাবাতের কাছে চলে এল। দুদিক থেকে তার দুবাহু চেপে ধরে প্রায় চ্যাংদোলা করে নিয়ে ছুটল গাড়ির দিকে। একটা মুহূর্ত বিমূঢ় হয়ে রইলেন তিনি, তারপরই যা বোঝার বুঝে গেলেন। ছেলেদের হাত ছুটিয়ে নিয়ে নিজেই ছুটলেন গাড়ির দিকে। দরজা খুলে উঠে পড়লেন ড্রাইভিং সীটে। অন্য পাশের দরজা খুলে প্যাসেঞ্জার সীটে বসল কিশোর,

চাবি গুঁজে দিল রাবাতের হাতে। রবিন উঠল পেছনে। দরজা। পুরোপুরি বন্ধ হওয়ার আগেই চলতে শুরু করল গাড়ি। বনবন করে স্টিয়ারিং ঘোরাচ্ছেন রাবাত। পুরো একটা চক্কর দিয়ে রাস্তার দিকে ঘুরতে গিয়ে আধডজন ছোট ছোট ঝোপকে মাড়িয়ে চ্যাপ্টা করে দিল। অল্পের জন্যে একটা গাছে বাড়ি লাগানো থেকে বেঁচে গেল নাকের একপাশ। দুই গুণ্ডা চমকের ধাক্কা কাটিয়ে কিছু করতে যাওয়ার আগেই রাস্তায় উঠে এল গাড়ি।
সিকি মাইল এসে গতি কমালেন রাবাত। ফিরে তাকাল দুই গোয়েন্দা।
রাস্তায় উঠে এসেছে গুণ্ডারা। হাত মুঠো করে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে প্রচণ্ড রাগে উন্মাদ নৃত্য জুড়েছে। নিষ্ফল আস্ফালন।
মুচকি হাসল কিশোর।
হাসতে লাগল রবিন।
আধঘণ্টা পর ফিরে এল মুসা। কপালে ঘাম। চোখমুখ আনন্দে উজ্জ্বল। হেসে বলল, বাইকটা ফেলে দিয়েছি একটা ডোবায়। চাবি রেখে এসেছি একটা পিলার বক্সে। কিছু সময়ের জন্যে আটকে দিলাম ব্যাটাদের।
রাবাতের দিকে তাকাল সে। ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল, নানা, কি হয়েছিল? এত গালাগাল শোনার শখ হলো কেন হঠাৎ? প্রচুর তো শুনলে-বাদুড়, ভাম! বাড়ি গিয়ে মাকে যদি বলি…কথা শেষ করতে পারল না হাসির জন্যে। মা এবং নানার কি চেহারা হবে কল্পনা করে হা-হা করে। হাসতে শুরু করল।
কিছুটা বিব্রত দেখাল রাবাতকে। আগে জানা থাকলে ধরতে পারত না। হঠাৎ করে এসে চমকে দিয়েছিল। যেটা থেকে তেল নেব বলেছিলাম সেটাতে ভিড় থাকায় মোড়ের পাম্পটায় চলে গেলাম। পেট্রোল নেয়ার পর মনে হলো, ট্যাংকের নিচে আবার যন্ত্র আটকে দেয়নি তো মিলার? রাস্তার ধারে সরে গিয়ে গাড়ির নিচে উঁকি দিয়ে দেখতে গেলাম। এই ফাঁকে আমার অজান্তে পাশে এসে দাঁড়াল শয়তান দুটো। ছুরি বের করে ভয় দেখাল, ওদের কথা না শুনলে হুঁড়ি ফাঁসিয়ে দেবে। পিকনিক গ্রাউন্ডে গাড়ি নিয়ে যেতে বাধ্য করল আমাকে।
গম্ভীর হয়ে কিশোর বলল, সাংঘাতিক বিপদের মধ্যে রয়েছেন আপনি। এখনও যে তেমন কোন ক্ষতি হয়নি, এটাই বেশি।
থাক, অত ভাবতে হবে না, হাত নাড়লেন রাবাত। আমি তখন সতর্ক ছিলাম না বলে বেকায়দায় পেয়ে গিয়েছিল। এরপর এলে আর সহজে ছাড়ব না, খানিকটা শিক্ষা দিয়ে দেব।
কি ভাবে শিক্ষাটা দেবে, বুঝতে পারল না মুসা। তবে নানাকে জিজ্ঞেস করার সাহসও হলো না। পুলিশকে জানালে কেমন হয়?

আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে ওদের আর জড়াতে চাই না। ওই হাদাগুলো এসে করবেই বা কি? শুধু শুধু একগাদা প্রশ্ন করে কেবল সময় নষ্ট করবে। শহর থেকে বেরিয়ে পশ্চিমে রওনা হয়ে যাব, তাহলেই হবে।
পশ্চিমে?
হ্যাঁ। ওদিকে যাব ভাববেই না ওরা। গুণ্ডাগুলোও না, মিলার আর তার দোস্তও না। পশ্চিমের কোন শহরে উঠে পুরানো গাড়ির দোকানে যাব। বুইকটা বেচে দিয়ে অন্য গাড়ি নিয়ে নেব। আবার রওনা হব নিউ ইয়র্কের দিকে। বুইকটা না দেখলে ওরা চিনতে পারবে না, আমরাও জ্বালাতন থেকে বাঁচব।
নানার দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল মুসা, হ্যাঁ, এইটা ভাল বুদ্ধি। বুইকটাই হচ্ছে যত নষ্টের মূল। মিলার, তার দোস্ত, মোটর সাইকেলওয়ালারা, সবাই চিনে গেছে এটাকে। ওদের খসাতে হলে গাড়িটাই বিদেয় করতে হবে।
জলদি মালপত্র গুছিয়ে নে। এখুনি বেরোব।
কয়েক মিনিটের মধ্যেই আবার হাইওয়েতে এসে উঠল ওরা। পশ্চিমে চলল। মধ্যরাতে ওহাইও আর পেনসিলভানিয়ার সীমান্তে একটা শহরে ঢুকল। রাস্তাগুলো সব নির্জন। বেশির ভাগ বাড়িরই আলো নিভে গেছে। তবে হাইওয়ের পাশে হলিডে ইন হোটেলটায় আলো জ্বলছে। ঘর নিতে অসুবিধে হলো না। বাকি রাতটা নিরাপদেই ঘুমিয়ে কাটানো গেল। পরদিন সকালে উঠেই চলে এল একটা গাড়ির দোকানে। তখনও খোলেনি দোকানটা। অপেক্ষা করতে হলো ওদের।
অবশেষে দোকান খুলল। বুইকটার জন্যে যা দাম দিতে বলল সেলসম্যান, দর কষাকষি না করে তাতেই রাজি হয়ে গেলেন রাবাত। দুই বছরের পুরানো একটা ফোর্ড সেডান কিনে নিলেন। বুইকের দাম বাবদ যা কাটা গেল, সেটা বাদ দিয়ে বাকি টাকার চেক লিখে দিলেন। তারপর আবার অপেক্ষার পালা। লং ডিসট্যান্ট কল করল সেলসম্যান। চেকটা ঠিক আছে। কিনা ব্যাংকে ফোন করে জেনে নেয়ার জন্যে।
ফোর্ড গাড়িটা নিয়ে দোকান থেকে বেরোতে বেরোতে দুপুর পেরিয়ে গেল।
এইবার আশা করি ঝেড়ে ফেলা যাবে ওদের, রাবাত বললেন। কড়া নজর রেখেছেন মিলার আর তার দোস্তকে দেখা যায় কিনা। বড় করে হাই তুললেন, চোখ ডললেন। নাহ, বয়েস বেড়েছে আমার। ধকল আগের মত সহ্য করতে পারব না, ভুলেই গিয়েছিলাম। আর বেরোতে ইচ্ছে করছে না। আজ বরং এখানেই থেকে যাই। বিশ্রাম নিই। মিলারের ভয় আর না করলেও চলবে। ফোর্ডটা চিনতে পারবে না ও, আমাদেরও খোঁজ পাবে না।
আপত্তি তো নেইই, বরং খুশি হয়ে রাজি হলো গোয়েন্দারা। এই একটানা ছোটা ওদেরও ক্লান্ত করে তুলেছে। হলিডে ইনে ফিরে এল ওরা। কয়েক মিনিটের মধ্যেই

রাবাতের নাক ডাকানোর শব্দ শোনা গেল।
মোটেলের পুলে সাঁতার কাটল তিন গোয়েন্দা। কাছের একটা ছোট গলফ কোর্সে গলফ খেলল। বেশি দূরে গেল না। সন্ধ্যার আগে আগে ঘরে ফিরে এল। মুসা আর রবিন টেলিভিশন দেখতে লাগল। জানালার কাছে বসে কিশোর তাকিয়ে রইল বাইরের দিকে। বার বার ভ্রুকুটি করছে আর নিচের ঠোঁট ধরে টানছে। গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। আচমকা মাথা ঝাঁকিয়ে আনমনেই বলল, ঠিক, এটাই আসল ব্যাপার!
ফিরে তাকাল অন্য দুজন।
কোনটা আসল ব্যাপার? জানতে চাইল রবিন।
রাবুনানার আবিষ্কারের প্রতি কোন আগ্রহ নেই মিলারের, কিশোর বলল। কোনকালে ছিলও না।
স্তব্ধ হয়ে গেল মুসা। খাইছে! বলো কি! আগ্রহ না থাকলে আমাদের পিছু নিয়েছে কেন? কাস্টারে নেমে আমরা যখন বন দেখতে গেলাম, আমাদের পিছু নিল, তখন পিস্তল বের করেছিল কেন? তুমি কি বলতে চাইছ পিস্তল দিয়ে বাইসন শিকারে এসেছে সে?
সুপারমার্কেটে আমাকেই বা ধরেছিল কেন তার দোস্ত? রবিন বলল।
ওর কথাই ভাবছি আমি, কিশোর বলল। কেশে গলা পরিষ্কার করে সোজা হয়ে বসল। সুপারমার্কেটে ঠিক কি বলেছিল তোমাকে লোকটা, রবিন?
বলেছিল, আমি নাকি ওর ছেলে, নেশা করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছি, আমাকে ফিরিয়ে নিতে এসেছে। অতি সহজ চালাকি। আমাকে আটকে রেখে রাবুনানার কাছে মুক্তিপণ হিসেবে তাঁর আবিষ্কারটা চাইবে। জিনিসটা কি, বলো তো? কোন ধরনের অস্ত্র? নাকি দেশরক্ষা বাহিনীর কাজে লাগে এমন কিছু?
প্রশ্নের জবাব না দিয়ে কিশোর বলল, ম্যানেজারকে কি বলেছে লোকটা, সেটা শুনতে চাই না। ঢুকেই তোমাকে কি বলেছিল?
তোমার সঙ্গে নেই ওটা। তবে অসুবিধে নেই। আদায় করে নিতে পারব।
তখন তোমার সঙ্গে কি জিনিস ছিল না?
আর কি? ঢোঁক গিলল রবিন। নিশ্চয় রাবুনোর আবিষ্কার।
কেন, আর কিছু হতে পারে না? এমন কিছু, যা সব সময় তোমার সঙ্গে থাকে, কিন্তু সেই সন্ধ্যায় ছিল না?
ভুরু কুঁচকে ফেলল রবিন। কিসের কথা বলছ?...ও, ক্যামেরাটা? ক্যামেরা এবং ক্যামেরার ব্যাগ। কিন্তু ওই সাধারণ জিনিসের প্রতি আগ্রহী হবে কেন লোকটা?
হাসল কিশোর। ক্যামেরার ব্যাগে তোমার ব্যবহার করা ফিল্মগুলো ছিল। মোটেলে রেখে গিয়েছিল। ওগুলোই চাচ্ছিল সে। কোন সন্দেহ নেই আর আমার।

হেলান দিয়ে বসে দুই হাতের আঙুলের মাথাগুলো এক করল কিশোর, তাতে দেখাল অনেকটা তাবুর চুড়ার মত। হাসিটা লেগে আছে মুখে। পিজমো বীচে তার ওপর যখন ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিলেন রাবাত, চেহারাটা কি হয়েছিল মনে আছে? সাংঘাতিক চমকে গিয়েছিল। আতঙ্কিত। আমার বিশ্বাস, আমরা যা ভাবছি সে-কারণে পিজমো বীচে যায়নি সে, গিয়েছিল সম্পূর্ণ অন্য কারণে।

ধরা যাক, ঘটনাক্রমেই আমাদের সঙ্গে ওখানে মিলারের দেখা হয়ে গিয়েছিল। আমাদের ওপর নজর রাখার জন্যে আসেনি। রাবুনানার বাড়িতেও আমরা বেরিয়ে আসার পর যে উঁকি মেরে দেখেছিল, সেটাও খুব সাধারণ ব্যাপার। উঁকিঝুঁকি মারা ওর স্বভাব। এক ধরনের কৌতূহল, পড়শীর ব্যাপারে যেমন থাকে কারও কারও। আমার চলে আসার পর মনটিরেতে কারও সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার জন্যে বেরিয়েছিল সে। আমরা সান্তা বারবারায় থেমে লাঞ্চ খেলাম, কিন্তু সে সোজা চলে গেল পিজমো বীচে। সেখানে গিয়ে হয়তো খাওয়া সেরেছে, বা বিশ্রাম নিয়েছে। তারপর আমরা গেলাম। সৈকতে একই সময়ে বেরিয়েছিলাম। রাবুনো তো দেখেই গেলেন রেগে। মিলারের চোখে বিস্ময় দেখেছি আমি। ওর চেহারা মনে আছে?

সৈকত ধরে হেঁটে শহরের দিকে চলে গিয়েছিল সে। তারপরই বদলে গেল পরিস্থিতি। মনটিরেতে কি কি ঘটেছিল, মনে আছে তোমাদের?

আছে, মুসা বলল। আবার ওর সঙ্গে সৈকতে দেখা হলো আমাদের। অন্য লোকটাকেও ওখানেই দেখলাম–ক্যামেরার দোকানে রবিনকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল যে।

হ্যাঁ। বাজি রেখে বলতে পারি ফিশারম্যান ওআর্কে আমাদের পিছু নিয়ে আসেনি মিলার। তাহলে লুকিয়ে থাকার চেষ্টা করত। এমন ভাবে চলাফেরা করত, যাতে আমাদের চোখে না পড়ে। কিন্তু তা সে করেনি। খোলাখুলিই সৈকতে হাঁটছিল সে, আর দশজন সাধারণ টুরিস্টের মত।

চোখের ওপর দুহাত চেপে ধরল কিশোর। পুরো দৃশ্যটা মনে করার চেষ্টা করছে। খুঁটিনাটি বাদ না দিয়ে।

মিলারের কাছেও একটা ক্যামেরা ছিল সেদিন, অবিকল রবিনেরটার মত। কিন্তু ছবি তুলছিল না। হাতে রেখে দিয়েছিল। তারপর দ্বিতীয় লোকটা এল। তাকে বলল মিলার–এনেছি ওটা। এর মানে কি? দ্বিতীয় লোকটার জন্যে কিছু নিয়ে এসেছিল মিলার। দুজনে হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে একটা বেঞ্চের সামনে দাঁড়াল, যেটাতে তখন রবিন বসেছিল। আমাদের চিনতে পারল মিলার। কি রকম ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল মুখ মনে আছে? স্যুভনিরের দোকান থেকে রেগেমেগে

বেরিয়ে এলেন রাবুনো। দেখেই কেটে পড়ল মিলারের সঙ্গে দেখা করতে আসা লোকটা। মিলারকে চেপে ধরলেন রাবুনো। ধমকাতে শুরু করলেন।
আবারও ভয় পেয়ে গেল মিলার। ওখানে রাবুনানাকে আশা করেনি, তাহলে নিশ্চয় আসত না। মিলারকে ছেড়ে দিয়ে আমাদেরকে তার সঙ্গে যেতে বললেন রাবুনো। বেঞ্চে রাখা ক্যামেরাটা তুলে নিল রবিন। রওনা হলাম আমরা।
ওই সময় থেকেই শুরু হয়েছে যত গণ্ডগোল। আমাদের পিছু নিল মিলার। মনে আছে, আমাদের গাড়ির পেছন পেছন কি ভাবে দৌড়ে এসেছিল? কিছু বলছিল, আমরা বুঝতে পারিনি?
মাথা ঝাঁকাল মুসা।
রবিন তাকিয়ে রইল কিশোরের দিকে। ঠিক! কেন এসেছিল?
কারণ, যে ক্যামেরাটা তুমি তুলে নিয়েছিলে, ওটা তোমার ছিল না, রবিন। ওটা মিলারের। রাবুনানাকে তেড়ে আসতে দেখে আক্রমণ ঠেকানোর জন্যে তাড়াতাড়ি রেখে দিয়েছিল বেঞ্চে।
তারমানে তুমি বলছ, মুসা বলল, ক্যামেরার পেছনেই লেগেছে সে? কিন্তু এরও তো কোন মাথামুণ্ড নেই। তার ক্যামেরা সে ফেরত চায়। মোটেলে এসে আমাদের দরজা খটখটালেই তো হত। বলত, তার ক্যামেরা ভুল করে আমরা নিয়ে এসেছি। ফেরত দিয়ে দিতাম। সাত রোজাতেই ফেরত নিয়ে যেতে পারত। এত চালাকি, এত পিছু নেয়ার কোন প্রয়োজন। পড়ত না।
শুধু ক্যামেরা হলে হয়তো তাই করত, কিংবা তা-ও করত না। মনটিরে থেকে সান্তা রোজায় গাড়ি চালিয়ে আসা কম ঝক্তি নয়, সাধারণ একটা ক্যামেরার জন্যে এ-কাজ করবে? তারপরও থামেনি। দীর্ঘ পথ আমাদের পিছে পিছে এসেছে। আমার ধারণা, ক্যামেরা নয়, ভেতরের ফিল্মের জন্যেই এমন করছে। ওটা ওদের কাছে দামী। ওই ফিল্মে কি আছে, সেটা আমাদের জানতে দিতে চায় না ওরা।
হ্যাঁ, মাথা দোলাল রবিন, এইটা হতে পারে। এতক্ষণে বুঝতে পারছি। মনটিরে থেকে আসার পর এত তাড়াতাড়ি ফিল্ম ফুরিয়ে গেল কেন ক্যামেরার, কেন ক্যামেরা আর তার ব্যাগটা অন্য রকম লাগল। তখনও পুরোপুরি ধরতে পারিনি ব্যাপারটা, দুটোই নতুন ক্যামেরা বলে। তবে পরিবর্তন একটা টের পেয়েছি। ক্যামেরা বদল হতে পারে, ভাবলে সঙ্গে সঙ্গে বুঝে ফেলতাম। উঠে গিয়ে ক্যামেরার ব্যাগটা এনে বিছানায় উপুড় করল সে। নয় রোল ফিল্ম পড়ল বিছানায়, তার মধ্যে একটা কেবল নতুন, ব্যবহার করা হয়নি। বাকিগুলো ছবি তুলে শেষ করে ফেলা হয়েছে, ডেভেলপ করতে হবে। চলো, ক্যামেরার দোকানে। দিলে সঙ্গে সঙ্গে ডেভেলপ করে দেয় এমন দোকান নিশ্চয় আছে।

বেরিয়ে পড়ল ওরা। হোটেল থেকে তিন ব্লক দূরে ছোট একটা মলে পাওয়া গেল ক্যামেরার দোকান। কাউন্টারে বসা মহিলাকে ফিল্মগুলো বের করে দিল রবিন। ডেভেলপ করতে সময় লাগবে। বিভিন্ন দোকানের ডিসপ্লে উইন্ডোতে রাখা জিনিস দেখে সময় কাটাতে লাগল ওরা।
কিছুক্ষণ পর আবার ফিরে এল ক্যামেরার দোকানে। শক্ত হলুদ কাগজের বড় একটা খাম ঠেলে দিল মহিলা। উত্তেজনায় প্রায় কাঁপতে কাঁপতে ওটা নিয়ে পার্কিং লটের দিকে এগোল রবিন। একটা নির্জন জায়গায় এসে খাম থেকে ছবির প্রিন্টগুলো বের করে দেখতে লাগল। দুপাশে দাঁড়িয়ে পাহারা। দিতে লাগল মুসা আর কিশোর। বার বার এদিক ওদিক চেয়ে দেখছে কেউ তাকিয়ে আছে কিনা। মাউন্ট রাশমোরে রাবুনো, কাস্টার পার্কে বাইসনের পাল, ব্যাডল্যান্ডের নানা রকম পাথরের ছবি। তার মধ্যে একটা বিমানের ছবি, রানওয়েতে ছুটতে ছুটতে ওড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে।
এটা আমি তুলিনি, রবিন বলল।
ছবিটা হাতে নিয়ে দেখল মুসা। চেহারাটা বেশ ছিমছাম বিমানটার। বেশি সরু, অনেক লম্বা ছুঁচাল মাথা, পেটের কাছে ডানাদুটো হাঙরের পিঠের পাখনার মত চোখা হয়ে পেছনে বেঁকে গেছে। যাত্রীবাহী প্লেন নয়, আর্মির জিনিস।
বাকি ছবিগুলো ঘটতে লাগল রবিন। আরও কয়েকটা ছবি পাওয়া গেল, যেগুলো সে তোলেনি। তেল শোধনাগার আর ভারী মাল তোলার এলিভেটরের মাঝামাঝি কিছু যন্ত্র দেখা গেল। খুব কাছে থেকে তোলা ড্রয়িং আর নকশার ছবি রয়েছে। বোর্ডে পিন দিয়ে আটকানো আছে জিনিসগুলো। নোটবুকের কিছু লেখা পাতার ছবি আছে। নানা রকম সমীকরণ, নোট, অর্থহীন শব্দমালা লেখা রয়েছে পাতাগুলোতে, যেগুলো পুরোপুরি দুর্বোধ্য ওদের কাছে।
ছবিগুলো দেখা শেষ করল রবিন। ঘেমে গেছে। হু, মাথা দুলিয়ে বলল সে, এ সব জিনিসই তাহলে দ্বিতীয় লোকটাকে দিতে যাচ্ছিল মিলার! মনে তো হচ্ছে আর্মির গোপন কোন ব্যাপার! মিলার একটা স্পাই, দেশের বাইরের শত্রুর কাছে বিক্রি করে দিচ্ছিল এ সব তথ্য!

.

এফ বি আইকে জানাতে হবে! চিৎকার করে উঠলেন রাবাত। ওরাই শয়তানগুলোর ব্যবস্থা করবে।
টেলিফোন ডিরেক্টরি টেনে নিয়েছে ততক্ষণে মুসা। দেখে বলল, এখানে নেই। এই শহরে এফ বি আইয়ের অফিস নেই।
না থাকারই কথা। নিউ ইয়র্কে গিয়ে ওদের জানাতে হবে। চল চল, এখনই রওনা হব। সুটকেস গোছা।

তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়ল ওরা। সারারাত গাড়ি চলল একটানা। ভোররাতে আকাশ যখন ধূসর হয়ে আসছে তখন একটা সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকল। সাদা পাথরের দেয়াল। প্রচুর গাড়ি চলাচল করছে। সুড়ঙ্গের অন্য পাশে আসতে চোখে পড়ল আকাশ ছোঁয়া দালান, প্রায় জট বেধে থাকা যানবাহনের ভিড়। প্রকাণ্ড পেনসিলভানিয়া স্টেশনের প্রকাণ্ড বাড়ির সামনে জায়গা দখলের জন্যে গুতোগুতি শুরু করেছে শত শত ভাড়াটে ট্যাক্সি।

স্টেশনের সামনে রাস্তার অন্য পাড়ে গাড়ি রাখলেন রাবাত। কিশোর নেমে গিয়ে একটা বিল্ডিঙে ঢুকল। টেলিফোন বুক দেখে এফ বি আই-র ঠিকানা জানার জন্যে। গাড়িতে বসে রইল অন্য দুই গোয়েন্দা, কিশোর কি খবর নিয়ে আসে শোনার জন্যে উদ্বিগ্ন।

সাড়ে নটার দিকে অফিসটা খুঁজে পেলেন রাবাত। ভেতরে ঢুকে একজন মানুষকে বসে থাকতে দেখা গেল। তার নাম হোগারসন। নিখুঁত একজন মানুষ–সুন্দর করে আঁচড়ানো বালি রঙের চুল, সাদা দাঁত, শান্ত, নরম। ব্যবহার, আন্তরিক ভঙ্গিতে হাত মেলাল। মিলার আর তার দোস্তের অপকর্মের কথা বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন রাবাত, শেষ দিকে তো রীতিমত খেপে গেলেন। কথা আটকে যেতে শুরু করল।

ধৈর্য হারাল না হোগারসন। তাকে শান্ত হওয়ার সুযোগ দিল।

মুসা তাকে শান্ত করার চেষ্টা করল, নানা, প্লীজ, অত রেগে যাওয়ার কিছু নেই। আমরা যা ধারণা করেছি তা না-ও হতে পারে। মিস্টার হোগারসনকে বরং ছবিগুলো দেখাও।

নিশ্চয়! আছাড় দিয়ে ছবির খামটা টেবিলে রাখলেন রাবাত। এগুলো ক্যামেরার মধ্যে ছিল। রবিন ভেবেছিল ওটা ওরই ক্যামেরা। ভুল করে ওরটা নিয়ে চলে গেছে স্পাইটা। মিলার বেঈমানটা এগুলো বিক্রি করে দিতে যাচ্ছিল বিদেশী শত্রুর কাছে।

ছবিগুলো দেখল হোগারসন। চেহারার ভাব একই রকম রইল, বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হলো না।

ব্যাপারটা কেমন যেন লাগল কিশোরের। মনে হলো, রাবাতের কথায় বোধহয় গুরুত্ব দিচ্ছে লোকটা। বলল, মিস্টার হোগারসন, আগে আমাদের পরিচয়টা দিয়ে নেয়া দরকার। পকেট থেকে তিন গোয়েন্দার একটা কার্ড বাড়িয়ে দিল।

কার্ডটা দেখল হোগারসন। প্রশ্ন করার জন্যে মুখ খুলল। কিন্তু তাকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে কিশোর বলল, আমি কিশোর পাশা, আমাদের নিজস্ব গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান। ক্যালিফোর্নিয়ার রকি বীচে আমাদের হেড কোয়ার্টার। যে কোন ধরনের রহস্যের ব্যাপারে আমরা আগ্রহী। অনেক ছোটবেলা থেকে গোয়েন্দাগিরি

করে এসেছি, শখানেকের বেশি রহস্যের সমাধান করেছি। কিছু কিছু তো এতটাই জটিল ছিল, পুলিশও হাল ছেড়ে দিয়েছিল। সুতরাং এ সব ব্যাপারে আমরা একেবারেই আনাড়ী, এ কথা বলতে পারবেন না।
এই প্রথম রবিনের মনে হলো হোগারসনের নির্বিকার মুখে অতি সামান্য উজ্জলতা দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। কার্ডটা টেবিলে রাখল।
মুসা বলল, মিস্টার হোগারসনকে সব বলো, কিশোর।
মনটিরেতে কি করে ক্যামেরা বদল হয়েছে, খুলে বলল কিশোর। গণ্ডগোল এখান থেকেই শুরু। তারপর নানা ভাবে যন্ত্রণা দিয়েছে আমাদের। সারাক্ষণ টেনশনে রেখেছে।
এক মুহূর্ত স্বস্তিতে থাকতে দেয়নি আমাদের! কণ্ঠস্বর দাবিয়ে রাখতে পারলেন না রাবাত।
তাঁকে কথা বলতে দিল না কিশোর। নিজে বলতে লাগল সব। মোটেলের ঘরে আগুন লাগা থেকে শুরু করে, কাস্টার ন্যাশনাল পার্কে পিস্তল হাতে অনুসরণ, মিশিগানে রবিনকে অপহরণের চেষ্টা, কোন কথাই বাদ দিল না।
মিশিগানের স্টারজিসে ঘটেছে ঘটনাটা, কিশোর বলল। কয়েক দিন আগে। সুপারমার্কেটের অ্যাসিসট্যান্ট ম্যানেজার ডেপুটি শেরিফকে ডেকে এনেছিল। খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন। শেরিফের অফিসে নিশ্চয় রেকর্ড রাখা হয়েছে।
চুপ করে আছে হোগারসন। আর কিছু বলে কিনা কিশোর, শোনার অপেক্ষা করল। মাথা ঝাঁকাল তারপর। শুধু বলল, হু।
সব কথা উগড়ে দিতে পেরে, সন্তুষ্ট হয়ে চেয়ারে পিঠ ঠেকাল কিশোর।
রাবাত বললেন, ওই ছুঁচো মিলারটা একজন সাংঘাতিক পাই। আর তার দোস্তটা নিশ্চয় বিদেশী শত্রুদের চর।
হোগারসন হাসল। কোন দেশ?
তাতে কি কিছু এসে যায়?
না, তা হয়তো যায় না।
ওদেরকে অপেক্ষা করতে বলে ছবির খামটা সহ উঠে চলে গেল। হোগারসন। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে জানাল, তার সহকর্মীরা খোঁজখবর শুরু করেছে। গোয়েন্দাদের যোগাযোগ রাখতে বলল।
নিউ ইয়র্কে কোথায় উঠছেন আপনারা? জিজ্ঞেস করল হোগারসন।
ইস্ট সাইডের ঘোট একটা হোটেলের নাম বললেন রাবাত, রিয়ারভিউ প্লাজা। লিখে নিল হোগারসন।
হঠাৎ সন্দেহ জাগল রাবাতের, আচ্ছা, রুম পাওয়া যাবে তো ওখানে? ভর্তি হয়ে যায়নি তো?

কয়েক মিনিট বসলে আমরাই সেটা জেনে দিতে পারি, হোগারসন বলল।
আবার উঠে চলে গেল সে। কয়েক মিনিট পর ফিরে এসে বলল, রিয়ারভিউ প্লাজায় দুটো রুমের কথা বলে এসেছে। খালি আছে।
যদি আর কিছুর দরকার পড়ে, কিংবা মিলারের সঙ্গে দেখা হয়, দয়া করে আমাদের জানাবেন, অনুরোধ করল হোগারসন। তার নাম লেখা কার্ড দিল।
গোয়েন্দারা বুঝল, তাদের কথায় গুরুত্ব দিয়েছে এফ বি আই। তদন্ত শুরু করেছে। সন্তুষ্ট হয়ে বেরিয়ে এল ওরা। সারি দিয়ে লিফটের দিকে এগোল। নেমে এল নিচে। হোটেলে চললেন রাবাত। পুরানো বাড়ি। এক সময় নদীর দিকে মুখ করা ছিল। এখন চারপাশে বড় বড় বিল্ডিং গজিয়ে ঘিরে ফেলেছে বাড়িটাকে। আঙিনায় ঢুকতেই গাড়ির দায়িত্ব নিয়ে নিল হোটেলের একজন অ্যাটেনডেন্ট। চালিয়ে নিয়ে চলে গেল পার্কিং লটে। লটটা কোথায় বোঝা গেল না। আরেকজন অ্যাটেনডেন্ট ওদের সুটকেসগুলো বয়ে নিয়ে চলল ওপরতলায়। ওদের ঘরে পৌঁছে দিয়ে চলে গেল। জানালায় হালকা ঘোলাটে কাচ। তার ভেতর দিয়ে উঁকি দিয়ে অন্য একটা বাড়ির কাঁচে ঘেরা অফিস দেখতে পেল কিশোর। উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। কয়েক সারি কম্পিউটারের সামনে বসে কাজে ব্যস্ত নারী-পুরুষ।
একঘেয়ে দৃশ্য। ভাল লাগল না কিশোরের। জানালার পর্দা টেনে দিয়ে। ক্লান্ত ভঙ্গিতে বিছানায় এসে উঠল। চোখ মুদে ভাবতে লাগল, তদন্ত শেষ করতে কতক্ষণ লাগবে এফ বি আইয়ের? মিলার আর সেই লোকটার ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নেবে? আর কিছু ভাবতে পারল না। ঘুমিয়ে পড়ল।
স্বপ্ন দেখল, বাড়িতে রয়েছে। স্যালভিজ ইয়ার্ডে। জঞ্জালের ভেতরে লুকানো ট্রেলারে তিন গোয়েন্দার হেডকোয়ার্টারে ঢুকছে গোপন সুড়ঙ্গপথে। তাড়াতাড়ি করতে হচ্ছে তাকে, কারণ টেলিফোন বাজছে... বেজেই চলেছে...
উত্তেজিত অবস্থায় ঘুম ভেঙে গেল তার। ঘেমে গেছে। টেলিফোন আসলেও বাজছে, তবে হোটেলে তাদের ঘরে রাখা ফোনটা। উঠে গিয়ে রিসিভার তুলল রবিন। ঘুম জড়িত চোখে তাকিয়ে আছে কিশোর। রবিনকে বলতে শুনল, হ্যাঁ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়!
রিসিভার রেখে কিশোরকে বলল, লবি থেকে হোগারসন ফোন করেছে। ওপরে আসছে।
হুড়াহুড়ি করে বিছানা থেকে নেমে পড়ল তিন গোয়েন্দা। মুসা দৌড় দিল নানাকে জাগানোর জন্যে। আলুথালু পোশাকে খালিপায়েই ছুটে এলেন। রাবাত। ঠিক এই সময় দরজায় টোকা পড়ল।
সঙ্গে করে আরেকজনকে নিয়ে এসেছে হোগারসন। তার চেয়ে লম্বা, বয়েসও কিছু বেশি। পরিচয় করিয়ে দিল, এজেন্ট পিটারম্যান। চেয়ারে বসল দুজনে।

হোগারসন চুপ করে রইল, কথা বলতে লাগল পিটারম্যান।
মিলারের সম্পর্কে বেশির ভাগ প্রশ্নেরই জবাব দিলেন রাবাত। নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করলেন। সকালের মত উত্তেজিত হলেন না, বলতে গিয়ে ভাষা হারিয়ে ফেললেন না। জানালেন, মিলারের ব্যাপারে কমই জানেন তিনি, অথচ বেশ কয়েক বছর ধরে লোকটা তার পড়শী, এত কাছাকাছি থাকলে আরও অনেক বেশি জানার কথা ছিল। কোন ধরনের ডিফেন্স ইন্ডাস্ট্রিতে চাকরি করে লোকটা, আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু-বান্ধব নেই–অন্তত রাবাত দেখেননি, অর্কিড জন্মানোর হবি। আর যে লোকটা মনটিরেতে তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল, রবিনকে কিডন্যাপ করতে চেয়েছিল, তার সম্পর্কে কিছুই জানেন না। বারোটা ছবি দেয়া হয়েছিল হোগারসনকে। সেগুলো বের করল পিটারম্যান। দ্বিতীয় লোকটার ছবি এর মধ্যে আছে কিনা জিজ্ঞেস করল। ছবিটা বের করে দিল রবিন। পুলিশের তোলা সাধারণ ছবি নয়। দামী পোশাক পরা অবস্থায় ভোলা হয়েছে। জায়গাটা দেখে মনে হলো বিমান বন্দর অথবা কোন রেল স্টেশনে রয়েছে। গেট দিয়ে বেরোচ্ছে। যেন এইমাত্র নামল। বিমান কিংবা ট্রেন থেকে।
এর পরিচয় জানা গেছে? জানতে চাইল রবিন। রেকর্ড খারাপ, না ভাল?
ছবিটা খামে ভরে আবার পকেটে রেখে দিল পিটারম্যান। আগেও এর সঙ্গে গণ্ডগোল হয়েছে আমাদের। নাম একটা জানি, তবে সম্ভবত এটাও অনেকগুলো ছদ্মনামের একটা। ব্যালার্ড।
সঙ্গে করে আনা একটা অ্যাটাশে কেস খুলল হোগারসন। কয়েক রোল। ফিল্ম বের করল। দেখে মনে হলো, ব্যবহার করা হয়ে গেছে ওগুলো। ডেভেলপের অপেক্ষায় আছে। রবিনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, রবিন, একটা সাহায্য করবে? তোমার ক্যামেরার কেসে ভরে রাখো এগুলো। অনেক উপকার হবে আমাদের। কেসটা চুরি যাওয়া নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না। যায় যাক। নষ্ট ফিল্ম এর ভেতরে।
লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন রাবাত, প্রবল আপত্তি জানালেন, না না, এটা করা উচিত হবে না! ছেলেটাকে ফাঁদের টোপ হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছেন। বিপদে পড়তে পারে ও। ওকে আমার হাতে তুলে দিয়েছে ওর। বাবা-মা। আমি ওর ক্ষতি হতে দিতে পারি না।
হাসল হোগারসন। মিস্টার রাবাত, ভুল করছেন, ওকে টোপ আমরা বানাচ্ছি না। টোপ সে হয়েই আছে। তাকে বরং বাঁচানোর চেষ্টা করছি। মিলার আর তার সঙ্গী আপনাদের খুঁজে বের করবেই। ফিল্মটা ওদের চাই। রবিনকে আবার ধরবে ওরা। তখন যদি সে ফিল্ম দিতে না পারে, কি ঘটবে বুঝতে পারছেন?

বজ্রাহত মনে হলো রাবাতকে। বসে পড়লেন আবার। তারমানে কিছু একটা গছিয়ে দেয়ার চেষ্টা করবে সে। আপনারা তার ওপর নজর রাখবেন। তাকে অনুসরণ করবেন। যেই ওকে ধরবে, আপনারা ওদের আটকাবেন।
স্বীকারও করল না দুই এজেন্ট, অস্বীকারও করল না। কেবল রাবাতকে অনুরোধ করল, তারা নিউ ইয়র্ক কিংবা হোটেল ছেড়ে যাওয়ার আগে যেন ওদেরকে একটা খবর দিয়ে যান। বিদায় নিয়ে বেরিয়ে গেল দুজনে।
দরজা বন্ধ করেও সারতে পারল না মুসা, চেঁচিয়ে উঠল রবিন, দারুণ হয়েছে। কাউন্টারস্পাই হিসেবে কাজ করার সম্মান দেয়া হলো আমাকে! এতদিন আমরা ছিলাম শিকার, এখন হলাম শিকারী। ডাকাতগুলো লেগে ছিল, আমাদের পেছনে, আমরা লাগব এবার ডাকাতের পিছে!
ডাকাত নয়, স্পাই, মনে করিয়ে দিল মুসা।
ওই হলো। স্পাইরাও আমার মতে একধরনের ডাকাত।
অত খুশি হয়ো না! গম্ভীর হয়ে বললেন রাবাত। তোমাকে ওরা টোপ হিসেবে ব্যবহার করছে! শান্ত থাকার চেষ্টা করছেন তিনি, পারছেন না। কল্পনাও করতে পারেননি, শেষ পর্যন্ত এফ বি আইয়ের হয়ে কাজ করতে হবে। পড়শীকে ধরার জন্যে ফাঁদ পাততে হবে সুদূর নিউ ইয়র্কে এসে!

.

আর কত! ভোতা স্বরে বলল রবিন। চার চারটে দিন পেরিয়ে গেল, ওদের ছায়াটির দেখাও নেই!
দোষটা আমাদেরই, মুসা বলল, আমরাই তো খসানোর চেষ্টা করেছি। এখন পাওয়া যাবে কেন?
চুপ করে আছে কিশোর। আমেরিকান মিউজিয়াম অভ-নেচারাল হিস্টরির সামনে একটা পাথরের বেঞ্চে বসে তাকিয়ে আছে চত্বরে দানা খুঁটে বেড়ানো কবুতরের ঝাকের দিকে। রাবাতের দিকেও লক্ষ রেখেছে।
শব্দ করে পাশের রাস্তা দিয়ে ছুটে যাচ্ছে গাড়ি। বিরক্ত চোখে ওগুলো দেখছেন বৃদ্ধ। রাগ হচ্ছে ভীষণ। গত চারদিনে একটি বারের জন্যে যেতে পারেননি–আবিষ্কার নিয়ে যেখানে যাওয়ার কথা, এত কাঠখড় পুড়িয়ে যাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন তিনি। কারও সঙ্গে যোগাযোগ পর্যন্ত করতে পারেননি। সারাক্ষণ কেবল একই চিন্তা, একই কাজ–মিলার আর তার দোস্তকে আড়াল থেকে টেনে বের করে আনা। হোটেল থেকে বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে চঞ্চল, সতর্ক হয়ে ওঠে তার চোখের তারা। উত্তেজিত হয়ে যান। রবিনের কাছ ঘেঁষে থাকেন, সরেন না মুহূর্তের জন্যেও।

জনপ্রিয় টুরিস্ট স্পটগুলোতে তাদের খোঁজা হতে পারে অনুমান করে ওসব জায়গাতেই এসে বসে থাকেন। নিউ ইয়র্ক সিটির দর্শনীয় স্থানগুলোতে ঘোরাফেরা করেন। সারাক্ষণ ক্যামেরার ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে রাখে রবিন। যেখানে যায়, সঙ্গে নিয়ে যায়। মাঝে মাঝে ফিল্মের রোলগুলো বের করে দেখে। কেউ যদি চোখ রাখে, যাতে মনে করে ওগুলো ডেভেলপ করার অপেক্ষায় আছে।
প্রথম দিন জাহাজে করে ম্যানহাটান আইল্যান্ড ঘুরে এসেছে ওরা। সন্ধ্যায় ডিনার খেয়েছে একটা হোটেলের খোলা ছাতের ওপরের রেস্টুরেন্টে। একধারে ওখানে ক্রেতাদের মনোরঞ্জনের জন্যে পিয়ানো বাজায় বাদকদল। নিচে নিউ ইয়র্ক শহরের আলোকমালা, যেন আলোর এক বিশাল সমুদ্রের মত ছড়ানো। যেদিকে তাকানো যায় শুধু আলো আর আলো। শব্দেরও কমতি নেই। প্রাণবন্ত শহরের অবিরাম গুঞ্জন, চলছেই, চলছেই।
পরদিন খুব সকালে উঠল ওরা। ব্রুকলিন থেকে মাটির নিচের পথ দিয়ে গেল কনি আইল্যান্ডে। সেখানে আরও অনেক ট্যুরিস্টের সঙ্গে বিখ্যাত অ্যাকোয়ারিয়াম দেখল। পটেটো নিশ খেলো ওরা ওখানে। ঠোঁট চাটতে চাটতে কিশোর বলল, মেরিচাচীকে গিয়ে বলতে হবে এ কথা। সে তো মনে করে সারা দুনিয়ায় সবচেয়ে ভাল নিশ সে-ই কেবল বানায়। এখানকারটা খেলে বুঝতে পারত কি জিনিস।
ধীরে ধীরে স্ট্যাচু অভ লিবার্টির দিকে এগিয়ে গেল ওরা। দিন শেষে খাওয়া সারতে গেল ওঅর্ল্ড ট্রেড সেন্টারে। এত উঁচুতে বসেছে, ছোট আকারের প্লেনগুলো উড়ছে ওদের নিচ দিয়ে। গোগ্রাসে গিলছে মুসা। চারপাশে তাকাচ্ছে। যেন বুঝতে পারছে না কোনদিকে আগে তাকাবে।
তৃতীয় দিনও ঘুরে বেড়িয়ে সময় কাটাতে লাগল ওরা। ঐতিহাসিক গ্রীনউইচ ভিলেজ দেখতে চলে গেল। দুপুরের খাওয়া খেলো চায়নাটাউনে।
লাঞ্চের পর তার ফরচুন কুকিতে পাওয়া কাগজের টুকরোটা খুলে পড়লেন রাবাত। তার ভাগ্যলিপিতে বলা হয়েছে:
আজ রাতে প্রেমে সার্থক হবে তুমি।
তিন গোয়েন্দা তো হেসেই বাঁচে না। হাসতে লাগলেন রাবাতও। এমন উদ্ভট কথায় কে না হাসে? তারপর গেল ওরা রকেটির রেডিও সিটি মিউজিক হল দেখতে। ডিনার খেলো লিনডিতে। নিউ ইয়র্কের অসামান্য স্বাদের পনির কেক খেলো। রাতে হোটেলে ফিরে এতটাই ক্লান্ত বোধ করল, বিছানায় শুতে না শুতেই ঘুম।
চতুর্থ দিন সকালে গেল মেট্রোপলিটান মিউজিয়াম অভ আর্টে, তারপর এসেছে সেন্ট্রাল পার্কে। বেঞ্চে বসেছে রোদের মধ্যে। ঠেলাগাড়িতে করে খাবার বিক্রি করছিল ফেরিওয়ালা। একজনকে ডেকে বিশেষ ধরনের রুটির ভেতরে ভেড়ার মাংস কেটে কেটে দিয়ে তৈরি করা সুভলাকি স্যান্ডউইচ কিনে খেয়েছে।

এখন, ওরা রয়েছে পার্কের আরেক প্রান্তে। মিউজিয়াম অভ ন্যাচারাল হিস্টরির সামনে।
এতসব ঘোরাঘুরির সময়, প্রায়ই বাদামী রঙের সোয়েটার আর ধূসর স্ন্যাকস পরা একজন তরুণকে আশেপাশে দেখেছে। আরও একজনকে দেখেছে নেভি ব্লেজার পরা, খোঁচাখোঁচা দাড়িওয়ালা, রুক্ষ চেহারার মাঝবয়েসী লোক। কখনও দুজনে একসঙ্গে থাকে, কখনও একজন এদিক থাকলে আরেকজন ওদিক।
এফ বি আইয়ের লোক, রবিন বলল। ওরা কাছাকাছি থাকলে সাহস পাই।
কিন্তু এরা কতটা কি করতে পারবে বুঝতে পারছি না, মুসার গলায় সন্দেহ। যাদের ধরতে এসেছে, বিশেষ করে মিলারের দোস্তটা একটা ইন্টারন্যাশনাল স্পাই। গোলাগুলি চলতে পারে।
এ সব আলোচনা বাদ দে, নিষেধ করলেন রাবাত। যখন চলে, দেখা যাবে। সামলানোর ক্ষমতা না থাকলে এদের পাঠাত না অফিস।
নানার মেজাজ খারাপ, আন্দাজ করতে পারল মুসা। অতিরিক্ত ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। সকালে বিছানা থেকে উঠতেই কষ্ট হয়েছে। মুসা অবশ্য আসতে মানা করেছিল। বলেছে, নানা, শুয়েই থাকো। নাস্তার জন্যে খবর পাঠাচ্ছি। ঘরেই থাকি আজ। মিলারের কথা ভুলে যাই বরং। সে আর আমাদের খুঁজে পাবে না।
পাবে! প্রায় ধমকে উঠেছেন রাবাত। ওকে ধরার এই সুযোগ কোন কিছুর বিনিময়েই ছাড়তে রাজি নই আমি!
মিলারের প্রতি রাবাতের রাগ দেখে মুচকি হেসেছে কিশোর।
আজ কিছু ঘটবেই, রাবাত বলেছেন। মন বলছে আমার।
সুতরাং সেই মন বলার কারণেই এখন পার্কে বসে আছে ওরা। বিকেল। হয়ে গেছে। কিছুই ঘটেনি এখনও। বাদামী সোয়েটার পরা লোকটা নেই আশেপাশে। নীল ব্লেজার পরা লোকটা আছে। এককোণে দাঁড়িয়ে ফেরিওয়ালার কাছ থেকে আইসক্রীম কিনে খাচ্ছে। চেহারায় স্পষ্ট বিরক্তি।
আমাদের আসলে চোখে পড়ছে না ওদের, মুসা বলল। এতবড় শহরে কোথায় খুজবে মিলার? এমন কিছু করা উচিত আমাদের, যাতে সবার নজরে পড়ে যাই– এই যেমন এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিঙের দেয়াল বেয়ে ছাতে ওঠার চেষ্টা, কিংবা হাডসন নদীতে সাঁতার কাটা। টেলিভিশনে দেখানো হবে আমাদের। মিলার তখন জানতে পারবে আমরা কোথায় আছি।
ভুরু কুঁচকে মুসার দিকে তাকালেন রাবাত। তোর মায়ের মাথায় গোবর বলেই তোর এই অবস্থা!
ফোড়ন কাটতে ছাড়ল না মুসাও, মগজ থাকার কি খেসারত যে দিতে হচ্ছে, সে-ও দেখতেই পাচ্ছি!

ধীরে ধীরে হাসি ছড়িয়ে পড়ল কিশোরের মুখে। টেলিভিশন।
এইবার ভুরু কোঁচকানোর পালা মুসার। ঘাবড়ে গিয়ে বলল, খাইছে! সত্যি সত্যি আবার নদীতে ঝাঁপ দিতে বলবে না তো? আমি রসিকতা। করছিলাম।
টেলিভিশনে যেতে হলে নদীতে ঝাঁপ দেয়া কিংবা বিল্ডিঙে চড়া লাগে না, শান্তকণ্ঠে বলল কিশোর। কোনো কুইজ শোতে যেতে পারি। কিংবা নতুন মুখদের অনুষ্ঠানেও যোগ দেয়া যেতে পারে।
হোটেল উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে যোগ দিলে কেমন হয়? রবিন বলল, পত্রিকায় পড়েছি, একটা নতুন হোটেল ভোলা হচ্ছে নিউ ইয়র্কে। নাম রাখা হচ্ছে নিউ উইন্ডসর। লোকের আগ্রহ আছে ওটার ওপর, কারণ, বছর দুই আগে পুড়ে যাওয়া আরেকটা হোটেলের জায়গায় তৈরি হচ্ছে ওটা। অনেক বড় পার্টি দেবে। গভর্নরও আসতে পারেন।
কবে খুলছে?
কাল রাতে। গভর্নর এলে টিভির লোকেরা আসবেই ক্যামেরা নিয়ে।
মাথা ঝাঁকাল কিশোর। আমাদের দাওয়াত পাওয়ারও ব্যবস্থা করে দিতে পারবে এফ বি আই। হোটেলটাতে ঘর নেয়া গেলে আরও সুবিধে। মিলার আর ব্যালার্ড জেনে যাবে কোথায় আছি আমরা।
উঠে দাঁড়াল কিশোর। সোজা রওনা দিল নীল ব্লেজার পরা লোকটার দিকে। কাছে এসে বলল, কাল রাতে নিউ উইন্ডসরের উদ্বোধনী পার্টিতে আমাদের যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেয়া কি এফ বি আইয়ের পক্ষে সম্ভব?
এত চমকে গেল লোকটা, হাত থেকে আইসক্রীম পড়ে গেল। ভাবতেই পারেনি তাকে চিনে ফেলবে একটা ছেলে।
টিভির নিউজ সেকশনের লোক নিশ্চয় আসবে, বুঝিয়ে বলল কিশোর। আইসক্রীম পড়ে যাওয়াটাকে পাত্তাই দিল না। লোকটার জুতোর ওপর পড়ে গলছে ওটা। হোটেলটা খোলার ব্যাপারে বাইরের লোকের মতামতও নিশ্চয় নেয়া হবে। প্রতিবেদক যদি আমাদের একজনকে প্রশ্ন করে, তাহলে বলতে পারি আমরাও ওই হোটেলে উঠেছি। ভাল লাগছে। হ্যারিস মিলার তখন জেনে যাবে আমরা কোথায় আছি। সারা নিউ ইয়র্কে আমাদের পেছনে ঘুরে বেড়ানোর ঝামেলা থেকে বাঁচবেন আপনিও।
সামলে নিয়েছে ততক্ষণে লোকটা। লম্বা দম নিল। বলতে চাইল,–কিশোর কি বলছে সে বুঝতে পারছে না। তারপর ভাবল বোধহয়, অহেতুক এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে এই ছেলেকে বোকা বানাতে পারবে না। আরেকবার দম নিয়ে, মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, ঠিক আছে, দেখি কি করা যায়। জানাব।
রাস্তার দিকে চলে গেল সে।

বন্ধুদের কাছে ফিরে এল কিশোর। জানাবে বলে গেল।
কিন্তু আমাদের যে এখানে একা ফেলে গেল, রাবাত বললেন।
নানা, মরিয়া হয়ে বলল মুসা, অমন অসহায়ের মত ভঙ্গি কোরো না তো! তোমাকে অসহায় বলা, আর ভয়ানক শারম্যান ট্যাংককে খেলনা বলা। একই কথা। তোমার সঙ্গে লাগতে এলে বরং মিলারই অসহায় হয়ে যাবে।
মুসার কথায় হাসি ফুটল রাবাতের মুখে। মেজাজ অনেকটা ঠিক হয়ে এল। ট্যাক্সি নিয়ে রিভারভিউ প্লাজায় যাওয়ার প্রস্তাব দিলেন।
সেদিন সন্ধ্যায়ই ফোন বাজল। রাবাত ধরলেন। হোগারসন করেছে। জানাল, নিউ উইন্ডসরে ঘরের ব্যবস্থা হয়ে গেছে। আগামী কাল যেন চলে যান।
গাঢ় রঙের স্যুট কিংবা রেজার আছে আপনাদের? জানতে চাইল হোগারসন। টেলিভিশনে চেহারা যদি দেখাতেই হয়, লোকে যাতে বোঝে ওই অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার জন্যেই বহুদূর থেকে ছুটে এসেছেন আপনারা। তৈরি হয়ে এসেছেন।
কিন্তু নেই তো! কিছুটা নিরাশ মনে হলো রাবাতকে।
থাক, চিন্তা করবেন না। জোগাড় করে দেয়া যাবে।

.

পুরোপুরি শেষ হয়নি হোটেল বাড়িটার কাজ। বিশাল গুহার মত দেখতে লবিটার বাতাসে রঙ আর অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থের কড়া গন্ধ। লিফটের কাছে একজন রুম সার্ভিস ওয়েইটারের সঙ্গে দেখা। রবিনের অনুরোধে তাকে একটা ছাপানো নকশা দিল সে, তাতে হোটেলের কোন ফ্লোরে কি আছে দেখানো আছে। ওদের ঘরগুলো রয়েছে তেত্রিশ নম্বর ফ্লোরে। রিয়ারভিউর ঘরের চেয়ে ছোট। তবে ওটা যেমন চারদিক থেকে বদ্ধ, এটা তেমন নয়, রাবাতের ঘর থেকে ঈস্ট রিভার চোখে পড়ে।
পাঁচটার সময় হোটেলে এসেছে ওরা। লবিতে যন্ত্রপাতি বসিয়ে ফেলেছে ততক্ষণে টিভির লোকেরা। ছয়টা পয়তাল্লিশ মিনিটে যখন এফ বি আইয়ের দেয়া গাঢ় নীল রঙের ব্লেজার পরে নামল আবার, আলোয় ঝলমল করছে তখন লবিটা। মেসেজ ডেস্কের কাছে দাঁড়িয়ে আছে হোগারসন। ওদের প্রায় টেনে নিয়ে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দিল একজন প্রতিবেদকের সঙ্গে।
লম্বা, সুদর্শন একজন লোক। ঝকঝকে সাদা দাঁত। সুন্দর করে আঁচড়ানো চুল। রাবাতের সঙ্গে হাত মেলানোর সময় তাঁর বাঁ কানের পাশ দিয়ে পেছনে তাকাল। তারপর তার পাশ কাটিয়ে চলে গেল একজন
মহিলাকে স্বাগত জানানোর জন্যে। রিভলভিং ডোর ঠেলে ভেতরে ঢুকেছে। মহিলা। গায়ের জ্যাকেটে প্রচুর ঝলমলে পুতি আর আয়নার টুকরো বসানো।

টিভি ক্যামেরার লাল আলো জ্বলে উঠল। একধারে দাঁড়ানো কানে হেডফোন পরা একজন ইঙ্গিত করল একজন ঘোষককে। ক্যামেরার সামনে এসে ঘোষক বলতে লাগল, সে নিউ উইন্ডসরের লবিতে দাঁড়িয়ে আছে। তার সঙ্গে যিনি রয়েছেন তার নাম মনিকা কনসর, হোটেলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে। যোগ দিতে সেই রোম থেকে উড়ে এসেছেন।
মিসেস কনসর ভি আই পি, সন্দেহ নেই, কিন্তু তার আর কোন পরিচয় দিল না ঘোষক। তিন গোয়েন্দা ভাবল, এখানে উপস্থিত অতিথিরা নিশ্চয়।
মহিলার পরিচয় জানে, কেবল ওরা তিনজন আর মিস্টার রাবাতই জানেন না। হাসিতে ঠোঁট এত ছড়িয়ে ফেললেন মহিলা, মুসার ভয় হতে লাগল ছিঁড়ে না যায়। অল্প দুচারটা কথা বলেই সরে গেলেন।
আচমকা রাবাত আর তিন গোয়েন্দার দিকে নজর দিল ঘোষক। হাত তুলে স্বাগত জানানোর ভঙ্গি করল। মুহূর্তে ওদের দিকে ঘুরে গেল ক্যামেরার চোখ।
আর ইনি হলেন মিস্টার আরমান রাবাত, চেঁচিয়ে উঠল ঘোষক, যেন হঠাৎ করে তাকে চোখে পড়ে যাওয়ায় অবাক হয়েছে। অত্যন্ত সম্মানিত একজন মেহমান। বহুদূরের ক্যালিফোর্নিয়া থেকে এসেছেন শুধু এই অনুষ্ঠানে, যোগ দেয়ার জন্যে।
ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে চওড়া হাসি হাসলেন রাবাত। ঘোষকের হাত চেপে ধরলেন। সহজে আর ছাড়তে চাইলেন না। ঘোষক বলল–পুরানো ওয়েস্টমোর হোটেলেটা যখন এখানে ছিল, তখন তার স্ত্রীকে নিয়ে বেড়াতে এলে ওটাতে ছাড়া আর কোথাও উঠতেন না। তাঁর স্ত্রী এখন পরপারে; ঈশ্বর তার বিদেহী আত্মার মঙ্গল করুন!! তাড়াতাড়ি বলতে গেলেন রাবাত, আমি আর আমার স্ত্রী হানিমুন করেছি…
কথা শেষ করতে দিল না ঘোষক, মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে দিল, অবশ্যই ওয়েস্টমোর হোটেলে। হাত ছাড়ানোর চেষ্টা করল সে। পারল না।
গমগমে কণ্ঠে রাবাত বললেন, প্রায়ই আসতাম আমরা। ওয়েস্টচেস্টার পুড়ে যাওয়ার খবর শুনে তো রীতিমত মুষড়ে পড়েছিলাম। তবে আর চিন্তা নেই। ওটার চেয়ে ভাল হোটেল নিউ উইন্ডসর এখানে দাঁড়িয়ে গেছে। এখনও কাঁচা কাঁচা গন্ধ আছে বটে, তবে কেটে যাবে। খুব শীঘি কেটে যাবে, ঠিকমত চালু হলেই। এই ছেলেগুলোকে নিয়ে এসেছি এবার, নিউ ইয়র্ক দেখাতে। এদের একজন আমার নাতি, অন্য দুজন তার বন্ধু ক্যামেরার চোখ ঘুরে গেল কিশোর, মুসা আর রবিনের হাসি হাসি মুখের দিকে। পুরো হপ্তাটাই এখানে কাটিয়ে যেতে চাই আমরা। খুব উপভোগ করছে ওরা। ইতিমধ্যেই রোলার কোস্টারে করে কনি আইল্যান্ড ঘুরিয়ে এনেছি ওদের।

এই সময় হাতের চাপ সামান্য শিথিল হতেই তাড়াতাড়ি ছাড়িয়ে নিল ঘোষক। তার পেশাদারী হাসিটা বিন্দুমাত্র মলিন না করে দ্রুত পিছিয়ে গেল। রাবাত আর তিন গোয়েন্দাকে ধন্যবাদ দিল। ব্যস, কাজ শেষ।

ঘোষকের মতই তাড়াহুড়ো করে ওখান থেকে সরে এলেন রাবাত। কপালের ঘাম মুছতে মুছতে ছেলেদের দিকে তাকালেন, কি বলেছি আমি, বলো তো? ঠিকঠাক মত বলেছি তো সব?

হেসে মুসা বলল, দারুণ বলেছ তুমি, নানা। একটা ভুলই কেবল করেছ, ওয়েস্টমোরের জায়গায় ওয়েস্টচেস্টার বলে ফেলেছ।

তাই নাকি? মোটেও চিন্তিত মনে হলো না রাবাতকে। একই কথা। মিথ্যে যে এতগুলো বলতে পেরেছি, এই বেশি। নিউ উইন্ডসরে যে থাকব, এটা ঠিকমত বলেছি তো?

তা বলেছ।

তবে আর চিন্তা নেই। ওই ছুঁচো মিলারটাকে জানিয়ে দেয়া হলো, কোথায় আমাদের পাওয়া যাবে।

ওখানে থাকার আর কোন দরকার নেই। ছেলেদের নিয়ে বেরিয়ে এলেন রাবাত। সিটিক্রপ বিল্ডিঙের একটা স্ক্যান্ডিনেভিয়ান রেস্টুরেন্টে খাওয়াতে নিয়ে চললেন ওদের।

রিসিপশনের কাছে দাঁড়িয়ে ওদের বেরোতে দেখল হোগারসন। বাধা দিল না।

ভাবতে ভাবতে চলেছে তিন গোয়েন্দা, কাজ যা করার তো করা হলো। মিলার আসতে কত সময় নেবে?

.

পরদিন সকালে নাস্তা প্রায় শেষ করে ফেলেছে তিন গোয়েন্দা, এই সময় হোটেলের কফি শপে ঢুকলেন রাবাত। অনেক রাত পর্যন্ত জেগে ছিলেন, রাত জেগে টেলিভিশনে নিজের ইন্টারভিউ দেখেছেন। লেট নাইট নিউজ দেখেছেন, লেট-লেট নাইট নিউজ দেখেছেন। মূসার পাশে হাসিমুখে বসতে বসতে জানালেন, সকালের খবরেও তার ইন্টারভিউ দেখানো হয়েছে।

কফি শপে হোটেলের আরও অনেক মেহমান নাস্তা খাচ্ছে। ওদের দিকে তাকিয়ে এমন ভঙ্গিতে হাসলেন, যেন সাংঘাতিক কেউকেটা কিছু হয়ে গেছেন। এখনই সবাই অটোগ্রাফের খাতা বাড়িয়ে সই নিতে ছুটে আসবে। খাতা না আনলেও মেনু হাতে এগিয়ে এল ওয়েইটার। তার মুখের দিকে তাকালও। তবে চিনতে পারার কোন লক্ষণ নেই তার চোখে।

রেগে গেলেন মনে হলো রাবাত। জ্বলন্ত চোখে তার দিকে তাকিয়ে। আদেশ দিলেন, কফি। প্যানকেক। দুটো ডিম। আর গরুর মাংস ভাজা। এ চমকে গেল

মুসা। নানা, তোমার না ডিম আর গরু খাওয়া বারণ। কোলেস্টেরল:..
চুলোয় যাক কোলেস্টেরল! ধমকে উঠলেন রাবাত। ময়লা জমলে, আমার শিরায় জমবে, তোর মাথাব্যথা কেন? আজ সারাদিনে অনেক ঘটনা ঘটবে, এনার্জি দরকার হবে আমার। সুতরাং সেটা এখনই জোগাড় করে নিতে, হবে।
কিন্তু খাওয়ার পর ঘটনা আর ঘটে না। এনার্জি খরচেরও প্রয়োজন পড়ছে রাবাতের। হোটেলের লবিতে বসে থাকার ব্যবস্থা করেছে তিন গোয়েন্দা। বার বার অহেতুক ক্যামেরা আর ক্যামেরার ব্যাগে হাত বোলাচ্ছে রবিন। এফ বি আইয়ের দুজনেই উপস্থিত। নীল ব্লেজার পরা লোকটা ঢুকেছে গিফট শপে, জিনিস দেখার ভান করছে। নিউজ কাউন্টারে ম্যাগাজিন ওল্টাচ্ছে বাদামী সোয়েটার।
আসছ না কেন, মিলার? বিড়বিড় করলেন রাবাত। আমরা তো তোমার অপেক্ষায়ই আছি।
তা কিন্তু তা-ও কিছু ঘটল না। আধঘণ্টা গেল। এক ঘণ্টা। ঘড়ির কাটা চলছে।
বেলা এগারোটায় মেজাজ গরম হতে আরম্ভ করল তার। সাড়ে এগারোটায় ফুটতে শুরু করল।
আশ্চর্য! বললেন তিনি। সেই কখন থেকে বসে আছি, মনে হচ্ছে বছর পেরিয়ে গেছে। গাধাটা সাক্ষাৎকার দেখেনি নাকি? ছাগল কোথাকার! খবরও দেখে না!
ধূর্ত হাসি ফুটল ঠোঁটে। আজ বিকেলে ইয়াংকি স্টেডিয়ামে একটা ডাবল গেম আছে। দেখতে যাবি নাকি, মুসা?
যাওয়া বোধহয় ঠিক হবে না, মুসা বলল। মিলার আর তার দোস্ত সাক্ষাৎকারটা দেখেছে কিনা, বোঝা যাচ্ছে না। দেখলে এখানে খুঁজতে আসবেই। তখন আমরা না থাকলে এতদিনের কষ্ট অহেতুক যাবে।
বাইরে থেকে একটু ঘুরে এলেও পারি, রাবাত বললেন। এখানে বসে থেকে ভুল করছি আমরা। হয়তো ঢোকার সাহসই পাচ্ছে না। বাইরে গিয়ে ওদের সুযোগ করে দেয়া উচিত।
আমার মনে হয় না, কিশোর বলল, আমরা বাইরে বেরোলেও ওদের হারাতে হবে। এসে আমাদের না পেলে অপেক্ষা করবে ওরা। কিংবা আবার। আসবে। এতদূর আমাদের পিছু ধাওয়া করে আসতে পেরেছে ওই ফিল্মের জন্যে। এত সহজে হাল ছাড়বে না।
সুতরাং বসে না থেকে বাইরে ঘুরে আসারই সিদ্ধান্ত হলো। তিন গোয়েন্দাকে নিয়ে মেসেজ ডেস্কে এসে দাঁড়ালেন রাবাত। ইয়াংকি স্টেডিয়ামে যেতে হলে কোন্ ট্রেন ধরতে হবে, এবং সেটা মাটির নিচ দিয়ে যায় কিনা, জিজ্ঞেস করলেন।
দুপুর বেলা সদলবলে হোটেল থেকে বেরোলেন রাবাত। হোটেলের দুই ব্লক দূরেই একটা আন্ডারগ্রাউন্ড স্টেশন। আধ ব্লক পেছনে লেগে রইল দুই এফ বি আই।

প্ল্যাটফর্মে নেমে প্রথম ট্রেনটা ইচ্ছে করে মিস করল গোয়েন্দারা, ওই দুজনকে আসার সময় দিল, ওরা এখনও এসে পৌঁছায়নি। পরের ট্রেনটায় চড়ল সবাই। এফ বি আইরা রইল কামরার এক প্রান্তে, গোয়েন্দারা আরেক প্রান্তে। ব্রংক্স বল পার্কের দিকে চলল ট্রেন। চতুর্দিকে কড়া নজর রাখলেন রাবাত। মিলাররা পিছু নিয়েছে কিনা দেখছেন।

স্টেডিয়ামে এসে ভান করলেন যেন তারা নিউ ইয়র্কের বাসিন্দা। তাতে খেলা দেখার সুবিধে আছে। খেলা দেখতে বসলে কোনও এক পক্ষকে সমর্থন করতে হয়। সেই পক্ষের দর্শকদের মধ্যে বসা ভাল। এবং সেটাই করলেন। তিনি। ইয়াংকিদের মধ্যে, বসলেন। প্রথম গেমে এক রান এগিয়ে রইল ইয়াংকিরা। সুতরাং প্রচুর চেঁচাতে পারলেন তিনি। আশেপাশে ইয়াংকি সমর্থক থাকায় চেঁচাতে কোন অসুবিধে হলো না।

বিরতির সময় হট ডগ খাওয়া হলো। নাতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে খেলেন তিনি। দুজনের কেউই জিততে পারলেন না। রবিন আর কিশোরও প্রচুর খেল, তবে নানা-নাতির ধারেকাছেও যেতে পারল না।

শুরু হলো দ্বিতীয় পর্যায়ের খেলা। শুরুতেই ইয়াংকিদের হারিয়ে দিল বহিরাগত টীম। নিজের আর বাইরের দল, দুটোকেই গালাগাল শুরু করল ইয়াংকি সমর্থকরা। সিটি বাজিয়ে, নানা রকম কটু কথা বলে উত্তেজিত করে জেতানোর চেষ্টা করতে লাগল। খেলার উত্তেজনায় কখন যে তাদের দলে মিশে গেলেন রাবাত আর তিন গোয়েন্দা, খেয়ালই রইল না। শেষ পর্যন্ত যখন ব্রংক্স বহুবাররা হেরে গেল, শির উঁচু করে তিন গোয়েন্দাকে নিয়ে বেরোনোর জন্যে উঠে দাঁড়ালেন রাবাত। ঘাড় কাত করে মুসার দিকে তাকিয়ে বললেন, কি, বলেছিলাম না ইয়াংকিরা জিতবে?

প্রচুর দর্শক হয়েছে। বেরোনোর গেটে ভিড়। ঠেলাঠেলি করে বেরোতে হচ্ছে। কনুইয়ের গুতো মেরে ভিড়ের ভেতর দিয়ে পথ করে এগোলেন। রাবাত। স্টেডিয়াম থেকে বেরিয়ে রেল স্টেশনে চলে এলেন। জনতার কোলাহল বিরক্তিকর, তবু বিকেলটা ভাল লাগল তার। সুন্দর বাতাস বইছে।

ম্যানহাটানের ট্রেন এসে দাঁড়াল। তিন গোয়েন্দাকে নিয়ে ট্রেনে উঠলেন। রাবাত যে কামরাটায় উঠলেন, তাতে বেজবল খেলার বেশ কিছু ভক্তও উঠেছে। দরজা বন্ধ হলো। চলতে শুরু করল ট্রেন। মুসার চোখে পড়ল বাদামী সোয়েটার পরা এফ বি আইকে, প্ল্যাটফর্মে জনতার ভিড়ে আটকা, পড়েছে সে, পাগলের মত তাকাচ্ছে এদিক ওদিক, ওদেরকে খুঁজছে। জানালা দিয়ে মুখ বের করে দিল মুসা। দেখতে পেল লোকটা। গতি বেড়ে গেছে। ট্রেনের। বাদামী সোয়েটারকে ফেলে রেখেই প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে চলে। এল।

মুসার দুপাশে চেপে আছে দুজন ভক্ত। একজন হোঁৎকা বিশালদেহী লোক, গায়ে স্পোর্টস কোট; আরেকজন মুসার চেয়ে দু-এক বছরের বড় হবে, কোন কিছু না ধরেই দাঁড়িয়ে আছে, একনাগাড়ে পিনাট খেয়ে চলেছে। শরীর মোড়ামুড়ি করে কোনমতে দুজনের মাঝখান থেকে বেরিয়ে কিশোরের কাছে চলে এল মুসা। একটা ধাতব হ্যান্ড-স্ট্র্যাপ ধরে দাঁড়িয়ে আছে কিশোর।

বডিগার্ডকে খুইয়েছি, তাকে বলল মুসা। বাদামী সোয়েটার পরা লোকটাকে প্ল্যাটফর্মে দেখলাম, উঠতে পারেনি।

বডিগার্ড? হেসে উঠল হাড্ডি সর্বস্ব একটা মেয়ে। বয়েস ষোলো সতেরো হবে। মাথায় বেগুনী রঙের কাপড় অনেকটা পাগড়ির মত করে পেচিয়েছে। সেটে আছে প্রায় কিশোরের গায়ের সঙ্গে। অকারণ কথা বলে বলে তার কান পচিয়ে ফেলার জোগাড় করেছে। গায়ে মাংস না থাকলে কি হবে, গলাটা যেন মাইক। এমন করে ফাটা বাশে বাড়ি মারছে, কিশোরের ভয় হতে লাগল, কামরার সব লোকই শুনে ফেলবে। কিসের বডিগার্ড? ভি আই পি নাকি তোমরা! বাব্বাহ, বডিগার্ডও থাকে সঙ্গে! পরের বার প্রেসিডেন্ট ইলেকশনে দাঁড়াবে নাকি!

খুব সাংঘাতিক কোন রসিকতা করে ফেলেছে যেন মেয়েটা, এমন ভঙ্গিতে নিজের কথায় নিজেই পুলকিত হলো। তার কথায় মজা পেল আরও কয়েকজন যাত্রী। মুসার দিকে তাকাল।

দুষ্টবুদ্ধি ঝিলিক দিয়ে উঠল কিশোরের চোখে। মুসার দিকে তাকিয়ে বলল, ভেবো না। ওকে আর দরকার হবে না। ইনকিউবেশন পিরিয়ড কালই শেষ হয়ে গেছে তোমার।

শক্ত হয়ে গেল মেয়েটা। সতর্ক হয়ে উঠল। ইনকিউবেশন! কেঁপে উল ফাটা বাঁশ। কিসের ইনকিউবেশন? ছোঁয়াচে রোগে ধরেছিল নাকি?

না না, মাথা নাড়ল মুসা, কিসের রোগ! ও এমনি এমনি বলছে! মিথ্যে বলা ওর স্বভাব!

মুসার বলার ভঙ্গিতে সন্দেহ আরও বাড়ল মেয়েটার। কিশোরের কাছ থেকে সরার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু মুসার কাছে থাকাটাও বিপজ্জনক। কোন রোগ, কে জানে! চিকেন পক্সও হতে পারে! তাড়াতাড়ি সরে যেতে লাগল। সে। কামরার একেবারে আরেক ধারে চলে গেল। পরের স্টেশনে ট্রেন থামতেই নেমে গেল। পক্সের ভয়ে তার সঙ্গে নামল আরও কয়েকজন।

ম্যানহাটানে পৌঁছার আগেই আরও অনেকে নেমে গেল। ভিড় আর আগের মত নেই। কামরার মাঝখানে প্রচুর জায়গা ছেড়ে দেয়া হয়েছে রাবাত আর তিন গোয়েন্দাকে। তাদের কাছাকাছি আসতে ভয় পাচ্ছে লোকে।

রাবাতকে বলল কিশোর, এফ বি আইয়ের লোকটা ট্রেনে উঠতে পারেনি। প্ল্যাটফর্মে তাকে থেকে যেতে দেখেছে মুসা।
তাতে আর অসুবিধে কি? রাবাত বললেন। এখানে মিলারও নেই, তার দোস্তও নেই।
তা ঠিক। যাত্রীদের ওপর আরেকবার চোখ বোলাল তিন গোয়েন্দা। মিলার কিংবা ব্যালার্ডের সঙ্গে কারও সামান্যতম মিলও নেই।
ফোরটি-সেকেন্ড স্ট্রীটে এসে ট্রেন থেকে নেমে পড়ল ওরা। একটা সুড়ঙ্গ আবিষ্কার করলেন রাবাত, যেটা ধরে গেলে পথ বাঁচবে। অল্প সময়ে পৌঁছতে পারবেন হোটেলে। অন্ধকার সুড়ঙ্গমুখটা দেখতে ভাল লাগল না মুসার। মনে হলো, ওর মধ্যে ঢোকাটা উচিত হবে না। সমর্থনের আশায় রবিন আর। কিশোরের দিকে তাকাল সে। কিছু বলল না ওরা। নীরবে এগোল রাবাতের। পিছু পিছু। অগত্যা মুসাকেও যেতে হলো।
সুড়ঙ্গের মাঝামাঝি পৌঁছে একটা ডাক কানে এল, দাঁড়াও, রাবাত!
পুরো সুড়ঙ্গটা নির্জন, নিজেদের বাদে আর কাউকে দেখেনি এত ক্ষণ। এবার দেখল। এগিয়ে আসছে আরেকজন। হাসি হাসি মুখ। বিচিত্র একটা রেনকোট পরা থাকায় আগের চেয়ে খাটোও লাগছে, মোটাও।
মিলার! চিৎকার করে উঠলেন রাবাত।
যাক, দেখা তাহলে হলো, মিলার বলল। অনেক দিন পর, কি বলো।
নীরব সুড়ঙ্গ। এতটাই নীরব, কোথায় যেন টপ টপ করে পানির ফোঁটা পড়ছে, তা-ও কানে আসছে।
পেছনে কথা বলে উঠল আরেকজন, ক্যামেরার ব্যাগটা আমি নিয়ে নিচ্ছি।
মনটিরেতে এই লোককেই দেখেছে গোয়েন্দারা, মিলারের দোস্ত, ব্যালার্ড। হাতে উদ্যত পিস্তল, রবিনের দিকে ধরে রেখেছে।
প্রতিবাদ না করে ব্যাগটা দিয়ে দিল রবিন।
ফিল্মগুলো আছে কিনা, দ্রুত ব্যাগ হাতড়ে দেখে নিল লোকটা। মিলারের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল, ঠিকই আছে। রাবাত আর গোয়েন্দাদের আদেশ দিল, ভেতরে যাও। সবাই।
পিস্তল দিয়ে সুড়ঙ্গের একটা দরজার দিকে ইশারা করল সে। খিল খুলে দিল মিলার। তার ওপাশে একটা দেয়াল আলমারি। সেঁতসেতে। ঝাড়ু, মেঝে পরিষ্কার করার স্পঞ্জ আর জীবাণু ও কীট-পতঙ্গনাশক ওষুধের টিনে বোঝাই।
ঢোকো! পিস্তল নেড়ে আবার আদেশ দিল ব্যালার্ড।
ঢুকতে বাধ্য হলো চারজনে। দরজা লাগিয়ে দেয়া হলো বাইরে থেকে। খিলটাকে ভালমত আটকে রাখার জন্যে তার মধ্যে কাঠি জাতীয় কিছু ঢোকানোর শব্দ

পাওয়া গেল। ধীরে ধীরে সরে গেল পদশব্দ।
বাঁচাও! চিৎকার করে উঠল মুসা। কে আছ, আমাদের এখান থেকে বের করো।
দীর্ঘ একযুগ পরে যেন রেলের একজন টিকেট বিক্রেতা এসে মুক্ত করল ওদের। রাবাতদের মতই সুড়ঙ্গ দিয়ে চলেছিল একজন পথচারী। আলমারির মধ্যে আজব আওয়াজ শুনতে পেয়ে সন্দেহ জাগে। রেলের অফিসে গিয়ে জানায়। একজন পুলিশ সঙ্গে নিয়ে এসেছে টিকেট বিক্রেতা। রাবাতকে প্রশ্ন শুরু করল পুলিশের লোকটা। কোন কথারই জবাব দিলেন না রাবাত। বিরক্ত হয়ে বরং এক ধমক লাগালেন তাকে। ছেলেদের নিয়ে সুড়ঙ্গ পার হয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে হোটেলে ঢুকেই হোগারসনকে ফোন করলেন।
সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এল হোগারসন। আগের মতই শান্ত।
এতে রাগ আরও বেড়ে গেল রাবাতের। ফোঁস ফোঁস করতে লাগলেন। চিৎকার করে বললেন, এত কষ্ট করে টাকা কামাই করে ট্যাক্স দিই, সেই ট্যাক্সের টাকায় বেতন পান আপনারা, আর সেবা করার এই নমুনা। রাস্তাঘাটে জান নিয়ে টানাটানি পড়ে আমাদের। দুটো:ডেঞ্জারাস স্পাইকে ধরার জন্যে আপনাদের সাহায্য চেয়েছিলাম। আমাদের কাজ তো ঠিকমতই করেছি, আপনার লোক কোথায়? ঘুমোচ্ছিল নাকি?
অনেকটা সে-রকমই, মিস্টার রাবাত, শান্তকণ্ঠে জবাব দিল। হোগারসন।
ছ্যাঁৎ করে জ্বলে উঠলেন রাবাত। তাকে শান্ত করতে সময় লাগল হোগারসনের।
সারাদিন কোথায়, কি ভাবে কাটিয়েছেন, জানালেন তখন রাবাত। বার বার অভিযোগ করলেন দুর্গন্ধে ভরা, বাতাসহীন, ময়লা ঝাড়ুতে বোঝাই আলমারির মধ্যে আটকে থাকতে হয়েছে বলে।
জঘন্য! বলে বক্তব্য শেষ করলেন তিনি।
ঠিক, একমত হলেন হোগারসন। এ রকমটা ঘটা মোটেও উচিত হয়নি।
মেজাজ একেবারে নরম হয়ে গেল রাবাতের। এতক্ষণে বসলেন।
হোগারসন বলল, আমাদের এজেন্টরা সব ছড়িয়ে পড়েছে। নিউ ইয়র্ক থেকে বেরোনোর সমস্ত পথে পাহারা দিচ্ছে ওরা–এয়ারপোর্ট, রেল স্টেশন, বাস স্টেশন, সুড়ঙ্গমুখ, ব্রিজ, কোথাও বাদ নেই। শহর থেকে বেরোনোর চেষ্টা করলে ওই দুজন ধরা পড়বেই।
যদি না পড়ে? প্রশ্ন করলেন রাবাত। এখানে এ ভাবে অকর্মণ্য হয়ে বসে থাকব নাকি আমরা?
যা মোটেও না। আপনাদের কাজ শেষ। আপনাদের আর বিরক্ত করবে না ওরা। মিলার তার ফিল্ম পেয়ে গেছে। ব্যালার্ডকে দিয়ে দেবে। ব্যালার্ড যখন ফিল্মগুলো ডেভেলপ করে দেখবে কিছুই নেই, বুঝবে আসল ছবিগুলো আমাদের হাতে

পড়েছে। আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে আসার সাহস তার হবে না। গা ঢাকা দেবে। ধরে নিতে হবে, আমরাই জিতলাম। আপনাদের আর ভয় নেই।
দুই দুইজন স্পাই ঘুরে বেড়াচ্ছে, আবার রেগে গেলেন রাবাত, আর আপনি বলছেন ভয় নেই! বাহ্, চমৎকার কথা!
হাসল হোগারসন। আর কোনদিন স্পাই হতে পারবে না মিলার, সেই সুযোগই পাবে না। তার শয়তানি ফাঁস করে দিয়েছেন আপনারা। গর্বিত হওয়া উচিত আপনাদের। যে কোন ডিফেন্স ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করতে হলে ফিঙ্গারপ্রিন্ট জমা দিতে হয়। যেখানে চাকরি করত, তার ধারেকাছেও আর যেতে পারবে না। নাম ভাড়িয়ে যদি আবার কোথাও চাকরির দরখাস্ত দেয়, ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিতে হবে, বাঁচতে পারবে না তখন আমাদের হাত থেকে। তবে আমার মনে হয় না এই বোকামি করার সাহস পাবে সে। আমেরিকায় থাকতে হলে চিরকাল পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হবে এখন থেকে। জানের শান্তি নষ্ট হবে। সেটা আরও বড় জেল।
সন্তুষ্ট হতে পারলেন না রাবাত। কিন্তু তার সঙ্গের শুয়াপোকাটার কি হবে? ব্যালার্ড না ফ্যালার্ড? যদি সে আবার কিছু করার চেষ্টা করে? আমার তো মনে হয় না সে স্পাইগিরি ছেড়ে দেবে।
আমারও না, একমত হলো হোগারসন। তবে তার খোঁজে লোক লাগিয়ে রাখব আমরা। ভালমত খোঁজা হবে। মিস্টার রাবাত, আপনি আর। তিন গোয়েন্দাকে অনেক ধন্যবাদ। অনেক সাহায্য করেছেন আপনারা।
চলে গেল হোগারসন। দরজা লাগিয়ে দিয়ে এল রবিন। পরিস্থিতি সহজ হলো না, কেমন ভারী হয়ে রইল।
মুসা বলল, কোন কাজই হলো না!
ওই হোগারসনটা একটা অপদার্থ! নাক দিয়ে ঘোঁৎ-ঘোৎ করতে লাগলেন রাবাত। দুধের শিশু পেয়েছে আমাদের! একটা কিছু বোঝাল, আর অমনি বুঝে গেলাম!
গম্ভীর হয়ে মাথা ঝাঁকাল কিশোর। আমাদের অবস্থাটা হয়েছে, পিঠের নিচে ভাজ হয়ে থাকা এলোমেলো চাদর নিয়ে ঘুমানোর মত। রাতে বার বার ঘুম থেকে জেগে উঠে চাদর টানতে হবে।
তোমার এ সব মঙ্গলগ্রহের ভাষা ছাড়ো দেখি!
ব্যাখ্যা করতে গেল না কিশোর। গভীর চিন্তায় ডুবে গেল। হোগারসন যা-ই বলে যাক, আসল ফিল্মগুলো না দেয়া পর্যন্ত মিলার বা ব্যালার্ডের হাত থেকে নিরাপদ নয় ওরা। দুজনকে খুঁজে বের করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়ার আগে নিশ্চিন্ত হতে পারবে না। তিন গোয়েন্দাও আরাম করে নিউ ইয়র্ক দেখতে পারবে না, রাবাতও তার আবিষ্কার হাত বদল করার ব্যাপারে মন দিতে পারবেন না।

পরদিন সকালে উঠে অবশ্য বেরিয়ে গেলেন তিনি। সারাদিন পর ফিরে এসে জানালেন, যার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন, তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পেরেছেন। কাজ এগোচ্ছে।

ফোর্ড গাড়িটা নিয়ে গেলেন একটা ওঅর্কশপে। সার্ভিসিং করাবেন। টুকিটাকি মেরামত থাকলে, সারিয়ে নেবেন। বাড়ি ফেরার পথে দীর্ঘ যাত্রায়। যাতে গোলমাল না করে ওটা। কি পরের কয়েকটা দিন খুব সকালে বেরিয়ে যান তিনি, ফেরেন সন্ধ্যায়। ছেলেরা থাকে নিজেদের মত। যেখানে ইচ্ছে ঘোরাফেরা করে। হাডসন নদীতে রাখা অনেক পুরানো একটা উভচর বিমান দেখতে গেল ওরা। টুরিস্টদের জন্যে রাখা হয়েছে ওটা দর্শনীয় বস্তু হিসেবে। গেল হেইডিন প্ল্যানেটোরিয়ামে। লিটল ইটালিতে পিজ্জা খেলো। মাথার অনেক ওপরে বসানো ট্রামলাইন ধরে বেড়াতে গেল রুজভেল্ট আইল্যান্ডে। রকফেলার সেন্টার দেখতে গেল। নানা জায়গার সুভনির কিনল। মিলারের সঙ্গে শেষ মোলাকাতের চারদিন পর সাক্ষাৎ হলো অর্কিড়ওয়ালা এক মহিলার সঙ্গে।

সিক্স অ্যাভেনু আর থার্টিয়েথ স্ট্রীটটা যেখানে মিলেছে, সেই মোড়ের কাছে ওদের পাশ কাটাতে গেল মহিলা। একটা ঝুড়িতে বসানো টবে অর্কিড নিয়ে চলেছে। গাছটা বেশ সুন্দর। ফ্যাকাসে সবুজ আর বাদামী রঙের, কাঁটাওয়ালা তিনটে চমৎকার ফুল।

শুনুন! ডাকল রবিন।

খাইছে! বলে উঠল মুসা। এ তো অর্কিড!

লাফ দিয়ে এগিয়ে গেল কিশোর। বিনয়ের অবতার সেজে জাপানী কায়দায় মাথা নুইয়ে অভিবাদন করে বলল, সিমবিডিয়াম ফুল, তাই না?

উজ্জল হলো মহিলার মুখ। তুমি অর্কিড চেনো? সুন্দর ফুল, তাই না? চাষ করো নাকি?

আমার চাচা করে, নির্বিকার ভঙ্গিতে মিথ্যে বলে দিল কিশোর।

তাকে বিশ্বাস করল মহিলা। একটা জরুরী কাজ আছে আমার, ফুলটা আমার মেয়ের বাড়িতে রেখে সেখানে যাব। ফিরে এসে ফুলটা দেখাতে নিয়ে যাব। এইবার আর আমাকে পুরস্কার না দিয়ে পারবে না।

তাই নাকি? অর্কিড শো হচ্ছে নাকি শহরে?

ঠিক শো না। আমাদের স্থানীয় সৌখিন অর্কিড চাষীদের মাসিক সম্মেলন। প্রধান অতিথি হয়ে আসবেন স্যার ওয়ালথার মারিয়াট। বক্তৃতা দেবেন। অর্কিডে তিনি একজন বিশেষজ্ঞ। এসো না তোমরাও? অর্কিডে আগ্রহী লোকদের বিনে পয়সায় অর্কিড বিতরণ করি আমরা। তোমাকেও দিতে পারব।, তোমার চাচাকে নিয়ে গিয়ে দেবে। নিউ ইয়র্কেই থাকো কোমরা?

না, ক্যালিফোর্নিয়ায়।
বাবা, অনেক দূর থেকে এসেছ! বেড়াতে?
মাথা ঝাঁকাল কিশোর।
অর্কিডের ঝুড়িটা মুসার হাতে ধরিয়ে দিয়ে পার্স খুলে কার্ড বের করল মহিলা। তাতে ঠিকানা লিখে কিশোরকে দিয়ে বলল, রাত আটটায় স্টেটলার রয়ালে আসবে। স্যার ওয়ালথার মারিয়াটের সঙ্গে দেখা করে তার অনুষ্ঠান থেকে অর্কিড় নিয়ে গেছ শুনলে খুব খুশি হবেন তোমার চাচা, আমি শিওর। আমাদের একজন সদস্য অনুষ্ঠানের ভিডিও করে রাখবে। ইচ্ছে করলে ক্যাসেটটার কপিও করিয়ে নিতে পারো। তার জন্যে অবশ্য পয়সা লাগবে।
মুসার হাত থেকে ঝুড়িটা নিয়ে নিজের পথে চলে গেল মহিলা।
কার্ডটার দিকে তাকাল কিশোর। নাম লেখা রয়েছে মিসেস স্নো জেলিমেয়ার। নিউ ইয়র্কের রিভারডেলের ঠিকানা। আর স্টেটলার রয়ালটা। পাওয়া যাবে থারটিজের সেভেন্থ অ্যাভেন্যুতে।
বন্ধুদের দিকে তাকাল সে। কি মনে হয় তোমাদের? সৌখিন অর্কিড। চাষীদের সম্মেলনের কথা পত্রিকায় দেখলে দেখতে যাবে মিলার? যেহেতু অর্কিডের ব্যাপার, তার চোখে পড়তেও পারে খবরটা।
মহিলার সঙ্গে যখন কথা বলছিলে, তোমার মতলব তখনই বুঝেছি, রবিন বলল। তোমার ধারণা মিলার এখনও নিউ ইয়র্কেই আছে। কিন্তু ওরকম একটা অনুষ্ঠানে যাওয়ার সাহস কি সে করবে? এফ বি আইয়ের ভয়ে তার। তো লুকিয়ে থাকার কথা।
এফ বি আই তো আর সমস্ত জায়গায় চোখ রাখেনি, ওরা রেখেছে। বিশেষ বিশেষ জায়গায়। নিউ ইয়র্ক থেকে মিলার বেরোতে গেলে ওদের চোখে পড়বে। সুতরাং অত তাড়াতাড়ি বেরোনোর সাহস করবে না সে। পরিস্থিতি ঠাণ্ডা হলে তখন চেষ্টা করবে। এতদিন সে বসে থেকে করবেটা কি? বিরক্ত হয়ে যাবে না? সময় কাটানোর জন্যে হলেও অনুষ্ঠানে যেতে চাইবে। বিশেষ করে অর্কিডের প্রতি তার যখন এত আগ্রহ।
তাহলে এটাই সুযোগ, মুসা বলল। ধরা যাক, সে যাবে। আমরাই বা বসে থাকি কেন?
রাবাতকে ওখানে নিয়ে যাবে কিনা, এটা নিয়ে সমস্যায় পড়ে গেল ওরা। মুসা নেয়ার বিপক্ষে। বলল, নানার মেজাজের ঠিক-ঠিকানা নেই। মিলারকে দেখেই হয়তো জ্বলে উঠবে। প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে ক্ষিপ্ত হয়ে যা খুশি করে বসতে পারে। ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে না আমাদের।
আমরা যে গেছি পরে যদি জানে? প্রশ্ন তুলল রবিন।

নাক কুঁচকাল মুসা, জানলে জানবে।
কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারল না ওরা। হোটেলে ফিরে চলল। রিসেপশন ডেস্কে একটা মেসেজ পেল। রাবাত রেখে গেছেন। আসতে দেরি হবে। রাতের খাওয়া ছেলেদের সঙ্গে খেতে পারবেন কিনা সন্দেহ আছে। ওদেরকে খেয়ে নিতে বলেছেন। সময় না কাটলে সিনেমা দেখতেও যেতে পারে ওরা।
হয়ে গেল সমস্যার সমাধান। সন্ধ্যায় স্থানীয় একটা রেস্টুরেন্টে ডিনার খেলো ওরা। নিউ ইয়র্কের মধ্যে নাকি সবচেয়ে বড় এবং ভাল হিরো স্যান্ডউইচ বানায় ওখানে। কথাটা বোধহয় সত্যি। খাওয়া শেষ করার পর মুসারও মনে হলো তার পেট ঠাসাঠাসি হয়ে গেছে।
রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে ক্রসটাউন বাস ধরে চলে এল স্টেটলার রয়ালে। লিফটে করে তেরোতলার গ্র্যান্ড বলরুমে পৌঁছল।
গ্র্যান্ড অর্থাৎ মহান বলরুমটা অত মহান নয়। গালভরা নামটাই যা। হোটেলটাও পুরানো। লাল কার্পেটের জায়গায় জায়গায় রঙ চটে গেছে। স্ফটিকের ঝাড়বাতিতে পুরো হয়ে জমে আছে ধুলো। লিফট থেকে নামতে তিন গোয়েন্দাকে স্বাগত জানাল মোটা এক লোক। গায়ে সাদা শার্ট। শার্টের বুকের কাছে তার নাম সুতো দিয়ে তোলা। কোন্ জায়গা থেকে এসেছে, তা ও লেখা আছে। তাতে জানা গেল তার নাম বিল কংকি, সাইয়োনেট থেকে এসেছে। ছেলেরা অর্কিডে আগ্রহী শুনে খুব খুশি হলো। স্যার মারিয়াটের বক্তৃতা সহ ভিডিও ক্যাসেটও যে তার অর্কিড়-বিলাসী চাচার জন্যে অবশ্যই নিয়ে যেতে চাইবে কিশোর, এ ব্যাপারেও নিশ্চিত ভবিষ্যদ্বাণী করে দিল।
কি করে ভাল অর্কিড ফলাতে হয়, এ ব্যাপারে লেকচার দেবেন স্যার মারিয়াট, বিল বলল। এর জন্যে ঠিক মত প্যারেন্ট জোগাড় করতে হবে। ভয়ানক ইন্টারেস্টিং।
দৃষ্টি বিনিময় করল মুসা আর রবিন। মুসার পেট ফেটে হাসি আসছে।
ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তাড়াহুড়ো করে চলে গেল বিল, আরও কয়েকজন এসেছে, তাদের স্বাগত জানাতে। মুসা বলল, প্যারেন্ট মানে কি? অর্কিডেরও কি মাতাপিতা থাকে নাকি?
কি জানি! ঠোঁট ওল্টাল রবিন। ইন্টারেস্টও যে কি করে ভয়ানক হয়, খোদাই জানে। সাংঘাতিক বলতে পারত। তা না, ভয়ানক।
থাক, খুঁত ধরা বাদ দাও, হাত নেড়ে বলল কিশোর। ওরকম ধরতে থাকলে বেশির ভাগ মানুষেরই ধরতে পারবে।
তেরোতলার ওই ঘরটা ঘুরে দেখতে শুরু করল ওরা।

প্রায় পুরো ফ্লোরটাই জুড়ে আছে গ্র্যান্ড বলরুম। প্রবেশমুখের বাইরে দুটো করিডর আছে। তাতে দুটো লিফট, হোটেলের গেস্টদের ওঠার জন্যে। লিফট শ্যাফটের পাশে একটা দরজা, তার ওপাশে সিঁড়ি। ডানের একটা হলঘরে রয়েছে কয়েকটা টয়লেট। বায়ের আরেকটা হলঘরে সার্ভিস লিফট, হোটেল কর্মচারীদের ওঠানামার জন্যে। লিফট ছাড়িয়ে গেলে পাওয়া যাবে ছোট প্যানট্রি অর্থাৎ ভাড়ার ঘর। প্যানটি থেকে বলরুমে সরাসরি ঢোকারও দরজা আছে। হলের শেষ মাথায় ভারী একটা দরজা, মুসার সন্দেহ হলো, ওটা দিয়ে বেরোলে আরেকটা সিঁড়ি পাওয়া যাবে। তবে নিশ্চয় সাধারণের চলাচলের জন্যে নয় ওটা। নব ঘুরিয়ে দরজাটা খুলল সে।সিঁড়ি দেখতে পেল। না। সরু এক চিলতে বারান্দার মত, ভারী রেলিঙ দিয়ে ঘেরা, তার ওপাশে খোলা।সে যে দরজাটা খুলেছে, সেটা ছাড়া বারান্দা থেকে বেরোনোর আর কোন পথ নেই। সরে এল সে। আপনাআপনি বন্ধ হয়ে গেল ভারী পাল্লা, খুট করে জায়গামত লেগে গেল নবের প্রিঙ লক।

মিলার এলে হয় লিফট ব্যবহার করতে হবে, নয়তো মেইন করিডরের সিঁড়ি। পালাতে হলেও ওই একই পথে। আর কোন পথ নেই, এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে নিল গোয়েন্দারা। সাইয়োসেটের বিল কংকলিন এখন গিয়ে দাঁড়িয়েছে স্পীকারস টেবিলের সামনে। বিনীত ভঙ্গিতে অতিথিদের সীটে বসতে অনুরোধ করল।

ঘরের একধারে লম্বা টেবিলে নানা রকম অর্কিডের টব রাখা আছে। সেটার দিকেই আগ্রহ বেশি অতিথিদের। সেখানেই ভিড় করছে। বিলের। মোলায়েম স্বরে কাজ হলো না। জোরে জোরে বলতে হলো। তাতেও সুবিধে হলো না। শেষে চিৎকার করে টেবিল চাপড়ে কিছুটা রুক্ষ স্বরেই যখন বসতে বলল, তখন এক দুই করে সরে এল অতিথিরা। সারি দিয়ে রাখা খাটো পিঠওয়ালা চেয়ারে বসল। ছাতে ঝোলানো আলোগুলো ম্লান হতে হতে যখন প্রায় অন্ধকার হয়ে গেল, তখন জ্বলে উঠল স্পটলাইট, আলো ফেলল স্পীকারস টেবিলের কাছে।

মাপা স্বরে বাছাই করা শব্দে অতিথিদের আরেকবার স্বাগত জানিয়ে, কি কারণে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে, জানাল বিল কংকলিন। ঘোষণা করল, স্যার মারিয়াট এখন আপনাদের তার চাষ করা কিছু অর্কিড দেখাবেন। কি করে বাজে প্যারেন্ট থেকেও উঁচু মানের অর্কিড জন্মানো যায়, সে-ব্যাপারে আলোচনা করবেন।

খাইছে! গুঙিয়ে উঠল মুসা। একেবারেই তো নীরস সাবজেক্ট! শুকনো, খটখটে! ঘুমিয়ে না পড়ি!

তার সামনের সীটে বসা মহিলা ফিরে তাকিয়ে ঠোঁটে আঙুল রেখে তাকে কথা বলতে নিষেধ করল।

চেয়ারের পিঠ খাটো হওয়ায় আরাম করে হেলানও দিতে পারল না মুসা। তার মনে হলো, ইচ্ছে করে এ রকম চেয়ারের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাতে বিরক্তিকর বক্তৃতার সময় শ্রোতারা ঘুমিয়ে পড়তে না পারে, শুনতে বাধ্য হয়। তবু যতটা সম্ভব কাধ নিচু করে গা এলিয়ে দিল সে।

স্পীকারের টেবিলের ওপাশে এসে দাঁড়ালেন রোগাটে, প্রায় কঙ্কালসার, আপেলের মত টুকটুকে লাল মুখওয়ালা এক ভদ্রলোক। হাড়িসার হাতের তালু ক্রমাগত ডলছেন। যেন করজোড়ে মিনতি করছেন তার ভয়াবহ বক্তৃতা শোনার জন্যে। বক্তৃতা ভয়াবহই হবে, বিলের কথা থেকেই আঁচ করে নিয়েছে মুসা। ইনিই প্রধান অতিথি স্যার ওয়ালথার মারিয়াট, পরিচয় করিয়ে দিল কংকলিন।

পুরো তিন সেকেন্ড কোন কথা বললেন না মারিয়াট। আন্তরিক হাসিতে কেবল দাঁত দেখালেন অর্কিড় প্রেমিকদের। তারপর বললেন, সম্মানিত ভদ্রমহোদয়গণ। বলেই চুপ। আবার কয়েক সেকেন্ড দাঁত দেখানোর পর বললেন, কয়েক মিনিট আগে মিস্টার কংকলিন আমাকে বললেন, বক্তা হিসেবে একজন ভেজা চাষীকে পেয়ে আজকের সভা নাকি খুবই আনন্দিত। এর আগের সম্মেলনের বক্তা নাকি ছিলেন শুকনো চাষী। ভেজা চাষী কাকে বলেছেন, বুঝতে পারছেন তো? আমাকে।

চাষী কি করে ভেজা কিংবা শুকনো হয় মাথায় ঢুকল না মুসার। নীরব হাসিতে ফেটে পড়ল সে।

কনুই দিয়ে, তো মেরে তাকে থামানোর চেষ্টা করল রবিন। তার মুখেও হাসি।

শব্দ করে হেসে ফেলার ভয়ে বন্ধুদের দিকে তাকাতে পারছে না। কিশোর। জোর করে চোখ আটকে রেখেছে ভেজা চাষীর ওপর।

পেছনে দরজা খোলার মৃদু শব্দ হলো। ফিরে তাকাল সে।

দয়া করে কি কেউ আলোটা নিভিয়ে দেবেন? অনুরোধ করলেন স্যার। মারিয়াট।

প্রায় লাফাতে লাফাতে ছুটে গেল কংকলিন। মাথার ওপরের আলোগুলো আগেই নিভিয়ে দেয়া হয়েছে। স্পটলাইটটাও নিভে গেল। ক্ষণিকের জন্যে অন্ধকারে ঢেকে গেল ঘর। একটা স্লাইড প্রোজেক্টর চালু হওয়ার হালকা গুঞ্জন শোনা গেল। পর্দায় আলো পড়ল। ছবি ফুটল। তাতে দেখা গেল, একটা গ্রীনহাউসে কাজে ব্যস্ত স্যার মারিয়াট। টেবিলে একের পর এক অর্কিড তুলে রাখছেন।

এখন শুনুন, কি করে ভাল, প্যারেন্ট বাছাই করব আমরা, আবছা অন্ধকারে আবার শোনা গেল তার কণ্ঠ। কুড়ি কিংবা ফুল দেখেই অনেক কিছু বোঝা যায়। যারা এর চাষ করে তাদের কাছে ওই জিনিস দুষ্প্রাপ্য নয়, ফুলের জন্যেই তো করে, তাই না? শ্রোতাদের কাছে প্রশ্ন রাখলেন তিনি।

করিডরের দিকের একটা দরজা খুলে গেল। দরজায় এসে দাঁড়ানো গাট্টাগোট্টা একজন মানুষের অবয়ব প্রোজেক্টরের আলোর আভায় চোখে, পড়ল। ঘরের অন্ধকার চোখে সইয়ে নেয়ার অপেক্ষা করছে মনে হলো।
ছবিতে টেবিলের সামনে দাঁড়ানো মারিয়াট তখন নানা রকম ফাস্ক, বীজ আর গাছের চারা নাড়াচাড়া করছেন। কোনটা বাছাই করে কি ভাবে লাগালে ভাল ফলন আশা করা যাবে, বোঝাচ্ছেন।
অন্ধকার ঘরে ঢুকল আগন্তুক। বন্ধ হয়ে গেল দরজা।
মুসার গায়ে খোঁচা দিল কিলোর। আস্তে উঠে রওনা হয়ে গেল ঘরের পেছন দিকে। তাকে অনুসরণ করল মুসা আর রবিন।
খানিকটা সরে এসে ফিসফিস করে কিশোর বলল, ঢুকল যে, ওই লোকটা মিলার, কোন সন্দেহ নেই আমার। হোগারসনকে ফোন করব, দেখি পাওয়া যায় কিনা।
দরজার পাল্লা যতটা সম্ভব কম ফাঁক করে পিছলে বেরিয়ে এল সে। পেছনে বেরোল অন্য দুজন। দাঁড়িয়ে গেল ওখানে। নীরব করিডরে ফোন। কোথায় আছে খুঁজছে ওদের চোখ।
কাছেই আরেকটা দরজা খুলে গেল।
করিডর আর বলরুমের সঙ্গে যোগাযোগকারী বড় দরজাটা নয়, অন্য আরেকটা ছোট দরজা, প্যান্ট্রির কাছে।
মিলার? তিন গোয়েন্দাকে দেখে ফেলে বলরুম থেকে পালাচ্ছে? করিডরে নিশ্চয় ওদের আবছা অবয়ব চোখে পড়েছে তার। ত্রিমূর্তিকে চিনতে অসুবিধে হয়নি মিলারের।
বাঁয়ের ছোট হলটাতে পদশব্দ শোনা গেল। তারপর বাসন-পেয়ালার ঠোকাঠুকি। এবং তারপর একটা গুঞ্জন, নিচতলা থেকে উঠে আসতে আরম্ভ করেছে সার্ভিস্ লিফটটা।
পা টিপে টিপে এসে হলে ঢুকল তিন গোয়েন্দা। লিফটের দিকে তাকাল। গাঢ় রঙের স্যুট পরা একজন লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। অন্ধকারে তার কাপড়ের রঙ বোঝা যাচ্ছে না, কালো দেখাচ্ছে। ওদের দিকে পিঠ। দুহাতে ধরা ট্রেতে কাপ-পিরিচ।
কোন ওয়েইটার? ব্যবহৃত কাপ-পিরিচ নিয়ে নিচে নামতে যাচ্ছে সে?
রবিন বলল, এই দেখো, ওর পায়ে লোফার?
চমকে গেল ওয়েইটার। সামান্য ঘুরে গেল মাথা, এদিকে তাকাল। মুখের একটা পাশ দেখা গেল।
ওভাবেই থাকুন, মিস্টার মিলার। রবিন বলল, আপনার একটা ছবি তুলে নিই!

সঙ্গে ক্যামেরা এনেছে রবিন। বেড়াতে বেরোনোর পর থেকে এটা সব সময় সাথে থাকে তার, কখনও কাছছাড়া করে না। লোকটার দিকে করে শাটার টিপে দিল। ঝিলিক দিয়ে উঠল ফ্ল্যাশার।
রবিনের দিকে লাফ দিল মিলার। একই সঙ্গে চিৎকার করে উঠল। হাত থেকে ট্রে-কাপ খসে পড়ে ঝনঝন করে ভাঙল।
ওই মুহূর্তে খুলে গেল সার্ভিস লিফটের দরজা। মিলারের পাশ দিয়ে ছুটে লিফটে ঢুকে গেল কিশোর আর মুসা। ইমারজেন্সি সুইচ টিপে দিল কিশোর। এটা টিপলে আটকে যায় লিফট, যেখানে আছে সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে। আর অ্যালার্মের লাল, বোতামটা টিপল মুসা। তীক্ষ্ণ শব্দে ঘণ্টা বেজে উঠল। বাজতেই থাকল।
পুলিশ। পুলিশ! বলে চেঁচিয়ে উঠল রবিন। খুন করে ফেলল! বাঁচাও!
রবিনের গলা টিপে ধরতে যাবে মিলার, এই সময় ঝটকা দিয়ে খুলে গেল। বলরুমের দরজা।
আরেকটা ছবি তুলে ফেলল রবিন।
ছুটে বেরিয়ে এল কংকলিন। রাগে কুঁচকে গেছে মুখচোখ। চিৎকার করে বলল, এই, হচ্ছে কি এ সব! বন্ধ করো।
থমকে গেল মিলার দ্বিধায় পড়ে গেছে। চোখ প্রায় অন্ধ করে দিয়েছে। ফ্ল্যাশারের তীব্র আলো।
পুলিশ। আবার চেঁচিয়ে উঠল রবিন, পুলিশ ডাকুন! আমাকে খুন করতে, এসেছে।
আবার টিপল শাটার একেবারে মিলারের মুখের কাছে ক্যামেরা নিয়ে গিয়ে।
ধাক্কা খেয়ে যেন পিছিয়ে গেল মিলার। চোখের সামনে নিয়ে গেছে। দুহাত তারপর ঘুরে দৌড় দিল সার্ভিস লিফটের দিকে।
মুসা আর কিশোর ওখানে অপেক্ষা করছে। ভাঙা কাপ-পিরিচ মাড়িয়ে উঠতে গিয়ে ওদেরকে লক্ষ করল মিলার। উঠল না আর। দৌড় দিল ভারী দরজাটার দিকে মুসার মত সে-ও ভেবেছে ওদিকে সিঁড়ি আছে। দুহাত সামনে বাড়িয়ে ছুটছে সে। নব ঘুরিয়ে একটানে পাল্লাটা খুলে চলে গেল। ওপাশের অন্ধকারে। পান্না ছেড়ে দিতেই আপনাআপনি বন্ধ হয়ে গেল সেটা, তালা লেগে গেল। চাবি ছাড়া ওদিক থেকে খুলতে পারবে না।
বলরুম থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে কৌতূহলী মানুষেরা। মহিলাদের কেউ কেউ ভয় পেয়েছে। করিডরে এসে এদিক ওদিক উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল অর্কিডপ্রেমীর দল।
লিফটের ঘণ্টা বাজা থেমে গেল।
অকস্মাৎ নীরব হয়ে গেল যেন সব কিছু, বড় বেশি চুপচাপ। এরই মাঝে কানে এল একটা চিৎকার। হলের শেষ মাথায় দরজার ওপাশ থেকে আসছে।

বাচাও! চিৎকার করছে মিলার, দরজায় কিল মারছে, দরজা খোলো! বের করো আমাকে! বাঁচাও!
কংকলিনের দিকে ফিরল কিশোর। শান্তকণ্ঠে বলল, মিস্টার কংকলিন, টেলিফোনটা কোথায় বলবেন দয়া করে? এফ বি আইকে ফোন করতে হবে।

.

রেস্টুরেন্টটা অবিশ্বাস্য রকমের বিলাসবহুল। সাদা মখমলের কাপড়ে ঢাকা টেবিলগুলো, জানালার পর্দায় এমব্রয়ডারি করা দামী কাপড়ের পর্দা। সবখানে তাজা ফুলের ছড়াছড়ি। কার্পেট এত পুরু, পা ফেললেই গোড়ালি অবধি দেবে যায়। মেন্যুর বদলে হেডওয়েইটার স্বয়ং এসে নরম, ভদ্রস্বরে কথা বলে খাবারের অর্ডার নিয়ে যায়। নীল টেলকোট আর ডোরাকাটা ভেস্ট পরা অন্য ওয়েইটাররা খাবার সরবরাহ করে। তিন গোয়েন্দার বেলায়ও এর ব্যতিক্রম হলো না। চিঙড়ির একটা বিশেষ ডিশের অর্ডার দিল ওরা। রান্না নাকি খুবই চমৎকার এখানে।
ওদের খাওয়াতে এনেছেন বিখ্যাত চিত্রপরিচালক ডেভিস ক্রিস্টোফার ঘরের চারপাশে তাকাতে তাকাতে বললেন, সিনেমায় তখনও ঢুকিনি। প্রায় পথে পথেই ঘুরে বেড়াচ্ছি বলা চলে, বেকার, কাজ খুঁজছি। এখানে আসার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারতাম না তখন হলে। সাধারণ কোন ফাস্ট ফুড শপের সাধারণ বার্গার পেলেই বর্তে যেতাম। তা-ও সব দিন জোগাড় করতে পারতাম না।
মিনারেল ওয়াটারের গেলাসে চুমুক দিলেন তিনি। হাসলেন। ধনী হওয়ার মজাই আলাদা। কেউ অস্বীকার করতে পারবে না এ কথা। হ্যাঁ, এবার তোমাদের কেসের কথা বলো। কিশোর, পত্রিকায় হ্যারিস মিলারের খবরটা দেখে তোমার মেরিচাচীকে ফোন করেছিলাম। তিনি তো আকাশ থেকে পড়লেন। তিনি জানেন মুসার নানার সঙ্গে তোমরা ছুটি কাটাতে গেছ, বেড়াতে। কল্পনাই করতে পারেননি, স্পাই তাড়া করে বেড়িয়েছ।
হেসে ফেলল মুসা। ছুটিতে বেড়াতে বেরিয়েছি, এটাও যেমন ঠিক : একটা কেস হাতে নিয়ে বেরিয়েছি এটাও ঠিক। কেসটা দিয়েছিল আমার মা
বাবাকে কি করে ঝামেলা মুক্ত রাখার জন্যে তিন গোয়েন্দাকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন মিসেস আমান, খুলে বলল সে। আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করেছি। সেটা করতে গিয়েই স্পাইদের সঙ্গে জড়িয়েছিলাম।
সে-রকমই শুনেছি, পরিচালক বললেন। এ সময় নিউ ইয়র্কে তোমাদের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে, ভাবিনি। ভাল লাগছে। একটা ছবির কাজে এসেছি। নিউ ইয়র্কে শুটিং করতে হবে। মনে হচ্ছে, সিনেমার আরও একটা ভাল গল্প পেয়ে গেলাম। পত্রিকায় তোমাদের কেসের খবরটা পড়ে তাই মনে হলো। এবার বলো সব। পুরো

কাহিনীটা তোমাদের মুখ থেকে শুনতে চাই রবিন, এটা তো বাড়ি নয়, লিখে ফেলার কাজটা নিশ্চয় শুরু করোনি?
করেছি, স্যার, রবিন বলল। আজ সকালে আপনার ফোন পেয়ে তো চমকেই গিয়েছিলাম। আমরাও ভাবতে পারিনি আপনি নিউ ইয়র্কে আছেন, দেখা হয়ে যাবে।
কাহিনী শুরু করল রবিন। গোড়া থেকে বলতে লাগল। কি করে মুসার আম্মা ওদেরকে কাজটা দিয়েছেন। পিজমো বীচে মিলারের সঙ্গে গোলমালের সূচনা থেকে স্টেটলার রয়ালে তাকে পাকড়াও করা পর্যন্ত কিছুই বাদ দিল না। মাঝে মাঝে তাকে কথা জুগিয়ে দিল মুসা আর কিশোর।
চমৎকার! পুরোটা শুনে বললেন পরিচালক। হোটেলের ওয়েইটাররা যে কাজের সময় লোফার পরে না, শুধু এই সামান্য সূত্র দিয়ে কাউকে সন্দেহ করে ফেলাটা সত্যি প্রশংসার যোগ্য। একটা ব্যাপার অবাক করছে আমাকে। সান্তা রোসায়ও তো গাড়ির নিচে উঁকি দিয়েছিলে তোমরা। পেট্রোল ট্যাংকে লাগানো সঙ্কেত পাঠানোর যন্ত্রটা তখন চোখে পড়ল না কেন?
অমন কিছু থাকতে পারে, তখনও ভাবিনি, জবাব দিল কিশোর। তা ছাড়া রাত দুপুরে চোখ তখন এমনিতেই ক্লান্ত, তার ওপর টর্চের ব্যাটারি গিয়েছিল ফুরিয়ে। নানা রকম উত্তেজনার মাঝে ব্যাটারি চেক করতে ভুলে গিয়েছিলাম। সবচেয়ে বড় কথা, মিলার যে দুষ্ট লোক, মিস্টার রাবাতের এ কথায় তখনও গুরুত্বই দিইনি। তাই নতুন ব্যাটারি ভরে ভালমত আবার খোঁজার কথা মনে হয়নি।
আগেও এ ধরনের অপরাধ করেছে কিনা মিলার, জানতে পারিনি। এ সব গোপনীয়, ব্যাপার, তাই এফ বি আই আমাদের সামান্যই জানিয়েছে। হোগারসনের কাছে জেনেছি, বিমানের যন্ত্রপাতি তৈরির একটা কারখানায় কাজ করত মিলার। ইলেকট্রনিক এঞ্জিনিয়ার ছিল সে। সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স ছিল তার, কারখানার মধ্যে যেখানে ইচ্ছে যখন তখন যেতে পারত। তবে কিছুদিন পর চাকরি থেকে বের করে দেয়া হলো তাকে–অন্যান্য টেকনিশিয়ানদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার অপরাধে। হয়তো প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে জেদের বশেই প্রাইয়ের কাজটা করেছে সে। চাকরি যাবে শোনার পর তথ্য চুরি করার সিদ্ধান্ত নেয়, বেরিয়ে আসার আগেই কাজটা সেরে ফেলে।
ছবি ডেভেলপ করার যন্ত্রপাতি ছিল না তার বাড়িতে। কোন ক্যামেরার দোকান থেকে করিয়ে আনারও সাহস করেনি, ঝুঁকি নিতে চায়নি। ক্যামেরাটা সহই দিয়ে দিতে চেয়েছিল ব্যালার্ডকে। কিন্তু তার দুর্ভাগ্য, ক্যামেরাটা বদল হয়ে হাতছাড়া হয়ে গেল। অন্য কারণে তাকে সন্দেহ শুরু করেন মিস্টার রাবাত। মিলার ভাবল,

তার তথ্য চুরির ব্যাপারটা নিয়ে তাকে সন্দেহ করছেন তিনি। চোরের মন পুলিশ পুলিশ!
হু, মাথা ঝাঁকালেন পরিচালক। অপরাধী এ ভাবেই নিজেকে ধরিয়ে দেয়।
মুসা বলল, যতই এগিয়ে যেতে লাগলাম আমরা, ক্যামেরাটার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠল মিলার। ওটা যে বদল হয়ে গেছে, ধরতে পারেনি রবিন। সে বুঝতে পারার আগেই তার কাছ থেকে ওটা কেড়ে নিতে চেয়েছিল মিলার।
সে-সব তো আগেই শুনলাম। ব্যালার্ডের কি খবর? তাকে ধরেছে?
মুহূর্তের জন্যে কালো হয়ে গেল কিশোরের মুখ। ও পালিয়েছে। হোগারসনের কাছে শুনলাম, মিলার ধরা পড়ার পরদিন নাকি ভিয়েনায় দেখা। গেছে তাকে। এফ বি আইয়ের জাল কেটে বেরিয়ে গেছে সে।
তারমানে ওস্তাদ গুপ্তচর সে। অনেক দিন ধরে আছে এ লাইনে।
যতবড় ওস্তাদই হোক, মুসা বলল, আমাদের কাছে একটা মার খেয়ে গেছে। যে ফিল্মগুলো নিয়েছে রবিনের ব্যাগ থেকে, সব বাতিল জিনিস। ডেভেলপ করার পর দেখবে কিচ্ছু ওঠেনি। মুখটা তখন পচা ডিম হয়ে যাবে। হয়তো গালাগাল করবে আমাদের, কিন্তু লাভ হবে না কিছুই।
মৃদু হাসি ফুটল পরিচালকের ঠোঁটে। মাথা ঝাঁকালেন। তা বটে। তো, মুসা, তোমার নানার আবিষ্কারটা কি? বিক্রি করতে পেরেছেন?
হাসল মুসা। পেরেছে। বিশেষজ্ঞরা বলছে, সত্যিই কাজের জিনিস। গাড়িতে ওটা পাইনি আমরা তার কারণ, গাড়িতে ছিল না। আক্রমণ আসতে পেরে ভেবে ওটা আগেই ডাকে রিভারভিউ প্লাজায় পাঠিয়ে দিয়েছিল, নিউ ইয়র্ক এসে প্রথম যে হোটেলে আমরা উঠেছিলাম। ম্যানেজারকে বলে রেখেছিল, আমরা না আসা পর্যন্ত যেন খামটা নিরাপদ জায়গায় রাখা হয়। রেখে দিয়েছিল ম্যানেজার। সেজন্যেই মিলার পিছে লাগায় আবিষ্কার খোয়া যাওয়ার ভয় ছিল না নানার, লোকটাকে দেখতে পারে না বলে ভীষণ খেপে গিয়েছিল।
কিন্তু আবিষ্কারটা কি? সামরিক বাহিনীর কাজে লাগবে এমন কিছু?
না, মহাকাশচারীদের কাজে লাগবে। গির্জার হলের জন্যে প্রিঙ্কলার। সিসটেম বানাতে গিয়ে এক ধরনের নতুন ভালভ আবিষ্কার করে বসে নানা। এর মধ্যে একটা অটোম্যাটিক সেনসর থাকবে। বর্তমানে যে সব ভালভ ব্যবহার করে নভোচারীরা তার চেয়ে অনেক ছোট আর হালকা বলে বহন করতেও সুবিধে। স্পেসস্যুটের ভেতরে বসানো এই জিনিসটা তাপমাত্রা আর চাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে বলে অন্যান্য বেশ কিছু যন্ত্রপাতি ছেটে ফেলা যাবে, তাতে স্যুটের আকার আর ওজন দুটোই অনেক কমানো যাবে। শিপ থেকে বেরিয়ে মহাকাশে ঘোরাফেরা করতে অনেক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবে নভোচারীরা।

তারমানে ভাল জিনিসই আবিষ্কার করেছেন!
হ্যাঁ। নানাকে নিয়ে টানাটানি শুরু করেছে এখন কয়েকটা ফার্ম, NASA-র অনেক জিনিস সাপ্লাই দেয় ওরা। একজন উকিল নিযুক্ত করেছে। নানা। তাকে নিয়ে কোম্পানিগুলোর সঙ্গে মাটিঙে বসছে। ভোরে বেরোয়, রাত করে ফেরে। সাংঘাতিক খাটুনি যাচ্ছে। সেই তুলনায় মেজাজ খারাপ হচ্ছে না। রাতে এসেও হেসে হেসে কথা বলে আমাদের সঙ্গে। রসিকতা করে। আগে যেটা একেবারেই করত না। হয় চুপ করে থাকত, নয়তো খেউ খেউ করে উঠত।
আসল কথাটা হলো দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পেয়েছেন। মানসিক চাপ থাকলে ভাল মেজাজ খারাপ হয়ে যায় হাসলেন তিনি হলে একটা ব্যাপার বোঝা যাচ্ছে, এই দীর্ঘ যাত্রায় একসঙ্গে থেকে থেকে অনেক কাছাকাছি চলে এসেছেন তোমাদের। নিঃসঙ্গ জীবনে তিন তিনজন ভাল বন্ধু জুটিয়ে নিয়েছেন।
হাসল না কেবল মুসা।
এখন আসল কথা শোনো, পরিচালক বললেন, খাওয়াতে এনেছি। কোথাও আরামে বসে তোমাদের গল্পটা শোনার জন্যে। আরও একটা প্রস্তাব– দিতে পারি, হাতে কাজ না থাকলে আমার সঙ্গে যেতে পারো। আমার নতুন ছবিটার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হবে আজ রাতে। মিস্টার রাবাকে ফোন করে দাও। সম্ভব হলে যেন সন্ধ্যার দিকে চলে আসেন আজ তিনি। কয়েক ঘণ্টা সময় দেন আমাদের।
পরিচালকের প্রস্তাবে খুশি হলো কিশোর।
তবে মুসাকে তেমন খুশি দেখাল না। আমতা আমতা করে বলেই ফেলল, এ ধরনের অনুষ্ঠানে যেতে ভয় লাগে আমার, স্যার।
অবাক হলেন পরিচালক। কেন?
অর্কিডপ্রেমীদের অনুষ্ঠান তো দেখলাম। বাপরে বাপ! ঢাকায় গিয়ে বাংলাদেশ টেলিভিশনের একটা আলোচনা অনুষ্ঠান দেখেছিলাম একবার। টিভির সামনে থেকে উঠে সোজা দৌড় দিতে ইচ্ছে করে। অর্কিডওয়ালারা। তার চেয়ে বিরক্তিকর!
হেসে ফেললেন পরিচালক। না, অতটা বিরক্তিকর লাগবে না আমাদের অনুষ্ঠান, কথা দিতে পারি তোমাকে, উত্তেজনা আর আনন্দের অনেক খোরাক পাবে। সবচেয়ে বড় কথা, প্রচুর খাবার সাজানো দেখবে টেবিলে, মুসার দিকে সরাসরি তাকালেন তিনি। চোখে মিটিমিটি হাসি। তোমার পছন্দ মত।
এইবার হাসি ফুটল মুসার মুখে। তাহলে স্যার আর কোন আপত্তি নেই আমার।

ভলিউম ২৮ – বিপজ্জনক খেলা – তিন গোয়েন্দা – রকিব হাসান – সেবা প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ: মে ১৯৯৮

মনটা খারাপ হয়ে গেছে ওদের। হঠাৎ করেই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন আন্ট জোয়ালিন। অথচ রকি বীচ থেকে যখন রওনা দিয়েছিলেন, তখন দিব্যি সুস্থ। রাস্তায় গাড়ি চালাতে চালাতে পেটব্যথা শুরু হলো। শোরটাউনে পৌঁছতে পৌঁছতে একেবারে কাহিল। তার বোন মিস কিশোর থ্রিলার ভায়োলার বাড়িতে থেকে যেতে বাধ্য হয়েছেন। ডাক্তার ডাকা হয়েছে। এসে ওষুধপত্র দিয়ে গেছেন। বলে গেছেন, আগামীদিনের আগে ভাল হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

মিস ভায়োলার বাড়িতে অবশ্য এমনিতেও উঠত ওরা–আন্ট জোয়ালিন, তিন গোয়েন্দা এবং কোরি ড্রিম। এখানে থেমে গোস্ট আইল্যান্ডে যাওয়ার অপেক্ষা করত। প্রতিদিন একবার করে দ্বীপে যায় লঞ্চটা। ধরতে না পারলে পরের দিনের জন্যে অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

কোরি ড্রিম তিন গোয়েন্দার বান্ধবী, এক স্কুলে একই ক্লাসে পড়ে। আন্ট জোয়ালিন কোরির খালা। গরমের ছুটিতে গোস্ট আইল্যান্ডে বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছিলেন ওদের। তিন গোয়েন্দার ওখানে যাওয়ার দুটো কারণ–ছুটি কাটানো এবং ভূত দেখা। কোরির দৃঢ় বিশ্বাস, গোস্ট আইল্যান্ডের একমাত্র হোটেল নাইট শ্যাডো-তে ভূত আছেই। যেমন নাম দ্বীপের, তেমনি হোটেলের। কৌতূহল ঠেকাতে পারেনি গোয়েন্দারা। যেতে রাজি হয়ে গেছে।

ভাল রোদ ঝলমলে দিন দেখে রওনা হয়েছে ওরা। পথে যে এ রকম একটা অঘটন ঘটবে কে ভাবতে পেরেছিল?

কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিরাশ হতে হলো না। সেদিনই সন্ধ্যার লঞ্চ ধরতে ওদের রাজি করালেন আন্ট জোয়ালিন। বললেন, তোরা চলে যা। কাল শরীর ভাল হয়ে গেলে আমিও যাব। না পারলে পরশু।

অহেতুক আন্ট ভায়োলার বাড়িতে বসে থাকার মানে হয় না। শোরটাউনে দেখার কিছু নেই। সুতরাং কোরিকে নিয়ে লঞ্চঘাটে রওনা হলো। তিন গোয়েন্দা।

ট্যাক্সি নিয়ে ছোট্ট শহরের সরু রাস্তা ধরে লঞ্চঘাটে পৌঁছল ওরা। রাস্তায় লোকজন তেমন নেই। যা আছে, বেশির ভাগই টুরিস্ট। ডকের শেষ মাথায় একধারে একটা ছোট কাঠের সাইনবোর্ডে লেখা: গোস্ট আইল্যান্ড টুরস। নিচে তীরচিহ্ন দিয়ে বোঝানো হয়েছে কোন ঘাট থেকে দ্বীপে যাওয়ার লঞ্চ ছাড়ে।

সেদিকে এগিয়ে গেল ওরা।

ছোট একটা বোট থেকে লাফিয়ে নেমে এল হাসিখুসি এক তরুণ। হেসে জিজ্ঞেস করল, গোস্ট আইল্যান্ডে যাবে?

কিশোর জবাব দিল, হ্যাঁ।
আমি এই লঞ্চের সারেং। এসো।
ব্যাগ-সুটকেস নিয়ে লঞ্চে উঠে পড়ল তিন গোয়েন্দা। হাত ধরে কোরিকে উঠতে সাহায্য করল সারেং। শুধু ওরাই। আর কোন যাত্রী দেখল না। অবাক লাগল কিশোরের।
সামনের দিকে এগিয়ে গেল তিন গোয়েন্দা। সরু কাঠের বেঞ্চের নিচে ঢুকিয়ে দিল ব্যাগগুলো। সবজে-ধূসর ঢেউ লঞ্চের কিনারে বাড়ি মারছে ছলাৎ ছল ছলাৎছল। খানিক দুরে সৈকতের বালিতে ফেলে দেয়া আবর্জনায় খাবার নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে চার-পাঁচটা সী গাল।
ওরা উঠতেই আর দেরি করল না সারেং। ডকের সঙ্গে বাঁধা লঞ্চের দড়িটা খুলে দিয়ে এঞ্জিন স্টার্ট দিল। বিকট গর্জন করে উঠল পুরানো এঞ্জিন। জেটির কাছ থেকে সরে যেতে শুরু করল লঞ্চ।
কেবিনের দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছে কিশোর। বাতাস ভেজা ভেজা। ঠাণ্ডা।
আচমকা ভীষণ দুলে উঠল লঞ্চ। জেটি থেকে সরে আসতেই বিশাল ঢেউ ধাক্কা মেরেছে। সীটে বসেও প্রচণ্ড ঝাঁকি খেল যাত্রীরা। সাংঘাতিক দুলুনি।
মজা পেয়ে হেসে উঠল কোরি। হাসিটা সংক্রামিত হলো অন্য তিনজনের মাঝে।
ভয় পাচ্ছ? হেসে জিজ্ঞেস করল সারেং। আজ অতিরিক্ত ঢেউ।
দারুণ! মুসা বলল। মনে হচ্ছে নাগরদোলায় চড়ছি।
রেলিঙের কাছে গিয়ে দাঁড়াল কোরি। আধ মিনিটেই অর্ধেক কাপড় ভিজিয়ে সরে চলে এল। বৃষ্টির ছাটের মত এসে গায়ে লাগে পানির কণা।
শোরটাউন থেকে বেশি দূরে না দ্বীপটা। বেশিক্ষণ লাগল না পৌঁছতে। তীরের দিকে তাকিয়ে ডকের এপাশ ওপাশ খুঁজল মুসা, কই? আমাদের না নিতে আমার কথা? কেউ তে এল না।
কোরি বলল, বুঝতে পারছি না। হয়তো দেরি দেখে ফিরে গেছে।
সারেঙের দিকে ফিরল কিশোর, আসতে দেরি করেছি নাকি?
আর দিনের চেয়ে কিছুটা তো দেরিই।
হু, কোরির দিকে তাকাল কিলোর। তারমানে মেলবয়েস লোক পাঠিয়েছিলেন ঠিকই। লঞ্চ না দেখে ফিরে গেছে।
ডকে ভিড়ল লঞ্চ। লাফ দিয়ে দিয়ে নামল ওরা। সারেং নামল না। ওপর থেকে ওদের ব্যাগ-সুটকেসগুলো বাড়িয়ে দিল এক এক করে।
দমকা বাতাসে ওদের দুই পাশে ধুলোর ঘূর্ণি উড়ল।
দ্বীপ বটে একখান! আনমনে বিড়বিড় করল সারেং

চারপাশে তাকাল কিশোর। শেষ বিকেলের রোদে এত সুন্দর লাগছে জায়গাটাকে, বাস্তব মনে হয় না। আকাশের গোলাপী রঙ রাঙিয়ে দিয়েছে সাগরের পানিকে। ঢেউ আছড়ে পড়ছে সাদা বালিতে। ডকের দুদিকে বহুদূর লম্বা হয়ে ছড়িয়ে গেছে সৈকতটা।
সরু একটা রাস্তা এঁকেবেঁকে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উঠে ঢুকে গেছে। পাইনবনের ভেতর। ওপর দিকে তাকালে বন ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না।
হোটেলটা কই? জানতে চাইল কিশোর।
শেষ ব্যাগটা মুসার হাতে তুলে দিল সারেং। শার্টের আস্তিন দিয়ে কপালের ঘাম আর নোনা পানি মুছল। হাত তুলে বনের দিকে দেখিয়ে বলল, ওখানে।
বনের ভেতর দিয়ে যেতে হবে? ঘাবড়ে গেল মুসা। ভূতের ভয় তার ষোলো আনা। আসার ইচ্ছেও ছিল, আবার না-ও। ভুতকে ভয় পায়, এদিকে দেখার কৌতূহলও সামলাতে পারেনি।
হ্যাঁ, সারেং বলল। এই রাস্তা ধরে চলে যাবে। লঞ্চের দড়ি খুলতে আরম্ভ করল সে। একটা গেটহাউস দেখতে পাবে। হোটেলটার চারপাশ, ঘিরে বেড়া দেয়া। যাও, পেয়ে যাবে গেট।
দড়ির খোলা মাথাটা ডেকে ফেলে দিয়ে এঞ্জিন স্টার্ট দিল সে। দ্রুত সরিয়ে নিতে শুরু করল ডকের কাছ থেকে। ওর এই তাড়াহুড়াটা ভাল লাগল না মুসার। বনের দিকে তাকাল। যাব কি করে? শাটলবাস আছে?
তার কথার জবাব দিল না সারেং। অনেক সরে গেছে। বিকট শব্দ করছে। এঞ্জিন। ওদের দিকে একবার হাত নেড়ে লঞ্চের নাক ঘুরিয়ে দিল সে। একটিবারের জন্যেও আর ফিরে তাকাল না।

.

লোকজন তো কাউকেই দেখছি না, নিজের ব্যাগটা হাতে নিয়েও আবার নামিয়ে রাখল কিশোর।
আমাদের কথা ভুলেই গেল কিনা কে জানে, কোরি বলল।
দাঁড়িয়ে না থেকে চলো হাঁটি।
একটা জিনিস অবাক লাগেনি তোমাদের? রবিন বলল, লঞ্চে আমরা ছাড়া আর কোন যাত্রী ছিল না। একজন টুরিস্টও এল না কেন?
সমুদ্রের অবস্থা খারাপ দেখে সাহস পায়নি হয়তো, অনুমান করল। মুসা।
মনে হচ্ছিল সাগরটা যেন ইচ্ছে করে ঠেলে আসতে চেয়েছে আমাদের। দিকে, কালো ছায়া পড়ল কোরির মুখে! এখানে আসতে বাধা দিচ্ছিল আমাদের।
খাইছে! গলা কেপে উঠল মুসার। ওরকম করে বোলো না। আমার ভয় লাগছে।

আরে কি সব ফালতু কথা শুরু করলে, বনের দিকে তাকিয়ে আছে। কিশোর। কেউ আসে কিনা দেখছে।
ফালতু দেখলে কোথায়? তর্ক শুরু করল কোরি। সুস্থ মানুষ, হঠাৎ করেই অসুস্থ হয়ে গেলেন আন্ট জোয়ালিন। সাগরের ঢেউ ঠেলে এসেছে। আমাদের দিকে। এসবই খারাপ লক্ষণ : নিজের অজান্তেই হাত উঠে গেল। গলার লকেটটার কাছে। আঙুলগুলো চেপে ধরল কাচের তৈরি মানুষের খুলির। মত দেখতে রঙিন লকেটটা। রকি বীচের এক অ্যানটিক শপ থেকে জোগাড় করেছে সে। দোকানদার বলেছে, বহু পুরানো জিনিস। প্রাচীন একটা কবরে পাওয়া গেছে। এটা যার গলায় পরা থাকবে. ড্রাকুলার মত সাংঘাতিক ভূতও। তার কিছু করতে পারবে না।
উফফ, বিরক্ত হয়ে বলল কিশোর, এক মুসার যন্ত্রণাতেই বাঁচি না, আরও একজন যুক্ত হলো। অই কোরি, তোমার ওই ভুত, অশুভ লক্ষণ, এসব নিয়ে লেকচার থামাবে?
ভূত দেখতেই কিন্তু এখানে এসেছ তোমরা।
ও একটা কথার কথা। আমি এসেছি আসলে বেড়াতে। ভুত যদি থাকেই, মুসাকে নিয়ে দেখিয়ে দিয়ে। পরে এখন চলো যাওয়া যাক
কেন, শাটলবাসের জন্যে অপেক্ষা করবে না মুসার দিকে আড়চোখে তাকাল রবিন।
শাটলবাস না, কচু আসবে এখানে মুখ ঝামটা দিয়ে বলল কোরি। তার চেয়ে বরং হাত নাড়ো, ট্যাক্সি চলে আসুক।
ঠাট্টা করছ নাকি? মনে হচ্ছে যেন মোড়ের কাছে বসে তোমার অপেক্ষা করছে গাড়িওয়ালা, কিশোর বলল এখানকার সুবিধা-অসুবিধা আন্ট জোয়ালিন তো সবই বলে দিয়েছেন। এখন বিরক্ত হও কেন?
কিন্তু ডকের কিনার থেকেই যে খাড়া পাহাড়ে চড়তে হবে একথা বলেনি. বিশাল দুটো সুটকেসে জিনিসপত্র ভরে নিয়ে এসেছে কোরি। এরকম বোঝা বইতে হবে জানলে আনত না বিরক্তমুখে নিচু হয়ে দুহাতে তুলে নিল দুটো সুটকেস।
নিজের ক্যানভাসের ব্যাগটা কাঁধের ওপর ফেলল মুসা। হাত বাড়াল কোরির দিকে, একটা দাও আমাকে। তুমি দুটো নিতে পারবে না।
কিন্তু দিল না কোরি। বলল, না, পারব।
চাপাচাপি করল না মুসা ঠিক আছে, না পারলে দিয়ে দিয়ে।
রাস্তা ধরে উঠতে শুরু করল, ওরা ঢুকে পড়ল পাইনবনে। কিছুদূর এগোতে পাথরের একটা গেটহাউজ দেখা গেল দুপাশ থেকে উঁচু লোহার শিকের বেড়া চলে গেছে দুদিকে। সারেং বলেছে হোটেলের পুরো সীমানাই ঘিরে রেখেছে ওটা।

গেটহাউজে কোন লোক পড়ল না। বেড়ার গায়ে সাইনবোর্ডে বড় বড় ইংরেজিতে অক্ষরে লেখা–
হোটেল নাইট শ্যাডো
প্রাইভেট প্রপার্টি
গেটে তালা থাকলেই হয় এখন, রবিন বলল, ঢুকতে আর হবে না।
কি যে বলো না, অস্বস্তি চাপা দিতে পারল না কোরি, তালা থাকবে কেন?
আছে কিনা দেখলেই তো হয়, লম্বা পা ফেলে আগে আগে গিয়ে গেটের সামনে দাঁড়াল মুসা। ঠেলা দিল পাল্লায়।
নড়ল না ওটা।
একপাশের পুরানো আমলের হাতল দেখিয়ে বলল রবিন, ওটা ঘোরাও। খুলে যাবে।
ঘুরিয়ে আবার ঠেলা দিল মুসা। খুলল না গেট।
তালা দেয়া! নাটকীয় ভঙ্গিতে হাত থেকে সুটকেস দুটো ছেড়ে দিল। কোরি। আমি জানতাম, এমন কোন কিছুই ঘটবে।
আরে এত অধৈর্য হচ্ছ কেন? গেটহাউজের ভেতর উঁকি দিয়ে দেখে বলল কিশোর, ফোন আছে। হোটেলে ফোন করে তালা খুলে দিতে বলব।
আকাশের দিকে তাকাল কোরি। এত তাড়াতাড়ি অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে কেন?
অন্ধকার হচ্ছে না। গাছপালার ছায়ার জন্যে অন্ধকার লাগছে। আলো ঢুকতে পারছে না ঠিকমত, দেখছ না?
সরু কাচের দরজা ঠেলে খুলে গেটহাউজে ঢুকল কিশোর। ফোন তুলে নিল। কুঁচকে ফেলল ভুরু।
দরজায় মাথা ঢুকিয়ে দিয়েছে মুসা। কি হয়েছে?
ডায়াল টোন নেই।
ইন্টারকম ফোন হতে পারে। হোটেলের রিসিভারে সরাসরি লাইন দেয়া।
তাতে কি? ডায়াল টোন তো থাকবে। রিসিভার রেখে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল কিশোর।
তারমানে বাইরেই আটকা পড়লাম, মুসার গলায় অস্বস্তি।
পড়লে পড়ব, দুষ্টু হাসি খেলে গেল কিশোরের মুখে। আজকের রাতটা নাহয় সৈকতেই কাটাব। বেড়াতেই তো এলাম।
ভাল হবে! উত্তেজনায় চকচক করে উঠল কোরির চোখ।
তা তো হবেই, মুখ গোমড়া করে ফেলেছে মুসা। খাব কি?
অ্যাই, গেট খোলা যাবে, বলে উঠল রবিন।
ঝট করে ফিরে তাকাল কিশোর, কি করে বুঝলে?

ওই যে, হুড়কো। ওটা সরালেই হয়। কারও অপেক্ষা না করে নিজেই হুড়কোটা সরিয়ে দিল রবিন। খুলে ফেলল পাল্লা।
চলো চলো, ঢুকে পড়ি! চিৎকার করে তাড়াতাড়ি সুটকেস দুটো তুলে নিল কোরি। দেরি করলে যেন আবার বন্ধ হয়ে যাবে গেট।
সৈকতে রাত কাটানো আর হলো না তাহলে আমাদের, কিশোরের কণ্ঠে কৃত্রিম হতাশা।
সারা গ্রীষ্মকালই পড়ে আছে সামনে, গেটটা খুলতে পেরে খুব খুশি রবিন, যত ইচ্ছে সৈকতে রাত কাটাতে পারব।
ঢাল বেয়ে উঠে চলল ওরা। দুধারে গাছপালা। মাথার ওপর পাখির কলরব। সামনে দিয়ে দৌড়ে চলে গেল একটা খরগোশ।
গাছপালার ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ল হোটেলটা।
দারুণ তো! বলে উঠল রবিন।
দাঁড়িয়ে গেল সবাই। তাকিয়ে আছে। বিশাল পুরানো আমলের বাড়ি। সাদা দেয়াল। ঢালু লাল টিনের চাল। সাজানো লন। মূল বাড়ি থেকে দুটো শাখা বেরিয়ে উঠে গেছে দুদিকের পাহাড় চূড়ায়। বড় লাল সদর দরজাটার দুদিকে দুটো পর্দা টানা বারান্দা। দুই সারি করে চেয়ার পাতা।
আরও কাছে এগিয়ে হোটেলের পেছনে উপসাগরটা চোখে পড়ল ওদের। কাঠের সিঁড়ি নেমে গেছে সৈকতে। ছোট ডকে কয়েকটা নৌকা বাধা।
খাইছে! দারুণ একটা সৈকত, চোখ বড় বড় করে বলল মুসা।
হ্যাঁ, কিশোর বলল, খুব সুন্দর।
আন্ট জোয়ালিন যতটা বলেছে, তারচেয়ে সুন্দর, হাঁ করে তাকিয়ে আছে কোরি।
ওই দেখো একটা নুইমিং পুল, হাত তুলল রবিন। কত্তবড় দেখেছ! পেছনের ওটা কি? পুলহাউজ নাকি?
কিন্তু লোকজন তো কাউকে দেখছি না, নিচের ঠোঁট কামড়াল কিশোর।
সামনে বিছিয়ে থাকা রাজকীয় হোটেলটার দিকে তাকিয়ে আছে কোরি। তাই তো! পুলেও কেউ নেই।
ডিনারে বসেছে হয়তো, মুসা বলল। আমারও এখন ওখানেই বসার ইচ্ছে।
কিন্তু আলো কই? ঘরে আলো নেই। বারান্দায় কেউ নেই। সৈকতে কেউ হাঁটছে না। হোটেলের সামনেও নেই কেউ। অস্বাভাবিক লাগছে না?
তাই তো! বলল কোরি।
মুখ দেখে মনে হলো চিন্তায় পড়ে গেছে কিশোর।
দামী পাথরে তৈরি সিঁড়ি বেয়ে লাল দরজাটার কাছে উঠে গেল ওরা। ডাবল ডোর। বিশাল কাঠামো। দরজা খোলার চেষ্টা করল কোরি। খুলল না। বেল

বাজাল শেষে।
বাড়ির ভেতরে ঘণ্টা বাজল কোনখানে।
দুই মিনিট অপেক্ষা করল কোরি। তারপর আবার বাজাল।
কয়েক ইঞ্চি ফাঁক হলো পাল্লা। ফ্যাকাসে চেহারার এক প্রৌঢ়কে উঁকি দিতে দেখা গেল। উষ্কখুষ্ক চুল। বিরক্তমুখে ওদের দিকে তাকিয়ে খড়খড়ে শুকনো গলায় বলল, যাও এখন। হোটেল বন্ধ।
দরজাটা টেনে আবার লাগিয়ে দিল সে।

.
চিন্তিত ভঙ্গিতে লাল দরজাটার দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর।
রবিন বলল, ভুল হোটেলে চলে এলাম তো?
দরজার পাশে দেয়ালে গাঁথা ব্রোঞ্জের, চকচকে প্লেটটা দেখাল কিশোর। তাতে লেখা:
হোটেল নাইটশ্যাডো।
এসটাবলিশড ১৮৫৫
এক নামের দুটো হোটেল আছে তাহলে, বলল রবিন। চলো, আমাদেরটা খুঁজে বের করি।
হাত নেড়ে মুসা বলল, আরে নাহ, এত ছোট দ্বীপ। আর হোটেল তুলবে কোথায়? তা-ও আবার এক নামে দুটো। এটাই।
জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে নিজের সুটকেসে লাথি মারল কোরি, নাহ, কিছু বুঝতে পারছি না। কোন রকম ফাঁক রাখেননি আন্ট জোয়ালিন। ফোনে কয়েকবার করে কথা বলেছেন হোটেলের মালিকের সঙ্গে...
কিন্তু এখানে তো লোকই নেই, মুসা বলল। খালি হোটেল। বোর্ডার নেই। হোটেল বন্ধ। লোকটা ঠিকই বলেছে।
আর কি কর্কশ গলা লোকটার, নাক কুঁচকাল রবিন। আরেকটু ভাল করে বলতে পারল না?
আমার কি মনে হয় জানো? কোরি বলল। লোকটা নিশ্চয় মাটির নিচের ঘরে কোন দানব বানাচ্ছে। আজ রাতে প্রাণ সঞ্চার করবে ওটাতে। তাই কারও নাক গলানো পছন্দ করছে না।
চমকে গেল মুসা। খাইছে! ফ্রাঙ্কেনস্টাইন! লোকটাকে লাগলও কিন্তু ডক্টর
আরে দূর, থামো তো! হাত নেড়ে থামিয়ে দিল ওকে কিশোর। কিসের মধ্যে কি। জ্বালাবে তোমরা, বুঝতে পারছি।
ওদেরকে অবাক করে আবার হাঁ হয়ে গেল দরজাটা। লম্বা, সুদর্শন চেহারার একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছেন। সাদা এলোমেলো চুল, সাদা গোফ। গায়ে সাদা

সাফারি শার্ট, পরনে সাদা প্যান্ট। ওদের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। চোখের কালো মণি দুটো ঝিলমিল করে উঠল তারার মত।
গুড ইভনিং, ভারী গমগমে কণ্ঠস্বর। হাসিটা মোছেনি মুখ থেকে। ওদের দিকে তাকিয়ে পরিচিত কাউকে খুঁজলেন যেন।
কথা বলতে গেল কোরি। ওকে থামিয়ে দিয়ে বললেন তিনি, আমার চাকর উলফের ব্যবহারে কিছু মনে কোরো না। তোমাদের বয়েসী ছেলেমেয়েদের ও পছন্দ করে না। কোরির দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমাদের এখানে একা দেখে আমারও অবাক লাগছে। জোয়ালিন এল না? ওরও তো আসার কথা ছিল।
হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়ল, জবাব দিল কোরি। শোরটাউনে– ছোটখালার বাড়িতে আছে। আমাদের চলে আসতে বলল। কাল শরীর ভাল হলে আন্টি আসবে। আপনাকে ফোন করে বলেনি কিছু?
ও, তুমি নিশ্চয় কোরি, কোরির প্রশ্নের জবাব দিলেন না তিনি। লম্বা একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে ওর হাতটা চেপে ধরে ঝাঁকালেন। চেহারায় অনেক মিল আছে।
থ্যাংক ইউ, অনিশ্চিত ভঙ্গিতে বলে কোনমতে হাতটা ছাড়িয়ে নিল কোরি।
এক্সকিউজ মী। আমিও তো উলফের মত অভদ্র হয়ে গেলাম দেখি। ঢুকতেই দিচ্ছি না তোমাদের, বলে তাড়াতাড়ি দরজা থেকে সরে দাঁড়ালেন তিনি। নিজের পরিচয়টা দিয়েই ফেলি। আমি ব্যারন রোজার সাইমন ডি মেলবয়েস। মেলবয়েস দি থার্ড। এই হোটেলের মালিক।
রোজার সাইমন মেলবয়েস? ভুরু কুঁচকে ফেলল রবিন। ব্ল্যাক ফরেস্ট টাউনের গোস্ট লেনে আমাদের একটা বাড়ি আছে। সেখানে পথের মাথায়। একটা অনেক বড় পোড়া বাড়ি…
ওটা ছিল আমার দাদার ভাইয়ের, মেলবয়েস বললেন। রহস্যময় একজন মানুষ ছিলেন তিনি, নিশ্চয় শুনেছ। ব্ল্যাক ফরেস্টে বহুদিন যাই না। এখানেই থাকি এখন। অনেক বদলে গেছে নাকি ব্ল্যাক ফরেস্ট?
খুব একটা না।
ব্ল্যাক ফরেস্ট গোরস্থানের লাশেরা সব এখনও কফিনেই রয়েছে তো? মাথা পেছনে ছুঁড়ে দিয়ে, চোখ বুজে হেসে উঠলেন মেলবয়েস। কেন এ প্রশ্ন করলাম নিশ্চয় বুঝতে পারছ। ওখানকার লাশ মাঝে মাঝেই ভূত হয়ে কফিন থেকে বেরিয়ে আসার বদনাম আছে তো।
পরস্পরের দিকে তাকাল মুসা আর কোরি। চোখে অস্বস্তি।
সামনের লবিতে ঢুকল সবাই। চারপাশে তাকিয়ে দেখতে লাগল কিশোর। বিশাল লবি। প্রচুর আসবাবপত্র। ডার্ক উডের দেয়াল। কাঠের তৈরি বড় বড় কড়িবরগা। একদিকের দেয়াল ঘেঁষে রাখা হয়েছে অনেকগুলো চেয়ার-টেবিল। ডার্ক উড,

নরম মখমল আর চামড়ার গদির ছড়াছড়ি। হোটেলটাকে গ্রীবাস না বলে হান্টিং লজ বললেই মানায় ভাল।
ব্যাগ-সুটকেসগুলো এখানেই রেখে দাও, মেলবয়েস বললেন। তোমাদের ঘর গোছাচ্ছে উলফ। গুছিয়ে এসে এগুলো নিয়ে যাবে।
বোর্ডাররা কই? জানতে চাইল কোরি।
নেই। হোটেল বন্ধ। গোফের এককোণ ধরে টানতে টানতে কোরির দিকে তাকিয়ে বললেন মেলবয়েস। বোঝার চেষ্টা করলেন ওর কি প্রতিক্রিয়া হয়। তোমার আন্টি আমার চিঠি পায়নি?
চিঠি?
হ্যাঁ। গত সপ্তা থেকে ফোন খারাপ। সেজন্যে চিঠি দিয়ে জানিয়েছি। হোটেলের ডাইনিং রুম আর ওল্ড উইঙের কয়েকটা ঘর মেরামত করতে হচ্ছে আমাদের। নতুন করে আসবাব দেব ঘরে ঘরে, জোয়ালিন জানে। এতদিনে শেষ হয়ে যেত কাজ। কিন্তু কাজের মাঝখানে হঠাৎ করে চলে গেল ওরা। জোয়ালিনকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলাম, আরও দুতিন সপ্তা পরে আসে যেন তোমাদের নিয়ে। ততদিনে কাজ শেষ হয়ে যাবে আমাদের। হোটেল চালু করে ফেলব।
তারমানে চিঠিটা পায়নি আন্টি, হতাশ কণ্ঠে বলল কোরি। শুধু শুধুই কষ্ট করে এলাম আমরা এতটা পথ।
অত দুঃখ পাওয়ার কিছু নেই, মেলবয়েস বললেন। কাল বিকেলে লঞ্চ না আসা পর্যন্ত নিশ্চিন্তে থাকো। উলফ খুব ভাল রান্না করতে পারে। খাওয়ার অসুবিধে হবে না তোমাদের। ইচ্ছে করলে সুইমিং পুল আর সৈকতে সাঁতারও কাটতে পারবে।
কিন্তু মন ভাল হলো না কোরির। কত কিছুই না করবে ভেবে রেখেছিল। সৈকতে রাত কাটানো, চিংড়ি ধরে কয়লার আগুনে ঝলসে খাওয়া, অনেক ছেলেমেয়েদের সঙ্গে হই-চই করে পার্টি দেয়া, সাগরে সাঁতার কাটা, আরও কত কি। কিন্তু সব গেল। গরমের ছুটিটাই মাটি।
তোমরা খেয়ে বেরিয়েছ? জানতে চাইলেন মেলবয়েস।
না, সারারাত না খেয়ে থাকার ভয়ে তাড়াতাড়ি জবাব দিল মুসা।
ওর ভঙ্গি দেখে হেসে উঠল রবিন আর কিশোর। কোরিও হেসে ফেলল।
এসো, ডাইনিং রুমে, বলে লম্বা লম্বা পা ফেলে জমিদারি চালে হাঁটতে শুরু করলেন মেলবয়েস। উলফকে বলি কিছু রান্না করে দিতে।
অনেক বড় কার্পেট বিছানো একটা ঘরে ঢুকলেন তিনি। সুইচ টিপে কয়েকটা ঝাড়বাতি জ্বেলে দিলেন। ঘরের একধারে বড় জানালার পাশে দুটো লম্বা টেবিল পাতা। টেবিলকুথে ঢাকা। চীনামাটি আর রূপায় তৈরি প্রচুর কাপ প্লেট, গ্লাস-বাটি সাজিয়ে রাখা। ঘরে আরও অনেকগুলো টেবিল আছে। ওগুলোর দুই ধারে যেসব

চেয়ার ছিল, সব উল্টে রাখা হয়েছে। বায়ের দেয়ালের কাছে বাঁশ বাধা। কাঠের মঞ্চ। দাগ লাগা ক্যানভাসের কাপড় ঝুলে আছে। দেয়ালের কাগজ ছেঁড়া। ছাতের খানিকটা জায়গার প্লাস্টার খসানো। রাজমিস্ত্রিরা কাজ শেষ না করেই চলে গেছে বোঝা যায়।
সেদিকে দেখিয়ে গজগজ করে বললেন মেলবয়েস, আর সপ্তা দুই কাজ করলেই হয়ে যেত। কিন্তু বেশি পয়সার লোভ দেখিয়ে শোরটাউনের এক শয়তান লোক বিল্ডিং মেরামতের জন্যে ডেকে নিয়ে গেছে ওদের। কবে যে ফিরে আসবে এখন, কোন ঠিক নেই।
ডাইনিং রুমের পেছনের দেয়ালে বিশাল এক জানালা। সেটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল কিশোর। আরিব্বাবা, কি দেখা যাচ্ছে!
সূর্য ডুবছে। পেছনের আঙিনায় ছড়ানো অসংখ্য ডেক চেয়ার, টেবিল আর বড় বড় ছাতা। তার ওপাশ থেকে শুরু হয়েছে সৈকত। কালো হয়ে আসা আকাশের পটভূমিতে রূপালী-ধূসর। তারও পরে উপসাগরের জল যেন জল নয়, শিল্পীর তুলিতে আঁকা বিচিত্র রঙের ছবি।
এত সুন্দর! পাশ থেকে বলে উঠল রবিন।
মুসা আর কোরিও দেখছে অপরূপ সূর্যাস্ত।
পেছন থেকে জিজ্ঞেস করলেন মেলবয়েস, কোরি, তোমার আন্টির শরীর কি খুব বেশি খারাপ?
কি জানি! ডাক্তার ডাকতে তো কোনমতেই রাজি হলো না। একটা ফোন করতে পারলে জানা যেত।
পারবে। কাল সকালে। লাইন ঠিক হয়ে গেছে, কিন্তু হোটেলের সুইচবোর্ড নষ্ট। পাইরেট আইল্যান্ড থেকে কাল লোক এসে ঠিক করে দিয়ে যাবার কথা।
কাশতে কাশতে ঘরে ঢুকল উলফ। সাদা রুমাল দিয়ে ঠোঁট মুছল। জানালার কাছে দাঁড়িয়েই ওর দিকে ফিরে তাকাল সবাই।
বেঁটে, রোগাপাতলা একজন মানুষ। কড়া মাড় দিয়ে ইস্তিরি করা খাটো হাতা সাদা শার্ট গায়ে, পরনে কালো প্যান্ট। কালো চুলের ডগা এমন করে মাথার দুই পাশে ছড়িয়ে আছে, যেন কতদিন ধরে আঁচড়ায় না। চোখা চেহারা, ছোট ছোট ধূসর চোখ, খাড়া নাক। চোয়ালের হাড় বেরিয়ে আছে। ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে আশপাশে যা কিছু দেখছে সব কিছুতেই তার বিরক্তি।
ও আমাদের উলফ, হেসে পরিচয় করিয়ে দিলেন মেলবয়েস, আগেই তোমাদের সঙ্গে দেখা হয়েছে। সাক্ষাৎকারটা নিশ্চয় পছন্দ হয়নি তোমাদের?
লাল হয়ে গেল উলফ। কিন্তু তার চেহারার ভাব বদল হলো না।

উলফ, মেলবয়েস বললেন, আমাদের মেহমানদের খিদে পেয়েছে। রান্নাঘরে কি আছে?
মুরগীর মাংস, অনেকটা চি-চি করে পাতলা গলায় কথা বলে, মনিবের ভারী গলার ঠিক উল্টো। সালাদও বানিয়ে দেয়া যায়। এমন ভঙ্গিতে শেষ কথাটা বলল সে, যেন বানানো না লাগলেই খুশি হত।
খুব ভাল, উলফের ইচ্ছার পরোয়া করলেন না ব্যারন। বিশাল হাত নেড়ে প্রায় মুরগী খেদানোর মত করে ওকে তাড়ালেন ঘর থেকে।
মাথা নিচু করে কোনদিকে না তাকিয়ে তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের বড় দরজাটার দিকে চলে গেল উলফ।

.

বসো তোমরা, একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লেন ব্যারন। কথা বলতে ভাল লাগছে। বোর্ডাররা চলে যাওয়ার পর খুব নির্জন হয়ে পড়েছে জায়গাটা। হোটেলে যখন লোক গমগম করে, দারুণ ভাল লাগে আমার।
চেয়ার টেনে বসল কিশোর। ব্যারনের দিকে তাকাল।
জুলাইয়ের শেষ দিকে আশা করি আবার চালু করে ফেলতে পারব, বললেন তিনি। যদি ঠিকমত ফিরে আসে শ্রমিকরা। আমি আর আমার ভাই। মিলারের ধারণা ছিল, মার্চে কাজ ধরলে গরমের ট্যুরিস্ট সীজনের আগেই সেরে ফেলতে পারব। কিন্তু ভুল হয়ে গেছে। ব্যাটারা যে টাকার লোভে এভাবে আমাদের ডুবিয়ে দিয়ে পালাবে ভাবতেই পারিনি।
এক এক করে সবার মুখের দিকে তাকালেন তিনি। আমার ভাই মিলার খুব মেজাজী মানুষ। সব সময় বিষণ্নতায় ভোগে। কালো হয়ে গেল তার মুখ। তা ছাড়া রোগটা ইদানীং অতিরিক্ত বেড়ে গেছে। বেশি মানুষ থাকলে নিচেই নামে না। অনেকটা সেকারণে, তাকে কিছুটা শান্তি দেয়ার জন্যেই বলতে পারো হোটেলটা কিছু দিনের জন্যে বন্ধ করে দিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম এই সুযোগে মেরামতটা সেরে ফেলব। এভাবে বন্ধ করলে ব্যবসার বিরাট ক্ষতি। কিন্তু কি করব? ভাই আগে না টাকা...
ট্রেতে করে খাবার নিয়ে এল উলফ।
একটা প্লেটে বড় এক টুকরো মাংস তুলে নিল মুসা। আমরা আপনাদের সাহায্য করতে পারি। দেয়াল মেরামতের কিছু কিছু কাজ করে দিতে পারব।
হ্যাঁ, সালাদের বাটি থেকে চামচ দিয়ে নিজের প্লেটে সালাদ তুলে নিতে লাগল রবিন। আন্ট জোয়ালিন আমাদের বলেছেন, হোটেলের মালিকের সঙ্গে, অর্থাৎ আপনার সঙ্গে নাকি কথা হয়েছে তাঁর–গরমকালটা হোটেলে পার্ট টাইম চাকরি

দেয়া হবে আমাদের। তাতে থাকাখাওয়ার জন্যে আর ভাবনা থাকবে না। পকেট থেকে নগদ পয়সা খরচ করতে হবে না।
বলেছি হয়তো। ঠিক মনে করতে পারছি না, ব্যারন বললেন। যাই। হোক, তোমাদের প্রস্তাবটা কিন্তু মন্দ না।
কিন্তু আমার কাছে মন্দই লাগছে, মুখ নিচু করে বলল উলফ। যার কাজ তাকেই সাজে। অপেশাদার দিয়ে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কাজ হয় না।
কাজটা তো কঠিন কিছু নয়, তাকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন ব্যারন। দেয়াল থেকে কিছু কাগজ ছিঁড়তে হবে...আরও কিছু টুকটাক.. আমার তো ধারণা ওই পয়সালোভী চামার শ্রমিকগুলোর চেয়ে ভাল পারবে এরা।
শক্ত হয়ে গেল উলফের চোয়াল। কাজটা নিরাপদ নয় মোটেও, কোরির দিকে তাকাল সে।
চমকে গেল কোরি। কি বলতে চায় লোকটা? মিস্ত্রির কাজে নিরাপত্তার প্রশ্ন কেন উঠছে?
পরের লঞ্চে ওদের ফিরে যাওয়াটাই ভাল মনে করি আমি, উলফ বলল।
কিন্তু আমি মনে করি না, তর্ক শুরু করলেন ব্যারন। কয়েকটা ছেলেমেয়েকে কাজ করতে দেখলে খুশিই হবে মিলার। জানালা দিয়ে বাইরের কালো হয়ে আসা আকাশের দিকে তাকালেন তিনি। হাসি হাসি ভঙ্গিটা চলে গেছে তার।
না। চলে যাওয়াই ভাল, থেমে থেমে একটা একটা করে শব্দ উচ্চারণ করল উলফ। যেন কোন ছোট্ট ছেলেকে বোঝাচ্ছে।
না। ভাল নয়। বরং কয়েকটা ছেলেমেয়েকে এখানে কাজ করতে দেখলেই আমার ভাল লাগবে, কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন হলো না ব্যারনের।
কান খাড়া করে ফেলল কিশোর। ব্যারন একবার বললেন মিলারের ভাল লাগবে। এখন বলছেন আমার ভাল লাগবে। কথাবার্তাগুলো কেমন গোলমেলে হয়ে যাচ্ছে।
সব কিছু মেরামত করে আবার যখন হোটেল খুলব আমরা, উলফ বলল, অনেক ছেলেমেয়ে আসবে তখন। তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে তার কণ্ঠ। অধৈর্য হয়ে উঠেছে।
বাড়ি ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে না মুসার। এসেছে যখন, কয়েকদিন থেকে যেতে পারলে ভাল হত। ব্যারনকে রাজি করানোর জন্যে বলল, আমাদের মধ্যে কিন্তু কোন ফাঁকি পাবেন না। আন্তরিক ভাবে খাটব। আমরা।
রবিনেরও ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে নেই। আমাদের কাজ দেখে আপনি খুশি হবেন, কথা দিতে পারি।
ঠিক আছে তাহলে, গোঁফের কোণ ধরে এক টান মারলেন ব্যারন। উলফের দিকে তাকালেন, ওরা থাকছে। কাঠমিস্ত্রির কাজ করবে। আমি ওদের বহাল করলাম।

কি প্রতিক্রিয়া হয় দেখার জন্যে উলফের দিকে তাকাল কিশোর।
কোন প্রতিক্রিয়া হলো না। ভাবলেশহীন চেহারা। খুদে খুদে ধূসর চোখে শূন্য দৃষ্টি। একটা মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে হাত বাড়িয়ে তুলে নিল খালি ট্রে-টা। চি-চি করে বলল, ঠিক আছে, আমি যাই।
খুশি হয়ে উঠল মুসা আর রবিন। কোরির মুখেও হাসি। একসঙ্গে কলরব। শুরু করল তিনজনে। কিশোর তাকিয়ে আছে ব্যারনের দিকে। একটা হাত তুললেন তিনি। হাসিমুখে বললেন, আমি আশা করব আন্তরিক ভাবেই খাটবে তোমরা। তবে তোমাদের সময় সবটুকু কেড়ে নিতে চাই না আমি। কাজের সময় কাজ। বাকি সময়টা পুলে সাঁতার কেটে, সৈকতে বেড়িয়ে কাটাতে পারবে, বাধা নেই। ফুর্তি করার জন্যেই তো এসেছ তোমরা, তাই না?
হ্যাঁ, হ্যাঁ! সমস্বরে চিৎকার করে উঠল মুসা, রবিন আর কোরি।
কিশোরের দিকে তাকালেন ব্যারন, তুমি কিছু বলছ না কেন?
অ্যাঁ!..হ্যাঁ, আমারও ভাল লাগবে।
লাগারই কথা। এখানে তোমাদের বয়েসী যারা বেড়াতে আসে, সবারই ভাল লাগে। মুখের হাসিটা বজায় রেখে পেছনে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালেন ব্যারন। লম্বা, সাদা চুলে আঙুল চালালেন। কোরির দিকে তাকিয়ে বললেন, কাল। তোমার আন্টির সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করব। ও না আসাতে খারাপই লাগছে।
কালকে নাগাদ চলে আসতে পারে। ভায়োলা আন্টি খুব ভাল নার্স।
ট্রে রেখে এঁটো বাসন-পেয়ালা নিয়ে যেতে ফিরে আসছে উলফ। তাকে বললেন ব্যারন, শোনো, ওদের ঘর দেখিয়ে দাও।
জবাব না দিয়ে টেবিলের কাছে এসে দাঁড়াল উলফ। বাসন-পেয়ালাগুলো জড়ো করতে গিয়ে ইচ্ছে করে আছড়ে ফেলতে লাগল একটার ওপর আরেকটা।
নিউ সেকশনে ওদের থাকার ব্যবস্থা করেছ নাকি? জানতে চাইলেন ব্যারন।
নিচের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল উলফ, না, ওল্ড উইং।
পলকের জন্যে হাসিটা চলে গেল ব্যারনের মুখ থেকে। পরক্ষণে ফিরে এল আবার। ছেলেমেয়েদের দিকে তাকিয়ে বললেন, রাতটা গিয়ে সেঁটে ঘুম। দাও। কাল সকালে দেখা হবে। তখন কাজের কথা বলব।
তাকে ধন্যবাদ জানাল ছেলেমেয়েরা। তারপর কথা বলতে বলতে উলফের পেছনে চলল একটা করিডর ধরে। আলো খুব কম এখানে। কীটনাশক তার একধরনের বদ্ধ ভাপসা গন্ধ বাতাসে।
পুরানো বাড়িতে এ রকম গন্ধ থাকে, জানে মুসা। আর ওগুলোই হয় ভূতের আস্তানা।

কোন দিকে না তাকিয়ে সোজা হেঁটে চলেছে উলফ। একটা মোড় ঘুরল। আরেকটা লম্বা করিডর পেরোল। দুই ধারে সারি সারি বদ্ধ দরজা। আবার একটা মোড় ঘুরল। থামল না।
অবাক লাগছে মুসার। কোথায় ওদের নিয়ে চলেছে লোকটা?
অবশেষে একটা খোলা দরজার সামনে থামল উলফ। দরজায় ব্রোঞ্জের প্লেটে নম্বর লেখা রয়েছে: ১৩২-সি।
বাইরে থেকে যতটা মনে হয়, মুসা বলল, ভেতরটা তারচেয়ে অনেক বড়।
তার মন্তব্যের জবাব দিল না উলফ। এখান থেকে চারটা ঘর তোমাদের জন্যে রেডি করেছি। কে কোনটাতে থাকবে নিজেরাই ঠিক করে নাও।
থ্যাংক ইউ, মোলায়েম স্বরে বলল কোরি।
দেখো, তোমাদের এখানে থাকাটা আমার ভাল লাগছে না, উলফ বলল।
কি?
এখানে থাকা তোমাদের জন্যে বিপজ্জনক।
কি বলতে চান? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
ছুতোর মিস্ত্রির কাজ, কিশোরের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল উলফ, খুব কঠিন। মিস্টার মেলবয়েস বুঝতে পারছেন না।
কিন্তু খাটতে তো আমাদের আপত্তি নেই, মুসা বলল, যত কঠিনই হোক, আমরা করব।
এখানে থাকতে ভাল লাগবে না তোমাদের, কিশোরের দিকে তাকিয়ে আছে উলফ। খালি থাকলে সাংঘাতিক বিপজ্জনক হয়ে ওঠে এই বাড়ি। পুরানো তো। পুরানো বাড়ি সব সময়ই খারাপ।
আপনারা থাকতে পারলে আমরাও পারব, কোন অসুবিধে হবে না, কোরি বলল, আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।
নিশ্চিন্ত থাকতে পারছি নানানা রকম ব্যাপার ঘটে এখানে, বিশেষ করে হোটেলের গেস্টদের বেলায় এমন সব ব্যাপার যা তোমাদের বলতে পারছি না, কণ্ঠস্বর খাদে নেমে এল উলফের।
জায়গাটাতে কোন সমস্যা আছে নাকি? জানতে চাইল কোরি। ভূতের উপদ্রব?
তাকিয়ে রইল উলফ কোরির দিকে। কতটা বলা যায় ওদের চিন্তা করছে। যেন। দেখো, আমি তোমাদের সাবধান করছি…
আসল কথা বলছেন না কেন? ভুত আছে? দেখেছেন?
দীর্ঘ একটা মুহূর্ত চুপ করে রইল উলফ। তারপর অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলল, অদ্ভুত অনেক কিছুই দেখতে হয় আমাকে, রহস্যময়, শীতল শোনাল ওর কণ্ঠ। বিচিত্র হাসি ফুটল পাতলা ঠোঁটে। ভূত বিশ্বাস করো নাকি তোমরা?

কিশোর বা রবিন কিছু বলে ফেলার আগেই তাড়াতাড়ি বলল মুসা, করি।
কোরি বলল, প্লীজ, বলুন না, কি দেখেছেন?
বাঁচতে চাইলে এখান থেকে চলে যাও, কোরির প্রশ্নের জবাব দিল না। উলফ। কালই।
ছায়ায়, ঢাকা পড়েছে ওর মুখের বেশির ভাগ অংশ। চেহারা দেখে মনের ভাব বোঝার উপায় নেই। তবে ওর কণ্ঠস্বরই বলে দিল, মিথ্যে ভয় দেখাচ্ছে না সে। আচমকা ঝটকা দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। আর একটা কথাও না বলে যেন নিঃশব্দে ভেসে চলে গেল অন্ধকার, শূন্য করিডর ধরে।

.

কোরি কোথায়? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
বুঝতে পারছি না, রবিন বলল। চোখে মিররড় সানগ্লাস। কাচের ভেতর। দিয়ে মুসার দিকে তাকিয়ে আছে। সৈকতের কিনারে গোড়ালি পানিতে হেঁটে বেড়াচ্ছে মুসা।
সকালে নাস্তার সময় এল না, উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল কিশোর। দুপুরে খাওয়ার সময়ও দেখা নেই। গেল কোথায়?
গেছে হয়তো কোথাও ভূতপ্রেত খুঁজতে, ঠোঁট উল্টে বলল রবিন। কিংবা হোটেলের পুরানো কোন কামরায় ধ্যানে বসে প্রেতাত্মার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছে। ওর তো এইই কাজ।
মেয়েটা কেমন অদ্ভুত…
আমি শুনে ফেলেছি! পেছন থেকে শোনা গেল তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর।
চিত হয়ে ছিল কিশোর। লাফ দিয়ে উঠে বসে ফিরে তাকাল। গোলাপী বিকিনি পরেছে কোরি। হাতে একটা ক্যানভাসের বড় বীচ ব্যাগ। চোখেমুখে রাগ।
কোরি…না বলে কোথায় চলে গেলে তুমি….আমরা এদিকে চিন্তায় বাঁচি না
সে তো দেখতেই পাচ্ছি। তোমাদের সব কথাই আমি শুনেছি। আমি কেমন অদ্ভুত, তাই না?
কোরি…
আমি পাগল? আধিভৌতিক ব্যাপারে আমার কৌতূহল তোমাদের কাছে আমাকে হাস্যকর করে তুলেছে, এই তো বলতে চাও?
তোমাকে হাস্যকর না করলেও, জবাব দিল রবিন, তোমার কাজকর্মকে যে হাস্যকর করেছে, এটা ঠিক।
ভুরু কুঁচকে গেল কোরির।
আরে বসো বসো, নিজের পাশে মাটিতে বিছানো ক্যানভাসে চাপড় দিল কিশোর। এই রবিন, বাজে কথা বোলো না তো। দেখি সরো, কোরিকে জায়গা দাও। বসো,

কোরি। এত সুন্দর দিনটা রাগারাগি করে নষ্ট কোরো না।
কিন্তু তাই বলে আমাকে নিয়ে হাসাহাসি সহ্য করব? মেজাজ দেখিয়ে ক্যানভাসের ওপর বসে পড়ল কোরি।
সারাদিন ছিলে কোথায়? জানতে চাইল কিশোর।
ঘুম থেকেই উঠেছি দেরি করে, ব্যাগ থেকে বড় একটা তোয়ালে টেনে বের করল কোরি। তারপর হোটেলের মধ্যে এখানে ওখানে ঘোরাঘুরি করেছি খানিকক্ষণ। আন্ট জোয়ালিনের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছি পারিনি। মেলবয়েস বললেন, লঞ্চ আসার সময় হলে গাড়ি নিয়ে ডকে যাবেন আন্টিকে নিয়ে আসতে।
যদি আজকে আসেন।
হ্যাঁ।
জায়গাটা কিন্তু ভারি সুন্দর! কিশোরের পাশে চিত হয়ে শুয়ে পড়ল রবিন। C. কোরি তখনও নানা জিনিস বের করছে। সানট্যান লোশনের শিশিটা বের করে রাখল একপাশে। সাঁতার কাটতে যাবে কেউ?
নাহ, মাথা নাড়ল কিশোর। আমার বসে থাকতেই ভাল লাগছে। মুসাকে গিয়ে বলো, তোমার সঙ্গে নামবে।
দেখো, একটা পাখি, ওপর দিকে তাকিয়ে আছে রবিন। ইস, আমিও যদি ওরকম করে উড়তে পারতাম!
কোরি আর কিশোর দুজনেই মুখ তুলে তাকাল। ধূসর আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে বড় একটা পাখি।
বাজপাখি, কোরি বলল।
এখানে বাজও আছে নাকি? পাখিটার সঙ্গে সঙ্গে নজর সরছে তার। চশমার কাঁচে ফ্যাকাসে নীল আকাশের প্রতিবিম্ব।
মনে হয় না, কোরি বলল। পাখিটাকে বেমানান লাগছে এখানে। এই দ্বীপের সব কিছু রঙিন, ঝলমলে, সুন্দর। অন্য কোনখান থেকে উড়ে এসেছে হয়তো মাছের আশায়। ক্ষণিকের জন্যে মনে হলো বাজপাখির ডানায় ভর করে অবাঞ্ছিত-অশুভ কোন কিছু কালো ছায়া ফেলতে এসেছে দ্বীপের সাদা সৈকতে। ভাবনাটাকে জোর করে মন থেকে তাড়াল সে।
পানিতে দাঁড়িয়ে আছে এখনও মুসা। ওদের দিকে পেছন করে। নীলচে সবুজ পানি এসে ভিজিয়ে দিচ্ছে বালি। চিকচিক করছে রোদে। ওর ডানে ঢেউয়ে ক্রমাগত দোল খাচ্ছে নিচু একটা কাঠের ডকে বাধা দুটো ক্যানু। ওদের দুদিকে ধনুকের মত গোল হয়ে বেঁকে গেছে সৈকত।
পেছনে বালির টিলার ওপরে রয়েছে হোটেলটা। সাদা দুর্গের মত বিছিয়ে থেকে যেন পাহারা দিচ্ছে সবকিছুকে। ডাইনিং রুমের বড় জানালার কাছে ঝিলিক

দিচ্ছে বিকেলের সোনালি রোদ। বাড়িটার দুদিক থেকে শুরু হয়েছে। পাইন বন। নীলচে-সবুজ। মৃদু বাতাসে সুগন্ধ ছড়িয়ে দুলছে যেন তার ঘোরে।
উফ, বিশ্বাস করতে পারছি না আমি! দেখতে দেখতে বলে উঠল কোরি। এত সুন্দর। ভাল লাগছে অন্য কেউ নেই দেখে। স্বাধীনভাবে দ্বীপে ঘুরে বেড়াতে পারব আমরা। যা ইচ্ছে করতে পারব।
হ্যাঁ, একমত হলো রবিন। আমার কাছে তো স্বর্গ মনে হচ্ছে।
হাত বাড়িয়ে একমুঠো বালি তুলে নিয়ে ঝরঝর করে নিজের পায়ে। ছাড়তে লাগল কোরি। আজ যে আমাদের ছুটি দিয়ে দিয়েছেন এজন্যে মিস্টার মেলবয়েসকে একটা ধন্যবাদ দেয়া দরকার।
হ্যাঁ, খুব ভাল লোক। গায়ে জমিদারের রক্ত আছে দেখেই বোঝা যায়।
কিন্তু উলফের ব্যাপারটা কি বলো তো? এরকম ভদ্র মালিকের ওরকম বুনো চাকর! উদ্ভট স্বভাব!
সকালে নাস্তা দেয়ার সময় মুখটাকে কিরকম করে রেখেছিল দেখেছ? একেবারে মরা চিংড়ি।
ওর সমস্যাটা কি? কাল রাতে ভয় দেখিয়ে তাড়াতে চাইল কেন আমাদের?
ভূত আছে ইঙ্গিত দিল, কোরি বলল, কিন্তু খোলাসা করল না কিছুই।
আমার তো মনে হলো অন্য ইঙ্গিত দিয়েছে, কিশোর বলল।
অন্য কি?
বুঝতে পারলাম না।
কিন্তু আমার বিশ্বাস, ভূতের কথাই বলেছে। এই দ্বীপে ভূত থাকাটা অসম্ভব কিছু নয়। সাড়ে তিনশো বছর আগে সেই ঔপনিবেশিক আমল থেকে এসে এখানে আস্তানা গেড়েছে মানুষ। খুনখারাপি হয়েছে প্রচুর। প্রেতাত্মা। থাকতেই পারে। শোরটাউনের আশেপাশে যত পুরানো বাড়ি, সরাইখানা, দুর্গ আর হোটেল আছে, সবগুলোতে ভূতের বদনাম। আমার মনে হয় না। মিথ্যে কথা বলেছে উলফ, কিংবা আমাদের শুধু শুধু ভয় দেখাতে চেয়েছে। কিছু না থাকলে আমাদের সাবধান করতে আসত না।
আচমকা উঠে দাঁড়াল কোরি।
কি হলো? জানতে চাইল রবিন।
একটা জিনিস ফেলে এসেছি।
কি?
জবাব না দিয়ে হাঁটতে শুরু করল কোরি। দ্রুত হেঁটে চলল হোটলের দিকে।
সেদিকে তাকিয়ে মন্তব্য করল রবিন, উলফের মত কোরিও আরেকটা উদ্ভটা চরিত্র…

আস্তে! শুনতে পেলে আবার রেগে যাবে।
ওর সঙ্গে জিনার স্বভাবের অনেক মিল, তাই না?
জবাব দিল না কিশোর।
*
সেদিন বিকেলে আকাশটাকে রক্তের রঙে রাঙিয়ে দিয়ে পাইন বনের আড়ালে যখন অস্ত গেল সূর্য, আকাশে দেখা দিল রূপালী চাঁদ, সৈকতে ফিরে এল। আবার ওরা। ফুরফুরে বাতাস শরীর জুড়িয়ে দিচ্ছে।
ইস্, কি একখান সূর্যাস্ত! আবার বালিতে গড়িয়ে পড়ল রবিন। এভাবে গড়াগড়ি করার নেশা হয়ে গেছে যেন তার। আকাশের দিকে চোখ।
পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে মুসা আর কিশোর। সাগরের পানিতে আকাশের প্রতিবিম্ব দেখছে।
আমার কি মনে হচ্ছে জানো? স্বপ্নিল হয়ে উঠেছে কিশোরের সুন্দর দুটো চোখ। কোন স্বপ্নের জগতে পৌঁছে গেছি!
কোরির হাতে ডোরাকাটা একটা চাদর। এই, ধরো তো একটু, চাদরটা বিছাই।
চাদর বিছাতে ওকে সাহায্য করল কিশোর। দুই কোণে দুটো বড় পিকনিক বাস্কেট চাপা দিয়ে দিল যাতে বাতাসে উড়তে না পারে।
চাদরের ওপর বসে পড়ে একটা বাস্কেটের দিকে হাত বাড়াল মুসা, খিদে পেয়ে গেছে আমার। কি দিয়েছে উলফ?
উম..দাঁড়াও, অনুমান করতে দাও আমাকে, কোরি বলল, কি হতে পারে? টিউনা মাছের স্যান্ডউইচ?.
ঢাকনা তুলল মুসা। ভেতরে তাকিয়ে বলল, হয়নি। আবার বলো।
গলদা চিংড়ি।
হ্যাঁ, হয়েছে। দারুণ সুগন্ধ! মুরগীর রোস্টও আছে।
আরেকটা ঝুড়ির ঢাকনা সরাল রবিন। বড় এক পাত্র সালাদ বের করল। আর বড় বড় দুটো ফ্রেঞ্চ ব্রেড। ম। আভন থেকে বের করেই ঝুড়িতে ভরে দিয়েছে উলফ।
মুখ গোমড়া করে রাখুক আর যাই করুক, নাক দিয়ে খাবারের সুগন্ধ টানতে টানতে বলল কোরি, খাবারগুলো ভালই দিচ্ছে।
চীনামাটির বাসন, রূপার চামচ, কাপড়ের ন্যাপকিন বের করে চাদরে নামিয়ে রাখল রবিন। সুন্দর করে ওগুলো ঝুড়িতে সাজিয়ে দিয়েছে উলফ। দুটো মোমও দিয়েছে।
আকাশের লালিমা মুছে কালো হয়ে যাচ্ছে। উজ্জ্বল হতে শুরু করেছে। চাঁদ। তীরে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের ছলাৎছল বাজনার মত লাগছে। খেতে আরম্ভ করল

ওরা।
সিনেমার মত লাগছে আমার কাছে! কোরি বলল।
এত সুন্দর দৃশ্য সিনেমাতে নেই, বলল রবিন।
হোটেলের দিকে তাকাল কোরি। আকাশের পটভূমিতে কালো দেখাচ্ছে। বাড়িটা। শুধু দোতলার দুটো জানালায় আলো জ্বলছে। তাকিয়ে রয়েছে যেন বেড়ালের চোখের মত।
খাওয়ার পর সাতরাতে নামলে কেমন হয়? প্রস্তাব দিল মুসা।
বেদিং সুট তো পরে আসিনি, রবিন বলল।
তাতে কি? হাসল মুসা। খালি গায়ে নামব।
চাঁদনী রাতে সাগরে সাঁতার কাটার স্বপ্ন দেখেছি আমি বহুদিন, কিশোর বলল।
তার মানে তুমিও নামবে?
অসুবিধে কি?
বালির ঢিবির ওপর দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বলে উঠল কোরি, কে যেন আসছে!
ফিরে তাকাল অন্য তিনজন। অন্ধকার ছায়ায় মিশে ভূতের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা মূর্তি।
ভয় পেয়ে গেল কোরি। জিজ্ঞেস করল, কে ওখানে?
ছায়া থেকে চাঁদের আলোয় বেরিয়ে এল মুর্তিটা।
অবাক হলো কোরি। মিস্টার মেলবয়েস!
ঢিবির মাথায় দাঁড়িয়ে থেকে ওদের উদ্দেশে হাত নাড়লেন তিনি। ধবধবে সাদাঁ পোশাকে ভূতুড়ে লাগছে তাঁকে। ভয়টা এখনও কাটেনি কোরির। বিশ্বাস করতে পারছে না সত্যি মানুষ কিনা। পরীক্ষা করার জন্যে হাত নেড়ে ডাকল, আসুন না?
অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে নেমে আসতে শুরু করলেন ব্যারন। খাওয়া বন্ধ করে মুসাও তাকিয়ে রয়েছে হাঁ করে। ভূত বুঝলে দেবে দৌড়।
কাছে এসে দাঁড়ালেন তিনি। হাতে একটা মদের বোতল। আরেক হাতে গ্লাস।
আন্ট জোয়ালিন এসেছে? উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জানতে চাইল কোরি।)
না, জবাব দিলেন ব্যারন। লঞ্চ এসেছে, কিন্তু তোমার আন্টি আসেননি। অত ভয়ের কিছু নেই। সামান্য পেটব্যথা তো, সেরে যাবে। আরও একআধ দিন বোনের ওখানে কাটিয়ে আসার ইচ্ছে।
কিন্তু ফোন করল না কেন?
সকালে ফোন যখন খারাপ ছিল তখন হয়তো চেষ্টা করেছে। ফোন খারাপ ভেবে পরে আর করেনি। আজ রাতটা যাক, তাকে আর বিরক্ত করব না। কাল সকালে যদি না করে আমরাই খোঁজ নেব। প্রসঙ্গটা বাদ দেয়ার জন্যে খাবারগুলোর ওপর চোখ বোলালেন তিনি। বাহ, উলফ তো নাস্তাটাস্তা ভালই দিচ্ছে তোমাদেরকে।

হেসে জবাব দিল কিশোর, নাস্তা নয়, একেবারে ভূরিভোজ।
উলফ কিন্তু আমাদের বাবুর্চি নয়। বাবুর্চির নাম মনিকা। আগামী শুক্রবারের আগে আসবে না। মৃদু হেসে বললেন ব্যারন, এত কাজ একহাতে করতে হচ্ছে বলে অভিযোগের পর অভিযোগ করে চলেছে উলফ। তবে রান্না করতে তার খারাপ লাগছে না এটাও বুঝতে পারছি।
সে তো বোঝাই যাচ্ছে, রুটি চিবাতে চিবাতে বলল মুসা। কিন্তু এত বেশি পেট ভরিয়ে রাখছে আমাদের, আলসে হয়ে যাচ্ছি। কাল কোন কাজই করতে পারব না।
হ্যাঁ, দশ পাউন্ড ওজন বেড়ে গেছে আমার, কোরি বলল।
ভয় নেই, কালই সেটা খসিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করব, হেসে বললেন ব্যারন। চাদরের একধারে বসে বোতল থেকে মদ ঢাললেন গ্লাসে। গ্লাসটা তুলে ধরলেন ওদের দিকে। তোমাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করছি।
লম্বা চুমুক দিলেন গ্লাসে। গম্ভীর হয়ে বললেন, মিলারও আমাদের সঙ্গে থাকলে এখন ভাল হতো, আচমকা বদলে গেছে কণ্ঠস্বর। কত করে বললাম আসতে। এল না।
আপনার ভাই কি অসুস্থ? জানতে চাইল কিশোর।
প্রশ্নটা যেন অবাক করল ব্যারনকে। অসুস্থ? মোটেও না। অতিমাত্রায় বিষণ্ন। আমরা মেলবয়েসরা এমনিতেই একটু খেয়ালী।
শুনেছি আমি, রবিন বলল। ব্ল্যাক ফরেস্টের সবাই জানে আপনার পূর্বপুরুষদের কাহিনী। আমাদের বাড়ির চিলেকোঠা থেকে মেলবয়েস ম্যানসন দেখা যায়।
চোখ বুজে যেন পূর্বপুরুষদের কীর্তিকলাপের দৃশ্য দেখার চেষ্টা করলেন। মেলবয়েস। হ্যাঁ, অনেক গল্প আছে ওদেরকে নিয়ে। ভয়ঙ্কর সব কাহিনী। চোখ মেলে তাকালেন রবিনের দিকে।
একঝলক হালকা বাতাস ওদের ঘিরে নেচে নেচে বয়ে গেল।
রোজার মেলবয়েস কি আপনার দাদা ছিলেন? জিজ্ঞেস করল রবিন।
আরেক চুমুক মদ খেলেন ব্যারন। না। আমার দাদার ভাই। আমার গ্রেট-আঙ্কেল।
তার নামে নাম রাখা হলো কেন আপনার? জানতে চাইল কোরি।
তার নামে রাখা হয়েছে কথাটা ঠিক না, বিচিত্র হাসি খেলে গেল ব্যারনের ঠোঁটে। চাঁদের আলোয় রহস্যময় দেখাল হাসিটা। আমার বাবার নামও ছিল রোজার।
পাইনবনে ডেকে উঠল কি একটা জানোয়ার। দীর্ঘ, বিষণ্ন চিৎকার।
তাদের সম্পর্কে বলুন না কিছু, অনুরোধ জানাল কোরি। শোনার জন্যে সামনে ঝুঁকে বসল।

হ্যাঁ, বলুন না, রবিনও আগ্রহী হয়ে উঠল। আসলে কি ঘটেছিল গোস্ট লেনের সেই পুরানো প্রাসাদটাতে?
আমিও খুব বেশি কিছু জানি না, ব্যারন বললেন। আমার জন্মের বহু আগে ঘটেছিল সেসব ঘটনা। বালির ঢিবির ওপরে হোটেলটার দিকে তাকালেন তিনি। মিলার এলে ভাল হতো। এসব গল্প আমার চেয়ে ভাল বলতে পারত সে।
আপনি যা পারেন বলুন, শোনার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে রবিন। পুড়ল কি করে বাড়িটা? রোজার মেলবয়েসের সম্পর্কে যা শোনা যায় সব কি সত্যি?
শব্দ করে হাসলেন ব্যারন। গ্লাসটা নামিয়ে রাখলেন চাদরে। সব কটা চোখ এখন তার দিকে। বাতাসে দুলে উঠে কাত হয়ে গেল মোমের শিখা। নিভু নিভু হলো, কিন্তু নিভল না।
রবিনের দিকে তাকালেন ব্যারন, তুমি নিশ্চয় শুনেছ, ব্ল্যাক ফরেস্টে প্রথম যারা বসতি করেছিল তাদের একজন ছিলেন আমার গ্রেট-আঙ্কেল রোজার মেলবয়েস। বিরাট ধনী ছিলেন তিনি। কোথায় পেয়েছিলেন এত, টাকা কেউ জানে না। কোথা থেকে ব্ল্যাক ফরেস্টে গিয়েছিলেন তিনি, তা-ও জানে না কেউ।
দেখতে তিনি কেমন ছিলেন? জিজ্ঞেস করল কোরি। আপনার মত?
তা-ও জানে না কেউ। আমাদের পরিবারের সবারই ছবি আছে, শুধু তাঁরটা বাদে। সেটাও আরেক রহস্য।
গ্লাস তুলে চুমুক দিলেন তিনি। ঠোঁট চাটলেন। তারপর বললেন, বিশাল ওই প্রাসাদ শহর থেকে এতদূরে কেন বানালেন, সেটাও রহস্য। ব্ল্যাক ফরেস্টে তখনও আজকের মত শহর গড়ে ওঠেনি, ভাল কোন রাস্তা ছিল না। বনের মধ্যেই বাড়ি বানালেন তিনি। বাড়িতে যাওয়ার একটাই পথ ছিল, গাছপালার ভেতর দিয়ে সরু একটা রাস্তা। বাড়িটা বানানোর সময় শ্রমিকেরা। যাতায়াতের জন্যে নিজেরাই তৈরি করেছিল রাস্তাটা।
গোপনীয়তা পছন্দ করতেন নাকি? জানতে চাইল কিশোর।
নাঃ...অন্তত ব্ল্যাক ফরেস্টে আসার পর প্রথমদিকে তো নয়ই। বরং রোজার মেলবয়েস আর তার সুন্দরী স্ত্রী ভেরোনিকা ছিলেন শহরের প্রাণ। সব জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন। প্রায়ই বড় বড় পার্টি দিতেন। লোক গমগম করত বাড়িতে। মোমের আলোয় কমলা রঙ লাগছে ব্যারনের চেহারা। মেলবয়েসরা খুব বিখ্যাত ছিল তখন। লোকে পছন্দ করত তাদের। শহরটার জন্যে অনেক করেছে। লাইব্রেরির জন্যে টাকা দিয়েছেন রোজার মেলবয়েস, ব্ল্যাক ফরেস্টের প্রথম হাসপাতালটা তার করা।
গ্লাসে চুমুক দেয়ার জন্যে থামলেন ব্যারন।

কোরির দিকে তাকাল কিশোর। হতাশা দেখতে পেল ওর মুখে। যেন ভয়াবহ কোন ভূতের গল্প আশা করেছিল সে।
রোজার আর ভেরোনিকার দুটো খুব সুন্দরী মেয়ে ছিল, ব্যারন বলতে লাগলেন আবার। মেয়েদের অসম্ভব পছন্দ করতেন রোজার। অতিরিক্ত। আর দশটা মেয়ের মত লেখাপড়া শেখার জন্যে স্কুলে যেতে দেননি ওদের। বাড়িতে টিচার রেখে দিয়েছিলেন। যা চাইত ওরা, দিয়ে দিতেন তিনি। কোন কিছুতেই না করতেন না। এক বছর এক মেয়ের জন্মদিনে ইউরোপ থেকে সমস্ত জন্তু-জানোয়ার সহ একটা আস্ত সার্কাস পার্টি ভাড়া করে নিয়ে এসেছিলেন তিনি।
খাইছে! বলে উঠল মুসা।
অ্যাই, বাধা দিয়ো না তো! অধৈর্য ভঙ্গিতে হাত নাড়ল কোরি।
আমার গ্রেট-আঙ্কেল মনে করেছিলেন, এত টাকা আছে যখন, জীবনটা বুঝি সুখেই কেটে যাবে, সাগরের কালো পানির দিকে তাকিয়ে বললেন। ব্যারন। কণ্ঠে বিষাদের ছোঁয়া। কিন্তু তা আর কাটল না। একদিন বনে খেলতে গিয়ে আর ফিরে এল না তাঁর দুই মেয়ে। রাতেই খোঁজাখুজি করা হলো। পাওয়া গেল না ওদের। পরদিন সকালেও না। সাত দিন পর বনের মধ্যে পাওয়া গেল ওদের লাশ। শরীরের মাংস আছে, কিন্তু হাড় নেই। কোন। অদ্ভুত উপায়ে আস্ত বের করে নেয়া হয়েছে কঙ্কালটা।
তা কি করে সম্ভব? বলে উঠল কিশোর।
আমি জানি না। লোকে তো তাই বলে।
খুনীকে ধরতে পেরেছিল পুলিশ? কোরি জিজ্ঞেস করল।
আমি বলতে পারব না। পুলিশকে ওকাজ করার জন্যে আদৌ ডাকা হয়েছিল, তাই বা কে জানে, রহস্যময় কণ্ঠে জবাব দিলেন ব্যারন। ওই ঘটনার পর থেকে আলো নিভে গেল প্রাসাদের। রাতে আর বাড়ির জানালায় আলো জ্বলতে দেখত না কেউ। সব বদলে গেল। ভেরোনিকাকে আর কোনদিন শহরে দেখা যায়নি। লোকে বলে, পুরো পাগল হয়ে গিয়েছিলেন নাকি তিনি। সারাক্ষণ ঘরে বসে থাকতেন। কখনও বেরোতেন না। রাতের বেলা বাড়ির কাছে কেউ গেলে শুনতে পেত অদ্ভুত সব চিত্তার, চেঁচামেচি। তাদের ধারণা ভেরোনিকার ঘর থেকে আসত। আর মেলবয়েস? তার যেন জীবনটাই থেমে গিয়েছিল। সমস্ত টাকা খুইয়ে ফেললেন তিনি। দামী দামী সমস্ত ছবি, জিনিসপত্র সব নীলামে উঠল, ঠেলা গাড়িতে ভরে নিয়ে যাওয়া হলো। তাকেও এরপর আর কোনদিন শহরে দেখা যায়নি। তারপর একদিন রহস্যময় ভাবে পুড়ে ছারখার হয়ে গেল বাড়িটা।
মেলবয়েসই পুড়িয়েছিলেন নাকি? জানতে চাইল কোরি।

তা-ও জানি না। আসল ঘটনাটা কি ঘটেছিল, কেউ জানে বলে মনে হয় না। সবই অনুমান। কেউ বলে পাগল হয়ে গিয়ে ভেরোনিকা আগুন দিয়েছিলেন বাড়িতে। কেউ বলে মেলবয়েস নিজেই দিয়েছিলেন। অভিশপ্ত বাড়িসহ নিজেকে শেষ করে দেয়ার জন্যে। ওই বাড়ির সবচেয়ে কাছে যে বাড়িটা ছিল, মেলবয়েসদের প্রতিবেশী, সে তার ডায়রিতে লিখে গেছে। সেরাতে কি ঘটেছিল প্রাসাদে। লেখাটা আমি পড়েছি। রাত দুপুরে নাকি দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠেছিল প্রাসাদে। কয়েক ঘণ্টা ধরে জ্বলল নরকের আগুনের মত। পরদিন লোকে যখন দেখতে এল, পোড়া ছাই ছাড়া আর কিছুই দেখল না।

সাগরের দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন ব্যারন।

মেলবয়েস আর ভেরোনিকার কি ঘটেছিল? জানার জন্যে তর সইছে না। কোরির।

আগুনে পুড়ে মারা গেছেন ভেরোনিকা, ব্যারন বললেন। ব্ল্যাক ফরেস্টের গোরস্থানে কবর দেয়া হয়েছে তাকে। কোন নামফলক লাগানো হয়নি তাতে। আর মেলবয়েসের কি হয়েছে কেউ বলতে পারে না। তাঁকে আর কখনও দেখেনি কেউ।

বাতাসে কাত হয়ে গিয়ে আবার লাফিয়ে সোজা হলো মোমের শিখা। শীত লাগল কোরির। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, গরম কাপড় নিয়ে আসিগে। কিশোর, তোমাদের জন্যে কিছু লাগবে?

উম, আমার জন্যে আনতে পারো, রবিন বলল।

ব্যারনের দিকে তাকাল কোরি, আমি না আসা পর্যন্ত আর কোন গল্প বলবেন না, প্লীজ! বালির ঢিবির ঢাল বেয়ে প্রায় দৌড়ে হোটেলের দিকে উঠে গেল সে। অদৃশ্য হয়ে গেল অন্ধকারে।

সাংঘাতিক এক গল্প শোনালেন, কিশোর বলল। মানুষের শরীর থেকে কঙ্কাল উধাও হয়ে যায়, এরকম কথা আর শুনিনি।

ভ্যাম্পায়ারের কাজ নয়তো? জিজ্ঞেস করতে গিয়ে গলা কেঁপে উঠল মুসার।

ভ্যাম্পায়ার হয় কি করে? রবিন বলল, তাহলে রক্ত থাকত না শরীরে। হাড় থাকবে না কেন?

তাহলে এমন কোন ভূত হতে পারে, যে হাড় খায়! ভয়ে ভয়ে বলল মুসা।

এর অন্য কোন ব্যাখ্যা আছে, কিশোর বলল। কিংবা লোকে বানিয়েও বলতে পারে। সাতদিনে লাশ এতটাই ফুলে গিয়েছিল, মনে হয়েছে হাড় নেই। লোকে সেটাকে রঙ চড়িয়ে বানিয়ে দিয়েছে উদ্ভট এক ভয়াল কাহিনী।

এই শুরু হলো তোমার যুক্তি দেয়া, রেগে গেল মুসা। উল্টোপাল্টা যুক্তি দিয়ে কাহিনীটাকে নষ্ট করছ কেন?

উল্টোপাল্টা নয়, এটাই ঠিক। কারণ ভূত বলে কিছু নেই।

হেসে উঠলেন ব্যারন। বাতাসে দুলে উঠল তার কোটের কোণা। চাঁদের আলোয় মনে হলো ডানা মেলতে চাইছে ওটা। বললেন, লোকে তো কত কথাই বলে। রোজার মেলবয়েস ভ্যাম্পায়ার ছিলেন, একথাও বলেছে অনেকে। মুসার দিকে তাকালেন, আমি যেরকম পোশাক পরে এসেছি, আমাকেও আবার ভুত মনে হচ্ছে না তো তোমার? ন
মাথা নাড়ল মুসা। কথা বেরোল না তার মুখ থেকে।
সবাই চুপচাপ। অনেকক্ষণ পর নীরবতা ভাঙলেন ব্যারন। ঠাণ্ডা পড়ছে। ওঠা উচিত
কথা শেষ হলো না তার। শোনা গেল তীক্ষ্ণ চিৎকার।
লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল সবাই।
আবার শোনা গেল চিৎকার। রাতের বাতাসকে চিরে দিল।
হো-হো-হোটেল থেকে আসছে! চেঁচিয়ে উঠল মুসা।
কোরি! বলল কিশোর।
.
দমকা বাতাস নিভিয়ে দিল মোমের আলো।
বালির ঢিবি বেয়ে উঠতে শুরু করল কিশোর। পিছু নিল মুসা আর রবিন।
চিৎকার থেমে গেছে।
ওপরে উঠে ফিরে তাকাল কিশোর। ব্যারনও উঠে আসছেন। তবে ওদের চেয়ে অনেক ধীর। এখনও একশো-গজ নিচে রয়ে গেছেন।
আবার ছুটল সে। পুল হাউজের পাশ কাটিয়ে, সুইমিং পুলের ধার দিয়ে ছুটে চলল অন্ধকার বাড়িটার দিকে। পেছনের দরজা দিয়ে একটা ছায়ামূর্তি বেরিয়ে ছুটে আসতে লাগল ওর দিকে।
কথা বলার জন্যে মুখ খুলেও মূর্তিটাকে চিনতে পেরে থেমে গেল। কিশোর। কোরি! কি হয়েছে?
আ-আমি…আমি ওকে দেখেছি! ঘোরের মধ্যে কথা বলছে যেন কোরি।
কি দেখেছ? জানতে চাইল রবিন। হাঁপাচ্ছে। সে আর মুসা দুজনেই এসে দাঁড়িয়েছে কিশোরের পাশে।
চিৎকার করলে কেন? ওদের পেছনে শোনা গেল ব্যারনের অস্থির কণ্ঠ।
আমি ওকে দেখেছি, আবার একই কথা বলল কোরি।
সাদা কোটের কোণা উড়িয়ে দৌড়ে কাছে এসে দাঁড়ালেন ব্যারন।
উলফও বেরিয়ে এল।
আমি-আমি ভূতটাকে দেখেছি! কোরি বলল।
গুঙিয়ে উঠল মুসা। কো-কো-কোথায়?

এমন ভাবে চিৎকার করে উঠলে… হাত দিয়ে বুক চেপে ধরলেন ব্যারন।
সরি। আপনাআপনি বেরিয়ে গেল মুখ দিয়ে
ভেতরে চলো সবাই। বলে ব্যারনের হাত চেপে ধরে টেনে নিয়ে চলল উলফ।
ওদের অনুসরণ করল তিন গোয়েন্দা আর কোরি। মিনিটখানেকের মধ্যেই লবিতে জমায়েত হলো। চামড়ায় মোড়া বড় একটা চেয়ারে বসল, কোরি। তার পাশে ব্যারন। দম নিতে কষ্ট হচ্ছে এখনও।
বায়ের করিডরের দিকে হাত তুলে কোরি বলল, হলঘরে দেখলাম ওটাকে। একজন মহিলার ভূত। দেয়াল ভেদ করে বেরিয়ে এল।
দেখতে কেমন? জানতে চাইল উলফ।
চমকে দিল কিশোরকে। কিশোর জানত না ঠিক ওর পেছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে লোকটা।
কপালের ওপর এসে পড়া একগাছি চুল আঙুলে পেঁচাতে পেঁচাতে। সামনের দেয়ালটার দিকে তাকিয়ে রইল কোরি। যেন ভূতের চেহারা, মনে করার চেষ্টা করছে। পুরানো আমলের পোশাক পরা। সাদা নাইটগাউন। লম্বা কালো বেনি। বয়েস কম। খুব সুন্দরী।
চেয়ারে নড়েচড়ে বসল সে। অস্বস্তি বোধ করছে। নজর এখনও সামনের দেয়ালের দিকে। ওর চোখ দুটোই বেশি নাড়া দিয়েছে আমাকে। বাপরে বাপ! কি বড় বড়। টকটকে লাল। মুখটা ফ্যাকাশে। মোমের মত।–.. আরও কিছু বলতে চাইল সে। কথা আটকে গেল।
আলতো করে ওর হাতটা চাপড়ে দিয়ে ব্যারন বললেন, শান্ত হও। উলফ, এক কাপ চা দাও না ওকে।
দেব। বলল, কিন্তু জায়গা ছেড়ে নড়ল না উলফ।
লাল চোখ মেলে আমার দিকে তাকিয়ে রইল সে, কোরি বলল। আমাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে মনে হলো। বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে গেল। হঠাৎ সবকিছু। ঘর। ঘরের বাতাস। সব। চিৎকার করে উঠলাম। দেয়ালে মিশে গেল ওটা। ঘাড়ে কিসের যেন ঠাণ্ডা ছোঁয়া লাগল। আবার চিৎকার করে উঠলাম।
দেয়ালের দিকে তাকিয়ে চুলের গোছা আঙুলে পেঁচাতে থাকল সে।
রবিনের দিকে তাকাল কিশোর। রবিন কি ভাবছে বোঝার চেষ্টা করল। ভূত দেখেছে কোরি, এ কথা বিশ্বাস করতে পারছে না সে। নিশ্চয় কেউ ভয় দেখাতে চেয়েছে ওকে।
কেরির দিকে ফিরল সে। এখনও ভয় পাচ্ছ?
ওর কথা যেন শুনতেই পায়নি কোরি। দেয়ালের দিকে তাকিয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে আছে।

হোটেলের পুরানো অংশে অনেক রহস্যময় ঘটনা ঘটেছে বলে শোনা যায়, ব্যারন বললেন। কিন্তু…
ও আবার আসবে, আচমকা তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠল কোরি। ভূতটা ফিরে আসবে। আমার যেন কেমন লাগছে!
*
ঘুম আসছে না কিশোরের।
নরম বালিশে মাথা রেখে চিত হয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল। সিলিঙে নানা রকম ছায়ার খেলা। বাইরে কালো নির্মেঘ আকাশ, তারায় ভরা। সাদা কোমল চাঁদটা যেন ভেসে রয়েছে উপসাগরের ওপরে।
ব্যারনের গল্পটার কথা ভাবছে সে। বনের মধ্যে ফুটফুটে দুটো ছোট্ট মেয়ের লাশ। হাড় নেই। পোড়া বাড়ি। খেপা মহিলা ভেরোনিকা। উন্মাদ রোজার ডি মেলবয়েস। তার বংশধর একই নামের বর্তমান ব্যারন, মেলবয়েস ডি থার্ড। ব্যারনের চাকর উলফ। মানে নেকড়ে! রাখার জন্যে আর কোন নাম খুঁজে পায়নি যেন ওর বাবা। নামের আকাল পড়েছিল যেন। লোকটা অদ্ভুত। নেকড়ের সঙ্গে মিল নেই মোটেও। বরং চেহারার দিকে তাকালে বিখ্যাত সেই ক্লাসিক ছবির দানবটার স্রষ্টার কথা মনে পড়ে–ড. জেকিল।
কোরির কথা ভাবল। সত্যি, কি ভূত দেখেছে সে? কিছু একটা তো দেখেছে নিশ্চয়। নইলে অমন করে চিৎকার করত না।
নাহ, ঘুমাতে আর পারবে না! বিছানা থেকে নেমে পড়ল সে। চাঁদটা চলে এসেছে যেন ঠিক তার জানালার বাইরে। হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায়। রূপালী জ্যোৎস্না ঘরে ঢুকে আলোর একটা আয়তক্ষেত্র তৈরি করেছে। কার্পেটে।
আলো মাড়িয়ে আলমারির কাছে গিয়ে শার্টটা বের করে গায়ে দিল সে। রান্নাঘরে যাবে। কোক-টোক কিছু পায় কিনা দেখবে।
দরজা খুলে সরু হলওয়েতে বেরিয়ে এল। বাতাসে কার্পেট ক্লীনার আর পোকা মারার ওষুধের গন্ধ। খুব মৃদু আলো জ্বলছে। রাতের বেলা ডিম লাইট জেলে রেখে উজ্জ্বল আলোগুলো সব নিভিয়ে দেয়া হয়।
হেঁটে চলল সে। রবারসোল স্যান্ডেল পরা থাকায় শব্দ হলো না। দুপাশের দরজাগুলো আগের মতই বন্ধ।
মোড় নিয়ে আরেকটা করিডরে বেরোল। বিচিত্র এক রকম গন্ধ। আবছা অন্ধকার। একই রকম নিঃশব্দ। যেন স্বপ্নের মধ্যে হেঁটে চলল সে।
ঠিক এই সময় কানে এল শব্দটা।
থমকে দাঁড়াল সে। নিঃশ্বাস বন্ধ করে ফেলল। মেঝের মচমচ না তো?
আবার হলো শব্দটা। আরেকটু জোরে। সেই সঙ্গে শেকলের ঝনঝনানি।

শেকল? ভুল শুনছে না তো?
আবার হলো শব্দটা। এগিয়ে এসে থেমে গেল।
আবার মচমচ। মৃদু গোঙানি। মানুষের গোঙানির মত। হালকা বাজনার শব্দ ভেসে এল। বীণা বাজাচ্ছে কেউ। ফিসফিস করে ওর নাম ধরে ডাকল কে যেন।
দূর! সব আমার কল্পনা, নিজেকে বোঝাল সে। বাতাসের শব্দ। সরু হলওয়েতে দমকা বাতাস এসব কারসাজি করছে।
করুণ সুরে বেজেই চলল বীণা। ফিসফিস করে তার নাম ধরে ডাকল। একটা ছোট্ট মেয়ে। একেবারে কানের কাছে।
ঘটনাটা কি? মোড়ের অন্যপাশে কেউ আছে নাকি? হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল সে। পার হয়ে এল মোড়টা। কানে এল মানুষের কণ্ঠ। জোরে জোরে কথা বলছে।
হাঁ করে ঢোক গিলে পানি খাওয়ার মত বাতাস গিলতে শুরু করল সে। যে ঘর থেকে কথা শোনা যাচ্ছে, তার দরজায় নম্বর নেই। নিচের ফাঁক দিয়ে চিলতে আলো এসে পড়েছে বাইরে।
ভূতুড়ে ফিসফিসানি থেমে গেছে।
এগিয়ে গিয়ে দরজায় কান পাতল সে।
ব্যারনের কণ্ঠ। চিনতে কোন অসুবিধে হলো না। রেগে রেগে কথা বলছেন কারও সঙ্গে। তর্ক করছেন।
কিশোর অনুমান করল, এটা ব্যারনের ঘর। করিডরের শুরুতে প্রথম ঘর। পাশে চওড়া সিঁড়ি নেমে গেছে। মেইন লবি আর হোটেলের অফিসে যাওয়া যায় ওটা দিয়ে।
শোনো! যা বলি শোনো! চিৎকার করে উঠলেন ব্যারন।
না, আমি শুনব না! সমান তেজে জবাব দিল আরেকটা কণ্ঠ।
মহিলা কণ্ঠ।
বিস্ময়ে নিচের চোয়াল ঝুলে পড়তে লাগল কিশোরের।
প্লীজ, আমার একটা কথা রাখো! কাঁদতে শুরু করল মহিলা, তোমার পায়ে ধরি, পার্টি দিয়ো না! প্লীজ, দিয়ো না!
দরজার বাইরে পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিশোর। কিন্তু আর কিছু শোনা গেল না।
কি নিয়ে তর্ক করছে ওরা? কিসের পার্টি? মহিলাটি কে?
ঘরের মধ্যে পায়ের শব্দ শোনা গেল। দরজার দিকে এগিয়ে আসছে। চট করে ওখান থেকে সরে এসে হলওয়ে ধরে দৌড় দিল কিশোর। যে-ই বেরোক, তার চোখে পড়তে চায় না।
.

পরদিন। সুন্দর, ঠাণ্ডা একটা সকাল। ডাইনিং রুমের বিশাল জানালা দিয়ে সোনালি রোদ এসে ছড়িয়ে পড়েছে ঘরের ভেতর। আকাশের রঙ ঘন নীল।
নাস্তা খেতে খেতে গতরাতের কথা সঙ্গীদের জানাল কিশোর।
হু, মাথা দুলিয়ে বলল কোরি, আমার কথা তাহলে বিশ্বাস হচ্ছে এতক্ষণে।
বিশ্বাস কাল রাতেই করেছি, কিশোর বলল। কিন্তু যাকে দেখেছ সে ভূত নয়, রক্তমাংসের জলজ্যান্ত একজন মানুষ, যে কথা বলে, তর্ক করতে পারে। মহিলাটি কে সেটাই ভাবছি এখন।
ব্যারনের রাধুনী হতে পারে, রবিন বলল, মনিকা।
না, মনিকা নয়। ব্যারন বলেছেন শুক্রবারের আগে আসবে না সে।
ওটা ভূত ছাড়া আর কেউ নয়, জোর দিয়ে বলল কোরি। হতে পারে বহুকাল আগে মেলবয়েসদের কারও স্ত্রী ছিল ওই মহিলা। অপঘাতে মরে ভূত হয়েছেরাত দুপুরে এসে ব্যারনের সঙ্গে তর্ক জুড়েছে
উলফ এসে ঢুকল ডাইনিং রুমে। মুখ সেই একই রকম গোমড়া। হাতে একটা লাল রঙের টুলবক্স। ছেলেমেয়েদের দিকে তাকিয়ে ভ্রুকুটি করল। কাজ শুরু করতে চাও?
কোরি জিজ্ঞেস করল, উলফ, হোটেলে কোন মহিলা আছে?
প্রশ্নটা অবাক করল উলফকে। মুখটাকে এমন করে ফেলল যেন বোলতায় কামড়ে দিয়েছে। দ্রুত সামলে নিয়ে বলল, না, নেই। কেন?
ব্যারনের সঙ্গে কোন মহিলা দেখা করতে এসেছে?
চোখ দেখেই বোঝা গেল এসব প্রশ্নে খুব বিরক্ত হচ্ছে উলফ। না, কেউ দেখা করতে আসেনি। রলিন মারা যাওয়ার পর আর কোন মহিলা ঢোকেনি। ব্যারনের ঘরে। রলিন ছিল তার স্ত্রী।
টুলবক্সটা নিয়ে ঘরের পেছনের অংশে চলে গেল উলফ। কিশোরের দিকে তাকাল কোরি। চোখে বিস্ময়। কিন্তু প্রসঙ্গটা নিয়ে আলোচনা করা গেল না। আর। এখন কাজের সময়।
এখান থেকে কাজ শুরু করবে তোমরা, দেয়াল জুড়ে থাকা লাইটহাউজের বিশাল একটা পেইন্টিং সরাল উলফ। ওয়ালপেপার সরাবে। সিরিশ দিয়ে ঘষে মসৃণ করবে।
*
সারাটা সকাল কাজ করল ওরা। পুরানো বাদামী রঙ ঘষে ঘষে তুলল। গরম হয়ে উঠেছে ঘরটা। মেঝেতে ছড়িয়ে আছে বাদামী রঙের শুকনো কণা। বাতাসেও উড়ছে। ঘামে আঠা হয়ে গেছে শরীর। উলফ ঠিকই বলেছে–পরিশ্রমের কাজ।

সাগরের নোনা হাওয়া কাঠের অনেক গভীরে ঢুকিয়ে দিয়েছে রঙ, তোলা খুব মুশকিল।

সাড়ে এগারোটা নাগাদ কোরি বলল, একটা কোক খাওয়া দরকার। আন্টিকেও ফোন করতে হবে। ও মই থেকে লাফ দিয়ে নেমে এল মুসা। কোরির সঙ্গে সঙ্গে এগোল। ওদের পেছনে গেল রবিন। কিশোর বলল, তোমরা যাও। আমি এটুকু শেষ করে আসি।

কথা বলতে বলতে যাচ্ছে তিনজনে। রান্নাঘরে ঢুকে যেতে আর শোনা গেল না। মইয়ে দাঁড়িয়ে নিজের কাজে মন দিল কিশোর। সিরিশ দিয়ে ঘষতে ঘষতে হাতের পেশী ব্যথা হয়ে গেছে। কিন্তু থামল না। ঘষেই চলল।

দশ কি পনেরো মিনিট পর কানে এল পদশব্দ। মুসারা নিশ্চয় ফিরে এসেছে।

ফিরে তাকিয়েই স্থির হয়ে গেল কিশোরের হাত।

মুসারা নয়। অবিকল ব্যারনের মত দেখতে একজন অপরিচিত লোক এসে দাঁড়িয়েছেন। সাদা চুল, সাদা গোঁফ। কিন্তু ব্যারনের মত হাসিখুশি নন, বরং উল্টো। পোশাকও পরিচ্ছন্ন নয়। কানা জলদস্যুদের মত এক চোখ কালো কাপড়ে ঢাকা। পরনে ঢোলা জিনস। প্যান্টের হাটুতে দাগ। গায়ে। সাফারি জ্যাকেট। অসংখ্য পকেট তার। কাগজ, কলম, রুমাল আর নানা। রকম জিনিসে উঁচু হয়ে আছে সেগুলো। ডান হাতে একটা হান্টিং রাইফেল। নল ধরে বাটটা ঠেকিয়ে রেখেছেন মেঝেতে। ভয়ানক বিরক্তিতে চোখমুখ কুঁচকে রাইফেলটাকে লাঠির মত ব্যবহার করে কাঠের মেঝেতে ঠুকঠুক শব্দ তুলে এগিয়ে এলেন কিশোরের দিকে।

হাই, হাসিমুখে বলল কিশোর।

জবাবে ঘোৎ করে উঠলেন তিনি। কালো একটা চোখ মেলে তাকিয়ে। রইলেন কিশোরের দিকে।

আমি কিশোর পাশা। আশা করল নিজের পরিচয় দেবেন ভদ্রলোক। দিলেন না দেখে জিজ্ঞেস করল, আপনি নিশ্চয় মিলার মেলবয়েস?

ব্যারন মিলার ডি মেলবয়েস, রাইফেলে ভর দিয়ে কিছুটা সামনে ঝুঁকে কুঁজো হয়ে দাঁড়ালেন তিনি। গলাটা তার ভাই রোজারের মত গমগমে হলেও অতটা মসৃণ নয়। আচরণ ভদ্র তো নয়ই, বুনো।

চেহারা এক, অথচ দুই ভাইয়ের মধ্যে অত অমিল হয় কি করে?–ভাবল কিশোর। বলল, আমরা বেড়াতে এসেছি এখানে। আমি আর আমার তিন বন্ধু। থাকা-খাওয়ার বিনিময়ে কাজ করে দিচ্ছি। মিলারের দৃষ্টির সামনে অস্বস্তি বোধ করছে সে।

শুনেছি, কিছুতেই সহজ হচ্ছেন না ভদ্রলোক। রাইফেলটাকে লাঠির মত ব্যবহার করে হেঁটে গেলেন জানালার কাছে। বাইরে তাকিয়ে রইলেন। উজ্জ্বল, রোদে আরও স্পষ্ট দেখা গেল তার পোশাকগুলো। অতিরিক্ত কুঁচকানো আর ময়লা।

রোজার বলেছেন, তাঁর ভাই বিষণ্নতা রোগে ভুগছেন। কেন এই বিষণ্নতা? আলাপ জমানোর জন্যে বলল কিশোর, দিনটা খুব সুন্দর, তাই না? জায়গাটাও দারুণ আপনাদের। মই থেকে নামবে কি নামবে না সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না সে।

কোথায় সুন্দর? বিরক্তকণ্ঠে প্রায় খেঁকিয়ে উঠলেন মিলার। প্রচণ্ড গরম! সাগরের দিকে তাকিয়ে থেকে নল ধরে ধীরে ধীরে ঘোরাচ্ছেন রাইফেলটা।

ঘরের মধ্যে গরম।

জবাব দিলেন না মিলার। অস্বস্তি আরও বাড়ল কিশোরের। ইচ্ছে করেই এমন পরিস্থিতি তৈরি করছেন তিনি যাতে সহজ হতে না পারে সে? মুসারা এত দেরি করছে কেন?

তোমার বন্ধুরা কোথায়? জিজ্ঞেস করলেন মিলার।

কাজ করতে করতে ঘেমে গেছিল, পানি খেতে গেছে। আমি এই কোণাটা শেষ করে যাব, হাত তুলে দেখাল কিশোর।

দেখার জন্যে ঘুরলেন না মিলার। বিষণ্নকণ্ঠে বললেন, জায়গাটা অতিরিক্ত চুপচাপ।

হবেই। এতবড় জায়গা। মাত্র পাঁচ-সাতজন লোক।

তার কথাটা মনে হয় পছন্দ হলো না মিলারের। মুখটাকে বিকৃত করে ঘনঘন রাইফেল ঠুকতে লাগলেন মেঝেতে। এগিয়ে আসতে শুরু করলেন। মইয়ের কাছে।

ভয় পেয়ে গেল কিশোর। মই থেকে টান মেরে ফেলে দেবেন না তো?

কিন্তু মইয়ের ফুটখানেক দূরে এসে দাঁড়িয়ে গেলেন তিনি। এক পকেট থেকে একটা রুমাল বের করে সশব্দে নাক ঝাড়লেন, গোফ মুছলেন, রুমালটাকে দলা পাকিয়ে ভরে রাখলেন আরেক পকেটে। কিশোরের দিকে চোখ তুলে বললেন, মন দিয়ে কাজ করো।

হ্যা করছি... ভয়ে ভয়ে বলল কিশোর। কি বললে আবার খেপে যান। কে জানে।

আমার ভাইকে দেখেছ?

না তো। সকালে নাস্তা খেতেও আসেননি।

হু! ওর সঙ্গে কথা ছিল।

ঠিক আছে, আমার সঙ্গে দেখা হলে তাকে বলব আপনি খুঁজছিলেন।

মন দিয়ে কাজ করো! হ্যাঁ, ভাল কথা, তোমরা কি পার্টিতে যোগ দিতে এসেছ নাকি?

পার্টি! চমকে গেল কিশোর। মোচড় দিয়ে উঠল পেটের মধ্যে। গতরাতের মহিলার কথা মনে পড়ল–প্লীজ, তোমার পায়ে ধরি, পার্টি দিয়ো না! কেন মানা করছিল মহিলা? পার্টিকে এত ভয় কেন তার?
কিসের পার্টি? জানতে চাইল কিশোর।
কর্কশ কণ্ঠে মিলার বললেন, থেকে যাও। পার্টিতে যোগ দিতে হবে তোমাদের। পালানোর চেষ্টা কোরো না।
*
সারাদিন কাজ করে সন্ধ্যায় খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়ল ওরা রবিনের মাথা ধরেছে। কোরির গা ম্যাজম্যাজ করছে কথাই বলতে পারল না কোনমতে খাওয়া শেষ করে ঘরে চলে গেল দুজনে
এত তাড়াতাড়ি শুতে যেতে ইচ্ছে করছে না কিশোরের। মুসারও না। ডাইনিং রুমে বসে রইল ওরা।
মিলারকে কি সত্যি পাগল মনে হয়েছে তোমার, কিশোর? জিজ্ঞেস করল মুসা।
পাগল কিনা জানি না, তবে আচরণ কেমন অদ্ভুত।
সেজন্যেই কোরি ভাবছে, ও ভূত।
যা খুশি ভাবুকগে। কারও আচরণ অদ্ভুত হলেই সে ভূত হয়ে যায় না। ভুলে যাচ্ছ কেন, মিলার বিষণ্নতা রোগে ভুগছেন। সে যাকগে। আন্ট জোয়ালিনের ব্যাপারটা কি বলো তো? কোরি নাকি একবারও যোগাযোগ করতে পারেনি তাঁর সঙ্গে?
এটাও আমার কাছে রহস্যময় লাগছে।
একটা মুহূর্ত চুপ করে রইল কিশোর। চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল, বাইরে একটু ঘুরে আসিগে। রঙের মধ্যে শ্বাস নিতে নিতে মাথাটা গরম হয়ে গেছে।
মুসাও বেরোল ওর সঙ্গে। হাঁটতে হাঁটতে চলে এল চন্দ্রালোকিত সৈকতে।
অপূর্ব দৃশ্য। হলদে আলোয় ঝলমল করছে বালি। তীরে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের ভাঁজগুলোকে কালচে দেখাচ্ছে।
কি পরিষ্কার আলো দেখো, মুগ্ধকণ্ঠে বলল কিশোর। সব স্পষ্ট।
স্যান্ডেল খুলে বালিতে পা রেখে দেখো। ঠাণ্ডা। খুব আরাম লাগে।
পানির কিনারে এসে দাঁড়িয়ে গেল কিশোর। ফিরে তাকাল হোটেলের দিকে। বালির ঢালের লম্বা ঘাসগুলোতে ঢেউ তুলছে বাতাস। মনে হচ্ছে ওগুলোও তরল পদার্থ। চাঁদের আলো সবকিছুকেই কেমন অন্য রকম করে তুলেছে।
ডকের দিকে একটা খসখস শব্দ হলো। পই করে ঘুরে তাকাল সে। ডকের ওপরে ছোট্ট পাথরের টিলার কাছে হয়েছে শব্দটা।
কিসের শব্দ? মুসাও শুনতে পেয়েছে।
কেউ নজর রাখছে নাকি? চলো তো দেখি।

আমার ভয় করছে।
ভূতের ভয়?
সবদিকে নজর থাকে ওদের। নিজে অদৃশ্য থেকে সবখানে হাজির হতে পারে একমাত্র ওরাই..
চলো তো দেখি।
বালির ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল কিশোর। নিচে কেউ থাকলে এখান থেকে দেখা যাবে।
কিন্তু অনেকখানি উঠেও কাউকে দেখতে পেল না। কোন শব্দও নেই। কেবল তীরে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের ছলাৎছল আর ঢেউয়ের মধ্যে বয়ে যাওয়া বাতাসের কানাকানি।
ক্লান্ত লাগছে। হাঁটতে আর ভাল লাগছে না। হোটেলে ফিরে চলল। দুজনে।

.

পরদিন সকালে নাস্তার পর আবার কাজে লাগল ওরা।

দেয়াল ঘেঁষে রাখা মঞ্চটাতে ওঠা দরকার। ছাতের ঠিক নিচে দেয়ালে দশ বর্গফুটমত জায়গার রঙ ঘষতে হবে। কিন্তু সবাই একসঙ্গে উঠতে পারবে না ওটাতে। মাত্র দুজনের জায়গা হয়।
মুসা বলল, আমি আর রবিন উঠে ঘষতে থাকি। আমাদের হাত ধরে গেলে তোমরা দুজন উঠো।
খালি খালি বসে থাকব? কিশোর বলল। মঞ্চের পাশে একটা মই ঠেস দিয়ে তাতে উঠে কাজ করা যায়।
কোরি গেছে তার আন্টিকে ফোন করতে।
একটা ইলেকট্রিক স্যান্ডার দিয়েছে আজ উলফ। হাতে ঘষার চেয়ে এটা দিয়ে ঘষা অনেক সহজ। অনেক দ্রুত অনেক বেশি জায়গা ঘষা যায় যন্ত্রটা দিয়ে। যথেষ্ট ভারী। অন্য তিনজনের চেয়ে সহজে তুলে ধরে রাখতে পারবে মুসা, কারণ তার গায়ে শক্তি বেশি। সুতরাং ওটা নিয়ে মঞ্চে উঠে পড়ল সে।
রবিন উঠল তার পাশে। মঞ্চটার অবস্থা বিশেষ সুবিধের লাগছে না আমার। নড়ছে, দেখছ? দুলছে। ভেঙে পড়বে না তো?
রবিনের সন্দেহটাকে গুরুত্ব দিল না মুসা। স্যান্ডার ঠেসে ধরতে গেল দেয়ালে। এই সময় ফিরে এল কোরি। মুখ থমথমে।
পেয়েছ? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
না। রিং হচ্ছিল ঠিকই। কেউ ধরল না। ভায়োলা আন্টি নাহয় হাসপাতালে গেছে।
কিন্তু আন্ট জোয়ালিন?
রোজার মেলবয়েস কি বললেন? শোরটাউনে যাবেন?

ঠোঁট ওল্টাল কোরি, জানি না। ফোন রেখে তার সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিলাম। কোথাও খুঁজে পেলাম না।

স্যান্ডারটা দেয়ালে ঠেসে ধরল মুসা। বিকট শব্দ করে রঙ তুলতে লাগল যন্ত্রটা। পাশে দাঁড়িয়ে টেনে টেনে দেয়ালের কাগজ ছিঁড়তে শুরু করল মুসা।

যন্ত্র দিয়ে কাজ করার ফলে বাতাসে রঙের কণা এত বেশি উড়ছে, শাস নিতে কষ্ট হতে লাগল দুজনের। ব্যাপারটা লক্ষ করে একটা আলমারি থেকে গিয়ে দুটো মাস্ক বের করে আনল কিশোর। হাত লম্বা করে বাড়িয়ে দিল রবিনের হাতে। একটা নিজে রেখে আরেকটা মুসাকে দিল রবিন।

কাজ করতে করতে পাশে সরে গেল মুসা। দুলে উঠল মঞ্চ। কাত হয়ে যাচ্ছে একপাশে।

চিৎকার করে উঠল রবিন, আরি, পড়ে যাচ্ছে তো!

ঠেকানো গেল না কোনমতে। মড়মড় করে ভেঙে পড়ল মঞ্চ। মুসার হাত থেকে স্যান্ডারটা উড়ে গিয়ে পড়ল কিশোরের পায়ের কাছে। আরেকটু হলে তার পা-টা হেঁচত। মেঝেতে পড়ে গেল মুসা আর রবিন।

দৌড়ে এল কোরি আর কিশোর।

কোনমতে উঠে বসল রবিন। হাতে মুঠো করে ধরা রয়েছে এখনও একটুকরো কাগজ। দেয়ালের দিকে চোখ পড়তে চিৎকার করে উঠল, আরে দেখো দেখো! একটা দরজা!

চোখ তুলে তাকাল বাকি তিনজন। দেয়ালের গায়ে যেখান থেকে কাগজ ছিঁড়েছে রবিন, সেখানে একটা দরজার খানিকটা দেখা যাচ্ছে।

এগিয়ে গেল কিশোর। টান দিয়ে নিচের দিকের বাকি কাগজটুকু ছিঁড়ে ফেলল। বেরিয়ে পড়ল পুরো দরজাটা। বিড়বিড় করে বলল, দরজা ঢেকে দিয়েছিল কেন? আশ্চর্য!

সরো! সরো ওটার কাছ থেকে! চিৎকার করে উঠল কোরি। আমি পড়েছি, ভূতের উপদ্রব ঠেকানোর জন্যে ভূতুড়ে ঘর কিংবা সুড়ঙ্গের দরজা এ ভাবে ফুলআকা কাগজ দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়। তাহলে নাকি ওসব দরজা দিয়ে। আর বেরোতে পারে না ভূত।

রসুনের মালা ড্রাকুলার মত ভূতকে ঠেকায় শুনেছি, কিন্তু ফুলআঁকা কাগজ দরজাটার দিকে এগিয়ে গেল কিশোর।

দেখো, আমি তোমাকে মানা করছি! সাবধান করল কোরি। যেয়ো না! বের করে এনো না ভূতটাকে...

চকচকে মসৃণ কাঠের দরজাটার একপাশে ফ্রেমে বাঁধাই একটা ছোট ছবি ঝোলানো। মঞ্চের আড়ালে ঢাকা পড়ে ছিল। সেটাকে ঝুলন্ত অবস্থায় রেখেই

কোণা ধরে সামান্য সরাতে বেরিয়ে পড়ল দরজার নব। হাসি ফুটল কিশোরের মুখে। নব ধরে মোচড় দিতে খুলে গেল দরজার পাল্লা।
কোরির দিকে ফিরে তাকাল সে। হাসি ছড়িয়ে পড়েছে মুখে।
ঢুকো না! কোরির দুচোখে ভয়। আমি এখনও বলছি, ভাল চাইলে বন্ধ করে দাও ওই দরজা!
মুসার দিকে তাকাল কিশোর।
হ্যাঁ-না কিছু বলল না মুসা। কোরির ভয়টা তার মধ্যেও সংক্রামিত হয়েছে। ঢোকা উচিত কিনা বুঝতে পারছে না।
রবিন বলল, খুলেই যখন গেছে, চলো দেখি কি আছে?
ওর মুখের কথা শেষ হতে না হতেই তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার দিয়ে ফড়ফড় করে বেরিয়ে এল কি যেন।
লাফ দিয়ে সরে গেল কোরি। মুসা হতভম্ব।
জানালার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল রবিন, বাদুড়। ওই জানালা দিয়ে বেরিয়ে গেল। হাসতে হাসতেই বলল, কোরি, ভ্যাম্পায়ার নয়, শিওর থাকতে পারো। দিনে বেরোয় না ভ্যাম্পায়ারেরা। সূর্য ডোবার আগে বেরোতে পারে না।
ইয়ার্কি মেরো না! ঝাঁঝিয়ে উঠল কোরি। যখন পড়বে ভূতের খপ্পরে তখন বুঝবে মজা!
যত ভয়ই পাক, কিশোর, রবিন আর মুসাও যখন ঢুকে গেল ভেতরে, আগ্রহ এবং কৌতূহল কোনটাই ঠেকাতে না পেরে কোরিও ঢুকে পড়ল ওদের পেছনে। অন্ধকারে আবার কিচকিচ করে উঠল কয়েকটা জীব। ফড়ফড় করতে লাগল মাথার ওপর। চামচিকে আর ছোট জাতের বাদুড়ে বোঝাই হয়ে। আছে জায়গাটা।
বাদুড় আমার সাংঘাতিক ভয় লাগে, অন্ধকারে ফিসফিস করে বলল কোরি। মাকড়সা আর তেলাপোকাকেও।
শুয়াপোকাকে ভয় লাগে না? হেসে জিজ্ঞেস করল রবিন। বড় কালো কালো শুয়াপোকা? লম্বা লম্বা কাটার মত লোম, কিলবিল করে
মাগো! গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল কোরি। দোহাই লাগে। তোমার রবিন, আর বোলো না..প্লীজ! উফ, দেয়ালেই হাত দিতে পারব না। আর।
ওর চিৎকারে মাথার ওপর ফড়ফড় করতে লাগল আবার বাদুড়ের ঝাক।
শক্ত করে গলার লকেটটা চেপে ধরল কোরি। অন্ধকারে কেউ দেখতে পেল না সেটা।
ধীরে ধীরে চোখে সয়ে এল অন্ধকার। পেছনের খোলা দরজাটা দিয়ে অতি সামান্য আলো আসছে। আবছামত দেখা যাচ্ছে এখন ভেতরটা। কংক্রীটে তৈরি

সরু, নিচু ছাতওয়ালা একটা সুড়ঙ্গে ঢুকেছে ওরা।
মুসা, কিশোর বলল, আলমারিতে টর্চ আছে। নিয়ে এসো তো দুটো। ঢুকেছি যখন ভাল করেই দেখে নিই কি আছে না আছে?
ভয়ের ভান করে রবিন বলল, না না, এগিয়ে না আর! বলা যায় না, কখন কাউন্ট ড্রাকুলার কফিন চোখে পড়ে যায়! এ ফালতু কথা বোলো না তো! লাফ দিয়ে দরজার দিকে সরে গেল কোরি। আমি যাব না!
ওর পাশ কেটে বেরিয়ে গেল মুসা। আলমারি খুঁজে দুটো টর্চ বের করে নিয়ে এল। মুসার কাছ থেকে একটা টর্চ নিল কিশোর। আগে আগে এগোল।
যাব না বললেও কৌতূহল দমাতে পারল না কোরি। এগিয়ে চলল তিন গোয়েন্দার সঙ্গে।
রোজার এসে যদি জিজ্ঞেস করেন, কাজ ফেলে কোথায় গিয়েছিলাম। আমরা, রবিন বলল, কি জবাব দেব?
সত্যি কথাই বলব, জবাব দিল কিশোর। সুড়ঙ্গটা দেখে কৌতূহল হয়েছিল। ভেতরে কি আছে দেখতে গিয়েছিলাম। স্বাভাবিক কৌতূহল এটা। তিনি কিছু মনে করবেন না। একটু চিন্তা করে বলল, তবে একটা কথা ভাবছি। এটার কথা কি উলফ জানে?
শুকনো গলায় কোরি বলল, আমার ভয় লাগছে!
সেটা তো বুঝতেই পারছি।
শূন্য সুড়ঙ্গ। পায়ের নিচে কংক্রীটের মেঝে। দেয়াল ছুঁয়ে দেখল কিশোর। ঠাণ্ডা। ভেজা ভেজা।
ওই দেখো! হাত তুলল মুসা।
ওর বলার ভঙ্গিতে চমকে গেল কোরি। আবার চিৎকার করে উঠল। তাকিয়ে দেখল দেয়াল বেয়ে এগিয়ে আসছে একটা বড় পোকা। গোঁ গো শুরু করল সে। যেন চোখ উল্টে দিয়ে পড়ে যাবে। ওয়াক ওয়াক করে বলল, আমার বমি আসছে!
নাহ, তোমাকে সঙ্গে নিয়ে এগোনোই তো মুশকিল! বিরক্ত হয়ে বলল কিশোর। যাও, তুমি চলে যাও, আমাদের সঙ্গে আর যাওয়া লাগবে না!
ঠিক আছে, আর চেঁচাব না। কিন্তু আধমিনিট পরেই বড় একটা মাকড়সা দেখে আবার চিৎকার করে উঠল কোরি। টারান্টুলা! ব্ল্যাক উইডো। স্পাইডার! পিষে ফেলো! কামড়ে দিলে সর্বনাশ!
আরে কিসের টারান্টুলা? ধমক লাগাল কিপোর। খেয়ে আর কাজ পেল না। এখানে টারান্টুলা আসবে কোত্থেকে? না চিনেই চেঁচামেচি। একেবারে সাধারণ মাকড়সা।

ডানে মোড় নিল সুড়ঙ্গ। ঢালু হয়ে গেছে মেঝে। গলিঘুপচির অভাব নেই। ওসবের মধ্যে না ঢুকে সোজা এগিয়ে চলল ওরা।
মুসা বলল, আমার মনে হয় সাগরের দিকে গেছে সুড়ঙ্গটা। পানির ধারে গিয়ে শেষ হয়েছে।
বানিয়েছিল কারা? রবিনের প্রশ্ন। জবাবটাও নিজেই দিল, বোধহয় প্রাচীন চোরাচালানির দল। রাতে জাহাজ থেকে গোপনে মাল খালাস করে। এনে হোটেলে লুকিয়ে রাখত।
টর্চের আলো সামনে ধরে রেখে সাবধানে নিচে নামতে লাগল কিশোর। আরও কয়েক মিনিট এগোনোর পর দেখা গেল দুভাগ হয়ে গেছে সুড়ঙ্গ। মূল সুড়ঙ্গটা বাঁয়ে মোড় নিয়ে সোজা এগিয়েছে। ওটা থেকে বেরিয়ে আরেকটা সুড়ঙ্গ চলে গেছে ডানে।
রসিকতা করে কিশোরকে জিজ্ঞেস করল মুসা, কোনদিকে যাব এবার, ক্যাপ্টেন কিড?
চলো আগে ডানেরটা ধরেই যাই, কোরি বলল।
কেন, কোন বিশেষ কারণ?
না না, তাড়াতাড়ি জবাব দিল কোরি, কোন কোন ভূত বিশেষজ্ঞ বা দিকটাকে অশুভ মনে করে তো…
আর কিছু বলা লাগল না। মুহূর্তে ডান দিকে ঘুরে গেল মুসা।
কয়েকশো গজ এগোনোর পর চিৎকার করে উঠল কোরি।
কি হলো? জানতে চাইল কিশোর।
মুখে কি জানি লাগল!
আলো ফেলল কিশোর। মাকড়সার জাল। তুমি কি ভেবেছিলে?
জবাব দিল না কোরি।
কি আর ভাববে, হাসতে হাসতে বলল রবিন, ভ্যাম্পায়ারের ছোঁয়া।
জালে দুলন্ত হালকা বাদামী মাকড়সাগুলো দেখতে দেখতে উত্তেজিত হয়ে উঠল কিশোর, সৈকতে বাস করে এসব মাকড়সা, পানির কিনারে। তারমানে বাইরে থেকে এসেছে এগুলো। আর বাইরে থেকে যেহেতু এসেছে, ঢোকার পথ আছে। এবং ঢোকার পথ মানেই বেরোনোর পথও।
গতি বাড়িয়ে দিল ওরা।
আঁকাবাঁকা সুড়ঙ্গের আরও কয়েকটা মোড় ঘুরে এসে দাঁড়াল একটা কাঠের দরজার সামনে। কয়েক ইঞ্চি ফাঁক হয়ে আছে। ওপাশে ঘন অন্ধকার।
দরজায় হাত রাখল কিশোর। এক মুহূর্ত দ্বিধা করে ঠেলা দিল। কাচকোচ আওয়াজ তুলে খুলে গেল পাল্লা। টর্চের আলোয় দেখা গেল ছোট একটা ঘর।

মাঝখানে একটা কাঠের টেবিল। দুই পাশে বেঞ্চ পাতা। টর্চের আলোয় দেখা গেল দেয়ালগুলোতে লাল রঙ লেগে আছে। যেন রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।
টেবিলের দিকে চোখ পড়তে খাইছে! বলে উঠল মুসা। হাত থেকে খসে গেল টর্চ। কিশোরের টর্চটা জ্বলছে।
বিড়বিড় করে কোরি বলল, মরার খুলি!
এগিয়ে গেল কিশোর। চটচটে কি যেন লেগে রয়েছে। আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে দেখল। আঠা আঠা জিনিস। গন্ধ শুকল। কিছু বুঝতে পারল না।
প্রোটোপ্লাজম! ফিসফিস করে বলল কোরি। ভূতেরা যেখান দিয়ে চলে, সেখানে নরকঙ্কাল দেখলেই তাতে লাগিয়ে রেখে যায়। এবার তো বিশ্বাস করবে আমার কথা? খানিকক্ষণ আগে এখানে বসে ছিল একটা ভূত, মরার খুলিতে করে নিশ্চয় কফি কিংবা চা খেয়েছে, এটা তারই প্রমাণ।
হেসে ফেলল রবিন, অতিরিক্ত ভূতের সিনেমা আর ভূতের গল্প পড়ার ফল এসব।
ধরতে গেল খুলিটা। নাড়া লাগতেই গড়িয়ে গেল ওটা। চোখ দুটো ওর ঘুরে গেল সে দিকে। ঝটকা দিয়ে হাতটা সরিয়ে আনল সে।
মাগো! খেয়ে ফেলল! বলে চিৎকার দিয়েই পেছন ফিরে দৌড় মারতে গেল মুসা।
খপ করে তার হাত ধরে ফেলল কিশোর। আরে থামো! কি করছ। পাগলের মত?
মুসাকে শান্ত হওয়ার সময় দিল সে। আগেই লক্ষ করেছে দরজার পাশে সুইচবোর্ড আছে। আলো জ্বেলে দিল। তুলে নিল মাটিতে পড়ে যাওয়া টর্চটা।
আর কিছু দেখার নেই। ফিরে চলল ওরা ডাইনিং রুমে।
সুড়ঙ্গটা যেখানে দুভাগ হয়েছে সেখানে পৌঁছে রবিন জিজ্ঞেস করল, বাঁয়েরটায় ঢুকবে না?
ঘড়ি দেখল কিশোর, নাহ, এখন আর সময় নেই। কাজে অনেক ফাঁকি দিয়েছি। মিস্টার রোজার জানতে পারলে রাগ করবেন।
যে দরজা দিয়ে ঢুকেছিল সেটার কাছে ফিরে এল ওরা।
কিন্তু দরজা বন্ধ। শত ঠেলঠেলিতেও খুলল না। আটকে গেছে কোন কারণে। এই সময় লক্ষ করল কিশোর, আলো কমে এসেছে টর্চের। ফুরিয়ে এসেছে ব্যাটারি।
শঙ্কিত কণ্ঠে রবিন বলল, আটকা পড়লাম না তো!
*
দরজায় দুই হাতে কিল মারতে মারতে চিৎকার করে উঠল কোরি, অ্যাই, শুনছেন? কেউ আছেন ওপাশে? দরজাটা খুলুন!
জবাব দিল না কেউ।
পদশব্দের আশায় কান পেতে রইল ওরা। কেউ এগিয়ে এল না।
বাইরে থেকে তালা আটকে দেয়নি তো? ককিয়ে উঠল কোরি।

দরজার কাছ থেকে সরে গেল কিশোর। বেরোনোর অন্য কোন পথ নিশ্চয় আছে। সময় থাকতে থাকতে সেটা খুঁজে বের করা দরকার। টর্চ নিভে গেলে মহাবিপদে পড়ব।
কি করবে? জিজ্ঞেস করল রবিন।
সুড়ঙ্গের অন্য মাথা দিয়ে বেরোনোর চেষ্টা করব।
মৃদু প্রতিবাদ করতে চাইল কোরি, কিন্তু কেউ তার কথা শুনল না। ফিরে চলল আবার ওরা।
সুড়ঙ্গের মাথাটা যেখানে দুই ভাগ হয়েছে সেখানে পৌঁছে এবারও ডানের সুড়ঙ্গটায় ঢুকল ওরা। কারণ কিশোরের ধারণা এটা দিয়ে সৈকতে বেরোনো যাবে। প্রায় গা ঘেঁষাঘেষি করে এগোল সরু সুড়ঙ্গ ধরে। ব্যাটারি ফুরিয়ে যাবার ভয়ে একনাগাড়ে জ্বেলে না রেখে মাঝে মাঝে টর্চ জ্বেলে পথ দেখে নিচ্ছে মুসা আর কিশোর।
পার হয়ে এল দরজাটা।
কিছুদূর এগোনোর পর আবার ভাগ হয়ে গেল সুড়ঙ্গ।
ডানেরটা দেখিয়ে বলল কোরি, এটাতেই ঢুকি, কি বলো?
সেটাতে ঢুকল ওরা। কিছুদূর এগোনোর পর মনে হলো অনেক বড় বাক নিয়েছে,সুড়ঙ্গটা। ঘুরে এগোচ্ছে। ছাত থেকে ফোঁটা ফোঁটা পানি ঝরে পড়ছে কংক্রীটের মেঝেতে। অসংখ্য মাকড়সার জাল। হাতে, মুখে, মাথায় জড়িয়ে যাচ্ছে।
চলেছে তো চলেছেই। পথ আর ফুরায় না। রবিন বলল, এ কোথায় চলেছি? বেরোনোর পথ পাওয়া যাবে তো?
কোথাও না কোথাও পথ একটা নিশ্চয় আছে, দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল কিশোর। কারণ সুড়ঙ্গগুলো মানুষের তৈরি।
আই, কোরি বলল, পথ ভুল করে একই সুড়ঙ্গ দিয়ে ঘুরে মরছি না তো আমরা? বার বার একই জায়গায় ঢুকছি না তো?
পথ হারিয়েছি বলতে চাও? শঙ্কিত স্বরে বলল মুসা।
কিংবা এমনও হতে পারে ফাঁদ পেতেছিল কেউ আমাদের জন্যে। সেই ফাঁদে ধরা দিয়েছি আমরা। সুড়ঙ্গগুলো সব একই রকম লাগছে দেখতে। কোনদিনই আর এখান থেকে বেরোতে পারব না আমরা।

.

পারতেই হবে; দৃঢ়কণ্ঠে বলল কিশোর। বেরোনোর পথ না পাওয়া পর্যন্ত এগিয়েই যেতে হবে আমাদের। নানা রকম প্রশ্ন মনে–কে বন্ধ করল দরজাটা? কেন করল? কি লাভ তার? কিন্তু প্রশ্নগুলো নিয়ে ভাবার সময় নেই। এখন।

একটা মোড় ঘুরে অন্যপাশে আসার পর দেখা গেল ক্রমশ খাড়া হয়ে ওপরে উঠে গেছে সুড়ঙ্গ। কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে এটা? বেরোনোর পথ সত্যি পাওয়া যাবে তো? সন্দেহ দেখা দিল কিশোরের। শুধু শুধু ঘুরে মরছে না তো?
আতঙ্ক এসে চেপে ধরতে শুরু করল। বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করছে। হৃৎপিণ্ডটা।
দুপুরের খাবার সময় হয়ে গেছে নিশ্চয়, টর্চের আলো ঘুরিয়ে এদিক ওদিক দেখে বলল মুসা। আলো কমে যাওয়ায় চারপাশে ছায়া বাড়ছে এখন। উলফ আমাদের খোঁজাখুঁজি করবে।
কি জানি! অনিশ্চিত শোনাল রবিনের কণ্ঠ।
তোমার কি মনে হয় সে-ই দরজাটা আটকে দিয়েছে? বুকের ওপর দুই হাত আড়াআড়ি চেপে ধরেছে কোরি। ভেজা বাতাসে ঠাণ্ডা লাগছে।
অসম্ভব কি?
সামনে কমে আসছে অন্ধকার। একটা মোড় ঘুরতেই আলো দেখা গেল। আলোর দুটো ঝিলমিলে বর্শা তেরছা হয়ে মেঝেতে এসে পড়েছে। দেখেই দৌড় দিল মুসা। পেছনে ছুটল অন্যরা।
ছোট একটা দরজা। তার ফাঁক দিয়ে আলো আসছে। ঠেলে খুলতে দেরি হলো না। হুড়মুড় করে বাইরে বেরিয়ে এল সবাই। অন্ধকার থেকে উজ্জ্বল সূর্যালোকে এসে চোখই মেলতে পারল না প্রথমে।
কিশোরের অনুমান ঠিক। সৈকতে বেরিয়েছে ওরা। উঁচু একটা ঢিবির ঢালে এমন জায়গায় এমন ভাবে রয়েছে সুড়ঙ্গমুখটা, সাগর থেকে দেখা যাবে না। নিচে সৈকতে দাঁড়িয়েও নয়। দেখতে হলে ঢাল বেয়ে উঠে আসতে হবে।
তাজা বাতাস কেমন লাগছে? হাসিমুখে জিজ্ঞেস করল কিশোর।
রোদ যে এত চমৎকার বুঝতে পারিনি কোনদিন, আকাশের দিকে মুখ তুলে বলল রবিন।
এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রোদ আর বাতাস খেলে পেট ভরবে না, তাগাদা দিল মুসা, হোটেলে যাওয়া দরকার।
হাসাহাসি করতে করতে ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল ওরা। বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়ে মুখে যেন খই ফুটছে। উঠে এল হোটেলের পেছনের নির্জন। আঙিনায়। সুইমিং পুলের পাশ কাটাল। কাচের দরজা ঠেলে পা রাখল ঘরের ভেতর।
ডাইনিং রুমে ঢুকেই থমকে দাঁড়াল কিশোর। তাকিয়ে রয়েছে মঞ্চটার দিকে। যেখানে ছিল ওটা সেখানে নেই। ঠেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সুড়ঙ্গে ঢোকার দরজার কাছে।
কেন খোলা যায়নি দরজাটা বুঝতে অসুবিধে হলো না কারও। মঞ্চটা দিয়ে ইচ্ছে করেই আটকে দেয়া হয়েছে যাতে সুড়ঙ্গের ভেতর থেকে শত ঠেলাঠেলিতেও না

খোলে।
বোঝা গেল না কে করেছে এই অকাজটা।
*
বিকেলটা সৈকতে কাটিয়ে উত্তেজনা দূর করার চেষ্টা করল ওরা। পারল না। থেকে থেকে মনে আসছে কেউ একজন ইচ্ছে করে ওদেরকে সুড়ঙ্গে আটকে মারতে চেয়েছিল। কে লোকটা? উলফ? মিলার?
মিস্টার রোজারকে কথাটা জানানো দরকার, কিশোর বলল। সবাই একমত হলো ওর সঙ্গে।
কিন্তু ডিনারের সময় পাওয়া গেল না ব্যারনকে। খেতে এলেন না তিনি। চামচ দিয়ে এক টুকরো মাংস নিয়ে সবে মুখে দিয়েছে কিশোর, এই সময় রাইফেলে ভর দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ঘরে ঢুকলেন মিলার। রাগে মুখ। লাল। এলোমেলো চুল। সেই সাফারি জ্যাকেটটাই পরে আছেন এখনও। বুকের কাছে ভোলা। নিচে হলদে স্পোর্টস শার্টের দুটো বোম নেই।
মিস্টার মিলার...এই যে, আমার বন্ধুরা:...সকালে দেখা হয়নি আপনার সঙ্গে, অস্বস্তি কাটানোর জন্যে কথা শুরু করতে গেল কিশোর।
এমন ভঙ্গিতে তাকালেন মিলার, যেন ওকেও চিনতে পারছেন না। মুসা, রবিন আর কোরির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল সে।
আনমনে ঘোৎ-ঘোৎ করলেন কেবল মিলার। হাত মেলালেন না। বিড়বিড় করে কি বললেন বোঝা গেল না। রাইফেলটা মেঝেতে শুইয়ে রেখে তার ভাই রোজারের চেয়ারটায় বসে খাবারের প্লেট টেনে নিলেন। হাপুস হুপুস করে খেতে শুরু করলেন নিতান্ত অভদ্রের মত।
সবাই হাঁ করে তাকিয়ে আছে তার দিকে। সুপ শেষ করে সালাদের বাটিটা টেনে নিলেন। চামচের পর চামচ মুখে পুরে আধ চিবান দিয়ে দিয়েই গিলে ফেলতে লাগলেন।
শেষে আর সহ্য করতে না পেরে ভয়ানক অস্বস্তি দূর করার জন্যে কথা শুরু করল কিশোর, আপনার ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে? ...তিনি খেতে আসবেন না?
কিশোরের দিকে তাকিয়ে থেকে মুখভর্তি খাবার চিবাতে থাকলেন মিলার। গিলে নিয়ে কোনমতে বললেন, না, রোজার এখানে নেই, বলেই আবার বড় এক চামচ সালাদ মুখে পুরলেন।
কোথাও গেছেন?
মাথা ঝাঁকিয়ে দায়সারা জবাব দিলেন মিলার। সশব্দে সালাদ চিবাতে লাগলেন।
অবাক লাগছে কিশোরের। এত বুনো কেন এই লোক? ভাইয়ের ঠিক উল্টো! দুই যমজ ভাইয়ের মধ্যে স্বভাবের এতটা পরিবর্তন কল্পনা করা যায় না।

কিশোরকে তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে দেখে অবশেষে ঘোৎ-ঘোৎ করে বললেন মিলার, রোজার গেছে শহরে। শোরটাউন। তারপর আরও কি যেন বললেন, এতই অস্পষ্ট, বোঝা গেল না কিছু।
আমার আন্টির খোঁজ নিতে গেলেন নাকি? জানতে চাইল কোরি।
ভাল একটা চোখের দৃষ্টি কোরির ওপর স্থির করে মিলার বললেন, আন্টি? হ্যাঁ, তোমার আন্টি।
আবার খাওয়ায় মন দিলেন তিনি। সালাদ শেষ করে আস্ত একটা মুরগীর রোস্ট আর আলুভাজার বাটিটা টেনে নিয়ে খেতে শুরু করলেন। কারও জন্যে একটুও অবশিষ্ট না রেখে শেষ করে ফেললেন পুরোটাই।
তার এই কাণ্ড দেখে তাজ্জব হয়ে গেল সবাই।
কিন্তু কারও পরোয়া করলেন না তিনি। কোন রকম ভদ্রতার ধার ধারলেন না। খাওয়া শেষ করে জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে কাত হয়ে তুলে, নিলেন রাইফেলটা। চেয়ার থেকে উঠে সেটাতে ভর দিয়ে চলে গেলেন ডাইনিং রুম থেকে।
হাঁপ ছেড়ে বাচল যেন সবাই।
এ তো রাক্ষস, বলে উঠল মুসা। এর সঙ্গে খেয়ে আমিও পারব না।
রোজার না বললেন বিষণ্নতা রোগ আছে? কোরি বলল।
আছেই তো, কিশোর বলল, নইলে এমন আচরণ করে নাকি কেউ!
বিষণ্নতা না ছাই! মুখ ঝামটা দিয়ে বলল কোরি। আস্ত এক উন্মাদ!
মিলারের সমালোচনা চলছে, এই সময় রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল উলফ। মুখটা আগের চেয়ে গোমড়া। বলল, কি, বলেছিলাম না এখানে থাকা নিরাপদ নয়? এখনও সময় আছে, পালিয়ে যাও।
আর না পালালে? ভুরু নাচাল মুসা। ভূত ছাড়া আর কিছুকে ভয় পাই না আমি। সত্যি করে বলুন, ভূত আছে কিনা? আপনাদের ওই মিলার ভূতফুত না তো?
দেখো, আমার কথা না শুনে ভুল করছ তোমরা... দরজার দিকে তাকিয়ে থমকে গেল উলফ। বড় বড় হয়ে গেল চোখ।
ফিরে তাকাল কিশোর। রাইফেলে ভর দিয়ে ফিরে আসছেন মিলার। উলফের দিকে তাকিয়ে গর্জে উঠলেন, থামলে কেন? চালিয়ে যাও তোমার বক্তৃতা।
কুঁকড়ে গেল উলফ। জ্যাকেটের মধ্যে গুটিয়ে ফেলতে চাইল যেন শরীরটা। না, স্যার, আমি তো কিছু বলছি না...
জ্বলন্ত এক চোখ মেলে উলফের দিকে তাকিয়ে রইলেন মিলার। বেশিক্ষণ চেয়ে থাকতে পারল না উলফ। চোখ নামাতে বাধ্য হলো।

বরফের মত ঠাণ্ডা গলায় মিলার বললেন, তোমার ডিউটি রান্নাঘরে, সেখানেই যাও।
যাচ্ছি, স্যার! ভীত ইঁদুরের মত রান্নাঘরের দিকে ছুটে চলে গেল উলফ। পালিয়ে বাচল যেন।
সন্তুষ্টির হাসি ফুটল মিলারের ঠোঁটে। উলফকে ভয় দেখাতে পেরে খুশি হয়েছেন। এই প্রথম তার মুখে হাসি দেখল কিশোর। উলফ এত ভয় পায় কেন মিলারকে? রোজারকে পায় না। তার সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে কথা বলে।
এমনকি অনেক সময় চাপাচাপিও করে। তাতে মনে হয় মনিব-ভূতের স্বাভাবিক সম্পর্কের চেয়ে কিছুটা বেশিই সম্পর্ক রোজারের সঙ্গে। অথচ তারই ভাই মিলারকে দেখলেই যেন গুটিয়ে যায় উলফ।
উলফকে তাড়িয়ে ছেলেমেয়েদের দিকে ঘুরলেন মিলার। পলকে মিলিয়ে গেল হাসিটা। কুঁচকে গেল ভুরু। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত একভাবে তাকিয়ে থেকে রাইফেলে ভর দিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন। পা টানতে টানতে বেরিয়ে গেলেন আবার ঘর থেকে।
*
খাওয়ার পর ডাইনিং রুমের বড় জানালাটার ধারে বসে কথা বলছে ওরা। ঘণ্টাখানেক পর ঘরে ঢুকলেন রোজার। সেই সাদা পোশাক পরনে। হেসে জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছ তোমরা? জবাবের অপেক্ষা না করেই বললেন, শোরটাউনে গিয়েছিলাম।
হ্যাঁ, মিস্টার মিলার বলেছেন আমাদের, কোরি বলল। আন্টি কেমন। আছে?
ভাল। ফোন করেছিলেন। মিলার ধরেছিল। আমরা হোটেল বন্ধ করে দিয়েছি জেনে আর আসেননি। দুদিন ভালমত বিশ্রাম নেয়ার জন্যে থেকে গেছেন। তোমরা কাজ করছ এখানে, সেটাও জানানো হয়েছে তাঁকে। সবই করেছে মিলার, কেবল তোমাদের বলতে ভুলে গেছে, খবরটা। দুশ্চিন্তায় রেখে দিয়েছে। আজকাল আর কোন কথা মনে থাকে না ওর।
যাক, আন্টি তাহলে ভালই আছে। একটা দুশ্চিন্তা গেল। কিন্তু আমি যে ফোন করলাম, ধরল না কেন? বাড়িতে কেউ ছিল না নাকি?
কি জানি, জিজ্ঞেস করিনি। ভায়োলা চলে যায় হাসপাতালে। তোমার আন্টিও বোধহয় সাগরের ধারে হাওয়া খেতে বেরিয়েছিল, তুমি যখন ফোন করেছিলে ওই সময়।
তাই হবে। খবরটা এনে দেয়ার জন্যে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।
ও ঠিক আছে। কোন খবর না পেয়ে দুশ্চিন্তা আমারও হচ্ছিল। জোয়ালিন বললেন, কাল-পরশু নাগাদ চলে আসবেন এখানে।...তো ঠিক আছে, তোমরা গল্প করো। আমি যাই।

পরদিন সকালে নাস্তা খেতে এল না কোরি। অস্বাভাবিক লাগল না সেটা তিন গোয়েন্দার কাছে। এর আগেও এমন করেছে সে। দেরি করে ঘুম থেকে উঠেছে। কাজ করার চেয়ে বিছানায় পড়ে থাকাটা ওর কাছে বেশি পছন্দের। ওকে নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাল না কেউ।

ডিমভাজায় চামচ বসিয়ে দিয়ে বিশাল জানালাটা দিয়ে সাগরের দিকে তাকাল মুসা। সাঁতার কাটার দিন নয় আজ। আকাশের অবস্থা ভাল না।

কিশোর আর রবিনও তাকাল। ভারী মেঘে ধূসর হয়ে আছে আকাশ। ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। জোরাল বাতাস বালির ঢিবিতে জন্মানো ঘাসের মাথাগুলোকে চেপে নুইয়ে দিচ্ছে।

না বেরোতে পারলে নেই, কিশোর বলল। ঘষাঘষির কাজ যতটা পারি সেরে ফেলব।

আজকেও যদি আবার আরেকটা সুড়ঙ্গমুখ বেরিয়ে পড়ে? রবিনের প্রশ্ন।

অবাক হব না। পুরানো বাড়ি। সুড়ঙ্গ, গুপ্তকুঠুরি থাকতেই পারে।

সারাটা সকাল একনাগাড়ে কাজ করল ওরা। দেড়টায় লাঞ্চ খাওয়ার আগে আর থামল না।

রান্নাঘরের বড় সিংকে হাত ধুতে ধুতে কিশোর বলল, কোরি কি এখনও উঠল না? এতক্ষণ তো ঘুমানোর কথা নয়।

ওর ঘরে গিয়ে দেখা দরকার, মুসা বলল।

কি জানি, রোজার কিংবা মিলারের সঙ্গে গিয়ে হয়তো আড্ডা দিচ্ছে, বলল রবিন। ওদের কাউকেও তো দেখলাম না।

তা ঠিক। নৌকা নিয়ে ব্যারনের সঙ্গে শোরটাউনেও চলে যেতে পারে, আন্টির সঙ্গে দেখা করার জন্যে।

ও তা কেন যাবে? প্রশ্ন তুলল কিশোর। আন্টি যে ভাল আছেন, শুনলই।

কেন, তোমার কিছু সন্দেহ হচ্ছে নাকি?

বুঝতে পারছি না, চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। তবে ব্যাপারটা স্বাভাবিক লাগছে না আমার কাছে।

নাস্তার পর উলফেরও আর দেখা মেলেনি। ওদের লাঞ্চের জন্যে রেফ্রিজারেটরে ঠাণ্ডা স্যান্ডউইচ আর ড্রিংকস রেখে গেছে। ডাইনিং রুমের ধূসর আলোয় দ্রুত খাওয়া শেষ করল ওরা। বাইরে মেঘের ঘনঘটা। কালো আকাশ। সকাল থেকে সেই যে বৃষ্টি শুরু হয়েছে, থামছে না আর। কমছে, বাড়ছে, কমছে, বাড়ছে–চলছে এভাবেই।

খাওয়ার পর আবার কাজে লাগল ওরা। দেয়াল থেকে আরও অনেক কাগজ ছিঁড়ল। কিন্তু আর কোন গুপ্তদরজা বেরোল না। আগের দিনের দরজাটা তৈমনি

লাগানো রয়েছে। ভোলার কথা একটিবারের জন্যে মনেও করল না কেউ। অন্ধকার সুড়ঙ্গে উঁকি দেয়ার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই আর।
সাড়ে চারটা নাগাদ যন্ত্রপাতি গুছিয়ে রেখে গোসল করতে চলল। নিজের ঘরে ঢোকার আগে কোরির দরজায় থামল কিশোর। টোকা দিল।
সাড়া নেই।
থাবা দিয়ে জোরে জোরে কোরির নাম ধরে ডাকল।
জবাব মিলল না।
নব ঘুরিয়ে ঠেলা দিতেই খুলে গেল পাল্লা। ভেতরে আলো জ্বলছে। অগোছাল বিছানা। কিছু পোশাক এলোমেলো হয়ে পড়ে আছে চেয়ারের হাতলে, কিছু বিছানায়। কিন্তু কোরি নেই।
কোরি? চিৎকার করে ডাকল কিশোর। বাথরুমে আছ নাকি?
কোন জবাব পাওয়া গেল না।
*
ডাইনিং রুমে বসে ডিনার খাচ্ছে ওরা, এই সময় সামনের দরজা দিয়ে রোজারকে ঢুকতে দেখল। ওদের দিকে তাকালেন না তিনি। দ্রুত হেঁটে চলে। যাচ্ছেন।
মিস্টার মেলবয়েস? ডাক দিল কিশোর। কোরিকে দেখেছেন কিনা জিজ্ঞেস করবে।
কিন্তু শুনতেই যেন পাননি ব্যারন। সোজা চলে গেলেন নিজের ঘরের দিকে।
কোরির জন্যে কিন্তু রীতিমত দুশ্চিন্তা হচ্ছে এখন আমার, কিশোর বলল। দুই সহকারীর দিকে তাকিয়ে।
দুশ্চিন্তাটা বাড়িয়ে দিতেই যেন রান্নাঘর থেকে খাবারের ট্রে হাতে ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করল উলফ, মেয়েটা কোথায়?
ওকে দেখেননি?
মাথা নাড়ল উলফ।
আমরা তো ভাবলাম মিস্টার রোজারের সঙ্গে নৌকায় করে শোরটাউনে। চলে গেছে।
না, সাহেবের সঙ্গে যেতে দেখিনি ওকে। সাহেব তো গেলেন ওয়ার্কারদের সঙ্গে কথা বলে জেনে আসতে কবে নাগাদ হোটেলের কাজ করতে আসছে ওরা।
ভয় পেয়ে গেল কিশোর। রান্নাঘরে যাচ্ছে উলফ। তার দিকে তাকিয়ে রইল। আচমকা ফিরে তাকাল মুসা আর রবিনের দিকে। আর বসে থাকা যায় না। কোরিকে খুঁজতে যাব আমি। তোমরা আমার সঙ্গে যাবে, না ভাগাভাগি হয়ে খুঁজবে?
একসঙ্গে থাকাই ভাল, মুসা বলল। ওর ঘর থেকে শুরু করা যাক। নাকি?

মাথা নাড়তে নাড়তে আনমনে নিজেকেই যেন প্রশ্ন করল রবিন, কোথায় আছে ও?
সত্যি সত্যি ভূতের খপ্পরে পড়েনি তো? ভয়ে ভয়ে বলল মুসা।
ভূত না কচু, কিশোর বলল। আঙুল তুলে মঞ্চটা দেখিয়ে বলল, ওটাও কি ভূতে নিয়ে রেখে এসেছিল দরজার কাছে?
কিশোর ঠিকই বলেছে। মুসার দিকে তাকাল রবিন। কোন মানুষের কাজ। হয় উলফ, নয়তো মিলার।
উঠে দাঁড়াল কিশোর। আর দেরি করা ঠিক হবে না।
কোরির ঘর থেকে খোঁজা শুরু করল ওরা। কোন সুত্র নেই। জিনিসপত্র, কাপড়-চোপড় দেখে বোঝা গেল না কোনটা নিখোঁজ হয়েছে কিনা। রাতে বিছানায় ঘুমিয়েছে কিনা তা-ও বোঝার উপায় নেই।
বিছানার অন্য পাশে গিয়েই চিৎকার করে ডাকল রবিন, এই, দেখে। যাও!
তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল কিশোর আর মুসা। বিছানার পায়ের কাছে মেঝেতে চক দিয়ে আঁকা বিচিত্র কিছু নকশা আর চিহ্ন।
পেন্টাকল এঁকেছে! অবাক হয়ে বলল কিশোর। কাছেই পড়ে থাকতে দেখল একটা পুরানো বই। হাতে নিয়ে দেখল। জনৈক ভূত-গবেষকের লেখা। কি করে ভূত তাড়াতে হয়, কি করে ডেকে আনতে হয়, লিখে রেখেছে। কোথাও কোথাও নকশা এঁকে বুঝিয়ে দিয়েছে।
ভুরু কুঁচকে মুসা বলল, খাইছে, ভূতকে ডেকে এনেছিল নাকি কোরি! শেষে ভুতেই গাপ করে দিল!
গম্ভীর হয়ে আছে কিশোর। জবাব দিল না।
কোরির ঘর, বাথরুম তন্নতন্ন করে খুঁজেও সন্দেহজনক আর কিছু পাওয়া গেল না।
ওল্ড উইঙে হলওয়ের দুই পাশে যত ঘর আছে, সবগুলোতে খুঁজে দেখা হলো। লবি আর রেকর্ড রুমেও পাওয়া গেল না কোরিকে। অফিস রুমে ঢুকল। অন্ধকার। নীরব। টর্চ জ্বেলে খুঁজে দেখল। নেই সে।
হোটেলের পেছনের আঙিনায় বেরিয়ে এল ওরা। বৃষ্টি থেমেছে। তবে আকাশ মেঘে ভারী হয়ে রয়েছে এখনও বাতাস গরম, ভেজা ভেজা।
সুইমিং পুলের কাছে এসে দেখা গেল বৃষ্টির পানিতে কানায় কানায় ভরে গেছে। কোরির নাম ধরে চিৎকার করে ডাকল কিশোর। জবাব পাওয়া গেল না। আরও কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর বলল, রোজার মেলবয়েসকে জানাতে। হবে।
রবিন বলল, পুলিশকে জানানো দরকার।

পুলিশ পাবে কোথায়? মুসা বলল, তার জন্যে শোরটাউনে যেতে হবে। কিংবা ফোন করতে হবে।
পাইরেট আইল্যান্ডেও পুলিশ আছে।
গোস্ট আইল্যান্ডের পাশের দ্বীপ পাইরেট আইল্যান্ড। গোস্ট আইল্যান্ডের চেয়ে বড়। মোটরবোটে যেতে দশ মিনিট লাগে।
ওখানে পুলিশ আছে জানলে কি করে? জিজ্ঞেস করল মুসা।
উলফের কাছে।
দ্রুতপায়ে হোটেলে ফিরে চলল ওরা।
*
ঘুমিয়ে পড়েননি তো? হোটেলে ঢুকে বলল রবিন।
হাতঘড়ি দেখল কিশোর। মাথা নাড়ল। মনে হয় না। মোটে তো সাড়ে আটটা।
ব্যারনের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। টোকা দিতে যাবে কিশোর, এই সময় ভেতর থেকে ভেসে এল তীক্ষ্ণ চিত্তার।
পরক্ষণেই আরেকটা চিৎকার শোনা গেল। অন্য কণ্ঠ।
তারপরেই শুরু হলো তর্কাতর্কি। রেগে রেগে কথা বলছে দুজন মানুষ। মিলারকে ধমক মারছেন রোজার। থেকে থেকে ঘোৎ-ঘোৎ করে উঠছেন। মিলার। চাপা গলায় জবাব দিচ্ছেন দুএকটা
দুজনকে থামানোর চেষ্টা করল একজন মহিলা।
কিশোরের হাত খামচে ধরল মুসা। ফিসফিস করে বলল, শুনলে?
পাগল! আস্ত পাগল! মহিলা বলল।
কে পাগল? খেঁকিয়ে উঠলেন মিলার।
তোমরা দুজনেই। বদ্ধ উন্মাদ! দুজনকেই তালা দিয়ে রাখা দরকার।
দেখো কথাবার্তা একটু সাবধানে...
অ্যাই, থামো! ধমক দিয়ে ভাইকে থামিয়ে দিলেন রোজার।
দেখো, ওর পক্ষ নেবে না বলে দিলাম। ও তোমার সাহায্য চায় না। তুমি একটা গাধা। একটা রামছাগল।
মুখ খারাপ করছ কেন? মহিলা বলল।
সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠলেন রোজার, আরে কি করছ! আরে!
মুসার দিকে তাকাল কিশোর। ভেতরে মারামারি বাধতে যাচ্ছে মনে হচ্ছে।
যত কথাই বলো তোমরা, দুই ভাইয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সমান তেজে চেঁচিয়ে উঠল মহিলা, আমি তোমাদের পার্টিতে থাকছি না।
না থেকে যাবে কোথায়? রাগে খসখসে হয়ে গেছে মিলারের কণ্ঠস্বর। যাওয়ার উপায় নেই তোমার।

রোজার বললেন মহিলাকে, কি করব বলো? কত বোঝানো বোঝালাম ওকে– পায়ে ধরা বাকি রেখেছি শুধু। শুনল না। মিলার, শোনো…
না, কোন কথা শুনব না আমি! ষাড়ের মত চিৎকার করে উঠলেন মিলার। তোমাদের সাবধান করে দিচ্ছি….
প্লীজ, মিলার, ভীতকণ্ঠে বলল মহিলা, নামাও ওটা! নামাও।
আরে করছ কি? রোজারও আঁতকে গেছেন কোন কারণে।
না না, মিলার! প্লীজ! রীতিমত আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে এখন মহিলা।
দোহাই তোমার, মিলার, ভয় পেয়ে গেছেন রোজারও, মাপ চাই আমি। তোমার কাছে! তুমি না আমার ভাই…
গুলির প্রচণ্ড শব্দ হলো ঘরের মধ্যে।
তারপর সব চুপ।
.
দরজার দিকে পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে শুনে হলওয়ে দিয়ে দৌড় মারল কিশোর। দেখাদেখি রবিন আর মুসাও ছুটল। তাড়াতাড়ি লুকিয়ে পড়ল একটা অন্ধকার কোণে।
ঝটকা দিয়ে খুলে গেল রোজারের ঘরের দরজা। রাইফেল হাতে বেরিয়ে এলেন মিলার। পরনে সেই সাফারি জ্যাকেট। উদভ্রান্তের মত ছুটে গেলেন একদিকে। একটামাত্র চোখ দিয়ে মনে হয় ঠিকমত দেখতে পাননি, ধাক্কা খেলেন গিয়ে উল্টোদিকের দেয়ালে। ঘুরে দাঁড়াতেই দেখে ফেললেন তিন গোয়েন্দাকে। বিশ্বাস করতে পারলেন না যেন নিজের চোখকে। ওদের এখানে আশা করেননি।
অ্যাক্সিডেন্ট! অস্বাভাবিক উঁচু গলায় ওদের বললেন তিনি। আমার ভাই রোজারের একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে।
রাইফেলটা ঘোরালেন চারপাশে। ভঙ্গি দেখে মনে হলো যেন যে কোন দিক থেকে শত্রু ছুটে আসার ভয় পাচ্ছেন। সেই অদৃশ্য শত্রুকে ঠেকানোর জন্যে তৈরি হয়েছেন।
সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল। ওপরে উঠে এল উলফ। জিজ্ঞেস করল, মিস্টার মিলার? কি হয়েছে?
টলতে শুরু করলেন মিলার। একপাশের দেয়ালে গিয়ে পড়লেন। সামলে নিলেন কোনমতে। অ্যাক্সিডেন্ট! একটা সাংঘাতিক অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে রোজারের!
ভুরু কুঁচকে গেল উলফের। নিচের চোয়াল ঝুলে পড়ল। অ্যাক্সিডেন্ট?
ডাক্তার ডাকুন, জলদি! চিৎকার করে বলল কিশোর। মিস্টার রোজারকে গুলি করেছেন উনি! এগিয়ে এসে রোজারের ঘরের দরজা খোলার জন্যে হাত বাড়াল সে।

খবরদার! গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন মিলার। যাও এখান থেকে। সরো!
এরকম হঠাৎ রেগে যাবেন মিলার, ভাবতে পারেনি কিশোর। ঢোক গিলে বলল, কিন্তু একটা মানুষ গুলি খেয়ে পড়ে আছে ভেতরে একজন মহিলাও আছেন…
তাতে তোমার কি? ভাগো এখান থেকে! দরজা জুড়ে দাঁড়ালেন মিলার। একচোখে কালো পট্টি। আরেক চোখে আগুন।
ডাক্তার ডাকতে বাধা দিচ্ছেন কেন? সামলে নিয়েছে কিশোর। মিলারের ধমকের পরোয়া না করে বলল, ভাইকে তো গুলি করলেন…
ডাক্তার ডেকে আর কোন লাভ নেই এখন।
মানে? লাল হয়ে গেছে উলফের মুখ।
দেরি হয়ে গেছে অনেক। রোজার মরে গেছে।
হাঁ করে মিলারের দিকে তাকিয়ে রইল উলফ। এগিয়ে গেল এক পা।
রাইফেল বাগিয়ে ধরলেন মিলার। প্রয়োজনে উলফকে গুলি করতেও দ্বিধা করবেন না।
উলফ বলল, অ্যাক্সিডেন্ট নয়, আপনি ভাল করেই জানেন…
না, জানি না, রাগত স্বরে বললেন মিলার, এটা অ্যাক্সিডেন্টই…
না, অ্যাক্সিডেন্ট নয়! মিস্টার রোজারকে গুলি করে মেরেছেন আপনি।
দীর্ঘ একটা মুহূর্ত চোখে চোখে তাকিয়ে রইল দুজনে। তারপর ঝটকা দিয়ে রাইফেল তুলে কাঁধে ঠেকালেন মিলার। উলফকে নিশানা করলেন।
আরে একি করছেন! পাগল হয়ে গেলেন নাকি? চেঁচিয়ে উঠল কিশোর।
*
সরান ওটা! শান্তকণ্ঠে বলল উলফ।
লোকটার স্নায়ুর জোর দেখে অবাক হলো কিশোর। মাত্র তিন ফুট দূরে ওর বুকের দিকে তাকিয়ে আছে রাইফেলের নল। কিন্তু ভয় পাচ্ছে না।
মিস্টার মিলার, আবার বলল উলফ, সরান ওটা। আপনি জানেন, আমাকে গুলি করতে পারবেন না।
জবাব দিলেন না মিলার। আস্তে আস্তে নামালেন রাইফেলটা।
উলফ বলল, আসুন আমার সঙ্গে। ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করি? আগেও যেমন বহুবার করেছি। আমাদের মেহমানদের অহেতুক ভয় দেখাচ্ছেন আপনি। ওদের ঘুমোতে দিচ্ছেন না।
কিন্তু দেরি হয়ে গেছে তো অনেক… বিড়বিড় করলেন মিলার।
না, হয়নি। এখনও সময় আছে। আসুন।
দ্বিধা করলেন মিলার। রাইফেলটা লাঠির মত করে ধরে ভর দিলেন তাতে। আবার আমার সঙ্গে চালাকি করছ না তো?

না না, করছি না।
জোরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মিলার। মাথা কাত করলেন, ঠিক আছে। চলো।
তিন গোয়েন্দার দিকে ফিরল উলফ, এই, তোমরা ঘরে যাও। শুতে যাও। আর এখানে দাঁড়িয়ে থেকো না।
মিলারকে নিয়ে সিঁড়ির দিকে রওনা হয়ে গেল সে।
*
রোজারের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল কিশোর।
কোথায় যাচ্ছ? জিজ্ঞেস করল রবিন।
জবাব না দিয়ে রোজারের ঘরের দরজা খুলে ফেলল কিশোর। ঢুকে পড়ল ভেতরে। বারুদের গন্ধ এসে ধাক্কা মারল নাকে। বড় একটা সিটিং রম। ঝকঝকে ক্রোমের আসবাবপত্র, সাদা চামড়ায় মোড়া গদি। কাচের কফি টেবিলে রাখা রূপার একটা কেটলি আর কয়েকটা চীনামাটির কাপ পিরিচ। কাউচের পেছনে সাদা একটা কাঠের টেবিল।
পেছনের দেয়ালে দুটো দরজা। অন্য ঘরে যাওয়ার জন্যে নিশ্চয়। রবিন। বলল, রোজার কোথায়?
ঘরে রোজারও নেই, মহিলাও নেই। মেঝেতে রক্তও নেই।
ভেতরের ঘরে আছে হয়তো, মুসা বলল।
কিন্তু চিৎকার তো এঘরেই শুনলাম।
গুলি খাওয়ার পর হামাগুড়ি দিয়ে ভেতরের ঘরে চলে গেছেন...
মেঝেতে সাদা কার্পেট পাতা। একফোঁটা রক্তের দাগ নেই।
এগিয়ে গিয়ে বায়ের দরজাটা খুলে ফেলল কিশোর। ভেতরে উঁকি দিল। ছোট একটা বেডরুম। টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে। এলোমেলো হয়ে আছে চাদর, বালিশ সব। খবরের কাগজ আর ম্যাগাজিন স্তূপ করে রাখা হয়েছে একপাশের দেয়াল ঘেষে। আরেকপাশে একটা বুকসেলফ। তাকের বই সব এলোমেলো। কুচকানো, ময়লা কয়েকটা শার্ট-প্যান্ট অযত্নে ফেলে রাখা হয়েছে মেঝেতে।
এটা নিশ্চয় মিলারের ঘর, অনুমান করল সে।
কই, রোজার তো এখানে নেই! কাঁধের ওপর দিয়ে তাকিয়ে বলল বিস্মিত মুসা।
ঘুরে দাঁড়াল কিশোর। তাড়াতাড়ি গিয়ে ডানের দরজাটা খুলল। এটাও বেডরুম। আগেরটার চেয়ে বড়। এটা অন্যটার একেবারে বিপরীত। জিনিসপত্র সব নিখুঁতভাবে গোছানো। ঝকঝকে পরিষ্কার।
এখানেও নেই কেউ! এতক্ষণে কথা বলল কিশোর। মিস্টার রোজার নেই। মহিলাও নেই।

অসম্ভব! গেল কোথায়? বিড়বিড় করল মুসা। ভয় ফুটুল চোখে। এই, ভূতের কারবার না তো! একটা লাশ এভাবে গায়েব হয়ে যেতে পারে না। সেই সঙ্গে একজন জ্যান্ত মানুষ…
একজন নয়, মনে করিয়ে দিল রবিন, দুজন। কোরিকেও খুঁজে পাচ্ছি না আমরা।
.
টোয়াইলাইট জোনে প্রবেশ করলাম নাকি আমরা? ধপ করে বিছানায় মুসার পাশে বসে পড়ল রবিন।
কথা বোলো না, আমাকে ভাবতে দাও, ওদের সামনে পায়চারি করতে করতে বলল কিশোর। মাথা গরম হয়ে গেছে আমাদের। ঠিকমত চিন্তা করতে পারছি না। সেজন্যেই উল্টোপাল্টা মনে হচ্ছে সব।
কিশোর, প্লীজ, এভাবে পায়চারি কোরো না। মাথাটা আরও গরম হয়ে যাচ্ছে আমার।
বোঝার চেষ্টা করছি আমি, আনমনে বলল কিশোর। রবিনের কথা যেন শুনতেই পায়নি। পায়চারি থামাল না। বাইরে দাঁড়িয়ে ঘরের মধ্যে তিনজন মানুষকে কথা বলতে শুনেছি আমরা। তর্কাতর্কি করছিল। তারপর গুলির শব্দ। এবং তারপর ঘর থেকে ছুটে বেরোলেন মিলার।
লাশটাকে টেনেহিঁচড়ে কোথাও সরিয়ে ফেলেছেন মিলার, অস্বস্তিতে বিছানায় নড়েচড়ে বসল রবিন। আশেপাশেই কোথাও আছে।
থমকে দাঁড়াল কিশোর। দুই সহকারীর দিকে তাকিয়ে বলল, তাহলে আরও ভালমত খোঁজা উচিত আমাদের। বিছানার নিচে। আলমারির ভেতর।
কিন্তু যদি মিলার চলে আসেন? দরজার দিকে তাকিয়ে বলল রবিন। রাইফেলটা এখনও তার কাছে। আমাদের ঘরে দেখলে রেগে গিয়ে গুলি করে বসতে পারেন। একটা খুন ইতিমধ্যেই করে ফেলেছেন…
জলদি সারতে হবে আমাদের। তিনজন তিন ঘরে খুজব, তাতে তাড়াতাড়ি হবে। তোমরা অন্য ঘরে যাও, আমি এখানে খুঁজি। এটা নিশ্চয় মিলারের ঘর।
কিন্তু কিশোর
যাও, দেরি কোরো না! বিছানার নিচে উঁকি দেয়ার জন্যে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল কিশোর
বেশ, অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠে দাঁড়াল রবিন। মুসা, এসো।
ওরা দুজন বেরিয়ে আসার দুই মিনিটের মাথায় দরজায় এসে দাঁড়াল কিশোর। উত্তেজিত স্বরে বলল, দেখে যাও! কি পেয়েছি।
চমকে গেল মুসা। লাশটা নাকি?

জবাব না দিয়ে দ্রুত আবার মিলারের ঘরে ফিরে এল কিশোর। পেছন পেছন এসে ঢুকল অন্য দুজন।
এই দেখো, বড় একটা ফটো অ্যালবাম তুলে দেখাল কিশোর।
দেখার জন্যে কাছে এসে দাঁড়াল মুসা আর রবিন।
দেখতে দেখতে রবিন বলল, পুরানো ছবি। যে রকম কালো হয়ে গেছে, মনে হয় একশো বছরের পুরানো।
না, এত পুরানো নয়, একটা ছবিতে আঙুল রাখল কিশোর, দেখো তো এটা চিনতে পারো কিনা?
নাইট শ্যাডোর সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটা বড় সেডান গাড়ি। ফিফটির। মডেল। সুন্দর রোদ ঝলমলে দিন। অলঙ্করণ করা দামী গাড়িটায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দুজন মানুষ–একজন পুরুষ, আরেকজন মহিলা।
এ তো রোজার মেলবয়েস, রবিন বলল। চুল এত কালো, চেনাই যায় না।
হ্যাঁ, মাথা ঝাঁকাল কিশোর। সঙ্গের মহিলাটিকে চিনতে পারো নাকি দেখো তো?
খাইছে! চিনে ফেলল মুসা। এ তো কোরির আন্টি! আন্ট জোয়ালিন।
হ্যাঁ। অবাক লাগছে না? তারমানে জোয়ান বয়েসে খাতির ছি দুজনের…
হলওয়েতে শব্দ হলো। হাত কেঁপে গেল কিশোরের। অ্যালবামটা মেঝেতে পড়ে গেল। তোলার চেষ্টা করল না। দরজার দিকে তাকিয়ে রইল।
কেউ এল না।
বেরোনো দরকার, ফিসফিস করে বলল রবিন। মিলার কখন ঢুকে পড়েন…
হ্যাঁ, ওর সঙ্গে একমত হলো মুসা। অ্যালবামের ছবি দেখে কোন। লাভ হবে না আমাদের। বরং তাড়াতাড়ি গিয়ে পুলিশকে খবর দেয়া দরকার। ওরা এসে খোঁজাখুঁজি যা করার করুক।
নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। এখানে কোথাও একটা ট্র্যাপোর আছে নিশ্চয়। রোজারকে গুলি করার পর লাশটা ওই পথে সরিয়ে ফেলেছেন হয়তো মিলার। মহিলাও ওখান দিয়েই পালিয়েছে।
কিন্তু রক্ত কই? প্রশ্ন তুলল রবিন। এক ফোঁটা রক্তের দাগও তো নেই কোথাও।
এটাই গোলমাল করে দিচ্ছে সব। কিছু বুঝতে পারছি না!
কিশোর, আর এখানে দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক না। এসব কথা বাইরে গিয়েও আলোচনা করতে পারব আমরা। মিলার ঢুকে পড়লে সর্বনাশ হয়ে যাবে।
দাঁড়াও, আরেকটু দেখে নিই।
খুঁজতে শুরু করল কিশোর। দেয়ালে থাবা দিয়ে দেখল ফাপা আছে। কিনা। টেবিল ল্যাম্প উল্টে দেখল। ড্রেসার-ড্রয়ারের নব ঘুরিয়ে দেখল।
কি করছ তুমি? জানতে চাইল রবিন।

দেখছি গুপ্তদরজা খোলার কোন গোপন সুইচ আছে কিনা, দেয়ালে একটা লাইট সুইচ দেখে সেটা টিপে দিল কিশোর। আরি দেখো দেখো!
বুকসেলফটা রিভলভিং ডোরের মত ঘুরতে আরম্ভ করেছে। অর্ধেক ঘুরে থেমে গেল। বইয়ের তাক চলে গেল অন্যপাশে, এপাশে চলে এল একটা ডেস্ক।
আবার সুইচ টিপল কিশোর। ডেস্কটা ঘুরে আবার বুক শেলফটা ঘুরে এপাশে আসতে শুরু করতেই সুইচ টিপে অফ করে দিল সে। মাঝপথে বন্ধ হয়ে গেল ঘোরা। ফাঁক দিয়ে দেখা গেল অন্যপাশে আরেকটা ঘর।
ফাঁকটা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল কিশোর। ফিরে তাকিয়ে বন্ধুদের বলল, এটা স্টাডিরুম। দেখে যাও।
লাশটা আছে? উঁকি দিল রবিন। কিন্তু অন্ধকারের জন্যে কিছু দেখতে পেল না। টেবিলে পেপারওয়েট চাপা দেয়া একটা কাগজের দিকে চোখ পড়তে স্থির হয়ে গেল দৃষ্টি। হাত বাড়িয়ে তুলে নিল কাগজটা। একবার পড়েই হাত কাঁপতে শুরু করল। কিশোর।
কি?
জলদি এসো! কি লিখেছে দেখো!
এপাশে বেরিয়ে এল কিশোর। রবিনের গা ঘেঁষে এল মুসা।
জোরে জোরে পড়তে শুরু করল রবিন
ডিয়ার জোয়ালিন
মর্মান্তিক এই খবরটা তোমাকে জানাতে কি যে কষ্ট লাগছে আমার বলে। বোঝাতে পারব না। তোমার বোনঝি কোরি আর ওর তিন বন্ধু কিশোর, মুসা এবং রবিন হঠাৎ করে দ্বীপ থেকে রহস্যজনকভাবে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। ওদের কি হয়েছে, কোথায় গেছে, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।
কি যে মানসিক যন্ত্রণা হচ্ছে আমার বলে বোঝাতে পারব না। পাইরেট আইল্যান্ডের পুলিশকে খবর দিয়েছি। ওরা এসে দ্বীপের প্রতিটি ইঞ্চি খুঁজে দেখেছে। কিছুই পায়নি। কোন সুত্র নেই। দিনেরাতে বহুবার ফোনে তোমার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেছি। না পেরে শেষে এই চিঠি লিখে জানাতে বাধ্য হলাম।
ঘটনাটা অদ্ভুত। মাথামুণ্ড কিছু বুঝতে পারছি না। পুলিশ কোন আশা দিতে পারছে না। রহস্যময় এই ঘটনায় ওরাও পুরোপুরি বিমূঢ় হয়ে গেছে। ছেলেমেয়েগুলোর বাবা-মাকে যে কি জবাব দেব ভেবে ভয়ে পালাতে ইচ্ছে করছে আমার। তোমার মুখোমুখি হওয়ার সাহসও আমার নেই।
যাই হোক, ওদেরকে খুঁজে বের করার সাধ্যমত চেষ্টা আমি করছি। ওদের এই উধাও হওয়ার রহস্য ভেদ না করা পর্যন্ত আমি ক্ষান্ত হব না। সারাক্ষণ দোয়া করছি, ছেলেমেয়েগুলো সুস্থ অবস্থায় ফিরে আসুক। কিন্তু বুঝতে পারছি, সেটা

ঘটার সম্ভাবনা একেবারেই নেই। অতীতেও এধরনের দুর্ঘটনা ঘটেছে এই দ্বীপে। হারানো মানুষকে আর জ্যান্ত ফিরে পাওয়া যায়নি। পাওয়া গেছে তাদের গলিত লাশ, কিংবা শুকনো কঙ্কাল। কি আর বলব, বলো? দ্বীপের এই বদনামের কথা তুমি তো সবই জানো।
মুখ তুলল রবিন। কাঁপা গলায় বলল, নিচে সই করেছেন মিলার মেলবয়েস! তারিখটা আজ থেকে দুদিন পরের!
.
আমাদের খুন করার প্ল্যান করেছে সে! চোখ বড় বড় হয়ে গেছে মুসার।
কিশোরের দিকে তাকিয়ে বলল রবিন, দাঁড়িয়ে আছ কেন এখনও? চলো না পালাই!
পাগল! বদ্ধ উন্মাদ! রবিনের হাত থেকে কাগজটা নিয়ে নীরবে আরেকবার পড়ল কিশোর। বিশ্বাস হতে চাইছে না তার। রসিকতা করেনি তো?
কার সঙ্গে করবে? কেন?
আমাদের খুন করতে চায় কেন?
কি করে বলব? পাগলের তো কত রকম ইচ্ছেই থাকে। অকারণেও অনেক কিছু করে। লোকটা একটা স্যাডিস্ট।
হু! নিজেকেই যেন প্রশ্ন করল কিশোর, উলফও কি এতে জড়িত আছে নাকি? নইলে রোজারকে খুন করা হয়েছে শুনেও পুলিশে খবর দেয়নি কেন?
দেয়নি, কি করে বুঝলে? জিজ্ঞেস করল মুসা।
তাহলে এতক্ষণে পুলিশ চলে আসার কথা। পাইরেট আইল্যান্ড থেকে আসতে ওদের দশ-বারো মিনিটের বেশি লাগবে না।
আমরাও তো খবরটা দিতে পারি।
কি ভাবে? রবিনের প্রশ্ন। ফোন করতে গেলেই দেখে ফেলবে উলফ। ওদিকেই রয়েছে সে আর মিলার।
তাহলে নৌকা নিয়ে নিজেরাই চলে যেতে পারি পাইরেট আইল্যান্ডে। ঘাটে তো নৌকা বাধাই আছে।
আমাদের ব্যাগট্যাগ সব, সঙ্গে নিয়ে চলে যাব। একবার বেরোতে পারলে এখানে ফিরে আসার আর কোন মানে হয় না।
কিন্তু কোরির কি হবে? চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। ওকে এখানে ফেলে যেতে পারি না। মিলার ওকে দেখলেই খুন করবেন।
কিন্তু কোথায় পাওয়া যাবে ওকে? রবিন বলল, তাড়াতাড়ি গিয়ে পুলিশ নিয়ে এলে ওরাই ওকে খুঁজে বের করবে। উলফ আর মিলার এসে আমাদের আটকে ফেলার আগেই পালানো দরকার। চলো চলো, আর দেরি করা যায় না।

দাঁড়িয়েই রইল কিশোর। সমস্ত প্রশ্নের জবাব না জেনে যেন বেরোতে ইচ্ছে করছে না তার। বলল, কিন্তু উলফ যদি আমাদেরকে মারার প্ল্যানই করে থাকে, তাহলে শুরু থেকেই জায়গা দিতে চাইল না কেন? কেন সময়। থাকতে আমাদের পালাতে বলল?

আরে বাবা, এসব কথা তো বাইরে গিয়েও ভাবা যাবে! পুরোপুরি অধৈর্য হয়ে পড়েছে রবিন। ভয়ে ভয়ে তাকাতে লাগল দরজার দিকে। মিলার ঢুকে পড়লে আর রক্ষা থাকবে না। কিশোরের হাত ধরে টান দিল সে, এসো।

হলওয়েতে বেরিয়ে এল ওরা। এদিক ওদিক তাকাল। কাউকে চোখে পড়ল না। ফিসফিস করে কিশোর বলল, সামনে দিয়ে বেরোনো যাবে না। উলফ কিংবা মিলারের চোখে পড়ে যেতে পারি। পেছন দিক দিয়ে পথ আছে, দেখেছি। ওটা দিয়ে বেরোব।

আমিও দেখেছি, মুসা বলল। কিন্তু ওটা তো রান্নাঘর দিয়ে গিয়ে বেরিয়েছে। যদি উলফ থাকে সেখানে?

থাকবে না। খেতে তো আর নিয়ে যায়নি মিলারকে। কথা বললে ওরা। ডাইনিং রুমে বসে বলবে।

যার যার ঘরে ঢুকে দ্রুতহাতে ব্যাগ গুছিয়ে নিল ওরা। ঘর থেকে বেরিয়ে পা টিপে টিপে চলে এল হলওয়ের মাথায়। কয়েক ধাপ সিঁড়ি আছে। নিচে আরেকটা করিডর। নামতে শুরু করল। মচমচ করে উঠছে পুরানো কাঠের সিঁড়ি। ওদের মনে হচ্ছে বোমা ফাটার শব্দ হচ্ছে যেন। মিলার কিংবা উলফের চলে আসার ভয়ে সারাক্ষণ সন্ত্রস্ত রইল।

সিঁড়ির গোড়ায়, করিডর এগিয়ে গেছে রান্নাঘরের দিকে। করিডরের একপাশে আরেকটা দরজা, অর্ধেক খোলা। সেটার কাছে এসে দাঁড়িয়ে গেল। কিশোর। কান পাতল কেউ আছে কিনা বোঝার জন্যে। কারও কথা শোনা গেল না। কানে আসছে শুধু ওদের নিঃশ্বাসের শব্দ।

ঘরের মধ্যে উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। কৌতূহল হলো কিশোরের। কেউ যদি না-ই থাকবে আলো কেন? সাবধানে ভেতরে উঁকি দিল সে। কোনও ধরনের স্টোর রুম ওটা। একধরনের তেলতেলে ভাপসা গন্ধ। ভালমত দেখে বুঝল, স্টোর রুম নয়, ট্রফি রুম। শিকার করা জন্তু-জানোয়ারের স্টাফ করা। আস্ত দেহ সাজানো রয়েছে টেবিল আর বেদীতে। দেয়ালে বসানো হরিণ, ভালুক, আর নেকড়ের মাথা। আরেকদিকের দেয়ালে চোখ পড়তেই অস্ফুট শব্দ করে উঠল কিশোর।

কি হলো? জানতে চাইল মুসা।

নীরবে হাত তুলে দেখাল কিশোর।

তাকাল মুসা আর রবিন। পাথর হয়ে গেল যেন মুহূর্তে।

দেয়ালে হরিণের মাথার মতই বসানো রয়েছে চারজন মানুষের কাটা মুণ্ড।
*
বাইরে উষ্ণ রাত। ঝিঁঝির কর্কশ চিৎকার। গাঢ় অন্ধকার।
পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসেছে ওরা। উলফের চোখে পড়েনি। বেরিয়েই দৌড় দিল সৈকতের দিকে।
লম্বা ঘাসে পা লেগে হুবহুস শব্দ হচ্ছে। কেয়ারই করল না। ঢাল, বালি, ঘাসের বাধা, কোনটারই পরোয়া করল না। একটাই ভাবনা, কোনভাবে নৌকার কাছে পৌঁছে যাওয়া। ধরা পড়লে ভাগ্যে কি ঘটবে বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না। আরও তিনটে মানুষের মাথা যোগ হবে ট্রফি রুমের দেয়ালে বসানো চারটে মাথার সঙ্গে।
কিশোর ভাবছে হতভাগ্য মানুষগুলো কে ছিল? নিশ্চয় হোটেলের গেস্ট। কোন কারণে হোটেল যখন বন্ধ ছিল, তিন গোয়েন্দার মতই হয়তো তখন এসেছিল বেড়াতে। উন্মাদ খুনী মিলারের পাল্লায় পড়ে আর ফিরে যেতে পারেনি। মরে গিয়ে ট্রফি রুমের শোভা বাড়াচ্ছে ওরা।
হঠাৎ একটা কথা মনে হতেই ঠাণ্ডা হয়ে আসতে চাইল হাত-পা। কোরিকে ইতিমধ্যেই খুন করে ফেলেনি তো মিলার? করে হয়তো গুম করে রেখেছে কোনখানে। ওদের তিনজনকেও শেষ করার পর ধীরেসুস্থে মুণ্ড কেটে নেবে। আর ভাবতে চাইল না সে।
কয়েক মিনিটের মধ্যেই ডকের গেটে পৌঁছে গেল ওরা। গেট খোলার জন্যে পাল্লা ধরে টান দিয়েই থেমে গেল মুসা। খাইছে! আটকানো!
ডিঙিয়ে যাব, রবিন বলল।
যাওয়া যাবে না। গেটের ওপর কাঁটা বসানো।
তাহলে?
চিন্তিত ভঙ্গিতে কিশোর বলল, হোটলে ফেরা ছাড়া উপায় নেই।
কি বলছ!
হ্যাঁ, আর কোন উপায় নেই।
তর্ক করল না মুসা বা রবিন। কিশোর যখন বলেছে, নিশ্চয় না ভেবে বলেনি।
দেরি না করে ছুটল আবার ওরা।
কিছুদূর এসে ফিরে তাকাল হোটেলের দিকে। ওপরতলার আলো দুটোও এখন নিভিয়ে দেয়া হয়েছে। পুরোপুরি অন্ধকার হয়ে আছে বাড়িটা। কালো। আকাশের পটভূমিতে হালকা কালো এক বিশাল ছায়ার মত দেখাচ্ছে।
ঢালে জন্মে থাকা লম্বা ঘাসের পরে বন। সেদিক দিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে ওদের। হোটেল থেকে যতটা সম্ভব দূরে থাকতে চায়।

বৃষ্টিতে ভেজা ঢাল বেয়ে নামাটা তেমন কঠিন না হলেও ওঠা খুব মুশকিল। তার ওপর সঙ্গে রয়েছে ব্যাগের বোঝা। কয়েক মিনিটেই হাঁপিয়ে গেল।
মেঘের ফাঁকে উঁকি দিল মলিন চাঁদ। ঘোলাটে আলোয় অন্ধকার কাটল কিছুটা। বনের মধ্যে একটা পেঁচা ডেকে উঠল।
বালির ঢিপির মাথায় সবার আগে উঠল রবিন। ডকের দিকে তাকিয়েই থমকে গেল।
সেটা লক্ষ করল কিশোর। কাছে উঠে এসে জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে?
হাত তুলে দেখাল রবিন।
ডকের দিকে তাকিয়ে একই অবস্থা হলো কিশোরেরও। চাঁদের আলোয় দেখা গেল, ছোট্ট ডকে যেখানে নৌকাগুলো বাধা থাকত, সেখানটা এখন। খালি। একটা নৌকাও নেই।
খাইছে! মুসার মনে হচ্ছে বরফের মত শীতল একটা হাত খামচি দিয়ে ধরেছে তার মেরুদণ্ড। যাব কি করে?
যেতে পারব না, বিড়বিড় করে বলল কিশোর। দ্বীপ থেকে বেরোনোর পথও বন্ধ করে দিয়েছে।

.

কোন রকম জানান না দিয়ে বৃষ্টি এল। ভিজিয়ে দিতে লাগল ওদের। আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকাল কিশোর। আবার কুচকুচে কালো হয়ে গেছে আকাশটা। মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়েছে চাঁদ।
কালো আকাশটাকে চিরে দিয়ে গেল বিদ্যুতের শিখা। গুড়গুড় মেঘ ডাকল।
ইস, একেবারে ভিজে গেলাম! বক্সের শব্দকে ছাপিয়ে চিৎকার করে : উঠল কিশোর।
এভাবে ভেজা ঠিক হচ্ছে না। সরে যাওয়া দরকার কোথাও, রবিন বলল। কিন্তু কোথায় যাব?
আরেকবার বিদ্যুৎ চমকাল। দিনের আলোর মত আলোকিত করে দিল। চতুর্দিক। বজ্রপাতের শব্দ। হাত দিয়ে মাথার পানি মোছার চেষ্টা করল কিশোর। মাথা থেকে মুখ বেয়ে গড়িয়ে নামছে পানি। চোখের সামনে জমে গিয়ে দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে।
বিকট শব্দে বাজ পড়ল আবার। থরথর করে কেঁপে উঠল মাটি। সাদা। আলোয় দেখা গেল বালির ঢিবিতে জন্মানো ঘাসগুলো বাতাসের ঝাঁপটায় আন্দোলিত হচ্ছে। একবার এদিক মাথা নোয়াচ্ছে, একবার ওদিক। ওদের মতই ঝড়বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে।
পুলহাউজে চলে গেলে কেমন হয়? কিলোর বলল।

সুইমিং পুলের পেছনে লম্বা ঘরটায় সাঁতার কাটার পোশাক আর পুল পরিষ্কারের জিনিসপত্র রাখা হয়। দুর্গন্ধ আর ধুলাবালি-ময়লা নিশ্চয় আছে। কিন্তু মাথা গোঁজার ঠাই তো হবে।
মুসা বলল, চলো, যাই।
দৌড়াতে শুরু করল ওরা। ভেজা মাটিতে পা পিছলে আছাড় খেল। কিশোর। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল আবার। ব্যাগটা মনে হচ্ছে কয়েক মন ভারী। আবার ছুটল মুসা আর রবিনের পেছনে। ঘরের দরজাটায় এখন তালা। দেয়া না থাকলেই হয়।
নাহ, তালা নেই।
পাল্লা ঠেলে খুলে ফেলল মুসা। হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকে পড়ল তিনজনে। এত জোরে হাঁপাচ্ছে কিশোর, ফুসফুসটা যেন ফেটে যাবে। বাতাসে ক্লোরিনের কড়া গন্ধ। বদ্ধ থাকায় অতিরিক্ত গরম। চালে ঝমঝম শব্দ তুলেছে বৃষ্টির ফোঁটা।
বাতি জ্বালার জন্যে সুইচ টিপল মুসা। আলো জ্বলে উঠল।
না না, জলদি নেভাও! চিৎকার করে উঠল কিশোর। মিলার দেখতে পেলে...
জানালা নেই। আলো বেরোবে কোন দিক দিয়ে?
আর কিছু বলল না কিশোর। ভিজে কপালের সঙ্গে লেপ্টে আছে চুল।
হাত দিয়ে মাথা থেকে পানি মুছতে মুছতে রবিন বলল, আপাতত তো। ঢুকলাম। এরপর কোথায় যাব?
এখানে ফোনটোন আছে নাকি? চারপাশে তাকাতে লাগল কিশোর।
থাকার সম্ভাবনা খুব কম, তবু যদি থাকে? এই আশায় খুঁজতে শুরু করল ওরা। লম্বা, নিচু চালার নিচে লাগানো উজ্জ্বল ফ্লোরেসেন্ট লাইটের আলোয় সবুজ দেখাচ্ছে ভেজা শরীরগুলোকে, মনে হচ্ছে সাগর থেকে উঠে। আসা তিনটে জলজন্তু।
টেলিফোন সেট পাওয়া গেল না।
এখন এই দ্বীপ থেকে বেরোব কি করে? চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল রবিন। ইচ্ছে করেই ডকের গেটে তালা লাগিয়ে রেখেছেন মিলার। নৌকাগুলো সরিয়ে ফেলেছেন।
কে বলল? পেছনে বোমা ফাটাল যেন গমগমে কণ্ঠ।
ভীষণ চমকে গেল তিন গোয়েন্দা। নিজের অজান্তেই ছোট্ট চিৎকার বেরিয়ে এল রবিনের মুখ দিয়ে। কিশোরও চিৎকার করতে যাচ্ছিল, কিন্তু। আটকে গেল গলায়। কুঁকড়ে গেল মুসা।
দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন মিলার মেলবয়েস। হাতে সেই হান্টিং রাইফেল। লাঠির মত ধরে তাতে ভর দিয়ে রেখেছেন। আরেক হাতে ছাতা। গায়ের হলদে রঙের রেইন স্লিকারের ঝুল গোড়ালি ছুঁই ছুঁই করছে।

ছাতাটা মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে রাইফেল হাতে এগিয়ে এলেন কয়েক পা। আলোর নিচে ভয়ঙ্কর লাগছে চেহারাটা। সাদা চুল এলোমেলো হয়ে আছে। ঘাড়ের কাছে বেশ কিছু চুল খাড়া। এক চোখে কালো কাপড়। আরেকটা ভাল চোখ জ্বলছে। ঠোঁটের এককোণ বেঁকে গেছে বিচিত্র হাসিতে।
কি পচা একটা রাত। কিন্তু এখানে কি করছ তোমরা?
কেউ জবাব দিল না।
কিশোর ভাবছে, এত তাড়াতাড়ি আমাদের খুঁজে পেল কি করে? কিভাবে জানল আমরা এখানে আছি?
কি, কথা বলছ না কেন? মিলারের হাসিটা মুছে গেল ঠোঁটের কোণ থেকে।
বজ্রপাতের শব্দ যেন মুখ খুলে দিল কিশোরের। কোনমতে বলে ফেলল, আমরা চলে যাচ্ছি।
চলে যাচ্ছ? জবাবটা অবাক করল মিলারকে। রাইফেলে ভর দিয়ে। আরেক হাতে গাল চুলকালেন।
হ্যাঁ। এখানে আর থাকব না আমরা, মূসা বলল।
মুসার কথায় আহত হয়েছেন মনে হলো মিলার। কিন্তু তোমরা তো যেতে পারবে না।
পারতে হবে, দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিল কিশোর। চমকের প্রথম ধাক্কাটা অনেকখানি সামলে নিয়েছে। দরজাটা খোলা রেখে দিয়েছেন মিলার। সেদিকে তাকাল। বিদ্যুৎ চমকাল, আকাশে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কড়াৎ করে বাজ পড়ল। বেড়ে গেল বৃষ্টির বেগ।
ওদের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত নীরব হয়ে রইলেন মিলার। নড়লেন না। কিন্তু তোমাদের তো যাওয়া হবে না, কঠিন, শীতল গলায় বললেন তিনি, পার্টিতে যেতে হবে। আমি নিজে তোমাদের দাওয়াত দিতে এলাম।
পার্টি? পেটের মধ্যে একধরনের শুন্য অনুভূতি হলো কিশোরের।
হ্যাঁ, পার্টি। শুরু হতে বেশি দেরি নেই, মিলারের একমাত্র চোখটা ওর দিকে তাকিয়ে আছে। কয়েক পা এগিয়ে এলেন। সরে যেতে চাইল কিশোর। কিন্তু দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে।
পার্টি শুরু করার জন্যে অপেক্ষা করছি আমি আর রোজার, বিচিত্র হাসিটা ফিরে এল মিলারের ঠোঁটের কোণে। কি ধরনের পার্টি, অনুমান করতে পারো?
মিস্টার মিলার, রবিন বলল, দয়া করে আমাদের যেতে দিন। এসব পার্টিফার্টিতে যেতে চাই না আমরা। আপনাদের যা ইচ্ছে করুনগে...
কি ধরনের পার্টি, অনুমান করতে পারো? রবিনের কথা যেন কানেই যায়নি তাঁর। বলতে পারবে না তো? ঠিক আছে, বলেই দিই, হান্টিং পার্টি। খেকখেক করে

হাসতে লাগলেন তিনি। হায়েনার হাসির মত লাগল রবিনের কাছে। এ মৌসুমে কাদের শিকার করব আমরা জানো? হাসিটা বাড়ছে তার।
বুঝে ফেলল কিশোর। মেরুদণ্ড বেয়ে শিরশির করে নেমে গেল ঠাণ্ডা শিহরণ। কল্পনায় ভেসে উঠল ট্রফি রুমের চারটে নরমুণ্ড।
কি করতে চাইছেন মিলার, মুসা আর রবিনও বুঝেছে। তাঁর হাতে হান্টিং রাইফেল। তিনি শিকারী, ওরা শিকার।
পাগল! উন্মাদ হয়ে গেছেন আপনি! কথাগুলো যেন বিস্ফোরিত হয়ে বেরিয়ে এল কিশোরের মুখ থেকে।
ঝট করে রাইফেলটা তুলে নিলেন মিলার।
সরে যাওয়ার চেষ্টা করল কিশোর। কিন্তু লুকানোর জায়গা দেখতে পেল না।
আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলা উচিত হয়নি তোমার! রেগে গেছেন মিলার। তোমাকে এলাম পার্টিতে দাওয়াত করতে, আর তুমি করছ আমাকে অপমান!
পার্টির দরকার নেই, অনুরোধ করে বলল মুসা, বেরোতে দিন আমাদের।
আমাকে পাগল বলছ কেন? আমি কি পাগল? রাইফেলটা আরও উঁচু করে ধরলেন মিলার। কিশোরকে নিশানা করলেন। দুপা আগে বাড়লেন আরও
মরিয়া হয়ে উঠল কিশোর। কোন রকম চিন্তাভাবনা না করে ছুটে গেল সামনের দিকে। একথাবায় সরিয়ে দিল নলের মুখ।
গুলি ফুটল বিকট শব্দে।
চিৎকার করে উঠলেন মিলার। রাইফেলের ধাক্কা এবং সেই সঙ্গে কিশোরের হাতের ঠেলা লেগে পেছনে উল্টে পড়ে গেলেন। একটা টেবিলের কোণায় বাড়ি খেল মাথা।
তার ওঠার অপেক্ষা করল না আর তিন গোয়েন্দা। ব্যাগগুলো যেখানে রেখেছিল সেখানেই রইল। খোলা দরজা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে এল ওরা। মুষলধারা বৃষ্টির মধ্যে।
এদিক দিয়ে! চিৎকার করে বলল মুসা।
সেদিকে ছুটল কিশোর। ভেজা মাটিতে জুতো পিছলে যাচ্ছে। মুসার পেছন পেছন বনে ঢুকে পড়ল। ফিরে তাকাল। ওর ঠিক পেছনেই রয়েছে রবিন। গাছপালার ফাঁক দিয়ে পুলহাউজটা দেখা যাচ্ছে। এখনও বেরোয়নি মিলার।
থামল না ওরা। যতটা সম্ভব দূরে সরে যাওয়া দরকার। বনের ভেতরের আঁকাবাঁকা পথ ধরে ছুটছে বৃষ্টি কমেছে। গুঁড়ি গুঁড়ি পড়ছে এখন। কিন্তু। বাতাসে পাতা নড়লেই ঝরঝব করে বড় বড় ফোঁটা বৃষ্টির মত ঝরে পড়ছে গায়ে।
চাঁদের ওপর থেকে সরে গেল মেঘ। গাছের মাথার ওপর দেখা গেল ফ্যাকাসে চাঁদ। ভূতুড়ে রূপালী করে তুলল বনভূমিকে। ভেজা পাতাগুলোকে কেমন বিকৃত

দেখাচ্ছে। মাটি থেকে হালকা ধোয়ার মত উঠছে গরম বাষ্প।
যাচ্ছি কোথায়? জিজ্ঞেস করল রবিন।
কথা বোলো না, জোরে জোরে হাঁপাচ্ছে কিশোর, ছুটতে থাকো। কপালে ডালের বাড়ি খেয়ে আঁউক করে উঠল। ব্যথাটা এতই তীব্র, দাঁড়িয়ে গেল নিজের অজান্তে। ডলতে শুরু করল কপাল।
একঝলক দমকা বাতাস আবার পানির ফোঁটা ফেলল গায়ে। সরে যাওয়ার চেষ্টা করল। পারল না। ভিজে চুপচুপে হয়ে গেল।
বনের ভেতর আরও খানিকক্ষণ দৌড়াল ওরা। পথ শেষ হয়ে গেল হঠাৎ। সামনে যেন হুমকি হয়ে দাঁড়িয়ে পথরোধ করে দিল কাটাঝোপ।
যাচ্ছি কোথায় আমরা? আবার জিজ্ঞেস করল রবিন। এভাবে দৌড়ে লাভটা কি?
বড় একটা গাছের নিচে দাঁড়াল ওরা। মাটি এখানে অনেকটাই শুকনো। গাছের পাতা এত ঘন, বৃষ্টির পানি নিচে পড়তে বাধা পেয়েছে।
দমকা বাতাস বয়ে গেল। জোরো রোগীর মত কাঁপিয়ে দিয়ে গেল গাছের পাতা।
পাগলটা কি আসবে নাকি? গাছের গায়ে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল রবিন।
কান পেতে আছে তিনজনেই। কোন শব্দ নেই, শুধু বাতাসের ফিসফাস আর ওদের ভারী নিঃশ্বাসের শব্দ ছাড়া।
জানোয়ারের মত খুঁজে বের করে আমাদের খুন করবে সে, কিশোর বলল।
দেয়ালের চারটে নরমুণ্ড আবার চোখের সামনে ভেসে উঠল ওর। আগের বছরের হান্টিং পার্টিতে ওদেরকেও নিশ্চয় এভাবেই দ্বীপময় তাড়িয়ে নিয়ে খুন করেছেন মিলার।
আসলেই এ ভাবে দৌড়াদৌড়ি করার কোন মানে হয় না, শার্টের হাতা দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে গিয়ে বাড়ি লাগা জায়গাটায় ব্যথা পেল কিশোর। কেয়ার করল না। একটা প্ল্যান দরকার আমাদের।
এ দ্বীপ থেকে বেরিয়ে যেতে হবে, রবিন বলল। পেছনে তাকিয়ে দেখল মিলার আসছেন কিনা।
সে চেষ্টা তো ইতিমধ্যেই করেছি, হাতে বসা একটা মশাকে থাপ্পড় মারল কিশোর। নৌকা ছাড়া যাব কি নিয়ে?
গাছের বাকল দিয়ে বানিয়ে নিতে পারি, মুসা বলল, আমাজানের ইনডিয়ানদের মত।
হাত নেড়ে ওর কথাটা উড়িয়ে দিল কিশোর, ফ্যান্টাসি বাদ দাও এখন। গাছ কাটবে কি দিয়ে? বাধবে কি দিয়ে? কাটার শব্দ শুনে মিলার চলে আসবে না? তা ছাড়া অত সময় কই?
চুপ হয়ে গেল মুসা। ভাবতে লাগল তিনজনেই। বৃষ্টি এখন পুরোপুরি থেমে গেছে।

রবিন বলে উঠল, পাইরেট আইল্যান্ডের পুলিশকে একটা ফোন করা। গেলেই হত …
ফোনগুলো রয়েছে সব হোটেলে। চাপড় মেরে আরেকটা মশা তাড়াল কিশোর।
তাহলে ওখানেই যাওয়া উচিত আমাদের, মুসা বলল।
পাগল নাকি! ওর কথাটা নাকচ করে দিল রবিন।
ও ঠিকই বলেছে, মুসার সঙ্গে একমত হলো কিশোর। চুপি চুপি হোটেলে ঢুকে পুলিশকে ফোন করব।
কিন্তু উলফ আর মার্টিন যদি…
আমরা হোটেলে ঢোকার সাহস করব এটা এখন কল্পনাও করবে না ওরা। চটাস করে বাহুতে চাপড় মারল মুসা, শালার মশা!
কল্পনা করবে না এটা বলা যায় না, গাল থেকে টিপে একটা মশা মারল কিশোর। উলফ নিশ্চয় জানে না আমরা কোথায় আছি। রান্নাঘর কিংবা ডাইনিং রুমেই হয়তো এখন বসে আছে সে।
দুজনেই বন্দুক নিয়ে তেড়ে আসবে না তো আমাদের? কেঁপে উঠল রবিনের গলা। চটাস চটাস চাপড় মারতে আরম্ভ করেছে সে-ও। উফ, ড্রাকুলার বাচ্চা সব! খেয়ে ফেলল!…যেমন মনিব, তেমনি তার চাকর। দুজনেই হয়তো মানুষ শিকারে আনন্দ পায়। এ দ্বীপের সবাই রক্তলোভী। দেখছ না মশাগুলোর কাণ্ড!
উপায় এখন একটাই, কিশোর বলল, রিস্ক নিতে হবে। যত তাড়াতাড়ি পারি গিয়ে হোটেলে ঢুকে ফোন করে আবার পালাব। ওরা না আসা পর্যন্ত লুকিয়ে থাকব কোথাও।
কোথায়?
জানি না, অধৈর্য শোনাল কিশোরের কণ্ঠ, হোটেলের ভেতরই কোনখানে।
বনের মধ্যে লুকিয়ে থাকাটা বরং নিরাপদ।
কতক্ষণ? মুসার প্রশ্ন।
হোটলের মধ্যেও বেশিক্ষণ লুকিয়ে বাঁচতে পারব না আমরা, মুসার। কথার পিঠে বলল কিশোর। ওরা আমাদের খুঁজে বের করবেই। যে ভাবেই হোক বাঁচার একটা বুদ্ধি বের করতে হবে। আরেকটা কথা ভুলে গেলে চলবে, না, কোরিকে খুঁজে পাইনি আমরা এখনও। হোটেলে গিয়ে কোনমতে আগে একটা ফোন যদি করতে পারি, পরের ভাবনা পরে ভাবব।
আরও কয়েক সেকেন্ড আলোচনার পর রওনা হলো ওরা। কিশোর বলল, রাস্তা থেকে সরো। যতটা সম্ভব গাছপালার আড়ালে থেকে এগোব…
কথা শেষ হলো না তার। বাতাসে ঝরে পড়ল পানির ফোঁটা। পরক্ষণে শোনা গেল গুলির শব্দ।

চমকে মুখ তুলে তাকাল সবাই। সামনে দুটো গাছের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন মিলার। রাইফেলটা ওদের দিকে তাক করা। গুলি করেছেন ওদের লক্ষ্য করেই।

.

আবার গুলি করলেন মিলার।

বিকট শব্দ গাছের গায়ে বাড়ি খেয়ে খেয়ে ফিরল দীর্ঘ সময় ধরে। মনে হলো যেন চতুর্দিক থেকে গুলি চলছে।

বুকে কিংবা মাথায় গুলি লাগার অপেক্ষায় ছিল কিশোর। লাগল না দেখে মুসা আর রবিনের দিকে তাকাল। কার গায়ে লেগেছে? ওরাও কেউ আর্তনাদ করল না। দেরি না করে প্রায় ডাইভ দিয়ে লুকাল এসে একটা গাছের। আড়ালে। উপুড় হয়ে পড়ায় হাঁটুতে ব্যথা পেল।

হামাগুড়ি দিয়ে একটা ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়ল তিনজনেই। এখানে। থাকলেও বাঁচতে পারবে না। নিঃশব্দে বেরিয়ে এল ঝোপের অন্যপাশে। লাফিয়ে উঠে দৌড় দিল। দুহাতে গাছের ডাল সরাতে সরাতে ছুট লাগাল প্রাণপণে।

আবার শোনা গেল গুলির শব্দ।

খুব কাছে থেকে।

তারপর শোনা গেল কুৎসিত, কর্কশ হাসি। খুব মজা পাচ্ছেন উন্মাদ মিলার।

একটা বিখ্যাত গল্পের কথা মনে পড়ল রবিনের–দা মোস্ট ডেঞ্জারাস গেম! লেখকের নামটা এ মুহূর্তে মনে পড়ছে না। ঝড়ের মধ্যে জাহাজডুবী হয়ে বনে ছাওয়া এক দ্বীপে উঠতে বাধ্য হয় এক নাবিক। দুর্গের মত এক পুরানো বাড়িতে ওঠে রাতের আশ্রয়ের জন্যে। প্রথমে খুব খাতিরযত্ন করে তাকে বাড়ির মালিক। তারপর হাতে একটা অস্ত্র ধরিয়ে দিয়ে বলে পালিয়ে যেতে। রাইফেল আর শিকারী কুকুর হাতে নাবিকের পিছু নেয় সে, খুন করার জন্যে। রাতের অন্ধকারে তাড়া খেয়ে ভীত জানোয়ারের মত বনের মধ্যে প্রাণভয়ে ছুটাছুটি করতে থাকে বেচারা নাবিক...অবিকল সেই গল্পের নকল চলছে এখন, ওদের ওপর। ওই ভয়ঙ্কর গল্প পড়েই কি হান্টিং পার্টির উদ্ভট আইডিয়া মাথায় এসেছে মিলারের?

আতঙ্কে মাথা গরম হয়ে যাওয়ার অবস্থা হলো ওর। মনে হচ্ছে বাস্তবে ঘটছে না এই ঘটনা। সামনে পথজুড়ে থাকা ঝোপঝাড়, পিচ্ছিল ভেজা মাটি, চাঁদের আলোয় বিকৃত দেখানো ওই যে পাতাগুলো, কোনটাই বাস্তব নয়। রাইফেলের শব্দ, গুলি ফোঁটার পর প্রতিধ্বনি, সবই ঘটছে যেন ভয়াবহ কোন দুঃস্বপ্নে।

শিকারের উত্তেজনায় হেসে ওঠা মিলারের ওই শিকারী-হাসিও অবাস্তব।

কিশোরের চিৎকারে বাস্তবে ফিরে এল সে। কিশোর বলছে, অ্যাই দেখো, কোথায় বেরিয়েছি আমরা।

সাগরের কিনারে চলে এসেছে ওরা। ঝোড়ো বাতাসে ফুঁসে ওঠা বড় বড় ঢেউ চাঁদের আলোয় রূপালী হয়ে ভীমবেগে এসে আছড়ে পড়ছে নীলচে-সাদা বালিয়াড়িতে।
থমকে দাঁড়িয়ে পানির দিকে তাকিয়ে রইল ওরা। সমতল, সরু এখানে সৈকত। কোথাও একটা বালির ঢিপিও নেই যে তার আড়ালে লুকাতে পারবে।
এখানে থাকা যাবে না, কিশোর বলল।
হ্যাঁ, একেবারেই খোলা, মুসা বলল।
গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে মিলারের আসার অপেক্ষা করছে ওরা। কান পেতে আছে গুলির শব্দের জন্যে। কার গায়ে বুলেট লাগবে প্রথমে কে জানে!
যাব কোথায়? কপাল বেয়ে ঘাম ঝরছে রবিনের। মোছার চেষ্টা করল না আর। চুলে আটকে আছে ভেজা পাতা। সেটাও সরাল না।
হোটেলেই ফিরে যাব, বলল কিশোর। বাঁচার এটাই একমাত্র উপায়।
সে-ই ভাল, মুসা বলল। এখানে থাকলে ডানাভাঙা হাঁসের মত গুলি করে মারবে।
শব্দ কিসের? শোনার জন্যে ঘাড় কাত করল রবিন।
মূসা আর কিশোরও কান পাতল।
তীরে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের একটানা গুমগুম ছাড়া আর কোন শব্দ কানে ঢুকল না।
রাইফেলের গুলি হলো না আর। প্রতিধ্বনি নেই।
গাছের আড়াল থেকে ভেসে এল না উন্মাদের অট্টহাসি।
দাঁড়িয়ে থাকলে সময় নষ্ট। কিশোর বলল, চলো।
ফিরে এসে আবার বনে ঢুকল ওরা। সাবধান রইল আগের বার যেখান দিয়ে চলেছিল সেখানে যাতে আর না যায়। রাস্তায় উঠল না। গাছের আড়ালে আড়ালে খুব সাবধানে, নিঃশব্দে এগিয়ে চলল বাষ্প ওঠা গরম বনের ভেতর দিয়ে।
ভীত জানোয়ারের মত–ভাবল কিশোর। পা কাঁপতে শুরু করল হঠাৎ। ক্লান্তি, নাকি ভয়ে কাহিল হয়ে গেছে, বুঝতে পারল না। ভাঁজ হয়ে এল হাটু। বসে পড়ল ভেজা মাটিতে।
এগিয়ে এল মুসা। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, কি হলো?
না, কিছু না। পা দুটো চলতে চাইছে না আর। বেশি সাঁতরালে যেমন মাংসপেশীতে খিচ ধরে যায়, তেমন।
হু। জিরিয়ে নাও খানিক। ঠিক হয়ে যাবে।
শান্তিতে বসারও উপায় নেই। কোনদিক দিয়ে বেরিয়ে চলে আসবেন মিলার, বোঝা যাচ্ছে না। তবু হাঁটতে যখন পারছে না, না বসে উপায় কি?

কয়েক মিনিট বিশ্রাম নিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। হাঁটু ভাজ হচ্ছে না আর। গোড়ালির ওপরের মাংসে খিচধরা ভাবটাও কমেছে। পা বাড়াল আবার।
কি, অসুবিধে হচ্ছে? জিজ্ঞেস করল মুসা।
মাথা নাড়ল কিশোর, না। চলো।
যতটা সম্ভব দ্রুত হেঁটে হোটেলের পেছন দিকে চলে এল ওরা। সামনে একচিলতে বালিতে ঢাকা জমি পেরোলে গিয়ে পড়বে ঘাসের মধ্যে। তারপর ঢাল বেয়ে উঠতে হবে।
জমিটা পেরোল ওরা। সামনে পাহাড়ের মত উঁচু বালির ঢিবির দিকে তাকিয়ে দমে গেল কিশোরের মন। বেয়ে ওঠা বড় কঠিন আর ভীষণ পরিশ্রমের কাজ।
কিন্তু উঠতেই হবে।
ওঠার পর কি দেখবে? মিলার কি কোনভাবে আন্দাজ করে ফেলেছেন। ওরা হোটেলে ফিরে যাচ্ছে? সেখানে গুলিভরা রাইফেল নিয়ে তৈরি হয়ে বসে আছেন? অন্ধকারে ওদের যাতে কায়দামত পেতে পারে, সেই সুযোগের জন্যেই কি সব আলো নিভিয়ে দেয়া হয়েছে?
উলফ কোথায়? হান্টিং পার্টিতে যোগ দিয়েছে কি সে-ও?
এমনও হতে পারে মিলার যখন বনের মধ্যে ওদের তাড়া করে ফিরছেন, হোটেলে তখন রাইফেল হাতে ঘাপটি মেরে বসে আছে উলফ। ওদের ঢুকতে দেখলেই দেবে গুলি মেরে।
ভাবনাটা অস্থির করে তুলল কিশোরকে। বলল, ছড়িয়ে পড়ো। রাইফেল হাতে উলফ কিংবা মিলারকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে যে যেদিকে পারো। ঝেড়ে দৌড় মারবে। নিশানা করতে গিয়ে দ্বিধায় পড়ে যাবে তাহলে ওরা।
অনিচ্ছাসত্ত্বেও একে অন্যের কাছ থেকে আলাদা হয়ে গেল ওরা। মাথা নিচু করে, পিঠ বাঁকিয়ে উঠতে শুরু করল ঢাল বেয়ে। পেছন থেকে গায়ে এসে লাগছে বাতাস।
পেছনের আঙিনায় উঠে এল কিশোর। পুল হাউজের দরজাটা খোলা। তবে আলো নেভানো। সারা বাড়ির সমস্ত আলো নেভানো।
অন্ধকারে শিকার করতেই ভালবাসেন বোধহয় মিলার।
কাছেই একটা জোরাল শব্দ হলো। গুলির শব্দ ভেবে আরেকটু হলে চিৎকার করে উঠেছিল কিশোর। বুকের মধ্যে এত জোরে লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ডটা, মনে হচ্ছে পাঁজর ভেঙে বেরিয়ে আসবে। মুহূর্তের জন্যে চোখের সামনে সব যেন সাদা হয়ে গেল। দম নিতে কষ্ট হচ্ছে।
বুঝতে পারল কিসের শব্দ। একটা ধাতব ডেকচেয়ার সিমেন্টে বাধানো চত্বরে উল্টে ফেলেছে বাতাস।

শব্দটা রবিন আর মুসার কানেও গেছে। ওরা দুজনও যে যেখানে ছিল দাঁড়িয়ে গেছে পাথর হয়ে। কান পেতে আছে। মিলারের কানেও কি গেছে চেয়ার পড়ার শব্দ? ভাবছেন ওরাই ফেলেছে? তাহলে খুজতে চলে আসবেন। এদিকে।
অপেক্ষা করতে লাগল ওরা।
এলোমেলো দমকা বাতাসে আরেকটা চেয়ার উল্টে পড়ল।
হোটেলের দিকে কোন নড়াচড়া নেই। রাইফেল হাতে এগিয়ে এলেন না মিলার।
চলো, ফিসফিস করে বলল কিশোর।
লম্বা দম নিয়ে হোটেলের দিকে পা বাড়াল সে।
মিনিটখানেকের মধ্যেই অন্ধকার ডাইনিং রুমে ঢুকে পড়ল ওরা। বদ্ধ বলে বাইরের চেয়ে এখানে গরম কম। নিঃশব্দে পাশ কাটিয়ে এল মিস্ত্রিদের মঞ্চটার। লবির ডাবল ডোরটার দিকে এগোল।
কেউ নেই, লবিতে উঁকি দিয়ে কিশোরের কানের কাছে ফিসফিস করে বলল রবিন।
দুজনেই বোধহয় বনে চলে গেছে, অনুমান করল মুসা।
গেলেই ভাল, বিশ্বাস করতে পারছে না কিশোর।
দেয়াল ঘেঁষে থেকে লবির দিকে এগোল ওরা।
সামনের ডেস্কে যে ফোনটা আছে, রবিন বলল, সেটাই ব্যবহার করতে পারব আমরা।
লবিতে ঢুকে টেলিফোনের কাছে এসে দাঁড়াল ওরা।
রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল মুসা। ডায়াল টোন নেই, হতাশ ভঙ্গিতে রিসিভারটা ধরিয়ে দিল কিশোরের হাতে। দেখো।
সর্বনাশ! ফিসফিস করে কথা বলার কথা ভুলে গিয়ে প্রায় চিৎকার করে উঠল রবিন। ফোন খারাপ হলে করবটা কি?
রিসিভার কানে চেপে ধরে বার কয়েক ক্রেডল খটখট করল কিশোর। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল, টোন এসেছে!
জলদি করো! উত্তেজনায় কিশোরের কাঁধ খামচে ধরল মুসা।
নম্বর দেখব কি করে? অন্ধকারে তো কিছু দেখা যাচ্ছে না…
কোমরে ঝোলানো টর্চটা খুলে নিল মুসা। আলো ফেলল সেটের ওপর। করো।
নম্বরও তো জানি না। রবিন, জলদি গাইড দেখো।
নম্বর বলল রবিন।
বোতামগুলো দ্রুত টিপে দিয়ে মুসাকে বলল কিশোর, লাইট নেভাও।
অপারেটর, অন্যপাশ থেকে কিশোরের কানে ভেসে এল একটা নাকি কণ্ঠ।
পাইরেট আইল্যান্ড পুলিশকে দিন, প্লীজ!

জরুরী? সন্দেহ ফুটল নাকি কণ্ঠটায়।
হ্যাঁ। প্লীজ, তাড়াতাড়ি করুন।
এক মিনিট।
অন্যপাশে খটাখট শব্দ হচ্ছে। ঘাড় ঘুরিয়ে হোটেলে ঢোকার দরজার দিকে তাকাল কিশোর। মিলারকে ঢুকতে দেখলেই ঝট করে বসে পড়বে ডেস্কের আড়ালে।
অনেক সময়, যেন দীর্ঘ এক যুগ পর কানে বেজে উঠল একটা ভোতা গলা, পুলিশ! কণ্ঠটা এমন কেন? যেন মাউথপিসে রুমাল চাপা দিয়ে কথা বলছে।
ভাবার সময় নেই। তাড়াতাড়ি বলল কিশোর, অ্যাঁ!...হালো, আমাদের সাহায্য দরকার। এখুনি।
শান্ত হোন। কি সাহায্য?
কয়েকজন লোক পাঠান এখানে। ফাঁদে ফেলে আমাদের খুন করার চেষ্টা চলছে...
কোনখান থেকে বলছেন?
আঁ?..নাইট শ্যাডো...গোস্ট আইল্যান্ড। প্লীজ, এখুনি পাঠান। সাংঘাতিক বিপদে রয়েছি আমরা। ও আমাদেরকে খুন করতে চাইছে।
নাইট শ্যাডো? ওপাশে মনে হয় নামটা লিখে নিচ্ছে পুলিশ।
বড় বেশি ধীরে কাজ করছে মনে হলো কিশোরের। বলল, তাড়াতাড়ি করুন, প্লীজ।
শান্ত হোন। বিশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাব আমরা। আরও কমও লাগতে পারে।
কট করে কেটে গেল লাইন।
ওরা আসছে, দুই সহকারীকে জানাল কিশোর।
কতক্ষণ লাগবে? জানতে চাইল রবিন।
বিশ মিনিট। বা তারও কম।
এই সময়টুকু উলফ আর মিলারের কাছ থেকে পালিয়ে থাকতে পারলেই বেঁচে যাব, মুসার কণ্ঠে স্বস্তি। চলো, লুকিয়ে পড়ি।
কোথায় লুকাব? রবিনের প্রশ্ন।
কেউ কোন জবাব দেয়ার আগেই দপ করে জ্বলে উঠল লবির লাইট। অফিসের খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল একজন মানুষকে।
খাইছে! হাঁ করে তাকিয়ে আছে মুসা। দৌড়ানো দেয়ার কথাও ভুলে গেছে।

.

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন রোজার মেলবয়েস। পরনে, সেই সাদা স্যুট। গলায় লাল রুমাল জড়ানো। উজ্জ্বল আলোর দিকে মুখ করে চোখ মিটমিট

করছেন। দ্বিধায় পড়ে গেছেন মনে হলো।
কয়েক সেকেন্ড কেউ কোন কথা বলল না। তারপর চিৎকার করে উঠল রবিন, মিস্টার মেলবয়েস! আপনি বেঁচে আছেন।
কি বলছ? এগিয়ে এসে ডেস্কের ধার খামচে ধরলেন তিনি। অবাক হয়েছেন। বেঁচে আছি মানে?
হুড়াহুড়ি করে তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল তিন গোয়েন্দা। খুব খুশি হয়েছে। এই দ্বীপে একমাত্র তিনিই ওদের বন্ধু।
সাদা গোফের কোণ টানতে টানতে বললেন তিনি, তোমাদের এখানে দেখতে পাব ভাবিনি।
আমরাও ভাবিনি আপনাকে দেখব, রবিন বলল। আপনি ঠিক আছেন তো?
আছি, প্রশ্নটাও যেন অবাক করল তাঁকে। না থাকার কি কোন কারণ আছে? এখানে হচ্ছেটা কি?
এখানে… বলতে যাচ্ছিল রবিন।
কিন্তু বাধা দিয়ে বললেন রোজার, এত রাতে তোমরা এখানে কেন? ঘরে কি হয়েছে? চেহারার এই অবস্থা কেন! ভিজে চুপচুপে, সারা গায়ে কাদামাটি– •এখানে করছটা কি তোমরা?
আপনি আমাদের সাহায্য করুন, তাড়াতাড়ি বলল রবিন। পুলিশকে ফোন করেছি আমরা…
সতর্ক হয়ে উঠল ব্যারনের চোখজোড়া। পুলিশ?
উলফ আর আপনার ভাই মিলার…
কোথায় ওরা?
কোরিকেও পাওয়া যাচ্ছে না, মুসা বলল। মিলার আর উলফ রাইফেল নিয়ে তাড়া করেছে আমাদের। বনের মধ্যে গুলিও করেছিল।
দ্বিধান্বিত ভাবটা অনেক কমল। গাল ডললেন ব্যারন। রবিনের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, নিশ্চয় আরেকটা হান্টিং পার্টি?
হ্যাঁ। তাই তো বললেন মিস্টার মিলার, রবিন বলল। আপনি আমাদের বাঁচান। থামান ওদের।
থামাব? অদ্ভুত হাসি খেলে গেল ব্যারনের মুখে। পিছিয়ে গেলেন এক পা। ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে আবার বললেন, থামাব?
হ্যাঁ। আমাদের খুন করতে চায় ওরা। একমাত্র আপনিই আমাদের বাঁচাতে পারেন…
থেমে গেল রবিন। বদলে যাচ্ছে ব্যারনের চেহারার ভাব। হাসিটা। বাড়ছে। হাসছেন কেন ওরকম করে? ওই অদ্ভুত হাসি মুখটা বিকৃত করে দিয়েছে।

চেহারাটাও কেমন অন্য রকম হয়ে যাচ্ছে।
মুসাও তাজ্জব হয়ে গেছে। বেঁচে আছেন তো রোজার? না মরে ভূত হয়ে গেছে।
জিজ্ঞেস করল কিশোর, আপনার কি অসুস্থ লাগছে, ব্যারন?
চমৎকার কথা বলেছ–ওদের থামান! থামান ওদের! হাহহাহহাহ! পাগলের মত হেসে উঠলেন রোজার।
আপনার শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে বোধহয়। আপনি বসুন।
এমন করছেন কেন? ব্যারনের এই পরিবর্তন দেখে রবিনও অবাক। কি যে হলো: আজকের রাতটাই যেন কেমন…
ওদের থামাব? ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ব্যারন, কেন থামাব? মাথার চুল খামচি দিয়ে ধরে টানতে শুরু করলেন। হ্যাঁচকা টানে গলা থেকে রুমালটা খুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। কোটের বোতাম খুলে ফেললেন।
আতঙ্কিত হয়ে পড়ল রবিন। ব্যারন! কি হয়েছে আপনার? অমন করছেন কেন?
কথাটা কানেই তুললেন না ব্যারন। কোট খুলে ছুঁড়ে ফেললেন ডেস্কে। দুই হাতে ভর দিয়ে ঝুঁকে দাঁড়ালেন ডেস্কের ওপর। কয়েক সেকেন্ড ওভাবে থেকে প্যান্টের পকেট হাতড়াতে শুরু করলেন। বের করে আনলেন একটুকরো কালো কাপড়। চোখে বাঁধার সেই কাপড়টা। বেঁধে দিলেন চোখের ওপর। এলোমেলো করে দিলেন মাথার সমস্ত চুল। মিলারের কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলেন, হান্টিং পার্টি! হান্টিং পার্টি! কোন কিছুর বিনিময়েই পার্টি আমি বন্ধ করব না।
পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তিন গোয়েন্দা। পায়ে শেকড় গজিয়ে গেছে। যেন। স্তব্ধ বিস্ময়ে বোবা হয়ে তাকিয়ে আছে সামনের পরিবর্তিত মানুষটার দিকে।
বুঝতে অসুবিধে হলো না কিশোরের, এই লোক রোজার নন, তার ভাই মিলার। কোন কারণে রোজার সেজেছিলেন। হয়তো ওদের বোকা বানানোর জন্যেই।

.

হান্টিং পার্টি বন্ধ করব? ভয়ঙ্কর মূর্তি নিয়ে ওদের মুখোমুখি হয়েছেন এখন মিলার। রোজারের ভদ্র, সৌজন্যে ভরা চেহারা উধাও হয়েছে, সেই জায়গায় বেরিয়ে এসেছে মিলারের বন্য, হিংস্র মুখ। পেছনে মাথা হেলিয়ে অট্টহাসি হেসে ওদের দিকে এক পা এগিয়ে এলেন। তোমরা আমাকে হান্টিং পার্টি বন্ধ করতে বলছ?
মিস্টার রোজার মানে, মিলার-প্লীজ! অনুরোধ করল কিশোর।
গটমট করে একটা চেয়ারের কাছে হেঁটে চলে গেলেন মিলার। ঠেস দিয়ে রাখা রাইফেলটা তুলে নিলেন। তার দিকে তাকিয়ে ছিল বলে এতক্ষণ চোখে পড়েনি ওদের।

রাইফেলটা চোখের সামনে এনে দেখতে লাগলেন মিলার। পানি মুছলেন ব্যাট থেকে।
এদিক ওদিক তাকাল কিলোর। পালানোর পথ নেই। ডাইনিং রুমে যাওয়ার দরজাটা খোলা। কিন্তু ওটা দিয়ে বেরোতে হলে মিলারের পাশ কাটিয়ে যেতে হবে। আর তা করতে গেলে দরজার কাছে যাওয়ার আগেই গুলি খাবে।
ইস, গাধার মত ইচ্ছে করে এসে ধরা দিলাম ভাবল সে। মরার জন্যে। এবার আর মুক্তি নেই। মিলারের হান্টিং পার্টি শেষ হওয়ার পথে।
চোখের সামনে আবার ভেসে উঠল ট্রফি রুমের দেয়ালে বসানো চারটে নরমুণ্ড। আরও তিনটে যোগ হবে ওগুলোর সঙ্গে। ভয়ঙ্কর দৃশ্যটা মন থেকে দূর করার জন্যে ঘনঘন মাথা নাড়তে লাগল সে।
ওদের দিকে রাইফেল ঘোরালেন মিলার।
পুলিশ কই? ভাবল কিশোর। এতক্ষণে তো পৌঁছে যাওয়ার কথা।
জিজ্ঞেসপনি আকাশটা যেন হাত টোকা।
ওরা না আসা পর্যন্ত ঠেকানো দরকার মিলারকে। কথা বলানো দরকার, যাতে গুলি করার কথা ভুলে থাকে।
রাইফেলের সিলিন্ডার চেক করলেন মিলার। সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, লোডেড।
এ সব করে পার পাবেন না আপনি! চিৎকার করে উঠল রবিন। নিজের কানেই বোকা বোকা লাগল কথাটা।
কিশোর বলল মিলারকে, ব্যাপারটা নিয়ে একটু আলোচনা করতে পারি তো আমরা, নাকি?
আড়চোখে মুসা আর রবিনের দিকে তাকাল সে। দরজার দিকে ঘন ঘন। তাকাচ্ছে ওরা। পুলিশ আসে কিনা দেখছে বোধহয়। রবিনের চেহারা ফ্যাকাসে। ঠোঁটের ওপর বিন্দু বিন্দু ঘাম। জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট মুছছে। মুসা। বার বার ঢোক গিলছে। হাত ঢোকানো প্যান্টের পকেটে।
আলোচনা? প্রশ্নটা যেন অবাক করেছে মিলারকে।
আপনি...আপনি সত্যি এখন গুলি করবেন আমাদের? কোনমতে জিজ্ঞেস করল কিশোর।
রাইফেল নামালেন মিলার। না... বিড়বিড় করে কি বললেন আরও, বোঝা গেল না। টান মেরে শার্টের কয়েকটা বোতাম ছিড়লেন। রাইফেলটা মাটিতে নামিয়ে তাতে ভর দিলেন। আরেক হাতে খোলা বুক চুলকালেন। একমাত্র ভাল চোখটা কিশোরের ওপর নিবদ্ধ।
জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলল মুসা। স্বস্তির। রবিনের চেহারা থেকেও দুশ্চিন্তা কমে গেল। গুলি করবেন না বলেছেন মিলার।

কিন্তু কিশোর স্বস্তি পেল না। এই পাগলের কথায় বিশ্বাস নেই। গুলি করবেন না?
মাথা নাড়লেন মিলার। লবিতে চোখ বোলালেন। রোজার গেল কই?
রোজার? জবাব দিল না কিশোর। তাকিয়ে আছে মিলারের মুখের দিকে। আশ্চর্য! ভাইকে গুলি করে মারার কথাটা বেমালুম ভুলে গেলেন নাকি? পাগল তো। যেতেই পারেন। মনে করাল না সে। আলোচনা চলুক। সময় নষ্ট হোক। ততক্ষণে পুলিশ চলে আসবে।
কোথায় ও? রাগত কণ্ঠে জানতে চাইলেন মিলার। আমার এই ভাইটাকে কোনদিন আর পার্টি পছন্দ করাতে পারলাম না। স্পোর্টস ও একদম বোঝে না।
শিকার পছন্দ করেন না নাকি তিনি?
বোঝে না, এটাই হলো কথা। সেজন্যেই আজ পার্টি শুরুর আগেই ওকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলাম। আমি চাইনি বাধা দিয়ে আমার সমস্ত মজা। নষ্ট করুক।
নাহ, বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছেন মিলার। গুলি করার পর বলেছিলেন রোজার মরে গেছে, এখন বলছেন সরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। বুক কাঁপছে কিশোরের। এই পাগলকে বিশ্বাস করে কে! বলছেন বটে ওদেরকে বেরোতে দেবেন, কিন্তু যদি না দেন? অকারণেই খেপে গিয়ে এখনই গুলি শুরু করেন? বাইরে বেরোনোর ছুতো খুঁজতে লাগল সে। বলল, চলুন না সবাই মিলে তাকে খুঁজে বের করি। আমরা কি দেখব গিয়ে? মুসা আর রবিনের দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করল কিশোর, ওরা ওর চালাকিটা ধরতে পেরেছে। কিনা।
যাবে কোথায় ও, ঠিকই ফিরে আসবে, তিক্তকণ্ঠে বললেন মিলার। জঘন্য হয়ে উঠেছে মুখের ভঙ্গি। ওকে সরানোর কত চেষ্টাই না করলাম। কিন্তু ঠিকই বেঁচে যায়। ফিরে ফিরে আসে।
আমাদের কি বেরোতে দেবেন? মুসা জিজ্ঞেস করল। কিশোরের পেছনে দাঁড়িয়ে একটা হাত রাখল ওর কাঁধে হাতটা বরফের মত শীতল।
হ্যাঁ।
সত্যি দেবেন? বিশ্বাস করতে পারছে না কিশোর।
হ্যাঁ, হাসি ফুটল মিলারের মুখে।
হঠাৎ যেন শরীরটা পালকের মত হালকা হয়ে গেল কিশোরের। মনে হলো শূন্যে ভাসতে শুরু করেছে। ভাসতে ভাসতে চলে যাচ্ছে হোটেল থেকে দূরে, দ্বীপ পেরিয়ে, সাগর পেরিয়ে…
একঘন্টা আগে বেরোতে দেব তোমাদের, হাসছেন মিলার।
ওপর থেকে মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ল যেন কিশোর। কি করবেন?
এক ঘণ্টা সময় দেব, ঘড়ি দেখলেন মিলার। তারপর তোমাদের পিছু নেব। আলফ্রেড হিচককের বইতে সেই গল্পটা পড়োনি? দা মোস্ট ডেঞ্জারাস গেম?

কিন্তু…আ-আ-আপনি…
শিকারের এটাই আনন্দ। শিকারকে সুযোগ দেয়া। এ ধরনের স্পোর্টস খুব ভাল লাগে আমার।
দরজার দিকে তাকাল কিশোর। পুলিশ আসছে না কেন এখনও?
কথা বলার আর সময় নেই, ঘড়ি দেখলেন আবার মিলার। মুখ তুলেই চিৎকার করে উঠলেন, রেডি, গো! খেলা শুরু!
মিলার..প্লীজ… হাত তুলল কিশোর।
মুসার ঠাণ্ডা হাতটা এখনও খামচে ধরে আছে তার কাধ।
রবিন পাথর।
গুলি করবেন না, প্লীজ! আবার অনুরোধ করল কিশোর।
ভয়ানক রাগে লাল হয়ে গেল মিলারের মুখ। ঝটকা দিয়ে রাইফেল তুলে বাট ঠেকালেন কাঁধে। দেয়াল সই করে ট্রিগার টিপে দিলেন। দুবার। বদ্ধ জায়গায় কামানের গর্জনের মত শব্দ হলো।
চিৎকার করে উঠল রবিন।
যাও; বেরোও! তার চিৎকার ছাপিয়ে শোনা গেল মিলারের গলা। খেলা শুরু! তাকিয়ে আছেন রাইফেলের নলের দিকে। দুটো নলের মুখ দিয়েই ধোয়া বেরোচ্ছে।
হিংস্র লোকটার সামনে থাকার সাহস হলো না, আর গোয়েন্দাদের। দৌড় দিল দরজার দিকে।

.

আবার ছোটার পালা। কিন্তু যাবে কোনদিকে?
লবি থেকে বেরিয়ে অন্ধকার ডাইনিং রুমে ঢুকল ওরা। চোখ মিটমিট করে দৃষ্টির সামনে থেকে অন্ধকার দূর করতে চাইল কিশোর। বদ্ধ, ভাপসা, ভারী বাতাসে দম আটকে আসতে চাইছে।
ঘরের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে গেল তিনজনে। বড় জানালাটা দিয়ে আকাশ চোখে পড়ছে। রাতের আকাশ, কিন্তু তারা নেই। মেঘে ঢাকা। ঘর আর বাইরে অন্ধকারের কোন তফাৎ নেই।
বাইরে চলে যাবে? বনে ঢুকে পড়বে আবার? বনই হলো তাড়া খাওয়া জানোয়ারের আশ্রয়স্থল।
কোথায় যাব? ফিসফিস করে জানতে চাইল মুসা।
লবির দরজার দিকে ফিরে তাকাল কিশোর। মিলার বেরোন কিনা। দেখল।
বেরোলেন না।
কিশোরের হাত খামচে ধরল মুসা। সুড়ঙ্গটায় ঢুকে পড়লে কেমন হয়?

ঠিক! সমর্থন করল কিশোর। পুলিশ না আসাতক লুকিয়ে থাকতে পারব ওখানে।
পুলিশ! কোথায় ওরা? বিশ মিনিটের বেশি হয়ে গেছে।
আমারও মনে হচ্ছে ওখানেই নিরাপদ, ভীতকণ্ঠে বলল রবিন।
অন্ধকারে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে এগোল ওরা। খুঁজে বের করল মঞ্চটা। ফিসফিস করে কিশোর বলল, ধরাধরি করে এমনভাবে সরাতে হবে, যাতে শব্দ না হয়…
ঘরের অন্যপ্রান্তে খসখস শব্দ হলো।
মিলার নাকি?
অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে মঞ্চটা খুঁজতে শুরু করল কিশোরের চোখ। সয়ে এসেছে। আবছামত দেখতে পাচ্ছে চেয়ার-টেবিলগুলোর অবয়ব।
কেউ নেই।
মঞ্চটা সরাল ওরা। সতর্ক থাকার পরেও শব্দ হয়েই গেল। চুপচাপ দাঁড়িয়ে বোঝার চেষ্টা করল কেউ আসে কিনা। এল না। দরজাটা খুলল তখন।
সুড়ঙ্গের মধ্যে আরও বেশি গরম। বাতাসে আর্দ্রতা বেশি। আঠা হয়ে যায় শরীর। ছত্রাকের গন্ধ।
পিঠ চুলকাচ্ছে কিশোরের। দুই কাঁধ ব্যথা করছে। পায়ে তো ব্যথা আছেই। অন্ধকারে আঁকাবাকা সুড়ঙ্গে পাগলের মত দৌড় দেয়ার ইচ্ছেটা। অনেক কষ্টে রোধ করল। তাড়াতাড়ি ছুটে কোন লাভ নেই।
রবিনও বুঝতে পারছে সেটা। মনের ভাবনাটাকেই প্রকাশ করে ফেলল, লুকানো হয়তো যায়, কিন্তু পালাতে পারব না।
ওর কাঁধে হাত রাখল মুসা, ভয় পাচ্ছ?
তুমি পাচ্ছ না?
পাচ্ছি।
হাঁটো, কিশোর বলল। এখানে দাঁড়িয়ে থাকাটাও ঠিক নয়।
বেশি দূরে যাওয়াটাও ঠিক হবে না, রবিন বলল। পুলিশ এলে শুনতে পাব না।…
মুসা, টর্চটা জালো তো। কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না।
কোমরে হাত দিয়েই বলে উঠল মুসা, যাহ, গেল!
কি?
আনতে মনে নেই। লবির টেবিলেই রয়ে গেছে।
দারুণ! মরণ বোধহয় আজ ঠেকাতে পারলাম না।
দৌড়ে গিয়ে ডাইনিং রুমের আলমারি থেকে খুঁজে নিয়ে আসব নাকি?
না, সময় নেই, বাধা দিল কিশোর। হাঁটতে থাকো।
এগিয়ে চলল ওরা। কান পেতে রেখেছে। মিলার পিছু নিলে যাতে শুনতে পায়। মুখে, মাথায় জড়িয়ে যাচ্ছে মাকড়সার জাল। হাত দিয়ে সরাতে গিয়ে জ্যান্ত

মাকড়সা লাগছে হাতে। কিলবিল করে উঠে যাচ্ছে গায়ের ওপর। থাবা দিয়ে সরাতে গিয়ে একটাকে ভর্তা করে দিল মুসা। ভেজা চটচটে পদার্থ লেগে গেল হাতে। প্যান্টে ডলে মুছল হাতটা।
কতক্ষণ হাঁটল ওরা বলতে পারবে না। অন্ধকারে সময়ের হিসেব রাখা কঠিন। ঢালু হয়ে আসছে সুড়ঙ্গের মেঝে। আচমকা চেঁচিয়ে উঠল মুসা, খাইছে!
কি?
কি হয়েছে?
জানতে চাইল রবিন আর কিশোর।
দরজা!
কি করে বুঝলে? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
এই তো, কাঠ। হাত দিলেই বোঝা যায়…নিশ্চয় ওই ঘরটা, যেটাতে মড়ার খুলি… ভয়ে কথাটা আর শেষ করল না মুসা।
কাছে সরে এল কিশোর। কই, দেখি?
ঠেলা দিতে খুলে গেল পাল্লা। ভেতরে ঢুকে পড়ল তিনজনে। দরজার পাশে দেয়ালে হাত রাখতে সুইচবোর্ডটা পেয়ে গেল কিশোর। আলো জ্বলল। ছাত থেকে ঝুলে থাকা মৃদু পাওয়ারের একটা বাল্ব।
ছোট ঘর। যে ঘরটাতে খুলি দেখেছিল, সেটা নয়। এটা অন্য ঘর। একটা বড় বিছানা আছে। একটা নাইটস্ট্যান্ড, দুই ড্রয়ারের ড্রেসার এবং একটা টেলিফোনও আছে।
আরেকবার ফোন করে দেখো না পুলিশকে, গলা থেকে মাকড়সার জাল টেনে সরাতে সরাতে বলল রবিন, ওরা লোক পাঠাল কিনা?
কথাটা মন্দ না। রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল কিশোর।
নীরব। ডায়াল টোন নেই।
ডেড, আনমনে বলল সে।
হু, আমাদের মত, বিড়বিড় করল মুসা। পার্থক্য শুধু এটা হয়ে গেছে, আমাদের হতে বাকি আছে…
কিশোরের দিকে তাকাল রবিন, এখানকার সব ফোনই কিন্তু একটা সুইচবোর্ডের ভেতর দিয়ে গেছে। মনে নেই সেদিন, গেট থেকে ফোন করার সময়…
ঝট করে রবিনের দিকে ফিরে তাকাল কিশোর। বড় বড় হয়ে গেছে। চোখ। তাই তো! ইস, কি বোকা আমি! সামনের অফিসে রয়েছে। সুইচবোর্ডটা।
তাতে কি হয়েছে? মুসার প্রশ্ন।
কি হয়েছে এখনও বুঝতে পারছ না? রিসিভারে আঙুলগুলো চেপে বসেছে কিশোরের। সমস্ত কল যায় সুইচবোর্ডের ভেতর দিয়ে। পাইরেট আইল্যান্ডে

পুলিশকে যে ফোন করেছি সেটাও গেছে। রিসিভারটা ক্রেডলে রেখে দুর্বল ভঙ্গিতে বিছানায় বসে পড়ল সে।
অফিস থেকে বেরিয়ে এসেছিল মিলার, রবিন বুঝে ফেলেছে। মুখ কালো হয়ে গেছে তারও। মুসার দিকে তাকাল, ওর মুখের রহস্যময় হাসিটা লক্ষ করোনি?
আমি করেছি, হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল কিশোর, এতক্ষণে বুঝলাম পুলিশ এল না কেন। ওদের সঙ্গে কথাই বলতে পারিনি। বলেছি মিলারের সঙ্গে। কণ্ঠস্বরটা অমন ভোঁতা শোনাচ্ছিল কেন এখন পরিষ্কার। রিসিভারে রুমাল চেপে ধরে কথা বলছিল।
হু, পাগল হলেও বুদ্ধি ঠিক আছে ষোলোআনা, তিক্তকণ্ঠে বলল মুসা। ধপ করে কিশোরের পাশে বসে পড়ল সে। তারমানে আমাদের উদ্ধার। করতে আর আসছে না কেউ।
নাহ, দরজার দিকে তাকাল কিশোর। যা করার আমাদের নিজেদেরই করতে হবে এখন। ছাতের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করল, আন্ট জোয়ালিন!
কি?
আন্ট জোয়ালিনের কথা বলছি। কোরি যতবার ফোন করেছে, ততবার সুইচবোর্ডের কাছে বসে বোর্ডটা কন্ট্রোল করেছে মিলার। একটা কলও আন্ট জোয়ালিনের কাছে যেতে দেয়নি। সেজন্যেই মিস ভায়োলার বাড়িতে ফোন করে কোন জবাব পায়নি কোরি। আন্ট জোয়ালিন এখানে আসেন এটা চায়নি মিলার। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ায় সে খুশি হয়েছে। তার পার্টির ব্যাপারে নাক গলাতেন তিনি, ঝামেলা তো অবশ্যই করতেন...
চলো এখান থেকে বেরিয়ে যাই, উঠে দরজার কাছে চলে গেল মুসা। ডাইনিং রুমের খুব কাছাকাছি রয়েছি আমরা। যে কোন সময় চলে আসতে পারে পাগলটা।
কোথায় যাব? হাতের তালুতে থুতনি ঠেকিয়ে বসে রইল কিশোর।
সৈকতে। ওখানেই তো পালিয়েছিলাম।
কি হবে তাতে?
হয়তো হবে না কিছু। কিন্তু এখানে যেমন, ফাঁদে আটকা পড়া ইঁদুরের অবস্থা তো আর হবে না। দৌড়াদৌড়ি করার অন্তত সুযোগ থাকবে।
উঠে দাঁড়াল কিশোর। ঘরটা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে আলোটা নিভিয়ে দিল। তাতে আগের চেয়ে অন্ধকার লাগল সুড়ঙ্গটা। গরমও বেশি লাগছে কেন যেন। বদ্ধ বাতাসে বিশ্রী একধরনের ভাপসা গন্ধ।
ওই দেখো, হাত তুলে ফিসফিস করে বলল মুসা।

কিশোরও দেখল। সামনে কয়েক গজ দূরের একটা দরজার ফাঁক দিয়ে হলদে আলো আসছে।
পাতলা আলোর ফালিটার দিকে তাকিয়ে আছে ওরা, এই সময় ঘরের ভেতর পায়ের শব্দ শোনা গেল। তারপর কাশি।
খাইছে! ভয়ে কেঁপে উঠল মুসার গলা। ভূত না তো?

ভলিউম ২৮ – ভ্যাম্পায়ারের দ্বীপ – তিন গোয়েন্দা – রকিব হাসান – সেবা প্রকাশনী
প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি, ১৯৯১
আগে চলো পিজ্জা কোভে যাই, মুসা বলল। আজকাল ওদের পিজ্জাগুলো আরও ভাল হয়েছে। বীফ আর মাশরুম দিয়ে যা বানায় না!
ওর বলার ধরনই বুঝিয়ে দিল, জিভে পানি এসে গেছে।
হাসল রবিন, বেরিয়েই আগে খাওয়ার চিন্তা?
তো আর কার করবে? খাওয়াই তো জীবন, মুসার কথায় সায় দিয়ে বলল টনি হাওয়াই। ঝাড়ুর শলার মত খাড়া খাড়া চুলে আঙুল চালানোর চেষ্টা করল। হেঁটে এত খাটো করে ফেলেছে, আঙুল ঢোকেই না। ওদের পিজ্জা আমারও খুব ভাল লাগে। প্রায়ই খাই।
আবার মাথা ঝাঁকাল রবিন। সেটাও জানি। তোমাকে চিনতেও কি আর। বাকি আছে নাকি আমার।
পিজ্জা কোভ আমার মোটেও ভাল লাগে না, জানিয়ে দিল টনির ছোট বোন সিসি। বছর সাতেক বয়েস। কিন্তু পাকা পাকা কথা বলার ওস্তাদ। পিজ্জা তো আরও পচা।
স্কুলে গরমের ছুটি হতেই খালার বাড়ি বেড়াতে চলে গিয়েছিল সিসি। সেজন্যে বাবা-মা আর ভাইয়ের সাথে একসঙ্গে আসেনি। দুদিন হলো ওর খালাত ভাই রেখে গেছে ওকে স্যান্ডি হোলোতে।
এসেই ভাইয়ের পেছনে লেগেছে সিসি। ভাই যেখানে যায়, তারও সেখানে যাওয়া চাই। নিতে চায় না টনি। কিন্তু না নিলে মায়ের ধমক খেতে হয়। কি আর করে বেচারা। নিতে বাধ্য হয়।
খেঁকিয়ে উঠল টনি, চুপ! তোকে কেউ জিজ্ঞেস করছে না। আইসক্রীমখোরের পিজ্জা কোভ ভাল লাগার কারণ নেই।
মেইন স্ট্রীট ধরে হাঁটতে হাঁটতে চারপাশে তাকাতে লাগল রবিন। সেই আগের মতই আছে স্যান্ডি হোলো। মিনি মার্কেটটা ছাড়া আর কোথাও তেমন কোন পরিবর্তন নেই।
আজই রকি বীচ থেকে মুসার সঙ্গে এসে হাজির হয়েছে সে। জিনাকে ভ্যাম্পায়ারের দ্বীপ থেকে উদ্ধার করে আনা হয়েছে সাত দিন আগে। তার অবস্থা দেখে সেদিনই তাকে নিয়ে রকি বীচে ফিরে গেছেন তার বাবা-মা। সঙ্গে গিয়েছিল মুসা।
জিনার মাথায় গোলমাল দেখা দিয়েছে। কোন কথা মনে করতে পারে। উল্টোপাল্টা আচরণ করে। বাধ্য হয়ে তাকে মেন্টাল হোমে ভর্তি করতে হয়েছে।

ডাক্তারের ধারণা, বিষাক্ত কোন কিছু রক্তে ঢুকে যাওয়াতে মাথায় গোলমাল দেখা দিয়েছে জিনার। ভ্যাম্পায়ারের কথা ডাক্তার কিংবা জিনার আব্বা-আম্মাকে বলতে যায়নি মুসা, তাকেও যদি পাগল ভেবে হাসপাতালে আটকে রাখে, এই ভয়ে। জন আর লীলার কথাও গোপন রেখেছে।
তবে কিশোর আর রবিনকে সব ঘটনা খুলে বলেছে সে।
ভ্যাম্পায়ারের কথা বিশ্বাস করেনি দুজনের কেউই, তবে কোন একটা রহস্য যে আছে, এ ব্যাপারে কিশোর নিশ্চিত। মুসা আর রবিনের সঙ্গে আসতে পারেনি সে। জরুরী কাজে রাশেদ পাশার সঙ্গে কোথায় নাকি যেতে হবে। রবিনকে নিয়ে স্যান্ডি হোলোতে ফিরে যেতে বলেছে মূসাকে। তদন্ত চালিয়ে যেতে বলেছে। সময় করতে পারলে সে নিজেও স্যান্ডি হোলোতে চলে আসবে।
গালে এসে লাগছে ভেজা নোনা বাতাস। লম্বা, বাদামী চুল উড়ছে রবিনের। কেঁপে উঠল, বাপরে, খুব ঠাণ্ডা! শীত লাগছে।
শীতই তো মজা, উনি বলল। খোলা সৈকতে অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসতে আরাম। ঠাণ্ডা পড়লে পার্টি জমে ভাল।
সবগুলো পাগল, সিসি বলল। নইলে শীতের মধ্যে কেউ করে এসব। ঘরে লেপের নিচে থাকা অনেক আরাম।
তাহলে সেটাই থাকতি, আমাদের সঙ্গে এলি কেন?
আমার ইচ্ছে।
তাহলে ওদেরও ইচ্ছে। কোনটা বেশি আরাম, তোর কাছে জিজ্ঞেস করবে নাকি?
করলে ভাল করত... কথা শেষ না করেই চিৎকার করে উঠল সিসি, দেখ দেখ, ওই যে আইসক্রীমের দোকান! নতুন হয়েছে, তাই না, টনি? আগের বার কিন্তু দেখিনি।
ভাইকে নাম ধরে ডাকে সিসি। ভাইয়া ডাকতে বললে ডাকে না, বলে ওসব পুরানো ঢঙ তার ভাল লাগে না। নাম ধরে ডাকাটা অনেক বেশি আধুনিক।
মুচকি হাসল রবিন। ভাইবোনের এই ঝগড়া ভালই লাগছে ওর। টনিকে বোকা বোকা লাগছে।
প্রিন্সেস-এর আইসক্রীম পারলার আর ভিডিও আর্কেডের দিকে তাকিয়ে চোখ চকচক করছে সিসির। ভাইয়ের হাত আঁকড়ে ধরে কো-কো শুরু করল, টনি, দে না একটা আইসক্রীম কিনে। বেশি করে যদি দিস, যা, আজ থেকে তোকে ভাইয়া ডাকাই শুরু করব।
ঘোঁৎ-ঘোৎ করে উনি বলল, পরে।
দিবি তো?

দেখা যাক। তুই কতখানি জ্বালাতন করিস, দেয়া না দেয়া তার ওপর নির্ভর করবে।
মেইন স্ট্রীটের শেষ মাথায় গিয়ে ঘুরে আবার যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে ফিরে চলল ওরা।
মিনি মার্কেটটায় লোকের ভিড় তেমন নেই। সৈকতে চলে গেছে সব। এখানে তো আর কেনাকাটা করতে আসে না ট্যুরিস্টরা, বেড়াতেই আসে।
গরমকালটা এখানে ভালই কাটত, অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে বলল মুসা, যদি না
থাক থাক, কি বলতে চায় মুসা বুঝে ফেলেছে রবিন, তাড়াতাড়ি বাধা দিল, এখন ওসব কথা…
কি কথা? জানতে চাইল টনি।
বললাম তো থাক। তারচেয়ে বরং নাটকের কথা বলো। হচ্ছে তো এবার?
হ্যাঁ, হবে। না হওয়ার কোন কারণ নেই। কবে লোক বাছাই করা হবে, দুএকদিনের মধ্যেই ঘোষণা দেবেন মিসেস রথরক…
নাটকের কথা শুনতে আমার ভাল্লাগে না, সিসি বলল।
তুই থাম! ধমক দিল টনি। কোনটাই তো তোর ভাল লাগে না, তাহলে এসেছিস কেন?
লাগে তো–বেড়াতে আর আইসক্রীম খেতে…
চুপ থাক! নইলে পাবি না।
মেইন স্ট্রীট থেকে বেরিয়ে ডানে মোড় নিল ওরা। এগিয়ে চলল সৈকতের দিকে। গোমড়া মুখে তিনজনের পিছে পিছে চলল সিসি। আইসক্রীম ছাড়া সৈকতে যেতে মোটেও ইচ্ছুক নয় সে।
একটা উঁচু বালিয়াড়ির গায়ে কাঠের সিঁড়ি আছে। সেটা বেয়ে উঠতে শুরু করল ওরা। এতজনের ভারে মড়মড় করে উঠল পুরানো সিঁড়ি। ভেঙে পড়ার হুমকি দিতে লাগল।
চারপাশে তাকাল রবিন। ওরা বাদে আর কেউ নেই সৈকতে। তবে আসবে। রাত বাড়লে ভিড় বাড়ে।
চাঁদের আলোয় ঢেউয়ের মাথাগুলোকে লাগছে রূপালী মুকুটের মত। দূরে দেখা যাচ্ছে পাথরের জেটি। সাগরের মধ্যে বেশ অনেকখানি ঢুকে গেছে।
কিসের শব্দ!
আচমকা এমনভাবে কথাটা বলল রবিন, মুসা আর টনি দুজনেই চমকে উঠল। ভয় পেয়ে গেল সিসি।
শব্দটা কানে গেছে সবারই। অসংখ্য ডানা ঝাঁপটানোর আওয়াজ।
ওই দেখো! আকাশের দিকে হাত তুলল সিসি। ওরিব্বাবা! কত বাদুড় রে!

মুসাও দেখছে। আতঙ্কের ঠাণ্ডা শিহরণ বয়ে গেল তার মেরুদণ্ড বেয়ে। তাকিয়ে আছে ওগুলোর দিকে।
অবিশ্বাস্য দৃশ্য! বিড়বিড় করল রবিন। আগের বার কিন্তু এত বাদুড় ছিল না এখানে।
কি বলেছিলাম! প্রায় ফিসফিস করে বলল মুসা। বিশ্বাস তো কয়রানি!
তুমি যা বলেছ, এখনও করছি না। পৃথিবীর বহু জায়গাতেই এ রকম বাদুড়ের ঝাক দেখা যায়। বাদুড়ের সঙ্গে ভূতের কাল্পনিক সম্পর্ক আছে বটে, কিন্তু বাস্তবেও আছে, এ আমি বিশ্বাস করি না।
ভাইয়ের গা ঘেঁষে বসল সিসি। শীতে না ভয়ে বোঝা গেল না। তবে যতদূর জানে মুসা আর রবিন, ভয়ডর একটু কমই আছে মেয়েটার।
আসছে তো আসছেই। বাদুড়ের ঝাক চাঁদ ঢেকে দিয়েছে। সৈকত অন্ধকার।
ধীরে ধীরে কমে এল বাদুড়। পেছনের পাহাড়ের দিকে চলে গেল। আবার বেরিয়ে এল চাঁদের মুখ।
কোত্থেকে এল ওগুলো? মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করল সিসি।
সাগরের মাঝের দ্বীপটা থেকে, মুসা বলল। বাদুড়ের অত্যাচার আর ভ্যাম্পায়ারের ভয়ে ওখানকার সব মানুষ পালিয়েছে। পোড়ো বাড়িগুলো এখন...
প্রসঙ্গটা চাপা দেয়ার জন্যে রবিন বলল, এতদিন হলো পড়ে আছে, সিনেমার লোকেরা দেখে না নাকি দ্বীপটাকে? হরর ছবির চমৎকার শূটিং করতে পারত।
তা পারত, টনি বলল। তেমন করে নজরেই পড়েনি হয়তো কারও। তাই আসেনি।
সিনেমা থেকে আবার নাটকের প্রসঙ্গ এসে পড়ল। স্যান্ডি হোলোতে একটা থিয়েটার আছে, সামার থিয়েটার। গরমের সময় প্রতি বছরই তাতে ছেলেমেয়েদের দিয়ে নাটক করানো হয়। এবারেও হবে। স্থানীয়রা তো থাকেই, যারা বেড়াতে আসে তাদের মধ্যে থেকেও অভিনয়ের জন্যে লোক নেয়া হয়।
কি নাটক করছে ওরা? জানতে চাইল রবিন। বই পড়া ছাড়াও নাটক, গান এ সবের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ আছে তার। কিছুদিন একটা গানের কোম্পানিতে পার্ট টাইম চাকরিও করেছে। আবার ওরা ডাকছে যাওয়ার জন্যে।
নাইট অভ দ্য ভ্যাম্পায়ার, নাটকের নাম বলল টনি।
কান খাড়া করে ফেলল মুসা, কাহিনীটা কি?
কি আর হবে, যে প্রসঙ্গটা চাপা দিয়ে রাখতে চাইছিল রবিন, সেটা। আবার উঠে পড়ছে দেখে তাড়াতাড়ি বলল, ভ্যাম্পায়ারের রক্ত খাওয়ার কাহিনী। ওরা তো ওই একটা কাজই পারে। এত কিছু থাকতে ভূতের গল্প। আর কোন কাহিনী খুঁজে পেলেন না মিসেস রথরক!
এটা সেরকম না, টনি বলল। নামটা ভয়ঙ্কর হলেও আসলে হাসির নাটক।

আরও কিছুক্ষণ কথা বলার পর উঠে দাঁড়াল মুসা, চলো, ওঠা যাক।
কোথায় যাব? জিজ্ঞেস করল টনি।
আর্কেডে। আমার খিদে পেয়েছে।
আমারও, বলেই বোনের দিকে তাকাল টনি। কিন্তু যত্ত মুশকিল এই, মেয়েটাকে নিয়ে। ঝামেলা! ওর জ্বালায় না পারব রেস্টুরেন্টে ঢুকে ভালমন্দ কিছু খেতে, না পারব আর্কেডে খেলতে।
ও, আমি ঝামেলা। বিরক্তির কারণ! ঝাঁঝিয়ে উঠল সিসি, বেশ, আমি থাকবই না। গেলাম বাড়ি চলে।
আঁতকে উঠল টনি, না না, যাসনে! একা গেলে মা আর আমাকে আস্ত রাখবে না!
তাহলে আর উপায় কি? আমাকে নিয়েই যেতে হবে তোদর।
যাব। তবে ঝামেলা করতে পারবি না।
করব, আইসক্রীম কিনে না দিলে। বাড়ি ফিরে গিয়ে মাকে বলব, তুই আমাকে সারা পথ ধমকাতে ধমকাতে নিয়ে গেছিস…
কতবড় মিথ্যুক রে! ধমকালাম আবার কখন? তুইই তো চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলে পিত্তি জ্বালাচ্ছিস।
আবার গালাগাল! চ্যাটাং চ্যাটাং, না? বেশ, যাচ্ছি বাড়ি ফিরে।
খপ করে বোনের হাত ধরে ফেলল টনি। দেখ, সিসি, কাজটা তুই ভাল করছিস না। ব্ল্যাকমেইল হয়ে যাচ্ছে কিন্তু।
কোন্ মেইল হচ্ছে তা বুঝিটুঝি না। তবে আমি সঙ্গে যাব, আমার যা। ইচ্ছে বলব, সাফ কথা। টীচার বলেছেন, স্বাধীনভাবে কথা বলা মানুষের। গণতান্ত্রিক অধিকার…
নাও, হয়েছে! হতাশ ভঙ্গিতে কপাল চাপড়াল টনি। এবার ওনার কাছে রাজনীতিও শুনতে হবে..অপরাধ হয়ে গেছে, সিসি। মাপ করে দে। তোর মরিচ গোলানো কথার তীর বন্ধ করে এবার রেহাই দে। চল, দেব। তোকে আইসক্রীম কিনে।
হাসি ফুটল সিসির মুখে, যা, দিলাম মাপ করে। তবে একটা আইসক্রীমে। আর চলবে না এখন। যতগুলো বলব, দিতে হবে।
দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল টনি, চল, দেব। ঠাণ্ডা লেগে তোর টনসিল পচে মরলে আমার কি!
হাসতে হাসতে বলল সিসি, তখনও মা তোকেই বকবে। বলবে, আমাকে ভোগানোর জন্যে ইচ্ছে করে বেশি বেশি আইসক্রীম কিনে দিয়ে আমার টনসিল তুইই পচিয়েছিস।
.

সাত দিন পর।
ছায়ায় লুকিয়ে আছে মেয়েটা। ছোট্ট নাক। কালো চুলের লম্বা বেণি। গায়ের রঙ আমেরিকানদের মত ফর্সা নয়, বরং কিছুটা বাদামী দেখছে সে। অপেক্ষা করছে।
দুটো মেয়ে এগিয়ে আসছে। একজনের লম্বা লাল চুল। চাঁদের আলোয় চকচক করছে।
এগিয়ে আসতে আসতে দ্বিতীয় মেয়েটার দিকে তাকাল সে। এই মেয়েটার সোনালি, কোঁকড়া চুল। মুখের চামড়া মসৃণ, ফ্যাকাসে। হাঁটার সময় নাচে চুলগুলো।
খুব খিদে পেয়েছে, বলল সোনালি চুল মেয়েটা। আর সহ্য হয় না। কখন যে পাব কে জানে!
পাওয়া যাবে শীঘ্রি, দ্বিতীয় মেয়েটা বলল। লোকজন তো আর কম। নেই।
ইস, যা খিদে লেগেছে! আর সহ্য করতে পারছি না...
দেখা দেয়ার সময় হয়েছে, ভাবল বাদামী মেয়েটা। ছায়া থেকে বেরিয়ে এগিয়ে গেল অন্য মেয়ে দুটোর দিকে।
হাই! চোখ চকচক করে উঠল লাল-চুল মেয়েটার।
দুজনেই দৌড়ে আসতে শুরু করল।
ওই যে এসে গেছে খাবার, সঙ্গের মেয়েটাকে বলল লাল-চুল মেয়েটা। বেশিক্ষণ আর না খেয়ে থাকতে হবে না।
দাঁড়িয়ে গেল বাদামী মেয়েটা। তার দুই পাশে এসে দাঁড়াল মেয়ে দুটো। ঠোঁট ফাঁক হলো। শ্বদন্ত দেখা গেল।
লাল-চুল মেয়েটার তাড়াহুড়া বেশি। শিকারের গলার শিরায় দাঁতের চোখা মাথা ফুটিয়ে দিতে মুখ বাড়াল।
ধমকে উঠল বাদামী মেয়েটা, গাধা কোথাকার! নিজের দলের লোককে চিনতে পারো না?
দ্বিধায় পড়ে গেল মেয়ে দুটো। মুখ সরিয়ে নিল লাল-চুল মেয়েটা।
কয়েক দিন আগে আমিও তোমাদের একজন হয়ে গেছি, বাদামী মেয়েটা জানাল।
অ, হতাশ ভঙ্গিতে বলল লাল-চুল মেয়েটা।
পেটের খিদে চোখে ফুটেছে ওদের।
তোমার নাম কি? জিজ্ঞেস করল সোনালি-চুল মেয়েটা। দলে ঢুকিয়েছে কে?
আমি কণিকা। বাড়ি ইন্ডিয়ায়। জন ঢুকিয়েছে আমাকে।
ও, জন। বেচারা! আগুনে পুড়ে মরল শেষ পর্যন্ত। বস্ তো ওর জন্যে রোজই দুঃখ করে,। দলের সেরা এজেন্ট ছিলখ কতজনকে যে ঢুকিয়েছে কিন্তু তোমার নাম

তো কখনও শুনিনি ওর মুখে?
এতজনকে ঢোকাল, কজনের নাম আর বলবে।
তা ঠিক। তা ছাড়া আমরা এসেছি দিন তিনেক হলো। গতবছরের পর আর জনের সঙ্গে দেখা হয়নি আমাদের। ওর সঙ্গে লীলাও মারা গেছে। ওদের মৃত্যুটা রহস্যময়। কি করে মারা গেছে কাউন্টও জানেন না। যে বাড়িটাতে ছিল ওরা, আগুন লেগে পুরো বাড়িটাই পুড়ে গেছে। কোন সূত্রই পাওয়া যায়নি।
তোমাদের নাম কি?
আমি কিমি, পরিচয় করিয়ে দিল সোনালি-চুল মেয়েটা। ও ডলি।
শ্বদন্ত দেখিয়ে হাসল ডলি। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কণিকার দিকে। বোঝার চেষ্টা করছে, কণিকা সত্যি কথা বলছে না মিথ্যে। জ্বলজ্বল করছে চোখ। তাতে রাজ্যের খিদে। কণিকাও চোখ সরাচ্ছে না ওর চোখ থেকে। হেসে নিজের শ্বদন্তও দেখিয়ে দিল।
এখানে দাঁড়িয়ে শুধু শুধু সময় নষ্ট করছি আমরা, ডলি বলল। আমার রক্ত দরকার। খিদেয় পাগল হয়ে যাচ্ছি। এক্ষুণি চলো।
হ্যাঁ, চলো, বলল কিমি।
রাস্তার সমতলে উঠে যাওয়া বালিয়াড়িটায় চড়ল ওরা।
বছরের এই সময়টায় আমার ভীষণ খারাপ লাগে, শুকনো গলায় বলল ডলি। খাবার নেই, কিছু নেই। শুধু রক্ত খেয়ে থাকতে হয়। মানুষকে পটিয়ে রক্ত জোগাড় করা যে কি কঠিন কাজ!
রাস্তায় উঠল ওরা। শহরের মেইন রোডের দিকে এগোল। সাইডওয়াক দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে অনেকে। দুজন তরুণ-তরুণী হাঁটছে, মাঝে একটা বছর চারেকের মেয়ে। দুদিক থেকে দুজনে হাত ধরে রেখেছে বাচ্চাটার। হার্ড রক, টি-শার্ট গায়ে দুটো মেয়ে হাঁটছে গা ঘেষাঘেঁষি করে। একজোড়া প্রৌঢ় দম্পতি হেঁটে যাচ্ছে দোকানগুলোর সামনে দিয়ে। দোকানের উইন্ডোর দিকে নজর। কিছু কিনবে বোধহয়।
ওদের কাউকে ধরা যায় কিনা ভাবছে ডলি, হাত চেপে ধরল কিমি, ওই দেখো! শিকার!
খানিক দূরে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে ওদের সমবয়েসী তিনটে ছেলে। পেছন পেছন হাঁটছে সাত-আট বছরের একটা ছোট্ট মেয়ে।
সবচেয়ে লম্বা ছেলেটা নিগ্রো। পেশী দেখে বোঝা যায় নিয়মিত ব্যায়াম করে, অ্যাথলিট। দ্বিতীয় ছেলেটাও লম্বা। মাথায় খাটো করে ছাঁটা চুল। আর তৃতীয় ছেলেটা হালকা-পাতলা, গোলগাল চেহারা, বাদামী-চুল।

মাথা নেড়ে চুল ঝাঁকিয়ে, মৃদু হেসে ডলি বলল, ওদের পটানো যেতে পারে, কি বলো?
চলো, চেষ্টা করে দেখা যাক, বলল কিমি।
.
ছেলেগুলোর দিকে এগোল তিন ভ্যাম্পায়ার।
কাছাকাছি এসে ডাকল কিমি, হাই।
ফিরে তাকাল ছেলেগুলো। মেয়েদের আসতে দেখে দাঁড়াল। বাদামী চুল ছেলেটা জিজ্ঞেস করল, আমাদের বলছ?
অকারণেই খিলখিল করে হাসল কিমি, এখানে তোমরা ছাড়া আর কে আছে? বেড়াতে এসেছ বুঝি?
মোরগের মত ঘাড় কাত করে, লাল চুল নাচিয়ে হাসল ডলি। আমরাও বেড়াতে এসেছি। আমি লেবার ডে পর্যন্ত থাকব।
অ, হাত বাড়িয়ে দিল বাদামী-চুল ছেলেটা, আমি রবিন। রবিন। মিলফোর্ড।
কোন শহর থেকে এসেছ তোমরা?
রকি বীচ।
আমি হানিকম্ব থেকে।
শুনতে তো নামটা মিষ্টিই লাগছে। জায়গাটাও মিষ্টি নাকি?
আছে। মোটামুটি।
আমাদেরটাও মোটামুটি। খুব খারাপও না, খুব ভালও না।
সঙ্গীদের পরিচয় করিয়ে দিল রবিন। নিগ্রো ছেলেটাকে দেখিয়ে বলল, ও মুসা আমান। আর এ হলো টনি হাওয়াই। ও সিসি। টনির বোন।
হাই, হালো, হাত মেলানো ইত্যাদি শেষ হলে কণিকা জিজ্ঞেস করল, যাচ্ছ কোথায় তোমরা?
শহরে, জবাব দিল রবিন। নাটকের জন্যে প্লেয়ার সিলেকশন করা হবে। আজ। টেস্ট দেব।
ও, ভালই হলো। আমরাও ওখানেই যাচ্ছি। চলো, একসঙ্গেই যাওয়া যাক।
মুসার বাহুর ফাঁকে হাত ঢুকিয়ে দিল ডলি। শুধু শুধু হাসছে। এত দ্রুত আন্তরিক হতে চাওয়ার ব্যাপারটা মুসার কাছে স্বাভাবিক মনে হলো না। এখানে অবশ্য অপরিচিত সবাইকেই তার সন্দেহ।
ওকে টেনে সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করল ডলি।
ভুরু কুঁচকে তাকাল মুসা। চিন্তিত।
তর সইছে না। খিদেটা ডলির সত্যি খুব বেশি, বুঝতে পারল কণিকা।
যেতে চাইছে না মুসা। অস্বস্তি বোধ করছে।

মুচকি হাসল কণিকা। বুঝতে পারছে, মেয়েদের সঙ্গে সহজ হতে পারে ছেলেটা। ভাল বিপদে পড়েছে বেচারা। মেয়েমানুষের খপ্পর।
টনি মোটামুটি স্বাভাবিক। কিমি যখন ওর হাত ধরল, মুসার মত কুঁকড়ে গেল না। বরং হাসির জবাব দিল হাসি দিয়ে।
রবিনের সঙ্গী হলো কণিকা। রবিন টনির চেয়েও স্বাভাবিক। মুসার মত অস্বস্তি বোধ করছে না। সহজ ভঙ্গিতে কথা বলতে লাগল কণিকার সঙ্গে। মেয়েদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে কোন অসুবিধে হয় না তার।
চলো, হটি, মুসার হাত ধরে টানল আবার ডলি।
মেইন স্ট্রীট ধরে হাঁটতে লাগল ওরা। বীচ এমপোরিয়ামের উইন্ডোর সামনে দাঁড়াল কিমি। বিকিনিগুলো খুব সুন্দর।
ওর দিকে তাকিয়ে হাসল ডলি, কিনবে নাকি?
নাহ, ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়ল কিমি, পয়সা নেই।
স্যাভি হেলোতে এই প্রথম এলে বুঝি? মুসাকে জিজ্ঞেস করল ডলি।
না, আরও এসেছি।
তাহলে তো তুমি সব জানো। গরমকালে নাকি এখানে অনেক লোক আসে, পার্টি-টার্টি, হই-চই হয় খুব?
হ্যাঁ, হয়। ভরে যায়। সৈকতে আগুন জ্বেলে কাবাব বানিয়ে খায়, আড্ডা দেয়, নাচাকোদা করে। পাগল হয়ে যায় যেন সব। বুড়োগুলোও ছেলেমানুষ। হয়ে যায়।
তাই নাকি! খুব মজা হবে এবার। খোলা জায়গার পার্টি আমার খুব ভাল লাগে। তোমরা সঙ্গে থাকলে আরও বেশি জমবে।
জবাব না দিয়ে হাঁটতে থাকল মুসা।
মনে মনে হাসছে কণিকা। মুসাকে আগ্রহী করতে পারছে না ডলি।
রবিনের দিকে তাকাল কণিকা। তুমি এসেছ আর?
মাথা নাড়ল রবিন, এসেছি।
কথা বলতে বলতে এগোল ওরা।
ডলি বার বার মুসাকে দল থেকে সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে। মুসাও সরতে নারাজ।
আমি বাড়ি যাব! আচমকা তীক্ষ্ণস্বরে চেঁচিয়ে উঠল সিসি।
ফিরে তাকাল সবাই। ভুলেই গিয়েছিল যেন ওর কথা। এমনকি ওর ভাই টনিরও যেন মনে ছিল না।
এত তাড়াতাড়ি?
কেন, আম্মা বলে দিয়েছে না এগারোটার পর যেন আর না থাকি।

জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে কিমির দিকে তাকিয়ে উনি বলল, তোমরা এগোও। আমি চট করে ওকে বাড়িতে রেখে আসি। সিলেকশনের আগেই চলে আসব। সিসির দিকে তাকাল, চল! জলদি! আর যদি রাতে কখনও সঙ্গে আসতে চাস তো ভাল হবে না বলে দিলাম।
রোজ রোজ দুটো করে কোন আইসক্রীম আর একটা করে চকলেট যদি। দিস, আসতে চাইব না।
অত পাবি না। একটা আইসক্রীম, আর একদিন পর পর একটা করে চকলেট।
কি ভেবে তাতেই রাজি হয়ে গেল সিসি।
*
মুসা কোন কথা জিজ্ঞেস করছে না দেখে ডলিই আগ বাড়িয়ে বলল, নাটকের প্লটটা খুব পছন্দ হয়েছে আমার। মেইন একটা চরিত্র যদি পাই...
জবাব দিল না মুসা।
থিয়েটারে পৌঁছে গেল ওরা।
মুসা আর রবিনকে বলল ডলি, তোমরা যাও। আমরা আসছি।
থিয়েটারের দরজার দিকে এগিয়ে গেল দুই গোয়েন্দা।
ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল ডলি। খিদেয় জ্বলে যাচ্ছে পেট। ভ্যাম্পায়ার হওয়ার যে এত যন্ত্রণা, আগে জানলে কে আসত!
খবরদার! চট করে কণিকার দিকে তাকাল কিমি। চোখে সন্দেহ। বিশ্বাস করতে পারছে না এখনও ওদের নতুন সঙ্গীকে। আবার ফিরল ডলির দিকে। এসব কথা বোলো না। কে কোনখান থেকে শুনে ফেলবে, কাউন্ট ড্রাকুলার কানে চলে গেলে রক্ষা থাকবে না। ভ্যাম্পায়ার যখন হয়েই গেছি, মানুষের রক্ত খেয়ে ফেলেছি, এখন এগিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। আমাদের।..কি বলো, কণিকা?
মাথা ঝাঁকাল কণিকা। তা তো বটেই!
যাই বলো, ডলি বলল, ওই মুসাটাকে আমার ভীষণ পছন্দ হয়েছে। কি স্বাস্থ্য। অনেক রক্ত শরীরে। ওর গলায় দাঁত ফোঁটাতে পারলে... চুটকি বাজাল সে, আহ!
কিন্তু ও তোমাকে ভাল চোখে দেখছে বলে মনে হলো না, কণিকা। বলল।
তা ঠিক। অতিরিক্ত চালাক, ডলি বলল। সম্মোহনের অনেক চেষ্টা করেছি। চোখের দিকেই তাকাতে চায় না। এখানকার ভ্যাম্পায়ারের ব্যাপারে কিছু জানে নাকি কে জানে! জন আর লীলা মরার সময় কাউন্ট ড্রাকুলা এখানে ছিলেন না। তার ধারণা, ওদের মরার ব্যাপারে এখানকার কারও হাত থাকতে পারে।
মুসার কথা বলছ?
অন্য কেউও হতে পারে!

ভঙ্গিতে তো মনে হচ্ছে আমাকে সন্দেহ করছ! নাকি? তোমার সঙ্গে কিন্তু কাউন্টের পরিচয় হয়নি এখনও, ঘুরিয়ে জবাব দিল ডলি। কোথায় থাকো সেটাও জানি না আমরা…
কাউন্টের সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেয়ার কথা ছিল জনের। কিন্তু সে-ই তো নেই।…চলো, ভেতরে চলো। দেরি দেখলে মুসারা আবার অবাক হয়ে ভাববে আমাদের কি হলো।
থিয়েটারের দরজার দিকে পা বাড়াল কণিকা।

.

স্টেজের কিনারে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে সব মুসা। তিরিশ-বত্রিশজন ছেলেমেয়ে আছে ঘরে। একসঙ্গে কথা বলছে সবাই। হই-চই, হাসাহাসি করছে।
কোনজন? ভাবছে সে। ওদের মধ্যে ভ্যাম্পায়ার কে? আছে কি কেউ?
সবার মুখের দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করল। সামনের সারির ওই চটপটে মেয়েটাই কি সারাদিন কফিনে শুয়ে কাটিয়ে রাতে বেরোয়? নাকি ওই ছেলে দুটো? চেঁচিয়ে, পরস্পরের পিঠে চাপড় মেরে উল্লাস করছে যারা?
ও নিশ্চিত, জন আর লীলাই শেষ নয়। ওদের দলে ভ্যাম্পায়ার আরও আছে। রিকি শরকে শেষ করেছে লীলা। জন দিচ্ছিল জিনাকে শেষ করে আরেকটু হলেই। অল্পের জন্যে বেঁচেছে জিনা।
বেটে, মোটা, মাঝবয়েসী এক মহিলা গটগট করে হেঁটে এসে ঢুকলেন স্টেজে। সোনালি চুল ব্যান্ড দিয়ে বাঁধা। কোলাহল ছাপিয়ে চিৎকার করে বললেন তিনি, অ্যাটেনশন, প্লীজ! আমার কথা শোনো তোমরা!
ধীরে ধীরে কমে এল চিৎকার-চেঁচামেচি, হট্টগোল। আমি মিসেস রথরক। স্যান্ডি হোলোর এই কমিউনিটি থিয়েটারের পরিচালক। একসঙ্গে তোমাদের এতজনকে দেখে খুব ভাল লাগছে আমার।
নাটকটা সম্পর্কে বলতে আরম্ভ করলেন তিনি। আগ্রহ হারাল মুসা। অডিটরিয়ামের সীটে বসা ছেলেমেয়েদের দিকে নজর ফেরাল আবার। ওসব। হাসিমুখের যে কোনটার আড়ালে লুকিয়ে থাকতে পারে মারাত্মক শ্বদন্ত। সুন্দর চেহারাগুলোর যে কোনটা নিমেষে পরিবর্তিত হয়ে রূপ নিতে পারে। ভয়াবহ দানবে।
কেশে গলা পরিষ্কার করলেন মিসেস রথরক। আবার তার দিকে ফিরল মুসা।
শুরু করা যাক, বললেন তিনি। রবিন মিলফোর্ড, উঠে এসো। তোমাকে দিয়েই শুরু করি।
সীটের সারির পাশ দিয়ে মঞ্চের দিকে এগোল রবিন। চেহারায় উত্তেজনার ছাপ। মঞ্চে উঠলে তার হাতে একটা কাগজ ধরিয়ে দিলেন মিসেস, রথরক। তাতে

সংলাপ লেখা। পড়া আর অভিনয় একসঙ্গে চালিয়ে যেতে হবে।
শুরু করল রবিন।
মুসার চোখ ওর দিকে। পাশ থেকে চমকে দিল ডলি, মুসা, আমি এসে গেছি।
ফিরে তাকাল সে। হাসিমুখে তাকিয়ে আছে ডলি। বলল, দেরি করে। ফেললাম নাকি?
না, মাত্র শুরু করেছে। রবিনই প্রথম। যে রকম ঢিলামি শুরু হয়েছে, কয়েক ঘণ্টা লাগিয়ে দেবে। হয়তো দেখা যাবে আজ আর সবার টেস্ট নেয়াই হলো না।
তুমি কোন পার্টটা করছ?
ডলির গায়ের পারফিউমের গন্ধ পাচ্ছে মুসা। পরিচিত লাগছে গন্ধটা। মনে করতে পারছে না। আমার এসব নাটক-ফাটক ভাল্লাগে না। তবু যদি করতেই হয় সবচেয়ে ছোটটা নেব, ডেলিভারি বয়। মাত্র পাঁচ লাইনের সংলাপ। দিলে দিল দিলে নাই।
লেডি ভ্যাম্পায়ারের পার্ট করার ইচ্ছে আমার, গর্বের সঙ্গে বলল ডলি। ডায়লগ আগেই নিয়ে গিয়ে মুখস্থ করে ফেলেছি। আশা করছি পেয়ে যাব। চরিত্রটা।
পরীক্ষা দেয়া শেষ করে মঞ্চ থেকে নেমে এল রবিন। ডলিকে জিজ্ঞেস করল, কণিকা আসেনি?
এসেছে, হাত তুলে দেখাল সে, ওই তো।
আমাকে খুঁজছ? এগিয়ে এল কণিকা। পেছনে কিমি।
কেন খুঁজছ? জানতে চাইল কণিকা।
না, এমনি। এলে একসঙ্গে, তারপর আর দেখা নেই...
ও। চলো, বসি।
আগের সীটটায়ই গিয়ে বসল রবিন। পাশে কণিকা। কিমি বসল টনির পাশে।
মুসার দিকে তাকাল ডলি। লম্বা চুলে ঝাঁকি দিয়ে হেসে বলল, আবার সেই তুমি আর আমি। একা।
জবাব দিল না মুসা।
মিসেস রথরক বললেন, টনি হাওয়াই, অভিনয় করবে? বলে ঘুরতেই ডলির ওপর চোখ পড়ে গেল, ও, ডলিও এসে গেছ। ভাল। তোমার কথাই ভাবছিলাম।
এখানকার ছেলেমেয়েদের অনেকেই তার পরিচিত।
হ্যাঁ, এসেছি, এক পা এগিয়ে গেল ডলি।
টনির আগে তুমি টেস্ট দিতে চাও?
অসুবিধে নেই। উনি আগে গেলেও হয়।
ঠিক আছে, তুমিই এসো আগে। তোমার চরিত্রটা বড়।
এগিয়ে গেল ডলি। মঞ্চের মাঝখানে গিয়ে দর্শকের দিকে ফিরে হাসল।

অনেকের মত মুসাও তাকিয়ে আছে ওর দিকে।
ভ্যাম্পায়ার হওয়া বড়ই কঠিন কাজ, সংলাপ বলার আগে লেকচার দিতে শুরু করল ডলি। যে না হয়েছে, সে বুঝবে না। গুঙিয়ে উঠল সে।
বাই ভাবল অভিনয় করছে ডলি, কিন্তু কণিকা আর কিমি বুঝতে পারছে, গোঙানিটা সত্যি। খিদেয় এমন করছে।
একটা বিশেষ দৃশ্য অভিনয় করে দেখাতে বললেন মিসেস রথরক।
অভিনয় শুরু করল ডলি।
ভালই, বলে উঠল মুসার কাছে দাঁড়ানো একটা মেয়ে। তবে অতি অভিনয় করছে।
ফিরে তাকাল মুসা। মেয়েটা সুন্দরী। কখন এসে দাঁড়িয়েছে তার পাশে বলতে পারবে না। মঞ্চের দিকে চোখ থাকায় খেয়াল করেনি এতক্ষণ। মাথাভর্তি কালো চুল। এত নিঃশব্দে এল কি করে! ভ্যাম্পায়ার নাকি?
ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল মুসা, কি বললে?
বললাম, অতি অভিনয়। নাটক না হয়ে কার্নিভলের যাত্রা হয়ে যাচ্ছে।
আস্তে বলো। শুনতে পেলে দুঃখ পাবে।
পায় পাক। ভুল তো আর বলিনি।
খুব বেশি আত্মবিশ্বাস মনে হচ্ছে তোমার?
জবাবে হাসল মেয়েটা। ডান হাতটা মুসার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, আমি অ্যানি। ওই চরিত্রটার জন্যেই টেস্ট দেব আমিও।
কয়েক মিনিট পর ডলিকে বিদেয় করে দিয়ে মিসেস রথরক ডাকলেন, এনিড ক্যামেরন, এবার তুমি এসো।
নড়ে উঠল অ্যানি। মুসার দিকে তাকিয়ে আরেকবার হেসে বলল, যাচ্ছি, দোয়া কোরো।
হালকা পায়ে সিঁড়ি বেয়ে নিঃশব্দে মঞ্চে উঠল সে।
ভ্যাম্পায়ার হিসেবে কাকে বেশি সন্দেহ করা উচিত, ভাবতে লাগল মুসা। ডলি, না অ্যানি? অ্যানিই হবে। ডলি অতিমাত্রায় সরব। অ্যানি শান্ত। ছায়ার মত নিঃশব্দ চলাফেরা তার।
অ্যানি অভিনয় শুরু করতেই নীরব হয়ে গেল সমস্ত অডিটরিয়াম। যেন কোন কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে সে। নাক কুঁচকাল, মোরগের মত ঘাড় কাত করল, হাসল, ভ্রূকুটি করল।
তাকিয়ে আছে সবাই।
মুসা নাটক বোঝে না। কিন্তু অ্যানি আর ডলির অভিনয় দেখে এটুকু অন্তত বুঝল, দুজনের মধ্যে কে ভ্যাম্পায়ারের অভিনয় ভাল করতে পারবে।

ডায়লগ বলা শেষ হতেই তুমুল হাততালি পড়তে লাগল। লজ্জা পেল অ্যানি। লাল হয়ে গেল। মঞ্চ থেকে নেমে এগিয়ে এল মুসার দিকে।
তুমি দারুণ অভিনয় করো! প্রশংসা করল মুসা। সত্যি বলছ? পার্টটা পেলে খুব খুশি হতাম।
ওর চকচকে বাদামী চোখের দিকে তাকিয়ে রইল মুসা। কোমল, কেমন যেন পুরানো ধাচের চোখ। হৃৎপিণ্ডের গতি বেড়ে যাচ্ছে ওর। ভ্যাম্পায়ারের বয়েসের কোন ঠিকঠিকানা থাকে না। কোন্ আমলের মানুষ অ্যানি!
এখান থেকে বেরিয়ে কোন কাজ আছে তোমার? জানতে চাইল অ্যানি।
নাহ। চলো না তাহলে হেঁটে আসি কোনখান থেকে। সৈকতে যাবে?
তা যাওয়া যায়, ভ্যাম্পায়ারের সঙ্গে বেড়াতে যাওয়ার কথা ভেবে বুকের মধ্যে কাপুনি শুরু হয়ে গেল মুসার। কিন্তু অ্যানি কি সতি, ভ্যাম্পায়ার? বাইরে নির্জনতার মধ্যে না গেলে সেটা বোঝা যাবে না। প্রমাণ করতে হলে ঝুঁকি নিতে হবে। ভূতের সঙ্গেই বেরোতে হবে।
দাঁড়াও, আসছি, বলে বাথরুম সারতেই বোধহয় মঞ্চের পেছনের পর্দা। সরিয়ে ওপাশে চলে গেল অ্যানি।
বেশি মানুষের সঙ্গে জানাশোনা হবে, তত ভাল। ভ্যাম্পায়ারের খোঁজ পাওয়া সহজ হবে। কোনজন যে ভ্যাম্পায়ার, কাছাকাছি না এলে বোঝা যাবে না।
সীটের দিকে ফিরে দেখল রবিন আর কণিকা বেরিয়ে যাচ্ছে।
পেছনে এসে দাঁড়াল ডলি। বলল, কিছুক্ষণের মধ্যে কে কোন পার্টটা পাবে, ঘোষণা করবেন মিসেস রথরক।
তুমি যেটা চাইছ, পাবে বলে মনে হয়?
না পাওয়ার কোন কারণ আছে? চোখের পাতা সরু হয়ে এল ডলির।
না না, তা বলছি না, ডলির প্রতিক্রিয়া দেখে অবাক হলো মুসা। তুমি কি ভাবছ সেটা জানতে চাচ্ছিলাম। রাগার কিছু কিন্তু বলিনি।
সামলে নিল ডলি, পার্টটা আমিই পাব।
অভিনয় তেমন বুঝিটুঝি না। তবে আমার মনে হয়েছে ভাল অভিনয় করেছ তুমি।
চেহারা আবার স্বাভাবিক হয়ে এল ডলির। বাইরে যাবে? চলো না, ঘুরে আসি। বদ্ধ ঘরে ভাল লাগছে না।
তোমার সঙ্গে যেতে পারব না।
কেন? ঘাড় বাকিয়ে তাকাল ডলি।
ঘাবড়ে গেল মুসা। আবার রেগে যাবে না তো!
না, আর রাগল না ডলি। মুসার চোখের দিকে তাকাল। আঠার মত আটকে গেল যেন দৃষ্টি।

মুসার মনে হতে লাগল তাকে কোন অদ্ভুত জায়গায়, স্বপ্নের মধ্যে টেনে নিয়ে চলেছে মেয়েটা। নিচের অন্ধকার খাদের মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছে সে।
এমন লাগছে কেন! জোর করে চোখ সরিয়ে নিল।
অবাক হলো ডলি। সেই সঙ্গে হতাশ। অভিমানের সুরে বলল, আমার সঙ্গে যেতে পারবে না কেন?
অ্যানিকে কথা দিয়ে ফেলেছি-ওর সঙ্গে বেরোব।
হতাশা ছেয়ে দিল ডলির চেহারা।
ওর অবস্থা দেখে মায়া লাগল মুসার। তুমি যেতে চাও আগে বললে না কেন? তাহলে অ্যানিকে আর…
অ্যাটেনশন প্লীজ! জোরে জোরে বলতে লাগলেন মিসেস, রথরক। আমার কথা শোনো! নাটকের জন্যে যারা যারা সিলেক্টেড হয়েছ, তাদের নাম ঘোষণা করছি। সবাই তোমরা ভাল অভিনয় করেছ। এত ভাল যে, কাকে বাদ দিয়ে কাকে নেব সেটা ঠিক করতেই বেকায়দায় পড়ে গেছি। সবাইকে নেয়ার মত এত চরিত্র আমাদের নাটকে নেই। তাই বাধ্য হয়ে কয়েকজনকে বাদ দিতে হয়েছে…
যারা বাদ পড়েছে তাদের দুঃখ ঘোচানোর জন্যে প্রচুর ভাল ভাল কথা বললেন তিনি। সান্ত্বনা দিলেন। শেষে নাম ঘোষণা করতে লাগলেন।
টনি, রবিন, মুসা তিনজনেই সুযোগ পেল। পেল কণিকা আর কিমি। অ্যানিকে মেইন রোলটা পেতে দেখে অবাক হলো না মুসা। ডলিকে দেয়া হলো একটা বড় চরিত্র। ডলি তাতে খুশি হতে পারল না মোটেও। অ্যানি যেটা পেয়েছে সেটা চেয়েছিল সে।
মুসা, রোলটা পেয়েই গেলাম শেষ পর্যন্ত! উল্লাসে ফেটে পড়ার উপক্রম হলো অ্যানির।
পাবে, সে তো জানা কথা। তোমার পাওয়ার ব্যাপারে একবিন্দুও সন্দেহ ছিল না আমার।
সত্যি বলছ?
মিথ্যে বলব কেন?
থ্যাংক ইউ, ঝলমলে হাসি উপহার দিল অ্যানি। চলো, বেরোই। নাকি আরও থাকবে?
না, আর কি? হয়েই তো গেল। টেস্ট দিলাম, চান্স পেলাম, ব্যস।
এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলল মুসা। ধরে রাখল, অ্যানির বেরোনোর জন্যে।
বাইরে বেরিয়ে আগে আগে হাঁটতে শুরু করল অ্যানি। মুসাও পা বাড়িয়েছে, খুট করে শব্দ হলো পেছনে ফিরে তাকাল। সাৎ করে একটা ছায়া সরে গেল দরজার

কাছ থেকে। ক্ষণিকের জন্যে আলো পড়ল ছায়াটার। মুখে। ডলিকে চিনতে ভুল হলো না তার।
একটা মুহূর্ত তাকিয়ে রইল ডলি। তারপর দড়াম করে লাগিয়ে দিল দরজাটা। রাগ দেখাল। মুসার সঙ্গে বেরোতে না পারার দুঃখ ভুলতে পারছে না।
কিছু করার নেই মুসার। অ্যানিকে কথা দিয়েছে আগে।

.

সৈকতে হাঁটতে হাঁটতে চাঁদের দিক মুখ তুলে তাকাল অ্যানি। জ্যোৎস্নায়। অনেক বেশি আকর্ষণীয় লাগছে ওকে।
মেয়ে ভ্যাম্পায়াররা যে সুন্দরী মেয়ের রূপ ধরে আসে, ভোলেনি মুসা। কিন্তু অ্যানিকে ভ্যাম্পায়ার ভাবতে ভাল লাগল না। তবে অসতর্কও হলো না। ভ্যাম্পায়াররা নানা ছলনা জানে। ওদের মায়ার জালে জড়ালে রিকি আর জিনার অবস্থা হতে দেরি হবে না তারও।
পানির কিনার দিয়ে হাঁটছে ওরা। নির্দিষ্ট কোন গন্তব্য নেই। ডানে পাথরের জেটিতে আছড়ে পড়ছে ঢেউ।
সামনের দিকে হাত তুলে অ্যানি জিজ্ঞেস করল, ওরা কি তোমার বন্ধু?
পানিতে নেমে পাশাপাশি হাঁটছে রবিন আর কণিকা। ঢেউ আছড়ে পড়ছে ওদের পায়ে।
মেঘের আড়ালে চলে গেল চাঁদ। অন্ধকারে হারিয়ে গেল দুজন। আবার যখন বেরোল চাঁদ, আর দেখা গেল না ওদের।
অবাক হলো মুসা। এত তাড়াতাড়ি গেল কোথায় ওরা?
কয়েক মিনিট নীরবে হাঁটল মুসা আর অ্যানি। আবার মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়েছে চাঁদ। অনবরত চলতে লাগল চাঁদের এই লুকোচুরি খেলা।
অ্যানি বলল, রাত নিশ্চয় অনেক। কটা বাজে?
অন্ধকারে ঘড়ি দেখার চেষ্টা করল মুসা। দেখা যাচ্ছে না। এগারোটার বেশিই হবে। বাড়ি যাওয়া দরকার। দেরি করলে আম্মা চিন্তা করবে।
বাহ, ভ্যাম্পায়ারের আবার আম্মাও থাকে!–ভাবল মুসা। যদিও এখন পর্যন্ত কোন রকম অস্বাভাবিক আচরণ করেনি অ্যানি। সময় নিচ্ছে আরকি। ধৈর্য ধরে সুযোগের অপেক্ষায় আছে।
কাল যাচ্ছ তো থিয়েটারে? জিজ্ঞেস করল মুসা।
নিশ্চয়ই।
চলো, তোমাকে দিয়ে আসি।
লাগবে না। আমি একাই চলে যেতে পারব। শুধু শুধু কষ্ট করতে হবে না তোমার।

শহরের দিকে রওনা হয়ে গেল অ্যানি। যতক্ষণ দেখা গেল ওকে, তাকিয়ে। রইল মুসা।
ধীরে ধীরে বালিয়াড়ির ওপাশে হারিয়ে গেল অ্যানি।
*
খুব ভাল লাগছে আমার, কিমি বলল। আজকের রাতটা খুব সুন্দর।
আমারও ভাল লাগছে, টনি বলল। সৈকতের কিনারে সাগরের দিকে মুখ করা বারান্দায় বসে আছে দুজনে। মস্ত কটেজটা ভাড়া নিয়েছেন টনির বাবা।
চলো না, সৈকতে হেঁটে আসি।
কি দরকার। এখানেই তো ভাল লাগছে।
তা লাগছে। গেলে আরও ভাল লাগত, সুযোগের অপেক্ষায় আছে। কিমি। টনিকে সম্মোহিত করে, ওষুধ শুকিয়ে কাবু করে রক্ত খাওয়ার অপেক্ষা। এভাবে বসে থাকলে সে-সুযোগ পাবে না। উঠে দাঁড়াল সে। রেলিঙের কাছে গিয়ে পেট ঠেকিয়ে দাঁড়াল।
খানিকক্ষণ বসে থেকে টনিও উঠে গেল।
ফিরে তাকাল কিমি। টনির মুখোমুখি হলো। জ্যোৎস্নায় খুব সুন্দর লাগছে ওকে। টনির চোখ আটকে গেল কিমির চোখে।
আরও কাছে চলে এল কিমি। হাত নাড়ল টনির নাকের সামনে। কিমির চাহনিতেই কেমন যেন হয়ে গিয়েছিল টনি, মিষ্টি গন্ধে অবশ হয়ে আসতে লাগল শরীর।
ওর কাঁধে দুই হাত রাখল কিমি। ধীরে ধীরে মুখটা নামিয়ে আনতে লাগল। গলার কাছে। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে দপদপ করছে শিরাটা। মুহূর্তে খিদে চাগিয়ে উঠল। প্রবল হয়ে গেল রক্তের তৃষ্ণা। ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে গেল আপনাআপনি। বেরিয়ে পড়ল তীক্ষ্ণ মাথাওয়ালা শ্বদন্ত। কুটুস করে ফুটিয়ে দিলেই হলো এখন। রক্ত বেরিয়ে আসবে ফিনকি দিয়ে। চুষে চুষে খাবে সে।
সাবধান, অত উতল হয়ো না!–নিজেকে হুঁশিয়ার করল কিমি। লোভ সামলাও। রক্ত শুষে ওকে ছিবড়ে বানিয়ে ফেলো না। ও মরে গেলে ভীষণ বিপদে পড়বে।
শিরাটার ওপর মুখ নামাল সে। দাঁত চেপে ধরল। ফুটিয়ে দিতে যাবে, ঠিক এই সময় শোনা গেল তীক্ষ্ণ চিৎকার, অ্যাই, কি করছ তোমরা?
ঝটকা দিয়ে মুখ সরিয়ে একলাফে পিছিয়ে গেল কিমি। ঠোঁট দিয়ে চেপে ঢেকে ফেলল দাঁত দুটো। গলা শুনেই বুঝতে পারল টনির বোন সিসি। সর্বনাশ! শঙ্কিত হলো কিমি। বিন্দু মেয়েটা শ্বদন্ত দুটো দেখে ফেলেনি তো?
টনিরও ঘোর কেটে গেল। চিৎকার করে উঠল, সিসি, চেঁচাচ্ছিস কেন?
দেখতে এসেছিলাম, তোরা কি করছিস, বলে হি-হি করে হাসতে লাগল সিসি।

রাগ আগ্নেয়গিরির লাভার মত ফুটতে শুরু করল কিমির মগজে। সিসির ঘাড় চেপে ধরে ওর গলাতেই দাঁত ফুটিয়ে দিতে ইচ্ছে করল। কিন্তু সেটা করতে যাওয়া হবে চরম বোকামি। যতই ঝগড়া করুক, বোনকে প্রচণ্ড ভালবাসে টনি। মুসা আর রবিনও পছন্দ করে। সিসির কিছু হলে। ভ্যাম্পায়ারের পেছনে আদাজল খেয়ে লাগবে তিনজনে। সাংঘাতিক বিপদে ফেলে দেবে। স্যান্ডি হোলো ছাড়তে বাধ্য করবে।

নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা চালাল কিমি।

পারছে না কোনমতে। পেটে খিদে না থাকলেও এক কথা ছিল। এখানে থাকলে নিজেকে সামলাতে না পেরে শেষে কোন অঘটন ঘটিয়ে বসে কে জানে! চলে যাওয়াই ভাল।

আমি যাই, টনি, বলে আর একটা মুহূর্ত দাঁড়াল না সে। দ্রুত বারান্দা থেকে নেমে লম্বা লম্বা পায়ে হাঁটতে শুরু করল। কানে এল, ওর চলে যাওয়ার জন্যে বোনকে দায়ী করে বকাবকি শুরু করেছে টনি।

*

রাত দুপুরে ঘনঘন কলিং বেলের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল মুসার। এতরাতে কে? আধো ঘুম নিয়ে বিছানা থেকে নামল সে। দরজা খুলতে চলল।

দরজায় দাঁড়িয়ে আছে দুজন পুলিশ অফিসার। মুসার নাম জানতে চাইল একজন।

মুসা।

পুরো নাম?

মুসা আমান।

আজ রাতে এনিড ক্যামেরনের সঙ্গে সৈকতে গিয়েছিলে?

হ্যাঁ, ডলে ডলে চোখ থেকে ঘুম তাড়ানোর চেষ্টা করল মুসা। কেন? কিছু হয়েছে নাকি?

কটার সময় শেষ দেখেছ ওকে?

এই….এগারোটা-সাড়ে এগারোটা হবে।

তোমার আব্বা আছেন বাসায়?

না, মাকে নিয়ে বেড়াতে গেছে হ্যাঁমারহেডে। বলে গেছে শনিবার নাগাদ আসবে।

কেন, বাবাকে দরকার?

না, তোমাকেই দরকার।

পরস্পরের দিকে তাকাল দুই অফিসার। একজন পুরুষ। ছয় ফুটের বেশি লম্বা। মাংসপেশীর পাহাড় মনে হয়। দ্বিতীয়জন কঠোর চেহারার মহিলা। দুজনেই গম্ভীর।

অ্যানির কিছু হয়েছে? জানতে চাইল মুসা।
ওকে পাওয়া যাচ্ছে না, অফিসার জানাল।
কে খবর দিল আপনাদের?
ওর আম্মা।
তারমানে সত্যি সত্যি আম্মা আছে অ্যানির। ভ্যাম্পায়ার নয় সে।
কোথায় তাকে শেষ দেখেছ? জানতে চাইল মহিলা অফিসার।
সৈকতে।
সৈকতের কোনখানে?
শহরের কিনারে। একটা বালিয়াড়ির কাছে। কমিউনিটি থিয়েটার থেকে বেরিয়ে ওখানে হাঁটতে গিয়েছিলাম আমরা।
জায়গাটা আমাদের দেখাতে পারবে?
মাথা ঝাঁকাল মুসা।
কাপড় পরে তাহলে এসো একটু আমাদের সঙ্গে।
পেট্রলকারের পেছনে বসে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে মুসা।? ভেসে ভেসে যেন সরে যাচ্ছে নির্জন, ঘুমন্ত শহরটা। খড়খড় করছে টু-ওয়ে রেডিওর স্পীকার। কথা হচ্ছে। কিন্তু কার সঙ্গে কথা বলছে অফিসাররা, বুঝতে পারল না সে।
অ্যানির কথা ভাবতে লাগল। মনে পড়ছে ওর চকচকে চুল। উজ্জ্বল হাসি।
আস্তে চালান, শহরের কিনারে পৌঁছে অফিসারদের বলল সে। আরেকটু সামনেই। মসৃণ, রূপালী সৈকতটার দিকে তাকিয়ে আছে সে। হঠাৎ বলে উঠল, হ্যাঁ, থামুন, এখানেই।
সঙ্গে সঙ্গে ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষল অফিসার।
গাড়ি থেকে নামল মুসা। ছোট বালিয়াড়িটার দিকে এগিয়ে গেল। হাঁটতে গিয়ে ঠাণ্ডা বালি ঢুকছে জুতোর মধ্যে।
ওর ঠিক পেছনেই রয়েছে দুই পুলিশ অফিসার। ওদের হাতের শক্তিশালী টর্চের রশ্মি হলুদ আলোর বৃত্ত সৃষ্টি করছে বালিতে।
এখানেই হাঁটছিলাম আমরা, মুসা বলল। গালে এসে লাগছে সাগরের। ফুরফুরে হাওয়া। নোনা গন্ধের সঙ্গে মিশে আছে পচা শ্যাওলার গন্ধ।
পেছনে দুদিকে সরে গিয়ে আলো ফেলে ফেলে দেখতে শুরু করল দুই অফিসার।
সৈকতের এপাশ-ওপাশ, সামনে-পেছনে চোখ বুলিয়ে অনুমানের চেষ্টা করল মুসা, কোথায় যেতে পারে অ্যানি?
রাতে এই সৈকত ভয়ানক বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। সর্বক্ষণ চলে ভ্যাম্পায়ারের আনাগোনা।

বালিয়াড়ির সাদা বালিতে উঁচু হয়ে আছে কালোমত একটা কি যেন। শেষবার এই বালিয়াড়িটার আড়ালেই হারিয়ে যেতে দেখেছিল অ্যানিকে। কৌতূহল হলো। এগিয়ে চলল ওটার দিকে। কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে তাকিয়ে দেখল, টর্চ হাতে খুজতে খুজতে দূরে সরে যাচ্ছে দুই অফিসার। পানির কিনারে খুঁজছে দুজনে। হয়তো ভাবছে রিকির মত পানিতে ডুবে মারা গেছে অ্যানিও।
কালো ঢিবিটার কাছে চলে এল মুসা। ভালমত দেখার জন্যে নিচু হয়ে তাকাল। পরক্ষণে সোজা হয়ে চিৎকার করে ডাকতে লাগল দুই অফিসারকে।
বালিতে চিত হয়ে পড়ে আছে অ্যানি। একটা হাত বুকের ওপর, আরেক হাত পাশে ছড়ানো। চাঁদের আলোয় ফ্যাকাসে লাগছে সাদা চামড়া। নিথর হয়ে পড়ে আছে সে।
কোন কিছুতে হাত দিয়ো না, মুসাকে সাবধান করল মহিলা অফিসার। সরে যেতে বলল।
অ্যানির দিকে তাকিয়ে আছে মুসা। খোলা চোখ দুটো নিপ্রাণ, শূন্য চাহনি মেলে যেন তাকিয়ে রয়েছে রাতের আকাশের দিকে। হাঁ হয়ে থাকা মুখ বালিতে ভরে গেছে। নাকের ফুটোয়ও বালি।
জানা দরকার কি করে মারা গেল ও। কাছে যেতে মানা করেছে তাকে। অফিসাররা। করুক। শুনবে না কথা। জানতেই হবে।
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছে দুজনে। মুসার দিকে চোখ নেই। এই সুযোগে অ্যানির লাশের কাছে চলে গেল সে। বসে পড়ে হাত বাড়িয়ে গলার কাছের চুল সরিয়ে দিল।
চিৎকার করে উঠল দুই অফিসার। ওকে সরিয়ে নিতে এল একজন।
ততক্ষণে যা দেখার দেখে ফেলেছে মুসা। চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখা। গেল গলার শিরার ওপরের চামড়ায় দুটো ফুটো। দুই ফোঁটা রক্ত বেরিয়ে কালো হয়ে আছে।
এই জিনিস দেখারই আশঙ্কা করেছিল। তারমানে তার সন্দেহ ঠিক। লীলা আর জন ছাড়াও আরও ভ্যাম্পায়ার আছে এই এলাকায়। ওগুলোকে থামানো দরকার। নইলে রিকি আর অ্যানির মত আরও কত জীবন যে নষ্ট করবে ঠিক নেই।
চাপা রাগ ফুঁসে উঠতে লাগল ভেতরে ভেতরে। ওখানে দাঁড়িয়েই আরও একবার প্রতিজ্ঞা করল, সবগুলোকে ধ্বংস না করে ক্ষান্ত হবে না।
খুঁজে বের করবে!
খুন করবে একে একে!
কোনটাকে রেহাই দেবে না। স্যাভি হোলোকে পুরোপুরি মুক্ত করবে। ভ্যাম্পায়ারের কবল থেকে।

*
বালিতে বসে পড়ল মুসা। মাথার মধ্যে কেমন ঘোর লেগে আছে।
মোবাইল ফোনে খবর পেয়ে আরও অনেক পুলিশ এসে হাজির হয়েছে। কাজে ব্যস্ত ওরা। লাশটা যেখানে পাওয়া গেছে, সাদা রঙের প্লাস্টিকের খুটি দিয়ে তার চারপাশ ঘিরে দিয়েছে। সূত্র খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিভাবে মারা গেল মেয়েটা বোঝার চেষ্টা করছে।
বসেই আছে মুসা।
অবশেষে কাজ শেষ হলো পুলিশের। ওকে ডাকল একজন। একটা গাড়িতে তুলে নিল।
চুপচাপ বসে রইল সে। কারও সঙ্গে কোন কথা বলল না। ওরাও তাকে জিজ্ঞেস করল না কিছু। থানায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওকে। অন্ধকার শহরটা ওর পাশ দিয়ে পার হয়ে যাচ্ছে যেন স্বপ্নের মধ্যে।
মেইন স্ট্রীট আর ওশন অ্যাভেনিউটা যেখানে ক্রস করেছে, তার এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে বাড়িটা। পাথরে তৈরি পুরানো বাড়ি। জানালায় মোটা। লোহার শিক লাগানো। জেলখানার মত। হাজত, না জেল?
অস্বস্তি বোধ করতে লাগল সে।
শেষবার ওর সঙ্গে দেখা গেছে অ্যানিকে। লাশটাও খুঁজে বের করেছে সে। তার জন্যে কি সন্দেহ করা হচ্ছে ওকে?
ওকারিশ নামে একজন ডিটেকটিভ তার অফিসে নিয়ে ঢোকাল মুসাকে। তারপর শুরু হলো মুষলধারে প্রশ্ন। একই প্রশ্ন বার বার। কখনও কণ্ঠস্বর চড়িয়ে, কখনও নামিয়ে; কখনও ধমকের সুরে, কখনও কোমল স্বরে–কোথায় দেখা হয়েছে অ্যানির সঙ্গে, কতদিনের পরিচয়, শেষবার ওর সঙ্গে কোনখানে ছিল, কতক্ষণ, ইত্যাদি ইত্যাদি এবং আরও নানা প্রশ্ন।
জবাব দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে গেল মুসা।
ভোরের ঘণ্টাখানেক আগে ছাড়া পেল সে। হেঁটে চলল মেইন স্ট্রীট ধরে, বন্ধ দোকানগুলোর পাশ দিয়ে। একটা লোককেও দেখা গেল না এ সময়ে।
দ্রুত হাঁটতে লাগল সে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সরে যেতে চাইছে যেন। থানার কাছ থেকে। সে যে নির্দোষ এটা পুলিশকে বোঝাতে পেরেছে কিনা বুঝতে পারছে না।
মনে হয় পারেনি। ওকারিশ ওকে সন্দেহ করে বসে আছে। ছেড়ে দিয়েছে বোধহয় ওর গতিবিধির ওপর চোখ রাখার জন্যে।
দোতলার শিক লাগানো জানালাগুলোর কথা মনে পড়তে আবার কেঁপে উঠল সে। ওর মধ্যে আটকা থাকতে হলে মরেই যাবে।
আবার অ্যানির কথা ভাবল।

রিকির কথা ভাবল।
রাগটা মাথা চাড়া দিল আবার। মনে মনে আবারও কসম খেল, ভ্যাম্পায়ারের দলকে ধ্বংস না করে শান্ত হবে না।
কি করে খতম করতে হয় ওদের, ভালমতই জানে এখন সে। ড্রাকুলার বইতে পড়েছে। একজন পাদ্রীকে জিজ্ঞেস করেছে। একজন মওলানাকে জিজ্ঞেস করেছে। পাদ্রী বলেছেন, কাঠের চোখা খুঁটি ঢুকিয়ে দিতে হবে। ভ্যাম্পায়ারের বুকে। ক্রুশ বাড়িয়ে ধরলে ভ্যাম্পায়ার আর এগোয় না। মওলানা বলেছেন, আল্লাহ-রসুলের নাম করলে কোন জিন-ভূতেরই সাধ্য নেই। কাছে এগোয়। দুজনেই একটা ব্যাপারে একমত রোদের আলো আর আগুন সহ্য করতে পারে না রক্তচোষা ভূত। রোদের মধ্যে বের করে নিয়ে এলে, কিংবা গায়ে আগুন ধরিয়ে দিলে ধ্বংস হতে বাধ্য। বুকে কাঠের খুঁটি পোঁতার চেয়ে আগুন ধরানোটাই সহজ মনে হয়েছে ওর কাছে।
তবে সবার আগে, প্রথম কাজটা হলো ওদের খুঁজে বের করা
*
সাঁঝের আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে কণিকা। কেমন অসহায় বোধ করছে। কোথায় ওরা?–ভাবল। সব সময় এত দেরি করে কেন আসতে? শহরে গিয়ে ছেলেগুলোকে খুঁজে বের করার কথা ভাবল একবার।
চোখের সামনে থেকে সরিয়ে দিল উড়তে থাকা লম্বা কালো চুল। জোরে নিঃশ্বাস ফেলল। ওর এত তাড়া থাকাটা উচিত না। ডলি আর কিমি কখনও তাড়াহুড়া করে না।
পা থেকে স্যান্ডেল খুলে নিল সে। ঠাণ্ডা বালি ঢুকে যাচ্ছে আঙুলের ফাঁকে। হাঁটতে গেলে লাফ দিয়ে দিয়ে উঠে আসছে পায়ের পাতার ওপরে।
মাথার ওপর ডানা ঝাপটানোর শব্দে মুখ তুলে তাকাল সে। অনেকগুলো বাদুড় একসঙ্গে উড়ে চলেছে পাহাড়ের দিকে।
বালিয়াড়ির পাশ দিয়ে চলার সময় খিলখিল হাসির শব্দে চমকে গেল। ফিরে তাকিয়ে দেখল টিলার আড়াল থেকে বেরিয়ে আসছে কিমি আর ডলি। ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ওপর।
ঘাবড়ে গেল কণিকা। ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল দুজনকে। চিৎকার করে উঠল, এই, কি করছ!
রক্ত খাব, জবাব দিল ডলি।
কি যা তা বলছ! আমি তোমাদের স্বজন!
স্বজনের রক্তই খাব আজ, কিমি বলল।

দুজনে যুক্তি করে এসেছে, বুঝতে পারল কণিকা। তারমানে আমাকে– বিশ্বাস করতে পারছ না?
না, পারছি না, ডলি বলল। তুমি যে আমাদের স্বজন, কি করে বুঝব?
কি করে বুঝতে চাও?
তোমার গলায় দাঁত বসাব। রক্তের স্বাদ থেকেই বুঝে যাব, তুমি আসল না নকল।
তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দুজনকে দেখতে দেখতে কণিকা বলল, কাউন্ট ড্রাকুলা বলেছেন বুঝি?
যদি বলি তাই?
একই কথা তো আমিও তোমাদের বলতে পারি। আমি যদি বলি, আমার সন্দেহ তোমরা নকল। কাউন্ট ড্রাকুলা আমাকে বলেছেন তোমাদের রক্ত খেয়ে দেখার জন্যে। তাহলে কি বলবে?
প্রশ্নের জবাব দিতে পারল না কিমি আর ডলি। পরস্পরের দিকে তাকাতে শুরু করল।
দ্বিধায় ফেলে দিয়েছে ওদের বুঝতে পেরে চাপ দিল কণিকা, কই, দাঁড়িয়ে আছ কেন? এসো, রক্ত টেস্ট করো আমার। তারপর আমি তোমাদের রক্ত টেস্ট করব।
ডলির দিকে তাকিয়ে আচমকা ধমকে উঠল কিমি, তখনই বলেছি, এসব চালাকির দরকার নেই। ও আমাদেরই লোক। জন যখন ঢুকিয়েছে, নকল। হতেই পারে না, কাউন্ট ড্রাকুলা যতই বলুন। নইলে আমাদের যা করতে বললেন, একই কাজ কণিকাকেও করতে বলবেন কেন? কণিকার দিকে তাকাল, থাক, নিজেরা নিজেরা ঝগড়া করে আর লাভ নেই। কোথায় যাচ্ছিলে?
শহরে।
আমরাও যাব।

.

পরদিন সন্ধ্যায় রবিনকে ফোন করল মুসা। সারাদিন ওর খোঁজ পায়নি। আশা করেছিল, আসবে। আসেনি। সে নিজেও যোগাযোগ করতে পারেনি। সারারাত থানায় কাটিয়ে এসে ভোরের দিকে সেই যে শুয়েছিল, উঠেছে। দুপুরের পর। সাগরে গিয়ে সাঁতার কেটেছে অনেকক্ষণ। ফিরে এসে গোসল করে খাওয়াদাওয়া সারতে সারতে বিকেল শেষ। কাপড় পরে বেরোনোর জন্যে রেডি হয়ে এখন রবিনকে ফোন করল।
ফোন ধরল বোর্ডিং হাউসের অ্যাটেনডেন্ট। ওখানেই উঠেছে রবিন। মুসার শত চাপাচাপিতেও ওদের ভাড়া করা কটেজে ওঠেনি। লোক বাড়লে গাদাগাদি হয়ে যাবে, আঙ্কেল আর আন্টির অসুবিধে হবে। বেড়াতে আসা মানুষকে কোনভাবে বিরক্ত করা উচিত না।

রবিন কোথায়? জানতে চাইল মুসা। রবিন মিলফোর্ড?
ঘরে। আপনি কে?
আমি তার বন্ধু। মুসা আমান। ডেকে দেয়া যাবে, প্লীজ?
ধরো। দিচ্ছি।
রিসিভার নামিয়ে রাখার শব্দ শুনতে পেল মুসা। বেশ দেরি করে এসে ফোন ধরল রবিন।
কে, মুসা? অ্যানির খবর শুনেছ?
হ্যাঁ। কেবল শুনিইনি, নিজের চোখে লাশ দেখে এলাম, মুসা বলল। কাল রাতে সৈকতে গিয়েছিল আমার সঙ্গে। বেড়িয়ে-টেড়িয়ে সাড়ে এগারোটা নাগাদ বাড়ি ফিরে যাওয়ার কথা বলে আমার কাছ থেকে চলে গেল। রাত দুপুরে পুলিশ এসে ঘুম থেকে জাগাল আমাকে। বলল বাড়িতে ফিরে যায়নি সে। ওর মা নাকি খোঁজাখুঁজি করছে। আমাকে ওদের সঙ্গে যেতে হবে। সৈকতে লাশ খুঁজে পাওয়ার পর আমাকে থানায় ধরে নিয়ে গেল। তারপর প্রশ্নের পর প্রশ্ন। যেন খুনিটা আমিই।
মানুষের জীবনটা কি অদ্ভুত, তাই না? কাল দেখলাম বেঁচে আছে, হেসেখেলে বেড়াচ্ছে, অভিনয় করছে, আজ নেই। কোনদিন আর মঞ্চে উঠবে না, কথা বলবে না... একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল রবিন।
মুসা চুপ করে আছে। অ্যানির গলার দাগগুলোর কথা বলবে কিনা ভাবছে। রবিন বিশ্বাস করবে না। এতদিন যেমন করেনি, এখনও করবে না।
মুসা, শুনছ?
হ্যাঁ।
চুপ করে আছ কেন?
এমনি। তোমার কথা শুনছি। তোমার গলা এমন লাগছে কেন? শরীর খারাপ নাকি?
হ্যাঁ। খুব টায়ার্ড লাগছে সারাটা দিন ধরে। কেন এ রকম হচ্ছে বুঝতে পারছি না। আর ঘুম! বিছানা থেকেই উঠতে ইচ্ছে করছে না। মনে হচ্ছে সাতদিন ঘুমাইনি।
অসুখটা কি?
সেটাই তো বুঝতে পারছি না। শরীরটা যেন একেবারে ভেঙেচুরে গেছে। আর দুর্বল কাকে বলে। আঙুল নড়াতেও ইচ্ছে করে না।
শঙ্কিত হয়ে উঠল মুসা। খারাপ ভাবনাগুলো মনে আসতে দিল না। অনিশ্চিত ভঙ্গিতে বলল, জুরটর আসবে হয়তো। রিহারস্যালে যাবে?
চেষ্টা করব। কণিকাকে কথা দিয়েছি ওর সঙ্গে কার্নিভল দেখতে যাব।
বন্ধুত্বটা তাহলে ভালমতই হয়ে গেছে, হাসল মুসা।

কি জানি! মেয়েটা যেন কেমন। এখনই ভাল, এখনই কেমন হয়ে যাচ্ছে। অস্বাভাবিক। খুব অবাক লেগেছে আমার।
এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে মুসা বলল, ঠিক আছে, রাখি। থিয়েটারে দেখা হবে।
রিসিভার রেখে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল সে। রবিনের ক্লান্তির কথা শুনে ভাল লাগছে না। ভ্যাম্পায়ারের খপ্পরে পড়ার পর রিকির ক্লান্ত লাগত, জিনারও লাগত। ক্লান্তি, ঘুম, বিছানা থেকে উঠতে ইচ্ছে না করা, ফ্যাকাসে চেহারা, ঘোর লাগা ভাবভঙ্গি এ সব ভ্যাম্পায়ারে রক্ত খেয়ে যাওয়ার লক্ষণ। রিকি তো মরেই গেল। জিনা বেঁচেছে কপালগুণে। তবে ওই সময়কার কথা। কিছু মনে করতে পারে না। জিনা কিছু বলতে পারেনি বলেই কিশোর আর রবিনকে ভ্যাম্পায়ারের কথা বিশ্বাস করাতে পারেনি সে। ভূতের কথা হেসে উড়িয়ে দিয়েছে কিশোর। অবিশ্বাসীর দৃষ্টিতে তাকিয়েছে রবিন। তবে এইবার ওদের ভুল ভাঙানোর সময় এসেছে। যা মনে হচ্ছে, রবিন নিজেই পড়েছে। ভ্যাম্পায়ারের কবলে।
রবিনকে সাবধান করে লাভ হবে না। ও কথা শুনবে না। সাবধান। থাকতে হবে মুসার নিজেকে। রবিনের ওপর চোখ রাখতে হবে। যাতে রক্ত খেয়ে খেয়ে ওকেও মেরে ফেলতে না পারে ভ্যাম্পায়ার।
ইস, রিকির ব্যাপারটাও যদি আগেভাগে বুঝতে পারত! তাহলে এভাবে অপঘাতে মরতে হত না বেচারাকে। অ্যানি যে এভাবে ভ্যাম্পায়ারের কবলে পড়বে, সেটাও আন্দাজ করতে পারেনি মুসা। ওকেই ভ্যাম্পায়ার ভেবে বসে ছিল।
সামনের টেবিলটায় এক কিল মারল সে। দাতে দাঁত চেপে চিৎকার করে বলল, রবিনকে আমি কোনমতেই মরতে দেব না! রিকিকে নিয়েছ, অ্যানিকে নিয়েছ, আর কাউকে পাবে না। আমার কোন বন্ধুকেই আর নিতে দেব না তোমাদের।
অস্থির ভঙ্গিতে ঘরের মধ্যে পায়চারি শুরু করল সে। রবিনের গলায় দাঁতের দাগ আছে কিনা দেখে শিওর হয়ে নিতে হবে।
কাজটা কার? কণিকার?
মেয়েটার চেহারা কল্পনা করল মুসা। আকর্ষণীয় চেহারা। লম্বা কালো চুল। মায়াময় দুটো চোখ।
কণিকার ওপর নজর রাখতে হবে, ভাবল মুসা। যত সুন্দর চেহারাই হোক, ভ্যাম্পায়ার হলে কোনমতেই বাঁচতে পারবে না আমার হাত থেকে।
টেবিলে পেপারওয়েট চাপা দেয়া কাগজটা একটানে তুলে নিল সে। নাটকের সংলাপ লিখে নিয়েছে ওতে। গটমট করে এগোল দরজার দিকে। ওপাশে গিয়ে দড়াম করে পাল্লা লাগাল। টনিদের বাড়ি হয়ে যাবে ঠিক করল। ওকে পেলে একসঙ্গে যাবে থিয়েটারে।

অন্ধকার রাত। চাঁদ তো বটেই, তারাও সব মেঘে ঢেকে দিয়েছে। কটেজগুলোর ফাঁকে ফাঁকে ছায়াগুলোকে মনে হচ্ছে যেন ঘাপটি মেরে থাকা ভূত।
শিউরে উঠল মুসা। গা ছমছম করতে লাগল। এটা ভ্যাম্পায়ারের রাত! এমন চমৎকার রাতে রক্ত খেতে বেরোবেই ওরা।
নিরাপদে টনিদের বাড়িতে পৌঁছে হাঁপ ছেড়ে বাচল সে। বাড়িটা নতুন। ইটের দোতলা বাড়ি। যেন ভুল করে গজিয়ে উঠেছে স্যান্ডি হোলোতে। এখানকার সব বাড়ি হয় কাঠের, নয়তো পাথরের। বেশির ভাগই পুরানো। সৈকতের ধারে ওগুলোর পাশে বাড়িটা তাই একেবারে বেমানান।
বাড়ির সামনে ছোট্ট একটা পার্কও আছে। গাছপালা আছে। দুটো দোলনা আর কয়েকজনে একসঙ্গে বসার ব্যবস্থা আছে।
এত অন্ধকার, কোনদিকে যাচ্ছে সে, ঠাহর করা কঠিন।
খুট করে শব্দ হলো।
দাঁড়িয়ে গেল মুসা। কান পেতে রইল। আর কোন শব্দ নেই। কিন্তু। শুনেছে যে তাতে কোন সন্দেহ নেই। লুকিয়ে আছে নাকি কেউ? মানুষ না
সব কিছুতে সবখানেই এখন ভ্যাম্পায়ার দেখছে সে। কারণ মন জুড়ে আছে রক্তচোষা ভূতের চিন্তা।
নিঃশব্দে বাড়িটার দিকে কয়েক পা এগোল। তারপর দাঁড়িয়ে গেল। অস্বস্তিকর একটা অনুভূতি। মনে হচ্ছে আড়াল থেকে কেউ নজর রাখছে তার ওপর।
লীলা আর জনের দোসররা কি জেনে গেছে ওর কথা? বুঝেছে ওকে ঠেকাতে না পারলে সবাইকে ধ্বংস করে দেবে সে? তাই আগেভাগেই ওকে খতম করে দিয়ে নিজেদের নিরাপদ ভাবতে চায়?
শব্দটা আবার কানে আসতে চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল মুসা। গাছপালার মধ্যে কোন কিছু থেকে থাকলেও চোখে পড়ল না। শুধুই অন্ধকার।
নাহ, কিছু না। কিছু শুনিনি। সব কল্পনা। মনকে বোঝানোর চেষ্টা করল সে।
বাড়ির আশেপাশে গভীর ছায়া। যেখানে সবচেয়ে বেশি অন্ধকার, সেই জায়গাটুকু পার হয়ে টনিদের সদর দরজার কাছে যেতে হবে।
এগোতেই আবার কানে এল ঘষার শব্দ। টেনে টেনে এগোনো পায়ের শব্দের মত। মাত্র কয়েক ফুট দূরে।
ও কিছু না! ফিসফিস করে বলে নিজেকে অভয় দিতে চাইল সে। আবার পা বাড়াল দরজার দিকে।
আবার শব্দ।
ঘষার!

নখ ঘষছে নাকি! বাদুড়ের ডানাতেও ধারাল, বাঁকা নখ থাকে। ভ্যাম্পায়ার বাদুড়ের রূপ নিতে পারে।
চলমান ছায়াটা চোখে পড়ল হঠাৎই। কিছু করার আগেই ওর গায়ের ওপর এসে পড়ল ওটা।
আতঙ্কে গলা চিরে চিৎকার বেরিয়ে এল ওর।
হি-হি হাসি শোনা গেল অন্ধকারে। হাততালি দিয়ে সুর করে বলতে লাগল সিসি, পেয়েছে। পেয়েছে! ভয় পেয়েছে।
চেপে রাখা দমটা ধীরে ধীরে ছাড়ল মূসা। হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকানি জীবনে কমবে কিনা ভেবে অবাক হলো। বিড়বিড় করে বলল, কে বলল ভয়। পেয়েছি? আমি জানতাম, তুমিই!
মোটেও জানতে না। তুমি ভেবেছিলে ভ্যাম্পায়ার।
অন্ধকারে অস্পষ্ট ছায়ার মত লাগছে সিসির চেহারা। হাসিতে ওর দাঁত যে সব বেরিয়ে পড়েছে, না দেখেও অনুমান করতে পারছে মুসা।
মানুষকে এভাবে ভয় দেখানো ঠিক না, গলার কাঁপুনি এখনও বন্ধ হয়নি। মুসার।
কেন?
কারণ ব্যাপারটা মজার নয় মোটেও, বলে আবার দরজার দিকে রওনা দিল মুসা।
আমার কিন্তু বেশ মজা লাগে। এমন চমকে যায় সবাই, উ, যা মজা। লাগে না তখন!
জবাব না দিয়ে বেল বাজাল মুসা।
কয়েক সেকেন্ড পর দরজা খুলে দিল টনি।
ইস্, তোমার বোনটা না একটা পাজির পা ঝাড়া! অভিযোগ করল মুসা।

.

নীরবে থিয়েটার হাউসের দিকে এগিয়ে চলেছে দুজনে। মুসা আর টনি।
অ্যানির কথা ভাবছে মুসা। দুঃখ হচ্ছে ওর জন্যে। কাল সবার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল সে, আজ আর থাকবে না। কত সহজেই না একজন জলজ্যান্ত মানুষ হারিয়ে যায় চিরকালের জন্যে!
রবিনের জন্যেও দুশ্চিন্তা হতে লাগল।
স্যান্ডি হোলোর দক্ষিণ ধারে সামান্য উঁচু একটা ঘাসে ঢাকা জমিতে দাঁড়িয়ে আছে থিয়েটার হাউসটা। আয়তাকার কাঠের বাড়ি। দেয়ালে সাদা রঙ। জানালাগুলো সবুজ।
মুসা আর টনি একসঙ্গে হলে ঢুকল। অনেকেই এসেছে। সবার মধ্যে চাপা উত্তেজনা। মঞ্চের কাছে জড় হয়েছে। অ্যানির কথাই আলোচনা করছে সবাই।

সবার মুখের দিকে তাকাতে লাগল মুসা। ওদের মধ্যে কোনজন ভ্যাম্পায়ার? কণিকাকে খুঁজল তার চোখ। কোথাও দেখতে পেল না ওকে।
ওই যে কিমি, উনি বলল। আমি যাই। পরে কথা বলব তোমার সঙ্গে।
মঞ্চ থেকে নামার সিঁড়ির কাছে কয়েকটা মেয়ের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে। কিমি। টনিকে ওর দিকে আসতে দেখে হাসল।
অন্য দিকে ভিড়ের মধ্যে রবিনকে খুঁজল মুসা। দেখতে না পেয়ে থিয়েটার। হাউসের আরেক দিকে রওনা হলো।
স্যান্ডি হোলোরই কেউ খুন করেছে অ্যানিকে, পাশ কাটানোর সময় বাদামী-চুল একটা মেয়ের মন্তব্য কানে এল মুসার। এমন কেউ, যাকে আমরা চিনি।
অ্যাই, মুসা, মুখ তিলে ভরা একটা ছেলে ডেকে বলল, নাটকটা আর হবে কিনা, কিছু শুনেছ?
মাথা নাড়ল মুসা। ছেলেটার মুখের দিকে তাকাল। এমন ফ্যাকাসে চামড়া কেবল ভ্যাম্পায়ারেরই হতে পারে। দিনের বেলা বেরোতে পারে না, রোদে যেতে পারে না, অন্ধকার ঘরে কফিনের মধ্যে শুয়ে থাকতে হয়–তাই এ অবস্থা। একে মনে রাখতে হবে, ভাবল সে।
থিয়েটারের দরজা খুলে গেল। ফিরে তাকাল মুসা। ক্লান্ত ভঙ্গিতে ঢুকছে রবিন।
চমকে গেল মুসা। রীতিমত করুণ রবিনের অবস্থা। বিধ্বস্ত চেহারা।
ঘুমের ঘোরে হাটছে যেন রবিন। মেঝের দিকে চোখ রেখে পা টেনে টেনে এগোচ্ছে মঞ্চের দিকে।
ভিড় ঠেলে ওর দিকে এগোল মুসা। কিন্তু সে রবিনের কাছে পৌঁছার আগেই ছায়া থেকে বেরিয়ে এল কণিকা। পৌঁছে গেল রবিনের কাছে। হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল ওকে সীটের দিকে। কথা বলতে বলতে হাসছে।
কণিকার দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মুসা। রবিনের অসুস্থতার জন্যে সে-ই দায়ী কিনা বোঝার চেষ্টা করছে। রবিনের গলায় দাঁতের দাগ আছে নাকি আগে দেখতে হবে। তারপর অন্য কথা।
পাশ থেকে কে যেন হাত চেপে ধরল, হাই, মুসা।
ডলি। পরনে ডেনিম কাটঅফ আর একটা নীল হলটার টপ। লম্বা চুলগুলোকে পেছনে কষে বেঁধেছে, ঘোড়ার লেজের মত ঝুলছে ঘাড়ের ওপর। হাঁ করে তাকিয়ে রইল মুসা। সুন্দর লাগছে ডলিকে। তবে কোনখানে যেন একটা খুত আছে। চোখে নাকি? মনে হলো। শীতল চাহনি। কেমন লোভাতুর।
খবর শুনেছ? জিজ্ঞেস করল ডলি।
নীরবে মাথা ঝাঁকাল মুসা।

সাংঘাতিক কাণ্ড। কালকের এতবড় ঘটনার পরেও সবাই রিহারস্যালে এল, অবাকই লাগছে আমার। আমি তো ভাবলাম ভয়ে আজ রাতে বাড়ি থেকেই বেরোবে না কেউ।
তুমিও তো বেরিয়েছ।
খিলখিল করে হাসল ডলি, কোন কিছুতে ভয় পাই না আমি।
ওরাও হয়তো পায় না।
মঞ্চে উঠলেন মিসেস রথরক। মাঝখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে হাত তুললেন চুপ করার জন্যে। অ্যাটেনশন, প্লীজ! এই, আমার কথা শোনো তোমরা।
কথা বন্ধ করে দিল সকলে।
মিসেস রথরক ঘোষণা করলেন, নাটক চলবে। সেটাকে উৎসর্গ করা হবে অ্যানির নামে। তারপর জানালেন, অ্যানির জায়গায় এখন ডলি অভিনয় করবে।
শুনেই উজ্জল হলো ডলির মুখ। মুসার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, এবার তোমার সঙ্গে অভিনয়ের সুযোগ পাব আমি।
জবাব দিল না মুসা। হিংসুক মেয়েটার ওপর বিরূপ হয়ে গেল মন। মিসেস রথরকের দিকে নজর ছিল বলে এতক্ষণ খেয়াল ছিল না। এখন ফিরে তাকিয়ে দেখল রবিন আর কণিকা নেই সীটে। অদ্ভুত ব্যাপার! রিহারস্যাল শুরুর আগেই কেটে পড়ল! কণিকা কি ওকে রক্ত খাওয়ার জন্যে ধরে নিয়ে গেল নাকি?
তাহলে শুরু করা যাক, মিসেস রথরক বলছেন। প্রথম পর্ব।
মুসার হাত ধরে টানল ডলি, আমাদের দিয়েই শুরু।
মনে রবিনের জন্যে একরাশ দুশ্চিন্তা নিয়ে ডলির পেছন পেছন মঞ্চের দিকে এগোল মুসা। মঞ্চে উঠল। কোথায় কোন ভঙ্গিতে দাঁড়াতে হবে দেখিয়ে দিলেন মিসেস রথরক। তারপর বললেন, রেডি। স্টার্ট।
মঞ্চের ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগল মুসা। নজর পেছনে ব্যাকড্রপের আঁকা বিল্ডিঙের দিকে। বিড়বিড় করে বলল, টোয়েন্টি সেভেন ব্র্যাকার স্ট্রীট।... কোথায় ওটা?..পাচ্ছি না কেন?...খুঁজে বের করতে না। পারলে পিঠের চামড়া রাখবেন না আমার মিস্টার কর্কলি।
ওর হাতে একটা ছোট বাক্স। মুদি দোকানের কর্মচারি সেজেছে। ডেলিভারি বয়ের বেশে খদ্দেরের বাড়িতে মাল সরবরাহ করতে এসেছে। ঠিকানা খুঁজে পাচ্ছে না।
ছায়া থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল ডলি। কানের কাছে বলে উঠল, কি খুঁজছ?
এমন চমকে গেল মুসা, আরেকটু হলে হাত থেকে ছেড়ে দিচ্ছিল বাক্সটা।
পথ হারিয়েছ বুঝি? ডলির ঠোঁটে শয়তানির হাসি।
আঁ... ইয়ে..ইয়ে... কথা সরছে না মুসার মুখ থেকে।
ইয়ে ইয়ে করছ কেন? হারিয়ে গেছ নাকি, সেটাও বলতে পারছ না?

আ-আমি ব্র্যাকার স্ট্রীটের সাতাশ নম্বর বাড়িটা খুঁজছি। তুমি চেনো?
চিনব না কেন? এসো, হাঁটতে শুরু করল ডলি।
পেছন পেছন চলল মুসা। বুক কাঁপছে। এত ভয় পাচ্ছি কেন? মনে মনে নিজেকে ধমক লাগাল সে। এটা তো আর আসল নয়। নাটক।
তবে আসল বিপদও আছে স্যান্ডি হোললাতে। পথ হারানো মানুষের কাছে এভাবেই আচমকা এসে উদয় হয় ভ্যাম্পায়ার। সেটা ভেবে নিজেকে ভয় পাওয়ানোর চেষ্টা করল। মনে হলো তার, তাতে অভিনয়টা জমবে ভাল।
হঠাৎ মুসাকে চেপে ধরল ডলি।
হাত থেকে বাক্স ফেলে দিল মুসা। ধাক্কা দিয়ে ডলিকে সরানোর চেষ্টা করল।
আসুরিক শক্তিতে তাকে জাপটে ধরল ডলি। ফাঁক হয়ে গেল ঠোঁট। দুদিকের কোণা সরে গিয়ে বেরিয়ে এল মারাত্মক শ্বদন্ত। মঞ্চের আলোয় ঝকঝক করে জ্বলছে দাঁত দুটো। মুসার গলায় দাঁত বসিয়ে দিতে গেল।
ভূ-ভূ-ভূত! বলে চিৎকার করে উঠল মুসা। কিছুতেই ডলির বাহুমুক্ত হতে না পেরে চেঁচাতে শুরু করল, বাবাগো! খেয়ে ফেলল! বাঁচাও! বাঁচাও!
ডলির আলিঙ্গন থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে ছটফট করতে লাগল।
আরে করছ কি? আবার চিৎকার করে উঠল মুসা। চিৎকারটা আগের চেয়ে বাস্তব মনে হলো। অভিনয় নয়। এত জোরে দাঁত ফোঁটাচ্ছ কেন? কেটে যাবে তো!
হাসি শোনা গেল দর্শকদের।
কিন্তু কানেই তুলল না ডলি। দাঁতের চাপ কমাল না সামান্যতম। বরং বাড়াতে শুরু করল।

.

আরে! করছ কি! ছাড়ো! ছাড়ো! চিৎকার করতে লাগল মুসা। যখন কোনমতেই ছাড়ল না ডলি, এক ধাক্কায় ওকে সরিয়ে দিল।
হাসি বাড়ল দর্শকদের।
পিছিয়ে গেল ডলি। প্লাস্টিকের দাঁত দুটো খুলে নিল।
গলায় হাত বোলাতে লাগল মুসা। রক্ত বেরোয়নি। তবে দাঁতের চাপ আরেকটু জোরে লাগলে যেত ফুটো হয়ে। বাপরে বাপ! আসল দাঁতের চেয়ে কম শক্ত নয় ওই প্লাস্টিকের দাঁত।
সরি, ডলি বলল, অভিনয়ে এতটাই মনোযোগ দিয়ে ফেলেছিলাম, তুমি যে ব্যথা পাবে সেটাও মনে ছিল না।
আহত জায়গা ডলতে লাগল মুসা। ডলির সরি বলাও তার গোমড়া মুখে হাসি ফোঁটাতে পারল না। ভোতা স্বরে বলল, তবে স্বীকার করতেই হবে তুমি ভাল অভিনেত্রী।

উজ্জল হলো ডলির চোখ। থ্যাংকস।
ভেরি গুড। চমৎকার অভিনয় করেছ, মিসেস রথরক বললেন। পরের দৃশ্য। রবিন, এসো।
দুর্বল ভঙ্গিতে মঞ্চের দিকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল রবিনকে। অন্য মানুষ লাগছে আজ ওকে। সেই প্রাণচঞ্চল রবিন নয়।
সংলাপও বলতে পারল না ঠিকমত। নীরস কণ্ঠ। তাতে প্রাণ নেই। যা করল সেটাকে আর যাই বলা যাক, অভিনয় বলা যাবে না।
বাতিল করে ফেলেছে ওকে! আনমনে বিড়বিড় করল মুসা।
শুনে ফেলল ডলি। কণিকার সঙ্গে বেরিয়েছিল না একটু আগে?
অ্যাঁ!...হা! কি মনে হতে ঝট করে তাকাল ডলির দিকে। কণিকার সঙ্গে বেরোনোয় কি হয়েছে?
না, কিছু না, অন্য দিকে চোখ ফেরাল ডলি।
ওর আচরণ রহস্যময় মনে হলো মুসার কাছে। ডলি কিছু জানে মনে হচ্ছে। ভ্যাম্পায়ারের ব্যাপারটা সে-ও সন্দেহ করেছে নাকি!
রিহারস্যালের পর মুসা আর ডলির সঙ্গে টনি আর কিমিও এগোল দরজার দিকে।
বাড়ি যাবে এখন? মুসাকে জিজ্ঞেস করল টনি।
এই সময় রবিন আর কণিকাকে আসতে দেখে মুসা বলল, না, এত সকাল সকাল যাব না। কণিকার ওপর নজর রাখতে চায় সে। চলো, প্রিন্সেসে যাই। খিদে পেয়েছে।
রবিনের দিকে তাকাল ডলি, তোমাকে দেখে তো মনে হচ্ছে কয়েক বছর ধরে ঘুমাওনি।
উল্টোটা বললে, রকিন বলল। সারা দিনই ঘুমাই এখন। জেগে উঠে দেখি, ঘুমানোর আগে যেমন ছিলাম, তার চেয়ে দুর্বল লাগছে।
তাকিয়ে আছে মুসা। রিকি আর জিনার সঙ্গে রবিনের অসুস্থতার মোলো আনা মিল। গলায় দাগ আছে কিনা দেখার চেষ্টা করল। নেই।
দ্বিধায় পড়ে গেল সে। রবিন কি আসলেই কোন রোগের শিকার? ভ্যাম্পায়ারের নয়?
পোলা শার্ট পরেছে রবিন। উঁচু কলার। গলার নিচের দিকটা দেখা যায় না। ওখানে দাগ থাকতে পারে। পুরো গলা না দেখে নিশ্চিত হওয়া যাবে না।
রবিনের হাত ধরে টানল কণিকা, চলো, বেরোই।
কোথায় যাব?
প্রিন্সেসে। মুসা বলল না?

হাই তুলতে তুলতে জবাব দিল রবিন, আমার ঘুম পাচ্ছে। আমি বাড়ি যাব।
হতাশ মনে হলো কণিকাকে। এক ঘণ্টার জন্যেও পারবে না?
ক্লান্ত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল রবিন। মুসার দিকে তাকাল, মুসা, আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে পারবে? একা যেতে ভরসা পাচ্ছি না।
চলো।
কিন্তু মুসা.. বলতে গেল ডলি।
বাধা দিল মুসা, না, ডলি, আজ আর তোমার সঙ্গে যেতে পারলাম না। কাল দেখা যাবে। রবিনকে দিয়ে আসা দরকার। ও অসুস্থ
এই না বললে প্রিন্সেসে যাবে?
বলেছি। রবিন বাড়ি যেতে চাইবে, জানতাম না। তোমরাও চলে যেতে পারো। আজ আর প্রিন্সেসে যাওয়া হবে না।
সে তো দেখতেই পাচ্ছি, কণিকার মতই হতাশ মনে হলো ডলিকেও।
মুসার দেখাদেখি টনিও যদি মত পাল্টায়, এই ভয়ে তাড়াতাড়ি ওর হাত ধরে টান দিল কিমি, চলো, ওরা না গেলে নাই। আমরাই যাই।
মাথা ঝাঁকিয়ে, মুসা আর রবিনকে পরে দেখা হবে বলে কিমির হাত ধরে বেরিয়ে গেল টনি।
একা যেতে যেন ভাল লাগছে না কণিকার। এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। পাশ থেকে বলে উঠল একটা কণ্ঠ, কি ব্যাপার, একা নাকি?
ফিরে তাকাল সবাই। মুসা দেখল, সেই তিল-পড়া ছেলেটা।
কণিকার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল ছেলেটা। হেসে বলল, আমি ইমি। কার্নিভলে যেতে ইচ্ছে করছে। একা একা যেতে ভাল লাগছে না। একজন সঙ্গী পেলে যেতাম। ভয় নেই, খেলাধুলার খরচা সব আমিই দেব।
কি ভেবে রাজি হয়ে গেল কণিকা। রবিনের দিকে তাকিয়ে বলল, ঠিক আছে, তুমি বাড়ি যাও। আমি এর সঙ্গে চলে যাচ্ছি।
হা-না কিছু বলল না রবিন। বলার শক্তিও যেন নেই।
ইমির সঙ্গে বেরিয়ে গেল কণিকা।
রবিনের দিকে তাকাল মুসা, এসো।
সারাটা পথ ক্লান্ত ভঙ্গিতে হেঁটে এল রবিন। উঁচু-নিচু জায়গাগুলোতে তাকে ধরে ধরে পার করল মুসা।
বোর্ডিং হাউসের গেটের কাছে এসে রবিন বলল, থাক, আর আসতে হবে না। যাও এখন। কাল দেখা হবে। থ্যাংক ইউ।
সামান্য উসখুস করে মুসা বলল, রবিন?
ঘুরে দাঁড়াল রবিন, কি?

রবিন, সাবধানে থেকো।
হাসল রবিন। বাড়ির বারান্দা থেকে এসে পড়া আলোয় মলিন দেখাল। হাসিটা।
দেখো, রোগ হওয়াটা কারও হাতে নয়। সাবধানেই তো থাকি…
আমি সেকথা বলছি না…
তাহলে? …ও, ভ্যাম্পায়ার। তোমার মাথা থেকে এখনও গেল না সেটা। কই, হপ্তা তো পেরিয়ে গেল এখানে এসেছি। ভ্যাম্পায়ারের ছায়াও তো চোখে পড়ল না।
কিন্তু আমি দেখে ফেলেছি…।
পরে কথা বলব। আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না…
ঠিক আছে, যাও। পরেই কথা বলব। তুলে দিয়ে আসব বারান্দায়?
না, লাগবে না।
*
বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করল না মুসার। সঙ্গী হিসেবে কাউকে পাওয়া যাবে না। এখন আর। ডলিও চলে গেছে। একা একাই সৈকতে রওনা হলো সে।
চলে এল ডক হাউসের কাছে। দ্বীপটার দিকে তাকিয়ে গা ছমছম করে উঠল। ফিরে তাকাল পেছনের কালো পাহাড়ের দিকে।
বাদুড় উড়ে যাচ্ছে মাথার ওপর দিয়ে। দ্বীপ থেকে আসছে। যাবে ওই পাহাড়টায়। খেয়েদেয়ে পেট ভরিয়ে অন্ধকার থাকতে থাকতেই আবার দ্বীপে ফিরে যাবে।
একা একা থাকতে ভাল লাগল না বেশিক্ষণ। ফিরে চলল। এতক্ষণ কৃষ্ণপক্ষের হলুদ চাঁদ ছিল আকাশে। এখন সেটাও মেঘে ঢাকা পড়েছে। সাগর থেকে এসে ঝাঁপটা দিয়ে গেল একঝলক ঠাণ্ডা বাতাস। গায়ে কাঁটা দিল।
অন্ধকার। চাঁদ-মেঘের খেলা। ভ্যাম্পায়ার আসার উপযুক্ত সময়।
সাবধানে এগিয়ে চলল মুসা।
ভয় লাগছে তার। দোয়া-দরূদ পড়তে পড়তে এগোল।
হাঁটতে হাঁটতে বালিয়াড়িটার কাছে চলে এল। কিছু ঘটল না।
মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল চাঁদ। ভূতুড়ে ঘোলাটে আলো ছড়িয়ে ৩ দিল আবার।
বালিয়াড়ির কাছ দিয়ে চলার সময় কালো কি যেন পড়ে থাকতে দেখল সে।
আবার কালো জিনিস! ধড়াস করে উঠল বুক। মানুষ না তো!
পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল ওটার দিকে।
মানুষই! পড়ে থাকার ভঙ্গিটা ভাল না। আরও কাছে এসে দেখল উপুড় হয়ে পড়ে আছে।
বুকের মধ্যে দুরুদুরু করছে ওর। পকেটে হাত দিল। এখনও আছে। রিকির বুটেন লাইটারটা। দ্বীপে গিয়ে জিনাকে আনার সময় একবার কাজে লেগেছে ওটা।

তারপর থেকে আর কাছছাড়াই করে না।
আলো জ্বেলে পড়ে থাকা মানুষটার মুখ দেখে চমকে গেল সে।
ইমি!
একবার নাড়ি টিপেই বুঝে গেল, বেঁচে নেই।
বালিতে মাখামাখি মুখ। গলায় ঝাক বেঁধে রয়েছে মাছি। নিশাচর মাছিও আছে তারমানে। রক্ত খায় নাকি! হাত দিয়ে প্রায় ডলে সরাল সেগুলোকে।
গলার চামড়ায় স্পষ্ট দেখা গেল ফুটো দুটো। এক ফোঁটা করে রক্ত লেগে রয়েছে সেগুলোর ওপর। মুখের চামড়া ময়দার মত সাদা।
শুষে ছিবড়ে বানিয়ে ফেলা হয়েছে ওকে। এক ফোঁটা রক্ত থাকতে। ছাড়েনি। একেবারে রিকির মত।
কে করল কাজটা? বেরিয়েছিল তো কণিকার সঙ্গে।
সন্দেহটা সরাসরি কণিকার ওপরই পড়ে। তবে সে না-ও হতে পারে। মাত্র আগের দিন একইভাবে অ্যানি খুন হয়েছে এখানে। সে তো আর কারও সঙ্গে বেরোয়নি। তারমানে খুন করার পদ্ধতি বদল করেছে ভ্যাম্পায়ার। রাতে এসে ওত পেতে থাকে শিকারের আশায়। কাউকে একা পেলেই...
ঝট করে মাথা তুলে চারপাশে তাকাতে শুরু করল মুসা। নির্জন সৈকতে কোন মানুষের সাড়াশব্দ নেই। সে একা! তার রক্ত খাওয়ার জন্যেও আসবে না তো ভ্যাম্পায়ার!
একটা মুহূর্তও আর থাকতে সাহস করল না। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। ছুটতে শুরু করল লোকালয়ের দিকে।

.

পরদিন রাতে। পিজ্জা কোভে দুটো টেবিলে বসেছে টনি, রবিন, কিমি, ডলি, কণিকা আর মুসা। আলোচনা হচ্ছে ইমির মৃত্যুরহস্য নিয়ে।
মেইন স্ট্রীটের একটা পে ফোন থেকে থানায় ফোন করলাম, মুসা বলছে। মাথাটা তখন পুরো খারাপ আমার। ভয়ে, উত্তেজনায় থরথর করে। কাঁপছে হাত-পা। কথাও বলতে পারছিলাম না ঠিকমত।
যাই হোক, পুলিশ এল। নিয়ে গেলাম লাশের কাছে। ওদের কাজ শেষ হওয়ার পর আবার আমাকে নিয়ে গেল থানায়। চলল একটানা জিজ্ঞাসাবাদ। ডিটেকটিভ অফিসার ওকারিশের সন্দেহ আরও বেড়েছে আমার ওপর। বাড়বেই। দু দুটো খুন হলো। একজনের সঙ্গে শেষ দেখা গেছে আমাকে। তা ছাড়া দুজনের লাশই খুঁজে পেলাম আমি। ওকারিশের বোধহয় সন্দেহ, খুন করে রেখে এসে খুঁজে বের করার অভিনয় করেছি।
কথা শেষ করে সবার মুখের দিকে তাকাতে লাগল মুসা।

কোন ভাবান্তর নেই ডলির।
রবিনকে আগের দিনের চেয়ে ক্লান্ত লাগছে। কণিকার পাশে বসে আছে চুপচাপ। চোখ লাল। মাথা সোজা রাখতেও কষ্ট হচ্ছে।
বার বার ওর গলার দিকে তাকাচ্ছে মুসা। পোলো শার্টের কলারের জন্যে আজও দেখা যাচ্ছে না দাঁতের দাগ।
কণিকার দিকে তাকাল সে। একটা পেপার ন্যাপকিন ছিঁড়ে কুটি কুটি করে এক জায়গায় জমাচ্ছে কণিকা। হাত কাঁপছে ওর। ভয়ে নাকি?
ভয় না কচু! মনে মনে রেগে গেল মুসা। অভিনয় করছে। দেখাচ্ছে আমাদের যে ওর কোন দোষ নেই।
মৃত্যুর আগে অ্যানির হয়েছিল তোমার সঙ্গে শেষ দেখা, বিষণ্ন কণ্ঠে বলল কণিকা, আর ইমির হলো আমার সঙ্গে। বিশ্বাসই করতে পারছি না।
এক টুকরো পিজ্জা বাড়িয়ে দিল রবিন। নাও।
আমি এখন কিচ্ছু মুখে দিতে পারব না, জোরে জোরে মাথা নাড়ল কণিকা। মনটা ভীষণ খারাপ।
ওর দিকে তাকিয়ে রইল মুসা। জানে, ভ্যাম্পায়াররা রক্ত ছাড়া কিছু খেতে পারে না। কণিকার চামড়া মোমের মত সাদা। যেন রক্তশূন্যতায়। ভুগছে। দিনের বেলা না বেরোতে পারলে, চামড়ায় রোদ না লাগলে এ রকম মড়ার মত সাদা হয়ে যায় মানুষের চামড়া।
দীর্ঘশ্বাস ফেলল টনি। এখানে এসেছিলাম ছুটি কাটাতে। ভেবেছিলাম চমৎকার কাটবে দিনগুলো। কিন্তু কারোর মনেই আর আনন্দ নেই। সৈকতে টহল দিচ্ছে পুলিশ। লোকে আতঙ্কিত। সবার মুখে কেবল খুনের আলোচনা। ভ্যাম্পায়ারকে দোষ দিচ্ছে অনেকে।
ওফ, চোখ মুখ কুঁচকে ফেলল কিমি, এক কথা শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেল! ভ্যাম্পায়ার বলে কোন কিছু থাকলে তো খুন করবে।
হায়রে কপাল, এখনকার দিনেও এই কুসংস্কার, আড়চোখে মুসার দিকে তাকাল ডলি। ভূত বলে কিছু নেই, সবাই জানে। তা-ও ভূতকে দোষ দেয়। বেকুব ছাড়া আর কি বলব ওদের।
বেকুব বলো আর যাই বলো, আমি ভূত বিশ্বাস করি, জোর গলায় বলল মুসা। সেটাকে আমি কুসংস্কারও বলব না। ভূত আছে এটা যেমন প্রমাণ। করতে পারেনি কেউ, নেই এটাও পারেনি। তবে, আছে, এটা আমি প্রমাণ করেই ছাড়ব এবার।
কণিকা তাকাল ওর দিকে। ভাবলেশহীন শূন্য দৃষ্টি। যেন মুসার কথায়। কোন আগ্রহ নেই ওর। বিরাট অভিনেত্রী। ভাবল মুসা। ডলিকে না দিয়ে নাটকের প্রধান

চরিত্রটা ওকে করতে দেয়া উচিত ছিল।
সত্যি ভূত বিশ্বাস করো তুমি? কিমি জিজ্ঞেস করল।
করে, মুসার হয়ে জবাবটা দিল রবিন। ভূতের কথা শুনলেই চোখ উল্টে দেয়। অথচ ক্ষ্যাপা মোষের সামনে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দাও, ভয় পাবে না। এ এক আজব চরিত্র, আমাদের মুসা আমান।
দুনিয়াটা, সত্যি, আজব মানুষে বোঝাই।
চুপ করে রইল মুসা। মনস্থির করে নিয়েছে কারও ব্যঙ্গ, কারও হাসাহাসিতে কান দেবে না। তর্কও করবে না। যে যা বলে বলুক। তার কাজ সে করে যাবে।
উঠে দাঁড়াল কিমি। টনির হাত ধরে ওকে টেনে তুলল চেয়ার থেকে। চলো। আমাকে কার্নিভলে নিয়ে যাবে বলেছিলে।
সেটা কাল বলেছি। মনমেজাজ আজ ঠিক নেই।
চলো। গেলেই মেজাজ ঠিক হয়ে যাবে। এখানে বসে এসব ফালতু আলোচনা করতে থাকলে বরং বিগড়াবে আরও।
তোমরা কেউ যাবে? সবার মুখের দিকে তাকাতে লাগল টনি।
কেউ যেতে চাইল না। টনিকে নিয়ে কিমি বেরিয়ে গেলে কণিকার দিকে ফিরল মুসা।
রবিনের সঙ্গে কথা বলছে কণিকা। কালো চুল। কালো চোখ। ফর্সা গাল। সুন্দর চেহারা। ওকে ভ্যাম্পায়ার ভাবতে কষ্ট হলো।
কিন্তু লীলাও সুন্দর ছিল।
তাই বলে কি ভ্যাম্পায়ার ছিল না?
আবার এক টুকরো পিজ্জা নিয়ে কণিকার দিকে বাড়িয়ে দিল মুসা, নাও।
বিরক্ত ভঙ্গিতে টুকরোটার দিকে তাকাল কণিকা।
মুসা জানত, এ রকমই করবে সে।
না, আমি খাব না, মাথা নাড়ল কণিকা। বললামই তো, খেতে পারব না।
খাও না, কণিকার মুখের কাছে টুকরোটা নিয়ে গেল মুসা। জোর করে। গুঁজে দেবে যেন। খুব ভাল বানানো হয়েছে। দারুণ টেস্ট।
না! বলে ঝটকা দিয়ে পেছনে মাথা সরিয়ে নিল কণিকা।
এক কামড় খেয়ে দেখো, চাপাচাপি শুরু করল মুসা।
খেতে যখন চাইছে না, থাক না, রবিন বলল, শুধু শুধু জোর করছ কেন ওকে?
আস্তে করে টুকরোটা প্লেটে নামিয়ে রাখল মুসা। চোখ কণিকার দিকে। ও বুঝে ফেলেছে, আমি ওকে চিনে ফেলেছি, ভাবছে মুসা। এখন নিশ্চয়। আমার মুখ বন্ধ করে দেয়ার কথা ভাববে। চিন্তায় পড়ে গেল সে। ভ্যাম্পায়ারকে সরাসরি যুদ্ধে

আহ্বান! কাজটা কি ঠিক হলো? অ্যানি আর ইমির সৈকতে পড়ে থাকার দৃশ্যটা কল্পনা করে শিরশির করে উঠল মেরুদণ্ডের ভেতর।
পরদিন বিকেল।
রবিনকে ফোন করল মুসা।
রবিন, আমি, কান আর কাঁধ দিয়ে ফোনের রিসিভারটা চেপে রেখে উবু হয়ে জুতোর ফিতে বাধতে লাগল সে।
কেমন আছ? জিজ্ঞেস করল রবিন। খসখসে কণ্ঠস্বর। কথাতেই বোঝা গেল ক্লান্তি এখনও কাটেনি ওর। নিশ্চয় আবার কোন ফাঁকে ওর রক্ত খেয়েছে ভ্যাম্পায়ার।
ঘাবড়ে গেল মুসা। দেরি করে ফেলল না তো! জরুরী কণ্ঠে বলল, রবিন, তোমার সঙ্গে কথা আছে।
এখন তো বলতে পারব না, রবিনের কণ্ঠস্বর এত দুর্বল, বোঝাই যায় না। প্রায়। কণিকার সঙ্গে দেখা করতে হবে। ওকে আমি কথা দিয়েছি…
ওর ব্যাপারেই তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই, বাধা দিয়ে বলল মুসা। ফিতে বাধা শেষ। সোজা হয়ে বসল। রিসিভারটা হাতে নিল আবার।
কণিকা? অবাক মনে হলো রবিনকে।
শোনো, রবিন, আমার কথা হয়তো বিশ্বাস করতে চাইবে না, তবু। বলি। ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্যে রয়েছ তুমি।
ওপাশ থেকে মৃদু হাসি শোনা গেল। দুর্বল হাসি।
দেখো, রবিন, আমি সিরিয়াস, গভীর কণ্ঠে বলল মুসা। হেসো না। আমার কথা শোনো।
আমার ভাল লাগছে না, মুসা, কাশতে কাশতে বলল রবিন। কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। বেরোতে হবে।
রবিন, একবারও কি তোমার মনে হয়নি হঠাৎ করে এত দুর্বল লাগছে। কেন তোমার? কিসের অসুখ? কারণটা আর কিছুই না, রবিন। সব কিছুর মূলে ওই কণিকা।
দীর্ঘ নীরবতার পর রবিন বলল, তাই?
কণিকা একটা ভ্যাম্পায়ার, রবিন, গরম হয়ে উঠছে মুসা। আমি জানি, কথাটা বিশ্বাস করা কঠিন। কিন্তু ও ভ্যাম্পায়ার। তোমার রক্ত খাচ্ছে। অল্প অল্প করে খাচ্ছে, যাতে মরে না যাও। রিকি, অ্যানি আর ইমির মত একবারে খেয়ে ফেলছে না। এখনও যদি সাবধান না হও…
মুসা, আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে, বাধা দিল রবিন। এখন এসব ভূতের গল্প ভাল লাগছে না…।

রবিন, গল্প নয়! বিশ্বাস করানোর জন্যে মরিয়া হয়ে উঠল মুসা। রিকির বেলায় কি ঘটেছে, বলেছি তোমাকে। জিনার অবস্থা তো নিজের চোখেই দেখলে। জিনার মতই তোমাকেও…
জিনার মাথায় গোলমাল হয়ে গিয়েছিল, তাই ওরকম করেছে। আমার তো আর তা হয়নি…
ভ্যাম্পায়ারেই ওর মাথাটা বিগড়েছে, রবিন। আমার কথা না শুনলে তোমারও এই অবস্থা হবে। যদি ভাগ্য ভাল হয়, বেঁচে থাকো, রিকির মত মরে না যাও। কণিকা তোমাকে…
কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে আমার, মুসা। অল্পতেই হাঁপিয়ে উঠছি। সেটা। ভূতের কারণে নয়। নিশ্চয় কোন ধরনের ভাইরাসের আক্রমণ হয়েছে, ফ্লুয়ু হবে। মুসা, তুমি বরং আমার কথা শোনো। রকি বীচেও বলেছি, এখনও বলছি–ডাক্তার দেখাও। জিনার আর তোমার একই অসুখ। কি হয়েছিল তোমাদের, কে জানে। অতিরিক্ত ভয় পেলে হয় ওরকম। সেরাতে নৌকা। নিয়ে একা একা দ্বীপে যাওয়া তোমাদের মোটেও উচিত হয়নি।…আঙ্কেল আর আন্টি ফিরেছেন?
আঁ? … হ্যাঁ।
কথা বলেছ তাঁদের সঙ্গে?
না।
তাহলে বলে ফেলল। আর দেরি কোরো না। সত্যি কথাটাই জানাও। বলবে, ভ্যাম্পায়ারের আতঙ্ক তোমার মাথা খারাপ করে দিচ্ছে। তোমার যদি বলতে সঙ্কোচ হয়, আমিই নাহয় বলে দেব। মোট কথা, তোমার চিকিৎসা হওয়া দরকার। দেরি করলে শেষে জিনার মত হাসপাতালে যেতে হবে।
নিজের জীবন বিপন্ন, আমাকে ভাবছে পাগল! কি যে করি!–চুপ করে রইল মুসা।
অ্যাই, মুসা, শুনছ?
হ্যাঁ, বলো।
আমি বেরোচ্ছি।…ওই যে, কণিকা এসে গেছে। পরে দেখা হবে…
প্লীজ, রবিন! চিৎকার করে উঠল মুসা। দোহাই লাগে তোমার! ওর সঙ্গে বেরিয়ো না! মারা পড়বে, রবিন…
কট করে শব্দ হলো। লাইন কেটে গেছে।
*
টপ করে এক ফোঁটা বৃষ্টির পানি পড়ল মুসার ঘাড়ে। বরফের মত শীতল পানি ঘাড় বেয়ে নেমে গেল নিচের দিকে। চামড়ায় অদ্ভুত সুড়সুড়ি তুলে।
ঘন হচ্ছে কুয়াশা। শহর ঢেকে দিয়েছে। স্ট্রীট ল্যাম্পগুলোকে আলো ছড়াতে দিচ্ছে না। কুয়াশার চাদরে ঢাকা পড়ে ঘোলাটে হলুদ আভা ছড়াচ্ছে কেবল

ওগুলো।
মেইন স্ট্রীটে উঠল মুসা। পিজ্জা কোভে খুজল রবিন আর কণিকাকে। পেল না।
আর্কেডে এসে প্রিন্সেস-এর দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল। বাইরের ভেজা রাতের চিহ্নও নেই এখানে। প্রচুর আলো। জোরাল মিউজিক বাজছে। বাজনার শব্দকে ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছে ছেলেমেয়েদের চিৎকার-চেঁচামেচি আর হাসির শব্দ। ভিডিও গেম খেলছে।
আইসক্রীম পারলারে উঁকি দিল। পাশাপাশি টুলে বসে আছে টনি আর কিমি। টনির হাতে আইসক্রীম।
এগিয়ে গেল মুসা। ওদের কাছে এসে দাঁড়াল। টনি, রবিনকে দেখেছ?
ঝট করে মাথা ঘোরাল কিমি। মুসাকে দেখে বদলে গেল চাহনি। মাথা নেড়ে বলল, না, দেখিনি। তুমি বাপু এখন যাও তো। আবার কোন্ ঘ্যানঘ্যানানি শুরু করবে...।
তোমাকে জিজ্ঞেস করিনি আমি! কঠোর স্বরে জবাব দিয়ে টনির দিকে ফিরল মুসা, কি, দেখেছ রবিনকে?
নাহ, গতকাল থেকেই দেখছি না, টনিও অধৈর্য।
কিন্তু ওকে আমার দরকার। খুঁজে বের করতেই হবে। ভীষণ বিপদে আছে ও।
আবার নাক গলাল কিমি, কিসের বিপদ?
কণিকা একটা ভ্যাম্পায়ার। রবিনকে সাবধান করেছি। কিন্তু আমার কথা বিশ্বাস করল না। কণিকা ওকে...
আহ, দয়া করে এবার থামাও না তোমার ওই ভ্যাম্পায়ারের গপ্পো! অধৈর্য হয়ে হাত নাড়ল টনি। কুটি করল।
বললাম তো গপ্পো নয়..
চোখের পাতা সরু করে ফেলল টনি। কথা শেষ করতে দিল না মুসাকে। দেখো, অতিরিক্ত জ্বালাতন শুরু করেছ তুমি। সহ্যের একটা সীমা আছে। তোমার মাথায় গোলমাল হয়ে গেল নাকি ভাবছি।
গোলমাল! কিসের গোলমাল? ফেটে পড়ল মুসা। রিকি মরল। জিনার যখন এই অবস্থা হয়েছিল, তখনও তোমাদের জানিয়েছি। বিশ্বাস করোনি। হাসাহাসি করেছ। আমাকে পাগল ভেবেছ। ওর কি অবস্থা হয়েছে, দেখেছ...
দেখেছি। সে-ও তোমার মত পাগল হয়ে গেছে। কোন কারণে। তোমাদের দুজনেরই মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল।
হ্যাঁ, হয়েছিল। এবং সেই কারণটা ভ্যাম্পায়ার! কতবার বলব এক কথা!
নিরাশ ভঙ্গিতে কপাল চাপড়াল টনি। মুসার দিকে তাকালও না আর।
মুসা বুঝল, কোন সাহায্য পাওয়া যাবে না এদের কাছে। যা করার তার। নিজেকেই করতে হবে। একা।

সে-ও আর কারও দিকে না তাকিয়ে গটমট করে বেরিয়ে এল আর্কেড থেকে।

.

কুয়াশার মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলল নীরবে মুসা।

সাদা কুয়াশার চাদরে ঢেকে গেছে স্যান্ডি হোলো। চেপে আসছে যেন চারদিক থেকে।

মন ভীষণ খারাপ হয়ে গেছে ওর। কেউ বিশ্বাস করছে না ওকে। সবাই ভাবছে পাগল হয়ে গেছে। সাহায্য করার কেউ নেই। একেবারে একা সে। নিঃসঙ্গ।

পায়ের নিচে নরম লাগল। নিচে তাকিয়ে দেখল ভেজা বালি। সৈকতে পৌঁছে গেছে।

জুতো খুলে হাতে নিয়ে খালি পায়ে হাঁটতে লাগল। আরাম লাগছে। আঙুলের ফাঁক দিয়ে বালি ঢুকে যাওয়ার সময় চমৎকার একটা অনুভূতি হয়। ওর বাঁ দিকে পানি। ঢেউ আছড়ে পড়ছে। কিছুদূরে সামনে বোট হাউসটা। কোন চিন্তাভাবনা না করে সেদিকেই এগিয়ে চলল সে।

মাথার ওপরে ডানা ঝাপটানোর শব্দ হতেই চমকে মুখ তুলে তাকাল। তিনটে বাদুড়। কুয়াশার মধ্যে অস্পষ্ট। নিচ দিয়ে না উড়লে চোখে পড়ত না। তাকিয়ে রইল ওগুলোর দিকে। বাদুড়ের রূপ ধরে আসে ভ্যাম্পায়ার। কুয়াশার মধ্যে এসেছে। কুয়াশার মধ্যে বাদুড় ওড়ে কিনা, খাবারের খোঁজে বেরোয় কিনা, জানা নেই ওর। ভূত হওয়ার সম্ভবনাটা উড়িয়ে দেয়া যায় না। সাবধান রইল। কিন্তু থেকেই বা কি করবে বুঝতে পারছে না। ভ্যাম্পায়ার হলে কি দিয়ে ঠেকাবে? কোন অস্ত্র তো নেই সঙ্গে।

বোকামি হয়ে গেছে। মস্ত বোকামি। যে সৈকতে দুদুটো খুন হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে, সেখানে এভাবে নিরস্ত্র চলে আসাটা উচিত হয়নি।

কিন্তু আক্রমণ করল না বাদুড়গুলো। তিনটে কালো ছায়ার মত মিলিয়ে গেল কুয়াশার মধ্যে।

ফিরে যাবে কিনা ভাবতে ভাবতে এগিয়েই চলল সে। আপন চিন্তায় বিভোর।

আরেকটা শব্দ কানে এল।

পেছনে।

কেউ অনুসরণ করছে ওকে!

চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে তাকাল সে।

কেউ নেই।

কল্পনা! ভাবল সে। মাথার মধ্যে ভূতের চিন্তা পাক খাচ্ছে বলেই উল্টোপাল্টা এত কিছু দেখছে।

কিন্তু না, ভুল দেখেনি। কুয়াশার মধ্যে থেকে ধীর পায়ে বেরিয়ে এল একটা মেয়ে। যেন একটা কাঁপা কাঁপা ছায়া বেরিয়ে এসে মানুষের রূপ নিল। কুয়াশা আর আলোর কারসাজি নাকি!
কে? জিজ্ঞেস করল সে।
আমি, ধীরপায়ে সামনে এসে দাঁড়াল ডলি।
এত রাতে এখানে?
বাড়িতে একা একা ভাল লাগছিল না। তোমার সঙ্গে হাঁটি কিছুক্ষণ? অসুবিধে আছে?
না, অসুবিধে আর কি, সঙ্গী পেয়ে খুশিই হলো মুসা।
পাশাপাশি হাঁটতে লাগল ওরা। চারপাশ ঘিরে ওদের সঙ্গে সঙ্গে হাঁটছে যেন কুয়াশার সাদা দেয়াল।
খপ করে মুসার হাত চেপে ধরল ডলি, শুনছ?
ফগহর্ন।
হ্যাঁ। ওই শব্দ আমার ভাল লাগে।
কেমন যেন রহস্যময়।
সামনে এসে দাঁড়াল ডলি। মুখোমুখি হলো ওর। হাত রাখল দুই কাঁধে। মিষ্টি গন্ধ পেল মুসা। ওর চোখের দিকে তাকিয়ে মোহনীয় কণ্ঠে বলতে লাগল ডলি, ফগহর্ন আমার ভাল লাগে। কুয়াশা ভাল লাগে। সব কিছু ঢেকে দেয়। কিছু দেখা যায় না। কেউ দেখতে পাবে না আমাদের।
ওর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বিচিত্র অনুভূতি হলো মুসার। মাথার মধ্যে বো করে উঠল। মগজে সব কিছু গড়বড় হয়ে যাচ্ছে। চোখের সামনে নাচতে শুরু করেছে কুয়াশা।
ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে ডলির মুখ।
*
হঠাৎ যেন সংবিৎ ফিরে পেল মুসা। সরিয়ে নিল গলা। হাত দিয়ে ডলতে ডলতে বলল, কামড় দিল কিসে?
ডলিও সরে গেছে। মশাটশা হবে। কুয়াশা পড়লে যেন পাগল হয়ে যায় রক্ত খাওয়ার জন্যে।
তোমাকে ঘাবড়ে দিলাম নাকি?
মুসার কথা যেন কানেই যায়নি। একঘেয়ে কণ্ঠে বলল ডলি, মশাকে আমি ঘৃণা করি। এমন শয়তানের শয়তান। রক্তচোষা জীব!
ঘাড় ডলছে এখনও মুসা। বলল, বাড়ি যাব। আর ভাল লাগছে না এখানে।
তুমি সব সময়ই খালি পালাতে চাও।

না, তা চাই না। তবে তোমার সঙ্গে যতবার দেখা হয় আমার, জরুরী কোন না কোন কাজ থাকে। ইচ্ছে করে কাজ বের করি ভেবো না। রবিনকে খুঁজতে এসেছিলাম এখানে। ওর জন্যে ভীষণ দুশ্চিন্তা হচ্ছে আমার।
কাল রাতে দেখা হচ্ছে তো? গলা শুনেই বোঝা যাচ্ছে মুসার চলে যাওয়ার কথায় হতাশ হয়েছে ডলি।
হ্যাঁ। কাল না হলেও পরশু। তুমি কোনদিকে যাবে? চলো, এগিয়ে দিয়ে আসি।
না, লাগবে না, থ্যাংক ইউ। এত তাড়াতাড়ি আমার যেতে ইচ্ছে করছে না। এসেছি যখন, খানিকক্ষণ হাঁটব। নইলে ঘুম আসবে না।
বাড়ি রওনা হলো মুসা। প্রায় দৌড়ে চলল। কিছুদূর গিয়ে ফিরে তাকাল। দেখা গেল না ডলিকে। হারিয়ে গেছে কুয়াশায়।
মাথার ওপর ডানা ঝাপটানোর শব্দ হলো। ওপরে তাকিয়ে বাদুড়টাকে দেখতে পেল না মুসা। বেশ কিছুটা ওপরে কুয়াশার মধ্যে রয়েছে।
নিজের অজান্তেই গায়ে কাঁটা দিল ওর। গতি বাড়িয়ে দিল। তবে বাদুড়টা ভ্যাম্পায়ার হয়ে গিয়ে আক্রমণ করল না ওকে। নিরাপদেই বাড়ি ফিরে এল সে।
বাড়িতে ঢুকেই আগে টেলিফোনে রবিনের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করল।. পারল না। ফেরেনি সে।
*
সৈকতে বসে আছে রবিন। কান পেতে শুনছে ঢেউয়ের গর্জন। গড়িয়ে নেমে যাচ্ছে পানি জেটি থেকে, সৈকতের বালি থেকে। শব্দটা কেমন দূরাগত মনে হচ্ছে। যেন স্বপ্নের মধ্যে ঘটছে এসব।
পাশে বসে আছে মেয়েটা।
এটাও কি বাস্তব?
নাকি কল্পনা?
ফিসফিস করে ডাকল, কণিকা, তুমি সত্যি আছ?
জবাব দিল কণিকা, আছি।
ওপরে উঠতে আরম্ভ করেছে কুয়াশা। হালকা হয়ে আসছে নিচের দিকের কুণ্ডলীগুলো। ঢেউয়ের বুকে এখন চাঁদের আলোর প্রতিফলন। সব কিছু ঝিলমিল করছে। সব কিছু কেমন কাঁপছে।
কণিকার দিকে ফিরে তাকাল রবিন। চাঁদের আলোয় আরও ফ্যাকাসে লাগছে মেয়েটার মুখ। চামড়ার রঙ এমন মোমের মত কেন? কালো চুল কুয়াশায় ভিজে গিয়ে ধূসর লাগছে। পাশে বসে থাকলেও এ মুহূর্তে মেয়েটাকে অবাস্তবই লাগছে ওর কাছে।
তার চোখের সামনে অস্পষ্ট, ধোয়াটে হতে আরম্ভ করল কণিকা।

রাতের হালকা বাতাস বয়ে গেল। কুয়াশার শেষ পুজগুলোকেও উড়িয়ে নিয়ে গেল। কণিকাকে অবাস্তব লাগছে এখনও ওর কাছে। ফিসফিস করে ডাকল আবার, কণিকা! জোরে ডাকতে যেন ভয় লাগছে।
কি? সাড়া দিল কণিকা।
বুঝতে চাইছি সত্যি তুমি আছ নাকি?
আবার রবিনের কাঁধে হাত রাখল কণিকা, আছি। তোমার খুব খারাপ লাগছে?
দুর্বল। পা-টা ভাঙার পর আর সুস্থ হতে পারলাম না। একটার পর একটা রোগ ধরতেই আছে।
সেই সঙ্গে ওষুধের প্রতিক্রিয়া, কণিকা বলল। এত অ্যান্টিবায়োটিকে শরীর দুর্বল হতে বাধ্য। তার ওপর নিশ্চয় কোন ধরনের জটিল ভাইরাস ঢুকেছে রক্তে। তোমার ডাক্তার দেখানো উচিত। দরকার হয় হাসপাতালে কাটাওগে কয়েক দিন।
কণিকা?
বলো?
দ্বিধা করল রবিন। একটা কথা। কিভাবে বলব বুঝতে পারছি না। মুসা যে বলে ভ্যাম্পায়ারে রক্ত খেলে এমন হয়, কথাটা কি বিশ্বাস করা উচিত?
না। আমি ভ্যাম্পায়ার বিশ্বাস করি না। তবে কিছু একটা এসে যে রক্ত খেয়ে যাচ্ছে, খুন করে মানুষগুলোকে ফেলে যাচ্ছে সৈকতে, এটা ঠিক।
তোমার কি মনে হয়? কারা করে? জানো কিছু?
ঢেউয়ের দিকে তাকাল কণিকা। চিন্তা করল একমুহূর্ত। তারপর জবাব দিল, বোধহয় জানি!

.

মেইন স্ট্রীটে ঘোরাফেরা করছে মুসা। উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত দোকানগুলোর দিকে নজর। বেরিয়ে আসা প্রতিটি মুখ দেখছে। রবিনকে খুঁজছে। বোর্ডিং হাউসে ক্রমাগত ফোন করেছে। রবিনকে পায়নি। অ্যাটেনডেন্ট জানিয়েছে, কোথায় গেছে বলে যায়নি। ধরেই নিয়েছে মুসা, কণিকার সঙ্গে বেরিয়ে গেছে রবিন। কণিকার মায়াজালে জড়িয়েছে।
ভ্যাম্পায়ারের জাল। বড় ভয়ঙ্কর জাল। একবার জড়ালে ছিন্ন করা কঠিন।
সম্মোহন করে করে নিশ্চয় রবিনের মনটাকে ধোয়াটে করে দিয়েছে কণিকা। সেজন্যেই অন্য কারও কথা আর শুনতে চাইছে না সে। কোন কিছু ভাবতে চাইছে না। জিনারও এ অবস্থা করেছিল জন।
জিনাকে মুক্ত করেছে। রবিনকেও করতে হবে। ভ্যাম্পায়ারের হাতে ওকে কোনমতেই মরতে দিতে পারে না।

অ্যানটিক হাউসটা থেকে হাত ধরাধরি করে বেরিয়ে এল একটা পেশীবহুল ছেলে আর একটা সোনালি-চুল মেয়ে। মুখ দেখা যাচ্ছে না।
টনি! কিমি! ডাকতে ডাকতে ওদের দিকে এগিয়ে গেল মুসা।
ফিরে তাকাল ছেলেমেয়ে দুটো। অবাক চোখে তাকাল। টনি আর কিমি নয়। মুসার অপরিচিত।
সরি, তাড়াতাড়ি বলল মুসা। আমার বন্ধু মনে করেছিলাম। তোমরা দেখতে ওদেরই মত।
হেসে হাত নেড়ে আবার হাঁটতে শুরু করল ছেলেমেয়ে দুটো।
গেল কোথায় সব? ভাবছে মুসা। চেনা কাউকে খুঁজে পাচ্ছি না কেন?
শহরে রবিনকে না পেয়ে সৈকতে চলে এল। আজ কুয়াশা নেই। চাঁদের আলো আছে। কিন্তু লোকজন বড় কম। পর পর দুটো খুন হওয়ার পর থেকে রাতের বেলা সৈকতে আসা কমিয়ে দিয়েছে লোকে। কয়েক জোড়া দম্পতি, আর হাতে গোণা কয়েকটা ছেলেমেয়েকে দেখা গেল। দুএকজন তার। মুখচেনা আছে, বাকি সবাই অপরিচিত।
রবিনকে খুঁজছে আর কণিকাকে ধ্বংস করা যায় কিভাবে ভাবছে। সবচেয়ে সহজ হত যদি রোদে বের করে আনা যেত। কিন্তু আনাটাই হলো। কঠিন। ও গিয়ে বললেই বেরিয়ে চলে আসবে না কণিকা। ধ্বংস করার দ্বিতীয় উপায়টা হলো বুকে কাঠের গজাল ঢোকানো। তার জন্যে ভ্যাম্পায়ারের আস্তানা খুঁজে বের করতে হবে।
কণিকার আস্তানা কোথায়? দ্বীপটাতে? জন আর লীলাকে ধ্বংস করার পরেও কি ওখানে থাকতে সাহস করবে ভ্যাম্পায়াররা?
দ্বীপটাতে গিয়ে খুঁজে দেখার কথা ভাবল। গেলে দিনের বেলা যেতে হবে। তখন কফিনের মধ্যে ঘুমিয়ে থাকে ভ্যাম্পায়ার।
রবিনের সাহায্য পেলে সবচেয়ে ভাল হত। রোদে বের করে আনতে পারত কণিকাকে। গজাল ঠুকে মারা অনেক বেশি কঠিন কাজ। নিজের আস্তানায় ক্ষমতা অনেক বেড়ে যায় ভ্যাম্পায়ারের। দিনের বেলায়ও জেগে, উঠে আক্রমণ করার ক্ষমতা রাখে। যদি আস্তানায় কোন ফাঁকফোকর না। থাকে, আলো আসার পথ না থাকে, অন্ধকার হয়।
সৈকতেও রবিনকে না পেয়ে সোজা ওর বোর্ডিং হাউসে রওনা হলো সে। খুঁজে আজকে বের করবেই। যেখান থেকেই হোক।
বারান্দার পরে হলঘর। ডেস্কে বসে পত্রিকা পড়ছে অ্যাটেনডেন্ট। জিজ্ঞেস করে জানা গেল, ঘরেই আছে রবিন। হাঁপ ছেড়ে বাঁচল মুসা। যাক, পাওয়া গেল। দুশ্চিন্তাও হলো। নিশ্চয় খুব অসুস্থ। ওঠার শক্তি নেই। নইলে ঘরে থাকত না।

ওর ধারণাই ঠিক। বেশ কয়েকবার থাবা দেয়ার পর দরজা খুলে দিল রবিন। চোখের পাতা আধবোজা। সাংঘাতিক দুর্বল। মুখ আরও ফ্যাকাসে হয়েছে। টলছে। দাঁড়িয়ে থাকতেও কষ্ট হচ্ছে।
এই অবস্থা হয়েছে তোমার! প্রায় চিৎকার করে উঠল মুসা। আমাকে খবর দাওনি কেন?
ভাবলাম রেস্ট নিলে সেরে যাবে…
ভেতরে ঢুকল মুসা।
একটা কাউচে পাশাপাশি বসল দুজনে।
কাল রাতে কোথায় ছিলে? কোন পার্টিতে গিয়েছিলে নাকি? জানতে চাইল মুসা।
কাল রাতে? কপাল কুঁচকে ভাবতে লাগল রবিন। মনে করার চেষ্টা করল। না, পার্টিতে যাইনি। কণিকার সঙ্গে বেরিয়েছিলাম। সৈকতে গিয়ে বসে থেকেছি অনেকক্ষণ। খুব কুয়াশা ছিল কাল, তাই না?
জবাব দিল না মুসা। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রবিনের মুখের দিকে। রক্তশুন্য মুখ। বিধ্বস্ত।
গলার দিকে তাকাল। দাঁতের দাগ দেখল না। তবে আছে, আজও ভাবল একই কথা। আরও নিচে। শার্টের কলারের নিচে লুকানো।
কেন, কুয়াশা ছিল কিনা মনে করতে পারছ না? জিজ্ঞেস করল মুসা।
পারছি। তবে অস্পষ্ট। সবই যেন ঘোরের মধ্যে ঘটেছে। কিংবা স্বপ্নের মধ্যে।
হবেই এ রকম–জানা আছে মুসার। ভ্যাম্পায়ারের মায়াজালে পড়লে এইই হয়। সব কিছু ভুলিয়ে দেয় ওরা। সম্মোহন করে। চোখে ঘোর লাগায়। তারপর ওই ঘোরের মধ্যে ধীরে সুস্থে ওদের কাজ সারে।
কেন ওরকম লেগেছে জানো? ভ্যাম্পায়ার তোমাকে সম্মোহন করেছে। বলে।
নিরাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল রবিন, আবার সেই ভ্যাম্পায়ার!
ভ্যাম্পায়ারেই যখন করছে এ সব, আবার সেই ভ্যাম্পায়ারই তো হবে। দাঁড়াও, দেখাচ্ছি তোমাকে প্রমাণ। আমার কথা বিশ্বাস না করে আর পারবে না।– শার্টের কলার চেপে ধরে এক হ্যাঁচকা টানে ওপরের বোতামটা ছিঁড়ে ফেলল মুসা। কলারটা নামিয়ে দিল নিচের দিকে।
আরে, আরে, কি করছ! চিৎকার করে উঠল রবিন।
এই দেখো! মুসাও চিৎকার করে উঠল। জানতাম, থাকবেই!
রবিনের গলার নিচের দিকে দুটো ছোট ছোট ফুটোর দাগ। কালচে বেগুনি হয়ে আছে।
দেখো এখন! দাগগুলো দেখো ভাল করে! টানতে টানতে রবিনকে আয়নার কাছে নিয়ে এল মুসা।

কি হবে দেখলে?
দেখোই না।
কি দেখব? তুমি কি বলতে চাও বুঝতে পারছি না।
কামড়ের দাগ।
ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল রবিন। তুমি বলতে চাইছ ভ্যাম্পায়ারের কামড়?।
তো আর কিসের? এমন করে আর কে ফুটো করবে?
পোকার কামড়! অধৈর্য হয়ে চেঁচিয়ে উঠল রবিন, মুসা, তোমার পাগলামি থামাও! ছুটিতে এসে অসুস্থ হওয়াটাই একটা জঘন্য ব্যাপার। তার। ওপর তোমার পাগলামির অত্যাচার সহ্য করতে পারছি না।
ভুলে যেয়ো না, ছুটিতে বেড়াতে আসোনি তুমি। জোর করে তোমাকে ধরে এনেছি আমি। ভ্যাম্পায়ার রহস্যের তদন্ত করতে। সেটা করছ না। উল্টো আমার কাজে বাধা দিচ্ছ। তোমাকে দোষ দিচ্ছি না। ভ্যাম্পায়ার তোমার মাথাটা গড়বড় করে দিয়েছে। তবে তোমাকে আমি মরতে দেব না। রিকির মত। দেরি হওয়ার আগেই যা হোক একটা কিছু করব।
রিকি পানিতে ডুবে মরেছে। রাতের বেলা ভাটার সময় আমি পানিতেও নামব না, ঢেউয়ে ভাসিয়েও নিতে পারবে না। অতএব মরব না। ভয় নেই।
রিকিকে ঢেউয়ে ভাসিয়ে নেয়নি, রবিন, বিশ্বাস করো আমার কথা! রক্ত খেয়ে ওকে শুষে মেরে ফেলেছিল ভ্যাম্পায়ারে। লাশটা পানিতে ফেলে দিয়েছিল। কণিকা তোমাকে সম্মোহন করে তোমার মাথাটা ঘোলাটে করে। দিয়েছে, তাই স্বাভাবিক চিন্তা করতে পারছ না। গলায় দাগ দেখেও তাই পোকার কামড় ভাবছ।
মুসার দিকে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তাকিয়ে রইল রবিন। কণিকাকে তুমি ভ্যাম্পায়ার ভাবছ? তুমি সত্যি সত্যি পাগল হয়ে গেছ, মুসা। নইলে ওর মত ভাল মেয়েকে…
রবিন, থামিয়ে দিল ওকে মুসা। কথা আজ শোনাতেই হবে রবিনকে। জোর করে হলেও। আমার কথা শোনো। কণিকা যে ভ্যাম্পায়ার, কোন সন্দেহই নেই আমার তাতে। রক্ত শুষে খেয়ে যাওয়ার সময় তার দাঁত আর মুখ থেকে তোমার রক্তে বিষ ঢুকে যায়। সেই বিষ তোমাকে অসুস্থ করে রেখেছে। এত দুর্বল লাগে সেজন্যেই। জিনার ব্যাপারে ডাক্তার কি বলেছে, ভুলে গেছ? বলেছে, রক্তে বিষ ঢুকেছে। তোমাকে এ ভাবে চলতে দিলে শেষমেষ তোমার কি হবে জানো? মারা যাবে। আর ভ্যাম্পায়ারের হাতে মারা পড়লে তুমি নিজেও ভ্যাম্পায়ার হয়ে যাবে। জীবত। মানুষের রক্ত ছাড়া আর তখন চলবে না তোমার…
উফ, কোন পাগলের পাল্লায় পড়লাম রে! অসহায় ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে লাগল রবিন। মুসা, তোমার দোহাই লাগে, তুমি যাও। আমাকে একটু একা থাকতে দাও।

রবিন! মুসাও চিৎকার করে উঠল, কেন তোমরা শুরুতেই আমার কথা বিশ্বাস করো না! কি করলে বিশ্বাস করবে? কি করে বোঝাব তোমাকে কোন দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে?
মুসা, তুমি যাও। ঘুম না এলে ঘুমের বড়ি খেয়ে ঘুম দাওগে। আমি একটু ভাল হলেই তোমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব…
রাগে, দুঃখে, হতাশায় কেঁদে ফেলার উপক্রম হলো মুসার। ফোঁস করে। নিঃশ্বাস ফেলে জোরে জোরে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, পারলাম না, রবিন! কিন্তু আমি চেষ্টা করেছিলাম…
এক মুহূর্তও আর দাঁড়াল না সে। ঝড়ের গতিতে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। নিজেকে বোঝাল, হাল ছাড়বে না কোনমতেই। জিনার বেলায়ও ছাড়েনি। ওকে বাঁচিয়েছে। আগে জানা থাকলে রিকিকেও মরতে দিত না। রবিনকেও বাঁচাতে হবে। সেই সঙ্গে প্রমাণ করে ছাড়বে, সে পাগল নয়, তার সন্দেহই ঠিক।
সিঁড়ি বেয়ে নামতেই দেখল, হলে ঢুকছে কণিকা। মুসাকে দেখে হেসে হাত তুলল, হাই, মুসা।
কটমট করে তাকাল মুসা।
কণিকা হাসল।
তুমি কোত্থেকে এলে? কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল মুসা।
সৈকত থেকে। পার্টি হচ্ছে। দাওয়াত দিয়েছে আমাদেরকে। রবিনকে নিতে এলাম। ও যাবে না। শরীর ভীষণ খারাপ।
তাহলে তুমিই চলো। যাবে?
যাব, সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল মুসা। রবিন আজ গেলে আর বাঁচবে না। রিকির মতই কাল তার লাশ পাওয়া যাবে সাগরে। ওর বদলে সে নিজে গেলে রবিন বাঁচবে। আর কণিকাও তার কিছু করতে পারবে না।
চলো, মুসার হাত ধরে টান দিল কণিকা। সাংঘাতিক খিদে পেয়েছে আমার।

.

পরদিন সন্ধ্যা।
মুসাকে দেখেই সরে পড়তে চাইল রবিন।
কিন্তু মুসা নাছোড়বান্দা।
শেষে প্রায় হাতজোড় করার মত করে রবিন বলল, দোহাই তোমার, আমার সঙ্গে কথা বোলো না। আর যদি বলোই, তো শুধু নাটকের কথা বলো। তোমার ওই ভ্যাম্পায়ারের গল্প শুনতে শুনতে কান পচে গেছে আমার।
থিয়েটারে নাটকের রিহারস্যাল দিতে এসেছে ওরা।
রবিন…

কিন্তু শুনল না রবিন। সরে গেল মঞ্চের দিকে।
তাকিয়ে রইল মুসা। ছাড়বে না সে। যতই রাগুক রবিন, তাকে বিশ্বাস করিয়েই ছাড়বে। রবিন বিপদটা বুঝতে পারছে না, কিন্তু সে তো পারছে।
সময়মত শুরু করা গেল না রিহারস্যাল। কয়েকজন ছেলেমেয়ে তখনও এসে পৌঁছায়নি। তাদের মধ্যে কিমি, ডলি আর কণিকাও রয়েছে। মঞ্চের সামনের দিকে অস্থির ভঙ্গিতে পায়চারি করছেন মিসেস রথরক। ঘন ঘন ঘড়ি দেখছেন।
রবিনের দিকে দৃষ্টি ফেরাল মুসা। আগের দিনের চেয়ে খারাপ অবস্থা ওর। চোখ দুটো কেমন ঘোলাটে, পানিতে ভরা। মুখের চামড়া মোমের মত ফ্যাকাসে। যেন জীবনে কোনদিন রোদের মুখ দেখেনি।
ভ্যাম্পায়ারের মত।
জীবন্মৃতদের দলে যোগ দিতে আর কত সময় লাগবে রবিনের? কিংবা মারা যেতে?
*
রিহারস্যালের পর টনি আর কিমিকে আরও কিছুক্ষণ থাকতে বললেন মিসেস রথরক, ওদের দৃশ্যগুলো ভালমত বুঝিয়ে দেয়ার জন্যে। দুজনেই কাঁচা।
থিয়েটারের দরজা দিয়ে কণিকার সঙ্গে রবিনকে বেরিয়ে যেতে দেখল মুসা। ওদের দিকে এগোতে যাচ্ছিল সে, সামনে এসে দাঁড়াল ডলি।
বাইরে খুব সুন্দর রাত। হাঁটতে যাবে?
চলো, রাজি হয়ে গেল মুসা। রবিনকে নিয়ে কোথায় গেল কণিকা দেখা দরকার।
বাইরে বেরিয়ে এল দুজনে। এদিক ওদিক তাকিয়ে রবিন আর কণিকাকে খুঁজতে লাগল মুসা। বাড়িটার মোড় ঘুরে অন্যপাশে চলে যেতে দেখল একটা ছেলে আর একটা মেয়েকে। সরু রাস্তা ধরে শহরের দিকে চলেছে আরও অনেক ছেলেমেয়ে। কেউ কেউ যাচ্ছে সৈকতে।
রবিনের দেখা নেই।
কোথায় গেল ও? ভুলিয়েভালিয়ে ওকে থিয়েটারের পেছনের বনে নিয়ে গেল না তো কণিকা? এখন হয়তো রবিনের রক্ত খাচ্ছে।
এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে? তাড়া দিল ডলি, চলো, শহরে চলে যাই।
ওর সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে আশপাশের গলিগুলোর দিকে নজর রাখল মুসা। রবিন আর কণিকাকে খুঁজছে ওর চোখ। হাত ধরাধরি করে হাঁটছে ছেলেমেয়েরা। হট ডগ খাচ্ছে। বীচ এমপোরিয়ামের উইন্ডোতে সাজানো জিনিসপত্র দেখছে।
আমাদের ডায়লগগুলো আরেকবার প্র্যাকটিস করলে কেমন হয়? ডলি বলল।
কি আর প্র্যাকটিস করব? হাতে গোণা কয়েকটা বাক্য আমার, মুখস্থ হয়ে গেছে। ভুলব না।

কিন্তু আমার ডায়লগ অনেক। কিছুতেই মনে থাকে না। প্র্যাকটিস করতে পারলে ভাল হত। স্ক্রিপ্টটা আছে তোমার কাছে?
না। ওটা আমার লাগে না।
আমারটা ভুলে ফেলে এসেছি থিয়েটারে। এনে দিতে পারবে?
ঠিক আছে, যাচ্ছি।
যাও। সৈকতে চলে এসো। কাঠের সিঁড়ির কাছে থাকব আমি।
দৌড় দিল মুসা। ও ভেবেছিল, তখনও টনি আর কিমিকে রিহারস্যাল দিচ্ছেন মিসেস রথরক। কিন্তু এসে দেখল অন্ধকার।
নিশ্চয় তালা দিয়ে চলে গেছেন মিসেস রথরক, ভেবে দরজার নব ধরে মোচড় দিল সে।
সহজেই খুলে গেল দরজা। লবিতে ঢুকল মুসা। পেছনে বাতাস লেগে দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল পাল্লাটা। চমকে উঠল সে।
ঘুটঘুটে অন্ধকার। দেয়াল হাতড়ে হাতড়ে এগিয়ে চলল।
বাতির সুইচটা কোনখানে অনুমানের চেষ্টা করল সে। লবিতে কোথায় কি আছে জানে। টিকেট বুদ। একটা কোকের মেশিন। সীটের কাছে যাওয়ার দরজা। সবই দেখতে পাচ্ছে কল্পনায়। কিন্তু সুইচটা কোথায়?
খসখস শব্দ হলো। বাঁয়ে। তারপর খুট করে আবার শব্দ।
কে? ডেকে জিজ্ঞেস করল সে।
জবাব নেই।
বুকের ভেতর হাতুড়ি পিটাতে শুরু করল যেন হৃৎপিণ্ডটা।
থিয়েটারের দরজা খোলা, অথচ সব আলো নেভানো। খটকা লাগল তার। ঘটনাটা কি?
বড়, ভারী একটা কিসের সঙ্গে যেন ধাক্কা লাগল। ঠং-ঠং, ঝনঝন, নানা রকম শব্দ হলো।
কোকের মেশিনটা।
চেপে রাখা নিঃশ্বাসটা ধীরে ধীরে ছাড়ল মুসা। লাইট সুইচটা খুঁজতে শুরু করল।
শব্দ হলো আবার। পা টিপে টিপে হাঁটার মৃদু শব্দ। বিড়ালের পায়ের মত। চারপাশের দেয়ালে মোলায়েম প্রতিধ্বনি তুলল যেন।
কে? আবার জিজ্ঞেস করল সে। গলা কাঁপছে।
এত ভয় পাচ্ছ কেন? নিজেকে ধমক দিল সে। ওটা ইঁদুর। অন্য কিছু না।
দেয়াল ধরে ধরে এগিয়ে চলল সে। সুইচটা কোথায়? পাচ্ছে না কেন?
পেল অবশেষে। সুইচ বোর্ডের কিনারে হাত পড়ল। সুইচটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে টিপে দিল।

আলো জ্বলল মাথার ওপর।
চোখ মিটমিট করে সইয়ে নিতে লাগল এই হঠাৎ উজ্জলতা। চারপাশে আকাল। লবিতে দাঁড়িয়ে আছে। একা। ইঁদুর থেকে থাকলে আলো জ্বলার সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে লুকিয়ে পড়েছে।
কিন্তু মনের খুঁতখুতি গেল না। সত্যি কি ইঁদুর? নাকি রেস্ট রুমে কেউ লুকিয়ে রয়েছে?
দরজা খুলে একটা ঘরে ঢুকল সে। এটা পুরুষদের রেস্ট রুম খালি। মেয়েদেরটাতেও উঁকি দিল। এটাও খালি। কেউ নেই।
ধূর! অহেতুক দেখাদেখি করছে এভাবে। কোন প্রয়োজন ছিল না। তারচেয়ে যা নিতে এসেছে, সেটা নিয়ে কেটে পড়া উচিত। দেরি দেখলে ডলি আবার চিন্তা শুরু করবে।
ডাবল ডোরটা পার হয়ে অডিটরিয়ামে চলে এল সে। সামনে সারি সারি সীট তার দিকে মুখ করে রয়েছে। সব যেন তাকিয়ে রয়েছে শূন্য মঞ্চটার দিকে।
ধীরে ধীরে মঞ্চের দিকে এগোল সে। নির্জন অডিটরিয়ামে প্রতিধ্বনি তুলল তার পায়ের শব্দ। অনেক জোরাল হয়ে কানে বাজল।
ডলি বলেছে, উইঙসের ভেতরে একটা টুলের ওপর স্ক্রিপ্টটা ফেলে গেছে।
সিঁড়ি বেয়ে মঞ্চে উঠতে শুরু করল সে। মঞ্চের পেছনে ফেলে রাখা হয়েছে কাপড়ের স্তূপ। ভাল করে দেখল মুসা। ধূসর রঙ চোখে পড়ল। পরিচিত রঙ।
ওগুলো দৃশ্যপট। নাটকের জন্যে তৈরি করা হয়েছে। মাটির নিচের ঘরে ভ্যাম্পায়ারের আস্তানার ছবি। কফিনের মধ্যে শুয়ে থাকা ভ্যাম্পায়ার।
এগিয়ে গেল মুসা। এভাবে ফেলে রাখলে নষ্ট হয়ে যাবে। ছড়িয়ে নিয়ে ঠিকমত, রোল করে কিংবা ভাঁজ করে রাখতে হবে। দেখেই যখন ফেলেছে, ঠিক করে রাখাটা তার কর্তব্য।
একটা কাপড়ের কোণা ধরে টান দিল সে।
দিয়েই থমকে গেল। চমকে উঠল ভীষণভাবে।
কাপড়টাকে ওভাবে স্তূপ করে রাখার কারণ আছে।
কাপড়ের নিচে একটা লাশ।
একজন মহিলার।
পেটের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠল মুসার। নাড়িভুড়িগুলো যেন জট পাকিয়ে যাচ্ছে।
খাইছে! একটিমাত্র শব্দ বেরিয়ে এল মুখ থেকে।
মিসেস রথরক। চিত হয়ে পড়ে আছেন। দৃশ্যপটের রঙের মতই তাঁর মুখটাও ফ্যাকাসে ধূসর।

কাঁপা পায়ে হাঁটু গেড়ে বসল মুসা। ভাল করে তাকাল গলার দিকে। দুটো দাঁতের দাগ স্পষ্ট।
খোদা, আবার খুন করল ভ্যাম্পায়ার! এই লাশটাও প্রথম চোখে পড়ল। তার! কি ভাববে এখন পুলিশ?
চোখের কোণ দিয়ে একটা নড়াচড়া দেখতে পেল।
ভ্যাম্পায়ারটা কি এখনও ঘরেই আছে!
বুকের দুরুদুরু বেড়ে গেল তার। পাঁই করে পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল।
ছায়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল একটা ছায়ামূর্তি। চিনে ফেলল।
কণিকা!

.

গাঢ় ছায়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা। মঞ্চের পেছনে। বড় বড় হয়ে গেছে চোখ। ঠোঁট ফাঁক।
কেন? দাঁতের জন্যে? এখনও গুটিয়ে নেয়নি শ্বদন্ত?
যেন মুসার মনের কথা পড়তে পেরেই তাড়াতাড়ি মুখের কাছে হাত নিয়ে গেল কণিকা। চিৎকার ঠেকাল, না শ্বদন্ত গোপন করল, বোঝা গেল না।
আবার অভিনয় করা হচ্ছে! রাগ লাগল মুসার। বলবে নাকি এসব ভণ্ডামি বন্ধ করতে? বলবে, আমি জানি, তুমি ভ্যাম্পায়ার!
নাহ, আপাতত না বলাই ভাল।
সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয় ঝেড়ে ফেলে গটমট করে ওর দিকে এগিয়ে গেল মুসা। মঞ্চের পেছনে ছায়ায় এসে দাঁড়াল। খপ করে চেপে ধরল কণিকার একটা হাত। হ্যাঁচকা টানে নিয়ে এল ছায়া থেকে আলোতে।
এতক্ষণে যেন লাশটাকে চোখে পড়ল কণিকার। ছোট্ট একটা চিৎকার বেরোল মুখ থেকে। চোখে ফুটল বিস্ময়। কুঁচকে গেল কপাল। নিজের অজান্তেই পিছিয়ে গেল এক পা।
এখানে কি তোমার? গর্জন করে উঠল মুসা। আমি তো জানতাম তুমি রবিনের সঙ্গে রয়েছ।
ছিলাম, নিঃশ্বাস ভারী হয়ে গেছে কণিকার। কিন্তু ও অতিরিক্ত দুর্বল। হাঁটা তো দূরের কথা, দাঁড়াতেই পারছিল না। বাড়ি চলে যেতে বললাম। একটা জরুরী কথা মিসেস রথরককে জিজ্ঞেস করতে থিয়েটারে ফিরে। এসেছিলাম আমি। কিন্তু...
থেমে গেল সে।
আর ন্যাকামি করতে হবে না। মনে মনে বলল মুসা। তুমিই খুন করেছ। মহিলাকে। কোন সন্দেহ নেই আর আমার। জিজ্ঞেস করল, কতক্ষণ আগে এসেছ?

এই তো, মিনিটখানেকও হয়নি। মিসেস রথরকের লাশটা দেখে কি করব ভাবছি, এই সময় একটা শব্দ কানে এল। ভাবলাম খুনী ফিরে এল বুঝি। তাড়াতাড়ি লুকিয়ে পড়লাম। কারণ আমাদের এই খুনীটা ডেঞ্জারাস। বাগে পেলে আমাকেও ছাড়ত না। তাই সাংঘাতিক ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। পরে দেখি তুমি।
আমি পুলিশকে ফোন করতে যাচ্ছি, মুসা বলল।
মাথা ঝাঁকাল কণিকা।
লবিতে দৌড়ে গেল মুসা। ফোন আছে ওখানে। থানায় ফোন করল। ডিউটি অফিসার বলল, কয়েক মিনিটের মধ্যে লোক পাঠাবে।
পুলিশ এবার আমাকে দেখলে খুশিতে মাথায় তুলে নাচবে! তেতো হয়ে গেল মুসার মন। আছাড় দিয়ে নামিয়ে রাখল রিসিভার। ঘুরে দাঁড়াতেই দেখল, পেছনে কয়েক ফুট দূরে দাঁড়িয়ে আছে কণিকা।
বুকের মধ্যে আবার ধড়াস করে উঠল মুসার। মনে পড়ল কণিকা ভ্যাম্পায়ার। একটা ভ্যাম্পায়ারের সঙ্গে একা এক ঘরে রয়েছে সে। তিন তিনটে খুন যে ইতিমধ্যেই করে ফেলেছে।
পিছিয়ে যেতে শুরু করল মুসা।
দেয়ালে গিয়ে পিঠ ঠেকল। কণিকার চোখে চোখ।
এক পা আগে বাড়ল কণিকা।
আরেক পা।
আর দাঁড়াল না মুসা। ঘুরে দৌড় মারল।
মুসা, শোনো, চিৎকার করে ডাকল কণিকা। দাঁড়াও। পালাচ্ছ কেন?
কিন্তু ফিরেও তাকাল না মুসা। এক ছুটে বেরিয়ে গেল দরজা দিয়ে। বাইরে গিয়ে পুলিশের অপেক্ষা করা বরং ভাল, নিরস্ত্র হয়ে একঘরে একটা ভয়ঙ্কর ভ্যাম্পায়ারের সঙ্গে থাকার চেয়ে।
সৈকতে লোক চলাচল নিষিদ্ধ করে দেয়ার কথা ভাবছে পুলিশ, মুসা বলল। রবিন আর টনির সঙ্গে বসে বসে পাথর ছুঁড়ছে পানিতে।
মিসেস রথরক খুন হওয়ার পর তিন দিন পেরিয়ে গেছে। খুনীকে ধরতে পারেনি পুলিশ। কোন মোটিভ বের করতে পারেনি। তিন খুনের কোনটারই কোন কিনারা করতে পারেনি ওরা, সূত্র পায়নি।
কিন্তু মুসার ধারণা, পুলিশ আসল ব্যাপারটা জানে। ভ্যাম্পায়ারের কথা না জানলে সৈকত বন্ধ করে দেয়ার কথা মাথায় আসত না ওদের। কিন্তু পুলিশ ভূত বিশ্বাস করলে লোকে হাসবে, এই ভয়ে ঘোষণা দিতে পারছে না।
রবিনকে কথা দিয়েছে মুসা, ওর সঙ্গে ভ্যাম্পায়ারের আলোচনা আর করবে না। টনি অবশ্য খোলাখুলি কিছু বলছে না, তবে মুসা বুঝতে পারছে, সে-ও এ নিয়ে

আলোচনা করতে চায় না।
একটা সান্তনার কথা–রবিনের দুর্বলতা যা ছিল, তার চেয়ে আর বাড়েনি। তবে মুখের দিকে তাকানো যায় না এখনও। কণিকা নিশ্চয় ওকে রেহাই দিয়েছে। রক্ত খাওয়া বন্ধ করেছে।
তবে, মুসা জানে, আপাতত বন্ধ করেছে। সুযোগ পেলেই আবার খাবে, কোন সন্দেহ নেই। মায়া করে ভ্যাম্পায়ার তার শিকার ছেড়ে দিয়েছে, এ কি কোনদিন হয়!
মেজাজ খারাপ করে একটা গোল পাথর তুলে নিয়ে পানিতে ছুঁড়ে মারল মুসা। একটা ঢেউ তখন তীরে আছড়ে পড়ে ভাঙছে। তার মাথায় পড়ল পাথর। পানি ছুঁয়ে ছুঁয়ে ব্যাঙের মত কয়েকটা লাফ দিয়ে কিছুদূর গিয়ে তারপর ডুবল।
মুসার মত মারার চেষ্টা করল টনি। হলো না। ডুবে গেল। বলল, কি করে মারো তুমি? তোমারটা লাফায় আর আমারটা ডুবে যায়?
মারার কায়দা আছে, জবাব দিল মুসা।
রবিন হাসল। মুসার মনে হলো, জোর করা হাসি। আজকাল আর হাসি আসে না ওদের। তিন তিনটে মানুষ খুন হওয়ার পর–বিশেষ করে পরিচিত আর বন্ধুজন, হাসি থাকার কথা নয়।
সৈকতে চলাফেরা সত্যি বন্ধ করে দেবে? বলল রবিন।
তাহলে আর এখানে থেকে লাভটা কি হবে আমাদের, মাথা ঝাঁকিয়ে বলল টনি। বাড়ি ফিরে যাওয়াই ভাল।
পুলিশও সেটাই চায়, মুসা বলল।
কিন্তু আমার মোটেও যেতে ইচ্ছে করছে না। আবার সেই একঘেয়ে পরিবেশ, কাজ নেই কর্ম নেই, সময় কাটতে চাইবে নাঃ নাহ, সৈকত বন্ধ করে দিলেও আমি যাচ্ছি না। সিসিকে নিয়ে আব্বা-আম্মা চলে গেলেও আমি থেকে যাব।
থেকে কি করবে? সৈকতটাই এখানে আসল। আর তো তেমন কোন জায়গা নেই। এখানে যা কিছু আনন্দের, সব এই সৈকতকে ঘিরে।
ঘড়ি দেখল টনি। কিমি অপেক্ষা করবে বীচ এমপোরিয়ামে। আমি যাই। পরে কথা বলব তোমাদের সঙ্গে।
সৈকত ধরে হেঁটে যাওয়া টনিকে যতক্ষণ চোখে পড়ল, তাকিয়ে রইল মুসা। তারপর ফিরল রবিনের দিকে। কণিকা কি তোমাকে বলেছে, মিসেস রথরকের গলায় দাঁতের দাগ ছিল?
জবাব না দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল রবিন। হাঁটতে শুরু করল।
ছাড়ল না মুসা। পাশে হাঁটতে হাঁটতে বলল, আমি দেখেছি। কণিকা এ ব্যাপারে কিছু বলেনি?

না। থাক না ওসব কথা।
রবিনের হাত চেপে ধরে হ্যাঁচকা টানে নিজের দিকে ফেবাল মুসা, শোনো, কণিকা যে ভ্যাম্পায়ার, এটা আমাকে প্রমাণ করতে দাও নইলে তোমাকেও ভ্যাম্পায়ার বানিয়ে ছাড়বে খুব শীঘ্রি। আমি প্রমাণ করতে পারব।
ওহ, মুসা, প্লীজ! গুঙিয়ে উঠল রবিন, আমাকে রেহাই দাও।
রবিনের কথা কানেই তুলল না মুসা, তুমি দুর্বল কেন..
ফ্লু কিংবা অন্য কোন ভাইরাসে ধরেছে।
তাহলে তোমার গলায় দাগ এল কোত্থেকে? পোকার কামড় হলে চলে। যেত। ভ্যাম্পায়ারের হলে যাবে না এত সহজে।
আবার গুঙিয়ে উঠল ররিন।
প্রমাণ করতে পারলে তো বিশ্বাস করবে আমাকে? তোমাকে অনুরোধ করছি, আমাকে একটা সুযোগ দাও, কোনমতেই হাল ছাড়ল না মুসা। যদি না পারি এ ব্যাপারে আর টু শব্দ করব না কখনও, কথা দিলাম। কণিকাকে আর সন্দেহ করব না।
বেশ, হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গি করল রবিন, আমি রাজি। বুঝতে পারছি, আমি তোমাকে সুযোগ না দিলে আমাকে রেহাই দেবে না তুমি। তবে তোমার ধারণা যে ভুল হবে, এখনই আমি লিখে দিতে পারি।
যাক, খানিকটা এগোনো তাহলে গেল! স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মুসা।
রাজি তো হলাম, কি করতে চাও এখন? জিজ্ঞেস করল রবিন।
প্রথমেই তোমাকে কথা দিতে হবে, প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত কণিকার সঙ্গে একা কোথাও যাবে না।
এটা কোন কথা হলো?
হলো। তুমি যেহেতু প্রমাণ চাও, আমার কথা তোমাকে শুনতেই হবে। নইলে প্রমাণ করব কি করে? রবিন, শোনো, কোন মানুষকে যদি তিনবার ভ্যাম্পায়ারে কামড়ায়, সেই মানুষটাও ভ্যাম্পায়ার হয়ে যায়। জীবন্মত অবস্থার ভয়াবহ যন্ত্রণা থেকে তাকে মুক্তি দেয়ার একটাই উপায় থাকে তখন, বুকে কাঠের গজাল মেরে…
হয়েছে, হয়েছে, তাড়াতাড়ি দুই হাত তুলে মুসাকে থামাল রবিন। যাব না কোথাও কণিকার সঙ্গে।
একা দেখাও করবে না ওর সঙ্গে। আশেপাশে আর কেউ আছে কিনা। শিওর হয়ে নেবে।
বুঝলাম! আর…
রবিন, আমি ইয়ার্কি মারছি না!

সে তো দেখতেই পাচ্ছি। ঠিক আছে, যা বলছ করব।
কথা দিচ্ছ?
দিচ্ছি। এখন বলো, তোমার উদ্দেশ্যটা কি? কি করতে চাও?
খুব সহজ। কি করলে ভ্যাম্পায়ার ধ্বংস হয়?
কণিকার বুকে কাঠের গজাল ঢোকাতে পারব না আমি!
ঢোকাতে বলাও হচ্ছে না। তারচেয়ে সহজেই সম্ভব। গজাল ছাড়া অন্য কিসে ভ্যাম্পায়ার মরে, বলো তো?
জানি না।
রোদ। সূর্যের আলো।
তোমার মাথাটা পুরোই গেছে!
রবিনের কথা হাত নেড়ে ঝেড়ে ফেলে দিল মুসা। কি করে মারবে ভ্যাম্পায়ারকে বোঝাতে লাগল, এই সময় পেছনে শব্দ শুনে থেমে গেল। ফিরে তাকিয়ে দেখে কণিকা।
স্থির হয়ে গেল মুসা। কতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছে ও? কতখানি শুনেছে?
.
কি ব্যাপার? হাসিমুখে জিজ্ঞেস করল কণিকা, কি আলোচনা করছিলে। তোমরা? আমাকে দেখে থেমে গেলে কেন?
কণিকার মুখের দিকে তাকিয়ে অনুমানের চেষ্টা করল মুসা, ওদের পরিকল্পনার কথা কতখানি জেনেছে মেয়েটা।
রবিনের পাশে গিয়ে দাঁড়াল কণিকা। এমন চুপ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন তোমরা? হাঁটবে, না অন্য কিছু করবে?
মুসার দিকে তাকাল রবিন। কণিকার দিকে ফিরে বলল, আমি যেতে পারব না। শরীর ভীষণ দুর্বল।
আমাকেও বাড়ি যেতে হবে, তাড়াতাড়ি বলল মুসা।
বেশ, যাও, কণিকা বলল। কাল দেখা হবে। মেইন স্ট্রীটের দিকে হাঁটতে শুরু করল সে। কয়েক পা গিয়ে ফিরে তাকিয়ে বলল, ওহহো, ভুলে গিয়েছিলাম। কাল সন্ধ্যায় সৈকতে একটা বড় পার্টি হবে। সবাই আসবে। তোমাদেরও দাওয়াত দিতে বলে দিয়েছে।
তাই নাকি, খুশি হয়ে রবিন বলল, খুব ভাল খবর শোনালে।
তাহলে কাল ওই সময় দেখা হবে, কণিকা বলল।
হ্যাঁ, কোনমতে দায়সারা জবাব দিল মুসা। কণিকাকে দূরে চলে যাওয়ার সময় দিল। তারপর বলল, আমাদের কথা শুনে ফেলেনি তো?

ফেললে আর কি করব! তবে কোনভাবেই যেন ও অপমানিত না হয়, সে-খেয়াল রাখতে হবে আমাদের।
*
ছিলে কোথায় তুমি? পরদিন রাতে সৈকতের পার্টিতে এলে মুসাকে জিজ্ঞেস করল রবিন। খাবার তো সব শেষ।
হোকগে শেষ। বারগার খেয়ে এসেছি।
হাই, মুসা, হাত নাড়ল কণিকা। আরও অনেকগুলো ছেলেমেয়ের সঙ্গে রবিনের পাশে বসেছে সে।
মধ্যরাত পার হয়ে গেছে। সারা সৈকত জুড়েই চলছে বীচ পার্টি। কথা রেখেছে রবিন। কণিকার সঙ্গে একা হয়নি একটিবারের জন্যেও।
চোখ বুলিয়ে চারপাশটা দেখল মুসা। হুল্লোড় করছে ছেলেমেয়েরা। সোডার ক্যান ছুঁড়ে মারছে এর ওর গায়ে। খালি ক্যান দিয়ে একটা পিরামিড বানানো হয়েছে। উচ্চতা হবে ছয় ফুট। ক্রমেই আরও উঁচু হচ্ছে ওটা। ভলিবল খেলার চেষ্টা করছে কয়েকজন, অন্ধকারে জ্বলে এ রকম বল দিয়ে। বাতাসে কয়লার ধোয়া আর সাগর থেকে ধরা তাজা মাছের কাবাবের সুগন্ধ।
কণিকার দিকে তাকাল সে।
আজকের রাতটাই তোমার শেষ রাত কণিকা!
রবিনের রক্ত আর খেতে পারবে না তুমি! কারোর রক্তই পাবে না!
ওর প্ল্যানটা হলো, রবিনের সঙ্গে কণিকাকে কোন একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে আটকে ফেলবে। বসিয়ে রাখবে সকাল পর্যন্ত। সূর্য ওঠার আগে কোনমতেই বেরোতে দেবে না।
সাগরের ওপরের আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। শোনা গেল বজ্রের গুড়ুড়ু চিমনি দিয়ে ভলকে ভলকে বেরোনো ধোয়ার মত কোথা থেকে কালো মেঘ এসে ছেয়ে ফেলল রাতের আকাশ।
বৃষ্টি! চমৎকার! খুশি হলো মুসা। বৃষ্টি এলে ওর প্ল্যানমত কাজ করতে সুবিধে হবে। ঘরে ঢুকতে বাধ্য হবে কণিকা। আর একবার ঢুকলো কোনমতেই ওকে সকালে সূর্য ওঠার আগে বেরোতে দেয়া হবে না।
ডলি এল এই সময়। টনি আর রবিনের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল। ওদের কথা শুনতে লাগল।
বৃষ্টি! আহ! আসে না কেন এখনও?
মুসার পাশে বসে পড়ল ডলি। কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, চলো, সৈকতের ওদিক থেকে হেঁটে আসি।

না। বসো। এখন আমার হাঁটতে ইচ্ছে করছে না, মুসা বলল। আমি এখন সবার সঙ্গেই থাকতে চাই।
রবিনের কাছ থেকে কিছুতেই দূরে সরা চলবে না এখন। সুযোগ দিলেই ভুলিয়েভালিয়ে তুলে নিয়ে যাবে ওকে কণিকা। আর গেলেই সর্বনাশ ভ্যাম্পায়ারের সম্মোহন বেশিক্ষণ এড়াতে পারবে না রবিন।
মিনতি ভরা চোখে মুসার দিকে তাকিয়ে আছে ডলি! জোরে নিঃশ্বাস ফেলল।
হাঁটতে যেতে রাজি না হওয়ায় ও এত দুঃখ পেল কেন বুঝতে পারল না মুসা। সবার সামনে অপমান বোধ করল নাকি?
দূরে আবার গুড়গুড় শব্দ। আবার বজ্রপাত।
নীচে নেমে আসছে কালো মেঘ।
এসো বৃষ্টি। আরও তাড়াতাড়ি। প্লীজ।
কিন্তু মুসার অনুরোধে কান দিল না বৃষ্টি। দূরেই রইল বিদ্যুৎ চমকানো, দূরেই রইল বজ্রের গর্জন।
ভোররাত তিনটের দিকে পার্টিটা হয়ে গেল একেবারে প্রাগৈতিহাসিক। বুনো উন্মাদনায় মেতে উঠল সবাই। হই-হুঁল্লোড়, নাচাকোদা, যার যা ইচ্ছে চালিয়ে যাচ্ছে।
মনে হচ্ছে খুনের কথাটা ভুলতে চাইছে সবাই, ডলি বলল।
মাথা ঝাঁকাল মুসা।
মুসা, এবার তো হাঁটতে যেতে পারি আমরা? সারারাত এক জায়গায় বসে থাকার ইচ্ছেটা আজ তোমার কেন হলো, বুঝতে পারছি না।
কি জবাব দেবে ভাবছে মুসা, এই সময় তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল আকাশ গুড়গুড় করে উঠল মাথার ওপর। চমকে ওপর দিকে তাকাতেই আকাশের এমাথা ওমাথা চিরে দিয়ে গেল বিদ্যুতের শিখা। পরক্ষণে বজ্রপাতের বিকট শব্দ।
মুহত পরেই অঝোরে নামল বৃষ্টি।
লাফ দিয়ে উঠে হাসাহাসি, চেঁচামেচি করতে করতে দৌড় দিল ছেলেমেয়ের দল। আর বাইরে থাকা যাবে না। এখন ঘর দরকার।
মুসা। চিৎকার করে উঠল ডলি, এদিকে! একদল ছেলেমেয়ের সঙ্গে মেইন স্ট্রাটের দিকে ছুটল সে।
চমৎকার!
রবিনের দিকে ফিরে বলল মুসা, শুরু করো।
ইঙ্গিতটা বুঝতে পারল রবিন। গম্ভীর ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল। কণিকার দিকে ফিরে বৃষ্টির শব্দকে ছাপিয়ে চিৎকার করে বলল, এসো, কণিকা। থিয়েটারটা সবচেয়ে কাছে। ওখানেই যাব।

থিয়েটারের দিকে দৌড় দিল দুজনে। পেছনে ছুটল মুসা। পাথরের কুচির মত গায়ে এসে আঘাত হানছে বৃষ্টির ফোঁটা। বাতাসে ঝাঁপটা দিয়ে এনে এত জোরে চোখে ফেলছে, চোখ মেলে রাখা কঠিন। কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে তাকাল। গুড। কেউ নেই।
রবিনের পাশ কাটিয়ে গিয়ে একটানে থিয়েটারের দরজাটা খুলে ফেলল
হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকে পড়ল রবিন আর কণিকা। মাথার ওপরে বিদ্যুৎ চমকাল। থরথর করে বাড়িটাকে কাঁপিয়ে দিল বজ্রপাতের শব্দ।
লবিতে দাঁড়িয়ে জোরে জোরে হাপাতে লাগল ওরা।
বাপরে বাপ! হঠাৎ করে কি নামাটাই নামল!কণিকা বলল। ভিজে চুপচুপে হয়ে গেছি।
হঠাৎ করে আর কোথায়। অনেকক্ষণ থেকেই তো গর্জাচ্ছে। মেঝেতে পা হকে জুতোয় ঢুকে যাওয়া পানি বের করতে লাগল রবিন।
দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছে ওর। দেখতে পাচ্ছে মুসা। দুর্বল শরীরে এ ভাবে দৌড়ানোটা কঠিন হয়ে গেছে ওর জন্যে।
চলো, বেসমেন্টে ঢুকে বসে থাকি, মুসা বলল। ওখানটায় গরম পাব। এখানে ঠাণ্ডা।
বেসমেন্টে নামার দরজায় নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। থিয়েটারের লোক ছাড়া অন্য কারও ঢোকা নিষেধ। কিন্তু তালা নেই। সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিল মুসা। এত রাতে আর কে দেখতে আসবে। নিষেধ অমান্য করে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে লাগল সে। রইল সুবার পেছনে। দরজাটা লাগিয়ে দিল।
বেসমেন্ট থেকে বেরোনোর দুটো দরজা। একটা দিয়ে ঢুকেছে ওরা। অন্যটা দিয়ে বেসমেন্ট থেকে সরাসরি বাইরে যাওয়া যায়।
কোন জানালা নেই।
এক্কেবারে নিখুঁত। এ রকম ঘরই দরকার ছিল।
বহু বছর ধরে নাটক হচ্ছে এই থিয়েটারে। নানা রকম জিনিসে বোঝাই # করে রাখা হয়েছে ঘরটা। প্লাস্টিকে মোড়ানো পোশাক ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে একদিকের দেয়ালে। তার ওপরের তাকগুলোতে নানা ধরনের হ্যাট। পুরুষের। মহিলাদের।
একটা কাঠের বাক্সের ওপর বসে পড়ল মুসা। দুটো টুল খুঁজে নিয়ে তাতে বলল রবিন আর কণিকা।
সকালের অপেক্ষায় থাকতে হবে এখন। আর কিছু করার নেই। রবিন আর মুসা দুজনে একই কথা ভাবছে। কণিকাকে আটকে রাখতে হবে সূর্যোদয়। পর্যন্ত।
ভিজেছে তিনজনেই। ভেজা চুল নিয়ে অনুযোগ করতে থাকল কণিকা। মুসা লক্ষ করল, ওর হাতে ঘড়ি নেই। তাতে আরও ভাল হয়েছে। সকাল হলো কিনা, বুঝতে

পারবে না কণিকা। এ
রবিনের চোখে শীতল দৃষ্টি। একে শরীর খারাপ। তার ওপর মুসার এসব পাগলামি তার পছন্দ হচ্ছে না।
সবই বুঝছে মুসা। বলল না কিছু। সকাল হোক। রোদের আলো এসে পড়ুক কণিকার গায়ে। ওই দৃষ্টি আর থাকবে না রবিনের।
কথা বলতে লাগল সে। কিন্তু রবিন তাতে যোগ দিতে পারল না বিশেষ। ক্লান্তিতে ভেঙে আসছে শরীর। শুয়ে পড়তে চাইছে। কিন্তু শোয়ার জায়গা নেই বলে বসেই থাকতে হলো।
কটা বাজে? অবশেষে জিজ্ঞেস করল কণিকা।
সোয়া তিনটে, ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মিথ্যে কথা বলল মুসা। বাজে আসলে অনেক বেশি। ভোরের আলো ফোঁটার সময় হয়ে গেছে প্রায়। আর পনেরো মিনিট পরেই কণিকা আর ভ্যাম্পায়ার থাকবে না। জীবন্মাতের অভিশাপ মুক্ত হয়ে চিরকালের জন্যে চলে যাবে পরপারে। দুঃখ হচ্ছে না মুসার। বাঁচিয়েই দিচ্ছে বরং কণিকাকে। জীবন্ত থাকার যন্ত্রণা বড় সাংঘাতিক।
আমি আর বসে থাকতে পারছি না, রবিন বলল। এখুনি গিয়ে বিছানায় পড়তে না পারলে মারা পড়ব।
কিন্তু এই ঝড়ের মধ্যে যাবে কি করে? মুসা বলল।
এখানে থেকে তো বৃষ্টির শব্দও শুনতে পারছি না, কণিকা বলল। কমল কিনা বুঝব কিভাবে? জানালা নেই কিছু নেই। চলো, ওপরে চলে যাই।
যে নামা নেমেছে, এত তাড়াতাড়ি থামবে না বৃষ্টি।
আমি ওপরে গিয়ে দেখে আসি।
তুমি বসো। রবিন যাক। নড়াচড়া না করলে বরং কিছুটা স্বাভাবিক হবে। ও। এভাবে বসে থাকলে ঘুমিয়ে লুটিয়ে পড়বে এখানেই।
হাসল কণিকা। তা অবশ্য ঠিক। রবিন, যাও। কোক মেশিন তত আছে, ওপরে। একটা কোকটোক আনতে পারো নাকি দেখো।
দ্বিধা করতে লাগল রবিন। ওর দিকে তাকিয়ে আছে মূসা। মনে মনে তাগাদা দিচ্ছে–যাও না! দেরি করছ কেন? তীরে এসে তরী ডুবিয়ো না!
আস্তে করে উঠে দাঁড়াল রবিন। বুড়ো মানুষের মত পা টানতে টানতে এগিয়ে চলল সিঁড়ির দিকে। আধমরা লাগছে ওকে।
পাঁচ মিনিট পর তিন ক্যান কোক নিয়ে ফিরে এল সে। বৃষ্টির কথা বলল, আরও বেড়েছে। কমার কোন লক্ষণই নেই। একটা ক্যান কণিকাকে দিয়ে আরেকটা মুসাকে দিল। দেয়ার সময় চোখে চোখে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল।
ইঙ্গিতটা বুঝল মুসা। এর মানে বৃষ্টি আসলে থেমেছে। সূর্য ওঠার সময় হয়েছে।

কণিকার এখন অগ্নিপরীক্ষার সময়। মুসা জানে, এই পরীক্ষায় পাস করতে পারবে না কণিকা।
তাকে আরও পাঁচ মিনিট সময় দিল মুসা। তারপর খপ করে হাত চেপে ধরে হ্যাঁচকা টান মারল। কোক খাওয়া শেষ হয়নি কণিকার। ক্যান থেকে শার্টে পড়ল অনেকখানি।
আরে! কি করছ? তীক্ষ্ণস্বরে চিৎকার করে উঠল কণিকা। ছাড়ো, ছাড়ো! হাত থেকে ছেড়ে দিল ক্যানটা। মুসার জুতোতে ছলকে পড়ল কোক।
স্থির দাঁড়িয়ে আছে রবিন। তাকিয়ে আছে কণিকার দিকে।
রবিন! চিৎকার করে উঠল মুসা। তাকিয়ে আছ কেন হাঁ করে? দরজা খোলো!
মুসা! কণিকাও চিৎকার করে উঠল, ছাড়া আমাকে!
বাইরে বেরোনোর দরজাটার দিকে এগিয়ে গেল রবিন। নবে হাত রেখে ফিরে তাকাল কণিকার দিকে। বড়
রবিন! ককিয়ে উঠল কণিকা। আমাকে বাঁচাও!
টানতে টানতে ওকে দরজার দিকে নিয়ে চলল মুসা। রবিনকে বলল, খোলো! খোলো!
ছাড়া পাওয়ার জন্যে রীতিমত যুদ্ধ শুরু করে দিল কণিকা। লাথি মেরে, আঁচড়ে, খামচে অস্থির করে তুলল মুসাকে। হাত ঝাড়া দিল। শরীর মোচড়াতে লাগল। কি করছ তুমি? ছাড়ো আমাকে!
আর দ্বিধা করল না রবিন। একটানে খুলে ফেলল দরজার পাল্লা। ওপরে উঠে গেছে কংক্রীটের সিঁড়ি। রোদ উঠেছে। সিঁড়ির মাথায় এসে পড়েছে উজ্জ্বল রোদ।
কেঁদে উঠল কণিকা, তুমি না বললে এখনও বৃষ্টি হচ্ছে। কই? মিথ্যে কথা বললে কেন? কি করতে চাও তোমরা?
মুসার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠল সে। কিন্তু পারল না। কব্জিতে আরও শক্ত হয়ে চেপে বসল মুসার আঙুল।
ধাক্কা দিয়ে ওকে দরজার বাইরে বের করে দিল মুসা। ওপরে এনে ঠেলে দিল রোদের মধ্যে।
চিৎকার করে উঠল কণিকা।

.

চোখ মুদে ফেলল মুসা। হঠাৎ করে রোদ পড়াতে মেলে রাখতে পারল না। মাথা সামান্য সরিয়ে নিয়ে আবার মেলল চোখ।
খাইছে! নিজের অজান্তেই মুসার মুখ থেকে বেরিয়ে এল শব্দটা। ভাবতেই পারেনি এমন কিছু ঘটবে।

দিব্যি রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে কণিকা। হাসিমুখে তাকিয়ে আছে মুসার দিকে। কিছুই হয়নি ওর।
খাইছে! আবার বলল মুসা। ঝুলে পড়ল নিচের চোয়াল। কণিকার গায়ে আগুন ধরছে না। বোমার মত ফেটে যাচ্ছে না।
সকালের রোদে চকচক করছে কণিকার কালো চুল। চোখের ওপর হাত এনে রোদ আড়াল করে জিজ্ঞেস করল, হয়েছে? তোমার প্রশ্নের জবাব পেয়েছ?
মুসা ভেবেছিল রবিন রেগে উঠবে। কিন্তু উঠল না। বরং সহানুভূতির দৃষ্টিতে তাকাল ওর দিকে। বলল, আমার শরীরটা ভাল থাকলে আজই তোমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতাম।
কথা বলার জন্যে মুখ খুলেও বন্ধ করে ফেলল মুসা। কথা খুঁজে পেল না।
আনমনে নিচের ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে দুজনের পাশ কাটিয়ে আবার বেসমেন্টে ফিরে চলল কণিকা। সিঁড়ির গোড়ায় নেমে ফিরে তাকিয়ে বলল, আমি যে ভ্যাম্পায়ার নই, আর কোন সন্দেহ আছে?
রবিন বলল, মুসা, তুমি বরং রকি বীচে ফিরে যাও…
না, যেতে হবে না, ক্লান্ত ভঙ্গিতে একটা টুলে বসে পড়ল কণিকা। বসো। কথা আছে।
মুসা আর রবিন যার যার আগের জায়গায় বসল।
আমি কিছু বুঝতে পারছি না, গলায় জোর নেই মুসার। ধাক্কাটা হজম করতে পারেনি এখনও। ভুলটা কোথায় করলাম?
ভুলটা তোমার মগজে, রবিন বলল। গাধার মত তোমার কথা শুনতে গেছিলাম! কিছু মনে কোরো না, কণিকা। আমি দুঃখিত। ও আমাকে এমন করে বোঝাতে লাগল…
ভুল করেনি ও, রবিনকে অবাক করে দিয়ে বলল কণিকা। ভ্যাম্পায়ার এখানে সত্যি আছে। সেজন্যেই এখানে এসেছি আমি। ওগুলোর অত্যাচার বন্ধ করতে।
কণিকা… তাকিয়ে আছে মুসা। তুমি..
মুচকি হাসল কণিকা। হাত বাড়িয়ে চেপে ধরল কালো চুল। টান দিয়ে খুলে আনল। বেরিয়ে পড়ল কোকড়া কালো চুল। এক এক করে প্লাস্টিকের নকল নাক, নকল দাঁত, গালে লাগানো রবারের আলগা চামড়া, গালের ভেতর দিকে লাগানো প্যাড় খুলে নিয়ে রাখল পাশের একটা বাক্সের ওপর। হাসিমুখে তাকাল দুই সহকারীর দিকে।
কিশোর! একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল মুসা আর রবিন।
আস্তে! চট করে দরজার দিকে চোখ চলে গেল কিশোরের। মেয়েলী কণ্ঠস্বর আর নেই। তার স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, কেউ শুনে ফেলবে! মুসার দিকে তাকিয়ে ভুরু

নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল, তা শেষ দিকের অভিনয়টুকু কেমন লাগল?
হাঁ করে তাকিয়ে আছে মুসা। কথা নেই মুখে।
অভিনয় কিশোরের জন্মগত ক্ষমতা। ছদ্মবেশ নেয়ার ক্ষমতাও অসাধারণ। গ্রীনহিলসে থাকতে বহুবার এর প্রমাণ পেয়েছে ওরা। পুলিশম্যান ফগর্যাম্পারকটকে কত যে নাকানি-চুবানি খাইয়েছে। ওকে এ রকম ছদ্মবেশ নিতে দেখে যত না অবাক হলো, তার চেয়ে বেশি হলো এই বেশে ওকে স্যান্ডি হোলোতে দেখে।
তোমার না রাশেদ চাচার সঙ্গে কোথায় যাওয়ার কথা? অবশেষে কথা খুঁজে পেল মুসা।
ছিল, কিন্তু যাইনি।
সে তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু কেন?
রিকির মৃত্যুটা ভাবিয়ে তুলেছিল আমাকে। তার ওপর দেখলাম জিনার অবস্থা। তোমার মুখে সব শুনেও ভ্যাম্পায়ারের কথা বিশ্বাস করিনি। তবে বুঝতে পারছিলাম রহস্যময় কিছু ঘটছে এখানে। একটা কথা মনে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে পুরানো পত্রিকা ঘাটাঘাটি শুরু করলাম। শিওর হয়ে গেলাম, আমার ধারণাই ঠিক হবে।... তোমাদের না জানিয়ে ছদ্মবেশে আসার কারণ, ভ্যাম্পায়ারের নজরে পড়তে চাইনি। বরং আমি ওদের খুঁজে বের করে ওদের দলে মিশে যেতে চেয়েছিলাম...
কিন্তু আমাদের জানিয়ে এলে কি অসুবিধে হত? মুসা বলল, আমরা না চেনার ভান করতাম।
পারতে না। স্বাভাবিক আচরণ করতে পারতে না কোনমতেই। এতটা বড় অভিনেতা তোমরা নও। আমি চাচ্ছিলাম, তুমি অন্তত আমাকে সন্দেহ করো। ভ্যাম্পায়ার ভাব। তাহলে ভ্যাম্পায়াররা আর আমাকে সন্দেহ করবে না। কারণ জন আর লীলার মৃত্যুর ব্যাপারে তোমাকে সন্দেহ করবে ওরা, বুঝতে পেরেছিলাম। কার কার সঙ্গে তোমার খাতির, জেনে যেত সহজেই। ওদের সন্দেহের আড়ালে থেকে কাজ করতে চেয়েছিলাম আমি।
সফল হয়েছ?
তা বলতে পারো।
তারমানে তুমি বলতে চাইছ ভ্যাম্পায়ার সত্যি সত্যি আছে এখানে। রবিনের কণ্ঠে অবিশ্বাস।
কেন, মুচকি হাসল কিশোর, আমাকেও মুসার মত পাগল মনে হচ্ছে। নাকি? তারপর সিরিয়াস হয়ে গেল। হ্যাঁ, ভ্যাম্পায়ার সত্যি সত্যি আছে। এখানে। ওগুলোর শয়তানী বন্ধ করতে না পারলে আরও কত মানুষকে যে খুন করবে

ওরা, তার কোন ঠিকঠিকানা নেই। রক্তের নেশায়, বিশেষ করে ক্ষমতার নেশায় ওরা উন্মাদ। ওরা আমাকে ওদের দলের মনে করেছে। দুবার সন্দেহ করে ধরে ফেলেছিল প্রায়, অল্পের জন্যে বেঁচে গেছি। ইমি আর অ্যানিকে ওরাই খুন করেছে। মিসেস রথরককেও। প্রথম দুজন খুন হওয়ার আগে কিছু জানতে পারিনি। কিন্তু মিসেস রথরকের ব্যাপারটা আঁচ করে ফেলেছিলাম। যখন গেলাম, দেরি হয়ে গেছে। বাঁচাতে আর পারলাম না। অল্পের জন্যে।
কারা করেছে এ কাজ? রাগে কাঁপছে মুসা। রিকির লাশটা ভেসে উঠল চোখের সামনে। ওর নিরীহ, লাজুক হাসিটা স্পষ্ট দেখতে পেল।
কিমি আর ডলি।
লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল মুসা। বুকের মধ্যে দাপাতে শুরু করেছে। হৃৎপিণ্ডটা। ডলি!
বসো। মাথা ঠাণ্ডা করো। কিমি আর ডলি দুজনেই ভ্যাম্পায়ার। আমাকে সন্দেহ করলে, আর ডলিকে চিনতে পারলে না?
আনমনে মাথা নাড়তে নাড়তে বিড়বিড় করল মুসা, ডলি! কিমি।
রক্তের নেশায়, খিদেয় পাগল হয়ে গিয়েছিল দুজনে। ইমি আর অ্যানিকে সৈকতে একা পেয়ে রক্ত শুষে ছিবড়ে বানিয়ে ফেলেছিল। হুঁশ ছিল না যে মরে যাবে। কিংবা খিদের ঠেলায়, কেয়ারই করেনি। একই কাণ্ড করেছে মিসেস রথরকের বেলায়ও।
আমার বিশ্বাস হচ্ছে না, মাথা নাড়ল রবিন। কিশোর, সব কথা যদি খুলে না বলল, তুমিও পাগল হয়ে গেছ ভাবতে বাধ্য হব। ভাবব, স্যান্ডি হোলোতে এসে মুসা আর জিনাকে যে রোগে ধরেছে, তোমাকেও সেই রোগে ধরেছে। সত্যি কি তুমি ভূত বিশ্বাস করছ?
মাথা নাড়ল কিনোর, না। তবে ভ্যাম্পায়ার বিশ্বাস করছি। কারণ, আছে ওরা। নিজের চোখে দেখেছি। তবে এ ভ্যাম্পায়ার ভূত নয়, ভূতেরও বাড়া, মানুষরূপী পিশাচ। সেই প্রাচীনকাল থেকেই ব্ল্যাক ম্যাজিক, জাদুটোনায় বিশ্বাস করে আসছে মানুষ। ভেবেছে, শয়তানের উপাসনা করে তাকে ভজাতে পারলে বিপুল ক্ষমতার অধিকারী হওয়া যায়। ভ্যাম্পায়ার হওয়ার চিন্তাও সেই বিশ্বাসেরই কুফল।
ব্রাম স্টোকার ড্রাকুলা লেখার বহু আগে থেকেই ভ্যাম্পায়ারের কথা জানত মানুষ। বিশেষ করে জার্মানী আর তার আশপাশের কয়েকটা দেশের লোকে। তারা নানা রকম পূজা-অর্চনার মাধ্যমে ভ্যাম্পায়ার হতে চাইত। ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার জন্যে। তাদের আরও একটা বিশ্বাস ছিল, এই ক্ষমতা লাভ করতে পারলে অনন্তকাল বেঁচে থাকা যাবে। তবে এর জন্যে কিছুদিন বেশ কষ্ট করতে হবে। কিছু ক্রিয়াকর্ম পালন করতে হবে, বিধিনিষেধ মেনে চলতে হবে।

আসল ভ্যাম্পায়ার যা করে থাকে বলে ওদের বিশ্বাস, সেসব ওদের মত করেই পালন করতে হবে। কোন রকম উল্টোপাল্টা করলে চলবে না। এই যেমন দিনের বেলা কফিনে শুয়ে থাকা, সন্ধ্যার পর বেরিয়ে রক্ত খাওয়া–সাধনা চলাকালে অন্য কোন রকম খাবার খাওয়া চলবে না, তাহলে সব মাটি। মোট কথা ভ্যাম্পায়ার যা যা করে, ঠিক তাই তাই করতে হবে। আসল ভ্যাম্পায়ার যেহেতু ভূত, তার অনেক ক্ষমতা, কিন্তু বাস্তব মানুষের তো আর সে-ক্ষমতা নেই। মানুষের রক্ত খাওয়ার জন্যে তাই নানা কৌশল আর ওষুধের আশ্রয় নিতে হয়। শিকারের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাকে সম্মোহন করে ভোলাতে হয়, সুযোগমত ওষুধ শুকিয়ে তাকে বেহুশ করতে হয়, তারপর দাতে লাগানো কৃত্রিম ধাতব দাঁত দিয়ে গলার শিরা ফুটো করে রক্তপান করতে হয়। অকাল্টের বই পড়ে জেনেছি এ সব।

যাই হোক, পুরানো আমলেও গুরু থাকত এদের, এখনও আছে। এখানে যে দলটা আছে, তাদের গুরুর নামটা নিশ্চয় শুনেছ তোমরা, বেশ গালভরা–কাউন্ট ড্রাকুলা...

কোথায় আছে ব্যাটা! দাঁতে দাঁত চাপল মুসা। নাম বলো। ধরে এয়সা ধোলাই দেব...।

বলছি, হাত তুলল কিশোর, তাকে কোনমতেই ছাড়া হবে না। তবে আগে জানতে হবে কোথায় আছে সে, কোন ঠিকানায়। চ্যালাগুলোকে পুলিশে ধরে ধোলাই দিলেই সুড়সুড় করে নাম বলে দেবে।

তাহলে চলো, এখনই ধরব। কিমি আর ডলি তো? দুই মিনিটও লাগবে। কাবু করে ফেলতে। থাকে কোনখানে?

কেন, আন্দাজ করতে পারছ না? জন আর লীলা কোনখানে ছিল?

ভ্যাম্পায়ারের দ্বীপ!

হ্যাঁ, এতে অবাক হওয়ার কি আছে? ঘাটি হিসেবে এত চমৎকার জায়গা আশেপাশে আর কোথায় আছে?

তা বটে। আমি মনে করেছি, জন আর লীলাকে যেহেতু ওখানেই খতম করা হয়েছে, জায়গা পাল্টাবে ওরা, ধরা পড়ার ভয়ে ওখানে থাকতে আর সাহস করবে না...কিন্তু বাড়িটা তো পুড়ে গেছে?

একটা পুড়েছে। আরও অনেক বাড়ি আছে ওখানে।

চলো তাহলে। এখনই যাব।

অত তাড়াহুড়া নেই। সারারাত জেগে ওরা দিনের বেলা বেহুশের মত ঘুমাবে কফিনের মধ্যে। তৈরি হয়ে যেতে হবে আমাদের। সারারাত জেগেছি, আমাদেরও কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়া দরকার। তারপর বেরোব। বলা যায় না, কিমি আর ডলি বাদেও ওখানে আরও লোক থাকতে পারে। কাউন্ট ড্রাকুলা নামে বদমাশটাও

হয়তো ওই দ্বীপেই থাকে, ভিন্ন কোন বাড়িতে। লড়াই করে ওদের কাবু করতে হলে শক্তি দরকার।
গলায় হাত বোলাতে বোলাতে রবিন বলল, আমার গলার দাগ দুটো তাহলে কিসের? নিশ্চয় পোকার কামড়ই হবে। আমি তো রাতে একা ওই দুই ভ্যাম্পায়ারের কারও ত্রিসীমানায়ও যাইনি।
তুমি না গেলে কি হবে? ভুরু নাচাল কিশোর। ওরা এসেছিল তোমার কাছে। ডলির কাজই হবে। ওটার খিদেই বেশি। তুমি এমনিতে অসুস্থ মানুষ। রাতের বেলা মরার মত ঘুমিয়েছ। চুরি করে বোর্ডিঙে তোমার ঘরে ঢুকে তখন রক্ত খেয়ে এসেছে। ঘুমের মধ্যেই ওষুধ শুকিয়ে নিশ্চয় বেহুশ করে নিয়েছিল তোমাকে। সেটা করা এমন কোন কঠিন কাজ নয়।
শয়তানের দল! শিউরে উঠল রবিন।
তোমাকেও খতম করে দিত ওরা। বেঁচে গেছ মুসার জন্যে। ও তোমার ওপর এমনভাবে চোখ রাখা আরম্ভ করেছিল, বেশি সাহস করতে পারেনি ডলি। ধরা পড়ে যাবার ভয়ে।
কৃতজ্ঞ চোখে মুসার দিকে তাকাল রবিন। আবার ফিরল কিশোরের দিকে। টনির কিছু করল না কেন তাহলে কিমি?
ওই একই কারণ, ধরা পড়ার ভয়। পিছে পিছে থেকে সিসি বাঁচিয়ে দিয়েছে ভাইকে। তবে টনিকেও ছাড়ত না ওরা। সুযোগমত ঠিকই সাবাড় করত। ওকে খাঁচায় পোরা মুরগী ভেবেছিল আরকি। যখন ইচ্ছে খাওয়া যাবে।
ঘড়ি দেখল কিশোর। চলো। অনেক বকবক করা হয়েছে। ঘুমানো দরকার।
ঘুমের কথায় হঠাৎ আবার দুর্বল বোধ করতে লাগল রবিন। এতক্ষণ উত্তেজনায় খেয়াল ছিল না। মুসার দিকে তাকাল, একা যেতে সাহস পাচ্ছি না।
হাসল মুসা, ভ্যাম্পায়ারের ভয়?
না, ভীষণ দুর্বল লাগছে। মাথা ঘুরে যদি পড়ে যাই।
চলো। আমি যাচ্ছি সঙ্গে।

.
টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে। দড়ি খুলল মুসা। লাফ দিয়ে উঠে পড়ল নৌকায়।
কিশোর আগেই উঠে বসে আছে।
ডক হাউসের ভেতরে মৃদু ঢেউয়ে দুলছে নৌকা।
হুডওয়ালা প্লাস্টিকের রেইন কোট পরে এসেছে দুজনেই। হুড তুলে দিয়ে শক্ত হয়ে বসল মুসা।
মাত্র দুপুর হয়েছে। কিন্তু কালো মেঘে এতটাই ভারী হয়ে গেছে আকাশ, প্রায় রাতের মত অন্ধকার। দাঁড়ের আঙটায় দাঁড় ঢুকিয়ে দিয়ে বাইতে শুরু করল সে।

গলুইয়ের কাছে বসেছে কিশোর। এদিকে মুখ করে। শক্ত হয়ে আছে। চোয়াল। চোখে কঠিন দৃষ্টি। বোঝা যাচ্ছে বন্ধুদের খুনের প্রতিশোধ নিতে মুসার মতই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সে।
রবিন এলে ভাল হত। সাহায্য করতে পারত। কিন্তু এতটাই অসুস্থ সে, বিছানা থেকে উঠতে কষ্ট হয়। তা ছাড়া সারারাত জেগে থাকার উত্তেজনা আর পরিশ্রমে আরও বেশি কাহিল হয়ে পড়েছে।
নৌকার পাটাতনে পড়ে আছে দুটো নাইলনের ব্যাগ। দুটোতে একই জিনিস আছে। কাঠের চোখা গজাল। বড় হাতুড়ি। ভ্যাম্পায়ার ধ্বংস করার সরঞ্জাম। কিশোরের বুদ্ধিতে নেয়া হয়েছে এসব। এগুলো দিয়ে কি করবে কিশোর, জানে না মুসা। বেকায়দায় পড়লে খুন করবে নাকি মানবভ্যাম্পায়ারের বুকে গজাল ঢুকিয়ে!
রোদ থাকলে ভাল হত, কিশোর বলল। বিচ্ছিরি আবহাওয়া।
ভ্যাম্পায়ারের জন্যে চমৎকার।
কি জানি। চাঁদনী রাতে বেরিয়েও ভ্যাম্পায়াররা আনন্দ পায়।
পাবেই। আধামানুষ তো! মানুষেরা যাতে যাতে আনন্দ পায়, ওরাও পায়।
মানুষেরা মানুষের রক্ত খায় না।
কে বলল? নরখাদকদের কাহিনী ভুলে গেছ? এই শতকের গোড়ার দিকেও আফ্রিকার জঙ্গল আর প্রশান্ত মহাসাগরের অনেক দ্বীপে মানুষখেকো মানুষের সন্ধান পাওয়া গেছে।
তা ঠিক, আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকাল মুসা। মনে হচ্ছে আগামী পুরো হপ্তাটায়ই বৃষ্টি থাকবে। থাকুকগে। ভ্যাম্পায়ারগুলোকে খতম করতে পারলে আর থাকব না এখানে। বাড়ি ফিরে যাব।
মাথা ঝাঁকাল কিশোর, কিন্তু যে হারে অন্ধকার হচ্ছে...
বৃষ্টির বেগ খানিকটা বাড়ল। রেইন কোর্টের ওপর ফোঁটা পড়ার একটানা আওয়াজ হতে থাকল পুট পুট করে। সাগর শান্ত। ঢেউ এতই কম, হ্রদের পানির মত লাগছে। তাতে সুবিধে হয়েছে। নৌকার গতি বেশি। দ্রুত এগিয়ে চলেছে দ্বীপের দিকে।
ভয় লাগছে? জিজ্ঞেস করল মুসা।
হ্যাঁ। তবে কাজ সারতেই হবে। স্যান্ডি হোলোতে এই ভ্যাম্পায়ারের ব্যবসা খতম করে ছাড়ব আজ। তোমার ভয় লাগছে না?
না, হাসল মুসা। ভয় তো ভূতকে। মানুষকে আবার কিসের ভয়?
কিন্তু মানুষকেই ভয় করা উচিত। কারণ ওরা বাস্তব। ক্ষতি করার ক্ষমতা সীমাহীন।

চুপ হয়ে গেল মুসা। এই তর্কের শেষ নেই। সে ভুত বিশ্বাস করে, কিশোর করে না। অতএব যুক্তি দেখানোরও শেষ হবে না।
কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে তাকিয়ে দ্বীপটা দেখল মুসা। কাছে চলে এসেছে। মেঘলা অন্ধকারের মধ্যে সামনে খাড়া হয়ে রয়েছে কালো দেয়ালের মত। জিনাকে নিতে এসে রাতের বেলা দেখেছিল সেদিন। দিনের বেলা অনেক বেশি ভয়ঙ্কর মনে হলো আজ।
দেখেই মনে হয় শয়তানের ঘাটি, কিশোর বলল।
হ্যাঁ, সত্যি সত্যি শয়তান বাস করে ওখানে।
আরও কাছে এলে গাছগুলোকে আলাদা করে চেনা গেল। দ্বীপের কিনারে ঘন হয়ে জন্মেছে বড় বড় গাছ।
বরফ শীতল এক ফোঁটা ঘাম ঝরে পড়ল মুসার কপাল থেকে। কেঁপে উঠল সে।
পুরানো ডকটা রাতের বেলা দেখেছে। কোনখানে ছিল, মনে করতে পারল না। আন্দাজে এগিয়ে চলল। তীরের একপাশ থেকে আরেক পাশে চোখ বোলাল। কিন্তু দেখতে পেল না ওটা।
কোথায়? কোনখানে ছিল?
তীরের আরও কাছে চলে এল নৌকা।
নাহ, নেই! গায়েব!
কি গায়েব? জানতে চাইল কিশোর।
ডকটা…ওহহো, না না আছে। মানে, ছিল।
করাতে কাটা কতগুলো তার মাথা পানি থেকে উঁকি দিয়ে আছে। বুঝিয়ে দিচ্ছে কোন্‌খানে ছিল ডকটা। এমনভাবে কেটে নষ্ট করে ফেলেছে, নৌকা বাঁধারও কিছু নেই।
ভ্যাম্পায়ারেরাই কেটে ফেলেছে, মুসা বলল। নৌকা নিয়ে কেউ এসে যাতে ওদের গোপন ঘাঁটি খুঁজে বের করে হামলা চালাতে না পারে সেজন্যেই এই সতর্কতা। নিজেদের নৌকা ভেতরে কোন খাড়িটাড়িতে লুকিয়ে রাখে।
তাহলেই বোঝো, চোখের পাতা সরু করে ফেলল কিশোর। এই একটা ব্যাপার থেকেই বোঝা যায় ওঁরা ভুত নয়; মানুষ। কিন্তু ওরা কিছু সন্দেহ করে ফেলল নাকি? আমরা আসব বুঝতে পেরেছে।
অসম্ভব নয়। সাবধানে তীরের কাছে নৌকা নিয়ে এল মুসা। টেনে তোলার জায়গা খুঁজতে লাগল। বড় বড় পাথর আর পাথরের খাড়া দেয়াল ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ল না।
সাঁতরে উঠলে কেমন হয়? কিশোরের প্রশ্ন।

নৌকাটা কোথায় রেখে যাব? নোঙর নেই। ভেসে চলে যাবে। তখন ফিরব কি করে?
দ্বীপটার যে পাশে খোলা সাগর, সেদিকে নৌকা নিয়ে গেল মুসা। ওপাশে বড় বড় ঢেউ। লোফালুফি শুরু করে দিল যেন নৌকাটাকে নিয়ে। এখনই ঢেউয়ের মাথায় চড়ছে নৌকা, পরক্ষণেই ঝপাৎ করে একেবারে নিচে দুই ঢেউয়ের মাঝখানের উপত্যকায়, তারপর আবার ওপরে। চলতেই থাকল এ রকম। মোচার খোলার মত দুলছে। গলুইয়ে বাড়ি খেয়ে পানি ছিটকে এসে পড়ছে চোখে মুখে।
খোলা সাগরে বেরোনোর উপযুক্ত নয় এই নৌকা, শঙ্কিত হয়ে বলল কিশোর। দুই হাতে দুদিকের কিনার চেপে ধরে রেখেছে। ভেতরের দিকটাতে থাকাই উচিত ছিল।
তীরের কাছে একটা পরিবর্তন চোখে পড়ল মুসার। চিৎকার করে উঠল, দেখো, ঢোকার মুখ!
কিশোরও দেখল। একটা খালমত ঢুকে গেছে দ্বীপের ভেতরে।
ওটার দিকে নৌকা বাইতে লাগল মুসা। ঢেউয়ের জন্যে বাইতে খুব অসুবিধে হচ্ছে। কিন্তু হাল ছাড়ল না সে।
খালের প্রবেশ মুখে ঢুকতেই ঢেউয়ের অত্যাচার কমে গেল। মাথার ওপর খাড়া হয়ে আছে বড় বড় গাছ। ছাতার মত ছড়িয়ে আছে ডালপালা। কিছু ডাল পানির ওপর ঝুঁকে পড়ে পানি ছুঁই ছুঁই করছে।
কুচকুচে কালো লাগছে পানির রঙ। তার ওপর দিয়ে নিঃশব্দে ভেসে এগিয়ে চলল নৌকা। আগের বারের কথা মনে পড়ল মুসার। রাত ছিল। মাথার ওপরে উড়ছিল অগণিত বাদুড়। বনের ভেতর থেকে ভেসে আসছিল নেকড়ের ডাকের মত ডাক। বাদুড়রা দিনে ওড়ে না, কিন্তু নেকড়ে যে কোন সময় হামলা চালাতে পারে। যদিও এখন ডাক শোনা যাচ্ছে না, তবু। সাবধান থাকতে হবে। কোন্‌দিক দিয়ে এসে ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে কোন ঠিক নেই। তা ছাড়া মেঘলা বনের চেহারা রাতের চেয়ে কম ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে না।
ওদিকে নিয়ে যাও, হাত তুলে দেখাল কিশোর। বন ওখানে ঢালু হয়ে নেমে এসেছে পানিতে। নৌকা রেখে যাওয়ার উপযুক্ত জায়গা।
নৌকার মুখ ঘুরিয়ে দিল মুসা। নরম মাটিতে ঠেকল নৌকার তলা। লাফ দিয়ে মাটিতে নেমে দড়িটা একটা গাছের ডালে বেঁধে ফেলল সে।
ব্যাকপ্যাক দুটো ওর দিকে ছুঁড়ে দিল কিশোর। তীরে নামল।
ভারী দম নিল মুসা। বাতাসে একধরনের ভেজা ভেজা ভাপসা গন্ধ। যাব?
মাথা ঝাঁকাল কিশোর। উত্তেজনায় চকচক করছে চোখ।

দ্বীপটা যে এত ছোট, আগে বোঝেনি মুসা। আগের বার পুড়িয়ে রেখে যাওয়া বীচ হাউসটার কাছে পৌঁছতে কয়েক মিনিটও লাগল না। ওটার দিকে। এগোতে গিয়ে আরও কতগুলো প্রায় একই ধরনের বাড়ি চোখে পড়ল। বাড়ি মানে বাড়িঘরের কঙ্কাল, ধ্বংসাবশেষ।
কফিনগুলো খুঁজে বের করব কি করে? ঘড়ির দিকে তাকাল মুসা। বিকেল তো হয়ে এল। দুজন দুদিকে গিয়ে খুঁজব নাকি? তাতে সময় বাঁচবে।
সত্যি কি লাভ হবে তাতে? ব্যাগটা হাত বদল করল কিশোর।
একা হতে ভয় পাচ্ছ নাকি?
দ্বিধা করল কিশোর। মাথা ঝাঁকিয়ে স্বীকার করল, পাচ্ছি না বলা যাবে না। খুনীদের সঙ্গে লাগতে এসেছি আমরা। সাধারণ খুনী নয়, একেবারে পিশাচ, জীবন্ত মানুষের গা থেকে রক্ত চুষে চুষে খেয়ে খুন করে। ওদের পক্ষে সব সম্ভব। এটা ওদের রাজত্ব। ধরে, বেধে রক্ত খেয়ে যদি লাশগুলো সাগরে ভাসিয়ে দেয় কিচ্ছু করার থাকবে না আমাদের।
ধরো কফিনে শোয়া অবস্থায় পাওয়া গেল ওদের। কি করব? গজাল ঢুকিয়ে দেব হৃৎপিণ্ডে?
না। খুন হয়ে যাবে সেটা। শুধু ভয় দেখাবে।
যদি ভয় না পায়?
পিটিয়ে বেহুশ করার চেষ্টা করবে।
তারপর?
কফিনের ডালা আটকে রেখে চলে যাব, যাতে বেরোতে না পারে। পুলিশ নিয়ে ফিরে আসব।
একে অন্যকে গুডলাক বলে দুজন দুদিকে রওনা হয়ে গেল। কিছুদূর গিয়ে ফিরে তাকিয়ে মুসা দেখল, কালো একটা বাড়ির কঙ্কালের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে কিশোর। ঘুরে দাঁড়াল মুসা। ডানের আরেকটা কঙ্কালের দিকে এগিয়ে চলল সে। দরজার কাছে এসে দ্বিধা করল। তারপর যা থাকে কপালে ভেবে ঢুকে পড়ল ভেতরে।
ঘুটঘুটে অন্ধকার। চোখে সইয়ে নেয়ার জন্যে দাঁড়াল। কয়েক সেকেন্ড পরেই বুঝতে পারল, ঘরে আরও কেউ রয়েছে।

.

দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল মুসা।
তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সামনের অন্ধকারের দিকে। ব্যাগটা হাতে ঝোলানো। চেন খুলে গজাল বের করতে সময় লাগবে। ততক্ষণে আক্রমণ করে বসবে ঘরে যে আছে। ডলি কিংবা কিমিকে ভয় করে না সে। দুটো মেয়ে কিছুই করতে পারবে

না ওর। তার ভয়, কাউন্ট ড্রাকুলাকে। পালের গোদা। পুরুষ মানুষ। সঙ্গে পিস্তল থাকা অস্বাভাবিক নয়।
খুট করে একটা শব্দ হলো।
তাকাল সেদিকে।
খুব আবছাভাবে নড়াচড়া চোখে পড়ল। মৃদু গরগর কানে এল। রেগে গেলে কুকুর যা করে।
হঠাৎ বুঝে ফেলল প্রাণীটা কি। নেকড়ে!
মহাসঙ্কটে পড়ে গেল মুসা। কি করবে? এগোনোর প্রশ্নই ওঠে না। পিছানোও বিপদ। মুহূর্তে এসে আক্রমণ করে বসবে নেকড়েটা।
জিম করবেটের মানুষখেকো বাঘ শিকারের কাহিনী মনে পড়ল। চৌগড়ের ভয়াবহ বাঘিনীর মুখোমুখি হয়ে গিয়েছিলেন একবার তিনি। হাতে ছিল রাইফেল। বাঘিনীটা এতটাই কাছে ছিল তাঁর, কোন রকম নড়াচড়া করতে গেলেই ঝাঁপিয়ে এসে পড়ত। খুব ধীরে ধীরে হাতের রাইফেলটা ঘুরিয়ে টার্গেট করে তারপর গুলি করেছিলেন।
সেই বুদ্ধিটাই কাজে লাগাল এখন সে। খুব ধীরে যেন অনন্তকাল ধরে। চেষ্টা করে নেকড়েটাকে চমকে না দিয়ে হাতের ব্যাকপ্যাকটা প্রায় পেটের ওপর নিয়ে এল। অন্য হাতটা আনল চেনের ওপর। করবেটের মত অতটা সাবধান থাকতে পারেনি, নড়াচড়া বোধহয় একটু বেশি হয়ে গিয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে গেল নেকড়ের গরুগরানি। হাতটা যেভাবে আছে সেভাবেই রেখে দিল সে। একেবারে স্থির। গরগর কমলে চেন খুলতে শুরু করল। ব্যাগের ভেতর হাত ঢোকাল। আঙুলে ঠেকল হাতুড়ির বাট। ঠিক এই সময় আক্রমণ করে বসল নেকড়ে।
একসঙ্গে কয়েকটা ঘটনা ঘটে গেল। হাত থেকে ব্যাগটা ছেড়ে দিল মুসা। টান দিয়ে বের করে আনল হাতুড়ি। নেকড়েটা এসে ওর গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগেই হাতুড়ি ঘুরিয়ে আন্দাজে বাড়ি মারল।
থ্যাপ করে একটা আওয়াজ হলো। বাড়িটা লাগল নেকডের পেটে। ভয়ঙ্কর গর্জন করে মুসার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ওটা।
পড়ে গেল মুসা। হাতুড়ি ছাড়ল না। চিত হয়ে পড়েছে। ওই অবস্থাতেই আবার বাড়ি মাবল লাগল নেকড়ের গলায়। প্রচণ্ড ব্যথায় আবার গর্জে উঠে থমকে গেল প্রাণীটা। পরক্ষণে দাঁত বের করে মুসার টুটি কামড়ে ধরতে এলো।
নাকে মুখে বাড়ি মারতে লাগল মুসা। তেলে দিল কটা। দরজা দিয়ে আসা আলোয় দেখতে পেল রক্ত বেরোচ্ছে নেকড়ের নাক থেকে। গুঙিয়ে উঠল ওটা। ভীষণ রাগে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল মুসার বুকে।

কানের পাশে বাড়ি মারল মুসা। মোক্ষম আঘাত। কাত হয়ে পড়ে গেল নেকড়েটা। ঠেলা মেরে বুকের ওপর থেকে নেতিয়ে পড়া প্রাণীটাকে সরিয়ে দিয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। মরেনি এখনও। চোখ মিটমিট করে তাকাচ্ছে। ব্যথাটা সহ্য হয়ে গেলেই আবার উঠে দাঁড়াবে। আবার কামড়ে ছিঁড়তে আসবে ওকে। সুযোগ দেয়া যাবে না। তাড়াতাড়ি ব্যাকপ্যাক থেকে একটা কাঠের গজাল বের করে চোখা মাথাটা ঠেসে ধরল নেকড়ের হৃৎপিণ্ড বরাবর। বাড়ি মেরে মেরে ঢুকিয়ে দিল যতখানি যায়।

থরথর করে কেঁপে উঠল নেকড়ের শরীরটা। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল গজালের চারপাশ থেকে। ঠিক মুমূর্ষ কুকুরের মত আর্তনাদ বেরিয়ে আসতে লাগল মুখ দিয়ে।

গজাল বেঁধা নেকড়ে! ভয়ানক দৃশ্য তাকাতে পারল না আর মৃণা! নেকড়ের মতই থরথর করে কাঁপতে লাগল সে-ও। মায়াই লাগছে প্রাণীটার। জন্যে। না মেরে উপায় ছিল না। না মারলে তাকে মরতে হত।

ব্যাকপ্যাকটা তুলে নিয়ে হাতুড়ি হাতে ছুটে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। ভেতরে আর কেউ আছে কিনা দেখারও প্রয়োজন বোধ করল না। ভয়ঙ্কর নেকড়ের সঙ্গে একঘরে বাস করার কথা নয় কারও।

কথাটা মনে হলো এই সময়–পোষা নেকড়ে নয় তো ওটা? তাই হবে। নইলে এত বিপজ্জনক একটা প্রাণীর সঙ্গে বাস করার সাহস হত না কিমি আর ডলির। তা ছাড়া এই দ্বীপে নেকড়ে আসবেই বা কোথা থেকে। দ্বীপ পাহারা দেয়ার জন্যেই রাখা হয়েছে প্রাণীটাকে। ঠিক। কাউন্ট ড্রাকুলার প্রহরী। ট্রানসিলভানিয়ার সেই দুর্গের মত। এর আগের বার যখন এসেছিল সে, তখনও ছিল ওটা। আগুনের ভয়ে নিশ্চয় কাছে আসেনি সেবার। একটাই আছে? না আরও? সাবধান থাকতে হবে। কোনদিক থেকে এসে ঘাড়ে পড়বে কে জানে। সাবধান থেকেও কতটা লাভ হবে বলা যায় না। দল বেঁধে এসে একযোগে আক্রমণ চালালে কিছুই করার থাকবে না ওর মুহূর্তে টেনে, ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে।

বাড়িটার কাছ থেকে সরে এসে দ্রুত অন্য বাড়ির খোঁজে হাঁটতে লাগল।

বুনো পথে চলতে গিয়ে দিরে বেলাতেও গা ছমছম করতে লাগল। ভূতুড়ে বন। সত্যি সত্যি ভূত থাকলেও এখানে অবাক হওয়ার কিছু নেই। ভয় তার শক্তি কেড়ে নিয়েছে যেন। পা দুটো অসম্ভব ভারী লাগছে। বুকের মধ্যে দুরুদুরু করছে।

পাওয়া গেল আরেকটা বাড়ি। একটা পাশ ধসে পড়েছে। ঢুকে কিছু পেল না।

একের পর এক বাড়িতে ঢুকে দেখতে লাগল সে। কোনটাতেই কফিন দেখল না। কিমি আর ডলিকে পেল না। যে ঘরেই তাক, আলমারি, সিন্দুক রয়েছে, কোনখানে খোঁজা বাকি রাখল না।

কিন্তু কিমিও নেই। ডলিও না। কোন চিহ্নই নেই ওদের। গেল কোথায়? কোন্‌খানে আছে?

ছোট্ট এক টুকরো খোলা জায়গায় এসে দাঁড়াল সে। ঘড়ি দেখল। তিনটে পঁয়তাল্লিশ। আগের বার যখন দেখেছিল, তখনও ছিল তিনটে পঁয়তাল্লিশ। হঠাৎ খেয়াল করল, সেকেন্ডের কাটাটা চলছে না। এই ব্যাপার! বন্ধ হয়ে গেছে। ঘড়ি। নেকড়ের সঙ্গে ধস্তাধস্তির সময় বাড়ি লেগে নিশ্চয়।

সময় বোঝার উপায় নেই আর। কতক্ষণ ধরে রয়েছে বলতে পারবে না। সূর্য ডোবার কত দেরি, তাও জানা গেল না।

বৃষ্টি থেমেছে। কিন্তু ভারী মেঘে ঢেকে রেখেছে আকাশ। সময় অনুমান করা কঠিন। তবে সন্ধ্যা বোধহয় হয়ে গেছে। আলো নিভে যাওয়ার আগেই কিমি আর ডলিকে খুঁজে বের করতে না পারলে আজকের মত ফিরেই যেতে হবে। রাতের বেলা অন্ধকারে ওদের খুঁজতে যাওয়াটা হবে চরম বোকামি। খুঁজে পাবেও না। ওদিকে মারাত্মক বিপদের ঝুঁকি নিতে হবে। আরও নেকড়ে থেকে থাকলে রাতের বেলা ভয়ানক বিপদে পড়বে।

কিশোর কোথায়? কাউকে নিশ্চয় খুঁজে পায়নি এখনও। তাহলে যোগাযোগ করত ওর সঙ্গে। নাকি বিপদে পড়ল? চিৎকার তো শোনা যায়নি।

খোলা জায়গাটায় দাঁড়িয়ে চারপাশে তাকাল মুসা। কোনদিকে যাবে বুঝতে চাইছে। বনের ভেতর থেকে ভেসে এল একটা কাঁপা কাঁপা ডাক। নেকড়ে! তারমানে আরও আছে! দূর থেকে শেয়ালের ডাকও অনেক সময় নেকড়ের মত লাগে। তবু, খারাপটা ভেবে রাখাই ভাল। প্রাণীটাকে নেকড়ে ধরে নিল সে।

রাতের আর কত বাকি? রাত পর্যন্ত কি অপেক্ষা করবে ওটা? একটাই আছে আর, না আরও বেশি?

ভুল করে আবার তাকাল ঘড়ির দিকে। তাকিয়েই মনে পড়ল নষ্ট। সেই তিনটা পঁয়তাল্লিশই বাজে। বাদুড়েরা এখনও বেরোয়নি। ওরা বেরোতে শুরু করলেই বুঝতে হবে সন্ধ্যা লেগে গেছে।

কিশোরকে ডাকার কথা ভাবল। চিৎকার করতে হবে তাহলে। নেকড়ের কানে যাবে সেই ডাক। হয়তো কিশোরের আগে ওরাই ছুটে আসবে। বনের ভেতর দিয়ে হাঁটতেও এখন ভয় লাগছে। কিন্তু উপায় নেই। নৌকার কাছে যেতে হলেও বনের ভেতর দিয়েই যাওয়া লাগবে।

নৌকা! তাই তো! এখান থেকে কতখানি দূরে, অনুমান করতে পারল না। সাগরের খোলা দিকটা দিয়ে খালে ঢুকেছিল। খুঁজে বের করতে সময় লাগবে। নেকড়ের তাড়া খেলে এখন পৌঁছতে পারবে না ওটার কাছে।

আতঙ্ক যেন চেপে ধরল ওকে। গাছপালার ফাঁকে ঘুরে বেড়াতে লাগল চঞ্চল দৃষ্টি। যেখানে দাঁড়িয়ে আছে জায়গাটা ঘাসে ছাওয়া। ভাল করে তাকাতে চোখে পড়ল একজায়গার ঘাস চ্যাপ্টা হয়ে আছে। কেউ মনে হয় হেঁটে গেছে এখান দিয়ে।
রাস্তা?
না, রাস্তা এখনও পুরোপুরি হয়নি। হেঁটে যাওয়ার ফলে একটা পায়ে চলা পথ তৈরি হচ্ছে। নেকড়ের কাজ?
ধূর! অত চিন্তা করে কিছু করতে পারবে না। নিজেকে ধমক লাগাল সে-যা হোক একটা কিছু করে ফেলো, নয়তো ভ্যাম্পায়ার খোঁজা বাদ দিয়ে মানে মানে কেটে পড়ো এখান থেকে।
কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে হাতুড়িটা বাগিয়ে ধরে পা বাড়াল সে। বনে এসে ঢুকল। বনটা এদিকে বেশ গভীর। এগিয়ে চলল গাছপালার মাঝখান দিয়ে। গায়ে বাড়ি লেগে সড়াৎ সড়াৎ করে সরে যাচ্ছে ডাল। পাতায় লেগে থাকা পানি মুহূর্তে ভিজিয়ে দিল শরীর। ঘন হয়ে জন্মে আছে মোটা মোটা লতা ঝুলে আছে রাস্তার ওপর। হাঁটতে গেলে জড়িয়ে ধরে।
এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে পড়তে বাধ্য হলো সে। সামনে ডালপাতা জড়িয়ে ধরে দুর্ভেদ্য দেয়াল তৈরি করে রেখেছে লতার দঙ্গল। তার ওপাশে বাড়ির দেয়ালের মত কি যেন চোখে পড়ছে। নিশ্চিত হওয়ার জন্যে ডাল সরিয়ে দেখতে যেতেই খোঁচা লাগল হাতে। কুটুস করে কি যেন বিধল।
আউক! করে হাতটা সরিয়ে এনে তাকাল। খাইছে! দুটো ফুটো। ভ্যাম্পায়ারে দাঁত বসালে যেমন হয়। দুই ফোঁটা রক্ত বেরিয়ে এসেছে। চুষে ফেলতে গিয়ে থমকে গেল। ভ্যাম্পায়ারের দ্বীপে এসে এ ভাবে রক্ত খাবে! নিজেও ভ্যাম্পায়ার হয়ে যাওয়ার ভয়ে তাড়াতাড়ি মুখ সরিয়ে আনল।
যাবে কি করে ওপাশে, ভাবনায় পড়ে গেল সে। কাটার জন্যে ছোঁয়াও যাচ্ছে না।
ব্যাকপ্যাক থেকে একটা গজাল টেনে বের করল। ঢুকিয়ে দিল লতার দঙ্গলের মধ্যে। চাড় মেরে মেরে ফোকর বড় করতে লাগল। তাকাল তার ভেতর দিয়ে।
বাড়িই আছে ওপাশে একটা। দ্বীপের অন্য বাড়িগুলোর তুলনায় মোটামুটি অক্ষত। আলো ফুরিয়ে আসার আগেই কাজ সারার তাগিদে দ্রুত হাত চালাল সে। ফোকরটা বড় করে ফেলল যাতে কোনমতে গলে অন্যপাশে চলে যেতে পারে। গজালটা আবার ব্যাগে ভরল।
কিন্তু কাঁটার জন্যে ফোকর গলে যাওয়াও এক ঝকমারি। কাপড়ে আঁকড়ে ধরল কাটা, ব্যাগ টেনে ধরল, হাতের, মুখের চামড়া ছড়ে গেল। সব কিছু সহ্য করেই আসতে হলো অন্যপাশে।

আকাশের দিকে তাকাল। বন্ধ হওয়ার পর আর শুরু হয়নি বৃষ্টি। মেঘের দল টুকরো টুকরো হয়ে গিয়ে ছুটতে আরম্ভ করেছে। কেউ যেন তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে ওগুলোকে। নেকড়ের দল! মনে পড়ল আবার।
সূর্য ডোবার আর কত বাকি? কতটা সময় হাতে আছে আর?
বাড়িটার দরজার কাছে এসে দাঁড়াল সে। নব চেপে ধরে মোচড় দিতে সহজেই ঘুরে গেল। ঠেলা দিতে ইঞ্চিখানেক ফাঁক হয়ে আটকে গেল পাল্লা। কোন কিছুতে লেগে গেছে।
জোরে ঠেলা দিল সে।
সামান্য একটু খুলে আবার আটকে গেল।
গায়ের জোরে ঠেলতে শুরু করল সে। যাতে আটকে ছিল, মেঝেতে ঘষার শব্দ তুলে সরে যেতে লাগল সেই জিনিসটা।
ফুটখানেক ফাঁক হতেই আর খোলার চেষ্টা করল না সে। তার মধ্যে দিয়েই চেপেচুপে কোনমতে ঢুকে পড়ল।
অন্ধকার ঘর। দরজা দিয়ে যা সামান্য আলো আসছে। আর কোনদিক দিয়ে আসার পথ নেই আর।
যার চোখে অন্ধকার সয়ে আসার অপেক্ষা করতে লাগল। চোখে পড়ল একটা ড্রেসার। এটাই দরজা আটকে রেখেছিল।
ধীরে ধীরে নজরে এল পুরো ঘরটাই। একটা রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে আছে সে। অদ্ভুত গন্ধ। আগুনের কুণ্ড করে নিভিয়ে ফেলার পর যা হয় অনেকটা সেরকম।
সমস্ত ঘরে ঘুরে বেড়াতে লাগল তার দৃষ্টি। পুরো ঘরটাই প্রায় খালি।
আরেকটা দরজা দেখে সেটা দিয়ে পাশের ঘরে ঢুকল। এই ঘরটা আরও বেশি অন্ধকার। ভেজা বাতাস। ভাপসা গন্ধ। কোণে কোণে অন্ধকার ছায়া। রান্নাঘর দিয়ে আসা আলোয় সে-অন্ধকার কাটছে না। দেখা যায় মোটামুটি।
দেয়ালগুলোর দিকে তাকাল সে। জানালা আছে। তবে তক্তা লাগিয়ে। পেরেক ঠুকে আটকে দেয়া হয়েছে।
ছায়াতে কি আছে দেখার চেষ্টা করল।
এককোণে ওটা কি?
আরে একটা নয়, তিনটে। ছায়া এতই গভীর, বোঝা যায়নি প্রথমে।
তিনটে আয়তাকার বাক্স পড়ে আছে।
কফিন!
দম বন্ধ করে ফেলল সে। তিনটে কেন? দুটোতে কিমি আর ডলি। তৃতীয়টায় কে আছে?

কাঁপুনি শুরু হয়ে গেল বুকের মধ্যে। যা খুঁজতে এসেছিল পেয়েছে। পাওয়া গেছে ভ্যাম্পায়ারের গোপন আস্তানা।
সাবধান রইল কোন রকম শব্দ যাতে আর না হয়। দরজা খোলার সময় যেটুকু করে ফেলেছে, ফেলেছে। ওই শব্দে যদি জেগে গিয়ে না থাকে, ভাল। জাগাতে চায় না। আস্তে করে নামিয়ে রাখল ব্যাকপ্যাকটা। একটা গজাল। বের করে রাখল একটা কফিনের পাশে। হাতুড়িটা মাথার ওপর তুলে, বাগিয়ে ধরে রেখে, টান দিল কফিনের ডালা ধরে।
তুলেই থমকে গেল। ভেতরে বিছানা আছে। কিন্তু মানুষ নেই।
হাতের তালু রেখে বিছানাটা ছুঁয়ে দেখল। গরম। তারমানে এইমাত্র বেরিয়েছে। নিশ্চয় দরজা খোলার শব্দে জেগে বেরিয়ে গেছে।
সোজা হয়ে দাঁড়াল মুসা। পেছনে শব্দ হলো।
চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল সে।
ধড়াস করে উঠল বুক। একটা হার্টবীট মিস হয়ে গেল। পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে লম্বা এক লোক। কালো আলখেল্লা, মুখ ভর্তি দাড়ি, ব্যাকব্রাশ করা চুল, ফ্যাকাসে চেহারা–সব মিলিয়ে একেবারে ব্রাম স্টোকারের ড্রাকুলা। ট্রানসিলভানিয়ার দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসেছে যেন।
তবে এই ড্রাকুলার হাতে পিস্তল আছে। খসখসে গলায় হুকুম দিল, কোন শয়তানি করার চেষ্টা করলেই গুলি খাবে। এখানে কি জন্যে এসেছ?
জবাব দেয়ার আগেই রান্নাঘর থেকে ঢোকার দরজায় আরেকটা মূর্তিকে দেখতে পেল মুসা। কিশোর।
কি হলো, জবাব দিচ্ছ না কেন?
এই জন্যে, পেছন থেকে বলে উঠল কিশোর।
ঘুরে দাঁড়াতে গেল ড্রাকুলা। সময় দিল না কিশোর। নির্দ্বিধায় কাঠের হাতুড়ি দিয়ে বাড়ি মারল লোকটার মাথায়।
এক আঘাতেই ড্রাকুলা কাত। হাতের পিস্তলটা মেঝেতে পড়ল খটাং করে। কাটা কলাগাছের মত টলে উঠে পড়ে যেতে শুরু করল লোকটা। হুমড়ি খেয়ে পড়ল মেঝেতে। বেহুশ হয়ে গেছে।
ধরো ব্যাটাকে! ওর কফিনেই শুইয়ে ডালা লাগিয়ে বন্দি করি। তারপর পুলিশ আনতে যাব।
শব্দ শুনে অন্য দুটো কফিনের ডালাও খুলে গেছে। উঁকি দিল কিমি আর। ডলি। দৃশ্য দেখে হাঁ হয়ে গেল দুজনেই।
কঠোর কণ্ঠে আদেশ দিল কিশোর, চুপচাপ থাকো। নইলে বসের অবস্থা করে ছাড়ব। ভ্যাম্পায়ারগিরি ঘুচিয়ে দেব আজ। হাতের হাতুড়িটা তুলে নাচাল। মাথায়

বাড়ি খাওয়ার ইচ্ছে আছে?
ঝট করে মাথা নিচু করে ফেলল ডলি। বোঝা গেল, ইচ্ছে নেই।
জিজ্ঞেস করল কিশোর, এ দ্বীপে আর কে কে আছে তোমাদের সঙ্গে?
কেউ না, জবাব দিল কিমি।
সত্যি বলছ?
সত্যি।
তাহলে কোথায় আছে?
বহু জায়গায়। কোটার নাম বলব?
সবগুলোরই বলতে হবে। পরে। দ্বীপে আর কেউ নেই তো?
না, মাথা নাড়ল কিমি।
থাকলে ওর মাথা ফাটানোর আগে তোমার মাথা ফাটাব, বলে দিলাম। হুমকি দিল কিশোর।
সত্যি নেই।
হু। শুয়ে পড়ো এবার। কোন রকম শয়তানির চেষ্টা করলে এটা ঢোকাব হৃৎপিণ্ডে, একটা গজাল দেখাল কিশোর। ভ্যাম্পায়ার-খেলা অনেক খেলেছ। অনেক নিরীহ মানুষকে খুন করেছ। রবিনের রক্ত খেয়েছ। তোমাদের খুন। করার জন্যে হাত নিশপিশ করছে আমার। সুযোগটা দিয়ো না।
বিশ্বাস করল ওরা। সুযোগ দিল না কিশোরকে। তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ে ভেতর থেকে ডালা নামিয়ে দিল।
সঙ্গে করে দড়ি নিয়ে আসা হয়েছে। তিনটে কফিনের ডালা বাক্সের সঙ্গে পেঁচিয়ে বাঁধা হলো, যাতে ভেতর থেকে কোনমতেই বেরিয়ে আসতে না। পারে তিন ভ্যাম্পায়ার।
কাজ শেষ করে দুই হাত ঝাড়তে ঝাড়তে মুসার দিকে তাকাল কিশোর, যাও এবার, পুলিশ নিয়ে এসোগে। আমি এদের পাহারা দিচ্ছি।
যদি দলে আরও লোক থাকে? তোমার ওপর হামলা চালায়?
নেই। কিমি মিথ্যে বলেনি। ডলির মত অভিনয় জানে না ও। আর যদি থাকেও, মেঝে থেকে পিস্তলটা তুলে নিল কিশোর, কিছু করতে এলে গুলি খেয়ে মরবে। দেখামাত্র বুকে গুলি করব। কোন ঝুঁকি নেব না। হাতে পিস্তল আছে যখন, নেকড়ে এলেও ভয় নেই যাও যাও, দেরি কোরো না। ওই শয়তানগুলো আসার আগেই নৌকায় উঠে পড়োগে।
ঠিক আছে, যাচ্ছি। সাবধানে থেকো। আমি যাব, আর আসব।
একটা গজাল আর হাতুড়ি তুলে নিয়ে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মুসা।

ভলিউম ২৯ – আরেক ফ্রাঙ্কেনস্টাইন – তিন গোয়েন্দা – রকিব হাসান – সেবা প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ: আগস্ট, ১৯৯৮

ঝড় একবার হয়ে গেছে। আকাশের অবস্থা, দেখে মনে হচ্ছে শেষ হয়নি, আবারও হবে।

লস অ্যাঞ্জেলেসের ছোট্ট শহর হিলটাউনে দোকানপাট সব আটটা বাজলেই বন্ধ হয়ে যায়। আর এখন বাজে রাত এগারোটা। তার ওপর ঝড়। ঘরের বাইরে লোকজন স্বভাবতই কম।

এখানকার স্ট্রিপ মলটা এমন আহামরি কিছু নয়। একটা লন্ড্রি, একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোর এবং একটা ভিডিও আর্কেড, ব্যস। আর কিছু নেই। স্টোরটা বন্ধ হয়ে গেছে আগেই। লন্ড্রিও বন্ধ। খোলা রয়েছে কেবল ভিডিও আর্কেড। মাঝরাতের আগে কখনোই বন্ধ হয় না।

ভেজা, তেলতেলে হয়ে আছে পার্কিং লট। চকচক করছে। একটামাত্র গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে আজ। একটা ক্লাসিক কনভার্টিবল। ছাতটা খোলা। যেন বৃষ্টিতে ভেজার পরোয়া নেই।

ওটার মালিক লেসলি কার্টারিসও বৃষ্টিকে পরোয়া করে না। করার উপায়ও নেই। তাহলে পেট চলবে না। ঝড়ের মধ্যেও বাড়িতে বাড়িতে পিজ্জা সাপ্লাই দিতে হয়েছে ওকে। বিরক্ত হয়ে গেছে। তাই আর্কেডে এসেছে ভিডিও গেম মেশিনের ওপর রাগ ঝাড়তে।

সে ভেবেছে সে-ই একমাত্র কাস্টোমার, তাকে বিরক্ত করবে না কেউ। ভারটিউয়াল ম্যাসাকার-২ খেলছে। নিজেকে পর্দার একজন ভারটিউয়াল ফাইটার কল্পনা করে নিয়ে তাক করে লাথি মারছে শত্রুকে। যদিও হাই স্কুলের, ফুটবল ম্যাচে খেলার মত আনন্দ নেই এতে। কিন্তু স্কুলে খেলতে যাওয়ার আর উপায় নেই। দুই বছর আগেই সে পাট চুকিয়ে এসেছে।

বোতামে টিপ দিয়ে গাড়ির গিয়ারের মত করে জয়স্টিক ধরে টান দিল লেসলি। কয়েক মাস আগেই হাই স্কোর লিস্টে নাম উঠে গেছে তার। BPE নাম সই করে রেখেছে কোন একজন হেরে যাওয়া খেলোয়াড়। শয়তানি করে সমস্ত হাই স্কোর লিস্ট লক করে দিয়েছে আজকে। চাপাচাপি করে তাতে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করছিল লেসলি, কিন্তু ভরসা কম। ইতিমধ্যেই দুজন খেলোয়াড়কে হারিয়ে বসে আছে। তৃতীয়টাকেও হারাতে চলেছে

এই যে, ভাই, পেছন থেকে ডেকে বলল একটা ভোতা কণ্ঠ, আমি খেলছিলাম ওখানে।

কাঁধের ওপর দিয়ে ঘুরে তাকাল লেসলি। ফ্যাকাসে চেহারার একটা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে পেছনে। মাথায় তেলকালি লাগা বেজবল ক্যাপ। গায়ে, টি-শার্টেও কালি।
বাথরুমে গিয়েছিলাম, ছেলেটা বলল।
তো আমি কি করব? কর্কশ জবাব দিল লেসলি। দেখেই রাগ লাগছে। তার। এই ছেলেটাই বোধহয় সেই হেরে যাওয়া খেলোয়াড়। বয়েস আঠারো-উনিশ। বখাটে চেহারা। মোটেও পছন্দ হলো না লেসলির। তার ধারণা, পাড়ায় পাড়ায় মস্তানি আর মেয়েদের পেছনে লাগা ছাড়া এর অন্য কোন কাজ নেই।
পর্দার দিকে নজর ফেরাল সে। দেরি হয়ে গেছে। কারাতের কোপ মেরে তার ভারটিউয়াল ফাইটারের ঘাড় মটকে দিয়েছে শত্রুপক্ষের এক যোদ্ধা। তাকে উদ্দেশ্য করে ব্যঙ্গভরা মন্তব্য আর পিত্তিজালানো যান্ত্রিক হাসি ছুঁড়ে দিল মেশিন। আরও রাগিয়ে দেয়ার জন্যেই যেন উজ্জ্বল লাল আলোয় গেম ওভার লেখাটা টিপটিপ করতে লাগল চোখের সামনে।
বিরক্ত হয়ে মেশিনকে এক চড় মারল লেসলি। ঝটকা দিয়ে ঘুরে তাকাল হাড্ডিসার ছেলেটার দিকে। সব রাগ গিয়ে পড়ল ওর ওপর। খেলা পণ্ড করেছে বলে। গর্জে উঠল, দিলে তো!
ক্যাপের ছায়ায় মুখের অনেকটাই আড়াল করে রেখেছে ছেলেটা। খেলা তো আপনি আমারটা নষ্ট করলেন। আমি ওখানে খেলছিলাম। মাঝখান থেকে আপনি ঢুকে পড়লেন।
তুমি গেলে কেন?
বাথরুম পেলে কি করব? আপনি অন্য কোন মেশিনে খেলতে পারতেন। এটাতেই কেন?
তুমি যে খেলছিলে কি করে জানব?
খেলাটা খোলা ছিল। ছিল না?
কতজনে অর্ধেক খেলে ফেলে রেখে চলে যায়...
বিলিই খেলছিল ওখানে, বলে উঠল আরেকটা কণ্ঠ। আপনি ওর খেলাটা নষ্ট করেছেন।
ঘুরে তাকিয়ে মোটাসোটা একটা ছেলেকে দেখতে পেল লেসলি। লম্বা চুল। কোমরে ঝোলানো কয়েন রাখার ব্যাগ। ওর নাম উইলিয়াম গ্লেজব্রুক। কিন্তু সবাই ডাকে পটেটো। নামটা চেহারার সঙ্গে মানিয়ে গেছে। ডাকতে ডাকতে এটাই নাম হয়ে গেছে এখন। আসল নামে কেউ ডাকে না। লোকে জিজ্ঞেস করলে সে নিজেও এই নাম বলে। বোধহয় আসল লম্বা নামটা ভাল লাগে না তারও, খাটোটাই পছন্দ।
তুমি আবার কে? খেঁকিয়ে উঠল লেসলি। ওর চামচা?

না, নাইট ম্যানেজার, জবাব দিল পটেটো।
মেশিনের দিকে সরে এল বিলি। সরুন।
লেসলির সন্দেহ হলো এই হাড্ডিসার ছেলেটাই মেশিনের রহস্যময় BPF। রাগ বেড়ে গেল তার। বিলির বুকে হাত রেখে জোরে এক ধাক্কা মারল।
একটা টেবিলের পায়ায় পা বেধে উল্টে পড়ল বিলি। টুপিটা খুলে পড়ে গেল। অদ্ভুত একটা দাগ দেখা গেল মাথার একপাশে।
ভুরু কুঁচকে গেল লেসলির। কিসের দাগ? মগজ অপারেশন করেছিল নাকি? ঠিক কাটা দাগের মত নয় দাগটা। বরং পোড়া দাগের সঙ্গে মিল বেশি।
হামাগুড়ি দিয়ে সরে গেল বিলি। লেসলির মনে হলো, একটা কিলবিলে পোকা পায়ের চাপে ভর্তা হওয়ার ভয়ে তাড়াতাড়ি সরে যেতে চেষ্টা করছে। নোংরা পাথরের তলায়। কল্পনাই করতে পারল না পোকাটা কি ভয়াবহ বিষাক্ত!
ঠিক এই সময় বিদ্যুৎ চলে গেল।
অন্ধকারে চিৎকার করে উঠল পটেটো, মানা করেছিলাম, শুনলেন না! নিজের সর্বনাশ নিজে ডেকে আনলেন! এখন আর কেউ ঠেকাতে পারবে না ওকে…
*
মাটিতে পড়ে থেকে ধীরে ধীরে লম্বা দম নিল বিলি ফক্স। রাগ কমানোর জন্যে নয়, বরং বাড়ানোর জন্যে। আর্কেড় এখন অন্ধকার। পার্কিং লটের বৃষ্টিভেজা। বাতিটা থেকে মলিন আলোর আভা এসে পড়েছে ঘরে।–
ক্যাপটা কুড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। শান্ত ভঙ্গিতে মাথায় পরল আবার। আগুন জ্বলছে মনে। কিন্তু প্রকাশ পেতে দিচ্ছে না। উত্তেজিত হয়ে বিস্ফোরণ ঘটানোর চেয়ে এভাবে আস্তে আস্তে খেলে যাওয়ার মজা অনেক বেশি।
কোণের জুকবক্সটা গমগম করে বেজে উঠল হঠাৎ। ঘরে বিদ্যুৎ নেই, তা ও বাজছে। কোথা থেকে শক্তি পেল ওটা বুঝতে পারল না লেসলি। দি নাইটওয়াকার বাজতে লাগল কানফাটা শব্দে। গানটা যে বিলির প্রিয় গান, তা-ও জানা নেই ওর।
লেসলির কাছে সরে এল বিলি। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, তোমার দান তুমি খেলেছ। এবার আমার পালা।
বিলির কণ্ঠে এমন কিছু রয়েছে, অস্বস্তি বোধ করতে লাগল লেসলি। আর লাগার সাহস পেল না। পিছিয়ে এল। হ্যাঁ, খেয়ে আর কাজ পেলাম না, তোমার সঙ্গে ফালতু সময় করি! কণ্ঠের সেই একটু আগের জোরটাও নেই আর।
দরজার দিকে রওনা দিল সে।
*

পার্কিং লটের খোলা বাতাসে বেরিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল লেসলি। আর্কেডের ব্যাপারটা বুঝতে পারছে না সেসময়মত বিদ্যুৎ চলে যাওয়া, বিদ্যুৎ ছাড়াই জুকবক্স বেজে ওঠা। কৌতূহল থাকলেও সাহস দেখাতে পারল না। বরং তাড়াতাড়ি পালিয়ে যাওয়ার একটা প্রবল ইচ্ছে তাগাদা দিচ্ছে মনে।
গাড়িতে উঠে ইগনিশনে মোচড় দিল সে। ফুল ভলিউমে বেজে উঠল রেডিও। গানটা পরিচিত। অতি পরিচিত।
দি নাইটওয়াকার!
আর্কেডের জুকবক্সে এই গানই বাজছিল।
ও কিছু না! সেফ কাকতালীয়! মন থেকে ভয় ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করল। মোচড় দিয়ে অফ করে দিল রেডিওর সুইচ।
কিন্তু বেজেই চলল গান।
অসম্ভব! এ হতেই পারে না! নব ঘুরিয়ে কাটাটা পার করে দিল ডজনখানেক স্টেশন।
গান বন্ধ হলো না।
ফিরে তাকিয়ে দেখল আর্কেডের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে হাড্ডিসার ছেলেটা। শান্ত ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে এদিকে।
ফার্স্ট গিয়ার দিল লেসলি। অ্যাক্সিলারেটর চেপে ধরল। ভেজা চত্বরে পিছলে গেল চাকা। তারপর এগোতে শুরু করল।
মনে পড়ল, কিছুদিন থেকে বিচিত্র সব ঘটনা ঘটছে এই ছোট্ট শহরটাতে। রহস্যময়ভাবে মারা যাচ্ছে মানুষ। চৌরাস্তায় পর পর কতগুলো দুর্ঘটনা ঘটেছে, সেগুলোও রহস্যময়। যারা ভূত বিশ্বাস করে, তাদের কেউ কেউ বলছে ভূতের উপদ্রব।
আর্কেডের ঘটনাটাও ভূতুড়ে মনে হচ্ছে লেসলির কাছে। বিদ্যুৎ ছাড়া যন্ত্র বাজে কিভাবে? বুঝে গেছে, আর্কেডের দরজায় দাঁড়ানো ওই ছেলেটার সঙ্গে এসবের নিশ্চয় কোন সম্পর্ক রয়েছে। অতএব পালাতে হবে ওর কাছ থেকে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।
গেটের কাছে এসে বন্ধ হয়ে গেল এঞ্জিন। মিসফায়ার করল না। পুটপুট করল না। কোন আগাম সঙ্কেত দিল না। এঞ্জিন বন্ধ হওয়ার কোন রকম নিয়ম-কানুন না মেনে স্রেফ থেমে গেল। গাড়িটাও দাঁড়িয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।
মরিয়া হয়ে ইগনিশনে মোচড় দিতে লাগল লেসলি। কাজ হলো না। চালু হলো না এঞ্জিন। কোন শব্দই করল না।
রেডিওতে বেজেই চলেছে দি নাইটওয়াকার।
দরজায় একই ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে আজব ছেলেটা।

হঠাৎ আলোর বিস্ফোরণ ঘটল যেন। সেই সঙ্গে তীক্ষ্ণ একটা শব্দ। ঝট করে ঘুরে গেল লেসলির মুখ। গাড়ির অ্যানটেনায় লাগানো পিজ্জা ডেলিভারি সাইনটাতে আগুন লেগে গেছে। পরক্ষণে ভয়ঙ্কর এক ধাক্কা লাগল শরীরে। বুক থেকে শুরু হয়ে ছড়িয়ে পড়ল হাত, পা, আর মাথায়। মনে হলো কোটর থেকে খুলে বেরিয়ে যাচ্ছে চোখ। প্রচণ্ডভাবে মোচড় খেতে শুরু করল দেহটা। সীটের ওপর লাফাতে লাগল পানি থেকে তোলা মাছের মত। পেশীর ব্যথা অসহ্য।
বুঝে নিল লেসলি, এই পার্কিং লট থেকে জীবন্ত বেরোতে পারবে না সে। মুঠো হয়ে গেল হাতের আঙুল। ওগুলোর মাথা থেকে ছিটকে বেরোচ্ছে বিদ্যুৎ-ফুলিঙ্গ। কোনমতে হাত বাড়িয়ে দরজাটা খোলার চেষ্টা করল সে। এত বেশি হাত কাঁপছে, হাতলটাই ধরতে পারল না। কাঁপুনির চোটে মাথাটা গিয়ে বাড়ি খেল দরজার পাশে।
কিন্তু কিছুই করার নেই আর ওর!
কিছুই করার নেই মৃত্যুযন্ত্রণা সহ্য করা ছাড়া!
*
আর্কেডের দরজায়-দাঁড়িয়ে লেসলিকে মারা যেতে দেখল বিলি। কোন রকম আবেগ তৈরি হলো না তার মনে। করুণা জাগল না।
অবশেষে গাড়ির রেডিও থেকে তার মনো-আকর্ষণ সরিয়ে আনল সে। চুপ হয়ে গেল রেডিও। নীরব হলো পার্কিং লট। কনভার্টিবলের সামনের সীট থেকে একঝলক পোড়া ধোয়া বেরিয়ে উঠে গেল স্ট্রীট ল্যাম্পের আলোর দিকে।
এতক্ষণে ঘুরে দাঁড়াল বিলি। ঢুকে গেল আবার আর্কেডের ভেতর।
পেছনে তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে পটেটো। বিলি তাকাতেই হেসে একটা কয়েন বাড়িয়ে দিল ওর দিকে।
কিন্তু নিল না বিলি। গেম মেশিন চালু করতে ওটার আর প্রয়োজন নেই। যে-কোন বৈদ্যুতিক যন্ত্র এখন তার গোলাম। ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির সার্কিটে ঢোকার এক অসাধারণ ক্ষমতা আছে ওর মনের। বিদ্যুৎ সরবরাহ করার সামর্থ্য আছে।
ভুরু থেকে এক ফোঁটা ঘাম মুছে ফেলে মেশিনের সামনে এসে দাঁড়াল সে। তাকাল শুধু ওটার দিকে। তাতেই যেন জাদুমন্ত্রের বলে আপনাআপনি চালু হয়ে গেল মেশিন।
মুখের একটা পেশী কাঁপাল বিলি। মুহূর্তে শুরু হয়ে গেল নতুন খেলা। কয়েন ফেলার পর যেমন করে হয়।
ক্রমেই ক্ষমতা বাড়ছে আমার, আপনমনে বিড়বিড় করল সে। নতুন আরেক রেকর্ড তৈরি করব খুব শীঘ্রি।
.

হিলটাউনের কাউন্টি বিল্ডিংটা আহামরি কিছু নয়। রঙ ওঠা, পুরানো। নতুন এলেও দ্বিতীয়বার ওটার দিকে চোখ তুলে তাকানোর কথা ভাববে না কেউ। করনির্ধারক, সমাজসেবকের আস্তানা আর হলভর্তি রেকর্ডপত্র আছে ওটাতে। আর আছে কাউন্টি করোনার হিউগ ওয়াগনারের অফিস।

অস্বস্তি বোধ করছেন করোনার। যে রায় দিয়েছেন, তাতে নিজেই সন্তুষ্ট হতে পারছেন না। জীবনে অনেক দেখেছেন, অনেক তার অভিজ্ঞতা। কিন্তু গত কিছুদিন ধরে যা শুরু হয়েছে হিলটাউনে, এরকম কাণ্ড ঘটতে আর দেখেননি কোনদিন। অন্য চারটা মৃত্যুর মত লেসলি কার্টারিসের মৃত্যুটাকেও অপঘাতে মৃত্যু বলে রায় দিতে বাধ্য হয়েছেন তিনি। কিন্তু খুতখুত করছে মনটা।

তাকিয়ে আছেন ওদের দিকে। তিনটে কিশোর ছেলে আর একজন। সুন্দরী মহিল। লাশটা দেখছে ওরা।

তিরিশ মিনিট আগে তার অফিসে ঢুকেছিল। তিন গোয়েন্দার একটা কার্ড আর পুলিশ চীফ ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্লেচারের একটা প্রশংসাপত্র তার সামনে বাড়িয়ে দিয়ে লাশটা দেখার অনুমতি চেয়েছিল ছেলেগুলো। মহিলা জানিয়েছে, সে একজন ডাক্তার। লাশটা পরীক্ষা করতে চায়।

একবার রায় দেয়ার পর সেটা নিয়ে আর দ্বিতীয়বার ভাবতে চান না। ওয়াগনার। তবে এক্ষেত্রে ব্যাপারটা আলাদা। ওরা যদি নতুন কিছু বের। করতে পারে করুক না। ক্ষতি কি?

ঘটনাটা সত্যি অদ্ভুত। নমুনা দেখে বজ্রপাতে মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না একে। কিন্তু লেসলি যখন মারা গেছে, তখন একবারও বজ্রপাত হয়েছে বলে রেকর্ড নেই।

লাশের ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়েছে ডাক্তার এলিজা। চোখে লাগানো প্রোটেকটিভ গগলস। পেশাদারী দৃষ্টিতে তাকাল মৃত ছেলেটার বাঁ কানের ভেতর। লাশের মাথা পুরো নব্বই ডিগ্রি ঘুরিয়ে একই ভাবে দেখল ডান কানের ভেতরটাও। ভাল করে দেখে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তাকাল তিন গোয়েন্দার দিকে, যারা ওকে অনুরোধ করে নিয়ে এসেছে এখানে। অবশ্য নিজেরও খানিকটা ইচ্ছা আর কৌতূহল জন্মেছিল গত কিছুদিনে হিলটাউনের অদ্ভুত মৃত্যুগুলোর কথা পত্রিকায় পড়ে।

রকি বীচ হাসপাতালের ডাক্তার এলিজা। তিন গোয়েন্দার বন্ধু। একবার একটা বিশেষ কাজে তাকে সাহায্য করেছিল ওরা। সেই থেকে বন্ধুত্ব হয়ে গেছে।

দুটো কানের পর্দাই ফেটে গেছে, তিন গোয়েন্দাকে জানাল সে। ভোতা কণ্ঠস্বর। সামান্য একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল কি পড়ল না।

ডাক্তারী পাস করতে গিয়ে বহু লাশ পরীক্ষা করেছে এলিজা। অনেক ধরনের মৃত্যু দেখেছে। মানুষের শরীর অনেক কাটাকুটি করেছে। কিন্তু লাশ দেখলে তার

এখনও মন কেমন করে। কেবলই মনে হয়, হাড়-মাংসে তৈরি এই নিথর দেহটাও একদিন তার মতই জ্যান্ত ছিল, চলেফিরে বেড়াত, কথা বলত। এরও আশা ছিল, নেশা ছিল, স্বপ্ন ছিল।

দস্তানা পরা হাতের আঙুল দিয়ে লাশের এক চোখের পাতা টেনে খুলল। সে। মৃত চোখের দিকে তাকাল। মণিটা একধরনের ঘোলাটে পাতলা পর্দায়। ঢাকা পড়েছে। অন্য চোখটা পরীক্ষা করেও একই জিনিস দেখতে পেল।

দুই চোখেই ছানি, কিশোর বন্ধুদের জানাল এলিজা। কণ্ঠস্বর এখনও ভোতা। কিশোর পাশার দিকে তাকিয়ে বলল, অতিরিক্ত উত্তাপের কারণে হয়েছে সম্ভবত।

সম্ভবত কেন? এলিজার কথায় অবাক হয়েছে কিশোর। শিওর হতে পারছেন না?

জবাব দিল না এলিজা। কি বলবে, ভাবছে। অ্যানাটমিক্যাল স্কেলের ওপর রাখা একটা প্লাস্টিকের ব্যাগ তুলে নিল। মুখ খুলে ভেতরে তাকাল।

ব্যাগের ভেতরের জিনিসটাকে প্রথম দর্শনে মনে হয় পোড়া মাংসের টুকরো। পুড়ে বিকৃত হয়ে গেছে। কিন্তু অভিজ্ঞ ডাক্তারের চোখ ঠিকই চিনতে পারল। জিনিসটা মানুষের হৃৎপিণ্ড। ময়না তদন্তের সময় লাশের বুক থেকে কেটে বের করে আনা হয়েছে।

বুকের মধ্যেই হার্টটা পুড়ে কাবাব হয়ে গেছে, এলিজা বলল। আশ্চর্য! করোনারের দিকে তাকাল সে। মিস্টার ওয়াগনার, আপনার কি ধারণা?

হাঁ করে তাকিয়ে আছে মুসা আর রবিন। কিছু বুঝতে পারছে না। বোঝার জন্যে মাথাও ঘামাচ্ছে না। ডাক্তারই যখন পারছে না ওরা কি বুঝবে? তবে কৌতূহল আর আগ্রহ নিয়ে শুনছে এলিজার কথা।

করোনার বললেন, এভাবে হার্টের টিস্যু ড্যামেজ হতে দেখিনি আর। তবে... গাল চুলকালেন তিনি। মনে মনে কথা সাজিয়ে নিলেন বোধহয়। বক্ষাস্থির নিচে এভাবে পুড়ে কিংবা পাজরের হাড় ফেটে যেতে পারে একটা কারণেইহাই-ভোল্টেজে প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক শক খেলে। বজ্রপাতে...

বাধা দিয়ে বলল এলিজা, কিন্তু কোন জায়গা দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবেশ করেছে। শরীরে, তার কোন চিহ্ন নেই। তারের ছোঁয়া লাগলে সেখানে দাগ কিংবা ক্ষত থাকার কথা।

আমার কাছেও এটাই অবাক লাগছে। দাগ নেই কেন?

ছেলেটা মারা গেছে ইলেকট্রিক শকে, কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু শকটা লাগল কোনদিক দিয়ে, সেটা বোঝা যাচ্ছে না।

ঢোক গিললেন ওয়াগনার। আমার অনুমান, গাড়ির ছাতে পড়েছিল বজ্রটা। সেখান থেকেই কোনভাবে ছেলেটার শরীরে ঢুকেছে।

তারমানে বলতে চাইছেন ধাতব বডির ছোঁয়া? তাতেও চামড়া পুড়বে। দাগ কোথায়?
কি জানি! এই প্রশ্নটার জবাব পেলে তো সব পরিষ্কারই হয়ে যেত।
তাহলে অপঘাতে মৃত্যু রায় দিলেন যে?
তাতে ভুল করিনি। অপঘাত মৃত্যুই তো। ইলেকট্রিক শক। আমরা কেবল শিওর হতে পারছি না, শকটা লাগল কিভাবে।
করোনারের মতই এলিজাও কিছু বুঝতে পারছে না। কিশোরের দিকে তাকাল। যুক্তি যেখানে অচল সেখানে কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়। আর সেটা খুব ভাল পারে এই ছেলেটা। কল্পনার দৌড় আর বুদ্ধি এত বেশি, কিভাবে যেন প্রায় শূন্য থেকেও বের করে নিয়ে আসে মূল্যবান সূত্র। ইতিমধ্যেই কোন জবাব, কোন উদ্ভট ব্যাখ্যা তার মাথায় ঠাই গেড়ে ফেলেছে কিনা বুঝতে চাইল। অবাস্তব কোন কিছুতে বিশ্বাস করে না কিশোর। ভূতুড়ে ঘটনাকে ভূতের কাণ্ড না ভেবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করে। দেখা যাক, এই ঘটনাটার কি ব্যাখ্যা দেয়।
কিশোর কিছু বলার আগেই দরজার দিকে ঘুরে গেল করোনারের চোখ। সেটা লক্ষ করে এলিজাও তাকাল সেদিকে। দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছেন একজন বিশালদেহী লোক। বুকে শেরিফের ব্যাজ।
কোন কেসের দায়িত্ব নিলে পুলিশ কিংবা স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে খাতির রাখার চেষ্টা করে কিশোর। নইলে তদন্তে প্রচুর অসুবিধে হয়। শেরিফ যদি ওদের কাজে বাধা দেন, পছন্দ না করেন, তার এলাকা থেকে বের করে দেন, কিছু করার থাকবে না। হিলটাউনে যখন পৌঁছেছিল ওরা, শেরিফ ছিলেন না এখানে। জরুরী একটা কাজে পাশের শহরে গিয়েছিলেন। সেই সুযোগে কোন রকম বাধার মুখোমুখি না হয়ে সহজেই করোনারের অফিসে ঢুকে পড়েছিল ওরা। এখন তিনি এসেছেন। ওদের তদন্তটাকে কোন চোখে দেখবেন কে জানে। করোনারের মত এত সহজে যদি তদন্ত করার অনুমতি না দেন?
এলিজার এসব নিয়ে মাথাব্যথা নেই। লাশ পরীক্ষা করতে এসেছে, করছে। করা হয়ে গেলে চলে যাবে। গোয়েন্দাগিরি করার জন্যে থাকতে হবে না এখানে। অতএব শেরিফের তোয়াক্কা তার না করলেও চলবে। কিভাবে ঘটনাটা ঘটেছে ভাবতে ভাবতে হঠাৎ ফিরে তাকাল করোনারের দিকে, এ নিয়ে এরকম মৃত্যুর ঘটনা পাঁচটা ঘটল হিলটাউনে। পত্রিকায় পড়লাম। বাকি লাশগুলোর গায়েও কি কোন রকম দাগ ছিল না?
পায়ের ওপর ভার বল করলেন ওয়াগনার। অস্বস্তিবোধটা বাড়ল। না, ছিল না। ওগুলোকেও বজ্রপাতে মৃত্যু ঘটেছে–এই রায় দিতে বাধ্য হয়েছি আমি।

তারমানে আপনি বিশ্বাস করেন না বজ্রপাতেই মারা গেছে লোকগুলো? আচমকা যেন প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল কিশোর।
অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন ওয়াগনার। জবাব দিতে পারলেন না। কিংবা আসল কথাটা স্বীকার করতে হয় বলে ইচ্ছে করেই দিলেন না।
দরজায় দাঁড়িয়ে বুকের ওপর আড়াআড়ি হাত রেখে কথাগুলো শুনলেন। শেরিফ। তারপর কাশি দিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন সবার। করোনারের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এরা কারা?
পরিচয় দিলেন ওয়াগনার।
হু! তাহলে তোমরা গোয়েন্দা, মাথা ঝাঁকালেন শেরিফ। এক এক করে নজর বোলালেন তিনজনের মুখে। তোমাদের জানা না-ও থাকতে পারে, তাই নিজের পরিচয়টা দিয়েই নিই। আমি শেরিফ মরফি রবার্টসন।
দেখেই অনুমান করে নিয়েছি, স্যার, খুশি করার জন্যে বিনীত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। রহস্যময় মৃত্যুর খবরগুলো পত্রিকায় পড়ে ইনটারেস্টেড হয়েছি। শখের গোয়েন্দা আমরা, একটা কার্ড বের করে দিল সে।
ভুরু কুঁচকে তিনটে নামের নিচে প্রশ্নবোধক চিহ্নগুলোর দিকে তাকালেন শেরিফ। এগুলো কেন? নিজেদের কাজের ব্যাপারে সন্দেহ আছে নাকি?
সন্দেহ নেই, কণ্ঠস্বরটাকে বড়দের মত ভারিক্কি করে তুলে কিশোর বলল, এগুলোর মানে, যে কোন ধরনের রহস্যের তদন্ত করতে আগ্রহী আমরা। জটিল, উদ্ভট কিংবা ভুতুড়ে কেস হলে আরও ভাল। এমন অনেকগুলো কেসের কিনারা করেছি আমরা, বহুদিন ধরে পুলিশ যার কোন সমাধান খুঁজে পায়নি। এই দেখুন না, ইয়ান ফ্লেচারের প্রশংসাপত্রটা বের করে দেখাল সে। আমাদের সার্টিফাই করেছেন ক্যাপ্টেন নিজে।
কার্ডটা ফিরিয়ে দিতে দিতে আবার মাথা আঁকালেন শেরিফ। হু! তারপর তাকালেন ডাক্তারের দিকে।
আমি ডক্টর এলিজা, হাত বাড়িয়ে দিল এলিজা।
হাত মেলালেন শেরিফ। কি সাহায্য করতে পারি, বলুন?
স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। বুঝে গেল, এক্ষুণি বেরিয়ে যেতে বলবেন না শেরিফ। তবে শেষ পর্যন্ত তদন্ত করতে দেবেন কিনা স্পষ্ট নয় এখনও।
কিশোরের দিকে তাকাল এলিজা। আবার ফিরল শেরিফের দিকে। এখানে গত কিছুদিনে বজ্রপাতের কারণে যেসব মৃত্যু ঘটেছে বলে বলা হয়েছে, সেগুলোর সপক্ষে তেমন কোন ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি..
কিছু মনে করবেন না, ডাক্তার, বজ্রপাতের ব্যাপারে আপনি কতখানি জানেন?
জানি। অনেক কিছুই।

আপনি কি জানেন, বাড়িতে ঘরের মধ্যেও অনেকে বজ্রপাতের শিকার হয়? হয়তো শাওয়ারে গোসল করছিল তখন, কিংবা টেলিফোনে কথা বলছিল। এমনও দেখা গেছে, হলঘরে অনেকে মিলে নাচার সময় তাদের মধ্যে কোন একজন বাজ পড়ে মরে গেছে। বাকিদের কারও কিচ্ছু হয়নি। শিওর হয়ে কেউ বলতে পারে না কখন, কোথায় বাজ পড়বে। সাধারণ বিজ্ঞান বইতে আমরা পড়ি মেঘে মেঘে ঘর্ষণের ফলে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, আর তাতেই বজ্রপাতের সৃষ্টি। কিন্তু ভেতরে এত প্রশ্ন আর রহস্য রয়ে গেছে, অনেক বড় বড় বিজ্ঞানীও তার জবাব দিতে পারেন না। জানেন সেটা?

আসলে আপনি কি বলতে চাইছেন, শেরিফ?

এতক্ষণে হাসি ফুটল শেরিফের মুখে। বলতে চাইছি, শরীরের দাগ নিয়ে যে প্রশ্নটা আপনি তুলেছেন, সাধারণ ইলেকট্রিক শকের বেলায় সেটা থাকাটা স্বাভাবিক। কিন্তু বজ্রপাত একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার...হিলটাউনে বাস না, করলে হয়তো আপনার মতই কথা বলতাম। কিন্তু এখন আর বলব না। কারণ রোজ সকালে এখানকার বেশ কিছু বিজ্ঞানীর সঙ্গে বসে আমাকে নাস্তা খেতে হয়।

চোখ মিটমিট করল এলিজা, তাতে কি?

বুঝলেন না? শেরিফের চোখ দুটোও এখন হাসছে। এখানে এই হিলটাউনে বজ্র উৎপাদন করে আমাদের বিজ্ঞানীরা। বিশ্বাস হয়?

জবাব দিল না এলিজা।

আমরা বজ্র বানাই, শেরিফ বললেন। শহরের ধারে অস্টাডোরিয়ান লাইটনিং অবজারভেটরিতে। আকাশের দিকে মাথা তুলে চেয়ে থাকে ওখানে একশো আইওনাইজড রড। বিদ্যুৎকে খুঁচিয়ে বজ্র তৈরি করে ওগুলো।

জোরে নিঃশ্বাস ফেলল এলিজা, এখবরটা তো জানতাম না!

তারমানে ঠিকমত হোমওয়ার্ক করেন না আপনি, রসিকতা করলেন শেরিফ।

বস্ত্রের ব্যাপারে যা-ই বলেন না কেন, স্যার, এই ময়না তদন্তের রিপোর্টে গলদ আছে।

কে বলল?

একজন ডাক্তার হিসেবে আমি বলছি। কারণ দাগ নেই...

সেই কথাটাই তো বোঝাতে চাইছি এতক্ষণ ধরে। সাধারণ শক হলে দাগ থাকত। এটা হয়তো কোন ধরনের অসাধারণ শক, তাই নেই। বজ্রপাত সম্পর্কে এখনও সব জানেন না বিজ্ঞানীরা, আগেই তো বললাম। হতে পারে, কিছু কিছু বজ্রপাতে বিদ্যুৎ এমন ভাবে ঢুকে যায় মানুষের শরীরে, ভেতরটা ঠিকই পুড়ে কয়লা হয়, কিন্তু চামড়ায় বা অন্য কোথাও কোন দাগ বা ক্ষত থাকে না...

রিমোট কন্ট্রোলড ইলেকট্রিক শক! বিড়বিড় করল কিশোর।

কি বললে? ঝট করে তার দিকে ঘুরে গেলেন শেরিফ। রিমোট? বুদ্ধিমান ছেলে! হয়তো ঠিকই বলেছ, রিমোট কন্ট্রোলড লাইটনিং। স্পর্শ ছাড়াই বিদ্যুৎ পাচার করে দেয় মানুষের শরীরে কে জানে! কিশোরের দিকে তাকালেন তিনি। একে একে চোখ বোলালেন রবিন আর মুসার দিকে। সন্তুষ্ট হয়ে মাথা ঝাঁকালেন, দেখে অবশ্য চালাক-চতুরই লাগছে তোমাদের। ঠিক আছে, করো তদন্ত, বাধা দেব না। তবে এমন কিছু করবে না, কারও ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলাবে না, যাতে কেউ তোমাদের বিরুদ্ধে নালিশ করতে পারে। যদি করে, শহর থেকে তোমাদের চলে যেতে বলতে বাধ্য হব আমি।

থ্যাংকিউ, স্যার, হাসি ফুটল কিশোরের মুখে। কেউ খারাপ রিপোর্ট করবে না, কথা দিতে পারি।

*

কিভাবে মারা গেছে, কি মনে হয় তোমার? কিশোরকে জিজ্ঞেস করল এলিজা।

করোনারের অফিস থেকে বেরিয়ে এসে একটা কফিশপে নাস্তা আর কফি খেতে বসেছে ওরা।

আমি ডাক্তার নই। আপনাদের আলোচনা থেকে যা বুঝলাম, একটা কথা জোর দিয়ে বলতে পারি, কিশোর বলল, বজ্রপাতে মৃত্যু ঘটেনি। লেসলির।

মুসা বলল, শেরিফের সঙ্গে তো একমত হয়ে এলে…

বজ্রপাতে মারা গেছে এ ব্যাপারে একমত হইনি। বলেছি ইলেকট্রিক শক। বজ্রপাত আর ইলেকট্রিক শক এক জিনিস নয়।

কিন্তু বজ্রপাতে বিদ্যুতের কারণেই মারা যায় মানুষ।

তা যায়। তবে লেসলি বাজ পড়ে মারা যায়নি। কিংবা সাধারণ ইলেকট্রিক শকও খায়নি। তাহলে শরীরে দাগ নিশ্চয় থাকত।

তাহলে কিসে মরল? ভুরু নাচিয়ে জানতে চাইল রবিন।

ইলেকট্রিক শকেই মরেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে সেই বিদ্যুটা বড় আজব! পরিবহনের জন্যে তার লাগে না এর, কোন মাধ্যম লাগে না। বাতাসের ইথারই যথেষ্ট। আরও একটা ব্যাপার। যেন মন আছে, মগজ আছে, চিন্তা-ভাবনা করে শিকার বেছে নেয়ার ক্ষমতা আছে ওটার।

এমন করে বলছ যেন ওটা একটা প্রাণী!

কেন, প্রাণীরা কি বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে না?

তা তো পারেই। অনেক প্রাণীই আছে যারা নিজের দেহে বিদ্যুৎ তৈরি করতে সক্ষম। চুপ হয়ে গেল রবিন।

একপাশে চেয়ারে রাখা ব্রীফকেস খুলে একটা ফাইল বের করল। কিশোর। সেটা থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে টেবিলে বিছাল। কি লেখা, দেখার জন্যে

গলা বাড়িয়ে দিল রবিন আর মুসা।
দেখুন, এলিজাকে বলল কিশোর, একটা হিসেব বের করেছি। এই এলাকায় যারা যারা বজ্রপাতের শিকার হয়েছে তাদের সবারই বয়েস সতেরো থেকে একুশ। সবাই পুরুষ। লেসলি কার্টারিসও সেই দলেই পড়ে। এর মানে। কি? মনে কি হয় না, বুঝেশুনে, শিকার বাছাই করে মৃত্যুবাণ মারছে সেই আজব বিদ্যুৎ?
বিস্মিত হলো এলিজা। তাকিয়ে রইল কিশোরের দিকে।
লেসলি কার্টারিস কোন জায়গায় মারা গেছে, একবার দেখা দরকার, কিশোর বলল। আপনার কাজ আপনি করে দিয়েছেন। যা বোঝার বুঝে নিয়েছি। আপনাকে না দেখালে শিওর হতে পারতাম না। যাই হোক, এবার আমাদের তদন্ত শুরু। দেখা যাক আমার যুক্তির সপক্ষে কোন সূত্র মেলে। কিনা। আপনি আমাদের সঙ্গে যেতে চান?
মাথা নাড়ল এলিজা, যাওয়ার তো খুবই ইচ্ছে ছিল। কিন্তু আরেকটা জরুরী কাজ আছে। নতুন কিছু জানলে জানাবে অবশ্যই। আমার সাহায্যের প্রয়োজন আছে বুঝলে তখন নাহয় চলে আসব। এখন তো আমাকে আর কোন দরকার নেই তোমাদের?
মাথা নাড়ল কিশোর, না, নেই।

.

স্ট্রিপ মলের পার্কিং লট থেকে এখনও বের করে আনা হয়নি লেসলি কার্টারিসের গাড়িটা। শেরিফের লোকেরা গাড়ি ঘিরে অরেঞ্জ-কোন বসিয়ে। গাড়িটাকে আলাদা করে রেখেছে। কেউ যাতে ওটার কাছে না যায়, কিছু না ধরে।
গাড়িটার পেছনে হাতখানেক দূরে ঝুঁকে বসল কিশোর। স্কিড় করে যাওয়া চাকার দাগ দেখতে পেল।
গাড়ির ভেতরে উঁকি দিচ্ছে মুসা।
একটা ফাইল হাতে তার কাছে দাঁড়িয়ে আছে রবিন। ফাইল পড়ে বলল, রাত বারোটা সতেরো মিনিটে এই গাড়ির ভেতরে লেসলির লাশটা পেয়েছে পুলিশ। শর্ট সার্কিট হয়ে নষ্ট হয়ে গেছে সমস্ত ইলেকট্রিক্যাল সিসটেম। ওয়্যারিঙের তার সব পুড়ে, গলে গেছে।
কিশোরের কাছে এসে দাঁড়াল সে।
এখনও ঝুঁকে বসে আছে কিশোর। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাকার দাগগুলোর দিকে তাকিয়ে কি যেন বোঝার চেষ্টা করছে। সেগুলো রবিনকে দেখিয়ে বলল, মনে হচ্ছে তাড়াহুড়ো করে পালাতে চেয়েছিল লেসলি।
রবিন জিজ্ঞেস করল, কার কাছ থেকে? কেন?

উঠে দাঁড়াল কিশোর। মলের দিকে তাকাল। কখন শেষ পিজ্জাটা ডেলিভারি দিয়েছিল লেসলি?
ফাইল দেখল রবিন। এগারোটা থেকে সাড়ে এগারোটার মধ্যে। কেন?
এগারোটার মধ্যে বন্ধ হয়ে যায় এখানকার সব স্টোর, ভিডিও আর্কেডের ওপর স্থির হলো কিশোরের দৃষ্টি। সম্ভবত এই আর্কেডটা বাদে।
*
আর্কেডের ভেতরের মান নীলচে আলো চোখে সইয়ে নিতে সময় লাগল তিন গোয়েন্দার। সামনের কাউন্টারে বসে কয়েন গুণে গুণে কাগজের টিউবে ভরে রাখছে একটা সতেরো-আঠারো বছরের ছেলে।
দশ...এগারো-বারো... গুণছে সে। কাউন্টারে ঝুঁকে গভীর মনোযোগে কাজ করছে। প্রতিটি মুদ্রা ভালমত দেখছে। তেরো...
এক্সকিউজ মি! ছেলেটার প্রায় কানের কাছে গিয়ে বলল রবিন।
ময়লা একটা আঙুল তুলে রবিনকে অপেক্ষা করতে ইশারা করে গুণে চলল ছেলেটা। তেরো...উম, চোদ্দ-..
কিশোরের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করল রবিন
অহেতুক দাঁড়িয়ে না থেকে আর্কেডের ভেতরটা দেখতে শুরু করল কিশোর। মুসা যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল।
ছেলেটার দিকে ঘুরল রবিন। আগের চেয়ে জোরে বলল, এক্সকিউজ মি, প্লীজ!
ঘর্মাক্ত, গোলআলুর মত একটা গোল মুখ ঘুরল রবিনের দিকে। ছোট ছোট দুই চোখের দৃষ্টি স্থির হলো ওর মুখের ওপর। অবাক হয়ে ভাবতে লাগল। রবিন, ছেলেটার মুখ কি কোনকালে বন্ধ হয়? নাকি সব সময়ই ওরকম অর্ধেক ফাঁক হয়ে খুলে থাকে?
অপেক্ষা করছে রবিন। কি চাই, কি সাহায্য করতে পারি, এ ধরনের কোন প্রশ্নের অপেক্ষা। কিন্তু কিছুই বলল না ছেলেটা। তাকিয়ে রইল হাঁ করে। শেষে রবিনকেই কথা শুরু করতে হলো, কি নাম তোমার?
আঁ? এই একটা শব্দ উচ্চারণ করে আবারও দীর্ঘ মুহূর্ত রবিনের দিকে তাকিয়ে রইল ছেলেটা। আস্তে করে মাথা ঝাঁকিয়ে যেন কথা বের করার চেষ্টা চালাল মগজের ভেতর থেকে। শেষে কোনমতে বলল, পটেটো।
মাথা ঝাঁকাল রবিন। হাসল। চমৎকার নাম। একেবারে মানানসই। পটেটো, তোমার একটা মিনিট সময় নষ্ট করতে পারি আমি?
হ্যাঁ, মলিন হাসি হাসল পটেটো। বলো।
জ্যাকেটের পকেট থেকে তিন গোয়েন্দার একটা কার্ড বের করল রবিন। পটেটোকে দেখিয়ে বলল, আমি একজন গোয়েন্দা।

পলকে পটেটোর প্রায় ফ্যাকাসে মুখটা আরও রক্তশূন্য হয়ে যেতে দেখল সে। ইঁদুরের মত চি চি করে উঠল, তো আমি কি করব?
কার্ডটা সরিয়ে রাখল রবিন। কাল রাতেও কি এখানে তোমারই ডিউটি ছিল?
মাথা ঝাঁকাল পটেটো, হ্যাঁ। রোজ রাতেই থাকে।
একটা ছবি দেখাল রবিন, এই লোকটাকে চিনতে পারো?
ছবিটা দেখল পটেটো। কুঁচকে যাচ্ছে ভুরু। দ্রুত চিন্তা চলেছে তার মনে, মুখ দেখেই বোঝা যায়। নাহ্, অবশেষে জবাব দিল সে, কখনও দেখিনি।
এমনভাবে মানা করে দেবে ছেলেটা, ভাবেনি রবিন। বলল, দেখো না, আরেকটু ভালমত দেখো। কাল রাত এগারোটা থেকে সাড়ে এগারোটার মধ্যে এখানে এসেছিল সে।
ধীরে ধীরে মাথা নাড়তে লাগল পটেটো। যেন কে ঢুকল কে বেরোল এসব নিয়ে কোন মাথাব্যথা নেই তার। ভঙ্গি দেখাল যেন কথাও বুঝতে পারছে না।
এমন সরাসরি মিথ্যে বলছে ছেলেটা! এভাবে যে মিথ্যে বলে তার মুখ থেকে কথা আদায় করা কঠিন। অসহায় বোধ করল রবিন। মুসার দিকে তাকাল।
পায়ে পায়ে কাছে এসে দাঁড়াল মুসা। কঠিন দৃষ্টিতে তাকাল পটেটোর দিকে। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, শোনো, আলু মিয়া, মনে করিয়ে দিচ্ছি তোমাকে। তোমাদের পার্কিং লটে খুন হয়েছে ছবির এই লোকটা, পড়ে থাকা আধপোড়া গাড়িটা দরজা দিয়ে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। সেটা দেখিয়ে বলল, ওই যে ওটা এর গাড়ি। ওই সময় তুমি এখানে থাকলে দৃশ্যটা তোমার চোখে না পড়ার কথা নয়। একটা গাড়ি আগুনে পুড়ছে, আর তুমি কিছু দেখোনি…
তাই তো, আস্তে করে বলল পটেটো। বড় বড় হয়ে গেল চোখ। ওপর-নিচে দ্রুত ওঠানামা শুরু করল তার মাথা। মুসার বাহুর শক্তিশালী পেশীর দিকে তাকিয়ে যেন হঠাৎ করে মনে পড়ে গেছে। আড়চোখে তাকিয়ে দেখল নিগ্রো ছেলেটার ঘুসি ছুটে আসছে কিনা তার গোল নাকের ডগাটাকে ভোঁতা করে দেয়ার জন্যে। হায় হায়… গাড়ির দিকে আঙুল তুলে সেটা আবার ঠেকাল রবিনের হাতের ছবিতে, এই লোকটাই সে?
*
আর্কেডের একেবারে পেটের মধ্যে সারি সারি ভিডিও গেম মেশিনের পাশ দিয়ে চলেছে কিশোর। ওগুলোর সামনে দাঁড়ানো ছেলেগুলো বেশির ভাগই তার সমবয়েসী, কেউ দুএক বছরের ছোট, কেউ বড়। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় চোখ তুলে কেউ কেউ শূন্য দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে তার দিকে। হয়তো ভাবছে ওদের মতই কিশোরও ভিডিও গেম খেলতে এসেছে।

একটা ক্লাসিক উরটিজার জুকবক্সের পাশ কাটাল সে। কমপ্যাক্ট ডিস্ক লাগানো আছে ওটাতে। ভিডিও গেম মেশিনগুলোর কাছে কেমন ভারিক্কি দেখাচ্ছে ওটার চেহারা।
মেশিনগুলোর পাশ কাটাতে গিয়ে একটা মেশিন দৃষ্টি আকর্ষণ করল তার। থমকে দাঁড়াল। Virtual Massacre-II মেশিন। পর্দায় স্তম্ভ তৈরি করে ফুটছে খেলে রেখে যাওয়া খেলোয়াড়দের নাম, সই, তারিখ আর সময়। একটার নিচে আরেকটা।
তাকিয়ে রইল কিশোর। নামের সারি শেষ হতেই একটা ভয়ঙ্কর দৃশ্য, ফুটল। একজন যোদ্ধা কারাতের কোপ দিয়ে মেরে ফেলল আরেকজন যোদ্ধাকে। মুমূর্ষ যোদ্ধার মুখ থেকে ফোয়ারার মত ছিটকে বেরিয়ে এল এক ঝলক রক্ত। পরক্ষণে বলে উঠল একটা যান্ত্রিক কণ্ঠ: খেলবে, এসো। আমি জানি তোমার পকেটে একটা সিকি আছে:
শেষ ওকে দেখেছি এই মেশিনটাতে একটা সিকি ঢোকাতে, পাশ থেকে বলল আরেকটা কণ্ঠ।
ফিরে তাকাল কিশোর। গোলআলুর মত মুখওয়ালা টিনেজ অ্যাটেনডেন্ট রবিনের সঙ্গে কথা বলছে মেশিনটার দিকে তাকিয়ে। পেছনে দাঁড়িয়ে আছে মুসা।
তারপর বেরিয়ে গেল, পটেটো বলছে। কিছুক্ষণ পর শুনলাম অ্যাম্বুলেন্সের সাইরেন।
কৌতূহলী দৃষ্টিতে ওকে দেখতে লাগল কিশোর। কিন্তু একটা চোখ রয়েছে মেশিনের পর্দায়। নামের স্তম্ভ ফিরে আসার অপেক্ষা করছে।
পটেটোর দিকে তাকাল রবিন, অ্যাম্বুলেন্স আসার আগে বাইরে অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়েছে তোমার?
মাথা নাড়ল পটেটো। শূন্য দৃষ্টিতে তাকাল। চোখ মিটমিট করল। বলা কঠিন। আমি বলতে চাইছি, এতটাই শোরগোল শুরু হয়েছিল, আলাদা করে কিছু বোঝা যাচ্ছিল না, বলেই ঝট করে ফিরে তাকিয়ে দেখে নিল মুসাকে, সে আবার অস্বাভাবিক কিছু ঘটানোর তালে আছে কিনা। এরকম ঘটনা ঘটলে যা হয় আরকি।
কাছাকাছি এমন কাউকে দেখেছ, যে মনে করতে পারবে কোন কিছু দেখেছে?
অ্যা…না মনে পড়ছে না।
পটেটোর পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বোলাল কিশোর। কথা গোপন করার জোর চেষ্টা চালাচ্ছে টিনেজ অ্যাটেনডেন্ট, বুঝতে অসুবিধে হলো না তার। কাকে বাঁচাতে চাইছে সে? কেন? মেশিনের পর্দায় ফিরে গেল তার। দৃষ্টি। আবার ফিরে এসেছে নামের স্তম্ভ।
অই, আলু, চিৎকার করে উঠল একটা ছেলে, আমার ভাঙতি পয়সা কই?

বাচল যেন পটেটো।এক্সকিউজ মি বলে তাড়াতাড়ি ছুটে গেল, সেদিকে।
রবিন, এদিকে এসো, হাত নেড়ে ডাকল কিশোর। পর্দার দিকে হাত তুলল, দেখো।
কি? চোখের পাতা সরু করে তাকাল রবিন।
ফাইল। বজ্রপাতের শিকার অন্য ছেলেগুলোর নাম কি ছিল?
ফাইল খুলল রবিন। একটা লিস্ট দেখল। হ্যারি গাটস... মরিস নিউম্যান..বিলি ফক্স বব-..
দাঁড়াও দাঁড়াও! বিলি ফক্স। ওর মিডলনেমটা কি? লেখা আছে?
আছে।
বিলি পিটার ফক্স?
হ্যাঁ।
বজ্রপাতের শিকার হয়েছিল পাঁচজন। তাদের মধ্যে একজন বেঁচে গিয়েছিল। তার নাম বিলি পিটার ফক্স। তাই তো?
ফাইলের দিকে আরেকবার তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল রবিন, হ্যাঁ। তুমি জানলে কি করে?
ওই দেখো, আবার পর্দার দিকে হাত তুলল কিশোর। হাই স্কোরারদের মধ্যে ওর নাম সই করা আছে নামের আদ্যক্ষর। বি পি এবং এফ। কি দাঁড়াল? বিলি পিটার ফক্স।
পর্দার কাঁচে সইটার ওপর আঙুল রাখল সে। ধীরে ধীরে পাশে সরাল আঙুলটা। তারিখ এবং সময় লেখা আছে। লেসলি কার্টারিসের নাম আছে। কখন খেলেছে, সময় লেখা আছে
পর্দা থেকে হাত সরিয়ে এনে দূনে দুই সহকারীর মুখোমুখি হলো। কিশোর। এর একটাই মানেনসৰি কার্টারিস খুন হওয়ার সময় বিলিও–এখানে ছিল।
.
ওয়াকম্যানের হেডফোন কানে লাগিয়ে একটা বুইক গাড়ির পেটের নিচে ঢুকে, কাজ করছে বিলি ফক্স। এ শহরের অর্ধেক ছেলেই মেকানিক। বিলিকে যা দিচ্ছেন তার অর্ধেক বেতনে ওর চেয়ে দক্ষ মেকানিক রাখতে পারতেন জোসেফ হাওয়ার্ড। কিন্তু ছেলেটাকে দেখে মায়া হয়েছে। তাই ইচ্ছে করেই বেতন বেশি দিচ্ছেন।
চিত হয়ে থেকেই পিঠ উঁচু করে পিঠের নিচের গদিটা টেনে ঠিক করল বিলি। পাশে হাত বাড়াল রেঞ্চের জন্যে। পেল না। কোথায় ওটা দেখার জন্যে মুখ ঘুরিয়ে তাকাল। চোখে পড়ল একজোড়া সুন্দর পা।
হাসিতে ঠোঁটের একটা পাশ নিচে নেমে গেল ওর। যে কোন জায়গায় লক্ষ পায়ের মধ্যে ওগুলোকে চিনে নিতে পারবে সে। স্কুলে, এখানে ওখানে, নানা জায়গায় ওই

পা আর পায়ের মালিককে হাজার বার দেখেছে। জীবনে। এক জিনিস বলতে সবচেয়ে বেশি দেখেছে বোধহয় ওই পা-জোড়া।

গ্যারেজের কংক্রীটের মেঝেতে হাই-হীলের খটখট শব্দ তুলে গাড়িটার দিকে এগিয়ে আসছে পায়ের মালিক। চিত হয়েই হাত আর পায়ের সাহায্যে নিজের শরীরটাকে মুচড়ে গাড়ির নিচ থেকে বের করে আনল বিলি। স্প্রিঙের মত লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

ওকে হঠাৎ এভাবে উঠে দাঁড়াতে দেখে চমকে গেল হাই-হীলের মালিক। পিছিয়ে গেল এক পা।

তাড়াতাড়ি কানের ওপর থেকে হেডফোন সরিয়ে নিল বিলি। বেজবল ক্যাপটা টেনে ঢেকে দিল মাথার কাটা দাগ। তার সবচেয়ে মধুর আর মোলায়েম হাসিটা উপহার দিয়ে বলল, মিলি, কেমন আছ?

ওফ, বিলি, যা কাণ্ড করো না! ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে!

কথা হারিয়ে ফেলল বিলি। ভয় দেখানো দূরে থাক, কোনমতেই সামান্য চমকে দিতেও চায় না সে মিলিকে।

সরি, মিলি, মেয়েটার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল সে। তার মতে পুরো কাউন্টিতে এত সুন্দর চোখ অন্য কোন মেয়ের নেই। হয়তো পুরো আমেরিকাতেও এত সুন্দরী নেই আর কেউ। এটাও কেবল ওর ধারণা। মিলি হলো বিলির বয়েসী একেবারে নিখুঁত সুন্দরী একটা মেয়ে।

নিজের হাতের দিকে তাকাল সে। তেলকালি মাখা। গ্যারেজে থাকলে সব সময়ই হাতে ময়লা লেগে থাকে। হাত দুটো সরিয়ে নিল।

বাবা কোথায়? জানতে চাইল মিলি।

প্রশ্নটা নিরাশ করল বিলিকে। সে ভেবেছিল শুধু তার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছে মিলি। ওর সঙ্গে কথা বলতে।

একটা নষ্ট গাড়ি আনতে গেছেন।

মিলির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল বিলি। ওকে সামনে দেখলে কিছুতেই, চোখ সরাতে পারে না। লক্ষ করেছে এতে অস্বস্তি বোধ করে মিলি। কিন্তু সে সরাতে পারে না, কি করবে? এত সুন্দর একটা মুখের ওপর থেকে চোখ সরায় কি করে মানুষ? শিল্পীর হাতেগড়া চেহারা!

আর কি করতে পারি তোমার জন্যে? জিজ্ঞেস করল বিলি।

আর কিছু না। বাবা বলেছিল, আজ একসঙ্গে লাঞ্চ খাব আমরা।

দ্রুত ভাবনা চলল বিলির মাথায়। মিস্টার হাওয়ার্ড যখন নেই, সে নিজেও তো খাওয়ানোর প্রস্তাব দিতে পারে মিলিকে। ও নিশ্চয় সেটা পছন্দ করবে।

তোমার কি খিদে পেয়েছে? জানতে চাইল বিলি। তোমাকে আমি খাওয়াতে পারি। কি খাবে? হেসে বলল, আমার কাছে জেলি ডোনাট আছে। কালকের বানানো। তবে এখনও তাজা। খাবে একটা?
নিজের অজান্তেই এক পা আগে বাড়ল সে।
পিছিয়ে গেল মিলি। মাথা নাড়ল।
বিলি মনে করল তার নোংরা পোশাক দেখেই সরে গেছে মিলি। ওর ঝলমলে জামাকাপড় আর চকচকে জুতোর দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল বিলির বুক থেকে। খাবে না কেন? কালকের বলে?
এই সময় একটা টো ট্রাক ঢুকতে দেখা গেল গ্যারেজের গেট দিয়ে। এসে গেছেন মিস্টার হাওয়ার্ড–মিলির বাবা এবং বিলির বস।
ট্রাকটাকে দেখামাত্র তাড়াতাড়ি দুই পা পিছিয়ে গেল বিলি।
কাছে এসে দাঁড়াল ট্রাক। ক্যাব থেকে বেরিয়ে এলেন জোসেফ হাওয়ার্ড লম্বা, সুদর্শন। মিলির দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বললেন, সরি, দেরি হয়ে গেল। অনেকক্ষণ এসেছিস?
মাথা নাড়ল মিলি, না, এই এলাম।
ওই অভাগা পিজ্জা-বয়টার পোড়া গাড়িটা আনতে আনতে দেরি হয়ে। গেল।
মেয়ের সঙ্গে কথা শেষ করে বিলির দিকে তাকালেন হাওয়ার্ড। বিলি, পোড়া গাড়িটার একটা ব্যবস্থা করো। তাড়াহুড়ো নেই। ও হ্যাঁ, ভাল কথা, রেডিওতেই তোমাকে বলতে চেয়েছিলাম কয়েকটা ছেলে তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে। শখের গোয়েন্দা। আমাকে এসে ধরল। বললাম, আমার গ্যারেজেই কাজ করে। ছেলেগুলোকে ভাল মনে হলো আমার। বলে দিলাম, তুমি অবশ্যই দেখা করবে।
বিষণ্ন, গভীর ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল বিলি। মনে মনে প্রশ্ন করল নিজেকে, গোয়েন্দা, না? আমার কাছে কি কাজ ওদের? গাড়ি সেরে দেয়ার জন্যে ভাল মেকানিক চায়?
কিন্তু নিশ্চিত জবাবটা পেল না। ESR।
মেয়ের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছেন হাওয়ার্ড। সেদিকে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে টো ট্রাকটার দিকে পা বাড়াল সে।
*
হু, এই বোকাটাই তাহলে মারা পড়েছে?
লেসলি কার্টারিসের ছবিটার দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলল বিলি। লেসলির স্কুল জীবনের ছবি। ঝাকড়া চুল, সুন্দর স্বাস্থ্য, মিষ্টি হাসিতে দুনিয়া জয় করার ভঙ্গি। এধরনের মানুষকে অপছন্দ করে বিলি, দুচোখে দেখতে পারে না। নিজের চেয়ে

ভাল স্বাস্থ্য আর সুন্দর চেহারার কাউকে দেখলেই ঈর্ষা হয় তার। ঘৃণা হয়। একে শেষ করে দিয়েছে বলে অনুশোচনা তো দূরে থাক, খুশি হলো মনে মনে।
ঘটনাটা খুব দুঃখজনক, নীরস কণ্ঠে বলল সে।
ছবিটা দিয়েছে কিশোর। কিন্তু রবিনের হাতে ফিরিয়ে দিল বিলি। কিশোরের তীক্ষ্ণ চোখের দিকে তাকানোর সাহস হচ্ছে না তার। দৃষ্টি তো নয়, যেন ধারাল ছুরি। অন্তরের অন্তস্তলটা পর্যন্ত যেন দেখে নেয়। রবিন কিংবা মুসার দিকেও তাকাল না সে। যন্ত্রপাতি নিয়ে খুটুরখাটুর শুরু করল। অনুভব করল, তিন জোড়া চোখ এখন তাকিয়ে আছে তার দিকে। নিচের দিকে মুখ নামিয়ে রেখে কাজ করার ভান করতে করতে জানতে চাইল, কি করে মারা গেল?
শেরিফ আর করোনারের কাছে শুনলাম বজ্রপাতে, জবাব দিল কিশোর।
না হেসে পারল না বিলি। হ্যাঁ, এরকম ঘটনা এখানে আজকাল হরহামেশাই ঘটে। মোড়ক খুলে একটা চিউঙিং গাম মুখে ফেলে চিবাতে শুরু করল। কোথায় মরল?
ভিডিও আর্কেডের বাইরে, জানাল কিশোর। লোকটা যখন মারা গেছে। আকাশে মেঘ থাকলেও একবারও বিদ্যুৎ চমকায়নি। বজ্রপাতের শব্দ শোনা যায়নি।
বিলির ওপর থেকে ক্ষণিকের জন্যেও চোখ সরাচ্ছে না সে।
অস্বস্তি বোধ করতে লাগল বিলি। এভাবে তাকিয়ে আছে কেন ছেলেটা? কিছু আঁচ করে ফেলেছে? নাকি কায়দা করে ওর পেটের কথা বের করার চেষ্টা এটা?
কাল রাতে তুমি ওখানে গিয়েছিলে, তাই না? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
হ্যাঁ, সত্যি জবাবটাই দিল বিলি। নিজেকে বোঝাল, মিথ্যে যত কম বলে পার করা যায়, ততই মঙ্গল। এই ছেলেটাকে ফাঁকি দেয়া সহজ হবে না।
তাহলে নিশ্চয় অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়েছে তোমার?
মাথা নাড়ল বিলি। দেখো, আমি যখন খেলা নিয়ে মেতে থাকি, দুনিয়ার কোন কিছুই চোখে পড়ে না আমার। অ্যাটম বোমা ফাটালেও শুনতে পাব না
আমি কেন, কালা নাকি মোটর মেকানিক বিলি। চট করে ভা।
কেন, কালা নাকি ব্যাটা তুই? মনে মনে রেগে উঠল মুসা। প্রথম দর্শনেই অপছন্দ করেছে এই মোটর মেকানিককে।
যেন তার মনের কথাটাই শুনে, ফেলল বিলি। চট করে চোখ তুলে তাকাল মুসার দিকে। ওর দিকেই তাকিয়ে আছে নিগ্রো ছেলেটা। তবে কোঁকড়া-চুল ছেলেটার মত দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা নেই এর, আছে ঝাজ।
আবার চোখ নামিয়ে নিজের কাজে মন দেয়ার ভান করল বিলি।
কিশোর বলল, বিলি, একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করি? নিজেকে কি ভাগ্যবান মনে করো তুমি?

আমি? নিজের বুকে হাত রাখল বিলি। মনে মনে বলল, বেকুবটা বলে কি? আমি ভাগ্যবান হলে দুনিয়ায় হতভাগা মানুষ আর কে? নাহ, চোখ দেখে যতটা মনে হয়েছে, ততটা বুদ্ধিমান তো নয়। জবাব দিল, না, সেটা মনে করবার কোন কারণ নেই।

কেন ভাগ্যবান, বুঝিয়ে দিচ্ছি আমি। তোমার মাথায়ও বাজ পড়েছিল। কিন্তু বেঁচে গেছ। বাকি সব কজন মারা গেছে। ওদের চেয়ে তুমি ভাগ্যবান নও?

হঠাৎ মাথার কাটা দাগটা চুলকাতে শুরু করল বিলির। বাজ পড়েছিল ঠিক ওখানটাতেই। অন্য যে কেউ হলে সঙ্গে সঙ্গে পরপারে চলে যেত। কিন্তু সে তো যায়ইনি, বেঁচে গেছে, আগের চেয়ে ক্ষমতাশালী হয়েছে আরও। ওর বেঁচে যাওয়াটা ডাক্তারদের কাছে একটা বিস্ময়।

হ্যাঁ, সেদিক থেকে আমাকে ভাগ্যবান বলতে পারো অবশ্য। প্রশ্নটা অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছে বিলিকে। কিশোরকে বিদেয় করার জন্যে একটা বুদ্ধি বের করল সে।

কিশোর! চেঁচিয়ে উঠল রবিন। আগুন! তোমার পকেটে ধোয়া!

চট করে চোখ ফেরাল কিশোর। সত্যিই তার জ্যাকেটের পকেট থেকে ধোয়া বেরোচ্ছে।

হাসি ঠেকানোর জন্যে জোরে জোরে চিউয়িং গাম চিবাতে লাগল বিলি।

পকেট থেকে সেলুলার ফোনটা টেনে বের করল, কিশোর। ধোয়া বেরোচ্ছে ওটা থেকে।

আগুন লাগল কি করে? চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে মুসা। ব্যাটারি কখনও এভাবে পোড়ায় বলে তো শুনিনি!

হাতে ছ্যাকা লাগতে তাড়াতাড়ি যন্ত্রটা ফেলে দিল কিশোর। মাটিতে পড়ে গলতে শুরু করল ওটার প্লাস্টিক বডি। ধোয়া বেরোচ্ছে অনবরত। হাতের তালুতে আঙুল বোলাতে লাগল সে।

পুড়ে যাওয়া ফোনটার দিকে তাকিয়ে আনমনে মাথা নাড়ার ভঙ্গি করল। বিলি, এসব আধুনিক যন্ত্রপাতির ওপর বিশ্বাস নেই। কখন যে কোন অঘটন ঘটাবে কিশোরের দিকে এতক্ষণে মুখ তুলে তাকাল সে। তোমাদের কথা শেষ হলে যেতে পারো। আমার জরুরী কাজ পড়ে আছে।

গম্ভীর হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। তারপর বলল, সাহায্যের জন্যে ধন্যবাদ। অনেক বিরক্ত করলাম তোমাকে।

না-না, ও কিছু না।

একটা এঞ্জিন খোলায় মন দিল বিলি।

ছোট্ট যে বাংলো বাড়িটাতে বাস করে বিলি আর তার মা, এই এলাকার সবচেয়ে পুরানো বাড়ি ওটা। রঙ চটে গেছে বহুকাল আগে। কাত হয়ে পড়েছে একপাশে। সামনের সিঁড়ির তিনপাশ ঘিরে আগাছা জন্মেছে। ড্রাইভওয়েটা ঘাস আর আগাছায় ঢেকে গিয়ে চেনাই যায় না। বাড়ির সামনে সুপ হয়ে আছে জঞ্জাল।
বাড়ি ফিরে বিলি দেখল তন্ময় হয়ে টেলিভিশনের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। তার মা। নিজের সমান লম্বা একটা কাউচে কনুইয়ে ভর দিয়ে কাত হয়ে শুয়েছেন। টক-শো হচ্ছে টিভিতে। গভীর মনোযোগে ওদের বাদানুবাদ শুনছেন তিনি।
দরজায় দাঁড়িয়ে মুচকি হাসল বিলি। পর্দার দিকে বিশেষ দৃষ্টিতে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে চ্যানেল বদলে গিয়ে দেখা গেল এমটিভি।
ঝটকা দিয়ে ফিরে তাকালেন মা। চিৎকার করে বললেন, রিমোট টেপাটেপি করছিস কেন? দে আগেরটা!
গায়ে শক্ত কি যেন লাগল তার। চোখ নামিয়ে দেখেন রিমোটটা তাঁর পাশে কাউচেই পড়ে আছে। বিস্মিত চোখ তুলে তাকালেন ছেলের দিকে।
বিলি তখন টিভির দিক থেকে নজর সরিয়ে নিয়েছে। চকোলেট মিল্কের একটা ব্যাগ কাটতে ব্যস্ত। রিমোট টিপে অনুষ্ঠান আবার আগের চ্যানেলে ফিরিয়ে আনলেন মা।
কি যে ছাইপাশ দেখো তুমি, মা, বিলি বলল। যত সব ছাগলের দল!
ছাগল হোক আর যাই হোক, টেলিভিশন তো ওদেরকে দাওয়াত করে নিয়ে যায়, কাটা জবাব দিলেন-মা। তোকে তো নেয় না।
ছাগলে ছাগল চেনে, পাগলে পাগল, যেন কি একটা মস্ত রসিকতা করে ফেলেছে ভেবে খিকখিক করে হাসতে লাগল বিলি। বিশ্রী ভঙ্গিতে শব্দ করে ঢেকুর তুলল।
মাথা নাড়তে নাড়তে মা বললেন, ভদ্রব্যবহার করতে পয়সা লাগে না, বিলি। তুই আর মানুষ হবি না কোনদিন। কোন মেয়ে তোর এই জঘন্য ঢেকুর। তোলা সহ্য করবে?
যে করবে, তাকে দেখলে তোমার জবান বন্ধ হয়ে যাবে, মা।
ছেলের দৌড় জানা আছে মায়ের। তার কথাকে গুরুত্বই দিলেন না। আবার মনোযোগ ফেরালেন টেলিভিশনের দিকে।
মা যতই খোঁচা দিয়ে কথা বলুক, ভাবছে বিলি, টেলিভিশনের ওই গর্দভগুলোর দলে কোনদিন যোগ দেব না আমি। ওদের চেয়ে অনেক বেশি ক্ষমতা আমার, অনেক বড় কাজ করতে পারি। সারা পৃথিবীকে কাঁপিয়ে দিতে পারি।
মনে মনে নানা রকম পরিকল্পনা করতে লাগল বিলি। সবগুলোই মিলিকে জড়িয়ে। ওকে বাদ দিয়ে কোন কিছু করার ইচ্ছে নেই তার। মিলি তার সঙ্গে অন্য মেয়েদের মত খারাপ আচরণ করে না। তাকে অবহেলা করে না। এড়িয়ে চলে না।

তাকে বোকা বলে না। তার রসিকতায় হাসে। তার খাতায় ভাল ভাল কথা লিখে দেয়। তাকে উৎসাহ দেয়। তাকে যে পছন্দ করে, তার জন্যে মায়া আছে, তার খারাপ কিছু হলে কষ্ট পাবে, এটা স্পষ্টই বুঝিয়ে দেয়। তাকে বেঁচে থাকার প্রেরণা জোগায়।

দরজায় টোকার শব্দ ভাবনার জগৎ থেকে ফিরিয়ে আনল বিলিকে। বিশেষ ধরনের পরিচিত টোকা। পটেটো এসেছে। দরজা খুলতে যাওয়ার আগে টেলিভিশনের দিকে তাকাল বিলি আরেকবার। মুহূর্তে হট্টগোল শুরু হয়ে গেল তাতে। ছবি ঠিকই থাকল, শব্দ হয়ে গেল গোলমেলে। কিছু বোঝা যায় না। মুচকি হাসল সে। গেল বিরক্তিকর গাধাগুলোর বকবকানি।

মা কিছু বলার আগেই ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল সে। দরজায় দাঁড়িয়ে আছে পটেটো। ঠোঁটে আঙুল রেখে তাকে এখানে কথা না বলতে ইশারা করল। নেমে গেল আঙিনায়।

পিছন পিছন গেল পটেটো। বললে বিশ্বাস করবে না, বিলি। আজ কারা এসেছিল আর্কেডে, তুমি কল্পনাও করতে পারবে না!

অনুমান করতে বলছ? গোয়েন্দা।

থমকে দাঁড়াল পটেটো। কি করে জানলে?

গ্যারেজেও হানা দিয়েছিল ওরা।

তোমাকে খুঁজে বের করল কিভাবে?

সেটাই তো আমি জিজ্ঞেস করতে চাই তোমাকে! কঠিন হয়ে উঠল বিলির কণ্ঠ। নিশ্চয় কোন ফাঁকে ভুল করে আমার নামটা বলে দিয়েছ ওদের কাছে।

হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল বিলি। ওর সঙ্গে তাল রাখতে হিমশিম খেয়ে গেল পটেটো।

না না, আমি একবারও তোমার নাম বলিনি। সত্যি।

মাঠে বেরিয়ে এসেছে ওরা। বিলিদের বাড়ির পেছনের তৃণভূমিটা বছরের এসময়ে সবুজ ঘন ঘাসে ভরা থাকে। এক সময় এটা ফক্স পরিবারের সম্পত্তি ছিল, বিলির দাদার। কিন্তু পরে হাতছাড়া হয়ে যায়। যেমন করে সব কিছু খুইয়েছে ওরা।

কাঁটাতারের বেড়াটা লাফ দিয়ে পেরিয়ে এল বিলি। তারের মাঝের ফাঁক দিয়ে ঢোকার চেষ্টা করতে লাগল পটেটো।

থাকো ওখানেই! বিলি বলল।

ঢাল বেয়ে পাহাড়ে উঠতে শুরু করল সে।

পটেটো ভাবল ওর ওপর রেগে যাওয়ায় ওকে সঙ্গে যেতে মানা করছে বিলি। সত্যি বলছি, বিলি, আমি কিছু বলিনি। তোমার কোন ক্ষতি কি আমি করতে পারি?

পাহাড়ের ওপরে ছোট একটা চত্বরমত জায়গা আছে। ঘাস খেতে খেতে ওখানে উঠে যায় গরুর পাল। রাতে বেশির ভাগ নেমে আসে। কিছু কিছু বেশি দুঃসাহসী গরু আছে, বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করে না, রাতেও থেকে যায় ওখানেই। গরু কি করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমায়, ভাবতে অবাক লাগে বিলির।

তুমি চলে যাও, পটেটো, ফিরে তাকিয়ে বলল বিলি। আমার এখন কাবাব খেতে ইচ্ছে করছে।

ভারী দম নিল পটেটো। কাঁপা গলায় বলল, এখন? না না বিলি, গরু ঝলসানোর সময় এটা নয়!

জবাবে হা-হা করে হাসল বিলি। যাও, চলে যাও। প্র্যাকটিসটা চালু রাখতে হবে আমাকে। নইলে শেষে দেখা যাবে অস্ত্র ভোতা হয়ে গেছে। ঠিকমত কাজ করছে না আর।

প্লীজ, বিলি, এখন ওসব করতে যেয়ো না!

ওর কাকুতি-মিনতিতে কান দিল না বিলি। আবার হেসে উঠল। সে কিছু করতে গেলে পটেটোর এভাবে বাধা দেয়া দেখে মজা পায়।

মানুষের সাড়া পেয়ে এক এক করে জেগে উঠতে শুরু করেছে গরুগুলো। বাবা করে ডাকছে। বুঝতেই পারছে না কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটতে যাচ্ছে, ওদের ভাগ্যে।

পটেটোর কাছ থেকে সুরে এসেছে বিলি। পাহাড়ের ওপরে উঠে। আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকাল। মেঘ জমেছে। তারা ঢেকে দিচ্ছে। ঝোড়ো বাতাস বইতে শুরু করল। পা ফুলে উঠল মেঘ। ঘন নীল, হয়ে গেল রঙ। বিদ্যুৎ-শক্তিতে বোঝাই। প্র্যাকটিস করার উপযুক্ত সময়।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি আমি, আকাশের দিকে তাকিয়ে মেঘের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল বিলি। আমি রেডি। চলে এসো!

আরও ছড়িয়ে পড়ল মেঘ। সব তারা ঢেকে দিল। ঝোড়ো বাতাসের গর্জনের মাঝে গরুগুলোর ডাকাডাকি বেড়ে গেল। আকাশের অনেক উঁচুতে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে ঘন ঘন।

আমি এখানে! চিৎকার করে বলল বিলি। এই যে এখানে! পারলে এসে ধরো আমাকে! বলেই যতটা জোরে সম্ভব দৌড়াতে শুরু করল সে। গরুগুলোর মাঝখানে চলে এল।

কই আসছ না কেন? আকাশের দিকে তাকিয়ে আরও জোরে চিৎকার করে উঠল সে। এসো! ধরো আমাকে!

দুই হাত ছড়িয়ে দিয়েছে সে। তাকিয়ে আছে রেগে যাওয়া মেঘের দিকে। বা এসো এসো! ধরো। আমি অপেক্ষা করছি! ওপর দিকে দুই হাত তুলে দিল সে। এসো! ধরো আমাকে।

বিলি দেখেছে, এভাবে ওপর দিকে হাত তুলে দিলে বিদ্যুৎ ছুটে আসে তার দিকে। বাড়ির ছাতে বসানো দণ্ডের মত আকর্ষণ করে সে বিদ্যুৎকে।
ফেটে পড়ল যেন আকাশটা। কোটি কোটি সাপের আঁকাবাকা জ্বলন্ত লেজ সৃষ্টি করে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল বিদ্যুৎ-শিখা। বজ্রপাত ঘটতে লাগল ধরণী কাঁপিয়ে।
অন্যান্যবারের মত এবারেও ব্যতিক্রম ঘটল না। বিদ্যুৎ-শিখা ছুটে ছুটে আসতে লাগল তার দিকে। গরুগুলোর মাঝখান দিয়ে ছুটে বেড়াতে লাগল সে। বিদ্যুৎ তাকে ধরতে না পেরে যেন প্রচণ্ড আক্রোশে গরুগুলোকে আঘাত হানতে লাগল। ভয়ে চিৎকার শুরু করেছে ওগুলো। বজ্রপাতে ঝলসে যাচ্ছে। মাংসপোড়া দুর্গন্ধে ভরে গেল বাতাস।
একটা বজ্র আঘাত হানল বিলিকে। শিরা বেয়ে তীব্র গতিতে বিদ্যুৎ ছড়িয়ে গেল সারা শরীরে। হাতের আঙুলের মাথা দিয়ে ছড়ছড় করে ছিটকে বেরোতে লাগল স্ফুলিঙ্গ। পায়ের পাতা আর আঙুল বেয়ে নেমে গেল মাটিতে।
পড়ে গেল বিলি।
থেমে গেল বজ্রপাত, কমে এল বিদ্যুৎ চমকানো।
মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আছে বিলি। যেন অগ্নিপরীক্ষায় ক্লান্ত। দেহটা অসাড়। হাত-পা ঠিকমত নড়াতে পারছে না। অন্য কোন মানুষ হলে পুড়ে ছাই হয়ে যেত। বিলির কিছু হয়নি। তবে প্রচণ্ড ইলেকট্রিক শক সামলে নিতে কিছুটা সময় লাগবে।
দূর থেকে এতক্ষণ এই ভয়াবহ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছে পটেটো। দৌড়ে এল কাছে। পড়ে থাকা দেহটার ওপর ঝুঁকে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জানতে চাইল, বিলি! তুমি ঠিক আছ তো? বিলি!
খবরদার! ধোরো না এখন আমাকে! ফোঁস করে উঠল বিলি। উঠে বসল। ওর কানের দুল, দাঁতের গর্ত ভরাট করা ধাতুতে এখনও স্পার্ক করছে। বিদ্যুৎ। শরীরের মধ্যে বিদ্যুৎ জমে আছে। বাতাসে বিদ্যুতের গন্ধ।
খুব ভাল আছি, হাসিমুখে জবাব দিল সে।
.
একটা মরা গরুর সামনে এসে দাঁড়ালেন শেরিফ রবার্টসন। হতভাগ্য প্রাণীটার খোলা নিষ্প্রাণ দুই চোখে এখনও মৃত্যুক্ষণের বিস্ময়ের ছাপ প্রকট। ওটার সামনে থেকে সরে গিয়ে সেলুলার ফোন তুলে কানে ঠেকালেন। হিলটাউন শেরিফ ডিপার্টমেন্টে মান্ধাতার আমলের যন্ত্রপাতি সরিয়ে কিছু কিছু যেসব আধুনিক জিনিস ঢোকানো হচ্ছে, এই ফোনটা তার একটা।
পুরানো বন্ধু অস্টারিয়ান লাইটনিং অবজারভেটরির প্রোজেক্ট ডিরেক্টর হোমার বেলের সঙ্গে কথা বলছেন তিনি। গতরাতের বিদ্যুৎ-ঝড় সম্পর্কে শেরিফকে

বিস্তারিত জানাচ্ছেন বেল।
হুঁ-হাঁ করে করে বেলের কথার জবাব দিচ্ছেন শেরিফ। এই সময় একটা খয়েরি রঙের সীডান গাড়ি এসে থামতে দেখলেন।
ফ্যাক্স করে আমার অফিসে পাঠিয়ে দিতে পারবে? গোয়েন্দাদের দিকে চোখ রেখে ফোনে বললেন শেরিফ। পারলে এখনই পাঠাও। অনেক ধন্যবাদ তোমাকে, হোমার। রাখি?
সুইচ টিপে লাইন কেটে যন্ত্রটা পকেটে রেখে দিলেন শেরিফ। কাত হয়ে আরেকটা মরা গরুর পাশ কাটিয়ে গাড়িটার দিকে এগোলেন।
গাড়ি থেকে নেমে আসছে তিন গোয়েন্দা।
আরও একটা গরুর পাশ কাটালেন শেরিফ। মাছি ভনভন করছে এটার ওপর।
ছেলেগুলোর মুখোমুখি হতে অস্বস্তি বোধ করছেন তিনি। এরকম ঝামেলায় আর জীবনে জড়াননি। হিলটাউনে অপরাধ খুব কম হয়। মাঝেসাঝে দুচারটে মাতলামি, ঠগবাজি আর ছিঁচকে চুরির ঘটনা ছাড়া উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটে না। বড় বড় চুরি-ডাকাতি ঘটার মত সম্পদ নেই শহরটাতে।
ঢাল বেয়ে উঠে আসতে আসতে ওপর দিকে তাকাল কিশোর। কোমরে হাত দিয়ে ওদের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছেন শেরিফ। এমন ভঙ্গি করে আছেন কেন? অস্বস্তি বোধ করছেন নাকি?
এগিয়ে এসে তার সামনে দাঁড়াল কিশোর।
শেরিফ বললেন, খবর তাহলে পেয়ে গেছ?
হেসে মাথা ঝাঁকাল কিশোর। কি দেখলেন? বজ্রপাতেই মারা গেছে?
কেন, অন্য কিছু আশা করেছিলে নাকি?
পত্রিকাওলারা তো বজ্রপাতে মারা যাওয়ার কথাই লিখেছে, ঘুরিয়ে জবাব দিল কিশোর।
মাথা ঝাঁকালেন শেরিফ। আঙুল তুলে দেখালেন। পাহাড়ের ওপরের ঘাসে ঢাকা চত্বরে তিনটে গরু মরে পড়ে আছে।
এগিয়ে গিয়ে ভাল করে দেখল কিশোর। প্রতিটা গরুর শরীর ঝলসে গেছে। রস মত বেরোচ্ছে। ফিরে এসে বলল, তারমানে আসল বজ্রপাতেই মারা গেছে এগুলো, বিড়বিড় করল সে। শেরিফের দিকে তাকাল, রিমোট কন্ট্রোলড নয়।
মাথা দুলিয়ে বললেন শেরিফ, তাই তো মনে হয়। অবজারভেটরির। হোমার বেলের সঙ্গে কথা বললাম এইমাত্র। ওই বনের ওপাশে মাইলখানেক দূরে ওটা।
ফিরে তাকাল কিশোর। যেন গাছপালার মধ্যে কোথায় লুকিয়ে আছে। অবজারভেটরিটা দেখতে চায়।
বজ্রপাতের কথা কিছু বলেছে?

বলেছে। কাল রাতে বেশ কিছু বাজ পড়েছে এই পাহাড়ের ওপর। পৃথিবীর যে কোন জায়গার যে কোন বজ্রপাতের ঘটনা ধরা পড়ে ওদের যন্ত্রে। রেকর্ড থেকে যায়। বিদ্যুৎ চমকালে একটা নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সিতে বেতার তরঙ্গ ছড়িয়ে দেয়
শুম্যান রেজোন্যান্স বলে একে, শেরিফের মুখ থেকে কথাটা প্রায় কেড়ে নিয়ে বলল কিশোর। বিজ্ঞতা জাহির করে আনন্দ পেতে দিল না তাঁকে। প্রতি সেকেন্ডে আট সাইকেল। সাধারণ ট্রানজিসটর রেডিও দিয়েও ধরা। যায়।
চুপ হয়ে কিশোরের দিকে তাকিয়ে আছেন শেরিফ। এই ছেলেটার সঙ্গে সতর্ক হয়ে কথা বলতে হবে। এ ডক্টর এলিজা নয়। কখন লজ্জা দিয়ে দেবে। কে জানে!
হেসে খোঁচাটা দিয়েই দিল কিশোর, দেখলেন তো, আমি হোমওয়ার্ক ঠিকমতই করি।
হেসে ফেললেন শেরিফ। কাল রাতে যে সাধারণ বজ্রপাতেই মারা গেছে গরুগুলো, এ ব্যাপারে সন্দেহ থাকার কারণ নেই।
তারমানে সন্দেহ আছে আপনার?
দ্বিধা করলেন শেরিফ, একটা ব্যাপারেই খটকা লাগছে–একসঙ্গে একই জায়গায় এতগুলো বাজ পড়ল কিভাবে? অবস্থা দেখে মনে হয় যেন কেউ ওগুলোকে ঠিক এখানেই পড়তে বাধ্য করেছিল!
কয়েক গজ সরে গিয়ে একটা সমতল জায়গায় দাঁড়ালেন তিনি। ঘাস ওখানে পাতলা। হাত নেড়ে ডাকলেন, এসো, দেখে যাও।
এগিয়ে গেল তিন গোয়েন্দা।
আঙুল তুললেন শেরিফ। জুতোর খোঁচায় সরিয়ে দিলেন খানিকটা জায়গার বালি।
একসঙ্গে ঝুঁকে তাকাল মুসা, কিশোর আর রবিন।
দেখেছ? কালো একটা জিনিস পা দিয়ে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন শেরিফ, বলো তো এটা কি? ভাবলেন, এটার জবাব অন্তত দিতে পারবে না। কিশোর। চোখে চ্যালেঞ্জ নিয়ে মাথা তুলে হাসিমুখে তাকালেন ওর দিকে।
আরেকটু নিচু হয়ে ভাল করে দেখল কিশোর। মুখ তুলে বলল, ফুলগারাইট। তাই না?
হাসি চলে গেল শেরিফের মুখ থেকে। এটাও জানো!
নিরীহ কণ্ঠে জবাব দিল কিশোর, বজ্রপাতে এরকম হয় বজ্র যেখানে পড়ে, প্রচণ্ড তাপে সেখানকার বালি গলে কাচ হয়ে যায়।
মাথা ঝাঁকালেন শেরিফ। উ?
হাত দিয়ে ডলে কালো জিনিসটার ওপরের বালি সরাল কিশোর।
কি করছ?

তদন্ত।
একটা মুহূর্ত চুপ করে রইলেন শেরিফ। তারপর বললেন, কিরতে থাকো। তবে এখানে নতুন আর কিছু পাবে বলে মনে হয় না। আমি যাই। আমার কাজ আছে।
বলে আর দাঁড়ালেন না তিনি। লম্বা লম্বা পায়ে হাঁটতে শুরু করলেন নিজের গাড়ির দিকে।
বসে পড়ল কিশোর। কালো জিনিসটার একপাশে আঙুল ঢুকিয়ে টেনে তোলার চেষ্টা করতে লাগল।
কি করছ? শেরিফের প্রশ্নটাই করল আবার রবিন।
সূত্র খুঁজছি?
কিসের?
এখনও শিওর নই। দেখি আগে।
আর কিছু বলল না রবিন। মুসাও চুপচাপ দেখছে।
কালো, শক্ত কাচটা টেনে তুলতে গিয়ে খানিকটা ভেঙে ফেলল কিশোর। হাতে নিয়ে লেগে থাকা বালির কণা সরিয়ে চোখের সামনে এনে দেখতে লাগল। তারপর বাড়িয়ে দিল দুই সহকারীর দিকে, দেখো এখন। বজ্রপাতে বালি গলে কাচ হয়, এটা বৈজ্ঞানিক সত্য। কিন্তু কাচের মধ্যে মানুষের পায়ের ছাপ পড়ে, এটা কোন সত্য?
খাইছে! বলো কি? ভুতুড়ে কাণ্ড নাকি? ভয়ে ভয়ে কাচটার দিকে তাকাল মুসা। হাতে নেয়ার সাহস করল না।
কিন্তু রবিনের ওসব ভয় তেমন নেই। কাচটা নিয়ে দেখতে লাগল। কালো, পুরু কাচের মধ্যে সত্যিই একটা জুতোর ছাপ। জুতোর তলার সামনের অংশ। পুরোটাই পড়েছিল। পেছনটা রয়ে গেছে মাটিতে গেঁথে থাকা কাচের ভাঙা অংশে। বিশ্বাস করতে পারছে না। হাত দিয়ে ডলে সরিয়ে দিতে চাইল ছাপটা। বুঝতে চাইল, সত্যি ছাপ, না কাচের গায়ে পড়া আলোর কারসাজি।
নাহ্, সত্যিই ছাপ! কোন সন্দেহই নেই আর তাতে।
এক কাজ করো না কেন? সহকারীদের দিকে তাকিয়ে বলল কিশোর। এটা নিয়ে কোন ফরেনসিক ল্যাবরেটরিতে চলে যাও পরীক্ষা করানোর জন্যে।
তুমি কি করবে?
বনের দিকে মুখ ফেরাল সে, অবজারভেটরিতে যাব।

.
হিলটাউনের বজ্রপাত সম্পর্কে কিছু বলুন, স্যার, অনুরোধ করল কিশোর।
তেমন কিছু বলার নেই। সারা বছরই বজ্রপাত ঘটে এখানে। সময় অসময় নেই।

অস্টাডোরিয়ান লাইটনিং অবজারভেটরির পরিচালক ডক্টর হোমার বেলের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে কিশোর। পাহাড়ের ঢালে ওক বনের আড়ালে লুকিয়ে রাখা হয়েছে বিরাট বিল্ডিংটা। যেন বাইরের কেউ দেখে ফেললে কি জানি কি ক্ষতি হয়ে যাবে। চ্যাপ্টা, লম্বা বাড়িটার ছাতে রেডার অ্যান্টেনা আর মাইক্রোওয়েভ ট্রান্সমিটারের মিলিত চেহারার একটা যন্ত্র। বসানো। পুরো ছাতে খাড়া করে বসানো সারি সারি লাইটনিং রড।

ভেতরে বড় একটা সাজানো গোছানো ঘরে আলোকিত ইলেকট্রনিক ডিসপ্লে শো করছে বিদ্যুতের ইতিহাস। যে কোন স্কুলছাত্র বিপুল আগ্রহ নিয়ে হাঁ করে তাকিয়ে থাকবে ঘরটার দিকে। তবে দেখার জন্যে ওদের যে ঢুকতে দেয়া হয় না, অনুমান করে নিয়েছে কিশোর। শেরিফ রবার্টসন সাহায্য না করলে সে নিজেও ঢুকতে পারত না।

ধূসর হয়ে আসা চুলদাড়ির ফাঁক দিয়ে হাসি দেখা গেল ডক্টর বেলের। ঠোঁটে। সব সময় এখানকার আকাশে মেঘ জমে, মেঘের ফাঁকে বিদ্যুৎ চমকায়, শোনা যায় বজ্রের গুড়ুগুড়ু।

এর কারণ কি, স্যার?

ভুরু উঁচু করলেন বেল। সেটাই তো জানার চেষ্টা করছি আমরা। এত বেশি জমে কেন এখানে?

স্কাইলাইটের ভেতর দিয়ে আকাশের দিকে তাকাল কিশোর। ছাতের কোন জায়গা বাদ দেয়া হয়নি। এমনকি স্কাইলাইটেও বসানো হয়েছে। লাইটনিং রড। কাচের ভেতর দিয়ে ছাতের বিরাট কিস্তৃত যন্ত্রগুলো চোখে পড়ছে।

এই রড বসানোর আসলেই কি কোন দরকার ছিল?

বজুকে বিশ্বাস নেই। কখন যে কোথায় গিয়ে পড়বে কেউ জানে না। যত বেশি রড লাগানো যাবে, ওগুলোর আকর্ষণে তত বেশি ছুটে আসবে। বজ্র। কেন ওগুলো ছুটে আসে, জানা সহজ হবে। কেউ কেউ জীবন্ত প্রাণীর সঙ্গে তুলনা করে একে। বলে, বজ্রের মন আছে, চিন্তা করার ক্ষমতা আছে।

ডিসপ্লের সামনে পায়চারি শুরু করলেন ডক্টর। তার পাশে হাঁটতে হাঁটতে নানা প্রশ্ন করতে লাগল কিশোর। নোটবুকে টুকে নিল। ডিসপ্লেতে। নানা ধরনের বজ্রের কথা লেখা আছে। মনোযোগ দিয়ে পড়ল সেগুলো।

নানা রকম যন্ত্রপাতির মধ্যে রয়েছে টেসলা কয়েল। বাতাস থেকে বিদ্যুৎ শুষে নেয়। আরেকটা আছে জ্যাকবৃস্ ল্যাডার। সমান্তরাল দুটো দণ্ডের একটা আরেকটাকে লক্ষ্য করে ক্রমাগত নীল বিদ্যুৎ ছুঁড়ে দিচ্ছে। এরকম একটা গবেষণাগারের পরিচালক হওয়ার জন্যে গর্ব বোধ করবেন যে কোন বজ্র বিজ্ঞানী। ডক্টর বেলও তাই করছেন।

ছাতের ওই যন্ত্রটা দিয়ে কি হয়, স্যার? জানতে চাইল কিশোর।
এক মুহূর্ত দ্বিধা করে জবাব দিলেন ডক্টর, কেমিক্যাল স্টোরেজ। ওয়েট সেল।
রীতিমত অবাক হলো কিশোর। মানে ব্যাটারি?
আঙুল তুলে ঘরের চারপাশটা দেখালেন ডক্টর। এখানকার সমস্ত যন্ত্রপাতি বস্ত্র থেকে শক্তি আহরণ করে চলে, কিশোর। ছাতের রডগুলোতে আঘাত হানে বজ্র। তাকে ধরে ফেলি আমরা। শক্তিটাকে জমিয়ে রেখে কাজে লাগাই। ধরার ব্যবস্থাটা এখনও নিখুঁত করতে পারিনি। তবে আশা করছি, করে ফেলতে পারব।
তার মানে আকাশের যে কোনখান থেকে বুকে টেনে আনার ব্যবস্থা করেছেন আপনারা। যদি কোন কারণে আপনাদের লাইটনিং রডে আঘাত না হানে বজ্র? অন্য কোনখানে গিয়ে পড়ে, তখন? মানে, আমি বলতে চাইছি, স্যার, অ্যাক্সিডেন্ট তো ঘটতেই পারে, তাই না?
প্রশ্ন শুনে আস্তে করে ডিসপ্লের দিক থেকে কিশোরের দিকে ঘুরলেন। ডক্টর। কিশোরের আপাদমস্তক দেখতে দেখতে চেহারায় ভাবের পরিবর্তন ঘটল।
দেখো, লোকে মনে করে আমরা এখানে বসে বজ্র তৈরি করি। যন্ত্রপাতিগুলোর সাহায্যে আকাশে মেঘ জমাই, সেটা থেকে বজ্র.. শান্তকণ্ঠে বললেন তিনি। কিন্তু আমরা সেটা করি না। আকাশে আপনাআপনি মেঘ জমে, বজ্র তৈরি হয়, আমরা সেটা নিয়ে গবেষণা করি মাত্র। বজ্রপাতে শুধু হিলটাউনেই নয়, সারা পৃথিবীতেই মানুষ মারা যায়। তাদের মৃত্যুর জন্যে যেমন আমরা দায়ী নই, হিলটাউনের মর্মান্তিক দুর্ঘটনাগুলোর জন্যেও আমরা দায়ী নই। আমাদের অবজারভেটরি বসানোর বহু বহুকাল আগে থেকেই বজ্রপাত হত এখানে।
কিন্তু এখনকার মত এত নিশ্চয় হত না?
থমকে দাঁড়ালেন ডক্টর বেল। ভুরু কোচকালেন। কি বলতে চাও?
কিছু মনে করবেন না, স্যার। আমি বলতে চাইছি, আপনাদের। অবজারভেটরি কোনভাবে এখানকার আকাশে মেঘ জমানোয় সাহায্য করছে না তো? হয়তো তাতেই বজ্রপাত হচ্ছে বেশি বেশি…
মোটেও না! রেগে উঠলেন ডক্টর। বোঝা গেল, এই প্রশ্নের মুখোমুখি তাকে আরও বহুবার হতে হয়েছে। হিলটাউনের আকাশে সব সময়ই মেঘ। বেশি জমত, বজ্রপাত হত বেশি, সেজন্যেই অবজারভেটরি তৈরির জন্যে বেছে নেয়া হয়েছে এই জায়গা।
সরি, স্যার। আমি কিছু ভেবে ওকথা বলিনি…
আবার পায়চারি শুরু করলেন ডক্টর। নরম হলো না ভঙ্গি।
প্রসঙ্গ থেকে সরে যাওয়ার জন্যে বলল কিশোর, স্যার, বজ্রপাতে মারা। যাওয়া মানুষদের রেকর্ড রাখেন আপনারা?

কাধ ঝাঁকিয়ে প্রশ্নটাকে যেন ঝেড়ে ফেলে দিলেন ডক্টর। না, রাখি না। আমরা শুধু কবে কোথায় কতবার বজ্রপাত ঘটল, তার রেকর্ড রাখি। মানুষ মরল কি বাচল, সে-খবরে আমাদের কোন প্রয়োজন নেই।
তারমানে হিলটাউনে বজ্রাহত হয়ে কতজন বেচে গেল, সেটাও নিশ্চয়। বলতে পারবেন না?
ভুরু কুঁচকে ফেললেন বেল। সেটা জানলে কি লাভ হবে তোমার?
দেখতাম আরকি, গায়ে বাজ পড়ার পরেও বেঁচে যায়, ওরা কেমন মানুষ?
কেমন আবার। তোমার আমার মতই স্বাভাবিক মানুষ।
কোনও অসাধারণ ক্ষমতা নেই ওদের বলতে চাইছেন?
নিরাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন ডক্টর, কিশোর পাশা, অযথা সময় নষ্ট করছ তুমি আমার। আমাদের এই প্রতিষ্ঠান একটা বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার। ভুডু কিংবা ব্ল্যাক ম্যাজিকের আখড়া নয়।
একটা ব্রোঞ্জের মূর্তির দিকে তাকাল কিশোর। দেবরাজ জিউসের মূর্তি। হাতের দণ্ড থেকে বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ ছুটছে। মিথলজি যদি বিজ্ঞান গবেষণাগারে থাকতে পারে ম্যাজিক থাকলে দোষ কি?–প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করল তার। বলল, আমিও বিজ্ঞানের কথাই বলছি, স্যার। জাদুবিদ্যা নয়। জানতে চাইছি, বজ্রপাতে আহত মানুষদের মধ্যে এমন কোন পরিবর্তন ঘটে কিনা, এমন কোন ক্ষমতা জন্মায় কিনা, যেটা বিস্ময়কর, অথচ তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে।
কাধ ঝাঁকালেন ডক্টর। শুন্যে দুই হাতের তালু চিত করে বললেন, ক্ষমতা জন্মায় কিনা জানি না, তবে বজ্রাহত হয়েও বেঁচে যায় কিছু কিছু মানুষ। বিদ্যুৎ সহ্য করার ক্ষমতা খুব বেশি ওদের। সব মানুষের সব কিছু সহ্য করার ক্ষমতা এক রকম হয় না। সহজ একটা উদাহরণ দিচ্ছি। পেটের কথাই ধরো। বাদুড়ের পোকা লাগা কাঁচা মাংস খেয়ে হজম করে ফেলতে দেখেছি– আমি অস্ট্রেলিয়ান আদিবাসীদের। তুমি-আমি কি সেসব খাওয়ার কথা কল্পনা করতে পারব? যদি বা গিলি, পেটে সহ্য হবে না। ফুড পয়জনিং হয়েই মরে। যাব। মানুষের নানা রকম সহ্য ক্ষমতার এমন ভুরি ভুরি উদাহরণ দেয়া যায়। তাই বলে ওদেরকে অস্বাভাবিক বলা যাবে না কোনমতেই।
আমিও ঠিক এই কথাটাই জানতে চাইছি, স্যার, নিজের ধারণার সঙ্গে মিলে যাওয়ায় খুশি হলো কিশোর। ওসব জিনিস গিলে হজম করতে পারাটাও একটা বিশেষ ক্ষমতা, এটা নিশ্চয় অস্বীকার করবেন না। নইলে আমি-আপনি পারি না কেন?
তা অবশ্য ঠিক। তবে ক্ষমতা না বলে একে অভ্যাস বললেই ঠিক হবে। আফ্রিকায় কিছু ওঝাকে দেখেছি, ভয়াবহ বিষাক্ত মাম্বা সাপের কামড়েও কিচ্ছু হয় না

ওদের। জিজ্ঞেস করেছিলাম। প্রথমে মুখ খুলতে চাইল না। পরে বলল, ছোটবেলা থেকে, অল্প অল্প করে বিষ রক্তে ঢুকিয়ে সহ্য করতে করতে শেষে এমন সহ্যক্ষমতা জন্মেছে, কোন বিষেই আর কিছু হয় না। ঘড়ি দেখলেন ডক্টর বেল। তোমার আর কোন প্রশ্ন আছে?
না, স্যার। অনেক সময় দিলেন। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। চলি, গুডবাই।
দরজার দিকে পা বাড়াল কিলোর।
*
হুয়ারটন কাউন্টি বিল্ডিঙের ফরেনসিক ল্যাবরেটরির ওয়েইটিং রুমে বসে আছে মুসা আর রবিন। দুটো কারণে অপেক্ষা করছে–একটা, ফুলগারাইটের ছাঁচ শুকানোর। আরেকটা, কিশোরের আসার।
বার বার ছাঁচটার দিকে তাকাচ্ছে রবিন। টিপে দেখছে শক্ত হলো কিনা। মুসার দিকে ফিরে বলল, ভাল একটা সূত্র পাওয়া গেল।
তা তো গেল, মুসা বলল। কিন্তু এই সূত্র ধরে এগোনোর উপায়টা কি?
ঘরে ঢুকল কিশোর।
ফুলগারাইটের স্তর থেকে আস্তে করে ছাঁচটা টেনে খুলে আনল রবিন। চমৎকার একটা নকল তৈরি হয়েছে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে আধখানা জুতোর ছাপ। কিশোরকে দেখিয়ে বলল, অনেক তথ্য জমা হয়ে আছে এখানে, কি বলো?
একটা ব্রাশ দিয়ে ছাঁচের গায়ে লেগে থাকা আলগা প্লাস্টিক আর বালির কণা ঝেড়ে ফেলতে ফেলতে বলল, দেখে মনে হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড মিলিটারি বুট। সাড়ে আট নম্বর।
ভুরু কোঁচকাল কিশোর। বিরাট পা।
কার, কিছু অনুমান করতে পারছ?
কিশোর জবাব দেবার আগেই মুসা বলল, বিলি ফক্স?
সেই সম্ভাবনাই বেশি, কিশোর বলল। এখনই গিয়ে ওর জুতো পরীক্ষা করা দরকার।
.
মহাসড়কের মাঝখানে একটা চৌরাস্তা। চারকোনাতেই ট্র্যাফিক লাইট আছে। গত কয়েক মাস ধরে অতিরিক্ত অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে এখানে। কারণটা বুঝতে পারছে না কর্তৃপক্ষ। মহাসড়কে সাধারণত একটানা দ্রুতগতিতে গাড়ি চালিয়ে হঠাৎ ট্রাফিকপোস্টে লাল আলো জ্বলতে দেখলে থামতে চায় না। চালকেরা, কিংবা থামতে গড়িমসি করে। সেকারণে দুর্ঘটনা ঘটে অনেক সময়। কিন্তু এ হারে নয়।
সেদিনকার বিষণ্ন, নিরানন্দ দিনটিতে দুটো গাড়ি ছুটে যাচ্ছে চৌরাস্তার দিকে। বাদামী ক্রাইসলার গাড়িটা দূর থেকেই সবুজ আলো দেখেছে। গতি না কমিয়ে

ছুটতে থাকল। অন্য রাস্তা ধরে আসা নীল ইমপালাটাও সবুজ আলো দেখে গতি কমাল না। দুটো গাড়ির একজন চালকও লক্ষ করল না-করার কথাও নয়–চারটে পোস্টের সবুজ বাতিই একসঙ্গে জ্বলে উঠেছে।
তীব্র গতিতে চৌরাস্তার দিকে ছুটে গেল দুটো গাড়ি। পরক্ষণে নীরবতা খাখা হয়ে গেল টায়ারের তীক্ষ্ণ আর্তনাদে। সাই সাই স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে একে অন্যের পথ থেকে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল।
বেঁচে গেল নেহাত ভাগ্যের জোরে। প্রায় গায়ে গা ছুঁয়ে পাশ কাটাল। একটা আরেকটার।
অই, পাগলের বাচ্চা পাগল! গাল দিল এক ড্রাইভার।
বাপের রাস্তা পেয়েছে? বলল আরেকজন।
দুই চালক খেঁকিয়ে উঠে যেন গায়ের ঝাল মেটাতে গাড়ি ছোটাল আরও জোরে।
আপনমনে হাসল বিলি ফক্স। একটা পরিত্যক্ত বাড়ির ছাতে উঠে ছাতের কিনারে পা ঝুলিয়ে বসে আছে। এই লাল আর সবুজ আলোর খেলাটা ভিডিও গেমের চেয়ে তার কাছে অনেক বেশি মজার। মানুষকে ভড়কে দিতে পেরে। আনন্দ পায় সে। যাদের চমকে দিচ্ছে তারা প্রায় সবাই পরিচিত বলে মজাটা আরও বেশি।
সব মানুষকেই ভড়কে দিতে চায় না বিলি। যারা শত্রু, শুধু তাদের। ভয় দেখায় ওই সব সহপাঠীদের যারা ওকে নর্দমার কীট মনে করে। ওই সব দোকানদারদের, সে দোকানে ঢুকলেই যারা সন্দেহের চোখে তার দিকে তাকায়। ওই সব শহরবাসীদের যারা তার দিকে তাকিয়ে মুখ বাঁকায়, পেছনে আজেবাজে কথা বলে। ওদের কাউকেই ছাড়তে রাজি নয় সে। সুযোগ পেলেই ভোগাবে, এটা তার স্থির সিদ্ধান্ত।
ভিডিও আর্কেডে পিজ্জাওলাটার হৃৎপিণ্ড কাবাব বানিয়েছে। একটা মথকে আগুনে পুড়তে দেখলে যতখানি দুঃখ হবে, সেটুকুও নেই তার জন্যে। সামান্যতম অনুশোচনা নেই।
গাড়ি দুটো কোনমতে বেঁচে চলে যাওয়ার পর অপেক্ষা করে বসে আছে সে, এই সময় পটেটোকে আসতে দেখল।
বাড়ির কাছে এসে ওপরে তাকিয়ে বিলি আছে কিনা দেখল পটেটো। তারপর সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসতে শুরু করল ওপরে।
জায়গাটা খুব পছন্দ বিলির। চারপাশে বহুদূর চোখে পড়ে। অনেক কিছু দেখা যায়। নিরিবিলি বসা যায়। তার নতুন আবিষ্কৃত এই খেলাটা এখানে বসার আনন্দ বাড়িয়ে দেয় বহুগুণ।
রাস্তার দিকে তাকিয়ে আরও দুটো গাড়ি আসতে দেখল বিলি। নতুন মডেলের গাড়ি। নিশ্চয় অ্যান্টিলক ব্রেক। এ ধরনের ব্রেক কতটা কাজের পরখ। করে দেখা যাক, ভাবল সে।

পটেটো এসে বসল তার পাশে। কি খবর, দোস্ত? কি করছ?
কিছু না, রাস্তার দিকে তাকিয়ে জবাব দিল বিলি।
কিছু তো একটা করছই।
জবাব দিল না বিলি। চৌরাস্তার দিকে তাকিয়ে একটা মাইন্ড-পালস ছাড়ল। মনের জোরে ঘটনা ঘটানোর ব্যাপারটার নাম দিয়েছে সে মাইন্ড পালস। এরই সাহায্যে ট্র্যাফিক লাইটের লাল আলোকে সবুজ করে দেয় সে, সবুজ আলোকে লাল। দুদিক থেকে যে দুটো গাড়ি আসছে তার একটা জীপ, আরেকটা মিনিভ্যান। সবুজ আলো দেখে গতি কমাল না কেউ। একেবারে কাছাকাছি হওয়ার আগে কেউই বুঝতে পারল না যে অন্যজন গতি কমাবে না। সবুজ আলো দেখেছে দুজনেই, কমাবে কেন? একেবারে শেষ মুহূর্তে ব্রেক চেপে থেমে দাঁড়াল গাড়ি দুটো। বোঝা গেল কাজের জিনিস অ্যান্টিক ব্রেক।
বাইরে কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে, পটেটো বলল। এটা শহর না ইঁদুরের গর্ত! বেরোনো উচিত আমাদের। আর ভাল্লাগছে না এখানে। চলো, লাস ভেগাসে চলে যাই। ধ্বংস করার... হেসে ফেলল পটেটো। তাড়াতাড়ি শুধরে নিয়ে বলল, মানে, আমি বলতে চাইছি, খেলার অনেক নতুন জিনিস পেয়ে যাবে ওখানে।
মাথা নাড়ল বিলি। লাস ভেগাসে যাচ্ছি না আমি। কোথাও যাব না মিলিকে ফেলে।
মিলির নাম উচ্চারণ করতেও ভাল লাগে তার। মনটা আনন্দে ভরে যায়।
মিলি, মিলি বলে বার বার চিৎকার করতে ইচ্ছে হয়।
বিলির দিকে তাকাল পটেটো। চোখ ঘুরিয়ে বলল, কি করে ভাবলে বললেই ও তোমার সঙ্গে চলে যাবে? স্কুলে ও তোমার দিকে তাকায় না। কথা বলে না।
কথাটা ঠিক। এ নিয়ে অনেক ভেবেছে বিলি। হতে পারে, স্কুলে অন্য কারও সামনে তার দিকে তাকাতে লজ্জা পায় মিলি। কত ধরনের লাজুক মেয়ে থাকে না। মিলিও হয়তো তেমনি। তার মানে এই নয় মিলি ওকে ভালবাসে না। অন্য কেউ সামনে না থাকলে তো কথা বলে। বলবে না-ই বা কেন? বিলি খারাপটা কিসে? স্বাস্থ্য ভাল না। ও অনেকেরই থাকে না। গরীব। সে তো পৃথিবীর বেশির ভাগ লোকই। কিন্তু তার মত অসাধারণ ক্ষমতা আর হকার আছে? এই ক্ষমতা ঠিকমত ব্যবহার করতে পারলে কোটিপতি হতে বেশিদিন লাগবে না।
স্কুলের কথা বাদ দাও, বিলি বলল। ওকে বোঝানো দরকার যে আমি ওকে ভালবাসি।
কি করে?
চৌরাস্তার দিকে তাকিয়ে ভাবতে শুরু করল বিলি। কি করে মন জয় করা যায় মিলির? কি করে বোঝানো যায় সে একজন যোগ্য লোক? গাড়ির দিকে মন নেই

আর তার। ট্রাফিক লাইটের দিকে তাকাচ্ছে না। বিড়বিড় করছে, ওকে বোঝাতে হবে ওকে আমি কতটা ভালবাসি। ওর কথা ছাড়া। আর কিচ্ছু ভাবি না আমি।
পটেটো প্রশ্নটা করায় খুশিই হলো বিলি। কি করে মিলিকে তার প্রতি আকৃষ্ট করা যায়, এই ভাবনাটা জোরাল হলো তার মনে।
পটেটোর প্রথম প্রশ্নটার জবাব এখনও দিতে পারেনি বিলি, আরেকটা প্রশ্ন তার পাতে তুলে দিল পটেটো, জনাব মজনু সাহেব, আরও একটা কথা–মিলি তোমার বসের মেয়ে। সেকথাটা ভুলে যেয়ো না।
পা তুলে হাঁটু ভাজ করে বসল বিলি। দুই হাত দিয়ে বুকের ওপর চেপে ধরল দুই পা। সেটা কোন সমস্যাই না।
কেন, সমস্যা নয় কেন?
ওটার ব্যবস্থা আমি করে ফেলতে পারব, কাঁধ ঝাঁকাল বিলি। দিলাম নাহয় ওর মনটাও ধ্বংস করে।
বিলির কথা ঠিক বুঝতে পারল না পটেটো। ওর মন? ও তোমার বস, বিলি…
মরে গেলেই ও আর আমার বস থাকবে না, খারাপ কথাটা এরকম করে বলতে চাইল না বিলি। কিন্তু পটোটোকে নিয়ে সমস্যা হলো ভেঙে না বললে ও কিছু বুঝতে পারে না। মন থাকে হৃৎপিণ্ডে। ওটা কাবাব বানিয়ে দেব। যাবে নষ্ট হয়ে। নিজের রসিকতায় মজা পেয়ে নিজেই হেসে উঠল।
আঁতকে উঠল পটেটো। পাগল নাকি! খবরদার, ওই টিকটিকিগুলোর কথা ভুলো না। ওদের ছোট করে দেখলে ভুল করবে। বিশেষ করে কোঁকড়াচুলোটাকে। ওর চোখ দেখেছ? চোখের দিকে তাকালেই ভয় লাগে। মনের ভেতর কি আছে সব যেন দেখতে পায়। মিস্টার হাওয়ার্ডের ক্ষতি করতে যাওয়া তোমার ঠিক হবে না, বিলি। আরেকটা কথা ভেবেছ? ওর। মেয়ে যদি বুঝে ফেলে তুমি ওর বাপকে খুন করেছ, কোনদিন আর ভালবাসবে? চরম ঘৃণা করবে তখন। বরং, অন্য কোনভাবে মিলির মন জয়। করার চেষ্টা চালাও।
ঠিক কথাই বলেছে পটেটো। কিন্তু কোন কিছু নিয়ে বেশি ভাবনা-চিন্তা করতে ভাল লাগে না বিলির। ঝট করে সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ শেষ করে ফেলাই ওর পছন্দ। দেরি সহ্য হয় না। তবু এক্ষেত্রে চিন্তা এবং সহ্য করা ছাড়া উপায় নেই।
মিলি সুন্দরী, পটেটো বলল, তা ছাড়া ধনীর একমাত্র কন্যা। ওর মত মেয়ে কোন গুণধর লোককেই বিয়ে করতে চাইবে।
পটেটোর চোখের দিকে তাকাল বিলি, আমার গুণ আছে।
চোখ সরিয়ে নিল পটেটো, হ্যাঁ, তা আছে।
দূরে পাহাড়ী রাস্তা বেয়ে একটা বড় ট্রাককে নেমে আসতে দেখা গেল। অন্যদিকে হিলটাউন পাস ধরে ছুটে আসছে একটা সাদা ফোর্ড গাড়ি।

বেশ, বিলি বলল, কতটা গুণ আর যোগ্যতা আমার আছে, মিলিকে দেখাব আমি।
মুখ ফেরাল পটেটো। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তাকিয়ে রইল বিলির দিকে। কি করে দেখাবে? গলা কাঁপছে ওর।
হাসল বিলি। আমার ক্ষমতা সম্পর্কে এখনও তোমার পুরোপুরি ধারণা নেই, পটেটো। অনেক কিছু করতে পারি আমি। রাস্তার গাড়িগুলোর দিকে চোখ ফেরাল সে। খেলাটা এখন আর খেলা নেই ওর কাছে, জরুরী কাজ হয়ে উঠেছে। ওর পরিকল্পনার একটা অংশ। একটা সাংঘাতিক পরীক্ষা। ভাবতে গিয়ে হাসি ছড়িয়ে পড়ল মুখে। এ পরীক্ষায় জয়ী হতে পারলে A+ দেয়া উচিত তাকে, ভাবল সে।
মিলিও তখন বুঝে যাবে ওর ক্ষমতা। ওর যোগ্যতার প্রমাণ পাবে। ওর। প্রতি দুর্বল হয়ে পড়বে।
কাছাকাছি চলে এসেছে দুটো গাড়ি। ট্র্যাফিক লাইটের দিকে মন ফেরাল বিলি। মগজের কোন এক রন্ধ্রে যেন নাড়ীর স্পন্দনের মত টিকটিক করে বাজতে শুরু করল একটা বিশেষ শক্তি। স্পষ্ট টের পাচ্ছে সে। অনুভব করতে পারছে। মাইন্ড-পালসকে কাজে লাগিয়ে ইচ্ছাশক্তির জোরে বিদ্যুৎ সঙ্কেত পাঠিয়ে দুদিকের লাল আলোকে সবুজ করে দিল। গুনতে শুরু করল: এক...দুই...তিন...
ধ্রাম!
প্রচণ্ড শব্দ। সাদা গাড়িটার পেটে গুলো মেরেছে ট্রাক। ডিগবাজি খেয়ে ঘুরতে ঘুরতে পথের পাশের খাদে গিয়ে পড়ল গাড়িটা। ট্রাকের ড্রাইভারও নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে। এলোপাতাড়ি ছুটছে। ঝাঁকি লেগে রাস্তায় ছড়িয়ে পড়তে লাগল ওতে বোঝাই বাঁধাকপি। একটা টেলিফোন পোস্টে তো খেয়ে অবশেষে থামল ওটা।
হেসে উঠল বিলি। আহ, কি খেলটাই না দেখাল! পায়ের ওপর থেকে হাত সরিয়ে নিল সে। উঠে দাঁড়াল। সত্যি দারুণ! এমনটা সচরাচর দেখা যায় না!
জোর করে হাসল পটেটো। না হাসলে যদি আবার বিলি রেগে যায়। কিন্তু খুশি মনে হলো না ওকে।
ওর বাহুতে থাবা মারল বিলি, কি ব্যাপার, খুশি না নাকি? দেখো, দেখে যাও। এমন খেলা পয়সা দিয়েও পাবে না।
জবাব দিল না পটেটো।
চলো, পটেটোর হাত ধরে টান দিল বিলি। কাছে গিয়ে দেখি।
বিলিদের আগাছাভরা পুরানো চত্বরে বড়ই বেমানান লাগছে তিন গোয়েন্দার ভাড়া করে আনা চকচকে নতুন গাড়িটা।
টোকা দিতে দরজা খুলে দিলেন বিলির মা। ঘরে নিয়ে গেলেন তিন গোয়েন্দাকে। ওদের অনুরোধে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাতে লাগলেন বাড়ির ভেতরটা। হলের

শেষপ্রান্তের একটা পুরানো দরজা ধরে টান দিলেন। ক্যাচকোচ করে প্রতিবাদ জানাল মরচে পড়া কজা। বিলির ঘরের বদ্ধ বাতাসের ভাপসা গন্ধ গোয়েন্দাদের নাকে এসে ধাক্কা মারল যেন।
আমার ছেলের স্বভাব ভাল না, মা বললেন, আমি নিজেই স্বীকার করছি সেটা। যে কারণে অনেকেই ওকে দেখতে পারে না। কিন্তু কারও ক্ষতি করার একটা পিঁপড়ে মারারও ক্ষমতা নেই ওর। কি করেছে ও?
দুই সহকারীর দিকে তাকাল কিশোর। ইঙ্গিতে চেপে যেতে বলল ওদের। বিলির মায়ের দিকে ফিরে বলল, এঘরে কয়েকটা মিনিট আমরা একা থাকতে চাই, মিসেস ফক্স। কোন অসুবিধে আছে?
ঘর থেকে পিছিয়ে বেরিয়ে গেলেন বিলির মা। আস্তে করে দরজাটা লাগিয়ে দিল কিশোর। যত আস্তেই লাগাক, কজার প্রতিবাদ বন্ধ করতে পারল না।
বাড়ির বাকি ঘরগুলোও শোচনীয়, তবে এটার অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। নরক বানিয়ে রেখেছে বিলি। দিনের বেলাতেও অন্ধকার। জানালার সমস্ত পর্দা, টেনে দেয়া। বাতাস চলাচল করতে পারে না বলে স্যাঁতসেঁতে হয়ে আছে। ভাপসা গন্ধের মধ্যে শ্বাস নেয়া কঠিন। বিছানাটা অগোছাল। মেঝেতে ছিটানো বহুকালের অধোয়া ময়লা কাপড়-চোপড়। যেখানে সেখানে ফেলে রেখেছে মোটর গাড়ির বাতিল যন্ত্রাংশ। ছাত আর দেয়ালের হেন জায়গা নেই, যেখানে গাড়ির ছবি আর ভিডিও গেমের পোস্টার লাগায়নি। বড় একটা ফিশ অ্যাকোয়ারিয়ামও দেখা গেল। তবে ওটা বিলির কিনা বোঝা গেল না। বহু আগেই শুকিয়ে গেছে। শ্যাওলা শুকিয়ে কালো হয়ে গিয়ে লেগে রয়েছে। নোংরা কাচের দেয়াল আর তলার পাথরে। মাছের চিহ্নও নেই।
পোস্টারগুলোর ওপরে আবার বিভিন্ন ম্যাগাজিন থেকে ছবি কেটে নিয়ে লাগিয়েছে বিলি। বিখ্যাত সব খেলোয়াড়, গায়ক, মডেল আর অভিনেতার ছবি, যাদের সঙ্গে কোনকালে দেখা হয়নি ওর। ওগুলোর পাশে সাটানো ছোট একটা সাদাকালো ছবি দৃষ্টি আকর্ষণ করল কিশোরের। একটা মেয়ে। মডেলগুলোর চেয়ে কম সুন্দরী নয়। বয়েস খুবই কম। কিশোরীই বলা চলে। নিষ্পাপ চাহনি।
বিলির আলমারি খুঁজতে লাগল মুসা আর রবিন।
আজেবাজে জিনিসের মধ্যে ঘাটতে ঘাটতে একটা ছেঁড়া জুতো পেয়ে গেল মুসা। বের করে দেখাল। কিশোর, দেখো, সাইজটা বোধহয় ঠিকই আছে।
সাড়ে আট?
মাথা ঝাঁকাল মুসা।
শুধু এতেই প্রমাণ হয় না লেসলি কার্টারিসকে খুন করেছে সে, রবিন বলল।
জবাব না দিয়ে আবার ছবিটার দিকে ফিরল কিশোর।

পেলে কিছু ওর মধ্যে? ছবিটা দেখিয়ে জানতে চাইল রবিন।
বুঝতে পারছি না, নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। তবে মনে হচ্ছে কোন বৈশিষ্ট্য আছে।
কিশোরের পাশে এসে দাঁড়াল রবিন।
আরও জুতো পাওয়া যায় কিনা খুঁজছে মুসা।
ছবিটার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল রবিন, মেয়েটা কে?
জানি না, চিন্তিত ভঙ্গিতে কিশোরও তাকিয়ে আছে ওটার দিকে। মনে হচ্ছে কোন বর্ষপঞ্জি থেকে কেটে নেয়া।
ঘুরে দাঁড়াল মুসা। আলমারি থেকে একটা বর্ষপঞ্জি বের করে দেখিয়ে বলল, এটা থেকে নেয়নি তো?
কোন পাতা থেকে ছবিটা কাটা হয়েছে, বের করতে সময় লাগল না। যে পাতায় ছবিটা ছিল, সেখানে চারকোনা কাটা। নিচে একটা নাম।
মিলি হাওয়ার্ড, পড়ল রবিন।
হাওয়ার্ড! চোখের পাতা সরু করে ফেলল কিশোর। পরিচিত লাগছে না!
*
টো ট্রাকে বসে কফি খাচ্ছেন জোসেফ হাওয়ার্ড, এই সময় ফোন এল। দুই ঢোকে বাকি কফিটুকু শেষ করে কাগজের কাপটা ছুঁড়ে ফেললেন বাইরে। এঞ্জিন চালু করে গিয়ার দিয়ে তাড়াতাড়ি গাড়ি ঘোরালেন। ছুটলেন হিলটাউন পাসে।
গত দুই মাসে কতবার যে তিনি এখানে এসেছেন, হিসেব নেই আর। চৌরাস্তায় অতিরিক্ত অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে ইদানীং। বহুবার আসতে হয়েছে তাকে এখানে, দোমড়ানো গাড়ি সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। ব্যাপারটা খুব রহস্যময় মনে হচ্ছে তার কাছে। বিশেষজ্ঞ ডেকে এনে চৌরাস্তার ট্র্যাফিক লাইটগুলো পরীক্ষা করে জানা দরকার, সমস্যাটা কোথায়? কাউন্টি প্ল্যানিং কমিশনে চিঠি লেখার কথাও ভেবেছেন তিনি।
তবে আজ আর ওসব কথা ভাবছেন না। আনমনে গাড়ি চালাতে চালাতে বরং ভাবছেন ছেলেটার কথা। বিলি ফক্স। গতকাল লাঞ্চের সময় গ্যারেজে গিয়েছিল মিলি। ওকে নার্ভাস মনে হয়েছে। আচরণে অস্থিরতা ছিল। কয়েকবার ওকে জিজ্ঞেস করার পর শুধু বিলির নামটা বলেছে। আর কিছু বলেনি।
কয়েক মাস আগে মিলির চাপাচাপিতে ছেলেটাকে কাজে নিয়েছিলেন তিনি। ধীরে ধীরে একটা মায়া জন্মে গেছে ওর ওপর। পিতৃস্নেহই বলা যায়। ছেলেটার ভাঙা স্বাস্থ্য, বিষণ্নতা, অমিশুক আচরণ এবং কাজের দক্ষতা ও বিশ্বস্ততা এ সব কিছু তার প্রতি মমতা বাড়িয়ে দিয়েছে তার।

কিন্তু যত মমতাই জন্মাক, বিলি যদি তাঁর একমাত্র মেয়ের অশান্তির কারণ হয়ে থাকে, ওকে বিয়ে করা ছাড়া উপায় থাকবে না। কিন্তু কি বলে ওকে বিদেয় করবেন? কাজের ব্যাপারে কোন খুত পাওয়া যায়নি তার। কোন ছুতো দেখিয়ে বরখাস্ত করা যাবে না। মিথ্যে বলতে পারবেন না তিনি। ছেলেটাকে তিনি পছন্দ করেন, মুখের ওপর এসো না-ও বলে দিতে পারবেন না। তাহলে? আজ বিলির ছুটি। সময় আছে। পরে শান্ত মাথায় ভেবেচিন্তে একটা উপায় বের করা যাবে।
অ্যামবুলেন্সের পেছন পেছন চৌরাস্তায় পৌঁছলেন হাওয়ার্ড। গাড়ি থামিয়ে কাজ শুরু করার আগে চারপাশে একবার চোখ বোলালেন। গর্তে পড়ে আছে। নতুন মডেলের একটা ফোর্ড। একটা পুরানো ট্রাক টেলিফোন পোস্টে নাক ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পেছনটা এমন করে রাস্তা জুড়ে রয়েছে, পুবদিকে। যাওয়ার পথ বন্ধ করে দিয়েছে। গাড়ি জমে গেছে। এই শূন্যতার মাঝেও কি করে যেন ভিড় জমে গেছে কৌতূহলী দর্শকের।
পার্কিং ব্রেক টেনে দিয়ে গাড়ি থেকে নামলেন হাওয়ার্ড। ট্রাকের পেছনের সরু ফাঁক দিয়ে একবারে একটামাত্র গাড়ি বেরোতে পারে। শেরিফের অফিসের একজন ডেপুটি ওখানে দাঁড়িয়ে গাড়িগুলোকে বের করে দেয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে।
সেদিকে এগিয়ে গেলেন হাওয়ার্ড- কি হয়েছে?
কি আর হবে, বিরক্তকণ্ঠে চেঁচিয়ে জবাব দিল ডেপুটি, পোলাপানের কাণ্ড! বাপের নতুন গাড়ি পেয়েছে। নতুন লাইসেন্স পেয়েছে। চালানো শুরু করেছে বেপরোয়া। ফলে যা ঘটার ঘটেছে। গাড়ির একেবারে পেট বরাবর মেরে দিয়েছে ট্রাক।
ছেলেটার কি অবস্থা?
বাঁচবে বলে মনে হয় না।
আহহা!
বিলির ওপর নতুন করে মায়াটা বেড়ে গেল হাওয়ার্ডের। ওকে ভাগানোর চিন্তাটা মাথা থেকে আপাতত বাদ দিলেন। কিছু করার আগে ব্যাপারটা নিয়ে মিলির সঙ্গে ভালমত আলোচনা করতে হবে। বিলির কতখানি দোষ, বিবেচনা করা দরকার। এমনও হতে পারে।
বুকের বাঁ পাশে তীক্ষ্ণ একটা ব্যথা ভেঙে তছনছ করে দিল সমস্ত চিন্তা ভাবনা। মুখ বিকৃত করে ফেললেন। দম নিতে কষ্ট হচ্ছে। ব্যথা সহ্য করে কোনমতে ফুসফুসে বাতাস টেনে নিয়ে ধীরে ধীরে ছাড়লেন।
কি হলো? বুঝতে পারছেন না তিনি। এমন লাগছে কেন? আরেকবার দম নিলেন। বাঁ কাধটা অবশ হয়ে যাচ্ছে। এটাকেই কি বলে হার্টবার্ন? হার্ট অ্যাটাক হচ্ছে? মিলির আশঙ্কাই ঠিক। অনেক দিন থেকে তাকে চর্বিওয়ালা জিনিস খেতে বারণ করে আসছে। শোনেননি। চর্বিই তার বেশি পছন্দ।

খসখসে গলায় ডেপুটিকে জিজ্ঞেস করলেন, ট্রাকটা সরাব?
লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে যাওয়া গাড়িগুলোকে সরাতে ব্যস্ত ডেপুটি। হাওয়ার্ডের দিকে না তাকিয়েই বলল, শেরিফকে জিজ্ঞেস করুন।
ট্রাকের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন শেরিফ। ড্রাইভারের স্টেটমেন্ট নিচ্ছেন।
হাওয়ার্ডের বুকের ব্যথাটা কমছে না। বরং বাড়ছে। বুক ডলতে ডলতে ঘন ঘন শ্বাস নিচ্ছেন। শ্বাস নিতেও কষ্ট। একবারে বাতাস টেনে ফুসফুস ভরে না ফেলে অল্প অল্প করে টানছেন।
ফিরে তাকাতে তাঁর ওপর চোখ পড়ল ডেপুটির। কি হয়েছে, মিস্টার হাওয়ার্ড? এমন লাগছে কেন আপনাকে? অসুস্থ নাকি?
সমস্যাটা বলতে যাচ্ছিলেন হাওয়ার্ড, এই সময় ভিড়ের কিনারে একটা পরিচিত মুখ চোখে পড়ল।
বিলি ফক্স! ওকে এখানে দেখবেন ভাবেননি
একটা অদ্ভুত অনুভূতি হলো তার। মনে হলো বুকের মধ্যে ঢুকে গেছে। বিলি। ব্যথাটাকে জুলুনি থেকে আস্তে আস্তে ঠেলে ভয়াবহ যন্ত্রণার দিকে নিয়ে। যাচ্ছে। বুকের মধ্যে আগুন জ্বলতে আরম্ভ করল যেন তার।
বিলি কি করে তার ভেতরে ঢুকবে! এই উদ্ভট ভাবনা কেন?
অনুভূতিটা কিছুতেই যাচ্ছে না মন থেকে। হৃৎপিণ্ড খামচি দিয়ে ধরে তাকে খুন করছে ছেলেটা।
ডেপুটির দিকে ফিরে কথা বলার জন্যে মুখ খুললেন। যন্ত্রণাকাতর একটা গোঙানি বেরোল, শুধু। ব্যথার আরেকটা বর্শা এসে ঘ্যাঁচ করে বিধল যেন হৃৎপিণ্ডে। চোখের সামনে মহাসড়কটা আবছা হয়ে এল।
হাওয়ার্ডের দেহটা বাঁকা হয়ে যেতে দেখল ডেপুটি। গাড়ি সরানো বাদ। দিয়ে দৌড়ে এসে ধরে ফেলল তাঁকে।
*
ভিড়ের কিনারে দাঁড়িয়ে আরও অনেকের সঙ্গে স্বরচিত বাস্তব নাটকটা দেখছে বিলি।
কি হলো, বিলি? শঙ্কিত কণ্ঠে জানতে চাইল পটেটো।
কানেই তুলল না বিলি। জবাব দিল না।
হাওয়ার্ডের হৃৎপিণ্ডটা তার বুকের খাঁচায় বেঁচে থাকার জন্যে আকুলি বিকুলি করছে। রাস্তার ওপর শুইয়ে দেয়া হয়েছে তাঁকে। চিৎকার করে। ডাক্তারদের ডাকছে ডেপুটি।
হাওয়ার্ডকে মাটিতে দেখে দৌড়ে এলেন একজন ডাক্তার।

আপনমনে হাসল বিলি। কিছুই করতে পারবে না ওরা, ভাবল সে। বোকার দল। চেষ্টাই হবে সার। কাজের কাজ কিছু হবে না।
কি হয়েছে? চিৎকার করে জানতে চাইলেন ডাক্তার।
হাওয়ার্ডের পাশ থেকে উঠে গিয়ে ডাক্তারকে জায়গা করে দিল ডেপুটি। বুঝলাম না! বেহুশ হয়ে গেলেন হঠাৎ!
ভাল করে দেখার জন্যে পাশে সরল বিলি।
পটেটোও সরে এল তার সঙ্গে সঙ্গে।
হাওয়ার্ডের গলার কাছে আঙুল চেপে ধরে নাড়ী দেখছেন ডাক্তার।
আনমনে মাথা নাড়ছে বিলি। যেন ক্রিকেট খেলায় নিজের দলকে হারতে দেখে হতাশ হয়েছে খুব।
নাড়ী তো নেই! এক সহকারীর দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠলেন। ডাক্তার। জলদি ব্যাগটা নিয়ে এসো!
অ্যামবুলেন্সের দিকে দৌড় দিল সহকারী।
লম্বা দম নিয়ে পা বাড়াল বিলি।
তার হাত খামচে ধরল পটেটো।
ঝাড়া মেরে সরিয়ে দিল বিলি।
কি করছ? ফিসফিস করে বলল আতঙ্কিত পটেটো। চলো, পালাই!
ঠাণ্ডা, চিকন ঘাম ফুটেছে তার কপালে।
কিন্তু ফিরেও তাকাল না বিলি। এগিয়ে চলল দৃঢ়পায়ে।
শার্টের বুকের কাছটা খুলে ফেলেছেন ডাক্তার। স্টেথো লাগিয়ে দেখতে শুরু করলেন। তার মুখের ভঙ্গিই বলে দিচ্ছে হাওয়ার্ডের অবস্থা।
খুব খারাপ!
মুমূর্ষ বসের দিকে এগিয়ে চলেছে বিলি। কেউ লক্ষ করল না তার উপস্থিতি। কিংবা করলেও গুরুত্ব দিল না। সবাই উত্তেজিত। নানা কারণে। কার্ডিয়াক কিট নিয়ে দৌড়ে এল ডাক্তারের সহকারীরা। প্রথমজনের সঙ্গে আরও একজন এসেছে। ডাক্তার তখন হাওয়ার্ডের বুকে ম্যাসেজ করছেন। জাগিয়ে তুলতে চাইছেন নিথর হয়ে পড়া হৃৎপিণ্ডটাকে।
দ্রুতহাতে হাওয়ার্ডের শরীরে ইলেকট্রোডের তার লাগানো শুরু করল ডাক্তারের সহকারীরা। একঘেয়ে শব্দ কানে আসছে বিলির। মনিটরে দেখতে পাচ্ছে হার্টের গতিবিধির সবুজ রেখাটা। আঁকাবাকা ঢেউ তোলার বদলে স্থির হয়ে আছে।
পাম্প শুরু করলেন ডাক্তার। হৃৎপিণ্ডটাকে সতেজ করার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন।

মেশিনের সঙ্গে যুক্ত তারগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে বিলি। সিনেমায় কারও হার্ট অ্যাটাক হলে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে এভাবে তার লাগায়, দেখেছে সে।
কিছুতেই কিছু করতে না পেরে সহকারীর দিকে তাকালেন ডাক্তার, তিনশো জুল দাও।
দিয়েছি। চার্জ হয়ে আছে, জবাব দিল এক সহকারী।
কই, হয়নি তো।
কিন্তু আমি তো দিয়েছি…
হাঁ করে যন্ত্রের দিকে তাকিয়ে আছেন ডাক্তার এবং তার দুই সহকারী। মাটিতে পড়ে থাকা মানুষটার মতই যন্ত্রও নিথর। মৃত।
মনে মনে হাসল বিলি। যন্ত্রের ব্যাটারি শুষে নেয়া কিছুই না তার জন্যে। ট্রাফিক লাইট বদলে দেয়ার চেয়ে অনেক সহজ।
ঘটনাটা কি? কাজ করছে না কেন? অবাক হয়ে গেছেন ডাক্তার। যাও তো, আরেকটা নিয়ে এসো।
উঠে আবার অ্যামবুলেন্সের দিকে দৌড় দিল এক সহকারী। অন্যজন ডাক্তারের সঙ্গে বসে মেশিনটা চালানোর চেষ্টা করেই চলেছে।
পায়ে পায়ে কাছে এসে দাঁড়াল বিলি।
নড়ে উঠল হাওয়ার্ডের চোখ। তার কথা তিনি শুনতে পাবেন কিনা, বুঝবেন কিনা জানে না বিলি। বোঝার চেষ্টাও করল না। তার কাজ এখন সে করে যাবে। বিড়বিড় করে শান্ত, মোলায়েম কণ্ঠে বলল, চিন্তা করবেন না, মিস্টার হাওয়ার্ড। টিভিতে কি করে ভাল করে ওরা আমি দেখেছি।
ডান হাতের আঙুলগুলো ছড়িয়ে সামনে বাড়িয়ে ধরল দুই হাত। হাওয়ার্ডের বুকের দিকে তাক করল।
জীবন আর মৃত্যুর সন্ধিক্ষণ এক অদ্ভুত জিনিস, ভাবল বিলি। একে নিয়ন্ত্রণ করা কি সাংঘাতিক উত্তেজনার কাজ!
মধ্যে বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ ছোটাতে শুরু করল সে। ঘুরতে ঘুরতে মগজে জমা হচ্ছে। অনুভব করতে পারছে। তীরে আছড়ে পড়ার জন্যে ছুটে চলা ঢেউয়ের মত শক্তি সঞ্চয় করছে স্ফুলিঙ্গগুলো। মগজ থেকে বের করে আনল সে। ঘাড়ে নামাল। সেখান থেকে পার করে দিতে লাগল ডান হাতে। বাহু আর আঙুল বেয়ে পৌঁছে গেল আঙুলের ডগায়। ইথারে ভর করে অদৃশ্য বিদ্যুৎ-শক্তি ঢুকে যেতে শুরু করল হাওয়ার্ডের বুকে।
চার্জ হয়ে যাচ্ছে নিথর হৃৎপিণ্ড। আচমকা ঝটকা দিয়ে ধনুকের মত পেছনে বাঁকা হয়ে গেল হাওয়ার্ডের শরীর। মাটির ওপর থেকে ফুটখানেক ওপরে উঠে গেল পিঠ। ধড়াস করে পড়ল আবার।

ততক্ষণে দ্বিতীয় মেশিনটা নিয়ে এসেছে ডাক্তারের সহকারী। কিন্তু ওটার আর প্রয়োজন নেই। চালু হয়ে গেছে হৃৎপিণ্ড।
মনিটরও সচল হয়ে গেছে আবার। কোন্ জাদুবলে আবার চার্জ হয়ে গেছে ওটার ব্যাটারি। সবুজ রেখাটা ঢেউ তুলতে শুরু করেছে। কানে স্টেথো লাগানোই আছে ডাক্তারের। নিখুঁত, স্পষ্ট হার্টবীট কানে বাজছে তার। সুস্থ, সবল মানুষের হৃৎপিণ্ডের মত। খানিক আগে যে মারাত্মক অ্যাটাক হয়েছিল, তার কোন লক্ষণই নেই।
অবিশ্বাসীর দৃষ্টিতে হাওয়ার্ডের দিকে তাকিয়ে আছেন ডাক্তার আর তার দুই সহকারী।
হার্ট তো চলছে! চালু হলো কি করে?
বুঝতে পারছেন না ডাক্তার। এতক্ষণে চোখ পড়ল বিলির ওপর। খানিক দুরে দাঁড়িয়ে আছে সে। চোখাচোখি হতেই হাসি ছড়িয়ে পড়ল মুখে। সিনেমার অভিনেতাদের কায়দায় কাঁধ ঝাঁকাল। কোন ব্যাখ্যা দেয়া থেকে বিরত রইল।
হিরো হয়ে গেল সে। এমন হিরো, যাকে সবাই ভালবাসে।
ওকে নিয়ে এখন গর্ব বোধ করবে মিলি। আপন করে পাওয়ার জন্যে অস্থির হবে। বিলির অন্তত তা-ই মনে হলো।

.

হিলটাউন কমিউনিটি হাসপাতালের নার্স স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে কিশোর। জোসেফ হাওয়ার্ডের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে। কিন্তু ইমার্জেন্সি বিভাগের এক কেবিনে সেই যে তাঁকে নিয়ে গিয়ে দরজা আটকে দিয়েছেন ডাক্তাররা, আর খোলার নাম নেই। দেখা করার ব্যাপারে ক্রমেই নিরাশ হয়ে পড়ছে সে।
কিন্তু সময়টা অহেতুক নষ্ট হতে দিচ্ছে না। বিলি ফক্সের মেডিক্যাল ফাইলের পাতা ওল্টাচ্ছে। প্রথমবার এসেছিল বজ্রপাতের শিকার হয়ে। রাতের বেলা। দ্বিতীয়বার হার্ট অ্যাটাক হয়ে, মাস পাঁচেক আগে। ঘাড়, মাথা আর পিঠে প্রচণ্ড ব্যথা হচ্ছিল। কয়েকদিন রাখার পর ডাক্তাররা লক্ষ করলেন প্রি-এগজিস্টিং কনডিশনে রয়েছে সে। ডাক্তারি পরিভাষায় এসে বলে অ্যাকিউট হাইপোকেলামিয়া।
একটা ধারণা রূপ নিতে শুরু করল কিশোরের মনে। মুসার দিকে তাকাল। জানালায় দাঁড়িয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে সে। রবিনকে পাঠিয়েছে ডক্টর এলিজাকে ফোন করতে। এলিজাকে পেলে তাকে দিয়ে কমিউনিটি হাসপাতালের ডাক্তারদের ফোন করিয়ে জেনে নেবে হাওয়ার্ডের অবস্থা।
পেছনে একটা শব্দ হলো।
ফিরে তাকাল কিশোর।

হলওয়ের ওয়াটার কুলারটার কাছে দাঁড়িয়ে আছে মিলি হাওয়ার্ড। হাত থেকে পড়ে যাওয়া পেপার কাপটার দিকে চোখ। মেঝেতে পানি।
মোছার জন্যে নিচু হতে গেল সে।
দাঁড়াও, পা বাড়াল কিশোর, আমি মুছে দিচ্ছি।
তাড়াতাড়ি পড়ে যাওয়া কাপটা, তুলে ওয়েস্টবাস্কেটে ফেলল। একটা পেপার টাওয়েল দিয়ে মেঝের পানি মুছে আরেকটা কাপে পানি ভরে বাড়িয়ে দিল মেয়েটার দিকে।
থ্যাংক ইউ, কাঁপা কাঁপা গলায় বলল মিলি।
তাকিয়ে আছে কিশোর। হাওয়ার্ডের মেয়ে। একে ধরেই তাঁর কাছে যেতে হবে এখন।
মেয়েটী ভীত এবং ক্লান্ত।
কেন?
বাবার জন্যে দুশ্চিন্তায়?
মিলি, সহানুভূতির সুরে বলল কিশোর, তোমার বাবার জন্যে আমি দুঃখিত।
থ্যাংক ইউ, আবার বলল মিলি। ভাল করে তাকাল কিশোরের দিকে। চোখে জিজ্ঞাসা।
ওকে অনিশ্চয়তার মধ্যে রাখল না কিশোর। জানাল, আমার নাম কিশোর পাশা। সখের গোয়েন্দা। হাত নেড়ে মুসাকে ডাকল। পরিচয় করিয়ে দিল, ও আমার বন্ধু ও সহকারী, মুসা আমান। এখানকার লোক নই আমরা। রকি বীচ থেকে এসেছি।
মাথা ঝাঁকিয়ে বলল মিলি, চিনতে পেরেছি। কাল আমাদের গ্যারেজে গিয়েছিলে তোমরা।
কিশোরও মাথা ঝাঁকাল। জানি, তোমার মন এখন খুব খারাপ। তবু কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই।
মাথা নাড়ল মিলি। হাসি ফোঁটাল মুখে। না না, মন ঠিক হয়ে গেছে। কি জানতে চাও?
বিলি ফক্সের ব্যাপারে।
মুহূর্তে মুখের ভাব বদলে গেল মিলির। বোঝা গেল, সে অনেকই কিছুই জানে।
অ্যাক্সিডেন্টের জায়গায় ও গিয়েছিল, তাই না? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
ঝিক করে উঠল মিলির চোখ। এ দৃষ্টি কিশোরের চেনা। কোণঠাসা শিকারি জানোয়ারের চোখে দেখেছে। তারমানে মিলি জানে বিলি ফক্সই কিছু করেছে। কি করে জানল?
হ্যাঁ, গিয়েছিল। আর কিছু জানার আছে? অধৈর্য কণ্ঠে মিলি বলল, তাড়াতাড়ি করো, প্লীজ। আব্বাকে দেখতে যাব।

কিশোরকে চুপ করে ভাবতে দেখে দরজার দিকে এগিয়ে গেল মিলি। কেবিনের দরজার কাছে গিয়ে ফিরে তাকাল একবার। তারপর ঢুকে দরজাটা লাগিয়ে দিল। জানালা দিয়ে ওকে দেখতে পাচ্ছে কিশোর। বাবার বিছানার পাশে একটা চেয়ারে বসল। বেহুশ হয়ে আছেন হাওয়ার্ড। প্রায় ডজনখানেক মেশিনের সঙ্গে তার আর নল দিয়ে যুক্ত করে দেয়া হয়েছে তার শরীর।
ওই যে, রবিন এসেছে, পেছন থেকে বলে উঠল মুসা।
ফিরে তাকাল কিশোর।
কাছে এসে দাঁড়াল রবিন। ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলেছে এলিজা। তাজ্জব হয়ে গেছে ডাক্তাররা।
কেন?
এটা দেখলেই বুঝবে, লম্বা, সরু একটা কাগজ কিশোরের হাতে তুলে দিল রবিন। জোসেফ হাওয়ার্ডের ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম।
কাগজটার দিকে তাকাল কিশোর। লম্বা, সোজা একটা রেখা। তারপর হঠাৎ করে বেঁকে গিয়ে ছোট-বড় ত্রিকোণ তৈরি করেছে। স্বাভাবিক হার্টবীটের সঙ্কেত। মাঝে মাঝে বর্শার মত চিহ্ন রয়েছে।
তাকিয়ে থাকতে থাকতে কিশোর জিজ্ঞেস করল, এটা দেখে কি বুঝব? ডাক্তারি বুঝি না আমি।
রবিন বলল, একজন নার্স আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছে। এই যে বর্শার মত জিনিস, এগুলো হার্ট চালু হওয়ার সময়কার... তখন কোন ধরনের বৈদ্যুতিক অনুপ্রবেশ ঘটেছিল হাওয়ার্ডের হৃৎপিণ্ডে।
তো?
ডাক্তার বলছেন ডিফাইব্রিলেটরে চার্জ ছিল না। প্যাডেলগুলো অচল ছিল।
খাইছে! বলে উঠল মুসা, গ্রীক ভাষা বলছ নাকি?
না, ডাক্তারি শব্দ। আমিও বুঝি না। আমাকে যা বলা হলো, তাই উগরে দিলাম।
মোদ্দা কথাটা কি তাই বলো? হাতের কাগজটা নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর।
হার্ট এভাবে চালু হওয়ার কোন ব্যাখ্যা দিতে পারছেন না ডাক্তাররা। মরা হার্ট হঠাৎ চালু হয়ে গেল।
মুসার দিকে তাকাল কিশোর।
অজ্ঞতার ভঙ্গি করে হাত ওল্টাল মুসা।
আবার রবিনের দিকে ফিরল কিশোর। এবার এসো, আমি তোমাকে একটা জিনিস দেখাই। নার্স স্টেশনের ফাইল র‍্যাকের দিকে এগোল সে। বিলি ফক্সের ফাইলটা তুলে নিয়ে বাড়িয়ে দিল। নাও। দেখো। বিলি ফক্স ভর্তি হয়েছিল এ হাসপাতালে। ওর মেডিক্যাল চার্টটা দেখো...

ফাইলটা হাতে নিয়ে দ্রুত পাতা উল্টে চলল রবিন। একটা পাতার পাশে লেখা নোটে আঙুল বোলাতে বোলাতে পড়ল। থেমে গেল একটা লাইনে এসে। মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, এ তো অদ্ভুত কথা! ব্লাড টেস্ট অ্যাকিউট হাইপোকেলামিয়া শো করছে!
মুচকি হাসল কিশোর। রবিনের চোখেও পড়ল তাহলে। পড়ে কিনা, এটাই দেখতে চেয়েছিল সে।
কিশোরের দিকে তাকাল রবিন। ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালান্স, তাই?
হ্যাঁ।
এবং ইলেকট্রোলাইট আমাদের শরীরে বৈদ্যুতিক স্পন্দন সৃষ্টি করে।
হ্যাঁ। হার্টের প্রতিটি বীটের সময়... চুপ হয়ে গেল রবিন। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কিশোরের চোখের দিকে তাকিয়ে রইল। কি বলতে চাইছ তুমি?
এটা আমার ধারণা মাত্র, রবিন। নিশ্চিত হয়ে বলতে পারছি নাতবু, যদি ধরে নিই, বিলির শরীরের ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালান্স ওকে প্রচণ্ড ক্ষমতার অধিকারী করে তুলেছে? অন্যান্য বিদ্যুৎ-উৎপাদনকারী প্রাণীর মত সে-ও তার নিজের দেহে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে? অস্বাভাবিক হাই-ভোল্টেজ?
হা করে তাকিয়ে আছে মুসা। এতটাই অবাক হয়েছে, যেন ভূত দেখতে পাচ্ছে সামনে।
কতটা হাই? অবাক রবিনও হয়েছে।
ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রামের কাগজটা নাচাল আবার কিশোর, যতটা হলে একজন মানুষের হৃৎপিণ্ড নিয়ে খেলা করতে পারে কেউ। কাবাব করতে। পারে, আবার মরাটাকে জ্যান্ত করে তুলতে পারে।
ফ্যান্টাসি, কিশোর! রূপকথা মনে হচ্ছে! মাথা নাড়তে নাড়তে রবিন বলল, মানুষের শরীর কখনও বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে না।
মানুষের শরীর এবং মন সম্পর্কে কখনোই শিওর হয়ে বলা যায় না কিছু। অনন্ত শক্তির অধিকারী মানুষের মন। মনের শক্তি দিয়ে কি না করতে পারে মানুষ? শরীরটাকেও মনের জোরে ইচ্ছেমত চালাতে পারে। ভারতীয় যোগীদের কথাই ধরো। কিংবা ব্যালে ড্যান্সাররা। ওরা যে সব কাণ্ড করে, আমরা জানি বলে এখন আর অবাক লাগে না। হঠাৎ করে দেখলে কি বিশ্বাস করতে পারতাম? সবচেয়ে বড় কথা, অন্য প্রাণী যে কাজটা করতে পারে, মানুষ কেন সেটা করতে পারবে না? কেন নিজের দেহে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারবে না?
পারবে, যদি তার শরীরে ওই প্রাণীদের মত বিশেষ যন্ত্রগুলো থাকে।
হ্যাঁ, যদি থাকে। উত্তেজিত ভঙ্গিতে রবিনের দিকে এক পা এগোল কিশোর। কিংবা তৈরি করে দেয়া যায়!

মানে? বুঝতে পারল না রবিন।
এমন হতে পারে, রবিনের কথা যেন শুনতেই পায়নি কিশোর, বিলি ফক্সের শরীর সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক অনেক বেশি বিদ্যুৎ সহ্য করতে পারে। ফুলগারাইটে পাওয়া ওর জুতোর ছাপ আমার মাথায় এধারণাটা ঢুকিয়েছে। বজ্রপাতে লক্ষ লক্ষ ভোল্টেজ বিদ্যুৎ শরীরে প্রবেশ করেছে ওর, পা বেয়ে মাটিতে নেমে গেছে। কোন ক্ষতি হয়নি ওর। লাভ হয়েছে। শরীরের বিশেষ কোষে কোষে জমা করে নিয়েছে সেই শক্তি, ব্যাটারির মত।
কি বলছ তুমি! ওকে কোন ধরনের লাইটনিং রড মনে করছ?
শুধু রড নয়, ও নিজে একটা জেনারেটরও বটে, শান্তকণ্ঠে বলল কিশোর, এই শক্তি দানবে পরিণত করেছে তাকে। ফ্রাঙ্কেনস্টাইন। আবার আঘাত হানার আগেই ঠেকাতে হবে এই দানবকে।
তোমার কথার মাথামুণ্ড আমি কিছু বুঝতে পারছি না, কিশোর! এমন ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে মুসা, যেন পাগল হয়ে গেছে কিশোর। সারা জীবন আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করেছ ভূত বিশ্বাস করি বলে, এখন নিজেই...
হাসল কিশোর, ভূত আমি এখনও বিশ্বাস করি না, মুসা। এখানে যেটা ঘটছে, যা দেখতে পাচ্ছি, সেটা পিওর সায়ান্স, খাঁটি বিজ্ঞান। দেখেও অস্বীকার করি কিভাবে?

.
পাঁচ মাস আগে হঠাৎ করেই জানতে পারে বিলি, এক সাংঘাতিক ক্ষমতা তৈরি হয়েছে ওর মধ্যে।
প্রথম যেদিন বজ্রপাতের শিকার হলো, সেদিনকার কথা মনে পড়ল তার। রাত করে ভিডিও আর্কেড থেকে বাড়ি ফিরছে। মাঠের মধ্যে দিয়ে চলেছে। হঠাৎ কালো হয়ে গেল আকাশ। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকানো শুরু হলো। হিলটাউনে এটা কোন নতুন ঘটনা নয়। ঝড়বৃষ্টি আর বজ্রপাতের সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে গেছে এখানকার অধিবাসীরা। তাই বিশেষ গুরুত্ব দিল না বিলি। তাড়াহুড়ো না করে স্বাভাবিক গতিতেই হেঁটে চলল বাড়ির দিকে।
বাতাস বইতে শুরু করল। বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে লাগল। ওপর দিকে তাকাল সে। পাহাড়ের ঢালে বনের আড়ালের অবজারভেটরিটা দেখার চেষ্টা বেকরল। লোকে বলে ওটার লাইটনিং রডগুলোই যখন-তখন বিদ্যুৎ-ঝড়ের সৃষ্টি। করে এখানে। ওটা তৈরি করার আগে ঝড়বৃষ্টি হলেও এত বজ্রপাত হত না। কিন্তু কর্তৃপক্ষ শহরবাসীকে বুঝিয়েছে, ওটা হওয়াতে বরং ভাল হয়েছে ওদের। লাইটনিং রডগুলো বজ্রপাতকে আকর্ষণ করে, টেনে সরিয়ে নিয়ে যায়। লোকের মাথায় পড়ে না আর।

বৃষ্টির বেগ এতটাই বেড়ে গেল, না দৌড়ে আর পারল না বিলি। আরও আগেই সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। ভিজে চুপচুপে হয়ে গেছে। বিদ্যুতের আলোয় দূরে চোখে পড়ছে ওদের বাড়িটা। লম্বা লম্বা ঘাস। এমনিতেই হাঁটতে বাধা দেয়। ভিজে গিয়ে অক্টোপাসের শুড় হয়ে গেল যেন। পা জড়িয়ে ধরে রাখতে চাইছে কেবলই। বুটের চাপে হুস হুস শব্দ হচ্ছে। দৌড়ানো কঠিন করে তুলল বিলিল জন্যে।

চতুর্দিক আলোকিত করে দিয়ে বিদ্যুৎ চমকাল হঠাৎ। এতক্ষণ যেগুলো চমকেছে, তার চেয়ে আলো অনেক বেশি। পরক্ষণে বিকট শব্দ। বিলির মনে হলো আকাশটা ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। সেই সঙ্গে তার নিজের মাথাটাও। শরীরে এমন তীব্র ব্যথা আর কখনও অনুভব করেনি। চিৎকার করতে চেয়েছে। মুখ দিয়ে শব্দ বেরোয়নি। শরীরের সমস্ত পেশী যেন জট পাকিয়ে গিয়েছিল। চুলে আগুন ধরে গিয়েছিল।

সাতদিন পর জ্ঞান ফিরেছিল ওর। সারা গায়ে ব্যান্ডেজ। মমি বানিয়ে ফেলা হয়েছিল দেহটাকে। হাসপাতালের বেডে শুয়ে ছিল সে। কেউ ছিল না পাশে।

প্রথমে দেখা করতে এলেন মা। এসেই শুরু করলেন বকাবকি, চিৎকার, চেঁচামেচি। বোকার মত ঝড়বৃষ্টি দেখেও মাঠের মধ্যে দিয়ে আসতে গিয়েছিল কেন সে, তার জন্যে একশো একটা কথা শোনালেন। গালাগালে তেতো হয়ে গিয়েছিল তার মন।

পটেটোও দেখা করতে আসেনি। আসার উপায় ছিল না ওর। অসুখ হয়ে সে-ও তখন হাসপাতালে।

ছাড়া পাওয়ার একদিন আগে এসে একমুঠো রজনীগন্ধার সুবাস ছড়িয়ে যেন তার সঙ্গে দেখা করল মিলি হাওয়ার্ড। একটি কুকিজ নিয়ে এসেছিল তার জন্যে। সেই সঙ্গে একটা সুখবর। তার বাবা একজন লোক খুঁজছেন। ওদের গ্যারেজের কাজের জন্যে। বিলির কথা বলেছে মিলি। বাবা রাজী হয়ে গেছেন। আপাতত একটা বেতন ধার্য করা হয়েছে। কাজ দেখাতে পারলে ভবিষ্যতে চাকরির পদোন্নতি হবে এবং বেতনও বাড়বে।

মিলিকে ওই মুহূর্তে দেবী মনে হয়েছিল বিলির। তার অন্ধকার বিরক্তিকর জীবনে আলোর মত। তখনই ঠিক করে ফেলেছিল, ওকে সুখী করবে সে। জগতের সবচেয়ে সুখী মেয়ে। সেটা করার জন্যে যা যা দরকার, সব করবে।

এর দুদিন পর একটা টর্চ লাইটের বাতিল ব্যাটারি বদলাতে গিয়ে নিজের ক্ষমতাটা প্রথম টের পেল বিলি। এতটাই চার্জ হয়ে গেল ব্যাটারি, টর্চের বাল সেটা সহ্য করতে না পেরে কেটে গেল। ব্যাটারিগুলো ফেটে গিয়ে অ্যাসিড গলে বেরিয়ে হাতে লাগল তার। শুরু হলো একটার পর একটা পরীক্ষা। দুই ঠোঁটে বা চেপে ধরে আলো জ্বেলে পটেটোকে অবাক করে দিল।

প্রথমে ব্যাপারটা খুব মজার মনে হয়েছে ওর কাছে।
কিন্তু এখন আর মজার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। জরুরী কাজে ব্যবহার করতে গিয়ে অতিমাত্রায় বিপজ্জনক করে ফেলেছে সে নিজেই।
ঘরে বসে কথাগুলো ভাবছিল বিলি, এই সময় গাড়ির আওয়াজ শুনল। জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখল, তিন গোয়েন্দা নামছে গাড়ি থেকে।
*
দরজায় দাঁড়ানো গোয়েন্দাদের ফাঁকি দেয়ার জন্যে বেডরুমের জানালা দিয়ে। বেরিয়ে গেল বিলি। বিদ্যুৎ যেন প্রচণ্ড রাগে ফেটে পড়তে চাইছে তার ভেতরে। মাঠের ওপর দিয়ে ছুটল সে।
কিন্তু দেখে ফেলল গোয়েন্দারা।
বিলি! বিলি! ডাকতে ডাকতে দৌড়ে আসতে লাগল কিশোর। পেছনে রবিন আর মুসা।
একবার ভাবল বিলি, দৌড়ে পালায়। কিন্তু পালিয়ে কোন সুবিধে করতে পারবে না, বুঝে গেছে। বরং ওরা কি বলে শোনা যাক। ইস, মস্ত ভুল হয়ে গেছে! ঝোঁকের মাথায় হাওয়ার্ডের ব্যাপারটা ঘটিয়ে ফেলার পর থেকেই ভাবছে সে। আরও সময় নিলে পারত। চৌরাস্তায় দুর্ঘটনা ঘটানোর পর পরই ওরকম একটা কাণ্ড না ঘটিয়ে অন্য কোথাও অন্য কোন সময় কাজটা করা উচিত ছিল। তাতে ওর ওপর সন্দেহ জাগত না কারও। আরও একটা বড় ভুল হয়ে গেছে–পটেটোর সামনে এটা করা। পটেটো ওর বন্ধু, ঠিক আছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওর গলার কাঁটা না হয়ে ওঠে।
মাঠের মাঝখানে এসে তাকে ধরে ফেলল তিন গোয়েন্দা। কিশোর তার হাত ধরল। ঝাড়া দিয়ে ছাড়িয়ে নিল বিলি। দাঁত কিড়মিড় করল। রাগে বড় বড় হয়ে গেছে চোখ।
ধোরো না! আমাকে থোরো না! চিৎকার করে উঠল বিলি। ওখানেই তিনজনুকে পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে ইচ্ছে করল। তাহলে রেহাই পাবে সে। ওরা আর বিরক্ত করতে পারবে না।
কিন্তু জানে একাজ করা উচিত হবে না। এরা মরলে পুলিশ আর গোয়েন্দা বিভাগের কড়া নজর পড়ে যাবে ওর ওপর। পিলপিল করে পিঁপড়ের সারির মত আসতে আরম্ভ করবে ওরা। ওকে ধ্বংস না করে ছাড়বে না।
বিলির রাগ দেখে পিছিয়ে গেল কিশোর। ঠিক আছে, ধরব না।
আর কখনও আমাকে ছোবে না বলে দিলাম!
তোমার সঙ্গে আমাদের কথা আছে, বিলি, ওকে শান্ত করার জন্যে বলল রবিন।
কি কথা? আমি কিছু করিনি, নিজের কাছেই বিশ্বাসযোগ্য মনে হলো না। কথাটা বিলির।

ওর মুখোমুখি দাঁড়াল কিশোর। কেউ বলছে না তুমি কিছু করেছ। আমরা ভাবলাম আমাদের কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে তুমি। সেজন্যেই এসেছি। যদি দিতে পারো, ভাল। না পারলে

লম্বা দম নিল বিলি। বেরোনোর জন্যে ছটফট করছে বিদ্যুৎ। জোর করে ঠেকিয়ে রেখেছে। জমে ওঠা শক্তিটাকে ধীরে ধীরে কমানো শুরু করল। কমাতে কমাতে ধিকিধিকি আগুনের পর্যায়ে নিয়ে এল।

বেশ, অবশেষে বলল সে, কি জানতে চাও?

*

কাউন্টি জেলের ইন্টারোগেশন রুমে বসে আছে রবিন। বিলিকে চোখ ডলতে দেখছে। খুব ক্লান্ত লাগছে ওকে। নিরীহ ভাবভঙ্গি। কেমন ভঙ্গুর। ভাবাই যায় না গোবেচারা চেহারার ওই অতি সাধারণ ছেলেটা তার রোগাটে শরীরের ভেতর থেকে ওই ভয়ঙ্কর ধ্বংসাত্মক শক্তি বের করতে পারে। বিলি একাজ। করতে পারে, এটা এখনও কেবল অনুমানের পর্যায়েই রয়েছে। কোন প্রমাণ জোগাড় করা যায়নি। সত্যি কি এতটা ক্ষমতা আছে বিলির?

মুখ তুলে তাকাল বিলি। শীতল, হিসেবি দৃষ্টি। দেখে অবিশ্বাস দূর হয়ে গেল রবিনের। হ্যাঁ, পারে। এই ছেলে ধ্বংস করতে পারে!

আর কতবার বলব, বিলি বলল, ওই লোকগুলো কিভাবে মারা গেছে আমি জানি না!

তাহলে আমাদের দেখে পালাচ্ছিলে কেন?

প্রচণ্ড জোরে টেবিলে চাপড় মারল বিলি। বার বার বলছি, ঘুরতে বেরিয়েছিলাম!

সব সময় ওরকম জানালা দিয়েই বেরোও নাকি?

ভয়ঙ্কর ভঙ্গিতে জ্বলে উঠল বিলির চোখ। প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে বলল, তোমাদের তো একটা মেডেল দেয়া উচিত আমাকে। আমার বসের জীবন বাঁচিয়ে দিয়েছি বলে।

নিরাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে লাগল রবিন। নাহ, বড় কঠিন ঠাই। এর। পেট থেকে কথা আদায় করতে পারবে না। বার বার একই প্রশ্ন করে যাচ্ছে। বিলির জবাবেরও কোন পরিবর্তন নেই। জোরাল প্রমাণ না পাওয়া গেলে ওকে আর বেশিক্ষণ আটকে রাখা যাবে না।

সত্যি বাঁচিয়েছ কিনা এখনও শিওর না আমরা, বলে চেয়ার ঠেলে উঠে। দাঁড়াল রবিন।

চেয়ারে হেলান দিল বিলি। রবিনকে দরজার দিকে এগিয়ে যেতে দেখে। প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল সে। কেন? কেউ কি তোমাদের বলেছে কিছু? পটেটো বলেছে?

বাইরে বসে আছে একজন ডেপুটি। রবিনকে দরজা খুলে দিল।

শেষবারের মত বিলির দিকে ফিরে তাকাল রবিন। সামনে ঝুঁকে বাকা হয়ে বসেছে এখন বিলি। দুই হাতে খামচে ধরেছে টেবিলের কিনার। অসহায় লাগছে ওকে। রবিনের চোখে চোখ পড়তেই বদলে যেতে শুরু করল ভঙ্গিটা। জানোয়ারের মত জ্বলে উঠতে শুরু করল দুই চোখ-না, জানোয়ার নয়। রবিনের মনে হলো বৈদ্যুতিক বাতির মত!
বেরিয়ে এল রবিন।
হলওয়েতে ওর সঙ্গে দেখা করল কিশোর আর মুসা। কিশোর আশা করেছিল, রবিনকে যেহেতু নিরীহ চেহারার মনে হয়, তার কাছে মুখ খুলবে। বিলি। সেজন্যেই কথা বলতে পাঠিয়েছিল। বুঝল, সুবিধে করতে পারেনি রবিন। তবু জিজ্ঞেস করল কিশোর, কি খবর?
কিছুই বলে না। বার বার একই কথা, সে একজন হিরো।
ধরে থাবড়া লাগানো দরকার। ফুঁসে উঠল মুসা।
লাগাতে গেলে তোমাকেও খতম করে দেবে, হাত নেড়ে ওকে শান্ত হতে ইশারা করল কিশোর। রবিনকে জিজ্ঞেস করল, জোসেফ হাওয়ার্ডকে কিভাবে বাঁচিয়েছে? কিছু বলল?
কিছুই না। গোপন বিদ্যা নাকি জানে সে। কোন্ এক গুরুর কাছে শিখেছে।
কোন্ গুরু?
বলবে না বলে দিয়েছে।
মাথা দোলাতে দোলাতে কিশোর বলল, হু। রবিন, আমার ধারণা পুরো ঘটনাটাই ওর সাজানো নাটক।
মানে? তুমি বলতে চাইছ হার্ট অ্যাটাকটাও ওই ঘটিয়েছে?
মাথা ঝাঁকাল কিশোর।
এসব ঝামেলা কেন করতে গেল?।
জানি না, আনমনে বলল কিশোর। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল। তবে এমন একজনকে চিনি যে জানে।

.
হিলটাউনের সবচেয়ে দামী এলাকায় সুন্দর একটা দোতলা বাড়ির সামনে মুসাকে গাড়ি রাখতে বলল কিশোর। রবিনের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, ঠিকানা ঠিক আছে তো?
নোটবুক দেখে নিশ্চিত হয়ে নিয়ে রবিন জানাল, হ্যাঁ, এটাই।
আসার পথে মিলির কথা রবিনকে জানিয়েছে কিশোর। হাসপাতালে ওর সঙ্গে কিভাবে দেখা হয়েছে বলেছে।

বেল বাজানোর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই দরজা খুলে দিল মিলি। বিশ্রাম নেয়ার জন্যে হাসপাতাল থেকে যদি বাড়ি এসে থাকে সে, সফল হয়নি সে চেষ্টা। বরং আগের চেয়ে অনেক বেশি বিধ্বস্ত লাগছে তাকে।
তিন গোয়েন্দাকে দেখে জমে গেল যেন।
মিলি.... শুরু করতে গেল কিশোর।
কিন্তু তাকে চুপ করিয়ে দিল মিলি। সরি। এখন কথা বলতে পারব না। হাসপাতালে রওনা হচ্ছিলাম। ভঙ্গি দেখে মনে হলো কেঁদে ফেলবে।
বিলি ফক্সকে হাজতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, মিলি, মোলায়েম করে বলল কিশোর। কিছুক্ষণ আগে শেরিফকে বলে তাকে আটকানোর ব্যবস্থা। করেছি।
তাকিয়ে রইল মিলি। কিছু বলল না।
তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওকে লক্ষ করছে কিশোর। ঠিকই অনুমান করেছিল। মিলি কিছু জানে। বলতেও চায়। কিন্তু ভয় পাচ্ছে।
ভেতরে আসব? স্বর আরও নরম করে জিজ্ঞেস করল কিশোর।
দ্বিধা করল মিলি। তারপর সরে গিয়ে পুরো মেলে ধরল দরজা।
লিভিং রুমে ঢুকল তিন গোয়েন্দা। সুন্দর করে সাজানো। দামী আসবাব, ঘর সাজানোর সরঞ্জাম, কার্পেট, টবে লাগানো গাছ আর অ্যানটিক প্রচুর আছে। তবে বাড়াবাড়ি নেই।
আমি হাই স্কুলে পড়ি, বলার মত অন্য কোন কথা যেন খুঁজে পেল না মিলি। বিলিও একই ক্লাসে পড়ে।
ওর সঙ্গে সম্পর্ক কেমন তোমার? জানতে চাইল রবিন।
আমার তরফ থেকে সাদামাঠা। কিন্তু ও বোধহয় আমাকে পছন্দ করে একটু বেশিই করে। ওর জন্যে দুঃখ হয় আমার। অস্বস্তি বোধ করছে। মিলি। যেন কোন সাংঘাতিক অন্যায় কিংবা বেআইনী কাজ করে ফেলেছে বিলির পছন্দের দাম দিতে না পেরে। সহপাঠী। অসুস্থ হয়ে পড়ে ছিল হাসপাতালে। মায়া দেখাতে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম গরীব মানুষ, লেখাপড়ার ফাঁকে ফাঁকে কাজ করে দুচারটে পয়সা পাক...কিন্তু...
গ্যারেজের চাকরিটা কি তুমিই তোমার বাবাকে বলে নিয়ে দিয়েছিলে নাকি? জানতে চাইল কিশোর।
মাথা ঝাঁকাল মিলি। হ্যাঁ। তার কয়েক দিন পর থেকেই ফোন আসতে থাকল। রিং হয়। আমি ধরলে কিছু না বলেই ছেড়ে দেয়।
কি করে বুঝলে বিলিই করত?
ভ্রূকুটি করল মিলি। আমাকে দেখলে যেভাবে গদগদ হয়ে তাকিয়ে থাকে...যা-ই হোক, বুঝতে পারতাম ঠিকই। কিশোরের দিক থেকে রবিনের দিকে ফিরল সে।

মুসাকে দেখল। আবার ফিরল কিশোরের দিকে। বিলিই যে করত কোন সন্দেহ নেই আমার।
ওর কথা বিশ্বাস করল কিশোর। কিন্তু মিলির এসব কথা বিলির বিরুদ্ধে প্রমাণ নয়। এখনও এমন কিছু বলেনি সে, যেটা দিয়ে ফাসানো যায় বিলিকে।
কখন থেকে সন্দেহ করলে অঘটন ঘটাতে শুরু করেছে বিলি?
সরাসরি কিশোরের চোখের দিকে তাকাল এতক্ষণে মিলি। ও নিজেই আমাকে বলেছে।
বিস্ময়ে সামনে ঝুঁকে গেল রবিন। মানুষ খুন করেছে এ কথা বলেছে ও?
না, তা অবশ্য বলেনি। তবে ওর নাকি ক্ষমতা আছে। ভয়ঙ্কর ক্ষমতা।
মাথা ঝাঁকাল রবিন।
কিশোর জিজ্ঞেস করল, কবে বলেছে?
শেষ লোকটাকে খুন করার পর।
লেসলি কার্টারিসকে?
মাথা ঝাঁকিয়ে মুখ নিচু করে ফেলল মিলি। আমি ওর কথা বিশ্বাস করিনি। ভেবেছিলাম আমাকে ভজানোর জন্যে গল্প করছে। কিন্তু আজ যা ঘটল মুখ তুলল সে। বুঝতে পারছি এক বর্ণও মিথ্যে বলেনি। যা বলেছে, সবই করতে পারে।
আর কাউকে বলেছ একথা?
হাসল মিলি। ছোট্ট, বিষণ্ন হাসি। মাথা নাড়ল। কে বিশ্বাস করবে এসব আজগুবী কথা?
একমত হয়ে মাথা ঝাঁকাল কিশোর।
আমি এখন রীতিমত ভয় পেয়ে গেছি, মিলি বলল। আমি ওকে এড়িয়ে চলতে গেলে না জানি কি করে বসে বাবাকে করল.. আমাকে করতে কতক্ষণ? বাবাকে একবার বাঁচিয়ে রেখেছে, দ্বিতীয়বার
মুখে হাত চাপা দিল মিলি।
এগিয়ে গিয়ে সান্তনা দেয়ার ভঙ্গিতে একটা হাত রাখল ওর কাঁধে রবিন। এখন আর ভয় পাওয়ার কিছু নেই তোমার। তুমি এবং তোমার বাবা দুজনেই নিরাপদ। আমরা আছি।
চোখের পানি আর ধরে রাখতে পারল না মিলি। কাউকে জমিয়ে রাখা কথাগুলো বলে মনের ভার লাঘব হয়েছে। ভাবসাব দেখে মনে হলো রবিনের কথা বিশ্বাস করেছে। ভরসা জন্মেছে তিন গোয়েন্দার ওপর।
*

ফেরার পথে আলোচনা করতে করতে চলল তিন গোয়েন্দা। উপায় খুঁজতে লাগল কি করে বিলির মত একটা ভয়াবহ বিপজ্জনক এবং মারাত্মক অপরাধীকে গ্রেপ্তার করানো যায়।
বিষাক্ত কেউটের চেয়েও ভয়ঙ্কর ও, কিশোর বলল। হাইভোল্ট বিদ্যুৎ। ছোঁয়া লাগলেই মৃত্যু। আমি ভাবছি, না ছুঁয়েও…
যা সব কথা শুরু করেছ না তুমি আমার জিনের আসরও এর চেয়ে কম উদ্ভট! গাড়ি চালাতে চালাতে বলল মুসা। রাস্তার দিকে নজর।
কয়েক মিনিট পর জেলখানায় পৌঁছল ওরা। যে কোন রকম অঘটন দেখার জন্যে তৈরি।
গাড়ি থেকে নেমে সবার আগে ভেতরে ঢুকল কিশোর। অজানা আশঙ্কায় অস্থির। কি দেখতে পাবে কে জানে! ডেপুটিকে দেখল টেবিলে বসে একটা ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছে। সে ছাড়া আর কেউ নেই ঘরে। তারমানে কোন ক্ষতি হয়নি। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে জিজ্ঞেস করল কিশোর, বিলি কোথায়?
ডেপুটি জবাব দেয়ার আগেই জানতে চাইল রবিন, অন্য কোন জেলে ট্রান্সফার করেছেন?
কিশোরের পেছন পেছন ঢুকেছে সে। মুসা রয়ে গেছে গাড়িতে।
বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছি, পেছন থেকে বলে উঠল একটা কণ্ঠ।
ফিরে তাকাল দুজনে। শেরিফ রবার্টসন।
ছেড়ে দিয়েছেন? বিশ্বাস করতে পারছে না কিশোর।
আর কি করব? হাতের ফাইলটা নেড়ে বললেন, এটা পড়ার পর ছেড়েছি। তোমরাই তো লিখে রেখে গেছ।
ছেড়ে দেয়ার কথা লিখিনি.. রবিন বলল।
দৌড় দিল কিশোর। যেতে যেতে বলল, মিলিকে ফোন করতে যাচ্ছি।
একটা মুহূর্ত ভুরু কুঁচকে সেদিকে তাকিয়ে রইলেন শেরিফ। চোখ ফেরালেন রবিনের দিকে। ফাইলটা খুলে পড়লেন, নিজের শরীরে বিদ্যুৎ তৈরি করে সেটার সাহায্যে খুন করে সে! রবিনের দিকে তাকিয়ে চোখের পাতা সরু করে বললেন, অনুমান? না সত্যি বিশ্বাস করো একথা?
বুকের ওপর দুই হাত আড়াআড়ি রাখল রবিন। শেরিফের মতই চোখের পাতা সরু করে জবাব দিল, করি। আমাদের বিশ্বাস ওই পাঁচটা রহস্যময় খুনের জন্যে বিলিই দায়ী। আপনি ওকে ছেড়ে দিয়ে ভুল করেছেন, স্যার। কি যে অঘটন ঘটাবে এখন সে-ই জানে!
শুকনো হাসি হাসলেন শেরিফ। তোমরা বলতে চাইছ বজ্র ছুঁড়ে মারতে পারে বিলি?

এটাই তো আপনার রিমোট কন্ট্রোলড ইলেকট্রিক শকের জবাব, তাই না?
গভীর ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন শেরিফ, মনে হচ্ছে। তবে বিশ্বাস করতে পারছি না।
ফাইলটা টেবিলে ছুঁড়ে ফেললেন তিনি। বুঝতে পারছি না কি করব! তোমাদের কথা বিশ্বাস করে শেষ বয়েসে শেষে তোক হাসাব নাকি কে জানে!...অবশ্য ইয়ান ফ্লেচারের ওপর ভক্তি আছে আমার। ও যখন তোমাদের সার্টিফাই করেছে...
আপনার দ্বিধা করার কিছু নেই, স্যার। আপনিই বলেছেন বজ্রের ব্যাপারে অনেক কথাই অজ্ঞাত রয়ে গেছে। বড় বড় বিজ্ঞানীরাও সব জানেন না। আর বজ্র মানেই বিদ্যুৎ। এখানে একটা কথা, অন্য জীব যদি নিজের দেহে বিদ্যুৎ তৈরি করতে পারে, মানুষই বা পারবে না কেন?
মুখ খুলেও আবার বন্ধ করে ফেললেন শেরিফ। প্রশ্নটা করে ওকে কোণঠাসা করে দিয়েছে রবিন। জবাব খুঁজে পাচ্ছেন না।
দৌড়ে ফিরে এল কিশোর। দরজায় দাঁড়িয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে রবিনকে জানাল, মিলি বাড়িতে নেই!
নিশ্চয় হাসপাতালে রওনা হয়ে গেছে, বলেই দরজার দিকে ছুটল রবিন।
বেরিয়ে গেল দুজনে।
পেছনে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইলেন শেরিফ। ভীষণ একটা সমস্যায় ফেলে দিয়েছে তাকে ছেলেগুলো।
রাত বারোটা বাজতে দশ মিনিট বাকি। ভাল লাগছে না পটেটোর। বিলি ফক্স আর তার ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক খেলার ভাবনা কিছুতেই দূর করতে পারছে না। মন থেকে। মাঝেমধ্যে একআধটু উত্তেজক বিকৃত খেলা যে ভাল লাগে না। তার, তা নয়। তবে ইদানীং বড় বেশি বিকৃত খেলা শুরু করে দিয়েছে বিলি, যেটা তার সহ্যের বাইরে। এসব খেলার কথা ভাবতেও ভাল লাগছে না আর ওর।
খালি ঘর। খানিক আগে একটা ছেলে আর তার বান্ধবী এককোণে দুটো মেশিনে খেলছিল। ওরাই আজকের শেষ খেলোয়াড়। চলে গেছে। একা একা বসে এখন কমিক পড়ার চেষ্টা করছে পটেটো। মন বসাতে পারছে না।
ঠিক বারোটায় উঠে গিয়ে মেইন ব্রেকার অফ করে আলো নিভিয়ে দিল সে।
অন্ধকার হয়ে গেল আর্কেড়। তবে পুরোপুরি নয়। একধারে একটা আলো জ্বলেই রইল। ভিডিও গেম মেশিনের স্ক্রীনের আলো। সতর্ক ভঙ্গিতে পা টিপে টিপে সেটার দিকে এগোল সে। Virtual Massacre-II মেশিনটা চলছে বিদ্যুৎ ছাড়াই। পর্দায় ফাইটারদের ওপরে ফুটে উঠেছে নামের একটা স্তম্ভ। বিশটা নাম। সবগুলো একজনের-বি, পিএফ.।
এই, যাহ! লেখাগুলোকে বলল সে। যেন ধমক দিলেই কথা শুনবে মেশিন। অপেক্ষা করতে লাগল মেশিন বন্ধ হওয়ার। হলো না। বিড়বিড় করে বলল, বিলি,

আমি জানি, তুমি একাজ করছ।
জবাব নেই।
হঠাৎ ঝমঝম করে বেজে উঠল জুকবক্সটা। দি নাইটওয়াকারস।
ঘটনাটা নতুন নয় পটেটোর কাছে। কিন্তু এ মুহূর্তে অস্বস্তি বোধ করতে লাগল সে। জোর করে হাসল।
কি হয়েছে বিলি? কিছু বলতে চাও? দরজার দিকে পা বাড়াল পটেটো। আতঙ্ক চেপে রাখার চেষ্টা করছে। ওর চারপাশের বাতাস ঘন, ভারী হয়ে। উঠেছে। অদ্ভুত এক ধরনের গন্ধ। বিদ্যুৎ-ঝড়ের পর যেমন হয়।
প্রতিটি পা বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে মনে হচ্ছে আরও বেশি দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। সে। এ এক ভয়ানক পরিস্থিতি। আতঙ্ক কিছুতেই বাগ মানাতে পারছে না। একটা মানুষখেকো হাঙরের সঙ্গে সাঁতার কাটছে যেন। জানে নিচের গভীর পানিতে কোনখানে রয়েছে ওটা, কিন্তু ও দেখতে পাচ্ছে না। সময়মত ঠিকই ভুস করে উঠে আসবে ওকে ছিঁড়ে খাওয়ার জন্যে।
দরজা খোলার জন্যে ঠেলা দিল পটেটো। পকেট থেকে চাবির গোছা বের করল। আবছা আলোয় অনেকটা আঙুলের আন্দাজে খুঁজে বের করল সঠিক চাবিটা। হাত ভীষণ কাঁপছে।
চিৎকার করে উঠল সে, কি করছ? বলেছিই তো ওদের কিছু বলিনি আমি!
জুকবক্সে মিউজিকের কানফাটা ঝমঝম ছাড়া কেউ জবাব দিল না তার কথার।
বাইরে এসে দরজাটা লাগিয়ে দিয়ে কাঁপা হাতে কোনমতে চাবিটা তালায় ঢোকাল সে। তালা লাগানোর পর একটা মুহূর্ত আর দেরি করল না। ছুটে নামল চত্বরে। ঝোড়ো বাতাস বইছে।
পার্কিং লটে এসেও শব্দের অত্যাচার থেকে নিস্তার পেল না। এখন বাজনা বাজাচ্ছে বাতাসের শব্দ। গাছগুলোও যেন স্পীকারে পরিণত হয়েছে। আকাশে মেঘ গুমগুম করে বাজিয়ে চলেছে হেভি মেটাল মিউজিক।
ওকে ঘিরে বইছে প্রবল বাতাসের ঘূর্ণি। এখনও দেখতে পাচ্ছে না বিলিকে। চিৎকার করে বলল, বিলি, বিশ্বাস করো! আমি কিছু বলিনি ওদের! শিশুর মত অসহায় ভঙ্গিতে কেঁদে উঠল। আমি তোমার বন্ধু, বিলি! আমার সঙ্গে এমন করছ কেন?
এতক্ষণে জবাব মিলল। মিউজিকের চেয়ে জোরাল শব্দে, রোদের চেয়ে উজ্জ্বল বিদ্যুতের একটা হলকা এসে লাগল ওর পিঠে। হৃৎপিণ্ডটাকে পুড়িয়ে দিয়ে বুক ভেদ করে গিয়ে ঢুকে গেল মাটিতে।
মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ল পটেটো। পকেট থেকে সিকিগুলো ছড়িয়ে পড়ল মাটিতে। পার্কিং লটে কংক্রীটের মেঝেতে ঝনঝন শব্দ তুলল। কিছুই কানে ঢুকল

না তার। ঢুকবেও না আর কোনদিন।
*
আর্কেডের হাতে দাঁড়িয়ে পার্কিং লটে পড়ে থাকা ওর বন্ধুর দেহটার দিকে তাকিয়ে আছে বিলি। মনের মধ্যে খুঁজে দেখল, যে কাজটা করেছে তার জন্যে কোন রকম দুঃখবোধ, অনুশোচনা আছে কিনা। নেই। একটুও খারাপ লাগছে না। ভয়বাহ বিদ্যুৎ যেন তার ভেতরটাকেও পুড়িয়ে, মুছে অনুভূতি আর আবেগশূন্য করে দিয়েছে। যা ঘটানোর ঘটিয়ে ফেলেছে। ফেরার উপায় নেই আর। এখন শুধু এগিয়ে যাওয়া। যা শুরু করেছে সেটার শেষ করতেই হবে।
ভয় পায় না সে। মিলি যদি সঙ্গে থাকে দুনিয়া জয় করার চেষ্টাতেও আপত্তি নেই। সব পারবে।
প্রবল বেগে বাতাস বইছে। উত্তরের আকাশে মেঘ জমছে। ঝড় আসবে।
দেখেও দেখল না বিলি। কেয়ারও করল না। ঝড়বৃষ্টি দেখার চেয়ে অনেক বেশি জরুরী কাজ এখন পড়ে আছে তার সামনে। ছাত থেকে নেমে আসতে লাগল পটেটোর লাশটা তুলে নেয়ার জন্যে।
.
হাসপাতালে যাওয়ার সময় সারাটা পথ আরও জোরে গাড়ি চালানোর জন্যে মুসাকে তাগাদা দিতে থাকল কিশোর। পঞ্চাশ-ষাট মাইল বেগে চলছে, তা-ও মনে হচ্ছে ওর, অনড় হয়ে আছে গাড়িটা।
মিলিকে কথা দিয়েছে, সে আর তার বাবা নিরাপদে থাকবেন। রাখার দায়িত্ব ওদের। বাঁচাতে না পারলে মিলির কাছে ছোট হয়ে যাবে তিন গোয়েন্দা। মান থাকবে না শেরিফ রবার্টসনের কাছে।
হাসপাতালের সামনে গাড়িটা পুরোপুরি থামার আগেই দরজা খুলে লাফ দিয়ে নেমে গেল কিশোর। দৌড় দিল লিফটের দিকে। ঘন ঘন চাপ দিচ্ছে বোতামে। এলিভেটর, মুসা এবং রবিন তার কাছে একসঙ্গে পৌঁছল।
পাঁচ তলায় উঠে এলিভেটরের দরজা ফাঁক হওয়া শুরু করতেই বেরিয়ে পড়ল কিশোর।
হলে ডিউটিরত বিস্মিত নার্সকে বলল, জলদি সিকিউরিটিকে ফোন করুন। বলে দিন, হাসপাতালের পরিচিত লোক ছাড়া আর কাউকে যেন ঢুকতে না দেয়।
নার্স কি বলে না বলে তার জন্যে দাঁড়িয়ে রইল না সে। দৌড় দিল হাওয়ার্ডের কেবিনের দিকে। জানালা দিয়েই মিলিকে দেখতে পেল। অস্থিরতা নেই। বসে আছে বাবার বিছানার পাশে চেয়ারে।
ফোঁস করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। ঠেলা দিয়ে খুলে ফেলল দরজা। আস্তে করে ডাকল, মিলি!

ফিরে তাকাল মিলি। সতর্ক হয়ে গেছে মুহূর্তে। উঠে এগিয়ে এল। কি?
আমাদের সঙ্গে এখুনি যেতে হবে তোমাকে।
কোথায়? কেন?
হাজত থেকে বিলিকে ছেড়ে দিয়েছেন শেরিফ।
তাই নাকি! যেন প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেয়ে পিছিয়ে গেল মিলি। কিশোরের কাঁধের ওপর দিয়ে তাকাল মুসা আর রবিনের দিকে। কিন্তু তোমরা আমাকে নিশ্চিন্ত থাকতে বলেছিলে। বলেছ আমরা নিরাপদ।
বলেছি। হাতে সময় কম। জলদি এসো। যেতে যেতে বলব...
মাথা নাড়ল মিলি। কিন্তু ডাক্তার বলেছেন বাবাকে নাড়াচাড়া করা একদম উচিত হবে না। ওঁকে একা ফেলে যেতে পারব না আমি।
কিশোরের পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকল মুসা। আমি তোমার বাবাকে পাহারা দিচ্ছি। তুমি ওদের সঙ্গে চলে যাও।
না! আমি যাব না!
জেদ কোরো না, মিলি!
বললাম তো আমি যাব না! টেবিলে রাখা হাতব্যাগটা নিয়ে এল মিলি। খুলে একটা পিস্তল বের করে দেখাল। বাবার। নিশানা খুব একটা খারাপ না। আমার। বাবাই গুলি চালানো শিখিয়েছে।
ওরকম হাজারটা পিস্তল দিয়েও বিলির বিরুদ্ধে কিছু করতে পারবে না। ভয়ঙ্কর ক্ষমতা ওর। যত তাড়াতাড়িই করো, পিস্তল তুলে গুলি করতে যেটুকু সময় লাগবে তোমার, ওর ততটা লাগবে না। মনে মনে শুধু বলবে
দপ করে নিভে গেল বাতি। কয়েক সেকেন্ড পরেই জ্বলে উঠল আবার। চালু হয়ে গেছে হাসপাতালের স্বয়ংক্রিয় জেনারেটর। ইমারজেন্সি পাওয়ার।
থাবা দিয়ে মিলির হাতের পিস্তলটা প্রায় কেড়ে নিল কিশোর। ও এসে গেছে!
*
হলের অনেক নিচে টুং করে মৃদু একটা শব্দ হলো। মিলি, কিশোর, রবিন, মুসা, সবাই শুনতে পেল সেটা। গলা লম্বা করে কিশোরের কাঁধের ওপর দিয়ে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল মুসা। শব্দটা কিসের বুঝতে চায়।
হল আর বেশির ভাগ জায়গাতেই ডিম লাইট জ্বলছে। সবচেয়ে বেশি। আলো আছে করিডরে, এলিভেটরের কাছে।
উঠে আসছে এলিভেটর।
সেদিকে দৌড় দিল তিনজনে।
টুং!

চারতলায় থেমেছে এলিভেটর। ঠিক ওদের নিচে। এলিভেটরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দুহাতে পিস্তলটা চেপে ধরে সামনে বাড়াল কিশোর। বিলির। দিক থেকে কোন রকম ক্ষতির সম্ভাবনা দেখলে নির্দ্বিধায় গুলি চালাবে। তারপর যা হয় হোক।

টুং!

পাঁচতলায় থামল এলিভেটর। দরজার দিকে পিস্তল তাক করে রেখেছে কিশোর। উত্তেজনায় টান টান হয়ে আছে স্নায়ুগুলো। ট্রিগার ছুঁয়ে থাকা আঙুলটা চেপে বসতে প্রস্তুত।

খুলে যাচ্ছে দরজা। এলিভেটরের মেঝেতে দলামোচড়া হয়ে পড়ে আছে একজন মানুষ।

পিস্তল নামাল কিশোর। পড়ে থাকা মানুষটাকে চিনতে পারল। ভিডিও আর্কেডের সেই ছেলেটা। পটেটো।

রবিনের দিকে তাকিয়ে ঘাড় কাত করে ইশারা করল সে। বুঝতে পারল রবিন। এলিভেটরে ঢুকে পটেটোর গলার কাছে হাত দিয়ে নাড়ী দেখল। মনে পড়ল, হাজতে বসে ওর কথা জিজ্ঞেস করেছিল বিলি। ইস্, তখন গুরুত্ব। দেয়নি! দেয়া উচিত ছিল। এখন দেরি হয়ে গেছে অনেক।

কিশোরের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল রবিন, নেই!

এলিভেটরে ঢুকে স্টপ সুইচটা টিপে দিল কিলোর যাতে ওই তলাতেই আটকে থাকে ওটা। বেরিয়ে এল আবার।

পেছনে এসে দাঁড়াল ডিউটি-নার্স। এলিভেটরের দেহটা দেখে অস্ফুট গলায় বলে উঠল, ও, লর্ড!

ওর দিকে ফিরে তাকাল কিশোর। এই তলায় ওঠার আর কোন উপায় আছে?

হাত তুলে হলের শেষ মাথা দেখাল নার্স। সিঁড়ি। নিজেকে সামালানোর চেষ্টা করছে এখনও।

দুই সহকারীর দিকে ফিরল কিশোর। মিলির কাছে থাকো। ওদের পাহারা দাও।

তুমি কোথায় যাচ্ছ? জানতে চাইল মুসা।

বিলিকে ধরতে। পটেটোর লাশটা এদিকে পাঠিয়ে আমাদের নজর সরিয়ে রাখতে চাইছে সে। সেই সুযোগে... কথা শেষ না করেই সিঁড়ির দিকে রওনা হয়ে গেল কিশোর।

*

সিঁড়িঘরের দরজা খুলে দাঁড়িয়ে রইল কিশোর। চোখে আলো সয়ে আসার অপেক্ষা করল। মেইন লাইন থেকে বিদ্যুৎ না পাওয়ায় এখানে বেশি পাওয়ারের আলোগুলোর কানেকশন বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে নিভে আছে। জ্বলছে অতি সামান্য

পাওয়ারের লাল বাল্ব। বিচিত্র এক অপার্থিব লালচে আলো সৃষ্টি করেছে। সরাসরি যেসব জায়গায় আলো পড়ছে না সেই কোণগুলোতে ছায়া।
আস্তে করে গলা বাড়িয়ে কোণের দিকে তাকাল সে। সিঁড়ির ধাপ দেখল।
কেউ নেই।
যতটা সম্ভব নিঃশব্দে নামতে শুরু করল সে। ধাতব সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত এবং শব্দ না করে নামা খুব কঠিন কাজ।
হাত লম্বা করে পিস্তলটা সামনে বাড়িয়ে রেখেছে।
মোড় ঘুরল একটা। কাউকে দেখা গেল না।
বাকি ধাপ কটা দৌড়ে পেরোতে শুরু করল। নিচে প্রায় পৌঁছে গেছে। এই সময় একটা গুঞ্জন কানে এল। কোন ইলেকট্রিক্যাল কয়েল খারাপ থাকলে যেমন মৃদু একটা শব্দ ওঠে, তেমনি। মাঝে মাঝে চড়চড় ফড়ফড় করে উঠছে। বাকি কয়েকটা ধাপ নিঃশব্দে নেমে কান পাতল সে।
কোন সন্দেহ নেই। কানের ভুল নয় তার। লম্বা করে দম নিল। সিঁড়িতে এক ধরনের গন্ধ। ব্যাখ্যা করে বোঝানো যাবে না গন্ধের রকমটা। তবে সচল বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিতে বোঝাই ঘরে যে রকম গন্ধ পাওয়া যায়, অনেকটা সেরকম।
উত্তেজনায় টানটান স্নায়ুগুলোকে ঢিল করার চেষ্টা চালাল সে। সেটা করা সম্ভব নয় আর এখন কোনমতেই। বরং পিস্তলটায় আরও শক্ত হয়ে চেপে বসল হাতের আঙুলগুলো। সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল সে। আক্রমণ করতে আসা বিলিকে দেখামাত্র গুলি করবে।
কিন্তু কোন নড়াচড়া চোখে পড়ল না। বরং নষ্ট করে দেয়া সার্কিট ব্রেকারটা চোখে পড়ল। তারের সঙ্গে পেন্ডুলামের মত দুলছে এপাশ ওপাশ। বাক্সটা যেন প্রচণ্ড আক্রোশে টেনে খুলে আনা হয়েছে। ছেঁড়া তারের মাথা একটার সঙ্গে আরেকটা লাগলেই বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ ছুটছে। চড়চড় ফড়ফড় আওয়াজটা হচ্ছে তখনই।
পিস্তল নামাল কিশোর। হতাশ হয়েছে। বিলি এখানে এসেছিল সন্দেহ নেই। স্পষ্ট প্রমাণ রেখে গেছে। এখন কোথায়?
*
হিলটাউন কমিউনিটি হাসপাতালের অন্ধকার করিডর ধরে শিকারী বিড়ালের মত এগিয়ে চলেছে বিলি। ভাল বলতে আর কোন কিছুই অবশিষ্ট নেই ওর মাঝে। ওর নিজেরই মনে হচ্ছে বহুদূরে কোথাও ফেলে এসেছে সেসব। কিন্তু তাই নিয়ে কোন আফসোস নেই ওর। একটা চিন্তাই রয়েছে তার মন জুড়ে। একটা চেহারা। মিলি হাওয়ার্ড!
শিরায় বইছে প্রচুর পরিমাণে অ্যাড্রেনালিন। অতি সতর্ক করে তুলেছে তাকে। অতিরিক্ত সচেতন। অনুভব করছে বৈদ্যুতিক-জ্যোতি ঘিরে ফেলছে তাকে,

অনেকটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের মত। দেয়ালের ভেতরের বৈদ্যুতিক তারগুলোর অস্তিত্ব টের পাচ্ছে সে। পুঁয়াপোকা যেমন নিজের শরীরকে খোলসে আবদ্ধ করে ফেলে, ভয়ের উৎপত্তি হয় যেখান থেকে মগজের সেই অংশটাকে তেমনি ভাবে বন্ধ করে দিয়ে জোসেফ হাওয়ার্ডের কেবিনের দিকে এগিয়ে চলল সে।
দরজা খুলল। পর্দা সরাল।
বিছানা আছে। তাতে ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে মিস্টার হাওয়ার্ডকে। কিন্তু মিলি কই?
মিলি! ডাক দিল সে। কোথায় তুমি?
পেছন থেকে কঠোর স্বরে বলে উঠল একটা কণ্ঠ, নোড়ো না, বিলি! আমি রবিন বলছি! আমার হাতে পিস্তল আছে!
ঘুরে তাকাল বিলি। অন্ধকারে একটা পর্দার আড়ালে মানুষ আছে, অস্পষ্ট ভাবে বোঝা যাচ্ছে। পর্দার একটা জায়গা উঁচু হয়ে আছে। পিস্তলের নল দিয়ে ঠেলে রাখলে যেমন হয়।
সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার অবচেতন মনের গভীরে কোথায়। যেন কে বলে উঠল, ভয় পাওয়া উচিত। কিন্তু পেল না সে। ভয়ের অনুভূতিটাকে ঘিরে ফেলেছে আশ্চর্য এক খোলস। কিংবা কোন ধরনের শক্তি। হতে পারে সেটা চৌম্বক ক্ষেত্র।
অন্ধকার ছায়া থেকে ধীর পায়ে বেরিয়ে এল মিলি।
গোয়েন্দা কিংবা পিস্তলের কথা মন থেকে বেমালুম উধাও করে দিল বিলি। সেসব আর কোন গুরুত্ব বহন করে না তার কাছে। এখন তার একমাত্র আকর্ষণ মিলি।
এসো, মিলি, হাত বাড়িয়ে ডাকল সে। অনেক কথা আছে তোমার সঙ্গে।
খবরদার, বিলি, পর্দার আড়াল থেকে ধমকে উঠল রবিন, ওকে ধরবে না!
মিলির সঙ্গে আমার কথা আছে। তাই না মিলি? ভাবছে বিলি, যদি ওর। ক্ষমতা প্রয়োগ করে মিলিকে কাছে টেনে নিয়ে আসা যেত, তাই করত।
যা বলার এখানেই বলো। কোথাও নিয়ে যেতে পারবে না, আদেশ দিল। রবিন।
মিলির চোখের দিকে তাকাল বিলি। মুখটা রয়েছে ছায়ার মধ্যে। দেখা যায় না কিছু। সে চোখে কিসের খেলা চলছে বুঝতেও পারল না সেজন্যে। তুমি কি আসবে?
বললাম তো, ও তোমার সঙ্গে কোথাও যাবে না, রবিন বলল।
বাধ্য হয়ে আবার পর্দার দিকে ঘুরল বিলি। এত কাছে থেকে মাত্র ছোট্ট একটা ভাবনা দিয়েই শেষ করে দিতে পারে ওকে। চিৎকার করে শাসাল, দেখো, ইচ্ছে করলে এক্ষুণি তোমাকে খতম করে দিতে পারি আমি!

আমিও তোমার মাথায় গুলি করতে পারি। কাপড়ের ভেতর দিয়ে দেখতে পাচ্ছি তোমাকে। বরফের মত শীতল কণ্ঠে আদেশ দিল রবিন, তোমাকে তিন সেকেন্ড সময় দিচ্ছি বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে।...এক...
অনেক হয়েছে। চিৎকার করে উঠল বিলি। অনেক সহ্য করেছি তোমাদের জ্বালাতন! গোয়েন্দা বলে এতদিন বজ্র ছুঁড়ে মারিনি। কিন্তু ইচ্ছে করলেই পারি সেটা, বিশ্বাস করো।
দুই! গুণল রবিন।
ঠিক এই সময় বিলির সামনে চলে এল মিলি। বাধা হয়ে দাঁড়াল দুজনের সামনে।
অবাক হলো না বিলি। যেন জানত, মিলি আসবে।
থামো, রবিন! পর্দার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল মিলি। আর একটা কথাও বোলো না!
বলেই বিলির দিকে ঘুরল সে। এখন ওর চোখ দেখতে পাচ্ছে বিলি। পানি টলমল করছে সেচোখে। দেখে তার নিজের চোখেও পানি চলে এল। এই তো চেয়েছিল সে। একজনের দুঃখে আরেকজন কাঁদবে। কষ্ট পাবে। অবশেষে তাকে বুঝতে পারল মিলি। বুঝল, সে ওকে কতটা চায়।
তারপর শুনতে পেল সেই কথাটা, যেটা শোনার জন্যে গত কয়েকটা মাস অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছে সে।
মিলি বলল, ঠিক আছে, আমি তোমার সঙ্গে যাব। যেখানে যেতে বলো, সেখানেই যাব। কিন্তু কারও কোন ক্ষতি কোরো না, প্লীজ!
করব না, কথা দিল বিলি। তুমি যা বলবে তাই করব আমি, মিলি।
মনে হতে লাগল ওর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ মুহূর্ত এটা।
কিন্তু বাদ সাধল রবিন। বলল, যা বলার এখানেই বলো, আমাদের। সামনে। এখান থেকে মিলিকে বেরোতে দেব না আমরা। আমি একা নই। মুসা আর কিশোরও আছে আমার সঙ্গে। যত শক্তিশালীই হও, তিনজনের সঙ্গে কোনমতেই পারবে না তুমি, বিলি।
জ্বলে উঠল বিলির চোখ। ভাবল, গাধাগুলো জানে না আমার শক্তির খবর। তিনজনকে মুহূর্তে ধোয়া বানিয়ে উড়িয়ে দিতে পারি কল্পনাও করতে পারছে না।
তাড়াতাড়ি বিলির আরও কাছে চলে এল মিলি। মাথা নেড়ে চিৎকার করে উঠল, না না, বিলি! চলো, আমি তোমার সঙ্গে যাব। ওদের কথা শুনব না।
ওর একটা হাত শক্ত করে চেপে ধরল বিলি। বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়ে গেল মনে হলো মিলির শরীরে। হাসল বিলি। লজ্জা পাওয়া শিশুর হাসি। চলো। এসো।
মিলির কোমর জড়িয়ে ধরে আস্তে আস্তে দরজার দিকে পিছাতে শুরু করল বিলি। চোখ রবিনের দিকে। গুলি করে কিনা দেখছে। নিরাপদেই। বেরিয়ে এল

কেবিন থেকে। লাগিয়ে দিল দরজাটা। তারপর নবের দিকে তাকিয়ে একটা মনো-বাণ ছাড়ল। মুহূর্তে গলে গেল ধাতু। বিকৃত, অকেজো হয়ে গেল তালাটা।
কেবিনের মধ্যে আটকা পড়ল রবিন। বিলি দরজা লাগিয়ে দিতেই পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। ডান হাতের তর্জনীর দিকে তাকাল একবার। যেটা পর্দায় ঠেসে ধরে পিস্তলের নল বুঝিয়ে ধোকা দেয়ার চেষ্টা করেছিল বিলিকে।
দরজার নবের অবস্থা দেখে হতবাক হয়ে গেল সে। মোচড় দিয়ে খোলার ব্যর্থ চেষ্টা করল একবার। বুঝল, হবে না। এগিয়ে গিয়ে টিপে ধরল একটা বোতাম। ইমার্জেন্সি বাটন। টিপলেই তাড়াহুড়ো করে ছুটে আসবে নার্স।

.

বাইরে পার্কিং লটের বাতাস কনকনে ঠাণ্ডা। তাজা। পরিষ্কার। যেন মুক্তির গন্ধ মিশে রয়েছে তাতে। হঠাৎ করেই এই অন্ধকার রাতটা এক ধরনের অদৃশ্য আলোয় ভরে উঠল যেন, অনুভব করল বিলি। আলোটা আলো নয়, এক ধরনের আনন্দ। বিচ্ছুরিত হচ্ছে মিলির কাছ থেকে। ওর হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকানি বুকে কান না লাগিয়েও ডাক্তারের স্টেথো দিয়ে শোনার মত শুনতে পাচ্ছে সে। ওর মগজের পাগল হয়ে ওঠা বিদ্যুৎ-তরঙ্গও স্পষ্ট অনুভব করতে পারছে।
ও আমাকে ভালবাসে, ভাবল বিলি।
জীবনে তুমিই একমাত্র ভাল ব্যবহার করলে আমার সাথে, মিলিকে বলল সে। নিজের কণ্ঠ শুনে নিজেই অবাক হয়ে গেল। এতটা উষ্ণ আর কোমল কণ্ঠস্বর যে ওর গলা দিয়েও বেরোতে পারে, ভাবেনি কোনদিন। রাগ চলে গেছে। মানুষ খুনের ঘটনাগুলো যেন এখন দূর অতীতের ধোয়াটে দুঃস্বপ্ন। ওসব ভুলে যেতে চায় সে। ওগুলোর কথা আর মুহূর্তের জন্যেও মনে করতে চায় না।
সেই প্রথম যেদিন তোমার সঙ্গে ক্লাসে দেখা হলো আমার, মনে আছে? জিজ্ঞেস করল বিলি। সবুজ একটা ফুক পরেছিলে তুমি। বড় বড় হলুদ ফুল। কি সুন্দরই না লাগছিল তোমাকে। ছেলেমানুষের মত হেসে উঠল সে। তখনই বুঝে গিয়েছিলাম, তোমাকে ছাড়া আমার চলবে না। নামেও কি মিল, দেখছ? মিলি! বিলি!
মিলির হাতটা কাঁপছে, টের পেল বিলি। নিশ্চয় শীতে, ভাবল সে।
কোথায় যাচ্ছি আমরা? দুর্বল কণ্ঠে জানতে চাইল মিলি। কোথায় নিয়ে। যাচ্ছ আমাকে?
তাই তো! এই প্রথম মনে পড়ল বিলির, কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ওকে? কখনও তো ভেবে দেখেনি। একটাই চিন্তা ছিল, কোনমতে মিলিকে হাসিল করা। সেটা করেছে। এখন কোথায় নিয়ে গিয়ে তুলবে?

তা তো জানি না, জবাব দিল সে। তুমি যেখানে যেতে চাও, সেখানেই নিয়ে যাব। যে কোন দোকানের ক্যাশ মেশিন থেকে সহজেই টাকা বের করে নিতে পারব আমি। যে কোন গাড়ি জোগাড় করতে পারব। তুমি শুধু মুখ ফুটে বলো একবার।
সামনে একসারি গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ওগুলোর দিকে হাত তুলে বলল, দেখো। কোনটা পছন্দ? ওই অ্যাকর্ডটা? ম্যাক্সিমা? ঘুরে তাকাল মিলির দিকে। কোনটা পছন্দ?
কিন্তু মোটেও খুশি মনে হলো না মিলিকে।
ওর হাত ছেড়ে দিল বিলি। পাশে হাঁটতে হাঁটতে বলল, জাপানী গাড়ি পছন্দ না হলে অন্য দেশ দেখি? টরাসটা কেমন মনে হচ্ছে? কিংবা ওই ফোর্ডটা?
ফোর্ড গাড়িটার দিকে শুধু তাকিয়ে থেকেই ওটার এঞ্জিন চালু করে ফেলল সে। গাড়ির উজ্জ্বল হেডলাইটের আলোয় চকচক করতে লাগল ভেজা চত্বরটা।
আনমনে মাথা নাড়তে লাগল সে। নাহ, এসব গাড়ি তার নিজেরই পছন্দ হচ্ছে না। মিলির জন্যে আরও ভাল কিছু চাই। একটা মার্সিডিজ দরকার। কিংবা ফেরারি।
দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে এগুলো, নাক কুঁচকে বলল বিলি। চলো অন্য কোনখানে। চলে যাই। ভাল গাড়ি খুঁজে বের করতে হবে। আপাতত এখান থেকেই কোন একটা নিয়ে কাজ চালানো যাক।
হঠাৎ নতুন একজোড়া হেডলাইটের আলো ঘুরে এসে পড়ল ওদের গায়ে। কয়েক গজ এগিয়ে থেমে গেল গাড়িটা। পুলিশের গাড়ি। লাফ দিয়ে সেটা থেকে নেমে এলেন শেরিফ রবার্টসন। হাসপাতাল থেকেই তাকে ফোন করে দিয়েছে কিশোর।
এটা কোন সমস্যাই নয় বিলির কাছে। ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিতে পারে। শেরিফকে।
ভয় পেয়ো না, মিলি। চুপ করে খালি দেখো, লোকটার কি করি আমি।
জবাব না পেয়ে মিলি কোথায় আছে দেখার জন্যে ঘুরে তাকাল সে।
কিন্তু মিলি নেই ওর পাশে। প্রাণপণে ছুটছে। দেখতে দেখতে পার্কিং লট থেকে বেরিয়ে চলে গেল অন্যপাশের ঘাসে ঢাকা মাঠে।
না! মিলি! যেয়ো না! চিৎকার করে উঠল বিলি।
ওর স্বপ্ন হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। চলে যাচ্ছে দূরে। সইতে পারছে না সে। নিজেকে বড় একা মনে হতে লাগল আবার।
*
অ্যাই বিলি, দাঁড়াও! নড়বে না বলে দিলাম! যেন মানুষ নয়, একটা পাগলা, কুত্তার উদ্দেশে ধমকে উঠলেন শেরিফ।
কিন্তু দাঁড়াল না বিলি। বুনো জানোয়ারের মত ঘুরে দৌড় মারুল। নজর অনেক সামনে। পলকের জন্যে দেখল একটা ঝোপ পার হয়ে গিয়ে ঘন জঙ্গলে লুকিয়ে পড়ছে মিলি।

কোথায় যাচ্ছে, নিজেও জানে না মিলি। একটাই চিন্তা, ওই দানবটার। কাছ থেকে সরে যেতে হবে যত দূরে পারা যায়। বাঁচতে হলে ওর দৃষ্টির আড়ালে থাকতে হবে। অন্ধকার রাত। কুয়াশা পড়ছে। বনের মধ্যে আরও বেশি অন্ধকার। এখানে হয়তো ওকে দেখতে পাবে না বিলি। কিন্তু বলা যায় না কিছু। দেখার অলৌকিক চোখও থাকতে পারে ওর, কে জানে!

ঠিক এই সময় ঝোপের ভেতর থেকে লাফ দিয়ে এসে পড়ল একটা ছায়ামূর্তি। ওকে জাপটে ধরল। চিৎকার করতে যাচ্ছিল মিলি। মুখ চেপে ধরল। সাড়াশির মত কঠিন আঙুল। হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেল ওকে ঘন ঝোপের মধ্যে।

কোনমতে মুখ ঘুরিয়ে তাকাল মিলি। ভেবেছিল বিলির জলন্ত চোখে চোখ পড়বে। কিন্তু তার বদলে অস্পষ্ট একটা অবয়ব ফুটতে দেখল আকাশের পটভূমিতে। চুলগুলো যেন কেমন। চেহারার কিছুই বোঝা গেল না। দানবের হাত থেকে ভূতের খপ্পরে এসে পড়ল নাকি!

ফিসফিস করে বলল ভূতটা, ভয় পেয়ো না, মিলি! আমি মুসা। একদম চুপ করে থাকবে। টু শব্দ কোরো না। কাছাকাছিই আছে ও।

ঝোপের মধ্যে মিলিকে নিয়ে ঘাপটি মেরে বসে রইল মুসা। মাঠ পেরিয়ে আসতে দেখল বিলিকে।

ওকে আর রবিনকে কেবিনে পাহারায় রেখে কিশোর চলে যাওয়ার পর মুসা গিয়ে দাঁড়িয়েছিল কেবিনের বাইরে। অন্ধকার ছায়ায় গা মিশিয়ে বিলির আসার অপেক্ষা করছিল। রবিন ভেতরে, সে বাইরে, দুজন দুই জায়গায় থেকে পাহারা দিচ্ছিল।

বিলি যখন মিলিকে নিয়ে বেরিয়ে গেল, নিঃশব্দে পিছু নিয়েছিল ওর। ওকে পরাস্ত করার জন্যে সুযোগ খুজছিল। কোন উপায় দেখেনি। যে লোক শুধুমাত্র ইচ্ছা-শক্তির সাহায্যে একজন মানুষকে মুহূর্তে শেষ করে দিতে পারে, তার সঙ্গে সামনাসামনি লাগতে যাওয়া চরম বোকামি। সেই বোকামি করেনি মুসা। সুযোগের অপেক্ষায় ছিল।

মিলি যখন বিলির কাছ থেকে সরে যেতে শুরু করল, ওকে সাহায্য করার জন্যে পিছে পিছে ছুটল মূসা। অবশ্যই গাছপালা আর ঝোপের আড়ালে থেকেছে। সাবধান ছিল, বিলির চোখে যাতে না পড়ে…

মিলি! মিলি! ডাকছে আর শিশুর মত ফোপাচ্ছে বিলি। কোথায় তুমি? সাড়া দাও। প্লীজ। আমি তোমার কোন ক্ষতি করব না। মাথায় তুলে রাখব। মিলি! মিলি!

আরও কাছে চলে এল সে। কাঁদতে লাগল।

কিন্তু তাকে শান্ত করার জন্যে ঝোপ থেকে বেরোল না মিলি। ওই দানবের সামনে যেতে চায় না আর। ওর কাছে গেলে ওর কথা মানতে হবে। সেটা মানা সম্ভব নয়

মিলির পক্ষে। না মানলে ধৈর্য হারিয়ে এক সময় না এক সময় রেগে উঠবে বিলি। মায়াদয়ার বালাই না রেখে তখন ধ্বংস করে দেবে ওকেও।
কি চাই তোমার, মিলি? কাঁদতে কাঁদতে বলছে বিলি। যা চাও তাই দেব! সব দেয়ার ক্ষমতা আছে আমার।
কুয়াশার চাদর ভেদ করে জ্বলে উঠল একটা আলোক রশ্মি। টর্চ। কঠিন কণ্ঠে আদেশ দিলেন শেরিফ, অ্যাই, ঘোরো এদিকে! তোমার কি হয়েছে জানি না আমি। তবে কয়েকটা প্রশ্নের জবাব চাই।
আমি কোন প্রশ্নের জবাব দেব না! চিৎকার করে বলল বিলি। বরং আমার কথার জবাব চাই। ও কোথায়? মিলি কোথায়?
গাছের মাথা কাঁপিয়ে দিয়ে যেন ঝাঁপিয়ে এসে পড়ল একঝলক ঝোড়ো বাতাস।
আকাশের দিকে তাকিয়ে আবার চিৎকার করে উঠল বিলি, জবাব দিচ্ছ না কেন আমার কথার? কোথায় আছে ও? খুঁজে বের করো! জলদি!
মেঘ ছড়িয়ে পড়েছে আকাশে। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকানো শুরু হলো।
কিশোর এসে দাঁড়াল শেরিফের পাশে। হাতে উদ্যত পিস্তল। ফিসফিস করে বলল, কোন কিছু করতে যাবেন না এখন, শেরিফ। চোখের পলকে মেরে ফেলবে আপনাকে ও।
কিন্তু রোখ চেপে গেছে শেরিফের। ওর শয়তানির নিকুচি করি আমি। তুমি সরো!
ওদের কারও দিকেই আর নজর নেই এখন বিলির। আকাশের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করেই চলেছে। মেঘের কাছে, বাতাসের কাছে, বিদ্যুতের কাছে ওর প্রশ্নের জবাব চাইছে। বার বার একই কথা জিজ্ঞেস করছে–মিলি কোথায়? মিলি কোথায়? মিলি কোথায়?
রাগে হাত মুঠো করে ওপর দিকে তুলে আঁকাতে লাগল সে। কিন্তু মেঘ ওর প্রশ্নের জবাব দিতে পারল না। ক্রমেই রেগে যাচ্ছে বিলি। আক্রোশ গিয়ে পড়ল বনের ওপর। ওই গাছই মিলিকে আড়াল করে রেখেছে।
মনকে আদেশ দিল সে। ভয়াবহ বজ্র-বাণ ছুটে গিয়ে আঘাত হানল একটা গাছের মাথাকে। গ্রেনেড ফাটার মত বিস্ফোরণ ঘটল যেন। আগুন লেগে গেল গাছের মাথায়। কয়েকটা ডাল ফেটে চৌচির হয়ে গোড়া ভেঙে ঝুপঝুপ করে পড়ল মাটিতে।
আরেকটা গাছের মাথায় আগুন ধরিয়ে দিল বিলি। তারপর আরেকটা। আকাশের দিকে তাকিয়ে আবার চিৎকার করতে লাগল। বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছে যেন।
ওর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আকাশও যেন খেপে উঠতে লাগল। ফুলে উঠল মেঘ। বাতাসের বেগ বেড়ে গেল। বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল ঘনঘন। বিকট শব্দে বাজ

পড়ল।
মহা খেপা খেপেছে যেন আজ দুই দানব। একজন মাটিতে। আরেকজন আকাশে। দুটোতে মিলে প্রলয় কাণ্ড ঘটিয়ে ছাড়বে। তছনছ করে দেবে। বেচারা হিলটাউন শহরটাকে।
তাজ্জব হয়ে এই কাণ্ড দেখছেন শেরিফ। কিন্তু বেশিক্ষণ চলতে দেয়া যায় না এসব। মহাক্ষতি করে দেবে তাহলে বিলি। পিস্তল তুলে আচমকা গর্জে উঠলেন, বিলি, থামো! থামো বলছি! নইলে গুলি করব বলে দিলাম!
ফিরে তাকাল বিলি। বিদ্যুতের আলোয় বাঘের চোখের মত জ্বলছে ওর। দুই চোখ।
পিস্তল হাতে এগিয়ে গেলেন শেরিফ। বিলিকে হাতকড়া পরানোর ইচ্ছে।
কিন্তু তার সে ইচ্ছে আর পূরণ হলো না। হঠাৎ গুঙিয়ে উঠে বুক চেপে ধরলেন। পিস্তলটা পড়ে গেল হাত থেকে। টলে পড়ে যাচ্ছেন। ধরার জন্যে ছুটে গেল কিশোর।
ঠিক এই সময় বাজ পড়ল। প্রচণ্ড শব্দে থরথর করে কেঁপে উঠল বন, পাহাড়, মাটি। চোখের কোণ দিয়ে পলকের জন্যে দেখতে পেল কিশোর, আকাশ থেকে তীব্র নীল একটা আগুনের শিখা ছুটে এসে লাগল বিলির মাথায়।

.

লস অ্যাঞ্জেলেস স্টেট সাইকিয়াট্রিক হাসপাতালের চওড়া করিডরে দাঁড়িয়ে আছে কিশোর। দরজায় লাগানো অভঙ্গুর কাচের মধ্যে দিয়ে বিলি ফক্সের সেলের ভেতরে তাকাল। ছোট্ট ঘর। টেলিভিশনের দিকে চেয়ে আছে বিলি। ভাবলেশহীন চেহারা। শূন্য দৃষ্টি। বোঝা যাচ্ছে অনুষ্ঠান দেখছে না। দেখার মত অবস্থাও নাকি নেই ওর। সেদিনকার সেই বিদ্যুৎ-ঝড় ওর মনকে ধুয়ে মুছে সাফ করে দিয়েছে। এটা অবশ্য ডাক্তারদের কথা।
কিশোর এই রায় বিশ্বাস করতে রাজি নয়। বিলির মাথায় বাজ পড়তে দেখেছে নিজের চোখে। সঙ্গে সঙ্গে মরে যাওয়ার কথা ওর। মাটিতে পড়ে গিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু মরেনি। কয়েক মিনিটের জন্যে অবশ হয়ে গিয়েছিল। হাত-পা। নড়াচড়া করেনি। সেই সুযোগে মাথায় পিস্তলের বাড়ি মেরে ওকে বেহুশ করেছিল মুসা। শেরিফের গাড়ি থেকে দড়ি এনে হাত-পা বেঁধে ফেলেছিল।
হিলটাউন কমিউনিটি হাসপাতালের ইমারজেন্সি ওয়ার্ডে রেখে কয়েক ঘণ্টা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর ডাক্তাররা তাকে এখানকার হাসপাতালে পাঠিয়ে দিলেন। সেটা দুদিন আগের কথা।
আজকে তার সঙ্গে কথা বলতে এসেছে তিন গোয়েন্দা। কিন্তু কিশোরের ধারণা, ও ওদের সঙ্গে কথা বলতে চাইবে না। তবুও এসেছে। যদি বলে।

দেখা করার অনুমতির জন্যে একজন নার্সকে ডাক্তারের কাছে পাঠিয়ে অপেক্ষা করছে কিশোর, এই সময় পায়ের শব্দে ফিরে তাকিয়ে দেখে ডক্টর এলিজা আসছে।
কখন এলেন?
এই তো, পনেরো মিনিট।
বিলিকে দেখতে নিশ্চয়?
মাথা ঝাঁকাল এলিজা। এখানে বিলিকে আনার পর থেকেই দিনে কয়েকবার করে এসে তাকে দেখে যাচ্ছে সে। তোমরা?
আমরাও দেখা করতে। অনুমতি পাওয়ার অপেক্ষা করছি।
দরজার কাচের ভেতর দিয়ে বিলিকে দেখল এলিজা। আবার কিশোরের দিকে ফিরল। করোনারের সঙ্গে কথা হয়েছে আমার। শেরিফ রবার্টসনের মৃত্যুটাকে দুর্ঘটনা বলে রায় দিয়েছেন তিনি।
বজ্রপাতে মৃত্যু?
মাথা ঝাঁকাল এলিজা। ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির সঙ্গেও কথা বলেছি। কেসটা কিভাবে সাজাবেন বুঝতে পারছেন না তিনিও।
যে টেস্টগুলো করাতে বলেছিলাম, করিয়েছেন?
করিয়েছি?
কি বুঝলেন?
সব ঠিক আছে। ইলেকট্রোলাইট, ব্লাড গ্যাস লেভেল, ব্রেন ওয়েভ...সব আর দশজন সাধারণ মানুষের মত।
অস্বাভাবিক কোন কিছু নেই শরীরে? কিছুই না?
দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইল এলিজা। কি করে এটা আন্দাজ করেছিলে, বলো তো?
করাটাই স্বাভাবিক...এরকম অদ্ভুত ক্ষমতার অধিকারী সচরাচর হয় না কোন মানুষ। বিদ্যুৎ হজম করতে পারে কেউ কেউ, কিন্তু পাচার করতে পারে। বলে শুনিনি কখনও।
দ্বিধা করতে লাগল এলিজা। অকারণে কেশে গলা পরিষ্কার করল। তারপর বলল, ডাক্তারি শাস্ত্রে এটা বিস্ময়কর এক ঘটনা। মানুষের দেহযন্ত্রে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা! যে যন্ত্র দিয়ে কাজটা করেছে বিলি, সেটা দেখতে অনেকটা বৈদ্যুতিক বান মাছের বিদ্যুৎ উৎপাদক যন্ত্রের মত। জন্ম থেকেই হয়তো ছিল ওটা ওর শরীরে। জন্মের সময় খুব ছোট ছিল, অক্ষম, ধীরে ধীরে বড় হয়েছে। বজ্রপাতের পর কোনভাবে চার্জ হয়ে গেছে ওটা।...প্রকৃতির আশ্চর্য খেয়াল! ওকে নিয়ে ভালমত গবেষণা করা দরকার।

হাসি ফুটল কিশোরের মুখে। বিলির দিকে তাকাল। ডাক্তাররা যতই বলুক সব ধুয়ে মুছে গেছে, বিলির ক্ষমতা কিন্তু নষ্ট হয়ে যায়নি।
ভুরু কোঁচকাল এলিজা। কি করে বুঝলে?
টেলিভিশনের দিকে তাকালেই বুঝতে পারবেন।
ঘুরে গেল তিন জোড়া চোখ।
একের পর এক চ্যানেল পরিবর্তন হচ্ছে টেলিভিশনের।
এলিজা বলল, কিছু তো বুঝতে পারছি না।
চ্যানেল পরিবর্তন হচ্ছে, সেটা দেখছেন?
হ্যাঁ, কিন্তু এতে
কি দিয়ে বদলাচ্ছে ও? রিমোট তো হাতে নেই।
এতক্ষণে মুসা আর রবিনও লক্ষ করল, রিমোটটা টেলিভিশনের ওপরেই ফেলে রাখা হয়েছে। বেশ খানিকটা দূরে বসে পর্দার দিকে তাকিয়ে আছে বিলি।
চোখ বড় বড় হয়ে গেল এলিজার। ঠিক থাকাটা তো ভয়ঙ্কর ব্যাপার! ওর এই ক্ষমতা নষ্ট না করে না দিলে তো আবার শুরু করবে শয়তানি।
দেখুন চেষ্টা করে, পারেন কিনা? তাহলে আবার স্বাভাবিক মানুষ হয়ে যাবে বিলি।
যা-ই বলো, ওর সঙ্গে তোমাদের দেখা করতে যাওয়া উচিত হবে না মোটেও! তোমরা ওর এক নম্বর শত্রু। প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে কখন কি করে, বসে...
ফিরে এল নার্স। যাকে অনুমতির জন্যে পাঠিয়েছিল কিশোর।
অনুমতি পাওয়া যায়নি। ওদের দেখলে খেপে উঠতে পারে বিলি, ডাক্তারেরও এটাই ধারণা।
এলিজা বলল, আমি ইচ্ছে করলে অনুমতি এনে দিতে পারি। কিন্তু, আবারও বলছি, উচিত হবে না।
দরজার বাইরে থেকেই বিলির সঙ্গে কথা বলার শেষ চেষ্টা করল কিশোর। চিৎকার করে ওর নাম ধরে ডাকল।
সাড়া দিল না বিলি। মুখও তুলল না। একভাবে তাকিয়ে আছে টেলিভিশনের দিকে। কিশোর ডাকাডাকি শুরু করলে একটা পরিবর্তনই শুধু ঘটল, টেলিভিশনের চ্যানেল বদলানো বন্ধ হয়ে গেল।
দুই সহকারীর দিকে ফিরল কিশোর। নিরাশ ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলল, হবে না। কথা বলবে না ও। চলো, যাই। আর কিছু করার নেই আমাদের এখানে।
*
একটা কথা বুঝতে পারছি না, মুসা বলল। বাসে করে রকি বীচে ফিরছে ওরা। ছোঁয়া না লাগিয়েই বিদ্যুৎ পাচার করে কিভাবে বিলি?

প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি। কিংবা টেলিপ্যাথি জাতীয় কিছু। টেলিপ্যাথিকে একধরনের রিমোট কন্ট্রোল সিসটেম বলতে পারো। দেখা যাক, বেঁচে যখন আছে ও, গবেষণাতেই বেরিয়ে পড়বে।

ওর ব্যাপারটাকে টেলিপ্যাথি নাম দিলে ভুল হবে, রবিন বলল, টেলিভোলটেজ হলে কেমন হয়?

মন্দ না।

ভলিউম ২৯ – মায়াজাল – তিন গোয়েন্দা – রকিব হাসান – সেবা প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ: আগস্ট, ১৯৯৮

রবিনের টোকার সাড়া দিল না সোফি।

পাশে দাঁড়ানো মারলার দিকে তাকাল। রবিন। আবার টোকা দিল দরজায়। জবাব নেই এবারেও। উঁকি দিয়ে দেখল রান্নাঘরের টেবিলে ঘাড় গুঁজে বসে আছে সোফি। অবাক হলো। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল।

সোফির সামনে টেবিলে বিছানো একটা পত্রিকা। লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমস।

কি হয়েছে, সোফি? জিজ্ঞেস করল মারলা। খবর সব ভাল তো?

জবাব দিল না সোফি। দুহাতে গাল চেপে ধরে তেমনি ভঙ্গিতে বসে আছে। অতিমাত্রায় আবেগপ্রবণ ও, জানা আছে মারলার। তবু অবাক লাগল। আচরণটা স্বাভাবিক নয়।

সোফির পেছনে এসে পিঠে হাত রাখল রবিন, খুব খারাপ কিছু?

গাল থেকে হাত সরিয়ে মুখ তুলে তাকাল সোফি। চোখ লাল। কোন কথা না বলে কাগজের নিচ থেকে গোলাপী রঙের একটা খাম বের করল। বাড়িয়ে ধরল সেটা। হাত কাঁপছে।

কি এটা? বলতে বলতে খামটা নিল রবিন। মুখ খোলা। ভেতর থেকে বের করল একটা চিঠি। অদ্ভুত চিঠি। লিখেছে:

শোনো

তোমার ধারণা তুমি আমাকে চেনো। আসলে চেনো না। হয়তো ভাবছ আমি তোমার বন্ধু। না, তা-ও নই। আমি তোমার তত্ত্বাবধায়ক। তোমার ভালমন্দ দেখাশোনার দায়িত্ব এখন থেকে আমার। মন দিয়ে শোনো।

এই চিঠির নিচে একসারি নাম দেখতে পাচ্ছ। সবার ওপরে রয়েছে। তোমার নামটা। তুমি যে আমার বাধ্য আছ তার ছোট্ট একটা প্রমাণ দিতে হবে। তারপর তোমার নামটা সারির ওপর থেকে কেটে পাশের তারকাচিহ্নের যে কোনও এককোণার ভেতরে লিখে দেবে। একবার তারকায় ঢুকে যেতে পারলে আর চিন্তা নেই, ওখানেই থাকবে তুমি, বেরোনোর প্রয়োজন হবে না।

সাবধান: আবার বলছি–তারকার কোণায় লিখবে, ভুলেও মাঝখানে নয়। তাহলে সেটাকে তোমার অবাধ্যতা ধরে নেব আমি। মারাত্মক বিপদে পড়বে। আমার কথামত কাজ সেরে তোমার পরের নামটা যার চিঠিটা ত্বর কাছে পাঠিয়ে দেবে। তোমাকে কি করতে হবে সেই নির্দেশ পাবে টাইমস পত্রিকার বিজ্ঞাপনের পাতায় একটা বক্সের মধ্যে। তারকাচিহ্ন আঁকা থাকবে বিজ্ঞপ্তির ওপর। সুতরাং চিনতে অসুবিধে হবে না কোনটা তোমার জন্যে। অক্ষরগুলো সব উল্টোভাবে লেখা থাকবে–যেমন dog-কে লেখা হবে god। ঠিকমত সাজিয়ে নিলেই পেয়ে যাবে

আসল বাক্যটা। চিঠি পাওয়ার তিনদিনের মধ্যে অবশ্যই তোমাকে তোমার বাধ্যতা প্রমাণ করতে হবে।
তালিকায় বাকি যাদের নাম আছে ইচ্ছে করলে তাদের সঙ্গে আলোচনা করে নিতে পারো। বাধা নেই। আমার ধারণা, আমার মতই ওরাও তোমার বন্ধু নয়, মুখে যতই বন্ধু বন্ধ করুক। তালিকার বাইরে কারও সঙ্গে এ ব্যাপারে আলাপ করবে না। যদি করো, রেগে যাব আমি।
একটা কথা পরিষ্কারভাবে জেনে রাখো, তোমাদের গোপন কথাটা জানি আমি। কিন্তু সেটা নিয়ে মাথাব্যথা নেই আমার। পুলিশকে জানাতে যাব না।
আমার কথার অবাধ্য হলে মারাত্মক পরিণতি অপেক্ষা করবে তোমার জন্যে। ভয়ঙ্করভাবে মৃত্যু ঘটবে তোমার।
–তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক।
চিঠিটা পড়ে মারলার হাতে দিল রবিন।
মারলা পড়ে বলে উঠল, দূর, যত্তোসব ছাগলামি। কেউ রসিকতা। করেছে। দলামোচড়া করে ফেলে দিতে যাচ্ছিল, বাধা দিল রবিন, দাঁড়াও। দেখি, দাও তো। আরেকবার পড়ে দেখি।
পড়ে দেখার কিছু নেই, রাগ করে বলল মারলা। যে পাঁচজনের নাম আছে এটাতে, তাদের কেউই পাঠিয়েছে ভয় দেখানোর জন্যে। ক্লডিয়া হতে পারে।
কেন, ড্যানিয়েল নয় কেন? ভুরু নাচাল রবিন।
হ্যাঁ, ড্যানিয়েলও হতে পারে। রবিনের দিকে তাকাল মারলা। বাজে রসিকতার অভ্যাস আছে ওদের দুজনেরই। ফেলো ওটা। অ্যাই সোফি, গুম হয়ে বসে না থেকে ওঠো তো। চলো, বারগার খেয়ে আসি মলে গিয়ে। কিছু কেনাকাটাও আছে আমার।
যাও তোমরা। আমি বাড়ি যাব। সোফি, বইটা দাও তো, কাল যেটা এনেছিলে। পড়া শেষ হয়নি আমার।
ওদের কথা, যেন কানেই ঢুকল না সোফির। ফিসফিস করে বলল, উড়িয়ে দিয়ো না ব্যাপারটাকে। পত্রিকায় বিজ্ঞাপনও কিন্তু দিয়েছে। এই দেখো।
পড়ে ভুরু কুঁচকে গেল রবিনের। তত্ত্বাবধায়ক লিখেছে: বৃহস্পতিবারের মধ্যে তোমার কুকুরছানাটাকে পানিতে চুবিয়ে মারো, সোফি।
বিরক্ত হয়ে মুখ বাঁকাল রবিন, হু, বললেই হলো। ফাজলেমি পেয়েছে। পাত্তাই দিয়ো না এসবে।
বিজ্ঞাপনটার দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে মাথা দুলিয়ে বলল মারলা, এ কাজ ক্লডিয়া ছাড়া আর কারও নয়। কারণ ও মানসিক রোগী।

কিন্তু রোগী হলেও ক্লডিয়া জন্তু-জানোয়ার অপছন্দ করে না, রবিন বলল। ও নিজে যখন কুত্তা পালে সোফির কুকুরটাকে মারতে বলবে, এ কথা বিশ্বাস হচ্ছে না আমার। আর বললেই বাচ্চাটাকে মেরে ফেলবে না একথাও জানে ক্লডিয়া। ভয়টা আসলে দেখাতে চেয়েছে অন্য কেউ।
আরেকবার চিঠিটার দিকে তাকাল রবিন। টাইপরাইটারে টাইপ করা। বিড়বিড় করে বলল, তত্ত্বাবধায়ক আসলে কি চাইছে বুঝতে পারছি নাঃ.
রেগে উঠল মারলা, এর মধ্যে বোঝাবুঝির কি আছে? স্রেফ ভয় দেখানোর জন্যে করেছে এই কাজ। সোফি ভয় পাচ্ছে ভেবে এখন নিশ্চয় একা একাই হেসে গড়াগড়ি খাচ্ছে। ফেলো ওটা, ফেলে দাও। সোফি, ওঠো তো। চলো।
চেয়ারে বসল রবিন। চিঠির নামগুলোর দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, মুসার নামও আছে। কিন্তু আমারটা নেই কেন?
কিশোরেরও তো নেই। তাতে কি হয়েছে?
কিশোরের না থাকার একটা যুক্তি আছে। ও এখন রকি বীচে নেই। তা ছাড়া সেদিন রাতে আমাদের সঙ্গে গাড়িতেও ছিল না। কিন্তু আমি তো গাড়িতেও ছিলাম, বাড়ি থেকেও চলে যাইনি। আমারটা নেই কেন?
তোমার কথা ভুলে গেছে আরকি। সেজন্যেই তো বলছি, রসিকতা।
গম্ভীর হয়ে ভাবছে রবিন। তার বিশ্বাস, রসিকতা করেনি তত্ত্বাবধায়ক। যা করতে বলেছে, সত্যিই চায় সেটা করা হোক। নইলে বিপদ ঘটাবে। ওদের গোপন কথা জানে বলে কি বোঝাতে চেয়েছে? মরুভূমিতে ওরা যে। অ্যাক্সিডেন্টটা করে এসেছে সেটার কথা? এ ছাড়া আর তো কোন, গোপনীয়তা নেই ওদের।
কনসার্ট শুনতে গিয়েছিল সেদিন ওরা। চিঠিতে যাদের নাম রয়েছে, সবাই গিয়েছিল। দিন পনেরো আগে পঁচটা টিকেট এসেছিল ডাকে। কে পাঠিয়েছে জানা যায়নি। সকাল বেলা যার যার বাড়ির ডাকবাক্সে খামের মধ্যে একটা করে টিকেট পেয়েছে সবাই। সেই সঙ্গে একটা করে নোট। তাতে কার কার কাছে টিকেট পাঠানো হয়েছে, নাম লেখা ছিল। অবিকল একই ধরনের নোট পেয়েছে সকলেই।
ভেবেছে ওদেরই কোন বন্ধু মজা করার জন্যে একাজ করেছে। পরে বলে চমকে দেবে। কোনকিছু সন্দেহ না করে কনসার্ট দেখতে গিয়েছিল ওরা মরুভূমির কাছে একটা শহরে।
রাতের বেলা মরুভূমির মাঝের রাস্তা দিয়ে আসার সময় বাজি ধরে হেডলাইট নিভিয়ে গাড়ি চালাতে গিয়েছিল ড্যানি। অন্ধকারে দেখতে পায়নি লোকটাকে। একটা তীক্ষ্ণ বাঁক পেরোতেই করল অ্যাক্সিডেন্ট। কিভাবে যে চাকার নিচে এসে পড়ল লোকটা বলতেও পারবে না সে। গায়ের ওপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে

দিয়েছিল। মারা গিয়েছিল লোকটা। পরিচয় জানার জন্যে অনেক চেষ্টা করেছে ওরা। পকেটে মানিব্যাগ ছিল না, আইডেন্টিটি ছিল না, ভিজিটিং কার্ড ছিল না লোকটার। সে যে কে, জানার কোন উপায় ছিল না। ওকে নিয়ে, কি করা যায়, একেকজন একেক কথা বলা শুরু করল। কেউ বলল পুলিশকে জানাতে, কেউ করল বিরোধিতা। পুলিশকে জানাতে গেলে বিপদে পড়ার ভয়ে শেষে মরুভূমির মাঝেই লোকটাকে কবর দিয়ে এসেছে ওরা। এ কাজে মুসা আর রবিনের একেবারেই মত ছিল না। ড্যানির আতঙ্কিত অবস্থা দেখে আর অনুরোধ ঠেকাতে না পেরে শেষে চুপ হয়ে গেছে

রবিনের দিকে তাকাল মারলা। তুমিও মনে হয় চিঠিটাকে সোফির মত সিরিয়াসলি নিয়েছ?

হ্যাঁ, না নিয়ে উপায় নেই। আমাদের গোপন কথা জানে বলেছে। আর গোপন কথাটা যে কি, সেটা তুমিও জানো, উঠে দাঁড়াল রবিন। মুসা আর ড্যানির সঙ্গে কথা বলতে হবে।

ক্লডিয়াই বা বাকি থাকে কেন তাহলে? মারলা বলল। আমি নিজে তাকে ফোন করে জানিয়ে দেব যে তার চিঠিটা পেয়ে পেটে মোচড় দেয়া শুরু হয়ে গেছে আমাদের। হেসে আরও গড়াগড়ি খাক।

মারলার ব্যঙ্গতে কান দিল না রবিন। চিঠিটা নিয়ে গিয়ে রাখল ফোনের পাশে। রিসিভার তুলে ডায়াল করল।

বাড়িতে নেই মুসা। ওর বাবা-মাও নেই। বেড়াতে গেছেন। আরও অন্তত এক হপ্তার আগে ফিরবেন না। বাড়িতে একা থাকে মুসা। অ্যানসারিং মেশিনে মেসেজটা রেখে ড্যানির নম্বরে ডায়াল করল রবিন। তাকেও পাওয়া গেল না। আবার অ্যানসারিং মেশিনে মেসেজ রাখতে হলো। তারপর খানিকটা দ্বিধা করেই ক্লডিয়াদের বাড়ির নম্বরে ফোন করল। সে-ও বাড়িতে নেই। এই ছুটির সময়টায় কাউকে পাওয়া যায় না। সবাই যেন বাড়ি ছাড়ার জন্যে অস্থির হয়ে ওঠে। অগত্যা ওখানেও অ্যানসারিং মেশিনে মেসেজ রাখতে হলো।

রিসিভার নামিয়ে রেখে এসে বলল রবিন, কারও ফোন না আসা পর্যন্ত ভাবছি এখানেই বসে থাকব।

কি যে বলো না, মুখ বাঁকাল মারলা। ফালতু একটা চিঠির জন্যে ঘরে বসে থাকব? সারাটা দিন নষ্ট! ঠিক আছে, তোমাদের ইচ্ছে হলে থাকো। আমি যাচ্ছি। হাত বাড়াল রবিনের দিকে, গাড়ির চাবিটা দাও। মলে আমাকে যেতেই হবে।

চুপ করে বসে থাকো তো! কিছুটা কড়া স্বরেই বলল রবিন। তোমাদের চাপে পড়ে একটা বোকামি তো করেই এসেছি সেদিন মরুভূমিতে। আর কোন কথা শুনছি না। গোপন কথা জানে যদি না বলত, পাত্তা দিতাম না। আমাদের দলের বাইরের

কেউ যদি হয়ে থাকে, জেল খাঁটিয়ে ছেড়ে দিতে পারবে। রেকমেইল করে ঘুম-খাওয়া হারাম করে দিতে পারবে। এখন আমাদের সবার একসঙ্গে থাকা দরকার। কিছু ঘটলে একসঙ্গে সেটাকে ঠেকানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

হাল ছেড়ে দিয়ে নিরাশ ভঙ্গিতে একটা চেয়ারে বসে পড়ল মারলা। অহেতুক দুশ্চিন্তা করছ তোমরা, আমি বলে দিলাম।

তোমার কথা সত্যি হলে তো বাঁচি।

এই সময় রান্নাঘরে ঢুকল সোফির কুকুরছানাটা। কাছে এসে আদর করে মনিবের হাত চাটতে শুরু করল। ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিল সোফি। মুখে। উদ্বেগের হাসি।

যে যতই বলুক আর ভয় দেখাক, দৃঢ়কণ্ঠে বলল সে, টমিকে আমি চুবিয়ে মারতে পারব না।

প্রশ্নই ওঠে না, তার সঙ্গে সুর মেলাল রবিন। আরেকবার তাকাল অদ্ভুত চিঠিটার দিকে। দেখাই যাক না, কি করতে পারে সে!

.

বাড়ি থেকে বেরিয়ে মলে চলে এল মুসা। সেরাতে মরুভূমির ঘটনাটার পর মন প্রায় সময়ই খারাপ থাকে। খারাপ হয়ে আছে মনটা। খিদেও পেয়েছে। কিশোর নেই, নাহলে স্যালভিজ ইয়ার্ডে গিয়ে আড্ডা দিতে পারত। রবিনও থাকছে ব্ল্যাক ফরেস্টে ওদের গোস্ট লেনের বাড়িতে।

রোদের মধ্যে গাড়িটা পার্ক করে রেখে একটা খাবারের দোকানে ঢুকল সে। আগে খেয়ে নেয়া যাক। তারপর ভাববে কোথায় যাবে। ম্যাকডোনাল্ডের তৈরি চিকেন বার্গার, পটেটো ফ্রাই আর কোকের অর্ডার দিল। সে। এই দোকানে পার্ট টাইম চাকরি করে সোফি। ওকে না দেখে ক্যাশিয়ারকে জিজ্ঞেস করল সোফির কথা। ক্যাশিয়ার বলল, ডিউটি শেষ। করে চলে গেছে সোফি। সেদিন আর আসবে না।

খাবারগুলো নিয়ে গুডলাক ফাউনটেইনের পাশের টেবিলটায় এসে বসল মুসা। বিরাট হাঁ করে বার্গারে কামড় বসাল। চমৎকার বানায়। ওর খুব। পছন্দ। মজা করে চিবাতে চিবাতে তাকাল ঝর্নাটার দিকে। ওটার পানিতে পয়সা ছুঁড়ে দিয়ে কোন কিছু চাইলে নাকি ইচ্ছে পূরণ হয়। পকেট থেকে একটা পয়সা বের করে ছুঁড়ে মারল সে। আস্তে করে গিয়ে অস্থির পানির নিচের ছোট গোল বেদিটাতে পড়ল পয়সাটা। ওখানে ফেলা খুব কঠিন কাজ। চাইবার মত কোন কিছু এ মুহূর্তে মনে পড়ল না মুসার। শেষে বলল, আমার মনটা ভাল হয়ে যাক।

বাহ, দারুণ হাত তত তোমার। সাংঘাতিক নিশানা, মেয়েলী কণ্ঠের হালকা হাসি মেশানো কথা শুনে ফিরে তাকাল মুসা।

পাশের টেবিলে বসে আছে এক অপূর্ব সুন্দরী তরুণী। একেবারে সিনেমার নায়িকাদের মত সুন্দরী। ঝলমলে সোনালি চুল। বড় বড় চোখের মণি সবুজ। ঠোঁটে টুকটুকে লাল লিপস্টিক। খাড়া তীক্ষ্ণ নাক। পরনে নার্সের সাদা পোশাক। কফি খেতে খেতে ম্যাগাজিন পড়ছিল। মুসার চোখে চোখ পড়তে মিষ্টি করে হাসল। মাথা নেড়ে ঠোঁট উল্টে বলল, কাজ হবে না। রোজই পয়সা ফেলি আমি। কোন চাওয়াই পূরণ হয় না আমার। হয় চাওয়াটা ঠিকমত হয় না, নয়তো মাত্র একটা পয়সা ফেলি বলে মন ওঠে না ঝর্নার।
মুসাও হাসল। এক পয়সায় ঝর্নার মন না উঠলে সিকি ফেলে দেখতে পারেন। বেশি ঘুষ পেলে আপনার ইচ্ছে পূরণ করেও দিতে পারে।
অনিশ্চিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল মেয়েটা। ঠোঁট ওল্টাল। যার পয়সায় হয়, তার সিকিতে কেন, লক্ষ ডলারেও হবে না। ইচ্ছা পূরণ হওয়ার কথা সব ফালতু। আমি আসলে পয়সা ফেলি হাতের নিশানা পরখ করার জন্যে। বেদিটাতে ফেলতে চাই। একদিনও পারিনি।
রোজ আসেন কেন?
লাঞ্চ করতে। কাছেই চাকরি করি আমি। হাসপাতালে।
নার্স?
বলে বটে নার্স, কিন্তু কাজ করায় অন্য, মুখ বাকাল মেয়েটা। আজ সকাল থেকে খালি টেস্ট টিউবে রক্ত নিয়েছি মানুষের।
চাকরিটা মনে হয় পছন্দ না আপনার?
নাহ! এগুলো কোন কাজ নাকি?
করেন কেন?
সময় কাটানোর জন্যে। তুমি কি করো? হাই স্কুলে পড়ে নিশ্চয়?
মাথা ঝাঁকাল মুসা।
ভবিষ্যতে কি করার ইচ্ছে?
ইচ্ছে তো হয় অনেক কিছুই। একেকবার একেকটা। কখনও মনে হয়। টীচার হব, কখনও মনে হয় দূর, ছেলে পড়িয়ে কি লাভ? তারচেয়ে মেকানিক হওয়া অনেক ভাল...
হাসল মেয়েটা, ডিসাইড করা মুশকিল, তাই না? তোমার বার্গার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। অতিরিক্ত বকবক করি আমি। আমি এখান থেকে না গেলে আর খেতে পারবে না।
আধখাওয়া বার্গারটা কখন প্লেটে নামিয়ে রেখেছিল মুসা, ভুলে গিয়েছিল। তুলে নিল আবার। হঠাৎ খেয়াল করল, মনটা আর আগের মত খারাপ নেই। কথা বলতে বলতে ভাল হয়ে গেছে।

না না, আপনি বসুন। খেতে খেতেও কথা বলতে পারি আমি। আমার কোন অসুবিধে হয় না। আপনার নামটাই কিন্তু জানা হলো না এখনও।
ক্রিসি, পাশে কাত হয়ে হাত বাড়িয়ে দিল মেয়েটা। তোমার?
মুসা আমান, বার্গারের শেষ টুকরোটা প্লেটে রেখে ক্রিসির হাত ধরে ঝাঁকিয়ে দিল মুসা। পরিচিত হয়ে খুশি হলাম।
এসব গতবাধা কথা ন্যাকা ন্যাকা লাগে আমার।
হাসল ক্রিসি। দাঁতগুলো সাদা হলেও ঠিক স্বাভাবিক নয়, সামান্য বাঁকা। তবে দেখতে খারাপ লাগে না। মুসাকে জিজ্ঞেস করল, তোমাকে কোথাও দেখেছি। কোথায়, বলো তো?
পত্রিকায় হতে পারে, ভাবল মুসা। ওদের স্কুলের বাস্কেটবল টীমকে জিতিয়ে দিয়ে হিরো হয়ে গিয়েছিল সে। বলল, কি জানি। দেখেছেন হয়তো কোনখানে। এখানেও হতে পারে। রোজ আসেন যেহেতুএখানকার বার্গার। আমার খুব পছন্দ।
হ্যাঁ, তাই হবে, অনিশ্চিত ভঙ্গিতে ভ্রুকুটি করল ক্রিসি। তোমার ঘাড়ে কি হয়েছে? নাকি সমস্যাটা মেরুদণ্ডে?
অবাক হলো মুসা। কি করে বুঝলেন?
ঘাড় যেভাবে শক্ত করে রাখছ।
খেলতে গিয়ে ব্যথা পেয়েছি। বেশি নড়াতে গেলেই খচ করে লাগে।
ডিপ-টিস্যু ম্যাসাজ নিয়ে পড়াশোনা করছি আমি। হাসপাতালে কাজ (করায় প্র্যাকটিসের সুযোগও পেয়ে গেছি। এই ম্যাসাজে রোগীর সাংঘাতিক আরাম হয়। ব্যথা চলে যায়।
শুধু ম্যাসাজেই? বিশ্বাস করতে পারছে না মুসা।
হ্যাঁ, হাতব্যাগ থেকে একটা কাগজ বের করে খসখস করে ফোন নম্বর আর ঠিকানা লিখে মুসার দিকে বাড়িয়ে দিল ক্রিসি। এটা রাখো,। ব্যথা বাড়লে যদি প্রয়োজন মনে করো আমাকে ফোন কোরো। বাসায় চলে এলেও বিরক্ত হব না।
কাগজটা সাবধানে পকেটে রাখতে রাখতে হাসল মুসা, গিনিপিগ বানাতে চান?
সত্যি কথা বলব? ঘাড় কাত করল ক্রিসি, চাই। সব ধরনের রোগীর ওপরই পরীক্ষা চালাতে চাই আমি। এরকম মালিশে কোন কোন ব্যথা আরাম হয়, জানাটা জরুরী। ভবিষ্যতে নার্সের চাকরি ছেড়ে ম্যাসাজ পার্লার খুলে বসব।
বলা যায় না, চলেও আসতে পারি একদিন। মাঝে মাঝে ব্যথাটা যা বাড়ে..কি ম্যাসাজ বললেন?
ডিপ-টিস্যু। ঘড়ি দেখল ক্রিসি। বাপরে, অনেক দেরি করে ফেললাম। উঠে দাঁড়াল সে। তোমার সঙ্গে কথা বলে ভাল লাগল, মুসা..
গতবাধা কথা। ন্যাকা ন্যাকা।

হেসে ফেলল ক্রিসি। শোধটা নিয়েই নিলে। চমৎকার কাটল সময়টা। সত্যি ভাল লাগল। বিকেলের পর আর বেরোই না আমি। তোমার ম্যাসাজ দরকার হলে ওই সময়টায় এসো।
ঘাড় কাত করল মুসা।
মিষ্টি একটা হাসি দিয়ে বেরিয়ে গেল ক্রিসি। চোখ ফিরিয়ে প্লেটের দিকে তাকাতেই দেখতে পেল খানিকটা বার্গার পড়ে রয়েছে। অবাক লাগল। হলো কি আজ ওর? খাওয়ার কথা ভুলে যাচ্ছে বার বার?

.

ড্যানিদের বাড়ির ড্রাইভওয়েতে সবে থেমেছে মুসা, তার পেছন পেছনই ঢুকল ড্যানির গাড়িটাও।
এগিয়ে গেল মুসা। ড্যানি গাড়ি থেকে নামতেই বলল, তার মানে বাড়ি ছিলে না। ভালই হলো, দেরি করে এসেছি। বসে থাকতে হলো না।
ড্যানি জানতে চাইল, ছিলে কোথায়? ফোন করে পাওয়া যায় না…
ড্যানিয়েল হার্বার, মুসার ক্লাসফ্রেন্ড। সব সময় হাসিখুশি থাকে। মাথায় ঘন চুলের বোঝা। নাকের ডগাটা মোটা। বড় বড় কানের দিকে ভালমত লক্ষ। করলে চেহারাটা যেন কেমন মনে হয়। কালো দুই চোখে তীক্ষ্ণবুদ্ধির ছাপ। পড়াশোনায় ভাল। অ্যারোনটিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং পড়ার ইচ্ছে।
মলে গিয়েছিলাম, মুসা জানাল। বাড়িতে রান্না করে খেতে ইচ্ছে করছিল না।
গাড়ির সীটে ফেলে রাখা একটা বাদামী কাগজে মোড়া বাক্স বের করল ড্যানি। খাবারের প্যাকেট। আরেকটা ঠোঙাও তুলে নিয়ে বলল, এসো।
সামনের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল সে। মুসা ঢুকল পেছনে। লিভিংরুমে ঢুকে এদিক ওদিক তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, জয় কোথায়?
ড্যানির ছোট বোন জয়। সাত বছর বয়েস। ভীষণ ভালবাসে ওকে ড্যানি।
আছে।
একা ফেলে গিয়েছিলে!
ড্যানির বাবা-মা বাড়ি নেই, জানে মুসা। ছেলে-মেয়েকে রেখে তারাও বেড়াতে গেছেন।
কি করব? কৈফিয়ত দেয়ার ভঙ্গিতে বলল ড্যানি। পেছনের উঠানে একটা পাখি কুড়িয়ে পেয়েছে। বেড়ালে বোধহয় ডানা ভেঙে ফেলেছে ওটার। তুলে এনে সেবাযত্ন শুরু করল। আমাকে হুকুম করল, জলদি দোকানে গিয়ে পাখির দানা নিয়ে এসো। ওকে সঙ্গে নিতে চাইলাম। বলে, ও না থাকলে নাকি পাখিটা মরে যাবে।

লিভিংরুমে ঢুকল জয়। ভাইয়ের বড় বড় কান পায়নি, তবে নাকটা পেয়েছে। চুলের রঙও এক রকম। দুজনের একই স্বভাব-কথা বলার সময়। অনবরত হাত নেড়ে নেড়ে নানা রকম ভঙ্গি করতে থাকে।
ভীষণ উত্তেজিত হয়ে আছে জয়। এগিয়ে এসে ভাইয়ের হাত থেকে ঠোঙাটা প্রায় কেড়ে নিল। মুসার দিকে তাকিয়ে বলল, মুসাভাই, ভাইয়া তোমাকে পাখিটার কথা বলেছে? জানালার নিচে পড়ে ছিল।
বলেছে, হেসে জবাব দিল মুসা। সেবাযত্ন করে নাকি অর্ধেক ভাল করে ফেলেছ।
বাচ্চা তো। কষ্ট বেশি সেজন্যে। ঠোঙার মুখ খুলে ভেতরে তাকাল। জয়। ভাইকে জিজ্ঞেস করল, বাচ্চা পাখির দানা এনেছিস তো?
দানা তো এক রকমই রাখে দোকানে, ড্যানি বলল। বড় পাখি যা খায় ছোটগুলোও তাই খায়। আমার মনে হয় না খাবারের তফাত বুঝতে পারে ওরা।
পারে না মানে? নিশ্চয় পারে! দাঁড়া, দেখে আসি খায় নাকি। নাহলে আবার যেতে হবে তোকে দোকানে। দোকানদারকে কড়া করে বলবি যাতে বাচ্চার দানা দেয়। দৌড়ে চলে গেল জয়।
খাইছে! যদি সত্যি না খায়?
কি আর করব? শঙ্কিত ভঙ্গিতে চুলে হাত চালাল ড্যানি। জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলল। যেতেই হবে আবার। কিন্তু সত্যি কি বাচ্চা পাখি আর বুড়ো পাখিদের খাবার আলাদা?
মনে হয় না। কখনও খেয়াল করিনি।
মুসাকে নিজের বেডরুমে নিয়ে এল ড্যানি। ঢুকেই দেখল অ্যানসারিং মেশিনের লাল আলোটা টিপটিপ করছে।
এগিয়ে গেল ড্যানি। রিসিভার ভোলার জন্যে হাত বাড়িয়ে বলল, বাড়ি ফিরেই যখন দেখি কেউ আমার খোঁজ করছিল, ভাল লাগে খুব। নিশ্চয় কোন বন্ধু।
যদি ইনশুয়ারেন্সের দালাল হয়?
ওরা কখনও মেসেজ রাখে না। হুট করে বাড়িতে ঢুকে একেবারে সামনে এসে দাঁড়ায়। ভাল করেই জানে, বলেকয়ে এলে কাউকে পাবে না। কেউ ওদের সামনে যাবে না। বাড়িতে থাকলেও নেই বলে দেবে। তবু মনে যখন করিয়ে দিয়েছ, সাবধান হওয়াই ভাল। বলা যায় নাঃ::
প্লে করল ড্যানি। একটামাত্র মেসেজ। রবিন করেছে। বেশ উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে ওর কণ্ঠ। বলেছে, ড্যানি যখনই ফিরুক, সঙ্গে সঙ্গে যেন সোফিদের বাড়িতে ফোন করে।
অবাক হয়ে মুসার দিকে তাকাল ড্যানি। মুসাও অবাক। জবাব দিতে পারল না। কোনমতে বলল, ওই ব্যাপারটা নিয়ে কিছু নয় তো?

কোন... ঢোক গিলল ড্যানি। বুঝে ফেলেছে। ভয়ে ভয়ে তাকাল মুসার দিকে। আমার ফোন করতে ভয় লাগছে। কি জানি কি শুনব! প্লীজ, তুমি করো!
মুসাও দ্বিধা করতে লাগল। ঠিক আছে, করছি। কাঁপা হাতে রিসিভার তুলে নিয়ে কানে ঠেকাল।
একবার রিঙ হতেই রিসিভার তুলে নেয়ার শব্দ পেল মুসা। জবাব দিল সোফি, হালো?
মুসা। রবিন আছে?
আছে।
কি হয়েছে, সোফি?
রবিনকে দিচ্ছি, কথা বলতেও যেন কষ্ট হচ্ছে সোফির, ওর কাছেই শোনো।
রিসিভার হাত বদল হওয়ার অপেক্ষা করতে লাগল মুসা।
কোত্থেকে বলছ, মুসা? জানতে চাইল রবিন।
ড্যানিদের বাড়ি থেকে।
ড্যানি আছে?
আছে। আমার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। কি হয়েছে?
দ্বিধা করতে লাগল রবিন। কিভাবে শুরু করব বুঝতে পারছি না।
বুকের মধ্যে কাঁপুনি শুরু হয়ে গেছে মুসার। নিশ্চয় মরুভূমির। ব্যাপারটাই। বলে ফেলো।
মুসা?
বলো না। শুনছি তো।
লম্বা একটা মুহূর্ত চুপ করে রইল রবিন। মুসা, কে জানি একটা অদ্ভুত চিঠি পাঠিয়েছে।
কি বললে? রবিনের কথাটা যেন বুঝতে পারেনি মুসা।
অদ্ভুত একটা চিঠি। না দেখলে বুঝবে না।
মরুভূমির কথা কিছু লিখেছে?
পরিষ্কার করে বলেনি। তবে মনে হয় ওই কথাটাই বলতে চেয়েছে। ড্যানিকে জিজ্ঞেস করো তো, ও আমাদের ভয় দেখানোর জন্যে লিখেছে কিনা?
ও কেন দেখাবে? করল তো ও-ই।
তবু...
আচ্ছা, করছি! জিজ্ঞেস করল মুসা, ড্যানি, সোফিকে ভয় দেখানোর জন্যে কোন চিঠি লিখেছ?
ভুরু ওপরে উঠে গেল ড্যানির, না তো!
সত্যি?

মিথ্যে বলব কেন?
না, কোন চিঠিটিঠি লেখেনি, রবিনকে জানাল মুসা।
ঠিক বলছে তো?
ড্যানির দিকে তাকিয়ে আছে মুসা। উদ্বিগ্ন লাগছে ড্যানিকে। না, বলছে না। চিঠিটা পড়ো তো শুনি।
পড়ে শোনাল রবিন। কোন পোস্ট অফিসের সিল আছে জানাল। মুসা চুপ করে থাকায় জিজ্ঞেস করল, মুসা, শুনছ?
হ্যাঁ। ঢোক গিলল মুসা। বুকের দুরুদুরু আরও বেড়েছে।
চিঠির কথামতই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েছে, রবিন জানাল। সাঙ্কেতিক ভাষায়। লিখেছে: সোফির কুকুরের বাচ্চাটাকে ওর নিজের হাতে চুবিয়ে মারতে হবে। বৃহস্পতিবারের মধ্যে।
দম বন্ধ করে ফেলল মুসা। বলো কি?
মুসা, কেউ জোক করেনি তো? ক্লডিয়া? কিংবা অন্য কেউ?
কি জানি। জিজ্ঞেস না করে বলি কিভাবে। ওকে ফোন করেছিলে?
নাহ। ভাবলাম তুমি করলেই ভাল হয়। তোমার সঙ্গে খাতির বেশি।
বেশি আর কই...
তবু
ঠিক আছে। করব।
মুসা, নামের সারিতে আমার নামটা নেই।
তাই নাকি?
ইন্টারেস্টিং, তাই না?
না, ডেঞ্জারাস! সোফি আবার ভাবছে না তো তুমি লিখেছ?
না, ভাবছে না।
ভাবনা চলেছে মুসার মাথায়। চিঠিতে যে কজনের নাম লেখা আছে, সবার এই বিপদের জন্যে ড্যানি দায়ী। গাড়িটা সে চালাচ্ছিল। আহাম্মকি করতে গিয়ে অ্যাক্সিডেন্টটা করেছে।
মুসা?
বলো।
খুব মুষড়ে পড়েছে সোফি।
পড়বেই। প্রথম পরীক্ষাটা ওকেই দিতে হবে। জোক, না সত্যি, এটা আগে ওকেই প্রমাণ করতে হবে। কুকুরের বাচ্চাটাকে না মারলে হয়তো সত্যি সত্যি বিপদে পড়তে হবে তাকে। এখনও কিছুই বলা যাচ্ছে না কি ঘটবে!
ডিসাইড করতে পারছে না ও কি করবে।

পারা সম্ভবও নয়। ঠিক আছে, আমি এখনই ক্লডিয়াকে ফোন করছি। দেখি কি বলে?
যা বলে জানিয়ো। তাড়াতাড়ি। ওকে না পেলেও জানিয়ো। রাখব?
রাখো।
লাইন কেটে দিয়ে ড্যানিকে সব জানাল মুসা।
গম্ভীর হয়ে গেল ড্যানি। পায়চারি শুরু করল। ফিরে তাকিয়ে বলল, ক্লডিয়া যদি না লিখে থাকে তো ভয়ের কথা। বাইরের কেউ লিখেছে। অ্যাক্সিডেন্টের কথাটা জানে। জানল কি করে?
সেটা পরেও ভাবা যাবে। ক্লডিয়াকে ফোন করে দেখো আগে কি বলে।
আবার রিসিভার কানে ঠেকাল মুসা।
ফোন ধরলেন মিসেস নিউরোন, ক্লডিয়ার আম্মা। জানালেন, কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে পর্বতের ওদিকে বেড়াতে চলে গেছে সে। তাকে ধন্যবাদ দিয়ে ফোন রেখে দিল মুসা।
কি বলল? মুসার একেবারে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে ড্যানি।
বেড়াতে চলে গেছে। ইয়োজিমাইটে। বৃহস্পতিবারের আগে ফিরবে না।
হু, চিন্তিত ভঙ্গিতে আবার পায়চারি শুরু করল ড্যানি। ধপ করে বসে পড়ল বিছানায়। মুসা, কি মনে হয় তোমার? ক্লডিয়াই একাজ করেছে?
কি জানি। তবে না করার সম্ভাবনাই বেশি। কেন করবে? সে নিজেও এতে জড়িত। পুলিশকে না জানানোর জন্যে চাপাচাপিটা সে-ই বেশি। করেছিল। সে নিজে যে ব্যাপারে ভয়ে অস্থির, সেটা বলে সোফিকে ভয় দেখানোর কথা ভাবাটাই অর্থহীন। তা ছাড়া রবিন বলল, খামের ওপর। লোকাল পোস্ট অফিসের সিল মারা। ক্লডিয়া গেছে সাতদিন আগে। চিঠিটা। এসেছে আজকে। যদি সত্যিই ও লিখে থাকত, ইয়োজিমাইট পোস্ট অফিসের সিল থাকত।
তা ঠিক। আচ্ছা, সোফি, মারলা আর রবিন মিলে আমাদের সঙ্গে রসিকতা করছে না তো? ভয় দেখানোর জন্যে?
রবিনের উদ্বিগ্ন কণ্ঠ কানে বাজতে লাগল মুসার। উঁহু! রবিন তো এ ধরনের রসিকতা করবেই না। সোফি আর মারলাও করবে না। তা ছাড়া। ক্লডিয়ার মতই ওদেরও করার কোন যুক্তি নেই।
সেটাই তো কথা। তাহলে?
উঠে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল ড্যানি। বাইরে তাকাল। ভাল এক ঝামেলায় পড়তে যাচ্ছি আমরা। তত্ত্বাবধায়ক–কি অদ্ভুত নাম! নির্ঘাত লোকটা উন্মাদ। বিকৃত মস্তিষ্ক। ভয়ানক নিষ্ঠুর। নইলে একটা কুকুরের বাচ্চাকে চুবিয়ে মারার কথা কল্পনাও করতে পারত না।

তোমার কি ধারণা সোফি সত্যি বিপদের মধ্যে আছে? আমার ফোনের অপেক্ষা করছে ওরা। একটা কিছু বলতে হবে।
মলিন হাসি হাসল ড্যানি। বাচ্চাটাকে মেরে ফেললে অবশ্য সোফির আর কোন রকম বিপদের আশঙ্কা থাকে না।
তা থাকে না। কিন্তু ওকাজ কি আর করা যায় নাকি!
যায় না। আমি হলে অন্তত পারতাম না। বলো, ক্লডিয়া বেড়াতে গেছে। ওর সঙ্গে কথা বলা যায়নি। কিংবা বলতে পারো, আমাদেরও অনুমান চিঠিটা ক্লডিয়াই লিখেছে। সবার মুখ থেকে এক কথা শুনলে সোফি খানিকটা নিশ্চিন্ত হতে পারবে।
তা পারবে না। ও নিশ্চিত হতে চাইবে।
জানালার কাছ থেকে ফিরে এসে মুসার মুখোমুখি দাঁড়াল ড্যানি। একটা কথা বলি?
বলো।
এভাবে সর্বক্ষণ একটা দুশ্চিন্তা আর মানসিক চাপের মধ্যে না থেকে পুলিশের কাছে চলে যাই। সব খুলে বলি। আমার একার জন্যে তোমাদের সবাইকে এভাবে ভোগানোর...
অনেক দেরি করে ফেলেছি। সোজা নিয়ে গিয়ে জেলে ভরবে পুলিশ এখন। তা ভরুক..তবে ভাবছি, পুলিশের কাছে যাওয়ার আগে সবার সঙ্গে একবার কথা বলা দরকার। সবাই যখন এতে জড়িত, সবার একসঙ্গে বসে আলোচনারও দরকার আছে।
তাহলে তো ক্লডিয়াকেও থাকতে হবে মীটিঙে। কবে আসছে ও?
বললাম না বৃহস্পতিবার।
সোফিকে কবে পর্যন্ত সময় দিয়েছে তত্ত্বাবধায়ক?
বৃহস্পতিবার।
তারমানে কুকুরের বাচ্চাটাকে না মারলেও বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বেঁচে থাকছে সোফি। তাহলে আর অত চিন্তার কিছু নেই। তত্ত্বাবধায়ক কিছু ঘটানোর আগেই মীটিঙে বসার সময় পাচ্ছি আমরা।

.

ওদের জন্যে বৃহস্পতিবারটা এল আর গেল কোন রকম নতুনত্ব না নিয়ে। ক্লডিয়া ফিরল না। অতএব আলোচনায় বসাও আর হলো না।
সারাদিন সাফির সঙ্গে কাটাল মারলা। মলে কেনাকাটা করল। সিনেমা দেখতে গেল। সারাটা দিন মোটামুটি শান্তই রইল সোফি। রাত বারোটা পর্যন্ত তার সঙ্গে

সঙ্গে রইল মারলা। রাতেও থাকতে চেয়েছিল, কিন্তু সোফি বলল লাগবে না। তার আম্মা ফিরেছেন।
সকালে ফোন করে খবর নেবে বলে বাড়ি ফিরে গেল মারলা।
কথামত পরদিন সকালে ফোন করল সে। ভালই আছে সোফি।
খবরটা সবাইকে জানিয়ে দিল মারলা। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ওরা। যাক, চিঠিটা আসলেই একটা ফালতু রসিকতা ছিল।
ক্লডিয়ার ফেরার অপেক্ষায় রইল সবাই। কিন্তু ফিরল না সে। মাকে ফোন করে জানিয়ে দিল আরও একদিন দেরি হবে।
শুক্রবার রাত।
সকাল সকাল শুয়ে পড়ল রবিন। মাথা ধরেছে। গত কদিন ধরে যা উত্তেজনা যাচ্ছে। শোয়র সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল। নানা রকম অদ্ভুত স্বপ্ন। দেখতে লাগল। কানের কাছে দমকলের ঘন্টা শুনে যেন ঘুম ভেঙে গেল ওর। তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বসল বিছানায়।
ফোন বাজছে। চমকে গেল। এতরাতে কে? বুকের মধ্যে হাতুড়ির বাড়ি পড়তে শুরু করল যেন ওর। কাঁপা হাতে রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল। হালো?
রবিন?
হ্যাঁ। কে?
মিসেস হল।
ধড়াস করে এক লাফ মারল রবিনের হৃৎপিণ্ড। দম আটকে এল। সোফির কি হয়েছে? ভাল আছে ও?
ফুঁপিয়ে উঠলেন সোফির আম্মা। জানি না। হাসপাতাল থেকে ফোন করেছিল। অ্যাক্সিডেন্ট করেছে সোফি। আমাকে এখুনি যেতে বলেছে। সোফির বাবা বাড়ি নেই। আমিও চশমাটা খুঁজে পাচ্ছি না। রবিন, আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারবে? এই অবস্থায় আমি গাড়ি চালাতে পারব না।
এতটাই অস্থির হয়ে পড়েছেন মহিলা, ভুলে গেছেন বহুদুরে থাকে রবিন। গাড়িতে করে যেতেও অন্তত একটি ঘণ্টা লাগবে ওর।
নিশ্চয় পারব, বলল রবিন, তবে আমার আসতে তো অনেক সময় লেগে যাবে। তারচেয়ে মুসাকে ফোন করে দিচ্ছি, সে আপনার অনেক কাছাকাছি থাকে। আমিও আসছি। হাসপাতালে দেখা হবে।
আচ্ছা, ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললেন মিসেস হল। মেয়ে কেমন আছে। জিজ্ঞেস করেছিলাম। কোন জবাব দিল না হাসপাতাল থেকে। ও মরে যায়নি তো?
না, মিসেস হল। সোফির অবস্থা সম্পর্কে এখনও শিওর না হয়তো ওরা। সেজন্যেই কিছু জানাতে পারেনি। ভাববেন না। কিছু হয়নি সোফির। কোন্

হাসপাতালে নিয়েছে?
জেনে নিয়ে মুসাকে ফোন করল রবিন।
অবাক কাণ্ড। একবার রিঙ হতেই রিসিভার তুলে নিল মুসা। যেন তৈরি হয়ে বসেছিল ফোনের কাছে। ঘুমায়নি, ওর কণ্ঠ শুনেই বুঝতে পারল রবিন। ঘড়ির দিকে তাকাল। রাত বাজে একটা। কি করছে মুসা?
মুসা?।।রবিন। খারাপ খবর আছে।
সোফির?
তুমি কি করে জানলে?
অনুমান। কি হয়েছে ওর?
মিসেস হল ফোন করেছিলেন, কি হয়েছে মুসাকে জানাল রবিন।
দশ মিনিটের মধ্যেই চলে যাচ্ছি আমি।
তুমি খারাপ খবর শোনার জন্যে বসে ছিলে, তাই না? ঘুমাওনি কেন?
ঘুম আসছিল না।
কি মনে হয়, মুসা? সোফি কি মারা গেছে?
ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল মুসা। জানি না! আজকাল আর কোন কথা ভাবতে ইচ্ছে করে না...অ্যাক্সিডেন্টটার পর থেকে কোন কিছু বেশি। ভাবলেই মাথা ধরে...
আমারও!
.
সোফি মারা গেছে!
খবরটা একই সঙ্গে শুনল ওরা তিনজন। রবিনদের গোস্ট লেনের বাড়ি থেকে হাসপাতাল অনেক দূর। তবু মুসার গাড়িটা যখন হাসপাতালের পার্কিং লটে ঢুকল, তার মিনিটখানেক পর রবিনও ঢুকল। মুসা ঠিকমতই সোফিদের বাড়িতে পৌঁছেছিল। কিন্তু প্রচণ্ড অস্থিরতার কারণে নানা রকম অঘটন ঘটিয়ে বেরোতে দেরি করে ফেলেছেন মিসেস হল।–
হাসপাতালে মেয়ের খবর শুনে বেহুশ হয়ে গেলেন তিনি। তাড়াতাড়ি নার্সরা ইমার্জেন্সিতে নিয়ে গেল তাকে। রবিনের মাথা ঘুরছে। যে ডাক্তার ওদের খবরটা দিলেন, বলার ভঙ্গিতে মনে হলো মৃত্যু নয়, সাধারণ সর্দি লাগার খবর দিচ্ছেন যেন। মাঝবয়েসী ভদ্রলোক, সবুজ সার্জিক্যাল গাউনে রক্ত লেগে আছে। ইমার্জেন্সি রুমে ডিউটি করেন। সারাক্ষণ জখমী রোগী আসতেই আছে। গাড়ি দুর্ঘটনা, ছুরি মারামারি, গুলিতে আহত রোগী, আসে বিরামহীনভাবে। এত দেখতে দেখতে ব্যাপারটা গা সওয়া হয়ে গেছে ডাক্তারের। মৃত্যু আর কোন প্রতিক্রিয়া

করে না তার মনে। কাউকে তাদের প্রিয়জনের মৃত্যুর খবর শোনাতে বিন্দুমাত্র মুখে আটকায় না আর।
অ্যাক্সিডেন্টটা হলো কিভাবে? হাঁটু কাঁপছে রবিনের। দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে।
মাথা নেড়ে বললেন ডাক্তার, শুনিনি। পুলিশকে জিজ্ঞেস করে দেখো।
বোকার মত প্রশ্ন করে বসল রবিন, সত্যি মারা গেছে, নাকি ভুল হয়েছে। আপনাদের? মানে, আমি বলতে চাইছি এখনও কোন সম্ভাবনাঃ...ভালমত চেষ্টা করলে এখনও হয়তো বাঁচানো যায়...
শূন্য দৃষ্টি ফুটল ডাক্তারের চোখে। হাসপাতালে আনার অনেক আগেই মরে গেছে। হাত ছোঁয়ানোরও সুযোগ পাইনি আমরা।
পুলিশ চলে যাওয়ার আগেই ওদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। মুসার দিকে তাকাল রবিন। মুখের যা ভঙ্গি করে রেখেছে মুসা, তাতে বোঝা যায় ওর মানসিক অবস্থাও সুবিধের না। তাকে নিয়ে পার্কিং লটে বেরিয়ে এল রবিন। যে অ্যাম্বুলেন্সে করে সোফিকে আনা হয়েছে, তার ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলছে একজন পুলিশ অফিসার।
এগিয়ে গেল রবিন। এক্সকিউজ মি, অফিসার, বলল সে। কার অ্যাক্সিডেন্ট করা যে মেয়েটাকে এক্ষুণি নিয়ে এলেন আপনারা, আমি তার বন্ধু। ডাক্তারের কাছে শুনলাম মারা গেছে। আপনি ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন?
তরুণ অফিসার। সুন্দর করে ছাঁটা বাদামী গোফ। নীল ইউনিফর্ম চমৎকার ফিট করেছে। গাড়ি ঘেষে দাঁড়িয়ে রবিনের দিকে তাকাল। ডাক্তারের মত ভাবলেশহীন মুখ নয়। অন্তত খানিকটা অনুভূতি এর আছে।
হ্যাঁ, গিয়েছিলাম, রবিনের বাহু স্পর্শ করল অফিসার। তোমার বন্ধুর জন্যে সত্যি আমি দুঃখিত। এত অল্প বয়েসেই শেষ হয়ে গেল বেচারি।
কিভাবে অ্যাক্সিডেন্ট করল?
গাছের সঙ্গে ধাক্কা লাগিয়েছিল। রাস্তার ধারের একটা অলিভ গাছ। এমন গুতেই মেরেছে, গাছটাও শেষ, গাড়িটাও ভর্তা।
ব্রেক ফেল করেছিল নাকি? না চাকা পিছলে গিয়েছিল?
কোনটাই না। চাকা পিছলালে ব্রেক করত। তাতে স্কিড মার্ক থাকত। ওরকম কোন চিহ্ন পাওয়া যায়নি। নেশার ঘোরে থাকলে কিংবা ঘুম পেলে অনেক সময় স্টিয়ারিঙে হাত ঠিক থাকে না। তীব্র গতির সময় স্টিয়ারিং সামান্য ঘুরলেও গাড়ি অনেক সরে যায়। রাস্তায় সামান্য পরে পরেই গাছ। গুতে লাগিয়েছে বোধহয় ওসব কোন কারণেই। গাড়ির অবস্থা দেখে মনে হয় ষাট মাইল বেগে ছুটছিল।
ধাক্কা লাগার সঙ্গে সঙ্গেই মারা গেছে?
পায়ের ভার বদল করল অফিসার। অস্বস্তি বোধ করছে। কোন সন্দেহ নেই তাতে।

এত শিওর হচ্ছেন কি করে?
শুনলে ভাল লাগবে না তোমাদের।
গোলাপী কাগজে লেখা চিঠিটা মনের পর্দায় ভেসে উঠল রবিনের। তবু, বলুন।
মুখ নিচু করল অফিসার। দেখো, সত্যি ভাল লাগবে না।
আমি জানতে চাই।
জানালা ভেঙে বেরিয়ে গিয়েছিল ওর মাথা। গাছের ডালে গলা টান লেগে ঘাড় ভেঙেছে। প্রচণ্ড ঝাড়া লেগে…
বলুন? কি হয়েছিল প্রচণ্ড ঝাড়া লেগে?
গাল চুলকাল অফিসার। দেখো, অ্যাক্সিডেন্টে মানুষ মারা গেলে লাশের চেহারা আর চেহারা থাকে না। তার ওপর যদি ধড় থেকে গলা ছিঁড়ে গিয়ে মাথাটা…
আর সহ্য করতে পারল না মুসা। কপাল টিপে ধরল।
রবিনও কাঁপতে শুরু করেছে।
আগেই বলেছিলাম তোমাদের, সহ্য করতে পারবে না, অফিসার বলল। বেশ কিছুটা দূরে রাস্তার পাশের একটা ঝোপে পাওয়া গেছে ওর মাথাটা।
ব্ল্যাক ফরেস্ট পার্কে বসে আছে ওরা। পার্কটা শহরের একধারে, হাই স্কুলের পেছনে। পাশ দিয়ে বইছে গ্রে উইলো রিভার। নির্জন পার্ক। বিমর্ষ, গভীর পরিবেশ।
ক্লডিয়াও এখন আছে ওদের সঙ্গে। পর্বত থেকে ফিরেছে। সেদিন সকালের ডাকে একটা চিঠি পেয়েছে ড্যানিয়েল। সোফির চিঠিটার হুবহু নকল। তফাত কেবল নামের সারিতে ওপরের নাম অর্থাৎ সোফির নাম নেই। সাঙ্কেতিক একটা বিজ্ঞপ্তিও ছাপা হয়েছে পত্রিকায়। লিখেছে:
ছোট বোনের ডান হাত পুড়িয়ে দাও
কে ডেকেছে এই মীটিং? জানতে চাইল রবিন। ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে বসেছে। তার পাশে বসে একটা ঘাসের ডগা দাঁতে কাটছে মারলা। চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে আছে। খবরটা শোনার পর থেকে কারোরই মন-মেজাজ ভাল নেই।
মীটিং ডাকিনি, ক্লডিয়া বলল। সবাইকে একজায়গায় হতে বলেছি যার যা ইচ্ছে বলার জন্যে।
লাভটা কি তাতে?
যদি কোন সমাধান বেরিয়ে আসে।
ভাল কথা, রবিন বলল। তাহলে বসে আছ কেন সবাই চুপচাপ?
বুঝতে পারছি না কিভাবে শুরু করব। আজকে আর উগ্র পোশাক পরেনি ক্লডিয়া, সাধারণত যেমন পরে থাকে সে। খাটো করে ছাঁটা তুষারশুভ্র চুল। চুলের রঙ আর শার্টের রঙ এক। পরনে নীল জিনস। ঠোঁটে লিপস্টিক আছে, তবে খুবই

পাতলা করে লাগানো। মেকআপ নেয়নি বললেই চলে। ওর এই মেকআপ নিয়ে মারলা তো প্রায়ই ইয়ার্কি মেরে বলে এক কেজি পাউডার আর আধা কেজি লিপস্টিক না হলে ক্লডিয়ার মেকআপই হয় না। আজ সেসব প্রায় কিছুই নেই।
নড়েচড়ে বসল ড্যানি, এরপর আমার পালা। চিঠি এবং গোটা পরিস্থিতি সম্পর্কে যা যা জানি সেটা নিয়ে প্রথমে আলোচনা করতে পারি আমরা। তারপর করতে পারি যা জানি না সেটা নিয়ে। কেমন হয়?
ভাল, নিচুস্বরে বলল মুসা। সবার কাছ থেকে সামান্য দূরে একটা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে বসেছে। সারারাত ঘুমায়নি। এখন সকাল এগারোটা। বাজে। ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে কথাবার্তা শেষ হলে এখানে এই ঘাসের মধ্যে শুয়েই ঘুমিয়ে পড়বে।
এই চিঠি এমন কেউ লিখেছে, শুরু করল ড্যানি, যে আমাদের সবাইকে চেনে। আমাদের গোপন ব্যাপারটা সম্পর্কে জানে। প্রথমে ভেবেছিলাম রসিকতা করছে, কিংবা ফাঁকা বুলি ঝাড়ছে সে। কিন্তু সোফির খুন হওয়ার পর এখন বুঝতে পারছি সে সিরিয়াস। সোফিকে তত্ত্বাবধায়কই খুন করেছে।
কি সব ছেলেমানুষের মত কথা বলছ, ড্যানির কথায় একমত হতে পারল না ক্লডিয়া। সোফি গাড়ি চালাতে গিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট করেছে। পুলিশের মতে এটা নিছকই দুর্ঘটনা। রাতের বেলা এত জোরে গাড়ি চালালে দুর্ঘটনা ঘটতেই পারে।
এ ব্যাপারে আমি তোমার সঙ্গে একমত, রবিন বলল। ওর মনের যা অবস্থা হয়েছিল, তাতে অন্যমনস্ক থাকাটা অস্বাভাবিক ছিল না। এর জন্যে অবশ্যই দায়ী করতে হবে তত্ত্বাবধায়ককে। তার মানে সরাসরি না হলেও পরোক্ষভাবে এই খুনের জন্যে সে-ই দায়ী।
কিন্তু বড় বেশি কাকতালীয়; মেনে নিতে পারছে না ড্যানি।
তোমার কি ধারণা অলৌকিক কোন ক্ষমতা প্রয়োগ করে সোফিকে অ্যাক্সিডেন্ট করতে বাধ্য করেছে তত্ত্বাবধায়ক? হাত নাড়ল রবিন, আমি, একথা বিশ্বাস করতে রাজি না।
কিন্তু একটা কথা তো ঠিক, মারলা বলল, চিঠিতে লিখেছিল ওর কথার অবাধ্য হলে মারাত্মক পরিণতি ঘটবে। সোফি অবাধ্য হয়েছে, ওর কথামত কুকুরের বাচ্চাটাকে চুবিয়ে মারেনি, অতএব তাকে মরতে হলো। আর কি। ভয়ঙ্কর মৃত্যু! ধড় থেকে মাথাই আলাদা... কেঁপে উঠল মারলা। চোখের কোণে পানি টলমল করে উঠল। সোফির জন্যে থেকে থেকেই কাঁদছে। খুব ঘনিষ্ঠ বান্ধবী ছিল।
বেশি নাটকীয় করে ফেলছ সবকিছু, অত আবেগের ধার দিয়ে গেল না ক্লডিয়া। অ্যাক্সিডেন্ট হলে আরও কত বিকৃত হয়ে যায় মানুষের দেহ। টুকরো টুকরো হয়ে যায়, থেতলে ভর্তা হয়ে যায়। সেই তুলনায় এটা তো কিছুই না।

তা ঠিক, একমত হয়ে মাথা দোলাল ড্যানি। ব্যাপারটাকে স্বাভাবিক অ্যাক্সিডেন্ট বলে ধরে নেয়াই ভাল। কারণ ওই সময় তত্ত্বাবধায়ক গাড়িতে ছিল না। থাকলে সে-ও বাচত না। চিঠি যখন লিখতে পারে, তখন নিশ্চিতভাবেই বলা যায় ভূত নয় সে। তোমার-আমার মতই মানুষ। আমার ধারণা, সরাসরি ও খুন করেনি সোফিকে। তবে পরোক্ষভাবে যে এই খুনের জন্যে সে দায়ী, তাতেও কোন সন্দেহ নেই।

আচ্ছা, মুসা বলল, গাড়ির যন্ত্রপাতির মধ্যে কোন কারসাজি করে রাখেনি তো তত্ত্বাবধায়ক? যাতে ব্রেক ফেল করে...

ব্রেক ফেল করে মারা যায়নি সোফি। মনে করিয়ে দিল রবিন, পুলিশ অফিসার কি বলল? গাছের সঙ্গে তো লাগিয়েছে। তারমানে বেপরোয়া গাড়ি চালাতে গিয়ে রাস্তা থেকে সরে ধাক্কাটা লাগিয়েছিল সোফি। এর মধ্যে জেমস বন্ড ভিলেনদের শয়তানি খুঁজে লাভ নেই।

কিন্তু শয়তানি তো কেউ একজন করছে। এই চিঠিই তার প্রমাণ।

তবে সে সোফিকে খুন করেনি, এটাও ঠিক, জোর দিয়ে বলল ক্লডিয়া।

ড্যানি বলল, আমার প্রশ্ন, এই তত্ত্বাবধায়ক লোকটা কে?

কেউ জবাব দিতে পারল না। একে অন্যের মুখের দিকে তাকাতে লাগল। জবাবের আশায়। কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর রবিন বলল, আমার কি মনে হচ্ছে জানো? মরুভূমিতে যে লোকটাকে কবর দিয়ে এসেছি আমরা, তার কোন পরিচিত লোক কিংবা বন্ধু হতে পারে।

সে কেন করবে একাজ?

প্রতিশোধ। আমরা ওর বন্ধুকে খুন করেছি। সে এখন আমাদের শাস্তি দেবে।

ব্ল্যাকমেইল?

না, তাহলে টাকা চাইত। বা অন্য কোন কিছু। সে আমাদের এমন সব কাজ করতে বলছে, যাতে আমরা ভয়াবহ মানসিক যন্ত্রণা পাই।

সেই লোকটা কে? আবার আগের প্রশ্নে ফিরে গেল ড্যানি।

কি করে বলব? হতাশ ভঙ্গিতে দুই হাত তুলল রবিন। জানলে তো গিয়ে চেপেই ধরতাম। যে লোকটাকে গাড়ি চাপা দিলাম তার পরিচয়ই জানি না, আর এর কথা জানব কিভাবে?

এখন কিশোরকে খুব প্রয়োজন ছিল আমাদের, হাই তুলতে তুলতে। বলল মুসা। এত জটিল একটা ধাঁধার সমাধান ও ছাড়া আর কেউ করতে পারবে না।

আবার এক মুহূর্ত নীরবতার পর ক্লডিয়া বলল, আমাদের মধ্যে কেউ কাজটা করিনি তো? জোক করার জন্যে? সবার মুখের দিকে তাকাতে লাগল সে।

তুমি কিছু করেছ কিনা তুমি জানো, মারলা বলল, তবে আমি এই জঘন্য চিঠি লিখিনি। সোফিকেও আমি খুন করিনি।
আবার খুনের কথা আসছে কেন? ও তো নিজে নিজে অ্যাক্সিডেন্ট করে মারা গেছে। আমি বলতে চাইছি চিঠিটার কথা:..
লিখলে তাহলে তুমিই লিখেছ, রেগে গেল মারলা, তোমার মাথায়ই ছিট আছে। এখানে ছিলেও না অনেকদিন। চিঠি লিখে ডাকে ফেলে পালিয়ে গিয়েছিলে। তোমার এই জঘন্য শয়তানির জন্যেই ঘাবড়ে গিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট করে সোফি মারা গেছে। ওর মৃত্যুর জন্যে তুমি দায়ী।
দেখো, মুখ সামলে কথা বোলো! আগুন জ্বলে উঠল ক্লডিয়ার চোখে। চিঠিটা যেদিন পেয়েছ তোমরা তার বহু আগে আমি শহর থেকে চলে গেছি…
আহ, কি শুরু করলে তোমরা! বিরক্ত হয়ে হাত নাড়ল রবিন। নিজেরা নিজেরাই মারামারি শুরু করে দিচ্ছ! থামো! চুপ করো!
মুসা বলল, অহেতুক নিজেদের সন্দেহ করছি আমরা। আমাদের মধ্যে কেউ তত্ত্বাবধায়ক নই। আসল কথা বাদ দিয়ে বসে বসে ঝগড়া করলে কাজ এগোবে না।
সরি! নিজেকে সামলে নিল মারলা।
ক্লডিয়ারও চোখের আগুন নিভে এল।
ড্যানি বলল, সমস্যাটা এখন আমার কাঁধে। কারণ এরপর আমাকে টার্গেট করেছে তত্ত্বাবধায়ক। যে কাজটা করতে বলেছে মরে গেলেও আমি তা করতে পারব না।
তা তো সম্ভবই নয়, মাথা নাড়ল ক্লডিয়া। যত বড় হুমকিই দিক তত্ত্বাবধায়ক, ছোট বোনের হাত পোড়ানোর প্রশ্নই ওঠে না।
পুলিশকে জানানো দরকার, রবিন বলল।
মাথা সোজা করল মারলা। পাগল হয়েছ?
না, হইনি। একটা অন্যায়কে ধামাচাপা দিতে গিয়েই আজ আমাদের এই অবস্থা। কেউ মানসিক শান্তিতে নেই। বুকে হাত রেখে কেউ বলতে পারবে না ঘটনাটার পর কোন একরাত শান্তিতে ঘুমাতে পেরেছে কেউ। আর সেই অপরাধটা গোপন করার কারণেই চিঠি লিখে হুমকি দেয়ার সুযোগ পেয়েছে তত্ত্বাবধায়ক।
পুলিশকে জানালে এখন জেলে যেতে হবে, ভোঁতা গলায় বলল ড্যানি। তাতে আমার অন্তত আপত্তি নেই। কারও থেকে থাকলে সে গিয়ে আগে একজন উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করতে পারো।
তোমার শাস্তিটাই সবচেয়ে বেশি হবে, ড্যানি, মারলা বলল। কারণ গাড়িটা তুমি চালাচ্ছিলে। লোকটাকে তুমি চাপা দিয়েছ…

সেজন্যেই তো যেতে চাই। যতই দিন যাবে, মনের যন্ত্রণা বাড়বেই, শুধু, কমবে না। এই পনেরো দিনে সেটা ভালমতই বোঝা হয়ে গেছে আমার। কোন শাস্তির ভয়েই আর ব্যাপারটা গোপন রাখতে রাজি নই আমি।
কিশোর থাকলে আমাদের এই অবস্থা হত না, রবিন বলল। একটা না একটা ব্যবস্থা করেই ফেলত ও।
কি করত? ভুরু নাচাল ক্লডিয়া। এটা কোন রহস্য নয় যে তার সমাধান করবে। জলজ্যান্ত একজন লোককে গাড়িচাপা দিয়ে মেরে ফেলেছি। আমরা। কিশোর কি করবে? সবারই কমবেশি দোষ ছিল সেদিন। ড্যানি তো বলেইছিল, কনসার্ট শুনে মাথা গরম হয়েছিল ওর, চেঁচামেচিতে কানের মধ্যে ঝা-ঝা করছিল, তারপরেও ওকে গাড়ি চালাতে দিলাম কেন? দিলাম তো দিলাম, শান্তভাবে চুপচাপ বসে থাকলেই পারতাম। এমন হট্টগোল শুরু করলাম গাড়ির মধ্যে, এ ওর গায়ে ঢলে পড়তে লাগলাম, স্যান্ডউইচ নিয়ে খাবলাখাবলি শুরু করলাম যেন জীবনে খাইনিঃ...এবং তার ওপর হেডলাইট না। জেলে অন্ধকারে গাড়ি চালানোর বাজি..
থাক, ওসব স্মৃতিচারণ করে আর লাভ নেই এখন, বাধা দিল রবিন। ভাবলেও রাগ লাগতে থাকে। বরং ড্যানির ব্যাপারটা নিয়ে কি করা যায় তাই বলো।
যদি মনে করো, ক্লডিয়া বলল, তত্ত্বাবধায়কের কথা না শুনলে সত্যি সে কোন অঘটন ঘটাবে, তাহলে পুলিশের কাছে যাওয়াই ভাল।
ঘটায় কিনা সেটা দেখলে কেমন হয়? প্রস্তাবটা ড্যানিই দিল।
সত্যি দেখতে চাও?
চাই বলাটা ভুল হবে। হুকুম যা দিচ্ছে তাতে তো পরিষ্কার সে একটা উন্মাদ। কোন সুস্থ লোক এসব করার কথা বলতে পারত না। কাপুরুষ বলো আর যা-ই বলো, কাউকে কিছু না জানিয়ে পালিয়ে যাওয়াই উচিত এখন। আমার, তত্ত্বাবধায়কের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। কোথায় গেছি জানতেও পারবে না সে, ক্ষতিও করতে পারবে না।

.

পুরানো প্রিয় জায়গায় ফিরে যেতে ভাল লাগে মানুষের। বিশেষ করে সেই জায়গাটা যদি কোন কারণে তার কাছে নিষিদ্ধ হয়ে যায় তাহলে আকর্ষণ যেন আরও বেড়ে যায়। রকি বীচে ফিরে অনির্দিষ্টভাবে ঘোরাঘুরি করতে করতে কখন যে স্কুলের স্টেডিয়ামের কাছে চলে এল মুসা, নিজেও বলতে পারবে না। বাইরে গাড়ি রেখে মাঠে ঢুকল। বাস্কেটবল খেলতে তাকে আপাতত বারণ করে দিয়েছেন ডাক্তার। তবে এটাও বলেছেন, মেরুদণ্ড ব্যথা করলেও হালকা ব্যায়ামে কোন অসুবিধে হবে না। ভাল দৌড়াতে পারে সে। মানে, পারত। কোয়ার্টার মাইল আর

হাফমাইলে লীগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। এখনও কি শরীরের সে-ক্ষমতা অটুট আছে?
শার্ট-প্যান্ট-জুতো খুলে রেখে শুধু আন্ডারওয়্যার পরে মাঠের একধার থেকে দৌড়ানো শুরু করল সে। প্রথমে খুব ধীরে। গতি বাড়তে লাগল। ছন্দময় পদক্ষেপ। দেখতে দেখতে গতি উঠে গেল অনেক।
জোরে জোরে দম ফেলছে। কিন্তু পরিশ্রম লাগছে না। বাহ্, ভালই তো পারছে। যেন মুক্তির আনন্দ। ডানাভাঙা পাখির ডানা ফিরে পাওয়ার মত। মন থেকে ঝেটিয়ে বিদেয় হয়ে যাচ্ছে সমস্ত দুশ্চিন্তা। বিষণ্নতা কেটে যাচ্ছে।
এক মাইল দৌড়াল সে-দুই মাইল:-তিন-চার...
থামল যখন, দেহের প্রতিটি পেশি অবশ হয়ে গেছে। ঘামছে দরদর করে। হেঁটে চলে এল মাঠের ধারে একটা গাছের নিচে। সবুজ ঘাসে শুয়ে পড়ল চিত হয়ে। আকাশ দেখতে পাচ্ছে। নীল, পরিষ্কার আকাশ। মন উড়ে গেল যেন সুদূর মহাশূন্যে। ভেসে বেড়াতে লাগল শরীরটা।
ঘুম ভাঙলে দেখল আকাশের নীল রঙ ধূসর হয়ে গেছে। ঝলমলে রোদ হারিয়ে গেছে বহু আগে। তারা ফুটবে এখনই। অন্ধকারের দেরি নেই। কি কাণ্ড! সারাটা দিন গাছের নিচে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিল, অথচ মনে হচ্ছে এই তো মাত্র কয়েক সেকেন্ড আগে শুয়েছে।
উঠে বসল। ক্লান্তিতে ভেঙে আসছে শরীর। ব্যথা করছে সর্বাঙ্গ। এত ঘুমিয়েও ঝরঝরে হয়নি। তবে দুশ্চিন্তা করল না সে। ব্যায়ামে দীর্ঘদিন বিরতি দিয়ে আবার হঠাৎ শুরু করলে এরকমই হয়। হাঁটতে হাঁটতে ফিরে এল কাপড়গুলো যেখানে ফেলে গিয়েছিল সেখানে। পরে নিল। ধীরেসুস্থে করছে সবকিছু। বাড়ি ফেরার তাড়া নেই। দিনটা.তো কাটাল। এখন কি করবে? যাবে কোথায়? বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করছে না। ভাবতে ভাবতে চলে এল। গাড়ির কাছে।
স্টিয়ারিং হুইলের পেছনে উঠে বসল। পা দুটো আড়ষ্ট লাগছে। মাথা ধরেছে। গাড়িতে ওষুধের শিশি আছে। ব্যথা পাওয়ার পর থেকে টাইলিনল ট্যাবলেট রাখে সঙ্গে। শিশিটা বের করে দুটো ট্যাবলেট নিয়ে মুখে পুরল। চিবিয়ে গুড়ো করে পানি ছাড়াই গিলে ফেলল তেতো ওষুধ। শিশিটা আবার রাখতে গিয়ে হাতে ঠেকল একটা কাগজের টুকরো। ফেলে দেয়ার জন্যে বের করে আনল। স্ট্রীটল্যাম্পের হ্যালোজেন লাইটের আলোয় লেখার ওপর চোখ পড়তেই কাগজধরা আঙুল দুটো শক্ত হয়ে গেল। ক্রিসি ট্রেভারের ঠিকানা আর ফোন নম্বর।
ঘড়ি দেখল। মোটে সাতটা বাজে। কানে বেজে উঠল ক্রিসির কণ্ঠ: বিকেলের পর আর বেরোই না আমি। তোমার ম্যাসাজ দরকার হলে ওই সময়টায় এসো।

কিন্তু আজ শনিবার। ওর মত অল্পবয়েসী একজন মহিলা কি ছুটির সন্ধ্যায় ঘরে বসে থাকবে? আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা দিতে না যাক, সিনেমায়ও তো চলে যেতে পারে? যাওয়ার আগে ফোন করে নেয়া দরকার।
গাড়ি চালিয়ে সবচেয়ে কাছের ফোন বুদটায় এসে ক্রিসির নম্বরে ডায়াল করল সে।
তৃতীয় রিঙে ধরল ক্রিসি। বাড়িতেই আছে। হালো?
ক্রিসি? আমি মুসা।
একটা মুহূর্ত চুপ করে রইল ক্রিসি। তারপর ভেসে এল তার উচ্ছল কণ্ঠ, হাই, মুসা। কেমন আছ?
ভাল। আপনি কেমন?
ভাল। একা একা ঘরে বসে অবশ্য বিরক্ত লাগছে। কি করছ?
একা একা রাস্তায় ঘুরতে আমারও ভাল লাগছে না। দিনের বেলা খুব দৌড়াদৌড়ি করেছিলাম। ব্যথা করছে।
তারমানে ম্যাসাজ লাগবে? হাসল ক্রিসি। নো প্রব্লেম। চলে এসো।
যে মলে ওদের দেখা হয়েছিল তার কাছাকাছিই একটা নতুন অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্সে থাকে ক্রিসি। মুসা বেল বাজাতেই দরজা খুলে দিল। কালো প্যান্ট আর সাদা ব্লাউজ পরেছে। নার্সের সাদা পোশাকের চেয়ে এই কাপড়ে অনেক বেশি সুন্দরী লাগছে ওকে। সবুজ চোখে উজ্জ্বলতা। লিপস্টিক লাগানো ঠোঁটে আন্তরিক হাসি।
এসো, ভেতরে এসো, দরজা থেকে সরে জায়গা করে দিল ক্রিসি। নোংরা করে রেখেছি। কিছু মনে কোরো না।
ঘরের চারপাশে তাকিয়ে দেখল মুসা। নোংরাটা কোথায় বুঝতে পারল না। কেবল একটা কফি-টেবিলে পড়ে থাকা দুটো পেপারব্যাক বইয়ের পাশে রাখা একটা কফির পট আর একটা মগে আধমগ কফি ছাড়া। ঘরের সমস্ত আসবাব বেশ উঁচু মানের। ক্রিসির বাবা-মা মনে হয় খুব ধনী। টাকা দিয়ে তারাই বোধহয় সাহায্য করে। হাসপাতালে নার্সের চাকরি করে এত বিলাসিতায় বাস করা সম্ভব নয়।
কেমন একটা বিচিত্র ধোয়া ধোয়া গন্ধ ঘরের বাতাসে। কোন ধরনের সুগন্ধী? বুঝতে পারল না মুসা।
ওর মুখ দেখেই অনুমান করে ফেলল যেন ক্রিসি, বোঝা যায়?
যায়। কিসের? মশার কয়েল?
না না, কয়েলের এত ভাল গন্ধ হয় নাকি। ও তো দম আটকে দেয়। এটা ধূপের গন্ধ। ইনডিয়ায় খুব ব্যবহার এটার, জানো: বোধহয়। মশা তাড়াতে কাজ করে

ধূপের ধোয়া। আরও নানা কাজে, বিশেষ করে দেবদেবীর পূজায় ব্যবহার করে ওরা এই জিনিস।
এখানে তো মশা নেই। আপনি কিসের পূজা করেন?
হেসে প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল ক্রিসি। করি যেটারই হোক। কফি খাবে?
দিতে পারেন। মাথাটা খুব ধরেছে।
দুধ দিয়ে না দুধ ছাড়া?
দুধ দিয়ে। চিনি দেবেন বেশি করে যাতে তেতোটা না থাকে।
রিফ্রিজারেটরের দিকে ঘুরল ক্রিসি। আমি খাই খুব কড়া। দুধ চিনি ছাড়া। আর এত গরম, জ্বলতে জ্বলতে ভেতরে নামে। কি, অবাক লাগছে শুনতে? হাসপাতালের সব নার্সই এরকম খায়। নাইট ডিউটি করতে হয় যে।
হাসপাতালে আসলে কাজটা কি করেন আপনি? জিজ্ঞেস করল মুসা।
এই নানা রকম টুকটাক কাজ, দুধ আর চিনি বের করে আনল ক্রিসি। একটা কাপও আনল। পট থেকে কফি ঢেলে তাতে দুধ-চিনি মিশিয়ে ঠেলে দিল মুসার দিকে। বাজে চাকরি। ছেড়ে দেয়ার কথা ভাবছি আমি।
সেটা কি ঠিক হবে?
মুসার মুখোমুখি বসল ক্রিসি। সবুজ চোখ মেলে তার দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচাল, কেন হবে না?
ঘরের জিনিসপত্রের দিকে ইঙ্গিত করল মুসা, বেতন তো ভালই পান মনে হচ্ছে।
নাকি বাবার টাকা আছে?
বাবার টাকাই বলতে পারো, মগ তুলে কফিতে চুমুক দিল ক্রিসি। দেখা হওয়ার পর থেকেই তোমার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম আমি। তুমি ফোন করবে জানতাম।
কি করে জানলেন?
অনুমান। খেলোয়াড়রা চায় ওষুধপত্র খেয়ে, ম্যাসাজ করে যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব রোগ আর ব্যথা কমিয়ে ফেলতে। খেলার মাঠ ছাড়া থাকতে পারে না তো।
হেসে ফেলল মুসা। ঠিকই বলেছেন। এখন কোত্থেকে এসেছি জানেন? মাঠ থেকে। দিনের বেলা এমন দৌড়ান দৌড়েছি...তারপর ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়লাম গাছের নিচে। এক ঘুমে পার করে দিয়েছি সারাটা দিন।
হাসল ক্রিসি। কফিটা শেষ করো। তারপর শুরু করছি।

.

পার্ক থেকে ফেরার পর গুম হয়ে বাড়িতে বসে রইল রবিন। একা বাড়িতে কিছুই ভাল লাগছে না। খেতে ইচ্ছে করছে না। টিভি দেখতে ইচ্ছে করছে না। এমনকি বই পড়তেও ভাল লাগছে না। না খেলে শরীর ভেঙে পড়বে। তাই সামান্য কিছু

মুখে দিয়ে এসে শুয়ে পড়ল বিছানায়। মুসার মতই আগের রাতটায় তারও ঘুম হয়নি।
বিকেলে টেলিফোনের শব্দে ঘুম ভাঙল। ক্লান্ত, ভঙ্গিতে উঠে গিয়ে রিসিভার তুলল। হালো?
ওপাশের কণ্ঠটা শুনে সচকিত হয়ে উঠল মুহূর্তে। কিশোর! ফিরেছ! কখন?
এই তো খানিক আগে। মুসাদের বাড়িতে ফোন করলাম। পেলাম না। ও কোথায়, জানো নাকি?
কিশোর, উত্তেজনায় রীতিমত কাঁপছে রবিন। অনেক কথা আছে। তুমি তো ছিলে না, জানোও না। সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে গেছে। তোমার সঙ্গে দেখা করা দরকার। এখুনি। ইয়ার্ডে আসছি আমি। তুমি কোথাও বেরিয়ো না।
এসো। বেরোব না।

.

হু, ভাল বিপদেই পড়েছ! আনমনে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। পুলিশের কাছে না যাওয়াটাই বোকামি হয়ে গেছে। সবচেয়ে বড় ভুল। ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্লেচারের কাছে গিয়ে খুলে বলতে পারতে।
কি করব? রবিন বলল। সবাই এমন বিরোধিতা শুরু করল, বাধা দিতে লাগল, কিছুই করতে পারলাম না। অ্যাক্সিডেন্টটা করে ড্যানি তো পুরোপুরি বোকা হয়ে গিয়েছিল। কথাই বেরোচ্ছিল না মুখ দিয়ে।
স্যালভিজ ইয়ার্ডে জঞ্জালের নিচে তিন গোয়েন্দার হেডকোয়ার্টারে মুখোমুখি বসে আছে দুজনে। কিশোর বসেছে ডেস্কের ওপাশে তার চেয়ারে। অন্যপাশে একটা টুলে পিঠ বাকা করে বসেছে রবিন।
ওই সব ঘোড়ার ডিম কনসার্টগুলো এই জন্যেই আমার ভাল লাগে না, মুখ বাকিয়ে বলল কিশোর। কোন আনন্দ তো নেইই, যত রাজ্যের হট্টগোল আর পাগলামি। গায়কদের দেখে মনে হয় না ওরা কোন সুস্থ লোক। সব যেন উন্মাদ। ওসব দেখে বেরোলে কোন লোকের মাথা ঠিক থাকে? ড্যানি তো সহ্য করতে পারে না জানোই, গাড়ি চালাতে দিলে কেন?
সেটাও হয়ে গেছে আরেক বোকামি, বিষণ্ন কণ্ঠে বলল রবিন। যা হবার তা হয়েছে। এখন কিভাবে মুক্তি পাওয়া যায়, তাই বলো? পুলিশের কাছে যাব?
ঘন ঘন নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে শুরু করল কিশোর। কয়েক সেকেন্ড পর মাথা ঝাঁকাল, যেতে তো হবেই। সঙ্গে সঙ্গে গেলে শুধু ড্যানির। শাস্তি হত, জেলে যেত সে একা। তবে তোমরা বেঁচে যেতে...
সেজন্যেই তো গেলাম না।

কিন্তু এখন সবাইকে জেলে যেতে হবে। ড্যানি যাবে অ্যাক্সিডেন্ট করে খুন করার অপরাধে, আর তোমরা যাবে লাশ গুম করতে তাকে সহযোগিতা আর সত্য গোপন রাখার অপরাধে। বাঁচতে আর কেউ পারবে না।
না পারলে নেই। জেলে গিয়ে বসে থাকা বরং অনেক ভাল। একে তো অপরাধ করে মানসিক চাপে ভুগছি, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এই তত্ত্বাবধায়কের যন্ত্রণা। সহ্যের সীমা ছাড়িয়েছে। শীঘ্রি এ থেকে মুক্তি না পেলে পাগল হয়ে যাব।
চুপ করে ভাবতে লাগল কিশোর।
অধৈর্য হয়ে উঠল রবিন, কি ভাবছ?
উ! ঠোঁট থেকে আঙুল সরাল কিশোর। পুলিশের কাছে তো যেতেই হবে। ভাবছি, নিজেরা আগে একবার তদন্ত করে দেখলে কেমন হয়।
কি তদন্ত করবে?
এই তত্ত্বাবধায়ক লোকটা যদি তোমাদের কেউ না হয়ে থাকে তাহলে বাইরের লোক। অ্যাক্সিডেন্টের কথাটা সে জানে। আমার প্রথম প্রশ্ন: কি করে জানল? তোমাদের মধ্যে মুখ ফসকে কেউ বলে ফেলেছে অন্য লোকের সামনে। তা যদি না হয়ে থাকে তাহলে খুন হওয়া লোকটার সঙ্গে তত্ত্বাবধায়কের কোন সম্পর্ক ছিল। কিংবা অ্যাক্সিডেন্টটা সেরাতে ঘটতে দেখে। ফেলেছে সে।
না, দেখেনি, আমি শিওর। ওই সময় ত্রিসীমানায় কোন লোক কিংবা গাড়ি দেখা যায়নি। কেউ ছিল না।
তাহলে জানল কি করে? বেশ, তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম, যেভাবেই হোক জেনেছে...
জেনেছে তাই বা কি করে বলব? চিঠিতে তো উল্লেখ করেনি। কেবল লিখেছে: তোমাদের গোপন কথাটা আমি জানি। অনেক ব্ল্যাকমেইলারই একরম আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ে কামিয়াব হয়ে যায়, সেজন্যেই বলে এমন করে।
তা হয়। কিন্তু আমাদের এই বিশেষ লোকটি আসল কথাটা জানে না এটা ভেবে ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে না। ও জানতেও পারে। তত্ত্বাবধায়ককে খুঁজে বের করতে হলে এখন আমাদের প্রথম কাজ হবে সেই মৃত লোকটার পরিচয়। জানা। এমনও হতে পারে লোকটাকে ড্যানি খুন করেনি। ত্রিসীমানায় আর কোন গাড়ি দেখোনি বলছ। এমনও হতে পারে আগেই তাকে খুন করে এনে রাস্তার ওপর ফেলে রেখেছিল কেউ। এবং সেই কেউটা হতে পারে এই তত্ত্বাবধায়ক। কেবল এইভাবেই তোমাদের কথা তার জানা সম্ভব।
এতক্ষণে হাসি ফুটল রবিনের মুখে। এই না হলে কিশোর পাশা। এতদিন ধরে এই সহজ কথাটা ওদের কারও মাথায় আসেনি। তাহলে এই সম্ভাবনার কথাটা আমরা গিয়ে পুলিশকে বললেই তো পারি?

না, মাথা নাড়ল কিশোর, আমি বিশ্বাস করছি বলেই যে ওরাও করবে, তা না-ও হতে পারে। করাতে হলে এর স্বপক্ষে কিছু প্রমাণ জোগাড় করা দরকার।
কি করে করবে? কোন সূত্রই তো নেই।
পুলিশ স্টেশনে গিয়ে ওদের কম্পিউটার ব্যবহার করতে পারি। গত এক মাসে যত লোক নিখোঁজ হয়েছে, তাদের লিস্ট বের করব। ওদের মধ্যে থেকে খুঁজে বের করব আমাদের বিশেষ লোকটাকে। এখন ওর চেহারা-সুরৎ সম্পর্কে যতটা পারো, জানাও আমাকে। কবর দেয়ার আগে দেখেছ তো?
মাথা ঝাঁকাল, রবিন। যতটা সম্ভব নিখুঁতভাবে লোকটার চেহারার বর্ণনা দেয়ার চেষ্টা করুল রবিন। বয়েস সাতাশ-আটাশ, ককেশিয়ান, সুদর্শন। গায়ে। ছিল তামাটে স্পোর্টস কোট আর হালকা বাদামী স্ন্যাকস।
হু, চমৎকার, একটা পেপারওয়েট নিয়ে উল্টো করে গোল মাথাটা টেবিলে রেখে ঘোরাতে লাগল কিশোর। আচ্ছা, ড্যানি সত্যি সত্যি শহর ছেড়ে চলে যাবে তো?
তাই তো বলল।
কোথায় যাবে কাউকে কিছু বলেছে?
জানি না। মুসাকে বলতে পারে। ওর সঙ্গে খাতির বেশি।
না বললেই ভাল করবে, পেপারওয়েটটার দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করল কিশোর।
কেন? মুসা মরে গেলেও কাউকে বলবে না।
জবাব না দিয়ে আচমকা উঠে দাঁড়াল কিশোর। চলো, বেরোই। পুলিশ। অফিসে যেতে হবে।

.

রকি বীচ পুলিশ স্টেশনের কম্পিউটার রুমটা বেশ সাজানো-গোছানো। ঢোকার মুখে ডেস্কে বসে কাজ করছেন একজন অফিসার। তিন গোয়েন্দাকে চেনেন। কম্পিউটার থেকে কিছু তথ্য নিতে চায় জানাল কিশোর।
কেন, কোন কেসের তদন্ত করছ নাকি?
মাথা ঝাঁকাল কিশোর, হ্যাঁ।
কি কেস?
এখনও বলার সময় আসেনি।
কিশোর পাশার স্বভাব জানা আছে অফিসারের। হেসে ঢোকার অনুমতি দিয়ে দিলেন।
ঘরটা এখন খালি। কেউ নেই। থাকার কথাও নয়। কোন কাজ না পড়লে, অর্থাৎ তথ্যের দরকার না হলে কেউ ঢোকে না এখানে। সারাক্ষণ বসে ডিউটি দেয়ার প্রয়োজন পড়ে না।

ঢুকেই রবিনের উদ্দেশ্যে লেকচার শুরু করল কিশোর, কম্পিউটার হলো আগামী প্রজন্মের ডিটেকটিভ। সঠিক প্রোগাম আর সঠিক ডাটা সরবরাহ করতে পারলে যে কোন ধাঁধার জবাব দিয়ে দিতে পারে কম্পিউটার। রহস্য সমাধান করতে চাইলে এর চেয়ে যোগ্য গোয়েন্দা আর কোথাও পাবে না। এর জন্যে কয়েকটা প্রোগ্রামও লিখেছি আমি। আমার নিজস্ব উদ্ভাবন। কাজে লাগানোর সুযোগ খুঁজছিলাম। পেয়ে গেছি আজ। আমি যেটা ব্যবহার করব, একধরনের ফিল্টার বা ছাঁকনি বলতে পারো একে। আসল লোকটাকে ছাড়া বাকি সব বাদ দিয়ে দেবে। এটা করতে পারা খুব জরুরী। সময় বাঁচবে অনেক। প্রতিমাসে লস অ্যাঞ্জেলেসে কত লোক যে নিখোঁজ হয়, হিসেবটা শুনলে তুমি আঁতকে উঠবে।
যায় কোথায় ওরা? জানতে চাইল রবিন।
কোথায় আর যাবে? বেশির ভাগই পালায়। অসুখী স্বামী কিংবা স্ত্রী। পালিয়ে বাঁচে।
হুহ
হাসছ?
তো কি করব? খুনের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই।
একেবারেই নেই তা বলা যাবে না। এদের কেউ কেউ খুনও হয়ে যায়। এখানকার কেসফাইলগুলো যদি সব পড়তে তাহলে হাসি মুছে যেত মুখ থেকে। মনে হত দুনিয়াটা বড় বিশ্রী জায়গা। এখানে হাসির কিছু নেই।
তোমার লেকচারটা একটু থামাও না দয়া করে।
কেন, ভাল লাগছে না?
মানুষের চরিত্র নিয়ে আলোচনা করতে আমার ভাল লাগে না।
বলো কি! মানুষ নিয়ে গবেষণা করাটাই তো সবচেয়ে মজার। এত রহস্যময় আর বিচিত্র প্রাণী সারা দুনিয়ায় আর একটাও খুঁজে পাবে না তুমি। মানুষ যে কি করে আর করে নাঃ অত
দোহাই তোমার, কিশোর, হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গিতে দুহাত তুলল রবিন, কচকচি ভাল্লাগছে না! যা করতে এসেছ, করো।
চিন্তিত ভঙ্গিতে ওর দিকে তাকিয়ে থেকে আনমনে মাথা দোলাল কিশোর, হু, তোমার মনমেজাজ এখন খুব খারাপ। দুশ্চিন্তায় ভরা। এসব কথা এখন তোমার ভাল লাগবে না।
একটা কথা সত্যি করে বলো তো। মানুষ জাতটাকে কি তুমি পছন্দ করো না?
করব না কেন? নিজেও তো মানুষ। মানুষের স্বভাব জানার এত আগ্রহ কেন আমার জানো? ওদের সাহায্য করার জন্যে। মানুষ যেসব অপরাধ করে, কেন করে সেটা যদি না জানো, ভাল গোয়েন্দা তুমি কোনদিনই হতে পারবে না।

একটা কম্পিউটারের সামনে গিয়ে বসে পড়ল কিশোর। নিখোঁজ মানুষদের ফাইলটা খোলার নির্দেশ দিল কম্পিউটারকে। যতটা সময় লাগবে ভেবেছিল রবিন, ফাইল খুলতে তারচেয়ে বেশি সময় লাগিয়ে দিল কম্পিউটার। ফাইলগুলো সব একজায়গায় নেই। বিভিন্ন নামে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। সবগুলোকে জোগাড় করে একখানে এনে খুলতে সময় লাগবেই। অপেক্ষা করতে হবে।
নামগুলো সব লাইন দিয়ে ফুটে উঠলে এক এক করে বাছাই শুরু করল কিশোর। রাশি রাশি নাম থেকে বাছাই করে রাত এগারোটায় ছয়টা নামে এনে ঠেকাল। কমে যাওয়ায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল দুজনেই।
এবার কি করবে? জানতে চাইল রবিন।
দুটো কাজ, দুই আঙুল তুলল কিশোর। এক, ফোন বুক দেখে ঠিকানা জেনে নিয়ে ওদের আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করব। হয়তো দেখা যাবে ছয়জনের মধ্যে কয়েকজনই আর নিখোঁজদের মধ্যে নেই, বাড়ি ফিরে গেছে। তালিকা থেকে বাদ যাবে ওরা। আরও কমে আসবে নিখোঁজের সংখ্যা। দ্বিতীয় কাজটা করতে পারি পত্রিকা দেখে। বিজ্ঞাপনের পাতার নিখোঁজ সংবাদে ওদের নাম-ঠিকানা দিতে পারে। তাতে সময় লাগবে অনেক বেশি। মাইক্রোফিল্ম করে কম্পিউটারে ভরে রাখা প্রতিটি পাতা দেখে দেখে ওই ছয়জনের নাম-ঠিকানা বের করতে সারারাতও লেগে যেতে পারে। তারপরেও কথা আছে, যদি পত্রিকায় থাকে। নইলে কষ্টটাই সার হবে।
কিন্তু এখন তো বাজে রাত এগারোটা। এত রাতে মানুষের বাড়িতে ফোন করবে?
উপায় কি? সময় এখন অতি মূল্যবান। কথা না বলে এসো হাত লাগাও। সেরে ফেলি। পত্রিকায় খোঁজার চেয়ে ডিরেক্টরিতে খোঁজাই সহজ হবে।
আসলেই সহজ হলো। পনেরো মিনিটেই ছয়জনের মধ্যে চারজনেরই ঠিকানা জোগাড় করে ফেলল। দেরি না করে ফোন শুরু করল। প্রথমজন কিশোর দুটো কথা বলার আগেই ফোন রেখে দিল। দ্বিতীয়জন মহিলা। নিখোঁজ লোকটার কথা বলতেই কাঁদতে শুরু করল। শিকারে গিয়ে হারিয়ে গিয়েছিল তার স্বামী। কয়েকদিন পর ভালুকের গুহার সামনে পাওয়া যায় তার। ক্ষতবিক্ষত লাশ। তৃতীয়জনও মহিলা। তার বাড়ির নিখোঁজ লোকটার কথা জিজ্ঞেস করতেই রেগে উঠল। জানাল, আরেক মহিলার কাছে চলে গেছে। তার স্বামী। খোঁজ পাওয়া গেছে। চতুর্থ নম্বরটায় রিঙ হয়েই চলল, হয়েই চলল। ধরল না কেউ।
কয়েকবার চেষ্টা করে রিসিভার রেখে দিল কিশোর। মনে হয় বাড়ি নেই। দেখা যাক, খানিক পরে আবার করব।
বাকি দুজন?

নামের তালিকার দিকে তাকাল কিশোর। ডেভন ব্রেক আর ইয়ান জোসেফ। ডিরেক্টরিতে তো পেলাম না।
ভুরু নাচাল রবিন, কি করবে?
ডিরেক্টরিতে যখন পেলাম না, পত্রিকাতেই দেখতে হবে।
খুব বেশিক্ষণ লাগল না প্রথম নামটা বের করতে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ডেভন ব্রেকের ওপর লেখা একটা প্রতিবেদন পেয়ে গেল রবিন। ছবি সহ। দেখেই চোখ কপালে। সেই চেহারা। মরুভূমিতে চিত হয়ে পড়ে থাকা লাশের মুখটা ভেসে উঠল কল্পনায়। একই পোশাক। তামাটে রঙের স্পোর্টস কোট। যেটা সহ ওকে কবর দিয়েছিল ওরা। ছবির সঙ্গে লাশটার তফাত কেবল ওটার ঠোঁটের কোণে রক্ত ছিল, এটার নেই। কম্পিউটারের পর্দার, দিকে কাঁপা কাঁপা তর্জনী তুলে প্রায় ফিসফিস করে বলল, এই সেই লোক!
তুমি শিওর?
ঢোক গিলল রবিন, এই চেহারা জীবনে ভুলব না।
প্রতিবেদনটা একই সঙ্গে পড়তে শুরু করল দুজনে। লিখেছে:
‘ব্যবসায়ী নিখোঁজ
তেত্রিশ বছর বয়স্ক ডেভন ব্রেক, একজন দোকানদার, সাত দিন ধরে নিখোঁজ। সান্তা মনিকার স্থায়ী অধিবাসী তিনি। দোকানটা তাঁর বাবার। প্রায় বাইশ বছর চালিয়েছেন। গানের ক্যাসেট, রেকর্ড, এসব বিক্রি হয়। বাবা মারা যাওয়ার পর ছেলে দোকান চালাত। তাঁর মা মিসেস ড্রেক একজন টীচার। অবসরে সমাজ-সেবার কাজ করেন। ছেলে নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়াতে বড়ই দুশ্চিন্তায় আছেন তিনি। হুট করে কোথায় গেছে, বা কোথায় যেতে পারে তাঁর ছেলে, এ সম্পর্কে কোনই ধারণা নেই তার। ওয়েস্টউড বুলভারে তাদের বাড়ি। গত দশ বছর ধরে সমাজ-সেবার কাজ করে আসছেন মহিলা। তাদের বিরুদ্ধে। কখনও কোন অভিযোগ শোনা যায়নি, কেউ কখনও বদনাম করেনি। ডেভন ব্রেকের কোন খোঁজ যদি কারও জানা থাকে, দয়া করে নিচের ঠিকানায় খবর দিলে বাধিত হবেন মিসেস ব্রেক।‘
চেয়ারে হেলান দিয়ে বিড়বিড় করতে লাগল রবিন, তারমানে ভাল মানুষটাকে খুন করলাম আমরা।
তোমরাই তার মৃত্যুর কারণ কিনা এখনও জানো না, কিশোর বলল। বলেছি না, এমনও হতে পারে আগেই তাকে কেউ খুন করে নিয়ে গিয়ে মরুভূমির ধারের ওই রাস্তায় ফেলে এসেছিল।
হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে রবিন বলল, গোপনে ওকে কবর দেয়াটা যে কত দিক থেকে ভুল হয়ে গেছে: ইস! পুলিশকে যদি জানাতাম, মহিলা জেনে

যেতেন এতদিনে তার ছেলের কি হয়েছে। ইস্, মহিলা নিশ্চয় রোজ ছেলের পথ চেয়ে বসে থাকেন। তার ছেলে আর কোনদিনই ফিরে আসবে না জানলে এই পথ চাওয়ার কষ্ট থেকে বাঁচতেন।
আমার কিছুতেই বিশ্বাস হতে চাইছে না লোকটাকে তোমরা খুন করেছ। ও চাপা পড়ার সময় চিৎকার শুনেছ?
না। চিৎকার করার কোন সুযোগই হয়তো পায়নি সে।
যে ভাবে চাপা পড়েছে বলছ, তাতে মনে হয় রাস্তায় হাঁটার সময় হঠাৎ করে চাকার নিচে চলে এসেছিল সে। সেটা কি সম্ভব? ভেবে দেখো, হাঁটার সময় কারও গায়ে ধাক্কা লাগলে শব্দ হবে, লোকটা চিৎকার করবে সেসবও কোন কিছুই শোনোনি তোমরা।
গাড়ির মধ্যে এত বেশি চেঁচামেচি করছিলাম আমরা, শোনার সুযোগই ছিল না…
কি জানি! আমার দৃঢ় বিশ্বাস, একটা ভুলের শিকার হয়েছ তোমরা। ভয় তোমাদের স্বাভাবিক চিন্তার ক্ষমতাও নষ্ট করে দিয়েছে। যেহেতু কবর দিয়ে ব্যাপারটা গোপন করে ফেলেছ, ওর মাকে কষ্ট দিয়েছ, সেটা পূরণের এখন সবচেয়ে ভাল উপায় হলো আসল খুনীকে ধরে আদালতে সোপর্দ করা। রাত দুপুরে ওই মরুভূমিতে কি করতে গিয়েছিল তার ছেলে, সেটা জানতে হবে আগে।
কিছুটা শান্ত হলো রবিন। কি করে জানব কে খুন করেছে?
অবশ্যই তদন্ত করে। আজ রাতে আর কিছু করার নেই আমাদের। বাড়ি গিয়ে ভালমত একটা ঘুম দাও। কাল সকালে উঠে ব্রেকের দোকানে যাব। ঠিকানা যখন জেনে গেছি, খুঁজে বের করতে কষ্ট হবে না। ওর মার। সঙ্গে দেখা করে কথা বলব।
কি লাভ হবে? নিখোঁজ সংবাদটা দেখে তো মনে হয় না ছেলে কোথায় যেতে পারে এ ব্যাপারে মিসেস ব্রেকের কোন রকম ধারণা আছে।
অনেক সময় জানলেও চেপে যায় মানুষ। নিখোঁজ হওয়ার পেছনে এমন সব কারণ থাকে, যেগুলো লজ্জা কিংবা অস্বস্তিতে পড়ার ভয়ে ফাস করতে চায় না। যে নিখোঁজ হয়েছে তার খোঁজ পাওয়ার জন্যে যতটুকু দরকার, তার বেশি বলে না। রবিনকে কম্পিউটারের সামনের চেয়ারটা থেকে সরিয়ে তাতে বসল কিশোর। আবার খুলল ডেভন ব্রেকের ফাইলটা। হাতের তালুতে থুতনি রেখে পর্দার দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল।
কি দেখছ? জানতে চাইল রবিন।
জবাব না দিয়ে কিশোর জিজ্ঞেস করল, কনসার্টের দিনটা কত তারিখ। ছিল?
জুলাইর শেষ দিন। একতিরিশ।

কিন্তু এই প্রতিবেদনটার তারিখ দেখো। জুলাইর মাঝামাঝি। বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়েছে তোমরা ওকে ধাক্কা দেয়ার দুই হপ্তা আগে। ওর ঠোঁটের কোণে তাজা রক্ত দেখেছ তোমরা। তারমানে মারা গেছে সে একতিরিশ তারিখেই। বাড়ি থেকে বেরোনোর প্রায় পনেরো দিন পর।
ইনটারেসটিং তো!
গুড। মাথায় তাহলে ঢুকতে আরম্ভ করেছে। আমি ভাবছি ওই দুটো হপ্তা কোথায় ছিল ডেভন? কার সঙ্গে? পর্দার দিকে আঙুল তুলল কিশোর। যেন জবাব চায় কম্পিউটারের কাছে। সেটা জানলে খুনী কে সেটাও জানতে পারব সহজেই।
*
পুলিশ স্টেশন থেকে বেরিয়ে কিশোর কোথায় যাবে জানতে চাইল রবিন। কিশোর বলল, রকি বীচে। স্যালভিজ ইয়ার্ডে। গোস্ট লেনে ওদের বাড়িতে থাকতে অনুরোধ করল রবিন। কিশোর বলল, জরুরী কাজ আছে। সকালে উঠেই তাকে বেরোতে হবে। গোস্ট লেন থেকে বেকায়দা। রকি বীচে যাওয়াই ভাল।
আর কিছু বলল না রবিন। চুপচাপ গাড়ি চালাল।
হঠাৎ জিজ্ঞেস করল কিশোর, আংকেলরা কবে ফিরবেন?
দেরি হবে।
হু
আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। এবার রবিন কথা বলল, কিশোর, একটা কথা তোমাকে বলা হয়নি। চিঠিতে আমার নাম নেই। গাড়িতে সেরাতে আমরা যারা যারা ছিলাম, তাদের মধ্যে শুধু আমার নামটাই নেই।
ঝট করে সোজা হলো কিশোর। আগে বলোনি কেন?
ভুলে গিয়েছিলাম। কেন লিখল না বলো তো? এত কিছু যখন জানে তত্ত্বাবধায়ক, নিশ্চয় জানে আমি কে?
তা তো জানেই। সব জানে সে। সেজন্যেই তো দুশ্চিন্তা হচ্ছে আমার।
কেন?
নিশ্চয় কোন উদ্দেশ্য আছে ওর। অকারণে করছে না এসব। আমি শিওর, কারণটা ভয়ানক কিছু।
কফি খাওয়া শেষ হলে লম্বা একটা টেবিলের কাছে মুসাকে নিয়ে এল ক্রিসি। বলল, কাপড় খুলে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ো।
খাইছে! কাপড় খুলব?
হাসল ক্রিসি, কেন, লজ্জা লাগছে? আরে সব খুলতে হবে না। শুধু শাট আর গেঞ্জিটা খোলো। ঘাড়ের কাছটা ডলতে হবে না?
হাঁপ ছাড়ল মুসা, তাই বলুন। আমি তো ভাবলাম…

পাশের ঘরে চলে গেল ক্রিসি। একটা তোয়ালে আর দুটো শিশি নিয়ে ফিরে এল। একটা শিশিতে বড়ি, আরেকটাতে মালিশ। তোয়ালেটা একটা চেয়ারের হেলানে রেখে জিজ্ঞেস করল, রেডি?
হ্যাঁ
উপুড় হয়ে টেবিলে শুয়ে পড়তে গেল মুসা।
দাঁড়াও, শিশি খুলে দুটো বড়ি বের করল ক্রিসি। এদুটো আগে খেয়ে নাও।
পেইন কিলার?
রোগীর অত কথা জানার দরকার নেই, রহস্যময় কণ্ঠে বলে চোখ মটকে হাসল ক্রিসি। যা করতে বলছি করো।
পানি দিয়ে বড়ি দুটো গিলে টেবিলে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল মুসা।
ডান হাতের তালুতে তেল নিয়ে ডলে ডলে দুই হাতেই মিশিয়ে নিল। ক্রিসি। আস্তে করে হাত দুটো রাখল মুসার পিঠে। শিউরে উঠল মুসা। তেলের কারণে নাকি হাতের স্পর্শে, বুঝতে পারল না। তবে অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।
ডলতে শুরু করল ক্রিসি। আস্তে আস্তে চাপ বাড়াচ্ছে।
কেমন লাগছে?
ভাল, অস্বস্তি বোধটা চলে যাচ্ছে মুসার।
তোমার মনে কোন দুশ্চিন্তা আছে, যেন কথার ছলে কথাটা বলল ক্রিসি। প্রশ্ন নয়।
উহু
স্বীকার না করলে কি হবে? আমি জানি, আছে।...পিঠ অত শক্ত কোরো না। আরও ঢিল করো।-হ্যাঁ, এখন বলো তো দেখি তোমার সমস্যাটা কি?
চুপ করে রইল মুসা। এক ধরনের ঘোর লাগছে মাথার মধ্যে। ঝিমুনি ঝিমুনি ভাব। স্বপ্নের জগতে চলে যাচ্ছে যেন সে। সত্যি, ম্যাসাজ করতে জানে বটে ক্রিসি। এত আরাম লাগছে! যেন জাদু করে ব্যথাটা কমিয়ে দিচ্ছে।
ঘুমে জড়িয়ে এল তার চোখ।
ঘুমিয়ে পড়ল..
*
বারান্দা দিয়ে হেঁটে চলল মুসা। পাশে একটা দরজা দেখে থামল। দরজা খুলে উঁকি দিয়ে দেখে একটা বেডরুম। বিছানায় শুয়ে নিশ্চিন্তে নাক ডাকাচ্ছে ওর বন্ধু ড্যানি।
ড্যানি? আস্তে করে ডাকল মুসা। শুনছ? ওঠো। উঠে পড়ো।
আড়মোড়া ভেঙে উঠে পড়ল ড্যানি। হাই তুলতে তুলতে জিজ্ঞেস করল, কে?
আমি, ড্যানি। মুসা।

ওর কথা যেন শুনতেই পায়নি ড্যানি। দরজার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলা, কেরিআন্টি, দাঁড়াও, আসছি।
আন্ডারওয়্যার পরা অবস্থায়ই তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে নেমে দরজার দিকে এগিয়ে গেল সে। মুসার পাশ দিয়েই গেল অথচ ফিরেও তাকাল না ওর দিকে।
কি হলো? দেখল না কেন ওকে? ড্যানি কি অন্ধ হয়ে গেছে? না সে নিজেই ভূত হয়ে গেছে–মানুষের চোখে অদৃশ্য?
দরজায় দাঁড়িয়ে বারান্দায় উঁকি দিল ড্যানি।
একটা শব্দ কানে আসছে মুসার। নিচতলা থেকে।
আবার খালার নাম ধরে ডাকতে লাগল ড্যানি। তারপর ছুটে বেরিয়ে গেল।
নিচে কিসের শব্দ দেখার জন্যে তার পেছন পেছন দৌড় দিল মুসা। চিৎকার করে সাবধান করল ড্যানিকে, ড্যানি, বাইরে যেয়ো না। তত্ত্বাবধায়কটা কোনখান থেকে তাকিয়ে আছে কে জানে!
কিন্তু শুনল না ড্যানি। ওভাবে আন্ডারওয়্যার পরেই নিচতলার সদর দরজার কাছে গিয়ে দরজা খুলে বাইরে তাকাল। গ্যারেজ থেকে মনে হয় শব্দটা আসছে। গাড়ির গায়ে সিরিশ দিয়ে ঘষছে যেন কেউ।
কে ওখানে? চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল ড্যানি।
যেয়ো না, যেয়ো না! বন্ধুর পাশে এসে দাঁড়াল মুসা। ওই লোকটা হবে।
শুনল না ড্যানি। কে কে করতে করতে বেরিয়ে চলে গেল। হাত ধরে। টেনে ওকে ভেতরে নিয়ে আসার চেষ্টা করল মুসা। কিন্তু জোর পেল না। মনে হলো একটা ছায়াকে ধরেছে। খুব সহজেই ওর হাতের মুঠো থেকে পিছলে বেরিয়ে অযত্নে বেড়ে ওঠা লন ধরে দৌড় দিল ড্যানি।
ড্যানি, আল্লার দোহাই লাগে তোমার, থামো! চিৎকার করে বলল মুসা।
গ্যারেজের ভেতরে ঘষার শব্দ থেমে গেছে। সুইচের জন্যে হাতড়াতে শুরু করল ড্যানি। পাওয়ার পর যখন টিপে দিল তখনও অন্ধকার হয়ে রইল গ্যারেজ। আলো জ্বলল না। ভ্রুকুটি করল সে। বড় বড় হয়ে গেল চোখ যখন দেখল তার আন্টির গাড়ির বেশ খানিকটা জায়গার রঙ ঘষে ঘষে তুলে ফেলা। হয়েছে।
তুলুক, তাগাদা দিল মুসা, দেখার দরকার নেই। জলদি চলো এখান থেকে।
গ্যারেজের ভেতরে শব্দ হলো আবার। বোকার মত দুঃসাহস দেখিয়ে বসল ড্যানি। গ্যারেজের ভেতরে যেতে যেতে ডাকল, অ্যাই, কে ওখানে?
ঝপঝপ করে একগাদা তরল পদার্থ এসে পড়ল ওর গায়ে। ভিজে গেল গা। ঝনঝন করে মেঝেতে একটা বালতি পড়ার শব্দ হলো। কি ঘটছে ও কিছু বুঝে ওঠার আগেই খস করে ম্যাচের কাঠি জ্বলে উঠল। গাড়ির হুডের কাছে। দাঁড়িয়ে আছে একটা ছায়ামূর্তি। বিদঘুঁটে গন্ধ ঢুকল মুসার নাকে।

ড্যানি! চিৎকার করে উঠল সে। একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ করছে, যতই চিৎকার করুক না কেন, গলা দিয়ে স্বর বেরোয় না।
জ্বলন্ত ম্যাচের কাঠি ড্যানির দিকে ছুঁড়ে মারল ছায়ামূর্তি। বুকে লেগে কাঠিটা পড়ল পায়ের কাছে জমে থাকা ট্রেলে। দপ করে জ্বলে উঠল আগুন। একটা সেকেন্ড বোকা হয়ে আগুনের দিকে তাকিয়ে রইল ড্যানি। পরক্ষণে জীবন্ত এক মানব-মশালে পরিণত হলো। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল কমলা রঙ আগুন। মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ল পা থেকে মাথায়। অদ্ভুত এক কাকতাড়ুয়া পুতুলের মত নাচানাচি শুরু করল, ড্যানি। ভয়াবহ যন্ত্রণায় অমানুষিক চিৎকার করছে।
ওকে ধরার চেষ্টা করল মুসা। আগুন থেকে বাঁচাতে চাইল। একটা কিছু করার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠল। কিন্তু কিছুই করতে পারল না। কিছু করার নেই। অনেক দেরি হয়ে গেছে। মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি খেতে লাগল ড্যানি। চামড়া পুড়ে, কুঁচকে, বিকৃত হয়ে যাচ্ছে মুখ। মাড়ীসহ দাঁত বেরিয়ে পড়ছে। ভয়াবহ দৃশ্য। কিন্তু শুধু চিৎকার করা ছাড়া আর কিছু করতে পারছে না। মুসা। চোখের সামনে প্রিয় বন্ধুর মৃত্যু ঘটতে দেখেও সহ্য করতে হচ্ছে। চিৎকার-চিৎকার-চিৎকার…
*
চোখ মেলতে ছাতের দিকে নজর গেল মুসার। প্রথমে বুঝতে পারল না কোথায় রয়েছে। কেয়ারও করল না। যেখানে খুশি থাক। দুঃস্বপ্নটা যে কেটেছে এতেই সে খুশি। এত ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন কমই দেখেছে।
পাশ ফিরে তাকিয়ে দেখল, সোফায় কুকড়ি-মুকড়ি হয়ে ঘুমাচ্ছে ক্রিসি। মুহূর্তে মনে পড়ে গেল ওর কোথায় রয়েছে, বিকেলে কি কি ঘটেছিল, সব।
কিন্তু বিছানায় এল কি করে? ছিল তো টেবিলে। ম্যাসাজে আরাম পেয়ে ওখানেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। তারমানে ক্রিসি ওকে বয়ে এনেছে। জোর তো সাংঘাতিক!
উঠে বসল মুসা। ভীষণ ক্লান্তি লাগছে। ঘুমানোর পর এরকম তো লাগার। কথা নয়! মাথার মধ্যে ঘোরটা এখনও কাটেনি। গাটাও গোলাচ্ছে ও। তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। একে শরীর অসুস্থ, তার ওপর গত কিছুদিন ধরে যে পরিমাণ উত্তেজনা আর মানসিক চাপ যাচ্ছে, এরকম হওয়াই স্বাভাবিক। তবে ঘাড়ের ব্যথাটা কমেছে। বাড়ি যাওয়ার তাগিদ অনুভব করল সে। নিজের বিছানায় ছাড়া ঘুমিয়ে শান্তি নেই।
দুঃস্বপ্নটা চেপে আছে এখনও মনে। ড্যানির পুড়ে যাওয়ার দৃশ্যটা এতই বাস্তব লেগেছিল, ভুলতে পারছে না। এত জায়গা থাকতে কেন কেরিআন্টির বাড়িতে ওকে দেখল, তারও যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। ড্যানির ওখানে যাওয়ার সম্ভাবনাই সবচেয়ে বেশি। যদিও কাউকে বলে যায়নি। কিন্তু অনুমান করতে কষ্ট হয় না।
কেরিআন্টি থাকেন সান্তা বারবারায়।

বিছানা থেকে নেমে একটা ভোয়ালে টেনে নিয়ে বাথরুমে রওনা হলো মুসা। ম্যাসাজ টেবিলটার পাশ কাটানোর সময় ফোনের ওপর নজর পড়তেই থমকে দাঁড়াল। একটা ফোন করলে কেমন হয়? দূর! কি ভাবছে! স্বপ্ন কখনও সত্যি হয় নাকি?

কিন্তু ইচ্ছেটা তাড়াতে পারল না মন থেকে। শেষে পা টিপে টিপে এগিয়ে গিয়ে তুলে নিলে রিসিভার। ক্রিসির দিকে তাকাল। তেমনি ঘুমাচ্ছে। নম্বর টিপল। ওপাশে রিঙ হচ্ছে। দুরুদুরু বুকে অপেক্ষা করছে মুসা।

ফোনটা ড্যানিই ধরল। কণ্ঠ শুনে বোঝা গেল ঘুম থেকে উঠে এসেছে। তাতে অস্বস্তি বোধ করল না মুসা। দুঃখ নেই মোটেও। বরং স্বস্তি। একটা বিরাট বোঝা নেমে গেল মন থেকে। স্বপ্নটা মিথ্যে। ড্যানি বেঁচে আছে।

কি ব্যাপার? জানতে চাইল ড্যানি।

তুমি ভাল আছ নাকি শিওর হয়ে নিলাম।

হাই তুলল ড্যানি। ভালই আছি। এখানে এসেছি তুমি জানলে কি করে?

অনুমান, স্বপ্নের কথাটা চেপে গেল মূসা। সরি, তোমার ঘুমটা ভাঙিয়ে দিলাম। যাও, শুয়ে পড়োগে। কেরিআন্টি কোথায়?

বেড়াতে গেছে।

আচ্ছা, রাখি। দুদিন পর যোগাযোগ করব।

ওখানে সব ঠিক আছে?

আছে। গুড নাইট, ড্যানি।

গুড নাইট।

রিসিভার নামিয়ে রাখল মুসা। ফিরে তাকাতে দেখে সোফায় সোজা হয়ে বসে আছে ক্রিসি। চোখে চোখ পড়তে হাসল। কোথায় ফোন করলে?

সান্তা বারবারায়। আমার এক বন্ধুকে।

অ। কেমন লাগছে এখন?

ব্যথাটা কমেছে।

আবার হাসল ক্রিসি। কমতেই হবে। বলেছিলাম না, আমার ম্যাসাজে জাদু আছে?

… যাচ্ছ কোথায়?

বাথরুমে। বাড়ি যাব। ঘুমাতে হবে।

কেন, এখানে অসুবিধে কি?

আমার কোন অসুবিধে নেই। অসুবিধেটা আপনার। বিছানা আমি দখল করে রাখলে সোফায়ই থাকতে হবে আপনাকে…

তাতে কি? আমার অসুবিধে হচ্ছে না।

কিন্তু আমার হবে। অস্বস্তিতে ঘুমাতে পারব না আমি। শরীরটাও যে রকম খারাপ লাগছে, না ঘুমালে মারা পড়ব।
বাথরুমের দিকে এগোল মুসা।

.

পরদিন রবিবার। সকালবেলা রবিনকে ফোন করল কিশোর। খবর আছে। ডেভন ব্রেকের দোকানের নতুন মালিক ওরই চাচা উইনার ব্রেক। মিসেস ব্রেকের কাছ থেকে কিনে নিয়েছে দোকানটা। লোকটা কোন সহযোগিতা। করতে রাজি হয়নি। এমনকি ব্রেকের বাড়ির ফোন নম্বরটাও দিতে চায়নি।
রবিনকে মাথা ঠাণ্ডা রাখার পরামর্শ দিল কিশোর। গোস্ট লেনে এখন ঘনঘন যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। বহুদিন পর বাড়ি ফিরেছে। ইয়ার্ডে কাজ জমে গেছে অনেক। তা ছাড়া আরও কাজ আছে।
সারাটা দিন মুসার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করল রবিন। কিন্তু পেল না। ওকে। কোথায় যে গেছে, কেউ বলতে পারল না।
সোমবারেও মুসার খবর নেই।
এমনকি সোফির শেষকৃত্য অনুষ্ঠানেও যোগ দিতে এল না।
ব্ল্যাক ফরেস্ট গোরস্থানের গির্জার সামনে রাখা হলো কফিন। আত্মীয় স্বজন বন্ধু-বান্ধবরা এল শোকের কালো পোশাক পরে। মারলার পাশে দাঁড়ানো রবিন। চুপচাপ তাকিয়ে আছে কয়েক গজ দূরের কফিনটার দিকে। সোফি যে মারা গেছে, মাথাটা আলাদা, ধড়ের সঙ্গে জোড়া লাগিয়ে সেলাই। করে দিয়েছে হাসপাতালের ডাক্তার, এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না। একঘেয়ে বিষণ্ন কণ্ঠে মৃত্যুর ওপারের সেই সবুজ তৃণভূমি আর পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া টলটলে পানির নহরের বর্ণনা করে চললেন পাদ্রী। রূপকথার মত লাগছে রবিনের কাছে।
অনুষ্ঠান শেষ হতে বহু সময় লাগল। সোফিকে কবর দেয়ার পর তার মা বাবার কাছে গিয়ে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে নানা কথা বলতে লাগল রবিন। কোন সাহায্য লাগবে কিনা জিজ্ঞেস করল। নিজের কানেই বড় ফাপা শোনাল কথাগুলো। কি সাহায্য করবে সে? তাদের মেয়েকে ফিরিয়ে দিতে পারবে? সোফি ছিল তাদের একমাত্র মেয়ে।
সবাই যার যার বাড়ি ফিরে গেল। রবিনের ফিরতে ইচ্ছে করল না। একা বাড়িতে মন টিকবে না। মুসাকে পাওয়া যাচ্ছে না। ইয়ার্ডে গিয়ে কিশোরের সঙ্গেও আড্ডা দিয়ে সময় কাটানো সম্ভব নয়। ও বলে দিয়েছে ব্যস্ত থাকবে।
গাড়ি নিয়ে পাহাড়ের কাছে চলে এল সে। পাহাড়ে চড়তে ভাল লাগে। ওর। কিন্তু আজ লাগল না। চুড়ায় খানিকক্ষণ বসে থেকে আবার নেমে এল নিচের উপত্যকায়। লেকের পাড়ে বসে রইল, ঘোরাঘুরি করল, লেকের শান্ত পানিতে ঢিল

ছুঁড়ল। অন্যমনস্ক। সারাক্ষণ মন জুড়ে রইল সোফির মৃত্যু, রহস্যময় তত্ত্বাবধায়কের চিঠি, মুসার জন্যে দুর্ভাবনা।
সারাটা দিন কাটিয়ে সন্ধ্যায় ঘরে ফিরল সে। বাবা-মা ফেরেননি। কি করবে? মুসাকে ফোন করল আবার। পাওয়া গেল না। একটা বই নিয়ে পিঠে বালিশ ঠেকিয়ে আধশোয়া হলো বিছানায়। কিছুতেই মন বসাতে পারল না। ড্যানির চেয়ে বেশি দুশ্চিন্তা হচ্ছে এখন মুসাকে নিয়ে। ড্যানি কাউকে কিছু না। বলে পালিয়েছে, বাঁচার জন্যে। মুসাও কি তাই করল?
সারাদিনের পরিশ্রমের ক্লান্তিতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়ল, বলতে পারবে না। টেলিফোনের শব্দটা যেন ঘুমের মধ্যেও কানে বোমা ফাটাল তার।
চোখ মেলতেই নজর পড়ল ঘড়ির দিকে। বারোটার বেশি। কেঁপে উঠল বুক। কে করল? কোন দুঃসংবাদ ছাড়া এত রাতে কেন ফোন করবে?
কাঁপা হাতে রিসিভার তুলে নিয়ে কানে ঠেকাল। হালো?
রবিন? কাঁদো কাদো স্বরে মারলা বলল। ড্যানি...
কি হয়েছে ড্যানির?
ও নেই...
ইমপসিবল!
ফোঁপাতে লাগল মারলা। সান্তা বারবারায় ওর খালার বাড়িতে চলে গিয়েছিল। এইমাত্র ফোন করে জানাল আমাকে মুসা। ও বাড়ি ফিরে এসেছে।তত্ত্বাবধায়ক ঠিকই খুঁজে বের করেছে ড্যানিকে। গায়ে পেট্রল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। ...
উফ, কি ভয়ঙ্কর!... রবিন, এবার আমার। পালা...
মুসা ছিল কোথায় এতদিন, কিছু বলেছে?
জিজ্ঞেস করিনি। করতে মনে ছিল না। ড্যানির কথা শুনেই...
আমি আসব তোমার ওখানে?
না না! হঠাৎ, যেন বহু দূরাগত মনে হলো মারলার কণ্ঠ। কেউ আর, এখন আমার কাছে এসো না। আমার কাছ থেকে দূরে থাকো। আমি জানি। যে-কোন সময় একটা চিঠি এসে হাজির হবে আমার নামে!
কিন্তু মীটিং হওয়া দরকার আমাদের। আলোচনা করতে হবে। পুলিশকে খবর দিতে হবে। আর বসে থাকা যায় না।...অ্যাই, মারলা, আমার। কথা শুনছ?
লাইন কেটে দিয়েছে মারলা। ওকে আর ফোন করে লাভ নেই। ধরবে না।
কিশোরকে ফোন করল রবিন। ঘুম থেকে টেনে তুলল। সব কথা জানাল।
দীর্ঘ কয়েকটা মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর কিশোর বলল, এখন লাইনে। আছে মারলা। তারপর ক্লডিয়া। সবশেষে মুসা। কাল সকালের, ডাকেই একটা চিঠি পাবে মারলা, কোন সন্দেহ নেই তাতে। এই তত্ত্বাবধায়ক লোকটা মিথ্যে হুমকি

দেয়নি। কাল অবশ্যই একটা মীটিং ডাকা উচিত তোমাদের। যাদের যাদের নাম আছে।
আমিও সেকথাই ভাবছি। সকালে?।
সকালে না, বিকেলে করো। আমিও আসতে পারব। সকালে কাজ আছে।
মারলা আর ক্লডিয়া মীটিঙে বসলে হয়। মারলা তো এখনই আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইল না। খবরটা দিয়েই লাইন কেটে দিয়েছে। ওর কাছ থেকে দূরে থাকতে বলেছে। কি করব বুঝতে পারছি না।
আলোচনায় বসতেই হবে। জায়গা ঠিক করো। বিকেলে হলে আমিও থাকব।
কি বোঝাবে ওদের? পুলিশের কাছে যেতে বলবে তো?
এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে কিশোর বলল, দেখি, কি করা যায়।
সকালে কি কাজ তোমার?
ডেভনের দোকানে যাব। তোমাকে নিয়ে যেতে পারতাম, কিন্তু উল্টো রাস্তা হয়ে যায়। বাসে করে চলে যেতে পারব। তোমার আসার দরকার, নেই। বরং বাড়িতে থেকে রেস্ট নাও। টাইমসের অফিসেও যাব একবার। বিজ্ঞাপনটা কে দেয় খুঁজে বের করার চেষ্টা করব।
পারবে?
দেখা যাক। রাখি এখন। অত চিন্তা কোরো না। ঘুম না এলে বরং একটা ঘুমের বড়ি খেয়ে নাও। সকালে উঠে সবার সঙ্গে যোগাযোগ করে। আলোচনায় বসার ব্যবস্থা করে রাখবে। সময় আর জায়গা ঠিক করে আমার অ্যানসারিং মেশিনে জানিয়ে রেখো। বাড়ি এসেই যাতে পেয়ে যাই।
আচ্ছা।
আর, রবিন...
বলো?
শয়তানটাকে ঠেকাতেই হবে আমাদের। আবার কারও ক্ষতি করার আগেই।
কিন্তু খুঁজে বের করব কিভাবে ওকে?
করব। যেভাবেই হোক। ছাড়ব না।
অত শিওর হচ্ছ কি করে?
অপরাধ করতে করতে এক না এক সময় ভুল করেই ফেলে অপরাধী। অপরাধ বিজ্ঞান তা-ই বলে। তত্ত্বাবধায়কের বেলায়ও এর ব্যতিক্রম হবে না। ঠিক আছে, রাখলাম। কাল দেখা হবে।
আচ্ছা।
লাইন কেটে দিল রবিন। এরপর ফোন করল মুসাদের বাড়ির নম্বরে।
.

পরদিন ব্ল্যাক ফরেস্ট পার্কে আবার মিলিত হলো ওরা। মারলা, ক্লডিয়া, রবিন আর মুসা। আজ দলের দুজন কম। সোফিও নেই, ড্যানিও নেই।

কেউ যেন কারও দিকে তাকাতে পারছে না। মুখ নিচু করে গম্ভীর হয়ে আছে।

সকালের ডাকে ঠিকই একটা চিঠি পেয়েছে মারলা। নামের স্তম্ভে ড্যানির নামটা নেই। সবার ওপরে এখন মারলার নাম। টাইমস পত্রিকায় পার্সোন্যাল সেকশনে একটা সাঙ্কেতিক বিজ্ঞাপন। মানে করলে হয়:

তোমার ডান হাতের তর্জনী কেটে কাটা আঙুল সহ চিঠিটা ক্লডিয়ার কাছে পাঠিয়ে দাও

কথা বলতে যাচ্ছিল ক্লডিয়া, কিন্তু ওকে থামিয়ে দিল রবিন। কিশোরের জন্যে অপেক্ষা করছে। বাড়ি থেকে বেরোনোর আগেই ফোন করে কিশোরের অ্যানসারিং মেশিনে মেসেজ দিয়ে রেখেছে।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। ঘাসে ঢাকা পাহাড়ের উপত্যকা ধরে লম্বা লম্বা পায়ে হেঁটে এল সে।

ফিরে তাকাল সবাই।

গাছের গোড়ায় হেলান দিয়ে বসেছে মুসা। তার কাছে এসে সবার মুখোমুখি বসল কিশোর।

কথা শুরু করল রবিন, একটা কথা এখনও জানানো হয়নি তোমাদের। ওই লোকটা কে, জেনে ফেলেছে কিশোর।

কোন লোকটা? নেহাত সাদামাঠা স্বরে জানতে চাইল ক্লডিয়া।

সেই লোকটা। মরুভূমিতে যাকে খুন করেছি আমরা।

মুহূর্তে সতর্ক হয়ে উঠল সবাই। একটা ঘাসের ডগা চিবুচ্ছিল মুসা। তাড়াতাড়ি ফেলে দিয়ে বলল, খাইছে! বলো কি? কে?

ডেভন ব্রেক।

কে সে?

সান্তা বারবারার এক দোকানদার।

অ, কোন উৎসাহ পেল না ক্লডিয়া। এ কথা এখন জেনেই কি আর না জেনেই বা কি। লোকটা তো এখন মৃত। আমরা ওকে খুন করেছি। কিশোর, তোমার জন্যে আলোচনা আটকে দিয়ে বসে আছে রবিন। কি নাকি বলবে তুমি আমাদের?

হ্যাঁ, বলব, মাথা ঝাঁকাল কিশোর। তোমাদের চোখ এড়িয়ে গেছে এমন কিছু পয়েন্ট আমি উল্লেখ করতে চাই। তবে তার আগে একটা প্রশ্নের জবাব দাও তো। ড্যানি কোথায় গিয়েছিল এ কথাটা তোমাদের মধ্যে কে জানতে?

কেউ না, মারলা জবাব দিল। কাউকে না জানিয়ে গিয়েছিল। উদ্দেশ্যটাই ছিল জেনে গিয়ে মুখ ফসকে কাউকে যাতে বলে না দিতে পারি আমরা, কোনমতেই

তত্ত্বাবধায়কের কানে না যায়।
তা তাহলে তত্ত্বাবধায়ক কি করে জানল ও কোথায় গেছে? কিশোরের। প্রশ্ন।
কেউ জবাব দিতে পারল না।
এক এক করে সবার মুখের দিকে তাকাতে লাগল কিশোর। কেউ একজন নিশ্চয় জানো তোমরা। কে? মুসার দিকে তাকাল সে। মুসা, তুমি? তোমার সঙ্গে বেশি ঘনিষ্ঠতা ছিল ড্যানির। বলে গেছে?
কিশোর ছাড়া অন্য সবাইকে অবাক করে দিয়ে বলে উঠল মুসা, ও যে। ওর আন্টির বাড়ি গিয়েছিল, এ কথা জানতাম আমি।
কি করে? প্রায় চিৎকার করে উঠল রবিন।
চুপ করে রইল মুসা।
জবাব দিচ্ছ না কেন? ভুরু নাচাল মারলা। কি করে জানলে?
আমি ওকে ওখানে ফোন করেছিলাম। দেখলাম আছে নাকি। মানে, ভাল আছে নাকি।
কিন্তু জানলে কি করে ওখানে আছে?
মুখ নিচু করল মুসা। হাতের তালু দেখতে দেখতে জবাব দিল, জানি না।
দেখো, তুমি কিছু লুকাচ্ছ আমাদের কাছে। কঠোর হয়ে উঠল ক্লডিয়ার কণ্ঠ। দুদিন ধরে নাকি তোমার কোন পাত্তা নেই। রবিন বহুবার ফোন করেছে বাড়িতে, তোমাকে পায়নি। কোন বন্ধু-বান্ধবের বাড়িতেও যাওনি। কোথায় ছিলে?
দ্বিধা করতে লাগল মুসা।
কোথায় ছিলে? আবার জিজ্ঞেস করল মারলা।
একটা মেয়ের বাড়িতে, অবশেষে জানাল মুসা।
তাজ্জব হয়ে গেল সবাই। মুসা আমান মেয়ের বাড়িতে থেকেছে।
কোন মেয়ে?
কে সে?
কি নাম?
কোথায় থাকে?
তোমরা চিনবে না, যেন মস্ত কোন অপরাধ করে ফেলেছে এমন ভঙ্গিতে জবাব দিল মুসা। নতুন পরিচয় হয়েছে।
কি নাম ওর? জানতে চাইল রবিন।
ক্রিসি। ক্রিসি ট্রেভার। আমাদের চেয়ে কয়েক বছরের বড় হবে।
ওখানে কেন গিয়েছিলে?
ম্যাসাজ করাতে। সেদিন গুডলাক ফাউনটেইনে বসে বারগার খাচ্ছিলাম। মেয়েটাও খাচ্ছিল। আমাকে পানিতে পয়সা ছুঁড়ে মারতে দেখে প্রশংসা শুরু

করল। এভাবেই আলাপ। কথায় কথায় জানাল সে হাসপাতালে কাজ করে। আমিও একসময় বললাম আমার ঘাড়ের ব্যথার কথা। সে তখন বলল, খুব ভাল ম্যাসাজ করতে পারে সে। আমার ব্যথাটা কমিয়ে দিতে পারবে। ঠিকানা দিল, সময় করে যাওয়ার জন্যে। পরশুদিন স্কুলের মাঠে। দৌড়াদৌড়ি করে ব্যথাটা বাড়ালাম। ক্রিসির কথা মনে পড়ল। চলে গেলাম। ওর কাছে। খুকখুক করে কাশল মুসা। সত্যি, ভাল ম্যাসাজ করে ও। ব্যথাটা কমিয়ে দিয়েছে। সেদিন রাতেই চলে আসতে চেয়েছিলাম। আসতে দিল না। জোর করে ধরে রাখল। বলল, ওর ম্যাসাজ শেষ হয়নি। রোগীকে পূর্ণ সুস্থ না করে বাড়ি পাঠানো উচিত না। কি আর করব! কৈফিয়ত দেয়ার ভঙ্গিতে বলল, জোরাজুরি করেও লাভ হলো না। আসতে দিল না তো দিলই না। নিজের বিছানা ছাড়া ঘুম আসে না বলাতে ঘুমের বড়ি খাইয়ে দিল।

কয়েক সেকেন্ড নীরবতার পর আবার আগের প্রসঙ্গে ফিরে গেল মারলা, ড্যানি যে আন্টির বাড়ি গেছে একথা জানলে কি করে তুমি, এখনও বলোনি কিন্তু।

কি বলব? হতাশ ভঙ্গিতে দুই হাত ওল্টাল মুসা।

কি করে জানলে?

অত দ্বিধা করছ কেন? মারলার সঙ্গে সুর মেললি রবিন।

বলতে তো পারি। কিন্তু বললে তোমরা বিশ্বাস করবে না।

কেন? না করার কি হলো? ব্যাপারটা কি বলো তো?

ভূত বিশ্বাস করি বলে তো সবাই হাসাহাসি করো আমাকে নিয়ে...

তারমানে বলতে চাও ভূতে খবরটা দিয়েছে? তীক্ষ্ণ হয়ে গেল মারলার কণ্ঠ।

মাথা নাড়ল মুসা, কে দিয়েছে জানি না। রাতে দুঃস্বপ্ন দেখলাম। দেখি, ড্যানি আন্টির বাড়িতে গেছে। আমিও আছি সেখানে। রাতে গ্যারেজে একটা শব্দ শুনে দেখতে চলল সে। চিৎকার করে অনেক মানা করলাম। শুনল না। গ্যারেজে ঢুকল। ওখানে অপেক্ষা করছিল লোকটা। একটা ছায়ামূর্তি। বালতিতে করে ড্যানির গায়ে পেট্রল ছুঁড়ে দিয়ে ম্যাচের কাঠি জ্বেলে ছুঁড়ে মারল...উফ, এতই বাস্তব! এখনও দেখতে পাচ্ছি।

অনেকক্ষণ চুপ থাকার পর ক্লডিয়া বলল, আশ্চর্য! স্বপ্ন যে মাঝে মাঝে সত্যি হয় এটাই তার প্রমাণ।...যদিও আমি বিশ্বাস করি নাঃ লোকটার চেহারা দেখেছ?

মাথা নাড়ল মুসা, না। অন্ধকারে লুকিয়ে ছিল। ড্যানির গাড়ির রঙ তুলে ফেলেছিল সিরিশ দিয়ে ঘষে। ঘষার শব্দ করে কৌতূহল জাগিয়ে টেনে নিয়ে গিয়েছিল ড্যানিকে:

আবার নীরবতা। কাশি দিয়ে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করল কিশোর। যা ঘটার তো ঘটে গেছে, এখন আসল কথায় আসা যাক। যে কারণে আজকের এই মীটিং।

আমার একটা পরামর্শ আছে। তোমাদের বাঁচার এখন সবচেয়ে সহজ উপায় হলো পুলিশের কাছে গিয়ে সব জানিয়ে দেয়া।
হু, ধরে নিয়ে গিয়ে জেলে ভরুক, ঝাঝাল কণ্ঠে বলল মারলা। তাহলে এতদিন গোপন রেখে লাভটা হলো কি?
কোন লাভই হয়নি। ক্ষতি হয়েছে বরং অনেক। জেলে ঢোকাটাই এখন তোমাদের জন্যে সবচেয়ে নিরাপদ। মরার চেয়ে জেলে যাওয়া ভাল।
কাঁপা গলায় মারলা বলল, কিন্তু এই তত্ত্বাবধায়ক ব্যাটা ওখানেও আমাদের ছাড়বে না। ড্যানি কোথায় আছে তার জানার কথা নয়। মুসা। তাকে বলেনি। আর আমরা তো কেউ জানতামই না। কাণ্ড দেখে মনে হচ্ছে তত্ত্বাবধায়ক সবজান্তা। অলৌকিক ক্ষমতা আছে ওর। দূর থেকে যেন অলৌকিক ক্ষমতা দিয়ে সোফির অ্যাক্সিডেন্ট ঘটাল, ড্যানি কোথায় আছে। জেনে নিয়ে পুড়িয়ে মারল...জেলের বদ্ধ জায়গায় আমরা একেবারেই অসহায় হয়ে যাব। বেরোতেও পারব না...
বাধা দিয়ে বলল কিশোর, মুক্ত থেকেই বা কি লাভ হলো ড্যানির? জেলেই বরং তোমরা নিরাপদ। ওখানে অন্তত পুলিশ থাকবে তোমাদের পাহারা দেয়ার জন্যে। তত্ত্বাবধায়কের সাধ্য হবে না ওদেরকে ফাঁকি দিয়ে জেলের মধ্যে ঢোকে:
যদি ভূত-প্রেত কিছু না হয়, বিড়বিড় করল মুসা।
ভূতফুত কিছু না। ও জলজ্যান্ত মানুষ। মারলার সর্বনাশ করার আগেই ওকে খুঁজে বের করতে হবে আমাদের।
কোথায় আছে কি করে জানব? জিজ্ঞেস করল রবিন।
তাকে খুঁজতেই বেরিয়েছিলাম আজ সকালে।
কোন খোঁজ পেলে?
পত্রিকার অফিস থেকে কিছু বের করতে পারিনি। যারা বিজ্ঞাপন দিতে। আসে তাদের নামধাম পরিচয় গোপন রাখে ওরা। পুলিশ গিয়ে চাপাচাপি করলে অবশ্য না বলে পারবে না। তবে তার আগে আমি একবার চেষ্টা করে দেখতে চাই।
মানে, পুলিশকে সবকথা জানানোর আগে?
মাথা ঝাঁকাল কিশোর। হ্যাঁ। দেখি আরেকটু সময় নিয়ে, আর কিছু বের করতে পারি কিনা।
তত্ত্বাবধায়ক ধরা পড়লে খুন হওয়ার আর ভয় থাকবে না আমাদের, এটা ঠিক। মুখ বাকাল ক্লডিয়া। কিন্তু অ্যাক্সিডেন্ট করে মানুষ খুনের দায় থেকে রেহাই পাব না কোনমতে।
সেটা পরের কথা, পরে দেখা যাবে। এখনকার বিপদ থেকে আগে বাঁচা দরকার।
ব্রেকের দোকানে গিয়ে কি জানলে? জিজ্ঞেস করল রবিন।

ডেভনের চাচার সঙ্গে কথা বলেছি। বিশেষ সাহায্য-সহায়তা করল না। ও নিশ্চয় কিছু জানে। কিন্তু চেপে গেল আমার কাছে। অনেক চাপাচাপি করে ডেভনদের বাড়ির ঠিকানা আদায় করে এনেছি।
ওর মা যেখানে থাকে?
হ্যাঁ
দেখা করেছ?
না। যাব এখন।
আমিও যাব।
চলো।
মীটিং এখানেই শেষ। মারলার দিকে তাকিয়ে বলল কিশোর, বাড়ি গিয়ে চুপ করে বসে থাকোগে। আমার ওপর ভরসা রাখো। তোমার একটা চুলও ছিঁড়তে পারবে না তত্ত্বাবধায়ক
গাড়ির হর্ন শোনা গেল।
ঘনঘন হর্নের শব্দে ফিরে তাকাল সবাই। সোনালি চুল একটা মেয়ে হাত নেড়ে মুসাকে ডাকছে।
ও-ই ক্রিসি, উঠে দাঁড়াল মুসা। কি জন্যে এল আবার... পা বাড়াল ও গাড়ির দিকে।

.

সান্তা মনিকায় ছোট একটা লাল ইটের বাড়িতে থাকেন মিসেস ব্রেক। কিন্তু পাওয়া গেল না তাকে। বার বার দরজার ঘণ্টা বাজিয়েও সাড়া মিলল না। বাড়ি নেই। তারমানে দেখা করতে হলে অপেক্ষা করতে হবে।
বাড়িটার আশেপাশে খানিকক্ষণ ঘুরঘুর করল কিশোর আর রবিন। লোকে কিছু বলে না, তবে সন্দেহের চোখে তাকায়।
এ ভাবে ঘোরাঘুরি না করে একটা রেস্টুরেন্টে গিয়ে বসার পরামর্শ দিল রবিন। খাওয়াও যাবে, বসারও ব্যবস্থা হবে।
খাওয়া সারতে ইচ্ছে করে অনেক দেরি করল ওরা। বেরিয়ে এসে আবার মিসেস ব্রেকের দরজার ঘণ্টা বাজাল। এবারেও সাড়া নেই। তারমানে এখনও ফেরেননি।
খাওয়া তো হলো। আর কি করে সময় কাটানো যায়? ভাবতে লাগল। ওরা। কিশোর বলল, চলো, সিনেমা হলে গিয়ে বসে থাকি।
অতএব গেল সেখানেই। একটা সায়ান্স ফিকশন ছবি। ভবিষ্যতের মানুষদের কাহিনী। যারা মানব-জীবনের ওপর বিরক্ত হয়ে গিয়ে রোবট হয়ে যেতে চায়।
সীটে বসে ঘুমিয়ে পড়ল রবিন। আগের রাতে ড্যানির মৃত্যুসংবাদ শোনার পর আর ঘুমাতে পারেনি। কিশোর পর্দার দিকে তাকিয়ে রইল আনমনা হয়ে।

ছবি শেষ হলে রবিনকে ডেকে তুলল সে। রাত দশটা বাজে।
ঘুম খারাপ হয়নি। শরীরটা বেশ ঝরঝরে লাগছে রবিনের।
হল থেকে বেরিয়ে আবার মিসেস ব্রেকের বাড়ি চলল ওরা।
এবার পাওয়া গেল তাঁকে। একবার বেল বাজাতেই খুলে দিলেন। দুজনের ওপর নজর বোলাতে লাগলেন। বলো?
মোটাসোটা, খাটো মহিলা। নার্ভাস ভঙ্গিতে বার বার ডান চোখটা কাঁপে। বয়েসের তুলনায় মাথার চুলে ততটা পাক ধরেনি। ক্লান্ত লাগছে তাকে।
মিসেস ব্রেক? কিশোর জিজ্ঞেস করল।
মহিলা মাথা ঝাঁকাতে পরিচয় দিল সে, আমার নাম কিশোর পাশা। ও আমার বন্ধু, রবিন।
আপনার নিখোঁজ ছেলের ব্যাপারে কথা বলতে এসেছি আমরা, বলে ফেলল রবিন।
ঘাবড়ে গেল কিশোর। এখনই এটা বলা উচিত হয়নি রবিনের। যদি মানা করে দেন মহিলা, কথা বলবেন না, বিফল হয়ে ফেরত যেতে হবে। কষ্ট করে এতক্ষণ সময় কাটানোর কোন অর্থ থাকবে না।
তবে মহিলা ওদের মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিলেন না। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর।
আমি কিছু বুঝতে পারছি না...? মহিলা বললেন কি বলতে এসেছ?
আপনার ছেলের কি হয়েছে জানি আমরা, কিশোর বলল। সব ঘটনা আপনাকে খুলে বলতে চাই। ঘরে আসব?
ডেভিকে তোমরা চিনতে? অনিশ্চিত শোনাল মহিলার কণ্ঠ।
না, জবাব দিয়েই চট করে কিশোরের মুখের দিকে তাকাল রবিন, আবার বেফাঁস কিছু বলে ফেলল কিনা বোঝার জন্যে। তার কোন প্রতিক্রিয়া না দেখে বলল, ওকে কবর দিতে সাহায্য করেছে যারা, তাদের মধ্যে আমি একজন।
কেঁপে উঠলেন মিসেস রেক। কে তোমরা?
নাম তো বললামই, জবাব দিল কিশোর। আমরা শখের গোয়েন্দা।
দীর্ঘ একটা মুহূর্ত দুজনের দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইলেন মহিলা। তারপর সরে জায়গা করে দিলেন, এসো।
বসার ঘরে ওদের বসতে দিয়ে বললেন, আমি কফি খাব। তোমরা খাবে?
কফি? কিশোর বলল, এসব জিনিস আমরা খুব একটা খাই না। ঠিক আছে, দিন এককাপ। শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছে। সেই কখন থেকে এসে আপনার বাড়ির কাছে ঘুরঘুর করছি দেখা করার জন্যে...
আমার বোনের বাড়িতে গিয়েছিলাম। বোলো এক মিনিট। নিয়ে আসছি।

রান্নাঘরে চলে গেলেন মিসেস ব্রেক
ঘরের চারপাশে চোখ বোলাতে গিয়ে দেয়ালে ঝোলানো একটা বাধানো ফটোগ্রাফ চোখে পড়ল রবিনের। কিশোরের গায়ে কনুইয়ের গুতো দিয়ে বলল, ওই যে, ডেভন।
ছবিটার দিকে তাকিয়ে কাঁটা দিল রবিনের গায়ে। ওর মনে হলো, ওরই দিকে তাকিয়ে আছে ডেভন। ছবির চোখে যেন নীরব জিজ্ঞাসা–কেন আমাকে এত তাড়াতাড়ি দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিলে? কি ক্ষতি আমি করেছিলাম তোমাদের? তাকিয়ে থাকতে পারল না সে। চোখ সরিয়ে নিল।
ট্রেতে করে কফি নিয়ে এলেন মিসেস ব্রেক। কেটলি থেকে কাপে কফি ঢালতে তাকে সাহায্য করল কিশোর।
ওদের মুখোমুখি চেয়ারে বসলেন মিসেস ব্রেক। কাপে চুমুক দিলেন। হ্যাঁ, বলো, কি বলতে এসেছ।
কনসার্ট দেখে ফেরার পথে মরুভূমিতে যা যা ঘটেছিল, খুলে বলল রবিন। কবর দেয়ার কথায় আসতেই নীরবে কাঁদতে শুরু করলেন মহিলা। রবিনের চোখেও পানি এসে গেল। পুলিশের কাছে কেন যায়নি ওরা এই কৈফিয়ত দিতে গিয়ে কথা আটকে যেতে লাগল তার মুখে।
আপনাকে খবর দেয়ার কথা ভেবেছি আমরা, রবিন বলল। লোকটা কে, কোথায় বাস করে, কিছুই জানতাম না। জানলে খবরটা ঠিকই দিতাম, যেভাবেই হোক। এই যে, জানার পর পরই চলে এলাম, একটুও দেরি করিনিঃ...ওর বাড়িতে কি করে খবর দেয়া যায় সেটা নিয়ে অনেক ভেবেছি আমরা। একবার মনে করলাম পুলিশকে একটা উড়োচিঠি দিয়ে জানিয়ে দিই অমুক জায়গায় অমুক দিন একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। লাশটাকে অমুক জায়গায় কবর দেয়া হয়েছে। কিন্তু তাতেও ভয় ছিল খোঁজ করতে করতে ঠিকই আমাদের হদিস করে ফেলবে পুলিশ। দম নেয়ার জন্যে থামল সে।
সত্যি বলছি, বিশ্বাস করুন, আবার বলল রবিন, ওকে খুন করতে চাইনি আমরা। কিভাবে গাড়ির নিচে চলে এল সেটা এখনও মাথায় ঢুকছে না আমার। লাশটা দেখার পর মনে হয়েছিল, রাস্তার ওপর শুয়ে ছিল আপনার ছেলে। বেহুশ হয়ে। অন্ধকারে স্রেফ তার ওপর দিয়ে গাড়িটা চালিয়ে দেয়া হয়েছে। চাকার নিচে কিছু পড়েছে বোঝার সঙ্গে সঙ্গে ব্রেক কষে গাড়ি দাঁড় করিয়ে ফেলে আমার বন্ধু ড্যানি। নিচে নেমে দেখি কি আর বলব! মিসেস ব্রেক, আপনার ছেলেকে খুন করেছি আমরা। যে কোন শাস্তি দিতে পারেন। আমাদের। ইচ্ছে করলে এখনই পুলিশে ফোন করে আমাকে ধরিয়ে দিতে পারেন।

রবিনকে অবাক করে দিয়ে তার বাহুতে হাত রাখলেন মহিলা। বিশ্বাস করতে পারল না সে। রেগে ওঠার বদলে সহানুভূতি দেখাচ্ছেন। আশ্চর্য!
ওর লাশের কি হলো এটা নিয়ে অনেক ভেবেছি আমি, মিসেস ব্রেক বললেন। রোজ রাতেই বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবতাম, কোথায় পড়ে আছে লাশটা? জানতাম মারা গেছে ও। কে খুন করেছে তা-ও জানি। তোমরা ওকে খুন করোনি, রবিন। অহেতুক কষ্ট পাওয়ার দরকার নেই। ওর লাশের ওপর দিয়ে গাড়ি চালিয়েছিল তোমার বন্ধু। তোমাদের গাড়ির নিচে চাপা পড়ে মারা। যায়নি। আগেই খুন হয়ে গিয়েছিল।
চোখে অবিশ্বাস নিয়ে মহিলার দিকে তাকিয়ে আছে রবিন। কিশোর নির্বিকার। রবিন তাকাতেই চোখ টিপল। অর্থাৎ, কি, বলেছিলাম না?
কফির কাপটা নামিয়ে রেখে চেয়ারে হেলান দিলেন মিসেস ব্রেক। পুরো ব্যাপারটা তোমাদের খুলেই বলি। খুব মানসিক কষ্টে আছ তোমরা, বোঝা যাচ্ছে। কপালে হাত ডললেন তিনি। তোমাদের সব বলতে পারলে আমারও মনটা খানিক হালকা হবে।
চুপ করে রইল ওরা। শোনার জন্যে অপেক্ষা করছে।
কপাল থেকে হাত নামালেন মিসেস ব্রেক। কোন্‌খান থেকে শুরু করব? প্রথম থেকেই বলি সব। ভালই চলছিল আমাদের মা-ছেলের সংসার। ঠিকমত দোকানে যেত ডেভি, ব্যবসা করত, ঠিকমত বাড়ি ফিরত। কোন রকম বদনেশা ছিল না। রাতে খাবার টেবিলে সারাদিন যা যা করত সব আমাকে বলত। একরাতে হঠাৎ করেই মেয়েটার নাম বলল। প্রায়ই আসত সিডি ডিস্ক কিনতে। উদ্ভট গান তার বেশি পছন্দ। মেয়েটার নাম মায়া। তেমন গুরুত্ব দিলাম না। দোকানে কত ধরনের কাস্টোমারই আসে। সবার গানের রুচিও একরকম না। এটা নিয়ে মাথা ঘামালাম, না। তবে ঘামানো উচিত ছিল। তাহলে হয়তো আজ আমার ডেভি বেঁচেই থাকত।
বদলাতে শুরু করল ডেভি। অসহিষ্ণু, বদমেজাজী হয়ে উঠল। কারণে অকারণে আমার সঙ্গে খেচাখেচি শুরু করে দিত, আগে যেটা সে কখনোই করত না। ওর এই পরিবর্তনে শঙ্কিত হলাম আমি। অনিদ্রা রোগেও ধরল ওকে। দোকান থেকে দেরি করে বাড়ি ফিরতে লাগল। তারপর একদিন আর ফিরলই না। দুদিন কোথায় কাটিয়ে ফিরে এল। বুঝলাম কোন মেয়ের পাল্লায়। পড়েছে। সেই মেয়েটাও হতে পারে, মায়া। ভাবলাম, পড়ে পড়ুকগে। জোয়ান বয়েসী ছেলে। পড়বেই। কিন্তু বাড়ি ফেরার পর কোথায় ছিল জিজ্ঞেস করাতে যখন এড়িয়ে গেল, সন্দেহ হলো আমার।
তারপর একদিন বাথরুমে তাকে কোকেনের প্যাকেট বাছাই করতে দেখে ফেললাম। কলজে কেপে গেল আমার। গানের জগতে হেরোইন আর অন্যান্য

নেশায় জড়িয়ে যাওয়াটা একটা অতি সাধারণ ব্যাপার, জানা আছে আমার। এই বিষ যে কোথায় নিয়ে যায় মানুষকে, তা-ও জানা। সাংঘাতিক ভয় পেয়ে গেলাম। একবার অভ্যস্ত হয়ে গেলে সর্বনাশ ঠেকানোর কোন পথই আর খোলা থাকবে না। ওর বাবা মারা যাওয়ার পর দোকানের ভার ওর ওপরই ছেড়ে দিয়েছিলাম। কোন গণ্ডগোল করেনি কখনও, তাই হিসেব নেয়ার কথাও ভাবিনি। সেদিন ভাবলাম। হিসেব নিতে গিয়ে দেখি কিছুই নেই। সব খুইয়ে বসে আছে। ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট শূন্য। আমি একটা স্কুলের টীচার। দোকানদারি না করলেও চলে যাবে মা-ছেলের। তাই দোকানের জন্যে চিন্তা না করে আগে ছেলের দিকে নজর দিলাম। ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে চাইলাম ওকে। প্রথমে রাজি হতে চাইল না। আমিও লেগেই রইলাম। শেষমেষ আমার চাপাচাপিতে ক্লিনিকে যেতে যেদিন রাজি হলো, সেদিন এমন। একটা জিনিস দেখে ফেললাম, বুঝলাম ক্লিনিকে নিয়ে গিয়েও আর লাভ নেই।

বাগানে ফুলগাছের পাতা ছাটতে গিয়ে পচা গন্ধ লাগল নাকে। খুঁজতে খুঁজতে দেখি একটা ঝোপের ধারে নতুন গর্ত। মাটি চাপা দেয়া। অল্প একটু খুঁড়তেই বেরিয়ে পড়ল সবুজ একটা পলিথিন ব্যাগ। তার ভেতরে তিনটে জানোয়ারের ধড়, মাথা কেটে আলাদা করে ফেলা হয়েছে–কুকুর, বেড়াল এমনকি একটা খটাশও আছে। গায়ের চামড়া জায়গায় জায়গায় কামানো। ডেভিকে জিজ্ঞেস করলাম। অস্বীকার করল না ও।

আমি বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার ভয় দেখালাম ওকে। কাকুতি-মিনতি শুরু করল। বলল সব ছেড়েছুঁড়ে দিয়ে আবার ভাল হয়ে যাবে। আমাকে ছাড়া থাকতে পারে না জানতাম, সেজন্যেই ভয় দেখিয়েছিলাম। কোন বদমাশদের দলে যোগ দিয়েছে জিজ্ঞেস করলাম। বলে দিল সব। ওই মেয়েটাই ওর সর্বনাশ করেছে।

কয়েক দিন আর বাড়ি থেকেই বেরোল না ডেভি। একদিন মায়া এসে হাজির হলো। ডেভির চেয়ে দুতিন বছরের ছোট হবে। খুব সুন্দরী। ডেভির সঙ্গে ফিসফাস করে কি সব বলল। সন্দেহ হলো আমার। ওরা গাড়িতে করে বেরিয়ে যেতেই আমিও গাড়ি নিয়ে পিছু নিলাম।

বড় একটা গুদামের মত বাড়ির সামনে গাড়ি থামাল ওরা। খানিক দূরে গাড়িতে বসে রইলাম। ঘন্টার পর ঘণ্টা পার হয়ে গেল। রাত হলো। তখনও ওদের বেরোনোর নাম নেই। আমার আশেপাশে যে সেব লোককে ঘোরাফেরা করতে দেখলাম, একটাকেও ভাল লোক বলে মনে হলো না। সব গুণ্ডাপাণ্ডা। ভয় পাচ্ছিলাম রীতিমত। রাত বারোটা পর্যন্ত বসে থেকে আর থাকার সাহস হলো না। বাড়ি না ফিরে চলে গেলাম আমার বোনের বাড়িতে। কি করা যায় ওর সঙ্গে পরামর্শ করতে।

পরদিন পুলিশ নিয়ে গেলাম ওই গুদামে। দুজন অফিসার ভেতরে ঢুকল। আমি বসে রইলাম বাইরে, পুলিশের একটা পেট্রল কারে। কিছুক্ষণ পর ফিরে এল অফিসার দুজন। মুখ সাদা। একজন রাস্তার ধারে দেয়ালের কাছে গিয়ে বমি শুরু করল। অন্যজন আমাকে জানাল, ভেতরে কেউ নেই। তবে যা আছে দেখলে সহ্য করতে পারব না। ভাবলাম ডেভির কিছু হয়েছে। লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে দৌড়ে ঢুকে পড়লাম গুদামে।

অনেকক্ষণ একটানা কথা বলার পর দম নেয়ার জন্যে থামলেন মিসেস ব্রেক।

শয়তান উপাসকদের আস্তানা ছিল ওটা, তাই না? শান্তকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

ভুরু কোচকালেন মিসেস ব্রেক, তুমি জানলে কি করে?

আপনার কথা শুনে। ওভাবে জন্তু-জানোয়ার বলি দিয়ে উপাসনা করে শয়তান উপাসকরাই। বলি দেয়ার জন্যে মানুষ তো আর সহজে মেলে না আজকাল যাই হোক। কি দেখলেন?

দৃশ্যটা কল্পনায় ভেসে উঠতে চোখমুখ বিকৃত করে ফেললেন মিসেস ব্রেক। কি যে ভয়াবহ দুর্গন্ধ ছিল ওখানে, বলে বোঝাতে পারব না। সব জায়গায় রক্ত, কোথাও শুকনো, কোথাও আধাশুকনো, কোথাও প্রায় তাজা। পশুর চামড়া আর নাড়ীভুড়ি ছড়িয়ে আছে সবখানে। বিচিত্র সব নকশা এঁকে রেখেছে মেঝেতে। কোনটা বৃত্ত, কোনটা পাঁচ কোণওয়ালা তারকা, কোনটা ছয় কোণ। ওগুলোর মধ্যে দুর্বোধ্য নানা রকম চিহ্ন আঁকা। কোন কোনটার মধ্যে নামও লিখেছে। সবই রক্ত দিয়ে। কালো রঙের আধপোড়া প্রচুর মোমবাতি পড়ে আছে মেঝেতে। কয়েক সেকেন্ডের বেশি ছিলাম না, কিন্তু তাতেই মাথা ঘুরতে শুরু করল আমার। মনে হলো পাগল হয়ে যাব। ছুটে বেরিয়ে এলাম বাইরে। অফিসাররা আমাকে নানা ভাবে শান্ত করার চেষ্টা করল। ডেভির জন্যে কষ্টে মনটা টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছিল। এত ভাল স্বভাবের একটা ছেলে আমার এ কাদের সঙ্গে মিশল! ওরা শুধু খারাপ নয়, ভয়ানক খারাপ, নরকের ইবলিস! ছেলের আশা ছেড়ে দিলাম।

তারমানে শয়তান উপাসকদের কাণ্ডকারখানা অজানা নয় আপনার? জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল কিশোর।

মাথা ঝাঁকালেন মিসেস ব্রেক। না। বইতে পড়েছি।

আপনার ছেলেকে ওরা পটিয়ে-পাটিয়ে বলি দেয়ার জন্যে নিয়ে গিয়েছিল।

আবারও মাথা ঝাঁকালেন মিসেস বেক। চোখে পানি টলমল করে উঠল আবার।

বলো কি! আঁতকে উঠল রবিন। এই যুগে খোদ আমেরিকা শহরে নরবলি!

ফিরে তাকাল কিশোর। আমেরিকা হলে কি হবে? মানুষের চরিত্র হতো। আর বদলায়নি। আদিম যুগেই রয়ে গেছে। বিবেক-বুদ্ধি বেশি যাদের, তারা জোর করে

খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে নিজেকে। যারা পারে না...যাকগে, মিসেস ব্রেকের দিকে তাকাল কিশোর, তারপর কি হলো?
মায়া হলো একজন শিক্ষানবীস, মিসেস ব্রেক বললেন। পুরোপুরি ডাইনী হতে হলে শুধু পশু বলি দিলে চলবে না, নরবলি দিতে হবে। শয়তান। উপাসকদের বিশ্বাস, যে যত বেশি মানুষ খুন করতে পারবে, কিংবা অন্যকে প্ররোচনা দিয়ে তার সাহায্যে ছলে-বলে-কৌশলে খুন করাতে পারবে, সে তত বেশি অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হবে। বলি দেয়া আত্মাগুলো দখলে চলে আসবে তার। যে যত বেশি নিষ্ঠুর হবে, আত্মাগুলো তার আদেশ তত বেশি পালন করবে। আমার ছেলেকে বোকা পেয়ে প্রথম শিকার হিসেবে তাকে নির্বাচিত করেছিল মায়া।
কি করে জানলেন? জিজ্ঞেস করল রবিন। মায়ার সঙ্গে কথা বলেছিলেন? নাকি ছেলেকে জিজ্ঞেস করেছেন?
মিসেস ব্রেকের এক চোখের পানি গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল। মোছার চেষ্টা করলেন না তিনি। ধরা গলায় বললেন, ওর সঙ্গে আর কখনও দেখা হয়নি আমার। গুদাম থেকে পালানোর দুদিন পর একদিন রাতদুপুরে ফোন। করল আমাকে। কেমন আছি জিজ্ঞেস করল। ওটাই তার সঙ্গে শেষ কথা। আর কথাও হয়নি, দেখাও না। নিখোঁজ হয়ে গেল।
মায়াকে জিজ্ঞেস করেননি ও কোথায় গেল?
না। তবে ওর বাবা-মার সঙ্গে দেখা করেছি।
কোথায়? গলা লম্বা করে সামনে মুখ বাড়িয়ে দিল কিশোর। কখন?
মর্গে। ওদের মেয়েকে শনাক্ত করতে এসেছিল।
মায়াও মারা গেছে!
বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন মিসেস ব্রেক। হ্যাঁ। শুনতে হয়তো খারাপ লাগবে তোমাদের, কিন্তু তবু বলি, ও মরাতে আমি খুশি হয়েছি। বেঁচে থাকলে আমার ছেলের মত আরও কত ছেলের যে সর্বনাশ করত কে জানে। যা হোক, আমি সেদিন গুদামে পুলিশ নিয়ে গিয়ে দেখে আসার পর কি ঘটল বলি। গুদামটার ওপর সাদা পোশাকে নজর রাখল গোয়েন্দা পুলিশ। কিন্তু শয়তান উপাসকদের কেউ আর ফিরে এল না সেখানে। মায়ার নাম বললাম পুলিশকে। শুধু নামটাই জানাতে পেরেছিলাম, তখনও ওর পরিচয় জানতাম না। নাম আর চেহারার বর্ণনা।
একটা কথা, বাধা দিয়ে বলল কিশোর, ওর চুলের রঙটা বলতে পারেন?
সোনালি।
হু! চিন্তিত ভঙ্গিতে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার কিশোর।
একথা কেন জানতে চাইলে? জিজ্ঞেস করল রবিন।

আছে, কারণ আছে। মিসেস ব্রেক, আপনি বলুন।
মায়া নামের কোন মেয়েকে খুঁজে বের করতে পারল না পুলিশ। ডেভিকেও না। ওর সন্ধান জানার চেষ্টা করতে লাগলাম আমি। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিলাম। জানতাম, আর কোনদিন ফিরে আসবে না আমার ছেলে। খুন করে কোথাও ফেলে দেয়া হয়েছে ওকে। তবু, মায়ের মন বুঝ মানল না, দিলাম। এক রাতে পুলিশ ফোন করল। স্যান বার্নাডিনো ভ্যালি হাসপাতালে যেতে অনুরোধ করল আমাকে। একটা মেয়ের লাশ নাকি নেয়া হয়েছে। হাসপাতালে যার সঙ্গে মায়ার চেহারা মিলে যায়।
যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না, পুলিশের অনুরোধ এড়াতে না পেরেই গেলাম। দেখা হলো মায়ার মা-বাবার সঙ্গে। মায়াকে শনাক্ত করলাম। ওর আসল নাম সারাহ। হার্ট অ্যাটাক হয়ে মারা গেছে। মরার আগে নাকি অদ্ভুত কাণ্ড করছিল সে। একটা বেড়াল বলি দিয়ে সারা গায়ে রক্ত মেখে, কালো মোম জ্বেলে, ঘরের মেঝেতে তারকা একে তার ওপর বসে শয়তানের উপাসনা করছিল। কিছুদিন থেকেই মেয়েকে নিয়ে চিন্তিত ছিলেন তার বাবা। চিৎকার শুনে তার ঘরে গিয়ে দেখেন মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে আছে মেয়ে। অবস্থা খারাপ দেখে তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নিয়ে গেলেন। হাসপাতালে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর মারা গেল সে। মরার আগে পুলিশের কাছে স্বীকার করেছে ডেভিকে সে খুন। করেছিল।
দীর্ঘ একটা মুহূর্ত চুপ করে থেকে দম নিলেন তিনি। তারপর রবিনের দিকে তাকিয়ে বললেন, ডেভিকে তোমরা খুন করোনি। খুন করে মরুভূমিতে ফেলে রেখে এসেছিল তাকে মায়া।
কত তারিখ ছিল সেটা? জানতে চাইল কিশোর।
জুলাইর একতিরিশ।
রবিনের দিকে তাকাল কিশোর, ওই দিনই তোমরা অ্যাক্সিডেন্ট করেছিলে না?
হ্যাঁ
মাথা ঝাঁকাল কিলোর। মিসেস ব্রেকের দিকে ফিরল, তারপর?
মিসেস ব্রেক বললেন, সারাহ নিজের মুখে স্বীকার করেছে ডেভিকে ওইদিন খুন করেছে সে। ওইদিনই রাতে বেড়াল বলি দিয়ে উপাসনা করেছে। ওইদিনই মারা গেছে। হাসপাতালের মর্গে নিজের চোখে ওর লাশ দেখেছি। আমি। শুধু আমি একা নই, ওর মা-বাবাও দেখেছেন। ডাইনী তো আর হতে পারল না। শুধু শুধু ছেলেটাকে আমার খুন করল।
আবার একটা মুহূর্ত নীরব থাকার পর মিসেস ব্রেক বললেন, সবই বললাম তোমাদের। ডেভির লাশটা যে খুঁজে পেয়েছ তোমরা, শেয়াল-কুকুরে খাওয়ার জন্যে ফেলে না রেখে কবর দিয়ে এসেছ, সেজন্যে তোমাদের কাছে। আমি

কৃতজ্ঞ। আবার গাল বেয়ে চোখের পানি গড়িয়ে পড়তে লাগল তার। কোনখানে দিয়েছ, মনে আছে? খুঁজে বের করতে পারবে?
পারব, মাথা কাত করল রবিন।
ঠিক আছে, একদিন নিয়ে যেয়ো আমাকে।
আচ্ছা।
আজ তাহলে উঠি আমরা, মিসেস ব্রেক? কিশোর বলল। অনেক রাত হলো। অনেক সময় নষ্ট করলাম আপনার..
সময় আর নষ্ট করলে কোথায়? বরং ডেভির খোঁজ জানিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞ করে দিলে। অনেক ধন্যবাদ তোমাদেরকে। ... কিশোর, সেরাতে তুমিও কি গাড়িতে ছিলে?
না, আমি ছিলাম না। বেড়াতে গিয়েছিলাম। আমি তখন লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে বহুদূরে। রবিন আর মুসা আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ফিরে এসে যখন শুনলাম, মনটাই খারাপ হয়ে গিয়েছিল। মানুষ খুনের দায়ে ওরা জেলে যাবে, এটা ভাবতেও কষ্ট হচ্ছিল...
না জেনে শুধু শুধুই কষ্ট পেয়েছ তোমরা। খুন করেছে আরেকজন, ভোগান্তিটা গেল তোমাদের...
ওহহো, মিসেস ব্রেক, একটা কথা, কিশোর বলল, জিজ্ঞেস করতেই ভুলে গেছিলাম। মনে করতে হয়তো খারাপ লাগবে আপনার। তবু এত কথা যখন বললেন, এটাও জেনেই নিই। কিভাবে খুন করেছিল সারাহ, বলেছে?
কেঁপে উঠলেন মিসেস ব্রেক। ঠোঁটের কোণ কুঁচকে গেল। ঘুমের মধ্যে মাথার চাঁদিতে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে চোখা একটা পেরেক ঢুকিয়ে দিয়েছিল ডাইনীটা...
আর বলতে পারলেন না মিসেস ব্রেক। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন।
তাকে শান্ত হওয়ার সময় দিল কিশোর। রবিনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, পেরেক-টেরেক কিছু দেখেছিলে তোমরা?
নাহ, মাথা নাড়ল রবিন। অত কিছু দেখার মত অবস্থা ছিল না কারও। সবাই খুব অস্থির হয়ে পড়েছিল। আতঙ্কিত।
হু। তারমানে খুজলে এখনও চাদিতে পেরেকটা পাওয়া যাবে।
চাদিতে পেরেক ঢোকালে তো মাথা থেকে রক্ত বেরোত। ঠোঁটের কোণ থেকে কেন?
সরু পেরেক ঢোকালে রক্ত আর কতটা বেরোবে? সামান্যই। ব্যথার চোটে মরার আগে নিশ্চয় জিভে কামড় লেগে গিয়েছিল ডেভনের। জিভ কেটে রক্ত বেরিয়ে ঠোঁটের কোণে লেগে গিয়েছিল। উঠে দাঁড়াল কিশোর। মিসেস ব্রেককে সান্তনা দেয়ার ভাষা খুঁজে পেল না। কোনমতে বলল, আজ তাহলে যাই, মিসেস ব্রেক...

বোসো। যাওয়ার আগে আরও একটা অদ্ভুত খবর শুনে যাও। পরদিন সারাহর বাবা মিস্টার জবার মর্গ থেকে মেয়ের লাশ আনতে হাসপাতালে গিয়েছিলেন। কবর দেয়ার জন্যে। পাওয়া যায়নি লাশটা। রহস্যময় ভাবে গায়েব হয়ে গিয়েছিল। পুলিশ অনেক চেষ্টা করেও হদিস করতে পারেনি লাশটার কি হয়েছিল।
এটা একটা খবর বটে। চোখমুখ কুঁচকে ফেলল কিশোর। মিস্টার জবারের ঠিকানাটা দিতে পারেন?।
নাম জানি। কোন শহরে বাস করেন সেটা জানি। কিন্তু ঠিকানা জিজ্ঞেস করিনি। পুরো নাম গ্রেগরি জবার। রিভারসাইডে থাকেন। ইনফরমেশন থেকে ওদের ফোন নম্বর জেনে নিতে পারলে ঠিকানা বের করা। কঠিন হবে না।
রবিনের দিকে তাকাল কিশোর, চলো। মিসেস ব্রেককে অনেক কষ্ট দিয়েছি আমরা। ওনার এখন একা থাকা দরকার।...অনেক ধন্যবাদ। আপনাকে, মিসেস ব্রেক। আমাদের দিয়ে যদি কোন রকম সাহায্য হবে মনে করেন কখনও, দ্বিধা-সঙ্কোচ না করে খবর দেবেন।
জবারের বাড়ি যাওয়ার জন্যে অস্থির হয়ে উঠল কিশোর। ইনফরমেশন থেকে ঠিকানা জোগাড় করেছে। কিন্তু রবিন বলল আগে মারলাকে দেখতে যাওয়া দরকার। পার্কের মীটিং থেকে যাওয়ার সময় ওর মনের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ ছিল।
মারলাদের বাড়ির সামনে পৌঁছে কিশোরকে গাড়িতে বসতে বলে, দেখতে চলল রবিন। মারলার ঘরের একটামাত্র জানালায় আলো জ্বলছে। বাকি পুরো বাড়িটাই অন্ধকার। বারোটা বাজতে কয়েক মিনিট বাকি। ভেজানো দরজা ঠেলে উঁকি দিল রবিন।
চিত হয়ে শুয়ে আছে মারলা। মৃদু শব্দে মিউজিক বাজছে। রবিনের সাড়া পেয়ে ফিরে তাকাল। চোখ কেমন ঘোর লাগা, লাল টকটকে। মাথার কাছের টেবিলে রাখা একটা আধখাওয়া মদের বোতল। অবাক হলো রবিন। মারলা তো মদ খায় না!
রবিন, বিড়বিড় করল মারলা, তুমি নাকি?
কেন দেখতে পাচ্ছ না? এগিয়ে গিয়ে বিছানার কাছে দাঁড়াল রবিন। কি। হয়েছে তোমার?
ছাতের দিকে তাকিয়ে ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল মারলা। কি হয়েছে? কিছুই না। খুব ভাল আছি আমি। ড্যানির যা অবশিষ্ট আছে, কাল নিয়ে আসবে। ওর মা আমাকে ফোন করে অনুরোধ করেছেন, একটা বাক্স কিনে নিয়ে যেতে পারব কিনা। ভাবতে পারো? দুই হপ্তা আগে রাস্তায় দেখে জোর করে বাজারে ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন আমাকে, পছন্দ করে ড্যানিকে একটা প্যান্ট কিনে দেয়ার জন্যে।

কাঁদতে শুরু করল সে। কথা জড়িয়ে গেল। আর এখন এল কফিন কিনে দেয়ার অনুরোধ।
ওর বাহুতে হাত রাখল রবিন। ড্যানির জন্যে তোমার চেয়ে কষ্ট আমার কম হচ্ছে না, মারলা। ও আমার বন্ধু ছিল। তত্ত্বাবধায়কের শয়তানি আমরা বন্ধ করবই। প্রতিশোধ নেব। কিশোর আর আমি অনেকখানি এগিয়ে গেছি। মরুভূমিতে পড়ে থাকা লোকটার মায়ের সঙ্গে কথা বলে এলাম
কোন আগ্রহ বোধ করল না মারলা। তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে লেগে সুবিধে করতে পারব না আমরা। বরং যা করতে বলে করে ওর হাত থেকে মুক্তি পাওয়া উচিত।
না, ওর কথা শুনব না আমরা।
শোনাই উচিত! নইলে সোফি আর ড্যানির অবস্থা হবে। বাঁচতে হলে ওর কথা শুনতেই হবে, ব্যথায় ককিয়ে উঠল মারলা। কপাল থেকে ঘাম গড়িয়ে পড়ল। বোতলটার দিকে বাঁ হাত বাড়াল, যদিও ডান হাত দিয়েই নেয়ার সুবিধে বেশি।
টান দিয়ে বোতলটা সরিয়ে ফেলল রবিন। অনেক খেয়েছ। ঘুমাও। এখন। কাল সকালে এসে দেখে যাব আবার।
বোতলটা দেয়ার জন্যে অনুরোধ করতে লাগল মারলা। নিজে উঠে রবিনের হাত থেকে কেড়ে নেয়ারও যেন শক্তি নেই। বাঁ হাতটা আরও বাড়িয়ে দিয়ে বলল, দাও, প্লীজ!
বারবার বা হাত বাড়াতে দেখে অবাক হলো রবিন। সন্দেহ হলো ওর। একটানে মারলার গায়ের ওপর থেকে চাদরটা সরিয়ে ফেলল।
মারলার ডান হাতে ব্যান্ডেজ বাধা। আনাড়ি হাতে বেঁধেছে। রক্তে ভিজে গেছে। রক্ত লেগে গেছে হাতটা বিছানার যেখানে ফেলে রেখেছিল সেখানকার চাদরে।
ডান হাতের তর্জনীটা নেই দেখাই যাচ্ছে।
মারলা! চিৎকার করে উঠল রবিন। তুমি কি মানুষ! করলে কি করে একাজ! নিজের আঙুল নিজে কেটে ফেললে!
উঠে বসল মারলা। চোখেমুখে রাগ আর ভয় একসঙ্গে ফুটেছে। আর কি। করতে পারতাম? একটা আঙুলই তো শুধু গেছে। যাক। প্রাণটা তো বাচল। জানো, খুব একটা কষ্ট হয়নি। ভালমত মদ খেয়ে মাতাল হয়ে নিলাম। তারপর ধারাল ছুরি দিয়ে কষে এক পোচ। ব্যস, গেল আলগা হয়ে। চিঠিটার সঙ্গে একটা খামে ভরে রেখেছি...
থামো! আর শুনতে চাই না!
থামল না মারলা। ওটা এখন নিয়ে যেতে হবে ক্লডিয়ার কাছে। বিজ্ঞপ্তিতে তাই বলেছে। ডাকে তো আর পাঠানো যাবে না। রক্ত দেখলেই সন্দেহ করবে। কি আর

করব? নিজেকেই বয়ে নিয়ে যেতে হবে। খামটা একটা পলিথিনের ব্যাগে ভরে নিয়ে যাব।
কাজটা করা তোমার মোটেও উচিত হয়নি…
এটাই উচিত হয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক মানুষ না। পিশাচ! সোফি আর ড্যানির কি দুর্গতি করেছে দেখলেই তো। যেখানে খুশি যেতে পারে সে। যা ইচ্ছে করতে পারে। এর পরেও ওকে ঘটানোর সাহস হবে? কথা না শুনলে। কি ঘটত বুঝেই একাজ করেছি। টুকরো টুকরো হয়ে কিংবা ছাই হয়ে মরার চেয়ে একটা আঙুল খোয়ানো অনেক ভাল।
হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে রবিন বলল, কি জানি কোনটা ভাল! কিন্তু এখন তুমি ওই শয়তানের তারকায় ঢুকে পড়েছ।
তাতে কি হয়েছে? একটা আঙুলের বিনিময়ে বেঁচে তো গেলাম।
কি জানি বাচলে না আরও মরলে! একদিন হয়তো আরও বেশি পস্তাতে হতে পারে এর জন্যে।…ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব? যাবে?
অদ্ভুত দৃষ্টিতে রবিনের দিকে তাকাল মারলা। সাহায্য লাগবে না। আমি নিজেই গাড়ি চালাতে পারব। মাত্র তো একটা আঙুল গেছে। বাকি নয়টাই এখনও ঠিক। তুমি কি ভেবেছ একটা আঙুল বাদ যাওয়াতেই পঙ্গু হয়ে গেছি আমি?
তোমার আব্বা-আম্মাকে ডাকব?
আহ, বললাম তো আমার কোন সাহায্য লাগবে না, বিরক্ত হলো। মারলা। এখন ওদের দেখালে হুলস্থুল কাণ্ড বাধিয়ে দেবে। যে জন্যে নিজের আঙুল খোয়ালাম, সেটাও আর করতে দেবে না। কথার অবাধ্য না হয়েও তত্ত্বাবধায়কের আক্রোশ থেকে বাঁচতে পারব না তখন। বরং সকলেই জানুক। ততক্ষণে ব্যথাও শুরু হবে, তত্ত্বাবধায়কের ফাঁদ থেকেও বেরিয়ে আসব। ডাক্তারের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন মনে করলে নিজেই যেতে পারব… তুমি যাও। এখানে কিছু আর করার নেই। বোতলটা দিয়ে যাও দয়া। করে।
*
গাড়িতে বসে অস্থির হয়ে উঠেছে কিশোর। এত দেরি করছে কেন রবিন? নেমে গিয়ে দেখে আসার কথা যখন ভাবছে এই সময় এল সে। সব কথা জানাল। জবারের সঙ্গে দেখা করে এসেই ক্লডিয়াদের বাড়িতে যাবে, ঠিক করল ওরা। মারলার পরের নামটা ক্লডিয়ার। তত্ত্বাবধায়ক এরপর ওর নামেই মেসেজ পাঠাবে। মারলা কি করেছে সেটা জানিয়ে ক্লডিয়াকে সাবধান করে দেয়া দরকার।
গাড়ি চালাচ্ছে রবিন। পাশে চুপচাপ বসে আছে কিশোর। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে।

কি ভাবছ? রবিনের চোখ সোজা সামনের দিকে। ঝলমলে জ্যোৎস্নার বান ডেকেছে যেন। আকাশে পূর্ণ চাঁদ। পূর্ণিমা নাকি আজ? আচ্ছা, শয়তান উপাসকরা কি পূর্ণিমাকে বেছে নেয়? নাকি অমাবস্যা?
সেটা নির্ভর করে কোন ধরনের পূজা ওরা করছে।
কিশোর, একটা কথা ভাবছি। আমাদের এই তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে ওই শয়তান উপাসকদের কোন সম্পর্ক নেই তো?
সোজা হলো কিশোর। আমিও এতক্ষণ ধরে এই কথাটাই ভাবছি...
*
রিভারসাইডে পৌঁছে মিস্টার জবারের বাড়িটা খুঁজে বের করতে পুরো একটা ঘণ্টা লেগে গেল ওদের। দুজনে একসঙ্গে এসে দাঁড়াল তার দরজার সামনে।
শহরের দরিদ্রতম এলাকায় বাস করেন। এখানে পুরো ব্লকের সব বাড়িই পুরানো। চাঁদের আলোয় বিচিত্র দেখাচ্ছে, যেন কার্ডবোর্ডের তৈরি ছাউনি সব।
মিস্টার জবারের বাড়িটা আরও বেশি পুরানো। মলিন, বিবর্ণ, হতদরিদ্র চেহারা।
দরজায় থাবা দিল কিশোর। বেশ কয়েকবার থাবা দেয়ার পর দরজা খুলে। দিলেন একজন বয়স্ক ভদ্রলোক। ছেঁড়া পর্দার ওপাশ থেকে উঁকি দিলেন। বাড়িটার চেহারার সঙ্গে মিল রাখতেই যেন পরনের পোশাকটাও তার অতি পুরানো।
কি? জিজ্ঞেস করলেন জবার।
আমরা আপনার মেয়ের ব্যাপারে কথা বলতে এসেছি, কিশোর বলল। যাদের সঙ্গে মিশেছিল, তারা আবার জ্বালানো শুরু করেছে। আমরা ওদের শয়তানি বন্ধ করতে চেষ্টা করছি। সেজন্যে আপনার সাহায্য দরকার।
কে তোমরা?
আমার নাম কিশোর। ও রবিন। আমরাও ওদের শয়তানির শিকার। সাংঘাতিক বিপদে ফেলে দিয়েছে। উদ্ধার পেতে চাই।
সারাহকে চিনতে নাকি তোমরা?
না। তবে তার সব কথা জানি। কিভাবে মারা গেছে শুনেছি। মারা যাওয়ার আগে যে লোকটাকে খুন করেছে তার কথাও জানি।
ওই ইবলিসগুলোর সঙ্গে মেশার আগে একটা পিঁপড়ে মারারও ক্ষমতা। ছিল না ওর। কি মেয়েটাকে কি বানিয়ে ফেলল! কেঁপে উঠল বৃদ্ধের কণ্ঠ। এসো। ভাল ছেলে বলেই মনে হচ্ছে তোমাদের। দেখি, কি সাহায্য করা যায়।
মিসেস জবারকে ডিস্টার্ব করব না তো আবার? বিনীত ভঙ্গিতে বলল কিশোর।
না না, ও ঘুমের বড়ি খেয়ে ঘুমাচ্ছে। একটু আস্তে কথা বললেই হবে। মেয়েটা মারা যাওয়ার পর থেকেই ঘুম-নিদ্রা একেবারে গেছে বেচারির। কড়া কড়া ঘুমের ওষুধ

খেয়ে ঘুমাতে হয় এখন।
বসার ঘরে ওদেরকে নিয়ে এলেন মিস্টার জবার। বয়েস ষাটের কাছাকাছি হবে। সারাহ্ নিশ্চয় ওদের বেশি বয়েসের সন্তান। কিংবা পালিতা কন্যাও হতে পারে।
রবিন আর কিশোরকে বসতে দিয়ে বললেন, হ্যাঁ, বলো এখন, কি জানতে চাও?
কি করে মারা গেল আপনার মেয়ে? জানতে চাইল কিশোর। সে একাই কথা বলছে। রবিন চুপ করে আছে।
যেদিন মারা গেল সেদিন রাতে ওর ঘর থেকে একটা চিৎকার শুনলাম। মনে হলো প্রচণ্ড ব্যথায় চিৎকার করছে। দৌড়ে গিয়ে দেখি বুক চেপে ধরে মেঝেতে গড়াগড়ি করছে সারাহ। বুঝলাম হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নিয়ে গেলাম। ডাক্তাররা অনেক চেষ্টা করেছে। কিন্তু বাঁচাতে পারল না। বুক চেপে ধরে কাশতে লাগলেন জবার। অবস্থা দেখে মনে হলো যেন তাঁরই হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাবে। অনেক কষ্টে কাশি থামিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আমার মেয়ে মানুষ খুন করেছে একথা তোমাদের কে বলল?
মিসেস জোসেফিনা ব্রেক।
বেচারি, একটা সেকেন্ড মুখ নিচু করে রাখলেন মিস্টার জবার। মুখ তুলে জিজ্ঞেস করলেন, আমার কাছে কি জানতে চাও?
আপনার মেয়ের যে কোন বন্ধুর নাম, যে ওই শয়তান উপাসকদের সঙ্গে জড়িত ছিল, কিংবা এখনও আছে।
ওর কোন বন্ধু ছিল না। ও ছিল একেবারে একা। নিঃসঙ্গ। এত সুন্দরী ছিল, কিন্তু কোন দিন কোন ছেলেবন্ধু জোটেনি। কোন ছেলে এসে ওর সঙ্গে যেচে বন্ধুত্ব করতে চায়নি। খুব অবাক লাগত আমার। কোন মেয়ে ওকে কখনও ফোন করত না। কেন, কখনও বুঝতে পারিনি। এখনও পারি না। জন্মের পর থেকেই খুব শান্ত ছিল মেয়েটা। হৈ-হট্টগোল পছন্দ করত না। কারও সঙ্গে কথা বলত না। একা একা নিজের মত থাকত। সেই মেয়েটাই শেষে কি হয়ে গেল!
কার সঙ্গে প্রথম মেলামেশা করেছিল, জানেন নাকি? এতক্ষণে একটা প্রশ্ন করল রবিন। কথা তো সে নিশ্চয় কারও সঙ্গে বলেছে। নইলে শয়তান উপাসকদের খপ্পরে পড়ল কি করে?
নাহ, জানি না! ক্ষোভের সঙ্গে জবাব দিলেন মিস্টার জবার। যদি জানতাম এই অবস্থা হবে, তাহলে তো কড়া নজরই রাখতাম। কি করে যে ওই ইবলিসগুলোর সঙ্গে পরিচয় হলো, কিছুই বলতে পারব না।
এদিক ওদিক তাকাতে গিয়ে কয়েকটা বাধানো ছবির ওপর দৃষ্টি আটকে গেল রবিনের। একটা বুকশেলফের ওপর দাঁড় করানো। জবারদের পারিবারিক ছবি।

চেয়ার থেকে উঠে পায়ে পায়ে সেগুলোর দিকে এগিয়ে গেল সে। একটা ছবিতে একা একটা মেয়ে বসে আছে। লাল চুল। সবুজ চোখ। বেড়ালের চোখের মত জ্বলছে। মেয়েটার চোখ দেখলেই মনে হয় মানসিক রোগী। কোন সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষ এরকম করে তাকায় না। হাত নেড়ে কিশোরকে ডাকল রবিন।
কাছে এসে দাঁড়াল কিশোর, কি?
দেখো তো চিনতে পারো নাকি?
একবার তাকিয়েই বলে উঠল কিশোর, বিকেলে মুসাকে ডেকেছিল যে সেই মেয়েটার মত না?
মাথা ঝাঁকাল রবিন। হ্যাঁ। কেবল চুলের রঙ বাদে।
ফিরে তাকাল কিশোর, মিস্টার জবার, সারাহর কোন যমজ বোন ছিল?
না তো! উঠে এলেন তিনি। কেন?
ছবির দিকে আঙুল তুলল কিশোর, আজ বিকেলে অবিকল এই চেহারার একটা মেয়েকে দেখেছি আমরা।
কাকে দেখেছ কে জানে। আমার মেয়ে মারা গেছে পনেরো দিন আগে। ওকে দেখতেই পারো না।
কিন্তু দেখেছি, জোর দিয়ে বলল রবিন, কোন সন্দেহ নেই আমার।
অসম্ভব! জোর দিয়ে বললেন মিস্টার জবার।
দ্বিধায় পড়ে গেল রবিন, চেহারার তো কোন অমিল নেই। চুলের রঙে মিলছে না যদিও। কিন্তু সেটাও কোন ব্যাপার নয়। হেয়ার ড্রেসারের দোকানে গিয়ে যে কেউ লাল চুলকে সোনালি করিয়ে নিতে পারে।
ঠিক বলেছ, ওর সঙ্গে একমত হয়ে বলল কিশোর। মিস্টার জবার, আপনি যা-ই বলুন না কেন, আপনার মেয়ে বেঁচে আছে...
কি বলছ তোমরা মাথায় ঢুকছে না আমার! নিজের চোখে ওকে মর্গে মৃত দেখে এলাম...
কিন্তু পরদিন গিয়ে আর লাশটা খুঁজে পাননি...
পাইনি। তাতে অত অবাক হওয়ার কিছু নেই। হাসপাতালের মর্গ থেকে লাশ গায়েব হওয়াটা নতুন ঘটনা নয়। কঙ্কাল বিক্রির লোভে ডোমেরাই অনেক সময়...
উত্তেজিত হয়ে সবাই কিছুটা জোরে জোরে কথা বলা শুরু করেছিল, তাতে ঘুম ভেঙে গেল মিসেস জবারের। ভেতরের ঘর থেকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, গ্যারি, কার সঙ্গে কথা বলছ?
কারও সঙ্গে না, মাই ডিয়ার, জবাব দিলেন মিস্টার জবার। ঘুম আসছে না তো, একা একাই। তুমি ঘুমাও। আমি আসছি একটু পরেই, রবিন আর কিশোরের

দিকে তাকিয়ে হাত নেড়ে ফিসফিস করে বললেন, জলদি পালাও। তোমাদের দেখলে সারারাতেও আর ঘুমাবে না। বকবক করতেই থাকবে।
বকবকে কিশোরেরও বড় ভয়। রবিনের হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল। দরজার কাছে গিয়ে ফিরে তাকিয়ে বলল, মিস্টার জবার, পরে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব।
রবিনকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল সে। বাইরে বেরিয়েই বলে উঠল, সারাহকেই দেখেছি আমরা। সেরাতে মারা যায়নি সে। হার্ট অ্যাটাকে অনেক সময় কমাতে চলে যায় মানুষ। মৃত্যুর সমস্ত লক্ষণ ফুটে ওঠে শরীরে। ডাক্তাররাও ভুল করে ফেলেন। সারাহর ক্ষেত্রেও নিশ্চয় ওরকম কিছু ঘটেছিল। হুঁশ ফেরার পর পালিয়েছে।
হ্যাঁ, এটা হওয়া বিচিত্র নয়। এমনও হতে পারে হার্ট অ্যাটাকটা ছিল তার বাহানা। মেডিটেশন করে করে এত ক্ষমতাই অর্জন করেছে, ইচ্ছে করলে সুপ্তির এমন এক জগতে চলে যেতে পারে, যাতে মনে হয় মরেই গেছে...অনেক পীর-ফকির তো এসব করেই মানুষকে ধোকা দেয়
জানি! চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল কিশোর। জলদি গাড়িতে ওঠো। মেয়েটাকে খুঁজে বের করতে হবে।
ক্লডিয়াদের ওখানে যাব না?
যাও। ওকে সাবধান করা দরকার। তাড়াতাড়ি করো।
*
এত রাতেও ক্লডিয়াদের গেট খোলা। হাঁ হয়ে খুলে আছে। হয় কেউ গাড়ি নিয়ে ঢুকেছে, ঢোকার পর আর বন্ধ করেনি। নয়তো কেউ তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে গেছে। লাগানোর সময় ছিল না।
সোজা গাড়িবারান্দায় ঢুকল রবিন। গাড়ি থামাল। নেমে গিয়ে বেল বাজাল। খুলে দিলেন কুড়িয়ার বাবা মিস্টার নিউরোন। পরনে পাজামা। ঘুম থেকে উঠে এসেছেন। রবিনকে চেনেন।
এত রাতে তোমারও দরকার পড়ল নাকি ক্লডিয়াকে? কণ্ঠস্বরেই বোঝা গেল মেজাজ ভারী হয়ে আছে তার। কোন কারণে খাপ্পা। পুলিশের লোক। চোর-ডাকাত নিয়ে কারবার। মেজাজ খিঁচড়ে থাকাটা অস্বাভাবিক না।
মানে! অবাক হলো রবিন। কি বলছেন, আঙ্কেল? আরও কেউ এসেছিল নাকি?
কি যে সব হয়েছে আজকাল তোমাদের, বুঝি না! আমাদের কি অমন বয়েস ছিল না নাকি? রাত দুপুরে যত্ত সব জরুরী কাজ পড়ে গেল সবার। তোমার দেখা করাটাও নিশ্চয় জরুরী?
সত্যি বলছি, আঙ্কেল, আসলেই জরুরী। ক্লডিয়াকে একটু ডেকে দেবেন, প্লীজ?

ও কি বাড়ি আছে নাকি যে ডেকে দেব। খানিক আগে মারলা এসেছিল। হাতে করে একটা পলিথিনের ব্যাগ নিয়ে এসেছিল। ডান হাতে তোয়ালে জড়ানো। কি যে বলল ক্লডিয়াকে কে জানে। একটু পরেই দেখি হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় যাচ্ছিস? বলে, মুসাদের বাড়ি। ...কেন?: জরুরী কাজ আছে। এজন্যেই তো বলছি রাত দুপুরে এমন কি কাজ পড়ে গেল যে... সরাসরি রবিনের দিকে তাকালেন মিস্টার নিউরোন। কোথাও যাওয়ার কথা আছে নাকি তোমাদের?

আছে বলাটাই নিরাপদ ভেবে তা-ই বলে দিল, রবিন। পুলিশী সন্দেহ এবং জেরা এড়ানোর জন্যে। জেরার মধ্যে পড়লেই ফাস করে দিতে হবে সব। কোন উপায় থাকবে না। তার পেট থেকে সমস্ত কথা আদায় করে নেবেন মিস্টার নিউরোন। এখনও সব কথা পুলিশকে জানানোর জন্যে তৈরি নয় ওরা।

বেরোনোর সময় সঙ্গে করে কিছু নিয়ে গেছে? জানতে চাইল রবিন।

হ্যাঁ। একটা পলিথিনের ব্যাগে করে কি যেন নিয়ে গেল।

অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, আঙ্কেল। শুধু শুধু এত রাতে কষ্ট দিলাম। সরি।

কিন্তু ঘটনাটা কি...কোথায় যাচ্ছ তোমরা?

পর্বতে, বলার সময় মিস্টার নিউরোনের দিক থেকে চোখ সরিয়ে রাখল রবিন। মিথ্যে কথা ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে। তাড়াতাড়ি এসে গাড়িতে উঠল।

দরজায় দাঁড়িয়ে তখনও ওদের দিকে তাকিয়ে আছেন মিস্টার নিউরোন। চিন্তিত মনে হচ্ছে তাকে। হাজার হোক পুলিশের লোক। সন্দেহটা বোধহয় ঠিকই করে বসেছেন।

গাড়িতে উঠে কিশোরকে সব জানাল রবিন। তারপর বলল, ব্যাপারটা মোটেও ভাল ঠেকছে না আমার, কিশোর। ক্লডিয়া মুসাদের বাড়ি গেল কেন?

তাই বললেন নাকি মিস্টার নিউরোন? নিশ্চয় তত্ত্বাবধায়কের কাজে গেছে, তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল কিশোরের গলা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস মারলার কাটা আঙুল পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুসাকে জানানোর জন্যে ক্লডিয়াকে জরুরী কোন মেসেজ দিয়েছে তত্ত্বাবধায়ক। জলদি যাও এখন মুসাদের বাড়িতে।

ক্ষতির আশঙ্কা করছ নাকি তুমি?

সে তো বটেই।

কি ক্ষতি?

স্টার্ট দাও, বলছি। তোমার নামটা নেই কেন চিঠিতে, বুঝে ফেলেছি আমি। রবিন, ভয়ানক বিপদের মধ্যে রয়েছ তুমি আর মুসা!

.

চোখ মেলল মুসা। আবার দুঃস্বপ্ন দেখেছে। কদিন ধরে যে কি হয়েছে তার বুঝতে পারছে না। ঘুমালেই দুঃস্বপ্ন দেখে।
ছাতের দিকে চোখ পড়ল। পরিচিত ছাত। নিজেদের বাড়ি।
পাশ ফিরে তাকাল। বিড়ালের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে সোফায় ঘুমাচ্ছে। ক্রিসি। নিজের ঘরে যেমন ঘুমাত, তেমনি ভাবেই। কিছুতেই ওকে বিছানায় শুতে রাজি করাতে পারেনি মুসা।
হাত-পা টানটান করে দিয়ে আড়মোড়া ভাঙল মুসা। পা লম্বা করে দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে নেমে এল বিছানা থেকে। মুখের ভেতরটা শুকনো। মাথা ধরেছে। কদিন ধরে এই ব্যথাটা লেগেই আছে, কখনও টিপ টিপ করে, কখনও তীব্র। ব্যথা কমানোর ওষুধ খেয়েও পুরোপুরি সারানো যাচ্ছে না। সেই সঙ্গে অদ্ভুত একটা ঘোর লাগা ভাব। সেই সঙ্গে ক্লান্তি। বহুবার বলেছে ক্রিসিকে। গুরুত্বই দেয়নি সে। হেসে উড়িয়ে দিয়েছে।
জানালার কাছে এসে বাইরে রাতের শহরের দিকে তাকাল সে। নির্জন রাস্তা। পৃথিবী মনে হচ্ছে না। যেন অন্য কোন গ্রহ। নিজের শরীরটাকেও নিজের লাগছে না তার। পেশিতে পেশিতে ব্যথা। একটা অদ্ভুত ব্যাপার হলো। কোনমতেই তাকে কাছছাড়া করতে চাইছে না ক্রিসি। কোন না কোন ছুতোয় সঙ্গে রয়ে যাচ্ছে। বিকেলে মীটিং থেকে ধরে নিয়ে যেতে চেয়েছিল নিজের বাসায়। মুসা রাজি হয়নি। শেষে যেচে-পড়েই ওর সঙ্গে চলে এসেছে ওদের বাড়িতে। খানিকটা গাইগুই করলেও চক্ষুলজ্জায় সরাসরি মানা করতে পারেনি মুসা।
কিন্তু কেন?
কি চায় ওর কাছে ক্রিসি?
কেন ওর সঙ্গে ছায়ার মত লেগে আছে?
এতদিনে বুঝে গেছে শুধু ম্যাসাজ করার জন্যে ওকে ডেকে নেয়নি সে। তাকে দিয়ে কিছু একটা করাতে চায়। যে কারণে আটকে রেখেছে। নিজের চোখে চোখে রেখেছে। কি করতে হবে সেটা এখনও বলেনি। তবে বলবে। শীঘ্রি। অনুমান করতে পারছে মুসা।
গেট দিয়ে একটা গাড়ি ঢুকল। এঞ্জিনের আওয়াজ শোনা গেল। গাড়ি বারান্দায় এসে থামল গাড়িটা।
ফিরে তাকাল মুসা।
জেগে গেছে ক্রিসি। ওর সবুজ চোখ পুরোপুরি সজাগ। ঘুমের সামান্যতম ছোঁয়া নেই। বিড়ালের মত। বিড়াল যেমন জাগার সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হয়ে যায়, ঠিক তেমনি।
এত রাতে কে? দরজার দিকে এগোতে গেল মুসা।

বাধা দিল ক্রিসি। দাঁড়াও ডাকুক আগে। তোমার কাছেই এসেছে।
সদর দরজায় ঘণ্টা বাজল। চোখের ইশারা করল ক্রিসি, এবার যাও। সাবধান থাকবে।
কেন?
যা বললাম কোরো। আমার কথার অবাধ্য হলে বিপদে পড়বে।
থমকে গেল মুসা। হুমকি দিল নাকি ওকে ক্রিসি? ওর কণ্ঠস্বর এরকম বদলে গেছে কেন?
আবার ঘণ্টা বাজল। ক্রিসির ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে ভাবতে দরজার দিকে এগোল মুসা। নিচে নেমে দরজা খুলে দিল। ও ভেবেছিল রবিন কিংবা কিশোর হবে। কিন্তু ক্লডিয়াকে আশা করেনি। ওর হাতে একটা পলিথিনের ব্যাগ।
তুমি!
হ্যাঁ, ভোতা, শুকনো গলায় বলল ক্লডিয়া, তোমার জন্যে এনেছি এটা। ব্যাগটা বাড়িয়ে দিল, নাও। যা খুশি করো এটা নিয়ে।
ব্যাগটা নিল মুসা, ঘটনাটা কি, বলো তো?
মারলা তার কাজ সেরে চিঠিটা পৌঁছে দিয়েছে আমাকে, কেমন যান্ত্রিক গলায় বলল ক্লডিয়া। ওকে যা করতে বলা হয়েছে সে করেছে। আমাকে যা বলা হয়েছে এখন আমি সেটা করলাম।
কে বলেছে?
তত্ত্বাবধায়ক। আমাদের ডাকবাক্সে একটা নোট পেয়েছি। দুটো মেসেজ লেখা আছে তাতে। একটা আমার জন্যে। একটা তোমার জন্যে। ব্যাগের মধ্যে আছে সেটা। আর একটা পিস্তল আছে।
পিস্তল?
হ্যাঁ, আমার আব্বারটা। তত্ত্বাবধায়ক তোমার কাছে পৌঁছে দেয়ার হুকুম দিয়েছে আমাকে। মেসেজ পড়লেই সব জানতে পারবে। যা যা দিলাম এই ব্যাগে, সব তোমার প্রয়োজন হবে।
এই সময় মুসার পাশে এসে দাঁড়াল ক্রিসি।
দেখে চোখ বড় বড় হয়ে গেল ক্লডিয়ার। এক পা পিছিয়ে গেল।
দাত বের করে দরাজ হাসি হাসল ক্রিসি। পিস্তলটাতে গুলি আছে তো, ক্লডিয়া?
ঢোক গিলল ক্লডিয়া। আপনাকে চেনা চেনা লাগছে?
চেনা মানুষকে তো চেনাই লাগবে, রহস্যময় কণ্ঠে জবাব দিল ক্রিসি। সময় যাক, আরও ভাল করে চিনতে পারবে। তোমাকে যা করতে বলা হয়েছে, করেছ নিশ্চয় ঠিকঠাক মত?
আ-আপনাকেও কিছু করতে বলেছে নাকি তত্ত্বাবধায়ক?

হেসে উঠল ক্রিসি। কথা কম বলো। ভাগো এখন, যাও। ক্লডিয়ার মুখের ওপর দড়াম করে দরজাটা লাগিয়ে দিল সে। মুসার দিকে ঘুরে দাঁড়াল। ব্যাগ খোলো।
ব্যাগের ভেতরে হাতড়াতে লাগল মুসা। ক্লডিয়া তার বাবার পিস্তলটা নিয়ে এসেছে। বের করে হাতে নিল। বলে গেছে গুলি ভরা আছে। দেখার প্রয়োজন বোধ করল না সে। মাথার মধ্যে কেমন করছে। ঘোরটা যেন। বাড়ছে। গুলিয়ে যাচ্ছে সবকিছু। এমন লাগছে কেন?
পিস্তলটা একহাতে নিয়ে আবার ব্যাগ হাতড়াল মুসা। মারলার কাটা আঙুলটা বের করে আনল। সঙ্গে সঙ্গে হাত থেকে ফেলে দিল ওটা। ব্যাগ। আর পিস্তলটাও পড়ে গেল মেঝেতে। ভাগ্য ভাল, ঝাঁকুনি লেগেও গুলি ফুটল না।
কাটা আঙুল এবং পিস্তল, দুটোই মাটি থেকে কুড়িয়ে নিল ক্রিসি। আঙুলটা নিজের পকেটে ভরে পিস্তলের চেম্বার খুলল। খোলার ভঙ্গি দেখেই বোঝা গেল এ কাজে অভ্যস্ত সে। ব্যবহার করতে জানে।
ম্যাগাজিন গুলিতে ভর্তি।
খলখল করে হেসে উঠল ক্রিসি। আজকের রাতটা হবে আমাদের মহাআনন্দের রাত। জলদি তোমার মেসেজটা পড়ে ফেলো।
কাঁপা হাতে ব্যাগ থেকে কাগজের টুকরোটা বের করল মুসা। দোমড়ানো লাল কাগজে লেখা নোট। জানালা দিয়ে আসা চাঁদের উজ্জল আলোয় লেখাটা পড়ার চেষ্টা করল সে কষ্ট হলো বুঝতে, তবে পড়তে পারল। উল্টো করে লেখা বাক্যটার মানে করলে হয়:
রবিনের খুলি উড়িয়ে দাও
নোটটাও হাত থেকে খসে পড়ে গেল মুসার। আমি পারব না!
পারবে, পারবে। না পারার কোনই কারণ নেই। নইলে কি ঘটবে জানো? জেলে যেতে হবে তোমাকে।
গেলে যাব। তবু রবিনকে খুন করতে পারব না আমি। মাথা খারাপ নাকি!
তাহলে তোমাকে খুন হতে হবে, কঠিন হয়ে গেল ক্রিসির কণ্ঠ। তারপরও বাঁচবে না রবিন। তাকে খতম করার ব্যবস্থা করা হবে। একবার যখন টার্গেট হয়ে গেছে, তত্ত্বাবধায়কের হাত থেকে তার নিস্তার নেই...
তত্ত্বাবধায়কের কথা আপনি জানলেন কি করে?
মুচকি হাসল ক্রিসি। কারণ আমিই তত্ত্বাবধায়ক। এতক্ষণে তোমার বুঝে যাওয়ার কথা। আমি তো ভাবলাম বুঝে গেছ।
মাথার ঘোলাটে ভাবটা কাটছে না মুসার। ঘোরটা যাচ্ছে না। ভাবল, আবার দুঃস্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু এভাবে খুন-খারাপি করে, একজনকে দিয়ে আরেকজনকে খুন করিয়ে লাভটা কি আপনার?

লাভ আছে। আমার গুরু বলেছেন নিজের হাতে খুন করার চেয়ে অন্যকে দিয়ে খুন করিয়ে মৃত আত্মাগুলোর মালিক হতে পারলে অনেক বেশি ক্ষমতাশালী হওয়া যায়। কারণ এতে চালাকির দরকার হয়। শয়তান নিজে চালাক। তাই চালাক মানুষকে পছন্দ করে। আমি নিজে কতটা চালাক সেটা বোঝার জন্যে, এবং একই সঙ্গে আত্মার মালিক হওয়ার জন্যে এই ফাঁদ পেতেছি আমি। তোমাদের টার্গেট করেছি। কনসার্টের টিকেটগুলো তোমাদের কাছে আমিই পাঠিয়েছিলাম। বোকার মত আমার ফাঁদে ধরা দিয়েছ তোমরা।
তোমরা কনসার্ট থেকে ফেরার আগে ডেভন গাধাটাকে খুন করে নিয়ে গিয়ে রাস্তায় ফেলে রেখেছিলাম। কাকতালীয় ভাবে হেডলাইট নিভিয়ে গাড়ি চালিয়ে আমার সুবিধে করে দিলে তোমরা। আমার বিশ্বাস, এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করেছেন খোদ শয়তান। লোকটাকে যে তোমরাই খুন। করেছ এটা তোমাদের বোঝাতে কোন কষ্টই হলো না আমার। চিঠি দিয়ে তখন তোমাদের ব্ল্যাকমেইল করা সহজ হয়ে গেল আমার জন্যে। ঘাবড়ে গিয়ে সোফি অ্যাক্সিডেন্ট করে মারা যাওয়াতে আরও ভড়কে গেলে তোমরা। ওকে আর আমার নিজের হাতে মারতে হয়নি। তবে আমার চিঠি পাওয়াতেই ঘাবড়ে গিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট করেছে সে। ওর আত্মার মালিক তাই আমি। শয়তানি হাসি ফুটল ক্রিসির ঠোঁটে। ড্যানিকে আমিই পুড়িয়ে মেরেছি। আমার অবাধ্য হয়ে পালিয়ে বাঁচতে চেয়েছিল বলে ভীষণ রাগ হয়েছিল আমার। তবে ওর খোঁজ দেয়ার জন্যে তোমাকে একটা ধন্যবাদ দিতেই হয়…
আমি খোঁজ দিয়েছি! মূসা অবাক। কখন?
সেরাতে ওকে ফোন করাটা মোটেও উচিত হয়নি তোমার। ফোন করে নিজের অজান্তেই আমাকে জানিয়ে দিলে ও কোথায় আছে…
রাগ মাথাচাড়া দিচ্ছে মুসার মগজে। পা বাড়াতে গেল সে।
পিস্তল নেড়ে নিষেধ করল ক্রিসি, উঁহু! মারা পড়বে! একটু এদিক ওদিক দেখলেই গুলি মেরে দেব। আমি যে সেটা পারব, তোমার বিশ্বাস করা উচিত।
বিশ্বাস করল মুসা। এখন আমাকে কি করতে হবে?
বললামই তো, রবিনকে খুন করো।
তাতে আমার লাভটা কি হবে? বন্ধুকে খুন করব। তাকে খুনের দায়ে আমাকে ধরে নিয়ে যাবে পুলিশ
নিতে যাতে না পারে, সে ব্যবস্থা আমি করতে পারি। তবে এক শর্তে।
বলে ফেলুন।
আমাদের দলে যোগ দিতে হবে।
শয়তানের দলে!

শয়তানকে ঘৃণা করা উচিত না। শয়তান ভীষণ ক্ষমতাশালী। তোমাকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে। আমি জানি, গুরুরও হবে। তোমার মত ছেলে আমাদের দরকার।

ঘুম ভেঙেছে অনেকক্ষণ। তারপর চমকের পর চমক। আস্তে আস্তে ঘোরটা কেটে যাচ্ছে মুসার। মাথার ভেতরটা পরিষ্কার হয়ে আসছে। কেন এই ঘোর, শরীর খারাপ লাগা, মাথা ধরা, দুঃস্বপ্ন দেখা, তা-ও অনুমান করতে, পারছে এখন। ম্যাসাজ করার আগে দুটো করে বড়ি খাইয়েছে ওকে ক্রিসি। নিশ্চয় তার মধ্যে ভয়ঙ্কর নেশা জাতীয় কোন জিনিস দিত। আফিম-টাফিম জাতীয় কিছু। বলল, কিন্তু আপনার কথায় বিশ্বাস কি?

বিশ্বাস করা ছাড়া আর কোন পথ নেই এখন তোমার। তবে সত্যি বলছি, তোমাকে দিয়ে আমাদের দলের অনেক কাজ হবে। সেজন্যেই তোমাকে মারব না। তা ছাড়া শুরুতেই একটা খুন করে ফেলে সাধনার একটা বড় ধাপ ডিঙিয়ে যাবে তুমি। এরপরের ধাপগুলো ডিঙানো খুব একটা কঠিন হবে না তোমার জন্যে। মহাক্ষমতাধর হয়ে যাবে তুমি অল্প বয়েসেই। আবার পিস্তল নাচাল ক্রিসি, ভেবে দেখো, কোনটা করবে? বেঁচে থেকে ক্ষমতাশালী হবে, না অকালে ধ্বংস হবে?

ভাবল মুসা। ক্ষমতাশালীও হতে চায় না, ধ্বংসও হতে চায় না। ঘাড় কাত করল, ঠিক আছে, আমি রাজি। হাত বাড়াল, দিন পিস্তলটা।

উঁহু, অত সহজে না, মাথা নাড়ল ক্রিসি। তোমাকে সেই জায়গাটায় নিয়ে যাব, যেখানে কবর দিয়েছ ডেভনকে। নাটকীয়তার জন্যে করছি ভেবো না। ওর আত্মা ঘোরাফেরা করছে ওর কবরের কাছে। সাধনা করে সোফি আর ড্যানির আত্মাকেও ওখানে পাঠিয়ে দিয়েছি। রবিনকে ওখানে নেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। হলো চারজন। ছয়টা তারকার বাকি দুটো কোণও ভরব আমি আর দুজনকে দিয়ে–মারলা আর ক্লডিয়া। ইতিমধ্যেই তারকার কোণে ঢুকে পড়েছে ওরা। একবার যখন ঢুকেছে, বেরোতে আর পারবে না। তারকার ছয়টা কোণ ভর্তি করার পর মাঝখানে ঢোকাব আমার নাম…

কি করে ঢুকবেন? আপনাকেও তো মরতে হবে তাহলে।

মরব। তবে আবার বেঁচে ওঠার জন্যে। হৃৎপিণ্ডে ছুরি ঢুকিয়ে আত্মহত্যা করব। তারকার ছয়টা আত্মাকে বশ করার পর ওদের সাহায্যেই বেঁচে উঠব আবার। বেঁচে থাকব অনন্তকাল। অসীম ক্ষমতার অধিকারী হব আমি…

আপনার পাগলা গুরুটা বুঝিয়েছে বুঝি এসব? নেশার ঘোর পুরোপুরি কেটে গেছে মুসার। উন্মাদ না হলে কোন ছাগলে বিশ্বাস করে…

ধক করে জ্বলে উঠল ক্রিসির বিড়াল-চোখ। খবরদার, আমার গুরুকে নিয়ে ঠাট্টা করবে না! যা বলছি করো, প্রমাণ পেয়ে যাবে কার কথাটা সত্যি।

হ্যাঁ, প্রমাণই দরকার আমার। বলুন, কি করতে হবে।

.
মুসাদের বাড়ির সদর দরজায় টেপ দিয়ে সঁটা কাগজটা প্রথম চোখে পড়ল রবিনের। তাতে গোটা গোটা করে লেখা:
রবিন, মরুভূমিতে সেই লোকটার কবরের কাছে যাচ্ছি আমি। তুমি এখনই চলে এসো। আসবে অবশ্যই। জরুরী কথা আছে।–মুসা।
অবাক হলো রবিন। ডেকে দেখাল কিশোরকে।
গম্ভীর হয়ে গেল কিশোর। বিপদের গন্ধ পাচ্ছি আমি, রবিন। সাবধান থাকতে হবে।
যাবে না ওখানে?
যাব তো বটেই। না গেলে মুসাকে বাঁচানো যাবে না। চলো। রাতের বেলা এখন জায়গাটা খুঁজে পাবে তো?
পাব।
খুব একটা অসুবিধে হলো না রবিনের। মোড়ের কাছে পাহাড়ের একটা খাড়া দেয়ালের কাছে এসে গাড়ি থামাল। সেরাতে গাড়ির গুতো লেগে বালির দেয়ালে গর্ত হয়ে গিয়েছিল। সেটা দেখাল কিশোরকে।
রাস্তা থেকে কতটা দূরে কবর দিয়েছিলে? জানতে চাইল কিশোর। টর্চ জ্বালার প্রয়োজন নেই। দেখার জন্যে চাঁদের আলোই যথেষ্ট।
এই পঞ্চাশ কদম হবে। কিন্তু আর গাড়ি কই? মুসার তো আমাদের আগেই চলে আসার কথা।
যেখানে যেতে বলেছে সেখানে আগে যাই চলো। নিশ্চয় আসবে।
রাস্তা থেকে নেমে বালির ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সেই রাতটার কথা ভাবল রবিন। একটা ভয়াবহ অশুভ রাত। অন্ধকার। ঝোড়ো বাতাসে বালি উড়িয়ে এনে ওদের চোখে-মুখে ফেলছিল। লোকটাকে কবর দিতেও কত যে অসুবিধে ভোগ করেছে ওরা। ইস, যদি খালি জানত, ও আগেই মরে। গিয়েছিল। ওরা খুন করেনি। তাহলে কি এই ঝামেলায় পড়তে হয়।
আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকাল। বিশাল গোল চাঁদ। উজ্জ্বল জ্যোৎস্না। আর সেদিন ছিল অমাবস্যার অন্ধকার। কোন কুক্ষণে যে হেডলাইট নিভিয়ে গাড়ি চালানোর বাজিটা ধরেছিল ওরা। ডাকে আসা রহস্যময় টিকিট পেয়ে কনসার্টে যাওয়াটাও পাপ হয়েছে। সেজন্যেই এই শাস্তি...
কিন্তু ওরা কি আর জানত ওদের কোন বন্ধু মজা করে নয়, তত্ত্বাবধায়কই শয়তানি করে টিকেটগুলো পাঠিয়েছিল, ওদের ফাঁদে ফেলার জন্যে। কিভাবে। জানবে? কয়েক মিনিটের মধ্যে ক্যাকটাস আর মরুর শুকনো ঝোপে ঘেরা একটা জায়গায় এসে দাঁড়াল দুজনে। গোল খোলা জায়গাটাকে ঘিরে যেন প্রহরীর মত

দাঁড়িয়ে আছে বড় বড় ক্যাকটাসগুলো। চাঁদের আলোয় লম্বা ছায়া পড়েছে। মাটিতে। ওগুলোর মাঝখানে তিন-চার ফুট গভীর একটা খাদ। খাদের তলায়। পাথরের স্তূপ। বালি খুড়ে কবর দেয়ার পর পাথর দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছিল। কবরটা যাতে শেয়াল বা মরুভূমির অন্য কোন লাশখেকো জানোয়ারে তুলে নিয়ে যেতে না পারে।

হাত তুলে দেখাল রবিন, ওই যে…

ওর কথা শেষ হতে না হতেই উহ্ করে উঠল কিশোর। গড়িয়ে পড়ে গেল খাদের মধ্যে।

কি হলো! বলে চিৎকার দিয়ে ফিরে তাকিয়েই রবিন দেখল মুসা দাঁড়িয়ে আছে। ওর হাতে একটা বেজবল ব্যাট, কোমরের বেল্টে গোঁজা পিস্তল। ক্যাকটাসের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে। বাড়ি মেরে ফেলে দিয়েছে কিশোরকে।

পাগল হয়ে গেলে নাকি? বলতে গেল রবিন। কিন্তু তাকেও এক ধাক্কায়। খাদে ফেলে দিল মুসা।

খিলখিল হাসি শোনা গেল আরেকটা গাছের আড়াল থেকে। বেরিয়ে এল সোনালি চুল সেই মেয়েটা। ওর হাতেও একটা রূপালী রঙের পিস্তল। আদেশ দিল, ব্যাটটা ফেলো। পিস্তল খুলে নাও। শেষ করে দাও ওকে।

ব্যাট ফেলে কোমর থেকে পিস্তল খুলে নিল মুসা।

বালিতে পড়ায় তেমন ব্যথা পায়নি রবিন। কোনমতে উঠে বসে চিৎকার করে বলল, কি করছ, মুসা? তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি?

না, রবিনের দিকে পিস্তল তাক করে জবাব দিল মুসা, আমার মনিব। তত্ত্বাবধায়কের হুকুম পালন করছি। ক্লডিয়া এসে এই পিস্তল সহ মেসেজ রেখে। গেছে। তাতে বলা হয়েছে গুলি করে তোমার খুলি উড়িয়ে দিতে। সেটাই করতে যাচ্ছি। নইলে ভয়ঙ্কর মৃত্যু ঘটবে আমার।

মুসা, শোনো বোকামি কোরো না…

পিস্তল কক করল মুসা। বিদায়, রবিন।

শোনো, মুসা, প্লীজ!

কি শুনব?

আমাকে খুন করলেও ও তোমাকে ছাড়বে না। আমি জানি…

সেজন্যেই তো ওদের দলে যোগ দিতে যাচ্ছি আমি। তোমার আত্মা চুরি করে একদিন মহাক্ষমতাধর হয়ে যাব।

এসব কথা তোমাকে বুঝিয়েছে বুঝি ডাইনীটা? তোমার মগজ ধোলাই করে দিয়েছে…

দেরি করছ কেন, মুসা? ক্রিসি বলল। গুলি করো।

হ্যাঁ, করছি। একটা কথা মনে পড়ল। যুদ্ধের সময় জার্মানরা অনেক বন্দিকে দিয়ে কবর খোঁড়াত, তারপর কবরের কিনারে ওদের দাঁড় করিয়ে করত। ডিগবাজি খেয়ে গর্তে উল্টে পড়ত গুলি খাওয়া মানুষগুলো। দেখতে নাকি খুবই ভাল লাগত ওদের। আমার এখন সেটা দেখতে ইচ্ছে করছে।
হা-হা করে অট্টহাসি হাসল ক্রিসি। নির্জন মরুর বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল সে-শব্দ। বাহ, আমার নির্বাচনে ভুল হয়নি। শয়তানের উপাসনা করতে হলে এই মানসিকতাই তো দরকার। যে যত নিষ্ঠুরতাই বলুক এসব কাজকে, আমি বলব না। এগুলোই তো মজা। প্রথম পরীক্ষায় উতরে গেলে তুমি, মুসা। ঠিক আছে, তোমার ইচ্ছেই পূরণ হোক। খাদ থেকে উঠে আসতে বলো ওকে। আমার নির্দেশেরও কিছুটা পরিবর্তন করে দিচ্ছি। মাথায় নয়, পেটে গুলি করো ওর। যাতে অনেকক্ষণ ধরে কষ্ট পেয়ে গুঙিয়ে গুঙিয়ে মরে। দেখতে ভাল লাগবে।
অ্যাই, উঠে এসো, পিস্তল নেড়ে কঠোর কণ্ঠে আদেশ দিল মুসা। চাঁদের আলোয় চকচক করছে কালো নল।
ফিরে তাকাল রবিন। বেহুশ হয়ে পড়ে আছে কিশোর। নড়ছে না।
গর্ত থেকে বেরোতে অতিরিক্ত দেরি করল রবিন। ভাবছে, থাবা দিয়ে মুসার হাত থেকে পিস্তলটা ফেলে দেয়া যায় কিনা। কিন্তু তাতেও লাভ হবে না। ক্রিসির হাতেও পিস্তল আছে।
খাদ থেকে উঠে এল রবিন। তার বায়ে রয়েছে এখন ক্রিসি, মুসা ডানে। দুজনেই দাঁড়িয়ে আছে খাদের কিনারে।
তোমার প্ল্যানটা কি, সারাহ? জানতে চাইল রবিন। সময় বাড়াচ্ছে। বাঁচার যদি কোন সুযোগ পাওয়া যায়।
হেসে উঠল ক্রিসি। আমি আর এখন সারাহ নই। সারাহ ঢুকে পড়েছে তারকার মধ্যে। মায়াও নই। সে-ও গেছে। আমি এখন ক্রিসি।
আমাদের সবাইকেই তারকায় ঢোকানোর শখ হয়েছে নাকি তোমার? ক্রিসির পিস্তলটার দিকে তাকাল রবিন।
শখ নয়, এটা আমার প্রয়োজন। ছয়টা আত্মা দরকার আমার। ছয় কোণে ছয়টা ভরে দিয়ে মাঝখানে থাকব আমি। ওরা হবে আমার গোলাম। তিনটে পেয়ে গেছি–ডেভন, সোফি আর ড্যানি। তোমাকে নিয়ে হবে চারজন। আমার ভাগ্য ভাল, না চাইতেই এসে হাজির হয়েছে আরও একজন, খাদে পড়ে থাকা কিশোরকে দেখাল ক্রিসি। ওকেও নেব। শেষটা পূরণ করে নেব মারলা কিংবা ক্লডিয়াকে দিয়ে। যাকে সুযোগমত পাই।
আর মুসা? ওকে দিয়ে কি করবে?

ও হবে আমার ডান হাত। আমার বাহন। আমার প্রধান গোলাম। ওকে দিয়ে যা ইচ্ছে করাব আমি... মুসার দিকে ফিরল ক্রিসি। মুসা, দেরি করছ কেন? দাও পেটে একটা বুলেট ঢুকিয়ে। খাদে পড়ে কেঁচোর মত মোচড়াতে থাকুক। আহ, কি মজাই না হবে দেখতে! করো করো, গুলি করো!

হ্যাঁ, করছি, রোবটের মত যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর মুসার। রোবটের মতই নড়ল। পিস্তল তুলল রবিনকে তাক করে। নাহ, হচ্ছে না। এই, আরেকটু পিছাও। খাদের আরও কিনারে যাও। নইলে ডিগবাজিটা হবে না ভালমত।

পেছনে সরতে গিয়ে কিশোরের দিকে চোখ পড়ল রবিনের। একটু যেন। নড়ল মনে হলো? নাকি চোখের ভুল?

পিছিয়ে গেল রবিন।

একসঙ্গে কয়েকটা ঘটনা ঘটল। লাফ দিয়ে সরে গেল মুসা। চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরেই বাড়ি মারল ক্রিসির পিস্তলধরা হাতে। ঠিক একই সময়ে ঝটকা দিয়ে উঠে বসে ক্রিসির পা ধরে হ্যাঁচকা টান মারল কিশোর।

মুসার বাড়িতে পিস্তলটা উড়ে চলে গেল ক্রিসির হাত থেকে। কিশোরের টানে পড়ে গেল ক্রিসি খাদের মধ্যে। হাঁচড়ে-পাঁচড়ে ওঠার চেষ্টা করল। কিন্তু। ততক্ষণে বেজবল ব্যাটটা তুলে নিয়েছে কিশোর। নির্দ্বিধায় বসিয়ে দিল ক্রিসির। মাথায়। এক বাড়িতেই বেহুশ।

ওকে বেঁধে ফেলা দরকার! চিৎকার করে বলল মুসা। ওই ডাইনীকে বিশ্বাস নেই!

তারমানে ওর কোন অলৌকিক ক্ষমতাই নেই, এমন ভঙ্গিতে বলল। রবিন, যেন নিরাশই হয়েছে। তাহলে এত সহজে কাবু করা যেত না।

কথা পরে, আগে দড়ি! মুসা বলল।

দড়ি কোথায় পাব? গাড়িতেও তো নেই।

তাড়াতাড়ি কোমরের বেল্টটা খুলে নিল মুসা। ওটা দিয়ে ক্রিসির হাত পিছমোড়া করে নিজেই বাধল।

আর কিশোরও ওদের বেল্ট দুটো খুলে দিল। ভালমত বাঁধতে আর অসুবিধে হলো না।

খাদের কিনারে পা ঝুলিয়ে জিরাতে বসল রবিন। মুসাকে বলল, ভাল অভিনয় শিখেছ তো। আমি তো বিশ্বাসই করে ফেলেছিলাম তুমি সত্যি সত্যি ক্রিসির গোলাম হয়ে গেছ।

গত কয়েক দিন গোলাম হয়েই ছিলাম। আফিম না কি জানি খাইয়ে আমাকে সারাক্ষণ নেশার ঘোরে রেখে দিত। আজ সেটা সময়মত কেটে না, গেলে কি যে ঘটাতাম কে জানে!

এমনিতেই কম ঘটিয়েছ নাকি? উফ, ঘাড় ডলতে ডলতে বলল। কিশোর। বাড়িটা আরেকটু আস্তে মারতে পারলে না?
পারতাম। তাহলে আমাকে বিশ্বাস করত না ক্রিসি। ফাঁকিটা আর দিতে পারতাম না। সত্যি কি বেহুশ হয়ে গিয়েছিলে নাকি?
নাহ, মাথা নাড়ল কিশোর। তুমি যদি অভিনয় করতে পারো, আমি পারব না কেন?...গাড়িটা রেখেছ কোথায় তোমরা? রাস্তায় তো দেখলাম না।
মোড়ের কাছ থেকে একশো গজ দূরে, ঝোপের ধারে। পড়ে থাকা ক্রিসিকে দেখাল মুসা, একে নিয়ে যাওয়া দরকার। কিভাবে নেয়া যায় বলো তো?
বয়ে নেব, আর কিভাবে? বলেই কান পাতল কিশোর। কিসের শব্দ? পুলিশের সাইরেন না?
তাই তো মনে হচ্ছে! খবর পেল কিভাবে?
কয়েক মিনিটের মধ্যেই বাঁকের কাছে পুলিশের গাড়ি দাঁড়ানোর শব্দ শোনা গেল। দৌড়ে আসতে দেখা গেল কয়েকটা ছায়ামূর্তিকে। সবার আগে আগে ছুটে আসছে একটা মেয়ে।
ক্লডিয়া! চাঁদের আলোতে চিনতে কষ্ট হলো না ওকে।
পিস্তল হাতে খাদের কাছে এসে দাঁড়াল তিনজন পুলিশ অফিসার। তাদের মধ্যে একজন ক্লডিয়ার বাবা মিস্টার নিউরোন।
*
ফেরার পথে রবিনের গাড়িতে করে চলেছে কিশোর, মুসা আর ক্লডিয়া। ওদের সামনে একটা পুলিশের গাড়ি, পেছনে আরেকটা। সামনেরটাতে ভোলা হয়েছে হাতকড়া লাগানো ক্রিসিকে। মুসার জেলপিটা স্টার্ট নিচ্ছিল না, যেটাতে করে সে আর ক্রিসি এসেছে। রাস্তার ধারে ঝোপের ধারেই ওটা ফেলে রবিনের গাড়িতে করে ফিরে চলেছে চারজনে।
গাড়ি চালাচ্ছে রবিন। পাশে মুসা।
পেছনের সীটে কিশোর আর ক্লডিয়া।
একটা কথার জবাব দাও তো, কিশোর বলল, তুমি জানলে কি করে। আমরা এখানে আছি?
মুসাকে ব্যাগটা দিয়ে বাড়ি ফিরতেই পাকড়াও করল আমাকে আব্বা, ক্লডিয়া জানাল। দুই ধমক দিয়েই জেনে নিল কোথায় গিয়েছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে থানায় ফোন করে পেট্রল কার আনাল। আমাকে নিয়ে ছুটল মুসাদের বাড়িতে। দরজায় মুসার নোটটা দেখে কারোরই বুঝতে অসুবিধে হলো না। কোথায় তোমাদেরকে পাওয়া যাবে।

হু, তিক্তকণ্ঠে বলল কিশোর, আজকাল আর গোয়েন্দাগিরি নিয়ে গর্ব করার উপায় নেই। সবাই খুব সহজেই সব কিছু বুঝে ফেলে।
তাতে কি কোন ক্ষতি হয়েছে? হাসল ক্লডিয়া। ক্রিসি ডাইনীটার বোঝা বওয়া থেকে তো রেহাই পেলে।
তা পেয়েছি, সামনের সীট থেকে বলে উঠল মুসা। তবে সবচেয়ে আনন্দ লাগছে ওর ভয়ঙ্কর মায়াজাল কেটে যে বেরোতে পেরেছি সেজন্যে। মাথা থেকে একটা পাহাড় নেমে গেছে মনে হচ্ছে। উফ, কি ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের মাঝেই না কেটেছে পনেরো-ষোলোটা দিন!
ডাকে আসা উড়োটিকেট পেলে কনসার্ট দেখতে যাবে আর? পেছন থেকে হেসে জিজ্ঞেস করল কিশোর।
আরও! তওবা! তওবা! দুই গালে চটাস চটাস চাটি মারতে শুরু করল মুসা।

ভলিউম ২৯ – সৈকতে সাবধান – তিন গোয়েন্দা – রকিব হাসান – সেবা প্রকাশনী
প্রথম প্রকাশ: আগস্ট, ১৯৯৮
বিকেলটা মায়ের সঙ্গে কাজ করে কাটাল জিনা। গাড়ি থেকে মালপত্র নামানো, ব্যাগ সুটকেস খুলে জিনিসপত্র গোছানো, দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা ঘরগুলো সাফসুতরো করা, খাবার আর প্রয়োজনীয় জরুরী জিনিস কিনে আনা, অনেক কাজ।
জিনার বাবা মিস্টার পারকার কোন সাহায্যই করতে পারলেন না। করতে এসেছিলেন, কিন্তু কাজের চেয়ে অকাজ বেশি-উল্টোপাল্টা করে কাজ আরও বাড়াতে লাগলেন, শেষে তাকে বিদেয় করে দিয়ে রেহাই পেয়েছেন মিসেস পারকার।
বারান্দায় বসে একটা বিজ্ঞানের বইতে ডুবে আছেন এখন মিস্টার পারকার।
বালিয়াড়ির আড়ালে অস্ত যাচ্ছে সূর্য। প্রবল বাতাসে নুয়ে নুয়ে যাচ্ছে বাড়ির পেছনের শরবন। মিসেস পারকার রান্নাঘরে। হট ডগ আর মাংস ভাজার সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে।
ডিনারের পর ওপরে চলে এল জিনা। হাত-মুখ ধুয়ে কাপড় বদলানোর জন্যে আলমারি খুলল। অ্যানটিক ড্রেসিং টেবিলে রাখা ঘড়ির দিকে। তাকাল। দেরি হয়ে গেছে। মুসারা বসে থাকবে। দেখা করার কথা সাড়ে সাতটায়।
দুই টান দিয়ে পাজামা খুলে মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলল সে। আলমারি ঘেঁটে বের করল একটা ডেনিম কাটঅফ।
সৈকতে যাবে না? নিচ থেকে শোনা গেল মায়ের কণ্ঠ।
নাহ। তুমি যাও, জবাব দিলেন মিস্টার পারকার। আমি এই চ্যাপ্টারটা…
একা যেতে ইচ্ছে করছে না। থাক, সকালের নাস্তার জোগাড়টা করে। ফেলিগে।
কিছুক্ষণ শুয়ে থাকলেও পারো। অনেক পরিশ্রম করেছ।
আগে কাজকর্মগুলো সেরে ফেলি, তারপর…
আয়নার সামনে এসে বসল জিনা। তামাটে চুল অনেক লম্বা হয়েছে। তারপরেও কাটতে ইচ্ছে করল না। ভাবতেই হেসে উঠল তামাটে চোখের বড় বড় দুটো মণি। মনে পড়ল, কয়েক বছর আগের গোবেল বীচের কথা। তখন। চুল কেটে ছেলেদের মত করে রাখতে পছন্দ করত সে। এখন রাখে লম্বা চুল। মাত্র কয়েক বছরেই কত পরিবর্তন এসে যায় একজন মানুষের। বিশেষ করে মেয়েদের। আগে হলে রাফিয়ানকে অবশ্যই সঙ্গে আনত। কোথাও বেড়াতে গেলে ওকে ফেলে যাওয়ার কথা ভাবতেও পারত না। আর এখন দিব্যি ফেলে এসেছে বাড়িতে, রকি বীচের বাড়িতে। আনাটাই বরং ঝামেলার মনে হয়েছে ওর কাছে।

সৈকত শহর স্যান্ডি হোলোতে বেড়াতে এসেছে ওরা। গরমকালটা এখানেই কাটানোর ইচ্ছে মিসেস পারকারের। মিস্টার পারকারের এ নিয়ে কোন মাথাব্যথা নেই। যেখানেই যান, বই আর গবেষণায় ডুবে থাকতে পারলেই তিনি খুশি।
নিচে নেমে হাত নেড়ে মাকে গুড-বাই জানিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। জিনা। বাড়ির সামনের দিকটা ঘুরে এসে দ্রুতপায়ে হাঁটতে লাগল বীচ হ্যাঁভেন ড্রাইভ ধরে শহরের দিকে।
বীচ হ্যাভেন ড্রাইভ!
আহা, কি নাম! কানা ছেলে তার নাম পদ্মলোচন। সরু, এবড়োখেবড়ো একটা পথ, খোয়াও বিছানো হয়নি ঠিকমত।
গুচ্ছ গুচ্ছ সামার কটেজগুলোর কাছ থেকে মিনিট দশেক হেঁটে এলে পড়বে এক চিলতে বালিতে ঢাকা জমি। চারপাশ ঘিরে জন্মেছে শরবন। তারপর বিশাল ছড়ানো প্রান্তর, ঘাসে ঢাকা, মাঝে মাঝে তাতে মাথা তুলে রেখেছে একআধটা ওক কিংবা উইলো গাছ। ওগুলো সব পার হয়ে গেলে দেখা মিলবে ছোট্ট শহরটার।
রাস্তা ধরে মিনিট পাঁচেক এগোতেই শরবনের আড়াল থেকে লাফ দিয়ে এসে সামনে পড়ল একটা ছায়ামূর্তি। বাঘ আর কুকুরের মিশ্র ডাকের মত চিৎকার করে উঠল খাউম করে। হাত চেপে ধরল জিনার।
ঝাড়া দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিল জিনা। অস্ফুট একটা শব্দ করল। মুখোমুখি হলো মূর্তিটার।
কেমন ভয়টা দেখালাম, হাসি ছড়িয়ে পড়েছে মুসার মুখে। ঝকঝকে সাদা দাঁত।
ভয় না, কচু! কিচ্ছু ভয় পাইনি আমি।
তাহলে চেঁচিয়ে উঠলে কেন?
কোথায় চেঁচালাম?
কোথায় চেঁচালে? দাঁড়াও, সাক্ষি জোগাড় করছি। শরবনের দিকে তাকিয়ে ডাক দিল মুসা, রিকি। বেরোও।
শরবনের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল মুসার চেয়ে অনেক খাটো, রোগা একটা ছেলে। গাজর রঙের কোকড়া চুল। নীল চোখ। লাজুক ভঙ্গি। খুব শান্ত।
ওর দিকে হাত বাড়াল মুসা, দাও পাঁচ ডলার। বলেছিলাম না ভয় দেখাতে পারব।
জিনার চোখের দিকে একবার তাকিয়েই চোখ সরিয়ে নিল রিকি। কড়া দৃষ্টি সহ্য করতে পারল না। তা তো বলেছিলে…
আমি ভয়ে চিৎকার করেছি! কোমরে হাত দিয়ে খেঁকিয়ে উঠল জিনা। আমি!
অ্যাঁ!…না না.না! ভয়ে প্রায় কুঁকড়ে গেল ছেলেটা। মুসার চোখে চোখ পড়তেই আবার বলল, করেছে, কিন্তু…

নাহ্, তোমাকে আর মানুষ করা গেল না,হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে লাগল জিনা। পুরুষ মানুষ, এত ভয় পাও কেন?
জবাব না দিয়ে মাথা নিচু করে রইল রিকি।
মাস দুই হলো জিনাদের বাড়ির পাশে ওদেরই অন্য একটা বাড়ি ভাড়া নিয়েছে রিকিরা। ভীষণ লাজুক ছেলে। দুই মাসে জিনা আর তিন গোয়েন্দা ছাড়া আর কারও সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে পারেনি। পড়শী বলে ওরাই যেচে পড়ে খাতিরটা করেছে, নইলে তা-ও হত না।
আজই এলে? পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে জানতে চাইল মুসা।
আজ বিকেলে, জবাব দিল জিনা। বাড়িটা ভালই, কিন্তু পরিষ্কার করতে জান শেষ। একটা হপ্তা লাগবে।
আমাদেরটাও একই। কাল এসে তো ঢুকেই মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড় হলো মার। একটা জানালার কাচ ভেঙে কি জানি কি একটা জানোয়ার ঘরে ঢুকেছিল। আমাদের কার্পেটটাকে বাথরুম মনে করেছিল।
ওয়াক! থুহ! আন্টির নিশ্চয় দাঁতকপাটি লেগে গিয়েছিল?
না, চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল খানিকক্ষণ। তারপর ঘুরে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। আর কোনদিন আসব না বলে রকি বীচে ফিরে যেতে চেয়েছিল তক্ষুণি, হাসতে হাসতে বলল মুসা। আমি আর বাবা অনেক কষ্টে ঠেকিয়েছি।
এটা রকি বীচের চেয়ে খারাপ জায়গা, পেছন থেকে বলল রিকি। জিনা আর মুসার কয়েক কদম পেছনে থেকে হাটছে।
আমার তো খুব ভাল লাগছে, মুসা জবাব দিল। দারুণ। সারাটা বিকেল সাগরে সাতরে কাটালাম, রোদের মধ্যে পড়ে থাকলাম। রাতে সৈকতে পার্টি হবে। সকালে উঠে নতুন করে আবার সব শুরু। কত মজা।
নতুন করে কি হবে?
গাধা নাকি। বুঝলে না। আবার বেড়ানো, সাঁতার কাটা, রোদে পোড়া, রাতে পার্টি…
একঘেয়ে লাগবে না?
মোটেও না। থাকো না দুতিন দিন, বুঝবে আনন্দ কাকে বলে।
আকাবাকা কাঁচা রাস্তাটা ঘাসের মাঠ পেরিয়ে, একগুচ্ছ সাদা রঙ করা কাঠের বাড়ির পাশ কাটিয়ে চলে গেছে শহরের দিকে।
শহরের মেইন রোডের কাঠে তৈরি ফুটপাথে যখন উঠল ওরা, বাতাস তখন বেশ গরম। এদিক ওদিক তাকাতে লাগল ওরা।
আরে, মুসা বলল, প্রিন্সেসের পাশে আবার ভিডিও-গেম আর্কেডও খুলেছে দেখি এবার। রিকি, টাকাপয়সা কিছু এনেছ?

জিনসের পকেট হাতড়ে নীল রঙের প্লাস্টিকের বুটেন লাইটারটা শুধু বের করে আনল রিকি। সব সময় জিনিসটা তার পকেটে থাকে। মাথা নাড়ল।
এই গরমের মধ্যে ওই বদ্ধ জায়গায় ঢোকার ইচ্ছে হলো কেন তোমার? জিনা বলল। বেড়াতে এসেছি, বেড়াব। ঘরে আটকে থাকার কোন মানে হয় না, সেটা যে ধরনের ঘরই হোক। চলো, খানিকক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে সৈকতে চলে যাই।
চলো, কি আর করা, আর্কেডের দিকে শেষবারের মত লোভাতুর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে পা বাড়াল মুসা।

.

মেইন স্ট্রীট ধরে হাঁটছে ওরা। জিনা ভাবছে, কিশোর আর রবিন থাকলে ভাল হত। ওরা আসেনি। ইয়ার্ডে প্রচুর কাজ। এই গ্রীষ্মে মেরিচাচী আর রাশেদ পাশা কোথাও বেড়াতে যাবেন না। কিশোরকেও আটকে দিয়েছেন চাচী। আর রবিন আবার পা ভেঙেছে পাহাড়ে চড়তে গিয়ে। এখন শয্যাশায়ী। পাহাড়ে চড়া ওর কাছে নেশার মত। বহুবার পা ভেঙেছে। এমনও হয়েছে, জোড়া লাগতে না লাগতে আবার ভেঙেছে কয়েক মাসের মধ্যেই। তা-ও পাহাড়ে ওঠা বন্ধ করতে পারে না।
কিশোর অবশ্য বলে দিয়েছে, ইয়ার্ডের কাজ সেরে ফাঁক পেলেই চলে আসবে। তবে সেই ফাঁকটাই পাবে কিনা যথেষ্ট সন্দেহ আছে জিনার। সবাই একসঙ্গে না থাকলে জমে না। কিন্তু আসতে না পারলে কি আর করা। মেনে নিতেই হয়।
মেইন রোডের একধারে সারি সারি দোকানের পাশ দিয়ে হেঁটে চলল ওরা। উইন্ডোতে সাজানো জিনিসপত্র দেখতে দেখতে। টুরিস্ট সীজন সবে শুরু হয়েছে। এখনই প্রচুর ভিড়। মেইন স্ট্রীটে যানজট। ফুটপাথে মানুষের জট। একা, জোড়ায় জোড়ায়, কিংবা দল বেঁধে হাঁটছে। যার যেভাবে খুশি, যেদিকে ইচ্ছে। কারোরই কোন নির্দিষ্ট গন্তব্য নেই।
খাইছে! আচমকা চিৎকার করে উঠল মুসা। রাস্তার অন্য পাড়ে পুরানো আমলে তৈরি সিনেমা হলটার দিকে চোখ। কি সব পোস্টার লাগিয়েছে দেখেছ? ভূতপ্রেতেরা উৎসব করছে নাকি? রিকির কাঁধে হাত রাখল সে। চলো তো, কাছে গিয়ে দেখি।
জিনা আর রিকিকে প্রায় টানতে টানতে নিয়ে রাস্তা পেরোল সে। আসিতেছে কিংবা আগামী আকর্ষণ লেখা পোস্টারগুলো দেখতে দেখতে বলল, সব তো দেখা যাচ্ছে হরর ছবি।
একটা অদ্ভুত ব্যাপার, ভূতপ্রেতকে ভয় পায় মুসা, অথচ ওসব ছবির প্রতিই তার আকর্ষণ বেশি।
গুঙিয়ে উঠল জিনা। মুসার যতটা পছন্দ, এধরনের ছবি তার ততটাই অপছন্দ। মুসার হাত ধরে টানল সে, এসো তো। পচা জিনিস দেখতে ভাল্লাগছে না।...

ওদিকে কি হচ্ছে দেখি।
রাস্তার শেষ বাড়ি এই সিনেমা হলটা। শহরটাও যেন শেষ হয়ে গেছে এখানে।- কংক্রীটে তৈরি ছোট আয়তাকার একটা জায়গাকে পার্কিং লট করা হয়েছে। তার ওপারে ঘাসে ঢাকা মাঠ। শহরের অধিবাসীদের পিকনিক স্পট, জনসমাবেশ আর অন্যান্য কর্মকাণ্ডেও ব্যবহার হয়। আজ রাতে অনেকগুলো উজ্জ্বল স্পটলাইটের আলোয় আলোকিত হয়ে আছে জায়গাটা। আলোর সীমানার বাইরে আবছা অন্ধকারে কয়েকটা ট্রাক আর ভ্যানগাড়ির কালো অবয়ব চোখে পড়ে।
এগিয়ে গেল তিনজনে। কার্নিভলের প্রস্তুতি চলছে। শ্রমিকদের হাঁকড়াক, করাতের খড়খড় আর হাতুড়ির টুকুর-ঠাকুর শোনা যাচ্ছে অনবরত।
কেমন যেন! বাস্তব লাগছে না পরিবেশটা। স্পটলাইটগুলো আকাশের দিকে তুলে দেয়া হয়েছে। নিচে তাই আলোর চেয়ে ছায়াই ছড়াচ্ছে বেশি। ব্যস্ত হয়ে এদিক ওদিক ছোটাছুটি করছে শ্রমিকরা। কালো, নীরব একটা দৈত্যের মত অন্ধকারে মাথা তুলে রেখেছে একটা নাগরদোলা। খুঁটি থেকে ঝুলছে রঙিন আলো। খাবার আর খেলার স্টলগুলো খাড়া করে ফেলা হচ্ছে অবিশ্বাস্য দ্রুততায়। ছোট একটা রোলার-কোস্টার বসাতে গলদঘর্ম হচ্ছে কয়েকজন লোক।
মাঠের কিনারে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল মুসা, জিনা আর রিকি।
গ্রেভিট্রন আছে নাকি ওদের কে জানে! আচমকা যেন ঘোরের মধ্যে কথা বলে উঠল রিকি।
কি ট্রন? বুঝতে পারল না মুসা।
গ্রেভি। গ্রেভ থেকে গ্রেভি। গ্রেভ মানে জানো না? কবর।
ও। তো সেটা দিয়ে কি হয়? কবরে ঢোকায় নাকি?
অনেকটা এরকমই। বনবন করে ঘুরতে থাকে। হঠাৎ মেঝেটা সরে যায়। সময়মত লাফ দিয়ে যদি দেয়ালের কাছে সরে যেতে পারো, বাচলে, নইলে পড়তে হবে নিচের অন্ধকার গর্তে।
বাহ, দারুণ খেলা তো, রোমাঞ্চকর মনে হলো জিনার।
অবাক হয়ে রিকির দিকে তাকিয়ে আছে মুসা। এই খেলা তোমার পছন্দ?
না না, তাড়াতাড়ি হাত নাড়ল রিকি। ওটা কোন খেলা হলো নাকি? এত ভয় পেতে কে চায়? বিপদও কম না!
নাগরদোলাও আমার ভাল লাগে, অন্ধকার মাঠের দৈত্যটার দিকে তাকিয়ে আছে জিনা।
ওসব পোলাপানের খেলা, মুসা বলল। এর মধ্যে উত্তেজনার কি আছে?
সব কিছুতেই উত্তেজনা দরকার হয় নাকি? খেলা খেলাই। মজা পাওয়াটা আসল কথা।

জিনার হাত ধরে টানল মুসা, দেখা তো হলো। চলো, সৈকতে। এখানে বিরক্ত লাগছে আমার।
পরিষ্কার রাতের আকাশ। উজ্জ্বল। মেঘমুক্ত। জ্যোৎস্নায় বালির সৈকতটাকে লাগছে চওড়া, রূপালী ফিতের মত।
পানির কিনার দিয়ে হাত ধরাধরি করে খালি পায়ে হেঁটে যাচ্ছে নারী পুরুষ। গোড়ালিতে মৃদু বাড়ি খাচ্ছে ঢেউ। পাউডারের মত মিহি বালিতে চাদর বিছিয়ে বসে হাসাহাসি করছে, গান গাইছে, চেঁচিয়ে কথা বলছে ছেলেমেয়েরা। কেউ বাজাচ্ছে টেপ। ড্রামের ভারী গুমগুম শব্দ তুলে বাজছে রক মিউজিক। তার সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে রেডিওর গান। ঢেকে দিচ্ছে সৈকতে ক্রমাগত আছড়ে পড়া ঢেউয়ের ছলাৎছল শব্দকে।
বালিয়াড়ির গোড়ায় আগুন জ্বেলে বসেছে কয়েকটা ছেলেমেয়ে। বালির ওপর দিয়ে ওদের দিকে খালি পায়ে হাঁটতে গিয়ে কয়েকজনকে চিনতে পারল মুসা আর জিনা। স্যান্ডি হোলোরই বাসিন্দা ওরা। আগের বার বেড়াতে এসে পরিচয় হয়েছে।
হাই, টনি, ডাক দিল মুসা।
ফিরে তাকাল টনি হাওয়াই। আগুনের আলো আর ছায়া নাচছে ছেলেটার চোখেমুখে। বেশ লম্বা। খাটো করে ছাটা কালো চুলের গোড়া ঝাড়র শলার মত খাড়া খাড়া। মুসাকে দেখে উজ্জ্বল হলো মুখ। আরি, মুসা? কেমন আছ? এখনও ভূতের ভয়ে কাবু?
তুমিও কি এখনও সেই বোকাই রয়ে গেছ? বলেই এক থাপ্পড় কষাল ওর পিঠে মুসা।
গুঙিয়ে উঠল টনি। উফ, বাপরে! গায়ের জোর কমেনি একটুও!
হেসে উঠল দুজনেই।
পরিচিত সবগুলো ছেলেমেয়ে স্বাগত জানাল জিনা আর মুসাকে। সরে গিয়ে বসার জায়গা করে দিল। পরিচয় করিয়ে দিল অপরিচিতদের সঙ্গে। কড়কড়, ফুটফাট, নানা রকম বিচিত্র শব্দ করছে আগুন। আরামদায়ক উষ্ণতা। গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে একসঙ্গে কথা শুরু করল সবাই।
রিকির কথা মনে পড়তে ডাক দিল মুসা, আই, রিকি, বসো।
এত মানুষ দেখে আড়ষ্ট হয়ে গেছে রিকি। দুই হাত প্যান্টের পকেটে। ছায়া থেকে বেরিয়ে এসে আস্তে করে বসে পড়ল মুসার পাশে। দ্বিধা যাচ্ছে না কোনমতে।
সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল মুসা, ও আমার বন্ধু, রিকি শর।
কিশোর আর রবিন এল না এবার? জানতে চাইল টনি।
নাহ, ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে বলল মুসা, রবিন আবার পা ভেঙেছে। কিশোর ইয়ার্ডের কাজে ব্যস্ত। তবে বলেছে, সারতে পারলে, দুচারদিনের জন্যে হলেও চলে

আসবে।
কিশোর নেই, বলল মুনা নামে একটা মেয়ে, তারমানে কোন রহস্য আর পাচ্ছ না তোমরা এবার।
পেলেই বা কি? নাকের সামনে পড়ে থাকলেও হয়তো দেখতে পাব না।
হু, তা ঠিক। জিনা, কেমন আছ?
ভাল।
নতুন আর্কেডটা দেখেছ নাকি? মুসাকে জিজ্ঞেস করল টনি। সাংঘাতিক!
দেখেছি। কিন্তু পয়সা আনিনি।
আমার কাছে আছে, হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াতে গেল টনি। চলো। খেলে আসি।
উঠে দাঁড়াতে গিয়েও দ্বিধা করতে লাগল মুসা। জিনার দিকে তাকাল। একসঙ্গে বেড়াতে বেড়িয়ে ওকে ফেলে চলে যাওয়াটা ঠিক হবে না। মাথা নাড়ল, নাহ, আজ আর যাব না। এইমাত্র এলাম ওখান থেকে। দেখা যাক, কাল।
কাল তাহলে বেশি করে পয়সা নিয়ে এসো, হাসল টনি। বসে পড়ল আবার। চুটিয়ে আড্ডা দিতে শুরু করল সবাই মিলে। রিকি বাদে। চুপ করে বসে আছে। চাদরের কিনারে জড়সড় হয়ে বসে তাকিয়ে আছে আগুনের দিকে। কথা শুনছে। হাতের তালুতে আনমনে অনবরত ঘোরাচ্ছে নীল লাইটারটা।
ও যে অস্বস্তি বোধ করছে, বুঝতে পারল জিনা। বলল, রিকি, বসে থাকতে তোমার ভাল না লাগলে হেঁটে আসতে পারো ওদিক থেকে। আমরা আছি এখানে।
হাঁপ ছেড়ে বাঁচল রিকি। সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ল লাফ দিয়ে।

.

গোল ছায়ায় বসে থাকা ছোট ছোট বিন্দুগুলোকে চিনতে সময় লাগল রিকির। সাগরের মাছখেকো পাখি। টার্ন। ছোট, মসৃণ একটা পাথরের টিলায় উঠে দাঁড়িয়েছে সে।
চলতে শুরু করল বিন্দুগুলো। এগিয়ে চলল পানির দিকে। অন্ধকার গ্রাস করে নিল ওগুলোকে।
রিকির দুই হাত পকেটে ঢোকানো। পানির দিক থেকে ঘুরল। ফিরে তাকাল পাথরের পাহাড়ের দিকে। চূড়াটা একখানে সমতল একটা টেবিলের রূপ নিয়েছে। বাদুড় উড়ছে ওটার ওপরে। কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে আবার। সাগরের দিকে ঘুরল সে। প্রায় অস্পষ্ট ছোট একটা দ্বীপের কালো অবয়ব চোখে পড়ছে, বাতাস নিতে ভেসে ওঠা সাবমেরিনের পিঠের মত। বাদুড়গুলো বোধহয় ওই দ্বীপ থেকেই আসে, মনে হলো তার।

এত বাদুড় এখানকার সৈকতে! মুখ তুলে বেগুনী আকাশের দিকে তাকাল সে। একটু আগেও মাথার ওপর উড়ছিল দুটো বাদুড়। এখন নেই।
সৈকতের এই অংশটুকু নৌকা রাখার উকটা থেকে দক্ষিণে। এখানে দাঁড়ালে গাছপালায় ছাওয়া নির্জন দ্বীপটা ভালমত দেখা যায়, দিনের বেলায়ই দেখেছে। দূর থেকেই দ্বীপটা পছন্দ হয়ে গেছে তার। এর কারণ বোধহয় নির্জনতা। মানুষজন বিশেষ পছন্দ করে না সে। একা থাকতে ভাল লাগে। মসৃণ, শীতল পাথরের দেয়ালে ঠেস দিয়ে অপলক চোখে দ্বীপটার দিকে তাকিয়ে রইল।
কতক্ষণ এভাবে ছিল বলতে পারবে না। হুশ হলো, যখন অস্পষ্ট হয়ে এল। দ্বীপটা। তাকিয়ে দেখল, নিচে নেমে আসছে মেঘ। চাঁদ ঢেকে দিয়েছে। কিছুক্ষণ আগের রূপালী সৈকতটাকে লাগছে লম্বা, ধূসর একটা ছায়ার মত। বিচিত্র। অদ্ভুত। ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মত পাক খেয়ে খেয়ে সাগরের দিক থেকে উড়ে আসতে শুরু করেছে কুয়াশা। বাতাস ভেজা, ঠাণ্ডা, ভারী।
মুসারা কি চলে গেছে? না বোধহয়। ওকে ফেলে যাবে না।
সুন্দর জায়গা। চমৎকার পরিবেশ। সবাই কেমন আনন্দ করে কাটাচ্ছে। কিন্তু ও পারে না। নিজের ওপর রাগ হলো রিকির। কেন মিশতে পারে না মানুষের সঙ্গে মেশার চেষ্টা করতে হবে এখন থেকে। কিন্তু নিজের কথায় নিজেরই আস্থা নেই। বহুবার এরকম কথা দিয়েছে নিজেকে, চেষ্টাও করেনি তা নয়, কিন্তু পারেনি। এইবার পারতে হবে, পারতেই হবে নিজেকে বুঝিয়ে পাথর থেকে নামতে যাবে, এই সময় ফড়ফড় শব্দ হলো মাথার ওপর।
মুখ তুলে দেখল, অনেকগুলো বাদুড় উড়ে এসেছে পাহাড়ের দিক থেকে। বিচিত্র ভঙ্গিতে ডানা ঝাঁপটে রওনা হয়েছে যেন মেঘের মধ্যে হারিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে।
বাদুড়েরা খুব ভাল প্রাণী, নিজেকে বোঝাল সে। ওরা পোকামাকড় খায়। খেয়ে মানুষের উপকার করে।
কিন্তু বাদুড়ের ডানা ঝাঁপটানোর শব্দ আর তীক্ষ্ণ চিৎকার এখন ভাল লাগল না তার কাছে। মেরুদণ্ডে শিহরণ তুলল।
আর দাঁড়িয়ে থাকার সাহস হলো না। তাড়াহুড়ো করে নেমে এল নিচের কুয়াশা পড়া ভেজা বালিতে। নেমেই থমকে দাঁড়াল।
সে একা নয়। আরও কেউ আছে।
ওর পেছনে। পাথরের চাঙড়ের আড়ালে।
দেখার চেষ্টা করেও দেখতে পেল না। কিন্তু মন বলছে, আছে।
মাথার ওপর ডানা ঝাঁপটানোর শব্দ বাড়ছে। ঝাঁকে ঝাকে বাদুড় উড়ে আসছে এখন পাহাড়ের দিক থেকে। অনেক নিচ দিয়ে উড়ছে। চলে যাচ্ছে সাগরের

ওপরে নেমে আসা মেঘের দিকে। ওর গায়ে এসে ঝাঁপটা মারছে নোনা পানির কণা মেশানো ঝোড়ো বাতাস।
চোখের কোণ দিয়ে নড়াচড়া লক্ষ করে ঝট করে পাশে ঘুরে গেল রিকি। দেখতে পেল মেয়েটাকে। ওর দিকেই তাকিয়ে আছে। কয়েক ফুট দূরে একটা পাথরের ওপর দাঁড়ানো। খালি পা।
ওকে তাকাতে দেখে নড়ে উঠল মেয়েটা। নিঃশব্দে পাথর থেকে নেমে এগিয়ে আসতে শুরু করল।
সুন্দরী। খুব সুন্দরী মেয়েটা। মেঘে ঢাকা চাঁদের আবছা আলোতেও ওর রূপ যেন ঝলমল করছে। রিকিরই বয়েসী হবে। কিংবা দুএক বছরের বড়।
হাই, মোলায়েম, মধুঝরা মিষ্টি কণ্ঠে ডাক দিল মেয়েটা। ডাগর কালো চোখ মেলে তাকাল ওর দিকে। বড় বড় ফুল ছাপা কাপড়ে তৈরি সারং স্কার্ট পরনে, তার সঙ্গে ম্যাচ করা বিকিনি টপ। ঝাঁকি দিয়ে কাঁধে সরিয়ে দিল মুখে এসে পড়া লম্বা লাল চুল। হাসল রিকির দিকে তাকিয়ে।
হাই! বুকের মধ্যে কাঁপুনি শুরু হয়ে গেছে রিকির। সবার সঙ্গে মেশার চেষ্টা করবে-খানিক আগে নিজেকে দেয়া এই কথাটা বেমালুম ভুলে গেল। মানুষ! অপরিচিত! তার ওপর মেয়েমানুষ! ইস, বালি ফাঁক হয়ে যদি গর্ত হয়ে যেত এখন, তার মধ্যে ঢুকে গিয়ে রেহাই পেত সে।
আমি পথ হারিয়েছি, কাছে এসে দাঁড়াল মেয়েটা। পারফিউমের গন্ধ লাগল রিকির নাকে। লাইলাক ফুলের মিষ্টি সুবাস।
আ! কি হারিয়েছেন?
পথ। আপনি আপনি করছ কেন? আমি তোমার বয়েসীই হব।
প-প-প্লথ হারিয়েছেন...মানে, হা-হা-হারিয়েছ... ঢোক গিলল রিকি। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।
হ্যাঁ, বেড়াতে এসেছি আমরা। বাবা কটেজ ভাড়া নিয়েছে। হাঁটতে হাঁটতে চলে গেছিলাম ওইই পাহাড়ের দিকে, হাত তুলে দেখাল মেয়েটা। হাতির দাঁতের মত ফ্যাকাসে সাদা চামড়া। এখন আর বুঝতে পারছি না। কোনদিকে গেলে বাসাটা পাওয়া যাবে।
আমি..মানে... কথা বলার জন্যে কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করল রিকি। মনে মনে ধমক লাগাল নিজেকে-এই ব্যাটা, স্বাভাবিক হ! কথা,বল ঠিকমত! এবং ধমকের চোটেই যেন হড়হড় করে শব্দগুলো বেরিয়ে এল মুখ থেকে
বেশির ভাগ সামার হাউসই ওই ওদিকটাতে।
ওদিকে ফিরে তাকাল মেয়েটা। দ্বিধা করছে।
যাবে আমার সঙ্গে? ওদিকেই যাব।

থ্যাংকস, বলে রিকিকে অবাক করে দিয়ে আন্তরিকতা দেখানোর জন্যে ওর একটা হাত ধরে টান দিল মেয়েটা। চলো।
এক ঝলক কড়া মিষ্টি গন্ধ এসে নাকে ঢুকল। বোঁ করে মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠল রিকির। অবশ হয়ে আসছে হাত-পা। জোর করে ছাড়িয়ে নেয়ার সাহস, শক্তি, কোনটাই পেল না। অদ্ভুত অনুভূতি। তাকে বাদ দিয়েই যেন পা দুটো চলতে শুরু করল মেয়েটার সঙ্গে।
এদিকে এই প্রথম এলাম। সুন্দর জায়গা। ছুটিটা এবার খুব ভাল কাটবে, মেয়েটা বলল।
অ্যাঁ!..হ্যাঁ। খুব ভাল।
ফিরে তাকাল মেয়েটা। আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছ কেন এমন কথা জড়িয়ে যাচ্ছে কেন? শরীর খারাপ নাকি তোমার?
মেয়েটার কুঁচকানো ভুরু আর তীক্ষ্ণ দৃষ্টির দিকে তাকানোর সাহস হলো না রিকির। আরেকদিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি বলল, কই, না তো! অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছি তো, বোধহয় ঠাণ্ডা লেগেছে।
হ্যাঁ, তা লাগতে পারে। ঠাণ্ডা পড়তে আরম্ভ করেছে খুব। কুয়াশাও কি রকম করে ছুটে আসছে। অবাক কাণ্ডই। সন্ধ্যায় যখন বেরিয়েছি, রীতিমত গরম ছিল।
ওই পাহাড়ে গিয়েছিলে কি করতে? একা একা তোমার ভয় করে না?
না। তোমার করে?
না। একা থাকতেই আমার বরং ভাল লাগে।
আমারও।
এই একটা কথাতেই আড়ষ্টতা অনেকখানি কেটে গেল রিকির। হয়তো। নিজের সঙ্গে মেয়েটার মিল খুঁজে পেয়েই। ভেবে নিল, মেয়েটাও লাজুক, সে ও লাজুক। যদিও আড়ষ্টতার ছিটেফোঁটাও নেই মেয়েটার মধ্যে।
রিকির কব্জিতে চেপে বসল মেয়েটার আঙুল। মৃদু হাসল। তাহলে তো আমরা বন্ধু হতে পারি।
তা পারি, মনে মনে বলল রিকি। মুখ দিয়ে বের করতে পারল না।
কোন শহর থেকে এসেছ তুমি? জিজ্ঞেস করল মেয়েটা।
রকি বীচ।
পাশাপাশি হাঁটছে দুজনে। বালিয়াড়ির পাশ থেকে সরে যাচ্ছে ক্রমশ। কথা বলতে বলতে পানির দিকে টেনে নিয়ে চলেছে ওকে মেয়েটা। তবে টানটা দিচ্ছে বড়ই আস্তে, হাঁটছে ধীরে ধীরে।
পানির কিনারে কুণ্ডলী পাকানো কুয়াশা।
লাইলাক ফুলের গন্ধ থেকে থেকেই নাকে ঢুকছে রিকির।

ওই দেখো, কেমন সুন্দর কুয়াশা, ঘন একটা কুণ্ডলীর দিকে হাত তুলে বলল মেয়েটা। ঢুকে দেখবে নাকি কুয়াশার মধ্যে কেমন লাগে?
রিকির ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সজাগ করছে: যেয়ো না, যেয়ো না! কিন্তু বাধা দিয়ে। নিজেকে রুখতে পারল না রিকি। এড়াতে পারল না মেয়েটার হাতের টান। আস্তে আস্তে ঢুকে গেল ঘন কুয়াশার মধ্যে। এতই ঘন, দুই হাত দূরের জিনিসও চোখে পড়ে না। এরই মধ্যে একটা ঝিলিমিলি ছায়ার মত মেয়েটাকে দেখতে পাচ্ছে সে।
নাকের কাছে দুলে উঠল কি যেন। বুঝতে পারল না রিকি। লাইলাকের মিষ্টি গন্ধটা তীব্রতর হলো। তার সঙ্গে মিশে গেছে ঝাঝাল আরেকটা কি রকম। গন্ধ।
বোঁ করে আবার চক্কর দিল মাথাটা। এবার আর গেল না অদ্ভুত অনুভূতিটা। এরই মধ্যে টের পেল গলায় নরম ঠোঁটের ছোঁয়া। পরক্ষণে কুট করে চামড়ায় তীক্ষ্ণ সুচ বেঁধার মত যন্ত্রণা।
একটা মুহূর্ত মাথার ভেতরে-বাইরে সমানে পাক খেতে থাকল.যেন ভেজা কুয়াশা। তারপর অন্ধকার। গাঢ় অন্ধকার।

.

কোথায় ও?
আর্কেডের ভেতরের সরু গলি ধরে এগিয়ে চলল জিনা। গিজগিজে ভিড়। বোমা বিস্ফোরণ, স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্রের গুলি, মহাকাশ যুদ্ধ আর রেসিং কার ছুটে চলার শব্দে ছোট্ট, স্বল্পালোকিত ঘরটায় কান পাতা দায়।
এখানে নেই।
কোথায়?
আর্কেডের পেছনে পিনবল মেশিন নিয়ে যেখানে খেলা চলছে সেখানেও নেই।
রাস্তায় বেরিয়ে এল জিনা। খোলা বাতাসে বেরিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাচল। অত বদ্ধ জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কোন মজা যে পায় ওই ছেলেগুলো! ভিডিও গেম খেলার নেশাটা আগে ছিল না মুসার, ইদানীং ধরেছে। কিশোর আর রবিনের কথা ভেবে আরেকবার আফসোস করল জিনা। ওরা থাকলে এই একাকিত্বে ভুগতে হত না। মুসাও নিশ্চয় খেলা নিয়ে মেতে উঠত না এতটা।
মুসাকে দোষ দিল না সে। মেয়েমানুষের সঙ্গে সারাক্ষণ যদি থাকতে না চায়, কিছু বলার নেই। আর তার নিজের মুশকিল হলো, সে নিজে মেয়ে হয়েও মেয়েদের সঙ্গ তেমন পছন্দ করে না।
দূর! কাজ নেই, কর্ম নেই, কথা বলার মানুষ নেই; এই বেড়ানোর কোন মানে হয় নাকি? রকি বীচে ফিরে যাবে কিনা ভাবতে শুরু করল সে।
সাগর থেকে ভেসে আসছে কুয়াশার কুণ্ডলী। অদ্ভুত সব আকৃতি নিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে পথের ওপর। রাস্তার আলোর আশেপাশে বিচিত্র ছায়া তৈরি করছে।

মেইন রোডের পাশের দোকান আর রেস্তোরাঁগুলোর দিকে তাকাল। জিনা। প্রচুর ভিড়। কুয়াশার মধ্যে মানুষগুলোকে মনে হচ্ছে দল বেঁধে উড়ছে।
ঘন হচ্ছে কুয়াশা। মনে হচ্ছে আর কিছুক্ষণের মধ্যে ঢেকে ফেলবে সব কিছু। প্রিন্সেস শপিং মলের পাশে আইসক্রীম পারলারটার দিকে এগোল সে।
পেল না এখানেও। আশ্চর্য! মুসারও দেখা নেই, রিকিরও কোন খবর নেই। গেল কোথায় ওরা? আশেপাশেই তো থাকার কথা। এ সময় বাসায় ঘরে বসে আছে, এটাও বিশ্বাস করতে পারল না। ভুল করেছে। মুসাদের কটেজটা হয়ে এলে পারত।
হাই, জিনা!
চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল জিনা।
না, মুসা নয়। আগের রাতে সৈকতে আগুনের ধারে পরিচয় হওয়া একটা ছেলে। সঙ্গে আরেকজন। দুজনেই ওর দিকে হাত নেড়ে চলে গেল সামনের দিকে। হারিয়ে গেল ঘন কুয়াশায়।
বাড়ি থেকে বেরোতে বোধহয় দেরি করে ফেলেছে মুসা। চলে আসবে এখুনি, ভেবে, একটা স্ট্রীটল্যাম্পের নিচে গিয়ে দাঁড়াল জিনা। হঠাৎ বিচিত্র এক অনুভূতি হলো-কেউ নজর রাখছে ওর ওপর।
ফিরে তাকাতে দেখল, ঠিক ছায়া থেকে বেরিয়ে এল একটা ছেলে। ওর চেয়ে বছর দুতিনের বড় হবে। তরুণই বলা চলে। হালকা-পাতলা শরীর, তবে রোগা বলা যাবে না। গায়ে কালো সোয়েটশার্ট, পরনে গাঢ় রঙের মোটা সূতী কাপড়ের প্যান্ট। ব্যাকব্রাশ করা কালো চুল। কাছে এসে দাঁড়াল। অপূর্ব সুন্দর কৌতূহলী দুটো কালো চোখের দৃষ্টিতে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত দেখল, জিনাকে। সিনেমার নায়ক কিংবা দামী মডেল হবার উপযুক্ত চেহারা। হেসে জিজ্ঞেস করল, কারও জন্যে অপেক্ষা করছ বুঝি?
এক পা পিছিয়ে গেল জিনা।
ও। সরি। বিরক্ত করলাম, তাড়াতাড়ি বলল ছেলেটা। এ শহরের বাসিন্দা। নয় ও, চামড়াই বলে দিচ্ছে। ফ্যাকাসে সাদা। এখানকার মানুষের চামড়া রোদে পুড়ে পুড়ে সব তামাটে হয়ে গেছে।
না না, ঠিক আছে, তাড়াতাড়ি বলল জিনা। এই কুয়াশার মধ্যে একা দাঁড়িয়ে থাকতে ভাল লাগছে না। সঙ্গী পেলে মন্দ হয় না। আটকাতে চাইল ছেলেটাকে, আপনি এখানে এই প্রথম এলেন?
তুমি করেই বলো। আপনি শুনতে ভাল্লাগে না। মাথা নাড়ল, না, আরও বহুবার এসেছি।...দেখো, কি কুয়াশা! এ রকম আর কখনও দেখিনি এখানে।

আমিও না, হাত বাড়িয়ে দিল জিনা, আমি জরজিনা পারকার। জিনা বললেই চলবে।
জন গুডওয়াকার, জিনার হাত চেপে ধরে ছোট্ট একটা ঝাঁকি দিয়েই ছেড়ে দিল ছেলেটা।
এতই ঠাণ্ডা, জিনার মনে হলো বরফের ছোঁয়া লেগেছে ওর হাতে। অনেক পুরানো নাম। তোমার পোশাকও খুব পুরানো আমলের।
মাথা ঝাঁকাল জন, হ্যাঁ। পুরানো আমলই আমার পছন্দ। এখনকার কোন কিছু ভাল লাগে না।
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলতে লাগল দুজনে।
ঘড়ি দেখল জিনা। পনেরো মিনিট ধরে দাঁড়িয়ে আছে।
তোমার বন্ধু আসবে তো? জিজ্ঞেস করল জন। এখানেই দেখা করার কথা?
মাথা ঝাঁকাল জিনা, হ্যাঁ, আর্কেডের সামনেই থাকতে বলেছে। শহরে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে সৈকতে যাওয়ার কথা আমাদের। কি হলো ওর বুঝতে পারছি না!
দেখোগে, দেরি করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এখানে তোমাকে পাবে না ভেবে সরাসরি সৈকতেই চলে গেছে।
তাই তো! একথাটা তো ভাবেনি এতক্ষণ।
আজ রাতে বেশি ভিড় থাকবে না সৈকতে, আবার বলল জন। অনেকেই কুয়াশা পছন্দ করে না। ওকে খুঁজে বের করতে সময় লাগবে না।
তা ঠিক, জিনার কণ্ঠে অনিশ্চয়তা। কিন্তু যা অন্ধকার…
চলো, আমি যাচ্ছি তোমার সঙ্গে। আমার কোন কাজ নেই। ঘুরতেই বেরিয়েছিলাম…
কিন্তু…
আরে, চলো। এই এলাকা আমার মুখস্থ। দশ মিনিটও লাগবে না ওকে খুঁজে বের করতে।
কোন রকম প্রতিবাদের সুযোগ না দিয়ে জিনার হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল জুন।
পথের মোড় ঘুরে ডিউন লেনে পড়ল ওরা। সোজা এগোল সাগরের দিকে। অবাক লাগল জিনার, যতই সৈকতের কাছাকাছি হচ্ছে, পাতলা হচ্ছে কুয়াশা।
জিনার মনের কথা বুঝতে পেরেই যেন জবাব দিল জন, স্যান্ডি হোলো শহরটা অনেক নিচুতে, অনেকটা গিরিখাতের মত জায়গায়। এতে হয় কি, সাগর থেকে কুয়াশা এসে একবার চড়াও হলে বদ্ধ জায়গায় আটকে যায়, আর সরতে চায় না।
তুমি কি ভূগোলের ছাত্র?
নাহ। ব্যাপারটা জানি আর কি।

সৈকতের কিনার থেকে সাগরের বেশ খানিকটা ভেতর পর্যন্ত আকাশে ভারী, ধূসর মেঘ। কিন্তু কুয়াশা প্রায় নেই। বড় বড় ঢেউ আছড়ে ভাঙছে তীরে। অন্ধকারেও ঢেউয়ের মাথার সাদা ফেনা চোখে পড়ছে।
পানির কিনারে হাঁটছে কয়েক জোড়া দম্পতি। খানিক দূরে পানির বেশ কিছুটা ওপরে অগ্নিকুণ্ড জ্বেলে বসে আড্ডা দিচ্ছে কতগুলো ছেলেমেয়ে। উঁচুস্বরে টেপ আর রেডিও বাজছে।
কাছে গিয়ে দেখল জিনা। মুসাও নেই, রিকিও না।
তাতে হতাশ হলো না দেখে নিজেই অবাক হয়ে গেল জিনা। তারমানে জনের সঙ্গ তার খারাপ লাগছে না। পানির কিনার ধরে পাশাপাশি হেঁটে চলল দুজনে। খুব সুন্দর করে গুছিয়ে কথা বলতে পারে জন। অনেক কিছু জানে। একটা তিমির গল্প বলল। পথ হারিয়ে বসন্তের শুরুতে নাকি তীরের একটা অল্প পানির খড়িতে এসে আটকে গিয়েছিল। ওটার বন্দি চেহারার নিখুঁত বর্ণনা দিয়ে ছবিটা দেখিয়ে দিল জিনাকে। শহরের লোকে বহু কষ্টে খোলা সাগরে বের করে দিয়েছিল আবার তিমিটাকে।
কথা বলতে বলতে কখন যে ওরা দক্ষিণের পাহাড়ের দিকে ঘুরে গেছে, বলতে পারবে না। হঠাৎ লক্ষ করল জিনা, পানির ধার থেকে তীরের অনেক ভেতরে চলে এসেছে। সামনেই পাথরের পাহাড়।
একপাশে বেশ খানিকটা দূরে বোট ডক। ঢেউয়ের গর্জন বেড়েছে। অস্বস্তি বোধ করতে লাগল জিনা। এত নির্জনতা তার পছন্দ হচ্ছে না।
কই, সমস্ত সৈকতই তো চষে ফেললাম, যেন তার মনের কথা পড়তে পেরেই সহজ কণ্ঠে বলল জন। তোমার বন্ধুকে তো পাওয়া গেল না। বেরোয়ইনি হয়তো বাড়ি থেকে।
চলো, ফিরে যাই, পা বাড়াতে গেল জিনা।
দাঁড়াও না, ভালই তো লাগছে। থাকি আরেকটু।
নাহ, আমার ভাল লাগছে না।
সামনে এসে দাঁড়াল জন। মুখোমুখি হলো। হাতটা চলে এল জিনার নাকের কাছে। অদ্ভুত একটা মিষ্টি গন্ধ নাকে ঢুকল জিনার। বডি স্প্রের নয়। আফটার শেভ লোশন? হবে হয়তো। কোন্ ব্র্যান্ডের লোশন ব্যবহার করে জন, জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল জিনা, এই সময় চোখ চলে গেল ওপর দিকে। মেঘের নিচ দিয়ে উড়ে যেতে দেখল কয়েকটা বাদুড়কে।
এখানে অতিরিক্ত বাদুড়!
বাদুড়কে ভয় পাও নাকি?
মুখ নামাল জিনা। ভয় পাব কেন?

না, এমনি। বাদুড়ের সঙ্গে ভ্যাম্পায়ারের সম্পর্ক আছে কিনা। স্যান্ডি হোলোতে কিন্তু ভ্যাম্পায়ারের গুজব আছে। মানুষকে আক্রমণ করার কথাও শোনা যায়।
দূর, ওসব ফালতু কিচ্ছা। আমি বিশ্বাস করি না।
যখন পড়বে ওদের কবলে, তখন বুঝবে মজা, রহস্যময় কণ্ঠে বলে হাসতে লাগল জন। আবার হাত বাড়াল জিনার নাকের কাছে।
মিষ্টি গন্ধ পেল জিনা। কিসের গন্ধ জিজ্ঞেস করতে গিয়ে এবারও জিজ্ঞেস করা হলো না। কথা শোনা গেল। বাকের আড়াল থেকে বেশ জোরেই কথা বলতে বলতে বেরিয়ে এল একজোড়া দম্পতি। ওদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়। মুখ ফিরিয়ে তাকাল। জিনা আর জনের উদ্দেশে হাত নাড়ল মহিলা।
জিনাও হাত নেড়ে জবাব দিল। জনের হাত ধরে টানল, এসো। এখানে। আর ভাল লাগছে না আমার।
মনে হলো, দম্পতিরা আসাতে নিরাশ হয়েছে জন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, হ্যাঁ, চলো।

.

সাগরের কি অবস্থা? জানতে চাইলেন মিস্টার আমান। পরনে বেদিং স্যুট। রান্নাঘরের কাউন্টারে দাঁড়িয়ে কাপে কফি ঢালছেন। চোখে এখনও ঘুম।
সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে পড়েছিল মুসা। বাবা-মা তখনও ঘুমে। নিঃশব্দে বেরিয়ে গিয়েছিল ঘর থেকে। সৈকতে গিয়ে দৌড়াদৌড়ি সেরে সবে ফিরেছে।
সাংঘাতিক, বলে, টান দিয়ে ফ্রিজের ডালা খুলল মুসা। কমলার রসের প্যাকেট বের করল।
কফির কাপে চুমুক দিলেন মিস্টার আমান। সাংঘাতিক মানে? খোলা জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন। পরিষ্কার আকাশ। ঝলমলে রোদ। ঝড়ের তো কোন লক্ষণ দেখছি না।
ঝড়ের কথা বলিনি। বড় বড় ঢেউ। বিশাল একেকটা। প্যাকেটের কোণা দাঁত দিয়ে কেটে ফুটো করে মুখে লাগাল মুসা। এক চুমুকে অর্ধেকটা খতম করে ফেলে হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে ঠোঁট মুছে তাকাল। বাবা, কখন উঠেছ?
দেয়ালের ঘড়ির দিকে তাকালেন মিস্টার আমান। সাড়ে নটা বাজে। এই বিশ মিনিট। কেন?
রিকি ফোন করেছিল?
না, হাই তুললেন মিস্টার আমান। টেনিস খেলতে যাবে নাকি?
না। সাঁতার। বডিসার্ফিং। যা ঢেউ একেকখান, খুব মজা হবে। ওয়ালফোনের কাছে এসে রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল মুসা। নম্বর টিপতে যাবে, এই সময়

জানালা দিয়ে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠলেন আমান, দেখো দেখো, একটা হামিংবার্ড!
রিসিভার রেখে লাফ দিয়ে এগিয়ে এল মুসা। কই? কোথায়?
ওই তো, ওই ফুলটার কাছে ছিল। মিস করলে।
কত্তবড়?
মৌমাছির সমান।
এখানে সবই মৌমাছির সমান নাকি? কাল রাতে আমার ঘরে কতগুলো নীল মাছি ঢুকেছিল। মৌমাছির সমান। এত্তবড় মাছি আর দেখিনি।
এত্ত ছোট পাখিও আর দেখিনি, ফুলগাছগুলোর দিকে তাকিয়ে আছেন। আমান। পাখিটাকে খুঁজছে তাঁর চোখ।
মুসাও তাকিয়ে আছে।
কফি শেষ করে কাপটা কাউন্টারে রেখে ফিরে তাকালেন আমান, রিকিকে ফোন করছিলে নাকি?
হ্যাঁ
এত সকালে? এখানে এত তাড়াতাড়ি তো কেউ ওঠে না।
রিকি আমার চেয়েও সকালে ওঠে।
আবার গিয়ে রিসিভার কানে ঠেকাল মুসা।
অনেকক্ষণ রিঙ হওয়ার পর ধরলেন রিকির আম্মা।
আন্টি, আমি মুসা। রিকি কোথায়?
অ, তুমি। বাগান থেকে রিঙ হচ্ছে শুনলাম। এসে ধরতে দেরি হয়ে গেল।...রিকি তো এখনও ওঠেনি। কাল রাতে দেরি করে ফিরেছে। দাঁড়াও, দেখে আসি।
আলসেমি রোগে ধরল নাকি ওকে! আনমনে বলল মুসা। ঘড়ির দিকে তাকাল। সব সময় ভোরে ওঠা রিকির অভ্যেস। পৌনে দশটা পর্যন্ত কখনও বিছানায় থাকে না।
রিসিভার ধরেই আছে মুসা। অনেকক্ষণ পর পায়ের শব্দ শুনল। খুটখাট শব্দ। ভেসে এল রিকির ঘুমজড়ানো, খসখসে ভারী কণ্ঠ, হালো!
রিকি? ঘুম থেকে উঠে এলে নাকি?
নীরবতা। হ্যাঁ। হাই তোলার শব্দ।
কাল রাতে কোথায় ছিলে?
গলা পরিষ্কার করে নিল রিকি, একটা মেয়ের সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিলাম।
খাইছে! কি বললে? বিস্ময় চাপা দিতে পারল না মুসা।
মেয়েটা অদ্ভুত, বুঝলে। ওর সঙ্গে হাঁটতে, কথা বলতে, একটুও সঙ্কোচ হচ্ছিল না আমার।

তোমাদের হলো কি! তুমি গেলে একটা অপরিচিত মেয়ের সঙ্গে, জিনা গেল একটা ছেলের সঙ্গে হ্যাঁ, তারপর?
ঘুমজড়িত কণ্ঠে গুঙিয়ে উঠল রিকি।
আই রিকি, শুনতে পাচ্ছ?
হ্যাঁ। কি জানি হয়েছে আমার। কিছুতেই চোখ টেনে খুলে রাখতে পারছি না। ঘুম যাচ্ছেই না।
জাহান্নামে যাক তোমার ঘুম। মেয়েটা কে?
লীলা। খুব ভাল মেয়ে। না দেখলে বুঝবে না। আমার সঙ্গে এত ভাল আচরণ করল। আমাকে ব্যঙ্গ করল না, ইয়ার্কি মারল না। ওর সঙ্গে কথা বলতে কোন অসুবিধেই হয়নি আমার।
ভাল। তা-ও যে আড়ষ্টতাটা দূর হচ্ছে তোমার..সৈকতে যাবে না?
নাহ। পারব না। শরীরটা কেমন ম্যাজম্যাজ করছে। দুর্বলও লাগছে খুব। রাতে কুয়াশার মধ্যে ঘোরাঘুরি করেছি অনেক। জ্বরটর আসবে নাকি বুঝতে পারছি না। এলে বিপদে পড়ে যাব।
কিসের বিপদ?
লীলাকে কথা দিয়েছি, আজ রাতে ওকে নিয়ে শহরে ঘুরতে বেরোব। তুমি আর জিনাও চলে এসো।
আসব। তোমার শরীর কি খুবই খারাপ? যা দারুণ ঢেউ দেখে এলাম। সার্ফিঙে না গেলে মিস করবে।
পারছি না, ভাই। সত্যি খুব দুর্বল লাগছে। এত ঘুম আমার জীবনেও পায়নি। রিসিভার ধরে রাখতে পারছি না। রাখি, আঁ? রাতে দেখা হবে।
মুসা জবাব দেয়ার আগেই লাইন কেটে গেল।
রিসিভার রেখে ভাবতে লাগল মুসা, কার সঙ্গে সার্ফিঙে যাওয়া যায়? টনির কথা মনে পড়ল।
ফোন করল। কিন্তু বহুক্ষণ চেষ্টা করেও পেল না ওকে। ফোন ধরল না কেউ টনিদের বাড়িতে।
তারপর করল জিনাকে। জিনার আম্মা ধরলেন। জানালেন, জিনা। বাথরুমে। দিনের বেলা কোথাও বেরোতে পারবে বলে মনে হয় না। ঘরের কাজ আছে। এত বেশি জঞ্জাল, সাফ করতে করতেই বেলা গড়াবে।
হতাশ হয়ে শেষে জানালার কাছে এসে দাঁড়লি সে। বাবা বাগানে ফুলগাছগুলোর কাছে ঘোরাঘুরি করছেন। হামিংবার্ডটাকে আবার দেখার আশা ছাড়তে পারেননি এখনও। মনেপ্রাণে তিনি একজন নেচারালিস্ট। জন্তু জানোয়ার ধরতে তিন

গোয়েন্দার সঙ্গে কত জায়গায় যে গিয়েছেন। আমাজানের জঙ্গলেও গিয়েছিলেন একবার।
বাইরে বেরোল মুসা। আর কোন উপায় না দেখে বাবাকেই পাকড়াও করল। বাবা, সাঁতার কাটতে যাবে না? এক মিনিট দাঁড়াও। আমি স্যুটটা পরে আসি।
ভুরু কুঁচকে ছেলের দিকে তাকালেন মিস্টার আমান। ধীরে ধীরে হাসি ছড়িয়ে পড়ল মুখে, কেন, কাউকে জোগাড় করতে পারলে না। সাগরে যখন ঢেউ বেশি, সাঁতার কাটতে না-ই বা গেলাম আজ। বরং এক কাজ করি চলো। হামিংবার্ড আর প্রজাপতির ছবি তুলেই কাটাই। একটা দুর্লভ প্রজাতির প্রজাপতিও দেখলাম ওদিকের ঝোপটায়। ধরতে পারলে মন্দ হয় না।
রাত আটটার সামান্য পরে জিনাকে নিয়ে পিজ্জা কোভে ঢুকল মুসা। একটা টেবিলে বসে থাকতে দেখল রিকি আর লীলাকে।
রিকিকে অমন লাগছে কেন? মুসার কানের কাছে ফিসফিস করে বলল জিনা।
কেমন?
বুঝতে পারছ না?
না
ঠিক বোঝাতে পারব না। মোটকথা, অন্য রকম।
পিজ্জা হাউসটায় খুব ভিড়। প্রায় সবই ওদের বয়েসী ছেলেমেয়ে। গুতোগুতি করে টেবিলে জায়গা করে নিচ্ছে। হই-হল্লা করছে।
মুসাদের দেখেই আড়ষ্ট হয়ে গেল রিকি। বোধহয় আগেই লীলাকে কিছু বলে রেখেছে, লীলাই ওদের সঙ্গে পরিচয় করে নিল, হাই, আমি লাইলাক। রিকির নতুন বন্ধু। অতএব তোমাদেরও। লীলা বলে ডাকবে।
কিন্তু নতুন বন্ধুটিকে পছন্দ করতে পারল না জিনা। লীলার বাড়িয়ে দেয়া হাতে হাত মিলিয়ে শুকনো গলায় বলল, হাই।
মুসার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল রিকি, পিজ্জার অর্ডার দিয়ে রেখেছি।
তোমরাও কি রকি বীচ থেকে? লীলা জানতে চাইল।
হ্যাঁ, জবাব দিল মুসা।
জিনা তাকিয়ে আছে লীলার নখের দিকে। লম্বা, নিখুঁত। সুন্দর করে নেল পালিশ লাগানো। লিপস্টিকের মত একই রঙের। রিকির দিকে কাত হয়ে বসেছে সে।
রিকির এই পরিবর্তনে অবাক হয়ে গেছে জিনা। মেয়েটার বেহায়াপনা সহ্য করছে কি করে রিকি?
ধাতব ট্রে তে করে গরম গরম পিজ্জা এল। ধোয়া উড়ছে। কেটে নিয়ে আসা হয়েছে। হাত বাড়িয়ে একটা করে টুকরো তুলে নিল মুসা, জিনা আর রিকি।

লীলা নিল না। তাকালই না প্লেটের দিকে। কৈফিয়ত দিল, পেট ভরে ডিনার খেয়ে এসেছি। একটা কণাও আর ঢোকানোর জায়গা নেই।
আরে একটু নাও না, অনুরোধ করল রিকি।
উঁহু, পারব না। খাও তোমরা।
খাবার দেখে হঠাৎ যেন কেমন হয়ে গেছে লীলা, লক্ষ করল মুসা। চোখে। ক্ষুধার্ত মানুষের দৃষ্টি। তাহলে নিচ্ছে না কেন?
জিনাও তাকিয়ে আছে লীলার চোখের দিকে। দরজার দিকে তাকিয়ে বড় বড় হয়ে যেতে দেখল ওর বাদামী চোখ।
ফিরে তাকাল জিনা। জনকে ঢুকতে দেখে তার চোখও স্থির হয়ে গেল ওর ওপর।
চোখে চোখ পড়তে হাসল জন।
মুসার গায়ে কনুই দিয়ে তো দিল জিনা। ওর সঙ্গেই কাল রাতে দেখা হয়েছিল আমার।
মুখ ভর্তি পিজ্জা চিবাতে চিবাতে ফিরে তাকাল মুসা। ও। একনজর দেখল জনকে। তারপর আবার খাবারে মন দিল।
ওদের দিকে এগিয়ে এল জন।
পরিচয় করিয়ে দিল জিনা, ও জন গুড় ওয়াকার। কাল রাতে পরিচয়।...জন, ও আমার বন্ধু মুসা। ও রিকি। আর ও লীলা, রিকির নতুন বন্ধু।
হাত মেলাল জন। একটা চেয়ারে বসল।
ট্রেটা ওর দিকে ঠেলে দিল মুসা, পিজ্জা নাও।
নো, থ্যাংকস, চেয়ারে হেলান দিল জন। এইমাত্র খেয়ে এলাম। তাকালই না খাবারের দিকে। জিনাকে জিজ্ঞেস করল, সৈকতের ধারে হাঁটতে যাবে না আজ?
জনের দিকে তাকাল জিনা। আটকে রইল চোখ। কেমন সম্মোহনী দৃষ্টি জনের চোখে। জোর করে নজর সরাতে হলো জিনাকে। মুসার দিকে তাকাল, মুসা, কি করবে?
আমি? সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না যেন মুসা। তোমার কি ইচ্ছে?
হাঁটতে যেতেই ইচ্ছে করছে।
আমারও, লীলা বলল। রিকির সঙ্গে। রিকির বাহুতে হাত রাখল লীলা, রিকি, কি বলো?
ঘাড় কাত করল রিকি, ভালই হয়।
ভিডিও গেম খেলতে যাবে না?
বদ্ধ জায়গায় ঢুকতে ইচ্ছে করছে না আর আমার। হট্টগোল, মনিটরের স্ক্রীনের আলো...নাহ্! তারচেয়ে সৈকতের খোলা হাওয়া, অন্ধকারে হেঁটে বেড়ানো অনেক ভাল।

জিনার দিকে তাকাল মুসা।
মাথা নাড়ল জিনা, উঁহু, আমিও যাচ্ছি না ওই আর্কেডে। সিনেমাও ভাল লাগবে না। তারচেয়ে সাগরের খোলা হাওয়াই ভাল।
হঠাৎই আবিষ্কার করল মুসা, এখানে বড় একা হয়ে গেছে সে। ধীরে ধীরে বলল, ঠিক আছে, যাও তোমরা। দেখি, আমি বরং টনিকে খুঁজে বের করিগে। ভিডিও-গেম খেলব। ওকে না পেলে সিনেমা দেখতে যাব। একাই যাব।
দ্রুত খাওয়া শেষ করল রিকি। বেরোনোর জন্যে যেন আর তর সইছে না। ওর অস্থিরতার কারণ বুঝতে পারল না মুসা। তবে বদলে যে গেছে, এ ব্যাপারে জিনার সঙ্গে এখন সে-ও একমত।
প্রায় অপরিচিত একটা ছেলের সঙ্গে জিনার যাওয়াটা পছন্দ হচ্ছে না তার। কিন্তু কি করবে? যার সঙ্গে খুশি বেরোতে পারে জিনা, তাকে বাধা দেয়ার কোন অধিকার তার নেই। বাধা দিলে জিনাই বা শুনবে কেন?
খাওয়া শেষ করে উঠে দাঁড়াল রিকি। মুসার দিকে তাকিয়ে বলল, বিল আমি দিয়ে যাচ্ছি। তুমি শেষ করেই বেরোও। জিনার দিকে ফিরল, তোমার হয়েছে?
হ্যাঁ, চলো। পেপার ন্যাপকিনে মুখ মুছে উঠে দাঁড়াল জিনা।
বেরিয়ে গেল চারজনে।
দরজার দিকে তাকিয়ে থেকে চিন্তিত ভঙ্গিতে পিজ্জা চিবাতে লাগল মুসা। কিশোর আর রবিনের অভাবটা তীব্রভাবে বোধ করল আরেকবার। দূর, একা একা কোথাও বেড়াতে বেরিয়ে আনন্দ নেই। স্যান্ডি হোলোর মত এত চমৎকার জায়গাতেও না। একমাত্র ভরসা এখন টনি। ওকে খুঁজে বের করতে না পারলে সন্ধ্যাটাই মাটি হবে।

.

দুদিন পর। সকালবেলা ঘুম থেকে জেগে, হাই তুলতে তুলতে আড়মোড়া ভাঙল মুসা। উঠে এসে দাঁড়াল বেডরুমের জানালার সামনে। বাইরের উজ্জ্বল আলোর দিকে তাকিয়ে চোখ মিটমিট করতে লাগল। পরিষ্কার আকাশ। গাছের মাথার ওপরে উঠে গেছে সূর্য। ঘরটা গরম, আঠা আঠা লাগছে।
আবার হাই তুলতে তুলতে ড্রেসারের দিকে এগোল সে। ড্রেসারের গায়ে ধাক্কা লাগল। ঘুম যায়নি এখনও। ড্রয়ার ঘেঁটে বের করল বেদিং স্যুট। টেনেটুনে পরে নিল কোনমতে।
দুপদাপ করে নেমে এল রান্নাঘরে। কাউন্টারে রাখা চাপা দেয়া এক টুকরো কাগজ দেখতে পেল। বাবা লিখে রেখে গেছেন। মাকে নিয়ে চলে গেছেন এক বন্ধুর বাড়িতে। দূরে কোথাও মাছ ধরতে যাবেন সকলে মিলে। ইস, আফসোস

করতে লাগল মুসা। জানলে সে-ও যেতে পারত সঙ্গে। এখানে আর কোন আকর্ষণ বোধ করছে না। রিকি যেন কেমন হয়ে গেছে। জিনার সঙ্গেও জমছে না। গতরাতে কখন ফিরেছিল? মনে করতে পারল না মুসা। বাড়ি ঢুকে ঘড়ি দেখেনি। সিনেমা দেখে, টনি আর আরও কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে গিয়েছিল কার্নিভলে। কিন্তু বন্ধ হয়ে গেছে তখন। মাঠ অন্ধকার।
মাঝরাতের পরই হবে, এটা ঠিক। কারণ নাইট শো দেখেছে। তার সঙ্গে জিনা আর রিকিকে না দেখে প্রশ্ন চেপে রাখতে পারেনি টনি। জিনার কি হয়েছ, বলো তো?
কি জানি! কেন? জানতে চেয়েছে মুসা।
অন্য একটা ছেলের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। লম্বা। আমাদের চেয়ে বয়েস বেশি। এ শহরের লোক নয়। আর রিকি ঘোরে একটা মেয়ের সঙ্গে। তাকেও এ শহরের ছেলেমেয়েরা কেউ কখনও দেখেনি। ঘটনাটা কি, বলো তো?
কি জানি! যার যেখানে ইচ্ছে ঘুরুক। আমি কি ওদের গাজেন নাকি?
না, তা বলছি না। তবু…
দেখো, এ শহরের লোক নয় বলেই সন্দেহ করতে হবে, এমন কোন কথা নেই। আমিও তো এখানকার লোক নই। টুরিস্ট সীজন। অপরিচিত লোক আসবেই।
আলোচনাটা আর এগোতে দেয়নি মুসা। ওখানেই চাপা দিয়েছে।
জিনার কথা ভাবতেই মনে হলো ফোন করে। দিনের বেলায়ও কি জনের সঙ্গে বেরোবে ও? কে জানে। ঘড়ি দেখল। সাড়ে দশটা বাজে। ঢকঢক করে গিলে ফেলল এক গ্লাস কমলার রস। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে গলায় আটকে গেল। ব্যথা লাগল। শুকিয়ে আছে কণ্ঠনালী।
জিনাদের নম্বরে ডায়াল করল সে।
তিন-চার বার রিঙ হওয়ার পর তুলে নিলেন জিনার আম্মা। হালো?
আন্টি? আমি মুসা। জিনা কোথায়?
ঘুমোচ্ছে।
এত বেলায়? ও তো সকাল সকালই উঠে পড়ে।
কি জানি, বুঝলাম না। ঘণ্টাখানেক গিয়ে অনেক ডাকাডাকি করে এসেছি। ঘুমই ভাঙে না। বলল, শরীর খারাপ লাগছে। উঠতে ইচ্ছে করছে না। এ রকম তো কখনও হয় না।
হু! কাল রাতে কখন ফিরেছে, জনের সঙ্গে কতক্ষণ ছিল জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করল মুসার। করল না। বলল, ঘুম ভাঙলে বলবেন সৈকতে যেতে। আমি সাঁতার কাটতে যাচ্ছি।
লাইন কেটে দিল সে। ঘাড়ের পেছনটা চুলকাল। রান্নাঘরের মধ্যে আরও গরম। ভারী, ভেজা ভেজা বাতাস।

বেজায় গরম তো আজকে। ঘরে কিংবা বাগানে না থেকে সৈকতে যাওয়াই ভাল। রিকিকে ফোন করল। সবে উঠেছে সে। ওকে বলল সৈকতে চলে যেতে। সঙ্গে বুগি বোর্ড নিয়ো। সাগরের অবস্থা জানি না এখনও। ঢেউ থাকলে সার্ফিং জমবে আজ।
সৈকতে এসে দেখল ইতিমধ্যেই ভিড় জমিয়েছে সকালের সাঁতারুরা। ডোবাডুবি করছে, নীলচে সবুজ ছোট ঢেউ কেটে সাঁতরে যাচ্ছে এদিক ওদিক। হলুদ আর সাদা ডোরাকাটা একটা বড় ছাতার নিচে তোয়ালে বিছিয়ে শুয়ে আছে রিকি।
আই, রিকি, বলে এগিয়ে গেল মুসা।
কি খবর? ঘুমজড়িত কণ্ঠে জানতে চাইল রিকি।
বুগি বোর্ড আনোনি?
আস্তে মাথা তুলে তাকাল রিকি, ভুলে গেছি।
অধৈর্য ভঙ্গিতে নিজের বোর্ডটা হাত থেকে ছেড়ে দিল মুসা। বসে পড়ল বালিতে। পিঠে রোদ লাগছে। কাল রাতে কি করেছ? মেয়েটার সঙ্গে দেখা হয়েছে?
হ্যাঁ, হাই তুলল রিকি। লীলার সঙ্গে শহরে ঘুরতে বেরিয়েছিলাম। ঘোরার পর সৈকতেও যেতে চেয়েছিল। কিন্তু রাজি হইনি। এত ক্লান্ত লাগছিল, সোজা বাড়ি গিয়ে শুয়ে পড়েছি।
ওঠো, সাঁতার কাটলেই শরীরের জড়তা চলে যাবে।
সাড়া দিল না রিকি।
অ্যাই, রিকি, চুপ করে আছ কেন?
নীরবতা।
রিকি?
মুখের ওপর ঝুঁকে ভালমত দেখে মুসা বুঝল, রিকি ঘুমিয়ে পড়েছে।
হয়েছে কি ওর? অবাক হলো মুসা। সারারাত ঘুমিয়ে সকালে সৈকতে আসতে না আসতে ঘুমিয়ে পড়ল আবার, এই হট্টগোল আর রোদের মধ্যে!
ঘুমের মধ্যেই দীর্ঘশ্বাস ফেলল রিকি। গড়িয়ে গিয়ে চিত হলো।
আরও একটা ব্যাপার অবাক লাগল মুসার। কোন্ ধরনের সানট্যান ব্যবহার করে রিকি? রোদে পুড়ে চামড়া তো বাদামী হবার কথা। তা না হয়ে হচ্ছে ফ্যাকাসে, রক্তশূন্য।
*
সেদিন অন্ধকার যতই ঘনিয়ে আসতে লাগল, উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়তে লাগল। লীলার দেহে। সৈকতে এসেছে খাবারের নেশায়। পেটে প্রচণ্ড ক্ষিধে। কিন্তু কোন হোটেলে গিয়ে কিছু খেতে পারবে না। একটা জিনিস দিয়েই খিদে মেটাতে হবে।
রক্ত!

মানুষের রক্ত!
শুরু যখন করেছে, শেষ না করে উপায় নেই।
অন্যান্য রাতের মত আজও সেই উদ্দেশ্যেই বেরিয়েছে। শিকার ঠিকই করা আছে। গত কয় রাত তার রক্ত পান করেই কাটিয়েছে। আজও করবে। তবে আজ শেষ। এক শিকারে বেশিদিন চালানো যায় না। বড় জোর তিন কি চারবার রক্ত পান করা যায়। এর বেশি করতে গেলে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে শিকার। মেরে ফেললে পুলিশ আসবে। তদন্ত হবে। ঘাবড়ে যাবে লোকে। রাতে আর সৈকতে বেরোতে চাইবে না। শিকার পাওয়া কঠিন হয়ে পড়বে। তাই রিকিকে একেবারে মেরে ফেলতে চায় না সে। শেষবারের মত তার রক্ত খাবে আজ।
রিকির আসার অপেক্ষাই করছে লীলা।
আসতে দেখা গেল ওকে। হাত নেড়ে ডাকল লীলা।
ক্লান্ত ভঙ্গিতে অনেকটা বুড়ো মানুষের মত ঝুঁকে পা টেনে টেনে এগিয়ে আসতে লাগল রিকি।
হাঁটতে শুরু করল লীলা। ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল নৌকা রাখার ডকটার দিকে। ছায়ায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। পেছনের পানিতে ঢেউয়ে দোল খাচ্ছে তিনটা নৌকা। গায়ে গায়ে ঘষা খেয়ে মৃদু শব্দ তুলছে।
লীলা, কোথায় তুমি? ক্লান্তস্বরে ডাকল রিকি।
এই যে এখানে। এসো।
রিকি আরও কাছে আসতে হাত ধরে তাকে ছায়ায় টেনে নিল লীলা। গলার। শিরাটার দিকে তাকাল। দপদপ করে লাফাচ্ছে। ওটার ভেতরে বয়ে যাওয়া ঘন তরল পদার্থ চুমুক দিয়ে পান করার ইচ্ছেটা পাগল করে তুলল ওকে। প্রথম প্রথম ভাল লাগত না। ঘেন্না লাগত। ধীরে ধীরে অভ্যেস হয়ে গেছে। এখন তো বরং ভালই লাগে। নেশা হয়ে গেছে। বাঘের যেমন হয়ে যায়। আফ্রিকার মাসাইদের যেমন হয়। জ্যান্ত গুরুর শিরা ফুটো করে চুমুক দিয়ে রক্ত পান। করে ওরা।
স্থির দৃষ্টিতে রিকির শিরাটার দিকে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করল লীলা, রিকি, আজ কি করতে চাও?
সৈকতেই বসে থাকব। শহর ঘোরার কিংবা সাঁতার কাটার শক্তি নেই। কেন যেন বল পাচ্ছি না শরীরে। মাথাটাও থেকে থেকে ঘুরছে।
ধপ করে বসে পড়ল রিকি।
ওর পাশে বসল লীলা। কাঁধে হাত রাখল।
মুখ তুলে তাকাল রিকি। মলিন হাসি হাসল।
জবাবে লীলাও হাসল।
মাথার ওপর কিচকিচ করে উঠল একটা বাদুড়।

তাকাল না রিকি। চেয়ে আছে লীলার মুখের দিকে।
ঠোঁট দুটো ফাঁক হলো লীলার। ঝকঝক করছে সাদা দাঁত। দুই কোণের দুটো দাঁত অস্বাভাবিক বড়। দন্ত। নেকড়ের দাঁতের মত।
এই প্রথম ব্যাপারটা লক্ষ করল রিকি। শিউরে উঠল নিজের অজান্তেই।
কিন্তু কিছু করার নেই তার। গায়ে বল নেই। উঠে দৌড় দেয়ার ক্ষমতা নেই। সম্মোহিতের মত তাকিয়ে আছে লীলার মুখের দিকে।
ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে লাগল মুখটা। চেপে বসল রিকির গলার শিরাটার ওপর।
কুট করে সুচ ফোঁটার ব্যথা অনুভব করল রিকি।
শেষ মুহূর্তে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতে চাইল লীলার মুখটাকে।
পারল না। অসহায়ের মত আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলো।
চোখের সামনে দুলে উঠল আঁধারের পর্দা।
পেটের খিদেয় পাগলের মত চুষেই চলল লীলা। তার গায়ের ওপর ঢলে পড়ল রিকি। তারপরেও ছাড়ল না লীলা। টনক নড়ল, যখন আর রক্ত বেরোল না। শিরা দিয়ে বেরিয়ে এল শুধু পানির মত রস।
মুখ সরাল লীলা।
রিকির দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠল। চাপা, গোঙানি বেরোল হাঁ হয়ে যাওয়া মুখ দিয়ে। এক ফোঁটা রক্ত রাখেনি রিকির শরীরে। খেতে খেতে মেরেই ফেলেছে।
খুন!
*
ছোট্ট দ্বীপ। গাছের মাথায় ডানা ঝাঁপটাচ্ছে অসংখ্য বাদুড়। ছাই রঙ আকাশে বিচিত্র ছায়া সৃষ্টি করে ইতিউতি উড়ে বেড়াচ্ছে। নিচে খুদে সৈকতের ধারে কাঠের তৈরি কতগুলো পরিত্যক্ত কুঁড়ে। মানুষ বাসের নিদর্শন। তবে এখন আর থাকে না কেউ। চলে গেছে। নৌকা ছাড়া যাতায়াতের আর কোন উপায় নেই। হয়তো এ বাধ্যবাধকতার কারণেই দ্বীপটা ছেড়ে গেছে মানুষ। তারপর থেকেই এটা বাদুড়ের দখলে।
জঙ্গলের মধ্যে দ্বীপের অন্ধকার একটা ঘরে অপেক্ষা করছে জন। পুব দিকের দেয়াল ঘেঁষে রাখা একটা কফিন। জানালার চৌকাঠে ভর দিয়ে চন্দ্রালোকিত আকাশে বাদুড়ের ওড়া দেখছে।
শব্দ করে নিঃশ্বাস ফেলল সে। মুখে মৃদু হাসি। উড়ে বেড়ানো বাদুড়ের আনন্দ যেন তার মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছে।
আবহাওয়া বেশ গরম। দুঃখের বিষয়, এ রকম থাকে না সব সময়। গ্রীষ্মকালটা যেন চোখের পলকে শেষ হয়ে যায় এই অঞ্চলে। আরও দীর্ঘ হলে সুবিধে হত।

শিকার পাওয়া যেত অনেক বেশি। আরও দ্রুত কাজ শেষ হয়ে যেত ওদের।
সাগরের দিক থেকে আসতে দেখা গেল লীলাকে। ঘরে ঢুকল। ঠোঁটে রক্ত শুকিয়ে আছে। মলিন মুখে, ক্লান্ত ভঙ্গিতে ঘরে ঢুকল।
কি ব্যাপার, লীলা? জানতে চাইল জন।
খবর ভাল না, জন, ধপ করে কফিনটার ওপর বসে পড়ল লীলা।
কি হয়েছে?
রিকিকে খুন করে ফেলেছি।
চমকে গেল জন। বলো কি!
হ্যাঁ। রক্ত খেতে গিয়ে হুশ ছিল না। এমন খাওয়াই খেয়েছি, শুষে ছিবড়ে বানিয়ে দিয়েছি ওকে।...আর আমারই বা কি দোষ বলো? পেটে এত খিদে থাকলে করবটা কি?
সর্বনাশ করেছ! পুলিশ আসবে। তদন্ত হবে। কোনমতে আমাদের কথা জেনে গেলে আর রক্ষা নেই, ধাওয়া করে আসবে দ্বীপে।
জানবে কি করে আমরা এখানে আছি?
ভেবে দেখল জন। তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু...
তা ছাড়া আমিই যে খুন করেছি, তার কোন প্রমাণ নেই। লাশটাকে সাগরে ফেলে দিয়ে এসেছি। ওরা ভাববে ডুবে মারা গেছে রিকি। ময়না তদন্ত করে মৃত্যুর কারণ বুঝতে পারবে না। গলার ফুটো দুটো দেখে বড়জোর অবাক হবে, কিসের চিহ্ন বুঝতেই পারবে না।
আমি ভাবছি অন্য কথা। সৈকতে রহস্যময় খুন হতে দেখে রাতের বেলা যদি আসাই ছেড়ে দেয় লোকে, আমরা বাঁচব কি খেয়ে?
যা করার তো করে ফেলেছি। আগে থেকেই অত ভেবে লাভ নেই। বসে থাকি। দেখি, কি হয়।

.

খুব ভোরে ঘুম ভেঙে গেল মুসার। ঘামে ভেজা চাদরটা গায়ের ওপর থেকে টান মেরে সরিয়ে ফেলে উঠে বসল। নেমে এসে দাঁড়াল জানালার কাছে। পাখি ডাকছে। পুবের আকাশে ধূসর আলোর আভাস। ভোর হচ্ছে।
কটা বাজল? জোরে জোরেই নিজেকে প্রশ্ন করল সে।
চোখ ফেরাল ঘড়ির দিকে।
সাড়ে পাঁচটা–নীরবে ঘোষণা করল যেন ঘড়িটা।
ঘুম ভাল হয়নি। সারারাত ছটফট করেছে। এপাশ ওপাশ করেছে। মনের মধ্যে কি জানি কেন একটা অশান্তি।

রিকির কথা ভেবে। জিনার কথা ভেবে। দুজনের আচরণই বিস্ময়কর। রকম বদলে গেছে।
সন্ধ্যায় সৈকত থেকে ফিরে জিনাকে ফোন করেছিল সে। খুব ব্যস্ত ছিল লাইনটা। সারাক্ষণ এনগেজ টোন। ডিনারের পর আবার করেছে। ধরেছেন জিনার আম্মা।
জিনা ঘরে নেই। বেরিয়েছে। নিশ্চয় জনের সঙ্গে, শঙ্কিত হয়ে ভেবেছে মুসা। আশঙ্কাটা কিসের, বুঝতে পারছে না।
জিনার সঙ্গে ভালমত কথা বলতে হবে–ঠিক করেছে সে। গলদটা কোনখানে জানা দরকার।
ওর চোখের সামনেই ফর্সা হতে থাকল আকাশ। পাখির কলরব বাড়ছে।
এখন বিছানায় ফিরে যাওয়ার কোন মানে হয় না। ঘুম আর আসবে না। তারচেয়ে সৈকতে গিয়ে কিছুক্ষণ দৌড়াদৌড়ি করে এলে অস্থির মনটা শান্ত। হতে পারে।
আলমারি খুলে একটা কালো রঙের স্প্যানডেক্স বাইসাইকেল শর্টস বের করে পরল। পায়ে ঢোকাল রানিং শূ। দক্ষ হাতে কয়েক টানে বেঁধে নিল ফিতে দুটো।
বাইরে বেরিয়ে নিঃশব্দে টেনে দিল দরজাটা। ভোরের শীতল বাতাস শিশিরে ভেজা। একসারি কটেজের পাশ দিয়ে দৌড়াতে শুরু করল। সাগরের দিক থেকে আসছে নোনা শুঁটকির গন্ধ।
সৈকতের কিনারে এসে পানিকে একপাশে রেখে গতি বাড়িয়ে দিল সে। কালচে-ধূসর আকাশের ছায়া পড়েছে পানিতে। কালির মত কালো লাগছে পানি। ওকে এগোতে দেখে চারদিকে দৌড়ে সরে যাচ্ছে সী গাল। বেশি কাছাকাছি হলে তীক্ষ্ণ চিৎকার দিয়ে আকাশে উঠে পড়ছে।
নির্জন সৈকত। কেউ বেরোয়নি এত ভোরে। শরীর চর্চা যারা করে, অথবা বহুমূত্র কিংবা রক্তচাপের রোগী, তারাও নয়। সে একা।
ক্রমশ উজ্জ্বল হতে থাকা দিগন্তরেখার কাছে একটা জাহাজের কালো অবয়ব চোখে পড়ছে। কোন ধরনের বার্জ হবে। এই আলোয় কেমন বিকৃত হয়ে গেছে আকৃতিটা, ছায়ার মত কাঁপছে। বাস্তব লাগছে না। মনে হচ্ছে ভূতুড়ে জাহাজ।
গতি কমিয়ে দিল মুসা। তবে দৌড়ানো বন্ধ করার কোন ইচ্ছে নেই। এগিয়ে চলল দৃঢ়পায়ে। একটা অগ্নিকুণ্ডের পাশ কাটিয়ে এল। পুরোপুরি নেভেনি ওটা। কালো ছাইয়ের ভেতরে এখনও ধিকিধিকি আগুন। পোড়া একটা কাঠ ছুঁড়ে দেয়া হয়েছিল সাগরে, ঢেউ আবার সেটা ফিরিয়ে এনে ফেলে রেখেছে সৈকতে। বালিতে মরে পড়ে আছে দুটো স্টারফিশ।
নোনা পানির কণা এনে চোখেমুখে ফেলছে বাতাস। ভেজা বালিতে মচমচ শব্দ তুলছে ওর জুতো। ধূসর রঙকে হালকা পর্দার মত সরিয়ে দিয়ে উঁকি দিতে আরম্ভ করেছে ভোরের রক্তলাল আকাশ। সেই রঙ প্রতিফলিত হচ্ছে সাগরেও।

দারুণ সুন্দর। দৌড়াতে দৌড়াতে ভাবছে মুসা। ঠাণ্ডা বাতাসের মধ্যেও বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছে কপালে। চোখ তুলে তাকালেই সামনে দেখা যাচ্ছে বালিয়াড়ির ওপারে কালচে পাহাড়ের চূড়াটা।
যতই এগোচ্ছে সেদিকে, পায়ের নিচে নুড়ির পরিমাণ বাড়ছে। বালি কম। মাটি শক্ত। পাহাড়ের ছায়া থেকে ঠেলে বেরিয়ে থাকা ডকটাও চোখে পড়ছে। এখন।
আরও এগোতে ডকের কাছে পানিতে কি যেন একটা ভাসতে দেখা গেল।
কোন ধরনের ছোট নৌকা? দূর থেকে ভালমত বোঝা যাচ্ছে না।
পানিতে লাল রোদের ঝিলিমিলি। স্পষ্ট হচ্ছে জিনিসটা। একটা নৌকার পাশে ডুবছে, ভাসছে।
তিমির বাচ্চা নাকি? তীরের কাছে এসে অল্প পানিতে আটকা পড়েছে? নাকি মরে যাওয়া বড় কোন মাছ?
ডকের কাছে এসে দাঁড়িয়ে গেল। দৌড়ে আসার কারণে হাঁপাচ্ছে। হাত দিয়ে কপালের ঘাম মুছে জিনিসটা কি দেখার জন্যে এগিয়ে গেল।
কয়েক পা গিয়েই যেন হোঁচট খেয়ে দাঁড়িয়ে গেল। গলার কাছে আটকে আসতে লাগল দম।
পানিতে উপুড় হয়ে পড়ে আছে একজন মানুষ। দুই হাত দুই পাশে ছড়ানো। ভঙ্গিটা মোটেও স্বাভাবিক না।
কোন চিন্তাভাবনা না করেই পানিতে নেমে পড়ল মুসা। গোড়ালি ডুবে গেল ঠাণ্ডা পানিতে। উত্তেজনায় জুতো খোলার কথাও মনে ছিল না। ভিজে গেছে। এখন আর খুলেও লাভ নেই। মানুষটার কোমর ধরে টান দিল। বেশ ভারী। মুখের দিকে না তাকিয়েই কাঁধে তুলে নিল। বয়ে নিল, এল তীরে। শুইয়ে দিল বালিতে।
প্রায় নগ্ন দেহটা কাটাকুটিতে ভরা। ডকের কাছের ধারাল পাথরে ক্রমাগত বাড়ি খেয়ে খেয়ে এই অবস্থা হয়েছে। একটা কাটা থেকে রক্ত বেরোচ্ছে না।
মুখ দেখার জন্যে চিত করে শুইয়েই চিৎকার করে উঠল মুসা।
রিকি!
দ্রুত একবার পরীক্ষা করেই নিশ্চিত হয়ে গেল, মারা গেছে রিকি।
ডুবল কি করে? সাঁতার তো ভালই জানত। নাকি ভাটার সময় নেমেছিল পানিতে, স্রোতে টেনে নিয়ে গেছে? জোয়ারের সময় আবার ফেলে গেছে। সৈকতে?
রিকি মৃত! নিজের অজান্তেই হাঁটু ভাজ হয়ে গেল মুসার। পা ছড়িয়ে বসে পড়ল বালিতে। বুজে এল চোখ।
ওর চেয়ে কোন অংশেই খারাপ সাঁতারু ছিল না রিকি। ডোবার কথা নয়, যদি তীব্র ভাটার সময় না নেমে থাকে। কিন্তু রাতের বেলা নামতে গেল কেন সে?

কেন, রিকি, কেন নামলে? চোখ খুলে আচমকা চিৎকার করে উঠল মুসা। চোখে লাগছে কমলা রঙের রোদ। আবার মুদে ফেলল চোখ।
কতক্ষণ একভাবে বসে ছিল সে, বলতে পারবে না। মানুষের কথা শুনে দ্বিতীয়বার চোখ মেলল। এগিয়ে আসতে দেখল দুজন জেলেকে।

.

চার রাত পর। আবার ঘুম আসছে না মুসার। বিছানায় গড়াগড়ি করছে। ছটফট করছে। চাদরটা এলোমেলো। বালিশগুলো মেঝেতে। অনেক চেষ্টায় তন্দ্রামত যা-ও বা এল, দুঃস্বপ্ন দেখতে লাগল।
রিকিকে দেখল সে।
অনেক বড় একটা সৈকত। ঝলমলে রোদে বালিকে লাগছে সোনালি। বড় বড় ঢেউ মাথা উঁচু করে রাজকীয় ভঙ্গিতে হেলেদুলে এসে আছড়ে পড়ছে। সৈকতে। ভেঙে ছড়িয়ে পড়ছে মাথায় করে বয়ে আনা সাদা মুকুট।
খালিপায়ে দৌড়াতে দৌড়াতে এসে হাজির হলো রিকি। পরনে কালো রঙের সাঁতারের পোশাক। পানির কিনার ধরে দ্রুতপায়ে দৌড়াচ্ছে। কোন শব্দ হচ্ছে না। নিঃশব্দে উড়ে চলেছে যেন বালির ওপর দিয়ে।
তাকে ধরার জন্যে দৌড় দিল মুসা। ফিরে তাকাল না রিকি। মুসাকে কাছে যেতে দিল না। মুসা এগোলে সে-ও গতি বাড়িয়ে দিয়ে সরে যায়।
রোদে আলোকিত সৈকতেও রিকির মুখটা স্পষ্ট নয়। ছায়ায় ঢেকে রয়েছে, যেন।
প্লীজ, রিকি, সামনে ঝুঁকে দৌড়াতে দৌড়াতে ভাবছে মুসা, একটু দাঁড়াও। তোমার চেহারাটা দেখতে দাও।
তার অনুরোধেই যেন ফিরে তাকাল রিকি।
চমকে গেল মুসা।
আতঙ্কে বিকৃত হয়ে গেছে রিকির মুখ। ঠেলে বেরোনো চোখ। মুখটা হাঁ হয়ে আছে চিৎকারের ভঙ্গিতে।
হঠাৎ কালো হয়ে এল আকাশ। বিশাল ছায়া পড়ল সৈকতে।
ছায়াটা অনুসরণ করে চলল রিকিকে। এত জোরে ছুটেও কিছুতেই ওটার সঙ্গে পেরে উঠছে না সে।
এখনও রোদের মধ্যেই রয়েছে রিকি, তবে দ্রুত দূরত্ব কমিয়ে আনছে। ছায়াটা। যেন ওকে গ্রাস করার জন্যে ছুটে আসছে।
দৃষ্টি স্বচ্ছ হয়ে আসছে মুসার। বুঝতে পারল, ছায়াটা মেঘের নয়, হাজার · হাজার কালো প্রাণী সূর্যকে ঢেকে দিয়ে এই অবস্থা করেছে।
কালচে বেগুনী পাখা দুলিয়ে উড়ছে ওগুলো। ওড়ার তালে তালে ওঠানামা করছে মাথাগুলো। তীক্ষ্ণ চিৎকারে কান ঝালাপালা করছে।

বাদুড়ের ঝাক তাড়া করেছে রিকিকে।
হাজার হাজার বাদুড় ডানা ঝাঁপটে, প্রায় গা ঘেঁষাঘেঁষি করে, কালো চাদর তৈরি করে সূর্যকে ঢেকে দিয়েছে। ছায়ায় ঢাকা পড়েছে সৈকত। ওদের তীক্ষ্ণ চিৎকার ঢেউয়ের গর্জনকেও ঢেকে দিয়েছে।
গাল বেয়ে ঘাম গড়িয়ে পড়ছে রিকির। চোখ বুজে ফেলল সে। কিন্তু মুখটা খোলাই রইল আতঙ্কে।
থেমো না, রিকি! মুসা বলল। দৌড়াতে থাকো!
কিন্তু কুলাতে পারল না রিকি। ধরে ফেলল ওকে বাদুড়েরা। হুমড়ি খেয়ে বালিতে পড়ে গেল সে। রাতের অন্ধকারের মত ছেকে ধরল ওকে বাদুড়গুলো।
তারপর সব কালো।
ঝটকা দিয়ে বিছানায় উঠে বসল মুসা। নিজের ঘরে রয়েছে দেখে স্বস্তির। নিঃশ্বাস ফেলল। জানালা দিয়ে ভোরের ধূসর আলো ঢুকছে।
বিছানা থেকে যখন নেমে দাঁড়াল সে তখনও ঘুম পুরোপুরি কাটেনি। চোখে লেগে রয়েছে দুঃস্বপ্নের রেশ।
অনিশ্চিত ভঙ্গিতে জানালার দিকে এগোল সে। কানে বাজছে যেন। বাদুড়ের তীক্ষ্ণ চিৎকার। চোখের সামনে দেখছে বাদুড়ের মেঘ! বাদুড়ের ঝাক! সৈকতের বালিতে হুমড়ি খেয়ে পড়া রিকিকে কালো চাদরের মত ঢেকে দিয়েছে!
জানালার চৌকাঠে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে যেন ভয়ঙ্কর সেই দুঃস্বপ্নের অত্যাচার থেকে রেহাই পাওয়ার চেষ্টা চালাল সে।
কিন্তু বাদুড় দেখল কেন?
স্বপ্ন বিশ্বাস করে না সে। ঘুমের মধ্যে তাহলে কি তার মগজ কোন জরুরী মেসেজ দিতে চেয়েছে? এত প্রাণী থাকতে নইলে বাদুড় কেন?
তবে কি ভ্যা...একটু দ্বিধা করে জোরে জোরে উচ্চারণই করে ফেলল সে: ভ্যাম্পায়ার!
না, ভূতের কথা ভাবছে না সে। ভ্যাম্পায়ার ব্যাটের কথা ভাবছে। ছোট্ট দ্বীপটা থেকে রাতের বেলা ঝাঁকে ঝাকে বাদুড় উড়ে আসতে দেখেছে। বেশির ভাগই নিরীহ ফলখেকো বাদুড়। তবে বড় বাদুড়ের সঙ্গে ছোট আকারের ভ্যাম্পায়ার ব্যাট বাস করাও অসম্ভব নয় ওই নির্জন দ্বীপে।
রক্তচোষা ওই ভয়ঙ্কর বাদুড়গুলোই কি হত্যা করেছে রিকিকে? অসম্ভব নয়। রাতের বেলা সৈকতের নির্জন জায়গায় চলে যেত রিকি। নিজের অজান্তেই ভ্যাম্পায়ারের শিকার হত। চুপচাপ এসে তার শরীর থেকে রক্ত খেয়ে চলে যেত ওগুলো। সেজন্যে দুর্বল বোধ করত, সকালে ঘুম থেকে উঠতে ইচ্ছে করত না। আমাজানের জঙ্গলে জন্তু-জানোয়ার ধরতে গিয়ে ওই বাদুড় সম্পর্কে বিরাট

অভিজ্ঞতা হয়েছে মুসার। জানে, কি রকম নিঃশব্দে এসে গায়ে বসে ভ্যাম্পায়ার ব্যাট। রক্ত খেয়ে চলে যায়। জানা না থাকলে, আর সজাগ এবং ওগুলোর ব্যাপারে পুরোপুরি সতর্ক না থাকলে কিছু টেরই পাওয়া যায় না।
যতই ভাবল, রিকির রহস্যময় মৃত্যুর আর কোন কারণই খুঁজে পেল না মুসা। সব খুনেরই মোটিভ বা উদ্দেশ্য থাকে। এ খুনের কোন মোটিভ পায়নি পুলিশ। তারমানে ভ্যাম্পায়ার। রক্ত খেয়ে খেয়ে শেষ করে দিয়েছে রিকিকে। এটাই মোটিভ। এবং জোরাল মোটিভ।
স্বপ্ন একটা বিরাট উপকার করেছে তার। সূত্রটা ধরিয়ে দিয়েছে।
পুরোপুরি সজাগ হয়ে গেছে মুসা। ঘুমের লেশমাত্র নেই আর চোখে। কুচকানো টেনিস শর্টসটা তাড়াতাড়ি পরে নিল। মাথায় গলিয়ে গায়ে টেনে দিল। আগের দিনের ব্যবহার করা টি-শার্ট। রওনা দিল দরজার দিকে। দাঁত ব্রাশ করার কিংবা মুখ ধোয়ারও প্রয়োজন মনে করল-না।
রান্নাঘর দিয়ে ছুটে বেরোনোর সময় নাস্তার টেবিল থেকে ডাক দিলেন তার বাবা, এই…
কিন্তু ততক্ষণে স্ক্রীনডোরের বাইরে চলে এসেছে সে। পরে কথা বলব, বলে ছেড়ে দিল পাল্লাটা। লাফ দিয়ে সিঁড়ি থেকে নেমে দৌড়াতে শুরু করল জিনাদের বাড়ির দিকে।
ধূসর রঙ আকাশের। বাতাস ভেজা ভেজা, কনকনে ঠাণ্ডা। বালি ভেজা। তারমানে আগের রাতে বৃষ্টি হয়েছিল।
বৃষ্টির শব্দ শুনতে পায়নি সে। বাইরের কোন শব্দই তার কানে ঢুকতে দেয়নি ভয়াবহ ওই দুঃস্বপ্ন। প্রথমে সাগরের ঢেউয়ের গর্জন। তারপর বাদুড়ের বাঁশির মত তীক্ষ্ণ চিৎকার।
ভ্যাম্পায়ার ব্যাট!
জিনাকে গিয়ে বলতে হবে। বলবে, সত্যটা জেনে গেছে সে।
ঝলমলে রোদ ছিল, আকাশটা নীলও ছিল; তারপরেও রিকির মৃত্যুর পর গত চারটা দিন কেমন যেন ধূসর, বিষণ্ন কুয়াশায় ঢেকে দিয়েছিল সব কিছু। মনটা ভীষণ খারাপ ছিল বলেই মুসার কাছে দিনগুলো এ রকম লেগেছে।
ঘটনার ছবিগুলো অস্পষ্ট হয়ে আসছে তার মনে, কেবল চিৎকার আর শব্দগুলো গেঁথে রয়েছে স্পষ্ট–রিকির বাবা-মায়ের বুকভাঙা কান্না, পুলিশের ভারী ও চাঁপা কণ্ঠ, সৈকতে বেড়াতে আসা ছেলেমেয়েদের চমকে চমকে ওঠা, ভীত কথাবার্তা।
গত চারদিনে জিনার সঙ্গে মাত্র একবার দেখা হয়েছে তার। জিনা অস্বাভাবিক আচরণ করেছে তার সঙ্গে। রিকির মৃত্যু রহস্য নিয়ে আলোচনাটা মোটেও জমেনি।

গত কয়েকদিনে বার বার কিশোর আর রবিনের অভাব অনুভব করেছে মুসা, বিশেষ করে কিশোরের। এখন ওর এখানে থাকার বড় দরকার ছিল। টেলিফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করেছে। রবিনকে পাওয়া গেছে। ব্যান্ডেজ খোলা হয়েছে। তবে ঠিকমত হাটাচলা করতে সময় লাগবে। আরও কিছুদিন বিশ্রাম নিতে বলেছেন ডাক্তার। ইয়ার্ডে পাওয়া যায়নি কিশোরকে। দুই ব্যাভারিয়ান ভাইয়ের একজন বোরিস জানিয়েছে, রাশেদ পাশার সঙ্গে বাইরে গেছে সে, পুরানো মাল আনতে, কখন ফিরবে কোন ঠিক নেই। হতাশ হয়ে লাইন কেটে দিয়েছে মুসা।
জিনার সঙ্গে আলোচনা জমাতে না পেরে সরে চলে এসেছিল মুসা। ভেবে অবাক হচ্ছিল, কি হয়েছিল রিকির? এত রাতে সাগরে নেমেছিল কেন? মারা গেল কেন? ওই অবেলায় শুধু শুধু সাঁতার কাটতে নেমেছিল রিকি, এটা বিশ্বাস করতে পারছিল না মুসা।
টাউন করোনার এটাকে দুর্ঘটনায় মৃত্যু রায় দিয়েই খালাস। কিন্তু মুসা। এত সহজভাবে মেনে নিতে পারছিল না ব্যাপারটা। বুঝতেও পারছিল না। কিভাবে মারা গেছে রিকি।
তবে এখন জানে। স্বপ্ন তার প্রশ্নের জবাব দিয়ে দিয়েছে।
সেই জবাবটা জিনাকেও জানাতে চলেছে সে।
গ্রীষ্মবাসগুলোর পেছন দিয়ে এগোচ্ছে। সাদা সাদা কটেজগুলোর আঙিনায় চওড়া সানডেক। ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে চেয়ার। একটা করে বড় ছাতা আর তার। নিচে টেবিল রয়েছে প্রতিটি আঙিনায়। রান্নাঘরের জানালা দিয়ে জিনাকে চোখে পড়ল।
লাফ দিয়ে ডেকে উঠল মুসা। জিনার নাম ধরে ডাকতে ডাকতে চলে এল পেছনের দরজার কাছে।
অবাক হয়ে মুখ তুলে তাকাল টেবিলে বসা জিনা। কেরিআন্টি এঁটো থালা-বাসন পরিষ্কার করছেন।
দৌড়ে আসার পরিশ্রমে হাঁপাচ্ছে মুসা। নাস্তা করেছ? জানতে চাইলেন কেরিআন্টি। টেবিলে রাখা প্যানকেকের থালাটা দেখালেন তিনি।
কিন্তু তাকে অবাক করে দিয়ে খাবারের দিকে এগোল না মুসা। জিনাকে দেখছে। জানালার কাচের ভেতর দিয়ে আসা ধূসর আলোয় ফ্যাকাসে লাগছে। ওর মুখ। জিনা, তোমার সঙ্গে কথা আছে।
নীরবে উঠে দাঁড়াল জিনা। এগিয়ে গেল দরজার দিকে।
ওর পিছু পিছু ডেকে বেরিয়ে এল মুসা। কথাটা জানানোর জন্যে অস্থির। সাগর থেকে বয়ে আসছে ঠাণ্ডা বাতাস। আকাশের ভারী মেঘ অনেক নিচে নেমে এসেছে।

ডেকের রেলিঙে হেলান দিয়ে গাছপালার দিকে তাকিয়ে রইল জিনা। ওর পাশে এসে দাঁড়াল মুসা। শার্টের নিচের অংশটা ওপরে টেনে তুলে সেটা দিয়ে কপালের ঘাম মুছল।
গন্ধ হয়ে গেছে শার্টটায়। নাক কুঁচকাল। তাড়াহুড়ায় আলমারি থেকে থোয়া শার্ট বের করে পরার কথা মনে ছিল না, আগের দিনেরটাই পরে চলে এসেছে। এ নিয়ে মাথা ঘামাল না।
কেমন কাটছে তোমার? মেঘলা আকাশের নিচে গাছপালার কালো মাথার দিকে তাকিয়ে কিছুটা লজ্জিত স্বরেই যেন জিজ্ঞেস করল জিনা।
ভাল না।
আমারও না।
তোমাকে কয়েকটা জরুরী কথা বলতে এসেছি, জিনা, ভূমিকা শুরু করল মুসা। অস্বস্তি বোধ করছে। ও যা বলবে, সেটা যদি বিশ্বাস না করে জিনা? হাসাহাসি করে?
আমার ঘুম পাচ্ছে। তাজা বাতাসেই বোধহয়।
জিনা, আমি কি বলছি, শুনছ? রিকি কিভাবে মারা গেছে, জেনে ফেলেছি।
চোখের পাতা সরু করে ফেলল জিনা। রক্ত সরে গিয়ে আরও ফ্যাকাসে হয়ে গেল মুখটা। কিভাবে মারা গেছে, সেটা আমিও জানি, মুসা। পানিতে ডুবে।
জিনা, শোনো, প্লীজ, অধৈর্য ভঙ্গিতে নিজের শার্টের ঝুল ধরে একটানে প্রায় হাঁটুর কাছে নামিয়ে দিল মুসা। প্লীজ, জিনা!
জবাব দিল না জিনা। মুসার চোখের দিকে তাকিয়ে রইল।
জবাবটা স্বপ্নের মধ্যে পেয়েছি আমি, গলা কাঁপছে মুসার। কিন্তু আমি জানি, এটাই সত্যি।
এবারও কোন কথা বলল না জিনা। তাকিয়ে রয়েছে ওর দিকে।
ভ্যাম্পায়ারে খুন করেছে রিকিকে।
তাই! এক পা পিছিয়ে গেল জিনা। এমন করে দুহাত তুলে ধরল, যেন। মুসার কথার অস্ত্র থেকে আত্মরক্ষা করতে চায়।
ভ্যাম্পায়ার! জোর দিয়ে বলল মুসা। সৈকতের ওপর দিয়ে হাজার হাজার বাদুড় উড়ে যেতে দেখি রোজ। বেশির ভাগই ফলখেকো বাদুড়। আমার বিশ্বাস, ফলখেকোগুলো যেখান থেকে আসে, সেখানে ভ্যাম্পায়ার ব্যাটও আছে। রিকিকে…
মুসা, থামো। এ সব রসিকতা এখন ভাল্লাগছে না আমার, আঁঝাল কণ্ঠে। বলল জিনা। দুই হাত আড়াআড়ি করে রাখল বুকের ওপর।

জিনাকে বোঝাতে গিয়ে ওর গলার দিকে চোখ পড়তে থমকে গেল মুসা। খাইছে বলে অস্ফুট একটা শব্দ বেরিয়ে এল মুখ থেকে। হাঁ করে তাকিয়ে রইল।
নানা রকম ভাবনা খেলে যেতে শুরু করল মাথায়। অদ্ভুত সব ভাবনা। সেগুলো বলতে গেলে পাগল বলবে লোকে।
উল্টোপাল্টা দেখছি নাকি আমি?-ভাবল সে। ওগুলো মশার কামড়?
জনের কথা মনে পড়ল তার। জন! এমন কি হতে পারে ভ্যাম্পায়ার ব্যাট নয়, আসল ভ্যাম্পায়ারের কবলেই পড়েছে জিনা? জন কি ড্রাকুলার মত মানুষরূপী সত্যিকারের রক্তচোষা ভূত?
মাথাটা গরম হয়ে যাচ্ছে! আমি বোধহয় পাগল হয়ে যাচ্ছি! ভাবতে লাগল মুসা।
স্বপ্নে কি দেখেছি আমি, শোনো, আবার যেন দুঃস্বপ্নের ঘোরেই কথা বলতে লাগল মুসা। মগজে ঘুরপাক খাচ্ছে চিন্তাগুলো। বাদুড়ের তাড়া খেয়ে দৌড়ে পালাচ্ছিল রিকি, আর বাদুড়গুলো…
থামো, মুসা! ফেটে পড়ল জিনা। বললাম তো, ভাল্লাগছে না আমার!
কিন্তু আমি যা বলছি, ঠিকই বলছি! জিনার রাগের পরোয়া করল না মুসা। বোঝার চেষ্টা করো, জিনা। ওই বাদুড়গুলোই যত নষ্টের মূল। রিকি…ওর গলায় এত বেশি কাটাকুটি ছিল, তার মধ্যেও…
আহ, থামো না! রাগে শক্ত হয়ে গেছে জিনার শরীর। দয়া করে তোমার বকবকানি থামাও।
কিন্তু, জিনা…
থামো! গর্জে উঠল জিনা।
থমকে গেল মুসা। ভুলটা কি বলল সে? ওর কথা কেন শুনতে চাইছে না। জিনা? বিশ্বাস করুক বা না করুক, কথা তো শুনবে!
মুসা, তোমার বয়েস বেড়েছে। আগের ছোট্ট খোকাটি আর নেই তুমি যে সব সময় ভূতের ভয়ে কাবু হয়ে থাকবে। এখন আর ওসব মানায় না, তামাটে চোখে রাগে যেন আগুন জ্বলছে জিনার। মুসার কাছে ওর এই আচরণ রীতিমত অস্বাভাবিক লাগল। বড় হও, জিনা বলছে। তোমার এত ঘনিষ্ঠ একজন বন্ধু মারা গেল, আর তুমি বসে বসে হরর ছবির গল্প তৈরি করছ!
না, তা করছি না… চিৎকার করে উঠল মুসাও।
কিন্তু তাকে কথা শেষ করতে দিল না জিনা। দেখো, জীবনটা কাহিনী নয়, বাস্তব।
আশ্চর্য! কবে এত বড় হয়ে গেল জিনা? রকি বীচ থেকে আসার সময়ও তো এরকম ছিল না। স্যান্ডি হোলোতে এসে মাত্র কদিনে…।
জীবনটা যে কাহিনী নয়, আমি জানি, তর্ক করতে গেল মুসা, কিন্তু…

রিকি আমাদের বন্ধু ছিল, চোখের কোণে পানি এসে গেছে জিনার। ওর মৃত্যুতে তোমার যেমন কষ্ট হচ্ছে, আমারও হচ্ছে। মেনে নেয়া কঠিন। কিন্তু এটাই বাস্তব। চোখের পানি গোপন করার চেষ্টা করল না জিনা। অতিরিক্ত আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছে। কিভাবে মারা গেছে ও, ঠিক করে বলতে পারছে না কেউ। পানিতে ডুবে মরেছে, এ কথাটা মানতে না চাইলে না মানো, তাই বলে ভ্যাম্পায়ারের গল্প! ওই ছেলেমানুষী গল্প দয়া করে আমাকে শোনানোর। চেষ্টা কোরো না আর।
লেকচার তো একখান ভালই দিয়ে দিলে। কিন্তু, জিনা... থেমে গেল। মুসা। আর কি বলবে? তাকিয়ে আছে জিনার গলার দাগ দুটোর দিকে।
জন একটা ভ্যাম্পায়ার! বিড়বিড় করে বলে ফেলল নিজেকেই। জিনাকে শোনানোর জন্যে বলেনি।
কিন্তু শুনে ফেলল জিনা। হাত দিয়ে চোখের পানি মুছে জ্বলন্ত চোখে। তাকাল। কি বললে? পাগল হয়ে গেছ তুমি। যাও এখান থেকে। আমার। সামনে থেকে সরো। তোমাকে সহ্য করতে পারছি না।
ঝটকা দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল জিনা। গটমট করে রওনা হলো ঘরে ঢোকার জন্যে।
মুসাও ঢুকতে গেল। দরজার কাছ থেকে তাকে ঠেলা দিয়ে সরিয়ে দিল জিনা। না, আসার দরকার নেই। যাও! আর কোনদিন আসবে না এখানে। তোমার মুখও দেখতে চাই না।
ভেতরে ঢুকে গেল জিনা। কেরিআন্টি বোধহয় নেই এখন ওঘরে, কিংবা ওদের কথা শুনতে পাননি, তাই কোন রকম প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হলো না। ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে ঘুরে দাঁড়াল মুসা। নেমে এল ডেক থেকে। ক্লান্ত, চিন্তিত ভঙ্গিতে ফিরে চলল। সামনে দিয়ে দৌড়ে পার হয়ে গেল দুটো খরগোশ। দেখলই না যেন সে।
বৃষ্টি শুরু হলো। প্রথমে বড় বড় ফোঁটায়। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই অঝোরে ঝরতে শুরু করল।
মাথা নিচু করে ধীরে ধীরে হাঁটছে মুসা। বৃষ্টিতে কোন প্রতিক্রিয়া হলো না। দুশ্চিন্তায় বৃষ্টির চেয়ে অনেক ভারী হয়ে আছে যেন মগজ।
পানি আর কাদায় জুতো পড়ে ছপছপ শব্দ তুলছে। ওর তারের মত চুলগুলোকে নরম করতে পারছে না পানি, লেপ্টে দিতে পারছে না। তবে শার্টটা ভিজে চুপচুপে হয়ে লেগে গেছে গায়ের সঙ্গে।
ভাবতে ভাবতে চলেছে সে। জিনা ঠিকই বলেছে, ছেলেমানুষী, উদ্ভট চিন্তা। ভ্যাম্পায়ারের কথা কি করে ভাবতে পারল? কিশোর হলে এরকম ভূতুড়ে ভাবনা কক্ষনো ভাবত না। ভ্যাম্পায়ারের কথা না ভেবে বাস্তব কিছু আবিষ্কার করত।

কিন্তু ভ্যাম্পায়ার ভূত অবাস্তব হলেও ভ্যাম্পায়ার বাদুড় তো বাস্তব। ওরা রক্ত খেয়ে রিকিকে…
তাহলে জিনার গলায় দাগ কেন? ভ্যাম্পায়ার ব্যাট রক্ত খেলে ওরকম দাগ রেখে যায় না।
মাথাটা আবার গরম হয়ে যাচ্ছে। একপাশের গাছগুলোর দিকে মুঠো তুলে আঁকাল সে, যেন শাসাল ওগুলোকে। বৃষ্টি আর বাতাসে নুয়ে নুয়ে যাচ্ছে গাছের মাথা।
ঘাড় বেয়ে বৃষ্টির পানি অঝোরে ঝরে পুরো ভিজিয়ে দিয়েছে পিঠ। শীত লাগল ওর। গায়ে কাটা দিল।
আবার ভাবতে লাগল ভ্যাম্পায়ারের ভাবনা। জিনার গলার দাগ দুটো নিয়ে ভাবল। কাকে সন্দেহ করবে? জনকে? না ভ্যাম্পায়ার ব্যাটকে?

.
নীলচে আলোর বিকেলে গভীর ঘুম থেকে ধীরে ধীরে জেগে উঠল জন। কফিনের ভেতরে হাত নাড়ানোর জায়গা নেই, তার মধ্যেই আড়মোড়া ভাঙল কোনমতে। ডালার বড় বড় ফুটোগুলো দিয়ে আলো আসছে। তবে এত কম, বোঝা যায় বাইরে দিনের আলো শেষ।
বড় করে হাই তুলে ডালায় ঠেলা দিল সে। কাচকোচ আওয়াজ তুলে ওপরে উঠে গেল ডালাটা। উঠে বসে চারপাশে তাকাল। তারপর বেরিয়ে এল কফিন থেকে।
হালকা স্যান্ডেলের শব্দে ফিরে তাকাল সে। ওপাশের ঘর থেকে দরজা দিয়ে এ ঘরে ঢুকল লীলা। কি খবর? ঘুম তাহলে ভাঙল।
তুমি এত আগে জেগেছ কেন?
খিদে। বড় খিদে। সহ্য করতে পারছি না। পেটে খিদে নিয়ে কি ঘুম আসে?
কি আর করা। সহ্য করতেই হবে। আগেই তো বলা হয়েছে আমাদের, এ রকমই ঘটবে…
তা হয়েছে। নাম লিখিয়েছি পিশাচের খাতায়। এখন যে বাঁচি না!
আর কোন উপায় নেই, চালিয়ে যেতেই হবে। একবার যখন ফাঁদে পা দিয়েছি, আর মুক্তি নেই। এখন বেরোতে গেলে কাউন্ট ড্রাকুলার বিশ্বাস হারাব। আর তার বিশ্বাস হারালে কি যে ঘটে, সে তো নিজের চোখেই দেখেছ। বেশি ভাবনাচিন্তা না করে তৈরি হয়ে নাও। বেরোতে হবে। শিকার তো একটাকে দিয়েছ শেষ করে। আজ কি করবে?
দেখি, নতুন কাউকে ধরার চেষ্টা করতে হবে।
কাকে? পরিচিত কাউকে?
ঠিক করিনি এখনও। ভেবে দেখতে হবে।

*
সারাটা দিন কি করে কাটালে? উঁচু ঘাসের মধ্যে দিয়ে বালিয়াড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞেস করল টনি।
সারাদিন বৃষ্টি হয়েছে। ঘাসের ডগায় পানি লেগে আছে। হাঁটতে গেলে নাড়া লেগে পায়ে পড়ে পা ভেজে। মুসার মনে হলো, বোকামি হয়ে গেছে। শর্টস না পরে জিনস পরে আসা উচিত ছিল। বিড়বিড় করে বন্ধুর কথার জবাব দিল, কিছুই না। আসলেই কিছু করেনি সে। বেশির ভাগ সময় লিভিং রুমের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থেকেছে, পায়চারি করেছে, রিকির লাইটারটা বের করে হাতে নিয়ে দেখেছে, স্বপ্নের কথা ভেবেছে, জিনা ওর কথা না শুনে তাড়িয়ে দেয়ায় দুঃখ পেয়েছে।
লাইটারটা এখনও হাতেই আছে ওর। রাখতে ভাল লাগছে। বন্ধুর একমাত্র স্মৃতি।
বালি শুকিয়ে যাচ্ছে দেখো, কত তাড়াতাড়ি, স্যান্ডেলের ডগা দিয়ে খোঁচা দিল টনি, কি আশ্চর্য, তাই না? সারাটা দিন ধরে বৃষ্টি হলো, আর কত সহজেই না সেটা শুষে নিল বালি।
সাগরের দিকে তাকাল মুসা। সন্ধ্যার শুরুতে মেঘগুলো ছাড়া ছাড়া হয়ে গেছে। রাতের আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। দিগন্তে ফ্যাকাসে চাঁদের চারপাশ ঘিরে পানির একটা নীলচে বৃত্ত তৈরি হয়েছে।
কি ভাবছ এত? মুসাকে জবাব দিতে না দেখে জিজ্ঞেস করল টনি।
টান দিয়ে একটা ঘাসের ডগা ছিঁড়ে নিয়ে দাঁতে কাটতে শুরু করল মুসা।
কি, বলছ না যে? অ্যাই, মুসা?
কি বলব?
যা ভাবছ।
বললে বিশ্বাস করবে না। হয় হাসবে, নয়তো জিনার মত রেগে গিয়ে দর্শন শোনাতে শুরু করবে।
মানে?
স্বপ্ন দেখে একটা কথা মাথায় এসেছিল। জিনাকে বলতে গিয়েছিলাম। দূর দূর করে খেদিয়েছে আমাকে।
আমি ওরকম কিছু করব না। নিশ্চিন্তে বলে ফেলো।
তা-ও দ্বিধা করতে লাগল মুসা। টনির চাপাচাপিতে শেষে বলতে বাধ্য। হলো স্বপ্নের কথা, রিকি কিভাবে মারা গেছে, সেই সন্দেহের কথা। ভ্যাম্পায়ার ব্যাটের কথাই শুধু বলল সে। জনকে যে ভ্যাম্পায়ার ভাবছে এ কথা চেপে গেল।
নিজে হাসল না টনি, যেহেতু কথা দিয়েছে। তবে জিনার কথা বলল, হাসবেই তো। ছেলেমানুষের মত কথা বললে কে না হাসে।

তুমিও বললে ছেলেমানুষ! জানো, স্বপ্ন অনেক বড় বড় সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে। অনেক আবিষ্কার, অনেক যুদ্ধ।
থামো, থামো, হাত তুলল টনি, ওসব আমি জানি। ওগুলো ছিল সব বাস্তব
এটা অবাস্তব, এই বলবে তো? কিন্তু টনি, ভুলে যেয়ো না, রিকির মৃত্যুটা বাস্তব।
কে ভুলে যাচ্ছে? রিকির মৃত্যুটা বাস্তব। আর বাস্তব কারণেই সেটা ঘটেছে, পানিতে ডুবে। তুমি কি ভেবেছ, জিনা আর আমি শুনলেই তোমার কথায় লাফিয়ে উঠব? ভ্যাম্পায়ারে রক্ত শুষে খেয়ে খেয়ে খতম করে দিয়েছে। রিকিকে-দারুণ এই আবিষ্কারের জন্যে তোমাকে বাহবা দিতে থাকব, পিঠ চাপড়াব?
টনির দিকে তাকিয়ে রইল মুসা। আহত স্বরে বলল, জিনাকে আমি বলতে গিয়ে বোকামি করে ফেলেছি, এটা ঠিক। সেই দুঃখ ভোলার জন্যে কারও ওপর নির্ভর করতে চেয়েছিলাম, সে তুমি। কিন্তু তুমিও যে এভাবে হাসাহাসি শুরু করবে…
হাসি মুছে গেল টনির মুখ থেকে। তাড়াতাড়ি বলল, সরি। তোমাকে দুঃখ দেয়ার জন্যে বলিনি কিন্তু।
মাথার ওপর ডানা ঝাপটানোর শব্দে মুখ তুলে তাকাল মুসা। দুটো বাদুড় উড়ে চলেছে বালিয়াড়ির দিকে।
বিজ্ঞানের ক্লাসে স্যার বলেছেন, বাদুড় খুব ভাল প্রাণী, ঘাসের ডগা চিবাচ্ছে টনি, কথা স্পষ্ট হলো না। পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার জন্যে ওদের প্রয়োজন আছে। ক্ষতিকর পোকামাকড় খেয়ে ওরা আমাদের উপকার করে। বাদুড়ের মল দিয়েও ভাল সার হয়।
ওই সার তুমি গিয়ে জমিনে ফেলোগে! তিক্তকণ্ঠে বলল মুসা। আর জাহান্নামে যাক তোমার বিজ্ঞানের ক্লাস।
রাগ করল না টনি। তোমার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি। রিকির– কথাটাও মন থেকে সরাতে পারছি না। বেচারা! তা ছাড়া জিনার সঙ্গে ওই অপরিচিত লোকটার খাতির..
বাদ দাও ওসব কথা, হাত নেড়ে বলল মুসা। নিজের কর্কশ স্বর শুনে নিজেই অবাক হয়ে গেল। ভাল্লাগছে না শুনতে!
কোন কথা বলেই আর জমানো যাবে না বুঝতে পেরে টনি বলল, তারচেয়ে চলো প্রিন্সেসে চলে যাই। মন ভাল হবে। যাবে?
মাথা নাড়ল মুসা, না। তুমি যাও। আমি বরং হাঁটাহাঁটি করে মগজটাকে সাফ করা যায় নাকি দেখি।
হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল টনি। ঠিক আছে, মন ভাল করার চেষ্টা করতে থাকো তুমি। আমি গেলাম।

জোরে জোরে হাঁটতে শুরু করল সে। কিছুদূর গিয়ে মুসার দিকে ফিরে হাত নাড়ল একবার।
বালিয়াড়ির দিকে হাঁটতে থাকল মুসা। চিন্তায় ভারী হয়ে আছে মন। সামনে কতগুলো ছেলেমেয়েকে জটলা করতে দেখে আর সেদিকে এগোল না। ঘুরে গেল পাহাড়টার দিকে। রাতের পরিষ্কার আকাশের পটভূমিতে বিশাল একটা স্তম্ভের মত লাগছে পাথরের কালো চূড়াটা।
জিনার কথা ভাবল। সকালে হয়তো ওর মেজাজ খারাপ ছিল। সেজন্যে কোন কথা শুনতে চায়নি। আবার কি যাবে ওকে বোঝাতে?
নাহ, যাবে না। সঙ্গে সঙ্গে বাতিল করে দিল ভাবনাটা। গিয়ে কোন লাভ নেই। ওর কথা শুনবে না জিনা।
কিন্তু ওকে বোঝানোর চেষ্টা করতেই হবে। জন যে ভ্যাম্পায়ার এ বিশ্বাসটা মনে বদ্ধমূল হচ্ছে ক্রমেই। ওর খপ্পর থেকে জিনাকে সরিয়ে আনতে না পারলে সাংঘাতিক বিপদে পড়ে যাবে জিনা।
আনমনে ভাবতে ভাবতে পাহাড়টার দিকে এগিয়ে চলল সে। গভীর চিন্তায় ডুবে না থাকলে আরও আগে দেখতে পেত। চোখে পড়তেই থমকে দাঁড়াল। কাপুনি শুরু হয়ে গেল বুকের মধ্যে।
একটা উঁচু বালির ঢিবিতে পড়ে আছে কালোমত কি যেন। নিথর।
খাইছে! কি ওটা? আবার লাশ!
আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে নিচু, ছায়ায় ঢাকা বালিয়াড়িটার দিকে তাকিয়ে আছে মুসা। ঘুরে দৌড় দিতে ইচ্ছে করছে। জিনিসটা কি দেখার কৌতূহলও দমন করতে পারছে না।
ভয় আর কৌতূহলের লড়াই চলল দীর্ঘ একটা মুহূর্ত। কৌতূহলের জয় হলো। পায়ে পায়ে এগোতে শুরু করল সে। কাছে পৌঁছে দেখল মানুষই, তবে মৃত নয়। কালো আঁটসাঁট পোশাক পরা মেয়েটা বসে আছে বালিয়াড়ির ওপর, দুই পা জড় করে, হাঁটুতে থুতনি ঠেকিয়ে।
লীলা! ডাকল সে।
জবাব দিল না মেয়েটা।
লীলা? জোরে ডাক দিয়ে আরেক পা আগে বাড়ল মুসা। ভয় কাটেনি এখনও। পা কাঁপছে।
তবু সাড়া দিল না মেয়েটা।
বালিয়াড়ির একেবারে কাছে এসে আবার ডাক দিল মুসা, এই, লীলা!
অবশেষে মুখ তুলল লীলা। আবছা অন্ধকারেও চকচক করছে তার গালের পানি। কাঁদছিল।

সরি, এক পা পিছিয়ে গেল মুসা। বিব্রতকর অবস্থা। কি করে সামাল। দেবে বুঝতে পারছে না। আর কোন কথা খুঁজে না পেয়ে আবার বলল, সরি!
ওর দিকে তাকিয়ে কয়েকবার চোখ মিটমিট করল লীলা। চিনতে অনেক সময় লাগল। দ্বিধান্বিত মনে হলো ওকে। যেন নিজের গভীর বেদনা, গভীর ভাবনায় হারিয়ে ছিল, বাইরের কারও সেখানে প্রবেশাধিকার নেই।
হাসল। জোর করে দুই হাত তুলে ডলে ডলে মুছল চোখের পানি। গালের পানি মুছল।
ও, তুমি! চিনতে পারিনি, থেমে থেমে বলল নীলা। নিজের হাত দুটো তুলে রেখেছে মুসা। ওগুলোকে নিয়ে কি করবে, যেন দ্বিধায় পড়ে গেছে। অবশেষে দুই পাশে ঝুলিয়ে দিল। জিজ্ঞেস করল, তোমার কি হয়েছে?
দীর্ঘশ্বাস ফেলল লীলা। জানি না। খালি কান্না পাচ্ছে।
রিকির জন্যে? বলেই থমকে গেল। প্রশ্নটা বোকার মত হয়ে গেল না তো! মানে, আমি বলতে চাইছি...।
রিকির জন্যেই, লীলা বলল। সৈকতে, শহরে, যেখানেই যাই, মনে হয় এই বুঝি সামনে পড়ল রিকি। এই বুঝি ডেকে উঠল হাই করে। আমি বিশ্বাস করতে পারছি না ও নেই। ওর এ ধরনের কিছু ঘটবে দুঃস্বপ্নেও ভাবিনি। কাউকে এ ভাবে মরতে দেখিনি তো। লাশই দেখিনি কখনও।
বুঝতে পারছি, লীলার দিক থেকে আস্তে করে পানির দিকে মুখ ফেরাল মুসা। আমিও বিশ্বাস করতে পারছি না। খুব খারাপ লাগছে আমারও। ও আমার বন্ধু ছিল।
জবাব দিল না লীলা। বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে উঠে দাঁড়াল। কাপড়ে লেগে যাওয়া বালি ঝাড়ল। ধীর পায়ে নেমে এসে দাঁড়াল মুসার সামনে। এত কাছে, ওর নিঃশ্বাস পড়তে লাগল মুসার মুখে।
বন্ধু হিসেবে ও যে কি ছিল তোমার কাছে, সে তো বুঝতেই পারছি। আমার সঙ্গে মাত্র কয়েক দিনের পরিচয়, তাতেই যে কষ্টটা লাগছে, আবার চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে এল লীলার। গাল বেয়ে গড়াতে লাগল। সহ্য করতে পারছি না।
হ্যাঁ, ও খুব ভাল মানুষ ছিল, লীলার চোখ থেকে চোখ সরাতে পারছে না। মুসা। সম্মোহন করে ফেলা হচ্ছে যেন তাকে।
চারপাশ থেকে ওদের ঘিরে বইছে সাগরের হাওয়া।
হাত তুলল লীলা। এলোমেলো চুল সরাল মুখের ওপর থেকে। একটু বেশিক্ষণই হাতটা উঠে রইল ওর আর মুসার মুখের মাঝখানে। একটা মিষ্টি গন্ধ ঢুকল মুসার নাকে। কিসের বুঝতে পারল না সে। পারফিউমের গন্ধই হবে হয়তো।

মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠল মুসার। এমন লাগছে কেন? আগের রাতে ভাল ঘুম হয়নি। সারাদিনে অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা করেছে। হয়তো সেজন্যেই খারাপ লাগছে।

কাল রাতে কেন যে সাঁতার কাটতে নেমেছিল রিকি বুঝলাম না, জোর করে লীলার চোখ থেকে চোখ সরাল মুসা।

আমিও না।

ও কিন্তু খুব শান্তশিষ্ট ছিল, মাথার ঘোর লাগা ভাবটা ঝাড়া দিয়ে সরানোর। চেষ্টা করতে লাগল মুসা। রাত দুপুরে হঠাৎ এরকম একটা কাণ্ড করার মত স্বভাব ছিল না।

সেটা ওর সঙ্গে কয়েকদিনের পরিচয়েই বুঝেছিলাম, মুসার মাথা ছাড়িয়ে বহুদূরে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিল লীলা। নির্জন সৈকতটা দেখছে। অবাক লেগেছে। সেজন্যেই। কাল রাতে আমাকে কটেজে পৌঁছে দিয়ে যখন বলল সে স্কিনডাইভ করতে যাচ্ছে, বিশ্বাস করতে পারিনি। আমি ভেবেছি বাড়ি ফিরে যাবে।

অবাক কাণ্ড! মাথা ঘুরছে মুসার।

সকালে যখন শুনলাম খবরটা... কথা আটকে গেল লীলার। শব্দ করে কেঁদে উঠল।

সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে ওর কাঁধে হাত রাখল, মুসা। কেপে উঠল লীলা। কয়েকটা সেকেন্ড ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে মুখ তুলে তাকাল। জোর করে হাসি ফোঁটাল মুখে। সরি!...কি করব? কিছুতেই থামাতে পারছি না। ঘটনাটার পর তোমাকেই প্রথম পেলাম, যার সঙ্গে মন খুলে কথা বলতে পারছি।

মুসার হাতটা ধরল সে। আরও এগিয়ে এল।

অস্বস্তি বোধ করছে মুসা।

ওর গলার দিকে তাকাচ্ছে লীলা। চোখে চোখ রাখল আবার।

মুসার অস্বস্তি বাড়ছে। সরে যাওয়ার কথা ভাবছে।

সেটা বুঝতে পারল বোধহয় লীলা। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত ওর চোখে চোখে চেয়ে রইল। দ্বিধা করছে। কোন একটা ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। যেন। আচমকা হাতটা ছেড়ে দিয়ে সরে গেল। কোন কথা না বলে ঘুরে লম্বা লম্বা পায়ে দৌড়াতে শুরু করল পাহাড়ের দিকে।

কি ভেবে মুসাও পিছু নিল তার।

.

সেরাতেও রিকিকে স্বপ্ন দেখল মুসা। তাকে সাবধান করে দিতে এসেছিল রিকি। কি করে মারা গেছে, ইনিয়ে-বিনিয়ে জানাল। রক্ত শুষে খেয়ে তাকে শেষ করে দিয়ে সাগরে ফেলে দিয়েছে। গলার ফুটো দুটো দেখাল। ভ্যাম্পায়ারের কাছ থেকে সাবধান থাকতে বলল।

রিকি মিলিয়ে যেতেই একদল ভ্যাম্পায়ারকে আসতে দেখল মুসা। তাড়া। করল ওকে। দৌড়ে পালাতে গিয়ে আর কোন উপায় না দেখে শেষে সাগরে ঝাঁপ দিল সে। টান দিয়ে মাঝসাগরে ভাসিয়ে নিল ওকে স্রোত। প্রচণ্ড ঢেউ ঝাঁকাতে শুরু করল। বহুদূর থেকে ডাক শোনা যেতে লাগল, এই মুসা, মুসা!
ঘুম ভেঙে গেল মুসার। দেখে ঢেউয়ে নয়, কাঁধ ধরে ঝাঁকি দিচ্ছেন তার বাবা। কি ব্যাপার? ওঠো। আজ এত দেরি কেন?
অনেক রাতে শুয়েছি, চোখ ডলতে ডলতে জবাব দিল মুসা। জানালার দিকে তাকিয়ে দেখল পর্দা সরিয়ে দিয়েছেন বাবা। সোনালি রোদ এসে পড়েছে মেঝেতে।
দশটা তো বাজে, টেবিল-ঘড়িটার দিকে হাত তুললেন মিস্টার আমান। ওঠো। আমরা সব কাপড়-চোপড় পরে রেডি। জলদি উঠে কাপড় পরে নাও। পিয়ারে যাওয়ার সময় নাস্তা খেয়ে নিয়ো।
খাইছে! ক্লান্ত ভঙ্গিতে উঠে বিছানার বাইরে মেঝেতে পা রাখল মুসা। চোখের পাতা আধবোজা করে বাবার দিকে তাকাল, এখনও পুরো খুলতে পারছে না। কোথায় যেন যাওয়ার কথা আমাদের?
ভুলে গেছ? সমুদ্রে ছিপ দিয়ে মাছ ধরতে যাওয়ার কথা না? ডক্টর বেনসনের বোটে করে? ছেলের কাধ ধরে আবার ঝাঁকি দিলেন আমান। বসে, আছ কেন? জলদি করো।
কাঁধ ছেড়ে দিয়ে দরজার দিকে রওনা হলেন তিনি।
আমি পারব না, বাবা, বলেই ধপ করে আবার বালিশের ওপর পড়ল মুসা।
দরজার কাছে গিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন আমান। উদ্বেগ ফুটেছে চেহারায়। কি ব্যাপার? শরীর খারাপ?
হ্যাঁ, বলেই তাড়াতাড়ি শুধরে নিল মুসা, না।...জানি না। বুঝতে পারছি না।
হয়েছে কি তোমার? দুপা এগিয়ে এলেন আমান। জ্বর-টর নাকি?
ভীষণ ক্লান্ত লাগছে, বালিশ থেকে মাথা তুলল না মুসা। অসুস্থ হইনি। এখনও। তবে মনে হয় হব। জীবাণু ঢুকে গেছে।
মুখটাও তো কেমন সাদা সাদা লাগছে। বোটে করে ভোলা সাগরে ঘুরে এলে ঠিক হয়ে যাবে। চলো। ওঠো।
না, বাবা, আমি পারব না। তোমরা যাও। আমি শুয়ে থাকি। ঘুমিয়ে নিলেই ঠিক হয়ে যাবে।
চিন্তিত ভঙ্গিতে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত ছেলের দিকে তাকিয়ে রইলেন আমান। ঘড়ির দিকে তাকালেন। দেরি হয়ে যাচ্ছে। সত্যি যাবে না?

না। ডক্টর বেনসনকে বোলো, আমার জন্যেই দেরি হয়ে গেছে তোমাদের। তিনি কিছু মনে করবেন না।
আনমনে মাথা ঝাঁকালেন আমান। আরেকবার দ্বিধা করে বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে আবার এগোলেন দরজার দিকে। দরজার কাছে গিয়ে আবার ঘুরলেন। এখনও ভেবে দেখো। পরে কিন্তু পস্তাবে। ছিপ দিয়ে বড় মাছ ধরার সুযোগ সব সময় আসে না।
পস্তালেও কিছু করার নেই, বাবা। আমি জোর পাচ্ছি না।
মাথা ঝাঁকিয়ে কিছুটা হতাশ ভঙ্গিতেই যেন বেরিয়ে গেলেন আমান। কয়েক মিনিট পর সদর দরজা লাগানোর শব্দ কানে এল মুসার। আরও কয়েক মিনিট পর গাড়ির এঞ্জিন স্টার্ট নেয়ার শব্দ।
কিছুক্ষণ একভাবে পড়ে থাকার পর আস্তে মাথাটা সোজা করল মুসা। ভীষণ ভারী লাগছে। গতরাতের কথা মনে পড়ল। লীলার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকার সময় একটা বিচিত্র গন্ধ ঢুকেছিল নাকে। বো করে উঠেছিল মাথাটা। তারপর থেকে আর সুস্থ বোধ করেনি।
আরও মনে পড়ল, লীলা পাহাড়ের দিকে চলে গেলে সে-ও পেছন পেছন গিয়েছিল। ও কোথায় যায় দেখার জন্যে। কিন্তু কিছুদূর যাওয়ার পর এমনই মাথা ঘোরা শুরু হলো, হাটা তো দূরের কথা, দাঁড়িয়েই থাকতে পারছিল না আর। বসে পড়েছিল। তারপর আর মনে নেই। এক সময় দেখে, বালির ওপর চিত হয়ে পড়ে আছে। ওপরে খোলা আকাশ। আশেপাশে একদম নির্জন। লীলাও ছিল না। উঠে টলতে টলতে কোনমতে বাড়ি ফিরে এসেছে।
বিছানা থেকে নেমে বাথরুমে চলল। পা টলছে। পেটে মোচড় দিচ্ছে। আগের রাতের মত বেহুশ হয়ে যাবার ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়ল।
বাথরুমে ঢুকে সিঙ্কের ওপর মুখ নামাল। হড়হড় করে বেরিয়ে আসতে লাগল পেটে যা ছিল।
ওয়াক ওয়াক আর হেঁচকি দিতে দিতে পেট ব্যথা হয়ে গেল, গলা চিরে গেল। পেটে আর কিছুই অবশিষ্ট রইল না। মনে হচ্ছে নাড়ীভুড়ি সব গিট বেঁধে গেছে। বনবন করে মাথা ঘুরছে। কপালে ঠাণ্ডা ঘাম। বাথরুমের ঠাণ্ডা। মেঝেতে বসে পড়ল সে।
কয়েক মিনিট পর গিট বাঁধা অবস্থাটা সামান্য কমল। চোখের সামনে বাথরুমের দেয়াল ঘোরাও বন্ধ হয়েছে।
জিনাকে সাবধান করতে হবে। বোঝাতেই হবে ওকে কি মস্ত বিপদে পড়েছে সে। জনের কথা বলতে হবে।

হঠাৎ কি মনে হতে তাড়াতাড়ি উঠে বেসিনের আয়নার সামনে এসে দাঁড়াল। নিজের গলায় দেখল দাগ আছে কিনা।
নেই!
আহ, বাঁচল! কিন্তু তাহলে মাথা ঘুরল কেন? বেহুশ হলো কেন? মিষ্টি গন্ধটার কথা মনে পড়ল। এরকম গন্ধ ছড়িয়েই কি মানুষকে মাতাল করে ভ্যাম্পায়ার ভূত? অবশ করে দেয় শরীর? যাতে নিরাপদে রক্ত পান করতে পারে?
তারমানে সে বেঁচে গেছে কোনভাবে। হয়তো চলে যাওয়ার পর কোন কারণে আর ফিরে আসেনি লীলা। রক্ত খায়নি। তাহলে গলায় দাঁতের দাগ থাকতই।
দাঁত ব্রাশ করল সে। চোখেমুখে ঠাণ্ডা পানির ছিটে দিল। একটা বেদিং স্যুট পরে নিল তাড়াতাড়ি। হাত-পা কাঁপছে এখনও। তবে ভ্যাম্পায়ারে রক্ত খেয়ে কাহিল করে রেখে যাওয়ার ভয়টা কেটেছে।
রান্নাঘরে নেমে এল সে। রিসিভার কানে ঠেকিয়ে জিনাদের নম্বরে ফোন করল। অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। রিঙ হচ্ছে। একবার। দুবার।
রিঙ হয়েই চলেছে।
ধরল না। তারমানে কেউ বাড়ি নেই।
জিনা, প্লীজ! চিৎকার করে অনুরোধ করল সে। ধরো! কথা আছে। তোমার সঙ্গে!
কাউন্টারে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মুসা। কানে রিসিভার ঠেকানো। ওপাশে বেজেই চলেছে ফোন।
জিনা, প্লীজ!
কিন্তু কেউ ধরল না তার অনুরোধে সাড়া দিয়ে।

.

দ্রুত নাস্তা সেরে নিয়ে আবার জিদের বাড়িতে ফোন করল মুসা। জবাব পেল না। অনেকটা শক্তি ফিরে পেয়েছে শরীরে। জিনাকে শহরে খুঁজতে চলল সে।
খুব গরম একটা দিন। নব্বইয়ের ঘরে তাপমাত্রা। এই অঞ্চলের জন্যে গরমটা বেশি। শহরে আসতে আসতেই ক্লান্ত হয়ে গেল মুসা। মেইন স্ট্রীটের। আশপাশে সব জায়গায় খুঁজে কোথাও না পেয়ে সৈকতে রওনা হলো।
ওখানেও পাওয়া গেল না তাকে।
বাড়িতে ফিরে এসে সারাটা দিন কাটিয়ে দিল কাউচে শুয়ে। কয়েক মিনিট পর পরই উঠে জিনাদের বাড়িতে ফোন করল। রিঙের পর রিঙ হতে থাকল, কিন্তু কারও কোন সাড়া পাওয়া গেল না। কেউ ধরল না ফোন।
বিকেলে আবার শহরে গেল সে। জিনাকে খোঁজার জন্যে।
আই, মুসা,সী-ব্রিজ রোড ধরে যাওয়ার সময় কানে এল একটা পরিচিত
ফিরে তাকাল সে।

প্রায় দৌড়ে এল টনি। তারপর, কি খবর?
ভাল, গতি না কমিয়েই জবাব দিল মুসা।
গাছের আড়ালে নেমে যাচ্ছে সূর্য। কিন্তু গরম এখনও বেশ। বাতাসের আর্দ্রতাও বেশি। চামড়া চুলকাচ্ছে মুসার। শরীরটা লাগছে বিশ মন ওজন।
সৈকতে খুঁজে এলাম তোমাকে, মুসার সঙ্গে তাল রাখতে হিমশিম খাচ্ছে টনি। যা গরম পড়েছে, ভাবলাম ওখানেই থাকবে। এখানে আশা করিনি।
তুমিও এখানে থাকবে ভাবিনি, শুকনো গলায় মুসা বলল। আর্কেডের এয়ারকন্ডিশনের ঠাণ্ডা ফেলে সৈকতে গেলে কি বুঝে?
যেতাম না, হাসতে হাসতে বলল টনি। কি যেন খারাপ হয়ে গেছে। ওদের। মেরামত করছে।
টনি, আমার শরীরটা ভাল নেই, আগের রাতের পুরো ঘটনাটা বলল না মুসা। বেশি কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। সময় নষ্ট না করে জিনাকে খুঁজে বের করতে হবে। কি ঘোর বিপদে রয়েছে সে, বোঝানো দরকার। টনির সঙ্গে দেখা না হওয়াটাই এখন ভাল ছিল।
হ্যাঁ, তোমাকে দেখে অসুস্থই লাগছে।
কি রকম?
মুখ শুকনো। বিধ্বস্ত। আড়চোখে মুসার দিকে তাকিয়ে আড়ষ্ট হাসি হাসল, ভ্যাম্পায়ার নাকি?
দাঁড়িয়ে গেল মুসা, কি বলতে চাও?
মানে, কাল যে বললে…আবার ভ্যাম্পায়ারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল নাকি? কি যেন নাম, লীলা–তোমার রক্তও খেয়েছে নাকি?
না। এমনিতেই শরীর খারাপ। জ্বরটর হবে। ভাইরাস।
হাসিটা মুছে গেল টনির মুখ থেকে। মিথ্যে বলছ কেন, মুসা? সত্যি সত্যি বলো তো, কি হয়েছে তোমার?
জবাব না দিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করল মুসা।
পিছে পিছে চলল টনি। শেষ হয়ে এল কটেজের সারি। সামনে ঘাসে ঢাকা মাঠ, যেটার ওপাশে শহর। দিনের আলো নিভে আসছে দ্রুত। যেন হ্যারিকেনের চাবির মত চাবি ঘুরিয়ে ক্রমে কমিয়ে দেয়া হচ্ছে আলোটা। দিগন্তে নেমে যাওয়া সূর্য বেগুনী আকাশে প্রচুর লাল রঙ গুলে দিয়েছে।
রাতে কার্নিভলে যাবে? জিজ্ঞেস করল টনি। আমার কয়েকজন বন্ধু প্রথমে যাবে আর্কেডে। অন্ধকার হয়ে গেলে তখন যাবে কার্নিভলে।
দেখি, কোন আগ্রহ দেখাল না মুসা। জিনাকে চোখে পড়তে চিৎকার করে উঠল, আই, জিনা!

কয়েক গজ সামনে মাথা নিচু করে হাঁটছে জিনা। যেন কোন জিনিস খুঁজতে খুঁজতে চলেছে রাস্তায়।
জিনা! গলা আরও চড়িয়ে দিয়ে ডাকল মুসা।
মুসার মনোযোগ এখন ওর দিকে নেই বুঝে, পরে দেখা হবে বলে এগিয়ে গেল টনি। জিনার পাশ কাটানোর সময়, কেমন আছ, জিনা? বলে জবাবের অপেক্ষা না করেই হেঁটে চলে গেল।
মুসাও দৌড়ে গেল জিনার দিকে। এই, জিনা, শোনো!
থামল জিনা। মুখ তুলে তাকাল। হাসি নেই মুখে। গম্ভীর। অ। তুমি।
বড়ই শীতল আচরণ। কেয়ারও করল না মুসা। ওসব দেখার সময় নেই। এখন। জিনার সঙ্গে কথা বলতে হবে। বোঝাতে হবে কি ঘটছে।
অধৈর্য ভঙ্গিতে মুসার দিকে তাকিয়ে রইল জিনা। ম্লান আলোতেও ফ্যাকাসে লাগছে চেহারা। চোখে ক্লান্তির ছাপ। গলার দাগ দুটো দেখা যাচ্ছে।
কথা আছে তোমার সঙ্গে, হাঁপাতে হাপাতে বলল মুসা। আমি সকাল থেকেই
হাত নেড়ে মুসার কথা যেন ঝেড়ে ফেলে দিল জিনা। আমার সময় নেই। কয়েক মিনিটের মধ্যে জনের সঙ্গে দেখা করার কথা…
ওর ব্যাপারেই কথা বলতে চাই তোমার সঙ্গে, প্রায় চিৎকার করে উঠল মুসা। নিজেকে দেখেছ আয়নায়? গলার দাগ দুটো দেখেছ?
দেখো, মুসা, মুহূর্তে রাগ চড়ে গেল জিনার। আবার সেই এক প্যাচাল শুরু কোরো না, মুখ ঘুরিয়ে নিল সে।
এক মিনিট, জিনা, অনুরোধের সুরে বলল মুসা। হাত রাখল জিনার কাঁধে। মাত্র একটা মিনিট ধৈর্য ধরে আমার কথা শোনো।
দীর্ঘ একটা মুহূর্ত চিন্তা করল জিনা। বেশ, ঠিক এক মিনিট। কিন্তু ভ্যাম্পায়ারের কথা যদি বলতে চাও, শুনব না।
জিনা, আমি ভ্যাম্পায়ারের কথাই বলতে চাই, মরিয়া হয়ে বলল মুসা। নিজের কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। জন একটা ভ্যাম্পায়ার। আমি জেনে গেছি। লীলাও তাই। ওরা দুজনেই ভ্যাম্পায়ার।
গুড-বাই, মুসা, শীতল কণ্ঠে বলল জিনা। চোখ ওপরে তুলে, দুই হাত নেড়ে মুসাকে বিদেয় হতে ইঙ্গিত করল।
জিনা, শোনো! প্লীজ!
না! শুনব না! চিৎকার করে উঠল জিনা। যাও তুমি!
কাল রাতে রিকি আমাকে বলেছে…
ঝটকা দিয়ে মুসার দিকে মুখ ফেরাল জিনা, কি বললে!
কাল রাতে, রিকি আমাকে বলল…

কোথায় দেখা হলো ওর সঙ্গে!
স্বপ্নে
মুসা, তোমার চিকিৎসা হওয়া দরকার, অনেকটা মোলায়েম হয়ে গেল জিনার কণ্ঠ। সহানুভূতির সুর। রিকির জন্যে আমাদের সবারই কষ্ট...কিন্তু তোমার বেলায় বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে...তোমার মগজে কিছু ঘটে গেছে। তোমার চিকিৎসা দরকার।
না, আমার কোন কিছুর দরকার নেই, হতাশা চাপা দিতে পারল না মুসা। আমি জানি আমি ঠিক আছি, জিনা। আমার কথা শুনলে পাগলামিই মনে
হা, পাগলই হয়ে গেছ তুমি, মুসার চোখে চোখ রেখে বলল জিনা। সেটা নিজে তুমি বুঝতে পারছ না।
আমি জানি আমি পাগল হইনি! দয়া করে আমার কথা কি একটু শুনবে?
এখন পারব না। আমি এখন একটা জিনিস খুঁজছি।
কি জিনিস খুঁজছ?
মাথা নিচু করে আবার হাঁটতে শুরু করল জিনা। মনে হলো কিছু হারিয়েছে রাস্তায়। স্যান্ডেলের ঘষায় খসখস শব্দ হচ্ছে। চঞ্চল হয়ে খোঁজাখুঁজি করছে চোখ জোড়া। মুসার দিকে না তাকিয়ে জবাব দিল, একটা রূপার ক্রুশ। কাল রাতে জনের সঙ্গে বেরিয়েছিলাম। তখন কোনভাবে গলা থেকে পড়ে গেছে ওটা।
ক্রুশ! তোমার গলায় ক্রুশ! তাজ্জব হয়ে গেল মুসা। তুমি আবার ধর্ম পালন শুরু করলে কবে থেকে? গির্জায় যাও?
ধর্ম পালন না করলে কি ক্রুশ গলায় পরা যায় না? গত জন্মদিনে আমার এক নানা দিয়েছিলেন। আসলে ওটা একটা লকেট। ক্রুশের মত করে তৈরি। মাঝখানে একটা পাথর বসানো।
তোমার নানা কি পাদ্রী নাকি?
কি করে বুঝলে?
নাতনীকে ক্রুশের মত লকেট উপহার দেন যিনি, তিনি ওরকমই কিছু হবেন, এটা আন্দাজ করতে জ্যোতিষ হওয়া লাগে না। কিন্তু কাল পরতে গিয়েছিলে কেন?
মা সুটকেস থেকে জিনিসপত্র বের করছিল। ওটা দেখে হঠাৎ পরতে ইচ্ছে করল। নিয়ে নিলাম। হারিয়ে ফেলব কল্পনাই করিনি। খুঁজে এখন বের করতেই হবে। নইলে খুব কষ্ট পাবে মা। রেগে যাবে।
রূপার ক্রুশ! অন্ধকারে যেন আশার আলো দেখতে পেল মুসা। শুনেছে, ভূতেরা নাকি ক্রুশকে ভয় করে। ভ্যাম্পায়ারেরা তো যমের মত ভয় করে।
জন দেখেছে নাকি ওটা? উত্তেজিত হয়ে উঠেছে মুসা। দেখে কি করল? তোমার গলায় দেখে সরে গেল না? ফেলে দিতে বলল না? কুঁকড়ে গিয়েছিল?

জবাব দিল না জিনা।
ওর সামনে এসে দাঁড়াল মুসা। মুখ দেখে অনুমানের চেষ্টা করল, জন কি করেছিল।
এ রকম পাগলের মত করছ কেন তুমি, বলো তো? ভুরু কুঁচকে ফেলেছে জিনা।
সত্যি কথাটা শুনবে? ক্রুশটা ওকে দেখিয়েছি। ও পছন্দ করেছে।
চোখ অন্যদিকে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করেনি?
না। মোটেও ভয় পায়নি। বরং চেনের হুক একবার খুলে গিয়েছিল। সে ওটা আটকে দিতে সাহায্য করেছে আমাকে।
পরস্পরের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল দুজনে। তারপর রুক্ষকণ্ঠে জিনা বলল, এতেই প্রমাণ হয়ে গেল তোমার ধারণা ভুল।
না, কিছুই প্রমাণ হলো না, নাছোড়বান্দার মত জিনার পিছে পিছে হাঁটতে লাগল মুসা। ভিন্নভাবে জিনাকে বোঝানোর চেষ্টা চালাল, এখনও তোমার ক্লান্ত লাগে? সকালে ঘুম থেকে উঠতে কষ্ট হয়?
তোমার ওই বোকার মত প্রশ্নের কোন জবাব আর আমি দেব না, মুসার দিকে ফিরেও তাকাল না জিনা।
হাল ছাড়ল না মুসা, দিনের বেলা কখনও দেখা হয়েছে জনের সঙ্গে দেখা না করার ছুতো দেখায়নি-বলেনি দিনে জরুরী কাজ থাকে বলে আসতে পারে না? ও যেখানে কাজ করে সে-জায়গাটা চেনো? একবারও তোমার মনে হয়নি সেরাতে আমরা যখন পিজ্জা খাচ্ছিলাম, কেন সে মুখে তুলতেও রাজি হয়নি?
রাগে ঝাঁকি দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল জিনা। মুঠো হয়ে গেছে দুই হাত। মুসা, তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।
যা জিজ্ঞেস করছি, জবাব দাও, জিনা!
তুমি এখন বিদেয় হলে আমি খুশি হব।
না, বিদেয় হব না। যতক্ষণ না তুমি আমার কথা শুনছ, আমি যাব না।
মুসা, দোহাই লাগে তোমার! চিৎকার করে উঠল জিনা, যাও এখন! বিরক্ত কোরো না! আমার অসহ্য লাগছে!
গেল না মুসা। বরং জিনাকে শান্ত করার জন্যে ওর কাঁধে হাত রাখতে গেল।
ঝটকা দিয়ে সরে গেল জিনা।
জনের আগমনটা টেরই পায়নি মুসা। যখন দেখল, নিজের অজান্তেই মুখ থেকে বেরিয়ে এল, খাইছে!
জনের পরনে কালো জিনস, গায়ে লম্বা হাতাওয়ালা কালো পুলওভার। এত গরমের মধ্যে এই পোশাক পরে না সাধারণত কেউ।
কি হয়েছে? মুসার দিকে তেড়া দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে জানতে চাইল সে।

ভয়ে বুকের মধ্যে কাঁপুনি শুরু হলো মুসার। পেটে খামচি দিয়ে ধরার মত অনুভূতি। ঠাণ্ডা হয়ে আসতে লাগল হাত-পা।
না, কিছু হয়নি, জিনা বলল।
এক পা পিছিয়ে এল মুসা। দুহাত ঝুলে পড়েছে দুই পাশে। জনের চোখের জ্বলন্ত দৃষ্টি যেন, গরম লোহার চোখা শিকের মত ঢুকে যাচ্ছে তার মগজের মধ্যে।
বললাম তো কিছু হয়নি, জন যে রেগে যাচ্ছে বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি বলল জিনা। এমনি কথা বলছিলাম আমরা।
জিনার দিকে ফিরল জন। মুহূর্তে বদলে গেল মুখের ভঙ্গি। হাসল। সেই এমনি কথাটা আমাকে নিয়েই হচ্ছিল। মুসাকে আমার নাম বলতে শুনলাম।
হ্যাঁ, ভুল শোনোনি, জনের হাত ধরল জিনা। টান দিল।
পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করল দুজনে। চলে যাচ্ছে।
কিছুই করার নেই আর মুসার। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে দুজনের দিকে। জনের জ্বলন্ত দৃষ্টি যেন এখনও বিদ্ধ করছে ওকে।
চলতে চলতে একবার ফিরে তাকাল জিনা। মুসা এখনও পেছন পেছন আসছে কিনা দেখল বোধহয়। জন একটিবারের জন্যেও ফিরল না।
ঠিকই সন্দেহ করেছি আমি! নিজেকে বলল মুসা। আমার ধারণাই ঠিক! পথের মোড়ে দুজনকে হারিয়ে যেতে দেখল।
কিন্তু কি করে প্রমাণ করবে জিনার কাছে? কিশোরকে খবর দেবে? যদি ওকে না পাওয়া যায়? পাওয়া গেলেও আসতে যদি দেরি করে ফেলে? বাঁচানো যাবে না জিনাকে।
বাঁচাতে হলে তাড়াতাড়ি কিছু করা দরকার।
কি করবে? কি করে বোঝাবে ওকে?
উপায়টা বিদ্যুৎ চমকের মত ঝিলিক দিয়ে উঠল মাথার মধ্যে। হ্যাঁ, এটাই। একমাত্র পথ! নিজের চোখে দেখলে বিশ্বাস করতে বাধ্য হবে জিনা।

.

ক্যামেরা নিয়ে কোথায় যাচ্ছ? লিভিং রুম থেকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার আমান।
দরজার কাছে দাঁড়িয়ে গেল মুসা। ও, বাবা, তুমি। দেখিইনি। খাপে ভরা ক্যামেরাটা কাঁধে ঝুলিয়ে ঘরের মধ্যে এগিয়ে এল আবার। কখন এলে?
এই তো। কিসের ছবি তুলতে যাচ্ছ?
রাতে সৈকতে অনেক পাখি পড়ে, মিথ্যে কথা বলল মুসা। ভ্যাম্পায়ারের কথা বললে বাবাও হয়তো বিশ্বাস করবেন না। একশো একটা কথা বলা, লাগবে। বোঝানোর জন্যে। অত সময় নেই। দেখি, তোলা যায় নাকি?

হাতের পত্রিকাটা কোলের ওপর নামিয়ে রাখলেন আমান। পাখি? রাতের বেলা? কি পাখি? সী-গাল ছাড়া আর তো কিছু দেখেছি বলে মনে পড়ে না।
ওগুলোই তুলব। নানা রকম কাণ্ড করে রাতের বেলা। এমন ভাবে তাড়া। করে বেড়ায় একে অন্যকে
কিন্তু তার জন্যে তো মুভি ক্যামেরা দরকার। স্টিল ফটোগ্রাফে কি আর ধরা যাবে নাকি?
মুভি আর পাব কোথায় এখন। স্টিলই তুলব, বাবার সঙ্গে মিথ্যে বলতে খারাপ লাগছে মুসার। কিন্তু সত্যি বলার আপাতত কোন পথও দেখতে পাচ্ছে না। জিনাকে বিশ্বাস করাতে পারেনি, টনিকে পারেনি, বাবাকেও পারবে বলে মনে হয় না। বিশ্বাস না করে যদি মাথায় গণ্ডগোল হয়েছে ভেবে ওকে আটকে দিতে চান, জিনার মহাসর্বনাশ ঘটে যাবে। এতবড় ঝুঁকি এখন কিছুতেই নিতে পারবে না সে।
ঠিক আছে, যা পারো তোলোগে, বললেন তিনি। কিন্তু এটা ব্যবহার করার কিছু নিয়ম আছে, নইলে ছবি ভাল ওঠে না। দাঁড়াও, দেখিয়ে দিচ্ছি, পত্রিকা রেখে উঠে এলেন আমান। রাতের বেলা এটা দিয়ে ছবি তুলতে গেলে ফোকাসিঙের দিকে নজর রাখতে হয়। দেখি, দাও, ঠিক করে দিই।
কার্নিভলে যাওয়ার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে মুসা। কিন্তু বেশি তাড়াহুড়ো করলে সন্দেহ হবে বাবার। যা করতে চাইছে করুক। ধৈর্য ধরে দাঁড়িয়ে রইল
খাপ থেকে ক্যামেরাটা খুলে নিলেন আমান। কিভাবে সবচেয়ে ভাল ফোকাসিং হবে দেখিয়ে দিলেন। চোখের সামনে কোনভাবে ধরে কিভাবে শাটার টিপতে হবে তা-ও বুঝিয়ে দিলেন।
বাবাকে ধন্যবাদ দিয়ে গুড-নাইট বলে বেরিয়ে এল মুসা।
কানির্ভলে গিয়ে পুরো এক রোল ফিল জিনা আর জনের ওপর খরচ করার ইচ্ছে ওর। ও শুনেছে, ভূতের ছবি ওঠে না। প্রতিটি ছবিতেই যখন জিনা দেখবে ওর একলার ছবি আছে, আশেপাশের সব কিছুর ছবি আছে, কেবল জনের নেই, তখন মুসার কথা বিশ্বাস করতে বাধ্য হবে। জনকে ভ্যাম্পায়ার প্রমাণ করার এটাই একমাত্র পথ।
অর্ধেক দৌড়ে অর্ধেক হেঁটে কার্নিভলে এসে পৌঁছল সে। শক্তিশালী স্পটলাইটের আলোর নিচে এসে দাঁড়াল। আশপাশের সমস্ত জায়গায় জিনা আর জনকে খুঁজতে লাগল ওর চোখ। চতুর্দিক থেকে কানে আসছে চিৎকার চেঁচামেচি, হই-হট্টগোল, হাসির শব্দ। হঠাৎ মনে পড়ল লীলার কথা। ও কোথায় এখন? সৈকতে? নতুন কোন শিকারের সন্ধানে ঘোরাফেরা করছে?
লীলার কথা আপাতত মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে জিনাদের খুঁজতে লাগল সে। দুই হাতে ধরে রেখেছে ক্যামেরাটা। যেখানে যে অবস্থায় দেখবে ওদের, সেভাবেই

তুলে ফেলবে। ফেরিস হুইলটার কাছে এল। জনতার ভিড়। ভিড়ের দিকে তাকিয়ে ওদের মধ্যে খুঁজল জিনা আর জনকে। হুইলে চড়ার জন্যে চিৎকার করতে করতে ছুটে এল একদল ছেলেমেয়ে। ধাক্কা মারল মুসার গায়ে।
কাত হয়ে পড়তে পড়তে এক হাতে ক্যামেরা ধরে রেখে আরেক হাতে একটা খুঁটি আঁকড়ে পতন ঠেকাল মুসা। অল্পের জন্যে মাটিতে পড়ল না ক্যামেরাটা। বিড়বিড় করে বলল, উফ, পাগল হয়ে গেছে এক্কেবারে! ক্যামেরা এভাবে হাতে রাখার সাহস পেল না আর। যে রকম উত্তেজিত হয়ে আছে ছেলেমেয়েগুলো, কখন কি ঘটিয়ে বসে ঠিক নেই। খাপে ভরল আবার। তবে ঢাকনাটা না লাগিয়ে খোলাই রাখল।
কয়েক মিনিটের মধ্যেই পেয়ে গেল জিনা আর জনকে। ফেরিস হুইলটা থেকে একটু দূরে হাত ধরাধরি করে হাটছে।
তাড়াতাড়ি ক্যামেরা খুলে আনতে গিয়ে খাপের ফিতে হাতে পেঁচিয়ে ফেলল মুসা। উত্তেজনায় কাঁপছে। পাশ থেকে খাপটা চলে এল পেটের ওপর। গলার ফিতেতে টান লাগল। কোনমতে বের করে আনল ক্যামেরাটা।
সবে শাটারে টিপ দিচ্ছে, ক্যামেরার চোখ আটকে দিয়ে সামনে চলে এল একটা মেয়ে। শেষ মুহূর্তে মুসার দিকে তাকিয়ে সরি বলল। দেরি হয়ে গেছে ততক্ষণে। শাটার টিপে ফেলেছে মুসা। প্রথম ছবিটা নষ্ট হলো।
দ্বিতীয়বার সুযোগ নেয়ার আগেই কয়েক গজ দূরে সরে গেল জিনারা। একটা রিফ্রেশমেন্ট বুদের কাছে গিয়ে সুযোগ মিলল আবার। কয়েক ফুটের মধ্যে চলে এল মুসা। ক্যামেরা তুলে শাটার টিপল। তারপর টিপেই চলল, একের পর এক।
ফোকাস ঠিক করে আরও কাছে থেকে তোলার জন্যে এগিয়ে এল সে। আলো ঠিক আছে নাকি দেখল। তারপর আবার জিনা আর জনকে ফ্রেমে আটকে শাটার টিপতে লাগল।
মুখ তুলল জিনা।
ঝট করে বুদের আড়ালে সরে গিয়ে মাথা নিচু করে ফেলল মুসা।
দেখে ফেলল নাকি?
আস্তে করে মাথাটা আবার বাড়িয়ে দিয়ে দেয়ালের ওপরে তুলে সাবধানে। উঁকি দিল।
না, দেখেনি। জনের দিকে ফিরেছে আবার জিনা। কথা বলছে।
আরও সতর্ক হয়ে গেল মুসা। কোনমতেই জনের চোখে পড়া চলবে না। জন দেখলে সঙ্গে সঙ্গে বুঝে যাবে মুসার উদ্দেশ্য। তারপর কি যে ঘটাবে। খোদাই জানে! ভ্যাম্পায়ারদের ভয়াবহ ক্ষমতার কথা কল্পনা করে এত লোকজন আর আলোর মধ্যেও গায়ে কাঁটা দিল ওর।

দুজনের পেছনে লেগেই রইল সে। ছবি যা তোলা হয়েছে, তাতেই কাজ হয়ে যাবে, তবু আরও ভাল ছবি তোলার অপেক্ষায় রইল সে। পিছে পিছে ঘুরতে লাগল ওদের।
ফেরিস হুইলে চড়ল দুজনে। মেটাল কারে পাশাপাশি বসল, খুব কাছাকাছি, গা ঘেঁষাঘেঁষি করে।
জুম লেন্স অ্যাডজাস্ট করে ক্যামেরার চোখ দুজনের দিকে তুলে শাটার টিপে দিল মুসা।
নিশ্চয় ছবিটা ভাল উঠেছে। কিন্তু থামল না মুসা। পুরো একটা রোলই শেষ করবে। কোন খুঁত রাখতে চায় না। বেশি ছবি হলে জিনাকে বিশ্বাস। করানো সহজ হবে।
ফেরিস হুইল থেকে নামার পরও ওদের পিছে লেগে রইল সে। গেম বুদগুলোর পাশ দিয়ে হাঁটছে দুজনে। চওড়া গলিপথের অন্যপাশে বুদের আড়ালে থেকে ওদের অনুসরণ করে চলল সে। সুযোগ পেলেই ক্যামেরা তুলে শাটার টেপে।
ফিল্মে অল্প কয়েকটা শট বাকি থাকতে গলি থেকে বেরিয়ে এল।
ভিড়ের মধ্যে ঢুকতে গিয়ে হঠাৎ ফিরে তাকাল জিনা। মুসাকে দেখে ফেলল। না চেনার ভান করল। জনের একটা হাত তুলে নিয়ে চোখ ফেরাল অন্য দিকে।
জিনা কিছু বলল না দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মুসা। বলল না বলেই জনের চোখে পড়ল না।
বেশিক্ষণ আর থাকবে না দুজনের এই খাতির। জন ভ্যাম্পায়ার-এটা বোঝার পর কি প্রতিক্রিয়া হবে জিনার, কি করবে, কল্পনায় দৃশ্যটা দেখে মুচকি হাসি ফুটল ওর ঠোঁটে।
আর ওদের অলক্ষে ছবি তোলা যাবে না। দরকারও নেই। অনেক তুলেছে। ক্যামেরাটা খাপে ভরল মুসা।
আসল কাজ হয়ে গেছে। এখন যত তাড়াতাড়ি পারা যায় ছবিগুলো ডেভেলপ করতে হবে। জিনাকে দেখাতে হবে।
খাপটা পেটের সঙ্গে চেপে ধরে দৌড় দিল সে। না ধরলে বাড়ি লাগে। কার্নিভলের মাঠ থেকে বেরিয়ে আসতে যাচ্ছে, এই সময় ওর নাম ধরে ডাকল কে যেন। টনিই হবে।
কিন্তু থামল না মুসা। ফিরেও তাকাল না।
সারি সারি গাড়ির ফাঁক-ফোকর দিয়ে পার্কিং লটটা প্রায় দৌড়ে পেরোল সে। মেইন রোডে বেরিয়ে ছোটার গতি বাড়িয়ে দিল। ফিল্ম ডেভেলপ করার দোকানটা রয়েছে এক ব্লক দূরে, ডিউন লেনের মোড়ে। বড় বড় হরফে বিজ্ঞাপন করে রেখেছে ওরা: এক ঘণ্টার মধ্যে ছবি দিয়ে দেয়া হয়।

ছবি পেতে এক ঘণ্টা! তারপর আর বড় জোর এক ঘণ্টা। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই জিনাকে বোঝাতে সক্ষম হবে সে, জন একটা ভ্যাম্পায়ার।
মেইন রোড পেরিয়ে অন্যপাশের ফুটপাথে উঠল মুসা। উত্তেজনায় ধাক্কা। মেরে বসতে লাগল এর ওর গায়ে। পরোয়াই করল না। কনুইয়ের গুতোয়। ভিড় সরিয়ে পথ করে নিয়ে ছুটে চলল। একটাই লক্ষ্য–ক্যামেরার দোকান।
মাঝবয়েসী এক লোক কোন্ আইসক্রীম খাচ্ছিল। মুসার ধাক্কা লেগে হাত থেকে পড়ে গেল আইসক্রীম। ছুটতে ছুটতেই সরি বলল মুসা। লোকটার জবাব শোনার অপেক্ষা করল না। ক্যাঙারুর মত লাফাতে লাফাতে চলেছে ডিউন লেনের দিকে। কাছাকাছি পৌঁছে আবার রাস্তা পেরোতে হবে। ট্র্যাফিক লাইটের দিকে তাকাল না। দিল দৌড়। সামনে পড়ল নীল রঙের একটা স্টেশন ওয়াগন। ঘ্যাচ করে ব্রেক কষল ড্রাইভার। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে কি যেন বলল।
ফিরেও তাকাল না মুসা।
ওর কানে বাজছে কেবল এক ঘণ্টা। এক ঘণ্টার মধ্যে হাতে এসে যাবে ছবিগুলো। জন যে ভ্যাম্পায়ার, তার জোরাল প্রমাণ।
দোকানটার সামনে এসে দাঁড়াল সে। কোনদিকে না তাকিয়ে দরজার নব চেপে ধরে টান দিল।
কিছুই ঘটল না। নব ঘুরল না। দরজাও খুলল না।
বন্ধ হয়ে গেছে দোকান। অন্ধকার। বুঝতে কয়েক সেকেন্ড সময় লাগল তার।
পরদিন সকাল আটটায় ঘড়ির অ্যালার্মের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল মুসার। ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম কথাটাই মনে পড়ল–ফিল্ম।
ডেভেলপ করতে হবে। জিনাকে দেখাতে হবে। ভ্যাম্পায়ারের বিরুদ্ধে প্রমাণ।
জিনাকে বাঁচাতে হবে।
কাপড় পরে, ঢকঢক করে এক গ্লাস কমলার রস খেয়ে, বাবা-মা ঘুম থেকে ওঠার আগেই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল সে। দৌড়ে চলল শহরের দিকে। একটা হাত প্যান্টের পকেটে ঢোকানো। শক্ত করে ধরে রেখেছে ফিল্ম ভরা প্লাস্টিকের কৌটাটা।
রাতের বেলা কোন এক সময় সাগর থেকে ভেসে এসেছে কুয়াশা। ছড়িয়ে পড়েছে ডাঙার ওপর। তার মধ্যে দিয়ে ছুটছে মুসা। শহরের কিনারে যখন পৌঁছল, সামান্য হালকা হলো কুয়াশা। কিছু কিছু জায়গা থেকে সরেও গেল। তবে আকাশে মেঘ, আছে। ধূসর, থমথমে হয়ে আছে। বাতাস ঠাণ্ডা। বাড়িঘরগুলোর ফাঁকে ফাঁকে কুয়াশা যেন আটকে রয়েছে।
মেইন রোডে উঠল সে। এত সকালে লোকজন নেই। স্যান্ডি হোলোর অন্যান্য দোকানপাটের মতই ছবি ডেভেলপের দোকানটাও দশটার আগে খোলে না।

কি আর করবে। সময় কাটানোর জন্যে নির্জন রাস্তার এমাথা ওমাথায় পায়চারি শুরু করল সে। হাতটা এখনও পকেটে। আঙুলগুলো ধরে রেখেছে। কৌটাটা। যেন ছাড়লেই পকেট থেকে পড়ে গিয়ে হারিয়ে যাবে মূল্যবান সূত্রগুলো।
হাঁটার সময় দুএকজন মানুষ দেখা গেল। প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছে। উদ্ভ্রান্তের মত ওকে রাস্তায় হেঁটে বেড়াতে দেখে কৌতূহলী চোখে তাকাতে লাগল ওরা। ফিরেও তাকাল না সে। অন্য কোন দোকানের দিকে সামান্যতম আগ্রহ নেই। হাটছে আর কয়েক মিনিট পর পরই হাত চোখের সামনে তুলে এনে ঘড়ি দেখছে, দশটা বাজতে আর কত দেরি।
পায়চারি করার সময় বাড়িঘরের বেশি কাছে গেল না, বিশেষ করে বিল্ডিঙের মাঝে মাঝে যেখানে কুয়াশা জমে রয়েছে। ভয় পাচ্ছে আবছা অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে ওর দামী সূত্রগুলো কেড়ে নেবে জন। যদিও জানে, ভয়টা একেবারেই অমূলক। বোকার মত ভাবনা। দিনের বেলা কোন কারণেই বেরোয় না ভ্যাম্পায়ার। বেরোতে পারে না। ওদের সে-ক্ষমতাই নেই।
কয়েক যুগ পেরিয়ে গেছে যখন মনে হলো মুসার, ঘড়িতে দেখে তখনও মাত্র সাড়ে নটা। একটা দুটো করে খাবারের দোকান খুলতে আরম্ভ করেছে। অন্যান্য দোকানের চেয়ে খাবারের দোকানগুলো আগে খোলে। সী-ব্রিজ কফি শপের কাউন্টারের সামনে একটা টুলে এসে বসল সে। হালকা খাবার আর। কফির অর্ডার দিল। পেট ভরানোর চেয়ে খাবার খেয়ে সময় কাটানোর দিকেই বেশি নজর তার। কেকের টুকরোটা চিবাতে গিয়ে করাতে কাটা কাঠের গুঁড়োর মত লাগল। কফিটা আরও বিস্বাদ। মগের কানায় কানায় পূর্ণ করে দিল দুধ দিয়ে। কয়েক চামচ চিনি মেশাল। তারপরেও কোন স্বাদ পেল না। উত্তেজনায় জিভই নষ্ট হয়ে আছে, ভাবল সে। নইলে এত বিস্বাদ লাগতে পারে না কোন খাবার।
কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে আর বার বার চোখ যাচ্ছে কাউন্টারের পেছনে দেয়াল ঘড়িটার দিকে। অনড় হয়ে আছে যেন কাঁটাগুলো।
দশটা বাজার পাঁচ মিনিট আগে ছবি ডেভেলপের দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল সে। দোকানের তরুণ ম্যানেজার তখন তালা খুলছে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মুসা। তাকিয়ে থেকে ওর দোকান খোলা দেখতে দেখতে মনে মনে তাগাদা দিতে লাগল আরও তাড়াতাড়ি করার জন্যে। লোকটার লাল চুল। শজারুর কাটার মত খাড়া। এক কানে পান্না বসানো একটা মাকড়ি।
দরজা খুলে লোকটা ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ঢুকে পড়ল মুসা।
ভুরু কুঁচকে অবাক চোখে মুসাকে দেখতে দেখতে ম্যানেজার বলল, গুড মর্নিং। খুব তাড়া নাকি তোমার?

পকেট থেকে কৌটাটা বের করে পুরু কাচ লাগানো কাউন্টারে রাখল মুসা। অতিরিক্ত তাড়া। এগুলো করে দিন।
কিন্তু ম্যানেজারের মধ্যে কোন তাড়া দেখা গেল না। পেপার ব্যাগ থেকে কফির একটা পাত্র বের করে ধীরে সুস্থে প্লাস্টিকের ঢাকনা খুলল। মুসার দিকে তাকাল। মেশিন খুলে রান করতে কিছুটা সময় লাগবে, হাই তুলতে লাগল
এক ঘণ্টার মধ্যে পাব না? জানতে চাইল মুসা।
মাথা নাড়ল লোকটা, দেড় ঘণ্টা পর এসো, সাড়ে এগারোটার দিকে। খাতা খুলে মুসার নাম-ঠিকানা আর টেলিফোন নম্বর লিখতে শুরু করল সে। এক সেটই করাবে? এ হপ্তায় স্পেশ্যাল বোনাসের ব্যবস্থা করেছি আমার। এর পর যত সেটই নাও, অর্ধেক দামে করে দেব।
থ্যাংক ইউ, লাগবে না, মুসা বলল। এক সেটই যথেষ্ট। সাড়ে এগারোটায় আসব, না? হবে তো?
মাথা ঝাঁকাল ম্যানেজার। নিশ্চয় খুব সাংঘাতিক জিনিস তুলে এনেছ, মুসার দিকে ঝুঁকে চোখ টিপল সে। দাম পাওয়া যাবে, এমন কিছু? আমার নিজের জন্যেও এক সেট করে রাখতাম তাহলে। ভয় নেই, বিনে পয়সায় রাখব না, কমিশন পাবে।
রাখলে রাখুনগে। কোন লাভ হবে না আপনার। আমাকেও পয়সা দেয়া লাগবে না। দয়া করে আমার ছবিগুলো আমাকে সময়মত দিয়ে দিলেই আমি খুশি।
আবার মেইন স্ট্রীটে ফিরে এল মুসা। জিনাকে ফোন করা দরকার। জিজ্ঞেস করে জেনে নিতে হবে সাড়ে এগারোটায় সে, কি করছে।
পে ফোনের দিকে এগোতে গিয়েও দাঁড়িয়ে গেল। না, আগে থেকে কিছু বলে লাভ নেই। প্রমাণগুলো সব হাতে নিয়ে গিয়ে হাজির হবে। মুখ বন্ধ করে দেবে ওর। যাতে কোন তর্ক আর করতে না পারে।
তা ছাড়া, এখন ফোনে ওর সঙ্গে জিনা কথা বলবে কিনা, তাতেও যথেষ্ট সন্দেহ আছে।
আরও দেড়টি ঘণ্টা রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করে বেড়ানো বড় কঠিন। সৈকতে রওনা হলো মুসা। কুয়াশা এখনও আছে। ধূসর রঙের ভারী মেঘ জমেছে আকাশে। ঝুলে রয়েছে সাগরের ওপর। সূর্য ঢেকে অন্ধকার করে দিয়েছে। সৈকত থেকে তাড়ানোর ব্যবস্থা করেছে সানবেদারদের।
বালিয়াড়ির ধার ধরে কিছুক্ষণ হাঁটল সে। সময়টাকে দ্রুত পার করার জন্যে।
এগারোটা বিশে ফিরে এল ডেভেলপিং স্টোরে। মাপ চাওয়ার ভঙ্গিতে হেসে স্বাগত জানাল ওকে ম্যানেজার, সরি!

কি হয়েছে? বুঝতে পারল না মুসা। বেশি তাড়াতাড়ি চলে এসেছিঃ প্রিন্ট রেডি হয়নি?
না, হয়নি, লাল চুলের মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে জোরে জোরে চুলকাতে লাগল ম্যানেজার।
আরও সময় লাগবে? তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল মুসার কণ্ঠ। ঢিবঢিব বাড়ি মারতে আরম্ভ করেছে হৃৎপিণ্ডটা।
আমার কিছু করার ছিল না, হাত উল্টে হতাশ ভঙ্গি করল লোকটা। মেশিন নষ্ট হয়ে গেছে। গীয়ার। নিউটনস কোভে আমাদের অন্য দোকানে ফোন করে দিয়েছি নতুন পার্টস দিয়ে যাওয়ার জন্যে।
কখন পাবেন?
কাঁধ নাচিয়ে হতাশ ভঙ্গি করল ম্যানেজার, সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা পর্যন্ত দোকান খোলা আছে। আধা ঘণ্টা আগেই এসো। পেয়ে যাবে। পাশে রাখা একটা স্থানীয় খবরের কাগজ তুলে নিয়ে হেডলাইন পড়তে শুরু করল সে। মুসা দাঁড়িয়েই আছে দেখে মুখ তুলে বলল, ঠিক সাতটায় চলে এসো। চিন্তা নেই। হয়ে যাবে।

.

কোনমতে দিনটা পার করে দিল মুসা। সারাদিনে একবারের জন্যেও সূর্যের মুখ দেখা যায়নি। বিকেলে সামান্য পরিষ্কার হলো আকাশ। সাদাটে উজ্জ্বল আভা ছড়িয়ে পড়ল পশ্চিম আকাশে। কিন্তু বাতাস সেই আগের মতই কনকনে।
দুপুরের পর কিছুক্ষণ ঘুমানোর চেষ্টা করেছিল সে। তন্দ্রামত এসেছিল। সেই সামান্য সময়েও দুঃস্বপ্ন দেখল। লীলা এসে রক্ত খাওয়ার চেষ্টা করল তার।
চমকে জেগে উঠল সে।
ঘুমের মধ্যেও ধস্তাধস্তি করেছে। কিছুতেই রক্ত খেতে দেয়নি লীলাকে।
দিনের চেয়ে বিকেলের আলো খুব একটা কমল না। অতি সামান্য। কালচে ধূসর মন খারাপ করে দেয়া আলো। কোন কিছুই ভাল লাগে না।
মুসারও লাগল না। বিছানা থেকে নেমে ভাল করে চোখে মুখে পানি দিয়ে এল। পরিষ্কার একটা শার্ট পরল। কেন করল এ সব জানে না। বোধহয় মন। ভাল করার জন্যে। মানিব্যাগে দেখে নিল টাকা আছে কিনা, ছবির বিল দিতে পারবে কিনা। টাকা না পেলে আবার ছবিগুলো আটকে দিতে পারে ম্যানেজার।
বেকার একটা দিন গেল। মেজাজই খারাপ হয়ে গেল ছবির দোকানের লোকটার ওপর। আরও খারাপ হবে ছবিগুলো যে ভাবে চাইছে সে, সেভাবে না এলে। ছবিতে জনের ছবি না উঠলেই কেবল জিনাকে বোঝাতে পারবে তার সঙ্গে আর মেলামেশা না করার জন্যে।
সাতটা বাজার কয়েক মিনিট আগে দোকানে ঢুকল মুসা।

হাসিমুখে কাউন্টারের সামনে এসে দাঁড়াল ম্যানেজার। এই যে, এসে পড়েছ।
কোন ভূমিকার মধ্যে গেল না মুসা। হয়েছে?
মাথা ঝাঁকিয়ে ড্রয়ার থেকে একটা পেটমোটা খাম বের করে ধড়াস করে টেবিলে ফেলল ম্যানেজার। খামের মুখটা পাতলা টেপ দিয়ে আটকানো। সাংঘাতিক ক্যামেরা। স্পষ্ট ছবি। এত দামী জিনিস পেলে কোথায়?
অহেতুক কথা বলার মেজাজ নেই মুসার। আমার বাবার। বিল কত হয়েছে?
কয়েক সেকেন্ড পর খামটা প্যান্টের পেছনের পকেটে নিয়ে ঝড়ের গতিতে দোকান থেকে বেরিয়ে এল সে। কোনদিকে না তাকিয়ে সোজা আর্কেডে ছুটল জিনাকে ফোন করার জন্যে।
সাতটা বেজে কয়েক মিনিট। ভারী মেঘ থাকায় আকাশ অস্বাভাবিক অন্ধকার। জন নিশ্চয় কফিন ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে, এতক্ষণে। ওর আগেই জিনার সঙ্গে দেখাটা করতে হবে তার। নইলে আজ রাতেও জিনাকে বের করে নিয়ে যাবে জন। তারপর হয়তো দেখা যাবে জিনার লাশও রিকির মত সাগরের পানিতে ভাসছে।
পে ফোন থেকে জিনার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করল মুসা। বার বার চেষ্টা করেও লাইন পেল না। জবাব দিল না কেউ।
জিনাদের বাড়িতে লোক নেই। জিনা কোথায়? শহরে এসেছে? এলে কোন্ কোন্ জায়গায় যেতে পারে ভাবল। খুঁজতে চলল তাকে। প্রথমে এল শহরের দক্ষিণ প্রান্তে মুভি থিয়েটারটায়। শো দেখার জন্যে লাইন দিয়ে থাকা মানুষগুলোর চেহারার দিকে তাকাতে লাগল। জিনা নেই এখানে। ডিউন লেন পার হয়ে প্রিন্সেসে এল এরপর। আইসক্রীম পারলার কিংবা আর্কেডের কোনখানেও নেই জিনা।
কোথায় গেল?
দোকানগুলোর ধার দিয়ে রাস্তার শেষ মাথার দিকে হেঁটে চলল মুসা। প্রতিটি রেস্টুরেন্ট, কাপড়ের দোকানে, কসমেটিক্সের দোকানে উঁকি দিল। জোড়ায় জোড়ায় হাঁটছে যে সব ছেলেমেয়ে, সবার কাছাকাছি এসে চেহারার দিকে তাকাল। কিন্তু নেই।
জিনা, কোথায় তুমি?
প্রায় একঘণ্টা ধরে শহরের দোকানপাট, অলিগলি, সবখানে চষে বেড়াল মুসা। ঘড়ি দেখল। আটটা পনেরো।
পকেটে হাত দিয়ে খামটার অস্তিত্ব অনুভব করল একবার। আছে। সৈকতে রওনা হলো সে।

সী-ব্রিজ রোড ধরে প্রায় ছুটতে ছুটতে চলল। গালে লাগছে সাগরের বাতাস। উত্তেজনায় টান টান হয়ে গেছে স্নায়ু, শক্ত করে দিয়েছে শরীরের পেশিকে। থেকে থেকে পেটে খামচি ধরা একটা অনুভূতি তৈরি হচ্ছে। ঠাণ্ডা ঘামের ধারা বইছে গাল বেয়ে। কয়েক মন ওজন লাগছে পা দুটোকে।
লাগুক। জিনাকে খুঁজে বের না করে থামবে না। কি রকম বিপদে রয়েছে। সে, বোঝাতেই হবে। কিশোর হলে যা করত। ওকে বিপদ থেকে মুক্ত না করা পর্যন্ত নিরস্ত হত না কিশোর। মুসাও হবে না।
মেঘে ঢাকা গোধূলির ঘনায়মান অন্ধকারে সৈকতের বালির রঙ হয়ে উঠেছে নীলচে রূপালী। ঢেউয়ের উচ্চতা নেই বললেই চলে। আলতো করে এসে ছুঁয়ে যাচ্ছে সৈকতের কিনারা। ডুবন্ত সূর্যকে দেখা যাচ্ছে না মেঘের আড়ালে থাকায়, তবে কালচে লাল করে তুলেছে পশ্চিমের মেঘপুঞ্জকে। সেই আলোর রেশ এসে লেগেছে সাগরের পানিতে। কিনারটা লালচে। গভীর যেখানে, সেখানকার রঙ সবুজ। তাতে কালো রঙ মেশানো। দূর থেকে সাগরের উল্টোদিকে বনের গাছগাছালির মাথাকেও একই রঙের লাগছে।
জিনা, দোহাই তোমার, দেখা দাও! কোথায় তুমি?
সৈকতে এখন অনেক লোক। সারাদিন যারা ঘরে বসে ছিল, তারাও বেরিয়েছে। সন্ধ্যাটা উপভোগ করার জন্যে।
বালিয়াড়ির ধার ঘেঁষে দৌড়াচ্ছে মুসা। এগিয়ে চলেছে পানির দিকে। হঠাৎ করেই উধাও হয়ে গেল সূর্য। ডুবতে দেখা গেল না। মেঘের বুকে লাল রঙ মুছে যাওয়া দেখে অনুমান করা গেল ডুবেছে। মুহূর্তে শীতল হয়ে গেল বাতাস। ঝপ করে নামল অন্ধকার।
দুইবার অন্য মেয়েকে জিনা বলে ভুল করল সে। দুটো মেয়েরই চুল জিনার মত। দৌড়ে কাছে গিয়ে দেখে ভুল ভাঙল। ওর দিকে কৌতূহলী- চোখে তাকাল মেয়েগুলো। মুচকি হাসল। বোকা ভেবেছে নিশ্চয়।
ভাবুকগে। মাথা ঘামাল না মুসা। জিনাকে খোঁজা চালিয়ে গেল।
দূর থেকে চোখে পড়ছে নৌকার ডকটা। সেদিকেই চলেছে সে, পাথরের পাহাড়ের একটা ধার যেখানে পানিকে ঠেলে সরিয়ে নেমে গেছে সাগরে, যার কাছে পাওয়া গিয়েছিল রিকির লাশ। দিনের আলো না থাকলেও সৈকতে এক ধরনের আলোর আভা থাকে প্রায় সব সময়। চোখে সয়ে এলে সেই আলোতে মোটামুটি অনেক কিছুই দেখা যায়। ডকের পানিতে তিনটে নৌকাকে ঢেউয়ে ডুবতে ভাসতে দেখা যাচ্ছে অস্পষ্টভাবে।
কয়েকজন মানুষ দেখা গেল তীরে। জিনা আছে বলে মনে হলো না। আর এগিয়ে লাভ নেই। ফেরা দরকার।

শহরেও নেই, সৈকতেও নেই। কোথায় গেল জিনা?
জোরে জোরে হাপাচ্ছে মুসা। নুড়ি মাড়িয়ে যাওয়ার সময় জোরাল মচমচ শব্দ তুলছে তার জুতো। সেই শব্দের জন্যেই প্রথমবার ডাকটা কানে এল না তার। দ্বিতীয়বারেও না। তৃতীয়বারে শুনতে পেল, মুসা! আই, মুসা!
লীলা!
থেমে গেল মুসা। হাপরের মত ওঠানামা করছে বুক। শিসের শব্দ বেরোচ্ছে নাকের ফুটো দিয়ে। জিরানোর জন্যে বালিতে বসে পড়ে দম নিতে লাগল জোরে জোরে।
মুসা, আমাকে খুঁজছ?
দৌড়ে আসছে লীলা। বাতাসে উড়ছে চুল। চাঁদের আলো পড়ে ঝিক করে উঠছে চোখের মণি। মড়ার মত ফ্যাকাসে গায়ের চামড়া।
কাছে এসে ঠোঁট ছড়িয়ে হাসল লীলা। আবার করল একই প্রশ্ন, মুসা, আমাকে খুঁজছ? এসে পড়েছি।
এতই মোলায়েম কণ্ঠস্বর, মনে হলো বাতাসের সঙ্গে কানাকানি করে কথা বলছে লীলা, মধুর ঝঙ্কার তুলে। কাল দেখা করোনি কেন?
হাঁটু গেড়ে মুসার পাশে বসে পড়ল সে। চোখে চোখ পড়ল। সম্মোহনী দৃষ্টি। মোলায়েম কণ্ঠে আবার জিজ্ঞেস করল লীলা, কাল দেখা করোনি কেন? কোথায় ছিলে? তোমার জন্যে মন খারাপ লেগেছে।
জবাব দিল না মুসা। মন খারাপ, না শরীর খারাপ? মনে মনে বলল সে। আমার রক্তে খিদে মেটাতে পারোনি বলে! পিশাচী কোথাকার!
আরও কাছ ঘেঁষে এল লীলা। চোখ দুটো স্থির মুসার গলার ওপর। কোন্‌দিকে তাকিয়ে আছে সে বুঝতে অসুবিধে হলো না মুসার। ওর গলার শিরাটার দিকে। শিউরে উঠল।
আবার মুসার চোখের দিকে নজর ফেরাল লীলা। সম্মোহনের চেষ্টা করতে লাগল।
কিন্তু সতর্ক রয়েছে মুসা। আজ আর কোনমতেই ওর সম্মোহনের ফাঁদে ধরা দিল না। তাকে সাহায্য করল আরেকটা জিনিস। লীলার চোখ থেকে চোখ সরাতেই তার কাঁধের ওপর দিয়ে দেখা গেল ডকটা। একটা নৌকায় উঠেছে। একজন লোক। হাত ধরে আরেকজনকে উঠতে সাহায্য করছে। ঢেউয়ে নৌকাটা দুলতে থাকায়ই বোধহয় যাকে তুলছে তার উঠতে অসুবিধে হচ্ছে।
জিনা!
ছোট্ট নৌকাটায় জিনাকে তুলে নিচ্ছে জন।
না! নিজের অজান্তেই মুসার মুখ থেকে বেরিয়ে এল চিৎকার।

ওর দুই কাঁধ চেপে ধরল লীলা। মিষ্টি গন্ধ মুসার নাকে ঢুকতে আরম্ভ করল। দম আটকে ফেলল মুসা। সুগন্ধী মেশানো কোন ধরনের ওষুধ শুকিয়ে শিকারকে অবশ করে দেয় এখানকার ভ্যাম্পায়াররা, কিংবা ঘুম পাড়িয়ে ফেলে নিরাপদে রক্ত খাওয়ার জন্যে, এটা এখন বুঝে গেছে সে।

নৌকার দিকে তাকিয়ে আছে মুসা। জিনা নৌকায় উঠে পড়েছে। দাঁড় তুলে নিয়েছে জন।

না! আবার চিৎকার করে উঠল মুসা।

লীলা ভাবল তাকেই বাধা দিচ্ছে মুসা। কাঁধে হাতের চাপ বাড়িয়ে মুসাকে আরও কাছে টানতে শুরু করল।

এত কাছে থেকে ওষুধের প্রভাব পুরোপুরি কাটাতে পারল না মুসা। বো করে উঠল মাথার ভেতর। লীলার হাতের কাছ থেকে যতটা সম্ভব দূরে সরিয়ে নিল নাকটা। ওর কাঁধের ওপর দিয়ে দেখছে নৌকাটা তীর থেকে আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে।

সত্যি বলছি, মুসা, কাল তোমার জন্যে ভীষণ মন খারাপ লেগেছে আমার, কানের কাছে প্রায় ফিসফিস করে বলল লীলা। কানের লতি ছুঁলো ঠোঁট।

ওর উদ্দেশ্য বুঝতে পারছে মুসা। মুখটা নামিয়ে নিতে চাইছে গলার শিরায়।

একবার দাঁত ছোঁয়াতে পারলে আর রক্ষা নেই। কুটুস করে ফুটিয়ে দেবে। রক্ত শুষে নিতে শুরু করবে।

মিষ্টি গন্ধ অবশ করে আনতে শুরু করেছে মুসার অনুভূতি।

অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে নৌকাটা। ছোট্ট দ্বীপটার দিকে চলেছে। যেটাতে লক্ষ বাদুড়ের বাস। যেটাতে ভ্যাম্পায়ারের বাস।

চলে যাচ্ছে জিনা। নিয়ে যাচ্ছে ওকে জন। দূরে। বহুদূরে। চিরকালের। জন্যে।

কিছু করতে না পারলে মুসা নিজেও হারিয়ে যাবে চিরকালের জন্যে! এদিকেও ভ্যাম্পায়ার, ওদিকেও। মনে মনে আল্লাহকে ডাকতে আরম্ভ করল। মুসা। বাঁচতে চাইলে এখনই কিছু করা দরকার। নইলে শেষ করে দেবে ওকে লীলা।

ধাক্কা দিয়ে লীলাকে সরিয়ে দিল সে। ফাঁক হয়ে গেছে লীলার ঠোঁট। শ্বদন্ত দুটো চিকচিক করছে চাঁদের আলোয়। ধকধক করে জ্বলছে দুই চোখ। তাতে রাজ্যের লালসা।

অবাক লীলাকে আরেক ধাক্কায় বালিতে ফেলে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল মুসা।

মুসা, শোনো! দাঁড়াও! মুসা!

কিন্তু ততক্ষণে ডকের দিকে দৌড় দিয়েছে মুসা। সরে যাচ্ছে লীলায় সম্মোহনী দৃষ্টির মায়াজাল থেকে, মারাত্মক সুগন্ধীর কাছ থেকে দূরে। বালিতে, নুড়িতে পিছলে যেতে লাগল জুতো। মচমচ শব্দ। যতই দৌড়াল কেটে যেতে লাগল মাথার

ঘোলাটে ভাবটা। দেখতে পাচ্ছে বোট হাউসের কাছে বাধা নৌকা দুটো দোল খাচ্ছে ঢেউয়ে।

পেছনের পকেট থেকে খামটা পড়ে গেল বালিতে। ফিরেও তাকাল না মুসা। তোলার চেষ্টা করল না। ওগুলো এখন অর্থহীন। একাকী জিনার দেখা পাবেও না আর, ছবি দেখিয়ে তাকে বোঝানোরও সময় নেই। ভ্যাম্পায়ারে ধরে নিয়ে যাচ্ছে ওকে, ওদের ভয়ঙ্কর আস্তানায়। ঠেকানো দরকার।

ডকের কাছে আসার আগে গতি কমাল না মুসা। মুখের কাছে হাত জড় করে চেঁচিয়ে ডাকল জিনা! জিনা! বলে।

তার ডাকে সাড়া দিল না জিনা। ফিরে তাকাল না।

সরে যাচ্ছে নৌকাটা। সাগরের পানিতে পড়া চাঁদের ঝিলমিলে ভূতুড়ে আলোতে এগিয়ে যাচ্ছে অন্ধকার দ্বীপটার দিকে। অস্পষ্ট হয়ে আসছে ক্রমে।

বনে ঢাকা দ্বীপ। বাদুড়ে বোঝাই দ্বীপ। ভ্যাম্পায়ারের দ্বীপ।

ওহ, খোদা! ককিয়ে উঠল মুসা। বড়ড় দেরি করে ফেললাম! অনেক দেরি!

সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল লীলার ওপর। ওকে দেরি করিয়ে দেয়ার জন্যে সে-ই দায়ী।

প্রচণ্ড রাগে ভয়ডর সব গায়েব হয়ে গেছে মুসার। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, তোমার ব্যবস্থা পরে করব আমি, শয়তানী! আগে ওই বদমাশটার একটা ব্যবস্থা করি!

.

একটা নৌকার বাঁধন খুলতে কয়েক সেকেন্ডের বেশি লাগল না মুসার। দ্রুতহাতে গিট খুলে দড়িটা ছেড়ে দিয়ে লাফিয়ে নামল নৌকায়। দাঁড় তুলে নিল।

সময় বয়ে যাচ্ছে। মহামূল্যবান সেকেন্ডগুলোর টিক-টিক টিক-টিক শব্দটাও যেন শুনতে পাচ্ছে সে।..

লীলার ডাক কানে এল। তীরে দাঁড়িয়ে ডাকছে ওকে লীলা। ফিরে যেতে অনুরোধ করছে। ফিরে তাকিয়ে মুসা দেখল, বালির ওপর দিয়ে বোট হাউসের দিকে দৌড়ে আসছে লীলা। চাঁদের আলোয় মনে হচ্ছে যেন উড়ে আসছে। ওকে ধরতে আসছে নিশ্চয়।

ঝপাৎ করে পানিতে দাঁড় ফেলল মুসা। বাইতে শুরু করল। জনকে ধরতে হলে যত দ্রুত সম্ভব এগিয়ে যাওয়া দরকার।

বোট হাউসের কাছে এসে দাঁড়িয়ে গেল লীলা। বুঝতে পেরেছে, তার ডাকে সাড়া দেবে না মুসা। থামবে না। বাকি যে নৌকাটা আছে এখনও, সেটার দিকে ছুটল। শেষবার ফিরে তাকিয়ে মুসা দেখল, নৌকার কাছে ঝুঁকে আছে লীলা। নিশ্চয় দড়ির গিট খুলছে।

যতটা ভেবেছিল মুসা, স্রোতের বেগ তার চেয়ে অনেক বেশি। যতই শক্তি দিয়ে সামনে এগোতে চাইছে সে, স্রোত তাকে সরিয়ে দিচ্ছে। এক ফুট সামনে এগোলে দুই ফুট পিছাচ্ছে। কি করে যেন বার বার পিছলে এসে স্রোতের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে নৌকাটা। কাত হয়ে যাচ্ছে, দুলছে ভীষণ। অথচ। ঢেউ ততটা নেই।

কাত হলেই পানি ঢুকছে। দেখতে দেখতে মুসার জুতো ভিজে গেল নৌকার তলায় জমা পানিতে। জুতো ভিজল, মোজা ভিজল, জুতোর মধ্যে ঢুকে গেল পানি। এ হারে উঠতে থাকলে নৌকা ডুবে যেতেও সময় লাগবে না। স্রোতের কারণে ঢেউগুলোও কেমন অশান্ত এখানে। নৌকার কিনারে বাড়ি লেগে পানির ছিটের ফোয়ারা সৃষ্টি হচ্ছে। চোখেমুখে এসে পড়ছে। চোখ বন্ধ করে ফেলতে বাধ্য করছে ওকে।

নাহ, পারব না! হতাশা গ্রাস করতে চাইছে মুসাকে। অনেক দেরি করে ফেলেছি আমি।

কিন্তু হাল ছাড়ল না।

চোখ মেলে সামনের দিকে তাকাল। নৌকাটা কোথায়?

দ্বীপে পৌঁছে গেছে নিশ্চয়।

চোখের পাতা সরু করে, নোনা পানির ছিটে বাঁচিয়ে দ্বীপের দিকে তাকাল সে। মেঘে ঢাকা চাঁদের ভূতুড়ে আলোয় কালো সাগরের পটভূমিতে ভয়ঙ্কর। অজানা জলদানবের মত লাগছে দ্বীপটাকে।

বিশাল সাগর যেন গিলে নিয়েছে জিনাদের নৌকাটা। চিহ্নও দেখা গেল না। ওটার।

ডানা ঝাপটানোর শব্দে আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকাল মুসা। খুব নিচু দিয়ে মূল ভূখণ্ডের দিকে উড়ে চলেছে শত শত বাদুড়। ফল খেতে যাচ্ছে। নাকি রক্ত! ওগুলোর মধ্যে কয়টা আছে ভ্যাম্পায়ার?

দ্বীপের আরও কাছে আসতে ওটার ওপরও ঝাঁকে ঝাকে বাদুড় উড়তে দেখা গেল। ডানার শব্দ আর কর্কশ, তীক্ষ্ণ চিৎকারে ঢেউয়ের শব্দও চাপা পড়ে যাচ্ছে। খোলা পেয়ে বাতাস বইছে হু-হুঁ করে। দামাল বাতাসে ভর করে উড়ছে শত শত, হাজার হাজার বাদুড়। উড়ছে, চিৎকার করছে, ডানা ঝাঁপটাচ্ছে, ডাইভ দিচ্ছে, ওপরে উঠছে, নিচে নামছে। দ্বীপের ওপরের আকাশটাকে ভরে দিয়েছে। পঙ্গপালের মত। একসঙ্গে এত বাদুড় জীবনে দেখেনি মুসা। আমাজানের জঙ্গলেও না।

দ্বীপের কিনারে একটা ছোট বোট হাউস চোখে পড়ল ওর। পুরো দ্বীপটাকেই গিলে নিয়ে গাছপালা আর আগাছা এখন খুদে সৈকতটাকেও গ্রাস করতে

চাইছে। ঢেউয়ে দুলতে দেখা গেল একটা বোট। নিশ্চয় ওটাই! জিনাকে নিয়ে আসা হয়েছে যেটাতে করে।
খালি নৌকা। দুজনের কাউকে দেখা গেল না ওতে।
ডকের কাছে এনে নৌকা থামাল মুসা। লাফ দিয়ে তীরে নেমে নৌকাটা টেনে তুলল বালিতে। চারপাশে তাকাল। সরু একটা পায়ে চলা পথ বাঁক নিয়ে ঢুকে গেছে জঙ্গলের মধ্যে।
খালিহাতে না গিয়ে অস্ত্র হিসেবে দাঁড়টা হাতে রেখে দিল সে। ভ্যাম্পায়ারের মত মহাক্ষমতাধর শত্রুর বিরুদ্ধে অতি সাধারণ একটা দাঁড়। তুচ্ছ! মনে মনে ডেকে বলল, আল্লাহ, তুমিই এখন আমার সবচেয়ে বড় ভরসা!
মনে জোর এনে, সাহস সঞ্চয় করে, একটা দাঁড় সম্বল করে দোয়া-দরূদ পড়তে পড়তে পা বাড়াল সে। এগিয়ে গেল পায়ে চলা পথটার দিকে। বুকের ভেতর ধড়াস ধড়াস করছে হৃৎপিণ্ড মেরুদণ্ডে শীতল শিহরণ।
মাথার ওপর নেমে এসেছে গাছের ডাল। এড়ানোর জন্যে মাঝে মাঝেই মাথা নুইয়ে ফেলতে হচ্ছে। ডানা ঝাঁপটানোর শব্দের বিরাম নেই। কোন গাছ, কোন ডালই খালি নেই। সবগুলোতে বাদুড় আছে। ওকে দেখে চিৎকার করছে ওগুলো। দাঁড় দিয়ে বাড়ি মেরে ভর্তা বানিয়ে দেয়ার ইচ্ছেটা বহুকষ্টে রোধ করল সে। বাড়ি যদি মারতেই হয় ওগুলোর গুরুকে মারতে হবে, ভ্যাম্পায়ারকে। তাতে অবশ্য রক্তচোষা পিশাচের কিছু হবে কিনা সন্দেহ। ব্রাম স্টোকারের ড্রাকুলা পড়েছে। ছবিও দেখেছে। জেনেছে, ভ্যাম্পায়ার মারতে হলে হৃৎপিণ্ডে কাঠের কীলক ঢুকিয়ে দিতে হয়।
কথাটা মনে পড়তেই আরেকটা বুদ্ধি মাথায় এল চট করে। হাতের দাঁড়টাও কাঠের। মাথাটা যদি চোখা করে নেয়া যায়...কিন্তু ছুরি পাবে কোথায়? হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখল, দাঁড়ের মাথা মোটামুটি চোখাই আছে। প্রচণ্ড শক্তিতে খোঁচা মারলে হয়তো বসিয়ে দেয়া যাবে পিশাচের বুকে। কিন্তু সেটা দিনের বেলায় সম্ভব। কফিনে যখন শুয়ে থাকে ওরা, আধো ঘুম আধো জাগরণের মধ্যে থাকে। এখন রাতে, পূর্ণ জাগরণের মধ্যে? অসম্ভব! মনকে হাত নেড়ে ভাবনাটা দূর করে দিল সে। এতসব যুক্তির কথা ভাবতে গেলে কোন কাজই হবে না। পিছিয়ে যেতে হবে। সব সময় এখন আল্লাহ-রসুলের কথাই কেবল মনে রাখা দরকার। তাহলে কোন প্রেতেরই ক্ষমতা হবে না তার ধারে কাছে। ঘেঁষে।
পথের শেষ মাথায় নিচু চালাওয়ালা কাঠের তৈরি একটা বীচ হাউস। অন্ধকার। কাছে এসে দেখা গেল কোন জানালায় একটা কাচও নেই। চালার ওপর পাক খেয়ে খেয়ে উড়ছে বাদুড়ের ঝাঁক। একটা বাদুড় খোলা জানালা দিয়ে বেরিয়ে

এসে মুসার গায়ে ধাক্কা খেতে খেতে শাই করে পাশ কেটে সরে গেল, তীক্ষ্ণ ডাক ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ঝোপের মধ্যে।
দাঁড়টা দুহাতে শক্ত করে চেপে ধরে জানালা দিয়ে ভেতরে উঁকি দিল মুসা। ঘুটঘুঁটে অন্ধকার। কিছুই দেখা গেল না।
ওর মনে হলো, জিনাকে নিয়ে এর মধ্যেই ঢুকেছে জন। এই বাড়িটাই ভ্যাম্পায়ারের আস্তানা। দ্বিধা করল একবার। তারপর যা আছে কপালে, ভেবে, দাড়ের মাথায় ভর রেখে লাফ দিয়ে উঠে বসল জানালার চৌকাঠে। পা রাখল
সব কটা জানালা খোলা থাকার পরেও ভেতরে ভাপসা গন্ধ। ছত্রাকের গন্ধে ভারী হয়ে আছে বাতাস। আরও একটা বোটকা গন্ধ আছে। বুনো জানোয়ারের? নাকি শুকনো হাড়গোড়! ভাবতে চাইল না আর। দম আটকে রেখে লাভ নেই। কতক্ষণ রাখবে? তারচেয়ে এই বিশ্রী গন্ধযুক্ত বাতাসেই দম নিয়ে পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেয়া ভাল। তাতে চলাফেরা সহজ হবে।
অন্ধকার চোখে সওয়ানোর জন্যে দাঁড়িয়ে রইল সে। স্থির। কানে আসছে বাইরের একটানা ডানা ঝাঁপটানোর শব্দ।
ধীরে ধীরে চোখের সামনে ফুটে উঠছে ঘরটার অবয়ব। লম্বা, সরু একটা ঘর। বেডরুম। কিন্তু খাট বা বিছানা নেই।
কোন কিছুই স্পষ্ট নয়। আলো না হলে দেখা যাবে না।
হঠাৎ মনে পড়ল রিকির লাইটারটার কথা। পকেটে হাত দিয়ে দেখল, আছে। বের করে আনল তাড়াতাড়ি।
কাঁপা আলোয় দেখতে পেল জিনাকে।
এক দিকের দেয়ালের ধার ঘেঁষে বসানো বড় একটা আর্ম চেয়ারে নেতিয়ে আছে। গদি মোড়া একটা বিরাট হাতলে মাথাটা পড়ে আছে।
মরে গেছে ও! মুসার প্রথম ভাবনাই হলো এটা। মেরে ফেলা হয়েছে। ওকে!
ভালমত দেখার জন্যে এগিয়ে গেল সে। জিনার হাতে হাত রাখল। গরম। ঠাণ্ডা হয়নি এখনও। নাকের কাছে হাত নিয়ে গেল। না, মরেনি! নিঃশ্বাস পড়ছে!
জানালার কাছে দাপাদাপি শুরু করল কয়েকটা বাদুড়। আরও আসতে লাগল। প্রায় ঢেকে দিল জানালাটাকে। কয়েকটা ঢুকে পড়ল ঘরের মধ্যে। আলোর পরোয়া করল না। যেন এই আলোর সঙ্গে পরিচয় আছে ওদের। অবাক কাণ্ড, বদ্ধ ঘরে উড়তে গিয়ে ছাতের সঙ্গে কিংবা দেয়ালে ধাক্কা খেল না– একটাও।
একটা বাদুড় উড়তে উড়তে আলোর এত কাছাকাছি চলে এল, ডানার ঝাঁপটায় নিভে গেল লাইটার। খস করে টিপে আবার জ্বালল মুসা। মেঝেতে রাখা একটা হ্যারিকেন চোখে পড়ল। পুরানো, তবে মরচে পড়া নয়। বেশ ঘষেমেজে রাখা হয়েছে। হ্যারিকেনটা তুলে আরও অবাক হলো। তেল ভরা। আশ্চর্য!

ভ্যাম্পায়ারদের আলোর দরকার হয় নাকি? হ্যারিকেনও ব্যবহার করে! মনে পড়ল, কাউন্ট ড্রাকুলার দুর্গে প্রচুর লণ্ঠন ছিল। তবে সেগুলো ব্যবহারের প্রয়োজন পড়ত না কাউন্টের। মেহমান এলে তাদেরকে জ্বেলে দিত।
হ্যারিকেন নিয়ে মাথা ঘামাল না আর। বাদুড়ের দিকেও নজর দেয়ার সময় এখন নেই। জিনা বেঁচে আছে। ওকে বের করে নিয়ে যাওয়া দরকার।
হ্যারিকেন ধরিয়ে লাইটারটা পকেটে রেখে দিল সে। দেখতে লাগল ঘরে কি কি আছে।
জানালা থেকে দূরে দেয়াল ঘেঁষে রাখা একটা জিনিস চোখে পড়ল। চিনতে সময় লাগল না। খাইছে! কেঁপে উঠল মুসা। কফিন! ডালা নামানো। জন নিশ্চয় এই কফিনে ঢুকে শুয়ে আছে!
আঙুলগুলো আরও শক্ত হয়ে চেপে বসল দাঁড়ের গায়ে।
বেশিক্ষণ ঘরে থাকল না বাদুড়গুলো। বেরিয়ে গেল। ঝটাপটির শব্দ বন্ধ হলো। তবে আবার আসবে ওরা, বুঝতে পারছে মুসা। যে কোন সময় ঝাক বেঁধে এসে ঢুকবে ঘরে। এখানে বাদুড়ের নিত্য আসা-যাওয়া, আচরণেই বোঝা যায়। আলফ্রেড হিচককের বার্ড ছবিটার কথা মনে পড়ল। ছবির পাখিগুলোর মত খেপে গিয়ে বাদুড়রা যদি একযোগে এসে এখন আক্রমণ করে ওকে? ছিন্নভিন্ন করতে সময় লাগবে না! ওগুলোর মধ্যে জলাতঙ্ক রোগের জীবাণু বহন করছে এমন বাদুড়ও থাকতে পারে…
উদ্ভট ভাবনাগুলো জোর করে মন থেকে তাড়িয়ে দিয়ে জিনার দিকে ঘুরল। সে। কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে ডাকল, জিনা! জিনা!
গলা কাঁপছে ওর।
জিনার কাঁধ চেপে ধরে কঁকি দিয়ে কণ্ঠস্বর আরেকটু চড়িয়ে আবার ডাকল, জিনা! ওঠো! এই জিনা!
শিহরণ বয়ে গেল জিনার শরীরে। কিন্তু চোখ মেলল না।
জিনা? আরও জোরে কাধ ধরে নাড়া দিল মুসা।
আবার শিহরণ বইল জিনার শরীরে। কিন্তু মাথা তুলল না।
দুই হাতে ওর মাথাটা চেপে ধরে সোজা করল মুসা। চোখের পাপড়ি ধরে পাতা খোলার চেষ্টা করল।
জিনা! ওঠো! উঠে পড়ো! ভয়ে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসতে চাইছে মুসার। আই, জিনা, প্লীজ! বেরিয়ে যেতে হবে এখান থেকে!
নড়ে উঠল জিনা।
ভরসা পেয়ে আরও জোরে ঝাঁকাতে লাগল মুসা।
অবশেষে চোখ মেলল জিনা। গুঙিয়ে উঠল। কে?

আমি, জিনা, আমি! মুসা! জলদি ওঠো! পালাতে হবে!
পেছনে কারও উপস্থিতি টের পাওয়া গেল।
ঝট করে ঘুরে গেল মুসা।
জন!
ঠোঁট ফাঁক করে, খদন্ত বের করে, জানোয়ারের নখের মত আঙুল বাকিয়ে মুসার গলা টিপে ধরতে ছুটে এল সে।

.

গলা চিরে বুনো চিৎকার বেরিয়ে এল মুসার। নিজের কণ্ঠস্বর নিজেই চিনতে পারল না। ঘরের দেয়ালে দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হলো সে শব্দ বাইরে বাদুড়ের কলরব বেড়ে গেল।
ক্ষণিকের জন্যে থমকে গেল জন। পরক্ষণে আবার আঙুল বাকা করে। এগিয়ে এল মুসার দিকে। চকচক করছে ওর বড় বড় শূদন্ত।
জলজ্যান্ত ভ্যাম্পায়ারকে চোখের সামনে দেখে আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে গেছে মুসা। ভাবনার সময় নেই। পরিকল্পনার সময় নেই। দাঁড়টা তুলে ধরল। চোখা দিকটা জনের দিকে করে।
এগিয়ে আসছে জন।
সামনে ছুটে গেল মুসা। কোনভাবেই যাতে মিস না হয়, একবারেই ঢুকিয়ে দিতে পারে জনের বুকে, সেভাবে দাঁড়টা ঠেলে দিল সামনের দিকে।
থ্যাপ করে জনের বুকে লাগল দাঁড়ের মাথা। পাজরের হাড় ভাঙার বিশ্রী শব্দ হলো। গলা চিরে বেরিয়ে এল বিকট চিত্তার।
দাড়টা ওর বুকে ঢোকেনি।
ঢোকানোর জন্যে টান দিয়ে পিছিয়ে এনে আবার ঠেলে দিতে যাবে মুসা, এই সময় দেখল তার আর প্রয়োজন নেই। হাটু ভাজ হয়ে পড়ে যাচ্ছে জন। গড়িয়ে পড়ল মেঝেতে।
এত সহজে ভ্যাম্পায়ারকে কাবু করতে পেরে বিমূঢ় হয়ে গেল মুসা। চিৎকার করার জন্যে মুখ খুলেছে, মুখে এসে বসল একটা বড় মথ। থাবা দিয়ে ওটাকে সরাতেই কানে এল জিনার চিৎকার। মুসা, মুসা, বাঁচাও আমাকে! মেরে ফেলল!
চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে গেল মুসা। লীলার সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছে জিনা।
এত তাড়াতাড়ি হাজির হয়ে গেল!
বোট হাউসের তৃতীয় নৌকাটার কথা মনে পড়ল মুসার। দাঁড় হাতে লীলাকে গুতো মারার জন্যে এগোতে যাবে, এই সময় সাঁড়াশির মত পা চেপে ধরল শক্ত, শীতল কয়েকটা আঙুল। মরেনি জন। এত সহজে মরে না। ভ্যাম্পায়ার।

লাথি মেরে পা ছাড়ানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে আবার দাঁড়টা তুলে ধরল মুসা। উত্তেজনা, আতঙ্কে গুতো মারার কথা ভুলে গায়ের জোরে বাড়ি মারল। জনের মাথা সই করে। ঢিল হয়ে এল আঙুলের চাপ। টা ছাড়িয়ে নিল মুসা। আবার বাড়ি মারল জনকে সই করে। তাড়াহুড়োয় জায়গামত না লেগে অর্ধেক লাগল মেঝেতে। ভেঙে দুটুকরো হয়ে গেল দাঁড়।

ভালই হলো। দাড়ের ডাণ্ডার মত অংশটা ওর হাতে রয়ে গেছে। ভাঙা দিকটা বর্শার ফলার মত চোখা। সেটা বাগিয়ে ধরে লীলার বুকে বসিয়ে দেয়ার জন্যে ছুটল সে।

মুসাকে আসতে দেখে অস্বাভাবিক ক্ষিপ্রতায় লাফ দিয়ে সরে গেল লীলা। শেষ মুহূর্তে যেন ব্রেক কষে দাঁড়াল মুসা। সামলাতে না পারলে দাঁড়টা লাগত জিনার গায়ে। ওর পেটে ঢুকে যেত।

ঘুরে দাঁড়াল আবার মুসা। লীলাকে সই করে দাঁড় তুলে ছুটল।

আবার সরে গেল লীলা।

নেচে উঠল আলোটা। কেন, দেখার জন্যে ফিরে তাকানোর সময় নেই। মুসার নজর লীলার ওপর।

গুতোটা এড়াতে পারল না এবার আর লীলা। তবে ঠিকমত লাগল না। যেখানে লাগাতে চেয়েছিল মুসা, তার সামান্য ভানে লাগল, হৃৎপিণ্ডে নয়।

আর্তনাদ করে বুক চেপে ধরে জনের পাশে পড়ে গেল লীলা। গোঙাতে লাগল। ওই সামান্য আঘাতে মরবে না। ঘাড়ের পাশে বাড়ি মারল মুসা। নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেল লীলার।

জিনা! জলদি চলো বলে ওর দিকে ঘুরে দেখল হ্যারিকেনটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে জিনা। চোখে অদ্ভুত দৃষ্টি। এগিয়ে যেতে শুরু করল। মেঝেয় পড়ে থাকা দুই ভ্যাম্পায়ারের দিকে।

কি করছ?

বিড়বিড় করে জবাব দিল জিনা, আগুনে নাকি ধ্বংস হয়ে যায় ভ্যাম্পায়ার!

হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মুসা। কি করবে বুঝতে পারছে না। ভ্যাম্পায়ারের ধ্বংস সে-ও চায়। একটু আগে দাঁড় দিয়ে গুতা মেরে তা-ই করতে চেয়েছিল।

দুজনের গায়ে তেল ঢেলে দিল জিনা। মুসাকে জানালার দিকে যেতে বলে নিজেও পিছাতে শুরু করল। পঁড়িয়ে গেল জ্যনালার কাছে এসে। একটা মুহূর্ত তাকিয়ে রইল পড়ে থাকা দুই ভ্যাম্পায়ারের দিকে।

নড়তে শুরু করেছে লীলা। মরেনি। বেহুশ হয়ে ছিল।

দুজনকে সই করে জ্বলন্ত হ্যারিকেনটা ছুঁড়ে মারল জিনা।

কি ঘটে দেখার জন্যে অপেক্ষা করতে চাইল না মুসা। তাড়াতাড়ি জিনাকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। আগুনে সত্যি সত্যি ধ্বংস হবে কিনা ভ্যাম্পায়ার, নিশ্চিত নয় সে। হলে তো ভাল। নইলে ওরা আবার জেগে ওঠার আগেই পালাতে হবে দ্বীপ থেকে।
বুনোপথ দিয়ে ছুটতে ছুটতে সৈকতে এসে পড়ল দুজনে। তিনটে ডিঙি এখন ঘাটে বাঁধা। যেটাতে করে এসেছিল মুসা, সেটাতে দাঁড় নেই। জুন যেটায় করে জিনাকে নিয়ে এসেছিল, সেটাতে উঠল।
তাড়াতাড়ি দাঁড় বেয়ে সরে যেতে শুরু করল দ্বীপের কাছ থেকে। সারাক্ষণ ভ্যাম্পায়ারের আক্রমণের আশঙ্কায় দুরুদুরু করছে বুক। দ্বীপের দিক। থেকে কোন বাদুড় নৌকার বেশি কাছে এলেই চমকে উঠছে। ভাবছে বাদুড়ের। রূপ ধরে চলে এসেছে জন কিংবা লীলা।
তবে এল না ওরা।
জিনা আবার নেতিয়ে পড়েছে। কোন কথা বলছে না। সাংঘাতিক ধকল গেছে ওর ওপর। নিশ্চয় ভয়াবহ রক্তশূন্যতায় ভুগছে। ফিরে গিয়েই আগে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে।
মূল ভূখণ্ডের তীর দেখা যাচ্ছে। ফিরে তাকাল মুসা। দ্বীপের দিকে। গাছপালার ফাঁক দিয়ে আগুন চোখে পড়ল মনে হলো। নিশ্চয় বীচ হাউসটাতে আগুন লেগে গেছে।
লাগুক। পুড়ে ছাই হয়ে যাক ভ্যাম্পায়ারের আস্তানা। অনেক জ্বালান জ্বালিয়েছে জন আর লীলা। রিকিকে খুন করেছে।
রিকির কথা মনে হতেই অজান্তে হাত চলে গেল পকেটে। লাইটারটা ছুঁয়ে দেখল মুসা। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জোরে জোরে নৌকা বাইতে শুরু করল তীরের দিকে।
*
পরদিন খুব সকালে আবার সৈকতে এসে হাজির হলো সে। দৌড়ে চলল বোট হাউসটার দিকে। ছবির খামটা পড়ে গিয়েছিল ওখানে। প্রচণ্ড এক কৌতূহল টেনে নিয়ে চলেছে ওকে। ছবিগুলো দেখতে চায়। দেখবে জনের ছবি সত্যি উঠেছে কিনা।
আগের রাতে সে যাবার পর আর বোধহয় কেউ আসেনি এদিকে। খামটা বালিতে পড়ে আছে। শিশিরে ভেজা।
উবু হয়ে তুলে নিল। টান দিয়ে মুখ ছিঁড়ে বের করল একটা ছবি। প্রথমেই বেরোল সেই ছবিটা, ফেরিস হুইলের মেটাল কারে পাশাপাশি বসা জন আর জিনার ছবি। স্পষ্ট উঠেছে। বরং বলা যায় জিনার চেয়ে জনের ছবিটা আরও স্পষ্ট। হতবাক

হয়ে গেল মুসা। তাড়াতাড়ি বাকি ছবিগুলো বের করে দেখতে লাগল। কোনটাতেই বাদ পড়েনি জন। সবগুলোতে আছে।
এর মানেটা কি? ভ্যাম্পায়ার বিশেষজ্ঞদের তত্ত্ব কি তবে ভুল? পিশাচের ও ছবি ওঠে?
মনের মধ্যে খুঁতখুঁত করতে লাগল ওর। জিনাকে বাঁচানো গেছে বটে, হয়তো জন আর লীলাও ধ্বংস হয়েছে, কিন্তু এই ভ্যাম্পায়ার রহস্যের সমাধান এখনও হয়নি। সমূলে ওদের ধ্বংস করতে হবে। সেটা করা তার একার পক্ষে সম্ভব নয়। মাথা ঘামানোর কাজগুলো তাকে দিয়ে হবে না। কিশোরের সাহায্য দরকার।
মনস্থির করে ফেলল, ফোনে যোগাযোগ করতে না পারলে কিশোরকে নিয়ে আসার জন্যে আগামী দিনই রকি বীচে রওনা হয়ে যাবে।

ভলিউম ৩৫ – তিন বিঘা – তিন গোয়েন্দা – রকিব হাসান

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৯

ম্যানিলা রোডের শেষ বাড়িটার সামনে এসে গাড়ি থামালেন মিস কেলেট। বাড়ির দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করল কিশোর, দারুণ কটেজ!

বন আর পাহাড়ের কোলে ছবির মত একটা বাড়ি। পুরানো পাথরের দেয়াল, টালির ছাত, পর্দা ঢাকা জানালা। বিরাট বাগানটাতে উজ্জ্বল রঙের ফুলের মেলা। ঝোপঝাড় আর বেডগুলো সব পুরানো ধাচে তৈরি।

ওল্ড-মেনস ভলান্টিয়ার সার্ভিসের একজন সদস্য মিস কেলেট। টীম প্রধানদের একজন। কিশোরও জুনিয়র মেম্বার। আজ ওর আসার কথা ছিল না; যার আসার কথা সে অসুস্থ থাকায় মিস কেলেটের অনুরোধে তাকে আসতে হয়েছে।

হ্যাঁ, কিশোরের হাসিটা ফিরিয়ে দিলেন মিস কেলেট। সেভারনরা এসেছেন এখানে বছরখানেক হলো। কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে বললেন, বাড়িটাতে নাকি ভূতের উপদ্রব আছে।

আবার হাসল কিশোর। বুদ্ধিদীপ্ত সুন্দর চোখ দুটো ঝিক করে উঠল। যাহ, ঠাট্টা করছেন!

না, ঠাট্টা করছি না। আমার সামনেই স্ত্রীকে বকাবকি করেছেন মিস্টার সেভারন, ভয় পান বলে। অদ্ভুত সব শব্দ নাকি শুনতে পান মহিলা, ঘরের মধ্যে নাকি ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে যায়। কারা নাকি হাসাহাসি করে। বেচারি!

হু। ভূতের গল্প আমার ভাল লাগে। মিসেস সেভারনকে জিজ্ঞেস করে। সব জেনে নিতে হবে।

দেখো, সারাদিন ধাক্কিয়েও দরজা খোলাতে পারো নাকি, অস্বস্তিভরা কণ্ঠে বললেন মিস কেলেট। আজকাল অপরিচিত কাউকে দেখলে দরজাও খুলতে চান না ওঁরা।

কেন?

জানি না। কিছু হয়েছে কিনা জিজ্ঞেস করেছিলাম। কিন্তু স্বীকার করলেন না। পুরো ব্যাপারটাই কেমন রহস্যময়।

কান খাড়া হয়ে গেছে কিশোরের। ভাল কোন রহস্য পেলে আর কিছু চায় না সে।

দেখো, মুখ খোলাতে পারে কিনা। বুড়োবুড়ি খুব ভাল মানুষ। বলেও ফেলতে পারেন।

যদি ঢুকতেই না দেন?

হাসলেন মিস কেলেট। যাও, আমি আছি এখানে। দরজা না খুললে পরে যাব। নাকি এখনই সঙ্গে যেতে বলছ?

গাড়ির দরজা খুলল কিশোর। না, আমিই যাই। লাঞ্চ নিয়ে গেছি দেখলে না খুলে পারবেন না। আধঘণ্টা পর এসে নিয়ে যাবেন আমাকে।
ঘুরে গাড়ির পেছনে চলে এল কিশোর। হীটেড ট্রলি থেকে গরম গরম দুই প্লেট রোস্ট বীফ আর এক প্লেট পুডিং বের করল। হাত নেড়ে মিস কেলেটকে চলে যেতে ইশারা করে পা বাড়াল কটেজের মরচে পড়া গেটটার দিকে।
নীল রঙ করা সামনের দরজায় টোকা দিল সে। চিৎকার করে বলল, ওল্ড মেনস ভলান্টিয়ার!
সাড়া নেই।
আবার টোকা দিল সে। জানালায় পর্দা টানা। ভেতরে কেউ আছে কিনা উঁকি দিয়ে দেখার উপায় নেই। দোতলার দিকে তাকাল। ওখানকার বেডরুমের জানালায়ও পর্দা টানা। বাড়ি আছেন তা সেভারনরা?
কি করবে ভাবছে কিশোর, এই সময় ফাঁক হয়ে গেল নিচতলার জানালার পর্দা। দেখা গেল একটা মুখ।
ওল্ড-মেনস ভলান্টিয়ার! সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠল সে। আপনাদের লাঞ্চ নিয়ে এসেছি।
বন্ধ হয়ে গেল ফাঁকটা।
দরজার শেকল খোলার শব্দ। ছিটকানি খুলল। দরজা খুলে দিলেন এক বৃদ্ধা। ছোটখাট মানুষ। মাথার চুল সব সাদা। সন্দেহভরা চোখে তাকিয়ে রইলেন কিশোরের দিকে।
মিসেস সেভারন?
মাথা ঝাঁকালেন বৃদ্ধা, হ্যাঁ।
আপনাদের লাঞ্চ নিয়ে এসেছি। জলদি নিন। ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।
তোমাকে তো চিনি না। মিস কেলেট কোথায়?
আরেক বাড়িতে গেছেন। আমি তার সহকারী। একা পেরে ওঠেন না। তাই আমাকে নিয়ে এসেছেন। আমার নাম কিশোর পাশা।
তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিশোরের আপাদমস্তক দেখলেন বৃদ্ধা। মুখ ফিরিয়ে ডাকলেন, জন, লাও। কিশোরের দিকে ফিরে অস্বস্তিভরা হাসি হেসে শেকলটা খুলে দিয়ে সরে দাঁড়ালেন। এসো। কিছু মনে কোরো না। আজকাল অপরিচিত কাউকে ঢুকতে দিতে ভয় লাগে আমাদের।
হা, সাবধান থাকা ভাল। চোর-ডাকাতে ভরে গেছে দেশটা।
কিশোর ঘরে ঢুকতেই দরজা লাগিয়ে ছিটকানি তুলে দিলেন বৃদ্ধা। তার হাত থেকে ট্রে-টা নিতে নিতে বললেন, তুমি কি একটু বসবে? আমরা লাঞ্চটা সেরে নিই?

সারুন, সারুন, কোন অসুবিধে নেই। আমি বসছি। মিস কেলেটের ফিরে আসতে সময় লাগবে।
রান্নাঘরে ট্রে-টা রেখে এলেন মিসেস সেভারন। কিশোরকে নিয়ে এলেন বসার ঘরে।
থ্যাংকস, পুরানো, আরামদায়ক একটা সোফায় বসে বলল কিশোর। ওক কাঠে তৈরি ছোট কফি টেবিলে রাখা দুটো ম্যাগাজিন আর একটা ছবির অ্যালবাম। অ্যালবামটা দেখি? মানুষের ছবি দেখতে ভাল লাগে আমার।
দেখো। তবে মানুষের ছবির চেয়ে এই কটেজের ছবিই বেশি।
সেভারনরা লাঞ্চ খেতে বসল। অ্যালবামের পাতা ওল্টাতে লাগল কিশোর। কটেজ আর বাগানটার সুন্দর সুন্দর ছবি। বাগানের ঠেলাগাড়িতে বসা এক বৃদ্ধের ছবি আছে। মিস্টার সেভারনের ছবি, অনুমান করল কিশোর।
প্রথম পাতায় রয়েছে এক যুবকের বেশ কয়েকটা ছবি। খাটো করে ছাটা চুল। লম্বা, সুগঠিত শরীর, ব্রোঞ্জ-রঙ চামড়া। পরনে জিনস আর কলেজ সোয়েটশার্ট। মিসেস সেভারনের সঙ্গে চেহারার অনেক মিল।
অ্যালবাম থেকে মুখ তুলে ঘরের চারপাশে চোখ বোলাল কিশোর। ৫ ঘর। ওক কাঠের মোটা মোটা কড়িকাঠ। ম্যানটলপীসে রাখা মাউন্টে এ ছবি-অ্যালবামে যে যুবকের ছবি আছে তার। অ্যাথেনসের পারথেননের সামনে দাঁড়িয়ে তোলা। কড়া রোদ। পিঠে ঝোলানো ব্যাকপ্যাক। হাসিমুখে ক্যামেরার চোখের দিকে তাকিয়ে আছে।
দ্রুত অ্যালবামের বাকি পাতাগুলো দেখা শেষ করে একটা ম্যাগাজিন তুলে নিল কিশোর। টান লেগে ভেতর থেকে বেরিয়ে মেঝেতে পড়ে গেল একটা চিঠির খাম। ওপরে ছাপ মারা একটা লোগো-কোন কোম্পানির নামের আদ্যক্ষর যুক্ত করে তৈরি। সাধারণ জিনিস। কৌতূহল জাগাল না কিশোরের। খামটা আবার আগের জায়গায় ঢুকিয়ে রাখল সে।
স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন মিসেস সেভারন।
ও কিশোর পাশা, পরিচয় করিয়ে দিলেন বৃদ্ধা। ভলান্টিয়ার সার্ভিসের সদস্য।
সোফা থেকে উঠে গিয়ে মিস্টার সেভারনের সঙ্গে হাত মেলাল কিশোর, হালো, মিস্টার সেভারন। অ্যালবামটা খুব সুন্দর। ম্যানটল পীসের ছবিটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, ওটা কি আপনাদের ছেলের ছবি?
ছেলের কথা উঠতেই আড়ষ্ট হয়ে গেলেন দুজনে। তাদের ভঙ্গি দেখেই বুঝে গেল কিশোর, কি যেন গোপন করতে চাইছেন। অবাক হলো সে।
ইয়ে... আমতা আমতা করে জবাব দিলেন মিসেস সেভারন, ছুটিতে থাকার সময় ওর কোন বন্ধু হয়তো তুলেছিল ছবিটা। হঠাৎ করেই একদিন। ডাকে এসে হাজির,

ও…
ও, কি? কৌতূহল হলো কিশোরের।
ও…ও চলে যাবার পর। অ্যালবামটা তুলে নিয়ে গিয়ে একটা ড্রয়ারে রেখে দিলেন মিসেস সেভারন।
তারমানে এখানে থাকে না আপনাদের ছেলে?
মাথা নাড়লেন মিসেস সেভারন। না।
ফায়ারপ্লেসের সামনের একটা চেয়ারে গিয়ে বসলেন মিস্টার সেভারন। ভঙ্গি এখনও আড়ষ্ট।
তাহলে কোথায়…? জিজ্ঞেস করতে গেল কিশোর।
দূরে থাকে, আচমকা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল মিস্টার সেভারনের কণ্ঠ।
স্পষ্ট বোঝা গেল এই প্রসঙ্গে আর কথা বলতে চান না মিসেস সেভারনও। কোন স্কুলে পড়ো তুমি?
রকি বীচ হাই।
দুজনের আচরণে কৌতূহল বেড়ে গেছে কিশোরের। ছেলের সম্পর্কে কথা বলতে চান না কেন? বুড়ো মানুষেরা তো সাধারণত ছেলেমেয়ের প্রসঙ্গ উঠলেই খুশি হয় বেশি, যতটা পারে বকর বকর করে, কিন্তু এরা ঠিক উল্টো। ছেলের সঙ্গে ঝগড়া করেছেন নাকি?
কোথায় থাকো? জানতে চাইলেন মিস্টার সেভারন।
ইয়ার্ডের ঠিকানা জানাল কিশোর।
রকি বীচে কতদিন? মিসেস সেভারন জিজ্ঞেস করলেন।
বহু বছর। প্রায় জন্মের পর থেকে।
ভাল লাগে?
লাগে।
আমরাও আছি বলতে গেলে প্রায় সারাটা জীবনই। জ্যাকিও এখানেই জন্মেছে…
মিস্টার সেভারনের ভ্রূকুটি দেখে থেমে গেলেন মিসেস সেভারন। লক্ষ করল কিশোর।
এই কটেজটা কিনেছি মাত্র বছরখানেক আগে, আবার ছেলের প্রসঙ্গ চাপা দেয়ার চেষ্টা করলেন মিস্টার সেভারন। খুব ভাল লাগে জায়গাটা। শান্ত, নীরব; কোন গোলমাল ছিল না, কিন্তু…
অপেক্ষা করতে লাগল কিশোর। পুরো এক মিনিট চুপ করে থাকার পরও যখন মুখ খুললেন না মিস্টার সেভারন, না জিজ্ঞেস করে আর পারল না সে, কিন্তু কি, মিস্টার সেভারন? কিছু ঘটেছে মনে হচ্ছে
তাড়াতাড়ি মাথা নাড়লেন মিস্টার সেভারন, না না, কি ঘটবে?

মিস কেলেট আমাকে বললেন বাড়িটাতে নাকি ভূতের উপদ্রব আছে।
অস্বস্তিভরা ভঙ্গিতে স্বামীর দিকে তাকাতে লাগলেন মিসেস সেভারন। সত্যি যেন ভূতের ভয়ে কাবু হয়ে আছেন।
হাসি ফুটল মিস্টার সেভারনের মুখে। অবাক করল কিশোরকে।
সব গাঁজা, বুঝলে। অতি কল্পনা। আমার স্ত্রী ভূতকে ভীষণ ভয় পায়।
সলজ্জ হাসি ফুটল মিসেসের মুখে। তুমিই তো ভয়ের গল্প শুনিয়ে শুনিয়ে ভয়টা বাড়াও আমার।
কিন্তু ঘর নাকি খুব ঠাণ্ডা হয়ে যায় মাঝে মাঝে, কিশোর বলল।
ঘরে রোদ না ঢুকলে তো হবেই, জোর দিয়ে কথাটা বলতে পারলেন না মিসেস সেভারন। এমনিতেই জায়গাটা বড় বেশি নীরব; দুপুরবেলায়ও গা ছমছম করে, তার ওপর…
তার ওপর কি? কিশোরের মনে হলো জরুরী কোন কথা বলতে চেয়েছিলেন মিসেস সেভারন। বলতে দিলেন না মিস্টার সেভারন। বাদ দাও ওর কথা, চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। প্রসঙ্গটাকে হালকা করার জন্যে বললেন, আমার স্ত্রীর ভূতে আসর করা ঘরটা দেখবে নাকি?
দেখব না মানে! এক্ষুণি চলুন।
এসো, হাসলেন মিস্টার সেভারন। স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি ওকে দেখিয়ে আনি। তুমি ততক্ষণে বাসনগুলো ধুয়ে ফেললো।
আপনাদের কষ্ট করার দরকার নেই, কিশোর বলল। ধোয়াধুয়িগুলোও আমরাই করব। আমাদের দায়িত্ব…
কোন অসুবিধে নেই, মিসেস সেভারন বললেন। বসেই তো থাকি। বরং কাজ করলে ভাল লাগবে। রান্না করে যে লাঞ্চ এনে খাওয়াচ্ছ, তাতেই আমরা কৃতজ্ঞ; কত কাজ আর ঝামেলা বাঁচাচ্ছ।
ধোও তুমি, আমরা যাচ্ছি, স্ত্রীকে বলে কিশোরের দিকে তাকালেন মিস্টার সেভারন। এসো।
এই সময় বাইরে গাড়ির হর্ন বাজল।
তাড়াতাড়ি গিয়ে জানালার পর্দা সরিয়ে তাকাল কিশোর। এহহে, মিস কেলেট চলে এসেছেন! আর কয়েক মিনিট দেরিতে এলে কি হত… নিরাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে লাগল সে। মিস্টার সেভারনের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, অন্য কোন সময় এলে কি ঘরটা দেখাবেন?
নিশ্চয় দেখাব। যখন ইচ্ছে চলে এসো। এলে খুশিই হব। কথা বলার লোক পাই না।

পকেট থেকে তিন গোয়েন্দার একটা কার্ড বের করল কিশোর। বাড়িয়ে দিয়ে বলল, নিন, রাখুন এটা। যদি কখনও কোন প্রয়োজন মনে করেন, ফোন করবেন।
কার্ডটা দেখলেন মিস্টার সেভারন। কিশোর গোয়েন্দা!...খুব ভাল। মুখ তুলে তাকালেন তিনি। কিন্তু প্রশ্নবোধকগুলো কেন? আত্মবিশ্বাসের অভাব?
এই প্রশ্নটা বহুবার বহুজনের মুখে শুনেছে কিশোর। দমল না। বলল, মোটেও না। বরং আত্মবিশ্বাস অনেক বেশি আমাদের। প্রশ্নবোধকগুলো বসানোর তিনটে কারণ। এক, রহস্যের ধ্রুবচিহ্ন এই প্রশ্নবোধক। যে কোন রহস্য সমাধানে আগ্রহী আমরা। ছিঁচকে চুরি থেকে শুরু করে ডাকাতি, রাহাজানি, খুন, এমনকি ভৌতিক রহস্যের তদন্তেও পিছপা নই। দুই, চিহ্নগুলো আমাদের ট্রেডমার্ক। আর তিন, যেহেতু দলে তিনজন, তাই তিনটে চিহ্ন দেয়া হয়েছে। একটু থেমে বলল, কারও কাজ করে দেয়ার জন্যে পয়সা নিই না আমরা। গোয়েন্দাগিরি করাটা আমাদের শখ।

.

তারমানে ঘরটা দেখতে পারলে না!
কিশোরের মতই নিরাশ হলো মুসাও। বেড়ায় হেলান দিল। তিন গোয়েন্দার ওঅর্কশপে বসে আছে ওরা।
আরেকবার গেলেই হয়, রবিন বলল। বলে তো এসেছই।
হ্যাঁ। যাব।
আঁতকে উঠল মুসা, ওই ভূতের ঘর দেখতে!
হাসল কিশোর, এইমাত্র না দেখে আসতে পারলাম না বলে দুঃখ করলে?
ঝটকা দিয়ে উঠে দাঁড়াল মুসা। আমি যাই। ফায়ারকে অনেকক্ষণ খাবার দেয়া হয়নি। খিদে পেলে চেঁচিয়ে, মাটিতে লাথি মেরে পাড়া মাত করবে। মা শেষে রেগে গিয়ে আমাকে সহ কানটি ধরে বের করে দেবে বাড়ি থেকে। পকেট থেকে একটা চকলেট বের করে মোড়ক খুলল সে। মট মট করে দুই টুকরো ভেঙে তুলে দিল দুজনের হাতে। বাকিটা মুখে পুরে কিশোরের দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচাল, তাহলে যাচ্ছই ভূত দেখতে?
হ্যাঁ।
কবে? কাল সকালে।
সকালে আমার গিটারের ক্লাস আছে, রবিন বলল। তারপর যাব লাইব্রেরিতে। দুপুরের পর হলে যেতে পারি।
ঠিক আছে। দুপুরের পরই যাব।

.

মুসা আর রবিন চলে যাওয়ার পর দুই সুড়ঙ্গ দিয়ে হেডকোয়ার্টারে ঢুকল কিশোর। ডেস্কের অন্য পাশে তার চেয়ারে এসে বসল। টেবিলে উপুড় করে ফেলে রাখা হয়েছে একটা বই, একটা রহস্য কাহিনী : দি মিস্টরি অভ দা রেড জুয়েলস। কিছুটা পড়ে ফেলে রেখে গিয়েছিল। তুলে নিয়ে পড়তে শুরু করল।

শেষ হওয়ার বহু আগেই বুঝে ফেলল চোর কোন লোকটা। আর পড়ার কোন মানে হয় না। বিরক্ত হয়ে বইটা রেখে দিল। রহস্য কাহিনী পড়তে গেলেই এই অবস্থা হয় তার। আগেই বুঝে ফেলে। ব্যস, মজা শেষ।

জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলল সে। স্কুলের ম্যাগাজিনের জন্যে একটা আর্টিকেল লেখার কথা। হাতে সময় আছে। এখন বসতে পারে। কিন্তু লিখতে ইচ্ছে করছে না। একে তো ম্যাগাজিনের সম্পাদিকা কেরি জনসনের সঙ্গে বনাবনতি নেই, তার ওপর বিষয় যেটা ঠিক করে দেয়া হয়েছে সেটাও একেবারে পচা-শহুরে মানুষের ঘুরে বেড়ানোর প্রবণতা এবং ফুটপাথ সমস্যা। এ জিনিস নিয়ে যে কেউ ভাবতে পারে, ভাবলেও অবাক লাগে তার। তথ্য জানার জন্যে লাইব্রেরি থেকে খুঁজেপেতে একটা বই নিয়ে এসেছে সে। সঙ্গে রকি বীচের একটা ম্যাপ।

স্যারকে কথা যখন দিয়েছে লিখবে, লিখতেই হবে। খানিকক্ষণ উসখুস করে কাগজ-কলম টেনে নিল সে। এই সময় বাঁচিয়ে দিল তাকে টেলিফোন।

তুলে নিয়ে কানে ঠেকাল, হালো!

কিশোর?

মিসেস সেভারনের গলা। সঙ্গে সঙ্গে কান খাড়া হয়ে গেল কিশোরের। ঢিলেঢালা ভাবটা চলে গেল। হ্যাঁ, বলছি!

কিশোর, ফিসফিস করে বললেন বৃদ্ধা, জোরে বলতে ভয় পাচ্ছেন যেন, একটা কথা…

বলে ফেলুন! উত্তেজনায় টানটান হয়ে গেছে কিশোরের স্নায়ু।

দুপুরে… ভীত মনে হচ্ছে মিসেস সেভারনকে। আসলে…

কথা শেষ করতে পারলেন না। একটা ধমক শুনতে পেল কিশোর।

এমন করছ কেন, জন! মিসেস সেভারনের কাতর কণ্ঠ শোনা গেল। কিশোরকে বললে ক্ষতি কি?

আবার শোনা গেল ধমক। মিস্টার সেভারন কি বললেন, রিসিভারে কান চেপে ধরেও বুঝতে পারল না কিশোর।

কিশোর, আবার লাইনে ফিরে এলেন মিসেস সেভারন, সরি, বিরক্ত করলাম। পরে কথা বলব…রাখি, গুডবাই।

দাঁড়ান দাঁড়ান, মিসেস সেভারন! চিৎকার করে উঠল কিশোর।

কট করে শব্দ হলো। রিসিভার নামিয়ে রাখা হয়েছে অন্যপাশে।

একটা মুহূর্ত নিজের হাতে ধরা রিসিভারটার দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। তারপর আস্তে করে নামিয়ে রাখল। ম্যানিলা রোডের ওই বাড়িটাতে রহস্যময় কোন ঘটনা যে ঘটছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই আর তার।

.

আরে এসো না, পায়ে জোর নেই নাকি তোমাদের! ফিরে তাকিয়ে বলল মুসা। সাইকেল থামিয়ে এক পা মাটিতে নামিয়ে দিয়েছে। সেভারনদের বাড়িতে চলেছে। আগের দিন বলেছিল যাবে না, কিন্তু রবিন আর কিশোর রওনা হতেই আর সঙ্গে না এসে পারেনি।

এত তাড়াতাড়ি চালাও কেন, বলো তো! কাছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল রবিন। তোমার গায়ে নাহয় জোর বেশি, আমাদের তো আর নেই।

বেশ গরম পড়েছে। মুখ লাল হয়ে গেছে তার।

হাসল মুসা। সেজন্যেই তো বলি, ব্যায়ামের ক্লাসে যোগ দাও। শরীরটাকে ফিট করে ছেড়ে দেবে।

কে যায় এত কষ্ট করতে...

তাহলে শরীরও ফিট হবে না।

কি বকবক শুরু করলে! সময় নষ্ট, প্যাডালে চাপ দিল কিশোর। চলো।

ম্যানিলা রোডে সেভারনদের বাড়ির সামনে পৌঁছল ওরা। সামনের রাস্তাটা বাদেও বাড়ির পাশ দিয়ে ঘাসে ঢাকা আরেকটা মোটামুটি চওড়া রাস্তা চলে গেছে একটা ছোট আপেল বাগানে। গাছগুলোর ফাঁকে ফাঁকে আঙুরের ঝোপ। তার ওপাশে বুনো গাছপালার জঙ্গল। বাতাসে দুলছে ফুলে ভরা ডালগুলো।

কাঠের গেটের পাশে বেড়ার গায়ে সাইকেল ঠেস দিয়ে রাখল ওরা। বাগানের দিকের রাস্তাটা ধরে এগিয়ে গেল। সামনের দরজার কাছে এসে দাঁড়াল।

খুলবে বলে তো মনে হচ্ছে না, তৃতীয়বার দরজায় টোকা দেয়ার পরেও সাড়া না পেয়ে বলল কিশোর। ভুল হয়ে গেছে। আমরা যে আসছি, ফোন করে জানিয়ে আসা উচিত ছিল।

বাইরে বেরিয়ে যায়নি তো? একটা ফুলের বেডের পাশে পঁড়িয়ে জানালা দিয়ে ভেতরে দেখার চেষ্টা করল মুসা। পর্দা টানা থাকায় কিছুই দেখতে পেল না।

উঁহু, মাথা নাড়ল কিশোর, বাইরে যেতে পারে না বলেই খাবার দিয়ে যেতে হয় ওদের। বাইরে বেরোনোর সমস্যা আছে।

মুসার হাত ধরে টান দিল রবিন, সরে এসো। এভাবে তোমাকে উঁকিঝুঁকি মারতে দেখলে আরও ঘাবড়ে যাবে ওরা।

সরে এল মুসা। পেছন দিক দিয়ে গিয়ে দেখি আছে নাকি।

কিন্তু পেছনে এসেও কাউকে দেখতে পেল না সে। কয়লার বাঙ্কারের ওপর গলা বাড়িয়ে রান্নাঘরের জানালা দিয়ে দেখার চেষ্টা করল। খালি। বাগানের ছাউনির পাশ ঘুরে এসে দাঁড়াল সাদা রঙ করা সুন্দর একটা ভিকটোরিয়ান সামার-হাউসের সামনে। জানালা দিয়ে ভেতরে তাকাল। কয়েকটা সাধারণ টুকিটাকি জিনিস ছাড়া মেঝেতে বিছানো রয়েছে পোকায় কাটা একটা পুরানো কার্পেট, দুটো ধুলো পড়া পুরানো ডেকচেয়ার, আর আপেল রাখার কয়েকটা কাঠের বাক্স। বাক্সগুলো খালি। বহু বছর এখানে কেউ ঢুকেছে বলে মনে হলো না।

বাগানের শিশিরে ভেজা ঘাস মাড়িয়ে হেঁটে গেল সে। বেড়ার গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। তাকিয়ে রইল একপাশের সবুজ তৃণভূমির দিকে। রঙবেরঙের প্রজাপতি আর বড় বড় ভোমরা উড়ে বেড়াচ্ছে ফুল থেকে ফুলে। বাটারকাপ, অক্স-আই ডেইজির ছড়াছড়ি। আর রয়েছে লম্বা, ব্রোঞ্জ রঙের এক ধরনের বুনো গুল্ম। দারুণ জায়গা! ফায়ারকে এনে ছেড়ে দিলে মন মত চরে খেতে পারবে।

হঠাৎ একটা ঝিলিক দেখতে পেল মাঠের কিনারের বনের মধ্যে। ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইল সে। কিসের আলো? টর্চ? মনে হয় না। বাচ্চারা হয়তো খেলা করছে। কোন ধাতব জিনিস বা কাঁচে প্রতিফলিত হয়েছে রোদ।

ভাবনাটা মাথা থেকে দূর করে দেবার আগেই গাছপালার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল একজন লোক। গলায় ঝোলানো জিনিসটা দূর থেকেও চিনতে পারল মুসা। দূরবীন।

একটা মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকল। বোধহয় মুসাকে দেখল। তারপর আবার চলে গেল গাছের আড়ালে। দূরবীনের কাঁচে লেগে ঝিক করে উঠল রোদ।

কে লোকটা? কটেজের ওপর চোখ রাখছিল কেন? ভাবতে ভাবতে কটেজের পাশ ঘুরে সামনের দিকে এগোল মুসা।

সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন মিস্টার সেভারন। মুসাকে দেখেই চিৎকার করে উঠলেন, অ্যাই, ছেলে, কে তুমি?

ও মুসা, মিস্টার সেভারন, তাড়াতাড়ি পরিচয় দিল কিশোর। আমাদের সঙ্গেই এসেছে। সামনের দরজায় সাড়া না পেয়ে পেছন দিক দিয়ে দেখতে গিয়েছিল।

ও, তুমিই মুসা। ধূসর চুলে আঙুল চালালেন তিনি। তিনজনেই এসেছ জানতাম না...

হেসে হাত বাড়িয়ে দিল মুসা। মিস্টার সেভরনের হাতটা ধরে রেখে চোখের ইশারায় চারপাশটা দেখিয়ে বলল, খুব সুন্দর জায়গা। ঘোড়দৌড়ের প্র্যাকটিস করার জন্যে এরচেয়ে ভাল আর হয় না।

মুসার হাতটা ছেড়ে দিয়ে মাথা ঝাঁকালেন মিস্টার সেভারন। হ্যাঁ। তবে ওখানে যেতে হলে, তৃণভূমিটা দেখিয়ে বললেন, আমার জায়গার ওপর দিয়ে ছাড়া যেতে

পারবে না। ঘোড়া চলাচলের একটা রাস্তা আছে বনের ভেতর দিয়ে। রাইডিং স্কুলের ছেলেরা মাঝে মাঝেই আসে এখানে ঘোড়ায় চড়া প্র্যাকটিস করতে। মুসার দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচালেন তিনি, ঘোড়ায় চড়তে ভাল লাগে মনে হয় তোমার?
মাথা ঝাঁকাল মুসা, লাগে। আমার নিজেরই একটা ঘোড়া আছে।
তাহলে তো ভালই। প্র্যাকটিস করতে ইচ্ছে হলে চলে এসো যে কোন সময়। আগাম অনুমতি দিয়ে রাখলাম।
থ্যাংকিউ, মিস্টার সেভারন।
চলো, রাস্তাটা দেখিয়ে আনি তোমাকে।...দাঁড়াও, এক মিনিট, আমার ছড়িটা নিয়ে আসি।...কিশোর, রবিন, তোমরা ঘরে গিয়ে বসো, আমার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলো। কথা বলার মানুষ পেলে খুশি হবে ও, তোমাদের মত শ্রোতা পেলে। ...কাল রাতের ঘটনাটা খুব রসিয়ে রসিয়ে বলতে পারবে।
কাল রাতে আবার কি ঘটল আগ্রহী হয়ে উঠল কিশোর।
সেটা তার কাছেই শুনো।
ছড়ি নিতে ঘরে ঢুকলেন মিস্টার সেভারন।
মুসার সঙ্গে বাগানের দিকে কিছুদূর এগিয়ে গেল কিশোর। সামার হাউসটা দেখে বলল, বাহ, খুব সুন্দর ভো। কাছে গিয়ে জানালা দিয়ে ভেতরে। তাকাল। কিন্তু কেউ থাকে বলে তো মনে হয় না।
কথাটা যেন মুসার কানেই গেল না। কিশোরের বাহু চেপে ধরল, কিশোর, একটা ঘটনা ঘটে গেছে।
কি?
বনের মধ্যে একটা লোক...
মানে?
কটেজের ওপর চোখ রাখছিল।
ভ্রূকুটি করল কিশোর। তুমি শিওর?
হ্যাঁ। গলায় ঝোলানো একটা দূরবীন। আমাকে দেখেই লুকিয়ে পড়ল। সন্দেহ হলো সেজন্যেই।
কেমন দেখতে?
মাথা নাড়ল মুসা, মুখ দেখিনি। লোকটা বেশ লম্বা। মাথায় চওড়া কানাওয়ালা নরম হ্যাট। ওর কাজকারবার মোটেও ভাল লাগেনি আমার।
নিচের ঠোঁট কামড়াল কিশোর। হু! হাঁটতে গেলে এখন সাবধান থাকবে। বুঝতে পারছি না, সেভারনদের বাড়ির ওপর নজর রাখতে যাবে কে! তবে যদি রেখে থাকে, কোন কারণ নিশ্চয় আছে। তারমানে সেভারনদের যারা বন্ধু, তারা লোকটার শত্রু। আমাদের জন্যে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। চোখকান খোলা

রেখো।...ওই যে, মিস্টার সেভারন বেরিয়েছেন। তোমরা। যাও। আমি আর রবিন মিসেস সেভারনের সঙ্গে কথা বলিগে। শুনি, কাল রাতে কি ঘটেছে।

.

কটেজের সামনের ঘরে রবিনকে বসতে দিলেন মিসেস সেভারন।

চাটা আমিই বানিয়ে নিয়ে আসি, মিসেস সেভারন, প্রস্তাব দিল রবিন।

রাজি হলেন না মিসেস সেভারন, না, আমিই পারব। অত দুর্বল ভেবো না। আমাকে। তোমরা আরাম করে বসো।

রান্নাঘরে চলে গেলেন তিনি।

কিন্তু বসে থাকতে ভাল লাগল না রবিনের। উঠে ম্যানটলপীসের দিকে এগিয়ে গেল জ্যাকি সেভারনের ছবিটা দেখার জন্যে। পর্দা টানা থাকায় ঘরে আলো কম। ভাল করে দেখার জন্যে নামিয়ে আনতে গেল। কাত হয়ে কার্ডবোর্ডের মাউন্ট থেকে খসে পড়ে গেল ওটা। তাড়াতাড়ি তুলে নিল আবার। আড়চোখে রান্নাঘরের দরজার দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করল মিসেস সেভারন দেখে ফেললেন কিনা।

ছবিটা আবার মাউন্টে ঢোকাতে গিয়ে ছবির নিচে প্রিন্ট করা তারিখটা চোখে পড়ল ওর। গত বছরের তারিখ : ১০ আগস্ট।

ঘরে ঢুকল কিশোর।

ছবি রেখে তার কাছে সরে এল রবিন।

মুসা কি দেখেছে, রবিনকে জানাল কিশোর।

সাবধান করে দিলে না ওকে? দূরবীনধারী লোকটার কথা শুনে চিন্তিত হলো রবিন।

করেছি।

জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল কিশোর। পর্দা ফাঁক করে তাকাল। মাঠের কিনারে পৌঁছে গেছে মুসা আর মিস্টার সেভারন। নিচু হয়ে একটা ঘাসের ডগা ছিঁড়ে নিয়ে দাতে কাটল মুসা। হাত নেড়ে তৃণভূমির অন্যপ্রান্তে কি যেন তাকে দেখাতে চাইছেন মিস্টার সেভারন।

গলাটাকে বকের মত পাশে লম্বা করে দিয়েও কিছু দেখতে পেল না কিশোর। বাইরে না গেলে দেখা যাবে না। হতাশ ভঙ্গিতে ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল সে।

ট্রে হাতে ঘরে ঢুকলেন মিসেস সেভারন। তাঁকে সাহায্য করতে উঠে গেল রবিন।

আগের দিনের সোফাটায় বসল কিশোর। এক কাপ চা এগিয়ে দিল রবিন। কফি টেবিলটায় সেটা রাখতে গিয়ে গোটা তিনেক চিঠি চোখে পড়ল কিশোরের। একটাতে সেই বিচিত্র লোগো ছাপ মারা। বাকি দুটোতে ডাক বিভাগের সীল দেখে

বোঝা যায় লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে এসেছে। ঠিকানায় মিসেস সেভারনের নাম। পেঁচানো হাতের লেখা।
হাত বাড়িয়ে একটা চিঠি তুলে নিতে গিয়েও থেমে গেল কিশোর। ন্টঅন্যের চিঠি দেখা ঠিক না। মিসেস সেভারন কিছু মনে করতে পারেন।
চায়ের কাপে চুমুক দিল সে। মুখ তুলে তাকাল বৃদ্ধার দিকে। কাল রাতে নাকি কি ঘটেছে, মিসেস সেভারন?
হ্যাঁ
শোনার জন্যে মনে মনে অস্থির হয়ে উঠেছে কিশোর। বলুন না, শুনি।
.
লম্বা ঘাস মাড়িয়ে তখন বনের কাছে পৌঁছে গেছে মুসা আর মিস্টার সেভারন। ঢুকে পড়ল বনের মধ্যে। রাস্তাটা দেখতে পেল মুসা। পুরানো ওকের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এঁকেবেঁকে এগিয়ে গিয়ে বেরিয়েছে একটা খোলা জায়গায়। পায়ের নিচে কার্পেটের মত বিছিয়ে আছে ঝরা পাতা।
কাটতে না কাটতে রাস্তায় উঠে আসে কাঁটালতা, দুদিনও যায় না, মিস্টার সেভারন বললেন। ছাত্ররাই কেটে কেটে পরিষ্কার করে রাখে।
কোন ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে থেকে কুহু-কুহু করে উঠছে একটা কোকিল। ওটার মিষ্টি স্বরের সঙ্গে পাল্লা দিয়েই যেন কর্কশ স্বরে প্রতিবাদ জানাচ্ছে ওকের ডালে বসা একটা দাঁড়কাক।
মিস্টার সেভারন জানালেন বহু শত বছর ধরে আছে এখানে বনটা।
দারুণ জায়গা! ঘোড়া নিয়ে সত্যি আসতে পারব তো? কোন অসুবিধে হবে না?
না, হবে না। যখন খুশি চলে এসো।
অদ্ভুত এই বনটার ভেতর দিয়ে ঘোড়া ছোটাতে কেমন লাগবে ভাবতেও রোমাঞ্চিত হলো মুসা।
মিস্টার সেভারন বলে চলেছেন, এই এলাকার সবচেয়ে পুরানো বন এটা। লোকে এখনও বেড়াতে এসে মজা পায় এখানে। তবে কদ্দিন পাবে আর জানি না। যে হারে কাটাকাটি শুরু হয়েছে...আমি যখন যুবক ছিলাম, তখনও অনেক বড় ছিল ওই বন। মাঠের ওপাশটাতেও ঘন বন ছিল। সব তো কেটে সাফ করেছে।
ওই যে নতুন স্পোর্টস সেন্টার আর শপিং সেন্টার খুলেছে ওটার কথা বলছেন?
হ্যাঁ, বিষণ্ন হয়ে গেল মিস্টার সেভারনের দৃষ্টি। আর কিছুদিন পর খোলা জায়গা বলতে কিছু থাকবে না। সব বাড়িঘর দিয়ে ভরে ফেলবে।
গাছপালার ফাঁক দিয়ে একটা সরু রাস্তা চোখে পড়ছে। তাতে একটা সাদা রঙের ভ্যানগাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল মুসা।

কার গাড়ি? মিস্টার সেভারনও দেখেছেন। এ রকম জায়গায় তো গাড়ি পার্ক করে না কেউ।
একটু আগে একটা লোককে দেখেছি আমি। দূরবীন দিয়ে আপনাদের বাড়ির ওপর চোখ রাখছিল।
থমকে দাঁড়ালেন মিস্টার সেভারন। কি বলছ! চলো চলো, ফিরে যাই। মিসেস সেভারনকে একা ফেলে এসেছি!
তার উদ্বেগ দেখে অবাক হলো মুসা। একা কোথায়? কিশোর আর রবিন আছে। কেউ কিছু করতে পারবে না তার।
মুসার কথা শেষও হলো না, বনের মধ্যে গুলির শব্দ হলো। লাফিয়ে উঠল মুসা। এত কাছে কে গুলি করছে? শব্দ লক্ষ করে সে ঘুরতেই দেখতে পেল লোকটাকে। চোখের পলকে গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল ছায়ার মত।
এখানে কি শিকারের অনুমতি আছে? জানতে চাইল সে।
মাথা নাড়লেন মিস্টার সেভারন। ভুরু কোচকালেন। না। কে গুলি ছুড়ছে বুঝতে পারছি না। ওই ভ্যানে করেই এসেছে মনে হচ্ছে। ভ্যানের ছাতে চড়ে বেড়া ডিঙানো সম্ভব।
আবার গুলির শব্দ। হাই ভেলোসিটি শটগান থেকে ছোঁড়া হচ্ছে। অতিরিক্ত কাছে।
ভয় লাগছে মুসার। এখানে থাকাটা নিরাপদ মনে হচ্ছে না আমার। কোন্ সময় এসে গায়ে লাগে!
গাছের ফাঁকে আবার ছায়ামূর্তিটাকে চোখে পড়ল মুসার। কাঁটাঝোপের কাছে বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে এদিকেই তাকিয়ে আছে। হাতের বন্দুকের নল এদিকে ফেরানো।
সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কাঁধে বন্দুকের বাঁট ঠেকিয়ে নিশানা করল লোকটা।
মিস্টার সেভারনের হাত ধরে টান দিল মুসা, চলুন। লোকটার ভাবসাব সুবিধের লাগছে না আমার।
তৃতীয়বার গুলির শব্দ হলো। ওদের মাথার ওপরের ডালে ছরছর করে এসে লাগল ছররা। ঝট করে মাথা নিচু করে ফেলল দুজনে।
পাখি তো কই, উড়ছে না, ফিসফিস করে বলল মুসা। আমাদেরকেই নিশানা করছে না তো?
হাতটা ধরে রেখেই বুঝতে পারছে সে, মিস্টার সেভারন কাঁপতে শুরু করেছেন। মাথা নেড়ে কম্পিত গলায় বললেন, মনে হয় না!
চুপ করে থাকুন। তাহলে ও মনে করবে আমরা চলে গেছি। হয়তো আর গুলি করবে না।

ঝোপের মধ্যে ঘাপটি মেরে বসে রইল দুজনে। বুকের মধ্যে টিপ টিপ করছে মুসার হৃৎপিণ্ডটা। ভয় হতে লাগল, সেই শব্দও শুনে ফেলবে লোকটা। ঝোপঝাড় ভেঙে কে যেন এগিয়ে আসতে লাগল।
ওদের ঝোপটার কাছে এসে দাঁড়াল একজোড়া বুট। পা ফাঁক করে দাঁড়াল। পায়ের সামনে তেরছা ভাবে এসে পড়েছে সূর্যরশ্মি। পকেট থেকে আরও দুটো কার্তুজ বের করে বন্দুকে ভরল সে। ধীরে ধীরে বন্দুক তুলে। নিশানা করল ওদের দিকে।

.

দম আটকে ফেলল মুসা। চারপাশটা বড় বেশি নীরব। পাতার ফাঁক দিয়ে তাকাল আবার লোকটার দিকে। এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। খুজছে কাউকে।
একটা পাথর তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারল মুসা। গাছের গায়ে লেগে ঝোপের মধ্যে গড়িয়ে পড়ল পাথরটা।
আবার ঝোপঝাড় ভেঙে সেদিকে ছুটল লোকটা। কাঁটাঝোপে পা বেধে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। চাপা গোঙানি শোনা গেল। হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে আবার দিল দৌড়।
লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে মিস্টার সেভারনকে হাত ধরে টেনে তুলল মুসা। যে পথে এসেছিল, তাঁকে নিয়ে সেই পথটা ধরে ছুটল কটেজের দিকে। ঝোপের ধারে দুটো কার্তুজের খোসা পড়ে থাকতে দেখে কুড়িয়ে নিল। এখনও গরম। পরে ভাল করে দেখবে ভেবে ঢুকিয়ে রাখল জিনসের পকেটে।
মিস্টার সেভারন, পুলিশকে জানানো দরকার এখনই। ওই লোকটা পাগল।
মুসাকে অবাক করে দিয়ে মাথা নাড়লেন মিস্টার সেভারন। না। আমি পুলিশের কাছে যাব না।
কিন্তু আরেকটু হলেই আমাদের খুন করে ফেলেছিল! ঘোড়ায় চড়ে আসাটা তো এখানে বিপজ্জনক। গুলির শব্দে ভয় পেয়ে গেলে পিঠ থেকে সওয়ারী উল্টে ফেলে পালানোর চেষ্টা করবে ঘোড়া। মারাত্মক অ্যাক্সিডেন্ট ঘটাবে। লোকটা ভীষণ বিপজ্জনক।
তার পরেও পুলিশের কাছে যেতে রাজি হলেন না মিস্টার সেভারন। জ্যাকেটে লেগে থাকা শুকনো পাতা ঝেড়ে ফেলে বললেন, লোকটা চলে গেছে এতক্ষণে। আমার ধারণা, ভুল করেছে সে। হরিণ-টরিণ বা ভালুক ভেবে আমাদের গুলি করেছে।
তাহলেও মস্ত অপরাধ করেছে সে, কারণ এখানে শিকার করা বেআইনী। তার ভুলের জন্যে মারাত্মক জখম হতে পারতাম আমরা। এ ভাবে যেখানে সেখানে

গুলি চালানোর জন্যে তো আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স দেয়া হয় না। পুলিশকে না জানালে এখন সেটা আমাদের অপরাধ বলে গণ্য হবে।
বন থেকে বেরিয়ে দেখল ওদের দিকে দৌড়ে আসছে রবিন।
কি হয়েছে? দূর থেকেই চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল সে। গুলির শব্দ শুনলাম।
একটা উন্মাদ আমাদের ভয় দেখানোর চেষ্টা করছিল, জবাব দিল মুসা।
কেন? কাছে চলে এসেছে রবিন।
ভুল করেছে, মুসাকে কথা বলতে দিলেন না মিস্টার সেভারন। শটগান থেকে গুলি ছোঁড়ার প্র্যাকটিস করছিল বোধহয়। দুই আঙুলে টিপে ধরে কাপড় থেকে আরেকটা পাতা তুলে ফেলে দিলেন তিনি। কোন ক্ষতি হয়নি আমাদের।
অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে মুসা। ঘটনাটাকে দুর্ঘটনা বলে চালাতে চাইছেন মিস্টার সেভারন।
ছড়িতে ভর দিয়ে দিয়ে দ্রুত বাড়ির দিকে এগিয়ে চললেন তিনি।
রবিনের হাত চেপে ধরল মুসা, রবিন, একটা লোক সত্যি সত্যি আমাদের ভয় দেখাতে চেয়েছিল।
তোমাকে নয় নিশ্চয়; ভয়টা আসলে দেখাতে চেয়েছে মিস্টার সেভারনকে, চিন্তিত ভঙ্গিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে রবিন। এমনিতেই তো যথেষ্ট ভয়ের মধ্যে আছেন তাঁরা, আর কত?
সব শুনে মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল মিসেস সেভারনের।
আরও যে কত কি ঘটবে খোদাই জানে! দুই হাতে মাথা চেপে ধরলেন। তিনি। কাল রাতে এ রকম একটা ব্যাপার...তারপর এখন এই! টিকতে দেবে না।
কাল রাতে কি হয়েছিল? জানতে চাইল মুসা।
ভূতের উপদ্রব আছে যে ঘরটায়, জবাব দিল কিশোর, সেটাতে নাকি অদ্ভুত শব্দ শুনতে পেয়েছেন মিসেস সেভারন।
ভয়ানক শব্দ! মিসেস সেভারন বললেন। মনে হলো নাকি স্বরে কাঁদছে কেউ, তারপর আবার খিলখিল করে হাসছে। ইনিয়ে বিনিয়ে কি সব বলছে।
জিনিসপত্রও নাকি তছনছ করেছে, কিশোর বলল।
ছায়ামূর্তিটার কথা বাদ দিচ্ছ কেন? রবিন বলল।
স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে অধৈর্য কণ্ঠে বললেন মিস্টার সেভারন, তারমানে বলে দিয়েছ ওদের! এ সব অতি কল্পনা...
না, কল্পনা নয়, রেগে উঠলেন মিসেস সেভারন, আমি দেখেছি ওটাকে! কোন ভুল ছিল না। ফিনফিনে পোশাক পরা কুয়াশার মত একটা ধূসর মূর্তি হালকা পায়ে ছুটে গেল লনের ওপর দিয়ে।

বোঝানোর চেষ্টা করলেন মিস্টার সেভারন, দেখো, কুয়াশার মধ্যে চাঁদের আলোয় অদ্ভুত সব আকৃতি তৈরি হয়, বাতাসে কুয়াশা উড়ে বেড়ানোর সময় মনে হয় মানুষ হাটছে...
জোরে জোরে মাথা নেড়ে মিসেস সেভারন বললেন, না, আমি যা দেখেছি ঠিকই দেখেছি। চাঁদের আলোয় কুয়াশায় কি হয় না হয় জানা আছে। আমার।
স্বামী-স্ত্রীর তর্কটা বন্ধ করার জন্যে কিশোর বলল, ঘরটা আমাদের দেখাবেন বলেছিলেন?
তা তো দেখাবই। নিশ্চয় দেখাব, মিসেস বললেন। তোমরা গোয়েন্দা। দেখো, কিছু বুঝতে পারো নাকি।
ওদের নিয়ে চললেন তিনি। ভূতুড়ে ঘরটা রয়েছে বাড়ির পেছন দিকে, রান্নাঘরের পরে।
বাড়ির সবচেয়ে পুরানো অংশ এটা, সঙ্গে সঙ্গে এসেছেন মিস্টার সেভারন। স্থানীয় একজন মিস্ত্রি বানিয়ে দিয়ে গিয়েছিল, মিস্টার জারভিস যখন থাকতেন। আমাদের আগের মালিক মিস্টার জারভিস, তাঁর কাছ থেকেই বাড়িটা কিনেছি। পেছনের এই দিকটা তেমন ব্যবহার করি না আমরা। জ্যাকি এ ঘরটাকে তার স্টাডি বানিয়েছিল। এখানকার জিনিসপত্র বেশির ভাগই তার। কিন্তু... থেমে গেলেন তিনি। তারপর বললেন, ভূত নিয়ে মাথাব্যথা ছিল না তার।
দরজা খুললেন মিসেস। সঙ্গে সঙ্গে এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস এসে লাগল গোয়েন্দাদের গায়ে। শীতের বাতাসের মত।
খাইছে! চমকে গেল মুসা। কিশোরের হাত খামচে ধরল।
হাতটা ছাড়িয়ে নিল কিশোর। ভয় পাচ্ছ?
নীরবে মাথা নাড়ল মুসা।
এ ঘরে আসতে আমার ভাল লাগে না, কেঁপে উঠলেন মিসেস সেভারন। গায়ে কাঁটা দিল মনে হলো। জ্যাকি চলে যাওয়ার পর এটাকে সেলাইয়ের ঘর বানিয়েছিলাম আমি। কিন্তু এমন ঠাণ্ডার ঠাণ্ডা, হাড়ের মধ্যে ব্যথা শুরু হয়ে যায় আমার।
সাবধানে ঘরে পা রাখল তিন গোয়েন্দা। কেঁপে উঠল কিশোর। তার টি শার্ট আর সুতির প্যান্ট ঠাণ্ডা ঠেকাতে পারছে না। বাইরে কড়া রোদ থাকা সত্ত্বেও ঘরটার মধ্যে ডিসেম্বরের বিকেলের মত ঠাণ্ডা।
বাপরে! সত্যি ঠাণ্ডা! রবিন বলল।
রোদ লাগে না কোন দিক দিয়ে, মিস্টার সেভারন বললেন। ঘরের মধ্যে নেই কোন ধরনের হীটিং সিসটেম। শীতকালে যে আর্দ্রতা ঢেকে, সেটা আর বেরোতে পারে না। সারা বছর সেঁতসেঁতে হয়ে থাকে। গরম হবে। কোত্থেকে।

আগুন জ্বেলেও গরম করার চেষ্টা করে দেখেছি, মিসেস বললেন। কাজ হয়নি। যে ঠাণ্ডা সেই ঠাণ্ডা।
নিচে একটা পুরানো সেলার আছে, মিস্টার সেভারন বললেন। সেটাতে আছে চিমনি। সেই চিমনি দিয়ে নিচের ঠাণ্ডা ওপরে উঠে আসে।
আগের মালিক কিছু জিনিসপত্র ফেলে গেছেন, হাত তুলে দেখালেন মিসেস সেভারন। ওই যে কার্পেটটা, ওটা ছিল তাদের। নতুন বাড়ি করে চলে গেছেন, তাতে এ জিনিস মানাবে না-বেশি পুরানো আমলের, তাই ফেলে গেছেন। আর ওই বুকশেলফটাও…
কিশোর দেখল, মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ে আছে কতগুলো বই। দেয়াল থেকে খুলে পড়েছে একটা ছবি। কেউ ফেলে দিয়েছে মনে হচ্ছে। পুরানো কার্পেটটা মেঝের বেশির ভাগ অংশই ঢেকে রেখেছে, জায়গায় জায়গায় দুমড়ানো। টেনে সোজা করে দেয়ার জন্যে নিচু হলো সে।
অবাক কাণ্ড! কিশোরকে দোমড়ানো জায়গাগুলো সমান করতে দেখে মিসেস সেভারন বললেন, আমি তো ভেবেছিলাম, ওটা, পেরেক দিয়ে লাগানো। সোজা হবে না। কুঁচকালও, সোজাও হচ্ছে আবার।
মেঝেতে পড়ে থাকা জিনিসগুলো তুলে সেলাইয়ের জিনিসপত্র রাখার বাক্সে রাখল রবিন। কিশোরকে সাহায্য করার জন্যে কার্পেটের একদিক ধরে টান দিল। নড়ল না। মেঝের তক্তার সঙ্গে আটকানো রয়েছে এদিকটা। বাক্সটা দিল মিসেস সেভানের হাতে।
গির্জায় যারা বিয়ে করতে আসে, তাদের পোশাক বানাতাম আমি, মিসেস সেভারন বললেন। এখন আর পারি না। কাজ করতে গেলেই আঙুল কেমন আঁকড়ে আসে।
আশ্চর্য! ঘরের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে বলল কিশোর। দেয়ালের কাঠের রঙ গাঢ় বাদামী। চেহারাটা কেমন বিষণ করে দিয়েছে ঘরটার। দেখলে অবশ্য ভূতুড়েই মনে হয়।
তুমি বলছ এ কথা! নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না মুসা।
ভূতুড়ে লাগলেই যে ভূত থাকতে হবে এমন কোন কথা নেই।
ভূতুড়ের মানে কি তাহলে?
জবাব দিল না কিশোর।
জানালার কাছে একটা চেয়ারে বসে পড়লেন মিস্টার সেভারন। মিসেস দলে ভারী হয়ে যাচ্ছেন দেখে যেন হতাশ হয়েছেন।
আপনি বিশ্বাস করেন না এ সব? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
না, মাথা নাড়লেন মিস্টার সেভারন।

মেঝেতে জিনিসপত্র ছড়িয়ে পড়ল কি করে? কেউ তো নিশ্চয় ফেলেছে।
তার হয়ে জবাবটা দিয়ে দিল রবিন, ভূমিকম্পেও পড়তে পারে। ক্যালিফোর্নিয়ায় তো আর ভূমিকম্পের অভাব হয় না, যখন তখন কেপে ওঠে মাটি।
তাহলে বাকি ঘরগুলোর জিনিস মাটিতে পড়ল না কেন? প্রশ্ন করলেন মিসেস সেভারন।
শুকনো হাসি হাসলেন মিস্টার সেভারন। বিশ্বাসই যখন করো, আসল কথাটাই বলে দাও ওদের।
আসল কথা? ভুরু কুঁচকাল কিশোর। জোয়ালিন।
জোয়ালিন!
পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল তিন গোয়েন্দা। মিস্টার সেভারনকে জিজ্ঞেস করল কিশোর, জোয়ালিনটা কে?
এক এক করে তিনজনের দিকে তাকালেন মিস্টার সেভারন। লম্বা দম ছাড়লেন। তারপর বললেন, ভূত!
.
আবার দৃষ্টি বিনিময় করল গোয়েন্দারা।
মুসা ভাবছে, সত্যি সত্যি তাহলে বাড়িটাতে ভূতের উপদ্রব আছে! একটা মেয়ের ভূত রাত দুপুরে সত্যি ঘুরে বেড়ায় বাড়িময়।
ওদের দিকে তাকিয়ে কোনমতে মুখে হাসি ফোঁটালেন মিসেস সেভারন। তারপর ফিরলেন স্বামীর দিকে। গল্পটা শুনিয়েই দাও না ওদের।
চেয়ারে হেলান দিলেন মিস্টার সেভারন। এই কটেজটা এক সময় অনেক বড় ছিল। আঠারোশো শতকে তৈরি করা একটা দুর্গের অংশ এটা। এই ঘরটা ছিল বিশাল ডাইনিং রুমের অংশ। মালিক ছিল ওয়ারনার নামে এক ধনী লোক। ওদের একমাত্র মেয়ে জোয়ালিন। অপূর্ব সুন্দরী। জন্মেছিল নববর্ষের দিনে। মা-বাবার চোখের মণি।
ভূতে ধরল কি করে তাকে? ফিসফিস করে বলল মুসা। ভয়ও পাচ্ছে, কৌতূহলও দমন করতে পারছে না।
শোনোই না! রবিন বলল।
এক জিপসি যুবকের প্রেমে পড়েছিল সে, মিস্টার সেভারন বললেন।
চেপে রাখা দুমটা আস্তে করে ছাড়ল রবিন। বাহ বেশ রোমান্টিক তো!
গুঙিয়ে উঠল মুসা। রোমান্টিক দেখলে কোথায়? এ তো ডবল ভূতের আলামত!
মিস্টার সেভারন বললেন, তার বাবার ধারণা ছিল, ওদের টাকা-পয়সা দেখেই মেয়ের দিকে হাত বাড়িয়েছে যুবক। ওসবের লোভে। তা ছাড়া সামান্য এক

জিপসি যুবককেও পছন্দ করতে পারছিল না সে। অনেক বুঝিয়ে-শুনিয়েও মেয়েকে ফেরাতে না পেরে শেষে ঘরে তালা দিয়ে রাখল।
সেই পুরানো কাহিনী! কিড়বিড় করল কিশোর। বড়লোক বাপ তার মেয়েকে কোনমতেই এক ছন্নছাড়ার হাতে তুলে দিতে চায় না। অতএব দুর্ঘটনা! তাই তো?
মাথা ঝাঁকালেন মিস্টার সেভারন। বাপের ওপর অভিমান করে মেয়ে কোন খাবারই স্পর্শ করল না; না খেয়ে খেয়ে মারা গেল।
এই ঘরের মধ্যে! আঁতকে উঠল মুসা। চারপাশে তাকাতে লাগল এমন ভঙ্গিতে, যেন এখনই ভূতটা বেরিয়ে এসে ঘাড়ে চাপবে ওর।
না, এখানে না, অন্য আরেকটা ঘরে; বহু আগেই আগুনে পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে ওটা। দুর্গে আগুন লেগেছিল। তবে, এ ঘরে না মরলেও, ওদের দিকে তাকিয়ে নাটকীয় ভঙ্গিতে হেসে বললেন মিস্টার সেভারন, এখানে রাতের বেলা চুরি করে জোয়ালিনের সঙ্গে দেখা করতে আসত যুবক।
খাইছে! মুসার ভঙ্গি দেখে মনে হলো সময় থাকতে উঠে চলে যাবে। কিনা ভাবছে।
জোয়ালিনের আর কোন ভাই-বোন ছিল না। তার মৃত্যুর পর খুব বেশিদিন আর বাঁচেনি তার বাবা-মা। পুরো পরিবারটাই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। লোকে বলে, জোয়ালিন এখনও তার প্রেমিকের অপেক্ষায় আছে। রাতের বেলা নাকি বেরিয়ে পড়ে তারই খোঁজে।
গল্প শেষ হওয়ার পরে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত চুপ করে রইল তিন গোয়েন্দা।
ঘোরের মধ্যে থেকে যেন বলে উঠল রবিন, বেচারি!
কি সব মানুষ! বিরক্ত হয়ে বলল মুসা, খাবার নিয়ে আবার কেউ গোসসা করে নাকি? মরার যেন আর কোন উপায় খুঁজে পেল না!
না খেয়েই নাহয় মরল, মিস্টার সেভারন বললেন, কিন্তু তাতেই কি ভূত হয়ে যেতে হবে নাকি? আসলে এ রকম ইমোশনাল গল্প ভালবাসে লোকে, সেজন্যেই তৈরি করে।
তবে, কিশোর বলল, মিসেস সেভারন যদি রাতের বেলা কিছু দেখেই থাকেন, তার কোন একটা বাস্তব ব্যাখ্যা নিশ্চয় রয়েছে।
রবিন বলল, আপনাদের কেউ ভয় দেখাতে চেয়েছে।
চট করে পরস্পরের চোখের দিকে দৃষ্টি চলে গেল বুড়ো-বুড়ির, কিশোরের চোখ এড়াল না সেটা।
এস্টেট থেকে আসা পোলাপানগুলো হতে পারে, মিস্টার সেভারন বললেন। ওদেরকে এদিকে ঘোরাফেরা করতে দেখেছি আমি। নিশ্চয় ভূতের গুজবটা ওরা শুনেছে। রাতে ভয় দেখাতে এসেছে আমাদের।

মেঝেতে পড়ে থাকা একটা বই তুলে নিল কিশোর। মলাট ওল্টাল। সাদা পাতাটায় পেঁচানো অক্ষরে লেখা রয়েছে একটা নাম-জ্যাকুয়েল সেভারন। চিঠির ঠিকানার হাতের লেখা আর এই লেখার সঙ্গে মিল রয়েছে। অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে মাথা দুলিয়ে বলল, তারমানে ওরা ভাল ছেলে না। ভাল হলে রাতের বেলা অন্যের বাড়িতে ঢুকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করত না। ওরা আরও খারাপ কিছু করতে পারে। চুরিদারি, কিংবা যা খুশি। সাবধান থাকতে হবে আপনাদের। জানালায়ও তালা লাগাতে হবে। পুরানো আমলে তৈরি এ সব জানালা সহজেই বাইরে থেকে খুলে ফেলা যায়।
হ্যাঁ, কিশোরের সঙ্গে একমত হলেন মিস্টার সেভারন।
ঘর দেখা হয়েছে। সারি বেধে বেরোনোর সময় জিজ্ঞেস করল কিশোর, গুজবটা কি সবাই জানে নাকি এদিকের?।
জানে, মাথা আঁকালেন মিস্টার সেভারন। আগের মালিক তো তার বাড়িতে যে ভূত আছে এটা নিয়ে গর্বই করত। আমরা বাড়িটা কেনার আগে জ্যাকি যখন দেখতে এসেছিল, সব বলেছিল তাকে জারভিস। জ্যাকি গিয়ে সবখানে গপ মেরে ছড়িয়েছে, তার বাবা একটা ভূতুড়ে বাড়ি কিনতে যাচ্ছে। বলেছে হয়তো মজা করার জন্যেই, কিন্তু...।
এই সময় বাড়ির বাইরে থেকে ডাক দিল কে যেন। জানালার পর্দা সরাতে দেখা গেল ডাক পিয়ন। দরজার নিচ দিয়ে কয়েকটা চিঠি ঠেলে দিয়ে চলে গেল সে।
তুলে নিলেন মিস্টার সেভারন। ঠিকানাগুলো পড়তে লাগলেন। উদ্বিগ্ন মনে হলো তাকে।
কৌতূহলী হয়ে গলা বাড়িয়ে দিল কিশোর। একটা চিঠিতে দেখল সেই একই রকম লোগো। এস আর এইচ অক্ষর দুটো একটার সঙ্গে আরেকটা পেঁচিয়ে লিখে তৈরি করা হয়েছে লোগোটা।
ওদের চিঠিও আছে?
কাদের চিঠি, নামটা ইচ্ছে করেই যেন চেপে গেলেন মিসেস সেভারন।
মিস্টার সেভারনও একই রকম চেপে যাওয়া ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে গম্ভীর স্বরে বললেন, হ্যাঁ।
চিঠিগুলো হলের টেবিলে রেখে দিলেন তিনি।
ও আমাদের ছাড়বে না! বিড়বিড় করে বললেন মিসেস সেভারন।

.

দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে তিন গোয়েন্দাকে বিদায় জানালেন দুজনে।
রাস্তা দিয়ে কয়েকশো গজ এসে দাঁড়িয়ে গেল কিশোর। সাইকেল থেকে নেমে সাইকেলটা ঠেস দিয়ে রাখল একটা দেয়ালে। দুই সহকারীকে জিজ্ঞেস করল,

তারপর? কে কি সূত্র পেলে?
আমি পেয়েছি, রাগত স্বরে বলল মুসা, একটা খুনীকে! বনের মধ্যে। আরেকটু হলেই ফুটো করে দিয়েছিল আমাকে। পকেট থেকে কার্তুজের ন্টখোসা দুটো বের করল মুসা। এই দেখো। তুলে নিলাম যখন, তখনও গরম ছিল।
একটা খোসা হাতে নিয়ে দেখতে দেখতে বলল কিশোর, একটু অন্য রকম।
মানে? কিশোরের হাত থেকে খোসাটা নিয়ে রবিনও দেখতে লাগল।
চাচা একবার একটা পুরানো বন্দুক কিনে এনেছিল, কয়েক বাক্স পুরানো গুলি সহ, কিশোর বলল। গুলিগুলো এ রকম ছিল। চাচা বলেছে, ঘরে বানানো গুলি ছিল ওগুলো।
কিশোরের হাতে খোসাটা ফিরিয়ে দিল রবিন। এ রকম গুলি কখনও দেখিনি আমি। কোন মন্তব্য করতে পারব না।
আমিও দেখিনি,মুসা বলল।
হু, ওর দিকে তাকাল কিশোর। একটা লোক ভয় দেখিয়ে তাড়াতে চাইল, দুটো গুলির খোসা পেলে; এ ছাড়া আর কিছু?
মাথা নাড়ল মুসা। না। লোকটার চেহারা দেখতে পারলে ভাল হত। পাতার জন্যে ওপরটা দেখা যাচ্ছিল না। কাছে এসে যখন দাঁড়াল, চোখে পড়ল শুধু গাঢ় রঙের জ্যাকেটের নিচের অংশ। জিনসের প্যান্ট ছিল পরনে। পায়ে বুট। আর দশজন সাধারণ মানুষের মত।
দূরবীন দিয়ে চোখ রাখছিল যে লোকটা, সে-ই তাহলে?
কাঁধ ঝাঁকাল মুসা, আর কে হবে।
ইস, আল্লাহ বাঁচিয়েছে! ওর কাঁধে হাত রাখল কিশোর, গুলি যে লাগেনি তোমার গায়ে! সর্বনাশ হয়ে যেত!
হ্যাঁ, আমি মারা যেতাম, কৃত্রিম গাম্ভীর্য নিয়ে বলল মুসা। এতিম হয়ে যেতে তোমরা।
হাসল কিশোর।
ওকে জিজ্ঞেস করল রবিন। তুমি কি জেনেছ?
কিছু চিঠি দেখেছি, তার মধ্যে দুটো চিঠি এসেছে কোন একটা কোম্পানি থেকে। লোগো দুটো এক। আরেকটা জিনিস অনুমান করছি-কেউ একজন। হুমকি দিচ্ছে সেভারনদের?
হুমকি; তারমানে ব্ল্যাকমেল?
জানি না। মিসেস সেভারন কি বললেন শুনলে না? ও আমাদের ছাড়বে না। এই ও-টা কে?
রবিন কোন জবাব দিতে পারল না। জিজ্ঞেস করল, লোগোটা দেখতে কেমন?

নোটবুক বের করে কলম দিয়ে তাতে এস এবং এইচ অক্ষর পেঁচিয়ে একটা ছবি আঁকল কিশোর। সেটা দেখিয়ে বলল, এই যে, এই রকম। দেখেছ কখনও?
মাথা নাড়ল রবিন।
মুসাও মাথা নেড়ে বলল, না। কি এঁকেছ, মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে পারছি না।
বোঝা যাবে, পরে, নোটবুকটা পকেটে রাখতে রাখতে বলল কিশোর, এ সব ছাড়াও ওবাড়িতে আছে একটা ভূতুড়ে ঘর। সারা ঘরে জিনিসপত্র ছড়িয়ে রেখে যাওয়ার ব্যাপারটা ইঙ্গিত করে, ওদের ভয় দেখাতে চাইছে কেউ। ঘরটা ভূতুড়ে হলেও কাজটা ভূতের নয়, এটা ঠিক।
জোয়ালিনের গল্প তুমি বিশ্বাস করছ না তাহলে? ভুরু কোঁচকাল মুসা।
গল্প গল্পই। তবে ঘটনা যা ঘটছে, তাতে ভূতের হাত নেই, আছে জলজ্যান্ত মানুষের হাত। কেউ ঘরে ঢুকে জিনিসপত্রগুলো ছড়িয়ে ফেলে গেছে, কোন সন্দেহ নেই আমার তাতে।
তাহলে আমাদের জানতে হবে এখন, রবিন বলল, সেই শয়তান। লোকটা কে এবং কেন এই উৎপাত করছে।
ঠিক, মুসা বলল।
কিন্তু জানা যাবে কি করে?
সেকথায় পরে আসছি। তার আগে আরেকটা কথা বলে নিই-লোগো। ছাড়াও আরও কয়েকটা চিঠি দেখেছি আমি। ঠিকানার ওপর যে রকম হাতের লেখা, জ্যাকির বইতেও একই রকম লেখা দেখেছি। তারমানে...
চিঠিগুলো জ্যাকির কাছ থেকে এসেছে। কথাটা শেষ করে দিল রবিন। উত্তেজিত মনে হলো তাকে।
মাথা ঝাঁকাল কিশোর। হ্যাঁ। পোস্টমার্কও দেখেছি। যেখান থেকে চিঠিগুলো এসেছে সেখানকার পোস্টমার্ক।
কোনখান থেকে?
লস অ্যাঞ্জেলেস।
লস অ্যাঞ্জেলেসের কোনখান থেকে?
তা কি করে বলব?
নিরাশ হলো রবিন। তাহলে আর লাভটা কি হলো! ঠিকানা না জানলে কিছু বের করা যাবে না।
জানব। শুরুতেই হাল ছেড়ে দিচ্ছ কেন? সবে তো তথ্য পেতে আরম্ভ করেছি আমরা।
পকেট থেকে চকলেট বের করে মোড়ক ছাড়াল মুসা। শান্ত থাকতে হলে চকলেটের বিকল্প নেই। একটা টুকরো ভেঙে রবিনকে দিল সে। আরেকটা

কিশোরকে। বাকিটা নিজের মুখে ফেলে চিবাতে শুরু করল।
চকলেট মুখে দিয়ে হাসি ফুটল রবিনের মুখে।
হেসে মাথা ঝাঁকাল মুসা, দেখলে তো, মগজটা কেমন হালকা হয়ে। গেল? চকলেটের বিকল্প নেই।
চকলেট গালে ফেলে কিশোর বলল, বাড়ি যাওয়া দরকার। ওই পচা প্রবন্ধটা শেষ করে ফেলতে হবে। যত তাড়াতাড়ি ঘাড় থেকে নামানো যায় ততই মঙ্গল। হুহ, আর কাজ পেল না, পথিকদের নিয়ে প্রবন্ধ। নামটাও বাজে-ফুটপাথ এবং পথচারী!
সত্যি, মুখ বাঁকাল মুসা, পচা সাবজেক্টই। তুমি না নিলেই পারতে।
কি করব না নিয়ে যে ভাবে চাপাচাপি শুরু করল…
তা ঠিক। মিস্টার গোবরেডকে এড়ানোই মুশকিল। বাচলাম। আমি এ সব লেখালেখির মধ্যেও নেই, আমাকে গছাতেও পারবে না…
সাইকেলটা রাস্তায় এনে উঠে বসল কিশোর। রবিন আর মুসাও চড়ল যার যারটায়। এগিয়ে চলল আবার।
পথের মোড়ে হঠাৎ দেখা গেল সাদা একটা ভ্যান। টায়ারের আর্তনাদ তুলে তীব্র গতিতে ছুটে আসছে।
খাইছে! বলেই ব্রেক কষে গতি কমিয়ে ফেলল মুসা। ভ্যানটাকে দেখেছি!
কোথায়? কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইল কিশোর।
বনের মধ্যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিল। আমি আর মিস্টার সেভারন দুজনেই দেখেছি।
সাবধান হয়ে গেল কিশোর। মুসার কথা শুনে নয়, গাড়িটাকে অস্বাভাবিক দ্রুত ছুটে আসতে দেখে। সরু রাস্তায় আরও যে যানবাহন আছে কেয়ারই করছে না যেন গাড়িটা। গতি বাড়াচ্ছে বরং। কিছু বলতে যাচ্ছিল সে, এঞ্জিনের শব্দে চাপা পড়ে গেল।
সরে যাবার চেষ্টা করল। বেধে গেল মুসার সাইকেলে। হ্যান্ডেলবারটা ছাড়িয়ে আনার জন্যে টানাটানি শুরু করল কিশোর।
ছাড়ো, ছাড়ো! চিৎকার করে উঠল মুসা। লাফ দিয়ে নেমে কিশোরের হাত ধরে হ্যাঁচকা টানে সরিয়ে নিয়ে এল রাস্তার পাশে। আছড়ে পড়ল সাইকেল দুটো।
আরে! চিৎকার করে উঠল রবিন, ইচ্ছে করে চাপা দিতে চাইছে!
কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল কিশোর। তাকিয়ে আছে ভ্যানটার দিকে। গর্জন করে মোড়ের ওপাশে হারিয়ে যাচ্ছে ওটা। ফিরে তাকাল দুই সহকারীর দিকে। তোমাদের লেগেছে?
সামান্য, মুসা বলল। এই ভ্যানটাকেই জঙ্গলের মধ্যে দেখেছিলাম। হলো কি লোকটার? বনের মধ্যে গুলি করল, রাস্তায় বেরিয়ে চাপা দিতে চাইল! মাতাল

নাকি? হাতের তালুর দিকে তাকাল সে। ঘষা লেগে ছড়ে গেছে।
উঁহু, মাথা নাড়ল কিশোর, আমার মনে হয় সেভারনদের বাড়ি থেকে আমাদের বেরোতে দেখেছে সে। কোন কারণে ভয় দেখাতে চাইছে আমাদের।
সাইকেলটা তুলল সে। ছিঁড়ে বেঁকে যাওয়া একটা স্পোক সোজা করল।
একই দিনে দুই দুইবার অল্পের জন্যে বাচলাম আজ, শুকনো কণ্ঠে মুসা। বলল। গোয়েন্দাগিরির কাজটা বড় বেশি বিপজ্জনক।
ছেড়ে দিতে চাও?
না না, ছাড়ার কথা বলছি না।
লোকটার চেহারা দেখেছ? শার্ট থেকে ময়লা ঝেড়ে ফেলল রবিন।
মাথা নাড়ল কিশোর, না। গাঢ় রঙের জ্যাকেটটা শুধু চোখে পড়েছে। সরেই তো সারতে পারছিলাম না, দেখব কখন?
আমিও পারিনি, মুসা বলল। এক পলকের জন্যে দেখলাম, খেপাটা স্টিয়ারিঙে হুমড়ি খেয়ে আছে।
তবে ভ্যানের পেছনের হলুদ লোগোটা দেখেছি। তোমরা দেখেছ?
রবিন আর মুসা দুজনেই মাথা নাড়ল।
আমারও তো তোমার অবস্থা, রবিন বলল। সরে বাঁচব, না দেখব? হাঁটু ডলল। জ্বালা করছে। ছড়ে গেছে মনে হয়। হাড়িতে লাগল কিনা কে জানে। সকালে উঠে আর হাঁটতে পারব না কাল।
লোগোটা আমার চেনা, বিড়বিড় করল কিশোর, খামের কোণায় যে লোগো দেখেছি, অবিকল সেরকম। হলুদ রঙের দুটো অক্ষর। এস আর এইচ অক্ষর দুটো পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে একটার ভেতর আরেকটা ঢুকিয়ে লিখে তৈরি করেছে।
তবে ওই পেঁচানো অক্ষরের মালিক যারাই হোক, শুকনো গলায় মুসা বলল, তারা ড্রাইভারের পদে একটা পাগলকে চাকরি দিয়েছে, যে দিনে-দুপুরে গাড়িচাপা দিয়ে মানুষ মারতে চায়।
ব্যাপারটা কাকতালীয়ও হতে পারে, রবিন বলল।
আমার তা মনে হয় না।
আমারও না, কিশোর বলল। বনের মধ্যে গুলি করা, রাস্তায় গাড়িচাপা দেয়ার চেষ্টা, এবং একটা বিশেষ লোগো; সবই কাকতালীয় হতে পারে না। ওই লোগোটা কোন্ কোম্পানির, সেটা এখন খুঁজে বের করতে হবে। আমাদের।
কি করে? রবিনের প্রশ্ন।
জানি না। তবে উপায় একটা বেরিয়েই যাবে।
.

পুরানো জিনিস নিয়ে ঘাটাঘাটি করেন রাশেদ পাশা, পুরানো বহু বাড়ি থেকে বহুবার জিনিসপত্র কিনে এনেছেন তিনি। সামনে পেয়ে তাকেই প্রথম জিজ্ঞেস করে বসল কিশোর। হতাশ হতে হলো না। ম্যানিলা রোড চেনেন রাশেদ পাশা। দুদিন আগেও গিয়েছেন একটা বাড়িতে পুরানো মাল দেখে আসার জন্যে। আবারও যাবেন। যাই হোক, জায়গাটার আগের মালিক কারা ছিল, পরে কারা কিনেছেন, বলতে পারলেন। সেভারনরা যে কিনেছেন, জানেন তিনি। ভূতের গুজবটাও শুনেছেন। তবে লোগোটা কোন কোম্পানির বলতে পারলেন না। তা না পারলেও একটা মূল্যবান পরামর্শ দিলেন, পাবলিক লাইব্রেরিতে চলে গেলেই পারিস। কোম্পানিগুলোর ওপর একটা ডিরেক্টরি করেছে ওরা। ওতে পেয়ে যাবি। এক কোম্পানির লোগো কখনও আরেক কোম্পানি নকল করে না, দুটোর চেহারা অবিকল এক রকম হয় না। সহজেই। পেয়ে যাবি।

চাচাকে ধন্যবাদ দিয়ে তক্ষুণি সাইকেল নিয়ে রওনা হলো লাইব্রেরিতে।

লাইব্রেরির তথ্য বিভাগে ঢুকে তাকের দিকে এগোতে যাবে, কে যেন তার নাম ধরে ডাকল, হাই কিশোর!

ফিরে তাকিয়ে দেখে কেরি জনসন হাত নাড়ছে। তেতো হয়ে গেল, মনটা। শুরু করবে এখন খোঁচানো কথা। আসার আর সময় পেল না মেয়েটা!

না গেলে কথা বলার জন্যে উঠে আসবে কেরি, কোনভাবেই তার হাত থেকে মুক্তি নেই। নিজে গিয়ে বরং কিজন্যে ডাকছে শুনে আসা ভাল। এগিয়ে গেল কিশোর। হাসিটা ধরে রেখে জিজ্ঞেস করল, কেমন আছ, কেরি?

ভাল। তুমি এই অসময়ে?

পড়াশোনার কি আবার সময়-অসময় আছে নাকি?

জবাব দিতে না পেরে জিজ্ঞেস করল কেরি, তোমার লেখাটার কর? ফুটপাথ অ্যান্ড হাইওয়ে?

হয়নি এখনও। হয়ে যাবে।

ও ব্যাপারে পড়াশোনার জন্যেই এলে নাকি?

নাহ, বই ঘাটতে গেলে তাক দেখেই অনুমান করে ফেলবে কেরি, কি খুঁজতে এসেছে কিশোর। কৌতূহল বেড়ে গেলে উঠে চলেও আসতে পারে দেখার জন্যে। ঝামেলা এড়ানোর জন্যে সত্যি কথাটাই বলল সে, একটা সাদা ভ্যানে বিচিত্র একটা লোগো দেখলাম। এস আর এইচ পেঁচিয়ে আঁকা। ভ্যানটা আরেকটু হলেই চাপা দিচ্ছিল আমাকে। পালিয়ে চলে গেল ড্রাইভার। কমপ্লেন করব আমি ওর নামে। ডিরেক্টরি দেখে কোম্পানির নামটা খুঁজে বের করতে এসেছি।

লোগোটা কেমন, এঁকে দেখাও তো।

চেনো নাকি তুমি?

দেখাওই না।
কেরির সামনে নোটবুক আর পেন্সিল পড়ে আছে। একে দেখাল কিশোর।
ও, শাজিন-হ্যারিসন কোম্পানি। চিনি তো। আমার আঙ্কেল চাকরি করে ওখানে।
কি বললে?
অবাক হওয়ার কিছু নেই। কোম্পানি যখন, যে কেউ চাকরি করতে পারে ওখানে, তাই না? আমার আঙ্কেল হলেই বা কি।
দীর্ঘ একটা মুহূর্ত প্রায় কতজ্ঞ দৃষ্টিতে কেরির দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। যাকে এড়িয়ে যেতে চেয়েছিল, কাকতালীয়ভাবে সে-ই একটা মস্ত উপকার করে দিল; অবশ্য না জেনে, কিশোররা যে তদন্ত করছে এটা জানলে হয়তো এত সহজে বলত না।
তা তো বটেই, অবশেষে জবাব দিল কিশোর। কোম্পানিটা কিসের? মাছ বেচাকেনার নাকি?
হাসল কেরি। এ কথা মনে হলো কেন?
লোগোটা দেখে।
মাছের ধারেকাছেও না। জমি কেনাবেচার ব্যবসা করে ওরা। বাড়ি বানানোর কন্ট্রাক্ট নেয়।
জমি বেচাকেনা!
তোমার হলো কি আজ? কথায় কথায় অবাক হচ্ছ। কেন, জমি বেচাকেনা কি দোষের নাকি?
না না, তা নয়…এমনি…
বেশি কথা বলতে গেলে কি সন্দেহ করে বসে কেরি, এজন্যে তাড়াতাড়ি ওকে ধন্যবাদ দিয়ে লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে এল কিশোর। বাড়ি ফিরে চলল।

.

তারমানে…সত্যি সত্যি বলে দিল! বিশ্বাস করতে পারছে না রবিন।
বাড়ি ফিরেই ওকে ফোন করেছে কিশোর। হ্যাঁ। ভুল করে কি একখান উপকার করে ফেলেছে আমাদের, জানলে এখন নিজের হাত নিজেই কামড়ে খেয়ে ফেলবে।
মেজাজ-মর্জি বোধহয় খুব ভাল আছে আজ ওর। যাকগে, কি করবে। এখন?
যাব ওদের অফিসে। জমি বেচাকেনা করে যখন, সেভারনদের জমিটা নেয়ার চেষ্টা করাটা অস্বাভাবিক নয়। হতে পারে, জায়গাটা কেনার প্রস্তাব দিয়েছে ওরা, বেচতে রাজি হচ্ছেন না মিস্টার সেভারন, সেটা নিয়েই বিরোধ। জমিটা কোম্পানির নেহাত দরকার, তাই ভয় দেখিয়ে বা অন্য যে কোনভাবেই হোক, তাদেরকে তুলে দেয়ার চেষ্টা করছে ওরা।

হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। এটাই কারণ। বাবার সঙ্গে কথা বলবে নাকি?
কেন?
জমিটা নিয়ে কোন বিরোধ থাকলে, কিংবা কোন অঘটন ঘটলে স্থানীয় পত্রিকায় ছোটখাট নিউজ ছাপা হওয়ার কথা। পুরানো পত্রপত্রিকা ঘাটলে…
আজ ঘুম ভেঙে পুণ্যবান কারও মুখ দেখেছিলাম! চতুর্দিক থেকে চমৎকার সব সাহায্য আসছে। এক্ষুণি চলে এসো ইয়ার্ডে। তুমি এলেই আঙ্কেলকে ফোন করব। আঙ্কেল অফিসে থাকলে এখনই যাব। চলে এসো। দেরি কোরো না।

.

পত্রিকার বিশাল বিল্ডিংটাতে ঢুকে সরাসরি মিস্টার মিলফোর্ডের অফিসে চলে এল দুজনে। খুব ব্যস্ত তিনি। ছেলেদের দেখে সরাসরি কাজের কথায় এলেন, বছরখানেক আগেই সম্ভবত ওদের নিয়ে একটা নিউজ ছাপা হয়েছে। বারো তেরো মাস আগের পত্রিকাগুলো ঘাটো, পেয়ে যাবে।
এ অফিসে বহুবার এসেছে কিশোর আর রবিন। পুরানো পত্রিকা কোথায় রাখা হয় জানে। চলে এল সেঘরে। তাক থেকে পত্রিকার বান্ডিল নামিয়ে টেবিলে ফেলল। তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল দুজনে।
নিউজটা খুঁজে বের করতে পঁয়তাল্লিশ মিনিটের বেশি লাগল না। আধ। কলামের একটা লেখা বেরিয়েছিল শাজিন-হ্যারিসন কোম্পানির ওপর। কোম্পানির অফিসের একটা ছবি ছাপা হয়েছে। সাইনবোর্ডে বড় করে আঁকা লোগোটাও স্পষ্ট। লম্বা এক মহিলা দাঁড়ানো অফিসের সামনে। মূলত তাকে উদ্দেশ্য করেই ছবিটা ভোলা হয়েছে। ছবির নিচে ক্যাপশন : শাজিন-হ্যারিসন কোম্পানির বর্তমান মালকিন মিসেস অগাস্ট শাজিন।
প্রতিবেদন পড়ে জানা গেল কোম্পানির মূল মালিক ছিলেন মিস্টার হ্যারিসন। শাজিন তার স্ত্রী। বিয়ের বছর দুই পরেই ক্যান্সারে মারা গেলেন মিস্টার হ্যারিসন। শেষ দিকে বাজার খারাপ ছিল বলে প্রচুর ঋণ হয়ে গিয়েছিল কোম্পানির। ব্যাংক প্রস্তাব দিল নিলামে চড়ানোর। কিন্তু কোম্পানি বেচল না। শাজিন শক্ত হাতে হাল ধরল। ব্যাংকের ঋণ শোধ করে দিল সুদে-আসলে। কোম্পানিটা আবার দাঁড়িয়ে গেলেও অবস্থা এখনও ভাল নয়।
শাজিনের কথার উদ্ধৃতি দিয়ে পত্রিকা লিখেছে, মিসেস শাজিন হ্যারিসন এই শহরের পতিত জমিগুলোর একটা বিহিত করতে চান। অহেতুক পড়ে থাকার চেয়ে ওগুলোতে কারখানা বা বহুতল আবাসিক বাড়ি কিংবা মার্কেট গড়ে তুলতে পারলে শহরেরও উন্নতি হবে, লোকের কর্মসংস্থানও হবে। তিনি সেই চেষ্টাই করছেন। এ ভাবে নিজেরও উন্নতি করতে চান, শহরবাসীরও।

চেয়ারে হেলান দিল কিশোর। মগজের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে ভাবনা। কোন সন্দেহ নেই আর তার, অতিরিক্ত লাভ দেখতে পাচ্ছে বলেই সেভারনদের বাড়িটা কিনে নিতে চায় শাজিন। বিরাট জায়গা সেভারনদের, কিন্তু জংলা বলে বাজার দর তেমন হবে না। বিক্রি করতে তাদের কোনমতে রাজি করাতে পারলে অল্প পয়সায়ই কিনে নিতে পারবে। আর শাজিনের যা পরিকল্পনা, সেটা বাস্তবায়িত করতে পারলে কোটিপতি হতে দেরি হবে না।
শাজিন-হ্যারিসন কোম্পানির আর কোন নিউজ আছে কিনা দেখতে শুরু করল আবার দুজনে। পাওয়া গেল আরেকটা ছোট খবর। কোম্পানিরই জনৈক কর্মচারী তাদের বিরুদ্ধে মামলা ঠুকে দিয়েছিল ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে নিরীহ মানুষের জমি দখলের অভিযোগ এনে।
ইনটারেস্টিং! কিশোর বলল। গভীর মনোযোগে কয়েকবার করে খবরটা পড়ল সে। মামলাটা আদালতে বিচারের জন্যে ওঠেনি একবারও। ধামাচাপা পড়ে গেল। কিছুদিন পর সেই কর্মচারীকে অফিসের টাকা চুরির অপরাধে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। নামটা গোপন করে গেছে পত্রিকা, কারণ এখনও বিচার শেষ হয়নি লোকটার, চোর প্রমাণ করতে পারেনি আদালত।
তারমানে রহস্যের চাবিকাঠি লুকিয়ে আছে শাজিন-হ্যারিসন কোম্পানিতে, নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে কাটতে আনমনে বিড়বিড় করল কিশোর। যত শীঘ্র সম্ভব এখন গিয়ে হানা দিতে হবে ওদের অফিসে। কিন্তু তার আগে একবার সেভারনদের বাড়িতে যাওয়া দরকার।
কেন?
জবাব দিল না কিশোর। গভীর চিন্তায় ডুবে গেছে।

.

বাড়ির কাছাকাছি আসতে রাস্তায় দেখা হয়ে গেল এক লোকের সঙ্গে, কুকুর নিয়ে হাঁটছে। সেভারনদের বাড়ির গেটে কিশোরদের থামতে দেখে এগিয়ে এসে বলল, সেভারনরা তো নেই।
কোথায় গেছেন? জানতে চাইল কিশোর।
ডে সেন্টারে। সকালে।
ও।
এতটা পথ অযথাই এলাম, কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বলল রবিন। লোকটার চলে যাওয়ার অপেক্ষা করল। তারপর বলল, ভেতরে আছে নাকি দেখা দরকার। থেকেও তো দেখা দেন না অনেক সময়।
কিন্তু ডে সেন্টারে চলে গেছেন বলল। না দেখলে কি আর বলেছে।
ফিরেও তো আসতে পারেন। যেতে দেখেছে, ফিরতে দেখেনি।

ঢুকে দেখতে বলছ?
অসুবিধে কি?
এতটা এসে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে কিশোরেরও নেই। কটেজের পেছন দিকটায় এসে একটা জানালা খোলা দেখতে পেল। ভুরু কুঁচকে বলল, এ কি!
কি?
জানালা খোলা।
তাতে কি?
দরজা-জানালা বন্ধ রাখার ব্যাপারে অতিরিক্ত সাবধান ওঁরা। দেখা দরকার।
কি দেখতে এসেছ জানি না। যাই হোক, তুমি দেখতে থাকো, আমি ওই বনের দিকটায় একটু ঘুরে আসি।
চারপাশে তাকাতে লাগল কিশোর। সামার-হাউসের দরজা খোলা, কিন্তু কাউকে চোখে পড়ল না। কয়লা রাখার বাংকারটার ওপরে উঠে ফ্যানলাইট উইন্ডোর ফাঁক হয়ে থাকা পাল্লার ভেতর দিয়ে উঁকি দিল।
মাথার ওপর দিয়ে একটা প্লেন উড়ে যাচ্ছে। ওটা চলে যাওয়ার পর যখন শব্দ সরে গেল একটা ঠনঠন শব্দ কানে এল। হাতুড়ি দিয়ে ধাতব কিছু পিটাচ্ছে। কেউ। তারপর কটেজের ভেতরে আসবাব টানাটানি করার শব্দ। ভুরু কুঁচকে তাকাল সে। সেভারনরা যদি ডে সেন্টারেই চলে গিয়ে থাকেন, কে টানাটানি করছে?
মিস্টার সেভারন, মিস্টার সেভারন বলে ডাক দিল সে।
জবাব নেই।
ভেতরে ঢুকে দেখার সিদ্ধান্ত নিয়ে সামার-হাউসে ঢুকে পড়ল সে। পুরানো একটা গুটিয়ে রাখা কার্পেটের পাশে তারের তৈরি পুরানো দুটো কোটের হ্যাঙ্গার। একটা হ্যাঙ্গার নামিয়ে এনে তারের মাথা যেখানে জোড়া দেয়া, সেখানটা খুলে ফেলল। তারটা সোজা করল টেনে টেনে। মাথার কাছটা সামান্য বাঁকিয়ে নিল বঁড়শির মত করে। ফিরে এসে আবার চড়ল কোল বাংকারে। ছোট ফ্যানলাইট জানালার মধ্যে তারের বাঁকা মাথাটা ঢুকিয়ে ভেতরের হুড়কো খুলে ফেলল। মূল পাল্লাটা পুরো খুলে ফেলতে আর কোন, অসুবিধে হলো না। এবার ঢোকা যাবে ওপথে।
ভাবনা চলেছে ওর মাথায়। ভেতরে যদি কেউ থেকেই থাকে, তাহলে কোনদিক দিয়ে ঢুকল সে? যদি এ জানালাটা দিয়ে ঢুকত, তাহলে আর হুড়কো লাগাত না, ভোলা রাখত, যাতে তাড়াহুড়োর সময় দ্রুত বেরিয়ে যেতে পারে।
দুরুদুরু করছে বুকের মধ্যে। জানালা গলে ভেতরে ঢুকল কিশোর। আস্তে করে আবার লাগিয়ে দিল পাল্লা।

দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল একটা মুহূর্ত। ঢোকার আগে রবিনকে ডেকে এনে পাহারা দেয়ার জন্যে বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখলে ভাল হত। এখন আর ওসব ভেবে লাভ নেই।
হঠাৎ একটা জোরাল শব্দে চমকে গেল সে। ভূতে আসর করা ঘরটা থেকে আসছে।
আস্তে করে দরজা খুলে সরু হলওয়ে ধরে নিঃশব্দে এগিয়ে চলল কিশোর। ভূতের ঘরের ভারী ওক কাঠের দরজাটা বন্ধ। তাতে কান চেপে ধরল
ভেতর থেকে আসছে ঠোকাঠুকির শব্দ। বিড়বিড় করে আপনমনে কথা বলছে কেউ।
খুব সাবধানে পিতলের নবটা চেপে ধরে ঘোরানো শুরু করল কিশোর। পুরোটা ঘুরে যেতে ঠেলা দিল। খুলে গেল দরজা। ঠাণ্ডা বাতাস এসে ধাক্কা মারল যেন গালে।
কি... বলতে গেল সে।
কালো একটা মূর্তি ঝুঁকে রয়েছে আগুনের ধারে পাতা টেবিলে রাখা টিনের ট্রাংকটার ওপর। ঝট করে সোজা হয়ে ফিরে তাকাল। চমকে গেল কিশোরকে দেখে। পরনে কালো জিনস, গায়ে কালো কমব্যাট জ্যাকেট। মাথার ব্যালাক্লাভা ক্যাপ টেনে নামিয়ে মুখ ঢেকেছে। চোখের জায়গার দুটো ফুটো দিয়ে কালো একজোড়া চকচকে মণি দেখা যাচ্ছে। লোকটা বেশ লম্বা। কেমন ঝুলে পড়া মেয়েলী কাঁধ।
তালা ভেঙে খোলা হয়েছে ট্রাংকটা। কাছেই পড়ে আছে একটা হাতুড়ি। বাইরে থেকে এই তালা ভাঙার শব্দই কানে এসেছিল।
তাড়াতাড়ি ট্রাংকের ভেতর থেকে একমুঠো দলিল তুলে নিল লোকটা। ওগুলো বেধে রাখা লাল ফিতেটা ঢিল হয়ে আছে।
কে আপনি? জিজ্ঞেস করল কিশোর। কি করছেন?
কাগজগুলো দ্রুত পকেটে ভরার চেষ্টা করল লোকটা। ঢোকাতে না পেরে হাত থেকে ছেড়ে দিল। তুলে নিল হাতুড়িটা।
সরো এখান থেকে! যাও! কিশোরের দিকে তাকিয়ে বিকৃত কণ্ঠে গর্জে উঠল সে। হাতুড়িটা ঝাঁকাতে লাগল বাড়ি মারার ভঙ্গিতে।
দ্রুত ভাবনা চলেছে কিশোরের মগজে। কি করা যায়? দৌড়ে বেরিয়ে গিয়ে যদি এখন দরজার তালাটা লাগিয়ে দিতে পারে, ঘরে আটকা পড়বে লোকটা। তারপর পুলিশকে ফোন করলে বাতিল করে দিল ভাবনাটা। ঘরে আটকে থাকবে না লোকটা। জানালা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সুযোগ আছে।

ভাবার সময় কম। কাছে চলে এসেছে লোকটা। লাফ দিয়ে পেছনে সরে। গিয়ে দরজাটা লাগিয়ে দিল কিশোর। দৌড় দিল সিঁড়ির দিকে।
কিছুদূর উঠে ফিরে তাকিয়ে দেখল সিঁড়ির গোড়ায় পৌঁছে গেছে লোকটা। দুই পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। কালো চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে যেন সম্মোহিত করার চেষ্টা করছে ওকে।
বাইরে থেকে ডাক শোনা গেল এই সময়, কিশোর, কোথায় তুমি?
রবিন!
বুকের মধ্যে রক্ত ছলকে উঠল কিশোরের। চিৎকার করে বলল, রবিন, সাবধান!
গজগজ করে কি যেন বলল লোকটা। এদিক ওদিক তাকিয়ে পালানোর পথ খুঁজল। সোজা গিয়ে সামনের দরজার শেকল সরিয়ে, দরজা খুলে বেরিয়ে গেল।
রবিনের চিৎকার শোনা গেল, অ্যাই, অ্যাই!
দৌড়ে নেমে এল কিশোর। সামনের দরজার সামনে এসে দেখল, রাস্তাটার দিকে বোকা হয়ে তাকিয়ে আছে রবিন।
কিশোর, লোকটা কে? আমাকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দৌড়ে চলে গেল।
চোর! চোর! চিৎকার করে উঠল কিশোর। লাফ দিয়ে রাস্তায় নেমে গেটের দিকে ছুটল। পলকের জন্যে দেখল মোড়ের ওপাশে চলে যাচ্ছে। লোকটা।
চোর! পেছনে প্রায় কানের কাছে শোনা গেল রবিনের চিৎকার। ঢুকল কি করে?
জানি না, মাথা নাড়তে নাড়তে বলল কিশোর।
কি নিতে এসেছিল? দামী গহনা-টহনা আছে নাকি?
দেখার সময় পাইনি। কতগুলো কাগজ ঘাটতে দেখলাম।
তাহলে দেখে ফেলো না।
এসো।
ভুতের ঘরটায় ফিরে এল ওরা। ট্রাংকের জিনিসগুলো ছড়িয়ে আছে মেঝেতে।
এটা কি? লাল ফিতেয় বাঁধা কাগজের বান্ডিলটা মেঝে থেকে তুলে নিতে নিতে বলল রবিন।
দেখি।
ফিতেটা খুলে কাগজগুলো দেখে গম্ভীর হয়ে মাথা ঝাঁকাল কিশোর, হু, বাড়ির পুরানো দলিল।
এগুলো নিতে চেয়েছিল কেন?
জানি না। হতে পারে, সেভারনদের মালিকানার প্রমাণ গায়েব করে দিতে চেয়েছে।
আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না। নিলে লাভটা কি? ভূমি অফিস থেকে যে। কোন সময় দলিলের নকল জোগাড় করে নিতে পারবেন মিস্টার সেভারন। জানালার বাইরে চোখ পড়তে বলে উঠল, রবিন, ওই যে, সেভাররা আসছেন।

কিশোরও এসে দাঁড়াল রবিনের পাশে। স্ত্রীকে ধরে ধরে আনছেন মিস্টার সেভারন।
ঘরের মধ্যে দুই গোয়েন্দাকে দেখে চমকে গেলেন তারা।
কিশোর! কিছুই বুঝতে না পেরে চোখ মিটমিট করতে লাগলেন মিসেস সেভারন। কি করছ তোমরা এখানে? খুব ক্লান্ত লাগছে তাকে। কতরকণ্ঠে গুঙিয়ে উঠলেন।
কি হয়েছে মিসেস সেভারনের? জানতে চাইল কিশোর।
ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে, মিস্টার সেভারন বললেন। মোড়ের ওপাশে আমাদের নামিয়ে দিয়েছে মিনিবাসের ড্রাইভার, ডে সেন্টার থেকে এলাম আমরা। হেঁটে এগোচ্ছি, এই সময় মোড়ের ওপাশ থেকে দৌড়ে এসে ধাক্কা দিয়ে কোরিনকে মাটিতে ফেলে দিল একটা লোক, একেবারে উন্মাদ, পাগল ছাড়া কিছু তো মনে হয় না!
খামোকা ভয় পাচ্ছ তুমি, জন, মিসেস বললেন। আমার কিছু হয়নি। লাগেনি কোথাও। পড়ে গিয়ে চমকে গেছি, এ ছাড়া আর কিচ্ছ হয়নি।
চিনতেও পারলাম না লোকটাকে…
আমি জানি, কে, কিশোর বলল। যে লোক এ ঘরে ঢুকেছিল, সে-ই হধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে মিসেস সেভারনকে।
এ ঘরে ঢুকেছিল! চোখ বড় বড় হয়ে গেল মিসেস সেভারনের। চিৎকার দিয়ে উঠতে গিয়ে, মুখে হাত চাপা দিলেন। কিন্তু তোমরাই বা ঢুকলে কি করে?।
কিভাবে ঢুকেছে জানাল কিশোর। শেষে বলল, আপনাদের না বলে ঢোকার জন্যে দুঃখিত। কিন্তু ঘরের মধ্যে শব্দ শুনে সন্দেহ হলো, ভাবলাম চোরটোর হবে, তাই…
বাধা দিয়ে মিসেস বললেন, জন, আমি ভেবেছি জানালাটা তুমি লাগিয়ে গেছিলে!
গম্ভীর হয়ে গেলেন মিস্টার সেভারন, মনে তো ছিল লাগিয়েছি…বাসটা এসে যেভাবে হর্ন দিতে শুরু করল, মাথার ঠিক থাকে নাকি কারও!
কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, কিশোর বলল, চোরটা ঢুকল কোন পথে? জানালা দিয়ে ঢোকেনি। বেরিয়ে গেল সামনের দরজা খুলে। একটা মুহূর্ত তাকিয়ে রইল দুজনের দিকে। তবে কিছু নিতে পারেনি।
আর থাকছি না আমি এখানে, অনেক হয়েছে? আচমকা তীক্ষ্ণ স্বরে। চেঁচিয়ে উঠলেন মিসেস সেভারন। তোমার বাড়ির মায়া ছাড়ো!
একটা চোরের ভয়ে বাড়ি ছেড়ে পালাব? মিস্টার সেভারন নরম হলেন না।
তাহলে কি পড়ে পড়ে মরব?
কে মারছে তোমাকে? অতি সাধারণ চোর। দুটো ছেলেকে দেখেই ভয়ে পালাল। ও কি করবে?

আমি একবার ভাবলাম, কিশোর বলল, ওকে আটকে ফেলে পুলিশকে ফোন করব…
করোনি তো? ভাল করেছ। পুলিশ-টুলিশ চাই না এখানে।
কিন্তু…
কোন কিন্তু নেই!
ধরে ধরে একটা চেয়ারে মিসেস সেভারনকে বসিয়ে দিল কিশোর আর রবিন।
রবিন, কিশোর বলল, এক কাপ চা বানিয়ে এনে দাও না মিসেস সেভারনকে।
যাচ্ছি, বলেই রান্নাঘরের দিকে চলে গেল রবিন।
তাকের ওপর কাপ-পিরিচ নাড়াচাড়ার শব্দ শোনা গেল। দুজনের দিকে তাকাল কিশোর। দেখুন, দয়া করে এবার সব বলুন এখানে কি ঘটছে। কিছু লুকাবেন না, প্লীজ। আমরা আপনাদের সাহায্য করতে চাইছি। আমার বিশ্বাস, কেউ একজন ভালমত পেছনে লেগেছে আপনাদের। বাড়ি থেকে না তাড়িয়ে ছাড়বে না।
নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে রইলেন মিসেস সেভারন। তারপর মাথা ন্টতুলে তাকালেন স্বামীর দিকে। শান্তকণ্ঠে বললেন, বলো, জন।
জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেললেন মিস্টার সেভারন। যত নষ্টের মূল একজন মহিলা।
অগাস্ট শাজিন?
ভুরু কুঁচকে গেল মিস্টার সেভারনের, তুমি জানলে কি করে?
তদন্ত করে।
দীর্ঘ একটা মুহর্ত কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইলেন মিস্টার সেভারন। তদন্তটা কিভাবে করেছ, জানতে চাই না। তবে একটা কথা স্বীকার করছি, বয়েস কম হলে কি হবে, খুব ভাল গোয়েন্দা তোমরা। নাম যখন জানো, এটাও নিশ্চয় জানো, জমি কেনাবেচার ব্যবসা আছে তার।
মাথা ঝাঁকাল কিশোর। জানি। এটাও অনুমান করেছি, আপনাদের বাড়ি থেকে আপনাদের তাড়াতে চাইছে সে-ই। জোর করে কিনে নিতে চাইছে। যেহেতু আপনারা রাজি হচ্ছেন না, ভয় দেখিয়ে বিদেয় করতে চাইছে।
হ্যাঁ। বনের ওপাশে যে স্পোর্টস সেন্টার আর শপিং সেন্টার করেছে, ওগুলোর মালিক শাজিন কোম্পানি। আরও নানা রকম সেন্টার করতে চায় সে, এর জন্যে বড় জায়গা দরকার, আর সেকারণেই আমাদের জায়গাটা নেয়ার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে। বাজারদরের চেয়ে বেশি তো দিতেই চায়, অন্য জায়গায় একটা বাড়িও দেবে বলেছে। কিন্তু সাফ বলে দিয়েছি, বেচব না। বুড়ো বয়েসে একটু শান্তি দরকার, শান্তিতে বাস করতে চাই; নড়াচড়া এখন একদম সহ্য হবে না।
কিন্তু জন, জ্যাকি…

ওর কথা থাক।
ছেলের কথা উঠতে কাঁদতে শুরু করলেন মিসেস সেভারন।
মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন মিস্টার সেভারন।
অস্বস্তিতে পড়ে গেল কিশোর। উসখুস করে বলল, যাই, দেখি, রবিনের চা কদ্দূর হলো।
রান্নাঘরের দিকে যাওয়ার পথে হলঘরে চোখ পড়ল তার। টেবিলে পড়ে আছে এখনও চিঠিগুলো। কানে আসছে স্ত্রীর প্রতি মিস্টার সেভারনের সান্ত্বনাবাক্য।
এটাই সুযোগ! দ্রুত টেবিলটার কাছে চলে এল কিশোর। লস অ্যাঞ্জেলেস পোস্ট অফিসের ছাপ মারা চিঠিটা তুলে নিল। ঠিকানার হাতের লেখাটা দেখতে লাগল ভালমত। কোন সন্দেহ নেই। বইটাতে জ্যাকি সেভারনের লেখার সঙ্গে ঠিকানার হাতের লেখার হুবহু মিল রয়েছে।
কাঁপা হাতে চিঠিটা বের করল কিশোর। ওপরের দিকটায় শুধু তারিখ লেখা, কোনখান থেকে পাঠিয়েছে লেখেনি। নিরাশ ভঙ্গিতে মাটিতে পা ঠুকল সে। কিন্তু কাগজ উল্টে অন্যপাশটা দেখতেই চোখ স্থির হয়ে গেল তার। রবারের স্ট্যাম্প দিয়ে সীল মারা রয়েছে : পাড়। প্যাসিফিক কাউন্টি প্রিজন, প্যাসিফিক কাউন্টি, লস অ্যাঞ্জেলেস।
প্রিজন! মানে জেলখানা! নিজের অজান্তেই ভুরু কুঁচকে গেল কিশোরের। সেভারনদের ছেলে জেল খানায় বন্দি। সেজন্যেই তার সম্পর্কে কোন কথা বলতে চান না, এতক্ষণ পরিষ্কার হলো ব্যাপারটা।
জেলখানায় বন্দি, তারমানে অপরাধী। কিন্তু সেভারনদের মত ভালমানুষদের ছেলে অপরাধী এটা মেনে নিতে কষ্ট হলো তার। মনে পড়ল পত্রিকার নিউজটার কথা : শাজিন-হ্যারিসন কোম্পানির এক কর্মচারী কোম্পানির বিরুদ্ধে মামলা ঠুকে দিয়েছিল, পরে তাকেই চোর সাব্যস্ত করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে।
চিঠিটা আবার খামে ভরে টেবিলে আগের জায়গায় রেখে দিল কিশোর।

.

বাজি রেখে বলতে পারি আমি, জ্যাকি অফিস থেকে টাকা চুরি করেনি। সব সাজানো ঘটনা। তাকে ফাঁদে ফেলার জন্যে।
বাড়ি ফেরার পথে সাইকেল চালাতে চালাতে বলল কিশোর।
কে ফাঁদে ফেলল? জানতে চাইল রবিন।
এখনও বুঝতে পারছ না? চলো, বাড়ি চলল। সব বলব।

.

তারমানে তুমি বলতে চাইছ জ্যাকি নির্দোষ? বেড়ায় হেলান দিল টলে বসা মুসা।
তিন গোয়েন্দার ওঅর্কশপে জরুরী আলোচনায় বসেছে ওরা।

হ্যাঁ, দৃঢ়কণ্ঠে বলল কিশোর। নিশ্চয় জ্যাকি বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল শাজিনের জন্যে, কায়দা করে তাই জেলে ঢুকিয়ে দিয়েছে। একই সাথে সেভারনদের মনোবলও ভেঙে দিতে চেয়েছে।
অফিসে চাকরি করত বলে নাহয় ছেলেটাকে জেলে ঢোকানোর সুযোগ পেয়েছে, রবিন বলল, কিন্তু তার বাবা-মাকে কি করে কটেজ থেকে সরাবে?
ওই যে, ভয় দেখাচ্ছে। সারাক্ষণ এ রকম স্নায়ুর ওপর চাপ দিতে থাকলে, এক সময় হাল ছেড়ে দিতে বাধ্য হবেন সেভারন। সেটা রুখতে হবে। আমাদের। ওই চোরটা কে, কোনখান থেকে এসেছে জানতে পারলে ভাল হত।
সেই লোকটা না তো, মুসা বলল, যে আমার ওপর গুলি চালিয়েছিল? আমাদের গাড়ি চাপা দিতে চেয়েছিল?
আমার তাই ধারণা, কিশোর বলল।
লোগোওয়ালা ভ্যানটা যেহেতু চালায়, তারমানে শাজিনের কোম্পানিতে চাকরি করে সে?
করতে পারে। কিংবা শাজিন ওকে বহালই করেছে সেভারনদের ভয় দেখানোর জন্যে। ভয় পেয়ে সরে গেলে তখন বাধ্য হয়ে কটেজ আর সমস্ত জায়গা শাজিনের কাছে বিক্রি করে দেবেন মিস্টার সেভারন, মহিলা নিশ্চয় সেটাই ভাবছে।
একটুক্ষণ চুপ করে থেকে মুসা বলল, এক কাজ করলে কেমন হয়, জ্যাকিকে একটা চিঠি লিখে দিতে পারি আমরা। ও এখন কোথায় আছে জানি।
কোন অসুবিধে নেই, ড্রয়ার থেকে কাগজ-কলম বের করল কিশোর। বরং ভাল হবে। বাবা-মাকে তখন চিঠি লিখে বাড়ি ছাড়তে নিষেধ করবে সে। হতাতে মনে জোর পাবেন সেভারনরা।
কি লিখবে? রবিনের প্রশ্ন।
লিখব, আমরা তার বাবা-মার তিনজন বন্ধু। লিখব, তাদের জন্যে আমরা উদ্বিগ্ন, কারণ অগাস্ট শাজিন... থেমে গেল কিশোর।
থামলে কেন? ভুরু নাচাল মুসা।
চিন্তিত ভঙ্গিতে নিচের ঠোঁট কামড়াল কিশোর। লিখব, তার বাবা-মাকে ভয় দেখানোর জন্যে তোক নিয়োগ করেছে শাজিন। ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা করছে।
তা লেখা যায়, মাথা দোলাল রবিন।
এখানে যা যা ঘটছে, সবই লিখব। ওর বাবা-মা যে পুলিশের কাছে যেতে চাইছেন না, এ কথাও জানাব।
আচ্ছা, অন্য প্রসঙ্গে গেল মুসা, শাজিন আর তার শয়তান গুণ্ডাটা কি বুঝতে পারছে আমরা তদন্ত করছি?

মাথা নাড়ল কিশোর, মনে হয় না। ও হয়তো ভেবেছে, আমরা সেভারনদের বন্ধু, কিংবা আত্মীয়; তাই ওঁদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ বন্ধ করার জন্যে আমাদেরও ভয় দেখিয়েছে। ভেবেছে বন্দুক তুললে আর গাড়ি চাপা দেয়ার ভয় দেখালেই সুড়সুড় করে গর্তে ঢুকে পড়ব আমরা।
ব্যাটাকে হাতে পেলেই হয় একবার, ওর বন্দুক দেখানো আমি বের
জ্যাকিকে চিঠি একটা লিখেই ফেলল কিশোর।
রবিন বলল, আমার কাছে দাও। বাড়ি যাবার পথে পোস্ট করে দিয়ে যাব। আশা করি কালই চিঠিটা পেয়ে যাবে সে।

.

পরদিন সকালে মিসেস সেভারনের ফোন পেল কিশোর।
কিশোর, উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন তিনি, তোমরা কি একবার আসতে পারবে?
পারব। কেন, মিসেস সেভারন?
কাল রাতে অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে। তোমরা এসো। এলে তদন্ত করতে পারবে।

.

তিন গোয়েন্দা কটেজে পৌঁছে দেখল রাতের ঘটনায় মিসেস সেভারন গেছেন ভড়কে, মিস্টার সেভারন গেছেন রেগে।
দেখো, কি করেছে, মাড়িয়ে নষ্ট করে ফেলা ফুলের বেডগুলো দেখালেন। মিস্টার সেভারন। পাতাবাহারের বেড়াটা পুরো ধসিয়ে দিয়েছে। রাগে, ক্ষোভে হাতের মুঠো শক্ত হয়ে এল তার। গলাটা খসখসে শোনাল। আরও কি সর্বনাশ করেছে জানো? বাগানের পুকুরটার পানি নষ্ট করে দিয়েছে পোকা মারার বিষ ফেলে। গন্ধ পাচ্ছ? সমস্ত গোল্ডফিশগুলো মেরে ফেলেছে।
নাক উঁচু করে বাতাস শুঁকতে লাগল কিশোর। হ্যাঁ, পাচ্ছি। ফুল গাছের পোকা মারার জন্যে আমিও এ বিষ পানির সঙ্গে মিশিয়ে গাছে স্প্রে করেছি বহুবার।
নিচু হয়ে নষ্ট করে ফেলা ফুলের বেডগুলো পরীক্ষা করতে লাগল সে। জুতোর ছাপ চোখে পড়ল। রাবার সোলের জুতো। গোড়ালিতে গোল গোল চক্র, ভালমতই দাগ বসে গেছে। আপনাদের ভয় দেখিয়ে ভড়কে দেয়ার জন্যেই এ কাজ করেছে শয়তানটা। মুখ তুলে মিস্টার সেভারনের দিকে তাকাল সে, যাতে কটেজ বেচে দিয়ে চলে যান।
জানি, তিক্তকণ্ঠে বললেন মিস্টার সেভারন। চলল, ঘরে চলো। একটা জিনিস দেখাব তোমাকে।

.

ঘরে পা দিয়ে মিসেস সেভারনকে রবিন আর মুসার কাছে বলতে শুনল কিশোর, …কাল রাতে আবার শুনেছি সেই অদ্ভুত শব্দ।

কটার সময়? জানতে চাইল রবিন।
রাত বারোটার দিকে বারোটায় শুরু হলো, কয়েক ঘণ্টা ধরে চলল।
বাতাসের শব্দ নয়তো? মুসা জিজ্ঞেস করল, যদিও তার সন্দেহ নেই ভতে করেছে ওসব শয়তানি। সত্যি, রাতের বেলা শব্দগুলো ভয়ঙ্কর লাগে শুনতে। ফায়ার পর্যন্ত মাঝে মাঝে ঘাবড়ে গিয়ে অস্থির হয়ে ওঠে।
আমার মনে হয় না বাতাসের শব্দ, মিসেস সেভারন বললেন। শুধু কি তাই... কাঁপা হাতে কার্ডিগানের পকেট থেকে একটা চিঠি বের করে দিলেন। তিনি, দেখো!
মুসা বা রবিন ধরার আগেই এগিয়ে এসে চিঠিটা নিয়ে নিল কিশোর। খামের গায়ে নোংরা আঙুলের ছাপ। ভেতরে এক টুকরো কাগজ। তাতে টাইপ করে একটা লাইন লেখা। বাংলা করলে দাঁড়ায়:
কাল রাতে ঘুমাতে পেরেছ?
নীরবে কাগজটা রবিনের দিকে বাড়িয়ে দিল কিশোর, যাতে রবিন আর মুসা দুজনেই দেখতে পারে।
খাইছে! দেখেই বলে উঠল মুসা। মিসেস সেভারনের দিকে তাকাল। কখন পেলেন?
সকালে। ডাকবাক্সে, গলা কাঁপছে মিসেস সেভারনের। কি করব আমরা, বলো তো? এই অত্যাচার আর তো সহ্য করতে পারছি না!
নীরবে একে অন্যের দিকে তাকাতে লাগল তিন গোয়েন্দা।
সান্ত্বনা দেয়ার ভঙ্গিতে আস্তে করে তার বাহুতে হাত রাখল কিশোর। আজ রাতে এসে পাহারা দেব আমরা। কোনমতে যদি ধরতে পারি বাছাধনকে, জেলের ঘানি না টানিয়ে ছাড়ব না। কত্তবড় সেয়ানা লোক, দেখে নেব।
না না, এ কাজ করতে দেব না আমি তোমাদের! ওঁরা লোক ভাল না। বিপদ হতে পারে। খারাপ কিছু ঘটে গেলে কি জবাব দেব তোমাদের বাবা মার কাছে?
এ নিয়ে এক বিন্দু চিন্তাও আপনি করবেন না, অভয় দিল রবিন। বিপদে পড়লে কি করে উদ্ধার পেতে হয় জানা আছে আমাদের। শুনলে আমাদের আব্বা-আম্মা কিছু তো বলবেই না, বরং তারাও সাহায্য করতে চাইবে আপনাদের।
হ্যাঁ, রবিনের কথায় সুর মিলিয়ে বলল মুসা, কিছু চিন্তা করবেন না আপনারা।
হাসলেন মিসেস সেভারন। কিন্তু দ্বিধা যাচ্ছে না তাঁর। তবু, সাবধান থাকা উচিত তোমাদের।
তা তো থাকবই, জোর দিয়ে বলল কিশোর। আমাদের জন্যে চিন্তা করবেন না।
বিদায় নেয়ার আগে কিশোর জানতে চাইল, হুমকি দিয়ে লেখা নোটটা তার কাছে থাকলে কোন অসুবিধে আছে কিনা।

কি করবে এটা দিয়ে? জানতে চাইলেন মিস্টার সেভারন।
এখনও জানি না। তবে তদন্ত করতে গেলে কাজে লাগতে পারে।
বেশ, রাখো। কাজে লাগলে তো ভালই।

.

টাইপিঙের গোলমালটা চোখে পড়েছে তোমাদের? বাড়ি ফেরার সময় সাইকেল চালাতে চালাতে জিজ্ঞেস করল কিশোর।
হ্যাঁ, রবিন বলল, ও অক্ষরটা সবখানেই বড় হাতের, বাক্যের শুরুতেও, বাক্যের মাঝখানেও। মেশিনের ওই কী টা নষ্ট। টিপতে গেলে বার বার ক্যাপিটল লেটারটাই ওঠে।
সেজন্যেই চিঠিটা নিয়ে এলাম। এই সূত্র ধরেই লেখকের আস্তানা আর তার নামটা খুঁজে বের করে ফেলতে পারব। তারপরে রয়েছে খামের ওপর আঙুলের ছাপ। প্রমাণও করা যাবে কে লিখেছে চিঠিটা, কোনমতেই পার পাবে না। বাগান যে তছনছ করেছে, তাকেও ধরা কঠিন হবে না। চিঠির লেখক আর বাগান তছনছকারী একই লোক হলে তো আরও ভাল।
সেভারনদের ওখানে কটার সময় যেতে হবে? জানতে চাইল মুসা। দেখি।
এগারোটার আগে গিয়ে বোধহয় লাভ হবে না।

.

উষ্ণ রাত। গা আঠা করা গরম। বাতাসে ঝড়ের সঙ্কেত। ওঅকশপের বেড়ায় হেলান দিয়ে রাখা সাইকেল তিনটা যখন সরিয়ে এনে চেপে বসল তিন গোয়েন্দা, এক টুকরো ঘন কালো মেঘ ঢেকে দিয়েছে চাঁদ।
ঝড় আসবে, আকাশের দিকে তাকিয়ে উদ্বিগ্ন স্বরে বলল রবিন।
নৈশ অভিযানের ষোলোকলা পূর্ণ হবে তাহলে, শুকনো গলায় বলল মুসা।
কি আর হবে, শান্ত রয়েছে কিশোর, উত্তেজনাটা বাড়বে আরকি।.
সাইকেলের আলোটা জ্বেলে দিল সে। সামনের জঞ্জালের ওপর ছড়িয়ে পড়ল আলো। প্যাডালে চাপ দিয়ে বলল, চলো, যাই।

.

সেভারনদের বাড়িতে বনের কিনারে একটা ওক গাছের নিচে বসে আছে তিনজনে। মাথার ওপর বাতাসে মড়মড়, সরসর, কটকট করছে গাছের ডালপাতা। কালো মেঘের আড়াল থেকে মুহূর্তের জন্যে বেরিয়ে আবার ঢুকে গেল চাঁদটা। দূর থেকে ভেসে এল বস্ত্রের চাপা গুমগুম শব্দ। পৃথিবীটাকে গুঁড়িয়ে দেবার হুমকি দিচ্ছে যেন।
ব্যাপারটা মোটেও পছন্দ হচ্ছে না আমার, পকেট থেকে চকলেট বের করে মোড়ক খুলতে শুরু করল মুসা। শুধু চোর-ডাকাত হলে এক কথা ছিল, মানুষকে

আমি কেয়ার করি না, কিন্তু…
একটা পেঁচা ডাকল ওকের ডালে। কাঁপা, কর্কশ, ভুতুড়ে ডাক ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে। সেই সঙ্গে বাতাসের ক্রুদ্ধ ফিসফিসানি মিলে এক ভয়ানক পরিবেশ সৃষ্টি করল। গায়ে কাঁটা দিল মুসার। সরে এসে গা ঘেঁসে বসল দুই সঙ্গীর মাঝখানে।
অন্ধকারে মুচকি হাসল রবিন। ফিসফিস করে বলল, এমন রাতেই ভ্যাম্পায়ারেরা বেরোয়। সেই সিনেমাটাতে দেখোনি, দুটো টিনএজার ছেলেমেয়ে কিভাবে রক্ত খেতে বেরিয়েছিল রাত দুপুরে…
আহ, কি সব অলক্ষুণে কথা শুরু করলে…
চুপ! চাপা গলায় সাবধান করল কিশোর। ওই দেখো!
কি-কি… ভীষণ চমকে গিয়ে তোতলাতে শুরু করল মুসা।
আরে, দেখছ না? ওই যে, ওদিকে।
রবিন আর মুসাও দেখল, পা টিপে টিপে সেভারনদের কটেজের দিকে এগিয়ে চলেছে একটা ছায়ামূর্তি। হাতে ঝুলিয়ে কোন ভারী জিনিস বয়ে নিচ্ছে।
এল কোত্থেকে ও? অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে রবিন। মাটি খুঁড়ে উদয় হলো নাকি?
ভ্যা-ভ্যা-ভ্যাম্পায়াররা যে কোনওখান থেকে…
আমি শিওর, রাস্তায় কোনখানে গাড়িটা রেখে এসেছে ও, মুসাকে থামিয়ে দিয়ে বলল কিশোর। এবং কি গাড়ি, তা-ও বলে দিতে পারি।
হঠাৎ দশদিক আলোকিত করে দিল বিদ্যুতের তীব্র নীল শিখা। ক্ষণিকের জন্যে স্পষ্ট দেখা গেল লোকটাকে। মাথায় ব্যালাক্লাভা ক্যাপ, গায়ে গাঢ় রঙের পোশাক।
সেই লোকটাই! উত্তেজিত হয়ে উঠল কিশোর।
খাইছে! আপনাআপনি মুসার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল শব্দটা।
একদৌড়ে ঘাসে ঢাকা সবুজ জমি পেরিয়ে বাগানে ঢুকে পড়ল লোকটা।
আবার বিদ্যুৎ চমকাল। সেই সঙ্গে বিকট শব্দে বাজ পড়ল। মুখ তুলে তাকাল তিনজনেই। ওকের বড় একটা ডালে আঘাত হেনেছে বজ্র। ফুলিঙ্গ আর আগুনের কণা লাফ দিয়ে উঠে গেল কালচে ধোয়াটে আকাশে। আতঙ্কিত চিৎকার করে উড়ে গেল একঝাঁক পাখি।
ভয় পেয়েছে গোয়েন্দারাও। বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে দেখল ভেঙে পড়ছে ডালটা।
সবার আগে সামলে নিল মুসা। এক চিৎকার দিয়ে উঠে দাঁড়াল। সামনে ছুটে গিয়ে ডাইভ দিয়ে পড়ল বনের মধ্যে, আরও ঘন গাছপালার আড়ালে। দেখাদেখি অন্য দুজনও তা-ই করল। কানফাটা শব্দ করে ভেঙে পড়ল ডালটা, একটু আগে ওরা যেখানে ছিল ঠিক সেখানে। বড় বাঁচা বেঁচেছে।

ঘাসের মধ্যে উবু হয়ে বসে আছে মুসা। কিশোর আর রবিন বসলে। জিজ্ঞেস করল, লাগেটাগেনি তো?
না, হাঁপাতে হাঁপাতে বলল কিশোর।
রবিনও জানাল লাগেনি।
আবার গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসল তিনজুনে।
যা চেঁচামেচি করলাম, তিক্তকণ্ঠে বলল কিশোর, আশেপাশের দশ মাইলের মধ্যে সবাই জেনে গেছে। বসে থেকে কোন লাভ হলো না। লোকটা নিশ্চয় চলে গেছে।
না, যায়নি, মুসা বলল। ওই যে।
সেভারনদের বাগানেই আছে এখনও লোকটা। বজ্রপাত, ডাল ভেঙে পড়া আর বাতাসের শব্দে বোধহয় চেঁচামেচি কানে যায়নি তার, কিংবা গেলেও মানুষের চিৎকারটা আলাদা করে বুঝতে পারেনি। হাতের ভারী জিনিসটা দেখা যাচ্ছে না। ঝুঁকে আছে ছাউনিটার ধারে। আগুন জ্বলে উঠল। একটা মুহূর্ত আলোকিত করে রাখল লোকটার মাথা।
কি করছে? বাতাসের শব্দকে ছাপিয়ে ফিসফিস করে বলল রবিন।
বুঝতে পারছি না, মুসা বলল। তবে ভঙ্গিতে মনে হচ্ছে না ভাল কিছু।
আবার জ্বলে উঠল আগুন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল এতক্ষণ কিশোর। চিৎকার করে উঠল, সর্বনাশ! ছাউনিতে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে!

.

ঝট করে সোজা হলো লোকটা। চারপাশে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করল কে কথা বলেছে। মোরগের মত ঘাড় কাত করে রেখেছে শোনার জন্যে।
শুনে ফেলেছে! কণ্ঠস্বর যতটা সম্ভব খাদে নামিয়ে রেখে রবিন বলল।
কেরোসিন বা পেট্রলে ভেজানো কাপড়ের টুকরোয় আগুন ধরিয়ে ছাউনির ওপর ছুঁড়ে মারল লোকটা। লাফ দিয়ে সরে দাঁড়াল লোকটা। এক মুহূর্ত তাকিয়ে দেখল আগুনটা ধরছে কিনা। তারপর ঘুরে দৌড় মারল সামনের গেটের দিকে। চোখের পলকে গেট পেরিয়ে রাস্তায় চলে গেল।
আবার আলোকিত হয়ে গেল বাগানের একটা ধার। বিদ্যুতের আলোয় নয় এবার, আগুনের। দাউ দাউ করে ধরে যাচ্ছে।
লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। জলদি চলো! লম্বা ঘাস মাড়িয়ে ছুটল ছাউনির দিকে।
হোসটা ওদিকে! কাছে পৌঁছে চিৎকার করে বলল সে। পেছনের দরজার ওপাশে আছে, সকালে দেখেছি। বুঝতে পারছে তাড়াতাড়ি নেভাতে না পারলে সামার-হাউসটাতেও ধরে যাবে। রবিন, ট্যাপটা ছেড়ে দিয়ে এসো।

ট্যাপ ছাড়তে গেল রবিন। কিশোর আর রবিন মিলে দ্রুত হোসপাইপটা খুলে ফেলতে শুরু করল। পানি বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে আগুনের দিকে পাইপের মুখ ঘুরিয়ে দিল কিশোর। কিন্তু কমার কোন লক্ষণ নেই আগুনের। ছড়িয়ে পড়ছে দ্রুত। কেরোসিন নয়, পেট্রল ছিটিয়েছে লোকটা। শুধু পানি দিয়ে এ আগুন নেভানো যাবে না। উপায়?

মরিয়া হয়ে সামার-হাউসের দিকে তাকাল কিশোর। দরজাটা খোলা। একদৌড়ে ঢুকে পড়ল সে। গুটিয়ে রাখা পুরানো কার্পেটটা ধরে টান দিল। নড়ে উঠল ওটা। কিন্তু একা একা টেনে বের করা খুব কঠিন কাজ।

এই, এসো তো, ধরো আমার সঙ্গে!

বাইরে বের করে কার্পেট দিয়ে আগুন লাগা জায়গাগুলো ঢেকে দেয়ার চেষ্টা করল ওরা। সেটা আরও কঠিন কাজ। পুরানো আমলের কার্পেট, বেজায় ভারী। আগুনের ওপর ছুঁড়ে মেরে ছড়িয়ে দেয়া সহজ কথা নয়।

নাহ, হবে না! আশা ছেড়ে দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল রবিন। কিন্তু কাজ বন্ধ করল না। ওপরে ছড়াতে না পেরে কম্বলের কোণা আর ধার দিয়ে বাড়ি মারতে লাগল বেড়ার গায়ে। সেই সঙ্গে চলছে হোস দিয়ে পানি ছিটানো।

আগুনের আঁচে মুখের চামড়া আর চুল পুড়ে যাবার জোগাড় ওদের। ধোয়া বাড়ছে। ঘন হচ্ছে ক্রমে।

কমছে, কমছে! চিৎকার করে উঠল কিশোর। থেমো না। চালিয়ে যাও।

অবশেষে নিভে এল আগুন। বাতাসে ধোয়া, পেট্রল আর কম্বল পোড়া উলের তীব্র গন্ধ। কম্বলটা আগুনের ওপর ফেলে রাখলে নতুন করে অগ্নিকান্দ্রে সৃষ্টি হতে পারে। টেনে সরিয়ে এনে পা দিয়ে মাড়িয়ে পোড়া জায়গাগুলো নিভিয়ে দিতে লাগল মুসা আর কিশোর। ছাউনির যেসব জায়গায় এখনও আগুন জ্বলছে, সেসব জায়গা লক্ষ্য করে সমানে পানি ছিটিয়ে চলল রবিন। পানি লাগলেই ছাঁৎ করে ওঠে আগুন, গলগল করে ধোয়া বেরোতে শুরু করে।

ভাগ্যিস কার্পেটটার কথা মনে পড়েছিল তোমার, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রবিন। ধপ করে বসে কপালে হাত বোলাতে লাগল। শুধু পানি দিয়ে এই আগুন কোনমতেই নেভানো যেত না।

মুসা আর কিশোরও এসে বসল ওর পাশে। দুজনেই ক্লান্ত।

আমরা না এলে আজ এখানে কি ঘটত কে জানে, গম্ভীর স্বরে বলল কিশোর।

দেখো, কি পেয়েছি, হলুদ রঙের একটা ট্রেল ক্যান তুলে দেখাল মুসা। কোল বাঙ্কারের ওপাশে ফেলে দিয়েছিল। ঝাঁকি দিয়ে দেখিয়ে বলল, অর্ধেক ভরা এখনও। সুযোগ পেলে সারা বাড়িই পুড়িয়ে দিত আজ।

হু, মাথা দোলাল কিশোর, কটেজেও লাগাত।

আঁতকে উঠল রবিন। ভেতরে মানুষ আছে জানা সত্ত্বেও!
জানা সত্ত্বেও। বড় ভয়ঙ্কর শত্রু সেভারনদের। স্বার্থ উদ্ধারের জন্যে মানুষ খুন করতেও দ্বিধা করবে না, স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে এখন।
চুপ করে ভাবতে লাগল তিনজনেই।
কটেজের পেছনের দরজা খুলে গেল হঠাৎ। বেরিয়ে এলেন মিস্টার আর মিসেস সেভারন। দুজনের পরনেই শোবার পোশাক। আতঙ্কিত ভাবভঙ্গি। ঘরের ভেতর থেকে আগুন লাগাটা নিশ্চয় দেখেছেন তাঁরা। সাহস করে বেরোতে বেরোতে দেরি হয়ে গেছে।
কি ঘটেছে তাদেরকে জানাল তিন গোয়েন্দা।
টর্চ জ্বেলে ছাউনির পোড়া জায়গাগুলো দেখাতে লাগল কিশোর। মাটিতে পড়ে থাকা একটা জিনিসের ওপর চোখ পড়তেই এগিয়ে গিয়ে নিচু হয়ে তুলে নিল। একটা ব্যাজ। জ্যাকেটে লাগানো ছিল। খসে পড়ে গেছে। পরে ভালমত দেখবে ভেবে পকেটে রেখে দিল ওটা সে।
ঝড় থেমে গেছে। কিন্তু আকাশের রঙ এখনও কালির মত কালো। সকাল বেলা আবার আসতে হবে, মনে মনে বলল কিশোর; এত অন্ধকারে রাতের বেলা আর কোন সূত্র খুঁজে পাওয়ার ভরসা কম।

.

কি বলে যে ধন্যবাদ দেব তোমাদের! মিসেস সেভারন বললেন। তিন গোয়েন্দাকে নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকেছেন।
আপনাদের কার্পেটটা গেল, প্রশংসা-পর্বটা ধামাচাপা দেয়ার জন্যে বলল রবিন।
যায় যাক, মিস্টার সেভারন বললেন। পড়েই তো ছিল, বরং একটা জরুরী কাজে লাগল।
এখন তো পুলিশকে অবশ্যই জানানো দরকার, গরম চকলেটের মগে চুমুক দিতে দিতে বলল মুসা। ব্যাপারটা এখন বিপজ্জনক হয়ে গেছে। বেপরোয়া হয়ে উঠেছে ওরা। এখনও সাবধান না হলে শেষে মারাত্মক কিছু ঘটে যেতে পারে।
না, পুলিশকে জানাতে এখনও আপত্তি আছে মিস্টার সেভারনের, নিজেরাই সামলাতে পারব আমরা। তোমরা আমাদের সাহায্য করছ, এতেই হবে, পুলিশকে আর দরকার নেই।
ভুরু তুলে দুই সহকারীর দিকে তাকাল কিশোর। অসহায় ভঙ্গি করল মুসা। সেভারনদের অনুমতি ছাড়া পুলিশের কাছে যেতে পারছে না ওরা।
হাত ধোয়ার ছুতো করে বেরিয়ে গেল কিশোর। বাথরুম থেকে ফেরার পথে হলে ঢুকে টেবিলটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। চিঠিগুলো এখনও আগের জায়গাতেই আছে। সেভারনদের ব্ল্যাকমেল করার মাধ্যম যদি চিঠি হয়ে থাকে, অর্থাৎ চিঠি

দিয়ে যদি তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে থাকে অগাস্ট শাজিন, তাহলে প্রমাণ জোগাড় করা সহজ হবে। তার দৃঢ় বিশ্বাস, টেলিফোন এবং চিঠি, দুভাবেই হুমকি দিয়ে সেভারনদের জ্বালাতন করছে মহিলা।
খুঁজতে শুরু করল কিশোর।
রান্নাঘরে কথা শোনা যাচ্ছে। বেরোনোর আগে রবিনকে চোখ টিপে বেরিয়েছিল কিশোর। ইঙ্গিতটা বোধহয় বুঝতে পেরেছে রবিন, বুড়োবুড়িকে কথা বলে ব্যস্ত রেখেছে। সুযোগটা কাজে লাগাল কিশোর।
প্রয়োজনীয় জিনিসটা খুঁজে পেতে সময় লাগল না। শাজিন-হ্যারিসন কোম্পানির লোগো ছাপ মারা একটা খাম। তুলে নেয়ার জন্যে হাত বাড়াল কিশোর। উত্তেজনায় কাঁপছে হাতটা।
দ্রুতহাতে খামটা খুলে চিঠি বের করে তাতে চোখ বোলাল। লিখেছে : এটাই তোমাদের শেষ সুযোগ। আমাদের প্রস্তাবে রাজি না হলে সোজা পুলিশকে গিয়ে বলব শাজিন-হ্যারিসন কোম্পানির অফিস থেকে টাকা চুরি করে সেই টাকা দিয়েই কটেজটা কিনেছে তোমাদের ছেলে জ্যাকি, টাকাগুলো সেজন্যেই পাওয়া যায়নি। কটেজটা তোমরা এমনিতেও রাখতে পারবে না, যেভাবেই হোক দখল করে নেয়া হবে; জেদ করে অহেতুক বিপদ আর ঝামেলা বাড়াবে শুধু শুধু। তারচেয়ে আমাদের প্রস্তাবে রাজি হয়ে যাওয়াই তোমাদের জন্যে সবদিক থেকে উত্তম।
তাহলে এই ব্যাপার! ভাল বুদ্ধি বের করেছে শাজিন। নিজের অজান্তেই মৃদু শিস দিয়ে উঠল কিশোর। পুলিশ যদি বিশ্বাস করে বসে চোরাই টাকা দিয়ে কটেজ কেনা হয়েছে, বাজেয়াপ্ত করবে বাড়িটা। তারপর নীলামে বেচে দেবে কোম্পানির টাকা পরিশোধ করার জন্যে। কোম্পানিই তখন কিনে নেবে কটেজ আর আশেপাশের সমস্ত জায়গা।
উত্তেজনায় বুকের মধ্যে কাঁপুনি শুরু হয়েছে কিশোরের। চিঠিটা আবার খামে ভরে রেখে দিল আগের জায়গায়।
পেছনে খুট করে শব্দ হতেই চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে তাকাল সে। ন্টমিক্টার সেভারন দাঁড়িয়ে আছেন। তাকিয়ে আছেন তার দিকে।
চোখে চোখ পড়তেই রাগত স্বরে বললেন, এখানে কি করছ? ব্যক্তিগত চিঠি পড়ছিলে কেন? আমাদের মুখ থেকে শুনে কি বিশ্বাস হচ্ছিল না?
সরি... পেছন থেকে বলে উঠল রবিন। সে-ও এসে দাঁড়িয়েছে দরজায়। ওপরতলায় আমি হাত ধুতে যাওয়ার সময় ধাক্কা লেগে উল্টে পড়েছিল টেবিলটা। তুলে সোজা করে রেখেছিলাম বটে, তবে চিঠিপত্রগুলো সব মেঝে থেকে তোলা

হয়নি। তাড়াহুড়োয় তখনকার মত বেরিয়ে গিয়েছিলাম। কিশোরকে বলেছি ঠিক করে সাজিয়ে রাখতে।
আটকে রাখা দমটা সশব্দে ছাড়ল কিশোর। কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকাল রবিনের দিকে। বুদ্ধি করে বাঁচিয়ে দিল।
সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাতে লাগলেন মিস্টার সেভারন। সত্যি বলছ, চিঠিগুলো পড়োনি?
অ্যাঁ… সরাসরি মিথ্যে বলতে বাধছে, একটা জবাব খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিশোর যেটা বললে প্রশ্নটা এড়ানো যাবে, আবার মিথ্যেও বলা হবে না।
এবার বাঁচাল মুসা। হলঘরের কথা সে শুনেছে কিনা বোঝা গেল না, রবিনের পাশে এসে দাঁড়িয়ে বলল, কিশোর, কটা বাজল খেয়াল আছে? রাত তিনটে। মা কোন কারণে আমার ঘরে আমার খোঁজ করতে গিয়ে যদি না দেখে, সারা বাড়ি মাথায় করবে…
অ্যাঁ! হাতঘড়ি দেখে আঁতকে ওঠার ভঙ্গি করল কিশোর। সেভারনের দিকে তাকিয়ে বলল, চিঠিগুলোর জন্যে আমি দুঃখিত, মিস্টার সেভারন।
ঠিক আছে, ঠিক আছে। টেবিল থেকে চিঠির বান্ডিল তুলে নিলেন মিস্টার সেভারন। হলুদ লোগোওয়ালা চিঠিটা বের করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন সেটার দিকে। বোধহয় বোঝার চেষ্টা করলেন খোলা হয়েছে কিনা। নীরস কণ্ঠে বললেন, যতবারই আসা যাওয়া করি এখান দিয়ে, চিঠিগুলো চোখে পড়ে, দেখতে দেখতে বিরক্ত হয়ে গেছি…
গটমট করে গিয়ে রান্নাঘরে ঢুকলেন। কয়লার চুলার ঢাকনা খোলার শব্দ শুনল তিন গোয়েন্দা, তারপর সশব্দে বন্ধ হলো আবার।
পুড়িয়ে ফেললেন! চোখের চারপাশ কুঁচকে গেছে রবিনের।
নিরাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে কিশোর বলল, বোকার মত প্রমাণগুলোকে নষ্ট করলেন। দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই আমাদের। চলল, যাই।
ওরা বেরোনোর সময় সামনের দরজা লাগিয়ে দিতে এলেন মিসেস সেভারন। কিশোর বলল, যোগাযোগ রাখবেন। সাহায্যের প্রয়োজন মনে করলে খবর দেবেন আমাদের।

.

রাস্তায় বেরিয়ে জিজ্ঞেস করল রবিন, চিঠিটাতে কি লেখা ছিল?
জানাল কিশোর।
খাইছে! আঁতকে উঠল মুসা। এত্তবড় শয়তান মহিলা তো আর দেখিনি! আমরা এখন কি করব?

ওই মহিলার বিরুদ্ধে প্রমাণ জোগাড় করব। জ্যাকিকে যে ফাসানো হয়েছে, এটা প্রমাণ করতে পারলে ওকে তো বের করা যাবেই, মহিলাকেও জেলের ভাত খাওয়ানো যাবে। তাতে সেভারনদের বাড়িটাও বাঁচবে।
কিন্তু কিভাবে সেটা সম্ভব?
শাজিন-হ্যারিসন কোম্পানির অফিসে গিয়ে তদন্ত করা ছাড়া তো আর কোন উপায় দেখছি না।
গেলেই কি আর তদন্ত করতে দেবে নাকি?
না, দেবে না। গোপনে করতে হবে কাজটা।
কিন্তু ঢোকার জন্যেও তো একটা ছুতো দরকার, রবিন বলল। এই, এক কাজ করলে কেমন হয়? স্কুলের প্রোজেক্টের কাজ নিয়ে গেছি বলব। বলব, রকি বীচের উন্নয়ন নিয়ে বিল্ডিং কোম্পানিগুলো কি ভাবনা-চিন্তা করছে সেটা জানতে গেছি। সুযোগ দিলে অগাস্ট শাজিনের একটা সাক্ষাৎকারও নেব।
বুদ্ধিটা ভালই। কিন্তু...
কিন্তু কি?
ব্যালাক্লাভা পরে এসেছিল যে লোকটা, সে তখন অফিসে থাকলে আমাদের চিনে ফেলবে।
মুসাকে সঙ্গে সঙ্গে চিনবে, এটা ঠিক। আমাদের দুজনকে না-ও চিনতে পারে। ওকে নেব না, তাইলেই হবে। কিংবা আরও এক কাজ করা যায়, আমি একাই যাব। রাস্তায় গাড়িটা ছুটে আসার সময় তুমি সামনে ছিলে, তোমাকে দেখার সম্ভাবনা বেশি; আমাকে কম, তাই আমি একা...
তারপরেও ঝুঁকি থেকে যায়...
গোয়েন্দাগিরিতে ঝুঁকি থাকবেই, তাই বলে কি পিছিয়ে যেতে হবে? বহুবার বলা কিশোরের কথাটাই কিশোরকে ফিরিয়ে দিল রবিন।
হেসে ফেলল কিশোর, নিলে একচোট। ঠিকই বলেছ, ঝুঁকির ভয়ে পিছিয়ে গেলে গোয়েন্দাগিরি ছেড়ে দেয়া উচিত।
তাহলে কখন যাচ্ছি?
কাল সকালেই যাও।

.

পরদিন সকালে ওল্ড প্যাসিফিক স্ট্রীটের এক কানাগলিতে ঢুকল রবিন। ঠিকানা দেখে বাড়িটা খুঁজে বের করতে সময় লাগল না। বাড়ির পেছনে নদী। কিংবা বলা যায় নদীর পাড়ে বাড়িটা, মুখটা অবশ্য রাস্তার দিকে ফেরানো। সামনের দরজায় একটা নোটিশ টানানো, তাতে বলা হয়েছে লিফট নষ্ট। পড়তে গিয়ে একটা জিনিস চোখে পড়ল রবিনের। ইংরেজিতে টাইপ করা লেখাগুলোর ও অক্ষরটা

সবখানেই ক্যাপিটাল লেটারে! সেভারনদের বাড়িতে পাওয়া চিঠির লেখার মত! কাজে লাগতে পারে ভেবে নোটিশটা ছিঁড়ে নিয়ে পকেটে রেখে দিল সে।
সাবধানে ঠেলা দিল দরজায়। কাচকোচ করে খুলে গেল পাল্লা। ভেতরে ঢুকল সে। ম্লান আলোকিত একটা হলওয়ে।
সামনে ঘোরানো সিঁড়ি উঠে গেছে। সিঁড়ির রেলিঙের বার্নিশ নষ্ট হয়ে গেছে, চটা উঠে গেছে কাঠের। লিফটের দরজায় আরেকটা নোটিশ : লিফট অচল।
নাক কুঁচকাল রবিন। বহুকাল ধরে পরিষ্কার না করলে, অযত্ন অবহেলায় ফেলে রাখলে এ রকম গন্ধ হয়।
সিঁড়ির পাশে দেয়ালে প্লাস্টিকের ফলকে লেখা রয়েছে, শাজিন-হ্যারিসন কোম্পানির অফিসটা তিনতলায়।
সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল সে। পেছনে পায়ের শব্দ শোনা গেল। ফিরে তাকিয়ে কাউকে দেখল না। একটা দরজা বন্ধ হবার শব্দ হলো। তারপর চুপচাপ।
নিচতলা কিংবা দোতলার অন্য কোন অফিসে ঢুকেছে লোকটা। চেপে রাখা নিঃশ্বাসটা ফেলে আবার উঠতে শুরু করল সে।
তিনতলায় উঠে সামনে একটা দরজা দেখতে পেল। দ্বিধা করে ঠেলা দিল। পাল্লায়। খুলে যেতে ভেতরে পা রাখল।
অফিস নয়, ঢুকেছে একটা ছোট রান্নাঘরে। আসবাবপত্র নেই বললেই চলে। এখানেও অযত্নের ছাপ। নোংরা। একদিকের দেয়াল ঘেঁষে সিংক। ছোট একটা টেবিলে রাখা একটা কালি লাগা কেটলি, পাশে চা-পাতার ব্যাগ। গোটা তিনেক কাপ-পিরিচ আছে।
মেঝেতে চোখ পড়ল ওর। আটকে গেল দৃষ্টি। ধুলোয় ঢাকা ময়লা। মেঝেতে জুতোর ছাপগুলো চেনা চেনা লাগল। কোথায় দেখেছে? মনে পড়ল। সেভারনদের বাগানে। জুতোর সোল অবিকল এক রকম। গোড়ালিতে গোল গোল চক্র। রাতের বেলা চুরি করে যে লোক বাগানে ঢুকেছিল সে এসেছিল এ ঘরে! বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছে না। তবু চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে অকাট্য প্রমাণ। একই ডিজাইনের জুতো অনেকেই পরতে পারে ভেবে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করল সম্ভাবনাটা, কিন্তু খুঁতখুতি গেল না মন থেকে। এককোণে। একটা কাঠের আলমারি দেখে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলল। ভেতরে হুক থেকে ঝুলছে একটা কালো রঙের জ্যাকেট। ঘরের একমাত্র জানালাটায় উঁকি দিয়ে বাইরে একটা ফায়ার এসকেপ দেখতে পেল।
এ ঘরে আর কিছু দেখার নেই। তবে যা দেখেছে, অনেক। বেরিয়ে এল রান্নাঘর থেকে। পাশে দুটো দরজার পরে আরেকটা দরজা দেখল, পাল্লার গায়ে লেখা রয়েছে অফিস।

দম নিয়ে আস্তে করে টোকা দিল দরজায়। সাড়া এল ভেতর থেকে, আসুন।
পাল্লাটা ফাঁক করে মাথা ঢুকিয়ে দিয়ে বলল সে, হাই।
টেলিফোনের রিসিভার কানে ঠেকিয়ে বসে আছে এক তরুণী, রিসিপশনিস্ট। রবিনের দিকে তাকিয়ে নীরবে হাসল, চেয়ার দেখিয়ে বসতে ইশারা করল।
হাতের ফাইলটা কোলের ওপর রেখে নিরীহ ভঙ্গিতে বসে পড়ল রবিন। চারপাশে তাকাতে গিয়ে চোখ পড়ল পাশের একটা দরজার ওপর, তাতে নেমপ্লেটে লেখা অগাস্ট শাজিন-এর নাম। সামান্য ফাঁক হয়ে আছে পাল্লাটা। টেবিলে রাখা একটা টাইপরাইটারের খানিকটা দেখা যাচ্ছে।
হ্যাঁ হ্যাঁ, ফোনে কথা বলছে তরুণী। কাল রেডি হবে? হবে তো?...ঠিক আছে, আমি নিজেই আসব নিতে...না ভাই, তাড়াতাড়ি দরকার। বড় অসুবিধার মধ্যে আছি। শর্টহ্যান্ডে ডিকটেশন নিতে নিতে আর ভাঙা টাইপরাইটার দিয়ে টাইপ করতে করতে জান শেষ হয়ে গেল।
ডেস্কে রাখা কতগুলো কাগজ দেখতে পেল রবিন। শর্টহ্যান্ডে কি সব লেখা।
ধন্যবাদ, বলে ফোনটা নামিয়ে রাখল তরুণী। রবিনের দিকে তাকাল, বলো?
কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করল রবিন। মনে মনে গুছিয়ে নিল কথাগুলো। বলল, আমার নাম রবিন মিলফোর্ড। স্কুলের একটা প্রোজেক্টের জন্যে তথ্য জোগাড় করতে এসেছি আমি। স্থানীয় কন্ট্রাক্টর আর বিল্ডাররা আগামীতে শহরটাকে উন্নত করার জন্যে কি কি প্ল্যান করেছে সে-সম্পর্কে জানতে চাই। আগামী দশ বছরে কি কি করছে তারা।
রবিনের কথা শুনে খুশি মনে হলো রিসিপশনিস্টকে। অনেক কাজই করবে, অন্তত আমাদের কোম্পানি। শহরের পশ্চিম ধারে বড় বড় কতগুলো শপিং সেন্টার আর হাউজিং এস্টেট বানানোর পরিকল্পনা আছে আমাদের। কিন্তু সমস্যা হয়েছে জায়গা নিয়ে। কিছু কিছু বাসিন্দা তাদের জায়গা বিক্রি করতে নারাজ। কোনমতেই তাদের বোঝানো যাচ্ছে না।
তাই নাকি? ভুরু উঁচু করল রবিন। তাইলে তো আর হচ্ছে না।
দ্বিধা করল রিসিপশনিস্ট। অবশ্য, মিসেস শাজিন চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। একবার যেটা ধরেন সেটা শেষ না করে তিনি ছাড়েন না। ম্যানিলা রোডের ধারে যে বন আছে, ম্যানিলা উড, সেটা পরিষ্কার করে একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক বানানোরও ইচ্ছে আছে তাঁর। সবচেয়ে ঝামেলাটা হচ্ছে ওখানকার জমি নিয়েই।
কান খাড়া করে ফেলল রবিন। কি ধরনের ঝামেলা?
এক বুড়োর অনেকখানি জায়গা আছে ওখানে। সে ওটা ছাড়তে চাইছে না। এদিকে ভূমি অফিস থেকে নোটিশ দিয়ে দিয়েছে আগামী তিন দিনের মধ্যে যদি মালিকানার দলিল দাখিল করতে না পারেন মিসেস শাজিন, ওই জায়গার

মালিক আর হতে পারবেন না। অনুমতিপত্র বাতিল করতে হবে। আবার নতুন করে দরখাস্ত করতে হবে তাকে।
হু, নিজের জায়গা না হলে ঝামেলাই। অন্যের জায়গার ওপর কিছু করার চিন্তা করে আগে থেকেই প্ল্যান করে বসে থাকার কোন মানে হয় না।
তা ঠিক, নড়েচড়ে উঠল রিসিপশনিস্ট। তোমার বোধহয় আরও কিছু জানা বাকি আছে? এক কাজ করো, পেছনের অফিসটায় চলে যাও। অনেক পরিকল্পনার নীলনকশা আর তথ্য লেখা কাগজ দেয়ালে সাটানো আছে, ওগুলো দেখে জেনে নাওগে। আমার জরুরী কাজ আছে। ডেস্কে রাখা কাগজগুলো দেখিয়ে বলল, এ চিঠিগুলো টাইপ করতে হবে। মিসেস শাজিন এসে ঠিকমত না পেলে রেগে যাবেন।
অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, উত্তেজনা চেপে রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করছে রবিন। এ ভাবে তাকে ঢালাও সুযোগ দিয়ে দেবে রিসিপশনিস্ট, ভাবতে ন্টপারেনি।
ইচ্ছে করলে ফটোকপিও করে নিতে পারো, তরুণী বলল। পুরানো প্ল্যানের কপিও পাবে তাকে রাখা ফাইলে। সেগুলোও দেখতে পারো। ফাইলিং কেবিনেটের পাশেই পাবে ফটোকপির মেশিন।
রিসিপশনিস্টকে আরও একবার ধন্যবাদ দিল রবিন।
পেছনের ঘরে এসে ঢুকল। কাগজপত্র দেখে দেখে দ্রুত কিছু নোট নিল। যদি রিসিপশনিস্ট দেখতে চায় যাতে দেখাতে পারে। কোন নোটই না নিলে সন্দেহ করে বসতে পারে। এখান থেকেই শুনতে পেল টেলিফোন বাজছে। রিসিপশনিস্টের কথা কানে এল।
ডেড ফাইলস লেখা কেবিনেটটা টান দিয়ে খুলল রবিন। কাগজপত্র ঘাটতে শুরু করল। গায়ে জারভিস লিখে রাখা একটা ফাইল দৃষ্টি আকর্ষণ করল। মনে পড়ল সেভারনদের আগে কটেজটার মালিক ছিল জারভিস নামে এক লোক।
ফাইলটা বের করে এনে খুলল সে। সেভারনদের জায়গাটাতে কি করা হবে, তার দুটো প্ল্যান পাওয়া গেল। মেশিনে ঢুকিয়ে দুটো প্ল্যানেরই একটা করে কপি করে নিল সে। আরও কিছু কাগজপত্রের কপি করে নিল, যাতে রিসিপশনিস্ট দেখলেও বুঝতে না পারে ঠিক কোন কাগজগুলোতে রবিনের আগ্রহ। ফাইলগুলো আবার ঢুকিয়ে রাখল আগের জায়গায়। রাখতে গিয়েই নজরে পড়ল আরেকটা সবুজ ফাইল। কৌতূহলী হয়ে বের করে আনতে যাবে এই সময় অফিসরুমে কথা শোনা গেল।
চলে এসেছেন, রিসিপশনিস্ট বলল। এত সকালে আসবেন তা তো বলেননি।
হ্যাঁ, ডরোথি, আসতে হলো, শোনা গেল অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ একটা কণ্ঠ। জরুরী আরও কয়েকটা চিঠি লিখতে হবে। ডিকটেশন মেশিন আর কম্পিউটারটা

এসেছে?
না, রেডি হয়নি এখনও। কাল গিয়ে আনতে বলেছে।
তাই নাকি। তাহলে তো মুশকিল হয়ে গেল…
নিশ্চয় অগাস্ট শাজিন। দেখার জন্যে দরজা ফাঁক করে উঁকি দিল রবিন। কালো জিনস আর কালো শার্ট পরা লম্বা এক মহিলা দাঁড়িয়ে আছে শাজিনের অফিসের সামনে। একটা হাত দরজার নবে। কুচকুচে কালো চুল। চোখও তেমনি কালো। গায়ের রঙ মোমের মত সাদা। ঠোঁটে টুকটুকে লাল লিপস্টিক। হরর ছবির ভ্যাম্পায়ারের কথা মনে পড়িয়ে দেয়-ড্রাকুলার স্ত্রী।
মাথার চুল সরানোর জন্যে হাত তুলল শাজিন। হাতের তালুতে প্লাস্টার। দেখতে পেল রবিন। যখম-টখম হলে এ রকম প্লাস্টার লাগায়।
ডরোথি, এক কাপ কফি দেবে? আর আগের চিঠিগুলো নিয়ে এসো তো। একটু আমার অফিসে। কিছু অদল-বদল দরকার।
অফিসে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিল শাজিন। আর দেরি করল না রবিন। বেরিয়ে এল পেছনের ঘর থেকে।
পেয়েছ? হেসে জিজ্ঞেস করল ডরোথি।
হ্যাঁ, নিচুস্বরে জবাব দিল রবিন। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। কয়েকটা কাগজের কপিও করে নিয়েছি। দেখতে চান?
ডরোথি দেখতে না চাইলেই খুশি হয় রবিন। ভয় পাচ্ছে, কোন সময় বেরিয়ে চলে আসে শাজিন, দেখে ফেলে তাকে। আপাতত ওর সামনে পড়তে চায় না। মহিলাকে দেখেই ওর সামনে যাওয়ার চিন্তাটা বাদ দিয়ে দিয়েছে সে। থাক তো সাক্ষাৎকার নেয়া।
হাত নাড়ল ডরোথি, লাগবে না। নিয়ে যাও।
আরও একবার ধন্যবাদ আর সেই সঙ্গে গুডবাই জানিয়ে তাড়াতাড়ি অফিস থেকে বেরিয়ে এল রবিন। দ্রুতপায়ে নিচে নামতে শুরু করল।
বাইরে বেরিয়ে ঘড়ি দেখল। অনেকক্ষণ লাগিয়ে দিয়েছে। চিন্তায় পড়ে গেছে নিশ্চয় মুসা আর কিশোর।

.

ম্যানিলা রোডে উন্নয়নের প্ল্যানটা পাওনি? জানতে চাইল কিশোর। তিন গোয়েন্দার ওঅর্কশপে বসেছে ওরা।
না, মাথা নাড়ল রবিন। ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের অফিসেই রয়ে গেছে হয়তো এখনও। রিসিপশনিস্ট বলল, তিনদিনের মধ্যে জমির মালিকানার দলিল জমা দিতে না পারলে ওদের অনুমতিপত্র বাতিল হয়ে যাবে।

এ জন্যেই মরিয়া হয়ে উঠেছে ড্রাকুলাটা, মুসা বলল। রবিনের মুখে শাজিনের বর্ণনা শুনে প্রথমে তার সন্দেহ হয়েছিল, মহিলাটা আসল ড্রাকুলাই নয় তো? তবে পরে মনে পড়েছে, আসল ভ্যাম্পায়াররা দিনের আলোয় বেরোতে পারে না। শাজিন বেরিয়েছে, তারমানে সে আসল ভ্যাম্পায়ার নয়, মানুষরূপী ভ্যাম্পায়ার-নইলে সেভারনদের মত এত নিরীহ বুড়ো মানুষকে অত্যাচার করতে পারে! তবে তার মতে আসল ভ্যাম্পায়ারের চেয়ে মানুষ-ভ্যাম্পায়াররা অনেক বেশি খারাপ।
ছিড়ে আনা নোটিশটা দেখল কিশোর। সেভারনদের হুমকি দিয়ে লেখা নোটটা বের করল। দুটোতেই ও অক্ষরটা অবিকল এক রকম।
শাজিনের টেবিলে একটা পুরানো টাইপরাইটার দেখেছি, রবিন জানাল, নিশ্চয় ওটা দিয়ে টাইপ করেছে। ওদের কম্পিউটার বোধহয় খারাপ হয়ে গেছে বা কোন কিছু, পচা টাইপরাইটার দিয়ে তাই চিঠি টাইপ করেছে।
হু! মাথা দোলাল কিশোর। তাহলে রান্নঘরের মেঝেতে জুতোর ছাপও দেখেছ?
হ্যাঁ। যে লোক রাতে এসে সেভারনদের বাগান তছনছ করেছে, সেই লোক ঢুকেছিল শাজিনের অফিসের রান্নাঘরে, জ্যাকেট লুকিয়ে রেখেছে আলমারিতে।
এক মুহূর্ত চুপচাপ নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটার পর হঠাৎ জিজ্ঞেস করল কিশোর, সেভারনদের কটেজের নকশাটা কপি করে এনেছ কেন?
কৌতূহল হলো, তাই। ভাবলাম, নকশা দেখে সেলার আর ভূতুড়ে ঘরটায় খোঁজাখুঁজি করতে সুবিধে হবে।
হু! চিন্তিত ভঙ্গিতে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। মুহূর্তে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে, হারিয়ে গেছে গভীর চিন্তায়।
পরদিন সকালে ফায়ারের পিঠে চেপে সেভারনদের বাড়ি রওনা হলো মুসা।
সুন্দর সকাল। মাঠ আর ঝোপঝাড় থেকে ওঠা ভোরের কুয়াশায় সবে প্রবেশ করতে আরম্ভ করেছে সোনালি রোদের বর্শা। দৃপ্ত পায়ে হেঁটে চলেছে পেশীবহুল, খয়েরী রঙের ঘোড়াটা।
সামনে ঝুঁকে চকচকে গলাটায় চাপড়ে দিয়ে বলল মুসা, কতদিন ঠিকমত দৌড়াই না, নারে? জায়গাই নেই সেরকম। আজ পেয়েছি। মনের সুখে দৌড়ে নেব।
যেন মুসার কথা বুঝে সায় দিতেই মাথা ঝাড়ল ফায়ার।
কটেজের পাশ দিয়ে ওকে নিয়ে বনের দিকে এগোল মুসা। নেচে নেচে এগোচ্ছে ফায়ার। নাক উঁচু করে দুই ফুটো ছড়িয়ে তাজা বাতাস টানল বুক বেভরে, অস্থির ভঙ্গিতে মাথা ঝাড়ল আরেকবার
অত অস্থির হচ্ছিস কেন? আদর করে ওর গলায় হাত বুলিয়ে দিল মুসা, জায়গামত আসিনি এখনও। শক্ত করে জিনের ওপর চেপে বসল সে। লাগামটায়

আঙুলের চাপ শক্ত করে পা টান টান করে দিল রেকাবে। দৌড়ানোর জন্যে তৈরি হচ্ছে।
গেট পেরিয়ে এসেই হাতে পেঁচিয়ে খাটো করে ফেলল লাগামটা। জোরে চলার ইঙ্গিত করল ফায়ারকে। মুসাদের বাড়ি থেকে হেঁটে এসে ইতিমধ্যেই গা গরম হয়ে গেছে ঘোড়াটার। মুহূর্তে দৌড়ানো শুরু করল।
দক্ষ ঘোড়সওয়ারের মত ওকে নিয়ন্ত্রণে রাখল মুসা। বেশি জোরেও ছুটল; বেশি আস্তেও না। হেসে বলল, ওভাবে পেশী ফোলাচ্ছিস কেন? উড়তে চাস? থাক, পঙ্খীরাজ হওয়ার দরকার নেই। যেভাবে বলছি সেভাবেই চল।
কিন্তু জোরে ছোটার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠল ঘোড়াটা। শেষে রাশ খানিকটা ঢিল করে ওকে ছুটতে দিল মুসা। মুহূর্তে যেন উড়ে এসে বনের রাস্তায় ঢুকল ফায়ার। সামনে ঝুঁকে বসে রইল মুসা। রেকাবে আরও টান টান হয়ে গেছে পা। সে-ও ছোটার জন্যে প্রস্তুত। কিন্তু অচেনা পথে জোরে ছুটতে অস্বস্তি হতে লাগল তার। দৌড়ানো থামাল হায়ারের। দুলকি চালে চলল কয়েক মিনিট। শেষে আবার হাঁটাতে শুরু করল আগের মত। হাত লম্বা করে আস্তে চাপড়ে দিল ঘোড়াটার ঘামে ভেজা ঘাড়।
দারুণ ছুটতে পারিস তুই, ফায়ার! হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে নিজের কপাল থেকেও ঘাম মুছল মুসা। সত্যি, প্রশংসা করার মত!
রেকাবে পায়ের ভর রেখে উঠে দাঁড়াল সে। পা দুটো ছড়ানোর জন্যে। চোখে পড়ল সাদা ভ্যানটা। আগের দিন যেখানে ছিল, ঠিক সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে।
এখানে কি করছে ও, এত সকালে! প্রথমেই এই ভাবনাটা এল মুসার মাথায়। নিশ্চয় উঁকিঝুঁকি মারতে এসেছে সেভারনদের বাড়িতে। আরও অঘটন দুটানোর তালে আছে।
ঘোড়া থেকে নামল সে। মাথার টুপিটা খুলে একটা গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখল। ফায়ারকে বাঁধল গাছের সঙ্গে। গলাটা চাপড়ে দিয়ে বলল, থাক এখানে, ফায়ার, ঘাস খা। আমি গিয়ে ভ্যানটা দেখে আসি। বেশিক্ষণ লাগবে না।
ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়ল সে। যতটা সম্ভব নিঃশব্দে এগোল গাড়িটার দিকে। পেছনে আঁকা সেই লোগো, এখন আর অপরিচিত নয়। জানালা দিয়ে ভেতরে দেখল। পেছন দিকে এসে হাতল ধরে মোচড় দিতেই খুলে গেল। দরজাটা।
খাইছে! আপনমনেই বলে উঠল সে, ভাগ্যটা ভালই আমার!
আশেপাশে কেউ আছে কিনা দেখে নিয়ে উঠে বসল ভ্যানের মধ্যে। লাগিয়ে দিল দরজাটা।
মেঝেতে পড়ে আছে একটা শটগান। পাশে রাখা এক বাক্স কার্তুজ। জান কি দেখবে, তবু সন্দেহ নিরসনের জন্যে ডালাটা খুলে দেখল। সেদিন এই কার্তুজ

দিয়েই গুলি করা হয়েছিল। সন্দেহ নেই। দুটো কার্তুজ তুলে নিয়ে পকেটে রাখল। চোখ বোলাল আর কি আছে দেখার জন্যে। এক কোণে একটা প্লাস্টিকের কনটেইনার, গায়ে মড়ার খুলি আর ক্রসবোন আঁকা স্টিকার লাগানো। মুখটা খুলে গন্ধ শুকল। পোকা মারার বিষ। একই রকম গন্ধ পাওয়া গিয়েছিল সেভারনদের বাগানের পুকুরে।

হাসি ফুটল মুসার ঠোঁটে। ঘুরতে এসে শাজিনদের বিরুদ্ধে এ রকম জোরাল প্রমাণ পেয়ে যাবে আশা করেনি। ভ্যান-চালকের চেহারাটা এখন দেখা দরকার, চিনে নেয়া দরকার, তারপর নিশ্চিন্তে বাড়ি ফিরে যেতে পারে।

গাড়ি থেকে নামতে যাবে, এই সময় কানে এল পায়ের শব্দ। ঝট করে মাথা নামিয়ে ফেলল সে। ড্রাইভারের পাশের দরজা খুলে গেল। আতঙ্কিত হয়ে শুনতে পেল, ইগনিশনে চাবি ঢোকানোর শব্দ এবং তারপর ইঞ্জিনের গর্জে ওঠা। মুসা কোন কিছু করার আগেই চলতে শুরু করল গাড়ি। গতি বেড়ে গেল মুহর্তে। অসহায় হয়ে গুটিসুটি হয়ে পড়ে থাকা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

.

একভাবে পড়ে আছে মুসা। মাথা তুললেই আয়নায় তাকে দেখে ফেলবে। ড্রাইভার। ফলে লোকটার চেহারা দেখার জন্যেও মাথা তুলতে পারছে না।

মিনিট দশেক এক গতিতে গাড়ি চালিয়ে এসে ব্রেক কষে গাড়ি থামাল ড্রাইভার। দরজা খুলে নামল। দড়াম করে লাগিয়ে দিল। সরে যেতে লাগল পায়ের শব্দ।

সব যখন চুপচাপ হয়ে গেল আবার, আস্তে মাথা তুলল মুসা। পেছনের জানালা দিয়ে তাকাল। রাস্তার ধারে বড় একটা বাড়ির সামনে থেমেছে গাড়িটা। রাস্তাটার দুই ধারেই গাছের সারি।

কোথায় এল সে? আশেপাশে তাকিয়ে চিনতে পারল না জায়গাটা। ড্রাইভারকে দেখা গেল না, তবে বাড়ির দোতলার জানালায় ছায়া নড়তে দেখল। জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছে কেউ।

আলো লাগছে চোখে। কপালের সামনে হাত এনে রোদ বাঁচিয়ে ভালমত তাকাল। জানালার সামনে দাঁড়িয়ে হাত-আয়নায় চেহারা দেখে ঠোঁটে লিপস্টিক লাগাচ্ছে এক মহিলা। লম্বা কালো চুল, মোমের মত সাদা চামড়া। শাজিনকে দেখেনি সে, রবিনের কাছে চেহারার বর্ণনা শুনেছে। মহিলাকে দেখেই এখন বুঝল, ও শাজিন ছাড়া আর কেউ নয়। ভ্যাম্পায়ারের কথা ভেবে কাঁটা দিল গায়ে। দিনের বেলা বেরোয় না ওই রক্তচোষা ভূত মনকে বুঝিয়ে জোর করে ভয় তাড়াল।

জানালার কাছ থেকে মহিলা সরে যেতেই দরজাটা খুলল সে। লাফ দিয়ে নামল। আবার লাগিয়ে দিল দরজা। কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে তাকিয়ে দেখল কেউ লক্ষ

করছে কিনা। সরে এসে ভ্যানটাকে সামনে রেখে আড়াল করে বসে তাকাল আবার বাড়িটার দিকে।
চিৎকার শোনা গেল এই সময়। দেখল বাগানের রাস্তা ধরে তার দিকেই দৌড়ে আসছে মহিলা। বোঝা গেল, কোনভাবে দেখে ফেলেছে।
আর বসে থাকতে সাহস করল না মুসা। উঠেই দিল দৌড়।
এই এই, শোনো! চিৎকার করে ডাকল মহিলা।
ফিরেও তাকাল না মুসা।
.
রাস্তার শেষ মাথায় দেখতে পেল একটা পাবলিক পার্কে ঢোকার লোহার গেট। ওর মধ্যে ঢুকে পড়তে পারলে গাছের আড়ালে বা অন্য কোথাও লুকাতে পারবে। ফিরে তাকাল কাঁধের ওপর দিয়ে। পেছন পেছন দৌড়ে আসছে মহিলা। কপালের ঘাম মুছতে মুছতে ভাবল মুসা, ফায়ার কাছাকাছি থাকলে লাফ দিয়ে গিয়ে এখন ওর পিঠে চড়ে বসতে পারত।
পার্কের মধ্যে এক জায়গায় ছুটাছুটি করে খেলছে বাচ্চারা। তাদের কাছে দৌড়ে এসে একটা স্লিপারের আড়ালে বসে পড়ল মুসা। আশা করল তাকে দেখতে পাবে না মহিলা।
কৌতূহলী দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাতে লাগল কয়েকটা ছেলেমেয়ে। ওদের দিকে তাকিয়ে হাসল সে। ঠোঁটে আঙুল রেখে চুপ থাকতে ইশারা করল। আস্তে করে মাথা বের করে গেটের দিকে তাকিয়ে দেখল দ্বিধান্বিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মহিলা। কয়েকটা অস্বস্তিকর মুহূর্ত। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে যেদিক থেকে এসেছিল আবার সেদিকে হেঁটে চলল মহিলা।
হাপ ছাড়ল মুসা।
আরও কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করে উঠে দাঁড়াল। রুমাল বের করে মুখের ঘাম মুহল। এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। তাকে ঘিরে ভিড় জমাতে শুরু করেছে বাচ্চারা। একটু আগে যেটা স্বস্তির কারণ হত, সেটা এখন বিরাট অস্বস্তি। তাড়াতাড়ি হাঁটতে শুরু করল উল্টোদিকের গেটের দিকে। প্রথমে জানতে হবে কোন জায়গায় তাকে নিয়ে এলেছে শাজিন, তারপর যেতে হবে। ফায়ারকে আনতে।
পার্ক থেকে বেরোতে গেটের ওপরের লেখা দেখে জানতে পারল, জায়গাটার নাম অগাস্টভিল।
ম্যানিলা রোডে পৌঁছে বনের ভেতর থেকে ফায়ারকে নিয়ে বেরিয়ে আসার সময় আরেক ঘটনা ঘটল। ঝোপের ভেতর থেকে হঠাৎ করে সামনে এসে দাঁড়াল সেই লোকটা, দূরবীন হাতে যাকে সেদিন সেভারনদের বাড়ির ওপর নজর রাখতে

দেখা গিয়েছিল। এমন করে বেরোল, চমকে দিল ঘোড়াটাকে, ঘাবড়ে গিয়ে উধ্বশ্বাসে দৌড়াতে শুরু করল ওটা। কয়েকবার, পিঠ থেকে পড়তে পড়তে বাঁচল মুসা।

.

সকালবেলা এত কিছু করে ফিরে আসার পর সেদিন আর সেভারনদের বাড়িতে যেতে ইচ্ছে করল না তার। রবিনও কাজে ব্যস্ত, ফোনে কিশোরকে জানিয়ে দিল, সে-ও যেতে পারবে না।

বিকেল বেলা ইয়ার্ডে এসে সকালের সমস্ত ঘটনার কথা কিশোরকে খুলে বলল মুসা।

শনিবার সকালে নাস্তা সেরেই সেভারনদের বাড়িতে রওনা হলো তিন গোয়েন্দা। আগের দিন বিকেলে ফোনে যোগাযোগ করার অনেক চেষ্টা করেছে কিশোর। লাইন না পেয়ে শেষে অপারেটরকে জিজ্ঞেস করে জেনেছে, তাঁদের ফোন নষ্ট।

আজ নিশ্চয় মেরামত করে ফেলবে, সাইকেল চালাতে চালাতে দুই সহকারীকে বলল কিশোর।

কটেজে পৌঁছে দরজায় বার বার টোকা দিয়েও কোন সাড়া পেল না।

মিসেস সেভারন! চিৎকার করে ডাকল কিশোর। সিঁড়ির গোড়ায় পড়ে থাকতে দেখল দুধের দুটো খালি বোতল। একটাতে একটা ভাজ করা কাগজ রবারের ব্যান্ড দিয়ে আটকানো। জানালার দিকে তাকিয়ে আবার চিৎকার করে বলল সে, মিসেস সেভারন, আমি কিশোর!

কান পেতে অপেক্ষা করতে লাগল।

কই, কেউ তো জবাব দিচ্ছে না, মুসাও মোরগের মত ঘাড় বাকা করে কান পেতে রেখেছে।

ঘুম থেকে ওঠেননি হয়তো এখনও, হাতঘড়ি দেখল রবিন। এখনও অনেক সকাল। বেশি তাড়াতাড়ি চলে এসেছি।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইল তিনজনে। কি করবে বুঝতে পারছে না। গাড়ি নিয়ে হাজির হলো দুধওয়ালা। গাড়ি থেকে নেমে দুধের বোতলের খাঁচা হাতে শিস দিতে দিতে এগোল কটেজের দিকে।

হাই, তার দিকে তাকিয়ে বলল কিশোর।

হাই, কাছে এসে দাঁড়াল দুধওয়ালা। কৌতূহলী চোখে তিন গোয়েন্দার দিকে তাকাতে তাকাতে বলল, দেখা করতে এলে নাকি?

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। দরজায় ধাক্কা দিচ্ছি, খুলছেন না।

এতক্ষণে তো রোজ উঠে পড়েন ঘুম থেকে। আরও জোরে ধাক্কা দাও। খাঁচাটা নামিয়ে রেখে খালি বোতলের গায়ে আটকানো কাগজটা খুলে নিয়ে পড়ল

দুধওয়ালা। এক লিটার বেশি দিতে বলেছেন। আনমনে বিড়বিড় করল, মেহমান এসেছে নাকি! কখনোই তো আসে না। খাঁচা থেকে তিনটা বোতল বের করে সিঁড়িতে রাখল সে। খালি বোতল দুটো তুলে খাঁচার খোপে রাখল। কি মনে করে লেটার-বক্সটার দিকে তাকাল। খবরের কাগজটা নেই। তারমানে উঠে পড়েছেন তারা। গোয়েন্দাদের দিকে তাকিয়ে বলল, তোমাদের ডাক শুনতে পাননি। আরও জোরে ধাক্কা দাও। খাঁচাটা তুলে নিয়ে আবার শিস দিতে দিতে চলে গেল সে।
দাঁড়াও, মুসা বলল, পেছনে গিয়ে দেখে আসি বাগানে বেরোলেন কিনা।
বাড়ির পাশ ঘুরে এসে এগোতে এগোতে থমকে দাঁড়াল মুসা। বাড়ির ভেতর থেকে কথা কানে এসেছে। এত সকালে টিভি অন করে দিয়ে বসে আছেন নাকি? সেজন্যে ওদের ডাক শুনতে পাননি?
সামার-হাউসের দরজা খোলা। ওখানে নেই তো মিস্টার সেভারন? উঁকি দিয়ে দেখতে গেল।
কিন্তু সামার-হাউসটা খালি। জোরে নিঃশ্বাস ফেলল মুসা। ফিরে যাওয়ার জন্যে ঘুরতে গিয়েও ফিরে তাকাল আবার। কোথায় যেন অস্বাভাবিক কিছু রয়েছে। কোনটা অস্বাভাবিক লেগেছে, ধরতে সময় লাগল না। কার্পেটটা বিছানো নেই মেঝেতে, আগুন নেভানোর জন্যে রাতে ওরা বের করে নিয়ে যাওয়ার পর আর বিছানো হয়নি। বাইরেই ফেলে রেখেছে। কেমন ন্যাড়া ন্যাড়া লাগছে মেঝেটা।
কি ভেবে দরজাটা ঠেলে আরও ফাঁক করল সে। পুরানো কাঠের বাক্স আর জঞ্জালের গন্ধ। আপেল রাখার পুরানো কয়েকটা কাঠের বাক্স ফেলে রাখা। হয়েছে দেয়াল ঘেঁষে, আর গোটা দুই ভাঙা ডেকচেয়ার। ভুরু কুঁচকে জিনিসগুলোর দিকে তাকাতে লাগল সে।
ট্র্যাপ-ডোরটা চোখে পড়তে দম বন্ধ করে ফেলল। তাকিয়ে রইল স্থির দৃষ্টিতে। আগের বার যখন এসেছিল, কাঠের মেঝে ঢাকা ছিল কার্পেটটা দিয়ে। সেজন্যে দেখা যায়নি ওটা।
আচমকা ঘুরে দাঁড়িয়ে লাফ দিয়ে নামল বাগানে। উত্তেজনায় কাঁপছে। খবরটা বন্ধুদের জানানোর জন্যে ছুটল।

.

সামার-হাউসে ঢুকে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত ট্র্যাপ-ডোরটার দিকে তাকিয়ে রইল তিনজনে।
কোথায় নেমেছে? বলে হাটু মুড়ে ওটার সামনে বসে পড়ল রবিন। চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে ঝুঁকে তাকাল নিচের দিকে। মেঝে আর ট্র্যাপ-ডোরের মাঝের ফাঁকে আঙুল ঢোকানোর চেষ্টা করল। না পেরে বলল, কিছু একটা দরকার। চাড় মেরে তুলতে হবে।

ও, ভুলে গিয়েছিলাম, মুসা বলল, কটেজের মধ্যে কথার আওয়াজও শুনেছি। হয় টিভি চালানো হয়েছে, নয়তো কথা বলেছেন সেভারনরাই। বেশি ভেতরের দিকে রয়েছেন, নিজেদের মধ্যে আলাপে ব্যস্ত, সেজন্যেই আমাদের ডাক শুনতে পাননি।
কিংবা হয়তো ইচ্ছে করেই খুলছেন না কোন কারণে।
ঘরের চারদিকে তাকাচ্ছে কিশোর। একটা বাক্সের নিচে ডাল ছাঁটার পুরানো মরচে পড়া বড় একটা কাচি দেখে বের করে নিল সেটা। রবিনের পাশে গিয়ে বসল চাড় মেরে ট্র্যাপ-ডোরটা তুলতে ওকে সাহায্য করার জন্যে।
নড়ে উঠল ডোরটা। চাপ বহাল রেখে বলল কিশোর, উঠে যাবে। চাপ ছেড়ো না। আরও জোরে।
ক্যাঁচকোঁচ করে উঠল কজা। বিচিত্র শব্দে গোঙাল পাল্লাটা। হঠাৎ ওপরে উঠে গেল। চিত হয়ে পড়ে গেল কিশোর।
হেসে উঠল মুসা।
কিশোরও হাসল। উঠে বসে কাপড় থেকে ধুলো ঝাড়তে লাগল।
রবিন কাশছে। গর্তের চারপাশে জমে থাকা ধুলো উড়ছে। নাকে ঢুকে গেছে তার।
দরজার বাইরে তাকিয়ে দেখল কিশোর, কেউ আসছে কিনা। প্রচুর হই চই হচ্ছে। হট্টগোল কানে গেলে দেখতে আসতে পারে।
গর্তের ভেতরে উঁকি দিল মুসা। বদ্ধ বাতাসের ভাপসা গন্ধ লাগল নাকে।
কিছুই তো দেখা যাচ্ছে না, বলল সে। টর্চ আছে?
দিনের বেলা, তাই টর্চ আনার কথা ভাবিইনি, জবাব দিল কিশোর।
ছাউনিটাতে আছে কিনা দেখে আসি, বলে উঠে চলে গেল রবিন। ফিরে বেএসে জানাল, টর্চ নেই, তবে ম্যাচ পেয়েছি। এই যে।
বাক্সটা হাতে নিয়ে ঝাঁকি দিল কিশোর। ভরা নয়, অল্প কয়েকটা কাঠি। খস করে একটা কাঠি জ্বেলে জ্বলন্ত কাঠি সহ হাতটা নামিয়ে দিল নিচে।
ইটের তৈরি একটা সিঁড়ি নেমে গেছে।
কিশোরকে অবাক করে দিয়ে এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস এসে ঝাঁপটা মেরে নিভিয়ে দিল আগুনটা। দুই সহকারীর দিকে ফিরল সে। সিঁড়ি আছে যখন, নামা যায়, কি বলো?
ভূতের ভয় থাকা সত্ত্বেও আমতা আমতা করে রাজি হয়ে গেল মুসা। রবিন তো আগেই রাজি।
সাবধানে খাড়া সিঁড়ির ধাপ বেয়ে নামতে শুরু করল ওরা। কাঠি মাত্র কয়েকটা, নিতান্ত প্রয়োজনের সময় ছাড়া জ্বালবে না ভেবে অন্ধকারেই অনুমানে নির্ভর

করে নামছে কিশোর। পা ফসকাল মুসা। পড়ে যেতে যেতে কোনমতে সামলাল। গোড়ালি মচকে ফেলেছিল আরেকটু হলেই।
আরে কি করছ! চিৎকার করে উঠল কিশোর।
সরি! বিড়বিড় করল মুসা। আই কিশোর, আরেকটা কাঠি জ্বালো না। মনে তো হচ্ছে কবরের মধ্যে ঢুকেছি, বাপরে বাপ, যা অন্ধকার! কি জায়গারে এটা!
কি আর? এখানে দিনদুপুরেও ভ্যাম্পায়ারেরা ঘোরাফেরা করে, ফিসফিস করে বলল রবিন, ভয় পাওয়ার ভান করছে। আরেকটু সামনে এগোলেই হয়তো হোঁচট খাব ড্রাকুলার কফিনে...
দোহাই তোমার, রবিন, তেনাদের নিয়ে হেলাফেলা কোরো না...! কেঁপে উঠল মুসার গলা।
আরেকটা কাঠি জ্বালল কিশোর। নিচু ছাত। সাদা রঙ করা দেয়ালের বহু জায়গায় প্লাস্টার খসে গেছে, ছাতলা পড়া। আরেক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস এসে লাগল। গায়ে কাঁটা দিল কিশোরের। আগুন দেখে জাল বেয়ে তাড়াহুড়া করে সরে যেতে লাগল একটা মাকড়সা। আলোটা নিভে যাওয়ার আগের মুহূর্তে চোখে পড়ল ওদের, একদিকের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড় করানো একটা ওয়াইন র‍্যাক, আরেক দিকে সম্ভবত কয়লার স্তূপ। সিঁড়িও আছে আরেকটা।
এটাই বোধহয় সেই সেলার, মুসা বলল, মিস্টার সেভারন যেটার কথা বলেছিলেন।
আমি যে পুরানো প্ল্যানটা কপি করে এনেছি, রবিন বলল, তাতেও আছে। এটা।
আরেকটা কাঠি জ্বালল কিশোর। দেখতে দেখতে বলল, জায়গাটা যেন কেমন। গা ছমছম করে, তাই না?
তুমিও বলছ এ কথা! জোরে বলতে ভয় পাচ্ছে মুসা। দেখা তো হলো? চলো, যাইগে...
আস্তে! থামিয়ে দিল ওকে কিশোর। কথা বলে কারা?
মাথার ওপর থেকে আসছে চাপা কথার শব্দ।
মিস্টার সেভারন নাকি? বিড়বিড় করে নিজেকেই যেন প্রশ্ন করল কিশোর।
নিজেরা দুজন ছাড়াও আরও কেউ আছে, রবিন বলল। কে?
মিসেস ড্রাকুলা চলে আসেনি তো সাতসকালে উঠে? মুসার প্রশ্ন।
দম বন্ধ করে, কান পেতে শুনতে লাগল তিনজনে। পাথরের মেঝেতে চেয়ারের পায়া ঘষার শব্দ শুনে বুঝল রান্নাঘরটা ওদের ওপরে কোথাও রয়েছে। কথা শোনা যাচ্ছে ওঘর থেকেই।
আরেকটা সিঁড়ি যে দেখলাম, সেটা দিয়ে উঠে দেখা যেতে পারে কোথায় উঠলাম, প্রস্তাব দিল কিশোর।

এখানে দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে সেটা বরং ভাল, সঙ্গে সঙ্গে বলল মুসা।
এখান থেকে পালাতে পারলে বাঁচে। তর সইছে না মুসার। আগে আগে উঠতে শুরু করল সে। তার পেছনে থেকে কাঠি জ্বেলে সামনের দিকে বাড়িয়ে ধরে রাখল কিশোর। সবার পেছনে রবিন।
সিঁড়ির মাথায় উঠে আরেকটা কাঠি জ্বালল কিশোর। ট্র্যাপ-ডোর দেখা গেল এখানেও।
এটা কি? ডোরের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে থাকা একটা জিনিস ধরে টান দিল রবিন। বের করে আনল।
কাঠির আলোয় দেখতে দেখতে বলল কিশোর, কাপড়। পোশাক থেকে ছিড়ে গেছে। দেখো, কি রকম পাতলা, ফিনফিনে…
শিউরে উঠল মুসা, খাইছে! তারমানে মিসেস সেভারন ভুল দেখেননি, সত্যি সত্যি ভূত আছে…
ফালতু কথা বাদ দিয়ে ঠেলা দাও, কিশোর বলল।
আরও দুই ধাপ উঠে ঘাড় বাঁকা করে, কাঁধ ঠেকিয়ে ঠেলতে আরম্ভ করল মুসা। নড়াতে পারল না পাল্লাটা। তাকে সাহায্য করল রবিন আর কিশোর। ফাঁক হতে শুরু করল পাল্লা। ঠিক এই সময় পা ফসকাল রবিনের। ছোট্ট একটা চিৎকার বেরিয়ে এল মুখ থেকে। গড়িয়ে পড়তে শুরু করল।
তাড়াতাড়ি নেমে এসে তাকে ধরে তুলল মুসা। ব্যথা পেয়েছ?
সিঁড়ি থেকে পড়লে ব্যথা আর না পায় কে! তিক্তকণ্ঠে জবাব দিল রবিন। তবে তেমন কিছু না।
এই, দেখে যাও, ফিসফিস করে ডাকল কিশোর। জলদি এসো!
ডালা আরও ফাঁক করে ফেলেছে সে। সেই ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ছে লাল রঙের একটা জিনিস।
কার্পেটের কিনারটা না? দেখে বলল রবিন। ভূতের ঘরের নিচে রয়েছি। আমরা, কোন সন্দেহ নেই।
তারমানে জোয়ালিনের প্রেমিক চুরি করে এখান দিয়েই ঢুকত, মুসা বলল।
হয়তো, কিশোর বলল। পুরানো বাড়িটা তখন ছিল এখানে। সেলার থেকে সরাসরি এদিক দিয়েই ডাইনিং রুমে মদ নিয়ে যেত চাকর-বাকরেরা।
হ্যাঁ, রবিন বলল। সামার-হাউসের ভেতর দিয়ে এসে চোরও ঢুকেছিল সেদিন এপথেই।
দুই ধাপ নেমে এসে ডালাটা ছেড়ে দিল কিশোর। কিন্তু এটা যে আছে এখানে, জানল কি করে সে? জানার তো কথা নয়। সব সময় কার্পেটে ঢাকা থাকে।

নিশ্চয় পুরানো প্ল্যানটা থেকে। আমি যেটা কপি করে এনেছি। শাজিনের তো জানাই আছে। যে লোকটাকে পাঠিয়েছে নকশা দেখিয়ে তাকে বুঝিয়ে দিয়েছে কোনখান দিয়ে ঢুকতে হবে…
আর সেজন্যেই, কিশোর বলল, কার্পেটটা অমন অগোছাল হয়ে ছিল। মিসেস সেভারন জানতেন পেরেক দিয়ে আটকানো ছিল..ঠিকই জানতেন; তার তো আর জানার কথা নয়, তথাকথিত ভূতটা সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসে নিচ থেকে ঠেলে ট্র্যাপ-ডোর খুলেছে, ওপরে বিছানো কার্পেটটাও পেরেক থেকে ছুটে গেছে ঠেলা লেগে।
চমৎকার! ভূত রহস্যের সমাধান হয়ে গেল। চলো, সেভারনদের জানাইগে।
এদিক দিয়েই যাব?
দরকার কি ঠেলাঠেলি করার।
সামার-হাউস দিয়ে আবার বাইরে বেরোল ওরা। উজ্জ্বল রোদে চোখ ধাধিয়ে গেল।
বাড়ির পাশ ঘুরে আসার আগেই একটা গাড়ির দরজা লাগানোর শব্দ হলো। স্টার্ট নিল এঞ্জিন। দৌড় দিল কিশোর। বাড়ির সামনের দিকটায় পৌঁছে দেখল মিস্টার সেভারনের গাড়িটা বেরিয়ে যাচ্ছে গেট দিয়ে।
কার সঙ্গে গেলেন? অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে মুসা।
ভ্রুকুটি করল কিশোর। গাল চুলকাল, সেটাই তো বুঝতে পারছি না…এমন কে এল, সাতসকালে বের করে নিয়ে যেতে পারল তাকে? গাড়িটাও নিশ্চয় ড্রাইভ করছে ওই লোকই।
আচ্ছা… কিশোরের মুখের দিকে তাকিয়ে থেমে গেল রবিন। চোখ বড় বড় হয়ে গেছে।
কি বলতে চাও?
মিসেস ড্রাকুলা লোক পাঠিয়ে কিডন্যাপ করাল না তো?
তা কি করে হয়… বলতে গেল মুসা।
কিন্তু সচকিত হয়ে উঠেছে কিশোর। জলদি এসো! মিসেস সেভারনের কি অবস্থা করেছে কে জানে!
জোরে জোরে সামনের দরজা ধাক্কাতে শুরু করল কিশোর।
তাকে অবাক করে দিয়ে খুলে গেল দরজাটা।
মিসেস সেভারনও অবাক, তোমরা! এই সাতসকালে তোমরা কোত্থেকে?
অনেক আগেই এসেছি আমরা, জবাব দিল কিশোর। কিন্তু আপনার স্বামী কোথায় গেলেন?
অস্বস্তি দেখা দিল মিসেস সেভারনের চোখে। গেছে..! দুধের বোতলগুলো তুলে নিলেন তিনি। এসো, ভেতরে এসো। তোমাদের এই ছিরি কেন? নর্দমায় নেমেছিলে

নাকি?
নর্দমায় না, সেলারে। রাস্তার দিকে ফিরে তাকাল কিশোর। কার সঙ্গে গেলেন মিস্টার সেভারন? মিসেস সেভারন বলতে চাইছেন না কেন? তবে একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল, কিডন্যাপ করা হয়নি সেভারনকে।
আবার মিসেস সেভারনের দিকে ঘুরল সে। কাল রাতে ফোন করার অনেক চেষ্টা করেছি। নষ্ট নাকি?
মাথা ঝাঁকালেন মিসেস সেভারন। হ্যাঁ। আজ ঠিক করে দেবে বলেছে।

.

সামার-হাউস দিয়ে ঢুকে কি পাওয়া গেছে শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন মিসেস সেভারন। বললেন, কিছুই জানতাম না আমরা। জানবই বা কি করে? কার্পেটটা কি কখনও তুলেছি।
এ বাড়ির পুরানো প্ল্যানটাও দেখেননি?
না। এ সব কাজ জ্যাকিই করত।
কিন্তু আসল দলিলগুলো নিশ্চয় আছে আপনাদের কাছে। সেদিন সেই। লোকটা ওগুলোই নিতে এসেছিল।
বোধহয় আছে। অনেক পুরানো কিছু দলিল নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে দেখেছি জ্যাকিকে। বলত, এখানকার পুরানো ইতিহাস জানার চেষ্টা করছে। তবে সবই… সবই…. ওই ভয়ঙ্কর মেয়েমানুষটা এসে জ্বালানো শুরু করার আগে।
বার বার দেয়ালের ঘড়িটার দিকে তাকাচ্ছেন তিনি। চেহারায় উদ্বেগের ছাপ। ব্যাপারটা লক্ষ করল কিশোর। বৃদ্ধার দিকে ঝুঁকে বলল, আপনি সত্যি বলছেন মিসেস সেভারন, আপনার স্বামী কোন বিপদে পড়েননি?
লম্বা করে শ্বাস টানলেন মিসেস সেভারন। এবারেও জবাব দিলেন না কিশোরের প্রশ্নের। বড় চিন্তা হচ্ছে…হুট করে এভাবে চলে গেল…আবার না কোন বিপদে জড়ায়…
কোথায় গেলেন?
মেয়েলোকটার অফিসে… বলেই চুপ হয়ে গেলেন মিসেস সেভারন। নাহ তোমাদের এ ভাবে বলে দেয়াটা ঠিক হচ্ছে না…
মিসেস শাজিনের অফিসে! কেন?
বিরক্তর চূড়ান্ত হয়ে গেছে। কত আর সহ্য করবে। আজ একটা হেস্তনেস্ত না করে ছাড়বে না বলেছে। দরকার হয় পুলিশের কাছেই যাবে। ওরা বিশ্বাস করবে না বলেই এতদিন যায়নি। …সহ্যের সীমা ছাড়িয়েছে ওই শয়তান বেটিটার অত্যাচার।

রুমাল বের করে নাক ঝাড়লেন মিসেস সেভারন। ওদের যেতে নিষেধ ন্ট করেছিলাম, কিন্তু পারলাম না। পুলিশ আগেও বিশ্বাস করেনি। আমাদের কথা, এখনও করবে না। শুধু শুধু আমাদের ছেলেটাকে… কান্নায় বুজে এল তাঁর কণ্ঠ।
ওদের মানে? আর কে আছেন মিস্টার সেভারনের সঙ্গে?
কিছুক্ষণ থেকেই ভারী একটা ইঞ্জিনের শব্দ কানে আসছিল। জোরাল হলো সেটা। উঠে দেখতে গেল মুসা। জানালার পর্দা সরিয়ে দেখেই চিৎকার করে উঠল, কিশোর, জলদি এসো!
দৌড়ে গেল রবিন। কিশোর গেল তার পেছনে।
গেটের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে একটা দৈত্যাকার জেসিবি ডিগার। ইচ্ছে করে ইঞ্জিনটাকে প্রচণ্ড গো-গো করাচ্ছে ড্রাইভার। এগজস্ট দিয়ে ভলকে ভলকে বেরোচ্ছে কালো ধোয়া। নীরব রাস্তাটার নীরবতা ভেঙে চুরমার করার বিকৃত আনন্দে মেতেছে যেন।
বার কয়েক গো-গোঁ করিয়ে ইঞ্জিনের গর্জন কমাল ডাইভার। পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে তাকিয়ে রইল কয়েক সেকেন্ড। ঠিকানা ঠিক আছে কিনা দেখল বোধহয়। তারপর পিছাতে শুরু করল বিশাল যন্ত্রটাকে। কিছুদূর পিছিয়ে গিয়ে নাক ঘুরাল কটেজের দিকে। ধীরে ধীরে এগোতে শুরু করল।
খাইছে! বলে উঠল মুসা।
উদ্দেশ্যটা কি ওর বুঝতে পারলেও বিশ্বাস করতে পারছে না রবিন।
দেখছ না, ভাঙতে আসছে! গেট, বেড়া সব ভেঙে ঢুকে পড়বে বাগানে…
ঠেকানো দরকার ওকে! চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। সচল হলো হঠাৎ। দরজার দিকে দৌড় দিল।

.

কামানের গোলার মত সামনের দরজা দিয়ে ছিটকে বেরোল যেন তিন। গোয়েন্দা। হাত নাড়তে নাড়তে গেটের দিকে ছুটল।
এই, থামুন, থামুন!
কিন্তু ওদের চিৎকার কানেই গেল না যেন ড্রাইভারের।
সামনের দরজায় এসে দাঁড়ালেন মিসেস সেভারন। মুখে হাতচাপা দিয়েছেন। সম্মোহিতের মত তাকিয়ে আছেন দানবটার দিকে। হঠাৎ মুখ থেকে বেরিয়ে এল ছোট্ট চিৎকার। বুড়ো পা দুটো যেন আর ধরে রাখতে পারল না। শরীরটাকে। হাঁটু ভাজ হয়ে বসে গেলেন দরজার গোড়ায়।
দৌড়ে ফিরে গেল তিন গোয়েন্দা। হাত ধরে টেনে সরাল তাঁকে। দরজার ফ্রেমে পিঠ লাগিয়ে যতটা সম্ভব আরাম করে বসিয়ে দিল।
মিসেস সেভারন, কি হয়েছে আপনার? উদ্বিগ্ন স্বরে জানতে চাইল রবিন।

ঘন ঘন কয়েকবার ভারী দম নিলেন মিসেস সেভারন। না না, আমার কিছু হয়নি।
শোবেন নাকি? নিয়ে যাব ভেতরে?
না, আমি এখানেই থাকব।
ওদিকে প্রচণ্ড গর্জন তুলে বেড়ার কাছে চলে এসেছে ডিগারটা। বেড়া ভাঙতে প্রস্তুত।
সত্যি সত্যি ভাঙবে! এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না মুসা। পাগল হয়ে গেছে! না হুমকি দিয়ে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে?
ও শয়তান মহিলাটার লোক হয়ে থাকলে, কিশোর বলল, সত্যিই ভাঙবে।
হাত নাড়তে নাড়তে আবার ছুটল সে। ড্রাইভারের চোখে পড়ল। ইঞ্জিন বন্ধ করে দিয়ে নেমে এল লোকটা। চিৎকার করে বলল, কি ব্যাপার? চাপা পড়ে মরার ইচ্ছে হলো নাকি?
জবাব না দিয়ে রাগত স্বরে প্রশ্ন করল কিশোর, আপনি কি করছেন?
দেখে বুঝতে পারছ না? মাথার হলুদ সেফটি হেলমেটটা ঠেলে পেছনে সরাল ড্রাইভার।
বুঝতে তো যা পারছি, বাগানটার সর্বনাশ করার ইচ্ছে হয়েছে আপনার।
কিশোরের পাশে এসে দাঁড়াল মুসা আর রবিন।
ওদের দিকে একবার করে তাকিয়ে আবার কিশোরের দিকে নজর ফেরাল লোকটা, বুঝলেই ভাল। ঘুরে আবার ক্যাবে উঠতে গেল।
দৌড়ে এসে তার হাত চেপে ধরল কিশোর। কে করতে বলেছে আপনাকে?
যে-ই হোক, বলেছে। অর্ডার।
কে দিয়েছে, সেটাই তো জানতে চাইছি।
ওভারঅলের পকেট থেকে একটা কাগজ বের করল লোকটা। লোকাল কাউন্সিল।
দেখি তো? কাগজটা প্রায় ছিনিয়ে নিল কিশোর।
মুসা আর রবিনও দেখার জন্যে পাশে সরে এল।
কাগজটা রাস্তা বাড়ানোর পার্মিট। রাস্তা চওড়া করার অনুমতি রয়েছে। তাতে।
এ কথা তো নতুন শুনলাম, মুসা বলল লোকটার দিকে তাকিয়ে। যাদের বাড়ি তাদের আগে জানানো হয়নি কেন?
জানাবে কি করে? ব্যঙ্গ করে বলল কিশোর। ভুয়া কাণ্ড তো! সেই ড্রাকুলা বেটির কাজ; দেখছ না, ভাঙা টাইপরাইটার, ও অক্ষরটা ক্যাপিটল লেটারে।
তাই তো!
এ সব ধাপ্পাবাজি ছাড়ন! কাগজটা লোকটার হাতে ফিরিয়ে দিতে দিতে বলল কিশোর। বিদেয় হোন এখান থেকে!

তাই নাকি? রাগল না লোকটা। কার হুকুমে?
হুকুমের কথা বলা হচ্ছে না। কাউন্সিলের বাপেরও সাধ্য নেই জায়গার মালিকের সঙ্গে কথা না বলে, তার অনুমতি না নিয়ে রাস্তা বাড়ানোর হুকুম দেয়।
ওসব আমার জানার দরকার নেই। আমাকে লিখিত অর্ডার দিয়েছে, পালন করতে আমি বাধ্য। তোমার মত একটা ছেলেমানুষের কথায় ফিরে যাব আমি ভাবলে কি করে?
ছেলেমানুষ কাকে বলছেন! রেগে উঠল মুসা।
হাত তুলে তাকে থামার ইঙ্গিত করে কিছুটা নরম হয়ে বলল কিশোর, ব্যাপারটা যে ধাপ্পাবাজি, আমি প্রমাণ করে দিতে পারি। যদি একটু সময় দেন।
পকেটে কাগজটা রেখে মাথা নাড়ল ড্রাইভার, সরি। আমার কাজ আমাকে করতেই হবে। এদিকের বেড়া আর গাছগুলোর আশা ছাড়ো, ক্যাবে উঠে ইঞ্জিন স্টার্ট দিল। সামনের দিকে একটা লিভার ঠেলে দিতেই বেড়ে গেল ইঞ্জিনের শব্দ।
কিশোর, ওকে থামানো দরকার! চিৎকার করে উঠল মুসা।
মাঝখানে দাঁড়িয়ে দুদিক থেকে দুজনের হাত চেপে ধরল রবিন। এসো, সামনে গিয়ে দাঁড়াই। দেখি, আমাদের মাড়িয়ে বেড়া ভাঙতে আসে কি করে।
গেটের বাইরে এসে বেড়ার সামনে হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে গেল ওরা।
পাশে ঝুঁকে মাথা বের করল ড্রাইভার, কি হলো, সরো! আরেকটা লিভার ঠেলে দিল সে। ধীরে ধীরে এগোতে শুরু করল ডিগার।
খাইছে! ঢোক গিলল মুসা। সত্যি সত্যি চাপা দেবে নাকি?
ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে মাথা নাড়ল কিশোর, এত সাহস হবে না।
দেখতে দেখতে যন্ত্রটা এত কাছে চলে এল, ওটার বনেটের মরচেগুলোও দেখতে পাচ্ছে ওরা। চোখ বন্ধ করে ফেলল কিশোর। কিন্তু জায়গা ছেড়ে নড়ল না। হাতের চাপ বাড়াল দুই বন্ধুর হাতে। ওরাও চাপ দিল একাত্মতা ঘোষণা করে।
বন্ধ হয়ে গেল ইঞ্জিন। আচমকা নীরবতা নেমে এল রাস্তা জুড়ে। চোখ মেলে দেখল কিশোর, ক্যাব থেকে নেমে আসছে ড্রাইভার। চোখমুখ ভয়ঙ্কর করে এগিয়ে এল ওদের দিকে।
সরো! রবিনের হাত চেপে ধরে হ্যাঁচকা টানে সরানোর চেষ্টা করল সে। মরতে চাও নাকি?
দেখুন, অনুরোধের সুরে বলল কিশোর, আমাদের কথা বিশ্বাস করুন, পুরো ব্যাপারটাই ধাপ্পাবাজি। নইলে কি আর এভাবে মেশিনের সামনে দাঁড়াতাম আমরা আমাদের প্রাণের ভয় নেই?
সেটাই তো বুঝতে পারছি না!

ইতিমধ্যে হই-হট্টগোল শুনে কি হয়েছে দেখার জন্যে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে সেভারনদের পড়শীরা।
শোনার পর একজন বলল, ঠিকই তো বলছে ছেলেগুলো। আপনি জোর করে ভাঙতে এসেছেন কেন? কে হুকুম দিল আপনাকে?
দ্বিধায় পড়ে গেছে ড্রাইভার। বলল, কাউন্সিল। আমার বস্ ডেকে বলল, ওপর থেকে ভাঙার নির্দেশ এসেছে। আমাকে পাঠাল ভাঙতে।
ভাঙতে বললে ভাঙুন, আমরা তো মানা করছি না, কিশোর বলল। কিন্তু বলছি একটু সময় দিতে, যাতে আমরা প্রমাণ করে দিতে পারি আপনারা ভুল করছেন।
হাতঘড়ি দেখল ড্রাইভার। আমি পারব না। এখান থেকে সেরে গিয়ে আরেকটা কাজ করতে হবে। সময় নেই।
তাহলে ওখানের কাজটাই আগে সেরে আসুন না?
মাথা নাড়ল লোকটা, সরি। এটাই আগে করার হুকুম দিয়েছে।
প্লীজ! অনুরোধ করল রবিন, আধঘণ্টা সময় দিন। তাতেই হয়ে যাবে।
হেলমেটটা খুলে মাথা চুলকাল ড্রাইভার। জোরে নিঃশ্বাস ফেলল। বেশ, দিলাম আধঘণ্টা, যাও। ততক্ষণে চা-নাস্তা খেয়ে নিই আমি। সকালে খবরের কাগজটাতেও চোখ বোলানো হয়নি। মনে থাকে যেন, আধঘণ্টা। তারপর আর সময় পাবে না…
আবার ক্যাবে উঠে গেল সে। লাঞ্চবক্স আর ফ্লাস্ক বের করল।
একটা মুহূর্ত আর দেরি করল না কিশোর। দুই সহকারীকে আসতে বলে ছুটল।
দরজার সামনেই বসে আছেন মিসেস সেভারন। ফ্যাকাসে চেহারা। গায়ের কাঁপুনি যায়নি।
কি বলল ও? জানতে চাইলেন তিনি।
ওরা নাকি রাস্তা বাড়ানোর পরিকল্পনা করেছে, কিশোর বলল, আপনাদের বাগানের সামনের অংশটা যাবে।
ঝট করে হাত উঠে গেল মিসেস সেভারনের হাঁ হয়ে যাওয়া মুখে।
ভাববেন না, তাড়াতাড়ি তাকে আশ্বস্ত করতে চাইল কিশোর, আমরা জানি, এগুলো সব অগাস্ট শাজিনের শয়তানি। প্রমাণ জোগাড় করতে যাচ্ছি আমরা।
কিন্তু…
পরে বলব সব, এখন সময় নেই। আপনাকে শুধু বলে যাচ্ছি, চিন্তা করবেন না। এই, এসো তোমরা।
সাইকেল নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল ওরা। সাঁ সাঁ করে ছুটল। আধঘণ্টা সময়ও নেই হাতে। এর মধ্যে ওল্ড প্যাসিফিক স্ট্রীটে শাজিনের অফিসে যেতে হবে, প্রমাণ জোগাড় করে ফিরতে হবে আবার ম্যানিলা রোডে। অসম্ভব মনে হচ্ছে।

কিছুদূর এগিয়ে হঠাৎ খেয়াল করল কিশোর, রবিন নেই ওদের সঙ্গে। ফিরে চেয়ে দেখল অনেক পেছনে পড়েছে সে। তাড়াতাড়ি আসার জন্যে হাত নেড়ে ইশারা করে আবার সামনে তাকাল কিশোর।
পারব না! হাঁপাতে হাঁপাতে বলল মুসা, কোনমতেই পারব না এই সময়ের মধ্যে।
ফুস্ করে শব্দ হলো। কেঁপে উঠল মুসার হাত। হ্যান্ডেলটা বেয়াড়াপনা শুরু করল। সামনের চাকাটা রাস্তা থেকে নেমে গেল পথের পাশে। সামলাতে পারল না মুসা। উল্টে পড়ে গেল।
ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে গেল কিশোর আর রবিন।
লাফ দিয়ে নেমে মুসার দিকে দৌড় দিল কিশোর, মুসা! কি হলো তোমার? ব্যথা পেয়েছ?
কনুই ডলল মুসা। উঠে দাঁড়াল। এগিয়ে গিয়ে টান দিয়ে তুলল সাইকেলটা। সামনের চাকাটার দিকে তাকিয়ে মুখ বাঁকাল এমন করে যেন নিমফুল মুখে দিয়েছে, গেছে!
কি? জানতে চাইল কিশোর।
পাংচার।
ঘড়ি দেখল রবিন, করবটা কি এখন?
তোমরা চলে যাও, মুসা বলল। আমি ফিরে গিয়ে মিসেস সেভারনকে পাহারা দিই।...যাও যাও, দাঁড়িয়ে থেকে সময় নষ্ট কোরো না। দুজনকে ঠেলা দিল সে। নাকি তোমাদের একজন থাকবে, আমি যাব?
মাথা নাড়ল কিশোর, না, তুমিই থাকো। আমরা যাই।
আবার সাইকেলে চাপল দুজনে। কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে তাকিয়ে মুসাকে বলল কিশোর, আমাদের দেরি হলে লোকটাকে ঠেকাবে, যে ভাবে পারো।
দুজনকে চলে যেতে দেখল মুসা। জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে ঘুরে দাঁড়াল। চাকা বসে যাওয়া সাইকেলটাকে ঠেলে নিয়ে চলল কটেজের দিকে।

.

তীব্র গতিতে প্যাড়াল করে চলেছে কিশোর আর রবিন। বেপরোয়া। রাস্তার মোড়গুলোতেও গতি কমাচ্ছে না, জোড়গুলোতেও না। রেলওয়ে ক্রসিঙের দিকে চলেছে এখন।
গেটের দিকে এগোতে এগোতে দমে গেল। লাল আলোটা জ্বলছে নিভছে। ওয়ার্নিং বেল বাজছে। দূরে শোনা গেল ট্রেনের হুইসেল। ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যেতে শুরু করল গেটটা।
বন্ধ হওয়ার আগে পেরোতে পারব? রবিনের প্রশ্ন।

না, ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে গেল কিশোর। চেষ্টা করে লাভ হবে না। আমরা ন্টট্রেনে কাটা পড়ে মরলে কোন উপকার হবে না সেভারনদের।
ট্রেনটা চলে যাওয়ার অপেক্ষায় রইল দুজনে। অস্থির হয়ে বার বার ঘড়ি দেখছে রবিন।
কয়েক যুগ তো পার হয়ে গেল, গজগজ করতে লাগল সে, ট্রেন আসারও আর সময় পেল না! মুসা ঠিকই বলেছে, আধঘণ্টার মধ্যে কোনমতেই ফিরতে পারব না আমরা।
পারতেই হবে, দৃঢ়কণ্ঠে বলল কিশোর। না পারলে চলবে না!
কানফাটা শব্দ তুলে পার হয়ে গেল ট্রেন খুলে যেতে শুরু করল গেট। প্যাডালে চাপ দিল ওরা। লাইন পেরিয়ে আসতেই পেছন থেকে শোনা গেল গাড়ির হর্ন। সামান্য ভাঙা ভাঙা। পরিচিত মনে হলো কিশোরের। ফিরে তাকাতেই দুলে উঠল বুক। ইয়ার্ডের পিকআপটা। গাড়ি চালাচ্ছেন রাশেদ পাশা। পাশে বসে আছে ডন। হাত তুলল কিশোর।
আগেই দেখতে পেয়েছেন রাশেদ পাশা। রাস্তার পাশে থামালেন।
পিকআপের পেছনে মুসাকে দেখে অবাক হলো কিশোর। কিন্তু প্রশ্ন করার সময় নেই এখন। গাড়ি থামতেই পাশে ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে দিল মুসা, সাইকেলগুলো দাও, তুলে ফেলি।
সাইকেল দুটো তুলে রবিন আর কিশোরের উঠে বসতে মিনিটখানেকও লাগল না। পাশ দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলল কিশোর, চাচা, যাও। ওল্ড প্যাসিফিক স্ট্রীটের মাথায় আমাদের নামিয়ে দিলেই চলবে।
গাড়ি চলল। মুসার দিকে তাকাল কিশোর, তুমি চাচাকে পেলে কোথায়?
কাকতালীয় ঘটনা প্রচুর ঘটে পৃথিবীতে, কৃত্রিম গাম্ভীর্য দেখিয়ে দার্শনিকের ভঙ্গিতে জবাব দিল মুসা। চাকা ফুটো হওয়াতে হাজারটা গাল দিয়েছি সাইকেলটাকে। ঠেলে নিয়ে প্রায় পৌঁছে গেছি সেভারনদের বাড়ির গেটে, এই সময় পাশের আরেকটা রাস্তা থেকে বেরিয়ে পেছন থেকে আমার পাশে এসে দাঁড়াল পিকআপটা। ডন আমাকে সাইকেল ঠেলে নিয়ে যেতে দেখে রাশেদ আঙ্কেলকে বলেছে। আমার সাহায্য লাগতে পারে ভেবে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন। তোমরা কোথায় গেছ তাঁকে জানালাম। ওল্ড প্যাসিফিক স্ট্রীটে দিয়ে আসতে অনুরোধ করলাম।
হু, একেই বলে ভাগ্য, মাথা দোলাল কিশোর। ম্যানিলা রোডের এক বাড়িতে মালের দরদাম করতে যাওয়ার কথা ছিল চাচার। তোমার চাকাটা ফুটো হলো বলেই দেখাটা হলো, নইলে এখন গাড়িটা পেতাম না।

মেঘ দেখে কেউ করিসনে ভয়, আড়ালে তার সূর্য হাসে... কিশোরের কাছ থেকে শেখা বাংলা কবিতাটা এই সুযোগে ঝেড়ে দিল রবিন।

যে ঝরঝরে পিকআপটা নিয়ে অনেক ব্যঙ্গ আর হাসাহাসি কিশোরও করে, চাচাকে মিউজিয়ামে দিয়ে আসতে বলে, সেটাই এখন বিরাট উপকার করল। সাইকেলের চেয়ে অনেক দ্রুত পৌঁছে দিল ওল্ড স্ট্রীটের মাথায়।

চিৎকার করে চাচাকে বলল কিশোর, রাখো এখানেই।

তিন গোয়েন্দা নেমে গেলে জিজ্ঞেস করলেন রাশেদ পাশা, দাঁড়াব এখানে?

না, লাগবে না, কিশোর বলল, চলে যাও। সাইকেলগুলো নিয়ে যাও। মিস্টার সেভারনকে পেলে তাঁর গাড়িতেই ফিরতে পারবে ম্যানিলা রোডে। সাইকেলগুলো রাখলে ঝামেলা হবে তখন, তাই দিয়ে দিল।

নতুন কোন কেস নাকি তোদের?

হ্যাঁ। পরে বলব সব। যদি সফল হতে পারি কাগজেও দেখতে পাবে।

ডন নামতে চাইল। নামতে দিলেন না রাশেদ পাশা। মুখটাকে পেঁচা বানিয়ে বসে রইল সে। কিশোর ওর দিকে তাকাতেই জিভ বের করে ভেঙচি কাটল। হেসে ফেলল কিশোর। মুসা আর রবিনও হাসতে লাগল।

পিকআপটা, চলতে শুরু করার আগেই রওনা হয়ে গেল তিনজনে। ঢুকে পড়ল কানাগলিটায়, যেটাতে রয়েছে শাজিন-হ্যারিসনের অফিস।

পুরানো বিল্ডিংটার সামনে সেভারনদের সবুজ গাড়িটা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল।

থামল কিশোর। বলল, গাড়িটা আছে, তারমানে মিস্টার সেভারন এখনও শাজিনের অফিসেই রয়েছেন।

কি করে জানলে? মুসার প্রশ্ন।

তা ছাড়া আর কোথায় থাকবেন? চল, ঢুকে পড়ি।

কিন্তু ঢুকতে গিয়ে হতাশ হতে হলো। বিল্ডিঙে ঢোকার মূল দরজাটা বন্ধ। ঠেলা দিয়ে দেখল রবিন। নব ধরে মোচড় দিল। ভেতর থেকে তালা লাগানো।

তালা দেয়া! কিশোরের দিকে তাকাল সে, কি করা যায়?

আর কোন পথ নেই?

না। কিন্তু মিস্টার সেভারন ঢুকলেন কিভাবে?

কি করে বলব? পাল্লায় কাঁধ লাগিয়ে ধাক্কা দিতে শুরু করল কিশোর। হাল ছেড়ে দিয়ে মাথা নাড়ল, নাহ, খোলা যাবে না। শনিবারে কি কেউ কাজ করে না নাকি এখানে? রবিনের দিকে তাকাল আবার সে, ঢোকার আর কোন পথই কি নেই?

এক মুহূর্ত ভাবল রবিন, আছে, তবে দস্যু সাইমন টেম্পলার হওয়া লাগবে আমাদের।

মানে?
একটা ফায়ার এসকে আছে। ওটা বেয়ে উঠতে পারলে…
রবিনকে কথা শেষ করতে দিল না মুসা। দেখাও ওটা, সাইমন টেম্পলারই হব আজ। কোনদিকে?
বাড়ির পাশ দিয়ে দৌড় দিল রবিন। পেছনে চলল মুসা আর কিশোর।
ফায়ার এসকেপটার নিচে দাঁড়িয়ে ওপর দিকে তাকাল কিশোর। চিন্তিত। বিড়বিড় করে বলল, কিন্তু ওটা বেয়ে ওঠা…সত্যি সত্যি সাইমন টেম্পলারকে দরকার… আমরা কি পারব!
তোমাদের দুজনের পারা লাগবে না, নির্দ্বিধায় বলে দিল মুসা, আমি উঠে যাচ্ছি। জানালা দিয়ে ঢুকে নেমে এসে সামনের দরজা খুলে দেব।…রবিন, বলো তো, কোন কোন দিক দিয়ে গিয়ে কিভাবে আসতে হবে?
নড়বড়ে, মরচে পড়া লোহার ধাপগুলো বেয়ে উঠে যেতে লাগল মুসা। কোনভাবে যদি পা পিছলায়, কিংবা কোন একটা ধাপ বসে যায়, নিচে পড়ে যে ছাতু হয়ে যেতে হবে জানে, সেজন্যেই ভয়ে নিচের দিকে তাকাচ্ছে না।
সাবধান, মুসা! ধাপগুলোর গোঙানি আর কচমচ শব্দ বুকের মধ্যে বাড়ি মারছে যেন কিশোরের। অসুবিধে হলে নেমে এসো, অন্য উপায় বের করব।
কিন্তু জানালার কাছাকাছি চলে গেছে ততক্ষণে মুসা। পাশে হাত বাড়িয়ে একটা জানালার চৌকাঠের নিচটা ধরে ফেলল। স্কুলে পড়ল একহাতের ওপর। দ্বিতীয় হাতটাও বাড়িয়ে দিয়ে ধরে ফেলল। নিজেকে টেনে তুলল চৌকাঠের ওপর। ঢুকে গেল ভেতরে। গলা বের করে নিচের দিকে তাকিয়ে হাসল। হাত নেড়ে সামনের দরজার কাছে চলে যেতে ইশারা করল কিশোর আর রবিনকে।
ঠিক দেড় মিনিটের মাথায় দরজাটা খুলে দিল মুসা।
ভেতরে ঢুকে গেল কিশোর আর রবিন।
সিঁড়ি বেয়ে দৌড়ে উঠতে শুরু করল তিনজনে। তিনতলায় শাজিন হ্যারিসনের অফিসের সামনে আসতে কথা শোনা গেল ভেতর থেকে। চাপা স্বরে কথা বলছে দুজন লোক।
মিস্টার সেভারনের গলা মনে হচ্ছে না? ফিসফিস করে বলল রবিন।
তাই তো, মুসা বলল।
শিওর হওয়ার একটাই উপায়, নিচের ঠোঁট কামড়াল কিশোর, ভেতরে ঢুকে পড়া।
.
অবাক হয়ে তিন গোয়েন্দার দিকে তাকালেন মিস্টার সেভারন আর তার সঙ্গী।
তোমরা!…তোমরা এখানে! মিস্টার সেভারন বললেন।
জবাব না দিয়ে কিশোর তাকিয়ে আছে তার সঙ্গীর দিকে।

আপনি জ্যাকি না? কিশোর বলল। কি করে এলেন?
হাসল জ্যাকুয়েল সেভারন যার ডাকনাম জ্যাকি। তাহলে তোমরাই তামাকে চিঠি লিখেছিলে।
কিন্তু এখানে এলেন… আবার জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল কিশোর।
মাথা নেড়ে তাকে থামিয়ে দিল জ্যাকি, সব বলার সময় নেই। একটা থাই বলি, তোমাদের চিঠি পেয়ে মনে হলো এখানে কি ঘটছে দেখে যাওয়া দরকার। বাবার দিকে ফিরল সে, বাবা, তোমাকে বলিনি, ওরা আমাকে শাজিনের শয়তানির কথা চিঠি লিখে জানিয়েছে।
ও, বাড়ি আসার তোর এটাই আসল কারণ। আমি তো ভেবেছি প্যারোলে ছাড়া পেয়ে আমাদের দেখতেই এসেছিস, বাবার কণ্ঠে মৃদু অভিমান।
দুটো কাজই করতে এসেছি, হাসল ছেলে। তিন গোয়েন্দার দিকে ফিরে বলল, আমার হাতে বেশি সময় নেই। আজকেই সন্ধ্যার আগে গিয়ে রিপোর্ট করতে হবে।
আপনারা ঢুকলেন কি করে এখানে? জানতে চাইল মুসা। সামনের দরজায় তো তালা লাগানো ছিল।
আবার হাসল জ্যাকি। এখানে চাকরি করতাম যে ভুলে গেলে? ডুপ্লিকেট একটা চাবি এখনও আছে আমার কাছে।
কিন্তু তোমরা এখানে কেন? আবার সেই প্রথম প্রশ্নটাই করলেন মিস্টার সেভারন। ঢুকলেই বা কি করে? আমাদের বাড়িতে গিয়েছিলে নাকি? জ্যাকির মা ভাল আছে? কিছু ঘটেছে?
কি ঘটেছে, জানাল কিশোর।
রক্ত সরে গেল বৃদ্ধের মুখ থেকে। ডেস্কের কিনার খামচে ধরলেন তিনি। এখনি যাওয়া দরকার।
যেতে তো হবেই, তার আগে কিছু তথ্য-প্রমাণ জোগাড় করে নিই। ও অক্ষর নষ্ট হওয়া ওই টাইপরাইটার দিয়ে একটা চিঠিও লিখতে হবে, ড্রাইভারকে বোঝানোর জন্যে যে সে একটা মস্ত ভুল করতে যাচ্ছে।
ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মুসা বলল, মাত্র দশ মিনিট সময় আছে আমাদের
এখনও দশ মিনিট আছে! বিশ্বাস হচ্ছে না রবিনের। আমার তো মনে হচ্ছে দশ হাজার বছর পার করে দিয়েছি। তবে সময় নিয়ে ভাবছি না, হেসে পকেটে হাত ঢোকাল সে। একটা চাবি বের করে দেখিয়ে বলল, ডিগারের ইগনিশন কী। চুরি করেছি।
ও, এ জন্যেই পেছনে পড়ে গিয়েছিলে তখন, হাসি ফুটল কিশোরের মুখেও। খবর লুকিয়ে রাখার দেখি তুমিও ওস্তাদ। যাকগে, কাজের কাজই করেছ একটা।

ড্রাইভারকে যে নির্দেশটা দেয়া হয়েছে, জ্যাকি বলল, তার একটা কপি নিশ্চয় এখানে আছে কোনখানে। যদিও অতটা অসাবধান ভাবতে পারছি না শাজিনকে। ধরা পড়ার মত প্রমাণ রেখে কাজ করার বান্দা নয় ও। আমি আর বাবা এতক্ষণ ধরে স্টেটমেন্ট খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম।
স্টেটমেন্ট? বুঝতে পারল না কিশোর।
হ্যাঁ, জমা-খরচের স্টেটমেন্ট। ইনকাম ট্যাক্স অফিসকে দিতে হয় যেটা। দেখতে চাইছিলাম, আমি যে সময় যে টাকাটা চুরি করেছি বলেছে শাজিন, সেই অঙ্কের টাকা সেই সময়ে অন্য কোন খাতে খরচ করেছে কিনা সে। ব্যাংক থেকে তখন কত টাকা তুলেছে, সেটা স্টেটমেন্টের সঙ্গে মিলিয়ে নিলেই প্রমাণ করে দেয়া যাবে সে-ই খরচ করেছে টাকাটা, আমি চুরি করিনি।
যদি সে সেই টাকার হিসেবটা স্টেটমেন্টে দেখিয়ে থাকে,তবে। অত কাঁচা কাজ করবে বলে মনে হয় না।
নিজের অ্যাকাউন্টের হিসেব রাখার জন্যে ব্যক্তিগত আরেকটা স্টেটমেন্ট বানাতে পারে, যাতে আসল হিসেবটা রাখবে।
তা পারে। কিন্তু সেটা কোথায়?
পাইনি। টাকা যে আমি চুরি করিনি, প্রমাণ করার আর কোন উপায় দেখতে পাচ্ছি না।
এখান থেকে চলে যাওয়া দরকার, মিস্টার সেভারন বললেন। শাজিন এসে যদি দেখে ফেলে আমাদের, সাংঘাতিক বিপদে পড়ব।
যা হয় হবে, জ্যাকি বলল, আবার খুঁজব। ওর বিরুদ্ধে প্রমাণ না নিয়ে আজ আমি বেরোচ্ছি না এখান থেকে।

.

জ্যাকির কথামত প্রথমে ফাইলিং কেবিনেটগুলোতে খুঁজতে আরম্ভ করল ওরা।
সেক্রেটারির মেশিনে টাইপ করা যে কাগজ পাও, সব দেখো, কিশোর বলল। ভাঙা কী দিয়ে লেখা হয়েছে, এমন কোন না কোন চিঠি নিশ্চয় পাবে। নিয়ে নেবে সেটা প্রমাণ হিসেবে কাজে লাগবে। তোমরা এদিকটায় দেখতে থাকো। আমি ওদিকটায় দেখছি।
কয়েক মিনিট পর হাসিমুখে বেরিয়ে এল কিশোর। হাতে একটা শর্টহ্যান্ড নোটপ্যাড আর দুই তা কাগজ। দুমড়ে ফেলে দেয়া হয়েছিল নিশ্চয় ময়লা ফেলার ঝুড়িতে, তুলে চেপেচুপে সোজা করে নিয়েছে।
সেক্রেটারির টেবিল থেকে একটা পেন্সিল তুলে নিল সে। আলতো করে প্যাডের একজায়গায় দাগ দিয়ে রবিনকে দেখিয়ে বলল, এই যে, রাস্তা চওড়া করার অর্ডারের খসড়া। দুমড়ানো একটা কাগজ দেখিয়ে বলল, আর এটা টাইপ করা

অর্ডারের কপি। ভুল হয়েছিল বলে ফেলে দিয়েছে। টাইপরাইটারটা দিয়ে টাইপ করে দেখেছি, ও অক্ষরটা কোনমতেই ছোট হাতের করা যায় না, কী-টা নষ্ট, মারলেই ক্যাপিটল লেটারটা পড়ে…
এটা কিন্তু হঠাৎ বলে উঠল মুসা। একটা ফাইলিং কেবিনেটের একেবারে পেছনে লুকানো সবুজ একটা ফাইল বের করে আনল সে। খুলল।
অ্যাই, জ্যাকি, দেখে যান! ডাক দিল সে। আপনার বাবাকে লেখা চিঠির কপি … একটা নিউজপেপার কাটিংও আছে। আদালতে আপনার কেসের রিপোর্ট।
এগুলো রেখেছে কেন? অবাক হলো রবিন।
দেখি? এগিয়ে এল জ্যাকি।
কিশোরও দেখার জন্যে মুসার পাশে এসে দাঁড়াল। রিপোর্টটা পড়ে বলল, পনেরোই অগাস্ট টাকাটা ফান্ড থেকে চুরি গেছে বলে লিখেছে কাগজওলারা।
হ্যাঁ, তাই তো দেখছি, মাথা ঝাঁকাল জ্যাকি। একটা ভুয়া ব্যবসা। প্রতিষ্ঠানের নামে জাল দলিল সই করার অপরাধে অভিযুক্ত করেছে আমাকে শাজিন। চেকটা লেখা হয়েছে দশ তারিখে। কেউ আমার সই জাল করে স্বাক্ষর দিয়েছে ওটাতে। কে, নিশ্চয় বুঝতে পারছ।
কিন্তু ওই তারিখে তো আপনি ছিলেন না এখানে।
জানি। আমি তখন গ্রীসে। কিন্তু কোন সাক্ষী নেই আমার, যে সেটা প্রমাণ করবে।
আছে, কিশোরের কালো চোখের তারা উত্তেজনায় চকচক করছে।
ভ্রূকুটি করল জ্যাকি, কে?
আপনার ছবি…আপনাদের বাড়ির বসার ঘরের ম্যান্টলপীসে যেটা রাখা আছে।
মাথা নাড়তে লাগল জ্যাকি, কি বলছ বুঝতে পারছি না। বসার ঘরে ঢুকি না অনেকদিন।
তুই জেলে যাবার পর ডাকে এসেছে ছবিটা, মিস্টার সেভারন বললেন। অ্যাথেনসে তোলা হয়েছে।
অ্যাথেনসে?
হ্যাঁ, মাথা ঝাঁকাল কিশোর, পারথেননের সামনে দাঁড়ানো।
নাক-চোখ কুঁচকে ভাবতে লাগল জ্যাকি, মনে করার চেষ্টা করছে। উজ্জ্বল হলো মুখ। হা হা, মনে পড়েছে; একটা আমেরিকান মেয়ে তুলে দিয়েছিল ছবিটা। বাড়ির ঠিকানা দিয়েছিলাম ওকে। ভাবিইনি ছবিটা পাঠাবে সে।
আর তাতে… উত্তেজনায় গলা কাঁপছে কিশোরের, ছবির নিচে তারিখটা ছাপা হয়ে গেছে, ১০ অগাস্ট। আপনি জানেন, কিছু কিছু ক্যামেরায় ছবি তোলার তারিখটা ছাপা হয়ে যায়।
কিন্তু আমি তো কোন তারিখ দেখলাম না, মিস্টার সেভারন বললেন।

আছে, জবাবটা দিল এবার রবিন, ভালমত খেয়াল করেননি, তাই দেখেননি। আমি হাতে নিয়ে দেখছিলাম সেদিন, মাউন্ট থেকে পড়ে গেল; তুলে নিয়ে আবার বসানোর সময় দেখেছি একেবারে নিচে তারিখ ছাপা রয়েছে। কিশোরও জানে। তখন অবশ্য তারিখটা নিয়ে কোন কথা ভাবিনি আমরা। ছবিতে তারিখ ছাপা থাকতেই পারে, সেটা স্বাভাবিক ব্যাপার।

স্বাভাবিক ব্যাপারটাই কাজে লেগে গেল এখন, কিশোর বলল। জোরাল সাক্ষী হয়ে দাঁড়াল।

হাসি ফুটল জ্যাকির মুখে। রবিনের কাঁধ চাপড়ে দিতে দিতে বলল, ভাগ্যিস হাত থেকে ফেলে দিয়েছিলে।

কিন্তু কথা হলো, মুসা বলল, মিসেস শাজিন এভাবে ফাসাতে গেল কেন আপনাকে?

প্রথম কথা, আমার ওপর একটা আক্রোশ আছে তার। একজন ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলরকে ঘুষ সেধেছে সে, সেই লোক আবার আমার বন্ধু। কয়েকটা বিল্ডিঙের প্ল্যান পাস করে দিলে তাকে অনেক টাকা ঘুষ দেবে বলেছে।

পুলিশকে জানাল না কেন আপনার বন্ধু?

কাঁধ ঝাঁকাল জ্যাকি। তাকে ব্ল্যাকমেল করছিল শাজিন। অল্প বয়েসে একটা অপরাধ করে ফেলেছিল-তেমন কিছু না, তবু বন্ধুটির সেটা নিয়ে মাথাব্যথার অন্ত নেই। সেটা জেনে গিয়েছিল শাজিন; ওই কথা মনে করিয়ে দিয়ে, পুলিশকে বলে দেবার ভয় দেখিয়ে দেখিয়ে তার কাছ থেকে কাজ আদায় করেছে। আমার বন্ধুটি জেলে যাবার ভয়ে শাজিনের কথা মানতে বাধ্য হয়েছে। বউ-বাচ্চা আছে তার...

রেগে গেল জ্যাকি। তিক্তকণ্ঠে বলল, মহিলাটা এতই শয়তান, নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে হেন দুষ্কর্ম নেই যা সে করতে পারে না। আমি যখন জেনে ফেললাম এসব খবর, আমাকে ঘুষ দিয়ে মুখ বন্ধ রাখতে চাইল সে। আমি ঘুষ নিতে রাজি না হওয়াতে গেল খেপে। শেষে আমাকেই দিল ফাঁসিয়ে।

আস্তে, সচকিত মনে হলো মিস্টার সেভারনকে, কে যেন আসছে!

সবাই শুনতে পেল সিঁড়িতে পায়ের শব্দ।

মিসেস শাজিন না তো! তাড়াতাড়ি দুই সহকারীকে নির্দেশ দিল কিশোর, আই, পেছনের অফিসটায় লুকিয়ে পড়া। আপনারাও আসুন।

দ্রুত পেছনের অফিসটায় চলে এল সবাই। ফাইলিং কেবিনেটের আশেপাশে ঘাপটি মেরে রইল। নিঃশ্বাস ফেলতেও ভয় পাচ্ছে। বাইরের ঘরে ঢুকল কেউ। হেঁটে গেল শাজিনের অফিসের দিকে। দরজা খুলল। সুইচবোর্ড অন করার শব্দ। রিসিভার তুলে নিয়ে ডায়াল করতে লাগল কেউ।

কে; দেখে আসি, ফিসফিস করে বলল কিশোর। আপনারা সব এখানেই থাকুন। আমি না ডাকলে নড়বেন না।
মাথা নুইয়ে পা টিপে টিপে সেক্রেটারির অফিসের দিকে এগোল সে। ডেস্কের ভেতরের দিকটায় এসে বসে পড়ল। দরজার কাচের ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে, শাজিনের অফিসে ডেস্কের এককোণে ঝুঁকে রয়েছে কালো পোশাক পরা একটা মূর্তি। মুখটা উল্টোদিকে ফেরানো।
আস্তে হাত বাড়িয়ে সেক্রেটারির ডেস্কে রাখা ইনটারকমের সুইচটা অন করে দিল কিশোর। সঙ্গে সঙ্গে কানে এল ভারী নিঃশ্বাস আর অস্থির ভঙ্গিতে টেবিলে অধৈর্য আঙুল ঠোকার শব্দ।
দ্রুত ভাবনা চলেছে কিশোরে মগজে। বসে থেকেই টান দিয়ে ড্রয়ারটা খুলল। ডিকটেশন মেশিনটা পাওয়া গেল। সারিয়ে নিয়ে এসেছে। ভাল। কাজ হবে এখন। ইনটারকমের পাশে সেটা রেখে রেকর্ড লেখা বোতামটা টিপে দিল।
খিলখিল হাসির শব্দ।
আরে হ্যাঁ...হ্যাঁ, কথা শুনতে পাচ্ছে কিশোর, আজ সকালেই গিয়েছে। এতক্ষণে নিশ্চয় ওদের অত সাধের বাগানটার অর্ধেকটাই নেই আর, বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে...কৈফিয়ত? কোন সমস্যা নেই। স্রেফ বলে দেব, ড্রাইভার ভুল করেছে। ক্ষমাটমা চাওয়া যেতে পারে পরে, কিন্তু তাতে লাভ কিছু হবে না, বাগান আর ফেরত আসবে না... আবার হাসি। এ রকম ভুল হতেই পারে, তাই না?
মনে মনে রাগে জ্বলে উঠল কিশোর। মহিলাটা মানুষ না, আসলেই ড্রাকুলা!
ভ্যানটা দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ, শাজিন বলছে। পেছনে রাখা জিনিসগুলো জলদি ফেলে দিয়ে আসুন।...হা হা, পাবেন টাকা, যা বলেছি পাবেন। কাজটা আগে হয়ে যাক..তবে মুখ বন্ধ রাখতে হবে আপনাকে। খুললে আপনিও বিপদে পড়বেন। আপনি আমাকে সহায়তা করেছেন, অস্বীকার করতে পারবেন। না। প্রমাণ করে দিতে পারব আমি। বন্দুকটার লাইসেন্সও আপনার নামে। পুলিশ জানতে পারলে আমাকে যেমন ছাড়বে না, আপনাকেও ছাড়বে না।
আস্তে মাথা তুলে তাকাল আবার কিশোর। এখনও এদিকে পেছন ফিরে আগের মতই দাঁড়িয়ে আছে শাজিন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছে।
ইনটারকমে আবার ভেসে এল তার কণ্ঠ। হ্যাঁ, মিস্টার সেভারন জায়গাটা বেচতে রাজি হয়ে গেলেই কাজ শুরু করে দিতে পারব আমরা। আবার টাকা আসতে আরম্ভ করবে। এখনকার টানাটানি আর থাকবে না।...কি বললেন? আবার হাসি। ঠিকই আছে, বুড়োটার উপযুক্ত শাস্তি...ভালভাবে বলেছিলাম, কানে তোলেনি...
পেছনে খুট করে শব্দ হতে ফিরে তাকাল কিশোর। দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন মিস্টার সেভারন। ছড়িটা তুলে ধরেছেন। রাগে লাল হয়ে গেছে চোখমুখ।

আরে করছেন কি! তাড়াতাড়ি বলল কিশোর, বসে পড়ুন, বসে পড়ুন! দেখে ফেলবে তো!
কিন্তু কানেও তুললেন না মিস্টার সেভারন। চিৎকার করে উঠলেন, শয়তান বেটি! আরেকটু হলেই বাড়িটা হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছিল আমার...শয়তানি করে করে আমার স্ত্রীকে ভয় দেখিয়েছিস, আমার জায়গা তছনছ করেছিস, তোকে আমি ছাড়ব না!
গটমট করে গিয়ে এক ধাক্কায় দরজাটা খুলে ফেললেন তিনি। এত জোরে ধাক্কা দিলেন, দেয়ালের সঙ্গে বাড়ি খেয়ে ঝনঝন করে ভেঙে পড়ল কাচ। পায়ের কাছে ছড়িয়ে পড়ল। লাগলে যে কেটে যেতে পারে, তোয়াক্কাই করলেন না। লাঠিটা নাড়তে নাড়তে গিয়ে ঢুকলেন শাজিনের অফিসে, শয়তান...
লাফিয়ে উঠে দৌড় দিল কিশোর, মিস্টার সেভারন!
পেছনের অফিস থেকে বেরিয়ে এসেছে জ্যাকি। কিশোরের আগেই গিয়ে বাবার হাত চেপে ধরল। বাবা, কি করছ! থামো না!
ঘুরে দাঁড়িয়েছে অগাস্ট শাজিন। গায়ে কালো জ্যাকেট, পরনে কালো। জিনস। লম্বা কালো চুল ছড়িয়ে পড়েছে কাঁধে। ঠোঁটে টকটকে লাল লিপস্টিক। ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে সাদা দাঁত। মনে হচ্ছে, যে কোন সময় বেরিয়ে আসবে। জানোয়ারের মত শ্বদন্ত-ড্রাকুলার যে রকম থাকে।
জ্যাকির ওপর চোখ পড়তে সরু হয়ে এল চোখের পাতা। ধমকে উঠল, এখানে কি? তোমার তো জেলে থাকার কথা। পেছনে তিন গোয়েন্দাকে দেখে বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে গেল চোখ, সরু হলো আবার; মোমের মত ফ্যাকাসে চেহারায় কালো ছাপ পড়ল। হচ্ছেটা কি?
আপনি যে একটা মিথ্যুক, সেই প্রমাণ জোগাড় হয়ে গেছে আমাদের, রাগত স্বরে বলল জ্যাকি।
কিশোরের বগলে চেপে রাখা ফাইলের দিকে তাকিয়ে কালো চোখের মণি জ্বলে উঠল শাজিনের। পুলিশকে যখন বলব, চুরি করে আমার অফিসে ঢুকে কাগজপত্র তছনছ করেছ তোমরা, শীতল কণ্ঠে বলল সে, কে কার কথা বিশ্বাস করে, কে সত্যিকার বিপদে পড়ে, দেখা যাবে তখন।
এবার আর আপনাকে বিশ্বাস করছে না ওরা, কঠিন কণ্ঠে জবাব দিল কিশোর, আপনার বিরুদ্ধে অনেক প্রমাণ আছে আমাদের হাতে। সেভারনদের বাগান নষ্ট করতে ডিগার পাঠিয়েছেন, ওঁদের শান্তি নষ্ট করেছেন, নানা ভাবে যন্ত্রণা দিয়েছেন ওঁদের, ব্ল্যাকমেল করেছেন; অভিযোগের অন্ত নেই, কটা অস্বীকার করবেন? ফাইলটা নাড়ল সে। আপনার শয়তানির সমস্ত প্রমাণ রয়েছে এর মধ্যে।

হঠাৎ ডাইভ দিয়ে পড়ল শাজিন। ড্রয়ার খোলার শব্দ। আবার যখন উঠে দাঁড়াল সে, হাতে উদ্যত ছোট একটা পিস্তল। কিশোরের দিকে হাত বাড়াল। ফাইলটা দাও!
জ্বী-না! ফাইল সহ হাতটা পেছনে নিয়ে গেল কিশোর, আপনার কথা আর শোনা হচ্ছে না।
দেখো, বোকামি কোরো না! বরফের মত শীতল শাজিনের কণ্ঠ, ভাল। চাও তো, দাও বলছি!
দিয়ে দাও, কিশোর, মৃদুস্বরে বলল জ্যাকি। ওকে বিশ্বাস নেই। সত্যি সত্যি গুলি করে বসবে।
অনিচ্ছাসত্ত্বেও ফাইলটা দিয়ে দিল কিশোর।
ও-কে, ফাইলটা গোল করে পকেটে ঢুকিয়ে, এগিয়ে এসে মিস্টার সেভারনের হাত চেপে ধরল শাজিন। বুড়োটাকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি আমি। কেউ আমার পিছে পিছে আসার চেষ্টা করলে..
নিতে যদি না দিই? মুসা বলল।
বাধা দিয়ে দেখো খালি, ঠোঁটজোড়া ফাঁক হয়ে গেল শাজিনের। ভয়ঙ্কর লাগছে দেখতে।
মিস্টার সেভারনের হাতটা বাঁকিয়ে পিঠের ওপর নিয়ে এল শাজিন। পিস্তলটা অন্যদের দিকে নিশানা করে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে চলল তাঁকে।
যেতে দিচ্ছ কেন! চিৎকার করে উঠল রবিন।
মাথা নেড়ে জ্যাকি বলল, কিছু করার নেই। বাধা দিলে যা বলছে তাই করবে। বরং অপেক্ষা করাই ভাল। বাইরে নিয়ে বাবাকে ছেড়ে দেবে।
মিস্টার সেভারনকে নিয়ে বেরিয়ে গেল শাজিন।
ডিকটেশন মেশিনটার কাছে এসে টেপের ক্যাসেটটা বের করে নিল কিশোর। পকেটে রেখে দিল।
ওটাতে কি আছে বুঝতে পারল জ্যাকি। নীরবে মাথা ঝাঁকাল।
কিন্তু বাইরে নিয়ে গিয়ে আপনার বাবাকে যদি কিছু করে! রবিন বলল।
এই সময় সিঁড়ি থেকে ভেসে এল গুলির শব্দ।
সর্বনাশ! বলেই দৌড় দিল জ্যাকি।
তিন গোয়েন্দাও ছুটল পেছনে।
দোতলার ল্যান্ডিং ফ্লোরে বসে আছেন মিস্টার সেভারন। বিমূঢ়ের মত তাকাচ্ছেন। হাতে শাজিনের পিস্তলটা। ছেলেদের দেখে বললেন, ল্যাং মেরে, ফেলে দিয়েছি। পিস্তলটা মাটিতে পড়ে আপনাআপনি গুলি বেরিয়ে গেল।
তার ছেলে জিজ্ঞেস করল, ওর গায়ে লেগেছে?

মাথা নাড়লেন বৃদ্ধ, না। নিচে গড়িয়ে পড়েই লাফ দিয়ে উঠে দৌড় দিল। তাড়াতাড়ি গেলে এখনও ধরতে পারবে…

হুড়মুড় করে সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করল ওরা। নিচতলায় নামতেই কানে এল পুলিশের সাইরেন। পরক্ষণে ব্রেকের শব্দ।

পুলিশ! ভুরু কুঁচকে ফেলল কিশোর, ওরা জানল কি করে?

এক মুহূর্ত পরেই সদর দরজা দিয়ে ঢুকতে লাগল পুলিশের লোক, জোড়ায় জোড়ায়। সিঁড়ির দিকে ছুটল।

কি হয়েছে? জানতে চাইল একজন। তিন গোয়েন্দা আর জ্যাকিকে দেখছে। তারপর তাকাল মিস্টার সেভারনের দিকে। তিনিও নেমে আসছেন। আপনি কি মিস্টার সেভারন? আপনার পড়শী ফোন করেছে থানায়। বলেছে, আপনার স্ত্রী আপনার জন্যে অস্থির হয়ে পড়েছেন…?

একজন মহিলাকে যেতে দেখেছেন? জানতে চাইল কিশোর।

অবাক হয়ে মাথা নাড়ল অফিসার, কই, না তো!

পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল তিন গোয়েন্দা। ওরাও অবাক।

আমি জানি কোনখান দিয়ে গেছে! আচমকা চেঁচিয়ে উঠল রবিন। সাইরেন শুনে আর সামনের দিকে যায়নি, ফায়ার এসকেপ দিয়ে পালিয়েছে!

জলদি! লাফিয়ে উঠে দৌড় দিল কিশোর। ধরতে হবে!

জ্যাকি আর তার বাবা পুলিশের প্রশ্নের জবাব দেয়ার জন্যে রয়ে গেল, তিন গোয়েন্দা ছুটল শাজিনকে ধরার জন্যে। মুসা যে জানালাটা দিয়ে ঢুকেছিল, সেটার কাছে এসে দেখল, ফায়ার এসকেপ থেকে নেমে পড়েছে শাজিন। বাধানো চত্বর দিয়ে দৌড়ে চলেছে। আঙিনার সীমানায় গিয়ে একটা দরজার ওপাশে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ঘুরে দাঁড়াল কিশোর। সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে ধরার চেষ্টা করতে হবে, বলেই ছুটল আবার।

ওদেরকে দরজার দিকে ছুটে যেতে দেখে চিৎকার করে উঠল অফিসার, অ্যাই, অ্যাই, কোথায় যাচ্ছ?

কিন্তু কে শোনে কার কথা। চোখের পলকে আঙিনায় বেরিয়ে এল ওরা। কাঠের দরজাটার দিকে ছুটল।

দরজার ওপাশে একটা অন্ধগলি। উঁচু দালানের জন্যে ঠিকমত আলো ঢুকতে পারে না বলে আবছা অন্ধকার। দুদিকের দেয়ালেই আগাছা জন্মেছে। রাতের কুয়াশা পানি হয়ে জমে আছে এখনও। ফোঁটা ফোঁটা ঝরছে। রাস্তায়। আবর্জনার ছড়াছড়ি। পানি আর মদের বোতল স্তূপ হয়ে আছে এখানে ওখানে।

আরি! আগে আগে ছুটতে ছুটতে থমকে দাঁড়িয়ে গেল কিশোর। নিচু হয়ে তুলে নিল কি যেন। ওই কাগজগুলো!...ঘটনাটা কি?
রবিন আর মুসাও দেখল দেয়ালের গায়ে সেঁটে থেকে বাতাসে বাড়ি খেতে খেতে নিচে পড়ছে কয়েকটা কাগজ।
খাইছে! কাগজ কুড়াতে শুরু করল মুসাও। ফেলে দিল কেন?
হয়তো আমাদের ঠেকানোর জন্যে, রবিন বলল। কাগজ দেখলে কুড়ানো শুরু করব আমরা, থামব, এই সুযোগে সে পালাবে।
চালাক কত! পালাতে দিচ্ছি না আজ শয়তানটাকে, বলেই দৌড় দিল মুসা।
গলির শেষ মাথায় বেরিয়ে দেখল একটা ছোট পার্কিং লট। কয়েকটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। আবার শাজিনকে চোখে পড়ল তিন গোয়েন্দার। কুকুর নিয়ে হাঁটতে বেরোনো একটা লোককে প্রায় ধাক্কা দিয়ে ফেলতে ফেলতে তার পাশ কেটে ছুটে চলে গেল। একপাশে জেটি। পার্কিং লটের কাছ থেকে শখানেক গজ দূরে বাধা রয়েছে কয়েকটা মোটর ক্রুজার।
হাত তুলল কিশোর, ওই যে! জেটির দিকে যাচ্ছে।
দাঁড়িয়ে গেল সে।
মুসাও দাঁড়াল, কি হলো?
বুঝেছি! এসো! আবার ছুটল কিশোর।
জেটির কাছে পৌঁছে দাঁড়িয়ে গেল শাজিন। দ্রুতহাতে একটা বোটের দড়ি খুলে ছুঁড়ে ফেলল ডেকে। কিন্তু ডেকে না পড়ে পানিতে পড়ল ওটা।
বোটে ওঠার আগেই পেছন থেকে গিয়ে তার জ্যাকেট খামচে ধরল মুসা। কিন্তু রাখতে পারল না। আশ্চর্য শক্তি শাজিনের শরীরে। ভূতই মনে হলো মুসার। ক্ষণিকের জন্যে দ্বিধায় পড়ে গেল। ঝাড়া দিয়ে ওর হাত থেকে জ্যাকেটটা ছাড়িয়ে নিয়েই এক লাফে গিয়ে ছোট মোটর বোটটায় উঠে পড়ল শাজিন।
নামতে গিয়ে পিছলে পড়ে গেল মুসা। চিত হয়ে পড়ল শান বাঁধানো ঘাটে। ব্যথা পেল পিঠে। রবিন আর কিশোর পৌঁছতে দেরি করে ফেলল। ততক্ষণে স্টার্ট দিয়ে ফেলেছে শাজিন। অসহায় হয়ে দেখতে লাগল তিন গোয়েন্দা, ঘাট থেকে সরে যেতে শুরু করেছে বোটটা।
নড়ে উঠল রবিন। পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল। খপ করে তার হাত ধরে ফেলল কিশোর। মরার দরকার নেই।
কিন্তু চলে যাচ্ছে তো! রাগে মাটিতে পা ঠুকল রবিন।
স্পীড বোটের সঙ্গে সাঁতরে পারবে না।
দেখো এটা কি? হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল মুসা। ব্যালাক্লাভা। শাজিনের পকেট থেকে পড়েছে।

আজ আর বাঁচতে পারবে না, সেজন্যেই ভাগ্য তার প্রতি বিরূপ; প্রমাণের পর প্রমাণ ফেলে যাচ্ছে, কিশোর বলল। এটা মাথায় দিয়ে সে নিজেই যেত সেভারনদের বাড়িতে। নানা রকম পোশাক পরে বিভিন্ন সাজে সমস্ত শয়তানিগুলো সে একাই করেছে, কেউ তার দোসর ছিল না।
তারমানে তুমি বলতে চাইছ, সেভারনদের বাড়িতে কোন পুরুষ লোক ঢোকেনি? মুসা অবাক।
না
কিন্তু ধরতে না পারলে কিছুই করা যাবে না, রবিন বলল। দেখো দেখো, লকটার দিকে যাচ্ছে। আগেই গিয়ে গেটটা বন্ধ করে দিতে পারলে…
বলে আর দাঁড়াল না সে। গেটের দিকে ছুটল প্রাণপণে।
মুসা আর কিশোরও তার পিছু নিতে যাচ্ছিল, এই সময় পাশে এসে থামল একটা পুলিশের গাড়ি। জ্যাকি আর তার বাবা বসে আছেন ওতে। টপাটপ লাফিয়ে নামল একজন পুলিশ অফিসার আর জ্যাকি।
শাজিন কোথায়? জিজ্ঞেস করল জ্যাকি।
হাত তুলে দেখাল কিশোর।
পালালই শেষ পর্যন্ত?
এখনও বলা যাচ্ছে না। রবিন গেছে গেটটা বন্ধ করতে। শাজিন বেরিয়ে যাবার আগেই যদি বন্ধ করে দিতে পারে…
কথা শেষ করার আগেই আবার গিয়ে গাড়িতে বসল অফিসার। জ্যাকিও উঠল। সরে জায়গা করে দিল মুসা আর কিশোরকে। কিশোর দরজা লাগানোর আগেই চলতে শুরু করল গাড়িটা।
গেটের কাছে পৌঁছে দেখা গেল পাগলের মত হাতলটা ঘোরাচ্ছে রবিন, বন্ধ করে দেয়ার জন্যে। গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে তাকে সাহায্য করতে ছুটে গেল জ্যাকি। গেট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে দেখে আবার বোটের নাক ঘুরিয়ে দিতে গেল শাজিন। কোন কারণে কেশে উঠে বন্ধ হয়ে গেল ইঞ্জিনটা। মরিয়া হয়ে বার বার দড়ি টেনে স্টার্ট দেয়ার চেষ্টা করতে লাগল সে।
এ সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইল না মুসা। কোনদিকে না তাকিয়ে গিয়ে পানিতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। তীব্র স্রোতকে অগ্রাহ্য করে সাঁতরে এগোল বোটের দিকে। ধরে ফেলল পানিতে পড়ে থাকা বোট বাঁধার দড়িটা। ঘুরে গিয়ে টেনে নিয়ে সাঁতরে চলল তীরের দিকে।
দড়িটা টান দিয়ে ছাড়িয়ে নেয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল শাজিন। কিন্তু ছাড়বে না আর, পণ করে ফেলেছে মুসা। একবার হাত থেকে জ্যাকেট ছুটিয়েছে বটে, কিন্তু দ্বিতীয়বার আর দড়ি ছুটাতে দেবে না।

পানিতে ঝাঁপ দিতে গিয়েও থেমে গেল শাজিন। তীরে দাঁড়ানো পুলিশের দলকে নজরে পড়েছে। বুঝতে পারল, পানিতে পড়েও বাঁচতে পারবে না আজ। খুব শীঘ্রি তাকে টেনে তুলবে পুলিশ। অহেতুক পানিতে পড়ে ভেজার কষ্ট করার চেয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে বোটের সীটে বসে পড়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ।
তীরে পৌঁছতে অনেকগুলো আগ্রহী হাত এগিয়ে এল মুসার দিকে। কেউ দড়িটা নিয়ে নিল তার কাছ থেকে, কেউ চেপে ধরল দুই হাত। তুলে আনল তাকে পানি থেকে।
বাপরে বাপ! ঝাড়া দিয়ে গা থেকে পানি ফেলতে ফেলতে বলল মুসা, যা ঠাণ্ডা! বরফও এরচেয়ে ভাল!
বোট থেকে নামানো হলো শাজিনকে। গাড়িতে তুলল তাকে পুলিশ।

.

কখন সন্দেহ করলে এ সব শাজিনের শয়তানি? ফুলস্পীডে গাড়ি চালিয়ে ম্যানিলা রোডে যাওয়ার পথে জিজ্ঞেস করল জ্যাকি।
লোগোটা দেখে।
তারপর?
তদন্ত চালিয়ে গেলাম। কেন সে এসব করছে, বুঝতে সময় লাগল না।
কি যে উপকার করলে তোমরা, কৃতজ্ঞ স্বরে বললেন মিস্টার সেভারন। বলে বোঝাতে পারব না!
প্রশংসা-পর্বটা এড়ানোর জন্যে আগের কথার খেই ধরে কিশোর বলল, তবে আজকের আগে বুঝতে পারিনি, সব কাজ সে একাই করেছে। আমরা ভেবেছিলাম, তার একজন পুরুষ সহকারীও আছে। সেদিন বনের মধ্যে বন্দুক দিয়ে গুলি করে মুসাদের ভয় দেখিয়েছিল সে নিজেই। কাঁটাঝোপের ওপর পড়ে গিয়ে হাত ছিলে ফেলেছিল, হাতের প্লাস্টার সেটাই প্রমাণ করে...।
বাড়ির কাছে পৌঁছে দেখা গেল, সামনের রাস্তায় তেমনি দাঁড়িয়ে আছে ডিগারটা। গেটের কাছে একজন পুলিশ অফিসারকে নিয়ে ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলছেন মিসেস সেভারন।
অফিসার আমাকে বলেছে, রেডিওতে থানায় জানিয়ে দিয়েছে, মিস্টার সেভারন বললেন। এত তাড়াতাড়ি লোক পাঠিয়ে দেবে থানা থেকে, ভাবিনি। ভালই হলো। ড্রাইভারের সঙ্গে আর ঝগড়া করা লাগল না।
আরও একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে মিসেস সেভারনের পাশে। চিনতে পারল মুসা। এই লোকটাকেই দূরবীন নিয়ে ঘোরাফেরা করতে দেখেছে বনের ভেতর।
গাড়ি থামাল জ্যাকি। তিন গোয়েন্দাকে বলল, নামো তোমরা। মা তোমাদের চা না খাইয়ে ছাড়বে না।

চিন্তিত ভঙ্গিতে মুসা বলল, তদন্ত এখনও শেষ হয়নি। দূরবীনওয়ালা লোকটার ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিতে হবে, শাজিনের সঙ্গে কিভাবে জড়িত ছিল।
ভুরু কোঁচকাল জ্যাকি, জড়িত ছিল মানে?
লোকটাকে কোথায়, কিভাবে দেখেছে জানাল মুসা।
হেসে উঠল জ্যাকি। আরে ও তো আমাদের রবার্ট লিওনেল। শখের পক্ষী-বিজ্ঞানী। সারাক্ষণ বনে বনে ঘুরে বেড়ায় আর পাখি দেখে।
ও, তাই! দুই বন্ধুর দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল মুসা।
গাড়ি থেকে নামল ওরা।
জ্যাকির কাছে সব শুনে এগিয়ে এলেন লিওনেল। মুসার দিকে তাকিয়ে বললেন, সেদিন বনের মধ্যে তোমার ঘোড়াটাকে ভয় পাইয়ে দেয়ার জন্যে দুঃখিত।
না না, ঠিক আছে, বলতে যাচ্ছিল মুসা, বলা হলো না, টেলিফোন কোম্পানির একটা গাড়ি এসে থামল।
গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে এল একজন লোক। আপনাদের তারে কোনখানে গণ্ডগোল হয়েছে, সেজন্যেই লাইন পাচ্ছেন না। খুঁজে বের করে এখুনি ঠিক করে দিচ্ছি...
কিশোর অনুমান করল, শাজিনই তারটা ছিঁড়েটিড়ে দিয়ে থাকবে কোন জায়গায়, সেভারনদের বিচ্ছিন্ন করে রাখার জন্যে, যাতে ডিগার নিয়ে বাগান ভাঙতে এলে তারা থানায় যোগাযোগ করতে না পারেন।

.

আমাকে নিয়ে তো খুব হাসাহাসি করা হয়েছে, রান্নাঘরের টেবিলে কাপে চা ঢালতে ঢালতে হেসে বললেন মিসেস সেভারন, আড়চোখে স্বামীর দিকে তাকিয়ে, ভূতের কথাটা কি ভুল বলেছি?
ভূত নয়, মানুষ। ফিনফিনে পোশাক পরে শাজিনই ভূত সেজেছিল।
সে যা-ই হোক, দেখেছি তো ঠিকই, চোখের ভুল ছিল না।
মাথা ঝাঁকাল কিশোর। হ্যাঁ। ওর পোশাকের কাপড়ই ছিঁড়ে আটকে গিয়েছিল সেলারে নামার ট্র্যাপ-ডোরে।
ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে মুসা বলল, আসল ভূত হলে সত্যি খুব মজা হত। শাজিন আসল ড্রাকুলা না হওয়ায় নিরাশই মনে হচ্ছে ওকে।
সেলারে আরেকবার চোখ বোলাতে চাই আমি, কিশোর বলল। কে জানে, নতুন আর কোন রহস্য পেয়ে যাই কিনা?
হেসে উঠল জ্যাকি, তোমরা মনেপ্রাণে গোয়েন্দা। রহস্যের খোঁজে থাকো সব সময়, রহস্য না হলে বাঁচো না। যোগ্য লোক পাওয়া গেছে এতদিনে। চলল,

আমিও তোমাদের সঙ্গে যাব। জোয়ালিনের ভূতের রহস্য সমাধানের ইচ্ছে আমারও অনেক দিনের।
তাই নাকি? চলুন! সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহিত হয়ে উঠল কিশোর। দারুণ হবে! বলা যায় না, ভূত খুঁজতে গিয়ে ওয়ারনার পরিবারের গুপ্তধনের নকশাও পেয়ে যেতে পারি।
ও, তাই বলো, গুপ্তধন, হাসল রবিন। আমি ভাবছিলাম ভূত খুঁজতে যাওয়ার এত আগ্রহ কেন তোমার?
গুপ্তধনের কথা আবার কার কাছে শুনলে? চোখ বড় বড় করে তাকাল মুসা। তার ওঠার কোন ইচ্ছে দেখা গেল না। আয়েশ করে ফ্রটকেক চিবুচ্ছে।
শুনিনি, অনুমান। এত বড়লোক ছিল যখন, গুপ্তধন তো থাকতেই পারে, তাই না?
তা পারে! রবিনও উত্তেজিত হয়ে উঠেছে।
কিন্তু মুসার মধ্যে তেমন উত্তেজনা নেই। হাত নেড়ে বলল, গুপ্তধন উদ্ধারে আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু দেড়শো বছরের পুরানো সেলারে জোয়ালিনের ভূতও থাকতে পারে। ওর বাবার ধনরত্ন লুট করতে যাচ্ছি দেখলে ঘাড়টা ধরে মটকে দিতে পারে। মিসেস সেভারন, আপনার কোন আপত্তি না থাকলে এই ফুটকেকটা আমি পুরোটাই খাব। বলা যায় না, জীবনের শেষ খাওয়াও হতে পারে এটা।

ভলিউম ৩৫ – নকশা – তিন গোয়েন্দা – রকিব হাসান

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৫

সন্ধ্যাবেলা ইয়ার্ডের ওঅকশপে বসে আড্ডা দিচ্ছে তিন গোয়েন্দা। ক্যামেরা নিয়ে। আলোচনা হচ্ছে, ইনফ্রারেড-ক্যামেরা। ওরকম একটা ক্যামেরা এই জন্মদিনে উপহার পেয়েছে মুসা। সামনের টেবিলে পড়ে আছে। কাজে লাগাতে পারছে না বলে তার খুব দুঃখ।

এই সময় ফোন বাজল। অলস ভঙ্গিতে হাত বাড়িয়ে রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল কিশোর। হালো?

পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ড?

হ্যাঁ।

কে, কিশোর? আমি ভিকটর সাইমন।

মুহূর্তে সজাগ হয়ে উঠল কিশোর। নিশ্চয় কোন কেস। ও, আপনি, স্যার? কি খবর?

ভাল। তোমাদের খবর কি? ব্যস্ত?

নাহ। কাজকর্ম কিছু নেই। বসে বসে ঝিমুচ্ছি।

ভালই হলো। ওয়াল্ট ক্লিঙ্গলস্মিথ নামে এক ভদ্রলোক আমার সামনে। বসে আছেন। ব্যবসায়ী। কারখানার মালিক। একটা বিপদে পড়ে আমার কাছে এসেছেন। কিন্তু আমার এখন মোটেও সময় নেই। তোমাদের কাছে পাঠাচ্ছি। দেখো, কোন সাহায্য করতে পারো কিনা?

বিপদটা কি, স্যার?

মিস্টার স্মিথকে পাঠাচ্ছি। তার কাছেই শুনো।

এখনই পাঠাবেন?

হ্যাঁ, এখনই।

আচ্ছা, পাঠান। আমরা তিনজনেই আছি।

দ্বিধা করে বললেন সাইমন, আরেকটা কথা, চোখ-কান একটু খোলা রেখো। ক্লিঙ্গলস্মিথের সন্দেহ, তার পেছনে লোক লেগে আছে। ইয়ার্ডেও গিয়ে হাজির হতে পারে ওরা। সাবধান থাকবে।

থাকব।

কোন দরকার হলে আমাকে ফোন কোরো। বাড়িতেই আছি।

আচ্ছা।

রাখলাম?

আচ্ছা।

কিশোরকে ধন্যবাদ দিয়ে লাইন কেটে দিলেন সাইমন।

উৎসুক হয়ে কিশোরের দিকে তাকিয়ে আছে মুসা আর রবিন। সে রিসিভার রাখতেই মুসা জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপার? কোন কেস?
মাথা ঝাঁকাল কিশোর। আর আফসোস করা লাগবে না। তোমার ক্যামেরা ব্যবহারের সুযোগ এসে গেছে। বাইরে গিয়ে লুকিয়ে বসে থাকোগে। এখন থেকে যে ভেতরে ঢুকবে তারই ছবি তুলে নেবে। গোপনে। কিছু যেন টের না পায়। আমি গেট খুলে রাখছি।
অবাক হয়ে কিশোরের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে মুসা। কিছুই বুঝলাম না!
বুঝতে আমিও পারছি না। মিস্টার সাইমন বললেন চোখ-কান খোলা রাখতে। তা-ই রাখব। ইনফ্রারেড-ক্যামেরার চেয়ে কড়া নজর আর কোন চোখের নেই। লেন্সের সামনে পড়লে আর ফসকবে না। সুতরাং ওই চোখই ব্যবহার করতে বলছি।
আর কোন প্রশ্ন না করে টেবিলে রাখা ক্যামেরাটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল মুসা। কাজে লাগানোর জন্যে অস্থির হয়ে ছিল, সেই সুযোগ পেয়ে গেছে আজ।
জঞ্জালের আড়ালে লুকিয়ে বসল মুসা।
ইয়ার্ডের বেশির ভাগ আলোই নেভানো। বোরিস আর রোভারকে নিয়ে রাশেদ পাশা গেছেন পুরনো মালপত্র দেখতে। দোতলার ঘরে মেরিচাচী একা।
রাস্তায় গাড়ি চলাচল করছে। এ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। কয়েক মিনিট পর একটা মোটর সাইকেলের ইঞ্জিনের শব্দ শুনল মুসা। শক্তিশালী ইঞ্জিন। ইয়ার্ডের গেটের কাছে একবার থমকাল মনে হলো, তারপর চলে গেল।
বসেই আছে মুসা, গেটের দিকে তাকিয়ে। হঠাৎ দেখতে পেল লোকটাকে। কেমন অনিশ্চিত ভঙ্গিতে ভেতরে ঢুকল। এগিয়ে আসতে লাগল। কিছুদূর এসে থমকে দাঁড়াল। তাকাল এদিক ওদিক। এমন ভঙ্গি করল, যেন ভুল করে ঢুকে পড়েছে। ঘুরে আবার এগিয়ে গেল গেটের দিকে। বেরিয়ে গেল।
ততক্ষণে ছবি তুলে ফেলেছে মুসা।
খানিক পর একটা গাড়ি এসে থামল গেটের সামনে। হর্ন বাজাল। ওঅর্কশপ থেকে বেরিয়ে গেল কিশোর আর রবিন। গাড়িটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। আরোহীর সঙ্গে কথা বলে সরে দাঁড়াল।-ভেতরে ঢুকল গাড়িটা। ইয়ার্ডের চত্বরে থামল।
গাড়ি থেকে নামলেন যিনি, তাঁর মাথা জুড়ে টাক, দীঘল শরীর, পরনে ধূসর রঙের পুরানো ছাঁটের স্যুট। হাত বাড়িয়ে দিলেন কিশোরের দিকে।
ছবি তুলে ফেলল মুসা। শুনতে পেল, ভদ্রলোক বলছেন, আমি ওয়াল্ট ক্লিঙ্গলস্মিথ।
কিশোর পশিা, নিজের পরিচয় দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিল গোয়েন্দাপ্রধান। ও রবিন। আমাদের আরেক বন্ধু মুসা আমান, একটা জরুরী কাজে বাইরে গেছে। চলে

আসবে।
রবিনের সঙ্গেও হাত মেলালেন স্মিথ। তাঁকে নিয়ে ঘরের দিকে এগোল কিশোর আর রবিন। বারান্দায় উঠল। ঢুকে গেল ভেতরে। বসার ঘরে ঢুকেছে।
ক্যামেরা হাতে বসেই রইল মুসা।
বসার ঘরে ঢুকে স্মিথকে বসতে বলল কিশোর। নিজেও বসল। জিজ্ঞেস করল, চা-টা কিছু দেব?
না না, দরকার নেই, হাত নেড়ে বললেন ভদ্রলোক, মিস্টার সাইমনের বাড়ি থেকে কফি খেয়ে এসেছি। সাংঘাতিক প্রশংসা করলেন তোমাদের। তোমরা নাকি অনেক বড় গোয়েন্দা।
জবাবে শুধু হাসল কিশোর।
কেশে গলা পরিষ্কার করে নিলেন স্মিথ। বললেন, হ্যাঁ, যা বলতে এসেছি সেটাই বলি। আমার এক ভাগ্নেকে খুঁজে বের করে দেয়ার অনুরোধ করব তোমাদের। তার নাম মাটি লফার, সে-ও আমারই মত কারখানার মালিক। অল্প বয়েসেই লস অ্যাঞ্জেলেসের বড় ব্যবসায়ী হয়ে গেছে। মাস তিনেক আগে নিখোঁজ হয়েছে।
চুপ করে রইল কিশোর। অপেক্ষা করছে।
প্লেন নিয়ে বেরিয়েছিল, আবার বললেন স্মিথ। সঙ্গে ছিল তার এক বন্ধু, লুক ব্রাউন। অ্যারিজোনার মরুভূমিতে নেমে কলোরাডো নদীর কাছাকাছি হারিয়ে যায় ওরা। তাদের আর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। বেমালুম গায়েব।
কিশোর জিজ্ঞেস করল, প্লেনটার কি হয়েছে?
ওটা পাওয়া গেছে। মরুভূমিতে ল্যাণ্ড করেছে। পাহাড়ের খাড়া একটা দেয়ালের কাছে। এর ষোলো মাইল উত্তরে ব্লাইদি নামে একটা শহর আছে।
প্লেনটার কোন ক্ষতি হয়নি? জানতে চাইল কৌতূহলী রবিন।
নাহ, কিছুই হয়নি। ট্যাংকে তেল কমে গিয়েছিল। তবে তার জন্যে মরুভূমিতে ল্যাণ্ড করার কোন প্রয়োজন ছিল না। ইচ্ছে করলে ব্লাইদির কাছে রিভারসাইড কাউন্টি এয়ারপোর্টে ফিরে যেতে পারত। ইঞ্জিনেরও কোন ক্ষতি হয়নি। এই ব্যাপারটাই সবচেয়ে বেশি অবাক করেছে আমাকে। যেন ইচ্ছে করেই নেমেছে লফার, হারিয়ে যাওয়ার জন্যে।
তারমানে মারা যায়নি? অনুমান করল রবিন। হেঁটে চলে গেছে কোথাও কোথায়?
জানি না। সামান্যতম সূত্রও পাওয়া যায়নি।
পুলিশ জানে? ভালমত খোঁজা হয়েছে?
তন্নতন্ন করে। দুই-দুইজন মানুষ, মরে গেছে না বেঁচে আছে, তারও কোন নমুনা নেই। পুলিশ তো খুঁজেছেই, এয়ার ফোর্সও রেসকিউ টিম পাঠিয়েছে, কোন লাভ হয়নি। গত হপ্তায় আমিও গিয়ে শেষ চেষ্টা করে এসেছি। কিচ্ছু পাইনি।

চুপ করে বসে আছে কিশোর। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে। কি যেন। একটা কথা মনে করার চেষ্টা করছে। হঠাৎ সোজা হয়ে বসল। কলোরাডো। নদীর কাছে নেমেছে বলছেন?
ভুরু কুঁচকে কিশোরের দিকে তাকালেন স্মিথ। হ্যাঁ। কেন?
ওড়ার সময় নিচে কি দেখেছেন, বলি?
বলো।
দেখেছেন কতগুলো দানবকে। একশো ফুট লম্বা একেকটা।
দানব! অবাক হয়ে কিশোরের দিকে তাকাল রবিন।
ঠিকই বলেছে ও, ওপরে-নিচে মাথা দোলালেন স্মিথ। কিশোরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কি করে জানলে তুমি?
ব্লাইদি নামটা চেনা চেনা লাগল। ভাবতে মনে পড়ে গেল, গত বছর মরুর ওই দানবগুলো সম্পর্কে পড়েছিলাম। মরুভূমির বুকে আঁকা অনেক বড় বড় ছবি। রেখাচিত্র। কয়েকশো বছর আগে নাকি ইনডিয়ানরা একেছিল ওগুলো। রাইদির কাছে কলোরাডো নদীর পাশে আঁকা ছবিগুলো সবচেয়ে বড়।
এতবড় ছবি আঁকল কি দিয়ে ওরা? রবিনের প্রশ্ন।
লাঙলের ফাল জাতীয় কোন যন্ত্র দিয়ে। ওপরের পাতলা বালি আর মাটির আস্তর কেটে গভীর দাগ করেছে নিচের পাথরের মত শক্ত হলদে রঙের মাটিতে। ফুটে উঠেছে দাগগুলো। ছবি হয়ে গেছে।
অবাক কাণ্ড! মরুভূমিতে একশো ফুট লম্বা ছবি আঁকতে গেল কেন ইনডিয়ানরা? মাটি থেকে দেখে যে পরে উপভোগ করবে, তারও উপায় নেই। কিছুই বোঝা যাবে না। অদ্ভুত কিছু রেখাই মনে হবে শুধু!
অনেক দিনের রহস্য ওটা, স্মিথ বললেন। বিরাট রহস্য। অনেক চেষ্টা করেও এর বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যা দিতে পারেননি বিজ্ঞানীরা।
কিশোর বলল, আপনার কি ধারণা ওই দানবগুলোকে দেখেই কৌতূহল হয়েছিল লফার আর ব্রাউনের? আরও কাছে থেকে দেখার জন্যে নিচে নেমেছিল?
মাথা নাড়লেন স্মিথ। না, মনে হয় না। এতবড় ছবি মাটিতে দাঁড়িয়ে দেখে কিছু বোঝা যাবে না, এটুকু বোঝার বুদ্ধি ওদের আছে। সুতরাং নামার অন্য কোন কারণ ছিল। তবে কারণটার সঙ্গে এই ছবির কোন সম্পর্ক থাকাটা অস্বাভাবিক নয়।
আমিও ঠিক এই কথাটাই ভাবছি! কিশোর বলল।
সেই সম্পর্কটা কি? রবিনের প্রশ্ন।
সেটা জানলে তো অনেক প্রশ্নেরই জবাব জানা হয়ে যেত।

একটা মুহূর্ত নীরবে কিশোরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন স্মিথ। তারপর বললেন, তোমাদের ব্যাপারে মিস্টার সাইমনের অনেক উঁচু ধারণা। সেটা বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছি এখন। মানুষ চিনতে আমার ভুল হয় না। কি ঠিক করলে, কাজটা নেবে তোমরা? খরচাপাতির জন্যে ভেব না…
মাথা নাড়ল কিশোর। না, ভাবছি না। কাজটা করব আমরা।
ভাল করে ভেবে দেখো। তদন্ত করতে হলে ওই মরুভূমিতে যেতে হবে। তোমাদের…
প্রয়োজন হলে যাবে। অ্যারিজোনা তো হাতের কাছে। বরফের দেশ আইসল্যাণ্ডে গিয়েও রহস্যের তদন্ত করে এসেছি আমরা।
এই প্রথম হাসলেন স্মিথ। ঠিক আছে, করো তদন্ত। কিন্তু তোমাদের আরেক বন্ধু তো এখনও এল না। দেখা হলো না।
কিশোর বলল, ঠিকানা দিয়ে যান, হবে। আজ রাতটা ভেবে নিই, কাল দেখা করব আবার। কি ভাবে কি করব, জানাব তখন আপনাকে।
ঠিক আছে। পকেট থেকে কার্ড বের করে দিলেন স্মিথ। আমি তাহলে এখন যাই।
উঠে দাঁড়ালেন স্মিথ। তাঁকে এগিয়ে দিতে চলল কিশোর আর রবিন।

.

স্মিথকে নিয়ে কিশোররা ঘরে ঢুকে যাওয়ার পর আরও পনেরো মিনিট অপেক্ষা করল মুসা। কাউকে ঢুকতে দেখল না। ভাবল, আর বসে থেকে লাভ নেই। আর কেউ ঢুকবে না। তার চেয়ে বরং যে দুটো ছবি তুলেছে সেগুলো ডেভেলপ করে ফেলা ভাল। দেখাতে পারবে কিশোরকে। যে লোকটা ঢুকে আবার বেরিয়ে গেছে, তার আচরণ সন্দেহজনক। তার পরিচয় বের করা। দরকার।
জঞ্জালের নিচে মোবাইল হোমের ভেতর, তিন গোয়েন্দার হেডকোয়ার্টারে আছে ল্যাবরেটরি। দুটো ছবি ডেভেলপ করে, প্রিন্ট করল মুসা। চমৎকার উঠেছে, খুবই স্পষ্ট। প্রথম ছবিটাতে দেখা যাচ্ছে লোকটা তাকিয়ে আছে কিশোরদের বাড়িটার দিকে। দ্বিতীয় ছবিটার দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে গেল মুসার, অস্ফুট শব্দ করে উঠল। ছবি দুটো নিয়ে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। বেরিয়ে এল হেডকোয়ার্টার থেকে।
ওঅর্কশপটা অন্ধকার। যতদূর মনে পড়ে আলো জ্বেলেই ভেতরে ঢুকেছিল সে। কে নেভাল? কিশোররা কি বেরিয়ে এসেছে? না, তাহলে হেডকোয়ার্টারেই ঢুকত, কিংবা তাকে ডাকত।
মনটা খুঁতখুঁত করতে থাকল তার। তবে ছবির উত্তেজনায় তেমন মাথা ঘামাল না ব্যাপারটা নিয়ে। ওঅর্কশপের দরজায় বেরিয়ে এল।

খসখস শব্দ হলো পেছনে। ফিরে তাকাতে গেল সে। মাথায় যেন বজ্রাঘাত হলো। চোখের সামনে জ্বলে উঠল হাজার কয়েক রঙবেরঙের তারী।
ঢলে পড়ে গেল মুসা।

.

ওঅর্কশপে আলো নেই দেখে কিশোর আর রবিনও অবাক হয়েছে। ভাবল, কোন কারণে নিভিয়ে দিয়েছে মুসা। স্মিথ গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার পর গেট লাগিয়ে দিল কিশোর। রবিনকে নিয়ে এগোল ওঅর্কশপের দিকে।
মাটিতে বেহুশ হয়ে পড়ে থাকা মুসার গায়ে হোঁচট খেল কিশোর। চিৎকার করে উঠল, মুসা, কি হয়েছে তোমার?– মুসার ভারি দেহটা ধরাধরি করে বসার ঘরে নিয়ে এল সে আর রবিন। লম্বা সোফায় শুইয়ে দিল।
ইয়ার্ডের বেচাকেনার হিসেব নিয়ে বসেছিলেন মেরিচাচী, চেঁচামেচি শুনে। নেমে এলেন। বেহুশ মুসাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে?
কিশোর বলল, কেউ বাড়ি মেরে বেহুশ করে ফেলে রেখে গেছে!
মরবি! এ ভাবেই মরবি তোর একদিন! বলে ছুট দিলেন চাচী। ভেজা তোয়ালে আর স্পিরিট অভ অ্যামোনিয়া নিয়ে এলেন। ততক্ষণে মুসার শার্টের বোতাম, কোমরের বেল্ট খুলে কাপড়-চোপড় ঢিল করে দিয়েছে কিশোর আর রবিন।
তুলোয় স্পিরিট অভ অ্যামোনিয়া ভিজিয়ে মুসার নাকের কাছে ধরলেন। মেরিচাচী। ভেজা তোয়ালে দিয়ে হাত-পায়ের তালু মুছে দিতে লাগল রবিন।
ঝাঁঝাল গন্ধ নাকে ঢুকতে গুঙিয়ে উঠল মুসা।
কানের কাছে চেঁচিয়ে বলল কিশোর, মুসা, ওঠো! তাকাও! এই মুসা, শুনতে পাচ্ছ? তোমার চকলেট-কেক শেষ হয়ে গেল তো!
চোখ মেলল মুস, চকলেট-কেকের কথা বললে শুনলাম?
হাসি ফুটল মেরিচাচীর ঠোঁটে। হ্যাঁ, ওঠো। আস্তটাই রেখে দিয়েছি তোমার জন্যে।
কি ঘটেছিল, জানার জন্যে প্রশ্নের তুবড়ি ছোটাল কিশোর আর রবিন।
কে যে বাড়ি মারল, কিছুই বলতে পারব না, দুর্বল কণ্ঠে জানাল মুসা। অন্ধকারে দেখতে পাইনি।
তার জন্যে গরম দুধ আনতে চলে গেলেন মেরিচাচী।
কিন্তু বাড়িটা মারল কে? কেন মারল? রবিনের প্রশ্ন।
আন্দাজ করতে পারছি, মুসা বলল। একটা সাংঘাতিক আবিষ্কার করে ফেলেছিলাম। ছবি!
ছবি! দুই ভুরু কুঁচকে কাছাকাছি হয়ে গেল কিশোরের।
উঠে বসল মুসা। মাথা ঝাঁকাল। হ্যাঁ। দুটো ছবি তুলেছি। প্রথম ছবিটা যার তাকে চিনি না। মনে হলো ভুল করে ঢুকে পড়েছে। বুঝতে পেরে বেরিয়ে গেছে। দ্বিতীয়

ছবিটা মিস্টার স্মিথের। তাকে দেখে অবাক হতাম না, হয়েছি তাঁর পেছনে আরেকজনকে দেখে। জঞ্জালের ওপাশে ঘাপটি মেরে ছিল। স্পষ্ট হয়ে উঠেছে চেহারা। ছবি দেখেই বোঝা যায় লুকিয়ে লুকিয়ে নজর রাখছে। এই লোকটাকেও চিনি না।

ছবিগুলো কোথায়! অধীর হয়ে জানতে চাইল কিশোর।

বেহুশ হওয়ার আগে পর্যন্ত তো হাতেই ছিল। হয়তো পড়ে গেছে। ওঅর্কশপের দরজায় খুঁজলে পাওয়া যাবে।

কিন্তু পাওয়া গেল না ছবিগুলো।

ওঅর্কশপের দরজায় একটুকরো কাগজ টেপ দিয়ে সটা। তাতে লেখা:

তিন গোয়েন্দা, সাবধান লেখার

নিচে আঁকা একটা রেখাচিত্র। ছবিতে একটা লোক, তার বুকের দিকে তীর তাক করা।

আঁকিয়ে হিসেবে সুবিধের না, রবিন বলল। কিশোর, কি বোঝাতে চেয়েছে?

বোঝাতে চেয়েছে, আমরা যেন সরে থাকি। নাহলে হৃৎপিণ্ড বরাবর তীর মারবে। তুড়ি বাজাল কিশোর, অর্থাৎ, খতম করে দেবে!

নেগেটিভগুলোর জন্যে ল্যাবরেটরিতে ঢুকল ওরা। ছবি ডেভেলপ করার জায়গাটায় জিনিসপত্র উলট-পালট হয়ে আছে। কেউ যে খুঁজে গেছে, বোঝা যায়।

বেশ কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি করে; ছবি, নিগেটিভ, কিছুই না পেয়ে খালিহাতে ফিরে এল দুই গোয়েন্দা। জানাল কি ঘটেছে।

সব শুনে কিশোরের দিকে তাকিয়ে হাসল মুসা, কেবল নিজেকেই বড় গোয়েন্দা ভাব, তাই না? হঠাৎ করেই মনে হয়েছিল নেগেটিভগুলো মূল্যবান, কোথাও লুকিয়ে রাখা দরকার।

অধৈর্য হয়ে হাত নাড়ল কিশোর, কোথায় রেখেছ?

উঠে দাঁড়াল মুসা। ঘুরে উঠল মাথা। আবার বসে পড়ল সে। খানিকক্ষণ পর একটু সুস্থ হয়ে কিশোর আর রবিনের সঙ্গে চলল ল্যাবরেটরিতে।

একটা উঁচু টুলের নিচে হাত ঢুকিয়ে নেগেটিভ দুটো বের করে আনল। টেপ দিয়ে আটকে রেখেছিল ওখানে।

ছোঁ মেরে তার হাত থেকে ওগুলো নিয়ে ল্যাবরেটরিতে ঢুকে গেল রবিন। ছবি প্রিন্ট করতে দেরি হলো না। বেরিয়ে এল ভেজা ছবি হাতে। টেবিলে রাখল।

ছবির ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল কিশোর। প্রথম যে লোকটার ছবি তোলা, হয়েছে, তার ছিপছিপে শরীর, মাথায় ধূসর চুল। আর স্মিথের পেছনে যে লোকটার ছবি উঠেছে, তার কালো চুল, পেশীবহুল দেহ।

তখুনি ফোন করে সাইমনকে সব কথা জানাল কিশোর। তার পরামর্শ চাইল।
পরদিন সকালে ছবিগুলো নিয়ে রকি বীচ পুলিশ স্টেশনে চলল তিন গোয়েন্দা। অফিসেই পাওয়া গেল পুলিশ চীফ ইয়ান ফ্লেচারকে। প্রথম ছবিটার ওপর টোকা দিয়ে গভীর ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, চিনি এঁকে। নাম মরিস ডুবয়। রকি বীচ সেভিংস ব্যাংকের ট্রাস্টি। ভদ্রলোক, তবে বড় বেশি খামখেয়ালি। পথ চলতে চলতে প্রায়ই নিজের বাড়ি ভেবে ভুল করে অন্যের বাড়িতে ঢুকে পড়েন। অনেকে রিপোর্ট করেছে পুলিশের কাছে। দ্বিতীয় ছবিটীয় টোকা দিয়ে বললেন, এর ব্যাপারে ফাইল না দেখে কিছু বলতে পারছি না।
কিন্তু অপরাধীদের রেকর্ড ফাইলে পাওয়া গেল না লোকটার নাম।
ক্যাপ্টেনকে ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে এল গোয়েন্দারা। স্মিথের অফিসে। তার সঙ্গে দেখা করতে চলল।
মুসার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল কিশোর, মুসা, ইনি ওয়াল্ট ক্লিঙ্গলস্মিথ। মার্টি লফারের মামা।
মুসার মাথায় বাড়ি মেরে ছবি নিয়ে যাওয়ার কাহিনী শুনে উদ্বেগ্ন ফুটল ওয়াল্টের চেহারায়। বললেন, থাকগে, তোমাদের আর এর মধ্যে গিয়ে কাজ নেই। পুলিশকেই বলি বরং। দেখুক আরেকবার চেষ্টা করে।
কিশোর বলল, কিন্তু এটা এখন আমাদের চ্যালেঞ্জ হয়ে গেছে, মিস্টার স্মিথ। মুসাকে বাড়ি মারার প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়ব না। আপনি আমাদের কাছে আসায় লোকটা এত খেপে গেল কেন? নিশ্চয় লফারের ব্যাপারে কিছু জানে। এই লোককে খুঁজে বের করতে হবে এখন আমাদের। মনে হচ্ছে, কিডন্যাপ করা হয়েছে আপনার ভাগ্নেকে।
ছবিটা ভাল করে দেখলেন স্মিথ। চেনা চেনা লাগল। হঠাৎ বলে উঠলেন, আরে, এই লোককে তো কাল দেখেছি। আমি বাড়ি থেকে বেরোনোর পর মোটর সাইকেলে করে পিছু নিয়েছিল। মিস্টার সাইমনের বাড়ি পর্যন্ত পিছে পিছে গিয়েছিল। তাকে জানিয়েছি এ কথা।
মুসার মনে পড়ল, আগের সন্ধ্যায় ক্যামেরা নিয়ে যখন লুকিয়ে বসেছিল, তখন গেটের কাছে মুহূর্তের জন্যে থেমেছিল একটা মোটর সাইকেল। সে কথা জানাল সবাইকে।
কিশোরের অনুমান করতে কষ্ট হলো না, সাইমনের বাড়িতে নিশ্চয় জানালার নিচে আড়ি পেতে থেকে কথা শুনেছে মোটর সাইকেল আরোহী, পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডের নাম শুনেছে, বুঝতে পেরেছে এরপর এখানেই আসবেন স্মিথ। তিনি কি করেন, দেখার জন্যে তাই আগেই এসে লুকিয়ে থেকেছে জঞ্জালের আড়ালে। ইনফ্রারেড-ক্যামেরা হাতে মুসাকে ওঅর্কশপে ঢুকতে দেখে আন্দাজ করে

ফেলেছে, কি কাজ করেছে মুসা। নিজের ছবি উঠেছে কিনা বুঝতে না পারলেও কোন ঝুঁকি নিতে চায়নি লোকটা। তর্কে তক্কে ছিল, সুযোগ বুঝে কেড়ে নিয়েছে ছবিগুলো। জানালায় আড়ি পেতে স্মিথের সঙ্গে কিশোরদের কি কথা হয়েছে, সেটাও নিশ্চয় শুনেছে। নাহলে ওঅর্কশপের দরজায় হুমকি দিয়ে নোট রেখে যেত না। তারমানে তদন্ত করতে গেলে এই লোকের ব্যাপারে সাবধান থাকতে হবে।

জরুরী আলোচনার পর স্মিথের অফিস থেকে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা। ইয়ার্ডে ফিরল। মরুভূমিতে যাওয়ার জন্যে তৈরি হতে হবে।

সানগ্লাস নিতে হবে, রবিন বলল, আর চওড়া কানাওয়ালা হ্যাট। মরুভূমিতে ভয়াবহ গরম। পানির ক্যান্টিনও লাগবে। আমাদের বার্থ সার্টিফিকেটের কপিও সঙ্গে নেয়া ভাল। বাই চান্স যদি মেকসিকোতে যাওয়া লাগে।

গরম কাপড়-চোপড়ও নিতে হবে, কিশোর বলল। দিনে গরম হলে হবে কি, রাতে কনকনে ঠাণ্ডা।

আজব প্রকৃতি! মুসা বলল। এই মিয়ারা, মরুভূমিতে শুনেছি ভূতের খুব দাপট, ঠিক নাকি?

আরে দূর! হাত নাড়ল কিশোর। ওসব বানানো গপ্পো।

তবে যে বইতে লেখে…

ও কি আর সত্যি কথা লেখে নাকি? ফ্যান্টাসি গল্প।

ভরসা কতটা পেল মুসা, তার মুখ দেখে বোঝা গেল না।

তবে পরদিন সকালে মিস্টার সাইমনের বিমানটা দেখা মাত্র উজ্জ্বল হয়ে গেল তার মুখ। প্লেন চালাতে ভাল লাগে তার। এই প্লেনটা আগেও চালিয়েছে। সে, এবার অনেক বেশি সময় চালাতে পারবে, কারণ ওদের সঙ্গে যাচ্ছে না। সাইমনের পাইলট ল্যারি কংকলিন। প্লেনটা তিন গোয়েন্দার দায়িত্বে ছেড়ে দিয়েছেন সাইমন।

মালপত্র নিয়ে প্লেনে চড়ল ওরা। আকাশে উঠল নীল রঙের সুন্দর বিমানটা। প্রথম যাবে স্যান বারনাডিনোতে।

সুন্দর সকাল। নিচে সান্তা মনিকার পাহাড়ের মাথায় ঝলমলে রোদ। প্রশান্ত মহাসাগরকে লাগছে নীল চাদরের মত। গালে হাত দিয়ে প্রকৃতির অপরূপ শোভা প্রাণভরে উপভোগ করতে লাগল কিশোর। মনের সুখে গান ধরল রবিন।

সাগর পেছনে ফেলে উত্তর-পশ্চিম দিকে প্লেন চালাল মুসা।

স্যান বারনাডিনোতে পৌঁছে ল্যাণ্ড করার আগে বিমান বন্দরের ওপরের আকাশে বার দুই চক্কর মারল। টাওয়ারের অনুমতি নিয়ে নামতে শুরু করল। রানওয়েতে

মাটি ছুঁয়েছে বিমানের চাকা, এই সময় রানওয়ের শেষ মাথায় একটা কাব বিমান চোখে পড়ল তার। তীব্র গতিতে ছুটে আসছে।
আঁতকে উঠল মুসা। খাইছে! অ্যাক্সিডেন্ট করবে তো!
ভীষণ বেকায়দা। ডানে-বাঁয়ে ঘোরানোর চেষ্টা করলে বিধ্বস্ত হবে বিমান। ব্রেক করলে হুমড়ি খেয়ে পড়বে। ওপরে তুলতে গেলে ধাক্কা লাগবে অন্য বিমানটার সঙ্গে। কি করা? গতি না কমিয়ে সামনে এগোনোর সিদ্ধান্ত নিল সে। আস্তে আস্তে ব্রেক করবে। আর কোন উপায় নেই।
ব্যাপারটা কিশোর আর রবিনের চোখেও পড়েছে। হাঁ করে তাকিয়ে। আছে। ভয়ে হৃৎপিণ্ডটাও স্তব্ধ হয়ে গেছে যেন। মুসার ক্ষিপ্রতা আর উপস্থিত বুদ্ধিই কেবল এখন বাঁচাতে পারে ওদের।
ধাক্কা লাগে লাগে, শেষ মুহূর্তে নাক উঁচু করে আকাশে উড়ল কবি। ব্রেক কষল মুসা। ওদের মাথার ওপর দিয়ে বিমানের প্রায় পিঠ ছুঁয়ে গেল অন্য বিমানটার চাকা। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সবাই।
বাচলাম! গলা কাঁপছে মুসার। প্রচণ্ড ভয় পেয়েছে।
প্লেন থামতে এগিয়ে এল একজন পাইলট। মুসা নামার সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়িয়ে দিল। দারুণ সামলেছ হে। খুব ভাল পাইলট তুমি। দোষ ওই গাধাটার। অফিসে গিয়ে একটা কমপ্লেন করে রাখো। বলা যায় না, তোমার দোষ দেখিয়ে রিপোর্ট করে বসতে পারে ও। আগেই তৈরি থাকো।
কিন্তু কবিটার রেজিস্ট্রেশন নম্বর লক্ষ করেনি কেউ। ওড়ার আগে টাওয়ারের অনুমতিও নেয়নি পাইলট।
সেদিন আর মরুভূমিতে যাওয়ার ইচ্ছে হলো না গোয়েন্দাদের। বিমান বন্দর থেকে বেরিয়ে একটা হোটেলে উঠল।
পরদিন সকালে এল আবার। বিমান বন্দরের অফিসে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, কাটা নিয়ে সেই পাইলট ফিরে আসেনি।
মরুভূমির উদ্দেশে রওনা হলো তিন গোয়েন্দা।
এঁকেবেঁকে এগিয়ে যাওয়া কলোরাডো নদীর রূপালী পানি চোখে পড়তে কিশোর বলল, মুসা, নিচে নামাও। ভালমত নজর রাখতে হবে। তার কোলের ওপর ক্যালিফোর্নিয়া, মরুভূমি আর অ্যারিজোনার তরাই অঞ্চলের একটা ম্যাপ বিছানো।
ওই দেখো! ডানে হাত তুলে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল রবিন। একটা দানব!
দেখা গেল একশো ফুট খাড়া উঠে যাওয়া একটা পাহাড়ের দেয়ালের কিনারে আঁকা হয়েছে বিশাল ছবিটা। দেয়ালের কাছে প্লেন নিয়ে গেল মুসা। চক্কর দিতে

লাগল একজায়গায়। বলল, আরেকটা পা কি হলো দানবের? ভূতে খেয়ে ফেলল নাকি?
ক্ষয় হয়ে গেছে কোন কারণে, বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে আছে কিশোর। ওটার পাশে দেখো আরেকটা ছোট মূর্তি। আশপাশের ওই রেখাগুলো কি?
বড় ছবিটার পাশে ওটার অর্ধেক বড় আরেকটী ছবি। রেখাগুলো তার বড় ভাইয়ের চেয়ে অনেক গভীর করে কাটা হয়েছে। তাই মুছেও যায়নি, ফুটেও উঠেছে অনেক স্পষ্ট হয়ে।
মাঝের ডিজাইনটা ক্রসের মত লাগছে, রবিন বলল।
একে বলে মালটিজ ক্রস, রেফারেন্স বইতে এ ধরনের রেখাচিত্রের ছবি দেখেছে কিশোর। পুরানো ইউরোপিয়ান ডিজাইন। নাইটস অভ মালটা নামে। একটা ক্রসেডর গ্রুপের স্মারকচিহ্ন এটা।
কিন্তু ইনডিয়ানরা নাকি এঁকেছে এই ছবি? প্রশ্ন করল মুসা।
সেটাও একটা ধারণা মাত্র, জবাব দিল রবিন। ইতিমধ্যে এই নকশী নিয়ে বেশ কিছু অধ্যায় পড়ে ফেলেছে সে। যদি তাই হয়ে থাকে, তাহলে এই চিহ্ন প্রমাণ করে প্রাচীন স্প্যানিশ ভ্রমণকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটেছিল ইনডিয়ানদের। আসলে, কেউই ঠিক করে বলতে পারে না কারা একেছিল এই ডিজাইন, কেন এঁকেছিল। এরিক ফন দানিকেন নামে একজন সুইস পুরাতাত্ত্বিকের বিশ্বাস, মহাকাশ থেকে নেমে আসা ভিনগ্রহবাসীর এঁকেছে এই ছবি। কিংবা তাদের নির্দেশে ইনডিয়ানরা এঁকেছে। স্পেশশিপ নিয়ে নামার সময় এই চিহ্ন দেখে বুঝতে পারত প্রাচীন সেই ভিনগ্রহবাসীরা, কোথায় নামতে হবে। যেহেতু আকাশ থেকে আগুনের রথে চেপে নামত ওরা, ইনডিয়ানরা ভাবত দেবতা।
তারমানে ভূতের কথাটা একেবারে মিথ্যে বলিনি! কেঁপে উঠল মুসার গলা। আমার তো ধারণা ভূতে গাপ করে দিয়েছে লফার আর তার বন্ধুকে!
তোমার মাথা! অধৈর্য স্বরে বলল কিশেয়। যত্তসব অবাস্তব ধারণা!
নদীর এ পাড়ে আর কোন ছবি দেখা গেল না। অন্য পাড়ে প্লেন নিয়ে এল। মুসা। কয়েক মিনিটের মধ্যেই চোখে পড়ল আরেকটা দানব। আরও এগোতে বোঝা গেল, একটা দানবীয় কুকুরের ছবি আঁকা হয়েছে।
এখানেই প্লেন নামিয়েছিল লফার, কিশোর বলল।
আশ্চর্য! দেখতে দেখতে বলল রবিন। এত নিখুঁত, দানিকেনের কথাই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে! মাটিতে দাঁড়িয়ে এই জিনিসের আকৃতি বুঝল কি করে শিল্পী? একমাত্র আকাশ থেকে দেখেই বোঝা সম্ভব!
খানিকটা এগিয়ে আরেকটা মানুষাকৃতির দানব আর ঘোড়ার ছবি দেখা গেল।
অনেকক্ষণ দেখেটেখে কিশোর বল, এবার ফিরে যাওয়া যায়।

ম্যাপে দেখা গেল, কাছাকাছি বিমান বন্দর রয়েছে রিভারসাইড কাউন্টিতে। সেখানে নেমে গাড়িতে করে ব্লাইদিতে যেতে হবে।
বিমান বন্দরের ওপরে এসে রেডিওতে নামার অনুমতি চাইল মুসা। অনুমতি পাওয়া গেল। নিখুঁত ভাবে ল্যাণ্ড করল সে। ট্যাক্সিইং করে এগিয়ে গেল হ্যাঁঙ্গারের দিকে। আগের দিনের মত কোন অঘটন ঘটল না।
প্লেন থেকে নেমে এসে একটা কেবিনে ঢুকল গোয়েন্দারা। চেয়ারে বসে হতি-পা ছড়িয়ে আরাম করছে, এই সময় এগিয়ে এল রুক্ষ চেহারার ছিপছিপে এক লোক। নিজেকে ফেডারেল অ্যাভিয়েশন এজেন্সির লোক বলে পরিচয় দিল। জিজ্ঞেস করল, তোমাদের মধ্যে পাইলট কে? কে প্লেনটা চালাচ্ছিলে?
অবাক হলো তিন গোয়েন্দা। মুসা জবাব দিল, আমি। কেন?
লাইসেন্স দেখি?
বের করে দিল মুসা।
লাইসেন্সটা খুঁটিয়ে দেখল লোকটা। কোন খুঁত পেল বলে মনে হলো না। মাথা দুলিয়ে বলল, হু, তোমাকেই খুঁজছি। আচমকা কর্কশ হয়ে গেল কণ্ঠস্বর, তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে!

.

ব্যাপার কি বলুন তো? জানতে চাইল রবিন।
জবাব দিল না বোকটী! মাথা নেড়ে মুসাকে তার সঙ্গে যেতে ইশারা করল। মুসা উঠছে না দেখে তার হাত চেপে ধরে টান দিল।
তাকে প্রায় টেনে নিয়ে চলল, লোকটা। রবিনকে মালপত্রের পাহারায় বসিয়ে রেখে পিছে পিছে চলল কিশোর।
কেবিন থেকে দূরে ছোট একটা বিল্ডিঙের একটা অফিস ঘরে মুসাকে নিয়ে এল লোকটা। কিশোরও ঢুকল সঙ্গে। ডেস্কের ওপাশে বসে আছেন। গোলগাল চেহারার এক ভদ্রলোক। একটা টাইপরাইটার নিয়ে যেন কুস্তি করছেন। রোলারের এ মাথার নব ধরে একবার টানছেন, ওমাথার নব ধরে একবার। নড়াতেও পারছেন না, সরাতেও পারছেন না।
হেসে এগিয়ে গেল কিশোর। বলল, মনে হয় এ জিনিস আর ব্যবহার করেননি? দিন, আমি ঠিক করে দিচ্ছি।
একটা লিভার টিপল সে। ফ্রী হয়ে গেল রোলার। সরাতে আর অসুবিধে হলো না।
বাহ, এত সহজ? ভারি গলায় বললেন ভদ্রলোক। থ্যাংক ইউ। মুসার দিকে তাকিয়ে ছিপছিপে লোকটাকে জিজ্ঞেস করল, ও কে?
স্যার, সেই প্লেনটার পাইলট। স্যান বারনাডিনোতে অ্যাক্সিডেন্ট করছিল। আরেকটু হলেই।

ইশারায় মুসা আর কিশোরকে বসতে বললেন চেয়ারে বসা ভদ্রলোক। মুসার দিকে তাকিয়ে সহানুভূতির সুরে বললেন, তোমার লাইসেন্স ক্যানসেল হয়ে যাবে। সরি, কিছু করার নেই। আকাশের নিরাপত্তার দিকে কড়া নজর রাখতে হয় আমাদের।
ভুরু কুঁচকে গেল মুসার। কিন্তু আমি তো কিছু করিনি..
কিশোর বলল, মনে হয় ভুল ইনফরমেশন পেয়েছেন আপনারা। দোষ ওর নয়, দোষ অন্য বিমানটার। স্যান বারনাডিনো থেকে নিশ্চয় ফোনে। যোগাযোগ হয় আপনাদের? লং ডিসট্যান্স কলে ভুল শোনা যেতেই পারে। দয়া করে আরেকবার যোগাযোগ করুন। টেলিটাইপ করে মেসেজ পাঠাতে অসুবিধে আছে?
না, নেই, মাথা নাড়লেন ভদ্রলোক। এখুনি করছি। আমি হারল্ড ডিক্সন, এই এয়ারপোর্টের ম্যানেজার। ছিপছিপে লোকটার দিকে তাকিয়ে বললেন, বিল, যাও তো, মেসেজ পাঠাও।
মাথা ঝাঁকিয়ে বেরিয়ে গেল বিল।
এখানে কেন এসেছে ওরা, জানাল কিশোর।
মার্টি লফারের নিখোঁজ সংবাদ ডিক্সনও জানেন। বললেন, জানি। মাস তিনেক আগে মরুভূমিতে হারিয়ে গেছে। অনেক খোঁজাখুঁজি হয়েছে, কোন চিহ্নই পাওয়া যায়নি। তোমরা কোন খোঁজ পেয়েছ?
না, মাথা নাড়ল কিশোর। এবং আমরা তার খোঁজ করি এটাও কেউ একজন চায় না। জঞ্জালের আড়ালে লুকিয়ে থাকা রহস্যময় লোকটার কথা। বলল সে। এমনও হতে পারে, লং ডিসট্যান্স কলের জন্যে গণ্ডগোল হয়নি, ফোনে আপনাদের দেয়াই হয়েছে ভুল খবর, যাতে লাইসেন্স কেড়ে নিয়ে আটকে দেন আমাদের। তদন্ত চালাতে না পারি।
খবর আসতে কতক্ষণ লাগবে, স্যার? অধৈর্য হয়ে পড়ল মুসা। পেট যে জ্বলে গেল খিদেয়! লাইসেন্স ক্যানসেলের সঙ্গে কি খাওয়াও ক্যানসেল করে দেয়া হবে নাকি?
হেসে ফেললেন ম্যানেজার। ভাল কথা মনে করেছ। আমারও খিদে পেয়েছে। একটু বসো, খবরটা শুনেই যাই। আমিও বেরোব। ইচ্ছে করলে আমার গাড়িতে একটা লিফট নিতে পারো। শহরে পৌঁছে দেব।
রবিনকে ডেকে আনতে গেল কিশোর।
মালপত্রের বোঝা নিয়ে ওরাও ঢুকল অফিসে, বিলও মেসেজ নিয়ে ফিরে এল। চেহারার কঠোর ভাবটা চলে গেছে তার। বলল, মুসার দোষ নয়, স্যার। ভুল তথ্য দেয়া হয়েছে আমাদের। এ রকম একটা শয়তানি কে করল বুঝতে পারছি না!
কে আর করবে! বিড়বিড় করল মুসা। যে আমার মাথায় বাড়ি মেরেছে...

পায়ে লাথি দিয়ে তাকে চুপ করিয়ে দিল কিশোর। বিলকে সব কথা শোনাতে চায় না। কার মনে কি আছে কে জানে!
অবশেষে ছাড়া পেল মুসা। অফিস থেকে বেরোল ওরা। আটটা বাজে। আকাশের রঙ উজ্জ্বল নীল। মরুভূমির ওপরে শুকনো পর্বতের ঢালে বড় বড় ছায় নামছে। খানাখন্দগুলো অন্ধকার হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই, কালচে-নীল দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে পর্বতের গায়ে কালি ঢেলে দিয়েছে যেন কেউ।
কি একখান আকাশ! মুগ্ধ হয়ে দেখতে দেখতে বলল রবিন। পর্বতটাকে এত বড় লাগছে কেন বলো তো?
বাতাস খুব পরিষ্কার বলে, জবাব দিল কিশোর।
মাখন রঙা একটা চকচকে কনভারটিবল গাড়ির কাছে ওদেরকে নিয়ে এলেন ডিক্সন। উঠতে বললেন।
সামনে বসল রবিন আর কিশোর। পেছনে ওদের মালপত্রের গাদার পাশে মুসা। শহরে রওনা হলেন ডিক্সন।
জানালা দিয়ে ঢুকছে উষ্ণ, অস্বাভাবিক কোমল বাতাস। গালে, মুখে লাগছে। তজ্জিব করে দিল গোয়েন্দাদের। সূর্যাস্তের সময়ও বাতাস বড় বেশি শুকননী, বিন্দুমাত্র আর্দ্রতা নেই। শিশিরের কোন লক্ষণই নেই বাতাসে।
আমি তো জানতাম মরুভূমিতে রাতে খুব ঠাণ্ডা পড়ে, ডিক্সনের দিকে তাকিয়ে বলল রবিন।
গরমকালে পড়ে না এখানে, জবাব দিলেন ম্যানেজার। বেডরোল ছাড়াই বাইরে ঘুমাতে পারবে, শীত লাগবে না। মরুভূমিতে ঘুমানোর কথা ভাবছ নাকি?
পরে, কিশোর বলল। আজ রাতে শহরেই থাকব। ভাল জায়গা আছে না?
আছে।
নতুন একটা মোটেলের ড্রাইভওয়েতে গাড়ি ঢোকালেন ডিক্সন। ঘোড়ার খুরের আকৃতিতে তৈরি বিল্ডিং। সাদা রঙ করা। সুইমিং পুলে গাঢ় নীল পানি। তীরে কয়েকজন লোক। ডাইভ দিয়ে পড়লেই পানি ছিটকে উঠছে।
পানি দেখে গা শিরশির করে উঠল মুসার, তখুনি ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছে করল। চমৎকার একটা রেস্টুরেন্টও চোখে পড়ল তার।
নিচতলায় ঘর নিল ওরা। ব্যাগ-সুটকেসগুলো ওখানে রেখে দশ মিনিটের মধ্যে এসে ঝাঁপ দিল পুলের পানিতে। গোসল সেরে রেস্টুরেন্টে গিয়ে গলা পর্যন্ত গিলল।
পরদিন সকালে কিশোর বলল খবরের কাগজের অফিসে যাবে। ব্লাইদির একমাত্র কাগজ Daily Enterprise-এর অফিসে হানা দিল ওরা, লফারের নিখোঁজ হওয়ার খবরটা পড়ার জন্যে।

সাইমন বলেন: গোয়েন্দাদের বন্ধু খবরের কাগজ আর পুলিশ, প্রচুর উপকার পাওয়া যায় তাদের কাছে। প্রথমে খবরের কাগজের অফিসে এল তিন গোয়েন্দা। পুরানো কাগজে লফার আর ব্রাউনের নিরুদ্দেশের খবর ছাপা হয়েছে, কিন্তু তাতে নতুন কিছু পেল না কিশোর, কেবল রিপ্পির কাছে বিশাল এক দানবের কাছে ওদের প্লেন ল্যাণ্ড করার খবরটা ছাড়া।
পুলিশের কাছে যাবে? জানতে চাইল রবিন।
যাব।
রাইদি পুলিশের কাছেও ভিকটর সাইমন নামটা অপরিচিত নয়, তার সুখ্যাতি তাদের কানেও পৌঁছেছে। তার ওপর তিন গোয়েন্দার কাছে রয়েছে। ইয়ান ফ্লেচারের দেয়া সার্টিফিকেট। সুতরাং রাইদির পুলিশ চীফের সঙ্গে যোগাযোগ করতে অসুবিধে হলো না।
তিনিও নতুন কোন তথ্য দিতে পারলেন না। বললেন, তোমরা যতটা জানো, আমিও ততটুকুই জানি। নতুন কিছু বলতে পারছি না।
হতাশ হয়ে থানা থেকে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা। রাইদির প্রধান রাস্তা হবসনওয়ে ধরে এগোল।
কিশোর, এক কাজ করা যাক, হঠাৎ বলে উঠল রবিন, মুসা হবে মার্টি লফার, তুমি আর আমি লুক ব্রাউন!
খাইছে! পাগল হয়ে গেলে নাকি? অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল মুসা। মরুর ভূতে আসর করেনি তো
তার কথা এড়িয়ে গিয়ে উত্তেজিত স্বরে রবিন বলল, তুমি প্লেন চালাবে। আমি আর কিশোর হব যাত্রী...
তাই তো করছি। এতে আর নতুন কথা কি?
এবারও মুসার কথায় গুরুত্ব দিল না রবিন। লফাররা যে পথ ধরে উড়ে গেছে, আমরাও সেই পথ ধরে যাব। শেষবার রিভারসাইড কাউন্টি থেকে উড়েছিল ওরা। ডিক্সনের কাছে ওদের ফ্লাইট চার্ট পাওয়া যাবে। আকাশ থেকে একই জিনিস দেখব, একই জায়গায় ল্যাণ্ড করব। হয়তো কিছু বোঝা যাবে।
তা যাবে! বিড়বিড় করল মুসা। বুঝব, কি করে গায়েব হয় মানুষ। কারণ আমরাও তো হব!
কিশোর বলল, রবিন কিন্তু মন্দ বলেনি। গায়েব যদি হইই, তাহলে তো আরও ভাল। রহস্যের সমাধান হয়ে যাবে। বুঝে যাব কি ভাবে গায়েব হয়েছে। লফাররা।
তার জন্যে অত কষ্ট করার দরকার কি? আমাকে জিজ্ঞেস করো, বলে দিচ্ছি। ভিনগ্রহ থেকে স্পেসশিপ এসে তুলে নিয়ে গেছে ওদের। আমি বাবা পৃথিবীতেই

ভাল আছি, অন্য কোন গ্রহে যেতে রাজি না। আল্লাহই জানে ওরা ওখানে কি খায় না খায়!
মোটেলে ফিরে তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল আবার তিন গোয়েন্দা। ট্যাক্সি নিয়ে চলল রিভারসাইড কাউন্টি এয়ারপোর্টে।
কড়া রোদ বাড়িটার সাদা দেয়ালে পড়ে ঠিকরে আসছে, চোখে লাগে। দাঁড়িয়ে থাকা বিমানগুলোর ডানা চকচক করছে। চওড়া কানওয়ালা হ্যাট পরেছে কিশোর আর রবিন। মুসা মাথায় দিয়েছে খড়ের তৈরি একটা মেকসিকান সমরেরো হ্যাট।
বাপরে বাপ, কি গরম! বলল সে। একশো আট ডিগ্রি। এয়ারপোর্টের থার্মোমিটারে দেখলাম।
ও তো কিছুই না, রবিন বলল। গরমের দিনে দুপুরবেলা নাকি বালি তেতে একশো পঁয়ষট্টি ডিগ্রি হয়ে যায়। এর মধ্যে হাঁটা লাগলে বুঝবে। ঠেলা।
গুঙিয়ে উঠল মুসা। খাইছে! বলো কি! তাহলে বেরোলাম কেন? মোটেলের পুলই তো আরামের ছিল।
আরাম করতে তো আসিনি আমরা, মনে করিয়ে দিল কিশোর। এসেছি মাটি লফারের খোঁজে। মনে রেখো, খরচটা বহন করছেন তার মামা।
প্লেনের দরজা খুলে দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল মুসা। ভেতরে বদ্ধ বাতাস আগুনের মত গরম হয়ে আছে। সেটা বেরিয়ে যাওয়ার সময় দিল।
প্রয়োজনীয় কাগজপত্র আনতে অফিসে গেল কিশোর।
কয়েক মিনিট পর আকাশে উড়ল নীল বিমানটা। এয়ারপোর্টের ওপর একবার চক্কর দিয়ে উত্তরে মরুভূমির দিকে নাক ঘোরাল মুসা।
মুগ্ধ হয়ে নিচের দৃশ্য দেখতে লাগল ওরা। আকাশের ছায়া পড়েছে। কলোরাডো নদীতে, আকাশের মতই নীল। তীরে অপূর্ব সুন্দর হলদে পাতাওয়ালা টামারিস্ক গাছের সারি। এক তীরে শস্য খেত, অন্য তীরে শুকনো টিলা-টক্কর, মালভূমি আর পাহাড়।
মরুভূমি শুনে আমি ভেবেছিলাম শুধু বালি আর পাথরের পাহাড় দেখতে পবি, রবিন বলল। কিন্তু এ কি দেখছি! এত সুন্দর!
বালিই ছিল এককালে, কিশোর বলল। ওই খালগুলো দেখছ না? নদী থেকে পানি নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছে ওগুলো দিয়ে। মাটি ভিজিয়ে ফসল ফলিয়েছে।
এক জায়গায় বড় একটা নিঃসঙ্গ দানব আঁকা আছে, আগের দিনই দেখে গেছে। সেটার কাছে এসে ভাল করে দেখার জন্যে নিচুতে বিমান নামিয়ে। আনল মুসা।
একটা টিলা আছে। প্রায় একশো ফুট উঁচু। একধারে খুবই খাড়া, আরেক ধীর ঢালু। ঢালু ধারটার কাছে সমতল জায়গায় বিমান নামানো সম্ভব। ল্যাণ্ড করল

মুসা।
বিমান বন্দর থেকে আনা ফ্লাইট চার্ট দেখে রবিন বলল, এখানেই ল্যাণ্ড করেছিল লফাররা। তারপর কি করেছে?
হয়তো গিয়ে ওই টিলাটার ওপর উঠেছে, কিশোর অনুমান করল, চারপাশটা দেখার জন্যে।
বিমান থেকে নেমে এসে টিলাটায় উঠল ওরা। ওপরটা সমতল, অনেকটা মালভূমির মত। রুক্ষ, কঠিন মাটি চারপাশে, তাতে বিছিয়ে আছে নুড়ি পাথর। এখানে ওখানে দু-চারটা ছোট ছোট শুকনো ঝোপ। বিরান প্রকৃতি।
দেখো, একটা রাস্তা, মুসা বলল, রাস্তাটা কি অদ্ভুত! মনে হয় কেউ যেন ঝড় দিয়ে নুড়ি সরিয়ে তৈরি করেছে।
রাস্তা না ওটা, রবিন বলল। একটা দানবের পা।
চিন্তিত ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে কিশোর। বলল, ভাবছি, এই টিলা মানুষের তৈরি নয়তো? প্রাচীন ইনডিয়ানরাই কি বানিয়েছিল চূড়ার ওপর ছবি আঁকার জন্যে?
হতে পারে, সমর্থন করল রবিন। আর দানবের অবস্থানটারও হয়তো কোন মানে আছে।
টিলাটার ওপর ঘুরে বেড়াতে লাগল ওরা। যত দিক থেকে সম্ভব দেখছে।
আচমকা দাঁড়িয়ে গিয়ে রবিন বলল, লফার যদি এখানে উঠে থাকে, কি পড়েছিল তার চোখে?
রবিনের পাশে দাঁড়িয়ে মুসাও দেখতে লাগল।
দানবের বাঁ হাতটীর ওপর দাঁড়িয়ে মরুভূমির দিকে তাকিয়ে আছে। কিশোর। হঠাৎ চিৎকার করে উঠল, ওই দেখো কি চকচক করছে।
ধাতব কিছু? রবিনের প্রশ্ন।
চলো না গিয়েই দেখি।
ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল কিশোর, পেছনে তার দুই সহকারী। ঢালের গোড়ায় পা দিয়েই থমকে দাঁড়াল সে। পরক্ষণে লাফ দিয়ে পিছিয়ে। এল। চিৎকার করে বলল, খবরদার!

.

মাথা তুলল প্রায় দুই ফুট লম্বা একটা গিরগিটি। ভীষণ রাগে ফোঁস ফোঁস করছে। ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে কিশোরের দিকে। সাপের জিভের মত চেরা লাল একটা জিভ ভয়ানক ভঙ্গিতে বার বার বেরোচ্ছে মুখের ভেতর থেকে।
আরেকবার লাফ দিয়ে আরও পিছিয়ে এল কিশোর। মূসা আর রবিন দাঁড়িয়ে গেছে। তাকিয়ে আছে গিরগিটিটার দিকে। চামড়ার রঙ কালচে বেগুনী। তাতে

হলুদ রঙের গোল গোল ছাপ। সারা শরীরে অসংখ্য আঁচিলের মত জিনিস কুৎসিত করে তুলেছে প্রাণীটাকে।
খাইছে! ঠিকরে বেরিয়ে আসবে যেন মুসার চোখ। কি এটা? কুমিরের বাচ্চার ব্যারাম হয়েছে?
হিলা মনস্টার, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কিশোর। জোরে দৌড়াতে পারে না বটে, তবে দাঁতের নাগালে পেলে সর্বনাশ করে দেবে। সাংঘাতিক বিষাক্ত।
থেমে গেল গিরগিটিটা। ঠাণ্ডা, কুৎসিত চোখ মেলে দেখছে গোয়েন্দাদেরকে।
আমাদের ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে, হেসে বলল রবিন।
সার্থক হয়েছে তার চেষ্টা, মুসা বলল। ভয়ে কলজে শুকিয়ে গেছে। আমার। এমন ভূতুড়ে জানোয়ার জনমেও দেখিনি। দাঁড়িয়ে থাকব কতক্ষণ। নড়লেই তো মনে হচ্ছে নড়ে উঠবে!
উঠুক। না দেখে গায়ে পা দিয়ে ফেললে বিপদ, কামড়ে দিতে পারে, কিশোর বলল। দেখে যখন ফেলেছি, আর কিছু করতে পারবে না। দৌড়ে পারবে না আমাদের সঙ্গে। তবে সাবধান যে করে দিয়েছে, এ জন্যে একটা ধন্যবাদ ওর পাওনা। ওর জাতভাইরা আরও অনেক আছে এই অঞ্চলে। বালি আর ঝোপের মধ্যে চুপ করে পড়ে থাকলে চোখে পড়বে না। ভুল করে পা দিয়ে ফেললেই মরব। সুতরাং, সাবধান!
কয়েক মিনিট একভাবে দাঁড়িয়ে থেকে ফোঁস ফোঁস করল হিলা মনস্টার। বিপদের আশঙ্কা নেই দেখে ঘুরল। অলস ভঙ্গিতে হেলেদুলে আস্তে আস্তে গিয়ে ঢুকে পড়ল একটা ঝোপে।
আবার পা বাড়াল তিন গোয়েন্দা। এগিয়ে চলল চকচকে জিনিসটার দিকে। হাঁটছেই, হাঁটছেই, কিন্তু জিনিসটার কাছে পৌঁছতে পারার কোন লক্ষণ দেখতে পাচ্ছে না। আশ্চর্য!
পায়ে মোকাসিন পরেছে ওরা। তলা ফুড়ে যেন উঠে আসছে তপ্ত বালির ভয়ানক উত্তাপ।
রুমাল বের করে মুখ মুছতে মুছতে মুসা বলল, বাপরে বাপ, হিলা মনস্টারের বাচ্চা এই বালিতে হাঁটে কি করে! পায়ে কিসের চামড়া লাগানো!
কিসের আর, ওরই চামড়া, কিশোর বলল। গরম বালিতে চলার উপযোগী করেই বানিয়ে দিয়েছে প্রকৃতি।
কিন্তু ওই চকচকে জিনিসটা কাছে আসে না কেন? ভূতুড়ে কাণ্ড মনে হচ্ছে!
ভূতটা আসলে বাতাস। বেশি হালকা বলে এখানে অনেক দূরের জিনিসও কাছে মনে হয়।
অবশেষে পৌঁছল ওরা ওটার কাছে। গোল একটা জিনিস রোদে পড়ে চমকাচ্ছে।

তুলে নিল রবিন। বড় একটা পাথর, তাতে ছোট ছোট অন্য পাথর গাঁথা। কোনটা গাঢ় লাল, কোনটা বাদামী, কিছু আছে সবুজ। নাড়াচাড়ায় গায়ে রোদ পড়লেই ঝিক করে উঠছে পাথরগুলো।
কিশোরকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল সে, কি এটা, বলো তো? কোন ধরনের স্ফটিকের সমষ্টি?
সম্ভবত জ্যাসপার।
মুসা জানতে চাইল, দামী জিনিস? হীরার মত?
হীরার মত অত দাম না হলেও, দামী, তাতে কোন সন্দেহ নেই।
আশেপাশে খুঁজল ওরা। ওরকম পাথর আর একটাও পাওয়া গেল না।
অবাক কাণ্ড! রবিন বলল। এটা এখানে এল কোত্থেকে?
মাটির দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে নিজেকেই প্রশ্ন করল, এর সঙ্গে লফারের নিখোঁজের কোন সম্পর্ক নেই তো?
বুঝতে পারল না মুসা। মানে?
এখানে জন্মালে এ রকম পাথর আশেপাশে আরও থাকার কথা। নেই কেন?
হয়তো ছিল, রবিন বলল। আকাশ থেকে চোখে পড়েছে লফার আর ব্রাউনের। এগুলোর জন্যেই নেমেছিল ওরা। তুলে নিয়েছিল।
মাথা ঝাঁকাল কিশোর। ঠিক এই কথাটাই বলতে চাচ্ছি আমি। সবই নিয়ে গেছে, কিন্তু এই একটা কোনভাবে রয়ে গেছে এখানে। হয়তো কাড়াকাড়ির সময় পড়ে গেছে। সেজন্যেই লফার আর ব্রাউন নিখোঁজ।
অস্বস্তি ফুটল মুসার চোখে। কিশোরের কথা এতক্ষণে বুঝেছে। আচ্ছা, বুঝলাম! ওদেরকে খুন করে পাথরগুলো ডাকাতেরা কেড়ে নিয়ে গেছে সন্দেহ করছ! মরুভূমিতে লাশ গুম করে ফেলেছে।
করলে অবাক হওয়ার কিছু নেই, রবিন বলল। দামী পাথরের জন্যে মানুষ খুন হওয়াটা নতুন কিছু নয়।
উফ, কি রোদরে বাবা! সিদ্ধ হয়ে গেলাম! মুখ দিয়ে বাতাস ছাড়ল কিশোর। এখানে আর দেখার কিছু নেই। চলো, প্লেনে গিয়ে বসি।
প্লেনের দিকে হাঁটতে লাগল ওরা। মনে হচ্ছে কাছে, অথচ যতই হাঁটে, পথ আর ফুরায় না।
ভারী পাথরটা নিয়ে হাঁটতে গিয়ে ঘেমে নেয়ে গেল রবিন। তা দেখে মুসা বলল, দেখি, দাও আমার কাছে।
পাথরটা মুসার হাতে তুলে দিয়ে বাঁচল রবিন।
কিছুদূর এগিয়ে মুসারও হাঁপ ধরে গেল। বলল, খাইছে! এটা পাথর না লোহারে বাবা! দশ টন ওজন হবে!

তার কথা শেষ হতে না হতেই চেঁচিয়ে উঠল রবিন, ওই দেখো, হিলা মনস্টার!
কই, কোথায়! এতটাই চমকে গেল মুসা, হাত থেকে ছুটে উড়ে গিয়ে পড়ল পাথরটা। লাফ দিয়ে সরে দাঁড়ল সে।
তবে অত চমকানোর কিছু ছিল না। বেশ দূরে রয়েছে গিরগিটিটা। ওদের দিকে তাকাল না। ধীর পায়ে হেঁটে গিয়ে ঢুকল একটা ঝোপের মধ্যে।
কিন্তু পাথরটা আর দেখতে পেল না ওরা। গেল কোথায়?
ওটাতে পড়ল না তো? একটা গর্ত দেখিয়ে বলল রবিন।
গর্ত না বলে সরু একটা ফাটল বলা উচিত। বেশ গভীর। দেখা গেল, তার মধ্যেই পড়েছে পাথরটা। তুলতে কষ্টই হলো। সাবধান থাকতে হলো হিলা মনস্টারের ব্যাপারে। গর্তে থাকলে কামড়ে দিতে পারে। আর কামড়ালে মরতে হবে।
মুসা কিছুক্ষণ বহন করার পর পাথরটার ভার নিল কিশোর। ভাগাভাগি করে বয়ে এনে প্লেনে তোলা হলো ওটাকে।
রিভারসাইড কাউন্টি এয়ারপোর্টে যখন পৌঁছল ওরা, বিকেল পাঁচটা বেজে গেছে।
পেটের মধ্যে নাড়িভূড়িও নেই আর আমার, ঘোষণা করল মুসা। এখন গিয়ে সুইমিং পুলে কয়েকটা ডুব, তারপর পেট ভরে গরুর শিককাবাব
ম্যানেজার হারল্ড ডিক্সনকে এগিয়ে আসতে দেখে থেমে গেল সে।
কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন তিনি, তারপর? কেমন কাটল? কি দেখে এলে?
হিলা মনস্টার, জবাব দিল মুসা।
হাসলেন ডিক্সন। ও আর এমন কি। কিছুদিন একটা মনস্টার পুষেছিলাম আমি। বাসন থেকে দুধ খেত ওটা। বেড়ালের মত এসে আমার কোলে উঠত।
বলেন কি! ঢোক গিলল মুসা। ওই কুৎসিত প্রাণীটাকে ধরতে খারাপ লাগত না আপনার?
না, লাগত না। ওটাকে শিস দিতে শিখিয়েছিলাম। বেশিদিন আটকে রাখিনি। ছেড়ে দিয়েছি মরুভূমিতে।
পাথরটা দেখাল তাঁকে রবিন। এটা পেয়েছি।
ডিক্সন বললেন। মরুভূমিতে গেলে এ সব পাথর অনেকেই পায়। আমরা। একে বলি চাইনিজ জেইড।
দামী?
আছে। মোটামুটি।
আপনার কি মনে হয়, এই পাথরের জন্যে ডাকাতেরা মানুষ খুন করবে? আকাশ থেকে এ সব দেখেই হয়তো নেমেছিল লফার আর ব্রাউন। তারপর ওগুলোর জন্যে খুন হয়েছে। হতে পারে না?

চাইনিজ জেইডের জন্যে মানুষ খুন হয়েছে এই এলাকায়, শুনিনি কখনও।
তাহলে হয়তো পাথর দেখে কৌতূহলী হয়ে নেমেছিল ওরী, মরুভূমিতে পথ হারিয়েছে। কিংবা জখম হয়ে পর্বতের মধ্যে আটকা পড়েছে।
শ্রাগ করলেন ডিক্সন। জখম হলে একজন হবে, দু-জন হওয়াটা অস্বাভাবিক। সেক্ষেত্রে আরেকজন প্লেন চালিয়ে নিয়ে আসতে পারত। আর পর্বতে গেলে টিলার কাছে প্লেন ফেলে যাবে কেন? মরুভূমিতে হাঁটীর চেয়ে। প্লেন নিয়ে যাওয়াই সহজ।
তা-ও বটে। চুপ হয়ে গেল রবিন।
কিশোর জানতে চাইল, লফারের প্লেনটা এখন কোথায়? জানেন?
আমাদের এখানেই, জবাব দিলেন ডিক্সন।
একটু দেখা যাবে?
হেসে বললেন ডিক্সন, সূত্র খুঁজতে চাও তো? ওদিককার হ্যাঁঙ্গারে আছে। পকেট থেকে চাবি বের করে দিলেন। নাও। দেখা হয়ে গেলে ফেরত দিয়ে যেয়ো।
ম্যানেজারকে ধন্যবাদ দিল কিশোর। পাথরটা আবার প্লেনের ভেতরে রেখে এসে দরজা লাগিয়ে দিল। দুই সহকারীকে নিয়ে রওনা হলো হাঙ্গীরের দিকে।
লাল আর সাদা রঙের একটা সুন্দর বিমান লফারের। চার সীট। কেবিনের একদিকের দরজা হাঁ হয়ে খুলে আছে।
ব্যাপারটা অবাক করল রবিনকে। দরজা লাগায়নি কেন?
তার প্রশ্নের জবাব দিতে পারল না কেউ।
ইনস্ট্রুমেন্ট প্যানেলে খুঁজতে লাগল কিশোর। মুসা গেল মালপত্র রাখার জায়গায়। গ্লীভ কম্পার্টমেন্টে হাত দিল রবিন। হলদে রঙের একটুকরো কাগজ পেল। পেন্সিলে লেখা নোটটার দিকে একনজর তাকিয়েই চিৎকার করে উঠল। সে, অ্যাই, দেখে যাও!
কাগজটাতে কবিতার মত করে লেখা:
তিন গোয়েন্দা সাবধান;
গোলাপের রঙ লাল
ভায়োলেটের রঙ নীল
লফারকে কবর দিয়েছি আমরা।
সময়মত না যদি সরো
সেথায় যাবে তোমরাও!

.
শিস দিয়ে উঠল মুসা, কোন ব্যাটার কাজ!
হবে কোন বদমাশ! জবাব দিল রবিন।

রসিক বদমাশ, নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। এই নোটের কথা ডিক্সনকে বলার দরকার নেই। তবে দরজা খোলা পাওয়া গেছে, এটা জানাতে হবে তাকে। দরজা যে খুলেছে, নোটটা সে-ই রেখে গেছে।
কিন্তু কখন রাখল? নিশ্চয় রাতের বেলা এক ফাঁকে ঢুকে রেখে গেছে। জানত, কোন না কোন সময় বিমানটাতে তল্লাশি চালাতে আমরা আসবই।
তার মানে আমাদের গতিবিধির ওপর পুরো নজর আছে ওর। কাগজটা যত্ন করে পকেটে রেখে দিল কিশোর। মিস্টার সাইমনের সঙ্গে কথা বলা দরকার। চলে রেখে দিল কিশোর পর পুরো নজর আছে
ডিক্সনকে চাবি ফিরিয়ে দিল কিশোর। বিমানটাতে লোক ঢুকেছিল। জানাল। তারপর মোটেলে ফিরে ফোন করল রকি বীচে সাইমনের বাড়িতে।
ফোন ধরল কিম। জানাল, মিস্টার সাইমন বাড়িতে নেই। জরুরী কাজে বাইরে গেছেন। কোথায় গেছেন, তা-ও বলতে পারল না। তিন গোয়েন্দার জন্যে একটা মেসেজ রেখে গেছেন।
মেসেজটা কিমকে পড়তে অনুরোধ করল কিশোর।
কিম পড়ল, রাইদি থেকে চলে এসো। লস অ্যাঞ্জেলেসে এসে তদন্ত করো। হোটেলে থাকবে, বাড়ি ফেরার দরকার নেই। লফারের অফিস আর তার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে খোঁজখবর নাও। আশা করছি, শীঘ্রি তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে। ভিকটর সাইমন।
পরদিন সকালে মালপত্র গোছগাছ করে ঘর থেকে বেরিয়ে এল তিন। গোয়েন্দা।
মোটেলের ম্যানেজার বলল, এত তাড়াতাড়িই চলে যাচ্ছ?
হ্যাঁ, জবাব দিল কিশোর। জায়গাটা ভাল লাগল না। দেখার তেমন কিছু নেই।
সব ঠিকঠাক মত নিয়েছ? ফেলে যাওনি তো কিছু? গেলে দয়া করে আমাদের বাড়িতে পাঠিয়ে দেবেন। এই যে রইল, ঠিকানা।
ঠিক আছে।
প্লেনে করে লস অ্যাঞ্জেলেসে আসতে বেশি সময় লাগল না। বিমানটা এয়ারপোর্টে রেখে ট্যাক্সি করে এসে শহরের একটা পুরানো হোটেলে উঠল ওরা।
জানালা খুলে বাইরে মুখ বের করে দিল মুসা। বলল, ফায়ার-এসকেপ আছে। আগের দিনে যেমন বানাত লোকে।
থাকবেই, রবিন বলল। বাড়িটা বানানো হয়েছে অনেক দিন আগে।
গোসল সেরে খেয়ে নিল ওরা। মুসা জিজ্ঞেস করল, এবার কি করব? কিশোর, মিস্টার ক্রিস্টোফারের দেয়া সেই পাসগুলো তো কোনদিন কাজে লাগল না। এবার লাগালে কেমন হয়?

এক সময় তিনটে পাস দিয়েছিলেন, তিন গোয়েন্দাকে বিখ্যাত চিত্রপরিচালক মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফার। ওগুলো দেখিয়ে যখন তখন হলিউড কিংবা লস অ্যাঞ্জেলেসের যে কোন স্টুডিওতে শূটিং দেখতে ঢুকতে পারবে ওরা। এবার বাড়ি থেকে বেরোনোর আগে কিশোরের মনে হয়েছিল, লফারের ব্যবসা যখন লস অ্যাঞ্জেলেসে, এদিকে তদন্তের জন্যে আসতেও হতে পারে। পাসগুলো ব্যবহারের সুযোগ মিলতে পারে তখন।

মন্দ হয় না, কিশোর বলল। কিন্তু যাব কখন? আমি তো ভাবছি পুলিশ হেডকোয়ার্টারে যাওয়ার কথা। লফারের খোঁজ নিতে।

তিনজন একসাথে গিয়ে কি করব? তুমি আর রবিন যাও। আমি বরং স্টুডিওতে চলে যাই।

হেসে বলল রবিন, খুব মনে হয় শূটিং দেখতে ইচ্ছে করছে?

হোটেল থেকে বেরিয়ে মুসা গেল শূটিং দেখতে। রবিন আর কিশোর চলল পুলিশ হেডকোয়ার্টারে।

কিন্তু নতুন কিছু জানতে পারল না। একজন পুলিশ সার্জেন্ট কথা বলল ওদের সঙ্গে। বলল, লফারের ব্যাপারটা সত্যি অবাক করে দিয়েছে আমাদের। কোনই হদিস নেই। লুক ব্রাউনের ব্যাপারেও কিছু জানি না। ব্লাইদি পুলিশও তেমন কিছু বলতে পারেনি।

আপনার কি মনে হয় মিসেস লফার আমাদের সঙ্গে দেখা করবে?

করবে। তার স্বামীর ব্যাপারে কেউ আগ্রহ দেখালে খুশি হয় সে। বেচারী: লফারের অফিসে তার সেক্রেটারির সঙ্গেও কথা বলতে পারো ইচ্ছে করলে।

সার্জেন্টের কাছ থেকে বিদায় নেয়ার আগে গোয়েন্দাদের সাবধান করে দিয়ে বলল সে, বিপদের আশঙ্কা দেখলেই আমাকে জানাবে। কোন রকম ঝুঁকি নিতে যেয়ো না। তার জন্যে পুলিশই আছে।

সার্জেন্টকে ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে এল কিশোররা। হোটেলে ফিরে এল। মুসা ফেরেনি।

রবিন বলল, অহেতুক ঘরে বসে না থেকে বরং চলো মুসা কি করছে দেখে আসি।

কিশোরের আপত্তি নেই।

কোন স্টুডিওতে যাবে মুসা বলেই গেছে। খুঁজে বের করতে মোটেও বেগ পেতে হলো না। পাস দেখিয়ে ভেতরে ঢুকল কিশোর আর রবিন। সেদিন একটা জায়গাতেই কেবল শুটিং চলছে। মেকসিকোর পটভূমিতে ওয়েস্টার্ন ছবির শুটিং। লোকজনের ভিড়ে মুসাকে কোথাও দেখতে পেল না ওরা।

সেটের মাঝখানে অনেক লোক জটলা করছে। সবাই বেশ লম্বা, মাথায়। চওড়া কানাওয়ালা মেকসিকান হ্যাট। কারও পরনে রঙচটা নীল জিনসের। প্যান্ট, গায়ে

ডেনিম জ্যাকেট; কারও এমব্রয়ডারি করা পোশাক। কোমরে রূপার বাকলেসওয়ালা চকচকে চামড়ার বেল্ট, পায়ে চামড়ার বুটজুতো। মেয়েদের পরনে উজ্জ্বল রঙের পোশাক। একটা দৃশ্যের শূটিঙের জন্যে প্রস্তুত হয়েছে সবাই।

এককোণে দু-জন লোককে কথা বলতে দেখল রবিন। একটু পর সরে এল একজন। চিনতে পারল রবিন। আরি, ওই তো মুসা! মাথায় সমব্রেরো হ্যাট।

হাত নেড়ে ডাকল তাকে রবিন। নিজেও এগিয়ে গেল।

বন্ধুদের দেখে মুসও এগিয়ে এল। বাহ, তোমরাও এসে গেছ দেখছি।

লোকটা কে, মুসা? জানতে চাইল কিশোর। কোণের দিকে তাকিয়ে আর দেখতে পেল না-ওকে। অভিনেতাদের ভিড়ে মিশে গেছে।

এমন কেউ না, একজন এক্সট্রা, মুসা বলল। ডাকাত দলের একটা দৃশ্যে অভিনয় করতে এসেছিল। আমার মাথায় সমব্রেরো হ্যাট দেখে বলল চেষ্টা করলে আমিও এক্সট্রীর কাজ পেতে পারি। করেছি। পাইনি। নিরাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল সে। পরিচালক বললেন, হয়ে গেছে, আর লোক লাগবে না।

তাহলে আর বসে আছ কেন? চলো, যাই।

হ্যাঁ, চলো। ব্যাংকেও যেতে হবে, বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগেই।

ব্যাংকে? ভুরু কোঁচকাল কিশোর।

যে লোকটা এক্সট্রা সেজেছে সে একটা চেক দিয়েছে। কাজ ফেলে বেরোতে পারবে না। তাই আমাকে অনুরোধ করল, একটা চেক দেবে; সেটা নিয়ে আমি যেন তাকে নগদ টাকা দিই। সে বেরোতে বেরোতে ব্যাংক বন্ধ। হয়ে যাবে। কিন্তু টাকাটা তার আজই দরকার। পকেটে যা ছিল দিয়ে দিলাম। সে আমাকে চেক সই করে দিল।

বোকামি করোনি তো? রবিন বলল। আজকাল কত রকম অসুবিধে হচ্ছে। প্রায়ই চেক জাল হয়।

কি করব, এমন করে ধরল। তবে এটা হবে না, সরকারি চেক। দেখো, ইউনাইটেড স্টেটস গভর্নমেন্ট ছাপ দেয়া।

বেরোল ওরা। একটা ব্যাংক দেখে দুজনকে দাঁড়াতে বলে ভেতরে চলে গেল মুসা। কয়েক মিনিট পর ব্যাংকের একজন দারোয়ান বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, তোমাদের নাম কিশোর আর রবিন?।

হ্যাঁ, কেন? জবাব দিল কিশোর।

ভেতরে আসতে হবে। বিপদে পড়েছে তোমাদের বন্ধু। তোমাদের নাম বলল।

ক্যাশিয়ারের সামনে দাঁড়িয়ে আছে মুসা। ওদের দেখেই উত্তেজিত স্বরে বলল, আমাকে চেক নিতে দেখেছ না তোমরা! ক্যাশিয়ার সাহেব বিশ্বাস করছে না,

তাকে বলো!
রবিন বলল, তখনই সন্দেহ হয়েছিল আমার, বোকামি করেছ!
কার কাছ থেকে কি ভাবে চেকটা নিয়েছে ক্যাশিয়ারকে বুঝিয়ে বলল সে আর কিশোর।
বিশ্বাস করল ক্যাশিয়ার। দারোয়ানকে বলল মুসাকে ছেড়ে দিতে।
কিশোর জানতে চাইল, চেকটাতে কি গোলমাল?
জাল, আরকি। ইদানীং বেশ কিছু জাল চেক পেয়েছি আমরা। সে জন্যেই সাবধান থাকতে হচ্ছে। যাই হোক, ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টের কাছে এটা পাঠিয়ে দেব।
কিন্তু আমার টাকার কি হবে? ককিয়ে উঠল মুসা। পকেট তো খালি করে দিয়ে দিয়েছি।
কি আর করবে, কপাল খারাপ তোমার। বোকামির ফল, সহানুভূতির সুরে বলল ক্যাশিয়ার। তোমাদের কথা বিশ্বাস করে যে ছেড়ে দিলাম, বরং সেইটা ভাব। পুলিশের কাছে তুলে দেয়াটাই স্বাভাবিক ছিল না?
কিশোর বলল মুসাকে, জলদি চলে! লোকটাকে ধরতে হবে।
চলো, রাগ করে বলল মুসা, ব্যাটার কপালে দুঃখ আছে! ধরতে পারলেই হয়! আমি করলাম ভালমানুষী, আর আমাকে এমন করে ঠকাল!
রাস্তায় বেরিয়ে দৌড় দিল তিনজনে। স্টুডিওর গেটে ওদের কাছে পাস চাইতে গেল দারোয়ান, পাত্তাই দিল না ওরা। ধাক্কা দিয়ে তাকে সরিয়ে ঢুকে গেল। সোজা চলে এল সেটের কাছে, যেখানে ছবির শুটিং হচ্ছে।
গায়ে গায়ে লেগে থাকা ভিড়ের জন্যে লোকটাকে চোখে পড়ল না মুসার। ভাবল ভেতরেই কোথাও আছে। ধাক্কা দিয়ে লোক সরিয়ে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করল সে। চিৎকার করে উঠল এক মহিলা। কনুইয়ের তো খেয়ে পড়ে যেতে যেতে বাঁচল দু-জন লোক। রাগে, বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল ওরা। কয়েকজনের হাতে পিস্তল, ওপর দিকে তুলে ফাঁকা গুলি করতে শুরু করল, মজা করার জন্যে। বেড়ে গেল চিৎকার-চেঁচামেচি। শিস দিয়ে উঠল কে যেন।
ভিড় থেকে সামান্য দূরে দাঁড়িয়ে আছেন নীল ব্যারেট ক্যাপ পরী ছোটখাট একজন মানুষ। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, কাট! কাট! কাট!
একজন বিশালদেহী অভিনেতাকে নিয়ে মাটিতে গড়াগড়ি খেতে শুরু করেছে মুসা। ভিড়ের মধ্যে তাকে ঢুকতে বাধা দিয়েছিল লোকটা। অনেক টানা-হাচড়া করে দু-জনকে আলাদা করা হলো।
এগিয়ে এলেন নীল টুপি পরা ভদ্রলোক। চোখের তারা উজ্জল। দেখেই চিনে ফেলল মুসা। বিড়বিড় করল আনমনে, খাইছে! পরিচালক! এইবার বারোটা

বাজাবেন আমার!
ঠকা খেয়ে মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল তার, সেজন্যেই এ রকম একটা কাণ্ড ঘটাতে পেরেছে।
মুসার সামনে দাঁড়িয়ে তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বোলালেন পরিচালক। মুসাকে বিমূঢ় করে দিয়ে আচমকা তার কাঁধ চাপড়ে দিয়ে বললেন, দারুণ! দুর্দান্ত অভিনয়, ইয়াং ম্যনি! এই জিনিসই চাচ্ছিলাম আমি! ভিড়ের মধ্যে গণ্ডগোল! একেবারে বাস্তব হয়েছে দৃশ্যটা!
তোতলাতে শুরু করল মুসা, কি-কি-কিন্তু আমি তো অভিনয় করিনি! ম্যাট উইণ্ডসর নামে একটা লোককে খুঁজতে ঢুকেছিলাম। আমাকে ঢুকতে বাধা দিল ওরা, তাই খেপে গিয়েছিলাম।
সেটের চারপাশে চোখ বোলালেন পরিচালক। বোধহয় চলে গেছে। তুমি আসার একটু আগে শটটা নেয়া শেষ করেছি, যেটাতে ম্যাট অভিনয়। করছিল। শেষ হতেই চলে গেছে।
মুসার চেহারা দেখে মনে হলো ধসে পড়বে সে। ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে বলল, ডাকাতি করে নিয়ে গেছে আমার সব টাকা! ক্যামেরাটা বিক্রি করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই এখন।
এগিয়ে এল কিশোর। মুসার হাত ধরে টান দিল, পাগল হয়ে গেলে নাকি? এসো।
ভিড়ের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে বলল, টাকার জন্যে ক্যামেরা বিক্রি করতে হবে কেন তোমার? আমরা আছি?
রবিন যোগ করল, তা ছাড়া এই কেসের জন্যে ওরকম একটা ক্যামেরা আমাদের দরকার হতে পারে।
কিশোর বলল, একটু দাঁড়াও। আমি পরিচালকের সঙ্গে কয়েকটা কথা বলে আসি।
পরিচালককে জিজ্ঞেস করল কিশোর, ম্যাট উইণ্ডসর কোথায় থাকে জানেন?
না। অফিসে খোঁজ করতে পারো। হয়তো ওদের কাছে ঠিকানা আছে।
কিন্তু অফিসের ওরাও কিছু বলতে পারল না। লোকটা ভবঘুরে টাইপের। মাঝে মাঝে এসে উদয় হয়। অভিনয়ের কাজ পেলে করে। নগদ টাকায় পাওনা বুঝে নিয়ে চলে যায়।
মুসরি টাকাটা উদ্ধারের আর কোন উপায় দেখল না কিশোর। স্টুডিও থেকে বেরিয়ে এল ওরা।
হোটেলে ফিরে খাওয়া-দাওয়ার পর অনেকটা শান্ত হলো মুসা। টাকার শোকের চেয়ে ঠকা খাওয়ার শোকটাই তার বেশি। বলল, লস অ্যাঞ্জেলেসে তার এক চাচা থাকেন, তার সঙ্গে দেখা করতে যাবে।

মুসা চলে গেল চাচার বাড়িতে, রবিন আর কিশোর চলল মিসেস লফারের সঙ্গে দেখা করতে।
পরিচয় পেয়ে গোয়েন্দাদের স্বাগত জানিয়ে বসার ঘরে নিয়ে এল মিসেস লফার। বেশ সুন্দরী। বয়েস কম। স্বামীর জন্যে খুবই চিন্তিত। চোখের কোণে কালি পড়ে গেছে।
নয় বছরের একটা ছেলে ঢুকল ঘরে। বাদামী চুল। মুখ ভর্তি তিল। অস্বস্তি নিয়ে তাকাতে লাগল কিশোর আর রবিনের দিকে।
তা আরও একটা ছেলে ঢুকল, তার বয়েস সাত। বোঝা গেল বড় ছেলেটার ভাই। বড়টার নাম পল, ছোটটা নেল, গোয়েন্দাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল ওদের মা। আদর করে বলল, তোমরা একটু ওঘরে যাও। আমি কথা বলে আসি।
ছেলে দুটো চলে গেলে করুণ সুরে মিসেস লফার বলল, বাপের জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে ওরা। বুঝতেই পারছি না কি ঘটল! তোমরা তার খোঁজ এনে দিতে পারলে চির কৃতজ্ঞ থাকব তোমাদের কাছে!
আমাদের সাধ্যমত চেষ্টা করব আমরা, কিশোর বলল।
মিসেস লফারের কাছেও নতুন কিছু জানতে পারল না ওরা। কেবল একটা ব্যাপার সঙ্গে করে বাড়তি কাপড় নেয়নি লফার। তারমানে বাইরে কোথাও থাকার উদ্দেশ্য নিয়ে যায়নি সে।
লফারের বাড়ি থেকে বেরিয়ে তার অফিসে চলে এল কিশোররা। দোতলার একটা দরজায় দেখা গেল নেমপ্লেট। টোকা দিল কিশোর।
সোনালি চুল এক মহিলা দরজা ফাঁক করল। বয়েসে তরুণী, সাতাশ আটাশ হবে। লফারের সেক্রেটারি, আন্দাজ করল কিশোর।
কি চাই? জানতে চাইল মহিলা।
দেখুন, আমরা মিস্টার লফারের ব্যাপারে কয়েকটা কথা জানতে এসেছি।
কিশোরের কথা শেষ হওয়ার আগেই দড়াম করে দরজা লাগিয়ে দিল সেক্রেটারি।
শুনুন, শুনুন! চেঁচিয়ে বলল কিশোর।
আবার ফাঁক হলো দরজা। আগের চেয়ে কম। ভয় পেয়েছে মহিলা।
ভয় নেই, আমাদের ঢুকতে দিন, কিশোর বলল। আমরা মিসেস লফারের কাছ থেকে এসেছি।
দ্বিধা করল মহিলা। কি করে বিশ্বাস করব?
ফোন করুন। জিজ্ঞেস করুন কিশোর আর রবিন তাঁর কাছে গিয়েছিল কিনা?
দরজা বন্ধ হয়ে গেল আবার। অপেক্ষা করতে লাগল দুই গোয়েন্দা। খুলল পাঁচ মিনিট পর। ভয় চলে গেছে মহিলার। ডাকল, এসো।

কিশোররা ঢুকতে আবার দরজা লাগিয়ে একেবারে তালা দিয়ে দিল সে। আর কেউ নেই ঘরে। ছোট ডেস্কে রাখা নেমপ্লেট দেখে জানা গেল মহিলা লফারের সেক্রেটারি, এবং তার নাম মিস পলী লয়েড।
কৈফিয়ত দেয়ার ভঙ্গিতে পলা বলল, তোমাদের দেখেই বুঝেছি, তোমরা খারাপ নও। কিন্তু সকালে এসেছিল দু-জন, মিস্টার লফারের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করার জন্যে, ওরা ভয়ঙ্কর। কলজের পানি শুকিয়ে দিয়ে গিয়েছিল আমার। তারপর থেকে আর কাউকে বিশ্বাস করতে পারছি না। দরজায় তালা দিয়ে রাখি সারাক্ষণ।
কারা ওরা? জানতে চাইল রবিন, পুলিশ?
না। বিশালদেহী দু-জন লোক, রুক্ষ ব্যবহার। কাপড়-চোপড় ভাল না। ডাকাতের মত আচরণ করছিল। আগে জানলে ঢুকতে দিতাম না। এসে যখন বলল মিস্টার লফারের ব্যাপারে কথা বলতে চায়, ভাবলাম গোয়েন্দা টোয়েন্দা হবে।
চট করে পরস্পরের দিকে তাকাল দুই গোয়েন্দা।
কিশোর বলল, মিস্টার লফারের খোঁজ করছিল?
হ্যাঁ, করছিল, পল বলল। মিস্টার লফারের অফিসের ফাইল, রেকর্ড আর তাঁর কাছে আসা চিঠিপত্র দেখাতে আমাকে বাধ্য করল। কব্জি মুচড়ে ধরেছিল, কালশিটে পড়ে আছে, দেখাল সে।
হু, মাথা দোলাল রবিন, তারমানে বাজে লোকই ওরা। পুলিশকে জানিয়েছেন?
না, মাথা ঝাঁকাল পল। আমাকে হুমকি দিয়ে গেছে পুলিশকে জানালে আস্ত রাখবে না।
কিশোরের দিকে তাকাল রবিন, আমাদের যারা হুমকি দিয়েছে মনে হচ্ছে তাদের দলেরই লোক।
হতে পারে, চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। তবে লফারের খোঁজখবর নিতে যখন এসেছে, ধরে নেয়া যায় ওরা তাকে বন্দি করেনি। তবে কি অন্য কোন দলের হাতে পড়েছে লফার?
সাদা হয়ে গেল পলের মুখ। কি বলছ তোমরা এ সব!
সবই আমাদের অনুমান। মিস লয়েড, মিস্টার লফার লোক হিসেবে। কেমন, বলুন তো? তাকে কি পছন্দ করেন আপনি?
ভুরু কাছাকাছি হয়ে গেল পলের। ইয়ে, বছরখানেক আগে প্রথম যখন এখানে চাকরিতে ঢুকি তখন তো খুবই ভাল মনে হত। হাসিখুশি, সদা ব্যস্ত একজন মানুষ। শীই শাঁই করে ব্যবসায়ে উন্নতি হচ্ছে। সংসারে অশান্তি নেই। পছন্দ করার মতই একজন মানুষ। তারপর হঠাৎ করে বদলে গেলেন তিনি।
কি রকম?

বদমেজাজী হয়ে গেলেন। চেয়ারে বসে বসে কি চিন্তা করতেন। কাউকে সহ্য করতে পারতেন না। কেউ কাজের কথা বলতে এলেও তাকে ধমকাতে শুরু করতেন। যারা মাল কিনতে আসত, তাদেরও যেন বিশ্বাস করতে পারতেন না। ভঙ্গি দেখে মনে হত, প্রতিটি লোক যেন তাকে ঠকানোর জন্যে উঠেপড়ে লেগেছে। সবাইকে সন্দেহ করতেন।

এ সব করার পেছনে কোন কারণ ছিল? জিজ্ঞেস করল রবিন।

ছিল। খুব উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল তার। তার এক বন্ধুর সঙ্গে পার্টনারশিপে আরেকটা ব্যবসা শুরু করতে চেয়েছিলেন। কলেজে পড়ার সময় থেকে দু জনের বন্ধুত্ব। হঠাৎ করে সমস্ত টাকা মেরে দিয়ে ইয়োরোপে চলে গেল বন্ধুটি। মিসেস লফার এ সব খবর জানেন না। দুশ্চিন্তায় ভেঙে পড়বে বলে তাঁকে বলেননি মিস্টার লফার। সেই বন্ধু ঠকিয়ে চলে যাওয়ার পর লুক ব্রাউনকে ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস করতেন না লফার। বলতেন, ব্রাউনের মত দুঃসাহসী বন্ধু হয় না। তারপর দু-জনেই গায়েব হয়ে গেলেন একদিন।

লুক ব্রাউন কি কাজ করতেন? জানতে চাইল কিশোর। ব্যবসা?

বলতে পারব না। তবে কোথায় থাকত, জানি। ঠিকানা দিচ্ছি, তোমরা পারলে খবর নাওগে।

নোটবুকে ঠিকানা লিখে নিল রবিন। জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, দুঃসাহসী বন্ধু বলে কি বোঝাতে চেয়েছেন, মিস্টার লফার?

মাথা নাড়ল সেক্রেটারি। তা তো বলতে পারব না।

কিশোর বলল, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, মিস লয়েড। এক কাজ করুন, পুলিশকে ফোন করে সব কথা বলুন। লোকগুলোর হুমকির পরোয়া করবেন না। আবার এসে গণ্ডগোল করতে পারে। পুলিশই আপনাকে নিরাপত্তা দিতে পারবে।

মিস্টার লফারের ব্যাপারে আর কিছু বলতে পারবেন। আমাদের?

আর? তার হবির ব্যাপারে বলতে পারি।

বলুন?

ঘোড়ার প্রতি আগ্রহ ছিল তাঁর। শেটল্যাণ্ড পনি পুষতেন। এতে কোন কাজ হবে তোমাদের?

হতে পারে, বলা যায় না।

মহিলাকে আবারও ধন্যবাদ দিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে এল গোয়েন্দা।

হোটেলে ফিরে লিফট থেকে নেমে নিজেদের রুমের দিকে এগোল। করিডরের শেষ মাথায় একজন লোককে দেখা গেল। গায়ে খাটো লাল জ্যাকেট। কোমরের বেল্টে চকচকে পালিশ করা তামার বকলেস।

লোকটাকে চেনা চেনা লাগল। চাবি দিয়ে দরজার তালা খুলতে খুলতে রবিনকে প্রশ্ন করল কিশোর, কে ও?
বেয়ারা-টেয়ারা হবে, জবাব দিল রবিন।
ঘরে ঢুকেই থমকে গেল কিশোর। মনে পড়েছে। চেঁচিয়ে বলল, আরে ওই লোকটাই তো! যার ছবি তুলেছে মুসা, জঞ্জালের আড়ালে ঘাপটি মেরে। ছিল! ওকে ধরতে হবে!
ছুটে বেরিয়ে এল দু-জনে।
কিন্তু নেই লোকটা। চলে গেছে।
লিফটের অপেক্ষা না করে দৌড়ে নিচে নামল ওরা। লোকটাকে দেখা গেল না।
ডেস্কে বসা ক্লার্কের দিকে এগোল কিশোর। লোকটার ছবিটা মানিব্যাগে রেখেছে। বের করে কুর্কিকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, এই লোক কি আপনাদের এখানে চাকরি করে?
ভাল করে দেখে মাথা নাড়ল ক্লার্ক, না, কখনও দেখিইনি একে।
কিন্তু এইমাত্র আমাদের ঘরের করিডরে দেখে এলাম! হোটেলের বেয়ারার পোশাক পরা।
দাঁড়াও, দেখছি। খানিক দূরে দাঁড়িয়ে থাকা একজন পোর্টারকে ডাকল ক্লার্ক, ভিক, শোনো তো? পোর্টার কাছে এলে ছবিটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, একে হোটেলে ঢুকতে দেখেছ? ওপরতলায় নাকি উঠেছিল। আমাদের বেয়ারার পোশাক পরা।
অবাক হলো পোর্টার। কই, দেখিনি তো?
তাহলে পোশাক পেল কোথায়? রবিন বলল, নিশ্চয় চুরি করেছে। আপনাদের স্টোর থেকে।
তা করতে পারে, ক্লার্ক বলল। এই লোকটার বয়েস চল্লিশ হবে। আমাদের কোন বেয়ারাই এত না। দাঁড়াও, হাউস ডিটেকটিভকে বলছি।
ডিটেকটিভের সঙ্গে দুই গোয়েন্দাও লেগে রইল। কোনখান থেকে পোশাক চুরি করে কোথায় বদলেছে, বের করা হলো। সিঁড়ি, চিলেকোঠা, এবং মানুষ লুকিয়ে থাকা যায় এ রকম সবখানে খুঁজে দেখা হলো। কিন্তু পাওয়া গেল না লোকটাকে।
হতাশ হয়ে নিজেদের ঘরে ফিরে এল দুই গোয়েন্দা। সঙ্গে সঙ্গে এল ডিটেকটিভ। জিজ্ঞেস করল, লোকটা দেখতে কেমন?
আনমনে বিড়বিড় করল কিশোর, বা-বা, আসল কথাটা জিজ্ঞেস করছে এতক্ষণে। এই লোক আর কি ডিটেকটিভগিরি করবে! নীরবে ছবিটা বাড়িয়ে দিল সে।

দেখল ডিটেকটিভ। এই চেহারার কাউকে দেখতে পেলে গোয়েন্দাদের। জানাবে, কথা দিয়ে বেরিয়ে গেল সে।
পালাল কি করে ব্যাটা? কিশোরের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল রবিন।
হয়তো কোন ঘরের ফায়ার-এসকেপ দিয়ে।
হাতমুখ ধুয়ে, খানিক বিশ্রাম নিয়ে, নাস্তা খেয়ে আবার বেরোল দুই গোয়েন্দা। পলার দেয়া ঠিকানা মোতাবেক লুক ব্রাউনের বাড়িতে যাবে।
নিজের বাড়ি নয়, একটা বোর্ডিং হাউসে ভাড়া থাকত ব্রাউন। হাউসের মালিক এক মহিলা, দরজা খুলে দিল। কথা বলে অতিরিক্ত। ভীষণ মোটা, বয়েস পঞ্চাশ পেরিয়েছে, পাক ধরতে শুরু করেছে চুলে। নাম মিসেস টোবারগট।
কিশোরদেরকে বসার ঘরে নিয়ে এল মহিলা। রান্নাঘর থেকে আসছে। খাবারের সুগন্ধ। নিশ্চয় রান্না করছিল মিসেস টোবারগট।
লুক ব্রাউনের ব্যাপারে জানতে চাইল কিশোর।
মিস্টার ব্রাউন? মহিলা বলল, ওর ব্যাপারে তো কত কথাই জানি। ভাল বোর্ডার ছিল। আমার রান্না খুব পছন্দ করত। তা শুধুমুখে তোমাদের সঙ্গে কথা বলছি কেন? এক কাপ চা অন্তত দেয়া উচিত।
বিনয়ের সঙ্গে চা খাওয়াটা এড়াতে চাইল কিশোর। কিন্তু কোনমতেই শুনল না মিসেস টোবারগট। চা তো আনলই, তার সঙ্গে নিজের তৈরি বিস্কুটও নিয়ে এল।
মানুষকে খাওয়াতে আমার খুব ভাল লাগে, মিসেস টোবারগট বলল। খাওয়ার জন্যে কত চাপাচাপি করেছি ব্রাউনকে, মোটা বানাতে চেয়েছি। কিন্তু যে হাড্ডি সেই হাড়ি। আমার দেয়া সব খাবার খেত, কিচ্ছু ফেলে রাখত না। কিন্তু তালপাতার সেপাই থেকে বিন্দুমাত্র উন্নতি হয়নি তার। অবাক কাণ্ড! আরি, খাচ্ছ না কেন? একটা বিস্কুটও ফেলে রাখা চলবে না। তোমাদের বয়েসী ছেলেদের অনেক বেশি খেতে হয়। নইলে শরীর টেকে না।
খাচ্ছি তো, আরেকটা বিস্কুট নিতে নিতে বলল কিশোর। খুব ভাল বানিয়েছেন। হ্যাঁ, ব্রাউনের কথা বলুন।
কি আর বলব, এক আজব লোক ছিল! সারাক্ষণই বাইরে যেত। ঘণ্টায় ঘণ্টায় বেরোত। আসত আর যেত, যেত আর আসত, একেবারে যেন চড়ুই পাখি। এত ঘোরাফেরা করত বলেই বোধহয় স্বাস্থ্য ভাল হত না। চুলও পাতলা হয়ে যাচ্ছিল।
কাজ করত কখন? জানতে চাইল রবিন। কিছু তো একটা নিশ্চয় করত। নইলে আপনার ঘর ভাড়া দিত কি করে?
কি জানি কি করে! সেটা আরেক আশ্চর্য! ভাড়াটেদের ব্যক্তিগত ব্যাপারে কখনও তাদের কাছে জানতে চাই না আমি। আরি, চুপ করে আছ কেন? বিস্কুটগুলো শেষ করো। খাও, খাও, লজ্জা নেই, আরও এনে দেব।

মূসাকে দরকার ছিল, তাহলে খাইয়ে শান্তি পেত মিসেস টোবারগট ভাবল রবিন।
কিশোর বলল, তাহলে বলছেন খুব ভাল বোর্ডার ছিল ব্রাউন?
ছিল। একটা পয়সা বাকি রাখেনি আমার। আর রাখবে কি, ছয় মাসের খাবারের খরচ সহ ভাড়া অগ্রিম দিয়ে দিয়েছিল। সে-ই বরং আমার কাছে পায়। টাকার বোধহয় কোন মায়া ছিল না তার।
বিস্কুটগুলো আপনার দারুণ! আরেকবার প্রশংসা করল কিশোর। হু, তা বাইরে যে যাচ্ছে, আপনাকে বলেছিল ব্রাউন?
হয়তো বলেছিল, আমার মনে নেই। থাকবে কি? এত বেরোয় যে লোক, সে বাইরে যাওয়ার কথা বললে কারও খেয়াল থাকে নাকি? মাঝে মাঝেই দীর্ঘদিনের জন্যে বেরিয়ে যেত।

হঠাৎ দু-জনকে অবাক করে দিয়ে সামনে ঝুঁকল মিসেস টোবারগট। স্বর। নামিয়ে বলল, মনে হয় রাজনীতি বা কোন বিদ্রোহের সঙ্গে জড়িত ছিল সে! ওই যে ল্যাটিন-আমেরিকান দেশগুলো আছে না, ওসব দেশে তো সব সময়ই গণ্ডগোল লেগে থাকে। আমার ধারণা, ওখানকার কোন দলের সঙ্গে জড়িত। ছিল। আমি যে বললাম কাউকে বলে দিয়ো না আবার!
না, না, বলব না! সতর্ক হলো কিশোর। কি করে বুঝলেন?
তার ঘর পরিষ্কার করতে গিয়ে এমন সব ছবি দেখেছি, তাতেই মনে হয়েছে। প্লেনের মধ্যে তোলা তার ছবি, ওই প্লেনগুলো আবার ব্যবহার হয়। যুদ্ধের সময়। মাথায় ইয়াবড় হ্যাট তার, হ্যাঁটের কানা তো না, যেন গরুর গাড়ির চাকা। তার সঙ্গে আরও লোক আছে। সবার কোমরেই গুলির বেল্ট, খাপে ঝোলানো পিস্তল। আরি, বিস্কুট খাও না কেন?

কই, খাচ্ছি তো! মহিলার কথা শুনতে শুনতে কৌতূহলে চিবানো থামিয়ে দিয়েছিল কিশোর, আবার কামড় বসাল হাতের বিস্কুটে।
হু, বোঝা গেছে। এই জন্যেই লফার বলত তার দুঃসাহসী বন্ধু, রবিন বলল।
নামটা চিনতে পারল মিসেস টোবারগট। বলল, হ্যাঁ, ওই ভদ্রলোককেও এখানে নিয়ে আসত ব্রাউন। মহিলার মুখ দেখে মনে হচ্ছে এ সব খবর বলতে পারায় তার খুশিই লাগছে। মিস্টার লফারই আমাকে বলেছে কি সাংঘাতিক যোদ্ধা তার বন্ধু লুক ব্রাউন, কি ভাবে বিদেশীদের হয়ে লড়াই করেছে। ব্রাউনের কাছে এ সব কাজ নাকি রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চারের মত। বন্ধুর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে যেত ভদ্রলোক।

লড়াইটা কোন দেশে করেছে, আপনি জানেন, মিসেস টোবারগট? প্রশ্ন। করল কিশোর।

নাহ। মনে থাকে না। তবে একটা জিনিস দেখাতে পারি তোমাদের, দেখো কিছু আন্দাজ করতে পারো কিনা। বিস্কুটগুলো কিন্তু শেষ করতে হবে, নইলে দেখাব না, হুমকি দিয়ে, উঠে চলে গেল মিসেস টোবারগট।
মহিলা চলে যাওয়ার পর রবিন বলল, কত রকম মানুষ যে থাকে দুনিয়ায়। বেশির ভাগ মানুষই মানুষকে খেতে দিতে চায় না; কিন্তু জোর করে খাওয়াতে চায়, এমন মানুষ এই প্রথম দেখলাম। এত বিস্কুট, শেষ করি কি। করে? তুমি খেয়ে ফেলে।
আমি পারব না। হাত মুছতে দেয়া কাগজে বিস্কুটগুলো মুড়ে পকেটে রেখে দিয়ে হাসল। মুসার জন্যে নিয়ে নিলাম। মিসেস টোবারগট ভাববে। আমরাই খেয়ে ফেলেছি।
মুসাকে আনলে খুব ভাল হত। কত খেতে পারে দেখা যেত।
মিসেস টোবারগট ফিরে এল। খালি প্লেট দেখে বেজায় খুশি। বলল, বাহ, এই তো চাই! না খাওয়া মানুষদের আমার একদম পছন্দ না। নাও, জিনিসটা তোমাদের দিয়েই দিলাম।
কিশোরের তালুতে একটা তামার মুদ্রা ফেলে দিল সে। ঝাড়ু দিতে গিয়ে ব্রাউনের ড্রেসিং টেবিলে পেয়েছি এটা। মনে হলো বিদেশী জিনিস। খুব পছন্দ হলো আমার। স্যুভনির হিসেবে রাখতে চাইলাম। তাকে সে-কথা বলতেই দিয়ে দিল আমাকে।
মুদ্রার লেখা পড়ল কিশোর, রিপাবলিকা ডি মেকসিকো! মুখ তুলে বলল, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, মিসেস টোবারগট। আজ তাহলে উঠি।
হোটেলে ফিরে ওরা দেখল, মুসা এসে বসে আছে। মিসেস টোবারগটের বিস্কুট খাওয়ানোর কাহিনী শুনে তো কিশোরদের সঙ্গে গেল না বলে আফসোসেই বাঁচে না সে।
ব্রাউনের কথা সব শোনার পর বলল, খাইছে! বলো কি! মেসিকোয় বিদ্রোহীদের প্লেন চালিয়েছে ব্রাউন!
হ্যাঁ, কিশোর বলল। আর রিপ্লি শহরটা মেকসিকো থেকে দূরে নয়।
একটা ম্যাপ বের করে এনে মেঝেতে বিছাল সে। তিনজনেই কুঁকে এল তার ওপর। আঙুল রেখে দেখাল কিশোর, এই যে দেখো কলোরাডো নদী কোন দিকে বয়ে গেছে। আমার মনে হচ্ছে এই নদী দিয়েই বোটে করে। মেকসিকোতে চলে গেছে লফার আর ব্রাউন।
নতুন বিদ্রোহে জড়িয়ে পড়েনি তো ব্রাউন? রবিনের প্রশ্ন। কিংবা অন্য কোনো বেআইনী কাজে?
নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। সেটাই জানতে হবে আমাদের।
.

সন্দেহের ওপর ভিত্তি করে এখন তদন্ত চালিয়ে যেতে হবে আমাদের, কিশোর বলল। প্রথমে ধরা যাক সেই পাথরটার কথা, মরুভূমিতে যেটা পেয়েছি। হয়তো দামী পাথরের খোঁজে মরুভূমিতে গিয়েছিল লফার আর ব্রাউন। সেখানে ডাকাতের কবলে পড়ে ওরা। আরেক হতে পারে, ব্রাউনের কথায় পটে গিয়ে তার সঙ্গে বোটে করে মেকসিকোতে চলে গেছে লফার।
সুতরাং আমাদের প্রথম কাজ হবে মরুভূমিতে গিয়ে আরও সূত্র খোঁজা। টিলার ওপরের ছবিটাতে কোনো ইঙ্গিত থাকতে পারে। ওখানে কিছু না পেলে একটা বোট নিয়ে কলোরাডো নদী ধরে আমরাও চলে যাব মেকসিকোতে।
গুড আইডিয়া! খুশি হয়ে বলল মুসা। শুনেছি কলোরাডো নদীর কৈ মাছ নাকি দারুণ টেস্ট। মাছ ধরার সরঞ্জাম নিয়ে যাব আমরা। তিনটে কাজ হৰে তীতে। মাছ শিকারের আনন্দ পাব, তাজা খাবারও পাব, আর লোকে দেখলে ভাববে আমরা মাছ ধরতে বেরিয়েছি।
হাততালি দিল রবিন। বহি, চমৎকার! বুদ্ধি খুলে যাচ্ছে দেখছি তোমার! কিশোরের দিকে তাকাল। কিন্তু কথা হলো, নদী ধরে গিয়ে লাভটা কি হবে আমাদের?
লাভ? কিশোর বলল, নদীপথে লফাররা গেলে অনেক সময় লেগেছে নিশ্চয়, কারও না কারও চোখে পড়েছে। যেখানেই লোকালয় দেখব, জিজ্ঞেস করতে করতে যাব আমরা। মেকসিকোতে ঢোকার জন্যে অনুমতি লাগবে। আমাদের। লস অ্যাঞ্জেলেস থেকেই নিতে সুবিধে।
বার্থ সার্টিফিকেট আর অন্যান্য কাগজপত্র নিয়ে মেকসিকান দূতাবাসে রওনা হলো তিন গোয়েন্দা। অনুমতি পেতে অসুবিধে হলো না। হোটেলে। ছেড়ে দিয়ে চলে এল এয়ারপোর্টে। বিমান নিয়ে আবার ফিরে চলল রিভারসাইড কাউন্টি এয়ারপোর্টে।
বিমান বন্দরে প্লেন রেখে ট্যাক্সিতে করে ব্লাইদিতে চলে এল। রবিন বলল, আগে থেকেই একটা বোট ভাড়া করে রাখলে হয় না?
ট্যাক্সিতে করেই নদীর ঘাটে চলে এল ওরা। নানা রকম বোট বাঁধা আছে। মুসা বলল, তোমরা নৌকা ঠিক করোগে। আমি খাবারের ব্যবস্থা করি। কতদিন বোটে থাকতে হবে, কে জানে। খাবার লাগবে।
সুপারমার্কেটের দিকে চলে গেল মুসা।
ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে অন্য দু-জন চলল বোট ভাড়া করতে।
লাল-সাদা রঙ করা একটা বোট পছন্দ হলো ওদের। দুই ইঞ্জিন বসানো। ওরা যে কাজে যাচ্ছে, তাতে বিপদের সম্ভাবনা আছে। বাড়তি একটা ইঞ্জিন অনেক কাজে দেবে।

পুরানো ধরনের আঁটো পোশাক পরা এক লোক ডেকে বসে ছুরি দিয়ে কাঠ ঠেছে একটা পুতুল বানাচ্ছে। একবার মুখ তুলে চেয়েই আবার নামিয়ে নিল। কাজ বন্ধ করল না।
বোটটা কি ভাড়া হবে? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
হয়তো, জবাব দিল লোকটা।
যতদিন ইচ্ছে রাখতে পারব?
আবার জবাব, হয়তো।
দিন দুয়েকের মধ্যে লাগবে। দেয়া যাবে?
হয়তো।
ঠিক আছে। তাহলে ওই কথাই রইল। দুদিন পর এসে নেব। ঠিকঠাক পাওয়া যাবে তো?
হয়তো।
বোট থেকে নেমে আসতে শুরু করল রবিন। হয়তো ছাড়া শকুনটী আর কোন শব্দ জানে না নাকি?
হয়তো, হেসে জবাব দিল কিশোর।
মুসার খোঁজে সুপার মার্কেটের দিকে এগোল ওরা। কিছুদূর এগোতে খাবারের নানা রকম প্যাকেটের বিশাল এক চলমান বোঝা চোখে পড়ল ওদের দিকে এগিয়ে আসছে। মুখ দেখা যাচ্ছে না, কেবল বোঝাটার ওপরে পরিচিত একটা সমব্রেরো হ্যাট বসানো। আরও কাছে এসে পরিচিত গলায় কথা বলে উঠল বোঝা, অ্যাই, কিশোর!
হঠাৎ করে বিস্ফোরিত হলো খাবারের বোঝ। প্যাকেট, টিন, ছিটকে পড়তে লাগল চারদিকে। বৃষ্টির মত এসে পড়ল রবিন আর কিশোরের কাঁধে। ওসবের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল মুসা আমান। চোর! চোর! বলে চিৎকার করে দৌড় দিল রাস্তা দিয়ে।
কিন্তু চোরটা দৌড় দেয়ার কোন চেষ্টা করল না। সহজেই তাকে ধরে ফেলল মুসা। ছোটখাট একজন মানুষের কলার চেপে ধরে ঝাঁকাতে শুরু করল, চোর কোথাকার! আমার টাকা ফেরত দাও!
রাস্তা থেকে যতটা সম্ভব খাবারের প্যাকেটগুলো কুড়িয়ে নিয়ে সেদিকে এগিয়ে গেল কিশোর আর রবিন। কাছে গেলে চিৎকার করে বলতে লাগল মুসা, এই ব্যাটাই সেদিন স্টুডিওতে চেক দিয়েছিল আমাকে! এর নামই ম্যাট উইন্ডসর!
কি বলছ তুমি, কিছুই তো বুঝতে পারছি না! বিমূঢ় হয়ে গেছে যেন ম্যাট।
আমাকে চিনতে পেরেছ, নাকি পারোনি?

পারব না কেন? স্টুডিওতে আমাকে টাকা দিয়েছিলে, আমি তোমাকে একটা চেক দিয়েছিলাম।
হ্যাঁ, মুখ বাঁকিয়ে ঝাঁঝাল কণ্ঠে মুসা বলল, সেই চেকটা ছিল জাল!
আরও অবাক হলো লোকটা। জাল! কিন্তু ও তো সরকারি চেক, জাল হয় কি করে?
সেটা তুমি জানো। চলো, পুলিশের কাছে চলো। অবাক হওয়ার ভানটা ওদের কাছেই করো। কলার ছাড়ল না মুসা। টেনে নিয়ে চলল। রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বলল, একটা কথা বলো দেখি এখন, চাঁদ, আমি যেখানেই যাই সেখানেই হাজির হয়ে যাও কি করে? ব্লইদিতে কি করছ?
আমারও তো সেই একই প্রশ্ন, তুমি এখানে এলে কি করে? আমার থাকাটা স্বাভাবিক, কারণ এখানেই আমার বাড়ি।
বিশ্বাস করল না মুসা। ব্যঙ্গের সুরে বলল, তাই নাকি! বলে গিয়ে সে কথা পুলিশকে!
থানায় এসেও ম্যাটের সেই একই কথা–সে কোন অপরাধ করেনি।
ডেস্ক সার্জেন্ট বলল মুসাকে, এখানে তার বাড়ি হওয়া অসম্ভব না। ব্লাইদিতে বহুবার দেখছি তাকে।
তাহলে লস অ্যাঞ্জেলেসে কি করছিল?
দেখো, আমার মনে হয় কোথাও একটা ভুল হয়েছে, মুসার প্রশ্নের জবাবে ম্যাট বলল। অনেক দিন থেকে আমি অসুস্থ। সিনেমায় কাজ করার। কথা ছিল বলেই সেদিন না গিয়ে পারিনি। কাজ শেষ হতেই চলে এসেছি। চেকটা যে জাল এর কিছুই জানতাম না আমি। টাকার অভাবে একটা সোনার ঘড়ি বিক্রি করেছিলাম। যার কাছে করেছিলাম, সে নগদ টাকার পরিবর্তে ওই চেক দিয়েছে। ঠিক আছে, আমারই অন্যায়, তোমার টাকা আমি ফিরিয়ে দেব।
ঘড়িটা কি এখানে বিক্রি করেছেন? সতর্ক হয়ে উঠেছে সার্জেন্ট।
না, লস অ্যাঞ্জেলেসে।
লোকটা দেখতে কেমন?
আমার চেয়ে লম্বা, বয়েসেও বড়। আমাকে বলল, কোন হোটেলে নাকি কাজ করে।
কি ভেবে পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করল কিশোর। মুসার ভোলা ছবিটা বের করে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, এই লোক?
জঞ্জালের আড়ালে ঘাপটি মেরে থাকা লোকটাকে ভাল করে দেখল ম্যাট। হ্যাঁ, এই লোকই! কিন্তু তোমরা এর ছবি পেলে কোথায়?

সার্জেন্টও অবাক হলো। ড্রয়ার থেকে একটা চেক বের করে দেখাল, এ রকম চেক নিয়েছিলেন?
একই সঙ্গে বলে উঠল মুসা আর ম্যাট, হ্যাঁ, হ্যাঁ, এ রকম!
মাথা ঝাঁকাল সার্জেন্ট। গত হপ্তায় ব্লাইদি ব্যাংকে এটা ভাঙাতে এনেছিল এক লোক। তারমানে চেক জালিয়াতির একটা নতুন দল গজিয়েছে।
ম্যাটকে আরও কিছু প্রশ্ন করার পর নিশ্চিত হলো সার্জেন্ট, লোকটা সত্যি কথাই বলছে। সে অপরাধী নয়। মুসার মত সে-ও অপরাধের শিকার।
কি আর করা? থানা থেকে বেরিয়ে এল চারজনে।
মোটেলে ফিরল তিন গোয়েন্দা।
তদন্তের আলোচনা শুরু হলো। মুসা জিজ্ঞেস করল, মরুভূমিতে আবার কি খুঁজবে?
ছবিটা দেখব আরেকবার। হতে পারে, কিছু মিস করেছি আমরা।
কবে যাবে?
আজই।

.
টিলার খানিক দূরে আগের জায়গাতেই ল্যাণ্ড করল মুসা। হেঁটে এসে টিলাটাতে উঠল ওরা। আগে আগে রয়েছে কিশোর। তার এখনও বিশ্বাস, ছবিটাতে রয়েছে লফারের নিরুদ্দেশ-রহস্যের জবাব। খুঁজতে শুরু করল সে।
মরুর পাথুরে কঠিন মাটি আয়তাকার ভাবে দেবে গেছে এক জায়গায়। আলগী হয়ে আছে মাটি। আগের বার লক্ষ করেনি এটা। কেন করেনি, সেটাও বুঝতে পারল না। তবে হয় এ রকম। প্রথমবারে অনেক সময় অনেক খুঁজেও একটা জিনিস চোখে পড়ে না, দ্বিতীয়বারে সেটা সহজেই চোখে পড়ে যায়।
কেউ খুঁড়েছিল! বলে উঠল রবিন।
তাই তো মনে হচ্ছে! চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। খুঁড়ে আবার মাটি দিয়ে গর্তটা বুজিয়ে দিয়েছে।
কি আছে নিচে? মুসার প্রশ্ন।
না দেখলে কি করে বুঝব? মুসা, আবার আমাদের ব্লাইদিতে ফিরে যেতে হবে। মাটি খোঁড়ার যন্ত্রপাতি নিয়ে আসতে হবে। একটা শাবল পেলেই
সেটা আমি একাই আনতে পারব। তোমরা বরং ইতিমধ্যে যা দেখার দেখে নাও। তাতে সময় বাঁচবে।
ঠিকই বলেছে মুসা। কিশোর আর রবিন রয়ে গেল। মুসা চলে গেল মাটি খোঁড়ার যন্ত্রপাতি কিনে আনতে।

টিলার ওপরে, নিচে, আতিপাতি করে খুঁজতে লাগল দু-জনে। নতুন কিছুই পেল না। ভয়ানক গরম। ওদের মনে হচ্ছে মাথায় হ্যাট না থাকলে মগজই গলে যেত। ছায়া বলতে কিছু নেই। ঘেমে নেয়ে গেল দেখতে দেখতে। আর কিছু না দেখে ছোট একটা ঝোপের পাশের সামান্য ছায়াতেই বিশ্রাম নিতে বসল ওরা।
কিশোর বলল, দানবের ছবির ওই ছড়ানো হাতের কোন অর্থ আছে।
কি?
বুঝতে পারছি না। বাঁ হাতটা যেদিকে নির্দেশ করছে সেদিকেই কিন্তু পাথরটা পাওয়া গেল।
আচ্ছা, পাথরটা কোন ধরনের নির্দেশক নয়তো? কোন কিছুর চিহ্ন? গুপ্তধন?
হতে পারে।
এক মুহূর্ত চুপ থেকে রবিন বলল, রাতে এসে ক্যাম্প করলে কেমন হয় এখানে? ব্রাউন আর লফার হয়তো পাহাড়ের কোন গুহায় লুকিয়ে আছে। রাতের বেলা গুপ্তধন খুজতে বেরোয়। নইলে ওই মাটি খুঁড়ল কে? কেনই বা খুঁড়ল? কি খুঁজেছে?
আল্লা মালুম! হাত ওল্টাল কিশোর।
এই গরমে অপেক্ষা করার মত কষ্ট আর হয় না। দু-জনেরই মনে হতে লাগল, যুগের পর যুগ পার হয়ে যাচ্ছে। অবশেষে ফিরে এল মুসা। প্লেনটা ল্যাণ্ড করতেই ছুটে গেল ওরা রবিন আর কিশোর। যন্ত্রপাতি নামাতে মুসাকে সাহায্য করতে।
মাথায় চওড়া কানওয়ালা হ্যাট, হাতে মাটি খোঁড়ার শাবল-কোদাল, সারি দিয়ে হাঁটা–মনে হচ্ছে যেন পুরানো আমলের প্রসপেক্টর, অর্থাৎ স্বর্ণ খুজিয়ের দল।
মুসা বলল, বাই চান্স যদি সোনা পেয়ে যাই, দারুণ হবে না!
হবে, কিশোর বলল, তবে অবাক হব না। অ্যারিজোনায় বেশ কিছু সোনার খনি আছে। স্প্যানিশরা যখন প্রথম এল এ দেশে তখন খুঁজে বের করেছিল। পরে হারিয়ে গেছে ওগুলো।
খনি কি আর হাঁটতে পারে নাকি যে কোথাও গিয়ে হারিয়ে যাবে? বুঝতে পারল না মুসা। হারায় কি করে?
হেসে উঠল রবিন। এই সহজ কথাটা বুঝতে পারছ না। পুরানো আমলের প্রসপেক্টররা তাদের খনির কথা গোপন করে রাখত, অন্যে কেড়ে নেয়ার ভয়ে। কাউকে বলত না। শেষে দেখা গেল নিজেও আসতে পারল না সোনা খুঁড়ে তোলার জন্যে। কালক্রমে বালিতে ঢেকে কিংবা ভূমিকম্পে মাটি ধসে বন্ধ হয়ে গেল খনির মুখ হারিয়ে গেল মাটির নিচে।
গর্তটার কাছে পলি করে খুড়তে লাগল ওরা। ঘামে চুপচুপে হয়ে গেল দশ মিনিটেই। হাল ছেড়ে দিয়ে মুসা বলল, দূর, খামোকা কষ্ট। এখানে কিছু পাওয়া

যাবে না।
রবিন বলল, হয়তো ছিল। মূল্যবান পাথর। তুলে নিয়ে গেছে।
আমার তা মনে হয় না, একমত হতে পারল না কিশোর। পাথর-টীতর হলে দু-এক টুকরো পড়ে থাকতই। একটা কণাও নেই কেন?
তাহলে কিসের জন্যে খুড়েছিল? ইনডিয়ানদের গুপ্তধন? মুসার প্রশ্ন।
তা হতে পারে। স্প্যানিশ ভ্রমণকারীদের গুপ্তধনও হতে পারে। এই দানবের ছবিটার মধ্যেই রয়েছে এর জবাব।
তোমার ধারণা লফাররা এই গুপ্তধন খুঁজতেই এসেছিল?
আসতেও পারে।
কিন্তু কে খুঁড়ল এই গর্ত? একটা পায়ের ছাপও নেই। ভূতুড়ে ব্যাপার না? এই দুপুর রোদেও গায়ে কাঁটা দিল মুসার।
না। যে খুঁড়েছে, সে খুব চালাক লোক। পায়ের ছাপ মুছে দিয়েছে, ইনডিয়ানদের মত, গাছের ডাল দিয়ে ডলে।
মরুকগে সব! হাতের কোদালটা মাটিতে ফেলে দিল মুসা। আমার খিদে পেয়েছে।
কোদাল তুলে নিল রবিন। গর্তের নিচে আলগা মাটি যা অবশিষ্ট আছে তুলে ফেলতে লাগল। কোদালের ফলায় লেগে উঠে এল একটুকরো কাপড়।
লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। ওটা কি!
মুসাও উঠে এগিয়ে এল।
মাটির ভেতর থেকে বাদামী রঙের একটা রুমাল টেনে বের করল রবিন। মাটি ঝেড়ে পরিষ্কার করল। এক কোণে সুতো দিয়ে লেখা একটা অক্ষর: D.
কারও নামের আদ্যক্ষর, কিশোর বলল, যার বানানটী ডি দিয়ে শুরু।
তার মানে সেই লোক ব্রাউন কিংবা লফার নয়, রবিন বলল।
না
তারমানে, চেঁচিয়ে উঠল মুসা, মাটিও খুঁড়েছে অন্য লোকে! ভুল করে রুমাল ফেলে গেছে!
তাই তো মনে হচ্ছে।
সূত্র হিসেবে কাজে লাগতে পারে ভেবে রুমালটা পকেটে রেখে দিল রবিন।
সমস্ত আলগা মাটি তন্নতন্ন করে খুঁজেও আর কোন সূত্র পাওয়া গেল না। আবার বলল মুসা, আমার খিদে পেয়েছে।
কিশোর বলল, এখানে এই রোদে বসে তো খাওয়া যাবে না। ছায়া দরকার।
কোথায় পাব ছায়া? চারপাশে তাকাতে লাগল মুসা।
মরুভূমির কিনারে পর্বত শুরু হয়েছে। সেটা দেখিয়ে কিশোর বলল, চলো, ওখানে উড়ে যাই। ছায়াও মিলবে, ঠাণ্ডাও।

উত্তম প্রস্তাব, সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল মুসা।
রবিন বলল, বলা যায় না, পর্বতের ঢালে জ্যাসপারও পাওয়া যেতে পারে।
প্লেনের কাছে ফিরে এল ওরা। দরজা খুলতেই যেন ধাক্কা মারল এসে গরম বাতাস, ঝলসে দিতে চাইল চোখ-মুখ। বদ্ধ থাকায় ভেতরের বাতাস তেতে আগুন হয়ে আছে। এয়ারকুলার চালিয়ে ভেতরটা ঠাণ্ডা করে নিতে হলো।
উড়ে এসে পাহাড়ের ঢালে নামতে বিশেষ সময় লাগল না। খাবারের টিন আর পানির বোতল নিয়ে নামল তিনজনে। পর্বতের ঢালে ছায়া খুঁজতে শুরু করল।
বড় বড় পাথরের চাঙড় পড়ে আছে। ছায়ার অভাব নেই এখানে। অনেক বড় একটা চাঙড়ের নিচে বড় গর্তের মত অনেকখানি-জায়গী। তাতে বসে খাওয়া সারল ওরা। মুসা:ওখানেই চিত হয়ে শুয়ে নাক ডাকানো শুরু করল। রবিন আর কিশোর উঠল খানিকটা জায়গা ঘুরে দেখতে।
ঢাল বেয়ে উঠতে উঠতে ওপর দিকে হাত তুলে কিশোর বলল, ওই দেখে, একটা গুহার মুখ। ঢুকে দেখব।
চল্লিশ ফুট ওপরে রয়েছে গুহাটা। ওটার কাছে এসে ভেতরে তাকাল দু জনে।
অন্ধকার। কিছু দেখা যায় না।
পকেট থেকে টর্চ বের করল কিশোর। রবিনকে বলল, এসো, ঢুকব।
তার কথা শেষ হলো না; তীক্ষ্ণ, ভয়াবহ এক চিৎকার যেন চিরে দিল। পর্বতের নীরবতা। গুহামুখে বেরিয়ে এল একটা বিশাল জানোয়ার। গোয়েন্দাদের ওপর ঝাঁপ দেয়ার জন্যে তৈরি।

.

হলদে চোখ মেলে তিন গোয়েন্দার দিকে তাকিয়ে আছে জানোয়ারটী। আমেরিকার একেক জায়গায় একেক নাম এর; কেউ বলে ওয়াইল্ড ক্যাট, কেউ বলে কুগার, আবার কেউ পার্বত্য সিংহ। ভয়ঙ্কর জীব। তামাটে চামড়ার নিচে থিরথির করে কাঁপছে অসাধারণ শক্তিশালী মাংসপেশী।
দৌড় দাও! চিৎকার করে বলল কিশোর।
চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে লাফিয়ে নামতে শুরু করল সে। পেছনে রবিন। পায়ে লেগে পাথর গড়িয়ে পড়ল। ওরাও কয়েকবার পিছলে পড়তে পড়তে বাঁচল।
চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে গেল মুসার। বেরিয়ে এসে জানতে চাইল, কি হয়েছে।
জানল কিশোর।
কিশোরদের পেছনে কুগারটাকে দেখতে পেল না মুসা। পিছু নেয়নি ওটী। একবার হুঙ্কার ছেড়ে ভয় দেখিয়েই যথেষ্ট হয়েছে ভেবে ফিরে গেছে আবার গুহায়।
ধপ করে বসে পড়ল কিশোর। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, ওটা মেয়ে কুগার। নিশ্চয় বাচ্চা আছে গুহার মধ্যে। সেজন্যেই এত রাগ। ভেবেছে বাচ্চার ক্ষতি করতে

গেছি।
গুহায় কি আছে তা তো জানলাম, রবিন বলল। আর ঢোকার দরকার নেই। ওখানে নেই ব্রাউন কিংবা লফার।
পর্বতের ঢালে বন আছে। সেটাতে ঢুকল তিন গোয়েন্দা। চোখ খোলা। রাখল সূত্রের সন্ধানে। একদিকে ধসে পড়া একটা ছাউনি দেখে এগিয়ে গেল। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও সন্দেহজনক কিছু পেল না ভেতরে।
আচমকা, ভয় ধরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করল মুসা, এই, প্লেনের কাছ থেকে এসেছি কতক্ষণ হয়েছে। পাক্কা দুই ঘন্টা!
তাতে কি? সামনে এগিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে কিশোরের। দরজায় তালা দেয়া আছে।
তা বটে। কিশোরের সঙ্গে এগোল মুসা, কিন্তু ভয়টা তাড়াতে পারল নী মন থেকে। খুঁতখুঁত করছে। বলল, বাপরে, বনের মধ্যেও এত গরম!
কয়েক গজ এগিয়ে আবার দাঁড়িয়ে গেল মুসা। দেখো, আমার ভাল্লাগছে। না! কেমন জানি লাগছে। প্লেনটার যদি ক্ষতি করে কেউ?
এইবার আর না শুনে পারল না কিশোর। ভয়টা তার মধ্যেও সংক্রমিত হয়েছে। ফিরে চলল ওরা।
আধঘণ্টা লাগল বন থেকে বেরোতে। প্লেনটা চোখে পড়ল। ঠিকই আছে। বিরক্ত হয়ে কিশোর বলল, খামোক নিয়ে এলে! আরেকটু দেখতে চেয়েছিলাম…
বাধা দিয়ে বলে উঠল রবিন, ওই, দেখো!
মুসার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ঠিকই সাবধান করেছে। গা শিউরানো অদ্ভুত এক দৃশ্য। শাঙ্কুব আকৃতির বিশাল একটা কি যেন মরুর বুক থেকে উঠে গেছে। আকাশের অনেক ওপরে। আগে কখনও না দেখলেও ওটা কি মুহূর্তে বুঝে ফেলল কিশোর। বালির ঘূর্ণি। ওদের দিকেই ধেয়ে আসছে।
কি-কি ওটা! চিনতে পারল না মুসা।
বালি-ঝড়! ভয় পেয়েছে কিশোর, গলা কাঁপছে। এই এলাকার লোকে বলে শয়তানের ঘূর্ণি! ঠিকই বলে, শয়তান ভর করে থাকে যেন বালির এই ঘূর্ণির মধ্যে। টর্নেডোর চেয়ে কম ভয়ঙ্কর না। প্লেনের ওপর দিয়ে বয়ে গেলে কিচ্ছু রাখবে না, ভর্তা বানিয়ে ফেলবে! জলদি সরাতে হবে! এসো!
ছুটল ওরা। ঝড় আসার আগে পৌঁছতে পারবে তো?
আরও জোরে! চেঁচিয়ে উঠল মুসা। রবিন আর কিশোরকে অনেক পেছনে ফেলে দিয়েছে।
প্লেনের কাছে পৌঁছল ওরা। ঝড়টা একশো গজ দূরে। এগিয়ে আসছে দ্রুত। দু-দিকের দুই ডানা চেপে ধরল কিশোর আর রবিন, মুসা ধরল লেজ।

তিনজনে মিলে ঠেলতে শুরু করল। নড়ে উঠল প্লেন। চাকায় ভর দিয়ে গড়িয়ে সরে যেতে শুরু করল। আরও জোরে ঠেলা দিল ওরা। গতি বাড়তে লাগল প্লেনের। সরে গেল অনেকখানি। বেকায়দা ভঙ্গিতে একটা পাথরে পা দিয়ে গোড়ালি মচকাল মুসা।
তবে প্লেনটাকে বাঁচাতে পারল ওরা। সামনে দিয়ে চলে গেল বালির ঘূর্ণি।
মাটিতে বসে গোড়ালি চেপে ধরে গোঙাচ্ছে মুসা।
ব্যথাটা কতখানি দেখার জন্যে তার পায়ে হাত দিতে গেল কিশোর।
চাপ লাগতে আরও জোরে চেঁচিয়ে উঠল মুসা। এমন অবস্থা, প্লেনও চালাতে পারবে না সে। তাকে এখন ফেলে রেখে তদন্ত চালানো সম্ভব নয়। অবশ্য দেখার আর নেইও কিছু।
মুসাকে প্লেনে উঠতে সাহায্য করল কিশোর আর রবিন। পাইলটের আসনে বসল এবার রবিন। রিভারসাইড কাউন্টি এয়ারপোর্টে ফিরে এল নিরাপদে।
ব্লাইদিতে মোটেলে ফিরে সবার আগে ডাক্তার ডাকা হলো।
মুসার পা ব্যান্ডেজ করে আর বেশ কিছু ট্যাবলেট গিলিয়ে দিয়ে ডাক্তার বললেন, কয়েক দিন বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে। ভালমতই মচকেছে।
রাতে ম্যাপ নিয়ে বসল কিশোর। ঠিক হলো মুসার জন্যে অপেক্ষা করবে না ওরা। সে আর রবিন বোটে করে এগিয়ে যাবে কলোরাডো নদী ধরে। ব্লাইদিতে থাকবে মুসা। জরুরী দরকার পড়লে ফোনে তার সঙ্গে যোগাযোগ করবে কিশোররী। পা ততদিনে ভাল হয়ে গেলে এবং প্লেনটীর প্রয়োজন পড়লে ওটা নিয়ে ওদের কাছে চলে যাবে মুসা।
ম্যাপের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল রবিন, মেকসিকোতে যেতে কত সময় লাগবে?
এমনিতে দূর তো খুব বেশি না, জবাব দিল কিশোর। একশো মাইল। কিন্তু পথ ভাল না। নদীটার দিকে তাকিয়ে দেখো–দ্বীপ আর পানির নিচে বালির চরার অভাব নেই। তার ওপর রয়েছে তিন তিনটে বাধ। অনেক সময় নষ্ট করবে।
ম্যাপ দেখে জানা গেল প্রথম বাঁধটার নাম ইমপেরিয়াল ড্যাম। ব্লাইদি থেকে আশি মাইল দূরে। দ্বিতীয়টা ল্যাওনা ড্যামি। আর তৃতীয়টা রয়েছে সীমান্ত ঘেঁষে, মেকসিকোর ভেতরে পড়েছে–মরিলস ড্যাম।
পরদিন ভোরবেলা উঠে মুসার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়ল রবিন আর কিশোর। ঘাটে এসে দেখল, বোট তৈরি। এর মালিক কথার বেলা হয়তো হয়তো যতই করুক, কাজের বেলা ঠিক।
বোট ছাড়ল দুই গোয়েন্দা। প্রথমে হাল ধরল রবিন। নদীর পানির রঙ এখন বাদামী, ওপরটা আয়নার মত স্থির আর চকচকে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রঙ

বদলাবে। মরুভূমির অস্বাভাবিক নীরবতার মাঝে ইঞ্জিনের শব্দ বেশি করে কানে বাজছে।
দু-তীরের একঘেয়ে দৃশ্য দেখতে দেখতে খুব শিগগিরই চোখ পচে গেল কিশোরের। সময় কাটানোর জন্যে বঁড়শি দিয়ে মাছ ধরতে বসল।
কয়েকটা বালির চরার পাশ কাটাল ওরা। ব্লাইদি থেকে একটা রাস্তা নদী পার হয়ে চলে গেছে, নদীর ওপরে ব্রিজ। সেটার নিচ দিয়ে পার হয়ে এল। বোট। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটা বিশাল আকারের কৈ মাছ ধরে ফেলল কিশোর।
দূরে দেখা গেল রিপ্পির পাহাড় চূড়া। টিলাও চোখে পড়ল। চিনতে পারল। ওখানেই রয়েছে দানবীয় নকশাগুলো।
দুপুরের আগে তীরে বোট ভেড়াল রবিন। মাছগুলো নিয়ে নেমে পড়ল দু জনে। আগুন জ্বেলে রান্না করে খেতে বসল।
ইমপেরিয়াল ড্যাম আর বেশি দূরে নেই, রবিন বলল। পাঁচ ঘণ্টার বেশি তো চললাম।
খাওয়ার পর আবার বোট ছাড়ল ওর। কিছুক্ষণ পরেই বাঁধটা চোখে পড়ল। কাছে এসে ডকে বোট ভেড়াল। এই প্রথম একটা বড় ধরনের লোকালয় পাওয়া গেল। মানুষজন যা আছে, বেশির ভাগই জেলে, ডক শ্রমিক, ট্রাক ড্রাইভার।
এক ড্রাইভারের সঙ্গে খাতির করে ফেলল কিশোর। লফার আর ব্রাউনের চেহারার বর্ণনা দিয়ে জানতে চাইল ওদের দেখেছে কিনা।
ড্রাইভার বলল, দেখেনি। ওরা অনেক দূর থেকে খুঁজতে এসেছে শুনে আরও কয়েকজন ড্রাইভারের সঙ্গে আলাপ করল সে। কেউ কিছু বলতে পারল না।
ওদেরকে ধন্যবাদ দিয়ে বোটে ফিরে এল দুই গোয়েন্দা। আবার বোট ছাড়ল। হাল ধরল কিশোর। আধমাইল মত যাওয়ার পর হঠাৎ একটা বালির টিবির দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল রবিন, দেখো, দেখো, সেই বেয়ারাটা!

.

শাই করে সেদিকে বোটের নাক ঘুরিয়ে দিল কিশোর। মাঝনদীতে রয়েছে। ওরী। কিনারে পৌঁছে বোট ভিড়িয়ে ডাঙায় নামতে নামতে অনেক সময় লাগিল। টিবির ওপারে আর দেখা গেল না লোকটাকে। বড় বড় পাথর আর পাহাড় রয়েছে ওখানে। কোথায় লুকিয়েছে কি করে খুঁজে বের করবে?
কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি করে লোকটাকে না পেয়ে আবার বোটে ফিরে এল ওরা। টিবিটীর কাছে পানিতে একটা সবুজ ঘোট মোটরবোট নোঙর করা। রবিন বলল, এই বোটে করেই হয়তো এসেছে ব্যাটা। খানিকটা এগিয়ে বসে থাকি চুপচাপ। এক সময় না এক সময় আসতেই হবে তাকে।

আবার নদীর মাঝখানে এসে নোঙর ফেলে মাছ ধরার ভান করতে লাগল দু-জনে। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। একটা লোক এসে বোটে উঠল। গায়ে নীল শার্ট। কিন্তু সে বেয়ারা নয়। তবে যে ভাবে ওদের বোটটার দিকে তাকাচ্ছে, সেটা সন্দেহজনক।

বোট ছাড়ল সে। মেকসিকোর দিকে যেতে লাগল। কোথায় যায়, দেখার জন্যে পিছু নিল গোয়েন্দারা। ওদের ধারণা হলো, সামনে কোথাও গিয়ে অপেক্ষা করবে বেয়ারার ছদ্মবেশী লোকটা। নীল শার্ট পরা লোকটা বোট তীরে ভিড়িয়ে তাকে তুলে নেবে।

আধ মাইল এগোনোর পর যেন ওদের ওপর বিরক্ত হয়ে উঠল লোকটা। বার বার পেছনে ফিরে তাকাচ্ছে। শেষে ইঞ্জিন বন্ধ করে দিয়ে ভেসে রইল। ওরা কাছাকাছি হলে হাত নেড়ে ডাকল।

বোট কাছে নিয়ে গেল কিশোর।

ককশ স্বরে জিজ্ঞেস করল লোকটা, আমার পেছনে লেগেছ কেন?

নিরীহ স্বরে কিশোর জবাব দিল, কই? আপনি যেদিকে যাচ্ছেন আমরাও সেদিকে যাচ্ছি।

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কিশোরের দিকে কড়া চোখে তাকিয়ে রইল লোকটা। আবার বোট ছাড়ল। আগের মতই পেছনে লেগে রইল গোয়েন্দারা।

ল্যাশুনা ড্যাম দেখা গেল। রিজারভয়েরের ভেতরে ঢুকে আবার ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল লোকটা। কিশোরদের ডেকে বলল, এবার কিন্তু আমি পুলিশ ডাকব!

ডাকুন না, জবাব দিল কিশোর। অন্যায় কিছু করিনি আমরা।

রবিন বলল, আপনার আর ডাকার দরকার হবে না। ওই যে পুলিশ আসছে।

পুলিশের লঞ্চ দেখেই ঘাবড়ে গেল লোকটা। গতি বাড়িয়ে ছুটতে শুরু করল। বাধা পেরিয়ে গিয়ে তীরে ভেড়াল নৌকা। লাফিয়ে ডাঙায় নেমে ছুটতে ছুটতে অদৃশ্য হয়ে গেল।

দূরবীন চোখে লাগিয়ে বোটটাকে দেখছে একজন অফিসার। কাছাকাছি বোট নিয়ে গেল কিশোর। জিজ্ঞেস করল, কিছু হয়েছে, অফিসার? বোটটা চুরি করে এনেছে ও, অফিসার জবাব দিল। সকালে রিপোর্ট করা হয়েছে আমাদের কাছে। তোমরা মনে হলো ওটার পিছু লেগেছিলে? কেন?

অল্প কথায় বুঝিয়ে বলল কিশোর, ওরা গোয়েন্দা। নিখোঁজ একজন মানুষকে খুঁজতে বেরিয়েছে। বেয়ারার ছদ্মবেশী লোকটা অদৃশ্য হয়ে যাবার পর কি করে সবুজ বোটের পেছনে লেগেছে বলল।

কিশোররা মেকসিকোতে যাচ্ছে শুনে অফিসার বলল, নোকটাকে ধরতে যাচ্ছি আমরা। কি করতে পারলাম জানার ইচ্ছে থাকলে ইয়োমাতে গিয়ে থানায় খোঁজ

কোরো। মেসেজ দিয়ে রাখব।
গতি বাড়িয়ে চলে গেল লঞ্চটা।
কিশোররাও এগোতে থাকল। পথে যেখানেই মানুষ-জন দেখতে পেল, জেলে নৌকা দেখল, থামিয়ে লফার আর ব্রাউনের খোঁজ নিল। কিন্তু ওরকম কাউকে দেখেছে বলে কেউ বলতে পারল না।
কেটে গেল দিনটা। সূর্য ডুবল। সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হতে লাগল। নদীর কিনারে আর পানির ওপর পোকা খুঁজতে বেরোনো পাখিগুলোকে অস্পষ্ট লাগছে। আকাশের পটভূমিতে বাদুড়ের দলকে লাগছে কেমন অপার্থিব।
থামার সময় হয়েছে, কিশোর বলল।
নদীর মাঝে একটা বালির চরার ধারে নোঙর ফেলল ওরা। খাবারের টিন আর স্লীপিং ব্যাগ নিয়ে নামল। ওখানেই ক্যাম্প করে রাত কাটানোর ইচ্ছে।
আগুন জেলে রান্না করতে বসল রবিন। হাত-পা ছড়িয়ে পাশে বসে রইল কিশোর। বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল মাংস ভাজার সুগন্ধ। মাখন মাখানো পাউরুটি, ভাজা মাংস, পনির, আপেলের সস, আর টিনে করে আনা সেদ্ধ বাঁধাকপি দিয়ে খাওয়া সারল ওরা। ঢুকে পড়ল স্লীপিং ব্যাগের মধ্যে।
আকাশে তারার মেলা। নীরব রাত। মরুভূমির মধ্যে দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীর মাঝে নির্জন বালির চরায় শুয়ে থাকা। সে এক বিচিত্র অনুভূতি। খুব ভাল লাগছে কিশোরের। এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে, জন্মটা সার্থক।
নিরাপদে রাত কাটল। পরদিন ভোরে রওনা হলো আবার ওরা। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে ইয়োমাতে পৌঁছে থানায় খোঁজ নিতে চলল। ওদেরকে স্বাগত জানাল ডিউটি অফিসার। নাম শুনে চিনতে পারল। লঞ্চ থেকে মেসেজ পাঠানো হয়েছে তার কাছে, বোঝা গেল।
তবে গোয়েন্দাদের নিরাশ করল অফিসার। বোট চোরকে ধরা যায়নি। পুলিশের হাত ফসকে পালিয়ে গেছে লোকটা। তার পরিচয়ও জানতে পারেনি পুলিশ।
থানা থেকে বেরিয়ে বোটে এসে উঠল দু-জনে। তারপর আবার এগিয়ে চলী।

.

দুপুরের পর সীমান্ত পেরিয়ে মেকসিকোর সোনোরা রাজ্যে ঢুকল ওরা। চেকপোস্টে খুব কড়াকড়ি। ডিউটি অফিসার ওদের জানাল, চোরাচালানি আর অবৈধ অনুপ্রবেশকারীরা নাকি ইদানীং খুব যন্ত্রণা দিচ্ছে। লফার আর ব্রাউনের কথা অফিসারকে জিজ্ঞেস করল কিশোর। কিন্তু কিছু বলতে পারল না অফিসার।
বিকেলের ভয়ানক কড়া রোদের মধ্যে এগিয়ে চলল বোট।

বেশ কয়েক মাইল এগোনোর পর নদীর তীরে কয়েকটা ঝোপের ধারে পাঁচ-ছয়টা ছেলেমেয়েকে জটলা করতে দেখা গেল। নদীতে গোসল করতে এসেছে ওরা। সীমান্ত পেরিয়ে আসার পর এই প্রথম মানুষ দেখতে পেল। গোয়েন্দারা। বচ্চিাগুলোর দিকে এগিয়ে গেল ওরা।
ওরাও বোট দেখে এগিয়ে এল। কৌতূহলী হয়ে দেখতে লাগল। স্থানীয় ইনডিয়ানদের ছেলেমেয়ে।
হাত নেড়ে ডাকল কিশোর। কিন্তু কাছে এল না ওরা। ভয় পাচ্ছে। শেষে এক বুদ্ধি করল সে। বোট থেকে মাটিতে নেমে পকেট থেকে চিউয়িং গাম বের করল। এইবার গুটিগুটি এগিয়ে এল ছেলেমেয়েগুলো।
সহজেই ভয় কাটিয়ে দিল ওদের কিশোর আর রবিন। ইংরেজি জানে না ওরা, তবে স্প্যানিশ বোঝে। ভাঙা ভাঙা স্প্যানিশে ওদের কাছে জানতে চাইল, কোন বিদেশীকে এদিক দিয়ে যেতে দেখেছে কিনা।
একটা ছেলে জবাব দিল, দেখেছে। এই প্রথম হ্যাঁ-বাচক জবাব পেয়ে সতর্ক হলো গোয়েন্দারা। ছেলেটার বাড়ি কোথায়, জিজ্ঞেস করল। হাত তুলে পাহাড়ের দিকে দেখিয়ে দিল ছেলেটা।
বোট ঘাটে রেখে ছেলেটার সঙ্গে ওদের বাড়িতে চলল দুই গোয়েন্দা, তার বাবার সঙ্গে দেখা করার জন্যে। দল বেঁধে ওদের সঙ্গে চলল বাকি ছেলেমেয়েগুলো। চিউয়িং গাম পেয়ে খুব খুশি ওরা। যে কোন সাহায্য করতে রাজি।
পাহাড়ের কোলে ওদের বাড়িঘর। যে ছেলেটী বিদেশী লোক দেখেছে বলেছে, তার বাবা কৃষক। ছেলের কথা সমর্থন করল। বলল, আমি দেখিনি, তবে শুনেছি। রিটার দিকে গেছে। আমেরিকান।
কি করে গেছে, জানতে চাইল কিশোর।
কৃষক জানাল, মরুভূমি দিয়ে এসেছিল লোকটা। কয়েক মাইল দূরে রেলস্টেশন আছে, রেলগাড়ি চলাচল করে। লোকটা লাইন ধরে হেঁটে গেছে সভবত স্টেশনে, তারপর গাড়িতে করে গেছে, ঠিক জানে না কৃষক।
কোন দিকে কি ভাবে যেতে হবে, জেনে নিল কিশোর। রবিনের সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করল, ওরাও ওই পথেই যাবে। তাহলে হয়তো আরও খোঁজ মিলতে পারে। ঘাটে বোট রেখে যাবে। কৃষককে অনুরোধ করে বলল, সে বোটটা দেখেশুনে রাখতে রাজি হলে তাকে টাকা দেয়া হবে।
রাজি হলো কৃষক। অতএব আর কোন দ্বিধা নয়। রেললাইনের দিকে হাঁটা শুরু করে দিল দুই গোয়েন্দা।
কয়েকশ গজ এগোতেই চোখে পড়ল রেললাইন।

ঘড়ি দেখল কিশোর। ছটা বাজে। রেললাইন ধরে এগোলে রাতের আগে পৌঁছে যেতে পারবে স্টেশনে।
স্লীপার আর লাইনে ফেলে রাখা পাথর মাড়িয়ে এগিয়ে চলল ওরা।
ঘণ্টাখানেক চলার পর লাইনের ধারে ছোট একটা বাড়ি দেখা গেল। ওটাই স্টেশন। সেখানে এসে দেখা গেল একজন মাত্র লোক স্টেশনটা চালাচ্ছে। স্টেশন মাস্টার থেকে লাইনম্যান–সব সে একাই। তার নাম কাপারিলো। বিদেশী এবং আমেরিকা থেকে এসেছে শুনে বিশেষ খাতির করতে লাগল। ওরা গোয়েন্দা শুনে খাতিরের পরিমাণ আরও বেড়ে গেল।
জানা গেল, কিছুক্ষণ পরই একটা মালগাড়ি আসবে, উত্তরে মেক্সিকালিতে যাবে। কিশোররা যেতে চাইলে তাতে ওদেরকে তুলে দেয়া সম্ভব হবে, এবং ওরা গোয়েন্দা বলেই এই কাজটা করতে রাজি আছে কাপারিলো। তবে যেহেতু মালগাড়িতে করে যাবে, টিকেট দিতে পারবে না। মালগাড়ি যাত্রী বহন করে না, সুতরাং টিকেট দেয়ারও নিয়ম নেই।
কথায় কথায় কিশোর জানতে চাইল, আচ্ছা, কিছুদিনের মধ্যে আর কোন আমেরিকানকে এ স্টেশনে আসতে দেখেছেন? গত দু-তিন মাসের মধ্যে?
একটা মুহূর্ত নীরব থেকে মনে করার চেষ্টা করল যেন কাপারিলো। বলল, দেখেছি। ছোট্ট স্টেশন, যাত্রী খুব কম আসে। বিদেশী তে আরও কম। সে জন্যেই মনে আছে। কয়েক হপ্তা আগে একজন ঠিক এ রকম সময়েই হেঁটে এসে হাজির। স্টেশনে মালগাড়ি থামলে আমরা মাল খালাস করছি, এমন সময় দেখি চুরি করে একটা বগিতে উঠে পড়ল লোকটা।
হবে হয়তো কোন ভবঘুরে, রবিন বলল। টাকা ছিল না, তাই চুরি করে উঠেছে।
আমিও তাই ভেবেছি। গিয়ে ধরলাম। কাকুতি-মিনতি শুরু করল। লোকটা। বলল, আমেরিকা থেকে এসেছে। গাড়িতে থাকতে দিতে বলল। কারা নাকি তাকে তাড়া করেছে।
পুলিশ? বেআইনী ভাবে মেকসিকোতে ঢুকেছে লোকটা?
কাঁধ ঝাঁকাল লোকটা। তা তো জানি না। মরুভূমির ওপর দিয়ে অনেক পথ হেঁটে এসেছে। ওর অবস্থা দেখে দুঃখই লাগল। হঠাৎ মরুভূমির রাস্তায় হেডলাইট দেখলাম। একটা গাড়ি আসছিল। দেখেই লোকটা বলল, তাকে ধরতে আসছে ওরা। ট্রেনটা তখন ছাড়ার সময় হয়েছে। ভাবলাম, থাকগে, যকি। সত্যি হয়তো বিপদে পড়েছে লোকটা।
ট্রেন ছেড়ে যাওয়ার পর স্টেশনে পৌঁছল গাড়িটা। লাফিয়ে নামল দু-জন লোক, আমেরিকান বলে মনে হলো। আমাকে জিজ্ঞেস করল কোন ভবঘুরেকে এদিক

দিয়ে যেতে দেখেছি কিনা। লোকটা নাকি অপরাধী। কিন্তু আমার কাছে তাকে ওরকম মনে হয়নি।
তারপর? জানতে চাইল কিশোর। বুকের মধ্যে একধরনের চাপা উত্তেজনা শুরু হয়েছে। মনে হচ্ছে, এতদিনে আসল খবরটা পাওয়া গেছে।
ভ্রূকুটি করল কাপারিলো। বরং ওই লোকগুলোকেই খারাপ মনে হলো আমার। অনেক দিন আমেরিকায় ছিলাম আমি। ওখানকার অপরাধী দেখেছি। কি রকম অচিরণ করে জানি। বিশ্রী ভাষায় কথা বলে, গাল দেয়। বিশালদেহী, রুক্ষ চেহারার ওই দু-জনও এ রকমই করছিল।
উত্তেজনা আর চেপে রাখতে পারল না রবিন। কিশোরের দিকে তাকিয়ে বাংলায় বলল যাতে কাপারিলো বুঝতে না পারে, ওই ভবঘুরেই নিশ্চয় লফার! আর লোকগুলো মনে হয় সেই দু-জন, যারা তার অফিসে গিয়ে তার সেক্রেটারিকে হুমকি দিয়েছে!
মাথা ঝাঁকাল কিশোর। মনে হয়।
কাপারিলোর দিকে তাকাল রবিন। জিজ্ঞেস করল, ভবঘুরে লোকটা লম্বা, না খাটো? দেখতে কেমন?
লম্বা। হালকা-পাতলা। মনে হলো অনেক পথ হেঁটে এসেছে। ভীষণ ক্লান্ত।
হু, মাথা দোলাল কিশোর। উত্তরে, সীমান্তের দিকে।
তাহলে, নিজেকেই যেন প্রশ্ন করল কিশোর, লফার এখনও বাড়ি পৌঁছল না কেন?
হয়তো ধরা পড়েছে, রবিন বলল। যারা তার পিছে লেগেছিল, তারা ধরে ফেলেছে। কিংবা হয়তো তার বাড়ির ওপর নজর রাখা হয়েছে ভেবে ভয়ে বাড়িতে ঢুকছে না। অথবা এমনও হতে পারে, কোন বিপদে পড়েছে তার বন্ধু ব্রাউন, তাকে উদ্ধার করার জন্যে মেকসিকোতে রয়ে গেছে সে।
এইটা হতে পারে। ব্রাউনের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। নিজেদের মধ্যে। কথাগুলো বাংলায় চালিয়ে যাচ্ছে কিশোররা। কিন্তু সে লফারের সঙ্গে ছিল না কেন? মরুভূমি পেরিয়ে লফার একা এল কেন?
এই সময় ট্রেনের হুইসেল শোনা গেল। দেখা গেল হেডলাইট।
কাপারিলো বলল, ওই যে, ট্রেন আসছে।
পতাকা দেখিয়ে ট্রেন থামাল সে। একটা বক্সকার দেখিয়ে তাতে উঠে যেতে বলল ছেলেদের।
কাপারিলোর সাহায্যের জন্যে তাকে অনেক ধন্যবাদ দিল কিশোর আর রবিন। হাত মেলাল। অন্ধকারে গা ঢেকে উঠে পড়ল বক্সকারে।

কয়েকটা মালের বাক্স গার্ডের গাড়িতে তুলে দিল কাপারিলো। আবার চলতে শুরু করল ট্রেন।

.

বক্সকারের বিশাল খোলা দরজার পাশে হাঁটু মুড়ে বসেছে কিশোর আর রবিন। ভেতরে আলো নেই। বাইরে চাঁদের আলো। মরুভূমির মধ্যে দিয়ে চলে গেছে রেললাইন। সীমাহীন বালির রাজত্বে ছোট ছোট ঝোপঝাড় আছে। কোথাও মাথা তুলেছে পাথরের পাহাড়। মাঝে মাঝে চোখে পড়ে বুনো জানোয়ার। আর কচিত-কদাচিত চোখে পড়ে একআধটা নিঃসঙ্গ মাটির তৈরি বাড়ি, এই এলাকায় অ্যাডবি নামে পরিচিত। এত রাতে আলো দেখা গেল না। কোন বাড়ির জানালায়।
এরপর কি করব আমরা? জিজ্ঞেস করল রবিন।
ট্রেনটা যতদূর যায়, যাব। লফার নিশ্চয় এইই করেছিল। গিয়ে দেখি, কি ঘটে?
অহেতুক বসে থেকে লাভ কি? একটু ঘুমিয়ে নিই। গুটিসুটি হয়ে শুয়ে পড়ল রবিন। বাপরে বাপ, যা ঝাঁকি! ঘুমানো লাগবে না!
কিশোরও শুয়ে পড়ল তার পাশে।
ঝাঁকি বন্ধ হয়ে যাওয়াতে ঘুম ভাঙল ওদের। ট্রেন থেমে গেছে। লোকের কথা শোনা গেল। একটা মুখ উঁকি দিল বক্সকারের দরজায়। হাসি হাসি একটা কণ্ঠ বলল, ওঠো, উঠে পড়ো। আমেরিকায় যাওয়া আর তোমাদের হলো না।
ইউনিফর্ম দেখেই চিনে ফেলল কিশোর। বিড়বিড় করল, মেকসিকান পুলিশ!
হ্যাঁ, মাথা ঝাঁকাল লোকটা। বর্ডার পুলিশ। মেকসিকোতে এটা শেষ স্টেশন। অবৈধ যাত্রীকে দেখলেই আমরা এখানে নামিয়ে নিই।
তারমানে মেকসিকালিতে এসে গেছি?
হ্যাঁ, এসেছ। নামো তো এবার, আরও অনেকে অপেক্ষা করছে। দেরি দেখলে বিরক্ত হয়ে যাবে, ব্যঙ্গের সুরে বলল পুলিশ অফিসার।
বক্সকার থেকে নামিয়ে ট্রেনের সামনের দিকে নিয়ে যাওয়া হলো কিশোরদের। ইঞ্জিনের কাছাকাছি দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে আরও কয়েকজনকে। সবার পরনেই ময়লা, মলিন পোশক। দরিদ্র কৃষক কিংবা শ্রমিক শ্রেণীর লোক সবাই।
কারা ওরা? রবিনের প্রশ্ন।
কিশোর জবাব দিল, হবে হয়তো আমাদেরই মত টিকেট ছাড়া যাত্রী। বেআইনী ভাবে বর্ডার পার হতে চেয়েছিল, আটকে দিয়েছে পুলিশ।
বড় একটা লরির পেছনে তোলা হলো ওদের।
কোথায় নিয়ে যাচ্ছে আমাদের? আবার প্রশ্ন করল রবিন।
জেলে হবে, আর কোথায়!

কিন্তু আমাদের জেলে নেবে কেন? আমরা তো অবৈধ ভাবে সীমান্ত পার হতে চাইনি!
চলতে শুরু করল লরি।
কিছুক্ষণ পর থানার শান বাঁধানো চত্বরে এসে ঢুকল। এগিয়ে এল কয়েকজন অস্ত্রধারী গার্ড। বন্দিদের নামিয়ে লাইন দিয়ে দাঁড় করানো হলো।
কিশোর আর রবিনকে লাইন থেকে বের করে দিল একজন অফিসার। আবার লরিতে ওঠানো হলো ওদের, তবে পেছনে নয়, সামনে, ড্রাইভারের পাশে। আবার পথে বেরিয়ে এল লরি। শহরের দিকে চলল।
অবাক হয়ে জানতে চাইল কিশোর, কি ব্যপিরি? আমাদের কোথায় নিচ্ছেন?
চোরাচালানি ধরার চেষ্টা করছে পুলিশ, জবাব দিল ড্রাইভার। তাই ট্রেন থেকে নোক নামিয়ে ধরে এনেছে। তোমরা নিশ্চয় তিন গোয়েন্দার লোক? শহরে নিয়ে গিয়ে তোমাদেরকে ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আমাকে। সেটাই করছি।
আশ্চর্য! রবিন বলল। আমাদের নাম জানল কি করে?
মিস্টার সাইমনের হাত নেই তো এতে? কিশোরের প্রশ্ন।
কি জানি? তবে কি তিনি আশেপাশেই কোথাও আছেন? লফারের। কেসটা নিজেই নিয়েছেন?
খোদাই জানে। ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করল কিশোর, আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?
আলগোডোনেসে।
তাহলে আমাদের বোটটার কি হবে? আনব কি করে ওটা? প্রশ্নটা অবশ্য ড্রাইভারকে করল না কিশোর, নিজেকে করল।
তোমরা গোয়েন্দা, তাই না? পুলিশের হয়ে কাজ করছ?
হ্যাঁ। একজন আমেরিকান ভদ্রলোককে খুঁজছি। মেকসিকোতে এসে হারিয়ে গেছে।
তোমাদের বোটের কথা কি যেন বললে? কোথায় ওটা?
কোথায় আছে জানাল কিশোর।
ড্রাইভার বলল, পুলিশ তোমাদের সাহায্য করবে। তোমরা হোটেলে উঠে বিশ্রাম নাও। বোটটা আনানোর ব্যবস্থা করব আমরা।
এক কাপড়ে চলে এসেছে। ঘণ্টাখানেক পর আলগোডোনেসের একটা দোকানে ঢুকল কিশোররা কিছু কাপড়-চোপড় কেনার জন্যে। খাঁটি মেকসিকান পোশাক কিনে পরল। মাথায় চাপাল উজ্জ্বল রঙের ব্যানডানা হ্যাট। উঁচু হিলওয়ালা মেকসিকান বুট কিনে পায়ে দিল।

শহরের সবচেয়ে বড় হোটেলটায় এসে রুম নিল ওরা। দুষ্টবুদ্ধি খেলে গেল কিশোরের মাথায়। নিজের নামকে স্প্যানিশ বানিয়ে লিখল, কিশোরীস্কো প্যাশোয়ে। আর রবিনের নাম রবিনাস্কো মিলফোর্ডো।
নাম দেখে মাথা দুলিয়ে ক্লার্ক বলল, বাহ, চমৎকার নাম। এক্কেবারে নতুন, আর কখনও শুনিনি।
হাসতে শুরু করল রবিন। বাংলায় জিজ্ঞেস করল, মানে কি এই নামের?
আমি কি জানি! আমেরিকার ফ্র্যাঙ্ক যদি মেকসিকোতে এসে ফ্রান্সিস্কো হয়ে যায়, কিশোরের কিশোরাস্কো হতে দোষ কি?
অকাট্য যুক্তি। চুপ হয়ে গেল রবিন।
ক্লার্ককে অনুরোধ করল কিশোর, আপনাদের গেস্ট বুকটা একটু দেখতে পারি? আমাদের দুজন বন্ধু আসার কথা। দেখি নাম আছে নাকি?
তোমাদের বন্ধুরা কি জেলে?
না, তবে নৌকা নিয়ে ভ্রমণে বেরিয়েছিল। আমদের চেয়ে বয়েস অনেক বেশি, চল্লিশের কাছাকাছি। দু-জনেরই হালকা-পাতলা শরীর, একজন বেশি লম্বা। নাম লফার।
মাথা নাড়ল ক্লার্ক। ওরকম কেউ ওঠেনি হোটেলে।
রেজিস্টার ঘেঁটে কিশোরও কিছু বের করতে পারল না। খাতাটা ঠেলে দিয়ে বলল, হয়তো অন্য কোন হোটেলে উঠেছে আমাদের বন্ধু। একজনের অবশ্য ঘোড়র প্রতি আকর্ষণ আছে। কাছাকাছি কোন ঘোড়ার রঞ্চি থাকলে, আর শেটল্যাণ্ড পনি থাকলে সেখানে উঠেও যেতে পারে।
তাহলে তো এদিকে তার আসারই কথা নয়, হাসিমুখে বলল ক্লার্ক। বর্ডারের কাছে একটা পনি ব্যাঙ্ক আছে ইয়োমা আর আড্রাডির মাঝামাঝি। নাম কুপার র‍্যাঞ্চ।
থ্যাংকস, হেসে বলল কিশোর। মনে হচ্ছে ওখান থেকেই বের করে আনতে হবে ওকে।
ঘরে ঢুকেই রবিন জিজ্ঞেস করল, কুপার রাঞ্চে যাওয়ার ইচ্ছে আছে নাকি?
সূত্র যখন একটা পাওয়া গেছে, গিয়ে দেখাই উচিত।
তা-ও বটে। হাত-মুখ ধুয়ে খাওয়ার জন্যে রেস্টুরেন্টে নেমে এল ওরা। ওখান থেকে ফোন করল ব্লাইদিতে, মুসার কাছে।
ভেসে এল মুসার হাসিখুশি কণ্ঠ, বেঁচে তাহলে আছ?
না, হেসে জবাব দিল রবিন, পরপরি থেকে করছি। তবে বেহেশতেই আছি বলতে পারো। দোজখে যাইনি। তারপর খবর বলল।
আমি ভালই আছি। পায়ের ব্যথা সেরেছে। লফারের খোঁজ পেয়েছ?
পেয়েছি। তবে ঠিক কোথায় আছে বলতে পারছি না।

ও। আমিও এখানে বসে নেই। পা একটু ভাল হতেই প্লেন নিয়ে বেরিয়েছিলাম। মরুভূমির ছবি তুলে এনেছি। রাতের মরুভূমি যা দারুণ লাগে।
রাতের বেলা মরুভূমিতে গিয়েছিলে তুমি! ভূতের ভয় করেনি?
আমি একা যাইনি। একজন বন্ধু জুটে গেছে। একটা প্রাইভেট প্লেনের পাইলট, নাম ওয়ারনার বল। আমার ইনফ্রারেড ক্যামেরাটার ভক্ত হয়ে গেছে।
হু। কিশোর বলছে, প্রতিদিন এ সময় তোমাকে মোটেলে থাকতে। ফোনে যোগাযোগ করব। গুড বাই।
লাইন কেটে দিল রবিন। কিশোরকে খবর জানাল।
পরদিন সকালে শহরে লফার আর ব্রাউনের খোঁজ নিতে বেরেলি দু জনে। দোকানপাট, পেট্রোল স্টেশন, রেস্টুরেন্ট-সমস্ত জায়গায় ঘুরল। কোন লাভ হলো না। দুপুর নাগাদ ক্লান্ত হয়ে হোটেলে ফিরে এল।
বিকেলে ওদের খোঁজ নিতে এল পুলিশের সেই ড্রাইভার। জানাল, ডকে নিয়ে আসা হয়েছে ওদের বোটটী।
হোটেল ছেড়ে দিল কিশোর। ডকে চলল।
ঘণ্টাখানেক পরই আবার বোটে করে নদীপথে ইয়োমার দিকে ফিরে চলল দুই গোয়েন্দা। বিকেলের উত্তপ্ত রোদ থাকতে থাকতেই আরেকবার সীমান্ত অতিক্রম করল। আরও কিছুক্ষণ পর চোখে পড়ল ইয়োমা ডক।
ডকে এসে বোট বাঁধল ওর। লোকজনকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিল কিশোর, কুপার ব্ল্যাঞ্চটা কোথায়। জানল, ওখান থেকে মাইল দুয়েকও হবে না।
দু-জনে দুটো রাকস্যাক বেঁধে নিয়ে নেমে পড়ল বোট থেকে। হেঁটে চলল মরুভূমির ভেতর দিয়ে চলে যাওয়া একটা সরু পথ ধরে।
চোখে পড়ল র‍্যাঞ্চের নিচু ছাতওয়ালা বাড়ি, আর ঘোড়া রাখার কোরাল।
রবিন বলল, জুতো না খুলে আর পারছি না। উফ, বাপরে বাপ, ফোঁসকা পরে গেছে। নতুন জুতো পরে আসাই বোকামি হয়ে গেছে!
বসে পড়ল সে। জুতো খুলে বিশ্রাম দিল পা দুটোকে। আবার পায়ে দিয়েই উঁক করে উঠল।
কি হয়েছে? উদ্বিগ্ন হয়ে জানতে চাইল কিশোর।
কি জানি মনে হলো বঁড়শি বিঁধেছে!
জুতোর মধ্যে বঁড়শি আসবে কোত্থেকে? ভুল করে একআধটা ভেতরে ফেলেনি তো?
নাহ, দেখার জন্যে আবার জুতোটা খুলে নিয়ে উপুড় করতেই টুপ করে পড়ল একটা ছোট, খড় রঙের জীব। কাঁকড়ার মত দাঁড়া, আর টিকটিকির মত লেজ। লেজটা ওপর দিকে বাঁকানো। মাথাটা সুচের মত চোখ।

সর্বনাশ! চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। কাকড়া বিছে! সাংঘাতিক বিষাক্ত! বিষ বেশি ঢুকে থাকলে বারোটা বাজিয়ে দেবে!
বিছেটাকে জুতো দিয়ে পিষে মেরে ফেলে, তাড়াতাড়ি কাপড় ছিঁড়ে রবিনের পায়ে টনিকেট বেঁধে দিল কিশোর, যাতে রক্তবাহিত হয়ে বিষ হৃৎপিণ্ডে পৌঁছতে না পারে। ওখানে পৌঁছলে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়বে বিষ। জিজ্ঞেস করল, হাঁটতে পারবে?
মাথা কাত করল রবিন, পারব।
কিশোরের কাঁধে ভর দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগেল সে।
ওদেরকে আসতে দেখল দু-জন কাউবয়। রবিনের অবস্থা দেখে এগিয়ে এল। একজনের নাম রস ডুগান, আরেকজন চাক হারপার।
রবিনকে র‍্যাঞ্চে নিয়ে যেতে সাহায্য করল ওর।
হই-চই শুনে র‍্যাঞ্চের মালিক মিস্টার কুপারও বেরিয়ে এলেন। ভেতরে নিয়ে গেলেন রবিনকে। বরফ আনতে বললেন।
দৌড়ে গিয়ে ফ্রিজ থেকে বরফের টুকরো বের করে আনল চাক হারপার।
ইতিমধ্যে বিষ-নিরোধক একটা ইঞ্জেকশন দিয়েছেন রবিনকে কুপার। আহত জায়গায় বরফ ডলে দিতে লাগলেন। বললেন, ভাগ্যিস র‍্যাঞ্চের কাছে এসে কামড় খেয়েছ। সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা করা না হলে মারাও যেতে পারতে! তা যাচ্ছিলে কোথায়?
আপনার এখানেই আসছিলাম, জবাব দিল কিশোর। একজন লোকের খোঁজে। লফারের চেহারার বর্ণনা দিল সে।
নিক কোরাসনের কথা বলছে না তো! বলে উঠল রস ডুগান।
নিক কোরাসন! বিড়বিড় করল কিশোর, নাম বানিয়ে বলেছে হয়তো। কুপারের দিকে তাকাল আবার, তারমানে ওরকম চেহারার একজন লোক আছে আপনাদের এখানে?
ছিল। এখন নেই। দুই হপ্তা চাকরি করেছে আমার এখানে।
সব কথা খুলে বলতে অনুরোধ করল কিশোর।
বলার তেমন কিছু নেই, কুপার বললেন। হঠাৎ একদিন এসে হাজির। খোঁচা খোঁচা দাড়ি। ময়লা কাপড়-চোপড়। যেন একটা ভূত। প্রথমে চাকরি দিতে চাইনি। কিন্তু খেপে যাওয়া একটা পনিকে যে ভাবে সামলাল, বুঝলাম ঘোড়ী চেনে, ঘোড়ার স্বভাব বোঝে। দিয়ে দিলাম চাকরি।
কোন সন্দেহ রইল না আর কিশোরের, নিক কোরাসনই মাটি লফার। জিজ্ঞেস করল, একা এসেছিল, না সঙ্গে অন্য কেউ ছিল?

একাই এসেছিল, মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন কুপার, কিন্তু রাখতে পারলাম না! শেটল্যাণ্ড পনির ব্যাপারে এত জ্ঞান আমি আর কারোর দেখিনি। লোক হিসেবেও ভাল। আমার খুব কাজে লাগত। কতভাবে চেষ্টা করলাম রাখার জন্যে, থাকল না। চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। দাঁড়াও, একটা জিনিস এনে দিচ্ছি। দেখো, কোন উপকার হয় কিনা তোমার। বাংকে ফেলে গিয়েছিল কোরাসন।
রসকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন কুপার।
রবিন বলল, কিশোর, কোন কারণে ব্রাউনের কাছ থেকে আলাদা হয়ে গেছে লফার। উত্তরে চলে গেছে।
মাথা ঝাঁকাল কিশোর। নামও গোপন করেছে। কারও কাছ থেকে ভাগছে মনে হয়। কাকে ভয় করছে?
আছে কোন শত্রু। সেই শত্রু তাকে খুঁজে বের করতে পারেনি। তাই আমাদের অনুসরণ করছে। ভাবছে, আমরা তাকে লফারের কাছে নিয়ে যাব।
তাহলে বুঝতে হবে ওদের হাত থেকে লফার ফসকেছে যে বেশিদিন হয়নি। নইলে আমাদের বাধা দিত না শত্রুরা। চুপচাপ থেকে বরং আমাদের পিছে পিছে আসত। কিশোর, এটাই আমাদের সুযোগ। একটা ফাঁদ পাততে পারি।
এই সময় ঘরে ঢুকলেন কুপার। হাতে একটা সাধারণ পোস্ট কার্ড। বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, দেখো, কিছু আছে কিনা।
মনযোগ দিয়ে কার্ডটা দেখল কিশোর। ঠিকানার লেখাগুলো কেমন জড়ানো। বলল, ডেনভার থেকে পোস্ট করা হয়েছে, নিক কোরাসনের নামে।
কি লেখা আছে? জানার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে রবিন। কীকে সম্বোধন করে লিখেছে?
কার্ডটার দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। ডিয়ার মার্টি।
তারমানে লফারকেই লিখেছে! আর কি লিখেছে?
মাত্র তিনটে অক্ষর, কার্ডটা রবিনের দিকে কাত করে ধরল কিশোর।
রবিনও দেখতে পেল, ঘন কালো কালিতে লেখা রয়েছে শুধু: YES
আর কিছু নেই।
অবাক হয়ে বলল রবিন, মানে কি এর?
কুপারও একই প্রশ্ন করলেন। কি মানে?
কিশোর বলল, মনে হয় এই প্রশ্নটার জবাব আমি দিতে পারব। তবে তার আগে আমার একটা প্রশ্নের জবাব দিন, মিস্টার কুপার। এই কোরাসন ওরফে লফারকে সাহায্য করার চেষ্টা কি সত্যি আপনি করবেন?
করব না মানে? আমার দেখা সবচেয়ে বড় ঘোড়া বিশেষজ্ঞ। তাকে পেলে যে কোন র‍্যাঞ্চার বর্তে যাবে।

হাসল কিশোর। কিন্তু কাউবয় হিসেবে তাকে তো আপনি পাবেন না, মিস্টার কুপার। লস অ্যাঞ্জেলেসের বড় ব্যবসায়ী এই লোক। কারখানার মালিক। আমার সন্দেহ এখন জোরদার হচ্ছে, তাকে কিডন্যাপই করা। হয়েছিল। কিডন্যাপারদের হাত থেকে পালিয়েছে। কোন কারণে পুলিশের কাছে যায়নি। কিডন্যাপাররা তাকে হন্যে হয়ে খুঁজছে। ওদের ধরতে আপনি আমাদের সাহায্য করবেন?
করব, জবাব দিতে একটুও দ্বিধা করলেন না কুপার।
গুড। রবিন বলছে ফাঁদ পেতে ওদের ধরার চেষ্টা করলে কেমন হয়? আমিও তার সঙ্গে একমত। রবিন, কি ভাবে ফাঁদ পাতবে, ভেবেছ নাকি কিছু?
মাথা নাড়ল রবিন। না। তুমি একটা বুদ্ধি বের করো।
কুপরের দিকে তাকাল কিশোর। মিস্টার কুপরি, আপনার দুই সহকারীর সাহায্যও লাগবে আমাদের। রস আর চাককে আমাদের ছদ্মবেশ নিতে হবে। আমাদের পোশাকগুলো পরে অন্ধকারে গিয়ে বোটে উঠবে।
কিডন্যাপাররা ভাববে আমরাই উঠেছি, রবিন বলল। তারপর?
আমরা র‍্যাঞ্চের পোশাক পরে কাউবয় সেজে র‍্যাঞ্চের গাড়ি নিয়ে আগেই গিয়ে বসে থাকব। চোখ রাখব বোটের ওপর। দেখব, রস আর চাকের পেছনে কেউ লাগে কিনা। লাগলে তাকে ধরার চেষ্টা করব। কি মনে হয়, মিস্টার কুপার? কাজ হবে?
একটা কথাও না বলে উঠে দরজার কাছে চলে গেলেন কুপার। গলা চড়িয়ে ডাকলেন, কোরিন, রস আর চাককে আসতে বলো তো।
দুই কাউবয় এলে ওদেরকে তার পরিকল্পনার কথা বলল কিশোর। এক কথায় রাজি হয়ে গেল ওরা। লফারকে ওরাও পছন্দ করত। তা ছাড়া র‍্যাঞ্চের একঘেয়ে জীবনে উত্তেজনার খোরাক পেয়েছে।
এইবার বলো, কুপার বললেন, পোস্ট কার্ডের লেখাটার মানে কি?
কিশোর হাসল। নিজেকে লফারের জায়গায় কল্পনা করুন। মেকসিকো থেকে পালিয়ে এসেছে সে। পকেটে টাকা নেই, সাহায্য করার কেউ নেই, বাড়তি যন্ত্রণা হিসেবে কিডন্যাপাররা লেগে আছে পেছনে। শেটল্যাণ্ড পনির ব্যাপারে জ্ঞান আছে তার। সেই জ্ঞানকে পুঁজি করে র‍্যাঙ্কে চাকরি নিয়েছে, দুটো কারণে কিছু টাকা উপার্জন, এবং খাওয়া আর বিশ্রাম। কিন্তু এখানে থেকেও স্বস্তি পায়নি...
কেন?
বুঝে ফেলল রবিন। বলল, মেকসিকোর বেশি কাছাকাছি বলে। কিডন্যাপরির সহজেই তার খোঁজ পেয়ে যেতে পারে, এই ভয়ে।
হ্যাঁ, মাথা ঝাঁকাল কিশোর। আরও দূরে সরে যেতে চাইল সে। তখন ডেনভারের এক বন্ধুর কাছে সাহায্য চেয়ে চিঠি লিখল। সম্ভবত জানতে চেয়েছে তার কাছে

কোন চাকরি আছে কিনা। সেই বন্ধু জবাব দিয়েছে। ইয়েস বলে। এ ভাবেই জবাব দেয়ার কথা চিঠিতে লিখে দিয়েছিল লফার। কিন্তু ভুল করে মার্টির নাম সম্বোধন করে ফেলেছে।
শিস দিয়ে উঠলেন কুপার। তারমানে ডেনভারে চাকরি করতে চলে গেছে! কি চাকরি?
যে ব্যাপারে সে বিশেষজ্ঞ, জবাব দিল কিশোর। শেটল্যাণ্ড পনি। আমি শিওর, ওখানকার কোন ঘোড়ার র‍্যাঞ্চেই পাওয়া যাবে তাকে।
ঠিক! তুড়ি বাজালেন কুপার। অতি সহজ এই ব্যাখ্যাটা আগে আমার মাথায় ঢুকল না কেন?
সূর্য ডোবার আগে আগে বেরিয়ে পড়ল রবিন আর কিশোরের পোশাক পরা দুই কাউবয়। ডকে এসে লাল-সাদা বোটটায় উঠল। তীরে কয়েকজন জেলে আর শ্রমিক ঘোরাঘুরি করছে। তাদেরকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল কিশোর বেশী চাক, সব ঠিক আছে তো, রবিন?
মনে তো হয়, রাকস্যাকটা ডেকে ফেলে জবাব দিল রস।
ঘুরে তো দেখে এলাম। কি বুঝলে? ইয়োমার কোন হোটেলেই আছে। লফার, তাই না? চলো, ওখানেই যাব।
ডকের একপ্রান্তে নোঙর করা ছিল, অন্যপ্রান্তের দিকে চলতে শুরু করল বোট। কণ্ঠস্বর নামিয়ে রস বলল, কেমন করছি আমরা, চাক?
দারুণ! এক্কেবারে কিশোর পাশা আর রবিন।
ওদের ঘণ্টা দুই আগে কুপার র‍্যাঞ্চ থেকে একটা জীপ বেরিয়ে গেছে। ধুলোর মেঘ উড়িয়ে চলে গেছে ইয়োমার দিকে। বিশাল স্টেটসন হ্যাট আর ফ্রানেলের চেক শার্ট পরা চাক-বেশী কিশোর বসেছে চালকের আসনে। তার পাশে রসের ছদ্মবেশে রবিন। পায়ের ব্যথা অনেক কমেছে।
ইয়োমার পুলিশ হেডকোয়ার্টারে এসে ঢুকল দু-জনে। ডেস্কে বসে আছে সেই পুলিশ সার্জেন্ট, কয়েক দিন আগে যার সঙ্গে কথা বলেছিল ওরা। কিন্তু চিনতেই পারল না ওদেরকে। ভোঁতা গলায় জিজ্ঞেস করল, কি সাহায্য করতে পারি?
চীফের সঙ্গে দেখা করতে চাই, প্লীজ। বলবেন কিশোর পাশা আর রবিন মিলফোর্ড কথা বলতে এসেছে।
চমকে গেল সার্জেন্ট। বলল, আরে, তোমরা! চিনতেই পারিনি। কি হয়েছে?
ছোট্ট একটা ফাঁদ পেতেছি আমরা, সার্জেন্ট, কিশোর বলল।
কয়েক মিনিট পর সংক্ষেপে সব কথা চীফকে জানাল সে আর রবিন।
মাথা ঝাঁকিয়ে চীফ বললেন, প্ল্যানটা ভালই মনে হচ্ছে। তোমাদের সঙ্গে অফিসার স্যাডি রোভারকে দিচ্ছি। সাদা পোশাকে যাবে।

লম্বা, পেশীবহুল মানুষ স্যাডি রোভার। কি করতে চায়, তাকে বুঝিয়ে বলল কিশোর।
ইয়োমা বোট ডকের কাছে একটা বালির ঢিবির আড়ালে লুকিয়ে বসল। তিনজনে। ছোট ছোট অনেক জলযান আসছে আর যাচ্ছে। ক্রমাগত ঢেউ তুলছে পানিতে। ডকে এমন কয়েকজনকে দেখা গেল, ভাবসাব দেখে মনে হলো ওদের নৌকা বাঁধা আছে জেটিতে।
স্যাডি জানাল, ওরা সন্ধ্যা হলে নৌকা ছাড়বে। তাদের মধ্যে একজন মেকসিকান দৃষ্টি আকর্ষণ করল কিশোরের। ডকে সে-ই একমাত্র লোক, কোন বিশেষ নৌকার প্রতি যার নজর নেই। এক জায়গায় বসে তাকিয়ে আছে অন্য পাড়ের দিকে।
ফিসফিস করে রবিন বলল, ওই যে, ওরা আসছে।
আবার ডকে ভিড়ল লাল-সাদা বোঁটা। নোঙর ফেলল। ডেকে দাঁড়ানো চাক আর রসের দিকে নজর এখন মেকসিকান লোকটার। ওরা দু-জন তীরে নেমে রাস্তা ধরে এগোল। উঠে দাঁড়াল লোকটা। কোন দিকে না তাকিয়ে রস আর চাকের পিছু নিল।
কিশোররাও উঠে দাঁড়াল। বেশ খানিকটা দূরত্ব রেখে মেকসিকান লোকটার পিছু নিল।
একটা হোটেলে ঢুকল চাক আর রস।
সাবধানে এগিয়ে গিয়ে হোটেলের জানালা দিয়ে ভেতরে উঁকি দিল মেকসিকান।
এই ব্যাটাই আমাদের লোক, নিচু স্বরে ঘোৎ-ঘোৎ করে বলল স্যাডি।
নিঃশব্দে পেছনে এসে দাঁড়াল তিনজন লোক, টেরই পেল না। মেকসিকান। খপ করে তার হাত চেপে ধরল স্যাডি। কঠিন স্বরে বলল, তোমাকে অ্যারেস্ট করা হলো!
হাত ছাড়ানোর জন্যে ধস্তাধস্তি শুরু করল লোকটা। ছুটতে পারল না। তার অন্য হাত চেপে ধরল কিশোর। হোটেল থেকে বেরিয়ে এল চাক আর রস।
থানায় নিয়ে আসা হলো মেকসিকান লোকটাকে।
তার পকেট থেকে কাগজপত্র বের করে দেখে বললেন চীফ, নাম পেকারি সোয়ানো। বেআইনী ভাবে ঢুকেছে। একজন সহকারীকে নির্দেশ দিলেন, হাজতে ভরো।
অভিযান সফল হওয়ায় খুব খুশি চাক আর রস। হাত মেলাল দুই গোয়েন্দার সঙ্গে। কিশোর ওদের ধন্যবাদ দিল।
চাক বলল, আমরা তাহলে জীপটা নিয়ে যাই। কি হয়েছে শোনার জন্যে নিশ্চয় অস্থির হয়ে আছেন বস।
বাকিটা আর তাহলে দেখতে পারলেন না, হেসে বলল কিশোর।

আরও কিছু বাকি আছে নাকি?
সবে তো শুরু। আমার বিশ্বাস, আমাদের এই বন্দীটি এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে। যাবেও। কি বলেন, চীফ?
হাসলেন চীফ। যাওয়াই উচিত। তাকে আমরা যেতে দিলে সোজা সে যাবে তার বন্ধুদের কাছে। হুশিয়ার করার জন্যে।
পরিকল্পনাটা বুঝে গেল চাক। বলল, পুরোটী দেখতে পারলে ভালই হত। কিন্তু বস নিশ্চয় ওদিকে অস্থির হয়ে আছেন। বেশি দেরি করা ঠিক হবে না আমাদের।
বেরিয়ে গেল চাক আর রস। তার একটু পরেই একজন অফিসার এসে জানাল, মেকসিকনি লোকটা পালিয়েছে। হাজতের দরজায় তালা দিতে ভুলে গিয়েছিলাম।
লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল স্যাডি। হোলস্টারে থাবা দিয়ে দুই গোয়েন্দার দিকে তাকিয়ে বলল, চলো!
বাইরে বেরিয়ে এল কিশোররা। একটা বাড়ির ছায়ায় হারিয়ে যেতে দেখা গেল পেকারিকে। স্যাডির সঙ্গে আরও তিনজন অফিসার রয়েছে। সবাই পিছু নিল লোকটার।
দ্রুত হাঁটছে পেকারি। কয়েকটা গলি পেরিয়ে একটা ছাউনির মধ্যে ঢুকল।
ছাউনিটা ঘিরে ফেলল সাদা পোশাকধারী পুলিশ।
খোলা দরজা দিয়ে উঁকি দিল কিশোর। পেকারি বাদেও আর দু-জন লোক আছে, ওরাও মেকসিকান।

.

লোকগুলোকে ধরে থানায় নিয়ে আসা হলো। কিন্তু মুখ খোলানো গেল না ওদের। কিছুই বলল না। যতই প্রশ্ন করা হলো, কেবল জানি না, জানি না করল।
চীফ বললেন, মনে হচ্ছে এগুলো চুনোপুটি। আসলেই কিছু জানে না।
রাতটা কুপারের র‍্যাঞ্চে কাটিয়ে পরদিন সকালে বেরিয়ে পড়ল কিশোর আর রবিন। বোটে করে কলোরাডো নদী ধরে ফিরে এল ব্লাইদিতে। দুটো বাঁধ আর আঁকাবাঁকা নদীর বিপজ্জনক একশো মাইল পথ পেরোতে সারাটা দিনই প্রায় লেগে গেল।
ঘাটেই পাওয়া গেল বোটের মালিককে। ছুরি দিয়ে কেটে পুতুল। বানাচ্ছে।
ভাড়ার টাকা গুনে দিল কিশোর। পকেটে ভরতে ভরতে জিজ্ঞেস বলল লোকটা, ভ্রমণটা হয়তো ভালই হয়েছে?
কিশোর জবাব দিল, হয়তো।
মোটেলে ফেরার পথে রবিন বলল হেসে, আমরা যাওয়ার পর বসে বসে শুধু পুতুলই বানিয়েছে হয়তো?

কিশোরও হাসল, হয়তো। আলসে মানুষের অভাব নেই দুনিয়ায়।
মোটেলে ফিরে মুসাকে পাওয়া গেল না। ক্লার্ককে জিজ্ঞেস করে জানা গেল, ওয়ারনার বল নামে একজন লোকের সঙ্গে সারারাতের জন্যে বেরিয়েছে।
পরদিন সকালেও কিছুক্ষণ তার জন্যে অপেক্ষা করল কিশোর আর রবিন। শেষে দেরি হয়ে যাবে বুঝে বেরিয়ে পড়ল। এয়ারপোর্ট থেকে বিমানে করে ডেনভার রওনা হলো লফারকে খুঁজতে।
ডেনভার বিমান বন্দরের তথ্য কেন্দ্র থেকেই জানতে পারল কাছেই শোবারন পনি র‍্যাঞ্চ নামে একটা ঘোড়ার র‍্যাঞ্চ আছে, যেটাতে শেটল্যাণ্ড পনি উৎপাদন করা হয়। আশেপাশে বেশ কয়েক মাইলের মধ্যে ওই একটা ঘোড়ার র‍্যাঞ্চই আছে।
ট্যাক্সি নিল কিশোর। পাহাড়ী পথ ধরে কয়েক মিনিটেই পৌঁছে গেল র‍্যাঞ্চটায়।
রবিন বলল, বেশি সহজে হয়ে গেল না? পাব তো লফারকে?
সহজ হলো কোথায়? কিশোর জবাব দিল, কত ঘোরা ঘুরলাম। তারপর তো জানলাম। তাকে পাব কিনা এখনও শিওর না।
রাঞ্চের সীমানায় ঢুকে একটা বাড়ির পাশে এসে দাঁড়াল ট্যাক্সি।
নামতেই রবিনের চোখে পড়ল, একটা আস্তাবলে ঢুকছে লম্বা, চওড়া কাঁধওয়ালা একজন লোক। ইশারায় কিশোরকে আসতে বলে সেদিকে এগিয়ে গেল রবিন।
আস্তাবলে ঢুকল দু-জনে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকাল। একসারি চারকোণা স্টল, ঘোড়া রাখা হয় ওগুলোতে। সব খালি, একটা বাদে। ওটাতে বদমেজাজী একটা ঘোড়াকে শান্ত করার চেষ্টা করছে লম্বা লোকটা, রবিন যাকে দেখেছে।
পেছনে এসে দাঁড়াল গোয়েন্দারা।
রবিন জিজ্ঞেস করল, মিস্টার লফার?
ভীষণ চমকে ঝটকা দিয়ে ঘুরে তাকাল লোকটা। চোখে ভয়। বলল, আমার নাম নিক কেরিসন।
ভয় পাবেন না আমাদের, মিস্টার লফার, শান্তকণ্ঠে বলল কিশোর। আপনার মামা ওয়াল্ট ক্লিঙ্গলস্মিথ আপনার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছেন। আমাদের পাঠিয়েছেন আপনাকে খুঁজে বের করার জন্যে।
কে তোমরা?
আমরা গোয়েন্দা। আমি কিশোর পাশা, ও রবিন মিলফোর্ড। আপনাকে সাহায্য করতে এসেছি আমরা, মিস্টার লফার, বিশ্বাস করতে পারেন। বন্ধু হিসেবে নিতে পারেন আমাদের।
বিশ্বাস! বন্ধু! ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলল লফার। তিক্ত কণ্ঠে বলল, এই কথাগুলো আর বোলো না আমাকে! দুনিয়ায় বন্ধু বলে কিছু নেই, বিশ্বাসও নেই!

আপনার বন্ধু ব্রাউনের কি হয়েছে?
ও আমার বন্ধু নয়! আমিই হতে চেয়েছিলাম! গাধামির ফলও পেয়েছি হাতে হাতে! তিক্তকণ্ঠে বলল লফার। সমস্ত কিছুর পরও যাকে খানিকটা বিশ্বাস করেছিলাম, সে-ও আমাকে বোক পেয়ে ঠকাল। পটিয়ে-পাটিয়ে অ্যাডভেঞ্চারের লোভ দেখিয়ে বাড়ি থেকে বের করল, তারপর ধরে নিয়ে গেল মেকসিকোতে।
দু-জনে একসঙ্গে গিয়েছিলেন? জানতে চাইল রবিন।
মাথা ঝাঁকাল লফার। হ্যাঁ। রাতের বেলা, নৌকায় করে। আগেই খবর দিয়ে রাখা হয়েছিল। আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল নৌকা। রাতে চুরি করে বর্ডার পার হয়ে মেকসিকোতে ঢুকেছি। ওখানে নিজের দলের সঙ্গে দেখা করেছে লফার।
শিস দিয়ে উঠল রবিন। মেকসিকান বিদ্রোহী?
না। ওই দল থেকে বেরিয়ে চলে এসেছে। নিজেই একটা দল গড়েছে। বেআইনী পথে টাকা কামানোর জন্যে।
তারমানে ব্রাউন ক্রিমিন্যাল।
হ্যাঁ।
তারপর, বলুন, আপনাকে নিয়ে গিয়ে কি করল? জানতে চাইল কিশোর।
সারাক্ষণ পাহারা দিয়ে রাখত। হুমকি দিত আমি পালানোর চেষ্টা করলে, পালিয়ে গিয়ে পুলিশকে খবর দিলে, আমার পরিবারের ক্ষতি করবে। তারপরেও পালালাম ঠিকই, কিন্তু পুলিশের কাছে গেলাম না স্ত্রী-পুত্রের ক্ষতির ভয়ে। নিরুদ্দেশ হয়ে গেলাম। মালগাড়িতে করে বর্ডারে চলে গেলাম। ব্রাউনকে একটা চিঠি লিখে দিলাম, আমি পুলিশের কাছে যাইনি, আমার পরিবারের যেন ক্ষতি না করে। কিন্তু আমার পেছনে ঠিকই লাগল ওরা। ওদের ধারণা, অনেক বেশি জেনে ফেলেছি আমি। মুখ বন্ধ করে দেয়া দরকার।
কিন্তু আপনাকে বেরোতে রাজি করাল কি করে ব্রাউন?
সেটা বোঝাতে পারব না, হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল লফার। বার বার বন্ধুদের বিশ্বাস করেছি, বার বার ওরা আমার সঙ্গে বেঈমানী করেছে। ব্যবসায় মরি খেয়ে মাথাটা ঘোলা হয়ে গিয়েছিল। মনে করলাম, কোথাও বেরোলে হয়তো ভাল লাগবে। তাই ব্রাউন যখন বেড়াতে বেরোনোর কথা বলল, রাজি হয়ে গেলাম। প্লেন নিয়ে ওড়ার পর ব্রাউন বলল মরুভূমির দিকে যেতে, আমাকে নাকি একটা সারপ্রাইজ দেবে। ওখানে প্লেন রেখে আমাকে নিয়ে গিয়ে বোটে উঠল। আমি ভেবেছিলাম সে একজন দুঃসাহসী অ্যাডভেঞ্চারার। কিন্তু আমার ধারণা ভুল। সাধারণ একজন অপরাধী ছাড়া সে আর কিছুই নয়।
তাকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেয়া উচিত, কিশোর বলল। সেই কাজটাই করব। আপনার সাহায্য লাগবে আমাদের, মিস্টার লফার। বেআইনী কি কাজ করছে

ব্রাউন, বলুন তো?
ভয় ফুটল লফারের চোখে। মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, না, এ সব কথা আমি বলতে পারব না! তাতে লাভও হবে না। মাঝখান থেকে আমার পরিবারের…
দেখুন, মিস্টার লফার, সারাজীবন পালিয়ে বেড়াতে পারবেন না আপনি। তাতে আপনার পরিবারেরও কোন লাভ হবে না। আপনার বাড়িতে গিয়েছিলাম। আপনার স্ত্রী আর ছেলেরা অস্থির হয়ে গেছে আপনার জন্যে।
চোখের কোণ ছলছল করে উঠল লফারের। কিন্তু কি করতে পারি আমি, বলো? বাড়ি তো যেতে পারব না!
কেন পারবেন না?
ব্রাউন আমাকে খুন করবে! আমার ছেলেদের মেরে ফেলবে!
অত সহজ না! জোর দিয়ে বলল রবিন। বলল, আর করে ফেলল। দেশে আইন-কানুন আছে। পুলিশের কাছে যান আপনি।
আবার নিরাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল লফার। পুলিশের কাছে আমি যেতে পারব না। কারণ আমিও অপরাধ করে বসে আছি।
মানে? জানতে চাইল বিস্মিত কিশোর।
ব্রাউনও জানে এটা। তাকে পুলিশের কাছে ধরিয়ে দিলে সে-ও আমাকে ধরিয়ে দেবে। আমার হাত দিয়ে বেশ কিছু জাল চেক এখানে ওখানে পাচার হয়ে গেছে।
চেক? কি ধরনের? আমেরিকান সরকারের চেক?
না, ব্যক্তিগত চেক।
নানা ভাবে লফারকে বোঝাতে লাগল কিশোর আর রবিন। কিছুতেই বাড়ি ফিরে যেতে রাজি করাতে পারল না। তবে একটা কথা দিল–ওদেরকে না জানিয়ে শোবারন র‍্যাঞ্চ ছেড়ে আর পলিবে না।
হাইওয়ের ধারে একটা রেস্টুরেন্টে এসে খাওয়া সারল দুই গোয়েন্দা। ওখনি থেকে ফোন করল মুসাকে।
মূসা? কিশোর। ডেনভার থেকে বলছি। খবর আছে।
আমার কাছেও আছে! উত্তেজিত শোনাল মুসার কণ্ঠ। কিন্তু এত দেরিতে করলে? আমি তো ভেবেছিলাম আর করবেই না বুঝি! অনেক বড় একটা সূত্র পেয়েছি। আসো এখানে, বলব। ডেনভারে কি করছ তোমরা?
লফারকে খুঁজে বের করেছি।
খাইছে! সত্যি?
হ্যাঁ। তবে খবরটা কারও কাছে ফাঁস কোরো না। কাল সকালের প্লেনে আসছি আমরা।

খাওয়ার পর আবার শোবারন র‍্যাঞ্চে ফিরে এল কিশোররা। সারাদিন কাজ করে এখন বিশ্রাম নিচ্ছে শ্রমিকেরা। কেউ অলস ভঙ্গিতে বসে আছে বারান্দায়, কেউ তাস খেলছে, কেউ গল্প করছে। সবার থেকে আলাদা বসে একটা জিন মেরামত করছে লফার। আগের চেয়ে অনেকটা শান্ত লাগছে তাকে।
কিশোরদের দেখে উঠে এল লফার।
কিশোর বলল, লোকগুলো মনে হচ্ছে খুব ভাল।
হ্যাঁ, লফার বলল। ভাল লোক। আমার আসল নাম কেউ জানে না এখানে। এদের মাঝে ভালই কাটে।
হাঁটতে হাঁটতে মাঠের দিকে সরে গেল তিনজনে। সেখানে চরছে ঘোড়ার পাল।
কেন যে এখান থেকে বেরোতে চাইছেন না, কিশোর বলল, মাথায় ঢুকছে না আমার। জায়গাটা ভাল, আপনার জন্যে নিরাপদ, সবই বুঝলাম। কিন্তু এখানে থেকে তো জীবন কাটাতে পারবেন না। যদি কিছু মনে না করেন, আপনাকে একটা পরামর্শ দিতে পারি।
কি? কিশোরের মুখোমুখি দাঁড়াল লফার। মনে হচ্ছে খানিকটা আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে।
এখুনি লস অ্যাঞ্জেলেসে ফেরার দরকার নেই আপনার। আমাকে আর রবিনকে সাহায্য করতে পারেন। ব্রাউনকে ধরব আমরা। তাকে ধরে পুলিশের হাতে দেব। হয়তো এর জন্যে আপনার সামান্য অপরাধ মাপও হয়ে যেতে পারে। ব্রাউনের হাত থেকেও রেহাই পাবেন।
দ্বিধা করল লফার। আস্তে করে হাত বাড়িয়ে কিশোরের একটা হাত চেপে ধরল, ঠিক আছে, আমি রাজি। প্রথমে কোথায় যেতে হবে?
ব্লাইদি।
চমকে গেল লফার। কিন্তু ওখানে তো ব্রাউনের সম্পাইরা আছে। দেখলেই চিনে ফেলবে আমাকে!
চিনবে না। ছদ্মবেশ পরিয়ে নিয়ে যাব।
.
পরদিন মাঝবয়েসী একজন প্রৌঢ় র‍্যাঞ্চারের ছদ্মবেশে কিশোর আর রবিনের সঙ্গে প্লেন থেকে নামল লফীর। সামান্য খুড়িয়ে হাঁটতে বলে দিয়েছে তাকে কিশোর। ভালই অভিনয় করছে সে।
মোটেলেই অছে মুসা। ওদের আসার অপেক্ষা করছে। লাফ দিয়ে উঠে এসে জড়িয়ে ধরল কিশোরকে। তারপর রবিনকে। হাত মেলাল। তাকলি লফারের দিকে।

পরিচয় করিয়ে দিল কিশোর। সব কথা জানাল। ব্রাউনকে ধরার প্ল্যান। করেছে যে বলল। তারপর জিজ্ঞেস করল, এবার তোমার দারুণ খবরটা বলে ফেলো! কি সূত্র পেয়েছ?
দুদিন আগে রাতের বেলা ওয়ারনার বলের সঙ্গে মরুভূমিতে গিয়েছিলাম কিছু নিশাচর জানোয়ারের ছবি তোলার জন্যে। একটা ছবিতে জানোয়ারের সঙ্গে কি উঠেছে জানো? একটা লোকের ছবি। নদীর কাছ থেকে কোথাও সরে যাচ্ছিল সে।
এতে অবাক হওয়ার এমন কি ঘটল? রাতের বেলা নদী থেকে মরুভূমিতে নামতে পারে লোকে। তোমরাও তো গিয়েছ।
আসল কথাটা শোনোই না। লোকটা কে জানো? রকি বীচে তোমাদের ইয়ার্ডে যে আড়ি পেতে ছিল।
বলো কি! এইবার অবাক হলো কিশোর। লস অ্যাঞ্জেলেসের সেই বেয়ারা! হ্যাঁ, এইটা একটা সূত্র বটে!
ওদের কথা বুঝতে পারছে না লফার। তাকে বুঝিয়ে দিল কিশোর। চেহারার বর্ণনা দিয়ে বলল, আমার ধারণা, ব্রাউনের দলের লোক ও। চিনতে পারছেন?
নাহ। আমাকে যারা ধরে নিয়ে গিয়েছিল, ওরা মেকসিকান। অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল লফার, তা থাকব কোথায় আমি? এই মোটেলে?
অসুবিধে কি? রবিন বলল।
না, অসুবিধে নেই। রুম থেকে হাত-মুখ ধুয়ে এসে রেস্টুরেন্টে ঢুকল চারজনে। খাওয়ার পর কিশোর বলল, এবার কাজের কথায় আসা যাক। মরুভূমিতে যাওয়ার কথা ভাবছি। নকশাগুলোর কাছে। তা ছাড়া ওখানে যখন ছদ্মবেশী বেয়ারাকে দেখা গেছে, কিছু একটা ব্যাপার নিশ্চয় আছে। ওখানে মাটি খোঁড়া হয়েছে, দেখেছি। আরও কোথাও খুঁড়েছে কিনা দেখব।
যারা খুঁড়েছে তাদের সঙ্গে ব্রাউনের দলের সম্পর্ক আছে ভাবছ নাকি? রবিনের প্রশ্ন।
থাকতেও পারে। রিপ্পিতে নদীর ধারে একটা কেবিন ভাড়া নেব আমরা। ওখানে থাকব। বোট ভাড়া করব। তাতে যতবার খুশি নদী পেরিয়ে মরুভূমিতে যাতায়াত করতে পারব।
এই পরিকল্পনায় সবচেয়ে বেশি খুশি হলো লফার। কারণ লোকালয়, বিশেষ করে ব্লাইদি থেকে সরে যেতে পারবে।
বেশ, তাহলে ওই কথাই রইল, কিশোর বলল। সকালেই রওনা হব আমরা। কারও কোন কথা আছে?

এক কাজ কোরো, মুসা বলল, তোমরা তিনজন চলে যেয়ো। আমি বরং রাইদি থেকে বোট ভাড়া করে, বাজার করে নিয়ে যাব। খাবার তো লাগবে। সঙ্গে করে আমার বন্ধু ওয়ারনার বলকে নিতে চাই। ওকে পুরোপুরি বিশ্বাস করা যায়। দরকার পড়লে আমাদের সাহায্যও করতে পারবে।
মন্দ বলোনি। কেবিনটা বরং তার নামেই ভাড়া করব। তাতে খোঁজ খবর নিলেও আমাদের শত্রুরী কিছু সন্দেহ করতে পারবে না।
পরদিন দুপুরে রিপ্পিতে পৌঁছে একজন কৃষকের কাছ থেকে একটা কেবিন ভাড়া করল কিশোররা। কেবিনটা পড়েছে নদীর এপারে ক্যালিফোর্নিয়ার সীমানায়। বাড়ির পেছনে ছড়ানো বারান্দা। ওখানে দাঁড়ালে নদী ও নদীর অন্য পাড়ে অ্যারিজোনার বিশাল টিলা আর পাহাড়গুলো চোখে পড়ে, যেখানে রয়েছে দানবীয় সব নকশী। হলুদ রঙের সুন্দর টীমারিস্ক গাছ ঘিরে রেখেছে। কেবিনটীকে।
বাসা পছন্দ হয়েছে? জিজ্ঞেস করল কৃষক।
খুউব, জবাব দিল কিশোর।
তবে একটা ব্যাপারে সাবধান থাকবে।
কি? সতর্ক হয়ে উঠল কিশোর। ভাবল চোর-ডাকাতের কথা বলবে বুঝি।
সাপ। র‍্যাটল স্নেক।
কয়েক মিনিট পরই কৃষকের কথার প্রমাণ পাওয়া গেল। বাড়ির চারপাশটা ঘুরে দেখার জন্যে বারান্দা থেকে নেমেছিল লফার। কিন্তু কয়েক পা এগোতে না এগোতেই বালির মধ্যে থেকে ফোঁস করে উঠল সাপ। আরেকটু হলেই তার পায়ে কামড়ে দিয়েছিল। লাফ দিয়ে এসে আবার বারান্দায় উঠল সে।
রবিন আর কিশোর মিলে সাপটীকে মেরে ফেলল।
কাঁপতে কাঁপতে লফার বলল, র্যাটলের বিষ যে কি জিনিস, হাড়ে হাড়ে জানা আছে আমার। ছোটবেলায় একবার কামড় খেয়েছিলাম। নেহায়েত আয়ু। আছে, তাই বেঁচেছি।
কেবিনের ভেতরও সাপ থাকতে পারে ভেবে প্রতিটি ঘর ভালমত খুঁজে দেখল ওরা।
রবিন বলল, আর থাকতে পারছি না আমি। পেটের মধ্যে কিছু নেই। খাওয়া দরকার।
খাওয়ার কথায় মুসার কথা মনে পড়ল কিশোরের। বলল, মুসারা তো। এখনও আসছে না।
সঙ্গে করে স্যাণ্ডউইচ এনেছে ওরা। খেয়ে নিল।

ইতিমধ্যে গোয়েন্দাদের ওপর অনেকটা বিশ্বাস এসেছে লফারের। নিজে নিজেই বলল, জানলে সব বলতাম তোমাদের। কিন্তু আমিও তেমন কিছু জানি না।
কোন ব্যাপারে? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
এই ব্রাউনের দলের ব্যাপারে।
যা জানেন তাই বলুন। তাতেও সাহায্য হবে।
আসলে কিছুই জানায়নি ওরা আমাকে। ওদের দলে যোগ দিতে রাজি হইনি। ওদের আস্থা অর্জন করতে পারিনি।
ওদের কাজটা কি, সেটা কি বলতে পারবেন?
শিওর না। অনুমান করতে পারি কেবল। গোড়া থেকেই বলি। বর্ডার পেরোনোর পর একটা বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তুলল আমাকে ব্রাউন। আশেপাশে আর কোন বাড়িঘর নেই। বাড়িটায় তিনজন মেকসিকান আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। ওদের হাবভাব ভাল লাগল না। কেমন করে যেন। তাকাচ্ছিল আমার দিকে। সবার মুখেই খালি টাকার গল্প। কি করে অল্প সময়ে। বেশি টাকা হাতানো যায়। সন্দেহ জাগল আমার। বোকার মত সেটা ফাস করে দিলাম ওদের কাছে। বললাম, ওদের সঙ্গে থাকব না। কিন্তু আমাকে আটকে ফেলল ব্রাউন। বেরোতে দিল না।
দুই বার আমাকে শহরে নিয়ে গেছে সে। ভয় দেখিয়ে আমাকে দিয়ে তার জাল চেক খাবারের দোকান থেকে ভাঙাতে বাধ্য করেছে। একটা মেকসিকান ব্যাংকের নামে ওই চেকগুলো তৈরি হয়েছে। যার নামে করা হয়েছে, সেটাও ছদ্মনাম।
পালালেন কখন?
বলছি। ওদের বেআইনী কাজে আমাকে যোগ দেয়ার জন্যে চাপ দিয়ে চলল ব্রাউন। কিছুতেই আমাকে রাজি করাতে না পেরে লোক দিয়ে পাঠিয়ে দিল একটা নিরালা জায়গায়। ঘরে আটকে সারাক্ষণ আমাকে পাহারা দিয়ে রাখা হত, সে-কথা তো বলেইছি। ওদের কাজের ব্যাপারে আমার সামনে আর মুখ খুলত না। আড়ি পেতে থেকে কথা শোনার চেষ্টা করেছি। জিঙ্ক প্লেটের কথা বলতে শুনে অনুমান করলাম কোন কিছু জাল করার ব্যাপারে আলোচনা করছে ওরা।
কি জাল করছে? জিজ্ঞেস করল রবিন।
তা বলতে পারব না।
হঠাৎ বলে উঠল কিশোর, জবাবটা আমি বোধহয় দিতে পারব, মিস্টার লফার। কোন আমেরিকানের নাম ওদেরকে বলতে শুনেছেন?
শুনেছি। ডগলাস বার্ড।
চট করে পরস্পরের দিকে তাকাল কিশোর আর রবিন। মরুভূমির গর্তে পাওয়া রুমালটার কোণে লেখা ছিল D. এখন বুঝল ওটা ডগলাসের নামের আদ্যক্ষর।

চেঁচিয়ে উঠল রবিন, ডগলাস বার্ডই আমাদের ছদ্মবেশী বেয়ার!
লফার বলল, তার দু-জন সহকারী আছে। সিজার এবং মারফি।
তাই নাকি? কিশোর বলল, তাহলে আপনার অফিসে ওই দুজনই গিয়েছিল আপনার সেক্রেটারির কাছে খোঁজ নিতে। তাকে ভয় দেখিয়েছে। রাতের বেলা মরুভূমিতে বার্ডের ছবিই উঠে গেছে মুসার ক্যামেরায়। রকি বীচে তার মাথায় বাড়ি মেরে ছবি কেড়ে নিয়ে গেছে এই লোকই।
একটা ব্যাপার মেলাতে পারছি না, রবিন বলল।
কি?
একটা পাথর। জ্যাসপার। মরুভূমিতে কুড়িয়ে পেয়েছি, আপনার প্লেনটী যেখানে পাওয়া গেছে, তার কাছে। মিস্টার লফার, দামী চোরাই পথিরেরও ব্যবসা করে নাকি ব্রাউনের দল? পাথর নিতেই হয়তো মরুভূমিতে গিয়েছিল বার্ড, মূসার ক্যামেরায় তার ছবি উঠে গেছে?
উঁহু! অবাক হয়ে মাথা নাড়ল লফার। আমার তা মনে হয় না। পাথর টারের কথা কখনও বলতে শুনিনি ওদের।
তাহলে অন্য কোন কারণে মরুভূমিতে গেছে বার্ড, কিশোর বলল। আবারও যেতে পারে। কখন যাবে জানি না। ওকে ধরতে হলে রাতের বেলা ওখানে হাজির থেকে পাহারা দিতে হবে আমাদের।

.
ইঞ্জিনের মৃদু ফটফট শব্দ ভেসে এল নদীর দিক থেকে। বাড়ল শব্দটা। কথা থামিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এল কিশোর আর রবিন। বড় একটা মোটরবোট আসতে দেখল। তাঁতে দু-জন লোক।
মনে হয় মুসারা আসছে, রবিন বলল।
কাছে এল বোটটা। মুসাকে চিনতে অসুবিধে হলো না। হাত নেড়ে চিৎকার করে তাকে ডাকতে লাগল ওরা।
বোটের নাক ঘুরে গেল। এগিয়ে এসে কেবিনের নিচে নদীর ঢালে তৈরি জেটিতে ভিড়ল।
একজন সুদর্শন তরুণকে নিয়ে নেমে এল মুসা। বয়েস বাইশ-তেইশ হবে। রোদের মধ্যে থাকতে থাকতে লোকটার চামড়া উজ্জ্বল বাদামী হয়ে গেছে। মাথা ভর্তি চুলের আসল রঙ ছিল সোনালি, এখন সাদা হয়ে গেছে মরুভূমির কড়া রোদে ঘুরতে ঘুরতে।
কিশোর আর রবিনের সঙ্গে ওয়ারনার বলের পরিচয় করিয়ে দিল মুসা।
হতি মেলানো আর কুশল বিনিময়ের পালা শেষ হলে হাতে হাতে বোট থেকে খাবারের প্যাকেটগুলো নামিয়ে আনল ওরা। কেবিনে নিয়ে এল।

মার্টি লফারের সঙ্গে ও বলের পরিচয় করিয়ে দিল মুসা। হাসিখুশি লোকটাকে পছন্দ করল সবাই।
তিন গোয়েন্দার সব সদস্যই হাজির। রাতের বেলা কি ভাবে পাহারা দেবে, এই নিয়ে আলোচনায় বসল সবাই।
সিদ্ধান্ত হলো, বোটে করে অপর পারে চলে যাবে ওরা। টিলার ওপর উঠে লুকিয়ে থাকবে। ওখান থেকে আশপাশে বহুদূর চোখে পড়ে। কেউ এলে সহজেই দেখতে পাবে। বার্ড কিংবা তার সাঙ্গপাঙ্গরা এলে, তাঁদের ধরা হবে।
বিকেল হয়ে গেল। শুধু স্যাণ্ডউইচ খেয়ে আর কতক্ষণ থাকা যায়। খিদে পেয়ে গেল ওদের। রান্না চড়ানো দরকার। লফার বলল, ঘোড়া পোষা ছাড়া আরেকটা কাজ ভাল করতে পারি আমি। রান্না করতে দিয়েই দেখো।
কোন আপত্তি নেই কারও। সত্যি প্রমাণ করে দিল লফার, রান্নায়ও তার চমৎকার হাত। খেয়ে সবাই প্রশংসা করল।
বারান্দায় এসে বসল সবাই। গল্প করতে লাগল। সূর্য ডুবতে দেরি নেই। কেবিন ঘিরে রাখা গাছের জটলার দিকে তাকিয়ে চোখ বড় বড় হয়ে গেল মুসার। চিৎকার করে উঠল, খাইছে! দেখো, কে এসেছেন।
ফিরে তাকাল সবাই।
মুসার মতই অবাক হয়ে গেল কিশোর আর রবিনও।
মিস্টার সাইমন!
হাসিমুখে এগিয়ে এলেন ডিটেকটিভ। তাঁকে এখানে দেখতে পাবে বল্পনাই করেনি তিন গোয়েন্দা। লাফ দিয়ে উঠে গেল এগিয়ে আনার জন্যে।
কেন এসেছেন, জানা গেল শিগগিরই। হাত-মুখ ধুয়ে, খেয়েদেয়ে সবার সঙ্গে বারান্দায় এসে বসলেন সাইমন। হেসে বললেন, কিশোর, কয়েক দিন ধরে তোমার আর রবিনের পিছে লেগে রয়েছি আমি। কলোরাডো নদী ধরে গেলে তোমরা, ফিরেও এলে। খুঁজতে খুঁজতে মিস্টার লফারের বন্ধু কুপারের র‍্যাঞ্চে গিয়ে হাজির হলে। আমিও গিয়েছি। মিস্টার কুপার আমাকে সব বলেছেন।
রবিন বলল, কিছুই বুঝতে পারছি না আমি, স্যার। গোড়া থেকে বলুন। আমাদের পিছু নিলেন কেন?
দীর্ঘ একটা মুহূর্ত নদীর পানির দিকে তাকিয়ে রইলেন সাইমন। কোনখান থেকে শুরু করছেন ভাবছেন যেন। বললেন, মিস্টার লফারকে খুঁজে বের করার দায়িত্বটা তোমাদের দেয়ার আগেই আরেকটা কেস পেয়েছিলাম আমি, একটা চেক জালিয়াতির কেস। সরকারি চেক জাল করা হচ্ছে। পুলিশ কোন কিনারা করতে পারছিল না।

চেক জালিয়াতি! মুসা বলে উঠল। কিশোর, আমি যেটা পেয়েছিলাম, ওটাও একই দলের কাজ নয়তো?
মুসা কি ভাবে চেক পেয়েছিল, সাইমনকে জানাল কিশোর।
মানিব্যাগ থেকে একটা চেক বের করলেন তিনি। মুসার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, দেখো তো এটার মত কিনা?
একবার দেখেই মাথা ঝাঁকাল মুসা, হা হা, ঠিক এই জিনিস। তবে ওটীতে টাকার অঙ্ক খুব কম ছিল।
তাহলে আর কোন সন্দেহ নেই, চেকটা আবার মানিব্যাগে ভরতে ভরতে হাসলেন সাইমন। তোমরা আর আমি একই কেসে কাজ করছি।
আপনি মেকসিকোতেও গিয়েছিলেন, না? জানতে চাইল কিশোর।
হ্যাঁ। জালিয়াতদের ছাপাখানাটা খুঁজে বের করার জন্যে। মেকসিকান পুলিশের সহায়তায় বেরও করেছি, কিন্তু পালের গোদাটাকে ধরতে পারিনি। পালিয়েছে। আমার বিশ্বাস, আমেরিকায় ঢুকে পড়েছে ওরা।
ওখানে পুলিশের হাত থেকে আপনিই ছাড়িয়েছেন আমাদের।
হাসলেন ডিটেকটিভ। মাথা ঝাঁকালেন।
আমরা মেকসিকোতে আছি, পুলিশের হাতে ধরা পড়েছি, জানলেন কি করে? জিজ্ঞেস করল রবিন।
তোমাদের সেই স্টেশন মাস্টার কাপারিলো তোমাদেরকে ট্রেনে তুলে দিয়েই পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। পুলিশ আমাকে জানিয়েছে। একজন আমেরিকানের পেছনে আরও দু-জন আমেরিকান লেগেছে শুনে অবাক হয়েছিল ওরা। সন্দেহ হয়েছিল, আমি হয়তো কিছু জানতে পারি। তাই জানিয়েছে। চেহারার বর্ণনা শুনেই বুঝে গেলাম, তোমরা ছাড়া আর কেউ নয়। পুলিশকে নিয়ে ছুটলাম সেই নির্জন স্টেশনে। মরুভূমির মধ্যে খুঁজতে খুঁজতে নিতান্ত ভাগ্যক্রমেই আবিষ্কার করে ফেললাম জালিয়াতদের ছাপাখানা।
তারমানে না জেনেই আপনার কেসের সমাধানটাও আমরাই করে। দিলাম, হেসে বলল রবিন।
হা, অনেক সাহায্য করেছ তোমরা, স্বীকার করলেন সাইমন। মালগাড়িতে করে তোমাদের পিছু নেয়ার ব্যাপারটাও একটা সূত্র দিয়েছিল অমিকে। ভাবলাম, জালিয়াতদের সর্দারও ওই পথেই সীমান্ত পেরোনোর চেষ্টা করবে না তো? তক্ষুণি পুলিশকে সতর্ক করে দিলাম। বললাম, সীমান্তের কাছে যত ট্রেন থামে সব চেক করতে।
আপনি জানতেন, তাতে আমরাও ধরা পড়ব। বলে দিলেন, আমাদের ধরলেও যাতে ছেড়ে দেয়া হয়, তাই না?

আবার মাথা ঝাঁকালেন ডিটেকটিভ। ঠিকই আন্দাজ করেছ। বুঝে গিয়েছিলাম, মিস্টার লফারের খোঁজ তোমরা পেয়ে গেছ। তাঁর চিহ্ন অনুসরণ করেই এগিয়ে যাচ্ছ। তাই আমিও তোমাদের পিছু নিলাম। আমার সন্দেহ হয়েছিল, জালিয়াতদের সঙ্গে তাঁর কোন যোগাযোগ আছে। তোমরা তাঁকে খুঁজে বের করতে পারলে তিনি তখন আমাকে তাদের কাছে যাওয়ার পথ। দেখাতে পারবেন।

প্রেসটার ওপর নজর রেখেছে পুলিশ। কাউকে এখনও গ্রেপ্তার করেনি। জালিয়াতদের বুঝতেই দেয়া হয়নি যে ওটী আবিষ্কার হয়ে গেছে। জানলে সতর্ক হয়ে গা ঢাকা দিতে পারে রাঘব বোয়ালগুলো। ওদেরকে আগে ধরতে পারলে চুনোপুঁটিগুলোকে ধরা কিছু না। খবর পেয়েছি, আজ রাতে নতুন ছাপা অনেক জাল চেক আসবে একটা বিশেষ জায়গায়। সেখান থেকে ছড়িয়ে দেয়া হবে সারা আমেরিকায়।

বিশেষ জায়গাটা কোথায়, বোধহয় আন্দাজ করতে পারছি, কিশোর। বলল। নদীর ওপারে টিলার কাছে, যেখানে দানবীয় নকশা আঁকা আছে। ওখানে প্লেন থেকে ফেলে দেয়া হয় জাল চেকের বাণ্ডিল, নিচে লোক থাকে, তারা, ওগুলো নিয়ে নদীপথে ছড়িয়ে পড়ে, তুলে দেয় বিভিন্ন শহরের এজেন্টদের কাছে। তাই তো?

আমিও ঠিক একই অনুমান করেছি, সাইমন বললেন।

আজ রাতে ওদের ওপর হামলা চালানোর কথা ভাবছেন?

হ্যাঁ।

আপনি আসায় ভালই হলো। আমরাও আজ রাতে ওখানে গিয়ে পাহারা দেয়ার প্ল্যান করেছিলাম। কি ঘটছে জানতাম না। জানা থাকায় এখন সুবিধে হবে।

তাহলে আর বসে আছি কেন? উত্তেজিত হয়ে বলল মুসা। আমরা ছয়জন। লোক কম না। দু-চারজন হলে সহজেই কাবু করে ফেলতে পারব। নাকি পুলিশ নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবছেন?

না, মাথা নাড়লেন সাইমন। বেশি লোকের আনাগোনা হলে টের পেয়ে যাবে ডাকাতেরা। প্লেন থেকে চোখেও পড়ে যেতে পারে। চেকগুলো হয়তো তখন ফেলবেই না।

.

রাত আরেকটু বাড়তে তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়ল সবাই। মুসার নিয়ে আসা বোটটায় চড়ল।

নদীর ওপারে তারাখচিত আকাশের পটভূমিতে মাথা তুলে রেখেছে টিলার চূড়া। কালো, কেমন ভূতুড়ে দেখাচ্ছে।

বোটের হাল ধরেছে বল। ইঞ্জিনের শব্দ শুনলে ডাকাতরা হুঁশিয়ার হয়ে যেতে পারে এই ভয়ে সরাসরি না গিয়ে প্রথমে খানিকটা উজানে নিয়ে এল বোট। তারপর ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল। স্রোতের টানে ভাটির দিকে আপনাআপনি ভেসে চলল বোট। টিলার কাছাকাছি আসার পর নোঙর করল সে।
নিঃশব্দে মাটিতে নামল সবাই। পাড়ের ওপর উঠে এগিয়ে চলল সারি দিয়ে। বালি পার হয়ে এসে দাঁড়াল একশো ফুট উঁচু টিলার গোড়ায়। ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল ওপরে।
এদিকের মরুভূমি বলের অতি পরিচিত। রাতে চলতেও অসুবিধে হয় না। তাই নেতৃত্বটা সে-ই নিল। আগে আগে চলল।
এদিকের ঢাল বড় বেশি খাড়া। তার ওপর রয়েছে আলগা পাথর। পা, পড়লে আর রক্ষা নেই। পিছলে পড়তে হবে। কোন রকম শব্দও করা চলবে না, শত্রুদের কানে চলে যেতে পারে। সুতরাং গতি হয়ে গেল খুবই ধীর।
তবে অবশেষে চূড়র কাছে পৌঁছাল দলটা। মাথা তুলেই ঝট করে নামিয়ে ফেলল বল। ফিসফিস করে জানাল, চারটে ছায়ামূর্তিকে চোখে পড়েছে।
সাইমন বললেন, ভাগাভাগি হয়ে এগোতে হবে এবার।
কিশোর আর রবিন ডানে সরে গেল। সাবধানে উঠে এল মালভূমির মত সমতল চূড়াটায়। ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে বসল।
কিশোরের কাঁধে হাত রেখে আলতো চাপ দিল রবিন। নীরবে হাত তুলে দেখাল। তারার আলোতেও ঝোপের পাশের গুহামুখটা নজরে পড়ছে। আগের বার দিনের বেলা কেন নজরে পড়েনি বুঝতে অসুবিধে হলো না। মুখের অর্ধেকটা ঝোপের আড়ালে থাকে। বাকি অর্ধেকটায় পাথর চাপা দিয়ে রাখলে সহজে কারও চোখে পড়বে না। চোরাই মাল কিংবা জাল চেক লুকিয়ে রাখার চমৎকার জায়গী।
বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। একটা প্লেনের ইঞ্জিনের গুঞ্জন শোনা গেল।
একসঙ্গে জ্বলে উঠল অনেকগুলো আলো। আচমকা আলোকিত করে ফেলা হলো চুড়ার একাংশ। বৈদ্যুতিক লণ্ঠন জ্বেলে দানবীয় নকশাটার বাঁ হাতের ওপর দাঁড়িয়ে গেছে চারজন লোক। আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। একজনকে চিনতে পারল কিশোর–ডগলাস বর্ড, অন্য তিনজন অপরিচিত। না না, আরও একজনকে চেনা গেল। সবুজ মোটরবোট চুরি করেছিল যে লোকটা, পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছিল, এ সেই লোক।
উড়ে এল প্লেনটী। একটা আলোও জ্বালেনি। টিলার মাথায় চক্কর দিল দু বার। কালো আকাশের পটভূমিতে ভালমতই চোখে পড়ছে ওটাকে। হঠাৎ সাদাটে একখণ্ড ধোঁয়ার মত কি যেন ছিটকে বেরোল ওটা থেকে।
চিনে ফেলল কিশোর। প্যারাশুট!

সরে যেতে লাগল প্লেনটা। তারমানে ওটার কাজ শেষ, চলে যাচ্ছে এখন
নেমে আসছে প্যারাশুট। কোন মানুষ নেই। দড়িতে বাধা বড় প্যাকেটের মত একটা জিনিস ঝুলছে। দানবের গায়ের ওপর নামল ওটা। দোল খেয়ে বিশাল এক ছাতার মত ধসে পড়ল প্যারাশুটটা। ঘিরে ফেলল চার লণ্ঠনধারী। আলো নিভিয়ে ফেলেছে। প্যারাশুট থেকে প্যাকেটটা খুলতে ব্যস্ত হলো। আক্রমণ করার এটাই উপযুক্ত সুযোগ।
রবিনকে নিয়ে উঠে দৌড় দিল কিশোর। চোখের কোণ দিয়ে দেখল, আরও চারটে ছায়ামূর্তি বিভিন্ন দিক থেকে ছুটে আসছে।
এ রকম কোন পরিস্থিতির জন্যে তৈরি ছিল না ডাকাতেরা। চমকে গেল। ওরা আঘাত হানার আগেই ওদের ওপর এসে পড়ল আঘাত। পাল্টা আঘাত হানার সুযোগ পেল না তেমন। যোদ্ধা হিসেবেও ওরা ভাল না। কারাত জানা চার গোয়েন্দা, সেই সঙ্গে বাড়তি আরও দু-জন লোক, এতজনের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারল না। তাছাড়া সাইমনের কাছে রয়েছে পিস্তল।
কাবু করে ফেলা হলো চার ডাকাতকে।
হঠাৎ পাথর গড়ানোর শব্দ হলো। ঝট করে ঘুরে তাকাল মুসা। চোখে পড়ল দ্রুত ঢালের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে আরেকটা ছায়ামূর্তি। ডাকাতদের আরেকজন। ধরো, ধরো ব্যাটাকে! চিৎকার করে দৌড় দিল সে।
পালাতে পারল না লোকটা। ডাইভ দিয়ে তাকে নিয়ে মাটিতে পরল মুসা।
লোকটার মুখে টর্চের আলো ফেলতেই চমকে উঠল লফার, ব্রাউন!
হ্যাঁ, এই লোকটাই পালের গোদা, মিস্টার সাইমন বললেন। আপনার বন্ধু।
চারজনকে কাজে লাগিয়ে দিয়ে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে ছিল সে। প্লেনের দিকে নজর ছিল বলে প্রথমে আমাদের কাউকে চোখে পড়েনি। দলের চারজন লোককে আক্রান্ত হতে দেখে দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল সে। ওরা ধরা পড়ার পর পালাতে চেয়েছিল। কিন্তু সর্বনাশ করে দিল পাথরটা। ওটাতে লাথি লেগে শব্দ হয়ে গিয়েছিল। দেখে ফেলেছিল মুসা।
দড়ির অভাব নেই। প্যারাশুট থেকে দড়ি কেটে নিয়ে পাঁচজনকে শক্ত করে বেঁধে ফেলা হলো। ঝোপ আর পাথরের আড়ালে খুঁজে দেখা হলো আর কেউ লুকিয়ে আছে কিনা। না, আর কেউ নেই।
প্যারাশুটে করে নামিয়ে দেয়া প্যাকেটটা খুললেন সাইমন। বেরিয়ে পড়ল। নিখুঁত ভাবে বাণ্ডিল করা হাজার হাজার জাল চেক। ইউনাইটেড স্টেটস গভর্নমেন্টের নামে ছাপা।
যাক, প্রমাণ সহ হাতেনাতে ধরা পড়ল, সন্তুষ্ট হয়ে বললেন সাইমন। অস্বীকার আর করতে পারবে না কিছু।

একটা টর্চ হাতে উঠে দাঁড়াল কিশোর। বলল, আমার সঙ্গে আসুন। একটা জিনিস দেখাব।
ঝোপের ধারে গুহামুখটার কাছে সবাইকে নিয়ে এল সে। আলো ফেলে দেখে বোঝা গেল, গুহা নয়, বড় গর্ত। ভেতরে পাওয়া গেল দড়ির বাণ্ডিল, মাটি খোঁড়ার যন্ত্রপাতি, আর আরও এক বস্তা জাল চেক।
আঁতকে গেল মুসা। বাপরে বাপ, কত! সব বাজারে ছাড়তে পারলে সর্বনাশ হয়ে যেত!
আসল কাজ শেষ। এবার বন্দিদের নিয়ে যেতে হবে। সেটা একটা বড় সমস্যা। সমাধান দিল মুসা। সে আর বল বোট নিয়ে যাবে পুলিশকে খবর দিতে। অন্যেরা ততক্ষণ ওখানেই বসে পাহারা দেবে বন্দিদের।
মুসা আর বল চলে গেল।
লণ্ঠন জেলে বন্দিদের কাছে বসে রইল অন্য চারজন।
আমাকে পুলিশে দিলে লফারও বাঁচতে পারবে না, আচমকা পাতলা, নাকি গলায় বলে উঠল ব্রাউন। সে-ও আমাদের দলে ছিল।
না, ছিল না, জোর প্রতিবাদ করলেন সাইমন। তোমাদের ভয়ে বহুদিন ধরে পালিয়ে বেড়াচ্ছে সে।
তাতে কি? আমাদের সঙ্গে কাজ করার পর পালিয়েছে। আমার কাছ থেকে জাল চেক নিয়ে বাজারে ছেড়েছে। বিশ্বাস না হলে জিজ্ঞেস করে দেখুন।
বিষণ্ন স্বরে জবাব দিল লফার, ও ঠিক কথাই বলেছে। আদালতে দোষ স্বীকার করতে রাজি আছি আমি।
তা কেন করবেন? কিশোর বলল। আপনি তো আর ইচ্ছে করে। করেননি। প্রাণের ভয় দেখিয়ে আপনাকে করতে বাধ্য করা হয়েছে।
সেটা প্রমাণ করতে পারবে না সে, খিকখিক করে হাসল ব্রাউন। তবে জাল চেক দিয়ে যে জিনিস কিনেছে আমি প্রমাণ করতে পারব। কোন কোন দোকানে চেক ভাঙিয়েছে সে, মনে আছে আমার। ওরা সাক্ষ্য দেবে, চেকগুলো ব্রাউন ওদের দিয়েছে। পুলিশ আমার কিছুই করতে পারবে না। কারণ একটা চেকও আমি নিজের হাতে ভাঙাইনি। মরলে আর সবাই মরবে। আমার কিছুই হবে না।
খেপা কুকুরের মত দাঁত খিচাল বার্ড। ভীষণ রাগে চেঁচিয়ে উঠল, শয়তান! বদমাশ! তুমি নিজে ভাল থেকে আমাদের বিপদে ঠেলে দেয়ার ফন্দি করেছিলে! দাঁড়াও, আমিও ছাড়ব না! আমি সাক্ষ্য দেব, লফার নির্দোষ, তুমি। জোর করে ওকে দিয়ে বেআইনী কাজ করিয়েছ!
গুড, মাথা দোলালেন সাইমন, তাতে তোমার ভালই হবে। শাস্তির পরিমাণ কমবে। কি কি জানো তুমি, বলো তো?

বার্ড বলল, মাস চারেক আগে মরুভূমির ওপর দিয়ে প্লেনে করে ওড়ার সময় দানবীয় নকশাগুলো চোখে পড়ে আমাদের। একটা গুজব কানে এনেছিল ব্রাউনের, কোন একটা টিলার ওপরের একটা দানবের হাত গুপ্তধনের খনির দিকে নির্দেশ করে আছে। এই টিলার ওপরে দানবটা দেখতে পেয়ে সেই কথাই মনে পড়ল তার। আমাকে বলল সে-কথা। দুজনে মিলে তখন নানা জায়গায় খুঁড়তে আরম্ভ করলাম। তারপর সত্যি সত্যিই পেয়ে গেলাম লুকিয়ে রাখা সোনা।
সোনা! প্রতিধ্বনি করল যেন কিশোর। কোথায়? কোনখানে?
যে গর্তটা তোমরা দেখেছ একটু আগে। দানবের হাত নয়, একটা পা। নির্দেশ করছে গর্তটা।
কি ধরনের সোনা? জানতে চাইলেন সাইমন।
ইনডিয়ানদের সোনা। জানাজানি হলে খোয়াতে হতে পারে। তাই আমেরিকায় বিক্রি করার সাহস পেলাম না। নিয়ে গেলাম মেকসিকোয়। টাকাটা দু-জনে ভাগ করে নিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ব্রাউনের মাথায় একটা শয়তানি বুদ্ধি এল। সে বলল, এই টাকা খাঁটিয়ে আরও অনেক অনেক বেশি টাকা আমরা আয় করতে পারি।
বুদ্ধিটা কি?
সে বলল, একটা ছাপাখানা করতে পারি আমরা। সেটীতে জাল নোট আর চেক ছাপতে পারি। সারা আমেরিকায় সে-সব ছড়িয়ে দিয়ে কোটি কোটি টাকা আয় করব। রাজি হয়ে গেলাম। ছাপাখানা বসল। জাল চেক ছাপা হতে লাগল। প্লেনে করে সেগুলো বর্ডার পার করে এনে এই টিলায় নামানোর ব্যবস্থা হলো। নির্জন জায়গা এটা। রাতে তো দূরের কথা, দিনেও সাধারণত আসে না এখানে লোকে। ঠিক হলো, এখানে এনে জমা করে রাখা হবে চেকগুলো। তারপর ধীরে ধীরে চালান করে দেয়া হবে বিভিন্ন শহরে। বাতিগুলোসহ প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিস ওই গর্তে লুকিয়ে রাখতাম আমরা।
বুঝলাম, মাথা ঝাঁকাল কিশোর। কিন্তু লফার এর মধ্যে এলেন কি করে?
সেটাও ব্রাউনের আরেকটা কুবুদ্ধি, ঘৃণায় মুখ বাকলি বার্ড। তার ওপর যাতে পুলিশের নজর না পড়ে সেজন্যে একজন সৎ, ভাল মানুষকে সামনে রাখতে চেয়েছিল। ভেবেছিল, ব্যবসায় মার খেয়েছে লফার, এই সুযোগে ভুলিয়ে-ভালিয়ে তাকে দলে টানতে পারবে। পারল না। জোর করে তাকে দিয়ে কাজ করানোর চেষ্টা করল। কিন্তু কিছুই করতে পারল না। পালিয়ে গেল লফার। অনেক কিছু জেনে ফেলেছে ততদিনে সে। সুতরাং তার মুখ বন্ধ করাটা জরুরী। আমাকে পাঠাল রকি বীচে। ব্রাউন ভেবেছিল লফার তার মামার বাড়িতেই গিয়ে উঠেছে। গিয়ে জানলাম তার মামা ডিটেকটিভ ভিকটর সাইমনের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে

তার ভাগ্নেকে খুঁজে বের করে দেয়ার জন্যে। মোটর সাইকেল নিয়ে মিস্টার স্মিথের পিছে পিছে গেলাম সেখানে। সেখান থেকে স্যালভিজ ইয়ার্ডে।
মুসার মাথায় বাড়ি মেরেছিল কে? আপনি?
গম্ভীর হয়ে বলল বার্ড, হ্যাঁ। তাকে বেহুশ না করে ছবিগুলো আনা যেত না তার কাছ থেকে। ওঅর্কশপের দরজায় নোটটাও আমি রেখেছি। বললাম যখন, সব কথাই বলি। রকি বীচ থেকে একটা ভাড়া করা প্লেনে তোমাদের অনুসরণ করলাম আমি। স্যান বারনাডিনোতে ওই প্লেনটাই ধাক্কা মারতে যাচ্ছিল তোমাদের। পাইলটটা একটা গাধা। মদ খেয়ে মাতাল হয়ে থাকে। প্রথমে বুঝতে পারিনি, তাহলে তাকে নিতাম না। আরেকটু হলেই তোমাদেরও মেরেছিল, আমাকেও। যাই হোক, ব্লইদিতেও লফারের প্লেনে তোমাদের হুমকি দিয়ে নোট আমিই রেখেছিলাম। রাতের বেলা চুরি করে ঢুকেছিলাম হ্যাঁঙ্গারে।
নোট লিখতে গিয়ে তো রীতিমত কাণ্ড করেছেন। একবার আর্টিস্ট, একবার কবি! রবিন বলল। এ সব করতে গেলেন কেন?
ভাবলাম, খানিকটা অন্য রকম করে দিলে হুমকির গুরুত্ব বাড়বে।
তা বেড়েছে বটে, স্বীকার করল কিশোর। জানতে চাইল, তিন মেকসিকানকে আমাদের পেছনে আপনারাই লাগিয়েছিলেন, তাই না?
হ্যাঁ। আফসোস করে বলল বার্ড, ইস্, সোনাগুলো পাওয়ার পর ব্রাউনের কথা কেন যে শুনলাম! অত লোভ না করে আমার ভাগের টাকাটা নিয়ে নিলেই হত...।
আচ্ছা, আরেকটা কথা। মরুভূমিতে একটা দামী পাথর কুড়িয়ে পেয়েছি। আমরা। ওটা সম্পর্কে কিছু জানেন নাকি?
দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইল বার্ড। ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল। নাহ্, পাথরের ব্যাপারে কিছু জানি না আমরা। তবে পর্বতের ওদিকে পাথর খুঁজতে যায় অনেকে। নিয়ে আসার সময় হয়তো ওদেরই কারও কাছ থেকে কোনভাবে পড়ে গেছে ওটা।
হু, বিড়বিড় করল কিশোর, তাই হবে!
পুলিশ নিয়ে মুসাদের ফিরতে অনেক সময় লাগল।
বন্দিদের নিয়ে চলে গেল পুলিশ। তাদের সঙ্গে গেলেন সাইমন। লফারও গেল। সমস্যা মিটে যেতেই বাড়ি যাওয়ার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে।
কেবিনে ফিরে চলল তিন গোয়েন্দা। সঙ্গে ওয়ারনার বল।
রাত আর বেশি বাকি নেই।

ভলিউম ৩৫ – মৃত্যুঘড়ি – তিন গোয়েন্দা – রকিব হাসান

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৬

ইয়ার্ডের গেট দিয়ে বেরোতে যাবে এই সময় কিশোরের সামনে এসে দাঁড়ালেন ভদ্রলোক। লম্বা, বেশ ভালো স্বাস্থ্য। রিমলেস চশমার ভেতর দিয়ে তাকালেন ওর দিকে।

বসে থাকতে ভাল লাগছিল না। তাই ঘুরতে বেরোচ্ছিল তিন গোয়েন্দা। সঙ্গে ওদের বন্ধু টমাস মার্টিন। পাহাড়ের দিকটায় ঘুরতে যাওয়ার ইচ্ছে।

তুমি নিশ্চয় কিশোর পাশা? হাত বাড়িয়ে দিলেন ভদ্রলোক। আমি অ্যালেক্স ককার। ব্যাংকে কাজ করি। মিস্টার ভিকটর সাইমন তোমাদের কাছে পাঠিয়েছেন। কথা বলার সময় হবে?

হবে, আসুন।

অ্যালেক্স ককরিডেনাল কিশোর। বে? ছ ককারকে এনে ওঅর্কশপে বসাল কিশোর। in কোন রকম ভূমিকার মধ্যে গেলেন না তিনি। বললেন, একটা বিশেষ কাজে এসেছি। মিস্টার সাইমনের কাছে গিয়েছিলাম। তার সময় নেই। বললেন, তোমরা আমাকে সাহায্য করতে পারবে।

বলুন কি করতে পারি?

পোশাক দেখে তো মনে হচ্ছে ঘুরতে যাচ্ছি। কাউকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ককার বললেন, এক কাজ করতে পারো, ম্যানিলা রোডের দিকে চলে যাও। বন্দর পেরিয়ে গিয়ে মোড় নিলেই ম্যানিলা রিভার। নদীর কিনার ধরে বনের মধ্যে ঢুকে যেয়ো।

কেন? কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইল কিলোর।

রিভেরা হাউসটা পেয়ে যাবে। অনেক পুরানো বাড়ি। নাম শুনেছ?

শুনেছি, মাথা ঝাঁকাল রবিন। পাথরে তৈরি। টালির ছাত। মেইন রোড থেকে অনেকখানি ভেতরে। বহুদিন ধরে ওখানে কেউ বাস করে না।

কার কাছে শুনলে?

বাবার কাছে। আমার বাবা সাংবাদিক।

ও। ঘুরতে গেলে ওদিকটায় একবার ঘুরে এসো।

কেন? আবার প্রশ্ন করল কিশোর।

একটা রহস্য দিতে পারব। আগে দেখে এসে। তারপর কথা। এখন যাই। পরে আসব আবার।

ওদেরকে একটা ধাঁধার মধ্যে রেখে বেরিয়ে গেলেন ককার। গেটের বাইরে গাড়ি রেখেছেন। তাতে চেপে চলে গেলেন।

গোয়েন্দারাও রওনা হলো আবার। বন্দর পার হয়ে এসে কিছুদূর এগোতে ম্যানিলা রিভারের ওপরের ব্রিজটা চোখে পড়ল। মোড় নিয়ে দ্রুত এগোল সেদিকে। নদীর ধার ধরে এগোতে এগোতে আইভি লতায় ছাওয়া পাথরের দেয়াল চোখে পড়ল। ঘন হয়ে জন্মানো ছোট ছোট গাছপালা প্রায় আড়াল করে রেখেছে দেয়ালটা। ফাঁক দিয়ে একআধটু চোখে পড়ে ছাতের টালি।
ওটাই রিভেরা হাউস, রবিন বলল।
যদ্দুর জানি, বাড়ির মালিক বুড়ো রিভেরা মারা যাওয়ার পর আর কেউ বাস করতে আসেনি, টম বলল। বুড়ো নাকি আজব লোক ছিল।
থমকে দাঁড়াল মুসা। আজব মানে? মরেটরে ভূত হয়নি তো আবার!
আরে দূর! হাত নেড়ে মুসার কথাকে উড়িয়ে দিল কিশোর। চলো, ঢুকে দেখি কি আছে? কেন আসতে বললেন ককার, জানতে হবে।
মিনমিন করে আরেকবার আপত্তি জানাল মুসা। কিন্তু তিনজনের চাপে আপত্তি টিকল না তার।
মেইন গেটটা খোলা। অবাক লাগল ওদের। আরও অবাক হলো, যখন ড্রাইভওয়েতে গাড়ির চাকার দাগ দেখতে পেল।
সামনের বিশাল ধূসর অট্টালিকাটার দিকে তাকিয়ে সাবধানে ড্রাইভওয়ে ধরে এগোল চারজনে। দুই ধারে ঘন হয়ে জন্মেছে গাছ আর ঝোপঝাড়। নীরবতার মধ্যে হঠাৎ শোনা গেল ভারি গলায় ডাক, অ্যাই, দাঁড়াও!
পুলিশের পোশাক পরা এক লোক বেরিয়ে এল গাছের আড়াল থেকে। মাথার হেলমেট বলে দিল মোটর সাইকেল নিয়ে এসেছে, মোটর সাইকেল পেট্রলম্যান। চেনে ওকে ছেলেরা। রকি বীচ থানার অফিসার, মরিস ডুবয়।
কি ব্যাপার, ডুবয়, আপনি এখানে? জানতে চাইল রবিন।
চোর তাড়া করে এসেছি। বন্দরে ইদানীং বড় বেশি চোরের উৎপতি হচ্ছে। ম্যানিলা রোড ধরে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ দেখি কালো রঙের বিরাট একটা লিমুজিন গাড়ি ছুটে আসছে। গতি না কমিয়ে এত জোরে মোড় ঘুরল, সন্দেহ হলো আমার। পিছু নিলাম।
ধরতে পারেননি?
না, পালাল।
ওদের সঙ্গে এগোল অফিসার ডুবয়। বাড়ির সদর দরজার সামনে মোটর সাইকেলটা রাখা। তাতে চেপে স্টার্ট দিল। বিকট গর্জন করে উঠল শক্তিশালী ইঞ্জিন। ফিরে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, তোমরা কি ভেবে এখানে?
ঘুরতে, জবাব দিল কিশোর।
কেস? হাসল অফিসার।

হতে পারে। এখনও জানি না। ফিরে গেলে বোঝা যাবে। বাড়িটী সম্পর্কে কিছু জানেন নাকি?
ক্লাচ চেপে গিয়ার দিল ডুবয়। তেমন কিছু না। অনেক দিন থেকে খালি পড়ে আছে, ব্যস, এটুকুই। গেটটা খোলা পেয়ে অবাকই লাগল। মনে হলো এ বাড়িতেই ঢুকে পড়ল কালো গাড়িটা। তবে কোথাও দেখতে পেলাম না। চোখের ভুল ছিল বোধহয়। চলি।
যান। গেট আমরা বন্ধ করে দিয়ে যাব।
ক্লাচ ছাড়তেই লাফ দিয়ে আগে বাড়ল মোটর বাইক। বেরিয়ে গেল ডুবয়। ধীরে ধীরে কমে গেল ইঞ্জিনের শব্দ। স্তব্ধ নীরবতা যেন গ্রাস করল ছেলেদের।

.
পরিত্যক্ত বাড়ির ড্রাইভওয়েতে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে টম বলল, বাড়িটার কিন্তু কোন বদনাম শুনিনি কখনও! আড়চোখে মুসার দিকে তাকাল সে। কক্ষনো কেউ বলেনি এখানে ভূতের উপদ্রব আছে!
মুসাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে তাড়াতাড়ি কিশোর বলল, এসো, ঘুরে দেখি। ককারের কথায় মনে হলো অদ্ভুত কিছু ঘটছে এখানে। রবিন, তুমি আর টম দরজা-জানালাগুলো দেখো; বন্ধ, নাকি খোলা। আমি আর মুসা চারপাশটা দেখব।
আলাদা হয়ে গেল ওরা। বিশাল বাড়িটার পেছনে চলে এল কিশোর আর মুসা।
নিচের দিকে চোখ পড়তে আচমকা থেমে গেল কিশোর। মুসা, দেখো!
কি? ঘন হয়ে জন্মানো ঘাসের দিকে তাকিয়ে কিছু দেখতে পেল না মুসা।
লম্বা ঘাসের ডগা সরিয়ে মাটি দেখাল কিশোর। এইবার দেখেছ? পায়ের ছাপ। কাল রাতে এসেছিল এখানে কেউ। হেঁটেছিল। দেখছ না, ঘাসের ডগা ভাঙা? শিশির পড়ে মাটি ভিজে নরম হয়ে গিয়েছিল তখন।
খাইছে, কিশোর, তোমার ওগুলো চোখ না, এক্স-রে মেশিন!
মুসার কথার জবাব না দিয়ে পায়ের ছাপ অনুসরণ করে এগোতে শুরু করল কিশোর। চত্বর পেরিয়ে চলে এল ঘন গাছের জটলার দিকে। নদীর দিকে চলে গেছে পায়ে চলা পথ। পায়ের ছাপ সেদিকেই গেছে।
মাছ ধরতে এসেছিল বোধহয় কেউ, অনুমান করল মুসা।
কি জানি! কথাটা ঠিক মেনে নিতে পারল না কিশোর।
ঘুরতে ঘুরতে এসে একখানে মিলিত হলো আবার চারজনে।
কিছু পেলে? রবিনকে জিজ্ঞেস করল কিশোর।
সমস্ত দরজা-জানালা বন্ধ। সামনের দরজার তালায় আঁচড়ের দাগ। দেখলাম। অন্ধকারে কেউ খোলার চেষ্টা করেছিল মনে হয়।

পায়ের ছাপের কথা জানাল কিশোর। মাথা নেড়ে বলল, তেমন কিছু পেলাম না। এতে বোধহয় সন্তুষ্ট করা যাবে না মিস্টার ককারকে।
আর কি দেখাতে চেয়েছিলেন তিনি? টমের প্রশ্ন।
বুড়ো রিভিয়েরার ভূত, হেসে বলল টম।
দূর, ওসব অলক্ষুণে কথা বোলো না তো! হাত নেড়ে বলল মুসা। আমি আর দাঁড়াতে পারছি না। খিদেয় পা কাঁপছে।
হেসে ফেলল সবাই।
পাথরের বাড়িটার দিকে তাকিয়ে আনমনে বিড়বিড় করল রবিন, এতবড় বাড়ি, এত পুরানো, খালি পড়ে আছে ভাবতে পারছি না। এই মুহূর্তে ভেতর থেকে কেউ গোপনে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে জানলেও অবাক হব না।
হ্যাঁ, একমত হলো কিশোর। পায়ের ছাপ আর তালায় আঁচড়ের দাগকে উড়িয়ে দিতে পারছি না। নিশ্চয় কোন মানে আছে এ সবের। ককারকে বলব। দেখি, কি বলেন।
মাথার ওপরের শূন্য, কালো জানালাটার দিকে তাকিয়ে অস্বস্তি দেখা দিল মুসার চোখে। দেখো, এ সব শুনতে একটুও ভাল লাগছে না আমার। আমি গেলাম!
গেটের দিকে হাঁটা দিল সে। হেসে তার পিছু নিল টম আর রবিন। কিশোরও চলল, তবে সে চিন্তিত। হাসিতে যোগ দিতে পারছে না। নিশ্চিত হয়ে গেছে, কোন রহস্য আছে বাড়িটীর। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখন ককারের সঙ্গে কথা বলতে চায়। বাড়ি ফিরেই যোগাযোগ করতে হবে।
বাইরে এসে গেটটা লাগিয়ে দিল সে। চাবি নেই, তালা দিতে পারল না।
ম্যানিলা রোডে ফিরে এল ওরা। ঝলমলে উজ্জ্বল রোদ।
ওরকম একটা পোড়ো বাড়ির প্রতি আগ্রহী হলেন কেন ককারের মত একজন ব্যাংকার? রবিনের মাথা থেকেও ভাবনাটা যাচ্ছে না।
বাবারে, ওসব কথা বাদ দাও না এখন! বাধা দিল মুসা। খাওয়ার জন্যে বসার জায়গা দেখো।
খোঁচা দিল টম, খাওয়ার পর ঘুমের জায়গা লাগবে না?
দেখো, ইয়ার্কি মেরো না। খাওয়া ছাড়া কেউ বাঁচতে পেরেছে? ঘুম ছাড়া কারও শরীরের ক্ষয় পূরণ হয়েছে?
তা হয়নি। তবে তোমার পূরণটা আজকাল একটু বেশিই হচ্ছে। বয়েসের তুলনায় দৈত্য।
জবাব দিল না মুসা। চারপাশে তাকিয়ে জায়গা খুঁজতে শুরু করেছে তার চোখ। রিভেরা এস্টেট পেছনে ফেলে এসেছে। ডানে উঠে গেছে ঘন বনে ছাওয়া পাহাড়ের ঢাল। বায়ে গমের খেত, শস্য কাটার পর খড়গুলো এখন রোদে শুকিয়ে

বাদামী হয়ে গেছে। খেতের প্রান্তে বিশাল এক ওক গাছ ডালপালা ছড়িয়ে ছায়া ফেলেছে, লোভ দেখাচ্ছে যেন ওদের।
জায়গা পাওয়া গেছে, হতি তুলে দেখলি মুসা। প্রথমে খাওয়া, তারপর ঘুম।
মাথা নাড়ল টম, ওখানে হবে না।
কেন? ভুরু কোঁচকাল মুসা।
পানি নেই।
তাই তো! সুতরাং পানির জন্যে আরও আধঘণ্টা হাঁটতে হলো ওদের। পাহাড় থেকে নেমে আসা ঝর্নাটা চোখে পড়ল মুসার। সবুজ তৃণভূমির মাঝখান দিয়ে বয়ে যাচ্ছে টলটলে পানির নহর।
আহ, দারুণ!
দারুণ তো বুঝলাম, রবিন বলল, বসবে কোথায়? ছায়ার তো চিহ্নও নেই এখানে।
দুর! খালি বাগড়া দেয়! গুঙিয়ে উঠল মুসা। কিন্তু ছায়া না থাকলে যে বসা যাবে না, মনে মনে এ কথাটা সে-ও স্বীকার করল।
আবার হাঁটতে হলো। দুই ধারে চেপে আসতে শুরু করল বন। ছোট একটা খাড়ির ধার দিয়ে গেছে পথ। ওপর থেকে গর্তে ঝরে পড়ছে ঝর্না।
খুশি হলো মুসা। বসার এত চমৎকার জায়গা আর পাওয়া যাবে না। গাছের ছায়া আছে, রোদ আছে, পানিও আছে। আর কি চাই!
বসে পড়ল ওরা। ব্যাগ খুলে ডিম আর মুরগীর মাংসের পুর দেয়া স্যাণ্ডউইচ বের করল মুসা। আর আছে আপেলের জেলি, চকোলেট কেক এবং ফ্লাস্ক ভর্তি বরফ মেশানো দুধ।
খাওয়ার জন্যে মুসাই তাগাদা দিয়েছে বেশি। কিন্তু খেতে বসে আবিষ্কার করল অন্য তিনজন, ওদেরও খিদে পেয়েছে ভীষণ। দেখতে দেখতে সাবাড় করে ফেলল সমস্ত খাবার। ঝর্না থেকে পানি খেয়ে এসে গাছের ছায়ায় যার যে ভাবে ইচ্ছে শুয়ে পড়ল।
চিত হয়ে শুয়ে আকাশ দেখছে কিশোর। গাছের ডালে শিস দিচ্ছে একটা। নাম না জানা পাখি। আরেকটা ছোট আকারের সবুজ পাখি ডাল থেকে মাঝে মাঝেই শূন্যে ঝাঁপ দিয়ে পোকা শিকার করছে। ফড়িং উড়ছে নানা রঙের।
আহ্, এই তো জীবন! আবেশে চোখ মুদে এল তার।

.

ঘুমিয়ে পড়েছিল বলে বাড়ি ফিরতে দেরি হয়ে গেল ওদের।
রকি বীচে ফিরে মুসা আর টম চলে গেল বেসবল প্র্যাকটিস করতে। রবিন আর কিশোর ইয়ার্ডে ফিরে এল।
মেরিচাচী জানালেন, মিস্টার ককার এসে বসে আছেন অনেকক্ষণ।

রবিন আর কিশোর বসার ঘরে ঢুকে দেখল অস্থির হয়ে পায়চারি করছেন তিনি। সাড়া পেয়ে ফিরে তাকালেন। এবারও কোন ভূমিকা না করে জিজ্ঞেস করলেন, কি দেখে এলে?
কিশোর বলল, গিয়ে দেখি গেট খোলা। চোর তাড়া করে ভেতরে ঢুকেছে একজন পুলিশ অফিসার। সে বেরিয়ে যাওয়ার পর পায়ের ছাপ দেখতে পেয়েছি...
পায়ের ছাপ! বাধা দিলেন ককার, কখন এসেছিল লোকটা?
রাতে কোন সময়, শিশির পড়ার পর।
কিন্তু গেট! কাল রাতে বেরোনোর সময় নিজের হাতে তালা লাগিয়েছি। আমি!
যেন বিদ্যুতের শক খেয়ে ঝট করে সোজা হয়ে বসল দুই গোয়েন্দা।
আপনি লাগিয়েছেন? প্রশ্ন করল অবাক রবিন।
হ্যাঁ। কারণ বাড়িটার মালিক এখন আমি।
আপনি! আরও অবাক হলো রবিন।
হা। কাল অন্ধকার হওয়ার আগ পর্যন্ত ওখানে ছিলাম আমি। তোমাদের কথা শুনে বোঝা যাচ্ছে, আরও কেউ ছিল ওখানে। কিংবা আমি আসার পর ঢুকেছিল। আমার ওপর হামলা চালানোর জন্যেও হতে পারে।
মিস্টার কুকার, হাত তুলল কিশোর, আশা করি আমাদের ওপর। আপনার বিশ্বাস জন্মেছে?
ভুরু কোচকালেন ককার। অবিশ্বাস করেছি কি করে বুঝলে?
এটুকু না বুঝলে আর এতদিন গোয়েন্দাগিরি করতে পারতাম না, এত কেসের সমাধান করতে পারতাম না। আপনি আসলে ভিকটর সাইমনের কথা বিশ্বাস করে আমাদের ওপর আস্থা রাখতে পারেননি। সেজন্যে সকালে সব কথা না বলে শুধু বাড়িটা দেখে আসার কথা বলেছেন। বুঝতে চেয়েছেন, আমাদের দিয়ে আপনার কাজ হবে কিনা। পরীক্ষা তো করলেন, কি মনে হলো, হবে?
মাথা ঝাঁকালেন ককার, হবে।
তাহলে আর অন্ধকারে না রেখে সব খুলে বলুন।
সোফায় নড়েচড়ে আরাম করে বসলেন ককার। বললেন, খামখেয়ালী লোক ছিলেন ফ্রান্সিস রিভেরা, হয়তো জানেনা। রকি বীচ লাইব্রেরিকে দান করে গেছেন তার এস্টেট। লাইব্রেরির কাছ থেকে কিছুদিন আগে বাড়িটা কিনেছি আমি। কিছু মেরামত-টেরামত করিয়ে নিয়ে পরে বেশি দামে বিক্রি করে লাভ করার আশায়। কেনার পর বাড়িটা ভাল করে দেখতে গিয়ে একটা অদ্ভুত জিনিস লক্ষ করলাম।
সামনে গলা বাড়িয়ে দিল রবিন, কি?

তিনতলায় একটা গুপ্তঘর। বিল্ডিঙটার ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় তৈরি। হয়েছে ওটা। রীতিমত একটা ব্যাংকের ভল্ট যেন। অগ্নিনিরোধক, কোন, জানালা নেই। গোপন ভেন্টিলেটরের সাহায্যে বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা। একমাত্র দরজার পাল্লাটা তৈরি হয়েছে খুব ভারি করে ইস্পাত দিয়ে। বন্ধ করার জন্যে টাইম লক লাগানো আছে।

ওরকম একটা ঘর কি কাজে লাগত রিভেরার?

খামখেয়ালী, বললামই তো, মাথায় ছিট, মৃদু হাসলেন ব্যাংকার। ব্যাংককে বিশ্বাস করে না, এ রকম বহু লোক আছে, তিনিও তাদের একজন। দামী জিনিসপত্র ওই গুপ্তঘরে রাখতেন। নিজেকে লুকিয়ে রাখার জায়গা হিসেবেও ব্যবহার করতেন ঘরটাকে। দামী জিনিস লুকানো আছে কিনা। দেখার জন্যে অনেক খোঁজাখুজি করেছি আমি ওখানে, পাইনি। রিভেরার এক বিশ্বস্ত চাকর সমস্ত জিনিস তুলে দিয়েছে লাইব্রেরি কর্তৃপক্ষের হাতে।

তা দিক, আমার মাথাব্যথা নেই। আমি কেবল বাড়িটা কিনেছি। তা-ও বসবাসের জন্যে নয়, ব্যবসা করার জন্যে। তবে গুপ্তঘরটা খুব পছন্দ হয়েছে। আমার। রিভেরার মতই ওখানে গিয়ে মাঝে মাঝে নিজেকে লুকিয়ে ফেলি। নিশ্চিন্তে, নির্বিঘ্নে কাজ করার এত চমৎকার জায়গা আর হয় না। নিজের ব্যক্তিগত অফিস বানিয়েছি ঘরটাকে।

জটিল হিসেব-নিকেশের কাজ করতে হলে এখন ওখানে গিয়ে ঢুকি আমি। ছোট একটা টেবিল, একটা কম্পিউটার আর কিছু ফাইলপত্র রেখে দিয়েছি। ঘর থেকে বেরোনোর সময় টাইম লক সেট করে দিই। তারপর আর কেউই, এমনকি আমিও নির্দিষ্ট সময়ের আগে আর ঢুকতে পারি না। ঠিক যতটায় সময় সেট করা থাকে কাঁটায় কাঁটায় ততটীয় খোলে তালাটা, তার আগে কিছুতেই নয়।

জানি, এতক্ষণে কথা বলল কিশোর, টাইম লকের এটাই বিশেষত্ব। নির্দিষ্ট সময়ে তালা খুলে যাওয়ার আগে কেউ ঢুকতে পারে না।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালেন ব্যাংকার। কিন্তু আমি যদি বলি আমার অনুপস্থিতিতে কেউ ওঘরে ঢুকেছিল, একবার নয়, একাধিকবার, তাহলে?

তালাটা নষ্ট না তো? রবিনের প্রশ্ন।

মোটেও না। একদম ঠিক। ভালমত পরীক্ষা করে দেখেছি আমি।

তারমানে আপনি চাইছেন, কিশোর বলল, ঘরটার তদন্ত করি আমরা? কি করে কে ঢুকল, বের করি?

মাথা ঝাঁকালেন ককার। হ্যাঁ। যখন-তখন ওবাড়ির যে কোন ঘরে ঢোকার জন্যে তোমাদের ডুপ্লিকেট চাবি বানিয়ে দেব... বলবেন কি বলবেন না, দ্বিধা করতে

করতে বলেই ফেললেন, আরেকটা ব্যাপার, কতখানি গুরুত্ব দেব বুঝতে পারছি না…আমার প্রাণ নাশের হুমকিও দিতে আরম্ভ করেছে!
কোথায়? কখন? প্রায় চেঁচিয়ে উঠল রবিন।
গম্ভীর মুখে মানিব্যাগ থেকে ভাজ করে রাখা দুই টুকরো কাগজ বের করলেন ককার। একটা দিলেন রবিনকে, আরেকটা কিশোরকে।
রবিন আগে খুলল। পেন্সিলে লেখা রয়েছে:
চিরকালের জন্যে এই বাড়ি ছাড়ো
নইলে কপালে মরণ আছে।
অন্য কাগজটা পড়ল কিশোর:
ঘড়ি যখন টিক টিক করবে
তখন আসবে মরণ!
মুখ তুলে তাকাল সে, কি বলতে চায়?
সেটা জানার জন্যেই ভাল গোয়েন্দা দরকার আমার, ককার বললেন। কাগজগুলো কোথায় পেয়েছি আন্দাজ করতে পারো?
গুপ্তঘরে, সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল কিশোর।
অবাক হয়ে গেলেন ককার, কি করে বুঝলে?
স্রেফ অনুমান। ওখানে পেয়েছেন বলেই এতটা উদ্বিগ্ন হয়েছেন। তা ছাড়া বললেনই তো, আপনার অবর্তমানে লোক ঢুকেছে ওঘরে।
কখন পেয়েছেন এগুলো? জানতে চাইল রবিন।
তোমার হাতেরটা চারদিন আগে। আর অন্যটা কাল রাত আটটায়। সেজন্যেই এসেছিলাম আজ সকালে, ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ব্যাংকারের চেহারা। বললে কাল রাতে বাড়িতে ঢুকেছিল কেউ, তারমানে আমাকে খুন করতে এসেছিল!
ভ্রূকুটি করল কিশোর। হু, যে লিখেছে সে সব জানে–আপনি কখন থাকেন না থাকেন। প্রতিশোধ নিতে চায় এমন কোন শত্রু আছে আপনার?
যদ্দুর জানি, নেই। শত্রু তৈরি হয় এমন কোন কাজ করি না আমি।
আগের প্রসঙ্গে এল রবিন, মিস্টার ককরি, ঘরে ঢোকার অন্য কোন পথ নেই তো? দেয়ালগুলো ভালমত দেখেছেন?
দেখেছি। কিছুই নেই। আমার জিনিসপত্র আর একটা ফায়ারপ্লেস বাদে ঘরে অন্য কোন জিনিসও নেই। চিমনির মুখে শিক লাগানো। তা ছাড়া চিমনির নলটী এত সরু, মানুষ ঢুকতে পারবে না।
কাগজ তো ফেলতে পারে?
মাথা নাড়লেন ককরি। তা পারে। তাহলে পাওয়া যেত চিমনির তলায়। কিন্তু পেয়েছি ঘরের মাঝখানে, কার্পেটের ওপর।

আপনি ছাড়া ঘরটার কথা আর কে জানে? জিজ্ঞেস করল কিশোর। তালাটা খুলতে জানে আর কেউ?
ঘরটার কথাই কাউকে বলিনি। সুতরাং তালার কথা জানার প্রশ্নই ওঠে না। রিভেরার চাকরও নেই যে সে বলে দেবে।
হু। আমরা আপনাকে সাহায্য করব। একটা কাজ করলে কি অসুবিধে হবে– আমরা আপনাকে ঢুকতে না বলা পর্যন্ত ওবাড়ি থেকে দূরে থাকতে পারবেন?
পারব। ঠিক আছে, আজ উঠি। চাবি তৈরি হয়ে গেলে তোমাদের জানাব।
ককার বেরিয়ে যাওয়ার পর ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করতে লাগল দুই গোয়েন্দা।
রবিন বলল, আজব কাণ্ড! টাইম লক লাগানো থাকলে দরজা খোলা অসম্ভব। ঢুকল কোন পথে? নিশ্চয় অন্য কোন পথ আছে।
আজ রাতেই দেখতে যাব রিভেরা হাউসে। তুমি বাড়িতে ফোন করে দাও। বলো ফিরতে দেরি হবে।

.

অন্ধকার নামলে বেরিয়ে পড়ল দুজনে। রবিনের ফোক্স ওয়াগেন গাড়িটা নিল। মুসাদের বাড়িতে পার্টি হচ্ছে। সে যেতে পারল না। পার্টিতে ওদের যেতে বলেছিল সে, কেন যাওয়া হবে না খুলে বলেছে কিশোর। আর কিছু বলেনি মুসা। চাপাচাপি করেনি। জানে, কিশোরের কাছে কেসের তদন্ত, সবার আগে, সেটা বাদ দিয়ে দাওয়তি খেতে যাবে না।
রিভেরা হাউস থেকে বেশ কিছুটা দূরে গাড়ি রাখল রবিন। বাকি পথ হেঁটে যাবে ওরা। ভেতরে কেউ থেকে থাকলে ইঞ্জিনের শব্দে যাতে সতর্ক হতে না পারে।
হেঁটে এগোল ওরা।
বিশাল গেটটা খোলা। আকাশে মেঘ করেছে। ঢাকা পড়েছে চাঁদ। বাতাস গরম, আঠা আঠা।
থমকে দাঁড়াল কিশোর। সকাল বেলা আমি লাগিয়ে গিয়েছিলাম। তারপর কেউ ঢুকেছে। হয়তো আছে এখনও।
ড্রাইভওয়ের দিকে নজর রাখতে পারে। অন্য কোনখান দিয়ে ঢেকি উচিত।
দেয়ালের ধার ধরে ঘুরে একটা ঘন জংলা জায়গায় চলে এল ওরা।
শক্ত একটা লতা ধরে টান দিয়ে কতটা শক্ত দেখতে দেখতে রবিন বলল, টপকানো কঠিন হবে না। বেয়ে উঠে যাওয়া যাবে।
নিরাশ করল তাকে কিশোর। দেয়ালের ওপর ভাঙা কাচ বসানো। সকালে দেখেছি। সহজে ঢোকার ব্যবস্থা রাখেননি ফ্রান্সিস রিভেরা।
তাহলে?

খুজতে হবে।
দেয়ালের ধার ঘেঁষে বড় গাছ তেমন নেই। খুঁজে খুঁজে অবশেষে পাওয়া গেল একটা। তার একটা ডাল দেয়ালের ওপর দিয়ে চলে গেছে অন্যপাশে, বাড়ির ভেতরে।
গাছে উঠে ডাল বেয়ে কাচ এড়িয়ে অন্যপাশে চলে আসতে পারল দুজনে। ডাল ধরে ঝুলে পড়ল। মাটি বেশি নিচে না। হাত ছেড়ে দিতে নিরাপদেই নামল মাটিতে।
বিদ্যুৎ চমকাল। গুড়গুড় শব্দ হলো আকাশে। গুঁড়ি মেরে বাড়ির সামনের খোলা জায়গায় চলে এল ওরা।
আবার বিদ্যুৎ চমকাল। বিকট শব্দে বাজ পড়ল। গাছের পাতায় প্রচণ্ড আলোড়ন তুলে বয়ে গেল এক ঝলক ঝোড়ো হাওয়া। ঝড় আসতে দেরি নেই।
খপ করে রবিনের হাত চেপে ধরল কিশোর। শুনছ! দৌড়ানোর শব্দ!
কান খাড়া করে রইল দুজনে। বাতাস, বজ্রপাত, গাছের পাতায় বৃষ্টির শব্দের মাঝেও পায়ের শব্দ কানে আসতে লাগল ওদের। ডালে পা পড়ে মট করে ভাঙল, জুতোতে ঠোকা লেগে গড়িয়ে সরে গেল একটা পাথর, শুনতে পেল ওরা।
বিদ্যুতের আলোয় লম্বা একজন মানুষকে বারান্দার দিকে ছুটে যেতে দেখা গেল। বারান্দায় উঠে সামান্য নুয়ে দরজার তালায় চাবি ঢোকাল। খোলার জন্যে।
ককরি! ফিসফিস করে বলল রবিন।
তুমি শিওর! তাকে তো আসতে মানা করেছিলাম।
দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে গেল লোকটা।
বৃষ্টির বেগ বেড়েছে। গাছের নিচে দাঁড়িয়ে জানালার দিকে তাকিয়ে। আছে দুই গোয়েন্দা, আলো জ্বলার অপেক্ষায়।
কিন্তু জ্বলল না।
ককার হলে আলো জলছেন না কেন? অধৈর্য স্বরে বিড়বিড় করল রবিন। কারও দেখে ফেলার ভয়ে? বাড়িটা যদি তারই হয়, ভয় কিসের?
হয়তো ককার নয়।
তাঁর মতই তে লাগল। একই রকম শরীর-স্বাস্থ্য। গাড়ির শব্দ কিন্তু শুনলাম না। তারমানে আমরা আসার আগেই ঢুকেছেন।
গুপ্তঘরে চলে গেছেন হয়তো!
কিংবা তার কিছু হয়েছে। হুমকি দিয়ে নোট লিখেছে যে লোক, সে হয়তো ঘাপটি মেরে ছিল ভেতরে, তারই অপেক্ষায়।
চলো, দেখি।
দরজার দিকে দৌড় দিল দুজনে।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল কিশোর। দাঁড়াও! লোকটা ককার না-ও হতে পারে। অন্য কেউ হতে পারে। ঢোকার সময় লোকটাকে মোটেও অস্থির মনে হয়নি। অথচ ককরি যখন আমাদের সঙ্গে কথা বলেছেন, খুব নার্ভাস মনে হয়েছে তাকে। দাঁড়াও, দেখি আর কিছুক্ষণ।
ঝোপের ধারে লুকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল দুজনে। মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। বিদ্যুতের আলোয় লাগছে রূপালী চাদরের মত।
রবিন বলল, আবার পায়ের শব্দ শুনলাম মনে হলো!
কান পেতে থাকতে থাকতে হঠাৎ একটা বড় ঘরের জানালায় আলো জ্বলতে দেখল ওরা।
এসো, দেখব, উঠে দাঁড়াল কিশোর।
মাথা নিচু করে একছুটে সামনের খোলা জায়গাটুকু পেরোল ওরা। মাথায় আর পিঠে আঘাত হানছে বড় বড় ফোঁটা। ভিজে চুপচুপে হয়ে গেছে।
জানালার কাছে পৌঁছে গেল দুজনে। এখানে গীয়ে বৃষ্টি লাগে না। ঘর থেকে কেউ দেখতেও পাবে না ওদের। আরেকটা ছোট জানালার কাছে সরে এল।
জানালাটা অনেক ওপরে। দুই হাতের আঙুলের ফাঁকে আঙুল ঢুকিয়ে পেটের ওপর রেখে মইয়ের ধাপ তৈরি করল কিশোর। তাতে পা রেখে উঠে দাঁড়াল রবিন। জানালা দিয়ে ভেতরে উঁকি দিল।
কি দেখছ? ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল কিশোর।
একটা লিভিং রুম। কাপড়ে মোড়া আসবাব, প্যানেল করা দেয়াল, ঝাড়বাতি। মানুষ নেই।
তাহলে আলো জ্বালল কে?
সুইচ হয়তো অন করাই ছিল। কারেন্ট চলে গিয়েছিল। আবীর এসেছে। আপনাআপনি জ্বলেছে আলোটা।
আর কি আছে?
ভারি দরজা। এককোণে অনেক বড় একটা ঘড়ি, গ্র্যাণ্ডফাদার কুক। সামনের দিকে পুরোটা কাঁচে ঢাকা। পিতলের বিরাট পেণ্ডুলাম। এখান থেকেও টিক টিক শুনতে পাচ্ছি।
টিক টিক? রবিনের ভারে আস্তে আস্তে সামনের দিকে ঝুঁকে যাচ্ছে। কিশোর। খালি বাড়িতে ঘড়ি চলছে!
রবিনেরও মনে পড়ে গেল নোটটার কথা:
ঘড়ি যখন টিক টিক করবে
তখন আসবে মরণ!
তুমি নামো, আমি দেখি, কিশোর বলল।

লাফ দিয়ে নামল রবিন।
একই ভাবে তার হাতে ভর দিয়ে উঠে গেল কিশোর।
কে চালাল ঘড়িটা? দেখতে দেখতে বলল সে। নিজের হাতঘড়ির সঙ্গে সময় মিলিয়ে নিল। একেবারে সঠিক সময়।
দপ করে ঘরের আলো নিভে গেল। আবার ঢেকে গেল অন্ধকারে। ঠিক একই সময়ে ঝিলিক দিয়ে উঠল তীব্র আলো। বজ্রপাতের বিকট শব্দ হলো।
পরক্ষণে শোনা গেল রক্ত-হিম-করা তীক্ষ্ণ চিৎকার।

.
চিৎকার থামতেই কাঠের বারান্দায় শোনা গেল পদশব্দ। পলকের জন্যে দেখা গেল একটা ছায়ামূর্তিকে। লাফ দিয়ে বাগানে নেমে লাফাতে লাফাতে চলে গেল ড্রাইভওয়ের দিকে।
ধরো! ধরো! বলে চিৎকার দিয়েই পিছু নিল কিশোর।
সে ড্রাইভওয়েতে ওঠার আগেই গাছের আড়ালে হারিয়ে গেল মূর্তিটা। তার জুতোর শব্দ কানে আসছে।
কিশোরকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেছে রবিন। লোকটাকে দেখতে পেল আবার। গতি বাড়াল সে।
ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সামনের লোকটা। ছুটতে পারছে না আর তেমন। ধরে ফেলল রবিন।
আবার বিদ্যুৎ চমকাল।
ভীত-সন্ত্রস্ত, পরিচিত মুখটা দেখে বিস্ময়ের সীমা রইল না ওদের।
এ কি! ডুডলি হ্যারিস! মস্ত ধনী। দামী ছবি আর শিল্পকর্ম সংগ্রহের বাতিক আছে। পগিলাটে স্বভাবের জন্যে রকি বীচে অনেকেই চেনে তাকে। তিন গোয়েন্দার সঙ্গে ভাল খাতির। এই লোক এখানে কি করছে?
রবিন আর কিশোরকে চিনতে পারলেন তিনিও। স্বস্তিতে ঢিল করে দিলেন শরীর। তোমরা!
আপনি এখানে কি করছেন, মিস্টার হ্যারিস? জিজ্ঞেস করল রবিন।
প্রশ্নের জবাব না দিয়ে হ্যারিস বললেন, কিশোর, আমাকে বাড়ি নিয়ে চলো, প্লীজ! থরথর করে কেঁপে উঠলেন তিনি। পরিশ্রম, উত্তেজনা এবং এই বৃষ্টিতে ভেজা সইতে পারছেন না আর বুড়ো শরীরে। উফ, কি সাংঘাতিক...কি জঘন্য চিৎকার...।
ধরে ধরে তাকে নিয়ে চলল কিশোর আর রবিন।
গাড়িটা কোথায়, দেখিয়ে দিলেন হ্যারিস। ম্যানিলা রিভার রোডের ধারে একটা বড় ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রেখেছেন। পুরানো মডেলের বিরাট গাড়ি। কাঁপা

হাতে দরজা খোলার চেষ্টা করলেন।
বাধা দিল কিশোর, মিস্টার হ্যারিস, কি হয়েছে না বলেই চলে যাবেন? বললে হয়তো কিছু করতে পারতাম।
অসাধু কোন কিছুতে জড়িত নন হ্যারিস, এ ব্যাপারে নিশ্চিত সে।
কিন্তু প্রলাপের মত বকেই চললেন তিনি, কি সাংঘাতিক...বাপরে বাপ...আসা একেবারেই উচিত হয়নি আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে ভুল করেছি...আসলে পান্নাগুলো চুরি হয়ে গেল তো...
কিশোরের দিকে ঝুঁকে নিচু স্বরে বলল রবিন, নিশ্চয় তার পান্নার জিনিসগুলোর কিছু হয়েছে। কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে বলার মত অবস্থাই নেই তাঁর।
গাড়ি চালাতে পারবেন কিনা তাতেও সন্দেহ আছে।
চিৎকার কে করেছে সেটাও কিন্তু জানা হয়নি, মনে করিয়ে দিল রবিন। মিস্টার ককার এখনও বাড়ির ভেতরে।
আমি যাচ্ছি দেখতে। এক কাজ করো, তুমি গাড়ি চালিয়ে তাকে নিয়ে আমাদের বাড়িতে চলে যাও। দেখছ না কি রকম কাঁপছেন। সেবা দরকার। চাচী আছে, চিন্তা নেই। আমি বাড়ির ভেতরটা দেখে তোমার গাড়িটা নিয়ে চলে আসব।
প্রায় চ্যাংদোলা করে হ্যারিসকে গাড়িতে তুলে দিল দুজনে। ইঞ্জিন স্টার্ট দিল রবিন। ততক্ষণে প্রবল বৃষ্টির মধ্যেই বাড়ির সদর দরজার দিকে দৌড়াতে আরম্ভ করেছে কিশোর।
ঘরগুলো সব অন্ধকার। সামনের দিকের একটা জানালায় দাঁড়িয়ে ভেতরে উঁকি দিল। কিছু দেখা যায় না। সদর দরজার পিতলের ঘণ্টাটা। বাজাল। কেউ সাড়া দিল না।
দরজায় থাবা দিয়ে ককীরের নাম ধরে ডাকল।
জবাব নেই।
নব ঘুরিয়ে খুলতে গিয়ে দেখল, ঘোরে না। তালা লাগানো।
দ্রুত হেঁটে ঘুরে বাড়ির পেছন দিকে চলে এল সে। পেছনের দরজা বন্ধ, সেলারের দরজা বন্ধ। কোনখান দিয়ে ঢোকার উপায় নেই। চিৎকার করে বার বার ককারের নাম ধরে ডেকেও সাড়া পেল না। বাড়িটা তেমনি অন্ধকার, নীরব হয়ে আছে।
কাজ হবে না। ঢুকতে পারবে না যে, বুঝতে পারল কিশোর। কি আর করা। নিরাশ হয়ে গাড়ির দিকে ফিরে চলল সে।
রবিন ওদিকে গাড়ির স্পীড তুলতে ভয় পাচ্ছে। হ্যারিস ধনী হলে হবে কি, ভীষণ কিপটে, গাড়িটাই তার প্রমাণ। পুরানো গাড়ি। গতি বাড়াতে গেলেই প্রতিবাদ শুরু করে ইঞ্জিন। বাধ্য হয়ে গতি কম রাখতে হলো তাকে।

অবশেষে ইয়ার্ডে পৌঁছল সে। নিচতলার ঘরগুলোতে আলো জ্বলছে। তারমানে জেগে আছেন মেরিচাচা, এবং নিচেই আছেন।
গাড়ির শব্দে দরজা খুলে বারান্দায় বেরিয়ে এলেন চাচী। বিধ্বস্ত হ্যারিসকে নিয়ে রবিনকে নামতে দেখে আঁতকে উঠলেন, মাই গড! তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন সাহায্য করার জন্যে।
রাশেদ পাশা ওপরের বেডরুমে চলে গেছেন। তাঁকে ডাকার প্রয়োজন হলো না। রবিন আর মেরিচাচীই ধরে ধরে হ্যারিসকে রান্নাঘরে নিয়ে এল। চেয়ারে বসিয়ে দেয়া হলো।
বড় তোয়ালে আর রাশেদ পাশার শার্ট-পাজামা এনে দিলেন রবিনের হাতে চাচী। বললেন, তুমি গা মুছে দাও। আমি কফি বানাচ্ছি।
চুলায় কেটলির পানি ফুটতে আরম্ভ করলে রবিনের দিকে ফিরে তাকালেন তিনি, কিশোর কোথায়? দুজনে তো দেখলাম একসঙ্গে বেরোলে।
যেন তার কথার জবাব দিতেই ঝটকা দিয়ে খুলে গেল দরজা। ভেতরে এসে দাঁড়াল কিশোর। টপটপ করে পানি পড়ছে ভেজা শার্ট থেকে।
চলে এসেছ! কিশোরকে এত তাড়াতাড়ি আশা করেনি রবিন।
হ্যাঁ। ঢুকতে পারলাম না। অনেক ডাকাডাকি করলাম, জবাবও দিল না কেউ। অহেতুক থেকে আর কি করব।
ঝড়ের গতিতে গাড়ি চালিয়েছ নিশ্চয়। আমি অবশ্য জোরে চালাতে পারছিলাম না, আড়চোখে হ্যারিসের দিকে তাকাল রবিন। শুকনো পোশাক পরে চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়েছেন তিনি।
দীর্ঘ একটা মুহূর্ত একবার রবিন, একবার কিশোরের মুখের দিকে তাকাতে লাগলেন মেরিচাচী। হঠাৎ করেই যেন মনে পড়ল, ওহহো, ভুলেই গিয়েছিলাম। মিস্টার ককীর এসে বসে আছেন তোদের জন্যে।
হাঁ হয়ে গেল দুই গোয়েন্দা। ভুরু কুঁচকে গেল কিশোরের। হ্যারিসের দায়িত্ব চাচীর ওপর দিয়ে বসার ঘরে এসে ঢুকল ওরা।

.

মিস্টার ককার, রবিন জিজ্ঞেস করল, আপনি ভাল আছেন!
আছি। কেন, না থাকার কোন কারণ ঘটেছে? প্রশ্ন করলেন ব্যাংকার।
আসলে জানতে চাইছিলাম, এত তাড়াতাড়ি এলেন কি করে এখানে, কিশোর বলল।
কি বলছ বুঝতে পারছি না! তাড়াহুড়া করতে যাব কেন? তাড়াহুড়া করা আমার স্বভাব নয়। যা করি ধীরেসুস্থেই করি। এমনকি জরুরী অবস্থায়ও তাড়াহুড়া করি না।

আপনাকে কিন্তু রিভেরা হাউস থেকে বেরোতে দেখিনি। পথেও আপনার গাড়ি আমাদের গাড়িকে ওভারটেক করতে দেখিনি। এলেন কি করে?
রিভেরা হাউস! ভুরু কোঁচকালেন ককার। ওখানে যাব কেন? গত দেড়টি ঘণ্টা ধরে তোমাদের অপেক্ষায় বসে থেকে থেকে বিরক্ত হয়ে গেছি। মিসেস পাশা বলতে পারলেন না তোমরা কোথায় গেছ। ওদের ভেজা কাপড়ের দিকে তাকিয়ে দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল তার, এত ভিজলে কি করে?
আপনার কেসের তদন্ত করতে গিয়ে, ককারের রুক্ষ ব্যবহার রাগিয়ে দিল রবিনকে। সেটা প্রকাশ করল না। রিভেরা হাউসে ঢুকেছিলাম। অন্ধকারে অবিকল আপনার মত দেখতে একজনকে ঢুকতে দেখলাম। একটু পর একটা আলো জ্বলে উঠে কিছুক্ষণ থেকে নিভে গেল। পরক্ষণেই কে যেন চিৎকার করে উঠল। আমরা ভাবলাম আপনাকে খুন করে ফেলা হচ্ছে। একজন লোক ছুটে বেরোল। তাকে তাড়া করলাম। ধরে নিয়ে এসেছি এখানে।
হাঁ হয়ে গেছেন ব্যাংকার। দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার রাগ বেমালুম উবে গেল। নরম হয়ে বললেন, আমি যাইনি তো। তোমরা না বললে ওবাড়ি থেকে দূরে থাকতে। তাই তো রয়েছি।
আপনি তাহলে এলেন কোত্থেকে?
সোজা ব্যাংক থেকে। বেশি কাজ থাকলে অফিস আওয়ারের পরেও কাজ করি আমি।
এইবার গোয়েন্দাদের অবাক হওয়ার পালা। পরস্পরের দিকে তাকাল ওরা।
এই সময় হ্যারিসকে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন মেরিচাচী। অনেকখানি সুস্থ হয়ে উঠেছেন ভদ্রলোক।
ককারকে দেখেই চটে উঠলেন হ্যারিস। তুমি! বলেই লাফ দিয়ে এগিয়ে গেলেন বিস্মিত ব্যাংকারের গলা টিপে ধরতে। চোর কোথাকার! আমার পান্নাগুলো কি করেছ! জলদি ফেরত দাও!
তাকে আটকে ফেলল কিশোর আর রবিন।
আবার রেগে গেলেন ককার। ভারি গলায় বললেন, আপনি যে-ই হোন, শান্ত হোন। কথাবার্তা সাবধানে বলবেন। মানহানীর কেস করে দিলে বিপদে পড়বেন কিন্তু।
এত সুন্দর জিনিসগুলো চুরি হয়ে গেল আমার! পান্না কেটে তৈরি করা এত সুন্দর সুন্দর পুতুল! রবিন আর কিশোরের দিকে তাকিয়ে ককিয়ে উঠলেন হ্যারিস। ফেরত দিতে বলো ওকে।
আপনার পুতুল আমি নিতে যাব কেন? গর্জে উঠলেন ককার। আর একবার এ কথা উচ্চারণ করলে পুলিশকে ফোন করব আমি!

আহ্, কি পাগলামি শুরু করলেন আপনি, হ্যারিস! কঠিন হয়ে উঠল মেরিচাচীর দৃষ্টি। শান্ত হয়ে বসুন। কি হয়েছে, খুলে বলুন সব।
চেয়ারে বসলেন হ্যারিস। ককারকে দেখিয়ে বললেন, এর মত দেখতে একজন লোক এসে হাজির বাড়িতে। পান্নার তৈরি আমার দুর্লভ সংগ্রহগুলো দেখতে চাইল। বলল, তার কাছেও কিছু জিনিস আছে। আমারগুলো দেখলে নাকি বলতে পারবে ওগুলো আমি কিনতে আগ্রহী হব কিনা। বের করে আনলাম। আমি তখন বাড়িতে একা…
ম্যাগি কোথায়? জিজ্ঞেস করলেন চাচী। ম্যাগি হলো হ্যারিসের বোন। মেরিচাচীর বান্ধবী।
বেড়াতে গেছে, জানালেন হ্যারিস। লোকটা আমার জিনিসগুলো দেখার পর জানতে চাইল আর আছে কিনা। গিয়ে আলমারি খুলে সবচেয়ে দামী জিনিসটা বের করলাম, পান্নার তৈরি একটা দাবার বোর্ড, অনেক টাকা দাম। ওটা নিয়ে ফিরে এসে দেখি লোকটাও নেই, আমার পুতুলগুলোও গায়েব!
ছুটে বেরোলাম। দেখি, একটা বড় গাড়িতে উঠছে সে। আমার গাড়িটা ড্রাইভওয়েতেই ছিল। তাড়াতাড়ি নেমে গিয়ে তার পিছু নিলাম। কিন্তু তার গাড়ির সঙ্গে তাল রাখতে পারলাম না। ম্যানিলা রিভার রোডে গাড়িটা ঢুকতে দেখলাম। তারপর দেখলাম একটা বাড়ির বিরাট গেট দিয়ে ঢুকে যেতে। ঝোপের আড়ালে গাড়ি রেখে কয়েক মিনিট অপেক্ষা করে আমিও ঢুকলাম সেই বাড়িতে। গাড়িটী দেখলাম না, তবে একটু পর লোকটাকে দেখলাম ঘরে ঢুকতে। তার পেছন পেছন আমিও ঢুকে পড়লাম ভেতরে।
সাংঘাতিক ঝুঁকি নিয়েছিলেন, কিশোর বলল, বুঝতে পারেননি!
বুঝব না কেন? আসলে এতটা রেগে গিয়েছিলাম চোরের ওপর, হিতাহিত জ্ঞান ছিল না। তা ছাড়া জিনিসগুলো ফেরত নেয়ার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছিলাম। যাই হোক, একটা হলঘরে ঢুকলাম। সামনের একটা ঘরে আলো জ্বলছিল। চুপিসারে এগোলাম সেদিকে। হঠাৎ আলো নিভে গেল। ঠিক আমার পেছনে হলো চিৎকারটা!
সে-কথা মনে পড়তেই কেঁপে উঠলেন হ্যারিস। এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, আর দাঁড়ানোর সাহস হলো না, ঝেড়ে দৌড় মারলাম। কোন দিকে যাচ্ছি তা-ও খেয়াল ছিল না। পেছনে পায়ের শব্দ শুনে মনে করলাম খুনীটা আমারই পিছু নিয়েছে। আরও জোরে দৌড়াতে লাগলাম। ধরা পড়ার পর দেখলাম, খুনীটা নয়, তোমরা।
ব্যাংকারের দিকে তাকাল কিশোর। মিস্টার ককার, মনে হচ্ছে, আপনার মত একই চেহারার আরও একজন আছে, যে মিস্টার হ্যারিসের পান্নাগুলো চুরি করে

নিয়ে গেছে। লোকটার চেহারা ভালমত দেখেছেন?
না, স্পষ্ট দেখতে পারিনি। মাথায় বড় হ্যাট পরেছিল। এখন বুঝতে পারছি, ইচ্ছে করে মুখের ওপর হ্যাট টেনে দিয়ে ছায়া ফেলে রেখেছিল। আমার দিকে তাকায়নি ঠিক মত। চেহারা দেখতে দিচ্ছিল না।
এর অর্থ, মিস্টার ককারের শরীরের সঙ্গে তার মিল দেখে চালাকি করে নিজেকে ককার বলে চালিয়ে দিতে চাইছে। রিভেরা হাউসে লোকে ঢুকতে দেখলে মনে করবে মিস্টার ককারই ঢুকছেন। সন্দেহ করে কিছু জিজ্ঞেস করতে আসবে না।
শুনতে একটুও ভাল লাগছে না আমার! মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন। ককার, বিপদে ফেলে দেবে দেখছি আমাকে! আজ হ্যারিস আমাকে দেখে চোর ভেবেছেন, আরেকদিন আরেকজনে ভুল করবে না, একটা ব্যবস্থা করা দরকার।
পুলিশকে জানাচ্ছি, টেলিফোন করতে উঠল কিশোর।
লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন ককার। বাধা দিলেন, না না, আমার কেসের ব্যাপারটা গোপন রাখতে চাই!
আপনার রহস্যের কথা কিছু বলব না। কেবল মিস্টার হ্যারিসের বাড়িতে চুরির কথাটা জানাব।
কয়েক মিনিট পর রিসিভার রেখে ফিরে এসে জানাল কিশোর, পুলিশ চীফ ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্লেচারকেই পেয়েছে। তিনি বলেছেন রিভেরা হাউসে লোক পাঠাবেন তদন্ত করতে। প্রয়োজনে রাতে পাহারার ব্যবস্থাও করবেন।
কিশোরকে হ্যারিসের কাছ থেকে দূরে একপাশে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে ককার বললেন, তদন্ত করে কি উন্নতি হয়েছে জানতে এসেছিলাম। কাল বিকেল পাঁচটায় রিভেরা হাউসে দেখা কোরো। গুপ্তঘরের দরজার টাইম লক তখন তোমাদের সামনে সেট করে দেব।
যাব।
কথা শেষ করে ব্যাংকার বেরিয়ে যেতেই হ্যারিস বললেন বাড়ি যাবেন। এখনও দুর্বল। একা যেতে পারবেন না বলে সন্দেহ হলো মেরিচাচীর। কিশোর আর রবিনকে বললেন বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসতে।
আপত্তি তো নেইই ওদের, বরং যেতে উৎসাহী, দেখে আসতে পারবে। কোনখান থেকে কি ভাবে পান্নাগুলো নিয়ে গেছে চোর।
হ্যারিসের গাড়িটা চালাল রবিন। পাহাড়ের কোলে পাথরের তৈরি হ্যারিসের বাড়িটা চেনে সে।
কিশোরও চেনে। রবিনের ফোক্স ওয়াগেন নিয়ে সে আসছে পেছন পেছন। হ্যারিসকে পৌঁছে দিয়ে ফেরত যেতে হবে ওদেরকে, গাড়িটা লাগবে তখন।

গেট দিয়ে ড্রাইভওয়েতে ঢুকতে চোখে পড়ল রবিনের, সদর দরজা হাঁ হয়ে খুলে আছে। আলো জ্বলছে ভেতরে।
আরি! চমকে উঠলেন হ্যারিস। খোলা রেখেই চলে গিয়েছিলাম! তাড়াহুড়োয় দরজা আটকে যেতেও মনে ছিল না!
রবিন গাড়ি থামাতেই দরজা খুলে নেমে পড়লেন তিনি। টলোমলো পায়ে যতটা সম্ভব দ্রুত এগিয়ে গেলেন দরজার দিকে।
গাড়ি রেখে কিশোর আর রবিনও তার পিছু নিল।
লাইব্রেরিতে ঢুকেই থমকে দাঁড়ালেন হ্যারিস। চিৎকার করে উঠলেন, হায় হায়, আমার দাবার বোর্ডটাও নেই! বুক চেপে ধরলেন তিনি। টেবিলেই ছিল! গেছে ওটাও!

.

ধরে তাকে চেয়ারে বসিয়ে দিল রবিন। গেলাসে করে পানি এনে দিল। কিশোর গেল ডাক্তারকে ফোন করতে।
ডাক্তার আসতে আসতে তদন্তটা সেরে ফেলতে চাইল সে। হ্যারিসের কাছে রবিনকে বসিয়ে রেখে যে ঘরে আলমারিটা আছে সে-ঘরে এসে ঢুকল। দেখা শেষ করে ফিরে আসতে কয়েক মিনিটের বেশি লাগল না।
চোখ বুজে আছেন হ্যারিস। খুললেন না। কিশোরের সাড়া পেয়ে বললেন, পান্নার বাকি জিনিসগুলো আলমারিতে আছে।
রবিনের দিকে তাকিয়ে নীরবে মাথা ঝাঁকাল কিশোর। ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল, কিছুই নেই আলমারিতে। সাফ করে নিয়ে গেছে। রবিনকে সরিয়ে এনে ফিসফিস করে বলল, চুপ থাকো। ডাক্তার আসার আগে হ্যারিসকে বলার দরকার নেই।
আবার ফোন করতে গেল কিশোর। এবার থানায়। ইয়ান ফ্লেচারকেই পাওয়া গেল।
আমার মনে হয় দ্বিতীয় চুরিটাও প্রথমটার ওপর ভিত্তি করেই হয়েছে, কিশোর বলল। সাজানো ঘটনা। প্ল্যান করে চুরি করতে এসেছিল চোর। মিথ্যে কথা বলে ভজিয়ে-ভাজিয়ে মিস্টার হ্যারিসকে দিয়ে আলমারির তালা খোলায়। প্রথমে কয়েকটা পুতুল নিয়ে আসেন তিনি। সেগুলো দেখার পর তাকে দাবার বোর্ডটা আনতে পাঠায় চোর। তিনি সেটা আনতে গেলে পুতুলগুলো নিয়ে সে বেরিয়ে যায়। সে জানত, মিস্টার হ্যারিস পিছু নেবেন। চালাকি করে তাঁকে টেনে নিয়ে যায় রিভেরা হাউসে। মিস্টার হ্যারিসের বাড়ি তখন পুরোপুরি খালি। সেই সুযোগে চোরের কোন সহযোগী এসে দাবার। বোর্ড আর আলমারিতে রাখা অন্যান্য জিনিস নিয়ে কেটে পড়ে।

চীফ বললেন, আমার বিশ্বাস, যারা বন্দরে উৎপাত করছে, এটাও সেই চোরদেরই কাজ। কদিন ধরে খুব জ্বালাচ্ছে ওরা। জেটিতে ভেড়ানো জাহাজ, বন্দরের গুদাম, যেখানেই সুযোগ পাচ্ছে, চুরি করছে। কোনমতেই ধরা যাচ্ছে না ব্যাটাদের। একটা কালো গাড়িতে করে চলাফেরা করত ওরা। পুলিশ জেনে ফেলেছে বুঝে সেটীও আর ব্যবহার করছে না।
মাল সরাচ্ছে কোথায়?
বুঝতে পারছি না। কড়া নজর রেখেছি আমরা। চোরাই মাল বাজারে এলেই খপ করে ধরব। কিন্তু আসছে না। তারমানে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে ফেলছে ওরা। পরে পরিস্থিতি ঠাণ্ডা হলে বের করবে।
জরুরী কিছু জানতে পারলে চীফকে জানাবে, কথা দিয়ে রিসিভার রেখে দিল কিশোর।
ডাক্তার এলেন। হ্যারিসকে দেখেটেখে বললেন, চিন্তার কিছু নেই। কয়েক দিন বিশ্রাম নিলেই সেরে যাবেন। বেশি উত্তেজনায় এমন হয়েছে। তোমাদের আর থাকার দরকার নেই। বাড়ি যেতে পারো।
ওষুধ দিয়ে ডাক্তার চলে গেলেন।
আলমারিও যে ফাঁকা করে দিয়ে গেছে চোর, এ কথা আর হ্যারিসকে বলল না কিশোর। শুনলে আবার কি করে বসেন ঠিক নেই। ওষুধ দেয়া হয়েছে। ঘুমাক। সকালে উঠে নিজেই যা দেখার দেখবেন।
রবিনকে নিয়ে বেরিয়ে এল কিশোর। বাড়ি ফিরে চলল।
অনেক রাত হয়েছে। ইয়ার্ডে ওদের বাড়িতেই রবিনকে থেকে যেতে বলল কিশোর। রবিনও রাজি হয়ে গেল। বাড়িতে ফোন করে দিলেই হবে, মা আর চিন্তা করবেন না।
পরদিন সকালে নাস্তা সেরেই বেরিয়ে পড়ল দুই গোয়েন্দা। প্রথমে যাবে। থানায়। আগের রাতে রিভেরা হাউসে পুলিশ কিছু পেল কিনা জানার জন্যে।
অফিসেই পাওয়া গেল ফ্লেচারকে। জানালেন, রিভেরা হাউসে নতুন কিছু পাওয়া যায়নি। তবে বন্দরে বেশ কয়েকটা ঘটনা ঘটেছে। একটা স্পীড বোটের মালিক জানিয়েছে, তার বোটটা চুরি করে কেউ ব্যবহার করেছে। ঘাটে রেখে যাবার সময় ওটার পেট্রল ট্যাংক ভরা ছিল, ফিরে এসে দেখে প্রায় খালি। বোটের ইঞ্জিনও গরম। অথচ বহুক্ষণ ওটা চালায়নি সে। তারমানে কেউ চালিয়েছে।
দ্বিতীয় ঘটনাটা হলো, হিরন নামে আরেকটা মোটর বোট চুরি করে নিয়ে। পালাচ্ছিল দুজন লোক। একজন বেটে, আরেকজন লম্বা। কোস্ট গার্ডের নজরে পড়ে যায় সেটা। তাড়া করে। ম্যানিলা রিভারের মুখের কাছে গিয়ে ডুবো পাথরে

ঘষা লেগে ডুবে যায় বোটটা। সাঁতরে তীরে উঠে জঙ্গলে ঢুকে পড়ে দুই চোর। আর ওদেরকে ধরা যায়নি।
আর তৃতীয় ঘটনাটা হলো, সী কিং নামে একটা জাহাজে ক্যাপ্টেনের কেবিনে চোর ঢুকেছিল। জাহাজটার মালিক স্টার লাইট শিপ কোম্পানি।
কি নিয়েছে? জানতে চাইল কিশোর।
মৃদু হাসলেন চীফ। শুনলে চমকে যাবে। একটা পান্না বসানো দামী হার। স্ত্রীর জন্যে কিনে রেখেছিলেন ক্যাপ্টেন টমার।
সত্যিই চমকাল দুই গোয়েন্দা। খবরটা হজম করতে সময় লাগল ওদের। তারপর কিশোর বলল, মিলে যাচ্ছে। ডুডলি হ্যারিসের বাড়ি থেকেও পান্নার তৈরি জিনিসই চুরি গেছে।
মাথা ঝাঁকালেন চীফ, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে দুই দুইটা চুরি। পান্নার ওপরই লোভ ওদের। একই দলের কাজ বলেই মনে হয়।
ক্যাপ্টেন টমার এখন কোথায়? তাঁর সঙ্গে কথা বলা যাবে?
লস অ্যাঞ্জেলেসে গেছেন। কোম্পানির হেড অফিসে, কথা বলতে। কাল নাগাদ ফিরে আসবেন।
একটার সঙ্গে আরেকটার যোগসূত্র দেখতে পাচ্ছি, চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল রবিন। বন্দরের চোরদের সঙ্গে মিস্টার হ্যারিসের বাড়িতে চুরির মিল, আবার মিস্টার হ্যারিসের সঙ্গে রিভের হাউসের যোগাযোগ। সব যেন একই সুতোয় বাঁধা।
আবার মাথা ঝাঁকালেন চীফ, সে-রকমই মনে হচ্ছে।
কিশোর বলল, বোট ব্যবহার করে শুনে মনে হচ্ছে, জলপথে পালায় চোরেরা। রিভেরা হাউসের পেছন দিয়েই বইছে ম্যানিলা নদী। বন্দর থেকে চোরাই মাল নিয়ে বোটে করে সোজা চলে যায় রিভেরা এস্টেটে। সেখানে কোনখান থেকে গাড়িতে পাচার করে দেয় মাল।
ঠিক! উত্তেজিত হয়ে উঠল রবিন। সেজন্যেই হদিস করতে পারছে না পুলিশ!
চীফের দিকে তাকাল কিশোর, আজ বিকেল পাঁচটায় রিভেরা হাউসে যাব আমি আর রবিন। জরুরী কিছু পেলে আপনাকে জানাব।
.
সাড়ে চারটায় রওনা হলো দুজনে। বাড়িতে কাজ থাকায় সেদিনও ওদের সঙ্গে যেতে পারল না মুসা।
এস্টেটে পৌঁছে রাস্তার ধারে একটা ঝোপের পাশে গাড়ি রাখল রবিন। আগের রাতে ডুডলি হ্যারিসও এখানেই রেখেছিল।
ভারি কাঠের গেটটার কাছে এসে শিস দিয়ে উঠল কিশোর। কাল রাতে খোলা দেখে গিয়েছিলাম..

এখন খোলা, এই তো? রবিন বলল, কাল রাতে তুমি চুরির কথা বলার। পর পুলিশ এসেছিল হয়তো, ওরাই লাগিয়ে রেখে গেছে।
কিন্তু সন্তুষ্ট হতে পারল না কিশোর।
সাবধানে ভেতরে ঢুকল দুজনে।
বাড়ির পেছনের পায়ের ছাপগুলো আরেকবার দেখব, কিশোর বলল। এই গেটের ব্যাপারটা ভাল্লাগছে না আমার। খোলা রেখে গেলে দেখি লাগানো, লাগানো দেখলে থাকে বন্ধ। নিশ্চয় কারও যাতায়াত আছে।
প্রথমবার যেখানে পায়ের ছাপগুলো দেখেছিল, সেখানে চলে এল সে। মাটির দিকে তাকাল।
দেখো, নতুন ছাপ। অনেকগুলো। এই কটা দেখো, বেশি দেবেছে। তারমানে লোকটার ওজন বেশি।
এগুলো কালকেরগুলো না বলছ? রবিনের প্রশ্ন।
রাতে অনেক বৃষ্টি হয়েছে। আগের ছাপ থাকার কথা নয়। বৃষ্টির পরে পড়েছে এগুলো।
ছাপ অনুসরণ করে নদীর ধারে চলে এল ওরা। এখানে নদীটা বেশ চওড়া।
মিনিটখানেক পর ড্রাইভওয়েতে একটা গাড়ি ঢোকার শব্দ শোনা গেল।
মনে হয় ককার এসেছেন, রবিন বলল। অন্য কেউও হতে পারে। লুকিয়ে পড়া দরকার।
ঘন গাছপালার আড়ালে আড়ালে এগোল ওরা। কিছুদূর এগোনোর পর বাড়ির বারান্দাটা চোখে পড়ল।
লম্বা, হালকা রঙের স্যুট পরা এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। অধৈর্য ভঙ্গিতে এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন। কয়েকবার তাকালেন ওরা যেদিকে রয়েছে সেদিকে, কিন্তু গাছের আড়ালে থাকায় ওদের দেখতে পেলেন না।
ককারই তো? রবিনের কণ্ঠে সন্দেহ, নাকি তার নকল?
ওদের দিকে পিঠ দিয়ে উল্টো দিকে ঘুরলেন ভদ্রলোক। নিঃশব্দে এক ছুটে তার কাছে চলে এল ওরা। আস্তে কাঁধে হাত ছোঁয়াল রবিন।
কে! ভীষণ চমকে গিয়ে চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন ভদ্রলোক।
সরি! আপনি আসলেই মিস্টার ককার কিনা, সন্দেহ ছিল আমাদের…
খুব চমকে দিয়েছ, গম্ভীর হয়ে আছেন ব্যাংকার। তোমাদের গাড়ি দেখলাম না, ভাবলাম আসোনি বুঝি। এসো। একটা মিনিট নষ্ট করা যাবে না। কাটায় কাটায় পাঁচটায় সেট করা আছে টাইম লক। এখনই যেতে হবে। নইলে আর ঢুকতে পারব না।

চাবি দিয়ে সামনের দরজার তালা খুললেন ককার। লিভিং রুমে ঢুকে চট করে একবার তাকালেন গণ্ডিফাদার কুকটার দিকে। তারপর গোয়েন্দাদের নিয়ে চললেন ওপরতলায়।
বড় একটা ঘরে ঢুকে ফ্রেমে বাঁধা একটা ফটোগ্রাফ সরাতে একটা ছোট ছিদ্র দেখা গেল। তাতে আঙুল ঢুকিয়ে বোধহয় চাপই দিলেন। খুব ছোট গোল একটা দরজা খুলে গেল। বেরিয়ে পড়ল টাইম লকের ডায়াল।
ডায়ালগুলোকে কিছুক্ষণ এপাশ ওপাশ ঘোরালেন তিনি।
তাকিয়ে আছে দুই গোয়েন্দা। দেয়ালের যে জায়গাটায় এতক্ষণ। কাগজের জোড়া আছে ভেবেছিল, সেখানে একটা চির দেখা দিল। বড় হতে লাগল ফাটলটা। অবশেষে খুলে গেল দরজা।
গুপ্তঘরে ঢোকার পথ।
গোয়েন্দাদের নিয়ে একটা ছোট, জানালাশূন্য ঘরে ঢুকলেন ককার।
ঘরের মাঝখানে পড়ে থাকা সাদা কাগজটা সবার আগে রবিনের চোখে পড়ল। এগিয়ে গিয়ে তুলে নিল ওটা।
তাতে লেখা:
ঘড়ি যখন টিক টিক করবে
তখন আসবে মরণ!
এবং এটাই শেষ হুশিয়ারি!
দীর্ঘ একটা মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল তিনজনে। তারপর হাত বাড়াল। কিশোর, দেখি?
প্রথম যে দুটো মেসেজ পাঠানো হয়েছিল, সেগুলোর মত একই হাতের লেখা।
কিছু মনে না করলে এটা আমরা রেখে দিচ্ছি, মিস্টার ককার, বলল সে। সূত্র হিসেবে কাজে লাগতে পারে।
থমথম করছে ব্যাংকারের মুখ। মাথা ঝাঁকালেন। রাখো।... ওদের হুমকিকে আমি ভয় করি না। ভাবছি এতটা ঘৃণা আমাকে কে করে যে খুনই করতে চায়!
রবিন বলল, জিনিস খোয়া গেছে নাকি দেখেন তো?
টেবিলে রাখা কাগজপত্র আর ফাইলিং কেবিনেটটা দ্রুত একবার দেখে নিলেন ককার। না, সব ঠিক আছে। আগের বারের মতই। ঘরের মেঝেতে রহস্যময় একটা নোট। কোন জিনিস খোয়া যায়নি। কিছুতে হাতও দেয়নি।
বর্গাকার ঘরটাতে চোখ বোলাল কিশোর। দরজা ছাড়াও ঢেকিার আরও পথ আছে, সেটা বের করতে হবে। মিস্টার ককার, দরজাটা লাগিয়ে দিন। খুজব।
সুইচ টিপে মাথার ওপরের একটা আলো জ্বাললেন ককরি। তারপর। ইস্পাতের ভারি দরজাটা লাগিয়ে দিলেন।
কাজে লেগে গেল দুই গোয়েন্দা।

ফায়ারপ্লেসে মাথা ঢুকিয়ে চিমনির ভেতর দিয়ে ওপরে তাকাল কিশোর।
ককার ঠিকই বলেছেন, ওপরের খোলা মুখটীয় শিক লাগানো। কেউ ওপথে ঢুকতে হলে শিকগুলো খুলে ফেলে দিতে হবে আগে। তা ছাড়া খুললেও এত সরু চিমনি দিয়ে কোন বাচ্চা ছেলেও ঢুকতে পারবে না। না, এ পথে করিও ঢোকা একেবারেই অসম্ভব।
কাজে লাগতে পারে ভেবে ছোট একটা হাতুড়ি নিয়ে এসেছে রবিন। সেটা দিয়ে দেয়াল ঠুকে দেখতে লাগল ফাপা আওয়াজ বেরোয় কিনা।
কার্পেট উল্টে দেখতে শুরু করল কিশোর। নিচের মেঝেতে ট্র্যাপিডোর কিংবা আলগা তক্তা কোন কিছুই নেই, যেটা সরিয়ে ঢোকা যায়। চিমনি আর দরজাটা বাদে কোথাও এমন ফাঁক-ফোকর নেই, যেখান দিয়ে মানুষ তো দূরের কথা, একটা ইঁদুর ঢুকতে পারে।
বুঝতে পারছি না! রীতিমত অবাক হয়েছে কিশোর। কেউ তো একজন নিশ্চয় ঢুকেছে। নইলে নোট রেখে গেল কি ভাবে?
সাধে কি আর ডাকতে গেছি তোমাদের! ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে চেয়ারে বসে পড়লেন ককার।
আরেকটা সম্ভাবনা আছে অবশ্য, হঠাৎ বলে উঠল কিশোর। পকেট থেকে ফিতে বের করে ঘরটা মাপতে শুরু করল। তারপর বলল, মিস্টার ককরি, দরজা খুলুন।
দরজার চৌকাঠের দুই পাশে দুই পা দিয়ে দাঁড়াল সে। দেয়াল কতটা পুরু, মাপল।
এ ঘরে আর কাজ নেই। বেরিয়ে এল সবাই। দরজা লাগিয়ে, টাইম লক সেট করে, দেয়ালের ছিদ্রের ওপর আবার ছবিটা ঝুলিয়ে দিলেন ককার।
ততক্ষণে সীটিং রুমের দেয়াল মাপতে আরম্ভ করেছে কিশোর। তারপর হলঘরে ঢুকে সেটার দেয়ালও মাপল।
ব্যাপারটা কি? কি করছ? জানতে চাইলেন ব্যাংকার।
দেখলাম গুপ্তঘরের দেয়ালে কোন কারসাজি আছে কিনা। এ সব পুরানো আমলের বাড়িতে অনেক সময় ফলস ওয়াল তৈরি করা হয়, আনমনে বলল কিশোর। কিন্তু এটার দেয়াল ফলস বলে মনে হয় না। মাপ ঠিক, কোন গণ্ডগোল নেই।
তাজ্জব ব্যাপার! রবিন বলল। হুমকিটীকে সিরিয়াসলি নেবেন, মিস্টার ককার। সাবধানে থাকবেন।
চওড়া সিঁড়িটা বেয়ে নিচে নেমে এল তিনজনে।
নীরব বাড়িটাতে একটাই মাত্র শব্দ শোনা যাচ্ছে এখন। বিরাট ঘড়িটার শব্দ:
টিক-টক! টিক-টক! টিক-টক!
বিড়বিড় করল রবিন, ঘড়ি যখন টিক টিক করবে, তখন আসবে মরণ!

লিভিং রুমের দিকে এগোল সে। গ্র্যাণ্ড ফাদার কুকটার সামনে দাঁড়াল। একতালে দুলছে পেণ্ডুলাম। শব্দ করছে টিক-টক, টিক-টক।
কপাল ভাঁজ করে ফেললেন ককার, একবারও দম দিইনি আমি ঘড়িতে! চলে কি করে?
নিশ্চয় দেয় কেউ, রবিন বলল। কাল রাতেও দেখে গেছি চলছে। যে লোক নোট রেখে যায়, হতে পারে সে-ই চাবিও দিয়ে যায়। সে বলছে, ঘড়ি টিক টিক করলে মরণ আসবে, হয়তো এই ঘড়িটার কথাই বলেছে।
ঘড়ির নিচে পেণ্ডুলাম রয়েছে যে খুপড়িটায়, তার কাচের দরজাটার দিকে তাকাল সে। ভেতরে অন্য কিছু নেই। ওপরের দরজাটী সাবধানে খুলে। ভেতরটা দেখল। এখানেও কিছু নেই।
নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর। গভীর চিন্তায় মগ্ন। কি যেন মনে করার চেষ্টা করছে। বলল, মিস্টার ককার, আমাদের ডুপ্লিকেট চাবির খবর
হায় হায়, তাই তো! এত কাজের চাপ, চাবির কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। ঠিক আছে, কাল সকালে আগে চাবিওয়ালার কাছে যাব, তারপর অন্য কাজ।

.

ইয়ার্ডে ফিরে মুসার পুরানো জেলপি গাড়িটাকে চতুরে দাঁড়ানো দেখল ওরা। মুসা বসে আছে ওঅর্কশপে। ওদের অপেক্ষায়।
তদন্তের কতখানি অগ্রগতি হয়েছে, কিছুই জানে না সে। শুনতে চাইল।
সব তাকে খুলে বলতে লাগল রবিন আর কিশোর। বদ্ধ ঘরে নোট পাওয়া গেছে শুনে গম্ভীর হয়ে গেল মুসা। মাথা দুলিয়ে বলল, বুঝলাম!
কি বুঝলে? ভুরু কোঁচকাল রবিন।
কে ওখানে নোট ফেলে এসেছে।
কে? রবিন অবাক।
ভূতে। বদ্ধ ঘরে ঢুকতেও কোন অসুবিধে হয় না ওদের।
তোমার মাথা! ভূত না ছাই! মানুষই ঢুকেছে। কি ভাবে, সেটাই বুঝতে পারছি না!
সেটা বুঝতে হলে বাড়িটার ওপর নজর রাখতে হবে আমাদের। ভাবছি, আজ রাতেই আবার যাব। কেউ ঢোকে কিনা দেখব। ঢুকলে তাকে ধরার চেষ্টা করব। মুসা, বাড়িতে তোমার কাজ শেষ হয়েছে?
পুরোপুরি হয়নি। তবে আজ রাতে না করলেও চলবে।
তাহলে যেতে পারবে আমাদের সঙ্গে?
পারব।
ভূত আছে তো পোড়োবাড়িতে, হেসে বলল রবিন, ভয় লাগবে না? যদি চেপে ধরে?

দোয়া-দরূদ পড়তে পড়তে যাব, হাত নেড়ে মুসা বলল, তাহলেই আর কাছে ভিড়তে পারবে না ভূত।
রাত নামার অপেক্ষা করল ওরা। তারপর তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়ল। ইঞ্জিনের আওয়াজ শুনলে পালিয়ে যেতে পারে চোরেরা, তাই গাড়ি নিল না। হেঁটে চলল। টর্চ আছে সঙ্গে, জ্বালানোর প্রয়োজন পড়ল না। চমৎকার চাঁদের আলো।
শহর ছেড়ে এসে নদীর পাড়ের পথ ধরল। এ পথে যানবাহন খুব কম। দুএকটা গাড়ি আসছে যাচ্ছে। রিভেরা এস্টেটের দিকে কোন গাড়ি যেতে দেখলেই পথের পাশের পপি কিংবা গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়ছে ওরা। বলা যায় না, গাড়িটা চোরেরও হতে পারে। চিনে ফেলতে পারে ওদের।
রিভেরা হাউসের গেটে এসে ফিরে তাকাল মুসা। কেউ পিছু নিয়েছে। কিনা দেখল। চাঁদের ফ্যাকাসে আলোয় রাস্তাটা পরিষ্কার দেখা যায়। নির্জন। গেটের পাশে গাছের জটলা আর দেয়ালে লম্বা লম্বা আইভি লতা রহস্যময় ছায়া সৃষ্টি করেছে। নিজের অজান্তেই গায়ে কাটা দিল তার।
গেট বন্ধ। ডিঙাতে অসুবিধে হলো না। ভেতরে ঢুকে বাড়িটার কাছাকাছি। এসে ঝোপে লুকিয়ে বসল। এখান থেকে সামনে-পেছনে দুদিকের দরজার ওপরই নজর রাখা যায়। চাঁদের আলোয় চকচক করছে বাড়ির প্লেট পাথরের টালি।
বসে আছে তো আছেই ওরা। কেউ আর আসে না। উসখুস শুরু করল মুসা। উঠে চলে যাওয়ার কথা বলতে যাবে কিশোরকে এই সময় তার গায়ে। কনুইয়ের তো মেরে ফিসফিস করে রবিন বলল, ওই দেখো!
জঙ্গলের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে সাদা শার্ট পরা খাটোমত এক লোক। বাড়িটার দিকে এগোল। হাঁটার ভঙ্গি দেখেই বোঝা যায় পথ ওর চেনা।
ধরতে হবে, কিশোর বলল। এসো।
নিঃশব্দে এগোল ওরা। আরেকটু হলেই পেছন থেকে গিয়ে লোকটাকে ধরে ফেলতে পারত। কিন্তু গোলমাল করে ফেলল মুসা। শুকনো ডালে পা। দিয়ে বসল। মট করে ভাঙল ওটা।
পাঁই করে ঘুরে দাঁড়াল লোকটা। তিন গোয়েন্দাকে দেখে একটা মুহূর্ত দেরি করল না। নদীর দিকে দৌড় দিল।
পিছু নিল তিন গোয়েন্দা।
সাংঘাতিক দৌড়াতে পারে লোকটা। বনের মধ্যে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল চোখের পলকে।
ওর কাছে পিস্তল থাকতে পারে এই ভয়ে টর্চ জ্বালতে সাহস করল না গোয়েন্দারা। চাঁদের আলো থাকা সত্ত্বেও বনের মধ্যেটা অন্ধকার। দেখা গেল না লোকটাকে।

খানিক পর একটা মোটর বোটের ইঞ্জিন গর্জে উঠল। নীরব রাতে অনেক বেশি করে কানে বাজল শব্দটা। নদীর দিকে ছুটল ওরা।
দেরি করে ফেলেছে। নদীর পাড়ে এসে দেখল, চলতে আরম্ভ করেছে। ছোট একটা স্পীড বোট। হুইল ধরে বসেছে লোকটা।
হতাশ চৌখে বোটটার দিকে তাকিয়ে রইল গোয়েন্দারা। নিজের ভুলের জন্যে ধরতে পারল না বলে আফসোস করতে লাগল মুসা। নদীর মোহনার দিকে যাচ্ছে বোট। দেখতে দেখতে হারিয়ে গেল বাকের আড়ালে।
কিশোর বলল, কাল রাতে দুজন লোককে তাড়া করেছিল পুলিশ। বেট ডুবে যাওয়ার পর পালিয়েছিল ওরা। একজন লম্বা, আরেকজন বেটে। মনে হয় সেই বেঁটে লোকটাই এই লোক।
রিভেরা হাউসে কি করতে এসেছিল? রবিনের প্রশ্ন।
সেটাই তো বুঝতে পারছি না। আসলে বোকামি করে ফেলেছি। ধরার চেষ্টা না করে তার পিছু নেয়া উচিত ছিল। কোথায় যায়, কি করে, দেখতাম। অনেকগুলো প্রশ্নের জবাব পেয়ে যেতাম তাহলে।
আবার বাড়ির কাছে ফিরে এল ওরা। আর এখানে থাকার কোন মানে নেই। সন্দেহজনক যাকে আশা করেছিল কিশোর, সে এসে চলে গেছে। এ রাতে আর কেউ আসবে বলে মনে হয় না।
অহেতুক বসে না থেকে দুই সহকারীকে নিয়ে বাড়ি ফিরে চলল কিশোর।

.

পরদিন সকালে নাস্তার পর স্টার-লাইট শিপ কোম্পানির অফিসে রওনা হলো কিশোর আর রবিন। মুসাকে ফোন করেছিল কিশোর। আসতে পারবে না বলে দিয়েছে মুসা। কাজে ব্যস্ত। মা তাকে আটকে ফেলেছেন।
অফিসটা খুঁজে বের করল সহজেই। রিসিপশন ডেস্কে বসা সেক্রেটারি বলল, ক্যাপ্টেন টমার? হ্যাঁ, আছেন। কিন্তু ব্যস্ত। দেখা করতে পারবেন বলে মনে হয় না।
বলুনগে পান্নার হারের ব্যাপারে কথা বলতে এসেছি অমিরা, কিশোর বলল। অবশ্যই দেখা করবেন তিনি।
অবাক হয়ে তার মুখের দিকে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তাকিয়ে রইল সেক্রেটারি। তবে আর কিছু বলল না। উঠে চলে গেল ভেতরের দিকের একটা অফিসে। গেল আর এল। অফিসের দরজা দেখিয়ে ওদেরকে যেতে বলল।
ক্যাপ্টেনের ইউনিফর্ম পরা লাল-চুল, লম্বা একজন মানুষ বসে আছেন সেগুন কাঠের ভারি ডেস্কের ওপাশে। গমগমে গলায় জিজ্ঞেস করলেন, হারটা সম্পর্কে কি জানো?

এখনও কিছু জানি না, স্যার, বিনীত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। আশা করছি, চুরির ব্যাপারে আমাদের কিছু বলবেন আপনি।
কেন বলব? তোমরা কে তা-ই তো জানি না।
তাড়াতাড়ি পকেট থেকে কার্ড বের করে দিয়ে নিজেদের পরিচয় দিল কিশোর। তাতে মুখের ভাবের কোন পরিবর্তন হলো না ক্যাপ্টেনের। ওদের গুরুত্ব বাড়ল না তাঁর কাছে। সেটা বুঝে পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে দিল কিশোর। ওদেরকে দেয়া রকি বীচের পুলিশ চীফ ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্লেচারের প্রশংসা পত্র।
নিরাসক্ত ভঙ্গিতে সেটা দেখলেন ক্যাপ্টেন। হাত বাড়ালেন ফোনের দিকে। চীফকে ফোন করলেন।
ওপাশের কথা শুনতে শুনতে আস্তে আস্তে ভাবের পরিবর্তন হলো তাঁর। রিসিভার নামিয়ে রেখে এই প্রথম হাসলেন। ক্যাপ্টেন ফ্লেচার অনেক প্রশংসা করলেন তোমাদের।
কিশোর বলল, তাই।
ঘড়ি দেখলেন ক্যাপ্টেন। বলল, কি জানতে চাও। আমার সময় কম।
হারটা সম্পর্কে বলুন।
বলার তেমন কিছু নেই। লস অ্যাঞ্জেলেসের একটা দোকান থেকে কিনেছিলাম, বাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্যে। ভাগ্যিস বীমা করিয়ে রাখার পরামর্শ দিয়েছিল দোকানদার। চুরি হয়েছে জানানোর সঙ্গে সঙ্গে বীমা কোম্পানি একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভকে নিয়োগ করেছে হারটা খুঁজে বের করার জন্যে। কিশোরের দিকে তাকালেন তিনি, তোমরা কি চুরির তদন্ত করছ নাকি?
হ্যাঁ। আমাদের এক পরিচিত ভদ্রলোকের অনেকগুলো দামী জিনিস কাল রাতে চুরি গেছে, সব পান্নার তৈরি। ধারণা করছি সেগুলোর চোর আর আপনার হার চৌর একই লোক। চোরটাকে দেখেছেন?
নাহ, দেখলে কি আর পালাতে দিই। রাতের ওই সময়টায় খুব বেশি ব্যস্ত ছিলাম। জাহাজ থেকে দামী মাল খালাস করা হচ্ছিল। আমি ছিলাম সেখানে। কাজ করার জন্যে কয়েকজন নতুন শ্রমিককে নেয়া হয়েছিল। শ্রমিকের ছদ্মবেশে চৌরটাও উঠে থাকতে পারে জাহাজে।
তা পারে। তাদের নাম-ঠিকানা লেখার ব্যবস্থা আছে আপনার জাহাজের রেজিস্টারে? খোঁজ নেয়া যাবে?
না। বেশি প্রয়োজন হলে বাইরের শ্রমিক ভাড়া করি আমরা। কাজ শেষ হলে পাওনা চুকিয়ে বিদেয় করে দিই। নাম-ঠিকানা লিখে রাখার প্রয়োজন পড়ে না।
নতুন কোন তথ্য দিতে পারলেন না ক্যাপ্টেন। সাহায্য হলো না গোয়েন্দাদের। তাকে ধন্যবাদ দিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে এল ওরা।

রকি বীচে ফিরে শিল্পকর্ম আর গহনার দোকানগুলোতে খোঁজ নিতে লাগল কিশোর, কেউ পান্নার কোন জিনিস বিক্রি করতে এনেছিল কিনা। দুই মাসের মধ্যে আনেনি কেউ, জানাল দোকানদারেরা। তবে ওদের একজন পরিচিত দোকানদার বলল, চোরাই মাল হলে ওদের কাছে আনার আগে অন্য একজনের কাছে যাবে চোর। তার নাম হব ডিকসন। এটা গোপন তথ্য। বলার আগে অবশ্যই ওদের কাছ থেকে কথা আদায় করে নিল দোকানি, এ খবর যাতে কারও কাছে ফাস না করে ওরা।

শহরের একধারে হব ডিকসনের অ্যানটিক শপ। ইট বের হওয়া পুরানো বিল্ডিংটার সামনে গাড়ি রাখল রবিন। বাড়িটার নিচতলা রাস্তার সমতল থেকে অনেক নিচে। সিঁড়ি বেয়ে নামতে হয়।

নেমে এসে দোকানের সামনে দাঁড়াল দুই গোয়েন্দা। উইণ্ডোতে নানা রকম অদ্ভুত জিনিস রাখা। কোনটা দামী, কোনটা সাধারণ। বোঝানো হয়েছে, সব ধরনের অ্যানটিকই পাওয়া যায় এখানে।

ওরা ঢুকতে কাঠের কাউন্টারের ওপাশ থেকে মুখ তুলল একজন ছোটখাটো মানুষ। ধূসর-চুল, চোখে স্টীল-রিমড চশমা। হাসিমুখে স্বাগত জানাল, হাল্লো, বয়েজ, কি করতে পারি তোমাদের জন্যে?

আপনি মিস্টার হব ডিকসন?

মাথা ঝাঁকাল লোকটা। হ্যাঁ। অ্যানটিক চাই? কি জিনিস?

কিছু কিনতে আসিনি, মিস্টার ডিকসন, ভূমিকা না করে সরাসরি কাজের কথায় এল কিশোর। জানতে এলাম, কেউ কি পান্নার তৈরি কোন জিনিস বিক্রি করতে এনেছিল?

হাসি মুছে গেল লোকটার। সেই সঙ্গে বিস্ময়ও ফুটল চেহারায়। চমকে গেছে। ঢোক গিলে সামলে নিল। জিজ্ঞেস করল, কে তোমরা?

কার্ড বের করে দেখাল কিশোর। পরিচয় দিল।

বলবে কি বলবে না, দ্বিধা করতে লাগল হব। শেষে কি মনে করে বলেই ফেলল, দামী একটা দাবার বোর্ড আর একটা হার বিক্রি করতে এসেছিল একজন।

সামনে গলা বাড়িয়ে দিল রবিন, কিনেছেন?

না, পাগল ভেবেছ আমাকে! এত দাম চাইল, কিনে বেচব কততে? লাভ করব কি?

লোকটা বলল, তার নাকি টাকার খুব ঠেকা। নইলে শখের জিনিস বেচত না।

লোকটা দেখতে কেমন, মিস্টার ডিকসন? জিজ্ঞেস করল কিশোর।

ভেবে বলল হব, লম্বা, মধ্যবয়েসী, চোখে রিমলেস গ্লাস। হালকা রঙের স্যুট পরেছিল, মাথায় ঐ হ্যাট।

রবিনের দিকে তাকিয়ে বলল কিশোর, মিস্টার ককারের মত মনে হচ্ছে না!

ও, চেনো তাকে? হব বলল। ভালই হলো। পকেটে হাত ঢোকাল সে।
ছোট চেন লাগানো একটা চাবির রিঙ বের করে কাউন্টারে রাখল সে। তাতে তিনটে চাবি। ফেলে গিয়েছিল। ফেরত দিতে পারবে?
প্রায় ছোঁ মেরে রিঙটা তুলে নিয়ে পকেটে ফেলল কিশোর। পারব।
দোকানিকে ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে এল দুই গোয়েন্দা। গাড়িতে এসে উঠল।
জিনিস বেচতে ককরি আসেননি, রবিন বলল, নিশ্চয় তার মত দেখতে সেই লোকটা। পান্নার বোর্ড আর হার যখন নিয়ে এসেছে, আমাদের সন্দেহই ঠিক, চুরিটা একই লোকের কাজ।
ইঞ্জিন স্টার্ট দিল সে।
পকেট থেকে রিঙটা বের করল কিশোর। চাবি তিনটা দেখতে দেখতে বলল, দুটো চাবি ইগনিশনের। কিসের ইগনিশন, বলো তো? গাড়ি, নাকি বোটের?
মনে তো হচ্ছে স্পীড বোটের।
একটা গাড়ির। অন্যটা স্পীড বোটের হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। তবে এটা মাস্টার কী-র মত লাগছে। যে কোন বোটের ইগনিশনে ঢোকানো যাবে। সূতরাং কোন নির্দিষ্ট বোটের খবর নিয়ে লাভ নেই। তবে গাড়িটার খোঁজ করা যেতে পারে। তার জন্যে ক্যাপ্টেন ফ্লেচারের সাহায্য দরকার।
এখনই যাব?
না, পরে। আগে বাড়ি যাও।
ইয়ার্ডে ঢুকতেই দুই ব্যাভারিয়ান ভাইয়ের একজন, রোভারের সঙ্গে দেখা। বলল, এইমাত্র বেরিয়ে গেল লোকটা।
কোন লোক? ভুরু কোঁচকলি কিশোর।
তোমাকেই খুঁজতে এসেছিল। প্রাইভেট ডিটেকটিভ। তোমাকে না পেয়ে নানা রকম উদ্ভট প্রশ্ন শুরু করল আমাকে। তোমাদের ব্যাপারে। যেন তোমরা একেকজন বড় বড় ক্রিমিনাল। দিয়েছি হাঁকিয়ে।
তিন গোয়েন্দার ব্যক্তিগত ওঅর্কশপে ঢুকল দুজনে। একটা টুলের ওপর বসে পড়ে রবিন বলল, কে লোকটা বুঝতে পারছ কিছু?
মনে হয় পারছি, জবাব দিল কিশোর। বীমা কোম্পানির গোয়েন্দা। ক্যাপ্টেন টমার যার কথা বললেন। দাঁড়াও, রোভারকে ডাকি। কি কি বলেছে, জিজ্ঞেস করি।
দরজায় মুখ বের করে রোভারকে ডাকল কিশোর। সে ভেতরে এলে জিজ্ঞেস করল, লোকটা কি বলল, সব খুলে বলুন তো?
হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছল রোভার। পুরানো একটা গদি ঝাড়ছিলাম। এই সময় এল সে। বয়েস বেশি না, সাতশি-আটাশ হবে। নাম বলল মিলার প্যাটোলি।

হু। তারপর?
বলল, আমি একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ। আইডেনটিটি বের করে দেখাল।
দেখতে কেমন?
লম্বাও না খাটও না। সুন্দর একটা স্যুট পরেছে। ধূসর ফেল্ট হ্যাট। দাঁতের ব্রাশের মত খাড়া খাড়া গোঁফ।
নকল গোঁফ না তো? রবিনের প্রশ্ন।
কি করে বলব?
তাই তো, কি করে বলবে! হাত দিয়ে ছুঁয়ে না দেখলে তো আর আসল নকল বোঝা যায় না।
আর কিছু জানার নেই। রোভারকে যেতে বলল কিশোর। পকেট থেকে চাবির রিঙটা বের করে টেবিলে রাখল। সেটার দিকে তাকিয়ে রইল চিন্তিত ভঙ্গিতে।
রবিন বলল, একটা চাবি মোটর বোটের ইগনিশনের। আরেকটা কোন গাড়ির। তৃতীয়টা সাধারণ দরজার তালার।
হু, আনমনে বলল কিশোর, তিনটেই যদি খুঁজে বের করা যেত, ভাল হত।
দুপুরের খাওয়ার আগে বেরেলি না ওরা।
খাওয়া শেষে বেরোল। চলে এল থানায়। চীফ ইয়ান ফ্লেচারকে অফিসে পাওয়া গেল। চাবিগুলোর কথা বলল তাঁকে কিশোর।
পুলিশের ফাইলে সব রকম গাড়ি আর মোটর বোটের ইগনিশনের চাবির ফটোগ্রাফ আছে। একজন অফিসারকে ডেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলেন। চীফ।
দশ মিনিটের মধ্যেই ফিরে এল অফিসার। উত্তেজিত। বলল, স্যার, গাড়িটা একটা বড় মেটিওর স্পেশাল! মনে হয় যে কালো গাড়িটাকে খুঁজছি আমরা, সেটাই।
কিশোর বলল, এই গাড়ি এ শহরে অত বেশি নেই। এখন বের করতে হবে, কটা গাড়ি আছে, তার মধ্যে কোনটা কালো, এবং মালিক কে।
সেটা জানা কঠিন হবে না, ফোনের দিকে হাত বাড়ালেন চীফ। স্টেট মোটর ভেহিকল ব্যুরোকে জিজ্ঞেস করলেই হবে।
রিসিভার কানে ঠেকিয়ে রেখেই প্যাড আর কলম টেনে নিলেন তিনি। ওপাশের কথা শুনে শুনে এক, দুই করে সিরিয়াল নম্বর দিয়ে লিখতে শুরু করলেন।
কয়েক মিনিট পর রিসিভার নামিয়ে রেখে প্যাড থেকে পাতাটা ছিঁড়ে কিশোরের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, এই নাও। মোটর ভেহিকল অফিস। থেকে আটটা মেটিওর স্পেশালের রেজিস্ট্রেশন নেয়া হয়েছে। নাম-ঠিকানা লিখে দিলাম।
আগ্রহের সঙ্গে হাত বাড়িয়ে কাগজটী টেনে নিল কিশোর। প্রথম নামটা পড়ল: জেরিল কাস্টার। হাসি ফুটল মুখে। উঠে দাঁড়িয়ে রবিনকে বলল, এসো, যাই।
সাহায্যের জন্যে চীফকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়ে থানা থেকে বেরিয়ে এল দুজনে।

প্রথমে কোথায় যাবে? জিজ্ঞেস করল রবিন।
এক নম্বরটা থেকেই শুরু করব, কোন ঠিকানায় যেতে হবে বলল কিশোর। এক এক করে সন্দেহ কাটাব, আর সন্দেহভাজনদের নাম ছাঁটাই করব।
রকি বীচের রেসিডেনশিয়াল এরিয়ায় অনেক বড় একটা বাড়িতে থাকেন জেরিল কাস্টার। গেটের ভেতরে ঢুকে ড্রাইভওয়ে ধরে কিছুদূর এগোনোর পর গাড়ি রাখল রবিন। দুজনে নেমে হেঁটে চলল।
হঠাৎ কিশোরের হাত খামচে ধরল রবিন। কিশোর, দেখো!
গ্যারেজের দিকে তাকাল কিশোরও। খোলা দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে। চকচকে নতুন মেটিওর স্পেশাল গাড়িটা।
বাগানে রকিং চেয়ারে বসে আছেন হাসিখুশি এক বৃদ্ধ।
এগিয়ে গেল গোয়েন্দারা।
গুড আফটারনুন, বয়েজ, হেসে বললেন বৃদ্ধ, খুব গরম পড়েছে, না!
হ্যাঁ, বিনয়ের অবতার সেজে গেল কিশোর। আপনি কি মিস্টার কাস্টার, স্যার?
নিশ্চয়, কাস্টারের শরীর খুবই হালকা-পাতলা, কিন্তু তাঁর হালকা নীল চোখের তারা উজ্জ্বল, প্রাণবন্ত। গত উনআশি বছর ধরেই জেরিল কাস্টার হয়ে বেঁচে আছি আমি। এর জন্যে দুঃখ নেই। তরুণ বয়েসে অবশ্য অন্য কিছু হতে ইচ্ছে করত, বিখ্যাত কোন চরিত্র...
জেরিল। সদর দরজার ওপাশ থেকে ডাক শোনা গেল। কার সঙ্গে কথা বলছ? বেরিয়ে এলেন ছোটখাট একজন মহিলা। মাথার সব চুল সাদা। দুই গোয়েন্দার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কি কথা বলছ?
বিনীত গলায় জবাব দিল কিশোর, আপনাদের গাড়িটার কথা জানতে এসেছি।
ভাল করেছ, কাস্টার বললেন। তবে ওটাতে চড়তে চেয়ো না, আমাকে চালাতে বোলো না। বাপরে বাপ! তারচেয়ে একপাল পাগলা ঘোড়াকে গাড়িতে জুতে চালানো অনেক সহজ!
গর্বিত ভঙ্গিতে মিসেস কাস্টার বললেন, আমি কিন্তু চালাতে পারি।
গাড়িটা কেমন লাগে আপনার? জানতে চাইল রবিন।
দারুণ! দুর্দান্ত! যেমন আরাম তেমনি গতি। স্পীডওলা গাড়ি ভাল লাগে আমার।
বৃদ্ধ এই দম্পতির সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগছে কিশোরের। অনেক চালান মনে হয়?
না, তেমন আর সুযোগ পাই কোথায়। বাজার করতে যাই, আর গির্জায় যাই। বাড়ি ছেড়ে বেশি দূর যেতে আর ইচ্ছে করে না আজকাল।
যেটুকু যাই, তাই যথেষ্ট, কাস্টার বললেন। ওর সঙ্গে গাড়িতে উঠলে সারাক্ষণ একটা দোয়াই করি, ঈশ্বর, অ্যাক্সিডেন্ট তো হবেই জানি-দয়া করে পঙ্গু বানিয়ে

ভুগিয়ো না আমাকে, মেরে ফেলো!
রবিন আর কিশোর, দুজনেই হাসতে লাগল। বুঝল, এই গাড়িটার খোঁজে আসেনি ওরা।
কিশোর বলল, আপনাদের সময় নষ্ট করলাম। ইদানীং মেটিওর স্পেশীলের প্রতি আগ্রহ জেগেছে আমাদের। তাই জানতে এসেছিলাম, কেমন
ফিরে এসে গাড়িতে উঠল দুই গোয়েন্দা।
রবিন বসল ড্রাইভিং সীটে।
তালিকাটার দিকে তাকাল কিশোর, একজন বাদ। বাকি রইল সাত। একসঙ্গে না গিয়ে ভাগাভাগি হয়ে খোঁজা উচিত আমাদের, তাহলে তাড়াতাড়ি হবে।
কি করবে?
বাড়ি চলো। চাচার ভাঙা গাড়িটা নেব। তুমি একদিকে যাবে, আমি একদিকে।
.
সন্ধ্যায় ক্লান্ত হয়ে ইয়ার্ডে ফিরল দুজনে। সবগুলো গাড়িই দেখে এসেছে। তবে কোনটার মালিকই দেখতে ককারের মত নয়।
একটাই জবাব হতে পারে এর, কিশোর বলল। গাড়িটা এই এলাকার নয়। অন্য কোনখান থেকে আনা হয়েছে। চোরাই নম্বর প্লেট ব্যবহার করে থাকলেও অবাক হব না।
কিন্তু গাড়িটা আছে কোথায় এখন?
জবাব মিলল না। সে রাতে জবাব না জেনেই ঘুমাতে যেতে হলো ওদের।
পরদিন সকালে কিশোর নাস্তা সেরে ওঅর্কশপে এসে ঢুকেছে কেবল, এই সময় এল মুসা। ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছেড়ে টুলে বসতে বসতে বলল, পালিয়েছি, বুঝলে, আর পারব না। কাজ অনেক করেছি।
গোয়েন্দাগিরি করবে তো? নাকি সেটাও বন্ধ?।
উপযুক্ত খাবার পেলে করতে আপত্তি নেই, হেসে জবাব দিল মুসা।
এই সময় রবিন এল।
কেসটার অনেক কিছুই এখনও মুসার অজানা। তাকে জানানো হলো।
খাইছে! মুসা বলল। এ তো সাংঘাতিক জটিল! কোন সূত্রই নেই! কি করে কি করবে?
মেটিওর স্পেশালটা খুঁজতে হবে। আর কোন পথ নেই, কিশোর বলল।
তো, এখন কি খুঁজতে বেরোবে?
এখন মিস্টার ককারের সঙ্গে দেখা করতে যাব।
ককারের ব্যাংকে তাঁর অফিসে দেখা করল তিন গোয়েন্দা।

ওদের সন্দেহের কথা শুনে খেপে গেলেন ব্যাংকার, কি, আমার বাড়িটাকে চোরাই মাল পাচারের স্টেশন বানিয়েছে! ধরতে পারলে ঘাড় মটকাব! হুমকি দিয়েছে কেন বুঝলাম। ভয় দেখিয়ে আমাকে দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছে, যাতে নিরাপদে শয়তানি চালিয়ে যেতে পারে।
হ্যাঁ, মাথা ঝাঁকাল কিশোর। তবে কি করে নোটগুলো গুপ্তঘরে ফেলে এসেছে, সেই রহস্যটা জানা হয়নি এখনও।
তা বটে। আর কি কি জেনেছ তোমরা?
জাহাজের কেবিন থেকে ক্যাপ্টেন টমারের পান্নার হার চুরির ঘটনা বলে কিশোর বলল, মনে হচ্ছে ডুডলি হ্যারিসের হারও চুরি করেছে একই চেরি।
ছেলেদের অবাক করে দিয়ে তীক্ষ্ণ স্বরে বললেন ককার, আমার তা মনে হয় না! হ্যাঁলুসিনেশনে ভুগছে হ্যারিস। কোন জিনিস চুরি যায়নি তার। একটা বানানো গল্প বলে দিয়েছে।
কথা বললে সময় নষ্ট। ব্যাংকারের সময় আর নষ্ট করল না গোয়েন্দারা। নতুন কিছু ঘটলে, কিংবা তথ্য পেলে তাঁকে জানাবে বলে যাওয়ার জন্যে উঠে দাঁড়াল। শেষ মুহূর্তে ডুপ্লিকেট চাবিটার কথা জিজ্ঞেস করল কিশোর। লজ্জিত হয়ে ব্যাংকার বললেন, আবার ভুলে গেছেন। খুব তাড়াতাড়িই বানিয়ে দেবেন, বলে দিলেন।
বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এল ছেলেরা। রকি বীচে ফিরে চলল।
হ্যারিসের ব্যাপারে ককারের মন্তব্যটা নিয়ে মাথা ঘামাতে লাগল।
কিশোর, কি মনে হয় তোমার? প্রশ্ন করল মুসা, সত্যি কি জিনিস চুরি গেছে হ্যারিসের?
গেছে। ককার এখনও রেগে আছেন তাঁর ওপর, তাই মানতে চাইছেন না। এগুলো তাঁর রাগের কথা। তবে হ্যারিসের সঙ্গে আরেকবার দেখা করতে অসুবিধে নেই আমাদের।
হঠাৎ করে লক্ষ করল কিশোর, মুসার আগ্রহ অন্য দিকে সরে গেছে। বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে সে।
কি ব্যাপার? জানতে চাইল কিশোর।
জবাব না দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল মুসা, রবিন, অত জোরে চালিয়ো না! ঠিক জায়গায় থামাতে পারবে না তো?
কোথায় থামাব?
ওই যে মিল্ক বারটার কাছে। সানডি খুব ভাল বানায় ওর–প্রচুর মাখন, চেরি আর বাদাম মেশায়। নামটাও দিয়েছে দারুণ, বিগল ইগলু। রাখো রাখো, গাড়ি রাখো।

লাঞ্চের সময় হয়ে গেছে। আগেই বলে রাখি, পয়সাটা তোমাদের কারও দিতে হবে। তাড়াহুড়া করে বাড়ি থেকে পালিয়েছি, টাকা নিতে ভুলে গেছি।
হেসে ফেলল কিশোর। বলল, গাড়ি রাখো, রবিন, এই পেটুককে নিয়ে আর পারা গেল না।
সাদা ছোট বাড়িটার সামনে গাড়ি রাখল রবিন।
শীঘ্রি ভেতরের একটা টেবিল ঘিরে বসল ওরা।
ওয়েইট্রেস এসে দাঁড়ালে অর্ডার দিল মুসা, চারটে বড় সাইজের বিগলু। ইগলু।
কিন্তু লোক তো তোমরা তিনজন?
তাতে তোমার কি? চারটে বলেছি, চারটে, ব্যস। দিতে অসুবিধে আছে?
না না, অসুবিধে কি? চলে গেল ওয়েইট্রেস।
লাঞ্চ আওয়ার এখন। ভিড়। প্রায় সব টেবিলেই লোক আছে। গুঞ্জন চলছে। মাথার ওপরের একাধিক অদৃশ্য স্পীকারে মৃদু শব্দে বাজছে রক এ মিউজিক। সব কিছু ছাপিয়ে হঠাৎ পেছন থেকে একটা কথা কানে এল কিশোরের, ..ঘড়ির সাহায্যে সারা হবে কাজটা!

.

ঘড়ির কথা শুনেই লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। কে বলছে দেখার জন্যে ঘুরতে গেল। খাবারের ট্রে নিয়ে তার একেবারে কাছে চলে এসেছিল ওয়েইট্রেস, হাতের ধাক্কায় উল্টে পড়ল ট্রে-টা। ঝনঝন করে ভাঙিল কাচের বড় বড় পেয়ালগুলো। মেঝেতে ছড়িয়ে গেল মুসার অত সাধের বিগলু ইগলু।
একটা মুহূর্তের জন্যে স্তব্ধ হয়ে গেল গুঞ্জন। পরক্ষণেই স্বাভাবিক হয়ে গেল। হাত থেকে খাবারের প্লেট পড়ে ভাঙাটা নতুন কিছু না।
দুজন লোক বেরিয়ে যাচ্ছে। হাঁটার সময় কথা বলছিল ওরা, কিশোরের কানে এসেছে। ওদের দেখিয়ে চিৎকার করে উঠল সে, মুসা, ওদের ধরতে হবে! জলদি এসো!
আবার স্তব্ধ হলো গুঞ্জন। এইবার বিস্মিত হলো শ্রোতারা। তবে তাদের তোয়াক্কা করল না কিশোর। দৌড় দিল লোক দুজনের পেছনে।
চিৎকার শুনে লোকগুলোও ফিরে তাকিয়েছে। একটা মুহূর্ত দেখল তিন গোয়েন্দাকে। তারপর ওরাও ছুটতে শুরু করল।
গোয়েন্দারা বাইরে বেরিয়ে দেখল, একটা কালো গাড়িতে উঠে পড়ছে ওরা।
ছেড়ে দিল গাড়িটা। রকি বীচের দিকে চলে গেল।
লম্বা লোকটাকে দেখলে! ছুটতে ছুটতে বলল কিশোর। শরীর একেবারেই ককারের মত!

রবিনের ফোক্স ওয়াগেন নিয়ে এসেছে ওরা। ড্রাইভিং সীটে বসল মুসা। অন্য দুজন উঠে দরজা বন্ধ করতে না করতেই গাড়ি ছেড়ে দিল সে। পিছু নিল কালো গাড়িটার।
পাকা রাস্তায় টায়ারের কর্কশ আর্তনাদ তুলে রবারের অনেকখানি ছাল চামড়া রেখে যখন মোড় ঘেরাল সে, অনেক দূরে চলে গেছে তখন সামনের গাড়িটা। এক্সিলারেটর যতটা যায়, চেপে ধরল মুসা।
প্রচণ্ড শব্দ করতে লাগল পুরানো ইঞ্জিন। ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে পড়ার হুমকি দিচ্ছে যেন। কেয়ারই করল না মুসা।
মেটিওর স্পেশাল হলে ধরতে পারবে না, কিশোর বলল। পত্তাই পাবে না।
দেখা যাক, মুসা বলল।
উঁচু হতে লাগল হাইওয়ে। সামনে হঠাৎ করে নেমে গেছে। তারপরে মোড়। কালো গাড়িটা একবার চোখে পড়ছে, একবার অদৃশ্য। হাল ছাড়ল না। মুসা। আঠার মত লেগে রইল পেছনে।
রকি বীচের কাছাকাছি পৌঁছল ওরা।
সামনের দিকে তাকিয়ে কিশোর বলল, ম্যানিলা রোডের দিকে যাচ্ছে। মনে হয়?
তার ধারণাই ঠিক। সেই পথই ধরল সামনের কালো গাড়িটা।
মোড় আর বনজঙ্গল এদিকটীয় বেশি। চোখের আড়ালে চলে গেল গাড়িটা।
রিভেরা এস্টেট চোখে পড়ল। গেট দেখা গেল। কিন্তু গাড়িটাকে আর দেখা গেল না। উধাও হয়ে গেছে।
গেট বন্ধ। ভেতরেও নেই গাড়িটা।
থেমো না, কিশোর বলল। এগিয়ে যাও।
কিন্তু পুরো রাস্তাটা পার হয়ে এসেও আর দেখল না গাড়িটাকে।
গেল! হতাশ ভঙ্গিতে সীটে হেলান দিল কিশোর।
তোমার এত কষ্ট কাজে লাগল না, মুসাকে বলল রবিন।
গাড়ি থামিয়ে দিল মুসা। ফিরে তাকিয়ে কিশোরকে জিজ্ঞেস করল, কি করব?
ডুডলি হ্যারিসের সঙ্গে দেখা করতে যাব।
ওই রোডেই তার বাড়ি, জানা আছে মুসার। গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে আবার চালাল।
সাগরের দিকে মুখ করা পাহাড়ের ঢালে তৈরি পাথরের বাড়িটা চোখে পড়ল। বিশাল দুটো টাওয়ার, পাথরের দেয়াল আর আদিম চেহারা পুরানো আমলের দুর্গের রূপ দিয়েছে বাড়িটাকে। নিজের সীমানা কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘিরে নিয়েছেন হ্যারিস। গেটে তালা নেই।
ড্রাইভওয়েতে গাড়ি ঢোকাল মুসা।

ঘণ্টা শুনে বেরিয়ে এলেন হ্যারিস। গম্ভীর হয়ে ছিলেন। তিন গোয়েন্দাকে দেখে উজ্জ্বল হলো চেহারা। ডেকে নিয়ে গেলেন লিভিং রুমে।
বেশি ভূমিকা না করে বললেন, দেখো, আমি তোমাদের সাহায্য চাই। আমার জিনিসগুলো খুঁজে বের করে দাও, আমি তোমাদের পুরস্কৃত করব।
তারমানে চুরির কেসটা আমাদের নিতে বলছেন আপনি? রবিন বলল।
অনেক জটিল কেসের সমাধান করেছ তোমরা, পুলিশও হিমশিম খেয়ে গিয়েছিল যেগুলো নিয়ে। আমার পান্নাগুলো যদি কেউ বের করে আনতে পারে, তোমরাই পারবে।
কিশোরের দিকে চোখ পড়তে থেমে গেলেন তিনি।
তাঁর দিকে নজর নেই কিশোরের। উঠে দাঁড়াচ্ছে। নজর বাগানের দিকের একটা জানালায়।
জিজ্ঞেস করল মুসা, কি? কিছু দেখেছ নাকি?
ফিসফিস করে জবাব দিল কিশোর, আড়ি পেতে আছে কেউ, আমাদের কথা শুনছে!
পেছনের দরজার দিকে ছুটল সে। ওদিক দিয়ে বেরিয়ে ঘুরে বাগানে চলে যাবে। পেছন থেকে ধরার চেষ্টা করবে লোকটাকে।

.

তাকে দেখে ফেলল লোকটা। কিংবা কিছু টের পেয়ে গেল। পাতাবাহারের বেড়া পার হয়ে লাফাতে লাফাতে ছুটল পেছনের সীমানার দিকে। গায়ে। বাদামী রঙের স্পোর্টস জ্যাকেট। ছুটতে গিয়ে ঝাঁকি লেগে কোণগুলো লাফাচ্ছে। বানরের দক্ষতায় কাটাতারের বেড়া ডিঙিয়ে চলে গেল ওপাশের রাস্তায়। ফিরে তাকাল একবার। দাড়ি-গোঁফে ঢাকা মুখ।
মুসা আর রবিনও ততক্ষণে বেরিয়ে চলে এসেছে।
তিনজনেই ছুটল বেড়ার দিকে।
বেড়ার কাছে এসে দাঁড়িয়ে গেল ওরা। ফাঁক দিয়ে রাস্তার এ পাশ ওপাশ দেখল কিশোর। অবাক হয়ে গেল। নেই লোকটা। গেল কোথায় এত তাড়াতাড়ি?
নীল জ্যাকেট পরা আরেকজন লোক রাস্তার উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে নতুন তৈরি হওয়া দুটো বড় বাড়ির দিকে তাকিয়ে আছে।
ডাকল তাকে কিশোর, এই যে, শুনছেন?...একজন লোককে দেখেছেন। এদিকে, বড় বড় দাড়ি!
ওই তো, ওই বাড়িগুলোর মাঝখানে ঢুকে গেল, জবাব দিল লোকটা। তাড়া করেছিলে নাকি? চোর?

জবাব দিল না কিশোর। গেট কাছেই। সেদিকে ছুটল। গেট দিয়ে বেরিয়ে এসে দৌড় দিল বাড়িগুলোর দিকে। কিন্তু বাদামী জ্যাকেট-ওয়ালা লোকটাকে দেখতে পেল না আর।
বাড়িগুলোর ওপাশের রাস্তায় খুঁজতে গেল কিশোর। আশপাশে লুকানোর সম্ভাব্য যত জায়গা দেখল, সব খুঁজে দেখতে লাগল মুসা আর রবিন।
পেল না লোকটাকে। গায়েব হয়ে গেছে।
একসঙ্গে ডুডলির বাড়িতে ফিরে চলল তিনজনে।
রাস্তায় এসে নীল জ্যাকেট পরা লোকটাকেও দেখতে পেল না।
এই লোকটা সত্যি বলেছে তো আমাদের? মুসার প্রশ্ন।
পেছনের বাগানে ওদের জন্য অপেক্ষা করছেন হ্যারিস।
কাছে এসে মাথা নেড়ে কিশোর জানাল, পেলাম না ওকে। তবে আপনার কেস আমরা নিলাম। পান্নাগুলো খুঁজে বের করে দেব।
পরদিন সকাল দশটায় থানায় চলল কিশোর আর রবিন। মুসা আসেনি। পালাতে পারেনি আজ। মা আটকে দিয়েছেন। চীফের সঙ্গে কথা বলে জানতে চায় কিশোর, বন্দরের চুরি রহস্যের সুরাহা হলো কিনা, কিংবা নতুন তথ্য পাওয়া গেল কিনা।
কড়া রোদ উঠেছে। গরম পড়ছে খুব। দোকানের ডিসপ্লে উইণ্ডোগুলোতে যেগুলোতে রোদ এসে পড়ে হয় সেগুলোতে শাটার টেনে দেয়া, নয়তো মোটা কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে।
কিশোর, দেখো! ঐ হ্যাট পরা লম্বা একজন লোকের দিকে আঙুল তুলল রবিন। ওদের দিকে পেছন করে রাস্তার ধারের একটা দোকানের উইণ্ডোর দিকে তাকিয়ে আছে লোকটা। অ্যালেক্স ককার, না সেই লোকটা? ককার হলে এ সময়ে ব্যাংক ফেলে এখানে কি করছেন?
চলো, জিজ্ঞেস করি।
রাস্তা পার হয়ে এল ওরা।
পেছন থেকে মৃদু গলায় ডাকল কিশোর, মিস্টার ককার!
ঘুরে তাকাল লোকটা।
এক পা পিছিয়ে এল কিশোর। লোকটা ককার নয়।
কি চাই? কর্কশ গলায় জিজ্ঞেস করল লোকটা।
হ্যারিসের পান্নাগুলো আপনিই সরিয়েছেন, তাই না? ফস করে বলে বসল রবিন। বলেই বুঝল, এ ভাবে জিজ্ঞেস করাটা ঠিক হয়নি।
কিসের পান্না? কি বলছ! তোমাদের আমি চিনি না। কথাবার্তা সাবধানে বলবে বলে দিলাম। নইলে পুলিশ ডাকব।

ধাক্কা দিয়ে ছেলেদের সরিয়ে, কয়েকজন ফেরিওয়ালাকে ঠেলে প্রায় ছুটে গিয়ে মোড়ের কাছে দাঁড়ানো একটা কালো গাড়িতে উঠে পড়ল লোকটা। চোখের পলকে মিশে গেল যানবাহনের ভিড়ে।
ওকে যেতে দিলাম কেন? নিজের ওপরই খেপে গেল রবিন।
আর কোন উপায় ছিল না বলে, কিশোর বলল। চোর চোর বলে চিৎকার করেও লাভ হত না, ও-ই যে চুরি করেছে কোন প্রমাণ নেই আমাদের হাতে। যাই হোক, গাড়িটার নম্বর দেখেছি। ফ্লেচারকে বলব।
মেটিওর নয়। যদ্দুর মনে হয়, গতকাল এই গাড়িটাকেই ফলো করেছিলাম। মুসা থাকলে বলতে পারত।
যেদিকে যাচ্ছিল, আবার রওনা হলো ওরা।

.

হু, তাহলে চোরটাকে দেখে এসেছ, সব শুনে মাথা দুলিয়ে বললেন চীফ। নাম্বারটা বলো।
কিশোর বলল, লিখে নিলেন চীফ। অফিসারকে ডাকলেন।
খোঁজ পাওয়া গেল গাড়িটার। রকি বীচেরই রেজিস্ট্রেশন, জনৈক ডেভিড কুপারের নামে। ফোন করে পাওয়া গেল সেই লোককে। থানা থেকে করা হয়েছে শুনে বলল, তার গাড়িটা চুরি গেছে। পুলিশকে খবর দেয়ার কথা ভাবছিল সে।
দয়া করে একবার আসতে পারেন থানায়, মিস্টার কুপার? অনুরোধ করলেন চীফ। সামনাসামনি সব শুনতে পারলে ভাল হয়। আপনার গাড়িটা খুঁজে বের করার ব্যবস্থা করতে পারি। নাকি আমরাই আসব?
না না, দরকার নেই, আমিই আসছি, কুপার বলল।

.

আধঘণ্টা পর একজন পুলিশ অফিসারের সঙ্গে অফিসে ঢুকল সম্ভ্রান্ত পোশাক পরা, মাঝবয়েসী, হালকা-পাতলা এক লোক। তাকে পৌঁছে দিয়ে চলে গেল অফিসার। নিজের পরিচয় দিল লোকটা, ডেভিড কুপার।
কিশোর আর রবিনের চেনা শত্রু হয়ে যেতে পারে ভেবে ফাইল র‍্যাকের আড়ালে ওদের লুকিয়ে পড়তে বললেন চীফ। ওখান থেকে উঁকি মেরে দেখতেও পারবে ওরা, কথাও শুনতে পাবে।
পরিচয় আর হাত মেলানোর পর বললেন চীফ, হ্যাঁ, গাড়িটার কথা বলুন, মিস্টার কুপার। কোথায় রাখতেন?
অবশ্যই গ্যারেজে।
কিশোর দেখল, চীফের দিকে মুখ করে থাকলেও চোখজোড়া অস্থির হয়ে এদিক ওদিক ঘুরছে লোকটার।

গ্যারেজ থেকে গাড়ি নিয়ে গেল? চোরটীর সাহস আছে বলতে হবে।
গ্যারেজ থেকে চুরি যায়নি। বাড়ির সামনে রাস্তার মোড়ে রেখেছিলাম, ওখান থেকে নিয়ে গেছে।
কবে? কাল রাতে?
অ্যাঁ!...হ্যাঁ, কাল রাতে।
হু, লোকটার চোখের দিকে তাকালেন চীফ, কাল রাতে? নিশ্চয় খুব দুশ্চিন্তায় ছিলেন?
চোখ সরিয়ে নিল কুপার। অ্যাঁ!..হ্যাঁ, তা তো বটেই..দুশ্চিন্তাই তো হবার কথা, তাই না? সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর যখন জানতে পারলাম গাড়িটা নেই, তখন থেকেই দুশ্চিন্তা শুরু হয়েছে।
সকালে কটায় ওঠেন ঘুম থেকে?
সাতটা।
ওই সময় দেখলেন গাড়িটা চুরি গেছে? আপনাকে ফোন করেছি সাড়ে দশটায়। তারমানে চুরি গেছে জানার পরেও সাড়ে তিন ঘণ্টা পার করে দিয়েছেন, পুলিশকে খবর দেননি, আবার বলছেন খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছিল।
আ-আমি... তখন বুঝতেই পারিনি গাড়িটা চুরি গেছে! চোখ মিটমিট করতে লাগল কুপার। কথা খুঁজে পাচ্ছে না যেন। হঠাৎ করেই রেগে উঠল, এমন জেরা শুরু করেছেন যেন আমি একটা ক্রিমিনাল!
কিছু মনে করবেন না, মিস্টার কুপার, আপনার আচরণই এ ভাবে কথা বলতে বাধ্য করছে আমাকে।
কি দেখলেন আমার আচরণের মধ্যে? খেঁকিয়ে উঠল কুপার।
আস্তে কথা বলুন। কি আচরণ করছেন, সেটা আপনিও বুঝতে পারছেন। যাকগে, গাড়ি চুরির রিপোর্ট করতে এসেছিলেন, করা হয়েছে। আপনি এখন যেতে পারেন। গাড়ির খোঁজ পেলে আপনাকে জানানো হবে।
কুপার চলে যাওয়ার পর বেরিয়ে এল কিশোর আর রবিন।
এত নার্ভাস কেন লোকটা? চীফের দিকে তাকাল রবিন। কথা বলতেই কেমন করছিল।
মিথ্যে কথা বলতে গেলে আর কি করবে, চীফ বললেন। ওর ওপর নজর রাখতে হবে। যেই পা ফসকাবে, অমনি কাঁক করে ধরব।

.

ইয়ার্ডে ফিরে দেখল ওরা টেলিফোনে কথা বলছেন মেরিচাচী। ওদের দেখেই বললেন, মুসা, ওরা এসে গেছে। কথা বলতে পারো। তবে আগেই বলে দিচ্ছি, আজ বিকেলে কোথাও আর বেরোতে পারবে না কিশোর। আমাদের বাড়ির ঘাস

এত বড় হয়ে গেছে, গরু চরানো যাবে। তোমার আংকেল গেছে বোরিস আর রোভারকে নিয়ে মাল কিনতে। সুতরাং কিশোরকে বেরোতে দেয়া যাবে না।
কিশোরের হাসি হাসি মুখটা কালো হয়ে গেছে হঠাৎ। কেন, বুঝতে পারলেন চাচী। ফোনটা তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, নে, কথা বল। তবে বেরোনোর চিন্তা করবি না বলে দিলাম আগেই।
সারাটা বিকেল আর বেরোনো হলো না। সন্ধ্যার আলোও যখন নিভে এল, তখন কাজ শেষ করে, হাতমুখ ধুয়ে, চা খেয়ে নিল কিশোর। রাস্তার আলোগুলো জ্বলেছে। গেটের দিকে এগোতে যাবে সে, ঘ্যাঁচ করে এসে থামল একটা পুরানো গাড়ি। জানালা দিয়ে মুখ বের করল মুসা আর রবিন। এই সময়ই আসতে বলেছে ওদেরকে কিশোর।
কোথায় যাব? কিশোর গাড়িতে উঠলে জানতে চাইল মুসা।
রিঙের তিন নম্বর চাবিটার ওপর গবেষণা চালাব আজ, কিশোর বলল। আমার বিশ্বাস, এটা রিভেরা হাউসের কোন দরজার তালার।
রিভেরা হাউস থেকে বেশ খানিকটা দূরে ম্যানিলা রোডের ধারে গাড়ি রাখল মুসা। পুরোপুরি অন্ধকার হয়ে গেছে তখন। বাকি পথটা হেঁটে এল। ওরা। এগোল দেয়ালের ধার ঘেঁষে। গেট খোলা। নিঃশব্দে ঢুকে পড়ল ভেতরে।
তারাখচিত আকাশের পটভূমিতে আবছা অন্ধকার একটা ভূতুড়ে ছায়ার মত মাথা তুলে আছে বাড়িটা। চাঁদ ওঠেনি এখনও। পা টিপে টিপে গিয়ে। বারান্দায় উঠল কিশোর।
তালায় চাবি ঢুকিয়ে কয়েকবার মোচড় দিয়েও খুলতে পারল না। ফিরে তাকিয়ে বন্ধুদের জানাল, লাগছে না। পেছনে চলো।
কিন্তু পেছনের দরজায়ও লাগল না চাবিটা।
সেলারের ঢাকনার না তো? রবিন বলল।
সেদিকেই চলল ওরা।
তালায় চাবি ঢোকাল কিশোর। মোচড় দিতেই ঘুরে গেল। খুলে গেল তালা। লেগেছে! উত্তেজিত হয়ে বলল সে।
ভারি ঢাকনাটা খুলল ওরা। সিঁড়ি নেমে গেছে মাটির নিচের ঘরে। সেই সিঁড়ি বেয়ে সাবধানে নেমে চলল ওরা নিচের অন্ধকারে।
টর্চ আছে সঙ্গে, কিন্তু জালতে সাহস করল না। এই অন্ধকারে জ্বাললে ওপরের ফোকর দিয়ে আলো বেরোবে, অনেক দূর থেকেও দেখা যাবে সেটা। আশেপাশে কেউ থাকলে দেখে ফেলবে।
স্যাঁতসেঁতে ঘর, ভাপসা গন্ধ বেরোচ্ছে। ভ্যাম্পায়ারের কথা মনে পড়ে গেল মুসার। গায়ে কাঁটা দিল তার। অদ্ভুত এক অনুভূতি মনে হচ্ছে, আড়াল থেকে কেউ নজর

রাখছে তার ওপর। অন্য দুজনের সঙ্গে গা ঘেষাঘেষি করে। এল সে। হঠাৎ এক চিৎকার দিয়ে লাফিয়ে একপাশে সরে গেল। পরক্ষণেই ধূড়ম-ধাড়ুম করে পতনের শব্দ।
কোমরে ঝোলানো টর্চের সুইচ টিপে দিল কিশোর।
আলোক রশ্মি ঘুরে গিয়ে পড়ল মুসার মুখে। কতগুলো কাঠের বাক্সের মধ্যে প্রায় ডুবে রয়েছে সে। চোলে জাতক। ঘড়ঘড়ে স্বরে বলল, কি-কি যেন। একটা নরম… চলে গেল আমার পায়ের ওপর দিয়ে। বাদুড়ের নখের মত
ওই যে তোমার বাড়ি, টর্চের আলো নেড়ে এককোণে দেখাল রবিন।
অনেক বড় একটা ইঁদুরকে কুঁজো হয়ে থাকতে দেখা গেল। মুসার চেয়ে বেশি ভয় পেয়েছে।
গায়ে আলো পড়তে শুটিগুটি একপাশে সরে গেল ওটা।
মুসাকে উঠতে সাহায্য করল রবিন অব কিশোর।
এখনও গা কাঁপছে মুসার। কিশোরের পিছু পিছু চুপচাপ এগোল আরেকটা সিঁড়ির দিকে।
শব্দটা তার কানেই আগে ঢুকল। দাঁড়িয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বলল, ওপরতলায় কেউ আছে!
কথা শোনা গেল। মেঝেতে বসানো কাঠের ঢাকনা তোলার শব্দ হলো।
চোর হলে কেয়ার করি না, ঢোক গিলল মুসা, কিন্তু অন্য কিছু হলে…
তাকে কথা শেষ করতে দিল না রবিন। চলো, দেখি।
সিঁড়ির মাথার দরজাটায় তালা দেয়া।
নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার কিশোর। বলল, আমরা ঢুকতে না পারলেও ওদেরকে বের করে আনতে পারি। চেঁচাও। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করো। বেরোতে বাধ্য হবে ব্যাটীরা।
চেঁচাতে শুরু করল তিনজনে। সেই সঙ্গে থাবা আর কিল মারতে লাগল দরজায়। মিনিটখানেক পরেই দরজার ওপাশ থেকে জোরে জোরে কথা শোনা গেল, অ্যাই, কে, বলো তো! নিশ্চয় পুলিশ! পালাও! জলদি পালাও!
ভারি পায়ের শব্দ ছুটে গেল ঘরের অন্য প্রান্তে।
চিৎকার করতে করতে গোয়েন্দারাও নেমে এল সিঁড়ি বেয়ে। বাইরে বেরোনোর সিঁড়িটা বেয়ে আবার উঠতে লাগল। বেরিয়ে এল সেলারের মুখে।
ওরাও বেরোল, এমন সময় জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়ল দুটো ছায়ামূর্তি। নদীর দিকে দৌড় দিল।
ধরো ব্যাটাদের! চেঁচিয়ে উঠল কিশোর।

ভূতের ভয়ের নামমাত্রও নেই আর মুসার মধ্যে। ছুটল লোকগুলোর পেছনে। তবে বনের ভেতরের পথ তার অচেনা, লোকগুলোর চেনা। ফলে গাছপালার আড়ালে ছোটার সময় ওরা সুবিধে বেশি পেল। পিছিয়ে পড়তে লাগল সে।
রবিনকে নিয়ে কিশোর ছুটল সোজা নদীর দিকে। বোটটেটি থাকলে সেটা আটকানোর ইচ্ছে। বন থেকে বেরিয়ে এসে দেখল পানির ধারে বাধা রয়েছে একটা মোটর বোট।
এখনও বেরোয়নি ওরা, কিশোর বলল। নেমে গিয়ে…
তার কথা শেষ হলো না। পেছন থেকে থাবা পড়ল হাতে। টর্চটী উড়ে গিয়ে পড়ল মাটিতে, নিভে গেল। বাল্ক ভেঙে গেছে বোধহয়। বাধা দেয়ার সুযোগ পেল না ওরা। কানের কাছে চেপে ধরা হলো পিস্তল। হাত-পা বেঁধে। মুখে কাপড় গুঁজে দেয়া হলো। তারপর বয়ে নিয়ে গিয়ে তোলা হলো বোটে।
ঘোঁৎ-ঘোৎ করে উঠল কে যেন। গর্জে উঠল ইঞ্জিন।
চলতে শুরু করল বোট।
মুখ ঘুরিয়ে কিশোর আর রবিন দেখল, ডানে কালো তীরের সঙ্গে ওদের দূরত্ব বাড়ছে। বুঝতে পারল উজানের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওদের। দুজন লোক রয়েছে কাছাকাছি। এরাই ওদের ধরেছে। একজন লম্বা। অন্যজন বেটে, গাট্টাগোট্টা। হাল ধরেছে সে।
এদের নিয়ে গিয়ে কি করব? সঙ্গীকে জিজ্ঞেস করল লম্বা লোকটা।
দেব পানিতে ফেলে।
.
হাত-পা বেঁধে বোটের তলায় ফেলে রাখা হয়েছে দুজনকে। অন্ধকার নদী ধরে যেন যুগ যুগ ধরে ছুটছে ওরা। রক্ত চলাচল ব্যাহত হওয়ায় অবশ হয়ে গেছে হাতের আঙুল। বোটের মাঝামাঝি অংশে একটা সীটে বসে ওদের পাহারা দিচ্ছে লম্বা লোকটা। তর্ক করছে বেটে সঙ্গীর সঙ্গে।
পানিতে ফেললে কি ঘটবে আন্দাজ করতে পারো? লম্বু বলল। কিডন্যাপ করাটাই বিরাট অপরাধ, ভিক, তারপর খুন…
থামো, ভীতু কোথাকার! খেঁকিয়ে উঠল বাটুল। ব্রুনো, তোমার যে কবুতরের কলজে, জানতাম না। এখানেই কোথাও ডোবাব ওদের। দেখি, নোঙরটা বের করো। ওটাতে বেঁধে ছেড়ে দেব।
শীতল শিহরণ বয়ে গেল রবিনের শিরদাঁড়া বেয়ে। লোকগুলো যে এতখানি সিরিয়াস, ভাবতে পারেনি এতক্ষণ। ভেবেছে কথার কথা বলছে। এখন দেখছে সত্যি সত্যি। তার মাথাটা রয়েছে বোটের একপাশ আর সীটের মাঝখানে। মুখ থেকে কাপড়টা ফেলার জন্যে বোটের গায়ে ঘষতে শুরু করল

দেখো, আমি এ সবের মধ্যে নেই! ব্রুনো বলল।
তাহলে বসে থাকো, ভিক বলল। আমিই যা করার করব।
ইঞ্জিন নিউট্রাল করে বোট থামিয়ে দিয়ে উঠে এল বাঁটুল।
ইতিমধ্যে কাপড় খুলে ফেলেছে রবিন। আরেকটা ভারি ইঞ্জিনের শব্দ। কানে আসছে তার। এমনিতেও মরবে ওমনিতেও, পিস্তলের ভয় আর করল না। মরিয়া হয়ে গলা ফাটিয়ে চিৎকার শুরু করল, বাঁচাও! বাঁচাও!
লাফ দিয়ে তাকে থামাতে এগোল ব্রুনো।
জ্বলে উঠল সার্চলাইট। ছুটে আসতে লাগল একটা লঞ্চ। সাইরেন বেজে উঠল। বোটের ওপর এসে পড়ল তীব্র আলো।
রবিনকে ধরা বাদ দিয়ে লাফিয়ে গিয়ে আবার হালের কাছে বসে পড়ল। ভিক। ছুটতে শুরু করল বোট।
এ সব করে বাঁচতে পারবে না, চিৎকার করে বলল রবিন। ভয় পাচ্ছে, ওদেরকে পানিতে ফেলে দিয়ে না পেছনের লঞ্চটীকে ঠেকানোর চেষ্টা করে। ডাকাতগুলো। ওদের ফেলতে দেখলে নিশ্চয় থেমে যাবে লঞ্চ, খোঁজাখুজি। করবে। এই সুযোগে পালাবে দুই ডাকাত। তবু হাল ছাড়ল না সে। বলল, নদীটা নিশ্চয় চেনেন না। একটু পর পরই পুলিশের ঘাঁটি আছে। ধরা আপনাদের পড়তেই হবে।
জবাবে গতি আরও বাড়িয়ে দিল ভিক। স্পটলাইটের আলো থেকে বাঁচার জন্যে শাই করে একবার এদিকে হাল ঘোরাচ্ছে, একবার ওদিক। বার বার মোড় নিতে গিয়ে ভীষণ দুলতে আরম্ভ করেছে বোট।
আরে করছ কি! আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল লম্বু বুকে ডুবিয়ে মারবে
ওর তো এই অভ্যাস আছেই, মোহনার কাছে আরেকটা বোটকে ডুবানোর কথা মনে পড়তে বলল রবিন। ভয় দেখানোর চেষ্টা করল, এই নদীর কোন কিছুই চেনেন না। নিচে যে কি মারাত্মক সব ডুবো পাথর আছে, জানেন না। তার ওপর অন্ধকার। সেবার তো তীরের কাছে ডুবেছিল বলে সাঁতরে উঠে জান বাঁচিয়েছেন। এবার রয়েছেন গভীর নদীতে। ডুবলে আর বাঁচতে পারবেন না।
তার সূরে সুর মিলিয়ে ব্রুনো বলল, ও ঠিকই বলেছে, ভিক, থামো তুমি! মরার চেয়ে পুলিশের হাতে পড়া ভাল!
ঠা-ঠা-ঠা-ঠা করে গুলির শব্দ হলো। গর্জে উঠেছে মেশিনগান।
আর চালানোর সাহস করল না ভিক। ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল। তীব্র উজ্জ্বল সাদা আলোর বন্যা যেন ভাসিয়ে দিল বোটটাকে। পুলিশের লঞ্চের ভারি খোল এসে ঘষা খেল বোটের গায়ে।
লঞ্চ থেকে লাফিয়ে নামল একটা ভারি শরীর।
মুসা! আনন্দে চিৎকার করে উঠল রবিন।-তুমি এখানে!

ভালই আছ তোমরা আনন্দে গলা কেঁপে উঠল মুসার। দ্রুতহাতে বাঁধন খুলতে শুরু করল।
দুই চোরের হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিল পুলিশ। লঞ্চে টেনে তুলল। মোটর বোটটাকে বেঁধে নেয়া হলো লঞ্চের সঙ্গে।
রকি বীচে ফিরে চলল লঞ্চ।
হেলান দিয়ে বসে কিশোর বলল, একটা কাজের কাজ করেছ, মুসা। এমন সময় মত পুলিশ নিয়ে হাজির হলে কি করে?
তোমাদের তুলে নিয়ে বোটটাকে চলে যেতে দেখলাম। পাগলের মত ছুটলাম গাড়ির দিকে। চলে গেলাম কাছের পুলিশ ফাঁড়িতে। ওদেরকে জানাতেই ওয়্যারলেসে যোগাযোগ করল একটা টহল লঞ্চের সঙ্গে। ছুটে চলে গেলাম আবার নদীর ধারে। লঞ্চটা আমাকে তুলে নিল। উজানের দিকে যেতে বললাম ওদের। রবিনের চিৎকারটা কাজে লেগেছে। তাড়াতাড়ি পাওয়া গেছে তোমাদের।
ও চিৎকার না করলে আর পেতে কিনা সন্দেহ আছে, কব্জি ডলতে ডলতে বলল কিশোর। আমাদের ডুবিয়ে দিতে চাইছিল বাটুল শয়তানটা।
রিভেরা হাউসের কাছে এসে তিন গোয়েন্দাকে নামিয়ে দেয়ার সময় লঞ্চের ক্যাপ্টেন বললেন, হেডকোয়ার্টারে দেখা কোরো। কিডন্যাপার দুটোকে ওখানেই নিয়ে যাচ্ছি।
মুসার গাড়িতে করে রকি বীচ থানায় চলল ওরা। শহরে ঢুকে সে বলল, খিদে পেয়েছে। প্রস্তাবটা মন্দ না, কিশোর আর রবিনেরও মনে ধরল। একটা ফাস্ট ফুডের দোকান থেকে হট ডগ আর গরম দুধ খেয়ে নিল।
থানায় এসে দেখল, ব্রুনো আর ভিককেও নিয়ে আসা হয়েছে। আরও দুজন অফিসারকে নিয়ে ওদের জেরা করছেন চীফ ইয়ান ফ্লেচার। কোন কথাই স্বীকার করতে চাইছে না দুই চোর।
বন্দরে চুরি-ডাকাতির কথা কিছু জানি না আমরা। ফুঁসে উঠল ভিক। কোন প্রমাণ আছে আপনাদের হাতে? প্রমাণ ছাড়া চোর বলতে পারেন না আমাদের।
কিডন্যাপার তো বলতে পারি, চীফ বললেন। তাতেই চলবে।
অনিশ্চিত দৃষ্টি ফুটেছে ব্রুনোর চোখে। চুপ করে রইল।
কিশোর বলল, স্যার, আমার মনে হয় রিভেরা হাউসে গেলেই জোরাল প্রমাণ পাওয়া যাবে। আমরা যাব নাকি দেখতে?
এক মুহূর্ত ভাবলেন চীফ। উজ্জ্বল হলো চোখ। ভাল বুদ্ধি। একজন। অফিসারের দিকে তাকিয়ে বললেন, মরিস, একটা পেট্রল কার নিয়ে তুমিও যাও সঙ্গে।
.

সে-রাতে দ্বিতীয়বারের মত রিভেরা হাউসে চলল তিন গোয়েন্দা। এবারও রাস্তার ধারেই গাড়ি রাখল। মরিসকে নিয়ে এল সেই জানালাটার কাছে, যেটা দিয়ে লাফিয়ে পড়েছিল দুই চোর।
ওই জানালা পথেই ভেতরে ঢুকে গেল ওরা।
শীঘ্রি আলো জ্বলে উঠল পুরানো বাড়িটার ঘরে ঘরে। তিন গোয়েন্দাকে নিয়ে খুঁজতে শুরু করল পুলিশ।
ডাইনিং রুমের কোণের একটা আলমারির দরজা টান দিয়ে খুলল মুসা। ভেতরে অনেকগুলো মলাটের বাক্স। হাত নেড়ে ডাকল মরিসকে, দেখে যান, এদিকে আসুন!
ছুটে এল মরিস, রবিন আর কিশোর। একটা বাক্স বের করে এনে মেঝেতে রেখে খুলল। পানি নিরোধক কাগজে মোড়া দামী একটা পরি। ফুলদানি রয়েছে ভেতরে। কোন দেশে তৈরি, সেটাও খোদাই করে লেখা। রয়েছে নিচে। জিনিসটা বিদেশী।
চোরাই মাল কোন সন্দেহ নেই, মরিস বলল। আগের বারও দেখে গেছি এই আলমারি। তখন এগুলো ছিল না।
অন্য বাক্সগুলোও খুলে দেখা হলো। নানা রকমের জিনিসে বোঝাই। চীনা মাটির তৈরি ঘর সাজানোর জিনিস, দামী গহনা, হীরা বসানো সোনার আঙটি আর হার, আরও নানা জিনিস।
ভ্রুকুটি করল রবিন। ডুডলি হ্যারিসের জিনিসগুলো কই? আর ক্যাপ্টেন টমারের পান্নার হার?
আবার শুরু হলো খোঁজা। একতলা-দোতলা-তিনতলার ঘর, চিলেকোঠা, সেলার; কোন জায়গাই বাদ দিল না। কিন্তু পাওয়া গেল না ওগুলো।
অবশেষে মরিস বলল, যা পাওয়া গেছে চোর দুটোকে ফাঁসানোর জন্যে যথেষ্ট। ওরাই রেখে গেছে এ সব।
তা ঠিক, কিশোর বলল। তবে মনটা খুঁতখুঁত করছে তার। পান্নার জিনিসগুলো পাওয়া গেল না কেন? কোথায় আছে ওগুলো?
বাইরে বেরিয়ে এল ওরা।
মরিসকে বলল কিশোর, আপনি যান। আমার টর্চটা পড়ে গেছে নদীর ধারে। ওটা নিয়ে আসি।
ঠিক আছে, যাও, বলে আরেকটা টর্চ কিশোরের হাতে ধরিয়ে দিয়ে পেট্রল কারের দিকে চলে গেল মরিস।
দুই সহকারীকে নিয়ে কিশোর রওনা হলো নদীর পাড়ে। টর্চটা খুঁজে পেল সহজেই। বাল্ব ভাঙেনি। ঝাঁকুনিতে নিভে গিয়েছিল। সুইচ টিপে হাতের তালুতে

দুচারটা বাড়ি দিতেই জ্বলে উঠল।
ড্রাইভওয়েতে ফিরে এল আবার ওরা।
মুসা বলল, আবার সেই অনুভূতিটা ফিরে এসেছে আমার। ভয় ভয় লাগছে। মনে হচ্ছে কেউ যেন নজর রাখছে আমাদের ওপর।
হেসে বলল রবিন, উত্তেজনা কেটে গেছে তো, অনুভূতি ফিরে আসবেই। তোমার ভয়ের অনুভূতি মানে তো ভূতের ভয়।
জবাব না দিয়ে গাড়ির দিকে এগোল মুসা।
তিনজনেই চড়ে বসল। পকেটে হাত দিয়ে চাবি খুঁজছে মুসা, এই সময় কানে এল ইঞ্জিনের শব্দ। আরেকটা গাড়ি আসছে। আলো নিভিয়ে আসছে। ঝোপের আড়ালে থাকায় মুসার গাড়িটাকে দেখতে পেল না। সোজা এগিয়ে। গেল রিভেরা হাউসের গেটের দিকে। গাড়ি থামিয়ে নেমে গেল ড্রাইভার, গেটের পাল্লা খুলে দিয়ে ফিরে এসে গাড়িতে উঠল। গাড়ি নিয়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে।
যাবে নাকি? জিজ্ঞেস করল রবিন।
মুসাকে বলল কিশোর, যাও।
হেডলাইট জ্বেলে দিল মুসা। খোলা গেটের দিকে এগোল সে-ও। ঢুকে পড়ল ভেতরে। গাড়িটা দেখতে পেল না।
ড্রাইভওয়েটা ঘুরে গিয়ে বাড়ির পেছনে যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে এনে গাড়ি রাখল মুসা।
নেমে পড়ল ওরাও। সামনে ঘন ঝোপঝাড়। চারাগাছকে নির্ভর করে ঘন হয়ে উঠে গেছে আঙুর লতা। বাড়ির অনেকখানিই দেখা যায় না এর জন্যে।
টর্চের আলোয় মাটি পরীক্ষা করতে লাগল কিশোর। অবাক হয়ে দেখল, চাকার দগি সোজা চলে গেছে বিল্ডিঙের দিকে।
লতানো ঝোপের দিকে এগোল রবিন। লতাপাতা ধরে টেনে ফাঁক করে বাড়িটা দেখার চেষ্টা করল। অবাক হয়ে দেখল একটা রাস্তা চলে গেছে গাছের জটলার ভেতর দিয়ে।
খাইছে! গুপ্তপথ! কাঁধের কাছে বলে উঠল মুসা।
রহস্যময় গুপ্তপথটা ধরে এগিয়ে চলল ওরা। মাথার ওপরে পাতার চাঁদোয়া। ফাঁক-ফোকর দিয়ে আকাশ চোখে পড়ে এক-আধটু। তবে অন্ধকারই বেশি। অনেকটা গাছের সুড়ঙ্গের মতই মনে হচ্ছে। কোন রকম সাড়াশব্দ না পেয়ে টর্চ জ্বালার সিদ্ধান্ত নিল কিশোর।
মরিসের দেয়া টর্চটা হাতে নিয়েছে রবিন।
ধসে পড়া একটা গোলাঘর ফুটে উঠল টর্চের আলোয়। মাটিতে চাকার দাগ। এগিয়ে গেছে ঘরটার দিকে।

ঘরে ঢুকে পড়ল ওরা। সামনের অর্ধেকটা একেবারে খালি। সামনের দিকে চালার আড়া বেঁকে গেছে, বেশি চাপ পড়লে ভেঙে যাবে। পেছনের অর্ধেক খড়ে বোঝাই। সামনের দিকটায় ওপর থেকে ঝুলে আছে খড়গুলো, যেন উপচে পড়তে চাইছে।
কবেকার খড়! মুসা বলল। মনে তো হয় রিভেরাই রেখে গিয়েছিল এগুলো।
তাহলে এই খড় সরানোর কাটাটা নতুন কেন? কাঠের হাতল লাগানো লোহার তিনটে বড় কাটাওয়ালা যন্ত্রটা দেখাল রবিন। খড়ের গাদার কাছে মাটিতে পড়ে আছে।
এবং গাড়িটাই বা কোথায়? কিশোরের প্রশ্ন।
সামনের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আচমকা নড়ে উঠল সে। এগিয়ে গেল খড়গুলোর দিকে। কাঁটাটা তুলে নিয়ে খোঁচা দিল খড়ে। কাঠে লাগার শব্দ হলো। কাটা ফেলে খড় ফাঁক করে দেখল। ভেতরে প্লাইউডের বোর্ড একটা হাতল লাগানো আছে।
হাতল ধরে টানতেই দরজার পাল্লার মত করে সরে এল প্লাইউড।
খাইছে! হাঁ করে তাকিয়ে আছে মুসা।
রবিনও হাঁ হয়ে গেছে।
খড়ের গাদার নিচে গোপন গ্যারেজ তৈরি করা হয়েছে। তার মধ্যে যেন আরাম করে ঘুমিয়ে আছে লেটেস্ট মডেলের একটা কালো রঙের মেটিওর স্পেশাল গাড়ি।
গাড়িটার দুই পাশেই জায়গা আছে। একদিক দিয়ে ঢুকে গেল কিশোর। বনেটে হাত রেখে বলল, ইঞ্জিন এখনও গরম। একটু আগে ঢোকানো হয়েছে।
রবিন আর মুসাও এগিয়ে এল। একমত হলো কিশোরের সঙ্গে।
শব্দ শুনতে পেল মুসা। ফিসফিস করে বলল, শুনছ? গোঙানি!
আলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে শুরু করল কিশোর। গ্যারেজের মেঝেতে কেউ নেই। গাড়ির পেছনের সীটের নিচে আলো পড়তেই চমকে উঠল।
মেঝেতে পড়ে আছে একজন মানুষ। হাত-পা বাঁধা। মুখে কাপড় গোঁজা।
ঢোঁক গিলল মুসা।
কে-কেউ ওকে বেঁধে ফেলে গেছে!
আলো ধরে রাখল কিশোর আর রবিন। দরজা খুলে ভেতরে গিয়ে লোকটার বাঁধন কেটে দিল মুসা।
ধীরে ধীরে উঠে বসল লোকটা। কব্জি আর গোড়ালি ডলে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করতে গিয়ে গুঙিয়ে উঠল আবার।

.

তার সঙ্গে কথা শুরু করল রবিন, আপনাকে কোথাও দেখেছি মনে হয়?

কোথায় দেখেছে মনে পড়ল। হ্যারিসের বাড়িতে আড়ি পেতে থাকা লোকটাকে যখন তাড়া করেছিল কিশোর, তখন রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিল যে নীল জ্যাকেট পরী লোকটা, এ সেই। উদ্ধার পেয়েছে এর জন্যে কৃতজ্ঞ হবে, তা না, জ্বলন্ত চোখে ওদের দিকে তাকাল সে। কপালের ঘাম মোছার জন্যে পকেট থেকে রুমাল টেনে বের করতে গেল। টান লেগে কি যেন একটা পড়ল পকেট থেকে।
দেখে ফেলল রবিন। নিচু হয়ে তুলে নিল। একটা নকল দাড়ি।
বুঝে ফেলল কিশোর। বলল, তার মানে আপনিই আড়ি পেতে শুনছিলেন হ্যারিসের বাড়িতে। এখন বলে ফেলুন তো, ছদ্মবেশ নিয়েছিলেন কেন? খেলাটা কি আপনার?
জবাব দিল না লোকটা। আরেক দিকে মুখ ফেরাল।
মুসা বলল, না বললে আবার বেঁধে এই গাড়িতে ফেলে যাব আপনাকে। নিশ্চয় বুঝতে পারছেন আমাদের তিনজনের সঙ্গে পারবেন না।
অগত্যা হার স্বীকার করে নিল লোকটা। বলল, হ্যাঁ, আড়ি পেতে আমি শুনেছি। তবে তাতে লাভের লাভ কিছুই হয়নি। এই জ্যাকেটটাও মাত্র একবার কাজ দিয়েছে। গায়ের জ্যাকেটটা খুলে উল্টে দেখাল সে। ভেতরের দিকটা বাদামী। তারমানে দুই দিকেই পরা যায়। এক পিঠের রঙ নীল, আরেক পিঠ বাদামী। তোমরা যখন আমাকে তাড়া করলে, এক ফাঁকে দাড়ি খুলে নিলাম। জ্যাকেটটা খুলে উল্টে নিয়ে পরে ফেললাম।
এবং আমাদের ধোকা দিলেন, রবিন বলল। ঠিক আছে, বলে যান।
আমি একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ। এতদিন এ কাজে গর্ব বোধ করতাম। তবে এবার ঘেন্না ধরে গেছে। আর না। এই পেশা ছেড়ে দেব ঠিক করেছি।
দ্রুত ভাবনা চলেছে কিশোরের মাথায়। প্রাইভেট ডিটেকটিভ? নিশ্চয় বীমা কোম্পানির। আপনার নাম মিলার প্যাটোলি?
মাথা ঝাঁকাল লোকটা। আমার আসল নাম প্যাট ব্রিংহ্যাম। ক্যাপ্টেন টমারের চুরি যাওয়া হার খুঁজে বের করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে আমাকে। আমি শুনলাম, তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলে তোমরা। তাই আড়ি পেতে শুনতে গিয়েছিলাম, তোমরা কতটা জানো। সেখানে শুনলাম, বুড়ো হ্যারিসও পান্নার জিনিস হারিয়েছে। আমি জানি কে নিয়েছে। বিশালদেহী ওই লোকটা, চশমা পরে যে– উইক শিপরিজ-সে নিয়েছে। এটা আমি বের করে ফেলেছি।
উইক শিপরিজ? রবিনের দিকে তাকাল কিশোর। নামটা এই প্রথম শুনল ওরা। ভাবছে, ওই লোকই অ্যালেক্স ককারের নকল নয় তো?
হ্যাঁ, জবাব দিল প্যাট, উইক শিপরিজ। সারা শহরে তার পেছনে ঘুরে বেড়িয়েছি আমি। শেষে তার গাড়িতে উঠে পেছনে লুকিয়ে থেকেছি। ভেবেছি, টমারের

হারটার কাছে আমাকে নিয়ে যাবে সে। কিন্তু সর্বনাশ করে দিল। হতচ্ছাড়া হাঁচি! নাক এত সুড়সুড় করতে লাগল কিছুতেই হাঁচি না দিয়ে পারলাম না। তারপর আর কি। মাথায় বাড়ি মেরে আমাকে বেহুশ করে ফেলল উইক। হুঁশ ফিরলে দেখি অন্ধকারে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় গাড়ির মেঝেতে পড়ে আছি। উফ, কি যে কষ্ট! গোয়েন্দাগিরি মানুষে করে নাকি!

মানুষেই করে, মুচকি হেসে বলল কিশোর, সবাই সহ্য করতে পারে না, এই আর কি। যাকগে। ভাল তথ্য দিলেন। সবাই মিলে এখন উইককে খুঁজতে যাব। আপনি যাবেন?।

একটু আগের প্রতিজ্ঞার কথা বেমালুম ভুলে গেল প্যাট। উজ্জ্বল হয়ে উঠল মুখ। নিশ্চয় যাব!

ওকে নিয়ে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা।

রিভেরা হাউসের জানালাটা এখনও ভোলা। সেটা দিয়ে ঢুকে পড়ল। চারজনেই। কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজি করেও উইককে পাওয়া গেল না। কোথাও।

ঘরে নেই, হাল ছেড়ে দিয়ে বলল কিশোর। বাইরে জঙ্গলের মধ্যে থেকে থাকলে ওকে আজ রাতে পাওয়ার আশা ছাড়তে হবে। পুলিশকে জানানো দরকার।

মুসার গাড়িতে করে শহরে ফিরে এল ওরা।

আমাকে আমার মোটেলে নামিয়ে দাও, অনুরোধ করল প্যাট। আজ রাতে আর কুটোটিও সরাতে পারব না। গোয়েন্দাগিরি অনেক হয়েছে।

ওকে নামিয়ে দিয়ে থানায় চলে এল তিন গোয়েন্দা। অফিসেই আছেন ফ্লেচার। কয়েকজন পুলিশ অফিসার আছে ঘরে। ব্রুনো আর ভিককে জেরা করা বোধহয় শেষ হয়েছে। ওরাও বসে আছে। আগের তেজ আর নেই ভিকের। বুকের ওপর ঝুলে পড়েছে মাথা। পুলিশের একজন ক্লার্ক কাগজ আর পেন্সিল নিয়ে ওদের জবানবন্দি নিতে তৈরি।

তিন গোয়েন্দাকে ঢুকতে দেখে হেসে বলল অফিসার মরিস, আমি চোরাই মাল নিয়ে আসার পরও বহুত উঁটি দেখিয়েছে। স্বীকার করতে চায়নি। একটু আগে সব বলতে রাজি হয়েছে। বাটুলটার নাম ভিক বারগার। আর লম্বুটা ব্রুনো বেকিং।

চেয়ার টেনে বসল ছেলেরা।

ব্রুনো বলল, হ্যাঁ, মোটর বোটটা আমরা চুরি করে এনেছি। বন্দরে অনেকের বোট বাঁধা আছে। রাতে কোন একটা চুরি করে নিয়ে কাজে বেরোতাম। মাস্টার কী ছিল আমাদের কাছে। ইঞ্জিন স্টার্ট দিতে অসুবিধে হত না। কাজ শেষ হলে নিয়ে গিয়ে আবার বোট রেখে দিতাম আগের জায়গায়। জাহাজের গায়ে বোট ঠেকিয়ে উঠে জাহাজ থেকেও জিনিস চুরি করেছি আমরা।

কি জিনিস? প্রশ্ন করলেন চীফ।

অনেক কিছু।
পান্নার তৈরি জিনিসও নিশ্চয়? জিজ্ঞেস করল কিশোর। চোখ গরম করে ওর দিকে তাকাল ভিক। তুমি জিজ্ঞেস করার কে! ধমক দিয়ে বললেন ফ্লেচার, জবাব দাও ওর কথার! চোখের আগুন নিভল না ভিকের। আরেক দিকে মুখ ফেরাল। ব্রুনো জবাব দিল, হ্যাঁ। তোমাদের দলপতি কে? রবিন জানতে চাইল।
দলপতি নেই, ব্রুনো জবাব দেয়ার আগেই তাড়াতাড়ি বলে উঠল ভিক, আমরা দুজনই–আমি আর ব্রুনো।
ব্রুনোর মত একজন মাথামোটা ভীতু লোককে নিয়ে তুমি লক্ষ লক্ষ ডলারের জিনিস চুরি করে গাপ করে দিয়েছ, এ কথা বিশ্বাস করতে বলো আমাদের? ব্যাঙ্গের হাসি হাসল রবিন, হাসালে। তোমাদের বস উইক শিপরিজের কথা আমরা জেনে গেছি।
এমন চমকে গেল দুই চোর, যেন বোলতায় হুল ফুটিয়েছে।
তু-তুমি কি করে জানলে… বলতে গিয়ে বাধা পেল ব্রুনো।
ধমকে উঠল ভিক, চুপ, গাধা কোথাকার! থামো!
চেয়ারে এলিয়ে পড়ল ব্রুনো।
কিশোর বলল, আর অস্বীকার করে লাভ নেই। উইক আর পান্নার জিনিসগুলো কোথায়, বলে ফেলো এখন।
নিজেরাই গিয়ে বের করে নাও না! দাঁতে দাঁত ঘষল ভিক।
তেজ দেখাবে না বলে দিলাম! কঠিন গলায় ধমক দিলেন চীফ। ভাল চাও তো, যা জিজ্ঞেস করে, জবাব দাও।
ভিকের দিকে তাকাল ব্রুনো, সবই তো বলে দিলাম। আর গোপন রেখে লাভ কি? ছেলেদের দিকে ফিরল সে। কি জানতে চাও?
রবিন জিজ্ঞেস করল, মিস্টার হ্যারিসের জিনিসগুলো কে চুরি করেছে?
টমারের হারটা আমরা নিয়েছি। হ্যারিসেরগুলো করেছে উইক আর কুপার। প্রথমে হ্যারিসের বাড়িতে গিয়ে কৌশলে তাকে দিয়ে পান্নার কিছু জিনিস বের করায় উইক। তারপর হ্যারিসকে দাবার বোর্ড আনতে পাঠিয়ে জিনিসগুলো নিয়ে বেরিয়ে যায়। বাড়ি খালি ফেলে তার পিছু নেয় হ্যারিস। ওই সময় বাড়িতে ঢুকে বাকি জিনিসগুলো নিয়ে আসার কথা ছিল কুপারের। কিন্তু সময়ের হেরফের করে গোলমাল করে দিয়েছিল সে। বাধ্য হয়ে তখন উইককে আবার যেতে হয়। তোমরা তখন হ্যারিসকে তার বাড়িতে পৌঁছে দিতে গেছ। আমাদের সঙ্গে বন্দরে দেখা করার কথা ছিল কুপারের। সেটাও সে করেনি। একটা বোট নিয়ে রিভেরা হাউসে তাকে পৌঁছে দেয়ার জন্যে তৈরি হয়ে বসেছিলাম আমি আর ভিক।

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। ওই বাড়িতে উইকের সঙ্গে দেখা হলো তোমাদের। সে নিয়ে গেছে পান্নার জিনিসগুলো, আর তোমরা অন্যান্য চোরাই মাল।
হ্যাঁ
লোকের বোট চুরি করে কাজ সারার ফন্দিটা কার মাথা থেকে বেরিয়েছিল? জিজ্ঞেস করলেন চীফ।
উইক। গাড়ির ওপর চোখ পড়ে গিয়েছিল পুলিশের গাড়ি আর নিরাপদ ছিল না। তাই বোট চুরি করতে শুরু করলাম, যাতে মালিকরাও কিছু বুঝতে না পারে। তবু সামাল দেয়া কঠিন হয়ে পড়ল। পুলিশ তো আছেই, এই ছেলেগুলোর উৎপাতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম, তিন গোয়েন্দাকে দেখাল সে। আজ রাতে সেলারে গিয়ে দরজা বন্ধ দেখে, ঘরে ঢুকতে না পেরে চেঁচাতে শুরু করল। আমরা তো ভাবলাম পুলিশ এসে ঘিরে ফেলেছে। জানালা টপকেই পালালাম।
প্রথম হাসল মুসা। হাসিটা সংক্রামিত হলো রবিন আর কিশোরের মাঝে। মুচকি হাসলেন ফ্লেচার। মরিসও হেসে ফেলল।
মুখটাকে বিষণ্ন করে রাখল ব্রুনো।
ভিকের চেহারা থমথমে।
হাসতে হাসতে ছেলেদের দিকে ফিরলেন চীফ। জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁ, এইবার বলো, উইকের কথা জানলে কি করে?
বলল রবিন। গোপন গ্যারেজ আর বন্দি ডিটেকটিভের কথা শুনে ভুরু কুঁচকে গেল চীফের।
চাবির রিঙটা বের করে দিল কিশোর, এটা পাওয়াতে অনেক সুবিধে হয়েছে আমাদের।
হু, মাথা দোলালেন চীফ। মনে হচ্ছে, শেষ হয়ে এসেছে কেসটা। অফিসারদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলেন তিনি, সকাল হলেই দলবল নিয়ে চলে যাবে রিভেরা হাউসে। তন্ন তন্ন করে খুজবে বাড়িটা। উইক আর কুপারকে সহ পান্নার জিনিসগুলো বের করার চেষ্টা করবে। গোলাঘর থেকে মেটিওর গাড়িটা বের করে নিয়ে আসবে।
ব্রুনো আর ভিকের ধরা পড়ার খবর নিশ্চয় পেয়ে যাবে ওরা, মরিস। বলল। যদি তল্পি গুটিয়ে পালানোর চেষ্টা করে?
শহর থেকে বেরোনো সমস্ত পথ ওদের জন্যে বন্ধ করে দিতে হবে। সব জায়গায় নজর রাখতে হবে। বিশেষ করে রাস্তাগুলো আর বন্দর। কড়া পাহারা বসিয়ে দাওগে ওসব জায়গায়। কিছুতেই যাতে বেরোতে না পারে। রিভেরা হাউসের চারপাশেও পাহারার ব্যবস্থা করবে।

কিশোর বলল, কিন্তু পুলিশ দেখলে তো সতর্ক হয়ে যাবে উইক। বাড়িতে ঢুকবে না।
জানি। সেজন্যেই এমন করে লুকিয়ে থেকে পাহারা দিতে হবে, যাতে উইক দেখতে না পায়। সে মনে করে, কেউ নেই, আগের মতই নির্জন। যেই ঢুকবে, অমনি ধরে ফেলা হবে।
নির্দেশ মত কাজ করার জন্যে তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে গেল। অফিসারেরা।
তিন গোয়েন্দার দিকে তাকালেন চীফ, আবার পুলিশকে বিরাট সাহায্য করলে তোমরা। অনেক ধন্যবাদ। যাও, বাড়ি যাও। বিকেলে ফোন করে আমাকে। খবর জেনে নিয়ো।

.

রাত অনেক হয়েছে। ঘুমন্ত শহরের পথ দিয়ে গাড়ি চালাচ্ছে মুসা। পেছনের সীটে বসা কিশোর বলল রবিনকে, বুঝতে পারছি না কি ঘটবে! উইক আর কুপার এখনও মুক্ত। পান্নাগুলোও খুঁজে পাওয়া যায়নি।
একমত হয়ে রবিন বলল, মিস্টার ককারকে হুমকি দিয়ে লেখা নোট রহস্যেরও কিনারা হলো না। সেদিন রাতে অমন ভয়াবহ চিৎকারই বা দিয়েছিল কে?
হু! আনমনে নিচের ঠোঁটে একবার চিমটি কাটল কিশোর। কেসটা শেষ হয়নি এখনও। অনেক কিছু বাকি?
আগে গিয়ে ভালমত ঘুমিয়ে নাও, সকালে ভাবনা-চিন্তা কোরো, হাই তুলল মুসা। ব্রেক কষল। বাড়ি এসেছে। নামো।
পরদিন সকালে ডিরেক্টরি ঘেটে ককারের বাড়ির ফোন নম্বর বের করে ফোন করল কিশোর। রিভেরা হাউসে নয়, তাঁর আসল বাড়িতে, যেখানে বাস করেন। আগের রাতে রিভেরা হাউসে যে চোর ধরা পড়েছে, জানানোর জন্যে। ফোন ধরল না কেউ।
তখন ব্যাংকে ফোন করল কিশোর।
সরি, স্যার, ব্যাংক থেকে জবাব দিল একজন, মিস্টার ককার এখনও আসেননি। তিনি কোথায়, তা-ও বলতে পারব না। বলে যাননি।
কিছুক্ষণ পর রবিন এল। তাকে খবরটা জানাল কিশোর। সারাটা সকাল ওঅর্কশপে বসে রইল দুজনে। খানিক পর পরই ককারের বাড়িতে ফোন করল কিশোর। একবারও ফোন তুলল না কেউ।
দুপুরে খাওয়ার পর আর বসে থাকতে পারল না কিশোর। রবিনকে নিয়ে থানীয় রওনা হলো।
অফিসে আছেন চীফ। চোখের কোণে কালি। চোখ লাল। সারারাত ঘুমাননি। সকাল থেকেও নিশ্চয় বিছানায় পিঠ লাগানোর সুযোগ মেলেনি। জানালেন,

পাশের শহরের এক মোটেল থেকে কুপারকে ধরে আনা হয়েছে।
রিভেরা হাউসের প্রতিটি ইঞ্চি খুঁজে দেখা হয়েছে, বললেন তিনি। মেটিওরটা নিয়ে এসেছে মরিস। কিন্তু উইক কিংবা পান্নাগুলোর কোন খোঁজ, মেলেনি। রিভেরা হাউসে নেই। নিশ্চয় অন্য কোনখানে লুকিয়েছে।
থানা থেকে বেরিয়ে একটা পাবলিক টেলিফোন বুঁদ থেকে আবার। ককারের বাড়িতে ফোন করল কিশোর। সেই একই অবস্থা। জবাব নেই। আবার ব্যাংকে ফোন করল সে। ব্যাংকেরও একই জবাব, আসেননি। কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।
বুদ থেকে বেরিয়ে এসে রবিনকে বলল সে, ব্যাপারটা ভাল মনে হচ্ছে না আমার। তাঁর বাড়িতে যাওয়া দরকার।
শহরের একধারে ককারের বাড়িতে এসে ঢুকল দুই গোয়েন্দা। সদরদরজার ঘণ্টা বাজিয়ে, অনেক ধাক্কাধাক্কি করেও সাড়া না পেয়ে সন্দেহ চরমে উঠল। শেষে আবিষ্কার করল, দরজায় তালা দেয়া।
পুলিশকে জানানো দরকার, গম্ভীর হয়ে বলল কিশোর। শিওর, খারাপ কিছু হয়েছে ককারের।
আধঘণ্টা পর থানা থেকে কয়েকজন পুলিশ নিয়ে এসে আবার ককারের বাড়িতে ঢুকল ওরা।
তালা ভেঙে ঘরে ঢুকল পুলিশ। সুন্দর করে সাজানো রয়েছে ঘরগুলো। সবই ঠিক আছে, কেবল ককার নেই।
আপাতত আর কিছু করার নেই। নতুন কিছু জানতে পারলে জানাবে, কিশোরকে কথা দিয়ে দলবল নিয়ে চলে গেল আফিসার মরিস।
নিজেদের গাড়িতে চড়ল দুই গোয়েন্দা।
চিন্তিত ভঙ্গিতে কিশোর বলল, আমার ধারণা, রিভেরা হাউসে গিয়েছিলেন ককার। বিপদে পড়েছেন। ওখানেই চলো।
বিকেলের মাঝামাঝি। কিন্তু সেই তুলনায় আলো কম। পশ্চিম আকাশে। মেঘ জমছে। চলতে চলতে হঠাৎই কোন রকম জানান না দিয়ে কেশে উঠে বন্ধ হয়ে গেল ফোক্স ওয়াগেনের ইঞ্জিন।
অনেক চেষ্টা করেও গোলমালটা ধরতে পারল না রবিন। কোন মতেই স্টার্ট করতে না পেরে বিরক্ত হয়ে গাড়িটাকে ঠেলে রাস্তার পাশে নামাল দুজনে। তেতো গলায় কিশোর বলল, আর কোন উপায় নেই, হেঁটেই যেতে হবে।
অনেক সময় খেয়ে নিয়েছে গাড়িটা। বিকেল শেষ। গোধূলিও শেষ হয়ে গেল দ্রুত। ঘণ্টাখানেক একনাগাড়ে হাঁটার পর ম্যানিলা রোডের মোড়ে এসে পৌঁছল

ওরা। রিভেরা হাউসে যখন ঢুকল, অন্ধকার হয়ে গেছে। ঢুকতে বাধা দিল না ওদের কেউ, কোন পুলিশম্যানকে দেখা গেল না আশেপাশে।
সোজা সেলারে ঢোকার মুখের দিকে এগোল কিশোর। ভাগ্যিস, চাবিটা ছিল সঙ্গে।
আকাশে গুড়গুড় করে মেঘ ডাকল। ঢাকনার তালায় চাবি ঢোকাল সে। সেলারে নেমে অন্য সিঁড়িটী বেয়ে রবিনকে নিয়ে ওপরে উঠতে শুরু করল। ভেবেছিল দরজায় তালা লাগানো দেখতে পাবে। ভেঙে কিংবা অন্য কোন ভাবে খুলতে হবে। কিন্তু অবাক হলো। দরজাটা ভোলা।
ভালই হলো। পরিশ্রম বাঁচল। ভেতরে ঢুকে পড়ল ওরা।
অন্ধকারে পা টিপে টিপে লিভিং রুমের দিকে এগোল। কিছুদূর যেতে না যেতেই কিশোরকে চেপে ধরল অসাধারণ শক্তিমান দুটো হাত। ফেলে দিল মেঝেতে। আরেকটী দেহ পড়ার শব্দ কানে এল তার। নিশ্চয় রবিনকেও ফেলেছে।
দীর্ঘ পথ হেঁটে এসে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ওরা। তবু বাধা দেয়ার চেষ্টা করল। টিকতে পারল না। মাথায় কঠিন কিছুর বাড়ি খেয়ে আধাবেহুশ হয়ে গেল কিশোর। টেনে এনে তাকে একটা চেয়ারে বসিয়ে হাতল আর পায়ার সঙ্গে হাত-পা বেঁধে ফেলা হলো। রুক্ষ হাতে মুখে ঠেসে দেয়া হলো কাপড়। একপাশে ধস্তাধস্তির আওয়াজ শুনে বুঝতে পারল, রবিনকেও কাবু করে ফেলা হচ্ছে।
তারপর নীরবতা। কানে আসতে লাগল এ্যাণ্ডফাদার কুকটার একটানা। একঘেয়ে শব্দ:
টিক-টক। টিক-টক! টিক-টক!
মাথার মধ্যে এখনও কেমন করছে তার, ঘোর পুরোপুরি কাটেনি। এরই মধ্যে ভাবল, রবিন কি এ ঘরেই আছে? না অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাকে?
.
কানে এল পা টেনে টেনে হাঁটার আওয়াজ। ভারি নিঃশ্বাস ফেলছে কেউ। জ্বলে উঠল একটা মান আলো। পুরো দৃশ্যটা দেখতে পেল কিশোর।
লিভিং রুমে রয়েছে সে। জানালার ভারি পর্দাগুলো টেনে দেয়া হয়েছে। এককোণে টিক টিক করে চলছে গ্র্যাণ্ডফাদার কুক। রবিনকেও তারই মত বেধে বসিয়ে রাখা হয়েছে পুরানো আমলের একটা পিঠ উঁচু চেয়ারে।
ওদের সামনে দাঁড়ানো লম্বা, বিশালদেহী একজন লোক। চোখে চশমা। ককারের মতই দেখতে অনেকটা, তবে ককার নয় সে। নিজের পরিচয় দিল উইক শিপরিজ বলে।
তাহলে এই লোকই সেই লোক, বন্দর-চোরদের দলপতি! ভাবল রবিন। মাথায় বাড়ি মেরে আমাদের কাবু করে চেয়ারে এনে বেঁধেছে। শয়তান কোথাকার!

একবার এর দিকে, একবার ওর দিকে তাকাতে লাগল উইক। বাঁকা হাসি হেসে বলল, অবাক হয়েছ, না? অন্যের কাজে নাক গলানোর শাস্তি এবার পাবে তোমরা।
রাগ চেপে চুপ করে রইল রবিন।
আজকের সন্ধ্যায় তোমাদের জন্যে অনেকগুলো চমকের ব্যবস্থা করেছি। আমি। তোমাদের বন্ধু অ্যাক্সে ককারও সে-সব উপভোগ করবে। গোয়েন্দাদের দিকে তাকিয়ে ঠাট্টা করে চোখ টিপল সে। তোমরা ভেবেছিলে, দুনিয়ায় একমাত্র তোমরাই চালাক। বোকা আর কাকে বলে। তোমরা কি জানো, যতবার এখানে এসেছ তোমরা, পুলিশ এসেছে, তোমাদের ওপর চোখ রাখা হয়েছে?
যদিও ভয় যে পেয়েছে এটা বুঝতে দিল না কিশোর কিংবা রবিন, বুঝতে পারল সাংঘাতিক চালাক এক খেপা অপরাধীর পাল্লায় পড়েছে এবার। ভেবে অবাক হলো, তাদের ওপর নজর রাখার কাজটা কে করেছে?
ঘড়ির দিক থেকে একটা চি-চি স্বর শোনা গেল। ঘুরে তাকলি উইক, গোরো, বেরিয়ে আসুন। মেহমান এসেছে।
তাজ্জব হয়ে দেখল দুই গোয়েন্দা ঘড়িটী তার পেছনের দেয়ালের খানিকটা অংশ নিয়ে পাশে সরতে আরম্ভ করেছে।
দরজা! চাপা গলায় নিজেকেই যেন বলল কিশোর, ঘড়ি দিয়ে আড়াল করা ছিল! নিশ্চয় দরজা খোলার গোপন সুইচ আছে!
বেরিয়ে এল সাদা-চুল এক বৃদ্ধ। নিখুঁত করে দাড়ি কামানো, নীল চোখ। এগিয়ে এসে ছেলেদের সামনে দাঁড়াল। অনিশ্চিত কণ্ঠে বলল, মিস্টার শিপরিজ, মেহমান হলে ওদের বেঁধে রাখা হয়েছে কেন? আপনি তো বলতেন বিরক্ত করার জন্যে এখানে ঢোকে ওরা। ক্ষতির ভয়েই তো কড়া নজর রাখতাম
অবাক লাগল কিশোরের। রবিনের দিকে তাকিয়ে দেখল সে-ও অবাক হয়েছে। উইকের দলে কাজ করে এই লোক? ঠিক মানায় না।
সময় হলেই সব বুঝবে, গোরো, উইক বলল। গোয়েন্দাদের অবাক হয়ে বুড়োর দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে মুচকি হাসল। ওহ, পরিচয় করানো হয়নি। ওর নাম গোরো কিনডার। একজন আবিষ্কারক। খুব বুদ্ধিমান।
আস্তে মাথা ঝাঁকাল গোরো। উইক, আপনি বলেছেন এরা আপনার পরিকল্পনা ভণ্ডুল করে দিতে চায়। কিন্তু আমার কাছে তো নিরীহ ছেলে বলেই মনে হচ্ছে। আমার মনে হয় না…
আপনার মনে হওয়া নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা নেই! কর্কশ গলায় বলল উইক। কাজটা শেষ হয়েছে?

হয়েছে হয়েছে, তাড়াতাড়ি বলল গোরো, শেষ হয়ে গেছে। অত উত্তেজিত হওয়ার কিছু নেই।
কে উত্তেজিত হচ্ছে! খেঁকিয়ে উঠল উইক। যান, নিয়ে আসুন।
তাড়াহুড়ো করে গুপ্তপথ দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল গোরো।
ছেলেদের দিকে ফিরল উইক। খুব চমকে গেছ, না? এ বাড়িতে একটা নয়, দুটো গোপন ঘর আছে, সেটা নিশ্চয় জানা ছিল না তোমাদের। তোমরা যখন পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে খোঁজাখুজি করে গেলে, তখন আমি চুপ করে বসেছিলাম ওই ঘড়ির পেছনের ঘরে। আজ সকালে যখন পুলিশ এল, তখনও ছিলাম।
নিজের মাথা ভাঙতে ইচ্ছে করল কিশোরের। ঘড়িটা দেখে তার সন্দেহ হয়েছিল, যতবার ওটার দিকে চোখ পড়েছে, ততবারই মনে হয়েছে কোন একটা রহস্য আছে ওটীর। তারপরেও ভাল করে পরীক্ষা করে দেখল না কেন!
রবিন ভাবছে অন্য কথা, উইকই কি ককারকে হুমকি দিয়ে নোট রেখে এসেছিল? এ কাজে তাকে সাহায্য করেছে গোরো? কিন্তু বুড়ো মানুষটীকে দেখে মনে হয় না সে কারও ক্ষতি করতে পারে।
ফিরে এল গোরো। হাতে একটা ভারি জিনিস। কালো বাক্সের মত দেখতে, এদিক ওদিক থেকে কয়েকটা অ্যান্টেনার মত বেরিয়ে আছে।
গুড! দুই হাত ডলতে ডলতে বলল উইক। কালো বাক্সটা দেখিয়ে গোয়েন্দাদের জিজ্ঞেস করল, এটা কি চিনতে পারছ?
টাইম বম্ব! বিড়বিড় করল কিশোর।
বাহ, বুদ্ধিমান ছেলে। বুঝে ফেলেছ, খিকখিক করে হাসল উইক। বোমা তৈরিতে একজন বিশেষজ্ঞ গোরো। বুড়োর দিকে তাকাল সে। যে ভাবে করতে বলেছি, করেছেন তো?
নিশ্চয়। আমার ভুল হয় না। ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে…
আপনার পদ্ধতির কথা কে জানতে চায়! কর্কশ গলায় নিতান্ত অভদ্রের মত বাধা দিল উইক। মাল ঠিকঠাক মত ভরেছেন কিনা, সেটা বলুন। এ বাড়িটাকে নেই করে দিতে পারবে তো?
ধড়াস করে এক লাফ মারল কিশোরের হৃৎপিণ্ড। ওদের সহ উড়িয়ে দেয়ার কথা ভাবছে না তো খেপা লোকটা। গোরোর দিকে তাকিয়ে দেখল, তার চেহারাও ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বুড়ো। বোমাটার গায়ে চেপে বসা আঙুলগুলো সাদা হয়ে গেছে।
কি বলছেন আপনি, মিস্টার শিপরিজ? কাঁপা গলায় বলল সে। আপনি আমাকে বলেছেন কনস্ট্রাকশনের কাজে বোমাটা ব্যবহার করবেন। এখন বলছেন…আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না…

পারবেন। খুব শীঘ্রি। বোমাটা ওই টেবিলে রাখুন। আর কিছু করতে হবে না আপনার। যা করার আমিই করব।
কিন্তু নির্দেশ মানল না আর গোরো। পিছিয়ে গেল এক পী। না না, মিস্টার শিপরিজ! আমি বুঝতে পারছি অন্য কোন মতলব আছে অপিনার, খারাপ মতলব। মিথ্যে কথা বলেছেন আপনি আমাকে। ছেলেগুলোর কথা মিথ্যে বলেছেন। ওরা আপনার মেহমান নয়, বন্দি। আসলে প্রতিটি কথাই মিথ্যে বলেছেন আমার সঙ্গে। আমার নতুন আবিষ্কার বাজারজাত করে আমাকে সাহায্য করার কোন ইচ্ছেই আপনার কোনদিন ছিল না। মিথ্যে আশা দিয়েছিলেন আমাকে।
লাফ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে টান মেরে গোরোর হাত থেকে বোমাটা কেড়ে নিল উইক। প্রচণ্ড এক থাবা মেরে মেঝেতে ফেলে দিল বেচারা বুড়ো মানুষটাকে। পড়ে রইল গোরো। ওঠার সামর্থ্যও হলো না।
বোমাটা টেবিলে রেখে দড়ি বের করল উইক। গোরোর হাত-পা বাঁধল শক্ত করে। বলল, হ্যাঁ, গোরো, ঠিকই বলেছ, ছেলেগুলো আমার বন্দি। এখন তুমিও হলে। আসলে বন্দি তুমি সব সময়ই ছিলে, কিন্তু গবেষণায় এতটাই ডুবে ছিলে, বুঝতে পারোনি সেটা।
সোজা হলো উইক। চোখ জ্বলছে। নিমেষে কেমন বদলে গেছে। ভাবভঙ্গি। কঠিন গলায় বলল, বোমা বানাতে কতখানি সফল হলে, নিজের আবিষ্কারের ফল এখন নিজেই পরখ করতে পারবে। তুমি ভাগ্যবান, তাই না? এতবড় সুযোগ কটী মানুষে পায়?
ভাঙা গলায় গোরো বলল, মাথা খারাপ হয়ে গেছে তোমার, উইক, বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছ! এ সব করে বাঁচতে পারবে না তুমি
তাই নাকি? দেখা যাবে। তবে তার আগে তোমার মুখটা বন্ধ করা দরকার।
এক টুকরো কাপড় এনে গোরোর মুখে ঠেসে ভরে দিল উইক। এইবার আমার আসল কাজ চলবে। জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, আমার সহকারীগুলো ধরা পড়ে সর্বনাশ করে দিল। থাকলে এখন সাহায্য হত।
আতঙ্কিত চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল বন্দিরী, পকেট থেকে কয়েক টুকরো তার বের করল উইক। কালো বাক্সটার ওপর ঝুঁকে বসে কাজ শুরু করল। দ্রুত নড়াচড়া করছে তার আঙুল, তরগুলোকে যুক্ত করে দিচ্ছে। বাক্সের অ্যান্টেনার সঙ্গে। তারপর বাক্সটা নিয়ে গিয়ে রাখল ঘড়িটার কাছে। তারের অন্য মাথা যুক্ত করল ঘড়ির সঙ্গে। কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে তাকিয়ে বলল, দেখলে গোরো, কেবল তুমিই নও, এ সব কাজ আমিও করতে পারি।

কাজ শেষ করে উঠে দাঁড়াল উইক। নাটকীয় ভঙ্গিতে বিশাল ঘড়িটা দেখাল বন্দিদের। সময়টা দেখে রাখো। তিনটায় সেট করে দিয়েছি। ঘন্টার কাটী যখন তিনের ঘরে পৌঁছবে, ফেটে যাবে বোম।
ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আছে দুই গোয়েন্দা। একটা বেজে গেছে। মনে। পড়ল সেই কথা: ঘড়ির সাহায্যে সারা হবে কাজটা…
যেন ওদের মনের কথা পড়তে পেরেই উইক বলল, সেদিন রেস্টুরেন্টে কি কথা শুনেছিলে মনে আছে? ঘড়ির সাহায্যে সারা হবে কাজটী। এখন। বুঝলে তো কি সারা হবে? সন্তুষ্টির হাসি হাসল সে। তবে সেদিন তোমাদের ওড়ানোর কথা বলিনি, কেবল বাড়িটা ধসিয়ে দেয়ার আলোচনা করছিলাম। কল্পনাই করিনি, সময় মত তোমরাও এসে হাজির হবে, কাজ সহজ করে দেবে আমার। এক ঢিলে দুই পাখি মারা হয়ে যাবে। আজকের পর আর কোনদিন আমার কাজে নাক গলাতে আসতে পারবে না তোমরা। ওই বিরক্তিকর ককারটাও না।
মাথা ঠাণ্ডা রাখো, ভয় পেলে সর্বনাশ হবে!–নিজেকে বোঝাল কিশোর। হাত-পায়ের বাঁধন খোলার জন্যে টানাটানি শুরু করেছিল। ককারের কথা বলতেই কান খাড়া করল।
ককার! কোথায় আছেন ব্যাংকার! তাঁকেও এ বাড়িরই কোনখানে। আটকে রাখেনি তো উন্মাদটী!
রবিনও বাঁধন খোলার চেষ্টা করল। এটে বসল আরও দড়ি।
দেখে হাসল উইক, করো, চেষ্টা করা ভাল। তবে লাভ হবে না। অত। কাঁচা কাজ করি না আমি। নিজে নিজে যদি খুলতে পারো, বেরিয়ে যাও, বাধা দেব না।
কিশোরও বুঝল, খুলতে পারবে না। অহেতুক আর সেই চেষ্টা করল না।
ওদের ব্যর্থ হতে দেখে মজা পাচ্ছে যেন উইক। বলল, কি করে এই গুপ্তঘরটা আবিষ্কার করলাম, জানার কৌতূহল হচ্ছে নিশ্চয়? সে-জন্যে গোরোকে ধন্যবাদ দিতেই হয়।
কি করে চোরাই মাল লুকানোর জন্যে একটা জায়গা খুঁজতে খুঁজতে রিভেরা হাউসটার ওপর চোখ পড়ে উইকের, খুলে বলল। মাল রাখতে এসেই একদিন দেখা হয়ে গেল গোরোর সঙ্গে।
গোরো বলল, সে নাকি ফ্রান্সিস রিভেরার খালাত ভাই। ছোটবেলা থেকেই এ বাড়ির সবখানে খেলা করেছে, গুপ্তঘরগুলো সব চেনে। ঘড়ি-ঘরে ঢোকার একটা চাবিও আছে তার কাছে। আবিষ্কারের নেশা আছে তার। রিভেরা মারা যাওয়ার পর তার মনে হলো, তাই তো, গুপ্তঘরটায় গিয়ে গবেষণা করলে তো মন্দ হয় না। বিরক্ত করতে আসবে না লোকে। মন দিয়ে কাজ করা যাবে। সেজন্যেই এসেছিল। দেখা হয়ে গেল আমার সঙ্গে।

আমি ভাবলাম, তাকে কাজে লাগানো দরকার। ঘরটা খুলে দিতে সে আমাকে সাহায্য করবে। সেই ঘরে মাল রাখলে নিজের অজান্তে সেগুলো পাহারাও দেবে। তাকে লোভ দেখলাম, আমি একটা ল্যাবরেটরি বানিয়ে দিতে পারি। নতুন ধরনের যে কোন আবিষ্কার করতে পারলে সেটা বাজারজাত করতে সাহায্য করতে পারি। আমার টোপ গিলে নিল সে।

তারপর থেকে নিশ্চিন্তে ওখানে চোরাই মাল রাখতে লাগলাম। গবেষণা নিয়েই ব্যস্ত থাকত গোরো। আমি কি এনে রাখলাম না রাখলাম তা নিয়ে মাথা ঘামাত না। চোখ তুলেও দেখত না। ভালই চলছিল। বাদ সাধল একদিন ককার। বাড়িটা কিনে নিল। বিপদে পড়ে গেলাম। তাকে না তাড়ালেই নয়। হুমকি দয়ে নোট লিখে রেখে এলাম তার গুপ্তঘরে। সেগুলো পেয়েই সে তোমাদের ডেকে আনল।

দম নেয়ার জন্যে থামল উইক। শয়তানি হাসি ফুটল চোখের তারায়। নিশ্চয় ভাবছ, কি করে ওই বদ্ধ ঘরে নোট রেখে এলাম? সে কথা বলছি না। তোমাদের। এই একটা কৌতূহল নিয়ে মরতে হবে তোমাদের, কোনদিনই জানতে পারবে না।

হ্যারিস এসেছিল যে রাতে, সে-রাতে একটা ভয়ানক চিৎকার শুনেছ তোমরা। আমিই করেছি চিকরিটী। ভয় দেখিয়ে বুড়োটাকে তাড়ানোর জন্যে। যে ভাবে ছোঁক ছোঁক করছিল, ওকে তাড়ানোর আর কোন উপায় ছিল না।

ঘড়ির দিকে তাকাল উইক। দুটো বাজতে পনেরো মিনিট বাকি। আপন মনেই বলল, নাহ, আর দেরি করা যায় না। এবার যেতে হয়। সময় থাকতেই দূরে সরে যাওয়া উচিত।

ঘড়ির পেছনের গুপ্তঘরটায় গিয়ে ঢুকল সে। বাক্স ফেলার শব্দ কানে আসতে লাগল গোয়েন্দাদের। কয়েক মিনিট পর ক্যানভাসের একটা বড় ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে বেরিয়ে এল উইক।

বাইরে ঝিলিক দিয়ে উঠল তীব্র আলো। মূহর্ত পরে বজ্রপাতের বিকট শব্দে থরথর করে কেঁপে উঠল বাড়িটা। তারপর নামল বৃষ্টি। মুষলধারে।

ঝড় আসছে, উইক বলল। এবার বিদায় নিতে হয় তোমাদের কাছে। এগোতে গিয়েও দাঁড়িয়ে গেল সে। ও হ্যাঁ, আরেকটা কথা। পান্নাগুলো কোথায় আছে ভাবছ তো? কাঁধের ব্যাগটাতে চাপড় দিল সে। এটার মধ্যে। আলোটা জ্বেলে রেখে যাচ্ছি যাতে ঘড়ির কাঁটা দেখতে পাও। চলি। গুডবাই।

বেরিয়ে গেল সে। সামনের দরজা খুলে বন্ধ হওয়ার শব্দ শোনা গেল।

বাইরে ঝড়ের তাণ্ডব।

তারমধ্যেও কানে আসছে বিশাল ঘড়িটী চলার জোরাল শব্দ:

টিক-টক! টিক-টক! টিক-টক!

.

সময় কাটছে। কাটছে না বলে বলা যায় উড়ে চলেছে। এমনই হয়। সময় দ্রুত কাটার জন্যে যখন অপেক্ষা করে মানুষ, তখন মনে হয় কাটছেই না। বড় ধীরে গড়িয়ে গড়িয়ে চলে। আর এখন যখন ওরা চাইছে না কাটুক, তখন যেন ছুটছে ঘড়ির কাটা।

কি করে যে পৌনে তিনটে বেজে গেল, টেরই পেল না।

জানোয়ার! দাঁতে দাঁত চাপল কিশোর। এ ভাবে আমাদেরকে ছিন্নভিন্ন হওয়ার জন্যে ফেলে গেল!

হাতে-পায়ে কেটে বসছে দড়ি। মরিয়া হয়ে টানাটানি শুরু করল ঢিল করার জন্যে। সেই একই অবস্থা। লাভ হলো না। সামনের দিকে ছুঁড়ে দেয়ার চেষ্টা করল নিজেকে, যাতে চেয়ার নিয়ে উপুড় হয়ে পড়ে। যাতে বোমাটার কাছাকাছি যেতে পারে।

এতেও কাজ হলো না।

রবিন শরীর মোড়ামড়ি করে হাতটাকে নিয়ে যেতে চাইছে তার পকেটের পেন্সিল কাটার ছোট ছুরিটার কাছে। সেটা আরও অসম্ভব মনে হলো। পকেটের ধারেকাছেও যাচ্ছে না আঙুল।

চুপ করে একই ভাবে পড়ে আছে গোরা। মেনে নিয়েছে যেন এই ভয়াবহ পরিণতি। এই অবস্থার জন্যে মনে মনে নিজেকে দোষারোপ করছে। কিনা বোঝা যাচ্ছে না।

এগিয়ে যাচ্ছে ঘড়ির কাঁটা।

আতঙ্কিত চোখে দেখল ছেলেরা, তিনটা বাজতে আর মাত্র পাঁচ মিনিট বাকি!

চেয়ারে হেলান দিল ওরা। ধসে পড়ল যেন শরীরটা। হাতলের ওপর ঢিল হয়ে গেল আঙুলগুলো। আর কোন আশা নেই!

প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ল। কাঁপিয়ে দিল বাড়িটাকে। ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল শব্দ। সামনের বড় জানালাটায় দৃষ্টি যেন আটকে গেছে রবিনের। একটা নড়াচড়া দেখতে পাচ্ছে যেন।

দূর, আতঙ্কে মাথা গরম হয়ে গেছে!–ভাবল সে।

কিন্তু চোখ সরাতে পারল না। তারপর যা দেখল, বিশ্বাস করতে পারল না নিজের চোখকে। কাচের ওপাশে একটা মুখ। অতি পরিচিত। মুসার!

হাঁ করে তাকিয়ে আছে রবিন।

ঝনঝন করে জানালার কাচ ভাঙল। পাল্লা খুলে ঘরে ঢুকল মুসা।

ঘড়ি দেখল কিশোর। আর মাত্র দুই মিনিট। বলল, জলদি করো মুসা! চেঁচিয়ে বলার চেষ্টা করল, কিন্তু জোর নেই গলায়। বোমা লাগানো আছে! দুই মিনিট পরেই ফাটবে! রবিনের পকেটে ছুরি আছে! আগে আমার দড়ি কাটো!

দৌড়ে এল মুসা। কয়েকটা মুহূর্তের জন্যে সময় যেন স্থির হয়ে গেল। ঘোরের মধ্যে যেন মূসাকে দড়ি কাটতে দেখল কিশোর। মুক্ত হওয়ার পর আর একটা সেকেণ্ড দেরি করল না। লাফ দিয়ে উঠে প্রায় ডাইভ দিয়ে গিয়ে পড়ল ঘড়িটার কাছে। হ্যাঁচকা টানে ঘড়ির সঙ্গে যুক্ত বোমার তারগুলো ছিঁড়ে বিচ্ছিন্ন করে দিল। এতক্ষণ পর রক্ত চলাচল শুরু হয়েছে পায়ে। বিচিত্র একট যন্ত্রণা। শরীরের ভার রাখতে পারল না আর পা দুটো। ধপাস করে পড়ে গেল মেঝেতে।
ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে আছে সে।
ঢঙঙ! ঢঙঙ! টঙঙ!
তিনবার বাজল ঘণ্টা। কিছুই ঘটল না। স্বস্তিতে চোখ মুদল কিশোর।
দড়ি কেটে অন্য দুজনকেও মুক্ত করে ফেলল মুসা।
গোটা দুই গোঙানি দিয়ে উঠে বসল গোরো। কাঁপা খসখসে গলায় বলল, আহ, বাঁচালে! ঈশ্বরের দূত হয়ে এসেছ নাকি তুমি!
চেয়ারে বসে থেকেই রক্ত চলাচল স্বাভাবিক হওয়ার সময় দিল রবিন। তবে মুখে গোঁজা কাপড়টা টেনে খুলে ফেলল। কোটি কোটি ধন্যবাদ দিলেও ওর ঋণ শোধ করতে পারব না আমরা! যমের দুয়ার থেকে ফিরিয়ে এনেছে!
দুই হাত তুলে নাড়তে লাগল মুসা, আরি বাবারে, থামো না! প্রশংসার। ঠেলায় তো পাগল হয়ে যাব! হয়েছিলটা কি?
আমাদের কথা বলার অবস্থা নেই এখন। তুমি কি করে এলে, আগে সেই কথা বলো।
সন্ধ্যায় স্যালভিজ ইয়ার্ডে গিয়ে শুনলাম, দুপুরে খেয়েই বেরিয়ে গেছ। অপেক্ষা করতে লাগলাম। যতই রাত হতে লাগল, তোমরা ফিরলে না, মেরি আন্টির সঙ্গে সঙ্গে আমারও দুশ্চিন্তা বাড়তে থাকল। মাঝরাতেও যখন দেখা নেই তোমাদের, আর থাকতে পারলেন না আন্টি। পুলিশকে ফোন করলেন। ওরাও কিছু বলতে পারল না। ইয়ান ফ্লেচার অফিসে নেই। যে অফিসার ধরল, সে কথা দিল খুজতে বেরোবে। তবে কখন বেরোতে পারবে, বলতে পারল না। অস্থির হয়ে পড়লাম। হঠাৎ করেই মনে হলো রিভেরা হাউসের কথা। তাই তো, ওখানে গিয়ে কোন বিপদে পড়েনি তো!
এটা ভাবার জন্যে আরেকবার তোমাকে ধন্যবাদ, মুসা, কিশোর বলল। এই কালো জিনিসটা দেখছ? একটা সাংঘাতিক বোমা। তুমি আসতে যদি আর কয়েক মিনিট দেরি করতে, এতক্ষণে এই বাড়িটার সঙ্গে সঙ্গে আমরাও ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতাম। ই খাইছে! ভয়ে ভয়ে বাক্সটার দিকে তাকাতে লাগল মুসা, বলো কি! এই শয়তানিটা কে করল? ফাটার ভয় নেই তো আর?

না, নেই, মাথা নেড়ে বলল গোরো। দুর্বল ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল। বোমাটা নেয়ার জন্যে এগোল।
আপনি ঠিক আছেন তো, মিস্টার কিনডার? সাংঘাতিক জোরে মেরেছে। আপনাকে উইক শয়তানটা!
আমি ঠিকই আছি। তোমাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তোমরা না থাকলে আজ আমাকে মরতে হত। আমাকে ভেতরে রেখে বোমা ফিট করে চলে যেত। সব আমার দোষ। ওর কথা বিশ্বাস করে এত ভয়ঙ্কর একটা জিনিস বানীতে গেলাম কেন?
আপনি তো আর খারাপের জন্যে বানাননি, ভালর জন্যে বানিয়েছেন। উইক যে আপনার সঙ্গে বেঈমানি করবে, ওদের শয়তানির সমস্ত প্রমাণ নষ্ট করে দেয়ার জন্যে বাড়ি উড়িয়ে দিতে চাইবে, সেটা জানতেন না। অতএব দুঃখ পাওয়ার কিছু নেই। তা ছাড়া আমাদের কোন ক্ষতিও হয়নি। বহাল তবিয়তে আছি সবাই।
এইবার বলে ফেলো তো সব, তাগাদা দিল মুসা। আর টেনশনে থাকতে রাজি নই।
সে-সব পরে শুনলেও হবে। বিপদ এখনও শেষ হয়নি। লুকিয়ে পড়তে হবে আমাদের। নিশ্চয় দূরে কোথাও অপেক্ষা করবে উইক, দেখবে বাড়িটী ধ্বংস হলো কিনা। বোমা ফাটার শব্দ না পেলে কি হলো দেখার জন্যে আবার ফিরে আসতে পারে।
মাথা ঝাঁকাল রবিন, তাই তো! এ কথা তো ভাবিনি! ওর কাছে পিস্তল থাকতে পারে। এবার এলে আর বাঁচতে দেবে না আমাদের।
উদ্বিগ্ন হলো মুসা, কোথায় লুকাব?
গুপ্তঘরটার দিকে হাত তুলল কিশোর।
ঘড়ির পেছনের ফোকরটা এতক্ষণ নজরে পড়েনি মুসার। দেখে হাঁ হয়ে গেল। খাইছে! ওটা আবার কি?
এসো। গেলেই দেখবে।
ছেলেদেরকে টর্চ জ্বালতে বলে সুইচ টিপে আলো নিভিয়ে দিল গোরো। সবাইকে নিয়ে গুপ্তঘরটার দিকে এগোল। সবার শেষে ঢুকল রবিন। কি করে ফোকরের দরজা বন্ধ করতে হবে, বলে দিল গোরো। বন্ধ করল রবিন। সামান্য ফাঁক রেখে দিল, বাইরের ঘরে কি ঘটছে দেখার জন্যে।

.

ঘরটা দেখল ছেলেরা। বেশ বড়। মোটা পাইপ দিয়ে বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মনে হলো, অন্য গুপ্তঘরটাও রয়েছে এটার ঠিক ওপরে। টর্চের আলোয় দেখা গেল কিছু আসবাব, কাজের বেঞ্চ, কিছু যন্ত্রপাতি, একটা হট প্লেট আর একটা খুদে রেফ্রিজারেটর।

বাহ, সুবিধা তো ভালই আছে, রবিন বলল।
এটা আমার ল্যাবরেটরি, গোরো বলল। খারাপ বলা যাবে না।
দরজার কাছে ঘাপটি মেরে রইল ওরা। ইয়ার্ড থেকে বেরোনোর পর যা যা ঘটেছে, মুসাকে বলার সুযোগ পেল রবিন আর কিশোর।
তিনজনে মিলে ভাবতে লাগল, ককার কোথায় আছে। কিন্তু এ মুহূর্তে বাড়িটা খুঁজে দেখার জন্যে বেরোতে সাহস পেল না। বসে আছে উইকের অপেক্ষায়।
থেমে এসেছে বিদ্যুৎ চমকানো। বজ্রপতি আরও আগেই বন্ধ হয়েছে। অন্ধকার নিঃশব্দতার মধ্যে এখন বেশি করে কানে বাজছে:
টিক-টক! টিক-টক! টিক-টক!
কিন্তু শব্দটা এখন কিশোরদের কাছে ভীতিকর নয়।
হঠাৎ স্নায়ু টানটান হয়ে গেল ওদের। সামনের দরজা খোলার শব্দ শুনেছে। লিভিং রুমে ঢুকল পদশব্দ। আলো জ্বলল।
দরজার ফাঁকে চোখ রাখল রবিন। মোলায়েম গলায় বলল, উইক!
অন্যেরাও গাঁ ঘেষাঘেষি করে এল ফাঁকে চোখ রাখার জন্যে। থমকে দাঁড়াল ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে। ছেঁড়া তারগুলো দেখল। যে চেয়ারে বন্দিরা বাঁধা ছিল, ওগুলো দেখল শূন্য। কাটা দড়ি পড়ে আছে মেঝেতে।
ধরতে বেরোব নাকি? জিজ্ঞেস করল রবিন।
মাথা নাড়ল কিশোর, এখন না।
উন্মাদ হয়ে গেল যেন উইক। রাগে লাল হয়ে গেল মুখ। হ্যাঁচকা টানে একটা চেয়ার তুলে মেঝেতে বাড়ি মেরে ভাঙল। চিৎকার করে বলতে লাগল, পালিয়েছে! কি ভাবে…
টান দিয়ে পকেট থেকে পিস্তল বের করল। ছাতের দিকে তুলে ট্রিগার টিপতে শুরু করল। ম্যাগাজিনের গুলি শেষ না করে থামল না।
খালি করে ফেলেছে! ফিসফিস করে বলল রবিন। ভাল!
পিস্তলটা মেঝেতে আছড়ে ফেলে চারপাশে তাকাতে লাগল উইক। দুচোখে উন্মাদের দৃষ্টি। আচমকী হেসে উঠল অট্টহাসি। হুমকি দিয়ে নোট রেখে আসার কথা প্রমাণ করতে পারবে না ওরা, যদি আমি আবিষ্কারটা ধ্বংস করে দিইগোরোর মহামূল্যবান আবিষ্কার…– ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল সে। দুড়দাড় করে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল।
না না! দম আটকে যাবে যেন গারোর। ওকে এ কাজ করতে দেয়া যাবে না! আটকাতে হবে!
চলুন! সোজা হয়ে দাঁড়াল কিশোর।
গুপ্তঘর থেকে বেরিয়ে এল চারজনে। দৌড়ে ঢুকল সামনের হলঘরে।

অন্ধকার সিঁড়িতে শোনা গেল উইকের গর্জন, বিচ্ছুর দল! সর্বনাশ করে দিয়েছে সব! আমি ওদের ছাড়ব না!
সিঁড়িতে পা রাখল গোরো। নিঃশব্দে উঠতে শুরু করল। তাকে অনুসরণ করল তিন গোয়েন্দা। আবিষ্কার বাঁচানোর জন্যে এতটাই মরিয়া হয়ে উঠেছে বুড়ো মানুষটা, ছেলেদেরও পেছনে ফেলে দ্রুত উঠে যাচ্ছে।
মিস্টার কিনডার, সাবধান! ডেকে বলল রবিন।
ছাতে ওঠার আগেই শয়তানটাকে থামাতে হবে!
সিঁড়ির মাথায় এসে দম নেয়ার জন্যে থামল সে।
পাশে এসে দাঁড়াল তিন গোয়েন্দা।
ওপরে তাকাল কিশোর। আরও সিঁড়ি আছে। চিলেকোঠায় উঠে গেছে। ওপরের দিকে করে টর্চ জ্বালল। আলোক রশ্মিতে ধরা পড়ল উইক। শিপরিজের মুখ, মুখ বিকৃত করে নিচের দিকে তাকিয়ে আছে।
উইক, আর শয়তানির চেষ্টা করে লাভ নেই, কিশোর বলল, আপনার চেয়ে সংখ্যায় আমরা অনেক বেশি। গায়ে যত জোরই থাক, চারজনের সঙ্গে পারবেন না। নেমে আসুন। জলদি!
নড়ল না উইক। চোখের খেপা দৃষ্টি আরও খেপা হচ্ছে।
নামুন বলছি! ধমক দিয়ে বলল রবিন। আপনার জারিজুরি খতম!
নড়ে উঠল উইক। ওপর থেকে ঝাঁপ দিল ওদের লক্ষ্য করে। ভারি শরীর নিয়ে ভয়াবহ গতিতে এসে পড়ল ওদের ওপর। সবাইকে ফেলে দিল। ওরা যখন সিঁড়িতে গড়াগড়ি খাচ্ছে, রেলিং ধরে উঠে দাঁড়াল সে। লাফিয়ে লাফিয়ে নেমে যেতে শুরু করল।
ধরো ওকে, মুসা, চিৎকার করে উঠল কিশোর, ওকে পালাতে দেয়া যাবে না। আমিও আসছি! রবিন, তুমি যাও মিস্টার কিনডরের সঙ্গে। ওপরে চলে যাচ্ছে। ছাতে উঠতে দিয়ো না তাকে। এই শরীর নিয়ে উঠতে গেলে মারা পড়বে!
কিশোরের কথা শেষ হওয়ার অনেক আগেই উঠে পড়েছে মুসা। উইকের পিছু নিয়েছে।
রবিন উঠে গেল চিলেকোঠায়। গোরোকে দেখতে পেল না। ঝোড়ো বাতাসে ঝাঁপটা দিয়ে খুলে ফেলল সামনের একটা জানালার পাল্লা। ওটার কাছে ছুটে এসে বাইরে উঁকি দিল সে।
এখনও মুষলধারে পড়ছে বৃষ্টি। ঠাণ্ডা, প্রবল ঝোড়ো বাতাস বইছে। থেকে থেকে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে এখনও, তবে অনেক দূরে সরে গেছে।
গেল কোথায় গোরো!–ভাবল রবিন। এই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে পিচ্ছিল ছাতে ওঠার চেষ্টা করলে পিছলে পড়ে মরবে।

জানালাটা দিয়ে ঢালু ছাতের একাংশ চোখে পড়ে। অন্ধকারের মধ্যেও আবছা ভাবে দেখা যাচ্ছে চিমনিটা।
গোরো! অস্ফুট স্বরে বলে উঠল রবিন।
এক হাতে চিমনি পেচিয়ে ধরেছে ভিজে চুপচুপে বুড়ো মানুষটা। ইটের তৈরি চিমনির গোড়ায় পা রেখে, কনকনে ঝোড়ো বাতাস আর তুমুল বৃষ্টির পরোয়া না করে, আরেক হাত বাড়িয়ে খুঁজছে কি যেন।
পড়ে মরবে! বাঁচাতে হলে এখুনি যেতে হবে আমাকে।ভাবল রবিন।
দেরি করল না সে। জানালা গলে নেমে পড়ল স্লেটপাথরে তৈরি পিচ্ছিল টালির ছাতে। তার পাহাড়ে চড়ার সমস্ত অভিজ্ঞতা আর প্র্যাকটিস এক করে ভারসাম্য বজায় রেখে খুব সাবধানে ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগিয়ে চলল চিমনিটার দিকে।
চিৎকার করে ডাকল, মিস্টার কিনডার, নড়বেন না, আমি আসছি!
ফিরে তাকাল বৃদ্ধ। বলল, ঠিক আছে। ওটা পেয়ে গেছি আমি। নড়ার আর দরকার নেই আমার।
গোরোর পাশে চলে এল রবিন। শান্ত হয়ে আমাকে ধরে থাকুন। আস্তে আস্তে পিছিয়ে যাব আমরা। সমস্ত ভার আমার ওপর ছেড়ে দিন। নিজে কিছু করার চেষ্টা করবেন না।
চিমনি ছেড়ে দিয়ে ওরা ঘুরে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড এক ঝলক ঝোড়ো বাতাস এসে ঝাঁপটা মারল। টলিয়ে দিল গোরোকে। সামলাতে পারল না সে। কাত হয়ে পড়ে যেতে শুরু করল। সেই সঙ্গে রবিনকেও কাত করে দিল।
ঠেকাতে পারল না রবিন। পড়ে গেলে দুজনে। গড়াতে শুরু করল ছাতের ঢালে। দ্রুত সরে যেতে লাগল কিনারের দিকে।

.

বাইরে চলে গেল উইক।
মুসা আর কিশোরও বেরিয়ে এল।
টর্চ জ্বেলে এদিক ওদিক দেখতে লাগল কিশোর। অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে। গেছে লোকটা।
ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল মুসা, দিল মনে হয় গোল খাইয়ে আমাদের!
মাথা ঝাঁকাল কিশোর, সে-রকমই তো মনে হচ্ছে। ও যে ওরকম করে। ঝাঁপ দিয়ে পড়বে, কল্পনাই করিনি!
তুমুল বৃষ্টির মধ্যেই টর্চের আলোয় ঝোপঝাড় আর গাছপালার মধ্যে উইককে খুঁজতে লাগল ওরা। কিন্তু তার ছায়াও দেখা গেল না আর।
হঠাৎ একটা গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ হলো। ছুটে ড্রাইভওয়েতে ঢুকল ওটা। আচমকা ব্রেক কষে থামানোর চেষ্টা করায় কর্কশ আর্তনাদ তুলল টায়ার। হেডলাইটের

আলো পড়েছে বাড়িটর সামনের অংশে।
পুলিশ! চিৎকার করে বলল মুসা।
টপাটপ লাফিয়ে নামল ছয়জন পুলিশ অফিসার। ছুটে এল ওদের দিকে।
সবার আগে রয়েছেন পুলিশ চীফ ইয়ান ফ্লেচার। যাক, পাওয়া গেল। কিশোর, তোমার চাচী তো অস্থির হয়ে পড়েছেন...
মুসার কাছে শুনেছি। পরে সব বলব। আগে উইককে খুঁজে বের করা দরকার।
উইকের কি হয়েছে, অল্প কথায় চীফকে জানাল কিশোর। বলল, আমার ধারণী বেরোতে পারেনি, এ বাড়িতেই কোথাও লুকিয়ে আছে। সারাক্ষণ টর্চ জ্বেলে রেখেছি আমরা। আড়াল থেকে বেরোলে আমাদের চোখে পড়তই। এখন আপনারা এসে গেছেন। আর বেরোনোর সাহস পাবে না। ওকে বের করে আনতে হবে।
চিৎকার করে সহকারীদের নির্দেশ দিলেন চীফ, বাড়ির চারপাশে খোঁজো। খেয়াল রেখো, কোনমতেই যেন পেছন দিয়ে বেরিয়ে যেতে না পারে। বাড়িতে যত আলো আছে, সব জ্বেলে দাও।
ককারও সম্ভবত এ বাড়িতেই আছেন, কিশোর বলল। তাকেও খুঁজতে হবে।
চীফ বললেন, তার জন্যে আর চিন্তা করতে হবে না। আমি অফিস থেকে বেরোনোর ঠিক আগে ফোন করেছেন। সারাদিন শহরের বাইরে ছিলেন। তোমাদের বাড়িতেই করেছিলেন। তোমার চাচীর কাছে তোমাদের নিখোঁজ হবার খবর পেয়েছেন। যে কোন মুহূর্তে এখানে চলে আসতে পারেন।
আলোয় আলোকিত হয়ে গেল বাড়িটী।
খাইছে! হঠাৎ আতঙ্কিত হয়ে চিৎকার করে উঠল মুসা। ওপর দিকে হাত তুলে দেখাল।
দেখে বরফের মত জমে গেল যেন কিশোর।
টালির ছাতের কিনার ধরে ঝুলছে দুটো ছায়া।
রবিন আর গেরো!
একহাতে গোরোকে পেঁচিয়ে ধরে রেখেছে রবিন। আরেক হাতে টালির কিনার খামচে ধরে ঝুলে আছে।
পাশে তাকাল কিশোর। মুসা নেই। চিৎকার করেই সরে গেছে। ঢুকে যাচ্ছে আবার বাড়ির ভেতর।
তার পেছনে ছুটল কিশোর। প্রার্থনা করল, খোদা, আমরা না যাওয়া পর্যন্ত আটকে রাখো ওদের! পড়তে দিয়ো না!
চিলেকোঠার জানালার কাছে পৌঁছে গেল ওরা।
মুসা বলল, আমি নেমে যাচ্ছি। তুমিও এসো। আমার গোড়ালি চেপে ধরে রাখবে।

কিশোর বলল, না, আমি জোরে পারব না। ভার রাখতে পারব না। এতজনের। আমি ওদের তোলার চেষ্টা করব, তুমি ধরে রেখো।
আপত্তি করল না মুসা।
ভেজা, পিচ্ছিল ছাতে নেমে গেল ওরা। কমে এসেছে বৃষ্টি। কিন্তু নতুন আপদ দেখা দিয়েছে। কুয়াশা জমতে আরম্ভ করেছে। বুড়ো আঙুল বাঁকা করে পা টিপে টিপে এগিয়ে যাচ্ছে ওরা।
এখনও ঝুলে আছে রবিন। দেয়ালের গায়ে ছাতের একপাশে টালি যেখানে গাঁথা হয়েছে, তার কাছাকাছি রয়েছে। নিশ্চয় টালির খাজে আঙুল ঢুকিয়ে দিয়েছে সে, নইলে একটা সেকেণ্ডও ঝুলে থাকা সম্ভব হত না।
টর্চ জ্বেলে দেখল কিশোর, টালিতে নয়, কিনার দিয়ে চলে যাওয়া ছাতের পানি নিষ্কাশনের পাইপ আঁকড়ে ধরে ঝুলছে রবিন। গোরোও এখন পুরোপুরি রবিনের ওপর ভর দিয়ে নেই, তার একটা হাতও পাইপ চেপে ধরেছে। তাতে অনেকটা ভার কমেছে রবিনের ওপর থেকে।
একপাশের দেয়ালের যে শিরাটা বেরিয়ে আছে, সাইকেলের সীটে বসার মত করে তাতে বসল মুসী। দুই পা আর গোড়ালি দিয়ে দুদিক থেকে চেপে ধরুল দেয়ালটা। কিশোরকে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়তে বলল।
মাথা নিচে পা ওপর দিকে করে ঢালু ছাতে শুয়ে পড়ল কিশোর। শক্ত করে তার গোড়ালি চেপে ধরল মুসা।
সামনে হাত লম্বা করে দিল কিশোর। কিন্তু অল্পের জন্যে রবিনের হাতের নাগাল পেল না। বলল, মুসা, পারছি না!
খুব সাবধানে শিরাটার ওপর ঘষটে ঘষটে আরও কয়েক ইঞ্চি নামল মুসা। হাত এগিয়ে গেল কিশোরের। তার আঙুলগুলো রবিনের হাত ছুঁতে পারল। রবিনের কব্জি চেপে ধরল। বলল, রবিন, ছেড়ে দাও! তোমার আঙুলগুলো দিয়ে আমার কব্জি পেঁচিয়ে ধরো!
ধরল রবিন। আরেক হাতে গোরোকে ঠেলতে লাগল ওপর দিকে, ছাতে তুলে দেয়ার জন্যে।
অন্য হাত দিয়ে গোরোর হাত চেপে ধরল কিশোর। টানতে লাগল ওপর দিকে।
সাংঘাতিক কঠিন আর যন্ত্রণাদায়ক একটা কাজ। তবে সফল হলো সে। আস্তে আস্তে ওপর দিকে উঠে আসছে গোরো।
দুর্বল হয়ে পড়েছে রবিন। কিশোরের হাতে তার ভার পুরোপুরি ছেড়ে দিয়ে গোরোকে আরও জোরে ঠেলতে লাগল।
অবশেষে ছাতে উঠে এল গোরো। উপুড় হয়ে তাকে চুপ করে শুয়ে পড়তে বলল কিশোর। পড়ে থাকুক। রবিনকে তুলে আনার পর তার ব্যবস্থা করবে।

সবচেয়ে বেশি ভার বহন করতে হচ্ছে মুসাকে। কিন্তু একচুল ঢিল করল না আঙুলের চাপ। দাঁতে দাঁত চেপে ধরে রইল সে।
রবিনও উঠে এল ওপরে। কিশোরের হাতে চাপ অনেকখানি কমল।
তুমি গোরোর পা ধরো, কিশোর বলল। আমি তাকে ধরে রাখছি।
খুব ধীরে তাড়াহুড়ো না করে একটা মানব-শেকল তৈরি করল ওরা। মুসা। ধরে রেখেছে কিশোরের পা। কিশোর ধরল গৌরোর দুই হাত। রবিন ধরল গোরোর দুই পাঁ। পিচ্ছিল ছাতে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে পরের তিনজন। টেনে টেনে তাদেরকে সরিয়ে আনতে শুরু করল মুসা।
অবশেষে ছাতের কিনার থেকে সরে এল সবাই।
কিশোর আর রবিনও শিরা আঁকড়ে ধরে হাঁপাতে লাগল।
এই ভয়াবহ টানাটানিতে একেবারেই কাহিল হয়ে পড়েছে গোরো। তাকে ধরে রাখল মুসা।
হাঁপাতে হাঁপাতে রবিন বলল, ভালই সার্কাস দেখলাম আমরা, কি বলো! আর কোন কাজ না পেলে দড়াবাজিকর হয়েও ভাত জোগাড় করতে পারব।

.

বাতাস অনেক কমে গেছে, তাই রক্ষা। গোরোকে নিয়ে ছাতের ওপর দিয়ে চিলেকোঠার জানালার দিকে এগোতে অতটা অসুবিধে হলো না ছেলেদের। নিচে হাঁকডাক শোনা যাচ্ছে। উইককে খুঁজতে ব্যস্ত পুলিশ। গোয়েন্দাদের খোঁজ এখনও পড়েনি নিশ্চয়।
জানালা টপকে ভেতরে ঢুকল প্রথমে রবিন আর কিশোর। নিচে থেকে গোরোকে ওপর দিকে ঠেলে দিল মুসা। তাকে টেনে তুলে অনিল দুজনে। মুসা ঢুকল সবার শেষে।
ভয়ানক পরিশ্রম গেছে। চিলেকোঠার মেঝেতেই চিত হয়ে শুয়ে পড়ল ওরা। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।
দুর্বল ভঙ্গিতে ছেলেদের দিকে তাকাল গারো, তোমাদের কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা আমার জানা নেই। নিজের প্রাণের বিন্দুমাত্র মায়া করলে না! সত্যি বলছি, এত বয়েস হলো, এ রকম ছেলে আমি দেখিনি! তোমরা একেকটা হীরের টুকরো!
কিশোর ও মুসাকে বলল রবিন, আর আমার নেই তোমাদের দুজনকে কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা! ছাতের কিনার ধরে ঝুলে পড়ার পর একবারও ভাবিনি আজ বেঁচে ফিরে আসতে পারব।
মুসার দিকে তাকিয়ে হাসল কিশোর, খাওয়া নিয়ে আর তোমাকে ঠাট্টা করব না, মুসা। যত মন চায় খেয়ো। তোমার ওই গণ্ডারের শক্তিই কেবল আজ দুটো প্রাণিকে রক্ষা করল! ধন্যবাদ।

দরাজ হাসি হাসল মুসা, শুকনো ধন্যবাদে কাজ হবে না। আজ রাতেই শিক কাবাব খাওয়াতে হবে। বিশ-পঁচিশ, যতটা খেতে চাই। পয়সার মায়া করতে পারবে না।
করব না। চলো, উইককে পাওয়া গেল কিনা দেখি।
নামতে শুরু করল ওরা। সবার পেছনে আসতে আসতে চিৎকার করে উঠল গোরো, আমার আবিষ্কার! ভুলেই গিয়েছিলাম ওটার কথা!
গোরোকে যেতে দিলে আবার কোন বিপদ বাধাবে। তাই কেউ বাধা দেয়ার আগেই আবার ছুটে চিলেকোঠায় উঠে গেল রবিন। জানালা গলে ছাতে নেমে পড়ল। চিমনির দিকে রওনা হলো। চিমনির কাছে এসে একহাতে চিমনি ধরে আরেক হাত ফোকরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে হাতড়াতে শুরু করল।
কি যেন হাতে লাগল। বের করে আনল সেটা। তারের একটা বাণ্ডিলের মত জিনিস। একমাথায় একটা অদ্ভুত যন্ত্র লাগানো। সেটা পকেটে ভরে চলে এল আবার জানালার কাছে।
তাকে ভেতরে ঢুকতে সাহায্য করল মুসা। ছাতে ঘোরার নেশায় পেল, নাকি আজ তোমাকে? ঘটনাটা কি?
পকেট থেকে জিনিসটা বের করল রবিন। মিস্টার কিনডার...
সে কথা শেষ করার আগেই মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল গোরে। ধকল সহ্য করতে পারেনি আর তার বুড়ো শরীর।
ধরাধরি করে তাকে নিচের লিভিং রুমে নিয়ে এসে একটা লম্বা সোফায় শুইয়ে দেয়া হলো।
এই সময় ঘরে ঢুকলেন ফ্লেচার। সঙ্গে আরেকজন লোক। মাথায় স্ট্র হ্যাট।
মিস্টার ককার! বলে উঠল রবিন।
দ্রুত এগিয়ে এলেন ব্যাংকার। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, যাক, তোমরা ভালই আছ। তোমাদের কিছু হলে নিজেকে...
বাধা দিল কিলোর, আমরা ঠিকই আছি। তবে মিস্টার কিনডারের সাহায্য লাগবে। বেহুশ হয়ে গেছে।
একজন অফিসারকে গাড়ি থেকে ফার্স্ট এইড বক্স আনতে পাঠালেন চীফ।
ছাতের ওপর ওদের ভয়াবহ অ্যাডভেঞ্চারের কথা বলল ছেলেরা।
পকেট চাপড়ে রবিন বলল, মিস্টার কিনডারের আবিষ্কার এখন আমার পকেটে।
চীফ জানালেন, উইককে পেলাম না। রোডব্লকের আদেশ দিয়ে দিয়েছি। আমি। শহর থেকে বেরোতে যাতে না পারে। সাংঘাতিক পিচ্ছিল চোরটা! একেবারে পাকাল মাছ!

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে কাটতে থমকে গেল কিশোর। জিজ্ঞেস করল, গোলাঘরটায় খুঁজেছেন?
কোন গোলাঘর?
যেটাতে গাড়ি লুকিয়েছিল?
মাথা নাড়লেন চীফ। না। মরিস আসেনি, আমরা ওটা চিনিও না, মনেও পড়েনি।
লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর, রবিন, মুসা, এসো আমার সঙ্গে! বলেই চীফ বাধা দেয়ার আগে রওনা হয়ে গেল দরজার দিকে।
বেরিয়ে পড়ল তিন গোয়েন্দা। বাইরে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। ঘন হতে আরম্ভ করেছে কুয়াশার চাদর। ভোঁতা করে দিয়েছে জানালার হলদে আলোগুলোকে। ঘন ঝোপে ঢুকে পড়ল ওরা।
গোলাঘরে গিয়ে ঢুকেছে ভাবছ নাকি? জিজ্ঞেস করল রবিন।
হ্যাঁ।
পেছনে ফিরে তাকাল মুসা। কুয়াশার জন্যে আলোগুলোকে কেমন বিচিত্র লাগছে। টর্চ জ্বালতে গেল।
বাধা দিল কিশোর, জেলো না। উইক দেখলে হুশিয়ার হয়ে যাবে। কিছুই যাতে টের না পায়। চমকে দিতে হবে ওকে।
গাছে তৈরি সুড়ঙ্গমুখের কাছে এসে দাঁড়াল ওরা। লতাপাতার ঢাকন। ফাঁক করল রবিন। ভেতরে পা রাখল তিনজনে। টানটান হয়ে আছে স্নায়ু। আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত।
রাত শেষ হয়ে এসেছে। পুবের আকাশে হালকা আলো। সুড়ঙ্গে সেটা প্রবেশ করছে না। এখানে ঘন কালো অন্ধকার। শঙ্কিত হলে কি এই অন্ধকারে বসে থাকলে নিশ্চয় চোখে সয়ে গেছে উইকের। ওরা নাম আগেই না ওদেরকে দেখে ফেলে।
ঝুঁকি নিয়েও তাই টর্চ জ্বালার সিদ্ধান্ত নিল কিশোর।
অন্ধকারের কালো চাদর ছুঁড়ে দিল তীব্র আলোক রশ্মি। সেই আলোয় পথ দেখে দ্রুত এগোল ওরা।
গোলাঘরে ঢুকল। খড়ের গাদা আগের মতই আছে। তবে সামনের দিকের কিছু খড় মাটিতে পড়ে আছে। বেরিয়ে আছে গোপন গ্যারেজের প্রাই উডের দরজা। ভেতরে উঁকি দিল সে।
দেয়ালের কাছে খুট করে একটা শব্দ হতেই পাক খেয়ে ঘুরে তাকাল তিনজনে। মুসার হাতের টর্চের আলো গিয়ে সোজা পড়ল উইকের মুখে। ভিজে, কুঁকড়ে আছে তার কাপড়-চোপড়। চোখে ব্রুনো দৃষ্টি। খড় সরানোর যন্ত্রটা তুলে নিয়েছে। মারাত্মক কাটাগুলো যেন ওদের দিকেই তাকিয়ে আছে।

এইবার তোমাদের শেষ করব আমি! বিষাক্ত গোক্ষোরের মত হিসহিস করে উঠল উইক। লাফ দিয়ে এগিয়ে এল ওদের গেঁথে ফেলার জন্যে।

.

খবরদার! গর্জন শোনা গেল পেছনে। নড়লে খুলি ফুটো করে দেব। হাত থেকে ওটা ফেলো, উইক!

থমকে গেল উইক। ফিরে তাকাল। দেখল, উদ্যত পিস্তল হাতে দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন চীফ ইয়ান ফ্লেচার। পেছনে আরও দুজন পুলিশ অফিসার। তাদের হাতেও পিস্তল।

একটা মুহূর্ত দ্বিধা করল উইক। তারপর হাত থেকে ছেড়ে দিল যন্ত্রটা। খটাং করে মেঝেতে পড়ল ওটা।

আবার লিভিং-রুমে ফিরে এল তিন গোয়েন্দা।

উইককে হাতকড়া পরিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। কারও দিকে তাকাচ্ছে। না সে। খানিক আগের ঝোড়ো আকাশের অবস্থা হয়েছে তার চেহারার।

প্রচণ্ড পরিশ্রম গেছে। তার ওপর ভেজা কাপড়-চোপড়। থরথর করে কাঁপছে তিন গোয়েন্দা। শুকনো চাদরের ব্যবস্থা করা হলো ওদের জন্যে।

শান্তিতে ঘুমিয়ে আছে গোরো। তার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে গোয়েন্দাদের দিকে ফিরলেন ককার, বললেন, আমি একে চিনতে পেরেছি। কয়েক বছর আগে একটা চমৎকার আবিষ্কার করেছিল। তার সেই ইলেকট্রনিক যন্ত্রটা বাজারজাত করার জন্যে টাকা ধার চাইতে এসেছিল আমার কাছে। না দিয়ে তখন ভুল করেছি। যন্ত্রটা লোকের উপকারে লাগত। টাকা না পাওয়াতেই উইক শিপরিজের মত বাজে লোকের খপ্পরে পড়ল। আরেকটু হলেই অজি সর্বনাশ করে ফেলেছিল তার বোমা!

শুনেছেন তাহলে, তিক্ত কণ্ঠে বলল রবিন।

মাথা ঝাঁকালেন ককার। ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকালেন উইকের দিকে। আবার ছেলেদের দিকে ফিরলেন। তবে এবার আর ভুল করব না আমি। ব্যাংক থেকে ঋণ পাওয়ার ব্যবস্থা করে দেব কিনডারকে। যত ইচ্ছে গবেষণা করুক, আমার বাড়িটা ব্যবহার করুক, কিচ্ছু বলব না।

এ কথা শুনে খুশি হলো তিন গোয়েন্দা।

রবিন বলল, আজ আপনাকে না পেয়ে আমরা ভেবেছিলাম খারাপ কিছু ঘটেছে। সেজন্যেই এখানে এসেছিলাম দেখার জন্যে। কি হয়েছিল বলুন তো?

ব্যাংকার জানালেন, খুব সকালে একটা জরুরী কাজে শহরের বাইরে। চলে গিয়েছিলেন। অফিসকে জানিয়ে যেতে পারেননি। বললেন, মাঝরাতে ফিরেছি। বাড়িতে ফিরে জানলাম, আমাকে না পেয়ে চিন্তিত হয়ে পুলিশ এসেছিল খুঁজতে।

ইয়ার্ডে কিশোরের চাচী আর থানায় চীফ ইয়ান ফ্লেচারের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম তখন।
হাতকড়া পরা উইকের দিকে তাকালেন তিনি। তোমরা আমার বাড়িতে ঢুকলে কি করে? চাবি পেলে কোথায়?
খকখক করে হাসল উইক। ওটা আর এমন কি ব্যাপার। তালাওয়ালা এনে চাবি বানিয়ে নিয়েছি।
এই জন্যেই তলার গায়ে আঁচড়ের দাগ দেখা গেছে, ভাবল কিশোর।
আমার গুপ্তঘরে ঢুকে নোট রেখে এলে কি ভাবে? জিজ্ঞেস করলেন ককার।
সেটি বলছি না, কিশোরদের দেখিয়ে বলল উইক। এরা জিজ্ঞেস করেছিল, এদেরকেও বলিনি। মাথায় বুদ্ধি কম না ওদের, পারলে বের করে নিক।
চ্যালেঞ্জটা গ্রহণ করল কিশোর। হাত বাড়াল, রবিন, কিনডারের যন্ত্রটা দেখি দাও তো?
পকেট থেকে অদ্ভুত যন্ত্রটা বের করে দিল রবিন।
কৌতূহলী হয়ে ওটার দিকে তাকাল সবাই।
হাতে নিয়ে ভাল করে দেখতে লাগল কিশোর। তিন ইঞ্চি লম্বা ছোট একটা প্লাটফর্ম তৈরি করে তাতে দুটো ওয়াটারপ্রুফ ব্যাটারি বসানো হয়েছে। তার নিচে রয়েছে চাকা। এক প্রান্তে ছোট ছোট একজোড়া খাজকাটা চোয়ালের মত জিনিস।
আমার অনুমান ভুল না হলে, কিশোর বলল, চাকাগুলো কয়েকবার ঘোরার পর হাঁ করে খুলে যায় চোয়াল দুটো। ঠিক কতবার ঘুরবে, সেটা সেট করে দেয়া আছে। চোয়াল খুললে চাকাগুলো থেমে যায়। আপনাআপনি আবার যখন চোয়াল দুটো বন্ধ হয়, চাকাঁ চালু হয়ে যায়। তবে তখন উল্টো দিকে ঘোরে।
দারুণ খেলনা তো! ককার বললেন।
হ্যাঁ। আমার বিশ্বাস, আপনার গুপ্তঘরে নোট রেখে আসার কাজে এই যন্ত্রটাই ব্যবহার করা হত।
কি!
উইক বাদে সবাই কৌতূহলী হয়ে তাকিয়ে আছে কিশোরের দিকে।
চোয়ালগুলো দেখুন, কিশোর বলল, খাজ কাটা আছে। এতে কাগজের টুকরো ধরিয়ে দিলে চেপে ধরে রাখবে। তারের সাহায্যে যন্ত্রটা চিমনি দিয়ে নিচে নামিয়ে দিলে চাকায় ভর করে চলে যাবে ঘরের মাঝখানে। সেখানে চোয়াল খুলে কাগজ ফেলে দিয়ে ফিরে আসবে চিমনির কাছে। তার টেনে তখন আবার এটা তুলে নিলেই হলো। ছাতে উঠে উইক করেছে এই কাজ।

বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে গেল ককারের চোখ। এ জন্যেই, মাথা দুলিয়ে। বললেন তিনি, এই জন্যেই আমরা বুঝতে পারিনি টাইম লক লাগানো ঘরে চোর ঢোকে কি করে! এ রকম একটা খেলনী যে তৈরি করে ফেলবে কেউ, কে ভাবতে পেরেছিল!
উইকের দিকে ফিরল কিশোর। আপনি গোরোকে বুঝিয়েছেন, এই খেলনাটা বাজারজাত করার জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করবেন। তার কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছেন ওটা। তারপর গিয়ে ওই কুকাজ করেছেন। আশা করি, আর দোষ এড়াতে পারবেন না। গুপ্তঘরে নোট যে আপনিই রেখেছেন, পুলিশ প্রমাণ করতে পারবে এখন, কি বলেন?
চুপ করে রইল উইক। চোখের দৃষ্টিতে কিশোরকে ভস্ম করার চেষ্টা করতে লাগল।
এখানকার কাজ আপাতত শেষ। উইককে থানায় নিয়ে যাওয়ার আদেশ দিলেন ফ্লেচার।
হাত তুলল কিশোর, এক মিনিট, পান্নার জিনিসগুলো কোথায়, আগে জিজ্ঞেস করে নিই। কোথায় লুকিয়েছেন ওগুলো, উইক?
এবারেও জবাব দিল না উইক। ঘৃণায় একবার থুথু ফেলে আরেক দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল।
বার বার জিজ্ঞেস করেও জবাব পাওয়া গেল না ওর কাছ থেকে। শেষে রাগ করে অফিসারদের আদেশ দিলেন চীফ, নিয়ে যাও থানায়, তারপর দেখা যাবে।
তারমানে জিনিসগুলো বের করার জন্যে আবার খুঁজতে আসতে হবে, বলল একজন অফিসার। এখনই কাজটা সেরে ফেলব নাকি, চীফ?
সেরে ফেললে মন্দ হয় না, আবার আসার ঝামেলা থেকে বাঁচা যাবে। এই, একজন গিয়ে বোমাটা চেক করো তত, ফাটার সম্ভাবনা আছে কিনা দেখো।
ঘরের মধ্যে চেক করতে গেলে ফেটে গিয়ে যদি দুর্ঘটনা ঘটে যায় এ জন্যে ঝুঁকি নিল না পুলিশ। কালো বাক্সের মত জিনিসটা বের করে নিয়ে বাড়ির কাছ থেকে দূরে খানিকটা খোলা জায়গায় চলে গেল দুজন অফিসার।
এত ভীষণ ক্লান্ত তিন গোয়েন্দা। তবু ঠিক করল, পীন্নীগুলো না খুঁজে যাবে না। বোমা বের করল যে দুজন অফিসার তাদের সঙ্গে বেরিয়ে এল।
কোনখান থেকে শুরু করব? জানতে চাইল মুসা।
চারপাশে চোখ বোলাতে লাগল কিশোর। সূর্য উঠছে। কুয়াশা কাটতে আরম্ভ করেছে সোনালি রোদ। প্রাসাদ থেকে পাঁচশো গজ দূরে ঝোপে ঢাকা একটা জায়গায় চোখ আটকে গেল তার। আঙুল তুলে দেখাল।
বাড়িটাতে বোমা ফিট করে দূরে বসে যদি দেখতে চাই ফাটল কিনা, এর চেয়ে ভাল জায়গা আর নেই এ বাড়িতে। সুতরাং ওখান থেকেই শুরু করব।

বৃষ্টি আর কুয়াশায় ভেজা ঘাস মাড়িয়ে এগিয়ে গেল ওরা। ঝোপগুলোর ভেতর উঁকি দিয়ে দেখল ক্যানভাসের ব্যগিটী আছে কিনা। কিন্তু হতাশ হতে হলো! নেই। আশপাশে ওরকম জায়গা আর আছে কিনা দেখল। তা-ও নেই।
পুরানো একটা ম্যাপল গাছের দিকে তাকিয়ে আছে রবিন। গোড়ার সামান্য ওপর থেকেই বেশ কয়েকটা ডাল ছড়িয়ে গেছে। কিশোরকে বলল, সহজেই ওঠা যাবে। ওতে চড়ে দেখব নাকি ভাল জায়গা আছে কিনা?
দেখো।
গাছটায় চড়া কঠিন কিছু না। নিচের একটা মোটা ডালে চড়ে তাকাল। স্পষ্ট দেখা যায় প্রাসাদটী। আরও ভাল করে দেখার জন্যে মাথার ওপরের একটা ডালে হাত দিতে গিয়েই ধড়াস করে এক লাফ মারল হৃৎপিণ্ড। পাতার আড়ালে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে ব্যাগটী।
পেয়েছি! পেয়েছি। চিৎকার করে উঠল সে।
দৌড়ে এল মূসা আর কিশোর।
ভারি ব্যাগটা নামাতে রবিনকে সাহায্য করল মুসা।
ব্যাগটা নিয়ে লিভিংরুমে ফিরে এল ওরা। হেসে বলল কিশোর, এগুলো না পেলে হ্যারিসকে খুশি করতে পারতাম না। আর মক্কেলকে খুশি করতে না পারলে মন খুঁতখুঁত করতে থাকে আমাদের।
সে তো দেখতেই পাচ্ছি, হেসে বললেন চীফ।
উইককে নিয়ে চলে গেল অফিসারেরা। সঙ্গে নিয়ে গেল বোমাটা আর ব্যাগে ভরা পন্নির জিনিসগুলো। পরে যার যার জিনিস ফিরিয়ে দিতে পারবে।
তিন গোয়েন্দাকে বাড়ি পৌঁছে দেয়ার জন্যে রয়ে গেলেন চীফ। ককার আর গোরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, পরে দেখা করবে কথা দিয়ে ওরাও বাড়ি যেতে তৈরি হলো।
মুসা বলল, একটা জরুরী কথা কিন্তু ভুলে গেছ।
কি? ভুরু কোঁচকাল কিশোর।
শিক কাবাব। পঁচিশটা খাওয়ানোর কথা ছিল।
পঁচিশটা শিক কাবাব। কৌতূহল হলো ব্যাংকারের। ঘটনা কি জানতে চাইলেন। জানানো হলো তাকে।
শুনে হাসতে শুরু করলেন তিনি। ফ্লেচার আর গোরোও হাসল।
ককার বললেন, কুছ পরোয় নেই, আমি খাওয়াব তোমাকে শিক কাবাব। যত খেতে পারো। পঞ্চাশটা খেলেও আপত্তি নেই। এখন বাড়ি যাও। বিশ্রাম নাও। বিকেলে চলে এসো এখানে। তোমাদের সঙ্গে আমার আরও কথা আছে। বুদ্ধিমান

মানুষের সঙ্গে কথা বলতে আমার ভাল লাগে। তোমাদের নিয়ে একসঙ্গে বেরোব। যে রেস্টুরেন্ট দেখাবে মুসা, তাতেই ঢুকব। ঠিক আছে?
ঝকঝকে সাদা দাঁত বের করে হাসল মুসা, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, স্যার।
ধন্যবাদগুলো তো আসলে তোমাদের পাওনা। চীফের দিকে তাকালেন ককার। আপনি আসবেন, চীফ? চলুন না, একসঙ্গে ডিনার খাই আজ?
হাসলেন চীফ। কথা দিতে পারছি না, ভাই। গত দুই রাত আপনাদের এই কেসের জন্যে দুচোখের পাতা এক করতে পারিনি। ভাবছি, আজ প্রাণ ভরে ঘুমাব। কিশোর, এসো, ওঠো। তোমাদের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে তারপর আমার ছুটি।

ভলিউম ৪১ – পিশাচকন্যা – তিন গোয়েন্দা – রকিব হাসান – সেবা প্রকাশনী

হঠাৎ করেই, প্রায় অলৌকিক ভাবে ক্ষমতাটা পেয়ে গেছি আমি, রিটা গোল্ডবার্গ বলল। কিভাবে পেয়েছি, জানতে চাও?

চাই, বলে মুসা আর জিনার দিকে তাকাল রবিন।

নীরবে মাথা ঝাঁকাল মুসা।

জিনা বলল, বলো।

একেবারে গোড়া থেকে?

হ্যাঁ, মাথা ঝাঁকাল রবিন। আমরা অনেক চিন্তা-ভাবনা আলাপ-আলোচনা করে একমত হলাম, কিশোরের ব্যাপারে কেউ যদি কোন সূত্র দিতে পারে, সে তুমি। ওকে খুঁজে বের করতে হলে সূব তথ্য আমাদের জানা দরকার। কিছুই মিস করা চলবে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তোমার এই ক্ষমতা পাওয়ার মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে কিশোরকে উদ্ধারের পথ।

ঠিক আছে, বসো তোমরা, বলে লিভিং-রুম থেকে উঠে চলে গেল রিটা। ফিরে এল কয়েক মিনিটের মধ্যে। বড় একটা বাঁধানো খাতা নিয়ে এসেছে হাতে করে। রবিনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, নিয়ে যাও এটা। আমার স্পেশাল ডায়েরী। পড়লে সব জানতে পারবে। আগে পড়ে নাও, তারপর কিভাবে তোমাদের সাহায্য করা যায়, আলোচনা করব। পড়ে তাড়াতাড়ি ফেরত দিও।

দেব, সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে ডায়েরীটা নিল রবিন।

তোমরা তিনজন ছাড়া আর কেউ যেন ডায়েরীটা পড়তে না। পারে, সাবধান করে দিল রিটা।

চোখেও দেখবে না কেউ, রবিন বলল। বড় খাম আছে তোমার কাছে?

আছে।

রিটার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মুসা আর জিনাকে নিয়ে বাড়ি চলে এল রবিন। মা-বাবা বাড়ি নেই, কাজে বেরিয়েছেন। নিরাপদে ডায়েরী পড়তে কোন অসুবিধে হবে না।

লিভিং-রুমে ঢুকেই মুসা বলল, মেরিআন্টির একটা খবর নেয়া দরকার।

ফোন করল সে। রাশেদ পাশা ধরলেন।

কয়েক মিনিট কথা বলে রিসিভার রেখে দিয়ে ফিরে তাকাল। মুসা, আন্টি এখনও বিছানায়। আঙ্কেলের মনমেজাজও ভাল না। ব্যবসা, কাজে-কর্মে মন নেই।

থাকার কথাও নয়, জিনা বলল। কিশোরের খোঁজ না পেলে কোনদিনই আর ভাল হবেন না আন্টি…

বাধা দিয়ে রবিন বলল, কথা আর না বাড়িয়ে কাজে লেগে পড়া যাক। ডায়েরীতে কি আছে পড়ছি আমি। তোমরা কাছে এসে বসো।

ডায়েরীটা খুলল রবিন। সুন্দর হাতের লেখা রিটার। গোটা গোটা অক্ষর। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। পড়তে কোন অসুবিধা হয় না।
জোরে জোরে পড়তে শুরু করল সে।
*
মহিলাটাকে স্রেফ একটা ডাইনী মনে হলো আমার। তবু সাহস করে সরাসরি ওর চোখের দিকে তাকালাম। আমার চেয়ে বেশ খানিকটা লম্বা। তাতে কি?-মনকে বোঝালাম। আমার বয়েস কম। ক্ষিপ্রতা বেশি। লড়াই করার জন্যে প্রস্তুত হয়েই এসেছি আমি।
কাবু ওকে করব আমি, তবে হাতাহাতি লড়াইয়ে নয়, কথার মারপ্যাঁচে।
এতদিন ধরে যা শিখে এসেছি, তাতে একটা ব্যাপার আমার কাছে পরিষ্কার, কোন কিছুতে জিততে হলে কিংবা কোন জিনিস পেতে চাইলে একাগ্রভাবে সেটা চাইতে হবে; ইচ্ছে শক্তিটাই হলো আসল।
বাজার করাটা খুব কঠিন কাজ। অন্তত আমার কাছে। রীতিমত যুদ্ধ করা মনে হয়।
চুলের গোড়ায় আঙুল চালিয়ে সাহস সঞ্চয়ের চেষ্টা করলাম। আমার সবচেয়ে সুন্দর হাসিটা তাকে উপহার দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, বিক্রির জন্যে? আগামী সপ্তায় থাকবে তো?
ডাইনী মহিলাটা একজন সেলস লেডি। নাম ক্লডিয়া। বুকে ঝোলানো নেম-ট্যাগে সোনালি অক্ষরে লেখা রয়েছে নামটা।
আমার কথায় চোখের একটা পাপড়িও কপাল না। বরং তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে মাথাটাকে পেছনে ঝটকা দিয়ে ছোট্ট একটা হাসি দিল।
এই একটা জিনিস একেবারেই সহ্য করতে পারি না আমি, তাচ্ছিল্য করা।
বিক্রি? উপহাসের সুরে বলল, এটা সাধারণ ব্লাউজ নয়, খুকী। তুমি চিনতে ভুল করেছ। প্যারিস, লন্ডন, মিলানের সামার কালেকশনে শো করা হয়েছিল। কিনতে হলে প্রচুর টাকা লাগবে। যদি না থাকে, আলোচনা করেও লাভ নেই। কিচ্ছা এখানেই খতম।
পিত্তি জ্বলে গেল আমার। মাঝে মাঝে ভেবে অবাক লাগে, এ ধরনের চাড়ালগুলোকে কোত্থেকে জোগাড় করে দোকান মালিকরা! দুনিয়ার আর কোথাও যেন জায়গা না পেয়ে খুঁজে খুঁজে রকি বীচে এসে হাজির হয় এরা। আজকে আমার জন্মদিন। আর আজই কিনা দেখা হলো এমন একটা জঘন্য চরিত্রের সঙ্গে।
অন্য কোনদিন হলে মহিলার এ কথা শোনার পর আর একটা সেকেন্ডও দাঁড়াতাম না। সোজা ঘুরে হাঁটা দিতাম। কিন্তু আজ আমি নিজের পয়সায় বাজার করতে

আসিনি। তাতে সাহস বেড়ে গেছে।
টান দিয়ে পকেট থেকে বাবার আমেরিকান এক্সপ্রেস প্ল্যাটিনাম কার্ডটা বের করলাম। আমার প্রতি জন্মদিনে কেনাকাটা করতে পাঠানোর সময় হাতে তুলে দেয় এটা বাবা, যাতে ইচ্ছেমত খরচ করতে পারি। মহিলাকে জিজ্ঞেস করলাম, কিনতে চাইলে নিশ্চয় পরা যাবে? গায়ে ফিট হলো কিনা বুঝব কি করে?
আমার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থেকে মাথাটা সামান্য একটু নোয়াল মহিলা। ঝাঁকি দিতেও ইচ্ছে করছে না। যেন অতি তুচ্ছ একটা জীব আমি।
ওর সামনে থেকে সরার জন্যে বললাম, তাহলে চেঞ্জিং রামটা দেখিয়ে দিন, প্লীজ।
আমার হাতের প্লাস্টিকের কার্ডটা মনোযোগ দিয়ে দেখল ক্লডিয়া। তারপর কোন কথা না বলে ঘুরে রওনা হয়ে গেল দোকানের পেছন দিকে। কয়েক কদম গিয়ে কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে তাকিয়ে বলল, এক সেকেন্ড। আসছি।
সাধারণত এ ধরনের বড় দোকানগুলোকে আমি এড়িয়েই চলি। কিন্তু ব্লাউজটার ওপর চোখ পড়ে গেছে আমার। সেই মে মাস থেকে উইনডোতে ঝোলানো দেখে আসছি। এটা জুন। এতদিনেও রাউজটা মাথা থেকে দূর করতে পরিনি আমি। কি করে পারব? আমার বয়েসী কোন মেয়েই পারবে না। এত সুন্দর জিনিস! কি তার রঙ: খাঁটি বিদ্যুৎ-নীল। হাতা কাটা। হাতে তৈরি লেস আর সিল্কের সুতোর অলঙ্করণ। একটা অদ্ভুত ব্যাপার-মনে হলো, আগে কোথাও দেখেছি ব্লাউজটা। ছোঁয়ার জন্যে, আপন করে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্যে অস্থির হয়ে উঠলাম।
ক্লডিয়া বলে গেল এক সেকেন্ড, কিন্তু ফিরল পুরো পাঁচ মিনিট পর। মুখটাকে গম্ভীর করে রেখে জানাল, তোমার জন্যে একটা চেঞ্জিং রুম রেডি করতে দেরি হয়ে গেল। এসো।
রেডি করেছে মানে! অবাক হলাম। আমি তো জানতাম পোশাকের দোকানে চেঞ্জিং রুম রেডিই থাকে। ও কি আমাকে চোর ভেবেছে? গোপন ক্যামেরা চালু করে রেখে এসেছে?
*
থাবড়া মেরে দেয়া উচিত ছিল বদমাশ বেটিটার মুখে! বলে উঠল মুসা। ছেদ পড়ল রবিনের পড়ায়। ডায়েরী থেকে মুখ তুলে তাকাল।
যা-ই বলো, মাথা দুলিয়ে বলল জিনা, রিটা লেখে কিন্তু চমৎকার। ভাষা ভাল। একেবারে ছবি দেখিয়ে দেয়। প্র্যাকটিস রাখলে বড় লেখক হতে পারবে।
হুঁ মাথা ঝাঁকাল রবিন।
পড়ো, পড়ো, এরপর কি হয়েছে শোনা যাক।
আবার ডায়েরীর দিকে চোখ নামাল রবিন।
*

চেঞ্জিং রুমে ঢুকে আর একটা মুহূর্তও দেরি করলাম না। ক্যামেরার কথা মাথা থেকে উধাও করে দিয়ে পরে ফেললাম। ব্লাউজটা। এমন ভাবে ফিট করল, যেন আমার জন্যেই মাপ দিয়ে বানানো হয়েছে।
আয়নার দিকে তাকালাম। সত্যি, দারুণ মানিয়েছে আমাকে। তবে দামটা অতিরিক্ত। তিনশো ডলার। একটা ব্লাউজের দাম তিনশো, কল্পনা করা যায়! বাবার পকেট থেকে এতগুলো টাকা খসাতে মায়াই লাগল আমার। কিন্তু কোনমতেই লোভ ছাড়তে পারলাম না। আয়নার দিক থেকেও চোখ সরাতে পারলাম না।
একদৃষ্টিতে প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কি যেন কি ঘটে যেতে লাগল আমার ভেতরে। প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেলাম। সাংঘাতিক ক্ষমতা তৈরি হচ্ছে যেন আমার মধ্যে। ব্লাউজটা আগে কোথাও দেখেছি-বার বার মনে হচ্ছে এ কথাটা। কোথায়? অন্য কোনও দোকানে? কোনও ফ্যাশন শোতে?
উঁহু, দোকানে নয় বা কোন স্টলে নয়! ব্লাউজটা যেন আমারই ছিল, আমি নিজেই পরেছি কোন এক সময়। কিন্তু তা কি করে সম্ভব?
যতই মনে করার চেষ্টা করলাম, তীক্ষ্ণ হয়ে উঠতে লাগল স্মৃতি। ক্যামেরায় তোলা ছবির মত ভেসে উঠল মনের পর্দায়। চোখ বুজে মনের চোখে ছবিগুলো দেখার চেষ্টা করলাম।
জোরাল একটা গুঞ্জন কানে এল। মনে হলো ছাতের কাছ থেকে আসছে। অনেক বেড়ে গেল শব্দটা। মাথার ওপর ফ্লোরেসেন্ট লাইটগুলো মিটমিট করতে করতে নিভে গেল।
অন্ধকার!
হঠাৎ থেমে গেল গুঞ্জন। আলো জ্বলে উঠল আবার।
ভয় পেয়ে গেলাম। ছুটে বেরোলাম বদ্ধ ঘরটা থেকে। ক্লডিয়া যেখানে থাকার কথা, সেখানে নেই। তার জায়গায় অন্য এক মহিলা। চুলের ছাঁট থেকে শুরু করে মেকআপু, জুতো সবই সেকেলে। অনেক পুরানো ফ্যাশন। আরও ঘাবড়ে গেলাম। মগজের গোলমাল হয়নি তো আমার!
ক্লডিয়ার চেয়ে কোন দিক দিয়েই ভাল নয় এই মহিলাটিও। নেম-ট্যাগে নাম লেখা: গ্যারেট। শীতল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, চেঞ্জিং রুমে কি করছিলে?
চেঞ্জিং রুমে কি করছিলাম মানে? আমি অবাক।
আমি জানতে চাইছি, কি পরছিলে?
নাহ, দোকানটার বদনাম না করে আর পারছি না। এখানকার সব কর্মচারীই দেখা যাচ্ছে ক্লডিয়ার মত। ভাল ব্যবহার শেখেইনি। কিছুটা রুক্ষস্বরেই জবাব দিলাম, গায়ে যে ব্লাউজটা দেখছেন, এটাই পরছিলাম।

চারপাশে তাকিয়ে অদ্ভুত সব পরিবর্তন লক্ষ করলাম। কোন কিছুই যেন স্বাভাবিক লাগছে না। ঘটছেটা কি এখানে! কয়েক মিনিট আগে যে ডেকোরেশন দেখে গিয়েছিলাম, সেটা বদলে গেছে। এত তাড়াতাড়ি কি করে বদলাল?
দেখো মেয়ে, ধমকের সুরে বলল গ্যারেট, আমার দোকানের মধ্যে কোন রকম গণ্ডগোল চাই না। যাও, বেরোও!
কিন্তু…আমি…
এক্ষুণি! আরও জোরে ধমকে উঠল গ্যারেট। কি সব পোশাক পরেছে দেখো! বিচ্ছিরি! আমার কাস্টোমাররা তোমাকে দেখে চমকে যাচ্ছে। যাও, যাও, বেরোও!
এতক্ষণে লক্ষ করলাম, দোকানের সব লোক তাকিয়ে আছে আমার দিকে। যেন আমি একটা চিড়িয়া। হাঁ করে দেখছে।
যাচ্ছি। তবে একটা কথা, ম্যাম, বলতে ছাড়লাম না, ওদের চমকে যদি কেউ দিয়েই থাকে, সেটা আমি না, আপনি।
কি বললে?
ঠিকই বলেছি। পাগলের চেয়ে ডাইনীকে অনেক বেশি ভয় করে লোকে।
জবাব আটকে যাওয়ায় মরা মাছের মত হাঁ হয়ে গেল। গ্যারেটের মুখ। প্রতিশোধ নিতে পেরে খুশিমনে দোকান থেকে বেরিয়ে এলাম আমি।
*
পথে বেরিয়ে হতবাক। কয়েক মিনিটের মধ্যে পুরো শহরটাই কেমন পাল্টে গেছে। মানুষজন, জিনিসপত্র, সব কিছু এক লাফে যেন ফিরে গেছে তেরো বছর আগে। কি বিচ্ছিরি সব পোশাক পরেছে লোকে। প্যান্ট, জুতো! আহা, কি ছিরি! ওয়াক! বমি আসে দেখলে! আর একটা ব্যাপার, সবাই শীতের পোশাক পরেছে।
সন্দেহ হলো। একটা দোকানে ক্যালেন্ডার ঝোলানো দেখে সেদিকে এগোলাম। স্তব্ধ হয়ে গেলাম। ১৯৮৭-র শীতকাল। এক লাফে এক যুগের বেশি পেছনে চলে এসেছি। অবিশ্বাস্য! এ কি করে সম্ভব!
বোকার মত তাকিয়ে রইলাম রাস্তার লোকজনের দিকে। ওরাও তাকাতে লাগল আমার দিকে। যেন আমি একটা কি!-পাগলা গারদ থেকে এইমাত্র ছাড়া পেলাম। গরমকালের পোশাক পরে আছি আমি। প্রচণ্ড উত্তেজনায় শীতও টের পাচ্ছি না।
মনে হলো, সব রহস্যের জবাব রয়েছে ওই চেঞ্জিং রুমটায়। পায়ে পায়ে আবার মলের দিকে ফিরে চললাম।
মলে ঢুকে এলিভেটরের দিকে এগোনোর সময় দেখলাম, গরম কাপড় পরে ভালুক সেজে যাওয়া একটা ছেলে দোকানের বিজ্ঞাপন করছে। হাতে একগাদা কাগজ। আমার দিকে একটা কাগজ বাড়িয়ে দিতে গিয়ে থমকে গেল। কুঁচকে

গেল ভুরু। ভাবল বোধহয়, আমি তার প্রতিদ্বন্দ্বী। আজব পোশাক পরে তার জায়গা দখল করতে এসেছি।
ভুল ভাঙানোর চেষ্টা করলাম না। তার হাত থেকে ছোঁ মেরে একটা কাগজ কেড়ে নিয়ে, একটা মুচকি হাসি উপহার দিয়ে সরে এলাম।
এলিভেটরে উঠলাম। আমি একা। দরজা বন্ধ হতে শুরু করল। ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম, এখনও একই ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে ছেলেটা।
কাগজটার পেছনে পেন্সিলে লেখা রয়েছে কি যেন। দাগ পড়ে গেছে। উল্টে দেখলাম, একটা ফোন নম্বর। ছেলেটারই হবে হয়তো।
দরজাটা পুরো লেগে যাবার পর মাথার ওপরের গুঞ্জনটা কানে এল। আলো মিটমিট করতে লাগল এলিভেটরের। নিভে গেল।
বিদ্যুৎ চলে গেল নাকি! ঘাবড়ে গিয়ে অ্যালার্ম বেলের বোতামটা টিপতে যাব, ফিরে এল আলো। মুহূর্ত পরেই দরজা খুলে গেল। তিনতলার মেঝেতে পা রাখলাম আমি।
বেরিয়ে এসে চারপাশে তাকালাম।
আবার সেই পরিচিত দৃশ্য। আমার পরিচিত পরিবেশ।
স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।
শিওর, আমি অতীতে চলে গিয়েছিলাম। ফিরে এসেছি বর্তমানে। সত্যি কি এসেছি? দোকানটাতে গেলেই বুঝতে পারব।
করিডর ধরে প্রায় দৌড়ে চললাম পোশাকের দোকানটার দিকে। ব্লাউজটা যেখানে ছিল। কিন্তু দুই কদমও এগোতে পারলাম না। সামনে এসে দাঁড়াল দুজন গার্ড।
এই মেয়েটাই, বলল একজন।
খপ করে আমার হাত চেপে ধরে টান দিল দ্বিতীয় গার্ড, এসো আমার সঙ্গে।
কোথায়? অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।
গেলেই টের পাবে, খুকী!
খুকী খুকী করছেন কেন আমাকে। রেগে উঠলাম। আমার বয়েস কি খুব কম মনে হচ্ছে?
কথার জবাব দিল না ওরা। একজন ওয়াকিটকি বের করে কারও উদ্দেশ্যে কথা বলল, পেয়েছি ওকে। ধরে নিয়ে আসছি...
*
রবিন এ পর্যন্ত আসতেই বাধা দিয়ে মুসা বলে উঠল, দেখো, ভাই, আমার মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে! গলা শুকিয়ে গেছে! কোক টোক কিছু যদি থাকে, এনে দাও জলদি! খেলে হয়তো সহ্য করতে পারব।...বাপরে বাপ, কি কাণ্ড!

হ্যাঁ, অবাক হওয়ার মতই ঘটনা! বিড়বিড় করল জিনা।
আমি কিন্তু অবাক হচ্ছি না, ডায়েরীটা খোলা অবস্থায়ই সোফায় উপুড় করে রাখল রবিন। সেদিন লেকের পাড়ে ইউ এফ ওটা দেখার পর থেকে অবাক হওয়া ছেড়ে দিয়েছি। কোন কথাই আর অবিশ্বাস করব না। চোখের সামনেই তো তুলে নিয়ে গেল ওরা কিশোরকে।
উঠে রান্নাঘরে চলে গেল রবিন। আভন থেকে বের করা গরম বার্গার, আর ফ্রিজ থেকে কোক নিয়ে ফিরে এল। সামনের টেবিলে। রেখে মুসার দিকে তাকাল, খাও।
একটা বার্গার তুলে নিল জিনা। গেলাসে কোক ঢালল।
ডায়েরীতে কি লেখা আছে জানার জন্যে অস্থির হয়ে গেছে ওরা। তাড়াতাড়ি গপগপ করে গিলে নিয়ে খাওয়া শেষ করল।
ডায়েরীটা আবার তুলে নিল রবিন।
মুসার দিকে তাকাল জিনা। পড়ার সময় আর বাধা দেবে না, বুঝলে! তাড়াতাড়ি পড়া শেষ করতে না পারলে রিটার সঙ্গে আলোচনায়ও বসা যাবে না। যত জলদি সম্ভব, খুঁজে বের করতে হবে কিশোরকে।
কিন্তু কোথায় আছে কিশোর? মুসার প্রশ্ন।
কাচু-পিকচুতে। জানা থাকলে, জবাব দিতে পারত জিনা।

.

ভারী লাগামটা খচ্চরের পিঠের ওপর দিয়ে টেনে এনে শপাং করে বাড়ি মারল কিশোর।
হাঁট, শয়তান কোথাকার! রাগে চিৎকার করে উঠল সে। লাঙলের হাতল ধরে ঠেলা দিল জোরে। মাথা ঘুরিয়ে খচ্চরটাকে চোখে চোখে তাকাতে দেখে রাগ আরও বেড়ে গেল।
হাঁট! টান দে! আরও জোরে খচ্চরের পিঠে বাড়ি মারল সে।
আস্তে এক পা বাড়াল জানোয়ারটা। তারপর আরেক পা।
পিছে পিছে হাঁটতে থাকল কিশোর। লাঙল ঠেলতে ঠেলতে ব্যথা হয়ে গেছে হাত। কাধ পোড়াচ্ছে চড়া রোদ। সকালটা অর্ধেক শেষ। সূর্যোদয় থেকে পরিশ্রম করে এতক্ষণে মাত্র দুটো ফালি চাষ দিতে পেরেছে।
এ ভাবে চললে খামারটা খোয়াতে হবে। ভাবনাটা শঙ্কা জাগাল মনে। এই খামারে জন্মায়নি সে। বাপ-দাদা চোদ্দ পুরুষে। কখনও হালচাষ করেনি। কিন্তু তাকে করতে হচ্ছে, পরিস্থিতির কারণে বাধ্য হয়ে।
পিঠ বেয়ে দরদর করে নামছে ঘাম। শার্টের হাতা দিয়ে ভুরুর ঘাম মুছল। এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানি বা লেমোনেড পেলে খখসে। গলাটা ভেজানো যেত।

কিন্তু থামার সময় নেই। এগিয়ে যেতে হবে। খেতের শেষ প্রান্তের দিকে তাকাল। ভুলে থাকতে চাইল পানির কথা।
থেমে গেল আবার খচ্চরটা। টানতে চাইছে না আর। থুতনি। বুকের কাছে নেমে এল কিশোরের। জানোয়ারটাকে সামলাতে গিয়ে পরিশ্রম যা হচ্ছে, তার চেয়ে নিজে টানলেও বোধহয় কষ্ট কম হত।
মাথার দোমড়ানো বাদামী হ্যাটটা খুলে নিয়ে রাগ করে মাটিতে আছড়ে ফেলল সে। গরম বাতাসে উড়িয়ে এনে মুখের ওপর ফেলতে লাগল বহুদিনের না কাটা লম্বা, কোকড়া চুলগুলো। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দুহাত পেছনে এনে কোমরে চাপ দিল। আগুনের মত পুড়িয়ে দিল যেন তীব্র ব্যথা। যতই দিন যাচ্ছে, পরিস্থিতি খারাপ হচ্ছে আরও। ফোঁস করে বেরিয়ে এল দীর্ঘশ্বাস। আকাশের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করল, মিস্টার হার্ট, খচ্চরটাকে একটু হটতে বলুন, প্লীজ!...আপনি বললেই ও হাঁটবে। আপনার কথা শোনে। আমাকে পাত্তাই দেয় না।
বাড়ির দিকে তাকাল কিশোর। বিশাল ওক গাছটার নিচের কবর ফলক দুটো এখান থেকেও দেখা যায়। রোদের মধ্যেও গায়ে। কাটা দিল তার। ইনডিয়ান দম্পতির মৃত্যুটা এখনও তার কাছে রহস্যময়।
নিজের অজান্তেই বুজে এল চোখের পাতা। সিসি আর হেনরিকে দেখতে পেল কল্পনায়। আবার চোখ মেলল। বিশাল বাড়িটাতে ওই দুটো ছেলেমেয়েকে নিয়ে একা থাকতে হয় তাকে।
কানে বাজতে লাগল লং জন হার্টের যন্ত্রণাকাতর কণ্ঠ: ছেলেমেয়ে দুটোকে তুমি দেখো, কিশোর! তোমার হাতে তুলে দিয়ে গেলাম ওদের!
যে বিকেলে মারা গেছেন হার্ট আর তার স্ত্রী কোরিনা, সেই বিকেলটা এখনও জ্বলজ্বলে তার স্মৃতিতে। ধূসর মেঘ জমেছিল আকাশে। ঠাণ্ডা বাতাসে ভেসে আসছিল বৃষ্টির গন্ধ। কাঠের দোতলা বাড়িটার বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল সে। তাকিয়ে দেখছিল, স্ত্রীকে ওয়্যাগনে উঠতে সাহায্য করছেন হার্ট। দূরের এক আত্মীয় বাড়িতে একটা অনুষ্ঠানে যাবেন।
ওয়্যাগনে বসে মাথার টুপিটার ফিতে বেঁধেছেন কোরিনা। ফিরে তাকিয়েছেন কিশোরের দিকে, বাবা, ছেলেমেয়ে দুটোকে দেখো। পারবে না?
মাথা ঝাঁকিয়েছে কিশোর।
সিসি আর হেনরিকে বলেছেন কোরিনা, তোমাদের কিশোর ভাইয়ের কথা শুনবে তোমরা। কি, বুঝতে পেরেছ? নইলে কিন্তু আমরা ফিরে আসার পর কোন উপহার পাবে না।
মুখ গোমড়া করে সামান্য মাথা ঝাঁকিয়েছে সিসি। হেনরি কোন কথা বলেনি। কুটি করে আপনমনে ছেঁড়া একটা কাপড়ের তৈরি খেলনা ক্রমাগত ঘুরিয়েছে ছোট

ছোট আঙুলে। গাল ফুলিয়ে আদুরে কণ্ঠে অনুরোধ করেছে, আমরাও তোমাদের সঙ্গে যাব, কোরিআন্টি।
হেনরি, তোমাকে সিসি আর কিশোরের সঙ্গে এখানেই থাকতে হবে, কঠোর হয়েছেন কোরিনা। লক্ষ্মী ছেলের মত থাকো। আসার সময় তোমাদের জন্যে অনেক কিছু নিয়ে আসব আমরা।
অনেক কিছু তো চাই না আমরা, হিসিয়ে উঠেছে সিসি। আমরা তোমাদের সঙ্গে যেতে চাই।
সিসি আর হেনরির কাঁধে হাত রেখেছে কিশোর। থাক, যাবার দরকার নেই। নিতে যখন চাইছেন না কোরিআন্টি, নিশ্চয় কোন কারণ আছে। এখানেই থাকো তোমরা, আমার সঙ্গে। আমাকে খারাপ লাগে?
জোরে জোরে মাথা নেড়েছে হেনরি আর সিসি।
না না, তোমাকে খুব ভাল লাগে আমাদের, কিশোরভাই, সিসি বলেছে। তোমাকে নিয়ে আমরা সবাই যদি আন্টিদের সঙ্গে যেতে পারতাম, আরও ভাল লাগত।
সকাল থেকেই কোরিনার পিছে লেগে থেকেছে দুই ভাই বোন। কতভাবে অনুরোধ করেছে সঙ্গে নেয়ার জন্যে। কান্নাকাটি করেছে। কিন্তু আন্টি অটল। কোনমতেই রাজি হননি। কিশোর বুঝেছে, বাধা না থাকলে সিসি আর হেনরিকে সঙ্গে না নিয়ে যেতেন না। ওদের বাবা-মা নেই। কোথায় আছে-মারা গেছেন না। বেঁচে আছেন, সেটাও আরেক রহস্য। এ ব্যাপারে প্রশ্ন করেও কোন জবাব বের করতে পারেনি কিশোর। হার্টদের সঙ্গে সিসি বা হেনরির রক্তের সম্পর্ক নেই। কিন্তু বাবা-মায়ের অবর্তমানে বাবা মার মতই স্নেহ দিয়ে দুজনকে বড় করতে চেয়েছেন ওই ইনডিয়ান দম্পতি। সুতরাং নেননি যখন, বোঝাই গেছে-সঙ্গে নেয়ার উপায় ছিল না।
সিসির বয়েস তেরো। হেনরির ছয়। কিশোরের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে এমন করে গিয়ে সিঁড়িতে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসেছিল দুজনে, মায়াই লাগছিল কিশোরের। দুজনেরই কালো চুল। দুজনেরই কান্নাভেজা সবুজ চোখের তারায় জ্বলছিল রাগের আগুন।
নিশ্চিন্তে চলে যান আপনারা, হেসে বলেছে কিশোর। সিসি আর হেনরি ঠিকমতই ঘরের কাজ করবে, সকাল সকাল ঘুমাতে যাবে…
তার দিকে তাকিয়ে জিভ বের করে ভেঙচি কেটেছে সিসি, হেসেছে কিশোর।
ঘোড়ায় টানা ওয়্যাগনে সামনের বেঞ্চসীটে উঠে বসেছিলেন হার্ট। চাকার ব্রেক ছেড়ে কিশোরের দিকে ফিরে বলেছেন, শনিবার নাগাদ ফিরব।
ঘোড়া চালানোর জন্যে চাবুক মারার দরকার পড়ত না হার্টের। লাগাম তুলে সামান্য টান দিতেই কোন রকম প্রতিবাদ না করে চলতে শুরু করেছে চারটে

ঘোড়া।
ওঁদের উদ্দেশ্যে হাত নেড়েছে কিশোর। সিসি আর হেনরিকে নাড়তে বলেছে।
না, নাড়ব না! রাগ করে হাত দুটো কোলের কাছে গুটিয়ে নিয়েছে সিসি।
নাড়ব না! বোনের দেখাদেখি হেনরিও একই ভাবে হাত গুটিয়ে নিয়েছে।
আমি ওদের সঙ্গে যেতে চেয়েছিলাম, সিসি বলেছে, নিল! রাগ করে পা ঠুকল সিঁড়িতে।
নিল না! দেখাদেখি হেনরিও পা ঠুকেছে।
হঠাৎ, আকাশের বুক চিরে দিয়ে গেল বিদ্যুৎ-শিখা। শোনা গেল বজের চাপা গুড়গুড় শব্দ। কিশোরের মনে হচ্ছিল পায়ের নিচের মাটি কাঁপছে। তীব্র গতিতে পিঠে ঝাঁপটা দিচ্ছিল বরফের মত শীতল ঝোড়ো হাওয়া।
ঘোড়াগুলোর আর্তচিৎকার কানে আসতে আকাশের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে তাকিয়েছে কিশোর। পেছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে চারটে ঘোড়াই। খুর দিয়ে বাতাস খামচে ধরতে চাইছিল যেন। পরক্ষণেই মাটিতে পা নামিয়ে পাগলের মত লাফ মেরেছে সামনের দিকে।
মরিয়া হয়ে লাগাম টেনে ওগুলোকে সামলানোর চেষ্টা করেছেন হার্ট। চিৎকার করে ডেকে ডেকে শান্ত করতে চেয়েছেন।
লাফ দিয়ে বারান্দা থেকে ছুটে গেছে আতঙ্কিত কিশোর।
চিৎকার করে ঘোড়াগুলোকে থামতে বলেছে। কিন্তু বিফল হয়ে বাতাসে ভেসে গেছে তার ডাক। হার্টই যেখানে থামাতে পারেননি, সে থামাবে কি?
টানতে টানতে গভীর খাদের দিকে ওয়্যাগনটাকে নিয়ে গেছে। ঘোড়াগুলো পড়লে নিজেরাও যে মরবে সে-খেয়াল ছিল না। টান সামলাতে না পেরে, ঝাঁকুনি লেগে চিত হয়ে পেছনে উল্টে পড়ে গিয়েছিলেন হার্ট। ওয়্যাগনের ধার আঁকড়ে ধরেছিলেন কোরিনা। হ্যাচকা টানে মাথার টুপিটা উড়িয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিল বাতাস, ফিতে বাঁধা থাকায় পারেনি, ফাঁসের মত গলায় টান দিচ্ছিল সেই ফিতে। বাতাসে উড়ছিল লম্বা চুল।
কোনমতেই থামানো যায়নি ঘোড়াগুলোকে। সোজা ধেয়ে গিয়েছিল খাদের দিকে। ডিগবাজি খেয়ে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল পাড়ের ওপাশে।
অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে হয়েছে কিশোরকে। সাহায্য করার কোন সুযোগ ছিল না।

.

দুর্ঘটনাটা নিয়ে অনেক ভেবেছে কিশোর। হাজার ভেবেও কোন কূলকিনারা পায়নি। কেন এমন অদ্ভুত আচরণ করল ঘোড়াগুলো? বিদ্যুৎ চমকাতে দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিল? নাকি বজের শব্দে ভয় পেয়েছিল?

সূত্র খুঁজে বেড়িয়েছে কিশোর ভাঙা গাড়িটায়, খাদের ওপরে, খাদের নিচে। কিছুতেই বুঝতে পারেনি, ঘোড়াগুলোর ওভাবে হঠাৎ খেপে যাওয়ার কারণ। রহস্যটা এখনও অমীমাংসিত।
সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপারটা হলো, কোন প্রাণীর ওপর হার্টকে এ ভাবে নিয়ন্ত্রণ হারাতে আর দেখেনি সে। বরং উল্টোটাই দেখেছে। সব জানোয়ার তাঁর কথা শুনত। গৃহপালিত তো বটেই, বনের জানোয়ারও তার কথা অমান্য করত না। করত যে না, সেটা তো কিশোর নিজের চোখেই দেখেছে। জানোয়ারে কথা না শুনলে আজ সে এখানে থাকত না, কোনদিন ওদের খাবার হয়ে মাটির সঙ্গে মিশে যেত।
মনে পড়ল রকি বীচের সেই দিনটির কথা। ভুল তারিখে তার জন্মদিন করে ফেলেছিলেন মেরিচাচী। ভুলটা যে কি করে করলেন তিনি, সেটাও এক রহস্য। আর যারই হোক, কিশোরের জন্মদিনের তারিখ নিয়ে অন্তত মেরিচাচীর ভুল হওয়ার কথা ছিল না। রহস্যটা ভেদের সুযোগই পায়নি কিশোর।
জন্মদিনে নতুন ক্যামেরা উপহার পেয়েছিল সে। সেই ক্যামেরা নিয়ে লেকের পাড়ের বনে ইউ.এফ. ওর ছবি তুলতে গিয়েছিল। আকাশে বিচিত্র মেঘ দেখেছিল। দেখেছিল রঙিন ফানেল। তারপর অন্ধকার। অন্ধকার কেটে গেলে শুরু হলো দুঃস্বপ্ন...মস্ত এক কাঁচের পাইপে ভরে রাখা হয়েছে তাকে...পালাল সে ওটার ভেতর থেকে...বিশাল ল্যাবরেটরির মধ্যে দিয়ে ছুটল...বেরোতে পারল না, ধরে ফেলা হলো তাকে...আবার পালাল...আবার ধরা পড়া...আবার। পালানো...আবার ধরা...শেষে নেতা গোছের লোকটা মহাখাপ্পা হয়ে তার সহকারীদের বলল-ভয়ঙ্কর ছেলে; একে এখানে রাখা যাবে না। এমন কোথাও রেখে এসো, যেখানে মুক্তও থাকবে আবার বন্দিও থাকবে, আমাদের খপ্পর থেকে কোনমতেই বেরিয়ে যেতে পারবে না...লোকটার মুখে ডাক্তারদের মাস্ক ছিল, চেহারা বোঝা যাচ্ছিল না, কিন্তু কণ্ঠস্বরটা চেনা চেনা-কোথায় শুনেছে ওই কণ্ঠ, স্বপ্নের মধ্যে মনে করতে পারেনি কিশোর...
তারপর আর কিছু মনে নেই। হুঁশ ফিরলে দেখল, একটা বনের মধ্যে পড়ে আছে সে। অন্ধকার হয়ে গেছে তখন। নানা রকম বুনো জানোয়ারের ডাক কানে আসতে লাগল। হঠাৎ দেখল, মাত্র কয়েক গজ দূরে দাঁড়িয়ে লাল চোখ মেলে তাকে দেখছে একটা বিশাল নেকড়ে। হাঁ করা মুখ থেকে ঝুলছে টকটকে লাল জিভ। অসংখ্য ধারাল দাঁত যেন তাকে ছিঁড়ে খেতে প্রস্তুত।
এটাও কি আরেক দুঃস্বপ্ন? নিজের বাহুতে চিমটি কেটেছে কিশোর। ব্যথা পায়নি। না, স্বপ্ন নয়, ভয়ঙ্কর বাস্তব।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। দৌড় দিতে গিয়ে লক্ষ করল, একটা নয়, একপাল নেকড়ে ঘিরে ফেলেছে তাকে। গাছে ওঠারও সময় পাবে না সে। ছুটে এসে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। নেকড়েরা।

তারমানে নিশ্চিত মৃত্যু। চোখ বুজে অপেক্ষা করতে লাগল। কিশোর, ধারাল দাঁতগুলো কখন তার গায়ে বেঁধে!

বিঁধল না। কানে এল মানুষের ফিসফিসে চাপা কণ্ঠ। চোখ মেলে দেখল অবিশ্বাস্য দৃশ্য। একজন মানুষ। ইনডিয়ান। পরনে শুধু প্যান্ট। গায়ে কিছু নেই। লম্বা লম্বা চুল। কথা বলছেন নেকড়েগুলোর সঙ্গে। পোষা কুকুরের মত তার পায়ের কাছে লুটোপুটি খেতে শুরু করেছে নেকড়েগুলো। এ যেন আরেক টারজান!

কিশোরকে উদ্ধার করে বাড়ি নিয়ে এলেন হার্ট। আরও চমক অপেক্ষা করছিল কিশোরের জন্যে। হতবাক হয়ে গেল, যখন জানতে পারল দক্ষিণ আমেরিকায় রয়েছে সে। অ্যান্ডিজের পার্বত্য অঞ্চলে পাহাড় ঘেরা একটা অতি দুর্গম শহর-কাচু-পিকচুতে।

বোকা হয়ে গিয়েছিল। এখানে এল কি করে সে? ইউ এফ ও তো নিয়ে যায় ভিনগ্রহে। পৃথিবীতে নামিয়ে দেয়ার কথা নয়!

তাকে পাগল ভাববে মনে করে হার্টকে সত্যি কথাটা বলল। বলল না, দুনিয়ায় তার কোন আত্মীয়-স্বজন নেই। ভাগ্যের সন্ধানে বেরিয়েছে। বানিয়ে দক্ষিণ আমেরিকার একটা শহরের নাম বলে দিল।

সেই থেকেই এ বাড়িতে আছে কিশোর। গত কয়েক মাসে বেশ কয়েকবার গেছে সেই বনে, যেখানে নেকড়ের কবলে পড়ে মরতে বসেছিল। বহু খোঁজাখুঁজি করেছে, সূত্র খুঁজেছে। এক জায়গায় মাটিতে বসে যাওয়া ছয়টা ছোট ছোট বিচিত্র গর্ত ছাড়া আর কিছু চোখে পড়েনি। মনে হয়েছে, ভারী কিছুর পায়ের চাপে তৈরি হয়েছে গর্তগুলো...

জানোয়ার বশ করার ক্ষমতাটা হার্টের কাছ থেকে রপ্ত করেছে সিসি। হাতে ধরে তাকে শিখিয়েছেন হার্ট। চেষ্টা করলে হয়তো কিশোরও শিখে নিতে পারত। কিন্তু কে জানত এমন বিপদে পড়বে! না শিখে এখন আফসোস হচ্ছে। বিদ্যেটা জানা থাকলে পাজি, কর্মবিমুখ, বেয়াড়া খচ্চরটাকে কাজ করাতে অসুবিধে হত না এখন। এটাকে দিয়েই তো দিব্যি হাল টানাতেন লং হার্ট, কোনই সমস্যা হত না। জানোয়ারটা কথা শুনত তার...

বাস্তবে ফিরে এল আবার কিশোরের মন। চারপাশে ছড়ানো জমিটার দিকে তাকিয়ে হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে লাগল। সন্দেহ হচ্ছে, কোনদিনই হাল দিয়ে শেষ করতে পারবে না। ফসল বোনা তো দূরের কথা।

কি করবে, বুঝে উঠতে পারছে না। খামারটা বাঁচানোর কোন উপায়ই মাথায় ঢুকছে না। নেকড়ের কবল থেকে বাঁচিয়ে এনে বাড়িতে জায়গা দেয়ায় হার্টের কাছে কৃতজ্ঞ সে। মৃত্যুকালে তাকে কথা দিয়েছে, সিসি আর হেনরিকে দেখবে। কথা যদি না-ও দিত, তাহলেও অসহায় ছেলেমেয়ে দুটোকে বাড়িতে একলা ফেলে চলে যেতে পারত না সে। যাওয়াটাও মুখের কথা নয়। যেখানে রয়েছে, সেখান থেকে বেরোতে হলে প্রচুর টাকা দরকার। তার কাছে আছে মোটে বিশ হাজার চিলিয়ান পেসো, আমেরিকান ডলারে এর মূল্যমান পঞ্চাশ ডলারেরও কম। বাড়ির আলমারিতে সামান্য যা ফেলে গিয়েছিলেন হার্ট, তার অবশিষ্ট। এত কম টাকা দিয়ে কোনমতেই বড় শহরে পৌঁছতে পারবে না তিনজনে। তারপর আরও ঝামেলা আছে। রকি বীচে ফিরতে হলে পাসপোর্ট দরকার। সে-সব জোগাড় করতেও অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে। কিভাবে এসেছে এখানে, বোঝাতে হবে কর্তৃপক্ষকে। সব কিছুর জন্যেই মোটা টাকা প্রয়োজন।

মিস্টার গ্যারিবাল্ডের কথা ভাবল। এখানকার ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট। গতকাল এসেছিল দেখা করতে। বলা ভাল, ধমকাতে।

লোকটার কথা মনে হতেই ভয়, আর রাগ একসঙ্গে মাথাচাড়া দিল মনে। হুমকি দিয়ে গেছে, সময় মত কিস্তি শোধ করতে না পারলে বাড়িঘর সব দখল করে নেবে। ওই চামারটার কাছ থেকে জমিটা ইজারা নিয়েছিলেন হার্ট। বাড়িঘর হাতছাড়া হলে নিজের ব্যবস্থা নাহয় একটা করে নিতে পারবে কিশোর, কিন্তু পথে বসবে সিসি আর হেনরি। কি হবে ওদের?

মনকে শক্ত করল সে। এখন টাকা জোগাড়ের একটাই উপায়, ফসল ফলানো। খচ্চরের পিঠে আবার বাড়ি মারল, লাগাম দিয়ে। হাট, ব্যাটা, খচ্চরের বাচ্চা! তোর জন্যে সারাদিন খেতে পড়ে থাকব নাকি?

বাড়ি খেয়ে চিৎকার করে উঠল জানোয়ারটা। এক পা আগে বাড়াল।

হ্যাঁ, থামবি না, সাবধান করল কিশোর। লাঙলের হাতলে শক্ত হলো আঙুল। ফালের খোঁচায় কেটে দুদিকে উল্টে পড়তে শুরু করল আবার কালো মাটি।

দেহের প্রতিটি পেশি টানটান হয়ে ছিঁড়ে পড়তে চাইছে। কিন্তু পরোয়া করল না আর কিশোর।

ডাক শুনে ফিরে তাকাল সে। দৌড়ে আসতে দেখল সিসিকে। কাঁধে নাচছে কালো বেণী। পেছন পেছন আসছে হেনরি।

মোচড় দিয়ে উঠল কিশোরের পেট। দৌড়ানোর ভঙ্গিটা ভাল লাগল না তার। খারাপ কিছু ঘটল নাকি!

লাঙলের হাতল ছেড়ে দিয়ে ওদের দিকে দৌড় দিল সে। চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে, সিসি? কি ব্যাপার?

দাঁড়িয়ে গেল সিসি। হাসল। না না, কিশোরভাই, ভয় পেয়ে না। খারাপ কিছু হয়নি।
দাঁড়িয়ে গেল কিশোর। জোরে জোরে হাঁপাচ্ছে। তাহলে ওরকম চিৎকার করছিলে কেন?
ঝিক করে উঠল সিসির সবুজ চোখের তারা। আমাদের শহরে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল না আজ তোমার, মনে নেই?
সরি, সিসি, আজ পারব না। অনেক কাজ পড়ে আছে, খেতের দিকে হাত তুলে দেখাল কিশোর।
কালো হয়ে গেল সিসির সবুজ চোখের তারা। উধাও হয়ে গেছে হাসি। মুখ নিচু করে বলল, কিন্তু তুমি আমাদের নিয়ে যাবে কথা দিয়েছিলে!
দিয়েছিলাম। কিন্তু…
প্যান্ট খামচে ধরে টান দিল হেনরি। মুখ তুলে তাকাল কিশোরের দিকে। চোখে টলমল করছে পানি। সবুজ দৃষ্টিতে কাতর অনুনয়।
তুমিও শহরে যেতে চাও?
নীরবে মাথা ঝাঁকাল হেনরি। হার্ট দম্পতি মারা যাওয়ার পর থেকে কোন কথা বলে না সে। প্রচণ্ড শ পেয়েছে বোধহয়। কথা বন্ধ হয়ে গেছে।
মাটিতে বসে পড়ল কিশোর। টোকা দিয়ে একটা লাল রঙের গুবরে পোকা ফেলল হেনরির পা থেকে। পরনের ওভারঅলটা অতিরিক্ত খাটো হয়ে গেছে ওর। সিসির দিকে তাকাল। বড় বড় ফুলওয়ালা নীল পোশাকটা মলিন, বিবর্ণ। ফসল ঘরে না ভোলা পর্যন্ত কাপড় কিনে দেয়ার উপায় নেই।
জানি, শহরে যাওয়ার বড় শখ তোমাদের, কিশোর বলল। কিন্তু জমি না চুষলে ফসল বোনা যাবে না। ফসল না হলে জায়গা-জমি বাড়ি-ঘর সব হারাতে হবে আমাদের।
কিন্তু, কিশোরভাই, পাশে বসে কিশোরের হাত খামচে ধরল সিসি। সবুজ চোখে উত্তেজনা। টাকার জন্যেই তো যেতে চাইছি আমি। ভাবছি, ঘোড়দৌড়ে আমিও অংশ নেব। প্রথম পুরস্কার এক লাখ পেসো আমিই পাব, দেখো। আমি জানি, আমি জিতব!
এক লাখ! প্রতিধ্বনি করল যেন কিশোর। টাকাটা পেলে ফসল ওঠা পর্যন্ত কোনমতে চালিয়ে নিতে পারবে সংসার।
সত্যি কি জিততে পারবে সিসি?
পারবে না। এত এত প্রতিযোগী রয়েছে। তাদের সঙ্গে সিসির জেতা, টাকা পাওয়া, সংসার চালানো…দূর! ছেলেমানুষী চিন্তা।
দেখো, সিসি, বোঝাতে গেল সে, আমি জানি, তুমি ঘোড়ায়। চড়ার ওস্তাদ। কিন্তু অন্য ওস্তাদেরাও আসবে। তাদের সঙ্গে পারবে না।

ঝটকা দিয়ে হাতটা সরিয়ে নিল সিসি। জ্বলন্ত চোখে তাকাল। আমি জিতব! আমি জিতব! আমি জিতব! তুমি যদি আমাকে নিয়ে যেতে না চাও, আমি একলাই যাব।
এতদিনে এই দৃষ্টির অর্থ জানা হয়ে গেছে কিশোরের। একবার যখন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে সিসি, কোনভাবেই আর ঠেকাতে পারবে না তাকে। এ ধরনের গোয়ার্তুমি কিশোরের। নিজের মধ্যেও আছে। আরেকজনকে বুঝিয়ে লাভ নেই। উঠে দাঁড়াল সে। দাঁড়াও, হ্যাটটা নিয়ে আসি।

.

হেনরিকে কাঁধে বসিয়ে কাঁচা রাস্তা ধরে হেঁটে চলল কিশোর। পাশে পাশে হাঁটছে সিসি। টানতে টানতে নিয়ে চলেছে তার প্রিয় ঘোড়াটাকে। ঘোড়াটা কালো। নাম গোস্ট। পিঠে চড়েই যেতে পারত সিসি, কিন্তু দৌড়ের আগে গোউকে ক্লান্ত করতে চায় না।
সিসির জেতার সামান্যতম সম্ভাবনা নেই। কিন্তু আর কিছু বলল না কিশোর। শহরে গেলে সিসি নিজেই নিজের ভুল বুঝতে পারবে। জেতার কল্পনাটা স্বপ্ন ছাড়া আর কিছু নয়।
শহরের কাছাকাছি হতে লোকের হট্টগোল আর ব্যান্ডের বাজনার শব্দ কানে এল। চৌরাস্তায় এসে মেইন রোডে উঠল ওরা। প্রধান সড়কটাও কাঁচা। রাস্তার ওপরে উঁচুতে আড়াআড়ি ভাবে ব্যানার টানানো হয়েছে। লোকে-লোকারণ্য। কাঠের তৈরি সারি সারি দোকান। দরজায় বড় করে লেখা নোটিশ ঝুলছে: ঘোড়দৌড়ের জন্যে দোকান বন্ধ।
রাস্তার পাশে টানানো সাইনবোর্ড পড়ে জানা গেল ঘোড়দৌড় হবে মেইন রোডে। বেলা ১টায়। ঘড়ি নেই কিশোরের হাতে। কোথায় হারিয়েছে, তা-ও মনে করতে পারল না; জন্মদিনে পাওয়া ক্যামেরাটার মত। জোর করে মন থেকে দূর করল রকি বীচের ভাবনা। ভাবলে ভীষণ কষ্ট হয়। সূর্য দেখে অনুমান করল একটা বাজতে আর বেশি দেরি নেই।
দারুণ, তাই না? উত্তেজনায় গলা কাঁপছে সিসির। মনে হচ্ছে আশপাশের অঞ্চলের আর কেউ নেই ঘরে, সব ঝেঁটিয়ে চলে এসেছে রেস দেখতে।
পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে মাথা উঁচু করে টাউন হলের দিকে তাকাল সে। বারান্দা আর সিঁড়িতে দাঁড়ানো কিছু লোক। হাসাহাসি করছে, কথা বলছে। পিপার ওপর দাঁড়িয়ে আছে একজন লোক। দুহাতে মাথার ওপর তুলে রেখেছে একটা বোর্ড। তাতে লেখা: ঘোড়দৌড়ে আগ্রহীরা এখানে এসে নাম লেখান।
নামটা লিখিয়ে আসি, সিসি বলল।

সিসির হাত থেকে লাগামটা নিয়ে নিল কিশোর। তুমি যাও। আমি গোস্টকে নিয়ে এগোচ্ছি। এক কাধ থেকে অন্য কাঁধে সরাল হেনরিকে। সিসির পিছে পিছে চলল।

বারান্দায় দাঁড়ানো লোকটাকে বলল সিসি, আমি নাম লেখাতে চাই।

মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেল বারান্দার হট্টগোল। সবার চোখ সিসির দিকে। যেন আরেকটা মাথা গজিয়েছে ওর।

চওড়া কাঁধওয়ালা লম্বা এক যুবক এগিয়ে এল সামনে। মেয়েমানুষ। তুমি রেস খেলবে কি?

নিজের নাকের ডগা টিপে ঘাম মুছল সিসি। কোথায় লেখা আছে সে-কথা, জন ফ্রেঞ্চ?

গাঢ় লাল চুলে আঙুল চালাল যুবক। লেখা নেই, কিন্তু নিয়ম কানুন সব মুখস্থ আমাদের। মেয়েমানুষ নেয়া হবে না।

অ, তাই নাকি। জানো যে, আমি খেললে জিততে পারবে। ভয়ে নিতে চাইছ না।

চোখের পাতা সরু হয়ে গেল জনের। তোমাকে ভয় পাব কেন! ফ্রেঞ্চদের সঙ্গে কেউ পারে না।

এগিয়ে গেল কিশোর। সে জানে, শহরের সবাই ফ্রেঞ্চদের ভয় পায়। এলাকার সবচেয়ে ধনী পরিবার। টাকা আর ক্ষমতার জোরে যে কাউকে ঘাড় ধরে বের করে দিতে পারে এ শহর থেকে। এখানকার স্থানীয় নয় ওরা। সেই সতেরোশো সালে উত্তর আমেরিকা থেকে এসেছিল ওদের পূর্বপুরুষ। ওদের দেখতে পারে না কিশোর, বিশেষ করে দুই ভাই জন ফ্রেঞ্চ আর মার্ক ফ্রেঞ্চকে। কেউ যদি না-ই পারে, নিতে এত ভয় পাচ্ছেন কেন?

আরে নিয়ে নাও, বলে উঠল আরেকটা ভারী কণ্ঠ।

সবগুলো চোখ ঘুরে গেল সেদিকে। দুটো সোনালি রঙের ঘোড়ার লাগাম ধরে টাউন হলের দিকে এগিয়ে আসছে মার্ক ফ্রেঞ্চ। হাঁটার তালে তালে ঢেউ খেলছে ঘোড়াগুলোর শক্তিশালী। পেশিতে।

দাও ওকে একটা সুযোগ, সিসিকে দেখাল মার্ক। খেলুক না। বুঝুক কেমন মজা।

দমে গেল কিশোর! ঘোড়া দুটো দেখেই বুঝে গেছে, ওগুলোর সঙ্গে পারতে হলে অলৌকিক ক্ষমতা লাগবে সিসির।

খুশিতে চিৎকার করে উঠল সিসি। থ্যাংকস, মার্ক। যাও কথা দিলাম, তোমাকে বেশি পেছনে ফেলব না আমি।

সিসির আত্মবিশ্বাস অবাক করল কিশোরকে। ভাবল, বড় বেশি ছেলেমানুষ।

বারান্দায় দাঁড়ানো একজন লোক হাত নেড়ে ডাকল সিসিকে। বড় একটা চকবোর্ড দেখাল। রেসে অংশগ্রহণকারীদের নাম লেখা রয়েছে বোর্ডটায়।

নাও, নিচে তোমার নাম লিখে দাও, চক বাড়িয়ে দিল সে।
পরিষ্কার অক্ষরে দ্রুত নিজের নামটা লিখে দিল সিসি।
মার্ক আর জনকে পরস্পরের দিকে তাকাতে দেখল কিশোর। মুচকি হাসি ওদের ঠোঁটের কোণে। শঙ্কিত হলো সে। আল্লাহই জানে, কি ফন্দি করেছে ওরা!
চকের গুঁড়ো কাপড়ে মুছে কিশোরের হাত থেকে লাগামটা নিয়ে নিল সিসি।
কিছুটা সরে এসে কানে কানে সিসিকে বলল কিশোর, ওদের ব্যাপারে সাবধান। ভাবভঙ্গি আমার ভাল লাগছে না।
চোখের তারায় ছায়া পড়ল সিসির। ভঙ্গিই দেখায় ওরকম। ওদের আমি ভয় করি না।
রেসের আগে বেশি কিছু বলে সিসিকে ঘাবড়ে দিতে চাইল না কিশোর। লাগামটা ফিরিয়ে দিল। হেনরিকে বলল, চলো, এমন কোথাও গিয়ে দাঁড়াই, ভালমত যাতে দেখতে পাই।
চিৎকার করে উৎসাহ দিও আমাকে, সিসি বলল।
দেব।
হেনরিকে কাঁধে নিয়ে কোলাহল মুখর জনতাকে ঠেলে পথ করে এগোল কিপোর। কাঁধে কাধ লাগিয়ে রাস্তার দুই পাশে দাঁড়িয়ে আছে দর্শকরা। রাস্তার শেষ মাথার দিকে তাকাল সে। প্রতিযোগীরা তৈরি হচ্ছে। মেইন রোড ধরে সোজা ছুটে যাবে শহরের শেষ মাথায়, সেখানে রাখা একটা পিপা ঘুরে আবার ফিরে যেতে হবে যেখান থেকে শুরু করেছিল সেখানে। রাস্তার মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়ানোই ভাল, দৌড়ের সবটাই তাহলে দেখা যাবে।
দর্শকদের মাঝে এক ভদ্রলোকের ওপর চোখ পড়ল কিশোরের। গুড ডে, মিস্টার রনসন।
ঘুরে দাঁড়ালেন মিস্টার রনসন। তিনিও বিদেশী। এখানকার জেনারেল স্টোরের মালিক। এখানকার বাকি দোকানদারের মত আজকের দিনে তিনিও দোকান বন্ধ করে দিয়েছেন, কিন্তু গা থেকে সাদা অ্যাপ্রনটা খোলেননি। আরি, কিশোর। আজকাল তো। তোমাকে দেখাই যায় না।
জোর করে মুখে হাসি ফোঁটাল কিশোর, কি করব, এত কাজ।
ভাগ্যিস তোমাকে খুঁজে পেয়েছিল লং হার্ট, নইলে ছেলেমেয়েগুলোর যে কি দুর্দশা হতো ভাবাই যায় না।
অ্যাপ্রনের পকেট থেকে একটা স্যারসাপ্যারিলা স্টিক বের করে হেনরির দিকে বাড়িয়ে দিলেন তিনি।
লোভে চকচক করে উঠল হেনরির চোখ। ছোঁ মেরে প্রায় কেড়ে নিল ক্যান্ডিটা।
হেসে উঠলেন মিস্টার রনসন।

অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, মিস্টার রনসন। কাঁধের ওপর হেনরিকে সোজা করে বসাল আবার কিশোর। ওর আর কি দোষ। কতদিন যে মিষ্টি কিনে দিতে পারি না ওকে।
নিজের ভাইও এতটা করে না, কিশোর। সত্যি তুমি…
কথা শেষ করতে দিল না তাঁকে কিশোর। সিসি এসেছে রেসে অংশ নিতে।
ও জিতলে টাকার সমস্যাটা তোমাদের কমবে, তাই না?
হ্যাঁ। সেজন্যেই আসা। রাস্তার শেষ মাথার দিকে তাকাল আবার কিশোর। ঘোড়া নিয়ে অপেক্ষা করছে প্রতিযোগীরা। সিসিকে দেখতে পেল। গলায় হাত বুলিয়ে আদর করছে গোস্টকে। হাত তুলে দেখাল কিশোর, হেনরি, ওই যে দেখো, সিসি।
হাততালি দিল হেনরি। বোনের উদ্দেশ্যে হাত নাড়ল।
হেসে সিসিও হাত নেড়ে জবাব দিল।
হার্ট প্রায়ই আমাকে বলত, কিশোরকে বললেন মিস্টার রনসন, জন্তু-জানোয়ারকে বশ করার অসাধারণ ক্ষমতা রয়েছে সিসির মধ্যে।
মাথা ঝাঁকাল কিশোর। এখানেই দাঁড়াই, কি বলো, হেনরি?
সরে জায়গা করে দিলেন মিস্টার রনসন। হ্যাঁ হ্যাঁ, দাঁড়াও। এসো, ঢুকে পড়ো।… তবে যতই ক্ষমতা থাক, ফ্রেঞ্চদের সঙ্গে জেতা মুখের কথা নয়। সিসি পারবে না। একেবারেই ছেলেমানুষ সে, ঘোড়াটাও তেমন কিছু না। আমার কি মনে হয়, জানো? যদি পারেও, না জেতাই ভাল হবে সিসির জন্যে। জিততে না পারলে পাগলা কুত্তা হয়ে যাবে দুই ভাই।

.

প্রতিযোগীদের ঘোড়াগুলোর সামনে টানটান করে একটা রশি ধরে রেখেছে দুটো ছেলে।
ঘোড়ায় চড়োয় চিৎকার করে উঠল গ্যারিবাল্ড। রেস পরিচালনার দায়িত্ব পড়েছে তার ওপর। শুধু ব্যাংকের মালিকই। নয়, শহরের ভালমন্দ দেখার ভারও তার…
ভালমন্দ! মনটা তেতো হয়ে গেল কিশোরের। ভালটা কখনোই চোখে পড়ে না গ্যারিবাল্ডের, কেবল মন্দটাই দেখে-এই যেমন একটা অসহায় পরিবারকে বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করার জন্যে। উঠে-পড়ে লেগেছে। গতকাল এসে হুমকি দিয়ে গেছে কিশোরকে। অথচ এখন গোল ভুঁড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে এমন হাসি হাসছে যেন ঈশ্বরের পাঠানো দেবদূত। গাল দুটোও কুৎসিত রকমের ফোলা লোকটার। ঘেন্না লাগে! থুতু ফেলতে গিয়েও আশেপাশে লোক থাকায় ফেলল না কিশোর।
রশির কাছে এসে দাঁড়াল ডজনখানেক ঘোড়া। লাগাম ধরে তৈরি হয়ে আছে সওয়ারিরা।

ওদের মধ্যে সিসিই একমাত্র মেয়ে। দূর থেকেও ওর রক্তিম গাল দেখে মনের উত্তেজনা আঁচ করতে পারল কিশোর।
উত্তেজনার চেয়ে শঙ্কা বেশি কিশোরের মনে। সিসির দুই পাশে দাঁড়িয়েছে দুই ভাই-জন আর মার্ক। দুদিক থেকে চেপে এসে গোস্টকে ঠেলে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে রশির কাছ থেকে। জুনের বাহুতে ধাক্কা মারল সিসি। হেসে উঠল জন। নিজের ঘোড়া দিয়ে চাপ দিতে লাগল গোস্টের পেটে।
ওদের উদ্দেশ্য বুঝে ভয় পেয়ে গেল কিশোর। রেসে জেতার চেয়ে সিসিকে আহত করার দিকেই যেন ওদের খেয়াল বেশি। ওদের মাঝখানে বড়ই ক্ষুদ্র আর ভঙ্গুর লাগছে বেচারি সিসিকে।
হাত উঁচু করল গ্যারিবাল্ডি। হাতে পিস্তল। আকাশের দিকে তাক করে গুলি করল একবার। হাত থেকে রশির দুই মাথা ছেড়ে দিল ছেলে দুটো।
রশিটা মাটিতে পড়ে যেতেই চিৎকার করে উঠল অশ্বারোহীরা। লাগামে টান দিয়ে চাপড় মারল ঘোড়ার গলায়। লাফ দিয়ে আগে বাড়ল ঘোড়াগুলো। ধুলোর ঝড় উঠল ওগুলোর ছুটন্ত খুরের আঘাতে।
নাকেমুখে ধুলো ঢুকে যেতে কেশে উঠল কিশোর। চোখ বন্ধ করে ফেলল। কানের কাছে চিৎকার করছে উত্তেজিত দর্শকেরা: জোরে, জন! মার্ক, আরও জোরে! রেসে যেন কেবল ওই দুজনই প্রতিযোগিতা করছে।
লোকে ভয় পায় ওদের। মনে মনে অন্য কাউকে সমর্থন করলেও প্রকাশ্যে সেটা জানানোর সাহস নেই। সিসির মত দুর্বল একটা মেয়ের পক্ষ নিলে নিজের বিপদ ডেকে আনা ছাড়া আর কিছু পাবে না।
জোরে জোরে হাততালি দিচ্ছে হেনরি। পা ছুঁড়ছে। ওর খুদে পায়ের লাথি লাগছে কিশোরের বুকে। কাঁধের ওপর তাকে সোজা করে বসাল কিশোর। দর্শকদের ঠেলে এগিয়ে গেল ভালমত দেখার জন্যে।
প্রাণপণে ছুটছে সিসি। দুই পাশে মার্ক আর জন। শুরু থেকেই গোস্টের প্রায় গা ঘেঁষে রয়েছে ঘোড়া দুটো। গোস্টের গায়ে ধাক্কা লাগছে। আগে বাড়ার পথ পাচ্ছে না সিসি।
হঠাৎ, হাত বাড়িয়ে গোস্টের লাগাম ধরে হ্যাচকা টান মারল মার্ক।
এলোমেলো পা ফেলতে শুরু করল গোস্ট। চিৎকার করে জোরে লাগাম টেনে ধরল সিসি।
সিসি! ধরে রাখো! ছেড়ো না! গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল কিশোর। পেটের ভেতরে খামচি দিয়ে ধরেছে তার। ঘোড়াটাকে নিয়ে এখন সিসি পড়ে গেলে, দুজনেই মরবে, অন্য ঘোড়াগুলোর পায়ের চাপে পিষ্ট হয়ে।
নিষ্ঠুর, কুৎসিত হাসি দেখতে পেল দুই ভাইয়ের মুখে।

সামলে নিয়েছে গোস্ট। তাকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছে সিসি। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। প্রায় সবগুলো ঘোড়াই এখন গোস্টকে পার হয়ে চলে গেছে। আগে বাড়ার আপ্রাণ চেষ্টা করছে সিসি। ঘোড়ার কাধ ডলে, পেটে পায়ের গুঁতো মেরে জোরে ছোটার ইঙ্গিত করছে।
গতি বাড়তে লাগল ঘোড়াটার। বাতাসে উড়ছে সিসির বেণী। দেখতে দেখতে ধরে ফেলল সামনের ঘোড়াটাকে। দ্রুত পাশ কাটাল ওটার। তারপর আরেকটার। আরও একটার। সামনে নুয়ে পড়ল সিসি। গোস্টের ঘামে ভেজা চকচকে কাঁধের ওপর নেমে এসেছে থুতনি।
কি করছে ও? অবাক হলো কিশোর। সিসির ঠোঁট যে নড়ছে কোন সন্দেহ নেই তাতে। যেন ফিসফিস করে কথা বলছে ঘোড়াটার সঙ্গে।
স্তব্ধ হয়ে গেছে কিশোর। একটার পর একটা ঘোড়াকে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে সিসি। তীব্র গতিতে পিপাটার চারপাশে ঘুরে আসার সময় ঘোড়ার গায়ের ধাক্কা লাগল পিপাটাতে। দুলে উঠল ওটা।
দম আটকে ফেলল কিশোর। পিপাটা উল্টে পড়ে গেলে ডিসকোয়ালিফাই হবে সিসি। কিন্তু ভাগ্য ভাল, পড়ল না।
পিপা ঘুরে এসে বাকি ঘোড়াগুলোকে পেছনে ফেলতে শুরু করল গোস্ট। কোনদিকে নজর নেই আর। লক্ষ্য যেন একটাই-শুধুই এগিয়ে যাওয়া; ধুলো-ধূসরিত পথের মাঝে, ধুলোর মেঘের পেছনে ফেলে আসা বাকি ঘোড়াগুলোকে।
অবিশ্বাস্য দৃশ্য! জন আর মার্কের দুটো ঘোড়া বাদে বাকি সবগুলো ঘোড়ার আগে চলে গেছে গোস্ট।
হেনরি, দেখো দেখো! আনন্দে গলা চিরে চিৎকার বেরিয়ে এল কিশোরের। জিতে যাচ্ছে সিসি!
ওর মাথাটাকেই যেন তবলা বাজিয়ে চাটি মারতে আরম্ভ করল হেনরি।
সামনের ঘোড়া দুটোকে হারাতে পারলেই জিতে যাবে সিসি! চাটির পরোয়া না করে আবার চিৎকার করে উঠল কিশোর।
জনের কয়েক ফুট পেছনে রয়েছে সিসি। হালকা ছিপছিপে শরীর নিয়ে যেন উড়ছে গোস্ট। ধরে ফেলছে বিশালদেহী সোনালি ঘোড়াটাকে।
ফিরে তাকাল মার্ক। হাসতে শুরু করল সিসির দিকে তাকিয়ে।
ওর উদ্দেশ্য বুঝে আতঙ্কিত হয়ে গেল কিশোর। আবার যদি লাগাম ধরে টান মারে, এই গতিতে থেকে কোনমতেই সামলাতে পারবে না গোস্ট। ডিগবাজি খেয়ে পড়বে। ঘোড়া আর তার সওয়ারি, দুজনেরই ঘাড় ভাঙবে।
চিৎকার করে সাবধান করতে গেল কিশোর। স্বর বেরোল না।
হাত বাড়াল মার্ক।

চাটি বাজানো থেমে গেছে হেনরির। কিশোরের চুল আঁকড়ে ধরেছে সে। শক্ত হয়ে গেছে শরীর। ফোপাতে শুরু করল। চিৎকার করে কেঁদে উঠবে মনে হচ্ছে।
ভয়ঙ্কর ওই দৃশ্য হেনরিকে দেখতে দিতে চাইল না কিশোর। টেনে তাকে কাধ থেকে নামানোর চেষ্টা করল। কিন্তু সেঁটে বসে। আছে হেনরি। কোনমতেই তাকে নামানো গেল না।
কোন রকম আগাম সঙ্কেত না দিয়ে আচমকা পেছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল মার্কের ঘোড়াটা। মার্কের একটা হাত বাড়ানোই আছে গোস্টের দিকে। ভয়াবহ হাঁক ছেড়ে, নাকের মাংস কুঁচকে ওপরে তুলে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল জনের ঘোড়াটার ওপর। কামড় বসাল ঘাড়ে! ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে ছিটকে পড়ল দুই ভাইয়ের ওপর। মার্কের আর্তনাদ কানে এল কিশোরের। ঘোড়ার পিঠ থেকে গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে সে। মরিয়া হয়ে জিন ধরে ঝুলে থাকার চেষ্টা করল। কিন্তু থাকতে দিচ্ছে না তাকে খেপা ঘোড়াটা।
জনের ভয়ার্ত চিৎকারও কানে আসছে। কামড় খেয়ে উন্মাদ হয়ে যাওয়া ঘোড়ার পিঠে বসে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে। মাটির কাছে মুখ নামিয়ে দিল ঘোড়াটা। পেছনের দুই পা উঁচু করে ছুঁড়ে দিল শূন্যে। এই উন্মাদ ঝাঁকুনি সহ্য করতে পারল না। জন। শেষ রক্ষা করতে পারল না। লাগাম থেকে ছুটে গেল হাত। দুই হাত দুদিকে বাড়িয়ে থাবা মেরে বাতাস ধরার চেষ্টা করল, যেন। উল্টে পড়ে গেল জিনের ওপর থেকে। মাঠিতে পড়ার শব্দটা স্পষ্ট শুনতে পেল কিশোর। জনের একটা হাঁত মাটিতে লম্বা হয়ে পড়ল। সামনের দুই খুর সবেগে সেই হাতের ওপর নামিয়ে আনল মার্কের ঘোড়াটা।
চোখ বুজে ফেলল কিশোর। জনের যন্ত্রণাকাতর ভয়ানক আর্তচিৎকার কানে এল তার। চোখ মেলল আবার। দেখল, মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে জন। তার ঘোড়াটা তীরবেগে ছুটে চলে যাচ্ছে। খুরের আঘাতে হাড় ভেঙে গিয়ে চামড়া ছিঁড়ে বেরিয়ে এসেছে চোখা মাথা। মাটি ভেজাচ্ছে গাঢ় লাল রক্ত।
চিৎকার-চেঁচামেচি হই-চই করছে লোকে। হাত তুলে দেখাচ্ছে। জনের দিকে চোখ ফেরাল কিলোর। সিসির ঘোড়াটা চলে গেছে রশির কাছে।
জিতে গেছি! জিতে গেছি! হেনরি, জিতে গেছি আমরা! কাঁধে বোঝা নিয়েই নাচতে শুরু করল কিশোর। হেনরির মুখ দেখতে পাচ্ছে না। তবে বুঝতে পারছে, নীরব হাসিতে দাঁত বেরিয়ে পড়েছে ওর।
ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে ওদের দিকে ছুটে এল সিসি। কিশোরভাই! হেনরি! আমি জিতে গেছি! জিতে গেছি!
কাছে এসে কিশোরের হাত জড়িয়ে ধরল সে। কি, বলেছিলাম না, আমিই জিতব! তুমি তো বিশ্বাস করোনি!

হ্যাঁ, দেখলাম তো! সিসির কাঁধ চাপড়ে দিল কিশোর।
এতক্ষণে কিশোরের কাঁধ থেকে নামল হেনরি। গাছ থেকে নামার মত করে পিছলে নেমে গিয়ে বোনের কোমর জড়িয়ে ধরল। মুখ চেপে ধরল পেটে।
আদর করে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল সিসি। তোকে অনেক ক্যান্ডি কিনে দেব, হেনরি। অনেক টাকার ব্যবস্থা হয়ে গেল।
আনন্দে খিলখিল করে হেসে উঠল সিসি।
তার হাসির শব্দ মিলাতে না মিলাতেই শীতল শিহরণ বয়ে গেল কিশোরের মেরুদণ্ড বেয়ে। লোকে ঘিরে ফেলেছে ওদের তিনজনকে।
জোরে কথা বলছে না কেউ। ফিসফাস করছে সবাই। সে-সব ছাপিয়ে বার বার কানে আসছে জনের যন্ত্রণাকাতর গোঙানি। যে ভঙ্গিতে সিসির দিকে তাকাচ্ছে লোকে, দেখে গায়ে কাঁটা দিল কিশোরের।
খবরদার, ওর বেশি কাছে যেয়ো না! চিৎকার করে উঠল। একজন। মেয়েটা মানুষ না, পিশাচ!
শয়তানের পূজারী! বলল আরেকজন। জন্তু-জানোয়ারেও ওর কথা শোনে! দেখলে না কেমন করে নিজের ঘোড়াটার কানে কানে কথা বলল? খেপিয়ে তুলল ফ্রেঞ্চদের ঘোড়াগুলোকে! ওই ডাইনীটাই দুটো ঘোড়ার লড়াই লাগিয়েছে!
বেশির ভাগ লোক তার কথা সমর্থন করল। গুঞ্জন উঠল তাদের মাঝে। ভুরু কুঁচকে সিসির দিকে তাকিয়ে আছে। চোখে সন্দেহ।
ও ডাইনী। চিৎকার করে উঠল আরেকজন।
ঠিক ঠিক, ঠিক বলেছ! বলে উঠল অন্য আরেকজন। সুর করে বলতে শুরু করল, ডাইনী! ডাইনী! ডাইনী!
তার কণ্ঠে কণ্ঠ মেলাল আরও অনেকে।
ওদের ভাবভঙ্গি দেখে শিউরে উঠল কিশোর। মনে পড়ে গেল মধ্যযুগের ডাইনী পোড়ানোর কথা।
থামুন! থামুন আপনারা! দোহাই আপনাদের! শান্ত হোন! পাগলের মত চিৎকার শুরু করল কিশোর। সিসি ডাইনী নয়! তাকে আমি চিনি। তার মত ভাল মেয়ে কম দেখেছি আমি।
কিশোর ভাই, ওরা আমাকে যা-তা বলছে, কেঁদে ফেলল। সিসি। আমি খারাপ কিছু নই। মোটেও ঠিক নয় ওদের কথা।
সিসির দিকে তাকাল কিশোর। ওর সবুজ চোখের তারা পানিতে ঢাকা পড়েছে।
ঠিক তো নয়ই, আমি কি জানি না সেটা, সিসির কাঁধে হাত রেখে তাকে আশ্বস্ত করতে চাইল কিশোর। ভয়ে কাঁপছে সিসি।

কিশোরের প্যান্ট খামচে ধরে পায়ের সঙ্গে সেঁটে রয়েছে। হেনরি। ওর মাথায়ও আলতো চাপড় দিয়ে অভয় দেয়ার চেষ্টা করল কিশোর।
কি করে ভাবছে ওরা সিসির মত একটা মেয়ে ডাইনী হতে পারে? রাগ ফুঁসে উঠতে লাগল কিশোরের মনের মধ্যে।
ওকে খারাপ ভাবছেন কেন আপনারা? লোকগুলোকে বোঝাতে গেল সে। লং হার্ট জন্তু-জানোয়ারদের বশ করতে জানতেন, তাঁর সঙ্গে থেকে থেকে ওদের সামলাতে শিখেছে সিসি। জানোয়ারেরা তাকে বিশ্বাস করে। যেমন আমি করি।
দুই হাতে জনতাকে ঠেলে সরিয়ে এসে কিশোরের মুখোমুখি দাঁড়াল মার্ক ফ্রেঞ্চ। জোরে জোরে হাঁপাচ্ছে। চিৎকার করে উঠল, ওই ইনডিয়ান হারামজাদাটাই ছিল যত নষ্টের গোড়া। ওর ভয়ে গাঁয়ের কেউ কথা বলতে পারত না। সবাই ভেবেছিল, মরেছে, গ-সুদ্ধ বেঁচেছে। কিন্তু এখন তো দেখা যাচ্ছে শয়তান কখনও মরে না। বংশধর রেখে যায়। সমস্ত তুকতাক শিখিয়ে দিয়ে গেছে এই ডাইনীটাকে। সিসির দিকে আঙুল তুলল সে। ডাইনীদের চেহারা ভালই হয়। নইলে মানুষের মন ভোলাবে কি করে?
সবাই মার্কের কথায় সায় দিয়ে মাথা ঝাঁকাতে লাগল। জোরাল গুঞ্জন উঠল তাদের মাঝে।
আপনারা যা-ই বলুন, জনতার দিকে তাকিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করল কিশোর, ঘোড়াগুলোর খেপে ওঠার পেছনে সিসির কোন হাত ছিল না। আপনারা নিজের চোখে দেখেছেন লাগাম টেনে ধরে সিসির ঘোড়াটাকে ফেলে দিতে চেয়েছিল জন। পড়ে গেলে ঘোড়াটা সহ মারা পড়ত সিসি। পরের বার যখন আবার একই কাজ করতে গিয়েছিল, বেসামাল হয়ে পড়ে ওদের ঘোড়া দুটো। এটা কি সিসির দোষ?
কিশোরের দিক থেকে জ্বলন্ত চোখের দৃষ্টি জনতার দিকে ফেরাল মার্ক। অস্বস্তিতে পায়ের ওপর ভার বল করল কেউ কেউ। সবাই চোখ নামিয়ে নিল। মার্কের বিরুদ্ধে সত্যি কথাটা বলতেও ভয় পাচ্ছে ওরা। ওর আক্রোশের শিকার হয়ে পরিবার পরিজন নিয়ে ধনে-প্রাণে মারা পড়তে চায় না। গলা শুকিয়ে গেল কিশোরের।
তুমি কি বলতে চাও আমার ভাই অন্যায় কিছু করেছে? কিশোরের দিকে এক পা এগিয়ে গেল মার্ক।
কি করেছে সেটা সবাই দেখেছে। আমি কেবল সত্যি কথাটা বললাম।
চোখের পাতা সরু সরু হয়ে এল মার্কের। ওই বাড়ির সবগুলো মানুষ শয়তান। ফকির-ফোকরা যেগুলো বাইরে থেকে আসে সেগুলোও শয়তান।

আমার তো ধারণা, ফকির-ফোকরাগুলো আসে বলেই এই শয়তানের গায়ে মানুষ এখনও বেঁচে আছে, নইলে বহু আগেই জমিদার-ফমিদারদের অত্যাচারে খতম হয়ে যেত। আর ফমিদারগুলোও তো বাইরে থেকেই ঘটি-কম্বল নিয়ে আসা। এখানকার নিরীহ মানুষের ঘাড় মটকে রক্ত চুষে বড়লোক হয়েছে।
কি বললি! ফকিরের বাচ্চার এত্ত বড় সাহস! চড় মারার ও ভঙ্গিতে হাত উঠে গেল মার্কের।
দুই ধাক্কায় সিসি আর হেনরিকে দুই পাশে সরিয়ে দিল কিশোর। চোখের পলকে ডান পাটা চলে এল সামনে। সামনের দিকে সামান্য কুঁজো হয়ে গেছে দেহ। কারাতে মারের কায়দায় দুই হাত উঠে গেছে, একটা সামনে, একটা পেছনে। এর চীনা মারের এই ভঙ্গিটা মার্কের একেবারে অপরিচিত নয়। কিশোরের ক্ষিপ্রতা আর চোখের ভয়ঙ্কর দৃষ্টি দমিয়ে দিল তাকে।
ভুরু নাচাল কিশোর, কি হলো, মারছ না কেন? মারো! দেখি তোমার তাকত! মেয়েমানুষের সঙ্গে হেরে ভূত হও, চালাকি করেও জিততে পারো না, আবার বড় বড় কথা বলতে এসেছ!
খবরদার! মুখ সামলে কথা বলবে! গর্জে উঠল মার্ক।
তাই তো করছিলাম এতক্ষণ! দুর্বল পেলে মারতে খুব মজা লাগে, না? তোমার ভাইয়ের ভেঙেছে হাত, আমি তোমার ঘাড়টা মটকে দেব। এসো! মারো!
কিশোরের মারমুখো ভঙ্গি দেখে আর এগোতে সাহস করল না মার্ক। এক পা পিছিয়ে গেল। দুই হাত ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, আজকে ছেড়ে দিলাম। আরেকদিন এ রকম বেয়াদবি করতে দেখলে...
আমরা কিচ্ছু করিনি, জবাব দিল কিশোর। শয়তানিটা তোমরা শুরু করেছ। সিসিকে রেসে অংশ নিতে দেয়ার ইচ্ছে ছিল না তোমাদের।
হ্যাঁ, সত্যিই নিতে চাইনি, মাথা ঝাঁকাল মার্ক। কেন জানো? কাচু-পিকচুতে তোমাদের চাই না আমরা। বাপ-মা দুটো উধাও হয়েছে। শয়তানের চেলা ছিল বোধহয়, শয়তানেই ধরে নিয়ে গেছে দোজখের মানুষকে জ্বালানোর জন্যে। বাকি দুটো চেলা ওয়্যাগন উল্টে মরেছে। বাকি আছ তোমরা। মাটিতে থুথু ফেলল মার্ক।
সাহস করে কিশোরের চোখে আর ফেলতে পারল না। এতিমদের মিছিলের সঙ্গে বিদেয় হয়ে গেলেই পারো। শুনলাম, কয়েক দিনের মধ্যেই এখান দিয়ে যাবে একটা কাফেলা। যাওয়ার জন্যে সাহায্য চাইলে বরং সাহায্য করতে পারি। চাইকি, কিছু পয়সাও ভিক্ষে দিয়ে দেব।
কিশোর কোন জবাব দেবার আগেই ঝটকা দিয়ে ঘুরে গটমট করে চলে গেল মার্ক। চারপাশে ঘিরে থাকা জনতার দিকে তাকাল কিশোর। কারও চোখে ভয়। কারও রাগ। মিস্টার রনসনকে দেখল চোখে। সহানুভূতি নিয়ে তাকিয়ে আছেন

ওদের দিকে। কিশোরের চোখে চোখ পড়তেই মনে হলো কথা বলবেন। কিন্তু ওই মুহূর্তে পাশে এসে দাঁড়ালেন মিসেস রনসন। স্বামীর হাত ধরে টেনে সরিয়ে নিয়ে গেলেন তাকে।
কেউ আসবে না সাহায্য করতে, বুঝে গেল কিশোর। ফ্রেঞ্চ জিততে পারেনি, জনতার উদ্দেশ্যে বলল সে, আপনারা সবাই দেখেছেন। সিসি জিতেছে। প্রথম পুরস্কারটা তার পাওনা এখন।
সামনে এগিয়ে এল গ্যারিবাল্ডি। এ খেলার বিচারক হিসেবে আমার রায়, চালাকি করে জিতেছে সিসি। তার জেতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায়। এমতাবস্থায় তাকে পুরস্কারের টাকা দেয়া উচিত হবে না। জনতার দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ল সে। আমার রায়ে কারও কোন আপত্তি আছে?
একটা লোকও জবাব দিল না। সবাই নীরব।
সিসি জিতেছে, দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করে দিল কিশোর, আপনি তাকে টাকাটা দেন বা না দেন।
দি ইয়াং ম্যান, যথেষ্ট বলে ফেলেছ। আর একটা বাক্যও না। যদি ভাল চাও, ছেলে-মেয়ে দুটোকে নিয়ে এখন বিদেয় হও এখান থেকে, কর্কশ কণ্ঠে বলল গ্যারিবাল্ডি।
লোকটার ফোলা ভুঁড়িতে ঘুসি মারার প্রবল ইচ্ছেটা অনেক কষ্টে রোধ করল কিশোর। এত রাগ তার কমই হয়েছে। আঙুলগুলো মুঠোবদ্ধ হয়ে গেছে।
ব্যাপারটা লক্ষ করল সিসি। তাড়াতাড়ি কিশোরের হাত ধরে টান দিল, এসো, কিশোরভাই। চলো, বাড়ি চলো।...তোমরা এগোও, আমি গোস্টকে নিয়ে আসি।
ঘুরে দাঁড়াল কিশোর। গ্যারিবাল্ডি বা অন্য কারও দিকে একটিবারের জন্যে ফিরে তাকাল না আর। ওদের প্রতি তীব্র ঘৃণাটা বুঝিয়ে দিয়ে হেনরিকে বলল, চলো, হেনরি।
শহর থেকে বেরোনোর রাস্তা ধরে দ্রুত এগিয়ে চলল সে।
মগজে ওগুলোর একটারও ঘিলু নেই, আনমনে বিড়বিড় করতে লাগল কিশোর। কুসংস্কারে ভরা। নইলে কি আর সিসিকে ডাইনী বলে।
হেনরির দিকে তাকাল সে। নিষ্পাপ চোখ মেলে তার দিকে তাকাল হেনরি। বড় মিষ্টি লাগল মুখটা। রাগ অনেক কমে গেল কিশোরের। ভয় নেই, হেনরি। তোমাদের কিশোরভাই বেঁচে থাকতে তোমাদের একটা চুলও কেউ খসাতে পারবে না। গাঁয়ের লোককে নিয়েও চিন্তা নেই। সিসিকে টাকা দিতে হয়নি, চুকে গেছে। ঘটনাটা নিয়ে আর বিশেষ মাথা ঘামাবে না কেউ।
হেনরিকে বলল বটে, কিন্তু কথাটা নিজেই বিশ্বাস করতে পারল না কিশোর। ফ্রেঞ্চদের কোন বিশ্বাস নেই। তাদের সঙ্গে জুটেছে আবার গ্যারিবাল্ডের মত

একটা ভয়ানক কুটিল পা-চাটা লোক।
শহরের বাইরে চৌরাস্তাটায় এসে সিসির অপেক্ষা করল ওরা। খানিক পরেই গোস্টের লাগাম ধরে টেনে নিয়ে আসতে দেখা গেল সিসিকে। ঘোড়াটা কাছে এলে হেনরিকে ওটার পিঠে বসিয়ে দিল কিশোর।
কিশোরভাই, সত্যি তুমি আমাদেরকে এতিম আর অসহায়দের মিছিলে দিয়ে দেবে? হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞেস করল সিসি। গলা কেঁপে উঠল ওর।
ফিরে তাকাল কিশোর। না। ফার্মটা আছে এখনও। মাথার ওপর চালা আছে আমাদের, চাষের খেত আছে; আমরা তো বাস্তুহারা নই।
আশ্বস্ত হলো সিসি। কিন্তু কিশোর হতে পারল না। আর কতদিন ওদের থাকতে দেবে গ্যারিবাল্ডং আজকের ঘটনার পর যে কোনদিন এসে হাজির হবে সে। টাকা দিতে না পারলে ঘাড় ধরে বের করে দেবে। কিছুই করার থাকবে না তখন।
দমিয়ে দেয়া ভাবনাগুলো মন থেকে ঝেড়ে ফেলল কিশোর। সিসির দিকে তাকাল। হাসল সিসি। দুশ্চিন্তার ছাপ নেই আর। মুখে। হেনরির মুখেও ভয় নেই। এদেরকে অসহায় অবস্থায় বিপদের মধ্যে ফেলে কোথাও চলে যাওয়া এখন অসম্ভব-ভাবছে কিশোর। এমন এক বেকায়দা অবস্থায় পড়েছে, নিজের কথাও ভাবতে পারছে না। নিজে যে কি করে এখানে এল, কে তাকে ফেলে গেল, সেই রহস্যের সমাধান করারও সুযোগ নেই। ছেলে মেয়ে দুটোর একটা কিনারা না করে বাড়ি ফিরে যাওয়ারও চেষ্টা করতে পারছে না। সিসি আর হেনরির একটা গতি না করে এই পরিস্থিতিতে ওদের ফেলে যেতে পারবে না সে।
সিসি, বাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে বলল সে, কোন চিন্তা, কোরো না। তোমাদের ব্যবস্থা না করে আমি কোথাও যাব না।
তারমানে ব্যবস্থা হলেই তুমি আমাদের ফেলে চলে যাবে! চোখ ছলছল করে উঠল সিসির।
আরি, আবার কাঁদবে নাকি!...থাক থাক, যাব না কোথাও! কেঁদো না! যদি কোথাও যাই, মানে যেতে হয়, তোমাদের সঙ্গে নিয়েই যাব।.. নাও, এখন চোখ মোছো। বোকা মেয়ে কোথাকার।
চোখ মুছল সিসি। কিন্তু হাসি ফুটল না মুখে। কিশোরভাই, তুমিও কি আমাকে ডাইনী মনে করো? লোকগুলো যা বলেছে, বিশ্বাস করো?
পাগল নাকি! আমি কি ওগুলোর মত ছাগল? জন্তু জানোয়ারকে কথা শোনানোর ক্ষমতা আছে তোমার, গর্ব করার মত বিদ্যে এটা। এখন তো আমার রীতিমত দুঃখ হচ্ছে, আমিও শিখলাম না কেন?
শেখোনি ভাল করেছ। তাহলে তোমাকেও শয়তান বলত লোকগুলো।
তা তো বলতই।

তবে তোমার কিছু করতে পারত না। যা সাহস দেখলাম আজ তোমার। এতগুলো লোকের বিরুদ্ধে যেভাবে রুখে দাঁড়ালে। মার্কের মত খেপা শুয়োরও তোমার ধমকে কুঁকড়ে গেল।...যা-ই বলো, ওর ভাইটার হাত ভাঙাতে আমি খুশিই হয়েছি। ঘাড় মটকে মরলে আরও খুশি হতাম।

খিলখিল করে হাসতে লাগল সিসি। বোনকে হাসতে দেখেই যেন হেনরিও হাসল।

কিন্তু কিশোর হাসতে পারল না। সিসির কথা আর হাসি চমকে দিয়েছে তাকে। মেরুদণ্ড বেয়ে নেমে গেল শীতল শিহরণ।

দিন কয়েক পর। কুড়াল দিয়ে লাকড়ি ফাড়তে ফাড়তে ভাবছে কিশোর-এই একটি কাজ অন্তত জানোয়ারের সাহায্য ছাড়া করা যায়। মাথার ওপর কুড়াল তুলে ঘুরিয়ে কোপ মারল আবার লাকড়ির গায়ে। কাঠের টুকরো ছড়িয়ে পড়তে লাগল চারদিকে। একপাশে জমে উঠছে লাকড়ির স্তূপ। লক্ষই নেই সেদিকে। তার মন জুড়ে রয়েছে অচষা জমিটা।

পর পর কয়েকদিন খচ্চরটাকে দিয়ে হাল টানানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে সে। গ্যাট হয়ে থাকে। কোনমতেই ওটাকে দিয়ে কাজ করাতে পারে না। এগোতেই চায় না। প্রতিরাতে যখন বিছানায় এসে গড়িয়ে পড়ে কিশোর, সারা গায়ে ব্যথা, ক্লান্তিতে ভেঙে আসে, তখনও ঘুম আসতে চায় না তার। গ্যারিবাল্ডের মুখটা কুৎসিত, বিকৃত হয়ে চোখের সামনে ভাসতে থাকে। সেই যে পেটের মধ্যে খামচি দিয়ে ধরে, আর যেতে চায় না।

আজ আসেনি গ্যারিবাল্ড। কাল আসবে। কিংবা পরশু দিন। আসবেই সে, জানে কিশোর। সামান্য যে কটা টাকা আছে আর, তা দিয়ে গ্যারিবাল্ডের ঋণ শোধ হবে না। বাড়িটা কেড়ে নেবে গ্যারিবাল্ড।

ছেলেমেয়ে দুটোকে নিয়ে তখন কোথায় যাবে? কি করবে?

কাফেলার কথাটা প্রথমে পছন্দ হয়নি তার। কিন্তু এখন যতই ভাবছে, ততই মনে হচ্ছে সে-ই ভাল। চলেই যাবে। আর কোন উপায়ও নেই। এ শহরে কেউ কাজ দেবে না তাকে। খাবার দেবে না! তার চেয়ে মিছিলে যোগ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করাই উচিত। কি করে এল সে, সেই রহস্যের সমাধানের চেয়ে বেঁচে থাকার চিন্তা করা দরকার আগে।

কুপিয়েই চলেছে কিশোর। কুপিয়েই চলেছে। তার আশঙ্কাটা কোনমতেই প্রকাশ করতে পারে না সিসি আর হেনরির কাছে। মুখ ফুটে বলতে পারে না যে কোন সময় এসে ওদেরকে বাড়ি থেকে বের করে দেবে গ্যারিবাল্ড। এতিমের মিছিলে ছাড়া তখন আর কোথাও ঠাই হবে না ওদের...

ঘোড়ার খুরের শব্দে ভাবনার সুতোটা ছিঁড়ে গেল তার। কুড়ালটা মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ফিরে তাকাল। ওদের পড়শী। আরনি হুফ। খোলা মাঠের ওপর দিয়ে

ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে। পাশাপাশিই থাকে, কিন্তু দেখা-সাক্ষাৎ খুব একটা হয় না। আরনির ছুটে আসার ভঙ্গিতে অশনি-সঙ্কেত দেখতে পেল কিশোর। পেটের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠল। ইদানীং দুঃসংবাদের আশঙ্কা দেখলেই এমন হয় তার। হেঁটে গেল সামনের বারান্দার দিকে।

সিঁড়িতে বসে আছে হেনরি। কাঠের একটা খেলনা, ঘোড়ার পা ছুটে গেছে, কোনমতেই লাগাতে পারছে না। লাগিয়ে দিল কিশোর। মুখ তুলে তার দিকে তাকিয়ে হাসল হেনরি।

কি হয়েছিল ঘোড়াটার? জিজ্ঞেস করল কিশোর।

হাসিটা মুছে গেল হেনরির মুখ থেকে। কথা বলে জবাব দিতে না পারার দুঃখেই যেন জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাতে লাগল।

ওর চুলে আঙুল বুলিয়ে দিল কিশোর। থাক, হেনরি। একদিন তুমি আবার কথা বলতে পারবে।

লাগাম টেনে ঘোড়া থামাল আরনি। মুখ তুলে তাকাল কিশোর। মাটিতে পা ঠুকতে ঠুকতে মৃদু ডাক ছাড়ল ঘোড়াটা।

হাল্লো, আরনি, স্বাগত জানাল কিশোর। কেমন আছেন?

ভাল না, কিশোর। তোমাকে সাবধান করতে এলাম। কি হয়েছে? বুকের মধ্যে কাপুনি উঠে গেল কিশোরের।

অদ্ভুত এক রোগ। গরুর। পাগল করে দিচ্ছে। জানোয়ারগুলোকে। গতকাল ফ্রেঞ্চরা ওদের ছয়টা গরুকে গুলি করে মারতে বাধ্য হয়েছে। আমরা মেরেছি আজকে তিনটাকে।

বলেন কি!

হ্যাঁ, তাই।

কিন্তু আমাদেরগুলোর তো এখনও কিছু হতে দেখলাম না, বলে বারান্দা থেকে নামল কিশোর। অসুস্থ যে সেটা কিভাবে বোঝা যাবে?

ঘোড়া থেকে নামল আরনি। চলো, তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি।

বাড়ির পেছনে আরনিকে নিয়ে এল কিশোর। পায়ের শব্দে মুখ। ফিরিয়ে দেখল হেনরিও এসেছে পেছন পেছন। তার দিকে তাকিয়ে হাসল কিশোর।

আমাদের তো আছেই মাত্র কটা গরু, কিশোর বলল। ওখানটায় ছেড়ে রেখেছি চরে খাবার জন্যে। গোয়ালে আর নিই না।

নিচু হয়ে একটা গরুর শিং চেপে ধরল আরনি। মাথা ঝাড়া দিয়ে ছাড়ানোর চেষ্টা করতে লাগল গরুটা। ডাকতে শুরু করল। কিন্তু শক্ত করে ধরে রাখল আরনি। একবার এপাশে, একবার ওপাশে কাত করে গরুর মুখটা দেখল।

কি দেখছেন? জানতে চাইল কিশোর। হাঁটু মুড়ে বসেছে গরুটার মুখের কাছে। তার পাশে বসে হেনরিও তাকিয়ে আছে কৌতূহলী চোখে।

অসুস্থ হলে নাক দিয়ে সবুজ গাজলা বেরোয়, আরনি বলল। তারপর লাল হয়ে যায়। যন্ত্রণায় পাগল হয়ে ওঠে গরুগুলো।

খুব খারাপ লোগ মনে হচ্ছে, কিশোর বলল।

খারাপ না হলে কি আর নিজের গরু গুলি করে মারতে হয়। এ রকম রোগের কথা কেউ কখনও শোনেনি। গায়ের লোকে ভাবছে, অশুভ কোন কিছুর ছায়া পড়েছে গাঁয়ে। কিশোরের দিকে তাকাল আরনি, তোমাদের গরুগুলো তো ভালই আছে দেখছি।

এখনও আছে। হতে কতক্ষণ। ভালমত খেয়াল রাখতে হবে। একটা গরু খোয়ালেও মস্ত ক্ষতি হয়ে যাবে আমাদের।

ফিরে যাওয়ার জন্যে ঘুরতে গিয়েই বরফের মত জমে গেল যেন আরনি। আতঙ্কে ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে চোখ।

কি দেখে এমন হলো আরনির দেখার জন্যে তাকাল কিশোর। পেছনের আঙিনায় একটা নেকড়েকে মুখে তুলে মাংস খাইয়ে দিচ্ছে সিসি।

অস্ফুট একটা শব্দ করে পিছিয়ে গেল আরনি। সিসি, সাবধান! ওটা নেকড়ে! কুকুর নয়! হেনরিকে দেখিয়ে কিশোরকে বলল, বাচ্চাটাকে ঘরে ঢোকাও। বন্দুক নিয়ে এসো।

ও কিছু না। ভয় পাবেন না, আরনিকে আশ্বস্ত করতে চাইল কিশোর। জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে সহজেই খাতির করে ফেলতে পারে সিসি। নেকড়েটা ওর কিছু করবে না।

কিন্তু শঙ্কামুক্ত হতে পারল না আরনি। কিন্তু ওটা নেকড়ে। গত বছর আমাদের অনেকগুলো গরু-ছাগল মেরে ফেলেছিল নেকড়েতে...আমি...আমি যাই...

দৌড়ে আঙিনা পার হয়ে গেল আরনি। মিনিটখানেক পরেই ওর ঘোড়ার ছুটন্ত পদশব্দ কানে এল কিশোরের। গরুগুলো বাবা করে হাঁক ছাড়ল কয়েকটা। তারপর নাক ঝাড়তে লাগল।

উঠে এসে একটা গরুর কপালে হাত রাখল সিসি। লম্বা জিভ বের করে ওর কনুই চেটে দিল গরুটা।

আরনি এসেছিল কেন? জিজ্ঞেস করল সিসি।

গরুর নাকি কি এক আজব রোগ হচ্ছে, কিশোর বলল।

মুখটা উঁচু করে ধরল সিসি। বাধা দিল না গরুটা। আরনি ধরাতে যেমন করেছিল, তার কিছুই করল না, চুপচাপ দেখতে দিল সিসিকে।

নাহ, আমাদেরটা সুস্থই আছে, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল সিসি। জন্তু-জানোয়ারের দুঃখ-যন্ত্রণা ওদের মত করেই বুঝতে পারে।
আরনিও বলছিল ভালই আছে, কিশোর বলল। কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারছিলাম না। তুমি যখন বলছ কিছু হয়নি, তারমানে সত্যি হয়নি, এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হলাম।
ও ভাল থাকবে, গরুটার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল সিসি। আমাদের একটা গরুরও কিছু হবে না।
না হলেই ভাল। এখন একটা গরু খোয়ানো মানে আমাদের বিরাট ক্ষতি। পাড়া-পড়শীদের গরুগুলোকে যে ভাবে গুলি করে মারতে হচ্ছে...
তার জন্যে কি দুঃখ হচ্ছে তোমার? প্রচণ্ড রাগ ঝিলিক দিয়ে উঠল সিসির চোখে। মরুক না! সব মরে সাফ হোক। শয়তানদের!
কি বলছ তুমি, সিসি!
ঠিকই বলছি। যেমন পাজী, ওদের শাস্তি হওয়াই উচিত। ওরা বলে আমি নাকি ডাইনী!
সেই শনিবারে হেনরি আর সিসিকে নিয়ে শহরে গেল কিশোর, দোকান থেকে জিনিস কিনে আনতে। সপ্তাহের এ দিনটিতে এলাকার সমস্ত চাষী বাজার করতে আসে। লোকে গমগম করে শহরটা।
কিন্তু সে দিন লোকের ভিড় দেখা গেল না মোটেও। কাঠের সাইডওয়াক ধরে হাতে গোণা কয়েকজন লোক হেঁটে যাচ্ছে। কেমন ভুতুড়ে নিস্তব্ধতা। পুরো শহরই যেন শোক পালনে রত।
রনসনস জেনারেল স্টোরের দরজা ঠেলে খুলল কিশোর। পাল্লার ওপরে লাগানো ঘণ্টা বেজে উঠে জানান দিল দোকানে খরিদ্দার ঢুকেছে। শব্দটা অনেক বেশি জোরাল মনে হলো কিশোরের কাছে। কারণ ভেতরে খরিদ্দারের ভিড় নেই, কোলাহল নেই। জুতোর শব্দ তুলে লোহাকাঠের পাটাতনের ওপর দিয়ে হেঁটে গেল কিশোর। তাকে অনুসরণ করল সিসি আর হেনরি।
স্টোররুমের পর্দা সরিয়ে দোকানে ঢুকলেন মিস্টার রনসন। হাসলেন। গুড ডে, কিশোর। তারপর, কেমন আছ তোমরা?
আছি ভালই, জবাব দিল কিশোর। শহরটা এমন নীরব কেন?
সারা হপ্তা ধরেই নীরব, রনসন জানালেন। গরুর রোগ নিয়ে মহা দুশ্চিন্তায় আছে লোকে। রোগ সারানোর সব রকম চেষ্টা করছে। কোন লাভ হচ্ছে না। তুমি কটাকে গুলি করলে?
একটাও না।
চোখ বড় বড় হয়ে গেল মিস্টার রনসনের। বলো কি! কি খাইয়ে রোগ সারালে?
আমাদের গরুর রোগই হয়নি।

সন্দেহ জাগল মিস্টার রনসনের চোখে। কেন হচ্ছে না বুঝতে পারছ কিছু?
কেন আবার! আমাদের ভাগ্য ভাল।
সিসির দিকে দৃষ্টি সরে গেল মিস্টার রনসনের। হবে হয়তো।...ভাগ্য ভাল, নাকি অন্য কিছু?
অন্য আর কি হবে?
হুঁ! আনমনে মাথা ঝাঁকালেন মিস্টার রনসন। অবস্থাটা এমনই এখানকার, কারোরই মন-মেজাজ ভাল নেই। তা কি লাগবে তোমাদের?
কিছু চিনি আর ময়দা, কিশোর বলল। আর সামান্য টিনের খাবার।
পকেট থেকে তার শেষ সম্বল নোটের তাড়াটা বের করে আনল কিশোর। এক হাজার পেসো কাউন্টারে রেখে ঠেলে দিয়ে বলল, এতে যা হয়, দিন।
দাঁড়াও, বাক্সে ভরে দিচ্ছি।
কাউন্টারের ওপাশে নিচু হয়েই স্থির হয়ে গেলেন তিনি। কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে বললেন, এই, তোমরা সরে যাও ওখান থেকে!
কাউন্টারের ওপর দিয়ে গলা বাড়িয়ে দিল সিসি। দেখল, একটা বাক্স উঁচু করে ধরে রেখেছেন মিস্টার রনসন।
কি হয়েছে, মিস্টার রনসন? জিজ্ঞেস করল সে।
সাপ, ফিসফিস করে জবাব দিলেন মিস্টার রনসন। এত বড় সাপ জীবনে দেখিনি। জলদি গিয়ে দেখো বাইরে কার কাছে বন্দুক আছে।
কিশোর বাধা দেয়ার আগেই কাউন্টার ঘুরে অন্যপাশে চলে গেল সিসি। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল সাপটার কাছে। ঘাবড়াবেন না, মিস্টার রনসন। ও আপনাকে কিছু করবে না।
আস্তে হাতটা বাড়িয়ে দিল সিসি। ভয়ে কাঠ হয়ে গিয়ে কিশোর দেখল, বিশাল সবুজ সাপটা ধীরে ধীরে সিসির হাত বেয়ে উঠে আসছে কাঁধের দিকে। ওর গলায় পেঁচিয়ে গেল মালার মত। শয়তানি ভরা কালো চোখের চাহনি সিসির ওপর স্থির। চেরা মাথাওয়ালা লাল জিভটা ঘন ঘন বেরিয়ে আসছে মুখের ভেতর থেকে।
হ্যাচকা টানে হেনরিকে নিজের পেছনে নিয়ে গিয়ে আড়াল করে রাখল কিশোর। সাপটার বাকা বড় বড় বিষদাঁতের দিকে তাকিয়ে শুকিয়ে গেল গলা। ঢোক গিলল বড় করে।
সাপটার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল সিসি। ফোঁস ফোঁস করছে ওটা। কিশোরের চোখে চোখ রাখল সিসি। ভয় নেই, কিশোরভাই, ওটা আমাকে কিছু করবে না। বাড়ির কাছে গিয়ে বনে ছেড়ে দেব।
কাউন্টারের ওপাশ থেকে বেরিয়ে এল সিসি। সাপের লম্বা লেজটা ঝুলে আছে ওর পিঠের ওপর। হাত বাড়িয়ে লেজের ডগাটা ছুঁয়ে দেখল হেনরি। কিশোর ওসব

কিছুই করতে পারল না। ভয়ে কেঁপে উঠল সে। জানে, বনের জানোয়ারের সঙ্গে ভাব করতে এক মুহূর্তও লাগে না সিসির। কিন্তু তাই বলে এতবড় একটা বিষাক্ত সাপকে গলায় পেঁচিয়ে রাখা!

পাথরের মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন মিস্টার রনসন। কাঁপছেন থরথর করে। দোকান বন্ধ করে দিচ্ছি আমি, কম্পিত স্বরে বললেন।

আমাদের জিনিসগুলো? কিশোর বলল।

আরেক দিন এসে নিও।

কাউন্টারে রাখা মুদ্রাটা হাত দিয়ে টেনে সরিয়ে আনল কিশোর। তুলে নিয়ে পকেটে ভরল। হতাশ কণ্ঠে বলল, সিসি। হেনরি। চলো, যাই।

দোকান থেকে বেরিয়ে এল ওরা। দড়াম করে মিস্টার রনসনকে পাল্লা লাগাতে শুনল। তালা আটকে দিলেন তিনি।

রাস্তা ধরে হেঁটে যাওয়ার সময়, পথচারীদেরকে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখল কিশোর। সবার চোখ সিসির গলার সাপটার দিকে। একটা বাড়ির জানালা দিয়ে তাকিয়ে ছিল এক মহিলা। ঝট করে পর্দা টেনে দিল। দেখেও দেখল না সিসি। আপনমনে হেঁটে চলল।

হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল কিশোর। যত তাড়াতাড়ি বনের কাছে পৌঁছানো যাবে, সাপটাকে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারবে।

*

সেদিন রাতে। লাফ দিয়ে বিছানায় উঠে বসল কিশোর। দ্বিধায় পড়ে গেছে। ঘুম ভাঙাল কিসে?

শব্দটা কানে এল আবার। একজন মানুষের কণ্ঠ,। খসখসে। ক্রুদ্ধ।

একজন নয়। আরও মানুষের কথা বলার শব্দ কানে আসতে লাগল।

ঘোড়ার খুরের ভোঁতা শব্দ শোনা গেল। বুকের মধ্যে হাতুড়ির বাড়ি পড়া শুরু হলো যেন তার।

জোরাল হতে লাগল খুরের শব্দ।

এগিয়ে আসছে।

তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে নেমে শার্টটা গায়ে দিল। ওপরে চাপাল ওভারঅল।

কারা আসছে? কি চায়?

জানালার কাছে দৌড়ে এল সে। বাইরে ঘন কালো রাতের অন্ধকার। ঘোড়ার তীক্ষ্ণ ডাক কানে এল। সেই সঙ্গে মানুষের রাগত চিৎকার।

দেখতে পেল লোকগুলোকে। বাড়ি ঘিরে চক্কর দিচ্ছে। শিকার কোণঠাসা করা নেকড়ের পালের মত।

জিভ শুকিয়ে সিরিশ কাগজের মত হয়ে গেল কিশোরের। চাদিটা দপদপ করতে লাগল। নিচে নামার সিঁড়ির দিকে দৌড় দিল সে।
সামনের পারলারের একধারে দেয়ালে ঝোলানো লং হার্টের রাইফেলটা হুক থেকে খুলে নিল। ধাক্কা দিয়ে খুলে ফেলল দরজা।
সিঁড়ি বেয়ে ছুটে নেমে এল নিচের বারান্দায়। দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে দেখার চেষ্টা করল অন্ধকারে। অস্পষ্ট দেখতে পেল রাস্তা দিয়ে ছুটে চলে যাচ্ছে কয়েকটা বড় বড় ছায়া। ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের শব্দটা কেবল স্পষ্ট।
বারান্দা থেকে নেমে এল কিশোর। চাঁদের ওপর থেকে সরে গেল কালো মেঘের ঢাকনা। বড় একটা জিনিসকে পড়ে থাকতে দেখল আঙিনায়।
দৌড়ে এল কাছে। প্রচুর রক্তের মাঝখানে বেকায়দা ভঙ্গিতে পড়ে আছে একটা গরু। একরাশ অভিযোগ নিয়ে যেন কিশোরের দিকে স্থির তাকিয়ে রয়েছে নিষ্প্রাণ চোখ দুটো।
চিৎকার করে উঠল কিশোর। রাগ যেন টগবগ করে ফুটতে লাগল মগজে। খুনীকে এখন সামনে পেলে নির্দ্বিধায় গুলি করে বসত। গরুটার লম্বা লাল জিভ বেরিয়ে এসেছে মুখের ভেতর থেকে। গলা থেকে চুঁইয়ে পড়ছে এখনও রক্ত।
মর্মান্তিক দৃশ্যটা সইতে না পেরে যাওয়ার জন্যে ঘুরে দাঁড়াতে গেল কিশোর। গরুর মুখের মধ্যে একটা জিনিস দৃষ্টি আকর্ষণ করল তার। একটা কাগজ দলা পাকিয়ে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। মুখের ফাঁকে।
গরুর মুখে কাগজ কেন? হাত বাড়াল কিশোর। লালা আর রক্ত মাখা জিভটায় আঙুল লাগতেই ঝটকা দিয়ে সরিয়ে আনল। অনুভূতিটা ভয়ঙ্কর। সাবধানে আবার হাত বাড়িয়ে খুলে আনল কাগজটা। চাঁদের আলোয় খুলে দেখল লেখা রয়েছে:
আমাদের গরু মেরেছ, তোমাদের গরু মারলাম।
মেয়েটাকে ঠেকাও।
তুমি না পারলে আমরা ঠেকাব।
বোকা হয়ে লেখাটার দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। ওরা ভাবছে, গরুর মড়ক লাগার পেছনে সিসির হাত আছে। কি অসম্ভব ভাবনা!
মরা গরুটার দিকে তাকাল সে। গরুটাকে জবাই করে রেখে গেছে ওরা। সিসিকেও কি খুন করতে আসবে!
দ্রুত ঘরের দিকে ফিরল কিশোর। সিসির কিছু হয়েছে কিনা দেখার জন্যে। সামনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে সে। সাদা লম্বা নাইটগাউনের ঝুল উড়ছে বাতাসে। বেণী খুলে ফেলায় কালো চুলের বোঝা এলোমেলো ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে সারা কাঁধে। সুন্দরী, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। চাঁদের আলোয় বাতাসে দুলন্ত গাউনটাকে অদ্ভুত লাগছে। মুখের ভঙ্গিটাও যেন কেমন।
বোনের পাশে দাঁড়ানো হেনরি। দুই হাত আড়াআড়ি রাখা বুকের ওপর। হেনরির সবুজ চোখ বিস্ফারিত। ঠোঁট কাঁপছে। ভাইয়ের কাঁধে একটা হাত রেখে তাকে সাহস জোগানোর চেষ্টা করছে সিসি।
আর কোন ভয় নেই, অন্যদিকে তাকিয়ে বলল কিশোর। ওরা চলে গেছে। সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠল সে। বন্দুকটায় হাত বোলাল। আবার এলে সোজা গুলি মেরে দেব।
কাগজটায় কি লেখা? জানতে চাইল সিসি।
ও কিছু না... দেখলে ঘাবড়ে যাবে ভেবে দেখাতে চাইল না। কিশোর। তাড়াতাড়ি কাগজটা পকেটে রেখে দিতে গেল।
কিন্তু কাগজটা কেড়ে নিল সিসি। পড়তে পড়তে চোয়াল শক্ত হয়ে গেল।
কি করে ভাবতে পারছে ওরা! কেঁদে ফেলল সিসি। কাগজটা দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল উঠানে।
কিশোরের দিকে মুখ তুলে তাকাল সে। চাঁদের আলোতেও ওর চোখের রাগ স্পষ্ট দেখতে পেল কিশোর।
ওরা ভাবছে আমি অশুভ কিছু! চিৎকার করে উঠল সিসি। জাহান্নামে যাক সব! মরুক! আমি ওদের ঘৃণা করি!
*
দুদিন পর। অনিচ্ছুক খচ্চরটার পেছন পেছন ভারী হাল ঠেলে নিয়ে এগোচ্ছে কিশোর, এই সময় দেখতে পেল গ্যারিবাল্ডকে। মুখটাকে আষাঢ়ের মেঘের মত গোমড়া বানিয়ে ভারী পায়ে ইটে আসছে খেতের ওপর দিয়ে।
খচ্চরটাকে থামাল কিশোর। পকেট থেকে রুমাল বের করে। ভুরুর ওপরের ঘাম মুছল।
কাছে এসে দাঁড়াল গ্যারিবাল্ড। পেছনে ঠেলে দিল হ্যাটটা। ভূমিকার মধ্যে না গিয়ে সরাসরি বলল, কিশোর, আগেই সাবধান করা হয়েছিল তোমাকে। সাফ কথা বলো, আজকের মধ্যে টাকা দিতে পারবে কিনা?
ঢোক গিলল কিশোর। আমার কাছে মাত্র বিশ হাজার পেসো আছে। ফসল না উঠলে কোনমতেই আর একটা পয়সাও জোগাড় করতে পারব না।
কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করল গ্যারিবাল্ড। চোখ নামিয়ে বলল, বেশ, ওটা আমি নিয়ে যাচ্ছি। আপাতত বাড়ি থেকে আর বিদেয় করলাম না তোমাদের।
পকেট থেকে নোটগুলো বের করল কিশোর। ফেলে দিল। গ্যারিবাল্ডের ছড়ানো তালুতে। ভারী চাপ অনুভব করছে বুকের মধ্যে। কিছুই রইল না আর তার কাছে।

তিনজন মানুষের কি করে চলবে! ভয়ানক দুর্ভাবনাটা জোর করে তাড়াল মাথা থেকে।
নোটগুলোর ওপর শকুনের নখের মত বাঁকা হয়ে চেপে বসল গ্যারিবাল্ডের আঙুল। হাতটা ঢুকে গেল কোটের পকেটে। ভঙ্গি দেখে প্রচণ্ড রাগ যেন দলা বেঁধে উঠে আসতে শুরু করল কিশোরের গলা বেয়ে।
তোমাদের জানোয়ারগুলো সব সুস্থ আছে? জিজ্ঞেস করল গ্যারিবাল্ড।
আছে।
ফ্রেঞ্চদের ভাগ্য অতটা ভাল নয়। গাঁয়ের সবাই অবাক। সবার গরু মরছে, তোমাদের মরে না কেন?
জানি। রাতের বেলা চোরের মত এসেছিল ওরা। সিসিকে খুন করার হুমকি দিয়ে গেছে।
এ ভাবে গরু যদি মরতেই থাকে, সিসিকে সত্যিই খুন করবে। ওরা; কেউ ঠেকাতে পারবে না।
কিন্তু সিসি কি ওদের গরু মারছে নাকি? রাগটা দমন করা কঠিন হয়ে যাচ্ছে কিশোরের পক্ষে। গরু মরছে রোগে। দোষটা অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে সান্ত্বনা পেতে চাইছে হদ্দ বোকাগুলো।
হ্যাটটা টেনে সোজা করে বসাল গ্যারিবাল্ড। তোমার কথা আমি বিশ্বাস করলেও, কিশোর, গায়ের অন্য কেউ করবে না।
কিশোরের যখন এই দুর্গতি, রিটার তখন অন্য ঘটনা। রবিনদের লিভিং-রুমে ডায়েরী পড়ে সেই ঘটনার কথাই জানছে রবিন। গভীর আগ্রহে শুনছে মুসা আর জিনা।
পোশাকের দোকানটাতে নিয়ে যাওয়া হলো আমাকে-রিটা লিখেছে।
জ্বলন্ত চোখে আমার দিকে তাকাল ক্লডিয়া। চুরি করে পালাচ্ছিলে, তাই না? মজা টের পাবে। চোরের জন্যে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা আছে আমাদের।
কি বলছেন? চমকে গেলাম। চোর হতে যাব কেন আমি?
চোর নও তো কি? আঙুল তুলল ক্লডিয়া। তোমার গায়ে। এখনও পরাই আছে ব্লাউজটা। নিয়ে পালাচ্ছিলে, আবার বলছ চোর নও!
ব্লাউজটার দিকে তাকালাম। ধীরে ধীরে মাথায় ঢুকল ঘটনাটা কি ঘটেছে। ব্লাউজ সহ দোকানের বাইরে ধরেছে আমাকে ওরা। না বলে জিনিস নিয়ে বেরিয়েছি। চুরিই তো। কিন্তু আসলে তো আমি চুরি করিনি। বোঝাতে গেলাম, দেখুন... বলেই চুপ হয়ে গেলাম। কি বলব? সময় পেরিয়ে অন্য সময়ে চলে গিয়েছিলাম! বিশ্বাস করবে?
চুপ হয়ে গেলে কেন? ধমকে উঠল ক্লডিয়া।

দেখুন, জিনিসটা কিনতেই তো চেয়েছিলাম আমি, জবাব দিলাম। নাহয় বাইরে থেকেই ধরে আনা হয়েছে আমাকে। তাতে কি হয়েছে? দাম দিয়ে দিচ্ছি। জিনিসটা আমার হয়ে গেল। ব্যস, ঝামেলা খতম।
উঁহু, তা হবে না, মাথা নাড়ল ক্লডিয়া! সবাই সুযোগ পেয়ে যাবে তাহলে। পকেটে টাকা নিয়ে এসে জিনিস চুরি করবে। ধরা পড়লে বলবে, দাম দিয়ে দিচ্ছি। একটা উদাহরণ তৈরি করে রাখা দরকার। দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। চুরি করার আগে যাতে দশবার ভাবে কেউ…
ভাল করে তাকিয়ে দেখুন তো, আমাকে কি চোর বলে মনে হচ্ছে?
ভদ্র চেহারার আড়ালেই চুরি করা সহজ, কঠোর জবাব দিল ক্লডিয়া। প্রহরীদের বলল, এই, সিকিউরিটি অফিসে নিয়ে যাও একে।
*
জঘন্য কথা বলল আমাকে সিকিউরিটি-ইন-চার্জ। বার বার চোর বলে অপমান করল। বাবাকে খবর দিল।
আমার বাবা একজন সম্মানিত লোক, ভাল মানুষ, যে কেউ পছন্দ করবে তাকে। জন হপকিনস ইউনিভার্সিটি থেকে সাইকোলজিতে ডিগ্রি নিয়ে এখন মানসিক রোগের চিকিৎসা করেন। টাকার সমস্যা নেই। তার মেয়ে হয়ে আমি এ ধরনের অপরাধ করতেই পারি না। এ সব বলে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করলাম ইন-চার্জকে। বুঝল তো না-ই, বরং ধমক দিল। আমার বাবার নাম নিয়ে ব্যঙ্গ করে বলল, মানুষের রোগ সারাতে যাওয়ার। আগে নিজের মেয়ের চিকিৎসা দরকার ছিল।
এত রাগ লাগল, কোন কথাই বলতে গেলাম না আর। একেবারে চুপ মেরে গেলাম। এদের সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই। বাবার আসার অপেক্ষায় রইলাম।
বাবা এল। নির্বিকার ভঙ্গিতে সিকিউরিটি-ইন-চার্জের সব কথা শুনল। কোন প্রতিবাদ করল না। আমার পক্ষে কোন সাফাই গাইতে গেল না। ইন-চার্জের কথা শেষ হলে শান্ত ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল, কি করতে চান এখন? ওর বিরুদ্ধে কেস করবেন? আমার উকিলকে ফোন করব?
না, এতটা নিচে নামব না আমরা, ইন-চার্জ বলল। অনেক কিছুই করতে পারতাম, কিন্তু আপনি সম্মানী লোক বলে ছেড়ে দিচ্ছি। পুলিশকে আর ডাকাডাকি করলাম না। বাবার দিকে চেয়ে কঠিন হাসি হাসল লোকটা। তবে, এ ধরনের কাজ করতে যাতে আর কেউ সাহস না পায়, সে-জন্যে একটা ব্যবস্থা করে রাখা দরকার।
*

আমার কয়েকটা ক্লোজআপ ছবি তুলে রেখে, বেশ কিছু সারগর্ভ উপদেশ দিয়ে বাবা সহ আমাকে বিদায় দিল সিকিউরিটি-ইন চার্জ।
ছবি তোলায় আতঙ্কিত বোধ করলাম। কি করবে? পোস্টারে আমার ছবি ছেপে চোর আখ্যায়িত করে লাগিয়ে দেবে মলের দেয়ালে দেয়ালে? অন্য দোকানদারদের সাবধান করে দেবে?
সর্বনাশ হবে! এই মলে ঢোকার এখানেই ইতি। রকি বীচেও টিকতে পারব কিনা সন্দেহ। স্কুলের সব ছেলেমেয়েরা জেনে যাবে, শিক্ষকরা জানবে, পাড়া-পড়শীরা জানবে; হাত তুলে দেখাবে আর হাসাহাসি করবে-ওই যে চোরনি রিটা যায়! কোনমতেই সহ্য করতে পারব না। এতক্ষণ এত গালাগাল অপমানেও যা হয়নি, তা-ই হলো, চোখ ফেটে পানি এল আমার। যে অপরাধটা আমি করিনি তার জন্যে এতবড় শাস্তি আমাকে না দিলেও পারত ওরা।
আমার হাত ধরে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল বাবা। আকাশ কালো মেঘে ঢেকে গেছে। পার্কিং লটের চত্বর ধরে গাড়ির দিকে। এগোলাম। কিছুদূর যেতে না যেতেই বিকট শব্দে বাজ পড়ল। গাড়িতে পৌঁছতে পৌঁছতে ভিজে চুপচুপে হয়ে গেলাম।
গাড়ি স্টার্ট দিচ্ছে বাবা। এতক্ষণে কথা বলার সুযোগ পেলাম, বাবা, ব্লাউজটা আমি চুরি করিনি।
থাক, ও নিয়ে আর আলোচনার দরকার নেই। দোষটা আমারই। বাবার দায়িত্ব ঠিকমত পালন করিনি আমি।
বাবা, সত্যি বলছি, ওটা আমি চুরি করিনি! বিশ্বাস করো!
যা হবার হয়ে গেছে। এখন থেকে আরও বেশি সময় দেব তোমাকে। আমার হাতে চাপ দিল বাবা।
বাবা, তুমি আমার কথা শুনছ না। আমি বলছি, আমি চুরি করিনি। সব দেখেশুনে চুরিই মনে হতে পারে, কিন্তু যা ঘটেছে সেটা সাংঘাতিক।
পার্কিং লট থেকে বেরিয়ে নীরবে কয়েক মিনিট গাড়ি চালাল বাবা। ভীষণ অস্বস্তিতে ভুগতে থাকলাম আমি। অবশেষে বাবা বলল, বেশ, বলো, কি ঘটেছে। আমি শুনছি।
ভেজা চুলে হাত বোলালাম। ঠোঁট কামড়ালাম। বাবাকে সব কথা বলি আমি, কোন কিছু গোপন করি না। বাবা আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু। আমাকে বিশ্বাস করে। কিন্তু আজকের ঘটনাটা। কি করবে?
বাবা, যে কথাটা আমি বলব এখন, কথা দিতে হবে চুপ করে। শুনবে। কথার মাঝখানে কোন মন্তব্য করবে না। কোন পরামর্শ দেবে না।
ঠিক আছে, কথা দিলাম।

ঘটনাটা হলো.. ঢোক গিলোম। দ্বিধা যাচ্ছে না আমার। শেষমেষ বলেই ফেললাম, বাবা, আমি সময় পেরিয়ে চলে গিয়েছিলাম।
মাথা ঝাঁকাল বাবা, বলো, আমি শুনছি।
বাবা, ব্লাউজটা পরে দেখার জন্যে চেঞ্জিং রুমে ঢুকেছিলাম। হঠাৎ আলোগুলো মিটমিট শুরু করল। বিচিত্র শব্দ হতে লাগল। আবার আলো জ্বললে যখন বেরিয়ে এলাম, আমি এক ভিন্ন জগতে চলে গিয়েছি। বাবা, সেটা উনিশশো সাতাশি সাল।
বাবাকে বিশ্বাস করতে বলছি, অথচ তখনও আমার নিজেরই বিশ্বাস হচ্ছে না; সত্যি সত্যি আমি অন্য সময়ে চলে গিয়েছিলাম।
উনিশশো সাতাশি? তেরো বছর আগে?
হ্যাঁ, বাবা। আমার কথা বিশ্বাস করছে কিনা বুঝতে পারলাম না। রাস্তার মোড়ের বিখ্যাত সেই অ্যামোজ কুকিস স্ট্যান্ডটা, যেটাতে প্রায়ই আমরা কুকিস কিনতে যেতাম…
এক সেকেন্ড, রাস্তা থেকে মুহূর্তের জন্যেও নজর সরাচ্ছে না। বাবা। মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। বাতাসে শুকনো-শ্যাওলা-ভেজা গন্ধের মত গন্ধ, গরমকালে বৃষ্টির সময় যা হয়। বেশি স্পীড়ে চালানোর সময় কথা বললে অ্যাক্সিডেন্ট করতে পারে, তাই গতি কমাল বাবা। হ্যাঁ, এবার বোঝার চেষ্টা করে দেখা যাক, এ ধরনের কল্পনা কেন করতে গেলে তুমি।
দমে গেলাম। অ, তারমানে তুমি আমার কথা বিশ্বাস করছ না! তুমি ভাবছ, মিথ্যে কথা বলছি!
আমি কি বলেছি, মিথ্যে বলছ? সত্যি কথাই বলছ তুমি, ডাক্তারী-কণ্ঠে বলল বাবা, ফোনে রোগীদের সঙ্গে এ ভঙ্গিতে কথা বলতে বহুবার শুনেছি। অনেক সময় কিছু কিছু ঘটনা একেবারে বাস্তব মনে হয়, কিন্তু আসলে সেগুলো বাস্তব নয়। মন আমাদের সঙ্গে চাতুরি করে। কল্পনা বাস্তবতাকে দাবিয়ে দেয়।
হা কপাল! বিড়বিড় করলাম। কেউ আমার কথা বুঝছে না, বিশ্বাস করছে না, এমনকি আমার সবচেয়ে বড় বন্ধুটিও নয়। কেউ না! কেউ না!
রিটা, বাবা জবাব দিল, সত্যিই বলেছ, আমি তোমার এত ঘনিষ্ঠ, এত কাছের মানুষ হয়েও পুরোপুরি বুঝতে পারিনি তোমাকে। কি করে বুঝব? আমি তো আর তোমার বয়েসী কিশোরী ছিলাম না কখনও। সেটা তোমার মা হলে পারত।… উনিশশো সাতাশি বললে না? এই সালটাই আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। তোমার মা মারা গিয়েছিল ওই বছর। আজকে তোমার জন্মদিন। এই দিনে মাকে তোমার খুব দেখতে ইচ্ছে করবে, এটাই স্বাভাবিক।

তারমানে, ধীরে ধীরে বললাম, তুমি বলতে চাও, মাকে দেখার ইচ্ছে আমার এতটাই বেড়ে গিয়েছিল, কোনভাবে সময়কে ডিঙিয়ে পেছনে চলে গিয়েছিলাম?
না, ঠিক তা নয়। তবে মাকে দেখতে এতই ইচ্ছে করছিল, তোমার মনে হয়েছে তোমার মায়ের বেঁচে থাকার সময়টায় চলে গেছ।
তারমানে এখনও তুমি আমার কথা বিশ্বাস করছ না! কান্না এসে যাচ্ছিল আমার, জোর করে ঠেকালাম। বাবার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে বাইরের দিকে তাকালাম। বড় বড় ফোঁটা ক্রমাগত আঘাত হানছে জানালার কাঁচে।
আমি বিশ্বাস করি বা না করি, রিটা, বাবা বলল, সত্যিই যদি তুমি পিছিয়ে চলে গিয়ে থাকো, সাংঘাতিক ভাগ্য বলতে হবে তোমার। কতবার আমি পিছিয়ে যেতে চেয়েছি সেই সময়টাতে…কিন্তু কখনও পারিনি।
হঠাৎ করেই বাবার জন্যে বড় মায়া লাগল। বেচারা! মাকে অসম্ভব ভালবাসত। মার কথা মনে হলে ভীষণ কষ্ট পায়। আস্তে করে হাত বাড়িয়ে তার কাঁধে রাখলাম। পাশে কাত হয়ে আমার মাথায় চুমু খেল বাবা।
ঘুরে পেছনে তাকালাম। পেছনের সীটে রাখা লাল কাগজে মোড়া একটা বড় বাক্স। ওটা আমার জন্মদিনের কেক, তাই না?
হ্যাঁ, জবাব দিল বাবা। মল থেকে যখন ফোন পেলাম, তখনই বুঝতে পারলাম তোমার মনের অবস্থা কি হবে। তোমাকে খুশি করার জন্যে কেকটা কিনে নিয়েছিলাম।
বললাম না, পৃথিবীতে আমার বাবা আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু!
বলে যে তোমাকে ধন্যবাদ দেব, বাবা, নাক টানলাম। ঠাণ্ডাটা ধরতে আরম্ভ করেছে মনে হয়। আমি সত্যিই এখন। খুশি।
বুনো অঞ্চলের ভেতর দিয়ে যাচ্ছি তখন। গাড়ির ছাতে তবলা বাজাচ্ছে বৃষ্টির ফোঁটা। কুয়াশা এত ঘন হয়ে গেছে, সামনে পনেরো ফুট দূরেও দৃষ্টি চলে না।
আর ঠিক এই সময় ঘটল অঘটনটা।
দম নেয়ার জন্যে থামল রবিন।
কিন্তু চুপ থাকতে দিল না তাকে মুসা আর জিনা।
থামলে কেন? চেঁচিয়ে উঠল মুসা। পড়ো পড়ো! তারপর?
অঘটনটা কি? জিনাও উত্তেজিত। পড়ো জলদি!
কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে রবিনের! হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে মুছে নিয়ে আবার পড়তে শুরু করল:
চলতে চলতে বন্ধ হয়ে গেল গাড়ির ইঞ্জিন। চুপ হয়ে গেল। রেডিও। বাতি নিভে গেল। যেন চলতে চলতে মরে গেল গাড়িটা।

কোনমতেই স্টার্ট করতে না পেরে বৃষ্টির মধ্যেই ছাতা আর টর্চ হাতে নেমে গেল বাবা। হুড তুলে খানিকক্ষণ ইঞ্জিনের এটা ওটা নাড়াচাড়া করল। চালু করতে পারল না।
ফিরে এসে ড্রাইভিং সীটে বসল বাবা। আশ্চর্য! মনে হচ্ছে কেউ যেন ব্যাটারির সমস্ত শক্তি শুষে নিয়েছে। অলটারনেটর ঠিক, কোন লীকটিক নেই...
বজ্রপাতের জন্যে নয় তো? জিজ্ঞেস করলাম।
হতে পারে...কিংবা ভিনগ্রহবাসীর মহাকাশযান, রসিকতা করল বাবা। ইদানীং রকি বীচের বাসিন্দারা কিভাবে ইউ এফ ও নিয়ে মেতে উঠেছে, জানা আছে তার।
দূর, ইউ এফ ও না ছাই। আকাশে তো কোন আলোই দেখছি না।...কি করব এখন?
কাছেই একটা গ্যাস স্টেশন আছে। মেকানিক আছে কিনা দেখতে পারি গিয়ে। তুমি গাড়ির মধ্যে বসে থাকো। গাড়ি পাহারা দাও। নেকড়েরা ঘিরে ধরলেও গাড়ি থেকে বেরোবে না।
এই শেষ কথাটাও বাবার রসিকতা। একটা সিনেমায় বনের মধ্যে গাড়ি খারাপ হয়ে যাওয়ায় ছবির বাবাকে বেরোতে হয়েছিল তার মেয়েকে রেখে। নেকড়েরা ঘিরে ধরেছিল গাড়িটা। ভয়ে গাড়ি থেকে বেরিয়ে ছুটে পালাতে চেয়েছিল মেয়েটা। মর্মান্তিক পরিণতি ঘটে তার।
কথাটা মনে করিয়ে বাবা বরং ভয় ধরিয়ে দিল আমার। বাইরের অবস্থাটা খুব খারাপ। চাঁদ নেই। ঘুটঘুঁটে অন্ধকার। গাড়ি খারাপ হয়েছে একেবারে নির্জন জায়গায়।
ছাতা আর টর্চ হাতে আবার বেরিয়ে গেল বাবা। ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে নেচে নেচে এগিয়ে যেতে দেখলাম টর্চের আলোটাকে। কমতে কমতে হঠাৎ মিলিয়ে গেল। বাবাকে গিলে নিল যেন প্রবল বৃষ্টিপাত আর ঘন কালো অন্ধকার।
একা বসে রইলাম গাড়ির মধ্যে।
তবলায় টোকার বিরাম নেই। গড়িয়ে গড়িয়ে আসতেই আছে কুয়াশা। পেঁজা তুলোর মত ঘিরে ফেলছে সব কিছুকে। বিদ্যুৎ নেই, উইশীল্ড ওয়াইপার চলতে পারছে না। সামনের জানালার বাইরেটাকে লাগছে একটা ভেজা ব্ল্যাকবোর্ডের মত।
নিজের অজান্তে গায়ে কাঁটা দিল। গাড়ির মধ্যে থাকাটা। নিরাপদ কিনা বুঝতে পারলাম না। এ সব নিয়ে যতই ভাবব, ভয়। বাড়তে থাকবে। তাই বর্তমানের ভাবনা মন থেকে ঝেড়ে দূর করে দিয়ে অন্য চিন্তায় মন দিলাম। সারাটা দিন যা যা ঘটেছে, বিশেষ করে মলে, সেটা নিয়ে ভাবতে লাগলাম। বাবা হয়তো ঠিকই বলেছে, কল্পনাতেই আমি সময় পেরিয়ে গিয়েছিলাম। একটা ঘোরের মধ্যে চেঞ্জিং

রুম থেকে বেরিয়ে দোকানের বইরে চলে গিয়েছিলাম। ক্লডিয়া অন্য কাজে ব্যস্ত ছিল বলে আমাকে দেখেনি।
কিন্তু কল্পনা কি এত বাস্তব হয়? নাকি মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল আমার? উল্টোপাল্টা, ভুলভাল সব দেখেছি! এমন একটা পর্যায়ে চলে গিয়েছিল মন, যেখানে কল্পনা আর বাস্তবের প্রভেদ বোঝা কঠিন ছিল।
পাগল হয়ে যাচ্ছি না তো?
অস্বস্তিভরে নড়েচড়ে বসতে গেলাম। সীট বেল্ট পরাই আছে। খুলতে যেতেই স্কার্টের পকেটে খসখস করে উঠল কিছু। একটা কাগজ। বিজ্ঞাপনের ছেলেটা দিয়েছিল।
এক সেকেন্ড! বিজ্ঞাপন!...এই তো প্রমাণ! এতক্ষণ মনে পড়েনি। আর কোন সন্দেহ নেই। কল্পনা নয়। সত্যি সত্যি সময় পেরিয়ে অতীতে চলে গিয়েছিলাম আমি।
পকেট থেকে কাগজটা বের করে পড়ার চেষ্টা করলাম। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। বিদ্যুৎ চমকাল। সবুজ রঙের কাগজ। আবার বিদ্যুৎ চমকানোর অপেক্ষায় রইলাম। যতবার চমকাল, একটু একটু করে পড়তে লাগলাম। দোকানটার গুণগান করেছে। ক্রিসমাসে কিছু জিমিস খুব সস্তায় পাওয়া যাবে, সেকথা লিখেছে। তবে আমার কথার সপক্ষে প্রমাণ করার মত তারিখ বা সন লেখা। নেই।
পেছনটা উল্টে দেখলাম। আকাশ চিরে দিল বিদ্যুতের নীল শিখা। গুড়গুড় শব্দ কেঁপে কেঁপে চলে গেল এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে। আমাকে অবাক করে দিয়ে স্পষ্ট যেন একটা পরিচিত হস্তাক্ষরে লেখা দেখতে পেলাম:
না, তুমি পাগল নও।
তবে মস্ত বিপদের মধ্যে রয়েছ।
কেকটা বের করে হাতে নিয়ে নাও।
এখনই।
লেখা বলছে পাগল নই, কিন্তু আমার মনে হলো বদ্ধ পাগল হয়ে গেছি, একেবারে উন্মাদ। কেক বের করলে কি হবে?
আবার পড়তে গেলাম লেখাটা। নেই। সেই ফোন নম্বরটাই শুধু। নাহ, সত্যি সত্যি পাগল হয়ে গেছি! ভয় দুর্বল করে দিল আমাকে। কিন্তু কৌতূহল দমাতে পারলাম না। আরেকবার বিদ্যুৎ চমকাতে কাত হয়ে পেছনের সীট থেকে তুলে আনলাম কেকের বাক্সটা। কিন্তু তেমন ভারী লাগল না। বোমা থাকলে নিশ্চয় অনেক বেশি ভারী হত।
কি জানি, এমন কোন বোমাও রেখে থাকতে পারে, যেটা হাত কা। খুব সাবধানে ডালা খুলোম। সিনেমায় দেখেছি, বাক্সে ভর। বোমার ডালা খুলতে গেলেই বুম

করে ফাটে। ভেতরে তার-টার দেখলাম না। টিক টিক করে ঘড়িও চলছে না। কেকের গায়ে লেখা রয়েছে: হ্যাপি বার্থডে, রিটা।
এটাই কি বিপদ? এই কেক? হো হো করে হেসে উঠতে ইচ্ছে করল। মনকে ধমক দিলাম: নির্জেকে সামলানোর চেষ্টা করো, রিটা! পাগলামি শুরু করেছ তুমি!
বিদ্যুৎ চমকাল আবার। কয়েকটা ছায়ামূর্তিকে আসতে দেখলাম। নিশ্চয় মেকানিক নিয়ে ফিরে এসেছে বাবা। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। কেকের কথাটা বাবাকে বললে হেসেই খুন হবে।
কাছে এসে দাঁড়াল সবচেয়ে আগের মূর্তিটা। দরজার লক খুলে দিয়ে, হাতল ঘুরিয়ে জানালার কাঁচ নামালাম। বাবা ভেবে জিজ্ঞেস করতে গেলাম, মেকানিক পেয়েছ?
এই সময় চেহারাটা চোখে পড়ল।
বাবা নয়। কিন্তু চেনা চেনা লাগল। কোথায় দেখেছি? কোথায় দেখেছি? হ্যাঁ, মনে পড়ল। দেখেছি মলের দেয়ালে। পোস্টারের ছবিতে। যেখানে অপরাধীদের ছবি সাঁটানো হয়। এই গুণ্ডাটার চেহারার পাশেই হয়তো এতক্ষণে মলের দেয়ালে শোভা পাচ্ছে আমার মুখটাও। ভাবতে কালো হয়ে গেল মনটা।
আতঙ্কটা আসতে সময় লাগল। ধীরেই এল। তবে, এল। মুখ দিয়ে ছোট্ট একটা চিৎকার বেরিয়ে এল আপনাআপনি। দ্রুত কাঁচটা নামিয়ে দিতে গেলাম। চট করে একটা হাত বাড়িয়ে দিল সে। ভেতরে ঠেলে দেয়ার আগেই তুলে দিতে পারলাম কাঁচটা। ভাগ্যিস গাড়িটাতে চাইল্ড লক আছে। দরজাটা খুলতে পারল না তাই। পটাপট যতখানে যতগুলো লক আছে, সব লাগিয়ে দিলাম।
তারপরের দৃশ্যটা হরর সিনেমার ভয়াল দৃশ্য বললে কম বলা হবে। চুপচুপে ভেজা ফ্যাকাসে চামড়া, চোখা নাক, মাথায় লেপটানো নানা রঙের চুলওয়ালা যুবকগুলোকে দেখে মনে হলো নরক থেকে উঠে এসেছে। মোট চারজন ওরা। গাড়ি ঘিরে ঘুরতে শুরু করল। থেকে থেকে চামড়ার দস্তানা পরা হাত দিয়ে চাপড় মারতে লাগল জানালার কাঁচে।
হাই, বেবি, দাঁত বের করে হাসল ওদের লাল-চুলো নেতাটা, যার ছবি মলে সাঁটানো আছে, বেরিয়ে এসো। কি বসে আছ, গাড়ির মধ্যে।
হ্যাঁ, চলে এসো, সুর মেলাল আরেকজন। এই গরমে বৃষ্টিতে ভিজতে বড় আরাম। শরীরটা তার এত মোটা, ছোটখাট একটা জলহস্তী মনে হচ্ছে। কপালে উল্কি দিয়ে সাপ আঁকা।
খেয়েদেয়ে আর কোন কাজ নেই তোমাদের? চিৎকার করে জবাব দিলাম। বৃষ্টিতে ভেজার চেয়ে বরং গাঁজায় দম দাওগে। ইচ্ছে করলে ড্রাগও নিতে পারো। এখানে আমাকে জ্বালাতে এসেছ কেন?

গাড়ির ট্রাংকে উঠে লাফাতে শুরু করল একজন। অন্য আরেকজন বুট পরা পায়ে লাথি মেরে একে একে ভেঙে ফেলতে লাগল হেডলাইট, টেল লাইট, পার্কিং লাইট।
তুমি বললে ড্রাগ-ট্রাগ সবই নেব, খিকখিক করে হেসে জবাব দিল নেতা। কিন্তু, গাড়িতে বসে আছ কেন? বেরোও। বেরিয়ে এসে তারপর বলো। নাকি ভাবছ ওখান থেকে তোমাকে বের করে আনতে পারব না আমরা?
জাহান্নামে যা, শয়তানের দল! চিৎকার করে উঠলাম আমি।
গাড়িটাকে দোলাতে শুরু করল ওরা। ভাগ্যিস ভলভো, গাড়িগুলো খুব মজবুত করে বানায় কোম্পানি। দোলানোর চোটে গা গুলিয়ে উঠল আমার। ভয় পেয়েছি সেটা বুঝতে দিলাম না ওদের, চিৎকার করে বললাম, এ গাড়ির মধ্যে জীবনেও ঢুকতে পারবি না তোরা। এটা কি জানিস? ভলভো এস সেভেন্টি। গাড়ির জগতে সবচেয়ে শক্তগুলোর একটা।
পাথর দিয়ে বাড়ি মারল জলহস্তীটা। ঝনঝন করে ভেঙে পড়ল ড্রাইভারের পাশের জানালা। ফোকর দিয়ে মাথা গলিয়ে বলল সে, সরি! তোমার ছোট্ট বাহনটার ক্ষতি করে ফেললাম না তো?
কেকটা ব্যবহার করার সময় এসেছে। খানিক আগে কাগজে দেখা লেখাটার কথা মনে পড়ল। আশ্চর্য! কিভাবে সতর্ক করে। দিল আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়!
বাক্স থেকে কেকটা বের করে যতটা জোরে সম্ভব বসিয়ে দিলাম ওর মুখে। কেক, মাখন, সব ছড়িয়ে গেল চতুর্দিকে। দলা দলা আটকে গেল ওর নাকে-মুখে, চুলে, মাথায়।
সরি, চিৎকার করে ওর কথাতেই জবাব দিলাম, তোমার ছোট্ট মুখটার কোন ক্ষতি করে ফেললাম না তো?
মুখ খারাপ করে একটা গালি দিল সে। চোখ থেকে আঠাল চকলেট বের করার চেষ্টা করছে। আমি তোমার বারোটা বাজিয়ে ছাড়ব!
ধরতে পারলে তবে তো, বলেই ওদিককার দরজার লকটা নামিয়ে, হ্যাঁন্ডেলে মোচড় দিয়ে, জোড়া পায়ে লাথি মারলাম দরজার গায়ে। আঘাতটা সবচেয়ে বেশি লাগল জলহস্তীর মোটকা ভুড়িতে। হুক করে সমস্ত বাতাস বেরিয়ে গেল তার পেট থেকে। চিৎ হয়ে পড়ে গেল কাদার মধ্যে।
দলের বাকি তিনজন রয়েছে অন্যপাশে। লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে ঝেড়ে দৌড় লাগালাম বনের দিকে।
এত বছরের চীয়ারলীডিং প্র্যাকটিস কাজে লাগল এখন। প্রায় উড়ে পার হয়ে এলাম খোয়া আর কাদাপানিতে ভরা রাস্তা। ঢুকে পড়লাম ঝড়ে উন্মত্ত বনের মধ্যে। যে ভাবে কোনদিকে না তাকিয়ে দৌড়াচ্ছিলাম, কপাল ভাল গাছের গায়ে

কপাল ঠুকে গেল না। ডালপাতার বাড়ি লাগছে মুখে। দুই হাত সামনে বাড়িয়ে সরানোর চেষ্টা করতে করতে ছুটলাম। ভেজা কাপড় সেটে আছে গায়ের সঙ্গে। ডালপাতা, কাঁটালতা জড়িয়ে যাচ্ছে হাতে পায়ে, আঁকড়ে ধরছে। তবুও বনটা এখন গাড়ির চেয়ে নিরাপদ।

জীবনেও এত ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাতে দেখিনি আমি। সারা আকাশটাতে জালের মত বিছিয়ে যাচ্ছে তীব্র নীল শিখা। ক্ষণে ক্ষণে বজ্রের গর্জন। যেন কোন অজানা দানবেরা দল বেঁধে পৃথিবী আক্রমণ করতে আসছে। কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে তাকালাম। নীলচে-সাদা বিদ্যুতের আলোয় ঠিক আমার পেছনেই লেগে থাকতে দেখলাম গুণ্ডাগুলোকে।

প্রাণপণে দৌড়াতে থাকলাম। পেছন ফিরে তাকালাম না আর। যখন মনে হলো, আর পারব না, ধরা পড়ে যাবে, ঠিক তখন চোখে পড়ল সার্ভিস স্টেশনের আলো। পাহাড়ের মাথায়। বাবা সম্ভবত ওখানেই গেছে মেকানিকের খোঁজে। কুয়াশায় উজ্জ্বল হতে পারছে না আলোটা, ঘোলাটে গোল একটা আভা। যা-ই হোক, এ যাত্রা বোধহয় বেঁচে গেলাম।

কিন্তু পাহাড়ের ঢালটা চোখে পড়তে দমে গেলাম। ওটা বেয়ে দৌড়ে ওঠা সহজ নয়। ধরে ফেলবে আমাকে গুণ্ডাগুলো। পেছনে চলে এসেছে।

তাই বলে থামলাম না। খোয়া বিছানো একটা রাস্তা উঠে গেছে চূড়ায়। সেটা ধরে উঠতে গিয়ে শরীর বাঁকা হয়ে গেল সামনের দিকে। পিছলে গেল স্যান্ডেল। পড়ে গেলাম উপুড় হয়ে। হাতের আঙুলগুলো নিজের অজান্তেই কাদায় বসে গিয়ে মাটি আঁকড়ে ধরল। হাঁপাতে হাঁপাতে বুক ব্যথা হয়ে গেছে।

ধরে রাখতে পারলাম না। আঙুলের সঙ্গে উঠে এল নরম মাটি। পিছলাতে শুরু করলাম। খানিকটা পিছলে নামার পরই গড়ানো শুরু করলাম। ধারাল পাথরের আঘাতে কেটে যেতে লাগল কপাল, কনুইয়ের চামড়া। পড়ে গেলাম কাদাপানিতে ভরা ছোট একটা গর্তের মধ্যে।

তোলো ওকে! চিৎকার করে বলল জলহস্তী। চোখেমুখে এখনও মাখন লেগে রয়েছে। এক হাতে পেট চেপে ধরে রেখেছে, যেখানে লেগেছিল গাড়ির দরজা। ওর বারোটা বাজাব আমি আজ!

এ দুজন এসে দুদিক থেকে ধরে টেনে দাঁড় করিয়ে দিল। আমাকে।

খুব চালাক ভারো নিজেকে, তাই না? বলল ওদের নেতাটা।

না, তা আমি ভাবি না, জবাব দিলাম। ভীষণ ঠাণ্ডা লাগছে আমার। খিদেয় পেট জ্বলছে। যে ভেজা ভিজেছি, সর্দি লেগে যাবে জানা কথা। বেপরোয়া হয়ে উঠেছি। কাজেই কথা বলতে পরোয়া করলাম না। আর কি ভাবছি শুনবে? ভাবছি,

সকালে কার মুখ দেখে আজ ঘুম ভেঙেছিল, তোমাদের মত একদল ঘেয়ো কুত্তার সামনে পড়তে গেলাম।
আমার চারপাশ ঘিরে ঘুরতে শুরু করল নেতাটা। রাগে কথা বেরোচ্ছে না মুখ থেকে। ঢোক গিলোম। কিন্তু যা বলার বলে। ফেলেছি, ফিরিয়ে নেয়া যাবে না আর।
ঘেয়ো কুত্তা হই আর যা-ই হই, কর্কশ কণ্ঠে বলল ওদের নেতা, তোমাকে একটা শিক্ষা না দিয়ে ছাড়ব না আজ, বিচ্ছু মেয়ে কোথাকার! রিকোর যা অবস্থা করেছ, জলহস্তীকে দেখাল। সে, তার জন্যে শাস্তি তোমাকে পেতেই হবে।
অ, মোটকুর নাম তাহলে রিকো! চুকচুক শব্দ করলাম জিভ দিয়ে। মুখ ফসকেই যেন বেরিয়ে গেল, আমি তো ভেবেছিলাম হিপো, হিপোপটেমাস।
চুপ...! মুখ খিস্তি করে গালি দিল জলহস্তী। গর্জন করে। বলল, আজ তোকে আমি...!
কালো জ্যাকেটের নিচ থেকে টান দিয়ে বের করল কি যেন। বোতাম টিপতে ঝটাৎ করে খুলে গেল আট ইঞ্চি লম্বা ইস্পাতের ফলা। একটা সুইচব্লেড।
আমাকে ইয়ার্কি মারা হচ্ছে, না! আমি হিপো? ছুরির মাথাটা আমার পেটের দিকে তাক করে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল রিকো, মজাটা আজ টের পাওয়াব।
এক পা এগিয়ে এল সে।
দম বন্ধ করে পেটে ছুরি খাওয়ার অপেক্ষায় আছি। হাঁচি দিয়ে ফেললাম। হাঁচি দেয়ার মোটেও উপযুক্ত সময় নয় এটা। কিন্তু বৃষ্টিতে ভিজে, কাদায় গড়াগড়ি খেয়ে, পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়ে আমার অবস্থা তখন বড়ই শোচনীয়।
আচমকা ঝলকে উঠল লালচে-সাদা তীব্র আলো। আকাশের বিদ্যুতের মতই অসংখ্য বিদ্যুতের শিখা উঠে আসতে শুরু করল আমার পায়ের কাছ থেকে। আমাকে ঘিরে, আমার সমস্ত দেহ ঘিরে, ছড়িয়ে পড়ল কাদাপানিতে; সরু সরু আলোর সাপের মত ছুটে গেল আমার শত্রুদের দিকে।
সবগুলোকে জীবন্ত জালের মত জড়িয়ে ফেলতে লাগল সেই রঙিন বিদ্যুৎ-শিখা। গলা ফাটিয়ে চিৎকার শুরু করল ওরা। পাগলের মত নাচতে লাগল কাদার মধ্যে। হাত-পা ছুঁড়ে সেই বিদ্যুৎ-বিভীষিকার কবল থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে।
দৃশ্যটা দ্রুত মিলিয়ে গেল চোখের সামনে থেকে। তারপর সব, অন্ধকার।

.

জেগে উঠে চারপাশে বিচিত্র সব পোশাক পরা মানুষকে দেখতে পেলাম। হাসপাতালে রয়েছি। পায়ের কাছে দাঁড়ানো মহিলা ডাক্তার। ধূসর-চুল। বুকে লাগানো নেম-ট্যাগে নাম লেখা শেলী অলরিজ। বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছে বাবা। সাংঘাতিক উদ্বিগ্ন। বাবার পাশে দাঁড়ানো একজন পুলিশ অফিসার।

পুলিশ কেন?
কাল থেকে সেই যে শুরু হয়েছে-আমার আতঙ্কের প্রহর কি আর শেষ হবে না!
আমি ওই ব্লাউজ চুরি করিনি! চিৎকার করে উঠলাম। জীবনে কারও জিনিস চুরি করিনি আমি!
কিসের ব্লাউজ? জানতে চাইল অফিসার।
চুরির অভিযোগে তোমাকে দায়ী করা হচ্ছেও না, ঘরের আরেক পাশ থেকে বলে উঠল আরেকটা কণ্ঠ। সেদিকে তাকাইনি, তাই দেখিনি এতক্ষণ-এখন দেখলাম, পুলিশ চীফ ক্যাপ্টেন ইয়ান। ফ্লেচার। হাসিমুখে এগিয়ে এলেন তিনি।
চুপ করে থাকো, হনি, আস্তে করে বাবা আমার কপালে হাত বুলিয়ে দিল। চুপচাপ শুয়ে থাকো। কোন চিন্তা কোরো না।
কিন্তু ও কিসের কথা বলল? চুরির প্রসঙ্গ টেনে আনতে চাইছে অন্য অফিসার।
আহ, থামো তো, ডেরিয়াল, ক্যাপ্টেন বললেন। মেয়েটা অসুস্থ। তাকে এ সময় বিরক্ত করার কোন দরকার আছে?...রিটা, আমাদের আসার কারণটা তোমাকে বলি। কিছুক্ষণ আগে তোমার ওপর হামলা চালানো হয়েছিল। মনে আছে?
ধীরে ধীরে স্মৃতিটা ফিরে আসতে শুরু করল আমার। গাড়িতে আটকা পড়া... বনের মধ্যে ছোটার দুঃস্বপ্ন...আমাকে ঘিরে ছড়াতে থাকা বিদ্যুতের জাল হাসপাতালে রয়েছি যখন, নিশ্চয় আমাকে ছুরি মেরেছে...
হ্যাঁ, মনে আছে, জবাব দিলাম। আমাকে ছুরি মারা হয়েছে!
না না, হনি, বাবা বলল, তোমার কিছু হয়নি। ছুরি ওরা মারতে পারেনি তোমাকে।
ক্লান্তিতে ভেঙে আসছে শরীর। বালিশে মাথা রাখলাম। চোখের পাতা মেলতেও কষ্ট হচ্ছে।
তোমাকে এখন প্রশ্ন করতে খারাপই লাগছে, ক্যাপ্টেন বললেন। কিন্তু তোমার স্মৃতিটা তাজা থাকতে থাকতে সব কথা জেনে নিতে চাই। বদমাশগুলোকে শায়েস্তা করতে হলে সব। জানতে হবে আমাদের।
ওই চার গুণ্ডার কথা বলছেন?
হ্যাঁ। ওরা এখন পুলিশের কজায়। শয়তানের গোড়া একেকটা। ওদের বিরুদ্ধে আগেও পুলিশের খাতায় অভিযোগ ছিল। এখন তো হাতেনাতেই ধরা পড়ল। দেখলে চিনতে পারবে?
পারব মানে? হেসে উঠলাম। ওদের চেহারা এখনই মুখস্থ বলে দিতে পারি আপনাকে।...এমনকি ছবি কোথায় পাবেন, তা-ও বলতে পারব।
ছবি!
মুখ ফসকে কথাটা বলে ফেলে আফসোস করতে লাগলাম। কিন্তু আর ফেরার উপায় নেই। মলের দেয়ালে অভিযুক্তদের ছবি যেখানে সাঁটানো হয়, সেখানে

দেখতে পাবেন ওদের নেতার ছবি-বাকি চারটেও নিশ্চয় আছে, অত খেয়াল করিনি; আমার ছবিটার পাশে।
তোমার ছবি মানে? কথাটা ধরে বসল অফিসার ডেরিয়াল। তুমি চুরি করেছিলে নাকি?
না, করিনি!
সে অনেক কথা, প্রসঙ্গটা চাপা দেয়ার চেষ্টা করল বাবা।
বিরক্ত দৃষ্টিতে ডেরিয়ালের দিকে তাকালেন ক্যাপ্টেন। আমার। দিকে ফিরে বললেন, আসল কথা আগে। রিটা, গুণ্ডাগুলো কিভাবে তাড়া করল তোমাকে, খুলে বলতে পারবে?
হ্যাঁ, পারব। গাড়িতে বসে ছিলাম, বললাম আমি। বাবা গিয়েছিল সার্ভিস স্টেশনে, গাড়ি ঠিক করার জন্যে মেকানিক আনতে। চারপাশ থেকে ভূতের মত এসে উদয় হলো শয়তানগুলো। গাড়িটাকে ঘিরে ফেলে জানালায় থাবা মারতে লাগল কেউ, কেউ ট্রাংকে উঠে লাফানো শুরু করল; তারপর একজন পাথর দিয়ে বাড়ি মেরে জানালার কাঁচ ভাঙল।
কোনটা?
মোটকা জুলহস্তীটা। ওর নাম নাকি রিকো।
খোঁচা দিয়ে কথা বলেছিলে?
নামটা ঠিক হয়নি বলে হেসেছিলাম।
তারমানে নাম নিয়ে ব্যঙ্গ! আনমনে বিড়বিড় করে ছোট একটা কালো পুলিশ বুকে তথ্যটা লিখে নিল ডেরিয়াল।
ডেরিয়াল, তুমি এখান থেকে যাও তো, শীতল কণ্ঠে বললেন ক্যাপ্টেন। হলে গিয়ে অপেক্ষা করো।...রিটা, জানালার কাঁচ ভাঙার পর কি করলে?
কোনমতে গাড়ি থেকে বেরিয়ে দৌড়ে ঢুকে পড়লাম বনের মধ্যে। সার্ভিস স্টেশনটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করছিলাম। ঢাল বেয়ে উঠতে গিয়ে গড়িয়ে পড়ে গেলাম নিচে। একেবারে ওদের হাতের মুঠোয়।
তারপর? বাধা দিলে কিভাবে?
আমি আসলে বাধা দিতে পারিনি, ভয়ঙ্কর দৃশ্যটা কল্পনা করে নিজের অজান্তেই ভুরু কুঁচকে গেল আমার। ছুরি বের করে আমাকে মারতে আসছিল হিপো... মানে, রিকো, হঠাৎ বাজ পড়ল ওদের ওপর...
বাজ পড়লে তুমি রেহাই পেলে কি করে? সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করল ডেরিয়াল।
তোমাকে না এখান থেকে যেতে বললাম! ধমকে উঠলেন ক্যাপ্টেন।
দরজার দিকে এগোল ডেরিয়াল। ভঙ্গি দেখেই বোঝা গেল, যেতে ইচ্ছে করছে না।
আমার দিকে তাকালেন ক্যাপ্টেন, হ্যাঁ, বাজ পড়ল, তারপর?

আমি জবাব দেবার আগেই ডাক্তার বলে উঠলেন, কিন্তু তা কি করে সম্ভব? রিটা, তুমি যা-ই বলো, ওই ছেলেগুলো বজ্রপাতের শিকার নয়।
কিন্তু ডাক্তার, ক্যাপ্টেন বললেন, প্রচণ্ড ইলেকট্রিক শক খেয়েছে ওরা, এটা তো ভুল নয়?
না, ভুল নয়। তবে বজ্রপাত থেকে শক্ খায়নি ওরা। বজ্রপাত হলে জুতো, কাপড়-চোপড় পুড়ে যেত, চামড়া ঝলসে যেত। কিন্তু তেমন কোন জখমই নেই ওদের শরীরে। কাপড়ের কোন ক্ষতি হয়নি। এত কাছে থেকে রিটাও অক্ষত থাকত না।
কিন্তু আমি নিজের চোখে দেখলাম, জোর দিয়ে বললাম আমি। হঠাৎ জ্বলে উঠল লাল-সাদা বিদ্যুতের শিখা, ঘিরে ফেলল ওদের।
অন্য কোন ধরনের বজ্র নয় তো? বাবা বলল। বল্ লাইটনিং বা অন্য কিছু?
বল লাইটনিং জাতীয় কিছু বাস্তবে সত্যি আছে কিনা জানা নেই আমার, ডাক্তার বললেন। যদি থাকেও, ওই বিদ্যুতের শিকার নয় ছেলেগুলো। ওদেরকে যেটা আঘাত হেনেছে সেটা লো-অ্যাম্পিয়ারেজ কিন্তু হাই-ভোল্টেজ এনার্জি সোর্স থেকে আসা। কোন ধরনের স্টান গান হতে পারে।
স্টান গান! মানে অবশ করে দেয়া বন্দুক? বাবা বলল। তারমানে আর কেউ ছিল তখন ওই বনে, গাছের আড়ালে লুকানো...
আমার তা মনে হয় না, ক্যাপ্টেন বললেন। ওই নির্জন গভীর জঙ্গলে, অন্ধকারে, প্রবল ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে অকারণে কে বসে থাকবে ট্যাজার গান নিয়ে? তারপর যেন নিজেকেই বোঝালেন, অবশ্য এ ছাড়া আর ব্যাখ্যাটাই বা কি!
আমিও ক্যাপ্টেনের সঙ্গে একমত। আমি আর ওই গুণ্ডাগুলো ছাড়া জঙ্গলে কেউ ছিল না তখন। ভেবে অবাক হলাম। বজ্রপাত হলে বিদ্যুৎ এল কোথা থেকে? আমার কিছু হলো না কেন? তবে কি... নিজের কাছেই প্রশ্নটা বেখাপ্পা লাগল আমার: আমিই কি কোনভাবে উৎপন্ন করেছি ওই বিদ্যুৎ?
স্টান গানটা তোমার কাছে ছিল না তো, রিটা? দরজার কাছ থেকে জিজ্ঞেস করল ডেরিয়াল। হলে যায়নি সে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল।
হাসলাম। ডান হাতের তর্জনী তুলে পিস্তলের মত তাক করলাম তার দিকে। এই যে আমার স্টান গান।
রীতিমত চমকে গেল ডেরিয়াল। লাফ দিয়ে সরে গেল। দরজার কাছ থেকে।
আমার রসিকতায় হেসে উঠল ঘরের সবাই।
যাকগে, ওসব কথা, যুক্তিসঙ্গত কোন ব্যাখ্যা না পাওয়ায় সন্তুষ্ট হতে পারলেন না ক্যাপ্টেন। রিটা, বদমাশগুলোকে চিকিৎসার জন্যে স্টেট হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। চিকিৎসা শেষে থানায় নেয়া হবে। যাবে দেখতে?

রাতের ঘটনার কথা ভাবলাম। আরেকবার ওদেরকে দেখার কৌতূহল সংবরণ করতে পারলাম না। বললাম, যাব।

*

হাসপাতালের লোডিং বে-তে পৌঁছে শব্দ শুনেই বোঝা গেল কোথায় আছে ওরা।

আমি যাব না! আমি যাব না! শুনতে পেলাম চিৎকার। পরিচিত সেই কর্কশ কণ্ঠ। নেতাটা। হাত সরাও!

তোমাকে কে কেয়ার করে, দারোয়ানের ছাও? চিৎকার করে উঠল আরেকজন। পিস্তল রেখে এসো দেখি, হয়ে যাক এক হাত, কে হারে কে জেতে! হিপোর কণ্ঠ।

এক সারি অ্যামবুলেন্সের কাছে এসে থামল আমাদের গাড়ি। বাবা, ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্লেচার, অফিসার ডেরিয়াল এবং আমি-গাড়ি থেকে নামলাম। দেখতে পেলাম সেই চার যুবককে। পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছে। ওদের ভ্যানে তোলার চেষ্টা করছে। দুজন পুলিশ। কোনমতেই ভ্যানে উঠতে চাইছে না। হাসপাতালের সিকিউরিটি গার্ডেরা ঘিরে রেখেছে চারপাশ থেকে।

চারজনের হাতেই হাতকড়া। একজনের হাতের সঙ্গে আরেকজনকে জোড়া দিয়ে শেকল বানিয়ে ফেলা হয়েছে। আলাদা থাকলে দৌড় দিত। একটা বিচিত্র জিনিস লক্ষ করলাম-ওদের চুল; তারের মত খাড়া হয়ে আছে। বৈদ্যুতিক শক খেয়েছে যে, নিশ্চয় সেজন্যে।

বাহ, চুলের ছাঁট তো বেশ চমৎকার হয়েছে! বলতে বলতে হাসিমুখে এগিয়ে গেলাম ওদের দিকে। কে ছেটে দিল? ডিজাইনার হবিস হপকিনস?

আস্তে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল আমার দিকে নেতা-গুণ্ডা। আতঙ্ক ফুটল চোখের তারায়। ঝুলে পড়ল নিচের চোয়াল। চিল্কারের ভঙ্গিতে হাঁ হয়ে গেল মুখ। শব্দ বেরোল না।

কিন্তু হিপোর চিৎকার রুদ্ধ হলো না। আমাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণ আর্তনাদ বেরিয়ে এল মুখ থেকে। সোজা দৌড় দিল পুলিশ ভ্যানের দিকে। বাকি তিনজনকেও টানতে টানতে নিয়ে চলল সঙ্গে। যেটাতে উঠতে বাধা দিচ্ছিল এতক্ষণ, সেই ভ্যানটাই যেন ওদের শেষ আশ্রয়স্থল।

সরাও, সরাও ওকে! মুখে কথা ফুটল লাল-চুলো নেতাটার। ও একটা আস্ত ডাইনী! দুজন পুলিশ অফিসারের আড়ালে লুকিয়ে পড়তে চাইল সে। এবার আমাদের মেরেই ফেলবে! দোহাই তোমাদের, আমাকে জেলখানাতেই নিয়ে চলো! প্লীজ! কেঁদে ফেলল বাহাদুর হিপো। ওকে কাছে আসতে দিয়ো না!

স্তব্ধ বিস্ময়ে দৃশ্যটা তাকিয়ে দেখলেন ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্লেচার, অফিসার ডেরিয়াল ও বাবা। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না কেউ। একজন একজন করে চোখ ফেরাল আমার দিকে।

হ্যাঁ, এরাই, ক্যাপ্টেনকে বললাম আমি। এই শয়তানগুলোই কাল রাতে ধাওয়া করেছিল আমাকে।

.

ঘড়ির অ্যালার্মের শব্দে চোখ মেলতে বাধ্য হলাম। মনে হলো কয়েক মিনিট আগে ঘুমিয়েছি। রাগ হলো ঘড়িটার ওপর। তাকিয়ে দেখি, দুপুর পেরিয়ে গেছে। তারমানে দীর্ঘ সময় ঘুমিয়েছি।

জানালার বাইরে উজ্জ্বল আলো। মনে পড়ল সব কথা। কাল রাতে ডাক্তার অলরিজকে দিয়ে আমার রিলিজ পেপার সই করিয়ে। বাড়ি নিয়ে এসেছে বাবা। ঘড়িটাতে আমিও অ্যালার্ম দিয়ে রেখেছিলাম। গরমের ছুটি। স্কুলে যাবার তাড়া নেই। ভাবলাম, আরেকটু ঘুমিয়ে নিই।

অ্যালার্ম বন্ধ করার জন্যে সুইচ টিপতে গেলাম। কিন্তু ঘড়িটার গায়ে আমার আঙুলের ছোঁয়া লাগতেই অদ্ভুত একটা কাণ্ড ঘটল। বন্ধ হয়ে গেল ঘড়িটা। পুরোপুরি মৃত! অ্যালার্ম তো বন্ধ হলোই, সময় শো করার যে লাল নম্বরগুলো জ্বলছিল, সেগুলোও নিভে গেল মুহূর্তে।

চোখ থেকে ঘুম দূর হয়ে গেল আমার। মনে পড়ল গাড়িটার কথা। গতরাতে গাড়িটাও এই ঘড়ির মতই আচমকা মরে গিয়েছিল।

তুলে নিলাম ঘড়িটা। অদ্ভুত একটা সুড়সুড়ি জাতীয় অনুভূতি টের পেলাম আঙুলে। হাত, বাহু বেয়ে উঠে এল শরীরে, পেটের কাছে নেমে গেল। চাঙা বোধ করতে লাগলাম। ১ লাফ দিয়ে বিছানা থেকে মাটিতে নামলাম। ড্রেসারের ওপর চোখ পড়তেই দেখতে পেলাম সিডি প্লেয়ারটা। পাশে রাখা সেই ব্লাউজ, যেটার কারণে এত হেনস্তা হতে হয়েছিল গতকাল।

সিডিটা নতুন। নিশ্চয় আমার জন্মদিনের উপহার। বাবা কিনে এনে রেখে দিয়েছে, আমি যখন ঘুমিয়েছিলাম।

খুব খুশি হলাম। বাবার প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে গেল মনটা। এত ভাল বাবা খুব কম মেয়েরই ভাগ্যে জোটে।

এ রকম একটা সিডি প্লেয়ার পাওয়ার আমার বহুকালের শখ। বাজাতে গেলাম। ড্রেসারের নিচে কার্পেটের ওপর ফেলে রাখা হয়েছে বাক্সটা। ওতে একটা পাতলা বই পেলাম। কি করে বাজাতে হয়, লেখা রয়েছে তাতে।

সিডি প্লেয়ার বাজাতে জানি আমি। তা-ও বইটা দেখে নিলাম ভালমত। সিডির পেছনের তার-সহ প্লাগটা বের করে নিলাম। সকেটে ঢোকাতে হবে। সকেটটা রয়েছে মার পড়ার টেবিলের নিচে। চেয়ার সরিয়ে ঢুকে পড়লাম টেবিলের নিচে। প্লাগের কাঁটাগুলো ঢোকাতে গেলাম সকেটে। ঢুকল না।

কয়েকবার চেষ্টা করে কেন ঢুকছে না দেখার জন্যে তুলে আনলাম চোখের সামনে। একটা কাটা সামান্য বাঁকা হয়ে আছে। মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। নতুন জিনিসটার বাকা কাঁটা! সোজা করতে প্লায়ার্স লাগবে। বেরিয়ে আসার আগে প্লায়ার্স ছাড়াই সোজা করা যায় কিনা দেখার জন্যে দুই আঙুলে টিপে ধরে চাপ। দিলাম। বাকি আঙুলগুলোর কোন একটা বোধহয় অন্য কাঁটাটাতে লেগে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঘটে গেল এক আজব ঘটনা। জ্যান্ত হয়ে উঠল সিডি প্লেয়ার। পাওয়ার পেয়ে গেছে। বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু হয়ে গেছে মেশিনে। একটা সিডি ঢোকানোই ছিল, প্লে বাটনটাও অন করা ছিল, বাজতে শুরু করল সেটা।

এমন ভাবে চমকে গেলাম, টেবিলের নিচে আছি ভুলে গিয়ে মাথা তুলতে গিয়ে বাড়ি খেলাম টেবিলে। ব্যথা লাগল। উহ করে মাথা নিচু করে ফেললাম। এ প্লাগটা ছেড়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলাম বাইরে। আমি ছেড়ে দিতেই আবার পাওয়ার চলে গেছে, অফ হয়ে গেছে প্লেয়ার। বুঝতে আর অসুবিধে হলো না, আমি একটা চলমান জেনারেটরে পরিণত হয়েছি।

চোখ পড়ল আবার ব্লাউজটার ওপর। মনে হলো, গতকাল ওটা গায়ে দেয়ার পর থেকেই যত গণ্ডগোল শুরু হয়েছে। গায়ে। দিয়ে অতীতে চলে গিয়েছিলাম। নিজের মধ্যের ভয়ঙ্কর ক্ষমতাটা প্রকাশ পেল…

সত্যি কি তাই?

আরেকবার পরীক্ষা করে দেখার কৌতূহল দমন করতে পারলাম না। নিশ্চিত হতে হবে, ওই ব্লাউজটার মধ্যেই লুকানো রয়েছে কিনা এত ক্ষমতা। জানাটা জরুরী মনে হলো আমার কাছে।

ব্লাউজটা হাতে করে নিয়ে গিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়ালাম। আয়নার দিকে চোখ রেখে ধীরে ধীরে পরে ফেললাম। ভয় লাগছে। বুকের মধ্যে দুরুদুরু করছে। কি ঘটবে জানি না।

মলের ড্রেসিং রুমে যা ঘটেছিল, ঠিক একই ভাবে মিটমিট করতে লাগল ঘরের বাতিটা। কানের কাছে গুঞ্জন শুনলাম। তারপর দপ করে বাতি নিভে গেল।

জ্বলে উঠল আবার।

ঘরের বাইরে পদশব্দ শুনতে পেলাম। বাবা আসছে নিশ্চয়। বাবা! গলা চড়িয়ে ডাক দিয়ে এগিয়ে গেলাম দরজার দিকে। উপহারটার জন্যে একটা ধন্যবাদ দেয়া দরকার। বাবা…

দরজা খুলেই স্থির হয়ে গেলাম।

বাবা নয়!

*

পড়া থামাল রবিন। দম নিল। ডায়েরীতে কটা পাতা আর বাকি আছে উল্টে দেখল। মুখ তুলে বলল, আর বেশি নেই। মাত্র কয়েকটা পাতা।
পড়ে ফেলো, মুসা বলল। বাপরে বাপ, এ কি গল্প শোনাচ্ছে! আমার কাছে তো রীতিমত ফ্যান্টাসি মনে হচ্ছে।
মাথা ঝাঁকাল জিনা। চোখের সামনে সেদিন কিশোরকে রূপ পাল্টাতে না দেখলে বিশ্বাসই করতাম না। ভাবতাম, রিটা গুল মারছে।
পড়ো, পড়ো! তাগাদা দিল মুসা।
লম্বা শ্বাস টেনে ফুসফুস বোঝাই করল রবিন। ধীরে ধীরে সেটা বের করে দিয়ে চোখ নামাল আবার ডায়েরীর পাতায়। রিটা লিখেছে:
এমন একজনকে দেখতে পেলাম, যাকে বহুকাল দেখি না। পরনে বড় বড় গোলাপী ফুল আঁকা কাপড়ের হাউসড্রেস। কানে ম্যাচ করা রঙের রিং। ওই পোশাক আমার অতি পরিচিত। কতবার ওটার নিচের অংশ ধরে টানাটানি করেছি। ওটা ধরে শপিং সেন্টারে গেছি, আরও কত কি।
মা! চিৎকার দিয়ে সামনে ছুটে গেলাম।
ঠোঁটে আঙুল রেখে চিৎকার করতে মানা করল মা। আমার ঘরে ঢুকে আস্তে লাগিয়ে দিল দরজাটা।
নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলাম না। আবার সেই মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে আছি, বহু বছর আগেই যাকে হারিয়ে ফেলেছিলাম। জীবনে আর কোনদিন দেখতে পাব স্বপ্নেও ভাবিনি। হাত বাড়ালেই ছুঁতে পারছি। স্বপ্ন নয়, পুরোপুরি বাস্তব।
হঠাৎ লক্ষ করলাম আমার ঘরটাও বদলে গেছে। গত গ্রীষ্মে কেনা বাঘের গায়ের ডোরাকাটা রঙের বেডশীটটা নেই বিছানায়, তার জায়গায় পাতা রয়েছে জলকুমারী আঁকা চাদর। জানালার পর্দাগুলো রঙধনু রঙের। বহু বছর আগে বাবা কিনে এনে দিয়েছিল মাকে। আমার প্রিয় গায়ক-গায়িকার পোস্টারগুলো দেয়াল থেকে উধাও। ওগুলোর জায়গায় টানানো রয়েছে কয়েকটা হাতে আঁকা ছবি। একটা বিশেষ ছবির দিকে চোখ পড়তে যেন প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেলাম। নতুন টানানো হয়েছে। একটা শপিং সেন্টার থেকে কিনে আনা হয়েছিল, ১৯৮৭ সালে। তেরো বছর আগে আমার বেডরুমটা যে ভাবে সাজানো ছিল, সেই দৃশ্য।
আমার মাকেও সে-সময় যেমন দেখেছিলাম, তেমনি আছে। তেমনি সুন্দরী। তেমনি হাসিখুশি।
ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরলাম। বহুদিন পর আবার যখন ফিরে পেয়েছি, কোনমতেই আর ছাড়ব না।

আরে, ছাড়, ছাড়! সেই আগের মত হেসে বলল মা। আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। রিটুমণি, কেমন আছিস, মা?
মায়ের মুখের সেই পুরানো আদুরে ডাক শুনে সহ্য করতে পারলাম না। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলাম। মায়ের জন্যে কি যে শূন্যতা জমে ছিল আমার বুকের মধ্যে। হাজারটা প্রশ্ন ছলবলিয়ে উঠে আসছে যেন আমার মুখে। কোনটা বাদ দিয়ে কোনটা করব? জিজ্ঞেস করলাম, আমার কি হয়েছে, মা? আমি এখানে এলাম কি করে?
আমিই প্রোগ্রাম সেট করে রেখেছি, যাতে তুই চলে আসতে পারিস এখানে, মা জবাব দিল।
প্রোগ্রাম মানে? তাজ্জব হয়ে গেলাম। আমি কি ভিসিআর নাকি?
হেসে উঠল মা। অনেকটা তা-ই। ভিসিআর-এর সার্কিটে ছোট্ট কম্পিউটার চিপ থাকে, মনে করিয়ে দেয় কখন যন্ত্রটাকে অন করে রেকর্ড শুরু করতে হবে, জানিস তো?
মাথা ঝাঁকালাম।
মানুষের দেহটাকেও ভিসিআর-এর সঙ্গে তুলনা করা যায়। তফাৎটা শুধু তারের মাধ্যমে সঙ্কেত পাঠায় কম্পিউটার চিপ, আর মানুষের পাঠায় মগজ-খুব সূক্ষ্ম বৈদ্যুতিক সঙ্কেত, স্নায়ুর মাধ্যমে।
তারমানে আমি যা করতে পারছি, জিজ্ঞেস করলাম, সব মানুষই তাই পারবে?–
না, মাথা নাড়ল মা, ত পারবে না। আর সব মানুষের মধ্যে বৈদ্যুতিক সঙ্কেত এত দুর্বল, আছে যে সেটাই বুঝতে পারে না। তোর ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আলাদা। তুই যে কোন মেশিনের ব্যাটারি থেকে শক্তি সংগ্রহ করে নিজের ভেতরে সঞ্চয় করতে পারিস। একটা জিনিস লক্ষ করেছিস, তোর এবারের জন্মদিনের শুরু থেকে তোর ছোঁয়ায় বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিগুলো কেমন উদ্ভট আচরণ করে?
হ্যাঁ, উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। আমাদের গাড়িটা আচমকা মাঝরাস্তায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ঘড়িটা গেল ডেড হয়ে। সিডি প্লেয়ার চলল। বাতিগুলোর কাছাকাছি গেলেই মিটমিট শুরু করে।
হুঁ, তারমানে আঁচ করে ফেলেছিস নিজের ভেতরের ক্ষমতার কথা, মা বলল। ওসব যন্ত্র থেকে সমস্ত বিদ্যুৎ শুষে নিয়ে নিজের ভেতরে জমা করে ফেলেছিলি নিজের অজান্তে। সেজন্যেই ডেড হয়ে গিয়েছিল যন্ত্রগুলো।
বলো কি! আমি তাহলে বান মাছের মত মানুষকে বৈদ্যুতিক শক দিতে পারি?
হাসিতে ঝিলিক দিয়ে উঠল মায়ের চোখ। বান মাছের চেয়ে অনেক বেশি পারিস। তবে কাউকে যাতে অহেতুক শক না দিয়ে বসিস, সে-জন্যে এটার ব্যবহার শিখতে

হবে তোকে। নিয়ন্ত্রণ করা জানতে হবে। তা না হলে কখন যে কাকে খুন করে ফেলবি, ঠিক, নেই।
আমার হাত নিজের হাতে তুলে নিল মা। তবে ভয় নেই, নিয়ন্ত্রণ করা শিখতে সময় লাগবে না। এটা তোর একটা বাড়তি ক্ষমতা। আসল ক্ষমতাটা জাম্পিং। তুই একজন জাম্পার।
আমি কি?
জাম্পার। আমাদের বাস্তবতাকে নিয়ন্ত্রণ করে যে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স, নিজের মধ্যে বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চয় করে তার মধ্যে সুড়ঙ্গ তৈরি করে ফেলতে পারিস তুই। সেই সুড়ঙ্গে ঝাঁপ দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে চলে যেতে পারিস যে কোন সময়ে-যাকে মোটামুটি ভাবে বলা হয়ে থাকে টাইম ট্র্যাভেল বা সময়-ভ্রমণ।
ওভাবেই আমাকে এই উনিশশো সাতাশি সালে নিয়ে এসেছ নাকি? মায়ের কথা হাঁ করিয়ে দিয়েছে আমাকে।
মুচকি হাসল মা। আমি আনিনি। আমি জাম্পার নই। তুইই এসেছিস আমার কাছে। নিজেই নিজেকে নিয়ে এসেছিস।
কিন্তু কিভাবে? আমি তো চেষ্টাও করিনি।
চেষ্টা তোকে করতে হয়ও না। তোর অতি-ইন্দ্রিয়ই এ ব্যাপারে তোকে সাহায্য করে।
বুঝলাম না।
আচ্ছা, বল্ তো, কখন উড়তে শেখে পাখির ছানা? ওড়ার জন্যে তাকে কি কোন শিক্ষা নিতে হয়?
না, জবাব দিলাম।
তারমানে উড়তে পারার ক্ষমতাটা ওর জন্মগত। ডিমের ভেতর থেকে যেদিন বেরোয় সেদিন থেকে ক্ষমতাটা তৈরি হয়ে যায় ওর মধ্যে। কিন্তু পারে না যতক্ষণ না মা ওকে বাসা থেকে ঠেলে ফেলে দেয়।
মার কথা ভয় ধরিয়ে দিতে লাগল আমার। তুমি কি বলতে চাইছ আমি উড়তেও পারি?
না, তা পারিস না। একটা উদাহরণ দিলাম। বাসা থেকে ঠেলে ফেলার পর হঠাৎ করেই আবিষ্কার করে ফেলে পাখির ছানা, সে উড়তে পারে। কিছুক্ষণ আনাড়ির মত ডানা ঝাঁপটাতে ঝাঁপটাতে শেষে ঠিক শিখে ফেলে কি করে ওগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। সময়মত আমিও তোকে কেবল একটা ঠেলা দিয়ে দিয়েছি। বাকিটা তোর আপনা-আপনিই হয়ে যাবে।
কিন্তু, মহা অস্বস্তিতে পড়ে গেলাম, তুমি আমাকে ঠেলা দিলে কিভাবে? তুমি তো আমার সঙ্গেই ছিলে না।

ছিলাম, মাথা ঝাঁকাল মা। তুই সেটা বুঝতে পারিসনি। বহুকাল আগে তোর মগজে একটা মেসেজ রেখে দিয়েছিলাম আমি। তোর এবারকার জন্মদিনে যাতে আমার কাছে আসতে পারিস, পিছিয়ে আসতে পারিস এখনকার সময়ে। মেসেজটাকে উস্কে দেয়ার জন্যে আরও একটা জিনিসের ব্যবস্থা করে রেখেছিলাম, যেটা দেখলেই মনের মধ্যে ঝড় ওঠে তোর…
ব্লাউজটা! জোরে কথা বলতেও ভয় পাচ্ছি, যেন চিত্তার করলেই এই মধুর স্বপ্নটা টুটে যাবে, অদৃশ্য হয়ে যাবে মা।
বুঝতে পারছি এখন, দোকানে ব্লাউজটা দেখে চেনা চেনা লেগেছিল কেন।
হ্যাঁ, মা বলল, ওটা এক ধরনের ভিজিউল ট্রিগার। অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ার পর কোন কিছুর সাহায্য ছাড়া নিজে নিজেই জাম্প করতে পারবি। কিন্তু আপতত ট্রিগারটা অন করার জন্যে সামনে একটা কিছু থাকা দরকার। ব্লাউজটা দিয়েই প্রোগ্রাম সেট করে রাখতে হয়েছিল আমাকে। ঘড়ি দেখল মা। আর বেশি সময় নেই আমাদের হাতে।
এই কথাটা শোনার ভয়ই করছিলাম। আবার হারাতে যাচ্ছি। মাকে। কেন? যাবে কেন?
মা যেন আমার কথা শুনতেই পেল না। একটা কথা মনে রাখবি, সময়-ভ্রমণ একটা ভয়ানক ব্যাপার। এতে স্পেস-টাইম কনটিনামে চিড় ধরায়। অতীতের সামান্যতম পরিবর্তনও ভয়ঙ্কর সময়-কম্পন সৃষ্টি করতে পারে…
চোখ বন্ধ করল মা। মাথা ঝেড়ে অতীতের কোন স্মৃতি যেন ঝেড়ে ফেলে দিতে চাইল। ব্যাপারটা বড়ই জটিল, রিটু। এখানে যত কম সময় কাটাবি তুই, ততই ভাল। সেজন্যে মাত্র পনেরো মিনিটের জন্যে তোকে এখানে নিয়ে এসেছি আমি।
পনেরো মিনিট! মাত্র! কিন্তু আমার তো আরও অনেকক্ষণ থাকার ইচ্ছে।
আমার হাতে মার হাতের চাপ শক্ত হলো। চাইলেই তো আর সব হয় না। কথা বাড়াসনে। জরুরী কথা সারতে হবে। তোকে এখানে ডেকে আনার সেটাও একটা কারণ। একটা খাম থেকে একটা ফটোগ্রাফ বের করল। ছয় থেকে সাত বছর বয়সের পাঁচটা হাসিখুশি ছেলেমেয়ের গ্রুপ ছবি। নে, এগুলো দেখ। দেখে বল তো, কাউকে চিনতে পারিস কিনা। এ ছবিগুলো পরিচিত লাগল আমার। বিশেষ করে একটা মেয়ের চোখ। মাথা নেড়ে বললাম, চেনা চেনাই লাগছে, তবে চিনতে পারছি না।
এদের সবার বয়েস এখন তোর সমান হয়ে গেছে, মা বলল। নাম বললে হয়তো চিনবি না। কারণ পরিচয় গোপন রাখার জন্যে আসল নামও হয়তো বদলে ফেলা হয়েছে।

ছবিটা হাতে নিয়ে আরও ভাল করে চেহারাগুলো দেখতে লাগলাম। চিনে ফেললাম একজনকে। একটা মেয়ে, যার চোখ বেশি পরিচিত লাগছিল। মেয়েটার ছবিতে আঙুল রেখে বললাম, ডানা হিউগ্রি! কিন্তু ও তো কিছুদিন আগে রহস্যময় ভাবে উধাও হয়ে গেছে। ভিনগ্রহবাসীরা ধরে নিয়ে গেছে তাকে!
সর্বনাশ! খবরটা শুনে প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেল মা। আমার চোখের দিকে তাকাতে পারল না।
কি মা, কি হয়েছে? জানতে চাইলাম।
তারমানে ওরা জেনে গেছে, মা বলল। এবং তারমানে তোকেও ধ্বংস করতে কিংবা ধরে নিয়ে যেতে আসবে ওরা। সাবধান, রিটা, মা কতটা সিরিয়াস, আমাকে রিটা বলে ডাকাটাই তার প্রমাণ, খুব সাবধান! তোকে বাঁচানোর জন্যে আমি ওখানে থাকতে পারব না। নিজেকে বাঁচাতে হবে তোর নিজেরই।
কি বলছ, মা? কার হাত থেকে বাঁচাব?
সময় নেই, যা বললাম মনে রাখিস। আরেকটা কথা, কোন কথা জানতে হলে মাদাম জিৎসুর সঙ্গে যোগাযোগ করিস। ওই মহিলা অনেক জ্ঞানী, অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের অনেক খবর রাখে…
তুমি ওই জিপসি গণক মহিলার কথা বলছ? ও তো একটা চীট…
গুড-বাই, রিটু!
মা, মা যেও না! আরেকটু দাঁড়াও! চিৎকার করে উঠলাম।
কি, বল।
আমার মনে হলো, মাকে যদি এখন বলে দিই, কিভাবে মারা গেছে সে, তাহলে হয়তো আর মারা যাবে না। ভয়াবহ সেই সকালটা এড়াতে পারবে। যদি পারে, নিয়তি বদলে যাবে তার। মারা আর যাবে না।
কিন্তু কোন ভাবেই কি নিয়তি বদলাতে পারে মানুষ? অতীতকে পরিবর্তন করে ভবিতব্য এড়াতে পারে?
চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি? মাকে সাবধান করে দেয়ার জন্যে বললাম, মা, শোনো, খুব জরুরী একটা কথা বলি তোমাকে।
কি, মণি?
জুলাইয়ের পাঁচ তারিখে তোমার অফিসে আগুন লাগবে…
তাড়াতাড়ি আমার মুখে হাত চাপা দিল মা, কথা বলতে দিল না। না না, আমি শুনতে চাই না, কেঁপে উঠল তার গলা। আমার অনেক কাজ, রিটা; আমাকে এক জায়গায় যেতে হবে।
আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে যাও, মা, ককিয়ে উঠলাম। তোমাকে ছাড়া আমার আর দিন কাটে না। তুমি যেখানেই যাও, সেটা যদি পরকালও হয়, নিয়ে যাও

আমাকে।
না, মণি, তা হয় না। তোর এখানে অনেক কাজ বাকি। ছবির বাকি ছেলেমেয়েগুলোকে খুঁজে বের করতে হবে তোকে। ডানার মত ওদেরকেও যদি ধরে নিয়ে গিয়ে থাকে, উদ্ধার করে। আনতে হবে। যে অসামান্য ক্ষমতা রয়েছে তোর, প্রয়োজনে সেটা প্রয়োগ করবি। বুদ্ধি করে চললে ওরা যত শক্তিশালীই হোক, তোর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। বেঁচে যেতে পারবি।
কিন্তু তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচতে চাই না। তুমি নেই, আমার দিনগুলো বড় কষ্টে কাটে…
কে বলল নেই? হেসে আমাকে জড়িয়ে ধরল মা। তার কাঁধে মুখ লুকালাম। আমার অনেক কিছু তোর মধ্যে ভরে দিয়েছি। তোর মনের ক্ষমতা প্রয়োগ করবি। নিজের ভেতরের আয়নার দিকে তাকাবি। দেখতে পাবি আমাকে।
আমাকে ছেড়ে দিল মা। চোখ মেলোম না। তার পারফিউমের গন্ধ নাকে আসছে আমার। হয়তো শেষবারের জন্যে।
অবশেষে কেটে গেল ঘোর। চোখ মেলে দেখলাম, মা নেই ঘরে।
দরজার বাইরে পদশব্দ। ভাবলাম, মা চলে যাচ্ছে ওদিক দিয়ে। দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলে বেরোলাম।
মা নয়, বাবাকে আসতে দেখলাম। আমাকে উত্তেজিত দেখে জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে, রিটা?
আঁ!…না, কিছু না!
গালে পানি কেন তোর? কেঁদেছিস?
না, কই? কাঁদিনি তো।
কেঁদেছিস। নিশ্চয় মার জন্যে মন খারাপ লাগছিল।…যাই, বলে দিই ওকে, তোর শরীর ভাল নেই, এখন আর দেখা হবে না।
কাকে, বাবা?
আরে ওই পুলিশ অফিসারটা। ডেরিয়াল। এসে বসে আছে, তোর সঙ্গে নাকি কি জরুরী কথা আছে।
এই এক বিরক্তি! সেদিনের পর থেকে, অর্থাৎ বনের মধ্যের সেই ঘটনাটার পর থেকে মাঝে মাঝেই এসে আমার সঙ্গে দেখা করে লোকটা। ইনিয়ে-বিনিয়ে একটা কথাই জানতে চায়: কি ভাবে ছেলেগুলোকে কাবু করলাম আমি?
বাবাকে বললাম, যাও, শরীর খারাপই বলে দাও। এখন দেখা করতে পারব না আমি।
*

শেষ হলো রিটার ডায়েরী। মুখ তুলে তাকাল রবিন। তার পড়া শেষ হবার পরেও দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কেউ কোন কথা বলল না।
হঠাৎ ঝটকা দিয়ে উঠে দাঁড়াল জিনা। চলো।
কোথায়? অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল মুসা।
রিটাদের বাড়িতে। এখন!
হ্যাঁ, অসুবিধে কি? ডায়েরীটাও ফেরত দেব আর কিশোরের ব্যাপারে কি করা যায়, সেটাও আলোচনা করব।
তারমানে, রবিন বলল, তুমি বিশ্বাস করেছ রিটার কথা?
নিজের ডায়েরীতে কেউ মিছে কথা লেখে না। তা ছাড়া কত রকমের উদ্ভট ঘটনা ঘটে পৃথিবীতে, তার হিসেব রাখে কে? চোখের সামনে যা যা দেখতে পাই আমরা, সে-সব ছাড়াও আরও বহু কিছু আছে–ব্যাখ্যার অতীত, যেগুলো নিয়ে মাথা ঘামাতে গেলে পাগল হয়ে যাওয়া লাগবে।
বাপরে! হেসে বলল রবিন। ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, একেবারে কিশোরের মত লেকচার শুরু করে দিলে। ডায়েরীটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। চলো। যাই।

.

বেডরুমের দরজায় টোকা শুনে উঠে গেল রিটা। খুলে দিল।
বাবা দাঁড়িয়ে আছেন। রিটা, অফিসার ডেরিয়াল তোর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। রান্নাঘরে বসিয়ে রেখে এসেছি। কফি খাচ্ছে।
কেন?
কি জানি, কি একটা ফর্ম নাকি পূরণ করতে হবে বলল। ওই যে সেদিন, বনের মধ্যে গোলমালটা করল-ছেলেগুলোকে নাকি কোর্টে নিয়ে যাচ্ছে। তোর ফর্মটা কোর্টে দাখিল করতে হবে।
ঠোঁট কামড়াল রিটা। কি যেন ভাবল। বেশ, যাও, আমি আসছি। কাপড়টা বদলে আসি।
মিস্টার গোল্ডবার্গ চলে গেলেন।
সিঁড়িতে তার পায়ের শব্দ মিলিয়ে যাবার অপেক্ষা করল রিটা। তারপর দৌড়ে এসে ঢুকল দোতলার হলরুমে, টেলিফোনটা যেখানে। ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে ডায়াল করল রবিনদের বাড়ির নম্বরে।
হালো, কে, রবিন?...ও, আমাদের বাড়িতে আসছিলে?... শোনো, আসার দরকার নেই। আপতত বাড়িতেই থাকো। সেই লোকটা, অফিসার ডেরিয়াল এসে বসে আছে। আমাকে থানায় নিয়ে যেতে চায়। কিসের ফর্ম নাকি পূরণ করতে হবে। আমার সন্দেহ লাগছে। কথা বলে আসি। আবার ফোন করব তোমাকে।

ডেরিয়ালের সঙ্গে কথা বলে সন্দেহজনক তেমন কিছু বুঝতে পারল না। কিন্তু মনটা খুঁতখুঁত করতেই থাকল তার।
আবার ওপরতলায় এসে রবিনকে ফোন করল সে। বলল, আমি থানায় যাচ্ছি।
ঠিক আছে, যাও। সাবধানে থেকো। থানায় গিয়েই একটা ফোন কোরো। আমরা ফোনের পাশে রইলাম।
*
কয়েক মিনিট পর একটা পুলিশ ক্রুজারের পেছনে বসে রওনা হলো রিটা। অস্বস্তিটা কোনমতেই তাড়াতে পারল না মন থেকে। অফিসার ডেরিয়ালই ওকে পেছনে বসতে বলেছে, নিরাপত্তার খাতিরে। কেবলমাত্র পুলিশম্যানেরাই নাকি সামনে বসে।
পেছনের সীটটা বানানো হয়েছে অপরাধীদের জন্যে। দরজার হাতল নেই, জানালার বাটন বা লক নেই। ড্রাইভারের সীট থেকে পেছনের সীটটাকে আলাদা করে রেখেছে প্লাস্টিক আর ধাতুর তৈরি গ্রিল। ছোটখাট একটা হাজতের মত লাগছে রিটার কাছে।
কোন অসুবিধে হচ্ছে? রিটার অস্বস্তিটা টের পেয়েই যেন। জিজ্ঞেস করল ডেরিয়াল।
না, হচ্ছে না, অফিসার।
শুধু ডেরিয়াল বললেই চলবে। ঘুরে যেতে অনেক রাস্তা, দেখি, শর্টকাটে যাই। অনেক সময় বাঁচবে তাতে।
কোনদিক দিয়ে যাবে না যাবে, সেটা ডেরিয়ালের ইচ্ছে। রিটা আর কি বলবে। চুপ করে রইল।
মোড় নিয়ে সরু একটা নির্জন, পরিত্যক্ত রাস্তায় নামল ডেরিয়াল।
অস্বস্তিটা বাড়ল রিটার। দুই ধারে কোথাও চষা খেত, কোথাও বন। বাড়িঘরের চিহ্ন নেই।
এ পনেরো মিনিট পর যখন বন আরও ঘন হতে দেখল, আর জিজ্ঞেস না করে পারল না সে, এদিক দিয়ে কি সত্যি বেরোনো যাবে?
জবাব পেল না। হঠাৎ করে চুপ হয়ে গেছে ডেরিয়াল।
আবার জিজ্ঞেস করল রিটা।
ভারী গলায় জবাব দিল ডেরিয়াল, বেরোনো যাবে, কিন্তু আমি থানায় যাব না। সন্দেহটা ঠিকই করেছ তুমি। পালাতে আর পারবে না, ডেলটা গার্ল। ধরা পড়ে গেছ।
ডেলটা গার্ল!

কেন, জানো না নাকি? তুমিও ডেলটাদের একজন। অসামান্য ক্ষমতাধর। কিন্তু আজ আর কিছু করতে পারবে না তুমি।
ডেলটাদের একজন মানে? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।
না পারার তো কথা নয়। মাত্র সেদিনই তো কিশোর পাশার নকল একজন ডেলটা এসেছিল। ওর নাম এজেন্ট নিমো। মিশন সাকসেসফুল না করেই চলে যেতে হয়েছে তাকে।
এখন আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?
গেলেই দেখতে পাবে।
চুপ হয়ে গেল ডেরিয়াল।
বিপদটা আঁচ করতে পারল রিটা। ডানা হিউগ্রি আর কিশোর পাশার মত তাকেও হয়তো উধাও করে দেয়া হবে।
পালানোর কথা চিন্তা করতে লাগল সে। জানালা দিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়া যাবে? উঁহু! এটা মিনি-হাজত এখান থেকে বেরোনো অসম্ভব। সেজন্যেই এ রকম জায়গায় তাকে বসতে দিয়েছে। ডেরিয়াল।
হঠাৎ মনে পড়ল ওদের ভলভো গাড়িটার কথা। সে-রাতে রাস্তার মাঝে রহস্যময়ভাবে ডেড হয়ে গিয়েছিল। মনে পড়ল, মার কথা। মা বলেছে যে অসামান্য ক্ষমতা রয়েছে তোর, প্রয়োজনে। সেটা প্রয়োগ করবি। কি ক্ষমতার কথা বলেছে মা, বুঝে গেছে রিটা। ব্যাটারি থেকে শক্তি শুষে নিয়ে নিজের শরীরে স্টোর করতে পারে সে। পরে সেটা ব্যবহার করে শত্রুকে নাস্তানাবুদ করে দিতে পারে। ভলভোর ব্যাটারি থেকে নিজের অজান্তে শক্তি শুষে নিয়ে সেদিন চার্জশূন্য করে দিয়েছিল বলেই থেমে গিয়েছিল ইঞ্জিন। সেই শক্তি পরে ব্যবহার করেছে ছেলেগুলোর ওপর।
হাসি ফুটল রিটার মুখে।
চোখ বন্ধ করে ধ্যানের জগতে চলে গেল সে। আশ্চর্য এক শক্তি অনুভব করতে শুরু করল শরীরে। রেডিওটা বাজতে বাজতে হঠাৎ চুপ হয়ে গেল। মাঝপথে অকস্মাৎ বন্ধ হয়ে গেল ইঞ্জিন। মরে গেল যেন গাড়িটা।
ঝটকা দিয়ে ফিরে তাকাল ডেরিয়াল। গর্জে উঠল, জলদি ইঞ্জিন চালু করো!
চিৎকার শুনে চমকে চোখ মেলল রিটা।
তাড়াতাড়ি করো! আবার চিৎকার করে উঠল ডেরিয়াল। ব্যাটারির চার্জ ফিরিয়ে দাও!
রাগটা কমান, শান্তকণ্ঠে বলল রিটা। কপালের রগ ছিঁড়ে যাবে তো।
তোমাকে জ্যান্ত ধরে নিয়ে যাবার আদেশ আছে আমার ওপর, দাঁতে দাঁত চেপে বলল ডেরিয়াল, কিন্তু জখম না করার কথা বলেনি।

জানালার বাইরে তাকাল রিটা। এখনও বুনো অঞ্চলে রয়েছে। আর কোন গাড়ির চিহ্নও চোখে পড়ল না।
আপনাকে তিনটে শব্দ বলার আছে আমার।
কি?
ধরতে পারলে ধরুন! বলেই গাড়ির দরজার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল রিটা। ছরছর করে গোলাপী রঙের স্ফুলিঙ্গ-বৃষ্টি শুরু হলো যেন। দপ করে জ্বলে উঠল কমলা আগুন। প্রচণ্ড শক্তির কাছে হার মানতে বাধ্য হলো দরজাটা। কজা, লক সব ভেঙে খুলে গিয়ে ছিটকে পড়ল বাইরে। এক লাফে গাড়ি থেকে বেরিয়ে বনের দিকে দৌড় দিল সে।
পিছু নিল ডেরিয়াল।
রিটার চেয়ে শক্তিশালী সে। দ্রুতগতি। মাথা না খাটালে কয়েক মিনিটের মধ্যেই ধরা পড়ে যাবে, বুঝে গেল রিটা। প্রাণপণে ছুটতে ছুটতে কি করা যায় বুদ্ধি বের করার চেষ্টা করল।
সামনে তারের বেড়া দেখা গেল। সাইনবোর্ডে লেখা:
খাবার পানি সরবরাহ কেন্দ্র।
সর্বসাধারণের প্রবেশ নিষেধ।
ওই বেড়া ডিঙানো কোন ব্যাপারই না তার জন্যে।
সাইনবোর্ডের নির্দেশ অমান্য করল সে। কাঠবিড়ালীর মত বেড়া বেয়ে উঠে লাফিয়ে নামল অন্যপাশে। ফিরে তাকিয়ে দেখল, চোখ দুটো আর স্বাভাবিক মানুষের মত নেই ডেরিয়ালের। অদ্ভুত আকৃতি হয়ে গেছে। গোল গোল চাকতি। হীরার দ্যুতির মত রাগের আগুন বেরোচ্ছে যেন ও দুটো থেকে। দৌড়ে কোন লাভ হবে না, মেয়ে। পালাতে পারবে না আমার হাত থেকে। ৯৪
জবাব না দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল রিটা। দৌড়ে ঢুকে পড়ল আবার বনের মধ্যে।
ডেরিয়ালের বেড়া ডিঙানোর শব্দ কানে এল। ছুটে আসছে দ্রুত।
নাহ, পালানো সম্ভব না। পাল্টা আঘাত হানার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল রিটা। একটা বুদ্ধি এসেছে মাথায়। সামান্য ঘুরে কিছুটা সরে গিয়ে ফিরে চলল বেড়ার দিকে।
আবার বেড়া ডিঙিয়ে অন্যপাশে চলে এল। না দৌড়ে আর, দাঁড়িয়ে রইল।
দেখতে পেল ডেরিয়ালকে। ছুটে এসে তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবাক হলো ডেরিয়াল। থামল না। এ পাশে আসার জন্যে তরতর করে বেড়া বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল।
গাড়ির ব্যাটারি থেকে সংগ্রহ করা অবশিষ্ট শক্তিটুকু বেড়ার ওপর প্রয়োগ করল রিটা। মুহূর্তে গোলাপী আলোর ফুলঝুরি শুরু হলো। সেই সঙ্গে আকাবাকা রঙিন আলোর সরু সরু বিদ্যুতের সাপ নাচানাচি শুরু করল বেড়ার গায়ে। হাই

ভোল্টেজের ভয়ানক বৈদ্যুতিক শক হজম করতে পারল না ডেরিয়াল। চিৎকার দিয়ে পড়ে গেল মাটিতে। যে ভাবে পড়ল, সেভাবেই রইল, নড়ল না আর।
মরল কি বাঁচল, দেখারও সময় নেই রিটার। শত্রুকে কাবু করে আর এক মুহূর্তও দাঁড়াল না। ছুটতে শুরু করল।
মলে এসে যখন পৌঁছল সে, সারা গা বেয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছে। দাঁড়াতে পারছে না। পরিশ্রমে থরথর করে কাঁপছে শরীর। খাবার দরকার? না, খিদে তো বোধ করছে না। বুঝল, কি জিনিস দরকার তার।
ব্যাটারি! রিচার্জ করতে হবে দেহটাকে। ব্যাটারিশূন্য হয়ে গেছে একেবারে।
পথে একটা বুঁদ থেকে রবিনদের মলে আসতে ফোন করে দিয়েছে। এখানে লোকের ভিড়ে ডেরিয়াল বা তার দলের লোকেরা এসে আঘাত হানতে সাহস করবে না। নিরাপদে কথা বলা যাবে।
টলতে টলতে মলে ঢোকার গেটের দিকে এগোল রিটা। দিগন্তরেখার দিকে ঝুঁকে পড়েছে সূর্য। পার্কিং লটে বিরাট লম্বা ছায়া পড়েছে রিটার।
বিকেল শেষ হয়ে আসছে। কতক্ষণ ধরে দৌড়েছে সে? অনন্তকাল!
একটা খেলনা ঘোড়ার ওপর বসে কাঁদছে তিন বছরের একটা বাচ্চা। সারা মুখ আইসক্রীমে মাখামাখি। আরও আইসক্রীমের জন্যে কাঁদছে বোধহয়। ওকে ঘোড়ায় বসিয়ে নিশ্চয় কোন কিছু কিনতে গেছে মা। রিটার দিকে তাকিয়ে চুপ হয়ে গেল বাচ্চাটা।
কারণটা বুঝতে সময় লাগল না রিটার। খাড়া খাড়া হয়ে গেছে চুল। কাপড় ঘেঁড়া। কাদায় মাখামাখি সারা গা। হরর ছবির ভূত। নিশ্চয় বাচ্চাটা তাকে ভূতই মনে করেছে।
কেয়ার করল না রিটা। মলের দিকে এগোল। কিন্তু পা তুলতে পারছে না আর। খেলনা ঘোড়ার কয়েন বক্সটায় হেলান দিয়ে দাঁড়াল।
মুহূর্তে শক্তি ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল শরীরে। ছলকে উঠল রক্তস্রোত। চুলগুলো স্বাভাবিক হয়ে এল।
কয়েকবার জোরে জোরে ঝাঁকি দিয়ে আচমকা থেমে গেল ঘোড়াটা। ডেড। মেশিনের ব্যাটারি আবার রিচার্জ না করলে আর চলবে না।
ঘোড়া থামতেই আবার চিৎকার করে কেঁদে উঠল বাচ্চাটা।
হাঁটতে শুরু করল রিটা। মলে ঢুকল।
দেখল, ওর আগেই এসে বসে আছে রবিন। ভিডিও গেমের দোকানের সামনে অস্থির ভাবে পায়চারি করছে। রিটার দিকে তাকিয়ে বড় বড় হয়ে গেল চোখ। হাঁ করে তাকিয়ে রইল দীর্ঘ একটা মুহূর্ত। তারপর এগিয়ে এল।
জিনা আর মুসা, কোথায়? জানতে চাইল রিটা।

দোকানের ভেতর।
গেম খেলছে?
না। সবাই একসঙ্গে থাকিনি, নিরাপত্তার জন্যে। কে কোন্‌খান থেকে নজর রেখেছে বলা মুশকিল। বুঝতে পারছি শত্রুর চোখ রয়েছে আমাদের ওপর। তাই ছড়িয়ে-ছিটয়ে রয়েছি। আমি তোমার অপেক্ষাই করছিলাম। রিটার ওপর নজর বোলাল রবিন। কিন্তু তোমার অবস্থা তো শোচনীয়। কি হয়েছিল?
আগে বাথরুম থেকে আসি। লোকে কিভাবে তাকাচ্ছে দেখছ না? কাদামাটিগুলো ধুয়ে আসি।
দাঁড়াও, আমরাও আসি তোমার সঙ্গে। জিনা আর মুসাকে ডাকতে ভেতরে ঢুকে গেল রবিন।
ওরা তিনজন বেরিয়ে আসার পর পরই একটা অদ্ভুত ঘটনা। ঘটল। মিটমিট করে উঠল মলের সমস্ত আলো।
খাইছে! অবাক হয়ে রিটার দিকে তাকাল মুসা। তুমি করছ?
নীরবে মাথা নাড়ল রিটা। সে-ও অবাক।
একসঙ্গে নিভে গেল সমস্ত আলো। যে ভাবে নিভল, তাতে মনে হয় মেইন লাইন জ্বলে গেছে। কোথায় খারাপ হয়েছে, সেটা বের করে, সারিয়ে-সুরিয়ে আবার আলো জ্বালতে প্রচুর সময় লাগবে। বাইরে সূর্যও ডুবতে বসেছে। গোলাপী-কমলা আলোর খেলা ম্লান করে দিয়ে দ্রুত এগিয়ে আসছে নীলচে-ধূসর গোধূলি।
বাতি নিভে যাওয়ায় মল জুড়ে শুরু হলো চিৎকার চেঁচামেচি। লুটপাটের ভয়ে তাড়াতাড়ি শাটার নামিয়ে দিতে শুরু করল দোকানদাররা। করিডরে ছোটাছুটি করছে লোকে। হলে উদ্বিগ্ন। ক্রেতার ভিড়। কি হয়েছে জানতে চাইছে সবাই।
কালো পোশাক পরা চারজন গার্ডের আবির্ভাব ঘটল এ সময়। কালো সানগ্লাস, কালো শার্ট, কালো প্যান্ট, কালো বেজবল ক্যাপ নিয়ে অন্ধকারে চমৎকার ভাবে মিশে যাওয়ার সুযোগ হলো।
ওদের। তবে হাতে টর্চ আছে চারজনেরই।
এদিক দিয়ে আসুন, প্লীজ, টর্চের আলো নেড়ে উত্তেজিত ক্রেতাদের পথ দেখাল একজন। ঘাবড়াবেন না। আসুন।
দ্রুত সাড়া দিল লোকে। পথ দেখিয়ে সবাইকে গেটের দিকে নিয়ে চলল গার্ডেরা। সারির পেছনে রইল চার গোয়েন্দা।
গার্ডগুলোকে সন্দেহ হচ্ছে আমার, নিচুস্বরে রবিন বলল। দেখছ, কেমন টর্চের আলো ফেলছে সবার মুখে? কাউকে খুঁজছে ওরা।
আমাদের! রিটার কণ্ঠে শঙ্কা।

তাই তো! জিনা বলল। দেখো, চোখ থেকে সানগ্লাস খুলছে না ওরা। তারমানে চোখ দেখলেই চমকে যাবে লোকে। বনের মধ্যে সে-রাতে নকল কিশোরের চোখ কি রকম ছিল মনে আছে?
ঠিক, মুসাও একমত। অন্ধকারে সানগ্লাস পরে আছে কেন নাহলে?
তারমানে ওদের চোখে পড়া চলবে না, উদ্বিগ্ন, শোনাল রবিনের কণ্ঠ। পালাতে হবে। সরে যেতে হবে কোনদিকে।
কিন্তু ভেতরে তো অন্ধকার, রিটা বলল। দেখতে পাব না কিছু। তা ছাড়া আরও গার্ড থাকতে পারে। ব্লাউজ চুরি করেছি ভেবে আমাকে সেদিন যারা ধরে নিয়ে গিয়েছিল, তাদের কেউ থাকলে মহা মুশকিলে ফেলে দেবে।
তাহলে! চিন্তায় পড়ে গেল রবিন। যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে। দ্রুত বেরিয়ে যাচ্ছে সামনের লোকগুলো। ছোট হয়ে। আসছে সারি।
হঠাৎ একজন গার্ড আলো ফেলল ওদের দিকে। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত স্থির হয়ে রইল আলোটা। সঙ্গীদের কিছু বলল বোধহয় লোকটা। একসঙ্গে চারটে আলো এসে পড়ল ওদের মুখে।
আর কোন উপায় নেই। চিৎকার করে উঠল ররিন, পালাও!

.

গেট ছেড়ে দৌড় দিল চার গার্ড। তাড়া করল ওদের।
ছুটতে ছুটতে রিটা বলল, ছোটাছুটি করে লাভ হবে না। পালাতে পারব না। ওদের ক্ষমতা অসীম। আমরা আছি, জেনে গেছে। না ধরে আর ছাড়বে না।
মলের মেইন গেট লাগানোর শব্দ শোনা গেল।
ওই যে, মুসা বলল, গেট লাগিয়ে দিচ্ছে। খাঁচার মধ্যে আটকে ফেলে ধরবে আমাদের।
ছুটতে থাকো, রবিন বলল। থেমো না।
কিন্তু এ ভাবে দৌড়ে কিছু হবে না তো, জিনা বলল। একটা বুদ্ধি বের করা দরকার আমাদের।
সামনে আরেকটা বড় দরজা। ওটার অন্যপাশে আসার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়াল রিটা। খেলনা ঘোড়াটার ব্যাটারি থেকে যেটুকু শক্তি সঞ্চয় করেছিল, সেটা ব্যবহার করে লাগিয়ে দিল। ইলেকট্রনিক দরজাটা। গার্ড আর ওদের মাঝে ভারী একটা প্রতিবন্ধকতা তৈরি হলো।
বন্ধুদের দিকে ফিরে তাকাল রিটা। এটা দিয়েও ঠেকানো যাবে না ওদের। দুমিনিট। বড় জোর তিন।
মাঝেসাঝেই মলে কেনাকাটা করতে আসে জিনা। তার দিকে–তাকাল রবিন। জিনা, পেছন দিকে বেরোনোর দরজা-টরজা আছে, বলতে পারবে?

এ তলায়? উঁহু, জবাব দিল জিনা। এসকেলেটরটা রয়েছে। মেইন গেটের দিকে।
না, ওদিকে যাওয়া যাবে না। রিকি হয়ে যাবে।
রিটাও বহুবার এসেছে এই মলে। জিনার চেয়ে কম চেনে না। বরং বেশিই চেনে। কোথায় কোথায়, কি আছে মনে করার চেষ্টা করল। পেছন দিয়ে বেরোনোর পথ নেই। তবে একটা বিকল্প আছে! প্রায় চিৎকার করে উঠল সে, শূ এলিভেটর।
কি? বুঝতে পারল না মুসা।
অনেকটা ডাম্বওয়েইটারের মত কাজ করে ওটা, জবাব দিল রিটা। জুতো বয়ে আনে।
শুধু কিছু জুতো বওয়ানোর জন্যে একটা এলিভেটর বানিয়ে ফেলেছে ওরা? অবাক না হয়ে পারল না রবিন।
হ্যাঁ, বানিয়েছে। তবে কিছু জুতো নয়, অনেক, রিটা বলল। যে জুতোটা তোমার পছন্দ, জানাবে সেলসম্যানকে, মিনিটের মধ্যে ওই মিনিএলিভেটরে করে এসে হাজির হবে তোমার
ভাল বুদ্ধি করেছে, প্রশংসা করল রবিন।
জুতো কিনতে আসিনি আমরা, মনে করিয়ে দিল মুসা। কাজেই এলিভেটরের প্রশংসা না করে ওটা দিয়ে কাজটা কি হবে সেটা জানতে পারলে ভাল হয়।
রিটার কথা বুঝে গেছে রবিন। তুড়ি বাজিয়ে বলল, ঠিক! রিটা, ঠিক! তোমার বুদ্ধি আছে!
নাহ্, নেতৃত্ব পেলেই এরা সবাই কিশোর পাশা হয়ে যায়! তিক্তকণ্ঠে বলল মুসা। দুর্বোধ্য কথাবার্তা! মূল্যবান সময় নষ্ট না করে বলেই ফেলো না ছাই কি বলতে চাও।
বুঝতে পারছ না? জুতো বয়ে আনে, তারমানে ওটার সার্বক্ষণিক অবস্থান হলো স্টোরের মধ্যে। যে তলায় স্টোর আছে সেই তলায় রাখা হয় ওটা। রিটাকে জিজ্ঞেস করল রবিন, রিটা, আমাদের ভার বইতে পারবে ওটা?
জিনাও দেখেছে এলিভেটরটা। জুতো বয়ে আনার জিনিস, মানুষের ভার বইতে পারবে না। তবে ওটা খুলে নিয়ে শ্যাফটটা ব্যবহার করতে পারব আমরা।
জলদি এসো! ছোটার গতি বাড়িয়ে দিল রবিন।
এলিভেটরটা খুঁজে পাওয়া কঠিন হলো না। ছোট বাক্সমত কারটা খোলার চেষ্টা করে দেখল সে। খুলল না। অত সহজ হবে না খোলা।
সবাই মিলে চেষ্টা করতে লাগল। খুলল অবশেষে।
খুলে ওটা নামিয়ে রাখল ওরা, এই সময় বিকট শব্দ হলো। পেছনে। কোন কিছু ভেঙে পড়েছে। ফুটখানেক পুরু, পনেরো ফুট উঁচু ভারী দরজাটাই হবে।
গেল লাখ লাখ ডলারের দরজাটা, মুসা বলল।

ভাঙল কি করে! জিনা অবাক।
ওরা মানুষ নয়, আগেই তো বলেছি, রিটা বলল। ওদের ক্ষমতা অসীম।
সামনের এলিভেটরের শ্যাফটটার দিকে তাকাল সবাই। চৌকোনা লম্বা একটা গর্ত। চওড়া খুব বেশি না। তবে একবারে একজন করে ঢুকতে পারবে।
গার্ডদের ছুটন্ত পায়ের শব্দ কানে এল।
আগে আমি যাচ্ছি, মুসা বলল। দোখ, নিরাপদ কিনা।
কে আগে যাবে সেটা নিয়ে তর্ক করার সময় নেই। নিচে নেমে আমাদের জন্যে অপেক্ষা কোরো না, রবিন বলল। দৌড়াতে শুরু করবে। ভাগাভাগি হয়ে একেকজন একেকদিকে চলে যাওয়াটাই ভাল। সবাইকে একসঙ্গে ধরা পড়তে হবে না।
আইডিয়াটা খারাপ লাগল না রিটার। কিন্তু অন্ধকারে একা হয়ে যাওয়ার কথাটা ভাবতেও ভাল লাগল না।
*
শ্যাফট বেয়ে নেমে চলেছে রিটা। দুই হাতের তালু দুই দেয়ালে এমন শক্ত করে চেপে রেখেছে যাতে পড়ে না যায়। কোন কারণে হাতের চাপ ঢিল হলেই বিশ ফুট নিচের কংক্রীটের মেঝেতে গিয়ে পড়তে হবে।
স্টোররুমে নেমে এল সে। সবাই ওর আগে নেমে গেছে। ওপরে প্রচণ্ড শব্দ। ভাঙচুর করছে গার্ডেরা। শ্যাফটটা ওদের নজরে পড়তে দেরি হবে না। পড়লেই বুঝে যাবে সব।
রবিন! অন্ধকারে, ফিসফিস করে ডাকল রিটা। মুসা! জিনা!
জবাব নেই। পরিকল্পনা অনুযায়ী যার যার পথে চলে গেছে ওরা নিশ্চয়।
ভারী দম নিল রিটা। কম্পিত নিঃশ্বাস।
হাতড়াতে হাতড়াতে এগোতে শুরু করল সে। হাতে লাগছে জুতোর সারি। অবশেষে একটা ধাতব স্পর্শ পেল। দরজা। আস্তে করে ঠেলে খুলে বেরিয়ে এল।
নিচতলাটা ওপরের চেয়ে অনেক বেশি অন্ধকার মনে হয়। তবে এতবার এসেছে এ জায়গায়, মুখস্থ হয়ে গেছে, অনুমানের ওপর নির্ভর করে এগোতে পারল তাই।
কিন্তু যাবে কোথায়?
যেখানেই যাক, সে জানে, লোকগুলো তাকে খুঁজে বের করে ফেলবে। ভেতরে খুঁজছে চারজন। মেইন গেটের কাছেও নিশ্চয় আরও অনেকে অপেক্ষা করছে।
বনবন করে ভাবনার চাকাগুলো ঘুরতে আরম্ভ করল তার।
কি করা যায়? টাইম-জাম্প করে লাভ হবে? তাহলে আর ওরা ধরতে পারবে না তাকে। তেরো বছর যদি পিছিয়ে চলে যায়, কি করে খুঁজে পাবে! কিন্তু সময়-

ভ্রমণে অভ্যস্ত নয় এখনও সে। কিভাবে নিজে নিজে যাতায়াত করতে হয়, জানে না।
ব্লাউজটা দরকার। যেটাতে, প্রোগ্রামিং করা আছে ১৯৮৭ সাল। কিন্তু নেই ওটা সঙ্গে। ডেরিয়ালের সঙ্গে বেরোনোর সময় গায়ে দেয়ার প্রয়োজন মনে করেনি। আচ্ছা, মনোনিবেশ করার জন্যে একমাত্র ব্লাউজটাই কি দরকার? বিকল্প কিছুতে কাজ হবে না? চকিতে মাথায় এসে গেল ছবিটার কথা। চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে।
করিডরের শেষ মাথায় অন্ধকারের মধ্যে আবছা ধূসর একটা চৌকোনা বস্তুর মত চোখে পড়ল মেইন গেটটা। জুতো খুলে ফেলে নিঃশব্দে পা টিপে টিপে এগোল সে। কাছে এসে দেখল, তার অনুমান ঠিক। গেটের কাছে পাহারা দিচ্ছে একজন। গার্ড।
লোকটা তাকে দেখতে পাওয়ার আগেই ইনফরমেশন কিসকের কাছে সরে গেল রিটা। হাত বাড়িয়ে খুলে আনল দেয়ালে টানানো নিজের ছবিটা। গার্ড-ইন-চার্জকে তখন পায়ে হাত দিয়ে সালাম করতে ইচ্ছে হলো তার, ছবিটা ওখানে টানানোর জন্যে।
এত অন্ধকার এখানে, ছবি দেখাটা খুব কঠিন। কাউন্টারের কাছ থেকে সরে এল, যেখানে কাঁচের দরজার ভেতর দিয়ে অতি সামান্য আবছা আলো চুঁইয়ে প্রবেশ করছে। দেখতে পেল ছবিটা। ব্লাউজের ওপর কেন্দ্রীভূত করল দৃষ্টি। কল্পনায় দেখতে শুরু করল। ব্লাউজ পরা অবস্থায় তার নিজের ছবি। অদ্ভুত এক অনুভূতি হলো। দাঁড়িয়ে যাচ্ছে ঘাড়ের রোম।
তারমানে কাজ হচ্ছে!
মাথার ওপরে গুঞ্জন শুরু হলো।
মুখ তুলে তাকে দেখে ফেলল গার্ড।
ওয়াকি-টকিতে মুখ লাগিয়ে চিৎকার করে উঠল সে, টার্গেট এখানে!
দৌড়াতে শুরু করল লোকটা। বিশ গজ দূরে রয়েছে। দ্রুত চলে আসছে কাছে।
সময়ের দরজা সময়মত খুলবে কিনা বুঝতে পারছে না রিটা। ছবিটা শক্ত করে চেপে ধরল। গুঞ্জন বাড়ছে।
কঠিন কয়েকটা আঙুল চেপে ধরল তার কাধ। কথা বলে উঠল যান্ত্রিক একটা কণ্ঠ, এবার যাবে কোথায়!
ফিরে তাকাল রিটা। কালো সানগ্লাস খুলে ফেলেছে গার্ড। টর্চের আলোর আভায় ভয়ঙ্কর দুটো চোখ দেখতে পেল রিটা।
ছাড়ুন আমাকে, নিজের শান্ত, কণ্ঠ শুনে নিজেই অবাক হয়ে গেল সে। কিছু প্রশ্ন আছে আপনার কাছে।

কি প্রশ্নঃ ছাড়ল না গার্ড।
সময় নিতে চাইছে রিটা। গুঞ্জনটা যখন শুরু হয়েছে, জাম্প করতে পারবে বুঝতে পারছে।
দপ করে চোখের সামনে থেকে নিভে গেল টর্চের আলো।
পরক্ষণে উজ্জ্বল দিবালোকে বেরিয়ে এল সে।
চারপাশে তাকাতে লাগল রিটা। দল বেধে কেনাকাটা করতে চলেছে ক্রেতারা। কি ঘটেছে; জানা আছে তার। তারপরেও অবাক না হয়ে পারল না। আবার অতীতে চলে এসেছে। আপাতত ভিনগ্রহবাসী গার্ডদের হাত থেকে বাঁচলেও অল্পক্ষণের মধ্যেই আবার তাকে ফিরে যেতে হবে বর্তমানে। বাইরে যখন বেরোতেই পেরেছে, বাঁচার একটা উপায় করে তবেই আবার ঢুকবে ভবিষ্যতের অন্ধকার মলে।
একটা ইলেকট্রনিক জিনিসপত্রের দোকানে ঢুকল সে। মুখ তুলে তাকাল সেলসক্লার্ক। ডিসেম্বরের শীতে ওর গায়ে গরমের পোশাক দেখে অবাক হয়ে গেল। মিষ্টি করে হেসে তার অবাক। ভাবটা কাটিয়ে দেয়ার চেষ্টা করল রিটা। বলল, হালো। আমি কিছু একটা কিনতে চাইছি, বাবার জন্মদিনে উপহার দেয়ার জন্যে।
*
কয়েক সেকেন্ড পরেই দোকান থেকে বেরিয়ে এল রিটা, পেছনে হাঁ হয়ে থাকা সেলস-ক্লার্ককে রেখে। হতবাক হয়ে দোকানের জিনিসপত্রগুলো দেখছে সে। বুঝতেই পারছে না, হঠাৎ কি এমন। ঘটে গেল যে বন্ধ হয়ে গেল চালু করে রাখা রেডিও-টেলিভিশন অডিও সেটগুলো!
করিডর ধরে দ্রুত এগুলো রিটা। শক্তিতে টইটম্বুর হয়ে আছে দেহ। প্রজাপতির মত পাখা মেলে উড়ে চলেছে যেন।
খেলনার দোকানের পাশ দিয়ে যেতে যেতে আরেকটা বুদ্ধি খেলে গেল মাথায়। থমকে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইল র‍্যাকে রাখা আলট্রা সোকার ওয়াটার গানটার দিকে। খানিক দূরে একটা বাচ্চা ছেলে আরেকটা খেলনা হাতে নিয়ে দেখছে- একটা বড়, চকচকে সবুজ ডাবল-ব্যারেল খেলনা রাইফেল।
এগিয়ে গেল সে। হাত বাড়াল ছেলেটার দিকে, দেবে একটু? দেখব।
এক মুহূর্ত রিটার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে হাত সরিয়ে নিল ছেলেটা।
দাও, খোকা, জোর দিয়ে বলল রিটা। তোমার চেয়ে বেশি প্রয়োজন ওটা আমার।
কাঁধে টোকা পড়তে ফিরে তাকাল রিটা। দোকানের ম্যানেজার। বেজির মত মুখ। সরু কুৎসিত গোঁফ। মুখটাকে গোমড়া করে রেখে জিজ্ঞেস করল, জন্মদিনে দেবে?
না।

সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে দ্রুত। ছাতের আলোগুলোর দিকে তাকাল সে। এখনও উজ্জ্বল। মিটমিট শুরু হওয়ার আগেই যা করার করে ফেলতে হবে।
হু। ...যাকগে, কি জন্যে কিনবে সেটা তোমার ব্যাপার।...পছন্দ হয়েছে? জিজ্ঞেস করল লোকটা।
মাথা ঝাঁকাল রিটা। র‍্যাক থেকে তুলে নিল আলট্রা সোকারটা। একটা শপিং ব্যাগ চেয়ে নিয়ে আরও কতগুলো খেলনা র‍্যাক থেকে নামিয়ে দ্রুত ভরে ফেলল।
এগুলোর দাম... বলতে গেল ম্যানেজার।
দরজার দিকে রওনা হয়ে গেছে রিটা। ভেতরে থাকলে আটকা। পড়তে হবে।
চিৎকার করে উঠল ম্যানেজার, আরে আরে, কোথায় যাচ্ছ...
কথা শেষ হলো না। মিটমিট করতে লাগল বাতিগুলো। সেই সঙ্গে গুঞ্জন।
দপ করে নিভে গেল বাতি।
ভিন্ন আরেক নাটক চলছে তখন কাচু-পিকচুতে। ভীষণ ক্লান্ত হয়ে বিছানায় গড়িয়ে পড়ল কিশোর। শরীরের প্রতিটি পেশিতে ব্যথা। কাপড় খুলতেও ইচ্ছে করল না তার।
এত ক্লান্তির পরেও ঘুম এল না। যতবার চোখ বোজে, গলাকাটা গরুটার চেহারা ফুটে ওঠে তার কল্পনায়। ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল গরুর চেহারা, তার জায়গা দখল করল সিসির মুখ।
সিসিকে কেন সন্দেহ করছে ওরা? জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে ভাল আচরণ করে সে, ওগুলোও তাকে পছন্দ করে, তার কথায় সাড়া দেয়। এর মধ্যে অশুভ ক্ষমতাটা কোথায় দেখতে পেল লোকে?
হঠাৎ ঝটকা দিয়ে উঠে বসল বিছানায়। ঘোড়ার খুরের শব্দ।
গায়ের ওপর থেকে চাদরটা টান মেরে সরিয়ে ফেলে বিছানা থেকে নেমে পড়ল। বুকের মধ্যে কাপুনিটা বেড়ে গেছে। জানালার কাছে এসে বাইরে উঁকি দিল।
চোখে পড়ল দলটাকে। দম আটকে আসতে চাইল।
সামনের আঙিনায় ঘুরে বেড়াচ্ছে ওরা। কতজন? পাঁচ...দশবারো? নাকি আরও বেশি?
রাতের অন্ধকারে ছায়ার মত নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে।
কি চায়? শেষ পর্যন্ত হুমকিটা কার্যকর করতেই কি চলে এল?
সিসিকে খুন করতে?
পেছনের কাঠের মেঝেতে শব্দ হতে পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল সে।
ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে হেনরি আর সিসি। তাকিয়ে আছে ওর দিকে। আতঙ্কিত।
ওরা এসে গেছে, তাই না? কাঁপা ফিসফিসে কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল সিসি।
জোরে একবার মাথা ঝাঁকি দিল কিশোর, হ্যাঁ।

পাশে এসে দাঁড়াল দুই ভাই-বোন। একসঙ্গে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে তাকাল সবাই। ঘোড়াগুলোর ঘোরাঘুরি বন্ধ হয়েছে। লম্বা সারি দিয়ে দাঁড় করিয়েছে তাদের সওয়ারিরা।
আজ আরও অনেকগুলো গরুকে মেরে ফেলতে হয়েছে, চিৎকার করে বলল একজন।
এর জন্যে দায়ী হচ্ছে ওই ডাইনী মেয়েটা, জন ফ্রেঞ্চ বলল। ওর স্লিঙে ঝোলানো হাতটাকে লাগছে সাদা তেকোনা নিশানের। মত। ওকে নামিয়ে দাও। বাকি দুজনকে কিছু করব না।
কিশোরের গা ঘেঁষে এল সিসি। ওর গায়ের কাপুনি টের পাচ্ছে কিশোর। কাঁধে একটা হাত রেখে সান্ত্বনা দিল। তার অন্য হাতটা আঁকড়ে ধরল আতঙ্কিত হেনরি।
আপনাদের গরুগুলো মারা যাচ্ছে, এ জন্যে সত্যি দুঃখিত আমরা, জবাব দিল কিশোর। এতে সিসির কোন হাত নেই। দয়া করে চলে যান আপনারা। আমাদের একা থাকতে দিন।
সব শয়তানির মূলে ওই ডাইনী মেয়েটা, মার্ক ফ্রেঞ্চ বলল। নেকড়ে আর সাপ নিয়ে কি করেছে, সব শুনেছি আমরা। আমাদের সবারই গরু মরছে, তোমাদের একটাও মরে না কেন? … .তুমি বাইরের লোক, কিশোর পাশা, তোমার সঙ্গে আমাদের কোন শত্রুতা নেই। মেয়েটাকে পাঠিয়ে দাও এখানে, তোমার কিছু করব না আমরা।
জলদি বের করে দাও শয়তানীটাকে! বলল আরেকজন।
জীবনেও না! চিৎকার করে উঠল কিশোর। আমার প্রাণ থাকতে নয়!
বেশ, মরো তাহলে, জন ফ্রেঞ্চ বলল। তোমাকে একটা সুযোগ দিয়েছিলাম, কিশোর পাশা, নাওনি…
একটা মশাল জ্বলে উঠল। পটাপট জ্বলে উঠল আরও কয়েকটা। মশাল হাতে ঘোড়ায় চেপে বাড়ির চারপাশে চক্কর। দিতে শুরু করল লোকগুলো।
লাগিয়ে দাও! দেখছ কি? মার্কের চিৎকার শোনা গেল। পুড়িয়ে মারো ডাইনীটাকে!
বাড়ির দিকে একজনকে মশাল ছুঁড়ে দিতে দেখল কিশোর।
ওপরের বারান্দার একপ্রান্তে এসে পড়ল মশালটা। কিশোরের জানালার সামনে নেচে উঠল আগুন।
চিৎকার করে উঠল সিসি।
জলদি! বলল কিশোর, বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে হবে আমাদের! জানালার কাছ থেকে ঠেলা দিয়ে সিসিকে সরিয়ে দিল সে।

হেনরিকে পিঠে তুলে নিয়ে সিসির পিছু পিছু এসে ঢুকল হলওয়েতে। ঝনঝন করে কাঁচ ভাঙছে। জানালা দিয়ে ঘরের ভেতরে মশাল ছুঁড়ে মারছে লোকগুলো। গুলির শব্দ হলো।
সিঁড়ি দিয়ে ধোঁয়া উঠে আসছে কুণ্ডলী পাকিয়ে। থমকে দাঁড়াল। সিসি। পেছন থেকে তাকে ঠেলা দিল কিশোর। থামলে কেন? আর কোন পথ নেই!
এলোমেলো পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করল সিসি। হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল, ধরে ফেলল তাকে কিশোর। কিশোরের গলা পেঁচিয়ে ধরে পিঠের ওপর ঝুলছে হেনরি।
বাতাসের জন্যে আকুলি-বিকুলি করছে কিশোরের ফুসফুস। ধোয়া ঢুকে গেছে। চোখ জ্বালা করছে। কালো ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে কাশতে কাশতে নেমে চলল সিঁড়ি বেয়ে। এলোমেলো পা ফেলছে সে-ও। হেনরির হাতটা ঢিল করার চেষ্টা করল। বরং শক্ত হলো সেটা আরও। ধোয়া থেকে বাঁচার জন্যে মুখ চেপে ধরল। কিশোরের কাঁধে। সমানে কাশছে।
মরতেই হবে বোধহয় আজ, ভাবছে কিশোর। কিন্তু এত সহজে হাল ছেড়ে দেয়ার পাত্র সে নয়।
পৌঁছে গেল নিচতলায়। ঘুরছে, পাক খাচ্ছে আগুনের শিখা; ধারাল নখর বের করে থাবা মারছে যেন কাঠের দেয়ালের গায়ে। মাথার মধ্যে দপদপ করছে কিশোরের। ভয়াবহ উত্তাপ ওকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে।
বাঁচতে হলে এখনই বেরিয়ে যেতে হবে।
ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে গলা বাড়িয়ে তাকাতে লাগল সে। কোনদিকে যাবে? চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলেছে আগুন।
সামনের দিকে যাও! চিৎকার করে উঠল আচমকা। সামনের ঘরটা দিয়ে বেরোতে হবে!
পায়ের কাছে লকলক করছে আগুনের শিখা। পরোয়া করল না। সোজা দৌড় দিল হলওয়ে ধরে সামনের বারান্দার দিকে। দেয়াল থেকে লাফ দিয়ে দিয়ে সামনে এসে পড়ছে আগুন। ওগুলোর চারপাশে নাচানাচি করে বাঁচার চেষ্টা করতে লাগল। কিশোর। মুখের চামড়া ঝলসে যাচ্ছে। ঝাঝাল ধোয়া চোখ পোড়াচ্ছে।
ছেলে-মেয়ে দুটোকে বের করে নিয়ে যেতেই হবে!-বার বার নিজেকে বলছে সে। ওদের বাঁচাতেই হবে।
দাঁড়িয়ে গেছে সিসি। তাকিয়ে আছে আগুনের দিকে। দিনের আলোর মত আলোকিত হয়ে গেছে ঘর। গাল বেয়ে পানি নামছে। কেঁদে ফেলল, বেরোনোর জায়গা নেই, কিশোরভাই!

বুকের মধ্যে হাতুড়ি পিটাচ্ছে কিশোরের হৃৎপিণ্ড পাগলের মত চারপাশে তাকাচ্ছে সে। পিছিয়ে যাওয়ার পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে আগুনের চাদর। সামনের দরজায় লাফালাফি করছে ছোট ছোট শিখা। মড়মড় শব্দ হলো। হাতের কড়িকাঠ ভাঙতে শুরু করেছে।
বাড়িটাকে আগুনের পুরোপুরি গ্রাস করে ফেলতে আর বেশি দেরি নেই। যে কোন মুহূর্তে তাসের ঘরের মত ধসে পড়বে। চিড়ে-চ্যাপ্টী করবে ওদের। তারপর পুড়িয়ে ছাই করবে।
হেনরিকে পিঠ থেকে বুকের ওপর নিয়ে এল কিশোর। সিসিকে বলল, শক্ত করে আমার শার্ট চেপে ধরো। ওই দরজাটা। দিয়ে বেরোব।
দুই হাতে কিশোরের শার্ট খামচে ধরল সিসি। ফোপানি থামাতে পারছে না কোনমতে। হেনরিকে চেপে ধরে দরজার দিকে দৌড় দিল কিশোর। কাঁধের একপাশ দিয়ে প্রচণ্ড ধাক্কা মারল পুড়তে থাকা কাঠে।
ছুটে গেল কব্জা।
বাইরে হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে সামলে নিল। হেনরিকে ছাড়েনি। ওকে চত্বরে নামিয়ে দিয়ে ফিরে তাকাল সিসির অবস্থা। দেখার জন্যে। শেষ মুহূর্তে শার্ট থেকে সিসির হাত ছুটে গেছে। বাইরে বেরিয়ে এসেছে সে।
স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে গিয়েও পারল না কিশোর। বিপদ এখনও কাটেনি।
ঘোড়ার পিঠে চেপে ওদের তিনজনকে ঘিরে চক্কর দিতে শুরু। করল লোকগুলো।
ভেতরে থাকলেই ভাল করতে! ভয়ঙ্কর গলায় বলল মার্ক, তাড়াতাড়ি মরে যেতে। এখন মরবে ধীরে।
কাপুরুষের দল! চিৎকার করে উঠল কিশোর। আমরা কোন অন্যায় করিনি। সিসি নির্দোষ!
ঘিরে ফেলা চক্রটা ছোট করে আনতে লাগল লোকগুলো। ঘোড়ার গরম নিঃশ্বাস পড়তে লাগল কিশোরের মুখে। কাঁধে কাঁধ, গলায় গলা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়েছে ওগুলো। ঘামের গন্ধ পাচ্ছে কিশোর। পশুগুলোর নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ এসে লাগছে নাকে।
পালানোর পথ নেই। ঘোড়ার পায়ের ফাঁক দিয়ে দৌড়াতে গেলে মাটিতে ফেলে খুর দিয়ে মাড়িয়ে তিলে তিলে শেষ করা হবে ওদের। : খসখসে কি যেন গলায় লাগতে ফিরে তাকাল কিশোর। চামড়ার ফালির একটা ফাস তার গলায় নামিয়ে দিচ্ছে মার্ক ফ্রেঞ্চ।
একটা জানোয়ারও আর অবশিষ্ট নেই তোমাদের, বলল সে। এবার তোমাদের পালা। সব কটাকে, ফাঁসিতে ঝোলাব। ইবলিসের ঝাড়-বংশ সব সাফ করে ফেলব।

খেলনার দোকানটার দিকে ঘুরে তাকাল রিটা। শাটার নামানো। নীরব। অন্ধকার। রেগে যাওয়া ম্যানেজার নেই। বাচ্চা ছেলেটা নেই। কোন লোকই নেই।
অন্ধকার করিডরে চোখ বোলাল সে। রবিন কোথায়? মুসা? জিনা?
কয়েক মিনিট পরেই জানতে পারল, তার আশঙ্কাই ঠিক। বেরোতে পারেনি ওরা। সামনের অন্ধকারে, খাবারের দোকানটাতে হুটোপুটির শব্দ। বোধহয় লড়াই করছে।
দৌড় দিল রিটা। সামনের একটা ফোয়ারা থেকে পানি ভর্তি করে নিল সোকার গানটার ম্যাগাজিনে। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, কাজ শেষ হয়ে গেলেই যাদের জিনিস আবার তাদের ফিরিয়ে দিয়ে আসবে। জিনিস দিতে না পারলে, দামটা দিয়ে আসবে।
হঠাৎ থরথর করে কাঁপতে শুরু করল পুরো মল। ভূমিকম্প শুরু হলো নাকি? না, ভূমিকম্প নয়, বড় কোন জেট প্লেন যাচ্ছে। তারপর মনে হলো, উঁহু, জেট প্লেনও নয়। অন্য কিছু।
কি শুরু হলো, এই মলে!
থামল না সে। খাবারের দোকানের কাছে এসে দেখল চেয়ার টেবিল সব উল্টে পড়ে ছত্রখান হয়ে আছে। কোনদিকে তাড়া করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে রবিনদের, বোঝা যায়।
না, বেরোতে ওরা পারেনি। শেষ মাথায় নিয়ে গিয়ে কোণঠাসা করে ফেলেছে গার্ডেরা। পেছন দিকে হাত মুচড়ে ধরে দেয়ালের গায়ে চেপে ধরেছে মুসা, রবিন আর জিনাকে। নড়তেও কষ্ট হচ্ছে, ওদের। লড়াই শেষ। সবার মুখ ওপর দিকে।
কি দেখছে ওরা?
রিটাও স্কাইলাইটের দিকে মুখ তুলে তাকাল।
হাঁ হয়ে গেল মুখ।
একটা ইউ এফ ও ফুড কোর্টের ওপর নেমে আসছে।
ভয়ানক শব্দে ভেঙে পড়ল স্কাইলাইটের কাঁচ। ধীরে ধীরে নামতে শুরু করল যানটা:। বিল্ডিঙের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। ওটার ভীষণ শক্তিশালী জেট ইঞ্জিন থেকে বেরোনো বাষ্প আর আগুনের হলকায় পুড়ে, গলে পানি হয়ে যেতে লাগল প্লাস্টিক। আগুন ধরে গেল চায়না-বান স্ট্যান্ডটায়। বৃষ্টির মত চতুর্দিকে ছিটকে পড়তে লাগল কাঁচ, ধাতু আর কাঠের টুকরো। ভয়াবহ গরম হলকা এসে লাগল রিটার মুখে। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। সত্যি সত্যি একটা ইউ এফ ও নেমে এসেছে মলের ভেতরে।
ছয়টা ধাতব পা বেরিয়ে এল ওটার পেটের নিচ থেকে। পোড়া. মেঝেতে ছড়িয়ে বসল। খুলে গেল হ্যাচওয়ে। তীব্র সাদা আলো ছড়িয়ে পড়ল ঘরের মধ্যে। প্রায়

নিঃশব্দে নেমে এল মইয়ের মত ধাতব সিঁড়ি।
ইউ এফ ও থেকে নামল একজন ভিনগ্রহবাসী। অবিকল মানুষের মতই দেখতে। তবে খুব লম্বা। চোখ দুটো কেবল অস্বাভাবিক। লাল অঙারের মত জ্বলছে ধকধক করে। রূপালী রঙের পোশাক পরনে। হাতে ছোট একটা জিনিস। কোন ধরনের
অস্ত্র। এ কথা বলে উঠল লোকটা। ভারী কণ্ঠস্বর। একেবারে যান্ত্রিক। সিনে রি রোবটেরা ওরকম করে কথা বলে। মুসা, রবিন আর জিনা ক মহাকাশযানে তোলার হুকুম দিল।
ওদেরকে কি প্রয়োজন এই ভিনগ্রবাসীগুলোর? কি করবে নিয়ে গিয়ে?
প্রায় কোন রকম বাধাই দিতে পারল না তিন গোয়েন্দা। মহাকাশযানে তোলা হলো ওদের।
অন্ধকার ছায়ার দিকে তাকিয়ে বলল নেতা গোছের লোকটা, রিটা গোল্ডবার্গ, বেরিয়ে এসো। নইলে তোমার বন্ধুদের খুন করা হবে।
মোটা থামের আড়ালে লুকিয়ে পড়েছে রিটা। ওখান থেকেই জবাব দিল, কি করে বুঝব, আমি বেরোলে আমাকে সহ খুন করবেন না?
ঝটকা দিয়ে তার দিকে ঘুরে গেল নেতার মুখ।
চট করে সরে গেল রিটা। ময়লা ফেলার একটা ধাতব ড্রামের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল।
কাল আমাদের ওপর বসের নির্দেশ আছে, তোমাদের জ্যান্ত ধরে নিয়ে যেতে হবে, জবাব দিল নেতা, যদি সম্ভব হয়। বেশি জ্বালাতন করলে শেষ করে দিতে বলা হয়েছে। এখন ভেবে দেখো, কোনটা তোমার পছন্দ। লাশগুলো নিয়ে গেলেও চলবে। তিনটে তাজা লাশ পেলে কম খুশি হবেন না বস।
ঢোক গিলল রিটা। চিন্তা করল এক মুহূর্ত। তারপর দুই হাত মাথার ওপর তুলে বেরিয়ে এল। এই যে, আমি এসেছি।
বুদ্ধিমতী মেয়ে! একঘেয়ে কণ্ঠস্বর লোকটার। পুরোই রোবটের মত আচরণ। খুব চালাক। বন্ধুদের জীবন বাঁচালে।
লোকটার চোখে চোখে তাকাল রিটা। ওর চেয়ে অনেক লম্বা। পারবে ওর সঙ্গে?
পারতেই হবে!
চোখ বুজল রিটা। ভয় নেই মনে।
শক্তি কেন্দ্রীভূত করছে।
বেজে উঠল সাইরেন। পুলিশের গাড়ির। ময়লা ফেলার পিপাটার কাছ থেকে বেরিয়ে এসে ফুড কোর্টটাকে ঘিরে ফেলল ডজনখানেক গাড়ি তীব্র গতিতে

ছোটাছুটি শুরু করল মেঝেতে। প্রচুর বিদ্যুৎ হজম করেছে রিটা। সেই শক্তি প্রয়োগ করে চালাচ্ছে। খেলনাগুলোকে।
পায়ের কাছে রকেট-গতিতে ছোটাছুটি করতে থাকা। খেলনাগুলো রিটার প্রতি মনোযোগ নষ্ট করে দিল নেতার। এই সুযোগে পিপার আড়ালে চলে এল আবার রিটা। রাইফেলটা হাতে নিয়ে বেরোল।
খবরদার! গর্জে উঠল সে। নেতার দিকে তাক করে ধরেছে খেলনা অস্ত্র। নড়লেই গুলি করব!
দ্বিধায় পড়ে গেল নেতা। অস্ত্রটার দিকে তাকিয়ে আছে। খেলনা। ওটা তোমাকে বাঁচাতে পারবে না।
ট্রিগার টেনে দিল রিটা।
পিচকারির মত তীব্র গতিতে ছুটে গেল রূপালী পানির সরু একটা ধারা। ভিজিয়ে দিল নেতাকে। মুখের ভেতর থেকে থুথু করে পানি ফেলল নেতা। বোকা মেয়ে! তুমি ভেবেছ সিনেমার রোবটগুলোর মত পানি দিয়ে আমাকে গুলিয়ে ফেলবে!
গা বেয়ে পানি পড়ে লোকটার পায়ের কাছে জমা হলো। পায়ের কাছ থেকে পানির একটা রেখা মেঝে বেয়ে রিটার কাছে এসে থেমেছে।
গলাব কেন? জবাব দিল রিটা। কাবাব বানাব।
হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল সে। পানির রেখার মাথাটার ওপর দৃষ্টি স্থির করল। ছিটকে বেরোতে শুরু করল গোলাপী ফুলিঙ্গ। পানি বেয়ে ভয়ঙ্কর ভোল্টের বিদ্যুৎ তীব্র গতিতে ধেয়ে গেল লোকটার দিকে। চোখের পলকে গিলে ফেলল তাকে গোলাপী বিদ্যুতের জাল। মাটিতে পড়ে জবাই করা ছাগলের মত ছটফট শুরু করল সে। তারপর নিথর হয়ে গেল।
চেঁচামেচি শুনে বেরিয়ে এল চার গার্ড। মই বেয়ে দ্রুত নেমে এল নিচে। নেতার দেহটা দেখল।
কে এগোবে এরপর? হুমকি দিয়ে বলল রিটা।
এক মুহূর্ত থমকাল ওরা। তারপর এগিয়ে এসে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করল ওকে।
ওদেরকে কাছে আসার সুযোগ দিল রিটা। হাসি হাসি কণ্ঠে বলল, জো-জো খেলবে? লাফ দিয়ে তার হাতে বেরিয়ে এল একটা লম্বা ধাতব স্প্রিঙের মত খেলনা। মাথার ওপর ঘোরাতে শুরু করল। গোলাপী আলোর চক্র তৈরি করল স্প্রিংটা।
ভয়াবহ বিদ্যুতের ছোঁয়ায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ল চার ভিনগ্রহবাসী গার্ড।
একটা সেকেন্ডও আর দেরি করল না রিটা। পাঁচ-পাঁচটা দানবকে ধরাশায়ী করে আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেছে তার। ওরা জ্ঞান ফিরে পাওয়ার আগেই মই বেয়ে উঠে এসে ঢুকে পড়ল ইট এফ ও-র ভিতরে।

*
মহাকাশযানের ভেতরটা আহামরি কিছু নয়। আধুনিক যাত্রীবাহী জেট প্লেনের পাইলটের কেবিনে যে ধরনের কন্ট্রোল প্যানেল থাকে প্রায় সেই রকম। কেবল ছাতটা অন্য রকম। ঝলমলে সাদা আলোকিত গম্বুজের মত।
হ্যাচটা লাগিয়ে দিল সে। দেয়ালে সুইচ রয়েছে। নিচে লেখা: হ্যাচ। সুইচটা অফ করে দিতেই লেগে গেল হ্যাচ।
ঘুরে তাকাতেই একধারে মুসা, রবিন আর জিনাকে দেখতে পেল সে। দাঁড়িয়ে আছে ওরা। কিংবা বলা যায় দাঁড়ানো অবস্থায় আটকে রাখা হয়েছে ওদের। মেঝে থেকে ছাত পর্যন্ত লম্বা, পরিষ্কার হালকা হলুদ রঙের প্লাস্টিকের মোটা টিউব খাড়া করে রাখা। তাতে ভরে রাখা হয়েছে তিনজনকে। কেমন আচ্ছন্নের মত হয়ে আছে ওরা। ল্যাবরেটরিতে মৃত প্রাণীকে যেমন করে তরল ওষুধের মধ্যে ভরে রাখা হয়, অনেকটা তেমনিভাবে। তফাৎ কেবল, ওরা জ্যান্ত।
কন্ট্রোল প্যানেলের দিকে তাকাল রিটা। আশ্চর্য আরেকটা ক্ষমতা অনুভব করছে নিজের মধ্যে। প্যানেলটা যেন তার বহু পরিচিত। কোন সুইচটা টিপলে কি হবে, প্রায় সবই বুঝতে পারছে।
একটা চারকোনা বোতাম টিপে দিতেই নিঃশব্দে ওপরে উঠে গেল টিউবগুলো। যেন ঘুম থেকে জেগে উঠে মেঝের ওপর দিয়ে তার দিকে হেঁটে এল মুসা, রবিন আর জিনা।
অনেক ধন্যবাদ, রিটা, জিনা বলল। আমি জানতাম, তুমি আসবে।
ভেন্নাগুলোর কি অবস্থা? মুসা জানতে চাইল। বিপদ কি কাটল আমাদের?
এখনও কাটেনি, জবাব দিল রিটা।
তুমি ঢুকলে কি করে? জিজ্ঞেস করল রবিন।
লড়াই করেছি ওদের সঙ্গে। ওরা হেরেছে।
খাইছে! চোখ বড় হয়ে গেল মুসার। একা ওই পাঁচ-পাঁচটা। দৈত্যকে কাবু করে ফেললে!
নইলে কি আর আমাকে এখানে ঢুকতে দিত? তোমাদের মত ধরে নিয়ে আসত। এতক্ষণে আমিও বন্দি হয়ে যেতাম কোন একটা টিউবে।
কথা পরেও বলা যাবে, তাগাদা দিল জিনা। এখান থেকে পালানো দরকার।
গর্তটার কাছে এসে দাঁড়াল আবার সবাই। সুইচটা অন করে দিল রিটা। সরে গেল হ্যাঁচের ভারী ঢাকনাটা।
নিচে দাঁড়িয়ে আছে ভয়ানক রেগে যাওয়া পাঁচজন ভিনগ্রহবাসী।
হ্যাচ লাগানোর জন্যে তাড়াতাড়ি আবার সুইচ টিপল রিটা।

আমি তো ভেবেছিলাম শয়তানগুলোকে মেরেই ফেলেছ বুঝি, ঢাকনাটা খাপে খাপে বসে যেতে বলল মুসা।
তারমানে বেহুশ হয়ে গিয়েছিল, রিটা বলল।
বেশ। কোনভাবে তাহলে ওদের মনে করিয়ে দাও, শয়তানি করতে এলে আবার বেহুশ করা হবে।
ধুড়ম ধুড়ম করে বাড়ি পড়তে শুরু করল হঠাৎ মহাকাশযানের পেটে। হাতুড়ি দিয়ে বাড়ি মারছে মনে হচ্ছে। ধাতুর পাত ভেঙে ঢোকার চেষ্টা করছে ভিনগ্রহবাসীরা। সে-রাতে গাড়ির মধ্যে বসে থাকার কথা মনে পড়ল রিটার। গুণ্ডা ছেলেগুলো এসে গাড়িটাকে এ রকম করে পিটাচ্ছিল। তবে সেবার জন্মদিনের কেক মুখে। মাখিয়ে দিয়ে পালানোর সুযোগ পেয়েছিল, এবার আর তত সহজ হবে না।
এই স্পেস শিপটা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি ভাল চেনে ওরা, রবিন বলল। আমরা কিছু না করে হাত গুটিয়ে বসে থাকলে ঠিকই ঢুকে পড়বে।
কি করব? রিটার প্রশ্ন।
এটা নিয়ে উড়ে চলে গেলেই হয়, সহজ জবাব দিয়ে দিল মুসা!
তা তো বটেই, পছন্দ হলো না জিনার। উড়ে চলে যাক। ভিনগ্রহে। শত্রুর দেশে। তারপর ফিরব কি করে?
যেতে পারলে ফিরতেও পারব, কন্ট্রোল প্যানেলে বসে পড়ল। মুসা। যা হবার হবে, সে পরে দেখা যাবে। আপাতত তো পালাই।
তা বটে, মুসার সঙ্গে একমত হলো রবিন। বাচতে হলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই ফুড কোর্টটা থেকে বেরিয়ে যাওয়া দরকার। কোনমতে যদি ঢুকতে পারে ওরা, দ্বিতীয়বার আর ঠেকাতে পারব না। স্রেফ খুন করে ফেলবে।
বেশ, কন্ট্রোল প্যানেলের দিকে মনোযোগ দিল মুসা, চালানো শুরু করলাম আমি।

.

রবিন, জিনা আর রিটা মহাকাশযানের গা ঘেঁষে দাঁড়াল। ধরার। মত যে যা পেল, শক্ত করে চেপে ধরল। কন্ট্রোল প্যানেলের সামনের চেয়ারে সীট বেল্ট লাগানো আছে, সেটা পরে ফেলল। মুসা।
সমানে পিটিয়ে চলেছে ভিনগ্রহবাসীরা। বিকট শব্দ। সহ্য করা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে মহাকাশযানের ভেতরেই তৈরি হচ্ছে শব্দটা। সময় বেশি নেই, বুঝতে পারছে গোয়েন্দারা। শীঘি মারাত্মক জখম করে ফেলবে মহাকাশযানের শরীরে, হয়তো আর মাটি ছেড়ে যাওয়াই সম্ভব হবে না তখন। ওড়ার সময় যে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি হবে, দুর্বল জায়গা থাকলে ধ্বংস হয়ে যাবে মহাকাশযান।

সবাই রেডি? ভয়ানক শব্দকে ছাপিয়ে চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল মুসা। রওনা হলাম!
কন্ট্রোলে হাত রাখল সে। কীবোর্ড নেই, স্টিয়ারিং হুইল নেই, শুধু দুটো ধাতব হাতের মত জিনিস। হাতের ছাপ নকল করে বানানো হয়েছে যেন। ওগুলোর ওপর হাত দুটো রাখল মুসা। বসে গেল সুন্দরমত। সঙ্গে সঙ্গে মনিটরে ফুটে উঠতে লাগল নানা রকম নম্বর আর লেখা।
আরও বেড়েছে বাড়ি মারার শব্দ। মরিয়া হয়ে উঠেছে ভিনগ্রহবাসীরা।
রেডি তো? জিজ্ঞেস করল মুসা। কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে তাকিয়ে তিনজনকেই দেখল একনজর। আবার ফিরল কন্ট্রোলের দিকে। ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে, সাহস জোগানোর চেষ্টা করছে নিজেকে। একটা অচেনা যানকে চালাতে ভয় যে পাচ্ছে বোঝাই যাচ্ছে। চিকন ঘাম দেখা দিয়েছে কপালে। চোখের দৃষ্টি মনিটরের ওপর স্থির। হাতের আঙুলগুলো অস্থির ভঙ্গিতে ওঠানামা করছে।
মহাকাশযানের গভীর থেকে চাপা গুমগুম শব্দ শোনা গেল। ক্রমেই বাড়তে থাকল শব্দটা। ভারী হচ্ছে। জোরাল হচ্ছে গুঞ্জন। বাইরের হাতুড়ি পেটানো থেমে গেল আচমকা। রাগে চিৎকার শুরু করেছে ভিনগ্রহবাসীরা। গোয়েন্দারা কি করতে যাচ্ছে, বুঝে গেছে।
গুঞ্জনটা তীক্ষ্ণ হতে হতে যেন আর্তনাদে রূপ নিল। দুলে উঠল মহাকাশযান। পরক্ষণে ঝাঁকি দিয়ে তীরবেগে ওপরে উঠতে শুরু করল।
কোন কিছু ধরেই দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব হলো না তিনজনের পক্ষে। প্রচণ্ড গতিবেগের কারণে পড়ে গেল মেঝেতে। সেটে গেল যেন মেঝের সঙ্গে। নিজের ওজন দুই টন মনে হতে থাকল রিটার।
মাথার ওপরে গম্বুজের মত ছাতটা স্বচ্ছ হয়ে গেছে। কাঁচের বড় গামলার ভেতর দিয়ে তাকালে যেমন লাগে, তেমন লাগছে রাতের আকাশটাকে। বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে আছে রবিন, জিনা আর রিটা। কন্ট্রোল প্যানেলে ব্যস্ত থাকায় মুসা তাকাতে পারছে না। মলের ধ্বংস হয়ে যাওয়া ছাতের গর্ত দিয়ে তীব্রগতিতে বেরিয়ে এল মহাকাশযান। সোজা উঠে গেল মেঘের দিকে। জেট ইঞ্জিন। থেকে বেরোনো উজ্জ্বল রঙিন ধোয়া প্রতিফলিত হয়ে মেঘটাকেও রঙিন করে দিল। জলযান চলার সময় যেমন পেছনে দীর্ঘ একটা ঢেউয়ের রেখা সৃষ্টি করে রেখে যায়, তেমনি করে মহাকাশযানটা রেখে যাচ্ছে ধোয়ার লেজ। উজ্জ্বল লেজটা মুছে না যাওয়া পর্যন্ত রঙিন হয়ে থাকছে মেঘ, অনেকটা ধূমকেতুর পুচ্ছের মত।
মেঘ থেকে বেরিয়ে এল মহাকাশযান। আরও ওপরে উঠল। আকাশটা এখন শুধুই কালো। গম্বুজের ভেতর দিয়ে তারাগুলোকে বড় বড় লাগছে, তবে কিছুটা ঘোলাটে।

রবিন ভাবছে, পৃথিবীর সীমানা কি ছাড়িয়ে এল? মহাকাশটাকে দেখতে কি এমনই লাগে? বিমান থেকে যে রকম দেখা যায়, তার সঙ্গে এখনকার আকাশের তেমন কোন তফাৎ খুঁজে পেল না সে। হতে পারে পৃথিবীর সীমানা এখনও কাটায়ইনি। মহাকাশযান।
কখন কাটাবে? চলছে যে তাতে কোন সন্দেহই নেই।
ওপরে ওঠার সময় নিচের দিকে যেভাবে টানছিল মাধ্যাকর্ষণ, যে কারণে মেঝেতে পড়ে গিয়েছিল ওরা, সেই টানটা আর এখন নেই। উঠে দাঁড়াল রবিন। দেখাদেখি জিনা আর রিটাও উঠল।
মুসার কাছে এসে দাঁড়াল রবিন। চালাতে তাহলে পারছ।
রিটা আর জিনাও এগিয়ে এল। ঘিরে দাঁড়াল মুসাকে।
চালানো-টালানোর ব্যাপারে তুমি তো একটা জিনিয়াস, প্রশংসা করল রিটা। প্লেন চালাতে পারো জানতাম। কিন্তু ভাবতেই পারিনি স্পেস শিও চালাতে পারবে। কি করে বুঝলে?
খুব সহজ, হাসতে হাসতে জবাব দিল মুসা। কেবিনের আলোয় ঝকঝক করতে থাকল তার সাদা দাঁত। রহস্যটা ফাঁস করে দিলেই বুঝবে, একটা বাচ্চা ছেলেও চালাতে পারবে এটা। আমি শুধু অটো পাইলট চালু করে দিয়েছি।
তারমানে নিজে নিজে চলছে এখন এটা? ভুরু কুঁচকে ফেলল জিনা। কোর্স যেখানে সেট করে রাখা আছে সেখানেই গিয়ে নামবে? ও মাথা ঝকাল মুসা। তাই তো করার কথা। পৃথিবীতে মানুষের তৈরি প্লেন, জাহাজ তা-ই করে।
কাজটা কি ঠিক হবে? রিটার প্রশ্ন।
না হওয়ারই বা কি হলো? অনিশ্চিত ভঙ্গিতে জবাব দিল মুসা। প্রাণে তো বাচলাম।
কই আর বাঁচলাম, রবিন বলল। মলের লোকগুলোর হাত থেকে বেঁচেছি। কিন্তু গিয়ে তো নামতে হবে ওদেরই দেশে। অর্থাৎ, শত্রুর দেশে। কোন গ্রহে যাচ্ছি, ওখানকার কোন কিছুই না। জেনে হুট করে চলে যাওয়াটা কি ঠিক হবে?
তা তো হবেই না, হাসিটা মুছে গেল মুসার। কিন্তু আর কি করতে পারি!
কিছু একটা উপায় বের করা দরকার, বেশি দেরি হয়ে যাবার আগেই, চিন্তিত স্বরে বলল রবিন।
করো, করো, যা করার জলদি করো। ভাবাভাবিগুলো আমার কর্ম নয়। আমাকে যে ভাবে চালাতে বলবে, আমি সেভাবেই চালাব।
তারচেয়ে এক কাজ করি বরং, রিটা বলল। যে ভাবে চলছে। এটা চলতে থাকুক। দেখি না কোনখানে গিয়ে থামে। জায়গাটা দেখে নেয়া দরকার। তারপর আবার অটে। পাইলট চালু করে সহজেই পৃথিবীতে ফিরে আসা যাবে।

তা ঠিক, মাথা ঝকাল রবিন। বুদ্ধিটা মন্দ না।
হ্যাঁ, সুযোগ যখন একটা পাওয়াই গেল, জিনার কণ্ঠেও উত্তেজনা, গ্রহটা দেখে এলে মন্দ কি?
সীটে হেলান দিল মুসা, আমি রাজি।
কিশোরের গলা থেকে ফাঁসটা খুলে নিল মার্ক। খিকখিক করে হাসল। না, অত সহজে মারব না। এত তাড়াতাড়ি মেরে ফেললে মজাটা আর রইল কোথায়...
হঠাৎ চালার একটা জ্বলন্ত অংশ খসে পড়ল মাটিতে।
ঘাবড়ে গিয়ে পেছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল ঘোড়াগুলো। চোখ উল্টে দিয়েছে। ওগুলোর কালো চোখে আতঙ্ক।
হেনরির হাত ধরে হ্যাচকা টান মেরে সরিয়ে নিল কিশোর।
ঘোড়াগুলোকে সামলাতে পারল না সওয়ারিরা! ভয়ে চিৎকার করতে করতে অন্ধকারে ছোটাছুটি শুরু করল ওদের বাহনগুলো। জিন আঁকড়ে বসে রইল কেউ, কেউ বা ঝুলে রইল একপাশে। প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে অস্থির।
মাটিতে পড়তে পড়তে জিনে আটকে গেল জন ফেঞ্চের ভাঙা হাতের স্লিং। পা পড়ে গেছে মাটিতে। হিঁচড়ে নিয়ে তাকে দৌড় বাড়িটার দিকে। একই রকম অদ্ভুত কাণ্ড করল মার্কের ঘোড়াটাও। সওয়ারি নিয়ে সোজা জ্বলন্ত বাড়ির দিকে দৌড়।
ঠিক এই সময় চালার আরও একটা বিরাট অংশ ভেঙে পড়ল ওদের ওপর। আগুন গ্রাস করে নিল ওদের। মাথা ঝাড়া দিতে দিতে একটা ঘোড়াকে কোনমতে আগুনের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখল কিশোর। কেশরে আগুন ধরে গেছে। মার্ক ফ্রেঞ্চ নেই তার পিঠে।
এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে দুচারজন সাহসী যা ছিল দলে, তারাও আর দেরি করল না। হয় ঘোড়ার পিঠে বসে, নয়তো লাফ দিয়ে। মাটিতে পড়ে দৌড়ে পালাতে লাগল দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে।
চোখের পলকে খালি হয়ে গেল জায়গাটা। আগুনের হলুদ আলোয় আলোকিত।
গর্দভের দল! বিড়বিড় করে বলল সিসি। ঘোড়া যে আগুনকে ভয় পায়, ভুলেই গিয়েছিল ওরা!
হ্যাঁ, বিমূঢ় ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল কিশোর, আগুনের এত কাছে আসা উচিত হয়নি ওদের।
জ্বলন্ত বাড়িটার দিকে চোখ তুলে তাকাল সে। জন বা মার্ক বেরিয়ে আসছে কিনা দেখছে। ওদের ঘোড়া দুটো পালিয়েছে। একটার পিঠেও সওয়ারি ছিল না। চালার নিচে চাপা পড়েছে দুই ভাই। জ্ঞান হারিয়ে থাকলে সব সাহায্যের বাইরে চলে গেছে ওরা এতক্ষণে। গায়ে কাঁটা দিল তার। সিসি আর হেনরির কাঁধে দুই হাত রেখে যেন সাহস সঞ্চয় করতে চাইল।

আগুনের লেলিহান শিখা ক্রমেই উঠে যাচ্ছে ওপরে। লোভী দানবের মত পুরো বাড়িটাকে গিলে নিয়েছে।
পালানো দরকার! সংবিৎ ফিরে পেল যেন কিশোর হঠাৎ লোকগুলো শীঘ্রি ফিরে আসবে, মার্ক আর জনের কি হয়েছে। দেখতে। দুই ভাই বেঁচে থাকলেও আমাদের ছাড়বে না, আর মরে গেলে তো খেপা কুকুর হয়ে যাবে ওদের পরিবারের লোকজন।
কিন্তু ছেলেমেয়ে দুটোকে নিয়ে কোথায় যাবে সে? এই এলাকায় কে সাহায্য করবে তাকে? খাবার নেই। পকেটে একটা পয়সা নেই। রাইফেলটাও গেছে ঘরের সঙ্গে সঙ্গে।
কোথায় যাব? মৃদু স্বরে জানতে চাইল সিসি।
বড় করে দম নিল কিশোর। বনের মধ্যে কাটিয়ে দেব আজকের রাতটা। কাল একটা বুদ্ধি বের করব।
তার প্যান্ট খামচে ধরল হেনরি। চোখ নামাল কিশোর। হেনরির ছোট্ট তুলতুলে গালে ছাই আর কালি লেগে আছে। সবুজ চোখ দুটো অনেক বড় লাগছে এখন, টলটলে, যেন গভীর দীঘির পানি। ঝুলে পড়েছে ছোট ছোট কাধ।
এখানে থাকব না আমরা, ভীষণ ক্লান্ত লাগছে কিশোরের, দিনু তবু দুই হাত বাড়িয়ে কোলে তুলে নিল হেনরিকে। থাকলে, মরতে হবে।
ঘুরে দাঁড়িয়ে বনের দিকে হাঁটতে শুরু করল সে। সিসি, আমার শার্ট ধরে রাখো। কোন কারণেই আলাদা হবে না।
বনের মধ্যে ঢুকে পড়ল ওরা। চাঁদের আলোকে আড়াল করে। রেখেছে গাছপালার ঘন ডাল-পাতা।
পেছন থেকে শার্ট ধরে হাঁটতে গিয়ে বার বার কিশোরের পায়ে হোঁচট খাচ্ছে সিসি, গায়ের ওপর এসে পড়ছে। কাঁধে বসা হেনরি দুই পা দিয়ে পেঁচিয়ে ধরেছে গলা। এ অবস্থায় হাঁটা খুব কঠিন হয়ে উঠেছে কিশোরের জন্যে।
আরেক বার হোঁচট খেয়ে সিসি বলল, সরি, কিশোরভাই, দেখতে পাচ্ছি না।
হয়েছে, জবাব দিল কিশোর, হাঁটার গতি এবার কমানো যায়।
বনের মধ্যে এত অন্ধকার, বাপরে! গলা কেঁপে উঠল সিসির।
গাছের ডাল থেকে শূন্যে ঝাঁপ দিল একটা পেঁচা। মুহূর্ত পরেই আক্রান্ত ইঁদুরের তীক্ষ্ণ আর্তচিৎকার শোনা গেল। শিকার নিয়ে অন্য ডালে গিয়ে বসল আবার পেঁচাটা।
এরপর ভারী নীরবতা।
অন্ধকারে চোখ মেলে দেখার চেষ্টা করছে কিশোর। তার মনে হচ্ছে বনের সব হিংস্র জানোয়ারের চোখ এখন ওদের দিকে। যে কোন মুহূর্তে ইঁদুরটার যা গতিক

হয়েছে, ওদেরও তা-ই হবে।
হেনরিকে এক কাঁধের ওপর বসাল সে। আগে বাড়তে গিয়ে পায়ের নিচে মট করে ভাঙল শুকনো ডাল।
সড়সড় করে দৌড়ে চলে গেল কি যেন। আরেকটা ইঁদুর হবে, ভাবল সে। কিংবা অন্য কোন ছোট প্রাণী। কাঠবিড়ালীও হতে পারে। নিরীহ-নিজেকে প্রবোধ দেয়ার চেষ্টা করল। ক্ষতি করবে না।
হাঁটতে থাকো, সিসিকে বলল সে।
বনের মধ্যে বাতাস ঠাণ্ডা। ভেজা ভেজা। যতই গভীরে ঢুকছে ঠাণ্ডা বাড়ছে। গাছের ডাল-পাতা এড়িয়ে চলার উপায় নেই। গায়ের সঙ্গে বাড়ি খাচ্ছে। পায়ের নিচে ঝরা পাতার পুরু কার্পেট।
কানের কাছে হেনরির নিঃশ্বাস আর সিসির হাঁপানোর শব্দ ছাড়াও আরেকটা শব্দ কানে এল কিশোরের।
দাঁড়িয়ে গেল।
কি হলো? জানতে চাইল সিসি।
চুপ! চাপা গলায় বলল সে। শব্দ!
কিসের? কিসের শব্দ?
কথা বোলো না। দম বন্ধ করে রাখো। হেনরি, তুমিও।
কান পেতে রইল কিশোর। কিছু শুনল না। অবশেষে ছেড়ে দিল দমটা।
ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলতে শুনল সিসিকে।
আবার হাঁটতে লাগল ওরা। কিছুদূর এগিয়ে কিশোর বলল, সামনে মনে হচ্ছে থামার জায়গা পাব।
ছোট একটা জায়গায় গাছপালা সামান্য পাতলা। চাঁদের আলো এসে পড়ছে মাটিতে। বেশি না, তবে দেখার জন্যে যথেষ্ট। বড় একটা গাছ কাত হয়ে পড়ে থাকতে দেখা গেল। মস্ত খোড়ল।
ওতে ঢুকে লুকিয়ে থাকা যাবে, খোড়লটা দেখিয়ে বলল কিশোর। হেনরিকে নামিয়ে দিল কাধ থেকে।
হামাগুড়ি দিয়ে তাতে ঢুকে গেল হেনরি।
তারপর ঢুকল সিসি। উঁহ, ভয়ানক গন্ধ!
ও কিছু না। পচা কাঠের গন্ধ, অধৈর্য কণ্ঠে বলল কিশোর। গন্ধ তোমার কোন ক্ষতি করবে না।
সে নিজেও ঢুকে পড়ল খোড়লে। পা লম্বা করা যাচ্ছে না। মুড়ে নিয়ে এল বুকের কাছে। সারা শরীরে অকল্পনীয় ব্যথা।

ফার্মে আর ফিরে যেতে পারবে না। রাতটা কোনমতে নিরাপদে কাটাতে পারলে আগামীকাল ভেবে দেখবে কি করা যায়।
পাতায় পাতায় কাঁপন তুলে বয়ে গেল এক ঝলক বাতাস। কি যেন গোপন কথা বলে গেল পরস্পরকে ফিসফিস কানাকানি করে। ডালে ডালে ঘষা খেয়ে বিচিত্র শব্দ সৃষ্টি করল।
জেগে বসে পাহারা দেয়া দরকার। কিন্তু কোনমতেই চোখ খোলা রাখতে পারছে না আর। দশ মণ ভারী হয়ে আসছে যেন চোখের পাতা।
আরেকটু আরাম করে বসার জন্যে নড়েচড়ে সোজা করল। মাথাটা, নজর পড়ল সামনে গাছের বেড়ার মাঝে অন্ধকার ছায়ার দিকে।
জ্বলন্ত দুটো হলুদ চোখ সরাসরি তাকিয়ে আছে তার দিকে।

.

আতঙ্কিত চিৎকারটা মুখ থেকে বেরোতে দিল না কিশোর। ঢাক গিলে নামিয়ে দিল বহু কষ্টে।
কিসের চোখ? নেকড়ে? ভালুক? পাহাড়ী সিংহ? ভয়ঙ্কর সব হিংস্র জন্তুর চেহারা খেলে যেতে লাগল মনের পর্দায়। সঙ্গে বন্দুক নেই। আত্মরক্ষার উপায় নেই।
আমাকে দেখেনি! নাকি দেখেছে? ভাবনাগুলো এলোমেলো আঘাত হানতে লাগল যেন মগজের মধ্যে। আমরা যে আছি খোড়লের মধ্যে, সেটাই জানে না!
বুকের মধ্যে ধুড়স ধুড়স করছে হৃৎপিণ্ডটা। গলা শুকিয়ে কাঠ। পিছিয়ে আসতে গেল।
আউ! চিৎকার করে উঠল সিসি। কি করছ?
চুপ! নিচু স্বরে সাবধান করল কিশোর। বললাম না তখন, একটা শব্দ শুনেছি!... পিছে পিছে চলে এসেছে ওটা। আমাদের খুঁজছে এখন।
কোথায়? এগোতে গিয়ে জায়গা না পেয়ে কিশোরের পায়ের ওপর চেপে বসল সিসি।
দীর্ঘ একটা মুহূর্ত চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে রইল সে। তারপর বেরিয়ে যেতে শুরু করল।
ধরার জন্যে থাবা মারল কিশোর। স্কার্ট চেপে ধরতে গেল। আঙুলের ফাঁক দিয়ে পিছলে গেল কাপড়। ধরে রাখতে পারল না। বেরিয়ে গেছে সিসি।
সিসি! জলদি ভেতরে ঢোকে।
ইঁদুরটার আর্তচিৎকারের কথা মনে পড়ল, কিশোরের। সিসিকে কি করবে এই প্রাণীটা?
সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল কিশোর। সিসির কোন ক্ষতি করতে.. দেবে না।

হামাগুড়ি দিয়ে খোড়লের ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়ল সে। কয়েক ফুট দূরে দেখা গেল সিসিকে। ঘন ডালপাতা ভেদ করে। চাঁদের আলোর আবছা আভা এসে অদ্ভুত আলো-আঁধারি সৃষ্টি করেছে তাকে ঘিরে।
ছায়া থেকে বেরিয়ে এল জ্বলন্ত চোখজোড়া।
চাপা গর্জন করে উঠল। ভারী গর্জন।
নেকড়ে!
সাপের মত নিঃশব্দে অন্ধকার থেকে আলোয় বেরিয়ে এল ওটা। কাঁপতে লাগল কিশোর। লম্বা, শক্তিশালী দেহটা এগিয়ে আসছে সিসির দিকে।
অত বড় জানোয়ারের সঙ্গে লড়াই করে পারবে না। দৌড় দিয়েও লাভ নেই।
নেকড়ের মুখটা স্পষ্ট হতেই হাঁ হয়ে গেল কিশোর। একটা মরা খরগোশ দাঁতে ঝুলছে।
ধীরে ধীরে সিসির দিকে এগোচ্ছে সাদা প্রাণীটা। চাঁদের আলোয় রূপালী লাগছে। সিসির কাছে এসে মাথা নিচু করল। খরগোশটা সিসির পায়ের কাছে ফেলে দিয়ে নিজেও শুয়ে পড়ল মাটিতে।
পালাও, সিসি! দৌড় দাও! চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করল কিশোরের। নেকড়ের ভয়ে বলতে পারল না। সিসিকে নেকড়েটার পাশে শুয়ে পড়তে দেখে দম আটকে এল তার। চিৎকারটা ঠেলে উঠে আসতে চাইছে গলার কাছে, বহু কষ্টে নিচে নামাল।
মন্ত্রমুগ্ধের মত তাকিয়ে দেখছে, আস্তে করে একটা হাত রাখল। সিসি নেকড়েটার ঘাড়ে। ধীরে ধীরে নিজের মুখটা নিয়ে গেল। সেদিকে। ওটার রোমশ চামড়ায় গাল রাখল সে।
স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর।
সিসির সেই নেকড়েটা!
গাঁয়ের লোকে কি তাহলে ঠিকই বলে? জন্তু-জানোয়ারকে বশ করার অশুভ ক্ষমতা আছে সিসির? উঁহু! মেনে নিতে পারল না সে। যেটা আছে, স্বেটা ভাল ক্ষমতা। জানোয়ারের বিশ্বাস অর্জন করে নিতে পারে। ওদের ভালবাসে, বোঝাতে পারে। যে ক্ষমতা ছিল লং জন হার্টের। তাতে অশুভ কোন ব্যাপার নেই।
খসখস শব্দ শুনে ফিরে তাকাল কিশোর। হেনরিও বেরিয়ে এসেছে। সিসি আর নেকড়েটার দিকে তাকিয়ে বড় বড় হয়ে গেছে চোখ।
ভয় নেই, হেনরি, কানের কাছে মুখ নিয়ে মৃদুস্বরে বলল কিশোর। এটা সিসির সেই বন্ধু নেকড়েটা। খরগোশ শিকার করে এনে দিয়েছে খাওয়ার জন্যে।
নেকড়েটার দিকে চুপ করে তাকিয়ে আছে হেনরি।

এখনও তার ভয় যাচ্ছে না ভেবে কিশোর বলল, নেকড়েটা কোনভাবে বুঝতে পেরেছে বিপদে পড়েছে তার বন্ধু। বাড়িতে সেদিন মাংস খাওয়াতে দেখে। পরে আমি সিসিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। বনের মধ্যে বাচ্চা অবস্থায় নাকি ওটাকে দেখতে পেয়েছিল সিসি। ওটার মা মরে গিয়েছিল। খাবার দিয়ে, আরও নানা ভাবে সাহায্য করে বাচ্চাটাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল সিসি। বড় হয়ে বিপদের দিনে এখন বন্ধুকে সাহায্য করে প্রতিদান দিতে এসেছে নেকড়েটা।
মাথা ঝাঁকাল হেনরি। ক্লান্ত চোখের পাতা উলল। তাকে আবার খোড়লের মধ্যে নিয়ে গেল কিশোর। তার কোলের মধ্যে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল হেনরি।
সিসির দিকে তাকাল কিশোর। নেকড়ের কোলের কাছে কুঁকড়ে শুয়ে, গায়ে মাথা রেখে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়েছে সিসি।
খোড়লের দেয়ালে মাথা ঠেস দিয়ে কিশোরও ঘুমিয়ে পড়ল।
ঘুম ভেঙে গেল কিশোরের। কেন ভাঙল? বুঝতে পারল না।
দম বন্ধ করে, কান পেতে রইল।
বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকাল। নেকড়েটা চলে গেছে। খোড়লের মধ্যে কিশোরের পাশে এখন শুয়ে আছে সিসি। গভীর ঘুমে অচেতন।
নড়েচড়ে আরাম করে বসল কিশোর। চোখ বুজল। কিন্তু আর আসছে না ঘুম।
হাজারটা ভাবনা ভীড় করে এল মনে। কি করবে সকাল হলে? এই খোড়লে অনন্তকাল ধরে বসে থাকা যাবে না। আলো ফুটলে ফ্রেঞ্চরা দলবল নিয়ে ছুটে আসবে। পকেটে একটা পয়সা নেই। খাবার নেই। পরনের কাপড়ের হালও বড় করুণ। কি করে বাঁচাবে হেনরি আর সিসিকে?
কান পেতে শুনছে বাতাসে গাছের পাতার ফিসফিসানি। ঘুমপাড়ানি গান গেয়ে চলেছে যেন। কিন্তু ঘুম আর তার কোনমতেই এল না। ভেবেই চলেছে। রহস্যময় কতগুলো প্রশ্নের জবাব খুঁজে পাচ্ছে না সে। মেলাতে পারছে না। এই যেমন, নেকড়ের কথাই ধরা যাক। এতদিন জেনে এসেছে, আন্ডিজ পর্বতমালায় নেকড়ে নেই। তাহলে এ বনেরগুলো এল কোথা থেকে? গায়ের লোকে বলে, সিসির অশুভ ক্ষমতা আছে। জন আর মার্ক ফ্রেঞ্চের ঘোড়াগুলোকে খেপিয়ে তুলেছিল সে। ওদের কথা ঠিক নয়-সিসি কিছু করেনি, কিশোর অন্তত বিশ্বাস করে না; কিন্তু তাহলে ওভাবে খেপল কেন ঘোড়াগুলো? অস্বাভাবিক ঘটনা। তারপর আজকে, দুই ভাইয়ের ঘোড়া দুটো প্রাণের মায়া না করে যে ভাবে ছুটে গেল আগুনের মধ্যে, তাতে যে কেউ বলবে উস্কানি দিয়ে ওগুলোকে সেদিকে যেতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। তারপর রয়েছে লং জন হার্ট আর তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুটা। গাড়ির ঘোড়াগুলো সেদিনও যেন অদৃশ্য কারও নির্দেশে সোজা খাদের দিকে ধেয়ে গিয়েছিল, নিজেদের প্রাণের পরোয়া না করে। তিনটে ব্যাপারকে এক করে দেখলে একটা সিদ্ধান্তেই

পৌঁছানো যায়-মোটেও স্বাভাবিক নয় ঘটনাগুলো; এ সবের পেছনে কারও কোন হাত নেই, এটা বললেই বরং মেনে নিতে ইচ্ছে করে না। তা ছাড়া সিসি আর হেনরির মা-বাবা…
কিশোরভাই, তুমি ঘুমাচ্ছ না? সিসির কথায় বাস্তবে ফিরে এল কিশোর।
তুমিও তো ঘুমাচ্ছ না।
ভেঙে গেল ঘুমটা। এভাবে কি ঘুমানো যায়?
বাইরেই তো ভাল ছিলে। নেকড়ে-বন্ধুর সঙ্গে। খোড়লে ঢুকলে কেন?
ও চলে গেল। ডাকলেই আবার আসবে। এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে সিসি বলল, কিশোরভাই, কাল আমরা কোথায় যাব? ভেবেছ কিছু?
কি আর ভাবব, বলো? কাফেলায় ঢুকে পড়াই উচিত।
ওই এতিমদের মিছিলে! ফকিরের মত ভিক্ষে করতে করতে যাব? রাগত স্বরে বলল সিসি, কিশোরভাই, তুমি বলেছিলে আমাদেরকে এতিমের মিছিলে ঢোকাবে না।
বোঝার চেষ্টা করো, সিসি, আর কোন উপায় নেই এখন। আমাদের, বিষণ্ন কণ্ঠে জবাব দিল কিশোর। ফার্মে ফিরে যেতে পারছি না। কাল রাতে যা ঘটে গেছে, এর পর গাঁয়ের পথে আমাদের দেখামাত্র ধরে নিয়ে গিয়ে হয় পুড়িয়ে মারবে, নয়তো ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেবে লোকে। কেউ কোন কথা শুনবে না। তা ছাড়া ফিরে যাবই বা কোথায়? বাড়িঘর কি আর আছে? সব তো পোড়া ছাই। তারচেয়ে এই জঘন্য জায়গা থেকে বেরিয়ে চলে যাব আমরা।
কোথায় যাব? সিসির প্রশ্ন।
উত্তর আমেরিকায়। সেখানে আমাদের বাড়ি আছে, আমার চাচা আছে, চাচী আছে; কোন অসুবিধে হবে না তোমাদের। সুখেই থাকতে পারবে।
আমি তো জানতাম দক্ষিণ আমেরিকারই অন্য এক শহর থেকে এসেছ তুমি। তাই তো বলেছিলে।
মিথ্যে বলেছিলাম। কারণ আমি এখনও জানি না, এখানে কিভাবে এসেছি। আর আমার যেটা সন্দেহ, সেটা আমি নিজেই বিশ্বাস করতে পারছি না। তোমাদের আর কি বলব!
দীর্ঘ একটা মুহূর্ত চুপ করে রইল সিসি। কিন্তু আমি কারও গলগ্রহ হতে চাই না, দৃঢ়কণ্ঠে বলল সে। আমি বড় হয়ে গেছি। নিজের দেখাশোনা নিজেই করতে পারব।
কথার শব্দে হেনরির ঘুমও ভেঙে গেছে। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বসেছে তার। চোয়াল শক্ত হয়ে গেছে। বোনের কথা সমর্থন করেই যেন সে-ও জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাল ওপরে-নিচে।

পারবে না, তা তো বলছি না। কিন্তু পারার জন্যে একটা স্বাভাবিক পরিবেশ চাই। সেটা কোথায় এখানে থাকা তো দূরের কথা, গায়ের লোকের চোখে পড়লেও মরতে হবে।
কোনভাবে ওদের বুঝিয়ে-শুনিয়ে থাকতে যদি পারতাম, ভাল হত! সিসি যেতে চায় না কেন, বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না। কিশোরের। নিজের জন্মভূমি, এতকালের বাসস্থান ফেলে কে-ই বা যেতে চায়!
বোনকে সমর্থন করে আবার জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাল হেনরি।
লং হার্টকে আমি কথা দিয়েছিলাম, কিশোর বলল, আমি তোমাদের ফেলে যাব না। তোমাদের দেখব।
কিন্তু সেই কথা আর রাখতে পারছ না, কেঁপে উঠল সিসির গলা।
পারলাম না কোথায়? আমি তো তোমাদের ফেলে যাচ্ছি না। সঙ্গেই যাচ্ছি। বরং নিয়ে যাচ্ছি এমন একখানে, যেটা এখানকার চেয়ে হাজারগুণ ভাল।
জোরে জোরে মাথা নেড়ে বুঝিয়ে দিল হেনরি, সে যেতে চায় না, হাজারগুণ ভাল হলেও না। সে এখানেই থাকতে চায়।
তাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে কিশোর বলল, ভাবনা নেই, হেনরি, আবার আসব আমরা এখানে। তবে অসহায় হয়ে নয়, শক্তি সঞ্চয় করে, টাকা-পয়সা নিয়ে, যাতে সমানে সমানে বাধা দিতে পারি ফ্রেঞ্চদের। শয়তান গ্যারিবাল্ড আর টাকার জন্যে মোচড় দিয়ে আমাদের দুর্বল করে ফেলতে না পারে...
কথা শেষ হলো না তার। কানে এল ইঞ্জিনের শব্দ। অবাক হয়ে কান পাতল। খানিক পরে উজ্জ্বল আলো দেখতে পেল গাছপালার ফাঁক-ফোকর দিয়ে। আশ্চর্য! এতরাতে বনের মধ্যে আলো কিসের? দলবল নিয়ে ওদের খুঁজতে এল গাঁয়ের লোকে? কিন্তু ইঞ্জিন! নাহ, দেখতেই হচ্ছে।
তাড়াহুড়ো করে খোড়ল থেকে বেরিয়ে এল সে।
কোথায় যাচ্ছ? জিজ্ঞেস করল সিসি।
দেখে আসি।
আমরাও আসছি।
না, তোমরা ওখানে বসে থাকো...
কিন্তু...
হাসল কিশোর। এইমাত্র না বললে নিজেদের দেখাশোনা করার মত যথেষ্ট বড় হয়েছ তোমরা? বসে থাকে। আমি যাব, আর আসব।
উঠে দাঁড়াতে গেল সে। সোজা থাকতে কষ্ট হচ্ছে। ভাজ হয়ে যেতে চাইছে হাঁটু। রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করার জন্যে ডলতে শুরু করল খিচ ধরা মাংসপেশি। হাত-পা ঝাড়তে লাগল।

মানুষের কণ্ঠ কানে ল।
দূর থেকে। আর দেরি করল না সে। রওনা হয়ে গেল বনের ভেতর দিয়ে।
*
থেমে গেছে মহাকাশযান। স্বচ্ছ গম্বুজ দিয়ে এখনও রাতের কালো আকাশ চোখে পড়ছে। তবে অন্ধকারটা এখানে অনেক বেশি। তারা দেখা যাচ্ছে পৃথিবীর আকাশের মতই। সবচেয়ে মজার ব্যাপারটা হলো, চাঁদও দেখা যাচ্ছে।
এ কোন্ গ্রহে নামল ওরা?-ভাবছে রবিন। তবে কি টুইন আর্থ আছে যে, এ কথা সত্যি? অবিকল পৃথিবীর মত আরেকটা যে গ্রহের কথা শোনা যায়, সেখানে এসে নামল ওরা? বেরোলেই বোঝা যাবে।
অন্য তিনজনের সঙ্গে আলোচনা করে হ্যাঁচের সুইচ টিপে দিল রিটা।
খুলে গেল হ্যাচ। নিঃশব্দে নেমে যেতে লাগল সিঁড়ি।
গর্তের মুখটা খুলে হুড়মুড় করে এসে ভেতরে ঢুকল রাতের তাজা বাতাস। ঠাণ্ডা, ভেজা ভেজা। বুক ভরে শ্বাস নিল ওরা।
আহ, দারুণ আরাম! মুসা বলল। পৃথিবীর চেয়ে কোন অংশে কম না।
মই বেয়ে মাটিতে নামল সবাই। খুব সতর্ক। বিপদের সামান্যতম সম্ভাবনা দেখলেও সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়বে স্পেস শিপে।
চারপাশে ঘন গাছপালা। ঘন বন। পেঁচার ডাক কানে এল। দূরে নেকড়ে ডাকল।
খাইছে! বলে উঠল মুসা, এ তো এক্কেবারে পৃথিবীর মত!
আমিও তাই ভাবছিলাম, জবাব দিল রবিন। শিওর, এটা সেই টুইন আর্থ। পৃথিবীর যমজ বলা হয় যে গ্রহটাকে, অনেক বিজ্ঞানীই এখন এটার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন...
বনের মধ্যে খসখস শব্দ হলো।
সবার আগে শুনতে পেল মুসা। ঝট করে ফিরে তাকাল সেদিকে। অন্ধকারের মধ্যে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে ফিসফিস করে বলল, কে যেন আসছে!
*
উপত্যকার একটা ভোলা জায়গায় বেরিয়ে এল কিশোর।
মেঘ সরে গেছে চাঁদের মুখ থেকে। উজ্জ্বল জ্যোৎস্নায় চকচক করতে দেখল অদ্ভুত একটা গোল জিনিসের পিঠ। আলো আসছে ওটার নিচ থেকে।
অবাক কাণ্ড! এখানেও ইউ এফ ও?
একবার ইউ এফ ও দেখতে গিয়েই তো আজকের এই দুর্দশা। দ্বিতীয়বার আর কোন বিপদে ঢুকতে চায় না সে। পা টিপে টিপে এগোল।
যতটা সম্ভব কাছে পৌঁছে গাছের আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে দেখতে লাগল। গোল জিনিসটার ছয়টা পা।

ছয় পা!
তাই তো! বনের মধ্যে যে ছয়টা গর্ত দেখেছিল, কিসের কারণে হয়েছে সেগুলো, জবাবটা পেয়ে গেল এখন। আরও একটা প্রশ্নের জবাব পাওয়া গেল, ইউ এফ ও-তে করেই তাকে নামিয়ে দিয়ে যাওয়া হয়েছিল এখানে। আবার এসেছে কেন ওরা? তাকে তুলে নিয়ে যেতে?
পেটের কাছে একটা হ্যাচ খুলে সিঁড়ি নামানো হয়েছে। সেটা দিয়ে নেমে এসেছে কয়েকজন মানুষের মত প্রাণী। পোশাক আশাকে পৃথিবীর মানুষের মতই লাগছে। শুধু তাই না, চেনা চেনাও লাগছে।
গাছপালার আড়ালে আড়ালে আরও কাছে এগোনোর চেষ্টা করল সে। খুব সাবধান থাকল। যাতে কোনমতেই লোকগুলোর চোখে পড়ে না যায়।
কাছে এসে চিনতে পেরে হাঁ হয়ে গেল। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না।
মুসা, রবিন, জিনা!
আর, আর রিটা গোল্ডবার্গ!
নাহ, এ সত্যি হতে পারে না!
চোখ ডলল সে। নিজের হাতে চিমটি কেটে দেখল ব্যথা লাগে কিনা।
লাগে! তারমানে যা দেখছে, বাস্তব। নিশ্চয় ওকে উদ্ধার করতে এসেছে তার বন্ধুরা।
ইউ এফ ও পেল কোথায়? হাইজ্যাক করেছে! আর কোনভাবে। পাওয়া তো সম্ভব নয়।
ওদের দিকে দৌড় দিল সে।

.
মিনিট পনেরো পর।
সিসি আর হেনরিকে নিয়ে আসতে রওনা হলো কিশোর। তার সঙ্গে চলল রবিন। বাকি তিনজন মহাকাশযানটার কাছে পাহারায় রইল।
খোঁড়লের কাছে পৌঁছে সিসি আর হেনরিকে বেরিয়ে আসতে বলল কিশোর।
বেরোল দুজনে।
রবিনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল কিশোর। খুশির সংবাদ দিল সিসি আর হেনরিকে-আর ওদেরকে মিছিলে যোগ দিয়ে কষ্ট করে পাহাড় পেরোতে হবে না। মহাকাশযানে করেই দেশে ফিরে যেতে পারবে।
সিসি খুশি হলো, কিন্তু হেনরি হলো না। হঠাৎ ঘুরে এক দৌড় মারল বনের দিকে
হেনরি! কোথায় যাচ্ছ, হেনরি! ওর পিছু নিতে গেল অবাক কিশোর।
তার হাত চেপে ধরল সিসি। থাক, যেতে দাও। বাধা দিও না।
আরও অবাক হলো কিশোর। বাধা দেব না মানে?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সিসি বলল, সে অনেক কথা। চলো, যেতে যেতে বলছি।
হাঁটতে হাঁটতে যে কথা বলল সিসি, বিশ্বাস করতে কষ্ট হলো। কিশোরের। অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, আর কত চমক অপেক্ষা করছে! জিজ্ঞেস করল, কবে থেকে বুঝতে পারলে তুমি?
যেদিন হার্ট আঙ্কেল আর তার কোরিআন্টিকে খুন করল হেনরি, জবাব দিল সিসি। সেদিনই বুঝলাম, আঙ্কেলের শিক্ষার কোন প্রয়োজন ছিল না তার। জন্ম থেকেই সে নানা বিদ্যায় পারদর্শী।
তারমানে বর্ণ ঈভুল! বিড়বিড় করল কিশোর। জন্ম-পিশাচ!
হ্যাঁ, মাথা ঝাঁকাল সিসি। আমার মায়ের পেটে জন্মালে কি হবে, সত্যিকার অর্থে ও আমার ভাই নয়। শয়তান। মা-বাবার রহস্যজনক ভাবে নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারেও ওর হাত আছে কিনা কে জানে! তবে ঘোড়াগুলোকে সে-ই যে নির্দেশ দিয়ে দিয়ে খেপিয়ে তুলেছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। মনে মনে কথা বলেছে ওদের সঙ্গে। আমাদের উপকার করার জন্যে করেনি এ কাজ, নিজের স্বার্থে করেছে।...এই যে, এখন, যেই এখান থেকে চলে যাওয়ার ব্যবস্থা হলো, অমনি পালিয়েছে। ও এখান থেকে যাবে না।
বুঝে থাকলে এতদিন বলোনি কেন? ভয়ে। যাকে ও শত্রু মনে করবে, নিষ্ঠুর ভাবে শেষ করে দেবে।
মহাকাশযানের কাছে পৌঁছে গেল ওরা।
সিসি বলল, তাড়াতাড়ি উঠে পড়ো। হেনরিকে বিশ্বাস নেই। কখন এসে হাজির হবে শয়তানির মতলব নিয়ে বলা যায় না। আমরা সবাই এখন তার শত্রু। জলদি করো।
সিসির ধারণাই ঠিক।
মহাকাশযানে উঠে পড়েছে সবাই। সিঁড়িটা সবে তুলেছে, এই সময় বনভূমি কাঁপিয়ে দিয়ে শোনা গেল সম্মিলিত গর্জন। অন্ধকারে অসংখ্য চোখ জ্বলজ্বল করতে দেখল কিশোর। নেকড়ের পাল নিয়ে ওদের ধ্বংস করতে এসে হাজির হয়েছে হেনরি। সবচেয়ে বড় নেকড়েটার পিঠে চড়ে এসেছে সে। ছোটখাট একটা ঘোড়ার সমান নেকড়েটা। শয়তানের উপযুক্ত বাহন। ধকধক করে। জ্বলছে নেকড়েগুলোর চোখ।
জলদি করো! আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল সিসি। ধরতে পারলে রক্ষা থাকবে না আমাদের কারও!
সুইচ টিপে দিল রিটা। বন্ধ হয়ে যেতে শুরু করল হ্যাঁচের ঢাকনা। কানফাটা গর্জন করে ওটার ওপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল বড় নেকড়েটা। কিন্তু মুখ ঢোকানোর আগেই বন্ধ হয়ে গেল ঢাকনা।

দেরি কোরো না! সিসি বলল। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পালাতে হবে এখান থেকে। শয়তানের কুবুদ্ধির অভাব হয় না!
ইঞ্জিন চালুই আছে। অটো পাইলট অন করে দিল মুসা।
*
আমার বিশ্বাস, এটা মহাকাশযান নয়, কিশোর বলল। অতি আধুনিক কোন আকাশযান। পৃথিবীর মানুষের তৈরি।
রকি বীচে ফিরে চলেছে ওরা।
এখন অবশ্য আমারও তাই মনে হচ্ছে, মনিটরের দিক থেকে চোখ সরাল না মুসা।
কে বানাল? রবিনের প্রশ্ন।
কোন অতি বুদ্ধিমান বিজ্ঞানী, জবাব দিল কিশোর। যা শুনলাম তোমাদের কাছে, তাতে একজনের কথাই মনে আসছে আমার-ডক্টর মুন। ভিনগ্রহবাসী বলে যাদের ধারণা করেছ তোমরা, তারা আসলে রোবট। জ্যান্ত মানুষকে নানাভাবে উন্নত করে রোবট বানিয়েছে সে। তার বশংবদ ভৃত্য করেছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তার লোকেরাই আমাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল সেরাতে। তার কাজে বাদ সাধায় আমাদের ওপর একটা আক্রোশ তো তার বরাবরই আছে। এখন মনে হচ্ছে, আমাকে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর কোনভাবে আমার মগজটাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল সে। দুঃস্বপ্ন ভেবেছি যে সব ঘটনাকে, আসলে ওগুলো দুঃস্বপ্ন ছিল, ঘোরের মধ্যেই করেছি, ওসব কাজ। রেগেমেগে শেষে সে আমাকে কাচু-পিকচুতে দ্বীপান্তর দিয়েছিল?
দ্বীপান্তর নয়, পাহাড়ান্তর, শুধরে দিল সিসি। পাহাড়ঘেরা দেশ তো।
হ্যাঁ, পাহাড়ান্তর, মাথা ঝাঁকাল কিশোর। হাসল। সম্পূর্ণ ভিন্ন। অচেনা পরিবেশে এত সহজে সিসি মানিয়ে নিতে পারায় খুশি হয়েছে সে। যা বলছিলাম। আমাকে বন্দি করে তারপর তোমাদের তুলে আনতে লোক পাঠিয়েছিল। আবার যদি তুলে আনার প্রয়োজন হয় আমাকে, যাতে সহজেই তুলে আনতে পারে, খোঁজাখুঁজি করা না লাগে, সে-জন্যে কোর্স অটো সেট করে রেখেছিল পাইলট। টিপে দিলেই যাতে পৌঁছে যেতে পারে কাচু পিকচুতে, তুলে নিয়ে আসতে পারে আমাকে।
এবং কাজটা সহজ করে দিল আমাদের, হাসল রিটা। খুব সহজেই জায়গামত পৌঁছে গিয়েছিলাম আমরা।
সহজ আর কই? ভুরু নাচাল কিশোর। আমাকে উদ্ধারের জন্যে যে কষ্ট তোমরা করেছ, যে ঝুঁকি নিয়েছ...বাপরে বাপ!...ভয়ঙ্কর সব রোবট দানবের সঙ্গে লড়াই!...
তা তো বুঝলাম, বাধা দিল মুসা। কিন্তু আবার তো সেখানেই ফিরে যাচ্ছি আমরা। নিশ্চয় মলের ভেতরে বা আশেপাশেই কোথাও রয়েছে ওরা। গেলেই কাক করে

ধরবে।
সেজন্যেই তো সেখানে যাওয়া চলবে না, কিশোর বলল। রকি বীচে নামাবে না স্পেস শিপ-যে বানিয়েছে সে এটার কি নাম রেখেছে, তা যখন জানি না, আপাতত এটাকে স্পেস শিপই বলব আমরা। রকি বীচের আশেপাশে যে কোন জঙলা কিংবা পাহাড়ী জায়গায় নামাবে, যেখানে মানুষজন তেমন যায় না, লুকিয়ে রাখা যায়।
রিটা বলল, সব প্রশ্নের জবাবই তো পাওয়া গেল, কিশোর, একটা প্রশ্নের জবাব আমি পাইনি এখনও।
ফিরে তাকাল কিশোর, কি?
আমি কে? আমিও কি রোবট?
এ কথা কেন মনে হলো তোমার!
ডক্টর মুনের রোবটগুলো আমাকে ডেলটাদের দলের লোক বলছিল। এই ডেলটারা কারা?
নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। ডেলটা! নামে তো রোবটই মনে হচ্ছে। তবে ওরা যা-ই হোক, আমাদের মতই ডক্টর মুনের শত্রু। সেজন্যেই ধরে নিয়ে যেতে এসেছিল তোমাকে।
তারমানে আমি আসলে কে, জানার কোন উপায় নেই?
থাকবে না কেন? গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিল কিশোর। রকি বীচে গিয়ে সুস্থির হয়ে নিই আগে, তারপর বেরোব ডেলটাদের খোঁজে।
-: শেষ :-

ভলিউম ৪৯ – ডীপ ফ্রিজ – তিন গোয়েন্দা – রকিব হাসান – সেবা প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ: ২০০২

ভয়ানক ঠাণ্ডা! কিশোর বলল।

ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকাল প্যাসেঞ্জার। সীটে বসা রবিন, আর বেশি নেই। এসে গেছি।

এত ঠাণ্ডা নিশ্চয় সাইবেরিয়াতেও নেই! গাড়ি চালাতে চালাতে মুসা বলল। শার্লিরা থাকে। কি করে।

শুধু শার্লিরা না, হেসে বলল রবিন। আরও বহু লোক বাস করে এ অঞ্চলে। তারা থাকে কি করে?

থাকতে থাকতে অভ্যাস হয়ে গেছে আরকি, মন্তব্য করল পেছনের সীটে বসা কিশোর। আমরা গরম অঞ্চল থেকে এসেছি বলে ঠাণ্ডাটা অনেক বেশি লাগছে।

নিউ ইয়র্কে বেড়াতে এসেছে ওরা। নিউ ইয়র্কের নিউ পোর্টে। রবিনের খালার বাড়িতে। এসে দেখে তিনি নেই। জরুরী কাজে চলে গেছেন। ঘরে একটা নোট রেখে গেছেন। তাতে লেখা: জরুরী কাজে বেরোতেই হলো। দিন সাতেকের মধ্যেই ফিরছি। ঘরে খাবারটাবার সব আছে। আশা করি তোমাদের কোন অসুবিধে হবে না।-আন মারগারেট।

সেটা গত কালকের কথা। আজ চলেছে ওরা পাইনভিউ লেকে। আরেক আন্টির বাড়িতে। বেলী আন্টি। তার মেয়ে শার্লি। আজকে ওর জন্মদিন। নিউ পোর্ট থেকে ফোন করেছিল রবিন। ওদের আসার খবর পেয়ে একটা সেকেন্ডও আর দেরি করেনি শার্লি। নিউ পোর্টে চলে গিয়েছিল রবিনদের সঙ্গে দেখা করতে। দাওয়াতটা তখনই দিয়ে এসেছে।

লোকের দিকে মুখ করা একটা বড়, চমৎকার বাড়িতে থাকে শার্লিরা। আগেও এখানে এসেছে রবিন। তবে কিশোর আর মুসা এই প্রথম।

পাইন বনের ভেতর দিয়ে গেছে রাস্তা। লেক ঘিরে আংটির মত একটা পাক খেয়ে এগিয়ে গেছে। বছরের এ সময়টায় বাইরের কেউই রাস্তাটা ব্যবহার করে না তেমন, কেবল স্থানীয় অধিবাসী আর আইস ফিশারম্যানরা ছাড়া।

জানুয়ারির শেষ দিকেই জমাট বরফ হয়ে যায় লেকের ওপরের পানি। আর এখন মধ্য-ফেব্রুয়ারিতে সেটা এতই পুরু, ট্রাক নিয়ে উঠে পড়ে আইস ফিশারম্যানরা। গাড়ি চালিয়ে চলে যায় নিজেদের ফিশিং শ্যান্টির কাছে। এই জমাট বরফে স্কেইটিংও খুব ভাল জমে।

তুষারে ঢাকা পিচ্ছিল রাস্তায় শেষ মোড়টা নিতেই সামনের বরফে ঢাকা লেকটা চোখে পড়ল ওদের।

উফ, কি দারুণ সুন্দর। চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। মুগ্ধ দৃষ্টিতে জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে। একেবারে ছবির মত! ডীপ ফ্রিজ
লেকের একধারে অনেকগুলো ফিশিং শ্যান্টি। এক জায়গায় এ রকম শ্যান্টির জটলাকে স্থানীয় মাছ শিকারীরা বলে শ্যান্টি টাউন। আরেক ধারে আইস-হকি খেলতে নেমেছে ছেলের দল।
দেব নাকি বরফের ওপর দিয়েই চালিয়ে? জ্বলজ্বলে চোখে কিশোরের দিকে তাকাল মুসা।
দাও, লেকের ওপর দিয়ে যাওয়ার আনন্দটা কিশোরও মিস করতে রাজি নয়।
.
পার হয়ে এল নিরাপদেই।
শার্লিদের ড্রাইভওয়েতে ঢুকল গাড়ি।
ওই দেখো! কি বানিয়েছে। বলে উঠল কিশোর।
একটা স্নেম্যানের গায়ে ফিনিশিং টাচ দিচ্ছে শার্লি আর তার বাবা-মা। কাউচে বসা লাইফ-সাইজ ভাস্কর্য। টেলিভিশন দেখছে সোম্যান। সব কিছুই বরফ দিয়ে। বানানো হয়েছে।
খাইছে। দারুণ তো। মুসা বলল।
মরগান আঙ্কেল খুব ভাল ভাস্কর, রবিন জানাল।
হুঁ, মাথা ঝাঁকাল মুসা। ভাল যে সেটা তো সৃষ্টি দেখেই বোঝা যাচ্ছে। অদ্ভুত সুন্দর।
ড্রাইভওয়ের শেষ মাথায় গাড়ি রাখল মুসা। দরজা খুলে নামল।
দৌড়ে এল শার্লি। এলে। আমি তো তোমাদের দেরি দেখে চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম। কাল রাতে যা তুষার পড়েছে! ভাবছিলাম, রাস্তার এত তুষার মাড়িয়ে হয়তো আর আসতেই পারলে না।
শার্লির গায়ে লাল পার্কা। কান ঢাকা সাদা মাফলারে। শীতের এই সাদা ওয়ান্ডারল্যান্ডে অপূর্ব সুন্দর লাগছে ওকে।
একে একে নামল কিশোর আর রবিন। শার্লিকে হ্যাপি বার্থডে উইশ করল ওরা। হাত-পা ছড়িয়ে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করতে লাগল। গা গরম করার জন্যে কয়েক রাউন্ড স্নো-বল ছোঁড়াছুড়ি খেলল। তারপর দল বেধে এগিয়ে গেল শালির বাবা-মার সঙ্গে দেখা করার জন্যে।
এসো, মিসেস মরগান বললেন। শার্লি তো তোমাদের জন্যে অস্থির হয়ে গিয়েছিল।
কি করব। যা বরফ, জবাব দিল কিশোর।
হ্যাঁ, আসতে যে পারলে সেটাই বেশি।

পুরো সকালটাই নিশ্চয় এর পেছনে কাটিয়েছেন, স্লেম্যানের ভাস্কর্যটা দেখিয়ে বলল কিশোর।
হ্যাঁ, জবাব দিলেন বেলী আন্টি।
কাল রাত থেকে বানানো শুরু করেছি, যোগ করলেন মরগান আঙ্কেল।
কিশোর, আমার মা আর বাবা, শার্লি বলল।
হাসল কিশোর। সে তো বুঝেইছি।
মিস্টার জিম মরগান বেশ ভারিক্কি চেহারার মানুষ। ধূসর হয়ে এসেছে খাটো করে ছাঁটা চুলের রঙ। মিসেস বেলীল মরগান হাসিখুশি, আন্তরিক। হাসি লেগেই আছে মুখে।
কিশোরের দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিলেন মরগান আঙ্কেল। আমিও তোমাদের অপেক্ষাই করছি। জরুরী কথা আছে।
বাবা, প্লীজ, শার্লি বলল। মাত্র তো এল ওরা। আগে কিছু মুখে দিক। লাঞ্চটা শেষ হোক।
লাঞ্চ তো আর চলে যাচ্ছে না।
আসামাত্র বেচারা ছেলেগুলোকে নিয়ে পড়লে কেন? বাধা দিতে এগিয়ে এলেন বেলী আন্টি। ওরা এখানে আনন্দ করতে এসেছে। তোমার জরুরী কথা শুনতে নয়।
আমি শুধু জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম, এখানকার চুরি-ডাকাতিগুলোর খবর ওদের কানে গেছে কিনা, মরগান আঙ্কেল বললেন।
সজাগ হয়ে উঠল কিশোর। তাড়াতাড়ি বলল, না না, আন্টি, আমরা বিরক্ত হচ্ছি না। শোনার বরং আগ্রহই হচ্ছে।
কেউ জমায় স্ট্যাম্প, কেউ অন্য কিছু রবিন বলল, আমাদের হবি অপরাধের কিনারা করা।
সাবধানী চোখে ওদের দিকে তাকালেন বেলী আন্টি। সবগুলো পাগল।
মরগান আঙ্কেলকে জিজ্ঞেস করল কিশোর, কতদিন ধরে হচ্ছে এ সব?
হচ্ছে তো কয়েক বছর ধরেই। শীতকালে। শীতের ভয়ে লোকে পালায়। লেকের চারপাশের ওসব নির্জন বাড়িতে তখন চোর ঢোকে। জিনিসপত্র চুরি করে। নিয়ে যায়, মরগান আঙ্কেল জানালেন। পুলিশ কিছু করতে পারছে না। বড় দুশ্চিন্তার মধ্যে আছি। বাড়ি খালি রেখে আমরাও তো শহরে-টহরে যাই। তোমরা আসাতে ভালই হলো। শার্লি এসে কাল যখন বলল তোমরা এসেছ, ভাবলাম, যাক, এবার বোহয় এ সমস্যাটার একটা সমাধান হবে। শুনেছি তো, এমন এমন অনেক কেসের। কিনারা করেছ তোমরা, পুলিশও যার থই খুঁজে পায়নি। আর সে-বছর রবিনও এসে একটা জটিল কেসের কিনারা করে রেখে গেছে। তারপর থেকেই

ভক্তি এসে গেছে। তোমাদের ওপর। একটা বাচ্চাকে কিডন্যাপ করা হয়েছিল। দিব্যি খোঁজ-খবর করে কিডন্যাপারদের পাকড়াও করে ফেলল রনি। বাচ্চাটাকে উদ্ধার করল। তাই বলছিলাম, যদি চুরির কেসটারও কিছু করতে পারতে…
জিম, বাধা দিলেন বেলী আন্টি, এখানকার কাজটা তুমি শেষ করো। আমি বারগার বানাতে গেলাম।
ছেলেদের দিকে তাকালেন মরগান। তোমরা আনন্দ ফুর্তি করো। আমি যাই।
আচ্ছা, কিশোর বলল।
স্লোম্যানটার গায়ে ফিনিশিং টাচ দিতে লাগলেন মরগান আঙ্কেল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খানিক দেখল তিন গোয়েন্দা। তার কাজের প্রশংসা না করে পারল না।
শার্লি বলল, লেকে যাবে নাকি? বাবা বলল, বরফের অবস্থা খুব ভাল। স্কেইটিং জমবে।
তিন গোয়েন্দাকে নিয়ে বাড়ির পেছন দিক ঘুরে লেকের পাড়ে এসে দাঁড়াল সে।
সত্যি, এত সুন্দর জায়গা! লেকটার দিকে তাকিয়ে থেকে মুসা বলল। পিকনিকের জন্যে এর তুলনা হয় না।
নির্বিঘ্নে চুরি-ডাকাতির জন্যেও তুলনাহীন, কিশোর বলল।
চোর-ডাকাতের কথা এখানে ভাল লাগছে না। দৃশ্যটার সঙ্গে বেমানান।
স্বর্গেও সাপ থাকে, গম্ভীর স্বরে জবাব দিল কিশোর। বাড়িঘরগুলোর অবস্থান দেখো। দেখলেই বুঝবে জায়গাটা কেন চোর-ডাকাতের স্বর্গ হয়েছে।
বেশির ভাগ বাড়িই বড় বড়। দুতিনতলা উঁচু। প্রতিটি বাড়ির চারপাশে প্রচুর খালি জায়গা। একজন মানুষকেও দেখা গেল না কোনখানে।
ডোবারকে ফোন করব কিনা ভাবছি, চিন্তিত ভঙ্গিতে রবিন বলল। চুরিগুলোর ব্যাপারে আলোচনা করা যাবে। ডোবার কগনান নিউ পোর্ট থানার অফিসার। কিডন্যাপ করা বাচ্চাটাকে উদ্ধারের সময় আমাকে অনেক হেল্প করেছিল। খুব ভাল অফিসার।…থাকগে, পরেই করব। চলো, শরীরটাকে গরম করে আসি। স্পীড স্কেইট নিয়ে এলে ভাল হত, লেকের ওপর জমে থাকা শক্ত, সমতল, মসৃণ বরফের দিকে তাকিয়ে আফসোস করল সে।
আনলেও কোন লাভ হত না, চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিল মুসা। আমার সঙ্গে পারতে না। সাধারণ স্কেইট দিয়েই তোমাকে হারানোর ক্ষমতা রাখি আমি।
তাই নাকি? এসো, সাধারণ স্কেইট দিয়েই হয়ে যাক প্রতিযোগিতাটা।
চলো।
কিশোর এ সব চ্যালেঞ্জের মধ্যে গেল না। তবে গাড়ি থেকে অন্য দুজনের সঙ্গে সে-ও তার স্কেইট বের করে নিয়ে চলে এল লেকের কিনারে। পরে নিল দ্রুত।
শার্লি বলল, তোমরা যাও। আমি বরং মাকে সাহায্য করিগে।

ঘুরে বাড়ির দিকে রওনা হয়ে গেল সে।
কোনখান থেকে ছোটা শুরু করবে ভাবছে কিশোর, এমন সময় হই-চই কানে এল।
ফিরে তাকাল তিন গোয়েন্দা।
লেকের একধারে জটলা করছে হকি খেলোয়াড় ছেলেগুলো। ওদের মুখোমুখি হয়েছে কয়েকজন বয়স্ক লোক। ঝগড়া করছে মনে হলো। তুমুল উত্তেজনা।
কিশোর বলল, হকি খেলছে, না চোর ধরা পড়েছে?
চোর না, চোর না! পেছন থেকে বলে উঠল শার্লি। হট্টগোল শুনে কি হয়েছে দেখার জন্যে ফিরে এসেছে। তোমার মাথায় এখন চোর ছাড়া আর কিছু নেই মনে হচ্ছে। বারার মত!
আঙ্কেলকেও নিশ্চয় দোষ দেয়া যায় না, রবিন বলল। বছর বছর চুরি হচ্ছে। পুলিশ কিছু করতে পারছে না। এখানে বাস করছেন। চিন্তায় তো তিনি পড়বেনই।
তা ঠিক, একমত হয়ে মাথা ঝাঁকাল কিশোর।
হট্টগোলের দিকে নজর দিল রবিন। ওর চেয়ে দুএক বছরের বড় একটা ছেলেকে দেখিয়ে আনমনেই বলে উঠল, পিটার হিগিনস না?
আচমকা হকি স্টিক তুলে একজন লোককে বাড়ি মারতে গেল ছেলেটা।
ওকে একদম সইতে পারে না বাবা, শার্লি বলল। এক্কেবারে বুনো। মারামারির জন্যে গত বছর আমাদের স্কুল থেকে বের করে দেয়া হয়েছে ওকে।
তবে ফুটবলটা ভালই খেলে, দেখে গিয়েছিলাম, রবিন বলল।
তা খেলে, শালি বলল। তবে ফাউল করে করে অনেকের পায়েই ব্যান্ডেজও আঁধায়। বাবার ধারণা, পিটার আর ওর বন্ধুরাই চুরিগুলো করে।
হঠাৎ লোকের কিনার থেকে ভেসে এল গলা ফাটানো চিৎকার। অ্যাই, ভাগো এখান থেকে। কোন কথা নেই। খেলা বন্ধ, ব্যস!
পিটার আর তার সঙ্গী খেলোয়াড়দের দিকে এগিয়ে আসছে আরও কিছু লোক। শার্লি জানাল, ওরা শিকারী। কারও কারও হাতে আইস বার। ইস্পাতের ভারী ওই শিকগুলোর সাহায্যে বরফ খোঁচায় ওরা। বরফে মাছ ধরার গর্তগুলোকে বুজে যাওয়া থেকে রক্ষা করে। তবে এ মুহূর্তে পিটানোর জন্যেই নিয়ে এসেছে ওই শিক।
চলো! বলে শার্লি বাধা দেবার আগেই বরফের ওপর দিকে স্কেইটিং করে ছুটল কিশোর।
পিছু নিল তার দুই সহকারী।
ওরা যখন কাছে গেল, তুমুল ঝগড়া বেধে গেছে ততক্ষণে দুটো দলের মধ্যে। বুড়ো একজন লোকের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল পিটার, আমরা খেলবই। আপনি বাধা দেয়ার কে?

বুড়োর সব চুল সাদা। গায়ে লম্বা ঝুলওয়ালা উলের কোই।
নিচু স্বরে কিশোর আর মুসাকে জানাল রবিন, বুড়োর নাম জিথার জ্যাকসন। শীতকালে সব সময় ওই একটা কোটই পরে থাকে। টাকা-পয়সার যে অভাব তা নয়। অতিরিক্ত কিপটে। জ্যাকসনস বেইট শপ দোকানটার মালিক। এই লেকের পাড়ের একমাত্র দোকান। লোকে বলে ওর জন্মের পর থেকেই চালাচ্ছে।
দেখো না খেলে আবার। সমান তেজে চেঁচিয়ে পিটারের কথার জবাব দিল। বুড়ো।
খেলবই তো। কি করবেন?
বললাম না, খেলেই দেখো।
কঠোর আরেকটা জবাব দিতে যাচ্ছিল পিটার, চোখ পড়ল রবিনের দিকে। আরি রবিন; কখন এলে?
এই তো। একটু আগে, রবিন বলল। কি হয়েছে?
আরে দেখো না, হকি খেলতে বাধা দিচ্ছে। সব মাছ নাকি তাড়িয়ে দিচ্ছি আমবা। নিজেরা পারে না ধরতে, দোষটা এখন আমাদের।
হাই, রবিন। হাত নেড়ে ডাকতে দেখা গেল আরেকজন লোককে। মাথায় লাল ক্যাগ। লম্বা, ছিপছিপে দেহ। এত উঁচু, সবার মাথার ওপর দিয়ে তাকে দেখা যাচ্ছে।
হাই! হাত নাড়ল রবিন।
আজই এলে নাকি?
হুঁ।
হাতের ইশারা করল লোকটা, এসো এদিকে।
মেরিন ডগলাস, লোকটার দিকে এগোনোর সময় দুই বন্ধুকে জানাল রবিন। খুব ভাল মোটর মেকানিক।
রবিন কাছে যেতে দস্তানা পরা একটা হাত বাড়িয়ে দিল ডগলাস। কেমন আছ?
কিশোর আর মুসার দিকে চোখ পড়তে ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল, বন্ধু। নাকি?
হ্যাঁ, হাতটা ধরে ঝাঁকি দিতে দিতে জবাব দিল রবিন। ও কিশোর।...আর ও মুসা।...ডগলাস, এত গোলমাল কিসের?
শুনলেই তো পিটারের কাছে। কিশোরের সঙ্গে হাত মেলাতে মেলাতে জবাব দিল ডগলাস। তারপর হাত বাড়াল মুসার দিকে। ওরা তো বলে হকি খেলে। কিন্তু যে কাণ্ডটা করে তাকে হকি খেলা বলে না। বরফের ওপর দিয়ে পাগলের মত ছুটতে থাকে। কোনদিন যে বিপদ ঘটাবে। হয় কারও শ্যান্টি ভাঙবে, নয়তো নিজেরাই বরফ ভেঙে পানিতে পড়ে মরবে।
শয়তানি করলে তো বিপদ হবেই। আপনারা বাধা দিচ্ছেন কেন? মাছ তাড়ায় বলে?

উঁহু। ভয়টা অন্যখানে। কোন রকম দুর্ঘটনা ঘটলে পুলিশ কাউকেই নামতে দেবে না আর লেকে। মাছ ধরাটা তখন যাবে আমাদের।
সবচেয়ে বেশি রাগ তো দেখা যাচ্ছে জ্যাকসনের, কিশোর বলল। ফেটে পড়ছে। এ রকম করছে কেন?
করবে না? এখানে মাছ ধরা নিষিদ্ধ হলে ওর ব্যবসা খতম। দোকানে লাল বাতি জ্বলবে যে। খেপাটা স্বাভাবিক।
পিটার কি করছে দেখার জন্যে ফিরে তাকাল রবিন। জ্যাকসনের সঙ্গে ঝগড়া। তুঙ্গে উঠেছে পিটারের। হকি স্টিক তুলে বাড়ি মারতে গেল বুড়োকে। তাকে সাহায্য করতে এগোল তার দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধু ডট আর কারনি। বয়েসে পিটারের দুতিন বছরের বড় হবে ওরা। গণ্ডগোল করার কারণে ওদেরকেও স্কুল থেকে বের করে দেয়া হয়েছে।
জ্যাকসনও কম যায় না। কোমরের টুল বেল্টে ঝোলানো ছোট একটা কুড়াল একটানে খুলে নিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, আমাকে বাড়ি মারবি? আয় তো দেখি কত্তবড় সাহস!
বাধা দিতে এগিয়ে গেল রবিন।
তার কথা কানেও তুলল না কেউ।
চোখ পাকিয়ে তার দিকে তাকাল কারনি। বেঁকিয়ে উঠল, নিজের চরকায় তেল দাওগে।
তবে খুনখারাবির মধ্যে কাউকেই যেতে দিল না জনতা।
পিটারদেরকে হকি স্টিক নামাতে বাধ্য করল। জ্যাকসনও আবার কুড়ালটা কোমরে ঝোলাল। কিন্তু কথার লড়াই বন্ধ করল না দুপক্ষের কেউই।
তীব্র স্বরে জ্যাকসন বলল পিটারকে, ভেবেছিস, চুরি-ডাকাতি করে এত সহজেই পার পেয়ে যাবি? আমি সব জানি!
কি জানো তুমি, বুড়ো ভাম কোথাকার! ঝাজিয়ে উঠল পিটার। মিথ্যে কথা বললে দেব এক বাড়িতে মাথাটাকে দুফাঁক করে।
আবার হকি স্টিক তুলল সে।
আবার কুড়ালে হাত দিতে গেল জ্যাকসন।
তবে দ্বিতীয়বারের মত আবার সামলে নিল নিজেদের।
পুলিশের সাইরেন কানে এল।

.

তিনটে পুলিশের গাড়ি এসে দাঁড়াল লেকের কিনারে।
হুড়মুড় করে কয়েকজন পুলিশ অফিসার নেমে দৌড় দিল বরফের ওপর দিয়ে।

বরফে আটকানোর কাঁটা বসানো নেই ওদের বুটের নিচে। কাজেই প্রথম লোকটাই লেকে নেমে আছাড় খেল।
হেসে ফেলল মুসা।
হাঁচড়ে-পাঁচড়ে লোকটা আবার উঠে দাঁড়াতেই রবিন বলল, ডোবার কগনান।
কাছে এসে জনতার দিকে তাকিয়ে হাপাতে হাপাতে বলল সে, একটা ফোন পেলাম, এখানে নাকি গণ্ডগোল হচ্ছে?
নিজের দলের কাছে ফিরে গেছে পিটার। চিৎকার করে বলল, জ্যাকসন নিজেকে এই লেকের মালিক দাবি করছে।
অ্যাই, পাজি ছোঁড়া, মিথ্যে কথা বলবি না! চেঁচিয়ে উঠল জ্যাকসনও। চোরের মার বড় গলা।
শুরু হলো জনতার গুঞ্জন। সবাই একসঙ্গে কথা শুরু করল। কিছু বোঝার উপায় নেই।
চিৎকার করে উঠল ডোবার, আহ, একজন একজন করে বলুন না!
স্কেইট করে তার পাশে এসে দাঁড়াল রবিন।
অবাক হয়ে গেল ডোবার। আরি, তুমি এলে কখন? এরা কারা?
এই তো, খানিক আগে। কিশোর আর মুসার পরিচয় দিল রবিন।
কিশোরের দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিল অফিসার। আমি ডোবার কগনান। তোমাদের কথা অনেক শুনেছি রবিনের মুখে।
আপনার কথাও শুনেছি আমরা, হাত মেলাতে মেলাতে বলল কিশোর।
এদিকে এসো। কথা বলি। তিন গোয়েন্দাকে নিয়ে ভিড়ের কাছ থেকে সরে গেল ডোবার। তার সঙ্গের অফিসাররা গিয়ে জনতাকে পাহারা দিতে লাগল, যাতে ঝগড়া করতে না পারে।
গত তিন সপ্তাহে এই নিয়ে বারো বার আসতে হয়েছে আমাকে এখানে, ডোবার জানাল। এখন আমি চীফের অপেক্ষা করছি। এগারো বারের বার তিনি। আমাকে বলেছিলেন আবার এ রকম কিছু ঘটলে তিনি নিজে আসবেন তদন্ত করতে।
জ্যাকসনের দোকানের দিক থেকে লেকে নেমে আসতে দেখা গেল দুজন। যুবককে। জনতার ভিড়ের দিকে এগোল ওরা। বয়েস তেইশ-চব্বিশ। একজনের মাথায় সোনালি চুল, ছয় ফুট উঁচু। আরেকজনের কালো চুল, উচ্চতায় প্রথমজনের চেয়ে কয়েক ইঞ্চি খাটো।
ওই যে, জ্যাকসনের দুই নাতি, ডোবার বলল। বড়টার নাম জ্যাকি। আর ছোটটা রকি। বাবা-মা থাকে ম্যারিল্যান্ডে। ওরাও ওখানেই থাকে। বছরে কয়েকবার করে আসে দাদার দোকানদারিতে সাহায্য করতে। ওদেরকে খারাপ লাগে না আমার।

পুলিশ চীফ ক্যাপ্টেন ইউরি রিকম্যানও এসে পৌঁছলেন। বরফের ওপর দিয়ে পা পিছলাতে পিছলাতে দ্রুত তার দিকে এগিয়ে গেল ডোবার। ক্যাপ্টেনও নেমে এগিয়ে আসতে লাগলেন। মাঝপথে মিলিত হলেন দুজনে। কিছু কথা হলো। তারপর একসঙ্গে জনতার দিকে এগোলেন।
অনেকেই আছেন দেখছি, ক্যাপ্টেন বললেন। ভালই হলো। আমি আপনাদের ঝগড়া থামাতে আসিনি। সেটা পার্ক কমিশনারের দায়িত্ব। আমি এসেছি জনসনদের বাড়ির ডাকাতির তদন্ত করতে। কেউ কোন তথ্য দিতে পারবেন আমাকে?
জনতার দিকে তাকিয়ে আছে তিন গোয়েন্দা। কে কি বলে শুনতে আগ্রহী।
পারব, জবাব দিল জ্যাকসন।
অকারণে এর মধ্যে জড়াচ্ছ কেন, দাদা? চুপ করানোর চেষ্টা করল জ্যাকি।
কি চুপ করতে দিলেন না ক্যাপ্টেন। কি জানেন, বলুন?
বাড়িটার আশেপাশে ঘুরঘুর করতে দেখেছি পিটার হিগিনসকে, জ্যাকসন জানাল।.
ফেটে পড়ল পিটার। দেখো বুড়ো, সাবধান করে দিচ্ছি তোমাকে। পস্তাতে হবে এর জন্যে। হকিস্টিক তুলে শাসাতে লাগল সে। মুখ টকটকে লাল।
দেখলেন, দেখলেন, আপনার সামনেই কেমন করছে? জ্যাকসন বলল। ওকে ছেড়ে রাখলে মানুষ খুন করবে একটু আগে আমাকেই খুন করতে চেয়েছিল...
তুমি থামো, পিটার, ক্যাপ্টেন বললেন। আমি দেখছি।
পিটারের কাছে সরে গেল রবিন।
আপনি জানেন না, ক্যাপ্টেন, চেঁচিয়ে উঠল পিটার, বুড়োটা অনেক দিন থেকেই আমাকে প্যাঁচে ফেলার চেষ্টা করছে। বাবাকে তো শেষই করে দিয়েছে। ওর মিথ্যে কথা আপনি বিশ্বাস করবেন না।
শুনি তো আগে, জ্যাকসনের দিকে ঘুরলেন ক্যাপ্টেন। পিটারকে ওখানে কখন ঘুরঘুর করতে দেখেছেন?
কাল সন্ধ্যায় দেখেছি। আজ সকালে দেখেছি। সারা সপ্তাহ ধরেই দেখছি, জ্যাকসন জানাল। দিনে, রাতে, সব সময়। শুধু ওই বাড়িটাই নয়, আরও অনেক বাড়ির সামনে ওকে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছি।
তাহলে আমার সঙ্গে থানায় চলুন একবার, প্লীজ। লিখিত বক্তব্য পেলে ভাল হয়।
যাচ্ছি। এগুলো জেলে ভরতে না পারলে শান্তিতে ঘুমাতে পারবে না কেউ।
ঘুম তোমার এমনিতেই হয় না, বুড়ো ভাম! রাগে গজগজ করতে লাগল পিটার। শুধু শুধু চোরের দোষ দিও না।
চোরতাকে এখনও অ্যারেস্ট করছেন না কেন? ঝাঁজিয়ে উঠল জ্যাকসন।

অধৈর্য ভঙ্গিতে হাত নাড়লেন ক্যাপ্টেন। এ ভাবে কাউকে অ্যারেস্ট করা যায় না, মিস্তার জ্যাকসন। থানায় চলুন। আপনার বক্তব্য শুনি। পিটারকেও আমাদের সঙ্গে থানায় যেতে হবে। ওর কি বলার আছে সেটাও শুনি। সে যে চোর, প্রমান পেলে তখন অ্যারেস্ট করা যাবে।
এতগুলো লোক যে ওকে বাড়িগুলোর সামনে ঘুরঘুর করতে দেখল, সেটা প্রমাণ না?
না। আমাদের কাজ আমাদের করতে দিন, মিস্টার জ্যাকসন। চোর হলে ও বাঁচতে পারবে না। আর মিথ্যে বললে আপনাকেও ভুগতে হবে। সহকারী অফিসারদের দিকে তাকালেন ক্যাপ্টেন। ওকে নিয়ে চলো।
পিটারের দিকে এগিয়ে গেল কয়েকজন অফিসার।
আচমকা এক কাণ্ড করল পিটার। রবিনের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল, রবিন, এখনও তুমি চুপ করে আছ! কিছু করছ না! আমি যে চোর নই, তুমি তো জানো?
অ্যারেস্ট তো করেনি তোমাকে, প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল রবিন। শুধু কয়েকটা প্রশ্ন করতে নিয়ে যাচ্ছে থানায়।
পিটারের হাত ধরে টান দিল একজন অফিসার।
রবিন, মরিয়া হয়ে বলল পিটার, রবিন, তোমাকে কি আমি সাহায্য করিনি? কিডন্যাপ হওয়া সেই ছেলেটাকে খুঁজতে গিয়ে তুমি যখন বিপদে পড়লে…
মনে আছে আমার, পিটার, শান্তকণ্ঠে বলল রবিন। চুপচাপ চলে যাও এখন ওদের সঙ্গে কোন গোলমাল বাধিয়ো না। সত্যি যদি অপরাধী না হও, তোমাকে বের করে আনার ব্যবস্থা আমরা করব।
পিটারকে গাড়ির দিকে নিয়ে চলল পুলিশ।
জ্যাকসন, আপনিও আসুন, ক্যাপ্টেন বললেন দোকান বন্ধ করে আসতে সময় লাগবে?
না। যাচ্ছি, চলুন। দোকান আমার নাতিরাই সামলাতে পারবে।
ক্যাপ্টেনের পেছন পেছন হাঁটতে শুরু করল জ্যাকসন।
বুড়োর দুই নাতির দিকে ঘুরল রবিন। হাত বাড়িয়ে দিল। আমি রবিন মিলফোর্ড। ডোবারের মুখে আপনাদের নাম জেনেছি। জ্যাকি আর রকি।
মুখটা গোমড়া করে রাখল জ্যাকি। রবিনের হাতটা আলতো করে ছুঁয়েই ছেড়ে দিল।
কিন্তু রকি তা করল না। রবিনের হাত ধরে ঝাঁকি দিয়ে বলল, আমি রকি জ্যাকসন। ও আমার বড় ভাই জাকি জ্যাকসন।

কিশোর আর মুসাকে দেখিয়ে রবিন বলল, এরা আম বন্ধু। কিশোর পাশা। ও মুসা আমান। আপনাদের মতই আমরাও বাইরের লোক। লস অ্যাঞ্জেলেসের রকি বীচ থেকে এসেছি।
অ, তাই নাকি?
কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বকবক করছ। ধমকে উঠল জ্যাকি। এসো জলদি!
ভাইয়ের আচরণে বিব্রত বোধ করল রফি। হাসিটা ধরে রাখল কোনমতে। কিছু মনে কোরো না। সবার সঙ্গেই এমন ব্যবহার করে ও। আমি যাই। দোকান সামলাতে হবে। পরে কথা বলব।
ভাইয়ের পিছু পিছু রওনা হয়ে গেল ও।
আর এখানে দাঁড়িয়ে থাকার কোন কারণ নেই। যার যার পথে চলে যেতে লাগল সবাই। নেতাকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে। খেলাটেলা আর জমবে না বুঝতে পেরে পিটারের দুই দোস্ত ডট আর কারনিও আর দাঁড়াল না। আচমকা স্কেইটিং করে ছুটতে শুরু করল। তাকিয়ে আছে কিশোর। মুহূর্তে জ্যাকসনের নাতিদের কাছে পৌঁছে গেল ওরা। কনুই দিয়ে গুঁতো মেরে রকিকে বরফের ওপর ফেলে দিল কারনি। ভান করল, যেন না দেখে করেছে। ডটের হকি স্টিকের মাথাটাও বেশ জোরেই লাগল জ্যাকির পিঠে।
কিশোরের কানে এল ডটের ব্যঙ্গভরা কণ্ঠ, বরফের মধ্যে দেখে চলাফেরা কোরো।
হাসতে হাসতে চলে গেল পিটারের দুই দোস্ত।
ছেলে দুটোর আচরণ ভাল লাগল না তিন গোয়েন্দার।
এখানে আর করার কিছু নেই ওদেরও।
শার্লিদের বাড়িতে ফিরে চলল।

.

দরজার কাছেই দেখা হয়ে গেল মরগান আঙ্কেলের সঙ্গে।
পুলিশকে আমিই ফোন করেছিলাম, জানালেন তিনি।
ভাল করেছেন, জবাব দিল কিশোর। নইলে খুনোখুনি হয়ে যেত।
আমিও বুঝতে পারছিলাম। যে ভাবে মারমুখো হয়ে উঠেছিল বুড়ো জ্যাকসন দূর থেকে দেখেও বেশ কেঝা যাচ্ছিলযাকগে। কেসটা হাতে নিয়েছ নাবি তোমরা?
তেমন করে হাতে এখনও নিইনি। তবে খেয়েদেয়ে জনসনের বাড়িটা একবার ঘুরে আসব। দেখি কোন সূত্র পাওয়া যায় কিনা। আন্টি, খিদে পেয়েছে। খাবার দিন।
খেতে বসে বার বার পার্টির কথা তুলে কিশোরকে নিরস্ত করার চেষ্টা করতে লাগলেন বেলী আন্টি। কিন্তু স্বামীর সঙ্গে কুলিয়ে উঠতে পারলেন না। মরগা আঙ্কেল আরও উসকে দিতে লাগলেন কিশোরের কৌতূহলটাকে। অতএব

নাকেমুখে খাবারগুলো প্রায় খুঁজে দিয়ে দুই সহকারীকে নিয়ে উঠে পড়ল কিশোর। জনসনদের বাড়ি রওনা হলো।
জনসনদের বাড়িটা অনেক বড়। লেকের দিকে মুখ করা। কয়েকজন পুলিশ অফিসারকে দেখা গেল সূত্র খুঁজতে। ডোবার কগনানকেও পাওয়া গেল ওখানেই।
কিছু পেলেন? জানতে চাইল কিশোর।
নাহ, মাথা নাড়ল ডোবার। জ্যাকসনের কথার ওপরই কেবল ভরসা। তবে হিগিনসদের সঙ্গে সম্পর্ক ভাল নয় তার। মিথ্যেও বলে থাকতে পারে।
সম্পর্কটা খারাপ হলো কেন? কৌতূহলী হলো কিশোর।
এক সময় পিটারের বাবা মিস্টার হিগিনস আর জ্যাকসন একসাথে ব্যবসা করেছে। এ সব ক্ষেত্রে সাধারণত যা হয়, সম্পর্কটা টেকেনি।
এর বেশি আর কিছু বলতে চাইল না ডোবার। কাজেই অন্য প্রসঙ্গে গেল কিশোর, কটা বাড়িতে চুরি হয়েছে?
গত তিন বছরে প্রায় দুই ডজন।
কি কি জিনিস নিয়েছে?
বেশির ভাগই সোনা-রূপার গহনা। ঘড়ি আর ওরকম সহজে বহনযোগ্য ছোটখাট দামী দামী জিনিস যা পেয়েছে সব নিয়েছে। কোন হদিস করা যায়নি ওগুলোর। যেন বাতাসে মিলিয়ে গেছে।
বিক্রি না করে কোথাও লুকিয়ে ফেলেছে বলছেন?
হয় লুকিয়ে ফেলেছে, নয়তো অনেক দূরের কোন শহরে নিয়ে গিয়ে চোরাই বাজারে বিক্রি করেছে। রবিনের দিকে তাকাল ডোবার। আচ্ছা, পিটারকে তোমার সন্দেহ হয়?
উঁহু, মাথা নাড়ল রবিন। বদমেজাজী। তবে চোর বোধহয় নয়।
অভাবে স্বভাব নষ্ট অনেক সময় হয়ে যায়, ডোবার বলল। যাকগে, চোর নাহলেই ভাল।
বাড়িটার চারপাশে তিন গোয়েন্দাও খানিকক্ষণ খুঁজে দেখল। কিন্তু বরফে পুলিশের এত বেশি জুতোর ছাপ পড়েছে, চোরেরটা থেকে থাকলেও আলাদা করে চেনা এখন মুশকিল। কিছু পাওয়া যাবে না বুঝতে পেরে বাড়ির সীমানা থেকে বেরিয়ে চলে এল ওরা।
চলো, এখানে আর দেরি না করে শার্লিদের বাড়ি চলে যাই, রবিন বলল। পার্টিটায় যোগ দেয়া দরকার। নইলে শার্লি আর আন্টি, দুজনেই মনে কষ্ট পাবে। মরগান আঙ্কেলের কথা আলাদা। পার্টির চেয়ে চোর ধরার ব্যাপারটাকেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন উনি।

রবিন, মুসা জিজ্ঞেস করল, সত্যিই কি তোমার মনে হয় পিটার নিরপরাধ? তার দোস্ত দুটোকে দেখে কিন্তু জ্যাকসনের ধারণাই সঠিক বলে মনে হচ্ছে আমার। পাজির পা ঝাড়া।
আর যে-ই করে থাকুক, পিটার যে নিজে চুরি করেনি এ ব্যাপারে আমি এখন মোটামুটি শিওর, জবাব দিল কিশোর।
কি করে শিওর হলে? রবিনের প্রশ্ন।
ডোবার কি বলল শোনানি? রহস্যময় এই চুরিগুলো হচ্ছে বছর তিনেক ধরে।
হ্যাঁ। তাতে কি?
তুমিই তো বলেছ গত বছর মিশিগানে চলে গিয়েছিল পিটার। তার মার কাছে এক বছর থেকে এসেছে। ও এখানে যখন ছিল না, তখনও তো চুরি হয়েছে।
হুঁ, এটা একটা শক্ত যুক্তি, মাথা দুলিয়ে বলল মুসা। তা ছাড়া নিজের এলাকায় থেকে এ ভাবে একের পর এক চুরি করার সাহস দেখাবে, এটাও অবিশ্বাস্য।
ঠিক, কিশোর বলল।
কিন্তু কথা হলো, প্রশ্ন তুলল রবিন, পিটার যদি চুরি না করে থাকে, তাহলে চোর কে?
সেটাই এখন খুঁজে বের করতে হবে আমাদের, জবাব দিল কিশোর।
শার্লিদের বাড়িতে ফিরে এল ওরা। বিশাল লিভিং রুমটায় বসে আছেন মরগান আঙ্কেল, বেলী আন্টি ও শালি। গরম চকোলেট খাচ্ছে সবাই।
কিশোরদের দেখেই জিজ্ঞেস করলেন বেলী আন্টি, আইসক্রীম খাবে?
গুঙিয়ে উঠল মুসা। ওটা তো আর গরম গরম দিতে পারবেন না।
হাসলেন বেলী আন্টি। দেখা যাক, গরম কি দেয়া যায়।
মরগান আঙ্কেল জিজ্ঞেস করলেন, কিছু পেলে?
নাহ্, তেমন কিছু না, রবিন জানাল। কিশোর বলল, পুলিশ এখনও সূত্র খুঁজে বেড়াচ্ছে।
আহ্, বিরক্ত হয়ে বললেন বেলী আন্টি, ছেলেগুলোকে একটু মুক্তি দাও না। ওরা এসেছে পার্টিতে আনন্দ করতে, আর তুমি ওদের লাগিয়ে দিলে গোয়েন্দাগিরিতে।
আমি জানি, পার্টির চেয়ে গোয়েন্দাগিরিতেই বেশি মজা পায় ওরা, মরগান শ্রাঙ্কেল জবাব দিলেন।
গরম চকোলেটের মগ, প্রচুর মাখন লাগানো কেক আর তিন-চার রকমের ফলের কুঁচি মেশানো আইসক্রীমের ট্রে এনে সোফার পাশের ছোট টেবিলে রাখলেন আন্টি। যার যারটা তুলে নিতে বললেন তিন গোয়েন্দাকে।
বেলী আন্টি নানা ভাবে চেষ্টা করলেও চুরির আলোচনা বাদে অন্য আলোচনা। জমল না। কোন সময় যে নিজেও তিনি যোগ দিয়ে ফেলে, বলতে পারবেন না।

আচ্ছা, আন্টি, চুরি হওয়ার রাতগুলোতে অস্বাভাবিক কোন কিছু কি চোখে। পড়েছে আপনার? কিংবা কোন শব্দ? প্রশ্ন করল কিশোর।
যতবার ডাকাতি হয়েছে, পৃলিশ এসে একই এশ করেছে আমাদের। আমরাও একই জবাব দিয়েছি না, কিছুই দেখিনি, কিছু শুনিওনি, বেলী আন্টি বললেন।
তবে এটা ঠিক, মরগান আঙ্কেল বললেন, আমাদের বাড়ির পাশ দিয়ে আমাদের অজান্তে কোন গাড়ির যাবার উপায় নেই। শুনতে আমরা পাবই!
কেন? জানতে চাইল মুসা।
কারণ আমাদের বাড়িটা রাস্তার একেবারে ধার ঘেঁষে তৈরি। পাইনভিউ থেকে বেরোনোর সময়ও আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে যেতে হবে, ঢোকার সময়ও। গাড়ির রাস্তা ওই একটাই, জবাব দিলেন মরগান আঙ্কেল।
তা ছাড়া, বেলী আন্টি বললেন, শীতকালে যানবাহন চলাচলও এখানে নেই বললেই চলে। কালেভদ্রে প্রতিবেশীদের একআধটা গাড়ি যায়-আসে আমাদের বাড়ির পাশ দিয়ে। সব শুনতে পাই আমরা। জায়গাটা এত নীরব বলেই শান্তির জন্যে এখানে বাস করতে এসেছি।
এক মুহূর্তের নীরবতার পর আঙ্কেল জিজ্ঞেস করলেন, চুরিগুলো কি বন্ধ করতে পারবে তোমরা? কি মনে হয়?
এক মুহূর্ত চিন্তা করে জবাব দিল কিশোর, আমাদের সাধ্যমত চেষ্টা তো আমরা অবশ্যই করব। দেখি কি করা যায়।

.

থানাতেই পাওয়া গেল ক্যাপ্টেন ইউরি রিকম্যানকে। পাইনভিউ লেকের চুরির কেসটা নিয়ে ব্যস্ত। পিটার আর জ্যাকসনের দুটো সই করা লিখিত বক্তব্য রয়েছে তাঁর সামনে, টেবিলে। সেগুলো পড়ছেন।
সাড়া পেয়ে মুখ তুললেন। অ। তোমরা। বসো...কি খবর? ডোবারের তো তোমাদের সম্পর্কে খুব উঁচু ধারণা...
পিটার চুরি করেনি, কিশোর বলল।
ভুরু উঁচু করলেন ক্যাপ্টেন! কি করে বুঝলে?
গত বছর সে ছিলই না পাইনভিউতে। মিশিগানে মায়ের কাছে চলে গিয়েছিল। কিন্তু চুরি তো থেমে থাকেনি। তারমানে সে জড়িত নয়।
মাথা ঝাঁকালেন ক্যাপ্টেন! জড়িত নয় বলতে পারো না। কারণ তার দোস্তরা তো পাইনভিউতেই ছিল। সে নিজে সামনে ছিল না, এটা বলা যেতে পারে। কিন্তু জড়িত নয়, কিংবা জানে না বলাটা ভুল হবে। একটা মুহূর্ত চুপ করে থেকে তিনজনেরই মুখের দিকে তাকালেন তিনি। তা ছাড়া, সে নিজেই স্বীকার করেছে চুরি করে ঢুকেছে একটা বাড়িতে।

হতবাক হয়ে গেল তিন গোয়েন্দা।
ভুরু কুচকে জিজ্ঞেস করল কিশোর, মানে?
একটু আগে সে নিজের মুখে বলেছে, বন্ধুদের নিয়ে ডেভিড শফারের বাড়িতে ঢুকেছিল। দুই হপ্তা আগে চুরি হয়েছে বাড়িটাতে।
ও চুরি করেছে, এ কথা বলেছে?
না, তা বলেনি। বলেছে, সাহস দেখানোর জন্যে বাজি ধরে খালি বাড়িতে ঢুকেছিল। তবে বিনা অনুমতিতে যে ঢুকেছিল, এ কথা স্বীকার করেছে।
কথা বলা যাবে ওর সঙ্গে?
এসো। উঠে দাঁড়ালেন ক্যাপ্টেন!
তাকে অনুসরণ করে বাড়ির পেছন দিকের একটা হাজতের সামনে এসে দাঁড়াল তিন গোয়েন্দা।
দুহাতে মাথা চেপে ধরে একটা বাংকের ওপর বসে রয়েছে পিটার।
পিটার, দেখো কারা এসেছে, ডাক দিলেন ক্যাপ্টেন।
মুখ তুলল পিটার।
কিশোরের দিকে তাকিয়ে ক্যাপ্টেন বললেন, তোমরা কথা বলো। আমি আসছি।
শিকের ওপাশ থেকে জিজ্ঞেস করল পিটার, আমাকে ছাড়িয়ে নিতে এসেছ?
দেখি কি করতে পারি... জবাব দিল কিশোর। ক্যাপ্টেনকে বললাম, এক বছর তুমি ছিলে না পাইনভিউতে। কাজেই ওসময়কার চুরি-ডাকাতিগুলোতে তোমার সরাসরি জড়িত থাকা সম্ভব নয়।
তারমানে আমি নিরপরাধ, এই তো বলছ?
নিরপরাধ কিনা সে-প্রমাণ যেমন এখনও মেলেনি, চোরের সঙ্গে যোগসাজশ আছে কিনা সে-ব্যাপারেও শিওর নই, জবাব দিল কিশোর।
মানে? এগিয়ে এসে শিক ধরে দাঁড়াল পিটার।
ক্যাপ্টেন বললেন, তুমি নাকি ডেভিড শফারের বাড়িতে ঢুকেছিলে।
ও তো স্রেফ মজা করার জন্যে। ঢুকে, ফ্রিজ থেকে কিছু খাবার বের করে নিয়ে বেরিয়ে চলে এসেছি। মনে হচ্ছিল, বেশ একটা মজা হলো।
মজা!
জানি, জানি। গাধামি করেছি, বুঝতে পারছি এখন।
বড় এক গোছা চাবি নিয়ে হাজির হলেন ক্যাপ্টেন। তালাটা খুলে দিতে দিতে পিটারকে বললেন, আপাতত তোমাকে ছেড়ে দেয়া হচ্ছে।
স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে তিন গোয়েন্দার দিকে কৃতজ্ঞ চোখে তাকাল পিটার, অনেক ধন্যবাদ তোমাদেরকে।

ধন্যবাদটা নিতে পারছি না আমরা, কিশোর বলল। তোমাকে ছাড়ানোর ব্যাপারে আমরা কিছুই করিনি।
গুঙিয়ে উঠল পিটার, তারমানে বাবা এসেছে।
উঁহু, জবাব দিলেন ক্যাপ্টেন। তাকে ফোন করে তোমার কথা জানালাম। ছাড়া তো দূরের কথা, সারা জীবন আটকে রাখতে বলে দিলেন।
দমে গেল পিটার। তাহলে ছেড়ে দিচ্ছেন কেন?
এইমাত্র খবর পেলাম, আরেকটা বাড়িতে চোর ঢুকেছিল, জবাব দিলেন ক্যাপ্টেন। তুমি এখানে আটকা রয়েছ। এই একটা চুরি অন্তত তুমি করোনি, এটা বোঝা গেছে।
তারমানে সত্যি আমাকে যেতে দিচ্ছেন?
বললাম তো, আপাতত। পরে তোমাকে আবার দরকার হবে আমাদের। জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে। এখন বাড়ি যাও। দূরে কোনখানে যাবে না। খোঁজ করলে যেন পাই। রবিনের দিকে তাকালেন ক্যাপ্টেন। তোমরা যাবে সঙ্গে?
মাথা ঝকাল রবিন, যাব।
পিটারকে নিয়ে থানা থেকে বেরিয়ে এল ওরা। মুসা বসল ড্রাইভিং সীটে। রবিন তার পাশে। পিটারকে নিয়ে কিশোর বসল পেছনে।
পাইনভিউতে ফিরে চলল আবার ওরা।
রাত যতই বাড়ছে, আবহাওয়া আরও ঠাণ্ডা হচ্ছে। রাস্তা খারাপ নয়, কিন্তু বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে বরফের কারণে। গাড়ি চালাতে অতিরিক্ত সাবধান থাকতে হচ্ছে মুসাকে। একটু এদিক ওদিক হলেই গিয়ে পড়বে রাস্তার পাশের খাদে।
শহর থেকে বেরিয়ে এসে পাইনভিউর রাস্তায় পড়ল গাড়ি। পিটারকে জিজ্ঞেস করল কিশোর, তারপর? এই চুরির পেছনের আসল ঘটনাটা কি বলো তো?
আমি কি করে জানব? রুক্ষ স্বরে জবাব দিল পিটার।
দেখো, পিটার, ক্যাপ্টেন কিন্তু সহজে তোমাকে ছাড়বেন না। তোমার আর তোমার দুই দোস্তের ওপর দোষটা চাপানোর চেষ্টা করবেন তিনি। তোমাকে আমরা সাহায্য করতে চাইছি। আর কিছু না করো, নিজেকে বাঁচাতে অন্তত আমাদেরকে সহযোগিতা করো।
দোষ কি করে চাপাবে? গত চুরিটার সময় আমি হাজতে আটকা ছিলাম, ক্যাপ্টেন নিজের মুখে বলেছে।
এমনও তো হতে পারে তোমার দোস্তরা গিয়ে কাজটা সেরে এসেছে, তুমি যে নির্দোষ সেটা বোঝানোর জন্যে। তা ছাড়া শফারের বাড়িতে চুরি করে ঢোকার

কথাটা বোকার মত স্বীকার করে ফেলে নিজের নামটাকে সন্দেহের তালিকায় লিখিয়ে দিয়ে এসেছ।
কিন্তু আমি চুরি করিনি। এ সব চুরি-ডাকাতিতে যুক্তও নই। আমার তো ধারণা, সব শয়তানির মূলে ওই বুড়ো জ্যাকসন।
সামনের প্যাসেঞ্জার সীট থেকে ঘুরে তাকাল রবিন। জনসনদের বাড়ির কাছে তোমাকেই সন্দেহজনক ভাবে ঘুরঘুর করতে দেখা গেছে। জ্যাকসনকে নয়। এর কি জবাব দেবে?
সন্দেহজনক ভাবে নয়, তীব্র প্রতিবাদ জানাল পিটার। দেখতে গিয়েছিলাম। বড় বড় বাড়িগুলো দেখতে আমার ভাল লাগে। দেখি আর ভাবি, আমিও একদিন ওরকম একটা বাড়িতে বাস করব।
ও কি বলতে চায় বুঝতে পারল রবিন। লেকের ধারের বাড়িগুলো এমনিতেই বড় বড়। আর জনসনদের বাড়িটা তো রীতিমত একটা প্রাসাদ। তাকিয়ে থাকার মতই।
ভাল সুন্দর কোন বাড়ির দিকে তাকিয়ে থাকাটা নিশ্চয় অপরাধ নয়? পিটার বলল, হোক না সেটা অন্যের বাড়ি।
চুরি করে বিনা অনুমতিতে কারও বাড়িতে ঢুকলে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হবে, জবাব দিল কিশোর। এটা আবার ভুলে যেয়ো না।
ভুলিনি। দেখো, একটা কথা বিশ্বাস করতে পারো, আমি বা আমার বন্ধুরা চোর নই। এই চুরির সঙ্গে জড়িত থাকা তো দূরের কথা।
তোমার কথা বাদ দিলাম। তোমার দোস্তরা যে জড়িত নয়, কি ভাবে প্রমাণ করবে? তোমাকে দেখতে কি থানায় গিয়েছিল ওরা? চুরিটা যখন হয়, তখন কি তোমার সামনে ছিল?
এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে জবাব দিল পিটার, কাজে ব্যস্ত থাকলে যাবে কি করে? এ সব বলে পুলিশকে বোঝাতে পারবে না।
আবার এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে পিটার বলল, দেখো, না বলে শফারদের বাড়িতে ঢুকে অপরাধ করেছি, ঠিক। তবে জিনিসপত্র চুরি করিনি। এই চুরিগুলো বুড়ো জ্যাকসনের কাজ। আমার বাবার ওপর প্রতিশোধ নিতে আমার ওপর দোষটা চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে।
তোমার বাবার সঙ্গে জ্যাকসনের শত্রুতাটা কি নিয়ে? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
ব্যবসায় পার্টনার ছিল। বেইট শপ আর ওটার চারপাশের জমির মালিক ছিল দুজনে, সমান সমান ভাগ, তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল পিটারের কণ্ঠ। কিন্তু মার সঙ্গে বাবার ডিভোর্সের সময় বাবা বেশ বড় রকমের একটা সমস্যায় পড়ে গেল। টাকার সমস্যাও ছিল।

তারপর?
পেছন ফিরে তাকিয়ে আছে রবিন। শুনছে। গাড়ি চালানোর জন্যে পেছনে নজর দিতে পারছে না মুসা। পিচ্ছিল রাস্তায় গাড়ি চালাতে খুব সাবধান থাকতে হচ্ছে তাকে। তবু যতটা সম্ভব শোনার চেষ্টা করছে।
জ্যাকসনের কাছে টাকা ধার চাইল বাবা। কিন্তু বুড়ো একটা পয়সাও দিল না। বাবা তখন খানিকটা জমি বেচতে চাইল। বুড়ো তাতেও রাজি হলো না। টাকার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠল বাবা। নামমাত্র মূল্যে পুরোটাই ঠকিয়ে নিল তখন জ্যাকসন। ওর কাছে বিক্রি করে দেয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না বাবার। তারপর থেকেই বুড়োকে প্রচণ্ড ঘৃণা করে বাবা। শত্রুতাটা বুড়োই জন্ম দিয়েছে। বাবা নয়।
এদিকেই যেন কোথায় তোমাদের বাড়িটা? শহরের একপ্রান্তে পৌঁছে জিজ্ঞেস করল রবিন।
হ্যাঁ, ডানে। ওই যে, গাছটার নিচে। হাত তুলে সবচেয়ে বড় গাছটা দেখাল পিটার।
গাছের কাছে গিয়ে গাড়ির গতি ধীর করল মুসা। পথ এত বেশি পিচ্ছিল, বাড়ির দিকে বাঁক নেয়ার সময় প্রায় শামুকের গতিতে গাড়ি চালাতে হলো তাকে।
রাস্তার ধারে কিছু ডালপালা পড়ে আছে। ঝড়ে ভেঙে পড়েছে হয়তো। তার ওপাশে একটা জীর্ণ মলিন পুরানো বাড়ির সামনে তার চেয়েও পুরানো একটা গাড়ি। বাড়ির একটা জানালার কাঁচ ভেঙে গিয়েছিল। সেখানটায় হার্ডবোর্ড লাগিয়ে ফোকর বন্ধ করা হয়েছে। বড়ই করুণ দশা।
কেউ কিছু বলার আগেই বলে উঠল পিটার, হ্যাঁ, এটাকেই বাড়ি বলে এখন আমার বাবা। কিন্তু বুড়ো জ্যাকসন যদি বাবার কথাটা মেনে নিত, তাহলে এত দরিদ্র হালে বাস করা লাগত না আমাদের। লেকের পাড়ের কোন একটা বাড়িতেই থাকতে পারতাম।
বাড়ির সামনে এনে গাড়ি রাখল মুসা। পুরানো ভলভো গাড়িটার পেছন থেকে আচমকা বেরিয়ে এলেন ক্যামোফ্লেজ জ্যাকেট পরা একজন মানুষ। হাতের শটগানটা তুলে কাঁধে ঠেকালেন। নিশানা করলেন মুসার দিকে।

.
বাবা, কি করছ? আমরা চেঁচিয়ে উঠল পিটার।
তোমার বাবা? কিশোর জানতে চাইল।
হ্যাঁ, মাথা ঝাঁকাল পিটার। মাথা গরম। পাহারা দিচ্ছিল।
এই, কি করেছিলি তুই? চিৎকার করে জানতে চাইলেন মিস্টার হিগিনস। বন্দুক নামালেন।
কিছুই করিনি।

তাহলে পুলিশে ধরে নিয়ে গেল কেন?
দরজা খুলে নেমে গেল পিটার। বুড়ো জ্যাকসনের শয়তানি।
আস্তে করে দরজা খুলে নেমে এল কিশোর। রবিন আর মুসাও নামল।
জ্যাকসন! কি করেছে? জানতে চাইলেন মিস্টার হিগিনস।
ঘরে চলো না। ঘরে গিয়ে বলি, পিটার বলল। এখানে ঠাণ্ডার মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি কথা।
জ্যাকসনের কথা আর কি বলব, বিড়বিড় করলেন মিস্টার হিগিনস। ওর মত ঠগবাজ আর দ্বিতীয়টি দেখিনি।
আপনাদের ব্যবসার কথা সব বলেছে আমাকে পিটার, কিশোর জানাল।
পিটার আর তার বাবার পেছন পেছন ভাঙা সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল কিশোর। এতই জীর্ণ, দুএক জায়গায় তক্তাও নেই। সে-সব জায়গা টপকে পেরোল। রবিন আর মুসাও একই ভাবে উঠে গেল।
তোমরা ভাবছ আমিই সম্পর্কটা নষ্টের জন্যে দায়ী? শটগানটা নামিয়ে রেখে নড়বড়ে একা লাউঞ্জ চেয়ারে বসে পড়লেন মিস্টার হিগিনস। ভুলেও তা ভেবো না।
পুরানো লম্বা একটা কাউচ দেখিয়ে কিশোরদের বসতে বলল পিটার। কিন্তু কাউচের মাঝখানে লম্বা হয়ে শুয়ে আছে একটা মস্ত কুকুর। এটাকে সরানোর চেষ্টা করল পিটার। নড়লও না কুকুরটা। এমনকি চোখের পাতা একবার মেলেই সেই যে বন্ধ করল, খুললও না আর।
দাঁড়িয়ে থাকার সিদ্ধান্ত নিল কিশোর। ঘরের চারপাশে দ্রুত একবার চোখ বোলাল। চুপচাপ তার পাশে দাঁড়িয়ে রইল মুসা আর রবিন।
মিস্টার হিগিনস, লেকের পাড়ের বাড়িগুলোতে চুরি হওয়ার কথা তো নিশ্চয় শুনেছেন? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
বুড়ো জ্যাকসনের কাজ, সাফ জবাব দিয়ে দিলেন মিস্টার হিগিনস।
কিন্তু তিনি চুরি করবেন কেন? টাকার তো তার অভাব নেই।
ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে কি বললেন মিস্টার হিগিনস, বোঝা গেল না। ছেলের দিকে তাকালেন। তোকে থানায় নিয়েছিল কেন?
জনসনের বাড়ির কাছে আমাকে ঘুরতে দেখেছিল। সত্যি বলছি বাবা, বিশ্বাস করো, আমি চুরি করিনি।
আমার জীবনটা তো ধ্বংসই করে ছেড়েছে, এবার তোর পেছনে লেগেছে। ওই শয়তানটাকে আমি শেষ করে ছাড়ব আজ। থাবা মেরে বন্দুকটা তুলে নিয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন মিস্টার হিগিনস। আজ আমারই একদিন কি ওর...।

তাড়াতাড়ি তার সামনে এসে দাঁড়াল কিশোর। মিস্টার হিগিনস, প্লীজ। পুলিশ সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। যা করার ওরাই করবে। অকারণে বিপদে পড়তে যাবেন না।
কিন্তু তোমরা কে? এখানে কি করছ? ধমকে উঠলেন মিস্টার হিগিনস।
বাবা, ওরা আমাকে সাহায্য করার চেষ্টা করছে, পিটার বলল।
আমাদের ধারণা, জবাব দিল কিশোর, চুরিগুলো পিটার করছে না। সেটাই প্রমাণ করতে চাইছি আমরা।
তোমরা এতে নাক না গলালেই ভাল করবে, মিস্টার হিগিনস বললেন। এটা জ্যাকসন আর আমার সমস্যা।
আপনাদের সমস্যা নিয়ে আমাদের কোন মাথাব্যথা নেই। কিন্তু পিটার যে চুরিগুলোতে জড়িত নয়, এটা আমাদের প্রমাণ করতেই হবে। নইলে যে কোন সময় আবার ওকে ধরে নিয়ে যাবে পুলিশ।
কিছুটা শান্ত হলেন মিস্টার হিগিনস। বেশ। করো প্রমাণ। তবে বুড়োটা যদি আমার ছেলের পেছনে আবার লাগে, ওকে আমি খুন না করে ছাড়ব না।
আর লাগতে পারবে না। আমরা লাগতে দেব না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।
বসে পড়লেন আবার হিগিনস। বন্দুকটা নামিয়ে রাখলেন।
আমরা এখন যাচ্ছি। প্রয়োজন হলে আবার আসব।
রবিন আর মুসাকে নিয়ে বেরিয়ে এল কিশোর।
এগিয়ে দিতে এল পিটার। অনেক ধন্যবাদ তোমাদেরকে। আমার জন্যে অনেক কষ্ট করলে।
ও কিছু না, কিশোর বলল। সত্যি যদি ডাকাতগুলোর সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্ক না থাকে, বুড়ো জ্যাকসন তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। চলি। আবার দেখা হবে।
গাড়িতে উঠে রবিন জিজ্ঞেস করল, কি মনে হয় তোমার?
কিশোর প্রশ্ন করল, কোন ব্যাপারে?
চুরি। মিস্টার হিগিনসের ধারণা জ্যাকসনই চোর।
আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।
আমিও না। চুরি করার কোন কারণ নেই তার। টাকার প্রয়োজন নেই। তা ছাড়া চুরি করে করে ঘাবড়ে দিয়ে এখানকার বাসিন্দাদের তাড়ালে আখেরে তারই লোকসান হবে। দোকানের আয় কমে যাবে। বন্ধই করে দিতে হবে হয়তো একদিন।
এঞ্জিন স্টার্ট দিল মুসা। গীয়ার দিতে দিতে বলল, কিন্তু, বুড়োর মারমুখো আচরণ দেখেছ? কাস্টোমারের সঙ্গে এই ব্যবহার করলে দ্বিতীয়বার আর তার দোকান

মাড়াবে না কেউ। আমার তো ধারণা, নাতি দুটো ওকে না সামলালে এতদিনে মানুষের মার খেয়ে ভূত হয়ে যেতে হত বুড়োকে।
হুঁ, আনমনে মাথা ঝাঁকাল কিশোর। নিচের ঠোঁট চেপে ধরে জোরে এক টান দিয়ে ছেড়ে দিল।
রবিন বলল, দুটো নয়, একটা। বড় নাতিটা তো বুড়োর মতই বদমেজাজী। দাদা-নাতি তিনজনের মধ্যে একমাত্র শান্ত মগজ কেবল ছোটটার। কিশোর, তুমি কিছু বলছ না?
অ্যাঁ?...হ্যাঁ। কাল সকালে দাদা-নাতি তিনজনের সঙ্গেই দেখা করতে যাব। মুসা, বাড়ি চলো এখন।
বাড়ি ফিরে আন্ট মারগারেটের কোন মেসেজ আছে কিনা দেখার জন্যে দোতলায় উঠে এল রবিন। আনসারিং মেশিনের প্লে বাটন টিপতেই শোনা গেল পুরুষকণ্ঠ: ভাবলাম, তোমাদের জানানো দরকার। জিথার জ্যাকসনের বাড়িতে রহস্যময় ভাবে আগুন লেগে পুড়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। সকাল বেলা চলে এসো। আমিও থাকব।-ডোবার কগনান।

.

পরদিন রোববার।
সকাল সকালই জ্যাকসনের বাড়িতে পৌঁছে গেল তিন গোয়েন্দা। দেখল, ওদের আগেই পৌঁছে গেছে ডোবার। জ্যাকসন আর তার দুই নাতি রকি-জ্যাকির সঙ্গে কথা বলছে।
মূল বাড়ি, যেটাতে রয়েছে জ্যাকসনের বেইট শপ আর বসবাসের ঘর, সেটা থেকে ডজনখানেক গজ দূরে একটা জিনিসপত্র রাখার ছাউনি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। পোড়া কয়লার টুকরো ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট নেই। আগুনের তাপে চারপাশের বরফ গলে গেছে। বরফ গলা পানিতে মাটি ভিজে কাদা হয়ে গিয়েছিল। সেই কাদা জমে এখন কাদার বরফ।
ভ্যান থেকে নেমে গেল কিশোর। নাকে লাগল পোড়া প্লাস্টিকের ঝাঁজাল পন্ধ।
মুসা আর রবিনও নেমে এগিয়ে গেল তার পেছনে।
এই যে, তিন গোয়েন্দা, ডোবার বলল। জ্যাকি জ্যাকসন আর রকি জ্যাকসনের সঙ্গে নিশ্চয় আগেই পরিচয় হয়েছে তোমাদের?
গতকালই, জবাব দিল কিশোর। হাত মেলানো চলল। গতকালকের মত আজ আর শীতল ব্যবহার করব না জ্যাকি। ব্যাপারটা লক্ষ করল কিশোর।
কি হয়েছিল? জিজ্ঞেস করল সে।
আগুন, ডোবার জবাব দেয়ার আগেই বলে উঠল জ্যাকি।

আমার কাছে কিন্তু দুর্ঘটনার মত লাগছে না, ডোবার বলল। ওই দেখো, হাত তুলে কিশোরকে পোড়া একটা পেট্রল রাখার ক্যান দেখাল সে। ছাউনির বেড়ায় পেট্রল ঢেলে তারপর আগুন দিয়েছে।
ওরকম ক্যান আমরা বিক্রি করি না, জ্যাকি বলল।
কেউ কিছু দেখেছে? কিশোর জিজ্ঞেস করল।
দাদার সঙ্গে পেছনের ঘরে বসে কথা বলছিলাম, জ্যাকি জানাল। এ সময় দেখি আগুন।
নিভানোর চেষ্টা করেছি, রকি বলল! হোস পাইপে বরফ জমে গিয়েছিল। পানি বের করতে করতে পুড়ে ছাই হয়ে গেল ঘরটা।
রাগত দৃষ্টিতে ছোট ভাইয়ের দিকে তাকাল জ্যাকি।
কি ছিল ছাউনিতে? কিশোরের প্রশ্ন।
বেশির ভাগই গরমকালে লেকে ব্যবহারের জিনিসপত্র, জবাব দিল জ্যাকি। ভেলা, বালতি, চাকার টিউব-এ ধরনের জিনিস।
কয়েকজন মাছ শিকারী গিয়ে দোকানে ঢুকল এ সময়।
এক মিনিট, বলে গোয়েন্দাদের রেখে জিনিসপত্র বিক্রি করতে চলে গেল দুই ভাই। কিশোর লক্ষ করল, বড় ভাইকে ভীষণ ভয় পায় রকি।
এই দুজনের সম্পর্কে কতটা জানেন? ডোবারকে জিজ্ঞেস করল কিশোর।
গতকাল যা যা বললাম। তার বেশি না।
বুড়ো জ্যাকসন এখন কোথায়?
মাছ ধরছে।
সত্যি! এত ঘটনা ঘটে গেল। ঘর, জিনিসপত্র পুড়ে নষ্ট হলো। তার কিছুই এসে গেল না?
দুই সহকারীকে নিয়ে পোড়া ধ্বংসস্তূপের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল কিশোর। একটা শিক পড়ে থাকতে দেখে সেটা দিয়ে পোড়া ছাই আর কয়লা ঘটতে শুরু করল। সূত্রের আশায়।
শিকটাকে তো পোড়া মনে হচ্ছে না, ডোবারের দিকে তাকাল কিলোর। কেউ ঘাটাঘাটি করে গেছে নাকি?
আমাদের ফরেনসিক বিভাগের লোকজন আর দমকল বাহিনীর কর্মীরা, ডোবার জানাল।
বুড়ো জ্যাকসন আর নাতিরা ঘাঁটেনি?
হয়তো ঘেঁটেছে। তবে জুতোর ছাপটাপ তো কিছু দেখলাম না পোড়া ছাইয়ের মাঝে। এমন পোড়া পুড়েছে, হয়তো কোন জিনিসই আর অবশিষ্ট নেই বুঝতে পেরে অকারণ কষ্ট করতে যায়নি।

অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, অফিসার ডোবার, কিশোর বলল। খবরটা আমাদেরকে জানানোর জন্যে।
সাবধান থেকো, ডোবার বলল। চোরগুলোকে মোটেও সুবিধের মনে হচ্ছে না আমার। আগুন লাগিয়ে যারা বাড়ি পুড়িয়ে দিতে পারে, ওরা সহজ লোক নয়। আরও খারাপ কিছুও করতে পারে। জমাট লেকটার দিকে তাকাল সে। এত শান্ত। দেখে মনেই হয় না এখানে এ ধরনের কোন কিছু ঘটতে পারে!
ডোবার চলে গেল।
কিশোরের দিকে তাকাল রুবিন। এখন, কি করব?
বুড়ো জ্যাকসনের সঙ্গে কথা বলব।
খাড়া পাড় বেয়ে লেকের দিকে নামতে শুরু করল তিন গোয়েন্দা। আগে আগে চলেছে কিশোর। পানির চিহ্নও নেই। লেকের যেদিকেই তাকানো যায়, জমাট বরফ। কিনারের কাছটাতেও প্রায় ফুটখানেক পুরু। যত বরফ, আইস ফিশারম্যানদের ততই সুবিধে।
প্রচুর পরিশ্রম আর খুব যত্ন করে বানানো হয়েছে মাছ ধরার শ্যান্টিগুলো। খুপরির মত ঘরগুলোর কোন কোনটার মাথায় টেলিভিশনের অ্যান্টেনাও দেখা যাচ্ছে। আয়েশী শিকারী।
আহ্! নাক কুঁচকাল মুসা। খাবারের গন্ধ! রান্না করছে কে?
করছে, যাদের খিদে পেয়েছে, হেসে বলল রবিন।
মাংস ভাজার গন্ধ। গরম খাবার, টেলিভিশন, ঘরের মধ্যে বসে মাছ ধরা-বড় মৌজে আছে শিকারীরা, কিশোর বলল।
দেখো দেখো, কি কাণ্ড করেছে, রবিন বলল। প্রতিটি শ্যান্টির দরজায় রঙ দিয়ে বড় বড় করে নাম-ঠিকানা লেখা রয়েছে। এ সব লিখেছে কেন?
যদি হারিয়ে যায় শ্যান্টিগুলো, রসিকতা করল মুসা, চিনে যাতে বাড়ি ফিরে আসতে পারে।
বেশির ভাগ শ্যান্টির তুলনায় জ্যাকসনেরটা হোট। পুরানোও অনেক। প্রাইউডের দেয়ালের চলটা উঠে গেছে জায়গায় জায়গায়। চালায় নতুন আলকাতরা পড়েনি বহুকাল। কড়া রোদে পুড়ে শুকিয়ে সাদা সাদা হয়ে গেছে আগের আলকাতরা।
মলিন দরজাটায় থাবা দিল কিশোর। মিস্টার জ্যাকসন, আমি কিশোর পাশা।
ঢুকে পড়ো। ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে বলল জ্যাকসন। আস্তে কথা বলো। কথা শুনে ভয় পেলে মাছ চলে যাবে।
ঠেলা দিয়ে দরজা খুলল কিশোর। ছোট্ট কেবিনটা জিনিসপত্রে ঠাসা। বেশির ভাগই মাছ ধরার সরঞ্জাম। বালতি থেকে শুরু করে ন্যাকড়া, রীল, নাইলনের সুতো সবই আছে। আর আছে ব্যবহার করে ফেলে দেয়া প্রচুর কফির কাপ। এক

কোণে রাখা একটা মোটরচালিত ড্রিল মেশিন। ওটার কর্ক ব্লেডটা এক ফুট চওড়া।
কুঁজো হয়ে চেয়ারে বসে আছে জ্যাকসন। চেয়ারটা এতই পুরানো, হাতলের গদিতে পোর স্পঞ্জ বেরিয়ে পড়েছে। বুড়োর হাতে খাটো একটা ছিপ। সামনে বরফের মধ্যে ফুটখানেক চওড়া গোল একটা গর্ত। সেটা দিয়েছিপের সুতো চলে গেছে নিচে।
আহহা, দরজাটা লাগিয়ে দাও না, রুক্ষ স্বরে বলল বুড়ো। গর্তের নিচের বরফ-শীতল পানিতে ভাসমান একটা লাল-সাদা ফাতনার দিকে চক্ষু স্থির।
ভেতরে জায়গা বলতে নেই। তার মধ্যেই কোনমতে গাদাগাদি করে দাঁড়াল তিন গোয়েন্দা।
আগুন লাগার ব্যাপারে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করতে এলাম আপনাকে, কিশোর বলল।
ওই শয়তান ছেলেটার কাজ, পিটার হিগিনস, প্রশ্ন করার আগেই জবাব দিয়ে দিল জ্যাকসন। প্রতিশোধ নিল আমার ওপর। চুরি করায় পুলিশের কাছে ধরিয়ে দিয়েছি বলে।
কাল রাতে ওর সঙ্গে দেখা করেছি আমরা, কিশোর বলল। চুরিটুরিগুলো, বোধহয় ও করেনি।
অ, একরাতেই ওর পক্ষে?
আমাদের কোন পক্ষটক্ষ নেই, স্পষ্ট করে জানিয়ে দিল কিশোর। আমরা শখের গোয়েন্দা। এই অপরাধের তদন্ত করছি।...এমন হতে পারে, চোরেরাই আপনার ঘরে আগুন দিয়েছে।...আগুনটা দেখলেন কখন?
সাড়ে দশটার দিকে। আমরা তাস খেলছিলাম। আমি, জ্যাকি আর রকি।
কার চোখে পড়ল প্রথমে?
জ্যাকির। বাথরুম থেকে পোড়া গন্ধ পেয়ে দেখতে গিয়েছিল। খানিক পরে বাইরে থেকে ওর আগুন আগুন চেঁচানো শুনে আমরাও গেলাম।
পোড়া গন্ধটা আপনারা পাননি?
প্রথমে পাইনি। পরে পেয়েছি।
আগুন আগুন বলে চেঁচানোর আগে না পরে?
ঠিক মনে করতে পারছি না।
কাউকে দেখেছেন? গাড়ি-টাড়ি বা কোন কিছু?
এতক্ষণে মুখ তুলে তাকাল জ্যাকসন। তোমার কি মনে হয়? আগুন লাগিয়ে আমার বাড়ি পুড়িয়ে দিয়ে গেল। দেখতে পেলে ছেড়ে দিতাম?

ফাৎনার দিকে চোখ পড়তেই অস্ফুট চিৎকার দিয়ে উঠল বুড়ো। পানির নিচে চলে গেছে ফানা।
খেয়েছে! বলে উঠল মুসা। চোখ চকচক করছে ফাত্রাটার দিকে তাকিয়ে। বোধহয় হাতও নিশপিশ করছে ছিপটাকে ধরে টান মারার জন্যে।
কথা বোলো না! ফিসফিস করে বলল জ্যাকসূন। খানিকটা সুতো ছাড়ল সে। তারপর ছিপ ধরে টান মারল।
উহহু, গেল ছুটে!যেৎ-ঘোৎ করে উঠল বুড়ো। তোমাদের জন্যে।
তার অভিযোগের ধার দিয়েও গেল না কিশোর। আগের প্রসঙ্গে অটল রইল। পিটার বাদে অন্য কাউকে সন্দেহ হয় আপনার?
না। ভাগ্যিস ভেতরে মূল্যবান কিছু ছিল না। সুতো গুটাতে শুরু করল জ্যাকসন।
দামী কোন জিনিসই নষ্ট হয়নি?
না। ছাউনির চালায় কাল একটা ফুটো দেখতে পায় জ্যাকি। চালা খুলে মেরামত দরকার ছিল। ছাউনির সমস্ত দামী জিনিস দোকানে সরিয়ে ফেলি আমরা।
ছাউনিটা বীমা করানো ছিল?
না।
চুপ হয়ে গেল কিশোর। আর কি জিজ্ঞেস করা যায় ভাবছে।
এই সুযোগে ড্রিল মেশিনটা দেখিয়ে মুসা জিজ্ঞেস করল, মিস্টার জ্যাকসন, ওই জিনিসটা দিয়ে কি করেন?
বরফ ফুটো করি। দুই ফুট পুরু বরফও অনায়াসে ফুটো করে ফেলা যায়।
আরেকটা কথা। শ্যান্টিগুলোর দরজায় নাম-ঠিকানা লেখা কেন?
বোকা নাকি? মানুষের বাড়ির গেটে নাম-ঠিকানা লিখে রাখা হয় কেন? অধৈর্য হয়ে উঠল জ্যাকসন। কোনটা কার বাড়ি চিনে রাখার জন্যে। শ্যান্টির ব্যাপারেও সেই একই কারণ। হাত নেড়ে বলল, এখন তোমরা যাবে? ওসব চুরিদারি আর আগুন লাগানোর ঘটনা নিয়ে আলোচনা করতে ভাল লাগছে না আমার। তবে বরফের মধ্যে মাছ ধরা যদি শিখতে চাও, বসতে পারো।
হা হা, শিখব শিখব! মুসার কণ্ঠে প্রচণ্ড উত্তেজনা।
এখন না। এখন সময় নেই, নিতান্ত বেরসিকের মত বলে উঠল কিশোর। আমাদের অন্য কাজ আছে। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, মিস্টার জ্যাকসন।
শ্যান্টি থেকে বেরিয় এল ওরা। খানিকক্ষণ অনিশ্চিত ভঙ্গিতে হাঁটাহাঁটি করল লেকের ওপর।
রাগ করে মুসা বলল কিশোরকে, কাজ তো কিছু দেখছি না। শুধু শুধু আমার মাছ ধরাটা বন্ধ করলে।

রবিন বলল, এক কাজ করা যায়। মেরিন ডগলাসের সঙ্গে কথা বলতে পারি। চুরি-ডাকাতিগুলোর ব্যাপারে তার কি অভিমত, জানা যাক।
কিন্তু কোথায় পাওয়া যাবে ডগলাসকে?
শার্লিদের বাড়িতে গিয়ে জিজ্ঞেস করার কথা ভাবল কিশোর। কিন্তু সেটা আর করতে হলো না। বেশ কিছুটা দূরে বরফের ওপর নিঃসঙ্গ বসে থাকতে দেখা গেল একটা লোককে। মাথায় লাল ক্যাপ।
হাত তুলে রবিন বলল, ওই যে!
এগিয়ে গেল ওরা। ভুল করেনি রবিন। মেরিন ডগলাসই। বিলাসবহুল কেবিন নেই তার। বাইরে খোলা বরফের ওপর বসে মাছ ধরছে। স্লেডে করে বয়ে এনেছে তার মাছ ধরার সরঞ্জাম। একটা বালতি উল্টো করে রেখে সেটার ওপর বসেছে। জড়সড় হয়ে আছে ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাঁপটায়।
সাড়া পেয়ে ফিরে তাকাল ডগলাস। আরে রবিন যে। কেমন আছ তোমরা?
ভাল, জবাব দিল রবিন। খাচ্ছে কেমন?
দূর, বিরক্ত ভঙ্গিতে হাত নাড়ল ডগলাস। একেবারেই না। মাছেরও মনে হয় আজ শীত লাগছে। অকারণ কষ্ট করছি। অনেকক্ষণ থেকেই বাড়ি যাবার কথা ভাবছিলাম।
চলুন তাহলে। আজ আপনার বাড়ি দেখব।
চলো। কফিটা তোমাদের সঙ্গে বসেই খাব।
ছিপ, সুতো এ সব গুছাতে তাকে সাহায্য করল তিন গোয়েন্দা। পেছন পেছন গিয়ে উঠল তার সবুজ পিকআপ ট্রাকটায়। লেক থেকে মাইলখানেক দূরে ডগলাস কার স্যালভিজ ইয়ার্ড-এ পৌঁছতে সময় লাগল না। কাঁটাতারের বেড়া দেয়া ইয়ার্ড। পুরানো, ভাঙাচোরা বাতিল গাড়িতে ভর্তি।
গেট দিয়ে ঢুকতেই বাড়ির ভেতর থেকে ঘেউ ঘেউ করে উঠল একটা কুকুর।
গাড়ি থেকে নেমে ডগলাসের বাড়িতে ঢুকল তিন গোয়েন্দা। হলঘরের পাশেই শিকলে বাধা কুকুরটাকে দেখতে পেল। মনিবকে দেখে কাছে আসার জন্যে অস্থির হয়ে উঠল ওটা।
এগিয়ে গিয়ে কুকুরটার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে দিল ডগলাস। এই তো আমি এসে গেছি, পুটি। খুব একা একা লাগছিল? আজ আর বেরোব না, যা, কথা দিলাম।
কুকুরের নাম পুটি। আজব নাম, মনে হলো মুসার। কিছু বলল না।
চুরি আর জ্যাকসনের বাড়িতে আগুন লাগার ঘটনা নিয়ে কিছুক্ষণ আলোচনা করল তিন গোয়েন্দা। নতুন কিছু জানাতে পারল না ডগলাস। কফি খাওয়া শেষ হলো। যাওয়ার জন্যে উঠল ওরা।

গেট পর্যন্ত ওদের এগিয়ে দিল ডগলাস আর পুটি।
আমন্ত্রণ জানিয়ে রাখল ডগলাস, কোন প্রয়োজন হলেই যেন নির্দ্বিধায় চলে আসে গোয়েন্দারা।

.

এখন কি করব? রবিনের প্রশ্ন। বহুত তো জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো। কিছুই তো এগোল না।
আমি এখনও ভাবছি, নিচের ঠোঁটে ঘনঘন দুবার চিমটি কাটল কিশোর, মিস্টার মরগানের কালকের কথাটা।
কোন্ কথা? ভুরু নাচাল মুসা।
ওই যে, কালকে বললেন, চুরি হওয়ার পর কোন গাড়িটাড়ির শব্দ তাঁর বাড়ির কাছ দিয়ে যেতে শোনেন না।
তাতে কি?
তাতে? গাড়ির শব্দ যদি না শুনে থাকেন তিনি, তাহলে ধরে নিতে হবে চুরির মাল নিয়ে চলে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে না চোরের। কারণ, সে এখানকারই বাসিন্দা।
তে কি করতে চাও এখন?
পরীক্ষা করে শিওর হব, মরগান আঙ্কেলদের বাড়ি থেকে গাড়ির শব্দ সত্যিই কতখানি শোনা যায়।
নেই কাজ তো খই ভাজ। এরচেয়ে বুড়োর সঙ্গে বসে মাছ ধরলে কাজ হত। আইস ফিশিঙের এতবড় একটা সুযোগ পেয়েও আমি হাতছাড়া করতে রাজি না এবার, মুসা বলল।
অনেক সুযোগ পাবে। আগে কেসটার একটা কিনারা করে ফেলি, কিশোর বলল।
আর যেতে অরাজি হলো না মুসা, চলো তাহলে।
মুসার পাশে বসে নির্দেশ দিতে লাগল কিশোর। ভ্যান চালাতে বললে পাশের রাস্তা ধরে মরগান আঙ্কেলদের বাড়ির দিকে। সরু রাস্তাটা ধরে এগোনোর সময় তীক্ষ্ণ নজর রাখল কিশোর।
সামনে চুলের কাঁটার মত একটা মোড়।
মোড় পেরোলেই মরগান আঙ্কেলের সীমানা।
খানিকক্ষণ রাস্তাটায় আসা-যাওয়া করল ওরা। বাড়ির সামনে দিয়ে।
মরগান আঙ্কেল ঠিকই বলেছেন, পেছনের সীট থেকে বলে উঠল রবিন। বাড়ির কাছ দিয়ে চুপি চুপি পালিয়ে যাওয়ার সাধ্য নেই কারও।
তুষারপাতের সময় ইঞ্জিনের শব্দ ঢাকা পড়ে যেতে পারে, মুসা বলল।
গেটের ভেতর গাড়ি ঢোকানোর সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে এল শালি। কাছে এসে বলল, অনেকক্ষণ আগেই তোমাদের আসার শব্দ পেয়েছি। বাড়ির পেছনে ঘোরাঘুরি

করছিলে কেন?
প্রশ্নের জবাব না দিয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর, তুষারপাতের সময়ও কি বাড়ি থেকে গাড়ির শব্দ শুনতে পাও?
নিশ্চয়ই। কেন?
এবারও শার্লির প্রশ্নের জবাব না দিয়ে মুসার দিকে তাকাল কিশোর, পেলে তো তোমার কথার জবাব?
কিন্তু এর পরও সন্তুষ্ট হতে পারল না কিশোর। রবিনকে বাড়ির ভেতরে গিয়ে কান পেতে থাকতে বলে বাড়ির সামনে-পেছনে বার বার ঘোরাঘুরি করতে থাকল ভ্যানটা নিয়ে। ফিরে এসে রবিনকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারল, যতবার বাড়ির কাছে দিয়ে গাড়ি গেছে, ততবার ইঞ্জিনের শব্দ শুনেছে রবিন। এমনকি দুই মাইল গতিতে আস্তে চালিয়েও ফাঁকি দিতে পারেনি রবিনকে। শেষে ভ্যানের শব্দ বেশি বলে শার্লিদের শব্দ কম করা সেডান গাড়িটা চালিয়ে দেখল। ওটার শব্দও স্পষ্ট শোনা যেতে লাগল বাড়ির ভেতর থেকে।
মরগান আঙ্কেল বাজার থেকে ফিরলে তাকে সব জানাল কিশোর।
তাহলেই বোঝো, তিনি বললেন। পুলিশকে আমি কোনমতেই বিশ্বাস, করাতে পারিনি। তাদের ধারণা, ঘুমিয়ে ছিলাম বলে আমি শুনতে পাইনি।
স্বামীর পক্ষ নিয়ে বেলী আন্টি বললেন, রাতে ও প্রায় ঘুমায়ই না আজকাল। অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকে। টিভি দেখে। বই পড়ে। যতগুলো চুরি হয়েছে, সব হয়েছে সন্ধ্যারাতের সামান্য পরে। অত তাড়াতাড়ি আমিই ঘুমাই না। শার্লির বাপের তো কথাই নেই।
হু, কিশোর বলল। আমরা বুঝতে পেরেছি। দুই সহকারীর দিকে তাকাল, চলল, বাইরেটা গিয়ে আরেকবার দেখে আসি।
এবারও ড্রাইভিং সীটে বসল মুসা। বাড়িঘরগুলোর কাছ থেকে বেশ খানিকটা সরে এসে লেকের পাশে একটা খোলা জায়গায় গাড়ি রাখল। সূর্য অস্ত যাচ্ছে। বাড়ছে ঠাণ্ডা।
দেখছ, কত তাড়াতাড়ি সন্ধ্যা হয়ে যায় এখানে? রবিন বলল।
তদন্তটা গরমকালে করতে পারলে ভাল হত, মুসা বলল।
গাড়ির বুট খুলে গরম কাপড়-চোপড় বের করতে শুরু করল কিশোর। ভারী জ্যাকেট পরল। পায়ে দিল কাটা বসান বুট। যাতে বরফের ওপর হাঁটার সময় পিছলে না পড়ে।
বনে ঢুকল ওরা। ছয় ফুট লম্বা ডাল কেটে নিয়ে ছড়ি বানাল। বরফে বুকে দেখে বোঝার জন্যে, পাতলা না ভারী।

কথাটা ঠিকই বলেছ তুমি, কিশোরকে বলল রবিন। চুরিটা যে-ই করুক, গাড়িতে করে আসে না। এখানেই বাস করে। কিংবা রাতের বেলা বাইরের কোন জায়গা থেকে এসে বনের ভেতর দিয়ে হেঁটে ঢোকে। কিন্তু তাতে যে পরিমাণ ঝুঁকি আর কষ্ট হবে, কোন চোরই সেটা করতে রাজি হবে কিনা সন্দেহ আছে আমার।
তবে বাইরে থেকে এলে মুশকিল হয়ে যাবে। কাউকে সন্দেহ করতে পারব না, মুসা বলল। ধরব কি করে ওকে?
দুজনের কথায় বিশেষ কান নেই কিশোরের। বেইট শপটার দিকে তাকিয়ে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে। মগজে গভীর ভাবনা চলেছে ওর। আচমকা ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, জ্যাকসনের ব্যাপারে কি ধারণা তোমাদের?
মানে! চমকে গেল মুসা আর রবিন দুজনেই।
আগুন লাগার ঘটনাটা?
বড় বেশি ভাগ্যবান মনে হয়েছে ওদেরকে, জবাব দিল রবিন। আগুন লাগার আগে সমস্ত দামী দামী জিনিস সরিয়ে ফেলা। ঘর পুড়ে যাওয়ার পরেও জ্যাকসনের অতিরিক্ত নির্বিকার ভাব। কাকতালীয় মনে হয়।
ঠিক বলেছ, বাতাসে তর্জনী দিয়ে বাড়ি মারার ভঙ্গি করল কিশোর। নির্বিকার থাকার কারণটা বোঝা যায়। পুড়েছে তো কেবল মূল্যহীন ভাঙা একটা ছাউনি। পুড়িয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেছে, কাজটা পিটারের। পুলিশ বা আমাদের নজর অন্য দিকে সরানোর জন্যেও এ কাজ করে থাকতে পারে। এক ঢিলে দুই পাখি।...
কিন্তু আমি ভাবছি মোটিভটা কি? কেন চুরি করবে বুড়ো জ্যাকসন? তার টাকার অভাব হয়েছে বলে তো মনে হয় না!
তারমানে বুড়োকেই চোর সন্দেহ করছ তুমি? রবিনের প্রশ্ন।
কিংবা তার দুই নাতি। ওদেরকেই বেশি সন্দেহ হচ্ছে আমার। কতগুলো পয়েন্ট দিচ্ছি, ভেবে দেখো। এক, ওরা বিদেশী-অর্থাৎ এখানে সব সময় থাকে না। মাঝে মাঝে আসে দাদাকে সাহায্য করতে। দুই, অনেক দূরের শহরে থাকে ওরা। ম্যারিল্যান্ডে। চোরাই মাল নিয়ে ম্যারিল্যান্ডে গিয়ে আশপাশে কোনখানে যদি মালগুলো বিক্রি করে দেয়, জানার কথা নয় এখানকার পুলিশের, যদি খোঁজ না নেয়। ডোবার কি বলেছিল, মনে আছে? তার সন্দেহ দূরের কোন শহরে গিয়ে মাল বিক্রি করে দিয়ে থাকতে পারে চোরেরা। তারমানে ম্যারিল্যান্ডে খোঁজ নেয়নি। এ ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞেস করে শিওর হতে হবে। যাই হোক, তিন, জ্যাকির সন্দেহজনক আচরণ। লেকে ঝগড়ার সময় আমাদের পাত্তাই দিতে চায়নি, কিন্তু পরদিন যখন আগুন লাগার তদন্ত করতে গেলাম, যেচে এসে খাতির করতে লাগল। এর মানে কি? মানে হলো, আমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা, যে পিটারই প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে আগুনটা লাগিয়েছে। চার, আগুন লাগার পর ধোঁয়ার,

গন্ধ। জ্যাকসন আর রকি কাছাকাছি থেকেও গন্ধ পেল না, আর বাথরুম থেকে গন্ধ পেয়ে বেরিয়ে গেল জ্যাকি। কিছুক্ষণ পর আগুন আগুন বলে চিৎকার করল। এর একটাই ব্যাখ্যা, ধোয়ার গন্ধ মোটেও পায়নি সে। বেরিয়ে গিয়ে আগুন লাগিয়েছে ছাউনিতে। আগুন ভালমত লাগার পর চিৎকার করেছে। ধোয়ার গন্ধের কথা মিথ্যে বলেছে।

একটানা অনেক কথা বলে দম নিল কিশোর। তারপর বলল, এখন প্রশ্ন একটাই, চোরাই মাল কি ভাবে সরায় ওরা? পুলিশ যেহেতু ওদের সন্দেহ করে না, গাড়িতে করে নিয়ে সহজেই বেরিয়ে যেতে পারে পাইনভিউ লেক থেকে। গত কয়েক বছরের রেকর্ড থেকে জানা যায়, কেবল শীতকালে চুরিগুলো হয়। প্রতিটি বাড়িতে চুরি করার পর পরই ম্যারিল্যান্ডে যায় না ওরা যাওয়া সম্ভব নয়, অনেক দূরের পথ। গেলে যেতে-আসতে বেশ সময় লাগবে। যায় একবারই। সেটা শীতের পর। সমস্ত চোরাই মাল জমিয়ে একসাথে নিয়ে যায়।

আরেকটা প্রশ্ন আসে এখন। মালগুলো কি করে? জবাব, লুকিয়ে রাখে। আর রাখে পাইনভিউরই কোনখানে। পুলিশ ওদের সন্দেহ করে না। তাই দোকানের মধ্যে কিংবা তার আশেপাশে কোথাও লুকিয়ে রাখাটাই ওদের জন্যে সুবিধে। যদিও লুকানোর সবচেয়ে ভাল জায়গা নয় দোকানটা। কোন কারণে যদি পুলিশ সন্দেহ করে বসে, গিয়ে খোঁজাখুঁজি করে, বেরিয়ে যাবে মালগুলো।

ঝুঁকি নিতে না চাইলে দোকানে রাখবে না ওরা। অন্য কোথাও লুকাবে। তবে সেটা পরের কথা। আগে আমাদেরকে দোকানেই খোঁজ করতে হবে। সেখানে পাওয়া না গেলে ভেবে দেখব, আর কোথায় লুকাতে পারে।

কিন্তু ওরাই যে চুরি করছে, অত শিওর হচ্ছ কি করে? মুসার প্রশ্ন।

এখনও হইনি। তবে হয়ে যাব।

পিটার আর তার দুই দোস্তকে কি সন্দেহের তালিকা থেকে একেবারে বাদ দিয়ে দিয়েছ?

না। তবে দোকানে খুঁজতে যেতে তো বাধা নেই। চোরাই মালগুলো ওখানে পেয়ে গেলে আমাদের কাজ সহজ হয়ে যাবে।

তাহলে এখন কি করব?

দিই একটু পাহারা-টাহারা। বলা যায় না, আজকেও চুরি করতে বেরোতে পারে। তাহলে হাতেনাতেই ধরে ফেলতে পারব।

হাসল রবিন। বেশি আশা হয়ে যাচ্ছে না?

পাহারা দিতে দোষ নেই।

ঘণ্টাখানেক ধরে লেকের ওপর দিয়ে হেঁটে বেড়াল ওরা। লেকের পাড়ের বাড়িঘরগুলো দেখল। কোনটায় আলো আছে, কোনটাতে নেই। প্রচণ্ড ঠাণ্ডার

মধ্যে থাকতে ভাল না লাগায় গরম এলাকায় বেড়াতে চলে গেছে ওসব বাড়ির লোকরা। আর এই সুযোগে বিনা বাধায় ওসব বাড়িতে ঢুকে পড়ছে চোর।
রাত যত বাড়ছে, শীতও বাড়ছে। সেই সঙ্গে ধেয়ে আসছে কনকনে ঠাণ্ডা ঝোড়ো বাতাস। যত গরম পোশাকই গায়ে থাকুক, ঠেকাতে পারছে না। সুচের মত বিঁধছে। হাড় পর্যন্ত ঠাণ্ডা করে দিতে চাইছে।
আরও আধঘণ্টা ঘুরে বেড়িয়ে পুরো লেকটাকে এক চক্কর দিল ওরা। অস্বাভাবিক কোন কিছুই চোখে পড়ল না। ওদের দেখে নিশ্চয় সাবধান হয়ে গেছে চোর। চুরি করতে বেরোয়নি।

.

পরদিন আবার এল ওরা পাইনভিউতে।
পিটারদের বাড়ির সামনের সরু রাস্তাটা পেরোনোর সময় মুসার বাহুতে হাত রাখল কিলোর, রাখো তো।
পিটারের বাবার সঙ্গে দেখা করবে? মুসা জিজ্ঞেস করল।
থাকলে করব। পিটার কি করছে, সেটাও দেখেই যাই।
গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে এনে পিটারদের ড্রাইভওয়েতে ঢুকল মুসা।
গ্যারেজে পাওয়া গেল ওদের। পিটার আর তার দুই বন্ধু ডট ও কারনিকে। পিটারের পুরানো পিকআপ গাড়িটা চালু করছে তিনজনে মিলে।
জ্যাক দিয়ে পেছনটা উঁচু করে চাকা লাগাচ্ছে পিটার।
কাজকর্ম তো ভালই জানে মনে হচ্ছে, মুসা বলল।
হাসল রবিন। কি করে বুঝলে?
ভঙ্গি দেখে।
রতনে রতন চেনে, হাসিটা বাড়ল, রবিনের। একটা কথা তোমাকে বলা হয়নি, মুসা। পিটারও তোমার মতই গাড়ি পাগলা।
কথা শুনে ফিরে তাকাল কারনি। দেখতে পেল তিন গোয়েন্দাকে। বলে উঠল, আরি আরি, কে এসেছে দেখো! জুনিয়ার শার্লক হোমসের দল। ন্যাকড়া দিয়ে হাত মুছতে মুছতে এগিয়ে এল সে। হাতটা বাড়িয়ে দিল কিশোরের দিকে, কালি লাগবে কিন্তু।
লাগুক, হেসে হাতটা ধরল কিশোর।
তোমাদের কথা সব আমাদের বলেছে পিটার। যে ভাবে ওকে থানা থেকে বের করে এনেছ...
আমরা আনিনি, বাধা দিয়ে বলল কিশোর। ক্যাপ্টেন ইচ্ছে করেই ছেড়ে দিয়েছেন। হয়তো ফাঁদ পেতেছেন, কে জানে! ছেড়ে না দিলে তো ফাঁদে ফেলতে পারবেন না।

কাছে এসে দাঁড়াল ডট আর পিটার।
ডট হাত মেলাল তিন গোয়েন্দার সঙ্গে।
পিটার জিজ্ঞেস করল, কাল আসোনি কেন? শুনলাম, কালও এসেছিলে পাইনভিউতে।
কালকে ব্যস্ত ছিলাম অতিরিক্ত।
চোর ধরা নিয়ে?
মাথা ঝাঁকাল কিলোর।
এগোল কিছু?
হ্যাঁ না দুটোই বলতে হয়। ডট আর কারনির দিকে তাকাল কিশোর। তোমাদের দুজনকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব। কিছু মনে কোরো না। আশা করি সত্যি জবাব দেবে।
কুঁচকে গেল কারনির ভুরু। কি করে বুঝবে সত্যি বলছি?
বলোই না। বোঝাবুঝির ব্যাপারটা তো পরে।
বলে ফলো।
পিটারকে থানায় নিয়ে যাবার পর এ এলাকায় আরেকটা চুরি হয়েছে। তোমরা করোনি তো? পিটারকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্যে?
ভুরুটা আরও কুঁচকে গেল কারনির। তারপর হেসে ফেলল, না। আমরা, খারাপ ছেলে হতে পারি, কিন্তু অপরাধ করে আরেকজনকে নিরপরাধ প্রমাণ করার মত খারাপ নই, বোকাও নই। তা ছাড়া চুরি করার মত ঘৃণিত কাজ আমাদেরকে দিয়ে হবে না।
দীর্ঘ একটা মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইল জন। তারপর বলল, বিশ্বাস করছ আমাদের কথা?
নির্দ্বিধায় মাথা ঝাঁকাল কিশোর। করছি।
হাসি ফুটল কারনি আর ডটের মুখে।
ঘরে যাবে? পিটার বলল। একটা জিনিস দেখাব তোমাদের।
মাথা কাত করল কিশোর।
দুই বন্ধুর দিকে ফিরল পিটার। তোমরা চাকাটা লাগিয়ে ফেলো। আমি ওদের সঙ্গে একটু কথা বলে আসি।
তিন গোয়েন্দাকে নিয়ে ঘরে ঢুকল পিটার। নিজের বেডরুমে নিয়ে এল। দেয়ালে ছোট-বড় নানা রকম পোস্টার লাগানো। সবই গাড়ি কিংবা মোটর সাইকেলের ছবি।
এ জিনিসটা আশা করি সাহায্য করবে তোমাদের তদন্তে, বলে ড্রয়ার খুলল পিটার। পোস্টকার্ড সাইজের একটা কার্ড বের করল। তাতে নতুন মডেলের মস্ত

একটা ট্রাকের ছবি।
ছবিটা কিশোরের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল সে, এটা আমার মিশিগানের বন্ধুদের। গত বছর ক্রিসমাসের সময় ওখানে ছিলাম আমি। উল্টে দেখাল কার্ডটা। দেখো, পেছনে নাম সই করা রয়েছে আমার বন্ধুদের। তারিখও দেয়া রয়েছে। বলতে পারো, কার্ড তো ডাকেও পাঠানো যায়। ওদের টেলিফোন নম্বর আছে আমার কাছে। ফোন করে কার্ডটার ব্যাপারে জানতে চাইতে পারো। সন্দেহ দূর হবে।
কার্ডটা হাতে নিল কিশোর। বলল, দেখিয়ে ভালই করলে। গোয়েন্দাগিরিতে কোন কিছুকেই সন্দেহের বাইরে রাখা যায় না, যতক্ষণ না কেসটার সমাধান হয়ে যায়। আচ্ছা, আরেকটা কথা। রাতের বেলা কি করে কারনি আর ডট? ওরা যে চুরিগুলো হওয়ার সময় বাড়িতেই ছিল, প্রমাণ করার উপায় আছে?
হাসল পিটার। বড়ই খুঁতখুতে মন তোমাদের। তবে সেটাকে দোষ বলছি না। এ রকম না হলে বড় গোয়েন্দা হওয়া যায় না। মাথা ঝকাল সে, হ্যাঁ, প্রমাণ করার ভাল উপায় আছে। ওরা দুজনেই সন্ধ্যার পর একটা রেস্টুরেন্টে কাজ করে। মাঝরাত পর্যন্ত। খোঁজ নিয়ে দেখতে পারো, এখানকার একটা চুরিও মাঝরাতের পরে হয়নি, সব আগে হয়েছে। আর রেস্টুরেন্টের নাম-ঠিকানা ফোন নম্বর লিখে দিচ্ছি, মালিকের নামও জেনে যাও, কারনি আর ডটের ব্যাপারে খোঁজ নিতে সুবিধে হবে।
তার আর দরকার হবে না, বলতে গেল মুসা, তোমাদের কথাতেই বিশ্বাস করলাম...
তাকে থামিয়ে দিয়ে কিশোর বলল পিটারকে, দাও, নাম-ঠিকানাগুলো লিখেই দাও। আর তোমার কার্ডটা আপাতত আমার কাছেই থাক।
পরদিন আবার পাইনভিউ লেকে এল তিন গোয়েন্দা। জ্যাকসনের সঙ্গে কথা বলবে। সুযোগ পেলে বাড়ির ভেতর খুঁজে দেখবে। আর যদি আপনাআপনি সুযোগ না আসে, তাহলে সুযোগের ব্যবস্থা করবে।
দোকানের সামনের খোয়া বিছানো বিরাট আঙিনাটায় গাড়ি রাখল মুসা।
দোকানের দরজার পাশে রাখা জ্যাকসনের পিকআপ। নীল রঙের বডি।
উঁকি দিয়ে দেখে ফিসফিস করে বলল কিশোর, জ্যাকসনকে কেবল দেখা যাচ্ছে। কোন ভাবে বের করে দিতে পারলে, খোঁজাখুঁজিটা করা যেত। দেখি, কি করা যায়। আমি আর মুসা ওকে বের করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব। রবিন, তুমি খোঁজ চালাবে।
ঘাড় কাত করল রবিন। ঠিক আছে।
দোকানে ঢুকল ওরা।

কাউন্টারের ওপাশে কতগুলো ফাত্না নিয়ে কি যেন করছে জ্যাকসন। বোধহয় বোঝার চেষ্টা করছে কোনটা ভালমত ভেসে থাকবে।
অ, তোমরা, মুখ তুলে দেখে বলল জ্যাকসন।
কেমন আছেন? আন্তরিকতার ভঙ্গি করল কিশোর।
তোমরা আসার আগে পর্যন্ত তো ভালই ছিলাম, মুখ গোমড়া করে জবাব দিল জ্যাকসন।
রেগে আছেন মনে হচ্ছে আমাদের ওপর? হাসল কিশোর। কারণটা কি?
হিগিনসদের বাড়িতে ঢুকতে দেখলাম তোমাদের, জ্যাকসন বলল।
তাতে অসুবিধেটা কি? প্রায় জিজ্ঞেস করে ফেলতে যাচ্ছিল মুসা। চোখের ইশারায় তাকে নিষেধ করল কিশোর।
জ্যাকসনের কথাটা যেন শুনতেই পায়নি কিশোর এ রকম ভঙ্গিতে চারপাশে তাকাতে শুরু করল। অবাক হওয়ার ভান করে আনমনে বিড়বিড় করল, বাপরে, জিনিসপত্রে একেবারে বোঝাই।
মিথ্যে বলেনি সে। তাক বোঝাই জিনিসপত্র। বেশির ভাগই মাছ ধরার সরঞ্জাম। ছিপ, সুতো, বঁড়শি, ফাৎনা থেকে শুরু করে মাছ ধরার পর তোলার জন্যে বড় হাতলওয়ালা নেট, যা যা প্রয়োজন সবই আছে।
প্রচুর বিক্রি নাকি এ সব জিনিসের? জিজ্ঞেস করল কিশোর। হেঁটে গেল স্তূপ করে রাখা মাছ ধরার আধুনিক সরঞ্জামগুলোর মাঝখানের সরু গলিপথ ধরে। দেখল বোটে লাগানোর ছোট আউটবোর্ড এঞ্জিন আছে। আছে ইলেকট্রনিক ফিশ ফাইন্ডার, তাতে কম্পিউটারের ছোট স্ক্রীন লাগানো, লেকের তলায় কোথায় কি আছে দেখা যায় ওটার সাহায্যে। এক ধরনের স্যাটেলাইট সিসটেমও আছে। যন্ত্রটা আগেও দেখেছে কিশোর। কিন্তু কখনও ব্যবহার করেনি। গ্লোবাল পজিশনিং স্যাটেলাইট সিসটেম বলে এগুলোকে। হাতে নিয়ে এদিক ওদিক ঘুরিয়ে মাছের অবস্থান নির্ণয় করা যায়। একটা মেটাল ডিটেক্টরও দেখা গেল একধারে রাখা।
ওসব পচা যন্ত্র নবিসদের জন্যে, যন্ত্রগুলোর প্রতি কিশোরের কৌতূহল লক্ষ করে জ্যাকসন বলল।
তাই? কিশোর বলল, আমি তো আরও ভাবলাম অতিমাত্রায় পেশাদারদের জন্যে ওসব যন্ত্র আবিষ্কার হয়েছে।
দূর। পেশাদাররা ফালতু যন্ত্রের সাহায্য নিতে যাবে কি করতে? মাছ খুঁজে বের করার জন্যে ওদের স্যাটেলাইট দরকার হয় না। এ ভাবে মাছ খুঁজে বের করে ধরার মধ্যে মজাও নেই।
তাহলে রেখেছেন কেন?

নবিসদের কাছে বিক্রি করি না আমি তা তো বলিনি। এ সব আলতু-ফালতু জিনিস ওরাই কেনে। হেসে উঠল জ্যাকসন।
মুসা আর রবিনও কিশোরের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে লাগল। একটা বাক্স দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল রবিন, এটা কিসের জন্যে?
তোমরা তো দেখা যাচ্ছে একেবারেই আনাড়ি, জ্যাকসন বলল। কিছুই চেনো না।
সে-জন্যেই তো চিনতে চাইছি, মুখে হাসি টেনে এনে জবাব দিল কিশোর।
ওটা স্লেড বক্স। মাছ ধরার সমস্ত সরঞ্জাম ভরে নিয়ে বরফের ওপর দিয়ে টেনে নিতে পারবে। বয়ে নেয়ার ঝামেলা নেই। পিঠটা বাঁকা হওয়া থেকে বাঁচবে। মাছ ধরার সময় ওটাতে বসতেও পারবে। এক জিনিসে কত সুবিধে, তাই না?
কোত্থেকে আনেন এগুলো? জানতে চাইল মুসা।
নিজেই বানাই, গর্বের সঙ্গে জবাব দিল জ্যাকসন। এ মৌসুমেই গোটা আষ্টেক বিক্রি করে ফেলেছি।
সবগুলোই কি এক রকম? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
বাজারে যেগুলো কিনতে পাওয়া যায়, আলাদা আলাদা ডিজাইন, সেগুলোর মত কিনা যদি জিজ্ঞেস করো, তাহলে বলব, না। আমারগুলো কাজের জিনিস, এটাই হলো আসল কথা।
অ, হঠাৎ করে যেন মনে পড়ে গেল কিশোরের, আপনার নাতিরা কোথায়?
মাছ ধরতে গেছে।
মনে মনে পুলকিত হলো কিশোর। ভাগ্যটা ভালই। এখন কোনমতে বুড়োটাকে সরিয়ে নিতে পারলেই পুরো বাড়ি খালি পাওয়া যাবে। ভাল মাছ কোনখানে পাওয়া যায়, জানে নিশ্চয় ওরা?।
শিখছে। প্রায়ই তো দেখি যন্ত্রপাতি নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করে। আমিও বাধা দিই না। শিখতে চায় শিখুক। নবিস থাকার কোন মানে হয় না।
আমাদের কি ওরকম ভাল জায়গা চেনাতে পারবেন?
বাহ! তোমাদেরও দেখছি আইস ফিশিঙের শখ? অবাক মনে হলো জ্যাকসনকে।
হয়েছে আপনার কথা শুনে। আমরাও নবিস থাকতে চাই না, হাসল কিশোর। আইস ফিশিং দেখতে দেখতে ক্রমেই শখ বাড়ছে। কৌতূহলটাও ঠেকাতে পারছিনা। আর মুসা তো সেদিন আপনার সঙ্গে শ্যান্টিতে দেখা হওয়ার পর থেকে আমাকে ধরে মারে আর কি। আপনি ওকে মাছ ধরা শেখাতে চেয়েছিলেন, আমি টেনে বের করে নিয়ে গিয়েছিলাম বলে। ওর সঙ্গে সঙ্গে আমার শখটাও চাগিয়ে উঠেছে। ভাবলাম, একবার চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি? বঁড়শি-টড়শি কিনতে কিছু টাকা খরচ হবে আরকি।

খরচও তেমন বেশি কিছু না, আগ্রহী মনে হলো জ্যাকসনকে। দামী যন্ত্রপাতিগুলো ভাড়া নিতে পারো আমার কাছ থেকে। ভাল কমিশন দেব। কারণ তোমাদেরকে আমার পছন্দ হয়েছে।
টোপ গিলেছে। মনে মনে হাসল কিশোর। এখন খেলিয়ে ডাঙায় তুলতে পারলেই হয়। বলল, কিন্তু আমরা কি পারব এত তাড়াতাড়ি?
পারবে। একেবারে পানির মত সহজ। যদি ঠাণ্ডাটা কেবল মেনে নিতে পারো।
কোনখান থেকে শুরু করব?
জায়গা তো বেশ কয়েকটাই আছে। কাউন্টারের ওপাশ থেকে বেরোল না জ্যাকসন। তবে কিশোর বুঝল, আর সামান্য চাপ দিলেই বেরোবে।
জায়গাগুলো কি দেখাতে পারবেন? সময় হবে আপনার? অনুরোধের ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল সে।
বোঝা যাচ্ছে, না দেখানো পর্যন্ত শান্তিতে থাকতে দেবে না আমাকে, হাসল জ্যাকসন।
যাক, তাড়াতাড়িই বুঝতে পারলেন, হেসে জবাব দিল কিশোর।
চেয়ার থেকে উঠে এল জ্যাকসন।
মুসার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল কিশোর। জ্যাকসনের পেছনে পেছনে দরজার দিকে এগোল সে। রবিনকে বলল, তোমার আর আসার দরকার নেই। তুমি এখানেই থাকো বরং। দোকান পাহারা দাও।
হ্যাঁ। সে-ই ভাল, জ্যাকসন বলল। যে রকম চোরের উৎপাত এখানে। দেখা গেল, দিনের বেলাতেও চুরি শুরু করল। সুযোগ দেয়ার দরকার কি?
কিশোর আর মুসাকে নিয়ে বেরিয়ে গেল জ্যাকসন।
ওরা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাজে নামল রবিন। একটা সেকেন্ডও দেরি করল না। দোকানের পেছনে একটা দরজা আছে। জ্যাকসনদের বেডরুমে ঢোকার। দৌড়ে এসে সেটা দিয়ে ঢুকে পড়ল সে।
বড় একটা ঘর। আসবাবপত্রে ঠাসা। এক পাশে রান্নাঘর আরেক পাশে বাথরুম। জানালার কাছে জ্যাকসনের বিছানা। দুটো চারপায়ার ওপর রাখা দুটো স্লীপিং ব্যাগ। জ্যাকি আর রকির জন্যে। ওদের ব্যাগ আর কাপড়-চোপড় মেঝেতে স্তূপ করা। ধোয়াধোয়ির আর ধার দিয়ে যায় না। অপরিচ্ছন্ন। নোংরা।
জ্যাকসনকে বাইরে কতক্ষণ আটকে রাখতে পারবে কিশোররা, বলা যাচ্ছে না। যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে। দুটো চারপায়ার মাঝখানে রাখা ছোট টেবিলটার দিকে নজর দিল সে। কিন্তু সন্দেহ করার মত কোন জিনিস দেখল না।
দ্রুত জ্যাকসনের ড্রেসারের ড্রয়ার পরীক্ষা করে দেখল। তারপর ঢুকল রান্নাঘরে। কেবিনেটগুলো খুলে দেখল। কোথাও চোরাই মাল আছে কিনা। নেই। এত

সাধারণ জায়গায় থাকবে, আশাও করেনি। তবু দেখল। নিশ্চিত হওয়ার জন্যে। মাল থাকলে হয় দেয়ালের ফাপা কোন জায়গায় থাকবে, নয়তো মেঝের তক্তার নিচে, মনে হলো তার।
পাঁচ মিনিট খোঁজাখুঁজি করে কোন কিছুই পাওয়া গেল না। জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখল, এখনও লেকের বরফের ওপরই দাঁড়িয়ে আছে কিশোররা। সময় নষ্ট না করে সরে এল রবিন।
সারা ঘরে নতুন করে আবার চোখ বোলাল সে। বোঝার চেষ্টা করল কেন জায়গায় থাকতে পারে জিনিসগুলো। স্লীপিং ব্যাগগুলো উঁচু করে দেখল। তারপর মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে চারপায়াগুলোর নিচে উঁকি দিল। চোখে পড়ল ছোট এক টুকরো ভাঁজ করা কাগজ। একটা চারপায়ার ক্যানভাসের নিচে গোঁজা।
কৌতূহল হলো।
বের করে এনে দেখল, তাতে দুই সারি নম্বর লেখা। তালিকার মত। তবে কোন জিনিসের নাম লেখা নেই নম্বরগুলোর বিপরীতে।
কি মানে এগুলোর, বুঝতে পারল না কিছু। কিন্তু মনে হতে লাগল, এর মধ্যে সূত্র আছে। নইলে এত যত্ন করে ওখানে লুকিয়ে রেখেছে কেন?
পকেট থেকে নোটবুক বের করে তার ভেতর থেকে কাগজ বের করল। পেন্সিল দিয়ে দ্রুত নকল করে নিল নম্বরগুলো। ঠিক যে ভাবে লেখা রয়েছে, সে ভাবে সাজিয়ে। আসল কাগজটা রেখে দিল আগের জায়গায়।
বাইরে কথা শোনা গেল। জোরে জোরে কথা বলছে কিশোর। বুঝল, সাবধান করে দিচ্ছে।
এ ঘরে আর কিছু পাওয়ার আশা নেই। আর থাকলেও সময় নেই। তাড়াতাড়ি দোকানে ফিরে এল রবিন।
প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সামনের দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকল জ্যাকসন। পেছনে কিশোর আর মুসা। বাপরে, বড় বাঁচা বেঁচেছে!-বুকের মধ্যে দুরুদুরু করছে রবিনের। আর সামান্য দেরি করলেই যেত ধরা পড়ে।
তারমানে তো মাছ ধরার সরঞ্জাম লাগবে এখন তোমাদের, জ্যাকসন জিজ্ঞেস করল। দেব?
এখন দেবেন? রবিনের দিকে তাকাল কিশোর।
মাথা ঝাঁকিয়ে ইঙ্গিতে বোঝাল রবিন, কাজ হয়ে গেছে।
জ্যাকসনকে বলল কিশোর, থাক পরেই দেন। আজকে মেরিন ডগলাসের সঙ্গে এক জায়গায় যাওয়ার কথা আছে আমাদের।

শুধু শুধু আমাকে বাইরে নিয়ে গিয়ে আমার সময় নষ্ট করলে কেন তাহলে? রেগে উঠল জ্যাকসন। কাউন্টারের ওপাশের চেয়ারে গিয়ে বসল।
কারণ আপনি ছাড়া মাছের সবচেয়ে ভাল জায়গাগুলো আর কেউ দেখাতে পারত না, তেলানোর ভঙ্গিতে জবাব দিল কিশোর।
তাতে অবশ্য কাজ হলো। নরম হলো জ্যাকসন। একটা ম্যাগাজিন তুলে নিয়ে পাতা ওল্টাতে শুরু করল।
ও, ভাল কথা, কিশোর বলল, আপনার দুই নাতির সঙ্গে একটু দেখা করার দরকার ছিল। কোথায় ওরা?
কেন, লেকে দেখোনি ওদের? ম্যাগাজিনটা জানালার দিকে নাড়ল জাকসন।
না তো। ঠিক আছে। এখন যাচ্ছি। দেখি পাওয়া যায় নাকি, বলে আর দাঁড়াল না কিশোর। দরজার দিকে রওনা দিল। বেরিয়ে এল দুই সহকারীকে নিয়ে।
পাহাড়ের গা বেয়ে লেকের দিকে নামতে নামতে ফিরে তাকাল একবার কিশোর। দেখল, জানালা দিয়ে ওদের দিকে নজর রাখছে কিনা জ্যাকসন।
দেখা গেল না তাকে।
রবিনকে জিজ্ঞেস করল কিশোর, কিছু পেলে?
নোটবুক থেকে কাগজটা বের করে দিল রবিন। এটা দেখো, কিছু বুঝতে পারো নাকি।
কতগুলো নম্বর, দেখতে দেখতে বলল কিশোর।
পাশ থেকে দেখার জন্যে কাত হয়ে এল মুসা।
নম্বরগুলোর মানে কি? জিজ্ঞেস করল রবিন।
বুঝতে পারছি না, জবাব দিল কিশোর। থাক, এটা নিয়ে পরে ভাবা যাবে। হাত তুলে দুজন মানুষকে দেখাল, জ্যাকি আর রকি না ওরা? মুসা, ডাক দাও তো।
অ্যাই, শুনছেন! চিৎকার করে ডাকল মুসা।
ফিরে তাকিয়ে তিন গোয়েন্দার দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ল দুই ভাই। কিন্তু কাছে এল না। কিশোররা ওদের দিকে এগোল। ওরা সামনের দিকে হাঁটতে শুরু করল। লেক পার হয়ে ওপারে চলে যাবে মনে হচ্ছে।
তিন গোয়েন্দাও গতি বাড়িয়ে দিল। বুটের নিচে কাঁটা থাকায় পিছলে পড়া থেকে বাঁচল।
এত তাড়াহুড়া করছে কেন? রবিনের প্রশ্ন। দেখছে না ওদের কাছে যেতে চাইছি আমরা?
আগে আগে হাঁটতে গিয়ে হঠাৎ টের পেল রবিন, পায়ের নিচে পাতলা হয়ে এসেছে বরফ। চাপ পড়তেই চড়চড় করে উঠল।
এগিয়ো না! এগিয়ে না! দুই বন্ধুর উদ্দেশে চিৎকার করে উঠল সে।

ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে গেল যেন কিশোর। তার গায়ের ওপর এসে পড়ল মুসা। কি হয়েছে?
পাতলা বরফ, স্থির দাঁড়িয়ে থেকে জবাব দিল রবিন। তোমরা যেখানে আছে, ওখানেও পাতলা। নোড়া না।
পাতলা বরফে কি করতে হয় জানা আছে মুসার। এক মুহূর্ত দেরি না করে। চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। শরীরের ভার বিশেষ এক জায়গায় না রেখে ছড়িয়ে দিল। মাত্র কয়েক ফুট সামনে দাঁড়ানো রবিনকে বলল, শুয়ে পড়ো। খুব ধীরে ধীরে।
মুসার দেখাদেখি কিশোরও একই ভঙ্গিতে বরফের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। চোখ রবিনের দিকে।
সামনের দিকে দুই হাত লম্বা করে দিল মুসা। রবিনকে ধরার জন্যে।
কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। বরফ ভেঙে জোরাল একটা ঝপাৎ শব্দ করে পানিতে পড়ে গেল রবিন।
ভাসল না আর।

.

রবিন! চিৎকার করে উঠল মুসা। ভাবল, ডাক শুনে বরফের গর্তটা দিয়ে মাথা তুলবে রবিন। কিন্তু ঝপাৎ শব্দটার পর আর কোন শব্দই কানে এল না তার।
হামাগুড়ি দিয়ে গর্তটার দিকে এগোল সে।
বরফ-শীতল পানিতে শুধু বরফের টুকরো ভেসে থাকতে দেখল।
গর্তটার মধ্যে রবিনকে ভেসে ওঠার জন্যে কয়েক সেকেন্ড সময় দিল। কিশোর। তারপর চেঁচানো শুরু করল, আপনারা জলদি আসুন! রবিন পড়ে গেছে! পড়ে গেছে!
মুহূর্তের মধ্যেই চতুর্দিক থেকে দৌড়ে আসতে শুরু করল মাছ শিকারীরা। কারও হাতে ইস্পাতের ভারী শিক, কারও হাতে বরফ ছিদ্র করার ড্রিল মেশিন। অবাক হয়ে দেখল কিশোর, উদ্ধারকারীরা তাদের কাছে আসছে না। বরং ৬জনখানেক দূরের কয়েকটা জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে।
এদিকে এসো! কিশোরদের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল একজন শিকারী। স্রোতের টানের মধ্যে পড়েছে সে। দ্রুত সরে যাচ্ছে।
স্রোত!
তারমানে ওপরটা জমাট বরফ হয়ে গেলেও নিচের পানিতে ঠিকই স্রোত প্রবাহমান। এতক্ষণে বোঝা গেল কেন পানিতে পড়ে মাথা তোলেনি রবিন। তুলতে পারেনি আসলে। বরফের নিচে চলে গেছে সে।

পরিস্থিতিটা বুঝতে পেরে শিউরে উঠল কিশোর। দম নিতে পারছে না রবিন। সেই সঙ্গে মারাত্মক ঠাণ্ডা পানি।
ওসব ভাবনা-চিন্তার ধার দিয়ে গেল না মুসা। যা করার, সেটাই করল। পাতলা বরফের কাছ থেকে হামাগুড়ি দিয়ে দ্রুত পিছিয়ে গেল সে। লাফ দিয়ে উঠে দৌড় দিল শিকারীদের দিকে।
মরিয়া হয়ে ততক্ষণে বরফকে আক্রমণ করেছে ওরা। আইস বার দিয়ে খোঁচাচ্ছে কেউ, কেউ কোপাচ্ছে কুড়াল দিয়ে, বাকিরা ব্যবহার করছে ড্রিল মেশিন।
বরফের নিচে রবিনের হলুদ রঙের পার্কাটা সরে যেতে দেখা গেল পলকের জন্যে।
এই যে এখানে। এখানে! চিৎকার করে উঠল মুসা।
কোন দিকে ভেসে যাচ্ছে রবিন, হাত তুলে দেখাল সে। রবিনের যাত্রাপথে যাতে গর্ত খুঁড়তে পারে শিকারীরা।
কিশোরও উঠে এসেছে। মুসার পাশে দাঁড়িয়ে বরফের নিচে তাকাল। মুখ। তুলে সামনের দিকে তাকিয়ে দেখল রবিন যেদিকে সরছে সেদিকে কোন গর্ত আছে কিনা।
মুসা দৌড় দিল নয় ইঞ্চি গোল একটা সদ্য কাটা গর্তের দিকে। উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে হাত ঢুকিয়ে দিল গর্তের ভয়ানক ঠাণ্ডা পানিতে। ওখান দিয়ে ভেসে গেলেই খপ করে ধরবে রবিনকে। ওর চারপাশ ঘিরে দাঁড়িয়ে গেল মাছ শিকারীরা। যে কোন সাহায্যের জন্যে তৈরি।
এই যে আসছে চিৎকার করে বলল একজন শিকারী।
হলুদ রঙের পার্কাটা ভেসে আসতে দেখল মুসাও। হাত আরও খানিকটা পানিতে ঢুকিয়ে দিল। ঠাণ্ডায় অসাড় হয়ে আসছে হাত। রবিনের কষ্টটা আঁচ করতে পারল। আতঙ্কিত হয়ে পড়ল মুসা। বাঁচবে তো রবিন!
এল অবশেষে রবিন। সঙ্গে সঙ্গে তার আস্তিন খামচে ধরল মুসা। টান দিয়ে পানির ওপর তুলে নিয়ে এল রবিনকে। মাথাটা ভেসে উঠল। নাক উঁচু করে লম্বা দম নিতে লাগল রবিন।
স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মুসা। বেঁচে তো আছেই। হুঁশও হারায়নি এখনও রবিন।
তবে বুঝতে পারছে বিপদটা কেবল শুরু। আসল বিপদ আসছে।
উদ্ধার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ল শিকারীরা। গর্তের চতুর্দিকের কিনারা কেটে বড় করতে শুরু করল। রবিনকে টেনে তুলে আনার জন্যে।
রবিন, তুমি ঠিক আছ? জিজ্ঞেস করল মুসা।
ভীষণ ঠাণ্ডা… রবিন জানাল।
আর সামান্য একটু সহ্য করো, মুসা বলল। নিয়ে আসব বের করে।

কিন্তু সে বুঝতে পারছে একটুতে হবে না, গর্তের মুখ বড় করতে অনেক সময় লাগবে। ইতিমধ্যেই প্রায় মিনিট দুয়েক পানিতে কাটিয়ে ফেলেছে রবিন। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। এর একটা কারণ, মারাত্মক ঠাণ্ডা পানি তার পেশী শক্ত করে ফেলছে।
গর্তের মুখ বড় করছে শিকারীরা। কিশোর আর মুসা রবিনকে ধরে রেখেছে। টান দিয়ে দেখল, তুলে আনার মত এখনও যথেষ্ট বড় হয়নি ফোকরটা।
ওকে তুলে এনে বরফের ওপর শোয়াতে আরও মিনিটখানেক লাগল।
উফ, ভয়ানক ঠাণ্ডা! কথা বলতে গিয়ে দাঁতে দাতে বাড়ি খাচ্ছে রবিনের। যে বিপদের ভয়টা পাচ্ছিল মুসা, সেটা এসে গেছে। পেশী ঠাণ্ডা হয়েছে। একে একে এখন শরীরের সমস্ত অঙ্গ ঠাণ্ডা হতে থাকবে। কাজ করতে পারবে না। রক্ত চলাচল ব্যহত হবে। দেহের তাপমাত্রা কমে যাবে। এবং সবশেষে দেহ অসাড় হয়ে গিয়ে নিশ্চিত মৃত্যু।
বাঁচানোর একটাই উপায়। যত দ্রুত সম্ভব গা গরম করা।
ওর গা গরম করা দরকার, মুসা বলার আগেই বলে ফেলল কিশোর।
একজন বলল, জ্যাকসনের ওখানে নিয়ে যাই। সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে বলল, এই ধরো তো। জলদি করো।
না না, মিস্টার মরগানের বাড়িতে নিয়ে চলুন। ওখানেই ভাল হবে। মিসেস মরগান নার্স, সেবাটা ঠিকমত হবে। কিশোর বলল। জ্যাকসনদের বিশ্বাস করতে পারছে না সে।
গ্র্যাহাম গুন নামে একজন মাছ শিকারী গিয়ে তাড়াতাড়ি করে তার স্নোমোবাইলটা নিয়ে এল। পেছনে টেনে নিয়ে এল জ্যাকসনের হাতে বানানো একটা স্লেড। রবিনের পাশে এনে রাখল। রবিনকে স্লেডে তুলে দেয়া হলো। মুসা উঠে বসল তার মাথার কাছে। গরম রাখার জন্যে রবিনের মাথাটা দুই হাতে চেপে ধরে রাখল।
স্নোমোবাইল চালানো শুরু করল গ্রাহাম।
রবিন? জেগে আছ তত? রবিনের নীল হয়ে যাওয়া ঠোঁটের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল মুসা।
বিড়বিড় করে কিছু বলল রবিন, স্নোমোবাইলের এঞ্জিনের গর্জনে বোঝা গেল না। তার ঠোঁটের কাছে কান নিয়ে এল মুসা।
পায়ের তালুতে কোন সাড়া নেই, রবিন জানাল।
মুসা জানে, রবিনের জন্যে এ সময়টা এখন সবচেয়ে বিপজ্জনক সময়। ঠাণ্ডা পানিতে কাটিয়ে এসে দেহ ঠাণ্ডা। তার ওপর গায়ের সমস্ত কাপড়-চোপড় ভেজা।

বরফ-ঠাণ্ডা বাতাসের সংস্পর্শে এসে সেগুলো জমে যেতে আরম্ভ করেছে। তাতে দেহটা আরও দ্রুত ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।
জেগে থাকো, রবিন, মুসা বলল। খবরদার, ঘুমিয়ে না। এসে গেছি আমরা।
.
স্নোমোবাইলের পেছন পেছন দৌড়ে চলেছে কিশোর। কি মনে হতে থেমে দাঁড়িয়ে চারপাশে তাকাল। লেকের কোনখানে দেখতে পেল না জ্যাকি কিংবা রকিকে। সন্দেহটা জোরালো হলো তার। ইচ্ছে করে ওদেরকে পাতলা বরফের দিকে টেনে নিয়ে গেছে, দুই ভাই। একটাই উদ্দেশ্য। পানিতে ফেলে খুন করা। লোকে ব্যাপারটাকে দেখবে অ্যাক্সিডেন্ট হিসেবে। শত্রুকে শেষ করে দেয়া হবে। নিজেদেরও কিছু হবে না।
চমৎকার পরিকল্পনা।
কিন্তু কেন করল?
কারণ, সঠিক পথেই এগোচ্ছে তিন গোয়েন্দা।
তার মানে, চুরিগুলোর পেছনে যে জ্যাকি আর রকির হাত আছে, তাতে কোনোই সন্দেহ থাকল না আর।
*
মুখ তুলে শার্লিদের বাড়ির দিকে তাকাল মুসা।
হাত নাড়তে দেখল শার্লিকে।
বাড়ির পেছনের দরজার কাছে এনে স্নোমোবাইল থামাল গ্র্যাহাম।
পানিতে পড়ে গিয়েছিল রবিন, শার্লিকে জানাল মুসা।
স্লেড থেকে রবিনের প্রায় জমে যাওয়া দেহটা গ্রাহামের সহায়তায় তুলে নিল সে।
ওকে যে তোমরা তোলার চেষ্টা করেছ, দেখেছি আমরা, শার্লি জানাল। রেডি হয়ে আছে মা।
রবিনকে বয়ে নিয়ে আসা হলো।
জরুরী কণ্ঠে বেলী আন্টি বললেন, সোজা ওকে বাথরুমে নিয়ে যাও। কাপড়-চোপড় সব খুলে ফেলো। শার্লি, চুলায় গরম পানি হয়ে গেছে। যা, নিয়ে। আয়। আমি আসছি।
ধরাধরি করে রবিনকে নিয়ে চলল মুসা আর গ্রাহাম। সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠতে লাগল।
দোতলায় এসে সোজা বাথরুম।
গরম পানি দিয়ে টাবটা ভর্তি করে রেখেছেন বেলী আন্টি। মুসা আর গ্রাহাম মিলে দ্রুত হাতে রবিনের গায়ের সমস্ত জামা-কাপড় খুলে দিল। শুধু আন্ডারওয়্যার বাদে। বাথরুমে ঢুকলেন বেলী আন্টি।

লজ্জা-শরমের সময় নেই এখন, বললেন তিনি। প্রাণ বাঁচানোটাই আসল কথা। এগুলোও খোলো। তারপর গরম পানিতে শোয়াও।
যে ভাবে যা করতে বলা হলো, অক্ষরে অক্ষরে পালন করল মুসা আর গ্রাহাম।
ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া দেহ গরম পানিতে রাখতেই কেঁপে উঠল রবিন।
ওর দিকে চোখ রাখো, বেলী আন্টি বললেন। আমি গরম কিছু নিয়ে আসিগে অ্যামবুলেন্সকে ফোন করে দেয়া হয়েছে। চলে আসবে যে কোন সময়।
কিশোর ঢুকল এ সময়। শঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকাল রবিনের দিকে। ও ভাল হবে। তো?
পানিতে খুব বেশিক্ষণ ছিল নাকি? জানতে চাইলেন বেলী আন্টি।
হিসেব রাখতে পারিনি। মিনিট তিনেক হবে বড় জোর। পানি থেকে যখন তুললাম, তখন জ্ঞান ছিল ভালমতই।
তাহলে চিন্তা নেই। ভাল হয়ে যাবে।
ধীরে ধীরে জেগে উঠতে শুরু করল রবিন।
রঙ ফিরতে লাগল শরীরে।
ওকে খাওয়ানোর জন্যে এক মগ গরম পানি নিয়ে এলেন বেলী আন্টি। বললেন, ওর ভেতরটাও গরম করা দরকার।
ডাক্তার আসতে আসতে রীতিমত সুস্থ হয়ে গেল রবিন। উঠে বসল টাবের মধ্যে। বিমূঢ়ের মত তাকাতে লাগল।
বাথরুমে ঢুকলেন ডাক্তার। কেমন আছ এখন?
ভাল, দুর্বল কণ্ঠে জবাব দিল রবিন।
তার দেহের তাপমাত্রা দেখলেন ডাক্তার। নাড়ি দেখলেন। ব্লাড প্রেশার মাপলেন। তোমার কপাল ভাল, তাড়াতাড়ি তুলে ফেলেছে। গা ভালমত গরম করতে হবে এখন। তবে বিপদ কেটে গেছে।
কত রকম ভুল কথা বলে মানুষ। এত ভোগান্তির পর কপাল ভাল হয় কি করে? ভাল তো হত যদি একেবারেই না পড়ত, মুসা বলল। রবিন বেঁচে যাওয়াতে অতি আনন্দে দিশেহারা।
হেসে ফেললেন ডাক্তার। পরিস্থিতির আড়ষ্ট ভাবটা কেটে গেল। হাসিটা সংক্রমিত হলো উপস্থিত সবার মাঝে।
পুরোপুরি ভাল হতে কত সময় নেবে? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
ভাল মোটামুটি হয়েই গেছে। প্রাণশক্তি খুব বেশি। আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যে হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারি আমরা ওকে। তবে তার বোধহয় আর প্রয়োজন হবে না। যা করার মিসেস মরগানই করতে পারবেন। ওকে বিছানায় রেখে মাঝে মাঝে টেম্পারেচার পরীক্ষা করা আর গরম তরল খাবার খাওয়ানো ছাড়া কিছুই করা লাগবে না।

ফিরে তাকাল কিশোর। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন বেলী আন্টি। আপনি কি বলেন, আন্টি? হাসপাতালে পাঠাব?
ডাক্তারের সঙ্গে আমিও একমত। আমার মনে হয় না আর নেয়ার কোন প্রয়োজন আছে।
তাহলে আমি বরং থেকেই যাই, রবিন বলল। এখানে সবার সামনে হাসপাতালের চেয়ে ভাল থাকব।
থাকতে পারো, হেসে বললেন বেলী আন্টি, এক শর্তে। আমার কথা সব শুনতে হবে। ইচ্ছে করলেই উঠে বেরিয়ে যাওয়া চলবে না।
না না, যাব না, রবিন এক কথায় রাজি। হাসপাতালে যাওয়ার চেয়ে যে। কোন শর্ত মেনে নেয়া অনেক ভাল। যা বলবেন তাই করব। পথ্য যা খেতে দেবেন, খাব।
হেসে বেরিয়ে গেলেন ডাক্তার।
রবিনকে একটা মেয়েদের বাথরোব এনে দিলেন বেলী আন্টি। পশমী মোজা দিলেন। ভেজা কাপড়-চোপড়গুলো ড্রাইয়ারে ঢোকালেন শুকানোর জন্যে। রবিনকে বললেন, আগুনের কাছে গিয়ে বসে থাকোগে।
রোবটা গায়ে দিল রবিন। উসখুস করতে লাগল।
কি হলো? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
এ রকম একটা বাথরোব পরে এখানে মেয়েমানুষদের সামনে ঘোরাফেরা করতে লজ্জা লাগছে আমার, আড়চোখে শার্লির দিকে তাকাল রবিন।
তাতে কি হয়েছে? গায়ে কাপড় তো আছে, কিশোর বলল।
খানিক আগে বাথরুমে যে অবস্থায় ছিলে সে ভাবেই যে থাকতে বলেননি, এটাই বরং তোমার ভাগ্য, মুসা বলল।
মুচকি হাসলেন বেলী আন্টি। হাসিটা বেড়ে যাচ্ছে বুঝতে পেরে ঠেকানোর জন্যে কৃত্রিম ধমক লাগালেন, এখনই কিন্তু কথা না শোনা শুরু করেছ তুমি।
আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, ঠিক আছে। আর দ্বিধা করল না রবিন। তাড়াতাড়ি গিয়ে আগুনের কাছে বসে পড়ল।
মুসা আর কিশোর বসল তার কাছাকাছি।
গরম চকলেট ড্রিংক এনে দিল শার্লি।
আগুনের উত্তাপ শোষণ করতে লাগল রবিনের শরীর। ধীরে ধীরে তাপমাত্রা বেড়ে যেতে শুরু করল। কিশোরের দিকে তাকাল সে। লেকে আসলে কি ঘটেছিল তখন, বলো তো?
জ্যাকি আর রকি এ রকম করল কেন জানতে চাইছ তো?
হ্যাঁ, মাথা ঝাঁকাল রবিন।

আমার বিশ্বাস, ইচ্ছে করেই আমাদেরকে পাতলা বরফের ওপর টেনে নিয়ে। গিয়েছিল ওরা, কিশোর বলল।
শেষ দিকে আমারও তাই মনে হচ্ছিল, রাগ মাথাচাড়া দিয়ে উঠল মুসার কণ্ঠে। রবিন পড়ে যাওয়ার পর ওর দিকে ছাড়া আর কোনদিকে তাকানোর সুযোগ ছিল না। কিশোরের দিকে তাকাল সে। ওরা কি করেছে দেখেছ নাকি?
নাহ্, মাথা নাড়ল কিশোর। আমার নজরও রবিনের দিকেই ছিল। পরে যখন খেয়াল হলো, ফিরে তাকালাম, দেখি ওরা দুজন চলে গেছে।
অ, ওরা আর সবার মত ছুটে আসেনি?অবাক হলো রবিন।
না।
এ সময় শার্লি ঢুকল ঘরে। রবিনের কাছে এসে বলল, তোমার পকেটের জিনিসপত্র। একটা প্লাস্টিকের ব্যাগ পাওয়া যায় কিনা দেখি, ভরে রাখার জন্যে।
তাহলে তো ভালই হয়, শার্লির হাত থেকে মানিব্যাগটা নিয়ে আগুনের সামনে রাখল রবিন। থাক এখানে। শুকাক।
আর এই যে তোমার হিসেবের কাগজ, জ্যাকসনের ঘর থেকে নকল করে। আনা কাগজটা রবিনের হাতে দিল শার্লি।
ওহহো, ভুলেই গিয়েছিলাম এটার কথা। সাবধানে ভেজা কাগজটার ভাজ খুলল সে, যাতে ছিঁড়ে না যায়। কালি জাবড়ে গেছে। তবে পড়া যায় নম্বরগুলো।
জিনিসপত্রগুলো দিয়ে চলে গেল শার্লি।
বেলী আন্টি রান্নাঘরে।
নম্বরগুলো দেখতে দেখতে কিশোর বলল, কি ভাবে পড়তে হবে? ওপর থেকে সারি দিয়ে নিচের দিকে, না পাশের দিকে জোড়ায় জোড়ায়?
কি জানি, হাত ওল্টাল রবিন।
মুসার দিকে তাকাতেই মাথা নাড়ল মুসা, আমার দিকে তাকিয়ে লাভ নেই, যেটা তুমি বুঝতে পারছ না, সেটা আমি কি করে বুঝব?
খানিকক্ষণ নম্বরগুলো নিয়ে মাথা ঘামাল ওরা। কিন্তু কি ভাবে পড়লে বা মানে কি এগুলোর– কোন সমাধান করতে পারল না।
হঠাৎ তুড়ি বাজাল রবিন। কে পারবে জানো? রয় কভারলি।
ভুরু কুঁচকাল কিশোর। কভারলিটা কে?
কম্পিউটারের জাদুকর। শার্লির মামাত ভাই। ওর কাছে এ ধরনের যে সমস্যা নিয়ে যাবে, সমাধান করে দেবে। সেবার কিডন্যাপ করা বাচ্চাটাকে? বের করতে আমাকে অনেক সাহায্য করেছিল সে।
কিশোর বলল, তোমার যখন এত আস্থা, তার কাছেই যাওয়া দরকার
ফোন বাজল।

রান্নাঘরের এক্সটেনশন থেকে ধরলেন বেলী আন্টি। ডেকে বললেন, কিশোর, তোমাদের চায়। যে কেউ একজন আসো।
উঠে দাঁড়াল কিশোর। তোমরা বসো। আমি দেখে আসি, কে।
রান্নাঘরে ঢুকে বেলী আন্টির হাত থেকে রিসিভারটা নিয়ে কানে ঠেকাল কিশোর। ওপাশের কথা শুনতে শুনতে গম্ভীর হয়ে গেল সে। বেলী আন্টি লক্ষ করলো। ব্যাপারটা। রিসিভারটা রেখে দিয়ে যখন ঘুরল কিশোর, জিজ্ঞেস করলেন, কি?
আসুন, ফায়ারপ্লেসের কাছে। সবাইকে একবারেই বলি।
কিশোর বসার ঘরে ঢুকতেই মুসা জিজ্ঞেস করল, কার ফোন?
জানি না, জবাব দিল কিশোর। শার্লির দিকে তাকাল। ওপর থেকে কাজ সেরে এসে সে-ও বসেছে এখন ফায়ারপ্লেসের কাছে। একটা অচেনা পুরুষ কণ্ঠ। আমার মাধ্যমে মরগান আঙ্কেলদেরকে একটা মেসেজ দিতে চায়।
দুঃসংবাদ। বুঝতে পারলেন আন্টি। কি মেসেজ?
হুমকি দিল আপনাদেরকে…
কি হুমকি? চিৎকার করে উঠল শার্লি।
আস্তে! কিশোরের দিকে তাকালেন আবার বেলী আন্টি। কি বলল?
বলল, তিন গোয়েন্দাকে সাহায্য করেছেন। এখন বিপদের জন্যে প্রস্তুত হোন।
কিশোরের কথা শেষ হতে না হতেই তীক্ষ্ণ, জোরাল একটা শব্দ হলো।
গুলির শব্দের মত।

.

মাথা নিচু! মাথা নিচু! চিৎকার করে উঠল কিশোর। বসে পড়ো সবাই মেঝেতে!
পাশে বসা শার্লির হাত ধরে একটানে নিচে নামিয়ে ফেলল মুসা। একই সঙ্গে নিজেকেও ছুঁড়ে দিল মেঝেতে।
রাবন নিজেই নামতে পারল।
বেলী আন্টিকে সাহায্য করল কিশোর।
অপেক্ষা করে রইল ওরা। কিন্তু গুলির শব্দ আর হলো না।
নিচেই থাকো, ফিসফিস করে বলল কিশোর। ওরাও হয়তো অপেক্ষা করছে। আমাদের ওঠার জন্যে।
আরও দুতিন সেকেন্ড অপেক্ষা করে আচমকা লাফিয়ে উঠে দরজার দিকে দৌড় দিল সে।
কিশোর, কোথায় যাচ্ছ! মুসা বলল। কি করছ তুমি? মরবে তো!
জবাব দিল না কিশোর। এক ধাক্কায় দরজাটা খুলে ফেলে বাইরে লাফিয়ে পড়ল। এঁকেবেঁকে দৌড়ে গিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল একটা ঝোঁপের মধ্যে।

ঘরে যারা অপেক্ষা করছে তারা কান পেতে আছে। কিশোর কোথায় আছে, কি করছে, কিছুই বুঝতে পারছে না। মাঝে মাঝে সামান্য খসখস ছাড়া আর কোন শব্দ আসছে না ওদের কানে।
অনন্তকাল ধরে যেন পড়ে রইল ওরা ঘরের মেঝেতে।
অবশেষে সামনের দরজায় শব্দ হলো।
পাল্লাটা খুলল।
ভেতরে ঢুকল জুতোর শব্দ।
বন্ধ হলো পাল্লাটা।
ঠিক আছে, এখন উঠতে পারো। কিশোরের কণ্ঠ।
সবার আগে উঠে পড়ল শার্লি। ঘুরে দাঁড়াল। দেখল, হাতে একটা বড় ডাল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কিশোর।
ঘরের কোণে ডালটা নামিয়ে রেখে এসে আগুনের কাছে বসল সে। ডাল ভাঙার শব্দ হয়েছিল। গুলি নয়।
জিমের অত শখের জাপানী ফেদার ম্যাপলের ডাল, বেলী আন্টি বললেন। রেগে আগুন হয়ে যাবে ও। কিন্তু ডাল ভাঙতে এল কেন?
নিশ্চয় ডালের ওপর উঠে বসে নজর রেখেছিল ঘরের ভেতর, জবাব দিল কিশোর। টেলিফোন পেয়ে আমাদের কি প্রতিক্রিয়া হয়, দেখতে চাইছিল হয়তো। ফিরে গিয়ে যে ফোন করেছে তাকে জানাত।
পড়ে গিয়ে কোমরটা যদি ভাঙত আমি খুশি হতাম, রাগত স্বরে বলল মুসা।
মুসার দিকে তাকাল কিশোর। দুঃখের বিষয়, খুশিটা আর হতে পারলে না। চলো এখন, রয়ের ওখান থেকে ঘুরে আসি। রবিন, তুমি থাকো। শার্লিকে ঝলল, শার্লি, দাও তত দ্রুত একটা চিঠি লিখে। তোমার মামাত ভাইয়ের কাছে। কাগজ কলম নাও। যা যা বলি, লেখো।
আমি গেলে অসুবিধে কি? রবিনের প্রশ্ন।
না, মাথা নাড়লেন বেলী আন্টি। তোমার শরীর এখনও বাইরে বেরোনোর উপযুক্ত হয়নি।
রয়ের কাছে কেন যাচ্ছে, সংক্ষেপে বেলী আন্টি আর শার্লিকে জানাল কিশোর।
শার্লি বলল, রয়কে একটা ফোন করে দিলেই তো হয়। আমিও দিতে পারি। রবিনও পারে।
উঁহু, মাথা নাড়ল কিশোর। চমকে দেয়ার মজাটা আর তাহলে থাকে না। টেলিফোনেই যদি কাজটা সেরে ফেলা যেত, যাওয়া আর না লাগত, তাহলে আলাদা কথা ছিল। কিন্তু যাওয়া যখন লাগবেই, গিয়েই পরিচয় করে নেব। জানাব সব।...দাও দাও, চিঠিটা লিখে দাও। দেরি হয়ে যাচ্ছে।

*
যত তাড়াতাড়ি পারা যায় কেসটার কিনারা করে ফেলা জরুরী, কিশোর বলল। ফোনে ওই হুমকি দেয়া নিয়ে দুশ্চিন্তায় থাকবেন মরগান আঙ্কেলরা।
বনের ভেতরের সরু রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালাচ্ছে মুসা। জ্যাকসনদেরই সন্দেহ করছ এখনও?
সন্দেহটা এখন পর্যন্ত ওদিকেই তো বেশি যাচ্ছে। তাই না? বিশেষ করে আমাদেরকে পাতলা বরফের দিকে নিয়ে যাওয়ার পর।
তা বটে। ম্যারিল্যান্ডে জ্যাকি আর রকি কারও কাছে কোন রকম জিনিস বিক্রি করেছে কিনা, সে-খোঁজ নিতে এখন বলা যেতে পারে ডোবারকে। ওদের বিরুদ্ধে প্রমাণ জোগাড় হয়ে যাবে।
তারচেয়ে ভাল হয়, যদি চোরাই মালগুলো বের করে ফেলতে পারি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এবারের মৌসুমে যা চুরি করেছে, সব পাইনভিউতেই আছে এখনও। সরায়নি। লুকিয়ে রেখেছে। শীতের পর নিজেরা যাওয়ার সময় সঙ্গে করে নিয়ে যাবে।
সারাটা পথ আলোচনা করেও কি ভাবে মালগুলো বের করবে, তার কোন সমাধান বের করতে পারল না ওরা।
*
রয় কভারলিকে পেল ওরা, রয়দের বাড়ির বোমেন্টে। মাটির নিচের এই মস্ত ঘরটায় রয়ের ওঅর্কশপ। বড় একটা ওঅর্কবেঞ্চে বসে গভীর মনোযোগে কাজে ব্যস্ত। চারপাশে ছড়ানো ছিটানো কম্পিউটারের অসংখ্য পার্টস। বিভিন্ন যন্ত্রাংশ জোড়া দিয়ে একটা কম্পিউটার তৈরি করছে।
রয়, তোর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে, দূরজায় উঁকি দিয়ে মিসেস কভারলি বললেন।
কি করছ? জিজ্ঞেস করল মুসা।
ফিরে তাকাল রয়। চোখ থেকে সেফটি গগলসটা খুলে নিল। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল দুই গোয়েন্দার দিকে। দুচোখে প্রচণ্ড বিস্ময়। তোমরা?
আমি কিশোর পাশা, ও মুসা..।
আরে জানি জানি! কিন্তু এলে কি ভাবে?
রবিন আর শার্লির কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে।
রবিন কই?
পাইনভিউতে, জবাবটা দিল মুসা। পানিতে ডুবে আধমরা হয়ে এখন আগুনের সামনে দম নিচ্ছে।

দেখেই চিনলে কি করে আমাদের? কিশোরের প্রশ্ন। নিশ্চয় আমাদের ছবি এত বেশি দেখিয়েছে রবিন...।
মাথা ঝাঁকাল রয়। তারপর লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল, দেখো, কথাই বলে যাচ্ছি শুধু। বসতে বলতেও ভুলে গেছি। এসো এসো, ভেতরে এসো।
তারা কথা বল, মিসেস কভারলি বললেন। আমি চা পাঠাচ্ছি।
একটা বিষয়ে আটকে গেছি, রয়, বলল কিশোর। তোমার কম্পিউটার জ্ঞান দিয়ে কোন সাহায্য পাওয়া যায় কিনা, দেখতে এলাম। রবিন বলল, তুমি এ ধরনের কাজে বিশেষজ্ঞ।
পকেট থেকে শার্লির চিঠিটা বের করে দিল কিশোর।
পড়ে বলল রয়, এটার কোন প্রয়োজন ছিল না। তোমরা সোজা এসে। বললেই পারতে।
তখন কি আর জানতাম, দেখামাত্র চিনে ফেলবে।
যাকগে, বলো কি করতে হবে? জানতে চাইল রয়।
পকেট থেকে নম্বর লেখা কাগজটা বের করে রয়ের হাতে দিল কিশোর।
কাগজটার দিকে তাকিয়ে রয় বলল, ভিজল কি করে?
ওই যে বললাম, চুবানি খেয়েছে। পাইনভিউ লেকের পানিতে সাঁতার কাটতে নেমেছিল রবিন, মুসা বলল।
চোখ কপালে উঠল রয়ের। তার মানে! পাগল হয়ে গেছে?
পাইনভিউতে চুরির খবর জানা আছে রয়ের। তিন গোয়েন্দা কেসটা হাতে নেয়ার পর কি কি ঘটেছে জানাল ওকে কিশোর। সব শেষে কাগজটা দেখিয়ে বলল, আমার ধারণা, পাইনভিউ লেকের চুরি-ডাকাতিগুলোর সঙ্গে এ নম্বরগুলোর কোন সম্পর্ক আছে। কোন ধরনের কোডও হতে পারে।
তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লেখাগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল রয়। মুখ তুলে বলল, চলো, ওপরে।
ওপরে এসে কিশোর বলল, তোমাদের ফোনটা ব্যবহার করা যাবে?
রান্নাঘরের দিকে হাত নেড়ে রয় বলল, কিরো গিয়ে।
কাকে করবে? জানতে চাইল মুসা।
ডোবার কগনানকে। যাও না। তুমিই করে এসো না। জিজ্ঞেস করবে, নতুন কিছু জানতে পারল কিনা।
ফোন সেরে দোতলায় চলে এসো, রয় বলল। ডান দিকের প্রথম ঘরটা।
নিজের ঘরে কিশোরকে নিয়ে এল রয়। কাণ্ডই করে রেখেছে। ঘরের দেয়ালের প্রতিটি ইঞ্চিতে ইলেকট্রনিক যন্ত্র লাগানো। তারের জটলা দেখে মনে হয় না এগুলো আর কোনদিন ছাড়ানো যাবে।

একটা কম্পিউটারের সামনে বসে পড়ল রয়। প্রথমে কাগজের নম্বরগুলো টাইপ করে নিল। তারপর একটা ম্যাথমেটিক্যাল টেস্ট চালাল সেগুলোর ওপর।
বুঝলে কিছু? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
মাথা নাড়ল রয়। এখনও না।
কোন ধরনের সাঙ্কেতিক লেখা নাকি?
মনে হয় না। প্রথম সারির নম্বরগুলো দেখো ভালমত খেয়াল করে। সাত তিন অর্থাৎ তিয়াত্তর দিয়ে শুরু। সবগুলোই। দ্বিতীয় সারিরগুলো চার শূন্য অর্থাৎ চল্লিশ। তারপর ফুলস্টপ। আবার একজোড়া সংখ্যা। আবার ফুলস্টপ। আবার সংখ্যা...
রয়ের কাঁধের ওপর দিয়ে নম্বরগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আচমকা চিৎকার করে উঠল কিশোর, ইস, আমি একটা গাধা! অনেক আগেই বুঝে যাওয়া উচিত ছিল আমার। রয়, ম্যাপ আছে?
এবার অবাক হওয়ার পালা রয়ের। তা তো আছে। কিন্তু কি বুঝলে?
ম্যাপটা কোথায়? উত্তেজিত হয়ে উঠেছে কিশোর।
বুকশেলফ থেকে একটা ম্যাপ এনে দিল রয়।
বুঝলে না এখনও? কিশোর বলল। লনগিটিউড এবং ল্যাটিচিউড।
হাসি ছড়িয়ে পড়ল রয়ের মুখে। ঠিক। ঠিক বলেছ। কিন্তু তার জন্যে তো ম্যাপ বইয়ের দরকার নেই।
কম্পিউটারেই একটা ম্যাপের প্রোগ্রাম খুলে নিল রয়। মাউসের সাহায্যে লনগিটিউড ৭৩ ও ল্যাটিচিউড ৪০-এর চারপাশে রেখা একে একটা বাক্স তৈরি করল। মাউসের সাহায্যেই বাক্সটাকে বড় করতে লাগল।
নিউ ইয়র্ক, কিশোর বলল।
কাগজের নম্বর দেখে টাইপ শুরু করল রয়। রিটার্ন বাটন টিপতেই বড় হয়ে সামনে এগিয়ে এল ম্যাপ।
নিউ পোর্ট, বলে উঠল কিশোর। উত্তেজনায় গলা কাঁপছে। আরও জুম করো। টার্গেট ঠিক করো।
কাগজের নম্বরের সারি দেখে আবার নম্বর টাইপ করল রয়। পাইনভিউ লেকের ওপর লাল রঙের ক্রস চিহ্ন জ্বলতে নিভতে শুরু করল।
এটাই তোমার জায়গা, কণ্ঠস্বরেই বোঝা যাচ্ছে রয়ও উত্তেজিত হয়ে। উঠেছে।
লেকের মধ্যে? আনমনে যেন নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করল কিশোর।
হ্যাঁ।
ঘরে ঢুকল মুসা। ডোবারের সঙ্গে কথা বললাম। নতুন কিছু পায়নি। বলল, আরও কয়েক জায়গায় খোঁজ নেবে।

নিতে থাকুক। এসো, দেখে যাও।
কিছু পেলে নাকি? এগিয়ে এল মুসা।
তোমাদের নম্বরগুলো হলো লনগিটিউড এবং ল্যাটিচিউড, রয় বলল।
মানে? কিছুই বুঝতে না পেরে হাঁ করে রইল মুসা।
ওকে ওভাবেই থাকতে দিয়ে কিশোর বলল রয়কে, এগিয়ে যাও। দেখা যাক, কি আসে?
আবার খানিকক্ষণ নম্বর টিপল রয়। লেকের ওপর এখন জ্বলতে-নিভতে শুরু করল লাল ক্রস।
দরজায় থাবা পড়ল এ সময়। রয়ের মা ডাকলেন, এই, চা নিয়ে যা।
তুমি কাজ করো, মুসা বলল। আমি আনছি।
দরজা খুলে মিসেস কভারলির হাত থেকে ট্রেটা নিয়ে ফিরে এল। তাতে চা আর বিস্কুট। একটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল।
ট্রের দিকে একবার তাকিয়েই মুখ ফেরাল কিশোর। নিচের ঠোঁটে ঘন ঘন চিমটি কাটল দুবার। মাছ ধরার অতি চমৎকার জায়গা! মুসার দিকে তাকাল সে। এত ভাল জায়গাগুলো বিছানার নিচে লুকিয়েছে কেন, বলো তো?
মুসার হা-টা আরও বড় হলো। অহেতুক কেন আমার মাথাটাকে গুলিয়ে দিচ্ছ?
জবাবটা নিজে নিজেই দিল কিশোর, গোপন রাখার জন্যে। উন্নত আধুনিক যন্ত্রপাতি পছন্দ করে না বুড়ো জ্যাকসন। কাগজটা দেখলে নিশ্চয় কিছু বুঝতে পারবে না সে।
মজা পেয়ে গেছে রয়। দ্রুত টাইপ করে চলেছে তার আঙুলগুলো। লেকের ওরে আরও কয়েক জায়গায় লাল ক্রস আবিষ্কার করল।
আর দরকার নেই, কিশোর বলল। লেকে গিয়ে এখন খোঁজ নিতে হবে। রয়, ক্রসগুলো সহ তোমার ম্যাপের এই অংশটার একটা প্রিন্ট দিতে পারবে?
তা তো পারবই। সঙ্গে আরও ভাল জিনিসও দিতে পারব।
একটা তাকের কাছে গিয়ে দাঁড়াল রয়। নানা ধরনের ছোট ছোট ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির মধ্যে থেকে একটা যন্ত্র টেনে বের করল। দেখতে সেলুলার ফোনের মত যন্ত্রটার বড় একটা এলসিঁড়ি স্ক্রীন আছে। কিশোরকে দিয়ে বলল, এটা ব্যবহার করতে পারো। গ্লোবাল পজিশনিং স্যাটেলাইট সিসটেম। সংক্ষেপে জিপিএস। স্যাটেলাইটকে ব্যবহার করে এটা তোমার অবস্থান বলে দিতে পারবে। বোঝা যাবে তুমি কোথায় আছ। যে ক্রস চিহ্নগুলো আবিষ্কার করলাম, নিখুঁত ভাবে ওই সব জায়গা বের করা যাবে এটার সাহায্যে। জায়গাগুলোতে কি আছে, খুঁজলেই বেরিয়ে পড়বে। কখন রওনা হচ্ছি আমরা?
মুসার দিকে তাকাল কিশোর, কখন?

দেরি করে লাভ কি? জবাব দিল মুসা। যদিও মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে পারিনি এখনও আমি।
চলো। যেতে যেতে বলছি।
চাটা খেয়ে নাও, রয় বলল।
*
গাড়িতে এসে উঠল ওরা। জিপিএসটা আর ম্যাপের প্রিন্টআউট সঙ্গে নিয়েছে রয়।
লেকের কাছে যখন পৌঁছল ওরা, অন্ধকার হয়ে গেছে। শীতের ঠাণ্ডা রাত নামছে। তুষার পড়ছে। মেঘে ঢাকা চাঁদ। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা ঝোড়ো বাতাস ঝাঁপটা দিয়ে যাচ্ছে। টান মারছে পরনের কয়েক প্রস্থ পোশাকের একেবারে ভেতরেরটা ধরেও।
কষ্ট আর ভোগান্তি জোগাড়ের সমস্ত উপায়গুলো মনে হচ্ছে তোমাদের জানা, গায়ের কোটটা টেনে দিতে দিতে বলল রয়।
এলে কেন? কিশোর বলল। স্পটগুলো খুঁজে বের করো।
কোন রকম ঝুঁকি নিল না সে। গাড়িতে চুরি আছে। সোজা দেখে কয়েকটা ডাল কেটে নিল ছড়ির মত ব্যবহারের জন্যে। ডালগুলো হেঁটেছেটে সাফ করে নিল।
রবিন তো দিনে পড়েছিল বলে রক্ষা। কিশোরের হাত থেকে একটা ডাল নিয়ে নিল মুসা। অন্ধকারের মধ্যে এখন পানিতে পড়লে বাঁচতে হবে না আর।
লেকে নেমে পড়ল ওরা। লাঠি ঠুকতে ঠকতে আগে বাড়ল। ম্যাপ দেখে। এগোল, সবচেয়ে কাছের স্পটটার দিকে। ম্যাপ আর জিপিএস-এর স্ক্রীনের সবুজ আভার দিকে নজর রয়ের। বরফ ঠুকতে ঠকতে আগে আগে চলেছে কিশোর। রয় মাঝখানে। পেছনে মুসা, টর্চের আলো ফেলে পথ দেখাচ্ছে।
কিছু দেখতে পাচ্ছ? জিজ্ঞেস করল রয়।
পাচ্ছি। বরফ। জবাব দিল কিশোর।
বাতাসের গর্জনকে ছাপিয়ে চিৎকার করে বলল রয়, কি জিনিস খুঁজতে এসেছি আমরা?
বলতে পারলে খুশি হতাম।
ডাকাতির মাল লুকিয়ে রাখেনি তো স্পটগুলোতে? তুষারপাতের মধ্যে দিয়ে লেকের পাড়ের বাড়িগুলোকে দেখার চেষ্টা করল রয়।
মনে তো হচ্ছে। এখনও কেউ মাছ ধরছে নাকি দেখা যাক।
বলাটা যত সহজ, করা ততটাই কিংবা তারচেয়েও বেশি কঠিন হলো। তাজা, তুষার বরফ ঢেকে দিচ্ছে। এক জায়গায় এসে থামল রয়। পা দিয়ে খোঁচা মেরে। সেখান থেকে তুষার সরিয়ে দিতে লাগল মুসা। দেখাদেখি কিশোর আর রয়ও তা-ই করতে লাগল। কয়েক মিনিট অবিরাম চেষ্টা করে আট ফুট ব্যাসের গোল

একটা জায়গা থেকে তুষার সরিয়ে ফেলল ওরা। নিচের কঠিন বরফ বেরিয়ে এল। টর্চের আলো ফেলে দেখতে লাগল মুসা।
কিছু দেখছ? জিজ্ঞেস করল রয়।
পরিষ্কার করা জায়গাটায় নতুন করে তুষার এনে ফেলছে ঝোড়ো বাতাস।
নাহ্, কিছুই নেই, হতাশ ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল রয়। এ স্রেফ পাগলামি! অকারণ কষ্ট!
এত তাড়াতাড়িই কাবু হয়ে গেলে? তোমার আসার ইচ্ছে দেখে তো মনে হচ্ছিল গোয়েন্দাগিরির খুব শখ? মুসা বলল। গোয়েন্দাগিরিটা কষ্টেরই। আরাম করে এ কাজ হয় না।
থাক থাক। আর লেকচার দেয়া লাগবে না, জবাব দিল রয়।
হাটু গেড়ে বসে পড়ল কিশোর।
পাতলা বরফ নাকি দেখো আগে, সাবধান করল মুসা। রবিনের পড়ে ওয়ার দৃশ্যটা কল্পনা করে শিউরে উঠল নিজের অজান্তেই।
কিছু একটা আছে এখানে, কিশোর বলল। আলোটা আরও সরাও তো দেখি।
কিশোরের নির্দেশিত জায়গায় আলো ফেলল মুসা। বরফের গায়ে একটা খাজমত চোখে পড়ল ওখানে। ম্যানহোলের ঢাকনার চেয়ে ছোট।
একটা গর্ত, কোন সন্দেহ নেই, দেখতে দেখতে বলল কিশোর। বরফ পড়ে বন্ধ হয়ে গেছে।
আলোটা আরও কাছে নিয়ে এল মুসা। আলোকরশিতে ধরা পড়ল চকচকে ছোট একটা জিনিস। বরফের মধ্যে গেঁথে রয়েছে।
কি ওটা? মুসার প্রশ্ন।
নতুন করে পড়া তুষারে দ্রুত ঢেকে যাচ্ছে জিনিসটা। হাত দিয়ে ডলে পরিষ্কার করে নিল কিশোর। টিনের পাত মনে হচ্ছে।
কোকের ক্যানের হতে পারে। এখানকার মানুষগুলো বড় নোংরা। যেখানে সেখানে ময়লা ফেলে, রয় বলল।
এখানে ময়লা ফেলতে আসবে কে? তা ছাড়া কোকের ক্যানের টিন এ রকম নয়।
তা-ও তো কথা। পরের স্পটটায় দেখব নাকি? রয় বলল। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আমিও বরফ হয়ে যাচ্ছি।
চলো, দেখাই যাক, উঠে দাঁড়াল কিশোর।
কি করে খুঁজতে হয় বুঝে ফেলেছে এখন ওরা। পরের স্পটটা বের করতে সময় লাগল না। প্রথমটার মতই একই রকম আরেকটা বুজে যাওয়া গর্ত দেখতে পেল। লেকের বরফের ওপর তুষারের আস্তর জমে আবার বরফ হয়েছে। স্তর দুটো আলাদা ভাবে বোঝা যায়।

এখানেও তো তেমন কিছু দেখছি না, হতাশ ভঙ্গিতে বলল কিশোর। দেখি, আরেকটা।
এত ঠাণ্ডা, উফ! রয় বলল।
ঠাণ্ডার জায়গায় ঠাণ্ডা তো হবেই, উঠে দাঁড়িয়ে রয়ের হাত থেকে ম্যাপটা নিয়ে নিল কিশোর।
তৃতীয় স্পটটায় এসে আবার গোল করে বরফ পরিষ্কার করল। আগের দুটোর মতই গোল একটা গর্তের চিহ্ন। বুজে গেছে বরফে। এটার মাঝখানেও প্রথমটার মত টিন গোঁজা।
নাহ, এখানকার লোকগুলো সত্যি... বলতে গেল রয়।
চুপ! ওকে থামিয়ে দিল মুসা। আলো নিভিয়ে দিল।
কি হয়েছে? ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল রয়।
শব্দ, কান পেতে আছে মুসা। ইঞ্জিনের।
ওদের পায়ের নিচের বরফে শব্দ বাড়ি দিতে শুরু করল। বাড়তে লাগল। ক্রমে। মুহূর্ত পরেই বোঝা গেল ওটা ইঞ্জিনের শব্দ। বরফে আঘাত হানাতে ওরকম শব্দের সৃষ্টি হয়েছে। ওদের দিকেই এগিয়ে আসছে। ঘুরে সেদিকে টর্চের আলো ফেলল মুসা। চকচকে ক্রোমের ওপর গিয়ে পড়ল আলো।
পালাও! চিৎকার করে উঠল কিশোর।
একটা ট্রাককে ছুটে আসতে দেখা গেল ওদের দিকে। সে আর রয় ঘুরে ডাইভ দিয়ে পড়ল এক দিকে। মুসা আরেক দিকে। কয়েক ইঞ্চির জন্যে বেঁচে গেল কিশোর। তার পাশ দিয়ে ট্রাকটা যাওয়ার সময় টর্চের আলোয় দেখতে পেল বডিতে লেখা: মেরিন ডগলাস স্যালভিজ।

.

গর্জন করতে করতে ছুটে অন্ধকারে হারিয়ে গেল ট্রাক।
চিৎকার করে উঠল কিশোর, মুসা, কোথায় তুমি?
আমি এখানেই আছি। ভাল। তোমরা?
আমি ভাল নেই, জবাব দিল রয়। হার্ট অ্যাটাক হয়েছে।
তার কথায় পাত্তা না দিয়ে অন্ধকারে ট্রাকটা যেদিকে চলে গেছে সেদিকে তাকিয়ে মুসা বলল, দেখা দরকার, কে এ রকম করে রাতের বেলা চড়াও হতে এসেছিল আমাদের ওপর।
ট্রাকটা তো ডগলাসের! উঠে দাঁড়াল কিশোর।
তারমানে ডগলাসই চোর? মিথ্যে সন্দেহ করেছি আমরা জ্যাকি আর রকিকে? আলো ফেলে ডালটা খুঁজতে লাগল মুসা।
আমাদের খুন করতে চেয়েছিল নাকি? রয়ের প্রশ্ন।

বুঝলাম না, জবাব দিল কিশোর। খুন করার ইচ্ছে থাকলে তো ঘুরে আবার আসত।
ভয় দেখাতে এসেছিল আমাদের, মুসা বলল। বরফে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওকে একটা বোনাস মজা দিয়ে দিলাম আমরা।
ডগলাস কিনা সন্দেহ আছে আমার, চিন্তিত ভঙ্গিতে কিশোর বলল। ভাবছি, ওর বাড়িতে খোঁজ নিতে যাব নাকি?
চলো, মুসা রাজি।
খোঁজাখুঁজি চালিয়ে যাওয়ার আর সাহস হলো না ওদের। ফিরে এল। নিজেদের গাড়িতে। ডগলাসের স্যালভিজ ইয়ার্ডে রওনা হলো।
ইয়ার্ডে পৌঁছে ড্রাইভওয়ের উল্টো দিকে রাস্তার ধারে গাড়ি রাখতে বলল কিশোর। গেটের দিকে হাত তুলে বলল, ওই দেখে। চাকার তাজা দাগ।
গাড়ি থেকে নামল ওরা। দাগগুলো পরীক্ষা করতে গেল কিশোর।
দাগের ওপর তুষারের স্তর পাতলা, বিড়বিড় করে যেন নিজেকেই বলল। সে। তারমানে বড়জোর ঘণ্টাখানেক আগে গেছে।
উঠে দাঁড়িয়ে চারপাশে তাকাল কিশোর।
গর্জন করে পাক খেয়ে বইছে হিমেল বাতাস। ইয়ার্ডের ভাঙাচোরা গাড়িগুলোর ফাঁক দিয়ে শিস কেটে যাচ্ছে।
পুটি কোথায়? কিশোরের প্রশ্ন।
কোন সাড়া নেই কুকুরটার। কোথাও দেখা গেল না ওটাকে। একটিবারের জন্যে ঘেউ ঘেউও করল না।
মূল বাড়িটা অন্ধকার। অফিসটাও।
মুসার হাত থেকে টর্চটা নিয়ে প্রথমে অফিসের দিকে গেল কিশোর। জানালা দিয়ে ভেতরে আলো ফেলল। আসবাবপত্র এলোমেলো। চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে খবরের কাগজ। মেঝেতে পড়ে থাকা বড় এক টুকরো মাংসের ওপর আলো পড়ল। টুকরোটার পাশেই নেতিয়ে পড়ে আছে পুটি।
সেদিক থেকে চোখ না সরিয়ে বলল সে, গোলমাল তো একটা দেখা যাচ্ছে।
তার পাশে এসে জানালা দিয়ে উঁকি দিল মুসা আর রয়।
পুটিকে দেখতে পেল।
ঘুমাচ্ছে নাকি কুকুরটা? রয়ের প্রশ্ন।
ওটার পাঁজরের ওঠানামা চোখে পড়ল কিশোরের। বলল, বেঁচেই আছে। ঘুমের ওষুধ খাইয়ে দিয়েছে মনে হয় ওকে।
ডগলাস কোথায়? মুসার প্রশ্ন।
চলো, খুঁজে দেখা যাক। একসঙ্গে না গিয়ে তিনজন তিন দিকে।

ভাঙাচোরা গাড়ির সারির ভেতর দিয়ে এগোতে লাগল ওরা। মাটির দিকে চোখ। তুষারে পায়ের চিহ্ন খুঁজছে। কিন্তু ছাপ এত বেশি ওখানে, কোনটা যে নতুন বোঝা মুশকিল। দুর্ঘটনায় ভেঙেচুরে চ্যাপ্টা হয়ে যাওয়া গাড়ি আছে প্রচুর। তিন-চার থাক করে একটার ওপর আরেকটা রাখা। কোন কোনটা পুড়ে এমন অবস্থা হয়েছে, চাকাটাকা তো নেই-ই, দরজা-জানালা, বাম্পার এমনকি ফেন্ডার প্যানেল পর্যন্ত গায়েব।

শব্দ শুনতে পাচ্ছি, অন্য সারির মধ্যে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে জানাল মুসা।

দৌড়ে গেল কিশোর আর রয়।

থাবা দেয়ার শব্দ, মুসা বলল। শুনতে পাচ্ছ?

কোনখান থেকে আসছে? কান পাতল রয়।

ঝোড়ো রাতের বাতাসের মধ্যে অন্য কোন শব্দ বোঝা কঠিন। তারপরেও তিনজনেই শুনতে পেল শব্দটা।

ডগলাস? ডগলাস? আপনি করছেন শব্দ? চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল মুসা।

পুরানো সেডান গাড়ির একটা উঁচু স্তূপ থেকে দুবার জোরাল থাবা দেয়ার শব্দ হলো। একটারও জানালার কাঁচ নেই। কোন কোনটার দরজা গায়েব। তবে প্রত্যেকটার ট্রাংক রয়েছে। যদিও রঙ চটা।

এদিকে, শব্দ লক্ষ্য করে দৌড় দিল মুসা।

নিচের গাড়িটার ট্রাংক থেকে শব্দটা আসছে মনে হলো। সেটাতে থাবা দিল মুসা। সামান্য আঘাতেই নড়ে উঠল ওপরের গাড়িগুলো।

ওপর দিকে টর্চের আলো ফেলে কিশোর বলল, সাবধান। একদম ওপরের বড় গাড়িটার ভাবভঙ্গি ভাল না। পড়ে যাবে।

বের করো আমাকে! ডগলাসের কথা ভেসে এল নিচের গাড়িটার ট্রাংক থেকে।

এক মিনিট। এখনই বের করছি, জবাব দিল মুসা।

রয়, একটা শাবল পাও নাকি দেখো তো, কিশোর বলল। বেয়ে ওঠা গেলে ওপরেরটা ঠেলে ফেলা যাবে হয়তো।

কিন্তু উঠতে গেলেই যদি উল্টে পড়ে সব?

স্তূপটা পরীক্ষা করে দেখে মাথা দোলাল কিশোর, হুঁ, পড়ার সম্ভাবনাই বেশি।

রয় শাবল নিয়ে ফিরে এলে মুসা বলল। যে ভাবে আছে এ ভাবেই খোলার চেষ্টা করতে হবে।

যে ট্রাংকটায় আটকে আছে ডগলাস, সেটার দিকে কাত হয়ে মুসা বলল, ডগলাস, একটা ভেজালে পড়ে গেছি আমরা। আপনার ওপরের গাড়িটা দেখে মনে হচ্ছে নাড়া লাগলেই উল্টে পড়ে যাবে।

ক্রেনটা নিয়ে এসে ওপরের গাড়িটা সরিয়ে ফেলা যেতে পারে, রয় বলল।

না না! ট্রাংকের ভেতর থেকে চিৎকার করে উঠল ডগলাস। ক্রেনটায় গণ্ডগোল আছে। আমি ওটা মেরামত করে সারতে পারিনি।
তাহলে আর কি, জবাব দিল মুসা। দেখি এই অবস্থায় কতটা কি করতে পারি।
ট্রাংকের তালার নিচের ফাঁকটায় শাবলের মাথা ঢুকিয়ে দিল মুসা। বলল, ডগলাস, রেডি! ট্রাংকের ডালা খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে চলে আসবেন।
শাবলের চাড় পড়তেই তীক্ষ্ণ ধাতব শব্দ হতে লাগল। চাপ লাগছে যে। মাথাটায়, গাড়ির সে-দিকটা নিচু হয়ে গেল।
ওপরের গাড়িটাতে টর্চের আলো স্থির রেখেছে কিশোর। গাড়ির পেছন দিকটা নিচু হয়ে গেছে অনেক। মুসা, সাবধান। আস্তে চাপ দাও।
শাবলে হাতের চাপ কমিয়ে ফেলল মুসা। কিন্তু চাপ ছাড়া খুলব কি করে?
আস্তে আস্তে চাপ বাড়িয়ে দেখো কি হয়।
ওপরের গাড়িটার দিক থেকে চোখ সরাচ্ছে না কিশোর। মুসা চাপ কমাতেই স্থির হয়ে গেল ওটা। ঠিক আছে। চাপ দাও আবার।
ট্রাংকের মধ্যে শাবলের মাথাটা আরও কয়েক ইঞ্চি ঢুকিয়ে দিল মুসা। ধীরে ধীরে চাপ বাড়াতে থাকল। বাঁকতে শুরু করেছে তালার কাছটা।
থামো! চেঁচিয়ে উঠল কিশোর।
চাপ কমিয়ে দিল মুসা। ওপরের গাড়িটাকে দুলুনি বন্ধ হওয়ার সময় দিল।
ডগলাস, ডেকে বলল মুসা, আবার! রেডি!
শাবল দিয়ে জোরে এক চাড় মারল মুসা। লাফ দিয়ে ওপরে উঠে গেল ট্রাংকের ডালা। প্রচণ্ড ঝাঁকুনি লাগল দ্বিতীয় গাড়িটাতে। দুলুনি অনেক বেড়ে গেল ওপরের গাড়িটার।
উঠে বসতেও প্রচুর সময় লাগিয়ে দিল ডগলাস। ঠাণ্ডার মধ্যে এ ভাবে আটকে থেকে আড়ষ্ট হয়ে গেছে শরীর। বড় বেশি ধীরে নড়ছে। শাবলটা ফেলে দিয়ে তার হাত চেপে ধরল মুসা।
পড়ে যাচ্ছে! চিৎকার করে উঠল রয়।
পেছনে ঢলে পিছলে পড়তে শুরু করেছে ওপরের গাড়িটা। দৌড়ে সরে গেল। রয়। লাফ দিয়ে গিয়ে সামনে পড়ল কিশোর। ডগলাসের আরেক হাত চেপে ধরে হ্যাঁচকা টান মারল। সে আর মুসা মিলে প্রায় চ্যাংদোলা করে বের করে নিয়ে এল ডগলাসকে। তাল সামলাতে না পেরে তুষারের ওপর পড়ে গেল তিনজনেই। নিচে পড়ল ওপরের গাড়িটা। অল্পের জন্যে বেঁচে গেল ওরা। ময়লা সহ তুষারের কণা এসে ছিটকে পড়ল ওদের গায়ে।
খাড়া হয়ে রয়েছে গাড়িটা। হুডের প্রায় পুরোটাই ঢুকে গেছে কঠিন বরফে।
চলুন এবার ভেতরে যাওয়া যাক, মুসা বলল।

কি মনে করে এখানে এসেছিলে তোমরা? জিজ্ঞেস করল ডগলাস। কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল। হাঁটতে গিয়ে দেখল ঠিকমত পা ফেলতে পারছে না। ঠাণ্ডায় অবশ হয়ে যাওয়া পা ফেলে কোনমতে খুড়িয়ে হাঁটতে লাগল।
আপনার ট্রাক নিয়ে আমাদের ভয় দেখাতে গিয়েছিল কেউ, মুসা বলল। লেকের মাঝখানে।
আমি যাইনি। যাওয়ার অবস্থায় যে ছিলাম না দেখলেই তো। অফিসের দিকে এগোনোর সময় শঙ্কিত ভঙ্গিতে চারপাশে তাকাল ডগলাস। পুটি কোথায়?
অফিসের ভেতরে, জবাব দিল কিশোর। মনে হয় ঘুমের ওষুধ খাওয়ানো হয়েছে।
খোঁড়াতে খোঁড়াতেই দৌড়ে গিয়ে অফিসে ঢুকল ডগলাস। হাঁটু গেড়ে বসে দুই হাতে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল কুকুরটাকে।
কি করেছে তোকে ওরা, পুটি!
আধখাওয়া মাংসের টুকরোটার কাছে এসে হাঁটু গেড়ে বসল কিশোর। সাদা পাউডার ছড়ানো রয়েছে মাংসের ওপর। বলল, যা অনুমান করেছিলাম। ঘুমের ওষুধ গুঁড়ো করে দিয়েছে। আরও কিছুক্ষণ গভীর ঘুম ঘুমাবে।
ঘুমটা ভাঙলেই বাঁচি, উদ্বিগ্ন শোনাল ডগলাসের কণ্ঠ। মাটিতে থাকলে ঠাণ্ডা লাগবে, সে-জন্যে কুকুরটাকে কাউচে শুইয়ে দিল সে।
পুলিশকে ফোন করে আসি, মুসা বলল।
ডগলাসকে বলল কিশোর, সাইডারের রস গরম করে দেব? খাবেন? গা গরম হবে।
কালো কফি। ফুটন্ত। এবং অনেক ধন্যবাদ তোমাদেরকে।
দিচ্ছি।
বাধা দিল রয়, তুমি বসো। আমিই যাচ্ছি। আমারও লাগবে কফি।
মুসা বলল, আমিই বা আর বাদ যাই কেন? যা ঠাণ্ডার ঠাণ্ডা!
ঠিক আছে, আমার জন্যেও এনো, রয়কে বলে ডগলাসের দিকে ফিরল কিশোর। আপনাকে আটকেছিল কে?
দুটো লোক। আমি কিছু বুঝে ওঠার আগেই আমার মাথায় একটা ব্যাগ পরিয়ে দিয়ে বয়ে নিয়ে গেল বাইরে।
চিনতে পেরেছেন?
কালো স্কি মাস্ক পরে ছিল মুখে। চেহারা দেখিনি।
কিছু বলেছে?
ভয় দেখিয়েছে।
গলা চিনতে পেরেছেন?
পরিচিতই লেগেছে। তবে চিনতে পারিনি।

জ্যাকসনের নাতিরা না তো?
কুকুরটার গায়ে হাত বোলানো থেমে গেল ডগলাসের। ঠাট্টা করছ?
না।
তাই তো! ঠিকই বলেছ তো! আকার-আকৃতিতে মিলে যায়। গলাটাও ওদেরই মনে হচ্ছে এখন।
ধূমায়িত কফির কাপ নিয়ে হাজির হলো রয়। পেছনে এল মুসা।
পুলিশ আসছে, জানাল সে।
ডগলাস, লেকটার ব্যাপারে আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করি? লেকের ম্যাপটা বের করে ডগলাসকে দেখাল। এই স্পটগুলো দেখুন। কিছু বুঝতে পারছেন?
কি বলতে চাও তুমি? ম্যাপের দিকে তাকাল ডগলাস।
জায়গাগুলোর তালিকা করে লুকিয়ে রেখেছে জ্যাকসনের নাতিরা।
কেন?
সেটাই তো জানার চেষ্টা করছি। আইস ফিশিঙের জন্যেও করা হয়ে থাকতে পারে।
কি যেন ভাবল ডগলাস। উঠে গিয়ে ডেস্কের কাগজপত্রের ভেতর থেকে লেকের একটা ছেঁড়াফাটা ম্যাপ বের করল। পেন্সিল দিয়ে গিজিগিজি করে প্রচুর নোট লেখা তাতে।
দুটো ম্যাপ পাশাপাশি রেখে কয়েক মিনিট মিলিয়ে দেখল। তারপর মাথা নাড়ল, তুমি শিওর, এই ম্যাপটা আইস ফিশিঙের জন্যে করা হয়েছে?
না, শিওর না, জবাব দিল কিশোর।
আমার ধারণা মাছ ধরার জন্যে চিহ্নিত করেনি। ফিশিং স্পট হিসেবে মোটেও ভাল না জায়গাগুলো। ভীষণ বিপজ্জনক। দুএক জায়গায় বঁড়শি ফেলে দেখেছি। খায় না তেমন। অকারণ ঝুঁকি নেয়া। রয়ের ম্যাপটার একটা ক্রস চিহ্নে আঙুল রাখল। এ জায়গাটার নিচ দিয়ে তীব্র স্রোত বয়। বরফকে কোনমতেই একভাবে থাকতে দেয় না। দিনের শেষ ভাগে এখানে রোদও পড়ে বেশি।
তাতে কি? মুসার প্রশ্ন।
রোদ মানেই গরম। আর গরমে বরফের ওপর দিকটা গলে যায়। রাতে আবার শক্ত হয়। এ রকম করতে থাকলে দুর্বল হয়ে যায় বরফ। ওসব জায়গায় মাছ ধরতে গেলে প্রাণের ঝুঁকি নিতে হবে। কে যায়?
তবে অন্য কোন লাভজনক কারণে কেউ ঝুঁকি যদি নিতে চায় নিতে পারে, তাই না? কিশোর বলল।
কোন কারণেই নিতে চাইবে না কেউ। মাথায় যদি সামান্যতম ঘিলু থাকে। অতিরিক্ত ঠাণ্ডা পড়লে বরফের পাতলা স্তরও ভীষণ শক্ত থাকে। তখন

বোঝাটোঝা কম নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। কিন্তু কি কারণে যাবে?
কারণ, মাছ শিকারীরা কেউ ওদিকে যায় না। রহস্যময় কণ্ঠে বলল কিশোর।
পুলিশ এল। ডগলাসের বক্তব্য শুনল। ওষুধ মেশানো মাংসের টুকরোটা দেখল। একটা ব্যাগে তুলে নিল গবেষণাগারে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করানোর জন্যে। তারপর ডগলাসকে সাবধান থাকতে বলে চলে গেল।
জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বয় বলল, আজকের মত তো শেষ হলো। কাজ। বাড়ি গিয়ে কম্বলের নিচে ঢুকে পড়তে ইচ্ছে করছে।
চিন্তা নেই। পৌঁছে দেব, কিশোর বলল। কিংবা এত রাতে আর বাড়ি ফিরে না গিয়ে চলো শার্লিদের ওখানেই চলে যাই। বাড়িতে মাকে একটা ফোন করে দিয়ো, রাতে ফিরছ না।
তা কথাটা মন্দ বলোনি, অরাজি হলো না রয়। ঠিক আছে, চলো। এত কাছে এসে রবিনকে না দেখে গেলে রাগ করবে। তা ছাড়া এখানে কম্বলের নিচে ঢোকাটাও তাড়াতাড়ি হবে।
হেসে ফেলল মুসা আর কিশোর।

.

পরদিন সকাল সকালই উঠে বাড়ি রওনা হয়ে গেল রয়। জানিয়ে গেল, বিকেলের আগে সময় দিতে পারবে না। স্কুলে যেতে হবে। জরুরী আরও একটা কাজ আছে। শেষ করে তারপর আসবে। বার বার করে বলে গেছে, তাকে বাদ দিয়ে যেন কোনমতেই স্পটগুলোতে খুঁজতে না যায় তিন গোয়েন্দা। হুমকি দিয়েছে, তাহলে চিরকালের শত্রুতা হয়ে যাবে।
দিনের অনেকটা সময়ই তদন্তের কাজে ঘুরে বেড়াল মুসা আর কিশোর। ডগলাসের ট্রাকটা দেখতে পেল বনের ভেতর। পরিত্যক্ত অবস্থায়।
রবিন সারাটা দিনই বিশ্রাম নিল।
বিকেলে আসার আগে ফোন করল রয়। জানাল, সে রওনা হচ্ছে।
কিশোর বলল, রয়, একটা মেটাল ডিটেক্টরও দরকার আমাদের। সেই সঙ্গে কালকের ম্যাপ আর তোমার জিপিএসটা তো আনবেই।
ডোবার কগনানকে ফোন করল সে। চলে আসতে বলল। বলল, পাইনভিউ লেকের চুরিগুলোর ব্যাপারে মূল্যবান তথ্য দিতে পারবে। তারপর ফোন করল পিটারকে। মিস্টার মরগানের বাড়িতে আসতে বলল সবাইকে।
পনেরো মিনিটের মধ্যেই চলে এল পিটার।
রয় আসতে আসতে সন্ধ্যা করে ফেলল। অন্ধকার হয়ে গেছে ততক্ষণে।
গাড়ির শব্দ শুনেই বেরিয়ে গেল তিন গোয়েন্দা আর পিটার।

হাসিমুখে গাড়ি থেকে নামল রয়। কাঁধে জিনিসপত্রের ব্যাগ। এক হাতে মেটাল ডিটেক্টর, অন্য হাতে একটা হালকা কুড়াল আর একটা আইস পিক।
ওর ভঙ্গি দেখে বলে উঠল মুসা, খাইছে! মেরু অভিযানে যাবে নাকি?
হেসে জবাব দিল রয়, বরফ কাটতে কাজে লাগবে। বাড়তি যদি না থাকে এখানে, সেজন্যে নিয়ে এলাম।
আর কারও সাহায্য দরকার হবে? জিজ্ঞেস করলেন মরগান আঙ্কেল। নিজের কথাই বোঝালেন তিনি।
আপাতত লাগবে না, কিশোর বলল। লাগলে জানাব।
হতাশ মনে হলো আঙ্কেলকে। তবে আর কিছু বললেন না। উঠে গিয়ে বসলেন বেশ কিছুটা দূরে। বেলী আন্টি আর শার্লি যেখানে বসে টিভি দেখছে।
বলে বলে হাল ছেড়ে দিয়েছেন বেলী আন্টি। গোয়েন্দাদের কাজে বাধা দিতে এলেন না আর। এমনকি ওদের কথার মধ্যেও এলেন না। ওদের কর্মকাণ্ড গা সওয়া হয়ে গেছে গত কয়েক দিনে।
কার কি কাজ, ভালমত বুঝিয়ে দিতে লাগল কিশোর। পিটারকে বলল, পিটার, তুমি আর রবিন গিয়ে জ্যাকসনদের ওপর নজর রাখবে। যদি বোঝে ওরা আমাদের ওপর হামলা চালাতে আসছে, শিস দিয়ে সঙ্কেত, দেবে। তিনবার। শিস-দুবার ছোট, একবার লম্বা। যাও, দশ মিনিট সময় দিলাম। অবস্থান নাওগে।
আরনির বাড়িতে ছুটল পিটার আর রবিন। বনের ভেতর দিয়ে এগোল যাতে চোখে পড়ে না যায়। জ্যাকসনের বাড়ির কাছে পৌঁছে দেখল ভেতরে আলো ওলছে। বেশি কাছে যাওয়ার সাহস পেল না ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে। তবে নিজেদের নিয়ে চিন্তিত নয় রবিন-বাড়িটার বেশি কাছে না গেলেই হলো, ভাবছে। কিশোরদের কথা। ওদের বরফ কাটার শব্দ যদি শুনে ফেলে জ্যাকসনরা?
ভেবে লাভ নেই। যা হবার হবে। যেটা করতে বলা হয়েছে ওদের, সেটাই করল। দুজন দুদিকে সরে গিয়ে দোকানের দুটো প্রবেশ পথের দিকে লক্ষ রাখতে লাগল। রবিনদেরকে অবস্থান নেয়ার সময় দিয়ে উঠে দাঁড়াল কিলোর। মুসা, আর রয়কে নিয়ে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। লেকের দিকে রওনা হলো।
ঠাণ্ডা নির্মল রাত। চাঁদের আলোয় আলোকিত লেকের দিকে তাকিয়ে বলল কিশোর, যাক, আবহাওয়াটা ভালই আজ। কালকের মত না। কাজ করতে অত কষ্ট হবে না।
ডোবার তো এল না এখনও, রয় বলল।
বলেছে যখন, আসবে, বলল কিশোর। কোন কারণে দেরি হচ্ছে আরকি। আসার আগেই দেখি কাজটা শেষ করে ফেলতে পারি কিনা আমরা।

হাতের লম্বা লাঠির মত জিনিসটা দিয়ে খোঁচা দিতে দিতে এগিয়ে চলল কিশোর। আগের দিন যে স্পটগুলো দেখেছে, সেগুলোতে গেল না আর।
তাকে অনুসরণ করল রয়। হাতের জিপিএসটার দিকে চোখ। যন্ত্রটার এলসিডি স্ক্রীন থেকে সবুজ আভা বেরোচ্ছে।
হঠাৎ বলে উঠল, ডানে!...হ্যাঁ হ্যাঁ, আরেকটু ডানে।
জিপিএস পকেটে রেখে দিয়ে মেটাল ডিটেক্টরের দিকে নজর দিল সে। কানে হেডফোন লাগানোই আছে। কিশোরের পাশ কাটিয়ে আগে চলে গিয়ে ডিটেক্টরের সাহায্যে তুষারে ঢাকা বরফের মধ্যে খুঁজতে শুরু করল। কয়েক বর্গগজ খুঁজেই থেমে গেল আচমকা।
এখানেই আছে, চেঁচিয়ে উঠল সে।
হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল মুসা আর কিশোর। আগের রাতের মত হাত দিয়ে তুষার সরাতে লাগল, ডিটেক্টরটা যেখানে নির্দেশ করছে ঠিক সেই জায়গায়। বেরিয়ে পড়ল সাদা বরফ।
কুড়াল দিয়ে কোপানো শুরু করল মুসা। কঠিন বরফে আঘাত হানার শব্দ লেকের পাড়ে বাড়ি খেয়ে প্রতিধ্বনি তুলে ফিরে এল। শব্দ না করে কাটা সম্ভব না।
প্রায় এক বর্গগজ জায়গায় ইঞ্চি পাঁচেক বরফ কাটা হতেই বেরিয়ে পড়ল অনেকগুলো টিনের পাত নিয়ে গোল করে পাকানো একটা বল।
কালকের মতই তো টিনের পাত। কাল ছিল একটা। আজ অনেকগুলো।
বলটায় মাছ ধরার সুতো বাঁধা, দেখতে পাচ্ছ? কিশোর বলল। কালকেরগুলো পরিত্যক্ত জায়গা। কাজ সেরে চলে যাওয়ার সময় টিনের পাতগুলো সরানোর প্রয়োজন বোধ করেনি। কল্পনাই করেনি হয়তো, এ সব জায়গায় খুঁজতে আসবে কেউ।
আইস পিক দিয়ে আঁচড়ে আঁচড়ে টিনের বলটার চারপাশের তুষার সরিয়ে ফেলল সে।
ভাল করে দেখার জন্যে মাথা বাড়িয়ে দিল রয়।
দস্তানা খুলে ফেলল কিশোর। বলটাকে শক্ত করে ধরে বরফ থেকে টেনে তোলার চেষ্টা করল। উঠে আসতে শুরু করল ওটা। টান লাগল। ওটার সঙ্গে বাঁধা সুতোটায় টান পড়ল।
সুতোর চারপাশের বরফ কুপিয়ে কেটে ফেলতে শুরু করল মুসা। থেমে গেল হঠাৎ। শিসের শব্দ। দুবার খাটো। একবার দীর্ঘ।
*
জ্যাকসনের বাড়ির পেছনের ঘরের জানালায় টেলিভিশনের আলো নড়াচড়া করতে দেখছিল রবিন। হঠাৎ দেখে দুটো কালো ছায়ামূর্তি দোকানের সামনের

দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসছে।
জ্যাকি আর রকি, রাতের বাতাসকে উদ্দেশ করে যেন ফিসফিসিয়ে বলল রবিন।
কি করব এখন? একই ভঙ্গিতে ফিসফিস করে জবাব দিল পিটার।
চমকে গিয়ে ফিরে তাকাল রবিন। কথামত কাজ না করায় রেগে গেল। পিটারের ওপর। তোমার এখানে কি?
একা একা ওখানে বিরক্ত হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু এখন কি করব আমরা?
রাগটা চেপে রাখল রবিন। বলল, ওরা সরলেই সাবধান করে দিতে হবে কিশোরদের।
দৌড়ে দোকানের পেছন দিকে চলে গেল দুই ভাই। একটু পরেই ইঞ্জিনের গর্জন শোনা গেল। রবিনরা দেখল স্নোমোবাইলে চড়ে লেকের দিকে ছুটে যাচ্ছে দুজনে।
*
দ্রুত হাতে তখন ঠাণ্ডা পানি থেকে সুতোটাকে টেনে তুলছে কিশোর। কানে এল ইঞ্জিনের শব্দ।
স্নোমোবাইল, রয় বলল।
আলো নেভাও, বলে উঠল কিশোর।
দ্রুত টর্চ নিভিয়ে ফেলা হলো। তবে চাঁদের আলোতেও সাদা বরফের ওপর তাদের আকৃতি বহুদূর থেকে চোখে পড়বে।
সুতো টানা বন্ধ করল না কিশোর। আজকে জিনিসগুলো বের করেই ছাড়বে। তার আগে কিছুতেই যাবে না লেক ছেড়ে।
সুতো শেষ হলো। শেষ মাথায় বাঁধা রয়েছে একটা মোটা দড়ি। দড়ি ধরে টানতে লাগল।
কাছে চলে আসছে স্নোমোবাইলের ইঞ্জিনের শব্দ।
সরে যাওয়া দরকার, রয় বলল।
দড়িটাও শেষ হলো। মাথায় বাঁধা একটা কালো রঙের প্লাস্টিকের ব্যাগ। মুখটা খুলল কিশোর। চাঁদের আলোয় চকচক করে উঠল ভেতরের রূপালী জিনিস।
কাছে চলে এসেছে স্নোমোবাইল।
কিশোর, চলে এসো, জরুরী কণ্ঠে রয় বলল।
ব্যাগের মুখটা আবার বেঁধে ফেলতে লাগল কিশোর। তোমরা দৌড়াতে থাকো। আমি আসছি। একেকজন একেক দিকে যাও।
দৌড়ানো শুরু করল রয়। মুসা ছুটল তার পেছনে।
ইঞ্জিনের গর্জন বাড়ছে। কাপুনি টের পাওয়া যাচ্ছে বরফে।
ব্যাগের মুখ বাঁধা হয়ে গেছে কিশোরের। ওটাকে টেনে নিয়ে দৌড় দিল সে ও।
.

ডগলাস বলেছে স্পটগুলো বিপজ্জনক। প্রমাণ পেল এখন। মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে বরফ ভাঙার শব্দ কানে এল কিশোরের।
জায়গাটা সম্পর্কে গভীর জ্ঞান সোমোবাইল চালকের। কি করতে হবে জানা আছে। সোজা না এসে, অনেকখানি ঘুরে চক্কর দিয়ে এগোতে শুরু করল। কিশোরের দিকে। যে ভাবেই হোক ওরা বুঝে গেছে চোরাই মাল কিশোরের কাছেই আছে।
বরফ ভাঙার শব্দ বাড়ছে। জমাট বরফের মত স্থির হয়ে গেল কিশোর। নড়লেই মুহূর্তে এখন বরফ ভেঙে নিচে পড়ে যাবে। যদি না নড়ে তাহলেও বিপদ। স্নোমোবাইল চালক এগিয়ে এসে ঝাঁকুনি দিয়ে ভেঙে দেবে। তাতেও নিচে পড়ে যাবে সে।
ওরা ভাঙলে অন্য একটা সম্ভাবনাও আছে। স্নোমোবাইল নিয়ে ওরাও নিচে পড়ে যেতে পারে। মরলে ডাকাতগুলোকে নিয়েই মরা উচিত। তৈরি হয়ে দাঁড়াল। সে।
শেষ মুহূর্তে কয়েক ইঞ্চির জন্যে মিস করল ওকে স্নোমোবাইল। কারণ চালকের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে ঝাঁপ দিয়ে বরফের ওপর পড়ে গেছে কিশোর। গায়ের কয়েক ইঞ্চি ওপর দিয়ে শাই করে চলে গেল ইস্পাতের ভারী আইস বারের মাথা। আগের জায়গায় থাকলে হয় শিকটা শরীরে গেঁথে যেত, নয়তো মাথায় বাড়ি খেত।
মুসার চিৎকার শুনে মাথা উঁচু করে দেখল সে, ওকে পড়ে যেতে দেখে ছুটে আসছে মুসা।
পালাও, মুসা! এসো না! চিৎকার করে উঠল কিশোর। মুসার দিকে ছুটে যাচ্ছে এখন স্নোমোবাইল।
ঘুরে আবার দৌড় দিল মুসা। স্নোমোবাইলের সঙ্গে পারল না।
পৌঁছে গেল স্নোমোবাইল। রকি চালাচ্ছে। জ্যাকি পেছনে বসা। হাতের আইস বারটা দোলাচ্ছে। শেষ মুহূর্তে কিশোরের মতই একপাশে ঝাঁপ দিল মুসা। ওর গায়েও লাগাতে পারল না জ্যাকি।
থামল না স্নোমোবাইল। ছুটছে। পৌঁছে গেল রয়ের কাছে। কিশোর কিংবা মুসার মত অতটা ক্ষিপ্রতা দেখাতে পারল না রয়। হাঁটুর পেছন দিকে আইস বারের প্রচণ্ড বাড়ি খেল সে। প্রায় ডিগবাজি খেয়ে পড়ল।
শীতল বরফের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে কিশোর। চড়চড় শব্দ তুলে ভেঙে যাচ্ছে বরফ। টুকরোটা কতখানি বড় হয়ে ভাঙবে তার ওপর নির্ভর করছে তার বাঁচা-মরা। বেশি ছোট হলে উল্টে যাবে। পানিতে তলিয়ে যাবে সে। আর বড় হলে তার ওপর হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে থেকে ভেলায় ভাসার মত ভেসে থাকতে

পারবে। চারপাশের বরফ ভাঙার শব্দ হৃৎপিণ্ডটাকে যেন খামচে ধরছে। একভাবে পড়ে থেকে জ্যাকি আর রকির ফেরত আসার অপেক্ষা করতে লাগল।
কতখানি দূরে আছে ওরা দেখার জন্যে আবার মাথা তুলল সে। অবাক হয়ে গেল দুটো মূর্তিকে স্কেইট করে স্নোমোবাইলটার দিকে ছুটে যেতে দেখে। মুসাকে দৌড়ে আসতে দেখল তার দিকে।
বরফ যেখানে ভাঙছে সেখান থেকে খানিকটা দূরে এসে থেমে গেল মুসা।
কাছে এসো না! বরফ ভাঙছে, চিৎকার করে উঠল কিশোর। সরে যাও! সরে যাও! নিজের মাথার পেছন দিকে ইঙ্গিত করল। মেটাল ডিটেক্টরটা তুলে নাও।
দৌড়ে গিয়ে বরফের ওপর পড়ে থাকা মেটাল ডিটেক্টরের লম্বা ডাণ্ডাটা ধরে তুলে নিল মুসা। কি করব এটা দিয়ে?
মধ্যযুগীয় নাইটরা কি করে যুদ্ধ করত মনে আছে?
আগে কি আর জানতাম এখন কাজে লাগবে? তাহলে ইতিহাসের ক্লাসে কখনোই অমনোযোগী হতাম না।
বল্লমের মত ব্যবহার করতে পারো নাকি দেখো। তাহলেই চলবে।
বুঝলাম। আমি যাচ্ছি। ফিরে এসে যেন করফের ওপরই পাই তোমাকে, মুসা বলল।
পাবে, হেসে জবাব দিল কিশোর। সাঁতার কাটার এক বিন্দু ইচ্ছেও আমার নেই।
ঘুরে কিশোরদের দিকে আসছে এখন স্নোমোবাইলটা। পেছন পেছনে তাড়া করে আসছে ছায়ামূর্তি দুটো। কাছে আসতেই বোঝা গেল মূর্তি দুটোর একজন রবিন, আরেকজন পিটার।
ড্রাইভারটাকে বাড়ি মেরে ফেলে দিতে পারো নাকি দেখো, মুসাকে বলল কিশোর।
দৌড় দিল মুসা। ঝাঁকি লেগে বরফের টুকরোটা মূল বরফের গা থেকে আরও খানিক ছুটল, কিশোর যেটাতে পড়ে আছে।
তিন দিক থেকে স্নোমোবাইলটাকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করছে মুসা, রবিন আর পিটার। মুসার হাতের মেটাল ডিটেক্টরের ডাণ্ডাটা মনে হলো বেকায়দায় ফেলে দিয়েছে ওদের। এগোলেই বাড়ি খাবে বুঝে গেছে। হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে গেল। চক্কর দিয়ে স্পীড বাড়িয়ে তীব্র গতিতে ছুটে আসতে শুরু করল মুসাকে লক্ষ্য করে।
জোরে চড়চড় করে উঠল বরফ। লড়াইটার দিকে আর নজর দিতে পারল না কিশোর। চোখ ফেরাতে হলো নিজের চারপাশের বরফের দিকে। কানে এল মুসার ইয়াহু চিৎকার। পরক্ষণে ধাতুর সঙ্গে ধাতুর বাড়ি লাগার শব্দ। নিশ্চয় ডিটেক্টরের ডাণ্ডা আর আইস পিকের সংঘর্ষ হয়েছে। তারপর হঠাৎ করেই নীরব হয়ে গেল

সব। কৌতূহল দমন করতে পারল না কিশোর। দেখার জন্যে মাথা উঁচু করতেই হলো তাকে।
দেখল স্নোমোবাইলটা ছুটে আসছে তার দিকে। ইঞ্জিন বন্ধ। গায়ের ওপর এসে পড়তে আর সামান্যই বাকি। ক্ষণিকের জন্যে যেন স্তব্ধ হয়ে গেল বাতাস। পরক্ষণে কানের কাছে বিকট এক গর্জন শুনতে পেল সে। তারপর ঝাঁকি। সবশেষে দুলুনি। তলিয়ে যাবার আগের মুহূর্তে দেখল স্নোমোবাইলটা অদৃশ্য হয়ে গেছে। পানিতে পড়ে একে অন্যকে মই বানিয়ে বেয়ে ওপরে ওঠার আপ্রাণ চেষ্টা শুরু করেছে রকি আর জ্যাকি।
*
বাঁচাও! বাঁচাও! বরফ পানিতে হাত ছুঁড়তে ছুঁড়তে চিৎকার করে উঠল রকি।
চোরাই মাল বাঁধা দড়িটার একপ্রান্ত থাবা দিয়ে তুলে নিল মুসা। সাবধানে এগোল বরফের মাঝখানের বিশাল গর্তটার দিকে। ওখানেই পড়েছে কিশোর, রকি, জ্যাকি আর স্নোমোবাইলটা। গর্তটা বড় বলেই আবার মাথা তুলতে পেরেছে ওরা, স্রোতের টানে রবিনের মত নিচে চলে যায়নি। বরফের স্তর এত পুরু, বেয়ে ওপরে ওঠা অসম্ভব।
দড়ির মাথাটা কিশোরের দিকে ছুঁড়ে দিল মুসা। ধরো জলদি!
গাধা নাকি! কোথায় ছুঁড়েছে? আমি তো এখানে, ধমকে উঠল জ্যাকি।
অন্ধকারে দাপাদাপি করছে কিশোর। দড়িটা খুঁজে পেল না।
তুলে এনে আবার ছুঁড়ে মারল মুসা। এবার ধরতে পারল কিশোর।
বরফকে বিশ্বাস করতে পারছে না মুসা। ভাঙা গর্তের এতটা কিনারে চলে এসেছে, যে কোন মুহূর্তে ওর ভারে ওই জায়গাটাও ভেঙে পড়তে পারে। দড়ির আরেক মাথা থেকে ব্যাগটা খুলে ফেলে দিয়ে মাথাটা নিজের কোমরে পেঁচিয়ে নিল। চার হাত-পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে কিশোরকে টেনে নিয়ে সামনে এগোল। যখন বুঝল, এখানে বরফ ভাঙার ভয় আর নেই, উঠে দাঁড়াল।
নাক দিয়ে দম টেনে মুখ দিয়ে ছাড়ল। একটা মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে ধীরে ধীরে আগে বাড়ল। পিচ্ছিল বরফে নিজের দেহটাকে নিয়েই হাঁটা কঠিন, তার ওর ভারী বোঝা টেনে এগোতে হচ্ছে। বার বার পিছলে পড়ার হাত থেকে বাঁচাতে হচ্ছে নিজেকে। গতি বড় ধীর। কতক্ষণ সহ্য করতে পারবে কিশোর?
যতক্ষণ পারে পারুক। ওসব ভেবে লাভ নেই। নিজের কাজ করে গেল মুসা।
থামা, দম নেয়া, আগে বাড়া!
থামা, দম নেয়া, আগে বাড়া!
কতক্ষণ যে এ রকম করে এগোল বলতে পারবে না। দড়িতে ঢিল পড়তেই ধড়াস করে উঠল বুকের মধ্যে। মনে হলো দড়ি ছেড়ে দিয়েছে কিশোর। কিংবা দড়িটা

ছুটে গেছে তার হাত থেকে।
ঘুরে গর্তের দিকে দৌড় দিতে গেল সে। কখন যে চাঁদ ঢাকা পড়ে গেছে। মেঘের নিচে খেয়ালই করেনি। আলো নেই। অন্ধকারে কিছু দেখতে পেল না। কিসে যেন হোঁচট খেয়ে উপুড় হয়ে পড়ে গেল। কনুই আর হাঁটুতে ব্যথা পেয়ে গুঙিয়ে উঠল।
মেঘ সরে গেল চাঁদের মুখ থেকে। আলোকিত হয়ে উঠল আবার মুসার চারপাশের জায়গাটা। কিসের ওপর পড়েছে দেখতে পেয়ে লাফ দিয়ে উঠে বসল। বরফের ওপর লম্বা হয়ে পড়ে আছে কিশোর। নড়ছে না।
কিশোর! চিৎকার করে উঠল মুসা।
সাড়া পেল না।
কিশোরের গায়ে জোরে জোরে ঠেলা দিতে লাগল। কিশোর! এই কিশোর?
পুরোপুরি সরে গেছে মেঘ। উজ্জ্বল তুষারে প্রতিফলিত ফকফকা জ্যোৎস্না। অনেক কষ্টে একটা চোখ মেলল কিশোর। ঠোঁট নীল। ফিসফিস করে বলল, জমে যাচ্ছি!
এত হট্টগোল শুনে লোকজনও ছুটে এল দল বেঁধে।
রকি আর জ্যাকিকে তুলতে গেল কয়েকজন।
চিৎকার করে বলল মুসা, এদিকে আসুন কেউ...কম্বল! স্লেড!
*
দশ মিনিট পর মিস্টার মরগানের বাড়িতে পৌঁছে গেল কিশোর, ডোবার কগনানের গাড়িতে চড়ে। স্নোমোবাইলটা পানিতে পড়ার পর ওখানে গিয়েছিল সে।
রকি আর জ্যাকিকেও তোলা হয়েছে। প্রচুর চাপ পড়ল বেলী আন্টির ওপর। বরফ-পানিতে ডোবা তিন তিনজন মানুষের ভেতরে-বাইরে গরম করতে গিয়ে। হিমশিম খেতে লাগলেন তিনি।
ডাক্তারকে খবর দেয়া হলো।
.
ফায়ারপ্লেসের গনগনে আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে রবিন, মুসা আর ডোবার কগনান নিজেদের গরম করছে।
রকি আর জ্যাকিই আপনার আসামী; রবিন বলল। মাল চুরি করে নিয়ে গিয়ে বরফের নিচে লেকের তলায় লুকিয়ে রাখে ওরা। পরে সুযোগ সুবিধে মত বের করে। আমাদের ধারণা, ম্যারিল্যান্ডে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে ওগুলো। খোঁজ নিয়ে দেখুন। বের করে ফেলতে পারবেন।
ওখানে আর খোঁজ নিতে যাওয়ার দরকার নেই, কঠোর পুলিশী কণ্ঠে বলল ডোবার। ওদের মুখ থেকেই বের করে নেব।

দরজার কাছে হই-চই শোনা গেল। দেখা গেল পিটারের কাঁধে ভর দিয়ে টলোমলো পায়ে ঘরে ঢুকছে রয়।
কোথায় ছিলে এতক্ষণ তোমরা দুজনে? জানতে চাইল ডোবার।
শয়তান জ্যাকিটা ইস্পাতের রড দিয়ে আমার পায়ে বাড়ি মারল, রয় বলল। পায়ে ব্যথা নিয়েই দৌড়াতে থাকলাম…
আমি ওকে দৌড়াতে দেখলাম, পিটার বলল। যে ভাবে ছুটছিল, থেকে থেকেই ভাজ হয়ে যাচ্ছিল পা, বুঝলাম পায়ের অবস্থা কাহিল। বেশি দূর যেতে পারবে না। পিছে পিছে ছুটলাম।
গিয়েছিলে বলেই বেঁচেছি, কৃতজ্ঞ কণ্ঠে বলল রয়। কিভাবে যে লেক থেকে উঠে গিয়ে বনের মধ্যে ঢুকলাম বলতে পারব না। মাথা ঘুরে পড়ে গেলাম। হুঁশ হলে দেখি হাতে বানানো স্ট্রেচারে করে আমাকে টেনে নিয়ে চলেছে পিটার। ওকে যে আমি কি বলে…
তাকে থামিয়ে দিয়ে নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল পিটার, ছোট্ট এই গল্পটার এখানেই সমাপ্তি।
না, সমাপ্তি নয়, রয় বলল। পিটার, আমাকে বলতে দাও। তুমি আমার পিছু না নিলে বনের মধ্যে আজ মারাই যেতাম। বরফের মধ্যে বেহুশ হয়ে যে ভাবে পড়ে গিয়েছিলাম, হুঁশই হয়তো আর ফিরত না…
থাক থাক, হাত তুলে বাধা দিল পিটার। খবরটা আর ছড়ানোর দরকার নেই। বিরাট হৃদয়ের অধিকারী, মহান উদ্ধারকারী-এ সব বিশেষণে ভুবন বিখ্যাত হয়ে যাব শেষে।
রয়কে বেডরুমে নিয়ে গেল ডোবার। বেলী আন্টি আর ডাক্তার মিলে ওখানে অসুস্থদের সেবা করছেন।
পিটারও ওদের সঙ্গে ঢুকল। ফায়ারপ্লেসের সামনে একটা চেয়ারে বসে পড়ল।
তারমানে ভাল কাজ একটা করেই ফেললে, পিটারের ওপর থেকে রাগ যায়নি রবিনের। কিন্তু তাই বলে, তোমার জায়গা ছেড়ে সরে আসার কথাটা কিছুতেই ভুলতে পারছি না আমি। তুমি তখন সরে না এলে ঘটনাটা অন্য রকম ঘটত।
কৈফিয়তের ভঙ্গিতে পিটার বলল, দেখো, রবিন, তুমি তিন গোয়েন্দার একজন। সোনার টুকরো ছেলে। সব সময়ের হিরো। তোমার মত গোয়েন্দা আমি হতে পারব না। সবই মেনে নিলাম। কিন্তু দুই ভাইকে বাধা দিয়ে আমি ঠেকাতে পারতাম না। মারামারি করে পারতাম না ওদের সঙ্গে। পিটিয়ে তক্তা বানাত। তারপর-ঠিকই স্নোমোবাইলটা নিয়ে চলে যেত।
তক্তা বানালে বানাত, নরম হলো না রবিন। মরে তো আর যেতে না। কিন্তু তোমার ভীতুপনার জন্যে কি সর্বনাশটাই না ঘটতে যাচ্ছিল।

যা ঘটেছে সেটা আমি সরে না এলেও ঘটত, পিটার বলল। আমার কথা শেষ করতে দাও। আড়াল থেকে দুই ভাইয়ের কথা শুনেই আমি বুঝেছিলাম স্নোমোবাইল নিয়ে বেরোবে ওরা। চুপচাপ গিয়ে ট্যাংকের সব তেল ফেলে দিলাম। তারপর গেছি তোমার কাছে।
নিচের চোয়াল ঝুলে পড়ল রবিনের। কি করেছ। তুমি কি করেছ?
রবিনের কথায় কান দিল না পিটার। কেন সরতে না পেরে সোজা গিয়ে বরফ ভেঙে পানিতে পড়ল স্নোমোবাইল? ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বলে। কেন বন্ধ হলো ইঞ্জিন? ট্যাংকের হিপ লাইন আর কারবুরেটরের সামান্য তেল ফুরিয়ে গিয়েছিল বলে।
পিটারকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করল রবিনের। আস্তে আস্তে হেঁটে গিয়ে ওর একটা হাত ধরে ঝাঁকাতে শুরু করল।
বাহ্, হাসিমুখে বলল পিটার, হিরো তাহলে শেষমেষ হয়ে গেলাম আমিও। চোরের অপবাদ থেকে হিরো!
*
একটু সুস্থ হতেই জ্যাকি আর রকিকে নিয়ে রওনা হলো পুলিশ। প্রথমে হাসপাতালে নিয়ে যাবে। পুরোপুরি সুস্থ হলে হাজতে নেবে।
গাড়িতে উঠতে যাবে দুই ভাই, এমন সময় গাড়ি নিয়ে ঢুকল জিথার জ্যাকসন।
ঘটনাটা কি? চিৎকার করে উঠল সে।
আপনি না এলে প্রশ্নটা আমরা আপনার বাড়িতে গিয়ে জিজ্ঞেস করতাম, জবাব দিল ডোবার। দেখুন তো চিনতে পারেন কিনা?
দুই ভাইকে ধরে জ্যাকসনের দিকে মুখ ফেরাতে বাধ্য করল সে।
রকি! জ্যাকি! বিশ্বাস করতে পারছে না জ্যাকসন। তোদের পুলিশে ধরেছে কেন?
চুরি করেছে, তাই ধরেছি, জবাবটা ডোবারই দিয়ে দিল। এ এলাকায় বেড়াতে এসে দোকানে কাজ করার ছুতোয় আপনার বাড়িতে থেকেছে। রাতে মানুষের বাড়িতে ঢুকে টুকে চুরি-ডাকাতি করেছে। লুটের মাল নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রেখেছে লেকের বরফের তলায়। গত কয়েক বছর ধরে করছে এ সব। এবারও বাদ দেয়নি।
অবিশ্বাসটা বাড়ল জ্যাকসনের। জ্যাকি, কি বলছে ওরা?
জবাব দিল না জ্যাকি। নীরবে মুখ ফিরিয়ে ঘুরে দাঁড়াল।
রকি?
বুকের ওপর ঝুলে পড়ল রকির মাথা।
এ ভাবে আমার...আমার-কান কাটলি তোরা! গাড়ির গায়ে গিয়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল জ্যাকসন। দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে।

.
দিন কয়েক পরে আবার একটা পার্টি দিল মরগান আঙ্কেলরা।
গাড়ি ভর্তি করে এল তিন গোয়েন্দা সহ পিটার, রয় ও শার্লির বন্ধুরা। রাস্তার শেষ মোড়টা ঘুরতে চোখে পড়ল ওদের পাইনভিউ লেকের ছবির মত দৃশ্য। কিন্তু এক প্রান্তের আইস-ফিশিং শ্যান্টিগুলোর কাছে একজন মৎস্য শিকারীকেও দেখা গেল না। অন্য প্রান্তে নেই হকি খেলোয়াড়ের দল।
মরগান আঙ্কেলদের মূস্ত লিভিং রুমটাতে ঢুকল ওরা দল বেঁধে। আরও লোককে দাওয়াত দেয়া হয়েছে। তারা এসে পৌঁছায়নি এখনও।
পিটারের বাবাকেও দাওয়াত দেয়া হয়েছে। তিনিও এসেছেন। বুড়ো জ্যাকসনকে দাওয়াত দেয়া হবে না জেনেই এসেছেন।
ফায়ারপ্লেসের সামনে দাঁড়িয়ে আছে. তিন গোয়েন্দা। ঘরে ঢুকলেন পুলিশ চীফ ক্যাপ্টেন, ইউরি রিকম্যান।
কেসটার সমাধান করে দেয়ার জন্যে পুলিশের তরফ থেকে তোমাদেরকে অনেক ধন্যবাদ, তিন গোয়েন্দাকে বললেন তিনি। হাততালি দিয়ে তাঁকে স্বাগত জানাল উপস্থিত মেহমানরা।
আপনাদেরকেও ধন্যবাদ, তিন গোয়েন্দার পক্ষ থেকে জবাব দিল কিশোর। কিন্তু আপনাদের সাহায্য ছাড়া আমরা কিছুই করতে পারতাম না।
তার কথার সঙ্গে যোগ করল রবিন, আন্টি যে ভাবে জলে ডোবা মানুষগুলোকে বাঁচিয়েছেন, সেটার প্রশংসা না করেও পারছি না।
মাছ শিকারীরা সবে কথা বলা শুরু করেছে পিটার ও তার বন্ধুদের সঙ্গে, ঠিক এ সময় দরজায় দেখা দিল বুড়ো জ্যাকসন।
এক্সকিউজ মী, বিব্রত ভঙ্গিতে বলল সে। দাওয়াত ছাড়াই এসে ঢুকে পড়লাম। কারণ, জানি আজ সবাইকে এখানে একসঙ্গে পাব। আমি আমার নাতিদের হয়ে মাপ চাইতে এসেছি সবার কাছে। ভাবলেই আমার এত খারাপ লাগে...বিশ্বাস করুন, ঘুণাক্ষরেও যদি টের পেতাম, পিটিয়ে সোজা করে ফেলতাম।..
টের পাননি কি আর করা, ক্যাপ্টেন রিকম্যান বললেন। আপনার হয়ে জেলখানার চোর-বদমাশরাই এখন ওদের সিধে করুক।
ঘরের ভেতর চোখ বুলিয়ে পিটার আর তার বাবাকে দেখতে পেল জ্যাকসন। পিটারের কাছে আমি বিশেষ ভাবে মাপ চাইতে এসেছি।
জ্যাকসনের কথা শুনে গুঞ্জন উঠল মেহমানদের মধ্যে।
পিটার, বুড়ো বলল, অকারণে তোমার ওপর দোষ চাপিয়েছিলাম আমি। আমাকে মাপ করে দাও। আমি এখন বুঝতে পারছি, তুমি সত্যিই একটা ভাল ছেলে। আমি যা করেছি তোমার বিরুদ্ধে, সেটা ঠিক করিনি।

ঘরের মাঝখান দিয়ে হেঁটে গেল পিটায়। জ্যাকসনকে অবাক করে দিয়ে তার হাতটা ধরে ঝাঁকিয়ে দিল। আমি কিছু মনে করিনি, মিস্টার জ্যাকসন।
ভিড়ের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গেলেন এরপর মিস্টার হিগিনস। জ্যাকসনের দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, জ্যাকি, পরস্পরকে ঘৃণা করাটা চালিয়ে যেতেই পারি আমরা, ব্যাপারটা যত খারাপই হোক। কিন্তু আমাদের সম্পর্ক খারাপের জন্যে গাঁয়ের মানুষকে ঝামেলায় ফেলাটা কি ঠিক হচ্ছে?
এরপর যা ঘটল, বিশ্বাস করতে পারল না মেহমানরা। চোখ বড় বড় করে। সবাই দেখল, হাতে হাত মেলাচ্ছেন মিস্টার হিগিনস আর বুড়ো জ্যাকসন। ঘর ভর্তি মানুষ আনন্দে হুল্লোড় করে উঠল। হাততালি দিতে লাগল।
একটা সত্যি কথা বলি এবার? হেসে বলল জ্যাকসন, বরফের ওপর হকি খেলাটা আমাদের মাছ শিকারীদের জন্যে বরং ভাল। লেকের এক প্রান্তে খেলা চললে ভড়কে গিয়ে ওদিকের সমস্ত মাছ চলে আসবে অন্য প্রান্তে আমাদের দিকে। কাজেই হকি খেলতেই পারে ছেলেরা। আপনারা কি বলেন?
হাসতে শুরু করল শৌখিন মৎস্য শিকারীর দল।
পিটার বলল, তাহলে আর মুফতে খেলতে যাচ্ছি না। খেলে দেয়ার জন্যে। আমাদের টাকা দিতে হবে।
পিটারের কাঁধে হাত রাখলেন ক্যাপ্টেন রিকম্যান। খেলার জন্যে টাকা দেবে কি দেবে না সেটা মেছুয়াদের ব্যাপার। কিন্তু আমার একটা প্রস্তাব আছে। আমি জারি গাড়ি সাংঘাতিক ভালবাসো তুমি। মেরামত করাটা তোমার নেশা। আমি তোমাকে একটা কাজ দিতে চাই। আগামী দুমাস প্রতি শনিবারে গিয়ে আমাদের থানার সবগুলো পুলিশের গাড়িকে টিউনিং করে দিয়ে আসবে!
পিটারের মুখ দেখে মনে হলো, লটারির টাকা পেয়ে গেছে। সত্যি বলছেন?
মাথা ঝাঁকালেন ক্যাপ্টেন। মুখে মৃদু হাসি।
ঘরের পরিবেশ হালকা হয়ে এল। পার্টি শুরু হলো সবাই যার যার মত কথা বলছে। গরম সাইডার আর চকলেট খাচ্ছে।
পিটার বলল, মুসা, হয়ে যাবে নাকি একটা হকি ম্যাচ। কালকেই খেলে ফেলতে পারি আমরা।
উঁহু, খেলাটেলা পরে, হাত নেড়ে মানা করে-দিল বুড়ো জ্যাকসন। আগে ওরা আইস-ফিশিং শিখবে। মুসার দিকে ভুরু নাচাল। কি বলো, মুসা আমান? আড়চোখে কিশোরের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল সে। ছিপটিপের জন্যে পয়সা দিতে হবে না। কিশোর বলল, তাহলে আমি রাজি। মাথা দুলিয়ে সায় দিল রবিন। তুমি কি বলো, রবিন?

ভলিউম ৪৯ – মঞ্চভীতি – তিন গোয়েন্দা – রকিব হাসান – সেবা প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ: ২০০২

এই কাজও কোরো না, কিশোর! সাবধান করল মুসা আমান। টেবিলের ওপাশ থেকে তাকিয়ে আছে।

খপ করে কিশোরের হাত চেপে ধরল জিনা, মরবে!

ডাক্তার আছে নাকি এখানে? বলল রবিন।

ভিড়ের দিকে তাকাল সে। রকি বীচ শপিং মলের একটা খাবারের দোকানে রয়েছে ওরা। রঙিন নিওন আলোয় রাঙা মুখ। এককোণে তাকের অনেক ওপরে চলছে একটা টেলিভিশন, ভিসিআরে পুরানো ছবি দেখানো হচ্ছে তাতে। দেখছে আর হাসছে লোকে।

একটু ভুরু উঁচু করল কিশোর। মুসা আর রবিনের দিকে তাকাচ্ছে না। গরমের ছুটি শেষ হয়ে এসেছে। আবার শুরু হবে স্কুল, তার আগেই শরীরটাকে যতটা সম্ভব ঠিক করে নিতে চায়।

শীতল সয়া বারগারের চারপাশ দিয়ে বেরিয়ে থাকা আলফালফার উঁটাগুলো মুখে ঠাসল কিশোর। এখানকার স্পেশাল খাবার এটা। তবে সে কেবল একলাই এর অর্ডার দিয়েছে। ইদানীং হঠাৎ করে আবার মোটা হতে শুরু করেছে, ছোটবেলার সেই রোগ। আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে সে। শরীর ফুলিয়ে ঢোল হতে আর চায় না। সেটা ঠেকানোর জন্যে যত কষ্ট হোক করবে। আদা আর ভাটুইয়ের মূলের রস বেরিয়ে এল বনরুটির ফাঁকের ভেতর থেকে। ফোঁটা পড়ল হাতে। দেখেও দেখল না সে। যত যাই বলো, এ জিনিস আমি খাবই। মজাও লাগবে।

কিন্তু মজা যে কি লাগছে, সেটা তার মুখের বিকৃত ভঙ্গি দেখেই আন্দাজ করতে কষ্ট হচ্ছে না। তবে কামড়ে নেয়া অংশটুকু চিবিয়ে গিলে ফেলে আবার কামড় বসাল।

ও তো সত্যিই খেয়ে ফেলছে। প্রায় ফিসফিস করে বলল রবিন।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল মুসা, এ ভাবে ডায়েট কন্ট্রোল করে বাঁচার চেয়ে মরে যাওয়া ভাল। প্লেট থেকে বীফ বারগারটা তুলে নিয়েও নামিয়ে রাখল আবার। আমার খিদে নষ্ট করে দিলে!

মুসা আমানের খিদে নষ্ট? চিবানোর ফাঁকে বলল কিশোর। তাড়াতাড়ি গিলে নিয়ে আবার কামড় দিল। কই, আমার তো খেতে খারাপ লাগছে না?

শুকনো কাঠ খেতে ভালও লাগে না, খারাপও লাগে না, মন্তব্য করল রবিন।

জবাব দিতে যাচ্ছিল কিশোর, হাসির হুল্লোড় বাধা দিল তাকে। ফিরে তাকিয়ে দেখল গোল একটা টেবিল ঘিরে বসে আছে জনাদশেক লোক, টিভির দিকে চেয়ে হাসছে। মঞ্চভীতি

মুহূর্তে মুখের ভার বদলে গেল কিশোরের, সর্বনাশ…
কি হয়েছে? জানতে চাইল জিনা।
জবাব দিল না কিশোর। চুপ করে তাকিয়ে আছে।
টিভির দিকে তাকিয়ে হেসে বলল রবিন, ও, এই ব্যাপার। পাগল সংঘ ছবিটা দেখাচ্ছে, যেটাতে অভিনয় করে বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিল কিশোর।
কুঁকড়ে গেছে কিশোর। অনেক বছর আগে নিজের শৈশবের শরীর দেখে আরও আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। তাড়াতাড়ি কামড় বসাল বিস্বাদ বারগারে।
পর্দায় দেখা যাচ্ছে দশ বছরের একটা ছেলে ঢুকল ঘরে। মুখে শয়তানি হাসি। একটা চেয়ারে আঠা লাগিয়ে দিচ্ছে, ওটাতেই বসবে ছোট্ট কিশোর।
কি ঘটবে আন্দাজ করেই হাসতে লাগল দর্শকরা।
হাতের বাকি বারগারটুকু প্লেটে ফেলে দিল কিলোর। আর বসতে পারছি না। চলো, উঠি।
এক সেকেন্ড, কোণের একটা টেবিল দেখাল রবিন, জাহির বিলিয়ার্ডও এসেছে। আমার বস লজ বার্টলেটের নতুন একটা ব্যান্ডের ড্রামার। ভাল লোক। উঠে দাঁড়াল সে। চলো, পরিচয় করিয়ে দিই।
সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল মুসা আর জিনা। কিন্তু কিশোরের তেমন ইচ্ছে নেই। সে এখন এখান থেকে পালাতে পারলে বাঁচে।
শেষে জোর করে মন শক্ত করে নিয়ে উঠল সে। অনেক দিন হয়ে গেছে, এখন আর তাকে চিনতে পারবে না কেউ।
অভিনয় তখনও দারুণ করতে! বলল লাল-চুল এক লোক।
চমকে গেল কিশোর। চিনে ফেলল নাকি? কিন্তু না, তার দিকে নয়, অন্য দিকে তাকিয়ে আছে লোকটা।
জাহির, কেমন আছেন? আন্তরিকতা দেখিয়ে বলল রবিন।
ফিরে তাকাল লোকটা। ও, রবিন। বোসো। আমার বন্ধু পিটারের অভিনয় দেখছি।
গোয়েন্দাদের দিকে তাকাল তার পাশে বসা বন্ধু।
জিনা বলে উঠল, আপনাকে তো চিনি! কাল রাতে টিভিতে সাক্ষাত্তার দিয়েছেন। গারবার থিয়েটারে নতুন মিউজিক্যালটার স্টার আপনি।
মাথা ঝাঁকাল পিটার, উজ্জ্বল হলো চোখ, ওয়াইল্ড ওয়াইল্ড ওয়াইল্ড! হ্যাঁ, ওটারই…
গোল টেবিলে বসা দর্শকদের হাসিতে চাপা পড়ে গেল তার কথা। ফিরে তাকাল পিটার। টিভির দিকে তাকিয়ে বলল, ওই যে, ওটাতেও অভিনয় করেছি আমি সেই ছোটবেলায় শুরু করেছিলাম, কিছুতেই আর ছাড়তে পারলাম না।

টিভির দিকে তাকাল কিশোর। চেয়ারের আঠায় তার প্যান্ট আটকে গেছে। টেনে তুলতে পারছে না। অসহায় করুণ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে চারপাশে, সাহায্যের আশায়। হাসি হাসি মুখ করে তার দিকে তাকিয়ে আছে দশ বছরের ছেলেটা, ওর দুর্দশা দেখে খুব মজা পাচ্ছে।
লাউডস্পীকার! নিজের অজান্তেই মুখ ফসকে বেরিয়ে এল কিশোরের।
ঝট করে তার দিকে ঘুরে গেল পিটার।
জাহির বলল, লাউডস্পীকার?
ছবিতে ওই নামই ছিল তার, বলতে বাধ্য হলো কিশোর। কণ্ঠস্বরটা ছিল খুব জোরাল। মাইকও বলত কেউ কেউ।
স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে পিটার, তুমি জানলে কি করে?
বোকার মত ফাঁস করে দিয়েছে বলে রাগ হচ্ছে কিশোরের। আর পিছিয়ে আসার উপায় নেই। দেখল, অনেকেই ফিরে তাকিয়েছে ওর দিকে। কেশে গলা পরিষ্কার করে বলল, ওই যে চেয়ারে আটকে আছে, ওই ছেলেটা আমিই ছিলাম।
তুমিই মোটুরাম! বলে উঠল সোনালি-চুল একটা মেয়ে।
এই রে, শুরু হবে এখনি! মোটুরামকে নিয়ে টিটকারি, হাসাহাসি, যে জিনিসকে আজীবন ভয় পেয়ে এসেছে কিশোর। জবাব দিল, আমার নাম মোটুরাম নয়, মোটুরাম হলো চরিত্রটার নাম।
লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল পিটার। হাত বাড়িয়ে দিল। এখন বুঝি, মস্ত অভিনেতা তুমি! ওই বয়েসেও যা করেছ...অভিনয় তোমার রক্তে মিশে আছে।
পিটারের সঙ্গে হাত মেলাতে গিয়ে বলল ও, তুমিও কম না। আরেকটা কি যেন নাম ছিল তোমার?
বাদ দাও, ওসব ভুলে আছি। এখন আমি পিটার হাইয়েম। এই নামেই চেনে লোকে।...পাগল সংঘ আমার জীবনটাই বদলে দিয়েছে। ওটার পর আর কোন ছবিতে চান্স না পেয়ে বিজ্ঞাপনের কাজ নিলাম। টাকা একেবারেই কম। অনেক কষ্টে কাটতে লাগল দিন। তবে শেষ পর্যন্ত আমার কণ্ঠই আমাকে বাঁচিয়ে দিল। লোকে বুঝতে আরম্ভ করল... হাসল সে। বাকিটা আর শুনে কাজ নেই, ইতিহাস। তোমার খবর কি?
এই আছি একরকম।
অভিনয় করো না?
না। চাচা-চাচীর কাছে থাকি। লেখাপড়া করি। তো, ওয়াইল্ড ওয়াইল্ড তো খুব নাম করছে...
করবেই। খরচটা কেমন হচ্ছে। লস অ্যাঞ্জেলেসে এ যাবৎ যত মিউজিক্যাল শো হয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যয়বহুল এটা। টাকা খরচ করতে কার্পণ্য

করছেন না প্রযোজক। লেজার লাইট, মার্শাল আর্ট ডিসপ্লে, উন্নত টেকনোলজি। গল্পটাও নেয়া হয়েছে দারুণ!
জাহির বলল, আমি ওটাতে ড্রামারের কাজ করি। আসলেই টাকা ঢালছেন প্রযোজক-পোশাক, স্টেজ সব কিছু বদলে দিচ্ছেন। নতুন নতুন লোক ভাড়া। করছেন। একমাস হয়ে গেল, অথচ এখনও ওপেন করার তারিখ ঘোষণা করছেন। না।
এক মিনিট, জানতে চাইল মুসা, শো দেখানো মানেই তো ওপেন হয়ে যাওয়া। আবার তারিখ ঘোষণার কি দরকার?
আছে। যেটা চলছে সেটা প্রিভিউ। একটা শো ওপেন করার আগে কয়েক হপ্তা ধরে চলে তার প্রিভিউ। ভুলটুল কোথায় আছে, কি করলে আরও ভাল হবে, বোঝার চেষ্টা চলে। মাঝে মাঝে কান্তারাতি দৃশ্যপট বদলে ফেলা হয়। তারপর যখন মনে হয়, সব একদম পারফেক্ট, কোন ভুল নেই, তখন ঘোষিত হয় ওপেনিং নাইট। পত্রিকার লোকদের দাওয়াত দেয়া হয় সমালোচনার জন্যে।
ওপেনিং নাইট এটার আসবে কিনা তাই ভাবছি! নিচু স্বরে আনমনে বলল পিটার।
কেন, কোন সমস্যা? জানতে চাইল রবিন।
মাথা নাড়ল পিটার। না, কর্তৃপক্ষের কোন সমস্যা নেই। যে কোন দিন ব্রডওয়েতে মুক্তির ঘোষণা দিতে পারে। আর যদি পয়লা রাতেই হিট হয়ে যায়, তাহলে তো কাজই হয়ে গেল। নানা জায়গা থেকে অভিনয়ের ডাক আসবে, ভাড়া নেবে, সিনেমার চুক্তি হবে অনেক টাকা..অনেক।
কালো-চুল সুদর্শন এক লোক টেবিলের ওপাশ থেকে বলে উঠল, আসল কথাটা বলো, পিটার; প্রিভিউ লম্বা করার আরও কারণ আছে।
অপরাধীর হাসি ফুটল পিটারের মুখে। নিজের ঘরের খারাপ কথা ঢাকঢোল পিটিয়ে অন্যকে শোনানোর কোন মানে হয় না, রলি। ইমপ্রেশন খারাপ করে লাভ কি।
কফি-টফি কিছু লাগবে কারও? জানতে চাইল ওয়েইট্রেস।
জিনা আর তিন গোয়েন্দা চেয়ার টেনে আনল টেবিলের কাছে।
কিশোরের দিকে তাকাল পিটার, এত বছর কি শুধু লেখাপড়াই করেছ?
না, শুধু লেখাপড়া করব কেন? ইলেকট্রনিকের কাজ শিখেছি, ইয়ার্ডে কাজ করেছি, গোয়েন্দাগিরি করছি।
গোয়েন্দা?
পকেট থেকে তিন গোয়েন্দার কার্ড বের করে দিল কিশোর।
কার্ডটা পড়ে মুখের ভাব বদলে গেল পিটারের। কিশোরের মনে হলো, ক্ষণিকের জন্যে যেন উজ্জ্বল হলো চোখ। সেটা লক্ষ করেই বলল ও, অসুবিধেয় পড়েছ?

অ্যাঁ!…হ্যাঁ! দ্রুত ডানে-বাঁয়ে ঘুরল পিটারের চোখ। হাসল। এই যে এখনকার মত। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তার দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। কিছু একটা এড়িয়ে গেল পিটার বুঝতে অসুবিধে হলো না ওর।
উঠে দাঁড়াল পিটার। পকেট থেকে টাকা বের করে টেবিলে রেখে ওয়েইট্রেসকে ইশারা করে বোঝাল, খাবারের দাম। জাহিরকে বলল, আমি যাই। খানিকক্ষণ তাস খেলে আসি।
রবিনের সঙ্গে কথা বলছে জাহির, আনমনে মাথা ঝকাল। কয়েকটা মেয়েও বসেছে টেবিলে। সমস্বরে বিদায় জানাল পিটারকে।
মুসার দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিত করল কিশোর। রবিনের চোখে চোখেও তাকানোর চেষ্টা করল। কিন্তু সে তখন জিনা আর মেয়েগুলোর সঙ্গে গান নিয়ে তর্ক জুড়েছে।
সুতরাং তাকে ছাড়াই পিটারের পিছু নিল কিশোর আর মুসা। করিডরের শেষ মাথায় চলে এল। একটা দোকানের সামনে করাতে কাটা কাঠের গুঁড়ো স্তূপ হয়ে আছে, আর কিছু তক্তার গাদা। দোকানটা খোলেনি।
এদিক ওদিক তাকাল পিটার। সন্তুষ্ট হয়ে মাথা ঝাঁকাল, শুড়, এখানে কেউ নেই। কথা বলা যায়। সত্যিই গোয়েন্দা তো তোমরা? মস্করা নয়?
না, মাথা নাড়ল কিশোর। অনেক জটিল কেসের সমাধান করেছি আমরা, ইচ্ছে করলে রকি বীচ থানায় খোঁজ নিতে পারো।
কণ্ঠস্বর খাদে নামাল পিটার, বিশ্বাস আসলে আগেই করেছি, নাহলে এখানে টেনে আনতাম না। বিপদে পড়েছি আমি। মস্ত বিপদ।
বিপদটা কেমন?
আমাকে মেরে ফেলতে চায়।
খাইছে! বলে উঠল মুসা। কেন?
জানলে আর তোমাদের সাহায্য চাইতাম না। গত হপ্তা থেকে কয়েকটা চিঠি আর টেলিফোন পেয়েছি..
কি বলে? জানতে চাইল কিশোর।
কখনও ফোন ধরলেই রেখে দেয়, কখনও ভারি গলায় বলে: ইউ আর গন্যা গেট ইট! কথায় ব্রিটিশ টান। বুড়ো মানুষের মত মনে হয়। কখনও বলে: বিঅ্যাওয়্যার, থেসপিয়ান? কিশোরের দিকে তাকাল পিটার, থেসপিয়ান মানে জানো? পুরানো আমলে অভিনেতাকে থেসপিয়ান বলে ডাকার চল ছিল।
জানি। আর কি বলে ফোনে?
খিকখিক করে কুৎসিত হাসি হাসে, পুরুষেরও হতে পারে, মহিলারও। বুঝতে পারি না।

চিঠিতে কি লেখে?
এক্কেবারে পাগলের প্রলাপ পিটারের কণ্ঠ কেঁপে গেল। কি করে আমি মারা যাব, সেই খবর জানায়। ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে যা লিখেছে তার মানে হলো–রক্তমাখা সিংহাসনে ডুবে মারা যাব আমি। বনের মত কোন কিছু এগিয়ে আসবে আমাকে গিলে খাওয়ার জন্যে…
চিঠিগুলো দেখতে পারলে হয়। কোন সূত্র মিলতে পারে।
চোয়াল স্কুলে পড়ল পিটারের, পাবে না! সাংঘাতিক চালাক! কোন সূত্র রাখেনি।
সেটা দেখলেই বুঝব, মুসা বলল।
কি জানি…এমন খারাপ লাগে না!…মনকে বোঝাই, ও কিছু না, কোন ভক্ত হয়তো রসিকতা করছে। কিন্তু অ্যাক্সিডেন্টগুলো ঘটতে শুরু করতেই বুঝলাম রসিকতা নয়।
অ্যাক্সিডেন্ট?
সিনারি খসে পড়ে। আমার যেখানে নাচার কথা রহস্যময় ভাবে স্টেজের সেখানে পড়ে থাকে পেরেক, ব্লেড ভাঙা এ সব। ভয় ফুটল পিটারের চোখে। সত্যি, আমার সাহায্য দরকার। মনে মনে একজন গোয়েন্দা খুঁজছিলাম। কিন্তু কি ভাবে জোগাড় করতে হয়, কাকে বিশ্বাস করব, বুঝতে পারছিলাম না। গোয়েন্দা বলতে আমার চেহারায় ভাসে ছোটখাট একজন বুড়ো মানুষ, মঞ্চের পাঁচশো হাতের মধ্যে থাকলেও চোখে পড়ে যাবে। এমন কাউকে দিয়ে আর কি গোয়েন্দাগিরি করা? তবে তোমাদের বয়েসী হলে সমস্যার সমাধান হয়ে যায়, বলতে পারি আমার বন্ধু। কেসটা নেবে? তোমাদের সাহায্য দরকার আমার।
মুসার দিকে তাকাল কিশোর। কথা হয়ে গেল চোখে চোখে। পিটারের দিকে তাকাল সে। এক শর্তে করতে পারি কাজটা।
বলো।
আমাদের পরিচয় গোপন রাখতে হবে। বলা যায় না, ভেতরের কেউও কাজটা করে থাকতে পারে, তোমার অতি পরিচিত কেউ।
স্বস্তি এবং কৃতজ্ঞতা একই সঙ্গে ফুটল পিটারের চোখে। বেশ, তাহলে এইই কথা। আমার কেসটা নিলে তোমরা। আজ রাত ছটার দিকে ড্রেসিং রুমে দেখা কোরো আমার সাথে। সাড়ে সাতটার আগে মেকাপ করতে হবে না আমার। তার আগে বেশ কিছুটা সময় পাব তোমাদের ঘুরিয়ে দেখানোর জন্যে। সাড়ে পাঁচটার মধ্যে যেতে পারলে আরও একটা জিনিস দেখতে পাবে। টিভি থেকে সাক্ষাৎকার নিতে আসবে আমার। এক এক করে মুসা, আর কিশোরের হাত ধরে ঝাঁকিয়ে দিল। সে। কি ভাগ্য! এমন করে দেখা হয়ে যাবে তোমাদের সঙ্গে বিশ্বাসই করতে পারছি

পিটারের সঙ্গে হাত মেলানোর সময় তার চোখের দিকে তাকিয়ে একটা আজব অনুভূতিতে মোচড় দিয়ে উঠল কিশোরের পেট। কথা খুব মনে থাকে তো। তার, সেজন্যেই ধোয়াটে ভাবে মনে আছে, ছোটবেলায় অভিনয় করার জন্যে যখন ক্যামেরার সামনে দাঁড়াত তখন হত এই অনুভূতিটা।
তারপর থেকে অভিনয়ের জগৎটাকে ঘৃণা করে এসেছে। এমন হতে পারে, চরিত্রটাই তার পছন্দ ছিল না, মোটুরাম বানিয়ে তাকে এভাবে হেনস্তার মধ্যে ফেলে। দেয়া উচিত হয়নি পরিচালকের। হঠাৎ করে এখন মনে হচ্ছে, অভিনয় জিনিসটা আসলে খারাপ লাগে না তার। গোয়েন্দাগিরি করতে গিয়েও বহুবার বহুরকম অভিনয় করতে হয়েছে। তফাৎ কেবল, সামনে তখন ক্যামেরা ছিল না, কিংবা সে মঞ্চের ওপর ছিল না।
সে যে জাত অভিনেতা তাতে কোন সন্দেহ নেই। নইলে মঞ্চের কাছাকাছি যাওয়ার কথা শুনে রক্তে দোলা লাগবে কেন? তার ওপর যোগ হয়েছে রহস্য। কেসটা হাতে নিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করল না ও।

.
বিকেল বেলা ইয়ার্ডের পুরানো পিকআপটা চালিয়ে মুসা আর জিনাকে নিয়ে পিটারের সঙ্গে দেখা করতে রওনা হলো কিশোর। পথে মুসা বলল, এখানে একটু রাখো তো। আমার গাড়িটা হয়েছে নাকি দেখে যাই।
আগের গাড়ি বিক্রি করে দিয়েছে মুসা। নিলামে আরেকটা গাড়ি কিনেছে। টয়োটা করোলা, ষাট হাজার মাইল চলেছে। একটা বড় ওঅর্কশপে দিয়েছে পার্টস-টার্টস বদলে ভাল করে মেরামত করে দেয়ার জন্যে।
কিশোর বলল, পাঁচটা তো বাজে প্রায়। এখন…
সময় তো আছে। দেখিই না। বেশিক্ষণ লাগবে না।
গ্যারেজটার নাম রকি বীচ অটো ডায়াগনস্টিক সেন্টার। কাঁচের দরজাটা ঠেলে খুলে চিৎকার করে ডাকল মুসা, আমার গাড়িটার কি খবর?
ভেতরে হাইড্রলিক লিফটের জঙ্গল হয়ে আছে। প্রতিটি লিফটে বসে আছে। একটা করে গাড়ি, ছাতের আলোয় কিভুত ছায়া পড়েছে মেঝেতে। এককোণে চেয়ার থেকে ঘুমজড়িত চোখে তাকাল একজন লোক। মুসার দিকে একবার। তাকিয়ে দেয়ালের ঘড়ি দেখল। বলল, বাপরে! পাঁচটা বাজে! ঘুমিয়েই পড়েছিলাম! কি করতে পারি তোমার জন্যে, বলো?
আমার গাড়িটা দিয়ে গিয়েছিলাম। স্টীল-গ্রে রঙের টয়োটা করোলা। হয়েছে?
মাথা চুলকাল লোকটা। গাড়িগুলোর দিকে তাকাতে লাগল। স্টীল-গ্রে টয়োটা..স্টীল-গ্রে টমোটা… আঙুল তুলল, ওটা?

হতাশায় কাঁধ ঝুলে পড়ল মুসার। লিফটে বসে আছে তার গাড়িটা। কোন মেরামতিই হয়নি এখনও। বলল, কি-কিছু করেননি।
কি করব, তোমার একটা পিটম্যান-আর্ম ক্ষয়ে গেছে। ওটা রেখে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না…
কি ক্ষয়ে গেছে?
ওই যে, হাত তুলে দেখাল মেকানিক, লম্বা একটা রডের সঙ্গে দুটো টায়ার যুক্ত। ওটা হলো স্টিয়ারিং লিংকেজ, চাকাগুলোকে ঘোরায়। এই ঘোরানোর জন্যে দরকার পড়ে আরেকটা যন্ত্রের, একে বলে পিটম্যান আর্ম। লিংকেজকে স্টিয়ারিং গিয়ারবক্সের সঙ্গে যুক্ত করে এটা, সেটা আবার যুক্ত স্টিয়ারিং কলামের সঙ্গে, সেটা যুক্ত স্টিয়ারিং হুইলের সঙ্গে। হাসল সে, মাঝখানে দুটো দাঁত নেই, ফাঁক। বেশ শক্ত ধাতু দিয়ে তৈরি পিটম্যান আর্ম, কিন্তু তারপরেও চিরকাল ঠিক থাকবে এটা ভাবার কোন কারণ নেই।
তাহলে বদলে ফেলছেন না কেন?
মাথা নাড়ল মেকানিক। নেই। স্টকে রাখি না আমরা কেউই রাখে না। বানিয়ে আনতে হয়। অর্ডার দিলে বানিয়ে দেয়, দু-তিন হপ্তা লাগে। আবার হাসল সে। অপেক্ষা করতেই হবে তোমাকে। আর কোন উপায় নেই। এ কদিন চলাচলের অন্য কোন ব্যবস্থা করে নাওগে।
কোনমতেই কি চালু করা যায় না? অনুনয় করল মুসা, কোন ভাবে?
আবার মাথা চুলকাল মেকানিক, একটা কাজ করা যায় অবশ্য। আমার এক বন্ধুর গাড়ি ফেলে গেছে, নিতে দেরি হবে। তার গাড়িরটা
তাই দিন! লাফ দিয়ে গিয়ে মেকানিকের হাত জড়িয়ে ধরল মুসা। গাড়িটা বড় দরকার! অভ্যাস হয়ে গেছে। গাড়ি ছাড়া একদম চলতে পারি না।
মাথা ঝাঁকাল মেকানিক, দেখি কি করা যায়।

.

উফ! মরে গেলাম। খাইছে, কিশোর, গর্তটও দেখো না নাকি! মাথা নিচু করে ফেলেছে মুসা। বাড়ি লেগেছে যেখানটায়, ডলছে।
সরি, কিশোর বলল, সত্যিই দেখিনি। আসলে খুব একটা চালাই-টালাই না, জানোই তো…
ভাগ্যিস রবিন আসেনি, দুজনের মাঝে মোড়ামুড়ি করে আরেকটু জায়গা বের করার চেষ্টা করল জিনা।চ্যাপ্টা হয়ে যেতাম এতক্ষণে।
রবিন গেছে লজের ওখানে।
কিশোর বলল, আর কষ্ট করতে হবে না। এসে গেছি।

বড় একটা থিয়েটারের সামনে দাঁড়িয়ে আছে দুটো সাদা গাড়ি। রাস্তা জুড়ে তারের ছড়াছড়ি। গিজগিজ করছে ক্যামেরাম্যান আর টেকনিশিয়ানে, চিৎকার করে নির্দেশ দিচ্ছে, আলো ঠিক করছে। সব কিছুর ওপরে ক্রেনের সাহায্যে নামানো হচ্ছে বিশাল এক সাইনবোর্ড, তাতে লেখা:
ওয়াইল্ড! ওয়াইল্ড! ওয়াইল্ড।
ভাল করে দেখার জন্যে জানালা দিয়ে গলা বের করে দিল কিশোর।
মুসা বলল, সময়মতই এসেছি। টিভির লোকেরা ইন্টারভিউ শুরু করেনি এখনও।
আই, কিশোর! ডাক শোনা গেল।
বিশাল তাঁবুর নিচে উঁচু ক্যানভাস চেয়ারে বসে আছে পিটার। কালো পোশাক পরা একজন লোক তার চুল ঠিক করছে। কপালে পাউডার মাখাচ্ছে এক মহিলা। দু-জনকেই সরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল পিটার। হাত নেড়ে ডেকে বলল, এসো। ক্যামেরা রেডি হয়ে গেছে।
বুলহর্ন মুখে লাগিয়ে আদেশ দিল একজন দাড়িওয়ালা লোক, জায়গাটা পরিষ্কার করুন, প্লীজ!
আধ ব্লক দূরে পিকআপটা পার্ক করে রেখে এল কিশোর। জিনা আর মুসাকে নিয়ে দৌড়ে গেল থিয়েটারের সামনে। কাঠের রেলিঙের বেড়া দিয়ে জায়গা আলাদা করে দেয়া হয়েছে দর্শকদের জন্যে, যাতে শূটিং দেখতে পারে। সেখানে এসে দাঁড়াল ওরা।
তাঁবুর ডানধারে গিয়ে দাঁড়াল পিটার।
সিল্কের শার্ট আর ঢলঢলে স্কার্ট পরা এক মহিলার চুলে স্প্রে করছে এখন হেয়ারড্রেসার। দ্রুত কাজ শেষ করে সরে গেল সে। মাইক্রোফোন হাতে পিটারের দিকে এগোল মহিলা। ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে ঝলমলে হাসি হাসল।
শোবিজ টুডের নিতা নিউমার, জিনা বলল।শো-টা খুব ভাল লাগে আমার।
খালি তো বকর বকর করে, মুসা বলল। এর বদনাম, ওর সমালোচনা, এই তো খালি…
তুমি কি বুঝবে ওসব! রেগে উঠল জিনা। তোমার তো খালি খেলা, অহেতুক সময় নষ্ট…
আহ, থামো তো তোমরা! ধমক দিল কিশোর। এটা ঝগড়ার সময় হলো নাকি… দেখি, শুনি কি বলে?
নাটকীয় ভঙ্গিতে কথা বলল নিতা, চুপ হয়ে গেল দর্শক, সবাই জানেন আপনারা ওয়াইল্ড ওয়াইল্ড ওয়াইল্ড গারবার থিয়েটারের একটা নতুন মিউজিক্যাল শো, অনেক দিন থেকে আত্মপ্রকাশের অপেক্ষায় আছে। দারুণ একটা জিনিস, দর্শককে যেমন মজা দেবে, টাকাও আসবে হুড়মুড় করে। কিন্তু একটা উত্তেজনা

চলছে ভেতরে ভেতরে। চ্যানেল ওয়ানের তদন্তকারী দল জেনে গেছে আজব কিছু ঘটছে এখানে, সবই হৃদয় জয় করা অভিনেতা পিটার হাইয়েমকে ঘিরে। পিটারের কাছে এখন আমাদের প্রশ্ন, সত্যিই কি ওয়াইল্ড ওয়াইল্ড বিপজ্জনক হয়ে উঠছে তাঁর জন্যে?
পিটারের দিকে মাইক্রোফোন বাড়িয়ে দিল নিতা।
কিন্তু পিটার কথা বলার আগেই ক্রেনের কাছে দাঁড়ানো একজন শ্রমিক চিৎকার করে উঠল, সরুন! সরে যান।
ওপর দিকে একবার তাকিয়েই তীক্ষ্ণ চিৎকার করে তাঁবুর মধ্যে ডাইভ দিয়ে পড়ল নিতা। তার চারপাশের লোকেরা হাত থেকে ক্লিপবোর্ড, স্যান্ডউইচ, ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি সব ছেড়ে দিয়ে যে যেদিকে পারুল ছুটে পালাল।
কিশোর তাকিয়ে আছে ওপর দিকে। বিশাল সাইনবোর্ডটা ঝুলে আছে এখন মাত্র একটা তার থেকে। আরেকটা তার বোর্ডের গোড়া থেকে ছিঁড়ে গেছে।
বাকি তারটাও ছিঁড়ে যাচ্ছে, বুঝতে পারল সে। ভারি বোর্ডটা ধরে রাখার সামর্থ্য নেই। চিৎকার করে উঠল কিশোর, পিটার, সরে যান?

.

আর কোন উপায় না দেখে রাস্তাতেই ঝাঁপিয়ে পড়ল পিটার। গড়িয়ে সরে গেল।
বিকট শব্দ করে রাস্তায় পড়ে ভাঙল বোর্ডটা। দু-হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়েছে কিশোর, মুসা আর জিনা।
তারপর একধরনের বিশ্রী নীরবতা। চোখ থেকে হাত সরাল কিশোর। বোর্ডটা এখন প্লাস্টিকের একটা ধ্বংসস্তূপ। থিয়েটারের দেয়ালের কাছে, পিটার যেখানে রয়েছে তার পনেরো ফুট দূরে।
অবশেষে কথা ফুটল কিশোরের, কারও লেগেছে?
না, একসঙ্গে জবাব দিল মুসা আর জিনা।
বোর্ডটার দিকে এগোল কিশোর।
বিকেলের বাতাস চিরে দিল পুলিশের সাইরেন। ডান, বাম থেকে পা টিপে টিপে একজন দু-জন করে এগিয়ে আসতে শুরু করেছে দর্শকরা। আবার ভিড় জমে গেল দেখতে দেখতে।
ঠেলেঠুলে ওদের ভেতর দিয়ে পথ করে এগোল কিশোর। পেছনেই রয়েছে জিনা আর মুসা। ব্যস্ত হয়ে উঠেছে ক্যামেরাম্যানরা, দুর্ঘটনার পর পিটারের অবস্থা কি হয়েছে ধরে রাখার জন্যে যেন পাগল হয়ে গেছে।
তোলা হয়েছে সব? জিজ্ঞেস করলেন রূপালী-চুল এক ভদ্রলোক। চেহারাটা মোটেও ভাল না, কুৎসিত না বলে ভয়ঙ্কর বললে ঠিক হয়।

হয়েছে, জবাব এল একটা ক্যামেরার পেছন থেকে। পিটারের রিঅ্যাকশন, সাইনবোর্ডটা পড়ার দৃশ্য...সঅব।
গুড। এসেছিলাম সাধারণ সাক্ষাৎকার নিতে, পেলাম চমৎকার একটা ঘটনা। অ্যাকশন। বিউটিফুল।
এক্সকিউজ মি, এক্সকিউজ মি বলতে বলতে কনুই দিয়ে গুতো মেরে পথ করে। সামনে এগোল কিশোর। পিটারের টুকরো টুকরো কথা কানে আসছে, কিন্তু তাকে দেখতে পাচ্ছে না। না না, আগে দেখিনি...ঠিকই আছি, কোন ক্ষতি হয়নি আমার...।
ভিড়ের কেন্দ্রে ঢুকে পড়ল কিশোর।
পিটারের পাশে বসে আছে নিতা। হাতে মাইক্রোফোন। একটা ক্যামেরার দিকে মুখ তুলে জিজ্ঞেস করল, আমাকে দেখা যায়?
যায়। শুরু করুন, জবাব দিল ক্যামেরাম্যান।
সঙ্গে সঙ্গে চেহারার ভঙ্গি বদলে গেল নিতার, শুরু হলো অভিনয়, প্রিয় দর্শকমণ্ডলী, আপনাদের চোখের সামনেই ঘটল ঘটনাটা। ওয়াইল্ড ওয়াইল্ড যে সত্যি বুনো, তার প্রমাণ পেয়ে গেলেন হাতেনাতে। দেখলেন কি করে বিশাল সাইনবোর্ডটা নেমে আসছিল পিটার হাইয়েমের ওপর। মাথা ফাটিয়ে দিচ্ছিল...।
মাথা? মুখ থেকে রক্ত সরে গেল পিটারের। আমার অতটা কাছে কিন্তু পড়েনি...
মাথা ঝাঁকাল নিতা। আপনার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি। ওরকম করে ভর্তা হতে কেউ চায় না। ধ্বংসপটা দেখিয়ে বলল সে, ওখানে গিয়ে একটা ক্লোজআপ নিলে কেমন হয়?
সেদিকে তাকিয়ে ঢোক গিলল পিটার। বলল, সরি, ড্রেসিং রুমে কাজ আছে আমার। উঠে দাঁড়িয়ে কিশোরের হাত চেপে ধরে টান দিয়ে নিচুস্বরে বলল, এসো। এমন ভঙ্গি করো, যেন তুমি আমার বডিগার্ড।
ওদের কাছে এসে দাঁড়াল মুসা। জনতার দিকে তাকিয়ে বলল, দয়া করে, এখন সরুন আপনারা। আমাদের কাজ করতে দিন।
লোকে ভাবল, সে থিয়েটারের লোক। নির্দেশ মানল।
ফিরে তাকিয়ে কিশোর দেখল, জিনা আসছে পেছন পেছন। তার পেছনে মুসা। রাস্তায় নেমে গেছে দু-জন ক্যামেরাম্যান, দুটো পুলিশের গাড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।
খোঁচা খোঁচা দাড়িওয়ালা মোটা এক লোক স্টেজের দরজা খুলে দাঁড়াল। পিটারকে জিজ্ঞেস করল, কোন চোটটোট লাগেনি তো?
না, লাগেনি।

মুসা আর কিশোরের দিকে সন্দিহান চোখে তাকাল মোটা লোকটা। পিটারকে আবার জিজ্ঞেস করল, এরা কারা?
আমার বন্ধু, হেসে বলল পিটার। কিশোরকে বলল, পৃথিবীর সবচেয়ে কড়া সিকিউরিটি গার্ডের সামনে দাঁড়িয়ে আছ তুমি। ওর নাম টোপাজ। অনুমতি না। থাকলে দেশের প্রেসিডেন্টকে ঢুকতে বাধা দেবে।
টোপাজের কঠিন চেহারায় এক চিলতে হাসি ফুটল। সরে ঢোকার জায়গা ছেড়ে দিল কিশোরদের। যাও।
থিয়েটারের ভেতর ঢুকল ওরা। বেশ নীরব। বাইরের কোলাহল ঢুকতে পারে না এখানে। পিটারের সঙ্গে ছোট একটা করিডর ধরে এগোল ওরা। বড় একটা কর্কবোর্ড ঝোলানো আছে দেয়ালে এক ইঞ্চি জায়গাও খালি নেই বোর্ডটায়। নোটিশ আটকে দেয়া হয়েছে পিন দিয়ে। ওটার পাশে টেলিফোন, অনেকগুলো ফোন নম্বর লেখা।
করিডরের শেষ মাথায় একটা আধখোলা দরজা। তাতে নাম লেখা নুরিখ টোপাজ। দরজার ভেতর দিকে একটা পেগবোর্ড থেকে ঝুলছে অনেকগুলো চাবি। টোপাজের অফিসের ডানে আরেকটা দরজা চলে গেছে স্টেজের দিকে।
দাঁড়ান, কিশোরদের সেদিকে নিয়ে যেতে দেখে পিটারকে ডাকল টোপাজ। ড্রেসিং রুমে লোক আছে। অচেনা কাউকে দেখলে খুশি হবেন না।
ফিরে তাকাল পিটার, কে?
মিস্টার কলিন আর মিস্টার রোম।
ও বলে কিশোরদের দিকে তাকাল পিটার। মিস্টার ডেভন কলিন হলেন প্রডিউসার, আর মিস্টার নরটন রোম মেইন ইনভেস্টর-এই থিয়েটারে সবচেয়ে বেশি টাকা খাটাচ্ছেন তিনি। আবার টোপাজের দিকে ফিরল সে। তো, তাদের সম্মানে কি করতে হবে? কিছু বলেছে নাকি তোমাকে? কণ্ঠস্বরে ঝাঁঝ।
তা বলেছে। গণ্ডগোল শুনে ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিলেন দু-জনেই। যখন দেখলেন আপনার কোন ক্ষতি হয়নি, বললেন, মেক শিওর হি গেটস হিয়ার ইন ওয়ান পিস।
তাই বলেছে, না? আমার জন্যে দেখি বড় দরদ, একেবারে দেখেশুনে রাখার হুকুম! স্টেজের দরজার দিকে ঘুরল পিটার। বেশ, দেখেই আসি কি সম্মান দেয়া যায়। খোলা তরোয়াল ঘোরাতে ঘোরাতে যেন দরজা দিয়ে ছুটে ঢুকে পড়ল সে।
কিশোরের দিকে তাকাল মুসা, চোখে বিস্ময়।
লাইনটা শেকসপীয়ারের, কিশোর বলল। যুদ্ধে যাওয়ার সময় রাজা পঞ্চম হেনরি বলেছিলেন তার লোকদের।
চমৎকার! ভোঁতা স্বরে বলল মুসা।

আরেকটা কথা ভাবছি, আনমনে যেন নিজেকেই বলল কিশোর, পিটারকে হুমকি দিয়ে লেখা চিঠিতে বলেছে: রক্তমাখা সিংহাসনে মৃত্যু হবে তার, এবং একটা বন এসে গিলে ফেলবে তাকে।
অদ্ভুত কথা! মাথামুণ্ড বোঝা যায় না।
যায়। আমার মনে হয় এটা কোন নাটকের সংলাপ থেকে নেয়া।
তাতে কি?
আমাদের প্রথম সূত্র।
তারমানে বলতে চাইছ চিঠির লেখক থিয়েটারের লোক? জিনার প্রশ্ন।
মনে হয়। দরজা দিয়ে ঢুকে স্টেজের পেছন দিকে ওদেরকে নিয়ে এগোল কিশোর।
ডানের বন্ধ দরজাটার ভেতরে ঢুকবে না, সাবধান করে দিল টোপাজ। স্টেজের কাছে যাবে না।
ডানে মোড় নিল কিশোর আলো তেমন নেই এখানটায়, অন্ধকার। ঝুড়ি বোঝাই কাপড়, টেবিলে রাখা যন্ত্রপাতি, আর একপাশে একটা নকল মোটরগাড়ি পড়ে আছে। বয়ে স্টেজ, স্পটলাইটের উজ্জল আলোয় আলোকিত।
এককোণে একটা দরজা। চকচকে একটা ধাতব তারা ঝুলছে ফ্রেমের ওপর থেকে। নিচে প্লাস্টিকের নেমপ্লেট, তাতে লেখা: পিটার হাইয়েম। কিশোর, মুসা আর জিনা এগিয়ে গেল ওটার কাছে। ভেতর থেকে শোনা গেল রাগত কণ্ঠস্বর।
খাইছে! ফিসফিস করে বলল মুসা, খুব রেগে গেছে মনে হয়। এত দুঃখ কিসের?
দেখে আসি, কিশোর বলল। তোমরা থাকো, চোখকান খোলা রাখো। পিটারের ঘরের দরজাটা দেখিয়ে বলল, ওরা বেরোলে আমাকে ডাকবে।
আচ্ছা।
টোপাজের নির্দেশ অমান্য করে স্টেজের দিকে এগোল কিশোর। চুপচাপ দেখল কাঠমিস্ত্রী, টেকনিশিয়ান আর মঞ্চশ্রমিকদের ছোটাছুটি। ইলেকট্রিক ড্রিল মেশিনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলছে ওয়াকিটকিতে চেঁচিয়ে কথা বলা।
হৃৎপিণ্ডের গতি দ্রুত হয়ে গেল কিশোরের। এই শব্দ, আলোর উষ্ণতা, সারি সারি সীটের বিশাল শূন্যতা রক্তে দোলা দিতে লাগল তার। সাধারণ জীবন যাত্রা এখান থেকে অনেক দূরে। এখানে, এই থিয়েটারের মধ্যে একদল পেশাদার শিল্পী মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছে একটা ফ্যান্টাসি তৈরির কাজে।
স্টেজের পেছনের মেঝে থেকে বিশাল এক দৃশ্যপট ধীরে ধীরে ওপরে উঠছে। দেখা যাচ্ছে গুহার দেয়াল-খোঁচা খোঁচা পাথরে বোঝাই, লুকানো আলো প্রতিফলিত হচ্ছে তাতে। বয়ে যাচ্ছে পাহাড়ী নদী। প্লাস্টার আর নানা উপকরণে তৈরি একটা অসাধারণ সৃষ্টি এটা, বুঝতে পারছে কিশোর। পেছনে দাঁড়িয়ে আছে

শ্রমিকেরা। দড়ি ধরে টেনে তুলছে জিনিসটা। অন্ধকারে এমন ভাবে আড়াল করা আছে দড়িগুলো, কিশোর যেখানে আছে সেখান থেকে দেখা গেলেও সীটে বসা দর্শকদের চোখে পড়বে না কোনমতেই। গুহার দৃশ্যটা ওপরে উঠে যেতেই বেরিয়ে পড়ল আরেকটা দৃশ্য।

সামনের পর্দার দিকে ঘুরল কিশোর। মিটমিট করা, ইলেকট্রিক আলো চোখে পড়ল তার। ভেতরের আরেকটা পর্দার ওপাশে রয়েছে বুক-সমান উঁচু কন্ট্রোল বোর্ড। তাতে অসংখ্য বোতাম, সুইচ আর একটা কম্পিউটার কীবোর্ড। তার ওপরে কাঠের তাকে দেয়ালের সঙ্গে আটকে রাখা হয়েছে একটা মনিটর। ওটার কাছে দেয়ালে হুকে ঝোলানো একসেট হেডফোন।

ডানে-বাঁয়ে দু-দিকেই তাকাল কিশোর। সবাই কাজে ব্যস্ত। এই সুযোগে কম্পিউটারটায় কি আছে দেখার লোভ সামলাতে পারল না সে। সবার অলক্ষে নিঃশব্দে এমিয়ে গেল বোর্ডের কাছে। স্ক্রীনে ইংরেজিতে লেখা:

ওয়াইল্ড! ওয়াইল্ড! ওয়াইল্ড!
গারবার থিয়েটার, লস অ্যাঞ্জেলেস
সাউন্ড, লাইট, অ্যান্ড ফ্রাই কিউজ
জে, বারনারডি, এসএম
জে, ইভারসন, এএসএম
১। লাইট এ কে রেইজেস হ্যান্ড।
২। সাউন্ড এ কে লাস্ট পারসন অন আর্থ!
৩। সাউন্ড সিগন্যাল ফ্রম অর্ক, কনডাকটর
৪। লাইট বয়েজ অ্যাট সেন্টার স্টেজ
প্রেস রিটার্ন টু কনটিনিউ
ইউজ কারসর টু হাইলাইট কিউ
এফ১: কমান্ড মেনু
এফ২: এডিট মেনু
এফ৩: অ্যাড লাইন
এফ৪: রেকর্ডার

কীবোর্ড নাড়াচাড়া শুরু করল কিশোর। রোল করে নিচ থেকে ওপরে উঠতে শুরু করল নি। বেরিয়ে আসতে লাগল মেনুর পর মেনু।

অ্যাই! হঠাৎ জোরাল কণ্ঠ হাঁক দিল পেছন থেকে।

ঝট করে কীবোর্ড থেকে উঠে চলে এল কিশোরের হাত। ঘুরে তাকাল সে।

এগিয়ে আসছে একজন তরুণ মঞ্চশ্রমিক। লম্বা লম্বা সোনালি চুল তার। রঙচটা ফ্যানেলের শার্টের হাতা গোটানো। বাহুতে উল্কি দিয়ে ছবি আঁকা।

সন্দেহে ভরা সবুজে চোখ ঘুরিয়ে ধমক দিল লোকটা, এখানে কি?
তাকিয়ে আছে কিশোর। বিড়বিড় করল, এই লোকই পিটারকে সাবধান করেছিল।
কি বললে?
বোর্ডটা পড়ার আগে চিৎকার করে আপনিই পিটারকে সাবধান করেছেন। চেহারাটা মনে আছে।
ভাল। এখন তোমার চেহারাটা এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলেই খুশি হব। কম্পিউটারে তোমার কোন কাজ নেই। স্টেজ ম্যানেজার নও তুমি।
মাথা ঝাঁকাল কিশোর, অস্বীকার করছি না। কম্পিউটার দেখলেই লোভ লাগে, খালি টিপতে ইচ্ছে কমে দাঁড়ান, আগের জায়গায় এনে দিই।
কম্পিউটারের দিকে আবার সে ঘুরতেই ভারি থাবা পড়ল কাঁধে। হ্যাঁচকা টানে সরিয়ে নিল পেছনে। কানের কাছে কঠিন কণ্ঠে বলল নোকটা, কিচ্ছু করার দরকার নেই তোমার। ভাগো!
আড়চোখে লোকটার হাতের দিকে তাকাল কিশোর। তেলকালি লেগে আছে আঙুলে। তার শার্টে লাগছে। কণ্ঠস্বর শান্ত রাখার চেষ্টা করল, দেখুন, আমার কথাটা আগে শুনুন…
কোন কথা শুনতে চাই না। আবার হ্যাঁচকা টান মারল নোকটা।
ঝাঁ করে কানে রক্ত উঠে গেল কিশোরের। আর ভদ্রতার ধার ধারল না। কঠিন কণ্ঠে বলল, হাত সরান?
দাঁত বের করে হাসল লোকটা, আরি, আবার রাগও করে! জোরে এক ধাক্কা মারল সে। ছেড়ে দিল কাঁধ।
হুমড়ি খেয়ে পড়েই যাচ্ছিল কিশোর, কোনমতে সামলাল। ফিরে তাকিয়ে দেখল হাসছে লোকটা। এগিয়ে আসছে।
রুখে দাঁড়াল সে। বলল, আর এক পা এগোবেন না।
হাসি আরও বাড়ল লোকটার। এগিয়ে আসছে। ধরে ফেলল কিশোরকে।
জুডোর প্যাঁচ কষল কিশোর।
লাভ হলো না। লোকটাও জুড়ো জানে। কিশোরের চেয়ে ওস্তাদ। মাথার ওপর দিয়ে ছুঁড়ে দিল তাকে।
থ্যাপ করে কাঠের মেঝেতে আছড়ে পড়ল কিশোর।

.

খালি মেঝেতে পড়লে ব্যথা পেত। শরীরের অর্ধেক পড়ল মেঝেতে, অর্ধেক দড়ির বান্ডিলের ওপর। আরও কণ্ঠস্বর কানে এল তার। পদশব্দ ছুটে আসছে।
সবার আগে পৌঁছে গেল লোকটা।

শেষ মুহূর্তে ঝটকা দিয়ে মাথা সরিয়ে নিল কিশোর। নইলে বুটের লাথি পড়ত মাথায়।
এই নিরু, কি করছ? বলে উঠল আরেকটা নতুন কণ্ঠ।
ফিরে তাকিয়ে কিশোর দেখল, লম্বা একজন লোক। মাথা ভরতি সাদা চুল। গায়ে জু-নেক সোয়েটার, পরনে খাকি প্যান্ট। কোটরে বসা চোখ। অবাক হয়েছে যে বোঝা যায়। পেছনে মুসা আর জিনা।
হাত ধরে কিশোরকে টেনে তুলল মুসা। ব্যথা পেয়েছ?
না, গায়ের ধুলো ঝাড়তে লাগল কিশোর। তবে সময়মত তোমরা না এলে। কি হতো বলা যায় না। এই যে মিস্টার নিরুটি, ইনি একজন মোষ...
নিরু, ধমক দিয়ে বললেন লম্বা ভদ্রলোক, এ সব আর কক্ষনো করবে না। যদি চাকরি করতে চাও এখানে।
আসলে...আমি...ও কম্পিউটারটা ঘাটতে লাগল...
তাই বলে গায়ে হাত তুলবে? জিজ্ঞেস করতে পারতে, টোপাজকে বলতে পারতে, তোমাকে মাতব্বরি করতে কে বলেছে? জানো, ও পিটারের বন্ধু? যাও, কাজে যাও।
চলে গেল নিরু।
হাত বাড়িয়ে দিলেন ভদ্রলোক, ভিনসি জাপা, স্টেজ ম্যানেজার।
কিশোরও হাত বাড়াল। শুরু থেকেই লক্ষ করছে, উচ্চারণ কিছুটা অন্যরকম ভদ্রলোকের; যেমন আর উচ্চারণ করতে গিয়ে কখনও বলেন আউ, কখনও আহ্। ম্যানেজারকে উচ্চারণ করলেন ম্যানেজাহ। জিজ্ঞেস করল কিশোর, আপনার বাড়ি কি নিউ ইয়র্ক সিটিতে?
অবাক হলেন ম্যানেজার, ব্রুকলিন। লং আইল্যান্ড। কি করে বুঝলে?
উচ্চারণ। মোষের কবল থেকে আমাকে বাঁচানোর জন্যে ধন্যবাদ।
ও কিছু না। নিরু আবার কোন শয়তানি করলে আমাকে বলবে।
আসলে দোষ আমারও আছে। না বলে কম্পিউটার ধরা উচিত হয়নি। আসলে কৌতূহলটা ঠেকাতে পারিনি...
হাসলেন জাপা। আর কোন কৌতূহল আছে? ঘুরে দেখতে চাও জায়গাটা?
হ্যাঁ, মন্দ কি?
মুসার দিকে তাকাল কিশোর। চোখে চোখে কথা হয়ে গেল। বুঝল মুসা, বলল, তোমরা যাও। আমার হাঁটতে ইচ্ছে করছে না। আমি বরং এটা দেখি। একটা টেবিলে রাখা স্পোর্টস ম্যাগাজিন টেনে নিল সে। পিটারের দরজার দিকে নজর রাখতে হলে এখান থেকে সরা চলবে না।

ম্যানেজারের সঙ্গে চলল কিশোর আর জিনা। কিশোর ভাবছে, এই নিরু লোকটা কে? পিটারের প্রাণনাশের চেষ্টায় কি তারও হাত আছে? সেজন্যেই সাইনবোর্ডটা পড়ার সময় ক্রেনের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল? তাকে দেখেই বা এত রেগে উঠল কেন?
দু-জনকে নিয়ে স্টেজে উঠে এলেন ম্যানেজার। বললেন, ওয়াইল্ড ওয়াইল্ড আসলেই একটা বুনো শো। গল্পটা হলো, কয়েকজন আমেরিকান তরুণ, মার্শাল আর্টের ছাত্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানে আটকা পড়েছিল। তাদের নেতার অভিনয় করবে তোমাদের বন্ধু পিটার। পালানোর চেষ্টা করতে গিয়ে জড়িয়ে পড়বে এক গুপ্তচর সংস্থার সঙ্গে। পুরানো মন্দির, গুহা, এ রকম অনেক জায়গার মধ্যে লুকাতে হবে তাকে।
সাংঘাতিক ব্যাপার! জিনা বলল।
কয়েকজন শ্রমিক একটা সেট সাজাচ্ছে। দুটো সোফা, একটা কালো টেবিল, তার ওপর একটা টেলিফোন রাখা। মাথায় হেডসেট পরা একজন লোক ফোনে কথা বলছে। আরেকজন পায়চারি করছে, একবার এদিক যাচ্ছে, একবার ওদিক। একটা ব্যালকনিতে গিয়ে উঁকি দিল। তার পেছনে একটা দৃশ্যপট, লিভিং রুমের দেয়াল তৈরি করা হয়েছে, তাতে একটা বুককেস।
সহজ সেট, কিশোর বলল। এত লোক কি করছে?
যতটা সহজ দেখছ ততটা নয়, ম্যানেজার বললেন। এত সাধারণ একটা সেট চালাতেও ষোলোজন লোক লাগে।
ষোলো! অবাক হলো জিনা। মাত্র একটা লিভিং রুমের জন্যে?
হেসে উঠলেন জাপা। হ্যাঁ। একজন লোক মাত্র একটা কাজই করে, যেমন যে আসবাব সেট করে সে কেবল সেটাই করে; ল্যাম্প, ফোন যে নাড়াচাড়া করে, তার সেটাই একমাত্র কাজ। আর কোন কাজ করতে দেয়া হবে না তাকে। তাতে জটিলতা বাড়ে। ভুল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। প্রতিটি কাজের জন্যে আবার এক্সট্রা নোক রাখতে হয়, কোন কারণে একজন যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে কিংবা অন্য কিছু ঘটে তার, আসতে না পারে, তখন কাজ চালানোর জন্যে। বুঝলে কেন এত লোক লাগে?।
শিস দিয়ে উঠল কিশোর। শো-র সময় এত লোক একসঙ্গে কাজ করে কি করে? যোগাযোগ রাখতে গিয়ে গোলমাল হয়ে যায় না?
প্রশ্নটা তাহলে করেই ফেললে। দাঁড়াও, কন্ট্রোল বোর্ডটা দেখাই, তাহলে আন্দাজ করতে পারবে। এখন আর নিরু তোমাকে বিরক্ত করতে আসবে না।
স্টেজের ওপাশ থেকে ভেসে এল ভারি একটা কণ্ঠ, টার্নটেল নড়ছে!
দাঁড়াও, দাঁড়াও! তাড়াতাড়ি হাত তুললেন জাপা। মেঝেতে খাঁজকাটা বিশাল এক গোল চক্রের মধ্যে জিনা আর কিশোরকে নিয়ে এলেন তিনি। টেকনিশিয়ানের

দিকে তাকিয়ে বললেন, এবার চালাও।
ধীরে ধীরে ঘুরতে শুরু করল চক্রটা। লিভিং রুমকে ওপরে সরিয়ে দিল। বেরিয়ে পড়ল আরেকটা সেট।
কন্ট্রোল বোর্ডের কাছে গিয়ে মনিটরের সামনে একটা টুল রাখলেন জাপা। শো-র সময় এখানে থাকি আমি, হেডফোন পরে। স্টেজের পেছন দিকে যারা থাকে, তাদের জন্যে নির্দেশ ঢোকানো থাকে কম্পিউটারে। মনিটরে লেখা ফুটতে। থাকে আর দেখে দেখে তাদের যার যার কাজের কথা বলতে থাকি আমি। এ ধরনের সিগন্যালকে আমরা বলি কিউ। এই যেমন, শব্দ আর আলো ঠিক করার ভার যাদের ওপর, তাদের হয়তো বললাম লাইটস থার্টি ফাইভ, গো। দৃশ্যপট যারা ওঠায়-নামায় তাদের কিউ করি টর্চলাইট দিয়ে। কিউর কয়েক সেকেন্ড আগে সাবধান করার জন্যে আলো জ্বালি একবার। রেডি থাকে শ্রমিকেরা। সঙ্কেত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাজ শুরু করে দেয়।
আর কম্পিউটার নিশ্চয় নির্দেশ বদল করতে কিংবা নতুন করে সাজাতে সাহায্য করে আপনাকে, কিশোর বলল।
আমাকেই করে, মাথা ঝাঁকালেন জাপা, তবে ডাটাগুলো আমি ঢোকাই না। আরেকজন লোক আছে, সে এসে করে রেখে যায়। স্টেজ ম্যানেজারের দায়িত্ব হলো স্ক্রিপ্ট অনুযায়ী কাজ করা। কিন্তু এই শো-র মত এত জটিল একটা শো-র জন্যে শুধু স্ক্রিপ্ট যথেষ্ট নয়, কম্পিউটার সেট আপ দরকার। আমার জন্যে সব কিছু প্রোগ্রামিং করে দিয়ে যায় একজন ওস্তাদ কম্পিউটার প্রোগ্রামার।
এত জটিল?
হ্যাঁ, এত জটিল। একটু এদিক ওদিক হয়ে গেলেই গেল। দেখা যাবে বসার ঘরে ঢুকে পড়েছে মোটরগাড়ি, দিনের বেলার দৃশ্যে হয়ে যাবে-রাতের অন্ধকার...
মনিটরের লেখা পড়ে নির্দেশ দেন আপনি। যদি সেখানে ভুল লেখা থাকে এবং ধরতে পারেন, তাহলে নিশ্চয় ঠিকটা দেবেন?
তা তো বটেই। তবে ধরাটা বড় কঠিন...
জোরে জোরে কাশল মুসা।
কিশোর ফিরে তাকাতেই ইশারা করল।
ম্যানেজারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সেদিকে রওনা হলো কিশোর আর জিনা। কাছে যেতেই মুসা বলল, ভেতরে তো মনে হচ্ছে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে।
ফিরে তাকিয়ে দেখল কিশোর, ম্যানেজারকে দেখা যাচ্ছে না। গিয়ে কান পাতল ড্রেসিং রুমের দরজায়।
প্রথম কণ্ঠটা জোরাল, খানিকটা খসখসে, আবার বিশ্বাস করতে বলছ কি করে? একবার শয়তানি করে বললে আর করবে না, বিশ্বাস করলাম। কিন্তু আবারও

করলে, উইকএন্ডে চলে গেলে ইয়োসিমাইটে। তারপরেও বলছ…
এ নিয়ে বহুবার আলোচনা হয়েছে, মিস্টার কলিন, পিটারের কণ্ঠ। মাঝে মাঝে কোনখান থেকে ঘুরে আসা ভাল, আপনিই বলেছেন…
তাই বলে পাহাড়ে চড়তে বলেছি? যখন জানো, নেতার অভিনয় করার জন্যে এই শো-তে আর কেউ নেই? যদি তোমার পা ভাঙত, কিংবা গোড়ালি মচকাত, কি অবস্থাটা হত! এমন সময় করলে কাণ্ডটা যখন টিকিট বিক্রি হতে আরম্ভ করেছে।
ভারি একটা কণ্ঠ বলল, দুই হপ্তা বন্ধ রাখায় অনেক লস হয়েছে আমাদের। দর্শক গেছে খেপে। টিকিটের দাম ফেরত দিতে হয়েছে, আরও নানা রকম গচ্চা। তারপরেও মুক্তি পাইনি খবরের কাগজওলাদের হাত থেকে। ওদের কুনজরে পড়েছি তো পড়েছিই, ভাল হওয়ার আর নাম নেই। আমি বাবা আর এর মধ্যে টাকা ঢালতে রাজি নই। যা যাওয়ার গেছে, লাভের আশা বাদ দিয়ে এখন লোকসান বাঁচানোর চেষ্টা করব।
আর ওসব বলে লাভ নেই, রোম, কলিন বললেন। অনেক দূর এগিয়ে গেছি, এখন আর শো বন্ধ করা যাবে না কোনমতে। দুনিয়াতে একজনই তো নেই, আরও লোক আছে…
আর্ট টিলারিকে আমার জায়গায় নেয়ার কথা ভাবছেন তো? বলে উঠল পিটার। সাংঘাতিক ট্যালেন্টেড অভিনেতা…এ কথাই বলতে এসেছেন আমাকে? তাহলে কানাঘুষাটা সত্যি, আমি ভাবছিলাম কিছু না।
ইয়ে… দ্বিধা করলেন রোম, আমরা চাই টিকেট বিক্রি।.
দীর্ঘ এক মুহূর্ত নীরব থাকার পর পিটার বলল, মিস্টার রোম, টাকাটা আপনার। আপনি ইচ্ছে করলে ওয়াইল্ড ওয়াইল্ড ভেঙে দিতে পারেন, কিংবা টিকিয়ে রাখতে পারেন। সুতরাং কাকে দিয়ে কাজ করাবেন, সেটাও আপনার ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপরই নির্ভর করে। আনুন টিলারিকে। দামী আর্টিস্ট আনার ঠেলা কাকে বলে বুঝবেন তখন। নিজের প্রশংসা করি না, তবু বলতে বাধ্য হচ্ছি, আমাকে বাদ দেয়ার ফল ভাল হবে না আপনাদের জন্যে।
তোমাকে রেখেই বা আমাদের কি লাভ? কলিন বললেন। পরের উইকএন্ডে তো আবার পালাবে।
আমার ব্যাপারে আপনার কি রকম ধারণা হয়েছে বুঝতে পারছি, মিস্টার কলিন। কিন্তু এই নাটকের জন্যে আমি নিবেদিত। এখনও লোকে তেমন করে চেনে না আমাকে, নাম ছড়ায়নি, কিন্তু নাটকটা দেখার পর ছড়াতে দেরি হবে না। লোকে তখন আমার সঙ্গে সঙ্গে আপনার কথাও বলবে; বলবে, আপনিই আমাকে খুঁজে বের করেছেন।

পিটারের পক্ষে কথা বলে উঠতে ইচ্ছে করল কিশোরের। পরের কথাগুলো শোনার জন্যে আরও জোরে কান চেপে ধরল দরজায়।
আমার মনে হয়, ব্যাপারটা নিয়ে পরে আরেকবার আলোচনায় বসতে পারি আমরা, খানিকটা নরম হলেন কলিন, মাথা ঠাণ্ডা হলে।
চেয়ার ঠেলার শব্দ হলো। তাড়াতাড়ি দরজার কাছ থেকে সরে এল কিশোর, মুসা আর জিনা। শুনতে পেল পিটার বলছে, আরেকটা কথা মনে করিয়ে দিতে চাই, আমার সঙ্গে যে চুক্তি হয়েছে তাতে লেখা আছে কোন কারণে যদি আমাকে বাদ দেয়া হয়, তাহলেও আমার বেতন ঠিকই দিতে হবে। টিলারিকে নিলে দু-জনের বেতন দিতে হবে আপনাকে। বিরাট অঙ্কের টাকা। যতদিন নাটকটা চলবে, টাকা দিতে হবে আমাকে।
রোমের ঝাঁঝাল কণ্ঠ শোনা গেল, কলিন, কি বলে? এ কথা তো আমাকে বলোনি তুমি?
চুপ করে রইলেন কলিন।
মৃদু হাসি শোনা গেল পিটারের। এতগুলো টাকা বাঁচাতে হলে হয় আমাকে দিয়েই অভিনয় করাতে হবে, নয়তো আমাকে মেরে ফেলতে হবে।
পায়ের শব্দ, রাগত ঘোৎ-ঘোঁতের পর ঝটকা দিয়ে খুলে গেল দরজা।
জিনা আর মুসা ম্যাগাজিন পড়ার ভান করল। টেবিলে রাখা জিনিসপত্র নাড়াচাড়া করতে লাগল কিশোর। দরজা খুলে তোক বেরোচ্ছে, তাতে যেন কিছু এসে যায় না তার।
তবে পেটের মধ্যে বিশ্রী একটা অনুভূতি হচ্ছে। মেরে ফেলার কথাটা এভাবে কলিন আর রোমের সামনে বলে ফেলাটা বোধহয় উচিত হয়নি পিটারের!

.

নিজের বিপদ নিজেই ডেকে আনছে, বিড়বিড় করল কিশোর।
মানে? বুঝতে পারল না মুসা।
কলিন আর রোমের সঙ্গে পিটারের কথা কাটাকাটির খানিক পর সেলুনের বাইরে কথা বলছে দুই গোয়েন্দা। ভেতরে দাঁড়িয়ে পিটারের চুল কাটা দেখছে। জিনা। যে লোকটা কাটছে তার নাম বব রডম্যান।
কিশোর বলল, কেউ একজন পিটারের পেছনে লেগেছে। মেরে ফেলার হুমকি দিচ্ছে নানা ভাবে। আজ আরেকটু হলে আমাদের চোখের সামনেই শেষ হয়ে যাচ্ছিল সে।
তাতে নিজের বিপদটা ডেকে আনল কোথায়? এখনও বুঝতে পারছে না মুসা।
কেন, শুনলে না কলিন আর রোমকে নিজেই বলেছে তাকে মেরে ফেললে ল্যাঠা চুকে যায়?

সে তো রসিকতা।
কিন্তু রসিকতাটাকেই যদি সিরিয়াস ধরে নেয়া হয়? পিটার মরে গেলে তাদের লাভ আছে। সুতরাং সন্দেহের তালিকায় দু-জনের নাম যোগ হলো।
হুঁ।
সেলুনে চুল কিশোর।
চুল কাটতে কাটতে জিনাকে বলল বব, খুব সুন্দর তোমার চুল। এমন করে সাজিয়ে দিতে পারি মঙ্গল গ্রহের ছেলেরাও ঝাঁক বেঁধে লাগবে তোমার পেছনে।
লাল হয়ে গেল জিনার গাল।
তোমার বকর বকর বাদ দাও তো, ব, পিটার বলল। ভিনগ্রহ ছাড়া আর কিছু বোঝো না?
চোখ ওল্টাল বব, ভিনগ্রহ বাদ দিতে হলে মহাকাশকে বাদ দিতে হয়। আমাদের অস্তিত্ব তাহলে থাকল কোথায়? ওখান থেকেই তো এসেছি আমরা…
তুমি এসেছ, আমি নই!
কাঁচি চালানো বন্ধ করে ফেলল বব। পিটারের ঘাড়ে লেগে থাকা কাটা চুল ব্রাশ দিয়ে চেচে নিচের কাপড়ে ফেলল। সুন্দর কাটা হয়েছে। এত তাড়াতাড়ি আর কেউ পারবে না।
নাপিতের চেয়ার থেকে নেমে এল পিটার। কিশোরদের দিকে তাকিয়ে বলল, খুব খিদে পেয়েছে। চলো কিছু খেয়ে আসি। সাড়ে সাতটা বাজতে এখনও প্রায় দেড় ঘন্টা বাকি।
ভাল কথা মনে করেছেন, হেসে বলল মুসা।
তারমানে আমাদের চ্যানেলে আসছ না তুমি? কিছুটা হতাশ কণ্ঠেই পিটারকে জিজ্ঞেস করল বব।
তোমাদের কিসে?
ভুলে গেছ? শো-র আগে কয়েকজন অভিনেতা আমার ওখানে আসছে। আধঘণ্টার জন্যে একটা অনুষ্ঠান হবে। আমাদের চ্যানেলে পৌঁছার চেষ্টা করব আমরা, অতীত জীবনের সঙ্গে যোগাযোগ করব..
মুখ বাঁকাল পিটার, অনেক ধন্যবাদ তোমাকে, বব। অতীত জীবনের চেয়ে একটা চীজবার্গারের সঙ্গে যোগাযোগ করতেই এখন বেশি ভাল লাগবে আমার।
সেলুন থেকে বন্ধুদের বের করে নিয়ে গেল পিটার। ফিরে তাকালে দেখতে পেত রহস্যময় হাসি ফুটেছে নাপিতের ঠোঁটে।
সিঁড়ি দিয়ে পিটারের ড্রেসিং রুমে নেমে এল গোয়েন্দারা। এই প্রথম ভাল করে ঘরটা দেখার সুযোগ পেল কিশোর। দেয়াল জুড়ে বিশাল বিজ্ঞাপন করা হয়েছে। পিটার হাইয়েমের–খবরের কাগজের কাটিং, প্রেস রিলিজ, বাঁধাই করা সাদা

কালো ছবি, ভক্তদের চিঠি সাটিয়ে রাখা হয়েছে। সবখানে ছড়িয়ে আছে পিটারের বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে ভোলা হাসিমুখ।
বাহ, খুব বিখ্যাত লোক মনে হয় আপনি, মুসা বলল।
টান দিয়ে গায়ের শার্টটা খুলে ফেলল পিটার। কাটা চুল লেগে আছে তাতে। কাপড়ের র‍্যাক থেকে আরেকটা শার্ট নিয়ে পরতে পরতে বলল, থিয়েটারের লোকের কাছেই শুধু পরিচিত। তা-ও নিক ফ্লিন্টকে কাজে লাগানোয়। এই লাইনে সবচেয়ে ভাল এজেন্ট সে।
পিটার, শোনো, প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল কিশোর, একটু আগে প্রযোজকদের সঙ্গে তোমার কথা কাটাকাটিটা শুনে ফেলেছি আমরা।
একটা সানগ্লাস পরল পিটার। চলো, বার্গার ব্রিসটোতে খেতে যাব। ওখানেই আলাপ করা যাবে। এই জায়গাটায় দম আটকে আসছে আমার।
দরজার বাইরে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল। কাঁধে ক্যানভাসের ব্যাগ ঝুলিয়ে নেমে যাচ্ছে কয়েকজন অভিনেতা। পিটারকে দেখে হাত নাড়ল।
রলিকেও দেখা গেল ওদের মাঝে। কালো চোখ নাচিয়ে পিটারকে বলল, ববের ওখানে যাবে না?
তোমাকেও পটিয়ে ফেলেছে নাকি?
হাসল রলি, ভালই লাগে। উদ্ভট সব কাণ্ড করে বব। আমরা কল্পনা করে নিই নানা রকম শব্দ শুনছি। বেশ মজা পাই। আসতে পারো, তোমারও খারাপ লাগবে না।
আমার খিদে পেয়েছে।
ও, এ জন্যে যাবে না? এটা একটা সমস্যা হলো? কাঁধের ব্যাগ নামিয়ে জিপার খুলল রলি। ভেতর থেকে বের করল প্লাস্টিকের বড় একটা পোটলা। বার্গার বের করে দিল।
দ্বিধা করল পিটার। বন্ধুদের দিকে চেয়ে বলল, তোমরা কি বলো?
তাজা বনরুটি আর গরুর মাংসের বড়ার সুগন্ধ যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল নাকে। হাত বাড়াতে গিয়েও সামলে নিল কিশোর, অনেক কষ্টে নিরস্ত করল নিজেকে। শরীরটাকে পিপে বানিয়ে সারাক্ষণ কষ্ট পাওয়ার চেয়ে খাবারের কষ্ট ভাল। মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, তা যাওয়া যায়। নতুন একটা জিনিস দেখতে পাব, অসুবিধে কি?
বার্গার নিতে মুহূর্ত দ্বিধা করল না মুসা, কিন্তু ববের ওখানে যাওয়ার কথা ভাবতেই থমকে গেল, অতীত জীবন! ভূতুড়ে কোন ব্যাপার নয় তো?
তার দিকে তাকাল রলি। বুঝতে পারল না।
জিনা বলে দিল, ভূতকে ভীষণ ভয় পায় মুসা।

.

ও, হাসল বলি। না না, ভূতপ্রেত নেই ওখানে। গ্যারান্টি দিতে পারি।

রলি ভূত নেই বললেও পুরো ব্যাপারটা ভূতুড়েই মনে হলো মুসার কাছে।
পিটারের গাড়িকে অনুসরণ করে ছোট একটা দোতলা বাড়ির পার্কিং স্পেসে গাড়ি ঢোকাল কিশোর। পিকআপটা না নিলেও চলত, এক গাড়িতেই জায়গা হয়ে যেত সকলের, কিন্তু বার্গারের লোভ যদি শেষ পর্যন্ত সংবরণ করতে না পারে এই ভয়ে খাবারওয়ালা গাড়িতে গেলই না সে।
সদর দরজায় দাঁড়িয়ে আছে বব রডম্যান। ঘন ভুরুর নিচে তার দৃষ্টি কেমন বদলে গেছে, নাপিতের দোকানে চুল কাটার সময় যেমন ছিল তেমন নয়, যেন বহুদূরে কোথাও তাকিয়ে আছে। স্বাগত জানাল, জুতো খুলে ঢোকো, অনেক যত্ন করে মেঝে পরিষ্কার করেছি, এই বলে।
বাইরে জুতো খুলে রেখে শুধু মোজা পরে লম্বা, সরু একটা করিডর ধরে এগোল কিশোর, মুসা আর জিনা। শেষ মাথায় ছোট, জানালাবিহীন একটা ঘর। ঢোকার মুখে টেবিলে রাখা একটা আলোকিত টেবিল ল্যাম্পকে মোটা কাপড় দিয়ে ঢেকে ছায়াঘন পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে। অদ্ভুত সব চাট ঝোলানো দেয়ালে। গ্রহ-নক্ষত্র আর এমন সব চিহ্ন ও নকশা আঁকা, কিছুই চিনতে পারল না কিশোর। শেকসপীয়ারের একটা শ্বেত পাথরের মূর্তির নিচে একটা পিয়ানো পড়ে আছে।
ঘরের মাঝখানে একটা পুরানো কার্পেট। সেটাতে হাত ধরাধরি করে গোল হয়ে বসেছে অভিনেতারা। চক্রের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে দরজার কাছে বসল বব। তার পাশে বসতে ইশারা করল কিশোর, মুসা ও জিনাকে।
ওরা বসলে অনুষ্ঠান শুরু করল বব। মাপা মাপা নরম গলায় বলল, চোখ বন্ধ করো সবাই নিজেদেরকে পাত্র তৈরি করো চারপাশের শক্তিদের জন্যে।
শিউরে উঠল মুসা। জিনার কাছে মনে হলো হাস্যকর। কিশোর বোঝার চেষ্টা করল কি বলতে চাইছে নাপিত।
কণ্ঠরা আজ এসেছিল আমার কাছে, বব বলছে। ওরা বলেছে তোমাদের কোন একজনের জন্যে আজ রাতে একটা দরজা খোলা থাকবে। এমন একটা দরজা যা শত শত বছর ধরে লুকানো রয়েছে। কার কথা বলছে জিজ্ঞেস করেছিলাম, বলেনি। দরজাটা কোন ধরনের জীবনে নিয়ে যাবে তা-ও জানতে চেয়েছি, নীরব থেকেছে ওরা।
নাক টানল একজন অভিনেতা। এই আজব পরিবেশে শব্দটা অবাস্তব লাগল।
আবার কথা বলল বব, বেশ ভারি একধরনের ফিসফিস শব্দ, অনেক যন্ত্রণা, বার বার বলেছে ওরা, তবে সবশেষে কাটবে মহাভার, হালকা হবে শরীর।
খাওয়ার ব্যাপারে সাবধান থাকলে শরীরের ওজন কমে গিয়ে শেষ পর্যন্ত হালকা হবেই, ভাবল কিশোর। অনুভব করল, তার দু-পাশের লোকের ধীরে ধীরে দুলতে আরম্ভ করেছে। গুঞ্জন করতে লাগল দুটো কণ্ঠ।

তাদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বব বলল, কিজার কথা ভাবো…ধীরে… খুলছে…।
ভূতের ভয় দূর হয়ে গেছে মুসার। ভাবল, তার টয়োটা করোলার দরজা খুলছে। ধীরে ধীরে। পিটম্যান আর্মটা লাগাতে কত সময় লাগবে?
ওই যে… বব বলল, নতুন একটা পরিবর্তন টের পাচ্ছ, বাতাস হঠাৎ করে বদলে গেলে যেমন অনুভূতি হয়?
আর সহ্য করতে পারল না একজন অভিনেতা, হেসে ফেলল। শশশ করে। তাকে থামতে বলল আরেকজন। বব নয়, অন্য কেউ, বুঝতে পারল কিশোর। ওই লোক বোধহয় পুরো ব্যাপারটাই বিশ্বাস করছে। অনেকেই হয়তো করছে, কে জানে!
এখন… বব বলল, দুলতে দুলতে ঢুকে পড়ো নিজেদের গভীরতম সত্তার ভেতরে…আমরা যখন দুলছি, তখন অদৃশ্য শক্তির পরিমাণ বাড়ছে, আগন্তুককে বের করে দেয়া হবে…
দুলতে শুরু করল কিশোর। শান্ত থাকো, নিজেকে বোঝাল সে, জোরাল অটো সাজেশন দেয়ার মত কোন ব্যাপার ঘটছে। ইচ্ছে করলে যোগ দিতে পারো, না করলে…
হ্যাঁ… উত্তেজনায় গলা আটকে আসতে চাইছে ববের, আমার বিশ্বাস ওটা এখানেই আছে…আমার বিশ্বাস তোমাদের মধ্যেও একজন সেটা অনুভব করতে পারছ…হ্যাঁ
পরক্ষণে ঘোর অন্ধকারে ঢেকে গেল ঘরটা। চোখ বোজা অবস্থাতেও সেটা বোঝা যাচ্ছে। নিভে গেছে বাতিটা।
তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার চিরে দিল নীরবতা। থ্যাপ করে কার্পেটের ওপর পড়ল ভারি কিছু।
আপনাআপনি খুলে গেল তার চোখ। চেঁচিয়ে বলল, আলো কই, আলো!
অন্ধকারে নড়াচড়া, দেয়ালে নখ ঘষার শব্দ।
মুসার হাত আঁকড়ে ধরল জিনা।
খাইছে!…কে-ক্কে… তোতলাতে শুরু করল মুসা।
মাথার ওপরে আলো জ্বলে উঠল।
চিৎ হয়ে পড়ে আছে পিটার। চোখ বোজা। কপালের পাশে লাল দাগ।
তার মাথার কাছে পড়ে আছে উইলিয়াম শেকসপীয়ারের মূর্তিটা।

.

না, লাগবে না, ঠিকই আছি আমি, আস্তে করে ববের হাতটা ঠেলে সরিয়ে দিল। পিটার। তার কপালে ভেজা কাপড় রাখতে যাচ্ছিল নাপিত। মূর্তির বাড়িতে কপাল কাটেনি তার, তবে ব্যথাটা জোরেই লেগেছে। ফুলে গেছে। লালচে রঙটা বেগুনী হয়ে যাচ্ছে দ্রুত।

হাসপাতালে ফোন করি, রিসিভার তুলে নিল মুসা।
না। প্রায় চিৎকার করে উঠল পিটার।
থমকে গেল মুসা।
কিশোরের দিকে তাকাল পিটার, আজ রাতের শো আমি কিছুতেই মিস করতে পারব না! বিপদে পড়ে যাব!
কলিন আর রোমের সঙ্গে পিটারের কথা কাটাকাটির কথা মনে করল কিশোর। বুঝতে পারল, নাটক থেকে তাকে বের করে দেয়া হবে এই ভয় পাচ্ছে সে। সেটা অন্য কেউ বুঝে ফেলার আগেই তাড়াতাড়ি ভিন্ন প্রসঙ্গে চলে গেল কিশোর, কি করে পড়ল? টেবিলের ওপর গিয়ে পড়েছিলে নাকি?
কপালের আহত জায়গা ডলল পিটার। না, চোখ বন্ধ করে বসে ছিলাম। হঠাৎ পড়ল মাথার ওপর।
মূর্তিটা আবার আগের জায়গায় তুলে রাখতে রাখতে জিনা বলল, অনেক ভারি। ব্যথা সেই তুলনায় কমই পেয়েছেন।
হাসার চেষ্টা করল পিটার, আমার মা বলত, আমার নাকি লোহার মত কপাল।
আরেকজন অভিনেতা বলল, পড়ল কি ভাবে? টেবিলের কিনারে বসানো ছিল নাকি? হয়তো অদৃশ্য শক্তিরা আসার ফলে ঘরের বাতাসে যে কাঁপুনি উঠেছিল…
হাত তুলে থামিয়ে দিল তাকে কিশোর। টেবিলের কিনারটা দেখছেন না কেমন উঁচু করে তৈরি? তুফান এলেও মূর্তিটা পড়ার কথা নয়।
দরজা দিয়ে মনে হয় প্রেতাত্মাকে আসতে দেয়া উচিত হয়নি, রলি বলল। না দেখে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে।
হালকা হাসি শোনা গেল।
কিন্তু রসিকতায় কান দিল না বব। গম্ভীর মুখ করে তাকাল পিটারের দিকে। রহস্যময় কণ্ঠে বলল, তোমার বেলায় কেন এটা ঘটল আশা করি বুঝতে পেরেছ।
ক্ষণিকের জন্যে পিটারের চোখের তারায় ভয় ফুটতে দেখল কিশোর। জোর করে হাসার চেষ্টা করল অভিনেতা, চোখ সরিয়ে নিল আরেক দিকে।
আরেকজন অভিনেতা জিজ্ঞেস করল, কিসের কথা বলছ, বব?
হ্যাঁ, কিসের কথা বলছে?-কিশোরও ভেবে অবাক হলো। একা পেলে জিজ্ঞেস করতে হবে পিটারকে।
ঘড়ি দেখল বব। আজ আর সময় নেই। অনুষ্ঠানটা আরেক দিন করা যাবে।
হ্যাঁ, উঠে দাঁড়াল পিটার। অন্তত আধডজন বন্ধু আর সহকর্মী তাকে সাহায্য করতে চাইল। কিন্তু কারও সাহায্য না নিয়ে একাই ধীরে ধীরে এগোল দরজার দিকে।

থিয়েটারের লোকেরা পিছু নিল তার। মুসা আর জিনাকে নিয়ে রয়ে গেল কিশোর। ববকে অনুরোধ করল, একটু পরীক্ষা করে দেখি ঘরটা?
কাঁধে ভারি ব্যাগ তুলে নিল বব। বাতির সুইচের কাছে দাঁড়িয়ে বলল, নাহ্, এখনি বেরিয়ে যেতে হবে। খুব শক্তিশালী অদৃশ্য উপস্থিতি টের পাচ্ছি আমি। এটাকে এভাবেই থাকতে দেয়া উচিত।
কিন্তু...
কিশোর কথা শেষ করার আগেই কিট করে সুইচ টিপে আলো নিভিয়ে দিল বব।
অন্ধকারে মাথা নাড়ল কিশোর। তদন্তটা করতে দেয়া হলো না বলে নিরাশ হয়েছে।

.

সাড়ে সাতটায় স্টেজের দরজা দিয়ে যখন ঢুকছে কিশোর, খিদেয় পেটের মধ্যে পাক খাচ্ছে নাড়িভুঁড়ি। কিন্তু খেতে যাওয়ার সময় নেই এখন আর।
দেয়ালের একটা সাইন-ইন শীটের সামনে দাঁড়াল পিটার।
গোয়েন্দাদের দিকে তাকিয়ে বলল সে, শো শুরু হওয়ার আধঘন্টা আগে এখানে সই করতে হয় আমাদের। সময়মত এই সই না দেখলে অন্য ব্যবস্থা করবে ভিনসি জাপা।
মেসেজ বোর্ডে নতুন একটা নোটিশ দেখতে পেল জিনা। পিটারকে বলল, আরি, এটার কথা তো বলেননি আমাদের!
সাইনে লেখা
খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনের জন্যে বলা হচ্ছে:
ওয়াইল্ড ওয়াইল্ড! ওয়াইল্ড! কোরাস অডিশন
মেইন স্টেজ, গারবার থিয়েটার
বৃহস্পতিবার, সকাল ১১.০০ টা
দুটো পার্টে অভিনয়ের জন্যে জরুরী ভিত্তিতে
একজন অভিনেতা ও একজন অভিনেত্রী লাগবে।
কেন? পিটার জিজ্ঞেস করল, তোমার আগ্রহ আছে?
ইয়ে...হলে মন্দ কি? নাচ তো শিখছিই আমি।
বেশ! এখনও দু-দিন সময় আছে হাতে। তৈরি হতে থাকো। কাজটা পেয়ে
গোয়েন্দাদের নিয়ে করিডরে বেরিয়ে এল পিটার, টোপাজকে অফিসে বসে থাকতে দেখে হাত নাড়ল।
এবার আর ড্রেসিং রুমে ঢুকতে কিশোরদের বাধা দিল না ডোরম্যান। একটা খাম তুলে নিয়ে কিশোরের দিকে বাড়িয়ে ধরল পিটার, নাও, তিনটে ফ্রী টিকেট আছে

এতে। সবচেয়ে ভালগুলোর তিনটে। পঞ্চম সারির মাঝখানে। এখন যাও, আমার কাজ আছে। তৈরি হতে হবে।
বাইরে বেরিয়ে জিনা বলল, লোকটার এনার্জি আছে। বিকেলে আমরা আসার পর থেকে কতগুলো ঘটনা ঘটে গেল। মাথায় এমন একটা বাড়ি খেল। তারপরও কিছু হয়নি। এখনও একেবারে স্বাভাবিক।
মাথা ঝাঁকাল মুসা। থিয়েটারের মধ্যে এ ভাবে আর কখনও ঢুকিনি। ভালই লাগে কিন্তু। স্টেজে ওঠাটা দারুণ রোমাঞ্চকর নিশ্চয়। এত লোকের চোখ সব তোমার ওপর থাকবে, হাসবে, প্রশংসা করবে, হাততালি দেবে…খুব ভাল, তাই না?
কিশোরও একমত হলো। শো-বিজনেস থেকে সরে আসার জন্যে জীবনে এই প্রথমবার দুঃখ হলো কিশোরের।

.

শো শেষ হওয়ার পর স্টেজের আলো নিভে এল, স্তব্ধ নীরবতা বিরাজ করতে লাগল হলের মধ্যে। সবাইকে থ করে দিয়েছে পিটার। তার জোরাল কণ্ঠের শেষ। কথাগুলো যেন এখনও ঘরের বাতাসে ভাসছে।
প্রথমে একটা-দুটো হাততালি পড়ল। তারপর যেন ফেটে পড়ল দর্শকরা। অনেকে উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে, শিস দিয়ে প্রশংসা করতে লাগল পিটারের।
সাংঘাতিক। মুসা বলল। দুই আঙুল মুখে পুরে তীক্ষ্ণ শিস দিয়ে উঠল।
আলো জ্বলে উঠল হলে। স্টেজের পর্দা পড়ল। আবার যখন সরল, স্টেজেও উজ্জ্বল আলো জ্বলছে তখন। কয়েক সারিতে দাঁড়িয়েছে অভিনেতারা। মূল অভিনেতারা রয়েছে সামনের সারিতে।
দর্শকদের অভিবাদন জানাতে সবার শেষে মঞ্চের একপাশ থেকে বেরিয়ে এল। পিটার। হাততালি আর চিৎকারে কানে তালা লেগে যাওয়ার জোগাড়।
হাসল পিটার। মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানাল দর্শকদের। মেকআপে ঢাকা পড়েছে তার কপালের দাগটা। কিশোর, মুসা আর জিনার দিকে তাকিয়ে আলতো চোখ টিপল। স্টেজের কিনারে এসে দাঁড়াল অনেক আগ্রহী দর্শকের সঙ্গে হাত মেলানোর জন্যে।
কি যেন বলতে যাচ্ছিল মুসা, থেমে গেল বিস্ফোরণের শব্দে। সেই সঙ্গে তীব্র আলোর ঝিলিক। থতমত খেয়ে গেল দর্শকরা। চিৎকার করে উঠল কেউ কেউ।
হাঁ করে তাকিয়ে আছে কিশোর।
মুহূর্ত আগেও পিটার যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানে এখন ঘন ধোঁয়ার কুণ্ডলী!

.

সীটের মাঝের গলিপথ ধরে ছুটল কিশোর, মুসা আর জিনা। হই-চই করছে। দর্শকরা। যারা সীটে বসা ছিল, তাদের অনেকেই উঠে পড়েছে।

ধাক্কা দিয়ে সামনের লোক সরিয়ে পথ করে এগোচ্ছে মুসা! পেছনে অন্য দু জন। অর্কেস্ট্রা রাখার জায়গাটা, অর্থাৎ অর্কেস্ট্রা পিট পেরিয়ে লাফিয়ে উঠল মঞ্চে।
ধোঁয়া সরে গেছে। নিথর হয়ে পড়ে আছে পিটার। কনুই দিয়ে লোক সরিয়ে তার কাছে পৌঁছল মুসা আর কিশোর।
পিটারের মাথাটা তুলে ধরেছে একজন অভিনেত্রী।
ঠিক আছে তো? জানতে চাইল কিশোর। হাটু গেড়ে বসে পড়ল পিটারের পাশে।
কপালে হালকা একটা লাল দাগ দেখা যাচ্ছে, বেরিয়ে পড়েছে কড়া মেকআপ ভেদ করে।
চুমু খাও আমার কপালে, ফিসফিস করল পিটার
কুঁচকে গেল কিশোরের ভুরু, মানে?
আমাকে..আমাকে বয়ে নিয়ে যেতে হবে…অর্কেস্ট্রাটা কোথায়?
পিটার! আমি কিশোর, কিশোর পাশা। তোমার কি হয়েছে?
বার কয়েক মিটমিট করে খুলে গেল পিটারের চোখের পাতা। ক্কি কিশোর!..মনে হচ্ছে ওয়েস্ট সাইড স্টোরির মৃত্যুর দৃশ্যটা অভিনয় করছিলাম!।
হাসি এবং স্বস্তি একসঙ্গে ফুটল অনেকের মুখে। কিন্তু কিশোর আরও গম্ভীর হয়ে গেল। তাকিয়ে আছে পিটারের মুখের দিকে।
স্টেজ ম্যানেজার জাপা আর একজন লম্বা ড্যাসার দাঁড়াতে সাহায্য করল পিটারকে।
ধরা লাগবে না, আমি ঠিকই আছি, টলতে টলতে মঞ্চ থেকে নামার জন্যে এগোল সে।
আবার প্রশংসার হাততালি দিল দর্শকরা। ভাবল, আরেকটা অভিনয় করছে পিটার! বেরোনোর দরজার দিকে সারি দিয়ে এগোতে শুরু করল ওরা
মঞ্চের কিনারে দাঁড়িয়ে নিচের দিকে তাকাল কিশোর।
অর্কেস্ট্রা পিটে দু-জন ইলেকট্রিশিয়ান তার পরীক্ষা করছেrমঞ্চের কিনারে অনেকটা টর্চের ব্যাটারির মত দেখতে একটা ধাতব যন্ত্রের মধ্যে গিয়ে ঢুকেছে তারগুলো। জাহির বিলিয়ার্ড আর আরেকজন মিউজিশিয়ান পঁড়িয়ে ওদের কাজ দেখছে।
কিশোর জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে?
হাত নাড়ল জাহির, কি জানি? আমার মাথাটাই উড়িয়ে নিত আরেকটু হলে।
ধাতব যন্ত্রটা দেখিয়ে গোমড়ামুখো এক ইলেকট্রিশিয়ান বলল; ফ্ল্যাশ-পাষ্টেলুজ কানেকশন। এর মধ্যে খুব কম শক্তির একধরনের বিস্ফোরক রাখা থাকে ইলেকট্রিক সিগন্যাল পেলেই ফেটে যায়। কালো হয়ে যাওয়া যন্ত্রটার দিকে

আবার হাত তুলল সে, পাওয়ারের গণ্ডগোলে মনে হয় কোন ধবনের সিগন্যাল পাঠিয়েছে। ব্যস, গেছে ফেটে।
মাঝে মাঝেই ঘটে নাকি এ রকম? জানতে চাইল কিশোর।
ঘটে না, তবে ঘটতে পারে। এখানে এই প্রথমবার ঘটল।
হুঁ-ভাবল কিশোর, ব্যাপারটা স্বাভাবিক ধরে নিতে ইচ্ছে করল না তার।
আরও কয়েক সেকেন্ড ইলেকট্রিশিয়ানদের কাজ দেখল সে আর মুসা, তারপর চলে এল পিটারের ড্রেসিং রুমে। জিনা আগেই এসে বসে আছে। আরও কয়েকজন অভিনেতা কথা বলছে। ইলেকট্রিক হট পটে চা বানাচ্ছে একজন। মেকআপ টেবিলের সামনে বসেছে পিটার, ফোনে কথা বলছে, কি করে ফ্ল্যাশ-পটটা ফাটল বলতে পারব না।...কেমন আছি জিজ্ঞেস করলে না?...হ্যাঁ, ভালই আছি।...ঠিক আছে, রুথ, পরে দেখা হবে।
রিসিভার নামিয়ে রেখে চেয়ারে হেলান দিল সে। কিশোরকে দেখে বলল, এসেছ। অন্য অভিনেতাদের বলল, এই, তোমরা এখন যাও, মেহমান আছে। আমি ঠিক হয়ে গেছি। অনেক ধন্যবাদ।
হাসিমুখে মাথা ঝাঁকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল অভিনেতারা। গায়ে কাঁটা দিল একবার পিটারের। শূন্য দৃষ্টি ফুটল চোখে। এক সন্ধ্যায় তিন-তিনবার দুর্ঘটনা! আনমনে কপালের জখমে হাত বোলাল। আরও কতবার হবে কে জানে...
সামনে ঝুঁকল কিশোর। এই শো-তে যারা কাজ করছে, তাদের কথা কিছু বলো তো আমাকে। জানা দরকার।
ভুরু সামান্য উঠে যেতে দেখল পিটারের। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে পেছনে তাকাল কিলোর। দরজায় দাঁড়িয়ে আছে বব রডম্যান।
যাক, ভালই আছ, স্বস্তিভরা কণ্ঠে বলল বব।
কেন, খুব খারাপ থাকব ভেবেছিলে নাকি? মনে করেছ পুরানো অভিশাপে আমাকেও ধরেছে। ম্যাকবেথ আর না বলার অনুরোধ করতে এসেছ?
শক্ত হয়ে গেল বব। তোমার আর শিক্ষা হবে না, পিটার!
কিশোরদের দিকে তাকাল অভিনেতা। বলল, বুঝতে পারছ না তো? দাঁড়াও, বুঝিয়ে দিই। ম্যাকবেথ নামটা বলা আমার জন্যে বারণ। বললেই ম্যাকবেথের অভিশাপে পড়তে হবে।
থমথমে হয়ে গেছে ববের মুখ। দোহাই তোমার, এবার বন্ধ করো, পিটার?
ব্যাপারটা কি বলুন তো? জানতে চাইল মুসা।
বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে লাগল বব। থিয়েটারের জগতের সবচেয়ে প্রাচীনতম অভিশাপ এই শব্দটা। উইলিয়াম শেকসপীয়ারের এই বিখত নাটকের নামটা মঞ্চে বলা অভিনেতাদের জন্যে বারণ। যে বলবে, তারই দুর্ভাগ্য শুরু হবে, নানা ভাবে...

কচু হবে, পিটার বলল।
নাকের ফুটো বড় হয়ে গেল ববের। দেখো, পিটার, পুরানো অনেক অভিশাপকে পাত্তা না দিয়ে বহুলোক অপঘাতে মরেছে। তোমাকে ভালবাসি বলেই সাবধান করছি, বিশ্বাস করো আর না করো, রসিকতা কোরো না ওসব নিয়ে। চুপ করে থাকলেই হয়। এই যে একের পর এক অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে, আঘাত আসছে তোমার ওপর এর কি ব্যাখ্যা দেবে? যাওয়ার জন্যে ঘুরল সে। আবার ফিরে তাকাল কাঁধের ওপর দিয়ে। আবারও বলছি, তোমাকে ভালবাসি বলেই এত কথা, নইলে আমার কি ঠেকা ছিল? এখনও সাবধান হও। উইলিয়াম শেকসপীয়ারের আত্মাকে নিয়ে অনেক বদনাম আছে, কাউকে কখনও ওটা ক্ষমা করেছে বলে শোনা যায়নি।
বেরিয়ে গেল বব।
কিশোরের দিকে তাকাল মুসা। চোখে অস্বস্তি।
লোকটা ভাল, পিটার বলল, তবে বোকা। নইলে এ সব বিশ্বাস করে?
নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর। চিন্তায় ডুবে গেছে। পিটারের কথায় কান আছে বলে মনে হলো না।
মুসা বলল, এ সব ব্যাপার একেবারে উড়িয়ে দেয়া কিন্তু ঠিক না।
কৃত্রিম বিস্ময়ে চোখ বড় বড় করে ফেলল পিটার, আরি, আরও একজন দেখি পাওয়া গেছে। মুসাকে আরও গম্ভীর হয়ে যেতে দেখে গাল চুলকাল, ভাবল, তারপর বলল, আচ্ছা, ঠিক আছে, না বললে যদি খুশি হও তোমরা, নাহয় না-ই বললাম।
হ্যাঁ, যা বলছিলাম, বাস্তবে ফিরে এল যেন কিশোর, এই শো-তে যারা কাজ করছে, তাদের ব্যাপারে কিছু বলো।

.

আরও একঘণ্টা পর থিয়েটার থেকে বেরোল ওরা। পিটার বসল তার গাড়িতে, জিনা, কিশোর আর মুসা উঠল পিকআপে।
গাড়ি চালাতে চালাতে ভাবতে লাগল কিশোর, অনেক কথা বলেছে তাকে পিটার, কিন্তু তার মধ্যে থেকে কোন সূত্র উদ্ধার করতে পারেনি।
আগে আগে গাড়ি চালাল পিটার। পথে কোন দুর্ঘটনা হতে পারে ভেবে পেছনে থেকে তাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে চলল গোয়েন্দারা। নিরাপদে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে ফিরল।
জিনাকে তাদের বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে ইয়ার্ডে ফিরে চলল মুসা আর কিশোর।
আমার মনে হয় জাপার কাজ, মুসা বলল। ফ্ল্যাশ-পট ফাটানো তার জন্যে কঠিন কিছু না।

হয়তো নয়, সামনের পথের দিকে তাকিয়ে বলল কিশোর, কিন্তু ববের বাড়িতে তিনি ছিলেন না। তাহলে আলো নিভিয়ে দিয়ে মূর্তি ফেলল কে? তাঁবুর কাছেও তাঁকে দেখা যায়নি। তাহলে সাইনবোর্ডই বা ফেলল কে?
ইয়ার্ডে ঢুকে ওঅর্কশপের সামনে গাড়ি রাখল কিশোর। নামার আগে বলল, আরও একটা ব্যাপার, পিটারের সঙ্গে কেন শত্রুতা করবেন ম্যানেজার? মোটিভটা কি?
কি জানি? হাত ওল্টাল মুসা। তাহলে কে করল এ কাজ? নিরু না তো?
সাইনবোর্ডটা পড়ার সময় অবশ্য ওখানে ছিল সে। স্টেজেও কাজ করেছে। কিন্তু পিটার বলেছে, তার কাজ সেট সাজানো, আর কিছুতে হাত দেয়া নিষেধ।
গাড়ি থেকে নেমে হেডকোয়ার্টারে ঢুকল ওরা। টেলিভিশনটা অন করে দিয়ে চেয়ারে বসল। নিউজ হচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে বলল, পিটারের ওপর কোন কারণে অবশ্য কড়া রাগ থাকতে পারে নিরুর। তবে কড়া রাগ তার সারা দুনিয়ার ওপরই থাকতে পারে, স্বভাবটাই ওরকম।
একটা টুলে বসল মুসা। ফ্ল্যাশ-পটটা ছিল অর্কেস্ট্রা পিটে। ফাটানোর কায়দাটা জানা থাকলে কোন মিউজিশিয়ানও কাজটা সেরে দিতে পারে।
জাহির বিলিয়ার্ডের মত কেউ?
মাথা ঝাঁকাল মুসা। ববকেও সন্দেহের তালিকায় ফেলা যায়। লোকটার মাথায় দোষ আছে। রলির ওপরও সন্দেহ হয়। ববের ঘরে ছিল মূর্তিটা পড়ার সময়। পিটারকে সরাতে পারলে নতুন স্টার হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে তার।
আমার মনে হয় না রলি আছে এ সবে, কিশোর বলল। তার স্টার হওয়ার সম্ভাবনাও নেই। পিটার সরলে সঙ্গে সঙ্গে আর্ট টিলারিকে খবর পাঠাবেন কলিন। বরং তাকেই সন্দেহ করা উচিত।
টিভির দিকে তাকাতেই পিঠ সোজা হয়ে গেল মুসার, খাইছে, দেখো!
পর্দায় দেখা যাচ্ছে গারবার থিয়েটার। আস্তে আস্তে সরে গেল ক্যামেরা, নিতা নিউমারকে দেখা গেল, পিটারের সাক্ষাৎকার নেয়ার সময় যে দুর্ঘটনা ঘটেছে সবিস্তারে সেটার বর্ণনা শুরু করল।
আতঙ্কিত নিরুকে দেখা গেল, চিৎকার করে সাবধান করছে। তারপর দেখা গেল, সাইনবোর্ডটা পড়ছে। স্লো-মোশনে দেখানো হলো দৃশ্যটা। নিচে এদিক ওদিক ছুটে পালাচ্ছে লোকে।
সাইনবোর্ডটা পড়ে ভাঙল। নিজের অজান্তেই টুলে বসেও কুঁকড়ে গেল মুসা। এরপর পর্দায় বড় হয়ে ফুটল পিটারের চেহারা। ঘাম-চকচকে, বিধ্বস্ত।
মঞ্চে শো শেষে ফ্ল্যাশ-পট বিস্ফোরিত হওয়ার কথাও বাদ গেল না সংবাদে।
খবরটা জানল কি করে ওরা

কিশোরের প্রশ্নের জবাবেই যেন বলল সংবাদ-পাঠক, ওগুলো আসলে দুর্ঘটনা না অস্বাভাবিক কিছু এ ব্যাপারে আমাদের লেট-নাইট নিউজ অনেকের সঙ্গে কথা বলেছে। একজন জবাব দিয়েছে, এর মধ্যে অনেক বেশি শক্তিশালী আর বিপজ্জনক কিছুর অদৃশ্য হাত রয়েছে।
বব রডম্যানকে হাজির করা হলো। থিয়েটারের বাইরে ক্যামেরার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নার্ভাস ভঙ্গিতে ম্যাকবেথের অভিশাপের কথা বলল।
ববের কথা শেষ হলে ক্যামেরার দিকে ফিরল রিপোর্টার। নাটকীয় বিষণ্ন ভঙ্গিতে বলল, থিয়েটারের জগতে স্কটিশ ওই নাটকটা নিয়ে একটা সাংঘাতিক ভীতি আছে। নামটা কেউ উচ্চারণ করতে চায় না। এটা কি কুসংস্কার? কেউ বলে, হ্যাঁ, কিন্তু তারাও বলে ভয়ে ভয়ে। নাম উচ্চারণ করার সময় থমকে যায়। সাড়ে তিনশোরও বেশি বছর আগে বার্ড অভ অ্যাভনের মৃত্যুর পর হয়তো জানতে পারব আমরা কেন এই বিশ্বাস আজও এত জোরাল।
কিশোরের দিকে ফিরল মুসা, এই বার্ড অভ অ্যাভনটি কে?
শেকসপীয়ারের ডাকনাম।
অস্বস্তি দেখা দিল মুসার চোখে। কিশোর, তুমি হয়তো বিশ্বাস করতে চাইবে না, কিন্তু জবাবটা তো এখানেই!
কিসের জবাব?
পিটারকে খুনের চেষ্টা জাহির কিংবা বব কিংবা অন্য কেউ করেনি। কাজটা শেকসপীয়ারের ভূতের!
.
পরদিন সকালে চোখ বড় বড় করে কিশোরের মুখে সব কথা শুনল রবিন। ইস, কাল বিকেলে তোমাদের সঙ্গে যেতে পারলে খুব ভাল হত। কিন্তু অফিসে এত কাজ…
কম্পিউটার অন করল কিশোর। জানি, পুরো হপ্তাটাই ব্যস্ত থাকবে। তবু এরই মধ্যে সূত্রের খোঁজ কোরো।
জাহিরের সঙ্গে কথা বলব। যে কোন সময় চলে আসবে।
ঝট করে ঘুরে তাকাল কিশোর, জাহির এখানে আসবে?
হ্যাঁ। সাউন্ড সিসটেমের ব্যাপারে ফ্যানাটিক বলতে পারো। যখন বললাম আমাদের কাছে কোয়াড্রোফোনিক স্পীকার আছে, কিছু টেপ নিয়ে এসে বাজিয়ে শুনতে চাইল।
আমরা কে বলেছ নাকি?
না। আমি কেবল বলেছি এখানে আড্ডা মারি আমরা। ক্ষতি করে দিলাম নাকি?

নাহ। আমরা যে গোয়েন্দা এ কথাটা গোপন রাখলেই চলবে। কেস শেষ হওয়ার আগে কাউকে বিশ্বাস করতে পারছি না। জাহিরকেও না।
কম্পিউটারে মন দিল কিশোর। আঙুলের কয়েকটা দ্রুত টোকায় ডাটাসার্ভ নেটওঅর্কের সঙ্গে যোগাযোগ করে ফেলল। এটা একটা ইনফর্মেশন সার্ভিস, কম্পিউটার এনসাইক্লোপিডিয়া, সদস্য হলেই ব্যবহার করা যায়।
অ্যাই, রবিন! বাইরে থেকে ডাক শোনা গেল, আছ নাকি?
ওই যে, জাহির এসে গেছে।
তাকে ওঅর্কশপের ভেতর নিয়ে এল রবিন।
কাঁধে ক্যানভাসের ব্যাগ। ঘরের ভেতর চোখ বোলাল জাহির। চওড়া হাসি ফুটল। চমৎকার! এই ক্লাবের সদস্য হতে হলে কি করতে হবে আমাকে?
হাসল রবিন। কি ধরনের ক্যাসেট এনেছেন দেখি আগে, তারপর বলব।
ব্যাগটা টেবিলে রাখল জাহির। দেখো।
ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিল রবিন। বের করে আনল একমুঠো ক্যাসেট। বাহ, কি সব জিনিস! দা মোস্ট হ্যাপি ফেলা, ওয়েস্ট সাইড স্টোরি, ক্যানডিড, সুইনি টোড–সব তো শো মিউজিক। কোত্থেকে জোগাড় করলেন? বাপের কালেকশন মেরে দিয়েছেন?
না, মাথা নাড়ল জাহির, ইদানীং আমার এগুলোই ভাল লাগতে আরম্ভ করেছে। হোক না পুরানো আমলের।
আমি ভেবেছিলাম আপনি রক মিউজিশিয়ান। কিন্তু যা দেখছি...আজকালকার ভাল জিনিসের তুলনায় এগুলো তো একেবারে...
কি বলছ বুঝতে পারছি। পিটারের সঙ্গে খাতির না হলে আমিও ঢুকতাম না। এর মধ্যে। যাই বলো, লোকটা জিনিয়াস। এ যাবৎ যত মিউজিক্যাল লেখা হয়েছে, সবগুলোর সব গান তার জানা। বেশির ভাগই আবর্জনা, কিন্তু কিছু আছে শুনলে চমকে যেতে হয়।
একটা মুহূর্ত জাহিরের দিকে তাকিয়ে থাকল রবিন। আমি ভেবেছিলাম টাকার জন্যে ওয়াইল্ড ওয়াইল্ডে কাজ নিয়েছেন আপনি। কিন্তু যা সব দেখছি...
টাকার জন্যেই। অনেক দিন ধরে চলে এ রকম একটা শো-তে কাজ নিতে পারলে টাকার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকা যায়। তা এত হেলাফেলা না করে বাজিয়েই দেখো না, খারাপ লাগবে না।
জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে চেয়ারে হেলান দিল রবিন। বেশ, শুনব। একটা কথা, শুনেছি, রক সিনের চেয়ে শো-বিজ লাইফ খুব একটা ভাল না। শো বন্ধ হয়ে গেলে কাজও চলে যাবে আপনার। কিন্তু রক কখনও হুট করে বন্ধ হয় না, টাকাও অনেক বেশি...

জানি। কাদের জন্যে বেশি? হাতে গোণা কয়েকজনের জন্যে, যাদের গান হিট হয়ে গেছে। আমার মত মড়াদের জন্যে নয়। এগিয়ে গিয়ে সুইনি টোডের ক্যাসেটটা ক্যাসেট প্লেয়ারে চাপিয়ে দিল জাহির। শোনো, কেমন লাগে?
ওয়র্কশপে ছড়িয়ে পড়ল বিষঃ মিউজিক। কিশোরের ভাল লাগল। ম্যাকবেথের অভিশাপ সম্পর্কে তথ্য খোঁজার পরিবেশ তৈরি করে দিল তাকে। কীবোর্ডে উড়ে চলল ওর আঙুল। পর্দায় শব্দ ফুটতে থাকল:
থিয়েটার
কুসংস্কার
অভিশাপ
প্রতিটি ফাইল খুঁজে দেখল সে। কিছুই পেল না।
বের করল, ম্যাকবেথ
সংক্ষেপে কাহিনী বলা হয়েছে নাটকের। রাজা হওয়ার জন্যে একজনকে খুন করেছিল ম্যাকবেথ নামে একজন। ডাইনীরা তাকে সাবধান করে দিয়েছিল, দুর্গের চারপাশ ঘিরে যখন এগিয়ে আসবে বন তখন তার মৃত্যু হবে। ভবিষ্যদ্বাণী সত্যি হয়েছিল। কিন্তু বনটা আসল বন নয়, পাতাসহ ডাল কেটে ক্যামোফ্লেজ তৈরি করে তার আড়ালে আড়ালে এগিয়ে এসেছে সৈন্যরা। রক্তাক্ত এক বিদ্রোহে মারা পড়ল ম্যাকবেথ।
ঐতিহাসিক তথ্য খুঁজতে লাগল কিশোর। চারটে সিনেমার নাম পাওয়া গেল...
হঠাৎ থেমে গেল সে। চারপাশ ঘিরে যখন এগিয়ে আসবে বন–পরিচিত না বাক্যটা?
এই সময় বাজল ফোন। রবিন ধরল।
সেদিকে একবার তাকিয়ে আবার নিজের কাজে মন দিল কিশোর। ড্রয়ার খুলে একটা ফাইল বের করল। তাতে কিছু নোট আছে। লিখে রেখেছে:
*কথায় ব্রিটিশ টান। বুড়ো মানুষের কণ্ঠ; বলেছে, সাবধান! থেসপিয়ান!
*চিঠিতে লেখা–রক্তেভরা সিংহাসনে মারা যাবে সে।
*চিঠিতে লেখা–বন এগিয়ে এসে গিলে ফেলবে তাকে।
চেয়ারে হেলান দিল কিশোর। পিটারের মত ঠিক একই ধরনের হুমকি ম্যাকবেথকেও দেয়া হয়েছে। যোগাযোগটা কোথায়?
ভাবতে লাগল সে। কে ফোন করেছে পিটারকে? বব রডম্যান? চিঠিগুলোও কি তারই লেখা? কেন করছে এ সব? অভিশাপটা যে সত্যি এটা বোঝানোর জন্যে? দুর্ঘটনাগুলোও তারই সৃষ্টি? কিন্তু এতসব করে লাভটা কি তার?
অন্য কেউও হতে পারে। এমন ভাবে করছে, যাতে সন্দেহটা ববের ওপর পড়ে। কারণ অভিশাপ নিয়ে বড় বেশি মাথা ঘামাচ্ছে বব।

হঠাৎ করেই পেটের মধ্যে অদ্ভুত এক শূন্য অনুভূতি হলো কিশোরের। অভিশাপটাতে কি আসলেই কিছু আছে?
মনে মনে হেসে উড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করল। এ সব সে বিশ্বাস করে না।
কিন্তু তবু...
ভাবনায় বাধা পড়ল রবিনের কথায়, মুসা করেছে, কিশোর। তোমাকে বলতে বলেছে, স্কুলে যাচ্ছে। বাস্কেটবল প্র্যাকটিসের ব্যাপারে নাকি কি কাজ আছে ওখানে। বেশিক্ষণ লাগবে না।
আচ্ছা, অন্যমনস্ক হয়ে বলল কিশোর। আবার ভাবনায় ডুবে গেল সে।
জাহিরের টেপ বাজানো শেষ হলো। রবিন বলল, খিদে পেয়েছে। কোথাও গিয়ে কিছু খেয়ে এলে কেমন হয়?
খুব ভাল হয়।
কিশোর, তুমি কি বলো?
তোমরা যাও। আমার কাজ আছে। শেষ করতে হবে। মুসার জন্যেও অপেক্ষা করতে হবে। ও এলে ওকে নিয়ে বেরোব। পিটারের ওখানে যেতে হবে।
ঠিক আছে। পরে দেখা হবে।
জাহিরকে নিয়ে বেরিয়ে গেল রবিন।
মনিটরের পর্দার দিকে তাকিয়ে ভাবার চেষ্টা করল কিশোর। কিন্তু মাথায় ঘুরছে খাবারের ভাবনা। ডায়েট কন্ট্রোল করতে গিয়ে ভাল খাবার আর পেটে পড়ছে না অনেক দিন। মনে পড়ল রলির বের করে দেয়া বার্গারের কথা-কামড় বসাচ্ছে রলি আর পিটার, ববের বাড়িতে যাওয়ার আগে...
ববের বাড়ি!
হুম! আনমনেই মাথা দোলাল কিশোর। একটা জরুরী কাজ বাকি রয়ে গেছে। কাজটা আগের দিনই করার কথা ছিল, করতে পারেনি।
চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল সে। বব রডম্যান এখন বাড়ি থাকলেই হয়।
প্রথম যেতে হবে রকি বীচ হাই স্কুলে, মুসাকে তুলে নেয়ার জন্যে।
ওকে খুঁজে বের করতে দেরি হলো না। জিনাকেও পাওয়া গেল ওখানে। মেয়েদেরও বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা আছে।
কিশোরকে দেখে দু-জনেই অবাক হলো। বাস্কেটবলের প্র্যাকটিস দেখতে এসেছ? জিজ্ঞেস করল জিনা।
না, মুসাকে নিয়ে যেতে। তোমাকে পেয়ে গিয়ে ভালই হলো। কাল ববের বাড়িতে শেকসপীয়ারের মূর্তিটা তুলে রেখেছিলে তুমি। কেমন লেগেছিল?
দ্বিধা করল জিনা। মার্বেলের মত ঠাণ্ডা, মসৃণ...
আর কিছু?

ভাবল জিনা, আঠা আঠা!
কি ধরনের আঠা? তেলতেলে খাবারের ওপর যেমন থাকে, বার্গারের ওপর?
আবার দ্বিধা করল জিনা। কি জানি, হবে হয়তো।
এতেই চলবে। মুসার দিকে তাকাল কিশোর, যাবে না?
কাজ শেষ হয়নি তো এখনও।
ঘড়ি দেখল কিশোর। ১টা বেজে ৫ মিনিট। থিয়েটারে যাওয়ার কথা দুটোর সময়। এক ঘণ্টা সময় নেই হাতে। ববের ওখানে গেলে এক্ষুণি যেতে হবে। ঠিক আছে, তুমি থাকো। আমি একাই সেরে আসি। দুপুর দুটোয় থিয়েটারে হাজির থেকো।
প্রায় ছুটে পার্কিং লটে ফিরে এল কিশোর। পিকআপে চড়ে স্টার্ট দিল। ফ্রিওয়েতে বেরিয়ে এসে রওনা হলো পশ্চিম হলিউডে।
কাজটা সহজ হবে না–চালাতে চালাতে ভাবছে সে-ববের কাছ থেকে তথ্য আদায় করাটা সহজ না।
ববের বাড়ির সামনে যখন গাড়ি রাখল সে, ঘড়িতে ঠিক দেড়টা বাজে। সিঁড়ি বেয়ে দৌড়ে উঠল ওপরে। দরজার ঘণ্টা বাজাল।
কে? ভেতর থেকে সাড়া এল।
কিশোর পাশা।
নীরব হয়ে রইল ওপাশ।
পিটার হাইয়েমের বন্ধু, আবার বলল কিশোর।
দরজা খুলল। চোখের পাতা সরু হয়ে এল ববের, তোমার নাম যে কিশোর, জানতাম না। তোমার নামের মধ্যে একটা অনুসন্ধানের গন্ধ পাচ্ছি। জানার ইচ্ছে বড় প্রবল।
সত্যি বলতে কি, অস্বস্তিতে পড়ে গেল কিশোর, আসলে কয়েকটা প্রশ্নই করতে এসেছি আপনাকে। ভেতরে আসব?
ঘড়ি দেখল বব। কয়েক মিনিটের মধ্যেই বেরোব, থিয়েটারে যেতে হবে। কি প্রশ্ন তোমার?
আমার বন্ধু পিটারের ব্যাপারে। ভয়ই লাগছে। অভিশাপ নিয়ে তার এমন হাসিঠাট্টা ভাল লাগছে না আমার। তার শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে আপনি কি পরামর্শ দিতে পারেন, কি করা যায়?
মাথা ঝাঁকিয়ে দরজা থেকে সরে দাঁড়াল বব, এসো।
লোকটার চোখে আলোর ঝিলিক চোখ এড়াল না কিশোরের। করিডরের শেষ মাথায় ঘরের দিকে এগোতে এগোতে বব বলল, আমার অনুষ্ঠান তাহলে ভাল লেগেছে তোমার?
লেগেছে। তবে খিদে না থাকলে আরও লাগত।

হাসল বব। আসলে খালি পেটেই এ সব কাজ করা ভাল। আমি তো কাল সারাদিনই কিছু খাইনি।
যা ভাবার ভেবে ফেলল কিশোর–বর কিছু না খেয়ে থাকলে তার হাতে বনরুটির তেল লাগার কথা নয়। কাল বিকেলে রলি আর পিটার বার্গার খেয়েছে। তার আঙুলে লেগে থাকাটা স্বাভাবিক।
সুইচ টিপে আলো জ্বালল বব। দরজার ডান পাশে সুইচটা। আরেকটু ডানে সরে দেয়ালের গায়ে সকেট, তাতে প্লাগ ঢুকিয়ে টেবিল ল্যাম্পের লম্বা তার বের করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মেঝেতে পড়ে থাকা তারটার মাঝামাঝি জায়গায় কয়েকটা প্যাঁচ খেয়ে আছে। টেবিলেই রয়েছে ল্যাম্পটা। উল্টোদিকের টেবিলে রাখা শেকসপীয়ারের মূর্তিটা, গম্ভীর, সার্বক্ষণিক কুটি করে আছে।
মনে মনে হিসেব করল কিশোর, সকেট থেকে ল্যাম্পের দূরত্ব পনেরো ফুট। মনে করার চেষ্টা করল অনুষ্ঠানের সময় কে কোথায় বসেছিল। দরজার কাছে বব, তার ডান পাশে চশমা পরা একটা মেয়ে, তার পাশে কোকড়া-চুল এক লোক, তারপর রলি, এবং তারপর তিনজন অভিনেতা। তাদের শেষজনের পাশে পিটার, মূর্তিটার কাছাকাছি, তারপর আরও দু-তিনজন অভিনেত্রী। চক্রের বাকি অংশটা। পুরণ করেছে সে নিজে, মুসা আর জিনা।
লোকটার কাছ থেকে কি ভাবে কথা আদায় করবে ভাবছে সে। আসলে, যত যা-ই বলুন, আমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে ব্যাপারটা আধিভৌতিক কিছু। বরং...
মানুষের শয়তানি বলতে চাইছ? মুচকি হাসল বব। প্রথম প্রথম এলে আর এ রকম কিছু ঘটলে সবাই তাই ভাবে। পরে ঠিক হয়ে যায়। বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়। বেশ, তুমি আমাকে বলো, বাতিটা আপনাআপনি নিভল কি করে?
টাইমার লাগানো থাকতে পারে, জবাব দিল কিশোর।
আবার হাসল বব। হ্যাঁ, ওভাবে বাতি নিভিয়ে, অন্ধকারে এতগুলো মানুষকে ডিঙিয়ে, কারও গায়ে সামান্যতম ছোঁয়া না লাগিয়ে গিয়ে মূর্তিটা ফেলে, আবার সবাইকে ডিঙিয়ে এসে আগের জায়গায় বসে পড়লাম; তারপর জ্বেলে দিলাম মাথার ওপরের বাতিটা! এতই সহজ!
ল্যাম্পের বাল্বটা কেটে গিয়ে থাকতে পারে।
কাটেনি। দেখেছি। সকেট থেকে প্লাগটা খুলে গিয়েছিল।
তাই নাকি? আমি গাধা তাহলে লক্ষ করলাম না কেন কাল? ভাবল কিলোর। পিটারের জন্যে বেশি উদ্বিগ্ন ছিলাম আর তার দিকে খেয়াল ছিল বলেই বোধহয় দেখিনি। বলল, তাহলে কেউ টেনে খুলে ফেলেছে।
কেউ নয়, কিছু, শুধরে দিল বব।
ঠোঁট গোল করে নীরবে শিস দেয়ার ভঙ্গি করল কিশোর। তাজ্জব ব্যাপার...

তার কাঁধে হাত রাখল বব। ইয়াং ম্যান, তোমার বন্ধুর জন্যে নিশ্চয় একটা দায়িত্ব আছে তোমার। আমার চেয়ে তোমার কথা বেশি গুরুত্ব দেবে সে, জানি। তাকে বোঝাওগে। ঘড়ি দেখল বব, আর সময় নেই, থিয়েটারে যেতে হবে। তোমাকে আর সময় দিতে পারছি না, সরি।

অনেক দিয়েছেন, ধন্যবাদ। ঘুরে করিডরে বেরিয়ে এল কিশোর। ববের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে বলল, ভাল কথা, আমার বন্ধু জিনা আপনার কাছে মাপ চেয়ে নিতে বলেছে। এখানে আসার আগে বার্গার খেয়েছিল। হাতে তেল লেগে ছিল। মূর্তিটায় লেগে নোংরা হতে পারে, এ জন্যে চিন্তা হচ্ছে তার। অত উত্তেজনার মধ্যে পরে আর মুছতে মনে ছিল না।

মাথা ঝাঁকাল বব। দেখেছি। কাল ওটা তোলার সময় লেগে গিয়েছিল আরকি। ভেজা ন্যাকড়া দিয়ে মুছতে হয়েছে আমাকে। গন্ধটা দারুচিনির মত। লাইটের সুইচেও এই জিনিস লক্ষ করেছি।

অবাক হয়েছে যে, সেটা চেহারায় প্রকাশ পেতে দিল না কিশোর। যাই হোক, জিনা আপনাকে সরি বলতে বলেছে।

হাসল বব। ও কিছু না। ওকে অত চিন্তা করতে মানা কোরো। আমি মুছে ফেলেছি।

থ্যাংকস।

সামনের দরজা দিয়ে বেরোল দু-জনে। তালা লাগাতে লাগাতে বব বলল, আবার একদিন এসে যোগ দিতে পারো। তবে মনে হচ্ছে এবার অনুষ্ঠান করতে দেরি হবে। উইলের শান্ত হতে সময় লাগবে।

উইল?

উইলিয়াম শেকসপীয়ার।

ও। ঠিক আছে, যাই। থিয়েটারে দেখা হবে।

আবার পিকআপ নিয়ে ফ্রিওয়েতে বেরিয়ে এল কিশোর। অল্পক্ষণেই স্পীডোমিটারের কাটা উঠে গেল পঞ্চাশ-পঞ্চান্নতে, আর তার মগজের কাটা কয়েক শো-তে। জিনা আর মুসাকে বাদ দিলে, পিটার ছাড়া একমাত্র রলিই বার্গার খেয়েছিল। তার টেনে প্লাগ খুলে, দৌড়ে ঘর পার হয়ে গিয়ে মূর্তি ফেলে এসে সুইচ টিপে মাথার ওপরের আলো জ্বেলে দেয়া–এতগুলো কাজ কি সে করতে পেরেছে অন্ধকারের মধ্যে?

ভুরু কাছাকাছি হয়ে গেল কিশোরের। বব নিজের ব্যাপারেও এই প্রশ্নই তুলেছিল তখন। তবে ববের চেয়ে রলির বয়েস কম। ক্ষিপ্র হওয়া স্বাভাবিক। কাজটা তার জন্যে কঠিন হলেও হয়তো অসম্ভব নয়।

আর যা-ই হোক, শেকসপীয়ারের ভূত এসে মূর্তি ফেলে দিয়েছে, এ কথা কিছুতেই বিশ্বাস করে না কিশোর।

.

গারবার থিয়েটারের পার্কিং লটে ঢোকার আগে গাড়ির গতি কমাল কিশোর। অনেক লম্বা লাইন পড়েছে টিকেট কাউন্টারের সামনে। নিশ্চয় গতরাতের নিউজ দেখেছে। কারও পৌষ মাস কারও সর্বনাশ বোধহয় একেই বলে–বার বার মরতে বসছে পিটার, ব্যবসা করছে অন্য লোক।

এগিয়ে গেল সে। মারাত্মক কতগুলো চোখা কাটা ডিঙিয়ে। প্রিং লাগানো। গাড়ি ঢোকার সময় মাটিতে দেবে থাকে। বেরোনোর সময় লাফ দিয়ে উঠে আসে। টায়ারে লাগলে চিরে ফালাফালা হয়ে যাবে। বেরোনোর একমাত্র পথ তখন, গেট। সুতরাং পার্কের ভাড়া মেরে দেয়ার আর উপায় থাকে না। দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার। পার্কিং লটগুলোতে প্রচুর এই জিনিস দেখেছে কিশোর, তারপরেও দেখলেই কেন যেন মধ্যযুগীয় অত্যাচার-কক্ষের কথা মনে পড়ে যায় তার।

গাড়ি পার্ক করে রেখে থিয়েটার স্টেজের দরজার দিকে দৌড় দিল সে।

করিডরে ঢোকার মুখে টোপাজের সঙ্গে দেখা। বাধা দিল না। মাথা নুইয়ে যাওয়ার ইশারা করল। কর্কবোর্ড পার হয়ে এল সে। স্টেজে ঢোকার দরজার ঠিক ওপাশেই মুসা আর পিটারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। পিটারের কপালের দাগটার কোন চিহ্ন নেই এখন।

হেসে বলল কিশোর, বেঁচেই আছ দেখতে পাচ্ছি।

আছি। আর কিছু ঘটেনি।

মুসাকে জিজ্ঞেস করল কিশোর, জিনা আসেনি?

মৃদু আলোকিত একটা কোণ দেখিয়ে মুসা বলল, ওখানে।

নাচছে জিনা।

কি করছে ও? কিশোরের প্রশ্ন।

হাসল মুসা, ভুলে গেছ? করিডরের সাইনটার কথা মনে নেই?

অডিশন নোটিশ? তারমানে সত্যিই সে…

জিনা তো তোমার অচেনা নয়। একবার কিছু করবে বলে গো ধরলে করেই। ছাড়ে।

হু! এইজন্যেই মেয়েদের এড়িয়ে চলতে চাই আমি।

কিন্তু সব সময় সবকিছু চাইলেই কি আর পারা যায়?

লাউডস্পীকারে গমগম করে উঠল পিটারের গলা, শুরু হতে যাচ্ছে কিয়োটো কন মোটো! আজ রাতের সবচেয়ে বড় ড্যান্স নাম্বার।

ঘোষণা শুনে দৌড়ে এল জিনা। মুসা আর কিশোরের সঙ্গে পাশের একটা দরজা দিয়ে ঢুকল অডিয়েন্সে।
ওরা বসতে না বসতে অন্ধকার হয়ে গেল স্টেজ। গুঞ্জন করে উঠল একটা মোটর, মোলায়েম সুরে বাজতে শুরু করল পিয়ানো। অর্কেস্ট্রা পিটের ভেতর থেকে উঠে আসছে মিউজিক।
অন্য বাদকেরা কোথায়? জানতে চাইল মুসা।
আনলেই পয়সা দিতে হবে, জবাব দিল কিলোর। তাই প্রতিটি রিহার্সালে আনা সম্ভব হয় না।
বেশ কিছু আলো জ্বলে উঠল। স্টেজের পেছনে ফুটে উঠল জাপানের একটা দৃশ্য।
হঠাৎ জোরাল হয়ে গেল মিউজিক। পর্দার আড়াল থেকে নাচতে নাচতে ঢুকল। নাচিয়েরা। আলোটা এমন ভঙ্গিতে ফেলা হয়েছে, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না ওদের, ছায়াগুলো মনে হচ্ছে একটা আরেকটাকে ভেদ করে যাচ্ছে আড়াআড়ি ভাবে। ওদের শরীরের তীক্ষ্ণ মোচড়গুলোতে মার্শাল আর্টের প্রকাশ প্রবল।
মুগ্ধ হয়ে দেখছে কিশোর। হালকা, সরু সরু আলোকরশ্মি যেন বাতাস চিরে ছুটে চলেছে এদিক ওদিক।
আচমকা যেন জমে গেল নর্তকেরা। একেবারে স্থির। একটা পর্দার আড়াল থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এল আরেকজন নর্তক। মনে হলো যেন উড়ে এল বাতাসে ভর করে। আস্তে করে এসে মঞ্চে নামল তার ছায়া। একাই নাচতে শুরু করল।
ওহ, পিটার! বিস্ময় চাপতে পারল না জিনা।
সচল ছায়াটার দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। পিটার যে ভাল নাচতে পারে জানা ছিল তার, কিন্তু এতটা ভাল কল্পনা করেনি। মুহূর্তে যেন দখল করে নিয়েছে পুরো মঞ্চটা।
মনে হচ্ছে মার্শাল আর্টের ওস্তাদ! প্রশংসা করল মুসা।
নাচতে নাচতে শরীর বাকিয়ে, মুচড়ে, নানা রকম কায়দা-কসরৎ দেখাচ্ছে পিটার।
নাচ চলেছে, এই সময় একটা ঘড়ঘড় শব্দ শোনা গেল।
চোখ বড় বড় হয়ে গেল কিশোরের, টার্নটেবল ঘুরছে!
পর্দা কাঁপতে শুরু করল। মেঝেতে পড়ে গেল নাচিয়েরা। বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠল কেউ কেউ।
লাফ দিয়ে শূন্যে উঠে পড়েছিল পিটার।পড়ল হাঁটু ভাজ করা অবস্থায়। ব্যথায় চিৎকার করে উঠল। মুখ থুবড়ে পড়ল মেঝেতে।
একলাফে সীট থেকে উঠে মঞ্চের দিকে দৌড় দিল কিশোর, মুসা আর জিনা। বাজনা থেমে গেছে। আলো জ্বলে উঠেছে। উত্তেজিত হয়ে পড়েছে দর্শক।

গোয়েন্দাদের মঞ্চে উঠতে বাধা দিল উল্কি আঁকা একটা হাত, কঠিন গলায় বলল, নামো! এখানে ওঠা বারণ।
নিরু। কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তিনজনের দিকে। চোখের আগুনটা বর্ষিত হচ্ছে মূলত কিশোরের ওপর।
আপনি তো আমাদের চেনেন! কিশোর বলল।
কি হবে চিনলে? থিয়েটারের লোক ছাড়া আর কাউকে উঠতে দেয়ার নিয়ম নেই। এখন তো আরও দেয়া যাবে না। কোন কিছু ঘটে গেলে দায়ী হবে কে?
অসহায় দৃষ্টিতে মঞ্চের দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। নিরু অন্যায় কিছু বলেনি।
তবু মুসা বলল, আমরা কোন সাহায্য করতে পারি নাকি দেখতাম।
কি ব্যাপার? সেট খসে পড়েছে নাকি?
পরিচিত কণ্ঠ শুনে চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে তাকাল কিশোর। মুসা আর জিনাও ঘুরল।
তিনজনেই অবাক। পিটার দাঁড়িয়ে আছে। বলল, এমন করে তাকাচ্ছ যেন আমাকে চিনতে পারছ না! হয়েছেটা কি?
আ-আ-আপনি নন! তোতলাতে শুরু করল জিনা।
মঞ্চ থেকে একজন লোককে ধরাধরি করে তুললেন ভিনসি জাপা এবং আরেকজন শ্রমিক। যাকে তোলা হলো সে পিটারের সমান লম্বা, সোনালি চুল।
ছায়া দেখে কিন্তু অবিকল একই রকম লাগছিল! নিজেকে যেন বোঝাল কিশোর।
আমরা ভেবেছিলাম...আমরা..মানে... কথা সাজাতে পারছে না মুসা।
বিস্ময়টা দূর হয়ে গেল পিটারের চেহারা থেকে। এইবার বুঝেছি! টেরি হান্না। অক্সিডেন্ট করেছে। তোমরা মনে করেছ আমি।
হ্যাঁ, মাথা ঝাঁকাল জিনা।
অনেকটা আমার মতই দেখতে। লম্বা, চওড়া...ভাড়া করে আনা হয়েছে আমার জায়গায় চালানোর জন্যে। নাচটাচ তো জানি না ওরকম
চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল একটা কণ্ঠ, ট্রট, টার্নটেবলটার কি হয়েছিল?
টার্নটেবলের উচ্চারণটা শোনাল টয়টেবল। ভিনসি জাপার নিউ ইয়র্ক টান।
স্টেজ থেকে জবাব এল, আপনি কিউ দিয়েছেন সেভেনটি সেভেন। ওটা টার্নটেবলের কিউ।
কী! ঝট করে কম্পিউটারের দিকে ফিরে তাকালেন ম্যানেজার। কিন্তু একটা লোককে তুলে ধরে রাখায় দৌড়ে যেতে পারলেন না।
কম্পিউটারে কোন গোলমাল হয়নি তো? টার্নটেবল অপারেটর জিজ্ঞেস করল।
হতে পারে! বিড়বিড় করলেন ম্যানেজার, কিন্তু কথাটা কিশোরের কান এড়াল না।
টেরি হান্নাকে স্টেজের ধারে একটা কটে নামিয়ে রেখে ফোনের দিকে দৌড়

দিলেন।
টেরির কাছে গিয়ে জানতে চাইল পিটার, কি অবস্থা তোমার?
ব্যথায় ককাতে ককাতে জবাব দিল টেরি, মনে হয় গোড়ালিটা গেছে।
কিশোর আর জিনার দিকে ফিরল মুসা, গোড়ালি ভেঙে থাকলে কয়েক মাসের জন্যে বাতিল। নাচানাচি বাদ।
ব্যাপারটা পিটারের বেলায়ও ঘটতে পারত, চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। কিন্তু তদন্ত করারও কোন উপায় দেখছি না। আমাদের উঠতে দেবে না। জোর করে কিছু করতে গেলে পুলিশের কাছে দিয়ে দেবে।
তাহলে কি করব? আমরা শ্রমিক নই, অভিনেতা নই, থিয়েটারের কেউ নই। এখানকার লোকেরাও পিটারের বন্ধু হিসেবে আমাদের চিনে ফেলেছে। ফাঁকি দিতে পারব না। তাহলে? নিরাশ ভঙ্গিতে হাত নাড়ল মুসা।
একটা উপায় অবশ্য আছে... চোখ চকচক করছে জিনার।
তার দৃষ্টি অনুসরণ করে আউটার করিডরের দিকে তাকাল মুসা ও কিশোর।
আধখোলা দরজা দিয়ে অডিশন নোটিশটা চোখে পড়ছে। বাইরে থেকে আ বাতাস লাগলেই নড়ে উঠছে কাগজটা।
ওখানে ঢোকার কথা বলছ নাকি? মুসার প্রশ্ন।
মাথা নাড়ল জিনা।
কিশোর আগেই বুঝেছে। মুসার কথার জবাব দিল, না। তবে নোটিশটা বলেছে একজন পুরুষ আর একজন মহিলা প্রয়োজন।
তাকে শুধরে দিল জিনা, এখন একজন পুরুষে আর হবে না, দু-জন লাগবে টেরির সমান লম্বা, মার্শাল আর্ট জানা...
এতক্ষণে বুঝেছে মুসা, আমি আমার কথা বলছ! কিন্তু নাচের ন-ও তে জানি না আমি। জীবনে কখনও স্টেজে উঠিনি...
তাতে কি? কিশোর বলল, মার্শাল আর্ট তো জানো। ঠিকমত অঙ্গভা করতে পারলে, জড়তা এড়াতে পারলে ওটাই নাচ হয়ে যাবে। তা ছাড়া আমি তে থাকবই আশেপাশে। ভয় কি?
কিন্তু আমাদের নেবে কেন?
এখন ওদের লোক প্রয়োজন। আমাকে নেবেই ওরা, কারণ অভিনেতা হিসে ছোটবেলায়ই সুনাম করে ফেলেছি। জিনাকে নেবে পিটারের সুপারিশে। আ আমাদের তিনজনের সুপারিশ তোমাকে নেয়ার জন্যে যথেষ্ট।

.

দরদর করে ঘামছে মুসা। কিশোরের কথাই ঠিক হয়েছে। ঢুকতে কোন অসুবি হয়নি ওদের। নিয়ে নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। নাচ শিখতে শিখতে এখন প্রাণ বেরোনো

জোগাড় মুসার। বাস্কেটবল প্র্যাকটিসের চেয়ে অনেক কঠিন লাগছে তার কাছে। কিশোরকেও নাচতে হচ্ছে। মুসার চেয়ে বেশি কষ্ট হচ্ছে তার। কারণ অ ফিট নয় তার শরীরটা।
পরদিন সকালে বিছানা থেকে নামার সময় মুসার মনে হলো একটা ট্রাক যে চলে গিয়েছিল তার শরীরের ওপর দিয়ে। পেশীতে ব্যথা। এই শরীর নিয়েই আবা যেতে হবে প্র্যাকটিস করতে।
কিশোরের অবস্থা আরও খারাপ। তার সঙ্গে দেখা হতেই মুসা বলল, এ নাচিয়েগুলো মানুষ না, কিশোর! আন্না ওদের শরীরে কি দিয়েছে আল্লাই জানেন?
হেসে বলল কিশোর, ওদেরকে বাস্কেটবল খেলতে দিলে বলবে, বাস্কেটব খেলোয়াড়েরা মানুষ নয়:...সব কাজেই প্র্যাকটিস দরকার। একেক কাজে একে রকম প্র্যাকটিস। একজনের কাজ আরেকজনকে করতে দিলে এবং সেটা তা জানা না থাকলে সাংঘাতিক কঠিন মনে হবে।
কিন্তু কিশোর, স্টেজে গিয়ে দর্শকদের সামনে যদি না পারি? পচা ডিম মেরে শেষ করে দেবে। কয়েক মন সাবান দিয়ে ধুয়েও গন্ধ দূর করতে পারব না!
আরে অত ঘাবড়িও না, পারবে ঠিকই। আমরা তো আর হিরো হতে যাচ্ছি, কোনমতে কাজ চালিয়ে দিতে পারলেই হলো। আমাদের আসল কাজ হলো গোয়েন্দাগিরি করা, পিটারকে বাঁচানো।
কিন্তু মঞ্চে উঠলেই তো আমার হাত-পা সিঁটিয়ে যাবে। অভিনয়ের আমি কি বুঝি? আমি পারব না, কিশোর, ভাই, আমাকে মাপ করো...
আরে দূর, অত ঘাবড়াও কেন? পারবে, খুব পারবে। না পারলে আমি শিখিয়ে দেব। আসল কাজটা হলো চেষ্টা করা। চেষ্টায় সব হয়।
নাচ শেখান যে ভদ্রলোক, তার নাম হেফটি ভাগনার। মুসার ভয় দেখে হাসলেন। সান্ত্বনা দিলেন, তোমার চেয়ে অনেক আনাড়িকে নাচের ওস্তাদ বানিয়ে দিয়েছি আমি। তোমার তো রীতিমত ট্যালেন্ট আছে। ভাল লাফ দিতে পারো...বাস্কেটবল এই একটা সুবিধা করে দিয়েছে তোমার। ভয় নেই, কোন ভয় নেই, দর্শকরা তোমার প্রশংসাই করবে, আমি হেফটি ভাগনার বলছি।
ওস্তাদের কথায় ভয় অনেক কাটল মুসার, আত্মবিশ্বাস বাড়ল।

.

অবশেষে মুসাকে ছাড়পত্র দিয়ে দিলেন ভাগনার। কোন পার্ট করতে হবে তা-ও বুঝিয়ে দিলেন, পিটার আর তার হিরোইন নেলি গুহার ভেতর থেকে পালানোর চেষ্টা করবে। সৈকতে বেরিয়ে গিয়ে পড়বে জাপানীদের খপ্পরে। ওই দৃশ্যটাতে ওদের সঙ্গে থাকবে তুমি।
আমি এটা ভাল পারতাম।

তুমি সবই ভাল পারবে, জাত অভিনেতা, বুঝে গেছি আমি। তোমাকে আরও কঠিন একটা পার্ট দেয়া হবে। ঘোরের মধ্যে স্বপ্ন দেখবে পিটার-ক্যালিফোর্নিয়ায় বাড়ি পৌঁছে গেছে, সৈকতে বেড়াতে বেরিয়েছে। গান গাইবে ওখানে, নাচবে, নানা রকম খেলা খেলবে, সেখানে তুমিও থাকবে তার সঙ্গে…
হু, মন্দ না। তারপর?
বীচবল খেলতে হবে তার সঙ্গে তোমাকে…
বীচবল!
মুচকি হাসল জিনা। কিশোরের দিকে তাকিয়ে কৃত্রিম সমবেদনায় জিভ দিয়ে চুক চুক শব্দ করল।
আঁতকে উঠলে যে? পারবে না নাকি? জিজ্ঞেস করলেন ভাগনার।
পারব না, কারণ যে কোন আউটডোর গেম আমার অপছন্দ-বললে কাজ হারানোর ভয় আছে, চুপ করে রইল কিশোর।
হেসে বলল মুসা। আরে দূর, অত ঘাবড়াও কেন? পারবে, খুব পারবে। না পারলে আমি শিখিয়ে দেব। আসল কাজটা হলো চেষ্টা করা। চেষ্টায় সব হয়। কিশোরের দিকে চেয়ে ভাগনারের অলক্ষে চোখ টিপল। বোঝাতে চাইল–কেমন মজা! আমার সময় তো খুব বলেছিলে, চেষ্টায় সব হয়। অন্যকে পরামর্শ দেয়া খুব সহজ!
তাহলে আর কি? ভাগনার বললেন, ঠিক আছে, যাও এখন। তিনটায় আবার দেখা কোরো।

.

পিটারের ড্রেসিং রুমের দরজা খুলে ভেতরে উঁকি দিল কিলোর, পিটার, ভাল খবর আছে। ওর পেছনে দাঁড়িয়ে আছে মুসা আর জিনা।
হাসিমুখে ওদের স্বাগত জানাল পিটার আর ভিনসি জাপা।
পিটার বলল, দাঁড়াও, দাঁড়াও, বোলো না! দেখি আন্দাজ করতে পারি কিনা? চোখ বন্ধ করে কপালে হাত রাখল সে। শেকসপীয়ারের ভূতকে তাড়া করে ধরে ফেলে এখন শেকল দিয়ে বেঁধে রেখেছ। চোখ মেলে হাসল। এমনি, দুষ্টুমি করছিলাম। খবরটা আমি জানি। আরও জানি, ভালই করবে তোমরা।
থিয়েটারে স্বাগতম, মুসা আর কিশোরের সঙ্গে হাত মেলালেন জাপা। এখানে ঢুকতে আর কোন বাধা থাকল না এখন তোমাদের। সেই সুবাদে খানিকটা পপকর্ন হয়ে যাক? মাঝারি আকারের একটা কাগজের ঠোঙা বের করে আনলেন যে চেয়ারে বসেছেন সেটার পেছন থেকে। একেবারে তাজা দিয়েছে।
ডায়েট কন্ট্রোল করার ফলে পেট প্রায় খালিই থাকে কিশোরের। জিভে জল এসে গেল তার। কিন্তু সে কথা বলার আগেই জিনা বলে উঠল, বাহ, পোশাকটা তো

সুন্দর! নতুন?।
পিটারের কস্টিউম র‍্যাকের দিকে এগিয়ে গেল সে। সিল্কের একটা আলখেল্লার মত ঢোলা পোশাক, তাতে নানা রঙের ফিতার বন্ধনী লাগানো। ধরার জন্যে হাত বাড়াল।
ঝনঝন করে কাঁচ ভাঙল। চিৎকার করে উঠল পিটার, আহহা, গেল তো পড়ে!
ফিরে তাকাল জিনা।
ভাঙা কাঁচ কুড়ানোর জন্যে নিচু হলো মুসা, ভাঙা আয়না মানে ব্যাড লাক!
তুমিও দেখি ববের মত কথা বলো, পিটার বলল।
কাঁচ কুঁড়াতে মুসাকে সাহায্য করল কিশোর আর জিনা।
দরজার দিকে এগোতে এগোতে জাপা বললেন, কম্পিউটারে নাম্বার সাজাতে বলিগে। কান খাড়া রাখবে কিন্তু। কিউ ভুল কোরো না। রিহার্সালের সময় যা বলেছি, অক্ষরে অক্ষরে মনে রাখবে। শেষ কথাগুলো নতুন অভিনেতাদের উদ্দেশে বললেন তিনি।
আসছি, পিটার বলল। কাঁচগুলো তুলেই চলে আসব।
ড্রেসিং রুম থেকে বেরোনোর আগে পপকর্নের ঠোঙাটার দিকে লোভীর মত তাকাল কিশোর। স্টেজের ডানে চলে গেল পিটার, ওদিক দিয়েই তার ঢোকার কথা। জিনা বসল দর্শকদের মাঝে। কিশোর আর মুসা স্টেজে রয়ে গেল ঢোকার অপেক্ষায়।
কিশোর দেখল, সুতো আর কঁচি হাতে পিটারের ড্রেসিং রুমের দিকে যাচ্ছে। একজন লোক। গলায় ঝোলানো দর্জির ফিতে।
পিটারের দর্জি, মুসাকে বলল কিশোর।
দর্জি?
থিয়েটারে নানা রকম পোশাক লাগে, কস্টিউম। সব সময় রেডি রাখতে হয়। কোথাও ছিঁড়ল-ফাটল কিনা দেখে রাখে দর্জি। মেরামত দরকার হলে সঙ্গে সঙ্গে সেটা সেরে রাখে।
বাপরে, থিয়েটারে অনেক ঝামেলা!
কাছে একটা টুলে পড়ে থাকা খবরের কাগজের হেডিঙে চোখ পড়ল কিশোরের:
দুর্ভাগ্যের শিকার তরুণ অভিনেতা
শেকসপীয়ারের প্রতিশোধ!
কাগজটা হাতে নিল সে। হেডলাইনের নিচে পিটারের একটা ছবি। কপালের ফোলাটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তার নিচে ক্যাপশন:
ওয়াইল্ড! ওয়াইল্ড! ওয়াইল্ড-এর স্টার পিটার হাইয়েম
এই হপ্তায় অনেকগুলো দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন।

ছবিটা দেখতে দেখতে মুসা বলল, আসলে যতটা ফুলেছিল তার চেয়ে বেশি ফোলা লাগছে ছবিতে।
হ্যাঁ, চোখের পাতা সরু হয়ে এল কিশোরের। ইচ্ছে করেই হয়তো ছবিটায় এ রকম করেছে। দ্রুত পাতা উল্টে শো-বিজের গসিপ পাতায় চলে এল সে।
এটা দেখো, কিশোরের কাঁধের ওপর দিয়ে দেখতে দেখতে বলল মুসা, আর্ট টিলারি একটা বিদেশী ফিল্মে কাজ করার কন্ট্রাক্ট সই করেছে। পিটারকে ছাড়া কলিনের আর কোন পথ নেই, তাকে পছন্দ করুন আর না-ই করুন।
তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার ভেসে এল পিটারের ড্রেসিং রুম থেকে।
চোখের পলকে ঘুরে দাঁড়িয়ে সেদিকে দৌড় দিল মুসা। কাগজটা হাত থেকে ফেলে তার পেছনে ছুটল কিশোর। ওদের পেছনে আরও কয়েকজন।
ঘরে ঢুকে দেখা গেল পাগলের মত ডান হাত চুলকাচ্ছে পিটারের দর্জি। চামড়া লাল হয়ে উঠেছে।
কি হয়েছে? জানতে চাইল কিশোর।
কোণের সিঙ্কের কাছে দৌড়ে গেল দর্জি। কল ছেড়ে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে হাত ভেজাতে ভেজাতে বলল, উফ, জ্বলে গেল! পুড়ে যাচ্ছে যেন!
এই, ডাক্তার ডাকুন! দরজার কাছে উঁকি মারছে অনেক লোক, তাদের উদ্দেশে বলল কিশোর। দর্জির দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, হয়েছে কি?
আঙুলের কাছ থেকে বাহুর মাঝামাঝি পর্যন্ত এখন লাল অনেকগুলো দাগ দেখা যাচ্ছে দর্জির। কি জানি, বলতে পারব না! ওটা কেবল ছুঁয়েছি, অমনি এই অবস্থা! কাঁপা হাতে পিটারের নতুন পোশাকটা দেখাল সে।

.
আর আধ ঘন্টা বাকি। প্লীজ, যার যার জায়গায় যান, স্টেজের স্পীকারে বেজে উঠল জাপার কণ্ঠ।
আমি যাই, মুসা আর কিশোরকে বলল পিটার। রেডি হতে হবে।...ও, ডাক্তার বুঝেছেন কি জিনিস লাগানো ছিল পোশাকে। অ্যানটিভোট দিয়ে দিয়েছেন ফক্সিকে, ঠিক হয়ে যাবে।
গুড, কিশোর বলল। দর্জির জন্যে উদ্বিগ্ন হয়ে ছিল সে। তোমার পোশাকের কি হবে? ওটা তো আর পরতে পারবে না।
মুখে ছায়া নামল পিটারের। বলতে কষ্টই হলো যেন, আজ রাতের জন্যে অন্য আরেকটা দেয়া হবে আমাকে। দেখেটেখে দেবে, যাতে ক্ষতিকর কিছু লাগানো না থাকে।
আজ রাতে পারবেন কাজ করতে? মুসার প্রশ্ন।

পারব। তবে মনের জোর আর রাখতে পারছি না। ভয়ই লাগছে। ভাগ্যিস পরিনি পোশাকটা! ফক্সি বেচারার জন্যেই বেঁচে গেলাম। আমার যন্ত্রণাটা গেল তার ওপর দিয়ে।
বাঁচলে তো বটেই, কিশোর বলল। স্টেজে যাওয়ার আগে গায়ে দিলে আর অভিনয় করতে হতো না। যে লাগিয়েছে সে এটাই চাইছিল, যাতে মঞ্চে যেতে না পারো। এখন মনে করার চেষ্টা করো তো পোশাকটা কে কে ধরেছিল আজকে?
মাথা হেলিয়ে ভাবল পিটার। ফক্সি ধরেনি এটা ঠিক...
সে তো জানা কথাই, মুসা বলল। নিজে আজেবাজে জিনিস লাগিয়ে আবার নিজেই ধরতে যেত নাকি?
কে লাগিয়েছে কার কথা বলি? নিজের থুতনিতে টোকা দিল পিটার। নিচের ওয়ারড়ো ডিপার্টমেন্টের কেউ হতে পারে, ডিজাইনারদের কেউ হতে পারে। কজনকে সন্দেহ করব?
মাথা ঝাঁকাল কিশোর। আমার ধারণা, তোমার ঘরে এসে ঝোলানোর পর পোশাকটাতে ওই জিনিস লাগানো হয়েছে। নইলে যে নিয়ে আসত তারও হাতে লাগত; চুলকাত। পুরো কাপড়ে না লাগিয়ে সামান্য একটু জায়গায় লাগালৈ অবশ্য আলাদা কথা।
ওটা আনার পর ড্রেসিং রুমে অনেক লোক ঢুকেছে। ভিনসি জাপা, হেফটি ভাগনার, রলি ওয়ারনার, কয়েকজন অভিনেতা। ওদের যে কেউ লাগিয়ে থাকতে পারে।
রলি ওয়ারনারের নামটা লাফ দিয়ে উঠে এল কিশোরের মনে। রলি-পিটারের সহকারী। বব রডম্যানের বাড়িতে দুর্ঘটনার সবচেয়ে সন্দেহভাজন ব্যক্তি। পিটারকে বসিয়ে দিয়ে নিজেকে তার জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে করছে এ সব?
দরজায় উঁকি দিলেন জাপা। কিশোর আর মুসাকে বললেন, দেরি করছ কেন তোমরা? টিকিট বিক্রি শেষ। একটা সীটও পড়ে নেই। তোমাদেরকে বসার জায়গা দেখিয়ে দেব, এসো।
ড্রেসিং রুম থেকে প্রায় ছুটে বেরোল দুই গোয়েন্দা। দরজা দিয়ে দর্শকরা ঢুকলে সীট নম্বর দেখে তাদের বসানোর ব্যবস্থা করছে একজন লোক। সেই লোকই কিশোর আর মুসাকে বারের কাছাকাছি একটা জায়গা দেখিয়ে দিল। জিনা দাঁড়িয়ে আছে ওখানে। হাত নেড়ে ওদের ডাকল। বক্স অফিসের কি অবস্থা দেখার জন্যে উঁকি দিল কিশোর। টিকেট কাউন্টারের সামনে এখনও লম্বা লাইন। আশায় আছে লোকগুলো, যদি কোনমতে একটা টিকিট পেয়ে যায়!

সাংঘাতিক ব্যবসা হবে মনে হচ্ছে, যে লোকটা ওদের সীট দেখিয়ে দিয়েছে। তাকে বলল কিশোর। ঘরভর্তি লোকের সামনে মঞ্চে উঠে অভিনয় করতে কেমন লাগবে, ভাবতেই রোমাঞ্চিত হলো সে।
তিন মাসের জন্যে বুকড হয়ে গেছে শো, জবাব দিল লোকটা। অথচ এখনও প্রিভিউ চলছে, আসল শো শুরুই হয়নি। অর্ডারের পর অর্ডার আসছে। কে ভেবেছিল এই কাণ্ড হবে এ হপ্তায়? আগে তো মরেই ছিল।
চলে গেল লোকটা।
জিনা বলল, দরজার পাশে দাঁড়িয়ে অনেকের কথা শুনছিলাম। পিটারের অ্যাক্সিডেন্টের কথাই বলাবলি করছে সবাই। যেন শো দেখতে নয়, দুর্ঘটনা দেখতে এসেছে। ঘটলে খুশি হবে। কখন ঘটবে তার অপেক্ষা করবে। হায়রে মানুষ।
মুসা বলল, যে কোন ধরনের বিজ্ঞাপন শো-র জন্যে ভাল।
একটা লোকের ওপর বার বার আঘাত আসছে, মরেও যেতে পারে, এটাকে বিজ্ঞাপন বলো! তুমিও তো মনে হচ্ছে মনে মনে চাইছ অ্যাক্সিডেন্ট থোক!
কমতে শুরু করল আলো। চুপ হয়ে গেল দর্শকরা। অর্কেস্ট্রা বাজতে শুরু করল।
অভিনয় দেখতে দেখতে যেন অন্য এক জগতে চলে গেল কিশোর। ভুলে গেল সে গোয়েন্দা, অভিনয় নয়, তদন্ত করতে এসেছে এই থিয়েটারে।

.

মধ্যবিরতির পর স্টেজের পেছনে এসে উঠল সে, জিনা আর মুসা।
পিটারকে দেখে জিনা বলল, আপনি সত্যি ভাল অভিনয় করেন, পিটার।
মুখ তুলে হাসল পিটার, থ্যাংকস। বাধাটা যে পুরোপুরি ভেঙে দিলাম সেটা কেমন লাগল?
বাধা…
মুসা কথাটা শেষ করার আগেই মাথার ওপর কি যেন নড়ে উঠল। ঝট করে মুখ তুলে তাকাল কিশোর। পরক্ষণেই এক হ্যাঁচকা টানে সরিয়ে নিল পিটারকে।
ফ্লাই এরিয়া থেকে ভারি একটা কাঠের দরজা খসে পড়ল। আরেকটু হলেই লাগত পিটারের গায়ে। মেঝেতে পড়ার আগেই আটকে গেল, ওপরের অংশটা দুটো দড়ি দিয়ে বাঁধা।
স্টেজে ছুটে এল জাপা। চিৎকার করে ডাকল নিরুকে।
পর্দার আড়াল থেকে মাথা বের করল নিরু।
এটা কি! দরজাটা দেখিয়ে বললেন জাপা।
আমি কি করে বলব?
কি করে বলবে মানে?

কিউটা তো আপনিই দিলেন। আপনার কথামতই কাজ হয়েছে।
ক্ষণিকের জন্যে স্তব্ধ হয়ে গেল যেন সবাই। জাপাকে দেখে মনে হচ্ছে ফেটে পড়বেন। এমন ভঙ্গিতে এগোলেন নিরুর দিকে, যেন কথা বললেই মেরে বসবেন।
চোখের মাথা খেয়ে বসেছিলে? আমি তো ছিলাম পর্দার আড়ালে, দেখেছি নাকি কি ঘটছে? তুমি তো দেখেছ। আমি বললেই তুমি শুনবে কেন? উফ্, আর কত! বিরক্ত হয়ে গেছি এ সব অ্যাক্সিডেন্ট নিয়ে!
আমাকে দোষ দিচ্ছেন কেন? কিউ দেয়ার মালিক আপনি, আমরা আপনার কথামত কাজ করি। ইচ্ছে করে কি আর ফেলেছি? না পারলে আপনি বরং চলে যান, অন্য কেউ আসুক। অ্যাক্সিডেন্টগুলো আপনার জন্যেই হচ্ছে।
চড় মারার জন্যে হাত তুললেন ম্যানেজার।
তাড়াতাড়ি তাঁকে ধরে ফেলল চারজন শ্রমিক। শান্ত করার চেষ্টা করতে লাগল।
নিরুর দিকে তাকিয়ে ফুঁসতে লাগলেন জাপা, তুমি কি করে চাকরি করো এখানে দেখে নেব! সব শয়তানি তোমার! সমস্ত শয়তানির মূলে তুমি!
যান যান, যা করতে পারেন করুনগে! নিরুও জাপার হুমকির তোয়াক্কা করল না।
•
ঠেলতে ঠেলতে স্টেজের দরজা দিয়ে ম্যানেজারকে বের করে নিয়ে গেল লোকেরা।
তার পেছনে চলল কিশোর, মুসা আর জিনা। যে পরিমাণ খেপেছেন জাপা, তাঁকে দিয়ে আপাতত আর কাজ হবে না, বাকি নাটকটা চালানোর দায়িত্ব অ্যাসিসটেন্ট ম্যানেজারের ওপর ছেড়ে দেয়া হলো।
কিশোর দেখল, দরজায় লাগানো পেগবার্ড পরীক্ষা করছে টোপাজ। খুব ভাল।
অফিসের চাবি ফেরত দিয়ে যেতে ভুলে গেছে ম্যানেজার। বিড়বিড় করল সে।
মুসা আর জিনাকে টেনে সরিয়ে আনল কিশোর। ফিসফিস করে বলল, ভুলে যায়নি।
মানে? দুজনেই হাঁ।
পকেট থেকে খাটো একটা চেনসহ চাবি বের করে দেখাল কিশোর, রেখেছিলেন ঠিকই। গোলমালের সুযোগে আমি সরিয়ে ফেলেছি। জাপার অফিস খুঁজে দেখব। জানার চেষ্টা করব অ্যাক্সিডেন্টগুলোর মূলে তিনিই কিনা।
.
মুসার টর্চের আলো ঘুরে বেড়াতে লাগল অফিসঘরে। মাঝরাত পেরিয়ে গেছে। চুরি করে থিয়েটারে ঢোকার আগে কাউকে চোখে পড়েনি তার।
হঠাৎ বলল ফিসফিস করে, শুনছ?

শুনছি, জবাব দিল কিশোর। তোমার হৃৎপিণ্ডের শব্দ। দেখি, আলোটা আরেকটু ফেরাও তো এদিকে।
কিশোরের হাতের ফোল্ডারটার ওপর আলো ফেলল মুসা। কভারে লেখা: পারসোনাল।
নিরু ওয়ারনারের ফাইল।
কি লেখা? জানতে চাইল মুসা।
বারের মধ্যে গোলমাল করার অপরাধে একবার অ্যারেস্ট হয়েছিল। আরও খানিকক্ষণ দেখে ফাইলটা বন্ধ করে ফেলল কিলোর। আর কিছু নেই। তিনসি জাপার ফাইলে সন্দেহ করার মত কোন তথ্য নেই। তবে টোপাজের ফাইলে আছে। একটা অপরাধে পুলিশ ধরে নিয়ে গিয়েছিল তাকে। জামিনে মুক্তি দিয়েছে। নিয়মিত হাজিরা দিতে হয় থানায়।
আর কিছু?
নাহ্, মাথা নাড়ল কিশোর। চলো, বেরোই। ফাইলটা ফোল্ডার কেবিনেটে রেখে দিল সে।
বেরোনোর সময় বা হাতে দরজার হাতল ধরে টানল।
গ্রাউন্ড ফ্লোরের নিচের তলায় অর্থাৎ মাটির নিচে রয়েছে ওরা। পা টিপে টিপে এগোচ্ছে। সিঁড়ির রেলিঙ ধরতেই উহ্ করে উঠল। বাঁ হাত চুলকাতে শুরু করল।
কি হলো? জানতে চাইল মুসা।
চুলকানি। দুটো ধাপ উঠল কিশোর। আরও বাড়ল চুলকানি। আরি, বাড়ছেই তো! অসহ্য!
আশ্চর্য! বিশ্বাস করতে পারছে না মুসা। এখানে চুলকানির বিষ এল কোত্থেকে? বিছুটির ব-ও তো নেই কোথাও।
এই জিনিসই যে পিটারের কাপড়ে লাগিয়ে রাখা হয়েছিল, সন্দেহ রইল না কিশোরের। মনে হচ্ছে জাপার পপকর্নের ঠোঙায়…
…ছিল এই বিষ! বাক্যটা শেষ করল মুসা।
সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে তাকে জিজ্ঞেস করল কিশোর, তোমার চুলকাচ্ছে?
না।
তাহলে দরজার হাতলে লেগে ছিল, রেলিঙে নয়। কোন ভাবে লাগিয়ে ফেলেছেন জাপা…।
ভোঁতা একটা শব্দ হলো।
এটা কিন্তু আমার হার্টের নয়! কান পাতল মুসা।
বাঁ দিক থেকে আসছে। চলো, দেখি?

জাপার কম্পিউটারের দিক থেকে আসছে শব্দটা। দৌড়ে এল দু-জনে। মনিটরের জ্বলন্ত পর্দা ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ল না। টর্চ জ্বালল মুসা।
জলদি নেভাও! ধমক এল পেছন থেকে।
ফিরে তাকাল দুই গোয়েন্দা।
মনিটরের পর্দার হালকা আভায় পিস্তলের চকচকে নলটা চিনতে ভুল হলো না ওদের।

.

হাত তোলো! সাবধান, কোন চালাকি নয়। আদেশ এল কঠোর কণ্ঠে।
ধীরে ধীরে এগিয়ে এল কিশোর আর মুসা। ওদের সামনে পিটারের ড্রেসিং রুম। সামান্য ফাঁক হয়ে আছে।
ওই দরজা দিয়ে ঢোকো! আবার আদেশ।
পা দিয়ে ঠেলে পাল্লা খুলল কিশোর। নিয়ন আলোয় আলোকিত একটা ছোট ঘড়ি রাখা পিটারের ড্রেসিং টেবিলে, গোলাপী আভা ছড়িয়ে পড়েছে ঘরে।
সুইচ টেপার শব্দ হলো। উজ্জ্বল আলো জ্বলে উঠল।
গলা শুনেই লোকটাকে চিনেছে কিশোর। হাতে ৩৮ ক্যালিবারের রিভলভার। নুরিখ টোপাজ।
হাতের চুলকানি বন্ধ হয়নি কিশোরের।
তাহলে তোমরাই! টোপাজ বলল।
চট করে কিশোরের দিকে তাকিয়ে নিল মুসা। আমরা মানে? বুঝতে পারল না।
রিভলভারে শক্ত হলো টোপাজের আঙুল। বলেছি না আমার সঙ্গে চালাকি। করবে না। কম্পিউটারটাতে তোমরাই গোলমাল করে রেখেছ। হাত দিতে দেখেছি।
আমরা নই!
পুলিশকে বোলো, এ কথা। রিভলভারটা তাক করে ধরে রেখে ফোনের দিকে হাত বাড়াল টোপাজ।
পুলিশকে বোঝানো মোটেও কঠিন হবে না, শান্তকণ্ঠে বলল কিশোর। সমস্যা আপনারই বেশি হবে। থানায় যে অফিসারের কাছে হাজিরা দিতে যান, তিনি যদি শোনেন আপনার কাছে একটা বেআইনী অস্ত্র আছে, খুশি হবেন না নিশ্চয়।
অন্ধকারে আন্দাজে ঢিল ছুঁড়েছিল কিশোর, লেগে গেল। চমকে যেতে দেখল টোপাজকে। রিভলভারের ভয় আর করল না, সিংকের কাছে এগিয়ে গিয়ে কলের মুখ ছেড়ে ঠাণ্ডা পানি দিতে লাগল হাতে।
ফোনের ওপর স্থির হয়ে গেছে টোপাজের হাত। তুমি জানলে কি করে?

রিভলভারটার কথা অনুমান করেছি, হাসল কিশোর। তবে অপরাধ যে একটা করেছেন, এটা জানি।
রিভলভার নামাল টোপাজ। যাও, ভাগো! এবারের মত ছেড়ে দিলাম।
কিন্তু আমরা ছাড়লে তো? সুযোগ পেয়ে গেল মুসা। কম্পিউটারের কাছে আপনি কি করছিলেন?
আমি এখানে গার্ডের চাকরি করি। যেখানে খুশি যাওয়ার অধিকার আমার আছে। স্টেজের ডানে চেয়ারে বসে বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, হঠাৎ জেগে গেলাম। দেখি কম্পিউটারের সামনে একটা ছায়া নড়াচড়া করছে। তোমাদের টর্চের আলো দেখে দিল দৌড়…
কি ধরনের ছায়া? জানতে চাইল কিশোর।
দুজনের দিকে একবার করে তাকিয়ে নিল টোপাজ। খাটো, তোমাদের মত নয়। রোগা, সেটাও তোমাদের মত নয়।
তার মানে আমরা নই, মুসা বলল, বুঝলেনই তো। আর কিছু বলার আছে?
দেখো, আমাকে যা-ই ভাব তোমরা, একটা কথা বিশ্বাস করো, এই থিয়েটারটাকে সত্যি ভালবাসি আমি। এর কোন ক্ষতি চাই না। দয়া করে যদি এখন বলো, এত রাতে এখানে কি করছিলে, খুশি হব। পিটারের বন্ধু সেজে আসলে কি করছ বলো তো?
কিশোরের দিকে তাকাল মুসা। জবাব দিতে দ্বিধা করছে।
একটা মুহূর্ত ভাবল কিশোর। মাথা ঝাঁকাল। মিস্টার টোপাজ, আপনাকে বলতে রাজি আছি। তবে কথা দিতে হবে গোপন রাখবেন…
চোখ উজ্জ্বল হলো টোপাজের, তারমানে তোমরাই সেই গোয়েন্দা!
অবাক হবার পালা কিশোরের। হাত চুলকানি বন্ধ করল।
মুসা জানতে চাইল, আপনি জানলেন কি করে?
কেউ বলেনি। পত্রিকায় পড়েছি।
অসম্ভব! বলে উঠল কিশোর।
তাহলে নিজের চোখেই দেখো। ভাঁজ করা একটা পত্রিকার পাতা প্যান্টের পেছনের পকেট থেকে টেনে বের করল টোপাজ। দেখো, লিখেছে; গোপন সূত্রে পাওয়া খবরে জানা গেছে দুজন গোয়েন্দা গোপনে দুর্ঘটনার কারণ খুঁজছে, তদন্ত চালাচ্ছে থিয়েটারে। মুখ তুলল ডোরম্যান, খবরটা পড়ে অবাক হয়েছি। ভাবছিলাম, কে হতে পারে?
এখন তো জেনে গেলেন। কাউকে বলবেন না আশা করি।
না, বলব না। তোমরা যে তদন্ত করছ, তাতে খুশিই হয়েছি। বললাম না, থিয়েটারটাকে ভালবাসি।

থ্যাংক ইউ। কিছু মনে না করলে একটা সাহায্য করুন আমাদের।
কি সাহায্য?
প্যান্টের পেছনে ডলে ভেজা হাত মুছল কিশোর। আসুন আমার সঙ্গে।
ড্রেসিং রুম থেকে বেরিয়ে কম্পিউটারের দিকে এগোল সে। টোপাজকে বলল, ওটা একবার দেখব।
দেখো।
মুসা এগোল কিশোরের পেছনে। অফিসের দিকে চলে গেল টোপাজ।
কিউর একটা তালিকা দেখা গেল মনিটরের পর্দায়। ওপরে লেখা: এডিট মোর।
এ তো গ্রীক ভাষা মনে হচ্ছে আমার কাছে, মুসা বলল।
কিংবা বলো গ্রীক বিয়োগান্তক নাটক।
নাকি শেকসপীয়ারের ট্র্যাজেডি?
এই কুসংস্কারের আলোচনা বাদ দাও তো, মুসা। বাস্তব কথা বলো। প্রমাণ দরকার এখন আমাদের।
নম্বর আর কোডগুলো তো পাগলের পাগলামি মনে হচ্ছে আমার কাছে। কি করে বুঝবে এ সবের মানে?
বোঝার দরকার নেই এগুলো। আমি দেখতে চাইছি অন্য জিনিস।
কয়েক মিনিট পর উঠে দাঁড়িয়ে কিশোর বলল, গণ্ডগোল করে রাখা হয়েছে এখানে।
টোপাজকে বলে থিয়েটার থেকে বেরিয়ে এল দুই গোয়েন্দা। গার্ডের সন্দেহ জাগতে পারে এই ভয়ে পার্কিং লট থেকে দুরে রাস্তার ধারে পিকআপ রেখেছে কিশোর। সেদিকে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ টের পেল, হাতের চুলকানি চলে গেছে। পানিতে সেরেছে বোধহয়।
খবরের কাগজওলারা আমাদের কথা জানল কি করে? প্রশ্ন করল মুসা।
মুখ ফসকে বলে দিয়েছে হয়তো পিটার।
বলেছে যে এ কথা আমাদের জানানো উচিত ছিল।
হয়তো জানাতে চায়নি। এ সবে সে-ও জড়িত থাকতে পারে। দুর্ঘটনায় যদি আহত হয়ে বসেও থাকে, তাহলেও ক্ষতি নেই তার। অভিনয় বন্ধ থাকলেও বেতন দিতে হবে তাকে, সেরকমই চুক্তি হয়েছে।
ভেবে বলল মুসা, কিন্তু বসে থাকার মত লোক মনে হয় না পিটারকে। কাজ করতেই ভালবাসে সে।
আমি ভাবছি কম্পিউটারটাকে স্যাবটাজ করল কে?
ভিনসি জাপা নন তো?

কিন্তু তিনি হলে রাতের বেলা চুরি করে ঢুকে করতে যাওয়ার দরকার কি? দিনের বেলা সবার সামনেই পারেন, কম্পিউটারে তিনি হাত দিলে কেউ সন্দেহ করবে না। তা ছাড়া আমাদের কাছে বলেছেন, প্রোগ্রামিং করতে জানেন না।
আরও একটা ব্যাপার, মোটেও খাটো কিংবা রোগা নন তিনি।
ঠিক, মাথা ঝাঁকাল কিশোর, ও রকম লোক কে আছে থিয়েটারে? কাকে কাকে চিনি আমরা?
এক মুহূর্ত চুপ করে ভাবল মুসা। তারপর বলল, শুধু শরীর স্বাস্থ্যে মিললেই হবে না, তাকে প্রোগ্রামিংও জানতে হবে, তাই না? কোন ধরনের পেশাজীবী কম্পিউটার বেশি ব্যবহার করে? গবেষক, লেখক
ছাত্র, বাদক…
থমকে দাঁড়াল কিশোর, বাদক!
রবিনকে প্রায়ই বলতে শুনি, কম্পিউটারে ড্রাম ট্র্যাকস প্রোগ্রাম করে ড্রামাররা, নানা রকম বাদ্যযন্ত্র…
জানি। থিয়েটারে ও রকম একটা লোককেই চিনি। ফ্ল্যাশ-পটের খুব কাছাকাছি ছিল, অথচ বিস্ফোরণে গায়ে একটা আঁচড়ও লাগেনি।
খাইছে! তাই তো! জাহির বিলিয়ার্ড!
তাহলে বুঝলে তো, শেকসপীয়ারের ভূত ঘটাচ্ছে না এ সব অঘটন!

.

গারবার থিয়েটারের পার্কিং লটে যখন গাড়ি রাখল কিশোর, সকালের রোদ ঢুকছে তখন জানালা দিয়ে।
আমার মনে হয় না কাজটা করতে পারব, মুসা বলল। যতই প্র্যাকটিস করাক।
পারবে, হাই তুলতে তুলতে বলল কিশোর। অনেক রাতে ঘুমিয়েছে। তারপর তোরে উঠেছে আবার। থিয়েটারে এসেছে প্র্যাকটিস করতে। ওরা নতুন লোক। সেজন্যে বেশি প্র্যাকটিস করতে হচ্ছে। জোর রিহার্সাল চলছে।
গাড়ি থেকে নেমে থিয়েটারের দিকে এগোল দুজনে।
কিন্তু এ ভাবে না ঘুমিয়ে আর কতদিন চালাব? মুসার প্রশ্ন।
কে যায় চালাতে? তুমি কি ভাবছ স্টেজে গিয়ে বীচবল খেলতে ভাল লাগবে আমার? একটুও না। কেসটার একটা কিনারা করতে পারলেই পালাব। তোমার আগে ঘুম থেকে উঠেছি আমি আজ। রবিনকে ফোন করেছি। ওকে টেনে তুলেছি বিছানা থেকে।
গালাগাল করেনি?
মাথা ঝাঁকাল কিশোর। করেছে। গাড়িতে করে রাত তিনটেয় ফিরেছে সান ফ্রানসিসকো থেকে। প্রথমে তো ঘুম জড়ানো স্বরে বকাবকি শুরু করল। কিন্তু

জাহিরের কথা যেই বললাম, পুরো সজাগ হয়ে গেল। বলল, আজকে রিহার্সালের পর ওর সঙ্গে লেগে থেকে কিছু বের করার চেষ্টা করবে।
স্টেজ ডোর দিয়ে স্টেজে ঢুকল ওরা। কালো পর্দার আড়ালে জাপার কন্ট্রোল চেম্বারের ভেতর থেকে আসছে কম্পিউটারের কী-র একটানা খটাখট।
মিস্টার জাপা, ডেকে বলল মুসা, আমরা এসে গেছি। তাড়াতাড়িই এলাম, কি বলেন?
খটাখট বন্ধ হয়ে গেল। জবাব নেই।
মিস্টার জাপা? পর্দা সরাল কিশোর।
মনিটরের সামনে বসা পিটার ঘুরে তাকাল। ঠোঁটে আঙুল রেখে কথা বলতে নিষেধ করল ওদের। ফিসফিস করে বলল, চুরি করে এখানে বসেছি, দেখলে আমাকে মেরে ফেলবে!
কণ্ঠস্বর নামিয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর, কি করছ?
কম্পিউটার স্ট্যান্ডে রাখা একটা মোটা ফাইল দেখিয়ে বলল পিটার, কিউর হার্ড কপি এটা। কম্পিউটারের নিচের তাকে রেখে দেয় জাপা। কয়েক হপ্তা আগে বানিয়েছে। কোন পরিবর্তন করতে হলে নিজের হাতে করে। ডানে-বাঁয়ে তাকিয়ে দেখে নিল সে, অন্য কেউ শুনছে কিনা। তারপর স্বর আরও নামিয়ে বলল, কম্পিউটারের সঙ্গে মিলিয়ে দেখছি, কোন গোলমাল করা হয়েছে নাকি। সত্যি বলতে কি, জাপাকে এখন সন্দেহ হচ্ছে আমার।
রাগ ফুটল মুসার কণ্ঠে, নিজেই যদি করবেন, তাহলে আমাদের ডেকে আনলেন কেন...
ঠিক আছে, ঠিক আছে, হাত তুলল কিশোর, সন্দেহ যখন হয়েছে, দেখুক। আমাদের না জানলেই কি? পিটার, তুমি কিন্তু ভুল করেছ। আমাদের ওপর যখন তদন্তের দায়িত্বই দিলে, কথা গোপন করা ঠিক হয়নি তোমার। এই বইটার কথা বলা উচিত ছিল।
মাথা কাত করে পিটার বলল, বলেছি তো। কাল রাতে মাথায় এল কথাটা। তোমাদের অ্যানসারিং মেশিনকে মেসেজ দিয়ে রেখেছি। পাওনি?
জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর, না। ভাবল, মেশিনটা কি খারাপ হয়ে গেল?
যাই হোক, কথাটা মনের মধ্যে খোঁচাতে থাকল, পিটার বলল। সকালে উঠেই চলে এলাম দেখার জন্যে। হাসল সে। কিছু মনে কোরো না, তোমাদের সাহায্যই করতে চেয়েছি।
কিছু পেলে?
দ্বিধা করল পিটার, না...এখনও পাইনি। তবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

বিশ্বাস করতে পারল না কিশোর। পিটারের আচরণ সন্দেহজনক মনে হলো ওর। নার্ভাস হয়ে আছে। কিছু যেন লুকানোর চেষ্টা করছে। কেন? অসুবিধেটা কি?
করিডরে গলার স্বর শুনে তাড়াতাড়ি কম্পিউটার বন্ধ করে দিল পিটার। বইটা রেখে দিল নিচের তাকে।
জাপা ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, এই, তোমরা এসেছে নাকি?
ভেতরে ঢুকলেন তিনি। সঙ্গে এসেছেন হেফটি ভাগনার, আর চারজন অভিনেতা।
এসেছি, হেসে জবাব দিল কিশোর। জিনা একটু পরে আসবে।
আচ্ছা। আসুক। আজ সারাদিন রিহার্সাল চলবে তোমাদের। রাতে স্টেজে উঠতে হবে।
নার্ভাস ভঙ্গিতে কিশোরের দিকে তাকাল মুসা।
মাথা ঝাঁকিয়ে, হেসে অভয় দিল তাকে কিশোর।
.
তবে যত ভয়ই পাক, স্টেজে উঠে অন্য মানুষ হয়ে গেল মুসা। তার মধ্যে যে এতটা ট্যালেন্ট আছে, জানত না। উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল দর্শকরা।
পিঠ চাপড়ে দিয়ে জাপা বললেন, চমৎকার। চেষ্টা করলে ভাল অভিনেতা হতে পারবে তুমি।
রাতে বাড়ি ফেরার পথে হেসে বলল জিনা, স্টার তাহলে বনেই গেলে?
কে যায় স্টার বনতে! আমি খেলোয়াড় হতে চাই। স্টেজে নাচানাচি করতে ভাল লাগে না।
চুপচাপ গাড়ি চালাচ্ছে কিশোর।
রেডিওটা নাড়াচাড়া শুরু করল জিনা। নব ঘুরিয়ে স্টেশন টিউন করতে লাগল। একটা স্টেশনে ক্ল্যাসিক্যাল মিউজিক হচ্ছে...আরেকটাতে বেসবল খেলা... তারপরেরটাতে খবর।
দূর, কোনটাই ভাল না, বিরক্ত হয়ে বলল জিনা। রবিনের কাছ থেকে ভাল কয়েকটা টেপ চেয়ে নিয়ে রেখে দেয়া উচিত গাড়িতে।
রেখে লাভ নেই। মনে করিয়ে দিল কিশোর, গাড়িটা আমার নয়, চাচার। খবরটা দাও তো। গলাটা চেনা মনে হলো!
ঠিকই বলেছে কিশোর। এ তো পিটারের গলা! টেপ করা ইন্টারভিউ হচ্ছে।
গারবার থিয়েটারে বার বার তার ওপর আঘাত আসার কথাই বলছে পিটার ফুলিয়ে-ফাপিয়ে।
সাক্ষাৎকার যে নিচ্ছে সে-ও কম যায় না। বলল, কয়েক দিনেই আপনার যা জনপ্রিয়তা লক্ষ করছি, আর্ট টিলারিকেও তো ছাড়িয়ে যাবেন আপনি। ব্রডওয়েতে তো যাবেনই, সেটা ছাড়িয়েও আরও বহুদূর।

বুঝতে পারছি না কি হবে! দীর্ঘশ্বাস ফেলল পিটার। উইলিয়াম শেকসপীয়ারের ভূত এখন আমার পিছু ছাড়লেই হয়!
হঠাৎ ব্রেক কষল কিশোর।
গতি কমে যাওয়ায় ঝটকা দিয়ে সামনে ঝুঁকে গেল জিনা আর মুসা।
কি হলো? চেঁচিয়ে উঠল মুসা।
বুঝে গেছি। উত্তেজিত কণ্ঠে বলল কিশোর।
কি বুঝেছ?
জবাব দেয়ার আগেই পেছনে টায়ারের শব্দ হলো। আরেকটা গাড়ি ব্রেক করেছে।
ফিরে তাকাল ওরা। একটা স্পোর্টস কার।
মুসা বলল, কিছুক্ষণ থেকেই আয়নায় দেখছি গাড়িটাকে! শিওর আমাদের পিছু নিয়েছে!
.
অ্যাক্সিলারেটর চেপে ধরল আবার কিশোর। পরের মোড়টায় যেন উড়ে চলে এল পিকআপ।
পেছন পেছন ঠিকই আসতে লাগল গাড়িটা।
স্টিয়ারিং বাঁয়ে কাটল কিশোর। মাটি থেকে লাফ দিয়ে উঠে গেল পিকাপের ডান পাশটা। চিৎকার করে উঠল জিনা।
কোথায় যাচ্ছ? চেঁচিয়ে জানতে চাইল মুসা।
জানি না।
একটা ছোট গর্তে পড়ল চাকা। ঝট করে মাথার ওপরে হাত তুলল মুসা, দেরি করে ফেলেছে। ছাতে ঠোকর খেল চাদি। উফ করে উঠল ব্যথায়। বলল, ভাঙা গাড়িতে চড়ার এই হলো শাস্তি।
গুলির শব্দ হলো পেছনে।
মাথা নামাও! বলে জিনার মাথাটা ড্যাশবোর্ডের নিচে চেপে দিয়ে নিজেও মাথা নুইয়ে ফেলল মুসা।
কিশোরের সে-সুযোগ নেই। কারণ গাড়ি চালাতে হচ্ছে ওকে।
আবার পাশে কাটল সে। নাহ, আর পারবে বলে মনে হয় না। কারণ ও চালাচ্ছে ঝরঝরে পিকআপ, পেছনের গাড়িটা স্পোর্টস কার। গতি বাড়িয়ে এগিয়ে আসছে ক্রমে। বাঁয়ের রকটা মনে হচ্ছে মাইলের পর মাইল লম্বা। পথের পাশে গাছের সারি। ডানেও একই অবস্থা, কেবল মাঝে মাঝে বিশাল বিল্ডিঙগুলোতে ঢোকার জন্যে যেটুকু খোলা। একটা বাড়িকে শপিং মল করা হয়েছে। গেটের কাছে নিওন আলোয় লেখা PARK শব্দটার আলো নেভানো।

পালানোর আর কোন পথ না দেখে তীক্ষ্ণ মোড় নিয়ে সেই গেটের দিকে এগোল কিশোর। হলুদ রঙের একটা CLOSED সাইন, যেন ছুটে আসতে লাগল ওদের দিকে।
কিশোর, কি করছ? চিৎকার করে উঠল জিনা। বলেই দু-হাতে মুখ ঢাকল।
তীব্র ঝাঁকুনি, গেটের কাঠ ভাঙার মড়মড় শব্দ। পার্কিং গ্যারেজে ঢুকে পড়ল কিশোর। র‍্যাম্পে উঠতে শুরু করেছে পিকআপ। মাথাটাকে সীটের পেছনে চেপে ধরেছে সে।
চারতলায় একটা বইয়ের দোকান আছে, এরই মধ্যে কোনমতে বলল কিশোর।
তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে! মুসা বলল।
ড্যাশবোর্ড আঁকড়ে ধরে আস্তে মাথা উঁচু করে জানালা দিয়ে তাকাল জিনা। ওপরে উঠতে চাও তো? ফাঁদে পড়ব।
দেখা যাক, কিশোর বলল। ঘুরে ঘুরে উঠতে শুরু করল পিকআপ।
বাড়িটা ছয়তলা। ছয়টা তলাই পার হয়ে র‍্যাম্প থেকে প্রায় লাফ দিয়ে অ্যাসফল্টের ছাদে বেরিয়ে এল গাড়ি। সাদা দাগ দিয়ে ঘর একে চিহ্ন দেয়া রয়েছে। একেকটা ঘরে একটা করে গাড়ি থাকবে। কিন্তু এখন কোন গাড়ি নেই। ওদের বয়ে দেয়াল, তাতে এলিভেটর, কাঁচের ছোট দরজা। ওটার পাশে সিঁড়ি।
পিকআপের ইঞ্জিনের গর্জন ছাড়া আর কোন শব্দ কানে আসছে না কিশোরের। ওরা কি একা? রিয়ারভিউ মিররে তাকাল। র‍্যাম্পের মুখ, যেখান দিয়ে বেরিয়ে এসেছে ওরা, সেটাকে লাগছে কালো একটা গর্তের মত। পঞ্চাশ ফুট পেছনে।
মনে হয় হারিয়ে দিয়েছি, বলল সে।
তাহলে আর কি? ঝাঁপ দাও ওপর থেকে। রাস্তায় নেমে পড়ি, তিক্ত কতে বলল মুসা। যাওয়ার আর তো কোন উপায় দেখছি না।
ছাদের চারটে কোণের দিকে তাকাল কিশোর।
স্পোর্টস কারটার কোন সাড়া না পেয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে আবার নামার জন্যে র‍্যাম্পের দিকে রওনা দিল।
এই সময় নিচ থেকে আলোকিত হতে শুরু করল কালো গর্তটা।
ওরাই আসছে! জিনা বলল।
ব্রেক কষল কিশোর। অ্যাসফল্টের গায়ে ঘষা খেয়ে আর্তনাদ করে উঠল রবারের চাকা।
থামলে কেন? চেঁচিয়ে উঠল মুসা, জোরে চালাও না! সরিয়ে দিতে পারবে ধাক্কা দিয়ে!
কিন্তু কাশি দিয়ে বন্ধ হয়ে গেল পিকআপের ইঞ্জিন।
ইগনিশনে মোচড় দিল কিশোর।

স্টার্ট হলো না ইঞ্জিন।
দুটো হেডলাইটের আলো বেরিয়ে আসতে লাগল র‍্যাম্পের গর্ত থেকে।
আবার চেষ্টা করল কিশোর। লাভ হলো না।
নেমে পড়ো গাড়ি থেকে! এক হাতে ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলে আরেক হাতে জিনার হাত চেপে ধরে টান মারল মুসা।
তিনজনেই নেমে দৌড় মারল সিঁড়ির দিকে।
উঠে পড়েছে স্পোর্টস কার। ওটার হেডলাইটের আলো ওদের ওপর পড়ে লম্বা লম্বা কিভুত ছায়া তৈরি করল-পা অস্বাভাবিক লম্বা, মাথা ছোট।
প্রাণপণে ছুটছে ওরা। আর বিশ ফুট যেতে পারলেই
আচমকা ডানে সরে গেল হেডলাইটের রশ্মি। চোখের পলকে সামনে চলে এল কালো রঙের চকচকে গাড়িটা, সামনে দেয়াল তৈরি করে দাঁড়িয়ে গেল। আটকে দিল সিঁড়িতে ঢোকার পথ।
দেখো, আমার কাছে পিস্তল আছে। গর্জে উঠল একটা ভোঁতা কণ্ঠ।
ঝটকা দিয়ে খুলে গেল গাড়ির দুদিকের দরজা।
পিস্তলটা দেখতে পেল কিশোর। কোন রকম প্রতিবাদ না করে মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়াল।
দেখাদেখি মুসা আর জিনাও তাই করল।
গাড়ি থেকে নামল দুজন লোক। স্কি মাস্ক দিয়ে মুখ ঢাকা। যে লোকটা ড্রাইভ করছিল, তার হাতে পিস্তল।
মুসা জিজ্ঞেস করল, কে আপনারা?
ইটের গাঁথনি তুলে দেয়াল তৈরি করে ঘিরে দেয়া হয়েছে ছাতের চারপাশ। একদিকের দেয়াল দেখিয়ে পিস্তল নেড়ে ধমক দিল ড্রাইভার। ওদিকে যাও?
পেটের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠল কিশোরের, ছাদ থেকে আমাদের লাফ দিতে বলবেন নাকি…
যাও বলছিকথা কম! আবার ধমক দিল ড্রাইভার। সঙ্গীকে বলল, হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছ কি? পিকআপটার ব্যবস্থা করো।
আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে কিশোর। তারপরেও বুদ্ধি ঠিকই কাজ করছে। বুঝতে পারছে, কণ্ঠস্বর আরেক রকম করে কথা বলছে লোকটা। যেন ধরা পড়ে যাওয়ার ভয় করছে।
দ্বিধা করল অন্য লোকটা। তারপর স্পোর্টস কারের দরজা দিয়ে মাথা ঢোকাল। বের করে আনল দুই বোতল মদ। পিকআপের দিকে এগোল।
কি-ব্ধি করতে চান? তোতলাতে শুরু করল কিশোর, ও-ওটা আমার চাচার গাড়ি!

শব্দ করে হাসল পিস্তলধারী। তাতে কি? মরে গেলে চাচাটাচা কিছু থাকবে না। এগারোটার নিউজে কি বলবে এখনই শুনতে পাচ্ছি আমি: তিনটে ছেলেমেয়ে মদ খেয়ে মাতাল হয়ে গাড়ি চালিয়ে মলের ছাদে উঠে পড়েছিল। ছাদের কিনারের দেয়ালে গুতো লাগিয়ে দেয়াল ভেঙে নিচে পড়েছে। তিনজনই মৃত। হাহ হা!
আমরা মাতাল...অসম্ভব...
কথা শেষ করতে পারল না কিশোর। তরল পদার্থ পড়ার শব্দ হলো। ফিরে তাকিয়ে দেখল পিকআপের সীটে মদ ঢালছে লোকটা। ও-কি করছেন? মদ ঢেলে দিচ্ছেন কেন?
এই থামো, সহকারীকে বাধা দিল পিস্তলধারী, সব ঢেলো না। খানিকটা রেখে দাও। ওদের গেলাতে হবে। রক্তে অ্যালকহল লেভেল বেশি দেখতে না পেলে সন্দেহ করে বসবে পুলিশ।
একটা বোতল পুরো ঢেলে শেষ করল অন্য লোকটা। বাকি বোতলটা নিয়ে এগোল ওদের দিকে।
শয়তান কোথাকার... মুঠো পাকাল মুসা। কি করতে চায় লোকগুলো বুঝে ফেলেছে।
থামো, মুসা, বাধা দিল কিশোর, কিছু কোরো না!
পিস্তলটা মুসার মুখের দিকে তাক করে ধরেছে ড্রাইভার। ঠিক। তোমার বন্ধু যা বলছে, করো!
চুপ হয়ে গেল মুসা।
যা বলছি করো, আবার বলল পিস্তলধারী, তাতে ব্যথা কম পাবে। হয়তো টেরই পাবে না কিছু। বোতলের মুখ খুলে দেয়ার জন্যে ইশারা করল সঙ্গীকে। মুসাকে খেতে বলল প্রথমে।
বিড়বিড় করছে জিনা। প্রার্থনাই করছে বোধহয়।
মুসার ঠোঁটের কাছে বোতলের মুখ ঠেকাল লোকটা 1 দাতে দাঁত চেপে রেখেছে মুসা! তাকিয়ে আছে পিস্তলটার দিকে। কি করবে সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। আস্তে করে ঠোঁট ফাঁক করল।
হঠাৎ ইঞ্জিনের শব্দ হলো। পাই করে সেদিকে ঘুরল পিস্তলধারী। কে এল। আবার...
সুযোগটা ছাড়ল না জিনা। মাথা নিচু করে ছুটে গেল লোকটার দিকে। কঁধ দিয়ে ধাক্কা মারল পেটে, বেল্টের সামান্য ওপরে। একই সঙ্গে থাবা চালাল পিস্তল ধরা হাতে।
বিস্ময় এবং ব্যথায় ছোট্ট একটা আর্তচিৎকার বেরোল লোকটার গলা থেকে। হাত থেকে উড়ে গেল পিস্তল।

অ্যাসফল্টের ওপর খটাং করে পড়ল ওটা। পড়ার আগেই ধরার জন্যে ডাইভ দিয়েছে মুসা। ধরে রাখতে পারল না। হাতের ঠেলা লেগে দূরে গিয়ে পড়ল পিস্তলটা। আনার জন্যে এগোতে যাবে, এই সময় চিৎকার করে বলল কিশোর, মুসা, লাগবে না।
ফিরে তাকিয়ে মুসা দেখল, তাড়াহুড়ো করে গিয়ে গাড়িতে উঠছে লোকগুলো। দরজা টেনে ধরে রেখেছে কিশোর আর জিনা, যাতে বন্ধ করতে না পারে। মুসাকেও ডাকল কিশোর।
স্টার্ট দিয়ে সরে যেতে লাগল স্পোর্টস কার।
র‍্যাম্পের মুখ দিয়ে বেরোল আরেকটা গাড়ি। একটা লাল পুরানো ফোক্সওয়াগেন। রবিন! অবাক হয়ে গেল কিশোর।
প্রথমে কিছু বুঝতে পারেনি রবিন। যেই বুঝল, নাক ঘুরিয়ে তেড়ে গেল স্পোর্টস কারটাকে।
পিকআপে উঠে পড়ল কিশোর, মুসা আর জিনা। এইবার ইগনিশনে মোচড় দিতেই স্টার্ট হয়ে গেল ইঞ্জিন। সোজা র‍্যাম্পের মুখের দিকে গাড়ি ছোটাল কিশোর।
নাকে আসছে অ্যালকহলের কড়া গন্ধ। এই ভয়াবহ উত্তেজনার মধ্যেও দেখতে পাচ্ছে মেরিচাচীর বিস্মিত মুখ। বাড়িতে কেউ মদ খায় না। একটু আধটু অভ্যাস যা। ছিল রাশেদ চাচার, সেটাও ছাড়িয়েছেন চাচী। কিশোর খেয়েছে, এটা যদি মাথায় ঢোকে তার বাকিটা আর ভাবতে চাইল না কিশোর!!
র‍্যাম্পের মুখে বাধা সৃষ্টি করা গেল না, তার আগেই ঢুকে পড়ল স্পোর্টস কার। তীব্র বেগে নেমে যেতে লাগল। পেছনে লেগে রইল পিকআপ আর ফোক্সওয়াগেন।
নিচে তিরিশ গজ দূরে লাল একটা সাইন দেখা যাচ্ছে: ENTRANCE ONLY তার ওপাশে রাস্তা।
ধ্যাত্তোর! গেল চলে! হতাশায় ড্যাশবোর্ডে দুম করে কিল মারল মুসা।
কিন্তু গতি না কমিয়ে বেরোতে গিয়েই ভুলটা করল ড্রাইভার। যে পথ ধরে নামছিল, তার গোড়াটা ঢালু হয়ে গিয়ে হঠাৎ করেই সোজা হয়ে গেছে। সেটাতে সামনের চাকা পড়তেই সাংঘাতিক ঝাঁকুনি লাগল। বলের মত ড্রপ খেয়ে ওপরে উঠে গেল গাড়ি। ঝটকা দিয়ে খুলে গেল দুপাশের দরজা। বাইরে ছিটকে পড়ল দুই আরোহী। গাড়িটা সরে চলে গেল।
ব্রেক কষল কিশোর। পড়ে থাকা দুটো দেহের দশ ফুট দূরে এসে থামল পিকআপ।

একধাক্কায় দরজা খুলে ফেলে লাফিয়ে নেমে দৌড় দিল কিলোর। অন্যপাশ দিয়ে নামল মুসা আর জিনা।
পিকআপের পেছনে ফোক্সওয়াগেন থামিয়ে রবিনও নেমে পড়ল।
নিথর হয়ে পড়ে আছে দুটো দেহ।
নিচু হয়ে টেনে একজনের মুখোশ খুলে ফেলল কিশোর।
টান লেগে ডান থেকে বায়ে কাত হয়ে গেল রলি ওয়ারনারের মুখটা।
অন্য লোকটার মুখোশ খুলল রবিন।
ভিনসি জাপা!

.

আতঙ্কিত দৃষ্টিতে দেহ দুটোর দিকে তাকিয়ে আছে জিনা। মরে যায়নি তো?
ওদের নাড়ি দেখল কিশোর। না। তবে অবস্থা ভাল না। আঘাত ভালইলেগেছে।
তাহলে তো অ্যাম্বুলেন্সকে খবর দেয়া দরকার; মুসা বলল। বাড়িতে ঢোকার মুখেই একটা টেলিফোন আছে। সেটার দিকে দৌড় দিল সে।
আশ্চর্য! মাটিতে বসে পড়েছে জিনা। রলিকে আমি বরাবরই সন্দেহ করেছি, কিন্তু ম্যানেজারকে খুব ভাল মানুষ মনে হয়েছে!
আরও আশ্চর্য হওয়ার মত খবর আছে আমার কাছে, রবিন আর জিনা দুজনের দিকে তাকাল কিশোর। ওরা দুজনই শুধু নয়, এর মধ্যে আরও লোক জড়িত। মিউজিশিয়ানদের লকার খুঁজতে গিয়ে জাহিরের সম্পর্কে কি পেয়েছি দেখো, জ্যাকেটের পকেট থেকে একটা খাম বের করে দিল সে।
ভেতর থেকে একটা হলদে ভাজ করা কাগজ বের কর কিশোর। তাতে নম্বর আর তথ্য ভরা। এগুলো কিউ এবং কিউ নম্বর। সে-রাতে আমি যেগুলো দেখলাম কম্পিউটারে, গোলমাল করা, সেগুলোও আছে এতে।
তারমানে জাহিরও আছে এর মধ্যে, জিনা বলল। কিন্তু কেন?
আবার ভাঁজ করে কাগজটা খামে ভরে নিজের পকেটে রেখে দিল কিশোর। প্রশ্নের জবাব জানতে চাইলে আরও গভীরে যেতে হবে আমাদের। পালের গোদাটাকে খুঁজে বের করতে হবে।
টেলিফোন সেরে ফিরে এসে মুসা জানাল, অ্যাম্বুলেন্স আসছে।
রবিন জিজ্ঞেস করল কিশোরকে, মনে হয় গোদাটা কে জানা আছে তোমার?
পিটারের ওপর বার বার আক্রমণ. এলে একটা লোক সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবে, থামল কিশোর। এক এক করে তাকাল সবার মুখের দিকে। এ ভাবে শ্রোতাদের ঝুলিয়ে রেখে মজা পায় সে। চিরকালের অভ্যাস।
কে? জানতে চাইল মুসা।

খুলেই বলি, দাঁড়াও। গাড়ির রেডিওতে খবরটা শোনার পর ব্যাপারগুলো খাপে খাপে বসে গেল আমার মাথায়। পিটারের কথা শুনে মনে হতো, অ্যাক্সিডেন্ট ঘটায় খুশিই হয়েছে সে নইলে এমন করে টিকিটও বিক্রি হত না, তারও কাজ থাকত কিনা সন্দেহ।

ওসব তো জানি আমরা, অধৈর্য হয়ে জিনা বলল। পিটার ব্রডওয়েতে যাবে, আরও ওপরে উঠবে। খ্যাতির চূড়ান্তে চলে যাবে। তাতে আমাদের কি? আসল লোকটা কে বলো?

খ্যাতির লোভ বড় লোভ, সেই সঙ্গে যদি টাকা আসে তাহলে তো কথাই নেই। পিটার হাইয়েমের কাছে এর চেয়ে বেশি আর কি চাওয়ার আছে: যা যা করেছে সে, তাতে অনেক কিছু স্পষ্ট হয়ে যায়। নিজের গুণগান প্রচার করার লোক নিজে ঠিক করেছে সে। ডেভন কলিনের সঙ্গে কথা বলার সময় নিজেই নিজের বিজ্ঞাপন করেছে, নির্লজ্জের মত নিজের প্রশংসা করেছে। জোর করে টিকে থাকতে চেয়েছে নাটকটাতে...।

লোকটার মাথায় যে ছিট আছে, সে তো জানিই আমরা, মুসা বলল। নিজের সম্পর্কে বড় বেশি উঁচু ধারণা। কিন্তু এ সব বলে কি বোঝাতে চাইছ তুমি?

অ্যাক্সিডেন্টগুলো ঘটার আগে টিকিট বিক্রি হত না, মরেই যেত হয়তো শো টা। দর্শক না থাকলে কাকে দেখাবে? কিন্তু পরে, দুই হপ্তার মধ্যে সাংঘাতিক হিট হয়ে গেল, অথচ এখনও ওপেনিঙের ঘোষণাই দেয়া হয়নি। এই পরিবর্তনটা কেন ঘটল?

খবরের কাগজ আর টিভি-রেডিয়ো ঘটিয়েছে ঘটনাটা, জবাব দিল মুসা, এ তো জানা কথা। এমন প্রচার শুরু করল..

একদম ঠিক, এক আঙুল তুলল কিশোর। কাগজগুলো পেয়ে গেল মজা। যেই একটা দুর্ঘটনা ঘটে, অমনি ফলাও করে ছেপে দেয়। থিয়েটারে তাদের কোন রিপোর্টার ওই সময় না থাকলেও খবরটা ঠিকই পেয়ে যায়।

তারমানে, রবিন বলল, কেউ খবরটা পাঠিয়ে দেয় ওদের।

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। এমন কেউ পাঠায়, যার কাছে বিজ্ঞাপন আর প্রচার একটা বিরাট ব্যাপার। সে জানে, এই একটা মাত্র জিনিসই তার চাকরি বাঁচাবে।

বুঝেছি! পিটার! বলে উঠল মুসা।

ভেবে দেখো, মুসার কথা যেন কানেই ঢোকেনি কিশোরের, তুমি একজন তরুণ অভিনেতা, একটা নাটক করছ যেটার সফল হওয়ার সম্ভবনা আছে। সারা জীবন একটাই স্বপ্ন তোমার, একটা নাটক হিট হোক। কিন্তু কাজটা করতে গিয়ে দেখলে কোন কারণে টিকিট বিক্রি হচ্ছে না। বন্ধ হয়ে যেতে পারে.নাটক। তাহলে কাজ

চলে যাবে তোমার। আবার সেই ভাতেমরা অভিনেতায় পরিণত হবে, না খেয়ে থাকতে হবে। কি করবে তখন?
হাত ওল্টাল মুসা, কি আর করব? মোটর মেকানিকের কাজ নেব।
আরে দূর, তোমার কথা কে বলছে, একটা উদাহরণ দিচ্ছি, কিশোর বলল। তুমি তখন চাইবে নাটকটার উন্নতি, যে ভাবেই হোক। ওয়াইল্ড ওয়াইল্ড দেখতে এখন কেন যাচ্ছে লোকে? নাটক দেখতে যতখানি, তার চেয়ে বেশি পিটারের দুরবস্থা দেখতে। আশা করছে একটা অক্সিডেন্ট ঘটবেই।
হু, মাথা দোলাল মুসা, বুঝতে পারছি।
আমার কিন্তু সে-রকম মনে হয় না, জিনা একমত হতে পারল না। নিজের ওপর নিজে দুর্ঘটনাগুলো কি করে ঘটাল সে?
সে তো ঘটায়নি, কিশোর বলল। হুমকি দিয়ে ফোনঃআসা, চিঠি আসা, এগুলো কেবল তার মুখের কথা, আমাদের কোন প্রমাণ দেখাতে পারেনি সে। চিঠিগুলো কোথায় যখন জানতে চেয়েছি, বলেছে ফেলে দিয়েছে। আমার তো। ধারণা, সব মিথ্যে কথা, ওরকম কোন চিঠি পাইনি সে। দুর্ঘটনা ঘটানোর জন্যে লোক ঠিক করেছে সে-ই। এমন করে সাজিয়েছে, যাতে মনে হবে অল্পের জন্যে বেঁচে গেছে, কিন্তু সত্যি সত্যি কোন ক্ষতি হবে না। থিয়েটারের বাইরে সেদিন যে সাইনবোর্ডটা পড়ল, দেখেছ কোনখানে পড়েছে? পিটার যেখানে দাঁড়ানো ছিল তার চেয়ে কতটা দূরে?
দেখেছি, ক্যামেরার একেবারে চোখের সামনে, যাতে সহজেই ধরা পড়ে। বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছে জিনা।
আর ফ্ল্যাশ-পট অ্যাক্সিডেন্টটাও সাংঘাতিক বিপজ্জনক মনে হয়েছে, মুসা। বলল। কিন্তু এমন সময় ফেটেছে, যখন সরে যাওয়ার জন্যে ঘুরেছে পিটার।
রবিন বাল, জাহিব করে থাকতে পারে এ কাজ, অর্কেস্ট্রা পিট থেকে।
জাপার নির্দেশে, যোগ করল কিশোর। যাই হোক, এই ঘটনার পর পিটারের ড্রেসিং রুমে ঢুকেছি আমরা। নিক নামে একজনের সঙ্গে ফোনে কথা বলছিল তখন সে। ব্যাপারটা নিয়ে প্রথমে মাথা ঘামাইনি আমি, যতক্ষণ না তার বিজ্ঞাপন প্রচারকের নামটা মনে পড়ল।
নিক ফ্লিন্ট। প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মুসা। ফ্লাশ-পট অ্যাক্সিডেন্টের খবরটা প্রচার করে দেয়ার জন্যে তাকে ফোন করেছিল পিটার। এখন বুঝতে পারছি গোপনে, আমাদের তদন্ত করার কথাটা খবরের কাগজকে কে জানিয়েছে। পিটার নিজে। এটাতে আরেকটা বিজ্ঞাপন হয়েছে তার।
ঠিক, কিশোর বলল। আর মনে হচ্ছে কম্পিউটারের দায়িত্বটা ছিল জাহিরের ওপর। চুরি করে থিয়েটারে ঢুকে কিছু কিছু কিউ গোলমাল করে দিত, অবশ্যই

জাপার সহায়তায়।
তারপর সে-রাতে টোপাজের হাতে ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গেল জাহির, মুসা বলল। আর যেতে সাহস করেনি। তাই বাধ্য হয়ে গোলমাল করার কাজটা নিজেই করতে গেল পিটার।
কিংবা হয়তো দেখতে গিয়েছিল আজ সকালে, জাহির ঠিকমত সব করতে পেরেছে কিনা। কোন কিউটাতে দুর্ঘটনা ঘটবে, এটা জানা না থাকলে সত্যি সত্যিই দূর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। তাই আগে থেকে সাবধান থাকতে চাইছিল।
সুতরাং কাল রাত থেকে শুরু করে আজ সকাল পর্যন্ত অনেক ভাবে ওদের বাধা দিয়েছ তোমরা, রবিন বলল। পুরো ব্যাপারটা ফাস হয়ে যাওয়ার ভয়ে শেষে তোমাদের পেছনেই লেগেছিল এরা। মুখ বন্ধ করে দিতে চেয়েছিল।
এক মিনিট, হাত তুলল জিনা। পোশাকে চুলকানির ওষুধ লাগানো আর মূর্তি ফেলার ব্যাপারটা তাহলে কি?
জবাবটা মুসাই দিতে পারল, নতুন পোশাকটা যেদিন পেয়েছে পিটার সেদিনের কথা মনে করো। একটা প্যাকেট হাতে বেরিয়ে গেল জাপা, বলল পপকর্নের প্যাকেট। আসলে তার মধ্যেই চুলকানির ওষুধ বলো আর বিষ বলো, জিনিসটা ছিল। পোশাকে লাগিয়েছিল সে-ই। তুমি যখন পোশাকটা ধরতে গেলে ইচ্ছে করে আয়নাটা ফেলে দিয়ে ভাঙল পিটার, তোমাকে সরানোর জন্যে। নাহলে তুমি ধরে ফেললে তোমারও হাত চুলকানি শুরু হতো। কে লাগিয়েছে হয়তো আন্দাজ করে ফেলতাম আমরা, এই ভয়ে তখন চুলকানির খবরটা জানাতে চায়নি পিটার।
কিশোর বলল, শেকসপীয়ারের মূর্তি ফেলার ঘটনাটা পিটার আর ওলি দুজনে। মিলে ঘটিয়েছে। ববের বাড়িতে যাওয়ার পথেই নিশ্চয় আলোচনা করে ঠিক করেছে, ওখানেও একটা দুর্ঘটনা ঘটাবে। দুজনেই বার্গার খেয়েছে, আঙুলে বনরুটির। তেল লেগেছিল। সেজন্যে মূর্তি আর বাতির সুইচ দুটোতেই লেগে গিয়েছিল ওই তেল। রলি তার ধরে টেনে টেবিল ল্যাম্পের প্লাগ খুলেছে, আর পিটার নিজের গায়ে নিজেই মূর্তি ফেলেছে। আমরা তখন চোখ বন্ধ করে আছি, ফলে কেউই দেখতে পাইনি কিছু।
কিন্তু পিটারের কপালে বাড়ি লেগেছিল, প্রশ্ন তুলল জিনা। আরেকটু হলেই কেটে যেত।
আমার কাছে অবাক লেগেছে, এত জোরে বাড়িটা লাগল, পরদিনই আবার মিলিয়ে গেল, বলল মুসা।
মেকআপ করে করেছিল ওরকম, জবাব দিল কিশোর। পকেটে বোধহয়। লাল মোম রেখে দিয়েছিল, কপালে লাগিয়ে দিয়েছে। নিজের কপাল নিজেই চেপে ধরে রেখেছিল, অন্য কেউ তো আর দেখতে যায়নি আঘাত কতখানি।

টার্নটেবলের ব্যাপারটা কি? আবার প্রশ্ন করল জিনা। একটা নিরপরাধ লোকের পা ভাঙল ওভাবে পিটার?
না, এই কাজটা সম্ভবত জাপা করেছে। টার্নটেবলের দায়িত্বে ছিল সে।
বুঝলাম। কিন্তু একটা কথা এখনও বুঝতে পারছি না, পিটারের নাহয় স্বার্থ আছে, সে এ সব করেছে, কিন্তু বাকি লোকগুলো? তারা কেন করেছে?
পিটারের মতই রলিরও কাজ হারানোর ভয়। জাহিরেরও টাকার দরকার ছিল। বড় কিছু অভিনেতা আর গায়ক-বাদক ছাড়া সবাই টাকার কষ্টে ভোগে, কাজটাকে পেশা হিসেবে নিলে।
স্টেজ ম্যানেজারেরও নিশ্চয় চাকরি হারানোর ভয়? মুসার প্রশ্ন।
মাথা নাড়ল কিশোর, এই একটা ব্যাপারই বুঝতে পারছি না। স্টেজ ম্যানেজারের চাকরির অভাব হয় না। কাজ জানা লোকের খুব কদর। ওয়াইল্ড ওয়াইল্ডের মত জটিল একটা নাটকের কাজ যাকে-তাকে দিয়ে হবে না। তারমানে জাপা কাজ জানে।
হঠাৎ কপালে ভাঁজ পড়ল মুসার। বুঝলে, টার্নটেবল অ্যাক্সিডেন্টের ব্যাপারটাও কেমন যেন গোলমেলে। জাপা যদি জানেই পিটার নাচছে, তাহলে ওভাবে অ্যাক্সিডেন্টটা ঘটাত না। তাকে অচল করে দেয়ার তো ইচ্ছে ছিল না কারোরই।
স্টেজ ম্যানেজার জানত যে লোকটা পিটার নয়, যুক্তি দেখাল জিনা।
মাথা নাড়ল রবিন, তাহলে একজন ভাল ড্যান্সারকেই বা অচল করে দেয়ার কি যুক্তি থাকতে পারে?
জবাবের আশায় কিশোরের দিকে তাকাল তিনজনেই।
শিওর হয়ে আমিও কিছু বলতে পারছি না, কিশোর বলল। তবে জবাবটা কি করে জানা যাবে হয়তো বলতে পারি। উচ্চারণ।
বুঝলাম না, জিনা বলল।
এসো আমার সঙ্গে।
ফোনের কাছে ওদের নিয়ে এল কিশোর। পিটারের নম্বরে ফোন করল। গা ঘেঁষাঘেঁষি করে এল মুসা, রবিন আর জিনা, যাতে ওপাশের কথা রিসিভারে শুনতে পারে।
হালো? পিটারের গলা ভেসে এল।
জাপার নিউ ইয়র্কি উচ্চারণ নকল করে জবাব দিল কিশোর, হ্যাঁ, ভিনস্ বলছি।
ওদেরকে ধরেছ?
ধরেছি।
যাক, বাঁচা গেল। খুব দুশ্চিন্তায় ছিলাম। তুমি ঠিকই আন্দাজ করেছ। আমাকে কম্পিউটার ধরতে দেখে সন্দেহ হয়েছিল কিশোরের। পুরো ব্যাপারটা ফাস করে

দিত সে।
হ্যাঁ।
রলির কি খবর? তার ব্যবস্থা করেছ?
থমকে গেল কিশোর। তার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তিন সহকারী।
জবাব দাও। চুপ করে আছো কেন? চিন্তায় চিন্তায় আমার মাথা খারাপ হয়ে গেল!
হ্যাঁ, জবাব দিল কিশোর।
ঠিক আছে, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল পিটার। কাল তোমার চেক পেয়ে যাবে।
জাপাও তাহলে টাকার জন্যেই এ কাজ করেছে। বুঝতে পারল কিশোর।
পিটারকেও ধরা, দরকার-ভাবল সে। তবে ফোনে কিছু বলা ঠিক হবে না। সাবধান হয়ে গিয়ে পালাতে পারে।
রাখলাম, ওপাশ থেকে বলল পিটার।
আচ্ছা।
রিসিভার রেখে দিল কিশোর। পিটার কি কি বলেছে, বন্ধুদের জানাল।
রবিন বলল, শেষ প্রশ্নটার জবাবও তাহলে পেয়ে গেলাম।
নীরবে মাথা ঝাঁকাল কিশোর। হ্যাঁ-না কিছু বোঝা গেল না।
মুসা বলল, আরেকটা প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। রলির পেছনে লাগল কেন পিটার?
নিশ্চয় বুলি লেগেছিল পিটারের পেছনে। সে মনেপ্রাণেই চাইছিল পিটার একটা দুর্ঘটনায় পড়ে অকেজো হয়ে যাক, তাহলে তার পালা আসবে। পিটারের জায়গায় অভিনয়ের সুযোগ দেয়া হবে তাকে। সেজন্যে টার্নটেবলের সুইচ টিপেছিল সে। জানত না, পিটারের জায়গায় অন্য লোক নাচছিল তখন। শত্রুর শেষ রাখতে নেই। তাই রলিকে শেষ করে দিতে চেয়েছে পিটার।
দূরে সাইরেনের শব্দ শোনা গেল।
অ্যাম্বুলেন্স আসছে, রবিন বলল।
মাথা ঝাঁকিয়ে আবার রিসিভার তুলে নিল কিশোর, এবার পুলিশকে ফোন করা দরকার। পিটারকে ধরতে হবে। জাহিরকেও।
বিড়বিড় করল জিনা, কি আশ্চর্য! লোভে পড়ে মানুষ কি না করে। অথচ কে ভাবতে পেরেছিল জাপার মত ভদ্রলোক...।
খাঁটি দার্শনিকের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল মুসা, শুধু চেহারা দেখে কখনোই বিচার করা উচিত নয় কে ভাল লোক, কে মন্দ। তা বটে! মাথা ঝাঁকাল জিনা।

ভলিউম ৪৯ – মাছির সার্কাস – তিন গোয়েন্দা – রকিব হাসান – সেবা প্রকাশনী
প্রথম প্রকাশ: ২০০২
টেলিফোনের শব্দ শুনে নাস্তার টেবিল থেকে উঠে গেলেন মিসেস বেকার। হলরুমে গিয়ে ফোন ধরে ফিরে এলেন। কিশোর ফোন করেছে। কথা বলতে চায়। যে কোন একজন উঠে যাও। ডল, তুমিই যাও, তোমার নাস্তা তো শেষ।
কিশোরের কথা শুনে প্রায় উড়ে চলে গেল উল! মুসা আর জিনার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল রবিন। ওরাও হাসল।
কানে এল ডলের গলা, হালো, কিশোর! আমি ডল।
মিনিট তিনেক পর হাসিমুখে ফিরে এল সে। উৎসুক হয়ে তার মুখের দিকে হাকাল মুসা, জিনা, আর রবিন। কিন্তু চুপ করে রইল ডল। মা উঠে যাওয়ার মপেক্ষা করছে।
মিসেস বেকার ডলের মা।
জানালা দিয়ে উঁকি দিলেন তিনি। বাগান থেকে পানি ছিটানোর শব্দ আসছে। সেদিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার হলো? বাজারে যেতে হবে, মনে আছে?
আর একটু, এই হয়ে গেল, জবাব দিলেন মিস্টার বেকার। আরেক কাপ চা দিয়ে যাবে?
আনছি।
কাপে চা ঢেলে তাতে দুধ আর চিনি মিশিয়ে নিয়ে উঠে গেলেন মিসেস বেকার। তিনি বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একসঙ্গে কথা বলে উঠল রবিন আর জিনা, কি বলল!
বলল, সাড়ে দশটায় হলিডে ইনে দেখা করতে। মুসার হাতের দিকে তাকাল ডল। পাউরুটিতে আধ ইঞ্চি পুরু করে মাখন মাখিয়েছে মুসা। তাতে এক ইঞ্চি পুরু করে লাগিয়েছে আপেলের জেলি। এক হাতে রুটির টুকরো, আরেক হাতে ইয়া বড় এক সাগর কলা নিয়ে একবার রুটিতে কামড় দিচ্ছে, আরেকবার কলায়; মুখ ভর্তি খাবার নিয়ে কথা বলতে পারছে না। কোনমতে গিলে নিয়ে বলল, খুব ভাল। তুমি আমাদের বিছানা-টিছানাগুলো গুছিয়ে ফেলো…
ইস্, পারব না, ঠোঁট গোল করে বলল ডল, যার যারটা সে সে গুছিয়ে নাওগে… আমিও যাব তোমাদের সঙ্গে। কিশোর ভাইয়া যখন জরুরী খবর দিয়েছে, নিশ্চয় কোন রহস্য। গোয়েন্দাগিরি করতে কেমন লাগে, আমিও দেখব।
বেশ, জিনা বলল, নিতে আপত্তি নেই। তবে দুতিন ঘণ্টার ছুটি আর বাড়ি থেকে বেরোনোর অনুমতিটা তোমাকেই নিতে হবে।
নেব, এককথায় রাজি হয়ে গেল ডল, যদিও জানে কাজটা কত কঠিন।

এবারের ছুটিটাই হয়েছে তিন গোয়েন্দা আর জিনার জন্যে ভোগান্তির। গোবেল বীচে বেড়াতে এসেও বাড়িতে টীচারের কাছে পড়তে বসতে হলো। কারণ পরীক্ষায় ভাল করতে পারেনি জিনা। মুসার রেজাল্ট তো আরও খারাপ। রবিনেরও ভাল না। বইয়ের পোকা হলেও পাঠ্যবইয়ে তার মনোযোগ নেই, পরীক্ষার আগেও রাত জেগে জেগে গল্পের বই পড়েছে। জিনার বাবা মিস্টার পারকার সাফ বলে দিয়েছিলেন, বাড়িতেও পড়তে হবে। সেই মত একজন শিক্ষকও রাখা হয়েছিল। কিন্তু শেষমেষ দেখা গেল সেই শিক্ষক আসলে একজন স্পাই। ফর্মুলা চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ল তিন গোয়েন্দার হাতে। পুলিশে দেয়া হলো তাকে।

বিপদে পড়ে গেলেন মিস্টার পারকার। শিক্ষক তো একজন চাই। স্কুল এখনও অনেক দিন ছুটি। তবে বাড়িতে আর টীচার রাখার সাহস হলো না তার। আবার কোন শয়তান লোক কিভাবে এসে জ্বালাতন করে। শেষে তাঁরই নিগ্রো বন্ধু বেকার দম্পতির ওপর ছেলেমেয়েদের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন। বেকাররা নির্ঝঞ্ঝাট। একমাত্র মেয়েকে নিয়ে বেশ বড়সড় একটা বাড়িতে থাকেন।

মিস্টার বেকার গোবেল বীচ স্কুলের শিক্ষক। মিস্টার পারকারের অনুরোধে। পড়াতে রাজি হলেন। তবে তিনি ছাত্রর বাড়ি যেতে পারবেন না, ছাত্রকেই তার বাড়িতে আসতে হবে। বাড়িতে জায়গা আছে, যদি ছাত্ররা থাকতে রাজি হয়, তাহলে আরও ভাল।

মিস্টার পারকার তো হাতে চাঁদ পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে মুসা, রবিন আর জিনাকে পাঠিয়ে দিলেন মিস্টার বেকারের বাড়িতে। খাওয়ার খরচ তিনিই দেবেন। কিশোরের যেহেতু রেজাল্ট খুব ভাল, তার আর টীচারের বাড়িতে থাকতে যাওয়া লাগল না। সে রয়ে গেল জিনাদের বাড়িতে। সে আর জিনার কুকুর রাফিয়ান।

বড়ই বেকায়দায় পড়ে গেছে তিন গোয়েন্দা আর জিনা। স্কুলের হোস্টেল খোলা থাকলে কোনমতেই থাকত না কিশোর, ব্যাগট্যাগ গুছিয়ে সোজা ওখানে চলে যেত। মুসা আর রবিনের বাবা-মাও বাড়িতে নেই, ছুটি কাটাতে রকি বীচ থেকে বহুদূরে চলে গেছেন। কিশোরদের স্যালভিজ ইয়ার্ডে রাশেদ পাশা একা। ডনকে নিয়ে মেরিচাচী বেড়াতে চলে গেছেন তার বোনের বাড়িতে, অর্থাৎ উনদের বাড়িতে। কাজেই নানা রকম শর্ত আর বাধ্যবাধকতা সহ্য করে গোবেল বীচে পড়ে থাকতে হচ্ছে ওদের।

তবে একেবারেই যে নিরানন্দ কাটছে এখানে, তা বলা যাবে না। এই তো, এসেই তো কয়েক দিনের মধ্যেই একটা রহস্যের সমাধান করে ফেলল। আরও যে করতে পারবে না, সেটা কে বলতে পারে?

যাই হোক, বাইরে বেরোনোর অনুমতি নিয়ে ফেলল উল। পারত না, যদি বাবার বাজারে না যাওয়া লাগত। মিস্টার বেকার বাজারে যাচ্ছেন বলেই অত সহজে দুটি দিলেন।
তর সইল না আর গোয়েন্দাদের। দশটা বাজতেই বেরিয়ে পড়ল সাইকেল নিয়ে। ওদের প্রিয় জায়গা, গায়ের ছোট্ট ডেইরি শপটায় রওনা হলো। আইসক্রীম থেকে শুরু করে রুটি-বিস্কুট-কেক সব পাওয়া যায় ওখানে। এককালে সরাইখানাই ছিল ওটা, নাম ছিল হলিডে ইন, এখন সরাইখানা বন্ধ-টাকার অভাবে চালু করতে পারছে না মালিক, তবে ডেইরি শপটা বন্ধ করেনি।
সাড়ে দশটার আগেই দোকানে ঢুকে বসে রইল ওরা। কিশোর এল কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে দশটায়। সঙ্গে রাফিয়ান। সাইকেল রেখে ঘরে ঢুকল। দরজায় থাকতেই বন্ধুদের ওপর চোখ পড়ল তার। হাসিমুখে এগিয়ে এল। জিনার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল রাফিয়ান। আদর করে গালমুখ চেটে দিতে দিতে অস্থির করে তুলল।
বাড়িতে পেট পুরে নাস্তা করে এসেও হলিড়ে ইনে ঢুকে লোভ সামলাতে পারেনি মুসা। একগাদা কেকের অর্ডার দিয়েছে। কিশোর বসতেই প্লেটটা তার দিকে ঠেলে দিল, নাও।
না-রে, ভাই, হাত নাড়ল কিশোর, আমি খাব না। দেখছ না, আবার ফুলতে শুরু করেছি। ওজন বাড়লে বড় ঝামেলা!
কয়েক বছর আগে অনেক মোটা ছিল সে, একেবারে গোল। খাবারের লোভ তারও কম ছিল না। কিন্তু ডায়েট কন্ট্রোল আর প্রচুর ব্যায়াম করে করে অনেক কষ্টে ওজন কমিয়ে শরীরটা স্বাভাবিক করেছে।
আরে দূর, একটা টুকরো খেলে কিছু হবে না, মুসা বলল। খুব টেস্ট…
মাথা নাড়ল কিশোর, টেস্ট যে আমিও জানি। ঠিক আছে, ছোট এক কাপ আইসক্রীম খেতে পারি।
মুসাভাই, তুমি খাওয়ার গপ্পোটা একটু থামাও না, বাধা দিল ডল, সবার ছোট সে, বয়েস মাত্র আট, তাই কিশোর-মুসা-রবিন তিনজনকেই ভাই বলে ডাকে, জিনাকে জিনাআপু। কিশোরভাই, বলো, কি রহস্য পেয়েছ।
অবাক হলো কিশোর, রহস্য পেয়েছি কে বলল তোমাকে?
ফোনে বললে না জরুরী কথা আছে?
ও, সেটা! জোরে নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। আর বোলা না, এবার কপালটা নেহাতই খারাপ আমাদের, গোবেল বীচে বেড়াতে এসেছিলাম! ইস, মেরিচাচী যখন বলল, কেন যে তার সঙ্গে গেলাম না!
ভুরু কুঁচকে তার দিকে তাকাল জিনা, কেন, আবার কি হয়েছে? তুমি তো ভালই আছো, মার রান্না খাচ্ছো, স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াও, পড়তে হয় না… জেলখানায়

তো রয়েছি আমরা…
সেই স্বাধীনতাটাই তো গেল বোধহয় এবার!
আরে এত ভণিতা না করে খুলেই বলে ফেলো না ছাই!
আগামী হপ্তায় একটা কনফারেন্স হতে যাচ্ছে, নিজের অজান্তেই এক টুকরো কেক তুলে নিয়ে কামড় বসাল কিশোর।
তাতে কি?
তোমার বাবার একজন বন্ধুও তাতে যোগ দেবেন।
বিজ্ঞান-সম্মেলন হলে তাতে তো যোগ দেবেই পাগলগুলো। বাবা যেমন পাগল, তার বন্ধুগুলোও পাগল, বড় বড় উন্মাদ একেকটা; তাতে তোমার অসুবিধেটা কোথায়?
মিস্টার গ্রেগাবেবিরনকে চেনো?
নাম শুনেছি। দেখিনি। বাবার কাছে মাঝে মধ্যে চিঠি লেখে।
বাপরে, নাম কি!মুসা বলল, দিনের মধ্যে শখানেক বার কাউকে আউড়াতে দিলে দম আটকেই মরে যাবে। ঝামেলা র‍্যাম্পারকটকে দেয়া দরকার…
অত বড়টা বলার দরকার কি, জিনা বলল, ছোট করে নিলেই হয়, মা যেমন নিয়েছে। কথা উঠলে মা বাবাকে বলে তোমার বন্ধু মিস্টার গ্রেগ, অত্তবড় নাম বলতে যায় না।
সেটা অবশ্য সমস্যা না, আরও সহজ করে নেয়া যায়, মিস্টার বেবি বললেই হয়, কিশোর বলল। যা বলছিলাম, সেই মিস্টার গ্রেগাবেবিরন গোবেল বীচে কনফারেন্সে যোগ দিতে আসছেন। জিনার দিকে তাকাল সে, আর উঠছেন কোথায় জানো? তোমাদের বাড়িতে।
উঠুকগে, তাতেই বা তোমার কি? সারাক্ষণ বাবার ঘরেই বসে থাকবে। যন্ত্রণাটা হবে মার। কফির চালান দিতে দিতে আর বাবার ফাইফরমাশ খাটতে খাটতে জান যাবে। তোমার কিছু না?
আমার ঘাড়েও একখান যন্ত্রণা চাপানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেই গ্রেগ ভদ্রলোক তার একমাত্র মেয়েকে নিয়ে আসছেন সঙ্গে করে।
এতক্ষণে চোখ বড় বড় হলো জিনার। এলিজা! বাপরে, তাহলে তো বিপদ! শুনেছি ওটার ধারেকাছে নাকি শয়তানও ঘেষতে চায় না, এতই বিরক্তিকর। দুই বছর বয়েসে মা মরে যায়, তারপর মিস্টার গ্রেগই তাকে মানুষ করেছেন। তোমার ঘাড়ে চাপাল কি করে?
খাওয়া বন্ধ করে তাকিয়ে আছে মুসা। ডল আর রবিনও উৎসুক চোখে চেয়ে আছে কিশোরের দিকে।

দুই বিজ্ঞানী থাকবেন নিজেদের নিয়ে, কিশোর বলল, আইলিন আর কেরিআন্টি রান্নাঘর আর ঘর সামলানোর কাজে ব্যস্ত, মেহমান হয়ে আসা মেয়েটাকে তাহলে কে দেখবে? একা একা থাকতে নিশ্চয় খারাপ লাগবে তার। তাই নিঃসঙ্গতা ঘোচানোর দায়িত্ব পড়েছে আমার ওপর।
হেসে ফেলল মুসা, খুব খারাপ খবর। কিশোর, তোমার জন্যে দুঃখ হচ্ছে আমার, যদিও সামান্যতম দুঃখের ছোঁয়া নেই তার কণ্ঠস্বরে। যেখানেই যাবে, ওই মেয়েটাও তোমার পিছে পিছে যাবে, দেখো, বলে দিলাম। সত্যি তুমি মরেছ।
সেটা জানি বলেই তো ভয়টা পাচ্ছি। স্বাধীনতা এক্কেবারে শেষ।
বাদ দাও বাড়িতে থাকাথাকি, হাত নাড়ল জিনা, বইপত্র নিয়ে পড়ালেখার ছুতোয় আমাদের কাছেই চলে এসো। এলিজার সঙ্গে বাড়িতে থাকার চেয়ে শান্তি।
এখানে আসার কথা বলিনি ভেবেছ। রেগে উঠলেন পারকার আঙ্কেল। কোন রকম চালাকি চলবে না, সাফ বলে দিয়েছেন তিনি। এলিজাকেই সঙ্গ দিতে হবে, কড়া নির্দেশ।
আল্লায় যা করে ভালর জন্যেই করে, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মুসা। ভাগ্যিস রেজাল্ট খারাপ করেছিলাম। জোরে জোরে কেকের টুকরো চিবাতে শুরু করল সে।
হাতের টুকরোটা শেষ করে আনমনে আরেকটা টুকরো তুলে নিল কিশোর। কামড় বসাল তাতে। হঠাৎ খেয়াল করল কেক খাচ্ছে। চোখমুখ কুঁচকে বিরক্ত হয়ে নিজেই নিজেকে শাসাল, নাহ, আমি গাধারার শরীর কমবে না! এই রাফি, নে।
দৌড়ে এল রাফি। ওপর দিকে মুখ তুলে কিশোরের হাত থেকে ছেড়ে দেয়া কেকের টুকরোটা গাঁক করে দাঁতে চেপে ধরল। কোৎ করে গিলে ফেলল। উৎসুক হয়ে তাকিয়ে রইল আরও পাওয়ার আশায়।
ও, এজন্যেই, হাসতে হাসতে রাফিকে বলল জিনা, এতক্ষণে বুঝতে পারলাম। তাই তো বলি, এত ভূমা হলে কি করে…কিশোর হতে চাইছে স্লিম, আর তুমি…
ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠল কিশোর, সর্বনাশ!
কি হলো? চমকে গেছে রবিন।
লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। মিস্টার বেবি আর তার মেয়েকে এগিয়ে আনতে যেতে বলেছেন আমাকে কেরিআন্টি। এগারোটার বাসে আসবেন। পৌনে এগারোটার বেশি বাজে।

.

টাউন হলের পাশ কাটানোর সময় রবিন বলল, কনফারেন্সটা এখানেই হবে। আগামী হপ্তায়, চারদিন ধরে চলবে। নোটিশ পড়েছি। কলিওপটারিস্টদের মীটিং।

কলিওপটারিস্ট কি?
কলি? অবাক হলো ডল। বাবাকে জিজ্ঞেস করতে হবে।
হবে হয়তো কলি কুত্তা গোছের কিছু, নিরাসক্ত ভঙ্গিতে বলল মুসা।
মুসার কথার জবাব দিতে গিয়ে রাস্তার উল্টো দিকে চোখ পড়তে থেমে গেল কিশোর। ওই দেখো, আসছে। ঝামেলা র‍্যাম্পারকট। দুষ্ট হাসি ফুটল মুখে। তাকে স্লিম হবার পরামর্শ দিলে কেমন হয়?
সাইকেলে করে এগিয়ে এল গাঁয়ের পুলিশম্যান ফগর‍্যাম্পারকট। পেটের কাছে। ছিঁড়ে যাওয়ার জোগাড় হয়েছে বেল্টটা। ছেলেমেয়েদের দেখে গম্ভীর হয়ে গেল।
গলা ফাটিয়ে ঘেউ ঘেউ করে উঠল রাফিয়ান।
তার দিকে একটা চোখ রেখে জিনাকে বলল, এই, তোমার কুত্তাটাকে থামতে বলো। কামড়ে দিতে এলে ওর বিরুদ্ধে রিপোর্ট করব আমি বলে দিলাম।
হাসল জিনা। আগামী হপ্তায় অনেক কুত্তার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করার সুযোগ পাবেন। কলি কুত্তা নিয়ে কনফারেন্স হচ্ছে। একটা কুত্তাও আপনাকে দেখে খুশি হবে বলে মনে হয় না…
জ্বলন্ত চোখে জিনার দিকে তাকাল ফগ। বলল, ঝামেলা! রাফিয়ানের দিকে তাকিয়ে সরে পড়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করল। বিড়বিড় করে আরও কি বলতে বলতে তাড়াতাড়ি প্যাড়ালে চাপ দিল।
পেছনে ঘেউ ঘেউ করে তেড়ে গেল রাফি। হাসতে হাসতে মুসা বলল, থাক থাক, রাফি, মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকট তো পালাচ্ছেন, তাঁকে আর গালাগাল করার দরকার নেই।
জিনার কথায় ঝট করে ফিরে তাকাল ফগ। ভীষণ রাগে লাল হয়ে গেছে চোখমুখ। কিন্তু কুকুরটার ভয়ে ফিরে আসতে সাহস করল না। চোখের আগুনে ওদের ভস্ম করতে করতে দ্রুত প্যাড়াল করে চলে গেল।
হাসতে লাগল সবাই।
জিনাকে বলল কিশোর, কলি কুত্তার কথা বলে দিলে তো ফগের ঘুম-ন্দ্রিা হারাম করে। ও এখন সারা গায়ে কলি কুত্তা খুঁজে বেড়াবে।
ভাল করেছি। কিন্তু কলি-কলি করে কি যেন বলছিলে…
কলিওপটারিস্ট।
হ্যাঁ, কলিওপটারিস্ট। মানে কি? জানো মনে হচ্ছে?
জানি, মাথা ঝাঁকাল কিশোর। পারকার আঙ্কেলকে বলতে শুনলাম। গুবরেপোকার বিশেষজ্ঞ। গুবরে নিয়ে যারা গবেষণা করে তাদেরকে বলে। কলিওপটারিস্ট।

তাজ্জব হয়ে গেল সবাই। গুবরেও একটা জিনিস! আর সেটা নিয়ে গবেষণা, কনফারেন্স করার মত লোকও আছে! জানত না।
হেসে বলল মুসা, ফগের মত বোকা মনে কোরো না আমাদের যে, যা বলবে তাই বিশ্বাস করব।
করলে করো না করলে নেই, যখন হবে তখন দেখবে।
বাস স্টেশনটা দেখা গেল। একটা বাস এসে দাঁড়িয়েছে। ঘড়ি দেখল কিশোর। এগারোটা বেজে গেছে। যাহ, নেমেই পড়লেন কিনা কে জানে! আমাকে না পেয়ে একা একা বেবিরা বাপ-বেটি বাড়ি চলে গেলে কেরিআন্টি রাগ করবেন আমার ওপর।
তাড়াতাড়ি রাস্তা পেরোল ওরা। বাসটা এসে সবে থেমেছে। দরজা খুলল। সারি দিয়ে নামতে শুরু করল যাত্রীরা।
এক হাতে একটা ব্যাগ আর অন্য হাতে একটা বড় সুটকেস নিয়ে নামলেন কালো দাড়িওয়ালা, মোটা ফ্রেমের চশমা পরা একজন ছোটখাট ভদ্রলোক। পেছনে নামল তার চেয়ে ইঞ্চিখানেক লম্বা একটা মেয়ে। দেখতে মোটেও ভাল নয়। চুল খুব পাতলা। ওগুলো দিয়েই সরু সরু দুটো বেণি করেছে। পরনে স্কুল ড্রেসের মত পোশাক। তার ওপর নীল ওভারকোট। কোমরে গাঢ় নীল বেল্ট। মাথায় রঙিন ব্যান্ড। আর বাঁ দিকে একটা ব্যাজ লাগানো গাঢ় নীল ফেল্ট হ্যাট।
বেশ কিছুটা দূরে দাঁড়িয়েও মেয়েটার স্পষ্ট জোরাল শব্দ কানে এল কিশোরের, না, বাবা, কুলি লাগবে না। আমরাই পারব। তুমি ছোট ব্যাগটা নাও, আমি বড় সুটকেসটা নিচ্ছি। দাও, ছাড়ো, আমার হাতে দাও।
মেয়েটার মুরুব্বী মুরুব্বী ভঙ্গি ভাল লাগল না কিশোরের।
চারপাশে তাকাতে লাগল মেয়েটা। আপনমনেই বলল, আমাদের না নিতে আসার কথা ছিল…
সাইকেল রেখে এগিয়ে গেল কিশোর। ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে বলল, আপনি কি মিস্টার বেবি?
বেবি! ও, হ্যাঁ হ্যাঁ, আমিই..তা বাবা, শুধু বেবি তো নই, গ্রেগাবেবিরন, জবাব দিলেন ছোটখাট, দাড়িওয়ালা ভদ্রলোক।
চাবুকের মত শপাং করে উঠল মেয়েটার কণ্ঠ, ইয়ার্কি মারা হচ্ছে নাকি?
না না, ইয়ার্কি মারব কেন? বড় নাম তো, কঠিন, তাই…
ছোট করতে গিয়েছিলে। কারও নাম ছোট করা যে অভদ্রতা, এটাও জানো না? কক্ষনো আর কাউকে এভাবে ডাকতে যাবে না, অন্তত বাবার বয়েসী কাউকে। নাম কি তোমার?

মুখের হাসি নিভে গেছে কিশোরের। কি-কি-ক্কিশোর পাশা। সুটকেসটা নেয়ার জন্যে হাত বাড়াল।
দিল না মেয়েটা। না, আমিই পারব। এটাতে বাবার দামী দামী গুবরেপোকাগুলো আছে। ভেঙে ফেললে গেল।
সুটকেস ভাঙবে কি করে?
আরে বুদ্ধু, সুটকেসের ভেতরে কাঁচের বাক্স আছে। ওটা ভাঙবে।
ও, তাহলে তোমার কাছেই থাক, মিস এলিজা গ্রেগাবেবিরন।
থাক, আমাকে আর পুরো নাম নিয়ে ডাকতে হবে না। আমি বাবার বয়েসী নই। শুধু এলিজা বললেই চলবে।
ট্যাক্সি ডাকব?
ডাকো। গুবরেপোকা সহ বাবাকে তুলে দিই। আমি ট্যাক্সিতে উঠতে পারি। কেমন বদ্ধ বদ্ধ লাগে। তোমার সঙ্গে হেঁটে হেঁটেই যাব। বেশি দূরে নাকি?
ততটা নয়। হেঁটে যাওয়া যায়। কিন্তু আমি তো সাইকেল নিয়ে এসেছি।
তাহলে সাইকেলে চেপেই যাব। সামনে ডাণ্ডায় বসে, কিংবা পেছনের ক্যারিয়ারে। চালাতে পারবে তো? না পারলে চিন্তা নেই। আমি পারব। দুজন তিনজন নিয়ে চালিয়ে অভ্যেস আছে আমার।
মেয়েটার চ্যাটাং চ্যাটাং কথায় মনে মনে চটে গেলেও মুখে ভাবটা প্রকাশ পেতে দিল না কিশোর। একটা ট্যাক্সি যেতে দেখে হাত তুলল। মিস্টার গ্রেগকে তাতে তুলে দিল। সুটকেসটা কোনমতেই সীটের ওপর কিংবা মেঝেতে রাখতে দিলেন না তিনি, নিজের হাঁটুর ওপর রেখে শক্ত করে ধরে রাখলেন। ব্যাগটা মেঝেতে রেখে কোথায় যেতে হবে ড্রাইভারকে ঠিকানা বলে দিল কিশোর।
চলে গেল ট্যাক্সি। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল এলিজা। যাক, বাঁচা গেল। এখন। ধীরে সুস্থে যাওয়া যাবে। এই, কাছাকাছি খাবারের দোকান আছে নাকি? নাস্তা করেছি সেই সকাল সাতটায়, খিদেয় পেট জ্বলছে আমার।
খানিক দূরে দাঁড়িয়ে আছে মুসারা। প্রায় সব কথাই কানে যাচ্ছে তাদের। ওদের দিকে তাকাল কিশোর। ওর কাচুমাচু মুখ দেখে হাসতে শুরু করল ওরা। এলিজার, দিকে ফিরে বলল কিশোর, আছে, দোকান। আগে এসো আমার বন্ধুদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।
সবাইকে হ্যালো বলল এলিজা। জিনার পাশে দাঁড়ানো রাফিয়ানকে দেখিয়ে, বলল, তোমার কুকুর নাকি?
তো আর কার?
জিনার মেজাজ জানা আছে কিশোরের। ছেড়ে কথা কইবে না এলিজাকে। ওর মুরুব্বীগিরি সওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। রাস্তার ওপরই না একটা কেলেঙ্কারি ঘটে

যায় এ জন্যে তাড়াতাড়ি বলল, ঠিক আছে, তোমরা যাও এখন। আমি এলিজাকে নিয়ে চা দোকানে যাচ্ছি। তারপর বাড়ি যাব।

.

সারাটা দিন কিশোরের ফোনের অপেক্ষা করল মুসারা, কিন্তু ফোন এল না। বিকেল বেলা চা খেতে বসেছে, এই সময় হাঁপাতে হাপাতে ঘরে ঢুকল কিশোর!

রান্নাঘর থেকে ট্রে হাতে ঢুকছিলেন মিসেস বেকার, কিশোরকে দেখে থমকে দাঁড়ালেন। বড় বড় হয়ে গেল চোখ। এ কি পোশাক পরেছু! ভেজা কেন? বৃষ্টি হচ্ছে নাকি?

সরি, মিসেস বেকার, দৌড়াতে বেরিয়েছিলাম। ওই পোশাকেই চলে এসেছি। বৃষ্টি না, ঘাম।

ডল বলল, কিশোর ভাই বেশি মোটা হয়ে যাচ্ছে তো, স্লিম হওয়ার জন্যে ব্যায়াম করে।

ও, আমি তো ভাবলাম... টেবিলের দিকে এগোলেন মিসেস বেকার, এসো। চা খাও।

ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল কিশোর।

মিসেস বেকার চলে যেতে মুসা বলল, এত তাড়াতাড়ি দৌড়াতে বেরোলে যে?

সাধে কি আর বেরোই, গুঙিয়ে উঠল কিশোর। এলিজার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে পালিয়েছি। একনাগাড়ে কথা বলতে থাকে ও, মাথা ধরিয়ে দেয়। যেখানে যাই, পিছে পিছে যায়। আর কোন উপায় না দেখে শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। সেখানেও বাঁচতে পারলাম না। ঠিক গিয়ে হাজির। দরজায় থাবা মারতে শুরু করল। শেষে খুলে দিলাম। বলল, একটা বই নিতে এসেছে। বুককেসে রাখা বইগুলো ঘটতে শুরু করল।

ধাক্কা মেরে বের করে দিলে না কেন? রেগে উঠল জিনা।

দিতাম না ভেবেছ? কিন্তু কিছু করলেই তো পারকার আঙ্কেল যাবেন। খেপে...উহ, কি যে বিপদে পড়লাম!

এই বাবাটাই হলো যত যন্ত্রণার মূল! নিজে উন্মাদ, মানুষকেও পাগল বানিয়ে ছাড়বে। কাউকে শান্তিতে থাকতে দেবে না।

তারপর কি করলে? জানার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে রবিন। তাড়ালে কি করে?

তাড়াতে কি আর পারি, কিশোর বলল। এ বই দেখে, ও বই ওল্টায়, সেটা ঘাটে, আর সেই সঙ্গে বকর বকর। চালিয়েই গেল। বিরক্ত হয়ে বিছানা থেকে নেমে পড়লাম। অবেলায়ই দৌড়ানোর জন্যে তৈরি হতে লাগলাম। আমাকে রানিং সুট পরতে দেখে জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাচ্ছি। বললাম, দৌড়াতে। সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, সে-ও দৌড়াবে। নিজের ঘরে গেল কাপড় বদলাতে। এই সুযোগে নিচে

নেমে বাগানে, গেট পেরিয়ে রাস্তায়; তারপর দৌড়, দৌড়, পেছন ফিরে তাকালাম না আর।
হেসে ফেলল মুসা, যদি এসে ধরে ফেলে এই ভয়ে?
মাথা ঝাঁকাল কিশোর।
ভাল বিপদেই পড়েছ।
বেশি দেরি করতে পারব না, করুণ কণ্ঠে বলল কিশোর। বেরোনোর সময় কেরিআন্টি দেখেছেন। দৌড়ানোর পোশাক দেখে বেরোতে বাধা দেননি, তবে তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে বলেছেন। একা থাকতে থাকতে বিরক্ত হয়ে যদি আঙ্কেলদের বিরক্ত করতে যায় এলিজা, এই ভয়ে।
সবাই সহানুভূতি জানিয়ে নানা কথা বলল কিশোরকে, কিন্তু এলিজার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় বাতলাতে পারল না। শেষে কিশোর বলল, এই অত্যাচার সহ্য করা যাবে না। একটা বুদ্ধি বের করতেই হবে।
বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ি ফিরে চলল সে।
সেদিন শনিবারের সন্ধ্যা। পরদিন গির্জায় যেতে হবে বলে আর কিশোরকে বিরক্ত করার সময় পেল না এলিজা। সকাল সকাল ঘুমোতে গেল।
পরদিন সকালে উঠে গির্জায় গেল। ধর্মীয় রীতিনীতিগুলো মোটামুটি মেনে চলে সে। দুপুরে খাওয়ার পর চিঠি লিখতে বসল। তারপর যেই কিশোরকে বেরোনোর জন্যে তৈরি হতে দেখল, অমনি ডবল বেনি ঝাঁকিয়ে জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাচ্ছ?
কাজ আছে, জবাব দিল কিশোর।
ইকটু দাঁড়াও। চিঠিটা হয়ে গেছে আমার। তোমার সঙ্গে আমিও বেরোব।
ওকে এড়ানোর সুযোগটা পেয়ে গেল কিশোর। বেশ, তাড়াতাড়ি শেষ করো। এমনিতেই পোস্ট অফিসে যেতে হবে আমাকে, কেরিআন্টি একটা চিঠি দিয়েছেন পোস্ট করতে। তোমারটাও করে দিয়ে আমব।
ঠিক আছে। তারপর দুজনে বেড়াতে বেরোব।
চিঠি নিয়ে পোস্ট অফিসে গেল কিশোর। ইচ্ছে করেই ফিরতে দেরি করল। অযথা এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াল। মুসাদের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ নেই। নিশ্চয় এখন পড়তে হচ্ছে এদের। গিয়ে ডিসটার্ব করা উচিত হবে না।
এলিজার ওপর ভীষণ রাগ লাগল কিশোরের। কোথায় এখন ঘরে কিংবা বাগানে বসে বই পড়ত সে, তা না, মেয়েটার ভয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে। ভাবতে ভাবতে একটা বুদ্ধি এসে গেল মাথায়। বাড়ি ফিরে এল। বসার ঘরের জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখল এলিজা আছে কিনা। নেই। তারমানে নিজের ঘরে বই পড়ছে কিংবা অন্য কিছু করছে। চট করে জানালার চৌকাঠ ডিঙিয়ে

ঢুকে পড়ল সে। রাফিয়ান রয়েছে তার ঘরে, শেকলে বাধা। পারকার আঙ্কেল বেঁধে রাখার হুকুম দিয়েছেন, যাতে যখন তখন ঘরে ঢুকে বিরক্ত করতে না পারে। তাতে সুবিধে হলো কিশোরের। তার সাড়া পেয়ে ডাকাডাকি করে সারা বাড়ি জানান দিতে পারল না কুকুরটা।

চুপচাপ এসে নিজের ঘরে ঢুকে পড়ল কিশোর। দ্রুত ছদ্মবেশ নিয়ে ভবঘুরে সাজল। এলিজার অলক্ষে আবার ঘর থেকে বেরিয়ে, বাগান পেরিয়ে চলে এল ছাউনিতে। সঙ্গে করে বই নিয়ে এসেছে। আরাম করে বসে পড়তে শুরু করল। সে যে ফিরে এসেছে এলিজা জানতেও পারবে না। কোন কারণে যদি ছাউনিতে এসে উঁকি মারে, তাহলে দেখবে একজন ভবঘুরেকে। ধমক ধামক মারবে কিংবা হই-চই করে জোয়ালিনকে ডাকবে। নির্বিবাদে বেরিয়ে যাবে তখন কিশোর।

কিন্তু নির্বিবাদে বেরোনো আর হলো না। কিশোরের অপেক্ষা করতে করতে অস্থির হয়ে উঠল এলিজা। চিঠি পোস্ট করতে এত দেরি? শেষে আর ঘরে থাকতে না পেরে বেরিয়ে এল। কথা না বলে কতক্ষণ থাকা যায়। বাগানে অস্থিরভাবে পায়চারি করল কিছুক্ষণ। একা একা সময় কাটছে না। ছাউনিটা দেখে কৌতূহল হলো। ধীরে ধীরে চলে এল সেখানে।

পায়ের শব্দ শুনে একটা ফুটো দিয়ে উঁকি দিল কিশোর। এলিজাকে দেখে তাড়াতাড়ি ছিটকানি তুলে দিল দরজার।

শুনে ফেলল এলিজা। কৌতূহল বাড়ল তার। ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখল, অচেনা একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে ঘরের মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে চোর চোর বলে চিৎকার শুরু করে দিল সে।

এলিজার ডাক শুনে রাফিও ঘাউ ঘাউ শুরু করল। শেকলে বাঁধা থাকায় আসতে পারছে না।

রান্নাঘরের জানালা দিয়ে উঁকি দিল জোয়ালিন।

কেরিআন্টি শুয়েছেন। বেডরুম থেকে বোধহয় চিৎকার কানে যায়নি তার। স্টাডিতে দরজা-জানালা আটকে বসে থাকা মিস্টার পারকার আর মিস্টার গ্রেগের কানেও নিশ্চয় যায়নি। তাহলে বেরোতেন।

কিন্তু গেল আরেকজন বিশেষ লোকের কানে। কাকতালীয়ভাবে ঠিক এই সময় সেখান দিয়ে যাচ্ছিল ফগর‍্যাম্পারকট। চোর চোর শুনে একটা মুহূর্ত আর দেরি করল না। গেটের কাছে সাইকেল রেখে ছুটে ঢুকল ভেতরে। দৌড়ে এল ছাউনির দিকে। চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, কই, কোথায় চোর?

ছাউনির মধ্যে! চিৎকার করে বলল এলিজা।

ঝামেলা! দরজায় থাবা মারতে শুরু করল ফগ। এই দরজা খোলো! জলদি! ভাল হবে না বলছি!

খুলে গেল ছিটকানি।
চোরকে জাপটে ধরতে তৈরি হলো ফগ।
কিন্তু বেরোল না চোর।
আস্তে করে পাল্লা ফাঁক করে ভেতরে উঁকি দিতে গেল ফগ। সঙ্গে সঙ্গে তাকে প্রায় ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে ছুটে বেরোল ভবঘুরের পোশাক পরা চোরটা। একদৌড়ে গিয়ে দেয়াল টপকে অদৃশ্য হয়ে গেল ওপাশে।
বিশাল বপু নিয়ে দেয়ালের কাছে যখন পৌঁছল ফগ, কয়েকটা ইট জোগাড় করে তার ওপর উঠে তাকাল অন্যপাশে, চোর ততক্ষণে হাওয়া।

.

পরদিন সোমবার সকালে বড় এক প্লেট মাংস ভাজা, আর তিনটে ডিম দিয়ে নাস্তা সারতে বসেছে ফগ, এই সময় বাইরে এসে থামল একটা বড় গাড়ি। সেটার দিকে চোখ পড়তেই হাঁ হয়ে ঝুলে পড়ল তার চোয়াল। কাটা চামচে গাঁথা মাংস গাথাই রইল। ডান হাতটা স্থির হয়ে রইল মাঝপথে, মুখ পর্যন্ত আর পৌঁছাল না।
ঝামেলা! ভাবছে ফগ। এই সাতসকালে শেরিফ এসে হাজির হলেন কেন? কাজের বুয়া মিসেস টারমারিককে ডেকে বলল, শেরিফকে ড্রইংরুমে বসাতে। তারপর তাড়াতাড়ি উঠে ইউনিফর্ম পরতে শুরু করল।
এক মিনিটে পোশাক পরা শেষ করে ড্রইংরুমে ঢুকল। গুড মর্নিং, স্যার। কোন জরুরী কাজ? আমাকে ডাকলেই তো চলে যেতাম।
ফগ, কোন ভূমিকার মধ্যে গেলেন না শেরিফ লিউবার্তো জিংকোনাইশান, এই এলাকায় একটা সাংঘাতিক আসামী এসে ঢুকেছে। জেল পালানো কয়েদী। ভীষণ চালাক। ছদ্মবেশ নেয়ার ওস্তাদ। গোবেল বীচে যে মেলা হচ্ছে, আমার মনে হয় ওখানে কোথাও লুকানোর চেষ্টা করবে। নজর রাখবে সেদিকে। সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে জানাবে আমাকে।
শেরিফ বাড়ি বয়ে তাকে খবর দিতে এসেছেন, নিজেকে খুব কেউকেটা মনে হলো ফগের। কণ্ঠস্বরটাকে ভারী করে তুলে বলল, মেলাতে নজর রাখতে অবশ্যই যাব, স্যার, তবে ইউনিফর্ম পরে নয়, ছদ্মবেশে। আপনি বোধহয় জানেন না, স্যার, পুলিশ স্কুলে আমি ছদ্মবেশের ওপর স্পেশাল কোর্স করেছিলাম।
তাই নাকি? সন্দেহ জাগল শেরিফের চোখে। কিন্তু তোমার ওই মোটা শরীর লুকাবে কোথায়? পেট? ধরা পড়ে যাবে তো। ব্যায়াম-ট্যায়াম করে চর্বি একটু কমাও না। খাওয়াটাও কমাও।
আহত হলো ফগ। অস্বস্তিতেও পড়ে গেল। স্লিম হওয়ার চেষ্টা তো করছি, স্যার। সকালে দুতিন প্লেটের জায়গায় এক প্লেট শুয়োরের মাংস খাই এখন, দুই হালি ডিমের জায়গায় মাত্র তিনটে...।

হুঁ, হতাশ ভঙ্গিতে মাথা দোলেন শেরিফ। পকেট থেকে একটা খাম বের করলেন, নাও, এতে একটা ফটোগ্রাফ আর কিছু কাগজ আছে। লোকটার স্বভাব চরিত্র সব লেখা আছে। পড়ে নিয়ো।
আগ্রহের সঙ্গে হাত বাড়িয়ে খামটা নিল ফগ। কাগজ বের করে পড়তে লাগল, মাঝারি উচ্চতা…তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, পাতলা গোঁফ…ঠোঁটের ওপর একটা কাটা দাগ…
পড়তে পড়তে সহসা সজাগ হয়ে উঠল ফগ। স্যার, এ লোকটাকে তো দেখেছি আমি কাল!
ভুরু কুঁচকে গেল শেরিফের, কোথায়?
সাংঘাতিক লোক, স্যার! ভয়ঙ্কর! গায়ে মোষের জোর, মোষের মতই লাথি মারে। জাপটে ধরতে গেলাম। আমাকে দশ হাত দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দৌড়ে পালাল।
আরে কোথায় দেখলে?
চোখগুলো বাঘের মত জ্বলছিল…না না, নেকড়েবাঘের মত! গোঁফ ছিল। কাপড়-চোপড়ে মনে হচ্ছিল সাধারণ ভবঘুরে। এখন বুঝতে পারছি, ভবঘুরে নয়, ছদ্মবেশে ছিল। ইস, আগে জানলে যতই মোষের শক্তি থাক ওর, ধরে রাখার চেষ্টা করতাম।
ফগ! কঠিন হয়ে উঠল শেরিফের কণ্ঠ, বকবকানি বাদ দিয়ে জলদি বলো আমাকে, কোথায় দেখেছ?।
ঝামেলা!…আঁ, ও, মিস্টার পারকারের বাড়িতে। বাগানের ছাউনিতে ঢুকে বসেছিল। একটা মেয়ে চোর চোর বলে চিৎকার শুরু করল। আমি তখন ওপথেই যাচ্ছিলাম। সাইকেল রেখে ঢুকে পড়লাম বাগানে। ছাউনির সামনে গিয়ে যে-ই বেরোনোর জন্যে ধমক দিলাম, হুড়মুড় করে বেরিয়ে এসে আমাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে…
মিস্টার পারকার…তারমানে জিনাদের বাড়িতে? কি যেন ভাবছেন শেরিফ, কিশোর ছিল নাকি তখন ওখানে?
থমকে গেল ফগ, না, স্যার, ও ছিল না। খোঁজ নিয়েছি। পোস্ট অফিসে গিয়েছিল চিঠি পোস্ট করতে।
হু, চিন্তিত ভঙ্গিতে বললেন শেরিফ। ঠিক আছে, তোমাকে যে কাজটা দিলাম, সেটা করো। আমি যাচ্ছি, কিশোরের সঙ্গে কথা বলতে।
ওর সঙ্গে কথা বলে কোন লাভ নেই, স্যার। ও তখন ওখানে ছিল না। লোকটার কথা কিছু জানাতে পারবে না…
কিন্তু ফগের কথা শোনার জন্যে বসে থাকলেন না শেরিফ। উঠে রওনা দিলেন দরজার দিকে। পেছন পেছন কে এগিয়ে দিতে চলল ফগ।
জিনাদের বাড়িতে এসে দরজার বেল বাজালেন শেরিফ।

খুলে দিল আইলিন। ও, মিস্টার জিংকোনাইশান! গুড মর্নিং।
আইলিন, কিশোর আছে? জিজ্ঞেস করলেন শেরিফ। আর কাউকে ডাকার দরকার নেই। শুধু ওকেই ডেকে দাও।
বসার ঘরে বসলেন শেরিফ। কয়েক মিনিট পরেই রানিং সুট পরে এসে হাজির হলো কিশোর।
কি, বেরোচ্ছ নাকি? ভুরু নাচালেন শেরিফ।
না, আঙ্কেল। বাইরে থেকে এলাম।
হঠাৎ ব্যায়াম শুরু করলে কেন?
মোটা হয়ে যাচ্ছি আবার। চর্বি কমানো দরকার।
ভাল। ফুগকেও সেই পরামর্শই দিয়ে এলাম। কিশোর, একটা প্রশ্ন করব, সত্যি জবাব দেবে। কাল ছাউনিতে কাকে দেখে গেছে ফগ?
একটা মুহূর্ত দ্বিধা করল কিশোর। তারপর মুখ তুলে বলল, আমাকে, স্যার।
হুঁ, মুখটাকে গম্ভীর করে রাখলেন শেরিফ, আমার ধারণা তাহলে ঠিকই। কিন্তু ছদ্মবেশ নিতে গেলে কেন? ফগকে বোকা বানানোর জন্যে?
না, আঙ্কেল। এলিজার হাত থেকে বাঁচার জন্যে।
এলিজা?
সব কথা খুলে বলল কিশোর।
অনেক কষ্টে হাসি চাপলেন শেরিফ। বললেন, এই ব্যাপার। আর ফগ ওদিকে তোমাকেই কয়েদী সন্দেহ করে বসে আছে।
আমাকে কয়েদী সন্দেহ করেছে!
জেল থেকে এক আসামী পালিয়েছে। খবর পেয়েছি, এ গায়েই এসে ঢুকেছে।
লোকটাকে কোথায় পাওয়া যেতে পারে, কিশোরকে জানালেন শেরিফ। কিশোরের ওপর ভরসা আছে তার। বলা যায়, ফগের চেয়ে অনেক বেশিই আছে। এর আগে অনেকগুলো জটিল কেসের রহস্য সমাধান করে দিয়েছিল কিশোর। পকেট থেকে এক মুঠো কাগজপত্র বের করে বেছে বেছে একটা কাগজ আর একটা ফটোগ্রাফ নিয়ে কিশোরের দিকে বাড়িয়ে ধরলেন, নাও, এগুলোতে লোকটার স্বভাব-চরিত্র আর চেহারার বর্ণনা পাবে। তোমাকেও যে লোকটার কথা জানানো হয়েছে, এটা ফগকে বোলো না। মেলা আর কনফারেন্সে যোগ দেয়ার জন্যে নতুন নতুন লোক আসছে, অচেনা মুখ দেখা যাবে অনেক। তাদের মধ্যে লুকিয়ে থাকার চেষ্টা করবে নোকটা।
থ্যাংক ইউ, আঙ্কেল, কিশোরের নজর ছবিটার দিকে, আমাকে জানানোর জন্যে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। লোকটাকে খুঁজে বের করার যথাসাধ্য চেষ্টা করব। আমি। মুসারা তো এ মুহূর্তে আটকে আছে মিস্টার বেকারের বাড়িতে। তদন্তে

আমাকে তেমন সাহায্য করতে পারবে না। তবু, যতটা পারা যায়, কাজে লাগানোর চেষ্টা করব।
কিশোর, সাবধান করে দিলেন শেরিফ, ডাকাতির কেসে জেল হয়েছিল। লোকটার। ভীষণ বিপজ্জনক। সাথে পিস্তল- টিস্তলও থাকতে পারে। নজর রাখবে কেবল। কিছু করতে যেয়ো না! চিনতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে খবর দেবে।
ঠিক আছে, তাই করব, আঙ্কেল।
সোফা থেকে উঠে দরজার দিকে রওনা হলেন শেরিফ। এই সময় ওপর থেকে নেমে আসতে দেখা গেল এলিজাকে।
শেরিফ বেরিয়ে গেলেন।
কিশোরের সামনে এসে দাঁড়াল এলিজা। গোবেল বীচের শেরিফ, তাই না? কেন এসেছিলেন? গতকালকের সেই ভবঘুরেটার কথা জিজ্ঞেস করতে?
হ্যাঁ বেশি কথার মধ্যে গেল না কিশোর। জেলপালানো আসামীটার কথা জানাতে চায় না এলিজাকে।
আমাকে ডাকা উচিত ছিল তোমার, অভিযোগ করল এলিজা। হাজার হোক, ওকে আমিই প্রথম দেখেছি। আমার সাক্ষীর একটা দাম আছে। ছাউনিতে গিয়ে না দেখলে, চোর চোর করে চিৎকার না করলে ওই পুলিশম্যানটা আসত না, জানাজানি হতো না, কালকে সর্বনাশ করে দিয়ে যেত...।
আমাকে এখন বেরোতে হবে, এলিজা, জরুরী কাজ আছে...
জরুরা কাজটা কি?
দৌড়াতে যাব।
একটু আগে না দৌড়ে এলে? জানালা দিয়ে দেখলাম।
দৌড়ানো শেষ হয়নি। আবার যাব।
তাজ্জব ব্যাপার! এক সকালে কবার দৌড়াও?
যা যন্ত্রণা শুরু হয়েছে, দৌড়ানো ছাড়া উপায় কি?
কিশোরের কথা বুঝতে পারল না এলিজা, মানে?
মানেটানে কিছু না। আমি যাচ্ছি।
আমিও যাব। সাগর আর নদীর পাড় দিয়ে দৌড়াতে আমার ভাল লাগে।
আমি ওসব পারাপারে যাচ্ছি না। পাহাড়ের দিকে যাব।
ও, পাহাড় তো আরও ভাল লাগে। এক সেকেন্ড দাঁড়াও। আমি চট করে কাপড়টা বদলে আসি।
মনে মনে নাছোড়বান্দা মেয়েটার হাত থেকে বাঁচার উপায় খুঁজছে কিশোর, বাঁচিয়ে দিলেন কেরিআন্টি। ড্রইংরুমে ঢুকলেন। এলিজা, তুমি এখানে। আমার

একটা কাজ করে দেবে?
বড়দের সম্মান করে এলিজা। কোন কিছু করতে বললে না করে না। কি কাজ, আন্টি?।
ফুলের তোড়াগুলো ঠিকমত বেঁধে ফুলদানিতে সাজিয়ে রাখতে হবে। আমি এক হাতে কুলিয়ে উঠতে পারছি না।
সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল এলিজা। আর এই সুযোগে কিশোর দিল দৌড়। একছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বাড়ির কোণ ঘুরে এসে জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখল, এলিজা কি করে। বড় একটা কাঁচি হাতে রান্নাঘরের দরজা দিয়ে বাগানে বেরোচ্ছে।
জানালা টপকে ভেতরে ঢুকে পড়ল কিশোর। মুসাকে ফোন করল। যথারীতি খাওয়ায় ব্যস্ত মুসা। রবিন ধরল।
কে, রবিন? বলল উত্তেজিত কিশোর। শোনো, খবর আছে। একেবারে হাতে এসে ধরা দিয়েছে চমৎকার একটা রহস্য। একটু আগে শেরিফ এসেছিলেন।
সংক্ষেপে যত দ্রুত সম্ভব, সব জানাতে লাগল কিশোর।
রান্নাঘরের দরজা দিয়ে বেরোলেও, সামনের দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকল এলিজা। হাতে এক গোছা ডাল সহ ফুল, কেটে এনেছে। কিশোরকে দেখে দাঁড়িয়ে গেল।
কথায় এতই মশগুল কিশোর, এলিজাকে ঢুকতে দেখেনি। পেছনে দাঁড়িয়ে সব। শুনে ফেলল এলিজা। ফোন রেখে কিশোর ঘুরে দাঁড়াতেই বলল, তুমি না বললে কালকের ভবঘুরেটার কথা জানতে এসেছিলেন শেরিফ? এখন রহস্য জোগাড় হলো কোনখান থেকে।
জবাব দিল না কিশোর। চট করে তাকিয়ে দেখে নিল, কেরিআন্টি আছেন কিনা। নেই দেখে সোজা দরজার দিকে রওনা হলো।
এই কিশোর, কোথায় যাচ্ছ? এলিজা ডাকল। আমাকে নিয়ে যাও। ফুলগুলো গোছাতে দশ মিনিটও লাগবে না আমার।
কে শোনে কার কথা। কিশোর ততক্ষণে বেরিয়ে চলে এসেছে দরজা দিয়ে। লাফ দিয়ে রাস্তায় নেমেই দৌড়। বেকারদের ওখানে যাবে। নিজের ওপর ভীষণ রেগে গেছে। টেলিফোনে কথা বলার সময় সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। সমস্ত রাগটা গিয়ে পড়ল এলিজার ওপর। ও-ই বা কেমন মেয়ে? চুরি করে অন্যের কথা শোনে!

.

বেকারদের সামার-হাউসে কিশোরের জন্যে অপেক্ষা করছে মুসা, রবিন, জিনা আর ডল। কিশোরকে একা দেখে জিজ্ঞেস করল জিনা, রাফি কই? আননি?
কি করে আনব? ওর চেন খুলতে গেলেই তো সুযোগ পেয়ে যেত মেয়েটা, পিছু নিত! হাঁপাতে হাঁপাতে জবাব দিল কিশোর। কি ভাবে পালিয়ে এসেছে জানাল।

রাগে মুঠো পাকিয়ে ফেলল জিনা। ধরে কাঁচি দিয়ে ওর বেণি দুটো যদি কুচ করে কেটে দিতে পারতাম এখন, ভাল হত!
তা যখন পারছ না, রবিন বলল, মেজাজ গরম না করে চুপ থাকাই ভাল। বরং রহস্যটার কথা শুনি।
আগের বিকেলে ফগ কি করে বোকা বনেছে, বন্ধুদের জানাল, কিশোর। শুনে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল সবাই।
শেরিফের দিয়ে যাওয়া কাগজ আর ছবিটা বের করল। ছবির ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল সবাই। লোকটার কালো চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, খোটা জরু, সাদামাঠা নাক, পাতলা ঠোঁট, ওপরের ঠোঁটে নাকের ঠিক নিচে একটা কাটা দাগ।
দাগটার ওপর আঙুল রেখে কিশোর বলল, এটা নিয়েই মুশকিলে পড়বে লোকটা। লুকানোর জন্যে বড় গোঁফের ব্যবস্থা করতে হবে। এমনিতে পাতলা গোঁফ আছে লোকটার, তাতে দাগটা ঢাকা পড়বে না, আলগা নকল গোফ লাগাতে হবে। শুধু গোঁফ লাগালে যদি উদ্ভট লাগে, তাহলে সেটা চাপা দেয়ার জন্যে দাড়িও লাগাতে পারে।
কেউ কিছু বলল না। শোনার জন্যে তাকিয়ে আছে কিশোরের মুখের দিকে।
চুল বেশ ঘন, আর সোজা সোজা, কোকড়া বা আগাগুলো বাকা নয়, বলল সে। সেজন্যে পার্ম করে কোকড়া করে নিতে পারে। আজকাল চুল তুলে পাতলা করে নিয়ে সাময়িকভাবে টাকও বানিয়ে নেয়া যায়। লোকটা ছদ্মবেশের ওস্তাদ। ধরা না পড়ার জন্যে অনেক কিছুই করতে পারে।
তাহলে আর ওর ছবি দেখে লাভ কি আমাদের? রবিনের প্রশ্ন।
হাতের রগগুলো ফোলা, দেখো, মুসা বলল। এগুলো ঢাকবে কি দিয়ে?
দস্তানা পরে নেবে, জিনা বলল।
হ্যাঁ, মাথা ঝাঁকাল রবিন। তা লোকটার পছন্দ-অপছন্দ কিছু আছে নাকি?
বিড়াল ভালবাসে, জবাব দিল কিশোর। কাগজটাতে লেখা আছে সব। আরও একটা ব্যাপার-অদ্ভুতই বলতে পারো-পোকামাকড়েও খুব আগ্রহ তার।
খাইছে! কলি? মুসা অবাক।
হ্যাঁ, শখের কলিওপটারিস্ট।
কনফারেন্সে যোগ দিতে যাবে না তো! চেঁচিয়ে উঠল জিনা। গুবরেপোকা ভালবাসে বলেই এসেছে গোবেল বীচে?
গোবেল বীচে হয়তো সেজন্যে আসেনি, কিশোর বলল, জেল থেকে পালিয়ে আর কোনদিকে যাওয়ার সুযোগ না দেখে এখানে ঢুকেছে। তবে আছে যখন, এ রকম একটা সম্মেলনে যোগ দেয়ার সুযোগ সে হয়তো হাতছাড়া করবে না।...কে ভাবতে পেরেছিল, জেলখাটা একজন দাগী আসামী গুবরেপোকা তালবাসে!..হ্যাঁ,

বাকি রইল লোকটার তীক্ষ্ণ চোখসেটা ঢাকাও কোন ব্যাপার নয়, চশমা পরে নিলেই হলো…
এ খবরটা আগে জানলে, ডল বলল, মিস্টার বেবিকেই সন্দেহ করতাম আমি। লোকটাকে দেখে মোটেও বিজ্ঞানী মনে হয় না। হ্যাট, মাফলার, ভারী কোট, দাড়ি, গোঁফ-একেবারে জেলপালানো ছদ্মবেশী কয়েদী।
ভাল বলেছ তো! মুসা বলল। কিশোরের দিকে তাকাল, লোকটা লম্বা কতখানি?
মিস্টার বেবির সমানই হবে, হেসে বলল কিশোর।
এ কথা এলিজাকে বলতে যেয়ো না, রবিন বলল। বলোনি তো?
না, মাথা নাড়ল কিশোর, বললাম না, রহস্যটা কি জানার জন্যে চাপাচাপি করছিল সে, সেটাই বলিনি। শুধু টেলিফোনে তোমার সঙ্গে কথা বলার সময় যেটুকু শুনেছে।
এলিজার ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে তোমার। মেয়েটার আড়িপাতারও বদস্বভাব আছে। যাকগে, কিশোর, রহস্যের তদন্তটা কি করে শুরু করব?
তোমরা তো আর তেমন কিছু করতে পারবে না, বেরোতেই পারো না। যা করার আমাকেই করতে হবে।
নিজেদের অবস্থার কথা ভেবে মুখ কালো করে ফেলল রবিন। নিজেদেরকে জেলে বন্দি কয়েদী মনে হচ্ছে এখন। কোনখান থেকে শুরু করবে?
এখানে লোকের ভিড়ে মিশে যাওয়ার চেষ্টা করবে সে, কিশোর বলল। হোটেল কিংবা বোর্ডিং-হাউসে থাকতে যাবে না, জানে, প্রথমেই ওসব জায়গায় হানা দেবে পুলিশ। কোথায় উঠল সেটার খোঁজ না করে বরং দুটো জায়গায় নজর রাখলে। সুবিধে হবে আমাদের জন্যে।
একা তো মেলায়, ডল বল। আরেকটা কোনখানে?
গুবরেপোকার সম্মেলনে, বলে দিল মুসা। তাই না, কিশোর?
গুবরেপোকার সম্মেলন বলে গুবরেপোকাদের সম্মেলন বোঝায়, হেসে শুধরে দিল কিশোর, আসলে পোকা নিয়ে তো হচ্ছে মানুষের সম্মেলন।
তাহলে কি বলব? গুবরেপোকাপ্রেমিক মানুষের সম্মোন?
হ্যাঁ, তা বলতে পারো। তবে বড়ই জটিল। বরং কলিপটাবিস্টদের কনফারেন্স বলা সহজ।
কলি হোক আর গলি হোক, জিনা বলল, যেটার সম্মেলনই হোক, যাব কি করে ওখানে আমাদের নিশ্চয় ঢুকতে দেবে না।
দেবে, কিশোর বলল। যদি মিস্টার বেবির সঙ্গে যাই। আন্টি আর আইলিন যাবে কিনা জিজ্ঞেস করেছিলেন তিনি, মানা করে দিয়েছে দুজনেই। পারকার আঙ্কেল সময় পেলে যাবেন বলেছেন। না গেলেই ভাল। আমরা যেতে পারব।

যদি ছুটি পাওয়া যায়, শুকনো মুখে বলল রবিন।
ছুটির ব্যবস্থা আমি করব, ডল বলল। যেতে না দিলে মার সামনে গিয়ে এমন কান্নাকাটি শুরু করব, বিরক্ত হয়েই শেষে বেরিয়ে যেতে বলবে।
হাসল মুসা, যদি ধমক দিয়ে বলেন?
তাহলেও বেরোব।
কিশোরের দিকে তাকাল জিনা, কবে থেকে তদন্ত শুরু করতে চাও?
আজ থেকেই, কিশোর বলল। আজ মেলায় যাব। কনফারেন্স কাল থেকে শুরু হবে।
কিন্তু আমরা আজ যেতে পারব কিনা বলতে পারছি না। সব নির্ভর করছে আমাদের দুটি পাওয়া না পাওয়ার ওপর।
এলিজাকে নিয়ে আমারও সমস্যা হবে। আমাকে বেরোনোর জন্যে তৈরি হতে দেখলেই সে সঙ্গে যেতে চাইবে। কেরিআন্টিও নিতে বলবেন। মেয়েটার হাত থেকে মুক্তির কোন উপায়ই দেখতে পাচ্ছি না! চালাকি করেও পার পাওয়া যাচ্ছে না। আচ্ছা এক মুশকিলে পড়লাম!
তোমার নাকি এত বুদ্ধি, কিশোরভাই, ডল বলল, ওকে এড়ানোর জন্যে কিছুই কি করতে পারো না?
দেখি, নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর, ভাবতে হবে!
মেলায় গেলে রাফিকে নিয়ে যেয়ো, অনুরোধ করল জিনা। আমরা গেলে ওর সঙ্গে দেখা হবে।
আচ্ছা, নেব।
বাড়ি ফিরে রান্নাঘরের জানালা দিয়ে উঁকি দিল কিশোর। ফিসফিস করে আইলিনকে জিজ্ঞেস করল, এলিজা কোথায়?
মুচকি হাসল আইলিন। ওপরে।
প্লীজ, আমার ঘর থেকে একটা বই এনে দাও। আমি যে এসেছি, আইলিনকে বোলো না।
হাসিটা বাড়ল আইলিনের। কি বই?
নাম বলল কিশোর।
মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল আইলিন। কয়েক মিনিট পর ফিরে এল।
আইলিনকে ধন্যবাদ দিয়ে বইটা নিয়ে চুপচাপ ছাউনিতে চলে এল কিশোর। রাফিয়ান চেঁচামেচি করে এলিজাকে জানান দিতে পারে, সেজন্যে ওর সামনেও পড়ল না।
দুপুর পর্যন্ত নিরাপদেই বই পড়ে কাটিয়ে দিল।

লাঞ্চের আগে আগে ঘরে ঢুকল সে। কেরিআন্টি জিজ্ঞেস করলেন, এতক্ষণ কোথায় ছিলি?
বাড়িতেই তো, অবাক হওয়ার ভান করল কিশোর।
বাড়িতে কোথায়? দেখলাম না তো।
ছাউনিতে। বই পড়ছিলাম।
স্থির দৃষ্টিতে কিশোরের ছিকে তাকিয়ে রইলেন কেরিআন্টি। কি যেন ভাবলেন। তারপর নীরবে কাঁধ ঝাঁকিয়ে চলে গেলেন রান্নাঘরের দিকে।
ওপর থেকে নেমে এসে কিশোরকে দেখতে পেয়েই ঘ্যানর-ঘ্যানর শুরু করল এলিজা। ও কোথায় ছিল, কি করছিল, তাকে না নিয়ে কেন গেল-একশো একটা প্রশ্ন : এড়ানোর একটাই উপায়-চুপ করে থাকা। তা-ই রইল কিশোর।
আজ বিকেলে মেলায় যাচ্ছি আমরা, লাঞ্চের টেবিলে কিশোরের দিকে তাকিয়ে ঘোষণা করল এলিজা।
ভাল, শান্তকণ্ঠে বলল কিশোর, যদিও বুকের ধুকপুকানি বেড়ে গেছে তার।
সাবধান, হুপলা স্টলে গিয়ে রিঙ ছুঁড়ো না কিন্তু।
কেন? অবাক হলো কিশোর।
ওরা সব ঠগ রিঙগুলো ইচ্ছে করেই ছোট বানায়, যাতে পুরস্কারের জন্যে সাজিয়ে রাখা জিনিসগুলোর কোনটাতেই না ঢোকে। ঢুকলেই তো ওটা দিয়ে দিতে হবে, ওদের লস।
রিঙ ছুঁড়ে বহুবার আমি বহু জিনিস পেয়েছি। তুমি পারো না বলেই পাও না। ছোঁড়ার কায়দা আছে।
মিস্টার পারকার এলেন মিস্টার গ্রেগকে সঙ্গে করে। রান্নাঘর থেকে ট্রে হাতে ঢুকলেন কেরিআন্টি।
ভারী লেন্সের ভেতর দিয়ে কিশোর আর মেয়ের দিকে তাকিয়ে দরাজ হাসি। হাসলেন মিস্টার গ্রেগ, বাহ্, চমৎকার জমিয়ে নিয়েছ দেখছি। খুব ভালই কাটছে তোমাদের। সকালে কি কি খেললে?
বাবা, কড়া গলায় মুখ ঝামটা দিল এলিজা, এমন করে কথা বলো যেন আমার বয়েস সাত, আমি একটা খুকি। কোন খেলা খেলিনি। সত্যি কথাটা হলো, সকাল থেকে প্রায় দেখাই হয়নি কিশোরের সঙ্গে আমার।
তাই নাকি? চট করে কথাটা ধরলেন মিস্টার পারকার খুব খারাপ কথা। কিশোর, এলিজা আমাদের মেহমান, মনে রাখা উচিত তোমার।
আমিও আপনাদের মেহমান-বলতে গিয়েও ঝামেলা বাধার ভয়ে বলল না। কিশোর।

ব্যাপারটা বোধহয় আঁচ করতে পারলেন কেরিআন্টি; প্রসঙ্গটা চাপা দেয়ার জন্যে বললেন, খাওয়া শুরু করো। ঠাণ্ডা হয়ে গেলে আলুগুলো আর মচমচে থাকবে না।
প্লেটে একগাদা আলুভাজা তুলে নিলেন মিস্টার গ্রেগ। অন্য সব প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে মুহূর্তে চলে এলেন গুবরেপোকা আর কনফারেন্সের কথায়। হাপ ছেড়ে বাঁচল কিশোর।
তোমাদের টাউন হলে মীটিংটা কেমন হবে ভাবছি, কিশোরের দিকে তাকিয়ে বললেন তিনি। কোন গণ্ডগোল না হলেই বাঁচি, অনেক নামী-দামী লোক আসবে।
কারা কারা? আগ্রহী হয়ে উঠল কিশোর।
এই তো, যেমন ধরো জেফরি জেফারসন। ক্রস-ভেইন থ্রী-স্পট ম্যাকলিং বীটল অভ পেরুভিয়ার বিশেষজ্ঞ তিনি। দারুণ লোক, সত্যি অসাধারণ। একবার পুরো সাতটা দিন জলাভূমিতে গুবরেপোকার গর্তের সামনে উপুড় হয়ে পড়ে ছিলেন।
মিস্টার পারকার বিজ্ঞানী হলেও এ সব পোকামাকড় পছন্দ করেন না। অসাধারণ বলছ কি হে? ও তো একটা পাগল।
কিছু মনে করলেন না মিস্টার গ্রেগ। সেটা তোমার মনে হচ্ছে। ওঁর মত। ভদ্রলোক কোটিতে একটা পাবে না। কিশোরের দিকে তাকালেন তিনি, তারপর রয়েছেন ডরোথি কফিন। বিশ্বাস করো আর না-ই করো, তিব্বতের স্কালকিং হাঞ্চ গুবরেপোকার চুরাশিট। ডিমে তা দিয়ে বাচ্চা ফুটিয়েছেন তিনি।
মুরগীর মত তা দিয়েছেন! কিশোর অবাক।
আরে না না, নিজে বসে কি আর দিয়েছেন? একটা গরম বাক্সে রেখে দিয়েছিলেন। কিন্তু বিস্ময়কর ব্যাপারটা হলো, চুরাশিটা ডিম থেকে বেরিয়েছিল চুরাশি দুগুণে একশো আটষট্টিটা ছানা-অথচ বেরোনোর কথা চুরাশিটা। অবাক লাগছে না?
অবাক লাগবে কেন? যমজ হয়েছে আরকি, জবাব দিল কিশোর।
এই আলোচনাটা বন্ধ করলে হয় না? পোকামাকড়ের কথা শুনতে ভাল লাগছে না কেরিআন্টির। খাবারের মধ্যেও পোকা দেখা শুরু করব আমি।
সরি, মিসেস পারকার, মিস্টার গ্রেগ বললেন।
কিন্তু কিশোরের আগ্রহ কমেনি। কনফারেন্সে আর কে কে আসবে, মিস্টার গ্রেগ?
অনেকেই আসবেন, মাই বয়, কজনের কথা বলব? কিশোরের আগ্রহ খুশি করল মিস্টার গ্রেগকে। আলতু-ফালতু লোক নয় কেউ, সবাই বিশেষজ্ঞ।
আপনি তাদের সবাইকে চেনেন?
না, সবাইকে চিনি না। লিস্ট দেখেছি। নামের পাশে যে সব ডিগ্রি লেখা রয়েছে, তাতে বোঝা যায় কেউ কাঁচা লোক নয়।

লিস্টটা কোথায়? দেখা যাবে?
দিচ্ছি। পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে নামের তালিকাটা বের করলেন মিস্টার গ্রেগ। কনফারেন্সের ব্যাপারে খুব ইনটারেস্ট দেখা যাচ্ছে তোমার। যাবে নাকি? এমনিতে তো ঢুকতে দেবে না, তবে আমি সঙ্গে নিয়ে গেলে দেবে।
কিশোরের জন্যে এটা সুখবর। অবশ্যই যাব। লিস্টটা দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ দিল মিস্টার গ্রেগকে। কনফারেন্স নিয়ে আলোচনা করে রীতিমত খাতির জমিয়ে ফেলল তার সঙ্গে। শেষে অদ্ভুত একটা প্রস্তাব দিয়ে বসল তাঁকে, আজ বিকেলে মেলায় যাচ্ছি আমরা, মিস্টার গ্রেগ। আপনার কনফারেন্স তো কাল। হাতে সময় থাকলে চলুন না আজ আমাদের সঙ্গে, রাউন্ডএবাউটে চড়তে কেমন লাগে দেখবেন।
কিশোরের মতলবটা বুঝতে পারছেন না কেরিআন্টি। মিস্টার গ্রেগের মত একটা বিরক্তিকর চরিত্রের সঙ্গে তার এই গায়ে পড়া খাতির অবাক করল তাঁকে।
অবাক কিশোরও হলো, যখন নির্দ্বিধায় জানিয়ে দিলেন মিস্টার গ্রেগ, আমার কোন আপত্তি নেই। সেই কবে ছেলেবেলায় চড়েছি, ভুলেই গেছি। আজ সেটা মনে করব।

.

মেলার গেটে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে জিনা, মুসা, রবিন আর ডল দেখল মিস্টার গ্রেগকে সঙ্গে করে নিয়ে আসছে কিশোর। মহাবিরক্তি উৎপাদনের জন্যে এক এলিজাই যথেষ্ট, তার ওপর আবার তার বাবা! কিশোরের উদ্দেশ্যটা কি?
মস্ত বোকামি হয়ে গেছে! এক ফাঁকে চুপি চুপি রবিনকে জানাল কিশোর। আসলে একটু রসিকতা করতে চেয়েছিলাম, তার খেসারত দিতে হচ্ছে। আমি ভেবেছিলাম, আসতে বললে পারকার আঙ্কেলের মত হেসে উড়িয়ে দেবেন, কিন্তু চলে যে আসবেন কল্পনাই করিনি। তিনি না এলে তার মেয়েকেও কোন ফাঁকে ফেলে চলে আসতে পারতাম।
কিন্তু সেটা আর হলো না, হতাশ কণ্ঠে বলল রবিন। ভোগান্তির চূড়ান্ত হবে এখন আমাদের। মেলা দেখা খতম।
মেলা দেখতে কিন্তু আসিনি আমরা, মনে করিয়ে দিল কিশোর। এসেছি মেলা দেখার ছুতোয় লোকটাকে খুঁজতে।
সাধারণ মেলা। একটা রাউন্ডএবাউট, একসারি দোলনা, হুপলা স্টল, একটা শূটিং রেঞ্জ, কেক আর মিষ্টির দোকান, আর কিছু ছোটখাট সাইড-শোর ব্যবস্থা আছে। ওগুলোর আশপাশ দিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল গোয়েন্দারা। হুপলা স্টলে ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখল। এলিজার কথাই যেন ঠিক, কোন জিনিসেই রিঙ পরাতে পারল না ওরা।

বলেছিলাম না, সব ফাঁকিবাজি, রিঙগুলো ছোট করে বানানো, মাথা সোজা করে বলল এলিজা। খামাখা আর পয়সা নষ্ট কোরো না।
ওর কথা শুনে ফেলল স্টল-মালিকের ছেলেটা এগিয়ে এসে বলল, মারতে পারো না, সেটা বলো। কোন ফাঁকিবাজি নেই। এই দেখো। কোনটাতে ফেলব? আট-দশটা রিঙ নিয়ে একে একে ছুঁড়তে লাগল। সে। প্রতিটা রিঙই লক্ষ্যভেদ করল। এলিজার দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচাল। কি বুঝলে? মারার কায়দা জানো না, তাই পারোনি।
লাল হয়ে গেল এলিজা। কথা জোগাল না মুখে।
সবচেয়ে বেশি মজা পাচ্ছেন মিস্টার গ্রেগ। হুপলা খেললেন। লজেন্স কিনে চুষতে লাগলেন। এলিজাকে সঙ্গে নিয়ে দোলনায় চড়াও রাদ দিলেন না।
কিছুতেই তো ওকে সরানো যাচ্ছে না, কি করি? জোরে নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। সন্দেহজনক কাউকে চোখে পড়েছে তোমাদের?
নাহ্, মাথা নাড়ল রবিন। চলো তো, ওই ভাঁড়ের তাবুটাতে গিয়ে দেখে আসি।
তেমন কিছু দেখার নেই ওখানে। তবে ভাঁড়কে দেখতে দেখতে হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠল কিশোর। সেটা লক্ষ করল রবিন। জিজ্ঞেস করল, কি হলো?
ভাল করে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখো, রবিনের কানে কানে বলল কিশোর। নাক আর ঠোঁটের মাঝে এত গাঢ় করে লাল রঙ দিয়েছে কেন? দাগ ঢাকার জন্যে?
হতে পারে! লোকটার হাতের দিকে তাকাল রবিন। দস্তানা পরা। রগ ফোলা কিনা তা-ও বোঝা যাচ্ছে না।
লোকটার দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। ছবির লোকটার মতই ভাড়ের চোখ দুটোও তীক্ষ্ণ। চুলের রঙ বা ধরন বোঝা যাচ্ছে না, টুপির নিচে ঢাকা থাকায়। উচ্চতাটাও মিলে যায়। মাঝারি উচ্চতার লোক সে।
আমাদের সন্দেহের তালিকায় রাখতে হবে একে, রবিন বলল। এটাই শেষ? নাকি আরও দুতিনজনকে দেখবে?
দেখব। ভাঁড়ের মুখের দিকে তাকিয়ে আরেকবার দাগটা খুঁজল কিশোর। রঙের জন্যে বোঝা যাচ্ছে না। রবিনের হাত ধরে টেনে নিয়ে এল পাশের চায়ের স্টলটায়।
চা খাবে? জিজ্ঞেস করল স্টলওয়ালা।
দিন, মাথা কাত করল কিশোর। তাকিয়ে রইল লোকটার মুখের দিকে। দাগ নেই। পাশের ভাড়ের তাবুটার দিকে হাত তুলে জিজ্ঞেস করল, ওর নাম কি জানেন?
পুরো নাম জানি না। ডাকনাম ডক, কিশোরের হাতে চায়ের কাপ ধরিয়ে দিল চা-ওয়ালা। ওকে আগে কখনও দেখিনি।

মেলায় মেলায়ই ঘোরে নিশ্চয়?
কি করে জানব? তবে মেলা ছাড়া ভাঁড়ের খেলা আর কোথায় দেখাবে? আরেকজন খদ্দের দেখে তার দিকে এগিয়ে গেল চা-ওয়ালা। ফিরে তাকিয়ে কিশোরকে বলল, ওকেই গিয়ে জিজ্ঞেস করো না।
কথাটা মন্দ বলেনি চা-ওয়ালা। কিন্তু এখন কথা বলার সময় নেই ওদের কারোরই। ব্যস্ত। আগামী দিন সকালে এসে ভাড়ের সঙ্গে কথা বলবে, ঠিক করল কিশোর। তখন হয়তো ভাড়ের পোশাকেও থাকবে না লোকটা, মুখে রঙ থাকবে না, কাটা দাগ থাকলে চোখে পড়বে।
চা খেতে ভাল লাগল না। দুজনেই ঢেলে ফেলে দিয়ে শূটিং রেঞ্জের দিকে চল।
চেয়ারে বসে টিকিট বিক্রি করছে এক বুড়ি। মাঝে মাঝে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাচ্ছে শূটারদের দিকে। ওদের গুলি আর এয়ারগান সরবরাহ করছে একটা ছেলে। দুই গোয়েন্দা তাকিয়ে থাকতে থাকতেই ওর পাশে এসে দাঁড়াল যুবক বয়েসী একটা লোক। ছেলেটাকে সাহায্য করতে লাগল।
রবিনের গায়ে কনুইয়ের গুঁতো দিল কিশোর। ছবির সঙ্গে অনেক মিল লোকটার। তীক্ষ্ণ চোখ, মোটা ভুরু, ঘন চুল। তবে নাকের নিচে দাগ দেখা গেল না।
নিচু স্বরে কিশোর বলল, না, এ আমাদের লোক নয়।
মাথা ঝাঁকাল রবিন, দাগ নেই। হাতের রগও ফোলা নয়।
সরে আসার সময় চেয়ারে বসা বুড়ি টিকিট বাড়িয়ে ধরল ওদের দিকে, ফ্যাঁসফেঁসে শ্লেষ্মাজড়িত কণ্ঠে বলল, শূটিং করবে? দেখোনা ভাগ্য পরীক্ষা করে।
মাথা নেড়ে মানা করল কিশোর।
বুড়ির দিকে তাকিয়ে দুঃখ লাগল রবিনের। নিশ্চয় কমিশনে কাজ করছে। এতই অসহায় মনে হতে লাগল বুড়িটাকে, একবার মনে হলো শুধু ওর হাতে দুটো পয়সা তুলে দেয়ার জন্যেই একটা টিকেট কাটে। বয়েসের ভারে কুঁচকানো মুখের চামড়া, অসংখ্য ভাঁজ পড়েছে। গায়ে-মাথায় জড়ানো শালটাও যেন তারই মত পুরানো।
দোলনাগুলোর কাছে লালমুখো এক লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল ওরা। লাল গোঁফ, লাল দাড়ি। গলায় জড়ানো ময়লা নীল একটা মাফলার। মাথার নীল টুপিটা কপালের ওপর টেনে দেয়া। গায়ের কোটটা অতিরিক্ত টাইট। প্যান্টটাও খাটো। অন্য কারও পোশাক পরে এসেছে যেন। কেমন হাস্যকর লাগছে ওকে। লোকে পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ওর দিকে তাকিয়ে হাসছে।
থমকে দাঁড়াল কিশোর। ফিসফিস করে রবিনকে বলল, চিনতে পারছ?
মাথা নাড়ল রবিন।
নাহ, ভাল গোয়েন্দা কোনদিনই হতে পারবে না! ঝামেলাকে চিনতে পারছ না?
ফগ!

চুপ! আস্তে! মুসাদের ডেকে নিয়ে এসোগে।
একটা তাঁবুর পাশে দাঁড়িয়ে ফগের অলক্ষে তাকে দেখতে লাগল ওরা।
দোলনার সামনে দাঁড়িয়ে গভীর মনোযোগে কি যেন দেখছে ফগ। দুষ্টবুদ্ধি খেলে গেল মুসার মাথায়। ফগের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বিনয়ের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল, কটা বাজে, স্যার?
ভুরু কুঁচকে মুসার দিকে তাকাল ফগ। ঘড়ি দেখল। চারটে। যাও, ভাগো! এমন জোরে ধমকে উঠল সে, চমকে গেল মুসা।
থ্যাংক ইউ, স্যার, বলে হাসতে হাসতে সরে এল অন্যদের কাছে।
মনে মনে সন্তুষ্ট হলো ফগ। ভাবল, বিচ্ছু ছেলেটা ওকে চিনতে পারেনি। তারমানে ওর ছদ্মবেশ সফল হয়েছে। মনের আনন্দে গোঁফে চাড়া দিতে গিয়ে মনে পড়ল, নকল গোঁফ, টান লাগলে খুলে যাবে। হাত সরিয়ে আনল তাড়াতাড়ি।
মুসার পর গেল জিনা। সঙ্গে রাফি। ফাঁকে দেখেই ঘাউ ঘাউ করে উঠল কুকরটা। চেন ধরে তাকে আটকাল জিনা। চুপ থাকতে বলল। মেলার মধ্যে গোলমাল করলে বের করে দেবে দারোয়ান।
আড়চোখে ওদের দিকে তাকাল ফগ। ঠেলে বেরোনো গোলআলুর মত গোল চোখে ভয় আর বিরক্তি। কিন্তু ছদ্মবেশ ফাস হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় কিছু বলতেও পারছে না।
হে মিস্টার, জিনা জিজ্ঞেস করল, আপনি কি জানেন, মেলা কটার সময় বন্ধ হবে?
সাড়ে দশটায়। সরো, কুত্তা সরাও তোমার। কামড়ে দেবে তো। মেলা কর্তৃপক্ষের কাছে নালিশ করব আমি! মাথা ঝাঁকি দিয়ে কথা বলতে গিয়ে তার আলগা লাল গোঁফের একটা পাশ খুলে গেল। তাড়াতাড়ি আঙুল দিয়ে টিপে ধরে আড়চোখে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করল, জিনা ওকে চিনতে পারল কিনা।
কিন্তু জিনার মুখে চেনার কোন লক্ষণ নেই। নিরীহ স্বরে বলল, রাফিকে ভয়। পাবার কোন কারণ নেই, মিস্টার। গায়ের হাঁদা পুলিশম্যান ঝামেলার্যাম্পারকট ছাড়া আর কাউকে কামড়াতে যায় না সে। বলে আর দাঁড়াল না। সরে এল। নীরব হাসিতে ফেটে পড়ছে।
ভয়ানক রাগে জ্বলে উঠল ফগের মুখ। ঠাস করে চড় মারার ইচ্ছেটা বহু কষ্টে রোধ করল। শেরিফের প্রশ্রয় পয়েই ছেলেমেয়েগুলো এতটা বেয়াড়া হয়েছে। ওর হাতে ছেড়ে দিলে কবে সিধে করে ফেলত। নিজের অসহায়ত্বে অজান্তেই ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল তার। চাকরির ওপর ঘেন্না ধরে গেল।
এরপর এল রবিন। ফগের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় নিচু হয়ে কি যেন তোলার ভঙ্গি করল। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে একটা বোতাম দেখিয়ে বলল, এ বোতামটা কি

আপনার, স্যার?
মাথা নাড়ল ফগ। অনেকটা শান্ত হয়ে এসেছে। তিন-তিনটা বিচ্ছু এল, কেউ তাকে চিনতে পারেনি ভেবে রাগটা কমে গেছে। না, থোকা, আমার না। মেলা দেখতে এসেছ বুঝি? কেমন লাগছে?
খুব ভাল।
রবিন ফিরে এলে কিশোর গিয়ে দাঁড়াল ফগের কাছে। তীক্ষ্ণ চোখে নিচের দিকে তাকিয়ে কি যেন দেখতে লাগল। মুখ তুলে জিজ্ঞেস করল, কিছু মনে করবেন না, স্যার। আপনার পায়ে ওগুলো পুলিশের বুট মনে হচ্ছে। চুরি করেছেন নাকি?
চমকে গেল ফগ। মনে মনে ঝাড়পেটা করতে লাগল নিজেকে। ছদ্মবেশ নেয়ার সময় জুতো বদলানোর কথা মনে ছিল না। কটমট করে তাকাল কিশোরের দিকে।
জুতোগুলো চেনা চেনা লাগছে, কিশোর বলল আবার। ফগের জুতোর মত...
ফগর‍্যাম্পারকট! ধমকে উঠল ফগ। বলেই বুঝল, ভুল করে ফেলেছে। শোধরানোর উপায় নেই আর। খেঁকিয়ে উঠল, ঝামেলা! শয়তান ছেলে! যাও, ভাগো এখান থেকে! ঘাড় মটকে দেব নইলে!
.
অনেক কষ্টে হাসি থামাল ওরা।
মুসাকে জিজ্ঞেস করল কিশোর, এলিজা কোথায়?
বাপের সঙ্গে রাউন্ডএবাউট চড়ছে। মিস্টার বেবি আসলেই পাগল। মেলায় হেন জিনিস নেই, যেটাতে চড়ছেন না তিনি।
চলো তো, দেখি।
রাউন্ডএবাউটের সামনে এসে দেখে ফগ দাঁড়িয়ে আছে। আড়চোখে ওদের দিকে তাকাল ফগ। চোখ জ্বলছে। মুখে কিছু বলল না। আশেপাশের লোকের কাছে ছদ্মবেশ ফাঁস হয়ে যাওয়ার ভয়ে।
মেলায় যে জেল পালানো কয়েদীটাকেই খুঁজতে এসেছে ফগ, সন্দেহ রইল না কিশোরের। কিন্তু কাকে দেখছে এমন মনোযোগ দিয়ে?
বুঝতে পেরে হতবাক হয়ে গেল কিশোর। আগে লক্ষ করেনি ভেবে অবাক হলো ভীষণ।
মিস্টার থেগের দিকে জাকিয়ে আছে ফগ।
ছবির কয়েদীটার সঙ্গে প্রচুর মিল মিস্টার গ্রেগের। তীক্ষ্ণ চোখ, মোটা ভুরু, গোঁফ, দাড়ি, হাতের ফুলে ওঠা রগ, মাঝারি উচ্চতা-সব মিলে যায়। গোঁফের জন্যে ঠোঁটে কাটা দাগ আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। থাকলে শিওর হওয়া যেত।

নিশ্চয় তার মত এখন একই কথা ভাবছে ফগও। কি করবে? অ্যারেস্ট করবে মিস্টার গ্রেগকে? থানায় নিয়ে গিয়ে গোঁফের নিচে দাগ আছে নাকি দেখবে? ইস, সে-চেষ্টা যদি করত! দেখার মত দৃশ্য হতো একটা।
ধীরে ধীরে গতি কমতে কমতে থেমে গেল রাউন্ডএবাউট। মেয়েকে নিয়ে নেমে এলেন মিস্টার গ্রেগ। ঘড়ি দেখলেন। কিশোরের দিকে তাকিয়ে বললেন, বাড়ি যাওয়া দরকার। চা নিয়ে বসে থাকবে পারকার।
অবাক হয়ে ওদের দিকে ফগকে তাকিয়ে থাকতে দেখল কিশোর। একটা কয়েদীর সঙ্গে কিশোরের অত খাতির দেখে নিশ্চয় ভীষণ অবাক হচ্ছে। ফগের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপে মুচকি হাসল সে।
বিড়বিড় করে কি বলল ফগ। চোখের দৃষ্টিতে কিশোরকে ভস্ম করার চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়ে সরে গেল ওখান থেকে।

.

মেলা থেকে ফিরতে কিছুটা দেরিই হয়ে গেল ওদের। তবে টেবিল থেকে ওঠেননি মিস্টার পারকার। বন্ধুর জন্যে চা নিয়ে বসে আছেন।
চা খেতে বসে মেলা দেখা নিয়ে একনাগাড়ে বকবক করে যেতে লাগলেন মিস্টার গ্রেগ। খুব উপভোগ করেছেন তিনি, সেকথা বলতে থাকলেন উৎফুল্ল হয়ে। সবই দেখলাম, একটা জিনিস বাকি রয়ে গেল কেবল, মাছির সার্কাস। মাছিকে ট্রেনিং দিয়ে কি করে ওদের দিয়ে কাজ করায় দেখার খুব শখ ছিল।
দেখে এলেই পারতে, মিস্টার পারকার বললেন।
দেখাল না তো আজ। কি নাকি অসুবিধা আছে।
নাক কুঁচকালেন কেরিআন্টি। আমি হলে ওই সার্কাসের দশ মাইলের মধ্যে যেতাম না। মিস্টার গ্রেগ, সত্যি কি সার্কাস দেখানোর মত অতটা মগজ মাছির আছে?
মাছি খুব বুদ্ধিমান প্রাণী, মিস্টার গ্রেগ বললেন। তবে গুবরেপোকার ক্ষেত্রে তারতম্য আছে। কোন কোনটা খুবই বুদ্ধিমান, কোনটা একেবারে বোকা। অ্যাটলাস পর্বতমালায় দুই হাজার ফুট ওপরে এক ধরনের গুবরে বাস করে, যারা পাতার সঙ্গে পাতা জুড়ে সেলাই করতে পারে…
গুবরের কথায় কান নেই কিশোরের। সে ভাবছে অন্য কথা মাছির সার্কাস! কয়েদীটা পোকামাকড় ভালবাসে। হয়তো ওই তাবুতেই লুকিয়ে রয়েছে। কিংবা সার্কাসটার মালিকই সে। ভিন্ন নামে চালাচ্ছে।
মাছির সার্কাস এসেছে মেলায়, জানতই না সে। বিজ্ঞাপনও দেয়নি ওরা। ঠিক করল, সকালে উঠেই দেখতে যাবে। ওই সময় শো থাকবে না, জানা কথা। তাতে বরং সুবিধেই হবে। কথা বলতে পারবে। কিভাবে দেখায় ওরা মাছির সার্কাস, জেনে আসবে। এই ছুতোয় দেখেও আসা যাবে লোকটা ওখানে রয়েছে কিনা।

কিন্তু যাবে কি করে? এলিজা তো সঙ্গে যেতে চাইবে। গেলেই ঝামেলা। পালানো ছাড়া গতি নেই। কেরিআন্টি বকবেন। তা বকুনগে। সেটা তো সে ফিরে আসার পর। ততক্ষণে কাজ উদ্ধার হয়ে যাবে তার।
অতএব পরদিন সকালে ছদ্মবেশ নিয়ে, এলিজাকে ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। সে? সকালে দৌড়াতে বেরোয়নি। তক্কে তক্কে ছিল, কখন এলিজা রান্নাঘরে ঢোকে যেই ঢুকেছে, অমনি ড্রইংরুমের জানাল গলে সটকে পড়েছে। মেয়েটার। চোখে পড়েনি। পড়লে চিৎকার করে পাড়া জানাত।
রাফিয়ানকে সঙ্গে আনেনি কিশোর। নানার মানে তার ছদ্মবেশ ফাস করে। দেয়া। আপনমনে শিস দিতে দিতে রাস্তা দিয়ে চলল।
পথে দেখা ফগের সঙ্গে। এই একটা ব্যাপার রীতিমত অবাক করে কিশোরকে। কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পায় না। যখনই সে ছদ্মবেশে কিংবা জরুরী কাজে বেরোয়, প্রায় সময়ই দেখা হয়ে যায় ফগের সঙ্গে। যেন আড়ালে থেকে ইচ্ছে করে কেউ দেখা করিয়ে দেয় ওদের।
সাইকেল চালিয়ে যেতে যেতে কিশোরের সামনে দাঁড়িয়ে গেল ফগ। ঝামেলা! এই ভিখিরিটা আবার এল কোত্থেকে? নিশ্চয় পাশের গাঁ থেকে, ভাবল সে! ধমক দিয়ে জিজ্ঞেস করল, অ্যাই ছেলে, অ্যাই, নাম কি তোমার?
টম, স্যার। হাত বাড়াল কিলোর, দুদিন কিছু খাইনি, স্যার। একটা রুটি খাওয়ার পয়সা দেবেন?
ঝামেলা! দ্বিধা করল ফগ। পকেট হাতড়ে একটা পঞ্চাশ সেন্টের মুদ্রা বের করে কিশোরের হাতে ফেলে দিল। কড়া গলায় বলল, পয়সা দিলাম, কিনে খাওগে। খবরদার, কারও বাড়িতে চুরি করতে ঢুকবে না। ধরা পড়লে চাবকে পিঠের ছাল তুলে ফেলব।
ফগের চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল কিশোর। তারপর রাস্তা থেকে নেমে। মাঠ পেরিয়ে কোনাকুনি এগোল। এই সকালবেলা ওকে সার্কাসে ঢুকতে দেখলে সন্দেহ করতে পারে ফগ। ওর চোখে পড়া চলবে না।

.

গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকল কিশোর। মরে আছে যেন জায়গাটা। গত বিকেলের হই চইয়ের কোন চিহ্নই এখন নেই। ভাড়ের তাঁবুটার কাছে এসে দাঁড়াল।
বালতি হাতে পানি আনতে যাচ্ছে একটা ছেলে। কিশোরকে দেখে দাঁড়াল। কাউকে খুঁজছ?
ডক। ভাঁড় সাজে যে।
ও তো নেই। দাঁত তুলতে গেছে। ব্যথায় পাগল হয়ে যাচ্ছিল।
কখন ফিরবে?

তা তো বলতে পারব না। দাঁত তুলতে যতক্ষণ লাগে। দেখা করতে চাইলে বসতে হবে তোমাকে।
ছেলেটা চলে গেল। কিশোর বসে রইল। আধঘণ্টা পর এল ডক।
উঠে দাঁড়াল কিশোর। ভাড়ের পোশাক নেই। সাধারণ প্যান্ট-শার্টে বড়ই সাদামাঠা লাগছে লোকটাকে। মাথায় ঘন চুল। চোখের দৃষ্টি এখন ঘোলা, যন্ত্রণার ছাপ। গালের একটা দিক ফুলে আছে, দাঁত ফেলে সে-জায়গাটায় ঠেসে তুলা ভরে দিয়েছেন ডাক্তার।
ভুরু কুঁচকে ওর দিকে তাকাল লোকটা।
নাকের নিচে রঙ নেই এখন। ভালমত দেখা যায়। কোন রকম কাটা দাগ নেই। ওখানে।
এই ছেলে, কে তুমি? জিজ্ঞেস করল ডক। মুখে তুলা থাকায় কথা কেমন জড়িয়ে যাচ্ছে।
টম। একটা চাকরির আশায় এসেছিলাম।
লেখাপড়া জানো? হিসেব করতে পারবে?
ঘাড় কাত করল কিশোর, পারব।
তাহলে এসো। একটা পার্ট টাইম চাকরি তোমাকে দেয়া যেতে পারে। দাঁত। তুলে এসেছি আমি। এখন ওসব হিসেব-নিকেশ করতে পারব না।
ডকের চাকরিতে আর আগ্রহ নেই কিশোরের। যা দেখার দেখে নিয়েছে। বলল, পার্ট টাইম চাকরিতে হবে না আমার। দেখি, সারাক্ষণের জন্যে কেউ নেয় কিনা। দেখায় কারা, বলতে পারেন?
ওই যে ওদিকে গেলেই তাঁবুটা পাবে। কিন্তু ওরাও তোমাকে ফুল টাইম চাকরি দিতে পারবে না।
না দিলে আপনার কাছেই আসব।
এসো, বলে তাবুতে ঢুকে গেল লোকটা।
মাছির সার্কাসের তাবুটা খুঁজে পেল কিশোর। বড়ই জীর্ণ দশা। রঙ উঠে গেছে কাপড়ের। কয়েক জায়গায় তালি। তাবুর কানায় রঙ দিয়ে লেখা রয়েছে :
বুবুকার বিখ্যাত মাছির সার্কাস
তাঁবুটার চেহারা দেখেই অনুমান করা যায়, যতই বিখ্যাত বলে বিজ্ঞাপন। করুক, দেখার আগ্রহ নেই লোকের। ব্যবসা লি না।
আগের দিন চোখে পড়েনি কেন, বুঝতে পারল কিশোর। একে তো মাছি দেখার আগ্রহ নেই বলে লোকের ভিড় ছিল না, তার ওপর তাবুটা রয়েছে একেবারে শেষধারে, কয়েকটা স্টল আর আরও কয়েকটা তাবুর আড়ালে। এদিকে

আসেইনি। ওরা। ফগের ওপর নজর ছিল বলে সে যেদিকে যেদিকে গেছে, ওরাও সেদিকেই থেকেছে।

তাবুর পর্দা ফাঁক করে ভেতরে উঁকি দিল সে। এক বুড়ি বসে আছে। সেই বুড়িটা, গতকাল যাকে শূটিং রেঞ্জের সামনে টিকেট বেচতে দেখেছিল। একটা টেবিলে রাখা বড় কাঁচের বাক্সের দিকে তাকিয়ে আছে গভীর মনোযোগে।

কেমন আছেন, মা? কোমল গলায় জিজ্ঞেস করল কিশোর।

চমকে গেল বুড়ি। ফিরে তাকাল। মুখের ভাঁজগুলো গম্ভীর হলো। ময়লা শালের প্রান্তটা কাঁধের ওপর খসে পড়েছিল, মাথায় টেনে দিল আবার।

মাছির সার্কাস খুলবে কখন, বলতে পারেন? জানতে চাইল কিশোর।

সময় হলেই খুলবে, ফ্যাঁসফেঁসে শ্লেষ্মাজড়িত কণ্ঠে জবাব দিল বুড়ি। খুকুর। খুকুর করে কাশল। আমার মেয়ে তো নেই এখন, সে এসে খুলতে

ও, আপনার মেয়েই দেখায়। তার নামই বুবুকা?

না, বুবুকা ছিল আমার স্বামী। মারা গেছে। আমার মেয়ের নাম ওগলা। ওর বাবা ওকে শিখিয়ে দিয়ে গেছে কি করে মাছিকে দিয়ে কাজ করাতে হয়। বুদ্ধিমান প্রাণী এই মাছিগুলো। গায়েও ভীষণ জোর। দেখলে অবাক না হয়ে পারবে না। ভারসুদ্ধ যেভাবে গাড়ি টেনে নিয়ে যায়।

গাড়ি? মাছির গাড়ি বুঝি?।

সে তো বটেই। মাছি কি আর ঘোড়ার গাড়ি টানতে পারবে? নিজের রসিকতায় নিজেই হাসল বুড়ি।

কিশোরের হাসি পেল না। আপনি তাহলে মিসেস বুবুকা?

স্বামীর নাম বুবুক হলে তাই তো হওয়ার কথা, আবার হাসল বুড়ি। আমি এখন আর কোন কাজ করতে পারি না। দেখাতে পারতাম আগে, এখন দেখাতে গেলে তালগোল পাকিয়ে যায়। কি আর করব? ছেলেমেয়ের ওপর বসে বসে খেতে লজ্জা লাগে। তাই অন্যভাবে ওদের সাহায্য করি।

কাল শূটিং গ্যালারির সামনে আপনাকে টিকেট বিক্রি করতে দেখেছি।

ওটা আমার ছেলের গ্যালারি। ওগলার ভাই। রাবুকা। কাঁচের বাক্সটার দিকে তাকাল বুড়ি। হাত নাড়ল কিশোরের দিকে চেয়ে। দেখে যাও, গাড়িটাকে টানতে শুরু করেছে ওরা! কেমন গড়িয়ে যাচ্ছে ছোট ছোট চাকাগুলো! খুব মজার, তাই না?...দাঁড়াও, আরেকটা খেলা দেখাচ্ছি তোমাকে। বাক্সের ডালা তুলতে হাত বাড়াল বুড়ি।

মা! আবার তুমি মাছির বাক্সের দিকে নজর দিয়েছ! পুরুষালী কণ্ঠের কর্কশ চিৎকারে কুঁকড়ে গেল বুড়ি।

কিশোর আর মিসেস বুবুকা, দুজনেই ফিরে তাকাল। দরজায় দাঁড়িয়ে আছে লম্বা চওড়া এক তরুণী। কালো চুল, চোখের দৃষ্টি ছুরির মত ধারাল, চেহারা আর পোশাকেই বোঝা যায়, জিপসি। ধমকে উঠল বুড়ির দিকে চেয়ে, তোমাকে না। কতবার বলেছি, ওটাতে হাত দেবে না!

গলা শুনে মনে হয় পুরুষমানুষ কথা বলছে। কোন মেয়ের মুখ দিয়ে বেরোচ্ছে, বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। বুড়ির মেয়ে ওগলা, বুঝতে অসুবিধে হলো না কিশোরের। ওর দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল, এই চেহারা কোথায় দেখেছে? চেনা চেনা লাগছে কেন?

এই ফকিরের বাচ্চাটা কে? ঢুকতে দিলে কেন? কি না কি চুরি করে নিয়ে যায়! কিশোরের দিকে তাকিয়ে খেঁকিয়ে উঠল, এই, কে রে তুইঃ মতলবটা কি?

মিনমিন করে জবাব দিল কিশোর, টম। খেতে পাই না, তাই একটা চাকরির আশায়...।

ভাল মানুষের কাছেই এসেছ চাকরির জন্যে! গজগজ করে বলতে লাগল। বুড়ি। আমাকেই দিনের মধ্যে বিশবার খেদায়। থাকব না, আমি থাকব না এখানে। অন্য কোথাও চাকরি খুঁজে নেব। কথায় কথায় এমন দুর্ব্যবহার...লাথি মারি অমন ছেলেমেয়ের মুখে!

যাও না, দেখি কে তোমাকে চাকরি দেয়? মুখ ঝামটা দিল ওগলা। এই ছেলে, বেরো! পারলে চড় মারে কিশোরকে। হাঁটতে হাঁটতে আবার রাবুকার আঁবুর কাছে চলে যাসনে! মেজাজ ভীষণ খারাপ হয়ে আছে ওর। সামনে পড়লে লাথি মারবে।

বাপরে বাপ, কি ভয়ানক পরিবার! বেরিয়ে আসতে যাচ্ছিল কিশোর, ডাক দিল ওগলা, এই ছেলে, শোন! ঘর ঝাড় দিতে পারবি?

ফিরে তাকাল কিশোর। ওগলার মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ মনে পড়ে গেল কেন চেনা চেনা লাগছিল। ওর ভাই রাবুকার সঙ্গে অনেক মিল। শুটিং রেঞ্জে ছেলেটার পাশে যে লোকটা এসে দাঁড়িয়েছিল, সে-ই তাহলে রাবুক।

বুবুকার পরিবারটাকে অদ্ভুত লাগল কিশোরের। কি জানি কেন মনে হলো। এদের কাছে কয়েদীটার খোঁজ পাওয়া যাবে। ঘর ঝাড় দিতে রাজি হয়ে গেল। বলল, পারব।

পয়সা কিন্তু বেশি পাবি না, সাবধান করে দিল ওগলা। একবার ঝাড় দিলে পঁচিশ সেন্ট দেব।

দুদিন কিছু খাই না, মুখটাকে করুণ করে তুলল কিশোর, যা পাব তা-ই সই।

এত কমে রাজি হচ্ছে দেখে অবাক হলো ওগল। চুরি করবি না তো?

না, ম্যাম। বাপ-দাদা চোদ্দ গোষ্ঠীর মধ্যে কেউ চোর ছিল না আমার।

গোষ্ঠীর মধ্যে হয়তো তুইই প্রথম পেশাটা চালু করলি, বলা যায় কিছু ঠিক আছে, শুরু কর। ওই যে ওখানে ঝাড়।
ঝাড় দিতে দিতে তথ্য আদায়ের চেষ্টা চালাল কিশোর, ম্যাম, মিস্টার রাবুকার সঙ্গে আপনার চেহারার অনেক মিল।
হবেই। যমজ ভাই যে।
মায়ের সঙ্গে তেমন মিল নেই, চোখ ছাড়া।
মুখ বাকাল ওগলা। মাকে দুচোখে দেখতে পারে না, বোঝা গেল।
তাঁবুতে কোন বিছানা চোখে পড়ল না কিশোরের। এখানেই ঘুমান নাকি আপনারা? মাটিতে বিছানো মাদুর দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল সে।
ভিখিরির বাচ্চার কথা শোনো! এই গাধা, সারারাত মাটিতে পড়ে থাকা যায় নাকি? ক্যারাভান আছে আমাদের।
কই, মেলার আশেপাশে তো কোন ক্যারাভান দেখলাম না।
নতুন নাকিরে তুই এখানে? মেলার মাঠে ক্যায়াভান রাখার জায়গা আছে? নাকি রাখলে লোকে পছন্দ করবে? গাঁয়ের দক্ষিণে একটা ভোলা মাঠে আমাদের ক্যারাভান। আপনমনেই বকর বকর শুরু করল ওগলা, ওখানেও কি আর শান্তি আছে! ব্যাঙের পোনার মত লোক বাড়ছে। ক্যারাভানে ক্যারাভানে গিজগিজ। দম নেয়ার জো নেই। আচমকা কি মনে হতে ভুরু কুঁচকে তাকাল কিশোরের দিকে। এত প্রশ্ন করছিস কেন? নিশ্চয় চোরের দলের ছেলে! স্পাই! কোথায় কার কাছে মাল আছে, জানার জন্যে পাঠিয়েছে। এই ছোঁড়া, আর কে কে আছে তোর দলে?
সত্যি বলছি, ম্যাম, আমি চোর নই। মেলা আমার ভাল লাগে। মেলার। লোকজন, পশুপাখিও খুব ভাল লাগে, সেজন্যেই খোঁজ-খবর নিচ্ছি। সার্কাসে যদি একটা চাকরি পেতাম, বাঘ-সিংহের খাঁচায় কাজ করতে বললেও আপত্তি করতাম না।
বাঘ-সিংহ, না? মুখে ওসব বলাই যায়। কাজ করতে গিয়ে দেখো না কেমন লাগে! দুটো পয়সার জন্যে সারাজীবনের জন্যে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাবে শরীরটা। দাগে ভর্তি করে দেবে।
ক্ষত? দাগ? দাগের কথাই যখন তুললেন, একটা কথা জিজ্ঞেস করি-ঠোঁটের ওপর দাগওয়ালা কাউকে দেখেছেন?
কি বললি? মুহূর্তে বদলে গেল ওগলার চোখের দৃষ্টি। এই, কি বললি? দাগ দিয়ে কি করবি তুই?
রীতিমত অবাক হলো কিশোর। না, কিছু না।
তাহলে বললি কেন?
আপনি বাঘ-সিংহের কথা বললেন…

যা, বেরো! আর ঝাড় দেয়া লাগবে না। এই নে, পঁচিশ সেন্ট, মাটিতে পয়সা ছুঁড়ে দিল ওগলা।
অত রেগে যাচ্ছেন কেন, ম্যাম? দাগের কথা বলে ভুল করেছি। মাপ করে দেবেন…
বেরো! নইলে এক্ষুণি রাবুকাকে ডেকে আনব। ফকির আর চোর দেখলে পেটানোর জন্যে অস্থির হয়ে যায়। একবার তোর মত একটা শয়তান ছেলের হাত মুচড়ে ভেঙে দিয়েছিল। ডাকব?
না, না, ঘাবড়ে যাওয়ার ভান করল কিশোর। যাচ্ছি, যাচ্ছি। মাটি থেকে পয়সা তুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল সে।

.

বিকেল বেলা দল বেঁধে গুবরেপোকার কনফারেন্সে গেল ওরা। কিশোর চলল এলিজা আর তার বাবার সঙ্গে। রাফিকে নেয়া হলো না। কারণ, জানা কথা, এ রকম একটা অনুষ্ঠানে কোনমতেই ঢুকতে দেয়া হবে না তাকে। মিস্টার বেকারের বাড়ি থেকে সোজা টাউন হলে চলে গেল মুসারা চারজন-সে, জিনা, রবিন আর ডল। কিশোরদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল গেটে। বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে যাবে শুনে ওদের ছুটি দিতে রাজি হয়েছেন মিস্টার বেকার।
টাউন হলের গেটে আরও একজনের দেখা পাওয়া গেল। ফগর‍্যাম্পারকট। পাহারা দেয়ার ছুতোয় দারোয়ানের সঙ্গে দাঁড়িয়ে রইল সে। আসল উদ্দেশ্য, কারা কারা আসে চোখ রাখা। ছেলেমেয়েদের দেখে গোলআলুর মত চোখ বড় বড় হয়ে গেল তার। ঢুকতে বাধা দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু মিস্টার গ্রেগর জন্যে পারল না। দারোয়ানকে জানালেন, তিনি নিয়ে এসেছেন ওদের। জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই করার রইল না ফগের।
সম্মেলনটা মোটেও আহামরি লাগল না ছেলেমেয়েদের কারও কাছে, একমাত্র এলিজা ছাড়া। কোনরকম মজা, কোনরকম বৈচিত্র নেই। কয়েদীটার খোঁজে সবার মুখের দিকে তাকাতে লাগল কিশোর। লোকটার চেহারার সঙ্গে দুতিনজনের মিল থাকলেও ওদের কারও ঠোঁটেই কাটা দাগ দেখতে পেল না।
দুই ধরনের গুবরেপোকা প্রেমিক এসেছে সম্মেলনে-দাড়িগোঁফ আর ঝাকড়াচুলো, নয়তো দাড়িগোঁফ আর টাকমাথা; মেয়েরা বাদে। বেশির ভাগই চশমা পরা।
শুরু হলো সম্মেলন। বিরক্তিকর আলোচনা। ভাল লাগল না। ফিসফিস করে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে গিয়ে ধমক খেয়ে থেমে গেল ছেলেমেয়ে। ঢুকে পড়েছে, মীটিং শেষ না হলে বেরোনোও যায় না। কি আর করবে? বসে বসে ঢুলতে শুরু করল মুসা। প্রচণ্ড বিরক্তিতে মুঠো শক্ত করে ফেলল জিনা। রবিনের

কোন ভাবান্তর নেই। ডল অতটা বিরক্ত হচ্ছে না, কারণ বাড়ি থেকে বেরোনোর। অন্তত সুযোগ পেয়েছে। তাকে একা বাড়ি থেকে দূরে কোথাও যেতে দেয়া হয় না। হাই তুলতে শুরু করল কিশোর। দরজার দিকে তাকাতেই দেখল টুলে বসে ফগও হাই তুলছে। চোখাচোখি হতেই পিঠ সোজা হয়ে গেল ফগের। মনে মনে গাল দিতে লাগল বিচ্ছু ছেলেটাকে। সে ভেবেছে দেখাদেখি হাই তুলে তাকে রাগাচ্ছে কিশোর।

সত্যি সত্যি যখন ঘুম এসে যাওয়ার জোগাড় হলো, তখন শেষ হলো সম্মেলন। সবার আগে আগে তাড়াহুড়া করে বেরিয়ে এল গোয়েন্দারা। গেটের বাইরে মাঠের কোণে বসে সকালে মেলায় গিয়ে কি কি জেনে এসেছে কিশোর, সেই আলোচনা শুরু করল।

সব শোনার পর মাথা দোলাল রবিন, হুঁ, সন্দেহজনক। কাটা দাগের কথা শুনে খেপে গেল কেন ওগলা?

এর একটাই মানে, কাটা দাগওয়ালা লোকটা কোথায় আছে, জানে সে, জিনা বলল।

মাথা ঝাঁকাল কিশোর, আমারও তাই ধারণা।

ক্যারাভানে লুকিয়ে রাখেনি তো? মুসা বলল। গিয়ে দেখো না একবার।

সেকথাই ভাবছি। আজই যাব। রাতে। অন্ধকার হলে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল মুসা, আমাদের আর যাওয়া হবে না। এমন প্যাঁচেই পড়েছি..যাকগে, যাও, তুমি একাই যাও। কি হলো না হলো জানিয়ে।

কোথায় যাবে একা একা

চমকে ফিরে তাকাল সবাই। এলিজা দাঁড়িয়ে আছে। পা টিপে টিপে এসে দাঁড়িয়েছে ওদের পেছনে।

রেগে উঠল মুসা, সেটা তোমার জানার দরকার নেই। আড়ি পাততে লজ্জা করে না?

লজ্জা কি ওর আছে নাকি! আরেক দিকে তাকিয়ে মুখ বাঁকাল জিনা।

রাগে, দুঃখে কেঁদে ফেলার অবস্থা হলো এলিজার। জিনাকে বলল, দাঁড়াও, তোমার আম্মাকে গিয়ে বলব, তুমি আমাকে অপমান করেছ।

বলোগে! ঝাজিয়ে উঠল জিনা। ইচ্ছে হলে বাবাকেও বোলো। আমি থোড়াই কেয়ার করি!

জিনাকে রাগালে এলিজার কপালে দুঃখ আছে। অঘটন ঠেকানোর জন্যে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল কিশোর। জিনা, তোমরা এখন যাও। আমি এলিজাদের সঙ্গে বাড়ি যাচ্ছি।

এলিজার হাত ধরে টানতে টানতে কিছুদূরে দাঁড়িয়ে থাকা মিস্টার গ্রেগের কাছে নিয়ে এল কিশোর। গুবরেপোকার পিঠের মতই চকচকে টাকমাথা এক বরে বিশেষজ্ঞের সঙ্গে কথা বলছেন মিস্টার গ্রেগ। সম্মেলনে এতক্ষণ কথা বলে আর শুনেও যেন প্রাণ ভরেনি দুজনের।
এলিজা বলল, বাবা, বাড়ি যাবে না? ডিনার নিয়ে তোমার জন্যে বসে থাকবেন পারকার আঙ্কেল।
হা হা, চলো। গুবরে-বিশেষজ্ঞের দিকে তাকিয়ে বললেন মিস্টার ঘেণ, রস, পরে কথা হবে। কাল আসছ তো?
আসব না মানে? যতদিন থাকব, রোজ আসব। এ রকম আলোচনা মিস করা যায়!

.

ডিনারের পর পারকার আঙ্কেল আর মিস্টার গ্রেগ গিয়ে ঢুকলেন স্টাডিতে। কখন বেরোবেন, কোন ঠিক নেই। কেরিআন্টি চলে গেলেন তার শোবার ঘরে। এলিজা গেল তার ঘরে। কিশোরের সঙ্গে আড্ডা দিতে চেয়েছিল, ঘুমিয়ে পড়ার ভান করে তাকে ভাগিয়েছে কিশোর। আইলিন রান্নাঘরে খুটুর-খাটুর করছে। বেশিক্ষণ করবে না আর, বোঝা যায়।
নিজের ঘরে দরজার ছিটকানি লাগিয়ে ছদ্মবেশ নিতে বসল কিশোর। অন্য কারও জন্যে বিশেষ ভয় নেই, তার ভয় এলিজাকে। রাতে বেরোনোর কথা শুনেছে। যদি এসে দরজার কাছে ঘাপটি মেরে থাকে?
মুচকি হাসল কিশোর। থাকো, যত পারো। ঘরের আলো নিভিয়ে অন্ধকার করে দিল সে। দরজার কাছে এসে কান পাতল। কোন শব্দ নেই। এলিজা থাকলেও একেবারে নিঃশব্দ হয়ে আছে।
আস্তে করে জানালার পাল্লা খুলল কিশোর। চৌকাঠ ডিঙিয়ে শেডের ওপর দাঁড়িয়ে পাশে হাত বাড়াল। বৃষ্টির পানি নামার পাইপটা হাতে ঠেকতেই চেপে ধরল শক্ত করে। কোন রকম শব্দ না করে নেমে এল ওটা বেয়ে। রাফিয়ানের ঘরটা রয়েছে উল্টোদিকে। সে দেখতে পেল না ওকে। ডাকাডাকি করল না। নিরাপদেই বাগান পেরিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল কিশোর। তারপর সোজা হনহন করে হাটা দিল। ফগ যদি টহলেও বেরিয়ে থাকে, তাকে দেখলে এখন চিনবে না। ভাববে, কোন বুড়ো মানুষ হাঁটতে বেরিয়েছে।
ক্যারাভানের মাঠে পৌঁছতে সময় লাগল না। ঠিকই বলেছে ওগলা, গিজগিজ করছে। গুণল। মোট বিশটা। কোনটা পুরানো, কোনটা নতুন। বেশিরভাগের ভেতরেই আলো জ্বলছে। রাবুকাদের কোনটা, কি করে জানবে?

উঁকি দিয়ে দেখা ছাড়া গতি নেই। দেখার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে সে। সুতরাং বিপদের পরোয়া করল না। সামনে যে ক্যারাভানটা দেখল, সেটার চাকার ওপর উঠে দাঁড়িয়ে জানালার পর্দা সরিয়ে ভেতরে তাকাল। দুজন মানুষ ভেতরে। একজন মহিলা, সেলাই করছে; আরেকজন পুরুষ, বই পড়ছে। স্বামী-স্ত্রী।
নেমে এসে পাশের আরেকটা নতুন ক্যারাভানের চাকায় চড়ল। একই ভাবে জানালা দিয়ে ভেতরে উঁকি দিল। নাহ, এটাতেও সন্দেহজনক কাউকে চোখে পড়ল না। পর পর চারটা ক্যারাভান দেখল। পাঁচ নম্বরটার চাকার ওপর থেকে নেমে আসতেই কুকুরের ডাক শোনা গেল। কাছেই ঘেউ ঘেউ করছে ওটা। ওকে দেখে ফেলল নাকি? কুকুরটার কাছাকাছি কোন ক্যারাভানে ওঠার সাহস করল না আর। অনেকটা দূর দিয়ে ওটার পাশ কাটিয়ে মাঠের আরেকধারে চলল। ওদিকেও অনেকগুলো ক্যারাভান।
অনেক পুরানো, ভাঙাচোরা একটা ক্যারাভানের সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেল। মাছির সার্কাসের তাবুটার কথা মনে পড়ল। ওটার করুণ দশার সঙ্গে এই ক্যারাভানটারও যেন মিল রয়েছে। ভেতরে আলোও জ্বলছে না।
পকেট থেকে টর্চ বের করল কিশোর। এদিক ওদিক তাকিয়ে সাবধানে উঠে দাঁড়াল ক্যারাভানের চাকায়। জানালা দিয়ে দেখা সম্ভব হলো না। চাকা থেকে নেমে দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। কান পেতে শুনল। কোন শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। আস্তে করে হাত বাড়িয়ে টান দিয়ে খুলে ফেলল দরজাটা। ভেতরে আলো ফেলল। খালি।
দূর! এ ভাবে হবে না! বিরক্ত হয়ে পড়ল সে। ওগলাদের ক্যারাভান কোটা, কারও কাছে জিজ্ঞেস করে জেনে নেবে কিনা ভাবল।
খালি ক্যারাভানটার পাশের ক্যারাভানের কাছাকাছি এসেছে, অন্ধকার থেকে পুরুষকণ্ঠের হাক শোনা গেল, কে রে ওখানে?
বুড়ো মানুষ, বাবা, গলা কাঁপিয়ে জবাব দিল কিশোর। রাত কাটানোর জায়গা খুঁজছি। কাছাকাছি কোথাও খড়ের গাদা আছে, বাবা?
আছে তো, বলল লোকটা। কিন্তু যার গাদা, সেই চাষীটা মানুষ না। তোমাকে দেখলেই কুত্তা লেলিয়ে দেবে। দেখি অন্ধকার থেকে সরে এসো তো, চেহারাটা দেখি।
ক্যারাভানের দরজা খুলে গেল। লণ্ঠন হাতে উঁকি দিল এক প্রৌঢ়। এ অন্য আরেকজন। যে লোকটা কথা বলছিল, অন্ধকার থেকে সরে এসে সে দাঁড়াল ক্যারাভানের পা-দানীর কাছে। কিশোরও বেরিয়ে এল আলোয়।
তার মুখের দিকে তাকিয়ে মায়া হলো লোকটার। বলল, মনে হচ্ছে বহুকাল কিছু পেটে পড়েনি তোমার। এসো, এক কাপ চা খেয়ে যাও।

চোখে ভাল দেখে না এমন ভঙ্গিতে পা-দানী বেয়ে ওপরে উঠল কিশোর। পা রাখল ভেতরে। নিচে দাঁড়ানো লোকটাও উঠে এল। লণ্ঠন হাতে লোকটার চেয়ে। দুচার বছর কম হবে তার বয়েস।
ক্যারাভানের ভেতরে জিনিসপত্র নেই বললেই চলে। তবে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।
প্রথম লোকটা দ্বিতীয় লোকটাকে দেখিয়ে বলল, আমার ভাই। চোখে দেখে না। বসে বসে ঝুড়ি বানায়, হ্যাঁঙ্গার বানায়। আমি নিয়ে গিয়ে বিক্রি করি। পয়সাকড়ি নেই আমাদের। তবে তোমাকে এক কাপ চা খাওয়াতে পারব।
আহ্, বড্ড দয়া তোমাদের, বলে মেঝেতেই বসে পড়ল কিশোর। অসুস্থ বুড়ো মানুষের মত ধুঁকতে লাগল।
মগে করে চা বানিয়ে আনল প্রথম লোকটা। তিনটে পুরানো কাপে ঢেলে দিল। চা খেতে খেতে বলল কিশোর, আসলে বুবুকাকে খুঁজতে এসেছিলাম আমি। শুনলাম, এখানেই আছে ওদের ক্যারাভান। অন্ধকারের মধ্যে খুঁজে পেলাম না। তাই ভাবলাম, রাতটা কোন খড়ের গাদায় কাটিয়ে সকাল বেলা খুঁজে বের করব।
বুবুকাকে পাবে কোথায়? অন্ধ বলল। ও তো নাকি কোনকালে মরে গেছে। শুনলাম। ক্যারাভানটা ঢুকিয়েছে ওই ওদিকে, মাঠের দক্ষিণ কোনাটায়, তাই না রে, জিফি?
মাথা ঝাঁকাল প্রথম লোকটা। বুবুকার ছেলেমেয়ে দুটো ভীষণ পাজি। বুড়ি মা'টাকে জায়গা দিতে চায় না। খালি ঝগড়া করে। বুড়িও কম যায় না। শাপশাপান্ত করে আর গাল দিতে থাকে। কত মেলা হলো, কত লোক এল এই মাঠে ক্যারাভান নিয়ে থাকতে, ওদের মত জঘন্য পরিবার আর দেখিনি। গেলে বাঁচি।
অন্ধ জিজ্ঞেস করল কিশোরকে, বুবুকা তোমার কিছু হতো নাকি? আত্মীয়?
না, বন্ধু ছিল। ছেলেমেয়েরা এখন হয়তো দেখলেও আমাকে চিনবে না।...চা'টার জন্যে ধন্যবাদ। খুব ভাল চা। বহুকাল এমন খাইনি।
খুশি হলো দুই ভাই। অন্ধ বলল, জিফি, রুটিটা কাট না। ওকেও একটু দে। রাতে আর বেশি লাগবে না আমাদের, হয়ে যাবে। কি বলিস?
দিচ্ছি।
না না, লাগবে না। চা খেয়েছি, তাতেই হবে। আজকাল রাতে কিছুই খাই না। খেলেই পেট খারাপ করে।
বুড়ো হওয়ার এই এক সমস্যা, আফসোস করে অন্ধ বলল। এক কাজ করো তাহলে। এখানে আমাদের সঙ্গেই থেকে যাও। এই রাতের বেলা কোথায় আবার খড়ের গাদা খুঁজতে যাবে।
না, না, তোমাদের আর কষ্ট দিতে চাই না। যেখানেই হোক, কাটিয়ে দেব রাতটা।

বাইরে মৃদু শব্দ হলো। কান খাড়া করল বুড়ো। নিশ্চয় বুড়ো বিড়ালটা। জিফি, দরজা খুলে দে। আসুক।
দরজা ফাঁক করতেই ভেতরে ঢুকে পড়ল হাড় জিরজিরে, লোম ওঠা একটা বুড়ো বিড়াল। একটা কান কামড়ে কেটে দিয়েছে অন্য বিড়ালে।
আপনার? বুড়োকে জিজ্ঞেস করল কিশোর। এ তো মরে মরে। খাবার পায় না নাকি?
না, আমাদের না, একটা পিরিচে সামান্য একটু দুধ ঢেলে দিল জিফি। রাবুকাদের বিড়াল। নামেই ওদের, জীবনেও একটা দানা খেতে দিয়েছে কিনা সন্দেহ।
চুকচুক করে দুধ খাচ্ছে বিড়ালটা। সেদিকে তাকিয়ে থেকে একটা বুদ্ধি মাথাচাড়া দিল কিশোরের মনে। বলল, রাবুকাদের ক্যারাভানে বরং নিয়ে যাই আমি এটাকে।
দুধ খাওয়া শেষ হলে বিড়ালটাকে তুলে নিল সে। বিড়াল দিয়ে আসার ছুতোয় ক্যারাভানের ভেতরটা দেখে নিতে পারবে।
দুই বুড়ো তাকে গুড-নাইট জানিয়ে বিদায় দিল। জিফি কিছুদূর এগিয়ে দেয়ার কথা বলল, রাজি হলো না কিশোর। বাইরে দাঁড়িয়ে হাত তুলে কোন ক্যারাভানটা রাবুকাদের, দেখিয়ে দিল জিফি। তারপর দরজা লাগিয়ে দিল।
কিশোর ভেবেছিল, ভাঙাচোরা হবে, কিন্তু বেশ বড় আর নতুন রাবুকাদের ক্যারাভানটা। মিউ মিউ করতে থাকা বিড়ালটাকে নিয়ে ওটার কাছে এসে দাঁড়াল সে।
বিড়ালের ডাক শুনে দরজা খুলে গেল। কে যেন ডাকল, পুষি, পুষি, কোথায় তুই? আয়।
গলাটা চেনা লাগল কিশোরের। ও কাছাকাছি হতে ক্যারাভানের পা-দানী বেয়ে নেমে এল একটা মূর্তি।
আপনার বিড়ালটা নিয়ে এলাম, কিশোর বলল। ওদিকে বসে বসে কাঁদছিল।
অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে থাকায় কালো অস্পষ্ট মূর্তিটার চেহারা দেখতে পেল না কিশোর। আর দেখলেও তারার আবছা আলোয় চিনত কিনা সন্দেহ। টর্চ জ্বালল সে।
মিসেস বুবুকা। হাত বাড়াল বুড়ি, পুষি, পুষি, আয়। হতচ্ছাড়ি মেয়েটা দুচোখে বিড়াল দেখতে পারে না। রাতের বেলা রাস্তায় পড়ে মরার জন্যে ওগলা তোকে বের করে দিয়েছিল, তাই না? আহারে!
বেড়ালটাকে কোলে নিয়ে আদর করতে লাগল বুড়ি।
ক্যারাভানে ঢোকার সুযোগ খুঁজছে কিশোর। গলা বাড়িয়ে উঁকিঝুঁকি মারছে। দেখতে চাইছে, ওগলা আর তার ভাই ছাড়া আর কেউ রয়েছে কিনা ভেতরে।

বিড়ালটাকে এনে দেয়ার জন্যে কোন রকম সৌজন্য দেখাল না বুড়ি। ভেতরে ঢোকার আমন্ত্রণ জানাল না কিশোরকে। বিড়ালটাকে কোলে নিয়ে ঘুরে রওনা হলো ক্যারাভানের দিকে। পা-দানীতে উঠল। বুড়ির কাপড় যেমন পুরানো আর ময়লা, স্যান্ডেল জোড়াও তাই। কোথা থেকে ইয়া বড় বড় দুটো স্যান্ডেল কুড়িয়ে এনেছে কে জানে। ক্যারাভানে উঠে একটা ধন্যবাদ পর্যন্ত না দিয়ে দড়াম করে লাগিয়ে দিল দরজাটা। রাগ লাগল কিশোরের। ছেলেমেয়েরা যে দেখতে পারে না, এ জন্যেই। এ রকম চাষাড়ে স্বভাবের বুড়ীকে কে পছন্দ করবে।

অন্ধকারে চুপ করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল কিশোর। তারপর পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল দরজার কাছে। সামান্যতম ফাঁক পাওয়া গেলেই হতো। দেখে ফেলতে পারত ভেতরটা।

কিন্তু কোথাও কোন ফাঁক দেখতে পেল না। জানালাতে পর্দা টানা। নিরাশ হয়ে চাকা থেকে নামতে যাবে এই সময় নিচু গলায় তর্কাতর্কি শুরু করল দুজন লোক। স্থির হয়ে গেল কিশোর। লোক! পুরুষ মানুষ! গলার স্বর বোঝা গেলেও, কথা বোঝা যাচ্ছে না। ওগলা আর তার মা মেয়েমানুষ। রাবুকা তর্ক করছে একজন পুরুষ মানুষের সঙ্গে-তারমানে চতুর্থ কেউ রয়েছে ক্যারাভানে।

পেছনে পায়ের শব্দ শোনা গেল। ফিরে তাকিয়ে তারার আলোয় মাঠ ধরে একটা ছায়ামূর্তিকে এগিয়ে আসতে দেখল কিশোর। নামার সময় নেই আর এখন। চোখে পড়ে যেতে পারে লোকটার। যেখানে ছিল, সেখানেই চাকার ওপর দাঁড়িয়ে ক্যারভানের গায়ে গা লাগিয়ে মিশে থাকার চেষ্টা করল কিশোর।

দরজায় দাঁড়িয়ে হাঁক দিল লোকটা।

দরজা খুলে দিল ওগলা, কে?

আমি, পোকার। রাবুকাকে জিজ্ঞেস করো, ডার্ট খেলতে যাবে নাকি।

রাবুকা, পোকার ডাকছে, ওগলা বলল। আমিও যাব তোমাদের সঙ্গে। ক্যারাভানের মধ্যে গাদাগাদি করে থেকে দম আটকে আসছে আমার।

ক্যারাভান থেকে নামল দুই ভাই-বোন। কিশোরকে কেউ দেখল না। পোকার যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে হাঁটতে শুরু করল তিনজনে। ক্যারাভানে রয়েছে এখন দুজন-বুড়ি আর চতুর্থ লোকটা, ভাবছে কিশোর। দেখতে পারলে ভাল হতো। কিন্তু কি করে দেখবে?

চাকা থেকে নেমে দরজার দিকে এগোল সে। ওগলারা নেমে যাওয়ার সময় যদি ফাঁক করে রেখে গিয়ে থাকে, এই আশায়।

পা-দানী বেয়ে নামার শব্দ হলো। চট করে সরে গিয়ে ক্যারাভানের গায়ে মিশে গেল আবার কিশোর। কে নামল? বুড়ি? নাকি অন্য লোকটা?

দেখতে পারল না ভাল করে। ওর দিকে পেছন করে হাঁটতে লাগল ছায়ামূর্তিটা। হারিয়ে গেল মাঠের অন্ধকারে। বাকি রইল আর একজন। হয় বুড়ি, নয়তো সেই চতুর্থ লোকটা। বুড়িই থাকবে, এত রাতে বেরোনোর কথা নয় তার। সেই লোকটাই বেরিয়েছে।

পা-দানীতে এসে উঠল সে। দরজায় ঠেলা দিল। লাগানো। তালা নেই নিশ্চয়। যা থাকে কপালে, খুলেই দেখবে। ভেতর থেকে বুড়ি দেখে ফেলে চেঁচামেচি শুরু করলে লাফিয়ে নেমে ঝেড়ে দেবে দৌড়। তবু ভেতরটা না দেখে যাবে না।

হাতল চেপে ধরে ঘোরাতে শুরু করল সে। ঘুরছে যখন, তারমানে তালা দেয়া নেই। পুরোটা ঘুরে যেতেই আস্তে করে ঠেলা দিল। ফাঁক হয়ে গেল পাল্লা।

ভেতরে উঁকি দিল। কাউকে দেখা গেল না। কোন শব্দও নেই। সাহস পেয়ে আরও ফাঁক করল। পুরোটাই খুলে ফেলল.শেষে।

কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না। কেউ নেই ভেতরে। আশ্চর্য! ভূতুড়ে কাণ্ড নাকি? গেল কোথায় চার নম্বর লোকটা? তার অলক্ষে কোন ফাঁকে নেমে চলে গেল।

ছাত থেকে একটা লণ্ঠন ঝুলছে। প্রচুর আলো ভেতরে। কেউ থাকলে দেখা যেতই।

এতটাই অবাক হয়ে গেছে কিশোর, এ ভাবে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকলে যে অন্য ক্যারাভানের কেউ দেখে ফেলতে পারে, সন্দেহ করতে পারে, সেটাও ভুলে গেল।

টনক নড়ল চিৎকার শুনে, এই, কে তুমি? ওখানে কি করছ?

ঝট করে ফিরে তাকাল কিশোর। একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে নিচে। কিশোর তাকাতেই কড়া গলায় আবার জিজ্ঞেস করল, কে তুমি?

জবাব দেয়ার প্রয়োজন মনে করল না কিশোর। লাফ দিয়ে নেমেই দিল দৌড়।

চোর চোর বলে চিৎকার শুরু করল লোকটা। তার চেঁচামেচিতে ঝট ঝট করে খুলে গেল আরও কয়েকটা ক্যারাভানের দরজা। হাঁকডাক করে লোক ছুটে আসতে লাগল তাকে ধরার জন্যে।

মাঠ পেরিয়ে ওপাশের বনে ঢুকে যেতে পারলেই বেঁচে যেত, আর তাকে ধরতে পারত না, কিন্তু বাদ সাধল মাটিতে পড়ে থাকা একটা মরা ডাল। তাতে পা বেধে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল সে। কপাল ঠুকে গেল শক্ত কিসে যেন। চোখের সামনে হাজারটা তারা জ্বলে উঠল। জ্ঞান হারাল না। তবে উঠতে দেরি করে ফেলল। ততক্ষণে চারপাশ থেকে তাকে ঘিরে ফেলল লোকেরা।

টানতে টানতে তাকে নিয়ে আসা হলো ওগলাদের ক্যারাভানের কাছে।

খবর শুনে ওগলা আর রাবুকা এসে হাজির। বুড়িও এল বিড়াল কোলে নিয়ে। কোথায় গিয়েছিল সে কে জানে। হাওয়া খেতে বোধহয়। টানাহেঁচড়ায় কিশোরের ছদ্মবেশ নষ্ট হয়ে গেছে। লণ্ঠনের আলোয় দেখতে দেখতে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল

ওগলা, কে রে তুই? সকালের সেই ছেলেটা না? তাই তো! গো, দেখো কি কাণ্ড! সকালেও এসেছিল ছদ্মবেশে, এখনও। ঠিকই সন্দেহ করেছিলাম। চোরের দলের পাই।
কাছে এসে দাঁড়াল বুড়ি। ভাল করে দেখতে লাগল কিশোরকে। আচমকা কিশোরের কানে ধ করে এক ঘুসি বসিয়ে দিয়ে বুড়ি বলল, পিটিয়ে তক্তা করে ফেলব! জলদি বল, কে তুই?
রাবুকাও কিলঘুসি মারতে শুরু করল।
ভয় পেয়ে বিড়ালটা লাফ দিয়ে নেমে গেল বুড়ির কোল থেকে। ছায়ার নিচে গিয়ে মিউ মিউ করতে লাগল।
যে লোকটা কিশোরকে উঁকি মারতে দেখেছিল, সে বাধা দিল। বলল, থাক, মারধরের দরকার নেই। সকালে পুলিশকে খবর দেব। যা করার ওরা করবে।
আরও পেটানোর ইচ্ছে ছিল রাবুকার। অন্যদের জন্যে পারল না। শেষে বলল, ঠিক আছে, বেঁধে নিয়ে গিয়ে ফেলে রাখি ভাঙা ক্যারাভানটার মধ্যে। সকালে পুলিশ এলে আরেক চোট ধোলাই হবে।
তা-ই করা হলো। ভাঙাচোরা খালি ক্যারাভানটার মধ্যে এনে ঢোকানো হলো তাকে। হাত-পা বেঁধে মেঝেতে ফেলে রেখে, দরজায় তালা লাগিয়ে চলে গেল লোকগুলো।
টানাটানি করে দেখল কিশোর। সামান্যতম ঢিল করতে পারল না বাঁধন। কিছুক্ষণ চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিল। বুঝল, এই দুর্গন্ধে ভরা ক্যারাভানের মধ্যেই রাত কাটাতে হবে তাকে। বেকায়দা ভঙ্গিতে মেঝেতে পড়ে থেকে।

.

ভোরবেলা হই-চই শুনে ঘুম ভেঙে গেল তার। এত অসুবিধার মধ্যেও যে ঘুমাতে পারে মানুষ, নিজের বেলায়ই সেটা প্রমাণ হয়ে যেতে দেখে অবাক হলো।
ক্যারাভানের কাছে অনেক লোক এসে দাঁড়িয়েছে। তালা খোলার শব্দ হলো। খুলে গেল দরজা।
প্রথমেই ফগের ওপর চোখ পড়ল কিশোরের। দরজা খুলেছে যে লোকটা, তাকে সরিয়ে তার জায়গায় এসে দাঁড়াল ফগ। কিশোরকে দেখেই বলে উঠল, ঝামেলা!
চিনতে পেরেও দীর্ঘ একটা মুহূর্ত অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। এই বিন্দু ছেলেটাকে আশা করেনি। ফোনে ছদ্মবেশী চোর ধরা পড়ার খবর শুনে ভেবেছিল, সেই কয়েদীটাই ধরা পড়েছে। চোরটার বয়েস কত, সে-ও জিজ্ঞেস করেনি, যে ফোন করেছে সে-ও বলেনি।
কিশোরকে দেখে নিরাশই হলো ফগ। চুরি করতে যে আসেনি কিশোর, তারচেয়ে ভাল আর কেউ জানে না। নিশ্চয় কয়েদীটাকে খুঁজতে এসেছিল। ধরে নিয়ে গিয়ে

হাজতে ভরেও লাভ হবে না। রিপোর্ট করতে হবে শেরিফের কাছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই মুক্তি পেয়ে যাবে কিশোর। উল্টো হয়তো ধমক খেতে হবে তাকেই। তারচেয়ে এখানে ছেড়ে দিয়ে যাওয়াই ভাল।
কিশোরকে ছেড়ে দিতে বলল সে।
চোর ধরেও এ ভাবে ছেড়ে দেয়ায় পুলিশের ওপর নারাজ হলো ক্যারাভানের লোকেরা। ব্যঙ্গ আর গালমন্দ করতে লাগল। কিন্তু কিছু করার নেই ফগের।
*
গেট দিয়ে কিশোরকে ঢুকতে দেখল প্রথমে এলিজা। তার বিধ্বস্ত চেহারা দেখে হাঁ হয়ে গেল। দৌড়ে এল। কি ব্যাপার? কি হয়েছে তোমার? রাতে কোথায় ছিলে?
সরো তো! খিঁচড়ে আছে কিশোরের মেজাজ। কানটা ব্যথা করছে এখনও। নিজের অজান্তেই হাত চলে গেল কানের ওপর। ডলতে গিয়ে স্থির হয়ে গেল হাতটা। ঝিলিক দিয়ে উঠল চোখের তারা। এলিজাকে আরও অবাক করে দিয়ে দৌড় দিল ঘরের দিকে।
সোজা এসে ফোনের কাছে দাঁড়াল সে। প্রথমেই খবর দিতে হবে শেরিফকে। তারপর ফোন করবে মিস্টার বেকারের বাড়িতে। মুসাদের জানানোর জন্যে। পেয়ে গেছে কয়েদীর খোঁজ!
*
ঘণ্টা দুই পরে সেদিন সকালে দ্বিতীয়বারের মত পুলিশ ঢুকল ক্যারাভানের মাঠে। তবে এবার আর ফগ একা নয়, সঙ্গে শেরিফ রয়েছেন, আরও আছে চারজন কনস্টেবল। যে জেল থেকে কয়েদী পালিয়েছিল, শেরিফের ফোন পেয়ে সেখান থেকে পাঠানো হয়েছে। কিশোরও একা আসেনি। সঙ্গে রয়েছে এখন মুসা, রবিন, জিনা, ডল, রাফিয়ান। আর অবশ্যই এলিজা। এবার আর তাকে বাড়িতে রেখে আসা যায়নি। অবশ্য রেখে আসার চেষ্টাও করেনি কিশোর।
দলবল নিয়ে সোজা এসে ওগলাদের ক্যারাভানটার সামনে দাঁড়াল ওরা। শেরিফের নির্দেশে দরজায় থাবা দিল ফগ। হাঁক দিল, আই, খোলো, জলদি খোলো! পুলিশ!
খুলে দিল বুড়ি। চোখ মিটমিট করে তাকাতে লাগল। মিউ মিউ করে পায়ের কাছে এসে দাঁড়াল বিড়ালটা। কোলে তুলে নিল ওটাকে। ফগের ওপর চোখ পড়তে কাশা শুরু করল। কাশি থামলে জিজ্ঞেস করল, রিপোর্ট লিখতে এসেছেন বুঝি?
ঝামেলা! রিপোর্ট না, কয়েদী ধরতে। বুঝবে মজা আজকে। ভেতরে কে কে আছে, বেরোতে বলো জলদি।
কে আর থাকবে? আমার ছেলে আর মেয়ে...এই ওগলা, ওঠ। রাবুকে উঠতে বল। পুলিশ।

চোখ ডলতে ডলতে বেরিয়ে এল রাবুকা আর ওগলা। এত পুলিশ দেখে চমকে গেল। মাটিতে নেমে দাঁড়াল। বুড়িও নামল বিড়াল কোলে নিয়ে।
লাফ দিয়ে ক্যারাভানে উঠে ভেতরটা দেখে এল ফগ। ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল কিশোরকে, কই, কোথায় তোমার আসামী?
মুচকি হাসল কিশোর। যাক, একেবারে শিওর হয়ে নিলাম যে ভেতরে আর কেউ নেই। ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল বুড়ির সামনে। আচমকা হাত বাড়িয়ে বুড়ির চুল ধরে মারল এক হ্যাঁচকা টান।
আঁউ করে উঠল বুড়ি। কিশোরের হাতে চলে এসেছে তার পরচুলা। মাথা ভর্তি ঝাকড়া চুল বেরিয়ে পড়েছে। একটা মুহূর্ত দ্বিধান্বিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল বুড়ি। তারপর ঘুরে দিল দৌড়।
ঝট করে একটা পা সামনে বাড়িয়ে দিল ফগ। তাতে বেধে গিয়ে ধুড়স করে হুমড়ি খেয়ে পড়ল বুড়ির ছদ্মবেশে থাকা লোকটা। কোলের বিড়ালটা উড়ে গিয়ে পড়ল আরও দূরে। ব্যথা পেয়ে চিৎকার শুরু করল মিউ মিউ করে।
লোকটাকে টেনে তুলে চোখের পলকে হাতকড়া পরিয়ে দেয়া হলো।
রাবুকা আর ওগলার হাতে হাতকড়া পরাতে যেতেই কাকুতি-মিনতি শুরু করল ওরা : আমরা কিছু করিনি, জোর করে এসে থাকতে চেয়েছে, থাকতে দিতে বাধ্য হয়েছি!
এ সব কথায় মন গলল না পুলিশের। আসামী লুকিয়ে রাখার অপরাধে গ্রেপ্তার করা হলো ওদেরও। জানা গেল, আসামী ওদের দূর সম্পর্কের ভাই। ডাকাতির অপরাধে জেলে গিয়েছিল। ডাকাতির টাকা লুকিয়ে রেখে গিয়েছিল। পুলিশকে বলেনি। জেল থেকে পালিয়ে এসে প্রথমেই সেই টাকা বের করে কিছু দিয়ে মুখ বন্ধ করেছে রাবুকার। ওগলা তাকে দেখতে পারত না। টাকার জন্যে আসামীকে জায়গা দেয়ারও পক্ষপাতি ছিল না। কিন্তু কি করবে? রানুকা দিয়ে ফেলেছে। একটা প্রায় নতুন ক্যারাভানেরও বায়না করে ফেলেছে। টাকার জন্যে এসে চাপ দিচ্ছে মালিক। পুরো টাকা না দিলে বায়নার টাকাও মার যাবে। ভাঙাচোরা ক্যারাভান-যেটাতে কিশোরকে বন্দি করে রাখা হয়েছিল, সেটা ওদেরই ফেলে দেয়া ক্যারাভান।
চারজন কনস্টেবলকে দিয়ে তিন আসামীকে হাজতে পাঠিয়ে দিলেন শেরিফ। তারপর ফগ আর ছেলেমেয়েদের সহ রওনা হলেন জিনাদের বাড়িতে।

.

এতবড় একটা দলকে নাস্তার জন্যে হাজির হতে দেখে অবাক হলেন না কেরিআন্টি। জানেন, আসবে। তাই প্রচুর মাংস, ডিম আর পাউরুটি বের করে

রেখেছেন। ভাজতে আর টোস্ট করতে যা দেরি। শেরিফকে জিজ্ঞেস করলেন, এত সকালে তো নাস্তা করে নিশ্চয় বেরোতে পারেননি। সবাইকেই দেব তো?
দিন।
আমি বাদ, মিনমিন করে লজ্জিত কণ্ঠে বলল ফগ। নাস্তা করতেই বসেছিলাম, এই সময় ফোন এল...দৌড়ালাম।
হাসলেন কেরিআন্টি। তারমানে পুরো খাওয়া হয়নি আপনারও। বসে পড়ুন। কোন সমস্যা নেই। প্রচুর আছে।
মিস্টার গ্রেগ আর মিস্টার পারকার নাস্তা সেরে স্টাডিতে চলে গেছেন। আপাতত তাঁদের ডাকার প্রয়োজন মনে করলেন না কেরিআন্টি। খাবার আনতে রান্নাঘরে চলে গেলেন।
কিশোর, এবার বলো তো দেখি, টেবিলে দুই কনুই রেখে সামনে ঝুঁকে বসেছেন শেরিফ। বুড়িকে তোমার সন্দেহ করার কারণটা কি?
সূত্র অনেকগুলোই পেয়েছিলাম, কিশোর বলল, কিন্তু মেলাতে পারিনি প্রথমে। রাবুকা আর ওগলার মা সেজে থাকার বুদ্ধিটা সাংঘাতিক। এই এলাকায়। এই প্রথম মেলায় যোগ দিতে এসেছে ওরা। কেউ জানে না ওগলার মা, তার বাবার আগেই মরে গেছে। সেই জায়গাটা সহজেই দখল করল লোকটা। জানত, কেউ সন্দেহ করবে না। ঝগড়াঝাটি বাধিয়ে পরিস্থিতিটাকে এতই স্বাভাবিক করে রেখেছিল, সত্যিই কেউ সন্দেহ করেনি যে সে রাবুকা আর ওগলার মা নয়। লোকটার প্রশংসা করতে হয়। বুড়ির ছদ্মবেশে পারও পেয়ে গিয়েছিল প্রায়। ধরাটা পড়ল আমাকে ঘুসি মেরে।
রাতে আমাকে হাত-পা বেঁধে ভাঙা ক্যারাভানে ফেলে রাখল। কষ্টের চোটে মাথাটা ঠিকমত কাজ করছিল না তখন আমার। ভোরের বাতাসে হেঁটে এসে মগজটা পরিষ্কার হয়ে গেল। কান ব্যথা করছিল। উলা দিতে গেলাম। হঠাৎ মনে হলো, একটা জরাজীর্ণ বুড়ি, এত জোরে ঘুসি মারে কি করে? ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে আগের পাওয়া সূত্রগুলোর মানে পরিষ্কার হয়ে গেল।
বুবুকার তাঁবুতে বসে গভীর মনোযোগে বাক্সে রা মাছি দেখছিল সে। তারপর ক্যারাভানে হাড় জিরজিরে বিড়ালটাকে কোলে নিয়ে আদর করা। মনে পড়ল, কয়েদীটা কীট-পতঙ্গ আর বিড়াল ভালবাসে।
সারাক্ষণ শাল দিয়ে মাথা ঢেকে রাখার ব্যাপারটাও স্বাভাবিক নয়। কেন রাখত। পরচুলা ঢাকার জন্যে। যাতে কারও নজরে পড়ে না যায়, কেউ বুঝে না ফেলে ওগুলো আসল চুল নয়।
আরও আছে। রাতে ক্যারাভানে ওঠার সময় তার পা দেখেছি। বিরাট পা। এতবড় পা কোন মহিলার হতে পারে না।

বুড়ি সেজে থাকায় আরও অনেক সুবিধে পেয়েছে সে। ঠোঁটের কাটা দাগ আর হাতের ফোলা রগ আড়াল করে রাখতে পেরেছে সহজেই। কুঁচকানো মুখের ভাঁজে লুকিয়ে ফেলেছিল কাটা দাগটা। ছদ্মবেশটা এত চমৎকার হয়েছিল, তাঁজের মধ্যে নাকের নিচের একটা কাটা দাগ আলাদা করে বোঝা যায়নি। আর রগ লুকানোর কোন চেষ্টাই করেনি সে। বুড়ো মানুষের হাতের রগ ফোলাই থাকে, তাই দেখলেও সন্দেহ করবে না, জানত।

হাসলেন শেরিফ, কিন্তু তোমাকে ফাঁকি দিতে পারেনি।

দিয়ে ফেলেছিল আরেকটু হলে। তবে ভুল করেই ফেলে অপরাধীরা। আসলে ঘাবড়ে গিয়েছিল আমাকে ছদ্মবেশে যেতে দেখে। পুলিশের চর, না চোরের দলের লোক বুঝতে পারছিল না। মেজাজ ঠিক রাখতে পারেনি তাই। আর মাথা ঠাণ্ডা রাখতে না পারলেই ভুল করে বসে, যত চালাক লোকই হোক। আমার মুখ থেকে কথা আদায়ের জন্যে ঘুসি মেরে বসল।

আর ওই একটা ঘুসিই কাল হলো ওর, হাসলেন শেরিফ।

ঝামেলা! বিড়বিড় করল ফগ। এত কাছে থেকেও কয়েদীটাকে ধরতে না পারায় আফসোস হচ্ছে তার। নিজের চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে।

মিস্টার ফগ... বলতে গেল কিশোর।

ফগর‍্যাম্পারকট! শুধরে দিল ফগ।

সরি, মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকট, হেসে বলল কিশোর, আমার কাছে একটা জিনিস পাওনা রয়ে গেছে আপনার।

ভুরু কুঁচকে তাকাল ফগ। তার গোলআলু চোখে বিস্ময়। ঘোৎ করে উঠল, কি জিনিস!

পকেট থেকে পঞ্চাশ সেন্টের মুদ্রাটা বের করে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, দেখুন তো এটা চিনতে পারেন নাকি?

প্রথমে কিছু বুঝল না ফগ। তারপর আপেলের মত টকটকে লাল হয়ে উঠল গাল।

নিন, মুদ্রাটা টেবিলের ওপর রেখে ঠেলে দিল কিশোর। কাঁপা হাতে তুলে নিল ফগ। তাকাতে পারছে না কিশোরের চোখের দিকে।

ভুরু কুঁচকালেন শেরিফ। একবার কিশোরের মুখের দিকে, একবার ফগের মুখের দিকে তাকাতে লাগলেন। কি ব্যাপার?

অনুরোধের সুরে কিশোর বলল, এই একটা রহস্য আমার আর মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকটের মধ্যেই গোপন থাক, আঙ্কেল, না-ই বা ফাঁস করলাম।

ভলিউম ৫০ – কবরের প্রহরী – তিন গোয়েন্দা – রকিব হাসান
প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৭

খাওয়ার পর আবার এসে মুসার শোবার ঘরে ঢুকল সবাই। মুসা, ফারিহা, কিশোর, রবিন আর টিটু।

ঢুকেই বলল কিশোর, রবিন, শুরু করো এবার তোমার ভূতের গল্প।

গ্রীনহিলস। বড়দিনের ছুটি কিন্তু বাইরে বেরোনোর উপায় নেই ওদের। প্রচণ্ড তুষারপাত হচ্ছে। তবে এ জন্যে বেরোতে পারছে না ওরা তা নয়। আসল কারণ, খুব ঠাণ্ডা লেগেছে মুসা ও ফারিহার। অসুস্থ বিছানায় পড়ে থাকতে বাধ্য হচ্ছে ওরা।

কি আর করে? রবিন আর কিশোরেরও বাইরে ঘোরাঘুরি বন্ধ। মুসা এবং ফারিহাকে সঙ্গ দেয়ার জন্যে মুসাদের বাড়িতে এসে বসে থাকে ওরাও। গল্প করে কাটায়।

এদিনও গল্পই চলছে। ভূতের গল্প। প্রথম গল্পটা বলেছে মূসা এবার রবিনের পালা।

মুসা বালিশে আধশোয়া হলো তার বিছানায়। বাড়তি আরেকটা বিছানায় টিটুকে জড়িয়ে ধরে শুলো ফারিহা। মুসার বিছানায় দেয়ালে হেলান দিয়ে আরাম করে বসল কিশোর আর রবিন যেহেতু গল্প বলবে, সবাই যাতে তার মুখ দেখতে পায় সেজন্যে একটা চেয়ারে সবার মুখোমুখি বসল সে।

পায়ের ছাপগুলো ছিল সত্যি বিশাল, বুঝলে, শুরু করল রবিন, অনেক বড়!

এই সময় ঝাড়া দিয়ে ফারিহার হাত ছাড়িয়ে একলাতে উঠে দাঁড়াল টিটু। আরেক লাফে বিছানা থেকে নেমে জানালার দিকে ছুটে গেল।

ব্যাপার কি? অবাক হয়ে তাকাল সবাই।

কারণটা জানা গেল একটু পরেই। জানালায় উঁকি দিল লাল টকটকে নোল একটা মুখ কুকুরটাকে দেখে রাজ্যের বিরক্তি নিয়ে মুখ কুঁচকাল, আহ, ঝামেলা।

অ্যাই, ওটাকে থামতে বলো!

অ্যাই টিটু, থাম, আয় এদিকে, ডাক দিল কিশোর। মিস্টার ফগ? আপনি এখানে?

ফগর‍্যাম্পারকট। শুধরে দিল পুলিশম্যান।

সরি, মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকট, আগের প্রশ্নটাই করল কিশোর, আপনি এখানে?

এদিক দিয়েই যাচ্ছিলাম। বাগানে সবগুলো সাইকেল একসঙ্গে দেখে বুঝলাম, আছো সবাই এখানেই। অনেকদিন দেখি না, তাই ভাবলাম…

দেখাটা করেই যাই, তাই না? হাসল কিশোর। আসলে কিজন্যে এসেছেন বলি? আমরা কোন রহস্য পেয়েছি কিনা খোঁজ নিতে।

লাল মুখ আরও লাল হয়ে গেল ফগের। ঝামেলা! না না, তা নয়…ইয়ে, ঝামেলা, সত্যি কোন রহস্য পেয়েছ নাকি?
মুচকি হাসল কিশোর। পেয়েছি।
গোলআলুর মত চোখগুলো আরও গোল আর বড় হয়ে গেল ফগের। জানালার। দিকে আরেকটু এগিয়ে এল মুখটা। পেয়েছ?
পেয়েছি।
গলা খাকারি দিল ফগ। এদিক ওদিক তাকাল। যেন দেখতে চাইল আড়াল থেকে কেউ ওর দিকে তাকিয়ে আছে কিনা। তারপর স্বর নিচু করে জিজ্ঞেস করল, রহস্যটা কি?
ভূত!
ঝামেলা! রসিকতা কোরো না তো! ফগ ভাবল, সে যে ভূত হয়ে গিয়েছিল সেই কথাটাই খোঁচা মেরে মনে করিয়ে দিতে চাইছে কিশোর।
না, সত্যি বলছি, রহস্যটা ভূতেরই।
সত্যি? ঠাট্টা করছ না তো?
না, ঠাট্টা করব কেন?
তা রহস্যটা কি?
আমরা আলোচনা করে সিদ্ধান্তে আসতে চাইছি, পৃথিবীতে ভূত বলে সত্যি কিছু আছে কিনা?
ঠাণ্ডার মধ্যেও ঘামতে আরম্ভ করল ফগ। রুমাল বের করে মুখ মুছল। কৌতূহল ঝিলিক দিয়ে উঠল চোখে। কিভাবে সিদ্ধান্তে আসবে?
মুসা একটা ভূতুড়ে গল্প বলেছে, ওর আর ফারিহার বাস্তব অভিজ্ঞতার গল্প। এখন বলতে যাচ্ছে রবিন। শুরু করেছিল। আপনি আসাতে থেমে গেছে। তা আপনার কি কোন কাজ আছে আমাদের কাছে? কিশোরের ভঙ্গিটা এমন, থাকলে বলুন, নাহলে বিদেয় হোন।
উসখুস করতে লাগল ফগ। আবার এদিক ওদিক তাকাল। তারপর হে-হে করে একটা বোকার হাসি দিয়ে বলেই ফেলল, ঝামেলা! যদি কিছু মনে না করো তোমাদের আলোচনায় কি আমি অংশ নিতে পারি?
এ রকম একটা প্রস্তাব দিয়ে বসবে স্বয়ং ফগ, কল্পনাও করতে পারেনি গোয়েন্দারা। এ ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগল ওরা। টিটু কি বুঝল কে জানে, ফগের দিকে তাকিয়ে খোক খোক শুরু করল সে।
ধমক দিয়ে ওকে থামাল কিশোর। আবার তাকাল ফগের দিকে। আপনি আমাদের আলোচনায় অংশ নেবেন?

কেন, অসুবিধে কি? হাতে কোন কাজ নেই আমার। আর কি যে তুষারপাত শুরু হলো, বিচ্ছিরি! সময় একদম কাটে না। বাইরে বেরোনোও মুশকিল। একটা রহস্য পেলেও হতো, সমাধানের চেষ্টা করতে পারতাম। শোনো, যদি চাও, ভূতের গল্প আমিও শোনাতে পারি তোমাদের। কিছু বাস্তব অভিজ্ঞতা আমারও আছে।
উৎসাহী হয়ে উঠল কিশোর। ফগের বাস্তব অভিজ্ঞতা! নিশ্চয় মজাদার কোন হাসির ব্যাপার হবে। সহকারীদের অবাক করে দিয়ে রাজি হয়ে গেল সে। বেশ, আসুন। রবিন, দরজাটা খুলে দাও, প্লীজ!
জানালা থেকে ফগের মুখ অদৃশ্য হয়ে গেল।
ওকে ঢুকতে দিচ্ছ? ভাল লাগছে না রবিনের। ভূতের গল্প শোনা না ছাই। ও আসলে আমরা কোন রহস্য পেয়েছি কিনা জানার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে।
উঠুক। এখন কোন রহস্য নেই আমাদের হাতে, তদন্ত চলছে না, ও কোন বাগড়া দিতে পারবে না। তা ছাড়া ওকে সরাসরি মানা করে দেয়াটা অভদ্রতা হতো।
দরজা খুলে দিল রবিন।
ফগ ঘরে পা রাখতে না রাখতেই ঝাঁপ দিয়ে গিয়ে পড়ল টিটু। পায়ের চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে গোড়ালিতে কামড়ে দিতে চাইল। চিৎকার করে উঠল ফগ, ঝামেলা! আহ, ঝামেলা! অ্যাই কুত্তা, সর, সর! কুকুরটার পেটে কষে এক লাথি হাঁকানোর ইচ্ছেটা দমন করল, লাথি মারলে যদি আর থাকতে না দেয় ছেলেমেয়েগুলো, এই ভয়ে।
টিটুকে প্রচণ্ড ধমক লাগাল কিশোর। কান ধরে হিড়হিড় করে টেনে আনল। এক চড় লাগাব ধরে! কখন কোন শয়তানিটা করতে হবে তাও বোঝে না। সব সময় এক। জলদি গিয়ে ফারিহার কাছে চুপ করে বোস!
আর কোন গণ্ডগোল করল না দিই। লেজ টিয়ে চুপচাপ গিয়ে ফারিহার বিছানায় উঠল।
একটা চেয়ার টেনে বসল ফগ। মুখের ঘাম মুছল।
দরজা লাগিয়ে আগের জায়গায় ফিরে এল রবিন।
ঝামেলা! রবিনের দিকে তাকাল ফগ। নাও, এবার শুরু করতে পারো। আগে একটা প্রশ্নের জবাব দাও। যে গল্পটা বলবে, সেটা কি বানানো, না সত্যি?
বলাই তো হলো বাস্তব অভিজ্ঞতার গল্প। বানানো হবে কেন?
ঠিক আছে। আর কোন প্রশ্ন নেই আমার।
গল্প শুরু করল রবিন।

.

অনেক বড় পায়ের ছাপ। কোন বিশাল জানোয়ারের। চেপে বসেছে। কারণ মাটি নরম। আগের রাতে বৃষ্টি হয়েছিল।

হান্টার রিজে যাচ্ছিলাম। ছাপগুলো চোখে পড়তে থমকে দাঁড়ালাম। চোখ বোলালাম চারপাশে।
পাহাড়ের ঢালে দাঁড়িয়ে আছি আমি। কোথাও কোন শব্দ নেই। নিচে হারলে ক্রীকের নীল জল। মাথার ওপরে হান্টার রিজের ঘন গাছপালায় ছাওয়া বন!!
আবার তাকালাম মাটির দিকে। কিসের পায়ের ছাপ ওগুলো? কোন জন্তুর? একপাশের ঝোঁপঝাড়ের ভেতর দিয়ে বেরিয়েছে বোঝা যায়। পায়ের চাপে চ্যাপ্টা হয়ে গেছে ঘাস। ঝোঁপের ডাল ভাঙা। ওপরের বন থেকে নেমেছিল ওটা। কিছুক্ষণ ওখানে দাঁড়িয়ে থেকে আবার ফিরে গেছে যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে।
আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, সেখান থেকে নিচে আমাদের বাড়িটা স্পষ্ট চোখে পড়ে। ধূসর পাথরে তৈরি পুরানো একটা বড় বাড়ি। বহুকাল আগে ইনডিয়ানদের বানানো।
আবার তাকালাম ছাপগুলোর দিকে। আমি জানি বনের মধ্যে হরিণ আছে। কিন্তু হরিণের পায়ের ছাপ নয় ওগুলো অন্য কিছু কুকুর জাতীয় কোন প্রাণীর। এখানে নেকড়ে আছে নাকি? না কায়োট?
ভালমত দেখতে গিয়ে আরেকটা অদ্ভুত জিনিস চোখে পড়ল, কুকুরটার পায়ের ছাপের পাশে কোথাও কোথাও একধরনের ঘষার দাগ। খুবই অস্পষ্ট।
পেছনে শব্দ হলো। চমকে উঠলাম ফিরে তাকিয়ে দেখি বনমোরগের একটা পরিবার হেলেদুলে নেমে আসছে খোলা জায়গাটার দিকে আমাকে দেখে থমকে গেল। প্রায় মিনিটখানেক অপেক্ষা করল আমি কিছু করছি না দেখে পাশ কেটে চলে যেতে শুরু করল নিচে ক্রীকের দিকে, বোধহয় পানি খেতে
এত কাছে থেকে বনমোরগ আর কখনও দেখিনি বেশ বড় আকারের লাল আর ধূসরে মেশানো পালক। লাল লাল চোখ দেখে মনে হয় রেগে আছে। পায়ের। দিকে তাকালাম। একেবারেই খুদে। যে ছাপ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, ওগুলো বনমোরগের হতেই পারে না।
ঠক করে মাটিতে এসে পড়ল কি যেন আমার সামনে মাত্র দুই হাত দূরে। তাকিয়ে দেখি ছোট একটা পাথর। ঢালে ঠোকর খেতে খেতে লাফিয়ে নেমে গেল কিছুদূর। চমকে গেল পাখিগুলো। কক কক করে ওড়াল দিল।
পেছনের বন থেকে হুড়মুড় করে দৌড়ে বেরিয়ে এল একটা মেয়ে। উত্তেজিত জিজ্ঞেস করল, লেগেছে?
ভাবলাম, আমার গায়ে লেগেছে কিনা জিজ্ঞেস করছে বুঝি। মাথা নেড়ে বললাম, না লাগেনি অল্পের জন্যে বেঁচেছি।

তোমার কথা কে বলছে, গাধা কোথাকার। পাখিগুলোর দিকে নজর মেয়েটার। কোনটা গিয়ে ঝাঁপ দিল ঝোঁপের মধ্যে, কোনটা বসল গাছের ডালে। বেশি ভীতুগুলো আরও দূরে উড়ে গেল গাছপালার মাথার ওপর দিয়ে। আমার দিকে ফিরল আবার মেয়েটা। হতাশ কণ্ঠে যেন নিজেকেই প্রশ্ন করল, একটার গায়েও লাগেনি?

লাগলে তো তড়পাত দেখতেই পেতে।

এগিয়ে এসে আমার সামনে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল মেয়েটা। পরনে শর্টস, গায়ে টি শার্ট, মাথায় লাল-সাদা একটা লস অ্যাঞ্জেলেস ডজারস বেজবল ক্যাপ, চোখে লাল কাঁচের সানগ্লাস আবার জিজ্ঞেস করল, সত্যি লাগেনি কোনটার গায়ে?

লাগলে মরে পড়ে থাকত।

অনেক সময় জখম হলেও উড়ে যায় বনমোরগ অন্যখানে গিয়ে মরে।

তাহলে খোজোগে ঝোঁপের মধ্যে, হাত তুলে দেখিয়ে দিলাম। পাথর ছুঁড়তে হলে একটু সাবধানে ছুঁড়ো। আশেপাশে কেউ আছে কিনা দেখে নিয়ে। আমার মাথাটাই ফাটিয়ে দিয়েছিলে আরেকটু হলে।

লাল কাঁচের ভেতর দিয়ে আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখল মেয়েটা। বড়দের মত কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, বোকার মত ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে যে কারও গায়ে লাগতে পারে।

রাগ লাগল মেয়েটার পাকামো দেখে। বললাম, আমি বোকাও নই, যে কারোও নই, আমার একটা নাম আছে-রবিন মিলফোর্ড।

হেসে ফেলল মেয়েটা, তুমি রেগে যাচ্ছ।

রাগিয়ে দেয়ার মত করেই তো কথা বলছ।

হাত তুলল ও, আচ্ছা ঠিক আছে, আর বলব না, সরি। তোমরা নতুন এসেছ এখানে, না?

হ্যাঁ। বেড়াতে।

ঢালের নিচের ওই বড় বাড়িটাতে উঠেছ?

হ্যাঁ, হাত বাড়িয়ে দিলাম। ওটা আমাদেরই। আমার মায়ের।

সেও তার হাত বাড়াল। আমি নিনা হাওয়ার্ডস কিন্তু সবাই ডাকে গগলস। সারাক্ষণ সানগ্লাস পরে থাকি তো, তাই।

হাত মেলালাম আমরা। ওর কনুইয়ের দিকে চোখ পড়ল। গোটা দুই গভীর আঁচড়ের দাগ। ঘষা লেগে কেটেছে। জিজ্ঞেস করলাম, ফুটবল খেল নাকি? গোলকীপার?

হাসল ও। বলল, আমাকে নিনা ডাকলেই খুশি হব। গগলস শুনতে ভাল্লাগে না। ফুটবল খেলি না, শুধু বেজবল। এই দাগগুলো দেখে বলছ তো? এগুলো খেলার সময় পড়ে গিয়ে নয়, পাথরে ঘষা লেগে কেটেছে। ওপরের শৈলশিরাটা দেখিয়ে বলল, বেশির ভাগ সময় ওখানে কাটাই আমি। রাতে যখন অন্ধকারে আর কিছু দেখা যায় না তখন নামি একটা ঘাসের ডগা ছিঁড়ে নিয়ে দাতে কাটতে লাগল সে।
রাতেও ঘোরাঘুরি করো এই বনের মধ্যে?
করি, তাতে কি? অন্ধকারকে ভয় পাও নাকি তুমি?
প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে ছাপগুলো দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, নিনা, এগুলো কিসের ছাপ, বলো তো?
মাটির দিকে তাকায়নি এতক্ষণ ও। ছাপগুলো দেখে মুহূর্তে বদলে গেল চেহারা। দাঁত থেকে খসে পড়ল ঘাসের ডগা। সাদা হয়ে গেল মুখ। সানগ্লাস খুলে নিয়ে ঝুঁকে দাঁড়াল আরও ভাল করে দেখার জন্যে। যখন সোজা হলো আবার, চোখ বড় বড় করে ফেলেছে। বাদামী মণি দুটোতে আতঙ্ক।
এখানে কেন এসেছিল ওটা? ফিসফিস করে নিজেকেই যেন প্রশ্ন করল নিনা।
ঢোক গিলোম। জিজ্ঞেস করলাম, কিসে কি করছিল?
প্রহরী, বলল সে, কবরের প্রহরী! ছাপগুলোর কাছ থেকে এমন ভঙ্গিতে সরে গেল মনে হলো ভয় পাচ্ছে।
কবরের প্রহরী?
আবার ছাপগুলোর দিকে তাকাল ও। এত নিচে আর নামেনি কখনও, গলা কাঁপছে ওর। মুঠো করে ফেলেছে হাত।
নিনা?
জবাব না পেয়ে ওর কাধ ধরে কঁকালাম, নিনা, কে ওই কবরের প্রহরী?
আমার দিকে চোখ তুলে তাকাল ও। একটা কুকুর, রহস্যময় কণ্ঠে বলল। বিশাল। কালো। এত বড় কুকুর কোথাও দেখতে পাবে না আর। তবে ওটা কুকুর নয়।
দ্বিধায় পড়ে গেলাম। বলছে কুকুর, আবার বলে কুকুর নয়, সেটা আবার কি? বললাম, কি যা তা বলছ! হয় কুকুর, নয়তো অন্য কিছু; একসঙ্গে দুটো প্রাণী হতে পারে না।
পারে, নিচুস্বরে জবাব দিল নিনা। ভূত-প্রেতেরা পারে। বিশাল কালো কুকুরের রূপ ধরে থাকে ওটা। দানব!
ওর হাতের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, কাঁপছে। বিশ্বাস করতে পারলাম না, যত্তসব ফালতু কথা!
তোমার কাছে ফালতু মনে হতে পারে, কিন্তু এ এলাকার সবাই জানে ওটার কথা। পাহাড়ের ওপরে ওই চুড়ার কাছে ইনডিয়ানদের একটা গোরস্থান আছে। বহুকাল

আগে নিচের উপত্যকায় বাস করত সেনিকা ইনডিয়ানরা। কবর দিত ওপরে। ওখানে যাদের কবর দেয়া হয়েছে, তাদের পাহারা দেয় ওই ভূতুড়ে কুকুরটা।
তাকিয়ে রইলাম নিনার দিকে। ভূত! প্রেত। দানব! কবরখানা পাহারা দেয় ভূতুড়ে কুকুর। এ সব কি বলছে?
আবার তাকালাম ছাপগুলোর দিকে। কুকুরের পায়ের এতবড় ছাপ আর দেখিনি আমি। দানবই ওটা।
সূর্য ডুবে গেছে। অন্ধকার নামল পাহাড়ে। গাছের মাথায় কাপন তুলে বয়ে গেল একঝলক বাতাস। মর্মর শব্দে মাটিতে গড়াল শুকনো ঝরা পাতা।
আমারও ভয় লাগতে আরম্ভ করেছে। ওকে বললাম, ভূতেরা মাটিতে পায়ের ছাপ ফেলে না।
সে কথা আমিও শুনেছি। কিন্তু এই ভূতটা ফেলে। কুকুরের মত গলা ছেড়ে ডাকে। পাহাড়ের ওপর ঘুরে বেড়ায়। এমনকি খুনও করে। আমার দিকে তাকাল ও। রবিন, কখনও পাহাড়ের ওপরে যেয়ো না।
কোনখানে?
শৈলশিরাটা দেখাল নিনা। ওদিকে। বিরাট এক ওক গাছ আছে, তার কাছে মৃত্যুপুরী। গেলে মেরে ফেলবে তোমাকে। সত্যি বলছি, বিশ্বাস করো আমার কথা।
বিরাট ওক। মৃত্যুপুরী। রূপকথার মায়াপুরীর রাক্ষস-খোক্কসের কেচ্ছা শোনাচ্ছে যেন আমাকে নিনা। তাকালাম ওর দিকে। ওর চোখের আতঙ্ক আমাকেও যেন গ্রাস করতে আরম্ভ করল। অদ্ভুত এক অনুভূতি হতে লাগল শরীরে। হাতের তালু ঠাণ্ডা হয়ে এল, মুখের ভেতরটা গেল শুকিয়ে। জোরাল হলো বাতাস। নড়িয়ে দিল ডালপালা। ঝরে পড়তে লাগল আরও অনেক শুকনো পাতা।
তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার শোনা গেল আচমকা। কুকুরের ডাকের মত।
ভীষণ চমকে গিয়ে লাফ দিয়ে আমার কাছে চলে এল নিনা। আমিও লাফিয়ে উঠতাম, কিন্তু পা দুটো মনে হলো বরফের মত জমে গেছে।
কিসের ডাক? জিজ্ঞেস করলাম।
ওটাই তো! ফিসফিস করে বলল নিনা। প্রহরী! সূর্য অস্ত গেলেই ডাকে।
কোনখান থেকে? আমিও ওর মত ফিসফিস শুরু করেছি।
ওই যে বললাম, পাহাড়ের ওপরে, চুড়ার কাছে। ওই যে আবার ডাকছে, ভয়ে ভয়ে বলল নিনা। ঝটকা দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল ও। আমি বাড়ি যাচ্ছি।
দাঁড়াও, দাঁড়াও! এক মিনিট, অস্বস্তি লাগছে আমার, ওই ডাক শুনেছ নাকি আরও?
মাথা ঝাঁকাল নিনা।
দেখেছ ওটাকে?

এক মুহূর্ত দ্বিধা করে আবার মাথা ঝাঁকাল সে।
কোথায়?
পাহাড়ের ওপর।
অস্বস্তিটা বাড়ল আমার। তুমি বলছ সব সময় পাহাড়ের ওপর থাকে ওটা। কাল রাতে তাহলে এখানে নেমেছিল কেন? পায়ের ছাপই বলছে, নেমেছিল!
চোখ আরও বড় বড় হয়ে গেল ওর, মুখ সাদা। শুকনো গলায় জবাব দিল, জানি না! এতদিন তো পাহাড়ের ওপরেই থেকেছে ওটা।
কিন্তু কাল রাতে এখানে নেমেছিল। এ জন্যেই ভয় পাচ্ছ তুমি, তাই না?
আমার চোখের দিকে তাকাল নিনা, এর আগে আর কোনদিন নিচে নামেনি ওটা। ছাপগুলোর দিকে তাকাল ও, নিচের উপত্যকার দিকে, তারপর আবার আমার দিকে। কাল রাতে এখানে নেমে তোমাদের বাড়িটার দিকে তাকিয়েছিল ওটা। কার দিকে, কেন তাকিয়েছে, জানি না। আমি শুধু জানি, এর আগে আর কোনদিন নিচে নামেনি প্রহরী।
আরও জোরে চিৎকার করে উঠল ওটা। চমকে উঠলাম দুজনে।
ওই জানালাটার দিকে তাকিয়েছিল ওটা, হাত তুলে দেখাল নিনা, একমাত্র জানালা যেটা পাহাড়ের এই ঢাল থেকে দেখা যায়। জানালাটা কার ঘরের?
গরম নেই। তাও ঘামতে শুরু করলাম। জবাব দিলাম, আমার!

.

দৌড় দিতে গেল নিনা। হাত চেপে ধরলাম ওর।
যেতে দাও, ও বলল, দেরি হয়ে যাচ্ছে।
এক মিনিট, আমি বললাম। কিন্তু শুনল না ও। ঝাড়া মেরে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে আবার দৌড় দিতে যাবে এই সময় মাটিতে পড়ে থাকা চকচকে একটা জিনিস চোখে পড়ল আমার। নিচু হয়ে তুলে নিয়ে বললাম, তোমার সানগ্লাস।
দাও।
হাতটা পেছনে সরিয়ে নিলাম, আগে বলো, ভূতটাকে তুমি দেখার পর কি ঘটল?
দ্বিধা করতে লাগল ও। আগে আমার চশমা দাও।
দিয়ে দিলাম ওটা। চোখে পরে নিল সে। ছাপগুলোর দিকে আরেকবার তাকিয়ে আমার দিকে মুখ তুলল। রাতের বেলাও পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতে ভাল লাগে আমার, বলেছি না?
মাথা ঝাঁকালাম।
হপ্তা দুই আগে ওরকমই এক রাতে বেরিয়েছিলাম। এখান দিয়েই যাচ্ছিলাম। একটা রাস্তা চলে গেছে পাহাড়ের ওপরের ঢাল বেয়ে ওপরের মাথা গেছে কবরখানার দিকে, নিচটা উপত্যকায় ওই পথের দিকেই যাচ্ছি, বেড়ানো শেষ

হয়েছে আমার, বাড়ি ফিরছি আসলে তখন হঠাৎ করেই চোখে পড়ল ওটাকে ওপরে, পথের একেবারে শেষ মাথায়, কয়েকটা গাছের কাছে।
দেখতে কেমন?
কতবার বলব? কুকুরের মতন। অনেক বড় কুকুর। রীতিমত একটা দৈত্য
কি করলে তখন?
আমার দিকে তাকিয়ে রইল নিনা। কি আবার করব? পাগল নাকি তুমি? ভূতের বিরুদ্ধে কিছু করা যায়? কিছুই করিনি। পাথর হয়ে গিয়েছিলাম। পা নড়াতে পারছিলাম না তারপর ওটা গায়েব হয়ে গেল।
গায়েব হয়ে গেল মানে?
গায়েব হয়ে গেল মানে-গায়েব একেবারে হাওয়া।
সন্দেহ হলে আমার, জিজ্ঞেস করলাম, সত্যি দেখেছিলে তো?
বুকের ওপর হাত দুটা আড়াআড়ি রেখে দাঁড়াল নিনা। তোমার অবগতির জন্যে একটা কথা জানাই মিস্টার রবিন মিলফোর্ড, যেখানে যে জিনিস থাকে না সেটা আমি দেখি না চিৎকারটার ব্যাপারে কি বলবে? এই ইকটু আগে যে দুজনে। শুনলাম? নাকি সেটাও শুনিনি?
তা শুনেছি অস্বীকার করতে পারলাম না কান পাতলাম। থেমে গেছে চিৎকার।
নিনা, তোমাকে মিথ্যুক বলছি না আসলে ভূত-প্রেতে বিশ্বাস করি না আমি।
এখানে এতদিন আসোনি বলে করোনি।
হয়তো তবে এখানকার ইনডিয়ানদের কথা আমি অনেক কিছুই জানি। আমার মায়ের এক পূর্বপুরুষ ছিলেন মোহক ইনডিয়ান। শার্টের গলার কাছের বোতাম খুলে কলারটা ট্র্যাক করে ধরলাম, এই দেখো!
কি ওটা?
দেখতে পাচ্ছ না একটা মালা? ওয়ামপাম গুটির। তাও আবার কালো গুটি। অনেক বড় মোহক যোদ্ধারাই কেবল এই মালা পরত। মালাটা কয়েক পুরুষ ধরে হাত বদল হতে হতে মার হাতে পড়েছিল। আমার গত জন্মদিনে আমাকে উপহার দিয়েছে মা।
ছুঁয়ে দেখতে পারি?
মালাটা ধরতে দিলাম নিনাকে।
বহুকাল আগে এই উপত্যকায় বাস করত মোহকরা, নিনা বলল। হয়তো তোমার মায়ের পূর্বপুরুষ সেই ইনডিয়ান যোদ্ধাও এই এলাকায়ই ছিলেন।
ছিলেনই তো, আমি বললাম। ওই বাড়িটা তো তার কাছ থেকেই পাওয়া। মালাটার মতই হাত বদল হতে হতে ওটাও মার দখলে এসেছে।

তারমানে তোমার পূর্বপুরুষ সেই ইনডিয়ান যোদ্ধাকেও মৃত্যুপুরীতেই কবর দেয়া হয়েছে?
হতে পারে। ওই মৃত্যুপুরীটা কি, বলো তো?
অনেক বড় একটা গুহা। পাহাড়ের ভেতরে সুড়ঙ্গের মত ঢুকে গেছে। মৃত্যুর সময় হলে ইনডিয়ান যোদ্ধারা গিয়ে ঢুকত ওর মধ্যে। কেবল বীরেরাই ঢুকত, সাধারণ ইনডিয়ানদের জন্যে বারণ! কড়াকড়ি ভাবে এই নিয়ম মেনে চলত ওরা। একবার ঢুকলে কেউ আর জীবিত বেরোতে পারে না ওখান থেকে। সেজন্যেই নাম হয়েছে মৃত্যুপুরী।
তুমি ঢুকেছ কখনও?
রাগ করে মালাটা ছেড়ে দিল নিনা। বললাম না কেউ জীবিত বেরোতে পারে না ওখান থেকে। কেউ না!
তাই?
তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না নাকি? দেখো, রবিন, বোকামি করে কিছু করে বোলো না। ওই চুড়ার কাছে যেয়ো না। গোরস্থানটা থেকে দুরে থাকবে। কোনমতেই মৃত্যুপুরীর ধারেকাছে যাবে না। যদি যাও, কোনদিন আর ফিরবে না, বলে দিলাম। কবরের প্রহরী ছাড়বে না তোমাকে।
গুডবাই জানিয়ে বাড়ি রওনা হলাম দুজনে।
বাড়ি ফিরতে পনেরো মিনিটের বেশি লাগল না আমার। ততক্ষণে অন্ধকার হয়ে গেছে। ভয়ও পাচ্ছি। চারদিকে নানা রকম শব্দ, আলো থাকতে যেগুলো ছিল না। বার বার মুখ ফিরিয়ে কাঁধের ওপর দিয়ে তাকালাম, কিন্তু কিছুই চোখে পড়ল না।
রাতে ডিনার খেতে বসে মা আর বাবাকে বললাম গোরস্থানটার কথা। ভূতের কথাটা চেপে গেলাম। বললে যদি হাসাহাসি করে? ওই এলাকার অনেক ইতিহাসই জানে মা বলল ইনডিয়ানদের ছয় ছয়টা উপজাতি বাস করেছে ওখানে। গোরস্থানটার কথাও জানে। কথিত আছে-ওটাকে কেউ অবহেলা করলে, ওটার ওপর দিয়ে তাচ্ছিল্য করে হেঁটে গেলে তার ওপর নাকি অভিশাপ নেমে আসে।
খাওয়ার পর পরই শুতে চলে গেল মা আর বাবা। সারাদিন এখানে ওখানে ঘুরে বেড়িয়ে ক্লান্ত। কিন্তু আমার ঘুম এল না। বিছানায় শুয়ে গড়াগড়ি করতে লাগলাম। ভাবতে লাগলাম কালো কুকুরটার কথা। ভূত-প্রেত বলে কিছু নেই, অনেকের কাছেই শুনি। তাহলে নিনা কি দেখল? হতে পারে বড় নেকড়ে অথবা কায়োট। বুনো কুকুরও হতে পরে। মালিককে হারিয়ে বুনো হয়ে গেছে কোন পোষা কুকুর।
কিন্তু হঠাৎ করে ওটা নিচে নামল কেন? আমাদের বাড়ির দিকে তাকিয়েই বা থাকবে কেন?

মনে হচ্ছিল ঘুম আর আসবে না। তবে ঘুমিয়েছি। কতক্ষণ পরে জানি না, জেগে গেলাম। আপনাআপনি খুলে গেল চোখের পাতা। কেন জাগলাম? কিসের। শব্দে? মনে হলো বাইরে কিছু একটা নড়াচড়া করছে।
চুপচাপ বিছানায় পড়ে থেকে কান পেতে রইলাম। প্রথমে রাতের স্বাভাবিক সব শব্দ কানে আসতে থাকল, এই যেমন আমার মাথার কাছে রাখা ঘড়িটা। টিকটিক টিকটিক করেই চলেছে। বাইরে গাছের ডালে বাতাসের কানাকানি। হারলে ক্রীক থেকে ভেসে আসছে রাতচরা হাঁসের ডাক। শুকনো পাতা গড়াচ্ছে। মাটিতে। তারপর আরেক ধরনের শব্দ করে উঠল পাতা। পা পড়লে যেমন হয়। শুকনো পাতা মাড়িয়ে হাঁটছে কেউ।
পুরো সজাগ হয়ে গেছি তখন। বাইরে কেউ আছে তাতে আর কোন সন্দেহ রইল না। মোলায়েম পা ফেলে আস্তে আস্তে হাঁটছে সে, কিন্তু শুকনো পাতা তার অস্তিত্ব জাহির করে দিচ্ছে। আমার জানালার কাছে এগিয়ে আসছে পদশব্দ। নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। এত ভারী আর জোরাল, কুকুর কখনও ওরকম নিঃশ্বাস ফেলে না। অনেকটা পরিশ্রমে হাঁপিয়ে পড়া মানুষের মত। কি ওটা?
ধীরে ধীরে কমে এল নিঃশ্বাসের শব্দ। আবার পাতায় পা পড়ার মর্মর ধ্বনি। আমার জানালার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে লাগল ওটা।
তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে উঠে দৌড়ে নামলাম নিচতলায়। লিভিং রুম পার হয়ে ছুটলাম। মা আর বাবা যাতে শুনতে না পায় সেজন্যে যতটা সম্ভব নিঃশব্দে দরজা খুলে বেরিয়ে এলাম সামনের ছড়ানো রেলিঙ দেয়া বারান্দায়।
এ সময় কানে এল চিৎকারটা।
ভয়াবহ আর্তচিৎকার। তাতে যন্ত্রণা তো আছেই, সেই সঙ্গে মিশে আছে আরও কিছু-আতঙ্ক।
তারপর আবার সব চুপচাপ। এতটাই নীরব হয়ে গেল, সন্দেহ হলো, সত্যি চিৎকারটা শুনেছি তো? নাকি সব আমার ভীত, ক্লান্ত মনের কল্পনা? ওপরে বাবা মার ঘরের দিকে তাকালাম, জানালায় আলো জ্বলে কিনা।
আগের মতই অন্ধকার। ওরা কিছু শোনেনি।
আমি কি একাই কি শুনলাম? সন্দেহটা বাড়ল-কল্পনাই করেছি।
চারদিক বড় বেশি নীরব। এতটা কেন? খেয়াল করলাম, হাঁসগুলো ডাকাডাকি বন্ধ করে দিয়েছে। সেটাও অস্বাভাবিক। এ ভাবে চুপ করে যাওয়ার একটাই কারণ, চিৎকারটা কানে গেছে ওদের। তারমানে ভুল শুনিনি আমি। কল্পনা নয়।
কিন্তু এল কোনখান থেকে?
সিঁড়ির দিকে এগোলাম। বারান্দার একধারে রয়েছে বাড়িটার সেলার। আগের। দিন মা আমাকে মাটির নিচের ওই ঘরটা দেখিয়ে বলেছে যে কদিন থাকব ওটাকে

আমাদের সবজি রাখার ঘর হিসেবে ব্যবহার করা হবে। অদ্ভুত জায়গায় তৈরি করা হয়েছে সেলারটা। পাহাড়ের গোড়ায়। কতগুলো সাদা পাথরের পর ঢালটা উঠে গেছে চুড়ার সেই শৈলশিরার কাছে, যেটাতে রয়েছে ইনডিয়ানদের কবর।
অনুমান করলাম, চিৎকারটা এসেছে ওই মাটির নিচের ঘর থেকে।
সিঁড়ি দিয়ে নেমে সেলারের দিকে এগোলাম। ঢালের দিকে চোখ! কেউ আছে। কিনা দেখছি। বড় বড় ঘাস জন্মে আছে। ঘাসের ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে নজর চলে গেল চুড়ার দিকে। তারপর আরও ওপরে, আকাশের দিকে। আধখানা চাঁদ আর অসংখ্য বড় বড় তারা প্রচুর আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে উপত্যকায়। দেখার জন্যে যথেষ্ট। ঢালের ওপর কিছু দেখলাম না। দুই পাশে তাকালাম। নেই। যেটা এসেছিল, চলে গেছে। মনে হলো, তখনকার মত আমি নিরাপদ।
সেলারের কাছে পৌঁছলাম। অনেক বড় একটা গর্তকে যাতে পানি না পড়ে সেভাবে ঢেকেঢুকে নিয়ে জিনিসপত্র রাখার ঘর বানানো হয়েছে। মুখের কাছে ঝুঁকে বসে ভেতরে উঁকি দিলাম। ভেতরে গাঢ় অন্ধকার। টর্চ আনার দরকার ছিল। আরও ঝুঁকে, দুই হাতের তালুতে ভর দিয়ে মাথাটা ঝুলিয়ে দিলাম ভেতরে। তাও কিছু চোখে পড়ল না। সকালে আলোতে ছাড়া দেখতে পারব না চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে পিছিয়ে এলাম।
খুট করে পেছনে একটা শব্দ হলো। পাথরের মূর্তি হয়ে গেলাম যেন।
খেয়াল করলাম, ঝলমলে চাঁদের আলো নেই আর এখন! ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে জ্যোৎস্না। ঢালের ঘাস, আশপাশের জমি, পাথর, গাছপালা সব অন্ধকারে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। আমার পেছনে কালো একটা ছায়া বড় হয়ে উঠছে আমার ছায়াও পড়েছে মাটিতে। চাঁদ পেছনে থাকায় ছায়াটা লম্বা হয়ে গেছে অনেক। পেছন থেকে আরও বড় একটা ছায়া ঢেকে দিচ্ছে আমারটাকে। আমি যে ভঙ্গিতে আছি, সেরকমই চার পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ানো।
ঠিক আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে ওটা।

.

ফিরে তাকানোর সাহস তো হলোই না, চোখ বন্ধ করে ফেললাম। ঘাড়ে এসে পড়তে লাগল যেন ভারী নিঃশ্বাস। এত বেশি হাঁটু কাঁপতে লাগল মনে হলো হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাব মাটিতে। ঠাণ্ডা রাতু। তার মধ্যেও ঘামতে শুরু করলাম। নিজের অজান্তে হাত উঠে গেল কালো গুটির মালাটার দিকে। চেপে ধরলাম। অপেক্ষা করছি ভয়ঙ্কর কিছু ঘটার। গালে গরম নিঃশ্বাস, তারপর ঘাড়ে দাঁত ফোঁটানোর তীক্ষ্ণ ব্যথা বা ওরকম কিছুর।
ওটাও যেন অপেক্ষা করে আছে, আমার পেছনে। আমার আঙুল, আমার হাত, শরীরের প্রতিটি অঙ্গ যেন কাঁপতে শুরু করল থরথর করে! চিৎকার করতে

চাইলাম। স্বর বেরোল না ভয়েই অকেজো হয়ে গেছে যেন স্বরযন্ত্র সামান্যতম। শব্দও করতে পারলাম না। এমনকি দম নিতেও যেন কষ্ট।
প্রচণ্ড গর্জনের পর একটা ভারী শরীর আমার ওপর লাফিয়ে পড়ার অপেক্ষা করছি। কিছুই ঘটল না। চোখ মেলছি না। ভাবছি, যে কোন মুহূর্তে এখন অনুভব করব ব্যথাটা, যে কোন সময়।
জানি না কতক্ষণ ওভাবে চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে কুকুরের মত হয়েছিলাম। কতক্ষণ অপেক্ষা করেছি তাও বলতে পারব না। অবশেষে মনে হলো একটা কিছু করা দরকার আমার চোখ বন্ধ রেখেই খুব ধীরে ধীরে এক দুই তিন করে শুনতে আরম্ভ করলাম। দশ গোণা শেষ হলেই ফিরে তাকাব। ঘুরতে আমি চাই না। ভয়ঙ্কর ওই চেহারাটা দেখার সাহস বা ইচ্ছা কোনটাই আমার নেই। চুপ করে আছি বলে হয়তো কিছু করছে না। নড়াচড়া দেখলেই এসে ঘাড় কামড়ে ধরবে সেই ভয়ও আছে। কিন্তু তবু দেখতে হবে। আর অপেক্ষা করতে পারছিলাম না।
দশ গুনে, চোখ মেলেই ঝটকা দিয়ে ঘাড় ঘোরালাম!
ডানে বায়ে দুদিকেই তাকালাম। চাঁদের আলো খেলে যাচ্ছে ঘাসের ওপর। সেলারের ওপরের পাথরগুলো আগের মতই সাদা, কোথাও কোন ছায়া নেই, আমার পেছনেও নেই।
কিন্তু ছায়া তো ছিল একটা! নাকি চোখের ভুল আমার? বুঝতে পারলাম না।
শৈলশিরার কাছে বনটার দিকে তাকালাম। কোন নড়াচড়া নেই। সব স্বাভাবিক। আকাশে চাঁদের কাছ থেকে সরে যাচ্ছে এক টুকরো মেঘ। মেঘের আড়ালে চাঁদ ঢাকা পড়েছিল বলেই কি ছায়া নেমেছিল উপত্যকায়? তাই হবে। কিন্তু অন্য ছায়াটা? যেটা আমার ছায়াকে ঢেকে দিয়েছিল? নিঃশ্বাসের শব্দ? এ সবের কি ব্যাখ্যা? হতে পারে কুকুরটা এসে দাঁড়িয়েছিল আমার পেছনে। তাই যদি হবে, তাহলে ভূতুড়ে কুকুর নয় ওটা। যতদূর জানি, ভূতের ছায়া পড়ে না। নিনার কথামত অবশ্য ওই কুকুরটা ভূত হলেও অদ্ভুত। পায়ের ছাপ বসে যায় মাটিতে। ছায়া পড়তেই বা দোষ কি? খুট করে শব্দ যে হয়েছিল একটা আমার পেছনে, সেটাও স্পষ্ট শুনেছি। মন কিংবা কানের ভুল নয়। সময়মত ফিরে তাকাইনি বলে নিজেকে গাধা বলে গাল দিতে লাগলাম। তাকালে একটা বড় রহস্যের সমাধান হয়তো তখনই হয়ে যেত। তাকালে হয়তো ঘাড় মটকে মেরে ফেলত, এই বলে সান্তনাও দিলাম মনকে।
অন্ধকার সেলারটার দিকে তাকালাম আবার। ঠিক করলাম, কাল সকালেই জেনে নেব কি ঢুকেছিল ওখানে। দিনের আলো ফুটলে সেলারে নামব। কিসে চিৎকার করল জানতেই হবে।

ঘরে ফিরে এলাম। বিছানায় শুয়েও ঘুম এল না কখন ভোর হবে, কখন সূর্য উঠবে, কখন নামব সেলারে, দেখতে পাব কিসে করেছে চিৎকার, এই চিন্তায় সময় আর কাটছে না।
তবে ঘুমিয়ে পড়লাম এক সময়। আবার যখন চোখ মেলোম দেখি রোদ উঠেছে। সব কিছুই আলোয় উজ্জ্বল। হাসিখুশি দিন। রাতে যে অমন একটা কাণ্ড ঘটে গেছে বিশ্বাসই হতে চায় না।
বিছানা থেকে নেমেই রওনা হলাম সেলারের দিকে। আগে দেখতে হবে কিসে চিৎকার করেছিল। জানতে হবে স্বপ্ন দেখেছি, না সত্যি।
না, স্বপ্ন নয়। সেলারের কাছাকাছি গিয়ে মাটির দিকে তাকিয়েই থমকে গেলাম। আবার সেই পদচিহ্ন। বড় বড় পায়ের ছাপ। সন্দেহ হলো। বাড়ির চারপাশে খুঁজে দেখলাম, সবখানেই আছে। বাগান, আঙিনা সব ঘুরে তারপর এগিয়েছে সেলারের দিকে। পাহাড়ের ঢালে যেমন দেখেছিলাম, অদ্ভুত সেই ঘষার দাগ এখানেও আছে কোথাও কোথাও, কুকুরটার পায়ের ছাপের পাশে। আরও নানা রকম ছাপ দেখতে পেলাম। ছোট ছোট জানোয়ারের বেশির ভাগই চিনি না।
সেলারের প্রবেশ মুখের কাছে এসে হাঁটু গেড়ে বসে ভেতরে উঁকি দিলাম। বাইরে এত আলো থাকলেও ভেতরটা তখনও অন্ধকার।
হঠাৎ মনে হলো আরও বেশি অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। চমকে উঠলাম। আবার! হাঁটু কাঁপতে আরম্ভ করল। ফিরে তাকালাম। চেয়ে দেখি সূর্যের মুখ ঢেকে দিচ্ছে এক টুকরো মেঘ। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে নিজেকে ধমক দিলাম-রবিন, অকারণ ভয়ে মনকে আচ্ছন্ন কোরো না। তাতে সত্য আবিষ্কারে ব্যাঘাত ঘটবে।
মেঘ সরে যাওয়ার অপেক্ষায় রইলাম। সরে গিয়ে আবার রোদ উঠল। ফিরে তাকালাম সেলারের দিকে। ভেতরে গলা বাড়িয়ে দিলাম। চোখে অন্ধকার সয়ে আসার অপেক্ষা করছি।
দেখতে পেলাম ওটাকে। একটা ব্যাকুন। গলায় মস্ত একটা ক্ষত। একগাদা রক্তের মধ্যে পড়ে আছে। চিৎকার করার জন্যে হাঁ করেছিল যে, সেই ভঙ্গিতেই রয়েছে মুখটা। চোখ দুটো ভোলা। নিষ্প্রাণ। কিন্তু আতঙ্কের ছাপ মুছে যায়নি তা থেকে।
সেলারের মুখের কাছে হুমড়ি খেয়ে আছি। ড্রামের মত বাজতে আরম্ভ করেছে। হৃৎপিণ্ডটা। তাকিয়ে আছি র‍্যাকুনের কালো, ছোট ছোট চোখ দুটোর দিকে।
সবাই জানে ব্যাকুন খুব লড়াকু প্রাণী। বেকায়দায় পড়লে ভালুকেও ছাড়ে না, যুঝতে থাকে। কিন্তু এই হতভাগ্য ব্যাকুনটা বাধা দেয়ার কোন সুযোগই পায়নি। শেয়ালে মারেনি ওটাকে, তাহলে ধস্তাধস্তি হতো, পড়ে থাকার ভঙ্গিটা হতো অন্য রকম। কায়োটেও নয়। তার চেয়েও বড় প্রচণ্ড শক্তিশালী কোন জানোয়ারের

কাজ। নেকড়ে বা ভালুকের পক্ষে এ ভাবে খুন করা সম্ভব। কিন্তু। সেটা মেনে নিতে পারলাম না। ওসব জানোয়ার হলে সেলারের কাছে পায়ের ছাপ থাকত তাহলে কিসে? কুকুরটা? সেলারে নেমে দেখলে জানা যাবে, যদি পায়ের ছাপ থাকে। তবে সেলারের মাটি এত শক্ত, পায়ের ছাপ পড়বে বলে মনে হয় না।

মিউ!

এতটাই চমকে উঠলাম, লাফিয়ে সোজা হতে গিয়ে মাথা ঠুকে গেল ওপরের বেরিয়ে থাকা একটা পাথরে মাথাটা ডলতে ডলতে ফিরে তাকিয়ে দেখি রোমার। আমাদের পড়শী মিসেস মারলোর ছোট কালো বেড়ালটা।

র‍্যাকুনের গন্ধ পেয়ে সেলারে ঢোকার চেষ্টা করা। ধরে ফেললাম।

এই যে, এখানে এসে বসে আছে, পেছন থেকে বলে উঠল একটা মহিলা কণ্ঠ। মিসেস মারলো। একটা বেড়াল আর একটা কুকুর পোষেন। কুকুরটার নাম ববি। রোমারকে আমার হাতে ছটফট করতে দেখে বললেন, যেই একটু ছাড়া। পেয়েছে অমনি চলে এসেছে। সারাটা রাত অস্থির হয়ে ছিল। খালি ডাকাডাকি করেছে।

কেন ডেকেছে বলতে পারি, মিসেস মারলো, বললাম আমি। কারণটা ওই যে ওখানে, হাত তুলে সেলারের দিকে দেখালাম। মিউ মিউ করে ছুটে গিয়ে সেলারে ঢুকতে চাইল আবার রোমার। ছাড়লাম না।

সেলারের ভেতরে উঁকি দিয়েই যেন বিদ্যুতের শক খেয়ে পিছিয়ে গেলেন মিসেস মারলো। মুখ সাদা।

তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কোন জানোয়ারে এ কাজ করেছে জানেন আপনি?

না, রবিন, জানি না, ঢোক গিলে কোনমতে জবাব দিলেন তিনি, শেয়াল টেয়ালে হবে। ভঙ্গি দেখে মনে হলো হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

আমার কিন্তু মনে হচ্ছে শেয়ালের চেয়ে বড় কোন জানোয়ারের কাজ, বললাম তাকে। ভালুক কিংবা নেকড়ে।

আমার চোখের দিকে তাকাতে পারছেন না তিনি। মুখ তুলে তাকালেন হান্টার রিজের দিকে। ওসব জানোয়ার লোকালয়ে আসতে চায় না, গলা কাঁপছে তাঁর।

আপনি ঠিক জানেন?।

জানব না কেন? হারলে ক্রীকেই তো জন্মেছি।

কিছুতেই আমার চোখের দিকে তাকালেন না মিসেস মারলো। রোমারকে আমার হাত থেকে নিতে নিতে বললেন, আয়, রোমার, বাড়ি যাই। আর এ ভাবে যখন তখন ঘর থেকে বেরোবি না, বুঝলি? যাওয়ার জন্যে এত তাড়াহুড়া শুরু করলেন তিনি, ঘুরতে গিয়ে জ্যাকেট আটকে গেল একটা ঝোঁপের বেরিয়ে থাকা ভাঙা ডালের মাথায়। টান দিয়ে সেটা ছাড়িয়ে নিয়ে প্রায় ছুটে চললেন।

মিসেস মারলো, পেছন থেকে চেঁচিয়ে বললাম, কবরের প্রহরীর কাজ নয়তো?

যেন দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন তিনি। ফিরে তাকালেন, রবিন, তোমার ভালর জন্যেই বলছি, হান্টার রিজের ওপরে পাহাড়ের মাথায় যেয়ো না কখনও। তোমার মা আর বাবাকে বোলো, তারাও যেন না যান। বলবে, আমি বলেছি।
কেন যাব না, মিসেস মারলো? জিজ্ঞেস করলাম।
এত কথা জানার দরকার নেই। যা বলছি, করবে।

.
কি করব বুঝতে পারলাম না। সবাই খালি পাহাড়ের মাথায় যেতে মানা করে। নাস্তার পর খানিকক্ষণ হারলে ক্রীক থেকে ঘুরে এলাম। বঁড়শি দিয়ে মাছ ধরার চেষ্টা করলাম।
দুপুরবেলা বাড়িতে খেতে এলাম। মাকে তখনও বলিনি মরা র‍্যাকুনটার কথা। বললেই সরিয়ে ফেলবে। ওটাকে ওই অবস্থায় নিনাকে দেখানোর ইচ্ছে আমার। আমি জানতাম, ও আমাদের বাড়িতে আসবেই।
ঠিকই এল। দুপুরের পর। এত দেরি করল কেন, জানতে চাইলাম? বলল, স্কুলে গিয়েছিল।
রাতের ঘটনার কথা জানালাম ওকে। র‍্যাকুনটার কথা বললাম। দেখতে চাইল সে। নিয়ে গেলাম সেলারে।
নিচে নামলাম দুজনে। শক্ত মার্টিতে পায়ের ছাপ পড়েনি। অতএব কুকুরটাই খুন করেছে কিনা, নিশ্চিত হওয়া গেল না।
গম্ভীর হয়ে দীর্ঘ সময় নিয়ে মরা র‍্যাকুনটাকে দেখল নিনা।
পরামর্শ চাইলাম, কি করা যায় এটাকে, বলো তো?
ও বলল, এক কাজ করি, কবর দিয়ে দিই।
প্রস্তাবটা পছন্দ হলো আমার। আমাদের বাড়ির পেছনে একটা কবর খুঁড়লাম দুজনে মিলে। তারপর মরা র‍্যাকুনটাকে তুলে এনে কবর দিলাম। রক্ত শুকিয়ে জমাট বেঁধে আছে গায়ে। অনেকক্ষণ আগে মরেছে, শক্ত হয়ে গেছে লাশ। কেমন। ঘিনঘিন করতে লাগল। ভালমত মাটি চাপা দিয়ে হাত ধুয়ে এলাম। ফিরে এসে দেখি, ডাল দিয়ে একটা ক্রুশ বানিয়ে কবরে পুঁতে দিয়েছে নিনা।
জিজ্ঞেস করলাম, এটা কেন? ব্যাকুনটা কি খ্রীষ্টান ছিল নাকি?
না সেজন্যে নয়, দিলাম অন্য কারণে। অনেক সময় ভূতে মারা প্রাণীও ভূত হয়ে যায়। কবর থেকে উঠে এটাও যাতে ভূত হতে না পারে সেজন্যে ক্রুশ গেঁথে দিলাম। এই বাধা ডিঙিয়ে যত চেষ্টাই করুক, আর ওঠার সাধ্য হবে না।
কোন মন্তব্য করলাম না। বিকেল প্রায় শেষ। আলো কমে আসছে। শৈলশিরার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, প্রহরী কি ওপরেই থাকে সব সময়? কখনও নিচে নামে না?।

এতদিন তো, তাই জানতাম।
তাহলে কিসে মারল র‍্যাকুনটাকে?
বুঝতে পারছি না, মাথা নাড়তে নাড়তে জবাব দিল নিনা, সত্যিই আমি কিছু বুঝতে পারছি না, রবিন! সব সময় মৃত্যুপুরীর কাছাকাছি থাকে ওটা। দূরে যায় না। লোকালয়ে মানুষের ঘরের কাছে যেতে কেউ কখনও দেখেনি ওটাকে। আমাদের বাড়িটার দিকে ফিরে তাকাল সে। সেলারের দিকে তাকাল। আমার প্রশ্ন, এখন কেন নামল? আর তোমাদের বাড়িতেই বা কেন? সানগ্লাস খুলে নিয়ে ওটার একটা উঁটি কামড়াতে লাগল। গভীরভাবে চিন্তা করছে বোঝা যায়।
জানার একটাই উপায়, নিনা।
কি?
পাহাড়ের মাথায় উঠে দেখতে হবে।
আরেকটু হলে হাত থেকে চশমাটা ফেলে দিয়েছিল নিনা। মাথা খারাপ! কবরের প্রহরী মৃত্যুপুরীতে যাবে!
না গেলে জানব কি করে?
জানার দরকারটা কি?
এত কৌতূহল আর চেপে রাখতে পারছি না। তা ছাড়া এর একটা বিহিত করা দরকার। এতদিন লোকালয়ে আসত না। এখন আসতে আরম্ভ করেছে। কাল। ব্যাকুন মেরেছে, আজ কিংবা দুদিন পর যে মানুষ মারবে না তার নিশ্চয়তা কি?
মারলে কি করার আছে?
ঠেকাতে হবে ওটাকে।
পারলে তুমি ঠেকাওগে। আমি এর মধ্যে নেই।
ঘটনাটা কি, নিনা? এত ভীতু তো মনে হয় না তোমাকে?
আমি জানি খোঁচাটা লাগবে ওর। মাথা উঁচু করে সোজা হয়ে দাঁড়াল। আমি ভীতু, না?
নইলে কি?
আমি ভীতু?
যেতে যখন চাও না, ভীতুই তো। তবে তুমি যাই বলো আর না বলো, আমি ওপরে যাবই। ওই মৃত্যুপুরী না দেখে আমার শান্তি নেই।
নিনার চোখ দুটো দ্বিগুণ হয়ে গেল। কারও ঢোকার সাধ্য নেই ওখানে। সব সময় পাহারা দেয় কুকুরটা। যদি ঢোকো, কোনদিন আর বেরোতে পারবে না।
আমি যাব, গোঁয়ারের মত বললাম। মরার সময় হলেই কেবল ওখানে ঢুকত ইনডিয়ানরা, সেজন্যে আর বেরোত না। সুস্থ অবস্থায় কেউ নিশ্চয় ঢুকে দেখেনি বেরোতে পারে কিনা?

কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেও বলল না নিনা।
আমি আজই যাব, জেদ চেপে গেছে আমার তখন, অন্ধকার হওয়ার আগেই। তুমি যাবে।
না বলার জন্যে মাথা নাড়তে গিয়েও থেমে গেল সে। সানগ্লাসটা তাড়াতাড়ি পরে ফেলে বলল, যাব।
তোমার সাহস আছে। হাসলাম ওর দিকে তাকিয়ে।
সাহস না, যা করছি আমরা, এটা স্রেফ পাগলামি! কপালে খারাপি আছে আজ আমাদের!
সে দেখা যাবে।
শৈলশিরায় উঠে এলাম আমরা। আগে আগে পথ দেখিয়ে চলল নিনা। এখানকার প্রতিটি রাস্তা, গলিঘুপচি ওর চেনা। পায়ে চলা সরু পথগুলো ঢেকে আছে ঝরা পাতায়। দুপাশে কোথাও গাছপালা, ঝোঁপঝাড়, কোথাও একেবারে খালি। শুধু বড় বড় ঘাস। নিনা সঙ্গে এসেছে বলে মনে মনে নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিলাম। ও না এলে পথ খুঁজে বের করাই মুশকিল হয়ে যেত।
তবে ভয় যে পাচ্ছে ও, স্পষ্ট বুঝতে পারছি। সে একা নয়, আমিও পাচ্ছি। বিকেল শেষ হয়ে এলেও পাহাড়ের ওপরে তখনও রোদ আছে, বেশ আলো। কিন্তু দিগন্তে যে মেঘ জমেছে সেটা লক্ষ করিনি। যখন করলাম, দেরি হয়ে গেছে তখন। ছড়িয়ে পড়ে ঢেকে দিল সূর্যকে। ধূসর করে দিল আকাশের রঙ। বার বার আকাশের দিকে তাকাতে লাগলাম। বোধহয় সেজন্যেই রাস্তার দিকে ভাল করে নজর দিতে পারিনি। একটা মোড় নিয়ে আচমকা দাঁড়িয়ে গেল নিনা। এখান থেকে সোজা পাহাড়ের মাথায় উঠে গেছে রাস্তাটা। মুহূর্তে অনুমান করে নিলাম এই পথের। মাথায়ই কুকুরটাকে দেখেছিল ও।
যেতে চাও, এখনও বলো? জিজ্ঞেস করল নিনা!
দ্বিধায় পড়ে গেলাম। এত তাড়াতাড়ি যে মেঘে ঢেকে অন্ধকার হয়ে যাবে ভাবিনি।
কি বলো, ফিরে যাব? আবার প্রশ্ন করল নিনা।
না, মনে সাহস এনে বললাম, এতদূর এসে ফিরে যাব না। এতক্ষণেও তো কিছু ঘটল না।
বোকার মত কথা বলে ফেলেছি সেটা আমিও বুঝলাম, নিনাও বুঝল, কিন্তু কিছু বলল না। মৃতের গুহার কাছেই যাইনি তখনও, ঘটবে কি? তবু কথাটা বললাম নিজের মনে সাহস রাখার জন্যে।
পথ বেয়ে উঠতে থাকলাম আমরা। শেষ মাথায় পৌঁছে থামলাম। আরেকটা পথ পাওয়া গেল। সেটা ধরে আরও ওপরে উঠতে লাগলাম। কিছুদূর ওঠার পর বড় বড় কতগুলো পাথরের পাশ কেটে কখনও মোচড় দিয়ে কখনও বা মোড় নিয়ে

এগিয়েছে পথটা। পাহাড়ের মাথার কাছে পৌঁছে গেছি আমরা ফিরে তাকিয়ে দেখি অনেক নিচে হারলে ক্রীকের নীল জল। বাকি সব কিছু গাছপালার আড়ালে ঢাকা পড়েছে।
আরও ওপরে উঠতে থাকলাম। পথ ক্রমে সরু হয়ে আসছে। বড় বড় কতগুলো গাছের ভেতর দিয়ে গিয়ে শেষ হলো এই পথটাও। সামনে বেশ বড় একটা আয়তাকার জায়গায় ঘাস জন্মে আছে। তিনপাশ ঘিরে আছে ঘন ঝোঁপঝাড়, গাছপালা; আর বাকি একপাশে পাহাড়ের দেয়াল, খাড়া হয়ে উঠে গেছে ওই পথটা ছাড়া আর কোনদিক দিয়ে জায়গাটাতে ঢোকার উপায় নেই। ঠিক মাঝখানে জন্মে আছে বিশাল এক ওক। গাছটা এতই বড়, পুরো জায়গাটাতে তার ছায়া পড়ে।
নিনা বলল, আয়তাকার জায়গাটাই ইনডিয়ানদের কবরস্থান গাছের পেছনে একটা গুহামুখ দেখা গেল। সেটা মৃত্যুপুরীতে ঢোকার পথ। পাহাড়টা দেখেই অনুমান করা যায়, সুড়ঙ্গটা অনেক গম্ভীর হবে।
কবরস্থানে ঢোকার জন্যে পা বাড়াল নিনা। বাধা দিলাম আমি।
বাকা হেসে বলল সে, এবার বোঝো, ভীতুটা কে?
ভয় আমি পাইনি, বললাম বটে, কিন্তু আমি জানি কথাটা পুরোপুরি সত্যি নয়। কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে প্রায় ফিসফিস করে বললাম, মা বলেছে, এই কবরস্থানে ঢোকার সময় কোনমতেই যেন অশ্রদ্ধা করা না হয়।
বেশ, তুমিই তাহলে আগে যাও। কি করে শ্রদ্ধা করতে হয় আমি জানি না, সরে জায়গা করে দিল আমাকে নিনা।
সরাসরি না ঢুকে গাছপালার কিনার ধরে ঘুরে রওনা হলাম আমরা। গুহামুখের কাছাকাছি গিয়ে ফিরে তাকালাম বিশাল ওকগাছটার দিকে। গোড়া থেকে কিছুটা ওপরে একটা ফোকর। হাত তুলে দেখালাম নিনাকে।
এই এলাকার সবচেয়ে বড় গাছগুলোর একটা ওটা, নিনা বলল। ভেতরটা ফোপরা। ইচ্ছে করলে ঢুকে বসে থাকতে পারো। আমি শুনেছি, পুরো একটা ফুটবল টীম ঢুকে থাকতে পারে ওর মধ্যে।
তাহলেই বোঝো, মানুষ কি রকম বানিয়ে কথা বলে, বললাম। ঢুকতে পারবে বড়জোর দুতিনজন, লোকে বলে এগারোজন। দেখবে, মৃত্যুপুরীর ব্যাপারটাও ওরকম। অনেক বাড়িয়ে বলা হয়েছে।
পাথরের দেয়ালে অনেক বড় একটা কালো গহবরের মত হয়ে আছে। গুহামুখটা। ভেতরে উঁকি দিলাম।
বেশি অন্ধকার, নিনা বলল। কিছু দেখতে পাচ্ছি না। চলো, বাড়ি চলে যাই।

টর্চ নিয়ে এসেছি, অসুবিধে নেই, বললাম ওকে। কিন্তু তাতেও খুশি হতে পারল না ও।
গুহার ভেতরে কয়েক কদম এগিয়েই থেমে গেলাম। পেছনে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি কালো অন্ধকারে ঢেকে গেছে। অথচ গোধূলিও শেষ হয়নি তখনও। মেঘের কারণে অবেলায় সন্ধ্যা। যাই হোক, এই অন্ধকারের মানে আমাদের জানা। কুকুরটার বেরোনোর সময় হয়েছে। দেখার সময় বেশি পাব না।
ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারপাশে আলো ফেললাম। ভেতরের বাতাস ঠাণ্ডা, ভেজা ভেজা। পাথরের গায়ে শ্যাওলা জন্মে আছে।
কিছু দেখতে পাচ্ছ? এমন করে কানের কাছে কথাটা বলল নিনা চমকে গেলাম।
না, ফিসফিস করেই জবাব দিলাম। চলো, এগোই
মাটি তেমন শক্ত না হলেও পাথরের ছড়াছড়ি। যতই ভেতরে এগোলাম, মাথার ওপর উঁচু হতে থাকল ছাত। গুহা না বলে ওটাকে মস্ত এক সুড়ঙ্গ বলাই উচিত। কারণ লম্বা হয়ে আছে। কিছুটা এগোনোর পরই বাক নিল দেয়াল। পেছনে আড়ালে চলে গেল গুহামুখ। অদৃশ্য হয়ে গেল বাইরের পৃথিবী। আকাশ চোখে পড়ে না আর। আলো বলতে এখন শুধু টর্চের ওপর ভরসা। আপনাআপনি আঙুলগুলো শক্ত হয়ে চেপে বসল তাতে। আলো না থাকলে এখানে কি যে ঘটবে কল্পনা করারও সাহস হলো না।
কিন্তু টর্চের আলো সাহস জোগাতে পারল না বেশিক্ষণ। ঘাড়ের রোম খাড়া হয়ে উঠল আমার। মনে হলো কেউ যেন আড়ালে থেকে আমাদের ওপর নজর রাখছে।
চারপাশে তাকালাম। সবখানে আলো ফেলে দেখলাম। একপাশে বড় বড় পাথরের চাঙড়। ভাবলাম, ওগুলোর ওপাশে লুকিয়ে নেই তো? কিন্তু বেরোল না কোন জানোয়ার বা আর কিছু। নজর রাখা হচ্ছে-এই অনুভূতিটাও গেল না আমার। বরং মনে হলো যা-ই হোক, সঙ্গে সঙ্গে এগোচ্ছে ওটা।
আচমকা আমার হাত খামচে ধরল নিনা।
কি? জিজ্ঞেস করলাম।
শুনছ না? ফিসফিস করে বলল ও।
কান পাতলাম। প্রথমে কিছু শুনলাম না তারপর মনে হলো, হ্যাঁ, শুনছি। বললাম, মৃদু গুঞ্জনের মত না?
মাথা ঝাঁকাল নিনা।
আরেকটু এগোলাম।
গুঞ্জনটা হয়েই চলেছে। বাড়ছে আস্তে আস্তে। যতই এগোলাম, আরও স্পষ্ট হয়ে এল।

দাঁড়িয়ে গেলাম। নিনাও দাঁড়াল আমার সঙ্গে।
এখন আর গুঞ্জন নয়। মনে হলো একটা কণ্ঠ, সুর করে রঅবিন! রঅবিন বলে নাম ধরে ডাকছে আমাকে।
পরস্পরের দিকে তাকালাম আমরা।
তোমাকে চেনে ওটা, নিনা বলল। ওর বাদামী চোখ দুটোতে ভয়, বড় বড় হয়ে গেছে। ও জানে তুমি এখানে এসেছ!
রঅবিন, এসো! রবিন, এসো! বলছে একটা জড়ানো কন্ঠ, কিছুতেই স্পষ্ট হচ্ছে না। তবে মানুষের গলা যে নয়, তাতে কোন সন্দেহ নেই।
চলো; পালাই! নিনা বলল। আরও জোরে আঁকড়ে ধরেছে আমার হাত। ওটা তোমাকে চেনে। তোমার কাছে কিছু চায়। ভয় লাগছে আমার রবিন, চলো চলে যাই!
গুহামুখের কাছে টেনে নিয়ে চলল আমাকে ও। অনেক পেছনে ফেলে এসেছি ওটা।
ভয় আমিও পেয়েছি। বার বার আমার নাম ধরে ডেকেই চলল কণ্ঠটা, রঅবিন, এসো!
চোখ বুজে ফেললাম। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত বুঝতে পারলাম না কি করব? কল্পনায় ভেসে উঠল মিসেস মারলোর সকাল বেলাকার ভীত মুখ। কানে বাজতে লাগল নিনার কথা–মৃত্যুপুরী থেকে কেউ কোনদিন জীবিত বেরোতে পারেনি। নিজের অজান্তেই হাত চলে গেল গলার কাছে, কালো গুটির মালাটা চেপে ধরলাম। আমার জায়গায় যদি কোন মোহক বীর হতো, কি করত এই পরিস্থিতে পড়লে? মন থেকে পেয়ে গেলাম জবাবটা।
আমি ফিরে যাব না, নিনাকে বললাম। দেখতেই হবে সামনে কি আছে। কেন আমার নাম ধরে ডাকে, কি চায়, জানতে হবে।
কি আর চাইবে? তোমাকে খুন করতে চায়, নিনা বলল। দুজনকেই খুন করবে। সময় থাকতে চলো পালাই।
যেতে ইচ্ছে করলে তুমি চলে যাও আমি এগোব। কবরের প্রহরী
তাহলে আমিও যাব তোমার সঙ্গে।
আবার এগিয়ে চললাম আমরা। সুড়ঙ্গের গভীর থেকে গভীরে। মাথার ওপরে ভেজা চুনাপাথরের ছাত! মৃত্যুর সময় হলে যারা এখানে চলে আসত সেই সব ইনডিয়ান যোদ্ধাদের কথা ভাবলাম,। জোর আনলাম মনে-ওরা আসত সময়মত; আর আমাদের সময়ই হয়নি এখনও, আমার এবং নিনার। সুতরাং বেরোতে পারব না কেন?

হঠাৎ তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার প্রতিধ্বনি তুলল গুহার দেয়ালে। চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে তাকালাম। নিনা চিৎকার করেছে। আবার চেঁচিয়ে উঠল সে। আবার। হাত তুলল। থরথর করে কাঁপছে। আমার পেছনে দেখাল।
তাকালাম সেদিকে। মাটিতে রেখেছিলাম টর্চের আলো, ওপর দিকে তুলতে লাগলাম। দুটো প্রবেশ পথ দেখতে পেলাম, সুড়ঙ্গমুখ–একটা আমাদের ডানে, আরেকটা বায়ে। দুটো পথের মাঝখানে দেয়ালের গা থেকে বেরোনো চ্যাপ্টা পাথরে বসে আমাদের দিকে তাকিয়ে নিষ্প্রাণ কুৎসিত হাসি হাসছে যেন একটা মানুষের খুলি।

.
চিৎকার করেই চলেছে নিনা। তাতে আরও ঘাবড়ে গেলাম আমি। হাত গেল কেঁপে। টর্চটা মাটিতে পড়ে নিভে গেল। ঘুটঘুঁটে অন্ধকারে চিৎকার বাড়ল ওর। হাতড়ে হাতড়ে ওটা তুলে নিয়ে ঝাঁকি দিতে জ্বলে উঠল আবার।
চেঁচানো বন্ধ হলো ওর। প্রলাপ বকার মত বলতে লাগল, তখনই বলেছিলাম আসা উচিত না, উচিত না, তাও এলে!
ও তো একটা খুলি, যেন কিছুই না এ রকম একটা ভঙ্গি করে আমিও যে ভয় পেয়েছি সেটা চাপা দিয়ে রাখতে চাইলাম।
কি বলছ!
তো আর কি? বহুদিন আগে মারা গিয়েছিল লোকটা।
কি করে বুঝলে?
তুমিই তো বলেছ মৃত্যুর সময় হলে এখানে এসে ঢুকত ইনডিয়ান যোদ্ধারা। সে তো অনেক কাল আগের কথাই।
খুলিটার ওপর আবার আলো ফেললাম আমি। স্কুলের বায়োলজি ক্লাসে কঙ্কাল দেখেছি, খুলিও। জানি ওগুলো দেখতে কেমন হয়। কিন্তু গুহার মধ্যের খুলিটাকে অন্য রকম লাগল। চোখের জায়গার গর্ত দুটো যেন আমাদের দিকেই তাকিয়ে আছে। দাঁত বের করে হাসছে বিকট হাসি।
খুলিটার নিচে দুই পাশের দুটো সুড়ঙ্গমুখে আলো ফেলে, দেখতে লাগলাম।
রবিন, নিনা বলল, আমার ধারণা খুলিটা ওখানে রাখা হয়েছে কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে। আমাদের সাবধান করার জন্যে। যাতে ভেতরে না ঢুকি।
এতদূর এসে ফিরে যাব, সাধারণ একটা খুলির ভয়ে? আমি বললাম।
মৃত্যুপুরীতে একটা খুলিও ভয় পাওয়ার জন্যে যথেষ্ট, নিনা বলল। তা ছাড়া। কোন পথটা দিয়ে ঢুকতে হবে আমরা, কি করে বুঝব?
সুড়ঙ্গমুখ দুটোর দিকে তাকিয়ে আছি। দেয়ালের গায়ে কালো দুটো ফোকর। আবার তাকালাম খুলিটার দিকে। চ্যাপ্টা যে পাথরটাতে বসানো তার নিচে

আরেকটা গোল পাথর আছে দেখতে অনেকটা চাকার মত। এ রকম আকৃতির। পাথর আর কখনও দেখিনি।
ডানের ফোকরটা দিয়ে বললাম, চলো, ওটাতে ঢুকি।
কেন?
দুজনে দুটোতে ঢুকতে চাও নাকি? আমি ডানেরটায়, তুমি বায়েরটায়?
মাথা খারাপ! একা আমি কিছুতেই যাব না। আর আমার কাছে টর্চও নেই।
আমিও জানি সেটা। অন্ধকারে সুড়ঙ্গে ঢোকা অসম্ভব।
ডানেরটাতেই ঢুকলাম দুজনে। মুখটা এত ছোট, হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে হলো। তবে কয়েক হাত এগোনোর পর আস্তে আস্তে চওড়া হয়ে গেল। ছাতও উঠে গেল উঁচুতে। সোজা হয়ে হাঁটা যায়। সুড়ঙ্গে অনেক মোড় আর বাক। ঘোরপ্যাঁচও প্রচুর। কয়েক মিনিট হাঁটার পর নিনা জিজ্ঞেস করল, রবিন, একটা জিনিস লক্ষ করেছ?
এদিক ওদিক তাকালাম, কি?
শব্দটা কমে গেছে।
কোন শব্দ?
তোমাকে যে ডাকছিল?
কান পাতলাম। তাই তো। ঠিকই বলেছে নিনা। খুলিটা দেখার পর শব্দের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। অনেক কমে গেছে শব্দটা। যদিও একনাগাড়ে ডেকে যাচ্ছে তখনও, রঅবিন! রঅবিন! রবিন!
সুড়ঙ্গের ভেতরে যতই এগোলাম আরও কমে এল শব্দ।
মনে হলো ভয় অনেকটা কমেছে নিনার। আমারও সাহস ফিরে এসেছে কিছুটা। শব্দ কমছে, তার মানে শব্দের উৎস থেকে দূরে সরে যাচ্ছি আমরা। কয়েক মিনিটের মধ্যে একেবারেই শোনা গেল না আর ডাকটা। পুরোপুরি নীরব।
কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে তাকালাম। পেছনে হাঁটছে নিনা। আমার দিকে তাকাল ও। আবার ভয় দেখা দিয়েছে চোখের তারায়। ডাকটা শোনার পর চমকে গিয়েছিলাম। আস্তে আস্তে সয়ে এসেছিল ওটা। একেবারে যখন থেমে গেল, অখণ্ড নীরবতা আবার অস্বস্তি বাড়িয়ে দিল আমাদের। মনে হতে লাগল, শব্দটা থাকলেই যেন ভাল হতো। আমার গা ঘেষে এল নিনা।
সামনে একটা বড় গুহায় বেরিয়ে এলাম আমরা। মেঝেতে টর্চের আলো ফেলেই স্থির হয়ে গেলাম। রাশি রাশি কঙ্কাল। তাকিয়ে রইলাম হাঁ করে। বুঝতে পারলাম, মৃত্যুর সময় হলে ওখানেই গিয়ে বসে থাকত ইনডিয়ানরা।
এত আওয়াজ কোরো না, ফিসফিস করে বললাম ওকে।
আওয়াজ কে করছে?
জুতো ঘষছ না...?

কথা শেষ করতে পারলাম না। আমার গায়ের ওপর এসে পড়ল নিনা। কিসে করছে… বলতে গেল। কিন্তু ওকেও কথা শেষ করতে দিলাম না আমি। চুপ করে থাকতে বললাম।
হালকা পায়ে হাঁটার শব্দ কানে আসছে।
আমার কানে কানে বলল নিনা, আমাদের সামনে থেকে আসছে!
যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, তার উল্টো দিকে গুহার দেয়ালে আরেকটা ফোকর। সুড়ঙ্গমুখ। তার ভেতরে হচ্ছে শব্দটা।
কান পাতলাম। এগিয়ে আসছে। পায়ের শব্দ, সন্দেহ নেই, কিন্তু শব্দটা যেন কেমন?
বুঝে ফেললাম। ওই শব্দ আমার পরিচিত। মানুষের পায়ের নয়। রাতের বেলা সেদিন আমাদের ঘরের কাছে শুনেছি।
নিনা! ফিসফিসিয়ে বলার কথা ভুলে গিয়ে চিৎকার করে উঠলাম। আমি জানি ওটা কিসের শব্দ। গত রাতে শুনেছি! ওটা…
ভূত! নিনাও চিৎকার করে উঠল।
কে যে আগে দৌড় দিল, মনে নেই। শুধু মনে আছে প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে ঝেড়ে দৌড় দিয়েছি আমরা পেছন ফিরে।
দৌড়াচ্ছি, দৌড়াচ্ছি, দৌড়াচ্ছি। ভূতটাও আসছে আমাদের পিছু পিছু।
আরও জোরে দৌড়াতে লাগলাম। আগে আগে ছুটছে নিনা। দৌড়ের রেকর্ড ভঙ্গ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যেন ও। কিন্তু তাতেও কুকুরটার সঙ্গে কুলাতে পারছে । আমাদের তাড়া করে না। নিশ্চয় আমাদের গন্ধ পেয়ে বুঝেছে আমরা সুড়ঙ্গে ঢুকেছি। ধরতে আসছে তাই।
জলদি, রবিন, আরও জোরে! চিৎকার করে তাগাদা দিল নিনা। ওই যে সুড়ঙ্গমুখ!
এত জোরে হাঁপাতে লাগলাম মনে হলো বুকটা ফেটে যাবে। আর কত জোরে ছুটব? সামনে বেশি দূরে নেই আর সুড়ঙ্গমুখ। মাথায় ঠোকর খেলাম। নিচু হয়ে গেছে ছাত। চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে কুকুরের মত ছুটলাম।
খোলা মুখটা দিয়ে বেরিয়ে গেল নিনা। লাফিয়ে সোজা হয়ে উঠে দৌড় দিল গুহামুখের দিকে। ওখানে পৌঁছতে পারলেও লাভ হবে না। বাইরে নিশ্চয় এখন রাত। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটাও বেরোবে। যদি না থেমে বাইরেও আমাদের তাড়া করে? পারব না ওটার সঙ্গে। সহজেই ধরে ফেলবে। ওটাকে ঠেকাতে চাইলে আটকাতে হবে। আর সেটা গুহার বাইরে গিয়ে হবে না। যা করার ভেতরে থাকতেই করতে হবে। কিন্তু কি করব?
গোল পাথরটার দিকে তাকিয়ে একটা বুদ্ধি এল আমার মাথায়। ডাক দিলাম, নিনা।

থামার একবিন্দু ইচ্ছে নেই ওর, তবু ফিরে তাকাল। ওকে কাছে আসতে বলে একধার থেকে ঠেলতে আরম্ভ করলাম পাথরটা।
কি করছ? চিৎকার করে বলল নিনা। জলদি এসো! ওটা আমাদের ধরে ফেলবে!
পাথর দিয়ে সুড়ঙ্গমুখ বন্ধ করে দেব। বেরোতে না পারলে আর ধরবে কি করে?
কুকুরটার নিঃশ্বাসের শব্দও কানে আসছে তখন। নিনাকে বললাম, চলে এসেছে ওটা। এসো, হাত লাগাও, আমাকে সাহায্য করো।
সেও এসে ঠেলতে শুরু করল। নড়ে উঠল পাথরটা। আরেকটু...আর একটু... তাহলেই বন্ধ হয়ে যাবে সুড়ঙ্গমুখ। ঠেলতে থাকলাম প্রাণপণে।
চলে এসেছে তো! ককিয়ে উঠে পাথর ছেড়ে দিয়ে আবার দৌড় মারল নিনা।
জোরে এক ঠেলা মেরে গড়িয়ে দিলাম পাথরটা। সুড়ঙ্গমুখে বসে গিয়ে আটকে দিল ফোকরটা।
আরে এসো না! কাঁধের ওপর দিয়ে তাকিয়ে আবার চিৎকার করে ডাকল নিনা।
কিন্তু আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। সামান্য একটু ফাঁক রয়ে গেছে সুড়ঙ্গমুখে। সেটা দিয়ে ভেতরে উঁকি দিলাম। দুর্গন্ধ মেশানো গরম নিঃশ্বাস এসে যেন ধাক্কা মারল নাকেমুখে। জ্বলজ্বলে দুটো চোখ সোজা তাকিয়ে আছে আমার চোখের দিকে। হাঁ করা মুখে বড় বড় ধারাল দাঁত। পাথরের জন্যে আটকা পড়েছে দেখে এত জোরে হাঁক ছাড়ল, মনে হলো কানের পর্দা ফেটে যাবে আমার। অন্যপাশের সুড়ঙ্গে প্রতিধ্বনি তুলল সেই চিৎকার।
আর দেখার সাহস পেলাম না। দৌড় দিলাম নিনার পেছনে।
দৌড়াতে দৌড়াতে ভাবছি, পাথর গলে কি চলে আসতে পারবে ওটা? স্বাভাবিক জানোয়ার হলে হয়তো পারবে না। কিংবা পারতেও পারে। যে বিরাট শরীর, প্রচণ্ড শক্তিতে পাথরটা. ঠেলে ফেলেও দিতে পারে। কিন্তু যদি ভূত হয়, তাহলে পাথর কেন, পাহাড়ও ঠেকাতে পারবে না ওটাকে। ঠিক পার হয়ে চলে। আসবে।
পাথরের অন্যপাশে থেকে গর্জন করছে ওটা। ফিরে তাকালাম পাথরটা তখনও দাঁড়িয়েই আছে। তারপর কানে এল আরেকটা চাপা ভারী শব্দ। আমাদের দুইপাশের দেয়াল, ছাত কাঁপতে শুরু করল। মনে হলো যেন ভূমিকম্প। পায়ের নিচে মাটি কাঁপছে। ছাত থেকে ছোট ছোট পাথর খসে পড়তে লাগল।
গুহামুখের কাছে পৌঁছে গেছে নিনা। আমি তখন অনেক পেছনে। ও যখন ছুটে বেরিয়ে গেল মুখটা দিয়ে, তখনও আমি ভেতরে।
প্রচণ্ড ঘেউ ঘেউ করেই চলেছে কুকুরটা। থরথর করে কাঁপছে মৃত্যুপুরী। ছাত থেকে, চতুর্দিকের দেয়াল থেকে বৃষ্টির মত খসে পড়ছে পাথর। যেন ভূমিধস শুরু হয়েছে। ঘাবড়ে গেলাম ভীষণ। পাহাড়ের দেয়াল ধসে পড়ে আমাকে চাপা দেবে নাকি?

বাইরে থেকে নিনার ডাক শোনা গেল, রবিন, বেরোচ্ছ না কেন এখনও?
হঠাৎ যেন বোমা ফাটল। ফিরে তাকিয়ে দেখি, সুড়ঙ্গমুখের দেয়াল থেকে বিরাট এক পাথর খসে পড়েছে। ওটার ধাক্কায় সরে গেছে গোল পাথরটা। কামানের গোলার মত ছিটকে বেরিয়ে এল বিশাল একটা কালো শরীর। ভয়ানক রাগে গর্জন করতে করতে তেড়ে এল আবার।
ততক্ষণে গুহামুখের কাছে পৌঁছে গেছি আমি। দুই লাফে বেরিয়ে গেলাম। আকাশে তখন তারা ফুটেছে। চিৎকার করে ডাকলাম, নিনা, আই নিনা, কোথায় তুমি?
এই যে এখানে! জবাব এল। গাছের ভেতরে!
একটা মুহূর্তও দেরি করলাম না! দৌড় দিলাম কবরস্থানের মাঝখানে ওকগাছটার দিকে। পেছনে ঘেউ ঘেউ করছে কুকুরটা।
রবিন, ধরে ফেলল তো! জলদি করো না। গুঙিয়ে উঠল নিনা।
গাছের ফোকরটা দেখতে পাচ্ছি। মাটি থেকে বেশ কয়েক হাত ওপরে। প্রাণের তাগিদে মানুষ যে কত অসাধ্য সাধন করে, তার প্রমাণ পেলাম সেদিন। তড়াক করে এক লাফ দিয়ে ধরে ফেললাম ফোকরটার ঠিক নিচের একটা ডাল দোল দিয়ে শরীরটাকে তুলে নিলাম ওপরে। পা ঢুকিয়ে দিলাম ভেতরে। আমাকে টেনে নিল নিনা।
গাছের গায়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল কুকুরটা। আমাদের মত হাত নেই, তাই ডাল ধরতে পারল না। বার কয়েক লাফ দিয়ে চেষ্টা করল, কিন্তু ফোকরটার কাছে পৌঁছতে পারল না।
কি করছে ওটা দেখার কৌতূহল চাপা দিতে পারলাম না। নিনার বাধা অগ্রাহ্য করে আস্তে গলা বাড়িয়ে উঁকি দিলাম।
অন্ধকারেও জ্বলজ্বল করছে দুটো চোখ। সোজা তাকিয়ে আছে ফোকরটার। দিকে। আমি তাকাতেই চোখে চোখ পড়ল। ভয়ঙ্কর গর্জন করে লাফ দিল আবার। ঝট করে মাথা নিচু করে ফেললাম।

.

মৃত্যুপুরীর কাছে এক প্রাচীন কবরখানায় গাছের ফোকরে বসে রইলাম দুজনে। শুনতে লাগলাম কুকুরটার তর্জন-গর্জন। যখনই ওটার আস্ফালন বেড়ে যায়, গলার কালো গুটির মালাটা চেপে ধরি। এত ভয়ঙ্কর পরিস্থিতেও কখন যে ঘুমিয়ে পড়লাম, জানি না। ঘুম ভাঙলে দেখি ভোর হয়ে গেছে। চলে গেছে কবরের প্রহরী। যাবেই। নিনা বলেছে, সূর্য ডোবার পরে বেরোয় ওটা, আবার সূর্য উঠলে চলে যায়।

বাড়ি ফিরে সত্যি কথাটা বলতে পারলাম না মাকে, ভয়ে। শুনলে রেগে যাবে। জানালাম, রাত কাটিয়েছি নিনাদের বাড়িতে। মাকে না বলে গিয়ে অন্যখানে থাকার জন্যে বকা খেতে হলো। চুপ করে রইলাম।
দুপুরের পর স্কুল শেষ করে নিনা এল। মা দেখার আগেই তাকে ডেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে বললাম, রাতে কবরস্থানে থাকার কথা যেন বলে না দেয়।
ও বলল, বলবে না। তার মাকেও সে মিথ্যে বলেছে–রাতে আমাদের বাড়িতে থেকেছে।
আমাকে হার্ব গ্যাটলিঙ নামে একজনের বাড়িতে নিয়ে যেতে এসেছে সে। ওদের পড়শী। নাম শুনেই বুঝলাম, লোকটা ইনডিয়ান।
নিনা জানাল, ও একজন শামান। সেনিকা ইনডিয়ান। শামান মানে জানো তো? ওঝা, কবিরাজ। খুব জ্ঞানী লোক। আমার মনে হয় ও আমাদের সাহায্য করতে পারবে।
গেলাম নিনার সঙ্গে। ওদের বাড়ির পাশে বনের মধ্যে একটা কাঠের বাড়িতে থাকে শামান। সেটার কাছে গিয়ে বন্ধ দরজায় টোকা দিল নিনা। বেরিয়ে এল হালকা-পাতলা একজন মানুষ। লম্বা কালো চুল। গালের চামড়া কুঁচকানো, অংখ্য ভাজ। অনেক বয়েস লোকটার। নিনাকে দেখেই হাসল। ভেতরে যেতে বলল আমাদের।
ওর বাড়িটা ভারি পছন্দ হলো আমার। আমাদেরটার মত অত বড় নয়, মোটে একটা ঘর, বেশ বড়, খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ফায়ারপ্লেসের কাছে গাদা করে রাখা হয়েছে অনেকগুলো কম্বল। তার ওপর বসতে দিল আমাদের। ফায়ারপ্লেসের ওপরে কাঠের দেয়ালে ঝোলানো একটা লাল ওয়ামপাম গুটির মালা আর উজ্জল রঙের পালকে তৈরি ঝলমলে একটা হেডড্রেস, অনেকটা মুকুটের মত জিনিস, ইনডিয়ানরা যা মাথায় দেয়।
শামানের পরনে নীল জিনসের প্যান্ট, গায়ে ফ্লানেলের শার্ট। কিছুটা নিরাশই হলাম পোশাক-আশাক দেখে। আমি ভেবেছিলাম জবরজং কিম্ভুত পোশাক থাকবে। কিন্তু এ তো সাধারণ পোশাক। এই লোক কি সত্যি ভূত তাড়াতে পারবে? তবে শার্টের গলার কাছের বোতাম খুলে ভেতরের জিনিসটা দেখিয়ে দেয়ার পর কেটে গেল নিরাশা। তার গলায়ও একটা ওয়ামপাম গুটির মালা। আমারটার মত শুধু কালো গুটি নয়, নানা রঙের গুটি। মালাটাও অনেক বড়।
দীর্ঘ একটা মুহূর্ত আমার মালাটার দিকে তাকিয়ে রইল সে। চোখ দুটো তার কুচকুচে কালো, একেবারে মালার গুটির মত! জিজ্ঞেস করল কোথায় পেলে ওটা?
জানালাম, কে দিয়েছে।
ও বলল, কালো গুটি খুব ক্ষমতাশালী।

তাকে জিজ্ঞেস করলাম, শামানরা কি ওঝা, না কবিরাজ? অনেক যাদু জানে?
ধীরে ধীরে হাসি ফুটল তার মুখে। কুঁচকানো মুখের ভাঁজগুলো গম্ভীর হলো আরও। মেঝেতে বিছানো একটা কম্বলে আসনপিড়ি হয়ে বসল। বলল, যাদু আমি জানি, তবে অনেক নয়, অল্প। ইচ্ছে করলে ওরকম যাদু তুমিও দেখাতে পারো, রবিন মিলফোর্ড। হয়তো আমার চেয়ে বেশিই পারো। কারণ তোমার গলার মালাটার ক্ষমতা অনেক।
সত্যি বলছেন?
সত্যি।
তাহলে আপনি কালো গুটির মালা পরেন না কেন?
নিয়ম অনুযায়ী আমি তো পরতে পারব না কালো গুটি পরে একমাত্র বীর যোদ্ধারা।
আমি তো বীর নই। আমার পরাটা ঠিক হলো কিনা বুঝলাম না। জিজ্ঞেস করলাম, এই মালা দিয়ে কি ভূত ঠেকানো সম্ভব? কবরের প্রহরীকে বাধা দেয়া যাবে?
কবরের প্রহরীকে বাধা দেয়ার দরকারটা কি তোমার? কোথায় দেখলে ওকে?
মৃত্যুপুরীতে। কাল ওই সুড়ঙ্গে ঢুকেছিলাম আমরা।
মুহূর্তে বদলে গেল শামানের মুখের ভঙ্গি। মৃত্যুপুরীতে ঢুকেছিলে! একবার আমার দিকে একবার নিনার দিকে তাকাতে লাগল সে। তারপর আমার ওপর দৃষ্টি স্থির হলো তার। মৃত্যুপুরী থেকে কেউ বেচে ফিরতে পারে না!
কিন্তু আমরা ফিরেছি, শান্তকণ্ঠে বললাম।
আমার দিকে তাকিয়ে থেকে দৃষ্টিটা কেমন অদ্ভুতভাবে বদলে গেল তার। নজর নামাল আমার গলার মালাটার দিকে। বলল, বেঁচে ফিরেছ, তার কারণ ওই মালা। ওটাই তোমাকে বাঁচিয়ে নিয়ে এসেছে। ওটা ছিল এক মহান বীর যোদ্ধার যাকে কবরের প্রহরীও নিশ্চয় সম্মান করে। তোমাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে তোমার পূর্বপুরুষ ওই মহান বীরকে স্মরণ করো মনে মনে, তাকে ধন্যবাদ দাও। মালাটা গলায় না থাকলে এখন আর এখানে বসে কথা বলতে পারতে না।
আমি তাকালাম নিনার দিকে। ও আমার দিকে।
শামান জিজ্ঞেস করল, মালাটা কি কখনও ছুঁয়ে দেখেছ?
অবাক হলাম। ছুঁয়ে দেখেছি মানে? এই যে গলায় পরে আছি এটা কি ছোঁয়া নয়?
যখন বিপদে পড়েছ, ভয় পেয়েছ, তখন হাত দিয়ে ছুঁয়েছ?
মাথা ঝাঁকিয়ে বললাম, কাল রাতে কুকুরটা যখন তাড়া করল, তখন ছুঁয়েছি। গাছের ফোকরে যখন বসেছিলাম, আর চারপাশে চক্কর দিচ্ছিল ওটা, তখনও ছুঁয়েছি। বার বার। ভয় পেয়েছিলাম তো খুব, তাই আপনাআপনি হাত উঠে

যাচ্ছিল গলার কাছে। এমনকি আগের রাতে আমাদের বাড়ির কাছে যখন গিয়েছিল কুকুরটা, তখনও ছুঁয়েছিলাম। কেন যেন ভয় পেলেই হাত উঠে যায় মালাটার কাছে।
আবার বদলে গেল শামানের চেহারা। বিস্ময় ফুটল কালো চোখে। তোমাদের বাড়িতে গিয়েছিল প্রহরী?
গিয়েছিল। হঠাৎ একটা চিৎকার শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে দেখতে গেলাম। সেলারে উঁকি দিয়ে দেখতে চাইছিলাম কিসে চিৎকার করেছে। ওই সময় মনে হলো আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে ওটা। ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। ভেবেছি গলা কামড়ে ধরবে। কিন্তু ধরেনি। খানিক পর পেছন ফিরে দেখি কিছু নেই।
আবার কালো মালাটার দিকে নজর গেল শামানের। চুপ করে রইল। তার কালো চোখে উদ্বেগের ছায়া।
প্রহরী এ রকম কেন করল, মিস্টার গ্যাটলিঙ? জানতে চাইল নিনা। হান্টার রিজ থেকে নিচেই নামেনি আর কখনও। রবিনদের বাড়িতে কেন গেল?
কারণ রবিনের ওপর চোখ পড়েছে ওর।
তাকিয়ে রইলাম শামানের দিকে, আমার ওপর? কেন?
আঙুল তুলে মালাটা দেখাল শামান, ওটার জন্যে।
নিজের অজান্তেই হাত উঠে গেল আমার। মালাটা ছুঁয়ে দেখলাম। গায়ের সঙ্গে লেগে থাকায় গরম হয়ে আছে।
মাথা ঝাঁকিয়ে শামান বলল, ওই মালা তোমাকে রক্ষা করছে, রবিন মিলফোর্ড। আবার কবরের প্রহরীকেও আকৃষ্ট করছে। ও জেনে গেছে ওটা আছে তোমার কাছে। কখনও তোমার পিছু ছাড়বে না আর।
ঘাবড়ে গেলাম। তাহলে তো মহামুসিবত! শীত করতে লাগল। মনে হলো। একটা সোয়েটার পরে গেলে ভাল হতো। মগজে যেন কেটে বসে গেল শামানের কথা– কখনও তোমার পিছু ছাড়বে না আর! মালাটা চেপে ধরলাম গলার সঙ্গে। মনে হলো শান্তি পেলাম। ওরকম অনুভূতি আর কখনও হয়নি আমার। মুখ শুকিয়ে গেছে। কথা বলতে কষ্ট হলো। জিজ্ঞেস করলাম, কেন? আমার কাছে কি চায় ওটা?
মাথা নাড়ল শামান। কি চায় জানি না। শুধু জানি, একটা হাত তুলল সে, যেহেতু কালো মালাটা গলায় পরেই ফেলেছ, ইনডিয়ানদের নিয়ম অনুযায়ী তোমাকে এখন বীর যোদ্ধা বলে প্রমাণ করতে হবে নিজেকে। তা নাহলে ওই প্রহরী ধ্বংস করে ছাড়বে তোমাকে।
আরও শুকিয়ে গেল গলার ভেতরটা। জিজ্ঞেস করলাম, কি করলে বীর যোদ্ধা হব? এখন তো আর লড়াই হয় না যে গিয়ে যুদ্ধ করে আসব।

যুদ্ধ না করেও বীর হওয়া যায়। এমন একটা কাজ করতে হবে তোমাকে, যাতে মৃত যোদ্ধাদের আত্মা শান্তি পায়।
কাজটা কি?
তা তো বলতে পারব না।
কাজটা কি, তাই যদি না জানি, কি করে করব?
দীর্ঘক্ষণ কোন কথা বলল না শামান আমার গলার মালাটার দিকে তাকিয়ে থেকে চুপ করে ভাবতে লাগল তারপর বলল, এমন কিছু করো, যাতে বর্তমান ইনডিয়ানদের উপকার হয়। ওদের জিনিস ফেরত পায়। তাহলেই ওদের পূর্বপুরুষের আত্মা শান্তি পাবে। প্রহরীকে সরিয়ে নেবে তোমার পেছন থেকে।
.
আকাশের অবস্থা ভাল না, রাতে খাবার টেবিলে বসে মা বলল। ঝড় আসবে আজ রাতে।
আকাশে মেঘ। দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়ল সেটা। ঢেকে দিল পুরো আকাশ। বিদ্যুৎ চমকাতে আরম্ভ করল। কিন্তু সেসব দিকে আমার তেমন নজর নেই। আমি ভাবছি, কি এমন জিনিস খোয়া গেছে ইনডিয়ানদের, যেটা ফেরত এনে দিতে না পারলে কুকুরটা আমার পিছু ছাড়বে না?
খাচ্ছিস না কেন, রবিন? মা জিজ্ঞেস করল, চিন্তা করছিস নাকি কিছু?
কই, না তো, মাকে দেখানোর জন্যে তাড়াতাড়ি বেশি বেশি করে খাওয়া শুরু করলাম।
কিন্তু কয়েক চামচ গিলেই আবার বন্ধ। গলায় আটকে যেতে লাগল। কুকুরটার কথা ভেবে খাবার নামতে চাইছে না গলা দিয়ে। গুহার ভেতরে ওটার ভয়ঙ্কর চেহারা, গরম দুর্গন্ধযুক্ত নিঃশ্বাস, বড় বড় দাঁত, লাল দুটো জ্বলন্ত চোখ, ওক গাছটাকে ঘিরে ভয়াবহ গর্জন, কিছুতেই দূর করতে পারছি না মন থেকে।
কি করব? কি করে ওটাকে আমার পেছন থেকে খসাব? ভেবে কোন কূলকিনারা করতে পারলাম না। কানে বাজছে শামানের কথা–এমন কিছু করো, যাতে বর্তমান ইনডিয়ানদের উপকার হয়। ওদের জিনিস ফেরত পায়। তাহলেই ওদের পূর্বপুরুষের আত্মা শান্তি পাবে। প্রহরীকে সরিয়ে নেবে তোমার পেছন থেকে।
কি উপকার করব? যদি দেখে কিছু করছি না তো কি করবে কুকুরটা?
কারও উপকার করতে হলে তার কিসের অভাব কিংবা কোন কোন অসুবিধে সেটা আগে জানা দরকার। হাতের চামচটা নামিয়ে রেখে মাকে জিজ্ঞেস করলাম, মা, এখান থেকে সেনিকা ইনডিয়ানরা চলে গিয়েছিল কেন, জানো কিছু?
খেতে খেতে মুখ তুলল মা। অবাক হয়ে তাকাল আমার দিকে। হঠাৎ সেনিকাদের ব্যাপারে এই আগ্রহ কেন?

দরকার আছে, মা, বলো না? অনুরোধ করলাম।
বাবার দিকে তাকাল মা। আবার আমার দিকে। গেছে কি আর সাধে? ওদের তাড়ানো হয়েছে।
কারা তাড়িয়েছে?
জবাবটা দিল বাবা, আর কারা? শ্বেতাঙ্গরা। স্পেন, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স এ সব দেশের লোক। বিদেশী হয়েও এলাকার আসল অধিবাসীদের বের করে দিয়েছে। ইনডিয়ানদের বাপ-দাদার সম্পত্তি কেড়ে নিয়েছে। জোর করে ওদের জমি দখল করে ওদের কুকুরের মত তাড়িয়েছে। যারা যেতে চায়নি, তাদের নিষ্ঠুরের মত খুন করেছে। এ সব ইতিহাস তো তোমার জানার কথা, রবিন।
কিছু কিছু জানি। সব নয়। আচ্ছা, পাহাড়ের মাথার ওই কবরখানাটার মালিক কে? জিজ্ঞেস করলাম, ইনডিয়ানরা নয়?
ছিল।
এখন?
ওরাই, তবে কবর আর দিতে আসতে পারে না, এক টুকরো রুটি ছিঁড়ে মুখে পুরল বাবা। চিবাতে চিবাতে বলল, এলেই লাঠি নিয়ে তাড়া করে শ্বেতাঙ্গরা।
ওরা আদালতে যায় না কেন? যদ্র জানি ইনডিয়ানদের সঙ্গে চুক্তি হয়েছে আমেরিকান সরকারের। জমির দলিল করে নিলেই তো ভোগদখল করতে পারে।
তাও করেছিল। কিন্তু দলিল করে আনার পর পরই কোথায় যেন নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে এখানকার সেনিকা সর্দার ব্ল্যাকফায়ার চার্লি টাসক্যানি। দলিলগুলো সব। ছিল তার কাছে। কোথায় যে সে গেছে কেউ জানে না। দলিলগুলোও নিখোঁজ হয়েছে তার সঙ্গে। গুজব আছে, চাঁদনি রাতে হান্টার রিজের মাথায় নাকি ঘুরে বেড়াতে দেখা যায় লম্বা-চওড়া এক জোয়ান পুরুষকে, সঙ্গে বিশাল এক কালো কুকুর। লোকের ধারণা, ভূত।
তারমানে মরে গেছে?
হয়তো গেছে। নইলে আসে না কেন?
তার ছেলেমেয়ে কেউ নেই?
এক ছেলে ছিল। বাবা নিখোঁজ হওয়ার কয়েকদিন পর সেও বাড়ি ছেড়ে চলে গেল। লোকে বলে, তাকে যেতে বাধ্য করেছিল এখানকার কয়েকজন প্রভাবশালী লোক। তারপর একে একে সবাইকে জায়গা ছাড়তে হলো একজন ইনডিয়ানকেও আর টিকতে দেয়া হলো না।
শামান হার্ট গ্যাটলিং বাদে?
ওর সঙ্গে দেখা হয়েছে নাকি তোমার?

হয়েছে। এতক্ষণে বুঝলাম এত জায়গা থাকতে বনে বাস করে কেন সে। তারমানে খোলা জায়গায় আসতেই দেয়া হয় না।
না, মাথা নাড়ল বাবা। বড় নিষ্ঠুরতা। অমানবিক। যাদের জায়গা, তাদেরই ঠাই নেই, ভোগ করছে অন্য লোক। উড়ে এসে জুড়ে বসা একেই বলে।
চুপচাপ ভাবলাম এক মিনিট। তারপর জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা, বাবা, দলিলগুলো যদি পাওয়া যায়, আবার কি তাদের জায়গায় ফিরে আসতে পারবে ইনডিয়ানরা?
তা পারবে। তখন অন্য কেউ বাধা দিলে পুলিশের সাহায্যও নিতে পারবে। তবে দলিল ছাড়া কিছুই করতে পারবে না।
কিন্তু একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না। এক সর্দার নাহয় গেছে, বাকি ইনডিয়ানরা আদালতে গিয়ে দলিলের নকল বের করে আনে না কেন?
ইনডিয়ানরা সাদাসিধা মানুষ। শ্বেতাঙ্গদের আইন-কানুনের জটিলতা, ঘোরপ্যাঁচ কমই বোঝে। ওরা এখনও অপেক্ষা করে আছে বোধহয়, ওদের সর্দার ফিরে আসবে, তৈরি করে দেবে ওদের বহু আশার স্বপ্নভূমি।
কতদিন হলো সর্দার নিখোঁজ হয়েছে?
এই বছর পাঁচেক। আমার দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচাল বাবা, এত প্রশ্ন কেন? সর্দার আর দলিলগুলোর খোঁজ করছ নাকি?
এখনও করিনি। তবে করব ভাবছি।
আর কিছু না বলে দ্রুত খাওয়া শেষ করে উঠে গেলাম ওখান থেকে। নিজের ঘরে গিয়ে একটা বই বের করলাম। কিন্তু মন বসাতে পারলাম না। তা ছাড়া আগের রাতে ঘুমাতে পারিনি। বইয়ের পাতার দিকে তাকিয়ে দুচোখ ভেঙে আসতে লাগল। শুয়ে পড়লাম বিছানায়। কিন্তু এত ক্লান্তি সত্ত্বেও ঘুমাতে ভয় পেলাম। মন বলছে কুকুরটা আসবে সেরাতেও।
ঠিক করলাম, যত যাই ঘটুক, ঘর থেকে বেরোব না। না বেরোলে কোন ক্ষতি করতে পারবে না কুকুরটা।
বেশিক্ষণ খোলা রাখতে পারলাম না চোখ। ঘুমিয়ে পড়লাম।
ঘুম ভেঙে গেল বজ্রপাতের শব্দে।
এত জোরে বাজ পড়তে আর শুনিনি। চোখ মেলোম। আর ঠিক সেই মুহূর্তে তীব্র নীল আলো ঝিলিক দিয়ে উঠল। জানালা দিয়ে ঘরের ভেতরও এসে পড়ল বিদ্যুতের আলো। দিনের মত আলোকিত হয়ে গেল।
আবার বজ্রপাত। মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। জানালায় এত জোরে এসে আঘাত হানতে লাগল, ভয় হলো কাঁচ না ভেঙে যায়। কিন্তু ওটা তো খোলা ছিল? নিশ্চয় আমি ঘুমিয়ে পড়লে মা দেখতে এসেছিল। জানালা খোলা দেখে ঝড়ের কথা

ভেবে বন্ধ করে রেখে গেছে। ভাল করেছে। নইলে ঘরের মধ্যে বন্যা বয়ে যেত। আমার পায়ের কাছের জানালাটার ছিটকানি বোধহয় ঠিকমত লাগেনি, বাতাসের ঝাঁপটায় সামান্য ফাঁক হয়ে গেছে পাল্লা। সেখান দিয়ে ফিসফিস করে কে যেন ডাকল, রবিন!

বুকের মধ্যে ধক করে উঠল আমার। পুরুষের কণ্ঠ। কিন্তু বাবার নয়। কার তাহলে?

আবার ডাকল, রবিন?

গায়ের চাদরের ধার খামচে ধরলাম। একটানে নিয়ে এসে ফেললাম বুক থেকে গলার কাছে।

কে ডাকে? ভুল শুনছি না তো?

আবার শোনা গেল ডাক, রবিন! শোনো!

গুহার মধ্যেও আমার নাম ধরে ডাকতে শুনেছি। তবে এ ডাক সেই ডাক নয়। স্বাভাবিক মানুষের কণ্ঠের মত। জানালার ফাঁকটা দিয়ে আসছে।

কোনমতেই বাইরে বেরোব না। ওই মায়াডাককে অগ্রাহ্য করতে না পারলে মারা পড়ব-নিজেকে বোঝালাম। যতই ডাকুক, ঘর থেকে আর বেরোচ্ছি না আমি।

রবিন! কথা শোনো?

ঘর থেকে নাহয় না-ই বেরোলাম, কে ডাকে দেখতে তো অসুবিধে নেই? আস্তে করে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালাম। অন্ধকারে কিছু চোখে পড়ল না।

আবার বিদ্যুৎ চমকাল। বাজ পড়ল বিকট শব্দে।

উঠে বসলাম। বিছানা থেকে না নেমে বাঁকা হয়ে এগিয়ে গেলাম জানালাটার দিকে। হাত দিয়ে দেখলাম, পায়ের কাছটায় বিছানা ভিজে গেছে। জানালা বন্ধ না করলে আরও ভিজবে।

আবার বাজ পড়ল। ভয়াবহ শব্দ। থরথর করে কেঁপে উঠল সবকিছু। বিকট শব্দে কি যেন ভেঙে পড়ল বাইরে। বিদ্যুতের আলোয় এমন একটা দৃশ্য দেখলাম, ঘাড়ের চুল খাড়া হয়ে গেল আমার।

দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম লম্বা এক লোককে। জানালার কাছ থেকে মাত্র চার ফুট দূরে। লম্বা চুল ঘাড়ের ওপর নেমে এসেছে। মাথায় পাখির পালকের মুকুট। গায়ে হরিণের চামড়ার হাতে বানানো জ্যাকেট, পরনে একই চামড়ার প্যান্ট। বহুকাল আগের ইনডিয়ান যোদ্ধারা যে রকম পরত। পাশে দাঁড়ানো একটা কালো কুকুর। মৃত্যুপুরীতে যেটাকে দেখেছি।

সোজা আমার দিকে তাকিয়ে আছে লোকটা।

জানালা বন্ধ করব কি, হাঁটু কাঁপতে শুরু করল আমার। জানালার শার্সিটা ধরে না রাখলে উপুড় হয়ে পড়েই যেতাম।

আবার বিদ্যুৎ চমকানোর অপেক্ষায় রইলাম।
চমকাল। আলোকিত করে দিল আমাদের পেছনের আঙিনা। আবার দেখলাম লোকটাকে। দাঁড়িয়ে আছে একই ভঙ্গিতে। কুকুরটারও নড়াচড়া নেই। আমার দিকে তাকিয়ে আছে দুজনেই।
হাত তুলল লোকটা। মনে হলো আমাকে বাইরে যাওয়ার জন্যে ইশারা করল। তারপর আবার অন্ধকার।
আর দেখার অপেক্ষা করলাম না। আমি যেতে না চাইলে কি করবে লোকটা কে জানে! তাড়াতাড়ি জানালার ছিটকানি লাগিয়ে দিয়ে বালিশে মাথা রাখলাম। চাদর টেনে দিলাম মুখের ওপর।
ঘুম নেই আর চোখে। কান পেতে শুনছি বাইরে ঝড়ের তাণ্ডব।
.
সকালবেলা বাড়ির চারপাশে ঘুরে দেখলাম। মানুষের পায়ের ছাপ দেখলাম না। কুকুরটারও না। এমনকি আমার জানালার নিচে যেখানে লোকটাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি সেখানেও কোন ছাপ নেই। সবখানে কাদা। পানি জমে আছে। একটা ম্যাপল গাছের মাথা জ্বলে গেছে। কাণ্ডটা মাঝখান থেকে চিরে দুই টুকরো। একটা অংশ ভেঙে পড়েছে মাটিতে। বাজ পড়েছিল গাছটার মাথায়।
নিনার আসার অপেক্ষায় রইলাম।
কিন্তু দুপুরের পর এল না ও। গেলাম ওর বাড়িতে। ওর মা বললেন, স্কুল থেকে ফেরেনি। গেলাম স্কুলে। দেখি বেজবল খেলছে। মাথায় সেই লাল বেজবল ক্যাপ। আমাকে দেখে হাত নাড়ল। আমিও নাড়লাম। দুই ক্লাসের প্রতিযোগিতা হচ্ছে। বুঝলাম খেলা শেষ না করে আসতে পারবে না ও। শেষ হতে সময় লাগবে।
ওখানে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই। খেলা দেখতে ভাল লাগল না। মন জুড়ে। আছে ভূত। চলে এলাম ওখান থেকে।
কিন্তু বাড়ি যেতেও ইচ্ছে করল না। কি করব? পা দুটো যেন ঠেলে নিয়ে চলল পাহাড়ের দিকে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সমস্ত রহস্যের চাবিকাঠি লুকিয়ে আছে ওই গুহার ভেতর।
ঝলমলে রোদ। আকাশে মেঘের চিহ্নও নেই কোনখানে। হান্টার রিজের পথ বেয়ে ওপরে উঠে চললাম আমি। এই রাস্তা, এই পাহাড়, সব নিনার মুখস্থ। আমার। অতটা চেনা হয়নি, তাই দ্রুত এগোতে পারলাম না।
সঙ্গে নিনা নেই। একা যেতে কেমন যেন লাগছে। মনকে বোঝালামও না আসাতে ভাল হয়েছে। ওর ভাল। কালো গুটির মালা আমি পরেছি, ও নয়। কুকুরটার নজর আমার দিকে। অতএব যা করার আমাকেই করতে হবে। ওকে এ সবে টেনে আনব কেন? মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে?

হারলে ক্রীকের ওপরে চলে গেছে সুর্য। ডুবতে তখনও ঘণ্টা দুয়েক বাকি। সূর্যাস্তের আগে কখনও বেরোয় না কুকুরটা। ওটার মালিক ইনডিয়ান লোকটার ভূতও নিশ্চয় রাতের আগে বেরোবে না। অতএব ওই মুহূর্তে মৃত্যুপুরীতে যাওয়া আমার জন্যে নিরাপদ। আশা করলাম সুড়ঙ্গে ঢুকে তল্লাশি চালিয়ে ভূত বেরোনোর আগেই বাড়ি ফিরে যেতে পারব।

কিন্তু জোর পেলাম না মনে। কেবলই চিন্তা হতে থাকল, আচ্ছা, সত্যি কি সূর্যাস্তের আগে বেরোয় না ভূতগুলো? ব্রাম স্টোকারের ড্রাকুলা অবশ্য বেরোত না। কিন্তু ওটা তো কল্পিত ভূত। বিশাল কুকুরটার লকলকে লাল জিব, ধারাল দাঁত, হিংস্র চেহারা আর রক্ত পানি করা বিকট চিৎকারের কথা ভেবে দমে গেলাম। আবার ওটার মুখোমুখি হতে হবে ভাবতেই কলজের পানি শুকিয়ে গেল। মনকে সাহস জোগালাম এই ভেবে, দুই দুইবার দেখা হয়েছে ওটার সঙ্গে আমার। ইচ্ছে করলেই ক্ষতি করতে পারত। করেনি। কিংবা করতে পারেনি। এর একটাই কারণ হতে পারে, আমার গলার কালো মালাটা। দুবার যদি রক্ষা করে থাকতে পারে আমাকে ওটা, আরও একবার পারবে।

কবরস্থানে উঠে গেছে যে রাস্তাটা, সেটার গোড়ায় এসে দাঁড়ালাম। দ্বিধা করলাম একবার তারপর যা থাকে কপালে ভেবে ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করলাম।

পৌঁছে গেলাম ঘাসে ঢাকা সেই আয়তাকার জায়গাটায়। কবরস্থানে। মাঝখানে বিশাল ওকের অন্যপাশে মৃত্যুপুরীর কালো মুখটা যেন হাঁ করে আছে। অপরিচিত নয় আর এখন ওটা। তবু দিনের আলোতেও সেদিকে তাকিয়ে গা ছমছম করে উঠল।

আগেরবারের মতই সম্মান দেখানোর জন্যে কবরস্থান মাড়িয়ে না গিয়ে ওটার ধার ধরে এগোলাম। সেই অদ্ভুত অনুভূতিটা হতে লাগল আবার–কে যেন আড়াল থেকে আমার ওপর নজর রাখছে। আমার প্রতিটি নড়াচড়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ করছে। অদৃশ্য চোখের অধিকারী। চারপাশে তাকালাম। কেউ নেই। কবরস্থানটা একটা ঘাসে ঢাকা মাঠ। তাতে এমন কোন ঝোঁপ বা গাছ নেই যার আড়ালে লুকিয়ে আমার ওপর চোখ রাখবে কেউ। তাহলে কোনখান থেকে রাখছে? সব কি আমার মনের ভুল? কল্পনা? বনের দিকে তাকালাম। আমার দৃষ্টি ফিরিয়ে দিল যেন নীরব বনটা। মনে হলো আমার দিকে তাকিয়ে রহস্যময় হাসি হাসছে। ঘাড়ের পেছনটা শিরশির করতে লাগল।

মৃত্যুপুরীর দরজায় গিয়ে দাঁড়ালাম। মনের পর্দায় ভেসে উঠল আহত ইনডিয়ান যোদ্ধাদের চেহারা। মৃত্যুর সময় হলে এখানে চলে আসত ওরা। ওই গুহার ভেতরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে কতজন! মনে মনে ঈশ্বরের কাছে মঙ্গল প্রার্থনা করলাম ওদের জন্যে। ওদের উদ্দেশ্যে জোরে জোরে বললাম, হে অশরীরী

বীরেরা, আমি তোমাদের বিরক্ত করতে আসিনি। এসেছি তোমাদের বংশধরদের সাহায্য করতে। তাদের ন্যায্য অধিকার আদায় করে নিতে। আমার গায়েও তোমাদের রক্ত আছে। তাই এই গুহাতে অধিকার আছে আমারও। আমাকে সাহায্য করো তোমরা।
শার্টের নিচ দিয়ে হাত ঢুকিয়ে স্পর্শ করলাম একবার কালো মালাটা + ঢুকে পড়লাম গুহায়।
বাইরের চেয়ে ভেতরে অনেক ঠাণ্ডা। কয়েক পা এগোলাম। কি যেন পড়ল কাঁধে। চমকে গিয়ে পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়ালাম। আবার পড়ল। ওপর দিকে টর্চের আলো ফেলে দেখি পানির ফোঁটা। কোনও ফাটলে জমা হয়ে আছে বৃষ্টির পানি। ফোঁটা ফোঁটা পড়ছে সেখান থেকে। নিজেকে বোঝালাম, সব কিছু সহজ ভাবে নাও, রবিন। অল্পতেই যদি এ ভাবে চমকে যাও, কাজ করবে কিভাবে?
মেঝেতে আলো ফেললাম। সুপ হয়ে আছে ধসে পড়া পাথর।
গুহার বাকটার অন্যপাশে চলে গেলাম। পেছনে আড়ালে পড়ে গেল গুহামুখ। বিকেলের রোদেলা আকাশও অদৃশ্য। চারপাশে শুধুই অন্ধকার। পাথর আর দেয়াল, দেয়াল আর পাথর ছাড়া অন্য কিছুই চোখে পড়ল না। ভয় তাড়ানোর জন্যে অন্যমনস্ক হতে চাইলাম। নিনার কথা ভাবলাম। কি করছে এখন ও? নিশ্চয় প্রতিপক্ষের ওপর প্রবল আক্রমণ চালিয়েছে। মাথায় লাল ক্যাপ। চোখের সানগ্লাসটা খুলে রেখেছে। খেলার সময় পরা যায় না।
আলো ফেললাম গুহার দেয়ালে। সুড়ঙ্গমুখ দুটোর ওপর। চ্যাপ্টা পাথরে বসে তেমনি বিকৃত হাসি হাসছে খুলিটা। যেন ব্যঙ্গ করছে আমাকে। ধস নেমে এত পাথর পড়ল, ওটার কিছু হয়নি। অবাক হলাম না। জানতাম, থাকবে ওটা। ফোকর দুটোর দিকে তাকালাম। একটার কাছে চিত হয়ে পড়ে আছে গোল পাথরটা, যেটা দিয়ে মুখ বন্ধ করেছিলাম। হয় আপনাআপনি পড়ে গেছে ওটা, কিংবা ধাক্কা দিয়ে ফেলেছে কুকুরটা। পাহাড় কেঁপে ওঠায়, ধস নামায় হয়তো ফেলতে সুবিধে হয়েছে ওটার। ভাবলাম, ভূতই যদি হবে, তাহলে পাথর ফেলতে প্রকৃতির সহযোগিতার প্রয়োজন পড়ে কেন? নিজের অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা নেই? মাথা চুলকালাম। কি জানি! কত রকম ভূত থাকে। একেক ভূতের একেক ধরনের ক্ষমতা।
আবার তাকালাম খুলিটার দিকে। কালো কোটর দুটোর দিকে তাকিয়ে অস্বস্তিতে ভরে গেল মন। নিনার ধারণাই ঠিক মনে হতে লাগল। ওটাকে ওখানে ইচ্ছে করেই রেখেছিল সেনিকারা, যাতে অনুপ্রবেশকারীরা দেখলে ভয় পায়, সুড়ঙ্গে ঢুকতে সাহস না করে।

আড়াল থেকে কেউ যে লক্ষ করছে আমাকে সেই অদ্ভুত অনুভূতিটা কিন্তু। আছেই। মনে হচ্ছে আমাকে অনুসরণও করছে ওটা। অশরীরী কিছু? নাকি আমার মতই শরীর আছে ওটার। দেখার জন্যে আচমকা ঘুরে দাঁড়িয়ে আলো ফেললাম। নাহ, কেউ নেই। অন্ধকার গুহা। কোন নড়াচড়া চোখে পড়ল না। কোন শব্দ নেই।

আবার ফিরলাম সুড়ঙ্গমুখ দুটোর দিকে। প্রথমে ডানে, তারপর বায়ে। দুটোই খোলা। ভেতরে অন্ধকার। আগের বার নিনার সঙ্গে ঢুকেছিলাম ডানেরটাতে। ওটা দেখা হয়ে গেছে। বায়েরটাতে ঢোকার সিদ্ধান্ত নিলাম।

ঢুকে যেতে শুরু করলাম সুড়ঙ্গের গভীর থেকে গভীরে। মাটি ভেজা ভেজা। নরম। বাইরের পানি পড়ে ফাটল দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে। সেজন্যেই এই অবস্থা। আগেরটার। চেয়ে অনেক বেশি মোড় আর গলিঘুপচি এটাতে। দুদিকের দেয়ালে আরও অনেক ফোকর দেখা গেল। কোনটা শুধুই গর্ত, কোনটা সুড়ঙ্গের মুখ। এখানে পথ হারালে কিংবা ভুল করে যদি ওগুলোর কোনটাতে ঢুকে পড়ে কেউ, বেরোনো মুশকিল। কোনটা দিয়ে কোনটাতে চলে যাবে, চিহ্ন দিয়ে না রাখতে পারলে শেষে বোঝাই যাবে না।

টর্চের আলো ফেলে খুব সাবধানে এগোতে লাগলাম। ভূতের ভয় তো আছেই, পথ হারানোর ভয়ও আছে। কোথাও কোথাও নিচু হয়ে যাচ্ছে ছাত। সেসব জায়গায় মাথা নুইয়ে ফেলতে হচ্ছে। অসাবধান হলে ঠোকর লাগছে মাথায়। দুপাশ থেকে চেপে এসে কোথাও সরু হয়ে যাচ্ছে পথ। হাঁটার সময় বেরিয়ে থাকা পাথরে ঘষা লাগে।

কিছুদূর এগোনোর পর থমকে দাঁড়ালাম। ফিসফিসে একটা কণ্ঠ কানে আসছে। সেই প্রথম থেকেই। আগের দিনও শুনেছি বলে সেদিন আর গুরুত্ব দিইনি। আমার নাম ধরে ডাকাডাকি।

শব্দটা কোনদিক থেকে আসছে বোঝার চেষ্টা করলাম। কান পাতলে মনে হয়, চতুর্দিকেই হচ্ছে। যেদিকে তাকাই, সেদিক থেকেই আসে। বদ্ধ জায়গায় কিংবা সুড়ঙ্গের মধ্যে বোধহয় কোন রকম কারসাজি করে শব্দ, সেজন্যেই ওরকম লাগে।

কিন্তু এ ভাবে ডাকে কে? দেখা দরকার। কিছুটা সামনে এগিয়ে, কিছুটা পিছিয়ে, এদিক ওদিক আরও দুচারটা উপসুড়ঙ্গে ঢুকে বোঝার চেষ্টা করলাম। হদিস পেলাম না। বেশি ঘোরাঘুরি করতেও সাহস পেলাম না। অগত্যা ডাকে ডাকুক এ রকম একটা মনোভাব নিয়ে আবার ফিরে এলাম মূল সুড়ঙ্গে। এগিয়ে চললাম সামনের দিকে।

সুড়ঙ্গের আরেকটা বড় মোড় ঘুরে অন্যপাশে বেরোতেই দেখি সামনে দেয়াল। রুদ্ধ। আর যাওয়ার পথ নেই। ছোট একটা গুহায় ঢুকে শেষ হয়েছে পথ। প্রথমে দেয়ালগুলোতে আলো ফেললাম, তারপর মেঝেতে।
কি যেন একটা পড়ে আছে।
এগিয়ে গেলাম। একটা পুরানো ব্রিফকেস। ভেতরে কি আছে দেখার কৌতূহল হলো। কিন্তু তালা লাগানো। খুলতে পারলাম না। এখানে ব্রিফকেস ফেলে গেল কে? প্রথমেই মনে এল চোর-ডাকাতের কথা। হয়তো এর মধ্যে দামী অলঙ্কার কিংবা টাকাপয়সা আছে।
নিচু হয়ে হাতল ধরে তুলে নিলাম ওটা। হালকা। টাকা কিংবা অলঙ্কার বোঝাই হলে অনেক ভারী হতো। ঝাঁকি দিয়ে বোঝার চেষ্টা করলাম কি আছে। মৃদু খড়মড় শব্দ হলো। বোঝা গেল না কি আছে। একেবারে খালি নয়, এটুকু বোঝা গেল শুধু।
খোলার চেষ্টা করলাম। তালা লাগানো। চাবি নেই সঙ্গে। ভেঙে খুলতে হবে। বাইরে নিয়ে গিয়ে খুলে দেখব ভেবে রেখে দিলাম হাতে। বাঁ হাতে ব্রিফকেস ঝোলানো, ডান হাতে টর্চ। আর কি আছে গুহায় দেখতে লাগলাম। আমার একপাশে কয়েক হাত দূরে এক দেয়ালের গোড়ায় আলো ফেলতেই স্থির হয়ে গেল হাত। বরফের মত জমে গেলাম যেন। নড়তে পারলাম না। দম নিতে পারলাম না। এমনকি চিৎকারও করতে পারলাম না।
আগের রাতে ঝড়ের সময় যে লোকটাকে দেখেছি, সে পড়ে আছে দেয়ালের নিচে। তেমনি হরিণের চামড়ার পোশাক পরনে। মাথায় পালকের মুকুট।
ভাল করে দেখতে গিয়ে বুঝলাম, লোকটা নয়, তার কঙ্কাল। মাথার চুল সব খসে পড়েনি তখনও। শরীরের কিছু কিছু জায়গায় হাড়ের সঙ্গে চামড়া জড়িয়ে আছে।
টপ করে মাথায় পড়ল কি যেন। এতটাই চমকালাম, পানির ফোঁটা কিনা সেটা ভাবারও সময় হলো না। ঘুরে দৌড় দিতে গেলাম। দেয়ালে বাড়ি লেগে হাত থেকে ছুটে গেল টর্চ। মাটিতে পড়ে নিভে গেল। গড়িয়ে যাওয়ার শব্দ শুনলাম। গাঢ় অন্ধকার যেন গিলে নিল আমাকে।
উবু হয়ে বসে হাতড়াতে শুরু করলাম।
টুপ করে ঘাড়ে পড়ল কি যেন। চিৎকার করে উঠলাম। কিন্তু না, পানির ফোঁটা। বেয়ে নামতে লাগল নিচের দিকে।
আবার হাতড়াতে শুরু করলাম মেঝেতে।
টর্চটা ঠেকল হাতে। তুলে নিয়ে সুইচ টিপলাম। জ্বলল না। ঝাঁকি দিলাম। তাও জ্বলল না। নানা ভাবে চেষ্টা শুরু করলাম জ্বালানোর জন্যে। জ্বলল না ওটা। হাত

কাঁপছে। কিছুতেই স্থির রাখতে পারছি না। বুকের মধ্যে হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে যেন।
যখন বুঝলাম, কিছুতেই জ্বালতে পারব না, আতঙ্কে অবশ হয়ে আসতে চাইল হাত-পা। এই অন্ধকারে বেরোব কি করে?
আন্দাজে পা বাড়ালাম সামনের দিকে।
কয়েক পা এগোতেই হোঁচট লাগল কিসে যেন। বিচিত্র খটমট শব্দ হলো। অকেজো টর্চটা মাটিতে রেখে নিচু হয়ে হাত দিয়ে ছুঁয়ে বোঝার চেষ্টা করলাম কিসে হোঁচট খেয়েছি। হাতে লাগল খসখসে, শক্ত কিছু। কঙ্কালের গায়ে হাত দিয়েছি বোঝার সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো বেহুঁশ হয়ে পড়ে যাব। ঘুরে উল্টো দিকে দিলাম দৌড়।
সুড়ঙ্গমুখের কাছের দেয়ালে গিয়ে ধাক্কা খেলাম। পাগলের মত হাত বাড়িয়ে ফাঁকা জায়গা খুঁজতে লাগলাম। ফাঁকা মানেই সুড়ঙ্গমুখ।
পেয়ে গেলাম ওটা। ছুটতে শুরু করলাম অনুমানের ওপর নির্ভর করে।
অকেজো টর্চটা আর তুলে আনিনি। কঙ্কালের কাছেই রয়ে গেছে। কিন্তু এত কিছুর মাঝেও ব্রিফকেসটা ফেলিনি হাত থেকে।
ছুটছি, ছুটছি, ছুটছি। গায়ে পাথরের ঘষা লাগতে বুঝলাম সুড়ঙ্গের সরু অংশটায় পৌঁছে গেছি। আরও কিছুদুর এগিয়ে মাথায় বাড়ি খেলাম। বুঝলাম, নিচু ছাত। আশা বাড়ল। ঠিকপথেই চলেছি।
ছোটা বন্ধ করে তখন হাঁটতে শুরু করলাম।
হাঁটছি তো হাঁটছিই, পথ আর শেষ হয় না। ঘটনাটা কি? এতক্ষণ তো লাগার কথা নয়?
আরও প্রায় পনেরো-বিশ মিনিট হাঁটার পর সন্দেহ হলো, পথ হারাইনি তো?
কথাটা মনে হতেই হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসতে লাগল। প্রচণ্ড আতঙ্কে মরিয়া হয়ে ছুটতে শুরু করলাম আবার। দেয়ালে দেয়ালে ধাক্কা খাচ্ছি। ঘষা লেগে ছড়ে যাচ্ছে কনুই। নিচু ছাতে ঠোকর খেয়ে মাথায় গোলআলুর মত ফুলে যাচ্ছে। কোন। কিছুরই পরোয়া করছি না। কেবল ছুটছি আর ছুটছি।
হঠাৎ ধাক্কা খেলাম দেয়ালে। কপাল ঠুকে গেল। হাত বাড়িয়ে দেখে বুঝলাম, সামনে এগোনোর পথ নেই। সরে গেলাম একপাশে। ফোকর পাওয়া গেল একটা। এগোতে গেলাম। কিন্তু সুড়ঙ্গমুখ নয় ওটা। দেয়ালের গায়ে বড় একটা গর্ত। পিছিয়ে এলাম। হাতড়ে হাতড়ে বের করার চেষ্ট করলাম সুড়ঙ্গমুখ। অনেক চেষ্টা করেও পেলাম না। যেটা দিয়ে ঢুকেছি, সেটার মুখও বের করতে পারছি না আর।
অবশ হয়ে গেছে শরীর। পরিশ্রমে হাপাচ্ছি। নাক দিয়ে শিস কেটে বেরোচ্ছে নিঃশ্বাস। একটা দেয়াল ঘেঁষে বসে পড়লাম।

হাল ছেড়ে দিয়েছি। মনে হলো, আর কোনদিন বেরোতে পারব না এই অন্ধকার গোলকধাঁধা থেকে। কেউ জানে না আমি এখানে আছি। কেউ আমাকে উদ্ধার করতে আসবে না।
মনের চোখে দেখতে পাচ্ছি, বাইরে এখন বিকেলের রোদ। নীল আকাশ। সাদা সাদা মেঘ। পাখি গান গাইছে। ওসব আর কোনদিন দেখতে পাব না আমি! ভীষণ কান্না পেতে লাগল।
আরেকটা কথা মনে পড়তে আতঙ্কে সিটিয়ে গেলাম। বাইরে এখনও দিন, কিন্তু বেশিক্ষণ থাকবে না আর আলো। বিকেল শেষ হয়ে যাবে। সূর্য ডুববে। সন্ধ্যা নামবে। সূর্যাস্তের পর পরই বেরোয় কবরের প্রহরী! তারপর কি ঘটবে ভাবতে পারলাম না আর।
ঘাম ঝরছে দরদর করে। ঘাড়ের ঘাম মুছতে গিয়ে হাতে ঠেকল মালাটা। আশার আলো ঝিলিক দিয়ে উঠল মনে। এমন করে চেপে ধরলাম ওটা যেন ধরার ওপরই নির্ভর করছে আমার বাঁচা-মরা।

.
বাতাস ভেজা। মাটি ভেজা। বসে থাকতে থাকতে প্যান্টের হিপ ভিজে গেল। দেয়ালে হেলান দিয়ে থেকে শার্টের পিঠও ভিজল। শীত শীত করতে লাগল আমার।
কতক্ষণ ওভাবে বসেছিলাম জানি না। হঠাৎ কানে এল, নাম ধরে ডাকছে। কেউ। গুরুত্ব দিলাম না। খিঁচড়ে গেল বরং মেজাজ। আরও যন্ত্রণা দিতে চাইছে। আমাকে।
বাড়তে লাগল ডাকটা। মনে হলো কাছে এগোচ্ছে।
তারপর আস্তে আস্তে আবার দূরে সরে গেল।
কয়েক মিনিট পর আবার শোনা গেল ডাকটা। আবার এগিয়ে আসছে। জোরাল হচ্ছে শব্দ।
আরও এগোতে চেনা চেনা লাগল স্বরটা। তেতো হয়ে গেল মন। আমার সঙ্গে রসিকতা করছে ভূতটা। চেনা মানুষের কণ্ঠ নকল করে আমাকে ধোকা দিতে চাইছে।
আরও এগিয়ে এল ডাক।
আর সহ্য করতে পারলাম না। চেঁচিয়ে উঠলাম, যা ব্যাটা ভূতের বাচ্চা, ভূত! সর এখান থেকে! যা পারিস করগে আমার!
আরও এগোল কণ্ঠটা। চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল, রবিন, কোথায় তুমি? কোত্থেকে কথা বলছ?

নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলাম না। ভুল শুনছি না তো? নিনার কণ্ঠ। নাকি ভূতটাই এসেছে নিনার রূপ ধরে আমাকে জ্বালাতে?
জবাব দিলাম না।
আবার শোনা গেল নিনার চিৎকার, রবিন, জবাব দিচ্ছ না কেন?
চিৎকার করে জবাব দিলাম, নিনা, আমি এখানে! এই যে, এখানে! তুমি কোথায়?
কয়েক সেকেন্ড পর আলো দেখতে পেলাম। এগিয়ে আসছে আলোটা।
উঠে দাঁড়ালাম। আমিও এগোলাম সেদিকে।
মুখের ওপর টর্চের আলো পড়ল আমার। নিনা জিজ্ঞেস করল, এই অবস্থা কেন তোমার?
পাল্টা প্রশ্ন করলাম, তুমি এলে কি করে?
জবাবে বলল ও, কেন আমি কি রাস্তা চিনি না নাকি?
না, সেকথা বলছি না। তুমি জানলে কি করে আমি এখানে আছি?
তুমি তো আর খেলা দেখলে না, চলে গেলে। আমি খেলা সেরে তোমাদের বাড়ি গেলাম। আন্টি বলল, তুমি দুপুরে খেয়ে সেই যে বেরিয়েছ, আর ফেরোনি। সন্দেহ হলো। কোথায় গেলে? মনে হলো, মৃত্যুপুরীতে চলে যাওনি তো? দৌড়ে বাড়ি গিয়ে একটা টর্চ নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। তোমাকে এখানে খুঁজে বের করতে অনেক কষ্ট হয়েছে আমার।
টর্চটা হাত থেকে পড়ে নষ্ট হয়ে গেল। পথ হারিয়েছিলাম। কিন্তু আমাকে খুঁজে বের করলে কি করে?
মাটি নরম। পায়ের ছাপ বসে গেছে। দেখে দেখে এসেছি। হাতে ওটা কি?
চলো, যেতে যেতে বলছি।
সুড়ঙ্গে চলতে চলতে সব কথা খুলে বললাম নিনাকে। আগের রাতে দেখা জীবন্ত লোকটা গুহার ভেতর কঙ্কাল হয়ে পড়ে আছে শুনে ওর গলা দিয়ে স্বর বেরোতে চাইল না। তাগাদা দিল, জলদি চলো, সূর্য ডোবার আগেই বেরিয়ে যেতে ইবে! ওই লোকটাই কুকুরের মালিক, বোঝা যাচ্ছে। মরে দুটোতেই ভূত হয়েছে।
হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল ও।
পেছন থেকে সাবধান করলাম, সাবধান, যত যাই করো, হাত থেকে টর্চ ফেলো না। তাহলে মরেছি!
আর কোন অঘটন ঘটল না। নিরাপদেই বেরিয়ে এলাম গুহাটায়, যেটা থেকে দুটো সুড়ঙ্গ দুদিকে চলে গেছে। ফিরে তাকালাম। পাথরের বেদিতে বসে নীরবে তেমনি বিকট হাসি হাসছে খুলিটা। ফিসফিস করে বললাম ওটাকে, সালাম, ভূতের রাজা, আর আসছি না এখানে! যত ইচ্ছে ভয় দেখাওগে এখন মানুষকে, আমাদের। আর পাচ্ছ না।

মৃত্যুপুরী থেকে বেরিয়ে এসে হাঁপ ছাড়লাম।
পশ্চিম দিগন্তে নেমে গেছে সূর্য। আড়ালে যেতে বেশি বাকি নেই।
জলদি হাঁটো! তাগাদা দিল নিনা। সূর্য ডোবার আগেই কবর এলাকা থেকে বেরিয়ে যেতে হবে।
খাড়া পাহাড়টার নিচে যখন নামলাম, সূর্য তখন ডুবে গেছে। তবে আর ভয়। নেই ততটা। প্রহরীর এলাকা পার হয়ে এসেছি আমরা।
এতক্ষণে সহজ হয়ে এল নিনা। আমার হাতের ব্রিফকেসটার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, কি আছে ওটাতে, বলো তো?
না খুললে বোঝা যাবে না। তবে অনুমান করতে পারছি।
কি?
দলিল। ইনডিয়ানদের জায়গার। আর গুহার ভেতরে মরে পড়ে থাকা লোকটা সেই ইনডিয়ান সর্দার, আমি নিশ্চিত।
অবাক হলো নিনা। এ ভাবে হেঁয়ালি করে কথা বলছ কেন? কোন ইনডিয়ান সর্দার?
ও, নিনা তাহলে জানে না ব্ল্যাকফায়ার চার্লি টাসকানির কথা। আগের রাতে বাবার কাছে যা যা শুনেছি সব বললাম ওকে।
মাথা দুলিয়ে নিনা বলল, তাহলে তো এখনই খুলে দেখতে হয় ব্রিফকেসটা।
এখানে না। বাড়ি গিয়ে।
আচ্ছা, ধরো, এটাতে দলিলই পাওয়া গেল। কি করবে?
নিয়ে যাব হার্ব গ্যাটলিঙের কাছে। ও-ই ভাল বলতে পারবে কি করতে হবে।
আমার সঙ্গে একমত হলো নিনা, তা ঠিক। সোজা ওর বাড়িতে চলে গেলেই পারি?
না। রাত হয়ে গেছে। রোজ রোজ এ ভাবে বাড়ি না ফিরলে মা বকা দেবে। তা ছাড়া ব্রিফকেসে দলিলগুলো নাও থাকতে পারে। বাড়ি গিয়ে আগে দেখব। যদি দলিলই থাকে, তাহলে কাল সকালে প্রথম কাজটাই হবে আমাদের গ্যাটলিঙের বাড়িতে চলে যাওয়া।
কিন্তু সকালে তো আমার স্কুল।
তাহলে দুপুরে কিংবা বিকেলে যাব। তুমি স্কুল থেকে ফিরে এলে। তোমাকে না নিয়ে যাব না।
কথা দিচ্ছ?
দিচ্ছি। হাজার হোক, তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ। উফ, তুমি না গেলে আজ কি যে হতো…
আর কোন কথা হলো না আমাদের। দুজন দুদিকে চলে গেলাম। পাহাড়ী পথ বেয়ে নীরবে আমি নেমে চললাম আমাদের বাড়ির দিকে। বেশি দূরে নেই আর।

গল্প শেষ করে একে একে সবার মুখের দিকে তাকাল রবিন। দম নিল। তারপর জিজ্ঞেস করল, কি বুঝলে?
মুসা বলল, এতে আর বোঝাবুঝির কি আছে? ভূত।
ফারিহা কিছু বলল না। নীরবে হাত বোলাচ্ছে টিটুর মাথায়।
কি বলতে গিয়ে আবার বোকা বনে যেতে হয় এই ভয়ে কোন মন্তব্য করল না। ফগ। বিড়বিড় করে শুধু বলল, ঝামেলা!
কিশোরের দিকে তাকাল রবিন। কিছু বলছ না?
নিচের ঠোঁটে ঘন ঘন দুবার চিমটি কাটল কিশোর। কি আর বলব? ভূতুড়ে কোন কিছুই আমি দেখছি না এর মধ্যে।
ভুরু কুঁচকে ফেলল রবিন। দেখছ না মানে? সমস্ত ব্যাপারটাই তো ভূতুড়ে!
মোটেও না, ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল কিশোর। বলতে পারো, অনেকগুলো প্রশ্ন জমা হয়েছে, যেগুলোর জবাব জানা দরকার। ঠিকমত জবাব পেলেই আর ভূতুড়ে থাকবে না একটা ঘটনাও। তাই না?
চুপ করে রইল রবিন।
ফগের দিকে তাকাল কিশোর। আপনি কিছু বুঝতে পারছেন না?
কোন্ ব্যাপারটা? অস্বস্তিতে পড়ে গেল ফগ।
এই যে এতগুলো ভূতুড়ে কাণ্ড ঘটল। কোনটা কেন, বলতে পারবেন না?
ঝামেলা! আমাকে আবার এর মধ্যে টানছ কেন? আমি কি ওখানে ছিলাম। নাকি? এ সব বোঝার জন্যে ঘটনাস্থলে থাকা লাগে না।
তাহলে তুমিই বলো না, চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিল ফগ।
গ্রহণ করল কিশোর। হাত নাড়ল, বেশ, তাই বলছি। তবে ঘটনা ব্যাখ্যা করার আগে একটা কথা জানা জরুরী, রবিনের দিকে তাকাল সে, রবিন, ব্রিফকেসটার মধ্যে দলিলই ছিল তো?
হ্যাঁ। ইনডিয়ানদের, জবাব দিল রবিন।
নিশ্চয় হার্ব গ্যাটলিঙের কাছে নিয়ে গিয়েছিলে। দেখে কি বলল ও?
অনেক ধন্যবাদ দিল আমাদের। কাগজগুলো বার বার মাথায় ছোঁয়াল। বলল, ব্রিফকেসটা ওর কাছেই থাক। জায়গামত পৌঁছে দেবে দলিলগুলো।
তারপর?
অনেক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল আমাদের কাছে। চলে এলাম আমরা। তার পরদিন আবার গিয়ে দেখলাম বাড়িতে নেই ও। দরজায় তালা। কোথায় চলে গেছে কেউ জানে না। আর কখনও ওকে দেখা যায়নি ওই অঞ্চলে।

আবার মাথা ঝাঁকাল কিশোর। বুড়ো হয়েছিল তো, নিশ্চয় মারাটারা গেছে। হারলে ক্রীকে যাওয়ার আর সুযোগ পায়নি। ঠিক আছে, এখন রহস্যগুলোর জট ছাড়ানো যাক একে একে। প্রথমেই ধরা যাক, পায়ের ছাপের কথা। খোলা জায়গায় পায়ের ছাপ। শুধু কুকুরের। পাশে মাটিতে অদ্ভুত ঘষার দাগ। ঝোঁপের ডালপাতা ভাঙা। ওই ঘষা দাগ আর ঝোঁপঝাড় ভাঙা থেকেই নিশ্চিত বলে দেয়া যায়, ওগুলো ভূতের কাজ নয়। ভুত কখনও পায়ের ছাপ ফেলে না। ছায়ার মত যেখানে ইচ্ছে চলে যায়। এর একটাই ব্যাখ্যা, ঝোঁপঝাড় ভেঙে কুকুরটার সঙ্গে একজন মানুষও বেরিয়েছিল। আর সে ইনডিয়ান। কুকুরের পায়ের ছাপের পাশে তার নিজের পায়ের ছাপও পড়েছিল। ডাল ভেঙে পাতা দিয়ে ডলে সেগুলো মুছে দিয়েছিল। কেউ যাতে অনুসরণ করতে না পারে, সেজন্যে ওরকম করে নিজের চিহ্ন মুছে রেখে যায় ইনডিয়ান শিকারী।
ও, তাই তো! ওয়েস্টার্ন গল্পে পড়েছি এ সব কথা। কিন্তু আমাদের বাড়িটার দিকে নজর দিয়েছিল কেন সে?
এই প্রশ্নটার জবাবের ওপরই নির্ভর করছে পুরো রহস্যটার সমাধান। শোনো, হারলে ক্রীকে তোমরা যাওয়ার পরই নজর পড়েছিল লোকটার। কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল। খোঁজ নিয়ে জেনেছিল, তোমার রক্তে সেনিকাদের রক্ত মেশানো আছে। নিজের জাতভাই ধরে নিয়েছিল তোমাকে সে। কোনভাবে গলার কালো মালাটা দেখেছিল। বুঝেছিল, দলিলগুলো যদি উদ্ধার করা কারও পক্ষে সম্ভব হয়, সে তুমি। তাই তোমার সঙ্গে কথা বলার জন্যে তোমাদের বাড়িতে গিয়েছিল। প্রথম দিনই কুকুরটা ঘটাল এক অঘটন। বনে থেকে শিকার করতে করতে নিশ্চয় ওর স্বভাব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। কুনটাকে দেখে খুন করে বসল। চিৎকার শুনে তুমি বেরিয়ে পড়লে ঘর থেকে। ভয় পাচ্ছিলে। ওই সময় তোমার সঙ্গে কথা বলে সুবিধে হবে না। বুঝে ফিরে গেল লোকটা।
কোথায়?
তার গোপন আস্তানায়।
সেটা কোনখানে?
হবে মৃত্যুপুরীর আশপাশে কোনখানে। বনের মধ্যে।
গুহার ভেতর নয় কেন?
কারণ, সে ইনডিয়ান। ওদের সমাজের নিয়ম-কানুন কড়াকড়িভাবে মেনে চলেছে। প্রথমত, কোন বীর যোদ্ধা ছাড়া মৃত্যুপুরীতে ঢোকার নিয়ম নেই। দ্বিতীয়ত, একমাত্র মৃত্যুর সময় হলেই কেবল ওখানে ঢুকতে হয়, তার আগে কোনমতেই নয়। তাই দলিলগুলো গুহার ভেতরে আছে জানা থাকা সত্ত্বেও ওখানে ঢুকে বের করে আনতে পারেনি সে, আনার সাহস হয়নি। গুহার কাছাকাছি থেকেছে,

কুকুরটাকে দিয়ে পাহারা দিয়েছে যাতে ওদের গোত্রের বাইরের কেউ ব্রিফকেসটা বের করে আনতে না পারে। সেই লোক জানত, গুহার ভেতর মরে পড়ে আছে সেনিকা সর্দার চার্লি টাসক্যানি। কোন কারণে ব্রিফকেসটা লোকটার হাতে দিয়ে যেতে পারেনি সর্দার। এমন হতে পারে, দলিলগুলো আনার পর লোকটা তার কাছাকাছি ছিল না। হঠাৎ করে সর্দার বুঝতে পারল, তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছে। আর কোন। উপায় না দেখে, ব্রিফকেসটা তুলে দেয়ার মত বিশ্বস্ত কাউকে হাতের কাছে না পেয়ে ওটা নিয়েই মৃত্যুগুহায় মরতে চলে গেল সে। যেহেতু সর্দার, সেও নিশ্চয় সেনিকা বীর ছিল।

যাই হোক, তোমাকে আর নিনাকে সুড়ঙ্গে ঢুকতে দেখল কুকুরের মালিক। কাকতালীয়ভাবে কুকুরটাও ওই সময় ঢুকে বসেছিল সুড়ঙ্গে। তাড়া করল ওটা তোমাদের। ঘেউ ঘেউ করে সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রচণ্ড শব্দ পাথর ধস নামিয়েছিল। এটা স্বাভাবিক। অনেক সুড়ঙ্গেই শব্দ ওভাবে ধস নামায়। তোমরা বেরিয়ে চলে এলে। কুকুরটা তোমাদের গাছ ঘিরে চক্কর দিতে থাকল। রাতের কোন এক সময়ে ওটাকে ডেকে নিয়ে গেল ওটার মালিক।

পরদিন শামানের সঙ্গে দেখা করতে গেলে তোমরা। আমার ধারণা, শামানের সঙ্গে যোগাযোগ থাকলেও তোমার কথা ওকে বলার সুযোগ পায়নি তখনও কুকুরের মালিক। শামান তাই তোমার গলায় কালো মালা দেখে চমকে উঠেছিল। সেও বুঝেছিল, তোমাকে দিয়ে দলিলগুলো বের করানো সম্ভব। সরাসরি ওগুলো এনে দেয়ার কথা বলার সাহস পায়নি। কারণ তখনও বিশ্বাস করতে পারেনি তোমাকে। তুমিও শ্বেতাঙ্গ। যদি বেঈমানী করো? তাই ভুতুড়ে কুকুরের ভয়টা ভাঙেনি। বলেছিল সেনিকাদের জিনিস ওদের ফিরিয়ে না দিলে কুকুরটা পিছু ছাড়বে না তোমার। সত্যি ছাড়ত না, যতদিন তুমি বের করে না আনতে। ব্রিফকেসটা শামানকে দিয়ে আসার পর কি আর ওটা তোমাদের বাড়িতে গিয়েছিল?

মাথা নাড়ল রবিন, না।

বললাম না। যাই হোক, তোমার সাহস দেখে আরও নিশ্চিত হলো কুকুরের মালিক, তুমি সত্যি বের করে আনতে পারবে ব্রিফকেসটা। তাই ঝড়ের রাতে। আবার গেল তোমাদের বাড়িতে। ডাকাডাকি করল। কিন্তু ভয় পেয়ে তুমি আর বেরোলে না। ঘরে ঢুকে কথা বলার সাহস হলো না ওরও। ফিরে গেল।

পরদিন সকালে বাড়ির আশেপাশে কোন পায়ের ছাপ দেখলে না তুমি। অত বৃষ্টি আর কাদাপানিতে ছাপ কি আর থাকে নাকি। নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

তারপর গিয়ে বের করে আনলে ব্রিফকেসটা। শামানকে দিয়ে দিলে। চলে গেল সে। ওটার জন্যে সেও কুকুরের,মালিকের মত অপেক্ষা করছিল ওই বনে।

পাওয়ার পর দুজনেই চলে গেল নিজের লোকেদের হাতে তুলে দিতে। এই হলো মোটামুটি গল্প। এখনও কি মনে হচ্ছে এর মধ্যে ভূতুড়ে কিছু আছে?
চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল রবিন। আচ্ছা, কুকুরের মালিকটা কে বলো তো? সর্দারের ছেলে?
হাসল কিশোর, তাতে কি কোন সন্দেহ আছে? বাবা যেদিন মৃত্যুগুহায় চলে যায়, নিশ্চয় সেদিন বাড়ি ছিল না সে। সেবারের পর আর কখনও যাওনি হারলে ক্রীকে?
গেছি। বেশ কিছু ইনডিয়ান ফিরে এসেছে। বাড়ি করে বাস করছে। সর্দারের ছেলে কোনজন, জানতে পারিনি। কালো কুকুরটাকেও দেখিনি।
এমন হতে পারে, শামানের মতই আর হারলে ক্রীকে থাকতে আসেনি সর্দারের ছেলেও। ওদের একটা গোপন মিশন ছিল, দলিলগুলো উদ্ধার করা। তোমার সাহায্যে ওগুলো বের করে নিজের লোকের হাতে তুলে দিয়ে ওরা চলে গেছে অন্য কোনখানে। হতে পারে না এটা?
মাথা ঝাঁকাল রবিন। পারে। আর মাত্র দুটো প্রশ্নের জবাব দরকার। এক নম্বর প্রশ্ন–কেন মনে হয়েছিল আড়ালে থেকে কেউ নজর রাখছে আমার ওপর?
মনে হয়েছিল, তার কারণ সত্যি রাখা হচ্ছিল। সতর্ক থাকলে মানুষের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় এ সব টের পায়। সর্দারের ছেলে লুকিয়ে থেকে নজর রাখছিল তোমার ওপর। শত শত বছর ধরে বনে-জঙ্গলে, পাহাড়ে বাস করে লুকিয়ে থাকার এক অসাধারণ ক্ষমতা অর্জন করেছে ওরা। ওরা লুকালে বনের জন্তু-জানোয়ারেই দেখতে পায় না, তুমি দেখবে কি?
আস্তে আস্তে মাথা দোলাল রবিন, হু। আমিও শুনেছি এ সব কথা। ঠিক আছে, মেনে নিলাম। এখন আমার দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব দাও। পাহাড়ের মধ্যে আমার নাম ধরে কে ডাকছিল?
ওটা, আমার বিশ্বাস, বাতাসের কারসাজি। পাহাড়টাতে অনেক ফাটল আছে, তোমার কথাতেই বোঝা গেছে। নানা জায়গায় ওপর থেকে পানি পড়তে দেখেছ। ওরকমই কোন একটা ফাটল দিয়ে বাতাস বয়ে যাওয়ার সময় বিচিত্র শব্দ হয়, তোমার মনে হচ্ছিল তোমার নাম ধরেই ডাকছে।
তাই?
হ্যাঁ। কেন, প্রমাণ করতে যেতে চাও?
না বাবা, দুহাত নেড়ে বলল রবিন, ভূত থাকুক বা না থাকুক, আমি ওই মৃত্যুপুরীর ধারেকাছে নেই আর! একবারই যথেষ্ট। যত খুশি শব্দ করুকগে গুহাটা, আমার তাতে কি?

ফগের দিকে তাকাল কিশোর। চোখ গোল গোল করে তাকিয়ে শুনছে পুলিশ। কনস্টেবল। ও তাকাতেই চঞ্চল হয়ে গেল চোখের তারা। ফগকে খোঁচানোর জন্যে কিশোর বলল, মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকট, যাবেন নাকি ওই পাহাড়ে? চলুন না গিয়ে দেখে আসি কিসে শব্দ করে? খানিক আগে না বললেন রহস্য খুঁজে বেড়াচ্ছেন?
গলা খাকারি দিল ফগ। অহেতুক কাশল। বিড়বিড় করে বলল, ঝামেলা! আমাকে নিয়ে আবার টানাটানি কেন?
মুচকি হাসল কিশোর, ভয় পেলেন নাকি?
ভূতকে ভয় পাব আমি? আর লোক পেলে না, আবার কোন বেকায়দা প্রশ্নে ফেঁসে যায় এই ভয়ে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল ফগ। ইস, অন্ধকার হয়ে গেল যে। ওদিকে কত কাজ পড়ে আছে। দরজার দিকে রওনা হলো সে।
পেছন থেকে ডেকে বলল মুসা, চলে যাচ্ছেন যে? আপনার অভিজ্ঞতার কথা শোনাবেন না?
ফিরল না ফগ। দরজার কাছে গিয়ে জবাব দিল, আহ, ঝামেলা! আজ না, আরেকদিন।
বেরিয়ে গেল সে।
মুখ বাঁকিয়ে ফারিহা বলল, ওর অভিজ্ঞতা না কচু। ও কোত্থেকে ভূত দেখবে? নিজেই তো ভূত হয়ে বসে ছিল একবার। আসলে জানতে এসেছিল, কোনও কেসের তদন্ত করছি কিনা আমরা। মাঝখান থেকে বিনে পয়সায় গল্পটা শুনে গেল।
খেক! খেক! করে উঠে যেন বলতে চাইল টিটু, আমি তো তখনই চেয়েছিলাম পায়ে কামড়ে দিয়ে আগাম পয়সা শোধ করে নিতে, তোমরাই তো দিলে না।

ভলিউম ৫০ – খেলনা ভালুক – তিন গোয়েন্দা – রকিব হাসান – সেবা প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ: ২০০২

গোবেল বীচ গাঁয়ের পথ ধরে সাইকেল চালাচ্ছে জিনা। পাশে তার বন্ধুরা, কিশোর, মুসা আর রবিন। কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস। তবে তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। ডিসেম্বরের ২৩ তারিখে এ রকম হবেই। চকচক করছে তার চোখ। ঠাণ্ডা আবহাওয়া খারাপ লাগে না তার, যদি দিনটা হয় মেঘমুক্ত, উজ্জ্বল। অন্যদেরও খারাপ লাগছে না। গান গাইছে চারজনেই। কেউ গলা ফাটিয়ে, কেউ গুনগুন করে।

চারটে সাইকেলের পাশে দৌড়াচ্ছে রাফি, গা আর পায়ের পাতা গরম করার চেষ্টা করছে। পাঁচজনের মধ্যে এই একটি চরিত্র, যার ভাল লাগছে না এই আবহাওয়া। কান চেপে রেখেছে মাথার সঙ্গে। কারণ মাথা গরম রাখার আর কোন ব্যবস্থা নেই তার। উলের গরম টুপি নেই মানুষের মত। ঘরে থাকলে অবশ্য এই কষ্টটা করতে হত না, তবে সেটা চায় না সে। জিনাকে ফেলে একলা থাকতে ভাল লাগে না তার। মাঝে মাঝে হেঁড়ে গলায় ডেকে উঠছে ঘাউ ঘাউ করে। তাতে গানের সঙ্গে সঙ্গত হচ্ছে না, বরং বেসুরো বেতাল করে দিচ্ছে।

রাস্তার শেষ মোড়টা পেরোতেই চোখে পড়ল সামনে গোবেল বীচ গির্জার উঁচু স্তম্ভ।

এসে গেছি, খুশি খুশি গলায় বলল জিনা। দেখো, গ্রামটাকে কি রকম বদলে দিয়েছে বড় দিনের উৎসব।

গাঁয়ের সবচেয়ে বড় দোকান গোবেল বীচ স্টোর। সেটার সামনে আসার আগে সাইকেল থেকে নামল না ওরা। নানা রকম জিনিস বিক্রি হয় দোকানটায়। জানালার কাছে শো-কেসে অসংখ্য খেলনা সাজিয়ে রাখা হয়েছে। আর রয়েছে উপহারের বিভিন্ন সামগ্রী। থাকবেই। কারণ আজ হলোগে ক্রিসমাস ইভের আগের দিন।

ইস্কুল ছুটি। গোবেল বীচে, জিনাদের বাড়িতে বেড়াতে এসেছে তিন গোয়েন্দা। জিনার আব্বা বিশিষ্ট বিজ্ঞানী জনাথন পারকার আর জিনার আম্মা মিসেস ক্যারোলিন, তিন গোয়েন্দার কেরিআন্টি, ভীষণ আদর করেন ওদের। এখানে এলে একেবারে ঘরোয়া পরিবেশ পেয়ে যায় ওরা। তার ওপর লেখাপড়ার চাপ না থাকলে তো কথাই নেই। তাই ছুটি কাটানোর কথা ভাবলে প্রথমেই মনে চলে আসে গোবেল ভিলার কথা। এটা হলো জিনাদের বাড়ির নাম। সত্যিই যেন চিরবসন্ত বিরাজ করে এই বাড়িটাতে। এখানে যেন শুধুই সুখ, দুঃখ নেই। বাড়িটা অনেক বড়। বহু বছরের পুরানো। কিনে সংস্কার করে নিয়েছেন জিনার আব্বা।

সেদিন সকালে ছেলেমেয়েদেরকে ডেকে বাজার করে আনতে বললেন কেরিআন্টি। সেজন্যেই বেরিয়েছে ওরা।
এই দেখো! প্রায় চিৎকার করে উঠল রবিন। জানালার কাঁচে নাক ঠেসে ধরেছে। দারুণ সুন্দর, না? ওই যে ওই জেট প্লেনটা? আর ওই যে ওই ইলেকট্রিক ট্রেন, কি বিশাল! আর…কিন্তু আন্টিকে তো এগুলো উপহার দিতে পারব না…
জিনা আর মুসাও জানালার কাঁচে নাক চেপে ধরে খেলনা দেখছে।
হ্যাঁ, ভাল ভাল খেলনা আছে, একমত হল মুসা। আর ওই যে সাইকেলগুলো দেখো। কি সুন্দর! কোন্ কোম্পানির বুঝতে পারছি না। ওরকম একটা সাইকেল পেলে চুটিয়ে চালাতে পারতাম, যেখানে খুশি যেতে পারতাম। ভাড়া করা সাইকেল দিয়ে কি আর মজা হয়।
এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেলনা আর সাইকেল দেখলে কাজ হবে না, তাগাদা দিল কিশোর। জিনিসপত্রগুলো কিনে ফেলা দরকার। আন্টি নিশ্চয় বসে আছেন। তাড়াতাড়ি যেতে বলে দিয়েছেন মনে নেই?
ঠেলে দোকানের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল সে। পেছনে ঢুকল অন্য তিনজন। ভেতরে উজ্জ্বল আলো। আর বেশ গরম। সব কিছুতেই কেমন যেন একটা উৎসব উৎসব গন্ধ। বাজারের তালিকা নিয়ে কাউন্টারের কাছে গিয়ে দাঁড়াল ওরা।
জিনিসপত্র বের করে সাজিয়ে গুছিয়ে প্যাকেট করে ব্যাগে ভরে দিল সেলসম্যান। হিসেব মিলিয়ে দাম মিটিয়ে দিল কিশোর। বেরোনোর আগে আরেকবার ঘুরে ঘুরে দেখল রবিন আর জিনা। অনেক চমৎকার জিনিস রয়েছে, দেখলেই কিনতে ইচ্ছে করে।
দোকানের একজন কর্মচারী এককোণে একটা মলাটের বড় বাক্স খুলছে। বয়েসে তরুণ। নাম ডিক, তাকে চেনে জিনা! জিজ্ঞেস করল, কেমন আছেন?
মুখ তুলে তাকিয়ে হাসল লোকটা। বলল, আরে, তুমি। ওরা কারা? বন্ধু বুঝি?
হ্যাঁ।
তা বন্ধুদের নিয়ে চলে এসো না আমাদের বাড়িতে। বড়দিনের দাওয়াত।
আরও অনেক দাওয়াত পেয়েছি, হেসে বলল জিনা। দেখি, চেষ্টা করব যাওয়ার। থ্যাংক ইউ।
বাক্সটা খোলা শেষ করল ডিক। ইতিমধ্যে মুসা আর কিশোরও এসে দাঁড়িয়েছে সেখানে। এ-হপ্তায় সাংঘাতিক বিক্রি হচ্ছে, তরুণ কর্মচারী জানাল। বিশেষ করে ক্রিসমাস ট্রি সাজানোর জিনিসপত্র। লোকের কাণ্ড! কিনতেই যখন হবে আগে কিনলেই হয়ে যায়। অনেক ঝামেলা বেঁচে যায়। দামেও সস্তা পায়। তা না। কিনবে তো কিনবে, একেবারে শেষ মুহূর্তে। তবে লোকের দোষও একতরফা ভাবে দেয়া যায় না। কোম্পানিগুলোরও দোষ আছে, যারা বানায়। আরে বাবা আরেকটু

আগে বানিয়ে দিলে কি এমন ক্ষতি হয়? দিলি তো দিলি, সেই পনেরো দিন পর। পনেরো দিন ধরে বসে আছি এই ভালুকগুলোর জন্যে।
বড় বাক্সের ভেতর থেকে ছোট একটা বাক্স বের করল সে। ভেতরে আরও দুটো ওরকম বাক্স রয়েছে। একটা বাক্সের ডালা খুলে দেখাল ছেলেমেয়েদেরকে। ভেতরে অনেকগুলো ছোট ছোট খেলনা ভালুক সাজানো রয়েছে। বিভিন্ন রঙের। গাঢ় লাল, নীল, সবুজ, হলুদ, সাদা, বেগুনি আর কমলা।
আরে, দারুণ তো! রবিন বলল। এগুলো অবশ্য উপহার দেয়া যায়। কেরিআন্টি সাজিয়ে রাখতে পারবেন।
ক্রিসমাস ট্রি ভালুক দিয়ে সাজাতে দেখিনি আর কখনও! অবাক হয়ে বলল কিশোর।
আসলে, ডিক বলল। ট্রি সাজানোর জন্যে নয় এগুলো। ম্যাসকট হিসেবে ব্যবহার হয়। গাড়ির মধ্যে ঝুলিয়ে রাখে না লোকে, ওরকম। এই কিছুদিন আগেও এ রকম খেলনা ঝোলানোর ধুম পড়ে গিয়েছিল। এখন একটু কমে এসেছে। তবে এ রকম ভালুক জনপ্রিয় হয়ে গেছে বেশ, বিশেষ করে এদিকটায়। তাই আমার বস্ মিস্টার ফোকসন বেশি করে অর্ডার দিয়েছেন এবার। মনে করছেন বড়দিনের সময় বেশি বিক্রি হবে। লোকের তো ঠিকঠিকানা নেই, হয়তো ট্রিতেও নিয়ে গিয়ে ঝুলিয়ে দিতে পারে।
কিন্তু দিল তো অনেক দেরি করে, জিনা বলল। লোকের কি আর কেনার সময় আছে? কেনাকাটা যা করার করে ফেলেছে। কালকের আগে বেচে শেষ করতে পারবেন বলে মনে হয় না। অনেক আছে।
তিন ডজন। একেক বাক্সে এক ডজন করে, জানাল ডিক। অত ভাবনা নেই। আগে না হলেও পরে হবে। সুন্দর জিনিস। লোকে কিনবেই। বারোটার অর্ডার ইতিমধ্যেই এসে গেছে, হাসল সে। মিস্টার মরিস দিয়েছেন। তার মানে বারোটা বিক্রি হয়ে গেছে ধরে রাখা যায়। তার মেয়ে পলি বন্ধুদের নিয়ে একটা পার্টি দেবে। সেজন্যেই কিনছে। ক্রিসমাস পার্টি। ক্রিসমাস ট্রিতে লাগাবে এই ভালুক। যাই, ফোন করিগে তাকে। এসেছে যে খবরটা দিই।
জিনা হাসল। হ্যাঁ, পলি যে পার্টি দিচ্ছে জানি। আমাদেরকেও দাওয়াত করেছে। যাই বলেন, ভালুকগুলো কিন্তু সুন্দর। ট্রিতে ঝোলালে ভালই লাগবে। অন্যান্য সাজ আর আলোতে একেবারে ঝলমল করবে, যা সুন্দর রঙ!
নীল রঙের একটা ভালুক হাতে নিয়ে দেখতে লাগল রবিন। বাদামী কাঁচের চোখ যেন জ্যান্ত হয়ে আছে ওটার। ঝিক করে উঠছে আলো লাগলেই। নরম মখমলের শরীর। আদর করে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, বাহ, খুব মিষ্টি!
তার দিকে তাকিয়ে হাসল কিশোর। বলল, নিয়ে নাও। কেরিআন্টির পছন্দ হবে।

ভালুকটার দাম মিটিয়ে দিচ্ছে রবিন, এই সময় দোকানের একধারে ডন নামে একজনকে ডাকল কেউ।
কমে গেল একটা, হাতের বাক্সটা নামিয়ে রাখতে রাখতে বলল ডিক। মিস্টার মরিসকে বারোটা পুরো করে দিতে হলে আরেকটা বাক্স খুলতে হবে। থাক এখন। খোলার সময় নেই। পরে।
আমরা খুলে দেব? সাহায্য করতে চাইল জিনা।
না, না, লাগবে না। থ্যাংক ইউ। অসুবিধে হবে না। কিছু জরুরী কাজ আছে, সেগুলো সেরে নিই আগে। কয়েকটা ভালুককে শো-কেসেও সাজাতে হবে, লোকের নজর কাড়ার জন্যে। অনেক সময় আছে। কাল বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত দোকান খোলা রাখব। গুডবাই।
তার পরদিন বিকেল চারটে। জমজমাট হয়ে উঠেছে ডক্টর মরিসের বাড়ির পার্টি। তার মেয়ে পলি, জিনার বয়েসী, খুব খাতির যত্ন করছে মেহমানদের। ক্রিসমাস ট্রির। চারপাশে জড়ো হয়েছে তার বন্ধুরা। অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস দিয়ে সাজানো হয়েছে গাছটা। চকচকে রঙিন কাগজের মোড়ক, সিল্কের ফিতে, কাগজের ফুল, ঘোট ঘোট রঙিন বালব, আর সাজানোর আরও নানা জিনিস যা যা পেরেছে, সব লাগিয়েছে এতে। এমনকি বারোটা রঙিন ভালুকও ঝুলছে গাছের ডালে।
বিরাট ঘরের এককোণে বিশাল এক টেবিল বোঝাই নানা রকম লোভনীয় খাবার। কোন কিছুর কমতি রাখেনি পলি। বন্ধুদেরকে খুশি করার জন্যে সব রকম চেষ্টা করেছে সে।
প্লেটে করে হাতে হাতে খাবার দেয়া হলো। ভীষণ ব্যস্ত হয়ে উঠল পলি। চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরছে, তদারকি করছে। এটা সেটা বাড়িয়ে দিচ্ছে। আরও খাবার নেয়ার জন্যে চাপাচাপি করছে। কেউ নিতে না চাইলে জোর করে তুলে দিচ্ছে তার প্লেটে।
খাওয়া দাওয়া শেষ হলে খেলার আয়োজন করল পলি। চমৎকার জমল মিউজিক্যাল চেয়ার। হৈ-হুঁল্লোড় আর হাসাহাসি চলল একনাগাড়ে।
তুমি ঠকিয়েছ, বব!
কে বলে রে! তুমি যে রবিনকে ধাক্কা মারলে সেটা কি?
না, আমি মারিনি! সে-ই বসতে পারেনি ঠিকমত!
বাইরে রাত নামছে। দেখতে দেখতে অন্ধকার হয়ে গেল। পরীর রাজ্যের পরীরানীর বাগান থেকে যেন তুলে আনা হয়েছে ক্রিসমাস ট্রিটা। এতই সুন্দর, এতই ঝলমলে।

এবার পুরস্কার দেয়া হবে, ঘোষণা করল পলি। ক্রিসমাস ট্রিতে ঝোলানো রয়েছে উপহার সামগ্রী, সেগুলো খুলে আনল সে। আরও নানা রকম জিনিস রয়েছে বাক্সে, টেবিলে স্তূপ করে রাখা। এক এক করে নাম ধরে ডাকতে শুরু করল পলি, ডায়না, এসো। এই দেখো, কি সুন্দর একটা পোশাক। নার্সের ইউনিফর্মের মত লাগে দেখতে, না?
খুব সুন্দর! এ রকমই একটা জিনিস চাইছিলাম, খুশি হয়ে বলল ডায়না।
মুসা আর জিনা পেল রোলার-স্কেট।
গুড! হেসে বলল জিনা। দুজনে এক জিনিস পেয়ে ভাল হলো। পাল্লা দিয়ে স্কেট করতে পারব।
কিশোর পেল বহু ফলাওয়ালা একটা ছুরি। রবিনকে দেয়া হলো চামড়ার একটা চমৎকার নোটবুক। রাফিকে পর্যন্ত দেয়া হলো একটা পুরস্কার। রবারের একটা হাড়, গলায় ঝোলানোর জন্যে, দেখতে একেবারে আসল হাড়ের মতই লাগে। কামড় বসিয়ে দিল রাফি। যখন দেখল রবার, ফেলে দিল মুখ থেকে।
তারপর হঠাৎই দপ করে নিভে গেল সমস্ত বাতি। আলোয় ঝলমল ঘরটা অন্ধকার হয়ে গেল। চেঁচিয়ে উঠল একটা ছোট মেয়ে। তার পর পরই আরও কয়েকজন চেঁচাল।
ভয় পেও না, শান্ত কণ্ঠে বলল কিশোর। ভয়ের কিছু নেই নিশ্চয় ফিউজ কেটে গেছে। ছোটাছুটি কোরো না। গায়ের ওপর পড়বে জিনিসপত্র ফেলে দেবে। ফিউজটা লাগিয়ে দিলেই আলো জ্বলে যাবে আবার
কিশোরের পরামর্শ কেউ শুনল, কেউ শুনল না ত চেঁচামেচি কমে এল। অনেকখানি। শোনা গেল ডক্টর মরিসের ভারী গমগমে কণ্ঠ, সমস্ত কোলাহল। ছাপিয়ে, শোনো, গোলমাল কোরো না কেউ। চুপ করে থাকো আমি সেলারে যাচ্ছি, ফিউজটা লাগিয়ে দেব।
তার কথাও অনেকেই শুনল না। কথা বলতে লাগল কেউ কেউ নড়তে শুরু করল অন্ধকারের মধ্যেই। দরজার কাছে রয়েছে মুসা। বাতাস লাগল গায়ে। ফিরে তাকিয়ে দেখে, কে যেন বেরিয়ে যাচ্ছে। কাপড়ের ঘষা লাগল তার মুখে। এক পা বাড়াল সে, কে দেখার জন্যে। জোরে একটা ধাক্কা দিয়ে ঘরের মধ্যে ঠেলে দিল আবার তাকে মূর্তিটা।
এই, শুনুন, শুনুন! চিৎকার করে বলল মুসা। কি করছেন?
তার কাছেই দাঁড়িয়ে রয়েছে কিশোর আর রাফি ছুটে বেরিয়ে গেল কুকুরটা একটু পরেই বাগানে শোনা গেল তার উত্তেজিত চিৎকার।
ব্যাপার কি? অবাক হলো কিশোর। কে বেরোল? দরজা খোলা ফেলে। রেখে?।
কাউ করে উঠল রাফি ব্যথায়। কেউ মেরেছে মনে হয় তাকে।

রাফি! ডাকল কিশোর। কি করছিস ওখানে?
বেরোতে যাবে সে, এই সময় আলো জ্বলে উঠল। হাসিমুখে ফিরে এলেন ডক্টর মরিস। কিছু বলার জন্যে মুখ খুলতে গিয়েই থমকে গেলেন ছেলেমেয়েদের মাথার ওপর দিয়ে তাকিয়ে রয়েছেন। চোখে বিস্ময়। তাঁর এই অবস্থা ওদেরকেও অবাক করল। মাথা ঘুরিয়ে তাকাল তার দৃষ্টি অনুসরণ করে। বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠল ওরাও।
আরে, ক্রিসমাস ট্রিটা কই!
নেই তো!
হলো কি!
চুরি করেছে।
হ্যাঁ হ্যাঁ, চুরি করে নিয়ে গেল কে যেন!
.
অবাক কাণ্ড! ক্রিসমাস ট্রি চুরি করার কথা কে কবে শুনেছে? তবে সেটা মেনে না। নিয়েও উপায় নেই জায়গামত নেই ওটা। ঘরের কোথাও নেই ডক্টর মরিস আর মিসেস মরিস স্বীকার করতে বাধ্য হলেন যে চুরিই হয়েছে ওটা আর কোন ব্যাখ্যা নেই বাতাসে তো মিলিয়ে যেতে পারে না।
আরেকটা ব্যাপার দেখে এসেছেন ডক্টর মরিস। ফিউজ কাটেনি। মেইন সুইচ অফ করে দেয়া হয়েছিল। তারমানে ওটা অফ করে আলো নিভিয়েছে চোর গাছটা চুরি করার জন্যে। কিন্তু কে করল?
শুনছেন, আংকেল? কিশোর বলল। আমার কুকুরটা এখনও ঘেউ ঘেউ করছে। বাগানে। নিশ্চয় চোরের পিছু নিয়েছিল।
দরজার দিকে দৌড় দিল সবাই। হুড়াহুড়ি শুরু করে দিল। আগে গেছেন ডক্টর মরিস। একই জায়গায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করে চলেছে রাফি। বাগানের গেট বন্ধ থাকায় বেরোতেও পারছে না, ফলে রেগে গেছে আরও। রাস্তায় একটা গাড়ির ইঞ্জিন স্টার্ট নেয়ার শব্দ হলো, একটা ভ্যান চাঁদ উঠেছে। সেই আলোয় মুসা আর কিশোর দেখতে পেল গাড়িটার পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে রয়েছে ক্রিসমাস ট্রির দুটো ডাল।
ওই যে যাচ্ছে! চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। চোর! চোর!
মুসার মনে পড়ল, অন্ধকারে ঘষা লেগেছিল তার মুখে। অবশ্যই গাছের ডালের, কোন ভুল নেই তাতে। কিন্তু কে এই কাজটা করল? একটা ক্রিসমাস ট্রি চুরি করে কি লাভ? এমন কোন দামী বস্তু নয় ওটা, অবশ্যই টাকার হিসেবে। বিক্রি করতে পারবে না। তাহলে এত কষ্ট করে এ রকম একটা জিনিস চুরি করতে এল কেন?

ডক্টর মরিস আর তার স্ত্রীও একই কথা বলাবলি করতে লাগলেন, কে চুরি করল? কেন? পাগল-টাগল নাকি?
ছেলেমেয়েদেরকে আবার ঘরে যেতে বললেন তারা। বাইরে থাকলে ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে। ঘরে এসে পুলিশকে ফোন করলেন ডক্টর মরিস, চুরির খবর দিলেন। দেরি হলো না। খানিক পরেই দুজন পুলিশম্যান এসে হাজির। সবাইকে অনেক অনেক প্রশ্ন করল তারা। নোটবুকে লিখে নিয়ে চলে গেল। ওরাও অবাক হয়েছে। কিছুতেই আন্দাজ করতে পারছে না কেউ, এ রকম জিনিস চুরির জন্যে এতটা ঝামেলা কেন করতে গেল চোর!
জিনাদের বাড়িতে ফিরে এল জিনা আর তার বন্ধুরা। চারজনের মুখে কেবল একই কথা, ক্রিসমাস ট্রি চুরি। ভাবছে, আলোচনা করছে। যতই করছে, ততই অবাক হচ্ছে। মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছে না।
চোরেরা গাছটা নয়, অনুমানে বলল রবিন, উপহারগুলোই চেয়েছে। খুলে নিতে অনেক সময় লাগত। তাই গাছটাই তুলে নিয়ে গেছে।
আমার তা মনে হয় না, জিনা বলল। উপহারগুলো ভাল, সন্দেহ নেই। তবে তেমন দামী নয় যে চুরি করতে আসবে। না, গাছটাই ওদের দরকার ছিল। প্ল্যানট্যান করেই এসেছে।
কিন্তু ক্রিসমাস ট্রি একটা সাধারণ ফার গাছ, মুসা বলল। এটা দিয়ে কার কি কাজ হবে? ক্রিসমাসের পরে এটার কোন প্রয়োজনই নেই।
কি জানি, চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। এই বিশেষ গাছটা দিয়ে হয়তো হবে। কি হবে সেটা যদি বুঝতে পারতাম!
রাত হলে শুতে গেল সবাই। চারজনেরই মাথায় ঘুরছে শুধু গাছটার ভাবনা। অনেক প্রশ্ন ভিড় করে আসছে মনে। জবাব মিলছে না কোনটারই।
কিশোর ভাবছে আরেকটা কথা। ক্রিসমাস ট্রি চুরি হয়েছে যখন, নিশ্চয় এর পেছনে কোন রহস্য রয়েছে। তবে কি আরেকটা রহস্য এসে হাজির হয়েছে ওদের কাছে? সমাধানের জন্যে? এলে ভালই হত। রহস্য পেলে ভাল লাগে। আর এ রকম জটিল আর আশ্চর্য হলে তো কথাই নেই।
*
পরদিন সকালে আরেকটা রহস্য পাওয়া গেল। রাতে ঘুমাতে দেরি করে ফেলেছে, পরদিন তাই ঘুম ভাঙতেও বেলা হয়ে গেল। নাস্তার টেবিলে এসে বসল গোয়েন্দারা। খাবার ঢাকা দিয়ে রেখে বাজারে গিয়েছিলেন কেরিআন্টি। ওরাও বসল, তিনিও ফিরলেন। সাথে করে নিয়ে এসেছেন কিছু চমৎকার কেক, আর একটা দারুণ খবর। আগের দিন রাত দুটোয় নাকি গোবেল বীচ স্টোরে চোর। ঢুকেছিল।

তাজ্জব ব্যাপার, বুঝলি জিনা, আন্টি বললেন। এত কষ্ট করে ঢুকল চোর। কিন্তু কিছুই নিল না। শুধু কিছু খেলনা ভালুক ছাড়া। বাক্সে ভরা ছিল, নিয়ে চলে। গেছে। শো-কেসে ছিল একটা না দুটো, তা-ও নিয়ে গেছে। মিস্টার ফোকসন বললেন, পুলিশও নাকি অবাক হয়েছে। কি ব্যাপার, বুঝতে পারছে না। ওদের ধারণা। হয় চোরটা পাগল, নয়তো বড়দিনে রসিকতা করেছে।
আজব ব্যাপার! কিশোর বলল।
হ্যাঁ। সে-রকমই লাগছে, বলল মুসা।
কয়েকটা খেলনা ভালুক শুধু? জিনা বলল। আর কিছুই নেয়নি? কোন মানেই হয় না এর।
নাহ! মাথা নাড়ল মুসা।
পলির গাছ চুরির চেয়ে আজব কিন্তু নয় ব্যাপারটা, বলল কিশোর।
কি যেন ভাবছে রবিন। মোলায়েম গলায় বলল, মনে আছে, গাছটা থেকে সমস্ত উপহার খুলে নেয়া হয়েছিল। কিন্তু ভালুকগুলো সব রয়ে গিয়েছিল। গাছের সঙ্গে ওগুলোও নিয়ে গেছে চোর।
রবিনের মত একই খাতে বইতে শুরু করল মুসা, জিনা আর কিশোরের ভাবনাও।
ঠিকই বলেছ, কিশোর বলল। লোকটা পাগলই হবে। খেলনা ভালুকের ওপর তার লোভ। যেখানেই দেখেছে, লোভ সামলাতে না পেরে তুলে নিয়ে গেছে।
তবে আইডিয়াটা এতই হাস্যকর মনে হলো, হাসির পাত্র হওয়ার ভয়ে কারও কাছে কথাটা বলল না ওরা। বলার মত আর কেউ তখন অবশ্য নেইও ওখানে। আন্টি চলে গেছেন রান্নাঘরে। হাঁড়িপাতিলের খুটখাট শব্দ হচ্ছে। লোভনীয় গন্ধ আসছে। কোথায় কার গাছ চুরি হলো, ভালুক চুরি হলো, পারকার আংকেলের এ সব ব্যাপারে কোন মাথাব্যথা নেই। তিনি গিয়ে ঢুকেছেন তার পড়ার ঘরে। নিশ্চয় জটিল কোন বৈজ্ঞানিক থিউরি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন এখন।
কি আলোচনা হচ্ছে কিছু বুঝতে পারছে না রাফি। যেন সেটাই জিজ্ঞেস করল, ঘাউ! অর্থাৎ ব্যাপার কি? কি নিয়ে অমন মাথা গরম করছ তোমরা?
রাফি, তুই কি ভাবছিস বল তো? জিজ্ঞেস করল কিশোর, আসলে নিজেকেই করল প্রশ্নটা। বলছি বটে পাগল, কিন্তু সে-রকম ভাবতে পারছি না লোকটাকে। এর অন্য কোন ব্যাখ্যা আছে...
খেলনা ভালুক সংগ্রহ করে না তো? বাধা দিয়ে বলল মুসা।
না, মাথা নাড়ল জিনা। সংগ্রাহক হলে একজন হত। ভেবে দেখো, ক্রিসমাস ট্রিটা যথেষ্ট ভারী। সেটাকে নিয়ে ভ্যানে তুলে ওরকম তাড়াতাড়ি চলে যাওয়া একজনের পক্ষে সম্ভব না। কমপক্ষে দুজন। পাগল হলেও একজন হত। তারমানে সগ্রহ কিংবা পাগলামি কোনটাই নয়।

ঠিকই বলেছ, একমত হলো কিশোর। কয়েকটা খেলনা ভালুক জোগাড়ের জন্যে শুধু এতসব করেনি লোকগুলো।
কি মনে হয় তোমার? ওই ভালুকগুলোর কোন বিশেষত্ব আছে?
থাকতে পারে। সে-কথাই ভাবছি আমি।
সে-কারণেই যেখানে যত ভালুক পেয়েছে সব তুলে নিয়ে গেছে ওরা। গাছটা নিয়েছে, দোকানের বাক্সগুলো নিয়েছে, এমনকি শো-কেসে একটা যে ছিল, সেটাও নিয়ে গেছে। তার মানে জানত কোথায় ওগুলো পাওয়া যাবে।
হ্যাঁ, একেবারে ঝেড়েপুছে নিয়ে গেছে, কিশোর বলল। একটাও রাখেনি।
এখন কি করবে ওরা? মুসার প্রশ্ন। সব তো নিল…
না, সব নিতে পারেনি, হাত নাড়ল রবিন। একটা রয়ে গেছে আমার কাছে। যেটা আন্টিকে উপহার দিতে কিনেছি।
তাই তো!
রবিন, উত্তেজিত কণ্ঠে কিশোর বলল। জলদি যাও! নিয়ে এসো!
ছুটে ওপরতলায় চলে গেল রবিন। একটু পরেই ফিরে এল নীল ভালুকটা নিয়ে।
কৌতূহলে ফেটে পড়ছে চারজনেই। গাঁ ঘেঁষাঘেঁষি করে এল দেখার জন্যে। কিছুই অস্বাভাবিক লাগছে না খেলনাটার। সাধারণ, ছোট, নরম একটা জিনিস, যেটার কোন বিশেষত্বই চোখে পড়ল না।
নাহ! মাথা নাড়তে লাগল মুসা। কিছু নেই। বাকিগুলোও, যেগুলো দেখেছিলাম, একই রকম দেখতে। ছোট ছোট, সুন্দর। তবে অস্বাভাবিক কিছুই নেই।
ব্যাপারটা বেশ রহস্যময়, কিশোর বলল। আমার মনে হচ্ছে দুটো চুরিরই কোন একটা সম্পর্ক আছে। আচ্ছা, রহস্যটা কি তা বের করলেই তো পারি আমরা? অন্তত করার চেষ্টা তো করতে পারি?
অন্য তিনজনও ভেবে দেখতে লাগল কথাটা।
হ্যাঁ, তা করতে পারি, মাথা দোলাল মুসা। শুরুটা করা যায় গোবেল বীচ স্টোর থেকেই। ওখানে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে পারি আমরা। কিভাবে কি হয়েছে তদন্ত করে আসতে পারি।
হ্যাঁ, তা পারি, জিনা বলল। এখন নিশ্চয় খোলাই আছে দোকান। এ সময়ে থাকে।
ওঠো তাহলে, উঠে দাঁড়াল কিলোর। চলো, যাই।
যত তাড়াতাড়ি পারল বাইরে বেরিয়ে এল ওরা। মিনিটখানেক পরেই গোবেল বীচ কটেজের দিকে চলল চারটে সাইকেল আর একটা কুকুরের মিছিল।

.

দোকানে পৌঁছে দেখল আরও অনেক লোক রয়েছে ভেতরে। কেউ কেউ সত্যি এসেছে জিনিস কিনতে, কেউ এসেছে কৌতূহল মেটাতে। কাউন্টারে কাউন্টারে

লোক ঘুরছে। যারা কিনতে এসেছে তারাও কম কৌতূহলী নয়। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চলেছে। তাদের মাল প্যাকেট করতে আর প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে দোকানের তিনজন কর্মচারী। প্রসঙ্গ একটাই, গতরাতের চুরি।
কিশোর দেখল, বেঁটে, গাট্টাগোট্টা এক লোকের সঙ্গে কথা বলছে ডিক। লোকটার বয়েস চল্লিশ-টল্লিশ হবে। চোখে কালো কাঁচের সানগ্লাস। সাংবাদিক বলে পরিচয় দিয়েছে। এক কোণে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। আর ডিক যা বলছে সব লিখে নিচ্ছে নোটবুকে। কাছে গিয়ে দাঁড়াল ছেলেমেয়েরা। ওদেরকে একটা আন্তরিক হাসি উপহার দিল ডিক।
হাল্লো, বলল সে। কি চাই? আরও খেলনা?
না, এমনি এলাম, হেসে বলল জিনা। জাস্ট কৌতূহল।
মেটাতে, হেসে যোগ করল কিশোর।
বাধা পড়ায় বিরক্ত হলো চশমাওয়ালা লোকটা। ছেলেমেয়েদের দিকে ফিরেও তাকাল না। ডিককে বলল, ওদেরকে বাদ দিন না। যা, কোথায় যেন এসেছিলাম?
নতুন আর কি বলব, যা বলার তো বলেই দিয়েছি, ডিক বলল। চোরেরা আর কিছুই নেয়নি, শুধু...।
হ্যাঁ, জানি, শুধু রঙিন খেলনা ভালুকগুলো নিয়েছে, অধৈর্য ভঙ্গিতে বলল লোকটা। আমার কথার জবাব কিন্তু এখনও পাইনি। আমি জানতে চাইছি সবই কি নিয়ে গেছে? দোকানে যা ছিল...মানে, এসেছিল? কটা এসেছিল?
এসেছিল ছত্রিশটা, ডিক বলল। চশমাওয়ালা লোকটার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। তার মনে হলো, সেলসম্যানের জবাব শুনে সামান্য যেন চমকে গেল লোকটা। তবে মুহূর্তে সামলে নিল সেটা। দ্রুত লিখে নিল নোটবুকে।
বারোটা নিয়ে গেছেন ডক্টর মরিস। আর চব্বিশটা... রবিনের ওপর চোখ পড়তে থেমে গেল সে। না না, তেইশটা ছিল দোকানে। কারণ এই ছেলেটা একটা নিয়ে গিয়েছিল, রবিনকে দেখাল সে।
এতক্ষণ এমন ভাব করছিল লোকটা যে ছেলেমেয়েগুলো চলে গেলেই বাঁচে। হঠাৎ করেই তার আচরণ বদলে গেল। এখন যেন ওদের প্রতিই বেশি মনোযোগ। আন্তরিক হওয়ার জন্যে হাসল। তাই নাকি? রবিনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল সে। তাহলে তুমিও একটা নিয়েছ? আমি শুনলাম, চোরেরা নাকি সব চুরি করেছে, যতগুলো ভালুক এসেছিল।
হ্যাঁ, সবই নিয়েছে, আরেকবার বলল ডিক। ডক্টর মরিসের বারোটা, আর এই ছেলেটার একটা বাদে। তার মানে দোকান থেকে চুরি হয়েছে তেইশটা।
কিশোর বুঝল, পলিদের ভালুকগুলো চুরি হওয়ার খবরটা জানে না সেলসম্যান।

রবিনের দিকে তাকিয়েই রয়েছে চশমাওয়ালা। একটা তাহলে আছে তোমার কাছে? কেন জিজ্ঞেস করছি জানো? পত্রিকায় লেখার জন্যে।
অ, পকেটে হাত ঢোকাল রবিন। নীল ভালুকটা সঙ্গেই রয়েছে। সেটা বের করে দেখিয়ে বলল, এই যে এটাই। খুব মিষ্টি, না?
রবিনের হাত থেকে ভালুকটা নিয়ে দেখতে লাগল সাংবাদিক। বলল, হ্যাঁ, মিষ্টি! ফিরিয়ে দিল আবার। শোনো, খবরের কাগজে নাম আর ছবি ছায়া দেখতে। কেমন লাগবে? আমার প্রতিবেদনে তোমার নাম আমি উল্লেখ করতে পারি। হেডলাইনটাও বলে দিতে পারি এখনি। বড়দিনের অপরাধ: নীল ভালুকের রহস্য। খুব আকর্ষণীয় হবে, তাই না?
লোকটার হাবভাব একটুও ভাল লাগল না কিশোরের। রবিনের হাত ধরে টান দিল, এসো। দেরি হয়ে যাচ্ছে। বেরোই। কিসের দেরি হয়ে যাচ্ছে বুঝল না রবিন। তবে জিজ্ঞেসও করল না। যা বলছে করার জন্যে ঘুরতে গেল।
এক মিনিট, হাত তুলল লোকটা। আর দুএকটা কথার জবাব দিয়ে যাও, কাগজের জন্যে। আমার কলামটা পুরো করতে হবে তো... রবিনের নাম-ঠিকানা জিজ্ঞেস করল সে।
বাড়ি তো এখানে না, জবাব দিল রবিন। বেড়াতে এসেছি। ওদের বাড়িতে, জিনাকে দেখাল সে। বাড়ির নাম গোবেল ভিলা। আর আমার আংকেলের নাম জনাথন পারকার। তিনি বিজ্ঞানী।
পুরোপুরি অধৈর্য হয়ে গেছে কিশোর। লোকটা এখন রবিনকে ছেড়ে দিলেই খুশি হয় সে। চশমাওলাকে প্রথম থেকেই খারাপ লাগছে তার। আর এখন সন্দেহ ঢুকে গেছে মনে। লোকটার প্রশ্নগুলো বিশেষ পছন্দ হচ্ছে না, খটকা লাগছে। কি করে চুরি হয়েছে, সেটা নিয়ে মোটেও আগ্রহ নেই, যত আগ্রহ কটা চুরি হয়েছে সেটা নিয়ে। কেন?
কোন কাগজে কাজ করেন আপনি? আচমকা জিজ্ঞেস করে বসল কিশোর।
হঠাৎ করে নোটবুক বন্ধ করল লোকটা। দা নিউজ! যাই এখন। তাড়াতাড়ি গিয়ে প্রতিবেদনটা লিখে ছাপতে দিতে হবে...গুডবাই!
বেরিয়ে গেল সে। ব্যাপারটা মুসারও অবাক লাগল। ভুরু কুঁচকে বিড়বিড় করতে লাগল সে, দা নিউজ তো বুঝলাম, কিন্তু কোন নিউজ? ডেইলি নিউজ? ইভনিং নিউজ? গোবেল বীচ নিউজ? কাগজের পুরো নাম বলেনি লোকটা। ওর কথাবার্তা হাবভাব কিছুই ভাল লাগেনি আমার।
আমারও না, জিনা বলল।
এতক্ষণে সুযোগ পেয়েছে কিশোর। দেরি করল না আর। প্রশ্ন শুরু করল ডিককে। তবে নতুন কিছু তেমন জানতে পারল না। আগেই জেনেছে এ সব। গত

রাতে দুটোর দিকে চোর ঢুকেছিল দোকানে। ওদের জানা ছিল কোথায় রয়েছে বার্গলার অ্যালার্ম। তারগুলো কেটে দিয়েছে ঢোকার আগে, যাতে ঘণ্টা বেজে ওদেরকে ধরিয়ে দিতে না পারে। বাক্সে যতগুলো ভালুক ছিল, সব নিয়েছে। শো কেসেরটাও নিয়ে গেছে। অন্য কোন জিনিসে হাত দেয়নি।

এটাই অবাক লাগে, ডিক বলছে। এত দামী দামী জিনিস থাকতেও কিছুই নিল না। নিল কিনা শুধু কয়েকটা সাধারণ খেলনা ভালুক! আরও আশ্চর্য, শো কেসেরটা পর্যন্ত বের করে নিয়ে গেছে। এতে পরিষ্কারই বোঝা যায়, ওরা এসেছিলই শুধু ওগুলো নিতে। আর কোন কিছুতে ইন্টারেস্টেড নয়। এই কাজ করতে ভেতরের কারও সাহায্য নিয়েছে। এই দোকানেরই কেউ! পুলিশের তাই ধারণা।

কেমন যেন লাগে! দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াল কিশোর। স্বাভাবিক মনে হয় না। মাথা নাড়ল সে। বিড়বিড় করল, পলিদের বাড়ি থেকে গাছ নিয়ে যাওয়াটাও অদ্ভুত। ভাবছি, কি আছে এ সব চুরির পেছনে? কারণটা কি?

একজন খরিদ্দার এগিয়ে এল ডিকের দিকে। জিনিস চাইল। ব্যস্ত হয়ে পড়ল সেলসম্যান। আর কথা বলা যাবে না, বুঝতে পারল ছেলেমেয়েরা। তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এল দোকান থেকে।

আপাতত আর কিছু করার নেই। কাজেই ভালুক চুরির ব্যাপারটা মন থেকে দূর করে দিয়ে লোকের বাড়িতে দাওয়াত খাওয়ায় মন দিল। জিনাকে দাওয়াত করে গেছে.তার অনেক বন্ধু। একলা গেল না কোথাও সে, মুসা, কিশোর আর রবিনকে নিয়েই গেল।

উড়ে যেতে লাগল যেন সময়। প্রচুর খাওয়া-দাওয়া হলো। সেই সাথে পেল অনেক সুন্দর সুন্দর উপহার। খুব খুশি ওরা। একে অন্যের উপহারের প্রশংসা করল। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে। তারপর সাগরের ধারে বেড়াতে বেরোল।

সারাদিনে এত খেয়েছে, সাগরের তীরে খোলা বাতাসে ঘুরে আসার পরেও খিদে পেল না তেমন। কাজেই হালকা কিছু খেয়ে খেলতে বসে গেল। তারপর ক্লান্ত হয়ে বিছানায় গেল।

ঘুমানোর আগে মুসার শেষ কথা, কাল আমার কিছু খাওয়া লাগবে না, বুঝলে।

শুধু হুঁ বলতে পারল কিশোর। তার পরেই ঘুম।

কথাটা একেবারেই ভুল বলেছে মুসা। সকালে উঠেই ভীষণ খিদে। প্রচুর খেতে পারল। অন্য তিনজনও কম গেল না। খেয়েদেয়ে বেরিয়ে পড়ল। বাগানে ঘোরাঘুরি করল খানিকক্ষণ। শেষে চলল সৈকতে। দুপুরের খাওয়ার সময় আবার যে খিদে সেই খিদে।

সেদিনটাও কেটে গেল খুব দ্রুত। নতুন কিছু ঘটল না।

তার পর দিন সকালে উঠে কেরিআন্টি দেখলেন খাবারে টান পড়েছে। দোকান থেকে আনতে হবে। তালিকা লিখে ছেলেমেয়েদের ডেকে বললেন বাজার থেকে নিয়ে আসতে।

এই যে এগুলো দরকার, বললেন তিনি। ডিম, ফল, সবজি...সব লিখে দিয়েছি। দুটো ঝুড়ি নিয়ে যাও। সাইকেলের স্যাডল ব্যাগে এত কিছু ধরবে না।

সাইকেল নিয়ে রওনা হলো ওরা। সাথে চলল রাফি। আকাশ মেঘলা নয়, বৃষ্টি পড়ছে না, পথঘাটও খটখটে শুকনো। এমন দিনে সাইকেল চালাতে ভাল লাগে ওদের। বাজারে পৌঁছে কেনাকাটাগুলো জিনাই করতে লাগল, আর ছেলেরা বোঝা বইতে লাগল।

রবিন পকেটে হাত দিতেই হাতে ঠেকল খেলনা ভালুকটা। আন্টিকে দিতে ভুলে গেছে। হাতের কাছে পেল যখন বের করে হাতে নিয়ে দেখতে লাগল নেড়েচেড়ে। বোঝার চেষ্টা করল কি এমন মাহাত্ম্য আছে? রাফিকে দেখাল।

রাফি, দেখ। সুন্দরই জিনিসটা, কি বলিস? কি নাম রাখা যায়, বল তো? এক কাজ করি। নীল রঙ যখন, নীল ভালুকই নাম রেখে দিই।

শান্তকণ্ঠে পেছনে বলে উঠল কেউ, বাহ্, খুব সুন্দর ভালুক তো। হাতে নিয়ে দেখতে দেবে?

ফিরে তাকিয়ে রবিন দেখল এক তরুণী মহিলা তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে হাসিমুখে। চোখগুলো কেমন বিষণ্ন। হাত বাড়িয়ে রেখেছে ভালুকটার জন্যে।

দিল রবিন। চকচক করে উঠল মহিলার চোখ। উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। ভালুকটার শরীর টিপে টিপে দেখছে।

আমাকে দেবে এটা? অনুনয় শুরু করল মহিলা। দাম আমি দিয়ে দেব। যত চাও, দেব। খেলনাটা আমাকে দিয়ে দাও। আমার ছেলের জন্যে। তার খুব অসুখ। বিছানায় পড়ে আছে। এটা পেলে খুব খুশি হবে।

মহিলার এই অনুনয় অবাক করল রবিনকে। মনটা হঠাৎ নরম হয়ে গেল। খেলনাই তো একটা, এতে যদি মহিলার ছেলে খুশি হয়, তোক না। হ্যাঁ বলতে যাবে সে, এই সময় একটা হাত এগিয়ে এল তার কাঁধের ওপর দিয়ে। মহিলার হাত থেকে প্রায় থাবা মেরে কেড়ে নিল ভালুকটা।

.

খুবই দুঃখিত আমি, কিশোর বলল ভদ্র কণ্ঠে। কিন্তু এটা অন্য একজনের জন্যে কেনা হয়েছে, ক্রিসমাস প্রেজেন্ট। এই উপহারের মূল্য আপনার জানা আছে। এটা আর কাউকে দেয়া যাবে না। আপনি চাইলে এ রকম ভালুক অনেক কিনতে পারেন, গোবেল বীচ স্টোরে পাওয়া যায়। ওদের কাছে এখন না থাকলেও অর্ডার দিয়ে আনিয়ে নিতে পারবেন।

প্রতিবাদ করার জন্যে মুখ খুলল মহিলা। কিন্তু শোনার অপেক্ষায় থাকল না কিশোর। রবিনকে টেনে নিয়ে গিয়ে ঢুকে পড়ল ক্রেতার ভিড়ে।
কাজটা কি ঠিক হলো? রবিন বলল। কি আর এমন জিনিস? মহিলাকে দিয়ে দিলেই হত। তার ছেলেটার খুব অসুখ।
অসুখ না ছাই! বানিয়ে বলেছে। জিনাদের বাড়ি থেকেই আমাদের পিছে লেগেছে। তুমি খেয়াল করোনি। অবাকই লাগছে আমার এখন! আর কত লোক ওই খেলনা ভালুকের ব্যাপারে আগ্রহী!
মানে? চোখ বড় বড় হয়ে গেছে জিনার। ওই মহিলা আমাদের বাড়ি থেকে পিছে লেগেছে?
হ্যাঁ। বাড়ি থেকে বেরিয়েই দেখলাম ছোট একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে রাস্তার পাশে। আমাদেরকে দেখে স্টার্ট নিল। খুব ধীরে ধীরে আসতে লাগল আমাদের সাইকেলের পিছে। পুরো রাস্তাটা সেকেন্ড গীয়ারে এসেছে। অথচ ইচ্ছে করলেই আমাদের পাশ কাটিয়ে অনেক আগে চলে আসতে পারত। আসেনি। কেন? আমাদেরকে অনুসরণ করছিল বলে। বাজারের কাছাকাছি পৌঁছে তারপর পাশ কাটাল। ওই মহিলাই গাড়িটা চালাচ্ছিল, আমি দেখেছি।
কিন্তু কেন? মুসার প্রশ্ন। তোমার কি মনে হয় এই মহিলাও ভালুক শিকারীদের একজন?
তাই তো মনে হচ্ছে এখন। আরও একটা ব্যাপার, যে চশমাওয়ালা লোকটা সেদিন ডিককে প্রশ্ন করছিল, খবরের কাগজের লোক বলে পরিচয় দিয়েছিল, তাকেও এখন চোরের দলের লোক বলেই মনে হচ্ছে। একটা ব্যাপার খেয়াল করোনি, কটা ভালুক ছিল, কটা চুরি হয়েছে, খালি সে-কথা জিজ্ঞেস করছিল বার বার লোকটা। রবিনের কাছে একটা আছে শুনে কেমন চমকে গিয়েছিল।
কিশোরের কথা শুনে রবিনও অবাক। তাই তো! হা হা, এই একটা ভালুকই নিতে পারেনি চোরেরা। সেজন্যেই এটা নিয়ে যেতে চেয়েছিল মহিলা!
দিয়ে তো দিয়েছিলে আরেকটু হলেই, মুসা বলল। আরেকটা বোকামি করেছ চশমাওয়ালাকে বাড়ির ঠিকানা জানিয়ে দিয়ে। উচিত হয়নি। ওই ব্যাটা সাংবাদিক না কচু। মহিলাকে বলেছে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে। আমাদের পিছু নিতে। কোনভাবে ভালুকটা জোগাড় করে নিয়ে যেতে। হয়তো এর জন্যে টাকাও দিয়েছে মহিলাকে।
নিয়ে গিয়েছিল আরেকটু হলেই! জিনা বলল। কিশোর বাধা না দিলে তো যেতই।
চিন্তিত লাগছে কিশোরকে। বলল, এবার পারল না বটে, তবে আমার বিশ্বাস, আবার চেষ্টা করবে ওরা।

অতি কল্পনা হয়ে যাচ্ছে না তো? মুসা বলল। হয়তো বেশি বেশিই ভেবে ফেলছি আমরা। দোকানে চুরি হয়েছে, ঠিক। পলিদের বাড়িতেও হয়েছে। কিন্তু তাতেই কি মনে হয় ঘটনাগুলোর মধ্যে কোন যোগসূত্র আছে? খেলনা ভালুকগুলোর পিছেই লেগেছে চোর, এমন তো না-ও হতে পারে। আর ওই মহিলা সত্যি কথাও বলে থাকতে পারে। হয়তো তার বাচ্চার সত্যিই অসুখ।
তার দিকে তাকিয়ে অধৈর্য ভঙ্গিতে হাত নাড়ল কিশোর। দূর! একেবারেই মিছে কথা বাড়ি চলো। ভালুকটা খুলে দেখব ভেতরে কি আছে।
ভেতরে? ভুরু কুঁচকে ফেলল রবিন।
হ্যাঁ। আমি কি ভাবছি বলছি। আমার ধারণা, ওই ভালুকগুলোর কোনটার মধ্যে রয়েছে মূল্যবান কিছু। চোরেরা ছত্রিশটার মধ্যে পয়তিরিশটাই নিয়ে গেছে। ওগুলোতে যদি থাকত এই একটা নেয়ার জন্যে আর অত চেষ্টা করত না। তারমানে রবিনের ভালুকটার মধ্যেই রয়েছে সেই জিনিস, তুড়ি বাজাল সে। গোপন কথা বলতে আমরা বাধ্য করব নীল ভালুককে!
তাড়াতাড়ি বাজার শেষ করল ওরা। তারপর বাড়ির পথ ধরল। অস্বস্তি বোধ। করছে। বার বার পেছন ফিরে তাকাচ্ছে। কেউ অনুসরণ করছে কিনা দেখছে। কিন্তু সন্দেহজনক কোন গাড়িকে পিছু নিতে দেখল না।
দুশ্চিন্তা গেল না তবুও। গোবেল ভিলার বাগানে ঢোকার আগে আর নিশ্চিন্ত হতে পারল না। ঢুকে, তারপর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। যাক! এবারে শান্তি!
জিনিসপত্রগুলো রান্নাঘরে নিয়ে এল ওরা। সেখানে ওগুলো রেখে রওনা হলো একটা পুরানো স্টোর রুমে। পারকার আংকেলের স্টাডি থেকে দূরে ঘরটা। ওখানে চেঁচামেচি করলেও তার কানে পৌঁছবে না। বিরক্ত হবেন না তিনি। কাজে বিঘ্ন ঘটবে না। গোলমাল একেবারেই সইতে পারেন না তিনি।
স্টোর রুমে ঢুকে পকেট থেকে ভালুকটা বের করল কিশোর।
ঘাউ! আগ্রহী মনে হলো রাফিকে।
দেখি তো, কিশোরের হাত থেকে ভালুকটা নিল মুসা। ছোট। খেলনা। এর ভেতরে কি থাকতে পারে বুঝতে পারছি না।
হীরাটীরা কিছু? রবিনের অনুমান।
কিংবা হয়তো এক টুকরো কাগজ, আবার মুসার হাত থেকে ভালুকটা নিয়ে ওটার পেট টিপেটুপে দেখতে শুরু করল কিশোর। দাঁড়াও! জোরে টিপলে কি যেন লাগছে!
কেটে ফেলো, মুসা বলল।
ঠিক। পকেট থেকে বহু ফলাওয়ালা ছুরিটা বের করল কিশোর, যেটা পলির কাছ থেকে উপহার পেয়েছে।

আমার কাছে দাও! উত্তেজনায় কাঁপছে মুসা।
বন্ধুর দিকে তাকাল কিশোর। কি ভাবল। তারপর হেসে ভালুক আর ছুরিটা বাড়িয়ে দিল। নাও, কাটো।
হাত কাঁপছে মুসার। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে দিল ছেড়ে। একসাথে ধরতে গেল জিনা আর কিশোর। ঠোকাঠুকি হয়ে গেল হাতে হাতে। ভালুকটার গায়ে লেগে লাফ দিয়ে ওপরে উঠে গেল ওটা। পড়তে লাগল আবার। রাফি ভাবল, এটা এক ধরনের মজার লোফালুফি খেলা। সে-ও অংশ নিল তাতে। ভালুকটা মাটিতে পড়ার আগেই লুফে নিল, দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল জোরে, যাতে না ফসকাতে পারে।
এই, এই! চিৎকার করে উঠল রবিন।
ফেল! ছাড়, জলদি! রাফির কলার ধরে ঝাঁকি দিল কিশোর।
কুকুরটার মুখ থেকে ভালুকটা বের করে নিতে গেল মুসা। কিন্তু এটাও খেলা ভেবে ছাড়ল না রাফি। আরও জোরে কামড়ে ধরল। গরগর শব্দ বেরোচ্ছে গলার ভেতর থেকে। যেন চ্যালেঞ্জ করছে, দেখি বের করো তো, কেমন পারো!
হয়েছে, রাফি! ধমক দিয়ে বলল কিশোর। ফেল ওটা! ছাড়! দেখি, দে আমাকে!
মুসাও হাত বাড়িয়েছে। দুজনে দুদিকে ধরে টান মারল। প্রচণ্ড টান, সইতে পারল না সামান্য একটা খেলনা। ছিঁড়ে গেল ওটা।
অবাক হয়ে অবশেষে কামড় ছেড়ে দিল রাফি। ছেঁড়া ভালুকটা তুলে নিল মুসা। দেখার জন্যে এত দ্রুত ঝুঁকে এল চারজনে, ঠোকাঠুকি হয়ে গেল মাথায়। ভেতরে আর কিছুই চোখে পড়ল না, তুলা ছাড়া। শেষে ফুটোর ভেতরে আঙুল ঢুকিয়ে দিল রবিন।
এই, আছে তো! কি যেন রয়েছে!
ভালুকটা নিয়ে ফুটোটা টেনে আরও বড় করল জিনা। কিছু তুলা টেনে টেনে বের করে ফেলল। তারপর ফুটোটা নিচের দিকে করে ঝাঁকি দিল জোরে। নিচে বাড়িয়ে রাখল আরেক:হাত। শক্ত করে পাকানো এক টুকরো কাগজ পড়ল তার ছড়ানো তালুতে।
একটা মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল সকলেই। নীরবে তাকিয়ে রয়েছে জিনার হাতের কাগজটার দিকে। তাহলে নীল ভালুক মুখ খুলল অবশেষে, বলতে যাচ্ছে তার। গোপন কথা!!
ভাল, কথা বলল কিশোর। লুকানোর চমৎকার জায়গা! এখন দেখা যাক কাগজে কি রয়েছে!
খুলতে আরম্ভ করে দিয়েছে জিনা। চুপ করে সেদিকে তাকিয়ে রইল অন্য তিনজনে। উত্তেজনায় এখন সবাই কাঁপছে। ভাজ খুলে হাতের তালুতে বিছিয়ে

ডলে। কাগজটা সমান করল জিনা। কি আছে পড়ার জন্যে ঝুঁকে এল সকলেই। কালো কালিতে নিখুঁত করে আঁকা রয়েছে কতগুলো আয়তাকার চিহ্ন। তার মধ্যে থেকে গজিয়ে উঠেছে কিছু নকশা, কিংবা জ্যামিতিক চিহ্ন। আর কিছু লেখা রয়েছে ভেতরে।
নকশা! চেঁচিয়ে উঠল মুসা।
হু! চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল জিনা। তাহলে এর পেছনেই লেগেছিল ওরা!
কারা সে-কথাটা জিজ্ঞেস করল না কেউ। জানাই তো আছে। চোরের কথা বলছে জিনা। ক্রিসমাস ট্রি আর দোকানে ঢুকে খেলনা ভালুক চুরির রহস্যের একটা জবাব এখন পরিষ্কার।
আমাদের অনুমানই ঠিক! বেশ সন্তুষ্ট লাগছে কিশোরকে। মুসা, এখন তো বিশ্বাস করবে? নীল ভালুকটার পেছনেই লেগেছিল চোরেরা।
হায়রে আমার নীল- ভালুক! ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলল রবিন। কি নিষ্ঠুর ভাবেই না খুন করা হলো তোকে!
কিশোর বলল, ঠিক করে ফেলা যাবে। নষ্ট হয়নি। ভাল করে দেখো, শুধু জোড়াটা ছুটেছে। তুলা ভরে আবার সেলাই করে নিলেই হয়ে যাবে।
কাজে বসে গেল রবিন। ও যখন খেলনা মেরামতে ব্যস্ত, অন্য তিনজন তখন নকশাটা নিয়ে বসল। মানে বোঝার চেষ্টা করতে লাগল।
নকশা, তাতে কোন সন্দেহ নেই, মুসা বলল। কিন্তু কিসের নকশা? হাতমাথা তো কিছুই বুঝতে পারছি না আমি।
এত সহজে হাল ছাড়ছি না, জিনা বলল। হয়তো কোন বাড়ির নকশা…
কিংবা গুপ্তধনের! বলে উঠল কিশোর। কোন নির্জন দ্বীপে লুকানো থাকলেও অবাক হব না। সব সময়েই কল্পনার বন্ধু ছেড়ে দেয় সে। তাতে ক্ষতি বিশেষ হয় না। রহস্য সমাধানের ক্ষেত্রে বরং লাভই হয়েছে এতে, বহুবার দেখেছে।
রান্নাঘর থেকে কেরিআন্টির ডাক শোনা গেল। এই জিনা, তোরা কোথায় গেলি? খাবার রেডি।
দাঁত দিয়ে কামড়ে সুতো কাটল রবিন। হয়েছে! ভালুকটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে হাতের কাজ দেখতে দেখতে বলল, একেবারে নতুনের মত। হ্যাঁ রে নীল ভালুক, আর কোন দুঃখ নেই তো তোর?
এটা আর আন্টিকে দেয়া যাবে না, মুসা বলল।
খাওয়ার পর আবার নকশাটা নিয়ে বসব, বলল কিশোর। এখন লুকিয়ে রাখি। কোথায় রাখব?
ঘাউ! জবাব দিল রাফি।

বাহ, ভাল জায়গার কথা বলেছিস তো, হেসে বলল কিশোর। ও বলছে, কুকুরের ঘরে রেখে দিতে। তারমানে ওর ঘুমানোর জায়গায়। ভালই হবে, কি বলো?
রাফির কথা বললেও তার বন্ধুরা জানে বুদ্ধিটা কিশোরের মাথা থেকেই বেরিয়েছে। একটা খাম খুঁজে বের করল সে। ভাজ করে কাগজটা তাতে ভরে টেপ দিয়ে মুখ আটকে দিল। খামটা নিয়ে গিয়ে আটকাল কুকুরের ঘরে ছাতের ভেতর। দিকটায়।
চলো, জলদি চলো, জিনা বলল। টেবিলে বেশিক্ষণ বসিয়ে রাখলে রেগে যায় আব্বা।
বকা খেতেই হবে, ধরে নিল সে। তবে খেতে হলো না। একটা জরুরী কাজে এতই মগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন পারকার আংকেল, কয়েকবার করে ডেকে তারপর বের। করে আনতে হলো তাকে। টেবিলে আসতে বরং তিনিই দেরি করে ফেললেন।
খুশি মনে খেতে বসল ছেলেমেয়েরা। একটা রহস্যের কিনারা করতে না করতেই এসে হাজির হয়েছে আরেকটা রহস্য।
নকশা!

.

সেদিন বিকেলেও আবহাওয়া ভাল রইল। তুষার পড়লেও অবশ্য ক্ষতি ছিল না। এই সময়টায় ভালই লাগে তুষার। ঘরে বসে লুডু-কেরম খেলা যায়। তবে পড়ল না। পরিষ্কার দিন। শুকনো। উজ্জ্বল। বাইরে বেরোনোর সুযোগটা হাতছাড়া করল না ওরা।
চলো, সাইকেল নিয়ে বেরোই, প্রস্তাব দিল জিনা।
চলো, রাজি হলো কিশোর। নকশা নিয়ে বিকেলেও বসা যাবে। এত তাড়াহুড়ো নেই।
কিশোরের পরামর্শে নীল ভালুকটা সাইকেলের স্যাডল ব্যাগে ভরে নিল রবিন।
নিচ্ছ যে, মুসা হাসল। ভয় লাগছে না? কেড়ে নিতে পারে ওরা…
খুব ভাল হয় তাহলে, কথাটা ধরল কিশোর। ব্যাটাদের ওপর নজর রাখার একটা ব্যবস্থা হয় নিতে এলে। চোরাই মাল সহ হাতেনাতে ধরেও ফেলা যেতে পারে। জানা যাবে ওরা কারা।
ঠিক, জিনা বলল। কড়া নজর রাখব আমরা। তবে রাখছি যে সেটা বুঝতে দেয়া চলবে না।
টোপ একবার গিললেই হয়, মুসা বলল। চোরগুলোর পিছু নিয়ে গিয়ে ব্যাটাদের গোপন আস্তানা বের করে ফেলব। গিয়ে বলব পুলিশকে। পুলিশ গিয়ে ধরবে…
হয়েছে, বকবক থামাও এখন, বাধা দিয়ে বলল কিশোর। সাইকেলের হ্যান্ডেল ধরে সোজা করল, উঠে বসার জন্যে। কোথায় যাওয়া যায়? চলো, বনের দিকেই

চলে যাই।
কেউ অরাজি নয়।
গোবেল বীচের একধারে ছোট বন। সেখানে পৌঁছে সাইকেল রেখে একটা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে জিরাতে লাগল কিশোর। দেখাদেখি অন্যেরাও তাই করল। তবে এ সময়টায় ঠাণ্ডা এত বেশি, বনের ভেতর ভাল লাগে না। বেশিক্ষণ থাকল না ওখানে ওরা। আবার সাইকেলে চেপে বসল।
ফেরার পথে ছোট একটা দোকান দেখে কিছু কেনাকাটার ইচ্ছে হলো রবিনের। দোকানটা নতুন খুলেছে। কাঠ কুঁদে নানা রকম খেলনা আর ঘর সাজানোর জিনিস বানিয়ে বিক্রি করে দোকানদার। চালাক-চতুর লোক।
দোকানের দেয়ালে সাইকেল ঠেস দিয়ে রেখে ভেতরে ঢুকল ছেলেমেয়েরা। রাফিও ঢুকল। লোকটার তৈরি জিনিসপত্র দেখতে লাগল প্রশংসার দৃষ্টিতে। সালাদের বাটি, চামচ, কাটাচামচ, খেলনা, জীবজন্তুর মডেল, সবই কাঠের তৈরি। পুঁতির মালাও আছে অনেক রকমের। কেরিআন্টিকে উপহার দেয়ার জন্যে একটা। সালাদের বাটি কিনল কিশোর।
রবিনের কিছু পছন্দ হলো না। কেনার মত জিনিস পেল না
। উপহার দেয়ার জন্যে মুসা কিনল একটা কাঠের অ্যান্টিক।
ঠাট্টা করে রবিন বলল, দেখো, এর ভেতর থেকে আবার কি বেরোয়।
দোকান থেকে বেরিয়ে এল ওরা। বেরোতেই রবিনের চোখে পড়ল, সাইকেলের স্যাডল ব্যাগ খোলা। দৌড়ে গেল কাছে।
হায় হায়, চিৎকার করে উঠল সে। আমার ভালুক!
তন্ন তন্ন করে খুঁজল ব্যাগটা, যদিও এত খোঁজার প্রয়োজন ছিল না। নেই তো নেইই। গায়েব হয়ে গেছে খেলনাটা।
ঠোঁট কামড়াল রবিন। আ-আমারই দোষ! আগেই তো আলোচনা হয়েছে, চুরি হতে পারে। তার পরেও মনে রাখলাম না কেন? ভুলে গেলাম কেন? নিশ্চয় কেউ নজর রেখেছে আমাদের ওপর। হয়তো বাড়ি থেকেই অনুসরণ করে এসেছে। তারপর যেই সুযোগ পেয়েছে, নিয়ে চলে গেছে। ইস, রাফিকে পাহারায় রাখলেও হত।
তোমার একার দোষ না, জিনা বলল। দোষ আমাদের সবারই। এতটা পথ আমাদের অনুসরণ করে আসবে, কে ভাবতে পেরেছিল? তবে আমি তেমন কাউকে কিন্তু দেখিনি পথে, যাকে সন্দেহ করা যায়।
আমিও না, মুসা বলল।
কিশোর কিছু বলছে না। চুপ করে ভাবছে। তার মনে পড়ছে এখন, মোটর সাইকেলের ইঞ্জিনের শব্দ শুনেছিল, যখন সাইকেল রেখে দোকানে ঢুকছে ওরা,

তখন। না না, ওরা যখন দোকানের ভেতরে ঢুকে গেছে, তখন।
নিশ্চয় চোরটা, চিন্তিত ভঙ্গিতে যেন নিজেকেই কথাটা বলল সে। একটা গাধা আমি! ছাগল! কেন পাত্তা দিলাম না!
গালাগাল করার কারণ আছে। সব সময় এতটা বেখেয়াল হয় না। সেজন্যেই এতগুলো জটিল রহস্যের সমাধান করতে পেরেছে। ভালুকটা চুরি যাওয়ায় একটা মূল্যবান সূত্র হারাল। চোরকে কাছে পাওয়ার জন্যে এটা একটা টোপ ছিল।
এবার কি করব? জিনার জিজ্ঞাসা।
কি আর। পুলিশের কাছে যাব, রবিন বলল। জিনিসটা তো চুরিই হয়েছে, নাকি? জিনিস চুরি গেলে পুলিশের কাছেই যেতে হয়।
পুলিশের কাছে? মুসা যুক্তি দেখাল। গিয়ে কি বলব ওদেরকে? পঞ্চাশ পেন্স দামের একটা খেলনা চুরি গেছে? হেসে খুন হয়ে যাবে না।
হবে না, গম্ভীর হয়ে বলল রবিন। যদি ওদেরকে বোঝাতে পারি, ভালুকটা কত দামী। আর নকশাটা দেখাই ওদের।
কিন্তু এখনই নকশাটার কথা পুলিশকে বলতে যাব না আমরা, কিশোর বলল। একবার দিলে আবার কবে ফেরত পাব, কোনদিন পাব কিনা, ঠিকঠিকানা নেই। ব্যাপারটাকে ওরা সিরিয়াসলি নিলে অবশ্য আমার কোন আপত্তি ছিল না। কিন্তু নেবে তো না।
গ্রহণযোগ্য তেমন কোন যুক্তি অবশ্য দেখতে পারল না সে। তবে সেজন্যে চাপাচাপিও করল না কেউ। ওদেরও তেমন ইচ্ছে নেই পুলিশকে দেয়ার। হাজার হোক, রহস্যটা ওদের। ওরাই এটা খুঁচিয়ে বের করেছে। নিজে নিজে সমাধান করতে পারলে মজাটা ষোলো আনা। তবে সেটা করার কোন উপায় আপাতত দেখতে পাচ্ছে না।
পথের ওপর দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা নিয়ে কয়েক মিনিট আলোচনা করল ওরা। তারপর সাইকেল নিয়ে আবার রওনা হলো।
চলতে চলতে হঠাৎ থেমে গেল কিশোর। বলল, এই, শোনো, একটা বুদ্ধি করেছি! আমাদের সাথে চোরের সম্পর্ক এখনও কাটেনি। ভালুকটা নিয়ে গেছে একটা বিশেষ কারণে। নিশ্চয় এখন পেট কাটা হচ্ছে ওটার। ভেতরের জিনিসটা বের করার জন্যে। সকালে আমরা যা করেছিলাম।
তাতে কি? বুঝতে পারছে না মুসা।
কেটে কিছু পাবে না ওর ভেতরে, তুলা ছাড়া। অবাক হবে। পরীক্ষা করতে বসবে তখন। নতুন করে সেলাই করা হয়েছে যে, দেখতে পাবে।
তাতেই বা কি?

কেন, বুঝতে পারছ না? উত্তেজিত হয়ে উঠেছে কিশোর। নকশাটা পাবে না। বুঝে ফেলবে, ওটা আমাদের হাতে পড়েছে!
হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝেছি! চেঁচিয়ে উঠল রবিন। আবার আমাদের পিছে লাগবে তখন। ভালুকের ভেতরে যে জিনিসটা পেয়েছি, সেটা কেড়ে নেয়ার জন্যে। কিংবা চুরি করার জন্যে। এইবার আর চোখের আড়াল করব না আমরা ওকে। কড়া নজর রাখব।
তবে কিশোরকে এতটা খুশি লাগল না। ভুরু কুঁচকে ফেলেছে। বিড়বিড় করে বলতে লাগল, টোপটা কোথায় কিভাবে পাতব? ও জানছে না কোথায় রেখেছি আমরা নকশাটা। পেতে হলে পুরো গোবেল ভিলা আতিপাতি করে খুঁজতে হবে তাকে। সেটা করতে যাবে বলে মনে হয় না। সহজ উপায় একটাই আছে...
ঠিক! বুঝে ফেলেছে জিনা। আমাদের একজনকে তুলে নিয়ে যাবার চেষ্টা করবে! জোর করে কথা বের করবে মুখ থেকে!
চোয়াল শক্ত হয়ে গেল মুসার। কাছছাড়া হব না আমরা। কোনমতেই আলাদা হব না। আর রাফির মত একটা কুকুর পাহারায় রয়েছে আমাদের। তুলে নিয়ে যাওয়া কি মুখের কথা? অত সহজ না।
এমনও হতে পারে, রবিন বলল। শুরুতে ওসব কিছুই না করে অন্যভাবে যোগাযোগের চেষ্টা করবে আমাদের সঙ্গে। এই যেমন টেলিফোন, কিংবা চিঠি।
তা না হয় করল, কিশোর বলল। কিন্তু আমরা তো দিতে চাইব না। তখন বাধ্য করবে কিভাবে? তবে একটা কথা ঠিক, কোন না কোনভাবে যোগাযোগের। চেষ্টা করবেই। তখন আমাদের কাজ হবে, বুদ্ধির খেলায় তাকে পরাজিত করা।
সেই চেষ্টাই করা হবে, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করল চারজনে। তারপর অনেকটা হালকা মন নিয়ে ফিরে চলল গোবেল ভিলায়।
*
দুরুদুরু বুকে অপেক্ষা করছে ওরা কিছু একটা ঘটার। ঘটল না। সেদিন তো নয়ই, পরের দিনও না। নকশারও সমাধান হলো না। অনেক চেষ্টা করেও বুঝতে পারল না কিছু।
তার পরদিন এত উজ্জ্বল রোদ উঠল, সৈকতে খেলতে বেরিয়ে পড়ল ওরা। সাগর শান্ত। বালি বেশ গরম। গায়ের কোটও খুলে ফেলতে হলো এক সময়।
সৈকতে আর কেউ নেই। যত খুশি চেঁচাতে পারল ওরা, যে ভাবে খুশি ছোটাছুটি করতে পারল। বিরক্ত হওয়ার কেউ নেই, ফলে ওদেরকেও অস্বস্তিতে থাকতে হলো না। সবচেয়ে বেশি লাফাচ্ছে রাফি, চেঁচামেচি করছে। এমন সব অঙ্গভঙ্গি করছে, হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ছে ছেলেমেয়েরা।

খেলায় এতই ব্যস্ত রয়েছে ওরা, মোটর সাইকেলটা আসার শব্দও শুনল না। সৈকতের ওপরের পথে এসে থেমে গেল ওটা।
টের পেল প্রথমে রাফি। পেয়েই খেলা থামিয়ে দিল আচমকা। ওপরের দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে চাপা গরগর শুরু করল।
অবাক হলো কিশোর। ঘুরে তাকাল। অপরিচিত লোকটাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল মাত্র কয়েক ফুট দূরে।

.

এগিয়ে আসতে লাগল লোকটা। তরুণ বয়েসী। উঁচু গোড়ালি ঢাকা বুট পায়ে। মাথায় হেলমেট, মুখে টেনে দেয়া সামনের স্বচ্ছ অংশ, ফলে চেহারা দেখা যাচ্ছে না স্পষ্ট। গলায় জড়ানো একটা স্কার্ফ।
লোকটাকে অদ্ভুত লাগছে, বোধহয় মুখ ঠিকমত দেখা না যাওয়াতেই লাগছে ওরকম। লোকটাকে পছন্দ হয়নি রাফির। ভাল লোক হলে এমন রেগে যেত না। সে। তাতে সবাই অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। জিনা আর রবিন কাছাকাছি হয়ে গেল, যেন পরস্পরকে রক্ষা করার জন্যে। মুসার হাতে বল। ছোঁড়ার জন্যে। নিয়েছিল। ধীরে ধীরে নামিয়ে নিল হাতটা। কি করবে বুঝতে পারছে না।
এই যে, এগিয়ে আসছে লোকটা। খেলছ বুঝি? রোদটাও ভাল উঠেছে, না? খেলার মতই।
আন্তরিক হওয়ার চেষ্টা করছে সে, কিন্তু তার কণ্ঠস্বরই ফাস করে দিল সব। মেকি। তার কথা একটুও ভাল লাগল না ছেলেমেয়েদের।
হ্যাঁ, মুখ গোমড়া করে রেখে জবাব দিল মুসা। ভালই দিন। কিন্তু তাতে কি?
মিষ্টি কথা বলে সুবিধে হবে না বুঝে গেল লোকটা। তাই আর ওসবের মধ্যে গেল না। তার আসল চেহারায় ফিরে এল। কর্কশ গলায় জিজ্ঞেস করল, তাতে? কাগজটা কই?।
চুপ হয়ে গেল মুসা। জিনা বলল, কিসের কাগজ?
দেখো, ফাঁকি দেয়ার চেষ্টা কোরো না। ভাল করেই জানো কিসের কাগজ। নীল খেলনা ভালকটার মধ্যে ছিল।
কিশোর বলল, কি বলছেন কিছুই তো বুঝতে পারছি না। আর ভালুকটাও নেই। কোন শয়তান লোক জানি সাইকেলের স্যাডল ব্যাগ থেকে চুরি করে নিয়ে গেছে। বিশ্বাস না হলে ওকে জিজ্ঞেস করুন, রবিনকে দেখাল সে। ওর ছিল। হারিয়ে খুব মন খারাপ হয়ে গেছে। বেচারি।
কিশোরের কথার সমর্থনে মাথা ঝকাল রবিন। দুঃখ দুঃখ ভাব ফুটিয়ে তুলল চেহারায়।

কঠিন দৃষ্টিতে কিশোরের দিকে তাকাল লোকটা, মিথ্যে কথা তো ভালই বলতে পারো। তবে ওসব কেচ্ছা গেলাতে পারবে না আমাকে। খেলনাটা চুরি হয়েছে, বিশ্বাস করছি, কিন্তু নকশাটা নেই ওর মধ্যে। তারমানে তোমাদের হাতেই পড়েছে।
চট করে পরস্পরের দিকে তাকাল মুসা আর কিশোর। বেশি কথা বলে ফেলেছে লোকটা। নিজের পরিচয় জানিয়ে দিয়েছে। সে জানে নকশাটা নেই খেলনার ভেতরে। তার অর্থ হয় সে-ই চুরি করেছে, কিংবা তার কোনও দোস্ত। নকশা বলেছে, শুধু কাগজ বলেনি, সুতরাং ওটা নকশাই। কিশোরেরা আন্দাজ করেছিল বটে ওরকম কিছুই হবে, কিন্তু নিশ্চিত ছিল না। এখন হলো।
যাক, এক চোরের দেখা পাওয়া গেল। এখন খুব বুদ্ধি করে মাথা ঠাণ্ডা রেখে চাল চালতে হবে, যাতে ওদের ফাঁদে ফেলা যায়।
কিন্তু গোলমাল করে দিল রাফি। সে খুব বুদ্ধিমান কুকুর, সন্দেহ নেই, তবে কুকুরের তুলনায় বুদ্ধিমান। মানুষের তুলনায় কিছুই না। মানুষের মত মাথা খাঁটিয়ে, চিন্তা-ভাবনা করে কাজ করতে পারে না। যা করার সহজাত প্রবৃত্তির বশেই করে ফেলে। এখন তার প্রবৃত্তি বলল, নোকটা খারাপ, তার বন্ধুদেরকে হুমকি দিচ্ছে, ক্ষতি করতে চায়, তার মত একটা কুকুরের উচিত তাকে তাড়ানো।
কাজেই সেই কাজই করে বসল রাফি। আক্রমণ করে বসল লোকটাকে। লোকটা কিছু বুঝে ওঠার আগেই তার পা কামড়ে ধরল সে। পায়ে মোটা চামড়ার ভারী বুট থাকায় কামড়টা মাংসে বসল না, বেঁচে গেল লোকটা। তবে ভয় যেমন পেল, রেগে গেল তেমনি।
শয়তান! কুত্তা! চেঁচিয়ে উঠল সে। পকেট থেকে একটা কশ (সীসা ভরা পাইপ) টেনে বের করে জোরে এক বাড়ি মারল রাফির মাথায়। টু শব্দটিও আর করতে পারল না কুকুরটা। বেহুশ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। নড়লও না আর।
রাফি! চিৎকার করে উঠল জিনা। হাঁটু গেড়ে বালিতে বসে পড়ল কুকুরটার পাশে। আপনি...আপনি আমার রাফিকে মেরেছেন! পস্তাতে হবে! এর জন্যে পস্তাতে হবে আপনাকে! আমরা আপনাকে ছাড়ব না... ফুঁসতে থাকল সে।
চুপ! ধমক লাগাল লোকটা। তুমিও যদি ওরকম একটা বাড়ি খেতে না চাও, চুপ করে থাকো!
রাগে ফেটে পড়বে যেন মুসা আর জিনা। আগে বাড়ল। লোকটার ওপরে ঝাঁপিয়েই পড়বে বুঝি।
খেঁকিয়ে উঠল লোকটা, এই, থামো! ভাল চাইলে আর এক পা এগোবে না! কশটা মাথার ওপর তুলল সে, বাড়ি মারার ভঙ্গিতে। এখানে খেলতে আসিনি আমি। আবার জিজ্ঞেস করছি। ভালুকের ভেতরে যে নকশাটা পেয়েছ সেটা কোথায়?

একটা কথাও বলল না মুসা, জিনা আর রবিন। কিশোর তো যেন শুনতেই পায়নি। এক জায়গায় পাথরের খাজে জমে রয়েছে পানি। বোধহয় তুষার গলেই হয়েছে। আঁজলা ভরে তুলে এনে ছিটিয়ে দিতে লাগল রাফির নাকেমুখে।
জোরে জোরে নাক টানছে রবিন। তার দিকে ফিরল লোকটা। বলল, এরা তো মুখ খুলবে না। তোমাকেই জিজ্ঞেস করছি। সত্যি সত্যি বলবে। নকশাটা কোথায়?
রাস্তার দিকে তাকাল রবিন। যদি কেউ আসে? কিন্তু কেউ আসছে না। ওদেরকে বাঁচানোর মত কেউ নেই কোথাও। কাঁপা গলায় বলল, আমি...আমি...মানে আমার কাছে নেই।...এখানে নেই আরকি। টা রয়েছে আমার আংকেলের বাড়িতে লুকানো! মনের সমস্ত সাহস এক করে জোর গলায় বলল, কোথায় আছে বললাম, কিন্তু তাতে কোন লাভ হবে না আপনার। গোবেল। ভিলাকে টুকরো টুকরো করে ফেললেও বের করতে পারবেন না। পাবেন না ওটা। এমন জায়গায় লুকানো হয়েছে।
রবিন ভেবেছে এ রকম করে বললেই লোকটা নিরাশ হয়ে চলে যাবে। গেল তো না-ই, তাকে আতঙ্কিত করে দিয়ে হা হা করে হেসে উঠল সে।
হাহ্ হাহ্ হাহ্! হো হো হোহ্! বোকা ছেলে! তুমি কি ভেবেছ আমি আনতে যাব ওটা? এত কষ্ট করব? কক্ষনো না। সেধে গিয়ে ধরা দেব ভেবেছ?
হাসি থামিয়ে দিল হঠাৎ। হ্যাঁ, এখন লক্ষ্মী হয়ে যাও সবাই। ভালয় ভালয় দিয়ে দাও ওটা। কাল পর্যন্ত সময় দিলাম। কাল দুপুর বারোটার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। ওই পাথরটার তলায় চাপা দিয়ে রাখবে।
কশটা দোলাল আরেকবার, ওদেরকে দেখিয়ে। হুমকি দিল। এ সম্পর্কে পুলিশকে কিংবা আর কাউকে যদি একটা বর্ণ বলল, ভাল হবে না মনে রেখো। আর নকশাটা না দিলেও খারাপ হবে। খুব খারাপ, শুধু এটুকুই বললাম, হ্যাঁ!
ওরকম করে সিনেমায় হুমকি দেয় খারাপ চরিত্রের লোকেরা দেখেছে ওরা। কেমন হাস্যকর লাগে ওখানে। তবে বাস্তবে সেটা মোটেও হাস্যকর লাগল না ওদের কাছে। যা বলছে, করবে লোকটা। মিথ্যে হুমকি দিচ্ছে না।
কি, বুঝেছ? জিজ্ঞেস করল লোকটা।
হ্যাঁ, মাথা দোলাল মুসা। পাবেন আপনার নকশা। নিচু স্বরে লোকটা যেন বুঝতে না পারে এমন ভাবে অভিশাপ দিল, সেটা তোমার গলায় ঢুকে গিয়ে যেন দম বন্ধ করে মারে!
কশটা পকেটে রেখে দিল লোকটা। কাল দুপুর বারোটা। মনে থাকে যেন।
ঘুরে ঢাল বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করল সে। উঠে গেল সৈকতের ওপরের রাস্তায়। নীরবে তাকিয়ে রয়েছে গোয়েন্দারা। তখনও রাফির পাশে হাটু গেড়ে বসে রয়েছে কিশোর। হুঁশ ফিরছে কুকুরটার।

হ্যাঁ, নকশা তুমি পাবে, রাস্তার দিকে তাকিয়ে বলল কিশোর, ঠিক সময়েই। তবে সেটা দিয়ে কোন লাভ হবে না তোমার।
অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল মুসা। কি বললে?
নকশা একটা দেব তাকে, তবে নকল। আসলটা দিয়ে দেব, এত বোকা নাকি আমি।
ওই, যাচ্ছে, রবিন বলল।
রাস্তায় মোটর সাইকেলের ইঞ্জিন স্টার্ট নিল।
খেলা আর জমবে না। রাফি দুর্বল হয়ে গেছে। তাকে নিয়ে গিয়ে এখন খেতে দেয়া দরকার। তারপর লম্বা একটা ঘুম।
ওঠ, রাফি, ওঠ, ডাকল কিশোর। লক্ষ্মী ছেলে, ওঠ। তোর আর কি দোষ? পেছন থেকে মেরে তো অনেক বাহাদুরকেও চিৎ করে ফেলা যায়। নইলে কি আর ছাড়তি? এতক্ষণে কামড়ে হয়তো কিমাই বানিয়ে ফেলতি।
তারপর সেই কিমাগুলো পেঁয়াজ মরিচ দিয়ে চুলায় চাপিয়ে দিত, হেসে বলল মুসা।
দুর্বল কণ্ঠে রাফি বলল, ঘাউ! কিমার চেয়ে হাড়ই তার বেশি পছন্দ।
*
বাড়ি ফিরে নিজের বিছানার পায়ের নিচে কার্পেটে রাফিকে আরাম করে শুইয়ে দিল জিনা। তারপর সবাইকে নিয়ে আলোচনায় বসল। উঠে চলে গেল মুসা। নকশাটা আনতে। কুকুরের ঘর থেকে ওটা খুলে এনে টেবিলে বিছাল।
তুমি তো বললে, একটা নকল নকশা দেবে, কিশোরকে বলল মুসা। পাবে কোথায়?
আঁকব, জবাব দিল কিশোর। বানিয়ে বানিয়ে দেব একটা এঁকে। দেখতে যাতে এটার মতই লাগে। তাহলে প্রথমে ধোকা খাবে মোটর সাইকেলওয়ালা লোকটা। নিয়ে চলে যাবে। বুঝবে, আসল নয়। আবার লাগবে তখন আমাদের পেছনে।
তাহলে কাগজও একই ধরনের ব্যবহার করতে হবে, রবিন বলল।
আগেই ভেবেছি সেটা, হেসে বলল কিশোর। সাধারণ কাগজ। সাদা খাতা থেকে ছিঁড়ে নিয়েছে ওরা। ইস্কুলে যেগুলো ব্যবহার করি আমরা। আমরাও ওরকমই একটা পাতা নেব...
খুব সাবধানে আঁকতে হবে, মুসা বলল। দেখতে যেন একেবারে আসলের মত লাগে।
তা লাগবে। শোনো, আরও সহজেই কাজটা করা যায়। এটার ওপরেই ছাপ দিয়ে আঁকতে পারি। কিছু কিছু জায়গা সামান্য বদলে দিলেই হবে।
প্রশংসার দৃষ্টিতে কিশোরের দিকে তাকাল মুসা। ভাল বুদ্ধি বের করেছ।

নকশাটার দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল কিশোর। নিজেকেই যেন বলল, হ্যাঁ, হবে। জিনার কাছ থেকে একটা খাতা চেয়ে নিয়ে একটা পাতা ছিঁড়ে নিল। তারপর গিয়ে বসল জানালার কাছে, আলো বেশি পাওয়ার জন্যে। ছাপ দিয়ে আঁকতে সুবিধে হবে। একটা ট্রেসিং পেপার আর বলপেন নিয়ে কাজ শুরু করল। আঁকাটা খুব সহজ। কঠিন হলেগে আসল নকশাটার মানে বোঝা। ঘোড়ার ডিম কিছুই বোঝা যায় না।

কয়েক মিনিট পর ট্রেসিং পেপারে আঁকা হয়ে গেল। সেটাকে তখন সাদা কাগজের ওপর রেখে জোরে চাপ দিয়ে রেখাগুলোর ওপর কলম বোলাতে লাগল কিশোর। নিচের কাগজে দাগ পড়ে যাবে। তখন তার ওপর কলম বুলিয়ে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে নকশা। বদলাতে হলে ট্রেসিং পেপারেই বদলাতে হবে। যাতে নিচে। ভুল চাপ পড়ে। তা-ই করতে লাগল সে।

হয়েছে। কিছুক্ষণ পর সন্তুষ্ট হয়ে মুখ তুলল কিশোর। চমৎকার! সামনে রেখে দুটো মিলিয়ে দেখেও সহজে ধরা যায় না।

হ্যাঁ, খুব ভাল, উত্তেজিত হয়ে বলল মুসা। দারুণ এঁকেছ। চোরেরা বুঝতেই পারবে না কিছু। আর যখন বুঝবে, দেরি হয়ে যাবে তখন। আমরা সময় পেয়ে যাব। কিছু করার।

সংখ্যা আর লেখাগুলোর ব্যাপারে কি হবে? রবিনের প্রশ্ন।

সংখ্যা আর লেখা? ভুরু কোঁচকাল মুসা।

দেখছ না, লেখা রয়েছে এন এস ই ডব্লিউ। এর মানে নিশ্চয় নর্থ সাউথ ঈস্ট ওয়েস্ট বোঝাতে চেয়েছে। তারপর রয়েছে সংখ্যা।

লেখাও লিখব, কিশোর বলল। কিছু নকশা দেখে, কিছু বানিয়ে বানিয়ে লিখতে শুরু করল সে। যা মাথায় এল।

অবশেষে শেষ হলো কাজ।

ব্যস, বলল সে। এখন শুধু এটা তুলে নেয়ার অপেক্ষা। কাল গিয়ে বসে থাকব। মোটর সাইকেলওলা নিতে এলে সাইকেল নিয়ে অবশ্যই তার পিছু নিতে পারব না। তবে ভাল একটা সূত্র পেয়ে যাব। মোটর সাইকেলের নম্বর। কে জানে, ওই একটা সূত্রই হয়তো ওর দোস্তদের কাছে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে আমাদের। হয়তো দলবল সহ ধরিয়ে দিতেও। সমাধান হবে নীল ভালুক রহস্যের।

.

পরদিন সকাল দশটায়ই সৈকতে চলে এল গোয়েন্দারা। লোকটা বলে গেছে বারোটায় আসবে। এর আগে ওর আসার আশা করেও লাভ নেই। কিন্তু বলা যায়। অতি উত্তেজনায় চলেও আসতে পারে। তাই আগেভাগেই চলে এসেছে ওরা।

লুকোছাপার ধার দিয়েও গেল না সে। সহকারীদের নিয়ে সোজা নেমে এল। সৈকতে। কেউ যদি ওদের ওপর নজর রেখে থাকে, রাখুকগে।
প্রাস্টিকের একটা ব্যাগে ভরে নকল নকশাটা নিয়ে এসেছে কিশোর। নির্জন। সৈকত। কাউকে চোখে পড়ল না। আগের দিনের মতই। যে পাথরের নিচে ওটা রাখতে বলেছে, সেটার নিচেই রেখে দিল সে। তারপর সবাইকে নিয়ে ফিরে চলল গোবেল ভিলায়।
কিন্তু বাগানের ভেতরে ঢুকে গেটটাও বন্ধ করতে পারল না মুসা, জলদি চলো বলে চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। শুরু হলো তার পরিকল্পনার দ্বিতীয় অংশ। দৌড়ে বাগান পেরিয়ে, বাড়ির পাশ দিয়ে ঘুরে চলে এল পেছনের গেটের কাছে। সেটা দিয়ে বেরোলে আরেকটা সরু গলিপথ পড়ে, দুপাশে উঁচু বালির পাড়। পথটা দিয়ে কেউ হেঁটে গেলে একেবারে পাড়ের কিনারে এসে না দাঁড়ালে দেখা যায় না।
বেশ ঘুরে গেছে পথটা। তবু ওটা দিয়ে সৈকতে যাওয়ার রাস্তায় উঠতে কয়েক মিনিটের বেশি লাগল না।
লুকাব কোথায়? জানতে চাইল রবিন।
বাস স্টপেজের পাশে ছোট একটা ছাউনি আছে, রাস্তা দিয়ে কিছুদূর গেলেই পড়ে। সেটা দেখাল কিশোর। ওটার পেছনে। কাল এখানটাতেই কোথাও মোটর সাইকেল ফেলে গিয়েছিল লোকটা।
রাফিকে শান্ত থাকতে বলল সে। বুঝতে পারল কুকুরটা। নীরবে চলল ওদের সাথে সাথে। এ রকম খেলা তার জন্যে নতুন নয়, আগেও বহুবার খেলেছে। ব্যাপারটা ভালই লাগে তার। শিক্ষিত কুকুর সে। কিশোরের আদেশ একটুও অমান্য করল না।
অনেকক্ষণ কিছুই ঘটল না। বারোটার বাস এল। থামল না। সোজা চলে গেল গোবেল বীচের দিকে। এই ছাউনিটায় এমনিতে থামে না বাস। কেউ যদি নামতে চায়, তাহলে শুধু থামে। আজ এখানকার কোন যাত্রী নেই। ফলে থামল না।
এবার সতর্ক থাকতে হবে, মুসা বলল। বারোটা বাজে। যে কোন সময় এসে হাজির হতে পারে লোকটা।
হ্যাঁ, মাথা দোলাল জিনা।
ওই যে, হাত তুলল মুসা। একটা মোটর সাইকেল আসছে।
কিন্তু থামল না মোটর সাইকেলটা। চলে গেল। কয়েক মিনিট পর গেল একটা কোচ। তারপর একটা লার। এবং তারপর...
চুপ! নোড়ো না! একটানে জিনাকে ছাউনির আড়ালে নিয়ে এল কিশোর। ওই লোকই!

ছাউনির পেছনে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে রয়েছে ওরা। পারলে দেয়ালের সঙ্গে শরীর মিশিয়ে ফেলতে চায়। শোনা যাচ্ছে মোটর সাইকেলের ইঞ্জিনের শব্দ। বাড়ছে... বাড়ছে...থেমে গেল। উঁকি দিতে ভয় পাচ্ছে গোয়েন্দারা। যদি লোকটা দেখে ফেলে? শেষে আর থাকতে পারল না মুসা, মাথা বের করে দিল একপাশ দিয়ে।
হ্যাঁ, মোটর সাইকেল! ফিসফিসিয়ে বলল সে। পথের অন্যপাশে রেখেছে। সৈকতের কিনারে। ওপরে। চলো, দেখি কি করে।
সাবধানে রাস্তা পেরোল ওরা। কোন শব্দ করছে না। রাস্তাটা পেরিয়েই উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল কিশোর। হামাগুড়ি দিয়ে এগোল। এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে চলে এল ঢালের কিনারে।
গলা বাড়িয়ে তাকাতেই দেখল, নেমে গেছে লোকটা। পাথরের দিকে এগোচ্ছে।
নকশাটা তুলতে যাচ্ছে, জানাল কিশোর। জলদি করতে হবে। সময় নেই।
সরে চলে এল চারজনেই। দ্রুত হাতে মোটর সাইকেলের নম্বর লিখতে শুরু করল রবিন। মুসা আর রাফি চুপ করে দেখছে। ক্যারিয়ার বক্স খুঁজছে কিশোর আর জিনা। আশা করছে এমন কোন কিছু পেয়ে যাবে, যেটা চোরকে ধরিয়ে দিতে সাহায্য করবে।
ভাগ্য ওদের পক্ষে। একটা চিঠি পেল জিনা। তাতে নাম-ঠিকানা লেখা রয়েছে। কে পাঠিয়েছে সেটা লেখা থাকলে ভাল হত! বিড়বিড় করল কিশোর। ঠিকানাটা পড়ে ফেলেছে। মিস্টার ডন হারভে। মিডলটন। জায়গাটা গোবেল বীচের কাছেই।
যেখানে পেয়েছিল খামটা আবার সেখানে রেখে দিল জিনা। একেবারে সময়মত।
চাপা ঘাউ করে উঠেছে রাফি। লোক আসছে, বুঝিয়ে দিল।
আসছে! রাফির পর পরই বলে উঠল রবিন। সৈকতের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ফিরে আসছে লোকটা!
যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওখান থেকে সরে এল ওরা। এমন কিছু করল না যেটা অস্বাভাবিক লাগে।
গোবেল ভিলায় ফিরে এসে আবার মাথা ঘামাতে বসল।
তেমন কিছুই পেলাম না, জিনা বলল। মাঝে মাঝে হতাশার কথা শোনানো। তার স্বভাব। তবে ঠিকই করে। সব সময় আশার কথা শোনালে অনেক সময়। খারাপ হয়।
কে বলল! কথাটা পছন্দ হলো না কিশোরের। অনেক পেয়েছি। এত যে পাব। সেটাই আশা করিনি। মোটর সাইকেলের নম্বর বড়জোর ওটার মালিকের সন্ধান দিত আমাদের। কিন্তু এখন ওই খামের ঠিকানা তার নাম-ধামও জানিয়ে দিল।
খুশি হতে পারল না জিনা। মাথা নাড়ল। কি করে জানছি ওটা ওরই নাম? সে ডন হারভে না-ও হতে পারে। হয়তো চুরি করেছে মোটর সাইকেলটা। কিংবা, চেয়ে

এনেছে। চিঠিটা হয়তো মোটর সাইকেলের আসল মালিকের।
অযৌক্তিক কথা বলেনি জিনা। তবু মানতে পারল না কিশোর। জিনা, এত হতাশার কথা বলো কেন! তোমার বরং বলা উচিত মোটর সাইকেল আর ওই খামের নাম-ঠিকানা লোকটারই।
বেশ, না হয় বললাম। তাতে কি?
তাতে আলোচনাটা চালিয়ে যেতে পারি আমরা। অনুমান করে। ভুল হতেই পারে। হলে হবে। তখন আবার নতুন উপায় বের করব। আগেই না না করে সব কিছু ছেড়েছুঁড়ে দিয়ে বসে থাকলে তো আর কাজ হবে না।
কিশোর ঠিকই বলেছে, জিনার দিকে তাকিয়ে বলল মুসা।
হ্যাঁ, আলোচনা চালানোই উচিত, রবিন বলল। দেখাই যাক না কিছু বেরোয় কিনা।
কিন্তু সেটা আর হলো না। খাবারের ডাক পড়ল। ডাকতে এলেন কেরিআন্টি। ডাইনিং রুমে যেতে হলো ওদের।
যাবার আগে কিশোর বলল, আজ বিকেলে মিডলটনে যাব আমরা। গোবেল বীচের কাছে হয়ে থাকলে বেশি সময় লাগবে না যেতে। মনে হচ্ছে বৃষ্টি আসবে।
ওতে কিছু হবে না। অল্পস্বল্প বৃষ্টিতে ভিজে অভ্যেস আছে আমাদের, কি বলো?
অল্পস্বল্প কেন, মুষলধারে নামলেও অ্যাডভেঞ্চারের এই পর্যায়ে গোয়েন্দাদেরকে থামাতে পারত না বৃষ্টি। সেটা বুঝেই যেন বিকেলের শুরুতেই থেমে গেল গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। ততক্ষণে মিডলটনের কাছাকাছি চলে এসেছে ওরা। রাফি খুশি হলো বৃষ্টি থেমে যাওয়ায়। শরীর ভেজাতে ভাল লাগে না তার, বিশেষ করে এই আবহাওয়ায়। সাঁতার কাটাটা অবশ্য আরেক রকম মজা, তাতে কিছু মনে করে না সে।
মিডলটনের বাইরে সাইকেল রেখে হেঁটে গাঁয়ের ভেতর ঢুকল ওরা। ঢোকার মুখেই বিশাল এক অ্যালসেশিয়ানের সঙ্গে দেখা, এদিকেই আসছে। কাছে এসে বেশ গুরুগম্ভীর চালে রাফির শরীর কল কুকুরটা। মুরুব্বিয়ানা দেখিয়ে বলল, গাররর!
রাফি বুঝতে পারল তার ভাষা। কুকুরটা বলেছে, এই আজব কুত্তাটা আমাদের গায়ে কি করছে? সে একই সুরে জবাব দিল, ঘাউ! ঘাউ! ঘাউ! অর্থাৎ, আমাকে পছন্দ না করতে পারলে শুনে রাখো, তোমাকেও আমি পারছি না!
গারর! খেঁকিয়ে উঠল অ্যালসেশিয়ান। শয়তান কোথাকার!
রাফিও কম যায় না। রেগে গিয়ে কুকুরের ভাষায় গালাগাল শুরু করে দিল। হাবভাবে মনে হলো চ্যালেঞ্জ করে বসেছে বড় অ্যালসেশিয়ানটাকে।
গাররর! ধাড়িটাও কি আর কম যায়।

কেউ বাধা দেয়ার আগেই বেধে গেল ঝগড়া। ঝাঁপিয়ে পড়ল একটা আরেকটার ওপর। রাস্তার কাদার ওপরই গড়াগড়ি শুরু করল দুটো কুকুর। কামড়াকামড়ি, চেঁচামেচি, খামচা-খামচি এবং এই জাতীয় যত রকম ব্যাপার আছে। কোনটাই বাদ রাখছে না।

শোরগোল শুনে বেশ কিছু গ্রামবাসী বেরিয়ে এল ঘরের দরজায়। জিনা লজ্জায় পড়ে গেছে। রাফিকে এখানে আনতে চাপাচাপি করায়। যতটা ভদ্রভাবে আর নীরবে সম্ভব গ্রামে ঢুকে খোঁজখবর করে বেরিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। তা আর হলো না।

রাফিকে সরে আসার জন্যে চেঁচিয়ে গলা ফাটাচ্ছে কিশোর। কে শোনে কার। কথা। লড়াইয়ে মশগুল এখন দুই কুত্তা। কে কাকে পরাজিত করবে, সেই চেষ্টা। এখন কি আর শোনার সময় আছে নাকি। লোকে এগিয়ে আসতে শুরু করেছে। হাসাহাসি করছে। কথা বলছে জোরে জোরে। এ রকম একটা লড়াই দেখতে পেয়ে যেন খুশিই হয়েছে। বাজি ধরতে আরম্ভ করে দিয়েছে।

পঞ্চাশ পেন্স, বলল একজন। বড় কুত্তাটার ওপর। ওটা ভারী বেশি। জোরও বেশি।

ছোটটাও কম না, আরেকজন বলল। বয়েস আরেকটু বাড়লে বাঘের বাচ্চা হবে!

এখন তো ছোট। পারবে না, বলল তৃতীয় আরেকজন। আর ওটা টাইগার। ডেভির কুকুর। ছোটটাকে খুনই করে ফেলবে।

না না! চিৎকার করে উঠল জিনা। লোকগুলোর কথা শুনে ভয় পেয়ে গেছে।

আমি ছোটটার ওপর পঞ্চাশ পেন্স! বলল অন্য আরেকজন লোক। করছে কি। দেখো! এত মার খেয়েও গলার কামড় ছাড়ছে না! এ রকম কিছুক্ষণ থাকতে পারলেই টাইগারের বারোটা বাজবে!

ওই যে, ডেভি আসছে, একটা ছেলে বলল।

লম্বা, শক্তিশালী একজন মানুষ এগিয়ে এল। করছেটা কি দেখো! চিৎকার করে বলল সে। এ রকম কাণ্ড তো করেনি কখনও! এই টাইগার! টাইগার! ছাড়, ছাড় বলছি! সামান্যতম দ্বিধা করল না লোকটা। উন্মত্ত, লড়াইয়ের একেবারে মধ্যিখানে গিয়ে দাঁড়াল। দুহাতে দুটো কুকুরের ঘাড় চেপে ধরে জোর করে টেনে ছাড়াল।

ঝাঁকি দিয়ে তার হাত থেকে ছোটার চেষ্টা করছে কুকুর দুটো। আবার গিয়ে পরস্পরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে। ছাড়ল না লোকটা। রেগে উঠে বলল, রক্ত বেশি গরম হয়েছে? পিটিয়ে লাশ বানিয়ে ফেলব। সর, যা!

তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল জিনা। রাফির কলার ধরে টেনে সরিয়ে নিল। বড় কুকুরটাকে নিয়ে চলে যেতে লাগল ডেভি। টাইগারের যাবার ইচ্ছে নেই। বার বার

পেছন ফিরে তাকাচ্ছে, আর রাফিকে ধমক মারছে।
রাফির কতটা ক্ষতি হয়েছে দেখতে বসল জিনা। যতটা ভয় পেয়েছিল ততটা জখম হয়নি। একটা কান থেকে রক্ত পড়ছে। গলার কাছে কিছু আঁচড়, বোম উঠে গেছে। আরও কয়েক জায়গায় নখের আর দাঁতের দাগ রয়েছে। কোন কোনটা থেকে রক্ত বেরোচ্ছে।
ভেবো না, মুসা বলল জিনাকে। ঠিক হয়ে যাবে। কিছু হয়নি।
কানটা তো ছিঁড়েছে! দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছে জিনা। মুসার মত কিছু হয়নি বলে উড়িয়ে দিতে পারছে না।
ইনফেকশন হয়ে যেতে পারে, কিশোরও চিন্তিত। অষুধ-টষুধ লাগানো দরকার। এ গায়ে ওষুধের দোকান আছে? জিনার দিকে তাকাল সে।
কুকুরের লড়াই দেখার জন্যে দুটো ছেলে বেরিয়ে এসেছিল। তারা এগিয়ে এল। গোয়েন্দাদের দিকে। আন্তরিক হাসি হেসে দুজনের মাঝে বড়টা জিজ্ঞেস করল, কিছু দরকার? দারুণ একটা কুত্তা তোমাদের! এত বড় অ্যালসেশিয়ানটাকে যে মার মারল! বয়েসকালে সত্যিই বাঘের বাচ্চা হবে! অ, আমার নাম রবি। এ আমার ভাই টেড। কাছেই আমাদের বাড়ি। রাফির ছেঁড়া কানের দিকে তাকিয়ে বলল, এক কাজ করো না। চলে এসো আমাদের বাড়িতে। স্পিরিট-টিরিট দিয়ে মুছে ওষুধ লাগিয়ে দেব।
কথাটা মন্দ না। ভেবে দেখল কিশোর। রাজি হয়ে গেল সে।
রবি আর টেডের বাবা-মা বাড়িতে নেই। তবে যা দরকার সেগুলো পেতে বাবা-মাকে দরকার হলো না। বাথরুমের ওষুধ রাখার বাক্সেই পাওয়া গেল সব। লড়াইয়ের সময় যে রাফি এতটা সাহসের পরিচয় দিয়েছে, ওষুধ লাগানোর সময় সে-ই একেবারে ভীতুর ডিম হয়ে গেল। কিছুতেই জখমে স্পিরিট লাগাতে দেয় না। অনেক কায়দা-কসরৎ করে তারপর লাগাতে হলো। সময় লেগে গেল বেশি।
আসল কাজের সুযোগ মিলল এতক্ষণে, যা করতে এসেছিল ওরা। তদন্তটা ওবাড়ি থেকেই শুরু করল। নব পরিচিত বন্ধুদের জিজ্ঞেস করল মোটর সাইকেলওয়ালা লোকটার কথা। প্রশ্ন করল বেশ চালাকির সঙ্গে, যাতে ছেলে দুটো কিছু সন্দেহ করতে না পারে।
গ্রামটা কিন্তু খুব সুন্দর, মুসা বলল। লোকজনও ভালই মনে হচ্ছে।
ঠিক, তার সঙ্গে সুর মেলাল কিশোর। মনটন বেশ ভাল। ডেভি রাগ করল না। নিজের কুকুরটাকে ছাড়িয়ে নিয়ে চলে গেল।
এখানকার একটা লোককে অবশ্য পছন্দ হয়নি আমার, জিনা বলল। ছেলে দুটোর দিকে তাকাল। চেনো নাকি তাকে? মোটর সাইকেল আছে। আরেকটু হলেই চাপা দিয়ে মেরে ফেলেছিল আমাকে। অল্প বয়েসী। এই তেইশ-চব্বিশ হবে।

ওর মুখ দেখতে পাইনি। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় একটা প্যাকেট পড়ে গেল। নাম-ঠিকানা লেখা। ভাবছি ওটা ফিরিয়ে দেব। নামটা হলো কি যেন...ও, ইয়ে, ডন হারভে।

ডন হারভে! চেঁচিয়ে উঠল টেড। ঠিকই আছে। তাকে তোমাদের ভাল লাগেনি, লাগার কথাও নয়। তোমাদের আর দোষ দেব কি, আমরাও দেখতে পারি না! ভীষণ পাজি লোক!

চেনো নাকি তাকে? রবিন জিজ্ঞেস করল। ডন হারভেই তো নাম?

মিডলটনের সবাই চেনে ওকে, জবাব দিল রবি। এ গাঁয়ের সে কুলাংগার, বড়রা তাই বলে। দেখো বাড়ি গিয়ে, পাবে বলে মনে হয় না। বেশির ভাগ সময়ই বাইরে বাইরে থাকে। কি করে আল্লাই জানে! ভাল কিছু করে বলে তো মনে হয় না। বড় ভাইয়ের সঙ্গে থাকে। ওই লোকটা ভাল। ডনের এ সব কাণ্ডকারখানায় সাংঘাতিক বিরক্ত।

ডনকে তাহলে কোথায় পাওয়া যাবে? জানতে চাইল কিশোর।

কে জানে! রবি বলল। মোটর সাইকেল নিয়েই ঘোরে সারাক্ষণ। তা নাহলে হাই স্ট্রীটের গ্র্যান্ড কাফেতে বসে থাকে। থাকার কোন ঠিকঠিকানা নেই তার।

নামেই গ্র্যান্ড, টেড বলল। আর কিছু নেই। আহামরি কিছু নয়। মিডলটনের সমস্ত শয়তান লোকগুলো গিয়ে বসে ওখানে, আড্ডা মারে। ডন প্রায়ই বলে, তার একটা কাজ দরকার। সেজন্যেই নাকি গ্র্যান্ড কাফেতে যায়, কাজ জোগাড়ের জন্যে। নানা ধরনের লোক আসে ওখানে, কে যে কখন কাজ দিয়ে ফেলবে বলা যায় না। কাজ অবশ্য একটা না একটা পেয়েই যায় সে। তবে ধরে রাখতে পারে না। অল্পদিনও টেকে না। কাজটা ভাল না বলে ছেড়ে দিয়ে চলে আসে। আব্বা বলে অন্য কথা। কাজের লোকই নাকি নয় ও।

চিনব কি করে তাকে? গ্র্যান্ড কাফেতে যদি পাই? জিজ্ঞেস করল জিনা। মোটর সাইকেলের পোশাকে দেখেছি তাকে। হেলমেট পরা। চেহারা দেখিনি।

পাতলা, লম্বাটে মুখ, যেন একটা ইঁদুর। কথা বলে ক্যাচক্যাচ করে, দরজার কজায় তেল না থাকলে যে রকম শব্দ হয়।

টেডের মুখে লোকটার চেহারার বর্ণনা শুনে না হেসে পারল না গোয়েন্দারা। তারপর দুই ভাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এল। আবার বেরোল পথে।

চলো, এ্যান্ড কাফেটা ঘুরেই আসি একবার, কিশোর বলল। হয়তো পেয়েও যেতে পারি আমাদের চিড়িয়াকে।

যা শুনলাম, মুসা বলল। আজব চিড়িয়াই মনে হলো। একের পর এক কাজ বদলায়। মোটর সাইকেল নিয়ে ঘোরে। বাকি সময় কাফেতে বসে থাকে। চুরিদারিগুলোতে সে জড়িত থাকলে মোটেও অবাক হব না।

মিডলটন জায়গাটা বড় না। মাত্র দুটো কাফে আছে। তার মধ্যে একটা হলো গ্র্যান্ড কাফে। নোংরা, মলিন একটা বাড়ি। ভেতরে কান ঝালাপালা করে দিয়ে ভীষণ জোরে মিউজিক বাজছে। ডনের মোটর সাইকেলটা দেখা গেল কাফের বাইরে। থমকে গেল গোয়েন্দারা। কি করবে ঠিক করতে পারছে না।
জানালা দিয়ে উঁকি দেয়া উচিত হবে না, চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। আমাদের ওপর ডনের চোখ পড়লে সব শেষ। আর এগোতে দেবে না। হুঁশিয়ার হয়ে যাবে। কিছু খুঁজে বের করতে পারব না তখন।
রাস্তার অন্য পাশে কয়েকটা গাড়ি দেখিয়ে মুসা বলল, ওগুলোর পাশে লুকালে কেমন হয়? ও কোথায় আছে, জানি। এক সময় না এক সময় বেরোবেই সে। সাথে কেউ থাকলে…
শশশ! ঠোঁটে আঙুল রেখে হুঁশিয়ার করল রবিন। ওই, আসছে!
কাফে থেকে বেরিয়ে আসছে লোকটা। দেখেই তাকে চিনতে পারল। এই সেই লোক, কোন সন্দেহ নেই। উঁচু বুট পায়ে। নকশা যখন নিতে এসেছিল তখন হেলমেটটা মাথায় ছিল, এখন খুলে হাতে নিয়েছে। টেড আর রবির দেয়া বর্ণনার সাথে মিলে যাচ্ছে তার চেহারা। ইঁদুরমুখো। সঙ্গে আরেকজন লোক রয়েছে। বেঁটে, গাট্টাগোট্টা, বয়েস চল্লিশ মত হবে। রাস্তায় নেমে এল দুজনে।
দ্বিতীয় লোকটাকেও চিনল মুসা। ফিসফিসিয়ে বলল, এই সেই লোক, গোবেল বীচ স্টোরে কালো চশমা পরা ছিল। সাংবাদিক বলে পরিচয় দিয়েছিল নিজেকে।
কিশোর, রবিন আর জিনাও চিনল তাকে।
দুজনে জোট বেঁধেছে, কিশোর বলল একই সঙ্গে কাজ করে মনে হয়।
কি বলছে শুনতে পারলে হত, আফসোস করে বলল রবিন।
একটা বুদ্ধি এসেছে মাথায়! ফিসফিস করে বলল কিশোর। লোকগুলোকে বেরোতে দেখে গাড়ির আড়ালে এসে লুকিয়েছে সবাই ওরা। ওই দেখো, মোটর সাইকেলটার কাছে দাঁড়িয়েছে। ওখানে যতক্ষণ থাকবে, ওদের কথা শুনতে পাব আমরা।
কি ভাবে? জিনার প্রশ্ন।
এসো আমার সঙ্গে।
মাথা নিচু করে রেখে এগোল কিশোর। গাড়ির জন্যে মোটর সাইকেলের কাছ থেকে ওকে দেখতে পাবে না লোকগুলো। চত্বরের একধারে রাস্তার কাছে চলে। এল সে। রাস্তা পেরোতে হবে এখন খুব সাবধান! দেখে না ফেলে!
কিশোরের কথামতই কাজ করল রবিন, জিনা আর মুসা। তার উদ্দেশ্য বুঝতে পারছে না। কি করতে চাইছে? প্রশ্ন করার সময় নেই। অনেক ঘুরে রাস্তা। পেরোল ওরা।

কোন বিষয় নিয়ে গভীর আলোচনায় মগ্ন লোকগুলো। কোন দিকেই তাকাচ্ছে না। এবার ওই কোণায় যেতে হবে, দেখাল কিশোর। তারপর ওই গলিটা ধরে চলে যাব কাফের কাছে। গলি আর হাই স্ট্রীটের মোড়ে রয়েছে কাফেটা তখনি দেখেছি সেজন্যেই যেতে চাইছি ওখানে।
কোণের কাছে চলে এল ওরা। বাড়িটার কোণ ঘুরলেই এখন ডন আর অন্য লোকটাকে দেখা যাবে। তবে দেখার প্রয়োজন নেই, ওদের কথা শুনতে পেলেই হয়। শোনা যাচ্ছে।
ঠিক আছে বলছ? ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে বলল বেঁটে লোকটা রেগে গেছে মনে হয়। শুরুতেই সব গোলমাল করে না ফেললে…
আমার দোষ নয়, মারভিন। তীক্ষ্ণ শোনাল ডনের গলা। ঠিকই বলেছে টেড, ইঁদুরের মত চিচিই করে।
আস্তে! শুনে ফেলবে! এদিকে এসো। বেঁটে লোকটা বলল।
দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে ফেলল গোয়েন্দারা। নিরাশ হয়েছে। এত কষ্ট করে এখানে এসেও লাভ হলো না। সরে যাচ্ছে লোকগুলো।
চলো, পিছু নিই, মুসা বলল। কি বলে শুনতে হবে।
ভাগ্য আরেকবার গোয়েন্দাদের পক্ষ নিল। এমন একটা জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল লোক দুজন, ওদের কথা শুনতে পেল ওরা। তবে আগের জায়গা থেকে সরে যেতে হলো অবশ্যই। নির্জন এক টুকরো পতিত জায়গা। একপাশে বেড়া।
আরেক পাশে বাড়ি। কাজেই লুকাতে অসুবিধে হলো না ওদের। ডন সিগারেট ধরাল। তার সঙ্গী ধরাল পাইপ। আবার কথা বলতে শুরু করল।
বেড়ার আড়ালে ঘাপটি মেরে শুনতে লাগল গোয়েন্দারা। আগের জায়গা থেকে লোকগুলো সরে আসায় বরং ভালই হয়েছে। এখন ওদের কথা আরও স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। …এ সব বলেছি আমি, মারভিন, ডন বলছে। সুবিধে করতে পারিনি। আর তাতে আমার দোষটা কোথায়? কি করে জানব জিনিসগুলো আসতে এত দেরি হবে? ওগুলো আসার আগেই আমার কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল ওখানে।
বেশ, ধরলাম সেটা ব্যাড লাক। তোমার কাজ শেষ হওয়ার আর সময় পেল না … যে কাজটা পানির মত সহজে সেরে ফেলা যেত, তার জন্যে ঝুঁকি নিতে হলো, তালা ভেঙে ঢুকতে হলো-সবই বুঝলাম, তারপরও…
যা-ই করে থাকি, কাজটা তো হলো। এটাই আসল কথা। নকশাটা দরকার। ছিল আপনার, পেয়েছেন। মালও পেয়ে যাব শীঘি, যদি নকশার নির্দেশমত এগোতে পারি। তারপর আমাদের কাজ হবে ওগুলো দেশ থেকে বের করে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দেয়া। ভাল লাভ হবে।

হোরেসের ভাগ দিতে হবে, ভুলো না। জেল থেকে বেরোবেই। তখন তার পাওনা মিটিয়ে দিতে হবে আমাদের।
ফন্দিটা ভালই করেছিল। নকশাটা ইসের মধ্যে ভরে…
ইসেটা যে কিসে তা আর শোনা গেল না। বাকি কথাগুলো উড়িয়ে নিয়ে গেল বাতাসে। কান খাড়া করে অনেক চেষ্টায় আরও কয়েকটা শব্দ শুনতে পেল গোয়েন্দারা। মারভিন বলছে, কাল রাত নটায়, পিংক হাউসে…
হাঁটতে শুরু করল দুজনে। আর ওদের কথা শোনা গেল না। শুনতে হলে আবার পিছু নিতে হবে। আর ঝুঁকি নিল না গোয়েন্দারা।
অন্ধকারও হতে শুরু করেছে। গোবেল বীচে ফিরে যাওয়া উচিত। ঘরে আরাম করে বসে বিকেলের এই অভিযান নিয়ে আলোচনা করা যাবে।
গোবেল ভিলায় ফিরে এল ওরা। ছেলেদের ঘরে এসে বসল সবাই।
আলোচনা শুরু করল কিশোর, তাহলে কি জানলাম আমরা? ডন হারভে চোরের দলের একজন। কথা শুনে মনে হলো অন্য লোকটা, অর্থাৎ মারভিন হলো তার বস।
কিংবা আরেকটা লোকের কথা যে বলল, সে-ও হতে পারে, জিনা মনে করিয়ে দিল। যার নাম হোরেস।
যে লোকটা জেলে রয়েছে, রবিন বলল।
সূত্র তো ভালই পেলাম, বলল মুসা। এখন এগুলো জোড়া দিয়ে খাপে খাপে মেলাতে পারলেই হয়। অনেক প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাব। মারভিন বেশ রেগে গেছে মনে হলো। কোন একটা ভুল নিশ্চয় করে চলেছিল ডন। সে বলল, তার কিছু করার ছিল না। কারণ মাল আসতে আসতে দেরি হয়ে গেছে। ততদিনে তার কাজের মেয়াদ শেষ। এখন প্রশ্ন হলো, কি কাজ? কোথায়? আর কি জিনিসের ডেলিভারি, যা আসতে দেরি হলো?
ভাবছে কিশোর। নাক কুঁচকে রেখেছে সামান্য। মনে হয় বুঝতে পারছি, বলল সে। ঝুঁকি নিতে হলো বলল মারভিন। তারপর বলল তালা ভেঙে ঢোকার কথা। আমার বিশ্বাস, পলির ক্রিসমাস ট্রি, আর গোবেল বীচ স্টোরে চুরি করার কথা বলেছে ও।
আর জিনিস নিশ্চয় সেই খেলনা ভালুকগুলো, উত্তেজিত হয়ে উঠেছে রবিন। ওগুলো আসতেই দেরি হয়েছে, জানি আমরা, ডিক বলেছিল। আর চুরিও হয়েছে শুধু ওগুলোই।
হ্যাঁ, জিনা বলল। বেশ মিলে যাচ্ছে। কিশোর, ডন মনে হয় গোবেল বীচ স্টোরে একটা টেমপোরারি কাজ নিয়েছিল। বড়দিনের সময় কাজ বেশি, বাড়তি লোকের দরকার হয় ওদের। ওই সময়ই তাকে গোপন খবর পাঠানো হয়েছিল, যে

কোন একটা খেলনা ভালুকের ভেতরে থাকবে নকশাটা। এল খেলনাগুলো। কিন্তু দেরি করে। তখন তার চাকরির মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। খেলনাগুলোর ভেতরটা দেখার আর কোন উপায় না পেয়ে শেষে চুরিই করে বসল সে। সময় পেলে অবশ্য দেখেটেখে যে ভালুকটার ভেতরে রয়েছে, সেটাই খুলত। তারপর আবার সেলাই করে রাখলেই কেউ ধরতে পারত না।
ঠিক! কথাগুলো যুক্তিসঙ্গত মনে হলো কিশোরের। আর এমনই কপাল ওদের, চুরি করে নিয়েও লাভ হলো না। রবিন যে একটা ভালুক কিনল, কাকতালীয় ভাবে তার মধ্যেই থেকে গেল নকশাটা। যা-ই হোক, চুরি রহস্যের সমাধান হয়েছে। এখন আমাদের জানতে হবে, নকশা দেখে কি জিনিস বের করতে চাইছে ওরা। কি হতে পারে, বলো তো?
বুঝতে পারছি না, মাথা নাড়ল মুসা। তবে দামী কোন কিছু। বলল না, দেশ থেকে বের করে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করলে ভাল টাকা পাবে। দামী জিনিসই।
তিন ভাগ করবে সেই টাকা, জিনা বলল। একটা ভাগ দেবে জেলের লোকটাকে। হোরেস।
আমার মনে হয় ও-ই নেতা। যদিও এখন জেলে রয়েছে। প্ল্যানট্যান সব সে-ই করেছে, শুনে সে-রকমই মনে হলো। নকশাটা সে এঁকেছে। আর সেটা পাচারের ব্যবস্থা করেছে …
খেলনা ভালুকের ভেতরে ভরে! বুঝে ফেলল রবিন।
হ্যাঁ। একটা ব্যাপার অবশ্য এখনও পরিষ্কার হয়নি। জেলে ওরকম একটা খেলনা কি ভাবে পেল হোরেস? সেটা আবার বাক্সে ভরে অন্য খেলনাগুলোর সঙ্গেই বা পাঠাল কিভাবে?
আমি জানি! বলে উঠল মুসা। কপালে টোকা দিয়ে বলল, এটা আজ ভালই খেলছে মনে হয়!
হাসল কিশোর। বলে ফেলো।
জেলে কাজ করতে হয় কয়েদীদের। অনেক রকম কাজ। শ্রমিকের কাজই বেশি। কাপড় সেলাই থেকে শুরু করে মেইল ব্যাগ বানানো পর্যন্ত সব করে। খেলনাও বানায়। শুনেছি, খেলনা বিক্রি করেও জেলখানার ভাল আয় হয়। জেলে হোরেসের কাজ খেলনা বানানো। কিংবা ইচ্ছে করেই কাজটা নিয়েছে সে, নিজের স্বার্থ উদ্ধারের জন্যে। যাতে নকশা এঁকে সেটা একটা খেলনা ভালুকের ভেতর ভরে দিতে পারে সহজেই। কোন ভাবে খোঁজ নিয়ে জেনেছে, কোন দোকানে। জিনিসগুলো চালান যাবে। সেটা জেনে নেয়াটা কঠিন কাজ নয়। জেনে, খবর দিয়েছে তার বন্ধুদের, কোত্থেকে কিভাবে জোগাড় করতে হবে নকশাটা।

হ্যাঁ, ঠিক বলেছ! তুড়ি বাজাল কিশোর। এটাই একমাত্র ব্যাখ্যা। কি ভারে পাঠিয়েছে জানার জন্যে মনটা খুঁতখুঁত করছিল। যদিও সেটা এখন জেনে আর লাভ নেই, দরকারও নেই আমাদের। এখন যে কাজটা করতে হবে, তা হলো। নকশার মানে বের করে জিনিসগুলো খুঁজে বের করা! লোকগুলোকে ঠেকানো। মারভিন আর ডন কাল রাতে পিংক হাউসে দেখা করবে বলেছে। হয়তো ওখানেই রয়েছে জিনিসগুলো। পিংক হাউসটা কোথায়, খুঁজে বের করতে হবে আগে।
কোথায় যে জায়গাটা, কিছুই বলতে পারব না, জিনা বলল। নামই শুনিনি। এই এলাকায় না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। তবে হলে ভাল হত, সুবিধে হত আমাদের জন্যে। সময়টা ভাল বেছেছে, তাই না? কাল নিউ ইয়ারস ইভ। রাত নটায় বাইরে বেশি লোক বেরোবে না। লোকে হয় বাড়িতে থাকবে, নয়তো পার্টিতে, নিউ ইয়ারের অপেক্ষায়।
আমরা বাদে! ঘোষণা করে দিল কিশোর। রাতের খাওয়া হয়ে গেলে, কেরিআন্টিকে বলব, আমরা স্টোররুমে খেলতে যাচ্ছি। ঘুমাতে দেরি হবে।
না বললেও কিছু এসে যায় না, জিনা বলল। আব্বা তো খেয়ে গিয়ে ঢুকবে স্টাডিতে। আম্মা টিভি দেখবে। আমরা সেই সুযোগে বেরিয়ে যাব। বলা যায় না, দাওয়াতও পেয়ে যেতে পারে, পার্টির। তাহলে তো কাজের কাজই হবে নিশ্চিন্তে বেরিয়ে পড়ব আমরা…
পিংক হাউস শিকারে, হেসে জিনার কথাটা শেষ করে দিল রবিন।
তা তো বেরোব, মুসা বলল। কিন্তু জানিই তো না ওটা কোথায়
তা জানা যাবে, বলল কিশোর। সময় আছে কালকের সারাটা দিনই পড়ে আছে।
যেতে যেতে তো সেই রাত নটা!
কপাল আমাদের ভালই বলতে হবে, জিনা বলল সব কিছুই কেবল পক্ষে যাচ্ছে। যেন আমাদের ইচ্ছেমতই ঘটছে সব আশা করি পিংক হাউসটাও পেয়ে যাব। কি বলিস, রাফি?
গররর! বিজ্ঞের ভঙ্গিতে জবাব দিল রাফি

.

পরদিন সকালে আবার মিডলটনে এল গোয়েন্দারা। কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। সাইকেল চালানোটা মোটেও আরামদায়ক হলো না। গায়ে পৌঁছে খেয়াল হলো, তদন্তটা কি করে চালাবে, আলোচনা করে ঠিক করে আসেনি। খোঁজ করতে গেলে যদি কোনভাবে টের পেয়ে যায় ডন? তাহলে এত দিনকার সব পরিশ্রম শেষ।
তবে বুদ্ধি একটা বের করে ফেলল কিশোর। চলো, ওই কাফেটায় ঢুকি। গ্র্যান্ড কাফে বাদে আরেকটা যেটা আছে সেটার কথা বলল সে। ওটার নাম ব্ল্যাক।

ক্যাট, দেখতে পাচ্ছে। ঠাণ্ডা লাগছে। গরম গরম কোকা কিনে খেতে চাইলে কেউ সন্দেহ করবে না। তখন কায়দা করে জেনে নেয়ার চেষ্টা করব, পিংক হাউসটা কোথায়।
কাফেতে এসে ঢুকল গোয়েন্দারা। একটা টেবিল বেছে বসে পড়ল। সকালের এই সময়টায় খরিদ্দারের ভিড় নেই। সুন্দর চুলওয়ালা একটা ছেলে ওয়েইটারের কাজ করছে। হাসি হাসি মুখ। তার নাম হ্যারি। ব্ল্যাক ক্যাটের মালিক ছেলেটার বাবা।
অর্ডার নিতে এগিয়ে এল হ্যারি। আদর করে রাফির মাথা চাপড়ে দিয়ে বলল, বাহ, বেশ সুন্দর কুকুর তো।
খুশি হলো রাফি। সেই সাথে জিনা। হ্যাঁ, বলল সে। আর খুব সাহস! বুদ্ধিও আছে। ঘরে বসে থাকার বান্দাই সে নয়। ওই যে কিছু কিছু কুকুর থাকে না, খালি ড্রইং রুমে বসে থাকে।
তা যে নয়, সে তো দেখতেই পাচ্ছি, হেসে বলল ছেলেটা। কথায় কথায় হাসে। ওর চেহারাই বলে, গলায় লাল ফিতে বেঁধে কোলে বসে থাকতে রাজি নয়।
সুযোগ পেয়ে গেল কিশোর। পিংক শব্দটা বলার এইই উপযুক্ত সময়, রঙের কথা যখন উঠলই। না, সহ্যই করতে পারে না অলস হয়ে বসে থাকা, বলল সে। তবে ফিতে পছন্দ করে রাফি। একবার পিংক একটা রিবন বেঁধে দিয়েছিলাম গলায়। সেটা পরে সৈকতে তার সে-কি নাচানাচি। রবিন, তোমার মনে আছে? পিংক রিবন। পিংক, বুঝলে তো? ওই পিংক হাউসের মত।
আন্দাজে ঢিল ছুঁড়েছে কিশোর। লাগবেই, আশা করেনি। তবে লাগল।
ভুরু কুঁচকে হ্যারি বলল, পিংক হাউসের নামও জানো! অবাক হয়েছে। কি করে জানলে? এই এলাকায় থাকো না তোমরা, বুঝতে পারছি। আগে কখনও দেখিনি।
সত্যি কথা খানিকটা বলে দেয়া উচিত মনে করল মুসা। দেখবে কোত্থেকে? হাসল সে। এদিকে আমরা এলে তো। প্রথম এসেছি কাল। তখনই শুনেছি, একটা লোক বলছে পিংক হাউসের কথা। নামটা অদ্ভুত। সেজন্যেই কৌতূহল হচ্ছে আমাদের। ওই রঙের বাড়ি নিশ্চয় খুব একটা নেই। ওটার সম্পর্কে জানার খুব ইচ্ছে আমাদের।
বেশ বড় একটা বাড়ি, হ্যারি জানাল। পুরানো। লাল রঙের। সেজন্যেই ওরকম নাম হয়েছে। তবে বাড়িটার অনেক বদনাম। ওটার মালিক হোরেস ট্রিমেইনির গ্রেপ্তারের পর থেকেই।
উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে গোয়েন্দাদের মুখচোখ পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল ওরা। দ্রুত হয়ে গেছে হৃৎপিণ্ডের গতি। বুঝতে পারছে, তদন্তে অনেক এগিয়ে গেছে।

খাবারের অর্ডার দিল কিশোর।
ধূমায়িত কোকার মগ নিয়ে এল হ্যারি। আর বড় একটা কেকের অর্ধেকটা। সেগুলো টেবিলে নামিয়ে রেখে সাজিয়ে দিল।
আগের আলোচনাটা আবার চালিয়ে গেল কিশোর। জিজ্ঞেস করল, হোরেস ট্রিমেইনিকে গ্রেপ্তার করছে কেন?
সে এক মজার গল্প। শোনোনি? সত্যি? কেন, চোরাই ছবিগুলোর কথা শোনোনি? পেইন্টিং?
হ্যাঁ, পেইন্টিং।
মাথা নাড়ল কিশোর। মুসা আর জিনাও নাড়ল। রবিন চুপ করে আছে। অবাক হয়েছে অন্য তিনজনের মতই।
ও। শোনো তাহলে, বলতে লাগল হ্যারি। বছরখানেক আগে লন্ডনের এক আর্ট গ্যালারি থেকে চুরি যায় ছবিগুলো। খুঁজতে খুঁজতে পুলিশ এসে ধর। হোরেসকে। চার বছরের জেল হয়ে যায়। তাকে দোষী প্রমাণ করতে পেরেছে বটে পুলিশ, তবে ছবিগুলো বের করতে পারেনি। কিছুতেই কথা বের করা যায়নি হোরেসের মুখ থেকে। তারপর থেকে ওই বাড়িটাতে আর কেউ বাস করে না।
বাড়িটা কোথায়? রবিন জিজ্ঞেস করল।
হ্যারি জানাল, বাড়িটা মিডলটন আর গোবেল বীচের মাঝে একটা সাধারণ রাস্তার ধারে। এটাই জানতে চেয়েছিল গোয়েন্দারা। কোকা শেষ করে উঠল ওরা। হ্যারিকে গুডবাই জানিয়ে বেরিয়ে এল কাফে থেকে।
দুপুরের খাওয়ার অনেক দেরি, কিশোর বলল। সময় আছে হাতে। ইচ্ছে করলে এখুনি ঘুরে দেখে যাওয়া যায়। এখন পেয়ে গেলে বিকেলে আর আসতে হবে না। মিডলটনে যত কম লোকে আমাদেরকে দেখে ততই ভাল। ডন কিংবা মারভিনের সামনে পড়তে চাই না কিছুতেই।
চলতে চলতে রবিন জিজ্ঞেস করল, কিশোর, এই হোরেস লোকটা ছবিগুলো কি তার বাড়িতেই লুকিয়ে রেখেছে? কি মনে হয় তোমার? নিশ্চয় গ্রেপ্তার যে হবে সেটা বুঝতে পেরেছিল। তাড়াতাড়ি লুকিয়ে ফেলেছে। এগুলোর কথাই বলছিল ডন আর মারভিন।
মুসাও রবিনের সঙ্গে একমত। কিশোর জবাব দেয়ার আগেই বলে উঠল, আমারও তাই মনে হয়। পুলিশ নিশ্চয় খোঁজা বাকি রাখেনি। আর সেটা ভাল করেই জানত হোরেস। কাজেই এমন জায়গায় লুকিয়েছে, যেখান থেকে খুঁজে বের করা কঠিন। কোথায় লুকিয়েছে সেটা বলে যেতে পারেনি সঙ্গীদের। তবে জেলে ঢুকে যোগাযোগ করেছে কোনভাবে। তারপর খেলনার ভেতরে নকশা ভরে সেটা পাচারের ব্যবস্থা করেছে।

আর জেল থেকে বেরিয়ে, জিনা যোগ করল। অবশ্যই তার ভাগটা চাইবে। ছবি বিক্রির টাকার। টাকা নিশ্চয় অনেক পাবে। বাকি জীবন আরামে কাটিয়ে দিতে পারবে।
সেটা আর হতে দিচ্ছি না আমরা, কিশোর বলল।
যেন তার কথার সমর্থনেই বলে উঠল রাফি, ঘাউ!
হেসে উঠল মুসা। শুনলে তো রাফির কথা। ও বলতে চাইছে, হোরেস মিয়া, ওই টাকা জিন্দেগিতেও তুমি পাবে না। আর পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে পোলাও কোরমা খাওয়াও চলবে না। তোমাকে আবার জেলেই ঢুকতে হবে, শুকনো রুটি খাওয়ার জন্যে।
অতটা জোর দিও না, জিনা বলল। বলা যায় না কি হয়। যে লোকের পেট থেকে পুলিশ কথা আদায় করতে পারেনি সে নিশ্চয় সাধারণ লোক নয়। তাকে এত ছোট করে দেখা উচিত না। আরেকটা কথা হয়তো জানো, জেলে কোন কয়েদী যদি ভাল ভাবে থাকে, ভাল আচরণ করে, তাকে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই মুক্তি দেয়া হয়। বলা যায় না, হোরেসকেও তেমনি ভাবে ছেড়ে দেয়া হতে পারে।
দিক না। আবার ঢোকাবে।
যদি চোরাই মাল সহ ধরতে পারে।
পারবে...
মুসা আর জিনার তর্কাতর্কিতে বাধা দিল কিশোর, ওই যে পিংক হাউস!
থেমে গেল পাঁচজনেই, রাফি পর্যন্ত। মুখ তুলে তাকিয়ে রয়েছে লাল বাড়িটার দিকে। সত্যিই লাল! দুই-আড়াইশো বছরের পুরানো। অর্ধেক কাঠ, অর্ধেক ইট সুরকি দিয়ে তৈরি। লাল রঙ করা হয়েছে। জানালার কাঠের শাটারগুলোও লাল। খড়-পাতা দিয়ে বানানো চালা। সামনের দরজায় উঠতে হয় সিঁড়ি বেয়ে। নির্জন, নিঃসঙ্গ। আশপাশে আর কোন বাড়িঘর নেই। বিশাল বাগান রয়েছে চারপাশ ঘিরে। তবে সেটাকে এখন আর বাগান বলা যাবে না। অযত্ন অবহেলায় জঙ্গল হয়ে গেছে।
চলো, ঢুকে দেখি, প্রস্তাব দিল মুসা। ধারে কাছে কেউ আছে বলে মনে হয় না। ভেতরে কি আছে দেখতে চাইলে এটাই সুযোগ। এখন দেখে রাখলে রাতে। এলে সুবিধে হবে।
কথাটা মন্দ বলেনি মুসা। কিশোরের পছন্দ হলো। গেটে ঠেলা দিল সে। কজায় এমন ভাবে জং পড়েছে, খুলতে জোর লাগল। কিচকিচ করে আর্তনাদ করে উঠল। তবে খুলল।
খুশি হয়ে উঠল কিশোর। তালা নেই। বাচলাম।

পথের পাশের খাদে সাইকেলগুলো লুকাল ওরা। তারপর সারি বেঁধে গেট দিয়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে। খোয়া বিছানো পথ ধরে এগোল বাড়ির দিকে। আগে আগে হাটছে রাফি। নাক উঁচু করে বাতাস শুঁকছে। সন্দেহজনক কিছুর গন্ধ পেলেই সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দেবে।

বাগানে ঢোকার গেটটার মত বাড়ির দরজা খোলা নয়। এখানে তালা দেয়া।

হলো না, নিরাশ হয়ে বলল মুসা। নিচতলার সমস্ত জানালা-দরজা ঠেলেঠুলে দেখল কোনটা খোলা আছে কিনা। মাথা নাড়ল, নাহ, আটকে রেখে গেছে! ঢোকা আর হলো না!

এক হিসেবে ভালই হলো, জিনা বলল। ঢুকতেও পারব না, ধরাও পড়ব না, তাতে কেউ বলতেও পারবে না বেআইনী ভাবে ঢুকেছি।

ওই আঙুর ফল টকের মত আর কি, ফোড়ন কাটল রবিন।

কিশোর কিছু বলছে না। নীরবে তাকিয়ে রয়েছে একেবারে মাটির কাছাকাছি। দুটো ভেনটিলেটরের গ্রিলের দিকে। লম্বা, সরু জানালার মত ফোকর, কাঁচটাচ নেই। এমন ভাবে তৈরি হয়েছে যাতে বাতাসের সাথে সাথে কিছু আলোও দিতে পারে মাটির তলার ঘরে।

আমি শিওর, ছবিগুলো থাকলে সেলারেই আছে, বলল সে। ইস, যদি কোনভাবে ঢুকতে পারতাম! নকশাটার সাহায্যে বের করতে পারতাম ছবিগুলো।

অনেক চেষ্টা করেও ঢোকা সম্ভব হলো না। আর কিছু করার নেই। বাড়ির পথ। ধরল ওরা।

তারপর সময় যেন আর কাটে না। সাংঘাতিক দীর্ঘ লাগছে। যেন সন্ধ্যা আর হবেই না সেদিন। আর যদি হয়ও, কেরিআন্টি কিংবা পারকার আংকেলের চোখ এড়িয়ে বাড়ি থেকে বেরোতে পারবে কিনা তাতেও সন্দেহ আছে না পারলে, এত চেষ্টা, এত পরিশ্রম, সব বিফল।

কয়েক বাড়ি থেকে দাওয়াত এসেছে, নিউ ইয়ার ইভের পার্টিতে যাওয়ার জন্যে। কিন্তু রাজি হলেন না জিনার আব্বা আম্মা। দুজন আত্মীয় বেড়াতে আসছেন সন্ধ্যায়। জিনার দূর সম্পর্কের চাচা-চাচী। তাদেরকে ফেলে দাওয়াতে যাওয়া যায় না।

সন্ধ্যা হলো। মেহমানরা এলেন। রাতের খাওয়া শেষ হলো। তার পরেও অনেক সময় বাকি। বড়রা সিটিং রুমে তাস খেলতে বসলেন।

ভালই হলো, কিশোর বলল। তাসে একবার ডুবে গেলে আর কোনদিকে খেয়াল থাকবে না। আর টেলিভিশন তো রয়েছেই। মাঝরাতের আগে আর উঠবে না কেউ। বাতাসের মত স্বাধীন আমরা। যেখানে খুশি চলে যেতে পারি, আনন্দে শিস দিতে শুরু করল সে।

এত খুশি হয়ো না, রবিন অতটা নিশ্চিন্ত হতে পারছে না। যদি কোন কারণে উঠে আসেন আন্টি? হাজারটা কারণ থাকতে পারে ওঠার। আমরা ঘুমিয়েছি কিনা সেটাই যদি দেখতে আসেন?

তাহলে আর কি, লক্ষটা কৈফিয়ত দিতে হবে। তবে এ ছাড়া আর কোন উপায় নেই। ঝুঁকি নিতেই হবে। এতখানি এগোনোর পর শুধু কৈফিয়তের ভয়ে তো আর ঘরে আটকে থাকতে পারি না।

বেরিয়ে পড়ল ওরা। ক্যারিয়ারে অনেক বড় একটা ঝুড়ি বাধল জিনা, রাফিকে বয়ে নেয়ার জন্যে। কাদার মধ্যে দৌড়ালে অনেক কষ্ট করতে হবে বেচারাকে।

ঝুড়িতে তোলা হলো রাফিকে। এ ভাবে চলার অভ্যাস আছে তার। কাজেই গোলমাল করল না, যে ভাবে রাখা হলো, চুপ করে গুটিসুটি হয়ে রইল ঝুড়ির মধ্যে।

রওনা হলো গোয়েন্দারা। যত দ্রুত সম্ভব প্যাড়াল করতে লাগল, সময় মত ওখানে পৌঁছানোর জন্যে। আত্মবিশ্বাসের অভাব নেই কিশোরের। ভয় তেমন করছে না। তবে পিংক হাউসে পৌঁছে কি দেখবে, আন্দাজও করতে পারছে না।

যে কাজে চলেছে, তাতে সফল হবে কিনা, এ ব্যাপারে সবারই সন্দেহ আছে। লুকিয়ে শোনা কয়েকটা কথার ওপর নির্ভর করে চলে এসেছে ওরা। লোকগুলো আদৌ পিংক হাউসে আসবে কিনা, তাই বা কে জানে? আগের দিন কথা বলার পর অনেক সময় পেরিয়েছে, ইতিমধ্যে অনেক সময় পেয়েছে ওরা মত বদলানোর।

আসবে কিনা কে জানে? ভাবনাটা প্রকাশই করে ফেলল রবিন।

জিনারও একই প্রশ্ন, তবে সেটা বলল না। আরেকটা ব্যাপারে সন্দেহ আছে। তার। নকশাটা সত্যিই ছবিগুলোর কাছে নিয়ে যাবে তো?

মাঝে মাঝেই পকেটে চাপড় দিচ্ছে কিশোর। নিশ্চিত হয়ে নিচ্ছে, নকশাটা আছে কিনা। তার ভয়, কোন ভাবে খোয়া না যায়। পকেট থেকে পড়েও যেতে পারে। হারানোর ভয়ে কুকুরের ঘর থেকে বের করেছে ওটা বেরোনোর ঠিক আগের মুহূর্তে। নকল নকশা একে দেয়ার বুদ্ধিটা করেছিল বলে খুশি এখন সে। ঠিক কাজটাই করেছে।

পিংক হাউস থেকে একটু দূরে সাইকেল রেখে হেঁটে চলল ওরা। খুব সাবধান রইল। কোন রকম শব্দ করল না।

গেটের কাছে পৌঁছেই থমকে দাঁড়াল কিশোর। আগে আগে হাঁটছিল সে। তাহলে তার অনুমানই ঠিক! গেট খোলা। অথচ দুপুরে নিজের হাতে লাগিয়ে দিয়ে গিয়েছিল পাল্লাটা। লোকগুলো যে এসেছে, তার আরও প্রমাণ আছে। ম্লান আলো দেখা যাচ্ছে গ্রিলের ফাঁক দিয়ে। একটা ভেনটিলেটরের ভেতর থেকে আসছে।

দেখলে তো! ফিসফিস করে বলল কিশোর, খুশি খুশি গলায়। আমার কথাই ঠিক!

.

অন্ধকারে গা ঢেকে রয়েছে গোয়েন্দারা।

ভাল করে তাকালেই শুধু চোখে পড়বে পাঁচটা ছায়ামূর্তি-চারটে মানুষের, আর একটা কুকুরের।

নিঃশব্দে ভেলটিলেটরের কাছে এসে থামল ওরা। ফাঁক দিয়ে নিচে তাকাল। গ্রিলের মাঝে যথেষ্ট ফাঁক। মুখ ঢুকিয়ে দেখতে তেমন অসুবিধে হয় না। সেলার, অর্থাৎ মাটির নিচের ঘরের বেশ অনেকখানিই চোখে পড়ে। ডনও আছে, তার সঙ্গী মারভিনও আছে। সেলারের মেঝেটা কাঁচা। পশ্চিমের কোণে মাটি খুঁড়ছে ডন, আর নকশা দেখে দেখে নির্দেশ দিচ্ছে মারভিন। নকল নকশা, যেটা এঁকে দিয়েছে কিশোর। তৃতীয় আরও একজন রয়েছে সেখানে, হাতে একটা বড় হ্যারিকেন। হোরেস ট্রিমেইনি জেলে যাওয়ার পর নিশ্চয় বাড়ির বৈদ্যুতিক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়েছে, অনুমান করল কিশোর।

গলা বাড়িয়ে দিল মুসা।

দেখো দেখো! রবিন বলে উঠল। সেই মহিলা। যে ছেলের জন্যে ভালুকটা নিতে চেয়েছিল আমার কাছ থেকে।

তাই তো!

ভালমত খেয়াল করে দেখতেই বাকি তিনজনও চিনতে পারল মহিলাকে।

একটা শাবল নিয়ে কাজ করে চলেছে ডন। মেঝে থেকে উঠে আসছে তাল তাল মাটি।

ওখানেই তো থাকার কথা! ওই খানেই! মারভিন বলল। নকশার ওপর থেকে চোখই সরাচ্ছে না। ডন, চালিয়ে যাও।

কিছুক্ষণ পর মুখ মোছার জন্যে থামল ডন। দরদর করে ঘাম ঝরছে মুখ বেয়ে।

আপনি দাঁড়িয়ে আছেন কেন? রেগে গেল উন। কথাই তো বলে চলেছেন খালি। এক-আধ বার খুঁড়লে হয়টা কি? টাকা তো আর কম নেবেন না! ইস, মাটি তো না, যেন সিমেন্ট!

মনে হলো রেগে যাবে মারভিন। কিন্তু রাগল না। মহিলার দিকে ফিরে বলল, দেখি, আলোটা আরেকটু এদিকে সরাও তো, ইসাবেল।

একটাতে হবে না, বলে হ্যারিকেনটা মাটিতে রেখে দিল ইসাবেল। আরেকটা হ্যারিকেন বের করে ধরাল। ততক্ষণে শাবল নিয়ে মাটি কোপাতে শুরু করেছে মারভিন। কিছুক্ষণ কাজ করে ফিরিয়ে দিল আবার ডনকে।

পালা করে দুজনে মিলে মাটি কুপিয়ে চলল। সেলারের পুরো পশ্চিম কোণটা যেন খুড়ে তুলে ফেলবে।

ওপরে, ভেনটিলেটরের কাছে দাঁড়িয়ে দেখছে গোয়েন্দারা। এতই মগ্ন হয়ে আছে, ঠাণ্ডার কথাও ভুলে গেল। কখন যে ঠাণ্ডা বাতাস ছাড়তে শুরু করেছে টের পেল না। কিছুই না পেয়ে বিরক্ত হয়ে ডন যখন শাবলটা ছুঁড়ে ফেলল, হাসি চাপতে কষ্ট হলো ওদের।
কোন চিহ্নই তো নেই! বলল সে। আমি আর পারছি না! হোরেস নাকি ট্রাঙ্কটা লুকানোর পর চিহ্ন দিয়ে রেখেছে। কই?
আরও খুঁড়তে হবে, মারভিন বলল। নকশায় লেখা রয়েছে এক ফুট। হাতের লেখা তো। সেভেনকেও ওয়ানের মত লাগে অনেক সময় লেখার দোষে।
তারমানে সাত ফুট খুঁড়তে হবে! ঘাবড়ে গেল ডন। এত নিচে রাখতে গেল কেন? পাগলামি, স্রেফ পাগলামি!
যা-ই হোক, খুঁড়তে তো হবে, ইসাবেল বলল। তাড়াহুড়ো নেই আমাদের। আস্তে আস্তে খোড়ো।
তা তো বলবেই! ফুঁসে উঠল ডন। তোমাকে তো আর পরিশ্রম করতে হচ্ছে না!
কথাটা এড়িয়ে গেল ইসাবেল। বলল, দুটো শাবল আছে। একজন এজন করে না খুঁড়ে দুজনে মিলে একবারেই খোড়ো। সহজও হবে, তাড়াতাড়িও।
বুদ্ধি-পরামর্শ ওরকম অনেকেই দিতে পারে। যে করে সে বোঝে ঠেলা! দুজনে যে খুঁড়ব, যদি কারও মাথায় লেগে যায়? একজন একজন করেই করতে হবে।
সোজা হলো কিশোর। সঙ্গীদের ইশারা করল। যেমন এসেছিল তেমনি নিঃশব্দে আবার ভেনটিলেটরের কাছ থেকে পিছাতে শুরু করল ওরা।
এখানে থাকলে বরফ হয়ে যাব, কিশোর বলল। যা ঠাণ্ডা পড়ছে! নকল নকশা দিয়ে ছবিগুলো ওরা খুঁজে পাবে না। চলো, কোথাও গিয়ে বসে থাকি। ওরা বেরোক। চলে গেলে তারপর ঢুকব আমরা। ছবিগুলো বের করার চেষ্টা করব।
ঠিক আছে, মুসা বলল। কিন্তু বসবটা কোথায়? বাইরে থাকলে সত্যিই মরে যাব!
চোরের গাড়িতে বসব, নির্দ্বিধায় বলে দিল কিশোর। আর তো কোন জায়গা। দেখছি না। বাগানের গেটের কাছে গাছের নিচে গাড়িটা দেখেছি। দরজায় তালা না থাকলেই বাঁচি...।
তালা লাগানো নেই। প্রয়োজন বোধ করেনি চোরেরা। ওরা কি আর ভাবতে পেরেছে এই রাতের বেলা এসে কয়েকটা ছেলেমেয়ে ওগুলোতে ঠাই নেবে ঠাণ্ডার কবল থেকে বাঁচার জন্যে?
গাড়িতে উঠে বসল সবাই, রাফি সহ। ঠাণ্ডা থেকে রেহাই মিলল। চোরের ওপর বাটপাড়ি করতে পেরে খুশি লাগছে ওদের।
ঘুমাতে চাও? আরাম করে সীটে হেলান দিয়ে বলল জিনা। ঘুমিয়ে নিতে পারো। আমি পাহারায় থাকি।

রবিনের আপত্তি নেই। ঢুলতে শুরু করল। কিশোর আর মুসাও ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু মনে হলো, চোখ বোজার সঙ্গে সঙ্গেই ওদেরকে জাগিয়ে দিল জিনা। কিশোরের কাঁধ ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল, এই, জলদি ওঠো! ওরা আসছে!
চোখের পলকে গাড়ি থেকে বেরিয়ে গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল ওরা। ডন তার দুই সঙ্গীকে আসতে দেখল। মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে আছে তিনজনেরই। গরম গরম কথা বলছে।
হোরেস আমাদেরকে ফাঁকি দিয়েছে! ডন বলল।
না, তা হতে পারে না, মানতে পারল না মারভিন। কেন ফাঁকি দিতে যাবে? কাল রাতে আবার আসব। দরকার হলে পুরো সেলারটাই খুঁড়ে ফেলব।
ইস, কি শীতরে বাবা! ইসাবেল বলল।
গাড়িতে উঠে চলে গেল লোকগুলো।
যাক, গেল, কিশোর বলল। খেয়াল করেছ, শাবল-টাবলগুলো আনেনি। খালি হাতে বেরিয়ে এসেছে। তারমানে ওগুলো রয়ে গেছে সেলারে। আমাদের কাজ সহজ করে দিয়ে গেল।
সহজ? জিনা প্রশ্ন করল, ঢুকতে পারলে সহজ। ঢোকাটাই তো আসল সমস্যা।
পথ একটা ঠিকই বের করে ফেলব, হাল ছাড়তে রাজি নয় মুসা।
কিন্তু সেই একই ব্যাপার, দিনের মতই। দরজা জানালা সব বন্ধ। ঢোকার কোন পথ নেই। ভেনটিলেটর দিয়ে ঢাকা যেত, যদি শক্ত গ্রিল না থাকত। আর মাঝে যে ফাঁক রয়েছে, তা দিয়ে ঢোকা অসম্ভব।
দূর! হতাশ হয়ে গেল মুসা। হবে না! ফিরে যেতে হবে দেখছি!
ঠিক এই সময় একটা জিনিসের ওপর চোখ পড়ল রবিনের। চাঁদের আলোয় চকচক করছে। খোয়া বিছানো পথের ওপর পড়ে রয়েছে। নিচু হয়ে তুলে নিল জিনিসটা। একটা চাবি!
আরি! প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মুসা। চাবি! মনে হয় সামনের দরজার!
এটা এখানে এল কিভাবে? জিনার প্রশ্ন।
বড়ই কাকতালীয় ব্যাপার! চোরগুলো এনেছিল হয়তো, কিশোর বলল। পড়ে গেছে কোনভাবে। যাক, ভালই হলো। ঢোকাটা হয়ে গেল আমাদের।
চাবিটা নিয়ে প্রায় দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল মুসা। তালার ফোকরে লাগিয়ে মোচড় দিতেই খুলে গেল। পিংক হাউসে ঢুকতে আর অসুবিধে হলো না ওদের।
ঝগড়া করার শাস্তি, রবিন বলল। ঝগড়াঝাটি না করলে, আর মাথা ঠাণ্ডা রাখলে চাবিটা যে পড়েছে টের পেয়ে যেত।
ভাল হয়েছে, কিশোর বলল। এসো, সেলারে ঢুকি।

নিচে নেমে প্রথমেই হ্যারিকেন দুটো জ্বালানো হলো। শাবল তুলে নিল মুসা। কিশোর বের করল নকশাটা। আসল নকশা। মিনিট দুই পরেই ঘরের পূর্ব দিকের। কোণায় খুঁড়তে আরম্ভ করল ওরা। মাটি ওখানটায় ঝরঝরে, শক্ত, জমাট হয়ে নেই। পালা করে খুঁড়তে লাগল কিশোর আর মুসা। মাঝে মাঝে জিনাও ওদেরকে সাহায্য করল। তবে তার গায়ে ছেলেদের চেয়ে জোর কম, তাই একটানা বেশিক্ষণ খুড়তে পারে না, হাঁপিয়ে যায়।

এক সময় বিড়বিড় করে বলল কিশোর, মাত্র এক ফুট। মুসা, চালিয়ে যাও। হয়ে এল বলে।

অবশেষে ঠং করে কিসে লাগল মুসার শাবল। উৎসাহ পেয়ে আরও তাড়াতাড়ি খুঁড়তে লাগল সে। বেরিয়ে পড়ল একটা টিনের ট্রাঙ্ক।

এরপরে ডালা তোলার পালা। বুকের কাপুনি বেড়ে গেছে ওদের। সবাই ঝুঁকে এল ভেতরে কি আছে দেখার জন্যে।

কয়েকটা রঙিন ক্যানভাস রোল পাকিয়ে বেঁধে রেখে দেয়া হয়েছে। একটা তুলে সাবধানে মেলে ধরল কিশোর।

ছেলেদের মত শিস দিয়ে উঠল জিনা। চিনি ওটা! ইস্কুলের লাইব্রেরিতে একটা রেফারেন্স বইতে দেখেছি। ওটার নাম উয়োম্যান উইথ ওয়াটার লিলি। সাদা কালো ছবিও দেখেছি এটার, পত্রিকায়। চুরি হওয়ার খবর বেরিয়েছিল যখন, তখন ছেপেছিল।

খাইছে! চেঁচিয়ে উঠল মুসা। এগুলোই তাহলে চোরাই পেইন্টিং। এখন শুধু গোবেল ভিলায় নিয়ে যাওয়া। তারপর পুলিশের হাতে তুলে দেবেন পারকার আংকেল।

ট্রাঙ্ক, ট্রাঙ্কটা ভীষণ ভারী, কিশোর বলল। বয়ে নিয়ে যেতে পারব না। সবচেয়ে ভাল হয়, বাগানে কোথাও লুকিয়ে রেখে গেলে। তারপর থানায় গিয়ে খবর দিতে পারব।

সেটাই ভাল হবে, হেসে বলল জিনা। এখন এসে ডন আর মারভিন দেখলে কি যে করত...

কি আর করবে? বলে উঠল একটা কণ্ঠ। তোমাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ দেবে। কারণ আমাদের কাজটা তোমরাই সেরে দিয়েছ। চাবিটার জন্যে ফিরে এসেছিলাম। পকেটে হাত দিয়ে দেখি, নেই। সেলারে আলো দেখে নামলাম। খুব ব্যস্ত ছিলে তো তোমরা, আমরা যে এসেছি, শোনোনি।

কথা বলছে মারভিন। তার পেছনে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে ডন। স্তব্ধ হয়ে গেছে গোয়েন্দারা। যখন ভাবছে, সফল হয়েছে, তখনই এল চরম ব্যর্থতা।

ঝট করে কথাটা মনে পড়ল জিনার। চোরগুলো যে এল, রাফি হুশিয়ার করল কেন? বুকের রক্ত ছলকে উঠল তার। দ্রুত চোখ বোলাল সেলারে। রাফি নেই!
আমার কুকুর! ককিয়ে উঠল সে। তাকে কি করেছেন আপনারা?
হেসে উঠল মারভিন। ওটা ঠিকই শুনতে পেয়েছে, আমরা যে এসেছি। কামড়ানোর চেষ্টাও করেছে। পারেনি। পিটিয়েছি।
কেঁদে ফেলবে যেন জিনা। মেরে ফেলেছেন! আমার রাফিকে মেরে ফেলেছেন! লাফ দিয়ে এগিয়ে গেল ডনের মুখে খামচি মারার জন্যে। খপ করে তার হাত চেপে ধরল লোকটা। মুসা আর কিশোর জিনাকে সাহায্য করতে এগোল। কিন্তু এক কথাতেই ওদের থামিয়ে দিল মারভিন, খবরদার! এক পা এগোলে মেয়েটার পেটে ছুরি মেরে দিতে বলব ডনকে!
তারপর দ্রুত ঘটতে থাকল ঘটনা। কিছু দড়ি পড়ে রয়েছে সেলারে। তুলে এনে ডন আর মারভিন মিলে বেঁধে ফেলল গোয়েন্দাদেরকে।
যাক, হলো, হাত ঝাড়তে ঝাড়তে বলল মারভিন, গোয়েন্দাগিরির শখ খানিকটা মিটবে। চালাকিটা ভালই করেছিলে, আমাদের নকল নকশাটা দিয়ে। তবে শেষ দিকে সন্দেহ হতে আরম্ভ করেছিল আমার। যাই হোক, সব ভালয় ভালয়ই শেষ হলো। তোমাদেরকে হ্যাপি নিউ ইয়ার জানাতে অসুবিধে নেই। হাহ হাহ হাহ! তোমাদেরকে যখন পাবে তোমাদের আত্মীয়-স্বজনরা, তখন সত্যি নতুন বছর এসে যাবে, আর আমরা অনেক দূরে চলে যাব। হয়তো আরও কিছুদিন থাকতাম এখানে, তোমরা যেতে বাধ্য করলে। যাব, কি আর করা। আসল জিনিসটা তো পেয়ে গেলাম। ডন, এসো। হ্যারিকেনগুলো নিয়ে নাও।
দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল সেলারের দরজা। বেরিয়ে গেছে চোরেরা। সাথে করে নিয়ে গেছে দামী ছবিগুলো।

.

প্রচণ্ড রেগে গেছে কিশোর। ভীষণ দুশ্চিন্তা হচ্ছে রাফির জন্যে। লোকগুলো তাকে এ ভাবে বোকা বানিয়ে গেল, এটা সহ্য করতে পারছে না। গালমন্দ করছে নিজেকে মনে মনে। বেরোতে হবে! চিৎকার করে উঠল সে। বেরোতেই হবে, যে ভাবে হোক!
মুখ আটকে রেখে যায়নি আমাদের, জিনা বলল। তার মানে দরকার মনে করেনি। যদি আমরা গলা ফাটিয়ে চেঁচাইও, আমাদের চিৎকার কারও কানে যাবে না। রাস্তা থেকে অনেক দূরে রয়েছি। আর এত রাতে আসবেও না কেউ। নিউ ইয়ারের পার্টি নিয়ে সবাই ব্যস্ত।
হ্যারিকেনও নিয়ে গেছে! রবিন বলল ভীত কণ্ঠে। কিছু দেখারও উপায় নেই। চাঁদের আলো যেটুকু পাওয়া যাচ্ছে তাতে যদি কিছু করা যায়!

দেয়ালে ঘষে দড়ি যদি ছিঁড়তে পারি! মুসা বলল। দেখি সেই চেষ্টাই করে। এ ভাবে বাধা থাকতে একটুও ভাল্লাগছে না আমার!
কিন্তু যত ভাবেই ঘষুক, কিছুই করতে পারল না সে।
হঠাৎ কান খাড়া করে ফেলল জিনা। একটা গোঙানি শুনেছে মনে হলো। সেলারে নামার সিঁড়ি থেকে এসেছে শব্দটা।
রাফি! চেঁচিয়ে উঠল সে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। মরেনি! আল্লাহ, রাফি মরেনি! বেঁচে আছে! আমার রাফি বেঁচে আছে!
তারপর শোনা পেল আরেকটা শব্দ। মরচে পড়া কজার ক্যাচকোচ। খুলে যাচ্ছে সেলারের দরজা।
লাগেনি! এবার চেঁচিয়ে উঠল মুসা। এত জোরে টান দিয়েছিল পাল্লাটা, লাগেইনি! আটকায়নি! ফাঁক হয়ে ছিল!
রাফি! রাফি! চেঁচাতে লাগল জিনা।
দরজা ঠেলে ফাঁক করে ঢুকে পড়ল রাফি। তিন লাফে কাছে চলে এল। জিনার গাল চেটে দিল। নাক ঘষতে লাগল মুখে।
আরে ছাড় ছাড়! জিনা বলল। ওসব পরেও করতে পারবি। আগে খোল তো। দড়িটা খোল পারলে।
রাফির বুদ্ধি আছে, ঠিক, কিন্তু হাত নেই। অত সহজে খুলতে সে পারে না। তবু চেষ্টার ত্রুটি করল না। প্রথমে কাপড় কামড়ে ধরে টেনে হিঁচড়ে জিনাকে বের করার চেষ্টা করল। পারল না। পারার কথাও নয়। এত ভারী একটা শরীর নেয় কি করে। ওসব বাদ দিয়ে দড়ি খুলতে পারে কিনা, সেই চেষ্টা করতে বলল তাকে জিনা। শেষে হাতের দড়ি কামড়াতে শুরু করল রাফি। এই কাজটাও সহজ নয়। মাঝে মাঝেই হাল ছেড়ে দেয়। আবার বুঝিয়ে শুনিয়ে তাকে চিবাতে রাজি করাতে হয়। এমনি ভাবে চলল। শেষে জিনা যখন হতাশ হয়ে পড়ল, ভাবল আর হবে না, তখনই কেটে গেল দড়ি।
উল্লাসে চিৎকার করে উঠল সে। খুলে গেছে! খুলে গেছে! ইস, অবশই হয়ে গেছে! নড়াতেও পারছি না! জোরে জোরে বাঁধনের জায়গাগুলো ডলতে লাগল সে। রাফি! লক্ষ্মী ছেলে! কাজের কাজই করেছিস!
হাতের রক্ত চলাচল স্বাভাবিক হয়ে এল। পায়ের বাধন খোলার জন্যে দেরি করল না সে। গড়িয়ে চলে এল অন্যদের কাছে। কিশোর মনে করিয়ে দিল ছুরিটার কথা। দড়ি কেটে ফেললে খোলার চেয়ে সহজ হবে। ওর পকেটেই রয়েছে উপহার পাওয়া বহু ফলার ছুরিটা।
ছুরি বের করে তিন গোয়েন্দার দড়ি কেটে ওদের মুক্ত করতে বেশি সময় লাগল না জিনার।

তাগাদা দিল কিশোর। জলদি চলো। চোরগুলোকে ধরে ওদের কাছ থেকে ছবিগুলো আদায় করে নিতে হবে।
সেলার থেকে বেরিয়ে এল ওরা। সদর দরজায় তালা লাগিয়ে দিয়ে গেছে। চোরেরা। তবে ঢুকতে অসুবিধে হলেও বেরোতে অসুবিধে নেই। জানালার ছিটকানি খুলে বেরিয়ে এল গোয়েন্দারা।
থানায় যাব? জিজ্ঞেস করল মুসা।
মিডলটনের থানা চিনি না, জিনা বলল। গোবেল বীচ বেশি দুরে না। ওই থানায়ই যেতে পারি। ওখানকার পুলিশও আমাদের চেনে। মিডলটন থেকে অর্ধেক দূরে তো চলেই এসেছি, আর অর্ধেক গেলেই হলো।
হ্যাঁ, একমত হলো কিশোর। তাতে সময়ও বাঁচবে। মিডলটনে গিয়ে থানা খুঁজে বের করতেও তো সময় লাগবে। চলো।
তবে বলা যত সহজ করা ততটা হলো না। ভীষণ ঠাণ্ডা রাত। ঘন মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়েছে চাঁদ। ফলে আলোও নেই। সাইকেল চালাতেও অসুবিধে। চলছে ওরা, চলছেই, তার পরেও পথ ফুরায় না। আস্তে আস্তে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল সবাই।
রবিন বলেই ফেলল, অবাক কাণ্ড! এতক্ষণে তো গোবেল বীচে ঢুকে পড়ার কথা!
পথ হারাইনি তো? দুশ্চিন্তাটা প্রকাশ করে ফেলল মুসা। দাঁ
দাঁড়াও তো, কিশোর বলল। একটা সাইনবোর্ড মনে হচ্ছে।
সাইকেল থেকে নামল সবাই। সাইনবোর্ডই। তবে লেখা পড়া গেল না।
চৌরাস্তায় ভুল করেছি, চিন্তিত হয়ে বলল জিনা। আরেক পথে চলে এসেছি ভুল করে। ফিরে গিয়ে খুঁজে বের করা ছাড়া উপায় নেই।
ইস, একটা আলোটালো যদি পেতাম! বলেও সারতে পারল না রবিন, সামনে দেখা গেল হেডলাইট। দ্রুত এগিয়ে আসতে লাগল আলো দুটো। কাছে এসে ব্রেক কষল, টায়ারের আর্তনাদ তুলে থেমে গেল গাড়ি।
পুলিশের পেট্রোল কার। ভেতরে দুজন অফিসার। একজন ইন্সপেক্টর। আরেকজন সার্জেন্ট। টহলে বেরিয়েছে। লোকে পার্টিতে ব্যস্ত। অপরাধগুলো এ সময়ই বেশি হয় রাস্তায়, কারণ নির্জন থাকে পথঘাট। কড়া নজর রেখেছে দুই পুলিশ অফিসার। এত রাতে চোর-ডাকাত আশা করছে তারা, চারটে কিশোর-কিশোরী আর একটা কুকুরকে অবশ্যই নয়। ওদেরকে খুঁজতে যে পুলিশ আসেনি, নিশ্চিত কিশোর। কারণ বাড়ি থেকে বেরিয়েছে ওরা বেশিক্ষণ হয়নি। এত তাড়াতাড়ি খোঁজ পড়ার কথা নয়।
পথ হারানোতে বিশেষ চিন্তিত ছিল না কিশোর। খুঁজে বের করতে সময় হয়তো লাগত, কিন্তু অসম্ভব ছিল না। তবু পুলিশ দেখে হাঁপ ছাড়ল।
ভালই হলো, ভাবল সে। গোবেল বীচে ফেরার পথ বাতলে দিতে পারবে। পুলিশ।

জিজ্ঞেস করার সময় পেল না সে। তার আগেই বেরিয়ে এল দুই পুলিশ অফিসার। কড়া গলায় জিজ্ঞেস করল একজন, এই, এত রাতে কি করছ এখানে?
ইন্সপেক্টরের কণ্ঠস্বর পছন্দ হলোনা রাফির। গরগর শুরু করল সে।
সরাও ওটাকে! চুপ করাও! ধমক দিয়ে বললেন পুলিশ অফিসার। চেহারাটা তো বিটকেলে!
প্রতিবাদ জানাল জিনা। তার রাফি এত খারাপ হতেই পারে না। কিন্তু মানতে রাজি নয় ইন্সপেক্টর। মেজাজ ভাল নেই তার। রেগে আছে। এই রাতে ডিউটি দিতে ভাল লাগছে না। সবাই বসে বসে বাড়িতে স্ত্রী-সন্তানের সঙ্গে নিউ ইয়ারের আনন্দ করবে, আর তাকে ডিউটি দিতে হবে, এটা মেনে নিতে পারছে না কিছুতেই।
দেখো, ভদ্রভাবে কথা বলো! আবার ধমক দিল সে। আদব-কায়দা শেখোনি নাকি? ভুরু কুঁচকে তাকাল কিশোরের দিকে। আমার প্রশ্নের জবাব কিন্তু দাওনি। এত রাতে এখানে কি করছ?
গোবেল বীচে যাচ্ছি, জবাবটা দিল জিনা।
বানিয়ে বলার আর জায়গা পাওনি! গোবেল বীচ কি উল্টোদিকে নাকি?
পথ ভুল করেছি। সেটা যখন বুঝলাম, আপনারাও চলে এলেন।
তাই? কোত্থেকে এসেছ?
গোবেল বীচ, জানাল রবিন।
দেখো, ফালতু কথা বলবে না আমার সঙ্গে! গোবেল বীচ থেকে গোবেল বীচে যায় কি ভাবে? আর এই রাতের বেলা, এত ঠাণ্ডায়, নিউ ইয়ারের পার্টি ফেলে কোন ছেলেমেয়ে বেরোয়? ব্যাপারটা সুবিধের লাগছে না আমার।
গোবেল বীচ থেকে গোবেল বীচে যাওয়া যায় না, ব্যাখ্যা করে বোঝাল কিশোর। কিন্তু গোবেল বীচ থেকে এসে তারপর তো আবার ফেরত যাওয়া যায়। মিডলটনে গিয়েছিলাম আমরা। ফিরে চলেছি গোবেল বীচে।
তার পরেও সুবিধের লাগছে না, কিছুতেই বিশ্বাস করতে রাজি নন ইন্সপেক্টর। নিশ্চয় বাড়ি থেকে পালিয়েছ তোমরা।
যদি ভবঘুরে কিংবা জিপসি না হয়ে থাকে, সার্জেন্ট বলল। বিদেশীই লাগছে।
জিপসি হলে অবাক হব না। কাপড়-চোপড়ের অবস্থা দেখেছেন, স্যার? ছেঁড়া, ময়লা। হাতে মুখে এত মাটি লাগল কোত্থেকে!
সেলারে মাটিতে গড়াগড়ি করে এলে এর চেয়ে ভাল অবস্থা আশাও করা যায় না।
দেখুন, মুসা বলল। আপনারা ভুল করছেন।
সাইকেলগুলো কিন্তু একেবারে নতুন! সন্দিহান হয়ে উঠেছে ইন্সপেক্টর। চুরিটুরি করে আনেনি তো?

দেখুন, বাজে কথা বলবেন না! রেগে গেল জিনা। দেখে কি চোর মনে হয় আমাদের? গোবেল বীচে কোথায় যাচ্ছি, জানেন? থানায়। একটা খবর দিতে।
বেশ, বেশ, বেশ! ব্যঙ্গ করার ভঙ্গিতে বলল সার্জেন্ট।- তা জানতে পারি কি, খবরটা কী?
অফিসারদের এহেন আচরণে মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে কিশোরের। মাথা সোজা করে নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল সে, খবরটা হলো, এক বছর আগে হোরেস ট্রিমেইনি যে ছবিগুলো চুরি করেছিল, সেগুলো খুঁজে পেয়েছি আমরা। মাল সহ চোরগুলোকে আটক করতে হলে এটাই সুযোগ!
তাই নাকি? টেনে টেনে বলল সার্জেন্ট। তারপর হো হো করে হেসে উঠল। গালগল্প তো বেশ ভালই বলতে পারো। বই লেখার চেষ্টা করো না কেন? ভাল পারবে। এ সব কাহিনী পুলিশকে বিশ্বাস করাতে পারবে ভেবেছ?
করা না করা সেটা পুলিশের ইচ্ছে!
কিন্তু সত্যি বলছি আমরা! প্রায় চিৎকার করে উঠল রবি।
বেশি ঠাণ্ডা, ইন্সপেক্টর বলল। এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলাই মুশকিল। সাইকেলগুলো রেখে গাড়িতে এসে ওঠো। ওগুলো পরে তুলে নিয়ে যেতে পারব। পেনড়ল সেইন্ট জনে নিয়ে যাব তোমাদের। সেখানে তোমাদের আইডেনটিটি চেক করব। তোমাদের কথা কতটা সত্যি থানায় বসেই খোঁজ নিতে পারব। নেয়া সহজও হবে। সময় অবশ্য লাগবে। তবে নিয়মের বাইরে তো আর যেতে পারি না।
মরিয়া হয়ে চেঁচিয়ে উঠল মুসা, কিন্তু তাইলে যে বেশি দেরি হয়ে যাবে। অনেক দূরে চলে যাবে চোরেরা। আর তখন ধরা যাবে না ওদের। ছবিগুলোও যাবে।
আমাদেরকে এ ভাবে আটকানোর কোন অধিকার আপনার নেই, কিশোরও রেগে গেল। আমরা কোন অন্যায় করিনি। বরং পুলিশকে সাহায্যই করতে চাইছি।
শোনো শোনো, কথা শোনো, হাসতে লাগল ইন্সপেক্টর। কি ভাবো নিজেকে? শার্লক হোমস?
না, তা ভাবি না! আমার নাম কিশোর পাশা। বেড়াতে এসেছি গোবেল বীচের বিখ্যাত বিজ্ঞানী…
কঠোর কণ্ঠে নির্দেশ দিল সার্জেন্ট, যাও, গাড়িতে ওঠো!
প্রতিবাদ জানাল ছেলেমেয়েরা। আরও তর্ক করল। কোন কথাই শুনল না পুলিশ। কিছুতেই বোঝানো গেল না ওদের।
অনেক বকবকানি হয়েছে, ইন্সপেক্টর বলল। আর কিছু শুনতে চাই না আমি। ভাল চাইলে গাড়িতে ওঠো।
মুখ কালো করে গিয়ে গাড়িতে উঠল গোয়েন্দারা। তবে চুপ করে বসে থাকল না কিশোর। গাড়ি যখন চলছে, পকেট থেকে তার রুমালটা বের করে, কলম দিয়ে

তাতে একটা চিঠি লিখল সে, অন্ধকারে কাপড়ের মধ্যে যতটা পারল। সেটা বাধল রাফির কলারে। সামনের সীটে বসে এ সবের কিছুই জানল না সার্জেন্ট কিংবা ইন্সপেক্টর।

পেনডল সেইন্ট জন থানার সামনে গাড়ি থামল। পেছনের দরজা খুলে অন্যদেরকে নামতে বলল কিশোর। রাফির কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, বাড়ি চলে যাবি! সোজা বাড়ি! জিনাদের বাড়ি! বলেই ঠেলে বাইরে বের করে দিল কুকুরটাকে। পেছনে আলতো চাপড় দিয়ে আবার বলল, যা! বাড়ি!

এই কয়েকটা কথাই রাফির জন্যে যথেষ্ট। একবার ফিরে তাকাল কিশোরের মুখের দিকে। বোঝার চেষ্টা করল, সত্যিই যেতে বলছে কিনা। তারপর লেজ নাড়তে নাড়তে চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল রাতের অন্ধকারে। এত দ্রুত ঘটে গেল ঘটনাটা, দুই পুলিশ অফিসার থানায় ঢোকার আগে লক্ষই করল না যে কুকুরটা নেই।

আরে, সার্জেন্ট বললেন। কুকুরটা গেল কোথায়?

হাত নেড়ে ইন্সপেক্টর বললেন, যেখানে খুশি যাক। ছেলেমেয়েগুলোকে নিয়ে এসো।

.

পেনডল সেইন্ট জন থানায় মাত্র দুজন পুলিশ পাহারায় রয়েছে, একজন কনস্টেবল, আরেকজন সার্জেন্ট। ছেলে-মেয়েদেরকে তাদের হাতে সোপর্দ করল ইন্সপেক্টর। মনে হয় বাড়ি থেকে পালিয়েছে, বলল সে। রাস্তায় সাইকেল চালাচ্ছিল। ওরা বলেছে গোবেল বীচ যাচ্ছে, কিন্তু সেটা উল্টো দিক। আরও কিছু গল্প বলল, বিশ্বাস করতে পারলাম না।

মুখ কালো করে জিনা বলল, বার বার একই কথা! কত বার বলব, বাড়ি থেকে পালাইনি! আর দল বেঁধে পালাতে যাবই বা কেন?

তোমাদের বাবা-মায়ের সাথে আগে কথা বলি, জানা যাবে। ততক্ষণ এখানেই থাকতে হবে তোমাদের। গোলমাল করবে না। রিপোর্ট লিখতে বসব এখন।

চারজন লোক বসে চারটে ফর্ম পূরণ করতে লাগল। চুপ করে বেঞ্চে বসে। একে অন্যের দিকে তাকাতে লাগল ছেলেমেয়েরা।

রাফি কোথায়? ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল রবিন।

বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছি! জবাব দিল কিশোর। পথে গলা থেকে রুমালটা খুলে পড়ে না গেলেই হয়। মেসেজ লিখে দিয়েছি পারকার আংকেলের কাছে, চুলে হাত বোলাল সে। অনেক দেরি হয়ে গেল!

হ্যাঁ, মাঝরাত, ঘড়ি দেখল মুসা। আংকেল কি ভাববেন কে জানে! তবে মেসেজ পাঠিয়ে ঠিক কাজই করেছ। আর কিছু করার ছিল না। এ রকম জরুরী একটা

ব্যাপার…
কাছে এসে ওদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করল পুলিশ। গোবেল ভিলায় ফোন করার পরামর্শটা জিনাই দিল। কিন্তু করা হলে দেখা গেল, লাইন ডেড। কি করে যে হলো, কিছুই বোঝা গেল না। অনেক সময় হয় এ রকম। সবচেয়ে কাজের জিনিসটা বিকল হয়ে যায় প্রয়োজনের সময়ে। নিউ ইয়ারের ছুটি শেষ না হলে আর মেরামত হবে না।
উত্তেজনা অসহ্য হয়ে উঠছে ওদের কাছে। প্রতিটি মিনিট যাচ্ছে, আর অস্বস্তি বাড়ছে ওদের। কারণ যতই সময় যাচ্ছে, দূরে সরে যাচ্ছে চোরেরা। কমে যাচ্ছে ধরা পড়ার সম্ভাবনা।
দূরে গির্জায় ঘন্টা বাজিয়ে সময় ঘোষণা করা হলো। এই সময় বাইরে একটা গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ হলো। তারপর শোনা গেল দৃঢ় গমগমে কণ্ঠ।
আব্বা এসে গেছে! বলে উঠল জিনা।
ঘরে ঢুকলেন পারকার আংকেল। সাথে রাফি। নিজের পরিচয় দিলেন পুলিশের কাছে। তারপর ফিরলেন ছেলে-মেয়েদের দিকে।
মুখ লাল হয়ে গেছে ইন্সপেক্টরের, লজ্জায়, যখন বুঝল সত্যি কথাই বলেছে ছেলেমেয়েগুলো।
কড়া চোখে ওদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন আংকেল, ব্যাপারটা কি, অ্যাঁ? স্টোররুম থেকে বেরোলে কখন? আমরা ভাবছি তোমরা খেলছ, আর এদিকে…রাফি ঠিকমত না গেলে তো…কিশোর, ব্যাপারটা কি, বলো তো?
বলার সুযোগ পেয়েছে, আর কি ছাড়ে সে। পরে আংকেল বাড়ি নিয়ে গিয়ে বকাবকি করুন আর যাই করুন, তখন চুপ করে থাকা যাবে না হয়। বলল, আংকেল, আরেকটা রহস্য সমাধানের চেষ্টা করছিলাম আমরা। দোকানের খেলনা চুরি আর পলিদের নীল ভালুক চুরির রহস্য…
শুরু থেকে গল্পটা বলে যেতে লাগল কিশোর। মাঝে মাঝে কথা জোগান দিল রবিন, জিনা আর মুসা। শুনে তো থ হয়ে গেল পুলিশেরা।
অসম্ভব! এক সময় আর থাকতে না পেরে চেঁচিয়ে উঠল ইন্সপেক্টর। সব বানিয়ে বলছে ওরা!
আমার তা মনে হয় না, গম্ভীর মুখে বললেন পারকার আংকেল। ওরা মিথ্যুক নয়। মাঝেসাঝে এ রকম রহস্যে জড়িয়ে পড়ে। বেশ কিছু রহস্যের সমাধানও করেছে। ওদের কথা বিশ্বাস করা উচিত। যা বলছে করা উচিত। অবিশ্বাস করে চুপ। করে থাকতে পারেন অবশ্য, পরে পস্তাবেন।
এই শেষ কথাটা ম্যাজিকের মত কাজ করল। হঠাৎ যেন সাড়া পড়ে গেল। পুলিশদের মাঝে। ফোন তুলে নিল একজন সার্জেন্ট। রেডিওতে পেট্রোল

কারগুলোকে হুঁশিয়ার করতে ছুটল ইন্সপেক্টর আর আরেকজন সার্জেন্ট। মিনিট কয়েক পরেই ফিরে এল ইঞ্চপক্টর।
সাহায্য আসছে, জানাল সে। ফোর্স পাঠাতে বলেছি। বসে থাকলে চলবে না। বেরোতে হবে আমাদের। পারকার আংকেল আর ছেলেমেয়েদের দিকে ফিরে বলল, ডন হারভের বাড়ি চেনো কেউ? তাকে ধরতে পারলে বাকিগুলোকে ধরার ব্যবস্থা হতে পারে। কোথায় পাওয়া যাবে অন্যদেরকে হয়তো বলতে পারবে সে।
বেরিয়ে গেলেই মুশকিল, গম্ভীর হয়ে আছে সার্জেন্ট। ছেলেমেয়েদের কথা অবিশ্বাস করে সময় নষ্ট করেছে বলে এখনই অনুশোচনা আরম্ভ হয়েছে।
সেটা ভেবে বসে থাকলে তো আর চলবে না। চেষ্টা করতে হবে। আবার ছেলেমেয়েদের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, চেনো?
না, বাড়িটা চিনি না, জবাব দিল কিশোর। তবে মিডলটনে থাকে, জানি। ওখানকার কাউকে জিজ্ঞেস করলেই চিনিয়ে দেবে। আমরা আসব আপনাদের সঙ্গে?
মানা করে দিল ইন্সপেক্টর।
তবে তাকে বোঝাতে পারল কিশোর, ওদেরকে সঙ্গে নিলে অনেক সুবিধে হবে। কারণ চোরগুলোকে ওরা চেনে, দেখেছে। চিনিয়ে দিতে পারবে।
আপনারা আপনাদের গাড়িতে যান, পারকার আংকেল বললেন। আমি ওদেরকে নিয়ে আসছি আমার গাড়িতে করে।
হেডকোয়ার্টারে আরেকটা মেসেজ পাঠাল ইন্সপেক্টর। মিডলটনে যাচ্ছে সে কথা জানাল। অনুরোধ করল ফোর্স যেন তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দেয়া হয় পেনড় সেইন্ট জনে।
রওনা হয়ে গেল দলটা। আগে আগে পুলিশের গাড়ি। পেছনে পারকার আংকেলের। তার সঙ্গে রয়েছে কিশোররা চারজন আর রাফি।
ব্ল্যাক ক্যাট কাফেতেও চলছে নিউ ইয়ারের পার্টি। বাইরে থামল দুটো গাড়ি। পুলিশের আগেই নেমে পড়ল কিশোর, ছুটে গেল সামনের গাড়িটার কাছে। ইন্সপেক্টরকে বলল, মালিকের ছেলে হ্যারিকে চিনি আমরা। যদি বলেন, আমি একাই গিয়ে জিজ্ঞেস করে আসতে পারি ডনের বাড়িটা কোথায়। তাতে কেউ কিছু ভাববেও না, কারও নজরে পড়ার সম্ভাবনাও কম।
ঠিক আছে, রাজি হলো ইন্সপেক্টর। বুদ্ধিটা ভাল। ডনের পেছনে যে পুলিশ লেগেছে, এ কথা লোকে এখন না জানলেই ভাল। তাহলে সতর্ক করে দেয়া হবে তাকে।
মুসা বলল, কিশোর, আমার সঙ্গে হ্যারির খাতির বেশি। আমি যাই?
বেশ, যাও।

কাফেতে ঢুকে পড়ল মুসা। অনেক লোক। হ্যারিকে দেখা গেল ব্যস্ত হয়ে এক টেবিল থেকে আরেক টেবিলে ছোটাছুটি করছে। অনেক কষ্টে তাকে থামিয়ে কথা বলতে পারল মুসা! হ্যারি, চিনতে পারছ? আমি, মুসা। একটা কথা জানতে। এলাম। আচ্ছা, ডন হারভের বাড়িটা চেনো?
ডন হারভে? তার সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক? সে তো লোক ভাল নয়!
জানি। তবু তার সঙ্গে দেখা করা খুব দরকার।
অবাক হলেও সময় নেই বলে আর কোন প্রশ্ন করল না হ্যারি। বলল, হাই স্ট্রীটের গ্র্যান্ড কাফে চেনো? আচ্ছা। ওখানে গিয়ে বয়ের প্রথম গলিটায় ঢুকবে। চলে যাবে শেষ মাথায়। একেবারে শেষ বাড়িটাই। ওটা তার ভাইয়ের বাড়ি। ওখানেই থাকে ডন।
অনেক ধন্যবাদ তোমাকে, হ্যারি!
বেরিয়ে এসে পুলিশকে ঠিকানা জানাল মুসা। আবার চলল দুটো গাড়ি। বাড়িটায় পৌঁছে দেখা গেল, একটা জানালায়ও আলো নেই। দরজায় থাবা দিল। সার্জেন্ট। একটা জানালায় আলো জ্বলল। খুলে গেল দরজা।
খুলে দিয়েছে লম্বা, স্বাস্থ্যবান এক যুবক। অন্ধকারে পুলিশের পোশাক ঠিকমত দেখা যায় না। চিনতে না পেরে জিজ্ঞেস করল, কি চাই? কে আপনারা?
পুলিশ। ডন হারভে এখানে থাকে? এগোল ইন্সপেক্টর।
চমকে গেল লোকটা। আবার তাহলে বাধিয়েছে! হ্যাঁ, এখানেই থাকে…
ঘরে আছে?
নেই।
কখন গেল?
এই তো, ঘণ্টা দুই আগে এসে জিনিসপত্র ব্যাগে গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল। জিজ্ঞেস করলাম। বলল, বাইরে কোথায় নাকি একটা চাকরি পেয়েছে। ও এ রকম মাঝে মাঝেই আসে যায়। অবাক হইনি। তবে মনে হলো, এবার বেশ কিছুদিনের জন্যেই যাচ্ছে। জলপথেই যাবে মনে হলো। ওর কথায় বুঝলাম।
জিজ্ঞেস করেননি কোথায় যাচ্ছে?
না। এখন আর করি না। করলে সত্য জবাব দেয় না, খামোকা কি লাভ। তবে বেশ খুশি খুশি মনে হলো আজ। কি করেছে?
এখন বলা যাবে না। তবে সত্যি কথা বললেন, সেজন্যে ধন্যবাদ। বিরক্ত করলাম। গুড নাইট।
দরজা বন্ধ হয়ে গেল।
পারকার আংকেলের সঙ্গে দ্রুত আলোচনা করে নিল ইন্সপেক্টর আর সার্জেন্ট।

গোবেল বীচ বড় বন্দর নয়। দেশের ভেতরে বেশিদূর যাওয়ার মত ইন্টারনাল ফেরি যোগাযোগ নেই। সে-কথাই বলল ইনসপেক্টর, যেতে হলে ফিশিং বোটে করে যেতে হবে। কিংবা মোটর লঞ্চ। বলেই তো দিয়েছে, দেশের বাইরে চলে যাবে। ছেলেমেয়েরা শুনেছে সে-কথা। নিয়ে গিয়ে ছবিগুলো বিক্রি করে টাকা ভাগাভাগি করে নেবে।
হয়তো চলেই গেছে এতক্ষণে, নিজের ওপরই রাগ হচ্ছে সার্জেন্টের।
না, তা বোধহয় যেতে পারেনি, কিশোর বলল। এতটা তাড়াহুড়ো তো দেখলাম না। ওরা নিশ্চয় ভাবছে আমরা এখনও সেলারেই আটকে রয়েছি। কাজেই ততটা সতর্ক হবে না।
আরও একটা ব্যাপার। এক মুহূর্ত চুপ থেকে, বলল সে, আমাদের জন্যে ওদের প্ল্যান বদলাতে হয়েছে। আজ রাতে যাওয়ার কথা ছিল না, আমরা বাদ। সাধলাম বলেই যেতে হচ্ছে। ধরা যাক, বোট আছে ওদের। তবে তাতে দুরে পাড়ি দেয়ার মত রসদ, নেই। সে-সব জোগাড় করে রওনা হতে সময় লাগবে। ট্যাংকে তেল ভরারও ব্যাপার আছে। আজ ছুটির দিন। সব কিছু বন্ধ। তেল জোগাড় করতেও অসুবিধে হবে ওদের, সময় লাগবে।
অবাক হয়ে কিশোরের মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে ইন্সপেক্টর। শার্লক হোমসই তুমি। তখন ওভাবে তোমাকে টিটকারি দেয়াটা উচিত হয়নি। মাথায় ঘিল আছে তোমার, সত্যি!

.

আবার এসে গাড়িতে উঠল সবাই। পুলিশেরা পুলিশের গাড়িতে, ছেলেমেয়েরা পারকার আংকেলের গাড়িতে। দ্রুত ছুটল গোবেল বীচের উদ্দেশে। পিংক হাউসের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সেটা দেখিয়ে জিনা বলল তার আব্বাকে, চোরাই ছবিগুলো ওখানেই পেয়েছি। রাফি না থাকলে আর বেরোতে হত না আজকে আমাদের। এখনও ওখানেই আটকে থাকতাম।
গোবেল বীচে পৌঁছল ওরা। মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল চাঁদ। কোমল আলোয় ভাসিয়ে দিল পুরো বন্দর এলাকা। নানা রকম বোট রয়েছে জেটিতে। মোটর বোট, ফিশিং বোট, লঞ্চ গা ঘেঁষাঘেঁষি করে ভাসছে পানিতে। শান্ত পরিবেশ। সব কিছু চুপচাপ, শুধু ঢেউয়ের মৃদু ছলাৎছল ছাড়া। মাঝেসাঝে একআধটা বোট গায়ে গায়ে ঘষা লেগে ক্যাচকোচ করে উঠছে।
কোনখান থেকে শুরু করব? সার্জেন্ট জিজ্ঞেস করল।
জেটিতে দাঁড়িয়ে দুজন পুলিশ অফিসার, পারকার আংকেল আর ছেলেমেয়েরা ঘুরে ঘুরে তাকাতে লাগল। কিন্তু অস্বাভাবিক কিছুই চোখে পড়ল না।
তীর ধরে হেঁটে যাই, ইন্সপেক্টর বলল। কিছু চোখে পড়তে পারে।

আমরাও আসি, বললেন পারকার আঙ্কেল। ছেলেমেয়েদেরকে বললেন, শোনো, তোমরা গিয়ে গাড়িতে বসে থাকো।
আব্বা! আবদার ধরল জিনা। আমরাও আসি না! কি হবে?
না, জিনা, যা বলছি শোনো। তোমাদের আসা লাগবে না। বসে থাকো। আমরা আসছি।
পেনডল সেইন্ট জন থানায় রেডিওতে মেসেজ পাঠাল ইন্সপেক্টর। পুলিশ ফোর্স এসেছে কিনা জানতে চাইল। আসেনি শুনে বলল, এলে যেন তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দেয়া হয় গোবেল বীচ বন্দরে। তারপর হাঁটতে শুরু করল।
অন্ধকার ছায়ায় হারিয়ে গেল তিনটে ছায়ামূর্তি।
গাড়ির ভেতরে কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকল গোয়েন্দারা। শেষে ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলল জিনা, আব্বটা যে কেন আমাদের নিল না!
তাতে কি? কিশোর-বলল। আমরা তো আর কথা দিয়ে ফেলিনি যে গাড়িতেই বসে থাকব। বেরিয়ে গেলেই পারি। চলো, আমরাও খোঁজাখুজি করি, অন্য ভাবে।
না না! রবিন গুরুজনের কথা অমান্য করতে রাজি নয়। আজ রাতে এমনিতেই অনেক অন্যায় করে ফেলেছি, না বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে। আর করতে চাই না।
হঠাৎ এই সময় ঘাউ ঘাউ করে উঠল রাফি। সামনের পা জানালার ওপর তুলে দিয়ে নাক বের করে দিল। তার ঘাড়ে হাত দিল কিশোর। রোম দাঁড়িয়ে গেছে কুকুরটার। ব্যাপার কি!
এই, চুপ করো তোমরা! সঙ্গীদের হুঁশিয়ার করল সে। রাফি নিশ্চয় কিছু টের পেয়েছে!
হালকা মেঘের ভেতরে ঢুকে গেছে আবার চাঁদ। জ্যোৎস্নার উজ্জ্বলতা অনেক কমে গেছে তাতে। সেই আলোয় দেখা গেল একটা আবছা মত ছায়ামূর্তি এগিয়ে। চলেছে, হাতে দুটো পেট্রোলের ক্যান।
ডনের মতই লাগছে! মুসা বলল ফিসফিসিয়ে। পারকার আংকেল আর পুলিশ। অফিসারেরা যে দিকে গেছে, তার উল্টো দিকে যাচ্ছে লোকটা।
কিছু একটা করা দরকার আমাদের! কিশোর বলল।
আবার মনে করিয়ে দিল রবিন, কিন্তু আংকেল তো এখানেই থাকতে বললেন!
তা বলেছেন। কিন্তু আমরা তো তার অবাধ্য হচ্ছি না। ধরা যাক, রাফি কিছুতেই গাড়িতে থাকতে রাজি হলো না। তাকে বের করে দিতে বাধ্য হলাম আমরা। ছাড়া পেয়েই একটা লোকের পেছনে ছুটল সে। আমাদেরকেও যেতে হলো, তাকে ফিরিয়ে আনার জন্যে।
মিথ্যে বলবে?
এখন কাজ উদ্ধার করা দরকার। সত্যি-মিথ্যে নিয়ে ভাবছি না।

দরজা খুলে দিয়ে রাফিকে নির্দেশ দিল সে। এক মুহূর্তও দেরি করল না কুকুরটা। তীরবেগে দৌড় দিল লোকটার পেছনে। সেলারের লোকগুলোর গন্ধ। ভোলেনি সে। ওদেরই একজন তাকে পিটিয়েছিল। জিনাদের বেঁধে রেখেছিল। প্রতিশোধ নেবে সে!

গাড়ি থেকে নেমে রাফির পেছনে ছুটল কিশোর।

এতই দ্রুত ঘটে গেল ঘটনাটা, কিছুই করার সুযোগ পেল না অন্য তিনজনে। বোকা হয়ে গেল যেন ওরা।

দেখতে দেখতে হারিয়ে গেল রাফি। কিশোরকে দেখা যাচ্ছে, অস্পষ্ট। দৌড়াচ্ছে। তবে শিগগিরই তাকেও আর দেখা গেল না।

দেখো, মস্ত ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছে কিশোর, জিনা বলল। এটা বসে বসে দেখতে পারি না আমরা। চুপ করে থাকা উচিত হবে না।

গাড়ি থেকে নেমে পড়ল ওরাও।

কি করতে চাও? মুসা জিজ্ঞেস করল।

যাব।

আমিও যাব। রবিন, তুমি বসে থাকো। আমরা না ফিরলে আংকেলকে বলবে।

বসে থাকার ইচ্ছে নেই রবিনের। ওদের সঙ্গে যেতে পারলেই বেশি খুশি হয়। কিন্তু কাউকে না কাউকে তো গাড়িটা পাহারা দিতেই হবে, বিশেষ করে আংকেল যখন বলে গেছেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও চুপ করে গাড়িতে বসে রইল সে।

অনেক ভারী লাগছে ক্যানগুলো। হাত ধরে এসেছে। জিরিয়ে নেয়ার জন্যে ও দুটো নামিয়ে রাখল ডন।

এখনও বহুদূর! মরার বোটটা আরেকটু কাছে হলে কি হত! বিড়বিড় করে গাল দিল সে। আর ওই ব্যাটা মারভিন, নিজে কিছু করবে না! খালি আমাকে হুকুম দেয়! বসে বসে থাকে!

বেজায় ঠাণ্ডা পড়েছে। তার ওপর বোঝা বইতে গিয়ে যেন অবশ হয়ে গেছে আঙুলগুলো। মুখের কাছে এনে ফুঁ দিয়ে গরম করতে লাগল সে। জিরাতে পারল না বেশিক্ষণ। পিঠে এসে লাগল প্রচণ্ড আঘাত। সামলাতে না পেরে উপুড় হয়ে পড়ে গেল সে।

উঠে দাঁড়ানোর আগেই ডান কাঁধে কামড় লাগল। চেঁচাতে শুরু করল ডন।

ছাড়বি না, রাফি, ধরে রাখ! চিৎকার করে বলল কিশোর– আমি আসছি!

মুহূর্ত পরেই পৌঁছে গেল সে। কামড় ছাড়ানোর জন্যে ধস্তাধস্তি করছে ডন। গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে। তার বিপদের কথা জানিয়ে দিতে চায় যেন জেটির সবাইকে।

গড়াগড়ি করছে কুকুর আর মানুষ। কিশোর কি করবে ঠিক করতে পারছে না। এই সময় সেখানে পৌঁছে গেল মুসা আর জিনা।

এসেছ! ওদেরকে দেখে খুশি হলো কিশোর। ধরো ব্যাটাকে! আমি একলা পারতাম না। রাফি, ছেড়ে দে!
কামড় ছেড়ে সরে এল রাফি। উঠে বসল ডন। করুণ অবস্থা হয়েছে তার। আতঙ্কিত করে দিয়েছে তাকে অ্যালসেশিয়ানের বাচ্চা। ভয়ে ভয়ে তাকাচ্ছে। কুকুরটার দিকে। তাকে যখন চেপে ধরল জিনা, মুসা আর কিশোর, বাধা দিল না সে।
চলো, গাড়ির কাছে নিয়ে যাই, কিশোর বলল। কিছু করতে চাইলে রাফি তো আছেই। এবার অ্যায়সা কামড় দিতে বলব, কথা শেষ করল না সে, ইঙ্গিতেই বুঝিয়ে দিল। পুলিশও আছে। ধরে প্যাঁদানি দিলেই সুড়সুড় করে বেরিয়ে আসবে পেটের কথা।
উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে জিনা। অনেক বেশি শব্দ করে ফেলেছে। মারভিন আর ইসাবেল এখন বেরিয়ে না এলেই বাঁচি।
ঠিকই বলেছ! একমত হলো কিশোর। জলদি করা দরকার! হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল সে।
কিন্তু পারকার আংকেলরা কোথায় আছেন, কে জানে! অন্ধকারে তাদেরকে খুঁজে বের করব কি ভাবে?
তবে যতই সমস্যা আসুক, একটা না একটা সমাধান করেই ফেলবে কিশোর। উপায়ের অভাব নেই তার বুদ্ধির ভাণ্ডারে। বলল, চলো তো আগে গাড়ির কাছে যাই।
নিরাপদেই গাড়ির কাছে পৌঁছল ওরা। মারভিন বা ইসাবেল কোন বিপদ ঘটাল না। গাড়ির কাছে এসেই হর্ন টিপে ধরল কিশোর। তিনবার লম্বা, তিনবার খাটো, আবার লম্বা, আবার খাটো, এ ভাবে বাজাতে লাগল। এক ধরনের মেসেজ এটা। কিছুক্ষণ বিরতি দিয়ে আবার একই ভাবে বাজাল।
বাহ, সত্যি, কিশোর, তোমার তুলনা নেই! উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল মুসা। তিনটে লম্বা, তিনটে খাটো...এ তো এস ও এস। পুলিশ অফিসারেরা শুনলেই বুঝে যাবে কিছু একটা গড়বড় হয়েছে।
উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে গোয়েন্দারা। দুশ্চিন্তা যাচ্ছে না কিছুতেই। হয়তো কানে যাবে পুলিশের, ছুটেও আসবে হয়তো, কিন্তু সময় মত আসবে তো? মারভিন আর আইরিনকে ধরতে পারবে? ওরা ঘুণাক্ষরেও যদি বুঝতে পারে, ডন ধরা পড়েছে, আসবে না আর। সোজা পালানোর চেষ্টা করবে। ডনের জন্যে নিজেদেরকে বিপদে ফেলতে রাজি হবে না কিছুতেই।
আরেকটা উপায় বের করা দরকার।
বুদ্ধিটা বের করল এবার জিনা।

.
ডন, শোনো, জিনা বলল, একটা কাজ করলে বেঁচে যেতে পারো। অন্তত শাস্তি কম করাতে পারো। আমাদেরকে সাহায্য করতে হবে। বলে দাও, তোমার সঙ্গীরা কোথায় আছে, ছবিগুলো কোথায় আছে। পুলিশের কাছে তোমার পক্ষে সুপারিশ করব আমরা। আমার বিশ্বাস, সরকারী উকিলও তাই করবেন।
আর না বললে, কিশোর বলল, আবার কুত্তা লেলিয়ে দেব। রাফিকে যে পিটিয়েছেন সেই জেদ এখনও যায়নি...
এমনিতে যত বাহাদুরিই দেখাক, ডন খুব ভীতু! কুকুরের কামড় খাওয়ার ঝুঁকি নিতে চাইল না। তা ছাড়া ধরা যখন পড়েই গেছে, বললে যদি কিছু সুবিধে হয়, সেটা নেয়াই উচিত। আর দ্বিধা করল না সে। বলল, মারভিনের বৌ ইসাবেল। মোটর বোটে রয়েছে দুজনে। আমার জন্যে বসে আছে। জেটির শেষ মাথায় ছোট একটা খাড়িতে আছে বোটটা। আমি যখন বেরোচ্ছি, তখন ক্যানভাসে মোড়াচ্ছিল ছবিগুলো। ফুয়েল ট্যাংক একেবারে খালি। তাই আমাকে পাঠিয়েছে তেল নিয়ে যেতে।
গুড। খুশি হলো কিশোর। তারমানে আটকা পড়েছে ওরা!
মোটর বোট! অবাক লাগল মুসার। তারমানে বেশি দূরে যেতেন না আপনারা?
না। কাছেই একটা বড় বন্দর আছে। সেখানে যাবে ঠিক করেছিল মারভিন। ওখানকার অনেককে চেনে সে। বড় একটা বোটের মালিক আছে, যে তার বন্ধু। তার বোটে করে দূরে কোথাও চলে যেতাম...
ওই যে, আংকেল এসে গেছেন! আনন্দে চিৎকার করে উঠল রবিন।
পুলিশ অফিসারদের সঙ্গে ছুটে আসছেন তিনি। কি, হচ্ছেটা কি? কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন তিনি। ও, তাহলে আমার কথা শোনোনি! গাড়ি থেকে নেমে গিয়েছিলে! ডনের ওপর চোখ পড়তে জিজ্ঞেস করলেন, এই লোক কে?
ওর নাম ডন হারভে, আব্বা, জিনা জানাল। রাফি ধরেছে।
একটা মুহূর্ত দেরি করল না দুই পুলিশ অফিসার। লোকটাকে প্রশ্ন শুরু করল। করে গেল একনাগাড়ে। জবাব দিতে দিতে হাঁপিয়ে গেল ডন। ছেলেমেয়েদের যা বলেছিল, সেই একই কথা বলতে হলো আরেকবার। জানাল, কোথায় মোটরবোট নিয়ে অপেক্ষা করছে মারভিন আর তার স্ত্রী। এই উত্তেজনার মুহূর্তে ছেলেমেয়েদেরকে বকতে ভুলে গেলেন পারকার আংকেল। ওদের সঙ্গে আসার কথা বারণ করতেও মনে রইল না। কাজেই ওরাও চলল পুলিশের সাথে।
এই সময় পৌঁছে গেল বাড়তি ফোর্স। বড় কালো একটা গাড়ি এসে থামল। নামল ছয়জন পুলিশম্যান। তারাও চলল সঙ্গে।

নীরবে চলল দলটা। কিছুদূর এগোনোর পর হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল ডন। হাত তুলে দেখাল একদিকে। ওই যে, ওখানে। ...ওই তো, বোটটা, সাদা।
ম্লান জ্যোৎস্না। তার ওপর বোটটা সাদা হওয়ায় ভালমতই দেখা যাচ্ছে ওটা। সাগরের পানির রঙ এখন কালচে।
ঠিক এই সময় চালু হয়ে গেল বোটের ইঞ্জিন। বেড়ে গেল গর্জন। খোলা সাগরের দিকে রওনা হয়ে গেল বোট। নিশ্চয় পুলিশকে দেখে ফেলেছে মারভিন আর ইসাবেল। পালাতে চাইছে। উন ধরা পড়েছে কিনা জানার কথা নয় ওদের। ওর জন্যে নিশ্চয় একটুও ভাবেনি, তাহলে এ ভাবে রওনা দিত না। আরও একটা ব্যাপার, জানে, ট্যাংকে তেল খুব কম। সাগরে গিয়ে যে কোন মুহূর্তে বন্ধ হয়ে যেতে পারে ইঞ্জিন। সেই পরোয়াও করেনি। তবে তাদের এই আচরণে অবাক হয়নি কেউ ও রকম চোরের কাছে এর চেয়ে বেশি আর কি আশা করা যায়?
কোস্টগার্ডকে সতর্ক করে দেয়া দরকার! বলল সার্জেন্ট।
কিন্তু তাতে সময় লাগবে, ইন্সপেক্টর বলল ওরা কিছু করার আগেই পালিয়ে যাবে চোরগুলো। কি একখান জোড়া, আহা! স্বামীও চোর, বৌটাও চোর! মিলেছে!
আরেকটা বুদ্ধি এসে গেল কিশোরের মাথায়। এ রকম জরুরী অবস্থায় একের পর এক আইডিয়া খেলে যায় তার মাথায়। ওই যে দেখুন, আরেকটা বোট! তেরপল নেই। ওটাতে উঠে যেতে পারব। ইঞ্জিনটা কোনমতে স্টার্ট নেয়াতে পারলেই পিছু নিতে পারব ব্যাটাদের!
কথাটা পছন্দ হলো ইন্সপেক্টরের। দেরি করল না। গিয়ে লাফিয়ে উঠে পড়ল বোটে। তার পর পরই উঠল সার্জেন্ট আর পারকার আংকেল। গোয়েন্দারাও দাঁড়িয়ে রইল না, কিংবা কারও অনুমতির অপেক্ষায় রইল না। সোজা গিয়ে উঠে পড়ল।
তীরে দাঁড়ানো পুলিশম্যানদের ডেকে বলল সার্জেন্ট, তোমরা যাও! কোস্টগার্ড স্টেশনে গিয়ে জানাও ওদের। জলদি!
ইগনিশন কী নেই। চাবি ছাড়াই ইঞ্জিন স্টার্ট দেয়ার কায়দা জানে সার্জেন্ট। হুইল ধরল ইন্সপেক্টর। রাতের ঠাণ্ডা বাতাস এসে লাগছে মুখে। কান খাড়া করে ফেলল রাফি ঢেউয়ের ছিটে এসে লাগছে, যেখানটায় লাগছে লবণ লেগে গিয়ে মোনতা হয়ে যাচ্ছে। চড়চড় করে চামড়া! কেয়ারও করল না গোয়েন্দারা। তাকিয়ে রয়েছে সাদা বোটটার দিকে। একটাই ভাবনা, কিছুতেই চোরগুলোকে পালাতে দেয়া চলবে না।
কিন্তু দুটো বোটের মাঝের দূরত্ব বাড়ছেই। ধরা কি যাবে না? পালিয়ে যাবে মারভিন আর ইসাবেল?

ভাবনাটাই গায়ে জ্বালা ধরায়। ইসি, রাফিরে! মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে কিশোরের। এত কষ্ট খামোকাই করলাম রে!
ভাবছ কেন? মনে করিয়ে দিল রবিন, ভুলে গেছ, ওদের পেট্রোল কম?
তাই তো! বলে উঠল মুসা। এ কথাটা তো মনে ছিল না!
এই দেখো, দেখো! চিৎকার করে বলল জিনা।
দেখার জন্যে চোখ বড় বড় করে ফেলল গোয়েন্দারা! সত্যিই তো! সাদা জিনিসটা বড় হচ্ছে!
ধরা যাবে! ধরা যাবে! চেঁচিয়ে উঠল রবিন, বলেছিলাম না, ধরা যাবে...
গেছে! কিশোর বলল, ব্যাটাদের পেট্রোল ফুরিয়ে গেছে! আর নড়তে পারবে না!
ঘটেছেও তা-ই। মোটর বোটের ট্যাংকে তেল শেষ। কিছুই করার নেই আর মারভিন এবং ইসাবেলের। চুপ করে হাত গুটিয়ে বসে থেকে পুলিশের হাতে ধরা দেয়া ছাড়া। আরেক কাজ করতে পারে। সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাতরে পালানোর। চেষ্টা করতে পারে। তবে এই ঠাণ্ডার মধ্যে সেটা হবে আত্মহত্যার সামিল। মরার চেয়ে জেলে গিয়ে বেচে থাকাও ভাল, কাজেই সেটা করতে গেল না ওরা।
গুলি না চালিয়ে বসে! ছেলেমেয়েদের জন্যে শঙ্কিত হয়ে উঠেছেন পারকার আংকেল। ওদেরকে ছোট কেবিনটায় ঢুকে পড়তে বললেন তিনি। গোলাগুলি চললে ভেতরে কিছুটা অন্তত নিরাপদ।
অনিচ্ছাসত্ত্বেও আদেশ পালন করল ওরা।
সাদা বোটের কাছাকাছি চলে এল পুলিশের বোট। মুখে হাত জড়ো করে চেঁচিয়ে বলল ইন্সপেক্টর, অ্যাই, সারেন্ডার করো! তোমাদেরকে গ্রেপ্তার করা হলো। কোন গোলমাল করবে না! হাত তুলে উঠে এসো!
গুলি হওয়ার আশঙ্কায় রইল ইন্সপেক্টর আর সার্জেন্ট। তৈরি হয়ে আছে দুজগেই। তবে তেমন কিছু ঘটল না। বোট দুটো গায়ে গায়ে লাগতেই নীরবে পুলিশের বোটে উঠে এল মারভিন। তারপর ইসাবেল। সঙ্গে সঙ্গে হাতকড়া পরিয়ে দিল সার্জেন্ট।
স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন পারকার আংকেল।
কেবিন থেকে সবই দেখল গোয়েন্দারা। হুড়াহুড়ি করে আবার ডেকে বেরিয়ে এল। হাসি ফুটেছে মুখে। ধরা পড়েছে চোরগুলো, আর পালাতে পারবে না।
ইন্সপেক্টর জিজ্ঞেস করল মারভিনকে, ছবিগুলো কোথায়?
নিরীহ কণ্ঠে জবাব দিল মারভিন, ছবি! কিসের ছবি? যেন কিছুই জানে না। কি বলছেন বুঝতে পারছি না। আমরা তো সাগরে হাওয়া খেতে বেরিয়েছি। নিউ ইয়ারস...
ধানাই-পানাই রাখো! ধমক দিয়ে বলল ইন্সপেক্টর। ভেবেছ কিছু দেখিনি? পানিতে তখন ওটা কি ছুঁড়ে ফেললে?

ও, ওটা? একটা পোটলা। পুরানো কাপড়ের। বাতিল জিনিস। বোঝা না বাড়িয়ে ফেলে দিলাম।
চট করে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে নিল দুই পুলিশ অফিসার। তবে কি এত দামী জিনিসগুলো পানিতে ফেলে নষ্টই করে ফেলল মারভিন। তার পুরানো কাপড়ের। গল্প এক বর্ণ বিশ্বাস করেনি তারা। ফেলে দেয়ার আরেকটা খারাপ দিক হবে, ওদেরকে আর আটকাতে পারবে না। কারণ কোন অপরাধ প্রমাণ করা যাবে না। বোট নিয়ে রাতের বেলা খোলা সাগরে হাওয়া খেতে বেরোনো কোন অপরাধ নয়।
যেন সেটা বুঝেই জোর দিয়ে বলল মারভিন, ইচ্ছে হলে বোটে খুঁজে দেখতে পারেন।
খুঁজে দেখা হলো। জানে পাবে না, তবু না পেয়ে হতাশই হলো দুই অফিসার। ছবিগুলো বোটে নেই।
রাগে, ক্ষোভে পারলে কেঁদে ফেলে কিশোর। এত কষ্ট করে এসে শেষে এ ভাবে বিফল হবে! কিছুতেই মেনে নিতে পারল না সে। বলল, আমরা একবার খুঁজে দেখি!
খুব বেশি আত্মবিশ্বাস, তাই না? ইন্সপেক্টর বলল ওদেরকে। তবে রাজি হলো, বেশ, দেখো।
মারভিনের বোটে উঠে গেল গোয়েন্দারা। আতিপাতি করে খুঁজেও কিছু পেল না। কোন চিহ্নই নেই ছবিগুলোর।
ভাবছে কিশোর। এ হতে পারে না। কিছুতেই না! জীবন থাকতে এত দামী জিনিস হাতছাড়া করতে পারবে না মারভিনের মত চোর! তাহলে? নিশ্চয় বোটেই লুকিয়ে রেখেছে কোথাও কোথায়?
নিরাশ হয়ে মাথায় হাত দিয়ে একটা সীটের ওপর বসে পড়ল মুসা। প্ল্যাস্টিকে মোড়া গদি। ওটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল কিশোর, এই মুসা, সরো তো!
কী?
সরো!
উঠে দাঁড়াল মুসা।
প্রায় হুমড়ি খেয়ে এসে সীটের ওপর পড়ল কিশোর। হাত বোলাল প্ল্যাস্টিকের কভারে। যে রকম মসৃণ আর সমান হওয়ার কথা তেমন নয়। কিছু যেন রয়েছে। ভেতরে।
ঝুঁকে নিচে দিয়ে তাকাল সে। অ, এই ব্যাপার! কভারটা চিরে ফেলা হয়েছে। তারপর সেলাই করে দিয়েছে। আঙুল ঢুকিয়ে হ্যাঁচকা টানে সেলাইয়ের জায়গাটা ছিঁড়ে খুলে ফেলল সে। হাত ঢুকিয়ে দিল ভেতরে।

হ্যাঁ, আছে! বেশ কায়দা করে লুকিয়ে রাখা হয়েছে ছবিগুলো! সহজে বোঝার উপায় নেই যে ওখানে রেখেছে।
ছবিগুলো নিয়ে হাসিমুখে কেবিন থেকে বেরোল কিশোর। পেছনে তার দলবল।
হাঁ হয়ে গেল দুই পুলিশ অফিসার। ছেলেমেয়েগুলোর তারিফ করল উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে। হাত মেলাল ওদের সঙ্গে। দুর্ব্যবহার করে থানায় ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করল।
হুঁ, সবশেষে বলল, বুঝেছি। জিনিস ঠিকই ফেলেছে পানিতে। সাধারণ ক্যানভাস গুটিয়ে নিয়ে আমাদের দেখিয়ে দেখিয়ে ফেলে বোঝাতে চেয়েছে ছবিগুলোই ফেলেছে, ধোঁকা দেয়ার জন্যে। পড়েও গিয়েছিলাম ধোকাতে। কিশোরের কাঁধে হাত রাখল সে। আমাদের ইয়াং শার্লক হোমস না থাকলে পার পেয়ে গেছিল চোরগুলো আরেকটু হলেই।

.
খুব ধুমধাম করে নিউ ইয়ারস ডে পালন করা হলো সেবার গোবেল বীচ গাঁয়ে। আবার দাওয়াত এল পলিদের বাড়ি থেকে। পার্টির আয়োজন পলিই করেছে। ক্রিসমাস ডে-র পার্টিতে যারা যারা উপস্থিত ছিল, তাদের সবাইকে দাওয়াত করেছে। সে। আসল উদ্দেশ্য, গোয়েন্দাদের মুখ থেকে চোর ধরার রোমাঞ্চকর গল্প শোনা। খবরটা সকাল বেলায়ই মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে গোবেল বীচ আর আশপাশের গাঁয়ে।
দুপুর বারোটায় রেডিওর স্থানীয় খবরেও প্রচার করা হলো সংবাদটা। জানানো হলো, হোরেস ট্রিমেইনির দল ধরা পড়েছে, ছবিগুলোও উদ্ধার করা হয়েছে। কিশোরদের নাম বলা হলো। এমনকি রাফিও বাদ পড়ল না।
বাহ, চমৎকার! হেসে বলল পলির বাবা ডক্টর মরিস। পেপারেও বেরোবে সংবাদটা। ছবি সহ। কেমন লাগছে তোমাদের?
ভালই, জবাব দিল জিনা। তবে তারচেয়ে ভাল লাগছে চোরগুলোকে ধরতে পেরে, আর ছবিগুলো উদ্ধার করতে পেরে।
আর দারুণ একটা অ্যাডভেঞ্চারও করতে পারলাম, মুসা বলল। সেটাও মস্ত বড় পাওয়া।
ঠিক, একমত হলো কিশোর। মাঝে মাঝে এ রকম অ্যাডভেঞ্চার ভালই লাগে। ছুটি শেষ হতে হতে আরেকটা যদি পেয়ে যেতাম!
যেতেও পারি, হেসে বলল রবিন। ঠিক আছে নাকি কিছু! আমরা তো যেখানেই যাই, রহস্য নিজে নিজে এসে হাজির হয়!
কোইনসিডেন্স, পলি বলল। কাকতালীয় ঘটনা।

মাথা নেড়ে কিশোর বলল, আমি সেটা মনে করি না। আর রহস্য নিজে নিজে এসে হাজির হয়, এ কথাটাও ঠিক না। ঘটনা তার স্বাভাবিক নিয়মেই ঘটে। কারও চোখে ধরা পড়ে, কারও পড়ে না। গোয়েন্দার চোখে পড়ে যায়। আর এই জন্যেই। মনে হয়, গোয়েন্দারা যখন যেখানে থাকে, ঘটনাগুলো ঘটে।

ইনটেলিজেন্ট বয়! কিশোরের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন ডক্টর মরিস। আমিও তোমার সঙ্গে একমত।

ভলিউম ৫০ – তাসের খেলা – তিন গোয়েন্দা – রকিব হাসান – সেবা প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ: ২০০২

মুসা আমান। দুষ্ট রাজা।

কি করে হলো?

তাসের খেলা খেলতে গিয়ে।

খেলাটা শুরু করার সময় ওরা জানত না কতটা বিপজ্জনক এই খেলা।

কিশোর জানলেও আঁচ করতে পারেনি। এতটা বিপদে পড়ে যাবে। কারণ জিপসিদের কাছ থেকে সে যেটা শিখে এসেছে, সেটা নিছকই খেলা। দাবা-লুডু-কেরমের মত। যাতে শুধুই মজা। মোটেও বিপজ্জনক নয়।

গোড়া থেকেই বলা যাক।

গরমের ছুটি শেষ হতে তখনও হপ্তা দুই বাকি। বিরক্ত। রীতিমত বিরক্ত লাগছে এখন মুসা ও রবিনের।

গ্রীষ্মের দীর্ঘ সব দিন কাটানোর কোন উপায় নেই।

ছুটিতে পড়ার জন্যে যত বই রেখেছিল, সব শেষ। কম্পিউটার গেমগুলো হাজার বার করে খেলেছে। পরিবারের সঙ্গে দূরে বেড়ানোও হয়ে গেছে। নিরাপদেই কাটিয়ে এসেছে এবার। বিপত্তি বলতে শুধু কয়েক ডজন মশার কামড়। সাঁতার কাটা, বেজবল খেলা, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেয়া, হই-হুঁল্লোড়, বনের মধ্যে চিৎ হয়ে শুয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে অলস সময় কাটানো, সব শেষ।

এখন আর কিছুই করার নেই। সময় এখন বড়ই একঘেয়ে। এ রকম থাকত না, যদি কোনমতে একটা রহস্য জোগাড় করা যেত।

কিন্তু রহস্যেরও যেন দুর্ভিক্ষ লেগেছে। পাওয়াই যায় না।

বাড়ির এক পাশের চত্বরে ভাঙা ম্যাপল গাছটার নিচে বসে আছে মুসা। রবিন। উঠে বসেছে গাছে। চেরা কাণ্ডের একটা ফালির ওপর।

কিছুদিন আগে বাজ পড়েছিল গাছটার মাথায়। ঠিক মাঝখান থেকে চিরে। দুভাগ করে দিয়েছে। দুটো দিক দুদিকে হেলে পড়ে ধনুকের মত বাকা হয়ে। আছে। দুটো ধনুক।

গোড়া থেকে খুঁড়ে তুলে ফেলে দিতে চেয়েছিলেন মুসার আম্মা মিসেস আমান। কিন্তু জিনিসটা দেখতে এতই অদ্ভুত, ফেলতে মন চায়নি মিস্টার আমানের। তাঁর কাছে জিনিসটাকে একটা চমৎকার ভাস্কর্য মনে হয়েছে। বললেন, থাক না, যতদিন ওভাবে থাকে।

শুরুতে কয়েকদিন ওগুলোতে আরাম করে পা দুলিয়ে চড়ে বসেছে মুসা।

তবে এ ধরনের আরামেরও একটা সীমা আছে। এখন আর ভাল লাগে না।

বরং মহা বিরক্ত।

গাছের গোড়ায় মাটিতে বসে আছে সে। ঘাস ছিঁড়ছে। একঘেয়েমি কাটানোর জন্যে মুঠো করে তুলে ছুঁড়ে মারছে রবিনের দিকে। বাগানের ঘাস ছেঁড়াটা ঠিক হচ্ছে না। জানে। কিন্তু চুপচাপ থাকতে ভাল লাগছে না। হাত দুটোকে ব্যস্ত রাখছে।
ঘাড়ের পেছনে সুড়সুড়ি লাগল মুসার। হাত দিয়ে টিপে ধরে একটা বড় কালো পিঁপড়ে তুলে আনল।
গাছের ডালে পা দোলাতে দোলাতে হাসল রবিন।
পিঁপড়েটা কোথা থেকে এসেছে বুঝতে অসুবিধে হলো না মুসার। ঘাস ছোঁড়ার প্রতিশোধ নিয়েছে রবিন। ডাল থেকে তুলে নিয়ে মুসার অগোচরে তার। ঘাড়ে ফেলেছে।
বিরক্ত কোরো না তো, ঘাড় ডলতে ডলতে বলল মুসা।
বরং বলো, এ সব করে বিরক্তি কাটাও তো, রবিন বলল।
এত একঘেয়েমীতে পেয়েছে, কথাবার্তাও দুজনের বিরক্তিকর লাগছে।
বাড়ি চলে যাই, রবিন বলল।
ওর দিকে আরেক মুঠো ঘাস ছুঁড়ে দিয়ে মুসা বলল, বাড়ি গিয়ে কি করবে?
জবাব দিতে পারল না রবিন।
ইস, কিশোরটাও সেই যে গেল, আসার আর নাম নেই, আফসোস করে বলল মুসা। ও থাকলে এত একঘেয়ে লাগত না। কোন না কোন উপায় একটা বের করেই ফেলত।
হ্যাঁ, ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল মবিন। ছুটি শেষ না করে বোধহয় আর আসবেই না এবার।
আমাদেরও ওর সঙ্গে মনটানায় চলে যাওয়া উচিত ছিল। রকি পর্বতটা দেখে আসা যেত আরেকবার।
ভুল যা করার করে ফেলেছি। এখন আর ভেবে লাভ নেই।
কিছু একটা করা দরকার। উঠে দাঁড়াল মুসা। ওদের ব্লকের শেষ মাথার দিকে তাকিয়েই স্থির হয়ে গেল। একটা বাড়ির কোণে লোক জড় হয়েছে।
খাইছে! পুরানো জিনিস বিক্রি করছে মনে হয়, অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে রবিনের কাঁধ থেকে একটা কুটো তুলে নিয়ে ফেলে দিল মুসা।
মিস্টার কাকু-কাকুর বাড়িতে! অবাক হলো রবিন। জিনিসপত্র সব বেচে দিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছে নাকি ও?।
জানি না তো। এইমাত্র দেখলাম।
প্রতিবেশী হিসেবে অতি জঘন্য কাকু-কাকু। কারও সঙ্গেই সদ্ভাব নেই। আর ছোটরা তো ওর দুচোখের বিষ।

গত শীতে মুসা গিয়েছিল কাকু-কাকুর বাড়িতে। পুরানো বাড়ি। কি যেন এক রহস্য লুকিয়ে রাখে বাড়িটা। দেখলেই গা ছমছম করে তার। পারতপক্ষে ওদিকে ঘেঁষতে চায় না। সেবার গিয়েছিল বিশেষ একটা কাজে। ক্যান্ডি বিক্রি করতে। লাভের টাকায় শীতে কষ্ট পাওয়া মানুষকে সাহায্য করার জন্যে।

দরজায় থাবা দিতেই কুত্তা লেলিয়ে দিল কাকু-কাকু। ভয়ঙ্কর একটা জার্মান শেফার্ড কুকুর আছে তার। বিশাল।

দৌড়ের অলিম্পিক রেকর্ড ভঙ্গ করল সেদিন মুসা। নইলে কুকুরের কামড়ে ক্ষতবিক্ষত হওয়া লাগত।

এ হেন কাকু-কাকু কি বিক্রি করছে ভেবে অবাকই লাগল তার। কৌতূহলটা দমাতে পারল না।

চলো তো দেখে আসি, বলেই লাফাতে লাফাতে ছুটল ড্রাইভওয়ে ধরে।

পেছন থেকে ডাকল রবিন। আরে দাঁড়াও দাঁড়াও। লোকটা ভীষণ পাজি...

কি বিক্রি করছে ও দেখতেই হবে আমাকে, পেছনে তাকিয়ে বলল মুসা। নির্যাতনের অস্ত্রশস্ত্র বিক্রি করলেও অবাক হব না। এই যেমন পিটিয়ে চামড়া ভোলার চাবুক, হাড় কাটার করাত, মাথায় পেঁচানোর কাঁটাতার। বিকৃত রুচির খুনী তো লোকটা। হিটলারের গেস্টাপো বাহিনীর লোকও হতে পারে।

মুসার রসিকতায় হাসল না রবিন।

কাকু-কাকুর সামনের চত্বরের সুন্দর করে ছাঁটা লন মাড়িয়ে ছুটল দুজনে। খোলা গ্যারেজের সামনে চার-পাঁচজন প্রতিবেশী। জিনিসপত্র ঘটছে।

চাবুক, করাত বা ও রকম কোন কিছুই দেখল না। অতি সাধারণ জিনিসপত্র। প্রথম টেবিলটার সামনে এসে দাঁড়াল মুসা। শিকার ও মাছ ধরার ওপর পুরানো একগাদা ম্যাগাজিন। বেশ চকচকে একজোড়া পুরানো ফ্যাশনের জুতো। একটা টোল খাওয়া দূরবীন। ঝিনুকের মত দেখতে একটা অ্যাশট্রে।

দূর, ফালতু জিনিস সব!

দাম কত এটার? সোনালী ফ্রেমে বাঁধাই একটা তৈলচিত্র তুলে দেখাল এক জিপসি মহিলা। রক্তিম সূর্যাস্তের সময় পালতোলা নৌকার ছবি।

মহিলা কাকু-কাকুর প্রতিবেশী। নাম লীলা রেডরোজ। এ এলাকায় এসেছে খুব বেশি দিন হয়নি। এ-ও আরেক বিচিত্র চরিত্র। কারও সঙ্গে মেশে না। কথা বলে না। একা একা ঘরে বসে থাকে। তাই পড়শীরাও ওকে এড়িয়ে চলে। সেটাও আবার ওর ভাল লাগে না। ভাবে, তার সঙ্গে খারাপ আচরণ করা হচ্ছে। ছোটদের ধারণা, বাড়ি বসে থেকে নানা রকম জড়িবুটির গবেষণা করে বুড়ি। তুকতাকের বিদ্যে শেখে! প্রেতসাধনা করে।

একশো ডলার, হাকল মিস্টার কাকু-কাকু। গ্যারেজের ভেতরে আরাম করে ফোল্ডিং চেয়ারে বসে আছে সে। হলদে রঙের পাতলা দুই হাতের তালুতে মাথার পেছনটা এলিয়ে দেয়া।
মাথায় ঝাঁকড়া চুল। সব সাদা। ঠিক মাঝখানে সিঁথি। সাদা মস্ত গোঁফজোড়া দেখতে অদ্ভুত। দুই পাশ থেকে বিচিত্র ভঙ্গিতে বেরিয়ে রয়েছে কোনা দুটো। মুখটা আপেলের মত টকটকে লাল। কেমন চারকোনা।
সবচেয়ে অদ্ভুত ওর চোখ দুটো। শয়তানি ভরা। নীল। সারাক্ষণই যেন রাগে জ্বলে। আনমনে বিড়বিড় করে নিজের সঙ্গে কথা বলে লোকটা। ক্রমাগত ভ্রুকুটি করে।
পরনে ঢোলা খাকি রঙের পাজামা। তাতে প্রচুর দাগ। গায়ে লাল টি-শার্ট। খাটো। ফুলে ওঠা ভুড়িটা পুরোপুরি ঢাকতে পারেনি।
টেবিলে কাত করে ছবিটা নামিয়ে রাখল রেডরোজ।
ভাল করে রাখুন। ভাঙলে কিন্তু আপনাকেই নিতে হবে, কাকু-কাকু বলল। খসখসে কণ্ঠ তার। চড়া স্বর। কক্ করে হাসল। মুরগী ডাকল যেন। লাফিয়ে উঠল তার সাদা গোফ।
পুরানো একটা রূপকথার বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছিল রবিন। তাড়াতাড়ি বইটা নামিয়ে রেখে কনুই দিয়ে গুতো মারল মুসাকে। ফিসফিস করে বলল, চলো, কেটে পড়ি। যেমন কাকু-কাকু, তেমনি রেডরোজ। গায়ে কাঁটা দিচ্ছে আমার।
গ্যারেজের ভেতরে একটা টেবিল চোখে পড়ল মুসার। এমন করে রাখা, প্রায় দেখাই যায় না। তাতে ডজনখানেক ছোট ছোট পুতুল। রবিনের কথা অগ্রাহ্য করে গ্যারেজে ঢুকে পড়ল সে। পুরানো র‍্যাকে রাখা ততোধিক পুরানো কতগুলো কোটের পাশ দিয়ে ঘুরে এগোল টেবিলটার দিকে।
কাছে যাওয়ার পর বুঝল, ওগুলো পুতুল নয়। বাতিদান। কালো কাঠ কুঁদে তৈরি করা হয়েছে রূপকথার ড্রাগন, এলভস জাতীয় নানা রকম দৈত্য-দানবের। প্রতিকৃতি।
একটা বাতিদান হাতে তুলে নিল সে। কল্পিত জীবটার অর্ধেক শরীর মানুষের, অর্ধেক ঘোড়ার।
পাশে এসে দাঁড়াল রবিন। বিচ্ছিরি। ইঁদুরের লেজের মত লম্বা লেজওয়ালা হোঁকা একটা মূর্তির দিকে হাত বাড়াল। এটা কোন জীব?
মুসা কিছু বলার আগেই ধমকে উঠল কাকু-কাকু। অ্যাই, ছেলেরা। কি চুরি করা হচ্ছে?
উঠে দাঁড়াল সে। জ্বলন্ত নীল চোখের দৃষ্টি দুজনের ওপর স্থির। দুই হাত কোমরে রেখে রাগত ভ্রুকুটি করতে থাকল।

হাত থেকে বাতিদানটা ছেড়ে দিল রবিন। তোতলাতে শুরু করল, না না, আ-আমরা কিছু চুরি করছি না।
আমরা শুধু দেখছিলাম, মুসা বলল।
ওগুলো ছোটদের জিনিস নয়, ক্রুদ্ধ স্বরে জবাব দিল কাকু-কাকু। যাও, বাড়ি যাও। অন্যের বাড়িতে ছেকছেক কোরো না এসে।
রাগ লাগল মুসার। কান গরম হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বিক্রির জন্যেই তো রেখেছেন এ সব।
বিক্রির জন্যে রেখেছি, চুরির জন্যে নয়…
দেখুন, আমরা চোর নই…
যাবে? নাকি ডাক দেব কুত্তাটাকে? কাকু-কাকুর চোখের ঠাণ্ডা নীল দৃষ্টি যেন বিদ্ধ করতে লাগল ওদের।
চলো, মুসার হাত ধরে টান দিল রবিন, লোকটা…পাগল!
দুটো টেবিলের মাঝখান দিয়ে বেরোনোর পথ। রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে আছে রেডরোজ। মুসা তার পাশ কাটানোর সময় ধাক্কা লাগল। মুসার মনে হলো, তাসের খেলা ধাক্কাটা রেডরোজই দিল। সবতে গিয়ে পা পিছলাল মহিলা। পতন ঠেকানোর জন্যে মুসার শার্ট খামচে ধরল। ধমকে উঠল, এই, দেখে চলতে পারো না!
কিন্তু আপনিই তো ধাক্কা দিলেন…
চুপ! বেয়াদব ছেলে কোথাকার!
নাহ্, এদের সঙ্গে পারা যাবে না। সবগুলো উদ্ভট। নিজেই দোষ করে নিজেই ধমকাচ্ছে। কি কাণ্ড! হাল ছেড়ে দিল মুসা।
আর কোন অঘটন যাতে না ঘটে, সে-ব্যাপারে সতর্ক থাকল। সাবধানে বাইরে বেরিয়ে এল।
সোজা হাঁটা দিল বাড়ির দিকে। যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে এসে। পেছন ফিরে তাকাল না আর।
বাড়ি পৌঁছে দেখল রান্নাঘরের দরজা বন্ধই রয়েছে। তারমানে বাবা-মা এখনও ফেরেননি বাইরে থেকে। পকেটে হাত দিল চাবির জন্যে।
হাতে লাগল জিনিসটা।
বিস্ময় ফুটল চেহারায়।
ধীরে ধীরে বের করে আনল হাতটা।
অবাক চোখে তাকিয়ে রইল।
কি জিনিস? জানতে চাইল রবিন।
রবিনের দেখার জন্যে হাতটা বাড়িয়ে দিল মুসা।

চারকোনা, আয়তাকার একটা বাক্স।
রবিন বলল, তাসের বাক্স মনে হচ্ছে না?
নীরবে মাথা ঝাঁকাল মুসা। দরজা খোলার জন্যে চাবি বের করল পকেট থেকে।
কিন্তু এটা তোমার পকেটে এল কি করে? চোখের পাতা সরু করে মুসার দিকে তাকাল রবিন। চুরি করলে নাকি?
.
তাসের বাক্সর ওপরের লেখাটা জোরে জোরে পড়ল মুসা, ভয়াল তাস!
অবাক হয়ে মুসার দিকে তাকিয়ে আছে রবিন। কি বললে? খাওয়ার টেবিলের সামনে সাজানো চেয়ারে বসেছে দুজনে।
মুখ তুলে ওর দিকে তাকাল মুসা। ভয়াল তাস। বাক্সের গায়ে লেখা রয়েছে। এই দেখো।
ও এমনি লিখেছে। একটা নাম দেয়া দরকার তো। বিড়বিড় করল রবিন। কিন্তু চুরি করলে কেন?
চুরি করিনি।
কাকু-কাকুর বাড়ি থেকে আনোনি?
আগে যখন ছিল না পকেটে, মনে তো হচ্ছে ওখান থেকেই এনেছি, নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরল মুসা।
চুরি করোনি! অথচ বলছ, ওখান থেকেই এনেছ... আচমকা চোখ বড় বড় হয়ে যেতে লাগল তার। তুড়ি বাজাল। ঠিক! বুঝে ফেলেছি!
ভুরু কুঁচকাল মুসা। কি বুঝলে?
লীলা রেডরোজ! ইচ্ছে করে পড়েছিল তোমার গায়ের ওপর। কেন?
ধীরে ধীরে হাঁ হয়ে যেতে লাগল মুসার মুখ। তারমানে....তারমানে...
হ্যাঁ, মাথা ঝকাল রবিন। চুরিটা সে-ই করেছে। আর পাচার করার বাহন হিসেবে বেছে নিয়েছে তোমাকে।
তাতে ওর লাভটা কি?
বুঝতে পারছি না।
একটা মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল মুসা। তারপর বাক্সটা খুলল। কাত করে টেবিলের ওপর ঢালল তাসগুলো। ঘাটতে শুরু করল।
সাধারণত বাক্সের সব তাসের পিঠে এক রকম ছবি আঁকা থাকে। এ তাসগুলোর সে-রকম নয়। একেকটার পিঠে একেক ছবি। সেগুলো বিচিত্রও বটে। কোনটাতে মুখোশ পরা নাইট, কোনটাতে শয়তান-চেহারার কল্পিত বামন-মানব, কোনটা ড্রাগন, কোনটা বা শুয়োরমুখো মানুষ। আরও নানা রকম অদ্ভুত সব ছবি আঁকা রয়েছে তাসগুলোয়। কোনটা কোন জীব, কি নাম, ওপরে লেখা রয়েছে।

ভয়ঙ্কর সব ছবি, দেখতে দেখতে বলল মুসা।
ভালমত দেখার জন্যে কাত হয়ে এল রবিন। মুসা, তাসগুলো দেখে মনে হচ্ছে অতি প্রাচীন। নিশ্চয় অ্যান্টিক ভ্যালু আছে। কাকু-কাকু দাম নিশ্চয় অনেক বেশি চাইত। সেজন্যে চুরি করেছে জিপসি বুড়ি। তোমাকে দিয়ে পাচার করিয়েছে। তোমার কাছ থেকে নিতে আসবে, আমি শিওর। চোরাই মাল রাখা উচিত না। চলো, কাকু-কাকুকে ফেরত দিয়ে আসি।
হু। যাই। আর চোর ভেবে ক্যাক করে কলার চেপে ধরুক আমাদের। পুলিশে খবর দিক। গলা কেটে ফেললেও বিশ্বাস করবে না আমরা চুরি করিনি। লীলা রেডরোজও স্বীকার করবে না তখন। সব দোষ হবে আমাদের। কে যায়। ঝামেলায়...।
আচমকা গমগমে ভারী একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল পেছন থেকে, মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হও!
অস্ফুট চিৎকার করে উঠল রবিন। চমকে গেল মুসা। হাত থেকে তাসগুলো ছড়িয়ে পড়ল মেঝেতে।
অট্টহাসি ফেটে পড়ল কানের কাছে। কি, মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত?
আরি, তুমি! চেঁচিয়ে উঠল রবিন। কখন এলে?
এই তো, ঘণ্টাখানেক হলো। তোমাদের বাড়িতে ফোন করে জানলাম তুমি এখানে। মুসাকে আর ফোন না করে চলেই এলাম।...তা কেমন চমকে দিলাম? মুখ থেকে একটা বড় সামুদ্রিক শামুকের খোসা সরাল কিশোর। মিনি লাউডস্পীকার। স্যুভনির। জিপসিদের কাছ থেকে কিনেছি।
স্বস্তির হাসি ছড়িয়ে পড়ল মুসার মুখে। একেবারে সময়মত এসেছ। মনে মনে তোমাকেই চাইছিলাম আমি।
রহস্য নাকি?
রহস্য ঠিক বলা যাবে না। ঘটনাটা বেশ মজার। তবে ভেজালেও পড়তে পারি, বলা যায় না।
কি হয়েছে? ভুরু জোড়া কাছাকাছি হলো কিশোরের। তাসগুলোর ওপর। চোখ পড়তে জিজ্ঞেস করল, তাস নিয়ে বসেছ কেন?
এগুলোর কথাই তো বলছি, মুসা বলল।
চুরি করে এনেছে ও, মিটিমিটি হাসছে রবিন।
ভুরু জোড়া আরও কুঁচকে গেল কিশোরের। চুরি করেছে? তাস চুরি করতে গেল কেন?
ও নিজে করেনি। করানো হয়েছে।
এতক্ষণে আগ্রহ দেখা গেল কিশোরের চোখে। কি ভাবে করাল?

হাত তুলল মুসা। বসো। সব বলছি।
একটা তাস টেনে নিল কিশোর। বিস্ময় ফুটল চোখে। এ জিনিস পেলে কোথায়?
চেনো মনে হচ্ছে? কিশোরের অবাক হওয়া দেখে মুসাও অবাক।
বিমূঢ় ভঙ্গিতে মাথা আঁকাল কিশোর। হ্যাঁ, এবারই তো দেখে এলাম জিপসিদের কাছে। ওদের ছেলেমেয়েরা সংগ্রহ করে। সাধারণ তাসের মত খেলাও যায় না এ দিয়ে। খেলাটা ভিন্ন রকম। তবে মজার।
আগ্রহ বাড়ছে রবিনের। জানো নাকি কি ভাবে খেলতে হয়?
মাথা কাত করল কিশোর। শিখে এসেছি। আমাদের বয়েসী একটা জিপসি ছেলের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তার কাছ থেকে এক প্যাকেট তাস নিয়েও আসতে চেয়েছিলাম। আসার সময় আর মনে ছিল না।
চোখ চকচক করছে মুসার। কিছুক্ষণ আগের বিরক্তির ছিটেফোঁটাও নেই আর এখন চেহারায়।
দুষ্ট রাজা, পিশাচ নাইট, মানুষখেকো ড্রাগন এ সব নিয়ে খেলতে হয় খেলাটা, কিশোর বলল আবার। প্রচুর যুদ্ধটুদ্ধ করা লাগে। জাদু আছে। ব্ল্যাক ম্যাজিক আছে। কম্পিউটার গেমের চেয়ে কোন অংশে উত্তেজনা কম না। বরং কয়েকজনে মিলে খেলা যায় বলে মজা অনেক বেশি।
হাত বাড়াল কিশোর। দেখি?
মুসার হাত থেকে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখতে লাগল সে।
কি ভাবে খেলতে হয় বলো তো? জিজ্ঞেস করল মুসা।
বলে নয়, খেলেই দেখাব। কিন্তু আগে বলো, কোথায় পেলে এ জিনিস?

.

মুসা আর রবিনের খিদে পেয়েছে। কিশোরও বাড়ি থেকে সামান্য কিছু মুখে দিয়ে চলে এসেছে। খিদে রয়েছে তার পেটেও।
খেতে খেতে কথা হলো তিনজনের। তাসগুলো কি ভাবে পেয়েছে মুসা, সব জানানো হলো কিশোরকে।
উঠে গিয়ে রেফ্রিজারেটরের ডালা খুলল কিশোর। একটা কোকের ক্যান বের করে নিয়ে এসে বসল আবার আগের জায়গায়। রবিন আর মুসাকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, তোমরা?
তুমি খেতে থাকো, মুসা বলল। দরকার হলে আমরা বের করে নেব।
ক্যানের মুখটা খুলে খাওয়া শুরু করল কিশোর। পুরোটা শেষ করার আগে থামল না। খালি ক্যানটা নামিয়ে রাখল টেবিলে। মুসা আর রবিনের খাওয়া শেষ হওয়ার অপেক্ষায় রইল।
ওদেরও খাওয়া শেষ হলো।

এবার শুরু করা যাক। তাসগুলো টেনে নিয়ে সব এলোমেলো করে দিতে লাগল কিশোর।
মুসার মুখোমুখি জানালার দিকে পেছন করে বসেছে রবিন। জানালা দিয়ে শেষ বিকেলের রোদ আসছে ঘরে। কমলা আভা এসে পড়েছে দুজনের গায়ে। জ্বলছে যেন ওরা।
মুসা, লুডুর পাশা নিয়ে এসোগে তো কয়েকটা, কিশোর বলল। আছে? অন্তত চারটে পাশা দরকার।
থাকার তো কথা, উঠে দাঁড়াল মুসা। দেখি খুঁজে। পাই নাকি।
সিঁড়ি বেয়ে দৌড়ে ওপরতলায় উঠে গেল সে। ড্রয়ার, বাক্স ঘাটাঘাটি করে খুঁজে চারটে পাশা বের করে নিয়ে নিচে নেমে এল।
তাসগুলোকে চারটে সমান ভাগে ভাগ করল কিশোর। উপুড় করে রাখল সবগুলো।
পাশাগুলো কিশোরের সামনে টেবিলে ফেলে দিয়ে নিজের চেয়ারে গিয়ে বসল মুসা।
এই দেখো, চারটে ভাগে ভাগ করলাম তাসগুলোকে। আঙুলের টোকা দিয়ে প্রতিটি ভাগকে দেখিয়ে কোনটার কি নাম বলতে লাগল কিশোর, চরিত্রতাস, শক্তিতাস, কর্মস এবং ভাগ্যতাস। কোন চরিত্রে খেলবে, চরিত্রতাস থেকে প্রথমে সেটা ঠিক করতে হবে তোমাকে।
টেবিলের ওপর দিয়ে তাসগুলো মুসার দিকে ঠেলে দিল সে। নাও, একটা তাস টেনে নাও। যেটা ইচ্ছে।
মাঝখান থেকে একটা তাস টেনে নিল মুসা। উল্টে দেখল। রাজা! দারুণ তো! আমি রাজা!
আমি আগে টানলে আমিই রাজা হতাম, রবিন বলল।
মাথা নাড়ল কিশোর। উঁহু। তুমি ওটা না-ও টানতে পারতে। দেখা যেত, রাজা না টেনে গোলাম টেনেছ।
হাসল রবিন। এমনি বললাম। রাজা হবার কোন ইচ্ছেই আমার নেই।
রাজা হলেই যে খুব সাংঘাতিক কিছু হয়ে যাবে, তা-ও না, কিশোর বলল। একেবারে দুর্বল রাজাও বনে যেতে পারে মুসা। শক্তিতাসের ওপর নির্ভর করে অনেক কিছু। মুসার দিকে তাকিয়ে হাসল সে। শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে শক্তি সামর্থ্য সব হারিয়ে আমাদের গোলামে পরিণত হয়েছ।
নামটা কি হবে সে-রাজার? ভুরু নাচিয়ে হাসল রবিন। গোলাম-রাজা। বাহ, সুন্দর একটা নাম আবিষ্কার করলাম তো। গোলাম-রাজা।

সেই স্বপ্নেই বিভোর থাকো, মুসা বলল। মনে রেখো, প্রথম সুযোগটা পাওয়া মাত্রই তোমাদের দুজনের মুণ্ডু কেটে ফেলার আদেশ দেব আমি।
ভ্রূকুটি করল রবিন। সামনে ঝুঁকে এল। তারমানে তুমি দুষ্ট রাজা?
খেলা খেলাই, জানিয়ে দিল মুসা। এখানে একজন আরেকজনকে হারানোটাই মূল কথা।
তাই বলে মুণ্ডু কেটে…তোমার কাছ থেকে এটা আশা করিনি, মুসা।
ওদের ঝগড়াটা বাড়তে দিল না কিশোর। রবিনের দিকে চরিত্রতাসের গাদাটা ঠেলে দিয়ে বলল, নাও। তোমারটা তোলো।
চোখ বন্ধ করে একটা তাস টেনে নিল রবিন। উল্টে দেখেই আঁউক করে উঠল, দূর! গথ! হওয়ার আর কিছু পেলাম না যেন? হতাশা ঢাকতে পারল না সে।
রবিনের হাত থেকে তাসটা নিয়ে দেখতে দেখতে বলল কিশোর, এটাও কম শক্তিশালী নয়। এখানে গথ হলো একজন জাদুকর। যে ইচ্ছেমত তার দেহের রূপ পরিবর্তন করতে পারে।
কিছুটা উজ্জ্বল হলো রবিনের মুখ। জাদুকর? তারমানে আমার জাদু করার ক্ষমতা আছে?
আছেই, এ কথা বলার সময় হয়নি এখনও, জবাব দিল কিশোর। তবে ক্ষমতা তৈরি হতে পারে।
মুসার দিকে তাকাল রবিন। ক্ষমতা পেলে রাজাকে ব্যাঙ বানিয়ে ফেলব আমি।
ব্যাঙের মত ডেকে উঠল মুসা। এত জোরাল আর বাস্তব শোনাল ডাকটা, চমকে গেল রবিন।
হা-হা করে হেসে উঠল মুসা। আহা, কি আমার জাদুকররে। বানাও আমাকে ব্যাঙ। এমন হাঁক ছাড়ব, ভয়ে বাপ-বাপ করে আবার মানুষ বানিয়ে দিতে পথ পাবে না।
কিশোরও হাসল। হাত তুলল। আচ্ছা, থামো এখন। প্যাচাল বাদ। খেলাটাই তো শুরু করতে দিচ্ছ না। এমন করলে বাদ দিয়ে দেব কিন্তু।
না না না, আর করব না। তাড়াতাড়ি বলে উঠল মুসা। অনেক দিন পর তোমাকে পেয়েছি তো। খুশিতে বাঁচাল হয়ে গেছি। কি করতে হবে বলো এখন?
চরিত্রতাসগুলোকে আবার শাফল করে নিজেরটা টেনে নিল কিশোর। উল্টে দেখে জানাল, আমি হলাম ক্রেল।
বুড়ো আঙুল আর মধ্যমার সাহায্যে তাসটা তুলে ধরে দেখাল সে। মুসা আর রবিন দুজনেই দেখতে পেল তাসের গায়ে আঁকা ছবিটা। অদ্ভুত এক বামন-জীব। মানুষের মত দেহ। মুখটাও মানুষের মত। কিন্তু নাকটা লম্বা। সামনের দিকে ঠেলে

দেয়া। সরু একটা পাইপের মত। গোলাপী কানের ওপরের দিকটা চোখা। মাথায় একটা রোমশ লাল হ্যাট। হাতে ইয়া বড় ছুরি। ফলাটা বাকানো।
এই ক্রেল জিনিসটা কি? জানতে চাইল মুসা। ভাল না মন্দ?
সেটা নির্ভর করে অনেক কিছুর ওপর, জবাব দিল কিশোর।
ক্রেলের চেয়ে কি গথেরা বেশি শক্তিশালী? রবিনের প্রশ্ন।
সেটাও নির্ভর করে।
কিসের ওপর নির্ভর করে? জানতে চাইল রবিন।
বুঝতে পারবে একটু পরেই, শান্তকণ্ঠে জবাব দিল কিশোর। চরিত্র নির্বাচন হলো। এখন আমাদের শক্তি অর্জন করতে হবে। পাশা চালতে হবে! মুসা, চারটে পাশা একই সঙ্গে চালো। দেখা যাক কি ওঠে তোমার ভাগ্যে। পাশার এক ফোঁটা সমান একশো পয়েন্ট শক্তি।
আগের বারের কথা মনে আছে। রবিনকে অভিযোগ করার সুযোগ দিল না মুসা। তুমি আগে চালো।
কেন, ভয় পাচ্ছ? পয়েন্ট কম পেয়ে গোলাম হয়ে যাওয়ার?
আর দ্বিধা করল না মুসা। চারটে পাশাই তুলে নিয়ে হাতের তালুতে ঝাঁকিয়ে টেবিলের ওপর গড়িয়ে দিল। সবগুলোতেই পাঁচ কিংবা ছক্কা। হাত ওপরে তুলে। ঝাঁকি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল সে, ইয়াহু! বিরাট ক্ষমতার অধিকারী এখন আমি!
রবিন আর কিশোরও পাশা চালল। দুজনের কারোরই তিনের বেশি উঠল না।
নাহ, গম্ভীর ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলল কিশোর, রাজাটা সত্যিই শক্তিশালী হয়ে গেল। রবিনের দিকে তাকাল সে। দুজনে একজোট হয়ে রাজার সঙ্গে লাগতে হবে এখন আমাদের। নইলে পারব না।
মুচকি হাসল মুসা। রাজা রাজাই। তাকে দমন করা অত সহজ না।
দেখা যাবে, চ্যালেঞ্জটা গ্রহণ করল কিশোর।
রাজারও ভুলে যাওয়া উচিত না, রবিন বলল, জাদুকরের চেয়ে শক্তিশালী কিছু নেই। যা খুশি করে ফেলতে পারে জাদুকর।
কথার লড়াই বাদ দাও না তোমরা, চেয়ারে হেলান দিল কিশোর। শক্ত হয়ে বসো। খেলাটা অনেকটা পুরানো গল্পের মত। গল্পের তিনটে চরিত্র আমরা। এখন চোখ বোজো। কল্পনা করতে থাকো, প্রাচীন যুগে রয়েছি আমরা। রাজা বাদশাদের যুগে। বনের মধ্যে বাড়ি। বনের কিনারে একটা দুর্গ।
রাজার দুর্গ! আমার! মুসা বলে উঠল।
তার কথায় কান দিল না কিশোর। গম্ভীর ভঙ্গিতে প্রায় ফিসফিস করে বলল, বনটা ভয়ানক বিপজ্জনক। অদ্ভুত সব প্রাণীর বাস ওখানে। মুখোশ পরা নাইট।

মিউট্যান্ট যোদ্ধা। ক্রেল। গথ! মর্ড। জেকিল। বিষাক্ত উদ্ভিদ। নিষ্ঠুর শত্রুরা সারাক্ষণ ঘুরে বেড়ায় বনের মধ্যে।
ভয় পেয়ে গেল মুসা। কিশোর, এমন করে বলছ, আমার গায়ে কাঁটা। দিচ্ছে।
থামল না কিশোর। কর্মসের গাদাটা মুসার দিকে ঠেলে দিয়ে বলল, তাস টানো। হাতে নিয়ে ওল্টাও। এরপর যা ঘটবে সামাল দেয়ার জন্যে তৈরি করো নিজেকে।
কি ঘটবে?
কিশোরের গম্ভীর মুখভঙ্গি, আবেগঘন ভারী কণ্ঠ, কালো চোখের স্থির দৃষ্টি ঘাবড়ে দিল মুসাকে। আগের মত হালকা নেই আর পরিবেশটা। কি জানি কেন মেরুদণ্ডের ভেতরে শিরশির করে উঠল তার।
সবচেয়ে ওপরের তাসটা টেনে নিয়ে উল্টে ফেলল।
হলুদ রঙের একটা মোটা বিদ্যুতের শিখা আঁকা রয়েছে ওতে।
তাসটা টেবিলের ওপর রাখল সে।
সঙ্গে সঙ্গে গুড়গুড় করে মেঘ ডাকল।
জানালার বাইরে বিদ্যুৎ চমকাল।
বাজ পড়ল বিকট শব্দে।
খাইছে! চিৎকার করে উঠল মুসা।
বাইরে তো উজ্জ্বল রোদ। বজ্রপাত হয় কি করে?
ছোঁ মেরে তাসটা তুলে নিল সে।
আবার মেঘের গুড়গুড়। বিদ্যুতের চমক। বজ্রপাত।
বিদ্যুতের আলোয় চোখে পড়ল একটা কুৎসিত, বিকৃত মুখ। বিচিত্র আলোয় সবুজ, কাঁপা কাঁপা দেখাচ্ছে। জানালার কাঁচে নাক ঠেকিয়ে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে।

.
চিৎকার দিয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল মুসা। ধাক্কা লেগে চেয়ারটা উল্টে পড়ল। মেঝেতে। ঠাস করে শব্দ হলো। আরেকবার চমকে গেল সে।
জানালার বাইরে বাজ পড়ল আবার। কাছেই কোথাও। বাড়ির দেয়ালে প্রতিধ্বনি তুলল সে-শব্দ।
থেকে থেকে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। সেই আলোয় মুখটাকে দেখা যাচ্ছে এখনও।
কাকু-কাকু!
জানালার কাঁচে নাক ঠেকিয়ে রেখেছে। গোল কুতকুতে চোখের দৃষ্টি ওদের ওপর স্থির। তারপর হাত তুলে রান্নাঘরের দরজাটা খুলে দিতে ইশারা করল সে।
চিৎকারটা যেন আপনিই বেরিয়ে এল মুসার মুখ থেকে। ও এখানে কি করছে?
ভারী দম নিল। দরজাটা খুলে দিতে এগোল সে।

টান দিয়ে খুলল দরজার পাল্লা। এই সময় প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ল আবার। কেঁপে উঠল বাড়িটা। পেছনের সিঁড়িতে মুষলধারে আছড়ে পড়তে দেখল বৃষ্টির ফোঁটা। পেছনের আঙিনার বুড়ো গাছগুলো দমকা বাতাসের ঝাঁপটায় গুঙিয়ে উঠে নুয়ে নুয়ে পড়ছে।

মুহূর্তে এ ভাবে বদলে গেল কি করে আবহাওয়া? অবাক লাগল তার।

বৃষ্টির মধ্যে পিঠ কুঁজো করে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল কাকু-কাকু। সাদা চুলগুলো ভিজে লেপ্টে গেছে মাথার সঙ্গে।

হলুদ রঙের একটা বর্ষাতি চাপিয়ে দিয়েছে তার টি-শার্ট ও পাজামার ওপর। বর্ষাতির গায়ে চকচক করছে বৃষ্টির ফোঁটা। চোখের পাতা সরু করে মুসার দিকে তাকাল সে।

আমি জানতাম এ বাড়িতেই থাকো তুমি, খসখসে, চড়া স্বরে কথা বলল কাকু-কাকু। ভেজা গোঁফ জোড়া বিচিত্র ভঙ্গিতে দুলে উঠল ঠোঁটের ওপর।

মুসার কাঁধের ওপর দিয়ে কিশোর আর রবিনের দিকে তাকাল সে। টেবিল থেকে উঠে এসে ওর পাশে দাঁড়াল রবিন।

তোমরাই তখন গ্যারেজে ঢুকেছিলে, তাই না? সন্দিহান দৃষ্টিতে দুজনের দিকে তাকিয়ে বলল কাকু-কাকু। একটা তাসের প্যাকেট খোয়া গেছে ওখান থেকে। কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করল সে। কুতকুতে চোখের দৃষ্টি ঘুরে বেড়াচ্ছে মুসা আর রবিনের ওপর। তোমরা নিশ্চয় কিছু জানো না। তাই না?

রবিনকে মাথা ঝাঁকাতে দেখল মুসা। বুঝতে পারল সত্যি কথাটা বলে দিতে যাচ্ছে রবিন।

আমরা চোর নই, মিস্টার কাকু-কাকু! রবিন মুখ খোলার আগেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল মুসা। এ কথাটাই তো জিজ্ঞেস করতে এসেছেন?

মোরগের মত মাথা কাত করে একপাশ থেকে তাকাল কাকু-কাকু। সত্যি জানো না?

বললামই তো আমরা চোর নই, মুসা বলল। আমরা আপনার তাস চুরি করিনি।

মাথা ঝাঁকাল কাকু-কাকু। চোয়াল ডলল। বৃষ্টির বেগ বাড়ছে। তার বর্ষাতিতে বাড়ি খেয়ে রান্নাঘরের মেঝেতে এসে পড়ছে পানি।

ঘরের মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে দিল সে। গলা লম্বা করে তাকাল মুসা আর রবিনের দিকে। মুখের কাছে মুখ চলে এল। পুদিনার গন্ধ তার নিঃশ্বাসে।

আশা করি সত্যি কথাই বলছ, দাঁতে দাঁত চেপে বলল সে। কারণ এ তাসগুলো খেলার জিনিস নয়।

ভেতরে ভেতরে ঘাবড়ে গেল মুসা। কিন্তু ভয়টা চেহারায় প্রকাশ পেতে দিল না। কাকু-কাকুর চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, কি বলতে চান আপনি?

তাসের খেলা
আমি বলতে চাই, ওগুলো খেলনা নয়। ভয়ানক বিপজ্জনক।
আপনি…আপনি আমাদের ভয় দেখাতে এসেছেন, ঠিক না? কোনমতে বলল মুসা।
ভয়? ভয়ের দেখেছ কি? তারপর ফিসফিস করে অদ্ভুত সম্মোহনী কণ্ঠে বলল, ঠিক আছে, ভয় যখন পেতেই চাইছ, পাও ভয়! ভীষণ ভয়!
হলুদ বর্ষাতিটা ভাল করে গায়ের ওপর টেনে দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেল সে। হারিয়ে গেল প্রবল ঝড়ের মধ্যে।
বরফের মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল মুসা। কানে বাজছে কাকু-কাকুর কথাগুলো। পাও ভয়! ভীষণ ভয়! নড়ে উঠল হঠাৎ। তাড়াতাড়ি দরজা লাগিয়ে তালা আটকে দিল।
ফিরে তাকাল কিশোরের দিকে। তাসগুলো টেবিলে দেখতে পেল না। লুকিয়ে ফেলেছে কিশোর। হাতটা টেবিলের নিচ থেকে বের করে আনল আবার সে।
অন্য সময় হলে হেসে ফেলত মুসা। এখন হাসল না। লুকালে কেন?
নইলে চোর ভাবত আমাদের। কোনমতেই বিশ্বাস করানো যেত না।
আমিও এ জন্যেই স্বীকার করিনি। কিন্তু তুমিও কি শুধু এ কারণেই ফেরত দাওনি তাসগুলো?
না, মাথা নাড়ল কিশোর। তাসগুলো আমাকে ভীষণ কৌতূহলী করে তুলেছে। সাধারণ খেলা মনে হচ্ছে না এখন আর। এর শেষ না দেখে আমি ছাড়তে চাই না।
কিন্তু পাও ভয়। ভীষণ ভয়, বলে কি বুঝিয়ে গেল লোকটা? চেয়ারে বসল মুসা। অভিশাপ দিল নাকি?
আরে দূর! অভিশাপ না কচু! খেলো তো…
রবিনের কথা শেষ হওয়ার আগেই তাসের গাদার সবচেয়ে ওপরের তাসটা তুলে উল্টে ফেলল মুসা।
তাসটার বুক কালো রঙ করা।
আস্তে করে তাসটা রাখল টেবিলে।
মুহূর্তে দপ করে নিভে গেল ঘরের সমস্ত বাতি।
.
বাবাগো! বলে চিৎকার দিয়ে আরেকটু হলে চেয়ার থেকেই পড়ে যাচ্ছিল মুসা।
আরি, এমন করছ কেন? অন্ধকারে শোনা গেল রবিনের কণ্ঠ। ঝড়ের সময় এমন বিদ্যুৎ যেতেই পারে।
আ-আমার…তা মনে হয় না, কথা আটকে যাচ্ছে মুসার। বিদ্যুতের শিখা আঁকা একটা তাস তুলে নিলাম। অমনি বিদ্যুৎ চমকানো শুরু করল। এখন একটা

কালো রঙ করা তাস তুললাম। আলো চলে গেল। রাতের মত কালো অন্ধকারে ছেয়ে গেল।
চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল মুসা। দেয়ালের সুইচবোর্ডটা হাতড়াতে শুরু করল সে। কয়েকবার করে টিপল। খটাখট শব্দ হলো। কিন্তু আলো জ্বলল না।
থামো, মুসা, রবিন বলল। অকারণে ভয় পাচ্ছ। ঝড়ের সময় ইলেকট্রিসিটি যায়ই, আবার বলল সে। তার জন্যে এ রকম মাথা গরম করে ফেলার কিছু নেই।
এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, এসো, অন্ধকারেই খেলি। দেখা যাক না কি হয়।
কিন্তু রাজি হলো না মুসা।
ডাইনিং রুমে গিয়ে ঢুকল। টেবিল থেকে মোমবাতি তুলে নিয়ে ফিরে এল। অন্ধকারে দিয়াশলাই বের করতে সময় লাগল। তবে কয়েক মিনিটের মধ্যেই। আবার টেবিলে তাসগুলোর ওপর ঝুঁকে পড়ল ওরা। মোমের কমলা আলোয় লম্বা ছায়া পড়ল রান্নাঘরের টেবিলটাতে।
আবার খেলা শুরু করা যাক, গম্ভীর কণ্ঠে বলল কিশোর। রবিন, একটা কর্মাস তুলে নাও।
একটা তাস টেনে নিল রবিন। মোমের আলোয় তুলে ধরল কি আছে দেখার জন্যে। আড়াআড়ি দুটো তরোয়াল আঁকা। নিচে একটা হেলমেট।
গথ জাদুবলে একদল সৈন্য সৃষ্টি করল এখন, কিশোর বলল। রাজার দুর্গ হামলার মুখে। নিজের দুর্গ থেকে বেরিয়ে গিয়ে রাজাকে পাশের অন্য রাজার আরেকটা দুর্গ দখল করে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করতে হবে।
কি করে করব? জানতে চাইল মুসা।
বাইরে বিকট শব্দে বাজ পড়ল। জানালার কাঁচে আঘাত হানছে প্রবল বৃষ্টির ফোঁটা। বাতাসে কাত হয়ে যাচ্ছে মোমের শিখা। প্রায় নিভু নিভু হয়ে গিয়ে লাফিয়ে সোজা হয়ে যাচ্ছে আবার।
তোমাকেও একদল সৈন্য সৃষ্টি করতে হবে, মুসার প্রশ্নের জবাব দিল কিশোর। চারটে পাশা ঠেলে দিল টেবিলের ওপর দিয়ে। প্রতি ছয় ফোঁটার জন্যে একশো করে নাইট তৈরি হবে তোমার।
পাশাগুলো তুলে নিয়ে হাতের তালুতে রেখে ঝাঁকানো শুরু করল মুসা। কিশোর, নিয়ম-কানুনগুলো কি তুমি বানিয়ে নিচ্ছ ইচ্ছেমত?
না। এ ভাবেই এ খেলা খেলতে হয়। মনে মনে রাখতে হয় হিসেবটা। কঠিনই, টেবিলের ওপর অধৈর্য ভঙ্গিতে টোকা দিতে লাগল কিশোর। কথা না। বলে যা বলছি করে ফেলো না।...এত ঝাঁকানো লাগে নাকি? ফেলো ফেলো, পাশা ফেলো। পর পর তিনবার ফেলতে পারবে। তার বেশি না। এই তিনবারে। তোমাকে কম করে এক হাজার নাইট জোগাড় করতে হবে।

পাশাগুলো টেবিলে গড়িয়ে দিল মুসা। তিনটে চার আর একটা ছক্কা পেল।
মোট আঠারো পয়েন্ট, মোমের আলোয় পাশার ফোঁটাগুলো ভালমত দেখে হিসেব করল কিশোর। তারমানে তিনটে ছক্কার সমান। এবং তারমানে তিনশো নাইট জোগাড় হলো তোমার।
মাত্র তিনশো! হতাশ হলো মুসা। তবে মজা পেতে শুরু করেছে। আরও সাতশো সৈন্য...।
থেমে গেল সে। কথা শোনা যাচ্ছে। বহু মানুষের মিলিত কণ্ঠ। চাপা হাসি। একটা ঘোড়া ডাকল। চিৎকার। চেঁচামেচি।
বাইরে থেকে আসছে নাকি?
ঘুরে জানালার দিকে তাকাল মুসা। অন্ধকারে এমনিতেই কিছু দেখা যায় না। তার ওপর জানালার কাঁচে বৃষ্টির পানির পর্দা। দৃষ্টি ভেদ করে ওপাশে যেতে দিচ্ছে না।
শুনতে পাচ্ছ? ফিসফিস করে বলল সে।
ও কিছু না, রবিন বলল। গাছের মাথায় আঘাত হানছে বৃষ্টি আর বাতাস। কি সাংঘাতিক ঝড় শুরু হলোরে বাবা! একেবারে হঠাৎ করেই। একফোঁটা মেঘও তো জমতে দেখিনি।
হুঁ, আবার পাশা ফেলো, কিশোর বলল। আরও সৈন্য দরকার তোমার। মাত্র তিনশোজন নাইট নিয়ে একটা দুর্গ দখল করতে পারবে না তুমি।
আবার পাশা, গড়িয়ে দিল মুসা। বাইরের কথা শোনার জন্যে কান পাতল। কানে এল শুধু বাতাসের গর্জন আর বৃষ্টির ফোঁটা আছড়ে পড়ার একটানা শব্দ।
দপ দপ্ করে উঠে কাত হয়ে গেল মোমের শিখা। পাশাগুলো ভাল করে দেখার জন্যে টেবিলের ওপর ঝুঁকে এল তিনজনে।
মুসা পেল দুটো ছক্কা, একটা পাঁচ, একটা এক। আবারও আঠারো পয়েন্ট এবং তিনশো নাইট।
আরও চারখান ছক্কা জোগাড় করতে হবে, হেসে উঠল রবিন। আর পারবে বলে মনে হয় না। দেব নাকি রাজার ওপর জাদুর মায়া ছড়িয়ে?
তোমার দান এখনও আসেনি, কিশোর বলল।
চালো আবার। হতাশ হওয়ার কিছু নেই। চার ছক্কা উঠেও যেতে পারে। কিশোর বলল। একজন অত্যন্ত শক্তিশালী রাজা বাস করে ওই প্রাসাদে। হাজারের কম নাইট নিয়ে ওর দুর্গ তুমি দখল করতে পারবে না। নাইট কম হলে গথের হাতে মারা পড়বে তুমি।
মারা পড়েই গেছি, বড়ই নিরাশ শোনাল মুসার কণ্ঠ। একসঙ্গে চারটে ছক্কা জীবনেও উঠবে না।

চারটে ছক্কা আছে যখন চারটে পাশায়, না ওঠার কোন যুক্তি নেই, আশ্বাস দিল কিশোর। মারো। যা হবার হবে।
একবার ঝাঁকি দিয়েই পাশাগুলো গড়িয়ে দিল মুসা।
ঠিক চারটে ছক্কা।
ইয়াহু! বলে আবার চিৎকার করে উঠল মুসা। দিলাম রাজার বারোটা বাজিয়ে! লাফিয়ে উঠে দুই হাত ছুঁড়তে শুরু করল সে।
প্রচণ্ড কানফাটা শব্দে ভেঙে পড়ল কি যেন। ক্ষণিকের জন্যে স্তব্ধ হয়ে গেল মুসা।
পরক্ষণে একই সঙ্গে চিৎকার করে উঠল তিনজনে।
কিসের শব্দ? ভয়ে চোখ বড় বড় হয়ে গেছে রবিনের।
কোন কিছু বিস্ফোরিত হলো বোধহয়, কান পেতে থেকে বিড়বিড় করল কিশোর। গাড়িও অ্যাক্সিডেন্ট করতে পারে।
রাগত কথার শব্দ শোনা গেল।
জোরাল চিৎকার।
তারপর তীক্ষ্ণ আর্তনাদ।
সেই সঙ্গে আবারও চিত্তার। কেউ যেন কাউকে আক্রমণ করে বসল।
পরমুহূর্তে ধাতব জিনিসের ঘষাঘষি, ঠোকাঠুকির প্রচণ্ড শব্দ।
তরোয়াল?
আরও চিৎকার। গোঙানি। আর্তনাদ।
জানালার বাইরেটা দেখার চেষ্টা করল মুসা। পলকের জন্যে। চোখ সরিয়ে ফেলল পরক্ষণে। যদি কিছু ঘটেই থাকে-কি ঘটছে দেখতে চায় না।
মনে হয় যুদ্ধ হচ্ছে বাইরে, কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে ভয়ে ভয়ে বলল রবিন। উঁচুস্বরে বলতে সাহস পাচ্ছে না।
আ-আমার...আমার ভাল লাগছে না এ সব, মুসা বলল। খেলাটা বন্ধ করা দরকার।
কারও কথার অপেক্ষা না করে তাসগুলো সব একখানে জড় করতে শুরু করল সে। হাত কাঁপছে। সব তাসগুলো জড় করার পর একসঙ্গে ঠেলা মেরে সব। ঢুকিয়ে দিল বাক্সের ভেতর।
বন্ধ করে দিল বাক্সের মুখ।
মুহূর্তে ফিরে এল দিনের আলো।
খাইছে! এতক্ষণ অন্ধকারে থাকার পর তীব্র আলোয় চোখ মিটমিট করতে লাগল মুসা।
কি ঘটছিল এতক্ষণ? বিশ্বাস করতে পারছে না রবিন। গাল চেপে ধরেছে। একহাতে। তাসের বাক্সটা বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার গেল কোথায়?

কাকতালীয় ব্যাপার, চোখের সামনে যা ঘটে গেল, সেটাকে অবিশ্বাস করতে পারছে না কিশোরও আর। একটা ব্যাখ্যা খুঁজে বের করতে চাইছে।
পায়ের শব্দ শোনা গেল।
হল ধরে এগিয়ে আসছে। রান্নাঘরের দিকে। দ্রুত।
ঘরে এসে ঢুকল কুৎসিত চেহারার এক বামন-মানব।

.

চিৎকার করে উঠল রবিন।
লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। দুই হাত উদ্যত। বাধা দিতে প্রস্তুত।
লাফ দিয়ে দেয়ালের দিকে সরে গেল মুসা। বুকের মধ্যে হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে যেন।
গোল মস্ত মাথাটা পেছনে ঝাঁকি দিয়ে হেসে উঠল বামন-প্রাণীটা। তীক্ষ্ণ, উচ্চকিত স্বর।
কালো কোঁকড়া চুল কাঁধের কাছে নেমে গেছে তার। খাটো করে ছাঁটা কালো দাড়ি। সবুজ চোখের মণিতে বন্য দৃষ্টি। লম্বা পাইপের মত নাক। গায়ে লোম ওঠা কালো উলের ফতুয়া। পরনে কালো চামড়ার প্যান্ট। পায়ে লোম বের হয়ে থাকা চোখামাথা বাদামী চটি।
আমি এখন মুক্ত! আনন্দে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল প্রাণীটা। ছোট ছোট হাত দুটো মাথার ওপর তুলে নাচাতে থাকল। পাখির মত স্বাধীন। অনেক ধন্যবাদ তোমাদেরকে। অনেক ধন্যবাদ।
এই, শুনুন শুনুন! চিৎকার করে বলল কিশোর।
কিন্তু থামল না বামনটা। আনন্দে লাফাতে লাফাতে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। টান দিয়ে রান্নাঘরের দরজা খুলল। হারিয়ে গেল বাইরের বৃষ্টিতে।
চেয়ারে নেতিয়ে পড়ল রবিন। একহাত দিয়ে গাল চেপে ধরে আছে এখনও। কিশোর নড়ল না। এখনও হাত দুটো উদ্যত। মুঠোবদ্ধ। বাধা দিতে প্রস্তুত।
ঘন ঘন ঢোক গিলে হৃৎপিণ্ডটাকে শান্ত করতে চাইল মুসা।
অবশেষে নীরবতা ভাঙল কিশোর। আনমনে মাথা নাড়তে নাড়তে বিড়বিড় করে বলল, ক্রেল। ওই জীবটা ছিল ক্রেল।
আবার ঢোক গিলল মুসা। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। বৃষ্টি বন্ধ হয়েছে। কিন্তু বাইরের কোন কিছু চোখে পড়ল না।
জীবটা দেখতে অবিকল চরিত্রতাসের গায়ে আঁকা ছবির ক্রেলটার মত, রবিন বলল।
তাই, না? তাসের বাক্সটার দিকে তাকাল মুসা। ঠিকই বলেছ। দেখতে ওরকমই।

বাক্সটা তুলে নিয়ে ঝাড়া দিয়ে টেবিলের ওপর ছড়িয়ে দিল সে। পাগলের মত খুঁজতে লাগল তাসটা। কোথায় ওটা? কই গেল?
তাসগুলো সব উল্টে দেখল সে। কিন্তু ক্রেল আঁকা তাসটা পেল না। বামনটা নিয়ে গেল নাকি?
বেশি তাড়াহুড়া করে ফেলেছি, বিশ্বাস করতে পারছে না সে। নিশ্চয় আছে এখানেই।
সময় নিয়ে প্রতিটি তাস উল্টে দেখল সে। রাজা, মিউট্যান্ট বামন, তিন জেকিল, দুই গথ, মুখোশ পরা নাইট...।
কোথায়? কোথায় তুই? বেরো। বেরো বলছি, আনমনে বলছে আর আছাড় দিয়ে দিয়ে একেকটা করে তাস ফেলছে টেবিলে মুসা।
নেই! অবশেষে দুই বন্ধুর দিকে মুখ তুলে ঘোষণা করল সে। হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে ক্রেল-তাসটা।
ভ্রূকুটি করল কিশোর। হাত বাড়াল, আমি দেখি তো একবার।
তাসগুলো তুলতে গিয়ে হাত ফসকে একটা তাস মাটিতে পড়ে গেল।
নিচু হয়ে সেটা তুলে নিল মুসা।
একটা ড্রাগন আঁকা তাস।
বিশাল ড্রাগন। জ্বলন্ত চোখ। মাথাটা ওপরে তোলা। গর্জনের ভঙ্গিতে হাঁ করা মুখে ভয়ঙ্কর দাঁতের সারি। নাক দিয়ে আগুন বেরোচ্ছে।
তাসটা দুই আঙুলে শক্ত করে চেপে ধরল সে।
কানে এল ভারী পায়ের শব্দ। হল ধরে ধীর পায়ে এগিয়ে আসছে কে যেন।

.

খাইছে! ড্রাগন! দম আটকে আসতে চাইল মুসার।
তাসটা টেবিলের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিল সে। ভয় দেখা গেল রবিনের চোখেও। চোখ বড় বড়। মুখ হা।
পাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে গেছে কিশোর।
ড্রাগন আসছে! বিড়বিড় করে বলল মুসা। দরজার দিকে তাকাল।
মুসা? কিসের ড্রাগন? জিজ্ঞেস করল একটা পরিচিত কণ্ঠ।
রান্নাঘরে ঢুকলেন মুসার বাবা-মা। বৃষ্টিতে ভিজে চুপচুপে। মিসেস আমানের ভেজা চুল থেকে গাল বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছে। মিস্টার আমানের নীল শার্ট ভিজে লেপ্টে গেছে গায়ের সঙ্গে।
না, কিছু না, , জবাব দিল মুসা। একটা খেলা খেলছি আমরা।
হাত কাঁপছে ওর। টেবিলের কিনার শক্ত করে খামচে ধরে রাখল, যাতে কাপুনিটা মার চোখে না পড়ে।

যাক তবু ভাল, বাড়িতেই আছিস, মা বললেন। আমি তো ভাবলাম হঠাৎ বৃষ্টি নামতে দেখে বেরিয়ে গেছিস বাইরে, ভেজার জন্যে। ঝাড়া দিয়ে পায়ের ভেজা স্যান্ডেল খুলে ফেললেন তিনি।
টেবিলের কাছে এসে দাঁড়ালেন মিস্টার আমান। পাশের বাড়িতে কি হয়েছে জানিস? হই-চই শুনিসনি?
কি অবস্থা! মা বললেন। বেচারা হ্যামলিন…
কি হয়েছে, মা? জানতে চাইল মুসা।
হাত দিয়ে মাথা থেকে বৃষ্টির পানি ঝেড়ে ফেললেন মিস্টার আমান। ও, দেখিসনি। যা দেখে আয়গে অবস্থা। ভয়াবহ।
তোরা শুনিসইনি? ভ্রূকুটি করলেন মিসেস আমান। অবাক করলি আমাকে।
রান্নাঘরের পেছনের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল মুসা। ধাক্কা দিয়ে খুলে ফেলে বাইরে বেরিয়ে এল। তার পেছনে এল কিশোর আর রবিন।
বৃষ্টি থেমে গেছে। ভারী, কালো মেঘগুলো ছিঁড়তে আরম্ভ করেছে। মেঘের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিচ্ছে শেষ বিকেলের সূর্য। ছুঁড়ে দিয়েছে রোদের বর্শা।
ভেজা ঘাস মাড়িয়ে কাঠের বেড়াটার কাছে ছুটে গেল মুসা। হ্যামলিনদের বাড়িটা চোখে পড়তেই দাঁড়িয়ে গেল।
বাড়ি না বলে বলা ভাল বাড়ির অবশিষ্ট।
ধসিয়ে দেয়া হয়েছে।
সমস্ত জানালাগুলো ভাঙা। খড়খড়িগুলো ছড়িয়ে পড়ে আছে ভেজা মাটিতে। ধসে পড়ে গেছে একটা দেয়াল। ভাঙা ইটের ছড়াছড়ি। অর্ধেকটা ছাতও ধসে পড়েছে।
বাড়ির সামনে দিয়ে বেরোনোর রাস্তাটার ধারে পাতাবাহারের বেড়া। ভেঙে, মাড়িয়ে ভর্তা করে ফেলা হয়েছে। পাশের বাগানের ফুলগাছগুলো উপড়ানো। কাদার মধ্যে উল্টে পড়ে আছে ডাকবাক্সটা।
বাড়ির চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে নীরব দর্শকরা। সবাই হ্যামলিনের প্রতিবেশী। দুজন গম্ভীর পুলিশ অফিসারের সঙ্গে কথা বলছেন হ্যামলিন দম্পতি। দুজনেই উত্তেজিত। রাগত ভঙ্গিতে হাত নেড়ে নেড়ে কথা বলছেন।
কি হয়েছে? একজন পড়শীকে জিজ্ঞেস করল মুসা। ঝড়ে করল নাকি এ কাণ্ড?।
কি জানি, অনিশ্চিত ভঙ্গিতে জবাব দিল মহিলা। হ্যামলিনরা বলল, ওদের ওপর নাকি হামলা চালানো হয়েছিল।
চমকে গেল মুসা।
মিস্টার হ্যামলিনের সীমানায় ঢুকল তিন গোয়েন্দা। জানালার কাঁচ মাড়িয়ে তার দিকে এগোনোর সময় তার কণ্ঠ কানে এল ওদের।

কোনও ধরনের সেনাবাহিনী! যেন ঘোরের মধ্যে কথাগুলো বলছেন মিস্টার হ্যামলিন। বিমূঢ় ভঙ্গিতে মাথা নাড়ছেন। ইউনিফর্ম পরা ছিল। মধ্যযুগীয় নাইটদের মত। ভোজবাজির মত উদয় হলো, আবার ভোজবাজির মতই গায়েব।
নাইট! নিজেদের কানকে বিশ্বাস করতে পারল না তিন গোয়েন্দা।
মিসেস হ্যামলিন ফোঁপাচ্ছেন। কি ভয়ানক! ঘোড়ার পিঠে চড়ে এসেছিল ওরা। মাথায় লোহার হেলমেট। মুখ দেখতে পাইনি ওদের। ওরা...ওরা... কথা শেষ করতে পারলেন না তিনি।
গলা জড়িয়ে ধরে স্ত্রীকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন মিস্টার হ্যামলিন।
বাড়ি আক্রমণ করেছিল ওরা, পুলিশকে বললেন তিনি। মনে হলো যেন সিনেমা। শুনলে হয়তো পাগল ভাববেন আমাকে। কিন্তু সত্যি বলছি। ঘোড়ার পিঠে চড়ে নাইটেরা এসে আমাদের বাড়ি আক্রমণ করেছিল।
কুঁকড়ে গেল মুসা। গলা শুকিয়ে গেছে। ঢোক গিলতে পারছে না। পা দুটো। হঠাৎ করেই দুর্বল লাগতে শুরু করল।
সিনেমা নয় এটা। জানে সে।
এটা ওদের খেলার ফল। ভয়ঙ্কর তাসের খেলা।
খেলার মধ্যে সে ওর সেনাবাহিনী পাঠিয়েছিল প্রতিবেশীর দুর্গ আক্রমণ করতে।
আর হ্যামলিনরা আক্রান্ত হয়েছে একদল ঘোড়সওয়ার হেলমেট পরা নাইটদের দ্বারা।
হঠাৎ করেই দুর্বল লাগতে লাগল মুসার। দুই হাতে মুখ ঢাকল। পেটের ভেতর পাক দিচ্ছে। সেটা থামার অপেক্ষা করতে লাগল।
কি করবে সে? নিজেকে প্রশ্ন করল। কি ব্যাখ্যা এর?
হ্যামলিনদের সঙ্গে তর্ক করছে পুলিশ অফিসারেরা। বিশ্বাস করছে না।
কিন্তু মুসা করছে। তার মনে হচ্ছে পুরো দোষটা তার। তাসের খেলা খেলে এই সর্বনাশ করেছে পড়শীদের।
পাতাবাহারের একটা ঝাড়ের দিকে নজর পড়তেই ধড়াস করে উঠল তার বুক। ঘন ছায়ার ভেতর থেকে আলোয় বেরিয়ে এল একজন লোক।
মিস্টার কাকু-কাকু!
চোখে চোখ আটকে গেল দুজনের। শীতল কুটিতে কঠোর হয়ে আছে কাকু-কাকুর চেহারা।
এক পা পিছিয়ে গেল মুসা। প্রয়োজন হলেই যাতে দৌড় দিয়ে বাড়ি চলে যেতে পারে।
দ্রুত এগিয়ে এল কাকু-কাকু। লম্বা লম্বা পায়ে। ভেজা ঘাস মাড়িয়ে। পেছনে বাতাসে উড়ছে তার হলুদ বর্ষাতির কানা। বিশাল ভুঁড়ি নাচছে হাঁটার তালে তালে।

কিছু বলবে নাকি আমাকে, ইয়াং ম্যান? স্থির, কঠিন দৃষ্টিতে মুসার দিকে তাকিয়ে কর্কশ কণ্ঠে বলল কাকু-কাকু। আমার হারানো তাসের বাক্সটা সম্পর্কে?
তারমানে কাকু-কাকু জানে সব। তাস খেলা হয়েছে বলেই যে হ্যামলিনদের বাড়িটা ধসে পড়েছে, জানে।
.
কাকু-কাকুর কুতকুতে গোল চোখজোড়া যেন লেজার রশ্মির মত এসে বিদ্ধ করতে লাগল মুসার চোখকে। সাদা গোঁফের নিচে ঠোঁট দুটো নড়ছে। বিড়বিড় করে বলছে কিছু। গম্ভীর কুটিতে গভীর ভাঁজ পড়েছে চামড়ায়।
জোরে ঢোক গিলল মুসা। সত্যি কথাটা বলতে পারছে না। ভীষণ বিপদে পড়ে যাবে তাহলে। বলতে পারছে না তাসগুলো ওদের কাছে আছে।
হ্যামলিনের বাড়িটা ধ্বংসের জন্যে ওরাই দায়ী, সেটাও বলার উপায় নেই। বড় অনুশোচনা হচ্ছে।
কাকু-কাকুর পেছনে দাঁড়িয়ে ঘন ঘন মাথা নাড়ছে পুলিশ অফিসারেরা। প্রতিবেশীরা জটলা করছে এখানে ওখানে। নিচু স্বরে কথা বলছে। সবাইই মোটামুটি অবাক, এটুকু বোঝা যাচ্ছে।
না, আমার কিছু বলার নেই, কাকু-কাকুকে বলে দিল মুসা। গলা কাঁপছে! বুকের মধ্যে এত জোরে লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ডটা, মনে হচ্ছে গলার কাছে উঠে চলে আসবে। কাশি দিল সে। বড় করে দম নিল। নাহ, কিছু বলার নেই।
তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে ভেজা পিচ্ছিল ঘাসের ওপর দিয়ে দৌড়ানো শুরু করল।
পালাতে চায়। ব্যাপারটা নিয়ে শান্ত মাথায় ভাবতে চায়। কি করা উচিত বোঝা দরকার।
রবিন কিংবা কিশোরের জন্যে অপেক্ষা করল না সে। ফিরে তাকাল না ওদের দিকে।
নিজের বাড়ির নিরাপত্তার মধ্যে পৌঁছানোর আগে থামলও না। সোজা ওপরতলায় নিজের শোবার ঘরে এসে ঢুকল। দরজা লাগিয়ে দিল।
জোরে জোরে হাঁপাচ্ছে। ঠাণ্ডা ঘামে ভিজে গেছে সারা দেহ। ধপ করে বসে পড়ল বিছানার কিনারে। মাথা ঘুরছে। বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করছে।
চোখ বুজল। চোখের সামনে ভেসে উঠল তাসের বাক্সটা। ওপরে লেখা: ভয়াল তাস!
*
সে-রাতে কাকু-কাকুর স্বপ্ন দেখল সে।
সাদা পোশাক পরে আছে কাকু-কাকু। সাদা সুট, সাদা শার্ট, সাদা টাই। সব সাদা। ওর চুল আর গোঁফের মত সাদা।

হাত তুলল সে। গম্ভীর সম্মোহনী ভাষায় বলল: ভয় পাও, মুসা! ভীষণ ভয়!
তারপর ঘুরে দাঁড়াল দরজার দিকে। ট্রাফিক পুলিশের মত হাত তুলে সঙ্কেত দিতে লাগল।
স্বপ্নের মধ্যেই ধীরে ধীরে বিছানায় উঠে বসল মুসা। নিজের বিস্মিত চেহারা নিজেই দেখতে পেল। স্বপ্নে সবই সম্ভব।
দরজার বাইরে ভারী পায়ের শব্দ শোনা গেল। নানা রকম শব্দ। ঘোৎ-ঘোৎ চিৎকার, জোরাল গোঙানি।
জোরে জোরে হাত নাড়তে শুরু করল কাকু-কাকু। মাথাটাকে পেছনে ছুঁড়ে দিয়ে মুখ ওপরে তুলে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। ঝাঁকি খেতে থাকল তার কাঁধ ছোঁয়া চুল।
গটমট করে ঘরে ঢুকল ঝকঝকে ধাতব বর্ম পরা একজন নাইট। ঢোকার সময় তার চওড়া কাঁধ ঢাকা বর্ম বাড়ি খেল দরজার সঙ্গে।
খাইছে!...এই, যান, যান! চিৎকার করে উঠল মুসা।
স্বপ্নের মধ্যেও বুঝতে পারছে সে, স্বপ্ন দেখছে। গলা চিপে ধরেছে যেন ভয়। বর্ম পরা নাইটের পেছন পেছন আরও কতগুলো প্রাণীকে ঢুকতে দেখে তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠল সে।
গথ আর ক্রেল। লম্বা নাকওয়ালা বামন প্রাণী। মুখোশ পরা নাইট। শুয়োরমাথা মানবদেহী প্রাণী।
অদ্ভূত ভঙ্গিতে পেছনে মাথা ঝাঁকি দিতে দিতে চেঁচাতে শুরু করল প্রাণীগুলো। কোনটা লম্বা ডাক ছাড়ছে, কোনটা গোঙাচ্ছে, কোনটা বা গর্জন করছে জানোয়ারের মত।
এত চিৎকার! এত শব্দ! এত হট্টগোল! কান চেপে ধরল মুসা।
কিন্তু মনে শব্দ ঢোকা কোনমতে আটকাতে পারল না। তার ওপর মারামারি বাধিয়ে দিল প্রাণীগুলো। চেঁচামেচি আর হট্টগোল বেড়ে গেল আরও বহুগুণ।
বড় বড় ছুরি আর তরোয়াল তুলে একে অন্যকে লক্ষ্য করে কোপ মারতে শুরু করল ওরা। ধস্তাধস্তি করছে। বর্মধারীরা বুকের সঙ্গে বুক ঠেকিয়ে ঠেলে সরানোর চেষ্টা করছে একে অন্যকে। তরোয়ালের আঘাত ঠেকাতে বর্ম বাড়িয়ে ধরছে সামনে।
ধস্তাধস্তি করতে করতে বিছানার ওপর এসে পড়ছে ওরা। তরোয়ানোর আঘাতে পর্দা কেটে যাচ্ছে। ডেস্কে রাখা জিনিসপত্র সব ছড়িয়ে ফেলছে মেঝেতে।
যুদ্ধরত একজন ক্রেল ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে গিয়ে জানালার কাঁচের ওপর ফেলল একজন মুখোশধারী নাইটকে। ঝনঝন করে হাজারও টুকরো হয়ে ভেঙে ছড়িয়ে পড়ল কাঁচ। দেয়ালের কাগজ চিরে দিল তরোয়ালের আঘাত।

বেরোন! বেরোন! বেরোন! গানের সুরে চিৎকার করে উঠল মুসা।
বেরোল না ওরা।
বেরোন! বেরোন! বেরোন! আবার চিৎকার করে উঠল সে। চিৎকার করতে করতে জেগে গেল। থরথর করে কাঁপছে। সারা শরীর ঘামে ভেজা। শার্টের পেছনটা ভিজে পিঠের সঙ্গে আটকে গেছে।
বিছানায় বসে রইল সে। পুরো সজাগ। জানালার পর্দা ভেদ করে ঘরে আসছে সকালের কমলা রোদ।
জানালার কাঁচ! না, ভাঙেনি তো! ভাঙেনি!
ওয়ালপেপারও কাটেনি।
স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে পা রাখল বিছানার বাইরে। উঠে দাঁড়াল।
কিন্তু মেঝের দিকে চোখ পড়তেই খাড়া থাকতে পারল না আর। ধপ করে বসে পড়ল বিছানায়। সমস্ত কার্পেটে কাদা। কাদামাখা অসংখ্য পায়ের ছাপ। ছোট, বড়, নানা রকম।
নিজের অজান্তেই একটা অস্ফুট চিৎকার বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে।
নিশ্চয় তাসের কাণ্ড! বিড়বিড় করল সে। দুই হাতে শক্ত করে নিজের বুক জড়িয়ে ধরল। কাঁপুনি বন্ধ করার চেষ্টা করল।
সর্বনেশে তাসের খেলা! আর কিছু না!
ওই তাসগুলোর কবল থেকে মুক্তি দরকার। যতক্ষণ ঘরে আছে ওগুলো, এই অত্যাচার চলতেই থাকবে। বাঁচতে চাইলে কাকু-কাকুকে তার জিনিস ফিরিয়ে দিয়ে আসা দরকার।
নিজেকে টেনে তুলল আবার। খাড়া হলো।
ঠিক করল, এখনই ফিরিয়ে দিয়ে আসবে। না দেয়া পর্যন্ত নিরাপদ নয়। তাড়াতাড়ি কাপড় বদলে নিয়ে দিয়ে আসবে গিয়ে এখনই।
মুখোমুখি হতে ভয় পাচ্ছে। সামনের সিঁড়ির ওপর রেখে এলেও হয়।
হ্যাঁ। তা-ই করবে। তাসের খেলা
তার সঙ্গে কথা বলার কোন দরকার নেই। চুরি করা যে কত বড় অপরাধ, সেই উপদেশ শোনারও প্রয়োজন নেই।
ওসব তার জানা। অন্যের কাছ থেকে সদুপদেশ নেয়া লাগবে না। তা ছাড়া সে নিজে চুরি করেনি। তাস খেলতে গিয়ে অন্যের বাড়িঘর ধ্বংসটাও ইচ্ছে করে করেনি। কি করে জানবে, তাস খেলা বাস্তব হয়ে ওঠে! নিজের চোখে না দেখলে পাগলেও বিশ্বাস করবে না। সে নিজেও করত না। অন্যায় একটাই করেছে, মিথ্যে কথা বলে। পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাসগুলো দিয়ে দেয়া উচিত ছিল কাকু-কাকুক। দিয়ে দিতও। কাকু-কাকুর ভয়েই দিতে পারেনি। দিতে গেলে ঠিকই চোর বলত।

একটা সিদ্ধান্ত নিতে পেরে অনেকটা শান্ত হয়ে এল সে। ভাল লাগছে এখন। কাকু-কাকুর মুখোমুখি না হয়ে কি ভাবে ফেরত দেবে, সেটাও ঠিক করে ফেলল। জিনসের প্যান্ট আর একটা টি-শার্ট পরে নিল। জুতোর ফিতে বাঁধতে গিয়ে দেখে হাত কাঁপছে। কই? শান্ত হলো কোথায়?
বড় করে দম নিল।
মুসা, সব ঠিক হয়ে যাবে, নিজেকে বোঝাল সে। তাসগুলো শুধু ফিরিয়ে দিয়ে এসো। আবার সব স্বাভাবিক হয়ে যাবে।
কিন্তু তাসগুলো রাখল কোথায়?
ড্রেসারের ওপর।
ড্রেসারের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।
কিন্তু তাসগুলো নেই সেখানে।
.
ড্রেসারের ওপর জিনিসপত্রের অভাব নেই। এলোমেলো। এক মহা বিশৃঙ্খল অবস্থা। তার মধ্যেই খুঁজতে শুরু করল সে। পেল না।
হাঁটু গেড়ে বসে ড্রেসারের নিচে খুঁজল। সেখানেও নেই তাসগুলো।
নিচতলা থেকে কথার শব্দ আসছে। রবিনের হাসি চিনতে পারল। চেয়ার টানার শব্দ হলো। সকাল সকালই চলে এসেছে। নিশ্চয় তাসের নেশায়।
এতক্ষণে মনে পড়ল, তাসগুলো নিচেই ফেলে এসেছে। নিচতলায়। রান্নাঘরের টেবিলের ওপর।
মাথা নাড়তে নাড়তে উঠে দাঁড়াল। ঘর থেকে বেরিয়ে দ্রুত এগোল সিঁড়ির দিকে।
রান্নাঘরে ঢুকে দেখল টেবিলে বসে আছে কিশোর আর রবিন। তাসগুলোকে আগের মত চার ভাগে ভাগ করেছে আবার কিশোর।
ঠিকই অনুমান করেছিল মুসা। তাসের নেশাতেই অত সকালে হাজির হয়ে গেছে কিশোর আর রবিন।
কিন্তু মা-বাবা কোথায়? ঘুম থেকেই ওঠেনি এখনও? নাকি বাইরে বেরিয়ে গেছে?
বাইরেই গেছে হয়তো। যাবার কথা আছে।
তোমার জন্যেই বসে আছি আমরা, রবিন বলল। তোমার ঘুম ভাঙাতে চাইনি।
মার সঙ্গে দেখা হয়েছে? মুসা জিজ্ঞেস করল।
মাথা ঝাঁকাল রবিন। আঙ্কেল-আন্টি দুজনেই বাইরে গেছেন। কি নাকি জরুরী কাজ আছে।
তুমি জলদি জলদি নাস্তা খেয়ে নাও, কিশোর বলল। তাস নিয়ে শাফল করতে শুরু করল সে।

আবার খেলা! চিৎকার করে উঠল মুসা। বাক্সে ঢোকাও। কাকু-কাকুকে ফেরত দিয়ে আসব। এখনই।
এখনই? ভুরু কুঁচকে গেল কিশোরের। খেলাটা শেষ না করেই? মাত্র তো অর্ধেক খেলোম।
মাত্র একটা দুর্গকে ধ্বংস করেছ, রবিন বলল। জিততে আরম্ভ করেছ। কিন্তু আমাদেরকে, অর্থাৎ গথ আর ক্রেলদের তোমাকে ধরার একটা সুযোগ দেয়া উচিত।
পারব না! মুসা বলল। তোমাদের হলোটা কি? খেলাটা ভয়ানক বিপজ্জনক। আমাদের পাশের বাড়িটার অবস্থা দেখনি? কাকু-কাকু তো সাবধানই করে দিয়ে গেছে আমাদের। বলেছে…
সেটাই তো দেখতে চাইছি, কিশোর বলল, সত্যি কথা বলেছে কিনা। ওর রূপকথা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে না আমার। করতে হলে আরও প্রমাণ চাই। ছোটদের ঘৃণা করে সে। ভাল করেই জানো।
আমাদের ভয় দেখানোর জন্যেও বানিয়ে বলতে পারে, রবিন বলল। তুমি তার কথা বিশ্বাস করে ভয় পেয়েছ, মুসা। তাসের চরিত্র কখনও বাস্তব হতে পারে না। তোমাকে বোকা বানিয়েছে।
কিন্তু…কিন্তু… কথা খুঁজে পাচ্ছে না মুসা। হ্যামলিনদের বাড়িটা?
তুফানে ধসে পড়েছে, রবিন বলল। ঝড়ে এরচেয়ে অনেক বেশি ক্ষতি হয় ঘরবাড়ির।
কিন্তু বিদ্যুৎ আঁকা তাসটা আমি তুলে নেয়ার আগে ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয়নি! তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল মুসার কণ্ঠ।
কিশোর আর রবিন দুজনেই হেসে উঠল।
তারমানে ওসব ভুয়া কথা সত্যি বিশ্বাস করে বসে আছ তুমি? কিশোর বলল।
বোসো, রবিন বলল। অকারণে সময় নষ্ট করছ। এসো, শেষ করে ফেলি খেলাটা।
দুজনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে মুসা। খেলাটা চালিয়ে যাবে, মনস্থির করে ফেলেছে ওরা। কিশোর যখন একবার ঠিক করেছে খেলবে, খেলবেই। কোন কথা বলেই থামানো যাবে না ওকে।
বেশ। বিড়বিড় করে আরও কি বলল মুসা, বোঝা গেল না। তাসের খেলা
রেফ্রিজারেটর থেকে কমলার রসের বোতল বের করে গ্লাসে ঢেলে নিল সে। ফিরে তাকাল কিশোর আর রবিনের দিকে। এক গেম খেলব আমি। মাত্র একটা গেম। ব্যস। তারপর কিছু ঘটুক বা না ঘটুক, তাসগুলো আমি ফেরত দিয়ে আসব। কাকু-কাকুকে।
তাস শাফল করে টেবিলে উপুড় করে রাখল কিশোর।

একটা তাস টেনে নিতে হাত বাড়াল রবিন। তিনজনেই সামনের দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে দিয়েছে কি ওঠে দেখার জন্যে।
ঘাড়ের পেছনে শিরশির করছে মুসার।
তাস ওল্টানোটা কি ঠিক হচ্ছে? ভুল করছে না তো আবার?
তাস টেনে নিল রবিন।
উল্টে ফেলল।
চিৎকার করে উঠল মুসা।

.

রবিনের হাতের তাসটায় ড্রাগন আঁকা।
মাথা তুলে রেখেছে ড্রাগনটা। গাঢ় রূপালী রঙ। লম্বা ঘাড়টা বাকা করে রেখেছে আক্রমণের ভঙ্গিতে। পিঠের মেরুদণ্ড বরাবর বড় বড় মারাত্মক কাটা খাড়া হয়ে আছে। প্রচণ্ড রাগে চোখ দুটো জ্বলছে। বুকের আঁশগুলোকে মনে হচ্ছে। ধাতব বর্মের মত। বুঝিয়ে দিচ্ছে যেন কোন বাধাই বাধা নয় ওটার কাছে। আধ ছড়ানো অবস্থায় রয়েছে কাঁধের কাছের ডানা দুটো।
লম্বা কুমিরের মত মুখটা হাঁ করে আছে গর্জনের ভঙ্গিতে। মুখের ভেতরে অসংখ্য ধারাল দাঁতের সারি। নাকের ফুটো দুটো ছড়ানো। কমলা রঙের আগুন বেরোচ্ছে নিঃশ্বাসের সঙ্গে।
হাঁ করে তাসটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে তিনজনে।
রবিন, একটা ভাগ্যতাস তুলে নাও। আরেক গাদা তাস রবিনের দিকে ঠেলে দিল কিশোর।
এক মুহূর্ত দ্বিধা করল রবিন। তারপর ভাগ্যতাসের প থেকে সবচেয়ে ওপরের তাসটা তুলে নিয়ে ওল্টাল। দুটো কালো রঙের তীর এমন করে বাঁকা। করে আঁকা হয়েছে, ফলার মাখা দুটো পরস্পরের দিকে মুখ করে আছে।
এর মানে কি? কিশোরকে জিজ্ঞেস করল রবিন।
এটা হলো নিয়ন্ত্রক তাস, কিশোর বলল। এর সাহায্যে চরিত্রগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে তুমি। তুমি আর এখন গথ নও। ড্রাগনটাকে চালু করো।
হ্যাঁ, করছি।
চোখ বুজল মুসা। স্বপ্নের দৃশ্যগুলো ভেসে উঠল আবার মনের পর্দায়। শোবার ঘরে চিৎকার-চেঁচামেচি আর গর্জন করতে থাকা, কুৎসিত ভয়ঙ্কর জানোয়ারগুলোর চেহারা স্পষ্ট দেখতে পেল।
নাহ, খেলাটা চালিয়ে যেতে ভাল লাগছে না তার।
চোখ মেলে দেখল, পাশাগুলো রবিনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে কিশোর। শক্তি সঞ্চয় করো। দেখাও তোমার ড্রাগনটা কত শক্তিশালী! নাক দিয়ে খোতখেত শব্দ করল

সে। দুই-এক পয়েন্ট পেয়ে বোনো না আবার।
পাশা চালল রবিন। চারটেই গড়িয়ে দিল একসঙ্গে। দুটো ছক্কা, একটা পচ, একটা চার।
দারুণ! চমৎকার! চিৎকার করে টেবিলে কিল মারল কিশোর। সাংঘাতিক শক্তিশালী করে তুলেছ ড্রাগনটাকে!
ড্রাগনের শক্তিশালী হবার কথা শুনে পেটের মধ্যে খামচি দিয়ে ধরল মুসার।
এখনও আমি রাজা, তাই না? মিনমিন করে জিজ্ঞেস করল সে। নাইটেরা এখনও আমার দখলে?
মাথা ঝাঁকাল কিলোর।
বেশ, মুসা বলল। আমি তাহলে আমার সেনাবাহিনী পাঠাচ্ছি ড্রাগনটাকে ধ্বংস করার জন্যে।
পাশাগুলোর জন্যে হাত বাড়াল সে।
হাতটা সরিয়ে দিল কিশোর। এখন আমার পালা। রবিনের দিকে তাকিয়ে হাসল। ড্রাগনের সঙ্গে হাত মেলানোর সময় হয়েছে ক্রেলের।
মানে? বুঝতে পারল না মুসা।
ক্রেলেরা ভীষণ চালাক, কিশোর বলল। খুব সাবধানী। কখন কোন পক্ষ নিয়ে খেলতে হবে, ভাল করেই জানে।
কিন্তু এর মানেটা কি?
এত সহজ কথাটা বুঝলে না? আমি আমার শক্তি ড্রাগনের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলব।
সাংঘাতিক হবে তাহলে? চিৎকার করে উঠল রবিন। আমাদের মিলিত শক্তির কাছে পরাজিত হতে বাধ্য হবে দুষ্ট রাজা, সে যত শক্তিশালীই হোক।
কাজটা কি ঠিক হলো? জিজ্ঞেস করল মুসা।
না হওয়ার কি হলো? খেলা খেলাই।
তাসের গাদা থেকে সবচেয়ে ওপরের তাসটা টেনে নিল সে। ওল্টাল। দাড়িওলা একটা এলফের ছবি। বাদামী অ্যাপ্রন পরে আছে কল্পিত বামন-মানবের মত প্রাণীটা। হাতে মাছ ধরার জাল।
একজন এলফ জেলে, বলে পাশাগুলোকে গড়িয়ে দিল কিশোর। মুসার দিকে তাকিয়ে বলল, ভীষণ বিপদে পড়তে যাচ্ছ তুমি, রাজা। সেনাবাহিনী হিসেবে লড়াই করার জন্যে দুই হাজার এলফ জেলেকে তার পক্ষে পেয়ে গেছে ক্রেল। নিঃশব্দে তোমার নাইটদের কাছে গিয়ে মাথার ওপর জাল ফেলবে এলফরা। ওদের পরাস্ত করে তোমার ওপর হামলা চালাবে। বাঁচাটা কঠিন হয়ে গেছে তোমার জন্যে।
এত্ত সহজ না! আবার খেলায় ফিরে আসতে শুরু করেছে মুসা। তাসের খেলা।

এতই সহজ, জবাব দিল কিশোর।
তারমানে আমাকে আটকে ফেলা হয়েছে?
হ্যাঁ, তুমি এখন ক্রেলের হাতে বন্দি, ঘোষণা করল কিশোর। পাশাগুলো রবিনের দিকে ঠেলে দিল। রাজা এখন বন্দি। ড্রাগন আসছে তাকে খতম করার জন্যে।
না না, দাঁড়াও! দাঁড়াও! চিৎকার করে উঠল মুসা।
কিন্তু ততক্ষণে পাশা গড়িয়ে দিয়েছে রবিন।
রাস্তার দিক থেকে গর্জন শোনা গেল।
খানিক পরেই মহিলাকণ্ঠের চিৎকার।
গাড়ির চাকার তীক্ষ্ণ আর্তনাদ। পরক্ষণে সংঘর্ষের শব্দ।
আবার শোনা গেল খেপে ওঠা জান্তব গর্জন। আগের চেয়ে জোরে। আরও কাছে থেকে।
কিশোর আর রবিনের চেহারায় বিস্ময়।
মনেপ্রাণে দোয়া চাইতে শুরু করল মুসা, ড্রাগনটা যাতে জ্যান্ত হয়ে উঠতে না পারে।

.

লাফ দিয়ে উঠে জানালার দিকে দৌড় দিল মুসা।
হই-হট্টগোল শুরু হয়েছে।
আরেকটা গাড়ি থামার শব্দ হলো। ব্রেক কষার ফলে কর্কশ আর্তনাদ করে উঠল চাকা।
শব্দ শুনছে, কিন্তু বাড়ির পেছনটা চোখে পড়ছে না বলে কিছু দেখতে পাচ্ছে না।
ঘুরে সামনের দরজার দিকে দৌড় দিল মুসা। পেছনে ছুটল কিশোর আর রবিন।
ঠেলা দিয়ে পাল্লাটা খুলে ফেলল মুসা। ভয়ঙ্কর আরেকটা গর্জন শুনতে পেল।
এ রকম শব্দ জীবনে শোনেনি সে।
বাঘ-সিংহের ভারী গলার কর্কশ গর্জন নয়। এমনকি হাতির কানফাটা চিৎকারও নয়।
শব্দটা কেমন বোঝানো খুব কঠিন। এ শব্দটা শুরু হচ্ছে মেঘের চাপা গুড়গুড় ডাকের মত। পেটের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসার সময় দ্রুত বেড়ে যায়। মাটি কাঁপতে থাকে। বাড়তেই থাকে, বাড়তেই থাকে। ভারী এই গমগমে গর্জনের সঙ্গে মিলিত হয় শিসের মত তীক্ষ্ণ একটানা শব্দ।
মড়মড় শব্দ শোনা গেল। একটা গাছ ভেঙে পড়ল।
মানুষের চিৎকার-চেঁচামেচি বাড়ছে।
মুসাদের সামনের লনে নেমে এল তিন গোয়েন্দা। দৌড় দিল রাস্তার দিকে। মোড়ের কাছে পৌঁছেই থমকে দাঁড়াল। রাস্তার ওপর মস্ত এক ছায়া পড়েছে।

ড্রাগনটাকে দেখতে পেল মুসা। ছায়ার ওপর সরে আসছে।
টাওয়ারের মত উঁচু। কাটা বসানো। বদমেজাজী। অবিকল তাসের গায়ে আঁকা ছবিটার মত।
আমি...আমি বিশ্বাস করতে পারছি না! চিৎকার করে উঠল মুসা।
কাঁটা বসানো মেরুদণ্ডটার দুপাশে দুটো রূপালী ডানা। ছড়িয়ে রেখেছে। জাহাজের পালের মত। হাঁটার সময় ওই ডানা লেগে ছিঁড়ে যাচ্ছে বিদ্যুতের তার। ঝরঝর, ছরছর করে স্ফুলিঙ্গ ছিটাচ্ছে বিদ্যুৎ।
বিশাল মাথাটা কাত করে আবার প্রচণ্ড গর্জন করে উঠল দানবটা। থপ থপ শব্দ তুলে ঝোলা ভারী দেহটা নিয়ে দুলে দুলে সামনে এগোচ্ছে। ধাক্কা লেগে মাটিতে ভেঙে পড়ছে বিদ্যুতের খুঁটি।
মস্ত একটা পা উঁচু করল ড্রাগনটা। একটা গাড়ির ওপর ফেলল। দিয়াশলাইয়ের বাক্সের মত চ্যাপ্টা হয়ে গেল গাড়িটা।
লোকে চিৎকার করতে করতে এদিক ওদিক ছোটাছুটি করছে। বাচ্চারা কাঁদছে। চেঁচাচ্ছে। নিয়ন্ত্রণ হারাল একটা গাড়ি। চাকার আর্তনাদ আর ইঞ্জিনের গর্জন তুলে এলোপাতাড়ি ছুটে গিয়ে ঢুকে পড়ল একটা বাড়ির লনে।
মুসার পাশে দাঁড়িয়ে হাঁ করে ড্রাগনটার দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। সিনেমা হলে গডজিলার ছবি দেখছে। যেন। বিড়বিড় করে বলল, ড্রাগন...একটা সত্যিকারের ড্রাগন!
আমরা ওটাকে এখানে নিয়ে এসেছি, কিশোরের হাত খামচে ধরল মুসা। ওটাকে সরানোও আমাদেরই দায়িত্ব। কিছু একটা করা দরকার। জলদি।
ঘুরে তাকাল রবিন। চোখেমুখে আতঙ্ক। করা তো দরকার। কিন্তু কি?
ইয়ে...
মুসার কথা শেষ হওয়ার আগেই বলে উঠল কিশোর, এক কাজ করা যায়।
আবার গর্জন করে উঠে আরেকটা গাড়ি পায়ের নিচে ফেলে ভর্তা করল ড্রাগন।
জলদি... তাগাদা দিল কিশোর। বাড়ির ভেতরে চলো। লন ধরে দৌড়ানো শুরু করল সে।
শেষবারের মত ড্রাগনটার দিকে তাকাল আরেকবার মুসা। নাক দিয়ে আগুন বের করছে তখন ওটা। তারপর দৌড় দিল কিশোর আর রবিনের পেছন পেছন। দৌড়াতে দৌড়াতেই জিজ্ঞেস করল, তোমার উদ্দেশ্যটা কি?
রান্নাঘরে ঢোকার আগে আর জবাব দিল না কিশোর। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, তাস! ড্রাগন আঁকা তাসটা দরকার। ওটাকে বাক্সে ঢুকিয়ে দিতে পারলেই হয়তো ড্রাগনটাও চলে যাবে।

হ্যাঁ হ্যাঁ! একমত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল মুসা। ঠিকই বলেছ। কাল রাতের কথা মনে আছে? তাসটা বাক্সে রাখতেই ঝড়-বৃষ্টি সব থেমে গেল।
জানি না কি ঘটবে, অনিশ্চিত ভঙ্গিতে জবাব দিল কিশোর। তবে কাজ হলেও হতে পারে।
বিকট শব্দে আছড়ে পড়ল কি যেন। চমকে গেল তিনজনেই। আরেকটা গাছ পড়ল নাকি? এত কাছে! যেন ওদের জানালাটার বাইরেই।
কোথায় ওটা? চিৎকার করে উঠল মুসা। ড্রাগনের তাসটা কোনখানে?
চিত করে রেখেছিলাম আমি ওটা, রবিন বলল। মনে পড়ে? আমার সামনে টেবিলের ওপর রেখেছি।
খুঁজে না পেয়ে হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল কিশোর। এখানে নেই ওটা!
হাল ছাড়ল না মুসা। তাসগুলোর মধ্যে খুঁজতে শুরু করল। বুঝল, কিশোর ঠিকই বলেছে।
ড্রাগনের তাসটা উধাও।
তারমানে একটা জিনিস বোঝা যাচ্ছে, যাকেই ডেকে আনা হচ্ছে, ফিরে যাবার সময় মুক্ত হয়ে যাচ্ছে ওটা। তাতেই সম্ভবত উধাও হয়ে যাচ্ছে তাসগুলো, কিশোর বলল।
এখন? এবার কি করা? গুঙিয়ে উঠল রবিন।
বাইরের হট্টগোল বেড়েই চলেছে। সাইরেনের শব্দ ওঠা-নামা করছে। মড়মড় করে কাঠ ভেঙে পড়ার শব্দ হলো।
মেরুদণ্ডে শীতল শিহরণ বয়ে গেল কিশোরের। টেবিলে পড়ে থাকা একটা তাসের দিকে তাকিয়ে থেকে আরেকটা বুদ্ধি এল মাথায়।
মুখোশ পরা নাইট! চেঁচিয়ে উঠল সে।
হাঁ করে ওর দিকে তাকিয়ে রইল মুসা আর রবিন।
নাইট দিয়ে কি হবে? জিজ্ঞেস করল মুসা।
খাবলা দিয়ে টেবিল থেকে পাশাগুলো তুলে এনে মুসার দিকে বাড়িয়ে ধরল কিশোর, নাও, চালো। নাইটদের এক বিশাল বাহিনী দরকার আমাদের। রূপকথার গল্পে এ ধরনের সৈন্যরাই লড়াই করে ড্রাগন তাড়াত।
কিন্তু... পাশাগুলোর দিকে অনিশ্চিত ভঙ্গিতে তাকিয়ে থেকে বলতে গেল মুসা।
ওকে কথা শেষ করতে দিল না কিশোর। চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি? যত বেশি সম্ভব পয়েন্ট জোগাড় করতে হবে এখন আমাদের। প্রচুর শক্তি দরকার।
সাহস জোগানোর জন্যে মুসার পিঠে চাপড় মারল কিশোর। গুড লাক, মুসা। চালো। সবগুলোতেই ছক্কা তোলো। জলদি!

বাইরে আবার গর্জন। বিদ্যুতের চড়চড়ানি। রাস্তায় আতঙ্কিত মানুষের চিৎকার চেঁচামেচি।
পাশাগুলো হাতের তালুতে নিয়ে চেপে ধরল মুসা। হাতের তালু খুলে ঝাঁকাল। চোখ বুজল। প্রার্থনা করতে লাগল চারটে ছক্কার জন্যে।
হাতটা নামাল টেবিলের ওপর। আস্তে করে গড়িয়ে দিল পাশাগুলো।
.
দূর! গুঙিয়ে উঠল মুসা।
তিনটে এক আর একটা দুই।
আবার চালো! আবার চালো! তাগাদা দিল কিশোর। চেষ্টা করে যাও, মুসা। তিনটে চাল আছে হাতে।
পাশাগুলোর জন্যে হাত বাড়াল মুসা। বাইরে একটা শব্দ থামিয়ে দিল ওকে। টেবিলের কাছ থেকে সরে এসে দৌড় দিল সামনের জানালার দিকে।
খাইছে! বিড়বিড় করে বলল সে। সামনের রাস্তায় মুখোশ পরা পাঁচজন নাইট চোখে পড়ল। একসঙ্গে হাঁটছে। মার্চ করে। ধীরে ধীরে। এক হাতে ধরা বর্মগুলো সামনে বাড়ানো। অন্য হাতের তরোয়াল খাড়া করে ধরে রেখেছে ওপর দিকে।
রোদে চকচক করছে পরনের ধাতব বর্ম। ড্রাগনের ছায়ায় গিয়ে দাঁড়াল। গভীর ধূসর ছায়াতে মিশে গেল ওদের বর্ম পরা দেহ।
এ ক'জনকে দিয়ে আর কি হবে, পাশ থেকে বিড়বিড় করল কিশোর। চারটেতেই যদি ছক্কা উঠত, তাহলেও নাহয় একটা কথা ছিল...
কথা শেষ হলো না তার।
তিনজনেই দম আটকে ফেলল। একসঙ্গে দুজন নাইটকে কামড়ে ধরে তুলে নিয়েছে ড্রাগনটা। মাথাটাকে ঝাড়া দিয়ে ছুঁড়ে দিল একপাশে। একটা বাড়ির ছাতের ওপর দিয়ে উড়ে গেল দেহ দুটো।
আবার মুখ নামাল ক্ষিপ্ত জানোয়ারটা। রাগে গর্জন করে মুখ দিয়ে তিনবার আগুন নিক্ষেপ করল বাকি তিনজন নাইটকে লক্ষ্য করে।
আতঙ্কে চিৎকার করতে করতে তরোয়াল, বর্ম সব ফেলে দিয়ে দৌড় মারল নাইটেরা। নিজেদের গায়ের বর্মের ঝনঝনানিতে ঢাকা পড়ে গেল ওদের চিৎকার।
ড্রাগনটাই জিতছে, বিড়বিড় করে বলল রবিন।
আতঙ্কে জমে গিয়ে দেখল ওরা, ড্রাগনটা এগিয়ে আসছে মুসাদের বাড়ির দিকে। মাথাটা বার বার ঝুঁকি দিয়ে পেছনে টেনে নিচ্ছে আক্রমণের ভঙ্গিতে।
ঢুকে পড়ল ওটা সামনের লনে। বিশাল ছায়ায় ঢাকা পড়ে গেল বাড়িটা।
সর্বনাশ! এদিকেই তো আসছে! ভয়ে দম আটকে আসছে মুসার। আমাদেরকে ধরতে আসছে!

আকাশে ভাসমান মেঘ যেমন সচল ভাবে ছায়া ফেলে ঢেকে দেয়, তেমনি ভাবে মুসাদের বাড়িটাকে ঢেকে দিয়েছে ড্রাগনের ছায়া। হঠাৎ শীত করতে লাগল ওদের। যেন সূর্যের সমস্ত উত্তাপ শুষে নিয়েছে ড্রাগনের ছায়া।
ঘুরে দাঁড়াল মুসা। জোর করে সরে এল জানালার কাছ থেকে।
কাঁপতে কাঁপতে দৌড় দিল রান্নাঘরের দিকে।
সামনের আঙিনায় ড্রাগনের সরীসৃপ সুলভ হিঁচড়ে আসার শব্দ হচ্ছে। প্রতিবার পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে কেঁপে উঠছে বাড়িটা।
একটা গাছ ভাঙার মড়মড় শব্দ কানে এল। ধড়াস করে আছড়ে পড়ল গাছটা। তার ছিঁড়ে চড়চড় শব্দ করতে লাগল বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ।
বাড়ির পাশ ঘুরে আসছে, চিৎকার করে জানাল রবিন।
শীতল অন্ধকার ছায়া এগিয়ে এসে ঢেকে দিচ্ছে এখন পেছনের আঙিনা। তারপর ছায়াটা পড়ল রান্নাঘরের জানালায়।
চোখ তুলে জানালার দিকে তাকাল মুসা। ড্রাগনের মস্ত, রিঙের মত করে পরানো আঁশওয়ালা, বর্মপরা চেহারার বুকটা দেখতে পেল। বাড়ির পেছনে ধাক্কা খেল ওটার শরীর। থরথর করে কেঁপে উঠল পুরো বাড়িটা। রান্নাঘরের প্লাস্টার ভেঙে খসে গিয়ে ঝুরঝুর করে পড়তে লাগল।
জানালার কাছে মুখ নামাল ওটা। কানফাটা শব্দ তুলে বন্ধ করল হাঁ করা চোয়াল দুটো। বাস্কেটবলের সমান বড় লাল টকটকে চোখ মেলে উঁকি দিল ঘরের ভেতরে।
চিৎকার দিয়ে জানালার কাছ থেকে পিছিয়ে যেতে শুরু করল রবিন। কিশোরের গায়ের ওপর গিয়ে পড়ল। থামল না। কিশোরের পাশ কাটিয়ে চলে যেতে লাগল ঘরের অন্য প্রান্তের দিকে।
জানালার দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। অন্য কোন দিকে নজর নেই। ঘনঘন চিমটি কাটছে নিচের ঠোঁটে। আচমকা ছোট্ট একটা চিৎকার দিয়ে ঘুরে দৌড় মারল টেবিলের দিকে। একটা মরিয়া ভাবনা মাথাচাড়া দিয়েছে মনে।
টেবিলটার ওপর প্রায় ডাইভ দিয়ে পড়ল সে। দুহাতে দুদিক থেকে ঝাড় দিয়ে এনে জড় করতে শুরু করল টেবিলে পড়ে থাকা তাসগুলো। থরথর করে কাঁপছে।
সবগুলো তাস একহাতে নিয়ে অন্য হাতে তুলে নিল বাক্সটা।
তাসগুলোকে বাক্সে ঢোকানোর চিন্তা ছাড়া আর কিছু ভাবছে না আপাতত।
ঢোকাতে পারলে হয়তো চলে যাবে ড্রাগনটা।
গত রাতের মত।
গতরাতে, মনে আছে তার, তাসগুলোকে সব একসঙ্গে করে বাক্সে ঢোকাতেই থেমে গিয়েছিল ঝড়বৃষ্টি। আলো ফিরে এসেছিল।

ঝনঝন করে উঠল জানালা। ড্রাগনটার নাকের ছোঁয়া লেগেছে ওখানে। ফিরে তাকাল কিশোর। লাল চোখ দুটো ওদের দিকেই তাকিয়ে আছে। নাকের ফুটো বিস্ফারিত হয়ে গেল দানবটার।
মাথাটাকে পেছনে টেনে নিল ড্রাগন। লম্বা গলাটা ধনুকের মত বাঁকা হয়ে গেল।
আঘাত হানতে যাচ্ছে। মাথা দিয়ে বাড়ি মারবে। প্রচণ্ড আঘাতে গুঁড়িয়ে দেবে ঘরের দেয়াল। তারপর ওদেরকে কামড়ে ধরে টেনে বের করবে।
সময় নেই। একেবারেই সময় নেই।
বাক্সের মধ্যে তাসগুলো ঢোকানো শুরু করল সে।
তাড়াহুড়োয় হাত থেকে পড়ে গেল বাক্সটা।
আপনাআপনি চাপা চিৎকার বেরিয়ে এল মুখ থেকে।
ঝপ করে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। কাঁপা হাতে থাবা দিয়ে তুলে নিল আবার বাক্সটা।
তাসগুলো অর্ধেক ঢুকিয়েছিল। ঠেলা দিয়ে বাকিটাও ঢুকিয়ে দিতে লাগল।
ঠেলা! ঠেলা! ঢুকে যাচ্ছে তাসগুলো।
ঢোকা শেষ।
বাক্সের মুখ বন্ধ করে দিল সে।
কাজ হবে তো?

.

ফট করে জোরাল একটা শব্দ হলো। অনেক বড় একটা বৈলুন ফেটে যাওয়ার
তীব্র সাদা আলোর ঝলকানিতে একই সঙ্গে শোনা গেল তিনজনের বিস্মিত চিৎকার।
চোখ মিটমিট করে জানালার দিকে দৃষ্টি ফেরাল কিশোর। সকালের ঝলমলে রোদ বন্যার মত এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে ঘরে।
বাইরে এখন স্তব্ধ নীরবতা।
জানালার কাছে ছুটে গেল ওরা। বাইরে উঁকি দিল।
ইয়া বড় বড় পায়ের ছাপ পড়ে আছে মাটিতে। গম্ভীর হয়ে দাগ বসে গেছে।
ড্রাগন নেই। কোথাও দেখা গেল না ওটাকে। উধাও হয়ে গেছে।
আনন্দে কথা বেরোল না মুসার মুখ থেকে। নীরবে পিঠ চাপড়ে দিতে লাগল কিশোরের।
হাসতে শুরু করল রবিন। হাসিটা সংক্রামিত হলো মুসার মাঝে। কিশোরও নীরব রইল না আর। পাগলের মত হাসতে লাগল তিনজনে। পিঠ চাপড়ে দিতে তাসের খেলা লাগল পরস্পরের। শেষে কোলাকুলি শুরু করল।
ড্রাগনটা চলে যাওয়ায় হাপ ছেড়ে বেঁচেছে।

কিন্তু টেবিলের ওপর রাখা তাসগুলোর দিকে চোখ পড়তেই হাসি বন্ধ হয়ে গেল মুসার। ওগুলো দিয়ে আসতে হবে কাকু-কাকুকে। এখনই।
হ্যাঁ, একমত হয়ে মাথা ঝাঁকাল রবিন। এমন করে তাকাতে লাগল তাসগুলোর দিকে, যেন যে কোন মুহূর্তে বোমার মত ফেটে যাবে ওগুলো। কাকু কাকু আগেই সাবধান করে দিয়েছিল আমাদের, তাসগুলো বিপজ্জনক। আমরাই কানে তুলিনি।
মাথার ঘন কোঁকড়া চুলে আঙুল চালাল কিশোর। কাকু-কাকু যদি জানবেই তাসগুলো এতটা বিপজ্জনক, তাহলে বিক্রির জন্যে সাজাল কেন?
ওগুলোর হাত থেকে মুক্তি চেয়েছিল হয়তো, জবাব দিল রবিন।
মিসেস রেডরোজই বা চুরি করল কেন?
অতিরিক্ত দাম হাঁকত কাকু-কাকু। বিনে পয়সায় জোগাড় করা গেলে দাম দিতে যাবে কেন?
তাহলে মুসার পকেটে ভরে পাচার করল কেন?
ধরা পড়লে মুসা পড়ত। চোর হিসেবে তার শাস্তি হত। এটা তো সোজা কথা।
মাথা নাড়ল কিশোর, উঁহু, অত সোজা নয়। নিজের ঠোঁটে জোরে এক টান দিয়ে ছেড়ে দিল। কারণটা অন্যখানে। মিসেস রেডরোজ জানত, তাকে দেখতে পারে না প্রতিবেশীরা। তাড়াতে চায় এখান থেকে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল রেডরোজ। তবে যাওয়ার আগে প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল। তাসগুলো মুসার পকেটে ঢুকিয়ে দিয়েছিল প্ল্যান করেই। জানত, তাসগুলো পেলেই খেলতে চাইব আমরা। আর খেলতে বসলে নিজেদের অজান্তেই ভয়ানক ক্ষতি করে দেব পড়শীদের। যদি দোষ পড়ে আমাদের ওপর পড়বে। এক মুহূর্ত ভাবল সে। তারপর বলল, হ্যাঁ, এটাই একমাত্র কারণ। আমি শিওর।
রেগে উঠল মুসা, তাহলে তো মহিলাকে গিয়ে এখনই ধরা দরকার...
পাবে কোথায়? ভুরু নাচাল কিশোর। গিয়ে দেখগে, তার বাড়িতে তালা। মারা।
তুমি দেখেছ নাকি?
না। অনুমান করছি। তাসের খেলায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার জন্যে বসে থাকবে না সে।
তাহলে আর সময় নষ্ট করছি কেন? চলো যাই। আগে মিসেস রেডরোজের বাড়িতেই যাব। ওখান থেকে কাকু-কাকুর বাড়িতে যাব। তাসগুলো ফেরত দিয়ে আসতে।
আমরাও যাব? কাকু-কাকুর বাড়িতে যেতে ভয় পাচ্ছে রবিন। সমর্থনের আশায় কিশোরের দিকে তাকাল।
কিশোর কিছু বলার আগেই মুসা বলে উঠল, আমাকে একা পাঠাতে চাও নাকি? আমি বাপু একা যেতে পারব না। তোমরা সঙ্গে থাকলে তা-ও সাহস পাব।

রবিনের দিকে তাকা কিশোর। তারপর মাথা ঝাঁকাল। বেশ। চলো।
তাসের বাক্সটার জন্যে হাত বাড়াল মুসা। যেই তুলে নিতে যাবে মুখটা খুলে গিয়ে একটা তাস পড়ে গেল মাটিতে। ধড়াস করে উঠল তার বুকের ভেতর। আবার না কোন অঘটন ঘটে যায়।
নিচু হয়ে তাড়াতাড়ি তুলে নিল তাসটা।
ওটায় কি আছে দেখে আঁতকে গেল।
দেখো দেখো! চিৎকার করে উঠল সে। এ তাসটা তো আগে দেখিনি একবারও!
অন্য দুজনের দেখার জন্যে হাতটা বাড়িয়ে দিল সে।
আরে এ তো...এ তো কাকু-কাকুর ছবি! রবিনও হতবাক।
কিশোরও দেখল। ভুল বলেনি মুসা বা রবিন। কাকু-কাকুই। সাদা চুল। সাদা গোফ। অদ্ভুত ভঙ্গিতে ঠেলে বেরিয়ে আছে ঠোঁটের দুই কোণে গোল গোল কুতকুতে নীল চোখ মেলে যেন সরাসরি তাকিয়ে রয়েছে ওদের দিকে।
দেখো তো, উল্টো দিকে কিছু আঁকা আছে কিনা? কিশোর বলল।
তাসটা ওল্টাল মুসা। অবাক হয়ে দেখল, লেখা রয়েছে: জাদুকর।
হু, চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল কিশোর। জাদুকর। তারমানে এটা মায়াতাস। সমস্ত তাসগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে। কিছু বুঝলে?
জোরে জোরে মাথা নাড়াল মুসা। বোঝাবুঝির আমার দরকার নেই। এগুলোর কোন ব্যাপারেই আর ঢুকতে চাই না। যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। চলো; গিয়ে তাড়াতাড়ি ফেরত দিয়ে আসি।
কিন্তু তার কথায় কান দিল না কিশোর। তাসটা হাতে নিয়ে উঁচু করে দেখল। আনমনে বিড়বিড় করল, সত্যিই কি জাদুকর? জাদু বলে সত্যি কোন জিনিস আছে?
তাসটা আবার কেড়ে নিয়ে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে পকেটে ভরে ফেলল মুসা, না থাকলে খানিক আগে কার ভয়ে ঘাম ছুটে গেল আমাদের? ড্রাগনের পায়ের ছাপ তো এখনও রয়েছে মাটিতে। এগুলো কি মিথ্যে? দেখো, অত কথার দরকার নেই। চলো, ফেরত দিয়ে আসি...
কিন্তু রহস্যটা ভেদ না করেই?
কিশোরের কোন কথার ধার দিয়েই গেল নাঃআর মুসা। তার হাত চেপে ধরে টেনে নিয়ে চলল দরজার দিকে।
জিনসের প্যান্টের পেছনের পকেটে ভরে নিয়েছে তাসের প্যাকেটটা।

.

সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল তিনজনে। সামনের লনের ওপর দিয়ে হাঁটতে লাগল।

মোড়ের কাছে বিশাল একটা ম্যাপল গাছ ছিল। কাত হয়ে পড়ে আছে এখন বিদ্যুতের তারের ওপর। একনাগাড়ে ফুলিঙ্গ ছিটাচ্ছে এখন ছেঁড়া তারগুলো। মাঝে মাঝে বেড়ে গিয়ে ফুলিঙ্গের ফুলঝুরি তৈরি করছে। চড়চড়, ছরছর শব্দ। করেই চলেছে।
গাছটার সামনে থামল ওরা।
রাস্তার ওধারে লাল রঙের একটা ভর্তা হয়ে যাওয়া জিনিস দেখাল মুসা। গাড়ি ছিল ওটা।
সারা ব্লক জুড়ে ধ্বংসলীলা চলেছে। ভেঙেচুরে তছনছ করে দেয়া হয়েছে। ভর্তা হয়ে যাওয়া গাড়ি। ভেঙে পড়া গাছ। ছেঁড়া তার। রাস্তায় বড় বড় গর্ত। দলিত মথিত পাতাবাহারের বেড়া আর ফুলের বেড।
রাস্তা আটকে রেখেছে তিনটে পুলিশের গাড়ি। নীরবে জ্বলছে নিভছে ওগুলোর লাল আলো।
ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে জটলা করছে লোকে। নানা রকম জল্পনা করছে। মাথা চাপড়াচ্ছে কেউ। কেউ বা উত্তেজিত কণ্ঠে বোঝানোর চেষ্টা করছে অন্যকে। হাত তুলে দেখাচ্ছে ধসে পড়া বাড়িঘর, ভর্তা হয়ে যাওয়া গাড়ি। চমকে যাওয়া বিমূঢ় ভঙ্গিতে মাথা নাড়ছে কেউ কেউ।
এ সবের মূলে আমরা! বিড়বিড় করে বলল মুসা। নিজেকে ক্ষমা করতে পারছে না কোনমতেই। লোকের সর্বনাশ করেছি!
আমাদের দোষ বলা যাবে না, গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিল কিশোর। আমরা তো জানতাম না তাস খেললে এতবড় কাণ্ড ঘটবে। আমাদেরকে দিয়ে যে ঘটনাটা ঘটিয়েছে, দোষী আসলে সে। মিস লীলা রেডরোজ। তাকে খুঁজে বের করা দরকার।
আমার এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না, হতভম্ব হয়ে যাওয়া ভঙ্গিতে বলল রবিন। গলা কাঁপছে। ভাবতেই পারছি না, সাধারণ কয়েকটা তাস এতবড় ক্ষতি করে দিতে পারে।
কয়েকজন প্রতিবেশীকে ওদের দিকে তাকাতে দেখে কুঁকড়ে গেল মুসা। তার মনে হতে লাগল ওরা যে অপরাধী লোকে সেটা টের পেয়ে গেছে। জেনে গেছে খেলতে বসে নাইট আর ড্রাগন ডেকে এনে ওরা এই মহা সর্বনাশ ঘটিয়েছে।
ভাবনাগুলো কোনমতেই স্বস্তিতে থাকতে দিচ্ছে না মুসাকে। তাসের প্যাকেটটা বয়ে এনেছে বলে নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছে তার। ইস, কোন কুক্ষণে যে কাকু-কাকুর বাড়িতে গিয়েছিল!
ভাবনাগুলো অন্য দুজনেরও শান্তি হারাম করছে। যতই ভাবছে, রাগটা গিয়ে পড়ছে লীলা রেডরোজের ওপর। অঘটনগুলোর জন্যে সত্যিই যে দায়ী।

ওর বাড়ির দিকে হাঁটা দিল আবার তিন গোয়েন্দা। পুলিশের গাড়িগুলো পার হয়ে এল। কানে এল রেডিওর কড়কড় শব্দ। ইউনিফর্ম পরা অফিসারেরা রাস্তার এ মাথা ও মাথায় হাটছে। গভীর ছাপগুলো দেখছে। মাথা চুলকাচ্ছে বোকার মত। বিস্মিত ভাবভঙ্গি।
মোড়ের কাছ থেকেই দেখা গেল লীলা রেডরোজের বাড়িটা। দরজা-জানালা সব বন্ধ। বাড়িতে যে কেউ নেই সেটা বোঝার জন্যে কাছে যাওয়া লাগে না।
বাড়িটায় ঢুকল ওরা। কিশোরের অনুমানই ঠিক। তালা লাগানো। বাড়িতে কেউ নেই। বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে লীলা রেডরোজ।
হতাশ হলো মুসা। ক্ষতিপূরণ আদায় করতে না পেরে।
কিশোর বলল, মহিলাকে খুঁজে বের করবই আমরা। জিনিসপত্র যা নষ্ট হয়েছে, সেগুলোর ক্ষতিপূরণ যদি না দিতে পারে, জেলের ভাত খাবে।
রেডরোজের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে কাকু-কাকুর বাড়ির দিকে এগোল। ওরা। সামনের দরজা বন্ধ। জানালাগুলোর কোনটাতেই প্রাণের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। অন্ধকার। বাড়িতে ঢুকে দেখা গেল সকালের খবরের কাগজটা পড়ে রয়েছে ড্রাইভওয়েতে।
ঘটনাটা কি? কাকু-কাকুও বাড়ি ছেড়ে চলে গেল নাকি?
দেখো, কাকু-কাকুর বাড়িটার কিছুই হয়নি, কিশোর বলল। ওর লন, সামনের আঙিনা, কোথাও কোন ক্ষতি হয়নি।
পকেটের তাসের প্যাকেটটায় হাত রাখল মুসা। বাড়ি থাকলেই হয় এখন। তাসগুলোকে তাড়াতে পারলে বাঁচি।
রাস্তা পেরিয়ে গিয়ে কাকু-কাকুর সুন্দর করে ছাঁটা লনে প্রবেশ করল ওরা। ওর সামনের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।
জানালা দিয়ে উঁকি দিল মুসা। কিন্তু রোদের প্রতিফলন জানালার কাছে এক ধরনের সোনালি পর্দা সৃষ্টি করেছে। ভেতরে দৃষ্টি প্রবেশে বাধা দিচ্ছে।
বড় করে দম নিল সে। তারপর যা থাকে কপালে ভেবে তিন ধাপ নিচু সিঁড়ি বেয়ে সামনের দরজার কাছে উঠে ঘণ্টার বোতাম টিপে ধরল। বাড়ির ভেতর থেকে ঘণ্টা বাজার আওয়াজ কানে এল।
মিস্টার কাকু-কাকু, বাড়ি আছেন? ডেকে জিজ্ঞেস করল মুসা। ভয় যে পাচ্ছে, সেটা প্রকাশ পেল কণ্ঠস্বরেই। মিস্টার কাকু-কাকু?
জবাব নেই।
বাড়ির ভেতর থেকে পদশব্দ ভেসে এল না। কোন শব্দই নেই।
আবার বেল বাজাল মুসা। অপেক্ষা করতে লাগল। হঠাৎ করেই হাত দুটো বরফের মত শীতল লাগতে লাগল তার। চাদির কাছে দপদপ করছে মাথার

শিরাগুলো।
ভয় তো পাবই, নিজেকে কৈফিয়ত দিল সে। লোকটা জাদুকর। অদ্ভুত, অলৌকিক ক্ষমতা রয়েছে তার। হয়তো একজন ভয়ঙ্কর ক্ষমতাশালী প্রেতসাধকই, কে জানে।
এবং সেই ক্ষমতাশালী লোকটা ভাবছে, তার জিনিস চুরি করেছে মুসা।
কি, কিছু শুনছ? নিচ থেকে জিজ্ঞেস করল কিশোর। তার কাছ ঘেঁষে এল রবিন। দুজনে তাকিয়ে রয়েছে মুসার দিকে।
আবার বেল বাজাল মুসা। দুই হাতে কিল মারতে শুরু করল দরজায়।
ঠেলা লেগে খুলে গেল দরজা।
ভীষণ চমকে গেল সে। মুখ থেকে চিৎকার বেরিয়ে এল আপনাআপনি।
অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব করে মাথা ঢুকিয়ে দিল ভেতরে। বাড়ির ভেতরে সামনের অংশটা অন্ধকার। ভারী দম নিল সে। নাকে এল তীক্ষ্ণ, মিষ্টি এক ধরনের সুবাস। মশলা মেশানো।
মিস্টার কাকু-কাকু? ডাক দিল আবার।
অন্ধকারে প্রতিধ্বনিত হলো তার ডাক। ভোতা, ফাপা এক ধরনের শব্দ।
আবার ভারী দম নিল সে। প্রচণ্ড গতিতে চলতে থাকা হৃৎপিণ্ডটাকে শান্ত করার চেষ্টা করল। তারপর দরজাটাকে আরেকটু ফাঁক করে পা রাখল ঘরের ভেতর।
শুনছেন? ডেকে জিজ্ঞেস করল সে। কেউ আছেন?
পরক্ষণেই ধড়াস করে এক লাফ মারল তার হৃৎপিণ্ড। লাফ দিয়ে পিছিয়ে এল। সে। সামনের ঘর থেকে ভেসে এল একটুকরো তীক্ষ্ণ হাসির শব্দ।

.

দরজার কাছে পিছিয়ে আসতে গিয়ে ধাক্কা খেল কিশোর আর রবিনের গায়ে। মুসা। ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ির মাথায় উঠে এসেছে ওরা।
আ-আছে..ঘ-ঘ-ঘরেই আছে সে… তোতলাতে শুরু করল মুসা।
আবার শোনা গেল তীক্ষ্ণ, উচ্চকিত হাসি।
আমার কাছে তো বাচ্চাদের হাসির মত লাগছে, মুসার গা ঘেঁষে এসে ফিসফিস করে বলল রবিন। কিংবা কোন জানোয়ারের।
ফ্যাকাসে এক ফালি রোদ পড়েছে লিভিং রুমে। সেটা ধরে প্রায় গায়ে গায়ে লেগে থেকে এগোতে শুরু করল ওরা। ঘরের অন্ধকার চোখে সয়ে এলে দেখা গেল ঘর ভর্তি পুরানো আসবাবপত্র। কয়েকটা খাড়া হেলানওয়ালা কাঠের চেয়ার আছে। একটা টেবিল আছে, তাতে এলোমেলো ভাবে নানা রকম জিনিস ছড়ানো। একটা ভাঙাচোরা পিয়ানো আছে। ছোট একটা টেবিলে রাখা একটা রূপার বল। জানালায় এত ভারী পর্দা টানা যে, আলোই আসতে পারছে না।

আবার হাসির শব্দ শোনা গেল।
ফিরে তাকাল মুসা। হাসিটা কোথা থেকে আসছে, শব্দ সৃষ্টিকারীটা কে, দেখে ফেলল।
একটা বানর। ছোট একটা বাদামী বানর একটা পিতলের খাঁচার মধ্যে উত্তেজিত ভঙ্গিতে লাফালাফি করছে। বানরের ভাষায় কিচকিচ করে চলেছে। সমানে।
বাহ, সুন্দর তো বানরটা! রবিন বলল। খাঁচাটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।
তীক্ষ্ণ কিচির-মিচির থামিয়ে দিল বানরটা। মাথা কাত করে তাকিয়ে দেখতে লাগল রবিনকে।
পোষাই তো মনে হচ্ছে, রবিনের পাশে গিয়ে দাঁড়াল মুসা। সাবধানে তাকিয়ে আছে বানরটার দিকে। নাকি আগে মানুষ ছিল, কাকু-কাকু জাদু করে ওকে বানর বানিয়ে ফেলেছে?
না, ও সব সময়ই বানর ছিল। পেছন থেকে বলে উঠল একটা তীক্ষ্ণ খসখসে কণ্ঠ।
কাকু-কাকুর গলা চিনতে পেরে চরকির মত পাক খেয়ে দরজার দিকে ঘুরে দাঁড়াল মুসা।
শীতল গোল গোল কুতকুতে চোখ মেলে তাকিয়ে আছে কাকু-কাকু। সাদা চুলগুলো মাথার পেছনে ঘাড়ের কাছে খাড়া হয়ে আছে। মখমলের লাল আলখেল্লার নিচে ডোরাকাটা পাজামা পরেছে।
মিস্টার কাকু-কাকু... শুরু করতে গেল মুসা।
এখানে কি তোমাদের? রাগত স্বরে জিজ্ঞেস করল কাকু-কাকু। এখন কটা বাজে? এত সকালে এসে ঘুম ভাঙালে কেন আমার? নাকি বাড়িটা খালি ভেবে আর লোভ সামলাতে পারোনি। চুরি করতে ঢুকে পড়েছ?
না-না! তোতলাতে শুরু করল মুসা, আ-আ-আমরা আপনার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছি। আ-আমরা...
বেশ দেখা তো হলো আমার সঙ্গে। চিৎকার করে উঠল কাকু-কাকু। সব সময় এ ভাবে চুরি করেই লোকের সঙ্গে দেখা করতে ঢোকো নাকি?
না। দরজাটা খোলাই ছিল, জবাব দিল মুসা।
চুরি করে ঢুকিনি আমরা, এতক্ষণে কথা বলল কিশোর। ঢোকার আগে বেশ কয়েকবার বেল বাজিয়েছি।
ব্যঙ্গের স্বরে বলল কাকু-কাকু, তাই নাকি...
বাধা দিয়ে রবিন বলল, দেখুন, আমরা সত্যি বলছি! চুরি করার সামান্যতম ইচ্ছে আমাদের নেই!
চোয়াল ডলল কাকু-কাকু। গোঁফের মাথা দুটো টেনে লম্বা করে দিল। ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে গোয়েন্দাদের দিকে। তোমরা কেন এসেছ, আমি জানি, অবশেষে

বলল সে।
অ, জানেন...জানবেনই তো... পেছনের পকেট থেকে তাসের প্যাকেটটা বের করে আনল মুসা। কাঁপা কাঁপা হাতে সেটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, এই যে, নিন!
জ্বলে উঠল কাকু-কাকুর নীল চোখ। তাহলে তোমরাই বাক্সটা চুরি করেছিলে।
না, আমরা চুরি করিনি, মুসা বলল।
তাহলে তোমাদের কাছে গেল কি করে?
মিস লীলা রেডরোজ চুরি করে আমার পকেটে ঢুকিয়ে দিয়েছিল সেদিন। আমাদেরকে দিয়ে খেলিয়ে প্রতিবেশীদের ক্ষতি করে তাদের ওপর প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল।
দীর্ঘ একটা মুহূর্ত মুসার দিকে তাকিয়ে রইল কাকু-কাকু। তারপর কিশোর আর রবিনের ওপর ঘুরে এসে আবার মুসার ওপর স্থির হলো তার দৃষ্টি। অ, তারমানে খেলাটাও তোমাদেরই কাজ। ড্রাগন ডেকে এনেছ। আরেকটু হলেই ধ্বংস করে দিচ্ছিলে তোমাদের পুরোটা ব্লক।
হয়তো, শান্তকণ্ঠে জবাব দিল কিশোর। কিন্তু তারপরেও স্বীকার করব না, দোষটা আমাদের। কারণ, ওরকম এক প্যাকেট তাস হাতে পেলে আপনিও খেলতে বসতেন। তাস খেলাটা দোষের কিছু না। কিন্তু সেটা যে এ রকম বাস্তব হয়ে উঠবে, সব কিছু ধ্বংস করে দেবে, সেটা কে জানত? যখনই বুঝলাম বিপজ্জনক, ফেরত দিতে নিয়ে এলাম।
যখন আনতে গেলাম, তখন দিলে না কেন? রেগে উঠল কাকু-কাকু।
তখন দিলে চোর বলতেন আমাদের।
এখনও যদি বলি?
বললে বলুনগে। এখন চোর বললে, আর ততটা গায়ে লাগবে না। কারণ, আমরা বুঝে গেছি, তাসগুলো বিপজ্জনক। যা-ই বলুন, কোন কিছু আর কেয়ার করি না। কারণ, কারও ক্ষতির কারণ আর হতে চাই না আমরা। কিন্তু একটা কথা বলুন তো, আপনিই বা এ রকম এক প্যাকেট বিপজ্জনক তাস বিক্রির জন্যে রেখেছিলেন কেন? যে কিনত, সে কি ভাবছেন খেলত না? ক্ষতির কারণ হত না? আর না জেনে ক্ষতি করলে দোষটা কার ওপর বর্তাত? ভুরু নাচাল কিশোর। আপনার ওপর। কারণ আপনিই এগুলোর আসল মালিক।
মানুষের ক্ষতি তো করেছই, আবার বেশি চোরের মার বড় গলা... থাবা দিয়ে মুসার হাত থেকে প্যাকেটটা কেড়ে নিল কাকু-কাকু।
দেখুন যা হবার হয়ে গেছে, পরিস্থিতিটাকে হালকা করার জন্যে বলল রবিন, কাকু-কাকুকে ভয় পাচ্ছে সে। এটা নিয়ে আর বাড়াবাড়ি করার দরকার নেই।

বাড়াবাড়ি মানে? রাগ তো কমলই না, বেড়ে গেল আরও কাকু-কাকুর। শয়তানিটা আমি করেছি, না তোমরা? চুরি তো চুরি, আবার সিনাজুরি…
সহ্য করতে পারল না আর মুসা। রেগে উঠল, দেখুন, আমরা চুরি করিনি! আমরা চোর নই, বার বার বলছি আপনাকে। কিছুতেই বিশ্বাস করছেন না। তা ছাড়া কি করে জানব আমরা, তাস খেলে বাস্তবে ড্রাগন আর নাইট ডেকে আনা যায়? এ রকম গাঁজাখুরি কথা কেউ বিশ্বাস করবে? আগে খুলে বলেননি কেন সে কথা? আসলে, ভুল আমাদের সবারই হয়েছে। আপনিও বাদ যাবেন না।
হ্যাঁ, যেন একমত হয়ে মাথা ঝাঁকাল কাকু-কাকু। গোফের কোনায় চাড় দিতে শুরু করল। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মুসার দিকে। ভুল। বড় রকমের ভুল। অনেক বেশি জেনে ফেলেছ তোমরা।
কাকু-কাকুর চোখের দিকে তাকিয়ে আছে মুসা। ঘাবড়ে গেল। পিছাতে গিয়ে ধাক্কা লাগল একটা উঁচু হেলানওয়ালা সোফায়। অনেক বেশি জেনে ফেলেছি। মানে? কি বলতে চান? তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল তার কণ্ঠ।
ওর পাশে এসে দাঁড়াল কিশোর আর রবিন।
প্রশ্নের জবাব দিল না কাকু-কাকু। অদ্ভুত হাসি ফুটল তার ফ্যাকাসে মুখে। তিন গোয়েন্দার ওপর দৃষ্টি স্থির রেখে তাসগুলো সব বের করল প্যাকেট থেকে।
তাস যখন তোমাদের এতই পছন্দ, বিচিত্র হাসিটা ছড়িয়ে পড়ল সারা মুখে-তার গোফ জোড়াকে মনে হলো ডানা মেলে উড়ছে, নিজেরাই এর চরিত্র। হয়ে যাও না কেন? তাসের জগতেই ঢুকে পড়ো তোমরা।
মানে? দম আটকে এল মুসার। কি বলতে চান…
তার কথা শেষ হওয়ার আগেই হাত গরিয়ে তাসগুলোকে শূন্যে উড়িয়ে দিল কাকু-কাকু।
ছুঁড়ে ফেলল মুসা, রবিন আর কিশোরকে লক্ষ্য করে।
ঘুরতে ঘুরতে, ওলট-পালট করতে করতে নিচে পড়তে লাগল তাসগুলো। ওদের মাথায়, ওদের কাঁধে। নীরবে ভাসতে ভাসতে মাটিতে নেমে গেল।
তাসগুলো সব মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার নেমে এল ওদের ওপর।
গাঢ়, ঠাণ্ডা অন্ধকার। এ রকম অনুভূতি আর আগে কখনও হয়নি ওদের।
ধীরে ধীরে ঘরটা মিলিয়ে গেল। কাকু-কাকু মিলিয়ে গেল। নিজেরাও পরস্পরকে দেখতে পাচ্ছে না আর।
নড়ল না তিনজনের কেউ। মনে হচ্ছে পড়ে যাচ্ছে। তলিয়ে যাচ্ছে। অন্ধকারে। বরফের মত শীতলতার মধ্যে।
নিথর নীরবতার মধ্যে।

তারপর একটা বিস্ফোরণ ঘটল যেন নিজেদের দেহে। তীক্ষ্ণ ব্যথা। আর্ত চিৎকার বেরিয়ে এল আপনাআপনি।
ব্যথাটা বুকের কাছ থেকে ছড়িয়ে গেল সমস্ত শরীরে। বাহুতে। পায়ে। মাথার মধ্যে ফেটে পড়ল ব্যথা। ঝিমঝিম করতে থাকল।
মাথা...মাথা...ঝিমঝিম...
মনে হলো টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে মাথাটা।
মনে হলো কোটর থেকে খুলে ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছে চোখ। দাঁত খুলে বেরিয়ে যাচ্ছে মুখ থেকে।
চিৎকার করতে থাকা ওদের হাঁ করা মুখ দিয়ে মগজটা খুলে বেরিয়ে যাচ্ছে।
হঠাৎ করেই মনে হলো ওরে, এই অন্ধকার ওদের চেনা।
নিথর এই শীতল অন্ধকারটাকে চেনে ওরা।
মনে হতে লাগল, এটাই মৃত্যু।
.
অন্ধকার কেটে যাওয়ার আগেই যেন ধুয়ে চলে গেল শীতলতা। গরম ঢেউয়ের ধাক্কা এসে লাগল যেন শরীরে।
কয়লা-কালো অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। অন্ধকার চাদরের মধ্যে মিটমিট করছে কতগুলো আলোর ফোঁটা। তাসের খেলা
তারা?
হ্যাঁ। তারকা খচিত আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে সে। মেঘমুক্ত আকাশ। ঝিরঝিরে বাতাস। চুল কাপে।
হাঁটুতে ভর দিয়ে রয়েছে, বুঝতে পারল। হাঁটু আর হাতের তালুতে। চার হাত-পায়ে। লম্বা ঘাসের মধ্যে।
বাতাস এত তাজা। এত মিষ্টি। দারুণ সুবাস।
বেঁচে আছি! আমি বেঁচে আছি! প্রথমেই এ কথাটা মনে পড়ল ওর।
কানে এল গোঙানির শব্দ। ওর পাশে থেকে। ঘাসের মধ্যে খসখস শব্দ।
হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে এল রবিন। চোখের পাতা সরু সরু করে তাকাল কিশোরের দিকে। যেন চিনতে পারছে না। ঝাঁকি দিয়ে চুল থেকে কুটো ফেলল। ফিসফিস করে বলল, কিশোর, কোথায় রয়েছি আমরা?
তাই তো! কোথায় রয়েছি? লম্বা ঘাসের মধ্যে রবিনকে অনুসরণ করে। বেরিয়ে এল মুসা।
ভালই তো আছি দেখা যাচ্ছে, জবাব দিল কিশোর। যদিও গলা কাঁপছে তার। আমার মনে হচ্ছিল মগজ ফেটে বেরিয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছিল, মারা যাচ্ছি।

কিন্তু আমরা এখন কোথায়? আবার প্রশ্ন করল রবিন। ছিল সকাল। এখন তো দেখতে পাচ্ছি রাত।
নিজেকে টেনে তুলল কিশোর। খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে চারপাশে তাকাল। চওড়া একটা মাঠের মধ্যে রয়েছি আমরা। সমতল মাঠ।
রবিন আর মুসাও উঠে দাঁড়াল।
চারপাশে তাকাতে তাকাতে মুসা বলল, কোন খামার-টামারের সামনে রয়েছি।
লম্বা ঘাসের মাঠ ছাড়িয়ে ওপাশে কমলা রঙের ছোট ছোট আগুনের কুণ্ড দেখতে পেল সে। গোল, নিচু কতগুলো কুঁড়েঘরের সামনে জ্বলছে।
গ্রামটাম হবে, কিশোর বলল। ঘরগুলো দেখো। ঘাস কিংবা খড় দিয়ে তৈরি।
অদ্ভুত! বিড়বিড় করল মুসা
ধূসর রাতের আলোতে ভাল করে দেখা যায় না। দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে তাকাল কিশোর। উঁচু একটা খড়ের গাদা চোখে পড়ল। ওটার পাশে উবু হয়ে আছে। একটা ঠেলাগাড়ি। ছোট ছোট আরও দুটো ঠেলাগাড়ি চোখে পড়ল ওদের। দূরে কুঁড়ের সারির কাছেই কোনখান থেকে ভেসে এল একটা ঘোড়ার ডাক।
ঘাড় থেকে থাবা মেরে লাল একটা পোকা ফেলল রবিন। অনেক রাত হয়ে গেছে। বাড়ি যাওয়া দরকার। জায়গাটাও আমার ভাল লাগছে না।
মনে তো হচ্ছে বাড়ি যাওয়াটা অত সহজ হবে না, ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল মুসা; বাড়ি থেকে বহু দূরে রয়েছি আমরা। কাকু-কাকু কি করেছে। আমাদের? এতই ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, কি যে বলছিল খেয়ালই করিনি। ঠিকমত।
ও বলেছে, কিশোর বলল, তাস যখন এত পছন্দ, তাসের জগতেই ঢুকে পড়ো তোমরা। তাসগুলো ছুঁড়ে মেরেছে আমাদের ওপর। তারপর এখানে পৌঁছে। গেছি আমরা।
তারমানে তাসের মধ্যে ঢুকে পড়েছি আমরা? চিৎকার করে উঠল মুসা। তাসের খেলায়? মুখোশ পরা নাইট আর আগুন ঝরানো ড্রাগনের দেশে?
অসম্ভব! বিড়বিড় করে বলল আতঙ্কিত রবিন।
হ্যাঁ, সত্যিই অসম্ভব। প্রতিধ্বনি করল কিশোর। কিন্তু সেটাই ঘটিয়ে বসে আছি আমরা।
কিন্তু...কিন্তু... কথা খুঁজে পেল না মুসা।
তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার কানে আসতেই ফিরে তাকাল কিশোর।
খসখস শব্দ। পায়ের আওয়াজ। লম্বা ঘাসের ডগা বেঁকে যেতে দেখল সে।
লম্বা এক সারি খুদে মানুষকে ঘাসের মধ্যে সারি দিয়ে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। গায়ে চামড়ার পোশাক। বড় বড় এলোমেলো চুলে ঢাকা মাথায় গম্বুজ আকৃতির

ধাতব হেলমেট, তারার ভোতা আলোয় চকচক করছে। হাতে লম্বা, চোখা ফলাওয়ালা বল্লম।
হুপ! হুপ! হুপ! প! হাঁটার তালে তালে একনাগাড়ে বিচিত্র শব্দ করছে ওরা।
জেকিলস! ফিসফিস করে বলল কিশোর। সাবধান হয়ে গেল। ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে চোখ।
ঝট করে বসে পড়ল তিনজনে। লুকিয়ে পড়ল লম্বা ঘাসের মধ্যে।
আমি ওদের চিনে ফেলেছি, ফিসফিস করে বলল কিশোর। তাসের মধ্যেও ওদের ছবি ছিল। ওরা শয়তান...।
তাসের পেছনে আমিও লেখা দেখেছি, কম্পিত কণ্ঠে রবিন বলল। ওরা খুব দুষ্ট শিকারী। নিজেদের মাংস নিজেরা খায়। মানুষ তো খায়ই।
.
হুপ! হুপ! হুপ! হুপ!
আতঙ্কিত হয়ে বামন-মানবগুলোর দিকে তাকিয়ে রয়েছে তিন গোয়েন্দা। মার্চ করে এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। হাঁটার তালে তালে বল্লম উঠছে, বল্লম নামছে। এক ভাবে। এক ভঙ্গিতে।
ভারী দম নিল কিশোর। ঘাসের মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে সরে যেতে শুরু করল লোকগুলোর চলার পথ থেকে।
হুপ! হুপ! হুপ! হুপ!
লোকগুলো কি ওদের দেখে ফেলেছে?
জানার জন্যে অপেক্ষা করা যাবে না।
হামাগুড়ি দিয়ে বেশ খানিকটা সরে গেল ওরা। হঠাৎ লাফিয়ে উঠে মাথা নিচু করে লম্বা ঘাসের ভেতর দিয়ে দৌড় দিল কিশোর। রবিন আর মুসা ছুটল ওর পাশে পাশে।
ঘাসে ঢাকা নরম মাটিতে যতটা সম্ভব নিঃশব্দে ছুটতে থাকল ওরা। কিন্তু ঘাসের গায়ে ঘষা লেগে শব্দ হয়েই যাচ্ছে। ফিরে তাকাল না। তবে কান পেতে রইল লোকগুলোর শিকার দেখতে পাওয়ার উল্লসিত চিৎকার শোনা যায় কিনা।
কোথায় যাব? কোথায় লুকাব? ভাবছে কিশোর।
বুকের মধ্যে পাগল হয়ে উঠেছে হৃৎপিণ্ডটা। ছোটার সময় হাঁপানোর শব্দকে কম করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগল সে।
তারার ফ্যাকাসে আলোয় উঁচু খড়ের গাদাটাকে কাঁপা কাঁপা অস্পষ্ট দেখাচ্ছে। মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে ওদের সামনে এক অতিকায় দৈত্যের মত।
এক মুহূর্ত দ্বিধা করল না সে। ভাবনা-চিন্তাও করল না বিশেষ। করার সময়ও নেই।

মাথা নিচু করে প্রায় ডাইভ দিয়ে পড়ল গাদাটার ওপর। এক পাশ থেকে ঢুকে পড়ল তার ভেতর।
ভেজা ভেজা। খসখসে। ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো গা চুলকানো।
এক হাতে চোখ ঢেকে যতটা পারল গভীরে ঢুকে গেল ও। মুখেও খড়ের খোঁচা লাগছে। খোঁচা দিচ্ছে কাপড়ে ঢাকা চামড়াতেও। ধারাল খড়ের ডগা তেরছা ভাবে খোঁচা মেরে আচড়ে দিচ্ছে ঘাড়ের চামড়া।
খড়ের গাদার মধ্যে খড়খড় আওয়াজ পিলে চমকে দিল কিশোরের। পরক্ষণে বুঝতে পারল, মুসা আর রবিনও ঢুকেছে ওর পাশেই।
খাইছে! বলে উঠল মুসা। এ তো এক্কেবারে ভেজা!
আমাদের দেখে ফেলল নাকি? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
কি-কি জানি, তুতুলে বলল মুসা। থাক, আর কথা বলার দরকার নেই। শুনে ফেলবে...
চুপ হয়ে গেল ওরা।
কান পেতে আছে কিশোর। জেকিলাদের পায়ের শব্দ শোনার জন্যে।
কানে এল না।
হুপ হুপও করছে না আর।
চলে গেল নাকি?
নাকি খড়ের গাদা থেকে ওদের বেরোনোর অপেক্ষা করছে?
মুখের চামড়ায় খোঁচা মারছে খড়ের ডগা। নাকের ভেতর ঢুকে যাওয়া একটা ভেজা খড় সরিয়ে দিতে চাইল সে। যথেষ্ট বেগ পেতে হলো সরাতে।
ইস, এত চুলকান চুলকাচ্ছে, ফিসফিস করে বলল রবিন।
কিশোরের নিজেরও কম চুলকাচ্ছে না। কি জবাব দেবে? পিঠ...বুক...গাল... কোথায় চুলকাচ্ছে না!
সেই সঙ্গে ক্রমাগত খোঁচানো।
চামড়ায় জ্বলুনি শুরু হয়ে গেল। শরীর না মুচড়ে আর থাকতে পারল না। গায়ের ওপর চেপে থাকা খড় সরানোর চেষ্টা করল। চুলকানো থামিয়ে দিল। লাভ নেই। চুলকাতে গেলে কষ্ট আরও বাড়ে।
দাতে দাঁত চেপে স্তব্ধ হয়ে রইল। উফ, এত চুলকানি...এত চুলকানি...
হঠাৎ চাপা একটা গোঙানি যেন জোর করেই বেরিয়ে এল মুখ থেকে।
বেশ বড় বড় লাল রঙের এক ধরনের পোকা। মুখ থেকে টেনে সরাল একটাকে। আরেকটা ঘষা দিয়ে ফেলে দিল হাতের উল্টো পিঠ থেকে।
ঘাড়ের ওপর পোকা হেঁটে বেড়াচ্ছে সড়সড় করে। শার্টের কলার দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। হেঁটে বেড়াতে শুরু করল পিঠের ওপর।

শত শত লাল পোকায় ছেয়ে আছে খড়ের গাদা। মানুষের গন্ধ পেয়েই যেন এসে হাজির হলো। ঘুরে বেড়াতে শুরু করল ওদের গায়ের ওপর।
ইয়াক! করে উঠল কিশোর। একটা লাল পোকা ওর ফাঁক হয়ে থাকা ঠোঁটের কোণ দিয়ে মুখে ঢুকে পড়ল।
থু-থু করে ফেলে দিল ওটা। জিভে ঝজাল-টক স্বাদ আটকে থাকল অনেকক্ষণ। দাঁতে দাঁত চেপে ফাঁক বন্ধ করে রাখল এরপর। কোনমতেই যাতে আর পোকা ঢুকতে না পারে।
পোকা ঢুকে থাকার কথা কল্পনা করে আরও একবার থু-থু করে উঠল। গাল চুলকাল। খড়ের গাদায় ঘষে পিঠের চুলকানি বন্ধ করতে চাইল।
কিন্তু কোন কাজই হলো না।
মনে হচ্ছে যেন ভয়াবহ এই চুলকামিতেই মারা যাবে।
চিৎকার করতে ইচ্ছে করছে। পোকায় ছাওয়া খড়ের গাদা থেকে ছুটে বেরিয়ে যেতে চাইছে। চিৎকার করে গলা ফাটিয়ে ফেলতে, কাপড় ছিঁড়তে, খামচে চামড়া তুলে ফেলতে ইচ্ছে করছে।
কোনদিনই এ চুলকানি আর বন্ধ হবে না, নিজেকে বলল সে। বাকি জীবনটা এ ভাবে চুলকে চুলকেই কাটাতে হবে।
নাহ, আর সওয়া যায় না! পাশ থেকে বলতে শুনল রবিনকে। আমি বেরিয়ে যাচ্ছি। মরলে মরব। তা-ও না চুলকে আর পারব না।
তবে মুসা তুলনামূলকভাবে স্থির রয়েছে। ফিসফিস করে বলল, চুপ! জেকিলরা এখনও ধারে কাছেই আছে।
যন্ত্রণার চোটে গায়ে কাঁপুনি শুরু হয়ে গেল কিশোরের। কমানোর কোন উপায় নেই। গায়ের ওপর চেপে রয়েছে ভয়াবহ খড়।
কান থেকে একটা পোকা বের করে ফেলল সে।
ফেলতে না ফেলতেই আরেকটা উঠে এল নাকের ওপর। ঢুকে গেল নাকের ফুটো দিয়ে।
না না! এ কাজও কোরো না! নিজেকে আদেশ দিল সে।
কিন্তু কথা শুনল না হাঁচি।
প্রচণ্ড জোরে হ্যাঁচ্চোহ করে উঠল সে।

.

ওর হাঁচির শব্দ মিলাতে না মিলাতেই ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে উঠল কয়েকজন। তারপর বাগত চিৎকার-চেঁচামেচি।
বেরিয়ে পালানোর সময় নেই আর। একাধিক পায়ের শব্দ ছুটে আসতে শোনা গেল।

অনেকগুলো হাত একসঙ্গে ঢুকে গেল খড়ের গাদায়। পা চেপে ধরে টেনে টেনে বের করে ফেলল কিশোরকে।
বিজাতীয় একটা ভাষায় অনর্গল কথা বলছে লোকগুলো, যার একটা বর্ণও বুঝতে পারল না সে। রবিন আর মুসাকেও বের করে ওরা আছড়ে ফেলল খড়ের গাদার নিচের শক্ত মাটিতে।
দ্রুত তিনজনকে ঘিরে ফেলল ওরা। কম করে হলেও ডজনখানেক বামন হবে। তীক্ষ্ণধার বল্লমের ফলা তিনজনের গায়ের কাছে কয়েক ইঞ্চি দূরে এসে থেমে গেল। নড়াচড়া করলেই দেবে ঘ্যাঁচ করে বিঁধিয়ে। ওদের চেহারায় প্রচণ্ড রাগ।
বুক চুলকাল কিশোর। শার্টের নিচ থেকে একটা পোকা বের করে এনে ছুঁড়ে ফেলল মাটিতে।
পাগলের মত চুলকে চলেছে রবিন আর মুসা। পোকা ফেলছে গা থেকে। দুনিয়ার আর কোনদিকে খেয়াল নেই যেন।
রবিনের চুলে চার-পাঁচটা পোকা ঘুরে বেড়াতে দেখে থাবা দিয়ে ফেলে দিল কিশোর।
অবশেষে, ফিরে তাকাল খুদে মানুষগুলোর দিকে, ওদের যারা বন্দি করেছে। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, তোমরা কেউ ইংরেজি জানো?
কলরব বন্ধ হয়ে গেল ওদের। ওদের এলোমেলো, জট বেঁধে যাওয়া লম্বা চুলের নিচের চোখ দুটো পাতা সরু করে তাকিয়ে রইল তিন গোয়েন্দার দিকে। আরও সতর্ক ভঙ্গিতে চেপে ধরল হাতের বল্লমগুলো।
ইংরেজি? লোকগুলোর ওপর দৃষ্টি ঘুরাতে থাকল কিশোর। জানো কেউ?
কৌতূহলী হয়ে গোয়েন্দাদের দিকে তাকিয়ে রইল লোকগুলো। যেন কল্পনাই করতে পারেনি বন্দিরা কথা বলতে পারে।
চলো যাই! মরিয়া হয়ে চিৎকার করে উঠল মুসা। এখানে আমরা থাকব কিসের জন্যে?
নীরবতা।
লোকগুলোর বল্লমের ফলা আরও এগিয়ে এল দুএক ইঞ্চি। ওদের ঘিরে থাকা চক্রটা আরও ছোট হয়ে এল।
গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়াল মুসা, কিশোর আর রবিন।
খুদে লোকগুলোর মাথার ওপর দিয়ে চক্রটার বাইরে তাকাল কিশোর। পালানোর পথ খুঁজছে তার চোখ। লোকগুলোর ওপাশে সমতল মাঠ ছাড়া আর রয়েছে সারি সারি গোল কুড়ে। প্রতিটি কুঁড়ের সামনে জ্বলছে একটা করে ছোট অগ্নিকুণ্ড।
ঢোক গিলল সে। পালানোর পথ নেই। লুকানোর জায়গা চোখে পড়ল না।

পিঠে চোখা ফলার খোঁচা খেয়ে আউক করে উঠল সে।
লাফ দিয়ে সামনে এগোল।
ভয়ঙ্কর ভঙ্গিতে ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করছে জেকিলেরা। পেছন থেকে বল্লম দিয়ে খোঁচা মারতে থাকল। নড়তে বলছে।
হাই! দাঁড়াও! চিৎকার করে উঠল কিশোর। কণ্ঠের আতঙ্ক চাপা দিতে পারল না। কোথায় নিয়ে যাচ্ছ তোমরা আমাদের?
আবার ঘোৎ-ঘোৎ। রাগত হট্টগোল। চাপা গর্জন।
লাফ দিয়ে আগে বাড়তে গেল মুসা। বল্লমের জোরাল খোঁচা এসে লাগল পিঠে।
নাহ্, বাঁচার কোন আশা নেই! হাল ছেড়ে দিল রবিন। একমাত্র পথ, গায়েব হয়ে যাওয়া।
যেটা কোনমতেই হওয়া যাবে না, যোগ করল মুসা।
অতএব বাঁচাও যাবে না।
এটা কিন্তু খেলা নয়, কিশোর বলল। কঠোর বাস্তব।
মাঠের ওপর দিয়ে ওদেরকে হেঁটে যেতে বাধ্য করল জেকিলরা। নিচু একটা কুঁড়ের সামনে এনে দাঁড় করাল। অগ্নিকুণ্ডের কাছে। আগুনের নিচে কড়কড় করে। কয়লা পুড়ছে। জ্বলন্ত রুবির মত। জোরাল বাতাসের ঝাঁপটা লাগল। ফুঁসে উঠল আগুন। লেলিহান শিখা লাফ দিয়ে ছুটে এল গোয়েন্দাদের দিকে।
কি করবে ওরা আমাদের, বলো তো? করুণ চোখে কিশোরের দিকে তাকাল রবিন। জীবন্ত কাবাব বানাবে?
কি জানি! নিচের ঠোঁট কামড়াল কিশোর। জানি না। তবে একটা কথা বলতে পারি। শিকারকে না মেরে জ্যান্ত ছিঁড়ে খায় না কখনও জেকিলরা।
এ রকম একটা তথ্যও খুশি করতে পারল না মুসা বা রবিনকে। শিরশির করে কাঁপুনি বয়ে গেল কিশোরের সারা দেহে। পা দুটো আর দেহের ভার রাখতে পারছে না।
ওদের মুখোমুখি বল্লম তুলে সারি দিয়ে দাঁড়াল জেকিলরা। আগুনের দিকে পেছন দিয়ে দাঁড়াতে বাধ্য করল।
আমরা কোন ক্ষতি করতে আসিনি তোমাদের! চিৎকার করে বলল কিশোর। কোন ক্ষতি করব না।
আমাদের ছেড়ে দাও! রবিনের কণ্ঠে কান্নার সুর। আমরা এখানে থাকি না। বাস করি না। আমাদেরকে আটকে রাখার কোন অধিকার তোমাদের নেই।
ঘোৎ-ঘোৎ করে নিজেদের মধ্যে কি সব আলোচনা করতে লাগল কয়েকজন। গোয়েন্দাদের দিকে নজর নেই। বাকিরা সব বল্লম তাক করে কড়া নজর রাখল যেন কোনমতেই পালাতে না পারে বন্দিরা।

ছোট ছোট বামন, কিশোরের দিকে কাত হয়ে ফিসফিস করে বলল মুসা। ওদের এত ভয় পাচ্ছি কেন আমরা? ছুটে পালালেই তো পারি।
মাথা নাড়ল কিশোর। উঁহু। খবরদার। সেই চেষ্টাও কোরো না। দেখতে ছোট হলে কি হবে। ওদের গায়ে অমানুষিক জোর। তা ছাড়া হাতে বল্লম। সাংঘাতিক নিশানা। মিস করে না।
ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল মুসা। তাহলে কি করব আমরা?
জবাব দেয়ার সুযোগই পেল না কিশোর। ঘষার শব্দ কানে এল। কাশি শোনা গেল। সাদা চামড়ার পোশাক পরা একটা জেকিল ছুটে বেরিয়ে এল কুঁড়ের নিচু দরজা দিয়ে।
ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে তিন গোয়েন্দা। বোঝার চেষ্টা করছে, কি খবর নিয়ে আসছে লোকটা। গায়ের চামড়ার ফতুয়া আর পাজামা আগুনের আলোয় চকচক করছে। বাকি সবার মত কালো চুল নয় এর। ঝকড়া সোনালি চুলের বোঝা। চওড়া কপাল। জ্বলজ্বলে নীল চোখ।
মেহমান, অদ্ভুত রকম ভারী গলায় বলে উঠল আগন্তুক। মেহমান, আবার একই কণ্ঠে একই শব্দ উচ্চারণ করল লোকটা।
আপনি...আপনি ইংরেজি জানেন? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
মাথা ঝাঁকাল লোকটা। জ্বলন্ত চোখের দৃষ্টি নিক্ষেপ করল কিশোরের দিকে। তোমাকে দেখে তো নাইট বলে মনে হচ্ছে না, চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল সে। ক্রেলের মতও লাগছে না।
তিন গোয়েন্দার দিকে এগিয়ে এল লোকটা। সরে নেতাকে জায়গা করে দিল দুজন জেকিল। তোমরা কি পথ? নাকি জাদুকর?
আগুনের আলো খেলা করছে তার দুচোখে। দুই হাত কোমরে রেখে তাকিয়ে আছে সে। জবাবের অপেক্ষা করছে।
আমরা...আমরা অতি সাধারণ মানুষ, জবাব দিল কিশোর।
চোখের পাতা সরু করে চোখ প্রায় আধবোজা করে তাকাল লোকটা। সাধারণ মানুষ! তোমরা কি শক্তিশালী?
না! চিৎকার করে উঠল রবিন। আমাদের কোন ক্ষমতাই নেই। আমাদের যেতে দিন। প্লীজ!
আমরা যুদ্ধ করতে আসিনি, শান্তকণ্ঠে লোকটাকে বোঝানোর চেষ্টা করল কিশোর। আমরা সৈনিক নই। আমরা...আমরা ছাত্র। আমরা ছেলেমানুষ।
মসৃণ চোয়াল ডলল লোকটা। তাহলে ছেলেমানুষ-ছাত্র তোমরা এলে কেন এখানে?

এক দুষ্ট জাদুকর আমাদেরকে পাঠিয়ে দিয়েছে এখানে, জবাব দিল কিশোর। আমরা ইচ্ছে করে আসিনি…
জাদুকর শুনেই একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল জেকিলরা। বল্লম তুলে নাচাতে শুরু করল।
চোখ বড় বড় হয়ে গেল ওদের নেতার। জাদুকরে পাঠিয়েছে? তারমানে তোমরাও জাদুকর।
না! চেঁচিয়ে বলল কিশোর। নিজের চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে। আমাদের কোন ক্ষমতা নেই। কোন ক্ষমতাই নেই। যা ঘটেছে, পুরোটাই একটা ভুলের কারণে। ভুল বোঝাবুঝির কারণে।
এক এক করে তিন গোয়েন্দার মুখের দিকে তাকাতে থাকল লোকটা। বিড়বিড় করে বলল, তাই না? বেশ, দেখা যাক।
দলের লোকের দিকে তাকিয়ে খেঁকিয়ে উঠে কি আদেশ দিল নেতা। সঙ্গে সঙ্গে দুজন জেকিল দৌড় দিল একটা কুঁড়ে ঘরের দিকে। ভেতরে ঢুকে গেল।
কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই বেরিয়ে এল সে। একজনের হাতে একটা রূপার বড় পানপাত্র। দুই হাতে শক্ত করে ধরে আছে সেটা। যেন মহামূল্যবান বস্তু রয়েছে ভেতরে।
লোকটা কাছে এলে পাত্রটা তার হাত থেকে নিয়ে নিল নেতা। তিন গোয়েন্দার সামনে নিচু করল, যাতে ভেতরে কি আছে দেখতে পায় ওরা। রূপার পাত্রে কালচে রঙের কি যেন রয়েছে। পাক খাচ্ছে। বুদবুদ উঠছে। ফোঁটার সময় হয়েছে তরল পদার্থটার।
এঁহ! একবার তাকিয়েই মুখ চোখ বিকৃত করে ফেলল কিশোর। পচা মাংসের গন্ধ বেরোচ্ছে জিনিসটা থেকে।
নাও, এটা তোমাকে খেতে হবে, পাত্রটা কিশোরের দিকে বাড়িয়ে দিল নেতা।
উঁহু! খেতে পারব না! পেটের মধ্যে গোলানো শুরু হয়ে গেছে তার। দুই হাতে নাক টিপে ধরে রাখল।
তারপরেও কি করে যেন নাকে ঢুকে যাচ্ছে ভয়ানক দুর্গন্ধ। এত খারাপ গন্ধের কথা কল্পনাই করা যায় না। পচা মাংস, পচা মাছ আর খটাশের গন্ধ একসঙ্গে করলে যা হয়, তা-ই হয়েছে।
ঘন কালো তরল পদার্থ পাত্রের কিনার বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে।
খাও খাও, জলদি খাও, ধমকে উঠল জেকিল-নেতা। তাড়াহুড়া করে গিলতে পারলে আর অত খারাপ লাগবে না।
কিন্তু…জিনিসটা কি? নাক থেকে হাত না সরিয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর। বিকৃত শোনাল কথাটা।

বিষ, অকপটে জবাব দিল লোকটা। মারাত্মক বিষ।
দম আটকে ফেলল কিশোর। কিন্তু কেন?
এটা আমাদের সত্য-পরীক্ষা, বুঝিয়ে দিল লোকটা। এটা খাওয়ার পরেও যদি তুমি বেঁচে থাকো, তাহলে বুঝতে হবে তুমি সত্যি কথা বলছ।
ফুটতে থাকা কালো তরলটার দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। কিন্তু, চিৎকার করে উঠল সে, কেউ কি এ জিনিস খেয়ে বাঁচতে পেরেছে?
মাথা নাড়ল লোকটা। না। এখনও কেউ পারেনি।
কতক্ষণ আর নাক ধরে থাকা যায়। হাত সরালেই দুর্গন্ধে পেটের মধ্যে গুলিয়ে উঠছে। বমি আসতে চাইছে। এত ভয়াবহ দুর্গন্ধ, শুধু গন্ধেই অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে সে।
খাও, আদেশ দিল আবার নেতা। সত্য-পরীক্ষা তোমাকে খেতেই হবে। নাও, ধরো। খাও।
এক হাতে ওর মাথা চেপে ধরল লোকটা। অন্য হাতে পাত্রটা চেপে ধরল। ঠোঁটের সঙ্গে।

.

গরম, আলকাতরার মত ঘন তরলের স্পর্শ পেল মুখের বাইরে কিশোর।
দুর্গন্ধে ভরা বাষ্প আটকে যাচ্ছে সারা মুখে।
কানফাটা একটা গর্জন কানের পর্দা কাঁপিয়ে দিল হঠাৎ।
পাত্রটা জেকিলের হাত থেকে পড়ে গেল। ঘন তরল পদার্থ ছড়িয়ে পড়ল মাটিতে।
আবার গর্জন। মাটি কেঁপে উঠল।
পিছিয়ে গেল জেকিল-নেতা। বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে গেছে চোখ।
ভুলে জিভ দিয়ে চেটে ঠোঁট পরিষ্কার করতে গেল কিশোর। জিভে লাগল। বিষের স্বাদ।
পেটের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠল।
কিন্তু সব কিছু ভুলে গেল বিশাল ড্রাগনটাকে দেখে।
আবার গর্জন।
আরেকটা ড্রাগন দেখা গেল। শরীর দোলাতে দোলাতে দৌড়ে আসছে ঘাসে ঢাকা মাঠের ওপর দিয়ে। তারপর আরও একটা ড্রাগনকে দেখা গেল।
ড্রাগনে সওয়ার আরোহীদেরকেও চোখে পড়ল তার। ড্রাগনের লম্বা, ওপরের দিকে বাঁকানো ঘাড়ে বসে আছে সারা দেহ বর্মে আবৃত যোদ্ধারা। ড্রাগনের পিঠের কাঁটা ওদের বিশেষ অসুবিধে করছে বলে মনে হচ্ছে না।
ওরা নাইট। হাতের তরোয়াল আর ঢাল আগুনের আলোয় চকচক করছে।
ক্ষিপ্ত হয়ে চিৎকার করছে ড্রাগনগুলো। খুলছে আর বন্ধ করছে ধারাল দাঁতওয়ালা চোয়াল। মাড়িয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিল খড়ের গাদা। নেতার

কুঁড়ের দিকে দৌড়ে গেল একটা ড্রাগন। ম্যাচ বাক্সের মত ভর্তা করে ফেলল ওটাকে।
হেলমেট আর বর্ম পরা ড্রাগনের লম্বা ঘাড়ে ঝুলে থেকে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে। নিচের দিকে। তরোয়াল ঘুরিয়ে কোপ মারছে হতবাক জেকিলদের।
হট্টগোল আর আর্তনাদে ভরে গেল মাঠটা। উল্লসিত নাইটদের যুদ্ধ চিৎকার। ড্রাগনের তীক্ষ্ণ, কর্কশ ডাক। আতঙ্কিত জেকিলদের গোঙানি আর আর্তনাদ।
শয়তান খুদে মানবের দল তাদের বল্লম ফেলে দিল দৌড়। ওদের নেতা পেছন পেছন ছুটতে ছুটতে চিৎকার করে দলের লোকদের ফেরানোর চেষ্টা করতে লাগল। ফিরে এসে যুদ্ধ চালাতে বলল।
হাসতে হাসতে মুসার বুকে অসততা ধাক্কা দিয়ে কিশোর বলল, বাপরে! কি একখান লড়াই। তোমার খেলা গেমটার মত।
এতে হাসির কি আছে বুঝতে পারল না মুসা। বলল, চলো, সময় থাকতে পালাই!
উল্টো দিকে ঘুরে দৌড়ানো শুরু করল গোয়েন্দারা। সরে যেতে লাগল জেকিল, নাইট আর তাদের ড্রাগনদের কাছ থেকে। জেকিলদের অগ্নিকুণ্ড আর কুঁড়ের কাছ থেকে।
নরম মাটিতে ব্যাপ থ্যাপ পায়ের শব্দ হতে লাগল ওদের। প্রাণপণে ছুটছে। ঘাস বন পেরিয়ে চওড়া একটা মেটে ঢেলার খেত সেটার ওপর দিয়ে ছুটল। যুদ্ধ থেকে দূরে। শয়তান জেকিলদের কাছ থেকে দূরে।
জোরে জোরে হাঁপাতে হাঁপাতে বুকের মধ্যে ব্যথা শুরু হয়েছে কিশোরের। ফিরে তাকাল সে।
কুঁড়েগুলো এখন জ্বলছে। কমলা আগুনের লকলকে শিখা উঠে যাচ্ছে। আকাশপানে। রাতের বেগুনী আকাশ। মনে হচ্ছে ঘাসে ঢাকা সমস্ত সমভূমিটাতেই আগুন ধরে গেছে। দাবানলের মত।
জেকিলেরা সব গায়েব। ড্রাগনের পিঠে চড়ে মাঠময় টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। নাইটেরা। উল্লাসে মাথার ওপর তরোয়াল উঁচু করে ধরে নাচাচ্ছে আর চিৎকার করছে।
ছুটতে থাকো, কিশোর বলল তার দুই সঙ্গীকে। ছুটতে ছুটতেই শার্টের হাতা গুটিয়ে নিল। থেমো না। এই নাইটগুলোকেও বিশ্বাস নেই। ওরাও আমাদের শত্রু।
আমাদের দেখে ফেললেই এখন সর্বনাশ, রবিন বলল। তেড়ে আসবে। ড্রাগনের সঙ্গে দৌড়ে পারব না আমরা।
ধরা পড়লে কাম শেষ, মুসা বলল।
আবার ফিরে তাকাল কিশোর। জ্বলন্ত কুঁড়ের আগুনের আলোয় এখনও উল্লাস করতে দেখা যাচ্ছে ড্রাগনারোহী নাইটদের। বিজয়ের আনন্দে মেতে আছে।

লড়াইটা মোটেও ন্যায্য হলো না, মুসা বলল। আমি বলতে চাইছি, একটা অসম লড়াই হলো। বড় বড় টানে তাজা ঠাণ্ডা বাতাস যেন বুক ভরে গিলে নিল মুসা।
মরুক না ব্যাটারা, ক্ষোভ চাপা দিতে পারল না কিশোর। তাতে আমাদের কি? আমাদের তো বিষ খেতে বাধ্য করছিল ওরা।
মনে করতেই পচা দুর্গন্ধটা যেন নাকে এসে লাগল কিশোরের।
ঘুরে দাঁড়িয়ে দৌড়ের গতি বাড়িয়ে দিল আবার।
কাছিমের পিঠের মত বাঁকা হয়ে নেমে গেছে এখানে সমভূমিটা।
নিচে জঙ্গল। ওখানে আবার কোন ভয়ঙ্কর প্রাণীরা লুকিয়ে আছে কে জানে! কিন্তু ড্রাগন আর নাইটদের হাত থেকে পালাতে হলে এখন ওদিকেই যেতে হবে। আর কোন পথ নেই।
নেমে চলল ওরা।
আচ্ছা, কোথায় রয়েছি আমরা, বলো তো? চলতে চলতে রবিন বলল। কোন জায়গায়? কি ভাবে ঘটল এ সব? আমাদের বাড়িঘরগুলোই বা কোথায়?
কিশোর বা মুসা কথা বলার আগেই ভারী পায়ের শব্দ হলো।
পায়ের চাপে মাটি কাঁপছে।
গুম! গুম! গুম! গুম!
রবিনের হাত ধরে টান মারল কিশোর। ডাগন আসছে! জলদি পালাও!
গুম! গুম! গুম! গুম!
চাঁদের আলোয় দেখা গেল ড্রাগনটাকে। ওপরে কাছিমের পিঠের মত বাকা। জায়গাটার কিনার ধরে চলেছে। হাটার তালে তালে দুলছে বিশাল বপু। ডানা। দুটো কাঁটা বসানো কাঁধের কাছে আধখোলা, উঁচু করে রেখেছে।
ছোট ঝোপের মধ্যে ঘাপটি মেরে রইল ওরা।
লম্বা, বর্ম বসানো গলাটা বাড়িয়ে সামনে তাকিয়ে আছে ড্রাগনটা। চোয়াল বন্ধ। হাঁটার সময় ওপরে নিচে দুলছে মস্ত মাথাটা। ওটার ঘাড়ে কোন নাইটকে দেখা গেল না।
কিশোরের হাত ধরে চাপ দিল রবিন। মুসা তার গা ঘেঁষে রয়েছে। নীরবে ড্রাগনটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে তিনজনে। বুক কাঁপছে। সবার মনে একই প্রশ্ন।
ড্রাগনটা কি দেখে ফেলেছে ওদের?
গন্ধ পেয়েছে?
খুঁজছে ওদেরকে?
না। একই ভঙ্গিতে হেঁটে সরে যেতে লাগল ওটা। এক সময় চাঁদের আলো থেকে মুছে গেল। হারিয়ে গেল অন্ধকার দিগন্তে।

পুরো একটা মিনিট আরও চুপচাপ বসে রইল ওরা। বুকের কাপুনি কমার অপেক্ষা করতে লাগল। তারপর নীরবতা ভাঙল কিশোর। ফিসফিস করে বলল, ওটা বুনো। নাইটদের হাতে পড়েনি এখনও। পোষ মানানো হয়নি।
কিন্তু আমরা আছি কোথায়? একটু আগে রবিনের করা প্রশ্নটাই মুসাও করল। দুঃস্বপ্নে?
নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার কিশোর। আমরা রয়েছি তাসের জগতে। তাসের খেলায়। আমাদের চরিত্র বানিয়ে খেলছে জাদুকর।
কাকু-কাকু তারমানে সত্যিই জাদুকর, মুসা বলল।
তাতে আর কোন সন্দেহ আছে এখন?
এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে মুসা বলল, কিন্তু আমরা এখন কি করব? আমাদের বাড়ি ফিরে যাবার উপায় কি? আলীবাবার পাহাড়ের গুহা খোলার মত কোন জাদুই শব্দ ব্যবহার করব নাকি? সিসেম ফাঁক! সিসেম ফাঁক!
সিসেম ফাঁক! মুসার দিকে তাকাল কিলোর। চিন্তিত মনে হচ্ছে ওকে। উঁহু। ওরকম মন্ত্রে কাজ হবে না...
তাহলে কিসে হবে? অস্থির হয়ে উঠেছে মুসা। কিশোর, কিছু একটা করো। ইস, কোন কুক্ষণে যে সেদিন কাকু-কাকুর বাড়িতে জিনিস বিক্রি করা দেখতে গিয়েছিলাম...
ফিরে যেতে হলে আবার তাসগুলো প্রয়োজন হবে আমাদের, মুসার কথায় কান নেই কিশোরের। ওগুলো সব একসাথে করে বাক্সে ঢুকিয়ে দিতে পারলেই আবার তাসের জগৎ থেকে বেরিয়ে যাব আমরা।
কিন্তু কোথায় পাওয়া যাবে তাসগুলো? মুসার প্রশ্ন।
চাঁদের আলোয় ধুয়ে যাচ্ছে ঘাসের মাঠটা। বাতাস বাড়ছে। ঠাণ্ডা। ভেজা ভেজা।
জাদুকরের বাড়ির মেঝেতে নিশ্চয় পড়ে আছে এখন, শুকনো কণ্ঠে জবাব দিল কিশোর।
দমে গেল মুসা। ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তাহলে আর পাব কি করে?
চলো, হাটা শুরু করি, রবিন বলল। কোন না কোন শহর পেয়েই যাব। কোথাও না কোথাও একটা ফোনও পাওয়া যাবে।
রবিনের দিকে তাকাল কিশোর। ব্যাপারটা দেখছি এখনও পুরোপুরি বোধের মধ্যেই যায়নি তোমাদের। ফোন নেই এখানে। শহরও পাবে না। মধ্যযুগীয় কোন একটা সময়ে প্রবেশ করেছি আমরা। কিংবা রূপকথার জগতে। যেখানে ড্রাগন, নাইট আর এলফের মত প্রাণীদের রাজত্ব।
চাঁদের আলোয় মুসা আর রবিন দুজনের চোখেই অস্বস্তি দেখতে পেল সে।

তবে, কিশোর বলল, এ থেকে বেরোতে আমাদের হবেই। কোন না কোন উপায় একটা বের করতে হবে। তাসের এই গেমের মধ্যে থেকে গেলে মৃত্যু অবধারিত।
কিন্তু সেই উপায়টা কি? মুসা বলল, এখানে এ ভাবে বসে বসে ভাবতে থাকলেই কি চলবে? বাড়ি আর কোনদিন পৌঁছানো হবে না তাহলে।
তা বটে, উঠে দাঁড়াল কিলোর। ঠাণ্ডা বাতাসে গায়ে কাঁটা দিল তার। মাটিতে কাঁপুনি তুলে থপ্ থপ্ করে হেঁটে যাওয়া ড্রাগনটার কথা ভাবল সে। কেঁপে উঠল আরেকবার।
একটাকে যখন দেখলাম, নিশ্চয় বুনো ড্রাগন আরও আছে। রাতের বেলা এ পথে চলাফেরা করে ওরা।
কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছি না, বুনো এই দৈত্যগুলোকে পোষ মানাল কি করে নাইটেরা? রবিনের প্রশ্ন।
হাতিকে ধরে আমরাও তো পোষ মানাই, জবাব দিল কিশোর। নিশ্চয় আছে কোন কায়দা।
নিচের উপত্যকার বনটার দিকে তাকাল সে। বনেই ঢুকে পড়ব না-কি? নিজেকেই প্রশ্ন করল যেন। হয়তো বনের মধ্যেটা এখানকার চেয়ে নিরাপদ। হয়তো রাস্তাটাস্তাও পেয়ে যেতে পারি। তাহলে লোকালয়ে পৌঁছানো সম্ভব হতে পারে। স্বাভাবিক মানুষদের গ্রামে।
মাথা ঝাঁকাল রবিন। কিছু বলল না। মুসা চুপ করে রইল।
হাঁটতে শুরু করল ওরা। আগে আগে চলেছে কিশোর।
ঢুকে পড়ল বনের মধ্যে। পায়ের নিচের মাটি এত নরম, জুতো দেবে যায়। পিছলে যায়। দ্রুত এগোনো তাই কঠিন।
থামল না ওরা। এগিয়ে চলল।
কয়েক মিনিট হাঁটার পর মাটিতে কিসের ওপর যেন পা পড়ল মুসার। নিচে তাকাল। গাছের ডালের মত কি যেন।
মট করে কিছু একটা ভাঙল।
গাছের ওপর থেকে নেমে এল ভারী একটা জাল। মাথার ওপর পড়ল তিনজনের।
ফাঁদ! ফাঁদ! চিৎকার করে উঠল কিশোর। ধরা পড়ে গেলাম আমরা।

.

এত ভারী জাল যে, ভারের চোটে বসে পড়তে হলো ওদের।
ধস্তাধস্তি করে গায়ের ওপর থেকে সরানোর চেষ্টা করল। দুই হাতে অনেক কষ্টে মাথার ওপর জালটা উঁচু করে ধরল মুসা। আবার উঠে দাঁড়াতে চাইল।
কিন্তু সাংঘাতিক মোটা দড়ি। খসখসে। ধারাল শন জাতীয় কোন কিছু দিয়ে তৈরি। হাতে কেটে বসে যায়। সুবিধে করতে পারল না সে।

তিনজনে মিলে নড়ানোর চেষ্টা করেও নড়াতে পারল না।
বাপরে বাপ! বলে উঠল মুসা। কি জিনিস দিয়ে তৈরি?
যেটা দিয়েই হোক, গুঙিয়ে উঠল রবিন। বেরোতে তো হবে আমাদের।
হ্যাঁ, চেষ্টা চালিয়ে যাও, কিশোর বলল। থেমো না।
কিন্তু বহু চেষ্টা করেও গায়ের ওপর থেকে জালটা ফেলতে পারল না ওরা। ভারী তো বটেই, তৈরিও করা হয়েছে এমন করে, যাতে নিচে পড়লে কোনমতেই ছুটতে না পারে শিকার। জালে আটকা পড়লে পাখির কেমন কষ্ট লাগে, হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারল ওরা এখন।
এরপর কি ঘটবে?
ভয়ঙ্কর সব ভাবনা খেলে যাচ্ছে কিশোরের মগজে। এতই ভয়ানক, সেগুলো মুসা আর রবিনকে বলে ওদের ভয় পাওয়াতে ইচ্ছে করল না ওর।
যদি এমন হয়, জালটা পাতা হয়েছে বহুকাল আগে? কেউ আর এখন দেখতে আসে না জালে শিকার পড়ল কিনা, কি ঘটবে তাহলে?
কেউ ওদের উদ্ধার করতে আসবে না। এই জালের নিচে আটকা পড়ে থেকে খেতে পেয়ে তিলে তিলে ক্ষুধায়-তৃষ্ণায় মৃত্যু ঘটবে ওদের।
আর যদি নতুন পাতা হয়ে থাকে, কে পাতল? কি ধরার জন্যে পাতল? মানুষ?
জেকিলদের আচরণের কথা মনে করে গায়ে কাঁটা দিল ওর।
পায়ের শব্দ শোনা গেল। বনতলে বিছিয়ে থাকা পাতার পুরু আস্তরণের ওপর দিয়ে কে যেন হেঁটে আসছে। শুকনো পাতায় পা পড়ে মচমচ শব্দ হচ্ছে। বরফর মত জমে গিয়ে অপেক্ষা করতে থাকল ওরা।
আসছে কে যেন! ফিসফিস করে বলল কিশোর।
শত্রু না হলেই হয়, জবাব দিল মুসা।
অদ্ভুত একটা জন্তু এসে দাঁড়াল জালটার কাছে। পুরো চেহারাটা নজরে এল। আত্মা শুকিয়ে গেল তিন গোয়েন্দার।
পরনে রোমশ চামড়ার পোশাক। মানুষের মতই দুই পায়ে হাঁটে। কালো চুলের দুই পাশে শুয়োরের কানের মত দুটো কান। ডগাটা ছুঁচাল। ওপর দিকে তোলা। মানুষের চোখ। শুয়োরের নাক। প্রায়-ঠোঁটহীন-মুখের দুই কোণ থেকে বেরিয়ে আছে ওয়ালরাসের মত লম্বা দাঁত।
হাল্লো! খাতির করার চেষ্টা করল মুসা। জাল থেকে আমাদের ছুটাতে এসেছেন?
জালের দিকে চুপ করে তাকিয়ে আছে জীবটা। লম্বা তিন আঙুলের ডগায়। বসানো জানোয়ারের মত বাকা নখ। লম্বা চুলের মধ্যে সেগুলো ঢুকিয়ে দিয়ে মাথা চুলকাল।
হাল্লো! ইংরেজি জানেন আপনি? জিজ্ঞেস করল আবার মুসা।

জবাবে ঘোঁৎ-ঘোৎ করে উঠল জীবটা। শুয়োরের মতই। বুকের গভীর থেকে বেরিয়ে এল চাপা সে-শব্দ।
প্লীজ... বলতে গেল আবার মুসা।
কিন্তু তীক্ষ্ণ একটা লম্বিত হেউপ হেউপ হেউপ ডাকে থেমে গেল সে।
বনের ভেতর থেকে ছুটে বেরিয়ে এল চার পাওয়ালা ছোট একটা জানোয়ার। বড় জীবটার পাশে এসে দাঁড়াল। বন্দিদের দেখে উত্তেজিত হয়ে ডাকাডাকি করতে লাগল। জালের চারপাশ ঘিরে নেচে বেড়াতে লাগল। কালো কালো ছোট খুর দিয়ে খোঁচা মারছে জালের দড়িতে। পারলে ওপরে উঠে এসে বন্দিদের। গায়েই খোঁচা মারে।
জানোয়ারটা দেখতে অনেকটা ছোট জাতের কুকুরের মত। গায়ের চামড়া লোমহীন। মানুষের চামড়ার মত। তবে অনেক বেশি মসৃণ আর চকচকে। হলুদ রঙের। কুকুরের মতই হেক হেক করে ডাকছে। হাই তোলার ভঙ্গিতে হাঁ করে এক সময় দুই সারি চিকন ধারাল দাঁত দেখিয়ে দিল।
বড় জন্তুটা ঘোৎ-ঘোৎ করে ছোটটার মাথা চাপড়ে দিল। বোধহয় শান্ত হতে বলল। ছোট কুকুরের মত জন্তুটা চিৎকার থামিয়ে দিয়ে আদর পাওয়া বিড়ালের মত গরগর করতে লাগল।
জাল ধরে টানতে শুরু করল শুয়োর-মানব।
আমাদের ছেড়ে দিচ্ছে! খুশিতে চিৎকার করে উঠল মুসা।
কিন্তু ভুল করেছে সে।
বন্দিদের ছাড়ল না শুয়োর-মানব। বরং জালের মধ্যেই আটকে রেখে জাল। সহ ওদের টেনে নিয়ে চলল বনের মধ্যে দিয়ে।
কোনমতেই বেরোতে পারল না গোয়েন্দারা। সাংঘাতিক শক্তি জটার গায়ে। গাছপালার ফাঁকফোকর দিয়ে অবলীলায় টেনে নিয়ে চলল তিন তিনজন মানুষ সহ এ রকম একটা ভারী জাল। অসহায় হয়ে জালের মধ্যে চিত হয়ে রইল তিন গোয়েন্দা।
শিকার ধরা পড়লে কুকুর যা করে, ঠিক সে-রকমই করতে লাগল ছোট আকারের কুকুরে-শুয়োর কিংবা শুয়োরে-কুকুরটা। চিৎকার-চেঁচামেচি, হাঁক-ডাক লাফালাফি সবই করছে। একবার ছুটে সামনে চলে যাচ্ছে। আবার ফিরে আসছে। জাল ঘিরে চক্কর দিতে দিতে নাচানাচি করছে।
চলার সময় ক্রমাগত ঘোৎ-ঘোৎ করছে শুয়োর-মানব। তার ওয়ালরাস দাঁতের গা বেয়ে জানোনায়ারের মত লালা গড়াচ্ছে। লম্বা নীল জিভ বের করে জানোয়ারের মতই চেটে নিচ্ছে সেগুলো।

জালের মধ্যে বড়ই কষ্ট হচ্ছে গোয়েন্দাদের। চিত হয়ে থেকেও আরাম পাচ্ছে না। টানার সময় প্রচণ্ড ঝাঁকি লাগছে। গায়ে গায়ে বাড়ি খাচ্ছে। ব্যথা লাগছে রীতিমত। অবশেষে থামল জন্তুটা। জাল টানা বন্ধ হলো।
ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। হাঁটু ডলছে মুসা। নীরবে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে রবিন।
জন্তুটা কোথায় নিয়ে এল ওদের?
লম্বা, নিচু, ধূসর রঙের একটা পাথরের বাড়ি দেখা গেল। এক মাথায় একটা দরজা। জানালা-টানালা নেই।
শুয়োর-মানবের বাড়ি?
জোরাল ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে, লম্বা দাঁত চাটতে চাটতে, বড় বাড়িটার পাশের ছোট একটা ঘরের দিকে এগিয়ে গেল জটা। সামনের একটা পাথরের দরজা খুলল।
সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে বেরিয়ে এল আগুনের শিখা।
একটা বেলচা তুলে নিল জটা। আগুনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। খোঁচানো শুরু করল। তারপর আরও কিছু কয়লা ফেলল আগুনে।
কিশোর, ওটা কি? ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল রবিন।
ঢোক গিলল কিশোর। চুলাই তো মনে হচ্ছে।
খাইছে! চমকে গেল মুসা। ওর মধ্যে ফেলে কাবাব বানাবে আমাদের? এ তো রাক্ষস মনে হচ্ছে! রূপকথার রাক্ষস!
জবাব দিল না কিশোর। তাকিয়ে আছে জন্তুটার দিকে। ক্ষুধার্ত ভঙ্গিতে দাঁত চাটছে। চুলার কয়লা খুঁচিয়েই চলেছে। পাগল হয়ে যেন লাফালাফি করছে আগুনের শিখা।
কি করব আমরা, কিশোর? প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেছে রবিন। কোন একটা বুদ্ধি বের করো। জলদি! পারবে বের করতে?
আবার ঢোক গিলল কিশোর।
নাহ, শুকনো স্বরে জবাব দিল সে। কোন বুদ্ধিই আসছে না মাথায়।
.
চুলায় আরও দুতিন বেলচা কয়লা ফেলল রাক্ষসটা। লাল টকটকে কয়লার তাপ বাইরে বেরিয়ে আসতে লাগল। তারপর সন্তুষ্ট হয়ে বেলচাটা ছুঁড়ে ফেলল একদিকে। গোয়েন্দাদের দিকে ফিরে থপথপ করে এগিয়ে আসতে শুরু করল।
ওর শুয়োরের মত মুখে ক্ষুধার্ত হাসি ছড়িয়ে পড়েছে। হলুদ রঙের কুকুরের মত প্রাণীটাও উত্তেজিত ভঙ্গিতে হাঁপাচ্ছে। রাক্ষসটাকে ঘিরে চক্কর দিতে দিতে এগোতে লাগল জালের দিকে।

চাঁদি দপদপ করছে কিশোরের। বুকের মধ্যে ধুড়স ধুড়স করছে হৃৎপিণ্ডটা। হাজার রকম ভাবনা ঘুরপাক খাচ্ছে মগজে। মরিয়া হয়ে বাঁচার উপায় খুঁজছে।
জালটা এখন তুলবে, ফিসফিস করে বলল কিশোর। ভোলার সঙ্গে সঙ্গে দৌড় মারবে। একসঙ্গে তিনজনকে ধরতে পারবে না রাক্ষসটা।
কিন্তু ভুল করেছে কিশোর। জন্তুটাকে এতটা বোকা ভাবা ঠিক হয়নি। জাল থেকে ওদের বের করল না সে। জাল সহই ওদের নিয়ে চলল চুলার কাছে। প্রচণ্ড আগুনের হলকা এসে লাগল চোখে মুখে। পুড়ে যাবে মনে হলো চামড়া। আগুনের তপ্ত উজ্জ্বলতা সইতে না পেরে চোখ বন্ধ করে ফেলল কিশোর।
টের পেল ধীরে ধীরে মাথার ওপর থেকে সরে যাচ্ছে জাল। চোখ মেলল সে। প্রায় বেরিয়ে পড়েছে রবিন আর মুসা। আরেকটু সরল জাল। কিশোরও বেরিয়ে পড়ল। খপ করে ওকে আর মুসাকে চেপে ধরল রাক্ষসটা। ভাবল বোধহয়, সবচেয়ে বড় শরীরের দুটোকেই আটকে রাখবে। অন্যটা পালালে পালাক।
ছাড়া পাওয়ার জন্যে ছটফট করতে লাগল মুসা। কিন্তু সাংঘাতিক শক্তিশালী রাক্ষসের হাত থেকে মুক্ত করতে পারল না নিজেকে।
না না, প্লীজ! চেঁচানো শুরু করল মুসা। দোহাই তোমার, শুয়োর-রাক্ষস, আমাদের ছেড়ে দাও। আমাদের মাংস ভাল না। মোটেও পছন্দ হবে না তোমার।
হ্যাঁচকা টান মেরে চুলার আরও কাছে ওদেরকে নিয়ে গেল রাক্ষসটা।
থামো! থামো! চেঁচিয়েই চলেছে মুসা।
জবাবে ঘোঁৎ-ঘোৎ করতে লাগল রাক্ষসটা। শুয়োরের চেহারার মুখটায় কোন রকম আবেগ লক্ষ করা গেল না।
চুলার মুখ দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে বেরোচ্ছে আগুনের শিখা। চামড়া পুড়িয়ে দিচ্ছে আঁচ। তবে রাক্ষসটার কিছু হচ্ছে বলে মনে হলো না।
অবলীলায় দুই হাতে দুজনকে ধরে উঁচু করে ফেলল রাক্ষসটা। নিয়ে চলল চুলার মুখের কাছে।
প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে নাচানাচি ও চিৎকারের পরিমাণ কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে কুকুরে প্রাণীটা। একবার আগে যাচ্ছে, একবার পেছনে, আবার আগে।
পেছন থেকে হঠাৎ কুঁই কুঁই করে উঠল ওটা। স্বর বদলে গেছে। ভীত কণ্ঠস্বর।
রাক্ষসের হাতে ঝুলতে ঝুলতেই ঘাড় ঘুরিয়ে ফিরে তাকাল কিশোর। দেখল, ঘাড় ধরে কুকুরটাকে উঁচু করে ফেলেছে রবিন। সোজা নিয়ে গেলে চুলার মুখের কাছে। আগুনে ফেলে দেয়ার ভঙ্গি করল।
থমকে গেল রাক্ষসটা। গোটা দুই খাটোমত ঘোঁৎ-ঘোতানি বেরোল মুখ দিয়ে।
প্রথমে কিশোরকে মাটিতে নামাল রাক্ষসটা। তারপর মুসাকেও নামাল। কিন্তু হাত ছাড়ল না।

উত্তেজনা চলে গেছে কুকুরটার। আতঙ্কে কো-কোঁ করছে। বুঝে গেছে রবিনের উদ্দেশ্য।
ছাড়ো ওদের, রাক্ষস কোথাকার! চেঁচিয়ে উঠল রবিন। নইলে দিলাম এটাকে আগুনে ফেলে!
দাঁড়িয়েই রইল রাক্ষসটা। ইতস্তত করছে।
ওর দুর্বলতাটা বুঝে গিয়ে আরও জোরে চিৎকার করে উঠল রবিন, ছাড়লে না এখনও! কুকুরটাকে চুলার একেবারে মুখের কাছে নিয়ে গেল সে। তার নিজের দেহেও যে ভয়াবহ আঁচ লাগছে, কেয়ারই করল না সেটাকে।
আতঙ্কে ত্রাহি চিৎকার শুরু করেছে কুকুরটা। খানিক আগে মুসা যে ভাবে শরীর মুচড়ে রাক্ষসের হাত থেকে ছুটতে চাইছিল, কুকুরটা করছে এখন সেরকম।
ভাল চাও তো ছাড়ো! চিৎকার করে উঠল রবিন।
রাক্ষসটা ওর ভাষা বুঝল কিনা বোঝা গেল না। তবে উদ্দেশ্য বুঝতে পারল। অবশেষে ছেড়ে দিল কিশোর আর মুসাকে। ওর কালো চোখে ভয় মেশানো আক্রোশ।
সরো এখন! বলার সঙ্গে হাত দিয়েও ইশারা করল রবিন। কুকুরটাকে ধরে রেখেছে চুলার মুখের কাছে।
বোঝা গেল, খাবারের চেয়ে কুকুরটার প্রাণ রাক্ষসটার কাছে বেশি প্রিয়। পিছিয়ে যেতে শুরু করল সে।
কিশোর, দৌড় মারো! রবিন বলল। কুকুরটাকে আগুনে ফেলে দেয়ার ভয়ে আমাদের কিছু করবে না সে।
দ্বিধা করছে কিশোর।
দেরি করছ কেন? যাও। কুকুরটাকে ছাড়ব না আমি, যতক্ষণ না নিরাপদ হতে পারছি।...দৌড়াও।
আর দেরি করল না কিশোর। মুসাকে নিয়ে দৌড়াতে শুরু করল। হতাশ ভঙ্গিতে সেদিকে তাকিয়ে আছে রাক্ষসটা।
কুকুরটাকে শক্ত হাতে বুকের সঙ্গে চপে ধরল রবিন। রাক্ষসটাকে হুমকি দিল, নড়বে না, খবরদার! নড়লেই আগুনে ফেশ্ব! যা বলল, সেটা ইশারাতে বুঝিয়ে দিল সে।
নড়ল না রাক্ষসটা। জোরে হতাশার নিঃশ্বাস ফেলল। পরাজিত ভঙ্গিতে ঝুলে পড়ল তাঁর কাঁধ।
পিছাতে শুরু করল রবিন। সরে যেতে লাগল চুলার কাছ থেকে।
এগিয়ে আসার জন্যে পা বাড়াতে গেল রাক্ষসটা।

সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটার গলায় হাত রেখে গলা টিপে মারার ভয় দেখাল রবিন। থেমে গেল রাক্ষসটা।
কুকুরটাকে নিয়েই দৌড় মারল রবিন। বনের কিনারে এসে ফিরে তাকিয়ে দেখল, অসহায় ভঙ্গিতে আগের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে রাক্ষসটা। পোষা। প্রাণীটাকে সাংঘাতিক ভালবাসে সে। ক্ষতির আশংকায় সামান্যতম নড়াচড়া করছে না।
বনের কিনারে এনে কুকুরটাকে মাটিতে নামিয়ে রাখল রবিন। তারপর এক ছুটে ঢুকে গেল বনের মধ্যে। কিশোর আর মুসাকে দেখতে পেল। তার জন্যেই অপেক্ষা করছে।
রবিনকে দেখার পর একটা সেকেন্ডও আর দেরি করল না ওরা। ছুটতে শুরু করল বনের মধ্যে দিয়ে।
পেছন ফিরে তাকাল না আর কেউ। রাক্ষসটা আসছে কিনা, সেটাও দেখতে চাইল না। এত জোরে জীবনে দৌড়ায়নি ওরা।
ছুটতে ছুটতে দম আটকে আসতে চাইল ওদের। পা ব্যথা করছে। দৃষ্টি ঘোলা হয়ে আসছে। কিন্তু তার পরেও থামল না। ছোটা...ছোটা..ছোটা...
বনের বাইরে বেরিয়ে এল ওরা। সামনে পাহাড়ের ঢাল। ঢালে জন্মে আছে ভুট্টা গাছের মত এক ধরনের গাছ। চাঁদের আলোয় বেড়ার মত লাগছে সামনের সারির গাছগুলোকে।
ওর মধ্যে লুকাতে পারব আমরা! আশা হলো রবিনের।
মাথা নিচু করে প্রায় ডাইভ দিয়ে গাছগুলোর মধ্যে ঢুকে পড়ল ওরা। শুকনো খড়খড়ে গাছ। কখনও দুহাতে ফাঁক করে, কখনও কাধ দিয়ে ঠেলা মেরে সরিয়ে সরিয়ে এগিয়ে চলল। শুকনো পাতা জুতোর চাপে মচমচ করছে।
গাছগুলো অনেক উঁচু। মাথা ঢেকে দিচ্ছে। তবে খচমচ, খসখস নানা রকম শব্দ করেই চলেছে। এগোনোর সময় ঠেলা লেগে বাঁকা হয়ে গিয়ে আগা নুইয়ে ফেলছে।
মিনিটখানেক পর থেমে গেল কিশোর। এত জোরে হাঁপাচ্ছে, দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে। বসে পড়ল হাঁটু গেড়ে। দম নেয়ার জন্যে।
চারপাশে লম্বা গাছগুলো বাতাসে মাথা দোলাচ্ছে। পাতা খসখস করছে।
এখানে আমরা নিরাপদ, মৃদু স্বরে বলল রবিন। অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে হলেও। কি বলো, কিশোর?
হ্যাঁ, ফোঁস ফোঁস করে হাঁপাতে হাঁপাতে জবাব দিল কিশোর। কেউ আমাদের দেখতে পাবে না।
কিন্তু এত লম্বা ভুট্টা গাছ আমি আর দেখিনি, মুসা বলল। এত মোটা আর...

কথা শেষ না করেই থেমে গেল সৈ। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ওর সামনের একটা গাছের বাকল খুলে যেতে শুরু করেছে।
দ্রুত নড়াচড়া চোখে পড়ল তার।
একটা হাত!
বাকলের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একটা লিকলিকে হাত। কার্টুন ছবির মত।
আশপাশের অন্য গাছগুলোও খড়মড় কাঁচক্যাঁচ করে বিচিত্র শব্দ করছে। জ্যান্ত প্রাণীর মত দুলতে শুরু করেছে।
তারপর সেগুলোরও বাকল খুলে যেতে লাগল। লম্বা কাঠির মত চকচকে মসৃণ দেহগুলো বেরোতে থাকল গাছের ভেতর থেকে।
ডজন ডজন সরু সরু নীরব প্রাণী। সবুজ মসৃণ মাথা। কোন চেহারা নেই। মুখ নেই। পাতায় মোড়া সবুজ সবুজ মাথা। ভুট্টার মোচার মত।
ডজন ডজন!
ক্যাচক্যাচ শব্দ করে করে খুলতেই আছে গাছের দল। বেদম দুলছে আর ঝাঁকি খাচ্ছে ভেতরের কাঠি-প্রাণীগুলো বেরিয়ে আসার সময়।
মসৃণ হাতগুলো বাড়িয়ে দিচ্ছে। রবারের মত লম্বা হচ্ছে। ওদেরকে পেঁচিয়ে ধরতে শুরু করল সে-সব হাত। শক্ত হতে লাগল চাপ...
শক্ত...
স্টেলক! আচমকা চিৎকার করে উঠল রবিন। তাসের গায়ে আঁকা দেখেছিল এগুলোর ছবি। তাসের পিঠে নাম লেখা ছিল।
আমি...আমি মনে করতে পারছি না, মুসা বলল। কথা বেরোতে চাইছে না ঠিকমত। গলা চিপে ধরা হয়েছে যেন তার।
কিশোরেরও বুক পেঁচিয়ে ধরছে হাতগুলো। জীবন্ত আঙুর লতার মত। গলা পেঁচাচ্ছে। শক্ত হচ্ছে চাপ।
দম নিতে পারছি না আমি... হাঁসফাঁস শুরু করল কিশোর। দম নিতে পারছি না...।
শরীর মুচড়ে মুচড়ে ছাড়ানোর চেষ্টা শুরু করল মুসা। লাথি মারতে লাগল।
কিন্তু শক্ত করে আঁকড়ে ধরে রাখল ওদেরকে অদ্ভুত প্রাণীগুলো।
অনেক বেশি। সংখ্যায় অনেক বেশি ওগুলো।
আরও, আরও গাছ খুলতেই আছে। শয়ে শয়ে! হাজারে হাজারে! বেরিয়ে আসছে একের পর এক লতানো কাঠি-প্রাণী, স্টেলক।
কি করব আমরা এখন? কোনমতে বলল রবিন। শ্বাস নিতে পারছে না। গলার মধ্যে ঘড়ঘড় আওয়াজ হচ্ছে। কি করব...!

ঝাড়া মারো! ঝাড়া মারো! চিৎকার করে বলল মুসা। ঝাড়া, খামচি, লাথি, চড়-থাপ্পড় যখন যেটা পারছে মেরে চলেছে সে। স্টেরা মাংসাশী, বুঝে গেছে সেটা। বেরোতে না পারলে শ্বাসরোধ করে মারবে ওদের।
বহু কষ্টে স্টেলকদের কবল থেকে নিজেদের মুক্ত করে ভুট্টা খেতের কিনারে বেরিয়ে এল ওরা। পাথরের মত স্থির হয়ে গেল মুহূর্তে।
সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটা সেনাবাহিনী। ক্রেল। শত শত। ঘোড়ার পিঠে আসীন। কারও হাতে বল্লম। কারও তরোয়াল।

.

সবার আগে নড়ে উঠল কিশোর। ঘুরে আবার দৌড় দিতে গেল ভুট্টা খেতের দিকে। কিন্তু দেরি করে ফেলেছে।
চোখের পলকে ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল ডজনখানেক ক্রেল। সামনে এসে পথরোধ করে দাঁড়াল। তরোয়াল ধরল বুকের ওপর।
নাহ, আর পারা গেল না! হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল মুসা। কোন জাদুকরের বাপও এসে এখন আর বাঁচাতে পারবে না আমাদের!
একটা মাঠের ওপর দিয়ে ওদেরকে হটিয়ে নিয়ে চলল ক্রেলেরা। ডজনখানেক সৈন্য ঘিরে রেখে এগোচ্ছে। কারও হাতে তরোয়াল, কারও হাতে বল্লম। বাকি সৈন্যরা ঘোড়ার পিঠে চেপে পেছন পেছন আসছে।
ধূসর মেঘের চাদরের আড়ালে ঢাকা পড়েছে চাঁদ। আরও ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে রাতের বাতাস। আরও ভেজা। কাদামাটিতে পিছলে যাচ্ছে বন্দিদের জুতো।
ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে হেঁটেই চলল ওরা। পা আর চলছে না। গলার ভেতরটা শুকিয়ে কাঠ। কপাল বেয়ে ঘাম গড়িয়ে নেমে ঢুকে যাচ্ছে চোখের ভেতর।
হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করল রবিন, কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ওরা আমাদের? এবার কি করবে? কেটেকুটে শিক কাবাব বানাবে?
জানি না, জবাব দিতেও আর ইচ্ছে করছে না কিশোরের।
অনন্তকাল ধরে যেন কেবল হাঁটতেই থাকব আমরা! মুসা বলল।
শেষ হলো মাঠ। বনে ঢুকল ওরা। লতানো উদ্ভিদে ভরা ঘন জঙ্গল। কাঁটা। ঝোঁপেরও অভাব নেই। সরু, আঁকাবাকা একটা রাস্তা চলে গেছে কাঁটা ঝোঁপগুলোর মাঝখান দিয়ে। হাঁটতে গেলে খোঁচা লাগে। ওদেরকে সেই পথ ধরে হটতে বাধ্য করল ক্রেলেরা।
বন থেকে বেরোল এক সময়। সরু সেই পথ ধরে কাদায় ভরা একটা ঢালু জায়গা দিয়ে ওদের নিয়ে চলল ক্রেলেরা।
পেছন পেছন আসতে আসতে সুর করে গেয়ে উঠল, মুক্তি নেই...মুক্তি নেই... মুক্তি নেই...

ঢোক গিলল কিশোর। পানির অভাবে খসখসে হয়ে যাওয়া কণ্ঠনালী ব্যথা করে উঠল। এক মুহূর্তের জন্যে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। পিঠে এসে লাগল বল্লমের খোঁচা। সমস্ত যন্ত্রণা সহ্য করেও আবার পা ফেলতে বাধ্য হলো সে।
মুক্তি নেই মুক্তি নেই..মুক্তি নেই... কুৎসিত সুরে জঘন্য গানটা গেয়েই চলল ক্রেলেরা। শুধু এই দুটো শব্দই।
উপত্যকা পেরিয়ে গিয়ে ধীরে ধীরে আবার ওপরে উঠতে শুরু করল ঢাল।
খাড়াই বেয়ে ঘুরে ঘুরে ওপরে উঠে অবশেষে চূড়ায় এসে শেষ হলো।
উঁচু চূড়াটায় দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগল তিন গোয়েন্দা। অনেক নিচে মাঠটা চোখে পড়ছে।
তরোয়াল তুলল ক্রেলেরা। এগিয়ে যেতে ইশারা করল বন্দিদের।
আমাদেরকে চূড়া থেকে ফেলে দিতে চায়! চেঁচিয়ে উঠল মুসা। ফিরে তাকাল ক্রেলদের দিকে। চেঁচিয়ে বলতে লাগল, কেন আমাদের ফেলতে চাইছেন? কি করেছি আমরা? ছেড়ে দিন আমাদেরকে। লড়াই করতে আসিনি আমরা।
মুক্তি নেই...মুক্তি নেই...মুক্তি নেই...
তরোয়াল তুলে এগিয়ে এল কয়েকজন ক্রেল।
এগোতে শুরু করল তিন গোয়েন্দা।
চলে এল একেবারে চূড়ার কিনারে।
কিশোর আর রবিনের হাত চেপে ধরল মুসা। কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল, গুড বাই, বন্ধুরা। অনেক কাল একসঙ্গে কাটিয়েছি আমরা। কত আনন্দ করেছি। সব। শেষ হয়ে যাচ্ছে এখন। গুড বাই!
দুই হাত প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে লাফ দেয়ার জন্যে প্রস্তুত হলো সে।
স্থির হয়ে গেল হঠাৎ।
ধীরে ধীরে এক পকেট থেকে বের করে আনল হাতটা।
একটা তাস।
মনে পড়ল, তাসটা বাক্স থেকে খসে মাটিতে পড়ে গেলে তুলে নিয়েছিল সে। মনের ভুলে পকেটে রেখে দিয়েছিল।
চিৎকার করে উঠল কিশোর। থামো থামো! একটা বুদ্ধি এসেছে আমার মাথায়!
.
ফিরে তাকাল মুসা। অবাক। মানে!
হাত বাড়াল কিলোর। দেখি, তাসটা দাও আমার হাতে।
কি করবে?
তর্ক কোরো না! আহ, জলদি করো! মুসা দেয়ার আগেই সেটা ছিনিয়ে নেয়ার জন্যে হাত বাড়াল কিশোর।

মুক্তি নেই..মুক্তি নেই..মুক্তি নেই…
ঘোড়ার পিঠে বসা ক্রেলেরা গান গাইছে।
মাটিতে দাঁড়ানো ক্রেলেরা চলে এল বন্দিদের কয়েক ইঞ্চির মধ্যে। শীতল, নিষ্ঠুর দৃষ্টি। তরোয়াল তুলে খোঁচা মারার ভঙ্গি করল।
তাসটা নিয়ে নিল কিশোর। পিঠে আঁকা জাদুকরের ছবিটা দেখল।
কাকু-কাকুর ছবি।
কি করবে ওটা দিয়ে? রবিনের প্রশ্ন। ওটা কি ভাবে বাঁচাবে আমাদের?
দাও ছুঁড়ে ফেলে! জাদুকরের ওপর প্রচণ্ড আক্রোশে ফুঁসে উঠল মুসা। কাকু কাকুকে সামনে পেলে এখন ওকেই ছুঁড়ে ফেলত পাহাড় থেকে।
উঁহু, মাথা নাড়ল কিশোর। ছুঁড়ে ফেললে লাভ হবে না। ছিঁড়ে ফেলতে হবে। জাদুর মায়া কাটবে হয়তো তাতে।
তাসটা সোজা করে ধরল কিশোর। ছিঁড়তে যাবে, আচমকা দমকা বাতাসে তাসটা টান দিয়ে কেড়ে নিল ওর হাত থেকে। ছুঁড়ে ফেলল চূড়ার কিনার দিয়ে।
নিজের অজান্তেই প্রচণ্ড চিৎকার বেরিয়ে এল কিশোরের কণ্ঠ চিরে।
ওদের আশা-…একমাত্র আশা…বাতাসে ভাসতে ভাসতে পড়ে যাচ্ছে নিচে। চূড়ার কিনার দিয়ে।
কোন রকম ভাবনা চিন্তা না করে ঝাঁপ দিল কিশোর।
থাবা মারল তাসটাকে ধরার জন্যে।
মিস করল।
মাথা নিচু করে পড়তে শুরু করেছে সে।
ওপরে মুসা আর রবিনের হাহাকার শোনা গেল। ক্রেলেরাও চেঁচাচ্ছে। আনন্দে। উত্তেজনায়।
উড়ে চলেছে যেন কিশোর।
মরিয়া হয়ে থাবা মারল আবার।
ধরে ফেলল তাসটা।
ফড়াৎ করে এক টান মেরে ছিঁড়ে ফেলল।
মাথা নিচু করে তীব্র গতিতে উপত্যকার দিকে উড়ে চলেছে তখন সে।
প্রচণ্ড আক্রোশে তাসটাকে টুকরো টুকরো করতে লাগল।
নিচের দিকে তাকিয়ে দেখল, ভয়ঙ্কর গতিতে মাটি ছুটে আসছে তার দিকে।
তারপর হঠাৎ করেই সব অন্ধকার।
এত অন্ধকার…
গম্ভীর নীরবতা…
সেই সাথে ঠাণ্ডা।

কাজ কি হলো! ভাবল সে।
তাস ছিঁড়ে ফেলাতে কি কাটল জাদুর মোহ?
বাড়ি ফিরতে পারল?
নাকি সত্যি সত্যি মৃত্যু ঘটেছে এবার?

.

ধীরে ধীরে কেটে গেল অন্ধকার।
গাড়ির শব্দ কানে এল।
স্পষ্ট হয়ে উঠল দিনের আলো।
বার কয়েক চোখ মিটমিট করে ফিরে তাকাল সে।
তার দুই পাশে একই রকম ভাবে বিমূঢ় ভঙ্গিতে বসে থাকতে দেখল মুসা আর রবিনকে।
আস্তে আস্তে কেটে গেল ঘোর।
দেখল, কাকু-কাকুর বাড়ির সামনের লনে পড়ে আছে ওরা।
বোঝার সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল মুসা। দৌড় দিল গেটের দিকে।
আরে কোথায় যাচ্ছ? শোনো! শোনো! পেছন থেকে ডাক দিল কিশোর।
ফিরেও তাকাল না মুসা। ছুটতে ছুটতেই জবাব দিল, আর একটা সেকেন্ডও আমি এখানে থাকব না। বাপরে বাপ! এবার নিশ্চয় ডাইনোসরের রাজত্বে পাঠাবে!
কথাটা সাবধান করে দিল কিশোর আর রবিনকেও। ওরাও উঠে দৌড় দিল। মুসার পেছন পেছন। জাদুকরের সীমানা থেকে পালিয়ে যেতে চায়।
গেটের কাছে গিয়ে কি ভেবে ফিরে তাকাল কিশোর।
কাকু-কাকুকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল সামনের দরজায়।
মিটিমিটি হাসছে।
প্রচণ্ড রাগ হলো কিশোরের। দাঁড়িয়ে গেল যেন হোঁচট খেয়ে।
তার গায়ে ধাক্কা খেল রবিন। কি হলো?
ওই লোকটার সঙ্গে একটা বোঝাঁপড়া আছে আমার! শীতল কণ্ঠে বলল কিশোর।
পাগল হয়েছ!
জবাব না দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল কিশোর। কাকু-কাকুর সঙ্গে কথা বলতে যাবেই।
খপ করে তার হাত চেপে ধরল রবিন। হ্যাঁচকা টান দিয়ে বলল, পরে। এখন বাড়ি চলো। খেয়েদেয়ে বিশ্রাম নিয়ে শান্ত হই। তারপর আমিও আসব তোমার সঙ্গে। আসলেই। এত সহজে ছেড়ে দেয়া যায় না ওকে।
একটু দূরে দাঁড়িয়ে গেছে মুসাও। রবিন ঠিকই বলেছে। চলো, আগে বাড়ি চলো। আরও একজনেরও হিসেব নিতে হবে আমাদের। লীলা রেডরোজ। ওকেও ছাড়ব

না আমি। খুঁজে বের করবই। ওর কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করাটা বাকি রয়ে গেছে।
ঢিল হয়ে এল কিশোরের দেহ। মাথা ঝাঁকাল। বেশ। চলো। আগে বাড়িতেই যাই।

ভলিউম ৫১ – পেঁচার ডাক – তিন গোয়েন্দা – রকিব হাসান – সেবা প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৭

রবিনকে খবরটা দিল দুধওয়ালা। কাল রাতে মিস্টার হুবারের বাড়িতে চোর ঢুকেছিল, শুনেছ খবরটা?

রবিনদের পাশের বাড়ির পরের বাড়িটা হপ্তা দুই আগে ভাড়া নিয়েছে কনি হুবার। একা থাকে।

কি কি নিয়েছে?

জানা যায়নি। মিস্টার হুবার বাড়ি নেই।

কে বলল আপনাকে? উত্তেজিত হয়ে উঠেছে রবিন। ওদের বাড়ির এত কাছে এমন একটা ঘটনা ঘটে গেল, আর সে কিছুই জানে না!

সকালে দুধ দিতে গিয়ে দেখি দরজা খোলা। একটা জানালা ভাঙা। মিস্টার হুবারের নাম ধরে ডাকাডাকি করলাম। বেরোলেন না। হলঘরের দরজা দিয়ে উঁকি দিলাম। ভেতরে জিনিসপত্র সব তছনছ হয়ে আছে। সন্দেহ হলো। ঘরে ঢুকে তক্ষুণি পুলিসকে ফোন করলাম।

ওহ! তারমানে ঝামেলা এসে দেখে চলে গেছে সব! ওদের আগেই ফারাম্পারকট এসে সূত্র খুঁজে নিয়ে চলে গেছে ভেবে হতাশ হয়ে পড়ল রবিন।

হ্যাঁ। নোটবুক বের করে কি কি সব টোকাটুকি করল। ভাবসাব দেখে মনে, হলো শার্লক হোমসের বাপ। আমাকে হুকুম দিল যাতে এ খবর কাউকে না বলি। ঝামেলাটা চিরকালই একটা হাঁদারাম। আমাকে ছাগল পেয়েছে আরকি। ওর কথায় আমি মুখ বন্ধ রাখি। আমার সব কাস্টোমারকে বলে দিয়েছি। যা পারে ও করুকগে এখন।

আপনি বাড়ির আশেপাশে কিছু দেখেছেন নাকি?

না। আশেপাশে ঘোরার সময়ই পাইনি। যখনই মনে হলো, বাড়িটাতে কিছু ঘটেছে, পুলিসকে ফোন করলাম। ভেতরে আমার মনে হয় কোন কিছুতে হাত দেয়া হয়নি। তোমরা তো গোয়েন্দাগিরি করো, নিশ্চয় বুঝতে পারছ আমি কিসের কথা বলছি।

মাথা ঝাঁকাল রবিন।

দুধওয়ালা চলে যাওয়ার পর আর দেরি করল না সে। সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল কিশোরকে খবরটা দেয়ার জন্যে।

কিশোরও আগ্রহী হয়ে উঠল। দুজনে মিলে রওনা হলো মুসাদের বাড়িতে। না না, তিনজনে মিলে। টিটুও চলল কিশোরের সাইকেলের ঝুড়িতে সওয়ার হয়ে। বাড়ি থেকে মুসা আর ফারিহাকে ডেকে নিয়ে চলে এল ওরা কনি হুবারের বাড়িতে।

হুবার ফেরেনি।

কিশোর বলল, সূত্র খোজো সবাই। পায়ের ছাপ, পোড়া সিগারেটের গোড়া, ড্রেসার, জানালার কাছে হাতের ছাপ-এ সব। যে যা পাবে নোটবুকে লিখে রাখবে।
কিশোরকে ঘুরে আরেকদিকে রওনা হতে দেখে ফারিহা জিজ্ঞেস করল, তুমি কোথায় যাচ্ছ?
জানালা দিয়ে ঘরের ভেতরটা দেখব।
জানালার পর্দা টানা। ভেতরে দেখা সম্ভব হলো না।
এক এক করে ছোট বাড়িটার জানালাগুলোয় উঁকি দিতে শুরু করল সে। কিন্তু একটা জানালা দিয়েও ভেতরে তাকানো গেল না।
সামনের দরজাটা বন্ধ। পেছনেরটাতেও তালা দেয়া।
পেছনের ভাঙা জানালাটার কাছে এসে দাঁড়াল সে। রান্নাঘরের জানালা। চোরই আসুক বা ডাকাত, এদিক দিয়েই ঢুকেছিল।
ভেতরে হাত ঢুকিয়ে পর্দাটা সরাল কিশোর। ঝড় বয়ে গেছে যেন ঘরের মধ্যে। ড্রেসার, টেবিলের প্রতিটি ড্রয়ার খুলে জিনিসপত্র মেঝেতে ছড়িয়ে ফেলা হয়েছে। আলমারিগুলো খোলা। ওগুলোর জিনিসও সব মাটিতে।
কিছু একটা খোঁজা হয়েছে।
কি জিনিস?
রান্নাঘর থেকে হঠাৎ একটা শব্দ শোনা গেল। বোঝা গেল না কিসের। কান পাতল সে। আবার শোনা গেল শব্দটা। ভাঙা জানালা দিয়ে ভেতরে তাকাল। দুটো জ্বলজ্বলে চোখ তাকিয়ে আছে ওর দিকে।
মিআও! মিআও! ডাকল চোখের মালিক।
বেড়াল, কিশোর বলল। কি ভয় পেয়েছে দেখো। পেটে মনে হচ্ছে খিদে। খাবার দেয়ার কেউ নেই। বেচারা!।
বাড়ির কোণ ঘুরে এগিয়ে এল অন্যরা। হাতে নোটবুক।
কিশোর বলল, ঘরের মধ্যে একটা বেড়ালের বাচ্চাকে ফেলে দরজা আটকে দিয়ে গেছে। কি করা যায়?
বের করে নিয়ে এসো, সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল ফারিহা।
কি করে? মুসার প্রশ্ন। সমস্ত দরজা-জানালা বন্ধ।
এই জানালাটা ভাঙা, দেখাল কিশোর। রুমাল জড়িয়ে নিলে ভাঙা কাঁচের ভেতর দিয়ে হাত ঢুকিয়ে দেয়া যাবে। ছিটকানি খুলতে পারলে বের করে আনা যাবে বাচ্চাটাকে। এ ভাবেই জানালা খুলেছে চোর।
খোলো না তাহলে, রবিন বলল। ঝামেলা মনে হয় এখন আর আসবে না।
পকেট থেকে বড় একটা সাদা রুমাল বের করল কিশোর। আঙুলে শক্ত করে জড়াল। ভাঙা কাঁচের ফোকর দিয়ে ঢুকিয়ে দিল হাতটা। ছিটকানিটা খুঁজে পেয়ে

বলল, পেয়েছি।
শার্সি খোলা এখন অতি সহজ। খুলে ফেলল ওটা।
চৌকাঠে উঠে বসল সে।
সঙ্গে যাওয়ার জন্যে ঘেউ ঘেউ শুরু করল টিটু।
ধমক দিয়ে কিশোর বলল, এই, থামাও তো পাজিটাকে। ওর চিল্কারে কেউ কি হয়েছে দেখতে এলেই আর ঢুকতে পারব না।
তাড়াতাড়ি সবাই মিলে চেষ্টা চালিয়ে চুপ করাল টিটুকে।
কিশোর ঢুকে পড়ল ভেতরে। বেড়ালের বাচ্চাটা আলমারির একটা তাকে বসে আছে জড়সড় হয়ে। সে এগোতেই আরও ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু খুব তাড়াতাড়িই ভয়টা কেটে গেল যখন একবাটি দুধ এনে ওর সামনে রাখল কিশোর। ক্ষুধার্ত ভঙ্গিতে লপাত লপাত করে জিভ দিয়ে চেটে শেষ করে ফেলল দুধটা। তারপর পায়ের কাছে এসে মিউ মিউ করতে লাগল। কিন্তু যেই সে ধরতে গেল, ঘাবড়ে গেল আবার। এক দৌড়ে পালাল। ছুটে চলে গেল দরজা দিয়ে হলঘরে।
আই, পুষি, পুষি। আয়, আয়, ডাকল কিশোর।
জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে মুসা জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে?
পালিয়েছে।
তাড়াতাড়ি ধরো না। কেউ চলে এলে মুশকিল হবে।
খুঁজে বের করতে হবে তো আগে ওটাকে। তারপর না ধরা।
হলঘরে ঢুকল কিশোর। ওলটপালট হয়ে আছে জিনিসপত্র। কোট, জুতো, প্যান্ট, শার্ট এ সব জিনিস আলমারি আর একটা চেস্ট অভ ড্রয়ার থেকে বের করে ছড়িয়ে ফেলা হয়েছে মেঝেতে। বাচ্চাটাকে দেখতে পেল না। কোথায় যে গিয়ে লুকিয়েছে ওটা কে জানে। ঘর থেকে ঘরে ঘুরতে লাগল সে।
নিচে তিনটে ঘর। ওপরে তিনটে। সব কটার জিনিসপত্রের একই অবস্থা। ফায়ারপ্লেসের নিচে কালি পড়ে থাকতে দেখে বোঝা গেল যে-জিনিস খুঁজতে এসেছিল লোকটা, ওটার জন্যে চিমনির মধ্যেও ঢুকেছিল।
একটা বেডরুম থেকে বেরিয়ে আসতেই লাল জিনিসটা চোখে পড়ল ওর। তুলে নিল। দস্তানা। ছোটদের।
বিড়বিড় করল আনমনে, এখানে ছোট বাচ্চা এল কোত্থেকে? হুবার থাকে তো একা।
সন্দেহ হলো–কোনও শিশুকে কিডন্যাপ করে এনে এখানে লুকিয়ে রাখেনি তো হুবার, যার খোঁজে এসেছিল লোকটা?
আপনমনেই মাথা নাড়ল আবার। না, যত ছোট শিশুই হোক, তাকে ড্রয়ার কিংবা চিমনিতে খুজবে না লোকটা।

ছোটদের আর কোন পোশাক আছে কিনা খুঁজতে লাগল কিশোর। কিছুই নেই। যা আছে সব বড়দের, পুরুষ মানুষের।
দস্তানাটা পকেটে রেখে দিল সে। সূত্র। এক জোড়ার একটা। আরেকটা গেল কোথায়?
ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগল ওর কাছে। গতরাতে একটা শিশু ছিল এ বাড়িতে। মনে হয় তাড়াহুড়োয় কাপড় পরানো হয়েছে ওকে। একটা দস্তানা ভুলে পরানোই হয়নি। কিংবা ঠিকমত লাগেনি বলে খুলে পড়ে গেছে।
এই সময় কানে এল মুসার চাপা ডাক, কিশোর, জলদি বেরিয়ে এসো। ঝামেলা আসছে!

.

কিশোর নিচতলায় নামার আগেই কানে এল ফগ্যাম্পারকটের ধমক, ঝামেলা।
এই, তোমরা এখানে কি করছ? যাও, ভাগো!
তারপর শুরু হলো টিটুর চিৎকার, হই-চই। মুচকি হাসল কিশোর। নিশ্চয় এখন ফগের গোড়ালির পেছনে লেগেছে টিটু।
কোনদিক দিয়ে বেরোনো যায় ভাবল কিশোর।
বাড়ির পেছন দিকে চিৎকার শোনা যাচ্ছে ফগের, পুলিসের কাজে নাক গলাতে এসেছ তোমরা আইনের বিরোধিতা করছ। ভাল চাও তো যাও এখান থেকে। উফ, ঝামেলা!
কে বলল নাক গলাচ্ছি? প্রতিবাদ করল রবিন। পড়শীর বাড়িতে চোর ঢুকেছে শুনলাম, দেখতে এসেছি। এতে নাক গলানোর কি দেখলেন?
জবাব খুঁজে না পেয়ে খানিকক্ষণ আমতা আমতা করল ফগ। তারপর ধমকে উঠল, আবার কৈফিয়ত দেয়া হচ্ছে, না? জলদি সরাও ওই শয়তানটা কুত্তাটাকে! নইলে কিন্তু ভীষণ রেগে যাব বলে দিলাম!
নিশ্চয় গোড়ালি কামড়াতে চাইছে টিটু। ফগের চেহারা কি হয়েছে এখন কল্পনা করে হাসিতে পেট ফেটে যাবার অবস্থা হলো কিশোরের। অন্যদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে দেখার সন্যে অস্থির হয়ে উঠল। আবার ভাবল, বেরোবে কোন পথে? ও যে ঘরে ঢুকেছে এটা দেখাতে চায় না ফগকে। তাহলে পেয়ে বসবে সে। নাক গলানোর ছুতোয় ওকে থানায় ধরে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাবে।
তোমাদের বড় বিচ্ছুটা কোথায়? আচমকা প্রশ্ন করল ফগ। এতক্ষণে খেয়াল করেছে কিশোর নেই ওখানে। নিজে নিজেই জবাব দিল, জ্বর নাকি? বাড়িতে পড়ে আছে? নিশ্চয় তাই। নইলে ওটারই তো আগে এসে এখানে হাজির হওয়ার কথা। সবার শেষে ধরুল ওকে, তাই না? ভাল হয়েছে। ওরকম শয়তানদের

বিছানায় পড়ে থাকাই উচিত। আচ্ছা শিক্ষা হয় তাহলে। এখন যাও সবাই এখান থেকে। ভাগো। নইলে বাড়িতে গিয়ে নালিশ করব। ঝামেলা
বাড়িতে নালিশ করার হুমকিটা কাজে লাগল। মায়ের বকা খাওয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই মুসার। রবিনেরও না। মানে মানে সরে পড়ল তাই। কিশোরকে নিয়ে ভাবল না। ওর ব্যবস্থা ও করে নিতে পারবে। ফাঁকে ফাঁকি দিয়ে সহজেই বেরিয়ে আসতে পারবে ঘর থেকে।
কিন্তু অত সহজে পার পেল না কিশোর। সামনের দরজা খুলে বেরোতে যাবে, এই সময় তালা খোলার শব্দ শুনল। ফগ খুলছে। সরার সময় পেল না। পাল্লা খুলে গেল। সামনে কিশোরকে দেখে এমন ডলি করল ফগ মনে হলো মাথায় বাজ পড়েছে। হাঁ হয়ে গেল মুখ।
গুড মর্নিং, মিস্টার ফল, মসৃণ গলায় বলল কিশোর। আসুন, ঘরে আসুন।
আচমকা ফেটে পড়ল ফগ, ফগর‍্যাম্পারকট! তুমি এখানে কি করছ? ঝামেলা!
না, কোন ঝামেলা করছি না। বাইরে থেকে শুনলাম একটা বেড়ালছানা খিদেয় কাঁদছে। ওটাকে বাঁচানোর জন্যে ঢুকেছি।
অন্যের বাড়িতে লুকিয়ে ঢোকাটা বেআইনী। এর জন্যে আমি তোমাকে হাজতে ঢোকাতে পারি, জানো?
কিন্তু বেড়ালছানা...।
মিথ্যে বলে পার পাবে না! গর্জে উঠল ফগ। তোমাকে এবার বাগে পেয়েছি আমি, ছাড়ব না। বেড়াল-টেড়াল কিচ্ছু না। আসলে বাড়ি খালি পেয়ে চুরি করতে ঢুকেছিলে তুমি...
ওর কথা শেষ হওয়ার আগেই মিআউ করে কিশোরের পায়ের কাছে এসে দাঁড়াল ছানাটা। প্রথম দর্শনেই অপছন্দ করল ফগকে। কটমট করে ওর দিকে তাকিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে হিসিয়ে উঠল।
হেসে বলল কিশোর, দেখলেন তো, মিথ্যে আমি বলিনি। বেড়ালটাই সাক্ষি।
বেড়ালটার দিকে মিটমিট করে তাকিয়ে রইল ফগ। ধমকে উঠল, যাও, এবারের মত ছেড়ে দিলাম। ভাগো ওটাকে নিয়ে। আমার জরুরী কাজ আছে এখানে। আর আসবে না, বলে দিচ্ছি।
বেড়ালের বাচ্চাটাকে নিয়ে সোজা মুসাদের বাড়ি রওনা হলো কিশোর। আশা করল, ওখানেই পাওয়া যাবে সবাইকে।
মুসাদের বাগানের ছাউনিতে অপেক্ষা করছে সবাই। কিশোরের সাড়া পেয়ে ছুটে বেরিয়ে এল টিটু। কোন কুকুরই বেড়াল দেখতে পারে না। টিটুও পারল না। তারস্বরে চিৎকার জুড়ে দিল। ধমক দিয়ে ওকে চুপ করাল কিশোর। বাচ্চাটাকে তুলে দিল ফারিহার হাতে।

ছাউনির ভেতরে একটা বাক্সে ছানাটাকে বসিয়ে দিল ফারিহা, এমন জায়গায় যেখানে টিটু ওর নাগাল পাবে না।
ছাউনিতে ঢুকে একটা বাক্স টেনে সবার মুখোমুখি বসল কিশোর। জিজ্ঞেস করল, বাড়ির চারপাশ ঘুরে দেখেছ তো সবাই?
মুসা, ফারিহা, রবিন, তিনজনেই মাথা ঝাঁকাল।
সূত্র পেয়েছ?
একপাতা কাগজ বের করল রবিন। বলল, খুব বেশি কিছু না। এই যে, রিপোর্ট।
কাগজটা দেখল না কিশোর। মুখেই বলো। শুনি।
বাড়ির চারপাশ ঘুরে দেখেছি আমরা সবাই। কোনদিক দিয়ে চোর এসেছে, দেখেছি। সামনের গেট দিয়ে ঢোকেনি। বাগানের পেছনের দেয়াল টপকে এসেছে।
কি করে বুঝলে?
জুতোর ছাপ পেয়েছি। গম্ভীর হয়ে বসে গেছে মাটিতে। ওপর থেকে লাফিয়ে পড়লেই কেবল ওরকম দাগ পড়ার কথা।
হতে পারে। বলে যাও।
ওই একই জুতোর ছাপ এগিয়ে গেছে একটা ঝোঁপের ধার পর্যন্ত। ভেতরে লুকিয়ে বসেছিল। বুঝলাম, কারণ অনেকগুলো ছাপ দেখেছি ওখানে। ওখানে বসে নিশ্চয় বাড়ির দিকে চোখ রেখেছিল লোকটা।
ছাপের নকশা একে এনেছ?
নিশ্চয়ই, মুসা বলল। পকেট থেকে একটা কাগজ বের করল। অনেক বড় পা লোকটার। এগারো নম্বর সাইজ। এই দেখো। নাইকি কোম্পানির জুতো। সোলের তলার নকশা আমার জুতোর মতই। একই জুতো। আমারটার সাইজ ওর। চেয়ে অনেক ছোট।
আর কি পেলে?
পকেট থেকে একটা সিগারেটের গোড়া বের করে দিল রবিন। এটা। মাটিতে পাতার নিচে পড়ে ছিল। সেজন্যেই ফগ দেখতে পায়নি।
ফগ ওখানে গিয়েছে কি করে জানলে?
অনেক জায়গায় ওর জুতোর ছাপ দেখেছি। সারা বাড়িতেই ঘুরেছে। ওর পা বিশাল। চোরটার চেয়েও বড়। দেখতে দেখতে মুখস্থ হয়ে গেছে। না চেনার কোন কারণ নেই। যাই হোক, আমার ধারণা, এ রকম সিগারেটের গোড়া আরও ছিল ওখানে। সে পেয়ে নিয়ে গেছে। এটা পাতার নিচে ছিল বলে দেখতে পায়নি।
তুমি পেলে কি করে?
আমি না। টিটু পেয়েছে। পাতার কাছে দাঁড়িয়ে গন্ধ শুঁকতে লাগল।
হাসল কিশোর। ও তো দেখি বড় গোয়েন্দা হয়ে গেছে।

নিজের নাম শুনে কান খাড়া করে ফেলেছে টিটু।
ওর দিকে তাকিয়ে কিশোর বলল, ওস্তাদ হয়ে যাচ্ছিস তুই।
প্রশংসা বুঝতে পারল টিটু। লেজ নাড়তে লাগল।
রবিনের দিকে ফিরল কিশোর, হ্যাঁ, আর কিছু?
ঝোঁপের ভেতর থেকে বেরিয়ে বাড়ির দিকে এগিয়েছে পায়ের ছাপ। ভাঙা জানালার নিচে গিয়ে থেমেছে। সুতরাং ওই জুতোর ছাপের মালিকই যে জানালা ভেঙে ঘরে ঢুকেছে, এটা অনুমান করতে অসুবিধে হয় না। একটা ইটের টুকরো পড়ে থাকতে দেখেছি জানালার নিচে। ওটা দিয়ে বাড়ি মেরেই কাঁচ ভেঙেছে সভবত।
ভাঙতে পারে, মাথা দোলাল কিশোর। এ ভাবে ভাঙলে শব্দ হবেই। কেউ শুনে থাকতে পারে। ঠিক আছে, খোঁজ নেয়া যাবে। বলো, আর কি পেয়েছ?
পায়ের ছাপ আরও আছে। তবে ওগুলো এমন সব জায়গায়, চোরের বলে মনে হলো না। সাইজেও মেলে না।
কোন্ কোন্ জায়গায়?
সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে ফুলের বেড় মাড়িয়ে পেছন দিকে চলে গেছে। আর ফিরে আসেনি। সামনের গেটের দিকেও যায়নি।
তারমানে কোন কারণে পেছন দিয়ে বেরিয়ে গেছে। আর কেউ তো ও বাড়িতে থাকে না, সুতরাং এই ছাপগুলো কনি হুবারের হওয়ারই সম্ভাবনা।
ব্যস, এইই, কাগজটা ভাঁজ করে আবার পকেটে রেখে দিল রবিন।

.
নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে শুরু করল কিশোর। এর অর্থ গভীর ভাবনা চলেছে তার মগজে। সূত্রগুলো নিয়ে ভাবছে।
এই সময় ওপরের বাক্সে নড়েচড়ে উঠল বেড়ালছানাটা। সেদিকে তাকিয়ে ঘেউ ঘেউ শুরু করল টিটু।
বিরক্ত হয়ে ধমক লাগাল কিশোর, আহ্, বড় বেশি বিরক্ত করিস! ও তোর কি করল যে ওকে.ধমকাচ্ছিস?
চুপ হয়ে গেল টিটু।
এক এক করে সবার মুখের দিকে তাকাল কিশোর, যা বোঝা যাচ্ছে, ইবারের বাড়ি থেকে কেউ কোন জিনিস চুরি করে নিতে এসেছিল কাল রাতে।
কিন্তু নিজের বাড়ি থেকে হুবার ওভাবে পালাল কেন? মুসার প্রশ্ন।
তর্জনী তুলে নাড়ল কিশোর, তাড়াহুড়ো কোরো না। আসছি সেসব প্রশ্নে। হা, যা বলছিলাম। কাল রাতে একটা লোক হুবারের বাড়িতে ঢুকে ঝোঁপের মধ্যে লুকিয়ে রইল। ও ভেবেছিল ওই সময় হুবার ঘুমিয়ে আছে। অসচেতন অবস্থায় পেয়ে যাবে

ওকে। ঘুম থেকে ডেকে তুলে পিস্তল দেখিয়ে হুমকি দেবে। আদায় করে নেবে। যেটা নিতে এসেছে।
কিন্তু কোন কারণে হুবারকে চমকে দিতে পারেনি লোকটা। হতে পারে কাঁচ ভাঙার শব্দে জেগে গিয়েছিল হুবার। বিপদের গন্ধ পেয়েছিল। সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে পাল্লাটা খোলা রেখেই অন্ধকারে পাগলের মত ছুটে পালিয়েছে...
কাল রাতে চাঁদ ছিল, মনে করিয়ে দিল ফারিহা। অন্ধকার ছিল না।
তা ঠিক, থ্যাংক ইউ। জ্যোৎস্নার মধ্যে পাগলের মত ছুটে পালিয়েছে। সঙ্গে করে নিয়ে গেছে লোকটা যে জিনিস নিতে এসেছিল সেটা। তারপর লোকটা ঘরে ঢুকে যখন দেখল পাখি পালিয়েছে, জিনিসটার জন্যে সারা ঘর তছনছ করে ফেলল।
জিনিসটা কি?
এখনও জানি না। তবে খুব বড় কিংবা ভারী কিছু নয়। তাহলে নিয়ে ছুটে পালাতে পারত না।
কি জিনিস অনুমানও করতে পারো না? জিজ্ঞেস করল ফারিহা। কিশোরের বুদ্ধির ওপর ওর বড় বেশি আস্থা। তার ধারণা, ঠিকই অনুমান করে ফেলতে পারবে কিশোর।
ঘরে ঢুকে একটা জিনিস পেয়েছি, পকেট থেকে লাল দস্তানাটা বের করল কিশোর।
জিনিসটার দিকে তাকিয়ে রইল সবাই। টিটু এগিয়ে এসে শুঁকতে লাগল।
ফারিহা বলে উঠল, এ তো পুতুলের দস্তানা! নাকি কোন বাচ্চার?
প্রথমে ভেবেছিলাম হুবার কোন শিশুকে কিডন্যাপ করে এনেছে। পরে বাদ দিয়েছি সম্ভাবনাটা। বাড়িতে এমন কিছু পেলাম না যাতে বোঝা যায় ওখানে কয়েকদিন একটা বাচ্চাকে রাখা হয়েছিল। শুধুই এই দস্তানাটা।
দস্তানাটা নেড়েচেড়ে দেখল রবিন। ঝকঝকে পরিষ্কার। বছর দুয়েকের কারও হাতে লাগবে বড়জোর। ফারিহা, তোমার বড় পুতুলটা কোথায়? ওই যে, পাঁচ বছরের জন্মদিনে পেয়েছিলে?
বাক্সে ভরে রেখে দিয়েছে, মুসা বলল। ও আর এখন পুতুল নিয়ে খেলে না।
আনব? উঠে দাঁড়াল ফারিহা।
নিয়ে এসো, কিশোর বলল। ফারিহা বেরিয়ে গেলে মুসা আর রবিনের দিকে ফিরল, চুরি করে ঢুকেছিল যে লোকটা তার পায়ের ছাপ একে এনেছ তোমরা। কিন্তু হুবারের ছাপ আনলে না কেন?
হাসল মুসা। গর্বিত ভঙ্গিতে বলল, এনেছি। তোমাকে দেখাতে ভুলে গিয়েছি। পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে ভাঁজ খুলল। ছাপগুলো ছোট। কেমন চ্যাপ্টা আর অস্পষ্ট।

নীরবে ছবিটা দেখল কিশোর। বেডরুম স্লিপার পরেই পালিয়েছে হুবার। দেখো, গোড়ালি নেই। জুতো পরারই যখন সময় পায়নি, আমার ধারণা, কাপড় বদলানোরও সময় পায়নি। তারমানে অতিরিক্ত তাড়াহুড়া।
হ্যাঁ, ছাপ দেখে আমারও মনে হয়েছে স্লিপার, একমত হলো মুসা।
পুতুল নিয়ে ঢুকল ফারিহা। অনেক বড়।
ওটার হাতে দস্তানাটা পরানোর চেষ্টা করল কিশোর। আপনমনে বলল, যদি কোন শিশুরও হয়ে থাকে এটা, সে তোমার এই পুতুলটার চেয়ে বড় নয়, ফারিহা। বুঝতে পারছি না, এই দস্তানটা ফেলে গেল কিভাবে লোকটা? জিনিসটা আবার পকেটে রেখে দিল সে। থাকগে, পরে ভেবে দেখব।
কাজের মেয়েটাকে দিয়ে মুসা আর ফারিহাকে ডেকে পাঠালেন মুসার আম্মা। দুপুরের খাওয়ার সময় হয়েছে।
উঠে দাঁড়াল কিশোর। আমরাও বাড়ি যাই। রবিন, যাবে না?
মাথা ঝাঁকাল রবিন।
মুসা জানতে চাইল, আমাদের মীটিং আবার কখন বসছে?
বিকেল সাড়ে তিনটায়। অবশ্য যদি তোমার আম্মা তোমাদেরকে জোর করে শুইয়ে না রাখেন। হয়তো বলতে পারেন–সবে জ্বর থেকে উঠলে, রেস্ট নাও।
তোমাকেও তো তোমার চাচী আটকে রাখতে পারেন?
পারবে না। পালিয়ে আসব।
তাহলে আমরাও পালিয়ে আসব, বুক ফুলিয়ে বলল ফারিহা।
ওপর থেকে মিউ করে জানান দিল বেড়ালের বাচ্চাটা, আমার কথা ভুলে গেলে নাকি?
খউ খউ করে উঠল টিটু, যেন বলতে চাইল, আরে না, সবাই ভুললেও আমি ভুলিনি!
রবিন জিজ্ঞেস করল, এটার কি হবে?
কিছুই হবে না। আমি ওকে পুষব, ফারিহা বলল।
যদি মা আবার বকাবকি শুরু না করে, বলল মুসা।
মুসার আম্মা যে জন্তু-জানোয়ার দেখতে পানেন না, এ কথা সবাই জানে। রবিন বলল, করলে আর কি করব। আমি বাড়ি নিয়ে যাব। একটা বাচ্চাকে না খাইয়ে রেখে মেরে তো আর ফেলা যায় না।

.

বিকেলে আবার মীটিং বসল মুসাদের ছাউনিতে। মুসার আম্মা কিংবা মেরিচাচী কেউই বাধা দেননি। ফলে বাধ্য হয়ে শুয়ে থাকা লাগেনি ওদের। বেঁচেছে।

আলোচনা শুরু করল কিশোর, লোকটা কিভাবে কাল হবারের বাড়িতে ঢুকেছিল, জানি আমরা। কিন্তু কি করে বেরিয়ে গিয়েছিল, জানি না। কেউ কিছু অনুমান করতে পারো?
পারি, জবাব দিল মুসা, সোজা সামনের দরজা খুলে বেরিয়ে চলে গেছে।
একটা জিনিস বোঝা যাচ্ছে, চাঁদনী রাতে প্রচুর ছোটাছুটি করেছে দুজন লোক। একজন বেরিয়েছে সামনে দিয়ে, আরেকজন পেছন দিয়ে দেয়াল টপকে। সামনের দরজা খোলা রেখে গেছে কোন একজন। বাতাসে খুলে আর বন্ধ হয়ে বাড়ি লেগে শব্দ হওয়ার যথেষ্ট সম্ভবনা আছে জেনেও সেই শব্দ কারও কানে যাওয়ার সভাবনাও বাদ দেয়া যায় না। এখন আমাদের খুঁজে বের করতে হবে, কার কানে গেছে সেই শব্দ।
কিভাবে? প্রশ্ন তুলল মুসা। জনে জনে গিয়ে তো আর জিজ্ঞেস করা যাবে না–এই মিয়া, তোমরা কি রাতের বেলা বিরাট পাওয়ালা এক লোক, আর নাইটগাউন পরা একজনকে লুকোচুরি খেলতে দেখেই? লোকে হাসবে না?
উপায় নেই, শান্তকণ্ঠে জবাব দিল কিশোর। জিজ্ঞেস না করলে জানব কি করে তবে তুমি যে ভাবে কলছ ওভাবে করব না। জিজ্ঞেসও করব বেছে বেছে।
কি জিজ্ঞেস করবে?
বলব আমার এক আঙ্কেল পম আছে, রাতের বেলা ঘুমের মধ্যে হাঁটে। কাল রাতে বেরিয়ে গিয়েছিল। কোথায় গিয়েছিল, বলতে পারছে না। কেউ কি অচেনা কোন লোককে রাস্তায় হাঁটতে দেখেছ? কিংবা কোথাও যেতে দেখেছ তাকে?
তোমার আবার আসে পম এল কোত্থেকে?
আছে। প্রয়োজনে শুধু পম নয়, আরেকজন আয়েস কমও এসে যাবে আমার। যার শখ, রাতের বেলা জোনাকি ধরা। কাল রাতে সেও বেরিয়েছিল জোনাকি ধরতে। তাকেও কেউ দেখেছে কিনা জিজ্ঞেস করব।
হাঁ হয়ে গেছে মুসা। তোমার এই আঙ্কেল পম আর বমের কথা তো কোনদিন আমাদের।
বলব কি? আমিও কি ছাই ওদের নাম শুনেছি নাকি? এইমাত্র বানিয়ে নিলাম। উদ্ভট কাণ্ডকারখানা করে তো দুজনেই। রাত দুপুরে যা খুশি করতে পারে। ওদের স্বভাবের কথা ব্যাখ্যা করে জিজ্ঞেস করলে লোকে আর হাসবে না।
হাসতে লাগল ফারিহা। নাম কি বানিয়েছ দুইধান, আহাহা! পম। বম। একজনকে নিশিতে পায়, আরেকজনের জোনাকি ধরার শখ। আসে কোধেকে তোমার মাথায় এ সব বুদ্ধি! হি-হি-হি-হি! হা-হা-হাহ!
মুসা আর রবিনও হাসছে।

মুসা বলল, তা তো বুঝলাম। কিন্তু জিজ্ঞেস করবে কাদের? সারা গায়েব সবাইকে করতে গেলে তো কয়েক মাস লেগে যাবে শুধু একটা প্রশ্নের জবাব। জানতেই।
সারা গাঁয়ের মানুষকে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছে কে?
তাহলে?
নিশাচরদের জিজ্ঞেস করব।
এই তো শুরু হলো রহস্য করে কথা বলা!
আরি, সহজ করেই তো বললাম। নিশাচর মানুষদের চেনো না? চৌকিদার, চৌকিদার।
ওহ, জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলল মুসা। তাই বলো। ঠিক বলেছ। পড়লে ওদের চোখেই পড়তে পারে। রাতভর পাহারা দেয়। কিন্তু জিজ্ঞেস করলেই বলবে কেন?
বলবে, কারণ পম আর কম আমার চাচা।
তোমার চাচা। আমাদের তো নয়।
আমিই জিজ্ঞেস করব তাহলে। দিনের বেলা ওদের সাথে কথাই বলা যাবে না। সারারাত পাহারা দিয়ে দিনে ক্লান্ত হয়ে ঘুমায়। মেজাজ থাকে খারাপ। কথা জিজ্ঞেস করতে গেলে রেগে উঠতে পারে। তাই রাতেই দেখা করব। তখন তোমরা যেতে চাইলেও যেতে পারবে না। তোমাকে আর ফারিহাকে তো বেরোতে দেবেন না আন্টি, ভাল করেই জানি। জ্বর থেকে সরে উঠলে, ঠাণ্ডা লাগার ভয়েই বেরোতে দেবেন না। রবিনকেও বেরোতে দেবেন না ওর আম্মা। সে-ও জ্বর থেকে উঠেছে। বাকি রইলাম আমি আর টিটু। অতএব আমরাই বেরোব।
মেরিচাচী যদি বেরোতে না দেন?
চাচী আজ বাড়ি থাকবে না। রাতে একটা পার্টিতে চলে যাচ্ছে চাচা-চাচী দুজনেই। অতএব আমি ফ্রী।
সত্যি, তোমার স্বাধীনতা দেখলে হিংসেই হয়! মুখ বিকৃত করে ফেলল মুসা, আমার মাটা যে কি! খালি পদে পদে বাগড়া!
রবিনের দিকে তাকাল কিশোর, রবিন, তোমাদের বাড়ি আর বারের বাড়ির মাঝখানের বাড়িটা কার?
কিটিদের।
বয়স?
আমাদেরই মত। কিছুটা বেশি হতে পারে।
করে কি?
স্কুলে পড়ে। পাখি দেখার শখ।
খাতির আছে তোমার সঙ্গে? নাহ, তেমন একটা নেই। দেখা হলে কেমন আছো, ভাল; বই নিয়ে দুচারটে কথা, এই পর্যন্ত। সে-ও বইয়ের পাগল। মাঝেমধ্যে আমার

কাছে বই নিতে আসে। কেন?
যেহেতু হুবারের পাশের বাড়িতেই থাকে, তাকে গিয়েও জিজ্ঞেস করতে পারো গতরাতে কোন শব্দ শুনেছে কিনা, যেটা তার কাছে স্বাভাবিক মনে হয়নি। একটা ছুতো করে চলে যেতে পারবে না?
মাথা কাত করল রবিন। আজই পারব। একটা পাখির বই হাতে করে নিয়ে যাব। লোভে চকচক করতে থাকবে ওর চোখ, আমি জানি। পড়ার জন্যে পাগল হয়ে যাবে। দেব, তবে তার আগে কথা আদায় করে নেব যতটা পারা যায়।
চুটুস করে চুটকি বাজাল কিশোর, ভাল বুদ্ধি! ঠিক আছে, তাই কোরো। জেনে এসে আমাকে ফোন করে জানিয়ো।

.

বাড়ি ফিরতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেল। তাড়াহুড়া করে একটা বই বের করে নিয়ে পাশের বাড়িতে রওনা হলো রবিন। পাওয়া গেল কিটিকে। সে নিজেই দরজা খুলে দিল। অবাক হলো রবিনকে দেখে। আরি, কি ব্যাপার, তুমি! আজ সূর্য পশ্চিম দিকে উঠল নাকি? এসো, এসো।
সূর্য ঠিক দিকেই উঠেছে, হাতের বইটা দেখাল রবিন। সেদিন বাবা কিনে এনে দিল এটা। ভাবলাম, তোমার তো পাখি খু। পছন্দ, হয়তো পড়তে ইনটারেসটেড হবে।
লোভী ছেলে রসগোল্লার দিকে যে দৃষ্টিতে তাকায় ঠিক সেই দৃষ্টি দেখা গেল কিটির চোখে। এসো, এসো, ঘরে এসো। আম্মা-আব্বা কেউ নেই বাড়িতে। চুটিয়ে গল্প করা যাবে। হাত বাড়াল, দেখি, বইটা?
ঘরে ঢুকেই বই খুলে বসল কিটি। ভঙ্গি দেখে মনে হলো চুটিয়ে গল্প করা বাদ দিয়ে এখন এই অবস্থায় যদি তাকে ফেলে যায় রবিন, তাহলেই খুশি হবে বেশি।
রবিন সেটা বুঝল। কিভাবে কথা শুরু করা যায় ভাবতে লাগল। সুযোগটা কিটিই তাকে করে দিল। বইয়ের একটা পাতা খুলে চিৎকার করে উঠল, আরে, পেঁচা? আর কি একখান ছবি দিয়েছে দেখো। দারুণ! র্দান্ত! ওই শোনো, পেঁচা ডাকছে। যেন বুঝতে পেরেছে আমি এখন ওর ছবি দেখছি। শুনতে পাচ্ছ?
কান পাতল রবিন। ডাকটা শুনতে পেল সে-ও! আজই প্রথম শুনলে? না কাল রাতেও শুনেছ?
রবিনের দিকে তাকাল কিটি। মাথা ঝাঁকাল। শুনেছি। জ্যোৎস্নায় ডানা ভাসিয়ে এসে বসল আমার জানালায়। মনে হলো যেন ওর সঙ্গে গিয়ে ইঁদুর ধরার দাওয়াত দিতে এসেছে আমাকে। কিছুক্ষণ বসে থেকে চলে গেল। ওরা ডাকে খুব জোরে, কিন্তু ওড়ার সময় কোন শব্দ হয় না। ছায়ার মত ভেসে চলে যায়।
শব্দ করলে কি আর ইঁদুর বসে থাকত ধরা পড়ার জন্যে। ডানা ঝাঁপটানোর শব্দ শুনলেই পালাত। আচ্ছা, যাই হোক, কটার সময় ডেকেছিল পেঁচাটা, মনে আছে?

অবাক হলো কিটি। কেন, তুমিও ওর ডাক শুনেছ নাকি? জবাবের অপেক্ষায় না থেকে চোখ আধবোজা করে ভাবতে লাগল, ডাকটা শুনেছি শুতে যাওয়ার ঠিক আগে। তখন বাজে দশটা। সাড়ে বারোটায় ঘুম ভেঙে গেল ওদের ডাকাডাকিতে। ওই সময়ই একটাকে দেখলাম জানালায় এসে বসতে। আস্তে করে বিছানা থেকে উঠে গেলাম ভালমত দেখার জন্যে।

তোমার বেডরুম কোনদিকে? আমাদের বাড়ির দিকে?

না, মিস্টার হুবারের। কাল রাতে চোর ঢুকেছিল ও বাড়িতে, জানো বোধহয়। কখন যে ঢুকল কে জানে। সাড়ে বারোটায় যখন জানালা দিয়ে তাকালাম, তখনও দেখি নিচতলায় আলো জ্বলছে। অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করেন মিস্টার হবার। মাঝে মাঝে জানালার পর্দা টানা থাকে না। ওই সময় দেখেছি টেবিলের সামনে বসে কি যেন করছেন। কাল রাতে রেডিও চালানো ছিল তার। শব্দ শুনেছি।

সাড়ে বারোটার পর আর কোন পেঁচা ডাকতে শোননি? সারারাতই তো শোনার কথা। চাঁদের আলো ছিল। নিশ্চয় ইঁদুর ধরেছে।

শুনেছি। পেঁচারা জ্যোৎস্না খুব ভালবাসে। অনেক রাতে আরেকবার ঘুম ভেঙে গেল আরেকটা শব্দে। কিসের শব্দ বুঝলাম না। আলো জ্বেলে ঘড়ি দেখলাম। সোয়া তিনটে বাজে। কয়েকটা বাদামী পেঁচা আর কয়েকটা ছোট পেঁচা ডাকাডাকি শুরু করল। ঝগড়া বাধিয়েছে মনে হলো।

ওই সময়ও কি হুবারের বাড়িতে আলো জ্বলতে দেখেছ?

দেখেছি। মজার ব্যাপার কি জানো, আলোটা দেখেছি রান্নাঘরে। ইলেকট্রিক আলো নয়। টর্চ কিংবা মোমবাতিটাতি হবে।

মনে মনে উত্তেজিত হয়ে উঠছে রবিন, কিন্তু সেটা বুঝতে দিল না কিটিকে। রান্নাঘরে আলো জ্বেলেছে নিয়ে সেই লোকটা, যে জানালা ভেঙে ঢুকেছে।

কিসের শব্দে ঘুম ভাঙল, বুঝতে পারনি? ভেবে দেখো তো, কাঁচ ভাঙার শব্দ কিনা?

তা হতে পারে, ভুরু কুঁচকে রবিনের দিকে তাকাল কিটি। চোর ঢোকার কথা ভাবছ নাকি তুমি? শোনো, কাঁচ ভাঙার শব্দই নি, আর যেটাই নি, আমার তাতে কোন আগ্রহ নেই। রান্নাঘরে কিসের আলো দেখেছি তা নিয়েও আমার মাথাব্যথা নেই। তা ছাড়া ঠিক ঠিক দেখেছি কিনা তাও বলতে পারব না। ঘুমের ঘোরে ভুলও দেখে থাকতে পারি।

অনেক কথা বলে ফেলেছে কেবল রবিনের কাছ থেকে টা পড়তে পাওয়ার কৃতজ্ঞতায়! আর নয়। বইয়ের পাতায় মুখ নামাল খাবার কিট।

আর কথা বলতে চায় না ও, বুঝল রবিন। উঠে দাঁড়াল। অনেক জেনেছে। এতটা জানতে পারবে আশা করেনি।
গুডবাই, কিটি।
গুড-বাই, বই থেকে মুখ না তুনেই জবাব দিল ফিটি। বইটা কবে ফেরত দেবে না দেবে কিছুই বলল না।
রবিনও কিছু জিজ্ঞেস করল না। দরজার দিকে হাঁটা দিল।
বাড়ি ফিরেই ফোন করল কিশোরকে। সব কথা জানাল।
বাহ্, অনেক কথা জেনে এসেছ তো, খুশি হলো কিশোর। বোঝা যাচ্ছে, জানালার কাঁচ ভেঙে রাত তিনটের পর লোকটা ঢুকেছিল হুবারের রান্নাঘরে, এবং তারপরে ছুটে পালিয়েছে হুবার। হয়তো সঙ্গে করে নিয়ে গেছে সেই জিনিসটা, যেটার জন্যে লোকটা এসেছিল।
আরও দুচারটা কথা বলে, রবিনকে ধন্যবাদ দিয়ে ফোন রেখে দিল কিশোর। চৌকিদারদের সঙ্গে কথা বলার জন্যে বেরোতে হবে তাকে।
সকাল সকাল খেয়েদেয়ে তৈরি হয়ে নিল কিশোর। টিটুকে নেবে কিনা ভাবতে লাগল। প্রয়োজন মনে করল না। বরং রাতের বেলা ওকে সামলানোই ঝামেলা। ইঁদুর, ছুঁচো আর এ জাতীয় নিশাচর জীবের আনাগোনা হবে। সেটা কানে যাবে টিটুর। আর গেলেই হই-চই। তার চেয়ে রেখে যাওয়াটা ভাল মনে করল সে।
সে যে বেরোচ্ছে এটা বুঝতে দিল না টিটুকে। ঘরে আটকে রেখে বেরিয়ে চলে এল।
কোনদিকে যাবে?
পেছনের দেয়াল টপকে পালিয়েছে হুবার। সেদিকে নদী। অতএব প্রথমে নদীর দিকে যাওয়ারই সিদ্ধান্ত নিল কিশোর। তবে তার আগে অনুমান করে নিতে হবে, ঠিক কোনদিকে গিয়েছে হুবার।
তাই চলে এল হুবারের বাড়ির পেছনে।
পুরো অন্ধকার হয়ে আছে বাড়িটা। পেছনের দেয়ালের কাছে দাঁড়িয়ে রাস্তাটার দিকে তাকাল। ঘঁ, ঠিকই অনুমান করেছে। নদীর দিকে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।
হাঁটতে শুরু করল রাস্তা ধরে। এদিকে যে সব চৌকিদার পাহারা দেয় তাদের সঙ্গে কথা বলতে হবে।
আস্তে আস্তে হেঁটে চলল। চলে এল পথের শেষ মাথায়। এখানে রাস্তাটা ভাগ হয়ে দুটো পথ দুদিকে চলে গেছে। এদিক ওদিক তাকাল। কোনও চৌকিদার চোখে পড়ল না।
এখন কোনদিকে যাবে? ডানে, না বায়ে?
ডানেরটাতে যাওয়াই ঠিক করল।

এবার ভাগ্য কিছুটা অসন্ন হলো। একসারি সাল গঠন জ্বলছে। তার মাঝে আবছামত দেখা যাচ্ছে চৌকিদারের কুঁড়ে। দরজায় একটা নড়াচড়া চোখে পড়ল। তারমানে কেউ আছে ওখানে।
কিশোর কাছাকাছি এগোতেই পায়ের শব্দ শুনে গলা বাড়িয়ে দিল লোকটা। জ্বলন্ত কয়লায় হাত সেঁকছে।
কাছে গিয়ে কিশোরও হাত দুটো ধরল কয়লার ওপর। উফ, একেবারে অবশ হয়ে গেছে। লোকটার দিকে তাকাল, কেমন আছেন?
কে হে তুমি? এত রাতে?
ঠেকা না থাকলে এই ঠাণ্ডার মধ্যে বেরোয় কোন পাগলে, প্রচণ্ড বিরক্তির ভান করে বলল কিশোর। নিজের পরিচয় দিল না। প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে বলল, কি আর বলব, কতগুলো উন্মাদ এসে জুটেছে বাড়িতে। এই যে আমার আঙ্কেল পমের কথাই ধরুন না। রাত দুপুরে ঘুমের মধ্যে হাঁটাহাঁটি করার অভ্যেস। বলে নিশির ডাক। বাইরে বেরিয়ে কোথায় কোনদিকে চলে যায়, কোন ঠিকঠিকানা নেই। সকালে আর কিছু মনে করতে পারে না। বলুন তো কি কাণ্ড।
আজও বেরিয়েছে নাকি? জিজ্ঞেস করল চৌকিদার।
কাল রাতে বেরিয়েছিল। এদিকে এসেছিল নাকি, দেখেছেন? পাজামা পরা, পায়ে চটি। বিছানা থেকে নেমে বেরিয়েছে তো, ওগুলোই পরা ছিল। বড়জোর একটা কোট গায়ে দিয়ে থাকতে পারে। ঠাণ্ডা যে লাগে, এ ব্যাপারে পাগলেরও হুশ থাকে।
হেসে উঠল চৌকিদার। না, ওরকম কোন পাগলকে দেখিনি কাল। কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে, যেন কেউ শুনে ফেলবে এই ভয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল, শোনো, তোমাকে বলেই ফেলি-কাউকে বলে দিয়ো না আবার, ফগ শুনতে পেলে চাকরিটা যাবে-কাল রাতে আমি কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, তাই কিছু দেখিনি। এই ঠাণ্ডার মধ্যে কে যায় রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে, বলো। একটু চিন্তা করে নিয়ে বলল, তবে বুড়ো ক্যামার ঘুমায়নি। ও ঠিকমতই পাহারা দিয়েছে। হাঁটতে হাঁটতে নদীর দিকে চলে গিয়েছিল। ও নাকি পাজামা পরা এক লোককে দেখেছে। অত রাতে ওই পোশাকে নদীর ধারে লোকটাকে দেখে অবাক লেগেছে তার। সেজন্যেই বলেছে আমাকে। এখন বুঝলাম, পাগলটা কে। তোমার আঙ্কেল পম। পাগল বললাম বলে আবার কিছু মনে করলে না তো?
আরে না না। আমিই তো বললাম পাগল।
পাগল যখন জানোই, ঘরের মধ্যে রাতে তালা আটকে রাখো না কেন? নইলে কোনদিন রাতে নদীতে পড়ে ডুবে মরবে কে জানে।
এখন থেকে তাই করতে হবে। যাই, বুড়ো ক্যামারের সঙ্গেই কথা বলে আসি।

বুড়োকে কোথায় পাওয়া যাবে জেনে নিয়ে আবার রাস্তায় এসে উঠল কিশোর। কানে এল সাইকেলের বেলের পরিচিত শব্দ। রাস্তার মোড়ের লাইটপোস্টের আলোয় সাইকেল চালিয়ে আসতে দেখা গেল ফগর‍্যাম্পারকটকে।
চট করে একটা গাছের আড়ালে সরে গেল কিশোর। টিটুকে না এনে ভাল কাজ করেছে। ফগকে দেখলে আর ঠেকানো যেত না ওকে। চেঁচামেচি শুরু করে দিত। তাতে তদন্তের বারোটা বাজত।
কুঁড়ের কাছাকাছি গিয়ে সাইকেল থেকে নামল ফগ। এগিয়ে গেল চৌকিদারের সঙ্গে কথা বলার জন্যে।
গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করল কিশোর।
আবার কতগুলো লাল আলো বুঝিয়ে দিল রাস্তার পাশে আরেকজন চৌকিদারের কুঁড়ে আছে। বুড়ো ক্যামারের আস্তানা। কাছেই নদী।
এই লোকও কিশোরকে চিনতে পারল না। নাম জিজ্ঞেস করল। বানিয়ে একটা নাম বলে দিল কিশোর। ওর ভয়, এখানেও এসে হাজির হতে পারে ফগ। বেরোনোর আর সময় পেল না ঝামেলাটা! ও যখন বেরিয়েছে একেবারে ঠিক তখনই! যাকগে, পুলিসের ডিউটি পুলিস করছে, সেটা তো আর ঠেকাতে পারবে না। বুড়ো ক্যামারকে তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করে জবাবগুলো জেনে নিয়ে এখন যত জলদি কেটে পড়া যায়।
আগের চৌকিদারের মত এত হাসিখুশি নয় বুড়ো ক্যামার। কথাও তেমন বলতে চায় না।
বুড়োকে আগ্রহী করে তোলার চেষ্টা করল কিশোর, আমার আঙ্কেল পমও রাতে ঘুমের ঘোরে হাঁটতে বেরিয়ে যেখানে আগুন দেখে সেখানেই হাত সেঁকতে বসে যায়।
কিশোরের আঙ্কেল পমের প্রতিও কোন আগ্রহ দেখাল না বুড়ো। নিশির ডাক কিংবা ঘুমের ঘোরে হাঁটা, কোনটাতেই ওর আকর্ষণ নেই।
কাল রাতে নিশ্চয় ওকে দেখেছেন আপনি, বলল কিশোর। পাজামা পরা। চটি পায়ে দিয়েই বেরিয়ে গিয়েছিল বাড়ি থেকে। দেখুন দেখি কি কাণ্ড। এই শীতের মধ্যে ওই পোশাকে ঘর থেকে বেরোনো। পাগল আর কাকে বলে।
এতক্ষণে কিছুটা আগ্রহী মনে হলো বুড়োকে। মুখ খুলল, কাল রাতে দেখেছি আমি ওকে। পাজামা পরে দৌড়াচ্ছে। পাগলই মনে হয়েছিল আমার কাছে। এখন তো বুঝলাম ঠিকই অনুমান করেছি।
আমিও ঠিক অনুমানই করেছি–ভাবল কিশোর। নদীর দিকে দৌড়ে এসেছে। হুবার। পালাচ্ছিল। কিন্তু নদীতে কেন?
হাতে কিছু ছিল নাকি আমার আঙ্কেলের?

ছিল। জিনিসটা কি চিনতে পারিনি। নদীতে নেমেছিল মনে হলো। এই ঠাণ্ডার মধ্যে! আসলেই পাগল। তাহলে ওই লোক তোমার আঙ্কেল। প্রায়ই এ রকম বেরোয় নাকি?
বেরোয়। চাঁদনি রাতেই মাথা খারাপ হয় বেশি। এদিক দিয়ে আর ফিরতে দেখেননি নিশ্চয়?
না।
আবার প্রশ্ন করতে যাবে কিশোর, এই সময় কানে এল সাইকেলের বেলের শব্দ। এসে গেছে গগ। আর এখানে থাকা নিরাপদ নয়। বুড়োকে ধন্যবাদ দিয়ে উঠে এল তার কাছ থেকে। হঠাৎ ভাবনাটা এল মাথায়। ফগ কি বলে শোনা যাক না। দ্রুত আলোর কাছ থেকে সরে এসে ঝোঁপের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল সে।
সাইকেল থেকে নামল ফল। কেমন আছো, ক্যামার?
ভাল, মিস্টার ফগারকট। এত রাতে এখানে?
একটা কেস পেয়েছি, ক্যামার। সেটারই তদন্ত করছি। কাল রাতে সন্দেহজনক কাউকে এদিক দিয়ে যেতে দেবে নাকি?
দেখেছি। নিশিতে পাওয়া এক পাগলকে। শীতের মধ্যে পাজামা আর চটি পরে দৌড়াচ্ছিল।
ঝামেলা! কি বলছ! নিশিতে পাওয়া পাগল, এ কথা কে বলল তোমাকে?
একটা ছেলে। ওর আঙ্কেল পমের নাকি ঘুমের ঘোরে হাঁটার রোগ আছে।
ছেলেটা দেখতে কেমন?
আলোর কাছ থেকে সরে বসেছিল। ভালমত দেখিনি চেহারাটা। তবে মনে হলো চুলগুলো কোকড়া।
কোঁকড়া! প্রায় চিৎকার করে উঠল ফগ। তারমানে ওই বিচ্ছু ছেলেটাও তদন্ত শুরু করে দিয়েছে। কঠোর কণ্ঠে বলল, শোনো, ক্যামার, শুনতে পাচ্ছো?
তা পাচ্ছি। আমি কানে খাটো হলে কি হবে, এতটা খাটো নই যে আপনার চিৎকার শুনতে পাব না।
ঝোঁপের মধ্যে বসে মুচকি হাসল কিশোর।
ঝামেলা! বেশি কথা বলো তুমি! ধমকে উঠল ফগ। যা বলি মন দিয়ে শোনো। কাল রাতের ওই পাগলটা আজও আবার এ পথে আসতে পারে। ওকে দেখলেই ধরে এনে আটকাবে। কথা আদায় করবে।
পাগল ধরতে গিয়ে শেষে মরব নাকি! মাথায় যদি বাড়ি মেরে বসে? আমি পারব না। আমার কাজ রাতে পাহারা দেয়া। দিচ্ছি, ব্যস। কাউকে আটক না করার জন্যে আমার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করতে পারবেন না।
হাসি চাপতে কষ্ট হলো কিশোরের।

ঝামেলা! ছেলেটা কোনদিকে গেছে?
হাত তুলে দেখিয়ে দিল ক্যামার।
তারমানে বাড়ি যেতে হলে এ পথেই ফিরতে হবে কিশোর পাশাকে, বিড়বিড় করল ফগ। চিৎকার করে ক্যামারকে বলল, পাগল নাহয় নাই ধরলে। ছেলেটাকে তো ধরতে পারবে? এ পথ দিয়েই যাবে ও. তোমার সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় কাঁক করে কলার চেপে ধরে আটকাবে! তারপর যা করার আমি করব। আমি এই পথের মাথায়ই লুকিয়ে থাকল।
তাহলে আপনিই ধরছেন না কেন?
ঝামেলা! খালি তর্ক করে। আমি রছি না তার কারণ আমাকে দেখলেই ছোকরা দৌড়ে পালাবে। ধরার সুযোগ আর পাব না।
ধরে কি করবেন?
সেটা আমার ব্যাপার, ধমকে উঠল ফগ!
চুপ করে ভাবতে লাগল ক্যামার। ফগকে চটিয়ে দিলে এই এলাকায় চাকরি করা কঠিন হয়ে পড়বে। অগত্যা রাজি হলো তার কথায়।
আবাঁর সাইকেলে চাপল ফগ। রাস্তা ধরে কিছুটা দূরে গিয়ে একটা বড় গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল।
ঝোঁপের মধ্যে বসে সবই দেখতে পেল কিশোর। নীরবে খুব একচোট হেসে নিল। মনে মনে বলল, থাকো বসে ওখানে সারাত। বিচ্ছু ছেলেটাকে আর ধরতে হবে না।
টিটুকে সঙ্গে আনেনি বলে আরেকবার ধন্যবাদ দিল নিজের ভাগ্যকে। হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল ঝোঁপ থেকে। মাথা উঁচু করল না। নেমে পড়ল রাস্তার পাশের খাদে। ওটা পার হয়ে মাঠে উঠল। ঝোঁপঝাড় আর গাছপালার অভাব নেই। ওগুলোর আড়ালে আড়ালে এখন অনেক দূর চলে যেতে পারবে ফগ আর ক্যামারের চোখ এড়িয়ে। তারপর ঘুরে ফাঁকে পার হয়ে গিয়ে আরেক জায়গা দিয়ে রাস্তায় উঠে পড়লেই হলো। নিরাপদে চলে যেতে পারবে বাড়িতে।

.

পরদিন সকালে নাস্তা করতে বসেছে কিশোর, এই সময় বাজল টেলিফোন। মিসেস বারজি এসে বলল, তোমার ফোন। রবিন করেছে।
একা সামলাতে পারেন না মেরিচাচী, তাই ঘরের কাজে সাহায্য করার জন্যে মিসেস বারজিকে রেখেছেন। মেরিচাচীরা যখন এখানে থাকেন না, রকি বীচে চলে যান, তখন গ্রীনহিলসের তাদের বাড়ি দেখাশোনার ভারও মহিলার ওপর।
এত সকালে ফোন! লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। নিশ্চয় নতুন কোন তথ্য কিংবা সূত্র পেয়েছে রবিন।

হালো?
কিশোর? ভেসে এল রবিনের উত্তেজিত গলা, হুবার ফিরে এসেছে। ফগ এখনও জানে না। তাই আগেভাগেই তোমাকে জানানো প্রয়োজন মনে করলাম।
তাই নাকি? খুব ভাল করেছ। কে বলল তোমাকে?
কিটি। সকালে বাগানে বেরিয়েছি। আমাকে দেখে এসে দেয়ালের ওপাশ থেকে কথা বলল। কাল রাতে নাকি পেঁচার ডাক শোনার জন্যে কান পেতে ছিল, এই সময় গেট খোলার আওয়াজ পায়।
কটার সময়?
রাত দুটো। চোর এসেছে ভেবে সঙ্গে সঙ্গে জানালায় গিয়ে দাঁড়ায়। দেখে চোর না, হবার। চাঁদের আলোয় চিনতে ভুল হয়নি ওর। বসার ঘরে ঢুকে আলো জ্বালে হুবার।
ওর পরনে কি ছিল?
ড্রেসিং-গাউনের মতই নাকি লেগেছে কিটির কাছে। হাতে কিছু ছিল না
তবে আগের রাতে বেরোনোর সময় একটা কিছু নিয়ে যে বেরিয়েছিল তে কোন সন্দেহ নেই। কাল রাতে চৌকিদার নিশ্চিত করেছে আমাকে এ ব্যাপারে।
তাহলে ওটা আর সঙ্গে আনেনি, রবিন বলল। কারণ হাতে যে কিছু ছিল না, এ ব্যাপারে কিটিও নিশ্চিত।
এক কাজ করো। মুসা আর ফারিহাকে ফোন করে তোমাদের বাড়িতে আসতে বলে দাও। আমি নাস্তা খেয়েই চলে আসছি। ঝামেলাও এ কেসের তদন্ত করছে। অনেকখানি এগিয়ে গেছে বলেই আমার ধারণা। আমরা যে পথে এগোচ্ছি, ঠিক সেই পথে সেও এগোচ্ছে...
কিশোর, তোর নাস্তা ঠাণ্ডা হয়ে গেল, ডাক দিলেন মেরিচাচী, জলদি আয়।
আসছি, মাউথপিসে হাতচাপা দিয়ে চিৎকার করে জবাব দিল সে। রাখি, রবিন। যা বললাম করো, রিসিভার নামিয়ে রাখতে গিয়ে মনে পড়ল কথাটা। ও হ্যাঁ, আরেকটা কথা, ফারিহাকে বোলো বেড়ালের বাচ্চাটাকে সঙ্গে নিয়ে আসতে।
খাবারগুলো কোনমতে নাকেমুখে ওঁজে, সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল কিশোর। ঝুড়িতে বসিয়ে নিয়েছে টিটুকে। টপ স্পীডে রওনা হলো রবিনদের বাড়িতে।
পথে ফগকে দেখতে পেল। আরেক রাস্তা দিয়ে আসছে। তবে অনেক দূরে রয়েছে এখনও। কিশোরকে দেখে জোরে জোরে হাত নেড়ে থামতে ইঙ্গিত করল। নিশ্চয় আগের রাতের কথা জিজ্ঞেস করতে চায়।
থামল না কিশোর, যদিও আগের রাতে কতক্ষণ পর্যন্ত তার অপেক্ষায় বসে ছিল ফগ জানার খুব আগ্রহ। রবিনদের বাড়িতে না গিয়ে আরেকদিকে সাইকেল চালিয়ে দিল সে।

কিশোরকে ধরার জন্যে গতি বাড়িয়ে দিল ফগ। গায়ের জোরে প্যাডেল চাপতে লাগল।
কিশোরও বাড়িয়ে দিল গতি। মোড় ঘুরে এসে লাফ দিয়ে সাইকেল থেকে নেমে ঠেলে নিয়ে ঢুকে পড়ল একটা নির্জন বাড়ির বাগানে। বেড়ার পাশে লুকিয়ে বসল। ফগও মোড়ের এ পাশে বেরিয়ে এল। লাল টকটকে হয়ে গেছে মুখ। হা করে হাঁপাচ্ছে। উড়ে চলে গেল যেন বেড়ার ওপাশের রাস্তা দিয়ে। কিশোর চুপ থাকতে বলল টিটুকে।
ফগ চলে গেলে বেরিয়ে এল কিশোর। সাইকেলে চেপে উল্টোদিকে রওনা হলো।
ঘামতে ঘামতে এসে রবিনদের বাড়িতে ঢুকল। ওর ঘরে ঢুকে দেখল মুসা, ফারিহা, রবিন সবাই ওর জন্যে অপেক্ষা করে বসে আছে। ফারিহার কোলে বেড়ালছানাটা। ওটাকে আদর করছে সে।
দেরি হওয়ার কারণ জানতে চাইল রবিন।
ঝামেলা পিছে লেগেছিল, জানাল কিশোর। হুবারের খবর কি?
ওকে দেখা যাচ্ছে না, রবিন বলল। নিশ্চয় বাড়িতে লুকিয়ে বসে আছে। বেড়াল আনতে বলেছিলে কেন? ওটা ফেরত দেয়ার ছুতোয় ওর সঙ্গে দেখা করার মতলব নাকি?
পারলে মন্দ হত না।
ও কি তোমাকে দেখলে খুশি হবে ভেবেছ?
না হলে না থোক। এ সুযোগ আমি হাতছাড়া করতে চাই না। ঝামেলার আগেই গিয়ে ওর সঙ্গে আমার কথা বলা দরকার।
ফারিহার হাত থেকে বেড়ালছানাটা নিল কিশোর। অমনি খউ বউ করে উঠল টিটু। ধমক দিল কিশোর, চুপ কর, হিংসুটে কোথাকার!
বেরিয়ে এল সে। হুবারের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে দ্বিধা করতে লাগল। কোনদিক দিয়ে ঢুকবে? সামনে, না পেছন? একেবারেই নির্জন লাগছে বাড়িটা। কেউ আছে বলে মনে হচ্ছে না। সে যে ফিরেছে এটা কি বুঝতে দিতে চাইছে না হুবার?
যা হোক কিছু একটা তাড়াতাড়ি করে ফেলা দরকার। এখানে দাঁড়িয়ে থাকাটা ঠিক হচ্ছে না। যে কোন সময় ফগ চলে আসতে পারে। পেছন দিয়ে যাওয়াই স্থির করল সে।
সামনের গেট দিয়ে ঢুকে সাবধানে পা টিপে টিপে ঘুরে বাড়ির পেছনে চলে এল। ভাঙা জানালাটার দিকে তাকাল। কাউকে চোখে পড়ল না। তারমানে লুকিয়ে থাকাই ঠিক করেছে হুবার। তাই যদি হয়ে থাকে সামনের গেটের বেল টিপলে দরজা খুলবে না। তাহলে কি করে ওকে বের করে আনবে?

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে আরম্ভ করল কিশোর। বনবন ঘুরতে লাগল যেন মগজের চাকাগুলো। বেড়ালছানাটার জন্যে উদ্বিগ্ন হবেই হুবার। জানালার ভাঙা ফোকরে মুখ রেখে বেড়ালের স্বর নকল করে ডেকে উঠল, মিআউ।

.

মিআউ! মিআউ! মিআউ।

ডেকেই চলল কিশোর। করুণ, ক্ষুধার্ত বেড়ালছানার ডাক। যে কারও হৃদয় ছুঁয়ে যাবে।

নিজের ডাক অন্যের মুখে শুনে প্রথমে কেমন অবাক হয়ে গেল ছানাটা। কিশোরের হাত থেকে ছুটে যাওয়ার জন্যে মোড়ামুড়ি শুরু করল। না পেরে সুর মিলিয়ে ডাকতে আরম্ভ করল মিআউ মিউ করে।

ফিসফিস করে ছানাটাকে উৎসাহ দিল কিশোর, গুড, চালিয়ে যা। আরও জোরে। ওটাও চেঁচিয়েই চলল।

নিজে ডাকাডাকি বন্ধ করে কান পাতল কিশোর। ঘরের মধ্যে কোন শব্দ হয় কিনা শোনার চেষ্টা করল।

হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। কেউ নড়ছে। হালকা পায়ের শব্দ। থেমে গেল। রান্নাঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল একজন লোক, যেটা দিয়ে হলঘরে ঢোকা যায়।

এই লোকই নিশ্চয় হুবার–ভাবল কিশোর। ভাল করে তাকাল লোকটার দিকে। পরনে শার্ট-প্যান্ট। ড্রেসিং গাউন আশা করেছিল সে। এখনও কিশোর আর ছানাটাকে দেখতে পায়নি। রান্নাঘরের ভেতরে এদিক ওদিক চোখ বোলাচ্ছে। বুঝতে চাইছে কোনখান থেকে আসছে শব্দটা।

লোকটার বয়স খুব বেশি না। তরুণই বলা চলে। পাতলা মুখ। উজ্জল, বুদ্ধিদীপ্ত চোখ। চুল সুন্দর করে পেছন দিকে আঁচড়ানো। দেখে মনেই হয় না এই লোক রাত দুপুরে ভয়ে ঘর ছেড়ে পালাতে পারে।

মিআউ!

আবার কিশোরের হাত থেকে ছুটে যাওয়ার চেষ্টা করল ছানাটা।

জানালার দিকে তাকাল নোকটা। কিশোরের কাধ আর মাথা চোখে পড়ল। বড় মানুষ ভেবে ঝট করে ঘুরে দাঁড়িয়ে হলে ঢুকতে গিয়েও থেমে গেল। ফিরে তাকাল। ভাল করে দেখে বুঝল কিশোর বড় মানুষ নয়। ওর হাতে রয়েছে বেড়ালছানাটা।

ধীরে ধীরে এগিয়ে এল সে। ধরা পড়ে গিয়ে বিব্রত বোধ করছে যেন।

জানালার ফোকরের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে কিশোর বলল, এটা আপনার বেড়াল? খিদেয় মিউ মিউ করছিল। বাড়ি নিয়ে গিয়ে খাইয়েছি।

হাত দিয়ে ডলে চুল সমান করল লোকটা। জবাব দিল, হ্যাঁ, আমার। দাঁড়াও, দরজাটা খুলে দিচ্ছি।
দরজার তালা আর ছিটকানি খুলল লোকটা। সাবধানে পাল্লা খুলে হাত বাড়াল, দাও।
কিশোর বুঝতে পারল, ছানাটা ওর হাতে দিলেই সঙ্গে সঙ্গে দরজা লাগিয়ে দেবে নোকটা। কথা বলার আর সুযোগ দেবে না। তাই ছানাটাকে আগের মতই ধরে রেখে বলল, আপনার ঘরে চোর ঢোকা নিয়ে গায়ে মহা উত্তেজনা। এখানে পুলিস এসেছিল, জানেন?
অবাক মনে হলো হুবারকে। পুলিস! কেন? বাড়িতে যে লোক ছিল না জানল কি করে?
দ্রুত ভাবনা চলেছে কিশোরের মাথায়। দুধওয়ালা যে সারা গায়ে খবরটা রটিয়েছে, হবার তাহলে জানে না। ফগ এসে সারা বাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজেছে এ কথাও জানে না। তার ধারণা, কেউ কিছু জানে না। এমনকি সে যে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিল এ কথাও নয়।
কি হয়েছিল, বলছি সব, হুবারের পাশ কাটিয়ে রান্নাঘরে ঢুকে পড়ল কিশোর।
বাধা দিল না হুবার। বরং কি ঘটেছিল শোনার জন্যে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। রান্নাঘরের দরজা লাগিয়ে দিল। কিশোরকে বসার ঘরে নিয়ে এল।
জিনিসপত্র সব এখন গোছগাছ করা। বাড়ি ফিরে আবার সব সাজিয়ে ফেলেছে হুবার।
বেড়ালটাকে ছেড়ে দিয়েছে কিশোর। মিউ মিউ করে ওদের পিছু নিল ওটা।
দুধ চাস নাকি? ছানাটাকে জিজ্ঞেস করল হবার। সরি, দিতে পারব না। দুধওয়ালা আসেনি আজ।
পুলিস বোধহয় আসতে মানা করে দিয়েছে, একটা চেয়ারে বসতে বসতে বলল কিশোর। বলেছে আপনি বাড়ি নেই।
পুলিসের এত ঠেকা পড়ল কেন এসে খোঁজাখুজি করার? বিরক্ত হয়ে বলল হুবার। কেউ কি বাড়ি ফেলে দুচার দিনের জন্যে বাইরেও যেতে পারবে না?
পুলিস খবর পেয়েছে চোর ঢুকেছে আপনার বাড়িতে। জিনিসপত্র সব ওলটপালট হয়ে ছিল। হুবারের চোখের দিকে তাকিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ করল কিশোর, ওর কথা শুনে লোকটা চমকে যায় কিনা। জিজ্ঞেস করল, বাড়ি ঢুকে সব অগোছাল দেখতে পাননি?
দ্বিধা করতে লাগল হুবার। আর কিছু যেন বলতে চায় না। শেষে আমতা আমতা করে বলল, হ্যাঁ, তা পেয়েছি। কিন্তু পুলিশকে খবর দিল কে?

দুধওয়ালা। ছানাটাকে পায়ের কাছে ঘুরঘুর করতে দেখে কোলে তুলে নিয়ে আদর করল কিশোর। দুধ দিতে এসে দেখে সামনের দরজা খোলা। সন্দেহ হয় তার। ডাকাডাকি করে আপনাকে না পেয়ে ঘরে ঢুকে দেখে জিনিসপত্র সব তছনছ। তখন পুলিসকে খবর দেয় সে।
ও, তাই নাকি! আমি কিছুই জানতাম না।
বাড়ি থেকে কখন বেরিয়েছিলেন আপনি? আচমকা প্রশ্ন করল কিশোর। জবাবটা জানা আছে ওর। হুবার সত্যি বলে কিনা মিলিয়ে দেখতে চায়।
আবার দ্বিধা করতে লাগল হুবার। আগের রাতে। বন্ধুর বাড়ি গিয়েছিলাম। গতরাতে ফিরেছি। ফিরে দেখি জিনিসপত্র সব ছড়ানো। তবে কোন কিছু চুরি হয়নি। আমার অনুমতি ছাড়া এ ভাবে নাক গলানো উচিত হয়নি পুলিসের।
দরজা খোলা থাকাতেই এই বিপত্তিটা ঘটল আরকি। আপনি কি দরজা লাগিয়ে গিয়েছিলেন?
নিশ্চয়ই।
বিশ্বাস করল না কিশোর। রাতে কি চোর এসেছে সাড়া পাওয়ার পরে পালিয়েছিল নাকি, জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করল। কিন্তু করল না। জানে, সত্যি জবাব পাবে না। এখন তো শার্ট-প্যান্ট পরা আছে। পায়ে জুতো। ড্রেসিং-গাউন আর স্লিপারটা কোথায় খুলে রেখেছে হুবার? ওপরতলায়? দেখতে পারলে হত।
জানালায় উঁকি দিল হেলমেট পরা একটা লাল টকটকে মুখ। ফার্যাম্পারকট।
চিৎকার করে উঠল হবার, কে? পুলিস। আবার এসেছে। এর একটা বিহিত না করলেই নয়!
ঠিক বলেছেন, স্যার, এর একটা বিহিত করা দরকার। ওদের জ্বালায় কোন মানুষ নিজের বাড়িতে শান্তিতে থাকতে পারবে না, তা কেন হবে?
রাস্তায় টহল দিতে বেরিয়ে এদিক দিয়েই যাচ্ছিল ফগ। হুবারের বাড়িটা চোখে পড়তে মনে হলো একবার উঁকি মেরে দেখে যায়। তাই দেখতে এসেছে।
হুবারের সঙ্গে কিশোরকে দেখে ওর গোল চোখ আরও গোল গোল হয়ে গেল। হা হয়ে গেল মুখ। আবার নাক গলাতে এসেছে ওই বিন্দু ছেলেটা! ওর আগেই এসে বসে আছে। চিৎকার করে হুবারকে বলল, দরজাটা খুলুন। আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে।
জ্বলন্ত চোখে ফগের দিকে তাকাল হুবার। গটমট করে গিয়ে জানালার শার্সি খুলে দিল। কি কথা? এ ভাবে উঁকি মারছেন কেন? দেখছেন না একজন বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছি? কি দরকার আপনার?
ঝামেলা! বন্ধু! ওর মত একটা ছেলে আপনার বন্ধু?

অপমান করে কথা বলছেন কেন? দাঁড়ান, হেড অফিসে গিয়ে আমি রিপোর্ট করব আপনার নামে। আমি চোর-ডাকাত নই, বেআইনী কিছুই করিনি যে পুলিস বারবার আমার বাড়িতে আসবে।
ঝামেলা!...ইয়ে, ঝামেলা! কথা হারিয়ে ফেলল ফগ। কাশি দিল। ইয়ে...আপনার বাড়িতে চোরের উপদ্রব হয়েছিল...
হয়েছিল তো আপনার কি? আপনাকে কে উপদ্রব করতে বলেছে?
অনেক কষ্টে হাসি চাপল কিশোর।
আপনার সামনের দরজা খোলা ছিল, কৈফিয়ত দেয়ার চেষ্টা করল ফগ। ভাবলাম...
কে ভাবতে বলেছে আপনাকে? ধমকে উঠল হুবার, যান, ভাঙন এখান থেকে!
আনন্দে ধেই ধেই করে নাচতে ইচ্ছে করল কিশোরের। হুবারকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করল। চিরকাল ওদেরকে যাও ভাগো বলে ধমকে এসেছে ফগ, এখন কেমন মজা? নিজের শুনতে কেমন লাগছে।
রেগে গেল ফগ। আহ..ইয়ে...ঝামেলা! আপনি কোনও প্রাণীকে বাড়িতে ক্ষুধার্ত অবস্থায় ফেলে যেতে পারেন না। সেটা অমানবিক। বেআইনী।
বেড়ালছানাটা ক্ষুধার্ত ছিল না! বলে ফগের মুখের ওপর শার্সিটা লাগিয়ে দিতে গেল হুবার।
চট করে রোমশ একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে ঠেকাল ফগ। ছানাটা নাহয় ছিল না। কিন্তু কুকুরটা? শুয়োরটা?
ভুরু কুঁচকে ফগের দিকে তাকিয়ে রইল হুবার। কি বলছেন আপনি, কনস্টেবল? কিসের কুকুর? কিসের শুয়োর? পাগল হয়ে গেলেন নাকি?
পাগল, না? ঝামেলা! শুধু কুকুর আর শুয়োরের ডাকই শোনা যায়নি, একটা শিশুর কান্নাও শোনা গেছে এ বাড়িতে। চিৎকার করে ওর মাকে ডাকছিল।
হুবারের চেহারা দেখে মনে হলো, ফগ যে পাগল হয়ে গেছে এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই তার আর।
কিশোর ভাবল, এইই সুযোগ। ওরা দুজন কথা কাটাকাটি করতে থাক। সে গিয়ে ওপরতলাটা দেখে আসতে পারে। একটা মুহূর্ত দেরি করল না আর। বেড়ালছানাটাকে নিয়ে রওনা দিল সিঁড়ির দিকে। সঙ্গে নেয়ার কারণ–হুবার জিজ্ঞেস করলে ছুতো দেবে, তার কোল থেকে নেমে পালাচ্ছিল এটা, ধরার জন্যে সেও ছুটেছে পেছনে।
নিচতলায় ফগ আর হুবারের চিৎকার বেড়েছে। একটা কথা ভেবে কিশোরেরও অবাক লাগল, কুকুর, শুয়োর আর শিশুর কান্নার কথা কার কাছে শুনল ফগ?

চুরি হওয়ার খবর শুনে ওরাও তো এসেছিল এ বাড়িতে। কই, বেড়ালছানাটা ছাড়া আর কোন জন্তু-জানোয়ার তো দেখেনি?
তবে কি কিটিকে জিজ্ঞেস করতে গিয়েছিল ফগ? লোকটাকে দেখতে পারে না বলে বানিয়ে বানিয়ে উল্টোপাল্টা বলে দিয়েছে কিটি?
হ্যাঁ, তাই হবে। মুচকি হাসল কিশোর।
ওপরতলার যে ঘরটায় ঢুকল সে প্রথম, সেটাও গোছগাছ করা। গুছিয়ে ফেলেছে হবার। ওর স্লিপার আর ড্রেসিং-গাউনটা খোঁজায় মন দিল সে।
.
ঘরের চারপাশে চোখ বোলাল কিশোর। একটা স্লিপারও চোখে পড়ল না। না না, আছে। একজোড়া লাল স্লিপার।
উল্টে দেখতে লাগল সে।
কাদা লাগা। প্রচুর কাদা। এগুলো পায়ে দিয়ে রাস্তায় হেঁটেছে হুবার, তাতে কোন সন্দেহ নেই।
খাটের নিচ থেকে টেনে বের করল একটা লাল-সাদা পাজামা। ঠোঁট গোল করে শিস দিয়ে উঠল। পাজামার নিচের দিকটায় কাদামাখা। আপনমনে মাথা ঝকাল সে। এই কাদা কোথা থেকে এসেছে, ওর জানা।
নদীর কিনার থেকে।
এবার ড্রেসিং-গাউনটা দরকার। পাওয়া গেল ওটাও। একটা উঁচু আলমারির মধ্যে। ওটাও নোংরা। তবে তাতে কাদার বদলে খড়ের টুকরো লেগে আছে। ড্রেসিং-গাউনটা পরে কোথায় ঢুকেছিল হুবার?
আস্তে করে আলমারির দরজাটা লাগিয়ে দিল কিশোর।
মোটেও বন্ধুর বাড়িতে যায়নি হুবার, ভাবল সে। বন্ধু কি আর তাকে খড়ের গাদায় শুতে দিয়েছিল নাকি। আসলে খড় আছে এমন কোনখানে ঢুকে লুকিয়েছিল সে। গোলাঘরে হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। রাতে রাস্তাঘাট সব নির্জন হলে ওখান থেকে বেরিয়ে চুপচাপ বাড়ি ফিরে এসেছে। চৌকিদার কি ফিরতে দেখেছে ওকে? তাহলে ভাববে আমার আঙ্কেল পম। হাহ হাহ!
নিচতলার গরম গরম কথাবার্তা থেমে গেল।
দড়াম করে একটা জানালা বন্ধ হওয়ার শব্দ হলো। মেঝেতে চার হাতপায়ে ভর দিয়ে উপুড় হয়ে ডাকতে আরম্ভ করল কিশোর, পুষি, পুষি, অ্যাই পুষি!
সিঁড়িতে একটা ডাক শোনা গেল, ওখানে কি করছ? জলদি নেমে এসো।
ঘর থেকে বেরিয়ে এল কিশোর। সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে বলল, সরি। বেড়ালছানাটা কোথায় জানি পালাল।

এই তো, নিচেই নেমে এসেছে, তপ্ত কণ্ঠে হুবার বলল। এবার তুমিও বেরোও। ছানাটাকে খাওয়ানোর জন্যে ধন্যবাদ। ওই নাকগলানো স্বভাবের পুলিসটাকে দেখে নেব আমি। ওর বিরুদ্ধে রিপোর্ট না করেছি তো আমার নাম হুবার নয়।
যাচ্ছি, স্যার, নিরীহ কণ্ঠে জবাব দিল কিশোর।
রাগ কমছে না হুবারের। লোকটা একটা আস্ত পাগল। কোন এক কিটি নাকি তাকে বলেছে আমার বাড়িতে কুকুর, শুয়োর আর বাচ্চা শিশুর কান্না শুনেছে। কেউ কিছু বলল আর অমনি বিশ্বাস করে বসতে হবে?
পকেট থেকে সিগারেট আর লাইটার বের করে সিগারেট ধরাল হবার।
পেট ফেটে হাসি আসছে কিশোরের। চারপাশে তাকাল। আর কিছু দেখার নেই এ বাড়িতে। নতুন কিছু আর বলারও নেই হুবারের। অতএব কেটে পড়া যায়।
সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে বলল, যাচ্ছি, স্যার। আপনি চলে এসেছেন, ছানাটার আর কোন অসুবিধে হবে না।
না, হবে না, কর্কশ কণ্ঠে জবাব দিল হুবার। এখন যাও তো। আমাকে একটু শান্তিতে একা থাকতে দাও।
বেরিয়ে এল কিশোর। শিস দিতে দিতে এগোল গেটের দিকে। হুবারের বাড়িতে ঢুকে অনেক তথ্য পাওয়া গেছে। ফগের চেয়ে অনেক বেশি জানে এখন সে। ফগ ওবাড়িতে ঢুকতেও পারেনি, কাদামাখা স্লিপার আর পাজামাটাও দেখেনি।
গেটের বাইরে বেরোতেই পড়ল ফগের মুখোমুখি। অপেক্ষা করছিল সে। ঝামেলা!
কিসের ঝামেলা? যেন কিছুই বুঝতে পারছে না কিশোর।
লাল হয়ে গেল ফগের গাল। কটমট করে তাকাল কিশোরের দিকে। তাহলে তুমি ওই লোকটার বন্ধু। জবর খবর। তোমার মত পাজি ছেলে যে কোন বড় মানুষের বন্ধু হতে পারে, ভাবতেই অবাক লাগছে।
শুনে খুশি হলাম।
ঠাস করে চড় মারার ইচ্ছেটা অনেক কষ্টে রোধ করল ফগ। যতই চালাকি করো, বিচ্ছু, এবার আর পার পাবে না। তোমার নামেও রিপোর্ট লিখব আমি।
কেন, আমি আবার কি করলাম?
কি করেছ, থানায় গিয়ে রুলের শুতে খেলেই বুঝবে।
রিপোর্টটা কি লিখবেন সেটাই তো বুঝলাম না। কাল রাতে চৌকিদার কিছু বলেছে বুঝি আমার নামে? আমি তো বেআইনী কিছু করিনি। আমার আঙ্কেল পমকে খুঁজতে বেরিয়েছিলাম। সাবধান, তার সঙ্গে ঝামেলা করতে যাবেন না, মাথা খারাপ লোক..
ঝামেলা! আগে বাড়ল ফগ। কিশোরকে টেনে টেনে ছিঁড়তে পারলে এখন জালা কমত তার। জীবনে এত রাগা বোধহয় আর রাগেনি। বাধা না পেলে নিজেকে

সামলাতে পারত না, হাত তুলে বসত। তারপর পড়ত আরও ঝামেলায়। টিটু ওকে বাঁচিয়ে দিল। বউ খউ করতে করতে ঘণ্টায় ষাট মাইল বেগে তেড়ে এল গোড়ালি কামড়ানোর জন্যে।
আর সবাই যেমন তেমন, টিটুকে পরোয়া না করে উপায় নেই। সোজা সাইকেলের দিকে দৌড় দিল ফগ। লাফ দিয়ে উঠে তাড়াহুড়ো করে প্যাডেল চাপতে গিয়ে একটা পা গেল ফসকে। ঋকি লাগল। আরেকটু হলে কাত হয়ে পড়ে যাচ্ছিল সে। পেছন পেছন খানিকদূর দৌড়ে গেল টিটু। তারপর ফিরে এল।
হাসতে হাসতে পেট চেপে ধরে রাস্তার ওপরই গড়াগড়ি খেতে লাগল কিশোর।
হুবারের বাড়িতে গিয়ে কি করল কিশোর, জানার জন্যে অস্থির হয়ে আছে সবাই। তাই হাসিটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না।
হু, তোমার অনুমান দেখা যাচ্ছে সবই ঠিক, শোনার পর মাথা দুলিয়ে বলল ফারিহা। পাজামা আর স্লিপার পরেই পালিয়েছিল হুবার। কোথাও গিয়ে লুকিয়ে থেকেছিল।
এবং সঙ্গে করে কোন জিনিস নিয়ে গিয়েছিল, যোগ করল কিশোর। কিন্তু ফিরে যখন এলকিটির কথা অনুযায়ী–তার হাতে তখন আর কোন কিছু ছিল না। তারমানে জিনিসটা কোথাও লুকিয়ে রেখে এসেছে।
নিশ্চয় কোন খড়ের গাদায়, রবিন বলল। গ্রীনহিলসে ওগুলোর অভাব নেই। অসংখ্য খড়ের গাদা আর গোলাঘর আছে। কোনটাতে রাখল?
জানি না। প্রয়োজন হলে খুঁজে বের করতে হবে, জবাব দিল কিশোর। হাতে সময় আমাদের কম। স্কুল খুলতে আর বেশি বাকি নেই। তার আগেই কাজ সারতে হবে।
কিন্তু কি করে কাজটা সারবে, অর্থাৎ প্রয়োজন দেখা দিলে জিনিসটা খুঁজে বের করবে, কারও মাথায় ঢুকল না। গ্রীনহিলসের সমস্ত খড়ের গাদা আর গোলাঘরে জিনিসটা খুঁজে বেড়ানো খড়ের গাদায় সুচ খোঁজার চেয়ে কঠিন। তা ছাড়া ওরা জানেও না কি জিনিস হাতে করে নিয়ে গিয়েছিল হুবার।
যাই হোক, ওটা নিয়ে মাথা ঘামানোর আগে গত রাতে চৌকিদারদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে কি করে এসেছে কিশোর, ফগকে কিভাবে হেনস্তা করেছে, কলার সুযোগ পেল এতক্ষণে।
শুরু হলো আরেকবার হাসাহাসি।
হাসতে হাসতে ফারিহা বলল, কিশোর, তুমি না, সত্যি কি বলব..হি-হি-হি। ওই ফগটাও হলো একটা আস্ত বোকা, তোমার পিছে লাগতে যায়। নিশ্চয় কাল সারারাত নদীর ধারে ঠাণ্ডার মধ্যে বসে থেকেছে তোমাকে ধরার জন্যে।

হয়তো, কিশোরও হাসছে। বুড়ো ক্যামারকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেই সব জানা যাবে।
চলো না গিয়ে জিজ্ঞেস করা যাক, প্রস্তাব দিল মুসা। হাতে তো কোন কাজ নেই আমাদের। সময় কাটবে।
রাজি হয়ে গেল সবাই।

.

নদীর পাড়ে গিয়ে দেখল বুজে ক্যামারের কুঁড়ের দরজা বন্ধ। সারারাত জেগে থেকে এখন নিচয় ঘুমাচ্ছে সে। এই কথাটা কারও মনে হয়নি আগে। ডাকাডাকি করাটাও উচিত হবে না এখন।
নিরাশ হয়ে ফিরে যাবার কথা ভাবছে, এই সময় মুসা দেখল নদীর পাড়ে একটা ছাউনির ধারে নৌকার তলায় আলকাতরা লাগাচ্ছে তার এক পরিচিত মাঝি। নাম ওয়ালি উইলবার্ন। পাশে বসে আছে ওর টেরিয়ার কুকুরটা।
কিশোরের দিকে তাকিয়ে বলল মুসা, দাড়াও, পাওয়া গেছে লোক। জিজ্ঞেস করে আসি।
সাইকেল রেখে মুসার পেছন পেছন চলল বাকি সবাই।
লোকটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল মুসা।
টিটুকে দেখে এগিয়ে এল টেরিয়ার কুকুরটা।
ব্রাশ ডলা থামিয়ে মুখ ফিরিয়ে ওর দিকে তাকান ওয়ালি। হেসে জিজ্ঞেস করল, কি, স্কুল শুরু হয়নি এখনও?
না। আর অল্প কদিন বাকি।
এ সময়ে নদীর পাড়ে কি মনে করে?
একজন লোকের খবর নিতে এসেছি।
কে?
ওর চাচা, কিশোরকে দেখাল মুসা, আঙ্কেল পম। রাতে ঘুমের মধ্যেই উঠে হাঁটতে বেরিয়ে যান। কোথায় যান, কি করেন, কোন ঠিকঠিকানা থাকে না। পরশুদিন রাতেও নাকি বেরিয়েছিলেন। কিশোরদের কাজের মেয়েটা জানালার বাইরে তাকিয়েছিল, সাহেবের হাতে একটা জিনিস ছিল দেখেছে। কি জিনিস, চিনতে পারেনি। পরদিন সেকথা আর মনে করতে পারলেন না আঙ্কেল পম। আমাদের পাঠিয়েছেন খোঁজ নিতে। বলেছেন, জিনিসটা খুঁজে বের করে দিতে পারলে পুরস্কার দেবেন।
আগ্রহী মনে হলে ওয়ালিকে। কোথায় খুঁজতে হবে বলেছেন কিছু?
ছোট্ট একটা সূত্র দিতে পেরেছেন। রাতে বেরিয়ে যেদিকে গিয়েছিলেন তিনি, সেদিকে নাকি শুধু পানি আর পানি দেখেছেন। পরদিন তার স্যাণ্ডেল আর

কাপড়েও কাদা পাওয়া গেছে।
অবাক হয়ে মুসার দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর আর রবিন। বুঝতে পারছে না, কোনদিকে এগোচ্ছে সে।
পানিতে ফেলে দেননি তো? নিজেকেই যেন প্রশ্ন করল ওয়ালি।
সেটাই তো জানতে এলাম। নদীর পাড়ে থাকেন। রাতে এদিকে কেউ এলে হয়তো চোখে পড়তে পারে।
মুসার উদ্দেশ্য এতক্ষণে বুঝতে পারল কিশোর। হুবার জিনিসটা এনে নদীর পাড়ে কোথাও লুকিয়েছে কিনা, কিংবা পানিতে ফেলে দিয়েছে কিনা, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রশ্ন করে সেটা জানতে চাইছে। বাহ্, মাথাটা তো ভালই খেলছে মুসার-মনে মনে প্রশংসা করল সে। যেহেতু নদীর দিকে এসেছিল হুর, তার স্লিপার আর পাজামায় কাদাও লেগে আছে, জিনিসটা নদীর পাড়েই কোথাও লুকিয়ে রেখে যাওয়াটা অসম্ভব নয়। কিংবা পানিতে ফেলে দিতে পারে।
আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে রইল কিশোর, ওয়ালি কি জবাব দেয় শোনার জন্যে।
মাথা নাড়ল ওয়ালি, না, রাতে কাউকে দেখিনি। তবে কাল রাতে চেঁচামেচি শুনে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। শুনি, বুড়ো ক্যামারকে ধমকাচ্ছে ফগর‍্যাম্পারকট। কোন একটা ছেলেকে নাকি ধরতে চেয়েছে, ধরতে পারেনি বলেই রাগ।
পরস্পরের দিকে তাকাল গোয়েন্দারা। সবার মুখেই হাসি।
আর কি শুনলেন? জানতে চাইল মুসা।
না, আর কিছু না। কিছুক্ষণ পর বুড়োকে কড়া নজর রাখার হুকুম দিয়ে চলে গেল ফগ। আজ সকালে এসে হাজির আমার কাছে। নৌকাটা রেডি করে দিতে বলেছে। ভাড়া নেবে।
কেন?
কি জানি? বলল, দরকার, রেডি করে রাখতে। বা হাতে কানের গোড়া চুলকাল ওয়ালি। আজ যেন আমার নৌকা আর বোটকের দাম বেড়ে গেছে হঠাৎ করে।
কান খাড়া করে ফেল কিশোর, মানে?
আরও একজন এসেছিল নৌকা আর বোট-হুক চাইতে।
কে? হুবার নাকি? পানিতে ডুবিয়ে রাখা বস্তায় ভরা জিনিস বা ওই রকম কিছু খুঁজে বের করার জন্যে অনেক সময় বোট-হুক ব্যবহার করে লোকে। ফগ আর হুবার দুজনেই হুকটা চায়, তারমানে দুজনেই পানিতে খুঁজতে বেরোবে মনে হচ্ছে। ফগকে যতটা মাথামোটা ভাবে ওরা, আসলে ততটা নয়। সেও অনুমান করে বসে আছে নদীর দিকেই এসেছিল হুবার, হাতের জিনিসটা পানিতে ফেলে গেছে। একটা ব্যাপার নিশ্চিত হওয়া গেল–হুবার যে খড়ের গাদায় গিয়ে শুয়ে ছিল, এ কথা এখনও জানে না ফগ।

এই দ্বিতীয় লোকটা কে? জানতে চাইল কিশোর।
চিনি না, জনমেও দেখিনি, জবাব দিল ওয়ালি। বিশালদেহী এক লোক। গায়ের রঙ বাদামী। গালে একটা কাটা দাগ। একটা চোখেও গোলমাল আছে। দশটা ডলার বাড়িয়ে দিয়ে আমার সবচেয়ে লম্বা হুকটা ভাড়া নিতে চাইল। বোঝে ঠেলা, একটা বোট-হুঁকের জন্যে দশ ডলার দিতে চায়। লোকটাকে পাগল মনে হয়েছে আমার। নিজেকে পরিচয় দিল বিজ্ঞানী বলে। পানির নিচে জন্মে থাকা উদ্ভিদের নমুনা সংগ্রহ করবে।
তাই, নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটা শুরু হয়ে গেছে কিশোরের। দ্বিতীয় লোকটা বার নয়। তাহলে কে? নিশ্চয় সেই লোকটা, যে বারো নম্বর জুতো পায়ে দেয়, চুরি করে সেদিন হুবারের বাড়িতে ঢুকেছিল যে।
ওয়ালিকে ধন্যবাদ দিয়ে সবাইকে নিয়ে ওখান থেকে সরে এল কিশোর।
টিটুর সঙ্গে আসতে চাইল টেরিয়ারটা। কয়েক মিনিটেই ভাল খাতির হয়ে গেছে। ডেকে ওকে ফিরিয়ে নিল ওয়ালি।
ওদের সাইকেলগুলোর কাছে এসে দাঁড়াল কিশোর। ফিরে তাকাল বন্ধুদের দিকে, জলজ উদ্ভিদের নমুনা সংগ্রহের গল্পটা বিশ্বাস করেছ?
এক বিন্দুও না, সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল রবিন। আমার মনে হয় সেই চোরটা। সেও সন্দেহ করেছে, হবার নদীর দিকে এসেছে, হাতের জিনিসটা পানিতে ফেলে দিয়েছে।
ফগেরও একই সন্দেহ।
আমি যাব না, বলে উঠল ফারিহা। ঝামেলা নদীতে নেমে কি করে না দেখে আমি যাব না এখান থেকে।
খানিক চিন্তা করে কিশোর বলল, এক কাজ করা যাক, তোমরা গিয়ে বসে থাকো ওয়ালির ছাউনিতে। ফগ এসে কি করে দেখবে। আমি থাকব না। আমাকে দেখলেই ভীষণ রেগে যাবে সে। কি করে বসে ঠিক নেই।
তুমি কোথায় যাবে? জানতে চাইল মুসা।
ওই দ্বিতীয় লোকটাকে খুঁজে বের করা যায় কিনা দেখি।
কিভাবে?
জবাব না দিয়ে কিশোর বলল, এসো, সাইকেলগুলো লুকিয়ে ফেলা যাক। ফগ যাতে এসেই দেখে না ফেলে।
ঝোঁপের মধ্যে সাইকেলগুলো লুকিয়ে আবার ছাউনির কাছে ফিরে এল ওরা।
মুখ তুলে তাকাল ওয়ালি, কি?
আমরা ঠিক করেছি, আজ নদীতে পিকনিক করব। আপনার ছোট নৌকাটা দরকার। ফগ কাজ সেরে চলে যাবার পরেই নাহয় নেব।

হেসে ফেলল ওয়ালি, বোট-হুক লাগবে না?
কিশোরও হাসল, না। জলজ উদ্ভিদে আমারও খুব আগ্রহ। তবে ওই বিজ্ঞানীর মত এত কষ্ট করার কোন ইচ্ছে নেই। বরং তাকে খুঁজে বের করে কয়েকটা প্রশ্ন করব উদ্ভিদের ব্যাপারে। কোনদিকে গেছে?
হাত তুলে নদীর কিনার ধরে এগিয়ে যাওয়া পায়েচলা পথটা দেখিয়ে দিল ওয়ালি।
তোমরা বসো, বন্ধুদের বলল কিশোর, আমি দেখে আসি। রওনা হয়ে গেল সে।
হনহন করে হেঁটে চলেছে কিশোর। নজর সামনের দিকে।
নদীর একটা বাঁক ঘুরতেই দেখা পেয়ে গেল লোকটার। লম্বা একটা বোট-হুক দিয়ে পানিতে খোঁচাচ্ছে। পাশে রাখা একটা বেতের হাতলওয়ালা বড় ঝুড়ি। পানি থেকে নানা রকম উদ্ভিদ তুলে তাতে ভরছে।
একটা মুহূর্তের জন্যে সন্দেহ হলো কিশোরের, লোকটা সত্যি উদ্ভিদবিজ্ঞানী নয় তো? কিন্তু চেহারা দেখে পরক্ষণে বাতিল করে দিল ভাবনাটা। কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ওকে দেখে ফিরে তাকাল লোকটা।
নিরীহ ধরে কিশোর জিজ্ঞেস করল, কি তুলছেন?
জবাব দিল না লোকটা। কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।
আপনার ঝুড়িতে নিশ্চয় অনেক শামুক জমা হয়েছে। বেছে নিতে পারি? আমি একটা হাঁস পালি...।
ধমকে উঠল লোকটা, খবরদার, ঝুড়িতে হাত দেববেনা। শামুকের এত দরকার হলে নিজেই ধরে নাওগে না।
আমার মনে হয় এদিকটাতে শামুক অনেক বেশি। এখন থেকেই পরি।
না! গর্জে উঠল লোকটা। এখানে না। আমার নানা নষ্ট করবে। অন্য কোথাও যাও। সারা নদীতেই শামুক ভর্তি।
দাঁড়িয়ে রইল কিশোর। নিশ্চিত হয়ে গেছে, এই লোক বিজ্ঞানী নয়।
গেলে না এখনও? হুক তুলল লোকটা। কথা না শুনলে যেন কিশোরের বুকেই বিধিয়ে দেবে। যাও, ভাগো এখান থেকে।
বাবারে! কি কাণ্ড! গ্রীনহিলসের সবাই আজকাল ফগের মুদ্রাদোষের শিকার হতে আরম্ভ করেছে নাকি? ফগ তো বলেই, হুরও বলে যাও, ভাগো! এই লোকটা বলে যাও, ভাগো!
আরেকবার যাও, ভাগো শোনার আগেই তাড়াতাড়ি ওখান থেকে সরে এল কিশোর। গেল না মোটেও। একটা ঘন ঝোপে বসে চোখের সামনে থেকে দুটো ডাল সরিয়ে উঁকি দিয়ে রইল।

আবার পানিতে খোঁচাতে শুরু করল লোকটা। মাঝে মাঝেই ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাচ্ছে। কিশোর কোনখান থেকে উঁকি মেরে আছে কিনা দেখছে বোধহয়।
পানিতে যে কোন্ জিনিস খুঁজছে, তাতে আর কোন সন্দেহ রইল না কিশোরের।
হুকে কি যেন বাধল লোকটার। টেনে তুলে আনল। একটা পুরানো জুতো। হক থেকে ওটা খুলে নিয়ে বিরক্ত ভঙ্গিতে পানিতে ছুঁড়ে ফেলল আবার।
হুকে আটকে কয়েকটা জলজ উদ্ভিদ উঠে এল। ওগুলো খুলে নিয়ে ঝুড়িতে ভরল সে।
এটা ভান। কেউ যদি নজর রেখে থাকে তাহলে যাতে মনে করে এই লোক সত্যি জলজ উদ্ভিদের নমুনা সংগ্রহ করছে। বুঝতে অসুবিধে হলো না কিশোরের, আসলে খুজছে সে অন্য জিনিস।
পানি থেকে আবার একটা ফালতু জিনিস উঠে এল হুকে আটকে। আগের মতই বিরক্ত ভঙ্গিতে ওটা পানিতে ফেলে দিল লোকটা।
ফগ কি করছে জানার খুব কৌতূহল হলো কিশোরের। একের পর এক এ সব জিনিস উঠতে থাকলে ফগও বেজায় বিরক্ত হবে। কল্পনায় ওর মুখভঙ্গি দেখতে পেয়ে একা একাই নীরবে হাসতে লাগল সে।
মুসারা ওদিকে অপেক্ষা করছে ওয়ালির ছাউনিতে বসে।
ফগ এল। সাইকেল রেখে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে জিজ্ঞেস করল, কি, হয়েছে?
এই যে, হয়ে গেছে, জবাব দিল ওয়ালি। দাঁড়ান, নামিয়ে দিচ্ছি।
ওরা যে লুকিয়ে আছে এটা যাতে টের না পায়, এ জন্যে টিটুর মুখ চেপে ধরে আছে ফারিহা। টেরিয়ারটা চুপচাপ বসে আছে মুসার পায়ের কাছে। ওটা শান্ত কুকুর। টিটুর মত এত চঞ্চল নয়।
কোনমতেই টিটুর মুখ বন্ধ রাখতে পারল না ফারিহা। ফগের গন্ধ পেয়েই খই খউ শুরু করল!
ওর কণ্ঠ ফগের পরিচিত। দরজায় এসে উঁকি দিল। ঝামেলা! এখানেও এসে বসে আছে। এই, তোমাদের পালের গোদাটা কই?
জানি না, সাফ জবাব দিয়ে দিল মুসা।
জলন্ত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, এখানে বসে থাকলে থাকো, কিছু বলব না। কিন্তু আবার যদি আমার কাজে নাক গলাতে এসেছ তো ভাল হবে। তোমাদের বিচ্ছু বন্ধুটাকেও সাবধান করে দিয়ো।
ফারিহার হাত থেকে ছুটে যাওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো টিটু। গলা ছেড়ে হাঁক দেয়া বাদে ওর আর করার কিছু রইল না।
বেশি সময় নষ্ট করল না ফগ। নৌকায় চেপে বসল। হুক দিয়ে খুঁজতে শুরু করল পানিতে। আগের রাতে বুড়ো ক্যামারের কাছে জেনে নিয়েছে নদীর ঠিক

কোন্‌খানটাতে নেমেছিল পাজামা পরা লোকটা।
নৌকায় করে ঘুরতে ঘুরতে একের পর এক বিরক্তিকর জিনিস তুলে আনতে লাগল পানির নিচ থেকে। সেগুলো ছুঁড়ে ফেলতে লাগল আর ঝামেলা। ঝামেলা! করতে থাকল। হঠাৎ চোখ পড়ল, তীরে দাঁড়িয়ে ওর কাজ দেখছে ছেলেমেয়েগুলো। গেল মেজাজ খারাপ হয়ে। মশার দল আবার এসেছে বিরক্ত করতে। মশা! হ্যাঁ, মশাই! তফাৎটা কেবল, মশা কামড়ানোর জন্যে গায়ে বসলে থাপ্পড় মেরে প্রতিশোধ নেয়া যায়। এগুলোকে যায় না। কবে ঠাণ্ডা করে দিত, কেবল ক্যাপ্টেন রবার্টসনের জন্যে পারে না।
রাগ কমানোর জন্যে পানিতে ঘ্যাচ ঘ্যাচ করে হুক দিয়ে খোঁচাতে লাগল। উঠে আসতে লাগল নানা রকম জঘন্য জিনিস। মেজাজ আরও খারাপ করে দিল ওর। তারপর এক সময় এমন একটা জিনিস উঠল, উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর মুখ। একটা লন্ড্রি ব্যাগ। ওখানে বসেই তাড়াতাড়ি ওটার মুখ খুলে ফেলল সে। যা বেরোল, তাতে আবার থমথমে হয়ে গেল মুখচোখ। অতি সাধারণ বাতিল কতগুলো কাপড়-চোপড়। কোন শিশুর হবে। অকাজের জিনিস, তাই কেউ ব্যাগে ভরে এনে পানিতে ফেলে দিয়ে গেছে। ব্যাগটা যাতে ডুবে থাকে, সেজন্যে তাতে ভারী পাথর ভরে দিয়েছে।
তীরে দাঁড়িয়ে আগ্রহের সঙ্গে তাকিয়ে আছে কিশোর গোয়েন্দারা।
আরও দুই জোড়া চোখ এখন আড়াল থেকে তাকিয়ে আছে ফগের দিকে। সেই গালকাটা লোকটা। খুঁজতে খুঁজতে নদীর বাঁক ঘুরে বেরিয়ে এসে ফগের দিকে চোখ পড়তেই থমকে দাঁড়িয়েছে। একটা ঝোঁপের আড়ালে সরে গিয়ে দেখছে, ফগ কি পায়। তার বোধহয় সন্দেহ হয়েছে, সে যা খুঁজছে, ওই পুলিসের লোকটাও তাই খুজছে।
লোকটা বাকের আড়ালে চলে আসাতে আর দেখতে পাচ্ছিল না বলে ঝোঁপ থেকে বেরিয়ে দেখা যায় এমন আরেকটা ঝোঁপের মধ্যে লুকিয়েছে কিশোর। ফাঁকে সেও দেখতে পাচ্ছে।
অনেকক্ষণ ধরে খোঁজাখুঁজি করেও আজেবাজে জিনিস ছাড়া কিছুই পেল না ফগ। নিরাশ হয়ে নৌকা নিয়ে তীরের দিকে রওনা দিল সে।
গালকাটা লোকটাও কিছু না পেয়ে চলে গেল।
ওর পিছু নিয়ে লাভ নেই। ঝোঁপ থেকে বেরিয়ে কিশোর এসে দাঁড়াল মুসাদের কাছে।
নৌকা থেকে নেমে কিশোরকে দেখে রাগ আর সামলাতে পারল না ফগ। চাকরির মায়া কিংবা ক্যাপ্টেনের ভয় আর করল না। সারারাত ওকে ঠাণ্ডার মধ্যে বসিয়ে রেখে শাস্তি দিয়েছে শয়তানটা। ওকে খানিকটা শিক্ষা না দিলেই আর নয়।

নৌকায় ফেলে রাখা লন্ড্রি ব্যাগটা তুলে এনে খপ করে চেপে ধরল কিশোরের কলার। তারপর ঠাণ্ডা ভেজা পোশাকগুলো ঠেসে ভরে দিতে লাগল ওর শার্টের ভেতর। তার মতে, ঠাণ্ডার মধ্যে এরচেয়ে বড় শাস্তি আর হয় না।
বাধা দিতে এল ওয়ালি, এ কি করছেন, মিস্টার ফগর্যাম্পারট! একজন পুলিসম্যান হয়ে
চোপরাও! গর্জে উঠল ফগ।
চুপ হয়ে গেল ওয়ালি।
মুসা আর রবিন এসে টানাটানি করে সরিয়ে আনার চেষ্টা করল ফাঁকে। কিন্তু ফগের গায়ে যেন অসুর ভর করেছে। ব্যাগের সমস্ত জিনিস কিশোরের শার্টের ভেতরে ভরে দেয়ার আগে কোনমতে সরানো গেল না ওকে।
প্রতিশোধ নিতে পেরে রাগ অনেকটা কমল তার। কোনদিকে আর না তাকিয়ে সাইকেলে চেপে চলে গেল।
এক এক করে শার্টের ভেতর থেকে জিনিসগুলো বের করতে লাগল কিশোর। ওকে সাহায্য করল ফারিহা। বিড়বিড় করে বকতে লাগল ফগকে।
থাক, বোকো না, শান্তকণ্ঠে বলল কিশোর। অনেক যন্ত্রণা দিয়েছি আমি ওকে। এটা করে খানিকটা মনের ঝাল যদি মেটে, মিটুক। আমাকে এমন করে কেউ ভোগালে আমিও শোধ নিতে ছাড়তাম না।
পানি থেকে তুলে আনা কাপড়গুলোর মধ্যে রয়েছে একটা নীল পাজামা, একটা লাল বেল্ট, একটা নীল টাই, লাল বোতাম বসানো একটা নীল ক্যাপ, একজোড়া মোজা, একজোড়া লাল জুতো, আর একটা লাল
থমকে গেল ফারিহা। জিনিসটা পরিচিত মনে হচ্ছে। হঠাৎ চিৎকার করে উঠল, কিশোর, দেখো দেখো!
দেখল কিশোর। ওরও চোখ বড় বড় হয়ে গেল।
একটা লাল দস্তানা!
ভালমত দেখার জন্যে ঘিরে এল মুসা আর রবিন। ওরাও চিনতে পারল। হবারের বাড়িতে যে দস্তানাটা পেয়েছিল কিশোর, অবিকল ওরকম আরেকটা। জোড়াটার দ্বিতীয়টা।
হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে গেল কিশোরের মুখ। ফগের ওপর রাগ না করে বরং আমাদের কৃতজ্ঞ হয়ে যাওয়া উচিত। আমার ওপর প্রতিশোধ নিতে গিয়ে যে কতবড় সূত্র ফেলে চলে গেল, যখন জানতে পারবে, নিজের হাত নিজেই কামড়ে খেয়ে ফেলবে!
এই সময় খেয়াল হলো ওর, টিটু নেই আশেপাশে। উত্তেজনায় কারোরই মনে ছিল না ওর কথা।

মুসা বলল, সেজন্যেই তো বলি, এত নিরাপদে কাজটা সারতে পারল কি করে ঝামেলা! টিটুই নেই। আহা বেচারা, গোড়ালি কামড়ানোর এমন মস্তবড় একটা সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলো ও। আজ ও ঠিক কামড়ে দিতে পারত। বাধা দিত না তো কেউ...।
কিন্তু ও গেল কোথায়? উদ্বিগ্ন হলো ফারিহা।
এতক্ষণে যেন সংবিত ফিরে পেল ওয়ালি। সকালে ও আজ ঘুম থেকে ওঠার পর থেকেই নানা রকম কাণ্ড ঘটছে। অবাক হতে হচ্ছে বার বার। খানিক আগে ফগের রেগে যাওয়াটা তো রীতিমত বিমূঢ় করে দিয়েছে। ফারিহার প্রশ্নের জবাবে বলল, নিশ্চয় আমার টেরিয়ারটার সঙ্গে মাঠে চলে গেছে। মাঝেমধ্যেই খরগোশ ধরতে যায়। আজ সঙ্গী পেয়ে খুশির ঠেলায় বোধহয় শিকার শেখাতে নিয়ে গেছে তোমাদের কুকুরটাকেও। ভয় নেই, চলে আসবে।

.

দল বেঁধে কিশোরদের বাড়িতে ফিরে এল সবাই। কিশোরের ঘরে বসে কথা বলতে লাগল।
কিশোরের ধারণা, পুতুলের কাপড়গুলোর মধ্যেই লুকিয়ে আছে রহস্যের চাবিকাঠি। অতএব সেগুলো ভালমত খুঁজে দেখা দরকার।
দুপুর হয়ে গেছে। মুসাদের বাড়ি থেকে ফোন করলেন মিসেস আমান। রবিনের মাও খোঁজ নিলেন। অসুস্থ ছেলেরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে সেই সকালে, এখনও ফেরার নাম নেই। দুজনেই অস্থির হয়ে উঠেছেন। মিসেস বারজি এসে প্রায় ধমকের সুরে জানিয়ে গেল সেকথা।
যাওয়ার জন্যে উঠে দাঁড়াল ফারিহা। বিরক্ত হয়ে বলল, দূর, ফোন করার আর সময় পেল না। যখন আসল কাজটা শুরু করতে যাব তখনই...কিশোর, কথা দাও, আমরা না এলে দেখার কাজটা তুমি শুরু করবে না?
হাসল কিশোর, আচ্ছা, করব না। নিশ্চিন্তে চলে যাও। খেয়েদেয়ে বিশ্রাম নিয়ে বিকেলে চলে এসো।
কিন্তু মুসারা বেরিয়ে যাওয়ার কয়েক মিনিট পরেই ঝমঝম করে নামল বৃষ্টি। কিছুক্ষণ পর কমল, তবে একেবারে বন্ধ হলো না। কখনও গুঁড়ি গুঁড়ি, কখনও ঝমঝম করে, পড়তেই থাকল।
আর কোন কাজ না পেয়ে পুতুলের পোশাকগুলো ইলেকট্রিক হিটারে শুকাতে বসল কিশোর। পরীক্ষা করে দেখার জন্যে উতলা হয়ে উঠেছে মন! কিন্তু ফারিহাকে কথা দিয়েছে দেখবে না, তাই দেখল না।
বিকেলের দিকে আকাশের অবস্থা আরও খারাপ হয়ে গেল। মুসা আর রবিনদের বাড়িতে ফোন করে জানল কিশোর, বেরোতে দিচ্ছেন না ওর মায়েরা। সবে জ্বর

থেকে না উঠলে হয়তো এভাবে বাধা দিতেন না।
কি আর করবে? মনমরা হয়ে বসে রইল কিশোর।
পুতুলের কাপড়গুলো নিজের পড়ার টেবিলের ড্রয়ারে রেখে খানিকক্ষণ টিভি দেখল। মন বসল না তাতে। বই পড়ার চেষ্টা করল! তাও মন বসাতে পারল না।
সন্ধ্যার পর চাচা-চাচী বেরিয়ে গেলেন। এক বন্ধুর বাড়িতে পার্টি আছে। ফিরতে অনেক রাত হবে।
সকাল সকাল খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ল কিশোর।
অনেক রাতে টিটুর চিৎকারে ঘুম ভেঙে গেল।
থামার জন্যে ওকে ধমকানো শুরু করল কিশোর।
কিন্তু থামল না কুকুরটা। দরজার কাছে গিয়ে আরও জোরে ঘেউ ঘেউ করতে লাগল।
সন্দেহ হলো কিশোরের। চোর এল না তো?
দরজার দিকে এগোল। পান্নাটা খুলতে না খুলতে একদৌড়ে বেরিয়ে গেল টিটু। নিচ থেকে কে? কে? বলে চিৎকার করে উঠল মিসেস বারজি।
কয়েক সেকেন্ড পর গেটের বাইরে রাস্তায় একটা গাড়ির ইঞ্জিন স্টার্ট নিল। দ্রুত চলে গেল গাড়িটা। জানালা দিয়ে ওটার টেল লাইট দেখতে পেল কিশোর।
সারা বাড়ির আলো জ্বেলে দিল সে। রান্নাঘরের একটা জানালার কাঁচ ভাঙা। ওখান দিয়ে ছিটকানি খুলেই ঘরে ঢুকেছিল কেউ। হুবারের বাড়িতে চোর ঢোকার কথা মনে পড়ল কিশোরের। ঠিক একই ভাবে ওদের ঘরেও ঢুকেছিল লোকটা।
কে? কেন?
হঠাৎ পেয়ে গেল জবাবটা। হুবারের বাড়িতে যে জিনিসের জন্যে ঢুকেছিল, ওদের বাড়িতেও সেই একই জিনিসের জন্যে এসেছিল লোকটা।
পুতুলের পোশাক!
নিশ্চয় সেই গালকাটা লোকটা। কিশোর তখন ভেবেছিল চলে গিয়েছে, আসলে যায়নি। নদীর পাড়ে কোথাও লুকিয়ে থেকে দেখেছে ফগ ওগুলো নিয়ে কি করে। সব দেখেছে। তারপর কিশোরের পিছু নিয়ে এসে ওদের বাড়িটা দেখে গেছে। এখন রাত দুপুরে এসে হানা দিয়েছে ওগুলোর জন্যে।
নিশ্চয় কোন মূল্যবান সূত্র লুকিয়ে আছে ওগুলোর মধ্যে। কোন সন্দেহ নেই আর।
অনেক রাতে বাড়ি ফিরলেন চাচা-চাচী।
চোর ঢাকার কথা জোর গলায় জানাল তাদের মিসেস বারজি। পুলিসে খবর দিতে বললেন মেরিচাচী।
রাজি হলেন না রাশেদ পাশা। পুলিস মানেই তো ফগর‍্যাম্পারকট। তাঁর মতে ওটা একটা হাঁদা। পারে কেবল ঝামেলা বাধাতে আর হই-হট্টগোল করতে। কাজের

কাছ কিছুই পারে না। কিছু যখন নিতে পারেনি চোরে, অহেতুক রাত দুপুরে ফগকে খবর দিয়ে আর যন্ত্রণা বাড়ানোর দরকার নেই।

পরদিন সকালে আকাশ ভাল হয়ে গেল। বৃষ্টি নেই। নাস্তা সেরে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এসে কিশোরদের বাড়িতে হাজির হলো ফারিহা, মুসা আর রবিন।

রাতে চোর আসার কথা ওদের জানাল কিশোর। কেন এসেছিল, কি তার উদ্দেশ্য সেটা নিয়েও সংক্ষিপ্ত আলোচনা হলো। কিশোরের সঙ্গে অন্য তিনশনও একমত হলো, গালকাটা লোকটাই এসেছিল, পুতুলের পোশাকের খোঁজে। অতএব আর দেরি না করে জলদি জলদি দেখে ফেলা দরকার কি এমন মূল্যবান জিনিস লুকিয়ে আছে ওগুলোর মধ্যে।

জিনিসগুলো নিয়ে কিশোরদের বাগানের ছাউনিতে ঢুকল সবাই।

টিটুকে পাহারা দিতে বলল কিশোর।

এত কড়াকড়ি কেন? জানতে চাইল ফারিহা।

বলা যায় না, বেড়ার ফাঁকফোকরগুলো দেখতে দেখতে জবাব দিল কিশোর, কাল রাতের লোকটা এসে উঁকি দিয়ে শুনে ফেলতে পারে আমাদের কথা। আমরা কি পেলাম, দেখে ফেলতে পারে।

হেসে ফেলল ফারিহা, এত সতর্কতা! নিজেরদেরকে পাই মনে হচ্ছে আমার। একেবারে পাই হেডকোয়ার্টারের সাবধানতা।

কথা অনেক হয়েছে, অধৈর্য হয়ে উঠল মুসা, এবার আসল কাজটা সেরে ফেলা দরকার। পোশাকগুলোর ভেতরে কি আছে জানার জন্যে আর কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে?

এই যে, শুরু করছি, বলে একটা জুতোর বাক্সের ডালা খুলল কিশোর। এর ভেতরে লুকিয়ে রেখেছে পুতুলের পোশাকগুলো। প্রথমে বের করল নীল রঙের পাজামাটা। বেশ সুন্দর। ওপর দিকে বোম লাগানো।

পকেট-টকেট কিছু নেই। ফারিহার দিকে তাকাল কিশোর, পুতুলের পোশাকের পকেট থাকে না, ফারিহা?

থাকে তো, হাত বাড়াল ফারিহা। দেখি? এটা ছেলে পুতুলের গায়ে মানাবে ভাল।

উল্টেপাল্টে ভাল করে দেখল সে। কিছু পাওয়া গেল না। রবিনের হাতে দিল। ও দেখে মুসাকে দেবে। প্রতিটি জিনিস সবাই মিলে দেখবে। তাতে কোন কিছু থেকে থাকলে চোখ এড়িয়ে যাওয়ার ভাবনা কম।

এরপর একটা লাল বেল্ট বের করল কিশোর। নিজে দেখে ফারিহার হাতে দিল। হাত থেকে হাতে ঘুরতে লাগল জিনিসটা। পাওয়া গেল না কিছু।

এরপর মোজালো দেখা হলো।

পুতুলের নাম কিংবা কোন চিহ্ন দেয়া আছে কিনা দেখল ফারিহা। নেই।

মুসা বলল, পুতুলের কাপড়ে আবার নাম লেখা থাকে নাকি?
থাকবে না কেন? ফারিহা বলল। অনেকেই নাম লিখে রাখে, কিংবা চিহ্ন দিয়ে রাখে, আলাদা করে বোঝার জন্যে। আমিই তো দিই।
মোজাতে পাওয়া গেল না কিছু। জুতোজোড়া বের করল কিশোর।
পুতুলের জন্যে বড়, বলল সে, কিন্তু বাচ্চা ছেলের জন্যে হোট। শক্ত করে বানানো, দেখো। পুতুলের জিনিস মনে হয় না। ফিতেগুলোও আসল। ইচ্ছে করলে বাঁধা যায়।
হয়তো কোন শিশুর জুতোই হবে, রবিন বলল। কোন বামন শিশু। স্বাভাবিক শিশুর চেয়ে পা ছোট তার।
তা নাহয় হলো, নিজের অজান্তে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার কিশোর। কিন্তু মাথায় ঢুকছে না এ জিনিসের এত গুরুত্ব হয়ে গেল কেন? কি এমন দামী জিনিস আছে এর মধ্যে যে চুরি করে নিয়ে যাওয়ার জন্যে দুটো বাড়িতে হানা দিল লোকটা?
দুটো ফিতেই খুলল ফারিহা। ভাল করে দেখল। খুব সুন্দর। আবার আগের মত জুতোতে বেঁধে রাখতে লাগল। একটার ফিতে বেধে জুতোটা পাশে রেখে আরেকটা বাধছে সে, এই সময় মাটিতে রাখা জুতোটা এসে ওকতে শুরু করল টিটু।
ওর দিকে তাকাল ফারিহা। হেসে জিজ্ঞেস করল, তোর নাক তো খুব কড়া। কার গন্ধ পাচ্ছিস?
বার দুই খুফ খুফ করল টিটু। তারপর মুখে নিয়ে একদৌড়ে চলে গেল ঘরের কোণে। জুতোটাকে ওখানে রেখে বসে পড়ল তার ওপর। যেন বোঝাতে চাইল, এটা এখন আমার।
তোর ওই খেলা বাদ দে তো! কদিন থেকেই শুরু করেছে। যা পায় নিয়ে গিয়ে দখল করে। কাল নিয়েছে আমার একটা রঙিন পেন্সিল। সকালে স্যান্ডেল। এখন জুতো, ধমক দিল কিশোর। আন ওটা। কাজ আছে।
আনল না টিটু। যেমন ছিল, বসে রইল।
হেসে বলল মুসা, কাল রাতে চোর তাড়িয়ে নিজেকে খুব বাহাদর ভাবছে আরকি। কাউকেই আর কেয়ার করে না। ব্যাটা শয়তানের হাড্ডি।
জুতোটা দেখা হয়ে যাওয়ার পরই নিয়েছে টিট, তাই আর ওটা নিয়ে মাথা ঘামাল না কিশোর বাক্স থেকে একটা কোর্ট বের করল। তাতে উঁচু কলারও আছে, বোতামও আছে।
ভালমত পরীক্ষা করে দেখল কিশোর। কোটের ভেতরে-বাইরে তো দেখলই, লাইনিংও বাদ দিল না। কিছুই লুকানো নেই। কোন কিছু ঠেকল না আঙুলে।

কিশোরের দেখা হয়ে গেলে অন্যেরাও দেখল কোটটা। ভাল কাপড়ে তৈরি পোশাকটা প্রায় নতুন। তেমন ব্যবহার করা হয়নি।
যতই দেখছি, ততই অবাক হচ্ছি, কিশোর বলল, কাকে পরানো হত এই পোশাক? চুরিই বা করা হলো কেন এগুলো?
চুরিটা কে করেছে? রবিনের প্রশ্ন। হুবার?
সে করে থাকলে ওগুলো নিয়ে গিয়ে আবার পানিতে ফেলে দেবে কেন? আমাকে খোঁচাচ্ছে আসলে একটা প্রশ্নই-সাধারণ এই জিনিসগুলো এত দামী হয়ে উঠল কেন? এর জবাব পাওয়া গেলেই সমাধান করে ফেলা যাবে এই রহস্যের।...এই যে, নাও, টাইটা দেখো। আর এই যে ক্যাপ।
ওর দিকে নজর দেয়া হচ্ছে না বলেই বোধহয় সেটা বোঝানোর জন্যে কাছে এসে দাঁড়াল টিটু। এর-ওর গা ঘেষাঘেষি করেও পাত্তা না পেয়ে খুকখুক শুরু করল।
বিরক্ত হয়ে কিশোর বলল, তোর সঙ্গে খেলার সময় এখন কারও নেই। যা তো এখান থেকে। তোকে বললাম পাহারা দিতে, আর তুই করছিস শয়তানী। যা, ভাগ।
মনমরা হয়ে গিয়ে আবার ঘরের কোণে বসে পড়ল টিটু।
ক্যাপটাও দেখা হয়ে গেলে ফারিহা বলল, এই তো শেষ, তাই না? পেলাম না তো কিছুই।
সেকথাই তো ভাবছি, নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। এ ভাবে নিরাশ হব ভাবিনি। এক কাজ করা যেতে পারে।
তিন জোড়া চোখ ঘুরে গেল ওর দিকে। কি?
এগুলো নিয়ে হুয়ের কাছে চলে যাব। তাকে জিজ্ঞেস করব, কার জিনিস? এত দামী কেন?
জবাব দেবে? রবিনের প্রশ্ন।
কি জানি!
তারচেয়ে বরং আরেকবার খুঁটিয়ে দেখা যাক; ফারিহা বলল। হয়তো প্রথমবারে আমাদের চোখ এড়িয়ে গেছে।
আরে, দূর! থাবা মারার ভঙ্গিতে হাত নাড়ল মুসা। এতগুলো চোখ, এমন করে দেখলাম, চোখ এড়িয়ে যায় কি করে?
তবে কিশোর তাচ্ছিল্য করল না ফারিহার কথাকে। মন্দ বলনি। যতক্ষণ সন্দেহ না যায়, সন্তুষ্ট না হওয়া যায়, বার বার দেখা উচিত। কখন যে কি জিনিস চোখ এড়িয়ে যাবে, বলা মুশকিল।
সুতরাং আবার প্রথম থেকে দেখা শুরু হলো।

এবং ফারিহার ধারণাই ঠিক। জিনিসটা পাওয়া গেল লাল কোটের উল্টে রাখা হাতার ভাঁজে। খুদে একটা সাদা রুমাল। সে-ই খুঁজে বের করল জিনিসটা। চিৎকার করে উঠল, দেখো দেখো, এমব্রয়ডারি করে ডেইজি ফুল আঁকা!
প্রায় ছোঁ মেরে তার হাত থেকে রুমালটা নিয়ে নিল কিশোর। ফুলের দিকে নজর নেই। ওর চোখ অন্যখানে। ফুলগুলোকে ঘিরে লেখা রয়েছে কতগুলো অক্ষর। সবগুলো সাজালে একটা নাম হয়ে যায়।
ইউরিক্লেস! কপাল কুঁচকে ফেলেছে মুসা। এ রকম উদ্ভট নাম তো আর শুনিনি কখনও। এ তো মনে হচ্ছে গ্রীক!
আমারও মনে হচ্ছে গ্রীক, রবিন বলল। কিন্তু মিথলজিতে এ রকম কোন নাম আছে বলে তো মনে পড়ছে না।
আমি জানি ওটা কার নাম, উত্তেজিত হয়ে বলল কিশোর। দারুণ একখান সূত্র! ফারিহা, কাজের কাজই করেছ একটা!

.

শোনো, গল্প বলার ঢঙে বলল কিশোর, বহুকাল আগে ইউরিক্লেস নামে এক লোক বাস করত গ্রীসে। সেকালে সবাই চিনত তাকে। বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিল বিশেষ একটা গুণের জন্যে ভেনট্রিলোকুইজম জানত। অনেক ছাত্র তৈরি করে নিয়েছিল সে। ওরাও একেকজন দক্ষ ভেনট্রিলোকুইস্ট হয়ে ওঠে।
ও, এই ব্যাপার, মুসা বলল। আমি তো ভাবতাম ভেনট্রিলোকুইজম বিদ্যাটা বুঝি আধুনিক। তাহলে এই কারবার। প্রাচীন গ্রীকরা তো দেখি সব ব্যাপারেই ওস্তাদ ছিল।
বিদ্যাটা আধুনিক তো নয়ই, বরং বহু পুরানো। যতদূর জানা যায়, গ্রীকরাই এ বিদ্যার প্রচলন করেছিল। তারপর পৃথিবীর নানা দেশে ছড়িয়ে পড়ে এটা। আফ্রিকার জুল থেকে শুরু করে মেরু অঞ্চলের এস্কিমোরা পর্যন্ত এ জিনিস প্র্যাকটিস করেছে। কিছুদিন আমিও আগ্রহী হয়ে উঠেছিলাম। প্র্যাকটিস করেছি। কিন্তু করতে বড় কষ্ট। তা ছাড়া আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিলাম বলে ছেড়ে দিয়েছি।
চোখ বড় বড় হয়ে গেল ফারিহার, তুমি ভেনট্রিলোকুইজম জানো!
অতি সামান্য, হাসল কিশোর। হঠাৎ ফুলে উঠল তার গাল। ঠোঁট দুটো গোল হয়ে গেল শিস দেয়ার ভঙ্গিতে। পরক্ষণে ঘরের কোণে একটা বেড়াল ডেকে উঠল। কান খাড়া হয়ে গেল টিটুর। সেদিকে তাকিয়ে ঘেউ ঘেউ শুরু করে দিল।
থাক, চেঁচাতে হবে না আর, বলল কিশোর। বেড়াল-টেড়াল কিছু নেই।
হাঁ হয়ে গেছে মুসা। তুমি করেছ ওই শব্দ!
মাথা ঝাঁকাল কিশোর।
বিশ্বাস করতে পারছে না রবিনও। সত্যি!

আবার মাথা ঝাঁকাল কিশোর।
সন্দেহ প্রকাশ করল না কেবল ফারিহা। তার ধারণা, পৃথিবীতে এমন কোন কাজ নেই যেটা কিশোর পাশা করতে পারবে না।
যাই হোক, আবার আগের কথার খেই ধরল কিশোর, আমার প্রশ্ন, একটা আধুনিক পুতুলের রুমালে প্রাচীন গ্রীক ভেনট্রিলোকুইস্টের নাম লেখা কেন? আর এটা এত দামীই বা হয়ে উঠল কেন?
হাত নাড়ল মুসা, আমি বলতে পারব না। তুমিই বলো।
কোন রুমালে যখন কোন নাম লেখা হয়, সাধারণত সেটা হয় ওটার মালিকের নাম, এক এক করে সবার দিকে তাকাল কিশোর, তাই না?
মাথা ঝাঁকাল সবাই।
এখন দুটো ব্যাপার হতে পারে, কিশোর বলল, হয় রুমালটা পুতুলটারই নামে, নয়তো ওটার মালিকের–যে একজন ভেনট্রিলোকুইস্ট।
তাই তো! কিশোরের মতই ব্যাপারটা অনেকখানি আঁচ করে ফেলেছে রবিন। আগে ভাবলাম না কেন? পুতুলটা আসলে স্টেজে ব্যবহার করা হতো, থিয়েটার কিংবা পুতুলনাচ, এ ধরনের কোন শো-বিজনেসে, যে জন্যে এত বড় করে বানানো হয়েছে। পোশাক-আশাকগুলোও তাই এতটা নিখুঁত।
মাথা ঝাঁকিয়ে তার স্বভাবসিদ্ধ নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল কিশোর, প্রাচীন সেই ভেনট্রিলোকুইস্টের নামানুসারে রুমালের মালিকের স্টেজ নেম রাখা হয়েছিল ইউরিক্লেস। পুতুলটাকে নিয়ে খেলা দেখাত যে। দিবালোকের মত পরিষ্কার হয়ে আসছে এখন সবকিছু।
কিন্তু আমার কাছে এখনও অমাবস্যার রাতের মতই অন্ধকার, মুসা বলল, পোশাকগুলো কাকে পরানো হত, তা নাহয় জানলাম; পুতুলের মালিকের নামও জানা গেল। কিন্তু তাতে আমাদের রহস্যের কিনারাটা কিভাবে হলো?
মিস্টার ইউরিক্লেসকে খুঁজে বের করতে পারলেই হয়ে যাবে, জবাব দিল কিশোর। হুবারকে গিয়ে জিজ্ঞেস করব পুতুলের এই পোশাকগুলো তার কাছে কেন, কেন এত দামী হয়ে উঠল এগুলো যে নেয়ার জন্যে তার বাড়িতে হানা দিল চোর, কেনই বা রাত দুপুরে ব্যাগে ভরে নিয়ে গিয়ে এগুলো নদীতে ফেলে দিয়ে আসা লাগল তার? এই জবাবগুলো পেয়ে গেলেই সমাধান করে ফেলতে পারব আমরা ইউরিক্লেস রহস্যের।
কিন্তু ওই ইউরিক্লেসকে খুঁজে বের করব কিভাবে আমরা? কোন সূত্র নেই আমাদের হাতে। সূত্র ছাড়া ওকে খুঁজে বের করা অসম্ভব। তা ছাড়া হাতেও আমাদের সময় নেই আর বেশি। তিন দিন পরেই স্কুল খুলে যাবে। না গিয়ে তো আর পারব না।

অত নিরাশ হচ্ছ কেন? দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল কিশোর, যুগ যুগ লাগবে না ইউরিকেসকে খুঁজে বের করতে। অল্প সময়েই হয়ে যাবে। শো-বিজনেস যারা করে, তাদের অফিস আছে। ওখানে ফোন করে খোঁজ নিলেই জানা যাবে ইউরিক্লেস নামের ভেনট্রলোকুইস্টকে কোথায় পাওয়া যাবে।
হুবারকেও জিজ্ঞেস করা যেতে পারে, রবিন বলল।
তা পারে। তবে জবাব সে নাও দিতে পারে। দিক আর না দিক, তার কাছে আমি যাবই। আজ বিকেলে দল বেঁধে সবাই গিয়ে হাজির হব তার বাড়িতে। আমি দেখতে চাই, পোশাকগুলো দেখলে তার মুখের অবস্থা কি হয়। চমকে যদি যায়, সামলে নেয়ার আগেই প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে নাস্তানাবুদ করে দেব। ভুল কোন জবাব দিলেই হয় কেবল, চেপে ধরৰ কাঁক করে।
পোশাকগুলো আবার জুতোর বাক্সে ভরে ফেলতে লাগল কিশোর।
ফারিহা বলল, রুমালটা খুব সুন্দর। এটা আমি আমার পকেটে রেখে দিই?
তা দাও। না হারালেই হবে।
ঘড়ি দেখল রবিন। বিকেল হতে এখনও অনেক দেরি। সময়টা কিভাবে কাটানো যায়? কি করা যায়, বলো তো?
চলো, গিয়ে কোনখান থেকে চকলেট খেয়ে আসি, প্রস্তাব দিল মুসা।
মনে ধরল সবারই। সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।
পথে ফগের সঙ্গে দেখা। কিশোরকে দেখে এগিয়ে এল। হাত তুলে থামার ইঙ্গিত করল ওদেরকে।
টিটকারির সুরে কিশোর বলল, আজ তো আপনার কাছে কোন ব্যাগট্যাগ নেই। কিছু ঢোকাবেন না আমার শার্টের মধ্যে?
গভীর ভাবটা একেবারেই নেই ফগের মধ্যে। কোমল গলায় বলল, ঝামেলা! কাল তুমি ব্যথা পাওনি তো, কিশোর?
অবাক হয়ে গেল ওরা। টিটুকে ঝুড়িতে আটকে রেখেছে কিশোর। সুতরাং সে কোন গোলমাল করতে পারল না। বলল, আজ পুবের সূর্য পশ্চিমে উঠল নাকি, মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকট? এত ভাল ব্যবহার যে?
রাগে ঝিক করে উঠল ফগের চোখ। সেটা পলকের জন্যে। কঠিন কিছু বলতে গিয়েও সামলে নিল। জোর করে হাসি ফোঁটাল মুখে। ঢোক গিলল। তারপর বলল, ক্যাপ্টেন রবার্টসনের কাছে রিপোর্ট করেছিলাম। তাতে হুবারের বাড়ির কুকুর, ওয়োর আর বাচ্চা শিশুর ডাকের কথাও উল্লেখ করেছিলাম।
কৌতূহলী হয়ে উঠল কিশোর, তারপর?
অহেতুক কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করল ফগ। এদিক ওদিক তাকিয়ে দ্বিধা করল। শেষে বলেই ফেলল, ক্যাপ্টেন একবর্ণও বিশ্বাস করেননি। তোমার কথা

লিখেছিলাম রিপোর্টে। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়ে দিয়েছেন, তোমাকে সহকারী করে নিতে।
ও, এই ব্যাপার। এ জন্যেই এত ভাল ব্যবহার। মিটিমিটি হেসে জিজ্ঞেস করল কিশোর, সহকারী করার নির্দেশ দিয়েছেন, নাকি সহকারী হবার?
আবার জ্বলে উঠল ফগের চোখ। দাঁত কিড়মিড় করল। কিন্তু কঠোর কিছু বলার সাহস পেল না কিশোরকে। আরেকদিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে শুধু বলল, ঝামেলা! উফ, ঝামেলা!
এতে আর ঝামেলার কি দেখলেন, কিশোর বলল। ক্যাপ্টেন যখন সাহায্য করতে বলেছেন আপনাকে, নিশ্চয় করব। আবার কথা হলে তাকে আমার সালাম জানাবেন। এখন আমরা চকলেট খেতে যাচ্ছি। পরে সময় করে কথা বলব।
ইচ্ছে করে কেউকেটা ভঙ্গি দেখিয়ে ফগের পিত্তি জ্বালিয়ে দিতে দিতে সাইকেলের প্যাডালে চাপ দিল কিশোর। যেদিকে যাচ্ছিল, দল বেঁধে সেদিকে রওনা হলো আবার। পেছনে তাকালে দেখতে পেত, চোখ গরম করে ওর দিকে তাকিয়ে আছে ফগ। আর শাপ-শাপান্ত করে ওর চোদ্দ গোষ্ঠী উদ্ধার করছে। এটা অবশ্য তাকালে দেখতে পেত না। কারণ এই বিশেষ কাজটা করছে ফগ মনে মনে।

.

লাঞ্চের আরও ঘন্টাখানেক বাকি। চকলেট খাওয়ার পর তাই আবার কিশোরদের বাড়িতে ফিরে এল সবাই।
বাগানে ঢুকে ছাউনির দিকে তাকিয়েই থমকে গেল কিশোর।
কি হলো? পেছন থেকে জিজ্ঞেস করল মুসা।
নীরবে হাত তুলে দেখাল কিশোর। তারপর দৌড় দিল ছাউনির দিকে। হাঁ হয়ে খুলে আছে দরজা। তালা লাগিয়ে গিয়েছিল সে। কজা ভেঙে খোলা হয়েছে। চাচা চাচী বাড়ি নেই। কোথাও গেছে হয়তো বেড়াতে। মিসেস বারজি গেছে বাজারে। এই সুযোগে কাজটা করেছে কেউ।
লোকটা কে, সেটা অনুমান করতে অসুবিধে হলো না কারোরই। নিশ্চয় সেই গালকাটা। ভেতরে ঢুকে দেখে সেটা আরও পরিষ্কার হলো। জিনিসপত্র সব তছনছ হয়ে আছে।
ওই ব্যাটা আবার এসেছিল পুতুলের কাপড়ের খোঁজে, মুসা বলল।
এবার নিশ্চয় নিয়েও গেছে, বলল রবিন।
কথাটা ঠিক। জুতোর বাক্সটা আছে বটে, কিন্তু ভেতরে পোশাকগুলো নেই। খালি করে সব নিয়ে গেছে। যে জিনিস হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছিল লোকটা, অবশেষে হাতে পেল সেগুলো।

.

ইস, কেন যে অন্য কোথাও রেখে যাওয়ার কথা মনে হলো না! কেঁদে ফেলবে যেন ফারিহা। ঘরে রেখে গেলেই হত। এখন কি নিয়ে হুবারের কাছে যাব আমরা?
ঘরে রেখে গেলেও আজ নিয়েই যেত লোকটা, কিশোর বলল। গাধার মত বাড়ি খালি ফেলে চকলেট খেতে বেরিয়েছিলাম। দোষটা আমাদেরই। চমৎকার সুযোগ করে দিয়ে গেছি লোকটাকে। কি আর করা। যা গেছে গেছে। এখন অনুশোচনা করে আর লাভ নেই। এসো, ঘরটা গুছিয়ে ফেলি।
কিন্তু আমাদের তদন্তের কি হবে?
সে দেখা যাবে। উপায় একটা বেরিয়ে যাবেই।
জিনিসপত্রগুলো যেখানে যেটা ছিল, গুছিয়ে রাখতে আরম্ভ করল সবাই মিলে। হঠাৎ চিৎকার করে উঠল ফারিহা, আরি, ভুলেই গিয়েছিলাম।
কাজ থামিয়ে দিয়েছে সবাই।
কিশোর জিজ্ঞেস করল, কি?
রুমালটা! ওটা নিতে পারেনি। আমার পকেটে আছে।
ও, বিশেষ আগ্রহ দেখাল না কিশোর। ওটা দিয়ে আর কোন লাভ হবে না এখন আমাদের। রেখে দাও তোমার কাছেই।
পকেট থেকে রুমালটা বের করে ফেলেছিল ফারিহা, কিশোরের অনাগ্রহ দেখে জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে আবার রেখে দিল পকেটে।
আবার জিনিস গোছানোয় মন দিল ওরা। সবাই খুব মনমরা। তীরে এসে তরী ডোবার অবস্থা। সূত্রগুলো হাতে পেয়েও খোয়াতে হলো।
লাঞ্চের আগে যার যার বাড়ি চলে গেল মুসা, ফারিহা আর রবিন। টিটুকে নিয়ে কিশোর এসে ঘরে ঢুকল। মিসেস বারজি ফিরেছে। কিশোরকে দেখেই বলল, এক ভদ্রলোক তোমাকে ফোন করেছিলেন।
কে?
ক্যাপ্টেন রবার্টসন।
ক্যাপ্টেন! কি বললেন?
বললেন তুমি বাড়ি এলেই যেন জানাই তিনি ফোন করেছিলেন। জরুরী কথা আছে।
সোজা টেলিফোনের দিকে দৌড় দিল কিশোর।
কে, কিশোর? ভেসে এল ক্যাপ্টেনের ভারী গলা। মেসেজটা তাহলে দিয়েছে তোমাকে। তা কেমন আছো?
ভাল, স্যার। কিজন্যে ফোন করেছিলেন?
ফগ একটা রিপোর্ট পাঠিয়েছে। উদ্ভট সব কথা লিখেছে। তোমার নামেও বিস্তর আজেবাজে কথা লিখেছে। আমি অবশ্য বিশ্বাস করিনি। কিন্তু মনে হচ্ছে কিছু

একটা ঘটছে গ্রীনহিলসে। কি, বলো তো?
ভেনট্রিলোকুইজম।
কি!
ভেনট্রিলোকুইজম, স্যার। বিদ্যেটার কথা নিশ্চয় জানা আছে আপনার।
তা আছে। কিন্তু তোমার কথা তো কিছু বুঝতে পারছি না।
ইউরিক্লেসের নাম শুনেছেন না, স্যার?সেই যে প্রাচীন গ্রীসে…
কি হয়েছে ইউরিক্লেসের?
ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছি, স্যার।
দীর্ঘ একটা মুহূর্ত নীরব থেকে ক্যাপ্টেন বললেন, কিশোর, কি আবল-তাবল বকছ! এত বছর পর তাকে খুঁজে পাবে কোথায়? তার কবরের হাড়ও এখন পাওয়া যাবে না।
ওকে নয়, স্যার, অন্য এক ইউরিপ্লেসকে খুঁজছি আমরা। এখনকার মানুষ।
অন্যপাশে হঠাৎ সতর্ক হয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন, তার কথা থেকেই বোঝা গেল। কিশোর, বেরিয়ো না কোথাও। আমি এখুনি আসছি। আর অপরিচিত কেউ এসে যদি ইউরিক্লেসের কথা জিজ্ঞেস করে, কিছু বলবে না।

.

ওপাশে লাইন কেটে গেল। বিমূঢ় হয়ে হাতের রিসিভারটার দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। রীতিমত অবাক। ব্যাপার কি? ক্যাপ্টেন কি তাহলে রহস্যটার কথা কিছু জানেন? ইউরিক্লেসকে চেনেন? সাংঘাতিক কোন ব্যাপার আছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। নইলে হুট করে এ ভাবে আসার জন্যে অস্থির হয়ে যেতেন না।
নাক ডলল কিশোর। সেদিনই বিকেলে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে ছিল না তার। রহস্যটার কিনারা হয়নি এখনও। তবু ক্যাপ্টেন যখন নিজেই আসতে চাইছেন, কি আর করা।
তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে মুসা আর রবিনকে ফোন করল কিশোর। ক্যাপ্টেনের আসার খবরটা জানিয়ে ওদের আগেভাগেই চলে আসতে বলল।
কিন্তু ওদের আগেই ক্যাপ্টেন চলে এলেন তার সেই বিরাট কালো গাড়িতে চড়ে। সঙ্গে আরেকজন লম্বা লোক। সাদা পোশাক পরা হলেও বুঝতে অসুবিধে হলো না কিশোরের, এই লোক সাধারণ কেউ নন। হয় পুলিসের গোয়েন্দা বিভাগের হোমরা-চোমরা কেউ, নয়তো অন্য কোন ধরনের সিক্রেট সার্ভিসের; সিআইএর লোকও হতে পারে।
কিন্তু এই লোক ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কেন?
পরিচয় করিয়ে নিলেন ক্যাপ্টেন, ও কিশোর পাশা। হেসে বললেন, আমাদের লোকাল পুলিসকে খুব জ্বালাতন করে, তবে মাঝে মাঝে পুলিসকে বেশ সাহায্যও

করে। অনেকগুলো জটিল কেসের সমাধান করা গেছে ও আর ওর বন্ধুদের কারণে।
রহস্যময় মানুষটার সঙ্গে হাত মেলাল কিশোর। একটা ব্যাপার লক্ষ কল, সঙ্গীর পরিচয় ছিলেন না ক্যাপ্টেন।
তাদেরকে বসার ঘ্রে এনে বসাল কিশোর।
চা-চাচী ফেরেনি। ভালই হয়েছে, নইলে পুলিস আসার জন্যে চাচীর কাছে একগাদা কৈফিয়ত দেয়া লাগত।
বসার পর সরাসরি কাজের কথায় এলেন ক্যাপ্টেন, হ্যাঁ, এখন বলো তো ইউরিক্লেসের ব্যাপারে কি কি জানো তুমি?
খুব বেশি কিছু না, স্যার, কিশোর বলল। এক কাজ করি, গোড়া থেকেই বলি। একটা রহস্যের তদন্ত করতে করতে ইউরিক্লেসের নামটা পেয়ে গেছি।
হ্যাঁ, বলো, প্রথম থেকেই বলো।
সবে শুরু করেছে কিশোর, এই সময় কয়েকটা সাইকেলের বেলের শব্দ শোনা গেল। বউ বউ করতে করতে দরজার দিকে ছুটে গেল টিটু।
ওই যে, মুসারা এসে পড়েছে। ক্যাপ্টেনের দিকে তাকাল কিশোর, ওরা এ ঘরে এলে কোন অসুবিধে আছে, স্যার? অন্যান্য বারের মত এবারও ওরা এ কেসে আমার সঙ্গে কাজ করছে।
না, কোন অসুবিধে নেই। আসতে বলো ওদের।
সাইকেল রেখে হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকল মুসা, ফারিহা, রবিন। ক্যাপ্টেনের সঙ্গে অপরিচিত একজন লোক আছে দেখে থমকে দাঁড়াল।
হেসে হাত নেড়ে তিনজনকেই কাছে ডাকলেন ক্যাপ্টেন। উঠে হাত মেলালেন ওদের সঙ্গে।
দেখাদেখি ক্যাপ্টেনের সঙ্গীও উঠে দাঁড়ালেন। হাত বাড়িয়ে দিলেন।
হাত মেলানোর পালা শেষ হলে ফারিহা জিজ্ঞেস করল ক্যাপ্টেনকে, কাজে এসেছেন? নাকি আমাদের সঙ্গে দেখা করতে?
দুটোই। কিশোরের কাছে ফোন করেছিলাম। সে বলল, কি একটা গল্প নাকি আমাকে শোনাবে তোমরা।
সবাই বসল। ক্যাপ্টেনের যতটা সম্ভব কাছে বসল ফারিহা।
আবার গোড়া থেকে শুরু করল কিশোর। কিভাবে রবিনের কাছে হারের বাড়িতে চোর ঢোকার কথা বলেছিল দুধওয়ালা, কৌতূহলী হয়ে ওরা কিভাবে দেখতে গেল ওবাড়িতে, বেড়ালছানাটাকে বের করে আনল, সব বিস্তারিত বলতে লাগল।
স্বাভাবিকভাবেই ফগের কথা এসে পড়ল।

ক্যাপ্টেন বললেন, আমার আসার খবর বোধহয় ও পায়নি। কিশোর, ওকে একটা ফোন করে দেবে?
নিশ্চয়, স্যার।
উঠে গিয়ে ফোন করে এল কিশোর। তারপর গল্পের বাকিটা বলতে লাগল।
পাঁচ মিনিটও গেল না, সাইকেল নিয়ে প্রায় উড়ে এসে পড়ল ফগ। হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকল। কাপড়ে খাবারের ঝোল আর রুটির গুড়ো লেগে আছে। মোছারও সময় পায়নি। ফোন পেয়ে খাবার ফেলেই সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে।
মাথা থেকে হেলমেট খুলে মেঝেতে রাখল সে।
ক্যাপ্টেন বললেন, বসো, ফগর‍্যাম্পারকট। কিশোর একটা গল্প শোনাচ্ছে আমাদের। তুমি এর অনেকখানিই জানো। কিন্তু রিপোর্টে তেমন কিছুই জানাওনি।
হাঁ হয়ে গেল ফগ। গোল চোখ আরও গোল। ভেবে পেল না কি কথা সে জানে অথচ ক্যাপ্টেনকে জানায়নি?
ফাঁকে দেখেই অস্থির হয়ে উঠেছে টিটু। আর থাকতে না পেরে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল ফগের গোড়ালির কাছে। ওর উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে কড়া ধমক লাগাল কিশোর, অ্যাই, চুপ করে বোস্! জরুরী আলোচনা হচ্ছে।
কিশোরের দিকে তাকাল টিটু। মুখ দেখেই বুঝতে পারল, এখন দুষ্টুমি চলবে না। ফারিহার পায়ের কাছে গিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল সে।
এগিয়ে চলল কিশোরের গল্প। রাতের বেলা চৌকিদারদের কাছে খোঁজ নিতে গিয়েছিল, তারপর ওকে ধরার জন্যে প্রায় সারারাত ঠাণ্ডার মধ্যে গাছের নিচে বসেছিল ফগ, এ কথায় আসার পর আর হাসি চাপতে পারল না মুসা। তার হাসি সংক্রমিত হলো ফারিহা আর রবিনের মধ্যে। জোর করে মুখ গভীর করে রাখল কিশোর। ক্যাপ্টেন আর তার সঙ্গীর মনে কি ঘটছে মুখ দেখে বোঝা গেল না। ঘাম দেখা দিয়েছে ফুগের কপালে।
পরদিন নদীতে নৌকা নিয়ে খুঁজতে গিয়ে কি পেয়েছিল ফগ, বলল কিশোর। ব্যাগের মধ্যে কি ছিল, তাও জানাল।
ফগের দিকে তাকালেন ক্যাপ্টেন, ফগর‍্যাম্পারকট, তোমার রিপোর্টে তো এ সব কথা বলনি? কি করেছ ওগুলো?
বেচারা ফগ। ভঙ্গি দেখে মনে হলো চোখ উল্টে দিয়ে পড়ে যাবে। ওর অবস্থা দেখে কিশোরের মায়াই হতে লাগল। তাড়াতাড়ি জবাব দিল, ওগুলো আমাকে দিয়ে দিয়েছিল। প্রতিটি জিনিস। অবাক হচ্ছেন, স্যার? আমিও হয়েছিলাম।
কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, ক্যাপ্টেন বললেন, এত জরুরী সূত্রগুলো তোমাকে দিয়ে দিল কেন ও?

ঢোক গিলল ফগ। পাকা আপেলের মত টুকটুকে হয়ে যাচ্ছে গাল। ইস, হতভাগা বিচ্ছুটা! আবার ডোবাল ওকে! এই ছেলেটার কারণেই আবার অপদস্থ হতে চলেছে। জবাব খুঁজে পাচ্ছে না সে।
জবাব দিয়ে দিল ফারিহা, খুশি মনে কি আর দিয়েছে? ভেজা জিনিসগুলো পানি সহই ওর শার্টের ভেতর ঠেসে ভরে দিয়েছে।
আহ, ফারিহা, থামো তো! এমনিতেই যা অবস্থা হয়েছে ফগের, আরও বেকায়দায় ফেলতে চাইল না ওকে কিশোর। দোষটা আমারই ছিল।
আশ্চর্য! খুব বিরক্ত হলেন ক্যাপ্টেন। একজন পুলিস হয়ে তোমার এই আচরণ? শার্টের ভেতর ভেজা কাপড় ভরে শাস্তি দেয়াছি-ছি-ছি!
ঝামেলা! বিড়বিড় করল ফগ। না, স্যার...ইয়ে...আমি কি করে বুঝব কাপড়গুলো খুব জরুরী ছিল?...ওগুলো যে সূত্র, বুঝতেই পারিনি। আসলে ওই সকালে মাথাটা আমার এত গরম হয়ে ছিল...
আরে না না, বললাম তো, আবার বলল কিশোর, দোষটা আমারই ছিল। আপনার অত লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। ক্যাপ্টেনের দিকে তাকাল সে, আসলেই, স্যার, অতিরিক্ত বিরক্ত করে ফেলেছিলাম আমি মিস্টার ফগ্যাপারটকে। তারপর ফগকে বাঁচানোর জন্যে তাড়াতাড়ি আবার ওর কাহিনীতে ফিরে গেল। বলতে লাগল, কিভাবে কাপড়গুলো শুকিয়ে জুতোর বাক্সে ভরে রেখেছিল। রাতে চোর এসেছিল। কিন্তু কিছু নিতে পারেনি।
এ সব কথা ফগের কাছে নতুন। চোখ গোল গোল করে শুনতে লাগল সে।
সকালে মুসার আসার পর, কিশোর বলছে, পুতুলের পোশাকগুলো নিয়ে গিয়ে ছাউনিতে বসলাম ভালমত দেখার জন্যে। অনেকভাবে দেখেও প্রথমে কিছু পাইনি। শেষে ফারিহা কোটের হাতার ভেতর থেকে একটা খুদে রুমাল বের করল। তাতে ডেইজি ফুলের চারপাশ ঘিরে যে অক্ষরগুলো লেখা, সেগুলো এক করলে একটা নাম হয়ে যায়-ইউরিকেস। ফারিহার দিকে তাকাল সে, রুমালটা আছে সঙ্গে?
পকেট থেকে বের করে দিল ফারিহা।
চুপচাপ রুমালটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন ক্যাপ্টেন আর তার সঙ্গী। হাঁ হয়ে গেহে ফগ। ওর মাথায় কিছু ঢুকছে না।কিসের পুতুল? আর পুতুলের মধ্যে পাওয়া রুমালেরই বা কি অর্থ? রাতে বুড়ো ক্যামারকে জিজ্ঞেস করে জানতে পেরেছিল, হন্তদন্ত হয়ে নদীর দিকে ছুটে যেতে দেখেছে একটা লোককে। তার হাতে কোন জিনিস ছিল। বুড়োর মনে হয়েছে, জিনিসটা পানিতে ছুঁড়ে ফেলেছে লোকটা। যেহেতু হুবারের বাড়িতে চোর আসার রাতে ঘটেছে ঘটনাটা, ফগের সন্দেহ হয়েছিল, চোরাই মালটাল বা.ওই জাতীয় কোন কিছু পানিতে ফেলেছে চোর।

লুকিয়ে রাখার জন্যে। এমন জায়গায়, যেখানে জলজ গাছগাছড়া আর শ্যাওলার মধ্যে আটকে থাকবে জিনিসটা। পরে এসে তুলে নিয়ে যেতে পারবে। কিন্তু খুজতে গিয়ে যে পুতুলের পোশাকের ব্যাগ পেয়ে যাবে, আর অতি সাধারণ ওই জিনিসগুলো মূল্যবান সূত্র হয়ে যাবে, কল্পনাই করতে পারেনি। তাহলে কি আর বিচ্ছু ছেলেটাকে দেয়! উহ! রাগে এখন নিজের চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে ওর।
কিশোরের দিকে মুখ তুলে তাকালেন ক্যাপ্টেন, রুমালটা দেখে কি মনে হলো তোমার?
কিছুই না, জবাব দিল কিশোর। আমাকে অবাক করেছে নামটা।
কেন? প্রশ্ন করলেন তার সঙ্গী।
কারণ, স্বাভাবিক নাম নয় ওটা। ওই নামের কোন লোকের সঙ্গে আমার কোনদিন দেখা হয়নি। জানি, গ্রীসে গেলে ওই নামের অনেককেই পেয়ে যাব। নামটা আমাকে অবাক করেছিল কেন, বলি। এই নামের আরেক লোকের কথা আমি জানি, প্রাচীন গ্রীসে যার জন্ম, ভেনট্রিলোকুইজমের জনক বলা হয়। কি করে জানলাম নামটা, তাও বলি। একটা ভেনট্রিলোকুইজম শিক্ষার বইতে।
মৃদু স্বরে লম্বা ভদ্রলোক বললেন, বুদ্ধিমান ছেলে! কিশোরের দিকে তাকালেন, তাহলে তোমার মনে হয়েছিল ওগুলো আধুনিক কোন ভেনট্রিলোকুইস্টের পুতুলের পোশাক, যে ইউরিক্লেস নামে পরিচিত?
মাথা ঝাঁকাল কিশোর, হ্য। রুমালে নাম দেখে, ওই লোকটাকে খুঁজে বের করার কথা ভাবছিলাম। তাকে জিজ্ঞেস করলে হয়তো এই রহস্যটা ভেদ করার মত কোন তথ্য পাওয়া যাবে।
আসনেই বুদ্ধিমান ছেলে,আনমনে বিড়বিড় করলেন আবার ভদ্রলোক। শুনে হয়তো খুশি হবে, তোমার অনুমান ঠিক। ইউরিকেল নামে সত্যিই একজন ভেনট্রিলোকুইস্ট আছে, আর ওই পোশাকগুলো তারই পুতুলের। হয়তো অবাক হবে শুনে এই পোশাকগুলো আমরাও খুঁজে বেড়াচ্ছি।
কেন? সত্যি অবাক হলো কিশোর। এত লোক সাধারণ একটা পুতুলের পোশাকের পেছনে লেগেছে কেন?
তুমি একটা গল্প শুনিয়েছ আমাদের, ভদ্রলোক বললেন, এবার আমি একটা গল্প শোনাই তোমাদের। তবে কথা দিতে হবে, আর কাউকে সেটা বলতে পারবে না। কোন প্রশ্ন করতে পারবে না। ইউরিক্লেসের নাম শুনে কেন অবাক হয়েছিলেন ক্যাপ্টেন রবার্টসন, জবাব পেয়ে যাবে গল্পটা শুনলে।
সবগুলো চোখ স্থির হয়ে গেল তার মুখের ওপর, কেবল ক্যাপ্টেনের বাদে। তার চোখ সবার ওপর ঘুরছে।

কিশোর, তুমি বুদ্ধিমান ছেলে, ক্যাপ্টেনের সঙ্গী বললেন, আশা করি বুঝে গেছ আমি পুলিস না হলেও ওরকমই একটা ডিপার্টমেন্টে কাজ করি।
নীরবে মাথা ঝাঁকাল কিশোর।
আমাদের কাজ হলো, শত্রুর সঙ্গে হাত মিলিয়ে যারা দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তাদের খুঁজে বের করা। অনেক লোক আছে ওরকম, বড় বড় জায়গায়, বড় বড় আসনে বসে আছে। অনেক তাদের ক্ষমতা, প্রভাব প্রতিপত্তি। তাদের বিরুদ্ধে কিছু করতে গেলে খুব সাবধানে পা ফেলতে হয় আমাদে। প্রচুর খোঁজ-খবর, সাক্ষি-সাবুদ জোগাড় করে তবেই তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হয়।
স্পাই! প্রায় ফিসফিস করে বলল ফারিহা।
শুধু স্পাই নয়, আরও অনেক ধরনের খারাপ মানুষ আছে, তাদের দিকেও নজর রাখতে হয় আমাদের। মিস্টার ইউরিক্লেস আমাদের ইনফর্মার। ওইসব খারাপ মানুষদের খোঁজ-খবর দেয়। খুব ভাল ভেনট্রিলোকুইস্ট সে। পুতুল দিয়ে কথা বলানোর খেলা দেখায়। এ জন্যে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হয় তাকে। খবর জোগাড়ের সুবিধে হয়। কনি হুবার ওর অ্যাসিসট্যান্ট।
ও, তাই! প্রায় চিৎকার করে উঠল ফারিহা।
আস্তে মাথা ঝাঁকালেন ক্যাপ্টেনের সঙ্গী। একদিন ইউরিক্লেসের এক বন্ধু এসে হাজির হলো আমার কাছে। জানাল, অপরাধীদের নামের একটা লিস্ট করেছে ইউরিক্লেস! কিন্তু শত্রুরা টের পেয়ে গিয়ে ওটা ছিনিয়ে নেয়ার জন্যে ওর পেছনে লেগেছে। লিস্টে এমন সব নাম আছে যাদের ধরার জন্যে আমরা অনেকদিন থেকে ওত পেতে আছি। দেশের ভেতরে শ্রমিক ধর্মঘট, কারখানায় ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ, আরও নানা ধরনের অপরাধের সঙ্গে এরা জড়িত বাঘা বাঘা সব মানুষ। সুতরাং লিস্টটা কতখানি দামী, বুঝতেই পারছ।
গভীর আগ্রহে শুনছে সবাই।
বলে চলেছেন ক্যাপ্টেনের সঙ্গী, তাকে সন্দেহ করে ফেলেছে অপরাধীরা, এটা টের পেয়ে গিয়ে লিস্টটা পুতুলের পোশাকের মধ্যে লুকিয়ে ফেলল ইউরিক্লেস। আমরা কোন সাহায্য করার আগেই একরাতে কিডন্যাপ হয়ে গেল সে। তার আগে কোনভাবে সহকারী হুবারকে নিশ্চয় পুতুলটার কথা জানিয়ে যেতে পেরেছিল। ও কিডন্যাপ হওয়ার পর পরই ওর ঘর থেকে পুতুলটা বের করে নিয়ে যায় হুবার। ওটার মধ্যে মূল্যবান কিছু লুকানো আছে, বোধহয় জানানো হয়েছিল ওকে। কিন্তু কি জিনিস, সেটা বলা হয়নি। গ্রীনহিলসে এসে নতুন বাসা ভাড়া করে পুতুলটা সহ হুবার লুকিয়ে রইল যাতে শত্রুরা ওকে খুঁজে না পায়। কিন্তু বাঁচতে পারল না। অত্যাচার করে নিশ্চয় ইউরিক্লেসের মুখ থেকে আদায় করে নিয়েছিল

কিডন্যাপাররা লিস্টটা কোথায় লুকানো আছে। হুবারকে খুঁজে বের করল ওরা। রাতের বেলা হানা দিল ওর বাড়িতে।
কে এসেছে বুঝতে পারল হুবার। টের পেয়ে আর দেরি করল না। পুতুলের গা থেকে তাড়াতাড়ি পোশাকগুলো খুলে নিয়ে একটা ব্যাগে ভরে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে। ওই তাড়াহুড়োর সময়ই লাল দস্তানাটা পড়ে গিয়েছিল, কিশোর যেটা খুঁজে পেয়েছে। তারপর ব্যাগটা নদীতে ফেলে দিয়ে এল হুবার। পুতুলটা লুকিয়েছে অন্য কোনখানে। হয়তো কোন খড়ের গাদায়। সেটা জরুরী নয়। কারণ লিস্টটা ওর মধ্যে নেই। ও এ সম্পর্কে কিছু জানে না, অস্বীকার করার জন্যেই সভবত এ কাজ করেছে। যাই হোক, ব্যাগটা পানিতে ফেলার কথা আজ নিয়ে জেনে গেছিল গালকাটা লোকটা। নদীতে খুঁজতে গিয়েছিল। কিন্তু ওর আগেই পেয়ে যায় ফগর‍্যাম্পারকট।
এবারও চুপ থাকতে পারল না ফারিহা, আরেক কাজ করলেই পারত হুবার। লিস্টটা বের করে রেখে দিয়ে কাপড়গুলো ফেলে দিতে পারত।
কাছে রাখার সাহস পায়নি হয়তো।
কিন্তু সে কি জানে না কাগজ পানিতে নষ্ট হয়ে যায়?
জানে। হয়তো এও জানে, কাগজটা এমনভাবেই রাখা আছে যাতে পানি লাগতে না পারে।
ক্যাপ্টেন বললেন, এখনই বোঝা যাবে সব। কিশোর, যাও তো, ওগুলো নিয়ে এসো।
চুপ করে রইল কিশোর। মুসা, রবিন আর ফারিহার মুখেও রা নেই।
ওদেরকে এ ভাবে চুপ হয়ে যেতে দেখে অবাক হলেন ক্যাপ্টেন। কি ব্যাপার?
ওগুলো আমার কাছে নেই, স্যার, মুখ কালো করে জবাব দিল কিশোর। ছাউনিতে রেখে বেরিয়েছিলাম, ফিরে এসে দেখি দরজা ভেঙে চুরি করে নিয়ে গেছে।

.

মৃদু শিস দিয়ে উঠলেন ক্যাপ্টেন। সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে বললেন, যাহ্, গেল আবার হাতছাড়া হয়ে! গালকাটা লোকটাই নাকি?
তাই হবে, আর কে? চিন্তিত ভঙ্গিতে বললেন সঙ্গী। ওই লিস্ট আমাদের হাতে পড়লে ওর এবং আরও অনেকের সর্বনাশ হয়ে যাবে। নেয়ার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছিল তাই।
এবং শেষ পর্যন্ত নিয়ে ছাড়ল। কিশোরের দিকে তাকালেন ক্যাপ্টেন, সব নিয়ে গেছে?
হ্যাঁ। কেবল ছোট রুমালটা বাদে। ফারিহা ওটা পকেটে রেখে দিয়েছিল।

জিনিসগুলো কোথায় রেখেছিলে, চলো তো দেখি?
ঘর থেকে বেরিয়ে সবাই রওনা হলো ছাউনির দিকে। ফগও চলল। বিষণ্ন হয়ে আছে খুব। যে রহস্যটা তার সমাধান করার কথা ছিল, করে ফেলেছিল প্রায়, নিজের বোকামির জন্যে সেটা হাত থেকে ফসকে গেল। এটা দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কি।
ছাউনিতে ঢুকল সবাই। খালি জুতোর বাক্সটা দেখাল কিশোর। কিছু নেই ওর মধ্যে। আশেপাশে আরেকবার খুঁজে দেখল সবাই মিলে। কিছুই পাওয়া গেল না।
হঠাৎ মনে পড়ে গেল ফারিহার। চিৎকার করে উঠল, কিশোর, ভুলে গেছিলাম! টিটু একটা জুতো নিয়ে গিয়েছিল না?
উত্তেজিত হয়ে উঠল কিশোরও, আরে, তাই তো! ঘরের কোণের দিকে দৌড় দিল সে। বের করে আনল জুতোটা।
প্রায় ছোঁ মেরে ওর হাত থেকে ওটা নিয়ে নিলেন ক্যাপ্টেনের সঙ্গী। উল্টেপাল্টে দেখলেন। তারপর পকেট থেকে একটা ছোট ছুরি বের করে ধারাল ফলার মাথা দিয়ে খোঁচাতে শুরু করলেন জুতোর গোড়ালিতে।
খুব মজবুত করে বানানো। কেটে আলগা করতে সময় লাগল। ভেতরে একটা কুঠুরি তৈরি করা হয়েছে ইচ্ছে করে। তার মধ্যে ঠেসে ভরা হয়েছে একটা ভাঁজ করা কাগজ। মোম দিয়ে এমনভাবে বন্ধ করা হয়েছে কুঠুরির ফাঁকফোকর, পানি ঢুকতে পারেনি। বোঝা গেল জেনেশুনেই পানিতে ফেলেছিল হুবার।
চারপাশ থেকে ঘিরে আছে গোয়েন্দারা। সাবধানে ভাঁজ খুলে একনজর দেখেই পকেটে ভরে ফেললেন সেটা ক্যাপ্টেনের সঙ্গী। হাসিমুখে তাকালেন ক্যাপ্টেনের দিকে, হ্যাঁ, এটাই।
স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল গোয়েন্দারাও। ওদের মুখেও হাসি ফুটেছে। টিটুকে বার বার ধন্যবাদ দিতে লাগল। ওর শয়তানির যে এতটা সুফল মিলবে, কে বতে পেরেছিল।
কেবল ফগের মুখে হাসি নেই। সে আরও দমে গেছে।
ছাউনি থেকে দল বেঁধে আবার বেরিয়ে এল সবাই।
কিশোর জিজ্ঞেস করল ক্যাপ্টেনকে, এখন কি করবেন, স্যার?
প্রথমে হুবারের বাড়ি যাব। নিশ্চয় খুব আতঙ্কের মধ্যে কাটাচ্ছে বেচারা। এর ভয়টা দূর করব। তারপর খুঁজে বের করব গালকাটা লোকটাকে। আমার বিশ্বাস কাগজটা যেহেতু হাতে পায়নি, এখনও এই এলাকাতেই আছে সে। ধরতে তেমন অসুবিধে হবে না। ফগের দিকে তাকালেন তিনি, দায়িত্বটা তোমার ওপর দিয়ে সুবিধে হবে না। ভরসা করা যায় না। অফিসে গিয়েই লোক পাঠাচ্ছি। ওদেরকে সব রকমে সাহায্য করবে তুমি।

হঠাৎ সচকিত হয়ে খটাস করে স্যালুট কিল ফগ। ইয়েস, স্যার! নিশ্চয় স্যার! ঝামেলা!
হাঁটতে হাঁটতে কি মনে হতে কিশোরের দিকে ফিরে তাকালেন ক্যাপ্টেন, তুমি তো যেটা ধরো, সেটা শেষ করে ছাড়ো। ভেনট্রিলোকুইজমের বই পড়েছ বললে। শিখেছিলে নাকি?
হাসল কিশোর, খুব সামান্য। প্র্যাকটিস করতে গিয়ে তেমন ভাল লাগেনি বলে অল্প শিখে ছেড়ে দিয়েছি।
মুখটা নড়ে উঠল তার। গলাটা কেমন ফুলে উঠল। স্বর কিংবা কথা কিছুই বেরোল না।
ফগের ঠিক মাথার ওপরে একটা পেঁচা ডেকে উঠল কিররর-কিররর-কিররর। চমকে মুখ তুলে তাকাল সে। আহ, ঝামেলা! দিনকাল কি উল্টে গেল নাকি? এই দুপুরবেলা পেঁচা বেরোয়!
পেঁচা কেন, মাথার ওপর কোন পাখিই দেখতে পেল না সে। আরও অবাক হয়ে গেল। এ কি ভূতুড়ে কাণ্ড! ডাক দিয়ে মুহূর্তে কোথায় উধাও হয়ে গেল পাখিটা?
কিন্তু ক্যাপ্টেন আর তার সঙ্গী ঠিকই বুঝে ফেলেছেন ব্যাপারটা।
ফগের দিকে তাকিয়ে ক্যাপ্টেন বললেন, এখানেই তোমার সঙ্গে কিশোরের তফাৎ। ওর সামান্য চালাকিটাও ধরতে পারলে না। ঠিকই বোকা বানিয়ে ছাড়ল।
বড় বড় হয়ে গেল ফগের গোল চোখ। বোকাটা বনল কি করে ধরতে পারল না।
এখনও বুঝলেনা? আরে বোকা, ডাকটা কিশোরই দিয়েছে। ভেনট্রিলোকুইজম নিয়ে এত আলোচনা হলো, তাও মাথায় ঢুকল না? তোমার মাথার ওপর ও ছুঁড়ে দিয়েছে পেঁচার ডাক। এ জন্যেই তো পাখিটাকে দেখতে পাওনি। সবার সামনে বোকা বনে এতই হতাশ হয়ে গেল ফগ, তখনকার মত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল, চাকরিটাই ছেড়ে দেবে। বিচ্ছু ছেলেটার কাছে পরাজিত হয়ে বার বার এ ভাবে লজ্জা পাওয়া থেকে তো বাঁচা যাবে। বিড়বিড় করে বলল, আহ, বড্ড ঝামেলা! তবে এতই আস্তে, কারও কানে গেল না কথাটা!

ভলিউম ৫১ – প্রেতের অভিশাপ – তিন গোয়েন্দা – রকিব হাসান – সেবা প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ: ২০০২

লস অ্যাঞ্জেলেসের সীমানা প্রায় ছাড়িয়ে এসেছে তিন গোয়েন্দা।

জানো কোথায় এলাম? গাড়ি চালাতে চালাতে হঠাৎ বলে উঠল মুসা।

তন্ময় হয়ে প্রকৃতি দেখছিল তার পাশে বসা কিশোর পাশা। ফিরে তাকাল। ফ্লেমিং রক?

মুসার কথায় পেছনে বসা রবিনও কৌতূহলী হয়ে উঠল। পিঠ খাড়া করে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। কেন, ভুলে গেছ, পত্রিকায় সেদিন যে আর্টিক্যালটা পড়েছিলাম সেটার কথা? সেই যে, সেই শহরটার কথা, অদ্ভুত ভাবে গায়েব হয়ে গিয়েছিল যেখানকার সমস্ত মানুষ।

ও, হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে। প্রায় চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। একটা রূপার খনিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল শহরটা। পর্বতের গভীরে। সবচেয়ে কাছের লোকালয়টাও যেখান থেকে দুশো মাইল দূরে।

হ্যাঁ, মাথা ঝাঁকাল রবিন। সিবিল ওঅয়েরর সময় আবিষ্কৃত হয় খনিটা। আর খনিটাকে ঘিরে শহরের সুদিন ছিল আঠারোশো তেষট্টি থেকে আঠারোশো পঁচাত্তর সাল পর্যন্ত। তারপর রাতারাতিই একদিন গায়েব হয়ে গেল শহরের সব লোক।

আর বলতে হবে না, কিশোর বলল। সবটাই এখন মনে পড়েছে। খবরটা দিয়েছিল এসে একজন স্বর্ণসন্ধানী। ক্ষুধা-তৃষ্ণা আর পরিশ্রমে আধপাগল হয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে এসে ঢুকেছিল টাকসন শহরে। ফ্লেমিং রকের পাশ দিয়ে নাকি এসেছিল সে। জানিয়েছিল, শহরটার সমস্ত লোক নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে।

আর নিরুদ্দেশটাও স্বাভাবিক উপায়ে হয়নি, কিশোরের মুখ থেকে কথা কেড়ে নিল রবিন। গোছগাছ করে চলে যাওয়া যাকে বলে তা নয়। বাড়িঘরের সমস্ত জিনিসপত্র ফেলে গেছে। আসবাব, কাপড়-চোপড় যেখানে যা ছিল, সব রয়েছে। স্বর্ণসন্ধানী লোকটা যখন শহরে ঢুকেছিল, খাবারের পাত্রও তখন স্টোভে চাপানো। গরম। যেখানে যা থাকার কথা সব কিছুই ছিল, ছিল না কেবল মানুষ।

লোকটার কথায় কান দিল না কেউ, রবিনের মুখ থেকে আবার কথা কেড়ে নিল কিশোর। ভাবল, অতিরিক্ত রোদ, ক্ষুধা-তৃষ্ণা আর একাকিত্ব লোকটার মাথার বারোটা বাজিয়ে দিয়েছিল। পাগল হয়ে গিয়েছিল সে।

একজন রিপোর্টার তো গিয়েছিল ফ্লেমিং রকে খোঁজ নিতে, মুসা বলল, তাই না?

হ্যাঁ, জবাব দিল কিশোর। কয়েকজন অভিযাত্রীকে সঙ্গে দিয়ে নিজের ছেলেকে পাঠিয়েছিলেন একজন খবরের কাগজের সম্পাদক। বেরোনোর জন্যে উপযুক্ত

সময় ছিল না সেটা। শীত আসার সময় হয়ে গিয়েছিল। ফলে তুষারপাতের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল ওরা। বাড়ি ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছিল। বসন্তকালে আবার চালাল অভিযান। কিন্তু শহরবাসীদের খুঁজে পাওয়া তো পরের কথা, শহরটাই খুঁজে বের করতে পারেনি ওরা।

দুনিয়ার বুক থেকে স্রেফ উধাও হয়ে গেল পুরো একটা শহর ভর্তি লোক। মুসা বলল। আশ্চর্য!

এখন অবশ্য লোকে ব্যাপারটাকে সিরিয়াসলি নিতে আরম্ভ করেছে, কিশোর বলল। একেকজন একেক কথা বলছে। ইনডিয়ানদের যারা দেখতে পারে না, তাদের বক্তব্য, খুনে ইনডিয়ানরা এসে চড়াও হয়েছিল শহরবাসীর ওপর। মেরেকেটে সাফ করে দিয়ে গেছে ওদের। এটা মেনে নেয়া যায় না। তার কারণ ওই এলাকার আশেপাশে যত ইনডিয়ান বসতি আছে বা ছিল, তাদের কেউই তেমন শত্রু ছিল না শেতাঙ্গদের, ঘৃণা করত না। তা ছাড়া এতবড় একটা ভয়ঙ্কর আক্রমণ চালানোর পর সেটা গোপন করে ফেলা সম্ভব ছিল না কোনমতেই।

কেউ বলে প্লেগ ছড়িয়েছে, রবিন থামতে কিশোর বলল। মড়ক লেগে সাফ হয়ে গিয়েছিল পুরো শহর। দুচারজন অধিবাসী অবশিষ্ট যা ছিল তারা মড়ক ছড়ানোর ভয়ে লাশগুলোকে কবর দিয়ে বাড়িঘর সব পুড়িয়ে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছিল।

কিন্তু এ রকম কিছু ঘটলে কোন না কোনভাবে সেটা বাইরের জগতে চলে আসতই, রবিন বলল। এমন একটা খবর চাপা থাকতে পারে না। কিন্তু কারও মুখে কখনও এ ধরনের কোন খবর শোনা যায়নি। আবার কেউ কেউ বলছে আরও অদ্ভুত কথা। সরকার নাকি ওখানে গোপন কোনও গবেষণা চালানোর জন্যে লোকগুলোকে সরিয়ে দিয়েছে অন্য জায়গায়। সেটাও চাপ থাকার কথা নয়। কি গবেষণা, কোথায় সরানো হলো, কিছুই জানা যায়নি কোনদিন।

হুঁ, মাথা দোলাল কিশোর। পুরো ঘটনাটাই রহস্যাবৃত থেকে গেল এ শতকের গোড়া পর্যন্ত। তারপর আবার নতুন করে শুরু হলো ফ্লেমিং রক নিয়ে আলোচনা। ঘটনাচক্রে দুজন লোক গিয়ে ঢুকে পড়ল ওই শহরে। পরস্পরকে চিনত না ওরা। বিভিন্ন সময়ে শহরে ঢুকেছিল দুজনে। ফিরে এসে অবিকল এক গল্প বলেছে। দুজনেই শহরটা দেখেছে রাতের বেলা। প্রথমে ওদের চোখে পড়ে একটা আলো, অনেক ওপর থেকে ঝুলছে। আলো দেখে দেখে কাছে গিয়ে দেখে ফ্লেমিং রক হোটেলের টাওয়ারে ঝুলছে একটা লণ্ঠন...

থাক থাক, আর বলার দরকার নেই। বাধা দিল মুসা। বলেই করলাম ভুল। এ সব ভূতুড়ে কান্ডকারখানা...

মুসার কথা কানে তুলল না কিশোর। তাকে এখন কথার নেশায় পেয়েছে। পেছন ফিরে রবিনের দিকে তাকাল। আর্টিক্যালে কি লিখেছে, মনে আছে না? ওই

লোকগুলো ঘরে ঢুকে দেখে এক আজব দৃশ্য। স্বর্ণসন্ধানী লোকটা যা যা বলেছিল, অবিকল এক রকম কাণ্ড। স্টোভে হাঁড়ি চাপানো, খাবার রান্না হচ্ছে। বাড়িঘরের নমুনা দেখে মনে হচ্ছিল মাত্র কয়েক মিনিট আগে বাসিন্দারা জায়গা ছেড়ে গেছে। সবই আছে, নেই কেবল কোন জীবন্ত প্রাণী। মানুষ তো নেইই, একটা কুকুর কিংবা মরুভূমির একআধটা কাঁকড়াবিছেও চোখে পড়ল না তাদের। পুরোপুরি একটা মৃত শহর।
এবং তারপর সেই লোক দুজনও মাসখানেকের মধ্যেই রহস্যময় ভাবে উধাও হয়ে যায়, যোগ করল রবিন। আর কোন খোঁজই পাওয়া গেল না তাদের। সে-ই শেষ। এ ঘটনার পর ফ্লেমিং রক দেখে এসেছে বলে দাবি করেনি আর কেউ।
গাড়ি রাখতে বলল কিশোর।
ব্রেক কষল মুসা।
রবিনের দিকে ফিরে তাকাল কিশোর। আমি যা ভাবছি তুমিও কি তাই ভাবছ?
মাথা ঝাঁকাল রবিন। মুসার দিকে তাকাল একবার। তারপর আবার তাকাল কিশোরের দিকে। হ্যাঁ। জায়গাটা থেকে যখন দূরে নই আমরা, কিংবা বলা যায় জায়গাটার কাছাকাছি চলে এসেছি, একবার ঢু মেরে গেলে ক্ষতি কি?
খাইছে! বলো কি? আঁতকে উঠল মুসা। জেনেশুনে ওই ভূতের শহরে ঢুকব ওদের দলে সামিল হতে?
সেটাও তো একটা অভিজ্ঞতা হবে, কিশোর বলল। ভূত দেখার এতবড় সুযোগটা ছাড়ি কেন? নাকি ভোটাভুটি করতে চাও? গণতান্ত্রিক অধিকার?
অধিকার আর পাচ্ছি কোথায়? নিমের তেতো করল মুসার কণ্ঠে। তিনজনের মধ্যে দুজনই তো ভোট দিয়ে বসেই আছো যাওয়ার পক্ষে। আমি দিলেই বা কি না দিলেই কি?
দিলে একটা জিনিস ভাল হবে, হেসে বলল কিশোর। আমাদের দলে চলে আসতে পারলে। একা একা অন্য দলে থাকাটা কি ঠিক?
গীয়ার লিভারে ধরে আবার হ্যাঁচকা টান মারল মুসা। ঝাঁকি দিয়ে চলতে শুরু করল গাড়ি। ওর রাগ দেখে হেসে ফেলল কিশোর।
হাইওয়ে থেকে মোচড় দিয়ে পাশের একটা রাস্তায় গাড়ি নামিয়ে আনল মুসা। মাইল তিরিশেক যাওয়ার পর আরেকটা কাঁচা রাস্তায় পড়ল। সোজাসুজি পবর্তের ওপরে উঠে গেছে রাস্তাটা।
ভীষণ এবড়োখেবড়ো পথ। প্রচণ্ড ঝাঁকি।
এ কি রাস্তা নাকি! বাপরে বাপ!
রাস্তা আসলে নয়ও। মাটিতে তৈরি হয়েছে গরুতে টানা গাড়ির চাকার গভীর দুটো খাজ। তার মধ্যে চাকা ফেলে টেনে নিয়ে যেতে হচ্ছে।

ভাগ্যিস ফোর-হুইল ড্রাইভ গাড়ি ভাড়া করেছিলাম, কিশোর বলল। নইলে এ রাস্তায় অসম্ভব ছিল চালানো।
আর খাবারগুলো তো জোর করেই নিলাম আমি, মুসা বলল। তোমরা তো নিতেই চাচ্ছিলে না। কাজে লাগবে না এখন? কিন্তু কথা হলো, যে রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালাতেই এত কষ্ট হচ্ছে, সেটা ধরে গরুর গাড়ি চলে কি করে?
নিশ্চয় হাতির সাইজের একেকটা গরু, মন্তব্য করল রবিন। গায়ে দানবের জোর। তবে যা-ই বলো, দারুণ একটা অভিযানের পূর্বাভাস পাচ্ছি।
সামনের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আচমকা গুঙিয়ে উঠল মুসা।
কি হলো? চমকে উঠল কিশোর।
দেখছ না, বৃষ্টি শুরু হয়েছে, শক্ত হাতে স্টিয়ারিং চেপে ধরে রেখে মুসা বলল। এ সব এলাকায় বৃষ্টির মানে জানো? মাটি এত শুকনো আর কঠিন, সহজে পানি শুষে নিতে পারে না। পর্বতের ওপর থেকে গড়িয়ে নামা পানিতে চোখের পলকে বন্যা হয়ে যাবে।
ঠিকই বলেছে মুসা। তথ্যটা কিশোরেরও জানা। অন্য চিন্তায় ছিল বলে এদিকে খেয়াল ছিল না তার। এ সব অঞ্চলে বছরে মাত্র কয়েকবার বৃষ্টি হয়। কিন্তু যখন হয়, ঢল নামে। খুলে যায় যেন আকাশটা। মেঘের বুকে যত পানি জমা হয়, যত তাড়াতাড়ি পারে ছেড়ে দিয়ে যেন বাঁচতে চায়।
প্রাকৃতিক দুর্যোগের আলামত সবার আগে টের পায় বন্য প্রাণীরা! এতক্ষণ যাদেরকে প্রায় চোখেই পড়ছিল না, এখন তাদেরকেই দেখা যেতে লাগল পালে পালে। পানি থেকে বাঁচার জন্যে উঁচু অঞ্চলের দিকে ছুটে চলেছে ওরা। হরিণ, খটাশ আর অন্যান্য রোমশ প্রাণীদের ছুটতে দেখা গেল উদ্ধশ্বাসে।
শুরু হলো প্রবল বর্ষণ। দেখতে দেখতে রাস্তার গভীর খাঁজ দুটো ভরে গেল পানিতে।
পূর্ণ গতিতে বিরামহীন ভাবে চলছে উইন্ডশীল্ড ওয়াইপার। কিন্তু কোনমতেই কুলিয়ে উঠতে পারছে না জানালার কাঁচ বেয়ে নেমে যাওয়া পানির প্রবল স্রোতের সঙ্গে। চোখের পাতা সরু করে এনে দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে সেই পানির চাদরের মধ্যে দিয়ে সামনে দেখার চেষ্টা চালাচ্ছে মুসা। একটা উঁচু পাথুরে জায়গায় উঠে এল। গ্র্যাচ করে ব্রেক কষল। বিস্মিত।
কিশোর, দেখো দেখো, সামনে ওই যে আলো দেখা যাচ্ছে। চেঁচিয়ে উঠল সে।
আরে দুলছে দেখো, রবিনেরও চোখে পড়েছে আলোটা। পাশের জানালার দিকে তাকিয়ে আছে। সেই লোকগুলোর বর্ণনার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে, তাই না?
এবং তারপর একদিন রহস্যজনক ভাবে নিখোঁজ হয়ে গেল দুজনে, আনমনে বিড়বিড় করল মুসা। আর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি ওদের!

আলোটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কিশোর বলল, কিসের আলো জানিই না আমরা এখনও। আদৌ ওটা ফ্লেমিং রক শহর কিনা, তাই বা শিওর হচ্ছি কি করে?
তা-ও তো কথা। তাহলে কি করব এখন?
আগে বাড়ো। কাছে না গেলে তো বোঝা যাবে না।
অচেনা জায়গা। রাস্তার অবস্থা ভাল না। খুব ধীরে ধীরে চালাতে শুরু করল মুসা। কিন্তু কিছুদূর গিয়েই ব্রেক কষল আবার। কিশোর, দেখো! ওই যে সাইনবোর্ডটা! ঢোক গিলল সে।
মলিন, ভাঙা তক্তাটার দিকে তাকিয়ে রইল ওরা। হেডলাইটের আলোয় পড়া যাচ্ছে খোদাই করা লেখাগুলো:
ফ্লেমিং রক
অ্যারিজোনা
লোকসংখ্যা: ৪৭৭
খাইছে। চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে মুসা। চারশো সাতাত্তর জন নারী-পুরুষ, ছেলেমেয়ে, বাচ্চাকাচ্চা মুহূর্তে গায়েব হয়ে গেল! এ কি বিশ্বাস করা যায়?
ঘটনাটা যখন ঘটেছে, না করেই বা কি করব, চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। দেখা যাক, আমরা ওদের খুঁজে বের করতে পারি কিনা। এত বছর পর দেখতে ওদের কেমন লাগবে আল্লাহই জানে।
কেমন আর লাগবে? ফাঙ্গাস পড়া কঙ্কাল। গলা কেঁপে উঠল মুসার। কিশোর, আমার ভাল্লাগছে না যেতে। চলো ফিরে যাই।
এতখানি এসে আর পিছিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে না, জবাব দিল কিশোর। রবিনের দিকে ফিরল। রবিন, কি বলো?
কেমন যেন ভয় ভয় করছে আমার এখন, নিচু স্বরে জবাব দিল রবিন। কিন্তু এতদূর এসে ফিরে যাব? রহস্যটার একটা কিনারা করে যাওয়াই উচিত। চলো, অন্তত ঝুলন্ত আলোটা কিসের দেখে যাওয়া যাক।
বৃষ্টি কিছুটা কমে এসেছে। বাতাসের বেগও কম। গ্লাভ কম্পার্টমেন্ট থেকে টর্চ বের করে নিয়ে নেমে পড়ল তিনজনে। এগিয়ে চলল। ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে খুব শীঘ্রি একটা বিল্ডিঙের অবয়ব চোখে পড়ল ওদের।
ওই যে, ঠিকই আছে, চারপাশে টর্চের আলো ফেলতে ফেলতে কিশোর বল। শহরটাই এটা। ফ্লেমিংরক।
আর ওইটা বোধহয় এই হোটেলের টাওয়ার, টর্চের আলো ফেলে দেখাল রবিন। দেখো, আলোটা এখনও ঠিক আগের মতই দুলছে। নাড়াচ্ছে না তো কেউ?
সেটা জানতে হলে ওখানে উঠতে হবে, কিশোর বলল।

ও-ওখানে উঠবে! সাহস পাচ্ছে না মুসা।
হ্যাঁ, নাহলে দেখব কি করে? মুখে বললেও মনে মনে ভয় যে একেবারে পাচ্ছে না কিশোর, তা নয়।
হোটেলের বারান্দায় উঠল তিন গোয়েন্দা। লবিতে ঢুকল। কি আছে দেখার জন্যে না থেমে সোজা উঠে এল দোতলায়। সেখান থেকে ছাতে।
কাউকে দেখা গেল না সেখানে। লণ্ঠনটা যদি কেউ নাড়িয়েও থাকে, নেই এখন। চলে গেছে। লণ্ঠনটা আছে। কিন্তু আলো নেই। নিবে গেছে।
কাঁচটা ছুঁয়ে দেখল কিশোর। এখনও গরম।
মেরু বেয়ে ঠাণ্ডা শিহরণ বয়ে গেল তিনজনেরই।
ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল মুসা, দেখা তো হলো। এখন কি?
লণ্ঠন দুলিয়েছে যে লোকটা, তাকে খুঁজে বের করব, কিশোর বলল। চলো, নিচে চলো। আশেপাশেই কোথাও আছে সে।
সিঁড়ি বেয়ে আবার নেমে এল ওরা। সমস্ত হোটেলে খুঁজতে শুরু করল। ডাক দিল কিশোর, এই যে ভাই শুনছেন? কেউ আছেন?
জবাব পেল না।
একটা জিনিস লক্ষ করল, স্বর্ণসন্ধানী যা যা বলেছিল সব ঠিক। একটা বর্ণও বাড়িয়ে বলেনি। জিনিসপত্র যেখানে যা থাকার সব আছে। কাপড় ঝুলছে আলনা থেকে। বিছানায় পরিষ্কার চাদর পাতা। রান্নাঘরে জ্বলন্ত স্টোভের ওপরে খাবার রান্না হচ্ছে।
পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল ওরা। চোখে অবিশ্বাস। কথা বলতে ভয় পাচ্ছে।
লবি ধরে যাওয়ার সময় অ্যাশট্রেতে একটা জলন্ত সিগারেটের টুকরো দেখতে পেল।
হঠাৎ কানে এল বিচিত্র শব্দ।
যান্ত্রিক হাঁস প্যাক-প্যাক করছে।
দেখতে পেল ওটাকে। ডাকতে ডাকতে পর্দার নিচ থেকে বেরিয়ে আসছে একটা খেলনা হাঁস। মেঝে ধরে হাস্যকর ভঙ্গিতে হেলেদুলে এগিয়ে এসে মুসার জুতোয় ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেল ওদের পায়ের কাছে।
নিচু হয়ে খেলনাটা তুলে নিল কিশোর। কিন্তু আর চালু করতে পারল না। দম দেয়ার চাবিটা নেই। আস্তে করে আবার মেঝেতে রেখে দিল হাসটা। হাত কাঁপছে।
কিশোর, মানুষজন আছে এখানে, কম্পিত কণ্ঠে বলল মুসা। জ্যান্ত মানুষ। যারা দম নেয়, কথা বলে, খায়দায়। কিন্তু কোথায় ওরা?
অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল কিশোর। জানি না। তবে খোঁজা বন্ধ করা যাবে না।

খুঁজতে থাকল ওরা। পেছনের দরজা দিয়ে এসে হোটেলের রান্নাঘরে ঢুকল। কাদামাখা পায়ের ছাপ দেখতে পেল মেঝেতে। বাইরে থেকে লবিতে ঢোকার পর ওদের যেমন ছাপ পড়েছিল এ ছাপগুলোও তেমনি।
বিগফুটের পায়ের ছাপ, রসিকতার চেষ্টা করল রবিন। পাহাড়ী অঞ্চলেই তো থাকে ওরা।
হাসল না অন্য দুজন।
বিগফুটেরা বুনো, কিশোর বলল। ওরা জুতো পরে না। তা ছাড়া বিগফুট নামেও যেমন বিগ, বাস্তবেও তেমন বড়। ওরা জুতো পরলে ছাপগুলো অনেক বড় হত। এগুলো স্বাভাবিক মানুষের পায়ের ছাপের সমান।
পুরো হোটেলটা তন্নতন্ন করে খুঁজল ওরা। সবখানেই মানুষ বসবাসের তাজা চিহ্ন দেখতে পেল, কিন্তু কোন মানুষ চোখে পড়ল না।
অবশেষে আবার বেরিয়ে এল বাইরের অন্ধকারে।
চারপাশে টর্চের আলো ফেলে দেখতে লাগল কিশোর। কিছু কিছু বাড়ির সামনে কেরোসিনের বাতি আছে, দেখো। চলো, জ্বালাই। রাতের বেলা তো আর কোথাও যাওয়া সম্ভব হবে না। বরং আলো জ্বেলে এই মৃত শহরটারই কোথায় কি আছে দেখি।
তাই করি, আর কোন উপায় নেই যখন, রবিন বলল।
মুসা কিছু বলল না। তবে কিশোর আর রবিন যখন এগোল, সে-ও চলল ওদের সঙ্গে সঙ্গে।
হ্যারিকেন জ্বালানো মোটেও কঠিন হলো না। ঝেড়ে-মুছে ঝকঝকে করে তেল ভর্তি করে রেখে দেয়া হয়েছে।
বৃষ্টি থেমে গেছে। কেমন বিষণ্ন একটা অসুস্থ চাঁদ উঁকি দিল মেঘের ফাঁকে। কিন্তু অস্থির মরুর আবহাওয়া বিদ্যুতের চমক দেখিয়ে, বজ্রের গর্জন তুলে আবারও বৃষ্টির হুমকি দিয়ে চলেছে ওদের। যেন বলতে চাইছে, এত খুশি হওয়ার কিছু নেই। এখনও কাজ শেষ হয়নি আমাদের।
গীর্জাটার দিকে এগোল গোয়েন্দারা। হোটেল থেকে মাত্র দুটো বাড়ি পরেই। খুব সাধারণ একটা আয়তাকার বাড়ি। ওপরে ঘূণ্টাঘরের মাথায় দুটো খুঁটি বানিয়ে তাতে ঘণ্টা ঝুলানোর ব্যবস্থা করেছে শহরের স্থানীয় ছুতোর।
ওরা গীর্জায় ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ঘণ্টা বাজতে আরম্ভ করল। বৃষ্টিভেজা রাতের বাতাসে কাঁপা কাঁপা ভূতুড়ে শব্দ ছড়িয়ে দিতে থাকল।
আতঙ্কিত হয়ে হুড়মুড় করে গীর্জা থেকে বেরিয়ে এল তিনজনেই। চোখ তুলে ওপরের ঘন্টাটার দিকে তাকাল।
বেজেই চলেছে ঘন্টা।

অসম্ভব। ইমপসিবল। ফিসফিস করে বলল রবিন। আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।
ঘন্টার রশি ধরে টান দিচ্ছে কেউ, ঘন ঘন নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে শুরু করল কিশোর। বাতাস নেই যে বাতাসে দোল খেয়ে নিজে নিজে বেজে উঠবে।
দুই সহকারীকে নিয়ে আবার গীর্জায় ঢুকল সে। দৌড়ে উঠে এল ঘন্টাঘরে, যাতে ওদের ফাঁকি দিয়ে পালাতে না পারে লোকটা। সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল ঘণ্টা।
রশি ধরে টান দিল মুসা। নড়লও না ঘণ্টাটা। বহুকাল ব্যবহার না করলেই কেবল এমন করে অনড় হয়ে থাকে। মনেই হয় না এক মুহূর্ত আগেও বাজছিল ওটা।
বিমূঢ়ের মত সিঁড়ি বেয়ে নামছে আবার ওরা, দড়াম করে পেছনে বন্ধ হয়ে গেল ঘন্টাঘরের দরজা। ভীষণ ভাবে চমকে গেল ওরা।
বাবাবাবাব্বাতাসে। তাই না কিশোর? মুসা বলল।
বাতাস কোথায় দেখলে? কিশোর বলল। বাতাস তো স্তব্ধ।
গীর্জার পেছন দিকে চলে এল ওরা। দরজার গায়ে একটা তীর বিদ্ধ দেখে দ্বিতীয়বার চমকানোর পালা। ফ্লেমিং রকের মানুষগুলোকে পাইকারী ভাবে খুন করে গেছে বুনো ইনডিয়ানরা, এ ধারণার কথাটা মনে পড়তেই বরফের মত যেন জমে গেল ওরা।
তোতোত্তোমার কি মনে হয়, এটা কোনও ধরনের হুঁশিয়ারি? কিশোরকে জিজ্ঞেস করল মুসা।
কিসের হুঁশিয়ারি পাল্টা প্রশ্ন করল কিশোর। তবে মুসাকে নয়, নিজেকেই। ওর বাস্তববাদী মন কিছুতেই অলৌকিক কোন কিছু মেনে নিতে পারছে না। নিজেকেই যেন বোঝাতে লাগল, কোন ধরনের ঠগবাজির শিকার হয়েছি আমরা। সত্যি কথাটা জানা গেলে দেখা যাবে, ব্যাখ্যাটা অতি সহজ। মনে আছে, একবার এক পাগল চিত্রপরিচালকের খপ্পরে পড়েছিলাম? সিনেমার সেট সাজিয়ে আমাদের দিয়ে অভিনয় করিয়ে গোপনে ছবি তুলে নিয়েছিল? এটাও সে-রকম কোন কিছু হতে পারে। সিনেমা কিংবা টিভি নাটকের সেট।
হলে তো ভালই হত, রবিন বলল। কিন্তু হোটেলের টাওয়ারে লণ্ঠন জ্বলে থাকা, গীর্জার ঘন্টা বাজানো...কি করে সম্ভব?
তার প্রশ্নের জবাব দিতে পারল না কেউ।
গীর্জা থেকে বেরিয়ে এসে শহরের রাস্তা ধরে হেঁটে চলল তিন গোয়েন্দা।
এরপর কোথায় যাব? মুসার প্রশ্ন।
অবশ্যই খুঁজতে, দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিল কিশোর। এর একটা বিহিত করতেই হবে। এত বড় একটা রহস্যের সমাধান না করেই চলে যাব?...এক কাজ করা যাক। তিনজনে মিলে একই জায়গায় খোঁজার চেয়ে ভাগাভাগি হয়ে যাই চলো। তাতে অল্প সময়ে অনেক বেশি জায়গা দেখা হয়ে যাবে।

আ-আমি বাপু পারব না। দুই হাত নেড়ে বলল মুসা। একা একা যেতে পারব না আমি।
আরে যাও যাও, কিছু হবে না, সাহস দিয়ে বলল কিশোর ভূতে খেয়ে ফেলবে না তোমাকে।
না খাক, ঘাড় তো মটকাতে পারে?
কথা না বাড়িয়ে যাও তো। কি আছে, তেমন সম্ভাবনা দেখলে গলা ফাটিয়ে চিৎকার শুরু কোরো। তোমাকে উদ্ধার করতে ছুটে যাব আমরা।...মুসা, তুমি ওদিকটা দেখো। আমি ডানে যাচ্ছি। রবিন, তুমি বায়ে। আধ ঘন্টা পর ঠিক এইখানে মিলিত হব আমরা। ঠিক আছে?
কারও জবাবের অপেক্ষা না করে হাঁটতে শুরু করল কিশোর। ডান দিকে চলে গেল সে। রবিন চলল বাঁ দিকে। কিশোরের মত অতটা আত্মবিশ্বাস বা সাহস সে দেখাতে পারছে না। তবে কমও দেখাচ্ছে না। মুসা রওনা হলো সোজা।
পর পর কয়েকটা বাড়ি-ঘরে ঢুকে খুঁজে দেখল সে। ফ্লেমিং রকের স্বাভাবিক দৃশ্য। স্টোভে আগুন জ্বলছে। কোথাও খাবার রান্না হচ্ছে, কোথাও টেবিলে গরম খাবার সাজানো। ডিনারের সময় খাবার ফেলে চলে গেছে যেন বাসিন্দারা।
তারপর স্কুল হাউসটাতে এসে ঢুকল সে। এখানকার সবচেয়ে ভূতুড়ে বিল্ডিং এটা। নিখুঁত ভাবে সাজানো ছোট ছোট ডেস্কের সারি। সেগুলোতে বই খুলে পড়ে আছে। কালির দোয়াতের মুখ খোলা। পাশে কালিতে ভিজানো পালকের কলম। বাতাসে ফড়ফড় করছে খোলা বইয়ের পাতা।
ব্ল্যাকবোর্ডের নিচে রাখা চক আর মোছার ন্যাকড়া। টীচারের শেষ মেসেজ লেখা রয়েছে বোর্ডে: মঙ্গলবার, ১৭ সেপ্টেম্বর। তার নিচে আজকের করণীয় শব্দ দুটোর নিচে লেখাপড়ার যে সব ফিরিস্তি রয়েছে, তার মধ্যে ভূত শব্দটা দেখা গেল। খুবই যুক্তিসঙ্গত মনে হলো মুসার কাছে। এখানকার কাণ্ড-কারখানার সঙ্গে ভূতের মিলই সবচেয়ে বেশি। যা সব ঘটছে, কেবল ভূতুড়ে বললেই এ সবের সঠিক ব্যাখ্যা করা সম্ভব।
স্কুল থেকে বেরিয়ে এল সে। আরও কয়েকটা বাড়িঘরের পাশ কাটিয়ে এল। ভেতরে ঢোকার প্রয়োজন মনে করল না। বোঝা যাচ্ছে, কেউ নেই ওগুলোতে। ঢুকলে সেই একই রকম দৃশ্য দেখতে পাবে, সেটাও জানা। একটা বড় বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেল সে। জেনারেল স্টোর বলে মনে হলো বাড়িটাকে। ঢুকবে কি ঢুকবে না ভাবতে ভাবতে ঢোকার সিদ্ধান্তই নিয়ে ফেলল। মনে হলো এর মধ্যে ফ্লেমিং রক রহস্য সমাধানের কোন সূত্র পাওয়া যেতে পারে।
দরজায় ঠেলা দিল সে। কাঁচকোচ করে উঠল কজা। মন বলছে, ঢুকো না, ঢেকো না, পালাও। কিন্তু পালাল না সে। বরং দরজা খুলে ভেতরে পা রাখল। প্রচণ্ড বাড়ি

লাগল মাথায়। চোখের সামনে আঁধার হয়ে এল দুনিয়া।
জ্ঞান ফিরল এক সময়। মাথার পেছনে ব্যথা। কতক্ষণ বেহুঁশ হয়ে ছিল বুঝতে পারল না। উঠে বসে কপালে হাত বোলাল। হঠাৎ করেই মনে হলো তার, ঘরে একা নয় সে।
ধড়াস ধড়াস করতে লাগল বুকের মধ্যে। পাগল হয়ে গেল যেন হৃৎপিণ্ডটা। মাথার পেছনে হাত চলে গেল নিজের অজান্তে। ফুলে উঠেছে জায়গাটা। আঠা আঠা কি যেন লাগল হাতে। রক্ত, কোন সন্দেহ নেই।
আবার চিত হয়ে শুয়ে পড়ে চোখ মুদল মুসা। স্পষ্ট অনুভব করছে, ঘরে অন্য কেউ আছে। তাকে যে বাড়ি মেরেছে সেই লোকটা? জ্ঞান ফিরতে দেখলে এখন কি করবে সে? আবার বাড়ি মেরে খতম করে দেবে?
আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে মুসা। কিন্তু প্রচণ্ড কৌতূহলের কাছে পরাজিত হলো ভয়। আস্তে করে একটা চোখ মেলল। বেহুশ হয়ে পড়ে যাওয়ার সময় হাত থেকে পড়ে গিয়েছিল টর্চটা। মেঝেতেই পড়ে আছে ওটা এখন। তবে নেভেনি, জলেই আছে। সেই আলোর আভায় ঘরের মধ্যে যতখানি সম্ভব একটা চোখ বোলাল সে। সারি দিয়ে কিংবা স্তূপ করে রাখা হয়েছে নানা রকম পণ্য। পাতলা ধূলোর আস্তর পড়ে আছে সেগুলোতে। আরেকটু দৃষ্টি সরাতেই লোকটাকে চোখে পড়ল তার।
নানা ধরনের ক্যান্ডি সাজানো বড় একটা কাঁচের বাক্সের সামনে দাঁড়ানো লোকটা। ইনডিয়ান যোদ্ধা। কোমরের কাছে এক টুকরো কাপড় জড়ানো শুধু, এ ছাড়া সারা গা খালি গলায় রঙিন পুঁতির মালা। হাতে একটা খাটো কুড়াল, ইনডিয়ানদের ভাষায় টমাহক বলে এগুলোকে। কুড়ালটা কোপ মারার ভঙ্গিতে উদ্যত নয়। ঝুলিয়ে রেখেছে নিচু করে। এক হাত থেকে আরেক হাতে কুড়ালটা চালান করে দিল লোকটা।
মুসার মনে হলো, বাস্তব নয়, দুঃস্বপ্নের মধ্যে রয়েছে। মনে মনে গুঙিয়ে উঠল সে। খোদা! এটা স্বপ্নই হোক।
লোকটার গায়ের রঙ গাঢ় বাদামী। সুগঠিত শরীর। প্রায় চৌকোণা সুন্দর চেহারা। কপালে বাধা ইনডিয়ানদের হেডব্যান্ড, তাতে নীলকান্তমণি খচিত। বেশ রাজকীয় মনে হলো লোকটাকে। তবে ভয়ে মাথা গরম হয়ে যাওয়ার কারণে মুসা লক্ষ করল না, লোকটার ভাবভঙ্গিতে ভয় পাওয়ার মত কিছু নেই।
আলতো করে ধরে রাখা টমাহকটার দিকে তাকিয়ে একমনে প্রার্থনা করতে লাগল সে; খোদা, ওই কুড়ালটা নামিয়ে রাখুক লোকটা! পুরো ব্যাপারটাই স্বপ্ন হোক। কিংবা হোক তার গরম হয়ে ওঠা মগজের অতিকল্পনা।
এই সময় কথা বলে উঠল যোদ্ধা। খুব ভারী সুনিয়ন্ত্রিত কণ্ঠস্বর। কিন্তু তার মধ্যেও কোথায় যেন একটা গরমিল রয়েছে। কেমন ভূতুড়ে আর নাটকীয় কথাবার্তা,

পবিত্র ভূমিতে অনুপ্রবেশ করেছ তোমরা! যেদিন থেকে চুরি গেছে এই ভূমি, সেদিন থেকেই অভিশাপ নেমেছে এখানে, চলবে যতদিন না এখানে ঘাস গজানো বন্ধ হবে। আমার গোত্রের বিরুদ্ধে যে নৃশংসতা প্রদর্শন করেছে বর্বর মাতাল খনিশ্রমিকেরা, তার শাস্তি তাদেরকে পেতেই হবে। ঘরবাড়ি সব তাদের থেকেও যুগ-যুগান্তর ধরে ঘরহারা হয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে।
উঠে বসল মুসা। হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছে লোকটার দিকে। ওকে বাস্তবও লাগছে, আবার অবাস্তবও। কোনমতে বের করে দিল যেন প্রশ্নটা, কিকিক্কি হয়েছিল ওদের?
তার প্রশ্নের জবাব দিল না ইনডিয়ান যোদ্ধা। যেন শুনতেই পায়নি। তারমত করে সেই একই স্বরে বলে গেল, তোমাকে আর তোমার দুই বন্ধুকে মাপ করে দেয়া হবে। তবে এক শর্তে। ফিরে গিয়ে এখানে যা যা দেখে গেল সব জানাতে হবে বাইরের পৃথিবীর মানুষকে। যাও, এখন চলে যাও।
কেঁপে উঠল মুসা। চলে যাও শব্দ দুটো বড়ই মধুর শোনাল তার কানে। যাওয়ার জন্যে তো সে রেডিই, বরং এ রকম একটা কথা শুনতে পাবে সেটাই আশা করেনি। তবে কিছু বলল না লোকটাকে।
হেডব্যান্ড খুলে নিয়ে সাবধানে ভাঁজ করল লোকটা। এগিয়ে গিয়ে রেখে দিল কাউন্টারের ওপর।
এটা নিয়ে যাও। তোমাকে দিলাম। তারপর হঠাৎ করেই যেন বাতাসে মিলিয়ে গেল লোকটা।
বসেই আছে মুসা। একটা আঙুলও নড়াতে পারছে না যেন। কিশোর আর রবিন এখন কোথায়? এখানে এখন চলে এলে ভাল হত। আরেকটা ভাবনা মাথায় আসতেই চমকে উঠল সে। তাই তো! ওরাও যদি ওরই মত বিপদে পড়ে থাকে? কিংবা তার চেয়ে বেশি বিপদে? কে জানে, হয়তো এ মুহূর্তে তার সাহায্য ওদের ভীষণ প্রয়োজন।
লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। পা দুটো দেহের ভর রাখতে চাইছে না। টলমল করে উঠল। পড়ে গেল না। জখমটা মারাত্মক নয়।
মাথার পেছনে হাত দিল আবার। শুকিয়ে শক্ত হয়ে গেছে রক্ত। জট বেঁধেছে চুলে। বমিটমি আসছে না। তারমানে শুধু চামড়া কেটেছে, খুলিতে তেমন চোট লাগেনি। ভাঙেনি, কিংবা ফেটেও যায়নি।
কি ভাবে লাগল আঘাতটা? টমাহক দিয়ে বাড়ি মেরেছিল ইনডিয়ান যোদ্ধা? উঁহু। তার আচরণে সেটা মনে হয়নি। তা ছাড়া ওই কুড়ালের সামান্য ছোঁয়া লাগলেও ধূলি কেটে দুই ভাগ হয়ে যেত। ভয়ঙ্কর, মারাত্মক অস্ত্র। হতে পারে, বাতাসের ধাক্কায় বন্ধ হতে গিয়ে দরজার পাল্লাই বাড়ি মেরেছে তার মাথায়।

টর্চটা তুলে নিল সে। একটা পুরানো আমলের কয়লা তোলার অনেক বড় হাতা পড়ে থাকতে দেখল। এ সব দিয়ে সে-যুগে মানুষ কয়লা নিয়ে গিয়ে ফেলত তাদের ফায়ারপ্লেস আর চুলার মধ্যে।
আলোর রশ্মি চারপাশে ঘুরিয়ে আনল সে। ডজনখানেক হাতা ঝুলতে দেখল দরজার পাশের দেয়ালে। একটা হাতা হুক থেকে খুলে পড়ে আছে।
হুঁ, আনমনেই মাথা দোলাল সে, মাথায় বাড়ি লাগার রহস্য ভেদ হলো। দরজা খোলার সময় ঠেলা লেগে কোনভাবে হুক থেকে খুলে গিয়েছিল হাতাটা, মাথায় এসে পড়েছে। ফ্রেমিং রকে রাত দুপুরে ঘুরে বেড়ানোর খেসারত। আর আমি ভাবলাম কিনা ভূতের কাণ্ড! কিশোর আর রবিনকে বলা যাবে না এ কথা। হাসাহাসি করবে ওরা। তবে ভূত যে একটা সত্যিই এসেছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই।
কাউন্টারের কাছে এসে দাঁড়াল মুসা। হেডব্যান্ডটা পড়ে আছে। দ্বিধা করতে করতে হাত বাড়িয়ে তুলে নিল। জিনিসটা বাস্তব। ভূতুড়ে কিংবা স্বপ্নের মধ্যে হাতে নিয়েছে মনে হলো না। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত জিনিসটার দিকে তাকিয়ে রইল সে। তারপর পকেটে ভরল। রওনা হলো দরজার দিকে।
বাইরে যখন বেরোল, তখনও মৃদু মৃদু কাঁপছে তার শরীর। মাথার ভেতরটা পরিষ্কার হয়নি পুরোপুরি। বুক ভরে টেনে নিল রাতের ঠাণ্ডা তাজা বাতাস। দপদপ করছে মাথার পেছনটা। চিৎকার করে ডাকল রবিন আর কিশোরের নাম ধরে। কোলা ব্যাঙের স্বর বেরোল। বেশি দূর গেল না তার দুর্বল কণ্ঠ। কোন জবাবও এল না।
আবার ডাকল সে। এটুকু পরিশ্রমেই বে করে চক্কর দিয়ে উঠল মাথা। ঘোলাটে হয়ে গেল দৃষ্টি। ভুলভাল দেখতে আরম্ভ করল। অন্ধকারে বহু লোকের জ্বলন্ত চোখ দেখতে পেল। তাদের কণ্ঠস্বর, কথাবার্তা কানে আসছে যেন। মনে হচ্ছে তাকে ঘিরে রেখেছে সবাই। হাঁটাচলা করছে আশপাশ দিয়ে।
মাথা ঝাড়া দিয়ে মাথার ভেতরের মাকড়সার জালের মত ঘোলাটে ভাবটা ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করল সে। লক্ষ করল, যে চোখগুলোকে এতক্ষণ মানুষের চোখ মনে করেছে, সেগুলো আসলে মরুভূমির নিশাচর প্রাণীর চোখ। ওদের ডাক, হাঁটাচলার শব্দকে ভেবেছে মানুষের শব্দ। খাবার খুঁজে বেড়াচ্ছে অসংখ্য কাঠবিড়ালী আর ইঁদুর। হুটোপুটি করছে। আশ্চর্য! মানুষের ঘোলাটে মগজ কত অসম্ভব দৃশ্যই না দেখিয়ে ছাড়ে। বাস্তব জিনিসগুলোকে কি ভাবে অবাস্তব করে তোলে।
বেরিয়ে এসে আবার চিৎকার করে রবিন আর কিশোরের নাম ধরে ডাকল। সাড়া পেল না এবারেও। গেল কোথায় ওরা? কোথায় গিয়ে বিপদে পড়ল? না পাওয়া

পর্যন্ত খুঁজতে হবে। প্রতিটি ঘরে ঢুকে দেখতে হবে। খুঁজে বের করতেই হবে ওদের।
*
রবিনও ওদিকে বাড়ির পর বাড়ি খুঁজে চলেছে। আলো ফেলে ফেলে দেখছে। নতুন কিছুই চোখে পড়ল না। ফ্লেমিং রকের সেই একই রকম স্বাভাবিক দৃশ্য।
তাই বলে খোঁজায় বিরতি দিল না। জেদ চেপে গেছে তার। এই রহস্যের কিনারা করতেই হবে।
বড় আরেকটা ঘরে ঢুকল সে। একটা সেলার দেখতে পেল এখানে। মাটির নিচের ঘর। ঢোকার দরজা একটাই, কিন্তু বড় বড় দুটো পাল্লা রয়েছে তাতে। ভেতরে ঢুকে দেখবে ঠিক করল। দরজা দুটো খুলতে বেশ কষ্ট হলো। ভারী কাঠের পাল্লা। মরচে পড়ে আড়ষ্ট হয়ে আছে কজা।
উঁকি দিয়ে দেখল রবিন। নানা রকম যন্ত্রপাতি, পুরানো কাঠের টুকরো, আর কিছু ভাঙা আসবাবপত্র পড়ে আছে ঘরটাতে। ঢুকে পড়ল সে। পরক্ষণেই বরফের মত জমে গেল। পা দিয়ে বসার পর বুঝতে পারল কিসের গায়ে পা দিয়েছে।
সাপ।
সাপটাও তার মতই চমকে গেছে।
কুণ্ডলী পাকিয়ে দরজার কাছে পড়ে ছিল। অন্ধকারে বিশ্রাম নিচ্ছিল বোধহয়। টর্চের আলোয় চকচক করছে খুদে খুদে দুটো চোখ। ডায়মন্ডব্যাক র‍্যাটলার। ফণার পেছনে হীরার টুকরোর মত ছাপ মারা বলেই এ রকম নাম দেয়া হয়েছে। র‍্যাটলস্নেককে সংক্ষেপ কবে বলা হয় ব্যাটলার।
ভাগ্য ভাল, সাপের গায়ে পায়ের পুরো চাপ পড়েনি। কেবল ছোঁয়া লেগেছে। পা ফেলতে গিয়ে টের পেয়েই মাঝপথে যে ভাবে ছিল সেভাবেই রেখে দিয়েছে পাটা। চাপ লাগলে এতক্ষণে শিওর ছোবল মেরে বসত। ডায়মন্ড র‍্যাটলারের ছোবল খাওয়ার অর্থ নিশ্চিত মৃত্যু।
দরদর করে ঘাম ঝরতে শুরু করল কপাল বেয়ে। পাথরের মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে রবিন। কানে আসছে হুটোপুটির শব্দ। ঘরের মধ্যে দৌড়াদৌড়ি করছে অসংখ্য ইঁদুর। এ রকম একটা খুনে সাপের সঙ্গে বাস করে এখনও বেঁচে আছে কি করে ইঁদুরগুলো ভেবে অবাক লাগল তার। একটা ইঁদুর দৌড়ে এসে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে গেল সাপটার ফুটখানেক দূরে। চকচকে চোখ মেলে এক মুহূর্তের জন্যে তাকিয়ে দেখল সাপ আর রবিনের হাতের আলো দুটোকেই। তারপর বিরাট এক লাফ দিল সরে যাওয়ার জন্যে। চোখের পলকে ছোবল মারল সাপটা। কিন্তু মিস করল। নিরাপদে ইঁদুরটা চলে গেল ঘরের কোণে।

সুযোগটা রবিনও হাতছাড়া করল না। ছোবল মারতে গিয়ে সাপের মুখটা বেশ খানিকটা দূরে সরে গিয়েছিল। রবিনের পায়ের দিকেও নজর ছিল না। ইঁদুরের মত অতটা না হলেও, বেশ বড়সড় একটা লাফ দিয়েই রবিনও পিছিয়ে চলে এল। একটা সেকেন্ডও আর দেরি করল না ওখানে। দৌড়ে বেরিয়ে এল ঘর থেকে।
*
একই ভাবে বাড়িঘরের মধ্যে খুঁজতে খুঁজতে শহরের জেলখানার কাছে এসে দাঁড়াল কিশোর। ঢুকে পড়ল ভেতরে। সামনের দিকের একটা বড় ঘরকে বানানো হয়েছে অফিস আর ওয়েইটিং কম। পেছনে আসামী রাখার দুটো ঘর। দেয়ালে দেয়ালে আলো ফেলে দেখতে লাগল কিশোর।
এক জায়গায় লেখা রয়েছে: গ্র্যাফিটি, ১৮৩০ স্টাইল।
বেশির ভাগ শব্দই ইনডিয়ান, ড্রয়িংগুলোও তাই। আপনমনেই বিষণ্ন হাসি হাসল কিশোর। লিখে অভিশাপ দেয়া হয়েছে নিশ্চয়। ড্রয়িং একে শেতাঙ্গ জবরদখলকারীদের জাদু করে তাদের শাস্তি দিতে চেয়েছে। বোঝা গেল এই জেলখানা তৈরি হয়েছে মূলত ইনডিয়ানদের তরে রাখার জন্যেই। ইতিহাসে পড়েছে, প্রচুর শয়তানি আর চালাকি কছিল ততকালীন শেতাঙ্গরা। সস্তা মদ খাইয়ে প্রথমে মাতাল করেছে ইনডিয়ানদের। মাতাল অবস্থায় তাদেরকে দিয়ে অপরাধ করিয়েছে। তারপর আসামী করে এনে ভরে রেখেছে জেলখানায়। আটকে থাকার সুযোগে দখল করে নিয়েছে ওদের বাড়িঘর, জমিজমা সব।
প্রথম সেলটায় এসে ঢুকল সে। কানে এল পেছনে দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ার শব্দ। চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল। খোলার চেষ্টা করল দরজাটা। অনড় রইল পাল্লা। জেলখানার ভেতরে আটকা পড়ল সে।
আশেপাশে মানুষ তো দূরের কথা, একটা প্রাণীকেও চোখে পড়ল না তার। সামান্যতম বাতাসও ঢুকছে না যে বাতাসে ধাক্কা দিয়ে দরজা লাগাবে। তাহলে?
মেরুদণ্ডে শীতল শিহরণ বয়ে গেল তার। শেষে আর কোন উপায় না দেখে মুসা আর রবিনের নাম ধরে গলা ফাটিয়ে চিৎকার শুরু করল।
কিন্তু কোন জবাব এল না। সাড়া এল না কারও কাছ থেকে। শহরের দূরতম প্রান্তে চলে এসেছে সে। এখান থেকে তার চিৎকার কারও কানে পৌঁছবে না। আরেকটা ভাবনা মাথায় আসতে শঙ্কিত হয়ে পড়ল সে। ওরা দুজনও কোন রকম দুর্ঘটনার শিকার হয়নি তো? নিজের চেয়ে ভয়টা ওদের জন্যে বেশি বেড়ে গেল তার। সে নিজে আটকা পড়েছে জেলখানায়। ওরাও যদি কোথাও এমন করে আটকে পড়ে, কেউ বাঁচাতে আসবে না ওদের। কেউ কাউকে মুক্ত করতে পারবে না। ফ্লেমিং রকের অভিশাপের শিকার কি ওরাও হতে যাচ্ছে?
*

ডাকতে ডাকতে জেলখানার কাছে চলে এসেছে মুসা।
রবিনও জায়গামত গিয়ে কিশোর আর মুসাকে না পেয়ে এদিকেই আসছে। মুসার ডাক কানে ঢুকতেই ছুটতে শুরু করল সে।
জেলখানার আরও কাছে আসার পর ক্ষীণ একটা ডাক কানে এল মুসার। কান পেতে শুনল কোনদিক থেকে আসছে। দৌড় দিল জেলখানার দিকে।
আবার ডাকতেই আবারও সাড়া এল। কথাগুলো বুঝতে পারল এবার। কিশোর বলছে, মুসা, আমি এখানে।
জেলখানার দরজার দিকে দৌড় দিল সে। একছুটে ঢুকে পড়ল ভেতরে। কিশোরকে গরাদের ওপাশে দেখে থমকে গেল প্রথমে। তারপর হাসতে শুরু করল।
হাসির কি হলো। যসির কি হলো? ভুরু নাচাল কিশোর। আগে বের করো আমাকে। তারপর যত খুশি হেসে। ওই যে, তোমার মাথার পেছনে দেয়ালে ঝোলানো রয়েছে চাবি।
মুসা ঘুরে দাঁড়ানোর আগেই ঢুকে পড়ল রবিন। কিশোরের শেষ কথাটা কানে গেছে তার। দেয়াল থেকে চাবি খুলে নিয়ে সেলের দরজা খুলতে এগোল।
দরজার তালায় চাবি ঢোকাল সে। মোচড় দিল। দেখে, তালাটা খোলা। ঠেলা দিতেই পাল্লাটাও খুলে গেল। অবাক হয়ে তাকাল কিশোরের দিকে। তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? দরজা তে খোলাই আছে।
হাঁ করে ওর দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। বিমূঢ়ের মত মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, ছিল না। এক মিনিট আগেও ছিল না। তোমরা মনে করেছ আমি চেষ্টা করিনি? বহু ভাবে চেষ্টা করে দেখেছি, খুলতে পারিনি।
ঢুকলে কি ভাবে? জিজ্ঞেস করল মুসা।
দেয়ালে টর্চের আলো ফেলে দেখতে দেখতে ঢুকে পড়লাম, কিশোর বলল আমি ঢুকতেই পেছনে আপনাআপনি লেগে গেল দরজাটা। আশেপাশে কেউ ছিল না। বাতাস ছিল না। কি ভাবে বন্ধ হলো, জিজ্ঞেস কোরো না আমাকে। জবা দিতে পারব না।
জিজ্ঞেস আমি করবও না, বিড়বিড় করে বলল মুসা। কারণ আমি জানি দরজাটা কে বন্ধ করেছে!
দেয়ালের অবস্থা দেখো, টর্চের আলো ফেলল কিশোর। কি সব লিখে রেখেছে। মানে করতে পারবে এ সবের? শব্দগুলো কিছুই বুঝলাম না। তবে ড্রয়িংগুলোর মানে বোঝা যাচ্ছে।
দেখার জন্যে তো ভেতরে ঢুকতে হবে, মুসা বলল। এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি না দেয়ালের লেখা। আমি ঢুকতে পারব না। আবার যদি লেগে যায় দরজাটা?

তা-ও তো কথা, চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল কিশোর। রবিন বাইরে থাকলে অবশ্য খুলে দিতে পারবে।
দেখা গেল রবিনও খুলতে পারল না, তখন? ভূতের ওপর বিশ্বাস নেই। ওর কোন যুক্তি মেনে চলে না। তালা আটকে দিলে তখন আর বেরোনোর জো থাকবে না।
থাক তাহলে, ঢোকার দরকার নেই, বেরিয়ে আসতে আসতে বলল কিশোর ঝুঁকি নিতে রাজি নয়। বসার ঘরের দেয়ালেও প্রচুর লেখা আছে।
ঘরের প্রতিটি দেয়ালে, প্রতিটি কোণে আলো ফেলে ফেলে দেখল ওরা। একট লেখায় আলো ফেলে থেমে গেল রবিন। জোরে জোরে পড়তে আরম্ভ করল আজকের দিনে, সাদা মানুষদের ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ৩ এপ্রিল ১৮৭২ সালে ছয়জন ইনডিয়ান যোদ্ধাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়েছে ঘোড়া চুরি অপরাধে, যে অপরাধটা করেইনি ওরা। আগামীকাল আমরা যাচ্ছি আমাদের ভাইদের সঙ্গে সাদা মানুষের দেয়া বিচারের রায়ে মৃত্যুদণ্ড ভোগ করতে। শিরচ্ছে করে হত্যা করা হবে আমাদের। এই অন্যায়ের বিচার হবে, এর শাস্তি ভোগ করতেই হবে ওদের। পুরো ফ্লেমিং রকের ওপর নামবে চিরকালের অভিশাপ। স্বর্গ থেকে নেমে আসবেন মহান প্রেত, এই অন্যায়ের বিচার করতে। আমাদের মহান পিতৃভূমি থেকে বিতাড়িত করবেন সাদা মানুষরে, সেই সব ভূমি, যেগুলো ফেঁড়ে কেটে খনি বানিয়েছে ওরা, তছনছ করে ছেড়েছে। ফ্লেমিং রককে মহাকাশের কালে শূন্য গর্ভে বিলীন করে দেবেন মহান প্রেত।
ফ্যানটাস্টিক। চিৎকার করে উঠল কিশোর। পকেট থেকে নোটবুক আর পেন্সিল বের করে দ্রুত টুকে নিল কথাগুলো। তারপর চোখ পড়ল দেয়ালের লিখনের ওপর, যেটা থেকে পড়েছে রবিন। দুর্বোধ্য ইনডিয়ান ভাষা দেখে চোখ কপালে উঠল তার।
রবিন। কণ্ঠস্বর ফিসফিসানিতে নেমে এল কিশোরের, কি করে পড়লে তুমি? তোমার তো এই ইনডিয়ান ভাষা জানার কথা নয়।
মাথা ঝাড়া দিয়ে মগজের ভেতর থেকে কি যেন দূর করতে চাইল রবিন। কি জানি। মনে হলো, কে যেন আমার ভেতরে ঢুকে লেখাগুলোর মানে করে দিল ইংরেজিতে।
আশ্চর্য! কথাগুলো বানিয়ে বলোনি তো?
উঁহু, মাথা নাড়ল মুসা, বানিয়ে বলেনি ও। এ ধরনের অভিশাপের কথা একটু আগে আমিও শুনে এলাম। একজন ইনডিয়ান যোদ্ধার মুখে।
কার মুখে?
ইনডিয়ান যোদ্ধা। জেনারেল স্টোরে গিয়ে ঢুকেছিলাম। দরজার পাশে ঝোলানো কয়লার হাতারবাড়ি খেয়ে বেহুশ হয়ে গেলাম। হুঁশ ফিরলে দেখি একজন

ইনডিয়ান যোদ্ধা হাতে টমাহক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটু দূরে। ও আমাকে জানাল ফ্লেমিং রকে ইনডিয়ানদের ওপর শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচারের কারণে অভিশাপ নেমেছে তাদের ওপর। চিরকালের জন্যে অভিশপ্ত হয়ে থাকতে হবে তাদের। কোনদিন রেহাই পাবে না। মুক্তি পাবে না এভিশপ্ত অবস্থা থেকে। সে আমাকে শর্ত দিয়েছে, এ সব কথা যদি বাইরের দুনিয়াকে জানার কথা দিই, তাহলে এখান থেকে মুক্তি পাব আমরা।
তারপর? লোকটা কই?
উধাও হয়ে গেল। স্রেফ মিলিয়ে গেল বাতাসে।
তারমানে..তারমানে, বিশ্বাস করতে পারছে না কিশোর, সত্যিই একটা ভূত দেখেছ তুমি?
হ্যাঁ। সে যে এসেছিল, তার প্রমাণও আছে আমার কাছে। পকেট থেকে হেডব্যান্ডটা টেনে বের করল মুসা। আমাকে এটা উপহার দিয়ে গেছে সেই ইনডিয়ান যোদ্ধা।
হেডব্যান্ডটা হাতে নিয়ে দেখতে লাগল কিশোর। কেমন বিমূঢ়ের মত হয়ে গেছে। অবিশ্বাস্য। অনেকক্ষণ পর মুখ খুলল সে। দুই সহকারীর দিকে তাকাল। বিশেষ করে মুসার দিকে। আর কি করতে বলেছে সে?
এখান থেকে চলে যেতে।
আমি আর রবিন থাকি, তুমি গিয়ে শেরিফকে ডেকে নিয়ে এসো।
না, জোরে জোরে মাথা নাড়ল মুসা। সেটা বোধহয় ঠিক হবে না। সকাল হলে দেখা যাবে শহরটাই নেই, আবার গায়েব। বোকা বনতে হবে তখন আমাদের। তা ছাড়া শেরিফকে ডাকাডাকি করতে গেলে সেই ইনডিয়ান যোদ্ধা রেগে গিয়ে ক্ষতি করে বসতে পারে আমাদের।
গম্ভীর ভঙ্গিতে মাথা দোলাল কিশোর। কি যেন ভাবছে। হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল মুখ। আরেক কাজ করি না কেন? চলো, গাড়িতে গিয়ে বসে থাকি। কাটিয়ে দিই রাতটা। ভোরের আলো ফুটলে যদি দেখি তখনও রয়েছে শহরটা, ছবি তুলে নেব পটাপট। তাতে প্রমাণ করতে পারব, ফ্লেমিং রক নামে একটা শহর সত্যিই ছিল এক সময়।
দারুণ। চমৎকার! একমত হয়ে মুঠো ঝাঁকাল রবিন।
চলো, বেরিয়ে যাই, তাগাদা দিল মুসা। এ শহরে থাকতে আর একটা মুহূর্তও ইচ্ছে করছে না আমার।
*
নিরাপদেই গাড়িতে ফিরে এল ওরা। আধো ঘুম আধো জাগরণের মাঝে কোনমতে কাটিয়ে দিল রাতটা। সকাল হলো। আলো ফুটল। সূর্য উঠল।

তারপরেও যখন শহরটা মিলাল না, কেন যেন খানিকটা হতাশই হলো ওরা।
গ্লাব কম্পার্টমেন্ট থেকে ৩৫এম এম ক্যামেরাটা বের করল কিশোর। প্রায় পুরো ফিল্মটাই খরচ করে ফেলল রহস্যময় শহরটার ছবি তুলে। টেলিফটো লেন্স লাগিয়ে হোটেল, জেনারেল স্টোর, স্কুলহাউস, গির্জা, জেলখানার ছবি তুলল।
যাক, হয়ে গেল কাজ, সন্তুষ্ট হয়ে ক্যামেরাটা রেখে দিল সে। এখন আর লোকে অবিশ্বাস করতে পারবে না আমাদের।
কিন্তু মুসার মুখে হাসি নেই। এ শহরের গল্প তো গিয়ে আগেও লোকে বলেছে। লাভটা হয়েছে কি? মাঝখান থেকে নিজেরাই গায়েব। আমাদের বেলায়ও যদি সেরকম কিছু ঘটে?
ঘটবে না, কিশোর বলল। তোমার ইনডিয়ান ভূত-বন্ধুটি তো শর্তই দিয়েছে, শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচারের কথা বাইরের দুনিয়াকে গিয়ে জানালে ছেড়ে দেবে আমাদের। আমার ধারণা, বেঁচে থাকতে ভাল লোক ছিল লোকটা। আমাদের ওপর সুনজর আছে তার।
অবাক হয়ে কিশোরের দিকে তাকাল রবিন। এ সব ভূতপ্রেতের কথা তুমি বিশ্বাস করছ?
করতে ইচ্ছে করছে, জবাব দিল কিশোর। কি করব বলো? হয়তো ফ্লেমিং রক শহরটাই এর জন্যে দায়ী।
যাক, খুশি হলো মুসা, ভূত সম্পর্কে তোমার মানসিক অবস্থার পরিবর্তনে আমি খুশি।
বেশি খুশি হয়ো না, সাবধান করল রবিন। আবেগের বশে এখন বলছে বটে, বাড়ি গিয়েই দেখবে বদলে গেছে।
ইঞ্জিন স্টার্ট দিল মুসা।
রাস্তার খাঁজকাটা সেই দাগে চাকা ফেলেই চালাতে হলো গাড়ি। দিনের বেলা এখন ভালমত দেখতে পারছে চারপাশটা। পথ কোথাও উঁচু কোথাও নিচু। কোথাও পাহাড়ের ওপর দিয়ে গেছে, কোথাও উপত্যকা ধরে। একটা পাহাড়ের মাথায় গাড়ি উঠলে শেষবারের মত ফ্লেমিং রককে দেখার জন্যে ফিরে তাকাল কিশোর।
মুসা! রবিন। চিৎকার করে উঠল সে। শহরটা নেই।
ব্রেক প্যাডালের ওপর প্রায় দাঁড়িয়ে গেল মুসা। ঝাঁকি খেয়ে থেমে গেল গাড়ি। সে আর রবিন একই সঙ্গে ঘুরে তাকাল, দেখার জন্যে।
সত্যিই নেই শহরটা।
*
হুঁ, ভূতুড়েই। দিন কয়েক পর ঘটনাটার কথা শুনে বলল ওদের বন্ধু টম।

কিংবা টাইম-ডিসটশন জাতীয় কোন কিছুর খপ্পরে পড়েছিলাম, কিশোর বলল। কিছুক্ষণের জন্যে কোনও ধরনের স্পেস হোলেও ঢুকে গিয়ে থাকতে পারি আমরা।
শেরিফকে দেখিয়েছ ছবিগুলো?
কোত্থেকে দেখাব? ওঠেইনি।
মানে? তুমি নিজের হাতে তুলেছিলে বলেছ।
হ্যাঁ, বলেছি। কিন্তু একটা ছবিও স্পষ্ট হয়নি। সব ঘোলা।
একটু দুরে সোফায় বসে নীরবে তাকিয়ে রয়েছে মুসা আর রবিন। ওদের দিকে একবার তাকিয়ে টমের দিকে চোখ ফেরাল কিশোর। শহর তো দূরের কথা, আশেপাশের পাহাড়-পর্বত, আকাশ কোন কিছুই ওঠেনি।
তাহলে ব্যাখ্যাটা কি এর? প্রশ্ন করল বিমূঢ় টম। এমন হতে পারে না, পত্রিকায় লেখাটা পড়ে ফ্লেমিং রক গেঁথে গিয়েছিল তোমাদের মগজে, তারপর রাতবিরেতে দুর্যোগের মধ্যে ওই পাহাড়ের ওপরে গাড়িতে বসে পুরো ব্যাপারটাই কল্পনা করে নিয়েছ তোমরা?
তিনজনের অবিকল এক রকম কল্পনা?
পকেট থেকে হেডব্যান্ডটা টেনে বের করল মুসা। তা ছাড়া এটা কি? কল্পিত জিনিস কি বাস্তবে আসতে পারে?
দেখতে তো জিনিসটা নতুনই লাগছে, টম বলল। কয়েক বছরের বেশি ব্যবহার করেনি।
হ্যাঁ, তাই, মাথা ঝাঁকাল মুসা। ভেতরের দিকটায় অ্যাপাচি ইনডিয়ানদের কিছু শব্দ লেখা রয়েছে। একজন ইনডিয়ান বন্ধুর কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম অনুবাদ করানোর জন্যে। তাতে যার নামটা লেখা রয়েছে তিনি একজন ইনডিয়ান সর্দার। ফ্লেমিং রকে খুন করা হয়েছিল তাঁকে এপ্রিলের চার তারিখে, আঠারোশো বায়ার সালে। মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল শ্বেতাঙ্গ খনিশ্রমিকেরা।
মুসার হাত থেকে হেডব্যান্ডটা নিয়ে দেখতে লাগল টম। ভেতরের লেখাটা দেখে বলল, যদূর জানি, ইনডিয়ানরা লেখার জন্যে এ ধরনের কালি ব্যবহার করে না। তারমানে বোকা বানানো হয়েছে তোমাদের।
উঁহু, মাথা নাড়ল রবিন। বোকা বানানো হয়নি। ইনডিয়ানরা সাদা মানুষের কালি ব্যবহার করত সেখানে। সাদা মানুষদের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর। তারপরেও সন্দেহ নিরসনের জন্যে সব রকম পরীক্ষা আমরা চালিয়েছি। একজন কেমিস্টের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ব্যান্ড। কালি পরীক্ষা করে তিনি জানিয়েছেন, দেখতে নতুনের মত লাগলেও এ ধরনের কালি উৎপাদন আঠারোশো আশি সালের পরে একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে।

জবাব হারাল টম। কিশোরের দিকে তাকাল। যে দুটো লোক তোমাদের আগে ফ্লেমিং রকে গিয়েছিল, তাদের কি হয়েছে কোন খোঁজ পেয়েছ?
নাহ। ওরা স্রেফ নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। কোন সূত্র রেখে যায়নি।
ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল টম। উঠে রওনা হলো টেলিফোনের দিকে।
কোথায় যাচ্ছ? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
চেনাজানা সবাইকে ফোন করে জানিয়ে দিতে, জবাব দিল টম, যাতে সর্বক্ষণ নজর রাখে তোমাদের ওপর। আমরা যারা ফ্লেমিং রকে যাইনি তাদের কাউকে সঙ্গে না নিয়ে কিছুদিন বেরোতে পারবে না তোমরা। বলা যায় না, কখন গায়েব হয়ে যাও।

.

ইঞ্জিনে বোধহয় কোন সমস্যা হয়েছে, মুসা, বিরক্তকণ্ঠে বলল কিশোর পাশা।
পিকনিক করতে পাহাড়ে গিয়েছিল তিন গোয়েন্দা। সারাদিন ওখানেই ছিল। এখন বাড়ি ফিরছে। সাঁঝ ঘনিয়েছে। আকাশে প্রকাণ্ড থালার মত চাঁদ। রাস্তার পাশের যব খেত ঝলমল করছে চাঁদের আলোয়। মনের আনন্দে গাড়ি চালাচ্ছিল মুসা, হঠাৎ ইঞ্জিনে গোলমাল। থেমে গেছে গাড়ি।
গ্যাস পেডালে চাপ দিল মুসা। ইঞ্জিনে কোন সাড়া নেই।
হতাশ ভঙ্গিতে এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল সে। মাঝ রাস্তায় এমন ঝামেলার কোন মানে হয়। একশো মাইলের মধ্যে কোন মানুষজন আছে বলে তো মনে হয় না।
হঠাৎ বিদঘুটে আওয়াজ করে উঠল ইঞ্জিন। তারপর চুপ। গাড়ি থেকে নেমে পড়ল ওরা। স্পোর্টস সেডানটাকে ঠেলতে ঠেলতে রাস্তার ধারে একটা খাদের কাছে নিয়ে এল। টর্চ লাইট দিয়ে ইঞ্জিন পরীক্ষা করে দেখল। স্টার্ট দেয়ার চেষ্টা করল আরেকবার। লাভ হলো না।
বৃথা চেষ্টা। হাল ছেড়ে দিল কিশোর। গ্যারেজে নিয়ে যেতে হবে।
ঠেলে তো আর নিতে পারব না, মুসা বলল। রশি বেঁধে টেনে নিতে হবে। কিন্তু এখানে গ্যারেজ কই?
চারদিকে চোখ বোলাল রবিন। উত্তেজিত গলায় বলে উঠল, ভাগ্যটা ভালই বলতে হবে, কিশোর। ওই দেখো, মাঠে একজন লোক। চাষা-টাষা হবে হয়তো। ওকে জিজ্ঞেস করে দেখা যেতে পারে, গ্যারেজ কোথায় আছে। গাড়িটাকে টেনে নেয়ার ব্যবস্থাও হয়তো করতে পারবে।
হাত দিয়ে যব খেত দেখাল মুসা।
মাঠের মাঝখানে লম্বা একটা আকৃতি দেখতে পেল কিশোর। দাঁড়িয়ে আছে। মানুষই মনে হচ্ছে। দূর থেকে ভাল বোঝা যাচ্ছে না।
চলো, লোকটার কাছে যাই, প্রস্তাব দিল মুসা।

পরামর্শটা মনে ধরল কিশোরের। রাস্তা পার হয়ে মাঠে নেমে পড়ল তিনজনে। এখানে ওখানে খোঁড়া গর্ত। চাষ করা জমিন। মাঠের মাঝখানে চলে এল ওরা। এখানেই দাঁড়িয়ে আছে লোকটা।
ঠিক এই সময় কালো মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে যেতে লাগল চাঁদ। তবে লোকটাকে দেখতে অসুবিধে হলো না কারও। চেহারা দেখে মুখ হাঁ হয়ে গেল ওদের।
লোকটার মাথায় বালতির মত উঁচু হ্যাট, গায়ে ছেঁড়াখোঁড়া কালো কোট প্যান্ট, পায়ে কালো জুতো। কালো চোখে কটমট করে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। লম্বা, বাঁকানো নাক, মুখটা অস্বাভাবিক সাদা। লম্বা হাত সোজা সামনে ধরে রেখেছে। বাঁকা আঙুল। যেন শিকারী পাখির নখওয়ালা থাবা।
গা ছমছম করে উঠল মুসার। কিশোরের মনে হলো শিরদাঁড়া বেয়ে ঠাণ্ডা পানির স্রোত নামছে। রবিনেরও কেমন যেন লাগতে লাগল। নিজেদের অজান্তেই কয়েক পা পিছিয়ে গেল ওরা।
চাঁদকে গ্রাস করে ফেলেছে প্রকাণ্ড কালো মেঘটা। অন্ধকার হয়ে এল চারপাশ। চোখ কুঁচকে তাকাল দুই গোয়েন্দা। লোকটাকে দেখার চেষ্টা করছে।
অদ্ভুত লোক, বিড়বিড় করল মুসা। বাজি ধরে বলতে পারি ব্যাটা কোন ভূতুড়ে বাড়িতে থাকে।
আশপাশে আর কাউকে দেখতে পাচ্ছি না, ফিসফিস করল কিশোর। অদ্ভুত মনে হলেও ওর কাছেই সাহায্য চাইতে হবে।
পা বাড়াল কিশোর। তার সঙ্গে রবিন।
মুসা লোকটার কাছে গিয়ে বলল, এই যে ভাই, আমাদের গাড়িটা হঠাৎ নষ্ট হয়ে গেছে। ওটাকে গ্যারেজে নিয়ে যাবার জন্যে সাহায্য দরকার।
কোন জবাব নেই। বাতাস শব্দ তুলে বয়ে গেল যব খেতের ওপর দিয়ে। বুক ঢিবঢিব করছে ওদের। ভয় লাগছে।
এখানেই থাকি, নিচু গলায় বলল মুসা। লোকটাকে চিনি না আমরা। জানি না কোন বদ মতলব আছে কিনা তার। পিছু ঘুরলেই যদি ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়ে!
কিন্তু লোকটা গেল কোথায়? হিসিয়ে উঠল মুসা। এত অন্ধকার! ব্যাটা আমাদের পেছনে ঘাপটি মেরে নেই তো? ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকাল ও।
হঠাৎ মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল চাঁদ। আবার আলোর বন্যায় ভেসে গেল যব খেত। ভৌতিক চেহারাটাকে এবার পরিষ্কার দেখা গেল।
ওটা একটা কাঠের খুঁটির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হ্যাঁটের নিচে বেরিয়ে পড়েছে খড়। বাঁকানো আঙুলগুলো তারের তৈরি। সাদা মুখটা রং করা।

কাকতাড়ুয়া! দারুণ অবাক কিশোর। একটা কাকতাড়ুয়ার ভয়ে মরছি আমরা!
কিন্তু ওটাকে অবিকল মানুষের মত লাগছে, বলল মুসা। এমন নিখুঁত জিনিস বানাল কে? ভয়ে আমার হার্টবিট বেড়ে গেছে।
আমারও, মুসা। তবে কাকতাড়ুয়া যেহেতু আছে, কাছেপিঠে খামার বাড়িও থাকার কথা। চলো, খামার বাড়ি-টাড়ির খোঁজ মেলে কিনা দেখি।
তিনজনে হাঁটা শুরু করেছে এমন সময় খনখনে কণ্ঠে কে যেন বলে উঠল, সাবধান! ভীষণ বিপদ! বাঁচতে চাইলে এখুনি এখান থেকে পালাও?
থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ওরা। কিশোরের ঘাড়ের পেছনের চুলগুলো সরসর করে খাড়া হয়ে গেল। গলা শুকিয়ে গেল মুসার। রবিনের বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করছে। বাকরুদ্ধ হয়ে কাকতাড়ুয়ার দিকে তাকিয়ে রইল ওরা। কথাগুলো বেরিয়েছে ওটার মুখ থেকেই!
বাতাসে কাকতাড়ুয়ার কোট উড়ছে পতপত করে, পা নড়ছে। চাঁদের আলোয় মনে হলো হাসছে ওটা। বিদ্রুপের হাসি। আঙুলগুলো বাঁকা করে সামনে বাড়ানো, যেন খামচি দিয়ে ধরার ইচ্ছে।
আমি যা শুনেছি তোমরাও কি তাই শুনেছ, মুসা? কাঁপা গলায় প্রশ্ন করল কিশোর।
হ্যাঁ, জবাব দিল মুসা।
কিন্তু কাকতাড়ুয়া যে কথা বলতে পারে, রবিন বলল, শুনিনি কোনদিন!
পরীক্ষা করে দৈখি। সত্যি ওটা কথা বলেছে কিনা তা জানা যাবে।
কিশোর জিজ্ঞেস করল কাকতাড়ুয়াকে, আমাদেরকে পালাতে বললে কেন? কেন পালাব? কিসের বিপদ?
জবাব দিল না কাকতাড়ুয়া। আগের মতই তাকিয়ে রইল কটমট করে।
কিশোর আরও কয়েকটা প্রশ্ন করল। চুপ হয়ে রইল কাকতাড়ুয়া। শুধু বাতাসের শব্দ ছাড়া আর সব নিশ্চুপ।
খামোকাই সময় নষ্ট করছি, বিড়বিড় করল কিশোর। খড়ের তৈরি জিনিস কি আর কথা বলতে পারে? চলো, মুসা।
চলো, বলল মুসা। কিন্তু যাব কোন দিকে
এদিক-ওদিক তাকাল কিশোর। খেতের শেষ প্রান্তে বড় একটা দালান চোখে পড়ল।
ওটা নিশ্চয়ই খামার-বাড়ি, বলল সে, চলো। ওখানেই যাই।
তাই ভাল। সায় দিল মুসা। এই ভূতুড়ে জায়গা থেকে পালাতে পারলে বাঁচি।
কাকতাড়ুয়াকে পেছনে রেখে দালানটার দিকে পা বাড়াল তিন গোয়েন্দা। মাঝে মাঝেই মেঘ চাঁদকে ঢেকে ফেলছে বলে চলার গতি মন্থর ওদের। অন্ধকারে

এবড়োখেবড়ো গর্তে ভরা মাঠ দিয়ে হাঁটা কঠিন। বার কয়েক মাটির টিবিতে পা হড়কে পড়ে যাচ্ছিল ওরা।

পাহাড়ে চড়ার চেয়েও বিশ্রী কাজ, একটা গর্ত লাফ মেরে টপকাতে টপকাতে মতব্য করল মুসা।

ঠিক বলেছে। সায় দিল কিশোর।

এরচেয়ে বেপোর্ট হিলসে ওঠা সহজ, বলল রবিন।

এমন সময় পায়ের শব্দ কানে এল। কেউ দৌড়ে আসছে ওদের পেছন পেছন।

কনুই দিয়ে কিশোরকে গুঁতো মারল মুসা। ফিসফিস করে বলল, কেউ আমাদের পিছু নিয়েছে।

বুঝতে পারছি, ফিসফিস করেই জবাব দিল কিশোর। পায়ের শব্দ আমিও শুনেছি। তবে অনুসরণকারী যে-ই হোক খারাবি আছে তার কপালে।

পেছন ফিরে দেখল না ওরা, গুনে গুনে দশ কদম এগোল। যব খেতের মাঝ দিয়ে কেউ আসছে। শোনা যাচ্ছে পায়ের শব্দ। ঠিক দশ কদম যাবার পরে ঘুরে দাঁড়াল তিন গোয়েন্দা। কারাতে মারের কায়দায় দাঁড়িয়ে গেছে আত্মরক্ষার জন্যে। আসন্ন হামলার জন্যে প্রস্তুত। তবে মেঘে ঢাকা চাঁদের আবছা আলোয় কাউকে দেখতে পেল না। পায়ের শব্দ আর শোনা যাচ্ছে না।

ঠোঁট কামড়াল কিলোর। বেহুদা কল্পনা করে আমরা খামোকই ভয় পাচ্ছি, মুসা।

কি জানি! নীরস শোনাল মুসার গলা। তোমার কথাই হয়তো ঠিক। বাতাসের শব্দ শুনে ভাবছি কেউ আমাদের পিছু নিয়েছে। তা ছাড়া এখানে আমাদের পিছু নিতেই বা যাবে কে?

ওর কথা মাত্র শেষ হয়েছে, এমন সময় যব গাছের বড় একটা অংশ দুদিকে ভাগ হয়ে গেল। একই সঙ্গে মেঘের আড়াল থেকে আত্মপ্রকাশ করল চাঁদ। চাঁদের আলোয় দেখা গেল ঠোঁটে সেই বিশ্রী জ্জিপের হাসি নিয়ে ওদের সামনে হাজির হয়ে গেছে কাকতাড়ুয়াটা।

দৃশ্যটা দেখে আতঙ্কে জমে গেল তিন গোয়েন্দা। পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ভৌতিক মূর্তিটার দিকে। দুহাতে যব গাছগুলোকে দুপাশে ঠেলে ধরে একটা গর্তে দাঁড়িয়ে আছে ওটা। নিঃশব্দে হাসছে।

হঠাৎ রাতের নিস্তব্ধতা চিরে খনখনে গলায় হেসে উঠল কাকতাড়ুয়া। তীব্রতর হয়ে উঠল আওয়াজ। তারপর হঠাৎই থেমে গেল।

দ্বিতীয়বার কথা বলল কাকতাড়ুয়া। কর্কশ শোনাল কণ্ঠ, ওই বাড়িতে যেয়ো না। এখুনি চলে যাও। নইলে কপালে অনেক দুর্ভোগ আছে।

দুই গোয়েন্দা আগের মতই দাঁড়িয়ে আছে। কথাগুলো সত্যি শুনেছে কিনা বিশ্বাস করতে পারছে না। কাকতাড়ুয়া ছেড়ে দিল যব গাছ। গাছগুলোর আড়ালে অদৃশ্য

হয়ে গেল ভয়ঙ্কর মুখটা। দ্রুত মিলিয়ে গেল দুটন্ত পায়ের আওয়াজ।
পায়ের শব্দে সংবিৎ ফিরে পেল যেন তিন গোয়েন্দা। কাকতাড়ুয়াটা যেখান থেকে উঁকি দিয়েছে দৌড়ে গেল সে-জাযগায়। কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না ওরা। ওনতেও পেল না।
ওটার পিছু নেব, চেঁচিয়ে বলল কিশোর।
কিন্তু যাব কোন দিকে? রবিনের প্রশ্ন।
যেখানে ওটাকে প্রথম দেখেছিলাম সেখানে।
ছুটল ওরা। দৌড়াতে দৌড়াতে চলে এল আগের জায়গায়। এখানেই কাকতাড়ুয়াটাকে দেখে গেছে।
কিন্তু খালি কাঠের খুঁটিটা দাঁড়িয়ে আছে। কাকতাড়ুয়াটা নেই!
হতভম্ব হয়ে গেল দুই গোয়েন্দা। বেদম হাঁপাচ্ছে। তবে যতটা না পরিশ্রমে তারচেয়ে বেশি ভয়ে।
কিশোর, আমরা সত্যি কি অশরীরী কিছু দেখছি? কেঁপে গেল মুসার কণ্ঠ।
আর অস্বাভাবিক কিছু কি শুনছি? অবাক শোনাল রবিনের কণ্ঠ। অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল।
জবাব দিল না কিশোর। ভূতুড়ে এ সব কাণ্ডকারখানার মাথামু কিছু সে-ও বুঝতে পারছে না।
মাঠের মধ্যে কাকতাড়ুয়াটাকে খুঁজে বেড়াল ওরা। কোথাও দেখতে পেল না। শেষে ঠিক করল খামারবাড়িতেই যাবে। খামারবাড়িতে কেউ থাকলে কাকতাড়ুয়া রহস্যের জবাব হয়তো সে দিতে পারবে। প্রেতের অভিশাপ
খামারবাড়িটা বেশ বড়। কতগুলো গাছ-পালার মধ্যে কাঠের বাড়ি। তবে খুবই দৈন দশা। বাড়ির জানালায় কোন আলো জ্বলছে না।
সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠে এল মুসা। দরজার কলিংবেল টিপল। ভিতরে কোথাও তীক্ষ্ণ শব্দে বেজে উঠল বেল। কিন্তু কারও সাড়া মিলল না। আবার বেল বাজাল মুসা। এবারও কোন সাড়া নেই।
মনে হয় বাড়িতে কেউ নেই, বলল কিশোর। তবে নিশ্চিত না হয়ে চলে যাওয়া ঠিক হবে না।
পেছন দিকে কেউ থাকতে পারে, রবিন বলল। চলো। ওদিকটা ঘুরে দেখি।
বারান্দার সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এল ওরা। চক্কর দিল বাড়িটাকে ঘিরে। কিন্তু জীবনের চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। ছোট ছোট গুলো পেঁচিয়ে যাচ্ছে পা, কাঁটা গাছের খোঁচা লাগছে হাতে। সেই সাথে কানের পাশে মশার ভনভনানি তো আছেই।

গত কয়েক বছরেও এ বাড়ি কেউ সাফ-সুতরো করেনি মনে হচ্ছে, অসন্তোষের গলায় বলল কিশোর।, জবাবে কেউ কিছু বলার আগেই ভয়ঙ্কর একটা চিৎকার ভেসে এল। আঁতকে উঠল ওরা।
কি-কি ওটা? কাঁপা গলায় প্রশ্ন করল মুসা।
জানি না। কাকতাড়ুয়ার চিৎকার নয়তো? বিড়বিড় করল রবিন।
কাছের একটা গাছ থেকে ডানা ঝাপটানোর শব্দ শোনা গেল। একটা পেঁচা। উড়ে আসছে গাছটা থেকে। বসল একটা ঝোঁপের ওপর। গোল গোল, বড় বড় চোখে কটমট করে তাকাল ওদের দিকে। তারপর ডানা ঝাঁপটে বুক হিম করা চিৎকারটা দিল আবার।
দুই গোয়েন্দা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে ফ্যাকাসে যসি হাসল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। বাড়ি চক্কর দেয়া শেষ। আবার চলে এসেছে বারান্দায়। বৃথা খোঁজাখুঁজি। মানুষ জন নেই। গলা ফাটিয়ে কেউ কি আছেন? বলে ডাকাডাকি করল। কোন জবাব এল না।
ফোন করা দরকার, বলল মুসা। কাছেপিঠের কোন গ্যারেজে খবর না দিলেই নয়। কিন্তু সমস্যা হলো বাড়ির ভেতরে ঢুকব কি করে? দরজা ভেতর থেকে ছিটকানি দেয়া।
জানালা দিয়ে যে ঢুকব তারও উপায় নেই, হতাশ শোনাল কিশোরের কণ্ঠ। অনেক উঁচুতে জানালা!
এদিক ওদিক তাকিয়ে রবিনও কোন উপায় বের করতে পারল না।
উপায় একটা আছে, মুসা বলল। পেঁচাটা যে গাছ থেকে উড়ে এসেছে, লক্ষ করেছি ওটার একটা ভাল চিলেকোঠার জানাল ছুঁই ছুঁই করছে। জানালা খোলা থাকলে গাছ বেয়ে উঠে গেলেই হলো। তারপর ভেতরে ঢুকে পড়ব।
গাছটার নিচে চলে এল ওরা। প্রথমে মুসা চড়ল গাছে। উঁচু ডালে দাঁড়িয়ে নিশ্চিত হয়ে নিল ওটা ওর ওজনের চাপে ভেঙে পড়বে না। তারপর জানালা ছুঁই ছুঁই ডালের ওপর চলে এল। হাত বাড়িয়ে জানালার কাঁচ স্পর্শ করল। ধাক্কা দিল। কাঅ্যাঅ্যাচ শব্দে খুলে গেল জানালা।
ভাগ্য ভাল আমাদের, কিশোর আর রবিনকে উদ্দেশ্য করে বলল মুসা। জানালা খোলা। চলে এসো।
গাছে উঠে পড়ল কিশোর। চলে এল মুসার পেছনে, মগডালে। খোলা জানালা দিয়ে চিলেকোঠার ঘরে ঢুকে পড়ল মুসা। তাকে অনুসরণ করল অন্য দুজন। ভিতরে ঢুকে পকেট থেকে পেন্সিল টর্চ বের করল ওরা।
টর্চের আলোয় বুঝতে পারল বেশ বড়সড় ঘর এটা। খালি। মেঝের ওপর ধুলোর ঘন আস্তরণ।

মেঝেতে কারও পায়ের ছাপ দেখছি না, বলল কিশোর। তার মানে অনেক দিন কেউ এ ঘরে ঢোকেনি।
চিলেকোঠার দরজায় টর্চ মারল রবিন। এ ঘরে ফোন নেই। নিচে আছে কিনা দেখে আসি।
দরজার দিকে পা বাড়িয়েছে ওরা, এমন সময় ছাদ থেকে কিচকিচ শব্দ ভেসে এল। কালো কালো কি যেন ছাদের কড়ি-বর্গা থেকে নেমে এসে উড়তে লাগল ওদের মাথার ওপর।
বাবাগো, ভূত! বলে চিৎকার দিয়ে মেঝে লক্ষ্য করে ডাইভ দিল মুসা।
খেয়ে গিয়ে তার সঙ্গে সঙ্গে কিশোর আর রবিনও ঝাঁপ দিল মেঝেতে।
শিকার ফস্কে যাওয়ায়ই যেন দিক পরিবর্তন করল হামলাকারীরা, আবার উঠে গেল ছাদে। বর্গা ধরে ঝুলতে লাগল। সেই সাথে অনবরত কিচকিচ শব্দ করেই চলেছে।
ভ্যাম্পায়ার! বাদুড়ের রূপ ঘরে আছে! রুদ্ধশ্বাসে বলল মুসা। জলদি ভাগো!
ওঠো না, সাবধান করল কিশোর। হামাগুড়ি দিয়ে এগোও। ভূত না হলেও আবার আক্রমণ চালাতে পারে ওরা।
চিলেকোঠার মেঝের ওপর হামাগুড়ি দিয়ে এগোল তিন গোয়েন্দা। দরজার সামনে পৌঁছে দ্রুত খুলে ফেলল কবাট। হামাগুড়ি দিয়েই বেরিয়ে এল ঘর থেকে। তারপর বন্ধ করে দিল দরজা।
সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামছে ওরা, চোখে পড়ল আরেকটা দরজা। ওটা খুলে একটা হলরুমে ঢুকে পড়ল তিনজনে।
আমার কি মনে হয় জানো? বলল কিশোর। বাড়িটা পরিত্যক্ত। মেঝেতে কার্পেট নেই, হলরুমে কোন আসবাব নেই। ইলেকট্রিসিটি নেই...।
হঠাৎ হলরুমের শেষ মাথায় কিসের যেন শব্দ হলো। থেমে গেল কিশোর। দেয়ালের সাথে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াল। পা টিপে টিপে এগোল দরজার দিকে। দরজাটা ভেড়ানো। ধাক্কা মেরে দরজা খুলল কিশোর। টর্চ জ্বালল। এ ঘরটাও খালি।
মেঝেতে টর্চের আলো ফেলল সে। হাসতে লাগল। ওই যে ভূতুড়ে শব্দের উৎস!
একটা ইঁদুর। মানুষের সাড়া পেয়ে দৌড়ে পালাল মেঝের গর্তে।
এদিকের সবগুলো ঘর একে একে আলাদা ভাবে পরীক্ষা করে দেখল ওরা।
দোতলায় কেউ নেই, কাজ শেষ করে জানাল মুসা।
আমিও কাউকে দেখতে পাইনি, রবিন বলল।
হু, গম্ভীর ভঙ্গিতে মাথা দোলাল কিশোর। এবার নিচতলাটা দেখা দরকার।

সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এল ওরা, ঢুকল ডাইনিং রুমে। অন্যান্য ঘরগুলোর মত এটাও খালি এবং ধুলোয় ভর্তি। তবে এ ঘরে পায়ের ছাপ চোখে পড়ল ওদের।
দেখো দেখো, পায়ের ছাপ! বলে উঠল উত্তেজিত রবিন।
কেউ এখানে ছিল! ফিসফিস করে বলল কিশোর।
এবং মাত্র কিছুক্ষণ আগে! ঢোক গিলল মুসা।
টর্চের আলোয় পায়ের ছাপগুলো পরীক্ষা করল ওরা। ছাপগুলো রান্নাঘর হয়ে খিড়কির দরজার দিকে চলে গেছে। দরজাটা বন্ধ। আর দ্বিতীয় পায়ের ছাপ এসে মিশেছে লিভিং রুমে।
পায়ের ছাপগুলো একজনেরই, মন্তব্য করল কিশোর। খিড়কির দরজা দিয়ে ঢুকেছিল সে। আবার বেরিয়ে গেছে ও পথেই।
মেঝেতে টর্চের আলো ফেলে আঁতকে উঠল মুসা। মেঝেতে কতগুলো খড় পড়ে রয়েছে। কেউ এ ঘরে খড়ের গাদা নিয়ে ঢুকেছিল। নাকি কাকতাড়ুয়াটাই...? গায়ে কাঁটা দিল তার। যে-ই হোক, এখনও এ বাড়িতেই রয়েছে সে। সম্ভবত বেসমেন্টে।
যেখানেই থাক, খুঁজে বের করব ওটাকে, দৃঢ়কণ্ঠে বলল কিশোর। রহস্যের সমাধান না করে যাচ্ছি না।
ঠিক বলেছ, বলল বটে রবিন, কিন্তু মুখ শুকিয়ে গেছে ওর।
রান্নাঘরে ফিরে এল ওরা। লক্ষ করল আরও কিছু পায়ের ছাপ চলে গেছে বেসিমেন্টের দরজার দিকে। তারপর নেমে গেছে সিঁড়ি বেয়ে।
সিঁড়ির শেষ মাথায় এসে দাঁড়িয়ে পড়ল ওরা। ভয়ে ভয়ে চোখ বুলাল চারপাশে। বেসিমেন্ট অর্থাৎ মাটির নিচের ঘরে কেউ নেই। ধুলো জমেছে পুরো হয়ে। জানালায় মাকড়সার জাল। এখান থেকে উঠান বা বাগানে যাবার কোন দরজা চোখে পড়ল না।
পায়ের ছাপ চলে গেছে ফিউজ বক্সের ধারে। ফিউজ বক্স পরীক্ষা করল কিশোর। তার ছেঁড়া। ইলেকট্রিসিটি থেকে থাকলেও বাতি জ্বালানোর কোন উপায় নেই।
পায়ের ছাপের মালিক এখান থেকে চলে গেছে সিঁড়ির দিকে, দেখেটেখে বলল সে।
সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল ওরা। যেতে যেতে রবিন বলল, ফোনটোন তো দেখলাম না এখানে। কাজেই সাহায্য পাচ্ছি না আমরা।
কাঁধ ঝাঁকাল কিশোর। দুটো কাজ করতে পারি আমরা এখন। হয় গাড়িতে ফিরে যেতে পারি, নয়তো এখানেই রাত কাটাতে পারি। তবে এখানে রাত কাটানোই বোধহয় ভাল হবে। মেঝেতে শুতে আমার কোন অসুবিধে নেই।

হাই তুলল মুসা। আমারও নেই। খুব ঘুম পাচ্ছে। শোয়ার মত জায়গা যখন আছেই আর দেরি করি কেন?
সে জ্যাকেট খুলে ভাঁজ করল। তারপর মাথার নিচে দিল। বালিশের কাজ দেবে জ্যাকেটটা। রবিন আর কিশোরও তা-ই করল।
শোয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল ওরা।
ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দুঃস্বপ্ন দেখল, কিশোর। দেখল গাড়িতে করে একটা বাড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছে ওরা। মুসা গাড়ি চালাচ্ছে। কিন্তু রাস্তা হারিয়ে ফেলেছে বলে খুঁজে পাচ্ছে না বাড়িটা। লোকজনকে জিজ্ঞেস করেও লাভ হচ্ছে না। বদমেজাজী লোকগুলো প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে না। হঠাৎ পেছন থেকে অদ্ভুত গলায় কে যেন বলে উঠল, যে বাড়িটা তোমরা খুঁজছ ওটা ডান দিকে। মোড় ঘোরো। মোড় ঘুরে নাক বরাবর চলে যাও। বাড়িটা দেখতে পাবে।
ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল কিলোর। দেখল পেছনের সীটে বসে আছে সেই কাকতাড়ুয়াটা।
ভৌতিক মূর্তিটা ওদের দিকে তাকিয়ে খনখনে গলায় হেসে উঠল। সরু, লম্বা টুপির ডগায় টোকা মেরে বলল, কাউকে জিজ্ঞেস করার দরকার নেই। আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি কি ভাবে যেতে হবে। ডান দিকে টার্ন নাও।
মুসা জানে ডান দিকে খাড়া খাদ। সে বাম দিকে হুইল ঘোরাল। তর ডান দিকেই ঘুরে গেল গাড়ি। গতি কমাতে ব্রেক চেপে ধরল। কমার বদলে বেড়ে গেল স্পীড। আতঙ্কিত হয়ে দেখল সোজা খাদের দিকে এগিয়ে চলেছে গাড়ি। গতি ক্রমে বেড়েই চলেছে।
পেছনের সীটে বসা কাকতাড়ুয়াটা হেসে উঠল ভয়ঙ্কর গলায়। খাদের কিনার লক্ষ্য করে ছুটে গেল গাড়ি। পরক্ষণে ডিগবাজি খেয়ে শূন্যে উঠে পড়ল, সাঁ সাঁ করে নিচে পড়তে শুরু করল, নেমে যেতে থাকল খাদের অতল অন্ধকারের দিকে। পড়ছে তত পড়ছেই! প্রতি সেকেন্ডে খাদের বিকট হ বড় হয়ে উঠছে।
বিজয় উল্লাসে চিৎকার করে উঠল কাকতাড়ুয়াটা। কানে হাত চাপা দিল কিশোর। খাদের পাথরের ওপর আছড়ে পড়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে ওদের গাড়ি। মারা যাবে ওরা।
ঘুম ভেঙে গেল কিশোরের। কোথায় আছে বুঝতে সময় লাগল।
ভয়ানক দুঃসপ্ন! ভাবল সে। কাকতাড়ুয়ার ভয় পেয়ে বসেছে আমাকে।
হঠাৎ বারান্দার কাঠের মেঝেতে ক্যাচকোচ শব্দ উঠল। কে যেন হেঁটে আসছে সামনের জানালার দিকে। উঠে বসল কিশোর।
কাকতাড়ুয়া!
জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। মুখে বিকৃত হাসি।

এখনও কি স্বপ্ন দেখছি? ঢোক গিলল কিশোর। নাকি সত্যিই ঘটছে এ সব
কর্কশ সুরে ফিসফিস করল ভয়ঙ্কর মূর্তিটা। এক্ষুণি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাও। শেষবারের মত সাবধান করছি।
জানালা থেকে মুখ সরাল কাকতাড়ুয়া। অদৃশ্য হয়ে গেল।
লাফ দিয়ে উঠে বসল কিশোর। দৌড়ে চলে এল দরজায়। জং ধরা ছিটকানি খুলতে সময় লাগল। এক ছুটে বারান্দায় বেরিয়ে এল। চারপাশে তাকাতে লাগল।
দরজা খোলার শব্দে ঘুম ভেঙে গেছে মুসা আর রবিনেরও। ওরাও চলে এসেছে।
চোখ ডলতে ডলতে জিজ্ঞেস করল মুসা, কি হয়েছে?
ঘটনাটা খুলে বলল কিশোর। কাকতাড়ুয়াটা হঠাৎ কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল বুঝলাম না।
ওই তো! হাত তুলে দেখাল মুসা।
যব খেতের সামনে দাঁড়িয়ে আছে ওটা। ঝলমলে চাঁদের আলোয় কাকতাড়ুয়ার কুৎসিত চেহারাটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।
এসো আমার সঙ্গে! চিৎকার করে বলল ওদেরকে কাকতাড়ুয়া। তারপর মাঠের দিকে ছুটতে লাগল।
ওর পিছু নেব, বলল কিশোর। ওকে ধরতে হবে। নইলে এ সব রহস্যময় কাণ্ডকারখানার কোন সদুত্তর মিলবে না।
ঠিক! রবিন বলল।
মুসাও তার সঙ্গে একমত।
যেখান থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে কাকতাড়ুয়া সেদিক লক্ষ্য করে দৌড় দিল ওরা।
রাতের আকাশে কালো মেঘের আনাগোনা আরও বেড়েছে। ঝড় হবে মনে হচ্ছে। গাছের চূড়ায় হাওয়ার মাতম।
যব খেতে ঢুকে পড়ল ওরা। কাকতাড়ুয়া হেলান দিয়ে ছিল যে কাঠের খুঁটির সাথে, সেখানে এসে দেখল খুঁটি খালি। নেই ওটা।
হতাশ ভঙ্গিতে কাধ ঝাঁকাল কিশোর। কাকতাড়ুয়া কোথায় গেছে তাই জানি না। কোথায় খুজব ওকে?
ভূতের মতই হুটহাট করে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, মুসা বলল। নিশ্চয় ভূত।
ভূত হোক আর যাই হোক ওকে খুঁজে বার করতেই হবে। এক কাজ করি-তিনজন তিনদিকে যাই। কারও চোখে কিছু পড়লেই চিৎকার করে জানাব। অন্য দুজন ছুটে যাব তখন তার দিকে। কি বলো?
ঠিক আছে, সায় দিল মুসা আর রবিন।
ডান দিকে মোড় নিল কিশোর, যব খেতের আরও গভীরে ঢুকে পড়ল।

সাবধানে হাঁটছে মুসা আর রবিন। দুহাতে গাছ ঠেলে সরাতে সরাতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে চারপাশে।
দূরে কোথাও কড়াৎ শব্দে বাজ পড়ল, আকাশে পলকের জন্যে ঝলসে উঠল রূপালী বিদ্যুৎ। চাঁদের আলো মেঘের আড়াল থেকে সামান্যই মুখ দেখানোর সুযোগ পাচ্ছে। ছায়া ছায়া অন্ধকার এখন যব খেতে। মুসার কাছে সব কেমন অপার্থিব, ভূতুড়ে লাগছে। শিরশির করে উঠল গা। ভূতদের জনন্য আদর্শ একটি রাত, মনে মনে ভাবল ও।
শক্তিশালী বাতাস এক ধাক্কায় সরিয়ে দিল মেঘ, হঠাৎ ঝলমলে জ্যোৎস্নায় ভরে গেল যব খেত।
একটা যব গাছের গায়ে এক টুকরো কাপড় আটকে আছে। বাতাসে ফড়ফড় করে উড়ছে। ওদিকে দৃষ্টি আটকে গেল মুসার। টুকরোটা হাতে নিয়ে বুঝতে পারল এটা কাকতাড়ুয়ার সেই শতছিন্ন কালো কোটের অংশ।
কাকতাড়ুয়া ঐদিকে এসেছে বুঝতে পারল সে। হয়তো খেতের মধ্যে কোথাও ঘাপটি মেরে আছে। লাফ মেরে ঘাড়ে পড়বে। কথাটা ভাবতেই বুক ঢিবঢিব শুরু হয়ে গেল তার। তবে থামল না সে। এগিয়ে চলল। বারবার ডানে বামে তাকাচ্ছে। হাত দুটো সামনে বাড়ানো। সম্ভাব্য হামলার জন্যে প্রস্তুত। তবে ভূত-প্রেতের বিরুদ্ধে কুংফু-কারাতে কতটুকু কাজে লাগবে ভেবে সন্দিহান মুসা।
বেশ খানিকটা পথ হাঁটার পরেও কিছু ঘটল না দেখে মুসা ধারণা করল কাকতাড়ুয়াটা বোধহয় এ তল্লাটে নেই। ঠিক তখনই ওর সামনে খচমচ করে একটা শব্দ হলো। শস্যের ডগা দুলছে। কিছু একটা এগিয়ে আসছে ওর দিকে। তাকে দেখতে পাচ্ছে না মুসা।
পাঁজরের গায়ে দমাদম পিটতে শুরু করল হৃৎপিণ্ড, বেড়ে গেছে হার্টবিট। দাঁড়িয়ে পড়ল মুসা। অপেক্ষা করছে। কাকতাড়ুয়াকে দেখামাত্র চিৎকার করে জানান দেবে কিশোর আর রবিনকে।
খচমচ শব্দটা ক্রমে কাছিয়ে এল। মুখ হাঁ করল মুসা, চিৎকার দিতে যাবে এই সময় যব গাছের ফাঁক দিয়ে একটা লাফিয়ে পড়ল ওর সামনে। পেছন পেছন একটা শিয়াল। শিয়ালটা ধাওয়া করেছে খরগোশকে। দুটো প্রাণীই ঝড়ের বেগে ছুটে গেল মুসার সামনে দিয়ে।
পেশীতে ঢিল পড়ল আবার ওর। খচমচ শব্দটা আবারও হচ্ছে। আবার ফিরে আসছে জানোয়ার দুটো। প্রথমে খরগোশটাকে দেখা গেল। এক দৌড়ে একটা গর্তের মধ্যে ঢুকে পড়ল ওটা। পরমুহূর্তেই হাজির হলো শিয়ালটা। তবে দেরি করে ফেলেছে সামান্য। শিকার হারিয়েছে বুঝতে পেরে হাল ছেড়ে দিতে বাধ্য হলো

ওটা। শিয়ালের ভঙ্গিতে জোরে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ঘুরে রওনা হয়ে গেল উল্টো দিকে।
অকারণ ভয় পেয়েছে ভেবে মনে মনে হাসল মুসা। তারপর আবার কাকতাড়ুয়ার খোঁজে যাত্রা শুরু করল।
ওদিকে যব খেতের মাঝ দিয়ে নিঃশব্দে এগোচ্ছে কিশোর। প্রতিটি পা ফেলছে সাবধানে। গর্তেটর্তে যাতে পড়ে না যায় সে-ব্যাপারে সতর্ক। এক জায়গার জমিন কাদায়। ওখানে পায়ের ছাপ চোখে পড়ল। ছাপগুলো চলে গেছে একটা ঝোঁপের দিকে। সেদিকটায় যব গাছগুলো আরও ঘন।
নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল কিশোরের। এ কাকতাড়ুয়ার পায়ের ছাপ হয়েই যায় না। ছাপগুলো যেখানে শেষ হয়েছে, সে-জায়গায় পা টিপে টিপে চলে এল সে। হঠাৎ যব গাছের পেছনে একটা আকৃতি দেখতে পেল। উপুড় করা বালতির মত টুপি পরা মূর্তি। কাকতাড়ুয়া!
মট করে কিশোরের পায়ের নিচে একটা শুকনো ডাল ভাঙল। পাই করে ঘুরে দাঁড়াল কাকতাড়ুয়া। হার্টবিট বেড়ে গেল কিশোরের, গলা শুকিয়ে কাঠ।
মুসা! রবিন! জলদি এসো! কাকতাড়ুয়াটা এখানে! গলা লম্বা করে চিৎকার করতে লাগল কিশোর।
ওর কথা শেষ হবার আগেই ছুটতে শুরু করল ভৌতিক মূর্তিটা। পিছু নিল কিশোর। কাকতাড়ুয়ার পায়ের শব্দ ক্রমে ক্ষীণ হয়ে এল। অনেক দূরে চলে গেছে। তবে একটু পরেই আবার বাড়তে লাগল শব্দটা।
ওটা আমাকে লক্ষ্য করেই ছুটে আসছে, ভাবল কিশোর। এবার নির্ঘাত হামলা চালাবে। তবে আমিও ওকে ছাড়ছি না। জাপটে ধরব।
পায়ের শব্দ লক্ষ্য করে ছুটতে লাগল কিশোর। মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়েছে চাঁদ। অন্ধকার হয়ে গেছে যব খেত। এমন সময় কে যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর গায়ে। শক্ত হাতে জাপটে ধরল। কিশোরও ছাড়ল না। হামলাকারীকে সে-ও জাপটে ধরল প্রাণপণে। জড়াজড়ি করে দুজনেই পড়ে গেল মাটিতে। রীতিমত কুস্তি শুরু হয়ে গেল।
লড়াইয়ের একটা পর্যায়ে দুজনেই কুস্তির প্যাঁচ থেকে নিজেদেরকে ছাড়িয়ে নিল। হিংস্র আক্রোশে আবার পরস্পরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছে, তখুনি চাঁদ বেরিয়ে এল মেঘের আড়াল থেকে। এবং সেই সঙ্গে রবিনও এসে দাঁড়াল ওখানে। হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল একটা মুহূর্ত। পরক্ষণে চিৎকার করে উঠল, আরে কি করছ তোমরা? পাগল হয়ে গেছ নাকি? নিজেরা নিজেরাই মারামারি!
তোমাকে আমি কাকতাড়ুয়া ভেবেছিলাম! ঢোক গিলল মুসা।
আমিও তো তোমাকে কাকতাড়ুয়া ভেবেছি! হাঁপাচ্ছে কিশোর।

হাসতে শুরু করল রবিন।
হাসিটা সংক্রামিত হলো অন্য দুজনের মাঝেও।
তবে কাকতাড়ুয়াটাকে দেখেছি আমি, হাসি থামলে বলল মুসা। পালিয়েছে। ওটার চেহারা আর দেখব বলে মনে হচ্ছে না।
তবু আরেকবার খুঁজে দেখতে অসুবিধে কি? কিশোর বলল।
আপত্তি করল না কেউ। এবার একসঙ্গে থেকে খোঁজ চালাল ওরা। কিন্তু ব্যর্থ হলো অভিযান। কাকতাড়ুয়ার টিকিটিরও দেখা মিলল না। আবার আগের জায়গায়, কাঠের খুঁটির কাছে ফিরে এল তিনজনে।
অদ্ভুত ব্যাপার! কাকতাড়ুয়াটা আগের মতই খুটির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।
আবার কি বলবে ওটা? আপনমনে বিড়বিড় করল মুসা।
ওকে জিজ্ঞেস করো তো আমাদের পিছু নিয়েছে কেন? রবিনকে উদ্দেশ্য করে বলল কিশোর।
জিজ্ঞেস করল রবিন। জবাব মিলল না। কাকতাড়ুয়া নিশূপ।
ঠোঁট কামড়াল কিশোর। খামারবাড়িতে ফিরে যাব। ওখানে বসে সিদ্ধান্ত নেব এরপর কি করব।
যব খেতের শেষ মাথায় চলে এসেছে ওরা, গোটা আকাশ জুড়ে লকলকিয়ে উঠল বিদ্যুৎ। তীব্র আলোয় সাদা হয়ে গেল পুরো এলাকা।
পরক্ষণে বিকট শব্দে বাজ পড়ল। আঘাত হেনেছে পুরানো খামারবাড়িটিতে। বিস্ফোরিত হলো ছাদ। দাউ দাউ জ্বলে উঠল আগুন। লেলিহান শিখা এক লাফে উঠে গেল আকাশে।
দৃশ্যটা আতঙ্কিত করে তুলল গোয়েন্দাদেরকে। তবু বাড়ি লক্ষ্য করে ছুটল ওরা। বাড়ির কাছে এসে দেখল ওটা জ্বলন্ত চুল্লিতে পরিণত হয়েছে। ধসে পড়েছে ছাদ, কড়ি-বর্গা দাউ দাউ করে জ্বলছে, জ্বলন্ত তক্তা দুড়ম-দাড়ম শব্দে ছিটকে পড়ছে মাটিতে।
আগাছায় ভরা ড্রাইভওয়েতে থমকে দাঁড়াল ওরা। আগুনের ভীষণ তেজ। কাছে যাওয়া যায় না।
আমাদের কিছু করার নেই, বিড়বিড় করল মুসা। বাড়িটা গেছে।
ভাগ্যিস বাজ পড়ার সময় বাড়ির ভেতরে ছিলাম না। শিউরে উঠল কিশোর! কাকতাড়ুয়ার পিছু না নিলে এতক্ষণে পুড়ে কাবাব হয়ে যেতাম।
বাড়িটার শেষ পরিণতি তাহলে এভাবেই ঘটল, কে যেন এলে উঠল পেছন থেকে। চট করে ঘুরল ওরা। একজন লোক। একটা পিকআপের জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখছে। বাড়ি ধসে পড়ার শব্দে গাড়ির আওয়াজ শুনতে পায়নি ওরা।

পিকআপ থেকে বেরিয়ে এল আগন্তুক। ওদের সামনে এসে দাঁড়াল।
আমি হ্যারি হ্যারিসন, নিজের পরিচয় দিল সে। পাশের খামারবাড়িটা আমার। ফায়ার ডিপার্টমেন্টকে ফোন করেই দৌড় দিয়েছি। এখুনি চলে আসবে। কিন্তু তোমরা কারা?
নিজেদের পরিচয় দিল তিন গোয়েন্দা। জানাল ওদের গাড়িটা নষ্ট হয়ে পড়ে আছে রাস্তার ধারে।
ও বাড়িতে ঢুকেছিলাম ফোন করার আশায়। গ্যারেজে গাড়িটা নেয়ার জন্যে সাহায্য দরকার, কিশোর বলল। কিন্তু বাড়িতে ঢুকে কাউকে দেখলাম না।
কাঁধ ঝাঁকাল কম্পটন। কোত্থেকে দেখবে? বিশ বছরে কেউ এসেছে নাকি ও বাড়িতে। খালি পড়ে ছিল। ভাড়াও দিতে পারছিলাম না। বহুকাল আগেই কে জানি গুজব ছড়িয়ে দিয়েছে, ভূত বাস করে বাড়িটাতে। জায়গাটা আমার। ভাড়া দিতে না পেরে শেষে বিক্রি করে দেয়ার কথা ভাবছিলাম গত কয়েক দিন ধরে। কিন্তু হলো না। বাড়িটা তো গেল। একটা পয়সাও আর পাওয়া যাবে না ওটা থেকে। জমিটাই যা ভরসা এখন। তবে এক হিসেবে ভালই হয়েছে। বাড়িটার জন্যে জমিটাও বিক্রি করতে পারছিলাম না।
যে প্রশ্নটা এতক্ষণ ধরে খেচাচ্ছিল কিশোরকে, এবার জিজ্ঞেসই করে ফেলল সে, আপনি নিজেও কি ঢোকেননি এ বাড়িতে?
তা ঢুকেছি। গত কালই তো কিচেনে ঢুকেছিলাম একটা কাজে। কেন?
রান্নাঘরে পায়ের ছাপ দেখেছি।
লিভিং রুমে খড়ও পড়ে থাকতে দেখলাম, মুসা যোগ করল।
আমি মাঠ থেকে গিয়ে সরাসরি বাড়িতে ঢুকেছি, জানাল হ্যারি হ্যারিসন। জুতোয় খড়-টড় লেগে ছিল বোধহয়।
যব খেতটার মালিকও নিশ্চয় আপনি? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
হ্যাঁ। আমার নতুন খামারবাড়ি ওই পাহাড়টার পেছনে।
*
সকাল হয়ে গেছে। বজ্রাঘাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত খামারবাড়ি এখন স্রেফ অঙ্গারের এক স্তূপ। পোড়া আবর্জনার ফাঁকে লকলকে জিভ বের করছে অগ্নিশিখা। ইতিমধে দমকলের একটা গাড়ি চলে এসেছে। কি ঘটেছে অল্প কথায় দমকল অফিসারকে জানিয়ে দিল হ্যারিসন। তারপর ফিরল তিন গোয়েন্দার দিকে।
এখানে আর কিছু করার নেই আমাদের। আমার বাড়িতে চলো। নাস্ত খাবে।
মুচকি হাসল মুসা, নাস্তা পেলে মন্দ হয় না। রবিনের দিকে তাকাল। কি বলো?
নীরবে ঘাড় কাত করে সায় জানাল রবিন। মুখে হাসি।

কিশোর বলল, খিদেয় আমারও পেট চোঁ চোঁ করছে। সারাটা রাত যব খেতে যে হারে ছোটাছুটি করলাম।
হ্যারিসন ওদের নিয়ে পিকআপে উঠল। সামনে জায়গা হলো না চারজনের রবিন বসল সামনে। কিশোর আর মুসা পেছনের খোলা জায়গায়।
ড্রাইভিং সীট থেকে মুখ বের করে পেছনে তাকিয়ে হ্যারিসন বলল, নাস্ত খেয়ে তোমাদের গাড়ি গ্যারেজে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেব।
শুনে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল তিন গোয়েন্দা।
যাবার পথে রবিন বলল, কাল রাতে যব খেতে কার যেন চিৎকার শুনলাম।
আমার চিৎকার শুনেছ, হ্যারিসন জানাল। কুকুরটাকে ডাকবে বেরিয়েছিলাম আমি। খরগোশ দেখলেই তাড়া করে ওটা।
মাঠে যা একটা কাকতাড়ুয়া বসিয়েছেন না!
হেসে উঠল হ্যারিসন। কেউ ভয় পায় না। এমনকি কাকেরাও না।
তবে আমরা পেয়েছি!-মনে মনে বলল রবিন।
কাকতাড়ুয়ার পোশাকটা কিন্তু অদ্ভুত, আলাপ চালিয়ে গেল সে।
মজা করার জন্যে ওগুলো পরিয়েছি ওটাকে, বলল হ্যারিসন। নিলামে পাওয়া কোট-প্যান্ট, জুতোজোড়াও।
এরপর বাকি রাস্তাটুকু আর বিশেষ কথা হলো না। বাইরের দিকে তাকিয়ে গত রাতের কথা ভাবতে লাগল রবিন। ঘটনাগুলো যে সত্যি ঘটেছে, দিনে আলোয় এখন বিশ্বাস করা কঠিন।
মিসেস হ্যারিসন তাঁর স্বামীর মতই ভাল মানুষ। উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালে গোয়েন্দাদেরকে। পেট পুরে নাস্তা খাওয়ালেন। রকি বীচ চেনেন তিনি ছোটবেলায় বহু বুছর থেকেছেন। সে-সব নিয়ে গল্প করলেন ওদের সঙ্গে।
নাস্তা খেয়ে মিসেস হ্যারিসনকে ধন্যবাদ দিয়ে বাড়ি থেকে বেরোল ওরা মিস্টার হ্যারিসন আবার ওদের নিয়ে এল ওদের গাড়ির কাছে।
স্পোর্টস সেডানটা আগের মত ঠায় দাঁড়িয়ে আছে খাদের পাশে। কম্পট ওদের গাড়ির সামনের বাম্পারে একটা রশি বাধলেন। রশির অন্য প্রান্তটা বেঁধে নিলেন নিজের গাড়ির পেছনে। তারপর টেনে নিয়ে রওনা হলেন গ্যারেজে। মুসা বসল তাদের গাড়িতে, হুইল ধরে। কিশোর আর রবিন উঠল পিকআপের পেছনে। দুই পাশের চমৎকার প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে দেখতে চলল।
মাইল দশেক যাবার পরে গ্যারেজের দেখা মিলল। ওদেরকে সাহায্য করার জন্যে হ্যারিসনকে বারবার ধন্যবাদ দিল তিন গোয়েন্দা। সময় আর গাড়ির পেট্রোল খরচ করার জন্যে টাকা সাধল। কিন্তু নিলেন না হ্যারিসন। বললেন, ওদের সাহায্য

করতে পেরে তিনি খুশি। তারপর পিকআপ নিয়ে রওনা হয়ে গেলেন বাড়ির দিকে।
কিশোরদের ভাড়া করা গাড়িটা পরীক্ষা করে দেখল গ্যারেজের মেকানিক। সমস্যাটা ফুয়েল পাম্পে। সারিয়ে দিল ত্রুটিটা। জ্যান্ত হয়ে উঠল ইঞ্জিন। গাড়িতে উঠে পড়ল তিন কিশোর। হুইল ধরল মুসা।
আবার সেই যব খেতের সামনে দিয়েই তো যেতে হবে, তাই না? জিজ্ঞেস করল মুসা।
মাথা ঝাঁকাল কিশোর।
কাকতাড়ুয়াটাকে আবার দেখতে পারব কিনা কে জানে!
হাতের চেটো দিয়ে থুতনি ঘষতে ঘষতে বিড়বিড় করল রবিন, কিশোর, ওই কাকতাড়ুয়াটাই কিন্তু এবার আমাদের জীবন বাঁচাল।
মাথা ঝাঁকাল মুসা। যেন বাড়িটাতে বাজ পড়বে যে তা সে আগে থেকেই জানত। ওই বাড়ি থেকে আমাদের দূরে থাকতে সাবধান করেছিল। কিন্তু তারপরেও বাড়িতে ঢুকেছি দেখে কৌশলে বের করে এনেছিল।
সশব্দে নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। এত সব চালাকি না করে আমাদেরকে বিপদটার কথা সরাসরি জানিয়ে দিলেই পারত।
তারমানে সন্দেহ আছে তোমার? রেগে গেল মুসা। তুমি আসলেই বড় অকৃতজ্ঞ।
হেসে ফেলল কিশোর। ভূতের কাছে কৃতজ্ঞ হতে বলছ?
আর কোন কথা না বলে নীরবে গাড়ি চালাল মুসা।
যব খেতের সামনে চলে এল। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কাকতাড়ুয়াটাকে কাঠের খুঁটির সাথে বাঁধা অবস্থায় আগের মত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল।
নামবে নাকি? ঠাট্টার সুরে বলল কিশোর। প্রাণ বাঁচানোর জন্যে ওকে একটা ধন্যবাদ দিয়ে আসি?।
মুখটা গোমড়া করে রাখল মুসা। জবাব দিল না।
যব খেতের দিকে তাকিয়ে আছে তিনজনেই। পাশ দিয়ে যাবার সময় মনে হলো কাকতাড়ুয়াটা হাসছে ওদের দিকে চেয়ে। তবে ক্রুর হাসি নয়, বোকা বোকা হাসি।
অলস ভঙ্গিতে আন্ডারগ্রাউন্ড আটলান্টায় ঘুরে বেড়াচ্ছে তিন গোয়েন্দা। বেড়াতে এসেছে রাশেদ পাশার সঙ্গে। তিনি এসেছেন জরুরী কাজে।
রাস্তার মাটির নিচে কিছু দোকানপাট আর ডিপার্টমেন্টাল স্টোর নিয়ে গড়ে উঠেছে জায়গাটা।
একটা দোকান থেকে লেটেস্ট হিট অ্যালবাম কিনেছে রবিন। কিশোরের হাতে বুকস্টোর থেকে কেনা একটা ব্যাগ। মুসা কিছুই কেনেনি। ইয়া বড় এক কোণ আইসক্রীম খাচ্ছে।

বাপরে, চারটে বাজে, ঘড়ির দিকে তাকাল কিলোর। চলো, হোটেলে চলে যাই। গোসল করা দরকার। চাচার সাথে সাড়ে ছটায় ডিনার। মনে আছে?
মাথা ঝাঁকাল মুসা আর রবিন দুজনেই। মনে আছে।
অদ্ভুত দোকানটা মুসার চোখে পড়ল প্রথমে। দোকানের সামনে বড় একটা জানালা। কালো রং করা। এক কোনায় প্রমাণ সাইজের একটা নরকঙ্কাল ঝুলছে। ডিসপ্লেতে ঝাড়ফুক, ভূত-প্রেত, জাদু-মন্ত্র ইত্যাদির ওপরে নানা বই সাজানো।
অ্যাই, কিশোর, আঙুল তুলে দেখাল মুসা, দেখো দেখো, সাইনবোর্ডটা: এখানে হাত দেখা হয়। চলো না, আমাদের ভাগ্যে কি আছে জেনে আসি।
মুচকি হাসল কিশোর। আবারও ভাগ্য গণনা! গত বারের কথা ভুলে গেছ? জ্যোতিষী ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল, আমাদের মাথায় শিং গজাবে। তিনজনেরই।
সম্ভাবনা এখনও ফুরিয়ে যায়নি, হাসল রবিন। এবার হয়তো বলবে লেজ গজাবে।
স্টোরের ভেতরে ঢুকল ওরা। ডাইনীর গুহার আদলে সাজানো হয়েছে ঘরটা। মৃদু আলো ধীরে ধীরে রঙ বদলাচ্ছে, আশপাশের সব কিছু ভূতুড়ে লাগছে। ব্যাকগ্রাউন্ডে বাজছে রোমাঞ্চকর মিউজিক। ঘরের দেয়ালে অদ্ভুত সব জিনিস সাজানো। কতগুলো বার দেখা গেল। সেগুলোতে নানা ধরনের লেবেল সটানোপ্রেমের আরক, ঘৃণার আরক, কর্মজীবনে উন্নতির আরক, ইত্যাদি। বড় বড় ভোলা পাত্র আছে কতগুলো। অদ্ভুত সব জিনিসে ভরা। লেখা দেখে বোঝা যায় ওগুলোতে আছে কুকুরের চুল, গোসাপের চোখ, ময়ূরের যকৃৎ, সাপের খোলস এবং ম্যানড্রেক গাছের শিকড়।
শুকনো মাথাগুলো দেখো, একটা কাঁচের বাক্সে আঙুল দিয়ে দেখাল মুসা। ভয়ঙ্কর লাগছে না?
সাবধান না হলে আমাদের দশাও ওগুলোর মতই হতে পারে, ঠাট্টা করল কিশোর।
মুসা বলল, জায়গাটা জানি কেমন লাগছে আমার। ঠিক বোঝাতে পারব না
হুঁ, তা ঠিক, মাথা দোলাল রবিন। এই ভূতুড়ে আবহর মধ্যে গা ছমছম করছে ওরও; ভয়ের কিছু নেই, এখানকার সব কিছুই সাজানো, নিজেকে মনে করিয়ে দিল ও।
মনে হচ্ছে যেন অ্যাজটেকের মন্দির। বলি দেয়ার ঘর, মন্তব্য করল কিশোর। এদিক ওদিক তাকাল। কিন্তু কেউ নেই নাকি এখানে?
যেন তার কথার জবাবেই খসখসে একটা কণ্ঠ ভেসে এল ঘরের দূর প্রান্ত থেকে। কি চাই?
পাক খেয়ে ঘুরে গেল ওরা। দেখল ছায়ার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে এক মহিলা। পরনে গোড়ালি ঢাকা কালো আলখেল্লা, লম্বা কালো চুল ঢেকে রেখেছে

মুখের একটা পাশ। মহিলার কালো চোখের তির্যক দৃষ্টি, সবুজ আইশ্যাডো আর ঠোঁটের লাল টকটকে লিপস্টিকে তাকে ভ্যাম্পায়ারের মত লাগছে।
হাত দেখাতে চাই, ভয়ে ভয়ে বলল মুসা। কত লাগবে?
দশ ডলার, জবাব দিল মহিলা।
আমার কাছে চার ডলার আছে, বলল মুসা। চলবে এতে?
ইঙ্গিতে কিশোর আর রবিনকে দেখিয়ে মহিলা বলল, তোমার বন্ধুদের কাছ থেকে নিতে পারো না?
তিনজনে মিলিয়ে তিরিশ তো? মাথা নাড়ল কিশোর। আমাদের কাছেও অত টাকা নেই। চলো, মুসা, আজ আর হাত দেখানো হলো না।
হাত তুলল মহিলা। তাড়াতাড়ি বলল, দাঁড়াও দাঁড়াও। তোমাদেরকে আমার ভাল লেগেছে। যা আছে, তাতেই দেখে দেব। কে আগে দেখাবে রু কুঁচকে কিশোরের দিকে তাকাল মহিলা। তুমি?
মাথা কাত করল কিশোর। আমার আপত্তি নেই।
এসো আমার সঙ্গে।
দরজার পর্দা সরিয়ে ওদেরকে নিয়ে পেছনের ঘরে ঢুকল মহিলা।
খাইছে! চমকে গেল মুসা।
এ ঘরটা আগেরটার চেয়েও ভূতুড়ে। পুরো ঘর কালো মখমলে মোড়া। একটা বেগুনি রঙের বাতি জ্বলছে। সেই আলোতে সবার দাঁত আর চোখের মণিও বেগুনি দেখাল। ভয়ঙ্কর লাগল তাতে। হঠাৎ করেই মনে হতে লাগল তিন গোয়েন্দার, এখান থেকে আর বেরোতে পারবে না কোনদিন। সময় থাকতে পালাবে কিনা চিন্তা করতে লাগল মুসা। কিন্তু মহিলা ততক্ষণে নিচু একটা টেবিলে বসে পড়েছে। কিশোরকে ইশারা করল তার পাশে বসতে। টেবিলটা কালো মখমলে মোড়া। ওপরে একটা কাঁচের বড় বল।
কিশোরের হাতের তালু মেলে ধরল মহিলা। চেয়ে রইল অনেকক্ষণ। টেবিলের সামনে দুটো কুশনে বসেছে রবিন আর মুসা। গভীর আগ্রহ নিয়ে দেখছে মহিলার কাজকর্ম।
তোমার বয়স আঠারো, কিশোরের হাত দেখে অবশেষে বলতে শুরু করল মহিলা। তুমি সাগরের ধারের কোনও শহরে, বড় একটা বাড়িতে বাস করো। সাংঘাতিক বুদ্ধিমান তুমি, ছাত্র হিসেবে ভাল, ইলেকট্রনিক জিনিসপত্র আর কম্পিউটারে আগ্রহ। আরও একটা কাজে তুমি খুব দক্ষ, কারও ওপর নজর...অর্থাৎ সতর্ক দৃষ্টি রাখা...।
এক টুকরো কাগজ আর পেন্সিল নিল সে। তোমার জন্ম তারিখ কবে বলো।

বলল কিশোর। মহিলা তারিখটা লিখে কাগজের ওপর কতগুলো লাইন টানল। লাইনগুলো কাটাকুটি করে তারপর আঁকল একটা বৃত্ত।
ক্রিস্টাল বলের দিকে তাকাও! হঠাৎ বলে উঠল সে।
তাকাল কিশোর। তবে ভেতরে ভেতরে সতর্ক। জানে ক্রিস্টাল বল দিয়ে জ্যোতিষীরা সম্মোহন করে ফেলে।
কিন্তু মহিলা সম্মোহন করল না কিশোরকে। সে-ও চেয়ে রইল ক্রিস্টাল বলের দিকে। ঝাড়া এক মিনিট ওদিকে তাকিয়ে থাকার পরে উত্তেজিত হয়ে উঠল সে।
তুমি গোয়েন্দা! রেগে গেছে মহিলা। তোমরা এখানে কেন এসেছ? আমার লাইসেন্স আছে। আমি অন্যায় কিছু করছি না। পুলিস আমার কিছু করতে পারবে না।
আমি পুলিসের লোক নই, ম্যাম, তাকে আশ্বস্ত করল কিশোর। আমরা আসলে শখের গোয়েন্দা। আপনার কাছে এসেছি শুধুই হাত দেখাতে। অন্য কোন মতলব নেই আমাদের।
অ! স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মহিলা। তাহলে আর কোন সমস্যা নেই। আমার কাছে অনেক প্রাইভেট ডিটেকটিভ আসে। আমি তাদের নানা সাহায্য করি। দরকার হলে তোমরাও আমাকে ভাড়া করতে পারো। তোমাদের রহস্য উঘাটনে অনেক সাহায্য করতে পারব।
মনে হচ্ছে আপনার সেই ক্ষমতা আছে, সন্দিহান সুরে বলল কিশোর। আপনি আমাকে আগে কখনও দেখেননি। অথচ আমার সম্পর্কে সব বলে দিলেন।
আসলে পত্রিকায় আমাদের ছবি দেখেছে, রবিন বলল। পত্রিকায় আমাদের কেসের কথা তো মাঝে মাঝেই ছাপা হচ্ছে।
কড়া চোখে রবিনের দিকে তাকাল মহিলা। চেঁচিয়ে উঠল, তোমাদের নামও কোনদিন শুনিনি আমি। যা বলেছি, আমার জাদুর ক্ষমতার জোরেই বলেছি। আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না, না? ঠিক আছে। হাত দেখা শেষ করি আগে। তারপর ঠিকই বিশ্বাস করবে।
আবার ক্রিস্টাল বলের দিকে তাকাল মহিলা। আমি মোটর সাইকেল দেখতে পাচ্ছি। দুটো মোটর সাইকেল। তোমাদের মধ্যে একজনকে পেছনে বসিয়ে আনা হয়েছে। আবার উত্তেজিত শোনাল তার কণ্ঠ। গোয়েন্দাগিরি তোমরা আগেও বহুবার করেছ। তবে এবার তোমাদের সামনে বিপদ দেখতে পাচ্ছি আমি। ভয়ানক বিপদ!
অ্যাক্সিডেন্ট? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
না। নতুন কোন কেসে জড়িয়ে পড়বে তোমরা। দেখতে পাচ্ছি-দেখতে পাচ্ছি এক চোখো একটা লোককে। নীল চোখ। সাদা গাড়িতে চড়ে সে। খুবই বিপজ্জনক

লোক। তার ধারে কাছেও যেয়ো না। লোকটার কাছ থেকে সব সময় দূরে থাকবে।
মহিলার কণ্ঠ ভীষণ জোরাল হয়ে উঠল, চেহারা দেখে মনে হলো সমাধিস্থ হয়ে পড়েছে সে। চোখ বোজা। যেন জানে না, কাথায় আছে।
সিলভার স্টার থেকে সাবধান! ফিসফিস করল সে। ওখানে যেয়ো না।
সিলভার স্টার কি? প্রশ্ন করল রবিন।
জবাব দিল না মহিলা। খামচে ধরল কিশোরের হাত। ব্যথা পেল কিশোর।
এক চোখো লোকটার কাছ থেকে সাবধান! ভারী নিঃশ্বাস পড়ছে মহিলার। সিলভার স্টার থেকে সাবধান! আমি...আমি সোনা দেখতে পাচ্ছি। অনেক সোনা। কিন্তু ওই সোনা অশুভ। ধরতে যেয়ো না। ধরলে...ধরলে মৃত্যু হবে! ওই সোনাকে ঘিরে আছে মৃত্যু আর...।
হঠাৎ চোখ খুলল মহিলা। বিস্ফারিত চাউনি। কিশোরের দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে চেঁচিয়ে উঠল, সিম্বু! সিম্বু আছে ওখানে! ওর কাছে যেয়ো না! তারপরই চোখ উল্টে দিয়ে, অজ্ঞান হয়ে কালো মখমলে ঢাকা মেঝেতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল সে।
সর্বনাশ! চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। মুসা, রবিন-দেখো তো এখানে পানি টানির ব্যবস্থা আছে কিনা। পানি নিয়ে এসো।
জ্যোতিষীর জ্ঞান ফেরাতে চেষ্টা করতে লাগল কিশোর। সিঙ্ক থেকে তোয়ালে ভিজিয়ে নিয়ে এল রবিন। ভেজা তোয়ালে দিয়ে তার মুখ মুছে দিতে লাগল কিশোর।
প্রথমে ভেবেছিলাম ভঙ্গি ধরেছে, কিশোর বলল। এখন তো দেখি সত্যি সত্যি বেহুশ।
কিন্তু মহিলা কি যেন বলছিল? রবিনের কণ্ঠে উদ্বেগ।
হুঁশ ফিরলে জিজ্ঞেস করব, বলল কিশোর।
কিছুক্ষণ পরে চোখ মেলে তাকাল মহিলা।
আপনি ঠিক আছেন তো? উকণ্ঠিত গলায় জানতে চাইল কিশোর।
ধীরে ধীরে মাথা দোলাল জ্যোতিষী। ভীষণ শক্তিশালী কম্পন অনুভব করছি আমি!... যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আটলান্টা ছেড়ে চলে যাও তোমরা। তোমাদের অনুরোধ করছি আমি।
সিম্বুটা কে? কিশোরের প্রশ্ন।
কে, জানতে চাও? আস্তে উঠে দাঁড়াল মহিলা। এসো আমার সঙ্গে।
তিন গোয়েন্দাকে নিয়ে বাইরের ঘরে চলে এল সে।
শেলফ থেকে কিশোরকে একটা বই বের করে দিল মহিলা। এটা পড়ো। সিম্বু কি জানতে পারবে। না, দাম দিতে হবে না। বইটা তোমাদের এমনিই দিলাম। এখন

যাও। আর কোনদিন এদিকে এসো না। আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি, তোমাদের ভাগ্য খারাপ!
জবাবে কিছু বলতে যাচ্ছিল কিশোর, মহিলার চেহারা দেখে চুপ হয়ে গেল। ভয় ফুটে আছে মহিলার মুখে। তাতে কোন ভণিতা নেই।
চলো, দুই সহকারীকে নিয়ে দরজার দিকে পা বাড়াল কিশোর। দরজার কাছে গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। হাত নেড়ে মহিলাকে বলল, গুড-বাই। অ্যান্ড থ্যাংক
উফ, বাঁচলাম! অদ্ভুত দোকানটা থেকে বেরিয়ে এসে যেন হাঁপ ছাড়ল মুসা। অভিজ্ঞতা একটা হলো বটে!
রবিন বলল, তুমিই তো ঢুকতে চাইলে।
চিন্তিত ভঙ্গিতে ঠোঁট কামড়াল কিশোর। কি যেন রয়েছে ওই মহিলা আর তার দোকানের মধ্যে। আরেকটু হলেই বিশ্বাস করে ফেলেছিলাম তার কথা।
ভুরু কুঁচকাল মুসা। অবাক। তারমানে করোনি?
*
হোটেলে ফিরে কিশোর গেল বাথরুমে। মুসা বিছানায় চিৎ। আর রবিন শুয়ে শুয়ে মহিলার দেয়া বইটা পড়তে শুরু করল।
বইটা ভুডু চর্চার ওপরে লেখা।
ভুডু-তত্তের জন্ম আফ্রিকায় হলেও হাইতি দীপে এই রহস্যময় ধর্মীয় বিশাস নিয়ে চর্চা হয় বেশি। জাদুমন্ত্র, ঝাড়-ফুক, নরবলি এ সবের সাহায্যে কিভাবে বিন্নি অনুষ্ঠান করা হয় তার বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে বইটাতে।
গোসল সেরে বেরিয়ে এল কিশোর।
রবিন বলল, জাদু করে তোমাদের যে কারও হাত এখন ভেঙে দিতে পারি আনি। এ জন্যে শুধু একটা পুতুল দরকার হবে আমার। পুতুলের হাতে সুচ ঢুকিয়ে দিলে মনে হবে তোমাদের হাতেও সুচ ঢুকে গেছে। বাবারে-মারে বলে চেঁচানো শুরু করবে।
লাফ দিয়ে উঠে বসল মুসা। না না, প্লীজ, এখন ওকাজটিও কোরো না ভাই! পাশা আঙ্কেলের সঙ্গে ডিনারের দাওয়াতটা আগে সেরে নিই। হাতে ব্যথা থাকলে খাওয়াটা আর জমবে না।
হেসে ফেলল কিশোর আর রবিন।
তবে, এ বিদ্যেটাতে যদি বিশ্বাস না থাকে তোর, বলল রবিন, তাহলে আর কোন ভয় নেই। তোমার ক্ষতি হবে না।
অ! স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মুসা। তাহলে এটা কি আর এমন ক্ষমতা হলো। পচা জাদু।

সিম্বু কি জিনিস জানতে পেরেছ? আলমারি থেকে পরিষ্কার একটা শার্ট বের করল কিশোর।
ছোট, মোটাসোটা একটা পুতুলের নাম সিম্বু, রবিন বল। ভয়ঙ্কর চোখ জোড়া কোটর ঠেলে বেরিয়ে আছে বাইরে। এই যে, ছবিও আছে।
তার কাঁধের ওপর দিয়ে তাকাল কিশোর। সিম্বু দুহাত শূন্যে তুলে রেখেছে। প্রতিটি হতে দশটা করে আঙুল। পা জোড়া ফাঁক করা। পায়ে দশটা করে মোট বিশটা আঙুল। কোমরে চওড়া বেল্ট।
বাপরে, চেহারা বটে। মন্তব্য করল কিশোর। তা এই সিম্বুটা আসলে কে?
দুর্লভ একটা চরিত্র, ব্যাখ্যা করল রবিন। সিম্বু তার মনিবের ধনসম্পদ পাহারা দেয়। এ ধরনের পুতুল এখন পাওয়া যায় না বললেই চলে। সগ্রাহকদের কাছে খুবই মূল্যবান বস্তু। ইদানীং সিম্বুর আদলে বেশ কিছু মূর্তি তৈরি করা হয়েছে। তবে কোনটাই আসল সিম্বুর ধারে কাছে যেতে পারেনি। বইটা কিশোরকে দিল ও। নাও, তুমি পড়তে থাকো। আমি এই ফাঁকে গোসলটা সেরে আসি।
কিশোর বসল বই নিয়ে। মুসাকে পড়ে শোনাল, সিম্বুর কাজ হলো সব সময় তার প্রভুর পাশে থাকা, তাকে শয়তানের হাত থেকে রক্ষা করা। কেউ সিম্বুর ক্ষতি কিংবা সে যাকে পাহারা দেয় তার ক্ষতির চেষ্টা করলে, মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটিয়ে ছাড়ে।
একবার হাইতিতে দুটো সিম্বু পুতুল পাওয়া গিয়েছিল। মিউজিয়ামে বিক্রি করে দেয়া হয়েছিল ওগুলো। তার পর থেকেই ঘটতে শুরু করল অঘটন। যারা ওগুলোকে খুঁজে পেয়েছিল, রহস্যময় ভাবে ভয়ঙ্কর মৃত্যু ঘটল তাদের। তাতেও অঘটন বন্ধ হলো না। মিউজিয়ামের পানির পাইপ বিস্ফোরিত হতে লাগল, হাতের ভারী আস্তর খসে পড়ে কাঁচের বাক্স চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল। বাধ্য হয়ে শেষে যেখান থেকে পুতুল দুটো আনা হয়েছিল, ফিরিয়ে দিয়ে এল মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষ। অবশেষে বন্ধ হলো দুর্ঘটনা।
খানিক পরে মুসা আর রবিনকে নিয়ে হোটেলের লবিতে চলে এল কিশোর। রাশেদ পাশা ওখানেই আছেন। কিশোরের হাতে একটা ব্রীফকেস। ওতে তার কিছু প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র রয়েছে।
তিন গোয়েন্দাকে নিয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে এলেন রাশেদ পাশা। রাস্তায় নেমে হাত তুলে ট্যাক্সি ডাকলেন।
সিলভার স্টারে যাব, জানালেন তিনি ড্রাইভারকে।
কি! চমকে উঠল কিশোর। কোথায় যাচ্ছি?
এই তো কাছের একটা রেস্টুরেন্টে, বললেন রাশেদ পাশা। তোদের পছন্দ হবে। সিলভার স্টারের সী-ফুডও চমৎকার।

তিন গোয়েন্দা আর কিছু না বলে চুপচাপ উঠে বসল ট্যাক্সিতে। রেস্টুরেন্টে ঢুকে কোণের দিকে একটা টেবিল দখল করল। বিকেলের ঘটনাটা চাচাকে জানাল কিশোর।
সাদা গাড়িতে চড়ে নীল চোখো লোক? আনমনা ভঙ্গিতে বললেন রাশেদ পাশা। এক চোখো। মনে হয় বুঝতে পারছি মহিলা কার কথা বলেছে।
কার কথা? অবাক হলো কিশোর।
লোকটার নাম পিয়েরে দুপা, বললেন রাশেদ পাশা। নষ্ট একটা চোখ ঢেকে রাখে সাদা কাপড়ের টুকরো দিয়ে। সাদা মার্সিডিজ চালায়। ঠাণ্ডা মাথার ভয়ঙ্কর এক খুনী।
খাইছে! বলে উঠল মুসা।
যখন পেশাদার গোয়েন্দা ছিলাম, দুপার সাথে বেশ কয়েকবার টক্কর লেগেছে আমার, রাশেদ পাশা বললেন। কিন্তু লোকটা বাইন মাছের মত পিচ্ছিল। ওকে ধরার জন্যে জাল গুটিয়ে এনেছি যতবার, ততবারই ও জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে গেছে। ওর বিরুদ্ধে ডাকাতির বহু অভিযোগ এনেছি, লাভ হয়নি। সব সময় ফস্কে গেছে। মহা ধুরন্ধর এক লোক। তার কাজে যে-ই বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, পথের কাঁটা দূর করতে দ্বিধা করেনি কখনোই।
ওর বিশেষত্ব কি? জানতে চাইল কিশোর।
অ্যান্টিক চোর, জবাব দিলেন রাশেদ পাশা। বিবেক বর্জিত কিছু সগ্রাহকের কাছে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে, চড়া দামে। ধরা পড়ে যাবার ভয়ে অবশ্য ওসব সংগ্রাহক তাদের সংগ্রহের প্রদর্শনী করার সাহস পায় না কখনোই। কি এক সাংঘাতিক নেশায় যেন তবু কেনে ওরা।
মহিলা জ্যোতিষী সিম্বুর কথা বলেছিল, বলল কিশোর। আর সিম্বু হলো দামী অ্যান্টিক। সব খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে।
মাথা ঝাঁকালেন রাশেদ পাশা। তার কপালে ভাঁজ পড়ল। কিন্তু দুপা কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ। সিম্বুর অভিশাপ থেকে একশো হাত দূরে থাকার কথা তার। অবশ্য প্রচণ্ড লোভ তাকে কোন পর্যন্ত নিয়ে যাবে সেটা অনুমান করা কঠিন।
আঙ্কেল, জ্যোতিষী মহিলা যে সব ভবিষ্যদ্বাণী করল, সেগুলো কি বিশ্বাস হয় আপনার? জিজ্ঞেস করল মুসা।
শ্রাগ করলেন রাশেদ পাশা। কে জানে! হয়তো কিছু ঘটার আভাস পেয়েছে মহিলা। বাস্তব প্রমাণ। অভিশাপ, ভবিষ্যদ্বাণী-এ সব জিনিসে বিশ্বাস নেই আমার। তবে জগতে অব্যাখ্যাত বহু জিনিসই ঘটে। সব কিছুই হেসে উড়িয়ে দেবার উপায় নেই।

সিলভার স্টারে আসার পর থেকেই মনটা খচখচ করছে আমার, দীর্ঘশ্বাস ফেলল রবিন।
আমার ধারণা, কিশোর বলল, দুপা যতই কুসংস্কারাচ্ছন্ন হোক না কেন, সিম্বুকে পাবার লোভ ছাড়তে পারবে না কিছুতেই।
কিশোরের কথা কানে গেল না রবিনের। সে কিশোরের কাঁধের ওপর দিয়ে তাকিয়ে আছে, চোখ বড় বড় হয়ে উঠেছে বিস্ময়ে। রবিনের দৃষ্টি অনুসরণ করে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল কিশোর। হাঁ হয়ে গেল মুখ।
ওই তো সেই লোক? ফিসফিস করল সে। নীল চোখো লোকটা!
রাশেদ পাশাকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাতে হলো না। দুপা নিজেই এগিয়ে এল তাদের টেবিলের দিকে। মশিয়ে পাশা, আপনাকে আবার দেখে খুব খুশি হলাম, তার গলার স্বর তেলতেলে, বিরস।
কিন্তু তোমাকে দেখে আমি খুশি হতে পারিনি, দুপা, বললেন রাশেদ পাশা। কি চাও?
আপনারা আসার আগে এই টেবিলে এক বন্ধুকে নিয়ে বসেছিলাম আমি। সে একটা খাম নাকি ফেলে রেখে গেছে এখানে। খামটা কি আপনাদের চোখে পড়েছে?
না, পড়েনি, জবাব দিলেন রাশেদ পাশা।
কিছু মনে না করলে একটু উঠে দাঁড়াবেন দয়া করে? বলল লোকটা।
অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠে দাঁড়ালেন মিস্টার পাশা। দেখাদেখি তিন গোয়েন্দাও।
দুপা টেবিলের নিচে, চেয়ারের নিচে, গদির তলায় তন্নতন্ন করে খুঁজল। পেল না কিছুই। তার চেহারা কঠিন। বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত, মশিয়ে পাশা। তবে খামটা আপনাদের চোখে পড়ে গেলে, দয়া করে আমাকে পৌঁছে দিলে কৃতজ্ঞ থাকব। আমি জানি আপনার মত গণ্যমান্য ব্যক্তির ওপর ভরসা রাখা চলে, কি বলেন?
রাশেদ পাশা কটমট করে তাকালেন ট্রুপার দিকে। খামটা আমরা পাইনি।
তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল দুপার কণ্ঠ। আমি চাই না পুলিস ডেকে আপনার এবং আপনার ছেলেদের সার্চ করাই। চেয়ারের ওপর রাখা কিশোরের ব্রীফকেসের দিকে ইঙ্গিত করল সে। ওটাতে নেই তো?
রাশেদ পাশা বসে পড়েছিলেন, লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। ন্যাপকিনটা টেবিলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, আমি জানি না তোমার খামে কি আছে। তবে মনে হচ্ছে ওটা পড়তে পারলে খুশিই হবে পুলিস। যাও, ডেকে নিয়ে এসো পুলিসকে। আমরা অপেক্ষা করছি।

ঘেৎ-ঘোৎ করে উঠল দুপা, বিড়বিড় করে কি যেন বলল। বোধহয় গোয়েন্দাদের মজা দেখাবে বা এ রকম কিছু। তারপর জুতোর গোড়ালিতে ভর করে চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল। চলে গেল যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে।
এতে কি প্রমাণ হলো? রবিনের প্রশ্ন।
জ্যোতিষীর কাছে গেলে জবাব মিলতে পারে, ঠাট্টা করল কিশোর।
ব্যাপারটা অদ্ভুত, চিন্তিত ভঙ্গিতে বললেন রাশেদ পাশা। আমার ধারণা দুপা বা সিম্বুকে নিয়ে আরও ঘটনা ঘটবে।
সিম্বু সম্পর্কে আর কি জানো, চাচা? কিশোর জিজ্ঞেস করল।
আটলান্টা রাজ্যের অনেকেই জানে সিম্বুর কথা। গৃহযুদ্ধের আগে এই পুতুলটাকে নিয়ে একটা গুজব চালু হয়েছিল, রাশেদ পাশা বললেন। ধনী এক বুড়ো বাস করত এখনকার রুট থ্রী-এইটি রোডের ধারে, বিশাল এক বাড়িতে। আপনার বলে কেউ ছিল না বুড়োর। কালো চামড়ার এক চাকরকে নিয়ে থাকত বিশাল বাড়িতে। চাকরটাকে পছন্দ করত বুড়ো। চাকরটারও ছিল বুড়োর জন্যে জান-প্রাণ। ভুডু ম্যাজিকে বিশ্বাস করত চাকরটা। তার মালিককেও সে ভুডু চর্চায় উৎসাহিত করে তোলে। যা হোক, গৃহযুদ্ধ শুরু হলে ইউনিয়ন আর্মি হামলা চালায় দক্ষিণ এবং পুবে। বুড়ো তার ধন-সম্পদের কি দশা হবে তা ভেবে খুবই দুশ্চিন্তায় পড়ে যায়।
খুবই স্বাভাবিক, মুচকি হাসল কিশোর।
সোনার টাকা, মোহর-যা কিছু ছিল তার, সব গলিয়ে সোনার বার বানিয়ে মাটিতে পুঁতে রাখে বুড়ো। সে-সব পাহারা দেয়ার জন্যে ওগুলোর সঙ্গে রেখে দেয় একটা সিম্বু পুতুল। পুতুলটা বানিয়ে দিয়েছিল তার কালো-চাকর। ইউনিয়ন আর্মিকে ঠেকাতে পাথরের দেয়ালও তুলেছিল বুড়ো। কিন্তু ঠেকাতে পারেনি। সৈন্যরা বাড়িতে ঢুকে খুন করে বুড়ো আর তার চাকরকে। তবে যদ্দুর জানি, সোনা-দানার সন্ধান আজতক কেউ পায়নি।
দারুণ গল্প! রবিন বলল। সেই গুপ্তধনের খোঁজ করেনি কেউ?
করেছে নিশ্চয়। আমি জানি না, জবাব দিলেন রাশেদ পাশা। তবে কেউ ওগুলোর খোঁজ পেলে মূল্যবান সিম্বু পুতুলটাও পেয়ে যাবে।
তা পাবে, মুসা বলল। সেই সঙ্গে অভিশাপের শিকারও হওয়া লাগবে হয়তো।
নীরব হয়ে গেল চারজনেই। চুপচাপ খাওয়া শেষ করল।
তারপর এয়ারপোর্টে গেল তিন গোয়েন্দা, রাশেদ পাশাকে পৌঁছে দিতে। রাশেদ পাশা নিউ ইয়র্কে যাবেন বিশেষ কাজে।
যাবার পথে কেন যেন অস্বস্তি লাগতে লাগল কিশোরের। অদ্ভুত এক অনুভূতি। ট্যাক্সির রিয়ার ভিউ মিররে চোখ রেখে বলল, কেউ আমাদের পিছু নিয়েছে।

সামনের ট্রাফিক লাইটে দাঁড়াতেই চেনা গেল লোকটাকে। সাদা একটা মার্সিডিজ, কিশোরদের ট্যাক্সির প্রায় গা ঘেঁষে দাঁড়াল। এক চোখে সেই লোকটা।
হয়তো ভেবেছে তার খামটা মেরে দিয়েছি আমরা! নিচু স্বরে বলল রবিন।
মনে হয়, চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা দোলালেন রাশেদ পাশা। আমাদেরকে খুন করার ইচ্ছে থাকলেও অবাক হব না। সাবধানে থাকতে হবে। বিশেষ করে তোমাদের।...
আগামী কদিন কি প্ল্যান তোদের, কিশোর? কি করবি ভাবছিস?
কোস্টের দিকে যাব। সৈকতে ঘুরে বেড়াব। দেখি, আরও কি কি করা যায়।
যা-ই করিস, সাবধানে থাকিস। বলা যায় না...
আর কয়েক মিনিটের মধ্যে এয়ারপোর্টে পৌঁছে গেল ওরা। পিয়েরে ট্রুপার টিকিটিও দেখা গেল না আর আশেপাশে। চাচাকে প্লেনে তুলে দিয়ে আবার ট্যাক্সি নিল কিশোর। হোটেলে ফিরে এল তিন গোয়েন্দা। রাস্তার ওপারে দুপার গাড়িটা দেখতে পেল কিশোর।
লোকটা আসলে চায় কি? মুসার প্রশ্ন।
লোকটা বোধহয় ধরেই নিয়েছে আমরা তার খাম চুরি করেছি। তাই পিছু ছাড়ছে না, কিশোর বলল। লোকটার ওপর আমাদেরও নজর রাখতে হবে।
ট্যাক্সি ভাড়া চুকিয়ে হোটেলে ঢুকল ওরা। রুমে এসে ব্রীফকেসটা বিছানার ওপর ছুঁড়ে ফেলা কিশোর। ওটার দিকে তাকাতেই চোখ স্থির হয়ে গেল রবিনের।
কিশোর! ব্রীফকেসের নিচে কি যেন লেগে আছে। চিৎকার করে উঠল সে। কি এটা?
একটা খাম। আটকে আছে ব্রীফকেসের তলায়।
আরি! কিশোরও অবাক। এটা এল কোত্থেকে!
খামটা খুলে নিল সে। বুঝতে পেরেছি। ব্রীফকেসের গায়ে কোন ভাবে লেগে গিয়েছিল চিবানো চিউয়িং গাম। তাতে আটকে গেছিল খামটা। চেয়ারেই পড়ে ছিল ওটা, মিথ্যে বলেনি দুপা। বড়ই কাকতালীয় ঘটনা। এবং অদ্ভুত।
খোলো তো দেখি! তাড়া দিল মুসা। ভেতরে কি আছে দেখার জন্যে তর সইছে না আমার।
খাম খুলল কিশোর। ভেতরে জরাজীর্ণ, মলিন এক টুকরো কাগজ। তাতে অদ্ভুত কিছু কথা লেখা ছড়ার ঢঙে। কিশোর জোরে জোরে পড়ে শোনাল:
ভাবছ ওটা আছে হেথায়।
খুঁজলে পাবে নাকো সেথায়
পাহাড় বেয়ে ওঠা মাথায়
আবার নামে নিচে।
অনেক গভীর শিকড় যেথায়

পাহারা দেয় সিম্বু সেথায়
সোনা চুরির ফন্দি ছাড়ো
মানে মন কেটে পড়ো
নইলে আছে দুঃখ অনেক
বাঁচবে নাকো কেউ।
অবাক হয়ে গেল ওরা।
রাশেদ আঙ্কেল যে বুড়ো লোকটার গল্প বলেছে এটা নিশ্চয় তার কাজ। অবশেষে বলল রবিন। ওই লোক তার ক্রীতদাসের সাহায্যে সোনাদানা লুকিয়ে রেখেছিল। পাহারার ব্যবস্থা করেছিল সিম্বুকে দিয়ে।
জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে ধাপে ধাপে মিলে যাচ্ছে, ফাঁকা শোনাল মুসার কণ্ঠ। আমরা লোভে পড়ে গুপ্তধনের সন্ধানে বেরোলেই অভিশাপ নেমে আসবে আমাদের ওপর।
দূর, তোমার অভিশাপ! কে বিশ্বাস করে? মুখ ঝামটা দিল রবিন।
যা-ই বলল, অদ্ভুত কিছু যে ঘটছে এখানে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কি বলল, কিশোর?
চিন্তিত ভঙ্গিতে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে কাটতে ফিরে তাকাল কিশোর, হুঁ।
আমাদের এখন কি করা উচিত তাহলে? রবিনের প্রশ্ন।
হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল কিশোর। ব্যাপারটার শেষ দেখে ছাড়ব। সোনা যদি পেয়েই যাই পুলিস বা কোন চ্যারিটির হাতে তুলে দেব।
জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল কিশোর। দুপা ওদের দিকে নজর রাখছে কিনা দেখার জন্যে পর্দার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিল। বৃষ্টি শুরু হয়েছে, জানাল সে। আমাদের বন্ধুটি এখনও আগের জায়গায় দাঁড়িয়ে-না না, চলে যাচ্ছে। ভেবেছে হয়তো ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে আমরা কোথাও বেরোব না।
আকাশ ফুটো করে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামল। গাছের শাখায় ঝোড়ো হাওয়ার মাতামাতি।
চলো, এই সুযোগে বেরিয়ে পড়ি, প্রস্তাব দিল মুসা। রেইনকোট আছে। কাজেই ভিজতে হবে না বৃষ্টিতে। আর ক্যাম্পিং-এর জন্যে গর্ত খোঁড়ার কিছু যন্ত্রপাতি নিয়ে এসেছিলাম। ওগুলোও নেব সাথে।
প্রস্তাবটা মন্দ না, নিমরাজি হলো কিশোর। ঠিক আছে, চলো। চুপচাপ হোটেলে বসে থাকতে ভাল্লাগবে না। দেখেই আসি সিম্বুকে পাওয়া যায় কিনা।
কয়েক মিনিট পরে হোটেলের পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল ওরা। এখানে ওদের বাইক রেখেছে। সাবধানে মোটর সাইকেল দুটো নিয়ে উঠে এল মেইন

রোডে। তাকাল এদিক-ওদিক। নাহ্, সাদা মার্সিডিজের চিহ্নও নেই কোথাও। রাস্তা প্রায় জনমানবশূন্য। গন্তব্য বুড়োর বাড়ি।
ভাগ্য ভালই বলতে হবে। একটু পরেই থেমে গেল বৃষ্টি। মেঘ সরিয়ে দিয়ে হেসে উঠল ঝলমলে চাঁদ। নদীর ধারে চলে এসেছে ওরা। নদীর পাশের সরু রাস্তায় ঢুকে পড়ল। অনেকটা পথ যাবার পর চোখে পড়ল বুড়োর বাড়ি। রাস্তা মেরামতির কাজ চলছে। বড় বড় সব যন্ত্রপাতি। খানিক দূরে একটা পাথুরে দেয়াল। ঘিরে রেখেছে বুড়োর শতাব্দী প্রাচীন বাড়িটাকে। মোটর সাইকেল থামাল ওরা। হেঁটে ঢুকে পড়ল গেট দিয়ে। চাঁদটাকে আড়াল করে দিতে শুরু করেছে মেঘ। বাতাস উঠছে। একটু পরেই আবার নামল বৃষ্টি।
বাহু, দারুণ! বিরক্ত কণ্ঠে বলে উঠল মুসা। এই আসে এই যায়!
টর্চ জ্বেলে এগোচ্ছে ওরা। বড় বড় ওক গাছের ডালে ঝুলে থাকা এক ধরনের শ্যাওলার কারণে বিঘ্নিত হচ্ছে যাত্রা। টর্চের আলোতে খুব কম জায়গাই আলোকিত হচ্ছে।
কানের পাশে নিশাচর পাখি তীক্ষ্ণ গলায় ডেকে উঠে দারুণ চমকে দিল ওদেরকে। ডাকতে ডাকতে বৃষ্টির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। ঘ্যাঙর-ঘ্যাঙ কোরাস ধরেছে ব্যাঙ। হাঁটু ডুবে যাওয়া গভীর জলায় নেমে পড়েছে কিশোর। পায়ের নিচে পিচ্ছিল কি একটা কিলবিল করে উঠল। আঁতকে উঠল ও। এক লাফে উঠে এল তীরে।
কি হলো? জানতে চাইল রবিন।
সাপ! বিড়বিড় করল কিশোর। গোখরো! আরেকটু হলেই গেছিলাম।
পুরানো বাড়িটার কাছাকাছি এসেছে ওরা, এমন সময় মড়মড় করে একটা ডাল ভেঙে গেল। মুসা দেল ডালটা সোজা রবিনের গায়ে পড়তে যাচ্ছে। সাবধান করে দেয়ার সময় নেই। প্রচণ্ড এক ধাক্কা মারল রবিনকে। ছিটকে পড়ে গেল রবিন। বিশাল মোটা ডালটা এক সেকেন্ডের জন্যে তার শিকার হারাল। ডালটার দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠল রবিন। আরেকটু হলে আমিও গেছিলাম, খসখসে গলায় বলল ও।
কিশোরের দিকে তাকাল মুসা। সিম্বু পুতুলের কারণে মিউজিয়ামে দুর্ঘটনাগুলোর কথা মনে পড়ে গেছে তার। ফিরে যাবে নাকি?
নাহ? ওই তো সামনেই বাড়িটা।
ওটাকে এখন আর বাড়ি বলা যায় না। দেয়ালগুলো শুধু খাড়া হয়ে আছে, ছাদ অদৃশ্য। এবড়োখেবড়ো মেঝে। আবর্জনা, ভাঙা কাঠ আর অন্যান্য পরিত্যক্ত জিনিসপত্রে বোঝাই মাটির নিচের ঘরটা।
ভাবছ ওটা আছে হোথায়, খুঁজলে পাবে নাকো সেথায়, পাহাড় বেয়ে ওঠো মাথায়, আবার নামো নিচে, বিড়বিড় করে ছড়াটা আওড়াল কিশোর। ছোটখাট একটা

পাহাড়ের মত টিলার মাথায় চড়ে তরাইয়ের চারপাশে চোখ বোলাল। বেশির ভাগটাই সমতল।
নেমে কোন দিকে যেতে হবে? জানতে চাইল রবিন।
মনে হয় বাড়ির পেছন দিকে যেতে বলেছে। চলো, দেখে আসি।
দেখা গেল বাড়ির পেছন থেকে মাটি ঢালু হয়ে নেমে গেছে।
অনেক গভীর শিকড় যেথায়, পাহারা দেয় সিন্ধু সেথায়, এবার আবৃত্তি করল রবিন। কিসের শিকড়? এদিকে কোনও বড় গাছটাছ তো চোখে পড়ছে না।
রূট সেলারের কথা বলেনি তো? বলে উঠল কিশোর। ঠিক! তা-ই বুঝিয়েছে। সেলার শব্দটা ইচ্ছে করে বাদ দিয়েছে। গুপ্তধন শিকারীকে ধোকা দেবার জন্যে। রূট মানে শিকড়। সেলার বাদ দেয়াতে শুধু গাছপালাই খুঁজে বেড়াবে যারা গুপ্তধন খুঁজতে আসবে। আমরাও সেই ধোকায় পড়ে গিয়েছিলাম।...আগেকার দিনে ঘর-বাড়িতে রূট সেলার থাকত বলে জানতাম। লোকে শাক-সজি রাখত রূট সেলারে। তখন তো আর ফ্রিজ আবিষ্কার হয়নি।
তা ঠিক, মাথা দোলাল রবিন। প্রশ্ন হলো, রূট সেলারটা কোথায়?
চলো, ওই টিলায় উঠে লাফালাফি করি, বুদ্ধি দিল কিশোর। ফাপা হলে শব্দ শুনেই বোঝা যাবে।
কিন্তু টিলায় চড়ব কেন? মুসার প্রশ্ন।
পাহাড় বেয়ে ওঠো মাথায়, আবার নামে নিচে, বলে স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছে ছড়াকার, জবাব দিল কিশোর। সেজন্যেই উঠব। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ওই টিলার নিচেই কোনখানে আছে গুপ্তধন।
পাহাড়ের গায়ে লাফালাফি করতে গিয়ে কাদা মেখে ভূত হয়ে গেল তিনজনেই।
ঘণ্টাখানেক এ ভাবেই চলল। হঠাৎ মুসা বলে উঠল, দাঁড়াও। দাঁড়াও। এখানে ফাপা একটা আওয়াজ শুনেছি। খুড়ে দেখা যাক।
পরের আধঘণ্টা নিবিষ্ট মনে মাটি খুঁড়ে চলল তিন গোয়েন্দা। পরিশ্রমের ফল মিলল অবশেষে। মাটি সরে বেরিয়ে এল কাঠ। আধ চা কাঠে শাবল দিয়ে বার কয়েক গুতো মারতেই ভেঙে গেল। টর্চের আলোতে একটা গর্ত দেখতে লে ওরা। বারো ফুট মত গম্ভীর হবে। খালি গর্ত।
গুঙিয়ে উঠল মুসা। খামোকাই এত খাটলাম!
এক মিনিট, বলল কিশোর। এখানেই কোথাও আছে। নইলে এত খাটতে যেত না বুড়ো। রূট সেলারের কাঠের মেঝের নিচেই রেখেছে সোনার বারগুলো।
সঙ্গে করে আনা টুল কিট থেকে রশি বের করল কিশোর। রশির এক মাথায় হক লাগিয়ে মাটিতে গাঁথল। রশি বেয়ে প্রায় বারো ফুট নিচে নেমে এল। মেঝেতে

আবার ঠুকতে শুরু করল ফাপা আওয়াজ শোনার আশায়। এবার বেশিক্ষণ পরিশ্রম করতে হলো না। শুনতে পেল প্রত্যাশিত শব্দটা।
কুঠরির কাঠের তক্তা ভেঙে খুলে ফেলেছে ওরা, এ সময় রূট সেলারে ঢুকতে শুরু করল বৃষ্টির পানি। পরিস্থিতি আরও খারাপ করে দেয়ার জন্যেই যেন ওপরের একটা গর্তে জমা পানিও উপচে গিয়ে ঢাল বেয়ে গড়িয়ে পড়তে শুরু করল সেলারে।
দেখতে দেখতে গোড়ালি ডুবে গেল ওদের। ক্রমেই বাড়ছে পানি।
এখানে থাকলে তো দেখছি ডুবে মরব, মুখ অন্ধকার হয়ে গেছে রবিনের। জ্যোতিষীর কথাই শেষ পর্যন্ত ফুলে যাবে মনে হচ্ছে!
সত্যি চলে যেতে চাইছ? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
দেখি আরেকটু, গুপ্তধন পাওয়ার আশা কিশোরের মতই ছাড়তে পারল না রবিনও।
দেয়ালের আরেকটা তক্তা খুলে আনল মুসা। পাহাড়ের গায়ে একটা সুড়ঙ্গ চোখে পড়ল। উচ্চতায় পাঁচ ফুটেরও কম। ওপরের দিকে উঠে গেছে সুড়ঙ্গটা। ফলে পানি ওটার নাগাল পাবে না।
বুড়ো এটা তৈরি করে রেখে গেছে, বলল কিশোর। জানত, বৃষ্টি হলে পানি ঢুকতে পারে। তাই এমন জায়গায় বানিয়েছে, যাতে পানি না জমে।
মাথা নিচু করে সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকে পড়ল ওরা। দশ ফুট যাবার পরে বাম দিকে মোড় নিল। ধীরে ধীরে এগোতে লাগল হামাগুড়ি দিয়ে।
কড়াৎ করে বাজ পড়ল। এবং ঠিক ওই মুহূর্তে অযাচিত ভাবে সিম্বুর মুখোমুখি হলো ওরা। একটা লোহার সিন্দুকের ওপর চুপ করে বসে রয়েছে ছোট্ট মূর্তিটা। হাঁ করে তাকিয়ে রইল তিনজনেই।
সিন্দুকে কি বারগুলো আছে?–সবার মনেই খেলে গেল একই প্রশ্ন।
বাক্সটা খুলব? ফিসফিস করে যেন নিজেকেই প্রশ্ন করল কিশোর।
কি-কি-কিন্তু, সিম্বুর অভিশাপ... ভয়ে কথা শেষ করতে পারল না মুসা।
বাক্সটা খুললে যদি...! রবিনও ভয় পাচ্ছে।
সিম্বুর কদাকার ছোট্ট মুখটার দিকে তাকিয়ে ভয় লাগছে ওদের। ফিসফিস করে বলল কিশোর, সিম্বু, আমরা তোমার কোন ক্ষতি করতে আসিনি। তোমার সোনা চুরি করার ইচ্ছেও আমাদের নেই। আমরা শুধু দেখতে চাই বাক্সের ভেতরে সোনাগুলো আছে কিনা।
আস্তে করে মূর্তিটা এক পাশে সরিয়ে রাখল কিশোর। বাক্স খোলার চেষ্টা করল। খুব মজবুত তালা। ওদের কাছে এই তালা খোলার যন্ত্র নেই।

এখন কি করা? সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে কিশোরের দিকে তাকাল রবিন। সিম্বুকে নিয়ে যেতে পারি আমরা…
কথা শেষ হলো না তার। বিকট শব্দে বাজ পড়ল আবার।
রূট সেলারে পানি জমছে জানা কথা, কিশোর বলল। বেশি দেরি করলে ভরে যাবে। বেরোনোর উপায় থাকবে না আমাদের। তারচেয়ে চলো এখন চলে যাই। কাল বৃষ্টির পানি নেমে গেলে আবার আসা যাবে। তালা খোলার যন্ত্র নিয়ে আসব কাল।
ঠিক বলেছ, সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল মুসা। স্বস্তি পেল সিম্বুর প্রহরায় রাখা সোনা দেখতে গিয়ে তাকে রাগিয়ে দিতে হলো না বলে।
প্যাসেজওয়ে ধরে পিছিয়ে এল ওরা। রূট সেলারে ঢুকল। পানিতে থই থই করছে সেলার।
গর্ত থেকে পানি রানোর ব্যবস্থা করতে না পারলে সকালের মধ্যে সেলার পুরো ডুবে যাবে, নিচের দিকে তাকিয়ে বলল কিশোর।
শাবল দিয়ে খুঁচিয়ে সেলার থেকে পানি সরে যাওয়ার জন্যে একটা মুখ তৈরি করল ওরা। সেলারের ছাত যাতে ভেঙে ধসে পড়তে না পারে, সেজন্যে তক্তা দিয়ে আটকে রাখার ব্যবস্থা করল।
করলাম তো, চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর, কিন্তু থাকবে কিনা জানি না। চলে, যাওয়া যাক।
দড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এল ওরা।
মোটর সাইকেলে চড়ে হোটেলে ফিরল ওরা। কারও নজরে পড়ল না। দুপার সাদা মার্সিডিজটাও দেখতে পেল না কোথাও।
ঘণ্টাখানেক পরে রকি বীচ থেকে অপ্রত্যাশিত একটা ফোন এল। কিশোরের চাচী মেরিচাচীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অ্যাক্সিডেন্ট করেছেন। অপারেশন লাগবে।
চাচাকে খবর পাঠাল কিশোর। তক্ষণি বাড়ি যেতে তৈরি হলো। আফসোস করে বলল, সিম্বুর সোনা দেখা আর হলো না আমাদের। যাকগে, কি আর করা! চাচী ভাল হয়ে গেলে আবার আসব। এখন আমি এয়ারপোর্টে ফোন করছি টিকেটের জন্যে।
পরদিন সকালের ফ্লাইটের টিকেট পেল ওরা। এয়ারপোর্টে আসার পথে লক্ষ করল পিছু পিছু সাদা মার্সিডিজটাও আসছে।
বাজি ধরে বলতে পারি, আমাদেরকে চলে যেতে দেখে খুবই অবাক হচ্ছে দুপা, রবিন বলল।
*

মাসখানেক পরে তিন গোয়েন্দার হেডকোয়ার্টারে বসে গল্প করছে কিশোর, মুসা রবিন ও ওদের বন্ধু বিড ওয়াকার।
সিম্বুর গল্প শুনে বিড জিজ্ঞেস করল, সোনার বারগুলো দেখতে গিয়েছিলে আর?
গিয়েছিলাম, জবাব দিল কিশোর। তবে যেতে দেরি করে ফেলেছিলাম।
মানে? ভুরু কোঁচকাল বিড। তুলে নিয়ে গেছে নাকি কেউ গুপ্তধনগুলো?
না, মাথা নাড়ল কিশোর। বুড়োর বাড়ির পাশে যে রাস্তাটা বানানো হচ্ছিল, দেখে এসেছিলাম, পরের বার গিয়ে দেখি সেটা তৈরি হয়ে গেছে। বুড়োর বাড়ি ভেঙে ফেলেছে। টিলা সমান করে বাড়ির ওপর দিয়ে চলে গেছে ছয় লেনের, কংক্রিটের ঝকঝকে রাস্তা।
তারমানে, হতাশ হলো বিড, বুড়োর গুপ্তধন চিরকালের জন্যে চাপা পড়ে গেল মাটির নিচে।
গম্ভীর ভঙ্গিতে মাথা দোলাল কিশোর। হ্যাঁ। সিম্বু আর মনিবের জিনিস বেশ ভালমতই পাহারা দিয়ে রেখেছে। মনে হয় কাউকে ছুঁতে দেয়নি। দুপাকেও না।

.

মোটর বোট নিয়ে সাগরে বেড়াতে বেরিয়েছে তিন গোয়েন্দা। সময় পেলেই এ রকম বেরোয়। তবে আজ সাগরের মতিগতি সুবিধের ঠেকছে না। মাথায় সাদা ফেনা নিয়ে ফুঁসে উঠছে ঢেউ। বোটের গায়ে ধাক্কা খেয়ে ছিটকে উঠছে পানি।
কপালে হাত রেখে ঢেউ দেখতে দেখতে কিশোর বলল, ঝড় আসবে মনে হচ্ছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তীরে ফিরে যাওয়া দরকার।
হাতের চেটো দিয়ে মুখ থেকে পানির ছিটা মুছল মুসা। হাল ধরে রেখে বলল, হ্যাঁ। সন্ধ্যাও হয়ে আসছে। তবে তীর থেকে বেশি দূরে নই আমরা। বাড়ি ফিরে যাই চলো। আমি ইঞ্জিনের স্পীড বাড়াচ্ছি।
রবিন কিছু বলল না। তাকিয়ে আছে ঢেউয়ের দিকে।
মোটর বোট নিয়ে বেড়াতে বেরোয় ওরা, ঝড়-টর দেখে না তা-ও না। তবে সে-সম্ভাবনা দেখলেই দ্রুত উপকূলে ফিরে আসে।
অ্যাকসিলারেটরে চাপ বাড়াল মুসা। গতি পেয়ে লাফ মেরে ছুটল মোটর বোট।
হঠাৎ খকখক করে কাশতে শুরু করল ইঞ্জিন। তারপর থেমে গেল। স্থির হয়ে পানিতে ভাসতে লাগল বোট।
ইঞ্জিন স্টার্ট দেয়ার চেষ্টা করল মুসা। কাজ হলো না।
নাহ্, হচ্ছে না, হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল মুসা। কোথাও কিছু গড়বড় হয়ে গেছে।
ইঞ্জিনের ঢাকনা খুলে দেখতে শুরু করল সে। কাজ শেষ করে মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলল, কই, কোথাও তো কোন গলদ দেখতে পাচ্ছি না। ট্রান্সমিশন, তেল, গ্যাস-সবই ঠিক আছে।

ইঞ্জিন স্টার্ট নিচ্ছে না কেন? রবিনের প্রশ্ন।
সাহায্য দরকার আমাদের। সাঁতার কেটে তো আর তীরে পৌঁছুতে পারব না, কিশোর বলল।
শিপ-টু-শোর রেডিও ট্রান্সমিটারের সুইচ অন করল সে। কিছুই ঘটল না। কয়েকবার সুইচ অন-অফ করল। পরীক্ষা করে দেখলতার, ব্যাটারি।
রেডিওতেও কোন সমস্যা দেখতে পাচ্ছি না, বিড়বিড় করল কিশোর। কিন্তু এটাও অকেজো হয়ে পড়েছে! অদ্ভুত ব্যাপার তো! এ কেমন ঝামেলায় পড়লাম।
সাঁঝের আঁধার ঘনিয়ে আসছে। সেই সাথে বাড়ছে বাতাস। বেড়ে যাচ্ছে ঢেউয়ের তীব্রতাও। ঢেউয়ের আঘাতে অসহায়ের মত পানিতে দোল খাচ্ছে বোট। আকাশে চাঁদ দেখা যাচ্ছে না। কালো মেঘ ঢেকে রেখেছে নক্ষত্রপুঞ্জ। ঠাণ্ডায় গায়ে কাটা দিতে লাগল ওদের। শীত করছে।
অবস্থা দেখে তো মনে হচ্ছে সারা রাত এখানেই কাটাতে হবে, অস্পষ্ট স্বরে বলল রবিন। ঢেউয়ের ধাক্কায় বোট উল্টে না গেলেই বাঁচি।
কেউ যে আমাদের এখান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে সে-চান্সও নেই, মুখ কালো হয়ে গেছে কিশোরের। এক হাত দূরের জিনিসও দেখা যায় না। জাহাজ-টাহাজ এলেও আমাদের দেখতে পাবে না।
হঠাৎ অন্ধকার কুঁড়ে কালো, প্রকাণ্ড কি একটা ওদের সামনে ছুটে আসতে লাগল। কর্কশ একটা কণ্ঠ ভেসে এল সাগর থেকে কে তোমরা?
জাহাজ! উল্লসিত হয়ে উঠল মুসা। আমাদেরকে দেখতে পেয়েছে। মুখের সামনে দুই হাত জড় করে এনে চিৎকার করে জবাব দিল, আমরা সাগরে আটকা পড়েছি। আমাদেরকে আপনাদের জাহাজে তুলে নেবেন?
দাঁড়াও। আসছি, জবাব এল।
কালো পাহাড়ের মত জিনিসটা এগিয়ে এল ওদের দিকে, থেমে পড়ল বোটের পাশে।
জাহাজটা বিশাল। বাতাসে দুলতে থাকা লণ্ঠনের আলোয় গলুই চোখে পড়ছে। তার নিচে সাদা অক্ষরে লেখা: অ্যাড্রিয়াটিক পাঞ্চ।
অদ্ভুত নাম! বিড়বিড় করল রবিন।
বোট লক্ষ্য করে জাহাজ থেকে একটা.দড়ির মই ছুঁড়ে দেয়া হলো।
মইটা দুহাতে ধরে ফেলল কিশোর। দ্রুত উঠে এল ওপরে।
বোটের সাথে মই বেঁধে ফেলল মুসা। রবিনকে উঠে যাওয়ার সুযোগ দিল। তারপর নিজেও অনুসরণ করল তাকে।
লাফ মেরে জাহাজের রেলিং টপকাল তিনজনে। দাঁড়াল এসে প্রকাণ্ড ওক কাঠের ডেকে। পুরানো আমলের লণ্ঠনের মিটমিটে আলোয় দেখল এটা একটা পাল

তোলা জাহাজ। বাতাসে পতপত করে উড়ছে পাল। মূল মাল খাড়া উঠে গেছে অন্ধকার আকাশে। একটা কাঠের সিঁড়ির মাথা গিয়ে ঠেকেছে হুইল হাউজে।
ডেকে বেশ কয়েকজন রুক্ষ চেহারার নাবিক। সবার পরনে পুরানো আমলের পোশাক। দাঁড়িয়ে আছে নিঃশব্দে। ভ্রু কুঁচকে দেখছে ওদেরকে। একজনের হাতে একটা হাপুন। অস্ত্রটা ভীতিকর ভঙ্গিতে দোলাল সে।
ট্রেনিং শিপ, নিচু গলায় দুই সহকারীকে বলল কিশোর। মনে হচ্ছে।
এমন ভূতুড়ে ট্রেনিং শিপ জীবনে দেখিনি আমি, ফিসফিস করল মুসা।
নোনা পড়া জ্যাকেট গায়ে এক লোক এগিয়ে এল ওদের সামনে। লোকটা লম্বা, মুখভর্তি কালো দাড়ি। তীক্ষ্ণ, কালো চোখ। কথা বলার সময় গলার স্বর শুনে গোয়েন্দারা বুঝল, খানিক আগে এই লোকই ওদের পরিচয় জানতে চেয়েছিল।
নাম কি তোমাদের? কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল লোকটা।
নিজেদের পরিচয় দিল কিশোর।
ঘোৎ-ঘোৎ করে উঠল লোকটা। তোমরা যে-ই হও তাতে আমার কিছু এসে যায় না।
সাহস করে জানতে চাইল রবিন, আপনি কে?
আমি এডওয়ার্ড নাইল। অ্যাড্রিয়াটিক পাঞ্চের ক্যাপ্টেন। তিমি শিকারী জাহাজ এটা। আমরা এসেছি নাটুকেট থেকে। ওখানেই ফিরে যাচ্ছি আবার। শক্ত সমর্থ কয়েকজন লোক দরকার আমাদের। তোমাদেরকে দিয়ে কাজ হবে মনে হচ্ছে। নানটুকেট না পৌঁছা পর্যন্ত তোমরা আমার ক্রু হিসেবে কাজ করবে।
অবাক হয়ে পরস্পরের দিকে তাকাল তিন গোয়েন্দা। এ লোক বলছে কি? উনবিংশ শতাব্দীর পরে আর কোন পাল তোলা তিমি শিকারীর জাহাজ তৈরি করা হয়নি। লোকটা ঠাট্টা করছে ভেবে কিশোর বলল, ক্যাপ্টেন নাইল, আপনার জাহাজে থাকতে আসিনি আমরা। আমাদের ইঞ্জিন খারাপ হয়ে গেছে। মেরামতের জন্যে লোক দরকার। দয়া করে যদি বোটটা সহ আমাদের তীরে পৌঁছে দেন, কৃতজ্ঞ থাকব।
ইঞ্জিন? ইঞ্জিন আবার কি জিনিস? খেঁকিয়ে উঠল নাইল।
লোকটা কি রসিকতা করছে নাকি! কিশোর বলল, জাহাজ চালাতে আপনার শক্তির দরকার হয় না?
গাধা নাকি! হয় না মানে? শক্তি ছাড়া জাহাজ চলে? সেজন্যেই তো বাতাস দরকার, আর বাতাসের শক্তিকে ব্যবহার করার জন্যে পাল! গমগমে গলায় বলল ক্যাপ্টেন। এ ছাড়া সাগরে জাহাজ চালাতে আর কোনও শক্তি জোগাড় করতে পারবে তুমি? আরেকটা কাজ অবশ্য করা যায়-সাগরে লগি ঠেলে জাহাজ চালাতে পারো।

ক্যাপ্টেনের কথা শুনে হো হো হাসিতে ফেটে পড়ল নাবিকরা। নাইলও হাসছে। যেন খুব মজার একটা রসিকতা করে ফেলেছে।
লোকগুলো ভারী অদ্ভুত! রাগ লাগল কিশোরের। চলো। এই পাগলদের সঙ্গে থাকার চেয়ে নিজেদের বোটে নেমে যাই। উত্তাল ঢেউয়ের মধ্যে ঝুঁকি নিয়ে ভেসে থাকব, সে-ও ভাল।
রেলিং-এর ধারে ছুটে এল ওরা। যেখান দিয়ে মই বেয়ে উঠেছে। উঁকি দিল।
সাথে সাথে জমে গেল যেন।
বোটটা নেই!
ধরো ওদেরকে! নাইল হুকুম দিল তার দেরকে। ধরো! ধরো!
নাবিকরা ছুটে এসে ধরে ফেলল তিন গোয়েন্দাকে। জোর করে নিয়ে এল মাঝ ডেকে। ক্যাপ্টেন নাইল গনগনে মুখ নিয়ে দাঁড়াল ওদের সামনে।
তোমাদের মতলব ভালই বুঝতে পারছি আমি, কর্কশ কঠে বলল সে। তোমরা অন্য তিমি শিকারীদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতে চাইছ। কিন্তু সে-সুযোগ আর পাবে না। পাঞ্চেই থাকতে হবে তোমাদেরকে আমরা কেপ হন হয় প্রশান্ত মহাসাগরে যাচ্ছি। তোমাদেরকে তিমি শিকারী বানিয়েই ছাড়ব। আমাদের কথা না কালে স্রেফ হাওরের মুখে ছুঁড়ে ফেলে দেব।
অবাক লাগছে কিশোরের। না বলে পারল না, প্রশান্ত মহাসাগরেই তো রয়েছি আমরা। আবার যাব কি ওখানে?
আমাকে জাহাজ চালানো শেখাবে, না? খেঁকিয়ে উঠল ক্যাপ্টেন। চল্লিশ বছর ধরে সাগরে সাগরে ঘুরছি, আমাকে সাগর চেনাবে। আর একটা কথা বলেই কি ভাল হবে না বলে দিলাম।
নাইলের হুমকি তিন গোয়েন্দার মেরুদণ্ডে ঠাণ্ডা শিহরণ জাগাল। কিশোরের মনে হলো একদল পাগলের কবলে পড়েছে। মুসা আর রবিনের মনে শচ্ছে জ্যান্ত দুঃস্বপ্ন দেখছে।
হুইল হাউজের দিকে ঘুরল নাইল। চেঁচিয়ে আদেশ দিল, ডেভিড পুকার। এখানে এসো।
বিশালদেহী, মোটাসোটা এক নাবিক হাজির হলো হুইল হাউজের সামনে। সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল ডেকে। নাইল তাকে হুকুম করল তিন গোয়েন্দাকে নিচে নিয়ে যেতে। ডিউটির জন্যে প্রস্তুত করতে হবে।
পুকার নিয়ে চলল ওদের। পেছন থেকে ভেসে এল ক্যাপ্টেন এবং তার আজব নাবিকদের ভৌতিক হাসি।
আমি ফাস্ট মেট, সিঁড়ি বেয়ে নামার সময় নিজের পরিচয় দিল পুকার। ডিউটি যখন থাকবে না, তখন তোমরা কোথায় থাকবে দেখিয়ে দিচ্ছি।

এ সব কি ঘটছে কিছুই বুঝতে পারছি না, মুসা বলল।
কি ঘটছে ঠিকই জানো তোমরা, কড়া গলায় বলল ফাস্ট মেট।
না, জানি না! প্রতিবাদ করল কিশোর।
সিঁড়ির শেষ মাথায় এসে ঘুরে দাঁড়াল পুকার। ধমকে উঠল, তাহলে আগে জেনে নাও কি কি করতে হবে তোমাদের। সব সময় নির্দেশ মেনে চলবে। নির্দেশ অমান্যকারী নাবিককে সাগরে, হাঙরের মুখে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হয়।
ক্যাপ্টেন নাইলের হুমকির কথা মনে পড়তে কেঁপে উঠল রবিন।
ওদের নিয়ে ক্রুদের লিভিং কোয়ার্টার্সে চলে এল পুকার। বেশ বড় ঘর। দেয়ালের সাথে লাগানো কতগুলো বাঙ্ক। প্রতিটি বাঙ্কের নিচে ঝুলছে একটা করে হারপূন। হারপূনের পাশে বর্ষাতি আর সাউথ ওয়েস্টার। ঝড় বাদলার দিনে চামড়ার জ্যাকেটের ওপর বর্ষাতি চাপাতে হয়। মাথা ঢাকতে হয় সাউথ ওয়েস্টার দিয়ে।
*
ওই খালি বাঙ্ক তিনটে তোমাদের, হাত তুলে দেখাল ফাস্ট মেট। ডেকে কাজ করার জন্যে রেডি হয়ে তাড়াতাড়ি চলে এসো।
হুকুম দিয়ে চলে গেল সে।
চলতে শুরু করেছে জাহাজ, টের পেল ওরা। কাঁচকোচ করছে কড়িকাঠ, দুলছে এদিক-ওদিক। মাথার ওপর একটা লণ্ঠন জ্বলছে মিটমিট করে। চর্বি আর তেলের গন্ধ আসছে ওটা থেকে।
তিমির তেল, মন্তব্য করল রবিন।
সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল কিশোর। গোয়েন্দাগিরি করতে গিয়ে সব ধরনের জ্বালানি ব্যবহার করার অভিজ্ঞতা হয়েছে ওদের। তাই গন্ধ পেয়েই বুঝতে পেরেছে লণ্ঠন জ্বলছে তিমির তেলে।
যদ্দুর জানি, বলল কিশোর, কেরোসিনের ব্যবহার শুরু হবার পর থেকে তিমির তেলের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। তাহলে ওটা এল কোত্থেকে? আসলে ঘটছে কি এখানে?
কিছুই বুঝতে পারছি না, জবাব দিল মুসা। তবে মন বলছে সাবধানে থাকা দরকার। ভূত-প্রেত…
আরে ধুত্তেরি তোমার ভূত-প্রেত! খেঁকিয়ে উঠে তাকে থামিয়ে দিল কিপোর। সারাক্ষণ খালি ভূতের ভয়…
বাঙ্কে এসে শুয়ে পড়ছে নাবিকরা। তাদের দিকে হাসি মুখে তাকাল রবিন। কিন্তু ওর দিকে ভাবলেশহীন মুখে তাকিয়ে রইল তারা।
আমরা এখানে নতুন, ভাব জমানোর চেষ্টা করল জো। কিন্তু পাথর-মুখ করেই থাকল জাহাজীরা।

নাবিকরা শুনেছি হাসিখুশি থাকে, বিড়বিড় করল কিশোর। কিন্তু এরা তো কবরের লাশ একেকটা।
বললেই তো খেপো, গম্ভীর কঠে মুসা বলল। কিন্তু না বলেও পারছি না। লোকগুলোর মতই জাহাজটাকেও ভূতুড়ে মনে হচ্ছে আমার।
এ জাহাজে বেশিদিন থাকতে হলে আর ভূতের প্রয়োজন পড়বে না, বলার সময় গলার স্বর কেঁপে উঠল রবিনের। নিজেরাও ভূত হয়ে যাব।
সমর্থন পেয়ে খুশি হয়ে তুড়ি বাজাল মুসা, এতক্ষণ ধরে ঠিক এই কথাটাই বোঝাতে চাইছি আমি।
ওদের কাছে বসা যামার্কা চেহারার এক নাবিক তার হারপূনের ধারাল, লম্বা ফলায় তেল মাখছে। সেই সাথে পালিশ করছে কাঠের ডাটা। একটা উকো হাতে নিল সে। ঘষে ঘষে ডগাটা তীক্ষ্ণ ও ধারাল করে তুলল। উকোটা লম্বা, মাছ ধরার বঁড়শির মত বাকানো।
লোকটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল কিশোর। উঁকো দেখতে দেখতে বলল, বিপদজনক অস্ত্র মনে হচ্ছে।
বিপজ্জনক তো বটেই। তবে তিমির জন্যে, ঘেৎ-ঘোৎ করে উঠল লোকটা। কিছু বোকা ছাগলের জন্যেও, বাজি ধরে বলতে পারি, নইলে নাম বদলে রাখব আমার।
কি নাম আপনার খাতির জমানো ভঙ্গিতে নিরীহ স্বরে জিজ্ঞেস করল কিশোর।
হোগার্ট ল্যাম্বার্ট, খসখসে কণ্ঠে জবাব দিল লোকটা। কি, নাম শুনে কোন সুবিধে হলো, বোকা হাগল?
ল্যাম্বার্টের ভাবভলি মোটেও সুবিধের পাগল না কিশোরের কাছে। আর কিছু বলল না তাকে। ওদের চেয়ে দুএক বছরের বড় এক কিশোরের সঙ্গে ভাব জমানোর চেষ্টা করল। একে ওর মত লাগছে না। তোমার নামটা কি, ভাই?
বাফার। আমি নিউ বেডফোর্ড থেকে এসেছি। আমার বাপ-দাদারা বহু কালের পুরানো তিমি শিকারী।
এক প্রশ্ন করে তিনটের জবাব পেয়ে গিয়ে উৎসাহ বেড়ে গেল কিশোরের। জিজ্ঞেস করল, আহা, এডওয়ার্ড পাঞ্চের ব্যাপারটা কি, বলো তো?
বিস্মিত দেখাল বাফারকে। কেন, এটা নানাঁকেটের একটা তিমি শিকারী জাহাজ।
যাচ্ছে কোথায়?
কেপ হর্ন। কিন্তু আমাকে এ সব প্রশ্ন করছ কেন? জাহাজ কোথায় যাচ্ছে যদি না-ই জানো তাহলে উঠলে কেন?
কিশোর কিছু বলার আগেই রবিন বলে উঠল, আমি তো জানতাম, কেপ হর্নে তিমি শিকার করা হত উনবিংশ শতব্দীতে।

আরও অবাক হলো বাফার। তা তো বটেই। আর এটা তো উনবিংশ শতাব্দীই। ১৮৫০ সাল।
বাফারের কথা শুনে হাঁ হয়ে গেল তিন গোয়েন্দা। ওদের কথা শুনছিল ল্যাঘাট। মুখ বাকিয়ে বলল, কোন্ সাল তা-ও জানে না! এমন বোকা তো জীবনে দেখিনি।
বাফার ছাড়া বাকি সবাই তিন গোয়েন্দার বোকামিতে হেসে উঠল। খনখনে, ভৌতিক হাসি। গা শিরশির করে উঠল গোয়েন্দাদের।
কিন্তু রেগে গেল মুসা। নাবিকদের দিকে তাকিয়ে ফেটে পড়ল, আমরা জানি এটা কোন্ সাল! আর এখান থেকে যে এখুনি চলে যাওয়া উচিত তা-ও জানি। আপনারা থাকুন আপনাদের অ্যাড্রিয়াটিক পাঞ্চ আর তিমি নিয়ে। আমরা গেলাম...
কটমট করে ওর দিকে তাকিয়ে থেকে আচমকা ঝটকা দিয়ে হারপূনটা তুলে নিল ল্যাম্বার্ট। ছুঁড়ে মারল ওকে লক্ষ্য করে।
সাঁৎ করে সরে গেল মুসা। অল্পের জন্যে মিস হলো ধারাল অস্ত্রটা। ঘ্যাঁচ করে বিধল গিয়ে জাহাজের গায়ে। তিরতির করে কাঁপতে থাকল ওটার দণ্ডটা।
বাপরে! আরেকটু হলেই তো গেছিলে! ঢোক গিলল রবিন।
সাবধান! চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। বিপদ এখনও কাটেনি।
দলবল নিয়ে ছুটে এল ল্যাম্বার্ট। আত্মরক্ষার জন্যে তৈরি হলো তিন গোয়েন্দা। হাত বাড়িয়ে দিল কারাতে মারের ভঙ্গিতে।
খেক খেক করে হেসে উঠল জাহাজীরা। ধরার জন্যে হাত বাড়াল।
ঠিক সেই মুহূর্তে ডেক থেকে ভেসে এল চিৎকার। তিমি! তিমি! ওই যে, বাঁ দিকে!
দোরগোড়ায় হাজির হলো পুকার। এই জলদি এসো তোমরা!...কিশোর, মুসা, রবিন-তোমরাও তোমাদের হারপূন নিয়ে ডেকে চলে এসো।
আপাতত ল্যাম্বার্টের দলের হাত থেকে বেঁচে গেল তিন গোয়েন্দা। অকারণে মারমুখী হয়ে ওঠা নাবিকরা ছেড়ে দিল ওদেরকে। কিশোর, মুসা ও রবিন যার যার বাকের মাঝখান দিয়ে হেঁটে দরজার দিকে এগোল। তরতর করে উঠে গেল সিঁড়ি বেয়ে।
এখনও চারদিকে অন্ধকার। তবে সাগর আগের চেয়ে শান্ত। মৃদু ঢেউয়ের ওপর দিয়ে ধীর গতিতে চলেছে জাহাজ।
ক্যাপ্টেন কুপারের আদেশে দশ-বারো জন নাবিক একটা তিমি শিকারের নৌকা পানিতে ভাসানোর তোড়জোড় করছে। কপিকলের সাহায্যে শিকলে বাঁধা নৌকা নামানো হলো জাহাজের এক পাশে। খানিক নেমে শূন্যে ঝুলে রইল নৌকাটা।
দেখতে দেখতে বলে উঠল কিশোর, এখানে তিমি এল কোত্থেকে?

কেপ হর্ন হয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে এসে পড়েছি, কড়া গলায় বলল ক্যাপ্টেন। এখানেই তো তিমির আড্ডা।
অবাক হয়ে রবিন বলল, এক রাতের মধ্যে কেপ হর্ন পৌঁছা কি সম্ভব? অ্যাটমিক জেট প্লেনের পক্ষেও এত দ্রুত চলা সম্ভব না।
জেট প্লেন! জিনিসটা কি? ক্যাপ্টেনের কণ্ঠে সন্দেহের সুর। আর অ্যাটমিক কথাটারই বা মানে কি?
কাঁধ ঝাঁকাল রবিন। আরও একশো বছর পার না করে দিলে এ প্রশ্নের জবাব জানতে পারবেন না।
মানে! কি বলছ তুমি?
বলছি বিংশ শতাব্দীর কথা। জেট প্লেন জিনিসটা বিংশ শতাব্দীর আকাশ যান।
ছোঁড়াটার মাথাটাই গেছে, বিড়বিড় করল নাইল। ওর কথার মাথামুণ্ডু তো কিছুই বুঝতে পারছি না।
কনুই দিয়ে রবিনকে গুঁতো লাগাল কিশোর। কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, বেশি কথা বলে আর ঝামেলা বাড়িয়ে না তো।
তিমি শিকারের নৌকা পানিতে ভেসে পড়তে প্রস্তুত। নাবিকরা উঠে পড়ল নৌকায়। বৈঠা ধরে বসল। পুকার চলে এল নৌকার মাঝখানে।
কিশোর পাশা, হারপুন ছোঁড়ার দায়িত্ব তোমার। তুমি গলুইয়ে গিয়ে বসো, আদেশ দিল ফাস্ট মেট। মুসা আমান, তুমি ধরবে হাল। রবিন, তুমি পেছন দিকের একটা বৈঠার ধারে বসো।
নৌকায় চড়ে যে যার জায়গায় বসে পড়ার পর কপিকলের লোকজন চাকা ঘুরিয়ে নৌকাটা পানিতে নামিয়ে দিল। দাড়িরা বৈঠা বাইতে শুরু করল। ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে অ্যাড্রিয়াটিক পাঞ্চ থেকে। ডেভিড পুকারের নির্দেশমত হাতল ঘুরিয়ে কোর্স ঠিক রাখছে। উদ্যত হারপূন হাতে গলুইয়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছে কিশোর।
ওই যে তিমির ফোয়ারা! তিমির ফোয়ারা! তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠল পুকার। মুসা, বাঁ দিকে ঘুরাও।
তাড়াতাড়ি বয়ে কাটল মুসা। কই, আমি তো কিছু দেখছি না।
কানা নাকি? বেঁকিয়ে উঠল পুকার, তোমার কিছু দেখার দরকার নেই। যা বলছি করো। নইলে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেব সাগরে।
অন্ধকার পানিতে বাঁ দিকে মোড় নিয়ে ছুটে চলল নৌকা। মাথার ওপরে কালো মেঘের আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছে একটা তারা। বৈঠা পানিতে পড়ছে আর উঠছে ছন্দময় গতিতে।
এই যে এসে পড়েছি, ঘোষণা করল পুকার। কিশোর পাশা, হারপূন ছোড়ো।

এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল কিশোর। কই, তিমি কই? কিসের গায়ে ছুঁড়ব?
ওই যে তিমি। ছুঁড়লেই বুঝবে কিসের গায়ে পড়েছে, খেক খেক করে উঠল ফাস্ট মেট।
হারপূন ছুঁড়ল কিশোর। তারপর রশি ধরে টে। তুলল অস্ত্রটা। কোন কিছুর গায়ে হারপূন বেঁধেনি দেখে মন মনে খুশি হলো ও।
রাগে কাঁপতে লাগল পুকার। তিমিটাকে মিস করেছ তুমি! ইচ্ছে করে ওটাকে পালিয়ে যেতে দিয়েছ।
কিশোরের কথা সমর্থন করে রবিন বলল, আমারও কিন্তু কোন তিমি চোখে পড়েনি।
নিশ্চয় তারমানে ভুল দিকে নৌকা ঘুরিয়েছ! চিৎকার করে উঠল পুকার। দাঁড়াও, জাহাজে ফিরে নিই। তারপর বোঝাব মজা। ক্যাপ্টেনের কাছে নালিশ করে তিনজনের পিঠের চামড়া না ছাড়িয়েছি তো আর কি বলব-নাও, ঘোরো এখন। পুরো এক পাক ঘোয়রা। আবার দেখা যেতে পারে তিমিটাকে। এবার যদি মিস করো কিশোর পাশা, তাহলে… দাঁতে দাঁত চাপল ফার্স্ট মেট।
হাল ঘুরিয়ে আবার নৌকার মুখ ঘোরাল মুসা। ছপাৎ-ছপাৎ দাঁড় ফেলছে দাড়িরা। গলুইয়ে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সাগরে চোখ বোলাচ্ছে কিশোর। নৌকাটা চক্কর মেরে মেরে ঘুরতেই থাকল।
তিমির চিহ্নও দেখা গেল না আর। হাল ছেড়ে দিল পুকার। জাহাজে ফিরে যাওয়ার হুকুম দিল।
জাহাজের কাছে এসে গা ঘেঁষে দাঁড়াল নৌকা। ওপর থেকে দড়িতে বাধা হুক নামিয়ে দেয়া হলো। সেগুলোতে আটকে আবার জাহাজে তুলে নেয়া হলো নৌকা। আগের জায়গায় ঝুলিয়ে রাখা হলো।
তিমিটাকে মারতে পারিনি ক্যাপ্টেন, ক্ষোভের সঙ্গে রিপোর্ট করল পুকার। এ জন্যে ওই ছোকরা তিনটে দায়ী।
এ কথা শুনে রেগে আগুন হলো নাইল। হুকুম দিল, জেলে ভরে তালা দিয়ে রাখোগে!
তিন গোয়েন্দাকে ঠেলা-ধাক্কা মেরে নিচে নিয়ে আসা হলো। একটা শিক লাগানো ছোট ঘরে ঢোকানো হলো। এটাই জাহাজের জেলখানা। সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। ওদেরকে একা রেখে চলে গেল জাহাজীরা। তিমির তেল ভরা একটা লণ্ঠন মিটমিট করে জ্বলছে গারদে। গোটা দুয়েক কাঠের বাঙ্ক আর মাঝখানে একটা ছোট টেবিল ছাড়া আর কোন আসবাব নেই ঘরটাতে। বাঙ্কে বসল। পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল।

ঘটনা দেখছি জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠছে, মন্তব্য করল মুসা। একটা ভূতুড়ে জাহাজের কতগুলো নাবিক-ভূতের হাতে আমরা এখন বন্দী।
আর এজন্যে দায়ী একটা ভূতুড়ে তিমি, খিটখিটে গলায় যোগ করল রবিন।
নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে কাটতে কিশোর বলল, অথচ পুকার বলছে সে তিমিটাকে দেখেছে।
আমাদেরকে ফাঁসানোর জন্যে বলেছে, এ তো সোজা কথা। আর নাইল যে ওর কথাই বিশ্বাস করবে সেটাও স্বাভাবিক। তবে আমার কি মনে হয় জানো-পুকার নিজেই একটা ভূত।
কিশোরের দিকে তাকাল মুসা। ওরা আমাদের নিয়ে কি করবে বলো তো?
জবাবে নিচের ঠোঁটে একটা টান দিয়ে ছেড়ে দিল কিশোর। বুঝতে পারছি না।
চুপ হয়ে গেল তিনজনেই। নাইলের হুমকির কথা ভাবছে ওরা।
নাইল আমাদেরকে হাঙর দিয়ে খাওয়াবে বলেছে, নীরবতা ভাঙল মুসা। হারে-ভূত বলে আবার কিছু নেই তো? আর ওগুলো নিশ্চয় মানুষখেকো নয়?
হাঙরের মানুষখেকো হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি, বলল কিশোর। সেটা আসল হাঙরই হোক, কিংবা ভূতুড়ে...।
হঠাৎ সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল। লাফিয়ে সিধে হয়ে বসল ওরা।
পায়ের আওয়াজ ক্রমে কাছিয়ে আসছে। একটু পরেই লোকটাকে দেখা গেল। ল্যাম্বার্ট। ডান হাতে একটা হারপূন। ঘরের মাঝখানে চলে এল তিন গোয়েন্দা। লোকটা কোন মতলবে এসেছে দেখতে চায়।
তোমাদের দোষেই আজ তিমিটাকে হারাতে হলো, নাক সিটকাল ল্যাম্বার্ট। কিভাবে নৌকা বাইতে হয়, কিভাবে হারপূন দিয়ে মাছ শিকার করতে হয়, কিছু জানো না তোমরা। আমি থাকলেই হয়েছিল আজ। তিমির বাপও আমার হাত থেকে বাঁচতে পারেনি কোনদিন।
মুচকি হাসল কিশোর। আপনার বদলে হারনার হিসেবে আমাকে পাঠানোটা আসলে সহ্য হচ্ছে না আপনার।
শুনে মুখ লাল হয়ে গেল ল্যাম্বার্টের। হারপূন ছুঁড়ে মারল দুই গরাদের ফাঁক দিয়ে।
ব্যাপারটা আগেই আঁচ করতে পেরেছিল মুসা। চট করে টেবিলটা দুহাতে তুলে ধরল, ঢালের মত করে। টেবিলে লাগল হারপূন। এত জোরে আঘাত হানল, কাঠ ফুটো করে ফেলল ধারাল ফলা। কয়েক ইঞ্চির জন্যে মুসার গায়ে বিধল না।
টেবিলটা নামিয়ে রাখল সে। হাতের চেটো দিয়ে মুখের ঘাম মুছল। একটানে টেবিল থেকে খুলে আনল হারপূন।
ল্যাম্বার্ট, এ নিয়ে দ্বিতীয়বার হলো। আর ছাড়ব না তোমাকে, বলেই হারপূন তুলল ল্যাম্বার্টকে সই করে।

বেগতিক দেখল ল্যাম্বার্ট। ধীরে ধীরে পিছু হঠল সে। তারপর আচমকা ঘুরে দাঁড়িয়ে সিঁড়ি বেয়ে ছুটে পালাল।
গারদের এক কোনায় হারপূনটা ছুঁড়ে ফেলে দিল মুসা। হাসতে হাসতে বলল, সত্যি সত্যি মারতাম না। তয় দেখালাম শুধু। তবে জিনিসটা আর হাতে নিতে দিচ্ছি না ওকে। তিমি শিকারে যাবার সময় ফাস্ট মেটকে হারপূন হারানোর কি ব্যাখ্যা দেবে তাই ভাবছি।
এমন সময় আবার কার পায়ের শব্দ শোনা গেল সিঁড়িতে।
আবার বোধহয় এসেছে ল্যাম্বার্ট, নিচুস্বরে বলল রবিন। মারামারি করতে। কিংবা হারপূনটা ফেরত নিতে।
বেশ। এবার আমরাও প্রস্তুত, হারপূন তুলে নিল কিশোর। আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে বাগিয়ে ধরল অস্ত্রটা।
তবে আগন্তুক ল্যাম্বার্ট নয়, বাফার।
ওকে দেখে হারপূন নামাল কিশোর।
জেলখানার দিকে আসার সময় বারবার পেছন ফিরে দেখছে বাফার। আমার এখানে আসা উচিত হয়নি, ফিসফিস করল বাফার। আমার ডিউটি এখন ওপরে। তোমাদের একটা জরুরী কথা জানাতে এসেছি?
কি? জানতে চাইল রবিন।
ক্যাপ্টেন তোমাদেরকে এখনই হাঙরের মুখে ফেলে দিত। জেলে পুরে রাখার কারণ তোমাদেরকে তার দরকার হতে পারে। তবে নানটুকেটে ফেরার আগে হাঙরের মুখে ফেলবেই, তাতে কোন সন্দেহ নেই।
তারমানে তার আগেই আমাদেরকে এখান থেকে কেটে পড়তে হবে, কিশোর বলল। তুমি আমাদের সাহায্য করবে?
দরকার হলে লড়াই করব, বুকে চাপড় দিয়ে বলল মুসা। বিনা যুদ্ধে নাহি দেব...
এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল বাফার। আমি সাধারণ একজন ডেকহ্যান্ড। তোমাদেরকে রা করার ক্ষমতা আমার নেই। আর মুক্তি পেলেও লাভ হবে না। কারণ এখন আমরা মাঝ সমুদ্রে। কি করবে তোমরা? হাজার মাইল পথ সাঁতার কেটে ডাঙায় উঠবে?
তিমি শিকারের নৌকা নিয়ে পালাতে পারি, উত্তেজিত গলায় বলল রবিন।
আবার মাথা নাড়ল বাফার। হুইল হাউজ আর ডেকে সব সময়ই কেউ না কেউ নজর রেখে চলেছে। ধরা পড়ে যাবে। তা ছাড়া নৌকা পানিতে নামানোও এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। শব্দ না করে পারবে না। যাকগে, তোমাদেরকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই

করো, কিশোর বলল। শত হলেও তুমি ঝুঁকি নিয়ে নিচে এসেছ। সাবধান করে দিয়েছ আমাদের।
তোমরা এমন অদ্ভুত ভাবে কথা বলছ কেন? জানতে চাইল বাফার। এটা ১৮৫০ সাল। অথচ তোমরা বিংশ শতাব্দীর কথা বলছ। পালের বদলে অন্য শক্তির কথা বলছ। ঘটনাটা কি?
দ্রুত দৃষ্টি বিনিময় করল দুই গোয়েন্দা। এ সব কি বলছে ছেলেটা?
ওকে যে আমরা ভূত ঠাউরে বসে আছি তা বলা যাবে না, ফিসফিস করে কিশোরের কানে কানে বলল মুসা।
মাথা আঁকাল কিশোর। সত্যি কথা বলব? বাফারকে বলল সে, এটা আসলে কোন সাল সেটাই শিওর হতে পারছি না আমরা।
দেয়ালে ঝোলানো একটা ক্যালেন্ডার দেখাল বাফার। বড় বড় অক্ষরে তাতে লেখা: ১৮৫০ সাল।
এর মানেটা দাঁড়াচ্ছে, বিড়বিড় করল মুসা, এই জাহাজটাতেই কেবল সময় বদলে গেছে। পিছিয়ে গেছে। এখানে থাকলে এই সালটাকেই মেনে নিতে হবে আমাদের।
ভুরু কুঁচকে গেল বাফারের। তোমরা পাগলা গারদ-টারদ থেকে পালিয়ে আসোনি তো? উদ্বিগ্ন শোনাল তার কণ্ঠ।
না, পাগলা গারদ থেকে পালাইনি, তাকে আশ্বস্ত করল কিশোর। তবে এই জাহাজ থেকে পালাতে চাই।
সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা দোলাল বাফার। পরে যদি সম্ভব হয় সাহায্য করব তোমাদের। এখন ডিউটিতে যেতে হবে, কথা শেষ করে সিঁড়ি বেয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।
মাথার নিচে হাত রেখে বাঙ্কে শুয়ে পড়ল কিশোর। আরেকটা বাঙ্কে গিয়ে বসল রবিন। টেবিলের ওপর উঠে বসল মুসা। পা ঝোলাতে লাগল। ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো আলোচনা করতে লাগল ওরা। বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করল।
সমস্যাটা হলো, মন্তব্য করল কিশোর, ভূত না আসল মানুষ সেটাই বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছে একদল পাগলের সঙ্গে চলেছি আমরা। কিন্তু ওদের কাজ কর্ম দেখে তো পাগল বলেও মনে হচ্ছে না।
ভূত! ভূত! কোন সন্দেহই নেই আমার, মুসা বলল। তুমি তো আর বিশ্বাস করবে না।
নাকি কোনও ধরনের টাইম মেশিনের মধ্যে পড়ে গেলাম আমরা? রবিনের প্রশ্ন। বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের রহস্যময় কোন কিছুতে? এক টানে সময়কে পার করে নিয়ে এসেছে ১৮৫০ সালে!

মাথা চুলকাল মুসা। তা তো বুঝলাম। কিন্তু আবার নিজেদের সময়ে ফিরে যাব কি করে?
চালাকি করতে হবে আরকি আমাদের, রবিন বলল। ক্যাপ্টেন নাইল আমাদেরকে এখান থেকে বের করলে এমন ভান করব যেন আমরা খুব ভাল নাবিক। জাহাজের নানা কাজে লাগছি দেখলে হয়তো তার মন বদলাতেও পারে। তখন নিশ্চয় আর আমাদের সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলার চিন্তা করবে না।
বুদ্ধিটা মন্দ না, হাতঘড়িতে নজর বোলাল কিশোর। আমরা জাহাজে উঠেছি মাত্র কয়েক ঘণ্টা। এর মধ্যে এত কিছু ঘটল কি করে?
জবাবে মুসা কিছু বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ গা-টা কেন যেন শিরশির করে উঠল। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। নাবিকের পোশাক পরা এক লোককে ওদের জেলখানার দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবাক হয়ে গেল। মুসার দৃষ্টি অনুসরণ করে একই দিকে তাকাল কিশোরও।
লোকটা নীরবে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। ভূতুড়ে একটা আকৃতি। মুখটা অস্বাভাবিক সাদা। সরু, সাদা সাদা লম্বা আঙুল দিয়ে চেপে ধরেছে জেলের গরাদ। চেহারায় কোন ভাবান্তর নেই। নীল চোখ জোড়া স্থির।
লোকটা এখানে এল কি করে? জড়ানো গলায় বলল মুসা। সিঁড়িতে ওর পায়ের শব্দ পাইনি।
উঠে বসল কিশোর। আমিও না।
রবিন বলল, লোকটাকে এ জাহাজের কেউ মনে হচ্ছে না।
তার পেছন পেছন যাওয়ার জন্যে হঠাৎ ইশারা করল ওদেরকে রহস্যময় আগন্তুক।
কে আপনি? প্রশ্ন করল কিশোর। আপনার সঙ্গে আমাদের যেতে বলছেন কেন?
বেরোতে যে বলছেন, বেরোব কি করে? ইঙ্গিতে বন্ধ দরজাটা দেখাল মুসা। ফাস্ট মেট দরজায় তালা মেরে রেখে গেছে। চাবি আছে নাকি আপনার কাছে?
ওদেরকে তাজ্জব করে দিয়ে তালায় হাত রাখল লোকটা। খুলে গেল তালা। টান দিয়ে দরজাটা খুলে ফেলল সে। কোঁচকানো চামড়াওয়ালা আঙুল দিয়ে আবার বেরোনোর ইশারা করল লোকটা।
খাইছে! চাবি ছাড়াই তালা খুলে ফেলল! মুখ হাঁ হয়ে গেছে মুসার।
দেখাই যাক না ওর সঙ্গে গিয়ে, কিশোর বলল। মুক্তির পথ দেখিয়েও দিতে পারে। কিংবা নতুন কোনও বিপদের পথ। অতএব সাবধান।
সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল তার দুই সহকারী।
জেল থেকে বেরিয়ে এল তিনজনে।

নিঃশব্দে আবার দরজা লাগিয়ে দিল ওদের ভৌতিক পথ প্রদর্শক। তালাটা তুলে লাগিয়ে দিল জায়গামত। তারপর হেঁটে গেল সিঁড়ির ধারে। উঠতে শুরু করল। সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সময় কোন শব্দ হলো না।
অস্বাভাবিক নীরবতায় গা ছমছম করতে লাগল তিন গোয়েন্দার। মুসার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। তলপেট শিরশির করছে রবিনের। কিশোরের শিরদাঁড়া বেয়ে যেন বরফের পানি নামছে।
সিঁড়ির শেষ ধাপ টপকে লোকটা উঠে গেল ডেকে। এগিয়ে গেল জাহাজের সামনের দিকে।
তিন গোয়েন্দাও উঠল। দাঁড়িয়ে পড়ল সিঁড়ির দোরগোড়ায়। উঁকি মেরে দেখল কাছে-পিঠে কেউ আছে কিনা। অন্ধকারে শুধু টিমটিম করে লণ্ঠন জ্বলছে। খালি ডেক।
নিঃশব্দে ঘুরে দাঁড়াল রহস্যময় আগন্তুক। আবার ইশারা করল তিন গোয়েন্দাকে। অনুগতের মত লোকটার পেছন পেছন ডেক ধরে এগোল ওরা। বড় বড় ঢেউ ধাক্কা মারছে জাহাজের গায়ে। জাহাজের কিনার ঢেউয়ের দোলায় উঠছে আর নামছে। নিচে তাকাল ওরা। ঢেউগুলো মাথায় সাদা ফেনা নিয়ে যেন টগবগ করে ফুটছে। দূরের তারাশূন্য অন্ধকার আকাশ থেকে ভেসে এল নাম না জানা নিশাচর পাখির তীক্ষ্ণ চিৎকার।
থেমে দাঁড়াল ভূতুড়ে লোকটা। স্থির দৃষ্টিতে তাকাল তিন গোয়েন্দার দিকে। পলকহীন চাহনি।
এরপর কি করবে নোকটা ভাবল কিশোর। ধাক্কা মেরে ফেলে দেবে না তে!
আঙুল তুলে জাহাজের পেছন দিকটা দেখাল আগন্তুক। ওদিকটা অন্ধকার। চোখ কুচকে ওদিকে তাকিয়ে রইল তিন গোয়েন্দা। অস্পষ্ট ভাবে আরেকটা জাহাজ দেখা গেল। ওদের জাহাজটার পেছন পেছন আসছে।
রহস্যময় আগন্তুক সাগরের দিকে ইশারা করল। তারপর জাহাজটা দেখাল।
লোকটা কি বলতে চাইছে বুঝে ফেলল মুসা। ও বলছে আমরা যেন সাঁতার কেটে ওই জাহাজে উঠে পড়ি। জাহাজটা কাছেই আছে। চলো, সাগরে নেমে পড়ি। রেলিং বেয়ে উঠে পড়ল সে, ডাইভ দেবে পানিতে।
ওর হাত ধরে ফেলল কিশোর। দাঁড়াও। দাঁড়াও। লোকটা সত্যি এটাই বোঝাতে চেয়েছে কিনা সে-ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে নিই আগে।
লোকটার দিকে ঘুরল ওরা। কিন্তু অদৃশ্য হয়ে গেছে আগন্তুক! বোকা বনে গেল ওরা। আবার ঘুরে তাকাল পেছন দিকে। অন্য জাহাজটাকেও দেখা যাচ্ছে না আর।
ভীষণ অবাক হয়ে গেল ওরা।

দেখার জন্যে রেলিঙে উঠেছিল মুসা, নেমে এল সেখান থেকে।
সত্যি কি এ সব আমাদের চোখের সামনে ঘটছে? জিজ্ঞেস করল সে। নাকি দৃষ্টি বিভ্রমের শিকার হচ্ছি?
জানি না, জবাব দিল কিশোর।
এমন সময় পেছন থেকে কে যেন কথা বলে উঠল, বড় বেশি ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছ তোমরা।
পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল তিন গোয়েন্দা।
বাফারকে দেখতে পেল! চেহারায় উদ্বেগ। আমি হুইল হাউজের ডিউটিতে ছিলাম, জানাল সে। তাই তোমাদের দেখে ফেলেছি। জেলখানা থেকে কিভাবে বেরিয়ে এলে বুঝতে পারছি না। ধরা পড়লে কপালে কিন্তু সত্যি খারাবি আছে তোমাদের।
বোকা বোকা গলায় জানতে চাইল মুসা, নাবিক লোকটা কোথায় গেল দেখেছ?
নাবিক? তোমাদের দুজনকে ছাড়া ডেকে তো আর কাউকে চোখে পড়েনি আমার।
আর যে জাহাজটা আমাদের পিছু নিয়ে আসছিল ওটা? প্রশ্ন করল কিশোর।
এমন ভাবে ওদের দিকে তাকাল বাফার, যেন ওরা পাগল হয়ে গেছে। এদিকে জাহাজ! তোমাদের উল্টোপাল্টা কথাবার্তা শুনে এখন আমারই পাগল হওয়ার জোগাড় হয়েছে।...•□ও, নিচে গিয়ে বিশ্রাম নাও। যে কোন সময় ডিউটি দিতে চলে আসতে পারে পুকার। তার চোখে পড়ে গেলে ভীষণ বিপদ হবে।
চলে গেল বাফার।
জেলখানায় ফিরে এল আবার তিন গোয়েন্দা। দরজাটা লাগিয়ে দিল কিশোর। দরজা বন্ধ হতে তালাটাও আপনা-আপনি লেগে গেল।
দরজাটাও দেখছি ভূতুড়ে! বিড়বিড় করল কিশোর।
যে যার বাঙ্কে শুয়ে পড়ল ওরা। ভাবছে একের পর এক ঘটে যাওয়া অদ্ভুত ঘটনাগুলো নিয়ে। বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করছে।
রবিন কথা বলল প্রথম। নাবিকটা প্রেতাত্মা জাতীয় কিছু হতে পারে।
শিউড়ে উঠল মুসা। ভূতুড়ে জাহাজে প্রেতাত্মা! ভয়ঙ্কর ব্যাপার।
বলা নেই কওয়া নেই, কড়াৎ করে বাজ পড়ল কোথাও। জাহাজটা দুলতে শুরু করল ভীষণ ভাবে। ডেক থেকে ভেসে এল চিৎকার-চেঁচামেচি।
পুকার নেমে এল নিচে। চেঁচিয়ে বলল, ঝড় শুরু হয়েছে। ডেকে চলে এসো সবাই।
জেলখানার দরজা খুলে দিল সে। যাও, ডেকে যাও, জলদি। সবাইকেই দরকার।
দৌড়ে চলে গেল পুকার।
ঘুমানোর ঘরে ছুটে ঢুকল তিন গোয়েন্দা। যার যার বাঙ্কের কাছে রাখা বর্ষাতি, মাথায় সাউথ ওয়েস্টার আর পায়ে রাবার বুট গলিয়ে উঠে এল ওপরে।

আলকাতরার মত কালো আকাশ। মুষলধারায় বৃষ্টি হচ্ছে। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। সেই সাথে চলছে গুড়ুম গুড়ুম বজ্রপাত। প্রবল বাতাসে বিশাল ঢেউ উঠছে সাগরে। ঢেউয়ের আঘাতে থরথর করে কাঁপছে জাহাজ। ঢেউ ভেঙে পড়ছে গলুইয়ের ওপর দিয়ে। ভাসিয়ে দিচ্ছে ডেক।

মুখের সামনে দুই হাত জড় করে ধরে তারস্বরে চেঁচাচ্ছে ক্যাপ্টেন নাইল। হুকুমের পর হুকুম দিয়ে চলেছে নাবিকদের। ঝটপট পাল গুটিয়ে ফেলল কয়েকজন নাবিক। আর কয়েকজন নিচে নামার গর্তের মুখের ঢাকনা আটকে দিল পেরেক ঠকে, যাতে ভেতরে পানি ঢুকতে না পারে। অনেকেই বাতাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে রেলিং ধরে ধরে জাহাজের সামনের দিক থেকে পেছনে যাবার চেষ্টা করছে।

পুকার এসে জানাল, জাহাজের খোলে ফুটো হয়ে গেছে।

এই ছেলেগুলোকে নিয়ে যাও, তিন গোয়েন্দাকে দেখিয়ে বলল ক্যাপ্টেন। ফুটো মেরামত করুক।

ফার্স্ট মেটের সঙ্গে দেখতে গেল ওরা। দেখল খোলের একটা তক্তা ভেঙে গেছে। পানি ঢুকছে হুড়মুড় করে। মেঝের কয়েক ইঞ্চি ইতিমধ্যেই ডুবে গেছে পানিতে।

কিশোর পাশা, লকার থেকে পাম্পটা নিয়ে এসো, হুকুম করল পুকার। কোনার ওই ব্যারেলে পাম্প করে পানি ফেলো তুমি আর রবিন। মুসা আমান, আমার সঙ্গে এসো। ফুটো মেরামত করতে হবে।

যন্ত্রপাতি রাখার একটা বাক্স নিয়ে এসে ফুটোর কাছে ফেলল পুকার। এক টুকরো তক্তা নিয়ে ফুটোর ওপর চেপে ধরল। বাক্স থেকে হাতুড়ি বের করে পেরেক ঠকে তক্তাটা আটকে দিতে শুরু করল মুসা; দু হাতে দ্রুত কাজ করছে সে। একেক বাড়িতে একেকটা করে পেরেক বসিয়ে দিচ্ছে তক্তায়।

দেখতে দেখতে ফুটোটা বন্ধ করে ফেলল দুজনে মিলে। খোলে পানি ঢোকা বন্ধ হলো।

গুড! মুসার প্রশংসা না করে পারল না পুকার।

ওদিকে খোলের লকার থেকে পাম্প নিয়ে এসেছে কিশোর। ছোট, হস্ত চালিত যন্ত্র। অনেক পুরানো মডেল। টিউবওয়েলের হাতলের মত হাতল। সেটাকে ওপরে-নিচে করে পাম্প করতে হয়। এ জিনিস এর আগেও দেখেছে সে, তবে রকি বীচ মিউজিয়ামে। পাম্পের সঙ্গে হোস পাইপ যুক্ত করে পানি সেচতে শুরু করল সে। সেচা পানি ফেলতে লাগল খালি ব্যারেলে।

অল্পক্ষণের মধ্যে ভরে গেল একটা ব্যারেল। দ্বিতীয় আরেকটা ব্যারেলে পাইপের মুখ ঢোকাল কিলোর। ওকে সাহায্য করছে রবিন। এই ব্যারেলটাও কানায় কানায় ভরে গেল। মেঝের পানিও শেষ।

ভালই তো দেখালে, পুকার বলল। ঠিক আছে, যাও এবার। ওপরে যাও। ওখানে যারা আছে তাদের সঙ্গে হাত লাগাওগে।
ডেকে উঠে এল তিন গোয়ে দা। লক্ষ করল ঝড়ের বেগ কমে গেছে অনেক। থেমে গেছে বৃষ্টি, বাতাসের তীব্রতা কমছে। ঢেউয়ের মাতামাতিটাও আর আগের মত নেই।
বড় বাঁচা বেঁচে গেছি, নাবিকদের বলল ক্যাপ্টেন নাইল। তবে ক্ষতিটা কম করেনি। জাহাজের যে সব জায়গায় ক্ষতি হয়েছে, মেরামত করে ফেলে।
বৃষ্টি নেই। অকারণে ভারী বর্ষাতি আর গায়ে চাপিয়ে রাখার কোন মানে হয় না। খুলে রেখে এল তিন গোয়েন্দা। দেখল, ঝড়ে জাহাজের ক্ষতি হওয়া জায়গাগুলো মেরামত করে ফেলেছে নাবিকেরা। মূল মাস্তুলের পালের একটা দড়ি ছুটে গেছে। ওপরে উঠে সেটা লাগানোর চেষ্টা করছে একজন নাবিক।
কিশোরের দিকে তাকাল ক্যাপ্টেন নাইল। কিশোর পাশা, আড়কাঠের উল্টো দিকে উঠে যাও তো। ওকে সাহায্য করো।
মাস্তুলের সাথে লাগানো সরু সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল কিশোর। আড়কাঠে চড়ে বসল। লোকটাকে চিনতে পারল এতক্ষণে। ল্যাম্বার্ট।
ঠিকঠাক মত কাজ করবে বলে দিলাম, অবজ্ঞার ভঙ্গিতে কিশোরকে বলল ল্যাম্বার্ট। পালের দড়িটা ধরো। গিট দাও…ওই যে ওই জায়গাটায়।
জবাব দিল না কিশোর। ওর দিকের পালের প্রান্তটা পতপত করে উড়ছে বাতাসে। ওটাকে ধরতে হলে তাকে আড়কাঠের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে হাত লম্বা করে দিতে হবে। মাত্র কাপড়টা ধরেছে ও, এমন সময় পাল ধরে হ্যাঁচকা টান মারল ল্যাম্বার্ট।
ভারসাম্য হারাল কিশোর। আড়কাঠ থেকে পড়ে যাওয়ার জোগাড় হলো তার। আতঙ্কিত হয়ে পড়ল মুসা ও রবিন। ডেকের ওপর ছিটকে পড়তে যাচ্ছে কিশোর।
তবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ওরা, যখন দেখল শেষ মুহূর্তে আড়কাঠটা ধরে ফেলেছে কিশোর। জাহাজের দুলুনির তালে তালে মালটাও দুলছে। কিশোরও ঝুলে থেকে দুলতে লাগল। তারপর শরীরের সমস্ত শক্তি জড় করে প্রাণপণ চেষ্টায় একটা পা রাখল আড়কাঠে। উঠে এল ওটার ওপর।
আপনি আমাকে ইচ্ছে করে ফেলে দিচ্ছিলেন। কঠোর কণ্ঠে বলে উঠল কিশোর।
খিকখিক করে হাসল ল্যাম্বার্ট। আমি ফেলব? আড়কাঠে বি ভাবে কাজ করতে হয় জানো না তুমি। তাই পড়ে গেছ।
জানি কি জানি না দেখাচ্ছি আপনাকে, ওকে চ্যালে করে বসল কিশোর। আপনার আগেই পাল খাটাব আমি।
কিছুদিন আগে কোস্ট গার্ড ট্রেনিং শিপে তার দুই সহকারী কাজ করে এসেছে কিশোর। জানে কি ভাবে পাল খাটাতে হয়। বাতাসে উড়তে থাকা পালের অংশটা

থাবা দিয়ে ধরে ফেলল ও। ওটার ধাতব ফুটোয় চামড়ার ফালি ঢুকিয়ে দিল। ফালিটা গোল করে আড়কাঠের হুকের মধ্যে ঢোকাল। তারপর গিট দিয়ে দিল শক্ত করে, নাবিকরা যে ভাবে দেয়। ব্যস, হয়ে গেল পাল খাটানো।
কাজ শেষ করে মইয়ের কাছে চলে এল কিশোর। ল্যাম্বার্টের তখন শোচনীয় অবস্থা। কিশোর যখন মই বেয়ে ডেকে নেমে এসেছে, তখনও পাল নিয়ে যুদ্ধ করছে ল্যাম্বার্ট।
চমৎকার দেখিয়েছ, কিশোর পাশা, পুকার বলল। সে সবই দেখেছে। ল্যাম্বার্ট ভুল করেছে। ওর তুলনায় তুমি অনেক বেশি দক্ষ। এক নম্বরের তিমি শিকারী হতে পারবে তুমি।
মুচকি হাসল কিশোর। মুসা আর রবিনের কাছে সরে এসে ফিসফিস করে বলল, প্ল্যানটা কাজে লাগছে। অন্তত ফার্স্ট মেটের মন গলাতে পেরেছি। আশা করি আমাদের পক্ষ নিয়ে এখন ক্যাপ্টেনের কাছে কথা বলতে দ্বিধা করবে না। বলবে আমাদের সাগরে ছুঁড়ে ফেলা উচিত হবে না। কারণ আমরা কাজের লোক।
আমারও তাই ধারণা, নিচু গলায় বলল রবিন। তবে বিপদ নিশ্চয় কাটেনি এখনও আমাদের…
ক্যাপ্টেনের চিৎকারে থেমে গেল সে।
এই, এদিকে এসো, হাত নেড়ে ডাকল ক্যাপ্টেন।
তাড়াহুড়া করে তার কাছে চলে এল রবিন।
যাও, ক্রোজ নেস্টে গিয়ে বসো, হুকুম দিল ক্যাপ্টেন। তাহিতির কাছাকাছি এসে পড়েছি মনে হচ্ছে। ডাঙা কত দূরে জানা দরকার। আন্দাজে চলতে গিয়ে পাহাড়ে ধাক্কা খেতে চাই না। তীক্ষ্ণ নজর রাখবে। প্রবাল প্রাচীরে ধাক্কা খেয়ে ডুবে মরতে চাই না।
নাবিকদের ভঙ্গিতে আই, আই, স্যার, বলে মূল মাস্তুলের দিকে ছুটল রবিন। মই বেয়ে উঠতে লাগল। আড়কাঠ আর মাস্তুলের সবচেয়ে ওপরের পাল পার হয়ে এল। মাস্তুলের মাথায় ঝোলানো একটা ঝুড়িতে উঠে বসল। এটাকেই বলে ক্রোজ নেস্ট। এখান থেকে সাগরের চতুর্দিকে নজর রাখা হয়। সাগরের অনেক দূর পর্যন্ত চোখে পড়ে।
তবে রাতের বেলা অন্ধকারে খুব বেশিদূর দৃষ্টি চলে না। ঝুড়িতে বসে চোখ টানটান করে রাখল সে। আবছা অন্ধকারে দেখার চেষ্টা করছে। জাহাজের দুলুনির, সঙ্গে সঙ্গে ঝুড়িটাও দুলছে। জাহাজ যখন কাত হচ্ছে, মাস্তুল কাত হচ্ছে, দুলতে দুলতে প্রায় পানির ওপর চলে আসছে তখন ঝুড়ি। জাহাজ সোজা হলেই আবার অনেক ওপরে উঠে যাচ্ছে। ভীষণ বেকায়দা এক অবস্থা। অনেক সময়

কোনও নাবিককে শাস্তি দেবার জন্যেও অতিরিক্ত সময় এই ঝুড়িতে বসিয়ে রাখা হয়।
ঝুড়ির বেকায়দা আসন, সেই সঙ্গে নোনা পানি মেশানো ঝোড়ো বাতাসের প্রচণ্ড ঝাপটা। অস্থির লাগছে রবিনের। চোখ কড়কড় করছে।
আহোয়, নিচ থেকে ভেসে এল ক্যাপ্টেনের নাবিক-সুলভ হাঁক। কিছু দেখছ?
পানি ছাড়া আর কিছু তো দেখছি না, জবাব দিল রবিন। অন্ধকারে বেশি দূর নজরও যায় না।
তাহিতির দেখা অবশ্যই মিলবে, চেঁচিয়ে বলল ক্যাপ্টেন। অন্ধকার হলেও। দেখার সঙ্গে সঙ্গে জানাবে আমাকে।
পাহারা দিতে লাগল রবিন। হঠাৎ রাতের আবছা পর্দা ভেদ করে কালো একটা কাঠামো ফুটে উঠতে শুরু করল। মনে হলো পানিতে ভেসে রয়েছে জিনিসটা।
নিশ্চয়ই ডাঙায় উত্তেজিত হয়ে উঠল রবিন। আহোয়। নিচে কেউ আছেন! ডেকের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বলল সে। ডাঙা দেখা যাচ্ছে। ডানে! ডানে!...জাহাজ ঘোরান!
ডেক থেকে ওর কথার প্রতিধ্বনি করল কিশোর, ডাঙা ডাঙা! জাহাজ ঘোরাতে বলছে।
সঙ্গে সঙ্গে আদেশ শোনা গেল ক্যাপ্টেনের। হুইল ধরেছে যে, তাকে বলছে জাহাজ ঘোরাতে।
ডানে ঘুরে গেল জাহাজ। ঢেউয়ের সাথে পাল্লা দিয়ে ছুটতে লাগল।
ঠিক সামনেই ডাঙা! চিৎকার করে জানাল রবিন। বায়ে ঘোরান এখন।
ওর কথারই পুনরাবৃত্তি করল ডেকে দাঁড়ানো কিশোর।
যে লোকটা হুইল ধরেছে, তাকে কি যেন বলতে শোনা গেল। ওপর থেকে রবিনের মনে হলো একা কুলাতে পারছি না এ রকম কিছু বলল লোকটা।
আদেশ দিল ক্যাপ্টেন, মুসা আমান, তুমি যাও, ওকে সাহায্য করোগে।
আই আই, স্যার, বলে এক মুহূর্ত দেরি না করে দৌড় দিল মুসা।
ক্যাপ্টেন বলল, নাক বরাবর সোজা চলে। ডাঙার দিকে। পাল টানটান করো। গতি বাড়াও।
এ-কি পাগলামি! শুনে গা হিম হয়ে গেল কিশোরের। ক্যাপ্টেন কি আত্মহত্যা করতে চাইছে নাকি? জাহাজসুদ্ধ সবাইকে ডুবিয়ে মারতে চাইছে।
প্রচণ্ড বেগে ছুটতে শুরু করল জাহাজ। কালচে কাঠামোটা ভীতিকর গতিতে কাছে চলে আসছে। আরও কাছে যেতে বোঝা গেল, তাহিতির ভূখণ্ড নয় ওটা। সাগরের মাঝখানে প্রবালের দ্বীপ।

ভয়ানক গতিতে প্রবাল প্রাচীরে এসে ধাক্কা মারল জাহাজ। বিকট শব্দে ভেঙে পড়ল মূল মাল আছড়ে পড়ল দড়ি-দড়ার জঙ্গলের ওপর। ক্রোজ নেস্ট থেকে ছিটকে পড়ল রবিন। দড়ি আঁকড়ে ধরে পতন ঠেকাল কোনমতে। তবে পুরোপুরি বাঁচতে পারল না। দড়াম করে এসে পড়ল ডেকে, কিশোরের পাশে।
রবিন! রবিন! উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল কিশোর।
ভয় নেই, আমি ঠিকই আছি, জবাব এল রবিনের। ভয় পেয়েছিল হাড়গোড় একটাও আও থাকবে না। কিন্তু তেমন কিছুই হয়নি দেখে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।
দৌড়ে এল মুসা। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, শয়তানিটা ইচ্ছে করে করেছে ক্যাপ্টেন। আমাদের ঝামেলায় ফেলার জন্যে। বাফার বলেছে আমাকে...
তার কথা শেষ হওয়ার আগেই শোনা গেল ক্যাপ্টেনের গর্জন। গালি দিয়ে বলল, সর্বনাশ করেছিস তোরা! আমার জাহাজের বারোটা বাজিয়েছিস! তোদের আমি ছাড়ব না!
কিন্তু আমি তো ঠিক মতই জানিয়েছি, কোন দিকে যেতে হবে... প্রতিবাদ করতে গেল রবিন।
কিশোরও বোঝানোর চেষ্টা করল ক্যাপ্টেনকে।
কিন্তু কে শোনে কার কথা। গর্জন থামল না ক্যাপ্টেনের। একগুয়ে ভঙ্গিতে বলতে থাকল, তোরা আমার জাহাজ ধ্বংস করেছিস! তোরা বিদ্রোহী! তোদের আমি ছাড়ব না! নাবিকদের দিকে ফিরে আদেশ দিল, ওদের সাগরে ফেলে দাও। হাঙরে ছিঁড়ে খাক।
বিকৃত আনন্দে চিৎকার করতে করতে ছুটে এল কয়েকজন নাবিক। ল্যাম্বার্টের দলের লোক এরা। এদের মধ্যে ল্যাম্বার্টকেও দেখা গেল। সবাই মিলে জাপটে ধরল তিন গোয়েন্দাকে। ঠেলা-ধাক্কা মেরে নিয়ে চলল রেলিং-এর ধারে।
হঠাৎ একটা অদ্ভুত ছায়ামূর্তিকে দেখা গেল এ সময়। এসে দাঁড়াল ওদের পাশে। সেই লোকটা, যে ওদেরকে জেলখানা থেকে বের করে এনেছিল। তারপর রহস্যময় ভাবে উধাও হয়ে গিয়েছিল ডেক থেকে।
ভাবলেশহীন মুখে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে লোকটা। অদ্ভুত একটা কাণ্ড করল। আঙুল তুলে নাবিকদের ইঙ্গিতে বোঝাতে লাগল কোন দিকে ফেলতে হবে বন্দিদের।
চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে তিন গোয়েন্দাকে পানিতে ছুঁড়ে ফেলল নাবিকেরা।
পানিতে পড়ার জন্যে তৈরি হয়েছিল গোয়েন্দা। কিন্তু পড়ল কাঠের মেঝেতে। হতবুদ্ধি হয়ে গেল তিনজনেই। উঠে বসল। তাকাতে লাগল চারপাশে।
যখন দেখল, নিজেদের মোটরবোটেই রয়েছে, বাকহারা হয়ে গেল একেবারে। ভূতুড়ে জাহাজ অ্যাড্রিয়াটিক পাঞ্চের চিহ্নও নেই কোথাও। দিগন্তে ভোরের

আভাস। ভালমত খেয়াল করে দেখে বুঝল, রকি বীচের কাছাকাছিই রয়েছে ওরা।
বোকার মত পরস্পরের মুখের দিকে তাকাতে লাগল তিনজনে।
বোটের ইঞ্জিনের কাছেই বসে আছে মুসা। ইগনিশনে মোচড় দিল। সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল মোটর। কিশোর দেখল, রেডিওটাও ঠিক মতই কাজ করছে।
অকেজো জিনিস হঠাৎ করেই ঠিক হয়ে গেল কি ভাবে? বিড়বিড় করল কিশোর।
অতি সহজ জবাব, বলে উঠল মুসা। কাল সন্ধ্যায় ভূতে নষ্ট করে দিয়েছিল এগুলো। সকাল বেলা ভূতের আসর কেটে যেতেই আবার ঠিক হয়ে গেছে সব।
সত্যিই কি পুরো একটা রাত একটা ভূতুড়ে জাহাজে কাটিয়ে এলাম? এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না রবিন।
এখনও কি সন্দেহ আছে তাতে? ভুরু নাচাল মুসা।
আসলে স্বপ্ন দেখেছি, ভূতের জাহাজ, এ কথাটা মানতে রাজি না কিশোর। ১৮৫০ সালের একটা তিমি শিকারী জাহাজের স্বপ্ন।
দুঃস্বপ্ন, শুধরে দিল রবিন।
তিনজনেই কি দুঃস্বপ্ন দেখলাম? মুসার প্রশ্ন। একই সময়ে? অবিকল এক স্বপ্ন?
তার এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারল না কিশোর কিংবা রবিন।

ভলিউম ৫১ – রক্তমাখা ছোরা – তিন গোয়েন্দা – রকিব হাসান – সেবা প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ: ২০০২

কাঁসার ঘণ্টার মত বেজে উঠল জোরাল কণ্ঠস্বর টুউউউ বিইইই…

কে? চমকে উঠল কিশোর।

শোনার জন্যে রবিন আর মুসাও কান পাতল।

…অর নট টুউউউ বিইইই…

রবিন বলল, কে জানি পদ্য বমি করছে!

জুনের চমৎকার রোদেলা দিন। হাতে কাজকর্ম নেই। বনের ভেতরে বেড়াতে এসেছে তিন গোয়েন্দা। সাথে করে খাবার নিয়ে এসেছে, লাঞ্চটা এখানেই সারবে। খাবার খুলে সবে খেতে বসেছে, এ সময় এই কাণ্ড!

দ্যাট ইজ দা কোয়েশ্চেন… বলে চলেছে কণ্ঠটা।

না না, পদ্য নয়, ভুরু কুঁচকে বলল কিশোর। হ্যামলেটের ডায়ালগ। তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য, আত্মহত্যা করতে চলেছে হ্যামলেট।

মনে হয় কোন হতাশ অভিনেতার কাজ।

অভিনেতা না ছাই, মুসা বলল। আমার তো মনে হচ্ছে পাগল।

গমগম করে উঠল কণ্ঠটা, টু ডাই, টু স্লীইইপ-নো মোর!…

অবাক কাণ্ড! রবিন বলল। কিন্তু…

চলো তো দেখি। উঠে পড়ল কিশোর। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল নদীর দিকে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে অনুসরণ করল রবিন।

কণ্ঠটা বলছে, ফর ইন দ্যাট স্লীপ অভ ডেথ হোয়াট ড্রীমস মে কাম…

এবার সত্যি সত্যি গায়ে কাঁটা দিচ্ছে আমার! মুসার কণ্ঠে অস্বস্তি।

নদীর একটা বাঁকের কাছে পৌঁছে গেছে ওরা। সামনে একটা কাঠের সেতু। ঝুলে রয়েছে যেন নদীর ওপর, যে কোন মুহূর্তে ঝুপ করে খসে যেতে পারে। খুঁটিগুলোর অবস্থা করুণ। সেতুর মাঝের অনেক কাঠ নেই, কিছু কিছু জায়গা থেকে সরে গিয়ে ঝুলছে, নাড়া লাগলেই খুলে পড়ে যেতে পারে। দুপাশে দড়ির রেলিঙ।

নদীতে তীব্র স্রোত। মাথা খারাপ না হলে ওই সেতু দিয়ে এখন নদী পারাপারের চেষ্টা করবে না কোন মানুষ।

কিন্তু লোকটার বোধহয় মাথাই খারাপ। সব চুল সাদা। কালো পোশাক পরনে। দাঁড়িয়ে রয়েছে সেতুর মাঝখানে। চোখ আরেক দিকে।

বলল, ফর হুউউ উড বিয়ার দা হুইপস অ্যান্ড স্করননননস অভ টাইম…

বদ্ধ উন্মাদ! ফিসফিসিয়ে বলল রবিন। বলে কি শুনছ!

দুহাত ওপরে তুলে ফেলেছে লোকটা। চলার গতি বাড়াল কিশোর। বলল, শুনছি। হ্যামলেট এ-সময় জীবন শেষ করে দেয়ার কথা ভাবে…

হোয়েন হি হিমসে মাইট হিজ কোয়ায়েটাস মেইক উইথ…
কি করার ইচ্ছে ওর? বুঝতে পারছে না রবিন।
জানি না…
আ বেয়ার বড়কিন!
বেয়ার বডকিনটা আবার কি জিনিসরে বাবা! মুসার প্রশ্ন।
সেতুর দিকে দৌড়াতে শুরু করেছে কিশোর। একটা ড্যাগার! ছুরি! লোকটা সত্যিই কিছু করবে!
চেঁচিয়ে উঠল মুসা, না, কিছু করবেন না, স্যার! সব ঠিক হয়ে যাবে!
চমকে ফিরে তাকাল লোকটা। তিন গোয়েন্দাকে দৌড়ে আসতে দেখল। মুখে অসংখ্য ভাঁজ। বয়েসের। চেহারা বিধ্বস্ত, কিন্তু মাথার চুল সব ঠিক আছে, এলোমেলো নয়। একঘেয়ে গলায় বলল, আমাকে বাঁচানোর চেষ্টা করে লাভ নেই। সব শেষ হয়ে গেছে। নিজের হাতেই জীবন দিয়ে দেব আমি।
ঝট করে একটা ছুরি বের করল। তুলে আনল বুকের ওপর।
কিশোর বুঝল, সেতুতে চড়ার সময় নেই। নদীর কাদাটে ঢাল পাড়ে ধপ করে বসে পিছলে নেমে গেল একটা খুঁটির কাছে।
ইনটু দা গ্রেট এভারলাসটিং আই কমেন্ড মাই স্পিরিট! ভারী গলায় চিৎকার করে উঠে ছুরিটা বুকে বসাতে তৈরি হলো লোকটা।
নাআআআ! গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল রবিন।
নড়বড়ে খুঁটিটা দুহাতে চেপে ধরল কিশোর। গায়ের জোরে ঝাঁকাতে শুরু করল। কাঁচম্যাচ করে দুলে উঠল পুরানো সেতু। তাল সামলাতে না পেরে তাড়াতাড়ি একদিকের দড়ির রেলিঙ আঁকড়ে ধরল লোকটা। ঝুলে থাকা কয়েকটা তক্তা খসে পড়ল পানিতে।
ঝাঁকিয়েই চলেছে কিশোর। মড়াৎ করে ভাঙল সেতুর একটা বীম, পুরানো আরেকটা বীম ভার রাখতে পারল না, ভেঙে গেল ওটাও। বিকট শব্দ করে ঝটকা দিয়ে পড়ে গেল সেতুর একপ্রান্ত। দড়িটড়ি কোন কিছু ধরেই আর কাজ হলো না। সামলাতে পারল না লোকটা। ঝপাং করে পড়ল পানিতে। ছুরিটা তখনও ধরে রেখেছে শক্ত করে।
ডুবে যাওয়ার আগে লোকটার রক্ত পানি করা চিৎকার প্রতিধ্বনি তুলল নদীর দুই তীর আর পাহাড়ে। মাঝপথে থেমে গেল চিৎকারটা, যেন গলা টিপে থামিয়ে দেয়া হলো। আতঙ্কিত চোখে মুসা দেখল, তীব্র স্রোত লোকটাকে ভাসিয়ে নিয়ে আসছে তার দিকে।
চলে যাবে! মরবে! পাথরে গিয়ে বাড়ি খাবে!

মুসার চিৎকার কানে পৌঁছল কিনা বোঝা গেল না, তবে কোনমতে মা তুলল লোকটা। বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও! সাঁতার জানি না...! নাকে মুখে পানি ঢুকে গেল বোধহয় ওর।
প্রায় একই সঙ্গে পানিতে ডাইভ দিল তিন গোয়েন্দা। মাথা তুলল লোকটা, আবার ডুবে গেল। এরই মাঝে পলকের জন্যে নজরে পড়ল তার আতঙ্কিত দৃষ্টি। তীব্র স্রোত ঠেলে তার কাছে পৌঁছল ওরা। হাত বাড়িয়ে কাধ ধরতে গিয়েও ঝটকা দিয়ে হাত সরিয়ে নিল মুসা। মুখ সরাল। আরেকটু হলেই তার গাল চিরে দিয়েছিল চুরির তীক্ষ্ণ ফলা।
কাছেই তো যেতে পারছি না! বলল সে।
শান্ত হোন, স্যার! অনুরোধ করল কিশোর! হাত নাড়বেন না। চুপচাপ ভেসে থাকার চেষ্টা করুন।
আমি...আমি...সাঁতার... আবার পানির নিচে ডুবে গেল লোকটার মাথা।
লোকটা সহযোগিতা করতে পারবে না, চিন্তা করার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেছে, বুঝল মুসা। হঠাৎ চার হাত পায়ে জোরে একটা ধাক্কা দিয়ে আগে বাড়ল, লোকটার বুক জড়িয়ে ধরল। লাথি মেরে, ঝাড়া দিয়ে নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করল যেন লোকটা, ছুরি নাচাল অনিশ্চিত ভঙ্গিতে।
সাবধান! চেঁচিয়ে মুসাকে সাবধান করল কিশোর।
ডান হাতে লোকটাকে জড়িয়ে ধরে রেখে অন্য হাতে লোকটার ডান কব্জি চেপে ধরল মুসা। একটা বিশেষ দুর্বল জায়গায় বুড়ো আঙুল দিয়ে চাপ দিতেই নিমেষে খুলে গেল ছুরি ধরা আঙুলগুলো পানিতে পড়ে গেল ছুরিটা।
ইতিমধ্যে দুর্বল হয়ে এসেছে লোকটা। নড়াচড়া আর তেমন করছে না। তাকে নিয়ে সঁতরে তীরে ওঠার চেষ্টা চালাল মুসা। মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরে রয়েছে চোখা পাথরের দেয়াল, দুপাশ থেকে চেপে এসেছে, মাঝের সরু ফাঁক দিয়ে বয়ে চলেছে পানি। লোকটাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকায় মুসা দেখল না সেটা, কিন্তু রবিনের চোখ বড় বড় হয়ে গেল।
ছেড়ে দাও, মুসা, ছেড়ে দাও! তুমিও মরবে!
জলদি এসে ধরো! আমি একলা পারছি না!
কিছুতেই ছাড়বে না মুসা, বুঝতে পেরে প্রাণপণে সাঁতরে এগোল অন্য দুজনে। কোনমতে কাছে এসে চেপে ধরল লোকটার হাত।
তিনজনে মিলে টেনেটুনে তীরের কাছে নিয়ে এল লোকটাকে। অল্পের জন্যে বেঁচে গেল লোকটা। চোখা পাথরের দেয়াল থেকে মাত্র কয়েক গজ দূরে তীরে এসে উঠল ওরা।

ভেজা মাটিতে চিত করে শুইয়ে দেয়া হলো লোকটাকে। চোখ মুদে রয়েছে সে। বেহুশ হয়ে গেছে বোধহয়। তাড়াতাড়ি ওর মুখে মুখ লাগিয়ে কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাসের চেষ্টা চালাল কিশোর।
কিছুক্ষণ পর হঠাৎ কেশে উঠল লোকটা। আ-আমি…কো-কোথায়…
চোখ মেলল লোকটা। ঘোলাটে দৃষ্টি। শূন্য চাহনি। ঠিক হয়ে এল ধীরে ধীরে। আমি বেঁচে আছি, তাই না?
আছেন। অল্পের জন্যে বেঁচেছেন, জবাব দিল কিশোর। সময় খারাপ যাচ্ছে নাকি আপনার?
খারাপ? বিড়বিড় করল লোকটা। দুর্বল কণ্ঠ, কিন্তু রাগ চাপা পড়ল না, বলল, শুধু খারাপ বললে কম বলা হবে। কোনমতে জীবনটাকে টিকিয়ে রেখেছি আমি!
আস্তে। আস্তে। হাত নাড়ল কিশোর, সহজভাবে কথা বলুন। আপনি কে? এখানে কি করতে এসেছেন?
আমি একজন বিপদে পড়া মানুষ, স্যার, নাটক করতে করতে যেন নাটকীয় ভঙ্গিতে কথা বলা অভাস হয়ে গেছে লোকটার। মাথা ঝাড়ল, যখন তাকে তুলে বসানোর চেষ্টা করল রবিন। নাম আমার নিভার ব্রাউন। চোখ নামিয়ে মাথা নাড়ল বিষণ্ন ভঙ্গিতে। হ্যাঁ, থিয়েটার আর সিনেমার সেই নিভার ব্রাউন। চমকে গেলে তো?
কারও কাছ থেকে জবাব না পেয়ে মুখ তুলে দেখল ওদের শূন্য দৃষ্টি। আর্ট ফিল্ম বোধহয় দেখো না তোমরা!
মাথা নাড়ল তিনজনেই।
তাহলে আর চিনবে কিভাবে? পচা নাটক আর সিনেমা দেখলে আমার নাম জানার কথা নয়। যাকগে! এখন আমার কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দাও তো। কেন বাধা দিলে আমাকে?
আত্মহত্যা একটা অপরাধ, মিস্টার ব্রাউন, কোমল গলায় বলল রবিন। আপনার পরিবারের কথা ভাবুন…
কঠিন হয়ে গেল লোকটার ধূসর চোখজোড়া, দৃষ্টি যেন ধারাল ছুরির ফলার মত ভেদ করে ঢুকে গেল রবিনের অন্তরে। পরিবার? সেই চরিত্রহীন মেয়ে মানুষটার কথা বলছ, যে আমাকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেছে হলিউডের এক ফিল্ম এডিটরের সঙ্গে!
স-সরি, মিস্টার ব্রাউন, আমি সত্যি দুঃখিত।
আরে শোনোই না, আমার দুঃখের ইতিহাস শুরুই তো করিনি এখনও। আর্ট ফিল্ম আর খুব একটা হয় না আজকাল, ফলে কাজ পাওয়া যায় না। একজন নিয়মিত একটা বেতন দিয়ে যাচ্ছিলেন, এখন সেটাও গেছে। তা ছাড়া মনের খোরাকই যদি

গেল একজন মানুষের, বেঁচে থাকার আর কি অর্থ বলো? জীবনের সব কিছু হারিয়ে আমার বয়েসী একজন মানুষ বেঁচে থেকে কি করবে? আঁ! কি করবে? আশপাশে মাটিতে চোখ বোলাল সে। আমার ছুরি কই?
পানির তলায়, কিশোর জানাল। নদীতে। শুনুন, ওসব পাগলামি চিন্তা বাদ দিয়ে আমাদের সঙ্গে আসুন। গাড়ি আছে। বাড়ি পৌঁছে দেব। বিশ্রাম নিলেই মাথা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। ভীষণ উত্তেজিত হয়ে আছেন এখন আপনি।
হবে না, হবে না! ওই ছুরিটা হারিয়ে তো মন আরও খারাপ হয়ে গেল! ওই ছুরিটা আমাদের পারিবারিক সম্পত্তি। আমার বাবার বাবা, তার বাবা, তার বাবার কাছ থেকে এসেছে! করলে কি তোমরা! আমাকে মরে তোত বাঁচতে দিলেই না, মাঝখান থেকে ওরকম একটা সম্পদ খোয়ালাম...।
দুই সহকারীর দিকে তাকাল কিশোর। তারপর জোর করে ধরে তুলল ব্রাউনকে। কিছুতেই যাবে না লোকটা। শেষে অনেকটা হাল ছেড়ে দেয়ার ভান করে ঘুরে দাঁড়াল তিনজনে। পাহাড় বেয়ে উঠতে শুরু করল।
একবার দ্বিধা করে পিছু নিল ব্রাউন। অভিযোগের পর অভিযোগ করে চলল। সমস্ত দুনিয়ার ওপর তার ঘৃণা জন্মেছে। তবে থামল না আর। বন পেরিয়ে এসে দাঁড়াল মুসার ভটভটানি জেলপি গাড়িটার কাছে।
ট্রাংক থেকে উলের একটা শাল বের করল মুসা। ব্রাউনের দিকে বাড়িয়ে দিল। ভেজা শরীর জড়িয়ে নিতে ইশারা করল লোকটাকে।
মুসা যখন ইঞ্জিন স্টার্ট দিল; শাল জড়ানো, এমনকি পেছনের সীটে রবিনের পাশে উঠে বসার কাজটাও সমাপ্ত হয়েছে লোকটার, ফোঁপাতে আরম্ভ করল। যেন কত কষ্ট।
প্লীজ, মিস্টার ব্রাউন, মুসা বলল, এত ভেঙে পড়ার কিছু নেই। সব ঠিক হয়ে যাবে। কোথায় থাকেন, বলবেন?
নাইনটি ফোর লেকভিউ এভিন্যু! হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখের পানি মুছল বেচারা ব্রাউন। আমার জীবন যদি রক্ষাই করলে, আরেকটু উপকার করো, দয়া করে একটা টিস্যু পেপার দাও।
একটা টিস্যু পেপার বের করে দিল কিশোর।
গাড়ি চালিয়ে রকি বীচের একটা পুরানো অঞ্চলে ঢুকল মুসা। শহরতলি দিয়ে চলেছে। সারা দুনিয়ার প্রতি এক নাগাড়ে অনর্গল অভিযোগ করে চলেছে ব্রাউন।
মিস্টার ব্রাউন! আর সইতে না পেরে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠল মুসা, দয়া করে একটু থামবেন? গাড়ি চালাতে পারছি না...
মাছ ধরার সরঞ্জামের একটা দোকানের পরেই তীক্ষ্ণ মোড়। উইন্ডশীল্ডের ওপাশে চোখ পড়তেই মুখ থেকে রক্ত সরে গেল ব্রাউনের।

সাবধান! চিৎকার করে উঠল কিশোর।
ভুল সাইড দিয়ে ধেয়ে আসছে আরেকটা লাল স্পোর্টস কার। নাক বরাবর ছুটে আসছে যেন ওদেরকে তো মারার জন্যেই!

.

শাই করে ডানে স্টিয়ারিং কাটল মুসা। নাকের একপাশ দিয়ে একটা গার্ড রেইলে গুঁতো মারল গাড়িটা। প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেলো। টায়ারের কর্কশ আর্তনাদ তুলে পাশ দিয়ে প্রায় গা ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল লাল ল্যামবোরগিনি গাড়িটা।
বিচ্ছিরি একটা ধাতব আওয়াজ ভরে দিল যেন বাতাসকে। পথের পাশে গাড়ি থামিয়ে দিল মুসা। ফিরে তাকিয়ে দেখল একটা টেলিফোন পোস্টে ধাক্কা লাগিয়েছে লাল গাড়িটা।
ঠিক আছে তো? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
আছি। উফ, বড় বাঁচা বেঁচেছি! মুসা বলে উঠল।
দরজা খুলে লাফিয়ে নেমে লাল গাড়িটার দিকে দৌড় দিল তিন গোয়েন্দা। ক্ষতি তেমন হয়নি, শুধু সামনের দিকে খানিকটা জায়গার ছাল উঠে গেছে।
আমিও ভাল আছি, বুঝলে! জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে চেঁচিয়ে বলল পেছনের সীটে বসা ব্রাউন। কিছুই জিজ্ঞেস করলে না আমাকে। আমার জীবনের কি কোন দাম নেই?
কানেও তুলল না তিন গোয়েন্দা। ওরা গাড়ির কাছে পৌঁছে গেছে, এই সময় ঝটকা দিয়ে খুলে গেল বাঁ পাশের দরজা। শোনা গেল তীক্ষ্ণ মেয়েলী চিৎকার, এই, দেখেশুনে গাড়ি চালাতে পারো না?
গাড়ি থেকে নেমে এল এক তরুণী। বয়েসে ওদের একআধ বছরের বড় হতে পারে। লাল চুল। গলার তিনটে সোনার হারকে ঠিক করল। হাত দিয়ে ডলে সমান করে দিল আঁটো জাম্পসুটের ভাঁজ। নাকে সানগ্লাস বসানোর আগে একবার বিষদৃষ্টি হানল কিশোর, রবিন আর মুসার ওপর। তারপর গটমট করে এগিয়ে এল। মেয়েটাকে চেনা চেনা লাগল কিশোরের।
দেখো, আমার গাড়ির কি করেছ! ধমক দিয়ে বলল মেয়েটা। একেবারে শেষ!
না, খুব একটা ক্ষতি হয়নি, মুসা বলল। তবে দোষটা তো আপনার…
তোমার দোষ!
দোষ যারই হোক, মেয়েটাকে শান্ত করার চেষ্টা চালাল কিশোর, এখন আর বলে লাভ নেই। আর গাড়ির যা ক্ষতি হয়েছে, তার জন্যেও চিন্তা নাই। বীমা কোম্পানিই যা করার করে দেবে। আসল জিজ্ঞাসাটা হলো, আপনি জখম-টখম হয়েছেন কিনা। ভাল আছেন?

দাঁত খিঁচিয়ে বলল মেয়েটা, তোমাদের চাঁদমুখ দেখার আগে তো ছিলামই! কি যে বিপদে ফেলে দিলে! এখন গ্যারেজে খবর দিতে হবে। ট্যাক্সি নিয়ে যেতে হবে আমাকে। এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে। ভাল ঝামেলা বাধিয়েছ।!
আবার ড্রাইভিং সীটের কাছে গিয়ে দাঁড়াল সে। ভেতর থেকে বের করল একটা মোবাইল টেলিফোন। কিশোর মনে করার চেষ্টা করছে, মেয়েটাকে কোথায় দেখেছে।
হাল্লো, মারলিন? ফোনে বলল মেয়েটা হাল্লো, আরে জোরে বলো না! হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি….ডায়না, ডায়না!…কী? হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে টেলিফোনটা প্রায় ছুঁড়ে ফেলে দিল। যাই কি করে এখন? হাঁটব!
দৌড়ে যাও! মুখে এসে গিয়েছিল কথাটা মুসার। কিন্তু বলল না। তার বদলে বলল, আমার গাড়িতে করে যাবেন?
তুমি চালাবে? তিক্তকণ্ঠে বলল মেয়েটা।
হ্যাঁ।
যেতে পারি, যদি ও চালায়, বুড়ো আঙুল দিয়ে কিশোরকে দেখাল ডায়না। কারণ আমার মনে হচ্ছে ও ভাল চালাবে। তোমাকে বিশ্বাস করতে পারছি না আমি। আবার গুঁতো লাগাবে কারও গাড়ির সঙ্গে।
কিশোরের দিকে একটা অদ্ভুত চাহনি দিয়ে কাঁধ ঝাঁকাল মুসা। ফিরে চলল গাড়ির কাছে।
মুচকি হাসল রবিন।
মেয়েটার ব্যাপারে কৌতূহল বাড়ছে কিশোরের। কোথাও দেখেছে। ডাকল, আসুন।
ঝাঁকুনি দিয়ে মুখের ওপরে এসে পড়া সিল্কের মত নরম লাল চুলগুলো সরিয়ে দিল ডায়না। এগোল মুসার গাড়ির দিকে।
আপনাকে চিনে ফেলেছি আমি, বলে উঠল কিশোর। আপনি ডায়না মরগান। পত্রিকায় পড়েছি…
…পারসোনালিটি ম্যাগাজিনে, কিশোরের বাক্যটা শেষ করে দিল ডায়না। হ্যাঁ, আমিই সেই মেয়ে। উদ্ভট আর্টিকেল, তাই না? হেডিংটা কি দিয়েছে। পড়লেই গা জ্বলে! ওটা একটা লেখা হয়েছে। গরু ছাগল কতগুলোকে নিয়ে ভরেছে পত্রিকা অফিসে। আহারে, আমার জন্যে কি দুঃখ ওদের, আমার বাবা মায়ের অকাল মৃত্যুতে কেঁদেকেটে অস্থির। মায়ের চেয়ে মাসীর দরদ বেশি। যত্তোসব!
কাছেই একটা ফোন বুঁদ দেখে এগিয়ে গেল ডায়না। ফোন সেরে ফিরে এসে উঠল গাড়িতে, সামনের প্যাসেঞ্জার সীটে। এমন ভঙ্গি করল, যেন

মিউনিসিপ্যালিটির ময়লার গাড়িতে উঠেছে। নাক কুঁচকে নির্দেশ দিল কিশোরকে, রকি বীচ মিউজিয়ামে যাও। জলদি।
পেছনের সীটে তখন একেবারে গুটিয়ে গেছে ব্রাউন। মুসার দেয়া শাল দিয়ে ঢেকে ফেলেছে আপাদমস্তক। মুখও দেখা যায় না।
সানগ্লাসের ভেতর দিয়ে তার দিকে তাকাল ডায়না। ব্যাপার কি? রোগী নাকি! এই, কি রোগ? এইডস
ব্রাউনের প্রতিক্রিয়া খুব একটা হলো না, সামান্য নড়েচড়ে বসল শুধু শালের তলায়। তার পাশে গাদাগাদি করে বসল মুসা ও রবিন।
না, রোগী না, জবাবটা দিল কিশোর। খুব দুর্বল। তা মিউজিয়ামে কেন? মরগানদের কালেকশন চেক করা হচ্ছে?
মুখ দিয়ে বিচিত্র একটা শব্দ করল ডায়না। চেক-ফেক না। যেখানকার জিনিস সেখানে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।
তাই নাকি? আগ্রহ দেখাল কিশোর। পারসোনালিটি তো বলছে, মিউজিয়ামের অর্ধেক জিনিসই নাকি আপনাদের। নিয়ে গেলে খালি হয়ে যাবে তো।
তা যাবে। পত্রিকা ভুল তথ্য দিয়েছে। অর্ধেক নয়, ষাট ভাগই আমাদের। এখন ওগুলো সব আমার সম্পত্তি। মিউজিয়ামে ফেলে রাখার পক্ষপাতি নই আমি। বাড়ি সাজাব। নিজের বাড়ির দেয়ালে ঝোলাব পেইন্টিংগুলো। ওদেরকে দিয়ে রাখব কেন শুধু শুধু?
অর্ধেকের বেশি জিনিস মিউজিয়াম থেকে চলে যাচ্ছে দেখে কিউরেটরের মুখটা কেমন হবে, আন্দাজ করতে চাইল কিশোর।
নিজের চোখেই দেখতে পেল খানিক পরে। মিউজিয়ামের কাছে চলে এসেছে গাড়ি। দেখা গেল, বাড়িটার পাশে একটা ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। ওটার পেছনে জড়ো হয়েছে পাঁচজন লোক। চারজনের পরনে ধূসর রঙের ইউনিফর্ম। বড় একটা বাক্স ট্রাকে তোলার চেষ্টা চালাচ্ছে। পঞ্চমজনের গাট্টাগোট্টা শরীর, নীল সুট পরেছে, চোখে সরু তারের চশমা। চারজনে ধরাধরি করে বাক্সটা ট্রাকের পেছনে নিয়ে গেছে। চেঁচিয়ে চলেছে নীল সুট। বার বার হাত নেড়ে কি বোঝাতে চাইছে, রাগে লাল হয়ে উঠেছে চোখমুখ। পাতলা হয়ে আসা সোনালি চুলের কয়েকটা গোছা এসে লেপটে রয়েছে ঘামে ভেজা কপালের ওপর। লোকগুলোকে কাজ থেকে, অর্থাৎ ট্রাকে বাক্স ভোলা থেকে বিরত রাখতে চাইছে।
এটাই বোধহয় শেষ বাক্স, আনমনে বিড়বিড় করল ডায়না। হুকুমের সুরে কিশোরকে বলল, আহ, তাড়াতাড়ি চালাও না। মোটোর সঙ্গে কথা বলা দরকার।
ধনুকের মত বাঁকা ড্রাইভওয়ে ধরে বাড়িটার পাশে এনে গাড়ি রাখল কিশোর। একটানে দরজা খুলে লাফিয়ে নামল ডায়না। কি হলো জুভেনার, ওদের

ধমকাচ্ছেন কেন?
রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছল লোকটা। সরে যাওয়া চশমাটা আবার ঠেলে দিল নাকের ওপর। সি মরগান, আপনার নিশ্চয় মনে আছে এই জিনিসগুলো মিউজিয়ামকে দান করে দেয়া হয়েছে। তিরিশ বছর আগে দলিল সই করে দিয়েছেন আপনার দাদা। কিউরেটর হয়ে কি করে আমি এগুলো নিয়ে যেতে দিই
অসহিষ্ণুতা চলে গেছে ডায়নার। শান্তকণ্ঠে বলল, জুভেনার, আপনিই বলেছেন, ওই দলিলটা পাওয়া যাচ্ছে না। ছিল যে তার ঠিক কি?
ছিল, নিশ্চয় ছিল! খুঁজে বের করার জন্যে সময় তো দেবেন? গত বছর আগুন লেগেছিল, জানেন। তখন সমস্ত পুরানো ফাইল সরিয়ে ফেলা হয়েছিল।
ওসব কথা অনেক শুনেছি, বাধা দিয়ে বলল ডায়না। আমার বাবার উইলের কপি আপনি দেখেছেন। জিনিসগুলো এখন আমার সম্পত্তি। এবং আমি ওগুলো ফেরত চাই। অনেক দিন তো রাখলেন, আর কত? নতুন করে সাজিয়ে নিন আবার।
নতুন করে! মাই ডিয়ার লেডি, এটা মিউজিয়াম, বেডরুম নয় যে বললেই সাজানো হয়ে যাবে। এত দামী দামী ছবি, শিল্পকর্ম, চাইলেই কি পাওয়া যায়? আর ওসব জিনিস ছাড়া মিউজিয়াম বাতিল।
মোলায়েম হেসে পরিবেশ হালকা করে ফেলতে চাইল ডায়না। কিশোর যতটা মাথামোটা ভেবেছিল মেয়েটাকে, এখন দেখল ততটা নয়। বরং বয়েসের তুলনায় অনেক বেশি বুদ্ধিমতী।
আহহা, এত মন খারাপ করছেন কেন? ডায়না বলল। অন্য ভাবেও তো ভেবে দেখতে পারেন। তিরিশটা বছর অন্যের জিনিস দিয়ে মিউজিয়ামের মান বাড়িয়েছেন, নাম কামিয়েছেন, এটা কি কম পাওয়া হলো?
ওগুলো রাখতে পারলেই শুধু খুশি হব আমি। আপনি অত্যন্ত অন্যায় কাজ করছেন। আপনার বাবাও মেনে নিতেন না এটা।
লোকটাকে ঠেলে সরানোর চেষ্টা করল চারজনের একজন। আহহা, মিস্টার জুভেনার, কি শুরু করলেন? সরুন না! ভীষণ ভারী এটা। সরুন, জায়গা দিন। ম্যাডাম যা বলছেন, শুনুন।
না, নিতে হলে আমার লাশের ওপর দিয়ে নেবে। ধাক্কা দিয়ে লোকটাকে সরিয়ে দিতে গেল জুভেনার।
আরেকজনের পায়ে পা বেধে গিয়ে উল্টে পড়ে গেল লোকটা। গেল রেগে। গাল দিয়ে লাফিয়ে উঠে ঘুসি মেরে বসল জুভেনারের চোয়ালে।
পড়ে গেল জুভেনার।

কিউরেটরকে পড়ে যেতে দেখে ছুটে এল মিউজিয়ামের তিনজন কর্মচারী। এসেই যে লোকটা জুভেনারকে মেরেছে তার পেটে ঘুসি মারল একজন। আরেক ঘুসি মেরে ফেলে দিল একটা বাক্সের ওপর।
চোয়াল ডলতে ডলতে চিৎকার করে উঠল কিউরেটর, এই কি করছ নিক, ওটা রডিনের স্ট্যাচু! ভাঙবে তো!
তার চিৎকার কানেই তুলল না কেউ। পাইকারী মারামারি শুরু হয়ে গেছে। মিস ডায়না মরগানের শ্রমিক বনাম মিউজিয়ামের কর্মচারী। টেনে-হিঁচড়ে বাক্স সরাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল জুভেনার।
এত দ্রুত ঘটে গেল ঘটনা, কিছুক্ষণের জন্যে যেন হতবুদ্ধি হয়ে গেল কিশোর। তারপর সংবিৎ ফিরল। দেখি, থামাই! রবিন, জলদি পুলিসকে ফোন করো! মুসা, এসো আমার সঙ্গে! বলেই দৌড় দিল সে।
একজন শ্রমিকের ওপর থেকে নিককে টেনে সরিয়ে আনল মুসা। ঘুরতেই দেখল, ঘুসি পাকিয়ে তারই দিকে ছুটে আসছে আরেকজন শ্রমিক। ঝট করে মাথা নিচু করে ফেলল সে। ঘুসিটা চলে গেল তার কাঁধের ওপর দিয়ে। সোজা হয়েই জুজিৎসুর প্যাঁচ মেরে মাটিতে ফেলে দিল লোকটাকে।
আরে থামুন, থামুন আপনারা! শুরু করলেন কি! চেঁচিয়ে বলল কিশোর।
কিন্তু কে শোনে কার কথা। পেছন থেকে এসে তাকে জাপটে ধরল মিউজিয়ামের এক কর্মচারী। মাটিতে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করতে লাগল। পারল না। কারাতের প্যাঁচে কুপোকাৎ হলো। চোখ বড় বড় হয়ে গেছে ডায়নার, এ রকম কিছু ঘটবে আশা করেনি। ধীরে ধীরে পিছিয়ে যাচ্ছে মুসার গাড়িটার দিকে।
কিছুক্ষণের মধ্যেই সাইরেনের শব্দ যেন মধু বর্ষণ করল কিশোরের কানে। পুলিসের সাইরেন। ড্রাইভওয়ের দিকে ফিরে তাকাল সে। দুটো গাড়ি চোখে পড়ল। পুলিসের। আগেরটাতে ড্রাইভারের পাশে অফিসার পল নিউম্যানকে বসে থাকতে দেখল।
ব্যস, ব্যস, অনেক হয়েছে! বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল টঙটঙে যান্ত্রিক কণ্ঠ, পেট্রোল কারের মেগাফোনে কথা বলছে পল। পুলিসের নির্দেশ উপেক্ষা করার সাহস হলো না কারও। লড়াই থামিয়ে দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে গেল, যেন গোবেচারা, কিছু করেনি।
গাড়ি থেকে নেমে এল পল আর তার সহকারী। আরেক দিক থেকে এল রবিন, ফোন করতে গিয়েছিল রাস্তার মোড়ের একটা ফোন বুদে। ভ্যান থেকে নেমে লাফাতে লাফাতে ছুটে এল মু।
মিস্টার জুভেনার, জিজ্ঞেস করল পল, কি হয়েছে? মালগুলো কার, মরগানদের না?

হ্যাঁ, জবাব দিল কিউরেটর। জোর করে নিয়ে যেতে এসেছে এই লোকগুলো।
নাকি আপনি জোর করে রেখে দিতে চাইছেন? মিস মরগানের সঙ্গে আগেই কথা হয়েছে আমার। দলিল যতক্ষণ দেখাতে না পারছেন, জিনিসগুলো রাখতে পারছেন না আপনি। বাধা দেয়ার কোন অধিকার নেই।
কিন্তু...কিন্তু...
যা বলার আদালতে গিয়ে বলবেন। আমাকে বলে লাভ হবে না।
পলের সঙ্গে তর্ক করছে কিউরেটর, রবিন চলে এল কিশোরের পাশে। জোর একটা লড়াই যে হয়ে গেছে, লোকগুলোর নাকমুখের অবস্থা দেখেই আন্দাজ করতে পারল। শিস দিয়ে উঠল আপনমনে। মাথার চুলে হাত বোলাল। মনে হয় মিসই করলাম! কেমন চলল?
দারুণ, জবাব দিল মুসা। মুখে মৃদু হাসি। ছড়ে যাওয়া কনুই ডলছে। তুমি ছিলে না বলে আমারও দুঃখ হচ্ছিল। কারাত আর জুজিৎসুর কি প্যাঁচগুলোই না কষলাম। দেখলে একেবারে মুগ্ধ হয়ে যেতে...
কথা শেষ হলো না তার। তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার শোনা গেল। ঝট করে ফিরে তাকাল সবাই ড্রাইভওয়ের শেষ মাথার দিকে।
মুসার গাড়ির গায়ে যেন সেঁটে রয়েছে ডায়না। পেছন থেকে তার গলা চেপে ধরেছে একজোড়া হাত।
দৌড় দিল দুই ভাই। পেছনে রবিন। চেঁচিয়ে উঠল, আরে ব্রাউন তো মেরে ফেলল মেয়েটাকে!

.

ডায়নাকে সাহায্য করছে কিশোর, ইতিমধ্যে ব্রাউনের কলার ধরে টেনে তাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে নিয়ে এল মুসা।
ডায়না, লেগেছে কোথাও? উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর।
না, না, আ-আমি ঠিক আছি! ফুঁপিয়ে উঠল একবার ডায়না। হাত চলে গেছে গলায়, যেখানটায় চাপ লেগেছে। শুধু মাথাটা কেমন যেন করছে!
অনেক সহ্য করেছি আমি, ডায়না মরগান, চিৎকার করে বলল ব্রাউন, নাটকের সংলাপ বলছে যেন, আর নয়। তোমাকে ছাড়ব আমি ভেবেছ! সর্বনাশ করে দেব। খুন করব! দুই হাত বাড়িয়ে এগোল সে।
ভয় পেয়ে গেল ডায়না। পিছিয়ে এল এক পা। লাফ দিয়ে তার আর ব্রাউনের মাঝে চলে এল কিশোর। বাধা হয়ে দাঁড়াল মাঝখানে। পল আর তার সহকারীও পৌঁছে গেল ওখানে। ব্রাউনকে টেনে সরিয়ে নিয়ে হাতকড়া পরিয়ে দিল তার হাতে। কিশোরের দুপাশে এসে দাঁড়াল মুসা আর রবিন।

আমাকে ছাড়ুন অফিসার, আমার কোন দোষ নেই, সংলাপ চালিয়ে গেল অভিনেতা। ও আমাকে বাধ্য করেছে এসব করতে। স্বপ্নেও যা ভাবতে পারিনি, তা-ই করিয়ে ছেড়েছে আমাকে দিয়ে।
ব্রাউনের মুখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে পল। চকচক করে উঠল চোখ। ও, আপনিই সেই লোক, না? হরর হাই স্কুল স্ত্রী নাটকটার বারোটা বাজিয়েছেন?
আমার কোন দোষ ছিল না, মাটির দিকে তাকিয়ে বলল ব্রাউন। পার্টটাই ছিল এরকম, বাজে।
ডায়নার দিকে নজর দিল কিশোর। সত্যি ঠিক আছেন তো আপনি?
হ্যাঁ, ভালই আছি, গলায় জোর নেই। কিশোরের চোখে চোখে তাকাল, দৃষ্টিতে স্বস্তি দেখা গেল এতক্ষণে। থ্যাংকস।
হাত ডলছে মুসা। দাঁতের দাগ স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। কামড়ে দিয়েছে ব্রাউন। জলাতঙ্কই না হয়ে যায় শেষে-ভাবল সে। পাগলই মনে হচ্ছে লোকটাকে! পাগলা কুকুরে কামড়ায়নি তো!
ধন্যবাদটা কিন্তু আমাকে দেয়া উচিত ছিল, হালকা গলায় বলল মুসা। আপনাকে ছাড়িয়ে আনার সময় কামড়টা ব্রাউন আমাকে দিয়েছে, কিশোরকে দেখাল সে। ওকে নয়।
শূন্য দৃষ্টিতে মুসার দিকে একটা মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল ডায়না। তারপর কিশোরকে বলল, লোকটা সাংঘাতিক! বদ্ধ পাগল…
এই, আমি সব শুনছি কিন্তু! গর্জে উঠল ব্রাউন। মাত্র তো কয়েকটা বছর। এর মধ্যেই আমার সম্পর্কে ধারণা পাল্টে গেল?
আপনি শান্ত হোন, মিস্টার ব্রাউন, বলে ডায়নার দিকে ফিরল কিশোর। একে চেনেন নাকি?
শীতল দৃষ্টিতে ব্রাউনের দিকে তাকাল ডায়না। চিনি না মানে। ওর নাম ব্রাউন না, এনুডা, বার্ব এনুডা। আব্বার কাছে চাকরি করত…
ওই পাপ মুখে ওঁদের নাম আর নিও না, চেঁচিয়ে উঠল এনুডা। সাহেব আর মেমসাহেব কত ভাল ছিলেন। তাদের ঘরে যে তোমার মত একটা খাণ্ডারনী কি করে জন্মাল বুঝতে পারি না! বিশটা বছর ওদের গাড়ি চালিয়েছি, অথচ একটা দিনের জন্যেও অসুখী হইনি। কত ভালবাসতেন আমাকে, যেন একেবারে আপন ভাই। প্রাসাদ ছেড়ে অন্য কোথাও থাকতে দিতেন না। আরে মেয়ে, এত যে বড় বড় কথা বলল, তোমাকেও কি কম আদর করেছি নাকি আমি? কোলেপিঠে করে মানুষ করিনি? তোমাদের জন্যে আমার থিয়েটারের ক্যারিয়ার নষ্ট করলাম। কড়া চোখে তাকাল ডায়নার দিকে। বিনিময়ে কি পেয়েছি? একটা আজীবন ভাতার

ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন তোমার বাবা, সেটাও তুমি বন্ধ করে দিয়েছ। তুমি কি মানুষ?
যারা কাজ করে না তাদেরকে বেতন দিই না আমি, ডায়না বলল। আপনারাই বলুন, বসে বসে কারও টাকা নেয়া কি উচিত? কিছু করে না। দিন রাত চব্বিশটা ঘন্টা টিভির সামনে বসে থাকে, আর পুরানো ছবির ডায়লগ নকল করে।
বেশ, আমি নাহয় কাজ করি না, কিন্তু বাড়িতে অন্য যে সব কাজের লোক ছিল? তাদেরকে তাড়িয়েছ কেন? সবাই কি অকাজের? তাড়াবেই তো। সবাই বাপের আমলের লোক যে। তোমার পাটিতে যাওয়া, আড্ডা মারা, অকাজ-কুকাজ সইতে না পেরে কিছু বলতে আসে যদি…
হয়েছে, হয়েছে, থামুন, হাত তুলল পল। মিস, ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে চান?
হঠাৎ ভয় দেখা দিল এনুর চেহারায়। দোহাই তোমার ডায়না, এই কাজটা অন্তত কোরো না! আমাকে রেহাই দাও। তুমি জানো, আমি লোক খারাপ নই। মাঝে মাঝে মাথাটা বিগড়ে যায়, তখন কি যে করে বসি!…সময় খুব খারাপ যাচ্ছে
মাথা নাড়ল ডায়না। না, অফিসার, ওসব নিয়ে আর মাথা ঘামাতে চাই না। আমি আশা করব, এরপর থেকে ভাল হয়ে যাবে এনুডা। আমার ব্যাপারে আর নাক গলাতে আসবে না।
অবাক হলো পল। বেশ, আপনি যখন বলছেন… হাতকড়া খুলে দিল এনুডার।
থ্যাংক ইউ, মৃদু স্বরে বলল এনুডা। ঝাড়া দিয়ে কাপড়ের ময়লা পরিষ্কার করল, যদিও লাভ হলো না খুব একটা, ভালমতই লেগে গেছে। চিবুক সোজা করে, কারও দিকে না তাকিয়ে হেঁটে চলে গেল।
ওকে ছাড়াটা বোধহয় ঠিক হলো না, কিশোর বলল। মাত্র কয়েক ঘন্টা আগে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল।
মাথা ঝাঁকাল ডায়না। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। মাঝে মাঝেই করে ওরকম। দেখে নেয়, কাছাকাছি লোক আছে কিনা। থাকলে করে, যাতে সময়মত ওকে থামাতে পারে ওরা। অভিনয় করতে পারেনি বলেই বোধহয় ওর এই ক্ষোভ। মাথায় ছিট আছে, তবে কারও কোন ক্ষতি করে না।
এনুডা দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলে পল বলল, লোকটাকে একটুও ভাল লাগল না আমার। হশিয়ার থাকবেন। কিছু করলে সঙ্গে সঙ্গে জানাবেন আমাদেরকে। কিশোর, মিস মরগানকে বাড়ি পৌঁছে দিতে পারবে? মুসার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল একবার, হাসল, তারপর সহকারীকে নিয়ে এগিয়ে গেল নিজেদের গাড়ির দিকে।
উষ্ণ, উজ্জ্বল একটা হাসি উপহার দিল কিশোরকে ডায়না। যে ভাবে সামলেছ না পাগলটাকে, খুব ভাল লেগেছে আমার। আর ওই মিউজিয়ামের শয়তানগুলোকে

যে সামাল দিলে, সে তো অবিশ্বাস্য।
ও কিছু না, মুসার জ্বলন্ত চোখের দিকে তাকিয়ে অস্বস্তি বোধ করছে কিশোর।
শোনো, কিশোরের হাত ধরে বলল ডায়না, আজ রাতে বাড়িতে একটা বিরাট পার্টি দিচ্ছি। তুমি এলে খুব খুশি হব।
অযথাই কাশল কিশোর। মুসা আর রবিনের দিকে তাকাল, চোখে অস্বস্তি। সেটা নজরে পড়ে গেল ডায়নার। তাড়াতাড়ি বলল, তোমার বন্ধুদের নিয়ে আসবে।
মুহূর্তে চোখের আগুন নিভে গেল মুসার। চওড়া হাসি ছড়িয়ে পড়ল মুখে। হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এল, আমি মুসা আমান।
খুশি হলাম, ডায়না বলল। ও কে?
ওর নাম রবিন মিলফোর্ড, কিশোর বলল।
পরিচয়ের পালা শেষ হলে ডায়নাকে বলল কিশোর, এখনও কি আমি গাড়ি চালাব? মুসা কিন্তু অনেক বেশি ভাল চালায়। তা ছাড়া গাড়িটাও ওর।
তা চালাক, নিমরাজি হলে, ডায়না। কিন্তু ও চালালে ভটভটানি কি কিছুটা কমবে?
হাসি চাপতে পারল না রবিন।
কিশোর বলল, কি জানি, কমতেও পারে। হাজার হোক, ওর গাড়ি যখন, ওর কথা শুনতেও পারে। কি বলো, মুসা?
মাথা নাড়ল মুসা, সরি। আমি চালালে আওয়াজ বরং আরও বাড়বে। কিশোর গাড়িটার কাছে পর মানুষ, ওর সঙ্গে তো রাগ-ঝাল দেখাতে পারে না। তবে আমার সঙ্গে হরহামেশাই দেখায়।
আঁতকে উঠল ডায়না। বলে কি! আরও বেশি শব্দ করবে! থাক বাবা, থাক। কিশোর, তুমিই চালাও।
হাসিমুখে গিয়ে পেছনের সীটে উঠে বসল মুসা। পাশে রবিন। ব্রাউন নেই। ঠাসাঠাসি হলো না আর। আরামেই বসতে পারল।
*
পার্টিটা নিশ্চয় দারুণ জমবে আজ! বাথরুমের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে বলল মুসা।
পায়ের মোজা খুলে কার্পেটে ছুঁড়ে ফেলল কিশোর। কি জানি। তোমার মত এতটা ভাবতে পারছি না। তাক থেকে একটা পার্সোনালিটি ম্যাগাজিনের কপি নিয়ে এসে ছানায় বসল।
বলতে বিশ্বাস করবে না, বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল মুসা। যা-ই বলল, অত বড় বাড়ি কমই দেখেছি। বনের মধ্যে এ রকম বাড়ি বানিয়ে বসে আছে কেউ, কল্পনাই করতে পারিনি!

হুমম! ছবি আছে এখানে। পত্রিকাটা নাড়ল কিশোর। সেজন্যেই বের করলাম। তা ছাড়া আরও একটা জিনিসের কথা মনে পড়ল।
কিশোরদের বাড়িতে কিশোরের বেডরুমে কথা বলছে ওরা।
কী? কৌতূহলী হয়ে ফিরে তাকাল রবিন।
মরগানদের আরেক সংহ-মারাত্মক বোরজিয়া ড্যাগার! পত্রিকাটা উল্টে দেখাল কিশোর। এই দেখো হেডলাইন। ওটাও ছিল মিউজিয়ামে। রত্ন বসানো একটা ছুরি। চারশো বছর আগে ওটার প্রথম মালিক ছিল সেই নিষ্ঠুর ইটালিয়ান পরিবার, বোরজিয়ারা, নাম শুনেছ নিশ্চয়। গোড়া ধার্মিক ছিল ওরা, সামরিক বাহিনীর উচ্চপদস্থ অফিসার ছিল, সবচেয়ে বড় কথা, ওরা ছিল ভয়াবহ খুনী। শোনা যায়, ওদের এই ড্যাগারটা নাকি অভিশপ্ত।
কি অভিশাপ।
কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে, যেন ভয়াবহতা বোঝানোর জন্যেই ফিসফিসিয়ে বলল মুসা, ছুরিটা ছোঁয়ার কয়েক মাসের মধ্যেই মারা যাবে ছুরির মালিক।
*
অন্ধকারে ম্যানশনের দিকে নিঃশব্দে এগিয়ে চলল তিন গোয়েন্দা।
প্রাসাদের ছাত থেকে উঠে গেছে চারটে মোচা আকৃতির মিনার, দুর্গের টাওয়ারের মত। বিশাল গাড়িবারান্দাকে ঘিরে রেখেছে আঙুরলতা আর ফুলের বেড়। চারদিকে যতদূর চোখ যায়, ছড়ানো লন গিয়ে মিশেছে বনের সঙ্গে। আর কোন বাড়িঘর চোখে পড়ে না। রাতের বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে জোরাল বাজনার শব্দ। দোতলার মস্ত চারটে জানালা দিয়ে উজ্জ্বল আলো এসে পড়েছে বাইরে, ভোরের রোদের মত।
ইয়ার্ডের পিকআপটা পার্ক করে রেখে ভেতরে ঢুকল তিনজনে। মুসার গাড়িটা আনার সাহস পায়নি। প্রচণ্ড শব্দে পাড়া জাগিয়ে দিতে চায়নি। বলা যায় না, পার্টির লোকে খেপেও উঠতে পারে।
ঢুকেই যেন ধাক্কা খেলো মুসা, তার নীল সুট বেমানান লাগল তার নিজের কাছেই। দুই ধরনের মেহমান আছে পার্টিতে, পরনে দুই ধরনের পোশাক। একদলের পরনে অতিরিক্ত দামী টাক্সিডো আর ইভনিং গাউন, আরেক দলের পরনে সুট, তবে ওগুলোর দামও কম নয়। মুসারটা ওগুলোর কাছে কিছুই না। ফিটফাট পোশাক পরা, রগ বের হওয়া একজন লোক মেহমানদের মাঝে দাঁড়িয়ে হলদে প্যাডে কি যেন লিখছে।
খবরের কাগজের লোক হবে, ফিসফিস করে বলল মুসা। সোসাইটি কলামিস্ট।
আরি, কিশোর। এসে গেছ। এসো, এসো, জোর গুনকে ছাপিয়ে ভেসে এল ডায়নার কণ্ঠ। রবিন। মুসা। এসো তোমরা।

অকারণেই হাসছে একঝাক লোক, তাদের মাঝ থেকে বেরিয়ে এল সে। চমৎকার পোশাক পরেছে ডায়না। ঘরের এই পরিবেশে পরী মনে হচ্ছে তাকে। কিশোরের হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল কালচে বাদামী চুলওয়ালা এক তরুণের কাছে। ছয় ফুটের ওপরে লম্বা। সিনেমার পর্দা থেকে নেমে এসেছে যেন।
কিশোর...রবিন...মুসা, পরিচয় করিয়ে দিল ডায়না। আর এ হলো ডিন রুজভেল্ট।
হাল্লো, বলে হেসে হাত বাড়িয়ে দিল ডিন। ঝিক করে উঠল সাদা দাঁত। এত সাদা, চোখ ধাঁধিয়ে দিতে চায়।
তার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন ছোটখাট একজন মহিলা। সাদা চুল। বয়েস ষাটের কাছাকাছি। তিন গোয়েন্দাকে যখন পরিচয় করিয়ে দিল ডায়না, মহিলার ভারী লেন্সের চশমার পাশে ঝিলমিল করে উঠল যেন ধূসর-সবুজ চোখ।
আর ইনি হলেন, মহিলার পরিচয় দিল ডায়না, ডক্টর নরিয়েমা ডিলারয়, আমার সবচে ঘনিষ্ঠ বন্ধু, আপনজন। এই দুনিয়ার সবার চেয়ে বেশি চিনি আমি একে।
হাসার সময় কাঁধে ঝাঁকি লাগে ডক্টর ডিলারয়ের। ও আমার ব্যাপারে সব কিছুই খুব বাড়িয়ে বলে। ওয়েলকাম টু ক্লিফসাইড হাইটস। দিনের বেলা এসো একদিন। কি সুন্দর বাগান আছে ডায়নার, দেখবে।
আরেকটা পরিচয় আছে ইনার, ডায়না বলল। ইনি আমার খালা, নরিখালা। চাকরি থেকে অর্ধেক অবসর নিয়েছেন বলা যায়। ক্লিফসাইড কান্ট্রি ক্লাবে এখন পার্টটাইম কাজ করেন। বাকি সময় বাগানের যত্ন করেন। আমার বাগানেও, নিজের বাগানেও। ফুল গাছের পাগল।
সৌজন্য দেখিয়ে মাথা ঝাঁকাল কিশোর। চারপাশে তাকাল। বিশাল এক পারলারে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা। দেয়ালে ঝোলানো অসংখ্য ছবি, সোনালি ফ্রেমে বাঁধাই, ঠাই নেই ঠাই নেই অবস্থা। এককোণে বুককেস আর সাইডবোর্ডের মাঝের ফাঁকে দাঁড়িয়ে আছে গ্রীক যোদ্ধার একটা মার্বেলে তৈরি বিশাল মূর্তি।
এই সময় দরজার ঘন্টা বাজল।
ডিন, রান্নাঘর থেকে আরও কয়েকটা কাপ নিয়ে এসো, প্লীজ, ডায়না বলল। তারপর এক্সকিউজ মি, বলে দরজা খুলতে এগোল।
কালেকশনগুলো দেখলে এসো, তিন গোয়েন্দাকে আমন্ত্রণ জানালেন নরিয়েমা। ডায়নাকে বোঝানোর চেষ্টা করছি, এগুলো এখানে রাখা ঠিক না, মিউজিয়ামেই ভাল। তবে এখানে যতক্ষণ আছে দেখতে অসুবিধে নেই। এসো।
ঘরের মাঝখান থেকে শুরু করে মার্বেলের মূর্তিটার কাছে গিয়ে শেষ হয়েছে একটা টেনিস কোর্টের সমান খাবার টেবিল। সেটার দিকে লোলুপ নয়নে একবার তাকিয়ে নরিয়েমার সঙ্গে পুরানো সাইডবোর্ডটার দিকে এগোল মুসা।

খোদাই করা কাঠের বেদির ওপর রাখা হয়েছে একটা কাঁচের বাক্স। ওটার কাছে দাঁড়িয়ে আছে চামড়ার জ্যাকেট পরা দুজন তরুণ আর একজন তরুণী।
এক্সকিউজ মি, নেলি, মেয়েটাকে বললেন ডক্টর।
সরে দাঁড়াল তিনজনেই।
এগিয়ে গিয়ে আঙুল তুলে বাক্সের ভেতরটা দেখালেন তিনি। ভেতরে বেগুনী মখমলের গদির ওপর শুয়ে আছে চমৎকার একটা ছুরি। লম্বা ফলা, আর মূল্যবান পাথর বসানো সোনার বাট ঝকঝক করছে উজ্জ্বল আলোয়।
মরগান কালেকশনের সবচেয়ে বিখ্যাত জিনিস এটা, নরিয়েমা জানালেন। বোরজিয়া ড্যাগার। নিশ্চয় নাম শুনেছ।
ও, এটাই? সাংঘাতিক! বলে বাক্সের ডালা তুলে ছুরিটা বের করে আনল নেলি।
হঠাৎ গমগম করে উঠল আরেকটা কণ্ঠ, বলেছিলাম না, এই রকমই করবে। করছে কি দেখো না! খেলনা ভেবেছে এত দামী দুর্লভ জিনিসগুলোকে?
ফিরে তাকাল তিন গোয়েন্দা। ছুটে আসছে জুভেনার, পেছনে ডায়না। নেলির হাত থেকে ছুরিটা কেড়ে নিয়ে আগের জায়গায় রেখে দিল কিউরেটর।
বাধা দিয়ে তখন অন্যায় করেছি, মিস মরগান, জুভেনার বলল। ভাবলাম, যাই। গিয়ে মাপ চেয়ে, শান্ত ভাবে বোঝানোর চেষ্টা করি আপনাকে, যে এ সব জিনিস ঘরে রাখা ঠিক নয়। ইশারায় ছুরিটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, দাম কল্পনা করতে পারেন ওটার?
মিষ্টি হাসল ডায়না। নিশ্চয়ই। ছুরিটা বের করে হাতে নিল সে। ফলাটা ওপরের দিকে তুলে ধরে ওটা নিয়ে এগোল খাবার টেবিলের দিকে, মেহমানরা যেখানে রয়েছে। চোখের পলকে থেমে গেল গুঞ্জন। একেবারে চুপ সবাই, ফিসফিসানিটুকুও নেই।
স্তব্ধতা ভাঙতে ভয় লাগছে যেন, এমনি ভঙ্গিতে খুব নরম গলায় বলল এক তরুণ, ডায়না, অভিশাপের কথা ভুলে গেছ! ওটার মালিক…
ঝটকা দিয়ে পেছনে মাথা কাত করে ফেলল ডায়না, নেচে উঠল লাল চুল। হা-হা করে হাসল সে। জুভেনারের দিকে ফিরে ছুরিটা তার বুকে বসিয়ে দেয়ার ভান করে বলল, জুভেনার, খুব খিদে পেয়েছে মনে হয়? দেব খাইয়ে?
সাদা হয়ে গেল কিউরেটরের মুখ।
ছুরি দিয়ে এক টুকরো পনির কাটল ডায়না। সেটাকে ছুরির মাথায় গেঁথে বাড়িয়ে দিল জুভেনারের দিকে। মুখে ব্যঙ্গের হাসি।
আধ সেকেন্ড পর দপ করে নিবে গেল ঘরের সমস্ত বাতি। মাঝপথে বন্ধ হয়ে গেল বাজনা। নিঃশ্বাস ফেলতে যেন ভুলে গেছে পার্টির সব লোক, যেন কোনদিনই আর ফেলতে পারবে না।

অন্ধকারে ধড়াস করে পড়ে গেল কি যেন!
তারপরেই শোনা গেল তীক্ষ্ণ চিৎকার!
ডায়নার!

.
আবার আলো জ্বলল। দেখা গেল, মার্বেলের মূর্তিটা ভেঙে পড়ে আছে মাটিতে। সাইডবোর্ডের খানিকটা ভাঙা। মেঝেতে ছড়িয়ে রয়েছে কাঁচের টুকরো।
সাইডবোর্ডের নিচে জবুথুবু হয়ে বসে আছে ডায়না। চেহারা সাদা। হাতে ধরে রেখেছে এখনও ছুরিটা।
তার পাশে গিয়ে বসল কিশোর, মুসা আর ডক্টর নরিয়েমা।
লেগেছে কোথাও? ডায়নাকে জিজ্ঞেস করল মুসা।
মূর্তির টুকরোগুলোর কাছে হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে জুভেনার, গেল তো তেইশশো বছরের পুরানো... গলা ধরে এল তার। মূর্তির শোকে চোখের কোণে পানি চিকচিক করছে।
ভয় পেয়ে গেছে ডায়না। কিশোরের কাঁধের ওপর দিয়ে তাকাল। ফুঁপিয়ে উঠে হাত থেকে ছেড়ে দিল ছুরিটা। তারপর লাফিয়ে উঠে এসে আঁকড়ে ধরল কিশোরের হাত, আরেকটু হলেই মারা গেছিলাম আজ!
গুঞ্জন করে উঠল মেহমানরা।
গলায় সহানুভূতি ঢেলে কিশোর বলল, কিছুই হয়নি আপনার। আসুন। বসুন এখানে।
একটা সোফায় প্রায় জোর করে ডায়নাকে বসিয়ে দিল সে। তারপর চারপাশে তাকাতে লাগল। অস্বস্তি বোধ করছে।
এই যে, কি হয়েছে? ওপর থেকে জিজ্ঞেস করল একটা কণ্ঠ।
চোখ তুলে কিশোর দেখল, ডিন কথা বলছে। দাঁত বের করা সেই ঝকঝকে হাসিটা উধাও, ঠোঁটে ঠোঁট চেপে রেখেছে।
অ্যাক্সিডেন্ট, কিশোর জবাব দিল।
কিছুই বুঝতে পারছি না, ডিন, ডায়না বলল। আলো নিবে গেল। কে যেন ফেলে দিল রোমান মূর্তিটা...
রোমান না, গ্রীক! শুধরে দিল জুভেনার। মূর্তি ভাঙার কষ্ট সইতে না পেরে দুহাতে মাথা চেপে ধরে মেঝেতেই বসে পড়েছে।
ছুরিটা তুলে নিয়ে গিয়ে আবার কাঁচের বাক্সে ভরে রাখল রবিন।
একটা তোয়ালে ভিজিয়ে নিয়ে এলেন নরিয়েমা। ডায়নার পাশে বসে তার কপালে চেপে ধরলেন। তাদেরকে ঘিরে দাঁড়াল মেহমানেরা।

ডায়নার হাত ধরে স্নেহের হাসি হেসে কোমল গলায় ডক্টর বললেন, দেখো, ভয়ের কিছু নেই। কুসংস্কার বিশ্বাস করা উচিত না। ওসব অভিশাপ-টভিশাপ সব ফালতু। মেহমানদের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলেন আবার। কিন্তু অনেকেই বিশ্বাস করে বসে আছে দেখছি।
ঢোক গিলল ডায়না। ভুরুর ওপরে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। অভিশাপের কথা জানো তুমি, নরিখালা?
ওসব চিন্তার দরকার নেই এখন।
প্লীজ, খালা, আমি ভয় পাব না। তুমি বলো।
দীর্ঘশ্বাস ফেললেন নরিয়েমা। বেশ, শুনতেই যখন চাও… সোফায় হেলান দিলেন তিনি। চুপচাপ ভাবছেন যেন কোথা থেকে শুরু করবেন। আরও কাছে ঘেঁষে এল মেহমানেরা।
কুসংস্কার বিশ্বাস করলে এই গল্প শুনে ভয়ই পাবে মানুষ, বলতে শুরু করলেন ডক্টর। ষোলোশো শতকে ইটালির অত্যন্ত ধনী আর ক্ষমতাশালী পরিবার ছিল রেজিয়ারা। তাদের কয়েকজন তো ছিল ভয়াবহ, প্রায় উন্মাদ। আস্তে মাথা নাড়লেন তিনি। ইতিহাস অবশ্য স্বীকার করে না সে কথা। তবে লোকের মুখ তো আর বন্ধ থাকে না। গুজব ছড়ায়ও বেশি এবং রঙ ছড়িয়ে। কিংবদন্তী আছে, বোরজিয়াদের যে লোকটার নাম শুনলেই কেঁপে উঠত লোকে, তার নাম অবমান্ডো বোরজিয়া। ডিউকের ভাইপো ছিল বেসমেন্টে চমৎকার একটা কালেকশন ছিল তার, স্টাফ করা মানবদেহের কালেকশন।
মুসা লক্ষ করল, কেঁপে উঠছে ডায়না।
ডায়নার কাঁধে হাত রেখে তাকে সান্ত্বনা দিন ডক্টর, অমন করছ কেন? এটা নিছকই গল্প, একটা হরর স্টোরি আরকি, আর কিছু নয়া। ঠিক আছে, ভয়ই যখন পাচ্ছ, আর বলব না!
না না, বলো! আমি ভয় পাব না
ডানার চেহারার ভয় ভয় ভান চোখ এড়াল না মুসার বুঝতে পারল, গল্পটা চলতে থাকলে আতঙ্কিত হয়ে পড়বে মেয়েটা।
ব্যাপারটা নিয়েও লক্ষ করলেন। বললেন, অনেক সময় ভয়ের গল্প পুরোটা এনে ফেললে ভয় কেটে যায়। বলেই ফেলি।
হ্যাঁ, বলো তুমি, ডায়না বলল। আমি ভয় পাব না।
আবার গল্প বলতে লাগলেন ডক্টর, বলা হয়, আরমান্ডো বোরজিয়া ছিল ইটালির সবচেয়ে নিষ্ঠুর জমিদার। এমন ভাবে করের বোঝা চাপিয়ে দিত গরীব প্রজাদের ওপর, সেটা শোধ করতেই হিমশিম খেয়ে যেত তারা। কোনদিনই পুরোপুরি শোধ করতে পারত না। বিয়ে করেছিল অনেকগুলো। যতক্ষণ ভাল লাগত, রাখত।

অপছন্দ হলেই ঘাড় ধরে বের করে দিত রাস্তায়। এমনকি তখনকার বিখ্যাত সুন্দরী ম্যারিজল অ্যাগ্রোর বরাতেও এইই জুটেছিল…
ছুরিটার কথা বলো, খালা। এ সব শুনতে ভাল লাগে না।
হ্যাঁ, বলছি। নিজের প্রাসাদ আর বাগানের বাইরে খুব কমই বেরোত আরমাভো। একদিন বেরিয়ে ভীষণ চমকে গেল। রাস্তায় শুধু ভিখিরি আর ভিখিরি। এক সময় ভালই ছিল লোকগুলো, জমিজমা ছিল, ওদেরকে পথে নামতে বাধ্য করেছে আরমান্ডোই, এ কথা জানা ছিল না তার। জানার চেষ্টাও অবশ্য করল না। তার কাছে মনে হলো ওগুলো শুধুই জঞ্জাল, মানব-জঞ্জাল।
মেরে ফেলল? ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল ডায়না।
সব কজনকে, এক এক করে। ওদেরকে প্রাসাদে দাওয়াত দিল সে। গোসল করতে দিল, পেট ভরে খাওয়াল। কৃতজ্ঞতায়, আনন্দে চোখে পানি এসে গেল ওদের। তারপর ওদেরকে মদের ভাড়ার দেখার দাওয়াত দিল আরমান্ডো। দেখতে নামল ওরা, কিন্তু একজনও উঠতে পারল না আর। শোনা যায়, প্রত্যেকটা মানুষকে আরমান্ডো খুন করেছে একটা রত্নখচিত ছোরা দিয়ে। হৃৎপিণ্ডে ঢুকিয়েছে ছুরি। লাশগুলো ফেলে রেখেছে মাটির নিচের ঘরে। সাতদিন পর একটামাত্র কবরে দাফন করা হয়েছিল ওগুলো।
চোখের কোণ দিয়ে কিশোর দেখল, ঝড়ের গতিতে হলুদ প্যাডে লিখে যাচ্ছে। সোসাইটি কলামিস্ট।
বাইরের কেউ কিছু জানল না, বলে গেলেন ডক্টর নরিয়েমা। তবে সবাই একদিন দেখল, রাস্তা ভিখিরি মুক্ত হয়ে গেছে। একজনও নেই।
হঠাৎ খাদে নেমে গেল ডক্টরের কণ্ঠ। শ্রোতারা ভালমত শোনার জন্যে আরও কাছে সরে এল।
একরাতে তন্দ্রা লেগেছে আরমান্ডোর। তার দরজা খুলে গেল। সে ভাবল, চাকর। ঘুমের ঘোরেই গাল দিয়ে পাশ ফিরল সে। কিন্তু চাকর নয়। মাটির নিচের ঘরে নিয়ে যাওয়া এক ভিখিরি। ছুরিটা তার হৃৎপিণ্ডে লাগেনি, ফলে মরেনি সে। একে জখম, তার ওপর না খেয়ে খেয়ে কাহিল হয়ে পড়েছে। তবু শরীরে শেষ শক্তিটুকু দিয়ে কোনমতে উঠে এসেছে ভাড়ার থেকে। রক্তমাখা ছুরিটা ফেলে এসেছিল আরমাভো, সেটা তুলে নিয়ে এসেছে ভিখিরি।
কিন্তু আরমান্ডোর বেডরুম চিনল কি করে, বালা? ডায়নার প্রশ্ন। প্রাসাদটা নিশ্চয় অনেক বড় ছিল, আর অনেক ঘর ছিল…
ছিল। অন্য কেউ হলে হয়তো চিনত না। কিন্তু ভিখিরি আসলে ভিখারিনী। ম্যারিজল। আরমান্ডোর ত্যাগ করা স্ত্রীদের একজন। রাস্তায় থেকে থেকে শেষ হয়ে গিয়েছিল মেয়েটা। চেহারা শরীর সবই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এমনকি

আরমান্ডোও চিনতে পারেনি তাকে ছুরি মারার সময়। জানালা দিয়ে তখন চাঁদের আলো আসছে। ছুরি মারার সময় আরমাভোর নাম ধরে এত জোরে গাল দিয়েছিল ম্যারিজল, লোকে বলে, সেই শব্দে জানালার কাঁচ নাকি চুরচুর হয়ে গিয়েছিল।
পারলারে স্তব্ধ নীরবতা। থমথমে পরিবেশ। সবাই যেন শুনতে পাচ্ছে নিজেদের হৃৎপিরে ধুকপুকানি।
চাকরেরা এসে দেখল, নরিয়েমা বললেন, বিছানায় পড়ে আছে দুটো লাশ। মরার আগে নিজের নিয়তি বুঝতে পেরে আতঙ্কিত হয়েছিল আরমাভো। বড় বড় হয়ে গিয়েছিল চোখ। তার কপালে ছুরি দিয়ে কেটে একটা অক্ষর, বি লিখে দিযেছিল ম্যারিজল। বি বোরজিয়ার নামের আদ্যক্ষর। নাকি ব্যাড বোঝাতে চেয়েছিল সে-ই জানে। এরপর থেকেই গুজব রটে যায়, ওই ছুরিটার মালিক যে-ই হবে, ছোঁয়ার চার মাসের মধ্যেই অপঘাতে মৃত্যু হবে তার।
শ্রাগ করলেন ডক্টর। ফিক করে ছোট্ট একটা হাসি দিলেন। আরে, মুখ অমন করে কেন রেখেছ তোমরা? এ-তো একটা গল্প। সত্যি না-ও হতে পারে। আর অভিশাপের কথা যে ঠিক নয়, তার তো প্রমাণই রয়েছে। কত দিন ধরে মিউজিয়ামে রইল ছুরিটা, কিন্তু কই, মালিক তো মরল না। কি বলেন, জুভেনার?
টেনেটুনে টাইয়ের নট ঢিলে করল কিউরেটর। আমতা আমতা করে বলল, সত্যি কথাটাই বলি। মিউজিয়ামে থাকার সময় কেউ ওটা ছুঁতে সাহস করেনি।
*
মেহমানদের যাবার সময় হলো।
ডায়না বলল, নরিখালা, গেস্টদের এগিয়ে দিয়ে এসো, প্লীজ। আমি এখানেই থাকি। শরীরটা ভাল্লাগছে না!
নিশ্চয়ই, ডক্টর নরিয়েমা বললেন। এত ভয় কেন? কিচ্ছু হবে না, দেখো। সব ফালতু কথা।
আমরা আরও কিছুক্ষণ থাকি? অনুরোধের সুরে বলল কিশোর। সাহায্য টাহায্য লাগতে পারে।
আড়চোখে দুই সহকারীর দিকে তাকিয়ে দেখে বোঝার চেষ্টা করল, ওদের মনোভাবটা কি। মুখ দেখেই বুঝল, সম্মতি আছে।
ডায়নাও আপত্তি করল না।
মেহমানদের মধ্যে প্রথম যে মানুষটা বেরিয়ে গেল, সে কিউরেটর জুভেনার। রাগে, ক্ষোভে গটমট করে চলে গেল সে। তারপর একে একে গেল অন্যেরা। সদর দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়েছেন ডক্টর নরিয়েমা, ডায়নার হয়ে গুডবাই জানাচ্ছেন সবাইকে।

পার্টিতে কাজ করার জন্যে ভাড়া করে তোক আনা হয়েছে। ওদেরকে সাহায্য করল তিন গোয়েন্দা। টেবিল থেকে সমস্ত বাসন-কোসন সরাতে আধ ঘণ্টার বেশি লাগল না। সোফাতেই গুটিসুটি হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে ডায়না। অভিশাপের ভয়ে কাবু হয়ে গেছে। তাকে বিরক্ত করল না গোয়েন্দারা। বেরিয়ে এল বারান্দায়।
কি ভাবে থাকা যায় এখানে বলো তো? কিশোর বলল। খানসামা-টানসামা হয়ে যাব নাকি?
মুসা বলল, থাকাটা কি ঠিক হবে? ছুরির গল্পটা শুনলে না! রোম খাড়া করে দেয়।
আমার কাছে যেন কেমন কেমন লাগছে! কিশোর বলল।
জুভেনারের কথা বলছ? রবিনের প্রশ্ন। ও এখানে আসার আগে কিন্তু সব ঠিকঠাকই ছিল।
হ্যাঁ। আর ডায়না এত ভয় পাচ্ছে দেখেও গল্পটা চালিয়েই গেলেন ডক্টর নরিয়েমা। থেমে যাওয়া উচিত ছিল। না বললেও পারতেন।
একবার ভেবেছি, নিষেধ করি বলতে… থেমে গেল মুসা। তাকিয়ে রয়েছে বাড়ির পাশের দিকে।
কি হলো?
শশশ! সার্ভেন্টস কটেজ!
ঘুরে তাকাল কিশোর। কটেজের জানালা গলে কালো পোশাক পরা একটা মূর্তিকে নামতে দেখল। বাড়ির সামনের দিকে যাচ্ছে, ফিসফিসিয়ে বলল সে। চলো, চমকে দিই।
নিঃশব্দে সিঁড়ি বেয়ে নেমে পড়ল তিনজনে। ঝোঁপঝাড়ের অভাব নেই। লুকিয়ে পড়ল একটার ভেতরে।
আমাদের দেখল নাকি? মুসার প্রশ্ন।
বোঝা যাবে এখুনি।
বোঝা গেল। হঠাৎ বরফের মত জমে গেল তিন গোয়েন্দা।
ঠিক ওদের মাথার পেছনে ধরা একটা সিলভার-প্লেটেড রিভলভারের নল।
বেরিয়ে এসো, মোলায়েম গলায় আদেশ হলো। ছায়ার কাছ থেকে সরে গেল লোকটা, কিন্তু রিভলভার উদ্যতই রয়েছে। ট্রিগার ছুঁয়ে আছে আঙুল। বার্ব এনুডা।

.

গুলি করার দরকার নেই, হাত তুলে ঝোঁপ থেকে বেরিয়ে এল মুসা।
সাহস আছে তোমাদের, বলল এনুডা। তবে একটা উপদেশ মনে রাখবে। এ কথা যেন ডায়না না শোনে…

কে ওখানে? সিঁড়ির ওপর থেকে জিজ্ঞেস করল ডায়না। বার্ব, করছ কি? ওটা নামাও!
না, নামাব না! তোমার সব কথাই মানতে হবে নাকি?
ডায়নার পাশে এসে দাঁড়াল ডিন। এনুডার হাতে রিভলভার দেখে ভয় দেখা দিল চোখে। এই, সরাও, সরাও ওটা?
খবরদার! ওভাবে কথা বলবে না আমার সঙ্গে! ডায়না....
তোমার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি, বার্ব, কোমল কণ্ঠে বলে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল ডায়না। হাত বাড়িয়ে দিল। দাও। নইলে আবার পুলিসে ধরে নিয়ে যাবে। এবার কিন্তু আর বাঁচাতে পারব না। বেআইনী ভাবে ঢুকে চুরির দায়ে হাজতে ঢোকাবে।
চুরি! চমকে গেল এডা। এটা তোমার আব্বা আমাকে দিয়েছেন, তুমি জানো। এখানে ফেলে গিয়েছিলাম। আমার জিনিস আমি নিতে এসেছি, একে কি চুরি বলে? হঠাৎ নাটকীয় ভাবে নষ্টটা নিজের মাথায় ঠেসে ধরল সে। থাক, আর কাউকে মরতে হবে না, আমিই মরব। এইবার আর আমাকে বাঁচাতে পারবে না কেউ...
মরতে চাইলে কিছু গুলি কিনে আনতে হবে তোমাকে। আশ্চর্য শান্ত ডায়নার কণ্ঠ। আব্বা এটা তোমাকে দিয়েছিলেন চোর-ঘঁচোড়কে ভয় দেখিয়ে তাড়ানোর জন্যে। গুলি ভরে দেননি, আমি জানি। আর দ্বিতীয় কথা হলো, এটা তোমাকে একেবারে দিয়ে দেননি আব্বা। আর আব্বার জিনিস মানেই আমার জিনিস। পুলিশের সঙ্গেও তোমার সম্পর্ক ভাল না। কাজেই বুঝতেই পারছ, হাতের তালু মেলে ধরল ডায়না। প্লীজ!
চঞ্চল হয়ে উঠল এনুডার চোখের তারা।
দিয়ে, ভাগো এখান থেকে, সিঁড়ির গোড়ায় ডায়নার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে ডিন। গিয়ে ঘুমাও। বিশ্রাম দরকার তোমার।
নেহায়েত নিরুপায় হয়েই যেন অস্ত্রটা নামাল এমুডা। বেশ, গলা কাঁপছে তার, জাহান্নামেই ফিরে যাচ্ছি আমি! বাড়ি তো না, নরক! গুলি খেয়ে নাহয় নাই মরলাম। মরার আরও পথ আছে। শুয়ে শুয়ে গিয়ে সেই উপায়ই ভেবে বের করব এখন।
যেন ছবিতে অভিনয় করছে, এমন ভঙ্গিতে রিভলভারটা ডায়নার ছড়ানো তালুতে ফেলে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল এনু। লম্বা লম্বা কদমে হাঁটতে শুরু করল ড্রাইভওয়ে ধরে।
সে চোখের আড়ালে চলে গেলে ডায়নাকে বলল কিশোর, একা থাকতে আপনার অসুবিধে হবে না তো? আমরা...

একা থাকছে না ও, বাধা দিয়ে বলল ডিন। আজ রাতে যাচ্ছি না। আমি থাকছি, ডক্টর নরিয়েমা থাকবেন। কাল যাতে সারাদিন ক্লাবে গিয়ে মন ভাল করতে পারে ডায়না, সেই ব্যবস্থাও করব। ওর কোন অসুবিধে হবে না।
বেশ, বলে দুই সহকারীর দিকে ফিরল কিশোর। এসো, যাই। গুড নাইট, ডায়না। দাওয়াতের জন্যে ধন্যবাদ।
এসেছ, খুশি হয়েছি। সময় পেলে আবার এসো। যে কোন সময়।
পিকআপে এসে উঠল ওরা।
কিশোর বলল, যে কোন সময় এমো কথাটা কি সত্যি সত্যি বলল? নাকি কথার কথা?
কিছু একটা ভাবছ তুমি, রবিন বলল। কি, বলো তো?
চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল কিশোর। বড় ধরনের কোন একটা গোলমাল ঘটছে এখানে। গোলমালটা কি ঠিক বুঝতে পারছি না।
চলতে শুরু করেছে গাড়ি। মুসা চালাচ্ছে। সামনের পথের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, ঠিকই বলেছ। এডাকেই বেশি সন্দেহ হচ্ছে। তার পাগলামিটা অভিনয়ও হতে পারে।
হ্যাঁ। ফিউজ বক্সটা কোথায় আছে, তার জানার কথা। আলো নেভাতে অসুবিধে হবে না তার। আর রিভলভার নিতে এসেছে রাতের বেলা চুরি করে, এটাও খোঁড়া যুক্তি মনে হয়েছে আমার।
তবে সে একলা পারেনি, দুজনের দরকার। সে যদি আলো নিভিয়ে থাকে, মূর্তিটা ঠেলে ফেলেছে আরেকজন। আরেকজন কে, বোধহয় আন্দাজ করতে পারি…
জুভেনার! বলে উঠল রবিন।
পথে আর কথাবার্তা তেমন হলো না। মুসা নীরবে গাড়ি চালাল, আর চুপচাপ বসে বসে ভাবল কিশোর। রবিন পেছনের সীটে বসে চিলতে একটুকরো ঘুম দিয়ে নিল।
কিশোর ভাবল, শুধু ডায়নাকে ভয় দেখানোর জন্যেই ওরকম একটা দুর্লভ মূর্তি ভেঙে ফেলল জুভেনারের মত অ্যানটিক-পাগল একজন মানুষ? আর যদি এনুডার কাজই হয়ে থাকে, কাজ সেরেই পালাল না কেন সে, দেখা দেয়ার জন্যে কেন বসে থাকল?
আরও অনেক প্রশ্ন জাগল তার মনে। জবাব মিলল না কোনটারই। ভাবছে মুসাও। দুজনের ভাবনার মধ্যে একটা ব্যাপারে মিল রয়েছে সেটা হলো, বোরজিয়া ড্যাগারের অভিশপ্ততার কাহিনী কি শুধুই গল্প? না কিছুটা সত্য রয়েছে এর মধ্যে?
*

কিশোর, ওই ডক্টর মহিলাকেও কিন্তু খুব একটা সুবিধের লাগেনি আমার। এত কথা বলতে গেল কেন? রবিন বলল কিশোরকে।
ফ্রিজ থেকে খাবার বের করছে কিশোর। স্যান্ডউইচ। ফলের রস।
কথা হচ্ছে কিশোরদের বাড়িতে। পরদিন সকালে। খাবার বের করে নিয়ে রান্নাঘরের টেবিলে এসে বসল কিশোর। রবিনের প্রশ্নের জবাব দিতে যাবে, এই সময় ঘরে ঢুকল মুসা। শুরু করে দিয়েছ দেখি তোমরা। দেরি করে ফেললাম না তো? খাওয়ার আগে, না পরে?
ঠিক সময়েই এসেছ। এসো, বসে পড়ো, কিশোর বলল।
তা জরুরী তলব কেন? চেয়ারে বসতে বসতে বলল মুসা।
যাব এক জায়গায়।
কোথায়? আবার ডায়নার ওখানে?
নাহ, ভাবছি মিউজিয়ামে যাব
সরু হয়ে এল মুসার চোখের পাতা। কি দেখতে যাবে? অ, বুঝেছি। জুভেনারের সঙ্গে কথা বলতে। দেখো কিশোর, আমার ভাল্লাগছে না। কেস আমরা অনেক পাব ভবিষ্যতে। কিন্তু অভিশপ্ত ওই ছুরির কুদৃষ্টিতে না পড়লেই কি নয়?
অভিশপ্ত বলেই তো তদন্তটা আরও বেশি করে করব। দেখব, সত্যি সত্যি অভিশাপ বলে কিছু আছে কিনা।
*
মিনিট কয়েক পরে ঘর থেকে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা।
কিশোর আর মুসা ইয়ার্ডের একটা পিকআপে উঠল।
রবিন ওদের সঙ্গে যাবে না। সে বাড়ি যাবে। জরুরী কাজ আছে। সে গেটের দিকে এগোল।
এঞ্জিন স্টার্ট দিল মুসা। পাশে বসা কিশোরের দিকে তাকাল। আগে কোথায় যাব? রকি বীচ মিউজিয়াম।
গাড়িটা পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় হাত নেড়ে ওদের বিদায় জানাল রবিন।
*
মিউজিয়ামের কাছাকাছি এসে প্রথম যে জিনিসটা চোখে পড়ল ওদের, তা হলো পার্কিং লট প্রায় শূন্য।
রোববারে তো খোলাই থাকে, তাই না? মুসার প্রশ্ন।
থাকে। ঘড়ি দেখল কিশোর। এগারোটা তিরিশ। এখন লোকের কাজের সময়।
ভ্যান থামাল মুসা। গাড়ি থেকে নেমে মিউজিয়ামে ঢুকল দুজনে। টিকিট কেটে এসে ঢুকল মেইন একজিবিট রুমে।

ঢুকেই বুঝতে পারল জুভেনারের এতখানি মর্মপীড়ার কারণ। দেয়ালগুলো প্রায় শূন্য। বড় বড় ছবি ঝোলানো ছিল ওসব জায়গায়, দাগ দেখেই বোঝা যায়। অসংখ্য কাঁচের বাক্স খালি পড়ে রয়েছে। এক কোণে আরামে চেয়ারে বসে দিবান্দ্রা দিচ্ছে মিউজিয়ামের দারোয়ান।
কবরও তো এর চেয়ে ভাল! ফিসফিসিয়ে বলল মুসা।
জিনিস নেই, কে আসবে পয়সা খরচ করে? মরগানদের কালেকশনগুলোই ছিল এই মিউজিয়ামের মেরুদণ্ড।
ওদের পেছনে হলওয়েতে পদশব্দ শোনা গেল।
বাড়ি চলে যাও, নিরো, বলে উঠল একটা পরিচিত কণ্ঠ।
চমকে জেগে গেল দারোয়ান।
বসে থেকে আর কি করবে। ভাবছি, বন্ধই করে দেব... কিশোর-মুসার ওপর চোখ পড়তে থেমে গেল কিউরেটর। আরি, দর্শক আছে দেখছি! অন্তত আজকের ইলেকট্রিক বিলের পয়সাটা পাওয়া গেল। কেন এসেছ তোমরা? মিউজিয়াম দেখতে? নাকি ডায়না পাঠিয়েছে। আবার কিছু নষ্ট করেছে?
মূর্তিটার জন্যে সত্যিই খারাপ লাগছে, মিস্টার জুভেনার, সহানুভূতি দেখিয়ে বলল কিশোর। আমরা এসেছি আসলে আপনার সঙ্গে দেখা করতেই।
আমার সঙ্গে দেখা করে আর কি হবে! চুপ হয়ে গেছে জুভেনার। একবার কিশোরের দিকে, আরেকবার মুসার দিকে তাকাচ্ছে। বোঝার চেষ্টা করছে কিছু। অবশেষে হাত নাড়ল, এসো। বরং আমি তোমাদের সঙ্গে কথা বলি।
হল পেরিয়ে একটা দরজার সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। চৌকাঠের ওপরে সাদা পাস্টিকের ফলকে লেখা: অথরাইজড পার্সনস ওনলি।
ভেতরে মস্ত অফিস, ছয়টা ডেস্ক। ঘরের অন্য প্রান্তে ওদেরকে নিয়ে এল জুভেনার। আরেকটা দরজা পড়ল, পুরোটাই কাঁচের। তার ওপাশে কয়েকটা আলাদা আলাদা অফিস, প্রতি রুমে একজন করে বসার ব্যবস্থা।
নিজের অফিসে ঢুকল জুভেনার। কিশোররা ঢুকতেই দরজা বন্ধ করে দিল। জানালার পর্দা টেনে দিল।
বসো। তা তোমাদের কথাটা আগে বলো। কি জানতে চাও?
প্রথমেই আপনার মিউজিয়ামটার কথা বলুন, অনুরোধের সুরে বলল কিশোর।
ডেস্কে কনুই রেখে ভর দিয়ে সামনে ঝুঁকল জুভেনার। দেখো, সোজা করেই বলি। মিউজিয়ামের এখন সময় খুবই খারাপ। টেকে কিনা সন্দেহ। জিনিসগুলো ফেরত না পেলে লোকে দেখতে আসবে না। নেইই কিছু, কি দেখতে আসবে? লোক না এলে বিগড়ে বসবে কোম্পানি আর এজেন্সিগুলো, আমাদেরকে ফান্ড দিতে চাইবে না আর। কতবড় সর্বনাশ হয়ে যাবে ভাববা! আর এর সব কিছুর

মূলে ওই ডায়না মরগান। বেআইনী ভাবে জিনিসগুলো জোর করে নিয়ে গেছে। সে।
দলিলটা খুঁজে বের করতে বলেন আমাদেরকে? কিশোর জিজ্ঞেস করল।
না, চেয়ারে হেলান দিল জুভেনার। লোক লাগিয়ে দিয়েছি আমি। পাবে কিনা জানি না। আমার ভয় হচ্ছে, একেবারেই হারিয়ে গেছে ওটা, কিংবা নষ্ট হয়ে গেছে। ফেরত পাব না। চুপ করে থাকল এক মুহূর্ত। অন্য কথা ভাবছি আমি। তোমরা তো ডায়নার বন্ধু?
হ্যাঁ, মাথা ঝাঁকাল কিশোর। তবে পরিচয়টা নতুন হয়েছে।
নতুন হলেও তোমাদেরকে বেশ গুরুত্ব দেয় ডায়না, দেখেই বুঝেছি আমি। তোমাদেরকে একটা কাজ করে দেয়ার অনুরোধ করব আমি। ডেস্কের সবচেয়ে ওপরের ড্রয়ারটা খুলল কিউরেটর। মিউজিয়ামের একটা ইমারজেন্সী ফান্ড আছে। খুব অল্পই টাকা। কয়েক বছর ধরে তিল তিল করে জমানো হয়েছে। এতদিন ওটা থেকে খরচের দরকার পড়েনি কখনও। এই টাকাটা আমি তোমাদের দিয়ে দেব। বিনিময়ে তোমরা ডায়নাকে বোঝাবে কালেকশনগুলো আবার মিউজিয়ামকে ফেরত দিতে। কি করে বোঝাবে জানি না আমি, কিন্তু বোঝাবে।
ড্রয়ার থেকে একটা খাম বের করল সে। বেশ পুরু। মুখ খুলে উপুড় করল ডেস্কের ওপর। ঝরে পড়ল অনেকগুলো কড়কড়ে একশো ডলারের নোট।
দশ হাজার ডলার আছে এখানে। আমার কাজটা করে দাও। এগুলো সব তোমাদের হবে।

.
দীর্ঘ একটা মুহূর্ত নোটগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল দুই গোয়েন্দা।
তারপর কথা বলল কিশোর, দশ হাজার ডলারের বিনিময়ে, আপনি বলছেন ডায়নার সঙ্গে কথা বলব আমরা। দরকার হলে তার বাড়িতে থাকব। একসঙ্গে বসে খাবার খাব। তাকে বোঝাব কালেকশনগুলো ফেরত দিতে।
হ্যাঁ, হাসল জুভেনার।
তারমানে ঘুস দিচ্ছেন।
ঘুস ভাবছ কেন? বরং ভাবো না, তোমরা একটা কাজ করে দিয়ে টাকাটা কামিয়ে নিচ্ছ।
চেয়ারে হেলান দিল দুজনেই। কিশোরের দিকে তাকাল রবিন। কি বুঝলে?
যা বোঝার বুঝলাম, কিশোর বলল।
অস্বস্তিতে পড়ে গেল জুভেনার। ওদের কথাবার্তার মানে বুঝতে পারছে না। দেখো, দশ হাজার ডলার অনেক টাকা, অনেক কিছু কিনতে পারবে তোমরা। এই

বয়েসে কত কিছুই তো কিনতে ইচ্ছে করে। দুজনের মুখের দিকে তাকাল একবার করে। তোমাদের বয়েসে আমি হলে এক লাফে রাজি হয়ে যেতাম।
কিন্তু আমরা ওরকম লাফাতে রাজি নই, জবাব দিয়ে দিল কিশোর।
বুঝেছি, আরও বেশি চাও! রেগে গেল জুভেনার। থাবা মারল ডেস্কে। এত্তো লোভ! ওই মেয়েটার মতই চামার! সব এক! কি ভেবেছ এটাকে? ব্যাংক...
আপনি ভুল করছেন, আর চুপ থাকতে পারল না মুসা। দশ হাজার অনেক টাকা। কিন্তু ঘুস দিয়ে কিনতে পারবেন না আমাদের। মানুষের জন্যে কাজ আমরা করি, তবে অন্য ভাবে।
কোন্ ভাবে শুনি?
আর যে ভাবেই হোক, বেআইনী ভাবে নয়।
কোনটাকে বেআইনী বলছ? মুসার দিকে আঙুল তুলে বাতাসে খোঁচা মারল জুভেনার। ডায়না যে কাজটা করল, সেটা বেআইনী নয়?
আপনার মানসিক অবস্থা বুঝতে পারছি আমরা, মিস্টার জুভেনার, কিশোর বলল। বুঝি, কালেকশনগুলোর কোন দরকার নেই ডায়নার। কিন্তু মিউজিয়ামের আছে। আমি সত্যিই চাই, দলিলটা আপনি পেয়ে যান। আর যদি না পান, আদালতে গিয়ে নালিশ করুন...
স্প্রিঙের মত লাফিয়ে উঠল জুভেনার। বেরোও! দরজা দেখাল সে। ভাগো! আর যেন এখানে না দেখি! আমাকে উপদেশ দিতে আসো! মাসের পর মাস ধরে শুধু আদালতে যেতে থাকি আর আসতে থাকি আমি। আর ওদিকে সব ভেঙেচুরে জিনিসগুলোর সর্বনাশ করে দিক মাথামোটা মেয়েটা। পাগল!
বেরিয়ে এল দুই গোয়েন্দা।
পেছনে এত জোরে দরজা বন্ধ করল জুভেনার, শব্দ শুনে মনে হলো বন্দুকের গুলি ফাটল।
*
এসে কোন লাভ হলো না, তাই না? মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে বলল মুসা। একসারি নিউজপেপার ভেনডিং মেশিনের পাশ দিয়ে চলেছে। ঘুস দিতে চায় আমাদেরকে! মরিয়া হয়ে গেছে লোকটা!
কয়েকটা খুচরো পয়সা মেশিনে ঢুকিয়ে দিয়ে একটা রকি বীচ টাইমস-এর কপি বের করে নিল কিশোর। লোকটা ছ্যাচড়া!
কিন্তু খুন পর্যন্ত কি এগোবে? এত প্রিয় যে সব জিনিস, তারই একটা ভেঙে ফেলবে খুন করার জন্যে? ভাঙা মূর্তিটাকে দেখে তার মুখের কি অবস্থা হয়েছিল লক্ষ করেছ?

সেটা অভিনয়ও হতে পারে। নিজেকে সন্দেহমুক্ত রাখার জন্যে করে থাকতে পারে কাজটা। ডায়নাকে আতঙ্কিত করে দিয়ে জিনিসগুলো ফেরত নেয়ার চেষ্টা হতে পারে। আর যদি মূর্তি গায়ে পড়ে ডায়না মরেই যেত…
…আরও সহজ হয়ে যেত কাজটা। অনেকটা আপনা থেকেই জিনিসগুলো আবার ফিরে যেত মিউজিয়ামে।
ঠিক। চল বাড়ি যাই। কম্পিউটারের ক্রাইম ডাটা বেজ দেখি জুভেনারের কথা কি বলে। বেরিয়েও যেতে পারে চমকপ্রদ কোন তথ্য।
পিকআপে উঠল দুজনে।
পার্কিং লট থেকে গাড়ি বের করে আনল মুসা।
সীটে হেলান দিয়ে খবরের কাগজটা খুলল কিশোর। হেডলাইনের দিকে তাকিয়েই উজ্জ্বল হয়ে উঠল চোখ। এই, শোনো, শোনো! লিখেছে: অভিশাপ, না কাকতালীয় ঘটনা? অভিশপ্ত বোরজিয়া ড্যাগার ছুঁয়ে অল্পের জন্যে বেঁচে গেছেন মরগানদের উত্তরাধিকারী?
রসাল গল্প লিখেছে মনে হয়। পড়ো তো শুনি।
গতরাতে ক্লিফসাইড হাইটসের মরগান ম্যানশনে এক সাংঘাতিক রোমহর্ষক ঘটনা ঘটেছে। তখন রাত প্রায় এগোরোটা। আকাশে ভরা চাঁদ, ঘরের ভেতরে জ্যোৎস্না এসে পড়েছে। যারা উপস্থিত ছিল ওখানে তখন, কেউ ভুলতে পারবে না…
বাহ্, গরুও পেয়েছে, টিটকারির সুরে বলল মুসা, দুধও ভালই দুইয়েছে।
হ্যাঁ। ইনিয়ে বিনিয়ে অনেক কথা লিখেছে এরপর। শেষটুকু পড়ি। কিছু মেহমান তখন বেরিয়ে গেছে। ভীষণ ভয় পেয়েছে ওরা। ওদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে গেছে, অভিশাপের কবল থেকে মুক্তি নেই মিস ডায়না মরগানের। মিস মরগানকেও বলতে শোনা গেছে-বাকি জীবনটা কি আমি এই অভিশাপ নিয়েই কাটাব? টাইমসকে কথা দিয়েছেন মিস মরগান, আজ ক্লিফসাইড কান্ট্রি ক্লাবে একটা সাক্ষাৎকার দেবেন…।
উচিত হবে না, আবার বাধা দিল মুসা। পত্রিকাওলাদের কাছ থেকে দূরে থাকা উহত ৩র, যেকথা বোঝাতে হবে। রিপোটাররা সারাক্ষণ লেগে থাকলে তদন্ত করতে অসুবিধে হবে আমাদের।
হ্যাঁ। বোয়জিয়া ড্যাগারেরও বিজ্ঞাপন হয়ে যাচ্ছে খুব বেশি। কে কখন আবার কোত্থেকে এর মালিকানা দাবি করতে চলে আসে কে জানে। ঝামেলা পাকাবে।
না-ও আসতে পারে। অভিশাপের ভয় আছে।
বাড়ি পৌঁছেই সোজা নিজেদের হেডকোয়ার্টারে ঢুকে গেল দুই গোয়েন্দা।
কম্পিউটার নিয়ে বসল কিশোর। পাশে বসল মুসা।
জুভেনারের বিরুদ্ধে কিছুই বলল না কম্পিউটারের ডাটা বেজ।

মুসা বলল, বার্ব এনুডার কথা কি বলে, দেখো তো?
কিছুটা অবাক হয়েই পর্দার দিকে তাকিয়ে রইল দুজনে। জোরে জোরে তথ্যগুলো পড়ল মুসা, বিশ বছর আগে এক দোকান থেকে এক টিন মাছ চুরি করেছিল… এগারো বছর আগে চেঁচিয়ে সংলাপ বলে পড়শীদের শান্তি নষ্ট করেছিল…দুই বছর আগে, নো-পার্কিং জোন থেকে একটা লিমোজিন গাড়ি সরানোর সময় একজন টো-ট্রাকের অপারেটরকে মেরে বসেছিল।
নাহ, খুনীর সারিতে পড়ে না, মাথা নাড়ল কিশোর।
বাইরে থেকে মেরিচাচীর ডাক শোনা গেল, কিশোর, কিশোর!
তাড়াহুড়া করে বেরিয়ে এল কিশোর ও মুসা।
তোর ফোন, মেরিচাচী বললেন। থানা থেকে করেছে। পল নিউম্যান।
দৌড় দিল দুই গোয়েন্দা।
রান্নাঘরে এসে ঢুকল।
রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল কিশোর। হালো?
কে, কিশোর? পল নিউম্যান বলল। খবর শুনেছ?
কিসের খবর?
ক্লিফসাইড কান্ট্রি ক্লাবে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে।
ডায়না মরগান না তো? উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর।
হ্যাঁ। গুলি করা হয়েছে। ভাবলাম, খবরটা তোমাকে জানানো দরকার।
.
ঝড়ের গতিতে ঘর থেকে বেরিয়ে এল দুজনে। পিকআপে উঠল। টায়ারের ওপর অত্যাচার চালিয়ে গাড়ি ঘোরাল রবিন। ছুটল পুবমুখো।
রাস্তায় সাইনবোর্ড রয়েছে: এনটারিং ক্লিফসাইড হাইটস।
তারপর থেকে নাটকীয়ভাবে বদলে গেছে এলাকার চেহারা। শহরতলির ছিমছাম সুন্দর বাড়িগুলোর পরেই শুরু হয়েছে ঘন বন। রাস্তায় তীক্ষ্ণ মোড় রয়েছে, ফলে সাবধানে গাড়ি চালাতে হচ্ছে মুসাকে। তবে কিছুতেই গতি কমাল সে।
বিরক্ত কণ্ঠে বলল, আলসেদের জন্যে তৈরি করেছে এই রোড! এ ভাবে চালানো যায়?
আরও খানিকদূর এগিয়ে আরেকটা সাইনবোর্ড দেখা গেল। তাতে ইংরেজি বড় হাতের অক্ষরে লেখা: সি সি সি। তীর চিহ্ন এঁকে দেখিয়ে দেয়া হয়েছে কোনদিকে যেতে হবে। বাঁয়ের খোয়া বিছানো পথটায় গাড়ি নামাল মুসা।
কায়দা-টায়দা তো বেশ ভালই করেছে।
করবে না? কিশোর বলল। এত দামী ক্লাব।

রাস্তার মাথায় বন কেটে সাফ করা হয়েছে। ঘোরানো একটা ড্রাইভওয়ে। হাসিখুশি, বাদামী ইউনিফর্ম পরা একজন লোক ওদের পথ আটকাল।
ঘ্যাচ করে ব্রেক কষল মুসা। জানালার পাশে এসে দাঁড়াল লোকটা। কার কাছে...?
ডায়না মরগান, বলেই ব্রেক ছেড়ে দিল মুসা। লাফিয়ে সরে গেল গার্ড।
ক্লাবহাউসের সামনে এসে আবার জোরে ব্রেক কষল মুসা। পাথরের তৈরি তিনতলা একটা বাড়ি। চারপাশে সুন্দর ফুলের বাগান। দুদিকের দরজা খুলে লাফ দিয়ে নামল দুজনে। পেছনে শুনতে পেল গার্ডের চিৎকার, এই শুনুন, শুনে যান!
কিন্তু কে শোনে কার কথা। সামনে কথা শোনা যাচ্ছে। বাড়ির পাশ ঘুরে এল দুজনে। বেশ বড় ছড়ানো একটা চত্বর, ঘাসে ঢাকা, চারপাশ থেকে ঘিরে রেখেছে বন। চত্বর না বলে মাঠই বলা যায় ওটাকে। মাঠের মাঝখানে অনেক মানুষ, কয়েকজন পুলিস অফিসারও আছে। ওদের কাছ থেকে দূরে একটা অস্থির ঘোড়াকে শান্ত করার চেষ্টা করছে জিনস পরা একজন লোক। আর ভিড়ের মাঝে সেই রিপোর্টারকে দেখা গেল, সোসাইটি কলামিস্ট, ঘুরে ঘুরে লোকের কাছ থেকে তথ্য জোগাড় করছে।
বার বার এক্সকিউজ মি বলতে বলতে লোকজনকে প্রায় ঠেলে সরিয়ে ভিড়ের মাঝখানে এসে ঢুকল কিশোর-মুসা। ডায়নাকে শুয়ে থাকতে দেখল ঘাসের ওপর। ফোপাচ্ছে। পাশে বসে আছেন ডক্টর নরিয়েমা। ভেজা একটা কাপড় দিয়ে তার কপালের রক্ত মুছে দিচ্ছে ডিন।
কেমন আছে ও? জিজ্ঞেস করল মুসা।
মুখও তুলল না ডিন, কথাও বলল না। তবে ডক্টর হাসলেন। অ, তোমরা! তোমরাও যে মেম্বার, জানতাম না। ঘোড়া থেকে পড়ে গেছে ডায়না। ভাগ্য ভাল, ব্যথা তেমন পায়নি।
পায়নি, পেতে পারত, থমথমে হয়ে আছে ডিনের মুখ। মরেও যেতে পারত। খুন করার চেষ্টা করেছে কেউ!
কি হয়েছে বলতে পারব না, কাঁপা গলায় বলল ডায়না। ভীষণ ভয় পেয়েছে। সাক্ষাৎকার দেয়ার পর থেকেই খারাপ লাগছিল। ভাবলাম, ঘোড়ায় চড়ে খানিকক্ষণ ঘুরলে ঠিক হয়ে যাবে। ঘুরছি, এই সময় শুনলাম গুলির শব্দ।
লেগেছে? কিশোর জিজ্ঞেস করল।
না। ঘোড়াটা লাফিয়ে উঠল। পড়ে গেলাম।
কে করেছে দেখেছেন? মুসার প্রশ্ন।
না, পুলিশকে বললাম...

দূরে চিৎকার করে উঠল কেউ। ঝট করে বনের দিকে ঘুরে গেল সব কটা চোখ। তিনজন পুলিশ অফিসার, দুজন লোক, আর একটা ছেলে বেরিয়ে এসেছে। একজন সিভিলিয়ানের হাতে সিলভারপ্লেটেড একটা রিভলভার। দুজন অফিসার জোর করে টেনে আনছে রবিনকে।
আরি! রবিন! মুসা অবাক।
অবাক কিশোরও হয়েছে। বিশ্বাসই করতে পারছে না। ও কি করে এল!
হাতকড়া লাগিয়েছেন কেন? চিৎকার করছে রবিন। খুলুন, খুলুন বলছি! আমি কি করলাম?
অনেক কিছুই করেছ, একজন অফিসার বলল। বেআইনী ভাবে ঢুকেছ বনের ভেতর। এটা প্রাইভেট প্রপার্টি। হাতে রিভলভার। গুলি ছোঁড়া হয়েছে ওটা থেকে। অ্যারেস্ট করার জন্যে যথেষ্ট নয় কি?
কিশোর-মুসাকে দেখে উজ্জ্বল হলো রবিনের চোখ। কিশোর, ওদেরকে বলো না, আমি কে!
একজন অফিসার চিনে ফেলল কিশোরকে। বাহ্, গন্ধ পেয়ে গেছ! রবিনকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, ছেলেটা তোমাদের দলের নাকি?
হ্যাঁ, কিশোর বলল।
অফিসার বলল, আমাদেরকে ও অবশ্য তোমাদের কথা বলেনি। বলেছে, একটা জুনিয়র ডিটেকটিভ টীমের মেম্বার।
ঝাঁকুনি দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিল রবিন। এই সময় ঘটল আরেক ঘটনা। ভিড় ঠেলে ভেতরে এসে ঢুকল দুজন গার্ড, ওদের মাঝে সেই লোকটাও রয়েছে, যে কিশোরদের ভ্যান থামিয়েছিল। দুজনকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠল, যা, এই তো! এদের কথাই বলেছি। পুলিস অফিসারদেরকে বলল, না বলে জোর করে ঢুকে পড়েছে। ওদের আটকান।
গুঞ্জন করে উঠল লোকেরা। জোরে সবাইকে শুনিয়ে বলল অফিসার রিম্যান, আপনারা অস্থির হবেন না। এরা গোয়েন্দা। এদের একজনকে আমি ভাল করেই চিনি। মিস মরগানও ভালই আছেন।
আশ্বস্ত হয়ে এক এক করে সরে যেতে লাগল সদস্যরা।
ভিড় কমে গেলে কিশোর বলল, থ্যাংকস, মিস্টার রিম্যান। রবিনের দিকে ফিরল। তুমি ওখানে কি করছিলে?
জিজ্ঞেস করেছি সে-কথা, জবাবটা দিল রিম্যান। লুকিয়ে মিস মরগানের ওপর নজর রাখছিল। বলল, বনের ভেতর নাকি কুড়িয়ে পেয়েছে রিভলভারটা। আপাতত ছেড়ে দিচ্ছি, তবে শহর ছেড়ে যেতে পারবে না। তোমাকে আমাদের

দরকার হতে পারে। রিভলভারটা নিয়ে যাচ্ছি, পরীক্ষা করতে হবে। রবিনের চোখে চোখে তাকাল অফিসার, মিথ্যে বলে থাকলে বিপদে পড়বে বলে দিচ্ছি।
নিজেদের গাড়ির দিকে এগোল পুলিসের। ডায়নার দিকে বুক কিশোর। আমাদের পরিচয় তো জানলেন। বুঝতেই পারছেন এখন, আপনাকে সত্যিই সাহায্য করতে চাইছি। কেউ লেগেছে আপনার পেছনে, খুন করতে চায়।
বাধা দিয়ে বলল ডায়না, আমি আগেই আন্দাজ করেছি, এ ধরনেরই কোন কাজ করো তোমরা। আচমকা কিশোরের হাত চেপে ধরল, আমাকে সত্যিই সাহায্য করবে।
গাল চুলকাল কিশোর। করব। আর সেলে আপনাদের বাড়িতে আমাদের থাকা দরকার। কোনও একটা ছুতোয় যদি
ছুতো করা লাগবে না। খুব সহজেই ব্যবস্থা করা যায়। আমার সিকিউরিটি অফিসার হয়ে যাও। জুনিয়র সিকিউরিটি। চাইলে বেতনও দেব। আমার নিরাপত্তা দরকার, বুঝতেই পারছ। থাকতেও পারবে, তদন্তও করতে পারবে।
এখানে এ ভাবে বসে থাকলে তো হবে না, তাড়া দিলেন নরিয়েমা। আমার অফিসে নিয়ে যাওয়া দরকার তোমাকে। কিছু ওষুধপত্র তো লাগবে।
মুসা, ডিন আর নরিয়েমা সাহায্য করলেন ডায়নাকে। ধরে ধরে তাকে নিয়ে চলল ক্লাবহাউসের দিকে। কয়েক গজ পেছনে রইল কিশোর আর রবিন। কিশোর জিজ্ঞেস করল, বনের মধ্যে কি করছিলে, বলো তো?
রবিন বলল, বাড়ি যেতেই মা বলল, কাজটা করা লাগবে না। সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। ইয়ার্ডে গিয়ে দেখলাম, তোমরা চলে গেছ। মেরিচাচী বললেন, পুলিস ফোন করেছিল। ডায়না নামে কে নাকি গুলি খেয়েছে। ঠিকানা বলতে পারলেন না। টেবিলে ফেলে রাখা পেপারের দিকে চোখ পড়ল। দেখি, তাতে লেখা, আজ এই ক্লাবটাতে আসবে ডায়না, সাক্ষাৎকার দেবে। বুঝলাম, অঘটনটা এখানেই ঘটেছে। একটা ট্যাক্সি নিয়ে ছুটলাম। গার্ডের ভেতরে ঢুকতে দিল না। ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে ঢুকে পড়লাম বনের মধ্যে। ভাবলাম, চুরি করে ঢুকব।
দম নেয়ার জন্যে থামল রবিন।
তারপর? কিশোর জিজ্ঞেস করল।
বনে ঢোকাটাও সহজ হলো না। বেড়া ডিঙিয়ে বনে ঢুকলাম। ক্লাবহাউসটাকে খুঁজতে লাগলাম, এই সময় কানে এল ঘোড়র পায়ের শব্দ। এগিয়ে দেখি, ডায়না ঘোড়ায় চড়েছে। গাছের আড়ালে লুকিয়ে থেকে ওর দিকে তাকিয়ে আছি, হঠাৎ গুলির শব্দ হলো। লাফ দিয়ে পেছনের পায়ের ওপর খাড়া হয়ে গেল ঘোড়াটা। মাটিতে পড়ে গেল ডায়না। বুঝলাম, গুলি তার গায়ে লাগেনি। তাই সেদিকে না

গিয়ে গেলাম যেদিক থেকে গুলির শব্দ শোনা গেছে সেদিকে। কে গুলি করেছে দেখলাম না, তবে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখলাম রিভলভারটা।
এনুডারটার মতই দেখাত, আনমনে বলল কিশোর।
দ্রুত হেঁটে অন্যদের কাছে চলে এল দুজনে। হাত তুলে বাগানের একটা জায়গা দেখাচ্ছেন ডক্টর নরিয়েমা। বেশ খানিকটা জায়গার মাটি কোপানো। কাছে পড়ে আছে হোস পাইপ, নানা রকমের বোতল, বীজের প্যাকেট। কোপানো জায়গায় ঘাস ছিল, কিছু নষ্ট হয়েছে কোপানোয় বাকিগুলো ওকেমন জ্বলা জ্বলা।
আর্সেনিকের কাজ, বুঝিয়ে বললেন ডক্টর। ঘাস সহজে রে না। কুপিয়ে নষ্ট করে ফেললেও আবার ওঠে। তাই মাটি যাবে আর্সেনিক ঢেলে দিয়েছিলাম। মরেছে এখন, আর উঠবে না। ভাবছি, এ বছর ওখানে টমেটো লাগাব।
ভাল। গুভিয়ে উঠল ডায়না। বডদ খারাপ লাগছে, খালা! শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে।
ক্লাবহাউসের দিকে এগিয়ে চলল ওরা। নিচতলায় উক্টরের অফিস। সুন্দর করে সাজানো গোছানো। একটা সিংক, একটা চেয়ার, একটা ডেস্ক, একটা কট, আর কয়েকটা তাক বোঝাই প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র।
কটে শুয়ে পড়ল ডায়না। গুঙিয়ে উঠল আবার। উফ, মাথার ব্যথায় মরে গেলাম!
দাঁড়াও, এখুনি সব ঠিক হয়ে যাবে, কোমল গলায় বললেন নরিয়েমা। দুটো ব্যথার বড়ি খেলেই, ব্যস...।
তাকগুলোর কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। একটা শিশি পাড়লেন। চুপ করে থাকো, ডায়নার দিকে তাকালেন না তিনি, যা করার আমি করছি। ডিন, এক গেলাস পানি।
ঘরটায় চোখ বোলাচ্ছে রবিন।
বড় একটা গেলাস ভর্তি করছে ডিন।
ডায়নার মাথার নিচে বালিশ দিয়ে আরামে শোয়ার ব্যবস্থা করছে মুসা।
আর পুরো ব্যাপারটাই কেন যেন অপছন্দ হচ্ছে কিশোরের। চেহারায় যেন শ্রাবণের কালো মেঘ জমছে। তাকিয়ে আছে ডায়নার দিকে।
বড়িগুলো হাতে নিয়েছে ডায়না। মুখে তুলতে যাবে। হঠাৎ কি ভেবে তাক থেকে শিশিটা পাড়ল কিশোর। লেভেলটা পড়ল। বড় বড় হয়ে গেল চোখ, যেন ছিটকে বেরিয়ে আসবে।
শিশির গায়ে লেখা রয়েছে: আর্সেনিক!
সাবধান করে থামানোর সময় নেই। লাফ দিয়ে এসে ডায়নার হাতে থাবা মারল কিশোর। মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ল বড়িগুলো।
চিৎকার দিয়ে উঠল ডায়না।

কিশোরের কলার চেপে ধরল একটা হাত। ধমক দিয়ে জিজ্ঞেস করল ডিন, এটা কি করলে?
ওর প্রাণ বাঁচালাম। আর্সেনিকের বোতলটা তুলে ধরল কিশোর।
নীরব হয়ে গেল ঘরটা।
ককিয়ে উঠল ডায়না। কটে বিছানো চাদরের মতই সাদা হয়ে গেছে মুখ।
সর্বনাশ! কিশোরের হাত থেকে ছোঁ মেরে শিশিটা কেড়ে নিলেন নরিয়েমা। আ-আ…আমি এটা কি করছিলাম!
আর্সেনিকের বোতল কেন এখানে? জানতে চাইল কিশোর।
সর্বনাশ! কি করছিলাম আমি! সর্বনাশ! কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না যেন নরিয়েমা। জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাচ্ছেন। কতবার ভেবেছি, কোন দিন এ রকম কিছু ঘটে যাবে! তবু সাবধান হলাম না। আজকে তো দিয়েছিলাম শেষ করে! ওষুধের দোকান থেকে আমিই কিনে আনি ওগুলো, পানিতে মিশিয়ে জমিতে ছিটাই আগাছা মারার জন্যে। অন্যান্য কেমিক্যাল আর ওষুধের সঙ্গে এখানেই রাখি। উচিত হয়নি, একেবারেই উচিত হয়নি। এই পোড়া চোখেও আজকাল আর ভাল দেখি না ছাই!…ডায়না, তোর কিছু হয়ে গেলে কি করতাম আমি, মা!
তো-তোমার কোন দোষ নেই খালা, পানিতে ভরে গেছে ডায়নার চোখ। আমার কপাল! তোমাকে দিয়ে করিয়ে নিয়েছে কোনও একটা শক্তি, বাধা দেয়ার ক্ষমতাই ছিল না তোমার! জাস্ট করে ফেললে কাজটা!
কি বলতে চাস?
বোরজিয়া ড্যাগারের অভিশাপ! তোমার ওপর ভর করেছিল! চেঁচিয়ে উঠল ডায়না, হতাশায় ভরা কণ্ঠ, শেষ হয়ে গেছি আমি! একবার যখন ছুঁয়ে ফেলেছি, আর কেউ বাঁচাতে পারবে না আমাকে! কেউ না! কোথাও গিয়ে আর বাঁচতে পারব
কিছুই হবে না, অভয় দেয়ার চেষ্টা করল কিশোর। সাধারণ দুর্ঘটনা এগুলো। অভিশাপ বলে কিছু নেই।
ও ঠিকই বলেছে, ডায়না, নরিয়েমা বললেন। ভুলটা আমারই। আরও সাবধান হব। এখন ঘুমাও। ঠিক হয়ে যাবে।
মাথার নিচে বালিশটা ঠিকঠাক করে দিলেন তিনি। ঘুমাও। আমি আর ডিন রইলাম, কোন ভয় নেই। এখানে কিশোরদের না থাকলেও চলবে।
পরিশ্রমে যতটা না তার চেয়ে বেশি ভয়ে কাহিল হয়েছে ডায়না। চোখের পাতায় কাঁপন জাগল। মুদে এল আপনাআপনি। ডিন আর নরিয়েমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, নিঃশব্দে অফিস থেকে বেরিয়ে এল কিশোর, মুসা আর রবিন।

বুড়িটাকে এক বিন্দু বিশ্বাস করি না আমি, হাঁটতে হাঁটতে বলল রবিন। বলছে ভুল হয়েছে। কি করে হলো? সব সময় কেমিক্যাল নিয়ে ঘাটাঘাটি করে যে, তার এ রকম ভুল হয় কি করে?
কি জানি, গাল চুলকাল মুসা, ভুল সব মানুষেরই হতে পারে। যে রকম নার্ভাস হয়ে পড়ল, তাতে তো মনে হলো সত্যিই অ্যাক্সিডেন্ট। আসলে কি দিচ্ছে খেয়ালই করেনি।
আমিও মানতে পারছি না ব্যাপারটা, যোগ করল কিশোর।
*
চল্লিশ মাইল গতিতে বিপজ্জনক মোড় নিল পিকআপ।
করছে কি বলো তো! গাড়িটার দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর আত্মহত্যা করতে চায় নাকি।
ক্লিফসাইড রোড ধরে ছুটছে দুটো গাড়ি। আগেরটা নীল কভারটিবল, পেছনেরটা সবুজ পিকআপ। আগের গাড়িটার খোলা ছাত। ড্রাইভারের সীটে বসা মেয়েটার লাল চুল লম্বা হয়ে উড়ছে বাতাসে।
ওটা ওর দুই নম্বর গাড়ি, মুসা বলল। আর কটা আছে এ রকম?
আছে নিশ্চয় অনেকগুলো টাকার তো অভাব নেই। তবে তৃতীয় গাড়িটা একটা মডেল টী হলে খুশি হতাম। বিশ মাইলের বেশি স্পীড তুলতে পারত না। আসলে, ওকে বাড়ি পৌঁছে দেয়া উচিত ছিল আমাদের।
বললাম তো কত করে, রাজি হলো না।
ক্লাব থেকে বাড়ি ফিরছে ডায়না। কমলা রঙের রোদ পড়েছে বনের গাছে গাছে। পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে সূর্য। মরগানদের সীমানায় ঢুকে পড়ল নীল গাড়িটা। খোয়া বিছানো পথে ধুলোর ঝড় তুলে এগিয়ে গিয়ে স্কিড করে থামল। একটা গ্যারেজের সামনে। চারটে গাড়ি রাখার জায়গা আছে ওটাতে।
পিকআপের গায়ে হালকা ধুলো জমেছে। রঙ কালো বলে ধুলোগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বেশি। উইন্ডশীল্ড ওয়াইপারটা চালু করে দিয়েছে মুসা, কাঁচ থেকে ধুলো মোছার জন্যে।
ডিরেক্টরি ঘেঁটে ইচ্ছে করলে ডায়নার ফোন নম্বরটা বের করে নিতে পারবে রবিন, তাই না? কিশোর বলল।
পারবে। আমাদেরকে খুঁজে বের করাও কঠিন হবে না। মরগান ম্যানশনটা কোথায়, ডিরেক্টরি খুললেই জেনে যাবে।
তুমিই কিন্তু ডায়নার বডিগার্ড সাজতে রাজি করালে আমাকে, আরেক দিকে তাকিয়ে বলল কিশোর।
আমি মুসা অবাক। এই, কি বলছ…

ওয়েলকাম! ওয়েলকাম! গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলল ডায়না।
ডায়না…
কিশোরকে কুথা শেষ করতে দিল না মেয়েটা। ঘুম থেকে উঠে খুব ভাল লাগছে। কটেজে গিয়ে ঘর দেখে এসো। আমাকে আসতে হবে?
মাথা নাড়ল দুজনেই।
আর কিছু বলল না ডায়না। দ্রুত রওনা হয়ে গেল ম্যানশনের দিকে।
জড়তার লেশও নেই, পিকআপের দরজা খুলতে বলল কিশোর।
গাড়ি থেকে নামল দুজনে। বাড়ির আশপাশে ঘুরল খানিকক্ষণ। তারপর চলল ডায়না কি করছে দেখার জন্যে। কটেজে পরেও যাওয়া যাবে, ভাবল। বসার ঘরে পাওয়া গেল ডায়নাকে। একটা টেলিফোন অ্যানসারিং মেশিনের ক্যাসেট রিওয়াইনড করছে।
খুব ভাল লাগে আমার এ সব যন্ত্র, ডায়না বলল। সেক্রেটারির চেয়ে অনেক ভাল। ভুল করে না, ছুটি চায় না, খিদে পেয়েছে বলে বেরিয়ে যায় না। যখনই দরকার, পেয়ে যাবে। তার খরচও অনেক কম
প্লে টিপতেই চালু হয়ে গেল মেসেজঃ হালো, মিস মরগান। জুভেনার বলছি। আপনার দাদার দলিলটা খুঁজে পেয়েছে আমাদের কর্চারী। অনেকগুলো ফাইলের নিচে চাপা পড়েছিল। কাল নাগাদ হাতে পেয়ে যাব। মঙ্গলবারে দয়া করে বাড়িতে থাকবেন, জিনিসগুলো ফেরত আনতে যাব। আরেকটা কথা মনে করিয়ে দিচ্ছি, মূর্তিটার দামও আপনাকেই শোধ করতে হবে। গ্রীক মূর্তিটার কথা বলছি। ওটা ভাঙার জন্য আপনাকেই দায়ী করব আমি। আপনিই জোর করে জিনিসটা নিয়ে গেছেন মিউজিয়ম থেকে। ভাল থাকুন।
চামড়ায় মোড়া গদিওয়াল আর্মচেয়ারে নেতিয় পড়ল ডায়না। চকের মত সাদা হয়ে গেছে গাল।
এ রকম কিছু হবে, আমি জানতাম, মুসা বলল। খারাপ লাগছে মেয়েটার জন্যে।
জানতে, না? কেঁকিয়ে উঠল ডায়না। তা তো জানবেই। তোমার তো আর কিছু না।
সরি, ডায়না। ওভাবে বলতে চাইনি-
জানি, জানি! জোরে নিঃশ্বাস ফেলল ডায়না। একদিক থেকে ভালই হলো। হতচ্ছাড়া এই জিনিসগুলো শুধু ভোগাচ্ছেই আমাকে, ক্ষতিই করছে। দেয়ালে ঝোলানো ছবিগুলোর ওপর চোখ বোলাল সে। ওগুলো ফেরত দিতে কষ্ট হবে, চোখ দেখেই বোঝা গেল।
জিনিসগুলো দেয়ার পরও কিন্তু আমাদের তদন্ত বন্ধ হবে না, কিশোর বলল।
অন্য কোন জগতে চলে গিয়েছিল যেন ডায়না, বাস্তবে ফিরে এল। ঠিক? কিশোরের চোখে চোখে তাকাল। এরপর কি করবে?

পারলারে খুঁজতে যাব…
না!
না কেন?
ডায়নার নিচের ঠোঁট সামান্য কাপল। আহত দৃষ্টিতে তাকাল কিশোরের দিকে। তুমি আমাকে একা ফেলে যাবে না। সিকিউরিটি অফিসার হয়েছ, মনে আছে?
তা আছে। মুসার দিকে তাকাল কিশোর। শ্রাগ করল। ঠিক আছে, তোমার ওপরই ছেড়ে দিলাম। সূত্র খুঁজে বের করা। পারবে তো?
পারব। দরজার দিকে এগোতে গিয়ে বিড়বিড় করে বলল, তুমি তো গার্ড দেবে ওকে, তোমাকে গার্ড দেবে কে?
কি বললে?
না, কিছু না। বেরিয়ে গেল মুসা।
*
কাঁচের বাক্সে আগের জায়গায়ই রয়েছে বোরজিয়া ড্যাগার। সাবধানে ডালাটা তুলল মুসা। অস্বাভাবিক কোন কিছু নেই তো বাক্সটায়? এই যেমন ইলেকট্রিক সুইচ, চোর ঠেকানোর কোন যন্ত্র…
আস্তে করে ছুরিটা তুলে আনল সে। মখমলের গদির নিচে খুঁজল হাত দিয়ে টিপে টিপে। কিছু নেই। ছুরিটা আবার রেখে দিয়ে এসে দেখল মূর্তিটা যেখানে ছিল সেখানটা। না, এখানেও চোখে পড়ার মত কিছু নেই।
তার মনে হচ্ছে, কিছু না কিছু আছেই ঘরে। ও দেখতে পাচ্ছে না এই যেমন সার্কিট ব্রেকারের বাক্স, লুকানো টেলিভিশন ক্যামেরা
এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে সে। ওক কাঠে তৈরি দেয়ালে হেলান দিয়ে চোখ বোলাচ্ছে সারা ঘরে। নড়তে গিয়ে খোদাই করা একটা জিনিসে কনুই লাগল। সরে গেল ওটা।
লাফিয়ে সরে এল মুসা। আবার আগের জায়গায় ফিরে এসেছে জিনিসটা।
কিরিচ করে একটা শব্দ হলো, তারপর ঝাঁকুনি। অবাক হয়ে দেখল সে, বুককেসটা সরে যাচ্ছে, নাড়া লেগে পড়ে গেল কয়েকটা বই। পেছনে দেয়াল টেয়াল কিছু নেই, শুধু গাঢ় অন্ধকার।
একটা গোপন কুঠুরি, ভাবল মুসা। পুরানো গোয়েন্দা গল্পের সিনেমাগুলোতে যেমন থাকে।
অতি সাবধানে ভেতরে পা বাড়াল সে। মনে করল, সিঁড়িটিড়ি। আছে। কিন্তু কিছুই ঠেকল না পায়ে। শুধু মাকড়সার জাল। এত সতর্ক থেকেও দুর্ঘটনা এড়াতে পারল না। পড়ে গেল, গিলে ফেলল যেন তাকে অন্ধকার!
.

সিমেন্টের মেঝেতে পড়ল সে। একটা মুহূর্ত পড়ে থাকল চুপচাপ। দম নিল। প্রচণ্ড ব্যথা পেয়েছে। নেড়েচেড়ে দেখল হাত-পা। না, ঠিকই আছে, ভাঙেনি।
ধীরে ধীরে চোখে সয়ে এল অন্ধকার। চারপাশে তাকাল সে। যেখান দিয়ে পড়েছে, সেই ফাঁক দিয়ে আলো আসছে আবছাভাবে। বেশ বড় একটা ঘরে পড়েছে সে। জিনিসপত্র নেই। অন্য পাশের দেয়ালে একটা ছোট দরজা।
উঠে এসে দাঁড়াল ওই দরজাটার কাছে। ঢোকার আগে দ্বিধা করল একবার। দরজাটা এত নিচু, মাথা নুইয়ে ঢুকতে হলো তাকে। খুব সতর্ক রইল যাতে আগের বারের অবস্থায় না পড়ে। দুই পাশে হাত ছড়িয়ে দেখল, দেয়ালের খসখসে পাস্টার লাগে হাতে। মাথা সোজা করতে যেতেই ছাতে বাড়ি লাগল, নিচু করে ফেলল আবার। একটা সুড়ঙ্গে প্রবেশ করেছে সে, বুঝতে পারল। আলোর অভাবে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। পা বাড়াল সামনে। কোথায় যাচ্ছে, বোঝার উপায় নেই। শুধু এটুকু বুঝল, ঢালু হয়ে নেমে গেছে সুড়ঙ্গটা।
মাথা নিচু করে রেখে, দুহাতে দেয়াল ছুঁয়ে ছুঁয়ে এগোল সে। প্রথমে ধীরে, তারপর গতি বাড়াল। কোন একটা জায়গায় নিশ্চয় পৌঁছবে, ভাবল সে। স্টোররুম, বয়লার রুম, কিংবা…
ভাবনা শেষ হওয়ার আগেই কিসে যেন বাড়ি খেলো। কপাল ডলল, যেখানে লেগেছে। আরেক হাত বাড়িয়ে দিল সামনে, একটা দরজা লাগল হাতে। হাতড়ে বের করল নব। ওটা ঘুরিয়ে ঠেলা দিতেই খুলে গেল পাল্লা।
আরেকটা অন্ধকার ঘর। ভেতরে পা দিল সে। পায়ের নিচে পড়ল কি যেন, আরেকটু হলেই উল্টে পড়ে যেত, সময়মত ধরে ফেলল দরজার পাল্লাটা। সুইচবোর্ডের আশায় হাতড়াতে লাগল দেয়ালের পাশে।
হাতে ঠেকল ধাতব বোর্ডটা। সুইচ টিপতে উজ্জ্বল ফ্লোরেসেন্ট আলোয় ভরে গেল ঘর। এতক্ষণ অন্ধকারে থেকে এই আলো অসহ্য লাগল চোখে, বন্ধ করে ফেলল। আবার খুলে মিটমিট করল। ঠিক হয়ে এল ধীরে ধীরে। নানা রকম জিনিসে বোঝাই। ট্রাংক, বাক্স, বাগানে কাজ করার যন্ত্রপাতি, আরও নানা রকম জিনিস। দেখল, যেটাতে পা দিয়ে পিছলে পড়ে যাচ্ছিল, সেটা একটা ধাতব রোলার-টে।
একপাশের দেয়ালে দেখতে পেল সার্কিট ব্রেকারের ধাতব বাক্সটা। বাক্সের সামনে দরজাটা টেনে খুলল সে। সুইচ আছে মোট বিশটা। নিচে লেখা রয়েছে কোনটা কোন্ ঘরের: রান্নাঘর, বসার ঘর, পারলার…। সুইচগুলোর নিচে একটা বড় মেইন সুইচ। এখান থেকেই ঘটনাটা ঘটানো হয়েছে, বিড়বিড় করে বলল সে নিজেকেই। পুরো ম্যানশন অন্ধকার করে দেয়া হয়েছিল, সুইচ অফ করে দিয়ে!
আরেক পাশের দেয়ালে দুটো কাঠের সিঁড়ি লাগানো। ওপরে দুটো দরজা। কোথায় ঢুকেছে সে, বুঝতে অসুবিধে হলো না। সুড়ঙ্গ দিয়ে বেসিমেন্টে চলে

এসেছে, মাটির তলার ঘরে। সার্কিট ব্রেকার বক্সের দরজাটা আবার লাগিয়ে দিয়ে এসে একটা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল। ঠেলা দিতেই খুলে গেল একটা দরজা। নাকে এসে লাগল ফুলের সুবাস। বাল্কহেড ডোর দিয়ে মাথা বের করল রোদের মধ্যে।
পেছনে তাকাতে চোখে পড়ল মরগানদের প্রাসাদটা। ওর দুই পাশেই ফুলের বাগান। সামনে খোয়া বিছানো রাস্তা। চলে গেছে ওটা গেস্ট কোয়ার্টার পর্যন্ত।
এক চিলতে হাসি ফুটল মুসার ঠোঁটে। লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। প্রায় দৌড়ে চলল প্রাসাদের দিকে। বসার ঘরের একটা জানালার নিচ দিয়ে যাওয়ার সময় কানে এল ডায়নার কণ্ঠ, একটা কথা বলি, শোনো, সিকিউরিটি অফিসার হয়ে…
মাথা তুলে দেখল মুসা, কাউচের কিনারে সোজা হয়ে বসে আছে কিশোর। অস্বস্তি বোধ করছে। ওর পেছনে দাঁড়িয়ে ঘাড়ে হাত রাখল ডায়না।
লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। চোখ পড়ল জানালার দিকে। মুসা! ওখানে কি করছো?
বিরক্ত করলাম না তো? মুচকি হেসে বলল মুসা।
না না, এসো, ভেতরে এসো।
ঘুরে এসে দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল মুসা।
ছিলে কোথায় এতক্ষণ? সেই কখন থেকে ভাবছি আসবে, আসবে…
কোথায় ছিলাম, চলো, দেখাব। ডায়নার দিকে তাকাল মুসা। ডায়না, টর্চ আছে?
আছে। লাগবে?
মাথা ঝাঁকাল মুসা।
তাড়াতাড়ি টর্চ আনতে চলে গেল ডায়না। ফিরে এল বড় একটা টর্চ নিয়ে।
এসো আমার সঙ্গে, কিশোরকে বলে পারলারের দিকে এগোল মুসা। কিশোর আর ডায়না তার পিছে পিছে চলল।
বুককেসের কাছে ফোকরটা দেখে হা হয়ে গেল ডায়নার মুখ।
নিচে একটা ঘর আছে। ফোকর দিয়ে ভেতরে আলো ফেলল মুসা। বেশি নিচে না। লাফ দিলেই নামা যায়। সিঁড়ি থাকলে আর লাফানোর দরকার পড়ত না।
ফোকরের মুখে দাঁড়িয়ে ঘরের ভেতরটা আলো ফেলে দেখল সে। একপাশের দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা হয়েছে একটা লোহার মই।
সব বুঝলাম, বলল মুসা। এই ঘর থেকে একটা সুড়ঙ্গ চলে গেছে স্টোর রুমে। সার্কিট ব্রেকার আছে ওখানে। ডায়নাকে যে খুন করতে চেয়েছে, সুড়ঙ্গ ধরে উঠে এসেছে এই ঘরে। তারপর মই বেয়ে উঠে ঠেলে ফেলে দিয়েছে মূর্তিটা।
আশ্চর্য! বিড়বিড় করল ডায়না।
চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল কিশোর। দুজন নয়, একজনেই করেছে কাজটা।

হ্যাঁ, মুসাও একমত। আস্ত শয়তান। প্রথমে আলো নিভিয়েছে। তারপর সুড়ঙ্গ দিয়ে দৌড়ে চলে এসেছে এই ঘরে, মই বেয়ে উঠেছে, বুককেসটা সরিয়ে ভেতরে ঢুকে মূর্তিটা ফেলেছে, তারপর আবার বুককেসটা আগের জায়গায় সরিয়ে রেখেছে। নেমে গিয়ে সুইচ অন করে আলো জ্বেলে দিয়েছে।
তার মানে এমন একজন লোক কাজটা করেছে, এই বাড়ির সমস্ত গলিঘুপচি যার চেনা…
এবং অন্ধকারেও যে কাজ সারতে পারে, কিশোরের কথার পিঠে বলল মুসা। ডায়নার দিকে ফিরল। বুককেসটা যে আসলে দরজা, জানেন আপনি?
হাত নাড়ল ডায়না। জানলে কি আর বলতাম না? মূর্তিটা পড়ার পরপরই আগে ওটা সরিয়ে দেখতাম।
তা ঠিক।
এ সব ভাল লাগছে না আমার, শিউরে উঠল ডায়না। গোপন দরজা, গোপন সুড়ঙ্গ-নাহ, একেবারে ভূতের বাড়ি মনে হচ্ছে! কালই দেয়াল তুলে ওই ফোকর বন্ধ করার ব্যবস্থা করছি। যথেষ্ট হয়েছে…
ডায়নার হাত ধরল কিশোর। এত ভয়ের কিছুই নেই। যেভাবে আছে থাকুক। সতর্ক করার দরকার নেই। ভুল করে বসতে পারে লোকটা। আর তাতে সুত্র পেয়ে যাব আমরা।
ঠিক আছে, তুমি যখন বলছ। মুখের কাছে হাত তুলল সে। হাই মাসছে।
আরও বিশ্রাম দরকার আপনার, কিশোর বলল। ঘুমানগে। আমাদের কাজ কালও করতে পারব।
মাথা ঝাঁকাল ডায়না। হ্যাঁ, আর দাঁড়াতে পারছি না আমি। কটেজে চলে যাও। সকালে দেখা হবে।
দোতলায় চলে গেল ডায়না। নিচতলার জানালাগুলো ভালমত বন্ধ করল দুই গোয়েন্দা মিলে। বেরিয়ে এসে ঘরে ঢোকার সমস্ত দরজা আটকে তালা লাগিয়ে দিল। তারপর ওদের ব্যাগ বের করল পিকআপ থেকে।
কটেজের দিকে হাঁটতে হাঁটতে মুসা বলল, কার কাজ, আন্দাজ করতে পারছি। জুভেনার আর ডক্টর নরিয়েমাকে সন্দেহ থেকে বাদ দেয়া যায়। ঘটনাটা ঘটার সময় পারলারেই ছিল দুজনে।
দাঁড়িয়ে গেল মুসা। ওই দেখো।
কি দেখব? একটা রাস্তা, মাথা চুলকাল কিশোর। খোয়া বিছানো। কি বলতে চাও? পার্টি শেষে এই পথ দিয়ে কাকে আসতে দেখেছিলাম?
এনুডা! বার্ব এনুডা! তাই তো! এ পথে এসে সহজেই স্টোর রুমে ঢুকে মেইন সুইচ অফ করে দিতে পারে!

ঠিক। জুভেনার কিংবা নরিয়েমার হয়েও কাজটা করতে পারে সে। মুসার দিকে তাকাল কিশোর। ভাবছি, কাল একবার গিয়ে দেখা করে আসব এনুডার সঙ্গে।
*
পঁচাশি ডিগ্রি।
চোখ ডলল মুসা। আউটডোর থারমোমিটারের রীডিং বিশ্বাস করতে পারছে না। বাপরে বাপ! বলল সে। সকাল বেলাও তো এত ছিল না! পুড়ে যাব আজকে!।
তাড়াতাড়ি কাপড় পরে নিয়ে ডায়নাকে খুঁজতে চলল দুই গোয়েন্দা। দেখল, কাপড় পরে বসে আছে ডায়না, ওদের জন্যেই। গুড মনিং, টেনে টেনে সুর করে বলল সে, তারমানে মেজাজ ভাল। আমিই যাচ্ছিলাম সাঁতার কাটতে যাবে কিনা তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করতে।
সাঁতার? মুসা বলল। পোশাক তো…
আছে, অনেক। কটেজের চেঞ্জিং রুমে খুঁজলেই পেয়ে যাবে। মেহমানদের জন্যে এক্সট্রা বেদিং সুট রেখে দেয়া হয়েছে।
কিন্তু তারচেয়ে
কনুইয়ের তো মেরে মুসাকে থামিয়ে দিয়ে কিশোর বলল, না, সাঁতারই কাটতে যাব।
ঠিক আছে। তোমরা গিয়ে কাপড় বদলে এসো। আমি ডিনকে ফোন করছি। সকালে সাঁতার কাটতে পছন্দ করে ও।
ফোন করতে গেল ডায়না। বেরিয়ে এল কিশোর-মুসা। সিটিং রুমের পাশ দিয়ে যাবার সময় কানে এল ডায়নার তীক্ষ্ণ কণ্ঠ, ছেলেমানুষী কোরো না!…নিশ্চয়ই না!…নির্বোধ ভাবছ কেন ওদের? আমার তো ধারণা, তোমার চেয়ে অনেক চালাক ওরা!
পরস্পরের দিকে তাকাল দুই গোয়েন্দা। কিশোর বলল, সমস্যাটা আমাদেরকে নিয়ে।
মাথা ঝাঁকাল মুসা। ভেবেছিলাম ডিনের সাহায্য পাব। কিন্তু ও তো আমাদের শত্রু ভারছে। এসো।
দ্রুত বেদিং সুট পরে নিল দুজনে।
চেঞ্জিং রুম থেকে আগে বেরোল কিশোর। দৌড়ে চলল সুইমিং পুলের দিকে। ডাইভিং বোর্ডে উঠে ঝাঁপ দেয়ার জন্যে তৈরি হলো। ঠিক ওই সময় পুলের নিচে ইলেকট্রিকের তারটা চোখে পড়ল তার। স্বচ্ছ পানিতে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, তারের একটা মাথায় লাগানো প্রাগ ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে একটা আউটডোর সকেটে।

শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল সে। ঝাঁপ দেয়া থেকে বিরত থাকল। তার পেছনেই উঠে এসেছে মুসা। পাশ কাটিয়ে প্রায় দৌড়ে এগিয়ে গেল।
নাআ! নাআ! বলে চেঁচিয়ে উঠল কিশোর।
কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। মাথা নিচু করে ডাইভ দিল মুসা।

.
বৈদ্যুতিক শক খেয়ে মরবে তার বন্ধু, তারই চোখের সামনে, অথচ সে কিছুই করতে পারবে না, এ-দৃশ্য সইতে পারবে না সে। চোখ বন্ধ করে ফেলল কিশোর।
ঝুপ করে শব্দ হলো পানিতে পড়ার। কয়েক সেকেন্ড নীরবতা। তারপর হুসস করে ভেসে ওঠার শব্দ। বৈদ্যুতিক শক খেয়ে মরার পর কি সাথে সাথেই ভেসে ওঠে লাশ? কতটা কুৎসিত লাগে দেখতে ওটাকে?
কিশোর, চোখ বুজে আছো কেন? মুসার ডাক শোনা গেল।
নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না কিশোর। আস্তে চোখ মেলে তাকাল। মুসাই। পানিতে মাথা তুলে ডাকছে। বহাল তবিয়তেই আছে। কিছুই হয়নি ওর!
ডাইভিং বোর্ড থেকে নেমে পড়ল কিশোর। দৌড়ে পুলের একপাশে এসে সকেট থেকে একটানে খুলে ফেলল প্লগটা।
সর্বনাশ! চোখ বড় বড় করে ফেলল মুসা। মরলাম না কেন?
আল্লাহই জানে!
ডায়না এসে হাজির হলো। পরনের বেদিং সুটটা লাল-কমলা ডোরাকাটা। এই, কি হয়েছে? কিসের কথা বলছ?
এই তারটা পানিতে ছিল, দেখিয়ে বলল কিশোর। প্লগ সকেটে ঢোকানো।
নিশ্চয় রাতের বেলা পাতা হয়েছে, বলল মুসা। মৃত্যুফাঁদ!
স্ট্রেঞ্জ! নিমেষে সাদা হয়ে গেছে ডায়নার মুখ, হাঁসি উধাও। আমার জন্যে পেতেছিল! জানে, সকালবেলা সাঁতার কাটতে নামি! ঢোক গিলে গিয়ে ধপ করে বসে পড়ল পুলের পাশের একটা চেয়ারে। হাত-পা কাঁপছে। কে.কে খুন করতে চায় আমাকে?
বলতে পারব না, ডায়না, কিশোর বলল। তবে এনুডাকে সন্দেহ করা যায়।
মুসা পানিতে নামার আগেই তারটা খুলেছ?
না। পরে। কি করে যে বেঁচে গেল, বুঝতে পারছি না!
আমি পারছি, ডায়না বলল। স্বস্তি ফিরে এসেছে কিছুটা। আমি নামলেও মরতাম না। সকেটটা খারাপ কয়েক বছর ধরেই। সারাবে সারাবে করেও সারায়নি বাবা। ভাগ্যিস ভুলে গিয়েছিল।
সাঁতার আপাতত থাক, কিশোর বলল। এনুডাকে গিয়ে ধরব এখন।

মাথা নাড়ল ডায়না। আমার মনে হয় না ওর কাজ। আমাকে দেখতে পারে, ঠিক, কিন্তু খুন করতে আসবে না।
চলুন না গিয়ে জিজ্ঞেস করে দেখি?
না। আমি ওর সামনে আর যাব না।
কিশোর, তুমিই যাও, পানি থেকে উঠতে উঠতে বলল মুসা। আমি ডায়নাকে পাহারা দিই।
তাই করো, প্রস্তাবটা পছন্দ হলো কিশোরের। আমি রবিনকে ফোন করছি। ওকেও যেতে বলব। দরকার হতে পারে।
মুসা চলে গেল চেঞ্জিং রুমে, কাপড় বদলাতে। আর কিশোর গেল কটেজে রবিনকে ফোন করতে। এনুডার ঠিকানা দিয়ে বলল, রবিন যেন ওখানে দেখা করে। তারপর তাড়াতাড়ি কাপড় পরে নিয়ে বেরিয়ে এল কিশোর। দৌড়ে চলল ড্রাইভওয়ের দিকে।
পিকআপে উঠে ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে ডায়নাকে ডেকে বলল, ডায়না, দুশ্চিন্তা করবেন না। চলে আসব কাজ শেষ করেই।
পিকআপ ছেড়ে দিল কিশোর। ড্রাইভওয়েতে থাকতেই দেখল উল্টো দিক থেকে আরেকটা গাড়ি আসছে। ব্রেক কষল সে। গাড়িটা কাছে আসতেই জানালা দিয়ে মুখ বের করে হেসে বলল, গুড মর্নিং, ডিন। খুব গরম, না?
জবাব দিল না ডিন। মুখ কালো করে রেখেছে। হুস করে পিকআপের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল গাড়ি নিয়ে।
*
ক্লিফসাইডের মাইল চারেক দূরে থাকে এনুডা। রকি বীচের একটা পুরানো এলাকা এটা। বাড়িঘরগুলো সব পুরানো, কোন কোনটা ধসে পড়েছে ইতিমধ্যেই, বাকিগুলোর অবস্থাও কাহিল। কয়েকটা অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং আছে। এক সময় লন ছিল সামনে, এখন সেখানে ঘাস আর আগাছার রাজত্ব, ফুলের নামগন্ধও নেই। বাতাস ভীষণ গরম। বাইরে কেউ নেই। মাঝে মাঝে বাচ্চা ছেলের চিৎকার আর নেড়ি কুকুরের ডাক ছাড়া কোন শব্দও নেই। দুচারটে জানালায় মানুষের মুখ দেখা গেল। একটুখানি হাওয়ার আশায় বসেছে খোলা জানালার ধারে। হাতপাখা দিয়ে জোরে জোরে বাতাস করছে। পিকআপের শব্দ পেয়ে কিশোরের দিকে তাকাচ্ছে কঠিন দৃষ্টিতে। কেন এই বিরক্তি, ওরাই জানে।
ডানে মোড় নিল কিশোর। বাড়ির নম্বর খুঁজতে লাগল। তার আগেই এসে হাজির হয়েছে রবিন। কিশোরকে আসতে দেখে গাড়ি থেকে নামল। হাত নেড়ে ডাকল। এমুডার বাসার সামনেই পার্ক করেছে সে।
কিশোর গাড়ি থেকে নামতেই বলল, এত দেরি করলে।

তোমার চেয়ে দূর থেকে আসতে হয়েছে আমাকে।
ডায়না কেমন আছে? একটা ভুরু উঁচু করল রবিন।
আছে বোধহয় ভালই। এতক্ষণে নিশ্চয় হেভি মারপিট লাগিয়ে দিয়েছে ডিন আর মুসা, হেসে রসিকতা করল কিশোর।
ভাল। তুমি মুক্তি পেলে। বলে কিশোরের হাত ধরে এনুডার ঘরের দিকে টেনে নিয়ে চলল রবিন।
ছোট্ট একটা বাড়ি। দেয়ালে কতদিন রঙ পড়ে না কে জানে। একপাশের দেয়াল ধসে পড়েছে। সামনের খুদে চত্বর ঘিরে বেড়া দেয়া। পুরানো সেই বেড়ায় কাত হয়ে ঝুলছে একটা টিনের প্লেটে লেখা সাইনবোর্ড।
পড়তে পারছ? জিজ্ঞেস করল রবিন। সামনের দরজাটা ঠেলে খুলল।
দাঁড়াও দাঁড়াও! লেখা আছে...হইতে সাবধান!
কি হতে সাবধান?
সেটুকু তো মুছে গেছে। বোধহয় কুকুর...
এই, কুত্তা! সাবধান! চেঁচিয়ে উঠল রবিন।
বিশাল কালো একটা প্রাণী ঘর থেকে বেরিয়ে ছুটে আসছে।
ধক করে উঠল কিশোরের বুক। পাগলের মত এদিক ওদিক তাকাল একটা হাতিয়ারের জন্যে। মাটিতে পড়ে থাকতে দেখল একটা ডাল। তুলে নিল ওটা। দৌড়ে এসে দাঁড়াল রবিনের সামনে, কুকুরটার মুখোমুখি।
এই, এই কুত্তা! সর, সর! ধমক দিয়ে বলল সে।
দাঁড়িয়ে গেছে জানোয়ারটা। দাঁত খিচাল বিকট ভঙ্গিতে।
এক পা আগে বাড়ল কিশোর। ডাল নেড়ে হুমকি দিল। গর্জে উঠল কুকুরটা। তবে পিছিয়ে গেল এক পা।
রবিন, সরে যাও! আস্তে করে বলল কিশোর। সামনের দরজাটা গিয়ে খোলো। আমি আটকে রাখছি এটাকে!
পারবে?
চেষ্টা করি। যাও!
কিশোরের পেছন থেকে বেরিয়ে রবিন পা বাড়াতেই লাফ দিয়ে এগোল কুকুরটা। কষে ওটার নাকেমুখে এক বাড়ি মারল কিশোর। কেউ করে পিছিয়ে গেল কুকুরটা। আবার বাড়ি তুলল কিশোর। লাঠির দিকে তাকিয়ে আছে ওটা, আর এগোনোর চেষ্টা করছে না।
অবাক কাণ্ড তো! ওরকম করে তাকাচ্ছে কেন? আরে, আবার লেজও নাড়তে আরম্ভ হরেছে! কি ভেবে লাঠিটা একপাশে নাড়ল কিশোর। ঠিক সেই দিক সই

করে লাফ দেয়ার ভঙ্গি করল কুকুরটা। দাঁড়িয়ে আছে। কিশোরের গায়ে এসে পড়ার কোন ইচ্ছে নেই।
কি কুত্তা ওটা? রবিনও অবাক হয়েছে। ওরকম করছে কেন?
বোধহয় রিট্রিভার! ঝুঁকিটা নিল কিশোর। লাঠিটা ছুঁড়ে ফেলল রাস্তায়। বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন কুকুরটার শরীরে। চোখের পলকে গেট দিয়ে বেরিয়ে গেল কুড়িয়ে আনার জন্যে। ওটা বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গেটটা লাগিয়ে দিল কিশোর।
রিট্রিভারই। চেপে রাখা নিঃশ্বাসটা শব্দ করে ছাড়ল কিশোর। দাঁত আছে প্রচুর ওটার, মগজ নেই।
সামনের দরজার কাছে এসে দাঁড়াল দুজনে। হলদে একটা কাগজে নোট লিখে টেপ দিয়ে সাঁটানো রয়েছে দরজায়:
ডিয়ার ফ্র্যাঙ্ক
মলে যাচ্ছি আমি। পাঁচতলায় পাবে। ওখানে শূটিং হতে পারে আজ।
৬টায় দেখা হবে।
এন.বি.
গাধা নাকি লোকটা? কিশোর বলল। এ ভাবে খোলাখুলি লিখে রেখে যায় কেউ?
জলদি চলো! খুন করে ফেলার আগেই ধরা দরকার! শুটিং হতে পারে বলছে…,
গেটের দিকে দৌড় দিল রবিন। কিন্তু কাছে যাওয়ার আগেই থমকে গেল। গেটের বাইরে দাঁতের ফাঁকে লাঠি চেপে ধরে দাঁড়িয়ে আছে কুকুরটা। ফিরে চেয়ে বলল, এই কিশোর, কি করব?
দাঁড়াও। গেটের কাছে এগিয়ে গেল কিশোর। আমি খুললেই তুমি বেরিয়ে যাবে। সোজা গাড়িতে!
তোমাকে যদি কামড়ায়?
কামড়াবে না। গেটটা সামান্য ফাঁক করতেই ঢুকে পড়ল কুকুরটা। লাঠিটা ধরল কিশোর। এই সুযোগে চট করে বেরিয়ে গেল রবিন।
কুকুরের মুখ থেকে লাঠি নিয়ে দূরে আরেকদিকে ছুঁড়ে দিল কিশোর। জানোয়ারটা সেটা আনতে ছুটতেই বাইরে এসে গেট লাগিয়ে দিল সে। পিকআপে উঠে পড়ল।
*
রবিনের গাড়িকে অনুসরণ করে মলে চলে এল কিশোর। ইনডোর লটে গাড়ি পার্ক করে রেখে এলিভেটরের কাছে চলে এল। বন্ধ হয়ে যাচ্ছে দরজা। ভেতরে লোক ঠাসাঠাসি।

দরজা টেনে ধরল কিশোর। এক্সকিউজ আস! বলেই কারও প্রতিবাদের তোয়াক্কা না করে ঢুকে পড়ল ভেতরে। রবিনও ঢুকল। কেউ পছন্দ করল না ব্যাপারটা। তবে কিছু বলল না।
পাঁচতলা, মিষ্টি করে হেসে বলল রবিন। অপারেটরের মন ভেজানোর জন্যে।
গোমড়া মুখে সামান্যতম হাসি ফুটল না ছিপছিপে রোগাটে মানুষটার। বোতাম টিপে দিল।
ওই কয়টা তলা পেরোতেই যেন সারা জীবন লেগে যাবে, কিশোরের মনে হলো। প্রতিটি তলায় থামছে লিফট। গাদাগাদি হয়ে থাকা মানুষের মধ্যে দিয়ে গুতাগুতি করে নামছে পেছনে দাঁড়ানো লোকগুলো।
অবশেষে পাঁচতলায় পৌঁছল লিফট। দরজা খুলল। নামতে যাবে দুজনে, হাত বাড়িয়ে ঠেকাল ওদেরকে একজন দাড়িওয়ালা লোক।
ঠিক এই মুহূর্তে দুটো গুলির শব্দ হলো! দাড়িওয়ালার পেছনের নীল সুট পরা একটা লোক দিল খিচে দৌড়, যেন এই ছোটার ওপরই জীবন নির্ভর করছে তার। অটোম্যাটিক পিস্তল হাতে তার পেছনে ছুটল বার্ব এনুডা।

.
ধরো, ধরো ওকে! চেঁচিয়ে উঠল রবিন। থামাও।
যেও না, যেও না! বাধা দিতে গেল কিশোর। ওর হাতে পিস্তল…
শুনতে পেল না বোধহয় রবিন। দাড়িওয়ালার হাত ঠেলে সরিয়ে বেরিয়ে গেল, দৌড় দিল এনুডার পেছনে।
চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছে লোকে, বাজার করতে এসেছে ওরা মলে। কেউ কেউ উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েছে মেঝেতে। কারও দিকেই তাকাচ্ছে না এনুডা। চোখ লাল, কঠিন চেহারা, তার নজর নীল সুট পরা লোকটার দিকে। মুহূর্তের জন্যেও সরাচ্ছে না। রবিনের বাড়িয়ে দেয়া পা-টাও দেখতে পেল না সে-জন্যে।
পায়ে পা বেধে উড়ে গিয়ে পড়ল এনু। ধড়াস করে পড়ল যেন ময়দার বস্তা। হাত থেকে ছুটে উড়ে চলে গেল পিস্তলটা। দোকানের জানালা-দরজা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রয়েছে খরিদ্দারেরা। বাধা দিতে বা কোন কিছু করতেই এগোচ্ছে না কেউ।
এই, থামো! খ্যাখ্যান করে উঠল একটা কণ্ঠ। ছেলেটা কে?
চিনি না, টম, জবাব দিল দাড়িওয়ালা লোকটা। আমার হাত সরিয়ে দৌড় দিল।
ঘুরে তাকাল রবিন। সার্চলাইটের উজ্জ্বল সাদা আলো প্রতিটি কোণ থেকে এসে পড়েছে তার ওপর। মেঝেতে এঁকেবেঁকে পড়ে রয়েছে ইলেকট্রিকের তার। হেসে উঠল কয়েকজন মানুষ, টিভি ক্যামেরা হাতে তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

একজন চিৎকার করে বলল, ফিল্মটা রেখে দিও টম। দারুণ দৃশ্য! কাজে লাগবে পরে!
যথেষ্ট হয়েছে, বলল প্রথম কণ্ঠটা। এই সরাও তো সব, পরিষ্কার করো। দশ মিনিটের মধ্যেই আবার শূটিং করব।
গুঞ্জন উঠল জনতার মাঝে। এদিক ওদিক সরে যেতে লাগল ওরা। কয়েকজন এগিয়ে গেল একটা টেবিলের দিকে, হালকা খাবার আর কোমল পানীয় রাখ ওটাতে।
ঢোক গিলল রবিন। দাড়িওয়ালা লোকটাকে তার দিকে আসতে দেখে লাল হয়ে গেল গাল। সব ভজকট করে দিয়েছ। আবার নতুন করে করতে হবে পুরো দৃশ্যটা।
সরি, স্যার, আমি ভেবেছিলাম…
যা করার করেছ। আর করবে না।
দাড়িওয়ালা লোকটা চলে গেলে ফিরে তাকাল রবিন। কিশোর এসে দাঁড়িয়েছে পাশে। রবিন কাঁধে হাত রেখে সান্তনার সুরে বলল, ওরকম ভুল সবাই করতে পারে। তুমি না করলে আমি করতাম, বাধা দিতে যেতাম এনুডাকে।
পেছন থেকে বলে উঠল এনুডা, আবার আমার পেছনে লেগেছ!
ফিরে তাকিয়ে শান্তকণ্ঠে বলল কিশোর, ভুল হয়ে গেছে, মিস্টার এনুডা। দেখলেনই তো…
একেবারে স্পষ্ট দেখেছি! চিবিয়ে চিবিয়ে বলল এনুডা, এনুডা এনুডা করবে না। এখানে আমি নিভার ব্রাউন। আমার ক্যারিয়ার ধ্বংস করতে এসেছ নাকি?
না, মিস্টার এনুডা। জানতে এলাম, ডায়না মরগানকে খুনের চেষ্টা আপনি কেন করছেন?
বড় বড় হয়ে গেল এডার চোখ। বুক চেপে ধরে মাতালের মত টলে উঠল। ইংরেজি নাটকের সংলাপ নকল করে বলে উঠল, ইউ ভাইল, ইভিল জুভেনাইল ডেলিংকোয়েন্ট! এত্তোবড় সাহস তোমার, আমাকে খুনী বলতে এসেছ…
করব না-ই বা কেন? প্রাসাদে সে-রাতে রিভলভার হাতে কাকে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছি? যে পথে দেখা গেছে আপনাকে, ওই পথ দিয়েই সার্ভেন্টস কোয়ার্টার থেকে এসে প্রাসাদের বেসিমেন্টে নামা যায়, সার্কিট ব্রেকারগুলো যেখানে আছে।
সার্কিট ব্রেকার? কি বলছ!
আরও বলতে পারি। আপনার সিলভার-প্লেটেড রিভলভারটাই বনের মধ্যে পাওয়া গেছে। গতকাল। ক্লিফসাইড কান্ট্রি ক্লাবে ডায়নাকে গুলি করার পর।
ফালতু কথা রাখো! আমার ক্যারিয়ার নষ্ট হওয়ার ভয় আছে, নইলে ধরে তোমাকে এখন এমন ধোলাই দিতাম! তুমি বলছ কান্ট্রি ক্লাবে গিয়েছিলাম, আর

আমি বলছি সারাদিন আমি এখানে ছিলাম। আমার পার্ট আসার অপেক্ষায়। এগিয়ে গিয়ে টেবিলের ওপর থেকে একটা খাতা নিয়ে এল। ফর ইওর কাইন্ড ইনফরমেশন, এই যে দেখো, আমার হাজিরা।
কিশোর পড়ল:
ব্রাউন, নিভার।
এসেছে-সকাল ৭.৩০।
বেরিয়েছে-বিকাল ৬.৩৫।
বিশ্বাস হলো তো? আরেকটা কথা, আমি বেসিমেন্টে ঢুকিনি।
কি করে বুঝব? সেরাতে গিয়েছিলেন ম্যানশনে। চাকরদের ঘরে ঢুকেছিলেন…
পার্টি চলছিল। সবার চোখ এড়িয়ে কটেজে ঢোকার উপযুক্ত সময় ছিল ওটা।
পাঁচ মিনিট! চিৎকার করে বলল একটা ভারী কণ্ঠ। আর মাত্র পাঁচ মিনিট। সবাই রেডি?
গুঙিয়ে উঠল এনুডা। হায়, হায়, অনেক সময় নষ্ট করলাম বকবক করে! আমি যাই! তাড়াহুড়ো করে চলে গেল সে।
এখনও আমি বিশ্বাস করি না ওকে, কিশোর বলল।
এখানে থেকেও আর লাভ নেই। এনুডার সঙ্গে কথা বলা যাবে না। চলো।
ওদের পেছনে হুস করে খুলে গেল এলিভেটরের দরজা। ঢুকে পড়ল দুজনে। এবার ভেতরে আর একজনও নেই, শুধু ওরাই।
আমার অন্য কাজ আছে, কিশোর বলল। তুমি এখানে থেকে এনুডার ওপর নজর রাখতে পারবে?
খুব পারব, আগ্রহের সঙ্গে বলল রবিন।
ও কি করে না করে সব দেখবে। দরকার হলে ওর বাড়ি পর্যন্ত অনুসরণ করে যাবে। সাবধান, ও যেন তোমাকে চিনতে না পারে।
পিকআপের মধ্যে প্রয়োজনীয় নানা রকম জিনিস আছে। বাক্স খুলে একটা সবুজ ইউনিফর্ম বের করল কিশোর, শ্রমিকের কাজের পোশাক। নাও, পরে ফেলো। একটা প্লাস্টিকের ব্যাগ হাতে নিয়ে ময়লা টোকানোর ভান করবে। পারবে তো?
দেখোই না, হেসে বলল রবিন। পোশাকটা হাতে নিয়ে বলল, আসছি। এক মিনিট। মহিলাদের টয়লেটের দিকে রওনা হয়ে গেল সে।
ফিরে এল একটু পরেই। ঠিকমত লাগেনি পোশাকটা। সামান্য ঢলঢলে হয়েছে। হাত আর পায়ের নিচের অংশ ভাজ করে মুড়ে রাখতে হয়েছে।
হেসে ফেলল কিশোর। দেখো, টিভির পরিচালক না আবার দেখে ফেলে। অভিনয়ের জন্যে জোর করে ধরে নিয়ে যাবে তাহলে।

ভালই হবে, হাসতে হাসতে বলল মেয়ে সেজে আসা রবিন।
তাকে রেখে পিকআপ নিয়ে বেরিয়ে এল কিশোর। রকি বীচ মিউজিয়ামে রওনা হলো। শহরের ঠিক মাঝখানে এসে লাল আলো দেখে থামল সে। এই সময় একটা লাল গাড়ি চোখে পড়ল, একধারে থেমে রয়েছে। পরিচিত লাগল গাড়িটা। ল্যামবোরগিনি।
চিনে ফেলল। ডায়নার গাড়ি। সামনে না এগিয়ে গাড়িটার পেছনে এনে পিকআপ রাখল কিশোর। কাছের একটা স্টোর থেকে বেরিয়ে এল ডিন রুজভেল্ট, হাতে একগাদা পত্র-পত্রিকা।
হাত নেড়ে ডাকল কিশোর, হাই, ডিন!
ফিরে তাকাল ডিন। কিশোরকে দেখেই চোখ জ্বলে উঠল। কী?
ডায়না এসেছে নাকি?
না, এল আর কই? বডিগার্ডের সঙ্গে রয়ে গেছে! বডিগার্ড শব্দটা ব্যঙ্গের সুরে বলল সে।
আমাদের ওপর অযথাই রেগে আছো। হাহ হাহ! তা কি জন্যে এসেছ?
গারেজ থেকে গাড়িটা নিতে, ল্যামবোরগিনটা দেখাল ডিন। ডায়নাই অনুরোধ করল।
পিকআপ থেকে নামল কিশোর। এত পত্রিকা কার জন্যে?
ওর জন্যেই। আজকের কাগজেও ওর ছবি বেরিয়েছে। বলল সব কটার একটা করে কপি কিনে নিয়ে যেতে।
ওর কাজ করে দিতে আপনার ভাল লাগে, না?
লাগলেই বা কি? তোমার জ্বালায় কিছু করতে পারব নাকি? আর তোমাকেই বা দোষ দিয়ে কি হবে? যতবারই ওর কাছাকাছি যেতে চাই, কেউ না কেউ এসে মাঝখানে পড়ে বাগড়া দেবেই।
এ-জন্যেই আমার ওপর রাগ, না? হেসে বলল কিশোর। বিশ্বাস করুন, বাগড়া দিয়ে শয়তানি করার কোন ইচ্ছেই আমার নেই।
তাহলে ওভাবে পিছে লেগে রয়েছ কেন?
রহস্যের লোভে। দারুণ একটা কেস পেয়ে গেছি। বোরজিয়া ড্যাগারকে ঘিরে জমে উঠেছে রহস্য। এর কিনারা করার জন্যেই ঘোরাফেরা করি ম্যানশনে।
সত্যি বলছ?
হ্যাঁ, সত্যি বলছি।
দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কিশোরের চোখে চোখে তাকিয়ে রইল ডিন। মনে হলো না, কথাটা বিশ্বাস করেছে।

ডিন, আপনাকে পেয়ে ভালই হলো। হয়তো বুঝতে পারছেন, ডায়নাকে কেউ খুন করার চেষ্টা করছে। আমাদেরকে সাহায্য করেন না কেন?
ডায়নার ওপর কড়া নজর রাখছি আমি।
কই আর রাখলেন? এই তো, চলে এলেন এখানে। যদি এই সময়ের মধ্যে কিছু হয়ে যায়?
কেন, তোমার বন্ধু আছে না ওখানে?
হ্যাঁ, আছে। সেজন্যেই তো বলছি, চোখ রাখার দরকার নেই। অন্যভাবে সাহায্য করুন আমাদেরকে।
কি ভাবে?
আসুন আমার সঙ্গে। রকি বীচ মিউজিয়ামে যাব। এ সবের পেছনে জুভেনারের হাত থাকতে পারে। তাহলে তাকে ঠেকাতে হবে। সাহায্য দরকার আমার। আপনি এলে ভাল হয়।
কি যেন ভাবল ডিন। তারপর মাথা নাড়ল, বেশ, চলুন তাহলে।
*
মিউজিয়ামে ঢোকার সময় চুলে হাত চালাল ডিন, অস্বস্তি বোধ করছে। শেষে বলেই ফেলল, কিশোর, আমি গোয়েন্দা নই। এ সব কাজ আমাকে দিয়ে কি হবে? তারচেয়ে আমি ম্যানশনে চলে যাই, ডায়নার কাছে কাছে থাকলে কাজ হবে।
আসুন। বেশিক্ষণ লাগবে না। কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করব শুধু জুভেনারকে।
রিসিপশনিস্ট জানাল, অফিসে নেই জুনোর। কোথায় গেছে, বলতে পারল না। ফিরতে দেরি হবে। বসা যাবে কিনা, জিজ্ঞেস করল কিশোর। রিসিপশনিস্ট বলল, ঠিক আছে, ওর অফিসে গিয়ে বসো।
এসে বসে আছে তো আছেই ওরী। জুভেনারের দেখা নেই।
উঠে যাবে কিনা ভাবছে কিশোর, বিশেষ করে ডিনের চাপাচাপিতে বিরক্ত হয়েই অনেকটা, এই সময় দরজা খোলার শব্দ হলো। ফিরে তাকাল দুজনে।
জুভেনার নয়। বাদামী সুট এ দুজন বিশালদেহী লোক।
জুভেনার কই? জিজ্ঞেস করল একজন।
তার জন্যেই তো বসে আছি আমরা, জবাব দিল কিশোর।
আসবে কখন?
জানি না। সেক্রেটারি বলল, দেরি হবে। কোথায় গেছে, জানে না।
হারামজাদাকে পেলে মজা দেখাতাম আজ! হাত মুঠো করে ফেলেছে লোকটা। টাকা দেবে না, ওর বাপ দেবে।
এই, কি বলছ! ধমক দিয়ে বলল দ্বিতীয়জন। মাথা সব সময়ই গরম হয়ে থাকে! চলো, পরে আসা যাবে।

প্রথম লোকটাকে প্রায় টেনে বের করে নিয়ে গেল দ্বিতীয়জন।
টানাটানিতে একজনের কোটের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে হোলস্টার, কিশোরের চোখ এড়ায়নি সেটা। চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল, দেখলেন?
কী? অবাক হলো ডিন।
পিস্তল। দুজনের কাছেই পিস্তল আছে।
বলে কি! ভয় পেয়ে গেল ডিন। তবে কি জুভেনারকে খুন করতে এসেছিল?
কি জানি!
আমি আর বসব না। চলো, অনেক দেরি হয়ে গেছে।
ঘড়ি দেখল কিশোর। হ্যাঁ, সাড়ে চারটে বাজে। চলুন।
সেক্রেটারির কাছে এসে জুভেনারের বাড়ির ঠিকানা চাইল কিশোর।
একটা কাগজে খসখস করে কিছু লিখে বাড়িয়ে দিল সেক্রেটারি।
লেখাটা পড়ে কিশোর বলল, হার্ড লেক। পাশের শহরটাই। ডায়নাদের বাড়ি থেকে দূরে না। ডিনের দিকে তাকাল। যাবে নাকি?
না, বাবা, আমি পারব না! দুহাত নাড়ল ডিন। পারলে তুমি যাও। আমি ম্যানশনে যাচ্ছি।
হাসল কিশোর। এত ভয় পেলেন? চলুন, আমিও যাব। মুসার সঙ্গে কথা আছে। রসিকতার ভঙ্গিতে চোখ টিপল সে। দেখি, ও সরতে রাজি হয় কিনা। তাহলে খানিকক্ষণের জন্যে একলা পাবেন আপনি ডায়নাকে। ওর বডিগার্ড হওয়ার খায়েশটা পূরণ হবে।
*
মরগান ম্যানশনের কাছে পৌঁছল দুটো গাড়ি। লাল ল্যামবোরগিনিটা আগে আগে রয়েছে, পেছনে কিশোরের পিকআপ।
ড্রাইভওয়ে পেরিয়ে আসতেই গাড়ি-বারান্দায় আরেকটা গাড়ি চোখে পড়ল।
ওটার কাছে এসে পিকআপ থামিয়ে নামল কিশোর।
এই যে, তোমরা এসেছ। ডায়না কোথায়?
ফিরে তাকল কিশোর। প্রাসাদের সদর দরজায় দাঁড়িয়ে হাত নাড়লেন তার দিকে ডক্টর নরিয়েমা। প্রশ্নটা তিনিই করেছেন।
ল্যামবোরগিনির দরজা খুলে লাফ দিয়ে নামল ডিন। কেন, মুসার সঙ্গেই তো ছিল! এখানেই থাকার কথা!
অবাক হলেন ডক্টর। বলো কি? আমি এসে দেখি, দরজা খোলা। ওরা নেই!
কিশোর আর ডিনও অবাক হলো। শঙ্কা ফুটল ডিনের চোখে।
খোঁজ করা দরকার। জরুরী কণ্ঠে বলল কিশোর। ডিনকে পাঠাল প্রাসাদে খুঁজতে। সে চলল গ্যারেজে দেখতে।

চারটে দরজাই খোলা। লনে কাজ করার যন্ত্রপাতি আর কিছু গ্রিল পড়ে থাকতে দেখা গেল গ্যারেজের দুটো ঘরের ভেতরে, বাকি দুটো পুরো খালি।
গাড়ি নিয়ে গেছে, ভাবল কিশোর। ফিরে চলল প্রাসাদে।
মাঝপথে থাকতেই দরজায় দেখা দিল ডিন। উত্তেজিত ভঙ্গিতে হাত নেড়ে ডাকল দৌড় দিল কিশোর।
ড্যাগার! ড্যাগার! চেঁচিয়ে বলল ডিন।
কি হয়েছে? কিশোর জানতে চাইল।
ডিনের চোখে ভয়। নেই ওটা!
ডিনের পাশ কাটিয়ে ছুটে পারলারে ঢুকল কিশোর। আবার জায়গামত ঠেলে সরিয়ে রাখা হয়েছে বুককেসটা, ছবিগুলো ঝোলানো রয়েছে ঠিকমতই। সোজা সাইডবোর্ডের দিকে এগোল সে। পড়ে রয়েছে কাঁচের বাক্স। ডালা খোলা। ছুরিটা নেই ভেতরে। দরজায় স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ডক্টর নরিয়েমার দিকে তাকাল সে!।
ডিন, ওপরতলায় খুঁজুন, কিশোর বলল। ডক্টর, আপনি হলওয়ে আর সিটিংরুমে দেখুন। আমি এখানে দেখছি। বলা যায় না, মুসাও লুকিয়ে রেখে যেতে পারে।
সমস্ত পারলারে তন্নতন্ন করে খুঁজল কিশোর। ড্রয়ার, কার্পেটের নিচে, বইয়ের ফাঁকে-মোট কথা ছুরি লুকানো যায় এ রকম কোন জায়গা বাদ দিল না
নেই।
ডিন আর ডক্টর নরিয়ে ফিরে এল শূন্য হাতে। দুজনেই মাথা নাড়ল।
কি হতে পারে বলো তো? ডিনের প্রশ্ন। ডায়নাকে কিডন্যাপ করল নাকি কেউ? সেই সাথে ছুরিটাও নিয়ে গেল?
আমার তা মনে হয় না। গাড়ি নেই যেহেতু মুসাকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরতে বেরোতে পারে। বসে থেকে থেকে বের হয়ে গিয়েছিল হয়তো। কোথায় যেতে পারে, বলুন তো?
কান্ট্রি ক্লাব! সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল ডিন।
কিংবা মলে!
বেশ। ডক্টর, আপনি আর আমি চলুন ক্লাবে যাই। ডিন, আপনি মলে যান।
বাইরে বেরোতেই দেখা গেল একটা গাড়ি আসছে। ডায়নার গাড়িবারান্দায় এসে থামল ওটা। দরজা খুলে নেমে এল ডায়না আর মুসা। অবাক দৃষ্টিতে ওদের মুখের দিকে তাকাতে লাগল।
ডায়না জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে?
কোথায় গিয়েছিলেন? পাল্টা প্রশ্ন করল কিশোর।

ঘুরতে। ভাল্লাগছিল না বসে থেকে থেকে। কিন্তু হয়েছেটা কি? মুখ অমন করে রেখেছ কেন? কি ব্যাপার?
আপনার জন্যে দুশ্চিন্তা হচ্ছিল।
আমার জন্যে? কেন? সাথে তো মুসাই আছে। আর আমি কচি খুকি না। বেরোতেই পারি যখন খুশি।
তা পারেন। ভাবতাম না, যদি বোরজিয়া ড্যাগারটা গায়েব না হয়ে যেত।
কি বললে!
ঠিকই বলছে, বললেন নরিয়েমা। খুলে বললেন, কি হয়েছে।
থমথমে হয়ে গেছে ডায়নার চেহারা। একটা কথাও আর না বলে চুপচাপ ঘরে ঢুকল, ছুরির বাক্সটা দেখার জন্যে।
*
আমি জুভেনারের ওখানে যাচ্ছি, ঘোষণা করল কিশোর। সারাটা বিকেল ওর অফিসে বসে থেকে এসেছি। ফেরেনি। সে-ও এসে ছুরিটা চুরি করে নিয়ে পালাতে পারে।
তা পারে, ডায়না বলল। কারণ বাড়ির দরজা-জানালা খোলাই ছিল।
ভুল করেছ, গম্ভীর হয়ে বললেন ডক্টর। এত দামী দামী জিনিস রয়েছে ঘরে। তালা দিয়ে যাওয়া উচিত ছিল।
যায়নি যখন, কি আর করা? কিশোর বলল। জুভেনারের বাসার ঠিকানা নিয়ে এসেছি। কারও ইচ্ছে করলে আসতে পারেন আমার সঙ্গে।
মাথা নাড়ল ডায়না আর ডিন। আর ডায়না যেহেতু থাকছে, মুসাও যাবে না। ডক্টর নরিয়েমা বললেন, আমি যাব। লোকটার সঙ্গে একটা বোঝাঁপড়া আছে আমার। জিজ্ঞেস করব, মেয়েটাকে এত জ্বালাচ্ছে কেন?
ক্লিফসাইড হাইটস পেরিয়ে এল ওরা। শর্ট নেক চেনেন নরিয়েমা, কিশোরকে পথ বলে দিতে থাকলেন। পথের দুধারে এখন ঘোট ঘোট বাড়ি আর টাওয়ারের মত উঁচু হয়ে উঠে যাওয়া বিশাল ম্যাপল গাছ। বাড়িঘরগুলো দেখতে সব প্রায় একই রকম। সাদা রঙ করা দেয়াল, ছিমছাম সন আর সুন্দর ফুলের বাগান। ঠিকানাটা তার হাতে তুলে দিয়েছে কিশোর। নম্বর দেখছেন নরিয়েমা। একটা বাড়ি দেখিয়ে হঠাৎ বলে উঠলেন, ওটাই।
অন্য বাড়িগুলোর মত পরিচ্ছন্ন নয় এটা। আগাছা সাফ হয় না বহুদিন। সর্বত্র। অযত্নের ছাপ।
গাড়িটাড়ি তো দেখছি না, কিশোর বলল। বোধহয় বাড়ি নেই।
এখন কি করবে তাহলে?
আপনি গাড়িতে বসুন। আমি দেখে আসি।

শূন্য ড্রাইভওয়ে ধরে হেঁটে চলা কিশোর। প্লাস্টিকের ব্যাগে ভরে ময়ল, জল ফেলে রেখেছে যেখানে সেখানে। নোংরা করে রেখেছে জায়গাটা।
সামনের দরজায় এসে ঘন্টা বাজল সে।
জবাব নেই।
আবার বাজাল। সাড়া মিলল না এবারেও। তুতীয়বার বাজিয়ে, জবাব না পেয়ে পাশে একটা জানালার কাছে চলে এল। ভেতরে উকি দিয়ে দেখল কেউ নেই। ফিরে এল পিকআপের কাছে।
কি আছে? জিজ্ঞেস করলেন নরিয়েমা।
না। বিছানা এলোমেলো। টেবিলে পড়ে আছে অধোয়া থালা-বাসন দেখে মনে হয়, তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে গেছে।
তার মানে পালিয়েছে। ছুরিটা চুরি করে।
হতে পারে। কিন্ত এর কোন যুক্তি খুঁজে পাচ্ছি না আমি! জুভেনার চায় সময় জিনিস যেগুলো মিউজিয়াম থেকে নিয়ে এসেছে ডায়না। শুধু একটা ছুরি চুরি করে পালাবে কেন? প্রশ্নটা এখন হঠাৎ করেই উদয় হলো কিশোরর মাথায়।

.

একটা মুহূর্তও আর এ ঘরে থাকতে ইচ্ছে করছে না আমার, ডায়না বলল। কেমন যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে সব।
তা ঠিক, মাথা দোলালেন নরিয়েমা। ভাল না লাগলে, চলো, বাইরে থেকে ঘুরে আসি। রাতের খাওয়াটাও কোন রেস্টুরেন্টে সেরে নেয়া যাবে। চলো, আজ আমিই খাওয়াব তোমাদের।
আইডিয়াটা মন্দ না, কিশোর বলল। কোন রেস্টুরেন্টে যাবেন?
ডিলমারস প্লেস।
চমৎকার জায়গা!তুড়ি বাজাল মুসা। রান্না খুবই ভাল। দামও বেশি।
দামের জন্যে ভাবতে হবে না তোমাদের, হাসলেন ডক্টর।
মুসার দিকে ফিরে বলল কিশোর, ঠিক আছে, তুমি যাও ওদের সঙ্গে। আমি রবিনকে নিয়ে চলে আসব সময়মত। মলে রেখে এসেছি ওকে, এনুডার ওপর নজর রাখার জন্যে।
*
পিকআপটাকে দেখে হাসল রবিন। তার গাড়ির পেছনে পিকআপ থামাল কিশোর। এনুডার বাড়ি থেকে ব্লকখানেক দূরে।
নেমে এগিয়ে এল সে। জানালার কাছে ঝুঁকে বলল, মলে গিয়েছিলাম। দেখলাম, শূটিং শেষ। তুমি নেই, এনু নেই। ভাবলাম, এখানেই এসেছ। তা খবর কি?

বিরক্ত হয়ে গেছি। শুটিং শেষ করে সোজা বাড়ি চলে এসেছে এনুডা। তারপর সেই যে গিয়ে ঘরে ঢুকেছে, বেরোনোর আর নামই নেই।
সন্দেহ হয় এমন কিছু চোখে পড়েছে?
নাহ্। একটা দৃশ্যেরই ছবি তোলা হলো কয়েকবার করে। অনেক দর্শক ভিড় করে বসে থাকল চারপাশে গোল হয়ে। কাজ শেষ করে ঘণ্টা দুয়েক আগে বাড়ি চলে এসেছে এনুডা।
কেউ দেখা করেছে তার সঙ্গে?।
করেছে, একটা মোটা লোক। মাথায় টাক। চোখে ভারী চশমা ছটার সময় ওকেই দেখা করতে বলেছে বোধহয় এনূড়া। ওর নামই হয়তো ফ্র্যাঙ্ক।
হু। ভেতরেই আছে এখনও?
না। এসে, কয়েক মিনিট থেকেই চলে গেছে।
বোঝা গেছে। এখানে আর কিছু করার নেই আমাদের। ভুরু নাচিয়ে মিটিমিটি হাসল কিশোর। রাতে খাবে কোথায়?
কেন, বাড়িতে! অবাকই হলো রবিন।
চলো না, কোন রেস্টুরেন্টে চলে যাই?
কিশোরের দিকে দীর্ঘ এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল রবিন। ব্যাপারটা কি, বলো তো? হঠাৎ এ ভাবে খাওয়ার দাওয়াত
খুলে বলল সব কিশোর, ছুরি হারানো থেকে শুরু করে, সব।
*
ডায়নার মনমেজাজ খারাপ থাকায় খাওয়াটা তেমন জমল না। বিল মিটিয়ে দিলেন নরিয়েমা। জিজ্ঞেস করলেন, এখন কোথায় যাবে?
বাড়ি, নিরাসক্ত কণ্ঠে বলল ডায়না। ঘুম পেয়েছে আমার।
গাড়ি মোট তিনটে। ডায়নার ল্যামবোরগিনি, কিশোরের পিকআপ, আর রবিনের গাড়ি। তিনজনকে ড্রাইভ করতে হবে।
কিশোরকে অনুরোধ কবে বসল ডায়না, কিশোর, তুমি চালাও না আমারটা! আমার চালাতে ইচ্ছে করছে না!
ঝট করে ডিন আর রবিনের দিকে চোখ চলে গেল কিশোরের। ডিনের চোখে রাগ। রবিনের মিটিমিটি হাসি। বোধহয় কিশোরকে ডায়নার শোফার হিসেবে কল্পনা করেই হাসি পাচ্ছে তার।
নিরাসক্ত দৃষ্টিতে ডিন আর রবিনের দিকে তাকিয়ে গাড়িতে উঠে বসল কিশোর।
কিশোর আর ডায়না উঠল ল্যামবোরগিনিতে। রবিনের গাড়িতে রবিন একা। পিকআপে মুসা আর ডক্টর নরিয়েমা। ডিন কারও গাড়িতে উঠল না। সে আশা করেছিল গাড়িটা চালাতে বলবে ওকে ডায়না। সে-অপেক্ষাতেই ছিল। সেটা যখন

হলো না, মেজাজ খারাপ করে চলে গেল সে। হুমকি দিয়ে গেল, ছুরিটা আর ফেরত পাবে না ডায়না!
সবাই চলল ওরা মরগান ম্যানশনের দিকে। ডিনই বা এ কথা বলল কেন, আর ডায়নাই বা ডিনকে উঠতে না দিয়ে কিশোরকে গাড়ি চালাতে বলল কেন, দুর্বোধ্য ঠেকল সবার কাছে। তবে এ নিয়ে বেশিক্ষণ মাথা ঘামাল না কেউ।
পথে নরিয়েমার বাড়িতে তাঁকে নামিয়ে দেয়া হলো।
রাস্তায় কোন অঘটন ঘটল না।
তবে বাড়ি পৌঁছে ডিনের ছুরি না দেয়ার কথাটা নিয়ে প্রশ্ন তুলল কিশোর। প্রথমে রেগে উঠল ডায়না। তারপর আমতা আমতা করতে লাগল। চেপে ধরল তাকে কিশোর, ছুরিটা কোথায় আপনারা জানেন, তাই না?
না না…আ-আমি…কিছু… থেমে গেল ডায়না। তারপর রেগে উঠল, আমাকেই চোর ভাবছ?
সব কথা জানতে চাই আমি, ডায়না, ভারী হয়ে গেছে কিশোরের কণ্ঠস্বর। খুলে বলুন।
এমন কিছু ছিল কিশোরের কণ্ঠে, প্রতিবাদ করার সাহস করল না আর ডায়না। ঠোঁট কেঁপে উঠল তার। ধপ করে বসে পড়ল একটা সোফায়। আঁকুনি লেগে চুল এসে পড়ল মুখের ওপর, সরানোর চেষ্টা করল না। আমাকে খুন করার চেষ্টা কে করেছে, জানি, মোটা খসখসে হয়ে গেছে তার কণ্ঠ।
কে? এনুডা?
মাথা নাড়ল ডায়না। না। এনুডাও নয়, জুভেনারও না।
তাহলে?
দুহাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠল ডায়না। চোখে পানি নিয়ে তাকাল কিশোরের দিকে, যেন করুণার আশায়।
কে, ডায়না? কোমল গলা জিজ্ঞেস করল কিশোর।
চোখের পানি আর ঠেকাতে পারল না ডায়না। আমি আর ডিন! সমস্ত ব্যাপারগুলো ছিল সাজানো!
চমকে যাওয়া সব কটা মুখের দিকে এক এক করে তাকাল সে। আর পেটে রাখতে পারল না কথা, গড়গড় করে বেরিয়ে আসতে লাগল সব, আব্বার রেখে যাওয়া সব টাকা বন্ধুবান্ধবের পাল্লায় পড়ে, বেহিসেবী খরচ করে শেষ করেছি। আমি। উড়িয়ে দিয়েছি কিছুদিনের মধ্যেই। টাকা ওড়ানো যে এত সহজ, জানতাম না! হঠাৎ একদিন দেখি খালি হয়ে গেছে অ্যাকাউন্ট। চাকর-বাকরের খরচ দিতে পারছি না। বিদেয় করে দিতে হলো ওদেরকে। শুধু যে অ্যাকাউন্টই খালি হয়েছে, তা নয়, ধারও হয়েছে অনেক। ম্যানশনটা বিক্রি করে দিলেও সে-ধার শোধ করে

খুব সামান্যই বাকি থাকে। ওই টাকা দিয়ে রকি বীচে কোনমতে ছোটখাট একটা বাড়ি কেনা যায়। খাওয়া-পরার জন্যে একটা কাজ জুটিয়ে নেয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকত না আমার। সেজন্যেই মিউজিয়াম থেকে আর্ট কালেকশনগুলো ফেরত নিয়ে এসেছি আমি, বলে গেল ডায়না। জানি, বেআইনী ভাবেই করেছি কাজটা। দলিলটা হারিয়ে ফেলেছে জুভেনার, এই সুযোগটা কাজে লাগিয়েছি। নিয়ে এসেছি বিক্রি করার জন্যে। চোখের পানির সঙ্গে কালো মাসকারা গাল বেয়ে নামছে তার।
বলে যান, কিশোর বলল। এর সাথে ড্যাগার চুরি আর খুনের চেষ্টার সম্পর্ক কি?
নোরজিয়া ড্যাগারটা নিয়ে বিজ্ঞাপন করা হয়েছে বেশি, নানা রকম ভাবে, গল্প বলে, সিনক্রিয়েট করে। খুনের চেষ্টাগুলো সব সাজানো-বন থেকে আমাকে সই করে গুলি ছোঁড়া, সুইমিং পুলে তার ফেলে রাখা, সব।
কেন?
বললাম না, পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের জন্যে। রিপোর্টাররা এসেছে। ফলাও করে খবর ছেপেছে। বিখ্যাত হয়ে পড়েছে বোরজিয়া ড্যাগার। ভাল দাম আশা করেছিলাম আমরা। তা-ই হতে যাচ্ছিল। দুএকজন টো টাকা অফারও দিয়ে ফেলেছে। ডিন আমাকে ভালবাসে, চোখ নামিয়ে দিল ডায়না। আমি বাসি না। কিন্তু তার এই দুর্বলতাটা কাজে লাগিয়ে তাকে দিয়ে এ সব করিয়ে নিয়েছি আমি। একটা মানুষকে কতদিন আর গাধা বানিয়ে রাখা যায়? বুঝতে পেরে সরে গেছে সে!
কয়েক সেকেন্ড নীরবতা।
তারপর মুসা জিজ্ঞেস করল, ছুরিটা কোথায়?
বাগানে। একটা ফুলের বেডের মধ্যে রেখেছিলাম...
কখন?
তুমি তখন বাথরুমে গিয়েছিলে। এই সুযোগে ওটা বাক্স থেকে বের করে নিয়ে ফেলে দিয়েছিলাম।
ঘুরে দাঁড়াল কিশোর। দরজার দিকে রওনা হলো।
কোথায় যাচ্ছ? জিজ্ঞেস করল ডায়না। পাবে না। এতক্ষণে নিয়ে গেছে নিশ্চয় ডিন।
তাহলে তাকে খুঁজে বের করব।
ঠিক এই সময় দপ করে নিভে গেল সমস্ত আলো।

.

ডিন, ডিনের কাজ! চিৎকার করে বলল ডায়না। আমাকে খুন করবে এবার! প্রতিশোধ নেবে! পাগল হয়ে গেছে!
আল্লাহই জানে, কি করবে? বিড়বিড় করল মুসা। হতে ছুরি আছে যখন..

আছে কোথায় ও রবিনের প্রশ্ন।
আউফ! করে উঠল অন্ধকারে মুসা।
কি হলো? কিশোর উদ্বিগ্ন।
কে যেন পা মাড়িয়ে দিল! ডায়নাই হবে!
তোমার পা? জোরে নিঃশ্বাস ফেলল ডায়না। আমি টর্চ খুঁজছি...
ড্রয়ার খোলার শব্দ হলো। অন্ধকার চিরে দিল টর্চের উজ্জ্বল আলোকরশ্মি।
দুটো আছে, ডায়না বলল।
আমাকে একটা দিন, বলল মুসা।
এই, চুপ! শোনো! ফিসফিসিয়ে বলল রবিন। সবাই শুনতে পেল বিচিত্র শব্দটা। থেমে গেল হঠাৎ।
এল কোত্থেকে? বুঝতে পারছে না ডায়না।
কি জানি! বুঝতে পারল না মুসাও। মনে হয় নিচে কোন জায়গা থেকে। দেখি, আলোটা জ্বালানো যায় কিনা।
সেলারের দরজার কাছে এসে দাঁড়াল মুসা। টান দিয়ে খুলে ভেতরে ঢুকল। সারকিট ব্রেকারের বাক্সটার কাছে এসে আলো ফেলল। মেইন সুইচ অফ করা। টান দিয়ে তুলে দিল ওটা। নিশ্চয় আলো জ্বলেছে, নিজেকে বলল সে।
বাইরে বেরিয়ে দেখল আগের মতই অন্ধকারে রয়েছে প্রাসাদ। আলো জ্বলেনি।
মেইন লাইনের তারটার কেটে দিয়েছে, অনুমান করল কিশোর আলো নেভাল, চিন্তিত শোনাল কিশোরের কণ্ঠ, অথচ আসছে না! ও কিছু করার আগে আমাদেরই ওকে খুঁজে বের করা উচিত। এসো তো।
টর্চের আলোয় পথ দেখে সামনের দরজার দিকে এগোল চারজনে। গ্রীষ্মের রাতের ভ্যাপসা গরম, আঠা আঠা করে দেয় ঘাম। এই পরিবেশে ওদের মনে হলো সব কিছুই যেন খুব ধীরে ঘটছে, স্লো মোশন ছায়াছবির মত। পুরানো কাঠ আর ধুলোয় ঢাকা কার্পেটের গন্ধ ভাসছে ঘরের বাতাসে। একের পর এক ঘরে ঢুকছে ওরা, আর একই রকম গন্ধ পাচ্ছে।
হঠাৎ থ্যাক করে একটা শব্দ হলো। ঝটকা দিয়ে মুখ তুলল কিশোর। ওপরে তাকাল। এক দৌড়ে হল পেরিয়ে এসে উঠল সিঁড়িতে। ঠিক পেছনে রয়েছে মুসা। সিঁড়ির মাথায় উঠে হলঘরে টর্চের আলো ফেলে দেখল। শূন্য ঘর।
ভুল করছেন আপনি, ডিন, চেঁচিয়ে বলল কিশোর। আমরা চারজন, আর আপনি একা। কিছুতেই পারবেন না। গোলমাল না করে বেরিয়ে আসুন। কিছু বলব না আপনাকে।
সাড়া নেই।
ডান দিকে হয়েছিল শব্দটা, ফিসফিস করে বলল কিশোর।

দেয়ালের দিকে পিঠ করে পা টিপে টিপে সেদিকে এগোল সে আর মুসা। দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে গেল। বন্ধ। পাথর হয়ে পঁড়িয়ে রইল কয়েকটা সেকেন্ড।
তারপর হঠাৎ এক লাথি মেরে পাল্লা খুলে ফেল্ল কিশোর। পরক্ষণেই সেটে গেল দেয়ালের সঙ্গে।
ঝটকা দিয়ে খুলে দেয়ালের সঙ্গে খটখট করে বাড়ি খেলো পাল্লাটা। কেউ বেরিয়ে এল না ঘর থেকে। টর্চ জ্বেলে ঘরে আলো ফেলল কিশোর। বড় একটা বিছানা রয়েছে, চানপাশে বেশ কিছু আসবাবপত্র। একটা আলমারির কাছে এসে টান দিয়ে খুলল দরজা। ভেতরে তিনটে কোট ঝুলছে হ্যাঁঙারে।
পালিয়েছে, মুসা বলল।
কিন্তু কোন পথে? কিশোরের প্রশ্ন। আবার বেরিয়ে এসে হলঘরে আলো ফেলল। ডায়না আর রবিনই বা কোথায়? কোন সাড়া নেই!
তার কথার জবাবেই যেন উল্টো দিক থেকে ভেসে এল তীক্ষ্ণ চিৎকার।
দৌড় দিল দুজনে। একটা ঘরে শব্দ শোনা গেল। ছুটে ভেতরে ঢুকল ওরা। মেঝেতে লুটিয়ে রয়েছে একটা দেহ, টর্চের আলো পড়ল তার ওপর।
রবিন! উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলে উঠল কিশোর। কি হয়েছে, রবিন? হাঁটু মুড়ে বসল তার পাশে।
উফ, কানটা...! কান চেপে ধরে আছে রবিন।
দেখি তো, রবিনের হাতটা সরিয়ে দিয়ে কানের দিকে তাকাল কিশোর। আরি, রক্ত পড়ছে তো! অবশ্য বেশি কাটেনি।
এখানে কি করছিলে তুমি? মুসা জিজ্ঞেস করল।
তোমরা চলে যাওয়ার পর আমি আর ডায়না ভাবলাম পেছনের সিঁড়ি দিয়ে উঠে যাই। ও সোজা তিনতলায় উঠে গেল। আমি দোতলায় উঠতেই একটা শব্দ কানে এল।
তারপরেই তুমি এখানে এসে ঢুকেছ? কিশোর বলল। টর্চ ছাড়া?
মাথা ঝাঁকাল রবিন। এখানে ঢুকতেই শুনলাম, পেছনে কে যেন ফিসফিস করে ডায়নার নাম ধরে ডাকছে। ফিরে চেয়ে আবছা একটা মূর্তিকে দেখলাম, ডিনের মতই লাগল। ছুরি চালাল। সরে গিয়েছিলাম, ফলে শুধু কানে একটু খোঁচা লেগেছে। চিৎকার করে উঠলাম। ও বুঝে ফেলল আমি কে। গাল দিয়ে উঠে দৌড়ে চলে গেল। কেঁপে উঠল রনি। লোকটা পুরো পাগল হয়ে গেছে।
ভাগ্যিস কান ছাড়া আর কিছু কাটতে পারেনি, কিছুটা রসিকতা করেই বলল মুসা।
কান দিল না রবিন। এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে হবে না! ডিনের মাথা এখন খারাপ! ডায়াকে পেলে ছাড়বে না। জলদি চলো।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, চলো!
ওপরতলা থেকে হঠাৎ আরেকটা চিৎকার শোনা গেল, প্রতিধ্বনি তুলল প্রাসাদের দেয়ালে। ছুটতে আরম্ভ করেছে ততক্ষণে কিশোর, মুসা আর রবিন। বড় একটা চিলেকোঠায় এসে ঢুকল।
ঢালু হয়ে নেমে গেছে কাঠের সিলিং। শেষ প্রান্তে একটা টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে আছে ডিন আর ডায়না।
সরো, জানোয়ার কোথাকার! হিস্টিরিয়া রোগীর মত চেঁচিয়ে উঠল ডায়না। ছুরিটা তুলে ধরেছে ডিন। এবার টেবিলের এ পাশ ঘুরে, আরেকবার ওপাশ ঘুরে পৌঁছতে চাইছে ডায়নার কাছে।
এই, ফেলো ওটা! দরজার কাছ থেকে বলল কিশোর।
ঝট করে ঘুরে তাকাল ডিন। মুখে পড়েছে কিশোরের টর্চের আলো।
বিকট চিৎকার করে টেবিলের ওপর ঝাঁপ দিয়ে পড়ল ডিন। প্রায় পিছলে চলে এল আরেক পাশে। ছুরি তুলে ছুটে এল কিশোরকে মারার জন্যে। কাছে এসে প্রথমেই থাবা দিয়ে কিশোরে হাত থেকে টর্চটা ফেলে দিল। মেঝেতে গড়াতে শুরু করল ওটা, তবে আলো নিভল না। থাবা দিয়ে ধরতে গিয়েও পারল না কিশোর, চলে গেছে আওতার বাইরে।
বোরজিয়া ড্যাগারের স্বাদ দেখে কেমন লাগে! সাপের মত হিসহিস করে উঠল ডিন।
দাঁড়িয়ে রইল না মুসা। তাড়াতাড়ি গিয়ে তুলে নিল টর্চটা, দুজনের গায়ের ওপর ফেলে দেখল, ডিনের ছুরিধরা হাতটা ধরে ফেলেছে কিশোর। কব্জির ওপরটায় একহাতে ধরে মোচড় দিয়ে আরেক হাতে কিছু একটা করল সে, ছুরিটা প্রায় উড়ে চলে গেল ডিনের হাত থেকে। খটাং করে গিয়ে পড়ল মেঝেতে।
ঘরের সবাই ছুটল ওটার দিকে। কিশোর, ডিন, রবিন, মুসা, ডায়না, সব্বাই। একসাথে হাত বাড়াল ওটা তুলে নেয়ার জন্যে। শুধু একজনের হাত পৌঁছল ওটার ওপর।
সরো! সরে যাও! চেঁচিয়ে বলল কিশোর। ধাক্কা দিয়ে সরানোর চেষ্টা করল রবিন আর ডায়নাকে।
মাথার ওপর ছুরিটা তুলে ঘোরাতে লাগল ডিন।
হঠাৎ লাফিয়ে এসে পড়ল ডায়নার ওপর। বাহু দিয়ে গলা পেঁচিয়ে ধরল। চেঁচানোর চেষ্টা করল ডায়না, সুর বেরোল না ঠিকমত, আ-আ-মার...দম...
ছুটে গেল কিশোর-মুসা।
সরো! ছুরিটা ডায়নার গলায় ঠেকিয়ে ধমক দিয়ে বলল ডিন।
মাঝপথেই দাঁড়িয়ে গেল দুই গোয়েন্দা।

এ রকম হওয়ার কথা তো ছিল না, ডায়না! তীক্ষ্ণ হয়ে গেছে ডিনের কণ্ঠ। কত কষ্ট করে, আলাপ-আলোচনা করে প্ল্যান করেছিলাম আমরা। ভেবেছিলাম বাকি জীবনটা সুখে কাটাব দুজনে। কিন্তু তুমি সব নষ্ট করেছ। সব শেষ করে দিয়েছে তোমার লোভ। কি, করেনি?।
ডি-ডিন, ছড়ো…! শরীর মুচড়ে গলা ছাড়ানোর চেষ্টা করল ডায়ণ। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। তুমি পাগল হয়ে গেছ!
প্যাঁচ আরও শক্ত করল ডিন। আমার সঙ্গে বেঈমানী করেছ, স্বীকার করো সে-কথা! করতে লজ্জা লাগছে? বলো, নীলামের সমস্ত টাকা মেরে দেয়ার ফন্দি করোনি তুমি? আমাকে কি দিতে চাওনি?
নাআআ…! হাঁসফাঁস করছে ডায়না। ছাড়ো, প্লীজ…
ঠেলে নিয়ে চলল তাকে ডিন। ধাক্কা দিয়ে ফেলল একটা কেবিনেটের ওপর। ঝটকা দিয়ে খুলে গেল ওটার দরজা। অসংখ্য প্লেট আর রূপার তৈজসপত্রের ফোয়ারা ঝরতে লাগল যেন। ওপর দিকে তাকাল সে। কিছুটা ঢিল হয়ে গেল বাহুর বাধন।
সুযোগটা কাজে লাগাল ডায়না। ঝাড়া মেরে গলা ছোটাল, তবে বাসনে পা পিছলে আছড়ে পড়ল মেঝেতে। ঝনঝন করে পড়ছে জিনিসপত্র।
আলো নিভিয়ে দিল মুসা। নরক গুলজার শুরু হয়ে গেল যেন।
মাত্র কয়েক সেকেন্ড স্থায়ী হলে লড়াই। শেষ হলো ভোতা একটা ধুপ শব্দ দিয়ে।
আবার যখন আলো জ্বালল মুসা, দেখা গেল ডিনের ভূপাতিত নিথর দেহের পাশে দাঁড়িয়ে আছে সে। ডান হাতের আলগা মুঠোয় পড়ে আছে বোরজিয়া ড্যাগার।
বেশি জোরে মারলাম না তো? হাতের টর্চটা নেড়ে হেসে বলল মুসা। মরে না গেলেই বাঁচি।
আরে নাআহ, ঠিক হয়ে যাবে, ডায়নাকে টেনে সরিয়ে নিতে নিতে বলল কিশোর।
মেরে ফেলেছিল আরেকটু হলেই! ফুঁপিয়ে উঠল ডায়না।
আর পারবে না, অভয় দিল কিশোর।
বাইরে একটা গাড়ির দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ হলো।
কে এল? রবিনের প্রশ্ন।
কি জানি! মুসা বলল।
এখনও কাঁপছে ডায়না। ধরে ধরে তাকে এনে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসিয়ে দিল কিশোর।
সব আমার দোষ, কিশোর, ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল ডায়না। আমি আর ডিনই সব করেছি…

এক মিনিট, হাত তুলল রবিন। হাতের টর্চটা ঘোরাল ডায়না আর ডিনের ওপর। একটা ব্যাপার বাদ পড়ে যাচ্ছে। ধরলাম, বনের ভেতর থেকে গুলি করেছিল ডিন। সুইমিং পুলে বিদ্যুতের তার ফেলে রাখাটাও ওর কাজ। কিন্তু সেদিন পার্টিতে ইলেকট্রিসিটি অফ করে দিয়ে মূর্তিটা ঠেলে ফেলল কে সেটা তো তার কাজ হতে পারে না?

ডায়নার দিকে তাকাল কিশোর-মুসা। পেছনের সিঁড়িতে মৃদু পায়ের শব্দ হলো।

কি, জবাব দাও? ডায়নার দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচাল রবিন। দরজার দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে গেল ডায়না। ঘরে স্নান আলো এসে পড়ল।

ফিরে তাকাল অন্যরা।

হাতে একটা কেরোসিনের বাতি নিয়ে গড়িয়ে আছেন ডক্টর নরিয়েমা। মুখে কুৎসিত হাসি। হাতের পিস্তলটা তুলে বললেন, এই যে তোমার জবাব।

.

ডায়না, সব ভণ্ডুল করে দিয়েছ তুমি, নিমের তেতো করল যেন ডক্টরের কণ্ঠে। বিরক্ত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। সব ঠিকঠাক চলছিল। এ রকম যে ঘটবে ভাবতেই পারিনি।

আমাদেরকে খুন করবেন? মুসা জিজ্ঞেস করল।

ডায়নার কাছে গিয়ে দাঁড়াও তোমরা তিনজন, তিন গোয়েন্দাকে নির্দেশ দিলেন তিনি। ডিনের কাছে। ডায়না, সরো। সেটটা এমনভাবে সাজাব, যাতে মনে হয়, তিনজনকে খুন করে নিজেও আত্মহত্যা করেছে ডিন। খিকখিক করে হাসলেন তিনি। খবরের কাগজে হেডিং কি বেরোবে, এখনই আন্দাজ করতে পারছি। দারুণ খবর ছাপবে ওরা। সব দোষ পড়বে ছুরিটার ঘাড়ে। ফলাও করে ওরা লিখবে, বোরজিয়া ড্যাগারের রক্তলালসার কারণে মারা পড়ল এতগুলো তরুণ প্রাণ। আহারে! পিস্তল নাড়লেন তিনি। দাঁড়িয়ে আছো কেন? যাও।

ধীরে ধীরে ডিনের দিকে এগোল ওরা।

প্লীজ, খালা…

চুপ! এখানে এসো! আমার পাশে!

পিস্তলটা এখন কিশোরের দিকে ধরে রেখেছেন ডক্টর। উঠে দাঁড়াল ডায়না, টলমল করছে শ, যেন যে কোন মুহূর্তে পড়ে যেতে পারে। আমি…আমি আপনাকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম, খালা। আপনার কথা বলিনি ওদেরকে। কেন এলেন? কারোই তেমন কোন ক্ষতি হত না…

আমার হত! সব টাকা পানিতে যেত! জুভেনার সমস্ত মাল ফিরিয়ে নিয়ে গেলে আমার টাকাগুলোর কি হত? মাথা নাড়লেন ডক্টর। আমি তা হতে দিতে পারি না।

ভাবনার ঝড় বইছে কিশোর-মুসার মাথায়। চোখ বোলাচ্ছে সারা ঘরে। মুক্তির উপায় খুঁজছে।
হাত তোলো! কড়া আদেশ দিলেন ডক্টর। সোজা আমার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকবে। তোমাদের ফন্দি বুঝতে পারছি না আমি মনে করেছ?
কিছু করার নেই ওদের। আদেশ মানতে বাধ্য হলো। হারিকেনের আলো কেমন ভূতুড়ে ছায়া ফেলেছে ঘরের ভেতর। ডিনের কাছাকাছি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল তিনজনে। ডায়না এগোল দরজার দিকে।
এই মেয়ে, জলদি করো না! বেঁকিয়ে উঠলেন ডক্টর। সারারাত দাঁড়িয়ে থাকব নাকি?
বুকের ওপর ঝুলে পড়তে চাইছে ডায়নার মাথা, এতই ক্লান্ত মনে হচ্ছে তাকে। তবে নরিয়েমার আদেশ পালন না করে পারল না।
ধরো, হ্যারিকেনটা বাড়িয়ে দিলেন ডক্টর। শক্ত করে ধরে রাখে। খবরদার, ছাড়বে না! ডায়না বাতিটা হাতে নিতেই দুহাতে ধবলেন পিস্তলটা, যাতে গুলি করার সময় না নড়ে। প্রথমে কিশোরের দুচোখের মাঝখানে নিশানা করলেন।
মারতে খারাপই লাগছে। চালাক-চতুর ছিল। স্বভাবও ভাল, জোরে নিঃশাস ফেললেন ডক্টর। কিন্তু উপায় নেই।
তারপর ঘটতে লাগল একের পর এক ঘটনা। অনেক বেশি উজ্জ্বল হয়ে গেল ঘরের আলো। গুলির শব্দ হলো। শোনা গেল আরেকটা চিৎকার।
দরজার দিকে ঘুরে গেল কয়েক জোড়া চোখ। হ্যারিকেনের সাতে পুরো বাড়িয়ে দিয়েছে ডায়না। ডক্টরের চোখের সামনে ধরে রেখেছে।
শয়তান! উন্মাদ হয়ে গেছে ডায়না। যত নষ্টের গোড়া তুমি! ডিনকে জানোয়ার বানিয়ে ছেড়েছ! আমার জীবনটা ধ্বংস করে দিয়েছ। তোমাকে শেষ করব এবার আমি...।
হ্যারিকেনটা ডায়নার হাত থেকে কেড়ে নিতে গেলেন নরিমো। টানাটানিতে ছুটে গেল ওটা ডায়নার হাত থেকে, উরও ধরে রাখতে পারলেন না, মেঝেতে পড়ে চুরমার হয়ে গেল কাঁচ, গড়িয়ে চলে গেল টেবিলটার তলায়। তবে আলো নিভল না।
ভেবেছিলাম তোকে কিছু করব না! ভীষণ রেগে গেছে নরিয়েমা। এবার তোকেও শেষ করব।
ডায়নার দিকে পিস্তল যোরালেন তিনি।
এটাই সঠিক সময়। নড়ে উঠল রবিন। লাফ দিয়ে গিয়ে পড়ল চারের সামনে। দা চালানোর মত করে কোপ মারল আর হতে। খসে পড়ে গেল।

আহত বিড়ালের মত চিৎকার করে উঠ পিলটা তুলে নেয়ার জন্যে পা বাড়ালেন ডক্টর। লাথি মেরে পিলটা সরিয়ে দিল রবিন। হ্যারিকেনের কাছে গিয়ে পড়ল ওটা।
দেখে প্রথমটায় কিছুক্ষণের জন্যে হয়ে গেল সবাই। পুরনো কাঠের মেঝেতে কেরোসিন পড়েছে, আগুন ধরে গেছে তাতে। শুকিয়ে খটখটে হয়ে আছে টেবিলের পায়া, তাতেও আগুন ধরল।
নেভাও! নেভাও! চিৎকার করে বলল ডায়না।
ফায়ার এক্সটিংগুইশার কোথায়! মুসা জিজ্ঞেস করল।
আমি জানি না…
এর বেশি আর শোনার অপেক্ষা করল না কিশোর-মুসা। যেভাবে শুকিয়ে রয়েছে কাঠ, দাউ দাউ করে জ্বলে উঠতে দেরি হবে না। একটানে রবিনকে নিয়ে দরজার দিকে এগোল কিশোর। বেরোনোর আগে ডক্টরের হাত চেপে ধরল। দুজনকেই টানতে টানতে নিয়ে বেরিয়ে গেল।
মুসাও দাঁড়িয়ে নেই। ডিনকে তুলে নিয়ে দৌড় দিয়েছে।
ডায়নাকে কিছু বলতে হলো না। সে নিজে নিজেই ছুটে বেরোল দরজা দিয়ে।
যত দ্রুত সম্ভব সিঁড়ি দিয়ে নামল ওরা। সদর দরজা দিয়ে ছুটে বেরোল কামানের গোলার মত সবাই, শুধু মুসা বাদে। ডিনকে বয়ে নিতে হচ্ছে তাকে।
বাইরে বেরিয়ে দেখল পুলিসের একটা গাড়ি এসে গেমেছে। দুজন পুলিস নেমে দৌড়ে এল প্রাসাদের দিকে।
বেরিয়েছে! চেঁচিয়ে বলল একজন।
কিশোরকে গালাগাল করতে করতে হাত ছাড়ানোর চেষ্টা করছেন নরিয়েমা।
ছাড়ল না কিশোর। টানতে টানতে তাকে নিয়ে এগোল পুলিসের গাড়ির দিকে। দুজন পুলিসের একজন ওদের চেনা, পল নিউম্যান। উত্তেজিত কণ্ঠে তাকে জানাল কিশোর, তিনতলায় আগুন লেগেছে!।
দেখেছি, জবাব দিল পল। ফোন করে দিয়েছি দমকলকে। ভুরু কোঁচকাল সে। গুলির শব্দ শুনলাম মনে হলো?
দেখুন অফিসার, অভিযোগ শুরু করলেন ডক্টর, এই গুণ্ডাটা আমাকে…
কিশোর, ওভাবে টানাহেঁচড়া করছ কেন মহিলাকে? মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি তোমার? ছাড়ো, ছাড়ো…
মিস্টার নিউম্যান, কিশোর বলল, গুলি যেটা শুনেছেন, এই মহিলাই ছুঁড়েছে। আমাকে মারার জন্যে।
সন্দেহ মেশানো বিস্ময় দেখা দিল পলের চোখে। একবার মুসার দিকে একবার কিশোরের দিকে তাকাতে লাগল। এই মহিলা!

হ্যাঁ। মুসা জবাব দিল। তা আপনি এলেন কি করে এখানে?
পাতলা পলিথিনের ব্যাগে করে সিলভার-প্লেটেড একটা রিভলভার নিয়ে এসেছে পল। সেটা দেখিয়ে বলল, ক্লিফসাইড কান্ট্রি ক্লাবে বনের ভেতর পাওয়া গিয়েছিল এটা, তোমাদের মনে আছে নিশ্চয়। আমাদের ব্যালিস্টিক এক্সপার্ট পরীক্ষা করে বলেছে, এটা মিস্টার মরগানের জিনিস। সেজন্যেই আমরা এসেছি, মিস মরগানকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে।
হ্যাঁ, এটা এখন ডায়নারই! চেঁচিয়ে উঠলেন নরিয়েমা। অ্যারেস্ট করুন ওকে, অ্যারেস্ট করুন!
হুমম, বুঝলাম, মাথা দোলাল পল। আনমনে বিড়বিড় করল, পুরানো অভিশাপ... একজন বৃদ্ধা মহিলা, তরুণকে গুলি...এবং একটা মেয়ে, যাকে তার নিজের রিভলভার দিয়েই গুলি করা হয়েছে..তারমানে...
...ব্যাপার আছে, ফস করে বসল মুসা।
চোখ স্থির হলো পলের। হ্যাঁ, ব্যাপার আছে। লম্বা কোন গল্প। খপ করে হাত চেপে ধরল ডায়না আর নরিয়েমার। আপনাদেরকে থানায় যেতে হবে। সারারাতই থাকতে হতে পারে ওখানে।
পলের কথায় বিশেষ কান নেই ডায়নার। আতঙ্কিত চোখে তাকিয়ে রয়েছে তিনতলার দিকে। ঘন ধোঁয়া উড়ছে এখন ওখান থেকে। আমি যাব না...যেতে পারব না...! প্রায় ফিসফিসায় বলল সে।
ওর বাড়ি পুড়ছে তো, বুঝতে পেরে বলল দ্বিতীয় অফিসার। দাঁড়াও খানিকক্ষণ। দমকল আসুক। দেখেই যাই, কি হয়।
দমকল! বিরক্ত ভঙ্গিতে নাক কুঁচকালেন নরিয়েমা। ওদের বুদ্ধি তোমাদের মত হলে আর দেখতে হবে না! সারারাতই দাঁড়িয়ে থাকতে হবে এখানে।
হাতকড়া বের করল পল। দেখে বুকের ওপর আড়াআড়ি হাত নিয়ে গেলেন ডক্টর।
কমলা আগুন নাচানাচি শুরু করেছে প্রাসাদের ছাতে।
পাহাড়ের গোড়া থেকে ভেসে এল সাইরেনের শব্দ।
কিশোরের পেছনে ফোঁসফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলছে রবিন। কিশোর তাকাতে বলল, না, কিছু না। শক পেয়েছি তো, সামলাতে সময় লাগছে।
তা লাগবেই। রবিনের হাত ধরে কিশোর বলল, অনেক ধন্যবাদ তোমাকে। তোমার জন্যেই এখনও বেঁচে রয়েছি আমি।
প্রাসাদের ছাতে আগুন বাড়ছে। বিষণ্ন চোখে সেদিকে তাকিয়ে রয়েছে ডায়না। কারও দিকেই নজর নেই তার।
*

জ্যাকেটের বোম এঁটে পিকআপের জানালা খুলে দিল মুসা। তাহলে কি জিনিস তোমার পছন্দ?।
দেখো, মুসা, কিশোর বলল তীক্ষ্ণ কণ্ঠে, আর যা-ই হোক, এই হ্যালোইন ক্যান্ডি অন্তত নয়। ওগুলো বাচ্চাদের খাবার। কতবার বলেছি, তোমার ইচ্ছে হলে খাও যত খুশি, আমাকে সাধাসাধি কোরো না। আমার ভাল্লাগে না।
ভাল, খুব ভাল। স্টিয়ারিং ঘোরাল মুসা। অক্টোবরের চমৎকার বাতাস। মলের দিকে চলেছে ওরা। তোমাকে অন্য কিছুই কিনে দেয়া হবে। রবিন, তুমি?
আমার ক্যান্ডি খেতে আপত্তি নেই, হেসে বলল রবিন। কিশোরের মত তো আর ওজন বাড়ার আতঙ্ক নেই আমার।
পার্কিং লটে এসে গাড়ি রাখল মুসা। তিনজনেই নামল। এলিভেটরে উঠল শুধু ওরাই, আর কেউ নেই। চারতলায় এসে আস্তে করে থামল কোন ঝাঁকুনি ছাড়া।
খবরদার, মুসা! চেঁচিয়ে বলল কিশোর। দরজা খুলতেই এলিভেটরের অন্য পাশে দেয়ালের সঙ্গে সেঁটে গেছে সে। লাফিয়ে সরে এল মুসাও।
খাটো, টাকমাথা একজন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে হাতে মেশিনগান নিয়ে। মুখে মুখোশ। চুপ! ধমক দিয়ে বলল কিচকিচে কণ্ঠ, একদম নড়বে না!
এই, কি করছ? লোকটার পেছন থেকে বলল এক মহিলা। ঠেলে লোকটাকে এলিভেটরে ঢোকানোর চেষ্টা করল। ওদের ভয় দেখাচ্ছ কেন? বাজার করতে এসেছে বেচারারা। দাঁড়াও, আজ বাড়ি গিয়ে নিই। পাগলামি তোমার ছাড়াব ভালমত। খেলনা কেনার শখ বের করব!
এলিভেটর থেকে বেরিয়ে এসে হাসল তিন গোয়েন্দা।
চিড়িয়া একেকটা, হেসে বলল মুসা। পাগল যে কত আছে এদেশে। বাচ্চাদের মত ছিনতাইকারী সাজার শখ হয়েছে।
হ্যাঁ। আরেকটা জুভেনার।
যা-ই বলো, কিশোর, ওটা অনেক বেশি বড় পাগল। মিউজিয়ামের জিনিস ফেরত নেয়ার জন্যে কি কাণ্ডটাই না করল। যেন ওর নিজের জিনিস। ফিরিয়ে নিয়ে তারপর ছাড়ল।
ছাড়ল আর কই? মূর্তিটার জন্যেও কেস করে দিয়েছে ডায়নার বিরুদ্ধে। টাকা আদায় করে তবে ছাড়বে।
মেয়েটার জন্যে খারাপই লাগে। শেষ পর্যন্ত বাপদাদার বসতবাড়িটাও বিক্রি করতে হবে। ভাগ্যিস আগুনটা নেভাতে পেরেছিল দমকল বাহিনী। নইলে বিক্রির জন্যে ওটাও থাকত না।
কোনও চাকরি-টাকরি এখন পেলে হয়।

পাবে। পেয়ে যাবে। পত্রিকায় অনেক বিজ্ঞাপন হয়েছে তো। টিভিতেও চান্স পেয়ে যেতে পারে। অনেক দিন দেখা নেই, ভাবছি দেখা করব…।
ইলেকট্রনিক্সের একটা দোকানের পাশ দিয়ে চলেছে ওরা, তীক্ষ্ণ চিৎকারে থেমে গেল। দোকানের ভেতর টিভি চলছে, চিৎকারটা এসেছে ওটার ভেতর থেকেই। পর্দায় দেখা গেল, পাগলের মত মাথার চুল ছিঁড়ছে আর চেঁচামেচি করছে এটা মেয়ে।
খাইছে। বলতে না বলতেই হাজির! অবাক হয়ে বলল মুসা। চিনেছ? আমাদের ডায়না মরগান! সত্যি সত্যি অভিনয় শুরু করে দিয়েছে টিভিতে!
ঘরময় ছোটাছুটি করছে ডায়না। চেঁচাচ্ছে, কাপ-প্লেট ছুঁড়ছে, চেয়ার উল্টে ফেলছে। হাতের কাছে একটা ফুলদানী পেয়ে সেটা নিয়ে তেড়ে গেল কাঁচুমাচু হয়ে থাকা খানসামার দিকে।
একেবারে নিজের জীবনের ঘটনা, কিশোর বলল। সেজন্যেই এত জীবন্ত।
যা-ই বলো, ট্যালেন্ট আছে মেয়েটা। নাম করে ফেলবে।
খানসামাটি কে, চিনতে পেরেছ ভুরু নাচাল রবিন।
আরে তাই তো, বার্ব এনুডা!
দুজনের অভিনয় দেখতে দেখতে হাসি ফুটল মুসার মুখে। ঠিকই হয়েছে। যেখানে যাওয়ার কথা ওদের, ঠিক সেখানেই গেছে।
এক পর্যায়ে হাসি আর চেপে রাখতে পারল না কিশোর। হো হো করে হেসে উঠল। চমৎকার হাসির অভিনয় করছে ডায়না আর এনুডা। হাসল মুসাও। তারপর হঠাই যেন সংবিৎ ফিরল। আরে, দাঁড়িয়ে আছি কেন এখনও! চলো! চলো!
একটা দোকানের দিকে ছুটল সে। হালউইন ক্যাভি কেনার জন্যে।

ভলিউম ৫৪ – গরমের ছুটি – তিন গোয়েন্দা – রকিব হাসান – সেবা প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৪

বিশাল এক জঙ্গলের মধ্যে বাড়িটা। জমিদার বাড়ি। কুমিল্লা থেকে এসে ময়নামতি ছাড়িয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া যাওয়ার মহাসড়ক ধরে কয়েক মাইল এগোলে পথের বাঁ পাশে পড়বে বিশাল এক বটগাছ। সেটার কাছে নেমে একটা ইট বসানো সরু রাস্তা ধরে আরও কিছুদূর গেলে সেই জঙ্গল, হীরামতির বাগ, অর্থাৎ বাগিচা। গরমের এই ছুটিতে সেটাই আমাদের গন্তব্য। হ্যাঁ, আমি রবিন বলছি। আবার এসেছি বাংলাদেশে বেড়াতে, আমরা তিন বন্ধু-আমি, কিশোর পাশা, এবং মুসা আমান।

অন্যান্যবারের মত এবারেও কিশোরের মামা রিটায়ার্ড ডিআইজি আরিফ চৌধুরী সাহেবের ঢাকার বাসাতেই উঠেছিলাম আমরা। একটা দিন ওখানে কাটিয়ে পরদিনই রওনা হলাম কুমিল্লার উদ্দেশে। গন্তব্য হীরামতির বাগ। নামটা শুনলে কেমন লাগে, তাই না? মনে হয়, প্রচুর হীরা-মতি পাওয়া যায় বুঝি ওই জঙ্গলে। আসলে তা নয়, হীরা আর মতি নামে দুই ভাইবোন ছিল, জমিদারের সন্তান। বিশাল এক দীঘি কাটিয়েছিলেন জমিদার আইন উদ্দিন সরকার, সেই দীঘিতে ডুবে মারা গিয়েছিল ছেলেমেয়ে দুটি। তখন থেকেই সেই দীঘির নাম হয়ে গেল হীরামতির দীঘি। কালক্রমে দীঘির চারপাশের বাগান সংস্কারের অভাবে জঙ্গল হয়ে গেল, দীঘির নামেই নাম হয়ে গেল সেই জঙ্গলেরও।

এই কাহিনী শুনেছি আমরা কিশোরের চাচা রাশেদ পাশার মুখে। তিনিই আমাদের এখানে আসতে অনুরোধ করেছেন। জঙ্গলের মধ্যে যে পূরানো জমিদার বাড়ি আছে, তার মালিক এখন রেহান উদ্দিন সরকার, রাশেদ পাশার দূর সম্পর্কের ফুফা। আইন উদ্দিন সরকারের শেষ বংশধর। আমেরিকায় বসেই শুনেছেন রাশেদ পাশা, তার ফুফুর খুবই দুরবস্থা চলছে এখন। তাই আমাদেরকে এখানে এসে নিজের চোখে সব দেখে খোঁজখবর করে যেতে বলেছেন রাশেদ আংকেল। সম্ভব হলে তখন সাহায্য করবেন।

ঢাকা থেকে কুমিল্লার বাসে চড়েছি আমরা। ময়নামতিতে নেমে স্কুটার নিয়েছি।

বটগাছের গোড়ায় কয়েকটা ছোট ছোট দোকান-মুদি, চা-পান-বিড়ি, এ সবের। ওগুলোর কাছে এসে ড্রাইভারকে থামতে বলল কিশোর। এগিয়ে এল কয়েকজন নোক, কৌতূহলী হয়ে দেখতে লাগল আমাদের। জমিদার বাড়িটা কোনদিকে জিজ্ঞেস করতে সবাই হাত তুলে দেখিয়ে দিল ইট বিছানো রাস্তাটা।

সেই পথ ধরে এগোল আমাদের স্কুটার। অনেক পুরানো রাস্তা, জমিদারী আমলে সরকারদের কোনও একজন তৈরি করেছিলেন নিজের খরচে। এখন অনেক

জায়গারই ইট নেই, ক্ষতের মত হয়ে আছে, জায়গায় জায়গায় গর্ত। মেরামত হয় না কত বছর কে জানে।
বেশ গরম পড়েছে। ঘেমে যাচ্ছি। পথের দুপাশে মাইলের পর মাইল কেবল খেত আর খেত। তরমুজ-বাঙ্গী ফলে আছে। এলোমেলো মাতাল হাওয়ায় ধুলোর। ঘূর্ণি উড়ছে। চাষীদের বাড়িঘর চোখে পড়ে কচি-কদাচিৎ। ওরা এই ভোলা মাঠে বাস করে না, থাকে দূরে, খেতের সীমানায় ওই যে ওই গ্রাম চোখে পড়ছে, সেখানে।
অবশেষে দেখতে পেলাম জঙ্গলটা। তিন পাশ ঘিরে খেত, একধারে নদী। কিছুদূর খোলা জায়গা ধরে এগিয়ে বনের মধ্যে ঢুকে পড়ল পথটা। ঘন গাছপালার ভেতর দিয়ে কয়েকশো গজ এগোতে দেখতে পেলাম জমিদার বাড়ির চৌহদ্দি। জঙ্গলটা আগে জঙ্গল ছিল না, বাড়ির আশপাশে বিশাল সব বাগান ছিল, আস্তে আস্তে সেই বাগান জঙ্গলে পরিণত হয়েছে। বিরাট সিংহদরজার প্রায় কিছুই অবশিষ্ট নেই আর এখন, কেবল দু-পাশের দুটো স্তম্ভ বাদে। একটা স্তম্ভের গোড়ায় একপাশে এখনও থাবা উঁচিয়ে বসে আছে শ্বেতপাথরের এক মস্ত সিংহ।
খোয়াবিছানো লম্বা গাড়িপথ পার হয়ে বিশাল এক প্রাসাদের সামনের গাড়িবারান্দায় এসে দাঁড়াল স্কুটার। রোদে ঝকঝক করছে ছড়ানো উঠান। সেখানে দানা খুঁটছিল একঝাঁক পায়রা আর ঘুঘু। স্কুটারের শব্দে ডানা ঝাঁপটে উড়ে গেল একসঙ্গে। কয়েকটা পায়রা গিয়ে বসল বাড়ির কার্নিসে, বাকবাকুম জুড়ে দিল।
খাইছে! হাঁ করে তাকিয়ে আছে মুসা, কি সুন্দর জায়গা!
স্কুটার থেকে নেমে আমিও হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলাম। সত্যিই অসাধারণ! জঙ্গলের মাঝে এমন একটা বাড়ি থাকতে পারে, না দেখলে ভাবাই যায় না। অনেক পুরানো বাড়ি। সংস্কারের অভাবে এখানে ওখানে বেরিয়ে পড়েছে লাল ইট, জানালার শাসিগুলো অপরিষ্কার, আনাচে কানাচে লতাগুল্ম আর শ্যাওলার রাজত্ব। পলকে একটা দিবাস্বপ্ন দেখে ফেললাম-এককালে আমাদেরই মত কত কিশোরের আনাগোনা ছিল এখানে, খেলে বেড়াত তারা, হই-চই করত, আজ একেবারে নীরব।
ওই যে, দাদী। বলে উঠল কিশোর।
উঁচু বারান্দার ওপরের বড় দরজাটা খুলে গেছে, সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন বৃদ্ধা। বয়েস ষাটের বেশি, কিন্তু এখনও মনে হয় চল্লিশের কোঠায়। অপরূপ সুন্দরী ছিলেন এককালে, বোঝা যায়। হবেনই, অত সুন্দরী না হলে কি আর জমিদার বাড়িতে বিয়ে হয়।
আমাদের আসার খবর চিঠিতে আগেই জানিয়েছেন রাশেদ আংকেল। সুতরাং আমাদের পরিচয় দিতে হলো না তাকে। হাসিমুখে সাবলীল ভঙ্গিতে সিঁড়ি বেয়ে

নেমে আসতে লাগলেন আমাদের দিকে। শুধু বললেন, এসেছিস। তোদের অপেক্ষাই করছি।
কোন রকম দ্বিধা নেই, জড়তা নেই, প্রথমেই আমাকে জড়িয়ে ধরে গালে চুমু খেয়ে আদর করলেন। আমি যে বিদেশী, অন্য ধর্মের মানুষ, বাঙালী মুসলিম পরিবারের মেয়ে হয়েও তার পরোয়াই করলেন না তিনি। মুহর্তে পছন্দ করে। ফেললাম তাকে, মনে হলো তিনি আমার নিজের দাদী। তারপর মুসাকে চুমু খেলেন তিনি, আমার পেছনেই ছিল সে। সবশেষে কিশোরকে, স্কুটারের ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে উঠে আসতে দেরি করে ফেলেছিল সে।
আয়, ঘরে আয়, ডাকলেন দাদী। আমি জানি, তাঁর ডাকনাম হীরা, অবশ্যই রাশেদ আংকেলের কাছে জেনেছি। এই নামটার জন্যেই আইন উদ্দিন সরকারের বাবা কনেকে বেশি পছন্দ করেছেন, কারণ তাঁর ছেলের ডাকনামও তিনি রেখেছিলেন মতি। সুযোগ পাওয়ামাত্র মিলিয়ে দিলেন হীরামতিকে। হীরামতির বাগ নামটাকে সার্থক করার জন্যেই যেন।
উঠানের কোণ থেকে উঠে বার দুই ঘাউ! ঘাউ! করে হাঁক ছেড়ে এগিয়ে এল একটা নেড়ি কুকুর। নেড়ি হলেও স্বাস্থ্য বেশ ভাল, খাবারের অভাব হয় না।
ও আমাদের কালু, হেসে পরিচয় করিয়ে দিলেন দাদী। আদর করে একবার ডাকলেই হয়, ভাব হয়ে যাবে।
সবার আগে মুসার সঙ্গে ভাব করে নিল কুকুরটা। আমাদেরও অবজ্ঞা করল না।
দোতলায় আমাদের থাকার ঘর গুছিয়ে রেখেছেন দাদী। দেখিয়ে দিলেন। বললেন, হাতমুখ ধুয়ে আয়, আমি নাস্তা দিচ্ছি।
ঘরটা দেখার মত। দেয়াল, ছাত, কড়ি-বরগাগুলো মোটেও মসৃণ নয়, দমকা বাতাসে পুকুরের শান্ত পানিতে যেমন কুচি কুচি ঢেউ ওঠে অনেকটা তেমনি, তার ওপর বিচিত্র অলঙ্করণ। অনেক বড় বড় জানালা। বাইরে বাগান। প্রজাপতি, ফড়িঙ আর পাখির ভিড় সেখানে। আমার মনে হতে লাগল আমি বাস্তবে নেই, পরীর রাজ্যে এসে পড়েছি।
মুখহাত ধুয়ে, কাপড় পাল্টে ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে নিচতলায় নেমে এলাম মস্ত হলঘরে। বাবুর্চিখানা, চাকরদের ঘর, খাবার ঘর আর রান্নাঘরে ঢোকা যায় সে ঘর থেকে। রান্নাঘর থেকে আরেকটা ছোট ঘরে চলে যাওয়া যায় উল্টোদিকের একটা দরজা দিয়ে, পরে জেনেছি। ওই ঘরটা কোন কাজে লাগে না, তবে অনেকটা সিঁড়িঘর হিসেবেই ব্যবহার হয়। মেঝেতে একটা লোহার শিকের জালিকাটা ঢাকনা, তার নিচে কয়লার ঘর। এককালে রান্নাঘরের চুলায় কয়লা ব্যবহার হত, এখন গ্যাস আসায় বাতিল হয়ে গেছে ওসব চুলা। কয়লা জমিয়ে রাখারও আর প্রয়োজন হয় না। রান্নাঘর দিয়ে ছাড়াও ওই সিঁড়িঘরে ঢোকার আরও একটা পথ

আছে, আমাদের শোবার ঘর থেকে। একটা আলমারি আছে দেয়াল ঘেঁষে, প্রথম দেখে তাই মনে হয়েছিল। পরে দেখে অবাক হয়েছি, ওটা আলমারি নয়, একটা গোপন দরজা, অন্য পাশে সরু একটা অন্ধকার সিঁড়ি নেমে গেছে। দেখে খুব রোমাঞ্চিত হয়েছিলাম। যাই হোক, সে-সব কথায় পরে আসছি।
হলঘরের দেয়ালে ঝোলানো বিরাট বিরাট ছবি, বেশির ভাগই হাতে আঁকা, ফ্রেমে বাঁধানো। সরকার পরিবারের পূর্বপুরুষদের ছবি। আধুনিক ছবি অর্থাৎ ফটোগ্রাফ আছে একটাই, হীরাদাদু আর মতিদাদার যুগল ছবি, দু-জনেই বিয়ের সাজে সজ্জিত, বর আর কনে। অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম ছবিটা। খুব সুন্দর।
খাবার ঘরে খেতে বসে কিশোর জানতে চাইল মতিদাদা কোথায়।
দাদী জানালেন, আক্কেল আলীকে নিয়ে শহরে গেছেন কাজে। জানা গেল, আক্কেল আলী এ বাড়ির একমাত্র কাজের লোক। টাকার অভাবে একজনের বেশি নোক রাখার ক্ষমতা নেই আর এখন রেহান উদ্দিনের। অথচ দাদুর যখন বিয়ে হয়, প্রথম আসেন এ বাড়িতে, তখনও অনেক চাকর-বাকর ছিল। আর তার আগে তো কথাই নেই, গিজগিজ করত নাকি মানুষে।
সন্ধ্যার মুখে শহর থেকে ফিরলেন দাদা। পুরানো, ঝরঝরে একটা মোটরগাড়িতে করে। আমরা তখন বাগানে। ছবির মানুষটারই মত আছেন এখনও, কেবল চুলগুলো সব সাদা হয়ে গেছে, এবং চোখের কোণে আর গলার নিচে ভাজ।
গাড়ি থেকে নেমেই আমাদের দেখলেন। ঋজু ভঙ্গিতে এগিয়ে এলেন আমাদের দিকে। এসে গেছ তাহলে। ভেরি গুড।
বিশাল থাবা দিয়ে চেপে ধরলেন আমার হাতটা। ঝাঁকিয়ে দিলেন আন্তরিক ভঙ্গিতে।

.

পরের দু-তিনটে দিন কালুকে নিয়ে দারুণ কাটল আমাদের। ফলগাছের অভাব নেই বাড়িটাতে। আম, জাম, লিচু, কাঁঠাল তো আছেই, আরও নানা রকম ফলের ছড়াছড়ি। বনের মধ্যে ঘুরে বেড়াই আমরা, ফল খেয়ে পেট ভরে থাকে, ভাত খাওয়ার আর জায়গা থাকে না। আমেরিকা থেকে এসে আমরা ভাত খাই শুনে নিশ্চয় অবাক লাগছে তোমাদের। কিন্তু সত্যি বলছি, এখানে এসে রুটির চেয়ে ভাতই বেশি প্রিয় হয়ে উঠেছে আমার। বোধহয় আবহাওয়াটা এমন যে এই খাবারই ভাল লাগে।
কালু ছাড়াও আরও একটা প্রাণী আছে এ বাড়িতে, অনেক বড় একটা কালো হুলো বেড়াল, টিক্কা খান। নামটা আক্কেল আলীর দেয়া। বেড়ালটার বড় বড় গোফ দেখলেই নাকি পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর নেতা জেনারেল টিক্কা খানের কথা

মনে পড়ে যায় তার। বেড়ালটাকে পাখিরাও পছন্দ করে না, সে উঠানে নামলেই চমকে যায় পায়রা আর ঘুঘুর দল, নিমেষে ডানা ঝাঁপটে উড়ে পালায়।
আক্কেল আলী নিজেও একটা চরিত্র বটে। সেই ছেলেবেলায় সাত-আট বছর বয়েসে সে ঢুকেছে এ বাড়িতে, তারপর আর যায়নি। সবাই চলে গেছে একে একে, সে রয়ে গেছে। এখন চাকর-মালী থেকে শুরু করে মতিদাদার শোফারের কাজ, সব সে একা করে। হালকা-পাতলা খাটো শরীর, কুচকুচে কালো গায়ের রঙ, বসে যাওয়া চোয়াল দেখে বোঝার উপায় নেই তার আসল বয়েস কত।
মাত্র কয়েকটা দিনেই বাড়িটার প্রতি ভীষণ মায়া পড়ে গেছে আমার। মনে হতে থাকে, সহজেই সারা জীবন কাটিয়ে দিতে পারি এখানে।
তিন দিনের দিন সকালে সামনের বাগানে আমগাছের ছায়ায় বসে আছি, এই সময় গাড়ির শব্দ কানে এল। গাড়িপথে ঢুকল একটা চকচকে গাড়ি। গাড়ি বারান্দায় থামিয়ে নেমে গিয়ে পেছনের দরজা খুলে দিল শোফার। নামলেন বেশ সভ্রান্ত পোশাক পরা একজন বয়স্ক ভদ্রলোক। বয়েস মতিদাদার সমানই প্রায় হবে। ছুটে গিয়ে হলঘরের দরজা খুলে দিল আক্কেল আলী। দুজনকে নিয়ে ভেতরে চলে গেল।
আয়েসী ভঙ্গিতে গাছের গোড়ায় বসে ছুরি দিয়ে কেটে আম খেতে খেতে গল্প করতে লাগলাম আমরা। দারুণ টেস্ট, আমের মত এত স্বাদ পৃথিবীর আর কম ফলেরই আছে। গাড়ির শব্দে উড়ে গিয়েছিল, একটা দুটো করে আবার উঠানে নেমেছে আট-দশটা ঘুঘু আর পায়রা।
ঘণ্টাখানেক পর চলে গেল মেহমানরা। তাঁদের সঙ্গে গেলেন মতিদাদা। আরেকটু পরে দাদীকে দেখলাম পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে দীঘির শান বাধানো ঘাটে বসলেন। ওটাই হীরামতির দীঘি। পাথরে তৈরি সোফার মত আসনে বসে তাকিয়ে রইলেন পানির দিকে, সাদা শাপলাগুলো যেদিকে ফুটেছে সেদিকে মুখ। চুপচাপ বসে রইলেন তিনি।
আমের রসে হাত ভরে গেছে। ধোয়ার জন্যে চললাম দীঘির দিকে। ঘাটের কাছে এসেই থমকে দাঁড়ালাম। এ-কি! দাদী কাঁদছেন! গাল বেয়ে নেমেছে পানির ধারা। কি হয়েছে তার?
আমার সাড়া পেয়েই তাড়াতাড়ি শাড়ির আঁচলে চোখ মুছে ফিরে তাকালেন। জোর করে হেসে বললেন, ও, রবিন! কি রে, খুব গরম?
না, হাত ধুতে এসেছি। দাদী, তুমি কাঁদছ কেন?
কই? চোখে কি যেন পড়ল…
মিথ্যে কথা বোলো না। আমি তোমাকে স্পষ্ট কাঁদতে দেখলাম।

দ্বিধা করলেন একবার দাদী। তারপর হাত দিয়ে তার পাশের জায়গাটা চাপড়ে দিয়ে বললেন, আয়, বোস।
বসলাম তার পাশে।
একটু আগে লোকটা এল না, গাড়িতে করে, দেখেছিস নিশ্চয়?
তিনি তোমাকে কিছু বলেছেন?
না, বলেনি, তবে কাদিয়েছে। ও এই বাড়ি কিনতে চায়। আমাকে আর তোর দাদাকে চিরকালের জন্যে চলে যেতে হবে এখান থেকে। ভাবলেই বুক ফেটে যায় আমার!
কেন দাদী, চলে যেতে হবে কেন? এতটাই অভাবে পড়ে গেছ তোমরা?
বসে খেলে রাজার ভাণ্ডারও ফুরায়, রবিন। জমিদারের ছেলে কাজকর্ম তো কিছু শেখেনি, টাকার দরকার হলেই জমি বেচেছে। এ বাড়ির আশেপাশে যত জমি আছে সব এককালে সরকারদের ছিল। শত শত একর। আজ আর এক বিঘেও অবশিষ্ট নেই, শুধু এই বাড়িটা বাদে। দুর্ভাগ্যের সূচনা সেদিন থেকেই, যেদিন সরকারদের সৌভাগ্য হারিয়ে গেল!
সরকারদের সৌভাগ্য মানে! পেছন থেকে বলে উঠল কিলোর। আমাদেরকে একান্তে কথা বলতে দেখে কৌতূহলী হয়ে সে আর মুসাও চলে এসেছে।
আয়, বোস, দু-জনকে বসতে বললেন দাদী।
দীঘির পানিতে ডোবাডুবি করছে দুটো পানকৌড়ি। সেদিক তাকিয়ে আছে মুসা। শিকারীর দৃষ্টি। একটা বন্দুক হাতে পেলেই এখন গুলি করে বসত।
তার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে দাদীকে জিজ্ঞেস করলাম, কোনও জিনিসের কথা বলছ?।
হ্যাঁ, অনেক দামী কিছু জিনিস, আমাদের আগ্রহ দেখে মুচকি হাসলেন দাদী। প্রায় দুশো বছর আগে, ইংরেজ আমলে এ বাড়ির প্রতিষ্ঠাতা আইন উদ্দিন। সরকারকে ওগুলো উপহার দিয়েছিলেন আগরতলার এক মহারাজা।
কি কি জিনিস ছিল? আগ্রহে বকের মত গলা বাড়িয়ে দিয়েছে কিশোর।
মুক্তার হার, হীরার জড়োয়া সেট, চুণি-পান্না বসানো সোনার একটা পানপাত্র, আর আরও নানা রকম জিনিস।
কিন্তু হারাল কি করে ওগুলো?
দেশ বিভাগের সময় হিন্দু-মুসলমানে যখন দাঙ্গা লাগল, এই এলাকায় তখন হিন্দুদের আধিপত্য। সেই সময় হঠাৎ করে মারা গেলেন তোর মতিদাদার দাদা আমিন উদ্দিন সরকার। সেই থেকে গায়েব হয়েছে জিনিসগুলো।
কি করে মারা গেলেন?

সেটাও এক রহস্য। একদিন দীঘির ওই পাড়ের ঘাটলার কাছে তাকে মরে পড়ে থাকতে দেখা গেল। অভিশপ্ত এই দীঘি। কত মানুষকে যে নিল!
খুন করেনি তো?
কেউ কেউ সে রকম সন্দেহ করেছে। তাদের ধারণা ছিল, জিনিসগুলোর লোভে খুন করা হয়েছিল মানুষটাকে! যাই হোক, ওগুলো আর পাওয়া গেল না। তাকে খুন করে হয়তো জিনিসগুলো নিয়ে গিয়েছিল কেউ। কিংবা সেই লোকের হাতে পড়ার আগেই তিনি কোথাও লুকিয়ে ফেলেছিলেন ওগুলো। আর তা করে থাকলে এখন এ বাড়িরই কোনখানে আছে। কারণ দাঙ্গা শুরুর পর আর একটি দিনের জন্যেও বাড়ির সীমানার বাইরে যাননি আমিন উদ্দিন সরকার।
এ বাড়িতেই আছে বলছ? আনমনে বলল কিশোর, নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটা শুরু হয়ে গেছে তার। কি ভাবছে সে, পরিষ্কার বুঝতে পারছি আমি।
থাকতেও পারে। তবে আমার বিশ্বাস, নেই।
নেই মনে হওয়ার কারণ? জানতে চাইল কিশোর।
কারণ ওগুলোকে সরকারদের সৌভাগ্য নাম দিয়েছিলেন আইন উদ্দিন সরকার। যতদিন ছিল, রমরমা অবস্থা ছিল সরকারদের, যেই গেল, অমনি শুরু হলো পতন।
এ সব কুসংস্কার। জমিদারী বিলুপ্তির পর টাকা রোজগারের অন্য কোন উপায় করেনি বলেই আসলে ফকির হয়েছে ওরা।
একেবারে ভুল বলিসনি কথাটা। অকর্মা বলেই তো এখন শেষ সম্বল বাড়িটাও বিক্রি করতে হচ্ছে। দাদীর কণ্ঠে ক্ষোভ।
বাড়ি বিক্রি মানে? কিশোর শোনেনি খবরটা।
তাকে আর মুসাকে আবার সব খুলে বললেন দাদী। এখান থেকে চিরতরে চলে যাওয়ার কথা বলতে গিয়ে আবার গলা ধরে এল তার।
খানিকক্ষণ চুপ থেকে ঘনঘন কয়েকবার নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। তারপর মুখ তুলল, বাড়িটা বাঁচানোর এখন একটাই উপায়, একসঙ্গে অনেকগুলো টাকা পেয়ে যাওয়া।
মলিন হাসি হাসলেন দাদী। একটা কানাকড়িও নেই আর তোর দাদার কাছে। অনেক টাকা কোথায় পাবেন?
আছে, উপায় আছে। গুপ্তধনগুলো খুঁজে বের করতে পারলেই আর টাকার অভাব হবে না তোমাদের।
সে আশার গুড়ে বালি। অনেকেই খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়েছে, পায়নি। তার মানে নেই এখানে। আমিন উদ্দিন সরকারকে খুন করে কেউ নিয়ে গেছে ওগুলো। কে

নিয়েছে, তা-ও জানি। তার এক মুন্সী ছিল। তিনি যেদিন মারা গেলেন, সেদিন থেকেই ওই লোকটাও নিখোঁজ হলো। আর তাকে দেখা যায়নি।
হুঁ! সহজে নিরাশ হতে জানে না কিশোর পাশা। তবু, একবার যখন গুপ্তধনের গন্ধ পেয়েছি, সহজে হাল ছাড়ছি না আমি। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, দাদী, এ বাড়িতে থাকলে আমরা ওগুলো খুঁজে বের করবই!

.

সেইদিন থেকেই গুপ্তধন খোঁজায় লেগে গেলাম আমরা। কিন্তু কিশোর পাশাও বেকায়দায় পড়ে গেল। কোন সূত্রই নেই হাতে, কিসের সাহায্যে খুজবে? তেমন কোন সূত্রই দিতে পারলেন না দাদী। আক্কেল আলীকে জেরা করেও কিছু জানা গেল না। প্রায় পয়তিরিশ বছর ধরে আছে এ বাড়িতে, অনেক ইতিহাস জানে এখানকার, কিন্তু গুপ্তধন উদ্ধারের ব্যাপারে সে-ও কোন সাহায্য করতে পারল না।
পরদিন সকালে উঠে নাস্তা খেয়ে আবার বাড়ির মধ্যে ঘুরে বেড়াতে শুরু করল কিশোর। গোপন দরজা কিংবা গোপন কুঠুরি আছে কিনা খুঁজছে। দাদী বললেন, একটা গোপন সিঁড়িই আছে জানি, যেটার দরজা আলমারির মত, যেটা দিয়ে তোদের ঘরে চলে যাওয়া যায়। আর কিছু নেই।
আসলেও মনে হলো নেই। কারণ অনেক খোঁজাখুঁজি করেও কিছু পেলাম না আমরা। নিরাশই হয়ে গেলাম। আমাদের অবস্থা দেখে শেষে দাদী বললেন, দেখ, বেড়াতে এসেছিস, বেড়িয়ে যা। ওসব গুপ্তধন খোঁজা বাদ দে। ওগুলো নেই এখানে। থাকলে অনেক আগেই পেয়ে যেত লোকে।
কিন্তু... তর্ক করতে গেল কিশোর।
তাকে থামিয়ে দিয়ে দাদী বললেন, ওসব কিন্তু-ফিন্তু বাদ দিয়ে বনের ভেতর থেকে ঘুরে আয়গে, যা। ভাল লাগবে। অনেক কিছু দেখার আছে। যা।
প্রায় জোর করেই আমাদেরকে ঘর থেকে ঠেলে বের করে দিলেন তিনি।
ভোর বেলা উঠেই শহরে চলে গেছেন দাদা, বোধহয় বাড়ি বিক্রির কাজেই। আমরা ঘুম থেকে উঠে দেখিনি তাঁকে। বাগানে দেখা হয়ে গেল আক্কেল আলীর সঙ্গে। গাছের গোড়ায় নিড়ানি দিচ্ছে। হেসে জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাচ্ছ?
জানালাম।
কোথায় গেলে কি দেখতে পাব, বলে দিল সে। একটা জায়গায় যেতে নিষেধ করল, বনের ভেতরে একটা মজা পুকুর। জায়গাটা নাকি ভাল না।
সঙ্গে সঙ্গে মুসা ধরল, কি ভাল না? ভূত আছে নাকি?
আবার হাসল আক্কেল আলী, তা জানি না। তবে বড় বড় সাপ আছে। এই তো, আর বছরই তো একটা বিরাট কেউটে মারলাম। জাম পাড়তে গিয়েছিলাম, দেখি গাছের গোড়া বেড় দিয়ে পড়ে আছে।

বেড় দিয়ে পড়ে থাকে! এত্তোবড়!
মুসার কথার জবাবে মাথা নাড়ল আক্কেল আলী। আরও একটা ব্যাপারে সাবধান করল আমাদের, জলার কাছে না যেতে। বেশ বড় একটা জলা আছে। তাতে নাকি পানির চেয়ে কাদা বেশি। পা পড়ে গেলে হড়াৎ করে একেবারে হাঁটু পর্যন্ত দেবে যায়।
পুকুরটা কোন দিকে আছে জেনে নিল কিশোর। সিংহ-দরজা দিয়ে বেরিয়ে সেদিকের পথই ধরল। আক্কেল আলী মানা করায় তার কৌতূহল বেড়ে গেছে।
আমাদের আগে আগে চলেছে কালু। অচেনা বনে-বাদাড়ে সঙ্গে কুকুর থাকলে অনেক সুবিধে।
বনে ঢুকে পড়লাম আমরা। ঘন হয়ে জন্মে আছে আম আর কাঁঠাল গাছ। বিরাট বিরাট কালোজামের গাছও আছে। মাঝে মাঝে বাঁশের ঝাড়। বনের মধ্যে এক ধরনের সবুজাভ আলো। গাছের মাথা দিয়ে যেন চুরি করে নেমে এসে মাটিতে পড়েছে রোদ, গোল গোল হয়ে পড়ে বনতলে সোনালি অলঙ্করণ করে দিয়েছে যেন।
প্রচুর শেয়ালের গর্ত দেখা গেল। আর আছে বেজি ও গোসাপ। প্রথম জানোয়ারটার দিকেই কালুর আগ্রহ বেশি দেখা গেল। গর্ত দেখলেই ছুটে যাচ্ছে সেদিকে, নাক নামিয়ে শুঁকছে। মাঝে মাঝে হাঁক ছাড়ছে ঘাউ ঘাউ করে, যেন বলতে চাইছে: বেরিয়ে আয় ব্যাটা শিয়ালের ছাও, হয়ে যাক একহাত! চুরি করে হাঁস-মুরগী খাওয়া তোমার আমি বের করব!
চলতে চলতে থমকে দাঁড়াল মুসা। তাকিয়ে আছে সামনের দিকে।
কিশোর জিজ্ঞেস করল, কী?
হাত তুলে দেখাল মুসা, ওই যে।
গাছের ফাঁক দিয়ে আমরাও দেখতে পেলাম পুকুরটা। কালচে-সবুজ পানি।
সুন্দর! বিড়বিড় করল কিশোর।
আমি বললাম, হ্যাঁ, খুব। শাপলা ফুটে আছে কেমন দেখছ? দারুণ!
লাল আর সাদা শাপলায় ছেয়ে আছে পুকুরটা।
তুলতে পারলে কাজ হত, বললাম। দাদীর জন্যে নিয়ে যেতে পারতাম।
হ্যাঁ, নামো, মাথা ঝাঁকিয়ে বলল মুসা, আর অমনি টুক করে সিন্দুকে টেনে নিয়ে যাক!
সিন্দুক? বুঝতে পারলাম না, সেটা আবার কি?
ও, জানো না এখনও। বাংলাদেশের অনেক পুকুরেই সিন্দুক থাকে। পুরানো দীঘি, পুরানো বড় আন্ধা পুকুর-যেগুলোর চারপাশে জংলা হয়ে থাকে, পানি কালো, সেগুলোতে বাস করে এই ভূতুড়ে সিন্দুক। বড় বড় শেকল থাকে। যেই পানিতে

নামবে, আস্তে করে এসে পায়ে পেঁচিয়ে ধরবে। তারপর একটানে একেবারে মাঝপুকুরে, পানির তলায়।
হেসে জিজ্ঞেস করলাম, নিয়ে গিয়ে কি করে?
হাত উল্টে মুসা বলল, আমি কি জানি? হয় গোলাম বানিয়ে রাখে, নয়তো ভূতুড়ে সিন্দুক বানিয়ে নিজেদের দলভারি করে। কিছু তো একটা করেই, নইলে নেয় কেন?
কিশোরের মতই আমারও ভূতপ্রেতে তেমন বিশ্বাস নেই, কিন্তু পুকুরটার দিকে তাকিয়ে মনে হলো সত্যিই থাকতে পারে ও রকম ভূতুড়ে কিছু, শাপলা পাতায় ঢাকা কালো পানি দেখলে কেমন গা ছমছম করে।
পুকুরের একটা পাড়ে ঝোঁপঝাড় একটু হালকা, বাকি তিন পাড়ে ঘন জঙ্গল হয়ে আছে। বেতবন নেমে এসেছে একেবারে পানির ওপর। বেত গাছের গোড়া বিছুটি আর লজ্জাবতী গাছে ছাওয়া। গাঢ় গোলাপী রঙের ফুল ফুটে আছে।
যে পাড় হালকা, সেই পাড়ে এসে উঁড়ালাম আমরা। লাফ দিয়ে সরে গেল একটা ব্যাঙ। ছড়ছড় করে পানির ওপর দিয়ে পিছলে চলে গেল অনেক দূর।
ব্যাঙটা যেখানে বসে ছিল সেখানে তাকাতেই একটা অদ্ভুত জিনিস দেখলাম। একটা চৌকোণা পাথর। ফুটখানেক পানির নিচে আরও একটা। কাত হয়ে আছে। শ্যাওলায় ছাওয়া। পিচ্ছিল যে হয়ে আছে বোঝার জন্যে পা রাখার দরকার নেই, দেখেই বোঝা যায়। পা দিলেই আছাড় খেয়ে পড়তে হবে পানিতে।
আশ্চর্য! ভুরু কুঁচকে পানির নিচে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলল কিশোর, এখানে সিঁড়ি বানাল কে?
সিঁড়ি নাকি? সিন্দুকের ভয় ভুলে এগিয়ে গিয়ে ঝুঁকে তাকাল মুসা।
তা ছাড়া আর কি?
তাই তো। পুকুরে তো সিঁড়ি বানায় মানুষ ঘাটলা তৈরি করলে। নেমে গোসল করার জন্যে।
কিংবা ঘাটলার সিঁড়িতে বসে আয়েশ করার জন্যে।
তাহলে কে সেই আয়েশী লোক?
নিশ্চয় সরকারদের কেউ। দেখো, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কাছাকাছি ঘরবাড়ি আছে। বাগানবাড়ি থাকলেও অবাক হব না।
এদিক ওদিক তাকাতে শুরু করল কিশোর। ঘাটের কাছ থেকে গজ পঞ্চাশেক দূরে বিশাল এক বেতের ঝাড়। সেটার দিকে চোখ আটকে গেল তার। আনমনে হাত নেড়ে আমাদের বলল, চলো তো, দেখি!
বেত গাছের সাংঘাতিক কাটা। লম্বা লম্বা লতা হয়, তাতে আঁকশির মত কাটা, ছোঁয়া লাগলেই চামড়া ছড়ে গিয়ে রক্ত বেরিয়ে যায়।

পড়ে থাকা একটা মরা ডাল খুঁজে আনল মুসা। সেটা দিয়ে কোনমতে বেত ফাঁক করে করে ভেতরে তাকাল। চোখে পড়ল একটা দেয়াল। আর কোন সন্দেহ নেই। সত্যিই একটা বাড়ি আছে এখানে।
ভেতরে কি আছে দেখতে হয়, কিশোর বলল।
এখানে গুপ্তধন আছে ভাবছ নাকি? জিজ্ঞেস করল। গরমের ছুটি
সম্ভাবনা কম। তাহলে পেয়ে যেত লোকে। তবু দেখতে চাই কি আছে।
ঢুকবে কি করে? জিজ্ঞেস করলাম। যা বেতের বেত, চোখের পলকে ছিলেছুলে দেবে।
বাড়ি গিয়ে দা এনে কাটতে হবে। চলো, আক্কেল আলীর কাছ থেকে নিয়ে আসি।
সব শুনে আক্কেল আলী বলল, তোমাদের না ওদিকে যেতে মানা করেছি, তা ও গেলে…
আরে দূর, হাত নেড়ে উড়িয়ে দিল কিশোর, গেলে কি হয়? এর চেয়ে অনেক গভীর আর বিপজ্জনক জঙ্গলে ঢুকেছি আমরা। দুটো দা দাও। ভেতরে ঢুকব।
সাপের কামড় খেয়ে মরার ইচ্ছে হয়েছে আরকি। চলো, আমিও যাব। একলা ছেড়ে দিলে মা বকবেন।
তোমার আর যাওয়ার দরকার নেই, মুসা বলল, আমরাই কাটতে পারব।
তাহলে মা-কে বলে যেতে হবে। নইলে আমিই বলে দেব। তোমাদের কিছু হলে শেষে মা আমাকে আস্ত রাখবেন না।
দাদীকে বলতে গেলে বাধা দিয়ে বসতে পারেন, এই ভয়ে আক্কেল আলীর কথার আর প্রতিবাদ করলাম না। তাকে সঙ্গে নিয়ে রওনা হতে যাব, এই সময় বারান্দায় বেরোলেন দাদী। এসেছিস তোরা? এ-কি, এখনও গোসলই করিসনি। যা যা, জলদি যা। আমার রান্না হয়ে গেছে।
মুগডাল দিয়ে রুইমাছের মাথার মুড়িঘন্ট, রুইমাছ ভাজা, চালকুমড়া ভাজি আর ডাল দিয়ে গলা পর্যন্ত গিললাম। তারপর যখন ক্ষীরের মত ঘন দুধ আর শহর থেকে কিনে আনা ফজলি আম নিয়ে এলেন দাদী, করুণ চোখে ওগুলোর দিকে তাকাতে লাগলাম। কারণ আমার আর একটা দানা গেলারও সামর্থ্য নেই। তবে মুসা ছাড়ল না। ইয়া বড় বড় দুটো ফজলি আম আর বড় এক বাটি দুধ মেরে দিল অনায়াসে। কম করে হলেও এক হাজার বার আউড়াল-এর চেয়ে সুস্বাদু খাবার পৃথিবীর আর কোন দেশে নেই।
ভরপেট খেয়ে তক্ষুণি আর বেরোতে পারলাম না। আধঘণ্টা মত গড়াগড়ি দিয়ে নিলাম বিছানায়। তারপর উঠে আক্কেল আলীকে সঙ্গে করে দা নিয়ে রওনা হলাম মজা পুকুরের পাড়ে।
.

আক্কেল আলীকে সঙ্গে এনে খুব ভাল করেছি। খানিক পরেই বুঝলাম, সে না এলে ওই বেত কেটে ভেতরে ঢোকার সাধ্য আমাদের হত না। সাংঘাতিক শক্ত গোড়। সারা গায়ে বড় বড় কাঁটা। বেতগাছ কাটতে হলে একটা বিশেষ কায়দায় কাঁটা বাঁচিয়ে কোপ দিতে হয়। সামান্য এদিক ওদিক হলেই কনুই থেকে হাতের নিচের অংশের চামড়া আর থাকবে না, ফালাফালা হয়ে যাবে কাঁটার আঘাতে। আক্কেল আলীর বক্তব্য, পাগল না হলে এই বেত কেটে ওই পোড়াবাড়িতে ঢোকার কথা ভাবে না কেউ। অর্থাৎ তার ধারণায়, আমরা তিনজনই পাগল।

বাড়িটা যে আছে ওখানে, জানা ছিল তার। বানিয়েছিলেন এখানকার প্রথম জমিদার, আইন উদ্দিন সরকার। এতটাই পোড়ো, ঢুকে দেখার কথা মনে হয়নি কখনও আক্কেল আলীর। পঁয়তিরিশ বছর আগে সে যখন এসেছিল, তখনও এমনই কাটা ছিল এখানটায়। তার মনে হয়েছিল-কি আর আছে এর মধ্যে দেখার মত, সাপ আর ইঁদুর-শজারু ছাড়া? শুধু ওসব দেখার জন্যে কাটার খোঁচা খেয়ে ঢোকার কষ্ট কে করে।

শেষ পর্যন্ত আক্কেল আলীর চেষ্টাতেই ঘরে ঢোকা সম্ভব হলো। দুই কামরার বাড়ি, বাগানবাড়ি নয়, তবে প্রচণ্ড গরমের সময়, কিংবা মন ভাল না লাগলে এসে একাকী কাটানোর জন্যে একটা চমৎকার জায়গা ছিল এটা একসময়। সামনে পুকুর, বন-জঙ্গল, গরমের দিনে চাঁদনী রাতে নিশ্চয় অপরূপ দৃশ্য হয়।

ভেতরে মাকড়সার জালের ছড়াছড়ি, পা বাড়ালেই হাতে, মুখে লাগে। সঙ্গে করে আনা ছোট একটা ডাল দিয়ে সামনের জালগুলো ছিঁড়ে সরিয়ে টর্চের আলো ফেলল কিশোর। জানালা আছে দুটো, কিন্তু বাইরে থেকে লতাপাতায় এমন করে জড়িয়ে আটকে রেখেছে, ঠেলে খোলা মুশকিল।

ভেতরের দিকের ঘরে দেয়ালের কাছে বহু পুরানো একটা বেঞ্চ রাখা, তাতে পুরু হয়ে ধুলো জমে আছে। টেবিলও আছে একটা, তাতেও ধুলো। আরেকটু কাছে এগোল কিশোর। আমরা রইলাম তার পেছনে।

দুটো গ্লাস দেখতে পেলাম টেবিলে।

কিশোর বলল, শেষবার যারা ঢুকেছিল এখানে, কথা বলেছিল বসে, তারা নিশ্চয় এই গ্লাসে করে কিছু খেয়েছিল। দু-জন লোক।

আক্কেল আলী বলল কিছুটা ক্ষোভের সঙ্গেই, কি আর খাবে! মদ খেয়েছিল আরকি! এ বাড়িতে তো এক সময় রীতিই ছিল, পুরুষমানুষের মদ খেতে হবে।

একটা গ্লাস তুলে নিয়ে দেখতে দেখতে কিশোর বলল, এ রকম গ্লাস রান্নাঘরের আলমারিতেও দেখেছি।

খাটো খাটো গ্লাস, খুব ভারি কাঁচে তৈরি, ইংল্যান্ডের একটা কোম্পানির নাম ছাপ দিয়ে লেখা রয়েছে তলায়।

অনেক খোঁজাখুঁজি করেও ঘরগুলোতে আর কোন জিনিস পেলাম না। গুপ্তধনের কোন চিহ্ন না পেয়ে কিছুটা নিরাশই হলাম।
রাতে খাবার টেবিলে বসে পোড়ো বাড়িতে ঢোকার খবরটা জানালাম আমরা।
গ্লাস দুটো পেয়ে খুশি হলো দাদী।
মতিদাদা বললেন, ঘরটা সুন্দর। তোমাদের বয়েসে চাঁদনী রাতে, বৃষ্টির দিনে, কতদিন গিয়ে একা একা বসে থেকেছি ওখানে। বন দেখতে খুব ভাল লাগত। বিশেষ করে পুকুরটা। শাপলায় ভরা, চাঁদের আলোয় রহস্যময় হয়ে উঠত। মুষলধারে বৃষ্টি যখন হত, তখন লাগত আবার আরেক রকম। শাপলাপাতায় বৃষ্টির নাচন দেখেছ? দুর্দান্ত!
চাঁদনী রাতে সিন্দুকেরা নিশ্চয় ছানাপোনা নিয়ে বেরোত! মুসা বলে উঠল। উঠে আসত পানি থেকে। ধাড়িটা থাকত আগে আগে, তার পেছনে মাদীটা, আর তাদের পেছনে ছানার দল। হেলেদুলে এগোচ্ছে বড় দুটো, আর পিচ্চিগুলো নাচানাচি করছে। ছবি তুলে রাখতে পারলে কোটিপতি হয়ে যাওয়া যেত!
ভুরু কুঁচকালেন দাদা। কারা বেরোত?
মুসার ভূতুড়ে সিন্দুকের কথা বুঝিয়ে বলল কিশোর।
হা-হা করে হাসলেন দাদা। বললেন, তাহলে একদিন গিয়ে রাতে থেকেই দেখো, বেরোয় কিনা?
থাক থাক, তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন দাদী, ছেলেগুলোকে আর কুবুদ্ধি দিয়ো না। সাপখোপের আড্ডা, শেষে কামড় খেয়ে মরবে।
কিন্তু কুবুদ্ধিটা কিশোরের মাথায় ঠিকই ঢুকে গেল। ঘরে ফিরে এসে শলা পরামর্শ করতে লাগল আমাদের সঙ্গে, ঘরটা পরিষ্কার করে ওখানে রাত কাটালে মন্দ হয় না। আমরা না করলাম না। একবার যখন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে সে, সেটা করবেই, আর তাকে ফেরানো যাবে না। তা ছাড়া ভয় ভয় করলেও ওখানে থাকতে আমাদের যে একেবারেই ইচ্ছে করছিল না, তা নয়।
সুতরাং পরদিন থেকেই দাদীকে না জানিয়ে কাজ শুরু করে দিলাম আমরা। ধুয়ে মুছে ঝকঝকে তকতকে করে ফেললাম বাড়িটাকে। আশপাশের জঙ্গল সাফ করলাম। জানালা খুলে দেয়া গেল। আরেকটা চমৎকার জিনিস বেরোল, একট। অ্যাকোয়ারিয়াম। মাটিতে বেশ বড় একটা ট্যাংক বানিয়ে, চারপাশ পাকা করে দেয়া হয়েছে। নালা কেটে পুকুর থেকে পানি ঢোকার ব্যবস্থা আছে। তাতে কিছু জলজ উদ্ভিদ লাগিয়ে দেয়া হয়েছে এমন করে, যাতে মাছের আগ্রহ জন্মায়। ওই অ্যাকোয়ারিয়ামে এসে ঢোকে ওরা। বহু দিন পরিষ্কার করা হয় না বলে ময়লা হয়ে আছে এখন ট্যাংকটার পানি, গাদা গাদা পাতা পড়ে পচে আছে তলায়। ওই পানিতেই কয়েকটা পুঁটি আর একটা টাকি মাছকে ঘুরতে দেখলাম।

দু-দিন লাগল সব ঠিকঠাক করতে।
তৃতীয় দিনের দিন বিকেলে ওই বাড়িতে বসেই চা খাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম আমরা। খাবার আর চায়ের কেটলি গুছিয়ে নিয়ে রওনা হলাম।
ঘরের দাওয়ায় বসে বসে প্রকৃতি দেখতে লাগলাম আমরা।..
করুণ গলায় টেনে টেনে বিলাপ করছে ঘুঘু। মাঝে মাঝে অলস ভঙ্গিতে শিস দিচ্ছে দোয়েল। পুকুরের পানিতে শাপলার ফাঁকে ফাঁকে পোকা আর ছোট মাছ খুঁজে বেড়াচ্ছে দুটো জলমুরগী।
পশ্চিমে যতই ঢলতে লাগল সূর্য, বনতলে লম্বা হতে লাগল গাছের ছায়া।
চা খাওয়া শেষ করলাম আমরা।
হঠাৎ মাথার ওপর কর্কশ গলায় ডেকে উঠল একটা পেঁচা। চমকে চোখ তুলে তাকালাম। চালার খাপে বাসা ওটার। দিন শেষ হয়ে রাত আসছে, জেগে উঠছে বনের নিশাচরেরা। খানিক আগেই উঁকি দিয়ে গেছে একজোড়া শেয়াল।
বাসাটার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলে উঠল কিশোর, ওটা কি?
উঠে দাঁড়াল সে।
আমি আর মুসাও তাকালাম।
কোথায়? জিজ্ঞেস করলাম।
বাসাটার পাশে দেখো। বাক্সের কোণা মনে হচ্ছে না?
খাইছে! তাই তো!
মোটেও দেরি করল না মুসা। খাপের ফাঁকে খুঁজে রাখা ছোট কাঠের বাক্সটা বের করে আনল। প্রায় দুশো বছরের পুরানো বাক্স, সারা গায়ে পিতলের পাত বসিয়ে নকশা করা। নিশ্চয় কারও শখের জিনিস ছিল এটা। বেশ ভারি।
এর মধ্যে গুপ্তধন নেই তো? কানের কাছে নিয়ে বাক্সটা ঝাঁকি দিয়ে ভেতরে কি আছে বোঝার চেষ্টা করল মুসা।
না, বেশি ছোট, কিশোর জবাব দিল। ভাবছি, খাপের মধ্যে গেল কি করে? পাখিতে নিতে পারেনি। এটা তোলার সাধ্য হবে না কোন পাখিরই। তাহলে কেউ রেখেছে। মানুষ।
আছে কি এর মধ্যে? জিজ্ঞেস করলাম।
খুলেই দেখা যাক না, মুসার হাত থেকে বাক্সটা নিয়ে ডালা খোলার চেষ্টা করল কিশোর। কিন্তু ডালাটা যে কোন দিকে, কোটা ওপর আর কোটা নিচ, সেটাই বোঝা গেল না। বেশ কায়দা করে তৈরি বাক্সটা।
অন্ধকার হয়ে গেছে। আলোয় না দেখে বাক্সটা খোলা যাবে না বুঝতে পেরে সেই চেষ্টা আর করলাম না আমরা। ওটা নিয়ে বাড়ি ফিরে চললাম।

.
গাড়ি-বারান্দায় সেই গাড়িটাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম আবার বাড়ি কিনতে চায় যে লোকটা, তার। ঘনঘন আসা-যাওয়া করছে, কিনেই ছাড়বে। খুব তাড়াতাড়ি গুপ্তধনগুলো আমরা উদ্ধার করতে না পারলে বাঁচানো যাবে হীরাদাদীর এত সাধের এই জমিদার বাড়ি।
দাদা-দাদী নিশ্চয় লোকটার সঙ্গে হলঘরে আছে, ওখানে বসে বাক্স খোলা নিরাপদ নয়, তাই ডাইনিং রুমে চলে এলাম আমরা। টেবিলে বসেই বাক্সটা খোলায় মন দিল কিশোর। বাক্সের গায়ে হালকা একটা রেখা চোখে পড়ল। বোঝা গেল, ওটাই জোড়া, কিংবা ঢাকনার কিনারা। ঘর থেকে গিয়ে তার ব্যাগ থেকে ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা এনে দেয়ার অনুরোধ করল আমাকে।
এনে দিলাম।
গ্লাস দিয়ে দেখে নিশ্চিত হলো সে, ঢাকনা কোনটা। সূক্ষ্ম ফাঁকটায় ছুরির মাথা ঢুকিয়ে চাড় দিতে লাগল। সামান্যতম নড়ল না ঢাকনাটা। আরও জোরে ছাড় দিতেই সামান্য ফাঁক হলো মনে হলো। জোরে জোরে চাড় দিতে লাগল তখন।
অবশেষে খুলে গেল ঢাকনা। মনে হলো, কোন ধরনের আঠা মাখিয়ে তারপর চেপে বসিয়ে দেয়া হয়েছিল ওটা, সে জন্যেই খুলতে অত কষ্ট হয়েছে।
ভেতরে কি আছে দেখার জন্যে আগ্রহে সামনে ঝুঁকে পড়লাম আমরা তিনজন।
হতাশ হতে হলো। কিছুই নেই! কিচ্ছু না! একটা সোনার মোহর কিংবা একটা সাধারণ আঙটিও নেই। গুপ্তধন তো দূরের কথা।
বাক্সটা টেবিলে রেখে দিয়ে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে শুরু করল কিশোর।
খালি বাক্স হাতে নিয়ে আবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল কিছুক্ষণ মুসা। তারপর নিরাশ ভঙ্গিতে রেখে দিয়ে বলল, দূর, খামোকা সময় নষ্ট!
আমি হাতে তুলে নিলাম বাক্সটা। ব্যাপারটা আমার চোখেই পড়ল প্রথম। বাইরের দিকটা যত বড়, ভেতরের দিকটা তার চেয়ে অনেকটাই ছোট, বিশেষ করে নিচের দিক। অতটা তো হওয়ার কথা নয়! অত পুরু নয় কাঠ। তাহলে? কিশোরকে বললাম আমার সন্দেহের কথাটা।
থাবা দিয়ে আমার হাত থেকে বাক্সটা কেড়ে নিয়ে একবার তাকিয়েই বলে উঠল কিশোর, তাই তো! ফলস বটম আছে।
বাক্সের নিচে বসানো চোরা কুঠরিটা খোলার চেষ্টা করতে করতে ঘেমে গেল সে, কিন্তু লাভ হলো না। খুলতে পারল না। শেষে রেগে গিয়ে মারল এক আছাড়। ভেঙে ফেলতে চায়। আর তাতেই হয়ে গেল কাজ। প্রচণ্ড আঘাতে ছুটে গেল ভেতরের স্প্রিঙ, খুলে গেল কুঠুরির ঢাকনা।
হুমড়ি খেয়ে পড়লাম আমরা তিনজন। ভেতরে রয়েছে একটা পুরানো খাম।

ছোঁ মেরে তুলে নিল কিশোর। খামের ভেতর থেকে বেরোল একটা অনেক পুরানো চাবি, আর এক তা ভাজ করা কাগজ। চাবিটা নিশ্চয় সিন্দুক কিংবা আলমারির, ভাবলাম, আর কাগজটা শুপ্তধন কোথায় আছে তার নকশা। দুরুদুরু বুকে অপেক্ষা করতে লাগলাম।
চাবিটা পকেটে রেখে ভাঁজ করা কাগজটা মেলল কিশোর।
আরেকবার হতাশ হতে হলো আমাদেরকে। কোন নকশা-টকশা নেই, কলম দিয়ে আঁকা একজন মানুষের ছবি। বিশেষত্ব একটাই, কয়েক রঙে আঁকা হয়েছে ছবিটা, একই কলম ব্যবহার করে, ভিন্ন ভিন্ন রঙের কালি দিয়ে। নিখুঁত করে আঁকা। কার ছবি চিনতে পারলাম। হলঘরে দেখেছি। জমিদার আমিন উদ্দিন সরকারের।
মানে কি এর? বিড়বিড় করল কিশোর।
ঘোড়ার ডিম! রেগে গেছে মুসা।
হতে পারে ওই ছবিটাই খুব দামী... বলতে গিয়ে থেমে গেলাম। চোখের কোণ দিয়ে চোখে পড়ল একজন মানুষ। নিঃশব্দে কখন এসে দাঁড়িয়েছেন ঘরে, উত্তেজনায় খেয়াল করিনি।
মুখ তুলে তাকালাম। গভীর আগ্রহে ছবিটার দিকে তাকিয়ে আছেন সেই ভদ্রলোক, যিনি বাড়ি কিনতে চান। আমরা তাকাতেই জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় পেয়েছ এটা?
বাক্সের মধ্যে, জবাব দিয়ে দিল মুসা।
বাক্সটা কোথায় পেলে?
কিশোরের বার বার চোখ টেপা সত্ত্বেও খেয়াল করল না মুসা, বলে দিল, পোড়োবাড়িতে। মজা পুকুরের ধারে বেতবন আছে না, সেখানে।
একটু দেখতে পারি ছবিটা? হাত বাড়ালেন ভদ্রলোক।
এই সময় ঘরে ঢুকলেন মতিদাদা। জিজ্ঞেস করলেন, কিসের ছবি?...এ-কি, এ তো আমার দাদার! কোথায় পেলে?
জানানো হলো তাকে।
লক্ষ করলাম, ছবিটার দিকে তাকিয়ে চকচক করতে লাগল ভদ্রলোকের চোখ, যিনি বাড়ি কিনতে এসেছেন। ছবিটা রেখে ভোলা বাক্সটাও হাতে নিয়ে দেখলেন। তারপর টেবিলে রেখে ঘুরে তাকালেন দাদুর দিকে, বললেন, হ্যাঁ, বাকি ঘরগুলো দেখার আর দরকার নেই আজ। রাতের বেলা না দেখে অন্যদিন এসে দিনের বেলা দেখব।
কিন্তু আপনিই তো দেখার জন্যে চাপাচাপি করলেন! ভদ্রলোকের এই হঠাৎ মত পরিবর্তনে যেন কিছুটা অবাকই হয়েছেন দাদা।

তা বলেছি। এখন বুঝতে পারছি, ঠিকই বলেছেন, রাতের বেলা ভালমত দেখা যায় না সব।
বেরিয়ে গেলেন আবার দু-জনে।
রাতের বেলা খাবার টেবিলে ছবিটা নিয়ে আলোচনা হলো। দাদু বললেন, আমার দাদু কিছুটা পাগলাটে স্বভাবের ছিলেন। ধাঁধা আর রহস্যের প্রতি বেজায় ঝোঁক ছিল তাঁর। নিজে নিজে অনেক ধাঁধা তৈরি করেছেন। ছবিও ভাল আঁকতে পারতেন।
তোমার কি মনে হয়, জিজ্ঞেস করল কিশোর, এই ছবিটাও কোন ধরনের ধাঁধা? গুপ্তধন কোথায় আছে তার ইঙ্গিত?
তার দিকে তাকিয়ে হাসলেন দাদা। তোর মাথায়ও দেখি উদ্ভট সব ভাবনা খেলে বেড়ায়। দাদার সঙ্গে মিলত ভাল। হাহ্ হাহ্!
তুমি গুরুত্ব দিচ্ছ না? তাহলে বাক্সটার মধ্যে অত যত্ন করে উঠিয়ে চালার খাপে ভরে রাখলেন কেন?
ওটাও আরেক পাগলামি।
কিন্তু মেনে নিতে পারল না কিশোর, তার মুখ দেখেই বোঝা গেল।
খাওয়ার পর ঘরে এসে চাবিটা দরজার চৌকাঠের নিচের একটা ফোকরে লুকিয়ে রাখল কিশোর। বলল, সাবধানের মার নেই।
ডাইনিং রুমে তখন যে কথাটা শেষ করতে পারিনি, সেই কথাটাই তুললাম আবার, ছবিটা দামী কোন ছবি নয় তো? হয়তো আমিন উদ্দিন সরকারের ছবির নিচে আঁকা আছে অনেক দামী কোন শিল্পীর ছবি। হতে পারে না?
পারে, মাথা ঝাঁকাল কিলোর।
আমার মনে হয়, মুসা বলল, ছবিটার নিচে কোন গোপন দরজা আছে। ফ্রেমটা কত বড় দেখেছ?
সেটাও সম্ভব। চলো, বরং দেখেই আসি।
শূন্য হলঘর। দাদা-দাদী শোবার ঘরে চলে গেছেন। আক্কেল আলী থাকে বাইরের একটা ঘরে, আগে মালী থাকত ওঘরে। সেটার দরজাও বন্ধ, তার মানে আক্কেল আলীও শুয়ে পড়েছে। বাড়ির বাইরে বাগানে পাহারা দিচ্ছে কালু। আমরা টর্চের আলো ফেলতেই এগিয়ে এল লেজ নাড়তে নাড়তে।
গুপ্তধন খোঁজার এটা চমৎকার সময়। আবার হলঘরে ফিরে এলাম আমরা। আমিন উদ্দিন সরকারের ছবিটার সামনে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। আসল না নকল, নিচে আরও ছবি আঁকা আছে কিনা বোঝার উপায় নেই।

এ ভাবে দেখে কিছু বুঝব না, কিশোর বলল। বুঝতে হলে ল্যাবরেটরিতে পাঠাতে হবে।
নিচে পথ আছে কিনা দেখে ফেলি না কেন? মুসা বলল।
বেশ শক্ত করে দেয়ালে লাগানো আছে ভীষণ ভারি ফ্রেমটা। খুলে সরাতে যথেষ্ট বেগ পেতে হলো।
সরিয়ে আবারও হতাশ হলাম। কোন ফঁক-ফোকর নেই। একেবারে নিরেট দেয়াল। দেয়ালে ঠুকে ঠুকে দেখলাম, একটা ইঞ্চি জায়গাও পেলাম না যেখান থেকে ফাপা আওয়াজ বেরোয়।
কি আর করব। ছবিটা আবার আগের জায়গায় বসিয়ে রাখলাম।
আগতত আর কিছু করার নেই এখানে। তদন্তের কাজ রাতের মত স্থগিত রেখে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ার প্রস্তাব দিল মুসা। সানন্দে রাজি হলাম আমি। তবে কিশোরের যাওয়ার ইচ্ছে নেই। সে জানাল, কিছু থাকলে এই ঘরটাতেই আছে। আমার মন বলছে!
থাকলে সেটা সকালেও বের করা যাবে, বললাম আমি। চলো, গিয়ে শুয়ে পড়ি। ঘুমিয়ে মাথা ঠাণ্ডা করি আগে।
উত্তেজনায় ভাল ঘুম হলো না সে রাতে। দুঃস্বপ্ন দেখলাম। পাহাড়ের গুহায় আলিবাবার রত্ন খুঁজে পেয়েছি যেন আমরা, কিন্তু বের করে আনার আগেই কেড়ে নিল চল্লিশ ডাকাত। আমাদের ধরে বেঁধে ফেলল। মুসাকে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করাল পাথরের বেদিতে। তার মুণ্ডু কাটবে। হাউমাউ করে চিৎকার করতে লাগল মুসা। আরেক ডাকাত এসে আমার কাধ চেপে ধরে ঝাঁকাতে লাগল।
ভেঙে গেল ঘুম। দেখি, ওঠার জন্যে আমার কাঁধ ঝাঁকাচ্ছে কিশোর।
নাস্তা সেরে দাদা চলে গেলেন শহরে, দাদী রান্নাঘরে। আমরা চলে এলাম হলঘরে। আগের রাতের অসমাপ্ত কাজটা শেষ করার জন্যে। কিশোরের ধারণা, রহস্যের সমাধান রয়েছে আমিন উদ্দিন সরকারের ছবিটাতে। গুপ্তধনের চাবিকাঠি ওটাই।
কিন্তু তাকিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে চোখ ব্যথা করে ফেললাম। অাভাবিক কিছুই বের করতে পারলাম না ছবিটার। নিরেট কাঠে তৈরি ফ্রেম, ফাপাও নয় যে তার ভেতর কোন নকশা জাতীয় কিছু ভরে রাখা যাবে।
কিন্তু কিশোর হাল ছাড়ল না। সামনে এগিয়ে, পিছিয়ে গিয়ে, মাথা এপাশে কাত করে, ওপাশে কাত করে দেখতে লাগল। সেই সঙ্গে চলল তার নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটা।
আচমকা আনমনে বলে উঠল, ব্যাপারটা অদ্ভুত!
কি অদ্ভুত? জানতে চাইলাম আমি আর মুসা।
আমিন উদ্দিন সরকারের বাবরি চুল।

চুলে আবার কি করল? বুঝতে পারলাম না।
হয়তো কোন ফকির কিংবা পীরের মুরিদ ছিলেন, মন্তব্য করল মুসা। এ দেশে অনেককেই তো ও-রকম রাখতে দেখি, যেন মুরিদ হলে বাবরি না রাখলে চলে না।
পীরের অনুকরণ করে আরকি, কিশোর বলল। আমিন উদ্দিন সরকার কেন ও রকম চুল রেখেছিলেন, সেটা তার ব্যাপার, আমাদের মাথাব্যথা নেই। আমার প্রশ্ন হলো, বাক্সের ছবিটাতে খাটো করে ছাঁটা চুল এঁকেছেন কেন তিনি?
আঁকার সময় হয়তো তার ছোট চুল ছিল।
সেই কথাটাই ভাবছি। কি করে জানব? দীর্ঘ একটা মুহূর্ত আবার ছবিটার দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। দু-বার চিমটি কাটল নিচের ঠোঁটে। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, রবিন, ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা নিয়ে আসবে? ছবিটাও নিয়ে এসো।
ঘর থেকে ওগুলো এনে দিলাম তাকে।
দুটো ছবি মিলিয়ে মিলিয়ে দেখতে লাগল সে।
বাবরির ওপর ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা ধরে রাখল দীর্ঘক্ষণ। ধীরে ধীরে হাসি ফুটল তার মুখে। মাথা দুলিয়ে বলল, ই, বুঝেছি! এত্তো সহজ, অথচ…
কি বুঝেছ! প্রায় চিৎকার করে উঠলাম আমি আর মুসা।
কিন্তু কিশোর জবাব দেয়ার আগেই ঝটকা দিয়ে খুলে গেল সদর দরজা। ছুটে ঘরে ঢুকল আক্কেল আলী। ভীষণ উত্তেজিত। চিৎকার করে ডাকতে লাগল, মা, ও মা, জলদি বেরোন! সাংঘাতিক কাণ্ড হয়ে গেছে! মা-আ!
রান্নাঘর থেকে তাড়াহুড়ো করে বেরোলেন দাদী। আঁচলে হাত মুছতে মুছতে জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে রে! অত চিৎকার করছিস কেন?
সর্বনাশ হয়ে গেছে, মা! সাহেব অ্যাক্সিডেন্ট করেছেন। লোক এসে খবর দিল, এখুনি হাসপাতালে যেতে হবে আপনাকে!
কিসের গুপ্তধন খোঁজা, আর কিসের ছবি-রহস্যের সমাধান, দল বেঁধে হাসপাতালে ছুটলাম আমরা।
খুব ব্যথা পেয়েছেন মতিদাদা। সারা গায়ে ছোট-বড় ব্যান্ডেজ, বা পায়ে প্লাস্টার। হাড় ভেঙে গেছে। তবে হুঁশ আছে তার। আমাদের দেখে মলিন হাসি হাসলেন। প্রথমেই দাদীকে সাবধান করে দিলেন চিৎকার করে কান্নাকাটি না করতে।
তাঁর মুখেই জানলাম, রঙ সাইড থেকে একটা ট্রাক এসে গুঁতো মেরেছিল তার গাড়িকে। ভাগ্যিস তিনি আস্তে চালাচ্ছিলেন, তাই অনেকটা সামলে নিতে পেরেছেন। নয়তো মুখোমুখি সংঘর্ষেই ভর্তা হয়ে যেত গাড়িটা। রাস্তার পাশের খাদে উল্টে পড়াও বিচিত্র ছিল না। যা-ই ঘটুক না কেন, এ কাহিনী বলার জন্যে আর বেঁচে থাকতেন না তাহলে। ট্রাকের নম্বর রাখতে পারেননি তিনি। তবে একটা

ব্যাপার তার মনে হয়েছে, ইচ্ছে করেই এসে তো লাগিয়েছে ট্রাকটা। যেন মারার জন্যেই রাস্তার মোড়ে ওত পেতে বসে ছিল।
ব্যাপারটা রহস্যময় মনে হলো আমার কাছে। প্রশ্ন জাগল, এই দুর্ঘটনার সঙ্গে গুপ্তধনের কোন সম্পর্ক নেই তো? কিন্তু আমরা যে গুপ্তধন খুঁজছি কে জানে? কারও তো জানার কথা নয়!
হাসপাতালের ভিজিটিং আওয়ার শেষ হলো। বাড়ি ফিরে যেতে হবে। দাদাকে দেখাশোনার জন্যে তাঁর কাছে রয়ে গেলেন দাদী। বার বার দুঃখ প্রকাশ করলেন, আমাদের খুব অসুবিধে হয়ে যাবে। কিন্তু আমরা সে-কথা উড়িয়ে দিয়ে বললাম, কোন অসুবিধে হবে না। আক্কেল আলী থাকলেই যথেষ্ট। সে না থাকলেও অসুবিধে নেই, আমরাই রান্না করে খেতে পারব। বাড়িটা খালি হয়ে যাওয়ায় মনে মনে খুশি হলো বরং কিশোর–পরে বলেছে আমাকে আর মুসাকে, রহস্যটার সমাধান করতে সুবিধে হবে।
সকালে চমৎকার রোদ ছিল, কিন্তু হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এখন দেখি কেমন যেন মুখ গোমড়া করে রেখেছে আকাশ। গুমোট গরম, বাতাস স্তব্ধ। আকাশের ঈষাণ কোণে একটুকরো সুরমা রঙের মেঘ যেন গ্যাট হয়ে বসে আছে। ভাবেসাবে। মনে হলো, কোন কারণে যেন রেগে গেছে প্রকৃতি, ফেটে পড়ার অপেক্ষায় আছে। সন্দেহ হলো, কালবোশেখি আসছে না তো?
বাড়ি ফিরে উঠানে ঘুঘুর পালকে দানা খুঁটতে দেখলাম না। কবুতরগুলো গিয়ে বসেছে ছাতের কার্নিশে, বকবকম নেই, চুপ করে থাকার মধ্যেও যেন কি এক ধরনের অস্থিরতা। বিপদের আশঙ্কা করছে বোঝা গেল।
যাই হোক, খাওয়া-দাওয়া সেরে আর কোন কাজ না থাকায় কিশোরের উৎসাহে ছবি-রহস্য সমাধানের কাজে লেগে গেলাম আমরা। দাদার এখন অনেক টাকা দরকার। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গুপ্তধনগুলো উদ্ধার করা গেলে ভাল।
যে কথাটা তখন বলতে গিয়ে বলতে পারেনি কিশোর, দাদার অ্যাক্সিডেন্টের কথায় থেমে যেতে হয়েছিল, সেটাই বলল, বাক্সে পাওয়া ছবির চুলের ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছ? খাটো করে আঁকা-ই হয়েছে দেয়ালে ঝোলানো ছবিটার বাবরি চোখে পড়ানোর জন্যে। আর এর মধ্যেই করে রাখা হয়েছে কারসাজি। ভাল করে দেখো আরেকবার, তোমরাও বুঝতে পারবে।
দেখলাম, যতভাবে সম্ভব। সেই আগের মতই অন্ধকারে রইলাম। মুসা বলল, দেখো, পারলে আগেই পেরে ফেলতাম; ঝুলিয়ে না রেখে বলেই ফেলো না ছাই!
কিশোর বলল, যত কারসাজি চুলের মধ্যে করে রাখা হয়েছে। দেখো, ভিন্ন ভিন্ন রঙে অতি খুদে খুদে অক্ষর আর নম্বর লেখা।

প্রায় ছোঁ মেরে কিশোরের হাত থেকে ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা কেড়ে নিলাম। সত্যিই তো! খুব সরু নিবের কলম দিয়ে এমন করে আঁকা হয়েছে ওগুলো, মিশে রয়েছে কোঁকড়া চুলের মধ্যে। জানা না থাকলে মনে হবে চুলের অলঙ্করণ করার জন্যে ওসব এঁকেছে আর্টিস্ট। ভাল বুদ্ধি করেছিলেন আমিন উদ্দিন সরকার।
নিশ্চয় কোন তথ্য দিয়েছেন! মুসা বলল। গুপ্তধনের খোঁজ!
তা দিয়েছেন, কিশোর বলল। তবে খুবই গোলমেলে জিনিস। সাঙ্কেতিক। সঙ্কেতের মানে বের করতে না পারলে বোঝা যাবে না কোথায় আছে।
তাহলে বসে আছো কেন? শুরু করে দাও না। আমরা যে পারব না, অন্তত আমি পারব না এ তো জানা কথাই।
আবার ম্যাগনিফাইং গ্লাস তুলে নিল কিশোর। দেখতে লাগল খুদে অক্ষর আর নম্বরগুলো।
দেখো, একটা নিয়ম মেনে চলা হয়েছে। চুলের দুটো করে ভাজের ফাঁকে, মাঝখানে একসারিতে রয়েছে অক্ষরগুলো। একেক সারির একেক রঙ। লালচে, ধূসর, বাদামী, ছাই রঙ…রঙের এই বিভিন্নতা কেন? একেকটা রঙ কি একেকটা বাক্য গঠন করেছে?
অক্ষরগুলো এত ছোট, ঠিকমত পড়া যায় না, বললাম।
ইচ্ছে করেই অত ছোট করেছে, নইলে তো যে কারোই চোখে পড়ে যেত। গ্লাস দিয়ে চেষ্টা করলে পড়া যাবে। এক কাজ করো, কাগজ কলম নিয়ে এসো।
নোটবুক আর পেন্সিল পকেটেই থাকে আমার। বের করে তৈরি হয়ে বসলাম।
বলা নেই কওয়া নেই, হঠাৎ বাজ পড়ল প্রচণ্ড শব্দে। ভীষণ চমকে গেলাম। ছুটে দরজার বাইরে বেরিয়ে এলাম আমি আর মুসা। তাজ্জব হয়ে দেখলাম আকাশের রূপ। সেই সুরমা রঙের মেঘের টুকরোটাই বিরাট-বিশাল হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে প্রায় আধখানা আকাশ জুড়ে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে তার ভেতর। আরও কিছু ছেঁড়া মেঘের টুকরো ছুটাছুটি করছে আকাশের ইতিউতি।
কালবোশেখি আসছে, পেছন থেকে বলে উঠল কিশোর।
মালীর ঘর থেকে বেরিয়ে এল আক্কেল আলী আর কালু। আক্কেল আলী বলল, ঘরে যান, ঝড়বৃষ্টি হবে।
আমি বললাম, আসুক। ঝড় দেখব আজ।
হাসল আক্কেল আলী। বলল, আম কুড়ানোর ইচ্ছে আছে নাকি?
আছে! লাফিয়ে উঠল মুসা। অসুবিধে হবে?
কিছু হবে না, যদি আসল ঝড়টা আসার আগেই ঘরে ঢুকে যান। বেশি ঝড়ে ডাল ভেঙে পড়ে, গাছ উপড়ায়, মাথায় পড়লে মরবেন।

শাই শাই একটা আওয়াজ কানে আসছিল, বুঝতে পারছিলাম না কিসের, গাছের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তেই বুঝলাম বাতাসের শব্দ শুনছিলাম। অনেক জায়গায় অনেক রকমের ঝড় দেখেছি, কিন্তু এর যেন তুলনা হয় না। স্তব্ধ হয়ে থাকা গাছের ডালপাতা আচমকা ভীষণ দুলতে আরম্ভ করল। প্রচণ্ড আঘাতে শুকনো পাতা উড়তে লাগল। টুপটাপ খসে পড়তে লাগল পাকা আম।

লাফ দিয়ে বারান্দা থেকে নেমে গেলাম আমরা তিনজন। পাকা আম কুড়াতে শুরু করলাম। কিন্তু কটা কুড়াব! দু-হাতে দুটো তুলে নিতে না নিতেই আশপাশে আরও দশ-বিশটা করে পড়ে। আম কুড়াতে যে এত মজা জানতাম না। মহাআনন্দে আমাদের সঙ্গে এসে যোগ দিল কালু। আম তো তুলতে পারে না, চারপাশে নাচানাচি আর ঘেউ ঘেউ জুড়ে দিল। খানিক দূরে দাঁড়িয়ে হাসছে আক্কেল আলী।

কয়েক মিনিট পর ক্ষণিকের বিরতি দিয়ে আবার বইতে শুরু করল বাতাস। আগের চেয়ে দ্বিগুণ জোরে। সেই সঙ্গে বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা পড়তে লাগল। এইবার শঙ্কা দেখা দিল আক্কেল আলীর চোখে। জরুরী গলায় বলল, জলদি ঘরে যান! তুফান এসে গেছে!

বারান্দায় গিয়ে উঠলাম। কিন্তু প্রবল বাতাস আর বৃষ্টির দাপটে সেখানেও টিকতে পারলাম না। ঘরে ঢুকে যেতে হলো। আমাদের সঙ্গে ঢুকল আক্কেল আলী আর কালু।

প্রায় ঘন্টাখানেক ধরে বইল ভয়াবহ ঝড়। তারপর হঠাৎ যেমন এসেছিল তেমনি করেই থেমে গেল আবার। কমে গেল বাতাস, আস্তে আস্তে বৃষ্টি পড়াও থেমে গেল। বাইরে বেরিয়ে অবাক হয়ে গেলাম। পশ্চিম আকাশে বিশাল এক মেঘের পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিচ্ছে পড়ন্ত সূর্য। আশ্চর্য তার রূপ আর রঙ! বিশ্বাসই হতে চায় না–এই কয়েক মিনিট আগেও কালিগোলা অন্ধকারে ঢেকে গিয়েছিল এখানে পৃথিবী। মাটিতে পড়ে থাকা ঝরাপাতার স্তূপ, ভেঙে পড়া ডাল আর পানি জমা না থাকলে ঝড় হয়ে গেল যে সেটাই বোঝা যেত না।

অনেক আম পাওয়া গেল। খেতে খেতে গলা পর্যন্ত ভরে গেল আমাদের। দু হাত, মুখ রসে মাখামাখি। ফল যে কোনদিন এত মজা করে, এভাবে খাওয়া যায়, তা-ও জানতাম না। এত মায়া, এত মাধুর্য আছে যে এই দেশটাতে, এখানে কেউ না এলে, বাস না করলে অনুভব করা তো দূরের কথা, আন্দাজও করতে পারবে না।

সন্ধ্যা হলো। প্রচণ্ড ঝড়ের পর কেমন নিস্তব্ধ হয়ে গেছে প্রকৃতি। দূর থেকে আজান শোনা গেল। ধ্যানমগ্ন হয়ে গেছে বুঝি সবাই-ওই যে গোধূলির কালচে আকাশ, নিচের গাছপালায় ছাওয়া প্রকৃতি, পোকামাকড়, পশুপাখি, সব, সবাই যেন স্রষ্টার প্রার্থনায় মগ্ন। দেখতে দেখতে মনটা বিষণ্ন হয়ে যায় অকারণে।

আলো জ্বেলে দিল আক্কেল আলী। রাতের জন্যে রান্না করতে গিয়ে ঢুকল রান্নাঘরে। আমরা তিন বন্ধু আবার ফিরে এলাম হলঘরে, আমিন উদ্দিন সরকারের ছবির কাছে। সাঙ্কেতিক অক্ষরের সমাধান করতে বসলাম।
অক্ষর আর নম্বরগুলো সাজিয়ে ফেলতে লাগল কিশোর। সে বলতে লাগল, আমি লিখে নিলাম। প্রথমে লালচে রঙে লেখা অক্ষর, লাইনটা দাঁড়াল এ রকম:
নিজচে২ খোঁজজো৪ আধাজর৩ জালেজর১
তারপর বাদামী:
আজছে২ তাজাহার৩ ভেজতর৪ সিজন্দুক১
একেক রঙে লেখা অক্ষরের একেকটা লাইন, সব মিলিয়ে হলো চারটে:
নিজচে২ খোঁজজোঃ আধাজরত জালেজর১
আজছে২ তাজাহার ভেজতরঃ সিন্দুক
সাজত তিন২ পাঁজচে৩ মিজলিয়ে দেজখো৫
রজতুরাজি৩ পেজয়ে যাজবেহ
অক্ষরগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলাম বোকার মত, কিছুই বুঝতে পারলাম না।
মুসা তো বলেই ফেলল, খাইছে! এ কোন ভাষা!
কারও কথার জবাব দিল না কিশোর। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে অক্ষরগুলোর দিকে। তারপর নীরবে আমার হাত থেকে পেন্সিলটা নিয়ে বলল, মনে হয় বুঝতে পারছি। এক, দুই, তিন করে নম্বর দেয়া আছে। নম্বর অনুসারে অক্ষরগুলোকে পর পর সাজিয়ে ফেলা যাক।
সাজিয়ে লেখার পর দাঁড়াল:
জালেজর নিজচে আধাজর খোঁজজো
সিজন্দুক আজছে তাজাহার ভেজতর
সাজত তিজন পাজচ মিজলিয়ে দেজখো
পেজয়ে যাজবে রজতুরাজি
মুসা বলল, এতেই বা কি হলো? সহজ কি হয়েছে?
হাসি ফুটল কিশোরের মুখে। মাথা নেড়ে বলল, হয়েছে। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, এখনও বুঝতে পারছ না? একটা ব্যাপার লক্ষ করেছ? প্রতিটি শব্দেই একটা করে বর্গীয় জ জুড়ে দেয়া হয়েছে, জটিল করে তোলার জন্যে। বাদ দিয়ে দাও...
বুঝে গেছি! প্রায় চিৎকার করে উঠলাম। পানির মত সহজ হয়ে গেছে এখন। তাড়াতাড়ি নোটবুকে লিখে ফেললাম:
জালের নিচে আধার খোজো
সিন্দুক আছে তাহার ভেতর

সাত তিন পাঁচ মিলিয়ে দেখো
পেয়ে যাবে রত্নরাজি
লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। বলল, মেসেজ পেয়ে গেছি! কোথায় খুঁজতে হবে বলে দিয়েছে। কাল থেকেই শুরু করব খোঁজা!

.

সারাদিন অনেক পরিশ্রম গেছে। রাতের খাওয়া সেরে শোয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লাম।
মাঝরাতে হঠাৎ করে ঘুম ভেঙে গেল আমার। কালুর ডাকে। নিচতলায় আক্কেল আলীর সঙ্গে ছিল সে। এখন বাইরে চলে গেছে। তার ঘেউ ঘেউ শুনে আক্কেল আলীর ঘুমও ভাঙল। ডাকতে ডাকতে বাইরে বেরোল সে।
মুসা আর কিশোরও জেগে গেল। সবাই বেরোলাম। কি হয়েছে জিজ্ঞেস করলাম আক্কেল আলীকে। সে বলল, মনে হয় চোর ঢুকেছিল!
জিজ্ঞেস করলাম, কিছু নিয়েছে?
বুঝতে পারছি না!
ঘরে ফিরে এসে দেখতে লাগল সে, কিছু নিয়েছে কিনা। দেখা গেল সব ঠিকঠাকই আছে। কিছু খোয়া যায়নি। সময়মত কালু জেগে যাওয়াতেই বোধহয় খালিহাতে পালিয়েছে।
তবে খালি হাতে যে যায়নি, যা নিতে এসেছিল, নিয়েই গেছে, সেটা জানতে পারলাম পরদিন সকালে। আমাদের ঘরে টেবিলের ওপর রেখেছিলাম পোড় বাড়িতে পাওয়া বাক্স আর তার ভেতরের কাগজটা। অনেক খুঁজেও আর পেলাম না সেটা। বুঝলাম, ওটা নিতেই এসেছিল চোর।
আরও নিশ্চিত হয়ে গেলাম, সঠিক পথেই এগোচ্ছি আমরা। গুপ্তধনগুলো এখনও খোয়া যায়নি, এ বাড়িতেই আছে। তবে দুঃখের বিষয়, আমরা ছাড়াও আরও কেউ জানে সে-খবর। ছবিটাও নিয়ে গেছে। আমাদের আগেই যদি গুপ্তধন কোথায় আছে, বের করে ফেলে?
কিশোর বলল, ফেললে ফেলুক। সিন্দুকের চাবি আমাদের কাছে। খুলবে কি করে?
তালা ভেঙে, জবাব দিল মুসা।
দেখা যাক কি করে। আমরাও তো আর বসে থাকব না। আমাদের অনেক সুবিধে। বাড়ির যেখানে-সেখানে যখন-তখন খোঁজাখুঁজি করতে পারব, সে পারবে না। তাকে আসতে হবে রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে।
তা-ও বটে।

খাবার তৈরি করে, টিফিন ক্যারিয়ারে ভরে হাসপাতালে রওনা হয়ে গেল আক্কেল আলী। আমরা বাড়িতেই রয়ে গেলাম। বলে দিলাম, বিকেলে ভিজিটিং আওয়ারে দাদাকে দেখতে যাব।
সকালের নাস্তা সেরেই আর দেরি করল না কিশোর, মেসেজটার মানে বের করতে বসে গেল। কয়েকবার করে পড়ল ছড়াটা। তারপর বলল, প্রথম লাইনটা থেকে শুরু করি-জালের নিচে আধার খোজো!
আধার মানে তো পাত্র, তাই না? মুসার প্রশ্ন।
মাথা ঝাঁকাল কিশোর, হ্যাঁ।
কি বলতে চায়? কোন জালটালের নিচে লুকিয়ে রেখেছে সিন্দুকটা?
মনে হয় না, মাথা নাড়ল কিশোর। জাল এমন কোন জিনিস নয় যার নিচে দেখা যায় না। তা ছাড়া সুতার জাল আর কতদিন টেকে? ব্যবহার করলে তো যায়ই, পড়ে থাকলেও নষ্ট হয়ে যায়।
তাহলে?
সেটাই তো ভাবছি, আনমনে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার কিশোর।
আমি বললাম, আচ্ছা, দেখতে ভুল করোনি তো? হয়তো জল লিখেছে, তুমি পড়েছ জাল...
তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে তুড়ি বাজাল কিশোর, ঠিক বলেছ! জলই হবে! তাহলে মিলে যায়! জলের নিচে আধার খোজো, তার ভেতরে সিন্দুক আছে। তার মানে কোন জলাশয় বা পানির নিচে লুকানো আছে একটা বড় পাত্র, তার মধ্যে রাখা হয়েছে সিন্দুকটা।
পুকুরের নিচে না তো? মুসা বলল, মজা পুকুরটা! আমি বাবা ওর মধ্যে নামতে পারব না। সাধারণ সিন্দুক থাকলেই ওতে ভূত হয়ে যাবে, আর রত্ন ভরা লোহার সিন্দুক হলে তো কথাই নেই, ভূতুড়ে সিন্দুকদের রাজা হবে!
ওই পুকুরে ডুব দিতে আমারও ভয় লাগবে, স্বীকার করল কিশোর। এক কাজ করতে পারি আমরা। আক্কেল আলী এলে, জেলে এনে মাছ ধরার ছুতোয় বেড়জাল নামিয়ে দিতে পারি। নিচে থাকলে জালে আটকাবেই সিন্দুকটা।
যদি দীঘিটাতে ফেলে দিয়ে থাকে? আমি প্রশ্ন তুললাম।
আমার তা মনে হয় না। এত বড় দীঘি থেকে যে সিন্দুক তোলা সহজ হবে না, এত নিচে নেমে কেউ খুঁজতে পারবে না, এটা জানা ছিল আমিন সরকারের। নিজেকে দিয়েই ভাবি, তার পরিস্থিতিতে আমি হলে কি করতাম? এমন কোথাও রাখতাম, যেখানে খোঁজার কথা সহজে মনে আসবে না কারও, কিন্তু জেনে গেলে বের করে আনতে আর অসুবিধে হবে না। দীঘির তলা থেকে তুলে আনা বেজায় কঠিন। একমাত্র উপায়, সমস্ত পানি সেঁচে ফেলা। তারপরেও কথা থাকে, কাদায়

বেশিদিন জেগে থাকবে না ভারি সিন্দুক, দ্রুত তলিয়ে যাবে। তখন পানি সেঁচলেও আর পাওয়ার উপায় থাকবে না। দীঘির নিচে লুকানোটা মোটেও নিরাপদ না। এমন কোথাও রেখেছেন, যেখানে সহজে খুঁজে পাবে না কেউ, আবার নিরাপদে থাকবে দীর্ঘদিন।

পুকুরের বেলায়ও তো এ কথা খাটে?

তা খাটে। তবে ছোট পুকুর তো, পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তা ছাড়া তখন তাড়াহুড়োয় কোনমতে সিন্দুকটা লুকিয়ে ফেলার কথাই কেবল ভেবেছেন আমিন সরকার...

আচ্ছা, বাধা দিয়ে মুসা বলল, আরও সহজ জায়গার কথা ভাবছি না কেন আমরা?

কোথায়? জানতে চাইলাম আমি আর কিশোর।

পোড়ো বাড়িটার পাশের মাছের অ্যাকোয়ারিয়াম! ওটাও তো জলাশয়...

তাই তো! লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর, আজকে আমার মাথাটার হলো কি? এটা ভাবলাম না কেন? জলদি চলো! শাবল, কোদাল নিয়ে যাব!

কালুকে সঙ্গে করে সেই পোড়োবাড়ির কাছে চলে এলাম আমরা। অগভীর নালার মুখটা মাটি দিয়ে বন্ধ করে দিতেই পুকুরের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। অ্যাকোয়ারিয়ামের সামান্য পানি সেঁচে ফেললাম আমরা। নিচে কাদা। কোদাল দিয়ে তুলে ফেলতে যথেষ্ট কষ্ট হলো। তারপরে মাটি খোঁড়া অবশ্য সহজ হয়ে গেল, ভেজা মাটি বেশ নরম। কোপ দিলেই উঠে চলে আসে।

কিন্তু ছয়...সাত...আট ফুট গর্ত করে ফেলার পরও কিছুই পাওয়া গেল না। শাবল কিংবা কোদালের ফলায় লেগে ঠং করে উঠল না লোহার সিন্দুক। আরও ফুট দুয়েক খুঁড়ে দেখল মুসা। গলগল করে পানি উঠে আসছে এখন গর্তের নিচে। ভরে যাচ্ছে।

বোঝা গেল, এখানে নেই সিন্দুকটা।

ক্লান্ত হয়ে বেতবন থেকে বেরিয়ে এলাম আমরা। সারা গা কাদায় মাখামাখি। দীঘির পানিতে ধুয়ে ফেললাম। খিদে ততটা পায়নি, কারণ কাজ করার ফাঁকে ফাঁকে প্রচুর আম খেয়েছি।

খানিকক্ষণ জিরিয়ে নিয়ে বাড়িতে এসে ভাত খেয়ে নিলাম। সকালেই রান্না করে রেখে গেছে আক্কেল আলী। তারপর আবার বেরোলাম গুপ্তধন খুঁজতে।

পুকুর আর দীঘিটা বাদে যত রকম জলাশয়, অর্থাৎ পানির আধার আছে ও বাড়িতে, সমস্ত জায়গায় খুঁজলাম। পানির ট্যাংকের ওপর উঠে ঢাকনা তুলে ভেতরটা দেখল মুসা। বাগানের ট্যাপের নিচে মাটি খুঁড়ে দেখা হলো। এমনকি ঘরে বাইরে যতগুলো কল আছে, সবগুলোর আশপাশের, নিচের দেয়াল ঠুকে ঠুকে

দেখলাম কোথাও ফাপা জায়গা আছে কিনা। টর্চের আলো ফেলে পুরানো। পাতকুয়াটার নিচেটা দেখলাম। পানি নেই এখন। শুকনো। সিন্দুক জাতীয় কিছু চোখে পড়ল না।

বেশ হতাশ হয়েই বিকেল বেলা হাসপাতালে রওনা হলাম তিনজনে। কালুকে রেখে গেলাম বাড়ি পাহারায়। টিক্কা খানও রইল, তবে তাকে দিয়ে কোন কাজ হবে না। চোর এলে ঠেকাতে পারবে না সে, ঠেকাতে যাবেও না। সে নিজেই একটা বড় চোর।

মতিদাদার অবস্থা আজকে বেশ খারাপ মনে হলো। দাদীর মখ শুকনো। কি ব্যাপার? ডাক্তার বললেন, না, ভয় পাওয়ার কিছু নেই। জখমগুলো ফুলেছে, প্রচণ্ড ব্যথা, সেজন্যেই কষ্ট পাচ্ছেন দাদা। ব্যথা কমানোর ইনজেকশন দেয়া হয়েছে, সেই সঙ্গে ঘুমের ওষুধ, সেরে যাবে। অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়বেন দাদা।

দুঃখ করে দাদী বলতে লাগলেন, আমরাও বেড়াতে এলাম, আর এ রকম একটা অঘটন ঘটল। আটকে বসে থাকতে হচ্ছে তাকে, আমাদের জন্যে কিছুই করাতে পারছেন না।

তাঁকে নানা ভাবে সান্তনা দিলাম। কিশোর ইঙ্গিত দিল, খুব তাড়াতাড়িই গুপ্তধনগুলোও বের করে ফেলা যাবে। ও বাড়িতেই যে আছে ওগুলো, এখন এ ব্যাপারে সে নিশ্চিত।

ভিজিটিং আওয়ার শেষ হলে বাড়ি ফিরলাম আমরা।

সিংহ দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। ভেবেছিলাম, গেটের কাছে বসে থাকবে কাল, কিন্তু তাকে দেখলাম না। উঠানে এসে দেখি নিশ্চিন্ত মনে খাবার খুঁটছে একজোড়া ঘুঘু আর কয়েকটা কবুতর। কালু নেই। গেল কোথায়? হঠাৎ তার ঘেউ ঘেউ শোনা গেল মালীর ঘর থেকে, আমাদের সাড়া পেয়েই বোধহয় ডেকেছে।

গিয়ে দেখি বাইরে থেকে দরজায় শেকল তুলে দিয়ে ঘরে আটকে রাখা হয়েছে তাকে। অবাক কাণ্ড! কে করল এ কাজ?

গম্ভীর হয়ে কিশোর বলল, ওই চোরটা এসেছিল। কোন ভাবে কুত্তাটাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে গিয়ে ঘরে আটকে রেখে গুপ্তধন খুঁজেছে! জলদি এসো, দেখি কি করল!

আর কোথাও কোন পরিবর্তন দেখলাম না, কেবল হলঘরে আমিন উদ্দিন সরকারের ছবিটা মেঝেতে নামানো। তারমানে আমাদেরই মত ওটার পেছনে গুপ্তপথ আছে কিনা দেখতে চেয়েছে চোর। বোধহয় আমাদের সাড়া পেয়েই আর তোলার সময় পায়নি, তাড়াহুড়ো করে পালিয়েছে।

আচ্ছা, আক্কেল আলী কিছু করছে না তো? মুসার প্রশ্ন। মাথা নাড়ল কিশোর, মনে হয় না। এ বাড়ির অনেক পুরানো চাকর সে…
পুরানো চাকরেরা যে অঘটন ঘটায় না, এমন তো কোন কথা নেই। হাসপাতাল থেকে আমাদের অনেক আগে বেরিয়ে এসেছে সে।
সে তো বাজারে যাবে বলে।
আমরা তো আর সঙ্গে যাইনি। দেখব কি করে? বাজারে যাওয়ার ছুতো করে হয়তো এখানে চলে এসেছিল।
চুপ হয়ে গেল কিশোর। হা-না কিছু আর বলল না।
আমরা আসার ঘণ্টাখানেক পর ফিরল আক্কেল আলী। হাসল আমাদের দিকে তাকিয়ে। বলল, আজ পাঙ্গাস মাছ রান্না হবে। অনেক বড় দেখে এনেছি। টমেটো দিয়ে মাছ, ফুলকপি ভাজি, ডাল। আম-কাঁঠাল-দুধ তো আছেই। চলবে?
মুহূর্তে চোরের খাতা থেকে তাকে খারিজ করে দিল মুসা। তাড়াতাড়ি বলল, চলবে মানে! জলদি যাও, ভাই, রান্নাটা সেরে ফেলো! এতটা খিদে পেয়েছে বুঝিনি
আক্কেল আলী রান্নাঘরে চলে গেল। আমরা বেরিয়ে এসে বসলাম দীঘির ঘাটে। সূর্য তখন প্রায় ডুবে গেছে। পশ্চিম আকাশের বিশাল মেঘটা একটা লাল-কালো বিচিত্র পাহাড়ের মত লাগছে।
গুপ্তধনের ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করতে লাগলাম আমরা।
কিন্তু কোন মানে বের করতে পারলাম না। মুসা বলল, দেখো, আমার মনে হয় ওই মজা পুকুরটাতেই খোঁজা দরকার। জেলে নামিয়ে দিয়ে দেখা উচিত।
দাদা থাকলে সুবিধে হত, কিশোর বলল। বেকায়দা হয়ে গেল। দেখি আক্কেল আলীকে জিজ্ঞেস করে, সে কোন ব্যবস্থা করতে পারে কিনা।

.

খাবার টেবিলে বসে জিজ্ঞেস করা হলে আক্কেল আলীকে। কেন জাল ফেলতে চাই, জানতে চাইল সে। সব শুনে বলল, তা জেলের ব্যবস্থা করা যায়। নগদ টাকা দিতে হবে না। মাছ যা উঠবে তার অর্ধেক দিয়ে দিলেই হবে। কিন্তু ওই পুকুরটাতে ভাল জাতের মাছ কিছু নেই। শোল, গজার এসব ছাড়া।
ওসব মাছের ভাগ নিয়ে কোন জেলে জাল ফেলতে রাজি হবে না? কিশোর জানতে চাইল।
হয়তো হবে। শোল-গজারেরও মেলা দাম। মাছই পাওয়া যায় না আজকাল মোটে। ভোরবেলা বেরোব। পেয়ে যাব কাউকে না কাউকে।
রাতটা নিরাপদেই কাটল।
পরদিন সকালে জেলের ব্যবস্থা ঠিকই করে ফেলল আক্কেল আলী।

তিনবার করে বেড়া দেয়া হলো পুকুরটাতে। ভকভক করে নিচ থেকে কাদা উঠে ওপরের পানিও ঘোলা করে দিল, সর্বনাশ হয়ে গেল শাপলার। মাছ ধরা পড়ল প্রচুর–কই, শিং, মাগুর, টাকি, শোল এসব মাছ। জেলেরা অখুশি হলো না। অখুশি হলাম আমরা। সিন্দুক তো দূরের কথা, ছোটখাটো একটা বাক্সও পাওয়া গেল না। মাছের ভাগ নিয়ে চলে গেল জেলেরা। ভাগে পাওয়া বাকি অর্ধেক মাছের বেশির ভাগই আবার পুকুরে ছেড়ে দিল আক্কেল আলী, কিছু জিইয়ে রাখল খাওয়ার জন্যে।

দাদা আর দাদীর জন্যে খাবার নিয়ে হাসপাতালে চলে গেল সে। আমরা আবার এসে বসলাম পুকুর পাড়ে।

কিশোর হাত বাড়াল আমার দিকে, দেখি, দাও তো তোমার নোটবইটা। মেসেজের মানে বুঝতে হয়তো ভুল করেছি আমরা। অন্য কিছু বোঝাতে চেয়েছে।

কয়েকবার করে ছড়াটা পড়ল সে।

আমি বললাম, আচ্ছা, তোমার দেখার ভুল না তো? লিখেছে এক অক্ষর, তুমি পড়েছ আরেকটা, এমন হতে পারে না?

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। তা তো পারেই! চলো, দেখি!

ভুল একটা সত্যিই হয়েছে, বেরোলো সেটা। প্রথম লাইনে জানের নিচে আধার খোজোর জায়গায় হবে জালের নিচে আঁধার খোজো। মাত্র একটা চন্দ্রবিন্দুর গোলমাল। কিন্তু ওই একটা চন্দ্রবিন্দুই যে এভাবে ভোগাবে আমাদের, তা কি আর জানতাম!

মুসা বলল, লাভটা কি হলো? আগের মতই গ্রীক ভাষা হয়ে আছে। জালের নিচে আঁধার কোথায়? জাল নিজেই তো একটা ফাঁকওয়ালা জিনিস…

লেখাটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল কিশোর। বলল, বোধহয়, বুঝেছি! এসো!

সোজা আমাদের থাকার ঘরে চলে এল সে। চৌকাঠের নিচ থেকে বের করল লুকিয়ে রাখা চাবিটা। টর্চ নিয়ে এগোল আলমারির দরজার মত দরজাটার দিকে। কোন প্রশ্ন করলাম না। জানি, নিজে থেকে কিছু সে না বললে প্রশ্ন করে তার কাছে থেকে জবাব পাব না।

দরজা খুলে আমাদের নিয়ে চলে এল সিঁড়ির নিচে। জালের মত ঢাকনাটার কাছে এসে কিশোর বলল, দেখো, এইটাকে যদি জাল ধরে নিই, তাহলে এর নিচে কি আছে?

কয়লা, নিরীহ স্বরে জবাব দিল মুসা।

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, অন্ধকার!

হ্যাঁ, অন্ধকার, মাথা ঝাঁকাল কিলোর, মানে, আঁধার। জালের নিচে আঁধার খুঁজতে বলা হয়েছে। চলো, সেটাই এখন খুঁজি।
একটানে ঢাকনাটা খুলে নিয়ে সবার আগে নেমে পড়ল মুসা। আমি আর কিশোর নামলাম তার পেছনে। দেয়াল ঠুকে ঠুকে পরীক্ষা করলাম আমরা। মেঝে পরীক্ষা করলাম–জায়গায় জায়গায় ছাল-চামড়া ওঠা, মেরামত করার কথাও আর মনে হয়নি কারও। এখানে নামেই না কেউ। প্রায়োজন পড়ে না। কোথাও কোন ফাপা শব্দ হলো না। ঘরে কোন জানালা দরজা নেই, আলো আসার পথ নেই, ঢোকার একমাত্র পথ ওই জালিকাটা ঢাকনাটা।
সিন্দুকটা আছে কোথায়? প্রশ্নটা আমাদের সবারই মনে।
এককোণে অযত্নে ফেলে রাখা হয়েছে কিছু কয়লা, ছোট একটা ভূপ। সেদিকে তাকিয়ে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে লাগল কিশোর।
বাইরে কালুর ঘেউ ঘেউ শোনা গেল। সে যে উত্তেজিত হয়ে ডাকছে, গুপ্তধনের চিন্তা আমাদের মাথায় না থাকলে হয়তো বুঝতে পারতাম। কিন্তু এ-মুহূর্তে কোন গুরুত্বই দিলাম না ডাকটাকে।
কয়লার স্তূপের দিকে হাত তুলল কিশোর, ওর নিচে দেখতে হবে।
মরচে পড়া একটা বেলচা পড়ে আছে। সেটা তুলে নিল মুসা।
কয়লা সরাতে দেরি হলো না। মেঝেতে দেখা গেল খানিকটা জায়গার প্লাস্টার নেই। ইট বেরিয়ে আছে। ওরকম ইট ঘরের অনেক জায়গাতেই বেরিয়ে আছে। আলাদা কিছু না। খুব একটা আশা করতে পারলাম না।
শাবল দিয়ে চাড় মেরে সেগুলো তোলার পরই কিন্তু বেরিয়ে পড়ল একটা খুদে আয়রন সেফ। চিত করে শোয়ানো। ডালা এবং হাতল ওপরের দিকে করা।
উত্তেজনায় প্রায় কাঁপছি আমি। মুসার অবস্থাও আমারই মত।
আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসল কিশোর। বলল, জালের নিচে আঁধার খোজো, সিন্দুক আছে তাহার ভেতর। এটুকু মিলে গেল। এবার পরের লাইন–সাত তিন পাঁচ মিলিয়ে দেখো। এটা সহজ, নিজেই যেন নিজেকে বোঝাচ্ছে সে, লক কম্বিনেশন। চাবির ফুটোয় চাবি ঢুকিয়ে মোচড় দিল। ঘুরল না। নব ধরে কম্বিনেশন মেলাতে শুরু করল-সাত...তিন...পাঁচ। কট করে একটা আওয়াজ হলো। আবার চাবিতে মোচড় দিতেই খুলে গেল তালা।
হাতল ধরে বাঁকা করে চাপ দিয়ে টেনে ডালা খুলল কিশোর।
হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম আমরা। টর্চের আলোয় যেন জ্বলতে লাগল সোনা আর পাথরে তৈরি মহামূল্যবান জিনিসগুলো।
দীর্ঘ একটা মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে থাকার পর নীরবতা ভাঙল মুসা, খাইছে, কি জিনিসরে বাবা! দাম কত হবে?

খড়খড়ে গলায় জবাব এল ওপরের ঢাকনার কাছ থেকে, অনেক! কোটিখানেক টাকা হলেও অবাক হব না। অনেক ধন্যবাদ তোমাদেরকে, খুঁজে বের করার জন্যে।
ঝট করে ফিরে তাকালাম আমরা। অপরিচিত একটা লোক। হাতে পিস্তল। ধীরপায়ে সরু সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসতে শুরু করল সে।
কয়লার ঘরের মেঝেতে এসে দাঁড়াল লোকটা।
কে আপনি? কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করছে কিশোর, বুঝতে পারছি।
বললেই কি আর চিনবে? খড়খড়ে গলায় বলল লোকটা, আমার নাম রবিউল। কিন্তু অনেকেই আমাকে দেখতে পারে না, বলে রবিগুণ্ডা। তাতে অবশ্য আমি কিছু মনে করি না, আড়ালে বলে তো। সামনে বলার সাহস কারও নেই।
কি চান?
সেটা আবার বলে দিতে হবে নাকি? হাতে করে আনা একটা চটের ব্যাগ ছুঁড়ে দিয়ে বলল রবিগুণ্ডা, অনেক করেছ, ছোট্ট আরেকটা কাজ করো, জিনিসগুলো ভরে দাও, নিয়ে বিদেয় হই।
তারমানে আপনিই লেগেছিলেন পেছনে। ছবি চুরি করেছেন, খালি বাড়িতে এসে কালুকে মালীর ঘরে ভরে রেখে অনুসন্ধান চালিয়েছেন…
কালু কি কুত্তাটার নাম নাকি? ভীষণ পাজি। এখন ও তো ঢুকতেই দেবে না। শেষে মাথায় বাড়ি দিয়ে বেহুশ করে ফেলে রেখে আসতে হলো।
মতিদাদার গাড়িতেও আপনিই ধাক্কা লাগিয়েছিলেন নাকি?
খিক খিক করে হাসল রবিগুণ্ডা। না, আমি না, আমার এক দোস্ত।
ও। একটা মুহূর্ত চুপ করে রইল কিশোর। গালে হাত ডলল। তারপর বলল, তার মানে একা কাজ করছেন না আপনি। দলে আরও লোক আছে। আপনাদের বস কে?
হাসি হাসি ভাবটা দূর হয়ে গেল রবিগুণ্ডার মুখ থেকে। আচমকা খেঁকিয়ে উঠল, এত কথা জিজ্ঞেস করো কেন! যা বলছি, করো, জিনিসগুলো ব্যাগে ভরে দাও গুলি খেতে না চাইলে! জলদি!
আচ্ছা আচ্ছা, যাচ্ছি! তাড়াতাড়ি বলল কিশোর। গুলি করবেন না!
এক ধমকেই কাবু হয়ে গেল! এটা তো তার স্বভাব না। কোন চালাকি করছে না তো? পরস্পরের দিকে তাকালাম আমি আর মুসা।
আড়চোখে দেখলাম, সেটার কাছে গিয়ে আবার বসে পড়ল কিশোর। লোকটার দিকে পেছন করে। হাঁ হয়ে খুলে থাকা ডালার নিচে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে বের করে আনল চাবিটা, আলগোছে ফেলে দিল বুক পকেটে, লোকটার অলক্ষে। তারপর

এক ঝটকায় ডালাটা আবার লাগিয়ে দিয়ে কম্বিনেশনের নব ঘুরিয়ে সব নম্বর দিল এলোমেলো করে।
অ্যাই, কি করো, কি করো! বলে চিৎকার করে উঠল লোকটা।
হাত ঝাড়তে ঝাড়তে উঠে দাঁড়াল কিলোর। ডালাটা বন্ধ করে দিলাম।
খোলো, নইলে গুলি করব!।
পা বাড়াতে গেল মুসা। ঝট করে তার দিকে পিস্তল ঘুরিয়ে ধমক দিল রবিগুণ্ডা, খবরদার!
থেমে গেল মুসা।
কঠিন কণ্ঠে বলল লোকটা, এক থেকে তিন পর্যন্ত শুনব। এর মধ্যে না খুললে প্রথমে পায়ে গুলি করব, তারার… কি করবে পিস্তল নাচিয়ে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল সে।
শুনল, এক!
চুপ করে রইলাম আমরা। কিশোর কি করে দেখছি।
কয়েক সেকেন্ড বিরতি দিয়ে আবার বলল রবিগুণ্ডা, দুই!
কিশোর চুপ।
উসখুস করছে মুসা। আমারও অস্থির লাগছে।
ঠিক এই সময় একটা নড়াচড়া লক্ষ করলাম ওপরে। দেখলাম, ঢাকনার কাছে নীরবে এসে দাঁড়িয়েছে কাল। লোকটা তিন গোনার সঙ্গে সঙ্গে ঘাউ করে একটা হাঁক ছেড়ে বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর।

.
একসঙ্গে ঘটে গেল কয়েকটা ঘটনা। আমাকে ওপর দিকে তাকাতে দেখেই সন্দেহ হওয়ায় রবিগুণ্ডাও তাকিয়েছিল। সরে যাওয়ার চেষ্টা করল সে। তাতে লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো কালু, টুটি কামড়ে ধরতে পারল না। তবে একেবারে বিফল হলো না তার। আক্রমণ। ঝাড়া লেগে হাত থেকে পিস্তলটা উড়ে চলে গেল নোকটার।
এ রকম একটা সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল মুসা। চোখের পলকে গিয়ে পড়ল লোকটার ওপর। জাপটে ধরে এক ল্যাঙ মেরে ফেলে দিল মেঝেতে। আমিও চুপ রইলাম না। তুলে নিলাম পিস্তলটা।
আবার গলায় কামড় বসাতে গেল কালু। মার খেয়ে হিংস্র হয়ে উঠেছে, প্রতিশোধ নিতে চাইছে লোকটার ওপর। গলার কলার টেনে তাকে আটকাল কিশোর।
পিস্তলটা আমাদের দখলে চলে আসায় আর কিছু করতে পারল না রবি। তা ছাড়া একা সে, আমাদের তিনজনের সঙ্গে পারবে না, তার ওপর রয়েছে সাংঘাতিক খেপে যাওয়া একটা কুকুর। আর গোলমাল করল না সে।

তাকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম আমরা। ছাড়া রাখতে সাহস পাচ্ছি না। তাই একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে ফেলার ব্যবস্থা করলাম। এরপর বসলাম আলোচনায়, কি করা যায়?

কিশোর বলল, থানা অনেক দূরে। অতটা পথ তাকে হটিয়ে নিয়ে যাওয়া নিরাপদ না। তা ছাড়া একটা লোককে পিছমোড়া করে বেঁধে পিতলের মুখে নিয়ে চললে ভিড় করে আসবে লোকে। কেন নিয়ে চলেছি, কি করেছে সে, জিজ্ঞেস করে করে জান অস্থির করে দেবে। বলতে হবে আমাদের। গুপ্তধনের খোঁজ পেয়েছি যে জানাজানি হয়ে যাওয়ার ভয় আছে। চোর-ডাকাতের তো অভাব নেই। আরও অনেকেই এসে লুট করার চেষ্টা করবে তখন।

তাহলে কি করব? বললাম, একে এখানে এভাবেই বেঁধে রেখে যাই। থানায় গিয়ে পুলিশকে খবর দিই, পুলিশই এসে ধরে নিয়ে যাক।

এটাই ভাল, মুসা বলল। রবিগুণ্ডার দিকে তাকাল সে। হেসে বলল, কি মিয়া, থাকতে পারবে না? কালুকে পাহারায় রেখে যাব। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এখানে পাখি দেখবে। সময়টা খারাপ কাটবে না।

থানায় এসে দাদায় পরিচয় জানিয়ে, আমরা তার কি হই বলে, চোর ধরার খবরটা দিলাম। গাড়ি নিয়ে রওনা হলেন একজন সাব ইন্সপেক্টর। তাঁর নাম ফারুক হোসেন।

কিন্তু সাংঘাতিক একটা চমক অপেক্ষা করছিল আমাদের জন্যে। গাছের কাছে। এসে দেখলাম, রবিগুণ্ডা পালিয়েছে। কয়েক টুকরো কাটা দড়ি পড়ে আছে গোড়ায়। কালুকে ছেড়ে রেখে গিয়েছিলাম, তাকে এখন বেঁধে রাখা হয়েছে গাছের সঙ্গে। আমাদের দেখেই কেউ কেউ করে উঠল।

অপদার্থ কুকুর! মার খায়, ধরা পড়ে, এ একটা কুকুর হলো নাকি! গাধা! বিরক্ত হয়ে বলল মুসা। হত যদি জিনার রাফিয়ান, কিংবা আমাদের চিতা, টের পেত বাছাধন। পালাতে আর হত না। কিন্তু ছুটল কি করে লোকটা?

গম্ভীর হয়ে কিশোর বলল, গিটগুলো হয়তো শক্ত করে দাওনি। ভুল হয়ে গেছে। আমাদের একজনের থাকা উচিত ছিল এখানে।

আমরা যে মিথ্যে বলিনি, বিশ্বাস করলেন সাব-ইন্সপেক্টর। কাটা দড়িগুলো আছে। সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো পিস্তলটা। ওটা তার হাতে তুলে দিলাম আমরা। চোরটাকে ধরার সব রকম চেষ্টা করা হবে-এই আশ্বাস দিয়ে চলে গেলেন তিনি।

আপাতত আর কোন কাজ নেই। খাওয়া-দাওয়া সেরে হাসপাতালে রওনা হলাম আমরা। দাদার খোঁজও নেব, গুপ্তধন পাওয়ার সুখবরটাও তাঁকে জানাব।

বলো কি বিশ্বাসই করতে পারলেন না দাদা। সত্যি পেয়েছ! গোয়েন্দা বটে তোমরা! কিন্তু আর ও বাড়িতে ফিরে যাওয়া চলবে না তোমাদের। হোটেলে থাকবে। বলা

যায় না, দলবল নিয়ে আবার ফিরে আসতে পারে রবিগুণ্ডা। ক্ষতি করবে তোমাদের।
তা পারবে না, কিশোর বলল। সাবধান থাকব। ওর মত গুণ্ডাকে কেয়ার করি না আমরা। এর চেয়ে অনেক বড় বড় চোর-ডাকাতের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছে। আমাদের। ও কিছু করতে পারবে না। হোটেলে থাকলে গুপ্তধনগুলো পাহারা দেবে কে?
পুলিশকে বলোনি ওগুলোর কথা? অবাক হলেন দাদা।
না। বলেছি, পিস্তল দেখিয়ে ঘরে ডাকাতি করতে এসেছিল রবিশুণ্ডা। কালুর সাহায্যে আটকে ফেলেছি।
ইস, অ্যাক্সিডেন্ট করার আর সময় পেলাম না। এখন বাড়ি থাকা উচিত ছিল আমাদের।
অ্যাক্সিডেন্টটা ইচ্ছে করে ঘটানো হয়েছে, আপনাকে সরিয়ে দেয়ার জন্যে। রবিগুণ্ডা একা নয়, আরও লোক আছে। আমার বিশ্বাস, দলের নেতা অন্য কেউ। আড়ালে থেকে যে কলকাঠি নাড়ছে। ওরা ভেবেছিল, আপনি হাসপাতালে গেলে দাদীও বাড়ি থাকবে না। তাহলে আমাদেরকেও অন্য কোথাও চলে যেতে হবে। এই সুযোগে গুপ্তধনগুলো বের করে নিয়ে যেতে পারবে ওরা। আমরা যে থেকেই যাব, বাগড়া দেব, এটা ভাবেনি।
সেই জন্যেই তো ভয়। রাগ করে এখন তোমাদের ওপর শোধ তোলার চেষ্টা করবে। অ্যাক্সিডেন্টে আমি মরেও যেতে পারতাম। কেয়ার করেনি ওরা। তারমানে তোমাদের খুন করতেও হাত কাপবে না ওদের। তাই বলছি...
বলাবলির কিছু নেই, দৃঢ়কণ্ঠে বলল কিশোর, আমরা ও বাড়িতেই ফিরে যাব। দেখাই যাক না, ওদের কতখানি দৌড়। গিয়েই জিনিসগুলো নিরাপদ কোথাও সরিয়ে ফেলব। আগের জায়গায় রাখা ঠিক হবে না।
কোথায় সরাবে?
দেখি গিয়ে। জায়গা একটা পেয়েই যাব। এতবড় বাড়িতে লুকানোর জায়গার অভাব হবে না।
আক্কেল আলীকে নিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম আমরা। দেখি, গাছেই বাধা রয়েছে। কালু। আমরা বেরোনোর সময় ওকে ছেড়ে দিতে ভুলে গিয়েছিলাম। আমাদের দেখে কুঁই কুঁই শুরু করল।
রাগ করে মুসা বলল, ঠিক হয়েছে! তোর মত একটা অপদার্থ গর্দভের ওরকম শাস্তিই হওয়া উচিত। গলায় দড়ি বেঁধে থাকতে কেমন লাগল?
গুপ্তধনগুলো দেখার জন্যে ভেতরে ভেতরে তড়পাচ্ছে আক্কেল আলী। বাড়ি এসে আর থাকতে পারল না। বলল, চলুন না, জিনিসগুলো দেখি।

তাকে নিয়ে কয়লা রাখার ঘরে ঢুকলাম আমরা। ঢুকেই চক্ষু স্থির। আয়রন সেফের ঢাকনা হাঁ হয়ে খুলে আছে। ভেতরে নেই জিনিসগুলো।
তাড়াতাড়ি গিয়ে হুমড়ি খেয়ে বসে পরীক্ষা করতে লাগল কিশোর। মুখ না তুলেই বলল, কোন ধরনের এক্সপ্লোসিভ দিয়ে তালা ভেঙে খোলা হয়েছে!
তারমানে অহেতুকই এত কষ্ট করলাম আমরা! তিক্তকণ্ঠে বলল মুসা। গেল জিনিসগুলো! আর পাওয়া যাবে না!
বাতাসে বারুদের কড়া গন্ধ। নাক উঁচু করে শুঁকতে শুঁকতে কিশোর বলল, বেশিক্ষণ হয়নি গেছে।
তাতে কি? ধরা তো আর যাবে না।
তবু এখুনি গিয়ে পুলিশকে জানানো দরকার।
থানায় গিয়ে সেই সাব ইন্সপেক্টরকে পাওয়া গেল-ফারুক হোসেন, তাঁর ডিউটি শেষ হয়নি। এইবার সব কথা, অর্থাৎ গুপ্তধনের কথাটাও খুলে বলতে হলো। মৃদু অনুযোগ করলেন তিনি, তখন জিনিসগুলোর কথা তাকে না জানানোয়। তাহলে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে পারতেন। ভুল যে হয়ে গেছে, স্বীকার করতেই হলো আমাদের।
ওয়্যারলেসে আশপাশের সমস্ত ফাঁড়িতে খবরটা জানিয়ে দিলেন তিনি। রেলস্টেশন, বাস স্টেশন আর যেদিকে যে-কটা মহাসড়ক বেরিয়ে গেছে, সবগুলোতে কড়া পাহারার ব্যবস্থা হলো। রবিগুণ্ডার চেহারার বর্ণনা দিয়ে দেয়া হলো। ওরকম চেহারার লোকের ব্যাপারে সতর্ক থাকবে পুলিশ।
দু-জন কনস্টেবলকে সঙ্গে করে নিয়ে এসে সরেজমিনে তদন্ত করে দেখে গরমের ছুটি গেলেন সাব ইন্সপেক্টর। বললেন, চোরটার কোন খবর পেলে আমাদের জানামো হবে।
আক্কেল আলী হাসপাতালে গিয়ে দাদাকে খবরটা জানানোর কথা বলল। কিশোর রাজি হলো না। অসুস্থ অবস্থায় তাকে সুখবর দেয়া যায়, কিন্তু দুঃসংবাদ জানানোটা উচিত নয়।

.

এরপর কয়েক দিন কেটে গেল। আর কোন ঘটনা ঘটল না। জমিদার বাড়িতে আছি আমরা। খাইদাই, ঘুরে বেড়াই আর গুপ্তধনগুলো পেয়েও হাতছাড়া হয়ে গেল বলে দুঃখ করি। ওগুলো উদ্ধারের আর কোন ব্যবস্থা করতে পারিনি।
দাদার অবস্থা ভাল হয়ে আসছে। পায়ের হাড় জোড়া লাগতে আরও দেরি হবে। তবে সে-জন্যে হাসপাতালে আর থাকার প্রয়োজন পড়বে না। শুনলাম, শথ্রি তাকে ছেড়ে দেয়া হবে।

রবিগুণ্ডা ধরা পড়েনি। তার কোন হদিসই করতে পারেনি পুলিশ। হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে যেন সে।
আমাদেরই খুঁজে বের করতে হবে ওকে, একদিন বলল কিশোর।
কি করে? মুসার প্রশ্ন। কোন সূত্র নেই আমাদের হাতে। কোথায় খুঁজব? পুলিশই যেখানে বিফল হয়েছে, আমরা কি করতে পারি?
তা জানি না। তবে কিছু একটা করা দরকার।
কোন ব্যাপারেই সহজে নিরাশ হওয়া কিশোরের ধাতে নেই।
যাই হোক, সুত্রটা হঠাৎ করেই পেয়ে গেলাম। কিংবা বলা যায় সূত্রের মালিককেই পাওয়া হয়ে গেল। সেদিন হাটের দিন। দুপুরের পর আক্কেল আলী কল, হাটে যাবে। আমরাও রওনা হলাম তার সঙ্গে।
বিরাট হাট বসেছে ময়নামতি বাজারের আশপাশ জুড়ে। ঘুরে ঘুরে সওদা করতে শুরু করল আক্কেল আলী! সব পাওয়া যাচ্ছে এখানে–মাছ, তরিতরকারি, ডিম, নানা রকম ফল। খুবই ভাল লাগত আমাদের, কিন্তু মজা অনেকখানি নষ্ট করে দিল আমাদের প্রতি মানুষের অস্বাভাবিক কৌতূহল। বিদেশী দেখলেই বোধহয় এ রকম করে ওরা। দল বেঁধে শুধু যে ছোট ছেলেরা পেছনে লাগল, তা নয়, অনেক বড় মানুষও আমাদের পিছে পিছে ঘুরতে লাগল। কোথায় যাই, কি করি, দেখে। শেষে ধমক দিয়ে ওদের সরাতে হলো আক্কেল আলীকে। তা-ও কি আর পুরোপুরি সরে। কয়েকটা ছেলে লেগেই রইল, এমন ভাবভঙ্গি ওদের, আমরা যেন চিড়িয়াখানার জীব, কিংবা ভিনগ্রহ থেকে নেমেছি।
এক জায়গায় গরম গরম জিলিপি ভাজা হচ্ছে দেখে লোভ সামলাতে পারল না মুসা, খেতে বসে গেল। আমি আর কিশোরও বসলাম। লোকের কৌতূহলী নজর আমাদের দিকে মুহূর্তের জন্যেও যেন সরাতে ইচ্ছে করছে না ওদের। আড়ষ্ট বোধ করতেন রকম ফুল মানুষের অস্থাটি করতে লাগলাম আমি। তবে মুসা ওসব কেয়ার করল না। কুড়মুড় করে খেয়েই চলল। দেখতে দেখতে সাবাড় করে দিল কেজিখানেক।
হঠাৎ এক চানাচুরওয়ালার ওপর চোখ পড়ল আমাদের। রঙিন বিচিত্র পোশক পরনে, মাথায় লম্বা চোখা টুপি, মুখে চোঙ। সেটাতে ফুঁ দিয়ে বো বো আওয়াজ করছে, অদ্ভুত ভঙ্গিতে কথা বলছে। যেন সার্কাসের সঙ। তার চোখও আমাদের ওপর। আমরা তাকাতেই দ্বিধা করল, চোখ নামিয়ে নিল, তারপর সরে চলে গেল আরেক দিকে।
লোকটাকে চেনা চেনা লাগল না? লোকটার পেছনটা দেখা যাচ্ছে, সেদিকে তাকিয়ে আছে কিশোর।

কিসের চেনা, জিলিপির আমেজে রয়েছে এখনও মুসা। পাশের দোকানে কদমা বিক্রি হচ্ছে। কদমার স্তূপের দিকে খেয়াল এখন তার। এখানে ওরকম সাজ সেজেই চানাচুর বিক্রি করে তো, পোশাকের জন্যে সবাইকেই এক রকম দেখা যায়।

আমি সেটা মানতে পারলাম না। লোকটাকে পরিচিত মনে হয়েছে আমারও। নিচু গলায় বললাম, রবিগুণ্ডা নয় তো? ছদ্মবেশে আছে?

উঠে দাঁড়াল কিশোর। এগিয়ে গেল লোকটার দিকে। আমিও এগোলাম তার সঙ্গে।

চানাচুর কেনার ছুতোয় লোকটাকে ভালমত দেখলাম আমরা। চুল কেটে, গোঁফ কামিয়ে, মুখে রঙ মেখে অনেক পরিবর্তন করে ফেলেছে চেহারার, কিন্তু কিশোরের তীক্ষ্ণ চোখকে ফাঁকি দিতে পারল না।

সরে এসে ফিসফিস করে আমাকে বলল সে, রবিগুণ্ডাই, কোন সন্দেহ নেই।

কি করব? পুলিশকে খবর দেব?

না, চোখ রাখতে হবে। বাজারের পর সে কোথায় যায় দেখব।

আক্কেল আলীকে লাগিয়ে রাখলাম তার পেছনে। আমরা লাগলে সন্দেহ করবে। সে ছদ্মবেশে থাকা সত্ত্বেও আমরা যখন তাকে চিনেছি, আমাদেরকেও নি চিনে ফেলেছে।

সন্ধ্যা হয়ে এল। বড় বড় কুপি বাতি জ্বেলে নিতে লাগল দোকানিরা, বাইরে যারা বসেছে। তবে আর বেশিক্ষণ চলল না হাট। ভেঙে গেল দ্রুত। বাজার থেকে বেরিয়ে একটা পায়েচলা মেঠোপথ ধরে রওনা হলো চানাচুরওলা। পিছু নিল আক্কেল আলী। তার সঙ্গে বেশ খানিকটা দূরত্ব রেখে অনুসরণ করলাম আমরা তিনজন।

শুরুতে পিছু নেয়াটা খুব একটা কঠিন হলো না, কারণ হাটফেরতা প্রচুর লোক চলেছে, তাদের সঙ্গে মিশে গেলাম আমরা। আকাশে চাঁদ আছে বটে, তবে চারু পাঁচদিনের। আলো যা আছে তাতে রাস্তা দেখা যায়, কিন্তু কয়েক গজ দূর থেকেও মানুষ চেনা যায় না। চানাচুরওলাকে চেনা যাচ্ছে তার বিচিত্র পোশাকের জন্যে, বিশেষ করে মাথার চূড়াওয়ালা টুপিটাই তার অস্তিত্ব ফাঁস করে দিচ্ছে।

এক জায়গায় এসে দু-ভাগ হয়ে গেছে রাস্তাটা। মূল পথটা চলে গেছে গায়ের দিকে, লোকজন সব সে-দিকে চলে গেল। রবি চলল অন্য পথটা ধরে নদীর দিকে। ভাগ্যিস এখানে চষা খেত আর নেই, ঝোঁপঝাড়ের ভেতর দিয়ে এগিয়েছে পথ, নইলে আমাদেরকে দেখে ফেলত সে। মাথা নুইয়ে ঝোঁপঝাড়ে গা ঢেকে নিঃশব্দে এগোলাম আমরা।

বেশ কাছে থেকেই তাকে অনুসরণ করে চলেছে আক্কেল আলী। কাজটায় ভয় যেমন লাগছে তার, মজাও পাচ্ছে। চমৎকার রোমাঞ্চ বোধ করেছে তার অনুভূতির কথা পরে সব বলেছে আমাদের।
হঠাৎ কি যেন ভেবে পেছন ফিরে তাকাল চোরটা। ঝট করে একটা ঝোঁপের পাশে বসে পড়ল আক্কেল আলী। তাকে আর দেখল না রবিগুণ্ডা।
এ কোথায় চলেছে সে?-অবাক হয়ে ভাবল আক্কেল আলী। ভাব দেখে তো মনে হচ্ছে নদীর পাড়ের শোনের দিকে চলেছে। সর্বনাশ! লোকটার কি ভয়ডর বলে কিছু নেই? ওখানেই তো আছে ভয়ঙ্কর এক কালী মন্দির, পারতপক্ষে ওদিকে ঘেষে না লোকে। এমনকি গরু চরাতেও যায় না রাখালরা। নেহায়েত বাধ্য হলে কোন কারণে দিনের বেলায়ও লোকে ওটার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দোয়া-দরূদ পড়ে বুকে ফুঁ দিতে দিতে যায়।
বিশাল এক নারকেল-সুপারির বাগানে ঢুকে গেছে পথটা। বাগানটার দুই পাশে বিরাট জঙ্গল। আম-কাঁঠাল-জাম ছাড়াও আরও নানা রকম গাছ আছে, মাঝে মাঝে বাশঝাড়। ভয়ানক জায়গা।
আক্কেল আলীকে অবাক করে দিয়ে একেবারে ওই কালী মন্দিরের সামনেই গিয়ে দাঁড়াল রবিগুণ্ডা। আরেক বার পেছনে তাকিয়ে দেখে নিশ্চিত হয়ে নিল কেউ পিছু নিয়েছে কিনা। কাউকে না দেখে ভাবল, নেয়নি। সেজন্যেই চোঙাটা নামিয়ে রেখে পকেট থেকে মোম আর দেশলাই বের করে ধরাল। আলো হাতে ঢুকে পড়ল মন্দিরের ভেতর।
পিছিয়ে এল আক্কেল আলী। ভয় পেয়েছে সে। দুই হাতে বাজারের ব্যাগ নিয়ে আরেকটু হলেই পড়েছিল আমাদের গায়ের ওপর।
কি হলো? জানতে চাইল কিশোর।
কা-কা-কালী মন্দিরে ঢুকল লোকটা!
তাতে কি?
বুঝতে পারছেন না? কাছেই শ্মশান, মড়া পোড়ানো হয়। আর ওই মন্দিরে কালীদেবীর পূজা হয়। বছরে একবার। বাকি সময়টায় খালিই পড়ে থাকে। লোকে বলে, ওই শশ্মশানের যত ভূতের আড্ডা ওই মন্দিরে।
খাইছে! আক্কেল আলীর চেয়ে বেশি ভয় পেয়ে গেল মুসা। আমি যাই!
ঘুরতে গেল সে। খপ করে তার হাত চেপে ধরল কিশোর। দাঁড়াও! রবিগুণ্ডাকে যখন ভূতে কিছু করে না, আমাদেরও করবে না। চলো, দেখি।
আগে আগে চলল কিশোর। তার পেছনে আমি। আমাদের পেছনে ভয়ে ভয়ে আসতে লাগল মুসা আর আক্কেল আলী।

মন্দিরের ভাঙা দরজা দিয়ে ভেতরের মোমের আলো দেখতে পেলাম। গাছপালার আড়ালে লুকিয়ে রইলাম আমরা।
ফিসফিস করে কিশোর বলল, এখানেই কোথাও লুকিয়ে রেখেছে গুপ্তধনগুলো। বেরও করতে পারছে না পুলিশের ভয়ে, নিয়ে পালাতেও পারছে না। নিতে পারলে এতদিনে পালিয়ে যেত। পুলিশকে ফাঁকি দেয়ার জন্যেই চানাচুরওয়ালার ছদ্মবেশে থাকতে হচ্ছে।
কিন্তু এই ব্যাটা এখানে থাকে কি করে! সাংঘাতিক অবাক লাগছে মুসার, এই ভূতের আড্ডায়!
তার মানেই তো বোঝা যাচ্ছে ভূতফুত কিছু নেই এখানে। কেউ আসেও না, নিরাপদ ভেবেছে জায়গাটা।
কি করব এখন আমরা? জিজ্ঞেস করলাম। লোকটাকে ধরার চেষ্টা করব?
না। ভয়ানক লোক সে। আরও পিস্তল থাকতে পারে তার কাছে। গুলি খেতে যাওয়ার মানে হয় না। তার চেয়ে এক কাজ করা যাক, তুমি আর আমি এখানে থাকি, মুসা আর আক্কেল আলী গিয়ে পুলিশকে খবর দিক। এখানে থেকে চোরটার ওপর নজর রাখব আমরা। আর তাকে পালাতে দেয়া যাবে না।
মুসা আর আক্কেল আলী চলে গেল।
চুপ করে বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম আমরা। একে তো জঙ্গল, তার ওপর শ্মশান, ভূতে বিশ্বাস না থাকলেও গা ছমছম করতে লাগল আমার। পরিবেশটা খারাপ। সেটাকে আরও ঘোরাল করে ভোলার জন্যেই যেন পেঁচা ডেকে উঠছে কর্কশ স্বরে, শোনা যাচ্ছে শেয়ালের হুক্কাহুয়া। কি করছে প্রাণীগুলো? নদীর ধারে কাঁকড়া খুঁজছে, না মড়ার তালাশে আছে?
কিশোর বলল, শ্মশান ছাড়া থাকে না। এমন করে পুরো শরীরটাকে পুড়িয়ে ফেলা হয়, ছাই ছাড়া আর কিছুই থাকে না। কাঁকড়া খুঁজতেই গেছে শেয়ালগুলো।
এ সব আলোচনাও এখন ভয় ধরাচ্ছে মনে। সারা আসে না কেন? মনে হতে লাগল, অনন্তকাল ধরে অনুপস্থিত ওরা।
অথচ বেশি সময় কিন্তু লাগল না ওদের। রবিগুণ্ডার ব্যাপারে সতর্ক হয়েই আছে পুলিশ। খবর শুনে একটা মুহূর্তও আর দেরি করলেন না সাব ইন্সপেক্টর ফারুক হোসেন। দলবল নিয়ে হাজির হয়ে গেলেন। গাড়ির শব্দ শুনলে সাবধান হয়ে গিয়ে পালানোর চেষ্টা করতে পারে চোরটা, সেজন্যে খেতের কিনারে গাড়ি রেখে এতদূর হেঁটে এসেছেন।
সামান্যতম বাধা দিতে পারল না রবিগুণ্ডা, কল্পনাই করেনি তার পিছু নিয়ে এখানে এসে হাজির হয়েছি আমরা। ও বোধহয় ভেবেছিল, আমরা তাকে চিনতে পারিনি।

তাকে নিয়ে যাওয়ার সময় কিশোর অনুরোধ করল ফারুক সাহেবকে, স্যার, নিয়ে গিয়ে তো নিশ্চয় কথা আদায়ের চেষ্টা করবেন। কি বলল না বলল আমাদের জানাবেন?
নিশ্চয় জানাব। পুলিশকে অনেক সাহায্য করেছ তোমরা। ধন্যবাদ। এক কাজ কোরো, কাল সকালে চলে এসো। আমার ডিউটি থাকবে তখন।
সুতরাং পরদিন সকালে উঠেই থানায় গিয়ে হাজির হলাম আমরা।
আমাদের বসতে দিলেন ফারুক সাহেব। চা-বিস্কুট আনালেন। কোন খবর আছে কিনা জানতে চাইল কিশোর।
মাথা নাড়লেন তিনি। মহাপাজী। স্বীকার কি আর করে। অনেক চেষ্টা করেছি। একটা কথাই স্বীকার করেছে, পিস্তলটা তার, ওটা দেখিয়ে তোমাদের হুমকি দিয়েছে–না করে পারেনি, তার কারণ পিস্তলে তার আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে। কিন্তু গুপ্তধনের কথা কিছুই বলেনি সে। সেফের তালা ভেঙে সে নাকি নেয়নি।
মন্দিরের ভেতরটা ভালমত খুঁজে দেখা দরকার ছিল, কিশোর বলল।
হাসলেন সাব ইন্সপেক্টর। দেখিনি মনে করেছ? আজ ভোরে উঠেই দু-জন লোক পাঠিয়েছি। তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে সব। কিচ্ছু পায়নি।
হতাশ হলাম।
আমাদের মুখ দেখে সান্তনা দেয়ার জন্যে বললেন তিনি, ধরা যখন পড়েছে, স্বীকার ওকে করতেই হবে। সরকার সাহেবকে বোলো, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওগুলো বের করে তাকে ফেরত দেয়ার চেষ্টা করব।
হাসপাতালে দাদার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম আমরা। সব জানালাম তাকে, আর কিছু গোপন করলাম না। দাদা-দাদী দু-জনেই খুব বকলেন আমাদের, ওসব ভয়ঙ্কর চোর-ডাকাতের সঙ্গে লাগতে গিয়েছি বলে। শেষে দাদা বললেন, খবরদার, ওসবের মধ্যে আর যাবিনে। পুলিশ কিছু করতে পারে ভাল, না পারে নেই, টাকা লাগবে না আমার। তোদের যে কোন ক্ষতি হয়নি এতেই আমি খুশি।
কিন্তু আমরা খুশি হতে পারলাম না। এত কষ্ট করে জিনিসগুলো উদ্ধার করলাম আমরা, আর সেটা কেড়ে নিয়ে যাবে একটা চিকে চোর, কিছুতেই মেনে নিতে পারলাম না।
কিশোর তো আরও পারল না। বাড়ি ফিরেই তার প্রথম কথা হলো, দাদুরা আসবেন পরশুদিন। তার আগেই বের করতে হবে গুপ্তধনগুলো।
কি করে? জানতে চাইল মুসা।
আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ওই কালী মন্দিরের কাছেই কোথাও আছে ওগুলো। ওখানে থেকেছে রবিগুণ্ডা, জিনিসগুলো দূরে কোথাও রাখবে না। চোখে চোখে রাখতে চাইবে, এটাই স্বাভাবিক।

সুতরাং সেদিন দুপুরের খাওয়ার পর আবার গেলাম আমরা শ্মশানে। দিনের বেলা অতটা ভয় লাগে না জায়গাটাকে। তবে মানুষজনের আনাগোনা মোটেও নেই। পাখির ছড়াছড়ি। এত ঘুঘু দেখা গেল, এয়ারগানটা কেন নিয়ে এল না, সে জন্যে আফসোসের সীমা রইল না মুসার।
মন্দিরের কাছে এসে আশপাশের বনের ওপর চোখ বোলাল মুসা। কোথায় থাকতে পারে, বলো তো?
আছে এখানেই কোথাও, জবাব দিল কিশোর। মন্দিরের ভেতরে নেই, তাহলে পেয়ে যেত পুলিশ। তারমানে বাইরে রেখেছে। মাটিতে পুঁতেও রাখতে পারে।
তাহলে বের করতে বুলডোজার লাগবে... আচমকা থেমে গেল মুসা। কান পাতল। কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে বলল, এই, মন্দিরের ভেতর লোক আছে! কথা শুনলাম!
মুসার কানের ওপর ভরসা আছে আমাদের। তাড়াতাড়ি লুকিয়ে পড়লাম ঝোঁপের ভেতর।
চুপ করে বসে রইলাম পুরো একটা মিনিট। তারপর উঠে দাঁড়াল মুসা, তোমরা থাকো এখানে। আমি দেখে আসি।
পা টিপে টিপে মন্দিরের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল সে। কান পেতে শুনল কয়েক মিনিট। ফিরে এসে বলল, দু-জন লোক। গুপ্তধন খুঁজতে এসেছে। রবিগুণ্ডার দলের। সে নাকি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে ওদের সঙ্গে। শফিক সাহেব বলে একজন লোকের কথা বলছে, ওই লোক ওদের বস্। ভয়ানক খেপে গেছে নাকি সে। রবিউলকে ধরতে পারলে চামড়া ছাড়াত, পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে বলে রক্ষা।
আরও কয়েক মিনিট পর খালিহাতে বেরিয়ে এল লোকগুলো। খুব রেগেছে, চেহারা দেখেই আন্দাজ করা যায়। একজনের রোমশ শরীর, মুখটা শিম্পাঞ্জীর মত। আরেকজন রোগা-পটকা, খাটো। মুখে বসন্তের দাগ। পান-ধাওয়া কালো দাঁত। মুখটা ছুঁচোর মত।
অহেতুক এখানে সময় নষ্ট করছি, মাইনকা, গরিলা বলল। রইব্বা হারামজাদাটা যে এত্তবড় শয়তান জানতাম না!
জানাজানি রাদ দিয়ে আরও ঘেঁজ, ছুঁচো, অর্থাৎ মানিক বলল। খালিহাতে গেলে যত ঝাল আমাদের ওপর ঝাড়বে শফিক সাহেব।
আমরা কি করব, না পেলে?
রইব্বাটা আমাদেরও ফাঁসিয়ে দিয়ে গেল। খালিহাতে গেলে শফিক সাহেব ভাববে, আমরাও মিছে কথা বলছি। বেঈমানী করছি, ক্ষোভের সঙ্গে বলল মানিক।

মন্দিরের বাইরেও খুঁজতে শুরু করল ওরা। দেখছে, কোনখানে মাটি খোঁড়া হয়েছে কিনা। মন্দিরের দেয়ালের ফাঁকফোকরও বাদ দিল না। যেখানেই কোন জিনিস লুকানোর মত জায়গা দেখছে, তার ভেতরে হাত ঢুকিয়ে কিংবা উঁকি দিয়ে দেখছে। কথা বলছে। বেশির ভাগই রবিগুণ্ডাকে গালাগাল, আর নিজেদের ভাগ্যকে দোষারোপ। শিম্পাঞ্জীর মত লোকটার নামও জানতে পারলাম, বদু।
খুঁজতে খুঁজতে আমাদের কাছাকাছি চলে এল দু-জনে। ঠিক এই সময় মুসার পেল হাঁচি। কিছুতেই চেপে রাখতে পারল না, হ্যাঁচচো করে উঠল প্রচণ্ড জোরে।

.

দৌড়ে এল দুই চোর।
ঝোঁপ থেকে প্রায় টেনে-হিঁচড়ে বের করল আমাদের। চিনে ফেলল। নিশ্চয় রবিগুণ্ডার কাছে আমাদের কথা শুনেছে। বার বার জিজ্ঞেস করতে লাগল, কেন এখানে এসেছি।
রোমাঞ্চকর এক গল্প ফেঁদে বসল কিশোর, বদুটাকে প্রায় বিশ্বাসও করিয়ে ফেলেছিল, কিন্তু মানিককে ফাঁকি দেয়া গেল না। সে বলল, ওসব ধানাই-পানাই করে লাভ নেই। তোমরাই গুপ্তধনগুলো খুঁজে বের করেছ, শুনেছি। একবার যখন পেরেছ, আবারও পারবে। আর সেগুলো খুঁজতেই এসেছ তোমরা। ভালই হলো। খোজো, বের করে দাও। ছেড়ে দেব।
কি আর করা? কিশোর বলল, মন্দিরের ভেতর থেকে শুরু করব।
ওখানে কি দেখবে? বদু বলল। পুলিশ দেখেছে। আমরাও দেখেছি। কিছুই নেই।
তবু দেখব। বলা যায় না, আপনাদের চোখ এড়িয়েও গিয়ে থাকতে পারে।
আমার মনে হলো, ফাঁকি দিতে চাইছে কিশোর। খামোকাই এখানে ওখানে খুঁজবে, কিছু না পেলে শেষে বিরক্ত হয়ে আমাদের ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে লোকগুলো; তারপর গিয়ে আসল জায়গায় খুঁজব আমরা-এমন কিছু হয়তো ভাবছে সে।
কি যেন ভাবল মানিক। দ্বিধা করল একবার। তারপর বলল, বেশ, খোঁজা। এসো। আমাদের সঙ্গে আবার মন্দিরে ঢুকল ওরাও।
ভেতরটা আবছা অন্ধকার। কেমন একটা ধোয়াটে গন্ধ। মাকড়সার জাল ঝুলছে যেখানে সেখানে। একধারে বেদীতে কালীমূর্তি। লাল জিভ বের করা, গলায় মাটির তৈরি নরমুণ্ডের মালা। একহাতে খাড়া। ভয়ানক চেহারা।
মুসা তো দেখে আঁতকেই উঠল।
গুপ্তধন লুকানোর মত জায়গা তেমন নেই। এককোণে পড়ে আছে চানাচুরওয়ালার পুরানো টিনের বাক্স আর চোঙটা। বাক্সটায় তেল চিটচিটে ময়লা একটা কাপড় বাধা, গলায় ঝোলানোর জন্যে। বাক্সের ওপরে ছড়ানো

গোল বারান্দামত জায়গাটায় অনেকগুলো খুপরি, তাতে তেল-মশলার শিশি। খোপে খোপে ডাল ভাজা, বাদাম ভাজা, পেঁয়াজ-মরিচ, আর চানাচুর বানানোর অন্যান্য উপকরণ সাজিয়ে রাখা।
অনেক খোঁজাখুঁজি করলাম আমরা সবাই মিলে। মূর্তির পেছন দিকটা ভাঙা, ভেতরের খড়গুলো টেনে টেনে বের করা হয়েছে।
কিশোর জানতে চাইল, কে বের করেছে এগুলো? আপনারা?
না, মাথা নাড়ল মানিক। আমার মনে হয়, প্রথমে এর মধ্যেই জিনিসগুলো লুকিয়েছিল রইব্বা, তারপর বের করে আবার অন্য কোথাও রেখেছে।
ভাঙা ফোকরটার দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। চিন্তিত মনে হলো তাকে। কোমরে ঝোলানো টর্চ খুলে নিয়ে মূর্তির ভেতরে আলো ফেলে ফাপা জায়গাটা দেখল। আরও কিছু খড় বাদে আর কিছুই নেই ভেতরে।
মন্দিরের ভেতরে পাওয়া গেল না জিনিসগুলো।
গজগজ করতে লাগল বদু বলেছি না নেই, শুধু শুধু সময় নষ্ট!
বিরক্ত হয়ে ধমক দিল মানিক, আহ, থাম তো তুই! ওদের কাজ ওদেরকে করতে দে!
বাইরে এসে আবার খোঁজা হলো। মন্দিরের চারপাশে বেশ অনেকখানি জায়গার মাটি পরীক্ষা করা হলো। কোথাও নতুন খোঁড়া কোন গর্ত পাওয়া গেল না। গাছের কোটরও বাদ দেয়া হলো না। কিন্তু কোথায় যে গুপ্তধনগুলো লুকিয়েছে রবিগুণ্ডা, তার কোন হসিদই পাওয়া গেল না।
নিতান্ত নিরাশ হয়েই আমাদের ছেড়ে দিল দুই চোর। শাসিয়ে দিল, ওদের পিছু নেয়ার চেষ্টা করলে ভাল হবে না।
হাঁটতে লাগল ওরা। একটাই রাস্তা। সুতরাং ওদের পিছু নেয়া ছাড়া উপায় থাকল না আমাদের। ওরাও জানে, কিছুদূর এগিয়ে দুটো রাস্তা দুদিকে চলে গেছে। তাই আমরা পিছে পিছে হাঁটায় কিছু বলল না।
কথা বলতে বলতে চলেছে বদ আর মানিক, আমাদের আগে আগে। দ্রুত হাঁটছে ওরা। ফিরেও তাকাল না আমাদের দিকে। নারকেল বাগানের বাইরে বেরিয়ে ওরা চলে গেল একপথে, আমরা আরেক পথে।
খেত পেরিয়ে বড় রাস্তায় উঠতে উঠতেই সন্ধ্যা হয়ে গেল। গাঁয়ের মসজিদ থেকে আজান শোনা যাচ্ছে। হঠাৎ আমার হাত চেপে ধরল কিশোর। দাঁড়াও। বাড়ি যাব না আমরা!
তাহলে কোথায় যাবে? অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।
গুপ্তধনগুলো আনতে।

খাইছে! বলো কি? মুসাও আমার মতই অবাক হয়েছে। জানো নাকি কোথায় আছে ওগুলো? তাহলে বের করলে না যে?
বের করলেই তো নিয়ে যেত ওই দুই চোর।
কোথায় আছে? জানতে চাইলাম আমি।
চলো, গেলেই দেখবে।
আকাশে চাঁদ আছে। পথ দেখে চলতে অসুবিধে হলো না। আবার এসে ঢুকলাম নারকেল বাগানে। সোজা মন্দিরের দিকে এগোল কিশোর। টর্চ আছে তার কাছে। কোমর থেকে খুলে নিয়ে জালল।
আমাদের নিয়ে আবার মন্দিরে ঢুকল সে। হেসে জিজ্ঞেস করল, বলো তো, কোথায় থাকতে পারে?
সাফ মানা করে দিল মুসা, জানি না। হাজার বছর একনাগাড়ে ভাবলেও আন্দাজ করতে পারব না!
বেশ, সূত্র দিচ্ছি, দেখো বুঝতে পারো কিনা। ধরো, অনেক দামী কিছু জিনিস আছে তোমার কাছে। ওগুলো সবচেয়ে বেশি নিরাপদ কোন জায়গায় থাকলে? এমন কোথাও, যেখানে রাখলে তোমার অজান্তে কেউ খুঁজে পাবে না, তোমাকে না জানিয়ে নিতে পারবে না কিছুতেই…
সঙ্গে সঙ্গে রাখলে, বললাম।
ঠিক। তুড়ি বাজাল কিশোর। রবিগুণ্ডার পকেটে ছিল না জিনিসগুলো। তাহলে কোথায়…
প্রায় চিৎকার করে উঠলাম, চানাচুরের বাক্স!
হেসে মাথা ঝাঁকাল কিশোর, হ্যাঁ। চলো, বের করে নিই।
বাক্সের ওপরের ডালাটা আলগা। সেটা সরাতেই দেখা গেল বাটা কানায়। কানায় ভরা ডালভাজা আর বাদামভাজায়। ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিল কিশোর। বের। করে আনল পানপাত্রটা। বলল, আর দেখার দরকার আছে? সব আছে এর মধ্যে।
কিশোর, তুমি একটা জিনিয়াস! না বলে পারল না মুসা।
নাও, চানাচুরওয়ালা সাজো এখন, হেসে মুসাকে বলল কিশোর। বাক্সটা গলায় ঝোলাও। রাত হয়েছে অনেক, বাড়ি যেতে হবে।
কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য তখনও কাটেনি। মন্দিরের দরজায় বেরোতেই দেখলাম দুই পাশে দুই প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে দুই চোর।
আমাদের দেখেই খিকখিক করে হেসে বলে উঠল মানিক, কি বদু বলেছিলাম না, ছেলেগুলো বোকা নয়। ওরা ঠিক বুঝেছে কোথায় আছে মাল। আমাদের চেয়ে অনেক চালাক। তুই তো বিশ্বাসই করতে চাস না। ফিরে না এলে কি হত, ভাব।

রইব্বাটাও কম চালাক না, ঘোঁৎ-ঘোৎ করে বলল বদু। অমন একটা চানাচুরের বাক্সের মধ্যে রেখে দেবে, কে ভাবতে পেরেছিল! আমরা তো আমরা, পুলিশই ধোকা খেয়েছে…কিন্তু এ তিনটেকে এখন কি করি?

কি আর করব। আটকে রেখে যাব মন্দিরের মধ্যে। মালগুলো দরকার ছিল আমাদের, পেয়েছি, ব্যস। যাওয়ার আগে একটা ধন্যবাদও দিয়ে যাব ওদের। আমাদের অনেক ঝামেলা বাঁচিয়ে দিল বলে। আবার খিকখিক করে হাসল মানিক। পকেট থেকে বের করল বড় একটা ছুরি। ফলা ধরে টানতেই কিটকিট শব্দ করে খুলে গেল ওটা। ঝিক করে উঠল চাঁদের আলোয়।

হাত বাড়াল সে, দাও, এবার বাক্সটা দিয়ে দাও দেখি। গোলমাল করলে ভূড়ি ফাঁসিয়ে দেব।

এই গুপ্তধন নিয়ে অনেক ঝামেলা সহ্য করেছি আমরা। বার বার উদ্ধার করছি, শেষ মুহূর্তে কেউ না কেউ এসে ছিনিয়ে নিচ্ছে। আর হাতছাড়া করতে রাজি নই আমরা কেউই।

কিশোর চুপ।

মুসাও চুপ। বারটা দেয়ার কোন লক্ষণ দেখাল না।

দাও বলছি! ধমক দিয়ে বলল মানিক।

চুপ করে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বহু। আমরা কেউ গোলমাল করলেই হাত তুলবে, ভঙ্গি দেখে বোঝা যাচ্ছে।

কিশোরের দিকে একবার তাকিয়ে আস্তে করে গলা থেকে বাক্স ঝোলানোর কাপড়টা খুলে নিল মুসা। এক পা বাড়াল মানিকের দিকে, ওটা দেয়ার ভঙ্গিতে।

ছুরিটা বাঁ হাতে নিয়ে মানিকও হাত বাড়াল।

কাপড়টা দুই হাতে চেপে ধরে মানিকের মাথা সই করে আচমকা ঘুরিয়ে বাড়ি মারল মুসা। প্রচুর জিনিসপত্র বোঝাই থাকায় ভারি হয়ে আছে বাক্স। ডাল, বাদাম, তেল-মরিচ-পেঁয়াজ সব ঝরে পড়ল বৃষ্টির মত। প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে ডালাটা খুলে উড়ে গিয়ে পড়ল কয়েক হাত দূরে।

মাথার একপাশে বাড়ি লেগেছে মানিকের। উহ করে মাথা চেপে ধরে বসে পড়ল সে। ছুরিটা ছেড়ে দিয়েছে হাত থেকে। কিশোরের টর্চের আলোয় পলকের জন্যে দেখলাম, মানিকের আঙুলের ফাঁকে রক্ত।

বাক্সের কাপড়টা হাত থেকে ছেড়ে দিল মুসা। মাটিতে পড়ে ঝনঝন করে উঠল বাক্স। তাকানও না সে। প্রায় ডাইভ দিয়ে পড়ে মাটি থেকে তুলে নিল মানিকের ছুরিটা।

নড়ে উঠল বদু। ঠেকানোর জন্যে এগিয়ে এল। ধরতে চাইল মুসাকে।

কিন্তু ততক্ষণে লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে সে। বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে ছুরি চালাল বদুর হাত সই করে। এফোঁড় ওফোড় করে দিল তালু।
মাগোহ! বলে চিৎকার করে উঠল বদু।
বিমূঢ় হয়ে গেছে দু-জনেই। মুসা যে এই কাণ্ড করে বসবে কল্পনাই করতে পারেনি। ওরা ভেবেছিল, তিনজনেই আমরা ছেলেমানুষ, ছুরি দেখিয়ে ধমক দিলেই পেসাব করে দেব।
এত দ্রুত ঘটে গেল ঘটনাটা, আমি বা কিশোরও স্তব্ধ হয়ে রইলাম একটা মুহূর্ত।
হাত বাড়াচ্ছে মানিক, মুসাকে ধরার জন্যে নয়, বাক্সটার দিকে।
আর একটা সেকেন্ডও দেরি করলাম না আমি। নিচু হয়ে এক থাবায় কাপড়টা ধরে হ্যাঁচকা টানে বাক্সটা তুলে নিয়েই দৌড় দিলাম বনের দিকে।
ধরো! ধরো! বলে চিৎকার করে উঠল মানিক।
পেছনে না তাকিয়েও বুঝতে পারলাম আলো নিভিয়ে দিয়েছে কিশোর। মুসাকে সাহায্য করতে হাত লাগিয়েছে।
কোন দিকে তাকালাম না। সোজা দৌড় দিলাম অন্ধকার বনের মধ্যে দিয়ে। আশা করলাম, পেছনে পায়ের শব্দ শুনতে পাব–বদু কিংবা মানিক, কোন একজন আমাকে তাড়া করে আসবেই।
কিন্তু এল না ওরা। মুসা আর কিশোর আটকে রেখেছে নিশ্চয় ওদের।
একটা ঘন ঝোঁপের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। বাক্সটা দু-হাতে ধরে বসে বসে হাঁপাতে লাগলাম। কান খাড়া রেখেছি কেউ আসে কিনা শোনার জন্যে। প্রতিজ্ঞা করে ফেলেছি, যা হয় হবে, গুপ্তধনগুলো আর চোরের হাতে পড়তে দেব না।
লড়াইয়ের শব্দ কানে আসছে। এখনও মুসা আর কিশোরকে পরাজিত করতে পারেনি দুই চোর। সহজে পারবে বলেও মনে হয় না।
আমি ঠিক করলাম, পারুক আর না পারুক, আমি এই ঝোঁপ থেকে বেরোচ্ছি না।
এই সময় হঠাৎ করেই কানে এল কুকুরের ডাক। এগিয়ে আসছে।
রাতের বেলা এই জঙ্গলের মধ্যে গায়ের নেড়িকুত্তাগুলোরও একলা আসার কথা নয়। তারমানে সঙ্গে লোক আছে। কে?
ধক করে উঠল বুক! আক্কেল আলী না তো! আসার সময় তাকে বলে এসেছিলাম, মন্দিরে যাচ্ছি আমরা। আমাদের দেরি দেখে হয়তো কালুকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে।
আমার অনুমান যে ঠিক, খানিক পরেই বুঝতে পারলাম।
বাবাগো, খেয়ে ফেলল গো! বলে চিৎকার করতে করতে ঝোঁপঝাড় ভেঙে ছুটে এল একজন লোক। পেছনে ঘেউ ঘেউ করে তাড়া করেছে একটা কুকুর।

আমার ঝোঁপের সামনে দিয়েই ছুটে গেল লোকটা। পায়ের কাছে লেগে রয়েছে কুকুরটা। দু-জনকেই চিনতে পারলাম–বদু আর কালু। অতবড় লোকটা যে কুকুরকে এ রকম ভয় পায়, না দেখলে বিশ্বাস হবে না। পড়িমরি করে নদীর দিকে চলে গেল সে। পেছনে কালু। হঠাৎ করেই যেন দুঃসাহসী হয়ে পড়েছে কাপুরুষ কুকুরটা।

হাসি পেল আমার। কিন্তু শব্দ শুনে ফেলার ভয়ে চেপে গেলাম।

আরেকটু পর আমার আর কালুর নাম ধরে ডাক শোনা গেল। মুসা ডাকছে আমাকে, আর আঙ্কেল আলী কালুকে।

ফিরে এল কুকুরটা। আমার ঝোঁপের সামনে এসে থমকে দাঁড়াল। নাক উঁচু করে কুঁই কুঁই করতে লাগল। তারপর ছোট্ট একটা হাঁক ছাড়ল, খেক!

বুঝলাম আমার অস্তিত্ব ফাঁস হয়ে গেছে। হেসে বললাম, দাঁড়া, বেরোচ্ছি।

কালুর পেছন পেছন চললাম। অন্ধকারে বনের মধ্যে পথ হারিয়েছি, বুঝতে পারলাম। কুকুরটার সাহায্য না পেলে এখন পথ চিনে মন্দিরের কাছে যাওয়া দুঃসাধ্য হয়ে পড়ত।

গাছের ফাঁকফোকর দিয়ে টর্চের আলো দেখা গেল। আমাকেই খুঁজতে আসছে কিশোররা।

আমাকে দেখেই বলে উঠল কিশোর, এই যে, আছ ঠিকঠাক? জিনিসগুলো আছে?

আছে, জবাব দিলাম।

শুনলাম, আমি দৌড় দেয়ার পর মানিক আমার পিছু নিতে যাচ্ছিল, টর্চ দিয়ে তার মাথায় বাড়ি মারে কিশোর। দুই দুইবার বাড়ি খেয়ে কাহিল হয়ে পড়ে মানিক। বদুর সঙ্গে লড়তে থাকে মুসা। এই সময় আমাদের খুঁজতে খুঁজতে এসে হাজির হয় আঙ্কেল আলী। কুকুরকে সাংঘাতিক ভয় পায় বদু দেখেই মারে দৌড়। তাকে তাড়া করে কালু। তিনজনের সঙ্গে পারবে না বুঝে মানিকও আর দাঁড়ায়নি, পিঠটান দিয়েছে।

বাড়ি রওনা হলাম আমরা। সাবধান থাকলাম, যাতে রাস্তায় আর কোন আচমকা আক্রমণের শিকার না হতে হয়।

বড় রাস্তায় উঠে কিশোর বলল, জিনিসগুলো বাড়ি নিয়ে যাওয়া নিরাপদ নয়।

জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় রাখবে?

থানায় চলো।

ওই অবস্থায় আমাদের দেখে অবাক হয়ে গেলেন ফাড়ির ডিউটি অফিসার। আমাদের পরিচয় দিয়ে সব কথা তাকে বললাম। জিজ্ঞেস করলাম, ফারুক

সাহেব কোথায়। তিনি জানালেন, বাইরে একটা জরুরী তদন্তের কাজে গেছেন, চলে আসবেন শীঘ্রি।
আমরা বসলাম।
আধঘণ্টা পরেই চলে এলেন ফারুক হোসেন। আমাদের অত রাতে ওই অবস্থায় দেখে তিনিও অবাক। জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার?
সব শুনে তিনি বললেন, সাংঘাতিক কাণ্ড করে এসেছ। পুলিশ যা পারেনি সেটাই করে বসে আছ! তোমরা যে এতবড় গোয়েন্দা, কল্পনাই করতে পারিনি!
ডিউটি অফিসারও আমাদের অনেক প্রশংসা করলেন। দু-জন পুলিশ অফিসারের এই উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় লজ্জাই লাগতে লাগল আমার।
কিশোর বলল ফারুক সাহেবকে, স্যার, জিনিসগুলো বাড়ি নিয়ে যেতে ভরসা পাচ্ছি না। এত রাতে তো ব্যাংক খোলা পাব না, নিরাপদ আর কোন জায়গার কথাও জানা নেই। থানায় রেখে যেতে চাই।
একমুহূর্ত চিন্তা করে নিলেন সাব ইন্সপেক্টর। তারপর মাথা ঝাঁকালেন, বেশ, রেখে যাও। রিসিট দিয়ে দিচ্ছি। যখন ইচ্ছে নিয়ে যেয়ো।

.

রাতটা নিরাপদে কাটল। পরদিন সকালে আক্কেল আলীর সঙ্গে হাসপাতালে রওনা হলাম।
গিয়েই শুনলাম, দাদাকে রিলিজ করে দেয়া হবে সেদিনই।
আমাদের অ্যাডভেঞ্চারের কথা জানালাম দাদা-দাদীকে। আমরা ছুরি মারামারি করেছি, এ কথা শুনে দাদী তো বাকহারাই হয়ে গেলেন। দাদা দিলেন বকা। আমাদের ওভাবে মন্দিরে যেতে দিয়েছে বলে আক্কেল আলীকেও বকতে লাগলেন।
চুপ করে রইলাম। বকে বকুক, আমাদের কাজ তো সারা।
দাদা-দাদীকে হাসপাতাল থেকে নিয়েই সেদিন বাড়ি ফিরলাম আমরা।
গুপ্তধনগুলো ফাঁড়িতেই রইল। কিশোরের ধারণা, এখনও বাড়িতে আনা নিরাপদ নয়। তবে চানাচুরের বাক্সটা নিয়ে এসেছে। অকারণে কিছু করে না সে। জিজ্ঞেস করলাম কেন এনেছে।
সে বলল, এটা এমন জায়গায় রেখে দেব যাতে বাড়িতে ঢুকলে সহজেই চোখে পড়ে। কেউ খুঁজতে এলে দেখে ফেলে। আমার বিশ্বাস, ওই দুই চোর আবার আসবে জিনিসগুলোর খোঁজে। ওদের বস্ ওদেরকে ছাড়বে না, পাঠাবেই।
মুসা জানতে চাইল, তাহলে এরপর আমাদের কাজ কি?
বাক্সের টোপটা রেখে দিলাম, কিশোর বলল, দেখা যাক ফাঁদে ধরা দেয় কিনা। দিলে বদু আর মানিককেও পাকড়াও করব। তারপর পুলিশে ধরে ভালমত

ধোলাই দিলেই সুড়সুড় করে বলে দেবে বসের নাম। পালের গোদাটাকেও ধরতে পারবে তখন পুলিশ। এখন থেকে আমাদের কাজ হবে, নজর রাখা। বাড়ির কাছাকাছি অচেনা কাউকে দেখলেই চোখ রাখব।
একটা কথা কয়েক দিন ধরেই মনে হচ্ছে আমার, জিজ্ঞেস করার কথা ভুলে যাই, এখন করলাম, কিশোর, দাদার অ্যাক্সিডেন্টের পর ওই ভদ্রলোককে কিন্তু আর একবারও দেখিনি।
আমিও ভেবেছি কথাটা। চলো দাদাকে জিজ্ঞেস করে দেখি, হাসপাতালে দেখা করেছে কিনা।
দাদা জানালেন, একদিন দেখা করতে গেছে। ব্যস, ওই পর্যন্তই। বাড়ি কেনার ব্যাপারে আর তেমন আগ্রহ দেখায়নি। বরং বার বার গুপ্তধনের কথা জানতে চেয়েছে।
তার নাম কি জানতে চাইল কিশোর।
দাদা জানালেন, শফিকুর রহমান।
সন্দেহটা পাকাপোক্ত হলো আমাদের, ওই লোকই চোরেদের বস। কারণ, সেদিন মানিক আর বদু আলোচনা করার সময়ও শফিক সাহেব নামটা বলেছিল।
আম-জাম-লিচু-কাঁঠাল খাই আমরা, রাতে আর দুপুরে খাই দাদীর চমৎকার রান্না, সকালে নানা রকম পিঠা। বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়াই, রাতে কখনও বসি দীঘির ঘাটে, অনেক রাত পর্যন্ত গল্প করি, কখনও গিয়ে বসি মজা পুকুরের পাড়ের সেই ঘরটার বারান্দায়।
উড়ে যাচ্ছে যেন আমাদের দিনগুলো। কিন্তু যাদের জন্যে উৎসুক হয়ে থাকি রোজই বিকেলের পর থেকে, তাদের আর সাড়াশব্দ নেই। তিন দিন গিয়ে যখন চারদিন পড়ল, সন্দেহ হতে লাগল আমার, আর আসবে না।
তবে সেদিনই এল ওরা। কিংবা বলা যায় সেই রাতে। জানানটা দিল কাল। দীঘির ঘাটলায় বসে আছি আমরা তিনজন। দাদা-দাদী বেডরুমে চলে গেছেন। আক্কেল আলী গেছে তার ঘরে। গল্প করছি, এই সময় একটা আমগাছের নিচ থেকে চাপা গরগর করে উঠল কুকুরটা।
লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল কিলোর। চাপা কণ্ঠে বলল, এসে গেছে।
আগেই প্ল্যান করে রেখেছি আমরা, ওরা এলে কি করব। গাছপালার আড়ালে গা ঢেকে মুসা আর কিশোর এগিয়ে গেল কালুর দিকে। আমি গেলাম মালীর ঘরের দিকে, আক্কেল আলীকে ডাকতে।
ঘুমায়নি সে। আগে থেকেই জানা ছিল তারও, এ রকম জরুরী অবস্থা হতে পারে। একবার ডাকতেই দরজা খুলে উঁকি দিল, ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, কি?
মনে হয় এসে গেছে। বেরোও।

নিঃশব্দে বেরিয়ে এল সে। পা টিপে টিপে আমরাও এগোলাম কিশোররা যেদিকে গেছে সেদিকে।
একটা আম গাছের গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে কিশোর আর মুসা। কালুর গলার কেন্ট ধরে রেখেছে মুসা, শান্ত থাকতে বলছে কুকুরটাকে। ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরেছে কালু, চুপ করেই আছে। গাছের গায়ে গা মিশিয়ে দাঁড়ালাম আমরা।
চাঁদের আলোয় দুটো ছায়ামূর্তিকে বেরোতে দেখলাম গাছের ছায়া থেকে। চেহারা বোঝা না গেলেও আকৃতিতেই চিনলাম বদু আর মানিককে।
বাড়ির সদর দরজার দিকে তাকিয়ে চুপচাপ প্রায় দশ মিনিট দাঁড়িয়ে রইল ওরা। আমরাও চুপ। কালুকে নিয়েই ভয়, কখন চিৎকার করে ওঠে।
কেউ জেগে নেই বাড়ির ভেতর, বোধহয় এ-ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েই অবশেষে বদুকে রেখে পা বাড়াল মানিক। সদর দরজার দিকে এগোল।
নড়ে উঠল মুসাও। আগেই আন্দাজ করে রেখেছে কিশোর, ওরা এলে কোনপথে কোথায় ঢুকবে। চানাচুরের বাক্সটা কয়লার ঘরে রেখে দিয়েছে সে। তার ধারণা, চোরগুলো ওই জায়গাটাতেই খুঁজবে আগে।
কালুর বেল্টটা আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে গাছের আড়ালে আড়ালে দ্রুত এগোল মুসা, অদৃশ্য হয়ে গেল। বাড়ির পেছন দিকের একটা জানালা খোলা রেখে দিয়েছি আমরা এ রকম জরুরী মুহূর্তের কথা ভেবেই। সেদিক দিয়ে ঘরে ঢুকে যাবে সে।
সদর দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল মানিক। পাকা চোর সে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ভেতর থেকে বন্ধ করে রাখা দরজাটা খুলে ফেলল। ফিরে তাকাল একবার। লুকিয়ে থাকা বদর উদ্দেশে হাত নাড়ল, তারপর ঢুকে গেল ঘরের মধ্যে।
অপেক্ষা করতে লাগলাম আমরা। মুসার কাজটা সহজ। জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকবে, রান্নাঘরে লুকিয়ে থাকবে মানিকের অপেক্ষায়। সে কয়লার ঘরে নেমে গেলেই ওপরের ঢাকনাটা নামিয়ে তালা লাগিয়ে দেবে।
অস্থির হয়ে উঠেছে কাল। আর চুপ থাকতে চাইছে না। রাফি কিংবা চিতার মত ট্রেনিং পাওয়া শিক্ষিত কুকুর নয় সে, অতি সাধারণ নেড়ি কুত্তা। এতক্ষণ যে কথা। শুনেছে এইই বেশি। হয়তো আরও শুনত, কিন্তু ভজকট করে দিল একটা শেয়াল। ঝোঁপের ভেতর থেকে মাথা বের করল হঠাৎ। আমরা না দেখলেও কালু দেখে ফেলল। আর যায় কোথায়। চুপ থাকার কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে গলা ফাটিয়ে ঘেউ ঘেউ করে উঠল।
মশায় কামড়াচ্ছে। চুলকাতে গিয়ে সামান্য অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম, ঢিল পড়ল কুকুরটার গলার কলারে, এক ঝটকায় আমার হাত থেকে সেটা ছাড়িয়ে নিয়ে শেয়ালকে তাড়া করার জন্যে লাফ মারল সে।

কিন্তু শেয়াল কি আর দাঁড়ায়। কুকুরের ডাক শুনেই পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল আবার ঝোঁপের মধ্যে।
বদু ভাবল, তাকে দেখেই খেপে গেছে কুকুরটা। বাবাগো, খেয়ে ফেলল গো! বলেই ঘুরে মারল দৌড়। কালুর নজর সরে গেল শেয়ালের দিক থেকে। বন্দুকেও দু চোখে দেখতে পারে না সে। শেয়ালের চেয়ে তাকে তাড়া করাটাই ভাল মনে করল বোধহয়, বদুর পায়ের গোছায় কামড়ে দেয়ার লোভেই যেন ঘেউ ঘেউ করতে করতে ছুটে গেল তার পেছনে।
ক্ষণিকের জন্যে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম আমরা। আমাদের প্ল্যান মত ঘটল না সব কিছু। সবার আগে সামলে নিল কিশোর। চিৎকার করে বলল, তুমি আর আক্কেল আলী বহুকে ধরো, আমি মুসার কাছে যাচ্ছি!
কালুর পেছনে দৌড় দিলাম আমি।
একটা শুকনো ডাল কুড়িয়ে নিয়ে আমার পেছন পেছন এল আক্কেল আলী।
দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ঝোঁপঝাড় ভেঙে ছুটছে বদু। কিন্তু যত জোরেই ছুটুক, কুকুরের সঙ্গে পাল্লায় পারার কথা নয়। বুঝতে পারল, ধরা পড়ে যাবে সে। থামল না তবু। কিন্তু কপাল খারাপ তার। একটা শেকড়ে পা বেধে উড়ে গিয়ে পড়ল ধুড়স করে।
তার গায়ের ওপর উঠে পড়ল কালু। কামড়ানোর জন্যে জায়গা বাছাই করছে যেন।
বাবাগো, আমি শেষ! বলে চিৎকার করে এলোপাতাড়ি ঘুসি মারতে লাগল বদু। একটা লাগল কালুর নাকেমুখে। ওটাও আরেক ভীতু। ব্যথা লাগতেই কেউ করে লাফিয়ে নেমে গেল বদুর ওপর থেকে। ফ্যালফ্যাল করে তাকাতে লাগল। আবার কামড়াতে যাওয়ার সাহস সঞ্চয় করছে।
সুযোগটা কাজে লাগাল বদু। আমরা তার কাছে পৌঁছার আগেই লাফিয়ে উঠে। আবার দিল দৌড়।
ঘেউ ঘেউ করে আবার তার পিছু নিল কালু।
কোন দিকে যাচ্ছে হুশ নেই দুর। সামনে যে জলাভূমি সে খেয়াল করল না। বরং আরেকটু এগিয়ে সামনে পানি চিকচিক করতে দেখে কুকুরের হাত থেকে বাঁচার জন্যে সোজা নেমে গেল সেটাতে। ছোপ ছোপ করে কাদা-পানি ভেঙে এগোতে লাগল।
কিন্তু কয়েক কদমের বেশি যেতে পারল না। হঠাৎ দেখলাম হাঁটু পর্যন্ত কাদায় ডুবে গেছে। পা যতই তোলার চেষ্টা করছে, আরও দেবে যাচ্ছে। আতঙ্কিত হয়ে পড়ল সে। মরে যাওয়ার ভয়ে বিকট চিৎকার করে উঠল।

জলাভূমির কিনারে দাঁড়িয়ে চিৎকার করতে লাগল কালু। আমরাও এসে দাঁড়ালাম। তাকে বাঁচানোর জন্যে আমাদেরকে অনুরোধ করতে লাগল বদু।
কয়েক মিনিট পর সেখানে এসে হাজির হলো মুসা আর কিশোর। বদুর দুরবস্থা দেখে হেসেই অস্থির মুসা। ওরা কি করেছে জিজ্ঞেস করলাম আমি। কিশোর জানাল, মানিককে নিয়ে গণ্ডগোল হয়নি। কয়লার ঘরে তালা দিয়ে রেখে এসেছে।
ডালটা নিয়ে কাদায় নেমে গেল মুসা। তার একটা হাত শক্ত করে ধরে রাখলাম আমি আর কিশোর। ডালটা বদুর দিকে বাড়িয়ে দিল মুসা। চেপে ধরতে বলল।
ধরল বদু।
মুসা বলল, এইবার আস্তে আস্তে উঠে এসো। তাড়াহুড়ো করলে কিন্তু ডাল ছেড়ে দেব।
সামান্যতম গোলমাল করল না বদু। যা নির্দেশ দেয়া হলো, নীরবে পালন করল।
তাকে তুলে আনলাম কাদা থেকে।
মুসার হাত থেকে ডালটা নিয়ে লাঠির মত বাগিয়ে ধরল আক্কেল আলী। বন্দুকে হুমকি দিল, তেড়িবেড়ি করলেই দেবে মাথায় বসিয়ে।
তবে আর কিছু করল না বদ। এক কালুর ভয়েই সে কাবু হয়ে আছে। বাকি চারজনের সঙ্গে মারপিটের ঝুঁকি নিতে চাইল না।
বদুকেও এনে কয়লার ঘরে ভরলাম আমরা।
চেঁচামেচিতে দাদা-দাদীও জেগে গেছেন। দাদী দেখতে এলেন কি হয়েছে।
সেই রাতেই আক্কেল আলীকে পুলিশের কাছে পাঠানো হলো, দুই চোরকে ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্যে।

.

পরদিন সকালে নাস্তা খেতে বসেছি। দাদাও বসেছেন আমাদের সঙ্গে। দাদী গরম গরম ভাপা পিঠে এনে দিচ্ছেন রান্নাঘর থেকে। খুব স্বাভাবিক ভাবেই উঠে পড়ল গুপ্তধন উদ্ধারের আলোচনা।
মুসা বলল, একটা কথা বুঝতে পারছি না, এতদিন বসে রইল কেন রবিউল। চানাচুরওলার ছদ্মবেশে সহজেই তো পালিয়ে যেতে পারত।
জবাব দিল কিশোর, আমার ধারণা, প্রথমে এই বুদ্ধি মাথায় আসেনি তার। কিংবা পালানোর সাহসই হয়নি। জিনিসগুলো নিয়ে গিয়ে মূর্তির মধ্যে ভরে রাখল। দুই শত্রু তখন তার। একদিকে পুলিশ, আরেক দিকে তার দলের লোক–তাদের সঙ্গেও বেঈমানী করেছে। ফলে লুকিয়ে থাকতে হলো তাকে মন্দিরের মধ্যে। কিন্তু নিরাপদ বোধ করল না ওখানে। যে কোন সময় ধরা পড়ে যেতে পারে। শেষে চানাচুরওলা সেজে বুঝতে চাইল, ফাঁকি দিয়ে পালাতে পারবে কিনা। বাজারে

গেল সেটা বোঝার জন্যে। আরও একটা কারণে গিয়েছিল সে, পুলিশ আর তার দলের লোকের ব্যাপারে খোঁজখবর করার জন্যে...
কিন্তু বাদ সাধলে তোমরা, হেসে কথাটা শেষ করে দিলেন দাদা। একেবারে সময়মত গিয়ে হাজির হলে বাজারে। চিনে ফেললে তাকে। পালাতে যে পারবে না সে, প্রমাণ পেয়ে গেল হাতেনাতে।
হ্যাঁ, ব্যাটার কপালটাই খারাপ, হেসে মন্তব্য করল মুসা।
চুপচাপ খাওয়া চলল কিছুক্ষণ। একটা প্রশ্ন নিয়ে অনেক ভেবেছি আমি, জবাব খুঁজে পাচ্ছিলাম না-শফিকুর রহমান গুপ্তধনগুলোর লোভেই বাড়িটা কিনতে চায়নি তো? আর তাই যদি হয়ে থাকে, সে শিওর হলো কি ভাবে যে এই বাড়িতেই রয়েছে জিনিসগুলো, বের করে নিয়ে যেতে পারেনি আমিন উদ্দিন সরকারের মুন্সী?
প্রশ্নটা তুললাম।
দাদা বললেন, এর একটাই জবাব হতে পারে, কথাটা কোনভাবে মুন্সীদের কারও মুখেই জেনেছে শফিকুর রহমান। আমার কি সন্দেহ হচ্ছে জানো? এই শফিকুর রহমান মধু মুন্সীর ছেলে।
ছেলে! প্রায় একসঙ্গে বলে উঠলাম আমরা তিনজন।
হ্যাঁ। তার একটা ছেলে ছিল বলে শুনেছি। বাবার কাছে নিশ্চয় গুপ্তধনের কথা শুনেছে সে। বিদেশে চলে গিয়েছিল বলে এতদিন আসতে পারেনি। দেশে ফিরেই বাড়িটা কিনতে এসেছে।
বিদেশে গিয়েছিল কি করে জানলেন? জিজ্ঞেস করলাম।
শফিকুর রহমান নাকি অনেক দিন দেশের বাইরে ছিল, আমাকে বলেছে। তোমাদের বয়েসে জাহাজে চাকরি নিয়ে চলে গিয়েছিল, ফিরেছে এই কিছুদিন আগে। সে যে মধু মুন্সীর ছেলে, এটা আমার অনুমান। আগে কিছু সন্দেহ করিনি, এখন করছি।
খাওয়ার পর থানায় রওনা হলাম আমরা। ফারুক হোসেনকে পাওয়া গেল। তাকে বললাম শফিকুর রহমানের ব্যাপারটা। তিনি জানালেন, বদু মুখ খুলেছে। বলেছে, শফিক সাহেব নামে এক লোকই ওদের বস্, গুপ্তধনগুলো চুরি করার জন্যে টাকা দিয়েছিল ওদের।
আমাদের মুখ থেকে সব কথা শুনে আরও শিওর হলেন তিনি। শফিকুর রহমানের কাছে যাবেন বললেন।
তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে গুপ্তধনগুলো নিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম আমরা।
মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগলেন দাদা-দাদী।

গর্বের সঙ্গে দাদা বললেন দাদীকে, দেখেছ, কি জিনিস! পানপাত্রটা দেখো, কি সুন্দর কারুকাজ করা। আর পাথর কি! আজকাল এসব জিনিস কল্পনাই করা যায় না।
সুন্দর, স্বীকার করলেন দাদী, তবে কল্পনা করা যায় না কথাটা ঠিক না। টাকা খরচ করলে এখনও এমন বানানো যাবে।
দূর, কি যে বলো তুমি, সেই কারিগরই নেই। চমৎকার একটা হার তুলে নিয়ে দাদীকে দিয়ে বললেন দাদা, নাও, এটা তোমাকে দিয়ে দিলাম। পরো।
সলজ্জ হাসি হেসে দাদী বললেন, তোমার মাথায় দোষ পড়েছে! এই বুড়ো বয়েসে এ হার পরে আমি কি করব! বললেন বটে, কিন্তু হারটা নিয়ে পরে ফেললেন।
হাসলেন দাদা। বললেন, দারুণ মানিয়েছে। আমাদেরকে সাক্ষি মানলেন, কি বলিস, মানিয়েছে না?
সাংঘাতিক! আমার আগেই বলে উঠল মুসা।
কিশোর বলল, এক কাজ করব, দাঁড়াও, তোমার পা-টা ভাল হয়ে গেলে তোমাদের বিবাহ বার্ষিকী পালন করব আমরা...
কিন্তু তার তো অনেক দেরি আছে, দাদা বললেন।
তাতে কি? আমাদের খাতিরে আগামই নাহয় করে ফেললে। বাসর ঘর সাজিয়ে দেব তোমাদের।
কৃত্রিম মুখ ঝামটা দিয়ে একটা কিছু বলতে যাচ্ছিলেন দাদী, এই সময় হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকল আক্কেল আলী। ভীষণ উত্তেজিত। বলল, হুজুর, একটা সাংঘাতিক খবর আছে! নন্দী পাড়ার সাহেব মিয়া এসেছে। আমাদের যে জমিগুলো নদীতে ডুবে গিয়েছিল বহুকাল আগে, আবার নাকি ভাসছে। চর জেগেছে, হুজুর, চর জেগেছে!
খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন দাদা। তারপর বিড়বিড় করলেন, সরকারদের সৌভাগ্য! শুরু হয়ে গেল আবার! আক্কেল আলীর দিকে মুখ তুলে বললেন, জাগবেই, জাগতেই হবে। আবার আমাদের সব হবে! আসল জিনিসই ফিরে এশেছে যে! জিনিসগুলোর দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি।
আনন্দে দাদীর চোখে পানি এসে গেছে। প্রচণ্ড আগে সইতে না পেরে উঠে এসে আমার কপালে চুমু খেয়ে মাথাটা বুকের সঙ্গে চেপে ধরলেন নীরবে।
একে একে মুসা আর কিশোরকেও চুমু খেলেন। তারপর বললেন, সরকার বাড়ির সৌভাগ্য ওই সোনার জিনিস নয়, আমার এই তিনটি রত্ন। ওরা ঘরে এসেছে। বলেই না ভাগ্য ফিরতে শুরু করেছে আমার, বুঝতে পারছি সোনাদানায় আবার ভরে উঠবে এই বাড়ি!
জমিদার-দাদার বাড়িতে এরপর মহাআনন্দে কাটতে লাগল আমাদের দিন।

নতুন কিছু আর বলার নেই।
ও হ্যাঁ, আরেকটা কথা জানার জন্যে নিশ্চয় কৌতূহল হচ্ছে তোমাদের; শফিকুর রহমান মধু মুন্সীর ছেলে–দাদার এই অনুমানটা সত্যি কিনা প্রমাণ করা গেল না, কারণ ধরা গেল না তাকে। পুলিশ তার ঠিকানায় খোঁজ নিতে গিয়ে দেখে, ঘরের তালা বন্ধ। বাড়িওয়ালা জানাল, আগের রাতে নাকি তড়িঘড়ি করে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে চলে গেছে লোকটা। বলে গেছে, আর আসবে না। দামী গাড়িটাও নাকি তার নিজের ছিল না, ভাড়া, রেন্ট-অ্যা-কার কোম্পানি থেকে নিয়েছিল।
তবে যাই হোক, শফিকুর রহমান ধরা পড়ুক আর না পড়ুক, বিপদ কেটে গেছে। দাদা-দাদীর মুখে হাসি ফুটাতে পেরে আমরা খুব খুশি। নিশ্চয়ই তোমরাও খুশি?

ভলিউম ৫৪ – চাঁদের পাহাড় – তিন গোয়েন্দা – রকিব হাসান – সেবা প্রকাশনী

(এ বইটি রোমহর্ষক সিরিজে শ্বেতহস্তী নামে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। উল্লেখ্য: রোমহর্ষক সিরিজের লেখক জাফর চৌধুরী রকিব হাসানের ছদ্মনাম।)

রাস্তা জুড়ে দাঁড়াল বিশাল হাতিটা।

খাড়াই বেয়ে উঠতে উঠতে ছেলেদের মনে হলো মেঘে ঢেকে দিয়েছে সূর্য।

মুখ তুলে দেখল ওরা, আকাশ মেঘে ঢাকেনি। ঢেকেছে শুড়ওয়ালা এক চারপেয়ে কালো দানব। এতবড় হাতি আর দেখেনি ওরা।

হাতিটাও ওদের মতই অবাক হয়েছে। থমকে দাঁড়িয়ে কুতকুতে চোখে তাকাল ওদের দিকে। গুমগুম শব্দ বেরোল গলার গভীর থেকে। রেগে গেছে। শুড়টা বাড়িয়ে দিল সামনে, ওদের গন্ধ নেয়ার জন্যে।

কাঁধের সঙ্গে ভাজ করে লেপ্টে ফেলেছিল কান দুটো। ঝটকা দিয়ে ছড়িয়ে দিল ছাতার মত। এতটাই বড়, কিশোর অনুমান করল, ওই সাইজের ডাইনিং টেবিল বানালে একেকটাতে আটজন করে লোক খেতে বসতে পারবে। রোদে ঝকঝক করছে ওটার ছয় ফুট লম্বা সাদা দাঁত।

কিশোরের মত স্থির থাকতে পারল না ওর বন্ধু মুসা। বলল, চলো, পালাই।

কোথায়? দুই ধারে ঘন ঝোঁপঝাড়ের দেয়াল হয়ে আছে।

যেদিক থেকে এলাম, মুসা বলল।

দৌড় দিয়ে লাভ হবে না। তাড়া করবে। হাতির সঙ্গে পারা যাবে না। ধরে। ফেলবে। ছয়-সাত টন ওজনের হাতির এক পায়ের পাড়াই যথেষ্ট, ভর্তা হয়ে যাব।

তাহলে কিছু একটা করো! এ সব যুক্তি তো আর প্রাণ বাঁচাবে না।

সামনের দিকে তঁড়টাকে ছুঁড়ে দিয়ে বিকট চিৎকার করে উঠল দানব। রক্ত হিম করা চিৎকার। কলরব করে ছুটে পালাতে শুরু করল বানর আর পাখির দল।

পেছনে তাকাল কিশোর। ওদের ভাড়া করে আনা নিগ্রো কুলির দল আতঙ্কিত হয়ে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে আছে, একজন বাদে। তার নাম আকামি। ওদের গাইড এবং ট্র্যাকার। সে দাঁড়িয়ে আছে ওর একেবারে পাশেই। হাতে একটা হাতি মারার রাইফেল। সেটা কিশোরের দিকে বাড়িয়ে দিল সে।

মাথা নাড়ল কিশোর। জ্যান্ত ধরার চেষ্টা করব।

মুচকি হাসল আকামি। নিজে সে দুঃসাহসী লোক, সাহসী মানুষদের পছন্দ করে। কিন্তু হাতি ধরার কথা সে-ও কল্পনা করতে পারে না।

সামনে এগোনোর সাহস নেই, পিছিয়ে যেতে ভয় পাচ্ছে, দু-ধারে মাউন্টেইনস অভ দা মুন, অর্থাৎ চন্দ্রপাহাড়ের কুখ্যাত ঘন ঝোঁপঝাড়ের দেয়াল। সময় থাকলে হয়তো কুপিয়ে কেটে পথ করে নেয়ার চেষ্টা করতে পারত, কিন্তু হাতিটা ওদেরকে সে-সময় দেবে বলে মনে হলো না।

মাটিতে গর্ত থাকলে নির্ধিধায় তাতে ঢুকে যেত এখন, তাও নেই।
একটা মাত্র পথ খোলা আছে, ওপর দিকে। কিন্তু সেদিক দিয়ে পালাতে হলে ডানা দরকার, উড়ে যেতে হবে। তার মানে, পালানোর পথ নেই।
দ্রুত ভাবনা চলেছে কিশোরের মাথায়। তাকিয়ে আছে ওপর দিকে।
লিয়ানা! হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল সে। মাথার ওপরে বড় বড় গাছের ডাল থেকে ঝুলছে ওই লতা। জাহাজ বাঁধার দড়ির মত শক্ত।
ধরব কি করে? কি করতে হবে বুঝে গেছে মুসা।
আমার কাঁধে ওঠ, কিশোর বলল।
কিশোরের কাঁধে উঠল মুসা। হাত বাড়িয়ে একটা লতা ধরে দোল দিয়ে উঠে। যেতে শুরু করল ওপরে।
এ আবার কি হচ্ছে!-অবাক হয়ে ভাবছে যেন হাতিটা। তাকিয়ে রয়েছে আজব ওই দড়াবাজিকরের দিকে।
আকামিকে নির্দেশ দিল কিশোর, যাও, ওঠো, জলদি!
কিশোরকে ছেড়ে আগে ওঠার ইচ্ছে ছিল না আকামির। কিন্তু তর্ক করে নষ্ট করার সময় এখন নেই। রাইফেলটা স্ট্র্যাপে ঝুলিয়ে, কিশোরকে মই বানিয়ে মুসার মতই উঠে যেতে শুরু করল সে-ও।
বিকট হস্তীনিনাদ করে দুলকি চালে এগোতে লাগল হাতি। লিয়ানার ডগায় ফঁসের মত গিঁট বেঁধে থাকে। সে-রকম একটা গিঁটে পা ঢুকিয়ে নিচের দিকে ঝুলে পড়ল আকামি। হাত বাড়াল কিশোরকে ধরার জন্যে।
বাড়ানো হাতটা ধরে ফেলল কিশোর। টেনে তাকে তুলে নিতে লাগল আকামি।
কিন্তু সার্কাসের এই খেলা মোটেও পছন্দ হলো না হাতির। ধরার জন্যে ছুটে এল সে। কিশোরের নিচে দাঁড়িয়ে আরেকবার হাঁক ছাড়ল। ওঁড়ের ফুটো থেকে বেরোনো গরম নিঃশ্বাসের ঝাপটা লাগল পায়ে। কিশোরের গোড়ালি পেঁচিয়ে ধরল শুড়টা।
আকামি টানছে ওপর দিকে, হাতি টানছে নিচে। ঘাবড়ে গেছে কিশোর। ভয়ঙ্কর এক মুহূর্ত। এই টানাটানি বন্ধ না হলে ছিঁড়ে দুই টুকরো হয়ে যাবে সে। আকামি তাকে ছেড়ে দিলেও বিপদ। নিচে পড়বে। পায়ের তলায় পিষে মারবে তখন দানবটা।
চিৎকার করতে করতে দৌড়ে এল কুলিরা। টিন বাজিয়ে, নানা রকম শব্দ করে হাতির দৃষ্টি অন্য দিকে ঘোরানোর চেষ্টা করল।
ওদের দিকে ফিরে ভয় দেখানোর জন্যে চিৎকার করে উঠল হাতি।
আওয়াজটা অদ্ভুত। ভয়াবহ সন্দেহ নেই, তবে বাঘ-সিংহের গর্জনের মত নয় শব্দটা, বরং অনেকটা মেয়েমানুষের চিৎকারের মত; অনেক গুণ জোরাল,

গায়ের রক্ত জমিয়ে দেয়।
কুলিদের হট্টগোলের জবাবটা দিয়েই আবার কিশোরের দিকে নজর ফেরাল সে। যেন বলতে চাইল-দাঁড়াও, তোমাদেরও ধরব, আগে হাতের কাজটা শেষ করে নিই!
আবার টান দিল কিশোরের পা ধরে।
ওপরে হড়াৎ করে পিছলে গেল কিছু। এই সম্ভাবনাটার কথা ভাবেনি কিশোর। লতাটা বোধহয় খুলে আসছে ডাল থেকে। নতুন বিপদ। লতা ছিঁড়ে গেলে শুধু সে-ই না, আকামিও পড়বে-দুজনেই মরবে তখন।
ছাড়ো! আমাকে ছেড়ে দাও! মরিয়া হয়ে চেঁচিয়ে উঠল সে।
কিন্তু ছাড়ল না আকামি। কিশোরের কব্জিতে আরও চেপে বসল আঙুলগুলো।
আরও একটা জিনিস পিছলে যেতে শুরু করল টানাটানিতে। কিশোরের গোড়ালি ঢাকা ভারি বুট, সাপের কামড় থেকে বাঁচার জন্যে পরেছিল। পট করে ছিঁড়ে গেল ফিতে। দ্রুত পিছলে পা থেকে খসে বেরিয়ে গেল জুতোটা।
মুক্ত হয়ে গেল পা। টেনে তাকে তুলে নিল আকামি। তারপর দুজনে মিলে বেয়ে উঠে গেল উঁচু ডালে।
জুতোটাকে নিয়ে পড়ল হাতি। আছাড় দিয়ে, পা দিয়ে মাড়িয়ে, দাঁত দিয়ে খুঁচিয়ে ওটাকে ছিঁড়ে, চ্যাপ্টা করে মাটিতে পুঁতে ফেলল। তারপর ঢেকে দিল লতাপাতা দিয়ে।
শিকারকে শেষ করে এ ভাবে কেন ঢেকে দেয় আফ্রিকান হাতি, এটা একটা বিস্ময়। এর জবাব কেউ জানে না।
কিশোর ভাবল, শান্ত হয়ে এবার চলে যাবে হাতিটা। কিন্তু গেল না ওটা। আবার নজর দিল ওদের দিকে। কুতকুতে চোখে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত দেখল গাছের মানুষগুলোকে। হঠাৎ এসে বিশাল মাথা দিয়ে ঢুস মারল গাছের গায়ে।
থরথর করে কেঁপে উঠল গাছ। ঝাঁকুনির চোটে ওপরের ডাল থেকে চিৎকার করে খসে পড়ল একটা বানর। মাটিতে পড়ল না। ধরে ফেলল আরেকটা ডাল।
প্রমাদ গুণল কিশোর-মুসা। হাতির এই আচরণের কথা ওরা শুনেছে। একেক সময় এমন খেপা খেপে যায় ওরা, গাছ থেকে ফেলে হলেও শিকারকে ধরার চেষ্টা করে। এই হাতিটাও একই কাজ করছে।
সামনের ডান পা-টা গাছের গায়ে তুলে দিয়ে ঠেলতে লাগল সে। মোপানি গাছ। শিকড় খুব শক্ত। তাই সামান্য একটু বাকা হলো মাত্র, কাত হলো না।
ছাড়ল না হাতি। ফেলেই ছাড়বে। দাঁত দিয়ে গাছের গোড়ার চারপাশের মাটি খুঁড়তে শুরু করল। সেই সঙ্গে ছিঁড়তে লাগল শিকড়। গোড়াটা নরম করতে পারলেই, ব্যস।

চুপ করে বসে থাকলে মরতে হবে, চিৎকার করে ডেকে বলল কিশোর, মুংগা, শিকল!
খানিক দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাতিটার কাণ্ড দেখছে কুলিরা। ডাক শুনে নড়ে উঠল তাদের একজন। আরও কয়েকজনের সাহায্যে মোটা একটা শিকলের এক মাথা তাড়াতাড়ি বেঁধে দিয়ে এল বিশাল টিলার চোখা মাথায়। আরেক মাথায় একটা ফাস বানিয়ে দৌড়ে এল হাতির এক পায়ের নিচে পেতে দেয়ার জন্যে। হাতি তাতে পা দিলেই ফাস টেনে আটকে দেবে।
মাথা সোজা করে আবার গাছ ঠেলতে আরম্ভ করেছে হাতি। ভয়াবহ ঝাঁকুনি লাগছে। বানরের দল পালিয়ে গেছে অন্য গাছে। কিশোর-মুসারাও এ কাজ করতে পারলে বেঁচে যেত। কিন্তু ওরা তো বানরের মত লাফাতে পারে না। কেবল প্রাণপণে গাছ আঁকড়ে ধরে রইল।
মুংগার ওপর নজর পড়ল হাতির। বিকট চিৎকার দিয়ে ঘুরল।
শিকল ফেলে দৌড় মারল মুংগা। কিছুদূর তাকে আর কুলিদেরকে তাড়া করে গেল হাতি। চোখের পলকে যে যেদিকে পারল ছুটে ঝোঁপঝাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল ওরা।
আবার গাছের কাছে ফিরে এল হাতি।
গুলি করা ছাড়া উপায় নেই। ভারি .৫০০ ডাবল-ব্যারেল রাইফেলটা হাতির দিকে তাক করতে গেল আকামি।
ধরে ফেলল মুসা, আমাকে দাও।
তার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল আকামি, এত ভারি রাইফেল দিয়ে মুসা গুলি চালাতে পারবে না ভেবে।
আরে দূর, দাও না! কি ভেবেছ আমাকে? ভারি রাইফেল চালিয়েছি আরও। দু-শো ফুট দূর থেকে ছোট্ট খাবারের টিন ফুটো করে দিতে পারি। আর এটা তো হাতি, বাড়ির সমান।
অনুমতির আশায় কিশোরের দিকে তাকাল আকামি।
হাসল কিশোর। মাথা কাত করে ইঙ্গিত করল দেয়ার জন্যে।
রাইফেলটা নিয়ে গুলি করতে যেতেই আবার ঘুরে দাঁড়াল হাতি। আবার বিরক্ত করতে এসেছে তাকে মুংগা আর তার লোকেরা। খেপে গিয়ে আরেকবার কালো দু-পেয়ে জীবগুলোকে তাড়া করল সে।
আবার সরে গেল লোকগুলো।
কি করে এত দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যায় ওরা, ভেবে অবাক লাগল মুসার। ভাবল, এ যাত্রা বাঁচতে পারলে কুলিদের কাছ থেকে কায়দাটা রপ্ত করবে ভালমত। কাজে লাগবে ভবিষ্যতে।

আবার গাছের দিকে ফিরে আসতে শুরু করল জানোয়ারটা। তাজ্জব ব্যাপার! ভয়ানক জেদ হাতির। যার পেছনে লাগবে তাকে শেষ না করে আর রাগ যায় না। আর ওটাকে কাছে আসার সুযোগ দিল না মুসা। গুলি করল।
ভারি রাইফেলের প্রচণ্ড গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে স্থির হয়ে গেল হাতিটা। মাটিতে কাত হয়ে পড়ল না, ভাজ হয়ে গেল সামনের দুই হাঁটু, যেন আস্তে বসে পড়ল মাটিতে, একটুও শব্দ না করে।
গুলি করার পর আরেক কাণ্ড ঘটেছে। গাছের ডালে বেকায়দা অবস্থায় দাঁড়িয়ে গুলি করেছে মুসা, রাইফেলের সাংঘাতিক ধাক্কা সইতে না পেরে পড়ে গেল মাটিতে। পাথরে পড়লে হাড়গোড় ভেঙে মরত, কিন্তু ওর ভাগ্য ভাল, গাছের গোড়ায় এখানে একধরনের শ্যাওলা হয়ে আছে। ওগুলোতে পড়ল। এত বড় আর মোটা শ্যাওলা পৃথিবীর আর কোথাও জন্মায় না। অনেক পুরু গালিচা তৈরি করে রেখেছে যেন, ফলে তাতে পড়ে বেঁচে তো গেলই সে, কোন আঘাতও পেল না।
রাইফেলটা হাত থেকে ছেড়ে দিয়েছে। উঠে দাঁড়াল। চোখ পড়ল বিশাল। হাতিটার ওপর। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে না এতবড় একটা দানবকে এত সহজে মেরে ফেলেছে। দুঃখও হচ্ছে। হাতি শিকার করতে আফ্রিকায় আসেনি ওরা, এসেছে বিশাল ওই প্রাণী জ্যান্ত ধরে নিয়ে যেতে।
কিশোরও নেমে এল গাছ থেকে। এগিয়ে গিয়ে হাতির কাঁধে বিধে থাকা একটা বল্লমের মাথার দিকে তাকিয়ে রইল। মরচে পড়ে গেছে। কেউ ছুঁড়ে মেরেছিল, মাংসে গেঁথে রয়েছে ফলাটা, কিন্তু ডাণ্ডাটা ভেঙে গেছে। পচে ঘা হয়ে গেছে। এ কারণেই বোধহয় মানুষের ওপর এত ক্ষিপ্ত হয়ে ছিল প্রাণীটা।
মাথার কাছে একটা বড় ফুটো। সেটা দেখিয়ে আকামি জিজ্ঞেস করল মুসাকে, এখানে গুলি করেছিলে?
মাথা ঝাঁকাল মুসা।
চট করে কিশোরের দিকে তাকাল আকামি। চোখে চোখে কথা হয়ে গেল দু জনের। তাড়াতাড়ি একটা অদ্ভুত কাণ্ড করল সে-শিকলটা তুলে এনে ফাস পরিয়ে দিল হাতির পায়ে।
অবাক লাগল মুসার। জিজ্ঞেস করল, মরা হাতিকে বাঁধছ কেন?
মরেনি, জবাব দিল কিশোর।
মানে? মগজে বুলেট খেয়ে পড়ে গেল, মরেনি মানে?
হাতি শিকারে তোমার অভিজ্ঞতা নেই তো, তাই বলছো। হাতির মাথার সামনের দিকটায় শুধুই হাড়, পুরু শক্ত হাড্ডি। এই হাড়ে ঢুকে আটকে যায় বুলেট, মগজ পর্যন্ত যেতে পারে না। মগজ অনেক পেছনে, দুই চোখের মাঝামাঝি জায়গায়। গুলির আঘাতে কেবল বেহুশ হয়েছে ওটা, শীঘ্রি জেগে যাবে।

হা হয়ে গেল মুসা। কথাটা জানে না বলে নিজের ওপর রাগ হলো, তবে খুশিও হলো, প্রাণীটাকে খুন করতে হয়নি বলে।
কিশোরের কথাই ঠিক।
গলার গভীর থেকে ভারি একটা ঘড়ঘড়ে শব্দ উঠে এল হাতিটার। তারপর চাপা গোঙানি। কাছাকাছি ছিল যারা, তাড়াতাড়ি সরে গেল।
চোখ মিটমিট করল হাতিটা। শুড় নাড়ল। তারপর বিকট চিৎকার করে আবার খাড়া হয়ে উঠল। তাড়া করতে গেল কাছে দাঁড়িয়ে থাকা একজন কুলিকে।
কিন্তু পায়ে আটকানো শিকল ঠেকিয়ে দিল তাকে।
পিছিয়ে গিয়ে, আরেকবার চিৎকার করে আবারও তেড়ে গেল হাতি। সাংঘাতিক টান লাগল শিকলে। আর তাকে আটকাতে পারল না শিকল, মট করে ছিঁড়ে গেল।
উধাও হয়ে গেছে কুলিরা।
কাউকে না পেয়ে মোপানি গাছটার দিকে তাকাল সে। কেউ নেই দেখে নিরাশ হয়েই যেন আরেকবার চিৎকার করে, রওনা হয়ে গেল বনের দিকে। পাথরে ঘষা লেগে লেগে শিকলের শব্দ উঠছে ঝনঝন, ঝনঝন। ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল সেই শব্দ।
খানিক দূরে গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে মুসা আর কিশোর।
স্তব্ধ হয়ে গেছে দু-জনে। এত শক্ত শিকল এমন করে ছিঁড়ে ফেলতে পারবে হাতিটা, কল্পনা করেনি।
জোর গুঞ্জন করে উঠল কুলিরা।
.
কান পেতে শুনছে সবাই। হাতির চিৎকার থেমে যেতে হঠাৎ বড় বেশি নীরব মনে হলো বনটাকে। কেমন যেন গা শিউরানো পরিবেশ। মনে হচ্ছে, এর চেয়ে হাতির চিৎকারও ভাল ছিল।
চলো, এগোই, কিশোর বলল।
আকামি জানাল, কুলিরা আর এগোতে চায় না।
কেন?
ওরা বলছে এটা খারাপ জায়গা। এখানে কিছু ধরতে পারব না আমরা। এখানে মৃত্যু ছাড়া আর কিছু নেই। এ রকম জায়গা নাকি আর কখনও দেখেনি। ওরা।
মাথা ঝাঁকাল কিশোর। সে-ও দেখেনি কখনও। মনে হচ্ছে একটা দুঃস্বপ্নের মধ্যে রয়েছে। আশপাশের দানবদের তুলনায় নিজেকে অতি ক্ষুদ্র লাগছে।
বড় বড় গাছগুলো এমন করে ছেয়ে আছে শ্যাওলায়-দেখে মনে হয় বুড়ো মানুষের দাড়ি। কনকনে ঠাণ্ডা বাতাসে দুলছে। ডালে ডালে জড়াজড়ি করে আছে

শত শত ফুট লম্বা লতা। যখন তখন নেমে আসছে আকাশের মেঘ, গাছপালা। ভেদ করে মাটি ছুঁয়ে ভেসে যাচ্ছে, যেন শিকার দেখে ছো মারার জন্যে নামছে আকাশচারী দানব।
ঘন হয়ে ঝুলে আছে কুয়াশার মত বাষ্প।
ভাবা যায় ঘরের সমান বড় একেকটা ফুল! ইউরোপ আমেরিকায় হাঁটু সমান উঁচ ফুল দেখেছে সে, কিন্তু এখানে সেই একই জাতের ফুলই চারজন মানুষের সমান উঁচ। আমেরিকায় যে বীজ পাখিতে খায়, সেটা এখানে পাখির চেয়ে বড়। যে সব ফার্ন সাধারণত হাঁটুর চেয়ে উঁচু হয় না, এই চন্দ্রপাহাড়ের সেগুলো বড় বড় গাছের সমান। সব কিছুই অস্বাভাবিক বড়।
অদ্ভুত এক জগৎ! শুরুতে তো কিশোর বিশ্বাসই করতে পারছিল না বাস্তবে রয়েছে। চিমটি কেটেও দেখেছে নিজের গায়ে ব্যথা পায় কিনা।
গাছপালার মতই এখানকার প্রাণীরাও বড়। হামিংবার্ড দেখেছে কবুতরের সমান। চিতাবাঘগুলো হয় বাঘের চেয়ে বড়। দেখতে দেখতে একসময় মুসা বলেছে, যা অবস্থা, কেঁচো দেখব সাপের সমান!
মাথা ঝাঁকিয়েছে কিশোর, তাই তো হয় এখানে। কেঁচো হয় তিন ফুট লম্বা। মাউন্টেইনস অভ দা মুনের ওপর একটা সাইন্টিফিক রিপোর্ট করেছিল ন্যাশনাল জিওগ্রাফি ম্যাগাজিন, উনিশশো বাষট্টির মার্চে বেরিয়েছিল সংখ্যাটা। এখানকার দানবীয় প্রাণীদের উল্লেখ আছে তাতে। অভিযাত্রীরা দেখে গেছে তিন ফুট লম্বা কেঁচো।
তাহলে এই আজব জায়গা সম্পর্কে কিছু শোনা যায় না কেন?
যায় না কে বলল? ম্যাপ দেখলেই পেয়ে যাবে। ভিকটোরিয়া হ্রদের কাছে, অনেক টুরিস্ট যায়। ম্যাপে নাম রুয়েনজোরি। এর মানে রেইনমেকার, বা বৃষ্টি প্রস্তুতকারী। সারাক্ষণই বৃষ্টি হতে থাকে এখানে। আর এর জন্যেই কোন টুরিস্ট রিসোর্ট গড়ে ওঠেনি। মানুষের চোখে না পড়ার আরেকটা বড় কারণ হলো, বেশির ভাগ সময়ই মেঘে ঢাকা পড়ে থাকে এই অঞ্চল।
বাব্বাহ্! এই অবস্থা! নামটা রুয়েনজোরি, না? আমি তো জানতাম মাউন্টেইনস অভ দা মুন।
এটা রুয়েনজোরির আরেক নাম।
পুরানো, না নতুন?
পুরানো। প্রাচীন মিশরীয়রা রেখেছিল।
কেন?
আজব জায়গা বলে। পৃথিবীতে এমন অবস্থা আর কোথাও নেই। এ যেন অন্য এক পৃথিবী। তাই পুরানো ম্যাপে নাম ছিল লুনায়ে মনটিস, অর্থাৎ মাউন্টেইনস

অভ দা মুন, অর্থাৎ চাঁদের পাহাড়। একহাজার বছরেরও বেশি কাল ধরে ম্যাপে ওই নাম থাকার পর হঠাৎ করেই মুছে ফেলা হলো। হয়তো লোকে তখন মনে করেছিল এ রকম জায়গা বলে কিছু নেই। কারণ পরের দিকে অভিযাত্রীরা আর এ জায়গাটা খুঁজে পায়নি। বিখ্যাত পর্যটক স্টেনলি-লিভিংস্টোনকে খুঁজে পেয়েছিলেন যিনি, তিনি একবার বলেছেন-ম্যাপে যে জায়গায় চাঁদের পাহাড় দেখানো রয়েছে, ওই জায়গাটাতে শুধু পানি, জাহাজে করে পার হয়েছি আমি; তার মানে ওখানে পাহাড় বলে কিছু নেই। সুতরাং ম্যাপ থেকে মুছে ফেলা হলো তখন। পরে আবার ফিরে এলেন তিনি। আফ্রিকার এই এলাকা ধরে যাওয়ার সময় কয়েক মুহূর্তের জন্যে মেঘ সরে গেলে বেরিয়ে পড়ল পর্বতের চূড়া-চিরতুষারের রাজত্ব, দেখে অবাক হয়ে গেলেন তিনি। ফিরে গিয়ে চাঁদের পাহাড়ের জায়গায় নতুন নাম বসালেন, রুয়েনজোরি।

আগের নামটাই ভাল ছিল। শুনতে একটু কেমন কেমন লাগে বটে, কিন্তু এক ধরনের রোমান্টিকতা আছে। আমরা আরও সহজ করে চাঁদের পাহাড়ই বলব, কি বলো?

অসুবিধে নেই।

এহেন রহস্যময় চাঁদের পাহাড়ের আরও গভীরে যে যেতে রাজি হবে না নিগ্রো কুলিরা, এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই, বিশেষ করে গুলি খেয়ে মরে যাওয়া হাতি জ্যান্ত হয়ে চলে যাওয়ার পর। হাতির মাথায় কোথায় গুলি লাগাতে হয়, ওরাও জানে না। কারণ বন্দুক দিয়ে শিকার করেনি ওরা, করেছে বর্শা আর তীর ধনুক দিয়ে।

অধৈর্য হয়ে বলল মুসা, সারাদিন এখানেই দাঁড়িয়ে থাকব নাকি? যেতে বলছ না কেন? ধমক লাগালেই হয়।

মাথা নাড়ল কিশোর, লাভ হবে না। ধমক দিয়ে কোন আফ্রিকানকে কোথাও নিয়ে যেতে পারবে না, নিজের ইচ্ছেয় যদি না যায়। যেতে বাধ্য করলে বিপদে ফেলে দেবে। সাংঘাতিক কুসংস্কার এদের, বনের বাঘ-সিংহকে পরোয়া করে না, কিন্তু ভূতের ভয়ে কুঁকড়ে যায়। এদের বেশির ভাগেরই ধারণা প্রতিটি বড় ঝোঁপ, প্রতিটি পাথর একটা করে ভূতের বাসা। যত বড় ঝোঁপ হবে, ভূতটাও হবে তত বড়। সময় দিতে হবে ওদের, বুঝতে দিতে হবে, দানবীয় এই গাছপালা আসলে কোন ক্ষতি করতে পারে না।

সময় কাটছে। কুলিদের বোঝানোর যথাসাধ্য চেষ্টা করল আকামি। অনেকক্ষণ পর যখন দেখল ওরা, এই দানব বনের ভূত তাদের কোন ক্ষতি করছে না, তখন অনিচ্ছাসত্ত্বেও আরও কিছুদূর এগোতে রাজি হলো।

একটা বুট নষ্ট করে ফেলেছে হাতি। আরেকটা পায়ে রেখে কোন লাভ নেই। সেটাও খুলে ফেলে দিয়ে আরেক জোড়া বুট পরে নিল কিশোর।
যেটা ফেলে দিল, মহানন্দে সেটা তুলে নিল হামবি নামের এক কুলি সর্দার। পায়ে টায়ার কেটে তৈরি একজোড়া স্যান্ডেল। সেগুলো খুলে রেখে বুটটা পরে ফেলল সে। আরেক পায়ে জুতোর মত করে পাতা জড়িয়ে লতা দিয়ে বেঁধে নিয়ে গর্বিত দৃষ্টিতে তাকাল সঙ্গী কুলিদের দিকে। এত সুন্দর জুতো জীবনে আর পরেনি সে।
.
লোকে কথায় বলে-গর্বে মাটিতে পা পরে না। কিন্তু নতুন জুতোর গর্বে আরও বেশি করে পা ফেলতে লাগল হামবি, নতুন শক্তি দিল যেন বিচিত্র জুতোজোড়া। হাসতে হাসতে পাহাড় বেয়ে উঠতে লাগল সে। কিন্তু আচমকা থমকে দাঁড়াল, হাসি মুছে গেছে মুখ থেকে। পাহাড়ী পথ বেয়ে একটা ভূতকে নেমে আসতে দেখেছে।
কয়াশায় জড়িয়ে থাকায় ভূতটাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে না। ভূত মনে হওয়ার কারণ, মানুষের মত দেখতে হলেও ওটা বেজায় লম্বা। তার ধারণা মানুষ এত লম্বা হতে পারে না।
পেছনের কুলিরাও দেখে ফেলল ভূতটাকে। আতঙ্কে, উত্তেজনায় একে অন্যের গায়ে গুতো দিয়ে কলরব শুরু করে দিল ওরা। দু-একজন ঘুরে দৌড় দেয়ারও চেষ্টা করল, ধরে ফেলল আকামি।
দমকা বাতাসে সরে গেল কুয়াশা। স্পষ্ট দেখা গেল এখন মানুষটাকে, ভূত নয়। কিন্তু তবু কুলিদের কারও বিশ্বাস হতে চাইল না।
ওরা যে অঞ্চল থেকে এসেছে, সেখানকার মানুষ পাঁচ ফুটের ওপরে কয়েক ইঞ্চির বেশি লম্বা হয় না। পৃথিবীর সবচেয়ে লম্বা মানুষ উয়াটুসিদের কখনও দেখেনি ওরা, যারা সাত ফুটের বেশি লম্বা হয়।
উয়াটুসিরা নিগ্রো নয়, সাদা মানুষও নয়, ওদের চামড়া উজ্জ্বল তামাটে রঙের। মাথা সোজা করে চলার স্বভাব, চলেও দ্রুতগতিতে, যেন দমকা বাতাস। ভাল নাচতে পারে, লাফ দিয়ে উঠতে পারে অনেক উঁচুতে।
কিং সলোমনস মাইনস ছবি থেকে উঠে এসেছে দেখি! বিড়বিড় করল কিশোর।
মাথা ঝাঁকাল মুসা। ফিল্মটা সে-ও দেখেছে। ওই ছবিতে উয়াটুসিদের একটা চমৎকার দৃশ্য চিত্রায়িত করা হয়েছে।
আঁকাবাঁকা পথ ধরে নেমে আসা লোকটার একটা সাদা চাদরে মোড়া, হাতে লম্বা লাঠি। বিদেশীদের দেখে নিশ্চয় অবাক হয়েছে, কিন্তু ভয় পেল না। নিজের চেয়ে আকারে ছোট মানুষকে ভয় করে না উয়াটুসিরা।

এগিয়ে আসছে লোকটা। পাশ কাটানোর সময় সামান্য মাথা ঝুঁকিয়ে সালাম জানাল।
আকামি, কিশোর বলল, ওকে থামতে বলো। ওর সঙ্গে কথা বলব।
সব আফ্রিকান গোত্রেরই মোটামুটি নিজস্ব একটা ভাষা থাকে, উয়াটুসিদেরও আছে। সেটা জানে না আকামি। সুতরাং সোয়াহিলি ভাষায় কথা বলল সে- আফ্রিকার অনেক জায়গার লোকেই এই ভাষাটা বোঝে।
বুঝল লম্বা লোকটা। মাথা ঝাঁকাল। তবে সোয়াহিলিতে না বলে কিশোরের দিকে ফিরে ইংরেজিতে বলল, কি করতে পারি, বলো?
অবাক হয়ে গেল কিশোর, আপনি ইংরেজি জানেন!
হাসি ফুটল তামাটে মুখটায়। এত বছর ধরে ইংরেজরা মাতব্বরি করল আমাদের ওপর, ভাষাটা জানব না? তবে আমি শিখেছি সিনেমায় কাজ করার সময়।
সিনেমা?
হ্যাঁ, একটা ছবিতে কাজ করতে হয়েছে আমাকে। অভিনয়।
নেচেছেন?
নেচেছি, লাফিয়েছি, কথাও বলেছি।
লাফিয়েছেন? কথাটা ধরল মুসা। তারমানে ওটা সাংঘাতিক লাফ, নইলে সিনেমায় নিতে যাবে কেন?
তা বলতে পারো।
আপনার নামটাই কিন্তু জিজ্ঞেস করা হয়নি এখনও, কিশোর বলল।
আমার নাম ওগারো। আমি একটা গায়ের মোড়ল।
ও, তারমানে সাধারণ লোক নয়। ইংরেজি জানে, গায়ের সর্দার...নিজের, মুসার আর আকামির পরিচয় দিল কিশোর।
মুসা বলে বসল, পরিচয় তো হলো, এবার আপনার লাফ দেখাবেন? শুনেছি উয়াটুসিরা অনেক উঁচুতে উঠতে পারে লাফ দিয়ে, কথাটা সত্যি?
ওগারো হাসল, সত্যি না হলে কি আর সিনেমার জন্যে ছবি তোলে?
তা-ও তো বটে। একমুহূর্ত ভাবল মুসা, লাফ দিয়ে কত ওপরে উঠতে পারবেন আপনি?
কতটা উঠতে বলো?
আবার ভেবে নিল মুসা। কিশোরকে দেখিয়ে বলল, আমার বন্ধুর মাথার ওপর দিয়ে পেরিয়ে যেতে পারবেন?
পরামর্শটা ভাল লাগল না কিশোরের। মুসার দিকে তাকিয়ে নিচু স্বরে বলল, ভাল করে ভেবে দেখো কি বলছ। যদি পার হতে না পারে, লাথি লাগবে আমার মুখে।
লাগবে বলা যায় না, লাগতে পারে, মুচকি হাসল মুসা।

সব শুনতে পেল ওগারো। আরেক কাজ করো বরং। কিশোর, তুমি তোমার বন্ধুকে কাঁধে নিয়ে উঠে যাও। লাফিয়ে দুজনের মাথার ওপর দিয়ে চলে যাব আমি।
হেসে ফেলল কিশোর। এগিয়ে গেল মুসার দিকে। তাকে জব্দ করতে চেয়েছিল মুসা এখন পড়েছে বেকায়দায়।
কি আর করবে মুসা, নিজের ফাঁদে নিজেই পড়েছে। কাঁধ নিচু করে দিল। তার কাঁধে উঠে বসে দুই পা ঝুলিয়ে দিল কিশোর মুসার বুকের ওপর।
কেমন লাগছে? হেসে জিজ্ঞেস করল কিশোর।
রাগে ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে উঠল মুসা।
শব্দ করে হেসে ফেলল কিশোর। তরল স্বরে বলল, মন খারাপ কোরো না। লাথি খেয়ে মরার ভয় পাচ্ছ তো? ভয় নেই, সবাইকে একদিন মরতে হবে-আগে আর পরে। তুমি না থাকলে তোমার জন্যে সত্যি খারাপ লাগবে আমার, মুসা। আহা, এতগুলো বছর একসঙ্গে ছিলাম, কত জ্বালিয়েছ আমাকে।
কিশোরের পা খামচে ধরল মুসা।
আঁউ! করে চিৎকার করে উঠল কিশোর, খামচি দিলে কেন?
যদি পড়ে যাও, সেজন্যে শক্ত করে ধরলাম।
আমি তো তোমার মাথা শক্ত করে ধরে আছি। পড়ব কেন?
হাসল মুসা। বুঝলে না? বুঝিয়ে দিলাম, এখনও মরিনি! জ্বালানো শেষ হয়নি।
গায়ের চাদর খুলে ফেলল ওগারো। তার তামাটে রঙের সুগঠিত শরীরটা দেখতে লাগছে একটা তামার স্তম্ভের মত।
দুই গোয়েন্দা ভাবল, কিছুদূর পিছিয়ে গিয়ে দৌড়ে এসে লাফ দেবে সে, হাই জাম্প যেভাবে দেয়া হয়। কিন্তু এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল ওগারো। হঠাৎ করে হাঁটু ভাঁজ করে আবার সোজা করে ফেলল, শূন্যে লাফিয়ে উঠল ঘড়ির মত। মুসার মাথা ছাড়াল পা, তারপর কিশোরের। ওর মনে হলো বিশাল পা দুটো এসে বাডি মারবে মুখে। চোখ বন্ধ করে ফেলল সে।
কিন্তু মাথার ওপর এক ঝলক দমকা বাতাস ছাড়া আর কিছু টের পেল না। চোখ মেলে দেখতে পেল তার পেছনে দাঁড়িয়ে হাসছে সর্দার। এতবড় একটা পরিশ্রমের পরও সামান্যতম হাঁপাচ্ছে না। চাদরটা তুলে নিয়ে আবার গায়ে পেঁচাল।
আর কিছু করতে হবে? জিজ্ঞেস করল সে।
করলে খুবই উপকার হয়, কিশোর বলল। তবে তার আগে বলে নিই, আমরা কেন এখানে এসেছি। আমরা এসেছি জন্তু-জানোয়ার ধরতে। চিড়িয়াখানা, সার্কাস, ফিল্ম কোম্পানির দরকার হয় এ সব জানোয়র। তাদের কাছে বিক্রি করব। এ ব্যাপারে আপনার সাহায্য দরকার।

জানোয়ার ধরা খুব বিপজ্জনক কাজ। একা করা কঠিন।
একা নই আমরা। তিরিশ জন লোক আছে। সবাই আফ্রিকান। আফ্রিকা চেনে ওরা, কোন্ জানোয়ার কোথায় থাকে, ওদের স্বভাব কেমন, জানে।
মাধা নাড়ল সর্দার। ওরা জানে কেবল খুন করতে। জ্যান্ত ধরতে জানে না।
কিন্তু আমার লোকেরা শিখে ফেলেছে। কয়েক মাস ধরে আমাদের সঙ্গে আছে ওরা। অনেক জানোয়ার ধরেছি-জিরাফ, মোষ, হায়েনা, চিতাবাঘ, বেবুন, জলহস্তী, অজগর সাপ, দাঁতালো শুয়োর, বুশ-বেবি, হানি ব্যাজার, আরও অনেক কিছু।
ও, তাহলে তো অনেকই এগিয়েছ। নিয়েই ফেলেছ সব।
না, এখনও বাকি আছে। সবচেয়ে বড়টাকেই ধরা হয়নি এখনও।
হাতির কথা বলছ?
হ্যাঁ। সাধারণ হাতি আগেই ধরতে পারতাম। তবে আমরা চাই চন্দ্রপাহাড়ের হাতি। বাচ্চা একটা হাতি অবশ্য চলে এসেছে আমাদের সঙ্গে। ওটার মা-কে মেরে ফেলেছে পোচাররা। হাতিটাকে বাঁচাতে গিয়ে পোচারদের মার খেয়ে আহত হয়েছে আমার আরেক বন্ধু রবিন মিলফোর্ড। অবস্থা এতটাই খারাপ, ফিরতি প্লেনেই দেশে, অর্থাৎ আমেরিকায় পাঠিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছি তাকে। আমার বন্ধু মুসা মরা হাতির বাচ্চাটাকে সান্তনা দিতে গিয়েছিল। বাচ্চাটা চলে এসেছে তার সঙ্গে। নেওটা হয়ে গেছে। খাঁচার বাইরে থাকলে মুসাকে ছেড়ে এক পা নড়বে না।
হাসল সর্দার। কিন্তু এখানকার হাতি তো ধরতে পারবে না।
কেন পারব না?
এগুলো অনেক বড়, অনেক শক্তি গায়ে। চন্দ্রপাহাড়ের হাতির মত শক্তিশালী আর কোন জানোয়ার পৃথিবীতে নেই। কারণ ওরা পাহাড়।
এই প্রথম লোকটার চোখে ভয় দেখতে পেল কিশোর। জিজ্ঞেস করল, পাহাড়ের মত বড় বলতে চাচ্ছেন তো?
না, আসল পাহাড়ই বলতে চাইছি।
সচল কুয়াশায় ডুবছে-ভাসছে যেন পেছনের আর আশপাশের পাহাড়গুলো।
সাধারণ জায়গা মনে কোরো না এটাকে, সর্দার বলল, জাদুর ছড়াছড়ি এখানে। চেহারা দেখে এখানে জিনিস চেনা মুশকিল। খালি চোখে যা দেখা যায়, আসলে সেটা সে-জিনিস নয়, অন্য কিছু। মস্ত ধোকা। আমাকে পাগল ভাবছ তো? বোকা ভাবছ? কোনটাই আমি নই। আমাদের ওঝারাও বোকা নয়। তাদের কথা বিশ্বাস করি আমরা। এই ভূমি হাতিদের পবিত্র স্থান। কুয়াশায় ঢেকে দেয় পাহাড়-পর্বত, হঠাৎ দেখবে একটা হাতি দাঁড়িয়ে আছে তোমার সামনে। পরক্ষণেই নেই, সেখানে আবার পাহাড়। দেখলে কে অবিশ্বাস করবে হাতি আর পাহাড় এক নয়? সুতরাং

বুঝতেই পারছ, হাতির সঙ্গে লাগতে যাওয়া আর পর্বতের বিরুদ্ধে লড়াই করা এখানে একই কথা।
আজব বিশ্বাস, ভাবল কিশোর। অনবরত পাক খেয়ে ঘুরে মরছে যেন কুয়াশার স্তর, তার মধ্যে দানবীয় ফুল, অজগর সাপের মত মোটা মোটা লতাগুলোকে কেমন অপার্থিব লাগছে। আপনি বলতে চাইছেন হাতি যদি ধরেও ফেলি, ওটা পরে পাহাড় হয়ে যাবে?
তা বলছি না। বিদেশী মানুষের জাদু আমাদের জাদুর চেয়ে অন্য রকমও হতে পারে। আমি বলছি, হাতি ধরায় আমাকে সাহায্য করার অনুরোধ কোরো না। উয়াটুসিরা অসহায়।
বেশ, হাতি ধরতে না হয় না-ই গেলেন। কিন্তু আরও সাহায্য করতে পারেন আমাদের। গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে গুজগুজ, ফিসফাস করছে কুলিরা। এগোতে সাহস পাচ্ছে না ওরা। একটু বোঝাবেন ওদের? বলবেন, সামনে কোন বিপদ নেই?
কিন্তু বিপদ নেই এ কথা তো বলতে পারি না। হাতির পেছনে লাগলে অবশ্যই আছে। সোজা গিয়ে মৃত্যুর মুখে ঢুকবে। এগিয়ে এসে পিষে মারবে তোমাকে পর্বত। ওগুলোর মধ্যে যে দুষ্ট প্রেতেরা বাস করে, হাত তুলে আশপাশের দানবীয় উদ্ভিদগুলোকে দেখাল সর্দার, ওরা চোখের পলকে বুনো জানোয়ার হয়ে গিয়ে খেয়ে ফেলবে তোমাদের।
ওগারোর কুসংস্কার দেখে মনে মনে হাসল কিশোর, তবে মুখে সেটা প্রকাশ করল না। বলল, সেই ভাবনা আমাদের। বেশ, সামনে বিপদ নেই, একথাও নাহয় না বললেন। সামনে যে তাঁবু ফেলার নিরাপদ জায়গা আছে এটা বলতে নিশ্চয় আপত্তি নেই?।
না, তা নেই, এ কথা খুশি হয়েই বলতে পারি। আমার গায়েই থাকার ব্যবস্থা করে দিতে পারি তোমাদের। বেশি দূরে নয়। তোমার আর সব লোক কোথায়? এখানে তো মাত্র বারোজন?
এটা স্কাউটিং পার্টি, কিশোর জানাল। আগে আগে হেঁটে চলে এসেছি আমরা, পথঘাট চিনে নেয়ার জন্যে। মোটর চলার রাস্তা আছে কিনা দেখে গিয়ে ওদেরকে খবর দিলে ওরা আসবে। জীপ আর ট্রাক নিয়ে পাহাড়ের গোড়ায় অপেক্ষা করছে ওরা। খবর পেলেই রওনা হবে। এখন আপনি আমাদের সাহায্য না করলে সব ভজকট হয়ে যাবে।
দেখি, কি করতে পারি, বলে ভয়ে কুঁকড়ে থাকা কুলিদের দিকে এগোল ওগারো।
মন দিয়ে সর্দারের কথা শুনল লোকগুলো। তার গায়ে ওদেরকে থাকতে দেয়া হবে জেনে মুহূর্তে খুশি হয়ে উঠল ওরা, ভয় কেটে গিয়ে উজ্জ্বল হলো চোখমুখ।

আনন্দে হুল্লোড় করে উঠল।
আবার এগিয়ে চলল দলটা। নানা রকম দানবীয় উদ্ভিদের অভাব নেই পথের পাশে, কিন্তু এখন ভয় কেটে গেছে কুলিদের। তবে গাছগুলোর কাছ থেকে দূরে থাকছে যতটা সম্ভব। মানুষ সমান উঁচু বিছুটির রোয়াগুলো বড় বড় কাঁটার মত, সুচের মত তীক্ষ্ণ। তাড়াহুড়ো করে এগোতে গিয়ে এই কাঁটার খোঁচা খেলো মুসা। বুশ জ্যাকেট আর সাফারি ট্রাউজারের মত ভারি কাপড়ও অতি সহজেই ভেদ করে চামড়ায় ফুটে গেল কাঁটা। ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল সে।
পথের ওপর পড়ে থাকা বিছুটির একটা ভাঙা ডাল তুলে নিয়ে কাঁটাগুলো পরীক্ষা করে কিশোর বলল, এতে লাগলে গাড়ির চাকাও ফুটো হয়ে যাবে! সাংঘাতিক শক্ত!
এগিয়ে গিয়েছিল সর্দার। গোলমাল কিসের দেখার জন্যে ফিরে এল। মুসার হাতের আঁচড় থেকে রক্ত বেরোতে দেখে আন্দাজ করে ফেলল কি হয়েছে। গম্ভীর ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলল, হবেই। চিতাবাঘের নখ ধারালই হয়।
চিতাবাঘ পেলেন কোথায়? অবাক হয়ে বলল মুসা, এ তো কাটা!
চিতাবাঘ যখন মরে যায়, এই গাছ হয়ে যায়। আবার গাছ মরে গিয়ে চিতাবাঘ হয়।
সর্দারের দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। ইংরেজি জানা বুদ্ধিমান একজন মানুষের এরকম অদ্ভুত বিশ্বাস জন্মায় ভাবতে অবাক লাগে। সব গাছপালাই কি নানা রকম জানোয়ার?
না, সব জানোয়ার নয়। কিছু কিছু গাছ আমাদের পূর্বপুরুষদের আত্মা।
তাহলে নিশ্চয় ওসব গাছকে ভয় করার কিছু নেই। আপনার পূর্বপুরুষরা নিশ্চয় সব ভালমানুষ ছিলেন?
তা ছিলেন। ভাল এবং দয়ালু। কিন্তু মরার পর খারাপ হয়ে গেছে। খারাপ এবং নিষ্ঠুর।
কেন এ রকম হলো?
কারণ ওদেরকে খাবার দিই না আমরা। দিতে পারি না। অনেক বেশি লোক। কত দেব? যাকে দিতে পারি না, সে-ই আমাদের শত্রু হয়ে যায়, রেগে গিয়ে ক্ষতি করার চেষ্টা করে। ধারাল নখওয়ালা জানোয়ার হয়ে ঝোঁপের মধ্যে লুকিয়ে থাকে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে, বিষাক্ত রস খাইয়ে আমাদের অসুস্থ করে ফেলে, গায়ের ওপর পড়ে পিষে মারে।
সর্দারের কথাকে সত্য প্রমাণ করার জন্যেই যেন গাছ থেকে ঝরে পড়ল একটা বিশাল লবেলিয়া ফুল। লাফ দিয়ে সরে গেল নিচে যে লোকটা ছিল সে। গায়ে পড়লে মরত।

ফুলটা ভাল করে দেখল কিশোর। নীল রঙের পাপড়িগুলো যেন একেকটা ইস্পাতের পাত। দশ-বারো বছরের একটা ছেলের সমান বড় ফুলটা এত ভারি, টেনে তুলতেই কষ্ট হয়।
চমৎকার নমুনা, বলে আকামির দিকে ফিরল কিশোর। দু-জন লোককে আসতে বলো তো, তুলে নিক।
হাত তুলল সর্দার। না না, নিয়ো না, আমার কথা শোনো। থাক এখানেই। এটা সঙ্গে নেয়ার মানে মৃত্যুকে বহন করা। দু-জন মানুষ হারাতে না চাইলে এ কাজ কোরো না।
ফিসফিস করে বন্ধুকে বলল মুসা, লোকটা পাগল। এসো, আমরা দুজনেই বয়ে নিই।
না, মাইন্ড করে বসতে পারে। তাহলে বেকায়দায় পড়ব আমরা। ও এখানকার সর্দার, ভুলে যেয়ো না।
পিপার মত ফুলটাকে ঠেলে রাস্তার ওপর থেকে সরিয়ে দিল কিশোর। থাক এখানে। পরে এসে নেব।
গায়ের দিকে এগোতে এগোতে আরও নানারকম অদ্ভুত জিনিস চোখে পড়ল ওদের। মাটিতে চার ফুট উঁচু হয়ে জন্মে থাকা শ্যাওলার পাশাপাশি গাছের গায়ে আঠারো ফুট পুরু হয়ে জন্মেছে আরেক ধরনের শ্যাওলা। ওগুলোর মধ্যে গর্ত করে বাসা বেঁধেছে পেঁচা। কোন কোন জায়গায় এমন করে ঢেকে ফেলেছে, মূল গাছটাকেই আর দেখা যায় না, মনে হয় শ্যাওলার বড় বড় স্তম্ভ। সেইসব স্তম্ভকে আবার ছেয়ে রেখেছে অপূর্ব সব অর্কিড, কি তাদের রঙ-লাল, গোলাপী, নীল, সবুজ! রামধনুর সাতরঙের ছড়াছড়ি এখানে।
সামনে হঠাৎ করে শেষ হয়ে গেল জঙ্গল। ওখানে ঘাসের রাজত্ব। আর ঘাসও বটে! মানুষের মাথা ছাড়িয়ে যায়।
তারপর আবার বদলে গেল দৃশ্য। কলাবাগানে ঢুকল ওরা। কলাগাছ না বলে তালগাছ বলাই ভাল, আর কলাগুলোকে কলা না বলে শসা। এত বড়।
মাটিতে পড়ে থাকা একটা কলা তুলে নিয়ে ছুরি দিয়ে কেটে অবাক হয়ে গেল মুসা। কিছু নেই ভেতরে, কেবল বড় বড় বীচি। শসটা কি হয়েছে জিজ্ঞেস করে জানতে পারল, বেশিদিন পড়ে থাকলে খোসার ভেতরেই শাঁসটা নষ্ট হয়ে যায়।
আরও এগোতে মানুষের কলরব শোনা গেল। বোঝা গেল, গায়ের কাছে চলে এসেছে।
গাঁয়ে ঢোকার মুখে পথের পাশে একটা বিরাট ঘর। ফুলে ফুলে ঢাকা। ভেতরে তাকে তাকে সাজানো রয়েছে ফল, শস্য, আর মাংস।
এটা কি? সর্দারকে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

দুষ্ট প্রেতের অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্যে এই ব্যবস্থা। খাইয়ে-দাইয়ে ওদের। পেট ভরিয়ে রাখতে পারলে মানুষের দিকে আর নজর দেবে না।
কাজ হয় এতে?
সব সময় হয় না, স্বীকার করল সর্দার। এত কিছু দেয়ার পরেও গাঁয়ে ঢোকে। নিয়ে আসে রোগ-শোক, আমাদের গরু ছাগল চুরি করে নিয়ে যায়। এ সব করতে করতে সাহস এতটাই বেড়ে গেছে, কিছুদিন ধরে আমাদের ছেলেমেয়েদেরও ধরে নিতে আরম্ভ করেছে। রাতের বেলা রহস্যজনক ভাবে হারিয়ে যায় ছেলেমেয়েগুলো। পরদিন সকালে পাহাড়, জঙ্গল আঁতিপাতি করে খুঁজেও ওদের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। একবার গেলে ফেরে না আর কখনও।
বিষণ্ন দেখাল সর্দারকে। আমাদের সবচেয়ে শক্তিশালী জাদুও এখানে বিফল হয়েছে। কি করব বুঝতে পারি না। যাই হোক, আমাদের যন্ত্রণার কথা বলে। তোমাদের মন খারাপ করতে চাই না। এসো, আমাদের গায়ে স্বাগতম।
আফ্রিকার অন্যান্য গাঁয়ের চেয়ে ওগারোর গ্রাম অনেক বেশি সুন্দর। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, ঝকঝকে করে রাখা হয়েছে। শক্ত, মোটা শ্যাওলা দিয়ে বেড়া দেয়া হয়েছে কুঁড়েগুলোর; কাঠামো আর খুঁটি বাঁশের তৈরি। বাঁধা হয়েছে লিয়ানা লতা দিয়ে। পেপিরাসের উঁটি দিয়ে চাল ছাওয়া হয়েছে-প্রাচীন মিশরীয়রা যে জিনিস দিয়ে কাগজ বানাত, সেই একই জিনিস। তালপাতা দিয়ে তৈরি চালার চেয়ে এ চালা অনেক বেশি টেকসই। চালার নিচের দিকটা অনেকখানি করে বাড়িয়ে রাখা হয়েছে, যাতে বেড়াগুলোতে বৃষ্টির পানি না লাগতে পারে।
কিন্তু ঘরবাড়ির চেয়ে গাঁয়ের মানুষের প্রতিই বেশি কৌতূহল আর আগ্রহ কিশোর-মুসার। সাত ফুটের বেশি লম্বা নারী-পুরুষ এগিয়ে এল তাদের সঙ্গে মমালাকাত করার জন্যে। গায়ের সাদা চাদরের কারণে মার্বেলের স্তম্ভ বলে মনে হচ্ছে ওদেরকে। মেহমানদের ঘিরে ফেলল ওরা।
নিজের ভাষায় আগন্তকদের পরিচয় গ্রামবাসীদের জানাল সর্দার।
ওগারোর মতই সহজ-সরল গ্রামের মানুষগুলো। হাসিমুখে মেহমানদের অভ্যর্থনা করল।

.
একটা ব্যাপার লক্ষ করল কিশোর, গায়ের সব মানুষ সাত ফুট উঁচু নয়।
ওদের চারপাশে ঘোরাঘুরি করছে অনেক খুদে খুদে মানুষ, যাদের গায়ে সাদা চাদর নেই, শুধু কোমরের কাছে একটুকরো গাছের বাকল বাধা। ওটাই ওদের নেংটি। উয়াটুসিদের মত তামাটে নয় এদের গায়ের রঙ, কুচকুচে কালো।
সবচেয়ে জিব ব্যাপারটা হলো, ওদের উচ্চতা। তিন থেকে চার ফুট, তার বেশি নয়। অথচ সবাই প্রাপ্তবয়স্ক।

এ তো মনে হচ্ছে গালিভারের গল্পের দেশে চলে এলাম! অবাক হয়ে বলল মুসা। ব্রবডিংনাগ আর লিলিপুট, দু-জাতের একসঙ্গে বসবাস। একদল দৈত্য, আরেক দল বামন। কি করে সম্ভব হলো এটা?

বামনরা হলো পিগমি, কিশোর বলল। কঙ্গোর এই এলাকার অনেক বিস্ময়ের একটা এই বিস্ময়। একই জায়গায় যেমন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মানুষের বাস, পাশাপাশি বাস পৃথিবীর সবচেয়ে খুদে মানুষদেরও-উয়াটুসি এবং পিগমি। উয়াটুসিদের কুঁড়ের পেছনে ওই যে ওইখানে মৌচাকের মত খুপরিগুলো দেখছ, ওগুলো পিগমিদের বাড়িঘর।

ওদের কথা শুনছিল সর্দার। বলল, তুমি ঠিকই বলেছ। গাঁয়ের একটা অংশে পিগমিরা থাকে। ওরা আমাদের চাকর। তবে ওদেরকে অসম্মান কিংবা অপমান করার কোন কারণ নেই। ওদের সর্দারের সঙ্গে দেখা হয়েছে? ওর নাম হিব।

নাম ধরে ডাকতেই বড় পুতুলের আকারের একজন মানুষ বেরিয়ে এল ভিড়ের মধ্যে থেকে। আন্তরিক ভঙ্গিতে হাত মেলাল কিশোর-মুসার সঙ্গে, অবশ্যই আফ্রিকান কায়দায়। শরীরের তুলনায় মাথাটা অস্বাভাবিক বড়। চোখের কোণে আর গলার ভাঁজ দেখেই বোঝা যায়, অনেক বয়েস তার, বুড়ো মানুষ।

উচ্চতার এই তারতম্য অদ্ভুত লাগছে কিশোরের কাছে।

কালো বনের কালো লোকটার চেহারার সঙ্গে মানুষের চেয়ে শিম্পাঞ্জীর মিলই বেশি। কিশোরকে আরও অবাক করে দিয়ে ইংরেজিতে কথা বলে উঠল সে, তোমাদের সাহায্য করতে পারলে খুশি হব আমরা। তোমাদের দেশের লোকেরা কথা-বলা-ছবি তুলতে এসেছিল আমাদের দেশে। তখন তোমাদের ভাষা শিখেছি।

তোমাদের দেশ বলতে আমেরিকানদের বোঝাচ্ছে হিবা। তার জানা থাকার কথা নয়, আমেরিকা থেকে এলেও কিশোর আমেরিকান নয়, বাংলাদেশী। আর মুসা তো তাদেরই দেশী, আফ্রিকান। সেসব ব্যাখ্যা করতে গেলে বাংলাদেশ আর আমেরিকা সম্পর্কে অনেক জ্ঞান দিতে হবে লোকটাকে। অত কথার মধ্যে গেল না কিশোর। হেসে বলল, আপনাদের ভাষাও যদি আমি এমন করে বলতে পারতাম, খুব ভাল হত।

সর্দার হিবা বলল, হাতি মারতে এসেছ তোমরা। আমরা তোমাদের সাহায্য করব।

পাহাড়ের সমান হাতি মারতে সাহায্য করবে এই বানরের সমান মানুষ!-হাসি পেল কিশোরের। তবে হাসল না। বলল, তাহলে তো উপকারই হয়। অবশ্য একটা ভুল করছেন, হাতি মারতে নয়, হাতি ধরতে এসেছি আমরা।

ওই একই কথা হলো, বিজ্ঞের ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল হিবা। ধরার পরই তো মারা। মাংস না খেয়ে জ্যান্ত হাতি কেন ধরে নিয়ে যাবে বিদেশীরা, এটা বুঝবে না

সে। তাকে বোঝানোর চেষ্টাও করল না কিশোর। ধরতে সাহায্য করলেই হয়। পরের কথা পরে।
কিশোর কি ভাবছে, আন্দাজ করে ওগারো বলল, পিগমিরা অনেক বড় হাতি শিকারি। আমরা, উয়াটুসিরা কাউকে ভয় পাই না, অথচ হাতি মারার সাহস নেই। কিন্তু পিগমিদের আছে। ওরা আমাদের চেয়েও সাহসী। তাদের জাদুর আলাদা। ক্ষমতা আছে। আমি এখনও জানি না, হাতি ধরতে পারবে কিনা তোমরা, কিন্তু যদি পারো, এই পিগমিদের সাহায্যেই পারবে।
মাথা নুইয়ে সর্দারের কথায় শ্রদ্ধা জানাল কালো বামন, বলল, হাতি ধরতে বিদেশীদেরকে সব রকম সাহায্য করব আমরা।
আশ্বাস পাওয়া গেছে। একজন কুলিকে সঙ্গে দিয়ে গাঁয়ের একজন লোক পাঠিয়ে দিল ওগারো, পাহাড়ের গোড়ায় রেখে আসা কিশোরদের বাকি দলটাকে খবর দেয়ার জন্যে।
চোদ্দটা ট্রাক, লরি, জীপ আর ল্যান্ডরোভারের সারি এসে ঢুকল গায়ের পাশের খোলা জায়গায়। ক্যাম্প করার ব্যবস্থা হলো ওখানে।
উয়াটুসিদের বড় বড় শিংওয়ালা গরুগুলো ঘাস খেতে খেতে চোখ তুলে তাকিয়ে দেখতে লাগল একদল আজব মানুষকে।
তাঁবু খাটানো দেখতে এসেছে গাঁয়ের ছেলেমেয়েরাও। তাদের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল বছর তেরো বয়েসের একটা ছেলে। গায়ের রঙ উজ্জ্বল তামাটে। সুন্দর চোখ, মুখে হাসি। ভাবভঙ্গিতে বোঝা গেল, কথা বলতে চায়।
ছেলেটাকে পছন্দ হয়ে গেল মুসার। জিজ্ঞেস করল, তুমি ইংরেজি জানো?
জানি। তবে বাবার মত বলতে পারি না।
দ্রুত তার সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে গেল মুসার। জানল, ছেলেটার নাম আউরো। সর্দার ওগারোর ছেলে সে।
চমৎকার একটা হ্রদ আছে এখানে। দুপুরের পর সেটা দেখিয়ে আউরোকে জিজ্ঞেস করল মুসা, মাছ আছে এখানে?
অভাব নেই, আউরো বলল। মাছ ধরতে যেতে চাও?
রাজি হয়ে গেল মুসা।
দৌড়ে গিয়ে বাবার কুঁড়ে থেকে পেপিরাস-আঁশের সুতোয় তৈরি দুটো ছিপ নিয়ে এল আউরো। সুতোর মাথায় কোনও প্রাণীর হাড় দিয়ে বানানো দুটো বঁড়শি বাধা। বুনো শুয়োরের চোয়ালের হাড়ে তৈরি একটা বেলচা জাতীয় জিনিসও আনল।
এটা কি জন্যে? জানতে চাইল মুসা।
কেচো তোলার জন্যে।
এক জায়গায় ভেজা নরম মাটি খুঁড়তে শুরু করল আউরো।

দুটো কেঁচো হলেই চলবে আমাদের, দুটো বঁড়শির দিকে তাকিয়ে বলল মুসা। চন্দ্রপাহাড়ের কেঁচোর আকারের কথা ভুলে গিয়েছিল।
অবাক হলো আউরো। দুটো কেন?
দুই ছিপের জন্যে দুটো।
একটাই তো একশো বার গাঁথতে পারবে।
কথাটা বুঝল না মুসা।
ইঞ্চি ছয়েক খোঁড়ার পরই আচমকা গর্তের তলার মাটি খুঁড়ে ছিটকে বেরোল একটা বাদামী মাথা।
সাবধান, সাপ! ঝট করে পেছনে সরে গেল মুসা।
সাপ না।
মাথার পেছনে একটু নিচে যেখানে ঘাড় থাকার কথা সেখানটা চেপে ধরল আউরো। খুঁড়েই চলল মাটি, যতক্ষণ না টেনে বের করে আনতে পারল জীবটাকে। তারপর হাত লম্বা করে তুলে ধরল।
পিগমির সমান লম্বা জীবটা, মুসার কব্জির মত মোটা। মাথাটা বাদামী, শরীরটা আগুনে-লাল। হাঁ করে রেখেছে কুৎসিত মুখ। এ ছাড়া চেহারায় আর কোন বৈশিষ্ট্য নেই।
দূরে দাঁড়িয়ে ছিল কিশোর। দেখতে এগোল।
চোখও নেই, মুসা বলল, কানও নেই।
আমাদের দেশের সাধারণ কেঁচোর মতই, কিশোর বলল। কানে শোনে না, গন্ধ পায় না, স্বাদ বোঝে না। তবে অল্প অল্প দেখতে পায়।
চোখ ছাড়া কি দিয়ে দেখে?
দেখে বলা যাবে না। খুদে খুদে ইন্দ্রিয় আছে এটার, এর সাহায্যে আলো আর অন্ধকারের পার্থক্য বোঝে। দিনের বেলা মাটির নিচে থাকে, রাতে বেরোয়। তখন টর্চের আলো গায়ে ফেললেই তাড়াতাড়ি আবার গিয়ে মাটির নিচে সেঁধোবে।
দানবীয় কেঁচোর শরীরের নিচের দিকে দু-পাশে এক ধরনের খোঁচা খোঁচা জিনিস আছে।
এগুলো দিয়ে কি হয়? জিজ্ঞেস করল মুসা।
এগুলো মাটির নিচে সুড়ঙ্গ করে এগোতে সাহায্য করে কেঁচোকে।
কিন্তু সুড়ঙ্গই বা করে কি করে? খুঁড়ে ফেলা মাটি যায় কোথায়?
সেটাই তো এক বিস্ময়। শরীরের ভেতর দিয়ে পার হয়ে যায় ওই মাটি। খোঁড়া মাটি গিলে ফেলে কেঁচো, সেগুলো আবার বের করে দেয় পেছনের একটা ফুটো দিয়ে। ফলে শরীরটা এগিয়ে গেলেও মাটিতে কোন সুড়ঙ্গ রয়ে যায় না, বের হওয়া মাটিতেই ভরে যায় খোঁড়া অংশটা।

আচ্ছা, এই কেঁচোটা পুরুষ না মেয়ে?
মেয়েও, পুরুষও।
তারমানে উভয়লিঙ্গ! বাপরে বাপ! একটা সাধারণ কেঁচোর মধ্যে এত কারিগরি!
এখন বুঝলে তো, কেঁচোও সাধারণ কোন প্রাণী নয়।
হ্রদের পাড়ে একটা কলাগাছের ভেলা বাঁধা আছে। মুসাকে নিয়ে সেটাতে চড়ল আউরো। বেয়ে নিয়ে এল বেশি পানিতে। মাথা কেটে ফেলে আগেই কেঁচোটাকে মেরে ফেলেছে সে। এখন সেটাকে কেটে দুই টুকরো করে বঁড়শিতে গাঁথল।
পানিতে বঁড়শি ফেলার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই টান পড়ল সুতোয়। টেনে তুলল মুসা। ক্যাটফিশের মত একটা মাছ, তবে আরও অনেক বড়।
মুসার পর পরই আউরোও ধরে ফেলল আরেকটা।
অবাক কাণ্ড! মুসা বলল, এখানকার সব কিছুই বিশাল, কেবল পিগমিরা বাদে। তোমরা, উয়াটুসিরা দুনিয়ার সবচেয়ে লম্বা মানুষ। এখানকার হাতিগুলো একেকটা দানব। ফুল বড়, গাছ বড়, এমনকি অতি সাধারণ একটা কেঁচো, তা-ও সাপের সমান। ব্যাপারটা কি?
আউরো কিছু বলার আগেই পেছনের পর্বত থেকে ভেসে এল বিকট আওয়াজ। গায়ে আসার পর এই শব্দ আরও শুনেছে ওরা, কিশোর বলেছে-পর্বতের গা থেকে কয়েক লক্ষ টন বরফ ভেঙে পড়ার আওয়াজ। কিন্তু উয়াটুসিদের বক্তব্য আলাদা।
আতঙ্কে গোল গোল হয়ে গেল আউরোর চোখ। তুমি বলছ আমরা বড়, কিন্তু আমাদের চেয়েও অনেক বড় সে!
সে? সে কে?
বজ্রমানব। সবচেয়ে লম্বা গাছটার চেয়েও লম্বা সে। হেঁটে যাওয়ার সময় মাটি কাঁপে থরথর করে। কথা বলার সময় মনে হবে হাজারখানেক সিংহ গর্জন করছে। তোমরা যাকে বিদ্যুৎ চমকানো বলো, আসলে সেটা হলো তার চোখের দৃষ্টি-রেগে গেলে অমন করেই জ্বলতে থাকে। সেই আগুন গাছে আঘাত হানলে গাছ ভেঙে পড়ে। গাঁয়ের ওপর পড়লে ঘরবাড়ি সব পুড়ে ছাই হয়ে যায়। সে আসে রাতের বেলা, চুপি চুপি। প্রথমে আমাদের গরু-ছাগল নিয়ে যেত। এখন মানুষও ধরে নিয়ে যায়। সন্ধ্যা নামলে আসে, ভোরের আগেই চলে যায়।
অতই যদি শক্তিশালী, চোরের মত আসে কেন?
তা বলতে পারব না।
আসলে সে ভীতু। নয়তো অন্যায় কিছু করে। সেজন্যেই চুপি চুপি আসে।
ওরকম করে বোলো না! ভয়ে ভয়ে চারপাশে তাকাতে লাগল আউরো। বজ্রমানবকে চেনো না! তার বিরুদ্ধে কথা বললে তোমাদেরও ছাড়বে না।

তোমাদের মারবে, তোমাদের জন্ত-জানোয়ার সব কেড়ে নেবে।
হ্রদের একপাশে গ্রাম। অন্য পাশে পানিতে নেমে এসেছে বন। গাছের নিচে কালো ছায়া।
অন্ধকার হয়ে আসছে, আউরো বলল। বাড়ি চলে যাওয়া উচিত।
লগি বেয়ে ভেলাটাকে তীরে নিয়ে এল ওরা। মাছ দুটো এবং বাকি কেঁচোর পুরোটাই মুসাকে দিয়ে দিতে চাইল আউরো।
মুসা জিজ্ঞেস করল, কেঁচো দিয়ে কি করব?
রান্না করে খাবে। খুব স্বাদ।
ওয়াক, থুহ! বলে কি! কেঁচো আবার খায় নাকি! সাপ হলেও কথা ছিল। তোমরা সাপ খাও?
খাব না কেন? সাপের মাংস খুব ভাল, মুরগীর মাংসের চেয়ে নরম আর রসাল। কেঁচোর মাংস আরও ভাল, কারণ এগুলোর হাড় নেই।
হাড় থাকুক আর না থাকুক, খিদেয় মরে গেলেও কেঁচো খেতে পারবে না মুসা।
মাছগুলো আমি নিয়ে যাই, বলল সে, কেঁচোটা তুমিই নাও। মাছ ধরতে নিয়ে গিয়ে অনেক মজা দিলে, ধন্যবাদ তোমাকে। সকালে দেখা হবে।
তাবুতে এসে মাছ দুটো রান্না করার জন্যে বাবুর্চির হাতে দিল মুসা। খেতে বসে বজ্রমানবের কাহিনী বন্ধুকে শোনাল সে।
কেমন গাঁজা মনে হয় না? মুসা বলল।
হয়ও, আবার না-ও, বলল কিশোর। যারা বিশ্বাস করে তাদের হদ্দ বোকা বলতে পারো। তবে এটাই স্বাভাবিক।
স্বাভাবিক! গাছের চেয়ে লম্বা, বস্ত্র নিক্ষেপ করে, গরু-মানুষ এ সব চুরি করে, এমন মানুষের গল্প তুমি বিশ্বাস করো!
আমি না করলেও দুনিয়ার অনেকেই এ ধরনের আজগুবী গল্প বিশ্বাস করে, বিশেষ করে বনের লোকেরা। আমাদের মত তো সভ্য জগতে বাস করে না ওরা, স্কুলে লেখাপড়া শেখার সুযোগ পায় না। বজ্রপাত, ভূমিকম্প, বন্যা, এ সব প্রাকৃতিক দুর্যোগ কেন ঘটে, তার বৈজ্ঞানিক কারণ জানে না। কুসংস্কার থাকবেই ওদের। তাই ওদের বিশ্বাস এসব ঘটানোর মূলে থাকে দুটো শক্তি-হয় দেবতা, নয়তো শয়তান। এই গাঁয়ে গরু-ছাগল হারাচ্ছে, ছেলেমেয়ে নিরুদ্দেশ হচ্ছে, ভয় ওরা পাবেই। আমারই তো চিন্তা হচ্ছে।
তার মানে বজ্রমানবের গল্পটা তুমি বিশ্বাস করছ?
ওরা যে ভাবে করছে সেভাবে করি না। আমার ধারণা গরু-ছাগল চুরি এবং বাচ্চাদের তুলে নিয়ে যাওয়ার পেছনে মানুষের হাত আছে। আজ রাতে পাহারার

ব্যবস্থা করব। আমাদের জানোয়ারগুলোও নিতে আসতে পারে। গরু-ছাগলের চেয়ে দাম অনেক বেশি ওগুলোর।
দলের সবচেয়ে বিশ্বাসী দু-জন লোক আকামি আর মুংগাকে পাহারায় নিয়োজিত করল কিশোর।
আমি জানি তোমরা খুব ক্লান্ত, ওদের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে বলল সে। সারাটা দিন কঠোর পরিশ্রম করেছ। কিন্তু জানোয়ারগুলো চুরি হয়ে গেলে এই পরিশ্রমের কোন অর্থ থাকবে না। পালা করে পাহারা দেবে তোমরা। একজন জেগে থাকলে আরেকজন ঘুমাবে।
কিশোরের কথায় প্রতিবাদ করল না ওরা।
মুংগা বলল, ভাববেন না বাওয়ানা। আমাদের অসুবিধে হবে না। আমরা বেঁচে থাকতে জানোয়ার চুরি করতে পারবে না কেউ।
চিন্তিত ভঙ্গিতে জানোয়ারের খাঁচাগুলোর দিকে তাকাল কিশোর। অগ্নিকুণ্ডের আলোয় খাঁচার জানোয়ারগুলো স্পষ্ট চোখে পড়ে না। সাবধানে থাকতে হবে, নিজেকে বোঝাল সে।
মুসা দাঁড়িয়ে আছে হাতির বাচ্চার সামনে। আদর করে ওটার নাম রেখেছে খুদে দানব। কিছুতেই ভেতরে থাকতে চাইছে না ওটা, শিকের ফাঁক দিয়ে শুড় বের করে দিয়ে ওর হাত জড়িয়ে ধরে টানছে, আর হাতির ভাষায় মানব শিশুর মত আবদার করছে বের করে দেয়ার জন্যে।
হেসে তার শুঁড়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল মুসা। বলল, রাতে আর কোথায় রাখব তোকে, বল? এখানেই আরাম। আমি তো কাছেই থাকব, তুই ডাকলেই শুনতে পাব। থাক, হ্যাঁ? লক্ষ্মী ছেলে।
কিন্তু লক্ষ্মী হওয়ার কোন ইচ্ছেই নেই খুদে দানবের। বেরোতে পারলে খুশি।
সারাদিন প্রচুর খাটাখাটনি গেছে। তাই তাঁবুতে ঢুকে শোয়র সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল মুসা। কিশোরেরও সময় লাগল না ঘুমাতে।

.

ভীষণ গোলমালে চমকে ঘুম থেকে জেগে গেল ওরা। প্রচণ্ড হই-হট্টগোল!
অনেক মানুষের কণ্ঠ, মহিলাদের কান্না, বাচ্চাদের তারস্বরে চিৎকার, রেগে যাওয়া পুরুষের ধমক-সব মিলিয়ে এক এলাহি কাণ্ড।
বিছানা থেকে লাফিয়ে নেমে একদৌড়ে তাবুর বাইরে চলে এল মুসা। প্রথমেই খেয়াল করল, হাতির বাচ্চাটা নেই।
খাঁচার কাছে দৌড়ে এল সে। পেছনে এল কিশোর।
শূন্য খাঁচা।

সারা গায়ে তুমুল হই-চই। লম্বা, বেঁটে, দুই প্রজাতির মানুষেরাই ভীত পিঁপড়ের মত আতঙ্কে ইতস্তত ছোটাছুটি করছে।
শূন্য খাঁচাটার কাছে, দুই গোয়েন্দার পাশে এসে দাঁড়াল সর্দার ওগাররা।
হাতিটাকে নিয়ে গেছে, কিশোর বলল।
কথাটাকে গুরুত্বই দিল না সর্দার। আরও জরুরী দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছে সে।
আমার ছেলেকে দেখেছ? জিজ্ঞেস করল সে। কান্নার পর্যায়ে চলে গেছে তার কণ্ঠস্বর, তাকে খুঁজে পাচ্ছি না। মনে হয় নিয়ে গেছে!
আরও কয়েকজন গ্রামবাসী দৌড়ে এল দুটো গরু হারানোর খবর নিয়ে। উয়াটুসিদের কাছে মানুষের চেয়ে কম দামী নয় গরু। ভাল হলে তো কথাই নেই। কিন্তু গ্রাম থেকে আসা মহিলা কণ্ঠের বিলাপ আর কান্না গরুর জন্যে নয়। কাঁদছে। সর্দারের ছেলে আউরোর জন্যে, তার মা।
গাঁয়ের সর্দার, অবশ্যই সাধারণ লোকেদের মত হবে না। তার ঘরবাড়িও অন্যদের চেয়ে আলাদা। দরজায় তালা লাগানোর ব্যবস্থা আছে তার ঘরে। গায়ের। একমাত্র তালা। সেই ঘর থেকে আউরোকে নিয়ে যাওয়া একটা বড় রহস্য।
দরজায় তালা ছিল না? জানতে চাইল কিশোর।
নিশ্চয় ছিল, সর্দার জানাল।
তাহলে ঢুকল কি করে লোকটা?
তুমি বুঝতে পারছ না, ও মানুষ নয়, দুষ্ট প্রেত, স্বয়ং বজ্রমানব। আর প্রেতের জন্যে তালা কোন ব্যাপার নয়।
রাতে তো দু-জনকে পাহারা রেখেছিলাম, বন্ধুর দিকে তাকিয়ে বলল মুসা। ওদের তো দেখছি না! কিডন্যাপ করে নিয়ে গেল নাকি?
আকামি আর মুংগাকে দেখেছে নাকি কুলিদের জিজ্ঞেস করল কিশোর। না, দেখেনি ওরা।
খাঁচার আশপাশের সমস্ত ঝোঁপঝাড় খুঁজে দেখা হলো। এক জায়গায় ঝোঁপের ডাল ভাঙা, দোমড়ানো। ঘাস দলিত মথিত। লড়াই হয়েছে যেন ওখানটাতে।
বনের অনেক ভেতরে ঢুকেও খোঁজা হলো।
ঘাবড়ে গেল কিশোর, দু-জন অভিজ্ঞ লোককে হারাল না তো? আকামি আর মুংগা না থাকলে এই অভিযানই ব্যর্থ হয়ে যাবে।
এই সময় শোনা গেল মুসার চিৎকার, এই যে, ওরা এখানে!
দৌড়ে এল কিশোর। একটা বড় পাথরের ফাটলে পড়ে আছে দু-জন লোক। হাত-পা বাঁধা, মুখে কাপড় গোঁজা। মারধরও করা হয়েছে।
মুখের কাপড় খুলে, বাঁধন কেটে দেয়া হলো ওদের।
কি হয়েছিল? জানতে চাইল কিশোর।

লজ্জায় মাথা তুলতে পারছে না আকামি। কি আর বলব! মুংগা ঘুমাচ্ছিল, আমি পাহারা দিচ্ছিলাম। চোখ বন্ধ করিনি, তবে খুব ক্লান্তি লাগছিল। কাউকে আসতে দেখলাম না, শুনলামও না কিছু, হঠাৎ কে যেন মুখ চেপে ধরল। চিৎকার করার চেষ্টা করলাম। আমার মুখে কাপড় খুঁজে দেয়া হলো। ঘুমের মধ্যেই মুংগার মুখেরও কাপড় খুঁজে বেঁধে ফেলল। আমি অনেক ধস্তাধস্তি করলাম, কিন্তু ছুটতে পারলাম না। আমাকেও বেঁধে ফেলল। তারপর এখানে এনে ফেলে দিয়ে চলে গেল।

বেশি লোক?

অনেক।

কি ধরনের মানুষ ওরা?

দেখিনি। তবে ওরা যে কালো মানুষ নয়, এটুকু বুঝেছি। সাদাও নয় ওরা।

কি যা-তা বলছ। ওদের দেখইনি, গায়ের রঙ বুঝলে কি করে?

গন্ধ থেকে। ওদের গায়ে রোদ আর মাটির গন্ধ নেই কালো মানুষদের মত। সাদা মানুষের মত তামাকের গন্ধও নেই। ওদের গায়ে চা আর পুদিনার গন্ধ। ওরা নাবিক, জাহাজে করে উত্তর থেকে মোমবাসায় এসেছে।

আরব! অনুমান করল কিশোর। কিন্তু আরবরা এই পার্বত্য অঞ্চলে কি করতে এসেছে?

আরবদের সম্পর্কে এ সব কথা বুঝতে পারছে না আউরো।

ওরা হলো দুষ্ট প্রেত, বলল সে। আর ওদের সর্দার হলো বজ্রমানব। ও এসেছিল?

বজ্রমানবের কথা আমি কিছু জানি না, আকামি বলল।

তার মাথা থাকে তারার দেশে। কথা বলার সময় গলা দিয়ে বজ্রের গর্জন বেরোয়, চোখের দৃষ্টিতে জ্বলে বিদ্যুতের চমক।

বজ্র বা বিদ্যুৎ কোনটাই ছিল না আমাকে যখন ধরল।

বিজ্ঞের ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল আউরো। গলা বন্ধ করে রেখেছিল, চোখ করে ফেলেছিল অন্ধকার, যাতে আওয়াজও না হয়, আলোও দেখা না যায়। হলে যে আমরা জেগে যাব। কিন্তু ষাঁড়ের মত শক্তিশালী আর গাছের সমান লম্বা একজনকে তো নিশ্চয় দেখেছ?

অন্ধকারে ওসব কিছুই দেখিনি। তবে গায়ে মোষের জোর আছে এ কথা বলতে পারি। প্রথমে কয়েকজন চেপে ধরল আমাকে। ঝাড়া দিয়ে ফেলে দিলাম। তারপর দুটো হাত এসে পড়ল আমার গায়ে। পিষে ফেলতে শুরু করল। দুর্বল করতে করতে একেবারে পানি বানিয়ে দিল আমাকে। কারও হাতে এত শক্তি আর দেখিনি।

হ্যাঁ, হ্যাঁ! ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে ওগারো। ওই তো বজ্রমানব! আমার ছেলেকে নিয়ে গেছে। আর কোনদিন তাকে পাব না। কোন মানুষ লড়াই করে পারে না বজ্রমানবের সঙ্গে।

আমরা লড়াই করব তার সঙ্গে, দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করল কিশোর, এবং আমরা পারবও! আপনার ছেলেকেও ফিরিয়ে আনব, যদি সে বেঁচে থাকে। সর্দার, কিছু মনে করবেন না, আপনার ভূতের গল্প আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। গরু যে চরি করে, সে আধিভৌতিক কিছু নয়, আমার-আপনার মতই মানুষ। বাজি ধরতে পারেন আমার সঙ্গে।

মাটি পরীক্ষা করছে মুসা।

কি ধরতে চাও বলে ফেলো! হঠাৎ বলে উঠল সে। এই পায়ের ছাপগুলো দেখো আগে। তারপর বুঝবে মানুষ কিনা!

কাদামাটিতে বসে গেছে খালি পায়ের ছাপ, স্বাভাবিক আকারের নয় সেগুলো। আশেপাশে বড় আকারের বুটের ছাপও বসে গেছে গম্ভীর হয়ে।

দেখে মিইয়ে গেল কিশোর। একটু আগে যা বলেছে সেগুলোকে এখন বড় বড় কথা বলে মনে হতে লাগল। মেরুদণ্ডের ভেতর দিয়ে যেন টেনে নিয়ে যাওয়া হলো ভয়ের সরু একটা সুতো। আরও নিশ্চিত হয়ে গেছে, কিডন্যাপাররা অবাস্তব কিছু নয়। তবে সাধারণ মানুষও নয়। এতবড় জুতো যে পরে, সেই মানুষটা কত বড়! ওজনও নিশ্চয় অনেক। আর সেই ওজন চর্বির নয়, মাংসপেশীর। ভয়াবহ সেই শক্তির নমুনা কিছুটা পেয়েছে আকামি।

শুধু গায়ের জোরই নয়, আরও নানা রকম ক্ষমতা আছে দৈত্যটার। এতবড় শরীর নিয়ে নিঃশব্দে হাজির হয়ে যেতে পারে, আকামির মত শক্তিশালী মানুষকে সহজে কাবু করে ফেলে, তালা খুলতে পারে, সামান্যতম শব্দ না করে চুরি করতে পারে একটা তেরো বছরের ছেলেকে, গরু চুরি করে; সবচেয়ে বড় কথা, একটা হাতির বাচ্চাকে খেদিয়ে নিয়ে চলে গেল, কেউ টেরও পেল না। অচেনা কেউ ধরতে এলে ভীষণ চেঁচামেচি করে হাতির বাচ্চা। তার মানে এই লোকটা হাতির ব্যাপারে অভিজ্ঞ।

অস্বস্তিটা মুখের ভাবে কিংবা আচরণে প্রকাশ পেতে দিল না কিশোর।

বড় বড় বুটের ছাপ থাকায় সুবিধেই হয়েছে, বলল সে। অনুসরণ করা যাবে। নাস্তা খেয়েই বেরিয়ে পড়ব আমরা।

বিশ মিনিট পর দলবল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল কিশোর-মুসা। এগিয়ে চলল বুট ও হাতির পায়ের ছাপ অনুসরণ করে। সঙ্গে কয়েকজন কুলি, আর অবশ্যই আকামি ও মুংগা। কয়েকজন অতি উৎসাহী গ্রামবাসীও আসতে চেয়েছিল। বাধা। দিয়েছে সর্দার ওগারো।

মরতে চাও? হুঁশিয়ার করেছে সে। বজ্রমানবকে রাগিয়ে দিয়ে আমাদের সবাইকে মারতে চাও? এক হাতে টিপে এই গ্রামটা ভর্তা করে দিতে পারে সে। আউরো তো আমারই ছেলে, আমারও যেতে ইচ্ছে করছে; কিন্তু আমি শুধু বাবাই। নই, আমি এ গাঁয়ের সর্দারও, সবার ভালমন্দ দেখার ভার আমার ওপর।

শুরুতে অনুসরণ বেশ সহজ হলো। মানুষের ছাপ যেখানে চোখে পড়ল না সেখানেও হাতির পায়ের বড় গোল গোল গভীর ছাপ পরিষ্কার দেখা গেল। দুনিয়ার আর কোন জানোয়ারই এত স্পষ্ট পায়ের ছাপ রেখে যায় না।

একেবারেই তো সহজ, হেসে উঠল মুসা। এই আরবগুলো ততটা চালাক নয়। শীঘ্রি দেখা পেয়ে যাব। তারপর বোঝাব মজা।

কিশোর কিছু বলল না। গভীর ভাবে পরীক্ষা করছে মানুষের পায়ের ছাপগুলো। আকামিকে জিজ্ঞেস করল, কয়জন মানুষ মনে হয় তোমার?

বারো…বড়জোর পনেরো।

আর আমাদের তিরিশ, সন্তুষ্ট হয়ে বলল মুসা। ব্যাটাদের খতম করে দেয়া কোন ব্যাপারই না।

কিন্তু ক্যাম্পে আরও লোক থাকতে পারে, কিশোর বলল। কথা হলো, এত স্পষ্ট ছাপ রেখে যাচ্ছে, এটা কি জানে না ওরা? নিজের প্রশ্নের জবাব নিজেই দিল, নিশ্চয় জানে। বেশিক্ষণ আর অতটা সহজ থাকবে না। কোথাও না কোথাও কোন চালাকি খাটাবে। তোমরা সব সাবধানে থাকো, চোখকান খোলা রাখো।

সামনে বুনো ফুলের একটা বন, গাছগুলো ওদের মাথার চেয়ে উঁচু। ডালগুলো এত মোটা, ফুলগাছের বলে মনে হয় না। বিশাল মোমবাতির মত লাগছে খাড়া হয়ে থাকা বিশ ফুট উঁচু লবেলিয়াকে। চূড়ার কাছে ছড়িয়ে থাকা কুঁড়ির দিকে তাকালে মনে হয় আগুন লেগেছে ওখানে।

ফুলবন পেরোতেই বদলে গেল বনের চেহারা, শুরু হলো বাঁশঝাড়। অনেক উঁচুতে চোখা চোখা বাঁশপাতায় তৈরি চাঁদোয়াকে নীল আকাশের পটভূমিতে অনেক বেশি সবুজ লাগছে। কুয়াশার কারণে সব সময় ভিজে থাকে পাতা, ভেজা মাটিতে ঝরে পড়ে মুক্তোর মত পানির ফোঁটা টুপটাপ, টুপটাপ। বাঁশগুলোও স্বাভাবিকের চেয়ে মোটা, থামের মত।

এতটা বড় হতে নিশ্চয় অনেক সময় লাগে, মুসা বলল।

মোটেও না, মাথা নেড়ে বলল কিশোর, বাড়া দেখলে অবাক হবে। এক মিনিটের জন্যে এখানে মাটি শুকাতে পারে না। ফলে খেয়ে না খেয়ে বাড়তে থাকে। বাঁশ। দুই মাসেই একশো ফুট লম্বা হয়ে যায়। আমি বানিয়ে বলছি না।

মুসার চোখে অবিশ্বাস দেখে হাসল সে। অন্য গাছ বড় হতে যত সময় লাগে, তারচেয়ে অনেক কম সময় লাগে বাঁশ বড় হতে, খুব দ্রুত বাড়ে। কিন্তু এখানে যে

হারে বাড়ে, তাকে বলতে হয় তীব্র গতি, কিংবা ঝড়ের গতি।
এত লম্বা বাঁশের বয়েস মাত্র দুই মাস! আমি বিশ্বাস করি না।
না করলেও ব্যাপারটা সত্যি। আর বড় হবে?
না, একশো ফুটই শেষ। এরপর কি ঘটবে?
ফুল ফুটবে। মাত্র একবার। তারপর মারা যাবে। ফুল থেকে যে বীজ ঝরবে সেগুলো থেকে নতুন চারা গজাবে। ওই যে দেখো একটা নতুন চারা, সবে গজানো শুরু হয়েছে।
মানুষের উরুর সমান মোটা ফুটখানেক উঁচু একটা বাঁশের চারার দিকে তাকাল মুসা।
কাল দিনের বেলায়ও এটা ছিল না এখানে, কিশোর বলল। রাতারাতি গজিয়ে গেছে।
কি করে জানলে?
পত্রিকা আর বই পড়ে। বৈজ্ঞানিক অভিযান চালানো হয়েছে এদিকটায়। অনেক মাপামাপি করেছেন বিজ্ঞানীরা। প্রথম কয়েক সপ্তাহ বাঁশের চারা চব্বিশ ঘণ্টায় দুই ফুট করে বাড়ে। আস্তে আস্তে কমে আসে বাড়ার এই হার। তবে অনেক চারাই কমার সুযোগ পায় না।
কেন?
জন্তু-জানোয়ারে খেয়ে ফেলে। খেতে খুব ভাল, নরম, রসাল।
আমি তো জানতাম বাঁশ শুধু মানুষে খায়। চাইনিজ রেস্টুরেন্টগুলোতে পাওয়া যায় বাঁশের তরকারি।
উয়াটুসি আর পিগমিরাও পছন্দ করে। গরিলার তো খুব প্রিয় খাবার। দেখো, গরিলারা ঘুরে গেছে এখান থেকে।
ভেজা নরম মাটিতে স্পষ্ট দেখা গেল গরিলার পায়ের ছাপ। মানুষের খানি পায়ের ছাপের মতই দেখতে। তবে আকারে অনেক বড়, এর পাশে পূর্ণবয়স্ক মানুষের পায়ের ছাপকে মনে হবে শিশুর পায়ের মত।
এত গভীর কেন? জানতে চাইল মুসা।
হবে না, যা ভারির ভারি। একটা পূর্ণবয়স্ক পুরুষ গরিলার ওজন হয় সাতশো পাউন্ড, বড় একজন মানুষের চারগুণ।
গেল তো এখান দিয়েই, বাঁশের এই চারাটাকে খেলো না কেন?
এটা গজানোর আগেই হয়তো গেছে। যত দূরে চলে যায় ততই ভাল। রোমশ ওই ভদ্রলোকদের সঙ্গে মোলাকাত করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই আমার।
কেন, ভয় পাচ্ছ?

না পাওয়ার কোন কারণ আছে? আদর করে যদি তোমার গায়ে হাত ছোঁয়ায়। তাহলেই চিত হয়ে যাবে। চারপাশে তাকাল কিশোর। আল্লাই জানে, কাছাকাছি আছে কিনা! দেখছে কিনা এখন আমাদের!
অত ভয় পাচ্ছ কেন? হামলা চালাবে নাকি?
গরিলার মেজাজ-মর্জির কোন ঠিক ঠিকানা নেই। চালাতেও পারে।
বিরক্ত না করলেও মারতে আসবে? কোন জানোয়ারই নাকি বিরক্ত না হলে মানুষকে আক্রমণ করে না?
তা করে না। কিন্তু কিসে যে গরিলাকে বিরক্ত করবে, সেটা বলাই মুশকিল।
এগিয়ে গেছে আকামি আর মুংগা। বাশের আড়ালে হারিয়ে গেছে। ওদেরকে ধরার জন্যে তাড়াতাড়ি এগোল দু-জনে।
বৃষ্টি শুরু হয়েছে। আকাশে কালো মেঘ। অন্ধকার কেমন নিঃসঙ্গ আর বিষণ্ন করে তুলেছে বনতল। ভারি, এক ধরনের চাপা ঘড়ঘড় শব্দ ভেসে এল হঠাৎ। ঝট করে শব্দের দিকে ফিরে তাকাল দু-জনে।
গরিলার বাসা আছে এখানে! নিচু স্বরে বলল কিশোর।
কিন্তু বাসাটা পাওয়া গেলেও তার মধ্যে গরিলা দেখা গেল না। দুই ফুট উঁচু করে গাছের ডালপাতা আর ঘাস বিছিয়ে একটা গদিমত তৈরি করা হয়েছে। গরিলার বিছানা।
আমি তো জানতাম গাছে থাকে ওরা, মুসা বলল।
গাছে চড়তে পারে, তবে রাতে ডালে থাকতে চায় না। এত ভারি শরীরের ভারে ডাল ভেঙে পড়ার ভয়ে বেশি ওপরেও উঠতে চায় না। বড়গুলো তো মাটি ছেড়ে নড়েই না।
বিড়বিড়, ফিসফাস, ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে কথা বলছে যেন অনেক মানুষ। এগিয়ে আসছে কমে। কিসের শব্দ, আন্দাজ করতে পারছে না মুসা। তবে শব্দ নিয়ে মাথা ঘামানোর আগে পেট নিয়ে ঘামানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করল সে। সামনে আবছা অন্ধকারে একটা বাঁশের কোঁড় গজিয়ে ঢাকতে দেখল। হাতের কাছে আর কোন খাবার নেই দেখে ছুরি বের করে নিয়ে এগোল কেটে নেয়ার জন্যে। ভাবল, গরিলারা যদি খেতে পারে, সে পারবে না কেন?
বিষণ্ন অন্ধকারকে যেন খানখান করে দিল তীব্র, তীক্ষ্ণ চিৎকার। শিরশির করে উঠল মুসার পিঠের কাছটায়। পাঁচ ফুট দূরের যে কালো ছায়াটাকে বনের ছায়া মনে করেছিল সে, আসলে ওটা একটা গরিলা। একজন উয়াটুসি পুরুষের সমান লম্বা, কিন্তু তিন-চারগুণ চওড়া। কুচকুচে কালো শরীর, তার মধ্যে সাদা বলতে কেবল বিকট হ থেকে বেরিয়ে থাকা ভয়ঙ্কর দাঁতগুলো। গভীর কোটরে বসা

চোখের রঙও কালো। কালো নাকটাকে মনে হচ্ছে শক্ত রবারে তৈরি, আর দাড়িকে লাগছে রঙ করার ব্রাশের মত।
লম্বা একটা কালো হাত বাড়িয়ে মুসার হাত থেকে বাঁশের কোড়টা কেড়ে নিল গরিলা। ছুঁড়ে দিল ঝোঁপের ভেতর। কিচমিচ করে উঠল কয়েকটা কণ্ঠ। তারমানে। ওখানে রয়েছে তার বাচ্চাগুলো। দুই হাতে নিজের বুকে দমাদম কিল মেরে যেন ঢাক বাজাতে শুরু করল গরিলাটা। এতেও সন্তুষ্ট হতে না পেরে ঢাকের সঙ্গে সঙ্গত করার জন্যে গলা ছেড়ে চিৎকার করতে লাগল।
এই শিক্ষা জীবনে ভুলবে না মুসা। কোন বড় জানোয়ারকে বিরক্ত করার পর যে অভিজ্ঞতা হয় সেটা বলার জন্যে বেঁচে থাকে না বেশির ভাগ মানুষই। কেন যে কি কারণে বিরক্ত হবে জানোয়ারেরা, সেটাও ঠিক করে বলার উপায় নেই। এই যেমন, এই গরিলাটা হয়েছে মুসা একটা বাঁশের কোড় তুলেছে বলে।
দুপদাপ করে হৃৎপিণ্ডটা লাফাচ্ছে ওর। পিছাতে শুরু করল মুসা। অতবড় এক গরিলার সঙ্গে হাতাহাতি লড়াইয়ে যাওয়ার মত বোকামি আর হয় না। সঙ্গে বন্দুক নেই। আছে শুধু দু-জনের কাছে দুটো ছুরি। এই দানবের বিরুদ্ধে সেগুলো দুটো সাধারণ শলাকা মাত্র।
পিছাতে পিছাতে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা কিশোরের গায়ের ওপর এসে পড়ল মুসা।
দাঁড়িয়ে থাকো, ফিসফিস করে বলল কিশোর। একচুল নড়বে না। যেই বুঝবে তুমি ভয় পেয়েছ, মুচড়ে ছিঁড়ে ফেলবে মুণ্ডটা।
পাশাপাশি দাঁড়াল দু-জনে।
সমানে ঢাক বাজিয়ে চলেছে গরিলাটা। চিৎকারও বন্ধ করছে না। আট ইঞ্চি লম্বা হাতের রোম। থাবাটা যেন একটা ভাত খাওয়ার বাসন।
ওর ভাষাতেই ওকে শাসানো দরকার, কিশোর বলল।
নিজের বুকে চাপড় মারতে শুরু করল সে। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে এমন ভঙ্গি করে ফেলল, কুৎসিত ভঙ্গি, যেন সে-ও একটা গরিলা। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে লাগল।
দেখাদেখি মুসাও তা-ই করল।
দু-জন মানুষ আর একটা গরিলার মিলিত বিচিত্র চিৎকার ছড়িয়ে পড়ল বাশবনে। চতুর্দিকে এখানে ওখানে শুরু হয়ে গেল আরও গরিলার ঢাক বাজানো আর চিৎকার। কলরব শুরু করল পাখি আর বানরের দল।
কি হয়েছে দেখার জন্যে দৌড়ে এল আকামি আর মুংগা। সঙ্গে কুলিরা। কাণ্ড দেখে তো হতবাক। একটা গরিলা চাইছে দুটো ছেলেকে ভয় দেখাতে, আর ছেলেরা চাইছে গরিলাটাকে ভয় দেখাতে।

কি করবে বুঝতে পারছে না আকামি আর মুংগা।
তবে খানিক পরে বোঝা গেল গরিলাটাই পরাজিত হতে চলেছে। কয়েক ইঞ্চি পিছিয়ে গেল ওটা। সঙ্গে সঙ্গে এক পা এগিয়ে গেল ছেলেরা। হাত নেড়ে এমন ভঙ্গি করছে যেন ধরতে পারলে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করবে গরিলাকে।
চিৎকার থামিয়ে দিল গরিলাটা। মুখের ভাব বদলে গেল। চোখে ভয় ফুটছে।
হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে, লম্বা দুই হাত মাটিতে নামিয়ে দিয়ে, কব্জিতে ভর রেখে, চার হাত-পায়ে হেঁটে অদৃশ্য হয়ে গেল ঝোঁপের ভেতর।
স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মুসা। ভয়টা প্রকাশ করল এতক্ষণে। বলল, আমার পা জমে গেছে।
হাসল কিলোর। তোমার কিছু খাবার দরকার। বাঁশের কোঁড় খেয়ে দেখতে পারো।
আরও! ভয়ে ভয়ে গাছের নিচে ছায়ার দিকে তাকাতে লাগল মুসা, এখন তার মনে হচ্ছে প্রতিটি ছায়াই একটা করে গরিলা। না খেয়ে মরে যাব, তবু বাঁশের কেড়ের লোভ আর করছি না!
আবার চলতে শুরু করল ওরা। বাঁশবন থেকে বেরিয়ে এল খোলা তৃণভূমিতে।
তারপরে একটা হ্রদ। বৃষ্টির মধ্যেও খুব সুন্দর লাগছে দেখতে।
বৃষ্টি-ভেজা আজব এই পার্বত্য অঞ্চলের এটা আরেক অদ্ভুত ব্যাপার। ঢালটা যেন বিচিত্র এক ব্যালকনি, আর প্রতিটি ব্যালকনিতে রয়েছে একটা করে হদ। অভিযাত্রীরা চমৎকার সব নাম দিয়েছে এগুলোর-গ্রীন লেক, ব্ল্যাক লেক, হোয়াইট লেক, গ্নে লেক। ওপর থেকে নেমে আসা বরফগলা পানি আর ক্রমাগত বষ্টির পানিতে সব সময় টুইটম্বুর থাকে হ্রদগুলো। প্রতিটি ব্যালকনি থেকে জলপ্রপাতের মত পানি ঝরে পড়ছে তার নিচের হ্রদটায়।
উদ্বিগ্ন হয়ে আকামি বলল, ওই পানিতে পায়ের ছাপ মুছে যাবে। এগোব কি করে?
হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল সে। বিশাল একটা ফুলের ওপর বসে রয়েছে চন্দ্রপাহাড়ের এক ভয়াল চেহারার প্রাণী। একটা ক্যামেলিয়ন। বড় বড় চোখ, মাথা থেকে বেরিয়েছে তিনটে শিং, যেন প্রাগৈতিহাসিক দানবের খুদে সংস্করণ।
খুব খারাপ লক্ষণ, আকামি বলল। কোনখানে যাওয়ার সময় এই প্রাণী সামনে পড়লে আর এগোনো উচিত না। এগোলেই বিপদ।
এ সব কুসংস্কার বিশ্বাস করে না কিশোর, অধৈর্য হয়ে বলল, হলে হবে। এগোও।
সঙ্গে আসা কুলিরাও দাঁড়িয়ে গেছে। কেউ এগোতে রাজি নয়। ভয়ে ভয়ে তাকাচ্ছে ছোট্ট গিরগিটিটার দিকে। আকামির সঙ্গে ওরাও একমত-ক্যাম্পে ফিরে যাওয়া উচিত।
দেখো, বোঝনোর চেষ্টা করল কিশোর, তোমরা সবাই সাহসী মানুষ। ভয়ানক বাঘ-সিংহের মুখোমুখি হতে পরোয়া কোরো না। হাতি-গণ্ডারের সঙ্গে লাগতে ভয়

পাও না। দাঁত নেই, বিষ নেই এমন একটা খুদে প্রাণীকে ভয় পাচ্ছ তোমাদের মত মানুষ, এ কথা বিশ্বাস করতে বলল আমাকে?
প্রাণীটার মুখের কাছে আঙুল নিয়ে গেল কিশোর।
আতঙ্কিত চোখে নীরবে তাকিয়ে রয়েছে লোকগুলো।
নড়ল না ক্যামেলিয়নটা। কোথা থেকে উড়ে এসে একটা মাছি বসল কিশোরের আঙুলে। ক্যামেলিয়নের মুখ থেকে বিদ্যুতের মত ছিটকে বেরিয়ে এল লিকলিকে জিভ, মাছিটাকে আটকে ধরে নিয়ে চলে গেল আবার মুখের ভেতর।
অনেকটা পিঁপড়েখেকোর মত কাজ করে এর জিভ, মুসাকে বলল কিশোর। কেমন লম্বা দেখলেই তো। চটচটে আঠা, লাগলে আর ছুটতে পারে না।
মাছিটাকে খেয়ে আরেকটা ফুলের ওপর সরে গেল ক্যামেলিয়নটা। এতক্ষণ ছিল নীল ফুলের ওপর, তার শরীরের রঙও ছিল নীল; যেই কমলা রঙের অন্য ফুলটাতে গেল, শরীরটা হয়ে গেল কমলা। মুহূর্তে গায়ের রঙ বদলে ফেলেছে।
দেখলেন! কাঁপা গলায় বলল আকামি, জাদু জানে!
জাদু না ছাই! রেগে গেল কিশোর। নিজেকে বাঁচানোর আর কোন উপায় নেই এটার, তাই এই ব্যবস্থা করে দিয়েছে প্রকৃতি। ভয়ঙ্কর চেহারা বানিয়েছে, যাতে অন্যেরা খেতে না আসে একে, ভয় পেয়ে সরে যায়। নিজের রঙ বদলাতে পারে, যাতে যে ফুলের ওপর বসবে তার সঙ্গে মিশে গিয়ে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারে। দুটো কাজ হয় এতে-শত্রুর চোখ এড়িয়ে থাকতে পারে, শিকারও তাকে দেখতে পায় না বলে জিভের নাগালে চলে আসে।
কিন্তু কোনভাবেই বোঝানো গেল না কুসংস্কারাচ্ছন্ন কুলিদের।
রেগেমেগে শেষে কিশোর বলল, বেশ, তোমরা না আসতে চাইলে চলে যাও। আমি আর মুসা একাই যেতে পারব।
ক্যামেলিয়নটার পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল সে। পেছনে চলল মুসা।
আধ মাইলও গিয়ে সারেনি, ছুটতে ছুটতে এল আকামি। জিজ্ঞেস করল, সত্যিই তাহলে ফিরে যাবেন না?
না, কিশোর বলল। তোমার আসার দরকার নেই।
আমি যাব আপনাদের সঙ্গে।
কিন্তু অশুভ লক্ষণ যে দেখলে?
বিপদে পড়লে একসঙ্গেই পড়ব। আপনাদের ফেলে আমি যাব না।
লোকটার বিশ্বস্ততায় গলে গেল কিশোর। কতটা দুঃসাহস দেখাচ্ছে আন্দাজ করতে পারল। রক্তে মিশে যাওয়া শত বছরের কুসংস্কার ভাঙতে চলেছে সে, সোজা কথা নয়।

কিন্তু আকামি একাই নয়, কয়েক মিনিট পর হাঁপাতে হাঁপাতে মুংগাও এসে হাজির।
অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল কিশোর।
হাতের রাইফেলটা দেখিয়ে কৈফিয়তের সুরে মুংগা বলল, ভাবলাম, এটা ফেলে যাচ্ছেন, বিপদে পড়তে পারেন। তাই নিয়ে এলাম।
নেয়ার জন্যে হাত বাড়াল কিশোর।
সরে গেল মুংগা। না না, আপনার বয়ে নেয়া লাগবে না। আমিই নিতে পারব।
খানিক পর এক এক করে ফিরে এল সব কজন। একজন লোকও ক্যাম্পে ফিরে যায়নি। ক্যামেলিয়নের ভয় কাউকে ঠেকাতে পারল না শেষ পর্যন্ত।

.

বৃষ্টির বেগ বেড়েছে। অঝোরে ঝরছে এখন বড় বড় ফোঁটায়। মাথার ওপর অনেক নেমে এসেছে কালো মেঘ। হাত বাড়ালেই যেন ছোঁয়া যায়। অন্ধকারও বেড়েছে। দশ ফুট দূরের জিনিসও আর চোখে পড়ে না ঠিকমত।
কিন্তু দমল না ওরা। হাতির পায়ের ছাপ অনুসরণ করে ঠিকই এগিয়ে চলল।
খুদে দানবের ছাপের পাশে মাঝেসাঝে খালি পায়ের ছোট ছাপ চোখে পড়ছে, বোধহয় সর্দারের ছেলে আউরোরই হবে।
বেচারা আউরো! আনমনে বলল কিশোর, যা শুনলাম, সুন্দর চেহারার ছেলেমেয়েগুলোকেই কেবল নিয়ে যায়। কেন নেয়?
আন্দাজ করতে পারি, আকামি বলল।
কেন?
কিডন্যাপাররা স্ল্যাভার, মানুষের ব্যবসা করে। গ্রাম থেকে ছেলেমেয়েদের ধরে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দেয়। সুন্দর চেহারাগুলো নেয় বেশি দাম পাবে বলে।
কান খাড়া করে ফেলেছে মুসা। কিন্তু দাস ব্যবসা তো বহু আগেই বন্ধ হয়ে গেছে বলে শুনেছি? এর বিরুদ্ধে এখন কড়া আইন করা হয়েছে।
কই আর হলো? আকামির হয়ে জবাব দিল কিশোর। আগের মত খোলাখুলি বাজারে বিক্রি হয় না, এই যা। গোপনে গোপনে এখনও হরদম চলছে এই ব্যবসা। শুধু আফ্রিকাই নয়, ভারত, বাংলাদেশ আর ওরকম দরিদ্র আরও অনেক দেশ থেকে মানুষ পাচার করে দেয়া হয় ধনী দেশগুলোতে, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে। নারী আর শিশুরাই প্রধানত এসবের শিকার।
নিশ্চয় জাহাজে করে সাগর পার করে নিয়ে যায়। সেজন্যেই জাহাজীদের গায়ের গন্ধ পেয়েছে আকামি।
মাথা ঝাঁকাল আকামি।
সামনে পেলে গন্ধ শুঁকে চিনতে পারবে লোকটাকে? জিজ্ঞেস করল মুসা।

নিশ্চয় পারব। আরবদের ওই ডাউ জাহাজগুলোর গন্ধ বড় বদ। একবার নাকে ঢুকলে জীবনে আর ভোলার উপায় নেই।
হ্রদের পাড়ে এসে দাঁড়াল ওরা। সব চিহ্ন আচমকা শেষ হয়ে গেছে এখান থেকে। আকামির মত ওস্তাদ ট্র্যাকারও আর কোন চিহ্ন খুঁজে পাচ্ছে না।
ব্যাটারা ভীষণ চালাক, বলল সে। এখান থেকে কোথায় গেছে বলার উপায় নেই। পানিতে নেমেছে এটুকু বুঝতে পারছি। কিন্তু তারপর? যে কোনও দিক দিয়ে নেমে অল্প পানিতে হেঁটে গিয়ে আবার পাড়ে উঠতে পারে। সাঁতরে লেক পার হয়েও ওপাড়ে চলে যেতে পারে। কোনটা করেছে?
হাতি কি সাঁতরাতে পারে নাকি? জানতে চাইল মুসা।
খুব ভাল পারে, জবাব দিল তার বন্ধু। তবে পানি বেশি গভীর না হলে সাঁতরানোর চেয়ে তলা দিয়ে হেঁটে চলে যেতেই বেশি পছন্দ করে ওরা।
তাজ্জব ব্যাপার! শ্বাস নেয় কি করে?
শুড়টা উঁচু করে রাখে, নাকের ফুটো বের করে রাখে পানির ওপর।
তাহলে তো পানির নিচে কাদায় পায়ের ছাপ থাকার কথা।
হ্রদটা বেশি গভীর না। টলটলে পরিষ্কার পানিতে চোখ ডুবিয়ে নিচের কাদা দেখতে লাগল আকামি। কিছুই দেখতে পেল না। একটা পরীক্ষা করল তখন। নেমে গেল পানিতে। পা দেবে গেল কাদায়। নাড়া লেগে ঘোলা হয়ে গেল পানি। ওপরে উঠে এল সে। আবার পানিতে চোখ ডুবিয়ে দেখল। আস্তে আস্তে থিতিয়ে গেল কাদা, আবার পরিষ্কার হলো পানি। তার পায়ের ছাপ নেই।
তারমানে হাতি এদিক দিয়ে গেলেও বোঝার উপায় নেই, চারপাশ থেকে গলিত কাদা সরে এসে নিমেষে ঢেকে দিয়েছে তার পায়ের ছাপ।
কোনওখান দিয়ে তো নিশ্চয় উঠেছে পানি থেকে, মুসা বলল। পাড়ে নিশ্চয় ছাপ পড়েছে। সেটা খুঁজে বের করলেই তো পারি?
কিন্তু বিশেষ আশাবাদী হতে পারল না আকামি। কারণ অঝোরে বৃষ্টি হচ্ছে। পায়ের ছাপ পড়লে সেটা মুছে দেবে এই বৃষ্টি। তবু কিশোরের কথার প্রতিবাদ না করে হ্রদের পাড়ে খুঁজতে শুরু করল সে।
সাংঘাতিক বিরক্তিকর এই শীতল বৃষ্টি। বেশিক্ষণ এর মধ্যে থাকলে একধরনের অস্থিরতায় পেয়ে বসে মানুষকে। কুলিদের মধ্যে সেই লক্ষণ দেখা যেতে শুরু করল।
হ্রদের পশ্চিম পাড়ে এসে আরেক বিপদ, চলাই মুশকিল হয়ে উঠল। থিকথিকে কালো কাদা, পা পড়লে ডেবে যায়-কোথাও কোথাও হাঁটু পর্যন্ত দাবে। কি মনে হতে ম্যাপ বের করল কিশোর। দেখল, এখানেই আছে সেই কুখ্যাত বিগো বগ, এর ভয়াবহতা সম্পর্কে প্রচুর লেখালেখি করেছে অভিযাত্রীরা। পানি আর কাদার

আঠাল সূপ তৈরি হয়ে থাকে যেন এখানে। মানুষের পা আঁকড়ে ধরে রাখে। এর মধ্যে হাঁটতে গেলে সাংঘাতিক পরিশ্রম।
শরীর ডেবে গেলেও এটাকে চোরাকাদা বলা যাবে না। কারণ চোরাকাদাকে যেমন অতল বলা হয়, এটা ঠিক সেরকম নয়। তবে চোরাকাদার চেয়ে কম বিপজ্জনকও নয়। যেখানে বেশি গভীর, সেখানে পড়লে অন্যের সাহায্য ছাড়া উঠে আসা কঠিন।
কাদার মধ্যে নেমে এগোনোর চেষ্টা করতে হঠাৎ কোমর পর্যন্ত ডেবে গেল আকামির। সবাই মিলে টেনেটুনে তাকে তুলে আনল বগ থেকে।
হেঁটে যেতে পারবে না বুঝে সাঁতরে যাওয়ার চেষ্টা করল মুসা। পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ার মত করে পড়ল তরল কাদার ওপর। মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল তার। শরীর।
তাড়াতাড়ি কাদার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে তার বাহু ধরে টেনে তুলে আনল কিশোর আর আকামি।
সারা গায়ে কাদা মেখে ভূত সেজে গেছে মুসা। হাত দিয়ে মুছতে মুছতে বলল, বাপরে বাপ, কি জঘন্য! পানি আর কাদা যে এক জিনিস নয় এতদিনে বুঝলাম! সাঁতার কাটা অসম্ভব!
এই সময় একটা অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়ল ওদের। দুটো হাতি। একটা বড় মাদী, আরেকটা ছোট মদ্দা-বয়েস খুব অল্প, সবে কৈশোর পেরিয়েছে। কিন্তু বাচ্চা হলেও হাতির বাচ্চা, গায়ে-গতরে অনেক বেড়ে গেছে। বড়টা সম্ভবত ছোটটার মা। কাদায় পড়েছে বড়টা। পাড়ে দাঁড়িয়ে খুঁড়ে ড় লাগিয়ে তাকে টেনে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা করছে বাচ্চাটা।
অনেক চেষ্টা করেও মাকে তুলতে পারল না সে। মায়ের তুলনায় অনেক ছোট, গায়ে শক্তিও কম, অতবড় ভারি একটা শরীরকে কি আর তুলে আনতে পারে? আর্তচিৎকার করতে করতে কাদায় পুরোপুরি ডুবে গেল মা। বিলাপ করে কাঁদতে শুরু করল বাচ্চাটা, কাদার পাড়ে দাপিয়ে বেড়াতে লাগল। অনেকটা মা হারা মানবশিশুর মতই।
বড় মায়া লাগল মুসার। কিন্তু কি করবে? বিশাল একটা হাতিকে কাদা থেকে তুলে আনার সাধ্য তাদের নেই।
এই করুণ দৃশ্য মন খারাপ করে দিল অভিযাত্রীদের। কাদার ভয়াবহতাও বুঝতে পারল। এই কাদা মাড়িয়ে আর এগোনোর সাহস করল না।
তা ছাড়া পায়ের ছাপ নেই, কোন চিহ্ন নেই, কোন দিকে এগোবে? অহেতুক আর হাঁটাহাঁটি না করে নিরাশ হয়ে গায়ে ফিরে চলল দলটা।
অদ্ভুত একটা কাণ্ড করল এই সময় হাতির বাচ্চাটা। একাকী এই ভয়ঙ্কর জায়গায় থাকতে যেন সাহস হলো না তার, মানুষের পিছে পিছে চলল।

হাতির বাচ্চারা এ রকম করে, জানা আছে মুসার। নিরালা জায়গায় একলা থাকতে ভয় পায়। কি মনে হতে হাত বাড়িয়ে ডাকল ওটাকে সে। কুকুরের বাচ্চার মতই সাড়া দিল হাতির বাচ্চা। এগিয়ে এসে তার হাতে ঔড় ঘষতে লাগল।
আদর করে তার শুড়ে হাত ঘষে দিল মুসা। সহজেই জন্তু-জানোয়ার নেওটা হয়ে যায় তার। এই বাচ্চাটারও হতে দেরি লাগল না। নামও একটা দিয়ে দেয়া হলো। মায়ের কাদায় ডুবে মরার ঘটনাটা স্মরণীয় করে রাখার জন্যে বাচ্চার নামকরণ হলো কাদার খোকা।

.

অধীর হয়ে অপেক্ষা করছিল সর্দার ওগারো, ওদের দেখেই দৌড়ে এল। ভেজা চুপচুপে, কাদামাখা বিধ্বস্ত মানুষগুলোকে দেখেই অনুমান করে নিল কি ঘটেছে। তবু জিজ্ঞেস করল, আমার ছেলেকে পেয়েছ?
নীরবে মাথা নাড়ল কিশোর।
বিষণ্ন চোখ তুলে পর্বতের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করল সর্দার, হে বজ্রমানব, তোমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে মানুষের কিছু করার নেই! বুঝলাম, আর কোনদিন ছেলেকে দেখতে পাব না আমি!
দেখুন, এত সহজে হাল ছাড়বেন না, বোঝাতে চাইল কিশোর, আমরা এখনও চেষ্টা ছাড়িনি। খবরটা পুলিশকে জানিয়েছেন?
লোক পাঠিয়েছি। কিন্তু জানি, লাভ হবে না। এমনিতেই অনেক কাজ পুলিশের, গোলমাল লেগেই আছে দেশে, ছেলে হারানোর মত একটা ছোট্ট ঘটনাকে পাত্তাই দেবে না ওরা। আসবে না।
বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে কুঁড়েতে ফিরে গেল সর্দার।
শরীর থেকে আঠাল কাদা ধুয়ে ফেলার জন্যে হ্রদে নামল কিশোর-মুসা আর তাদের সঙ্গীরা।
প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে। ক্যাম্পে যারা ছিল, তারা রান্না করেই রেখেছে। তাঁবুতে ঢুকেই খেতে বসে গেল কিশোররা। গপগপ করে গিলতে লাগল সবাই। কাদার খোকারও খাবারের ব্যবস্থা করল কুলিরা।
পেট শান্ত হয়ে এলে মুসা জিজ্ঞেস করল, আজ রাতে কি করব? পাহারা লাগবে? হাতির এই বাচ্চাটাকেও যদি চুরি করতে আসে?
খাঁচায় তালা দিয়ে রাখব, জবাব দিল কিশোর।
খাঁচায় ঢুকতে চাইল না হাতির বাচ্চা। শেষে মুসাকে আগে ঢুকে গিয়ে ডেকে ডেকে তাকে ঢোকাতে হলো। তারপর এক ফাঁকে পিছলে বেরিয়ে চলে এল সে। চট করে তখন দরজা লাগিয়ে তালা আটকে দেয়া হলো। শিকের ফাঁক দিয়ে শুড় বের করে

হাতির ভাষায় প্রতিবাদ জানাতে লাগল কাদার খোকা। আদর করে তার ওঁড়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল মুসা, থাক, কোন ভয় নেই। এখানে তুই বেশি নিরাপদ।
বলল বটে, কেন যেন কথাটা নিজেই বিশ্বাস করতে পারল না। আগের রাতে খুদে দানবকেও এ রকম অভয় দিয়েছিল। কিন্তু রক্ষা করতে পারল কই?
তবে এদিন আর ভুল করল না। এক তালার ওপর ভারি আরেকটা তালা লাগাল সে। দেখি, এবার কি করে খোলে ব্যাটারা?
ঝুঁকি নিতে চাইল না কিশোর, পাহারার ব্যবস্থা করল। হাতির বাচ্চাটা ছাড়াও আরও অনেক দামী দামী জানোয়ার আছে। নিলে ভাল দামে বেচতে পারবে ডাকাতরা।
আকামি আর মুংগা বেজায় ক্লান্ত। কুলিদের কারও ওপর পাহারার ভার দিতে ভরসা পেল না কিশোর। সর্দার ওগারোর সঙ্গে পরামর্শ করল।
গ্রাম থেকে লোক দিল সর্দার।
হাতে বল্লম নিয়ে খাঁচার সামনে পাহারায় বসল দুজন শক্তিশালী উয়াটুসি যোদ্ধা।
.
আহত হাতির চিৎকারের মত অদ্ভুত শব্দ পৃথিবীতে আর আছে বলে জানা নেই মুসার। চমকে জেগে গেল সে। মেরুদণ্ডে বয়ে গেল শীতল শিহরণ, শিরশির করে উঠল চামড়া, খাড়া হয়ে গেল রোম। মনে হলো বিদ্যুতের তার ছুঁয়ে ফেলেছে।
একটা মুহূর্ত যেন পাথর হয়ে পড়ে রইল সে। তারপর বিছানা থেকে লাফিয়ে নেমে দৌড় দিল তাবুর বাইরে, কি হয়েছে দেখার জন্যে।
খাঁচার কাছে এসে হোঁচট খেল। কিসে লাগল দেখার জন্যে তাকাল নিচে। অন্ধকার এখনও কাটেনি। আবছা ভাবে দেখল ওগারোর একজন প্রহরী পড়ে আছে। নিথর। তাড়াতাড়ি বসে তার নাড়ি দেখল। মারা গেছে লোকটা।
হাতড়ে হাতড়ে দ্বিতীয় লোকটাকেও বের করল সে। সে-ও মৃত।
পাশে এসে দাঁড়িয়েছে কিশোর। তাঁবু থেকে বেরোতে শুরু করেছে কুলিরা। গা থেকে আসছে গ্রামবাসীরা। খাঁচার মধ্যে এখনও চিৎকার করে চলেছে হাতির বাচ্চাটা।
কি হয়েছে ওর? নিজেকেই যেন প্রশ্ন করল কিশোর।
মনে হয় ডাকাতেরা ভয় দেখিয়েছে।
তালায় হাত দিয়ে দেখল মুসা। একটা ভোলা। আরেকটা লাগানো রয়েছে।
দৌড়ে তাবুতে গিয়ে চাবি নিয়ে এল সে। তালা খুলল।
কি করবে?
ভেতরে গিয়ে ওকে শান্ত করব।
যেয়ো না! এখনওর হুঁশ নেই, খুন করে ফেলবে!

করবে না। আমাকে চেনে।
দরজা খুলে আস্তে ঢুকে পড়ল মুসা।
এই, খোকা, চুপ কর! আমি, চিনতে পারছিস না? আমি…
কিন্তু তার কথা হাতির কানে ঢুকল বলে মনে হলো না। নিজের চিৎকারেই হয়তো কান ঝালাপালা, মুসার কথা আর শুনতে পাচ্ছে না। এক ধাক্কায় তাকে ফেলে দিল।
লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল মুসা। খাঁচার দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল।
চেপে ধরল তাকে বাচ্চাটা। চাপ দিতে শুরু করল। আরেকটু বাড়লেই মড়মড় করে পাঁজর ভেঙে যাবে মুসার। বুঝল, কিশোর ঠিকই বলেছে। ঢোকাটা উচিত হয়নি।
শুড়টা ধরার জন্যে হাতড়াতে শুরু করল সে। ওটাতে হাত বুলিয়ে দিতে পারলে হয়তো শান্ত করা যাবে।
একটা কান ঠেকল হাতে। একটা দাঁত। হাত চলে গেল যেখানে ঔড় থাকার কথা, কিন্তু নেই ওটা। তার বদলে চটচটে আঠাল পদার্থ ভিজিয়ে দিল হাত।
আরেকটু ওপর দিকে হাত তুলতে হাতে ঠেকল কাটা মাংস। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে। আরও ওপরে কাটা ওঁড়ের গোড়াটুকু।
ব্যাপারটা বুঝে ফেলল মুসা। চুরি করতে এসে দু-জন প্রহরীকে খুন করেছে ডাকাতেরা। হাতিটাকে চুরি করতে চেয়েছে। কিন্তু তালা খুলতে পারেনি। বাচ্চাটা ভেবেছিল, কোন বন্ধু এসেছে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। শুড় বাড়িয়ে স্বাগত জানাতে গিয়েছিল সে। কেটে ফেলেছে ভয়ানক নিষ্ঠুর লোকটা। নিশ্চয় ভেবেছে- নিতেই যখন পারলাম না, অন্য কাউকেও রাখতে দেব না। শুড় কাটা হাতির কোন দাম নেই।
প্রচণ্ড যন্ত্রণায় পাগল হয়ে গেছে বাচ্চাটা। শান্ত করার আশা বৃথা। খাঁচায় থাকলে মরতে হবে। তাড়াতাড়ি দরজার দিকে এগোল কিশোর।
এই খেপা অবস্থায় শুড় থাকলে কিছুতেই বেরোতে পারত না মুসা, ধরে ফেলত তাকে হাতি। এখন ধরতে পারল না বটে, মাথা দিয়ে ঢুস মারতে ছাড়ল না।
খাঁচার বাইরে কয়েক হাত দূরে গিয়ে পড়ল মুসা।
তাড়াতাড়ি এসে তাকে তুলে নিল কয়েকজন কুলি।
খাঁচা থেকে ছুটে বেরোল ক্ষিপ্ত হাতি। যাকে সামনে পেল তাকেই ধরার চেষ্টা করতে লাগল। এদিক ওদিক ছুটে পালাতে শুরু করল লোকে।
কাউকে ধরতে না পেরে গায়ের দিকে ছুটল মত্ত হাতি। প্যাপিরাসের তৈরি কুঁড়ের বেড়াগুলো ধসিয়ে দিতে লাগল টুস মেরে। তছনছ করে ফেলতে লাগল সবকিছু।
আচমকা কানফাটা শব্দে গর্জে উঠল ভারি রাইফেল।

ঢলে পড়ল হাতিটা।
ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে তখন। সেই আবছা আলোয় কিশোরের হাতে রাইফেলটা দেখতে পেল মুসা।
কেন মারলে? চিৎকার করে উঠল সে।
আর কি করতে পারতাম!
কয়েক মিনিট সময় পেলে শান্ত করতে পারতাম ওকে। মেরে ফেলার দরকার ছিল না।
পারতে না। ওর গুঁড়ের যন্ত্রণা কমত না। ক্রমেই আরও ক্ষিপ্ত হত। রক্তক্ষরণে মরার আগে আরও কি কি ক্ষতি করত কে জানে। মানুষ মারলেও অবাক হতাম না।
কিন্তু ওষুধ আছে আমাদের কাছে। ওর চিকিৎসা করতে পারতাম।
দেখো মুসা, মাঝে মাঝে তুমি খুব বোকা হয়ে যাও! তোমার দুঃখ বুঝতে পারছি। একটা কথা বুঝতে পারছ না, জখমটা সারানো গেলেও কোনদিনই আর শুড় ফিরে পেত না সে। বেঁচে থাকতে সাংঘাতিক অসুবিধে হত। তোমার দুটো হাত কেটে দিলে কি অবস্থা হবে বলো? হাতির ঔড় না থাকলে আমাদের হাত না থাকার চেয়েও বেশি অসুবিধে হয়। পানিও খেতে পারে না। ওকে যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেয়ার আর কোন উপায় ছিল না।
ছুরি আর কুড়াল নিয়ে মৃতদেহটার ওপর ততক্ষণে ঝাঁপিয়ে পড়েছে গ্রামবাসীরা। হাতির মাংস তাদের প্রিয় খাবার। নষ্ট করার মানে হয় না।
কিশোরের কথায় তখনকার মত চুপ হয়ে গেলেও রাগ চাপা আগুনের মত ধিকিধিকি জ্বলতে লাগল মুসার মনে। ডাকাতদের ওপর বিষিয়ে গেছে মন। দাঁতে দাঁত চেপে কঠিন একটা প্রতিজ্ঞা করল সে। তাকাল বন্ধুর দিকে।
বুঝতে পারল কিশোর। নীরবে মাথা ঝাঁকাল শুধু।

.

নাস্তার পর ঘটনাটা নিয়ে আকামির সঙ্গে আলোচনায় বসল কিশোর।
সামান্য কটা টাকার জন্যে এত নিষ্ঠুর হতে পারে কেউ, ভাবা যায় না! বলল সে। কাল রাতে আবার নিশ্চয় পায়ের ছাপ রেখে গেছে। কি মনে হয় তোমার, পিছু নিয়ে ধরা যাবে?
মাথা নাড়ল আকামি। না, লাভ নেই। কালকের অবস্থাই হবে। পানির কাছে টেনে নিয়ে যাবে আমাদের, তারপর ফুস!
যদি খালি জানতাম কোথায় থাকে ব্যাটারা! এতবড় পার্বত্য এলাকায় কোথায় খুঁজব ওদের?

হাঁটাচলাও সহজ নয় এখানে, মুসা বলল। রাস্তা তো নেইই, দুনিয়ার যত কাদা,হদ, জঙ্গল, খাড়া খাড়া টিলা আর তুষার।
তারপরেও, হাল আমরা ছেড়ে দিতে পারি না, কিশোর বলল। আকামি, সবাইকে বলো তৈরি হতে। একঘণ্টার মধ্যেই বেরোব আমরা।
হঠাৎ একটা শব্দ শুনে ফিরে তাকাল মুসা। লাফিয়ে উঠে দৌড় দিল। বন থেকে বেরোতে দেখেছে খুদে দানবকে।
মাথা বের করেই দাঁড়িয়ে গেছে হাতির বাচ্চাটা। সাবধানে তাকাচ্ছে। মুসাকে দেখে চিৎকার করে উঠল আনন্দে। ছুটে এল তার দিকে।
মুসাও ছুটে গেল। কোথায় ছিলি তুই খুদে! জলদি বল! কেমন আছিস?
ম্যাজিকের মত চারপাশে লোক জড় হয়ে গেল। মুসার দুঃখ দেখে মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল ওদেরও, আনন্দ দেখে খুশি হলো।
সবাই খুশি, কেবল সর্দার ওগারো বাদে।
আমার ছেলে? আমার ছেলে তো এল না ওর সঙ্গে।
সবগুলো চোখ ঘুরে গেল বনের দিকে। আউরোকে দেখা গেল না। ডাকাতদের আখড়া থেকে পালিয়ে এসেছে একলা খুদে দানব। কাদায় মাখামাখি। তাকে হ্রদে গোসল করাতে নিয়ে গেল মুসা।
ভাল করে গোসল করিয়ে তাকে নিয়ে পানি থেকে উঠে এল সে। খেতে দিল।
অনেক অত্যাচার চলেছে বেচারার ওপর। চামড়ায় আঁচড় আর কাটাকুটির দাগ। কাটা বসানো ভারি বুটের লাথি আর চামড়ার চাবুকের বাড়ির স্বাক্ষর ওগুলো।
ভীষণ রাগ লাগছে মুসার। শাস্তি দিতেই হবে শয়তানগুলোকে। আউরোকেও উদ্ধার করে আনতে হবে। কিন্তু ওদের আস্তানাটা খুঁজে পাবে কি করে? পায়ের ছাপ ধরে গিয়ে যে লাভ নেই, সে তো জানাই হয়ে গেছে।
চট করে মাথায় এল বুদ্ধিটা। তাই তো, খুদে দানবের পায়ের ছাপ ধরে ধরে গেলেই হয়! কাছেই আকামিকে দেখে উত্তেজিত হয়ে তাকে কথাটা জানাল মুসা।
চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল আকামি।
হতে পারে, কাজ হতে পারে!
সুতরাং আবার দল বেঁধে বেরোনোর পালা। আগের রাতে ডাকাতেরা যে ছাপ রেখে গেছে, সেগুলোকে গুরুত্ব দিল না ওরা, বাচ্চা হাতিটার ছাপ অনুসরণ করে এগোল। অনেক জায়গায় ছাপ অত্যন্ত অস্পষ্ট, কিন্তু আকামির অভিজ্ঞ চোখে তা-ও এড়াল না।
গ্রীন লেকের দিকে এগিয়ে গেছে চিহ্ন। তবে এবার আর পানিতে হারিয়ে গেল না। বরং হদের পাড় ধরে এগোল। ডানে ঘুরে পুব দিকে চলে গেছে। পুব প্রান্ত ছাড়িয়ে, জলপ্রপাত পেরিয়ে প্রায় খাড়া পথ বেয়ে উঠে গেছে ব্যালকনিতে, যেখানে ব্ল্যাক

লেককে ঢেকে রেখেছে কালো মেঘ। এখানে জন্মে আছে প্রকাণ্ড পাম, প্রকাণ্ড মিমোসা আর আট ফুট উঁচু ঘাস। বিশাল এক গণ্ডার চরছে দানবীয় বিছুটি বনে, তিন ইঞ্চি লম্বা কাঁটাওয়ালা ডালগুলো চিবিয়ে চলেছে-ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে আইসক্রীম কেক খাচ্ছে। হ্রদের কিনারে জন্মে আছে বড় বড় জলজ উদ্ভিদ।
পুরো দৃশ্যটা এতটাই অস্বাভাবিক, মুসার মনে হচ্ছে স্বপ্ন দেখছে। বিড়বিড় করে বলল, এ তো ফ্যান্টাসি ল্যান্ড! কল্পনার রঙিন জগৎ!
মোটেও কল্পনার জগৎ নয়, বাস্তব, অতিমাত্রায় বাস্তব, কিশোর বলল। তিরিশ লক্ষ বছর আগে পুরো আফ্রিকারই এই চেহারা ছিল। এখান থেকে বেশি দরে নয় সেরেঙ্গেটি প্লেন-বিশাল এক তৃণপ্রান্তর, ওখানে মাটি খুঁড়ে পাওয়া গেছে অতিকায় শুয়োর, ভেড়া, উটপাখি, বেবুন আর গণ্ডারের ফসিল। আজকের গণ্ডারের দই গুণ বড় ছিল ওগুলো। আফ্রিকা ছিল দানবের রাজত্ব। দানবেরা সব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, কেবল এই পার্বত্য এলাকা বাদে। এখানে ওরা টিকে আছে আজও।
কিছুতেই মাথায় ঢুকছে না আমার, পৃথিবীর সব জায়গা থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল দানবেরা, অথচ এখানে টিকে থাকল কি করে?
এর সঠিক জবাব কেউ দিতে পারে না। প্রতিদিন বৃষ্টি হওয়াটা অবশ্য একটা বড় কারণ। তাতে দ্রুত বাড়ে গাছপালা, বড় হয়; আর বেশি খাবার পেলে তৃণভোজীরাও বিশালাকার হয়ে যায়। কিন্তু অনেক কারণের একটা হতে পারে এটা, সব নয়। আরেকটা জবাব হতে পারে এই জায়গাটা কোনভাবে আলাদা হয়ে গিয়েছিল দুনিয়ার সঙ্গে, এখনও আলাদা হয়েই আছে, সাগরের মাঝে দ্বীপগুলো যেমন মূল ভূখণ্ড থেকে আলাদা হয়ে যায়। মাটিরও কোন ব্যাপার থাকতে পারে। এই অঞ্চলে কখনও আগ্নেয়গিরির উৎপাত হয়নি, ফলে সেই প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে একই রকম রয়ে গেছে মাটি। যা-ই ঘটে থাকুক, এখানে আমরা তিরিশ লক্ষ বছর আগের পৃথিবীর পরিবেশে রয়েছি, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কেমন লাগছে ভাবতে?
ভূতুড়ে!
ভারি কুয়াশা গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিতে রূপ নিল। বাড়তে বাড়তে একেবারে মুষলধর শুরু হলো, সেই সঙ্গে বজ্রপাত। দশ মিনিটে মুছে দিল বাচ্চা হাতিটার পায়ের ছাপ।
হঠাৎ করে থেমে গেল বৃষ্টি। পায়ের ছাপের জন্যে ব্যর্থ খোঁজাখুঁজি, চলল। মেঘের নিচে ঢেকে থাকা অদৃশ্য পর্বতের দিক থেকে ভেসে এল বাজ পড়ার প্রচণ্ড শব্দ, ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরতে লাগল যেন ব্যঙ্গের হাসি হেসে।
যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে সবাইকে ছড়িয়ে পড়ে একশো ফুট গোল একটা বৃত্ত তৈরি করার নির্দেশ দিল আকামি। তারপর ভাল করে প্রতিটি ইঞ্চি

জায়গা পরীক্ষা করে দেখতে বলল। দেখতে দেখতে কেন্দ্রের দিকে এগিয়ে আসবে সবাই।
কিন্তু কিছু পাওয়া গেল না। ভেজা মাটিতে বসে পড়ল ওরা।
আবার বজ্রের হাসি শোনা গেল গুপ্ত পর্বত থেকে।
এই শব্দ রাগিয়ে দিল কিশোরকে। এখানে বসে বসে ওই হাসি শুনবে নাকি? তোমরা পুরুষ মানুষ, না কচি খোকা? দুদু খাও? যাদের ভয়ে কাবু হয়ে বসে আছ। এখানে, তারা দেবতা নয়, আমাদেরই মত মানুষ। ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আশেপাশেই কোথাও আছে ওরা, হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে পারে না। ওদের খুঁজে বের আমাদের করতেই হবে। এক কাজ করি এসো, ভাগাভাগি হয়ে খুঁজতে থাকি। একসঙ্গে দু-জন দু-জন করে থাকব। এই জায়গা থেকে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ব আমরা। তন্নতন্ন করে খুঁজব। দুপুর নাগাদ ফিরে আসব আমরা এই জায়গায়, কেউ কিছু পেয়ে থাকলে বলব।
কেউ আনমনে মাথা নাড়ল, কেউ বিড়বিড় করল, কিন্তু নির্দেশ অমান্য করল না কেউ। কে কার সঙ্গে থাকবে, ভাগ করে দিল আকামি। একেক দল একেক দিকে ছড়িয়ে গেল। কিশোর-মুসা রওনা হলো উত্তরে।
খাড়া আরেকটা ঢালের কাছে চলে এল ওরা। দানবীয় গাছপালা এখানেও, রোমশ ডালপালা; বিরাট বিরাট ফুল-যেমন ডেইজির আকারই বাসনের সমান। যে সব শ্যাওলা পায়ের নিচে কার্পেটের মত হয়ে থাকার কথা, সেগুলো কিশোরের মাথা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে দিয়ে কয়েক গজ এগিয়েই থেমে গেল দু-জনে। সামনে অসম্ভব ঘন হয়ে জন্মেছে শ্যাওলা, লতার সঙ্গে জট পাকিয়ে দুর্ভেদ্য হয়ে উঠেছে। মনে হচ্ছে একেবারে নিরেট, কোন ফাঁক-ফোকর নেই এর মধ্যে।
হবে না এ ভাবে, মাথা নেড়ে বলল কিশোর। শ্যাওলা ঠেলে এগোনো যাবে না। এমন কাণ্ড আর দেখিনি!
জন্তু-জানোয়ার চলাফেরা করে কি ভাবে তাহলে?
ভাল প্রশ্ন। নিশ্চয় সুড়ঙ্গ আছে। করে নিয়েছে ওরা। চলো, বেরিয়ে গিয়ে খুঁজে দেখি।
যতটা কষ্ট করে ঢুকেছে, ঠিক ততটাই কষ্ট করে শ্যাওলা যেখান থেকে শুরু হয়েছে সেখানে আবার বেরিয়ে এল ওরা। শ্যাওলার কিনারা ধরে এগোল। খুঁজে বের করল সুড়ঙ্গমুখটা। কিন্তু বড় বেশি সরু ওটা-সাপ কিংবা ইঁদুর-ঘঁচো জাতীয় প্রাণীরা তৈরি করেছে। কিন্তু চন্দ্রপাহাড়ের ইঁদুর-ঘঁচোও বেড়ালের চেয়ে বড়।
মুসা বলল, মোড়ামুড়ি করে ঢুকে যাওয়া যায়।
তা যায়। গিয়ে সাপের কামড় খেয়ে মারাও যায়। ইঁদুর চলাচল করলে এখানে সাপ থাকতে বাধ্য। মাম্বা কিংবা গোখরোর মুখোমুখি পড়লে আর বাঁচতে হবে না।

অন্য কিছু করা দরকার।
কি করবে ভাবছে ওরা, এই সময় সমস্যার সমাধান করে দিল একটা শুয়োর। ছুটে বেরোল আরেকটা বড় সুড়ঙ্গমুখ দিয়ে। এতক্ষণ ওই মুখটা চোখে পড়েনি ওদের।
মানুষ দেখে থমকে দাঁড়াল শুয়োরটা। ঘেঁৎ-ঘোৎ শুরু করল। ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে গোলমাল না করে ছাড়বে না।
ছুরির মত ধারাল ভয়ঙ্কর দাঁতগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। মুসাকে সাবধান করল, চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকো!
চোখ গরম করে গোঁ-গোঁ করে ধমক দিল শুয়োরটা, কয়েকবার আক্রমণ করার মিথ্যে হুমকি দিল। কিন্তু বোকা মানুষগুলো তার আহ্বানে সাড়া দিচ্ছে না দেখে বোধহয় ভাবল, এই কাপুরুষদের সঙ্গে লড়াই করে মজা নেই। শেষবারের মত একবার শাসিয়ে, দাঁত নাচিয়ে, নেমে চলে গেল পর্বতের ঢাল বেয়ে।

.
সুড়ঙ্গটার ভেতরে উঁকি দিল ওরা। তিন ফুট উঁচু, দুই ফুট মত চওড়া। ঘুটঘুটে অন্ধকার।
ভেতরটা মোটেও পছন্দ হলো না মুসার। হাত-পায়ে ভর দিয়ে এগোতে হবে। ভেতরে ঢুকে আরেকটা শুয়োরের যদি মুখোমুখি হয়ে যাই? যা অন্ধকারের অন্ধকার, বাপরে বাপ! সাংঘাতিক বিপদে পড়ব!
অন্য ভাবেও ভেবে দেখতে পারো। তোমার যেমন অপছন্দ, শুয়োরেরও তেমনি অপছন্দ হতে পারে এই সুড়ঙ্গ। চিতাবাঘের ভয়ে। সুতরাং সামনে যদি শুয়োর পড়ে, ঘোৎ-ঘোৎ করেই, তুমিও চেঁচানো শুরু করবে। চিতাবাঘের মত গর্জন করতে পারলে তো আরও ভাল। চিতাবাঘ সাজার এই মোক্ষম সুযোগ ছাড়া বোধহয় উচিত হবে না। কি বলো?
পরামর্শের জন্যে ধন্যবাদ। কিন্তু গর্জনের ওপর ভরসা করতে পারব না আমি। ছুরিটা হাতে রাখব। চিৎকার শুনে.ভয় না পেলে শেষ ভরসা এই ছুরি।
হাতে নয়, দাতে, শুধরে দিল কিশোর। হামাগুড়ি দেয়ার জন্যে হাত দুটো ব্যবহার করতে হবে তোমাকে। ছুরি ধরতে পারবে না।
চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে, দাঁতে ছুরি কামড়ে ধরার পর শুয়োরের চেয়ে কম ভয়ঙ্কর মনে হলো না দুই গোয়েন্দাকে।
আগে সুড়ঙ্গে ঢুকল কিশোর। সামনে কোনও বিপদ থাকলে প্রথমে সে-ই সেটার মোকাবেলা করতে চায়।
এতে মুসা যে বিপদমুক্ত থাকল তা নয়, কারণ আক্রমণ পেছন থেকেও আসতে পারে।

তাতে বরং বিপদটা বেশিই, পেছন দিকে ছুরি চালাতে পারবে না। এত সরু সুড়ঙ্গে ঘোরার উপায় নেই।
বন্ধুকে সামনে থাকতে দেয়ায় শুরুতে যে অস্বস্তিটা ছিল, এখন আর নেই। বিপদে পড়লে কিশোর তো অন্তত ছুরি চালাতে পারবে, সে তা-ও পারবে না। তার সামনের দিকটায় একটা বাধা অন্তত আছে, পেছনে কিছুই নেই। একেবারে খোলা। শুয়োর এসে যদি দাঁত দিয়ে চিরে দেয়, কিংবা চিতাবাঘে কামড়ে ধরে, কিছুই করার থাকবে না তার।
চলো, এগোই, কিলোর বলল। কোন অসুবিধে আছে?
না, মানা করে দিল মুসা। বিপদটা বুঝতে যখন পারেনি তার বন্ধু, না বুঝুক, না বুঝে স্বস্তিতে থাকুক।
চলতে চলতে নতুন আরেকটা দুশ্চিন্তা এসে ভর করল মাথায়-কত লম্বা এই সুড়ঙ্গ কয়েক মাইলও হতে পারে। এভাবে হামা দিয়ে কতটা এগোনো সম্ভব? বিপদ আরও আছে। মাটিতে পড়ে থাকা কুটো আর চোখা পাথর ইতিমধ্যেই হাতের তালু আর হাটুতে খোঁচা দিতে আরম্ভ করেছে। এই অত্যাচার কতক্ষণ সইতে পারবে?
সামনে থেকে ডাকল কিশোর, মুসা, আসছ?
অনেকটা এগিয়ে গেছে সে। শ্যাওলার সুড়ঙ্গের ভেতর প্রতিধ্বনি তেমন হলো না, শব্দটাও কেমন চাপা চাপা।
চিৎকার করে জবাব দিল মুসা।
কয়েক মিনিট নীরবে হামাগুড়ি দিল সে। হঠাৎ শ্যাওলায় বাড়ি খেল মাথা। থেমে গিয়ে হাতড়ে হাতড়ে বোঝার চেষ্টা করল, ব্যাপারটা কি? দু-ভাগ হয়ে গেছে সুড়ঙ্গ। এবার কি? কোনটা ধরে যাবে? ডাকল, কিশোর?
মনে হলো, তার মুখ ভর্তি তুলল। বিস্ময়কর ভাবে শব্দ চেপে দিচ্ছে শ্যাওলা। আবার চিৎকার করে ডাকল সে। কোন ফল হলো না। বেশিদূর এগোল না তার ডাক। সাড়াও মিলল না।
আবার চিৎকার করল।
জবাব নেই।
তার জন্যে অপেক্ষা করল না কেন কিশোর? হয়তো দু-ভাগ যে হয়ে গেছে সুড়ঙ্গ, এটা খেয়ালই করেনি। ভোলা পেয়েছে, ঢুকে পড়েছে। মাথায় বাড়ি না। লাগলে সে নিজেও বুঝতে পারত না। যেটা ভোলা পেত, সেটা দিয়েই ঢুকে যেত।
মাথা গরম হতে দিল না সে। তাতে বিপদ বাড়বে। শান্ত থেকে ভাবার চেষ্টা করল-কি ঘটতে পারে? সুড়ঙ্গটা যে ভাগ হয়েছে কিশোর এটা খেয়াল না করলে যেটা সোজা গেছে সেটা দিয়েই ঢুকবে। মোড় নিয়েছে যেটা সেটা দিয়ে নয়। তাহলে সোজা গেছে কোনটা? কি ভাবে বোঝা যাবে?

গাঢ় অন্ধকারে সেটা বোঝা কঠিন।
দুটো সুড়ঙ্গই সোজা গেছে মনে হচ্ছে।
ভীষণ লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ড। বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে। নিজেকে বোঝানোনার চেষ্টা করল-ভয়ে নয়, আসলে পরিশ্রমে হাঁপাচ্ছি আমি। পরিশ্রম হবেই, রয়েছে খাড়া পর্বতের ঢালে। হাত-পায়ে ভর দিয়ে ঢাল বেয়ে ওপরের দিকে ওঠা সহজ ব্যাপার নয়।
কিন্তু মন কি আর ফাঁকিতে পড়ে? ঠিকই বুঝতে পারছে, পরিশ্রমে নয়, বুক কাঁপছে প্রচণ্ড ভয়ে। ফাঁদে পড়া ইঁদুরের চেয়েও খারাপ অবস্থা হয়েছে তার।
অন্ধকার এই গর্তের মধ্যে বোঝারও উপায় নেই কোথায় ঘাপটি মেরে আছে হিংস্র জানোয়ার, কিংবা মারাত্মক বিষাক্ত সাপ। কোনদিকে যাচ্ছে তা-ও বোঝা যায় না। যদি দেখতে পেত, এতটা অনিশ্চয়তায় ভুগত না।
ছুরি দিয়ে ছাতে খোঁচা মেরে দেখল। গায়ে গায়ে জড়িয়ে গিয়ে শক্ত রবারের। মত হয়ে আছে শ্যাওলা। কাটার জন্যে খুঁচিয়েই চলল। হাত ব্যথা হয়ে গেল। কিন্তু থামল না সে। অনেক চেষ্টার পর অবশেষে ছাত দিয়ে দেখা গেল এক চিলতে আলো।
দ্বিগুণ উদ্যমে খোঁচাতে থাকল সে।
মাথা গলানোর মত একটা ফোকর করে ফেলল।
আলোয় মাথা বের করতে পারাটা একটা বিরাট স্বস্তি। কিন্তু লাভটা কি? চারদিকে যেদিকেই তাকায় কেবল শ্যাওলা, শ্যাওলা আর শ্যাওলা। তা-ও বেশিদূর দৃষ্টি চলে না। কুয়াশায় গিলে নিয়েছে যেন শ্যাওলার বনকেও।
কোনটা যে কোন দিক, বাইরেটা দেখে আরও অনিশ্চিত হয়ে গেল। কিছু বোঝার উপায় নেই। ভেতরে তো অন্তত দুটো সুড়ঙ্গ আছে, যে কোন একটা বেছে নিতে পারে। এখানে কি আছে? কিছু না।
আবার মাথা নিচু করে ফেলল। হাত-পায়ে ভর দিয়ে এগোল ডানের সুড়ঙ্গ ধরে।
কিশোরের নাম ধরে ডাকল আবার।
সাড়া নেই।
বুঝল, এভাবে ডেকে ডেকে অহেতুক দমই শেষ করবে, লাভ হবে না।
ছড়ে যাওয়া তালু আর হাটুতে ভর দিয়ে দ্রুত এগিয়ে চলল। প্রতিবার হাত বাড়াতে গিয়েই মনে হচ্ছে এই বুঝি হাতটা পড়ল মসৃণ, পিচ্ছিল কোন ঠাণ্ডা কিলবিলে শরীরে। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ফুঁসে উঠবে সরীসৃপটা, ছোবল মারবে।
কিন্তু তেমন অঘটন ঘটল না।
আরেকটা দুই-সুড়ঙ্গের কাছে পৌঁছাল সে।
ডানে যাবে না, বায়ে?

দুটো একই রকম মনে হলো তার, বায়েরটাই ধরল।
একটু পরেই থেমে গেল। কান পেতে আছে। সামনে মৃদু একটা খসখস শব্দ। এগিয়ে আসছে।
কিছু একটা আসছে!
আশা করল, ছোট কিছু হবে, নির্বিষ, ক্ষতি করতে পারবে না, এমন কিছু, শজারু কিংবা খরগোশ। কিন্তু অত ছোট জানোয়ার এমন শব্দ করতে পারবে না। শব্দটা হচ্ছে সুড়ঙ্গের ছাত আর দেয়ালে ঘষা খাওয়ার ফলে।
দ্রুত মনের পর্দায় খেলে গেল ভয়াবহ কতগুলো জর মুখ। প্রাণীটা গরিলা, দানবীয় পিঁপড়ে ভালুক কিংবা জঘন্য হায়েনা হতে পারে। তিনটেই সাংঘাতিক জীব। শুয়োরও কম বিপজ্জনক নয়। ক্ষুরের মত ধারাল দাঁত ওগুলোর। চোখের পলকে চিরে ফালাফালা করে দিতে পারে।
এ রকম বদ্ধ জায়গায় সবচেয়ে মারাত্মক হলো চিতাবাঘ।
ভাবনাটা অবশ করে দিতে চাইল তার শরীর।
পিছিয়ে যাবে?
লাভ নেই। যত তাড়াতাড়িই পিছাক, তারচেয়ে অনেক দ্রুত ছুটে আসতে পারবে চিতাবাঘ। ধরে ফেলতে কয়েক সেকেন্ডও লাগবে না।
ভয় পেয়েছে সে এটা বুঝতে পারলে আরও সাহস হয়ে যাবে বাঘটার। দ্বিধা থাকবে না আর, আক্রমণ করতে ছুটে আসবে।
মনে পড়ল কিশোরের কথা-ঘোৎ-ঘোৎ করবে…
কিন্তু শুয়োর হওয়ার ইচ্ছে নেই তার। জানোয়ারই যখন হতে হবে, চিতাবাঘই হবে, গর্জন করবে।
এমন গর্জন শুরু করল, দুনিয়ার কোন চিতাবাঘই তা পারবে না। একই সঙ্গে সামনের দিকে ছুটে গেল আক্রমণের ভঙ্গিতে। জানোয়ারটা সাহস সঞ্চয় করার আগেই তাকে ভয় দেখিয়ে তাড়াতে হবে।
গর্জনের জবাবে গর্জন। জবাবটাও কম ভয়ঙ্কর নয়।
আরও জোরে গর্জন করতে লাগল মুসা। মনে হচ্ছে ফুসফুস ফেটে যাবে। চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে জন্তুর মত করে যতটা জোরে সম্ভব ছুটে গেল সামনের দিকে।
ঠাস করে মাথায় মাথায় বাড়ি লাগল।
উফ! করে উঠল চিতাবাঘটা।
উফ! করে উঠল সে নিজেও।
বসে পড়ল দুই চিতাবাঘ। হাসতে লাগল। ভীতুর হাসি। কারণ দু-জনেই ভয় পেয়েছে সাংঘাতিক।

এখানে তোমার দেখা পাব, কল্পনাই করিনি, কিশোর বলল।
মুখটার কাছে অপেক্ষা করনি কেন? দু-ভাগে ভাগ হয়েছে যেখানটায়।
দু-ভাগ? বুঝতেই পারিনি! এখন বলো দেখি, ভুল পথে এলে কি করে?
আন্দাজে ঢুকে পড়েছি দুই সুড়ঙ্গের একটাতে।
ঘুরতে পারবে?
চেষ্টা করল মুসা। শরীর বাঁকিয়ে, মুচড়ে-টুচড়ে, অনেক ভাবে। শেষে বাদ দিল চেষ্টা।
পারব না। বেশি সরু।
তাহলে পিছাতেই হবে তোমাকে, উপায় নেই। বেশি দূর যেতে হবে না, ভেবো না, এই পাঁচ থেকে দশ মাইল! তিক্ত কণ্ঠে বলল কিশোর।
কি যেন ভাবল মুসা। শান্তকণ্ঠে বলল, দাঁড়াও, পাঁচ মিনিটেই ঘুরে যাব।
কি করে?
হাসল মুসা, জাদু জানি আমি। এসো।
পিছাতে লাগল মুসা। চলে এল দ্বিতীয় দুই-সুড়ঙ্গটার মুখে। পাশেরটাতে ঢুকে চুপ করে বসে রইল। তার পাশ কাটিয়ে গেল কিশোর। তখন পিছু নিল সে।
কিশোর ভাবল, এখনও তার সামনেই রয়েছে মুসা। হঠাৎ পেছনে এক ভয়াবহ গর্জন শুনে চমকে উঠল। অপেক্ষা করছে চিতাবাঘের ধারাল নখের আঁচড়ের। তার বদলে খোঁচা লাগল ছুরির মাথার।
তুমি! পেছনে গেলে কি করে!
বললাম না, জাদু।
আরে বাবা অত মশকরা করছ কেন? বলেই ফেলো না।
ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিল মুসা।
একটা ঘণ্টা হামাগুড়ি দিল ওরা।
তারপর থেমে গেল কিশোর। আমার হাতও শেষ, হাঁটুও শেষ। আর কোন দিন উঠে দাঁড়াতে পারব না! জানোয়ার হয়ে বাঁচতে হবে।
চিত হয়ে শুয়ে পড়ল মুসা। না ঘুমিয়ে আর পারব না আমি। যাও, ঘুরে এসো। আমি এখানেই অপেক্ষা করব।
কিন্তু এখানে ঘুমানো অসম্ভব মনে হলো তার। শ্যাওল-বনে বুকে হেঁটে চলা কৎসিত প্রাণীর অভাব নেই, ওগুলো জাগিয়ে রাখল তাকে। চুপ করে থাকলেই শরীরের ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে।
কাঁপুনি উঠে গেল এক সময়।
জমে যাচ্ছি ঠাণ্ডায়, বলল সে। চলো, এগোই। না হলে শরীর গরম থাকবে না।

বাপরে বাপ, এমন ঠাণ্ডার ঠাণ্ডা। মনে হচ্ছে মেরু অঞ্চলে আছি! আবার এগোতে শুরু করল কিশোর।
খানিক দূর এগিয়ে থেমে গেল। এই মুসা, দেখো, মনে হয় এসে গেছি। আলো দেখতে পাচ্ছ?
নতুন উদ্যমে এগিয়ে চলল ওরা।
আলোটা বাড়ছে ক্রমে।
অবশেষে বাইরে বেরিয়ে এল ওরা। আলো এত উজ্জ্বল লাগল, চোখই মেলতে পারল না ঠিকমত, মিটমিট করতে থাকল। অথচ আলো যে খুব বেশি, তা নয়। রোদের চিহ্নও নেই, মেঘে ঢাকা সূর্য; এমন লাগছে বেশিক্ষণ একটানা অন্ধকারে থেকে দিবালোকে বেরিয়ে আসার কারণে।
আমি মনে করেছিলাম বিষুবরেখার কাছাকাছি আছি, মুসা বলল। কিন্তু এ তো মেরু অঞ্চল।
বিষুবরেখাতেই আছি। তবে সাগরসমতল থেকে অনেক ওপরে তো, তাই এত ঠাণ্ডা। আল্পস পর্বতের চুড়ার চেয়েও ওপরে রয়েছি আমরা।
চোখে অবিশ্বাস নিয়ে বন্ধুর দিকে তাকিয়ে আছে মুসা। যাহ্, বেশি বলে ফেলছ! তা কি করে হয়? মন্ট ব্ল্যাঙ্কের উচ্চতা পনেরো হাজার ফুট।
জানি। কিন্তু এটার চূড়া সতেরো হাজারের কাছাকাছি। আমরা আছি প্রায় ষোলো হাজার ফুট উঁচুতে।
মস্ত বড় পর্বতারোহী হয়ে গেলাম তো তাহলে। তাই তো বলি, এত শীত, লাগে কেন! কিন্তু এত ওপরে, এই ঠাণ্ডাতেও যে দাবানল লাগতে পারে, জানতাম না। দেখো, কত ছাই।
ছাই? কুয়াশার জন্যে ঠিকমত দেখতে পাচ্ছি না আসলে। ছাই কোথায়?
এই তো।
হাত রেখে দেখো।
হাত রাখল মুসা। হাতে লেগে গেল ভেজা ভেজা সাদা জিনিস।
আরি, তুষার! বিষুব অঞ্চলে তুষার! স্বপ্ন দেখছি নাকি!
আরও দেখো। ওই যে, হ্রদটা, হোয়াইট লেক।
কুয়াশা বড় বেশি সচল এখানে। এই সরছে, এই জমছে। সরে যেতে বেরিয়ে পড়েছে হ্রদটা। আক্ষরিক অর্থেই সাদা। পানির ওপরে পুরোটা বরফ হয়ে আছে। তার ওপর হালকা তুষারের আস্তরণ।
কেমন পাথুরে, মরু প্রকৃতি এখানকার। দানবীয় ফুল আর গাছপালা অনেক পেছনে পড়ে আছে। কুয়াশার চাদরের ওপাশে কোথাও রয়েছে পর্বতের আকাশ

কুঁড়ে ওঠা চূড়া। আছে বরফের নদী। যেখান থেকে যখন তখন হিমবাহ নেমে যায় নিচের খাড়ির দিকে।
কুয়াশা কুণ্ডলীর ফাঁকে ফাঁকে নিচের আজব দৃশ্য দেখা যাচ্ছে, যেন এলিসের মত এক আজব দেশে এসে পড়েছে ওরা। যেখানকার সবই অদ্ভুত। পর্বতের কোলে বিশাল ছড়ানো আঙিনায় যেন বিষণ্ন হয়ে ঘুমিয়ে আছে কালো ব্ল্যাক লেক। তার নিচে ব্যালকনিতে সাজিয়ে রাখা হয়েছে যেন গ্রীন লেক, চারপাশের জঙ্গলের পটভূমিতে একটা রত্নের মত জ্বলছে।
নিচে, অনেক নিচে, পর্বতের পাদদেশে চোখে পড়ছে ছোট হোটেলটার চালাগুলো, যেখানে গেস্ট বুকে দেখেছে সেই সব বিখ্যাত মানুষদের নাম, যারা এই পর্বতের চূড়ায় চড়ার বহু চেষ্টা করেছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন অনেক রাজকুমার, কাউন্ট, ডিউক, এবং রয়্যাল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটির লোয়েল টমাস জুনিয়র আর অ্যাডলাই স্টিভেনসনের মত অভিযাত্রীরা।
তবে গেস্ট বুকে খুব কম নামই লেখা আছে। আরও হাজার হাজার মানুষ সেই অনাদিকাল থেকে ঘুরে গেছে এই রহস্যময় পর্বতের পাদদেশ থেকে, চেষ্টা চালিয়েছে এর চূড়ায় ওঠার।
আবার এগিয়ে এল কুয়াশার ধূসর চাদর, চোখের সামনে বাধা হয়ে ঢেকে দিল নিচের অপরূপ দৃশ্য-হ্রদ, জঙ্গল, বাড়িঘর।
চন্দ্রপৃষ্ঠের চেয়েও বিস্ময়কর এই পর্বতের জন্যে চাঁদের পাহাড় নামটা মোটেও অসঙ্গত নয়!
বাতাসে ক্রমাগত রূপ বদল করছে কুয়াশা। অদ্ভুত সব আকৃতি তৈরি হচ্ছে-কোনটা স্তম্ভ, কোনটা গাছ, কোনটা বা আবার একশো ফুট লম্বা মানুষ।
কিশোর, আমার গা ছমছম করছে, মুসা বলল। ওই যে ওই কুয়াশার স্তরটাকে দেখো, মনে হয় যেন একটা হাতি। সাদা হাতি।
আজব জিনিসটার দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। কুয়াশার মত আচরণ করছে না। কুয়াশা হলে এক আকৃতিও বেশিক্ষণ থাকত না, বাতাসেও সরে যেত। এই জিনিসটা সরছে না। একই জায়গায় একভাবে দাঁড়িয়ে আছে। যেন একটা সাদা হাতি, কিংবা সঠিক ভাবে বললে ছাই-সাদা হাতি।
চোখ ডলল কিশোর।
এখনও আছে ওটা।
উত্তেজনায় টগবগিয়ে উঠল, রক্ত।
এ সত্যি হতে পারে না। শ্বেতহস্তী খুব দুর্লভ। একটা সাদা হাতির জন্যে ওদেরকে দুই লক্ষ ডলার দেবে বলেছে টোকিও চিড়িয়াখানা।

কিশোরের মনে হলো স্বপ্ন দেখছে। তবে ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন যে ভাবে দ্রুত বদলাতে থাকে, এটা তেমন করে বদলাচ্ছে না। এক রকম রয়ে গেছে।
কাছে এগোনোর চেষ্টা করলে হয়তো কুয়াশা হয়ে মিলিয়ে যেতে পারে হাতিটা। তখন নিশ্চিত হতে পারবে, স্বপ্ন, নাকি চোখের ভুল?
দেখা যাক এটা সত্যি কিনা, বলল সে। এসো। খুব আস্তে, এক পা এক পা করে।
এগোতে লাগল ওরা।
নড়ল না দানবটা। মিলিয়ে গেল না। ভয় পেয়ে পালাল না। রেগেও গেল না। যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। হয়তো আর কখনও মানুষ দেখেনি। সুতরাং জীবগুলোকে ভয় পাবে, না ঘৃণা করবে, বুঝতে পারছে না।
আরও কাছে এসে কিশোর দেখল, সাদাটা আসলে কুয়াশার জন্যে মনে হয়েছে। কিন্তু কুয়াশার মধ্যে আরও হাতি তো দেখেছে আগে, ওগুলোকে তো এ রকম মনে হয়নি? এটাকে এখন হালকা ধূসর লাগছে। তাতে নিরাশ হলো না সে। জানা আছে, শ্বেতহস্তী বলতে ধবধবে সাদা হাতি নয়। তুষার শুভ্র হাতির কথা কেবল গল্প-কাহিনীতেই লেখা থাকে। বাস্তবে যেগুলোকে সাদা হাতি বলা হয়, সেগুলোর চামড়া পুরোপুরি কালো নয়, ফ্যাকাসে ধূসর।
একেবারে কাছাকাছি যেতে পারলে বুঝতে পারত, এই হাতিটার ফ্যাকাসে ভাবটা কতখানি বেশি। যত বেশি হবে, তত দাম বাড়বে।
মুসাও কিশোরের মতই সাবধানে এগোচ্ছে। শ্বেতহস্তীর দাম তারও জানা।
ওদের প্রতি তেমন আগ্রহ দেখাচ্ছে না হাতিটা।
দশ ফুটের মধ্যে চলে এল দুজনে। তারপর থামল।
এই মুহূর্তটা জীবনে ভুলবে না ওরা। দম বন্ধ হয়ে আসছে উত্তেজনায়।
এটার চামড়ায় ফ্যাকাসে ভাবটা অনেক বেশি, সেজন্যেই দূর থেকে কুয়াশার মধ্যে সাদা লাগছিল। মাঝে মাঝে লালচে ছোপ। পিঠটা সাদা, ময়লা তুষারের মত, যেন তুষার জমা পর্বতের চূড়া। নখ সাদা, চোখের রঙ লালচে-সাদা। কান আর মাথায় সাদার মধ্যে লাল লাল ছোট-বড় ফুটকি।
আর কোন সন্দেহ নেই, শ্বেতহস্তীই এটা! মাদী হাতি।
সাদা হাতি যে, তার আরও একটা বড় প্রমাণ, কালো হাতির মত বদমেজাজী নয়। মারচিসন ন্যাশনাল পার্কে একটা সাদা গণ্ডার ছিল। অনেকেই লিখেছে ওটার। কথা। খুব নাকি দ্র ছিল ওটা, সাধারণ গণ্ডারের মত বদমেজাজী নয়। সাদা খরগোশ, সাদা ইঁদুর, কালো কিংবা ধূসর জাতের পাখি যেগুলো সাদা হয়ে যায়, সবই নাকি শান্ত স্বভাবের হয়। সাদা রঙের তুষার-চিতাকে ভয় পায় না মানুষ। অথচ কালো চিতা আর কালো জাগুয়ার ভয়ানক হিংস্র হয়।

যে চিড়িয়াখানা এই হাতিটাকে পাবে, তারা অতি ভাগ্যবান। দর্শকদের জন্যে সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হবে এটা। অনেক চিড়িয়াখানার এই হাতি কেনার সামর্থ্যই নেই। জাপানীদের আছে, দুর্লভ জানোয়ারের জন্যে তারা খরচও করে। ওরা ঘোষণা করেছে দুই লাখ ডলার দেবে, চাপাচাপি করলে আরও অনেক বেশিও। দিতে পারে, বিশেষ করে এই হাতিটার জন্যে।
মাত্র দশ ফুট দূরে দাঁড়িয়ে আছে এতগুলো টাকা, অথচ ধরে নিয়ে যাওয়ার কোন উপায় দেখছে না ওরা। এতবড় একটা হাতির বিরুদ্ধে দুটো ছেলে কিছুই করতে পারবে না। ধরতে হলে অনেক লোকবল দরকার। এই সাফারির জন্যে যত লোক ভাড়া করেছে ওরা, সবাইকে নিয়ে এলেও হয়তো কাজ হবে না। একটাই কাজ করার আছে আপাতত, জানোয়ারটাকে বিরক্ত না করে, চমকে না দিয়ে চুপচাপ পিছিয়ে যাওয়া। তারপর লোকজন নিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে আসা।
হাতিটার ওপর চোখ রেখে আস্তে আস্তে পিছাতে শুরু করল দু-জনে। যে ভাবে এগিয়েছিল, তার চেয়ে সাবধানে।
হঠাৎ কানের কাছে কথা বলে উঠল একটা ভারি কণ্ঠ।
চমকে ফিরে তাকাল ওরা।
ছয়জন লোক দাঁড়িয়ে আছে। পরনে আরবদের সাদা পোশাক। হাতে পিস্তল আর তলোয়ার।
দৌড় দেব নাকি? মুসা বলল।
লাভ নেই। গুলি করে মেরে ফেলবে। বরং কথা বলে দেখি। বাংলা বোঝা প্রশ্নই ওঠে না, ইংরেজিও যে বোঝে না সেটা বোঝা গেল জিজ্ঞেস করতেই, নেতার কাছে জানতে চাইল কিশোর, ইংরেজি জানেন?
জবাবে রাগী ভঙ্গিতে মাথা নাড়ানো আর কিছু আরবী শব্দের তুবড়ি। আকামি যা বলেছে, ঠিক সে-রকম ওদের গায়ের রঙ-সাদাও না, কালোও না। মরুভূমিতে জন্ম, সেখানকার রোদ গাঢ় বাদামী করে দিয়েছে ওদের চামড়া। মাথায় পাগড়ি জড়ানো। পা খালি, জুতো-স্যান্ডেল কিছু নেই। তুষার মাড়াচ্ছে, অথচ ভঙ্গি দেখে মনে হয় না কোন অসুবিধে হচ্ছে। কঠিন লোক ওরা।
কথা বলতে বলতে একবার হাতিটার দিকে, একবার ছেলেদের দিকে তাকাঁচ্ছে নেতা।
ওদের উদ্দেশ্য আন্দাজ করতে পারছে কিশোর।
তাবুতে হামলা মনে হয় এরাই চালিয়েছে, বাংলায় বলল সে। কোনভাবে জেনেছে, হাতি ধরতে এসেছি আমরা। ওরাও এসেছে একই উদ্দেশে। আমাদের হাতিগুলো ওরা চুরি করেছে। এটাকে ধরতেও বাধা দেবে।
এমন ভঙ্গি করো, যেন কোনই আগ্রহ নেই আমাদের।

তাই করতে হবে। চুপচাপ সরে পড়ি চলো। অবশ্য যদি যেতে দেয়।
যেতে দিল না ওরা। যেই পা বাড়াল ছেলেরা, পিস্তলের নল ঠেসে ধরা হলো পিঠে। কাপড় ছিঁড়ে চোখ বেঁধে ফেলল। কেড়ে নেয়া হলো ছুরি দুটো। তারপর এগোনোর জন্যে বেশ জোরে, ব্যথা দিয়ে খোঁচা মারল পিঠে।
চলতে চলতে পাথরে পিছলে, হোঁচট খেয়ে, কিংবা উঁচু-নিচুতে তাল, সামলাতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে এগোল দুজনে। সেসব ক্ষেত্রেও খোঁচার বিরাম নেই। অকারণেই মারছে। কখনও গালাগাল, কখনও তলোয়ারের খোঁচাও সহ্য করতে হচ্ছে।
কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? মুসার প্রশ্ন।
বোধহয় ওদের ক্যাম্পে। জায়গাটা কোথায় গোপন রাখতে চায়, সেজন্যেই চোখ বেঁধেছে।
নিয়ে গেলে ভালই হয়। আউরোকে দেখতে পাব। মুক্ত করতে পারব।
জবাব দিল না কিশোর। মুসার দুঃসাহস যে কতখানি, ভাল করেই জানে সে। যত সহজে মুক্ত করার কথা বলছে, একদল গলাকাটা ডাকাতের হাত থেকে সেটা যে তত সহজ হবে না, মুসা নিজেও বুঝতে পারছে। তবু আশা ছাড়ছে না।
খুব কষ্ট হচ্ছে এগোতে। শ্যাওলার সুড়ঙ্গে হামাগুড়ি দিয়েই কাহিল হয়ে গেছে। এখন এই দুর্গম পথ। তার ওপর খিদে। পা চলতে চায় না। তবে একটাই স্বস্তি, এই হাঁটাহাঁটির ফলে শরীরটা গরম রয়েছে, প্রচণ্ড ঠাণ্ডায়ও জমে যায়নি এখনও। অবশ্য পিঠে ধারাল তরবারির ফলা ঠেকে থাকলে, আর কখন খচ করে ঢুকে যায় ভাবলে এমনিতেই গরম হয়ে থাকে শরীর।
সোজাসুজি না গিয়ে এদিক ওদিক ঘুরিয়ে ঘুরপথে নেয়া হলো ওদের, কোন দিকে যাচ্ছে দ্বিধায় ফেলে দেয়ার জন্যে, যাতে পথ চিনতে না পারে।
তবে একটা ব্যাপারে অসাবধান হলো ডাকাতেরা, বাতাস। এ অঞ্চলে আসার পর থেকে লক্ষ করেছে কিশোর, বাতাস বয় পশ্চিম থেকে পুবে। অনেক ঘোরাঘুরির পর অবশেষে যখন সোজা এগোল ওরা, খেয়াল করল বাতাস লাগছে তার পিঠে। তথ্যটা মনে গেঁথে নিল সে। ডাকাতের আস্তানা থেকে বেরোতে পারলে বাতাসের বিপরীতে এগোতে হবে। তাহলে পৌঁছে যাবে হোয়াইট লেকে, সেখান থেকে ব্ল্যাক লেক আর গ্রীন লেক পেরিয়ে ক্যাম্পে ফিরে যেতে পারবে।
কিন্তু যদি মুক্তি পায় ডাকাতদের কবল থেকে, তবে তো; মস্ত একটা যদি রয়ে যাচ্ছে।
প্রায় ঘন্টা দুই একটানা চলার পর সামনে কথার শব্দ শোনা গেল।
হঠাৎ করে পিঠ থেকে বাতাস এবং তলোয়ার দুটোই সরে গেল। বেশ উষ্ণ এখানে আবহাওয়া। রান্নার সুগন্ধ ভুরভুর করছে।

বন্দিদের চোখ থেকে কাপড় খুলে নেয়া হলো।
বিরাট এক গুহায় এসে ঢুকেছে ওরা। সেজন্যেই আর বাতাস লাগছে না। পিঠে। মশালের আলোয় আলোকিত। আগুনের বড় কুণ্ড গরম করে রেখেছে গুহাটা। হাত থেকে ফটিকের ঝাড়বাতির মত ঝুলে আছে স্ট্যালাকটাইট। ঝালর লাগানো দামী কাপড়ে ঢাকা দেয়াল। মেঝেতে চিতাবাঘের চামড়ার কার্পেট। সাদা আলখেল্লা পরা মানুষেরা বসে আছে তাতে। বাঘের মাথাকে তাকিয়া বানিয়ে ঠেস দিয়েছে। হাতে পুদিনার গন্ধ মেশানো চায়ের পেয়ালা।
এ কোথায় ঢুকলামরে বাবা! কিশোর বলল। মনে হচ্ছে হাজার বছর পেরিয়ে এসে ঢুকেছি আরব্য রজনীর জগতে।
কিংবা কাউন্ট মস্টিক্রিস্টোর প্রাসাদে! বিড়বিড় করল মুসা।

.

তোমাদের পছন্দ হয়েছে জেনে খুশি হলাম! ইংরেজিতে কথা বলল কেউ।
সাংঘাতিক ভারি কণ্ঠস্বরটা এল যেন গুহার দেয়াল ভেদ করে। জবাব যখন দিয়েছে, নিশ্চয় তাদের বাংলা বুঝতে পেরেছে। এই বিদেশ-বিভুইতে বাংলা বোঝে কেউ, এটা জেনে হাঁ হয়ে গেল দুই গোয়েন্দা।
বিশালদেহী একজন মানুষ। সাত ফুটের কাছাকাছি লম্বা, সেই পরিমাণ চওড়া। অন্যদের মত সাদা পোশাক পরেনি। বরং তার আলখেল্লাতে রামধনুর সাতটা রঙই বিদ্যমান, খুব দামী, চমৎকার সিল্কের কাপড়ে তৈরি, মশালের আলোয় চকচক করছে। সোনা-রূপায় তৈরি, মূল্যবান পাথর বসানো একটা ব্রেস্ট প্লেট পরেছে বুকে। মাথায় পাগড়ির বদলে রয়েছে সিংহের কেশরে বানানো মুকুটের মত একটা জিনিস। কোমরের বেল্টের জন্যে জীবন দিতে হয়েছে একটা তুষার-চিতাকে। একপাশে খাপে ঝোলানো অলঙ্করণ করা একটা বড় পিস্তল, আরেক পাশে তলোয়ার। সূক্ষ্ম এমব্রয়ডারি করা স্লিপার পায়ে, কিশোরের পায়ের প্রায় দ্বিগুণ হবে একেকটা পা। বিশাল পায়ের ছাপের কথা মনে পড়ল তার।
দাস ব্যবসায়ীদের সর্দার লোকটা, বুঝতে অসুবিধে হলো না ছেলেদের। একেই উয়াটুসিরা বঙ্গমানব বলে জানে।
কিন্তু এক্ষণে বজ্রমানবের মুখে মেঘ বা বজের কোন চিহ্ন নেই, তার জায়গায় রয়েছে উজ্জ্বল রোদ। তামাটে রঙের মুখে ঝকঝক করে উঠল সাদা দাঁত।
মাথা নুইয়ে সালাম জানাল লোকটা। ইংরেজিতে বলল, বাংলা বুঝতে পারি, বলতে পারি না। আমার তেলের কোম্পানিতে অনেক বাংলাদেশী আর ভারতীয় আছে, তারা বাংলায় কথা বলে। নোয়াখালীর একজন ফোরম্যানের কাছে অল্প-স্বল্প বাংলা শিখেছি। যাই হোক, আমার বাড়িতে স্বাগত জানাচ্ছি তোমাদের। নিশ্চয় খিদে পেয়েছে। বিশ্রাম দরকার। এসো আমার সঙ্গে।

লোকটার মোলায়েম ব্যবহারে. পিত্তি জ্বলে গেল কিশোরের। অনেকগুলো বাজে কথা মুখে এসে গিয়েছিল, কিন্তু চেপে গেল। এ সব বলার সময় নয় এখন।
পর্দা সরিয়ে আরেকটা ছোট গুহায় ঢুকল বস্ত্রমানব। এটা আরও জমকালো করে সাজানো। চিতার চামড়ার ওপর রাখা পুরু গদি। নরম বালিশে হেলান দিয়ে তাতে আধশোয়া হলো লোকটা। কিশোর-মুসাকেও গদি দেখিয়ে আরাম করতে বলা হলো।
কঠোর পরিশ্রমের পর গা এলিয়ে দিতে পেরে খুশিই হলো ওরা।
ট্রে হাতে ঢুকল একজন চাকর। ট্রেতে পুদিনার সুগন্ধ দেয়া তিন কাপ গরম চা আর কিছু কেক।
দেখো আমাদের চা খেতে পারো কিনা, বস্ত্রমানব বলল। সরি, কফি দিতে পারলাম না, নেই। ইউরোপ-আমেরিকায় ঘোরার সময় কফিই খাই, তবে বাড়ি ফিরলে চা।
এটা আপনার বাড়ি? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
না না, হেসে উঠল বমানব। এটা সাধারণ শিবির। পারস্য উপসাগরের তীরের একটা দেশে পঞ্চাশ হাজার মানুষের আমি শেখ। টাকার অভাব নেই আমার। কিন্তু শুধু টাকায় মন ভরে না, অ্যাডভেঞ্চারের প্রবল নেশা, তাই বেরিয়ে পড়ি মাঝে মাঝে। প্রাসাদ ছেড়ে চলে আসি গুহায়। লোক রেখে আসি আমার প্রজাদের প্রতি যাতে কোন অবিচার না হয় সেটা দেখার জন্যে, আর আমি এসে এখানে আইন ভাঙি।
বেআইনী কাজ যে করেন স্বীকার করছেন?
করব না কেন? যেটা তোমরা জেনেই গেছ, সেটা লুকিয়ে লাভ কি? কয়েকবার গেছি তোমাদের ক্যাম্পে। তোমাদের বন্ধু উয়াটুসিদের গ্রাম থেকে বেশ কয়েকজনকে ধরে এনেছি, খুব ভাল চাকরের কাজ করতে পারে ওরা। ওদেরকে এমন লোকের কাছে পাঠাই, যারা ভাল টাকা দেয়।
সর্দারের ছেলেকে ধরে এনেছেন। তাকেও পাঠিয়ে দিয়েছেন?
না, এখনও এখানেই আছে। দেখতে চাও?
জবাবের অপেক্ষায় না থেকে হাততালি দিল শেখ।
একজন চাকর ঢুকল।
আরবিতে তাকে হুকুম দিল শেখ।
খানিক পর পর্দা ফাঁক করে ভেতরে ঢুকল আউরো। বন্ধুদের দেখে আনন্দে চিৎকার করে ছুটে এসে তাদের হাত চেপে ধরল।
তোমরা এসেছ! জানতাম আমাকে নিতে আসবে!

তোমাকে নিতে আসিনি, শুকনো স্বরে বলল কিশোর। আমরাও তোমার মতই বন্দি। তোমাকে কোন সাহায্য করতে পারব না।
দপ করে আলো নিভে গেল ওগাবোর মুখ থেকে।
অ। হাসিমুখে মিঠে মিঠে কথা বলছে আর খাবার দিচ্ছে বলেই এই শেখকে বিশ্বাস কোরো না। ও খুনী।
হা হা করে হেসে উঠল শেখ।
ছেলেটাকে আমার ভীষণ পছন্দ। ওর তেজ আছে। এ ভাবে আমার সামনে কথা বলতে সাহস করে না কেউ। সর্দারের ছেলে তো, সর্দারের মতই কথা।
কালো হয়ে গেল তার মুখ।.ঔনো রাগ ফুটল চোখের তারায়। দূর হয়ে গেল হাসি হাসি ভাবটা।
তবে সর্দারের ছেলেরা বেয়াদব হয়, ওকে আদব শিক্ষা দেব আমি! কিছু শিক্ষা ইতিমধ্যেই পেয়ে গেছে। এই ছেলে, মোয়রা, দেখাও তোমার বন্ধুদের।
নড়ল না আউরো।
আরবিতে তীক্ষ্ণ আদেশ দিল শেখ। দৌড়ে ঘরে ঢুকল একজন চাকর। আউরোকে চেপে ধরে জোর করে তার পিঠ ঘোরাল কিশোর-মুসার দিকে। চামড়ার চাবুক দিয়ে পিটিয়ে রক্তাক্ত করে দেয়া হয়েছে পিঠ।
মৃদু হাসল শেখ।
কড়া গলায় বলল মুসা, লাগতে হলে সমানে সমানে লাগা উচিত। একটা বাচ্চা ছেলেকে ধরে সবাই পেটাতে পারে, এতে বীরত্ব জাহির হয় না। কথা না শুনলে কি করবেন? পিটিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলবেন?
না না, মারব কেন? টাকা আসে এমন কোন কিছুকেই মেরে ফেলি না আমি। ভাল গোলাম হবে ও। তবে তার আগে ওর তেজটা নষ্ট করতে হবে। ঘোড়াকে যেমন করে বশ মানানো হয়।
এই নিষ্ঠুরতার কি কোন প্রয়োজন আছে? কিশোরের প্রশ্ন।
নিষ্ঠুর? কি বলছ তুমি? আমরা অনেক ভদ্র। কি দিয়ে মেরেছি, দেখাচ্ছি, দাঁড়াও।
দেয়ালে ঝোলানো খুব সাধারণ দেখতে একফালি চামড়া নামাল শেখ।
দেখো হাত দিয়ে, বলল সে। একেবারে নরম। আমাদের ভাষায় একে যা বলে তার বাংলা করলে দাঁড়াবে কোমল শিক্ষা।
মনে করেছেন চিনি না, কিশোর বলল। অত্যাচার করার জন্যে যত খারাপ জিনিস বানিয়েছে মানুষ, তার মধে এটা একটা। দক্ষিণ আফ্রিকায় একে বলে স্যামবক। গণ্ডারের চামড়া কেটে বানিয়ে সিংহের চর্বি ডলে নরম করা হয়। নরম করাই হয় যাতে মারলে বেশি ব্যথা লাগে। চামড়ায়-ছুরির মত কেটে বসে যায়। আপনার মত

নিষ্ঠুর মানুষেরা যারা একটা ছেলেকে পেটাতে দ্বিধা করে না, তারাই কেবল একে কোমল বলতে পারে। নিজের পিঠে পড়লে আর এই নাম রাখত না।
জ্বলে উঠল বজ্বমানবের চোখের তারা, তবে মুখে হাসি লেগে রইল।
মনে হচ্ছে তোমাদের এই বন্ধুটির মত একই শিক্ষা দরকার তোমাদেরও। তবে সেটা না করতে হলেই খুশি হব আমি। বেয়াদবি আমি সইতে পারি না। যারা করে, তাদেরকে আদব শিখিয়ে দিতে ইচ্ছে করে। চাকরের দিকে চাবুকটা ছুঁড়ে দিল শেখ। সেটা লুফে নিয়ে আউয়োকে সহ পর্দার ওপাশে চলে গেল চাকর।
ছেলেদের দিকে তাকাল শেখ। আশা করি ওর পিঠে আরও বিশ ঘা চাবুক লাগবে। সেটা ওকে তো বটেই, তোমাদেরও ভদ্র হতে শেখাবে। পর্দার ঠিক ওপাশেই কাজটা করা হবে, যাতে চিৎকারটা তোমরাওঁ শুনতে পাও।
চাবুকের প্রথম বাড়িটা পড়তেই বাঘের মত লাফিয়ে উঠল মুসা।
টেনে তাকে বসিয়ে দিল কিশোর।
কিছু করলে আউরোর ক্ষতিই করবে শুধু। বসে থাকো। আমাদের সুযোগ আসবে।
বিশটা বাড়ি শেষ হলো। টু শব্দ শোনা গেল না আউরোর। নিরাশ হলো শেখ, তার চেহারাই সেটা বলে দিচ্ছে। প্রতিটি বাড়ি পড়েছে আর দাঁতে দাঁত, চেপেছে কিশোর-মুসা, যেন তাদের নিজের পিঠে পড়েছে।
শেষ হয়ে গেলে শেখ বলল, ওরটা আপাতত শেষ। এবার তোমাদের ব্যবস্থা। হয়তো ভাবছ ধরে নিয়ে আসা হলো কেন?
আমাদেরও গোলাম বানানোর ইচ্ছে নাকি? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
না। তোমাদের কিনতে রাজি হবে না কেউ। তোমাদের দিয়ে কাজ তো হবেই না, অকারণে ঝামেলা বাড়াবে। শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে থেকে থেকে ওদেরই মত হয়ে গেছ তোমরাও। বশ মানানো কঠিন। সব সময় খালি পালানোর চিন্তায় থাকবে। যেহেতু তোমরা আমেরিকার নাগরিক, তোমাদের সরকারও গোলমাল করতে পারে। না, কোটিপতির প্রাসাদের আরামের জীবন তোমাদের জন্যে নয়। ভাগ্য এত ভাল নয় তোমাদের।
তাহলে আটকে রেখেছেন কেন?
কারণ আছে। জানোয়ার ধরার ওস্তাদ তোমরা। আজ একটা সাদা হাতির কাছে তোমাদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে আমার লোকেরা। এত দামী জানোয়ার সারা দুনিয়ায় আর নেই। তোমরা ওটাকে ধরার চেষ্টা করবেই। তাই তোমাদের ঠেকিয়েছি।
কেন?

কেন, সেটা না বোঝার মত বোকা নও তোমরা। তোমাদের মত আমিও জানি ওটাকে কোথায় বিক্রি করলে বেশি দাম পাওয়া যাবে। একটা হাতির দামে দশটা ক্যাডিলাক গাড়ি কিনতে পারব। হাতিটা ধরে বিক্রি না করা পর্যন্ত তোমাদের আটকে রাখতেই হচ্ছে।

ততক্ষণ কি আমার লোকেরা বসে বসে আঙুল চুষবে মনে করেছেন? ওরা আমাদের খুঁজবে। খুঁজে বের করবে এই গুহা। দলে ওরা অনেক, সেই তুলনায় আপনারা অনেক কম। শুধু শুধু প্রাণ খোয়াবেন। প্রাণের চেয়ে কি বড় হয়ে গেল একটা হাতি?

কুটিল হাসি হাসল বজ্রমানব।

সাধারণ হাতি হলে অন্য কথা ভাবতাম। কিন্তু শ্বেতহস্তী সাধারণ নয়। জানো, অনেক দেশে দেবতা মানা হয় একে? পৃথিবীর বহু দেশ ঘুরেছি আমি, বাঘায় গেছি, সিয়ামে গেছি-থাইল্যান্ডকে অনেকে বলে সিয়াম, আমারও এই নামটাই ভাল লাগে। শ্বেতহস্তীকে নিয়ে যে কি করে ওরা, না দেখলে বুঝবে না।

পাগল-ছাগল সব দেশেই আছে, মুখ গোমড়া করে বলল মুসা।

তা বলতে পারো। মস্ত এক ধনীর বাড়িতে একবার একটা সাদা হাতি দেখেছিলাম। মার্বেল পাথরে বাঁধানো শানদার বিশাল এক চত্বরে ওটাকে রাখা হত। সোনা-রূপার কারুকাজ করা অনেক দামী সিল্কের কাপড়ে সারাক্ষণ ঢেকে রাখা হত ওটার পিঠ। কাপড়ের স্কুলগুলোর কি বাহার, একেবারে গোড়ালির ওপর নামানো। সোনার মালা বানিয়ে পরিয়ে রাখা হত দাতে। মাথার ওপর ধরে রাখা হত রাজকীয় ছাতা, যাতে রোদে কষ্ট না পায় হাতি।

হাতির সেবা করার জন্যে অস্থির হয়ে থাকত অনেক বড় বড় নামী-দামী মানুষেরা। কেউ উটপাখির পালকের পাখা দিয়ে বাতাস করত, কেউ গা থেকে মাছি তাড়াত, কেউ বা সোনার পাত্র থেকে তুলে নিয়ে দুর্লভ ফল খাওয়াত ওটাকে।

নদীতে নিয়ে যাওয়া হত গোসল করানোর জন্যে। তখন সোনার সুতোয় কাজ করা কাপড়ে ঢেকে দেয়া হত ওটার শরীর। আটজন লোক ওই সময় সদাব্যস্ত থাকত ওটার সেবায়, কোন ভাবে যেন কোন কষ্ট না হয়। বাজনা বাজাতে বাজাতে আগে আগে যেত ব্যান্ড পার্টি। নদী থেকে গোসল সেরে এসে চত্বরে উঠলে রূপার গামলায় করে গরম পানি এনে পা ধুয়ে দেয়া হত হাতির, তারপর সুগন্ধী মাখিয়ে দেয়া হত।

গলায় দড়ি দিয়ে মরা উচিত ব্যাটাদের, গজগজ করতে লাগল মুসা। নির্বোধের দল! একটা হাতিকে নিয়ে এই কাণ্ড!

হাসল শেখ। ওটা হাতি নয় ওদের কাছে, দেবতা। দেবতার পূজা তো করবেই। ওই অতি মারা গেলে তাকে রাজার সম্মান দেয়া হয়েছে। বিশাল মঞ্চে সাতদিন শুইয়ে রাখা হয়েছে লাশ। তারপর চন্দন কাঠের মত দামী কাঠ দিয়ে পোড়ানো হয়েছে। পোড়া ছাইগুলোও সাংঘাতিক পবিত্র, নেয়ার জন্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু দিনরাত কড়া নজর রেখেছে প্রহরীরা, যাতে কেউ নিতে না পারে। সেই ছাই কুড়িয়ে নিয়ে দামী বাক্সে ভরে কবর দেয়া হয়েছে এমন জায়গায়, যে গোরস্থানে রাজারাজড়াদেরই কেবল ঠাই মেলে।
শেতহস্তীর ব্যাপারে নানা মজার মজার কিচ্ছা-কাহিনীও চালু আছে। এক সময় নাকি গোটা পৃথিবীটা ছিল বিশাল এক সাদা হাতির পিঠে। হাতিটা কোন কারণে নড়লেই পৃথিবীও কাঁপত, ফলে ভূমিকম্প হত। একবার রানী ভিক্টোরিয়াকে কি উপহার দিয়েছিলেন সিয়ামের এক রাজা, জানো? একটা সোনার বার, তার তালা খোলার চাবিটাও সোনার। সবাই ভেবেছিল এত দায় বারে করে নিয়ে দামী দামী পাথর কিংবা অলঙ্কার পাঠানো হয়েছে। কি বা খুলে দেখা গেল তাতে রয়েছে রাজার সাদা হাতির কয়েকটা রোম। রাজার কাছে মনে হয়েছিল, ইংল্যান্ডের রানীকে পাঠানোর জন্যে এর চেয়ে দামী জিনিস আর তাঁর সাম্রাজ্যে নেই। আর সিয়ামের রাজদূত রানীর প্রশংসা করার সময় বলেছেন, রানীর চোখ, ভাবভঙ্গি, এবং আরও অনেক কিছুই একেবারে সাদা হাতির মত। এরপরও বলতে চাও এই হাতি সাধারণ হাতি?
না, মাথা নাড়ল মুসা, দামের দিক থেকে অসাধারণ। মানুষই এর দামটা বাড়িয়েছে। প্রাণী হিসেবে আর দশটা সাধারণ হাতির মতই হাতি এটাও।
মাথা ঝাঁকাল শেখ। বুদ্ধিমান ছেলে। আমার কাছেও দামটাই বড়। যাই হোক, ওই হাতি যতদিন ধরা না পড়ে তোমরা আমার মেহমান। উল্টোপাল্টা কিছু কোরো না, আমিও তোমাদের কিছু করব না। কিন্তু আমার কাজে নাক গলাতে এলে প্রাণ নিয়ে পালাতে পারবে না, এটা মনে রেখো।

.

হাততালি দিল শেখ।
চোখের পলকে উদয় হলো চাকর।
ছেলেদেরকে শেখের গুহা থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া হলো পেছনের বড় গুহায়। পুরোপুরি অন্ধকার এখন ওটা। খালি।
গুহার চারপাশে অনেক পর্দা ঝোলানো। ওগুলোর অন্যপাশের হোট গুহা থেকে আসছে নাক ডাকানোর শব্দ। কোন কোনটাতে কথা বলছে একাধিক লোক, তাসটাস খেলছে হয়তো, ঘুমায়নি এখনও।

বড় গুহার পেছনের ছোট একটা গুহায় কিশোর-মুসাকে নিয়ে আসা হলো। পুদিনা মেশানো চায়ের কড়া গন্ধ এখানে। অগ্নিকুণ্ডের ওপর বিরাট পাত্রে চা তৈরি হচ্ছে, বাষ্প উঠছে ওটা থেকে, পুদিনার গন্ধ ছড়াচ্ছে। একটি মাত্র মশাল জ্বলছে গুহাটায়, অন্ধকার কাটছে না। এখানে আরামের ব্যবস্থা নেই, চিতার চামড়ার কার্পেট নেই, গদি নেই। নগ্ন দেয়ালের গা থেকে বেরিয়ে আছে খোঁচা খোঁচা পাথর। ঠাণ্ডা পাথুরে মেঝে। এককোণে কুকুরের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে আছে একটা ছেলে, খালি গা। মানুষের সাড়া পেয়ে নড়ে উঠল। উঠে দাঁড়ালে চেনা গেল, সর্দার ওগারোর ছেলে।

আউরো! এগিয়ে গেল মুসা। এই জঘন্য জায়গায় এনে তোমাকে রেখেছে ওরা! উয়াটুসির রাজকুমারের জন্যে যোগ্য জায়গাই বটে!

দূর্বল হাসি হাসল আউরো। এটা গোলামদের ঘর। পাচার করার আগে এখানেই বন্দি করে রাখা হয়। কাল পর্যন্ত অনেকেই ছিল। ওদেরকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে জাহাজে তুলে দেয়ার জন্যে। লোহিত সাগরের কোন বন্দরে নিয়ে যাওয়া হরে। ওরা বলেছে, আমাকেও নিয়ে যাবে আগামীকাল, পারস্য উপসাগরের তীরে।

ঘরটা দেখতে দেখতে বলল মুসা, মাটির নিচের কয়লা রাখার ঘরও এরচেয়ে ভাল। আর কিছু না থাক, ওসব ঘরের একটা খুদে জানালা হলেও থাকে, এটার তা-ও নেই। আগুনে চাপানো পাত্রটার দিকে তাকাল। যাই হোক, এই ঠাণ্ডায় চা যে খেতে দিচ্ছে এটাই বেশি।

চা কি আর আমাকে দেয়? ওটা প্রহরীদের জন্যে। যাতে জেগে থাকতে পারে।

তোমাকে কি খেতে দেয় ওরা?

কিছু না। একেবারেই কিছু না। ওরা বলে, হাঁটু গেড়ে বসে হাতজোড় করে যখন চাইব, তখনই কেবল দেবে। ওরা বলে, সর্দারের ছেলে আমি-এই ভাবনাটি মাথা থেকে, বিদেয় না হলে ভাল গোলাম হতে পারব না। বলেছে, না ভোলা পর্যন্ত খেতে দেবে না। না দিক। না খেতে খেতে মরে যাব, তবু মাথা থেকে বিদেয় করব না।

মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা গর্বিত কিশোরটির দিকে চিন্তিত ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে কিশোর। পিঠের জখমগুলোতে নিশ্চয় অকল্পনীয় যন্ত্রণা হচ্ছে। কিন্তু মুখের ভাবে সেটা একবিন্দু প্রকাশ পাচ্ছে না ছেলেটার। এই ছেলে ভাঙবে তবু মচকাবে না। সুযোগ পেলে অনেক বড় নেতা হতে পারবে।

কিন্তু আগামীকাল ওকে দেশ থেকে সরিয়ে নেয়া হলে সেই সুযোগ আর কোনদিনই পাবে না আউরো। গোলামির ঘানি টেনেই কাটবে সারাজীবন। তাকে বাঁচাতে হলে কিছু একটা করা দরকার, এবং সেটা আজ রাতেই।

গুহাটা খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করল কিশোর। দেয়ালের প্রতিটি ইঞ্চি, ছাত, মেঝে, কোন জায়গা বাদ দিল না।

কিন্তু কোন রকম ফাঁকফোকর দেখল না। খোলা জায়গা একটাই আছে, যেখান দিয়ে ঢুকেছে ওরা। সেটার পাহারায় রয়েছে ছয়জন প্রহরী। তিনজন বসেছে দরজার বাইরে, তিনজন ভেতরে। আলখেল্লার ঝুল পেতে বসেছে, যাতে ঠাণ্ডা এড়াতে পারে। চা খেতে খেতে নিচু স্বরে আলাপ করছে। বিশালদেহী মানুষ একেকজন। সঙ্গে পিস্তল আর তলোয়ার রয়েছে।

ওরকম অস্ত্র থাকলে একজন লোকই নিরঞ্জ তিন বন্দিকে সামলানোর জন্যে যথেষ্ট। ছয়-ছয়জন সশস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে কিছুই করার নেই।

ছয়জনের কাছে যদি অস্ত্র না-ও থাকত, তাহলেও হাতাহাতি লড়াইয়ে কার করতে পারত কিনা সন্দেহ। তার ওপর ওদের চিৎকারে আরও লোক ছুটে আসত।

অলৌকিক কোন উপায়ে যদি কাবু করতে পারে এই ছয়জনকে, তাহলেও ঝামেলা শেষ হবে না। বড় গুহাটা পেরোতে হবে, যার চারপাশে ছড়িয়ে আছে ডাকাতদের ঘর। সবাই ঘুমায়নি। হঠাৎ উঁকি দিয়ে বসতে পারে একআধজন। চোখে পড়ে গেলেই চিৎকার শুরু করবে, আবার ধরে আনা হবে ওদেরকে।

পালানোর কোন উপায় দেখতে পাচ্ছে না কিশোর। আপাতত হাল ছেড়ে দিয়ে শুয়ে পড়াই উচিত মনে করল। ঘুমিয়ে আগে ক্লান্তি দূর করা দরকার। কিন্তু যা শীতল মেঝে, ঘুম হবে বলে মনে হয় না।

বুশ জ্যাকেটের পকেটে শক্ত একটা কিছু ক্রমাগত চাপ দিচ্ছে কোমরের নিচে, অস্বস্তিকর। সামান্য একটু নড়েচড়ে শুলো, যাতে চাপটা না লাগে।

হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে বসল সে। বড় বড় হয়ে গেছে চোখ। পকেটের জিনিসটা কাজে লাগানো যেতে পারে।

পকেটে হাত ঢুকিয়ে ছুঁয়ে দেখল জিনিসটা। আধ ইঞ্চি ব্যাসের তিন ইঞ্চি লম্বা একটা বিশেষ কার্তুজ।

বড় জানোয়ার ধরার সময় হরদম ব্যবহার করা হয় এগুলো। ভেতরে সেরনিল নামে এক ধরনের তরল ঘুমের ওষুধ ভরা থাকে। মাথায় ইঞ্জেকশনের সুচের মত সুচ লাগিয়ে তীর ছোঁড়ার যন্ত্রে পরিয়ে ছুঁড়ে মারা হয় জানোয়ারকে লক্ষ্য করে।

গায়ে ফোঁটার পনেরো মিনিটের মধ্যে নিথর হয়ে ঘুমিয়ে যায় জানোয়ার। তারপর চার ঘণ্টার জন্যে আর খবর নেই। ট্রাকে তুলে বয়ে নিয়ে গিয়ে খাঁচায় ভরার জন্যে যথেষ্ট সময়।

যে কার্তুজটা আছে তার পকেটে, এটা একটা বড় গণ্ডার, মোষ কিংবা হাতিকে কাবু করে ফেলতে পারে। ছয় থেকে বারোজন মানুষকে গভীর ঘুমে অচেতন করে দিতে পারে।

কিন্তু লোকগুলোর শরীরে ঢোকাবে কি করে এই ওষুধ? তার কাছে ছোঁড়ার যন্ত্র নেই। থাকলেও অবশ্য লাভ হত না। ওদের দিকে যন্ত্র তাক করতে দেখলেই গুলি

করত।
চোখ পড়ল চায়ের পাত্রটার ওপর। আগুনে কি ওষুধের গুণ নষ্ট করবে? জানা নেই। পেয়ালার পর পেয়ালা চা খাচ্ছে লোকগুলো। এত চা খায় কি করে আল্লাহই জানে। কয়েক মিনিট পর পরই পেয়ালা ভরছে। পাত্রটাতে যদি কোনমতে গিয়ে ওষুধটা ঢেলে দিয়ে আসতে পারে.••
মোড়ামুড়ি শুরু করল। আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে আগুনের কাছে। যেন শীত লাগছে, উত্তাপ চায়, এমন ভঙ্গি।
সঙ্গে সঙ্গে তার দিকে ফিরে তাকাল লোকগুলো।
হাত তুলে জ্বলন্ত কয়লা দেখাল সে। বোঝাল, উষ্ণতা দরকার।
সন্দেহ করল না লোকগুলো। এত ঠাণ্ডার মধ্যে আগুনের আরাম সবাই চায়। আর নজর দিল না তার দিকে।
গড়াতে গড়াতে এমন একটা জায়গায় চলে এল সে, লোকগুলো রইল তার একপাশে, আরেক পাশে আগুন। লোকগুলো আলাপে মগ্ন হয়ে যাওয়ার অপেক্ষায় রইল সে। সাবধানে পকেটে হাত ঢুকিয়ে ওদের অলক্ষ্যে বের করল কার্তুজটা। শরীরের আড়ালে রেখে প্লগ খুলে চায়ের পাত্রে ঢেলে দিল ভেতরের ওষুধ। খালি কার্তুজটা পকেটে ভরে রাখল। ওষুধ কাজ করলেই হয় এখন।
ঘুমের মধ্যেই যেন সরছে, এমন করে চলে এল আবার মুসা আর আউয়োর কাছে।
কিশোর কি করে এসেছে, বুঝে ফেলেছে মুসা।
আউরো আন্দাজ করেছে কিছু একটা করা হয়েছে, কিন্তু কি, বুঝতে পারেনি। চুপ করে রইল। নড়ল না কেউ। প্রহরীদের সন্দেহ জাগে এমন কিছু করল না।
উঠে গিয়ে আবার পাত্র থেকে চা ভরে এনে খেতে লাগল লোকগুলো।
উত্তেজনায় টানটান হয়ে আছে কিশোর। কাজ হবে তো? এটাই ওদের শেষ ভরসা। গরমে ওষুধ নষ্ট হয়ে গেলে আর কিছুই করার নেই।
আচ্ছা, ওষুধের গন্ধ পেয়ে যাবে না তো? আশা করল, পাবে না, পুদিনার তীব্র গন্ধ ঢেকে দেবে ওষুধের গন্ধ।
চা খাচ্ছে লোকগুলো।
কিশোরের মনে হচ্ছে, যুগ যুগ ধরে খেয়েই চলেছে ওরা। তবু কিছু ঘটছে না। অনন্তকাল পেরিয়ে যাচ্ছে যেন।
কিন্তু আসলে পেরোল পনেরো মিনিট। কথা কেমন জড়িয়ে এল ওদের। তারপর থেমে গেল। ঢুলতে শুরু করল প্রহরীরা।
আনন্দে দুলে উঠল কিশোরের মন। হচ্ছে, কাজ হচ্ছে!

একজন আরেকজনকে জেগে থাকার জন্যে হুশিয়ার করতে লাগল ওরা। কিন্তু গিলেছে তো সবাই। কে জেগে থাকবে? ওষুধ কাবু করে ফেলল ওদেরকে। কয়েক মিনিটেই গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে গেল।
পা টিপে টিপে দরজার দিকে এগোল তখন তিনজনে।
নড়ছে না প্রহরীরা।
সাবধানে ওদেরকে ডিঙিয়ে এল কিশোর। পর্দা সরাল কয়েক ইঞ্চি। উঁকি দিয়ে দেখল বড় গুহাটায় কেউ আছে কিনা।
প্রায় অন্ধকার গুহা। অল্প কয়েকটা মশাল জ্বলছে এখনও। এই সামান্য আলোয় এতবড় গুহার কিছুই আলোকিত করতে পারেনি।
প্রথমে কিছু চোখে পড়ল না তার। আরও ভাল করে তাকাতে দেখতে পেল কয়েকজন লোক ঘুমিয়ে আছে। চিতার মাথাকে বালিশ বানিয়েছে।
ফিসফিস করে বলল কিলোর, কঠিন ঠাই। কেউ জেগে উঠলেই এখন মরেছি।
অন্ধকার তো, মুসা বলল। দেখতে পাবে?
স্পষ্ট না দেখলেও আমাদের পোশাকই বুঝিয়ে দেবে ওদের দলের লোক নই। হলে আলখেল্লা থাকত।
ঘুমন্ত প্রহরীদের দিকে তাকাল মুসা। তাহলে আলখেল্লাই পরে নেব।
লোকগুলোর ভারি শরীর থেকে আলখেল্লা খোলাটা অত সহজ হলো না, তবে ভোলা গেল শেষ পর্যন্ত। দ্রুত সেগুলো পরে নিল ওরা। চোখ ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ফলে কেউ এখন বুঝতে পারবে না ওরা কারা।
নিঃশব্দে বেরিয়ে এসে বড় গুহাটা ধরে এগোল তিনজনে। বুক কাঁপছে। দৌড় দিতে ইচ্ছে করছে। ধরা পড়ার ভয়ে দিল না।
প্রথম লোকটার পাশ কাটাল নিরাপদে।
মুখ ঘুরিয়ে রেখেছে আরেক দিকে। তবে প্রয়োজন ছিল না-পরনে আলখে, মুখ তো দেখাই যায় না।
দ্বিতীয় লোকটার কাছে আসতেই মাথা তুলল সে। তিনটে সাদা আলখেল্লা পরা মূর্তি নজরে পড়ল। আবার মাথা নামিয়ে চোখ মূদল সে।
ধীরেসুস্থে তৃতীয় এবং চতুর্থ লোকটার পাশ কাটাল ওরা।
গুহার বাইরে বেরিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। অলস ভঙ্গিতে তাকাতে লাগল এদিক ওদিক। যেন ভেতরে দম বন্ধ হয়ে আসছিল বলে বাইরের খোলা হাওয়ায় খাস নিতে এসেছে।
এক জায়গায় দাঁড়িয়ে বোঝার চেষ্টা করল কেউ পাহারায় আছে কিনা।
কাউকে চোখে পড়ল না।

একদিকে হাঁটা দিল তখন। তারপরেও যখন কেউ ডাকল না, হঠাৎ যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল শরীরে। আলখেল্লার ঝুল তুলে দিল দৌড়।
আগে আগে ছুটছে কিনোর। বাতাস গায়ে লাগতে মোড় ঘুরল। মনে আছে, বাতাসের বিপরীতে যেতে হবে। দিনের মত এত জোরাল না বাতাস, তবু বোঝ যায়।
দুর্গম পথ। চাঁদ আছে আকাশে। কিন্তু থাকলেই কি, কুয়াশার জন্যে ঠিকমত চোখে পড়ে না। এর ওপর নির্ভর করে চলা মুশকিল।
তবু থামল না ওরা। ছুটছে। কাঁটায় লেগে হাত-পায়ের চামড়া ছড়ে গেল, চোখা পাথরে পা কাটল, কিন্তু ছোটার বিরাম নেই।
চোখে পড়ল হোয়াইট লেক। সামনে, মৃদু চিকচিক করছে ঘোলাটে চাঁদের আলোয়।
ওই যে হাতিটা! বলে উঠল মুসা।
আশ্চর্য! দিনের বেলা যেখানে দেখেছিল, ঠিক সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে ওটা।
কিন্তু আমি তো দেখছি দুটো, কিশোর বলল। যতটা সম্ভব তীক্ষ্ণ করে ফেলেছে দৃষ্টি। মনে হচ্ছে আরেকটা কালো হাতিও আছে। নাকি সাদাটারই ছায়া?
গুঁড়ি মেরে মেরে কাছে এগোতে লাগল ওরা।
মুহূর্তের জন্যে সরে গেল কুয়াশা। পরিষ্কার হলো ধোঁয়াটে চাঁদের আলো। না, আসলেই আছে আরেকটা হাতি। মদ্দা। স্পষ্ট দেখা গেল এখন। ওর কালো চামড়া এই আলোতেও বোঝা যাচ্ছে। নিচে নামবে কি করে ভাবল কিশোর। পথ একটাই, শ্যাওলার ভেতরের সুড়ঙ্গ। খুঁজে বের করা কঠিন হলো।
আবার ওটায় ঢুকব? ব্যাপারটা পছন্দ হচ্ছে না মুসার। এই মাঝরাতে!
ওটার মধ্যে দিনই কি আর রাতই কি? একই রকম অন্ধকার।
কিন্তু রাতের বেলা যদি চিতাবাঘ ঢুকে বসে থাকে?
থাকলে কিছু করার নেই। আর কোন উপায় নেই আমাদের। অসুবিধে একটাই হবে, হাতে-পায়ে পেঁচাবে এই আলখেল্লা।
খুলে ফেলব?
খুলে রেখে যেতে পারলেই ভাল হত। কিন্তু ভীষণ ঠাণ্ডা। শেষে নিচের ঝুল তুলে কোণগুলো শক্ত করে কোমরে পেঁচিয়ে বাঁধল ওরা। ঢুকে পড়ল সুড়ঙ্গে।
ভেতরে ছোট ছোট হাজারো শব্দের কোলাহল। অত সব শব্দ। কারা করছে, মোটামুটি জানা আছে ওদের। কিন্তু ছোট ছোট প্রাণীগুলোকে পরোয়া করল না। করার দরকারও নেই। কারণ ওগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর আর হিংস্রতম যেটা, সেটা সিভেট ক্যাট। একধরনের বনবিড়াল। ওদের সাড়া পেয়ে ভয়ে ছুটে পালাল।

ঢোকার সময় যে অসুবিধে হয়েছিল মুসার, এখন পথ জানা থাকায় সেটা আর হলো না। বাইরে বেরিয়ে এল নিরাপদে।
নামতে নামতে ব্ল্যাক লেক আর গ্রীন লেকের পাশ কাটাল, তারপর বাশে ছাওয়া গরিলা-বনের ভেতর দিয়ে এসে পৌঁছল ক্যাম্পে।
এতটাই ক্লান্ত, কথা বলার শক্তিও আর নেই। সোজা বিছানায় পড়তে ইচ্ছে করছে, পড়েই ঘুম।
কিন্তু এখুনি একটা কাজ না সারলে হবে না, কিশোর বলল। ডাকাতদের আস্তানা কোথায় জেনে গেছি। পুলিশকে খবর দিতে হবে।
আউরোর বাবাকে জাগানো হলো।
রাতদুপুরে ছেলেকে দেখে প্রথমে বিশ্বাসই করতে চাইল না। শেষে নেচে উঠল আনন্দে। তক্ষুণি একজন লোক পাঠাল পর্বতের পাদদেশে মটুয়াঙ্গা পুলিশ ফাঁড়িতে।
এত রাতে ঘুম থেকে ডেকে তোলায় মহা বিরক্ত হলো পুলিশেরা। সকালের আগে বেরোতে পারবে না, সাফ বলে দিল।
কি আর করা? অপেক্ষা করতেই হলো।
তবে কথামত সকালবেলা ওগাবোর গাঁয়ে এল ওরা। পথ দেখিয়ে ডাকাতদের গুহায় তাদের নিয়ে চলল কিশোর। সঙ্গে নিয়েছে তার দলবল।
গুহার কাছে পৌঁছল দুপুরের সামান্য আগে। কিন্তু গুহায় ঢুকে দেখা গেল খালি গুহা। কোন মানুষ নেই!
বন্দিরা পালিয়েছে জেনেই সাবধান হয়ে গিয়েছিল নিশ্চয় ডাকাতেরা। পালিয়েছে। জিনিসপত্র সব নিয়ে গেছে। বাতাসে ভাসছে কেবল পুদিনার গন্ধ।
ভীষণ শয়তান ব্যাটারা! নাকমুখ কুঁচকে বলল কিশোর।
সাংঘাতিক দুর্গম পথ পার হয়ে আসতে পুলিশেরও কষ্ট হয়েছে। শীতে কাবু হয়ে গেছে ওরা। হাত-পায়ের নানা জায়গায় জখম। রাগটা পড়ল কিশোরদের ওপর। কিন্তু যেহেতু ডাকাতরা গুহায় থাকার প্রমাণ আছে, দোষ দিয়ে কিছু বলতে পারল না। কেবল কালো মুখগুলোকে আরও কালো করে রাখল।

.

এরপর কি করবে ডাকাতেরা বুঝতে পারছে কিশোর। সাদা হাতিটা দেখেছে। এই এলাকা ছাড়ার আগে ওটা ধরার চেষ্টা করবে বজ্রমানব।
সময় কম, বলল সে। ইতিমধ্যেই ধরে ফেলেছে কিনা কে জানে! তবে বোধহয় পারেনি। কারণ সকালটা গেছে জিনিস গোছগাছ করতে। সুযোগ একটা পেলেও পেতে পারি।
হোয়াইট লেকের দিকে ফিরে চলল ওরা।

অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটছে মুসা।
কি ব্যাপার? জিজ্ঞেস করল কিশোর। ভাবছ মনে হয় কিছু?
মুখ তুলে তাকাল মুসা। হ্যাঁ, ভাবছি। একটা চালাকি করলে কেমন হয়?
কি চালাকি?
বুদ্ধিটা খুলে বলল মুসা।
হাসল কিশোর। এতে কাজ হলেও হতে পারে। এখান থেকে ক্যাম্পে যাওয়ার নিশ্চয় অন্য কোন পথ আছে, শর্ট কাট। নইলে গাঁ থেকে হাতি ধরে আনতে পারত না ডাকাতেরা। একজন পুলিশকে সাথে নিয়ে যাও তুমি, রাস্তাটা খুঁজে বের করো। আমি অন্যদের নিয়ে ঘুরপথে যাই।
বেশ। এক ঘণ্টার মধ্যে খুদে দানবকে নিয়ে হোয়াইট লেকে পৌঁছে যাব।
শর্ট কাট রাস্তাটা খুঁজে বের করতে সময় লাগল না। সেটা ধরে একজন পুলিশের সঙ্গে ক্যাম্পে এসে পৌঁছল মুসা।
সাপ্লাই ট্রাক খুঁজে একটা স্প্রে গান বের করল। সাদা রঙ ভরল সেটাতে। অবাক হয়ে তার কাজ দেখছে গ্রামবাসীরা। কিন্তু ওদের কৌতূহল মেটানোর জন্যে কোন কথা বলল না সে।
ডাক দিল খুদে দানবকে।
আনন্দে শুড় তুলে চিৎকার করতে করতে দৌড়ে এল হাতির বাচ্চা।
তোর জন্যে একটা কাজ ঠিক করেছি, খুদে। আয় আমার সঙ্গে।
পুলিশ সঙ্গীকে নিয়ে আবার হোয়াইট লেকে ছুটল মুসা। বাচ্চাটা চলল পেছন পেছন। ..
পাহাড় বেয়ে ওঠা সহজ কাজ নয়, তার ওপর তাড়াহুড়ো করতে হচ্ছে, হাঁপিয়ে পড়ল দু-জনে। খুদে দানবের অবশ্য অতটা অসুবিধে হলো না। পাহাড়ে চড়ার অভ্যেস আছে তার।
হ্রদের তীরে পৌঁছে দেখল ওদের জন্যে অপেক্ষা করছে কিশোররা। অধৈর্য হয়ে উঠেছে পুলিশ। বার বার চলে যেতে চাইছে। ওদেরকে বোঝাতে বোঝাতে অস্থির হয়ে গেছে কিশোর।
হাতে স্প্রে গান আর সঙ্গে একটা বাচ্চা হাতিকে নিয়ে মুসাকে দেখে ভুরু কুঁচকে গেল ওদের। হাজারটা প্রশ্ন করতে লাগল।
তাদের প্রশ্নের জবাব দিল না মুসা। কুয়াশার মধ্যে সাদা হাতিটাকে খুঁজছে তার চোখ।
দেরি করে ফেললাম নাকি? আনমনে বিড়বিড় করল সে। ডাকাতেরা ধরে নিয়ে গেল না তো?

এখনও নেয়নি, কিশোর বলল। তবে খারাপ খবর আছে। একজন লোক পাঠিয়েছিলাম খবর নিতে। গোপনে দেখে এসেছে ডাকাতেরা অনেক লোক, যা আন্দাজ করেছিলাম তারচেয়ে অনেক বেশি। আমাদের ডবল। এদিকেই আসছে। সবার কাছে পিস্তল আছে। সেই তুলনায় আমাদের কাছে তেমন কোন অস্ত্র নেই। পুলিশের আছে বল্লম, কুলিদের কাছে ছুরি।
আগ্নেয়াস্ত্র না থাকারই কথা, শিকার করতে আসেনি ওরা। যদি কোন কারণে বিপদে পড়ে যায়, সে-জন্যে সতর্কতা হিসেবে একটা রাইফেল এনেছে, মুংগার হাতে আছে সেটা।
একসাথে দল বেঁধে এসে যদি ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাদের ওপর, কিশোর বলছে, ওদের সঙ্গে পারব না আমরা। তবে তোমার রঙের বুদ্ধিটা কাজে লাগলে বোকা বনতেও পারে, তাতে ছড়িয়ে পড়বে ওরা। এক এক করে কাবু করব তখন।
তা তো হলো। কিন্তু আমাদের শ্বেতহস্তী কোথায়?
ওদিকে। ওই পাথরগুলোর কাছে।
তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কুয়াশার মধ্যে খুঁজতে লাগল মুসা। প্রথমে সাদা-কালো কিছু পাথর চোখে পড়ল। তারপর নড়ে উঠল সাদা একটা পাথর। তার পর পরই
জায়গা বদল করল কালো একটা পাথর, ঔড় তুলে চিৎকার করে উঠল।
পা টিপে টিপে কালো হাতিটার কাছে চলে এল কিশোর আর মুসা।
ওদের দেখেই সরে যেতে লাগল হাতিটা।
দৌড়ে ওটার কাছে চলে এল দু-জনে। প্রে গান তুলে সাদা রঙ ছিটাতে শুরু করল ওটার শরীরে।
কিছুক্ষণের মধ্যেই কালো হাতিটা পরিণত হলো সাদা হাতিতে। পুরো শরীর রঙ করার দরকার পড়েনি। কুয়াশার মধ্যে বোঝারই উপায় রইল না ওটা কালো হাতি।
মানুষের অদ্ভুত আচরণে ভড়কে গেছে হাতিটা। চিৎকার করছে সমানে।
করুক, কিশোর বলল। যত চেঁচাবে, তত তাড়াতাড়ি এটাকে খুঁজে পাবে ডাকাতেরা।
শোনা গেল ডাকাতদের হই-চই। ছুটে আসছে ওরা।
দ্রুত নির্দেশ দিল কিশোর। দশ-পনেরোজন কুলিকে পাঠাল রঙ করা হাতিটার পেছনে। বাকিরা সাদা হাতিটার কাছাকাছি হ্রদের তীরে পাথরের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল।
মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগল কিশোর-হে কুয়াশা, আরও, আরও বেশি করে পড়ো! ঘন হয়ে পড়ো! যাতে ডাকাতেরা হাতিটাকে চিনতে না পারে।

যেন তার প্রার্থনা সত্যি শুনতে পেল চাঁদের পাহাড়। সাহায্য করল ওদেরকে। হঠাৎ করে সাংঘাতিক ঘন হয়ে গেল কুয়াশা। দশ হাত দূরের জিনিসও চোখে পড়ে না।
কুয়াশার মধ্যে শোনা গেল চিৎকার, আরবিতে চেঁচিয়ে কথা বলছে ডাকাতেরা। কি ঘটছে আন্দাজ করতে পারছে কিশোর। রঙ করা হাতিটাকে তাড়া করেছে ওরা।
পরিকল্পনার একটা অংশ তো ঠিকঠাক মতই হচ্ছে। বাকিটা হবে তো? সাদা হাতিটা এখন ডাক ছাড়লেই হয়। কিশোর দেখেছে, এটা মাদী হাতি। কালোটা পুরুষ। ওটা বিপদে পড়েছে বুঝে ডাকাডাকি করবে তো? করলে কয়েকজন ডাকাত দেখতে আসতে পারে। তখন হামলা চালিয়ে কাবু করে ফেলা যাবে ওদের।
কিন্তু সাদা হাতিটা অতিমাত্রায় ভদ্র। চুপচাপ রইল। এত শোরগোলও যেন ওটার ধৈর্যের বাধ ভাঙাতে পারল না। তবে কি ব্যর্থ হতে যাচ্ছে মুসার পরিকল্পনা?
আর বসে থাকা যায় না। মরিয়া হয়ে কিশোরই হাতির ডাক ডাকতে আরম্ভ করল। চিৎকারের পর চিৎকার।
সাড়া দিল ডাকাতেরা। হট্টগোল আর ছুটন্ত পায়ের শব্দ শোনা গেল। দৌড়ে এল একজন ডাকাত।
মুহূর্তে তাকে কজা করে ফেলল পুলিশ। পিস্তল ব্যবহারের সুযোগই পেল না লোকটা, কেড়ে নেয়া হলো। ধরেই হাত-পা বাঁধা শেষ।
কুয়াশা ফুঁড়ে বেরিয়ে এল আরেক ডাকাত। তাকেও আটকে ফেলা হলো।
তারপর বেরোল তিনজন একসঙ্গে। দু-জনকে কাবু করে ফেলা গেল কোন গোলমাল ছাড়া, কিন্তু তৃতীয়জন পিস্তল তুলে গুলি করে বসল।
পড়ে গেল একজন পুলিশ।
গুলির শব্দ শুনে দল বেঁধে ছুটে এল ডাকাতেরা। দশ-বারোজন একসঙ্গে বেরিয়ে এল কুয়াশার আড়াল থেকে। প্রচণ্ড হাতাহাতি লড়াই বেধে গেল পুলিশ আর কুলিদের সঙ্গে।
শেষ পর্যন্ত পারল না ডাকাতেরা। আটক হলো। হাতে গুলি খেল কিশোরের সবচেয়ে ভাল যোদ্ধাদের একজন, হামবি। কিন্তু তারপরেও লড়াই বন্ধ করল না।
ওষুধ লাগিয়ে তার জখম বেঁধে দিতে চাইল কিশোর।
ওসব পরে, বলে এড়িয়ে গেল হামবি।
রঙ করা হাতিটাকে নিয়ে কি ঘটছে দেখার জন্যে দৌড়ে গেল মুসা। একটা পাথরের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখল, ওটাকে ঘিরে ফেলেছে ডাকাতেরা। মোটা মোটা দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলার চেষ্টা করছে। দুই দিকে হাতির ডাক শুনে হতবুদ্ধি হয়ে গেছে কয়েকজন ডাকাত। সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না কোনদিকে যাবে। যারা হাতির

বেশি কাছে রয়েছে, তারা বুঝে ফেলেছে এটা রঙ করা হাতি, বিমূঢ় হয়ে গেছে এরা। ব্যাপারটা কি ঘটেছে মাথায়ই ঢুকছে না তাদের।
হঠাৎ আরেকটা হাতির চিৎকার কানে এল মুসার। এটা কিশোরের কণ্ঠ থেকে বেরোয়নি।
কি হয়েছে দেখার জন্যে দৌড়ে গেল সে। দেখল, সাদা হতিটা সরে গিয়েহল, ওটাকে ঘিরে ফেলেছে কয়েকজন ডাকাত। তলোয়ার দিয়ে খোঁচা। মেরে মেরে সরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে ওদের ক্যাম্পের দিকে। রাগে, যন্ত্রণায় চিৎকার করছে জানোয়ারটা।
ওদের নিষ্ঠুরতা দেখে মুসার মনে হলো এই লোকগুলোই হয়তো গায়ে গিয়ে সেদিন কিশোর হাতিটার শুড় কেটেছিল।
কিন্তু সাদা হাতি ভদ্র হলেও সহ্যের একটা সীমা আছে। কত আর কষ্ট সহ্য করবে? আচমকা ঘুরে গিয়ে রুখে দাঁড়াল সে। এ রকম কিছু ঘটতে পারে আশা করোন বোধহয় লোকগুলো। সরে যাওয়ারও সুযোগ পেল না। চোখের পলকে দু-জনকে দাঁত দিয়ে গেঁথে ফেলল হাতি। পা দিয়ে পিষে ভর্তা করে দিল আরেকজনকে। শুড় দিয়ে বাড়ি মেরে শুইয়ে দিতে লাগল নাগালে যাকে পেল।
সাদা হাতিটার চিৎকার শুনে সমস্ত বাধা পায়ে দলে পড়িমরি করে ছুটে এল কালো মন্দা হাতিটা। আক্রমণ করে বসল ডাকাতদের।
দুটো খেপা হাতির আক্রমণ ঠেকানোর সাধ্য হলো না ডাকাতদের। ঘাবড়ে গিয়ে এদিক ওদিক দৌড় মারল। গিয়ে পড়ল পুলিশ আর কুলিদের খপ্পরে।
ওরা জিতে গেছে, বুঝতে পারল কিশোর। কিন্তু বজ্রমানবের কথা ভুলে গিয়েছিল সে।
কুয়াশা সরে এসে ঢেকে ফেলল কিশোরকে। কয়েক সেকেন্ড পর সেটা সরতেই দেখল, ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে আছে শেখ।
কুটিল হাসি হাসল ডাকাত সর্দার। বাহ্, তুমি এখানে! তোমাকেই খুঁজছিলাম!
খাপ থেকে পিস্তল খুলল সে।
দাঁড়ান, হাত তুলল কিশোর, আমার কাছে পিস্তল নেই। আমি শুনেছি, আরব যোদ্ধারা মুখোমুখি লড়াইয়ে নিরস্ত্র শত্রুকে হত্যা করে না। কাপুরুষতা মনে করে। আপনিও আরব। সাহস থাকলে পিস্তলটা ফেলে দিন। তারপর আসুন। দেখা যাক কে হারে, কে জেতে।
পিস্তল ফেলল না শেখ, তবে খাপে ঢুকিয়ে রাখল।
তুমি একজন আরব শেখকে কাপুরুষ বলো! এসো, দেখি, কতটা বাঘের বাচ্চা?
বিশাল বপু নিয়ে দু-হাত বাড়িয়ে রেলইঞ্জিনের গতিতে কিশোরকে আঘাত করতে ছুটে এল শেখ।

শেষ মহর্তে পথ থেকে সরে গেল কিশোর। জুডোর কায়দা প্রয়োগ করল শেখের ওপর। লোকটার নিজের ওজন আর শক্তিকে কাজে লাগিয়েই কাবু করার চেষ্টা করল তাকে।
বিফল হলো না। দড়াম করে মুখ নিচু করে পাথরের ওপর আছড়ে পড়ল যেন পাহাড়। মাথা ঠকে গেল ভীষণ ভাবে। অজ্ঞান হয়ে গেল।
যে কোন মুহূর্তে জ্ঞান ফিরে আসতে পারে লোটার। সঙ্গে দড়ি নেই। তাড়াতাড়ি শেখের লম্বা আলখেল্লা ছিঁড়ে ফালি করে দড়ি পাকিয়ে তার হাত-পা বেঁধে ফেলল কিশোর।
চোখ মেলল শেখ। হাত-পা নড়ানোর চেষ্টা করে পারল না। বুঝতে পারল, আর কিছু করার নেই তার। চুপ হয়ে গেল।
কুয়াশার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল পুলিশেরা, সঙ্গে মুংগা। অবাক হয়ে একবার তাকাতে লাগল পড়ে থাকা দানবটার দিকে, একবার কিশোরের দিকে।
ওরা বলছে, মুংগা বলল কিশোরকে, আপনি সাদা মানুষের জাদু ব্যবহার করেছেন। নইলে এই দৈত্যের সঙ্গে পারতেন না। আপনাকে পিষে ফেলত।
জাদুই, মুচকি হাসল কিশোর, তবে সাদা মানুষের নয়। এশিয়ানদের।
কুলিদের সহায়তায় বন্দিদের নিয়ে চলে গেল পুলিশ।
কিশোর-মুসা রয়ে গেল। তাদের অন্য কাজ আছে।
খুদে দানবকে পাথরের আড়ালে লুকিয়ে রেখে একজন লোককে তার পাহারায় রেখে দিয়েছিল মুসা। এখন দেখল, বড় হাতি দুটোর সঙ্গে গিয়ে বন্ধুত্ব করে ফেলেছে বাচ্চাটা। তার পরিকল্পনার এটাও একটা অংশ ছিল।
হাতির স্বভাব ভাল করে জানা আছে তার। মা-হারা বাচ্চা হাতিকে দেখাশোনার ভার পড়ে অন্য বয়স্ক মাদী হাতির ওপর। স্বেচ্ছায় এই দায়িত্ব নিয়ে নেয় হস্তিনী। খালা হয়ে যায় শিশুটার। প্রয়োজন পড়লে তাকে নিজের দুধ খাইয়েও বাঁচিয়ে রাখে।
মুসা দেখল, বাচ্চাটার সঙ্গে ড় জড়াজড়ি করে আদর করছে সাদাটা। গলার ভেতর বিচিত্র ঘড়ঘড় আওয়াজ হচ্ছে দুটোরই। এ যেন আদর করে চুমু খাওয়ার সঙ্গে সোহাগের কথা।
মুসাকে দেখেই আনন্দে চিৎকার করতে করতে তার দিকে ছুটে এল খুদে দানব।
ক্যাম্পে যাওয়ার জন্যে তাকে নিয়ে ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল মুসা।
এইবার হবে অগ্নিপরীক্ষা। শিশু হাতির মায়ায় সাদাটা কি আসবে সঙ্গে সঙ্গে লড়াইয়ের আগে হলে এককথা ছিল, কিন্তু এখন মানুষের ওপর ঘৃণা জন্মেছে হাতিটার, নিষ্ঠুর ভাবে তাকে তলোয়ার দিয়ে খুঁচিয়েছে মানুষ। শত্রু আর বন্ধুর

পার্থক্য কি বুঝতে পারবে? জোর খাঁটিয়ে তাকে বন্দি করা যায়নি, মায়ার বন্ধনে জড়িয়ে কি টেনে আনা যাবে?
বাচ্চাটার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে হাতিটা।
বাচ্চাটা একশো গজ সরে গেল…দুশো গজ…তবু নড়ছে না সে।
খালা যে আসছে না এতক্ষণে খেয়াল করল খুদে দানব। ফিরে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল।
হাতির ভাষা না জানলেও আন্দাজ করতে পারল কিশোর-মুসা, কি বলছে বাচ্চাটা। আদুরে গলায় বলছে ওটা-প্লীজ, খালা, এসো না আমাদের সঙ্গে! তোমাকে আমার ভাল লেগেছে!
এই ডাক উপেক্ষা করার ক্ষমতা নেই মাদী হাতির। কেঁদে উঠল মায়ের অন্তর। জবাব দিল-ঠিক আছে, খোকা, আসছি! দাঁড়া!
এক পা দু-পা করে এগোতে শুরু করল শ্বেতহস্তী। গতি বাড়ছে। এগিয়ে আসতে লাগল হেলেদুলে। একবার দ্বিধা করে কালো হাতিটা পিছু নিল সাদাটার। সে-ও সঙ্গিনীকে হারাতে রাজি নয়।
তাদেরকে এগিয়ে আনার জন্যে আনন্দে চিৎকার করে ছুটে গেল বাচ্চাটা। দুটোর মাঝখানে থেকে গায়ে গা ঠেকিয়ে জড়াজড়ি করে নামতে শুরু করল ঢাল বেয়ে। যেন বাবা-মাকে পেয়ে গেছে। এগোল কিশোরদের ক্যাম্পের দিকে।
স্তব্ধ হয়ে প্রাণী জগতের এক অপার বিস্ময় দেখছে দুই গোয়েন্দা। চোখে জল এসে গেল ওদের। জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে, খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখে ওরাও এগোল হাতিগুলোর পেছন পেছন।

ভলিউম ৫৪ – স্বর্গদ্বীপ – তিন গোয়েন্দা – রকিব হাসান – সেবা প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ: ২০০১

উজ্জ্বল নিওন আলোয় লেখা ওয়েলকাম টু নর্থ ক্যারোলিনা সাইনটা যখন চোখে পড়ল ওদের, মধ্যরাত পেরিয়ে গেছে তখন।

খিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে আমার, ঘোষণা করল মুসা। দুই হাত স্টিয়ারিঙে। চোখ সামনের রাস্তায় নিবদ্ধ। না খেয়ে দুর্বল হয়ে পড়লে জিনার কোন উপকার করতে পারব না।

ম্যাপ দেখে রবিন জানাল, সামনে আর মাইল দশেক গেলেই খাবার পাওয়া যাবে।

দারুণ! বলল উচ্ছ্বসিত মুসা। সারাদিনের মধ্যে সবচেয়ে ভাল খবরটা দিলে। গাড়িটারও পেট্রল দরকার। আমাদেরও স্ট্রেল দরকার।

কটা বাজে? হাই তুলতে তুলতে জিজ্ঞেস করল কিশোর। দুহাত টান টান করে ছড়িয়ে দিয়ে আড়মোড়া ভাঙল।

নাস্তার সময় হয়ে গেছে, মুসা জানাল। ঘুমিয়ে গেছিলে তো, তাই জানো না। তোমাদের দুজনকেই একটা সংবাদ দিই। ভার্জিনিয়া থেকেই আমাদের অনুসরণ করে আসছে একটা ট্রাক।

নাম্বার দেখেছ? সতর্ক হয়ে উঠল কিশোর। মুহূর্তে ঘুম উধাও হয়ে গেল চোখ থেকে।

না, রিয়ারভিউ মিররের দিকে তাকিয়ে জবাব দিল মুসা। বেশি দূরে। দেখা যাচ্ছে না।

মাথাটা সামান্য উঁচু করে সাবধানে তাকাল পেছনে বসা রবিন। আমিও কিছু দেখতে পাচ্ছি না। হতে পারে আমাদের মতই সে-ও ফ্লোরিডা থেকেই আসছে। কাকতালীয় ব্যাপার।

উঁহু, মুসা মানতে চাইল না। আমি গতি বাড়ালেই সে-ও বাড়ায়, কমালে কমায়। অনুসরণ যদি না করে থাকে, তাহলে কি খেলছে আমাদের সঙ্গে?

এসিট র‍্যাম্পের শেষ মাথায় এসে একটা গ্যাস স্টেশনে গাড়ি ঢুকিয়ে দিল মুসা। পাম্পের লাগোয়া একটা বড় রেস্টুরেন্ট। খামারবাড়ির মত চেহারা। গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে তেল ভরতে লাগল কিশোর। মুসা আর রবিন নজর রাখল রাস্তার দিকে।

ওই যে, মুসা বলল।

গ্যাস স্টেশনের পাশ দিয়ে দ্রুত সরে গেল ট্রাকটা। উজ্জ্বল আলোয় স্পষ্ট দেখা গেল ওটাকে।

লোক তো মনে হলো দুজন, তাই না? কিশোর বলল।

হ্যাঁ, মাথা ঝাঁকাল মুসা। কিন্তু গতি তো কমাল না একবিন্দু। তারমানে আমারই ভুল ছিল। আমাদের অনুসরণ করেনি ওরা।
তেল ভরা শেষ করে রেস্টুরেন্টের সামনে এনে গাড়িটা রাখল ওরা। তারপর রেস্টুরেন্টে ঢুকল। একটা টেবিল বেছে নিয়ে বসে পড়ল। রাত দুটো বাজে। কিন্তু এখনও টিন-এজ ওয়েইট্রেসের মুখের হাসি মলিন হয়নি। হাসিমুখে স্বাগত জানাল ওদের। কথায় দক্ষিণাঞ্চলীয় টান। একটা করে মেন্যু তুলে দিল প্রত্যেকের হাতে।
ডিনার পাওয়া যাবে এত রাতে? জিজ্ঞেস করল মুসা।
যাবে, হাসিটা উজ্জ্বল হলো আরও। দিনে-রাতে যখন খুশি যে কোন খাবার চাও, দিতে পারব আমরা।
তাই নাকি! খুশিতে দাঁত বেরিয়ে পড়ল মুসার।
খাবারের অর্ডার দেয়া হলো। এনে দিল ওয়েইট্রেস। নীরবে খেয়ে চলল ওরা। রাত জেগে, একটানা গাড়িতে বসে থেকে ক্লান্ত। কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। খাওয়া শেষ করে বিল দিয়ে রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে এল।
ভাবছি, গাড়ির দিকে এগোতে এগোতে বলল কিশোর, আমাদের ট্রাকের বন্ধুরা না এসে হাজির হয় আবার এখন।
চলেই তো গেল, জবাব দিল রবিন। আর আসবে কি?
সে আর মুসা আগে আগে হাঁটছে।
খাইছে! বলে হঠাৎ গুঙিয়ে উঠল মুসা।
দুজনে তাকিয়ে আছে ভ্যানটার দিকে।
কি দেখে থমকাল ওরা, পেছনে থাকায় বুঝতে পারল না প্রথমে কিশোর। তারপর লক্ষ করল, স্বাভাবিকের তুলনায় নিচু হয়ে আছে গাড়িটার ছাত। এর কারণ, চার চাকার রিমের ওপর দাঁড়িয়ে আছে এখন ওটা। চারটে টায়ারই কেটে ফালা ফালা করে দেয়া হয়েছে।
কাটা রবারগুলোর দিকে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল মুসা। তারপর দাঁতে দাঁত চেপে বলল, এরজন্যে পস্তাতে হবে ওদের!
পস্তানো তো পরে, কিশোর বলল। আগে ওদের নাগাল তো পেতে হবে। তার জন্যে গাড়িটা সচল করা দরকার। রাস্তার ধারে চব্বিশ ঘণ্টা খোলা চাকা মেরামতের দোকান দেখেছি। দেখি, চারটে টায়ারের জন্যে কি পরিমাণ খসায় পকেট থেকে।
চার নয়, পঁচটা, শুধরে দিল মুসা। বাড়তি চাকাটাও খতম করে দিয়ে গেছে। ওই দেখো। ভ্যানের পেছনে দরজার ফ্রেমে আটকে রাখা চাকাটা দেখাল সে। কিন্তু কে করল শয়তানিটা?

রাত দুপুরে রসিকতা করতে আসেনি কেউ, কিশোর বলল। ইচ্ছে করে করেছে। ভয় দেখিয়ে আমাদের রকি বীচে ফেরত পাঠানোর জন্যে।
সামান্য কয়খান চাকা কেটে আমাদের ফেরত পাঠাবে? ভুরু নাচাল রবিন। জিনাকে না নিয়ে ফেরত যাচ্ছি না আমরা, এটা ওদের বুঝিয়ে দেয়া দরকার।
সময় হলে আপনি বুঝবে, কিশোর বলল।
শতিনেক ডলার আর পঁয়তাল্লিশটা মিনিট গচ্চা দিয়ে আবার এসে রাস্তায় নামল ওরা। ভোর রাতের নীরবতা। ঘুমন্ত পরিবেশ। কিন্তু ওদের চোখে ঘুম নেই।
কখন যে গিয়ে পৌঁছাতে পারব, নিজেকেই যেন প্রশ্নটা করল মুসা।
ম্যাপ দেখে বলল রবিন, আরও তিনশো মাইল গেলে পাওয়া যাবে ফ্লোরিডার সীমান্ত।
তারপর? ফ্লোরিডা থেকে গাল আইল্যান্ড?
আজ রাত নটা-দশটা নাগাদ পৌঁছে যাব, রবিন বলল। বর্ণনা পড়ে মনে হচ্ছে দারুণ হবে জায়গাটা। গাল আইল্যান্ড, লোকসংখ্যা পাঁচশো সাঁইত্রিশ, গাড়িটা যেখান থেকে ভাড়া নিয়েছে, তারা একটা ছোট বই দিয়েছে। তথ্যগুলো লেখা আছে তাতে। ফ্লোরিডার দক্ষিণ পশ্চিম উপকূল থেকে মাত্র কয়েক মিনিটের পথ, সারাসোটা আর নেপসের মাঝামাঝি। বোটে করে যাওয়া যায়, আবার গাড়ি নিয়েও যাওয়া যায়। গাড়িতে করে যেতে হলে সীভিউ থেকে ফ্ল্যামিঙ্গো পাসের ভেতর দিয়ে আইল্যান্ড কজওয়ে পেরিয়ে যেতে হবে। দ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তে চমৎকার একটা সাদা বালির সৈকত আছে...।
বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর, দেখো তো, ওয়াইল্ড পাম মোটেলটার কথা লেখা আছে নাকি?
আছে, ট্রাভেল বুকের পাতা উল্টে দেখে বলল রবিন। দ্বীপের উত্তর প্রান্তে। বলছে প্রাকৃতিক দৃশ্য খুব সুন্দর ওখানকার। থাকার জন্যে বিশটা আধুনিক কটেজ আছে, এয়ারকন্ডিশনার আর টিভি সহ। সৈকতের কাছে। মার্কেটিং সুবিধা আর নাইটলাইফ সহ।
এই নাইটলাইফটা কি জিনিস? মুসার প্রশ্ন।
বুঝতে পারছি না, জবাব দিল রবিন। গেলেই বোঝা যাবে। তবে রাতের বিনোদনের কথাই বলেছে হয়তো, সেটারই নাম দিয়েছে নাইটলাইফ।

.

পাক্কা তিরিশটা ঘণ্টা রাস্তায় কাটিয়ে অবশেষে সরু আইল্যান্ড কজওয়েতে গাড়ি ঢোকাল মুসা।
নাইটলাইফের তো কিছুই দেখছি না, চারপাশে তাকাতে তাকাতে বলল কিশোর।

ওই যে নাইটলাইফ, হাত তুলে সামনের বাড়িটা দেখাল মুসা। কুপারস ডিনার। এখনও খোলা।
কিশোর আর রবিন দুজনেই হাসল। তাকিয়ে আছে বাড়িটার দিকে। পুরানো ঢঙে তৈরি বাড়ি, সাদা রঙ করা। দ্বীপের মেইন স্ট্রীটের নাম কারলু রোড। এই রোডের পাশে কজওয়ের এককোণে দাঁড়িয়ে আছে বাড়িটা।
নাইটলাইফ বটে, বিড়বিড় করল কিশোর।
ওই যে, আমরা যেটা খুঁজছি, গাল আইল্যান্ড মেরিনার দিকে হাত তুলল রবিন। সাইনবোর্ডে লেখা: ওয়াইল্ড পাম মোটেল। চার মাইল।
মুসা, ডানে ঘোয়রা, বলল সে।
সাংঘাতিক ঝড় হয়ে গেছে এখানে, বিধ্বস্ত গাছপালাগুলো দেখে বলল মুসা। ভেঙে এসে রাস্তায় পড়ে আছে কিছু নারকেল আর পাম গাছ। সে-সব এড়িয়ে সাবধানে চালাতে হচ্ছে তাকে।
দিনের আলোয় নিশ্চয় অন্য রকম লাগবে, হতাশ মনে হলো রবিনকে। এখন তো একেবারে বিবর্ণ!
শুধু বিবর্ণই নয়, রুক্ষও লাগছে। রাস্তায় মানুষজন নেই। বাড়িঘরও তেমন দেখা যাচ্ছে না এদিকটাতে।
সত্যি কথা বলব? মুসা বলল। সৌন্দর্যের ছিটেফোঁটাও দেখছি না আমি। বরং ভূতুড়ে মনে হচ্ছে। দেখলে মনে হয় কাজ করতে করতে কিসের আশঙ্কায় যেন হঠাৎ করে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে উন্নয়ন। দেখছ না কেমন আধখাপচা তৈরি হয়ে পড়ে আছে বাড়িগুলো?
যা-ই বলো, কিশোর বলল, এতটা খারাপ কিন্তু না। আমি তো কার্ড তৈরি করার উপযোগী প্রচুর দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি।
কথাটা ভুল বলেনি সে। গাছপালার যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে ঝড়ে, কিন্তু এখনও প্রচুর গাছপালা দাঁড়িয়ে আছে–ছবির মত করে সাজানো, তার ওপাশে চাঁদের আলোয় ঝিকমিক করছে গালফ অভ মেসিকো।
যাক, এলাম শেষ পর্যন্ত, শব্দ করে নিঃশ্বাস ফেলল মুসা। পুরো আধপাক গাড়ি ঘুরিয়ে মোড় নিল। পাশ দিয়ে চলে গেল গোলাপী নিওন আলোয় লেখা ভ্যাকেন্সি সাইন। গাড়ি থামাল এনে ওয়াইল্ড পাম মোটেলের অফিসের সামনে।
ওয়াইল্ড পাম কেন নাম রাখা হয়েছে বোঝা যাচ্ছে, হোটেলের সীমানার মধ্যে জন্মানো উঁচু উঁচু পামের জটলাগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল রবিন। প্রচুর গাছ।
জেগেই আছে মনে হয়, আলোকিত অফিসের দিকে তাকিয়ে থেকে ইমার্জেন্সি ব্রেকটা লাগিয়ে দিল মুসা।

ঘড়ি দেখল কিশোর। হাত-পা টান টান করে দিয়ে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার আড়ষ্টতা কাটাতে চাইল। নামার সময় হয়েছে।
হঠাৎ এক ধাক্কায় তার পাশের দরজাটা খুলে ফেলে লাফ দিয়ে নেমে দিল দৌড় মুসা।
.
কিশোরও দরজা খুলে লাফিয়ে নেমে মুসার পেছনে ছুটল। অফিসের পেছনের ঘন ঝোঁপঝাড়গুলোর মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে মুসা।
মুসা! দাঁড়িয়ে গেল কিশোর। ঝোঁপের অন্ধকারে মুসাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা চালাল তার চোখ।
জবাব দিল না মুসা।
মুসা! আবার ডাকল সে।
আচমকা হুড়মুড় করে অন্ধকার থেকে উজ্জ্বল চাঁদের আলোয় বেরিয়ে এল মুসা। অফিসের পেছনে দাঁড়িয়ে ভেতরে উঁকিঝুঁকি মারছিল একটা লোক, কোনখানটায় দাঁড়িয়ে ছিল হাত তুলে দেখাল সে। আমাদের দেখে দৌড় মারল।
চেঁচামেচি শুনে অফিস থেকে বেরিয়ে এলেন লম্বা এক ভদ্রলোক। বয়েস প্রায় ষাট। ছোট করে ছাটা ধূসর রঙের দাড়ি। অফিসের বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। পেছনে বেরোল কিশোরদের বয়েসী এক কিশোরী।
হালো, ডেকে জিজ্ঞেস করলেন ভদ্রলোক, এসেছ তাহলে। তোমাদের অপেক্ষাতেই ছিলাম।
হ্যাঁ, জবাব দিয়ে দ্রুত সেদিকে এগোল কিশোর। পেছনে এল মুসা।
আমি জেরাল্ড গ্লেজব্রুক, হাত বাড়িয়ে দিলেন ভদ্রলোক। ইভা তো তোমাদের দেরি দেখে অস্থির হয়ে যাচ্ছিল।
কতদিন পর দেখা! কেমন আছ তোমরা, কিশোর? এগিয়ে এল মেয়েটা। লম্বা, ছিপছিপে দেহ। সুন্দরী। লাল চুলগুলো মাথার পেছনে টেনে নিয়ে গিয়ে ঘোড়ার লেজের মত করে বেঁধেছে।
চাচা, ও কিশোর পাশা, পরিচয় করিয়ে দিল ইভা। আর ও মুসা, মুসা আমান ... আর এই যে, রনি।
গাড়ি থেকে নেমে চলে এসেছে রবিনও। কিশোরের কাছ থেকে সামান্য দূরে দাঁড়িয়ে আছে।
খুব খুশি হলাম তোমাদের দেখে, আন্তরিক কণ্ঠে বললেন মিস্টার ব্রুক এই খানিক আগেও তোমার বাবা ফোন করে জিজ্ঞেস করেছেন তোমরা এসেছ নাকি, রবিনের দিকে তাকিয়ে বললেন তিনি। ইভা তো তোমাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তোমাদের মত গোয়েন্দা নাকি আর সারা দুনিয়ায় নেই।

বাড়িয়ে বলেছে, হাসল কিশোর। বন্ধু তো। প্রশংসা করা কথাবার্তা বিব্রত করে ওকে, তাই প্রসঙ্গ পরিবর্তন করার জন্যে বলল, যাই হোক, আপনাদের চমকে দিতে চাই না। তবু বলতেই হচ্ছে, আপনাদের পেছনের জানালায় দাঁড়িয়ে উঁকি দিচ্ছিল একটা লোক। আপনারা কোন শব্দটব্দ শুনেছেন? অস্বাভাবিক কিছু?
ইভার সবুজ চোখের তারায় শংকা দেখতে পেল কিশোর।
না! দেখিনি! হঠাৎ রেগে গেলেন মিস্টার ব্রুক। তাই তো বলি! আমি আরও ভেবে অবাক হচ্ছিলাম, অস্বাভাবিক কিছু ঘটছে না কেন আজ? এসো, ভেতরে এসো। সব বলছি তোমাদের।
উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত একটা ঘরে ঢুকল ওরা। ফরমিকার কাউন্টার থেকে শুরু করে লাল প্লাস্টিকের চেয়ার আর অন্যান্য আসবাবপত্র সব কিছুতে ধুলো পড়ে আছে। মলিন হয়ে গেছে চেহারা, লক্ষ করল কিশোর। যত্ন নেয়া হয় না বোঝা যায়। যেন কোন কারণে ওগুলোর প্রতি একটা অনীহা জন্মে গেছে মালিকের।
পেছনে আমার বেডরুম, পর্দা ঝোলানো একটা দরজা দেখালেন মিস্টার ব্রুক। ইভারটা তার পাশে।
কাউন্টারের পেছনে সারি সারি নম্বর। প্রতিটি নম্বরের ওপরে হুক। চাবি ঝুলছে ওগুলো থেকে।
সুন্দর একটা রিসর্ট ছিল এটা, দুঃখের সঙ্গে জানালেন মিস্টার ব্রুক। ফলের হালুয়া কাটতে চাচাকে সাহায্য করল ইভা। এটা নিয়েই ব্যস্ত ছিল। কিশোরদের আসার শব্দ শুনে কাজ রেখে তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে গিয়েছিল দুজনে। প্রচুর ট্যুরিস্ট আসত। ভালই ছিলাম আমরা। কিন্তু দুর্ঘটনাটাও ঘটল, আমরাও গেলাম।
চাচার সঙ্গে সুর মেলাল ইভা, চাচার ডকটার সর্বনাশ করে দিয়ে গেছে হলুদ রেসিং বোটটা।
দুজন ট্যুরিস্ট রোদ পোয়াচ্ছিল, এই সময় এসে তো মারল বোটটা। ফুঁসে উঠলেন মিস্টার ব্রুক। দুজনকেই হাসপাতালে নিতে হয়েছে।
বোট চালকের কি খবর? জানতে চাইল কিশোর।
ওর আর কি হবে? বিরক্তিতে মুখ বাঁকালেন মিস্টার ব্রুক। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেছে অ্যাক্সিডেন্টের পর পরই ফুল স্পীডে পালিয়ে গেছে সে। তার মানে ইচ্ছে করে ভেঙে দিয়ে গেছে ডকটা। পুলিশ পরে জানতে পেরেছে বোটটা নাকি চোরাই বোট ছিল। চোরটাকে ধরতে পারেনি। বোটটাও নাকি আর খুঁজে পায়নি। পুলিশের ধারণা, ডকে বাড়ি লেগে বোটটারও ক্ষতি হয়েছিল। ফেটে-টেটে গিয়েছিল নিচের দিকে। পানি ঢুকে ডুবে গেছে চ্যানেলে। চোরটাও মরেছে পানিতে ডুবে। কিন্তু আমার বিশ্বাস হয় না।

ঘটনাটা কি জিনার নিখোঁজ হওয়ার আগের? জানতে চাইল কিশোর।
আগের দিনের, ইভা জানাল।
জিনা কি করে নিখোঁজ হলো, খুলে বলবে? অনুরোধ করল কিশোর।
বলব না কেন? বলার জন্যেই তো তোমাদের ডেকে আনলাম, ইভা বলল।
গাল আইল্যান্ডে বেড়াতে গিয়ে জিনার রহস্যময় ভাবে নিখোঁজ হওয়ার খবরটা মুসাদের বাড়িতে ফোন করে ইভাই জানিয়েছিল। মুসা গিয়ে খবর দিয়েছে। কিশোর আর রবিনকে। তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে সেদিনই রকি বীচ থেকে গাল আইল্যান্ডের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে তিনজনে।
খুক করে কাশল ইভা। জিজ্ঞেস করল, খাবে কিছু?
মাথা নাড়ল কিশোর, না, আমরা খেয়ে এসেছি। তুমি বলো।
জিনা এখানে বেড়াতে আসার পর থেকে রোজই আমরা একসঙ্গে সৈকতে বেড়াতে যেতাম। সেদিন আমার কিছু জরুরী কাজ ছিল অফিসে। চাচাকে সাহায্য করতে হয়েছিল। জিনাকে বললাম সৈকতে চলে যেতে। আমি পরে যাব।
লাঞ্চের পর খাবার নিয়ে গেলাম সৈকতে। আমাদের বসার প্রিয় জায়গাগুলোতে খুঁজলাম। কোথাও পেলাম না তাকে। ভাবলাম, শহরে-টহরে গেছে। চলে আসবে। আমি অপেক্ষা করতেই থাকলাম। কিন্তু সে আর আসে না। চাচার গাড়িটা নিয়ে বেরিয়েছিল সে। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে মোটেলে ফিরে এলাম। চাচাকে বললাম সব। তখনও খারাপ কিছু সন্দেহ করিনি আমরা।
সন্ধ্যার পরেও যখন ফিরল না, ভীষণ দুশ্চিন্তা হতে লাগল। বিভিন্ন জায়গায় ফোন করে খোঁজ নিল চাচা। আমিও কয়েক জায়গায় ফোন করলাম। কোথাও যায়নি জিনা।
একটানা কথা বলে দম নেয়ার জন্যে থামল ইভা।
গেকো গাড়িটা পরে খুঁজে পেয়েছে পেলিক্যান লেন-এ, মিস্টার ব্রুক জানালেন, পরিত্যক্ত অবস্থায়।
গেকো! চোখের পাতা সরু করে ফেলল মুসা। গেকো তো জানি এক ধরনের গিরগিটি?
আরে না না, এ গেকো সে গেকো নয়, না হেসে পারলেন না মিস্টার ব্রুক। এর পুরো নাম হেরিং গেকো। ডেপুটি শেরিফ। আমাদের এখানকার পুলিশ ফোর্স। ওই একজনের ওপরই দায়িত্ব দেয়া হয়েছে পুরো দ্বীপ দেখাশোনার। যাই হোক, আঙুলের ছাপটাপ খোঁজাখুঁজি করেছে সে। পেয়েছে তিনজনের। আমার, জিনার আর গাড়ির গ্যারেজের মিস্ত্রির।
মাত্র একজন পুলিশ? বিশ্বাস হচ্ছে না রবিনের। আস্ত একটা দ্বীপের দেখাশোনার জন্যে মাত্র একজন?

হ্যাঁ, বিরক্তির সঙ্গে জবাব দিলেন মিস্টার ব্রুক। অথচ দেখো, সীভিউর কাউন্টি কর্তৃপক্ষ পাশের দ্বীপ ক্যাসটেলো কী-কে দিয়েছে পাঁচজন পুলিশ। আর আমাদের মাত্র একজন। বড় বেশি পক্ষপাতিত্ব!
তা, আপনাদের গেকো সাহেব কোন সূত্রটুত্র পেয়েছে? জানতে চাইল কিশোর।
কিছু না, জবাব দিলেন মিস্টার ব্রুক। গাড়িটা রেখেছি অফিসের পেছনে। তোমরা ইচ্ছে করলে ওটাতে সূত্র পড়ে আছে কিনা খুঁজে দেখতে পারো। তার জন্যে গাড়িটাকে টুকরো টুকরোও যদি করে ফেলতে হয়, তাতেও আমার আপত্তি নেই।
জিনাকে জিম্মি হিসেবে আটকে রেখে টাকার জন্যে নোট পাঠিয়েছে? কিংবা ফোন-টোন কোন কিছু?
কিছুই পাঠায়নি। পাঠিয়ে লাভ হবে না, জানে। আমার তো টাকা-পয়সা নেই যে দিতে পারব। শুধু কি কিডন্যাপিং; চুরি-দারি আরও কত কিছুই করছে। এই তো, জিনা নিখোঁজ হওয়ার তিন রাত আগে আমার দুটো পাম গাছ চুরি করে নিয়ে গেছে।
খাইছে! চোখ বড় বড় হয়ে গেল মুসার। পাম গাছ! গাছ চুরি করে কার কি লাভ?
ফ্লোরিডায় কিছুদিন ধরে পামের এক ধরনের রোগ হচ্ছে, পাম-ফাঙ্গাস বলে এক জাতের ফাঙ্গাস ধ্বংস করে দিচ্ছে গাছগুলোকে, মিস্টার ব্রুক জানালেন। কাজেই এ সব গাছের এখন খুব কদর এ অঞ্চলে। সুস্থ গাছ পেলে ভাল দাম দিতে রাজি আছে অনেকে।
মজার ব্যাপার হলো, ইভা বলল, এত নিঃশব্দে কাজটা করেছে ওরা, রাতের বেলা কোন শব্দই শুনিনি আমরা। এমনকি গাছগুলো যে গায়েব হয়ে গেছে পরদিন সকালেও খেয়াল করিনি আমি। মাটিতে গর্ত দুটো প্রথমে চাচার চোখেই পড়েছে।
প্রায় সারাটা জীবনই এখানে কাটিয়ে দিলাম, মিস্টার ব্রুক বললেন, চোরের ছায়াও দেখিনি কখনও। ঘরের দরজা-জানালায় তালা তো দূরের কথা, ছিটকানিও লাগাইনি কোনদিন। কিন্তু হঠাৎ করেই বড় বড় শহরের মত চুরি-ডাকাতি আর নানা রকম অপরাধের কাজ শুরু হয়ে গেছে গাল আইল্যান্ডেও। ফোঁস করে। নিঃশ্বাস ফেললেন তিনি। বাস্তবে ফিরে এলেন যেন। এই দেখো, খালি নিজের দুঃখের বয়ানই করে চলেছি। এতটা পথ গাড়ি চালিয়ে এসেছ, নিশ্চয় খুব ক্লান্ত। চলো, ঘুমানোর জায়গা দেখিয়ে দিই। আমারও ঘুম পেয়েছে।
ভাববেন না, মিস্টার ব্রুক, দৃঢ়কণ্ঠে বলল কিশোর, জিনাকে তো খুঁজে বার করবই আমরা, আপনার গাছগুলোও খুঁজে বের করে দেব।
অত মিস্টার-ফিস্টার বলা লাগবে না, স্রেফ আঙ্কেল বলবে আমাকে, বলে দিলেন মিস্টার ব্রুক। নিজের বাড়ি মনে করবে। সামান্যতম অসুবিধে হলেও জানাবে আমাকে।

একটা হুক থেকে চাবি খুলে নিয়ে কিশোরের হাতে ফেলে দিলেন তিনি। দশ নম্বর কটেজটার চাবি। ওখানেই থাকার ব্যবস্থা করেছেন ওদের।
সারি ধরে হেঁটে গিয়ে শেষ মাথার কটেজটা, বলে দিলেন তিনি। জিনাকে দিয়েছিলাম তিন নম্বরটা। ও আসার পর ইভাও তার সঙ্গেই ঘুমাত।
থ্যাংকস, অ্যান্ড গুডনাইট, জেরি আঙ্কেল, দরজার কাছে গিয়ে ফিরে তাকিয়ে হাত নাড়ল মুসা।
ইভাও চলল ওদের সঙ্গে। কিশোর বলল, আসা লাগবে না। তুমি যাও। আমরা চিনে নিতে পারব।
তোমরা আসায় একটা পাষাণ নেমে গেল আমার মন থেকে, ইভা বলল। উফ, কি দুশ্চিন্তাই যে হচ্ছিল।
আর দুশ্চিন্তার দরকার নেই, রবিন বলল। জিনাকে খুঁজে বের করবই আমরা।
ইভাকে গুডনাইট জানাল তিন গোয়েন্দা। ঘরে ঢুকে ওর দরজায় ছিটকানি এবং শিকল লাগানোর শব্দ না শোনা পর্যন্ত অপেক্ষা করল। তারপর রওনা হলো গাড়ির দিকে। ব্যাগ-সুটকেসগুলো আনতে হবে।
ওগুলো নিয়ে এল নিজেদের ঘরে।
খুব সুন্দর, বড় একটা ঘর। বড় বড় খাট। ধপ করে বিছানায় বসে পড়ে মুসা বলল, উফ, বাপরে বাপ! এত কাহিল জীবনে হইনি!
হবেই। এত পথ গাড়ি চালানো কি সোজা কথা, রবিন বলল।
কথা না বলে আর, শুয়ে পড়ো, কিশোর বলল। তাড়াতাড়ি উঠতে হবে আবার ঘুম থেকে। সাতটার মধ্যে তদন্ত শুরু করে দেব। প্রথমেই খুঁজে দেখতে হবে গাড়িটা। যেটা থেকে নিখোঁজ হয়েছে জিনা।
মুসা বলল, একবার ঘুমালে এখন আমার কানের কাছে কামান দাগলেও উঠতে পারব কিনা সন্দেহ। তবু, সকাল বেলা ঠেলাঠেলি করে দেখো।
হেসে মাথা ঝাঁকিয়ে বাতি নিভিয়ে দিল কিশোর।
সবে শুয়েছে, হঠাৎ ঝনঝন করে কাঁচ ভাঙার শব্দ হলো।
ঝট করে উঠে বসল আবার কিশোর। মুসা আর রবিনও ঘুমায়নি এখনও। শব্দটা যেদিক থেকে এসেছে সেদিকে তাকিয়ে আছে।
ঘটনাটা কি... বলতে গেল মুসা।
কিন্তু কথা শেষ হলো না তার। ভেসে এল তীক্ষ্ণ চিৎকার।

.

আই, কিশোর! কিশোর! চিৎকার করছে ইভা। তোমাদের গাড়ি! জানালার কাঁচ ভেঙে কে জানি ঢোকার চেষ্টা করছে!

এক লাফে বিছানা থেকে নেমে ছুটে বেরিয়ে এল ওরা। রবিন গেল ইভার কাছে। মুসা আর কিশোর ছুটল গাড়ির দিকে।
ওই যে যাচ্ছে! ওই যে ব্যাটা! চিৎকার করে উঠল মুসা। ছুটন্ত মূর্তিটার দিকে দৌড় দিল সে। তাকে অনুসরণ করল কিশোর।
কিন্তু ধরা গেল না লোকটাকে।
পালাল ব্যাটা! হাঁপাতে হাঁপাতে বলল মুসা।
সামনের বাঁ পাশের জানালাটা ভেঙেছে, কিশোর বলল।
গাড়ির দিকে এগোল দুজনে। ততক্ষণে পৌঁছে গেছে রবিন আর ইভা।
গাড়ির জানালা দিয়ে মাথা ঢুকিয়ে দিল রবিন।
কার-ফোনটা নিয়ে গেছে, তারের ছেঁড়া মাথাটা তুলে দেখাল সে। আর কিছু মনে হয় নিতে পারেনি। ইভার চেঁচামেচি শুনে দৌড় দিয়েছে।
নেয়ার মত আর তেমন কিছু ছিলও না ভেতরে। আগেই নিয়ে গেছে ওরা।
তবু, কিশোরও আরেকবার ভালমত দেখল, আর কিছু খোয়া গেছে কিনা।
সীটের ওপর পড়ে থাকা কাঁচের টুকরো পরিষ্কার করল। জানালায় আটকে থাকা টুকরোগুলোও টেনে টেনে তুলে ফেলে দিল। ফোকরটা বন্ধ করে দিল প্লাস্টিকের কাপড় দিয়ে। আরও একবার ইভাকে গুডনাইট জানিয়ে শুতে গেল আবার নিজেদের ঘরে।
কিছু একটা ঘটছে এখানে, কিশোর বলল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। জিনাকে কিডন্যাপ করে নিয়ে গেল। আমরা যাতে ওকে খোঁজাখুঁজি না করি, সে জন্যে নানা রকম শয়তানি শুরু করেছে এখন। ফোনটা নিয়েছে বটে, কিন্তু চুরি করার উদ্দেশ্যে আসেনি চোর। চুরি করতে এলে অত শব্দ করে জানালার কাঁচ ভাঙত না। নিঃশব্দে সারার চেষ্টা করত।
হুঁ, হাই তুলতে তুলতে বলল মুসা। সকাল বেলা দেখব, শয়তানিটা কার। এখন ঘুমানো যাক।
দ্বিতীয়বারের মত বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়ল ওরা।
রাতে আর কিছু ঘটল না।
পরদিন খুব সকালে ঘুম ভেঙে গেল কিশোরের। এক ডাক দিতেই উঠে গেল রবিন। তাকে নিয়ে গাড়িটা দেখতে চলল কিশোর।
ময়লা হয়ে আছে গাড়িটা। প্রচুর ধুলো। ব্যবহার করা হয় না বোধহয়, পরিষ্কারও করেন না সে-জন্যে। অফিসের পেছনে ফেলে রেখেছেন। অফিসের অপরিষ্কার আসবাবপত্রগুলোর কথা মনে পড়ল কিশোরের! কোন কারণে. সব কিছুর প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছেন যেন মিস্টার ব্রুক।

এই কিশোর, দেখো, নাইলনের সুতোয় বোনা একটা ফিতে তুলে দেখাল রবিন। একদিকের গ্লোভ কম্পার্টমেন্টের কজায় আটকে ছিল।
সামনের সীটের নিচে খুঁজছিল কিশোর। ঘাড় ফিরিয়ে জিনিসটার দিকে তাকিয়ে বলল, কিসের ফিতে?
যে কোন জিনিসের হতে পারে এটা, রবিন বলল। টেপ প্লেয়ার, ক্যামেরা।
এটা না তো? উজ্জ্বল হলুদ রঙের একটা স্পোর্ট-স্টাইল ক্যামেরা বের করে দেখাল কিশোর। ধাতব আংটার সঙ্গে ছেঁড়া ফিতের মাথাটা লেগে রয়েছে এখনও।
পেলে নাকি কিছু? দরজার কাছ থেকে শোনা গেল মুসার কণ্ঠ।
অ, ঘুম ভাঙল। ক্যামেরাটা মুসাকে দেখাল কিশোর।
আরি, জিনার এ রকম একটা ক্যামেরা ছিল না! চেঁচিয়ে উঠল মুসা।
মাথা ঝাঁকাল কিশোর। হ্যাঁ। কজায় আটকে গিয়েছিল ফিতেটা। তাড়াহুড়ো ছিল, তাই ভোলার চেষ্টা না করে হ্যাঁচকা টানে ছিঁড়ে নিয়ে এসেছিল। ছবিটা তুলে নিয়েই লুকিয়ে ফেলেছিল সীটের নিচে।
রবিনের দিকে তাকাল সে, রবিন, ছবিটা ডেভেলপ করা দরকার। মেইনল্যান্ডে চলে যাও। এক ঘণ্টায় ছবি দিয়ে দেয় যে সব দোকানে, ওদের কাছ থেকে করিয়ে আনে।
জানালাটা মেরামত করিয়ে আনব?
নাহ, আপাতত দরকার নেই। পরে সময় করে করা যাবে। বৃষ্টি এলে। প্লাস্টিক দিয়ে আটকেই ঠেকাব আপাতত।
গাড়ি নিয়ে রওনা হয়ে গেল রবিন।
সেদিকে তাকিয়ে থেকে মুসা বলল, আমরা চলো যাই পেলিক্যান লেনে। গাড়িটা যেখানে পাওয়া গেছে। দেখে আসা দরকার।
চলো। ডেপুটি গেকো আসলেই সূত্র খুঁজেছে বলে আমার মনে হয় না। তাহলে এই ফিতে আর ক্যামেরাটা আমাদের হাতে পড়ত না।
মিস্টার ব্রুকের গাড়িটা নিয়ে রওনা হল দুজনে।
কয়েক মিনিট পর জায়গাটাতে পৌঁছে গেল ওরা। ম্যাপ দেখে মুসাকে গাড়ি থামাতে বলল কিশোর। বালির ওপরে ইট বিছিয়ে রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। বালিতে টায়ারের দাগগুলো ভালমত লক্ষ করল সে। কিডন্যাপারের গাড়ির চাকার দাগ দেখলে যাতে পরে চিনতে পারে।
বাড়িঘর তো নেই বললেই চলে, চারপাশে তাকিয়ে দেখতে দেখতে বলল মুসা। জিনার কিডন্যাপিঙের পর বিশেষ কেউ আর আসেনি বোধহয় এদিকে। এখনও সূত্র পাওয়ার আশা আছে।

নোটবুক বের করে পেন্সিল দিয়ে তাতে নানা রকম টায়ারের দাগের নমুনা এঁকে নিচ্ছে কিশোর, এই সময় সেখানে এসে থামল একটা পুলিশের গাড়ি। স্টিয়ারিঙের নিচ থেকে ধীরে-সুস্থে বেরিয়ে এল পেশীবহুল একজন লোক। কোমরের বেল্টে দুই হাতের বুড়ো আঙুল ঢুকিয়ে দিয়ে, হাঁটার তালে তালে রিভলভারের খাপ দোলাতে দোলাতে পুরানো ওয়েস্টার্ন সিনেমার নায়কদের মত কিশোরের সামনে এসে দাঁড়াল। আমি গেকো, ভারিক্কি চালে পরিচয়টা জানিয়ে যেন কৃতার্থ করে দিতে চাইল গোয়েন্দাদের। ডেপুটি শেরিফ হেরিং গেকো।
মানে মৎস্য-গিরগিটি, মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল মুসার। হেরিং হলো মাছ আর গেকো গিরগিটি।
কি বললে?
না, কিছু না।
কিছু হারিয়েছ? মৎস্য-গিরগিটি কথাটা বোধহয় শোনেনি গেকো, কিংবা শুনলেও ঠিক বুঝতে পারেনি। নইলে রেগে যেত, জানা কথা।
উঁহু, মাথা নাড়ল কিলোর। আমি কিশোর পাশা। হাত বাড়িয়ে দিল সে।
কিন্তু ধরল না গেকো। আঙুল দুটো যে ভাবে ঢুকিয়ে রেখেছিল, সেভাবেই রাখল। গিরগিটির মতই মাথাটা একপাশে কাত করে এক চোখ উঁচু করে তাকাল।
কিশোর পাশা?
হ্যাঁ। ও আমার বন্ধু, মুসা আমান।
ও, তোমাদের কথাই বলেছে তাহলে গ্লেজব্রুক। নিখোঁজ মেয়েটাকে খুঁজতে এসেছ তোমরা।
মাথা ঝাঁকাল কিশোর।
ওকে কিডন্যাপ করা হয়নি, রায় দিয়ে দিল ডেপুটি। সুতরাং যেখান থেকে এসেছ, সেখানে ফিরে যেতে পারো।
কিডন্যাপ হয়নি, আপনি কি করে জানলেন? কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রাখতে কষ্ট হলো কিশোরের।
তাহলে টাকা দাবি করে নোট পাঠাত, এ তো সহজ কথা।
সব সময় টাকার জন্যে কিডন্যাপ করে না। আরও নানা কারণ থাকে।
থাকে, অস্বীকার করছি না, কথাটার কোন সদুত্তর না দিয়েই অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল গেকো। তোমরা এখন অন্যের জমির ওপর দাঁড়িয়ে আছ। সেটা যে। অপরাধ জানা আছে কি?
কিন্তু আমরা তো কোন ক্ষতি করছি না।
ওসব বুঝি না। এ জায়গাটা অন্য মানুষের। এবং আমি জানি, যার জায়গা, সে তোমাদের এখানে আসা পছন্দ করবে না।

চারপাশে তাকিয়ে সাইনবোর্ড খুঁজল কিশোর। কই, কোথাও তো লেখা নেই।
সব সময় যে লিখে দিতে হবে এমন কোন কথা নেই, জবাব দিল শেরিফ। আমাকে রেখেছে তাহলে কিসের জন্যে? আমার কাজ, এ রকম অপরাধ যাতে না করে কেউ সেদিকে লক্ষ রাখা।
তাহলে মালিকের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে আসা যেতে পারে।
ওই কথাটি চিন্তাও কোরো না, কঠিন কণ্ঠে বলল ডেপুটি। বাইরে থেকে নাক গলাতে আসা দুটো বালকের সঙ্গে প্যাচাল পাড়ার চেয়ে অনেক বেশি জরুরী কাজ আছে নীরা লেভিনের। এটা ট্যুরিস্ট স্পট, শান্তিতে সময় কাটাতে আসে লোকে। এখানে কোন রকম গোলমাল চাই না আমি, বলে দিলাম।
সে তো বুঝতেই পারছি, মুসার দিকে ঘুরল কিশোর। চলো হে, মুসা, ডেপুটি সাহেব এখানে শান্তি বজায় রাখতে থাকুন। আমরা অন্য কাজে যাই।
গাড়িতে চড়ে রাস্তায় ওঠার পরও ওদের পিছু ছাড়ল না শেরিফ। শহরে ঢোকার পর তারপরে গেল।
শেরিফ চলে গেল সৈকতের দিকে, কুপারস ডিনারটা সামনে দেখে তার পাশে এনে গাড়ি থামাল মুসা।
ঘোট হল ঘরটায় ঢুকল দুজনে। মাত্র একজন কাস্টোমার। সুবেশী একজন অল্প বয়েসী মহিলা। সোনালি চুল। কাউন্টারে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে কফি খাচ্ছে।
কাউন্টারের উল্টো দিকে একটা টেবিলে লাল চামড়ায় মোড়া চেয়ারে বসল দুই গোয়েন্দা।
ওরা বসতেই এগিয়ে এল ওয়েইট্রেস, মহিলা। বয়েস পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে। ধূসর রঙ লেগেছে চুলে।
মেন্যু লাগবে না আমাদের, ম্যাগি, মহিলার হালকা নীল পোশাকের বুকে সুতো দিয়ে লেখা নাম দেখে বলল কিশোর। আমাদের জন্যে ডিম, হোম ফ্রাই, আর টোস্ট।
হোম ফ্রাই হবে না, ম্যাগি জানাল। হ্যাশ ব্রাউন।
আনুন। ওতেই চলবে।
খিদে পেয়েছে খুব। গোগ্রাসে গিলছে দুজনে, এমন সময় পেছনের ঘর থকে সরু একটা দরজা দিয়ে হুড়মুড় করে ঢুকল একজন লোক। ওর দাগ লাগা দোমড়ানো অ্যাপ্রনের বুকে লেখা রয়েছে কুপার।
ম্যাগি, ওয়েইট্রেসকে বলল সে, গ্রিলে মাংস গেঁথে দিয়ে এসেছি। রান্নাটা শেষ করে ফেলগে। অ্যাপ্রনে মুছল তেল মাখা হাত। ওই ডেপুটিটা যদি দ্বীপের এ সব শয়তানি বন্ধ করতে না পারে, পরের বার শেরিফের ইলেকশনে প্রার্থী হয়ে অবশ্যই তার বিরোধিতা করব আমি।

মুখ তুলে তাকাল কাউন্টারে দাঁড়ানো সোনালি চুল মহিলা। কি আজেবাজে বকছ, কুপার!
না, সত্যি বলছি।
ষোলো বছর ধরে এক নাগাড়ে ডেপুটিগিরি করছে এখানে গেকো, মহিলা বলল। তার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামলে হেরে ভূত হবে, জানা কথা।
না, হব না। কেন এতদিন টিকে ছিল ওই হাঁদাটা, জানো? দ্বীপে কোন অপরাধ হত না বলে। এখন যখন ঘটতে শুরু করেছে, বেশিদিন আর টিকতে পারবে না। আমার কথা ডায়েরীতে লিখে নিতে পারো তুমি, নীরা।
নীরা!
মাঝপথে থেমে গেল কিশোরের চামচ।
মুসারও কান খাড়া হয়ে গেছে।
লেখালেখির আর দরকার নেই। যার যার নিজের পথ দেখা ভাল, নীরা বলল। তোমার ভালটা তো কখনোই বুঝতে চাওনি। কতবার বলেছি, আখেরটা গুছিয়ে নাও, কিন্তু কানেই যায় না তোমার। ডেভলেপমেন্ট কোম্পানি এখনও তোমার জায়গাটা কিনে নিতে আগ্রহী।
এবং আমি এখনও বলছি, জবাব দিল কুপার, জায়গা আমি বেচব না। বেচো বেচো করে বিরক্ত করতে এসো না তো আর দয়া করে।
শোনো, কুপার, ভেবে দেখো, নীরা বলল, কি পাচ্ছ তুমি এই রেস্টুরেন্ট ব্যবসা থেকে? এক কাপ কফি বেচতে গিয়ে দুতিন কাপ বাড়তি দেয়া, দুটো ডিম ভাজা দিলে একটা ডিম ফ্রি দেয়া-এ সব করে কেউ ব্যবসা চালাতে পারে? লাভ। হয় কিছু? বরং লস। অনেক বেশি লস। লোকসান দিতে দিতে শেষ হচ্ছ। আমি ব্যবসায়ী, আমি জানি। তারচেয়ে বেচে দিয়ে টাকা নিয়ে চলে যাও। কাজে লাগবে। কত চাও, নিজের মুখেই বলো বরং।
মহিলাটাকে ভাল লাগল না কিশোরের। বুঝতে পারছে, কুপারও তাকে দেখতে পারে না।
বেশ, নরম হওয়ার ভান করল কুপার। জায়গাটা যখন এতই তোমার পছন্দ, যাও, দিয়ে দিলাম।
রান্নাঘর থেকে সব কথাই বোধহয় কানে গেছে ম্যাগির। তাড়াতাড়ি দরজা দিয়ে মুখ বের করে চিৎকার করে বলল স্বামীকে, না না, কুপার, এ কি করছ!
কর্কশ কণ্ঠে ধমকে উঠল কুপার, তুমি আবার এ সবে নাক গলাতে এলে কেন? যাও, নিজের কাজ করোগে!।
খাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে দুই গোয়েন্দার। প্রবল আগ্রহ নিয়ে কাউন্টারের দিকে তাকিয়ে আছে।

এই নাহলে পুরুষ মানুষের মত কথা, হাসি ফুটেছে নীরার মুখে। চামড়ার পার্স থেকে চেক বই বের করল। বলল, কত চাও?
দুই হাতের তালুর দিকে তাকাল কুপার। বিড়বিড় করল, দশ লাখ।
দশ লাখ! দম আটকে ফেলল কিশোর।
দশ লাখ, কি? ভুল শুনেছে কিনা বুঝতে চাইল যেন নীরা।
কি আবার, ডলার। দশ লাখ ডলার, কুপার বলল। তুমি জানতে চেয়েছ, কত চাই। আমার দাম আমি বললাম। পছন্দ হলে নাও, নাহলে বিদেয় হও।
না না, বিদেয় হব কেন!
চেক লিখতে শুরু করল নীরা।

.
খাইছে! এ জায়গার দাম দশ লাখ ডলার! ফিসফিস করে বলল মুসা।
হুঁ, বিশ্বাস তো আমারও হচ্ছে না, কাউন্টারের দিকে তাকিয়ে থেকে নিচের ঠোঁটে ঘন ঘন চিমটি কাটছে কিশোর।
চেকটা কুপারের হাতে তুলে দিল নীরা।
হাতে নিয়ে দেখল কুপার। দেখল, সত্যি দশ লাখ লিখেছে কিনা। তারপর ধীরে ধীরে ছিঁড়তে শুরু করল। ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে বাতাসে উড়িয়ে দিল। নীরার দিকে তাকিয়ে হাসল, রসিকতা করলাম। কিছু মনে কোরো না।
কুপারের কথা শেষ হওয়ার আগেই ঝটকা দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল নীরা। দুপদাপ পা ফেলে চলে গেল দরজার দিকে।
উফ, বাঁচলাম! স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ম্যাগি। আমি তো ভেবেছিলাম সত্যি সত্যি বুঝি তুমি…
দশ লাখ কেন, দশ কোটি টাকা দিলেও এ জায়গা বেচব না আমি, কুপার বলল।
এক্সকিউজ মী, কাউন্টারের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলল কিলোর, তার পেছনে এগোল মুসা। আপনাদের কথাবার্তা সব শুনে ফেলেছি। গাল আইল্যান্ডে প্রচুর জায়গা আছে নাকি নীরা লেভিনের?
প্রচুর কি বলছ? খড়খড় করে উঠল ম্যাগি। গাল আইল্যান্ডের অর্ধেকটাই তো তার।
আসলে, শুধরে দিল কুপার, জমি বেচাকেনার যে কোম্পানিতে সে কাজ করে, জায়গাগুলো তাদের। কোম্পানির মালিক ডগলাস কেইন। কারলুর শেষ ধারে, সৈকতের কিনারে তার বাড়ি। এত ধনী, যা ইচ্ছে তাই কিনতে পারে।
হ্যাঁ, ঘৃণায় নাক কুঁচকাল ম্যাগি। আর তার কেনা সম্পত্তির মধ্যে একটা হলো ওই নীরা লেভিন।

কিন্তু জায়গা বেচার জন্যে এত চাপাচাপি করছে কেন ওরা? জানতে চাইল কিশোর।
টাকা কামাইয়ের নতুন ধান্দা! রুক্ষ শোনাল ম্যাগির কণ্ঠ।
গুজব শোনা যাচ্ছে, কুপার জানাল, চিরকালই ক্যাসটিলো কীর দরিদ্র প্রতিবেশী এই গাল আইল্যান্ড। ক্যাসটিলোর পুরো পশ্চিম উপকূলটাই উপসাগরের মধ্যে ঢুকে রয়েছে। সবখানে রয়েছে সাদা সৈকত। সংস্কার করা হয়েছে ওগুলোর। নীরার মত উন্নয়নকারীরা আমাদের এই ছোট্ট দ্বীপটাকেও আরেকটা ক্যাসটিলো কী বানিয়ে ফেলতে চাইছে। আরেকটা গুজব আমি শুনেছি, ডগি, মানে ডগলাস নাকি গাল আইল্যান্ডটাকে একটা প্রাইভেট রিসর্ট বানানোর স্বপ্ন দেখছে। এখানে আসতে হলে তখন তোমাকে এটার মেম্বার হতে হবে। সরাসরি আর এ ভাবে চলে আসতে পারবে না।
কিন্তু তারপরেও, মুসা বলল, আপনার এই জায়গাটুকুর জন্যে দশ লাখ ডলার অনেক বেশি না?
তা তো বেশিই, কুপার বলল। রেস্টুরেন্টটা দিয়ে দিতে আপত্তি ছিল না আমার। কিন্তু বাড়িটা তো ছাড়তে পারব না। বহু বছর ধরে আছি। আমার মত আরও অনেকেই আছে। ভালবেসে ফেলেছি দ্বীপটাকে। থোক না সাধারণ, কিন্তু এ তো এখন বাড়ি। আর আমরা চাই, এখন যেমন আছে ঠিক তেমনই থাকুক দ্বীপটা। অন্য কিছু হলে আমাদের বিদেয় হতে হবে।
তারমানে আপনার ধারণা, কিশোর বলল, ডগলাস আপনাকে তাড়াতে চাইছে?
তোমার কি মনে হয়? ভুরু নাচাল কুপার। হঠাৎ করেই যদি কোন জায়গায় অকারণে অ্যাক্সিডেন্ট, চুরি-ডাকাতি এ সব শুরু হয়ে যায়...
এবং কিডন্যাপিং, যুক্ত করল মুসা।
হ্যাঁ, ওই মেয়েটার কথা শুনেছি, কপার বলল। আর আমি বাজি ধরে বলতে পারি, ওকে উদ্ধারের কোন চেষ্টাই করেনি ওই গেকোটা। মেয়েটার জন্যেই এলে নাকি?
মাথা ঝাঁকাল কিশোর। আমি কিশোর পাশা। ও আমার বন্ধু মুসা আমান। গত রাতে এসেছি আমরা। আমাদের আরও এক বন্ধু এসেছে, রবিন মিলফোর্ড। জিমার কি হয়েছে, খোঁজ-খবর নিচ্ছি আমরা...
বাইরে খোয়ার মধ্যে টায়ার ঘষার কর্কশ শব্দে ছেদ পড়ল কথায়। গাড়ির দরজা লাগানোর শব্দ হলো। ছুটে ঘরে ঢুকল রবিন।
সদ্য প্রিন্ট করে আনা ছবিগুলো তুলে দিল কিশোরের হাতে।
বাহ, বড় তাড়াতাড়ি দিল তো, কিশোর বলল।
চলো, টেবিলে গিয়ে বসে দেখা যাক, মুসা বলল।

এক্সকিউজ আস, কুপার, বলে টেবিলের দিকে হাঁটতে শুরু করল কিশোর। তিনজনে এসে বসল আবার আগের টেবিলটায়। রবিনের জন্যেও খাবারের অর্ডার দেয়া হলো।
ছবিগুলো টেবিলে ছড়িয়ে দেখতে শুরু করল ওরা।
এটা দেখো, বেশ স্পষ্ট, একটা ছবি দেখাল রবিন।
মিস্টার ব্রুকের কাঠের তৈরি কেবিন ক্রুজারের সামনে দাঁড়ানো জিনা আর ইভা। কিশোরের কাছে এটা সাধারণ ছবি মনে হলো।
ঘাটতে ঘাটতে একটা ছবিতে আটকে গেল তার চোখ। টেনে নিয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল, এটাই আমাদের দরকার!
হাতে নিয়ে তিনজনেই ভালমত ছবিটা উল্টেপাল্টে দেখতে লাগল। বোঝার চেষ্টা করল। ছবিতে আরেকটা গাড়ির পেছনের অংশ দেখা যাচ্ছে। মিস্টার ফ্রকের গাড়িতে বসে ভোলা। তাড়াহুড়া করে তোলার কারণে অস্পষ্ট রয়ে গেছে ছবির অনেক কিছু। বোঝা কঠিন।
ছবির এক জায়গায় আঙুল রাখল কিশোর। দেখো, এটা জেরি আঙ্কেলের গাড়ির জানালার ফ্রেম। এটা গাড়ির হুড।
আর এটা, রবিন বলল, সামনের গাড়িটার পেছনের বাম্পার।
ঠিক, একমত হলো কিশোর। আর এটা দেখো। সাদা-কালো স্টিকার। বাম্পারের বা সাইডে, নিচের দিকে লাগানো। কোন ধরনের আইডেন্টিফিকেশন নম্বর।
ভাড়া করা গাড়ির এ সব থাকে, উত্তেজিত হয়ে উঠল রবিন। কোম্পানির নিজস্ব একটা সিরিয়াল নম্বর দিয়ে রাখে গাড়িতে।
এ ছবিটা বড় করা দরকার, কিশোর বলল। আমি শিওর, এ গাড়িটা দিয়েই জিনাকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। এই কোড নম্বরটা যতক্ষণ না বুঝতে পারছি...।
খাওয়া শেষ করে আর দেরি করল না রবিন। উঠে দাঁড়াল। এনলার্জ ছবিটা নিয়ে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরে আসছি আমি।
বেরিয়ে গেল সে।
মুসার দিকে তাকাল কিশোর। আমরা আর বসে থেকে কি করব? চলো, একটু সৈকতের দিক থেকে ঘুরে আসি।
ওদিকে কেন? বলতে গেল মুসা।
তদন্ত করতে। ভুলে যাচ্ছ কেন, সৈকতে যাবার পথেই নিখোঁজ হয়েছে জিনা। বলা যায় না, জরুরী সূত্র পেয়ে যেতে পারি ওদিকে।
কুপারের বিল মিটিয়ে দিল কিশোর। রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে গাড়িতে চাপল দুজনে। স্টার্ট দিয়ে দক্ষিণে গাড়ি ঘোরাল মুসা। মেইন রোড ধরে সৈকতের দিকে চলল।

কি বলেছিলাম? দিনের বেলা দারুণ লাগবে! চতুর্দিকের চমৎকার প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে শিস দিতে শুরু করল কিশোর।

একটা মোড় ঘুরতেই সাদা সৈকত চোখে পড়ল। নারকেল আর উঁচ উঁচ রয়্যাল পামের সারি তিনদিক থেকে ঘিরে রেখেছে সৈকতটাকে। সারা দ্বীপে এখানেই কিছু মানুষের ভিড় দেখা গেল।

দিনটা কিন্তু পানিতে নামার মতই, লোভাতুর দৃষ্টিতে সাগরের নীল পানির দিকে তাকাল মুসা।

হাসল কিশোর। পরে। সাঁতার কাটার অনেক সুযোগ পাবে।

বালির প্রান্তে সারি দিয়ে থাকা গাছের ছায়ায় গাড়ি রাখল মুসা। গাড়ি থেকে নামল দুজনে।

শক্তিশালী ইঞ্জিনের গর্জন শুনে ফিরে তাকাল মুসা। পেছনের একটা সরু গলি থেকে বেরিয়ে এল একটা সাদা-কালো ট্রাক। তীব্র গতিতে ছুটে এল ওদের দিকে।

এক ধাক্কায় কিশোরকে রাস্তার কিনারে ফেলে দিয়ে নিজেও ঝাঁপ দিয়ে পড়ল মুসা। পাশ দিয়ে ছুটে যাওয়া ট্রাকটার গরম বাতাসের ধাক্কা লাগল গায়ে। দেখতে দেখতে ট্রাকটা মোড় নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল রাস্তার অন্য পাশে।

বড় বেশি তাড়াহুড়া মনে হচ্ছে, উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল কিশোর।

গা থেকে বালি, ঝাড়তে ঝাড়তে মুসা জিজ্ঞেস করল, ড্রাইভারের চেহারা দেখেছ?

না। দেখার সুযোগ পেলাম কোথায়? কাল রাতে যে গাড়িটা পিছু নিয়েছিল। আমাদের, ওইটা, তাই না?

তাই তো মনে হলো, মুসা বলল। তবে এবারও লাইসেন্স প্লেটটা দেখতে পারিনি। এমন করে ধুলোর ঝড় তুলে ছুটে গেল।

গাড়িটার ভাবনা আপাতত মাথা থেকে দূর করে দিল কিশোর। ইভা জানিয়েছে, সে আর জিনা এদিকের সৈকতে এলে পানির কিনারে একটা পামের জটলার কাছে বসে গায়ে রোদ লাগাত। কোথায় আছে সে-রকম জায়গা, খুঁজতে শুরু করল তার চোখ।

কিছুটা দূরে সৈকত ঘেঁষে একটা লাল রঙের বাড়ি দেখতে পেল। সামনে সবুজ লন। ওটাই সম্ভবত ডগলাস কেইনের বাড়ি।

শিস দিয়ে ফেলল মুসা। খাইছে! বাড়ি একখান!

দোতলা মূল বাড়িটা ছাড়াও একটা গেস্ট হাউস, পাঁচটা গাড়ি রাখার গ্যারেজ, আর অনেকগুলো কুকুরের ঘর আছে। গ্যারেজের পাশে দাঁড়ানো একটা কালো সিডান গাড়ি। খানিক দূরে কংক্রীটের প্যাডের ওপর রাখা একটা ছোট হেলিকপ্টার।

সাংঘাতিক ধনী তো লোকটা, কিশোর বলল।

সে তো বটেই, মুসা বলল। কুপাররা বলল না, যা কিনতে ইচ্ছে হয়, কেনার ক্ষমতা আছে ডগলাস কেইনের।
নিচু একটা দেয়ালের কাছে গিয়ে দাঁড়াল ওরা। সর্বসাধারণের জায়গা থেকে বাড়ির সীমানা ভাগ করা হয়েছে ওই দেয়াল দিয়ে। দেয়ালের দুই প্রান্ত থেকে ছোট ছোট খুঁটির সারি চলে গেছে সৈকতের ওপর দিয়ে পানির কাছে। খুঁটিগুলোতে শিকল লাগিয়ে বেড়া বানিয়ে আলাদা করে দেয়া হয়েছে সৈকতটা। শিকলের ভেতরটা ব্যক্তিগত বুঝিয়ে দিয়েছে।
কি ভাবছ? ভুরু নাচাল মুসা। চলে যাব নাকি ওপাশে?
আমি তো জানতাম, সৈকতের কোন মালিক থাকে না। তা ছাড়া ভেতরে ঢাকা বেআইনী কথাটা যখন কোথাও লেখা নেই, মুচকি হাসল কিশোর, ঢুকে পড়লামই বা।
সহজেই বেড়াটা ডিঙিয়ে চলে গেল মুসা। তার পেছনে রইল কিশোর। লম্বা লম্বা পায়ে হেঁটে যেতে লাগল ডগলাসের সৈকত ধরে। দেয়ালের গায়ে গেট দেখে ভেতরে ঢোকার জন্যে মোড় নিল।
যদি দেখে? মুসার প্রশ্ন।
কি আর করবে? কিশোর বলল আবার। বড়জোর তার সীমানা থেকে বেরিয়ে যেতে বলবে...
কথা শেষ না করেই থমকে দাঁড়াল সে। কুকুরের ডাক কানে এসেছে। কোন দিক থেকে এল?
জানার জন্যে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। বাড়ির সীমানায় পা দিতে না দিতেই দেখে মূল বিল্ডিংটার পাশ ঘুরে ছুটে বেরিয়ে আসছে তিনটা কুকুর। ভয়ঙ্কর ডোবারম্যান পিনশার। বিকট ভঙ্গিতে দাঁত বের করে গর্জন করছে চাপা স্বরে।
কিশোর! চিৎকার করে উঠল মুসা।
লন মাড়িয়ে ছুটে আসছে কুকুরগুলো। সামনের কুকুরটা, বিরাট একটা কালচে-বাদামী জানোয়ার সোজা ধেয়ে আসছে কিশোরের দিকে।

.
কিশোর, জলদি! বলে এক চিৎকার দিয়েই ঘুরে ছুটতে শুরু করল মুসা। লাফ দিয়ে গিয়ে উঠে পড়ল নিচু দেয়ালটায়। কিশোর কি করছে দেখার জন্যে ফিরে তাকাল।
প্রাণপণে দৌড়াচ্ছে কিশোর। কুকুরগুলোকে পেছনে ফেলার চেষ্টা করছে। কিন্তু পারছে না। পায়ের কাছে খটাস খটাস চোয়াল বন্ধ করছে সামনের কুকুরটা। যে কোন মুহূর্তে কামড় লেগে যাবে।

কিশোরও দেয়ালটার কাছে পৌঁছে গেল। লাফ দিয়ে উঠে পড়ল দেয়ালে। উঠতে সাহায্য করল তাকে মুসা। এক মুহূর্ত দেরি না করে লাফ দিয়ে উল্টো দিকের সৈকতে নেমে পড়ল দুজনে। বালি মাড়িয়ে ছুটতে লাগল।
কয়েক সেকেন্ড পরেই সৈকতে বেরোনোর গেট দিয়ে বেরিয়ে এল কুকুরগুলো। পেছন পেছন আসতে লাগল।
উপায় না দেখে আবার দেয়াল ডিঙিয়ে বাড়ির সীমানায় ঢুকে পড়ল ওরা। দেয়ালে বসে থাকা নিরাপদ নয়। নিচু। লাফ দিয়ে ধরে ফেলতে পারবে কুকুরগুলো। বাঁচতে হলে কোন ঘরেটরে ঢুকে পড়তে হবে।
লন ধরে ছুটতে ছুটতে চোখের কোণ দিয়ে বাদামী একটা ছায়া দেখতে পেল কিশোর। কাছে এসে গেছে সামনের কুকুরটা।
ঘুরে দাঁড়াল মুসা। বুঝে গেছে দৌড়ে পরাজিত করতে পারবে না ওই ভয়ানক জানোয়ারগুলোকে। অ্যালুমিনিয়ামে তৈরি একটা লন চেয়ার তুলে নিয়ে বাড়ি মারার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল।
অ্যাই, থাম! তীক্ষ্ণ কণ্ঠে আদেশ শোনা গেল।
চোখের পলকে দাঁড়িয়ে গেল কুকুরগুলো। একেবারে কাঁচুমাচু হয়ে তাকাল মনিবের দিকে। স্লাইডিং ডোর সরিয়ে বেরিয়ে এসেছে লম্বা একজন লোক।
রোদে বেরিয়ে এল নোকটা। ভুরু কুঁচকে রেখেছে। গোয়েন্দারা তার দিকে চোখ তুলে তাকাতেই হাসল। কিন্তু চোখের শীতলতা কাটল না তাতে।
দারুণ জিনিস পুষছেন, শুকনো কণ্ঠে বলল কিশোর।
ঠিকই বলেছ, লোকটা জবাব দিল। তোমাদের আগে যে লোকটা কাউকে কিছু না বলে বাড়িতে ঢুকেছিল, কামড়ে তাকে মেরেই ফেলেছিল আরেকটু হলে।
আমাকে কিছু করার আগে আমি ওর ঘাড়টা ভেঙে দিতাম, হাতের চেয়ারটা মাটিতে ফেলে দিল মুসা।
ডগলাস কেইন, মুসার কথা যেন শুনতেই পায়নি, এমন ভঙ্গিতে হাত বাড়িয়ে দিল লোকটা।
কিশোর পাশা, কেইনের হাতটা ধরে ঝাঁকিয়ে দিল কিশোর। ও আমার বন্ধু, মুসা আমান।
জানি, কেইন বলল।
সত্যি? কিশোর অবাক। কি করে জানলেন?
জানানোর লোক আছে আমার, প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল কেইন। তা গাল আইল্যান্ডে কি উদ্দেশ্যে?
আমাদের এক বন্ধু নিখোঁজ হয়ে গেছে এখান থেকে, জবাব দিল কিশোর। জরজিনা পারকার। আমাদের বিশ্বাস, কিডন্যাপ করা হয়েছে তাকে।

গুরুতর অভিযোগ, হাসি মুছল না লোকটার মুখ থেকে। কিন্তু রোদের মধ্যে গরমে দাঁড়িয়ে কেন? এসো, ভেতরে এসো। ঠাণ্ডা কিছু খাবে?
ঠাণ্ডা খাওয়ার তেমন কোন ইচ্ছে নেই কিশোরের, কিন্তু ঘরের ভেতরটা দেখার সুযোগটাও ছাড়তে চাইল না। রাজি হয়ে গেল।
জিনিসপত্র সব এলোমেলো হয়ে আছে, কিছু আবার ভেবে বোসো না। গোছানোর সময় পাই না, দামী দামী জিনিসপত্রে সাজানো একটা সান-রুম পেরিয়ে দুজনকে বিরাট রান্নাঘরে নিয়ে এল কেইন। সাদা বিশাল কাউন্টারটাতে অসংখ্য বাক্স আর বাদামী ব্যাগ পড়ে আছে। কিশোরকে সেগুলোর দিকে তাকাতে দেখে বলল, কাল সন্ধ্যায় একটা ছোটখাট পার্টি আছে।
ইনটারকমে কথা বলল কেইন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকল একজন লোক। উচ্চতা পাঁচ ফুট দশের কম হবে না। খোঁচা খোঁচা দাড়ি। উস্কখুস্ক চুল। পেশী যেন ফুটে বেরোচ্ছে। নড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে কিলবিল করে উঠছে হাতের পেশী।
এনডি টাওয়ার, গোয়েন্দাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল কেইন। এনডি, ও কিশোর পাশা। আর ও মুসা আমান।
আরেকটু হলেই ওদের চাপা দিয়ে ফেলেছিলাম আজ, এনডি বলল, যেন মস্ত বড় একটা রসিকতা। রাস্তায় হাঁটার সময় আরও সাবধান হওয়া উচিত তোমাদের।
যাই বলেন, দারুণ একখান ট্রাক কিন্তু আপনার, খোঁচাটা না দিয়ে ছাড়ল না কিশোর। রাস্তায় বেরোলেই দেখা হয়ে যায়...
বাদ দাও ওর কথা, কিশোরকে থামিয়ে দিল কেইন। এনডি, ওদের সোডা দাও।
বিশাল রেফ্রিজারেটর থেকে চার ক্যান সোডা বের করল এনডি।
বাপরে বাপ, কতবড় ফ্রিজ! প্রচুর খাবার ধরে নিশ্চয়, রেফ্রিজারেটরটার কাছে এগিয়ে গেল মুসা। রসে ভেজানো কালো আঙরের একটা ক্যান বের করল মুসা। খাবই যখন, ভাল করে খাই। ক্যানটা খুলতে গিয়ে ফ্রিজের দরজার দিকে চোখ পড়তেই স্থির হয়ে গেল তার হাত। বিদ্যৎ খেলে গেল যেন শরীরে।
কিশোর তখন সৈকতে ভোলা ইভা আর জিনার যুগল ফটোগ্রাফটা দেখাচ্ছে কেইনকে। মাত্র গত সপ্তাহে তোলা।
ছবিটার দিকে ঠিকমত তাকালও না কেইন। সরি। কখনও দেখিনি একে।
এনডিকে দেখাল কিশোর। আপনি দেখেছেন?
উঁহু, না দেখেই বলে দিল এনডি। পরে তাকাল ছবির দিকে।
আপনি শিওর?
মেয়েটা সুন্দরী, কোন সন্দেহ নেই। চোখে পড়ার মত। দেখলে ঠিকই মনে থাকত।
রেফ্রিজারেটরের কাছ থেকে ফিরে এল মুসা। উত্তেজনা চাপা দিতে কষ্ট হচ্ছে তার। কিশোরের দিকে তাকিয়ে ইশারা করতে যাবে, ফোন বাজল দোতলায়।

কোরি, ধরো তো! দরজার দিকে ফিরে চিৎকার করে বলল এনডি।
ছুটন্ত পায়ের শব্দ শোনা গেল। দৌড়ে যাচ্ছে কোরি।
কয়েক সেকেন্ড পর রান্নাঘরে উঁকি দিল আরেকটা লোক, বস, আপনার ফোন! মিয়ামি থেকে। এনডি যেমন লম্বা, কোরি তেমনি খাটো। হালকা-পাতলা। মাথার কালো লম্বা চুল ব্যাকব্রাশ করা। এনডির দিকে তাকিয়ে বলল, আমি কুকুরগুলোকে ঘরে আটকে রাখতে যাচ্ছি।
যাও, বলে ডাকল আবার কেইন, কোরি, শোনো। এদের নাম জানো? ও কিশোর পাশা। আর ও মুসা আমান।
অস্বস্তিভরা চোখে ওদের দিকে তাকাল কোরি, কিছু বলল না।
আপনারা মনে হচ্ছে সবাই খুব ব্যস্ত, কিশোর বলল কেইনের দিকে তাকিয়ে। আমরা বরং চলে যাই।
কিন্তু যাওয়ার কোন ইচ্ছে নেই কিশোরের। তার ধারণা, যত বেশি সময় থাকা যাবে, তত বেশি সূত্র পাওয়া যাবে। একটা ব্যাপারে ইতিমধ্যেই শিওর হয়ে গেছে- ওদেরকে ফলো করে আসা ট্রাকটার মালিক ডগলাস কেইন।
কেউ কিছু বলছে না দেখে থাকার আশা ত্যাগ করল কিশোর। সোডা খাওয়ানোর জন্যে ধন্যবাদ। আর কুকুরগুলোকে ডেকে ফেরানোর জন্যেও।
তোমাদেরকেও ধন্যবাদ, কেন ধন্যবাদ দিল, সে-কথাটা আর খোলসা করল কেইন। কোরি, তুমি আর এনডি ওদেরকে এগিয়ে দিয়ে এসো। দেখো, কুকুরগুলো যেন আর বিরক্ত করতে না পারে।
বাইরের ঘরে কিশোররা ঢুকেছে, এই সময় দরজার বাইরে নীরা লেভিনকে দেখা গেল।
তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল এনডি, কাঁচের স্লাইডিং ডোরের ছিটকানিটা খুলে দেয়ার জন্যে।
ভেতরে ঢুকে কিশোরদের দেখে থমকে দাঁড়াল নীরা। কোথায় যেন দেখেছি তোমাদের?...ও, কুপারের রেস্টুরেন্টে। আমার পিছু নিয়েছ কেন?
আপনার পিছু নেব কেন? হাসিমুখে জবাব দিল কিশোর। আপনার অনেক আগেই আমরা এসেছি।
মনে মনে রেগে গেলেও রসিকতার ঢঙে মুসা বলল, মনে তো হচ্ছে আপনিই আমাদের অনুসরণ করে এসেছেন।
হয়েছে, হয়েছে! আমার কথা তুলে নিলাম! নীরস স্বরে জবাব দিল নীরা।
একটা মেয়েকে খুঁজতে এসেছে ওরা এখানে, বিশ্রী একটা পরিস্থিতি তৈরি হতে যাচ্ছে দেখে তাড়াতাড়ি বলে উঠল এনডি। আমরা বলে দিয়েছি সে এখানে নেই। তাই ওরা এখন চলে যাচ্ছে।

ওদের দরজার বাইরে বের করে দিয়ে দরজা লাগিয়ে দিতে গেল এনডি, কিন্তু কি ভেবে দাঁড়িয়ে গেল কিশোর। ছবিটা বের করে জিনার ছবিতে আঙুল রেখে দেখাল নীরাকে। দেখুন তো, আপনি দেখেছেন নাকি?
ছবিটার দিকে তাকিয়ে আছে নীরা, কিশোর তার মুখের দিকে তাকিয়ে লক্ষ করছে কোন প্রতিক্রিয়া হচ্ছে কিনা।
তিন দিন হলো নিখোঁজ হয়েছে, কিশোর বলল। ভাবলাম, মিস্টার কেইন। কিংবা তাঁর কর্মচারীদের কেউ দেখে থাকতে পারে, সৈকতের এত কাছে বাড়ি যখন।
মেয়েটা সুন্দরী, নীরা বলল। হ্যাঁ, দেখেছি ওকে। সৈকতে ঘোরাফেরা করতে। দ্বিতীয় মেয়েটার সঙ্গে।
ওদের সঙ্গে আর কাউকে দেখেছেন?
উঁহু। ওদেরকেও দেখতাম না যদি তোক বেশি থাকত। এ সীজনে ট্যুরিস্ট খুব কম এসেছে। সৈকতে তোক প্রায় ছিলই না।
শুনলাম, টুরিস্ট আসা কমে যাওয়ার পেছনে নানা রকম কারণ রয়েছে। অ্যাক্সিডেন্ট, চুরি-ডাকাতি এ সব খুব বেড়ে গেছে দ্বীপে। ট্যুরিস্ট নেই, ব্যবসা নেই-ব্যবসায়ীরা বিপাকে পড়েছে। মিস্টার কুপারের মত।
ওই গাধাটার কথা আর বোলো না! রেগে উঠল নীরা। ও রকম একটা জায়গার জন্যে দশ লাখ ডলার হাতে পেয়ে যে ফিরিয়ে দেয় সে আস্ত বোকা!
কিংবা যে অত টাকা দেয়, খোঁচা মারতে ছাড়ল না কিশোর।
বরফের মত শীতল হয়ে গেল নীরার দৃষ্টি। এনডির দিকে তাকিয়ে কঠিন স্বরে বলল, বের করে দিয়ে এসো ওদের!
কিশোরকে বলার জন্যে তর সইছে না মুসার। ওদের বাইরে বের করে দিয়ে এনডি চলে যেতেই বলল, জানো, কি দেখে এলাম?
কি?
নানা রকমের ছবি চুম্বক দিয়ে আটকে রেফ্রিজারেটরের দরজা সাজিয়েছে।
ফ্রিজের দরজা ওরকম অনেকেই সাজায়, কিশোর বলল। তাতে অবাক হওয়ার কি আছে?
আছে। পারকার আঙ্কেলের ছবি যদি লাগানো থাকে ডগলাস কেইনের ফ্রিজের দরজায়, অবাক হবে না?
তারমানে জিনাই ছবিটা লাগিয়েছে ফ্রিজের দরজায়, কিশোর বলল।
হ্যাঁ। আর কে লাগাবে? মুসা বলল।
অথচ কেইন আর তার কর্মচারীগুলো স্রেফ অস্বীকার করল, জিনাকে দেখেনি। ছবির দিকে না তাকিয়েই। কিন্তু সে ছাড়া ওই ফ্রিজে আর কেউ লাগায়নি তার বাবার ছবি। কোন এক সুযোগে লাগিয়ে দিয়েছে। আমাদের জন্যে সূত্র। সে

জানে, ওর নিখোঁজ হওয়ার কথা শুনলে আসবই আমরা। ছবিটা ছাড়া আর কিছু আছে?
না। থাকলেও দেখিনি।
আবার ঢুকতে হবে ওই বাড়িতে, কিশোর বলল। জিনার নিরুদ্দেশের ব্যাপারে কেইনের হাত থেকে থাকলে ওই বাড়িতেই তাকে আটকে রেখেছে।
পার্টির সময় ঢুকে পড়লে কেমন হয়? সবাই ব্যস্ত থাকবে পার্টি নিয়ে, আমাদের কেউ লক্ষ করবে না।
ঠিক বলেছ, পরামর্শটা পছন্দ হলো কিশোরের। এখন চলো, মোটেলে ফিরে যাই। রবিনের ফেরার অপেক্ষা করি।
গাড়িতে উঠে ফিরে চলল ওরা।
ওয়াইল্ড পাম হোটেলের সামনে এনে গাড়ি থামাল মুসা। ভ্যানটার কাছে। ফিরে এসেছে রবিন। ওদের অপেক্ষাতেই ছিল।
ব্রেক করেও সারতে পারল না মুসা, ভেতর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এল রবিন। ১২ বাই ১৪ ইঞ্চি একটা ছবি বাড়িয়ে দিয়ে বলল, দেখো তো, কেমন হলো?
গাড়ি থেকে নেমে এসে ছবিটা হাতে নিল কিশোর। একবার দেখেই বলে উঠল, ঠিকই বলেছিলাম। আইডেন্টিফিকেশন নম্বরই এটা।
বেশির ভাগ নম্বরই অস্পষ্ট, বোঝা যায় না, রবিন বলল। দোকানের লোকটা বলল, এরচেয়ে ভাল করার আর সাধ্য নেই তার।
ঠিকই বলেছে, একমত হলো কিশোর, এর চেয়ে ভাল আর কেউই করতে পারবে না। শেষ তিনটে সংখ্যা পড়া যাচ্ছে এখন-তিন, দুই, ছয়।
মুখ তুলে তাকাল সে। এখন আমাদের পরবর্তী কাজ রেনটাল কার এজেন্সিকে ফোন করা। শেষ তিনটা সংখ্যা মেলে, এ রকম কটা গাড়ি আছে তাদের, খোঁজ নেয়া।
মোটেলের অফিস ঘরে ঢুকল ওরা।
ওদের দেখেই বলে উঠলেন মিস্টার ব্রুক, আর বোধহয় টিকতে পারলাম! কাউন্টারের ওপর একটা কাগজ রেখে ওদের দিকে ঠেলে দিলেন তিনি। পড়ো এটা।
কি? তুলে নিল কিশোর। রেডস্টার বুকিংস। কিসের কোম্পানি?
পড়ো না, তাহলেই বুঝতে পারবে। ওরা আমার কাস্টোমার জোগাড় করে দেয়। কাস্টোমারের সঙ্গে মধ্যস্থতা করে মোটেলে বুকিঙের ব্যবস্থা করে। বিনিময়ে কমিশন পায়।
কাগজটা জোরে জোরে পড়ল কিশোর: আমরা আর ওয়াইল্ড পাম মোটেলের সঙ্গে চুক্তিতে থাকতে পারছি না।

কি কারণ? জানতে চাইল রবিন।
সেটা তো আমিও বুঝতে পারছি না, ক্ষোভের সঙ্গে বললেন মিস্টার ব্রুক। ফোন করেছিলাম। জবাব দিল না। আমার কাছে একটা টাকাও পাবে না ওরা। সব পাওনা সময় মত দিয়ে দিয়েছি। কোন অভিযোগ নেই আমার বিরুদ্ধে। মোট কথা, কাজ না করার কোন কারণই নেই।
তারমানে কেউ ওদের কাজ করতে মানা করেছে, কিশোর বলল।
মনে হয়। প্রচুর টাকা খাইয়েছে, কিংবা অন্য কোন ভাবে চাপ সৃষ্টি করেছে। আমার ডক ভেঙে দিয়েছে, গাছ চুরি করেছে, এখন আমার ব্যবসার ওপর হাত দিয়েছে। জায়গাটা বিক্রির জন্যে মোটা টাকা দেয়ার প্রস্তাবও দিয়েছিল। আমি শুনিনি। এটাই সম্ভবত আমার অপরাধ। মনে হচ্ছে এরপর আমার বোটটার ওপর নজর দেবে। তাড়াতাড়ি ওটা মেরিনায় সরিয়ে না ফেললে-যেখানে পাহারার ব্যবস্থা আছে, ওটাও খোয়াতে হবে আমাকে।
আপনার বন্ধু কুপার কিন্তু রুখে দাঁড়িয়েছেন, কিশোর বলল। আমার মনে হয় আপনারও এত সহজে হাল ছেড়ে দেয়া উচিত হবে না।
বলার চেয়ে করা কঠিন, তিক্তকণ্ঠে জবাব দিলেন মিস্টার ব্রুক।
আজকের দিনটা অন্তত চুপ করে থাকুন। কোন সিদ্ধান্ত নেবেন না। বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। শান্ত মাথায় চিন্তা করার মত অবস্থা নেই।
মিস্টার ব্রুককে চুপ করে থাকতে দেখে কিশোর বলল, আমরা আপনাকে সাহায্য করব। আমার দৃঢ় বিশ্বাস জিনার কিডন্যাপের সঙ্গেও এ সবের কোন সম্পর্ক আছে। একটা রহস্যের সমাধান হলে আরেকটারও হয়ে যাবে।
কিছু কিছু যুদ্ধ আছে, যেগুলো করে কোন লাভ হয় না, মিস্টার ব্রুক বললেন। যাকগে, আমি কোন কথা দিতে পারছি না তোমাদেরকে।
অফিস থেকে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা। সঙ্গে এল ইভা।
কিশোরের দিকে তাকাল মুসা। জিজ্ঞেস করল, এখন কি করব?
চলো, গাড়িটার খোঁজ-খবর করা যাক, জবাব দিল কিশোর। তারপর খেতে যাব কুপারস ডিনারে।
চলো, আমিও যাব তোমাদের সঙ্গে ইভা বলল।
খোঁজাখুঁজি করতে অনেক সময় গেল। লাঞ্চ করতে কুপারস ডিনারে যখন গেল ওরা, লাঞ্চের সময় পেরিয়ে গিয়ে প্রায় ডিনারের সময় হয়ে গেছে।
মজার ব্যাপার, কাকতালীয় ভাবে ওখানেই সবুজ গাড়িটার খোঁজ পেয়ে গেল ওরা। তবে ওটাই আসল গাড়িটা কিনা, নিশ্চিত হতে পারল না। যদিও শেষ তিনটে নম্বর মিলে যায়। গাড়িটার রঙ সবুজ।

গাড়িটা যে নিয়ে এসেছে, সে.ও কুপারস ডিনারে কফি খেতে ঢুকেছে। লোকটার কালো চুল। চামড়ার রঙ মোমের মত ফ্যাকাসে।
লোকটা বেরিয়ে গেলে ম্যাগিকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল ওর নাম হারম্যান কেগ।
মাসখানেক হলো এসেছে, ম্যাগি জানাল। বিচিত্র স্বভাব। কারও সঙ্গে কথা বলে না। ঢোকে, চুপচাপ খেয়েদেয়ে বিল দিয়ে চলে যায়।
কোথায় থাকে, বলতে পারেন? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
শুনেছি পেলিক্যান লেন-এ,ম্যাগি বলল।
আমিও তাই শুনেছি, পেছনের ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে বলল কুপার। লোকটা চোর-ডাকাত হতে পারে বলেও ধারণা করা হচ্ছে।
শুধু কি চোর, ম্যাগি বলল। শুনলাম, শিকাগো থেকে এসেছে সে। ওখানে মানুষ খুন করে পালিয়েছে।
হ্যাঁ, এ গল্প আমিও শুনেছি, কুপার বলল। কেউ কেউ বলে, আসলে লোকটা একটা বিদেশী স্পাই। বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে নিজের দেশের লোকেরা তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। সেজন্যে গাল আইল্যান্ডে এসে লুকিয়ে আছে।
চোর-ডাকাত-ধুনী-স্পাই, যা-ই হোক, ইভা বলল, লোকটা যে খারাপ, দেখলেই বলে দেবে যে কেউ। আরও কিসের কিসের সঙ্গে জড়িত, কে জানে!
সেটা জানতে যাওয়ার জন্যে এখনও দিনের কিছু আলো অবশিষ্ট আছে, নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল কিশোর।
চলো তাহলে, লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল মুসা, ফরেন স্পাই মিস্টার হারম্যান কেগ জিরো জিরো সেভেনের সঙ্গে দেখাটা সেরেই আসি।

.

পেলিক্যান লেনে মোড় নেয়ার সময় গতি কমিয়ে ফেলল মুসা। অনেক জমিতে মলিন হয়ে আসা বিক্রয় হইবে সাইন দেখা গেল। একটা বাড়ি দেখা গেল, শূন্য, নির্জন, পরিত্যক্ত। গভীর মনোযোগে সব লক্ষ করছে কিশোর।
রাস্তার শেষ মাথা পর্যন্ত চলে যাও, মুসাকে বলল সে। হারম্যান কেগ কোন বাড়িতে আছে দেখে নেয়া যাক। তারপর খানিকটা সরে এসে রাস্তার দিকে মুখ করে গাড়ি পার্ক করো।
তাতে লাভটা কি? জিজ্ঞেস করল ইভা। অস্বস্তিতে ভরা কণ্ঠ।
মুচকি হাসল কিশোর। তাতে লাভটা হলো বিপদ দেখলে এক মুহূর্ত দেরি না করে পালাতে পারব।
একটা কটেজ টাইপের বাড়িতে থাকে কেগ। ছোট্ট একটা রঙচটা ডেকের মত বারান্দা বেরিয়ে আছে সামনের দরজার গোড়া থেকে। তার ওপরে চালা।

একপাশে বড় বড় জানালা বাড়িটার, একেবারে মেঝে থেকে ছাতে গিয়ে ঠেকেছে। ফ্ল্যামিঙ্গো পাসের দিকে মুখ করা। ক্যাসটিলো কীর চমৎকার দৃশ্যাবলীর অনেক কিছুই দেখা যাবে ওখানে দাঁড়ালে। দেখার জন্যেই বানানো হয়েছে ওভাবে জানালাগুলো। দেয়ালের রঙ নষ্ট হয়ে গেছে। চলটা উঠে উঠে বিশ্রী ক্ষতের মত দেখাচ্ছে। চড়া রোদে খুব সহসাই রঙের ছিটেফোঁটাও আর থাকবে না বোঝ যায়। কেবল চারপাশ ঘিরে থাকা পামের সারির কোন পরিবর্তন নেই, বাড়িটার রুক্ষতার মাঝে মোলায়েম প্রলেপ যেন ওগুলো।
প্রবালে তৈরি, অযত্নে নোংরা হয়ে থাকা গাড়ি বারান্দায় গাড়িটা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মুসাকে বলল কিশোর, তোমার জিরো জিরো সেভেন মনে হয় ঘরেই আছে।
গাড়ি ঘুরিয়ে রেখে ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল মুসা। দরজা খুলে লাফিয়ে নামল মাটিতে।
রবিন, কিশোর বলল, তুমি আর ইভা গাড়িতেই থাকো। পাহারা দাও। আমরা আসছি।
মুসাকে নিয়ে বাড়িটার দিকে রওনা হয়ে গেল সে। গাড়িটার কাছে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ দেখল কিশোর। তারপর দরজার দিকে এগোল।
টোকা দেয়ার আগেই খুলে গেল দরজা। দরজায় দাঁড়িয়ে আছে কেগ। তারমানে নজর রাখছিল সে।
কি চাও? ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল কেগ।
আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা ছিল, কিশোর বলল। যদি কিছু মনে না করেন।
আর যদি করি?
কেগের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে কিশোর বলল, ভেতরে আসব?
আমার গাড়ির কাছে কি করছিলে তোমরা? কেন বিরক্ত করছ শুধু শুধু? কয়েক ইঞ্চি পিছিয়ে গেল কেগ। ওদের মুখের ওপর দরজাটা যাতে বন্ধ করে দিতে পারে।
বেশি সময় নেব না, অনুরোধ করল কিশোর।
তোমাদের সঙ্গে কথা বলার কোন দরকার আছে বলে মনে হয় না, গোঁয়ারের মত বলল কেগ। তোমাদেরকে আমি চিনিও না।
আমি কিশোর পাশা। ও আমার বন্ধু মুসা আমান।
কেগকে চুপ করে থাকতে দেখে আবার বলল কিশোর, আমাদের এক বন্ধু নিখোঁজ হয়ে গেছে এ দ্বীপ থেকে।
প্যান্টের পেছনের পকেট থেকে জিনা আর ইভার যুগল ফটোটা বের করে দেখাল সে।

গভীর মনোযোগে ছবিটা দেখল কেগ। তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ করছে, কোন রকম প্রতিক্রিয়া হয় কিনা।
অবশেষে মুখ তুলে তাকাল কেগ। এদের কাউকেই দেখিনি আমি। চেনা তো দূরের কথা। দয়া করে এখন যাও তোমরা।
দেখুন, ব্যাপারটা সত্যি আমাদের জন্যে জরুরী, ছবিটা আবার পকেটে রেখে দিল কিশোর। তারপর আচমকা ঢিল ছুঁড়ে বসল অন্ধকারে। মুখ বন্ধ না রাখলে ক্ষতি করার হুমকি দিয়েছে আপনাকে ডগলাস কেইন, তাই না?
বেরোও! বেরোও আমার বাড়ি থেকে! চিৎকার করে উঠল কেগ।
কিন্তু নড়ল না কিশোর আর মুসা।
আমরা জানি, কেগের চিৎকারের পরোয়াই করল না কিশোর, জিনাকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। কি বলো, মুসা?।
হুঁ, মাথা ঝাঁকাল মুসা। আপনার গাড়িটার মত একটা গাড়ি দিয়ে।
আমার বিরুদ্ধে কিসের অভিযোগ আনতে চাইছ তোমরা, বুঝতে পারছি না, গলার জোর হারিয়ে ফেলেছে কেগ। সত্যি বলছি, ডগলাস কেইনের সঙ্গে কোন। সম্পর্ক নেই আমার। আমি প্রমাণ করে দিতে পারি, এখানে এ বাড়িতে দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টা বসে বসে আমি ছবি আঁকি, কেবল খাবার সময়টুকু বাদে। আমি একজন আর্টিস্ট। তারপর কিশোরদেরকে আর কিছু বলার কিংবা ভেতরে ঢোকার কোন সুযোগ না দিয়ে হঠাৎ পিছিয়ে গিয়ে দড়াম করে লাগিয়ে দিল দরজা।
মুসার দিকে তাকাল কিশোর। ভুরু নাচাল, কি বুঝলে? জবাবের অপেক্ষা না করে বলল, চলো, গাড়ির নম্বরটা লিখে নিই। চাকার খাঁজের ডিজাইনগুলোও দেখব।
গাড়ির কাছে এসে নোটবুকে নম্বরটা লিখে রাখল সে। তারপর পেলিক্যান লেন থেকে এঁকে আনা ডিজাইনগুলো বের করে মিলিয়ে দেখতে লাগল।
এই দেখো, মুসাকে দেখাল কিশোর। জিনার ফেলে যাওয়া গাড়ির কাছে যে সব দাগ পেয়েছি, তার সঙ্গে একটা দাগ মিলে যাচ্ছে।
ভ্যানের কাছে ফিরে এল দুজনে। কি কি জেনে এল, জানাল রবিন আর ইভাকে।
কেগকে কি মনে হলো? জিজ্ঞেস করল ইভা।
বুঝলাম না, ডাকাত দলের সর্দার, নাকি স্পাই, জবাব দিল মুসা। তবে ডগলাসের কথা শুনে চমকে গেছে, এটা ঠিক।
তার গাড়িটার দিকে এখন নজর রাখা দরকার, কিশোর বলল। এটাই আসল গাড়িটা কিনা, যেটাকে আমরা খুঁজছি, এ ব্যাপারে এখনও শিওর হওয়া যাচ্ছে না। খুঁজলে ওরকম তিনটে নম্বর মিলে যাবে বহু গাড়ির সঙ্গে। পুরো নম্বরটা ছাড়া নিশ্চিত হওয়া কঠিন। আর চাকার ডিজাইনও মিলে যাবে লক্ষ গাড়ির সঙ্গে,

কারণ কোম্পানি তো আর প্রতিটি চাকারই ডিজাইন বদল করে না। কেগের গাড়ির সঙ্গে এ সব মিলে যাওয়াটা কাকতালীয়ও হতে পারে।
খাইছে! গুঙিয়ে উঠল মুসা। খুঁজে বের করব কি করে তাহলে?
ফোনে কাজটা সারা যেতে পারে, কিশোর বলল।
তাহলে দায়িত্বটা আমাকে দিতে পারো, ইভা বলল। বসে বসে যত খুশি ফোন করতে পারব আমি।
কোন কাজ? বুঝতে পারল না মুসা। গাড়ির সবুজ রঙ আর শেষ তিনটে নম্বর মিলে যায়, এমন কটা গাড়ি আছে, রেন্টাল কোম্পানিতে ফোন করে জানার কাজ, বুঝিয়ে দিল কিশোর।
ইভাকেই দায়িত্বটা দিল সে।
মোটেলের কাছে আসতে কিশোর বলল, মনে হচ্ছে আঙ্কেল ব্রুকের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে কেউ।
সবাই দেখল, পার্কিং লটে একটা দামী বড় গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।
মুসা গাড়িটা পুরোপুরি থামানোর আগেই হ্যাঁচকা টানে দরজা খুলে লাফিয়ে নেমে গেল ইভা। দৌড় দিল অফিসের দিকে।
তার পেছনে ছুটল কিশোর আর রবিন। গাড়িটা রেখে আসতে সামান্য দেরি হলো মুসার।
অফিসের কাছাকাছি আসতে কানে এল মিস্টার ব্রুকের কণ্ঠ, এ জায়গা বিক্রির কোন ইচ্ছেই আমার ছিল না। কিন্তু আর তো কোন উপায়ও দেখতে পাচ্ছি না।
ঘরে ঢুকল তিন গোয়েন্দা। ইভা আগেই ঢুকে পড়েছে। ফিরে তাকাল নীরা লেভিন। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত জ্বলন্ত চোখে গোয়েন্দাদের দিকে তাকিয়ে থেকে আবার মিস্টার ব্রুকের দিকে ঘুরল।
ঠিক আছে, নয় লাখ ডলারই দিলাম, যান। দ্রুত চেক লিখে টেবিলের ওপর দিয়ে ঠেলে দিল মিস্টার ব্রুকের দিকে।
কিশোরের দিকে তাকালেন মিস্টার ব্রুক। খবর শুনেছ? আমার বোটটাও শেষ। মেরিনাতে সরানোর আর সুযোগ হয়নি। স্টার্ট দিতেই ইঞ্জিনে বিস্ফোরণ। তলা খসে গিয়ে তলিয়ে গেছে পানিতে। কোনমতে প্রাণে বেঁচে ফিরে এসেছি।
অস্ফুট শব্দ করে উঠল ইভা।
দীর্ঘ একটা মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল কিশোর। কি বলবে ভেবে পেল না।
মাথা নামালেন মিস্টার ব্রুক। ভগ্ন, বিধ্বস্ত একজন বুড়ো মানুষ। মুখ তুলে তাকালেন আবার নীরার দিকে। খুব যে বেশি দিচ্ছ না, সেটা তুমিও জানো। রিসর্ট বানিয়ে এর দশগুণ পয়সা তুলে নেবে খুব সহজেই। চেকটার দিকে তাকালেন না তিনি।

দশ কি বলছেন? না বলে আর পারল না কিশোর। বিশ-তিরিশ গুণ এসে যাবে পয়লা দুএক বছরেই। তার পরেরগুলো তো ফাউ। অনন্তকাল ধরে পেতেই থাকবে।
তাড়াতাড়ি একটা দলিল বের করে বাড়িয়ে দিল নীরা। নিন, সই করে দিন।
চাচা, খবরদার! চিৎকার করে উঠল ইভা। সই দেবে না বলে দিলাম!
না দিয়ে কি করব, বল? ক্লান্ত, শুকনো কণ্ঠস্বর। তোরা চলে গেলি। বোটটা খুইয়ে এলাম। এসে দেখি স্টেট রিসর্ট ইন্সপেক্টর বসে আছে। হুমকি দিয়ে গেছে, আগামী কয়েক সপ্তার মধ্যে যদি প্রয়োজনীয় সংস্কার করাতে না পারি, মোটেলে তালা লাগিয়ে দেবে। বলে গেছে, নতুন আইন নাকি হয়েছে এ ব্যাপারে। কত আর লড়াই করব?
দিন, সইটা দিয়ে ফেলুন, নীরা বলল। স্টেট ইন্সপেক্টর অন্যের ঘাড়ে চাপুক।
আঙ্কেল ব্রুক, শান্তকণ্ঠে বলল কিশোর, সই করার আগে দলিলটা ভালমত পড়ে নিন। প্রয়োজন মনে করলে উকিলকে ডেকে আনুন।
এই ছেলে, তুমি থামো! ধমকে উঠল নীরা। বেশি ফড়ফড় কোরো না। আগে আমাদের বেচাকেনা শেষ হয়ে যাক, তারপর যত খুশি পরামর্শ দিয়ে। নইলে খারাপ হবে বলে দিচ্ছি।
পাত্তাই দিল না কিশোর। আঙ্কেল ব্রুক, একটা ফোন করব।
হাত নেড়ে পাশের ঘরটা দেখিয়ে দিলেন মিস্টার ব্রুক।
চলে গেল কিশোর।
ইভা বলল, চাচা, দোহাই তোমার জায়গাটা বিক্রি কোরো না!
দেখি তো দলিলটা? কেউ বাধা দেয়ার আগেই টান মেরে মিস্টার ব্রুকের হাতের নিচ থেকে তুলে নিল রবিন।
অ্যাই, দেখো! চিৎকার করে উঠল নীরা। ভাল হবে না...
দলিল সম্পর্কে তেমন কোন ধারণা নেই রবিনের, তবে ওদের ব্ল্যাক ফরেস্টের বাড়িটা কেনার সময় কিছু কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছে। পড়তে শুরু করল সে।
কলমটা টেবিলে নামিয়ে রেখে অপেক্ষা করতে লাগলেন আঙ্কেল ব্রুক। নীরার দিকে তাকাল, পড়তে আর আপত্তি কি? পড়ুক না। ভেতরে যদি কোন রকম গণ্ডগোল করে না রাখো, অত ভয় পাচ্ছ কেন?
ঠাস করে ব্রীফকেসের ডালা বন্ধ করল নীরা। মুচকি হাসল রবিন। এতটাই প্রতিক্রিয়া হলো নীরার, এমন ভঙ্গি করল, চমকে গিয়ে এক পা পিছিয়ে গেল ইভা।
বহুত নাক গলাচ্ছ সব কিছুতে! রবিনের দিকে তাকিয়ে গজগজ করতে লাগল নীরা।

হুমকি দিচ্ছেন? রাগ দমাতে পারছে না মুসা।
পাশের ঘরের দিকে তাকাল রবিন। দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে কিশোরকে। ফোনে কথা বলছে। নোটবুকে কি যেন লিখে নিয়ে ফোন রেখে দিল। ফিরে এল অফিসে।
ব্যুরো অভ কমার্শিয়াল ইন্সপেকশনে ফোন করেছিলাম, জানাল সে। স্টেট রিসর্ট ইন্সপেক্টর সেজে যে এসেছিল, সে ভুয়া লোক। নভেম্বরের আগে এ মোটেল ইন্সপেকশনে আসার কোন ইচ্ছেই নেই কর্তপক্ষের।
কিন্তু আইডেনটিটি দেখিয়েছে লোকটা, বিশ্বাস করতে পারছেন না মিস্টার ব্রুক।
ওটাও নকল, দেখুনগে।
মিথ্যে কথা! তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল নীরা। রাগ দমন করতে পারল না আর। এত অল্প সময়ে এত খোঁজ নিতে পারার কথা নয় তোমার। আমি এখন ফোন করলে ঠিক ওরা বলবে, তুমি কোন ফোনই করোনি। তোমাকে চিনতেই পারবে না ওরা।
যান, গিয়ে করে দেখুন তাহলে, সরে জায়গা করে দিল কিশোর।
নাক গলানো বিছুর দল! গালি দিয়ে উঠল নীরা। রবিনের হাত থেকে দলিলটা কেড়ে নিয়ে, টেবিল থেকে চেকটা তুলে ব্রীফকেসে ভরল। তারপর গর্ট গট করে রওনা হলো দরজার দিকে।
বেরোনোর আগে ফিরে তাকাল, ভেবো না পার পেয়ে যাবে। বাঘের মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছ তোমরা। এর চেয়ে অনেক বড় বড় ঘাগু লোককে...
কথাটা শেষ করল না নীরা। সমস্ত রাগ যেন গিয়ে পড়ল মিস্টার ককের ওপর। পিস্তলের মত তার দিকে আঙুল তাক করে চেঁচিয়ে চলল, বুড়ো হাঁদা কোথাকার, সুযোগ দিয়েছিলাম, সদ্ব্যবহার করোনি। এখনও সময় আছে, মনস্থির করে বেচে দাও জায়গাটা। পরে এমন অবস্থা হবে, বেচার মত কিছু আর অবশিষ্ট থাকবে না।

.

নীরা চলে যাওয়ার পর আরও কিছুক্ষণ কথা বলল ওরা। আলোচনা করল ব্যাপারটা নিয়ে। তারপর কিশোর বলল, আজ আর কিছু করার সময় নেই। রেন্টাল কোম্পানির অফিসও নিশ্চয় বন্ধ হয়ে গেছে। কাল সকালে যা করার করব।
আগের রাতে ভালমত ঘুমাতে পারেনি, সেদিন তাই সকাল সকাল শুয়ে পড়ল ওরা।
পরদিন সকালে ঝরঝরে শরীর নিয়ে ঘুম ভাঙল কিশোরের। মোটেলের অফিসে এসে দেখে কাজে লেগে গেছে ইভা। তাকে সাহায্য করছে রবিন।
অঘটনের যেন শেষ নেই, কিশোরকে বলল ইভা। কাল রাতে চাচার এক বন্ধু ফোন করেছিল। হিবিসকাস ড্রাইভে থাকে। তার সান-রমের জানালা ভেঙে ঘরে

ঢুকে কে নাকি এয়ারকুলারটা নষ্ট করে দিয়ে গেছে। গেকোর কাছে রিপোর্ট করা হয়েছে। সে বলেছে কোন দুষ্ট ছেলের কাজ।
আহা, পুলিশ অফিসার বটে! দরজার কাছ থেকে বলে উঠল মুসা। ধীর পায়ে ঘরে ঢুকল।
তারমানে ওই ভদ্রলোকের জায়গাটার ওপরও নজর পড়েছে ওদের! আর কি খবর? জানতে চাইল কিশোর।
এয়ারপোর্টে কার রেন্টাল এজেন্সিতে ফোন করেছিলাম, ইভা জানাল।
কোন খোঁজ পেলে?
গাড়িটার বর্ণনা দিয়ে জানতে চাইলাম, কার কাছে ভাড়া দিয়েছে।
কি বলল? আগ্রহে সামনে গলা বাড়িয়ে দিল কিশোর।
রবিনের দিকে তাকাল ইভা। আবার ফিরল কিশোরের দিকে। হাসল। বলেছে, হারম্যান কেগ নামে শিকাগোর এক বীমার দালাল গাড়িটা ভাড়া নিয়ে গাল আইল্যান্ডে গেছে। স্টিকারে লেখা যে সিরিয়াল নম্বরটা দিল, সেটার শেষ তিনটে নম্বরও মিলে গেছে।
নিচের ঠোঁটে জোরে একবার টান দিয়ে ছেড়ে দিল কিশোর। চিন্তিত ভঙ্গিতে আনমনে বিড়বিড় করল, শিকাগোর একজন বীমার দালাল গাল আইল্যান্ডে এসে ছবি আঁকা শুরু করল কেন?
ছবি যে আঁকছে তার কি প্রমাণ? প্রশ্ন তুলল মুসা। ওটা ওর মুখের কথা। নিজের চোখে তো আর তাকে আঁকতে দেখিনি আমরা।
আমার মনে হচ্ছে, আরেকবার তার বাড়িতে যাওয়া উচিত আমাদের, কিশোর বলল। আমাদের জানতে হবে জিনা কেন কেগের গাড়ির ছবি তুলেছে।
ও হ্যাঁ, তোমাদের বলতে ভুলে গেছি-বীমার কথায় মনে পড়ল, ইভা বলল, চাচা গেছে মেইনল্যান্ডে। ওখান থেকে ফোন করেছিল। তোমাদের বলতে বলেছে তোমাদের ভ্যানের কাঁচটা সারিয়ে নেবে চাচা। যখন পারো টাকাটা দিয়ো। আর এখানে তার গাড়িটা ব্যবহার করতে বলেছে তোমাদেরকে। ওটার কিছু মেরামতি আছে। তাই নিতে ভরসা পায়নি। রাস্তাঘাটে যদি খারাপ হয়ে যায়। তোমাদেরটাই নিয়েছে।
মেইনল্যান্ডে গেছেন কেন? কোন জরুরী কাজ?
হ্যাঁ। বোটটার বীমা করানো ছিল। বীমা কোম্পানির সঙ্গে কথা বলতে গেছে।
আচ্ছা। ঠিক আছে, কিশোর বলল, আমাদের আগেই যদি আঙ্কেল ব্রুক ফিরে আসেন, তাঁকে আমাদের ধন্যবাদ জানিও, কাঁচটা ঠিক করে আনার জন্যে।
অফিস থেকে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা। মিস্টার ব্রুকের গাড়িটাতে চড়ল। ড্রাইভিং সীটে বসল মুসা।

পেলিক্যান লেনে পৌঁছে একটা নির্জন বাড়ির পেছনে গাড়ি রেখে বেরিয়ে এল ওরা। মুসাকে গাড়ির পাহারায় রেখে রবিনকে নিয়ে এগোল কিশোর।
খালি একটা জায়গা পেরিয়ে কেগের বাড়ির দিকে এগোনোর সময় আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকাল সে। ধূসর মেঘের আড়ালে লুকোচুরি খেলছে সকালের সূর্য। সাগরের দিক থেকে আসছে দমকা বাতাস। নুয়ে নুয়ে পড়ছে পাম আর পাইনের মাথা।
ঝড় আসবে, কিশোর বলল।
সুবিধেই হবে তাতে, রবিন বলল। চুরি করে আমরা বাড়িতে ঢুকতে গেলে ঝড়বৃষ্টির মধ্যে লোকের চোখে পড়ার সম্ভাবনা কম।
কেগের বাড়ির পাশের জায়গাটাতে পৌঁছে দাঁড়িয়ে গেল কিশোর। বড় একটা ঝোঁপের আড়ালে থেকে বাড়িটাতে চোখ বোলাল।
গাড়িটা নেই, রবিনকে জানাল সে।
কি করব?
তুমি এখানেই থাকো। আমি আরও কাছে গিয়ে দেখে আসি।
বেশি ঝুঁকি নিতে যেয়ো না, সাবধান করে দিল রবিন।
মাথা নুইয়ে এক দৌড়ে বাড়ি আর ঝোঁপের মাঝের খালি জায়গাটুকু পার হয়ে এল কিশোর। কটেজের একটা বড় জানালার পাশে এসে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল।
কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে, কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে জানালা দিয়ে লিভিং রুমের ভেতরে উঁকি দিল সে। মেঘে ঢাকা আকাশের প্রতিবিম্ব পড়েছে কাঁচের ভেতর। পুরোপুরি ঢাকা পড়ে গেছে এখন সূর্য। বেরোচ্ছে না আর। দেখতে দেখতে এতটাই ঘন মেঘ জমে গেছে, সকালটাকে লাগছে সূর্য ডোবা সন্ধ্যার মত।
সাবধানে সরে এসে ডেকে ওঠার দুই ধাপ সিঁড়ির প্রথমটাতে পা রাখল কিশোর। মচমচ্ করে উঠল কাঠের তক্তা। কিন্তু সেটা চাপা পড়ে গেল মেঘ ডাকার শব্দে।
দ্বিধা করল এক মুহূর্ত। মাথার ওপর বাতাসে কাত হয়ে যেন ঝুলে রয়েছে একটা নারকেল গাছের মাথা। দরজার দিকে এগোল সে। সামান্য ফাঁক হয়ে আছে পাল্লা। আস্তে করে ঠেলে সেটা আরও ফাঁক করে ঢুকে পড়ল ভেতরে।
পা টিপে টিপে চলে এল ডাইনিং রুমে। ওখানে দাঁড়িয়ে কান পাতল ভেতর থেকে শব্দ আসে কিনা শোনার জন্যে। ঘরের এক প্রান্তে সিংকের কল খোলা, ক্রমাগত পানি পড়ার শব্দ হচ্ছে। কিন্তু মানুষের সাড়া পাওয়া গেল না।
কি খুঁজতে এসেছে জানে না সে। কিন্তু খুঁজতে আরম্ভ করল।
কেগ ছবি আঁকে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে হাত মোটেও ভাল নয়। কতগুলো বাজে ছবি এঁকেছে।

খানিকক্ষণ খোঁজাখুঁজি করে বেরোতে যাবে, এই সময় ডাইনিং রুমের টেবিলে একটা পরিচিত জিনিস চোখে পড়ল। একটা হাতঘড়ি। তুলে নিয়ে উল্টে দেখল। কাজে এতটাই মনোযোগ, বাইরে যে গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ হচ্ছে, শুনতে পেল না। কিন্তু রবিন ঠিকই শুনেছে। গাড়িটা পেলিক্যান লেনে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ইঞ্জিনের শব্দ কানে এসেছে তার। উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল কিশোরের জন্যে। ঝোঁপটার কাছ থেকে সরে এল একটা আঙুরের ঝাড়ের কাছে। চিৎকার করে ডেকে সাবধান করে দেবে কিনা কিশোরকে বুঝতে পারছে না। কাছে চলে এসেছে গাড়িটা। গাড়ির চালকও তার ডাক শুনতে পাবে।

রবিন কিছু করার আগেই ড্রাইভওয়েতে ঢুকে পড়ল গাড়ি।

কড়াৎ করে বাজ পড়ল সাগরের পানিতে। বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা পড়তে আরম্ভ করল। সবুজ গাড়িটার দিকে দৌড় দিল সে। গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল কেগ। মুহূর্তে বৃষ্টি বেড়ে গিয়ে মুষলধারে পড়া শুরু হলো।

কেগের হাতে লম্বা কালো একটা জিনিস।

ধড়াস করে উঠল রবিনের বুক। রাইফেল নাকি?

কেগ! চিৎকার করে ডাকল রবিন।

গাড়ির কাছে স্থির হয়ে গেল কেগ। রবিনের দিকে ঘুরতে গিয়েও ঘুরল না সে। অর্ধেক ঘুরেছিল, ঝটকা দিয়ে পুরো ঘুরে গেল আবার দরজার দিকে। কারণ কটেজের দরজা দিয়ে ডেকে বেরোতে দেখে ফেলেছে কিশোরকে।

তুমি! রাগে চিৎকার করে উঠল কেগ। তুমি এখানে কি করছ?

কিশোর, সাবধান! রবিনও চিৎকার করে উঠল। ওর হাতে রাইফেল!

বাজ পড়ল আবার। তার চিৎকার ঢাকা পড়ে গেল বাজের শব্দে। বাজটা পড়ল ডেকের কাছের নারকেল গাছটার মাথায়। মাথাটা চিরে দিল এমন করে, যেন মাখনে ছুরি চালাল। একটা অংশ ভেঙে গেল কাণ্ড থেকে। ডিগবাজি খেতে খেতে পড়তে লাগল ডেকের ওপর। কিশোর যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, ঠিক সেইখানে।

.

কিশোর! বলে চিৎকার দিয়ে উঠল রবিন। আতঙ্কিত চোখে তাকিয়ে আছে গাছের নিচে কুঁকড়ে পড়ে থাকা কিশোরের দেহটার দিকে।

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলে হবে না। কেগকে ঠেকাতে হবে। মুসা অনেক দূরে। ডাকলেও শুনবে না। শুনলেও লাভ হবে না। ও আসতে আসতে অনেক দেরি হয়ে যাবে। যা করার তার নিজেকেই করতে হবে। কেগের পা সই করে ঝাঁপ দিল রবিন। তাকে নিয়ে পড়ল মাটিতে।

আরে কি করছ! কি করছ! ছাড়ো না! চেঁচাতে লাগল কেগ। আমার পর্দা টানানোর রডগুলোর সর্বনাশ করে দেবে তো। বাঁকা হয়ে যাবে!

কেগের পাশে মাটিতে পড়ে থাকা আঁটি বাঁধা জিনিসগুলোর দিকে ভালমত নজর দিল এতক্ষণে রবিন। পর্দা টানানোর রড? বোকা হয়ে গেছে।
এক মাস আগে অর্ডার দিয়ে এসেছিলাম বানিয়ে রাখার জন্যে, গোঁ-গোঁ করে বলল কেগ।
কেগের ঘ্যানর ঘ্যানরে কান দিল না রবিন। রাইফেল নয় জানার সঙ্গে সঙ্গে একটা বড় দুশ্চিন্তা মগজ থেকে নেমে গেল। লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। কিশোরকে গাছের নিচ থেকে বের করতে হবে।
মুখে যা-ই বলুক, ওকে বের করতে রবিনকে ঠিকই সাহায্য করল কেগ। ধরাধরি করে গাছের মাথাটা সরাল কিশোরের ওপর থেকে। প্রথমে ডেকের ওপরের চালায় পড়েছিল বলে রক্ষা। চালায় পড়ে তারপর কিশোরের ওপর পড়েছে। সরাসরি পড়লে কোমর ভাঙত, কিংবা অন্য কিছু হত। মোট কথা আঘাতটা হত মারাত্মক।
ঘাড়ে সামান্য ব্যথা পেয়ে বেহুশ হয়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছু হয়নি। জ্ঞান ফিরতেও সময় লাগল না।
ভালই আছি আমি, ঘাড় ডলতে ডলতে বলল কিশোর। ভিজে গোসল করা ছাড়া খারাপ আর কিছুই হয়নি। কাঁধে কিছু আঁচড় আর ছ্যাঁচা লেগেছে, নারকেলের ডগা ধারাল তো...
ঝাপটা দিয়ে গেল প্রচণ্ড ঝোড়ো বাতাস। বেড়ে গেল বৃষ্টির বেগ। ক্রমেই খারাপের দিকে মোড় নিচ্ছে ঝড়। ঘন ঘন বাজ পড়ছে। ক্রমাগত কালো মেঘের বুক চিরে ছুটে যাচ্ছে বিদ্যুতের লকলকে শিখা।
এখানে থাকা বিপজ্জনক, কিশোর বলল। বাজটা তখন গাছের মাথায় না পড়ে আমার মাথায় পড়লেই গেছিলাম।
ভেতরে তো যাবই, এতক্ষণে ভাষা খুঁজে পেল যেন কেগ। তবে তার আগে তোমাকে অ্যারেস্ট করানো দরকার।
মাটি থেকে রডগুলো তুলে আনল সে। একসাথে বাঁধা ছিল বলে বৃষ্টির মধ্যে দুর থেকে রাইফেলের মত মনে হয়েছে রবিনের কাছে। রাইফেলের মতই উঁচু করে ধরল এখন কেগ। বেআইনী ভাবে আমার সীমানায় ঢুকেছ তোমরা। দরজা ভেঙে আমার ঘরে ঢুকেছ।
না, দরজা ভাঙিনি, প্রতিবাদ জানাল কিশোর। দরজাটা খোলাই ছিল।
বুঝলাম, হুড়কোটা ভাঙা ছিল। তাই বলে অন্যের ঘরে ঢুকে পড়বে নাকি? চুরি করতে ঢুকেছিলে?
নাহ্, হাসিমুখে মাথা নাড়ল কিশোর। চুরি করার মত কিছু নেই ঘরে। কতগুলো পচা ছবি। ওগুলো কে নেয়।

কিন্তু কিশোরের রসিকতায় নরম হলো না কেগ। রেগে উঠল, তোমাকে আমি পুলিশে দেব!
ডেকের ওপর উঠে পড়ল আবার কিশোর। বৃষ্টি কম লাগে। মিস্টার কেগ, আপনাকে একটা কথা বলি। আপনি যে গাড়িটা চালাচ্ছেন, আমাদের বন্ধুকে কিডন্যাপ করতে ব্যবহার করা হয়েছে সেটা।
ফালতু কথা বোলো না! ধমকে উঠল কেগ।
প্রমাণ আছে আমাদের কাছে।
কি প্রমাণ?
ঘটনার সময়কার একটা ছবি। তাতে সহজেই প্রমাণ করা যাবে আপনার গাড়িটাই ব্যবহার করা হয়েছিল। এক মুহূর্ত থেমে কেগকে খবরটা হজম করার সময় দিল কিশোর। তারপর বলল, সুতরাং আমাকে ধরিয়ে দেয়ার জন্যে পুলিশ ডাকলে আমরাও ছেড়ে দেব না আপনাকে
তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কেগকে লক্ষ করছে কিশোর।
ডেকে উঠে পড়ল কেগ। সরে গিয়ে রেলিঙে হেলান দিয়ে দাঁড়াল, হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গিতে।
আমি কাউকে কিডন্যাপ করিনি।
তাহলে কে করেছে?
আমি জানি না।
আপনার গাড়িটা যে ব্যবহার করা হয়েছে এটা তো ঠিক?
একটা মুহূর্ত চুপ করে থেকে ভাবল কেগ, বলবে কিনা দ্বিধা করছে। তারপর হঠাৎ বলে উঠল, গাড়িটা চুরি হয়ে গিয়েছিল।
চুরি! সমস্বরে বলে উঠল রবিন আর কিশোর।
হ্যাঁ, পাঁচদিন আগে। সৈকতের ধারে আমি তখন ছবি আঁকছিলাম।
চুপ করে তাকিয়ে রইল কিশোর।
ছবি আঁকা শেষ করে বাড়ি ফেরার জন্যে গাড়ির কাছে গেলাম, কে বলল। গাড়িটা যেখানে রেখেছিলাম সেখানে পেলাম না। চাবি আমার পকেটেই ছিল। তারমানে তার ছিঁড়ে বিকল্প উপায়ে স্টার্ট দিয়েছে।
পুলিশকে জানিয়েছেন?
না।
আপনি যে সত্যি কথা বলছেন, বিশ্বাস করব কি করে?
আমার মুখের কথাই বিশ্বাস করতে হবে তোমাদের।
হু। গাড়িটা আবার ফেরত পেলেন কি করে?

প্রথমে ভেবেছিলাম কোন ছেলে-ছোকরার কাজ। গাড়ি চুরি করে নিয়ে গেছে খানিকক্ষণ চালিয়ে মজা করার জন্যে। কিন্তু থানার সামনে দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় দেখি সামনের চত্বরে দিব্যি দাঁড়িয়ে আছে আমার গাড়িটা। নো-পার্কিং জোনে গাড়ি পার্ক করার অপরাধে তাতে একটা টিকেট লাগিয়ে দিয়েছে হেরিং গেকো।

তারমানে এমন কোথাও ফেলে গিয়েছিল চোর, যেখানে গাড়ি পার্ক করা বেআইনী, কিশোর বলল। টিকেটটা আছে আপনার কাছে?

না, তিক্ত কণ্ঠে জবাব দিল কেগ। ফাইনের টাকাটা সহ টিকেটটা গেকোর ডাকবাক্সে ফেলে দিয়েছি। মেজাজ তখন কি পরিমাণ তিরিক্ষি হয়ে গিয়েছিল কল্পনা করতে পারবে না। গাড়ি চুরি গেল আমার। হেঁটে শহরে ফিরতে হলো। ফিরে দেখি থানায়, এবং টিকেট লাগানো। কড়কড়ে বিশটা ডলার গচ্চা দিতে হলো। এখানে কি কোন আইন-কানুন আছে!

থাকবে। খুব শীঘ্রি।

দেখো, কেগ বলল, আমি কোন উৎপাত চাই না। বিশ্বাস করো, কাউকে কিডন্যাপ করিনি আমি। কে করেছে তা-ও জানি না। বিশ্বাস করো আর না-ই করো, গাড়িটা যে চুরি হয়েছিল আমার, এ কথা ঠিক।

ঠিক আছে, করলাম, কিশোর বলল। এখন ডাকুন পুলিশকে। আমাকে অ্যারেস্ট করানোর জন্যে। আপনার কথা আপনি বলবেন। আমাদের কথা আমরা বলব। দেখি পুলিশ কারটা বিশ্বাস করে।

বাদ দাও পুলিশ! বিরক্তির চূড়ান্ত হয়ে গেছি আমি। ওই গেকো গিরগিটিটার কাছ থেকে যত দূরে থাকা যায়, ততই ভাল।

তা বটে, মাথা ঝাঁকাল কিশোর। ওর ছায়া মাড়ালেও ঝামেলা!

প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ল আবার কাছাকাছি কোথাও। বিদ্যুৎ-শিখার আকাশ জুড়ে ছুটে বেড়ানোর বিরাম নেই। বজ্রপাতের ভয়ে ঘরে ঢুকে পড়ল কেগ।

কি বুঝলে? কিশোরের দিকে তাকিয়ে চাপাস্বরে জিজ্ঞেস করল রবিন।

কিডন্যাপিঙের সঙ্গে জড়িত থাক বা না থাক, লোকটা কোন কিছু লুকাচ্ছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই আমার।

কিশোরের জবাব শুনে চোখ বড় বড় করে তাকাল রবিন।

পকেট থেকে ঘড়িটা বের করে দেখাল কিশোর। চিনতে পারো?

কয়েকটা সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে জবাব দিল রবিন, জিনারটা না? জন্মদিনে পারকার আঙ্কেল যেটা দিয়েছিলেন তাকে?

মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

কোথায় পেলে? জিজ্ঞেস করল রবিন।

কেগের ঘরে। টেবিলের ওপর। নিশ্চয় জিনাই রেখে গেছে। এত বেশি জিনিসপত্র ছড়ানো রয়েছে, ওসবের মধ্যে এটা আলাদা করে চোখে পড়েনি কেগের। এখন আমাদের জানতে হবে কেগের সঙ্গে কেইনের সম্পর্কটা কোথায়?
বৃষ্টির বিরাম নেই।
আকাশের দিকে তাকাল একবার কিশোর। চলো, আর এখানে কোন কাজ নেই।
মুসা নিশ্চয় অবাক হয়ে যাচ্ছে, এতক্ষণ কি করছি আমরা ভেবে।
.
প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে শহরে ফিরে চলেছে ওরা।
গাড়ি চালাচ্ছে মুসা। ফুল স্পীডে চলছে উইন্ডশীল্ড ওয়াইপার। বৃষ্টি মেশানো ঝড়ো বাতাসের ঝাপটা বার বার এসে আঘাত হানছে গাড়ির গায়ে। সঙ্গে করে নিয়ে আসছে বালির কণা, কুটো-পাতা।
পেলিক্যান আর কারলুর কোণে এনে গাড়ি রাখল মুসা। কুপারের রেস্টুরেন্টের কাছে। খাওয়া দরকার।
বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্যে মাথা নুইয়ে একদৌড়ে ঘরে ঢুকল তিনজনে। খাবারের অর্ডার দিয়ে অপেক্ষা করছে এই সময় দরজায় দেখা দিল ডেপুটি গেকো। ভারিক্কি চালে এগিয়ে এসে দাঁড়াল ওদের টেবিলের কাছে।
তোমাদেরকেই খুঁজছি। তোমাদের সঙ্গে কথা আছে আমার... কিশোর আর রবিনের কাদায় মাখামাখি হয়ে থাকা কাপড়ের দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল গেকো। কাদার মধ্যে কুস্তি করে এসেছ নাকি?
উঁহু, মাথা নাড়ল কিশোর। বৃষ্টির সময় সাগরকে কেমন লাগে, দেখতে গিয়েছিলাম।
গোটা দুই হাঁচি দিল গেকো। হাত ঢোকাল প্যান্টের পকেটে। দেখাদেখির কাজ আমিও খানিকটা করে এসেছি। ওয়াইল্ড পাম মোটেলে গিয়েছিলাম। আরেকটা নৌ-দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে ওরা।
দুর্ঘটনা? কুঁচকে গেল কিশোরের ভুরু। ওরা ঘটাবে কেন? ইঞ্জিনের মধ্যে বোমা পেতে রেখে এসেছিল কেউ, স্টার্ট দিলেই যাতে ফাটে।
খুব বেশি জেমস বন্ডের ছবি দেখো, একটা টুল টেনে নিয়ে ওদের কাছে বসে পড়ল গেকো।
কেন, আপনার কি ধারণা? পেট্রোলের গ্যাস জমে ইঞ্জিনটা উড়ে গেছে?
বাস্তব কথা ভাবলে সেটাই স্বাভাবিক, মহাবিজ্ঞের ভঙ্গিতে জবাব দিল গেকো। পুরানো বোট। পুরানো ইঞ্জিন। এ ধরনের ঘটনা তো ঘটতেই পারে।
হু, তা তো পারেই, ফোড়ন কাটল কুপার। কিছুদিন ধরে যে হারে স্বাভাবিক সব দুর্ঘটনা ঘটছে দ্বীপটাতে, আর কিছুদিন এ ভাবে চললে এর নাম বুক অভ ওয়ার্ল্ড

রেকর্ডসে উঠে যাবে।
ওগুলো যে দুর্ঘটনা নয়, এমন কোন প্রমাণ আছে তোমার কাছে? খেঁকিয়ে উঠল গেকো।
সে-রাতে আমার প্রোপেন ট্যাংকটা যে ফুটো হয়ে গেল, ওটার সঙ্গে যুক্ত টিউবগুলোকে টেনে খুলে বাকাচোরা করে ফেলে রাখা হলো, সেটাও নিশ্চয় দুর্ঘটনা?
র‍্যাকুনে করেছে, খোঁচা মারল কিশোর।
কিংবা অ্যালিগেটরে, গেকো বলল। সারা বছরই জ্বালায় ওগুলো, জানোই তো।
তারমানে আপনি বলতে চান, জিনাকেও ব্যাকুনে কিংবা অ্যালিগেটরে ধরে নিয়ে গেছে? শীতল কণ্ঠে বলল কিশোর।
মনে করিয়ে দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ, টুলের ওপর ঘুরে বসে ওদের মুখোমুখি হলো গেকো। ওয়াইল্ড পামে ব্রুকের ভাতিজির কাছে শুনলাম খবরটা।
ইভা? শঙ্কিত হয়ে উঠল কিলোর। আবার কোন খারাপ খবর শোনাবে!
হ্যাঁ, হাসিমুখে মাথা ঝাঁকাল গেকো। কিডন্যাপিং-ফিডন্যাপিং কিছু না। তোমাদের বান্ধবী এখন মহানন্দে আরেক জায়গার সমুদ্র সৈকতে রোদ পোয়াচ্ছে।
কি করে জানলেন?
চিঠি পাঠিয়েছে। ওয়াইল্ড পামের ঠিকানায়। বিশ্বাস না হলে নিজেরাই গিয়ে দেখে এসো।
খাবার তৈরি হয়ে গেছে। নইলে তক্ষুণি উঠে চলে যেত ওরা। কোনমতে নাকে-মুখে খাবারগুলো খুঁজে, কুপারের বিল মিটিয়ে দিয়ে গাড়ির দিকে ছুটল তিনজনে।
ওয়াইল্ড পামের সামনে মুসা গাড়িটা রেখেও সারতে পারল না, ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলে লাফিয়ে নেমে পড়ল কিশোর। দৌড় দিল অফিসের দিকে।
কিশোরকে দেখেই যা বোঝার বুঝে নিল ইভা। ডয়ার থেকে নীরবে বের করে দিল চিঠিটা। পোস্টকার্ডে লিখে পাঠিয়েছে জিনা।
জিনার হাতের লেখা, তাতে কোন সন্দেহ নেই, দেখতে দেখতে বলল কিশোর। দুই পাশে এসে দাঁড়িয়েছে মুসা আর রবিন। সিল-ছাপ্পর দেখে বলল, দুদিন আগে মিয়ামি থেকে পোস্ট করা হয়েছে।
আমাকে না জানিয়ে মিয়ামিতে চলে গেছে জিনা, বিশ্বাসই হচ্ছে না আমার! ইভা বলল। অথচ আমরা এদিকে...
যদি গিয়েই থাকে, ইচ্ছে করে যায়নি, আমি শিওর, কিশোর বলল। তা ছাড়া এটা কিডন্যাপারদের চালবাজিও হতে পারে। ওকে দিয়ে লিখিয়ে আমাদের বোঝাতে চেয়েছে লং আইল্যান্ড থেকে নিজে নিজেই মিয়ামিতে চলে গেছে সে। আর যদি জিনাই পাঠিয়ে থাকে, তাহলে কার্ডটা পাঠানোর পেছনে কোন উদ্দেশ্য আছে

তার। কিছু একটা বোঝাতে চেয়েছে। ভোলা কার্ডে খোলাখুলি লিখলে শত্রুদের চোখে পড়ে যেতে পারে। সেজন্যে ইঙ্গিত দিয়ে বোঝাতে চেয়েছে। ও লিখেছে: জায়গাটা দারুণ। গতবারের চেয়ে ভাল লাগছে। ইস, তোমরা থাকলে খুব মজা হত। জিনা। মুখ তুলে তাকাল সে। বুঝতে পারছ কিছু?

বিমূঢ়ের মত মাথা নাড়ল মুসা, কিছু না। অতি সাধারণ একটা চিঠির মতই লাগছে।

রবিনের দিকে তাকাল কিশোর, তুমি বুঝেছ?

ভাবছে রবিন। হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল মুখচোখ। গতবার মিয়ামিতে যায়ইনি সে! লং আইল্যান্ডে গিয়েছিল!

ঠিক, হাসি ফুটল কিশোরের মুখে। এটা দিয়েই বোঝাতে চেয়েছে যে যা লিখেছে, তার অন্য অর্থ আছে। কার্ডের ছবিটার ক্যাপশন লিখেছে দেখো: মিয়ামির সমুদ্রতীর কখনও ঘুমায় না। চোখের পাতা সরু করে তাকাল কিশোর। এর মধ্যেও সূত্র আছে নিশ্চয়। ছবিটার কোন মানে না-ও হতে পারে অবশ্য। হাতের কাছে যা পেয়েছে তাতেই লিখে পাঠিয়ে দিয়েছে। সূর্যাস্তের দৃশ্য কিংবা ডলফিনের ছবিওয়ালা কার্ড পেলেও হয়তো তাতেই লিখত।

কি জানি! চিন্তিত ভঙ্গিতে কপাল চুলকাল রবিন। সূত্রের পর সূত্র দিয়ে যাচ্ছে জিনা। গাড়ির ছবি, কেইনের বাড়িতে ফ্রিজে তার বাবার ছবি, কেগের বাড়িতে ঘড়ি, এখন এটা! তারপরেও এগোতে পারছি না আমরা!

আজ রাতে কেইনের বাড়িতে ঢুকব আমরা, পার্টির সময়, কিশোর বলল। পুরো বাড়িটাতে খুঁজব। যদি ওখানে জিনাকে না পাই, তাহলে শিওর হয়ে যাব, ওকে মিয়ামিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সমুদ্রতীরের কোন বাড়িতে আটকে রেখেছে। মিয়ামির সমুদ্রতীর কখনও ঘুমায় না-কথাটা লেখার এই একটাই অর্থ হতে পারে!

ঝড়বৃষ্টি থেমে গেছে। সকালের মত নেই আর। তবে আকাশে ভারী মেঘ জমে আছে এখনও। যে কোন সময় আবার শুরু হবে।

কেইনের বাড়ির সামনে এসে গাড়ি থামাল মুসা। সে আর কিশোর এসেছে। রবিনকে রেখে এসেছে মোটেলে, ইভার সঙ্গে। কেইনের বাড়িতে ঢুকলে বিপদ ঘটার একশো ভাগ সম্ভাবনা। সবাই আটকা পড়লে উদ্ধারের উপায় থাকবে না আর। রবিনকে রেখে এসেছে সে-কারণে। বলে এসেছে, রাত বারোটার মধ্যে ফিরে না গেলে প্রথমে যেন মিয়ামি পুলিশের কাছে যায় রবিন, কারণ ডেপুটি হেরিং গেকোকে দিয়ে কোন কাজ হবে না। তারপর রকি বীচে ফোন করে ওমর ভাইকে।

কারলু রোডে সারি সারি নানা ধরনের চকচকে গাড়ির পেছনে ভ্যানটা রাখল মুসা। একপাশে কেইনের বাড়ির দেয়াল। ওটা ঘেঁষে রাখা হয়েছে গাড়িগুলো।

বাড়ির ভেতর থেকে ভেসে আসছে হাসি আর বাজনার শব্দ।
সাগরের দিক থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে আসছে যেন ঘন কুয়াশা। ফ্লাডলাইট জ্বেলে দিতে হয়েছে কেইনকে। তারপরেও সুবিধে হচ্ছে না। বাড়িটার খুব সামান্য জায়গাই স্পষ্ট হয়েছে তাতে। সত্তিই বোধ করছে কিশোর। কুয়াশার মধ্যে গাছপালার ভেতরে সহজে ওদেরকে চোখে পড়বে না।
পার্টির উপযুক্ত পোশাক পরে এসেছে দুজনে। উল্টোপাল্টা পোশাকে এসে মেহমানদের নজরে পড়ে গেলে ধরা পড়ে যাবে সহজেই। কিশোর পরেছে স্পোর্ট কোট আর স্ল্যাকস। মুসা গায়ে দিয়েছে উজ্জ্বল রঙের প্রিন্টওয়ালা শার্ট। পরনে জিনস।
ভেতরে ঢোকার আগে শেষবারের মত সাবধান, করল কিশোর, দেখো, কারও সন্দেহ হয়, এমন আচরণ কোরো না। সবাই যাতে ভাবে আমরাও দাওয়াত পেয়েই এসেছি।
হাসল মুসা, তা করব না। তবে সামনে খাবার পড়ে গেলে খানিকটা তো চেখে দেখতেই হবে, কি বলল? না খেলেই বরং গেস্টরা সন্দেহ করবে।
কোন রকম ঝুঁকি নেবে না। আমাদের উদ্দেশ্য হবে কাজ সেরে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিরাপদে বেরিয়ে যাওয়া।
ড্রাইভওয়ে ধরে আগে আগে হেঁটে চলল কিশোর। পেছনে মুসা।
সামনের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন লোক। কিন্তু তাদের কাউকেই কেইনের দুই সহকারীর মত লাগল না। মেহমানই হবে ওরা।
সামনের হলঘরে ঢুকে লোকজন দেখে ফিসফিস করে কিশোরের কানের কাছে বলল মুসা, দুশো জনের কম হবে না।
এনডি আর কোরির ব্যাপারে সতর্ক থাকো, কিশোর বলল।
কোথায় ওরা? দেখছি না তো।
এখানে দেখা যাচ্ছে না বলে যে বাড়িতে নেই, সেটা ভাবা ঠিক হবে না। ওখানে দাঁড়িয়েই হলঘর আর লিভিং রুমের সমস্ত জায়গায় চোখ বোলাল কিশোর। নীরা লেভিনের সামনেও পড়া চলবে না আমাদের।
রান্নাঘরের দিকে এগোল দুজনে। চারপাশে নজর রাখতে লাগল মুসা, কিশোর এগিয়ে গেল রেফ্রিজারেটরটার দিকে।
ছবিগুলো ভালমত দেখে এসে বলল, ছবিটা নেই।
সরিয়ে ফেলল নাকি? রেফ্রিজারেটরটার দিকে তাকাল মুসা। সবই ঠিকঠাক আছে, কেবল ছবিটা সরিয়েছে।
তারমানে নজরে পড়ে গেছে ওদের, কিশোর বলল। ঠিক আছে, এক কাজ করা যাক। ভাগাভাগি হয়ে গিয়ে খুঁজতে থাকি আমরা। জিনা এ বাড়িতে আছে কিনা,

বোঝা দরকার। থাকলে কোথায় আছে জানতে হবে। তুমি এই তলাতেই খোজো, আমি দোতলায় যাচ্ছি। ফোন বেজেছিল ওখানে, মনে আছে? কেইনের অফিস-টফিস থাকতে পারে।
সিঁড়ির দিকে এগোল সে। কে যেন ডেকে বলল তাকে, আই, কোথায় যাচ্ছ? কেইন এখনই চলে আসবে।
তার একটা মেসেজ আছে, সেটাই দিতে যাচ্ছি, ফিরে তাকাল না কিশোর। ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে। দ্রুত ভাবনা চলেছে মগজে। একটা সেকেন্ডও আর দেরি না করে একেক লাফে কয়েকটা করে সিঁড়ি টপকে দোতলায় উঠে এল।
শূন্য হলঘর। ডানে ঘুরল সে। শেষ মাথায় চলে এল। তিনটে বেডরুম আর একটা বাথরুম পেরোল। ওগুলোতেও কেউ নেই।
মুসা তখন লিভিং রুমের এক মাথার দিকে এগিয়ে চলেছে। শেষ মাথার হলে এসে পৌঁছল। ওটা ধরে এগোলে মস্ত একটা বাথরুম, গোটা দুই বেডরুম আর। একটা বসার ঘরে যাওয়া যায়।
একটা বেডরুমে ঢুকে বড় একটা দেয়াল আলমারি খুলে দেখল। বাথরুমে খুঁজল। নেই কেউ। ঘরটাও কেউ ব্যবহার করে বলে মনে হলো না।
দ্বিতীয় বেডরুমটাও প্রথমটার মতই। তবে আলমারিটা একেবারে খালি নয়। ছোট একটা বাক্স পাওয়া গেল। তাতে জাপানী ভাষায় কি যেন লেখা। তার ভেতরে কতগুলো ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশ দেখা গেল। ডায়োড, ট্রানজিস্টর, কম্পিউটারের চিপস এ সব জিনিস।
শেষ ঘরটায় বড় একটা টেবিলে প্রচুর জিনিসপত্র ছড়ানো। তার মধ্যে লাল একটা সানগ্লাস দেখতে পেল সে। জিনিসটা পরিচিত মনে হলো। অবিকল এ রকম একটা সানগ্লাস আছে জিনার।
তুলে নিয়ে পকেটে ভরতে যাবে ঠিক এই সময় দরজার কাছ থেকে শোনা গেল এনডি টাওয়ারের কণ্ঠ, অ্যাই, কে তুমি?
সানগ্লাসটা প্রথমে পকেটে ভরল মুসা। তারপর আস্তে করে ঘুরে দাঁড়াল। আমি একজন গেস্ট!
তুমি! চিৎকার করে উঠল এনডি। আবার ঢুকেছ এখানে!
খেপা ষাঁড়ের মত মাথা নিচু করে ছুটে গেল মুসা। মাথা দিয়ে প্রচণ্ড গুতো মারল এনডির পেটে। ওর ভয়ানক শক্ত খুলির এ রকম আঘাতে বাঘ কাবু হয়ে যাওয়ার কথা, আর এনডি তো মানুষ হুঁক করে একটা শব্দ বেরোল মুখ থেকে। মেঝেতে পড়ে গেল সে।
কোন দিকে আর না তাকিয়ে হলরুম ধরে দৌড় মারল মুসা।

ওপরতলায় কিশোর তখন এক বেডরুম থেকে আরেক বেডরুমে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু জিনার কোন চিহ্নই চোখে পড়ছে না তার।
হল পার হয়ে বাঁয়ে ঘুরল। বাকি আছে দুটো ঘর। ওগুলো দেখা হয়ে গেলেই শেষ হয়ে যাবে। হলের শেষ মাথার দিকে পা বাড়াল সে। কানে এল একটা শীতল কণ্ঠ, …আরে না, এখন না! আমি আগে আসি। পার্টি শেষ হলেই রওনা দেব। কি বললাম, বুঝেছ?
ডগলাস কেইনের গলা চিনতে পারল কিশোর।
পা টিপে টিপে দরজাটার দিকে এগিয়ে গেল সে। কান পাতল দরজায়।
তোমার কাজ হলো, তীক্ষ্ণ হয়ে যাচ্ছে কেইনের গলা, আমি যা বলি অক্ষরে অক্ষরে শুনবে। কমও না, বেশিও না।
কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ থাকার পর চেঁচিয়ে উঠল কেইন, তুমি কি আমার কথা বুঝতে পারছ? ফোনে কথা বলছে সে, বোঝা গেল। আমি বলছি আমি এসে যা করার করব। দেখে যেন দুর্ঘটনা মনে হয়। সেজন্যেই তো ওদের খবর দিতে বললাম তোমাকে। দিয়েছ, না তা-ও দাওনি?
গভীর আগ্রহে দম বন্ধ করে শুনছে কিশোর। তার মনে হচ্ছে, ওদের কেসটার সঙ্গে এ সব কথার কোন সম্পর্ক আছে।
আরে গাধাটাকে তো কোনমতেই বোঝানো যাচ্ছে না! আরও জোরে চিৎকার করে উঠল কেইন। তোমার কি ধারণা দুনিয়াসুদ্ধ লোকের মাথায় তোমার মত গোবর পোরা? তুমি গায়েব করে দেবে, আর সবাই একবাক্যে বলবে-আহা, আহা, গায়েব হয়ে গেল! কেউ কোন খোঁজ নেবে না? এখন বুঝতে পারছি ড্যাগো কেন তোমাকে আমার কাজ করতে পাঠিয়েছে। পাঠিয়ে আসলে জানে বেঁচেছে। তোমার হাঁদাপনা ও আর সহ্য করতে পারছিল না। দেখো, পিকো, তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, আমি ড্যাগোর মত তোমাকে আর কারও ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করব না। আমাকে খুশি করতে পারলে ভাল, না পারলে কানটা ধরে বের করে দেব। আর আমি যাদের বের করে দিই, পরে তাদের কি হয় জানো তো? হয় অ্যালিগেটরের পেটে যায়, নয়তো হাঙরের খাবার হয়। এইমাত্র তুমি যে পদ্ধতিতে গায়েব করতে চাইলে।
দড়াম করে ফোনটা রেখে দিল কেইন। এত জোরে আছাড় দিয়ে রাখল, দরজার বাইরে দাঁড়িয়েও শুনতে পেল কিশোর।
নিচতলার চেঁচামেচি মনোযোগ সরিয়ে নিল তার। হট্টগোলটা হঠাৎ করে বেড়ে গেছে। কেইনের কানেও যাবে নিশ্চয়। দেখতে বেরোতে পারে। তাড়াতাড়ি দরজার কাছ থেকে সরে যেতে লাগল সে। কিন্তু কোথাও লুকিয়ে পড়ার আগেই ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এল কেইন। কিশোরকে দেখে ফেলল।

অ্যাই! কে, কে! চিৎকার করে উঠল কেইন। ও, তুমি! এনডি! কোরি! জলদি এসো! দৌড়ে এসে কিশোরের কোট চেপে ধরল সে।
কিন্তু ধরে রাখতে পারল না। দৌড় মারল কিশোর। হ্যাঁচকা টান লেগে কাপড় ছিঁড়ে গেল। ফিরেও তাকাল না সে। সিঁড়ির দিকে ছুটল। কানে আসছে কেইনের চিৎকার। লোকজন ডাকছে সে।
জমে উঠেছে পার্টি। কিন্তু হট্টগোল যেন চরমে পৌঁছাল হঠাৎ করেই। ব্যাপারটা ভাল লাগল না কিশোরের।
পালাচ্ছে! পালাচ্ছে! কানে এল চিৎকার।
প্রথমে ভাবল, তার কথাই বলা হচ্ছে। চারপাশে তাকিয়ে কাউকে না দেখে বুঝল অন্য কারও কথা বলছে। জানালার বাইরে চোখ পড়তে দেখল লন ধরে সৈকতের দিকে ছুটে যাচ্ছে একটা ছায়ামূর্তি। কুয়াশার জন্যে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না।
মুসা!
পেছন পেছন দৌড়াচ্ছে এনডি। বিপদে পড়ে গেছে মুসা।
বিপদে কিশোর নিজেও পড়েছে।
থামাও! থামাও ওকে! সিঁড়ির মাথায় শোনা গেল কেইনের চিৎকার।
সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে গেস্টদের ওপর নজর বোলাল একবার কিশোর। এদিক ওদিক তাকিয়ে সবাই বোঝার চেষ্টা করছে গণ্ডগোলটা কোথায়।
কিন্তু কিশোরকে তাড়া করতে গিয়ে যখন দুজন গেস্টকে ধাক্কা মেরে একটা কাঁচের বাক্সের ওপর ফেলে দিল কেইন, হাসির হুল্লোড় উঠল।
হাসিটা থেমে গেল গুলির শব্দে।
ঝট করে একটা টেবিলের আড়ালে বসে পড়ল কিশোর। পরক্ষণেই বুঝল, শুলিটা তাকে লক্ষ্য করে করা হয়নি। শব্দ এসেছে বাইরে থেকে। মুসার জন্যে দুশ্চিন্তায় বুকের মধ্যে ধড়াস করে উঠল তার।
লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল আবার। কোন দিকে না তাকিয়ে সোজা দরজা লক্ষ্য করে দিল দৌড়।
মুসা তখন সৈকতে পৌঁছে গেছে। আলগা বালি মাড়িয়ে ছোটা ভীষণ কঠিন। এগোনোও যায় না। তা ছাড়া অল্পেতেই পরিশ্রান্ত হয়ে যেতে হয়।
পেছনে তাড়া করে আসছে এনডি। বালিতে সে-ও দৌড়াতে পারছে না ঠিকমত। কিন্তু তার হাতে পিস্তল আছে। আরেকবার গুলি করল সে।
মুসার কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল গুলি।
চিৎকার করে উঠল এনডি, থামো বলছি! পরের বার কিন্তু মাথা সই করে মারব!।
মুসা বুঝল, দুবারই ইচ্ছে করে মিস করেছে এনডি। তাকে থামানোর জন্যে।

লাফ দিয়ে চত্বরে নেমে মুসারা যেদিকে গেছে সেদিকে ছুটল কিশোর। সামনে লনের মধ্যে চেয়ার পাতা। সরানোর সময় নেই। লাফ দিয়ে একটা চেয়ার পেরোল।
কিছুদূর এগোতেই দেখল, খুব বেশি দূরে যেতে পারেনি মুসা। দাঁড়িয়ে গেছে। পেছনে এগিয়ে যাচ্ছে এনডি। নিশ্চয় পিস্তলের ভয় দেখিয়ে থামিয়ে দেয়া হয়েছে মুসাকে।
পেছন থেকে এনডিকে কাবু করতে ছুটল কিশোর। কিন্তু তার পেছনেও লোক লেগে গেছে। কোরি ছুটে আসছে ধরার জন্যে। তার পেছনে চেঁচাতে চেঁচাতে আসছে কেইন।
ছুটতে ছুটতেই ফিরে তাকাল একবার কিশোর। বুঝল, আর ছুটে লাভ নেই। ধরা পড়ে গেছে। কারণ, কেইন আর কোরি-দুজনের হাতেই উদ্যত পিস্তল।
তা ছাড়া, কুকুরগুলোকেও ছেড়ে দেয়া হয়েছে। বাঘের মত গর্জন করতে করতে ছুটে আসছে ওগুলো।
.
কজওয়ে ধরে বেরিয়ে এল গাড়িটা।
তারপর যে রাস্তাটা ধরল, দেখেই বুঝতে পারল কিশোর, ফ্লোরিডার বিখ্যাত অ্যালিগেটর অ্যালির দিকে যাচ্ছে।
মুসাকে জানাল সে-কথা।
বিড়বিড় করে মুসা বলল, এত রাতে অ্যালিগেটরগুলো এখন ঘুমিয়ে থাকলেই বাঁচি।
অ্যাই, চুপ! কোন কথা নয়, সামনের প্যাসেঞ্জার সীট থেকে ধমক দিল কোরি।
গাড়ি চালাচ্ছে এনডি।
পেছনের সীটে হাতকড়া লাগিয়ে বসিয়ে রাখা হয়েছে মুসা আর কিশোরকে। হাতকড়ার একটা মাথা হাতের কব্জিতে, অন্য মাথা গাড়ির ফ্রেমে আটকানো। কোনমতেই ছুটানো সম্ভব নয়, একমাত্র চাবি ছাড়া। কাজেই ছাড়া পাওয়ার চেষ্টা না করে চুপচাপ সুযোগের অপেক্ষায় বসে রইল দুজনে।
সৈকত থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে প্রথমে বাগানের একটা ছাউনিতে আটকে রাখা হয়েছিল ওদের। গেস্টরা যাতে না দেখে। নিশ্চয় ওদের কাছে গিয়ে কৈফিয়ত দিয়েছে কেইন, দুটো চোর ঢুকেছিল চুরি করতে। পালিয়ে গেছে।
পাটির পর গাড়িটাতে তুলে দেয়া হয়েছে ওদের। দ্বীপের বাইরে দূরে কোথাও সরিয়ে দেয়া হচ্ছে। জিনাকেও বোধহয় এ ভাবেই সরিয়ে ফেলা হয়েছে। কেইনের। গাল আইল্যান্ডের বাড়িতে যে নেই জিনা, এ ব্যাপারে শিওর এখন ওরা। তবে নেয়া হয়েছিল ওখানে, তার প্রমাণ যেফ্রিজারেটরে লাগানো ছবিটা, আর টেবিলে

রাখা চশমা। হয়তো ওঘরেই প্রথমে আটকে রাখা হয়েছিল ওকে। সেজন্যেই চশমাটা ফেলে আসতে পেরেছে।
চলতে চলতে গাড়ির গতি কমে গেল হঠাৎ। কারণটা জানার জন্যে দুজনেই। বাইরে তাকাল ওরা। অতি সরু একটা রাস্তায় গাড়ি ঢুকিয়ে দিল এনডি। দুই পাশেই বিশাল জলাভূমি। অন্ধকারে পানি চেনা যাচ্ছে না। তবে আছে। ওগুলোতে কোন কোন প্রাণীর বাস, কল্পনা করে শিউরে উঠল কিশোর। জোক আছে। নানা ধরনের বিষাক্ত কীটপতঙ্গ আছে। আর আছে ঝাঁকে ঝাঁকে অ্যালিগেটর। কোন মতে যদি চাকা পিছলে ওই জলায় গিয়ে পড়ে গাড়িটা, আর উঠতে পারবে না। ভয়াবহ কাদায় আটকে যাবে। পুরোটা যদি ডুবে যায়, তাহলে জ্যান্ত কবর হবে। আর যদি না যায়, অ্যালিগেটরের খাবার হবে।
এটা কোরি কিংবা এনডির না জানার কথা নয়। তাহলে এ পথ ধরল কেন ওরা? নিশ্চয় পুলিশের ভয়ে। সামনে সম্ভবত চেক পোস্ট জাতীয় কিছু আছে। দুটো ছেলেকে গাড়ির পেছনে হাতকড়া লাগিয়ে কেন আটকে রাখা হয়েছে, অবশ্যই জানতে চাইবে ওরা। সে-সব এড়ানোর জন্যেই এই নির্জন বিপজ্জনক রাস্তা ধরেছে এনডি।
অতিরিক্ত সাবধান থেকেও চাকা সোজা রাখতে পারছে না সে। বৃষ্টিতে রাস্তা পিচ্ছিল হয়ে থাকার কারণে। সামনের ডান পাশের চাকাটা মূল রাস্তা থেকে সরে গেল কাঁচা মাটিতে। প্রচণ্ড ঝাঁকি দিয়ে কাত হয়ে গেল গাড়ির একপাশ।
শক্ত হয়ে বসে থাকো! নড়বে না কেউ! চিৎকার করে উঠল এনডি। স্টিয়ারিং চেপে চাকাটাকে তুলে আনার আপ্রাণ চেষ্টা শুরু করল।
মুক্ত হাতটা দিয়ে সামনের সীটের পেছনটা খামচে ধরল কিশোর। টের পাচ্ছে, উঠে আসার বদলে ক্রমশ রাস্তা থেকে নেমে যাচ্ছে চাকাটা।
আর মাত্র কয়েক ইঞ্চি সরে গেলেই শেষ। কোনমতেই আর তোলা যাবে না। জলাভূমিতে পড়ে যাবে গাড়ি।
শেষ চেষ্টা করল এনডি। লো গীয়ারে দিয়ে গ্যাস পেডাল পুরো চেপে ধরল ফ্লোরবোর্ডের সঙ্গে। একই সঙ্গে গায়ের জোরে যতটা সম্ভব বায়ে ঘুরিয়ে দিতে লাগল স্টিয়ারিং।
সাংঘাতিক ঝাঁকি। আরও কয়েক ইঞ্চি পিছলে গেল চাকা। তবে সামনে না গিয়ে সরে যেতে লাগল বা পাশে। উঠে চলে আসতে শুরু করল। আর গোটা কয়েক ঝাঁকুনি আর চাকা পিছলানোর পর রাস্তায় উঠে এল পড়ে যাওয়া চাকাটা।
জোরে নিঃশ্বাস ফেলে কপালের ঘাম মুছল এনডি।
গাড়ির আরোহীরা আবার স্বাভাবিক ভাবে শ্বাস নিতে শুরু করল।

আর কোন অঘটন ঘটল না। রাস্তাটা নিরাপদেই পার হয়ে এল গাড়ি। বড় রাস্তায় উঠল। যেন ক্ষতিটা পুষিয়ে নেয়ার জন্যেই দ্বিগুণ গতিতে গাড়ি ছোটাল এনডি।
প্রায় ঘণ্টা তিনেক গাড়ি ছোটানোর পর গন্তব্যে পৌঁছল ওরা। মিয়ামিতে অনেক আগেই ঢুকে পড়েছে। এখন কোথায় এল, সাইনবোর্ড দেখে বুঝতে পারল কিশোর। বিসকেইনি বে।
প্রচুর গ্রীষ্মমণ্ডলীয় গাছপালা দেখা যাচ্ছে।
আরও কয়েক মিনিট চলার পর বড় একটা দেয়াল ঘেরা বাড়ির গেটের কাছে। এসে থামল গাড়ি। ভেতরে গাছপালা, ঝোঁপঝাড়ের প্রায় জঙ্গল হয়ে আছে।
কাউকে গেটের কাছে আসতে দেখা গেল না। অথচ খুলে গেল গেটটা।
খাইছে! বিড়বিড় করল মুসা। ভূতের বাড়ি নাকি?
গাড়ি ঢোকাল এনডি। লম্বা ড্রাইভওয়ে চলে গেছে সুদৃশ্য একটা গাড়ি বারান্দা পর্যন্ত। কয়েকটা গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল চত্বরের একপাশে। বেশ খানিকটা দূরে, সীমানার উত্তর প্রান্তে সিমেন্টে বাঁধানো বেদির ওপর দাঁড়িয়ে আছে একটা হেলিকপ্টার। চিনতে পারল কিশোর। কেইনের হেলিকপ্টারটা। তারমানে ওদেরকে গাড়িতে করে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে হেলিকপ্টারে করে এসে বসে আছে।
কয়েক গজ এগিয়েই থেমে গেল গাড়িটা। একটা বড় গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল একজন লোক। হাতে ছোট রিমোট কন্ট্রোলের মত একটা যন্ত্র। গেটের দিকে তুলে বোতাম টিপতেই আপনাআপনি বন্ধ হয়ে গেল গেটের পালা।
মুসার ভূত রহস্যের সমাধান হয়ে গেল। রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে খোলে, বন্ধ হয় গেটটা।
গাড়ির পাশে এসে দাঁড়াল লোকটা। নিচু হয়ে তাকাল। গাড়ির ভেতরটা দেখল। তারপর সন্তুষ্ট হয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে এগিয়ে যেতে ইশারা করল এনডিকে।
গাড়ি-বারান্দার সামনে এনে গাড়ি রাখল এনডি। ইঞ্জিন বন্ধ করে দিয়ে দরজা খুলে নামল। তার আগেই নেমে পড়েছে কোরি। পকেট থেকে চাবি বের করে খুলে দিল কিশোরের হাতকড়া। এনডির হাতে পিস্তল বেরিয়ে এসেছে। মুসার হাতকড়াও খুলে দেয়া হলো। তারপর দুজনকেই বেরিয়ে আসতে বলা হলো।
মুসা আর কিশোর দুজনের পিঠেই পিস্তল ঠেসে ধরে ঘরে ঢোকানো হলো।
বিশাল বড় হলঘর। দুই পাশের দেয়াল ঘেঁষেই দুটো মস্ত মাছের ট্যাংক রাখা। পাঁচশো গ্যালন পানি ধরে একেকটাতে।
আপনার বস্ মনে হয় পুঁটি মাছ খুব পছন্দ করে? একটা ট্যাংক দেখিয়ে এনডির সঙ্গে রসিকতা করল কিশোর।

তা তো করেই, মুখ গোমড়া করে জবাব দিল এনডি। বায়েরটাতে আছে একটা স্টিং রে। আর ডানেরটাতে কয়েক ডজন পিরানহা।
বাপরে, সাংঘাতিক হবি তো। খুনে মাছ পোষে।
খুনে জিনিসই আমার পছন্দ, কথা বলে উঠল একটা কণ্ঠ। ছায়ার মধ্যে থেকে লম্বা লম্বা পায়ে বেরিয়ে এল ডগলাস কেইন। পিতপিতে মাছ পুষে মজা নেই। ঠিকমতই তাহলে আনতে পেরেছ, এনডি। দেরি দেখে আমি তো চিন্তায়ই পড়ে গিয়েছিলাম। যা পিছলা না এগুলো। ভয় পাচ্ছিলাম পালিয়ে না যায়।
নাহ্, যাবে কোত্থেকে, জবাব দিল কোরি। হাতকড়া খোলা কি আর অত সহজ।
কথাবার্তা শুনে পাশের লিভিং রুম থেকে বেরিয়ে এল গাট্টাগোট্টা এক লোক। মাথায় কোঁকড়া চুল। মুখটা কেমন চারকোনা। বড় বড় দাঁত। কাছে এসে দাঁড়াল। মুসা আর কিশোরের আপাদমস্তক দেখে বলল, এই দুটো ছেলেই এত নাকানিচুবানি খাওয়াচ্ছিল তোমাদের?
হাসল কেইন। অত সহজ মনে কোরো না ওদের। খোঁজ-খবর নিয়েছি আমি। কি জেনেছি জানো? শুনলে ভাল লাগবে না তোমার। ওরা কারও পেছনে লাগলে তার সর্বনাশ না করে ছাড়ে না। কেউ রেহাই পায়নি ওদের হাত থেকে।
এতটাই...! কথাটা শেষ করল না লোকটা। এক ভুরু উঁচু করল।
কিশোর, এর নাম রাগবি ড্যাগো, পরিচয় করিয়ে দিল কেইন।
শুরু থেকেই লোকটার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল কিশোর। কিছু মনে করার চেষ্টা করছিল। মনে হচ্ছিল কোথাও দেখেছে একে। নাম শোনার পর বুঝল কোথায় দেখেছে। পত্রিকায়। ছবি।
আপনিই ফ্লোরিডার সেই কুখ্যাত গ্যাং লীডার নন তো? কিশোর বলল। বহুবার পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছেন। সারা আমেরিকার পুলিশ আপনাকে খুঁজছে।
তুমি জানলে কি করে? অবাক হলো ড্যাগো।
জানি বলেই তো গোয়েন্দাগিরি করতে পারি, জবাবটা এড়িয়ে গেল কিশোর।
কি বুঝলে? ড্যাগোর দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচাল কেইন। বলেছিলাম না, ডেঞ্জারাস ছেলে ওরা। নাম শুনেই চিনে ফেলল তোমাকে। খোঁজ-খবর রাখে। তবে যত বিপজ্জনকই হোক, এবার আর ওদের মুক্তি নেই। দুই সহকারীর দিকে তাকাল সে। এনডি, ওদেরকে আমার জলজ প্রাণীগুলো দেখিয়ে আনন। গরমও যা পড়েছে আজ। মিয়ামির পচা গরম। ইচ্ছে করলে গোসল করার জন্যে পুকুরেও নামিয়ে দিতে পারো।
দাঁত বের করে হাসল কোরি। এনডিও হাসল। পিস্তল দেখিয়ে ইশারা করল দুই গোয়েন্দাকে। পিঠে পিস্তল ঠেকিয়ে পেছনের দরজার দিকে এগোতে বাধ্য করা

হলো ওদের। তবে তার আগে পিছমোড়া করে হাত বেঁধে নেয়া হলো দুজনেরই।
ওদিক দিয়েই ঢুকতে দেখা গেল নীরা লেভিনকে। ওকে দেখামাত্র পিস্তল লুকিয়ে ফেলল দুই গুণ্ডা। কিশোর আর মুসার পেছনে এমন করে গা ঘেঁষে দাঁড়াল যাতে ওদের বাধন দেখতে না পায়।
থমকে দাঁড়াল নীরা। ওরা এখানে কি করছে?
দ্বিধা করল এনডি। কি-কিছু না, ম্যাম।...মিস্টার কেইনের অ্যাকোয়ারিয়াম দেখতে চাইল...
ওদের নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না, তাড়াহুড়ো করে এগিয়ে এল কেইন। একটু পরেই চলে যাবে ওরা। নীরার হাত ধরে টান দিল সে। এসো।
কিছুই তো বুঝতে পারছি না! চোখ কুঁচকে তাকিয়ে আছে নীরা। শত্রু থেকে বন্ধু হয়ে গেল কি করে হঠাৎ? তোমার চাকরি নিয়েছে নাকি?
ওসব নিয়ে পরে কথা বলব তোমার সঙ্গে, তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল কেইনের কণ্ঠ। এখন যেতে দাও।
এগোও, কিশোরকে ধাক্কা দিল এনডি।
বাইরে দুটো বিশাল সুইমিং পুলের কাছে ওদেরকে নিয়ে আসা হলো।
সাঁতার কাটতে বলবেন নাকি? সেগুলোর দিকে তাকিয়ে ব্যঙ্গ করল মুসা, সুইমিং সুট তো ফেলে এসেছি, ভুলে।
কোন অসুবিধে নেই, হেসে জবাব দিল কোরি। অনেক আছে আমাদের। কটা লাগবে?
কিশোর লক্ষ করল একটা পুলেও ডাইভিং বোর্ড নেই। পাড়ের চারপাশ ঘিরে মোটা শিকলের বেড়া। অনেক নিচে পানি।
বেশ কিছুটা দূরে বোট হাউস আর জেটি। জেটিতে বাঁধা একটা সাদা বোট। চ্যানেলের বাইরে খোলা সাগরে একটা ইয়ট দেখা যাচ্ছে। বেআইনী কাজ কারবার করে রাজার হালেই আছে কেইন আর ড্যাগো। হেলিকপ্টার, ইয়ট কোন কিছুরই অভাব নেই।
কিশোরের গায়ে কনুই দিয়ে তো লাগাল মুসা। কোন দিকে তাকিয়ে আছ?
পুলের দিকে দৃষ্টি ফেরাল আবার কিশোর। বিশাল একটা ত্রিকোণ পাখনা ভেসে উঠেছে একটা পুলের পানিতে। মসৃণ গতিতে ঘুরতে লাগল পুলের কিনার ঘেষে।
হাঙর!
হোয়াইট শার্ক!
মানুষখেকো বলে ভয়ানক বদনাম আছে এগুলোর।
আপনাআপনি দ্বিতীয় পুলটার দিকে নজর চলে গেল কিশোরের। ওটাতেও কি হাঙর আছে?

যেন তার মনের কথা পড়তে পেরেই হেসে বলল কোরি, ওটাতে কি আছে, ভাবছ, তাই না? যাও, নিজের চোখেই দেখো।
দ্বিতীয় পুলটার কাছে নিয়ে আসা হলো ওদের। ছোট একটা বাক্সের ভেতরে রাখা সুইচ টিপে দিল এনডি। পানি নিরোধক আবরণে মোড়া বা জ্বলে উঠল পুলের নিচে। একবার তাকিয়েই শিউরে উঠল কিশোর। মস্ত দুটো অ্যালিগেটর শুয়ে আছে পানির তলায়। আলো দেখে নড়েচড়ে উঠল দানব দুটো। বিকট ভঙ্গিতে হাঁ করে ওপরের দিকে তাকাল একটা। ভঙ্গিটা মোটেও ভাল লাগল না ওর। জানোয়ারগুলো হয়তো ভেবেছে, খাবার নিয়ে আসা হয়েছে।
মনে হয় না মানুষের মাংসে এদেরও অরুচি আছে।

.

কোন একটা পুলের পানিতে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়া হবে ওদের-ভাবছে কিশোর। যেটাতেই ফেলা হোক, ফলাফল সমান। পাড়ের এত নিচে পানি, কোনমতেই হাত বাড়িয়ে নাগাল পাবে না। ধরে উঠতে পারবে না-যদি ওঠার সময় পায়, যদি তার আগেই ছিন্নভিন্ন করে না ফেলে ওদেরকে ভয়াবহ জানোয়ারগুলো।
ধাক্কা খাওয়ার অপেক্ষাতেই আছে সে আর মুসা। মনে মনে বাঁচার উপায় খুঁজছে।
নড়ে উঠল মুসা।
উঁহু! সঙ্গে সঙ্গে পিস্তলের খোঁচা মারল তার পাঁজরে এনডি। ওসব করে কোন লাভ হবে না। ফুটো হওয়া রক্তাক্ত লাশটা তখন ফেলে দেব পুলের পানিতে। হজম করে ফেলবে অ্যালিগেটরেরা।
ঘড়ি দেখল কোরি। তারপর বলল, আসলে, এখুনি তোমাদের মারা হবে না। বসের নির্দেশ নেই। একটু ভয় দেখানো হলো কেবল। তবে বাড়াবাড়ি করলে ভয়টা সত্যে পরিণত হবে, মনে রেখো।
মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। বেঁচে থাকলে মুক্তির সুযোগ থাকবে। জিজ্ঞেস করল, কি করতে চান আমাদের নিয়ে?
খিকখিক করে হাসল কোরি। আমাদের বস্ খুব মজার লোক। এসো, দেখাচ্ছি তোমাদের।
সাগরের উল্টো দিকে বনে ঘেরা একটা জায়গায় ওদের নিয়ে আসা হলো। গাছপালার ভেতরে এক টুকরো খোলা জায়গা। কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। মাঝখানে মস্ত একটা তাঁবু। এত বড়, একটা দোতলা বিল্ডিং অনায়াসে ঢেকে দেয়া যাবে ওই তাবু দিয়ে।
খাইছে! এটা কি জিনিস? চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে মুসা। সার্কাস দেখাবে নাকি?

তাই মনে হচ্ছে? হেসে বলল কোরি। সার্কাসের তাবু নয়। এটা আমাদের অস্থায়ী গুদাম। বনের মধ্যে বড় বেশি পোকামাকড়ের আড্ডা। খুব জ্বালায়। বেশি বেড়ে গেলে গ্যাস দিয়ে মেরে ফেলা হয় ওগুলোকে। তাতে পোকাও মরে, জিনিসপত্রও নষ্ট হয় না।

এখন পোকামাকড় বেড়ে গেছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই পোকা মারার গ্যাস ছাড়া হবে তাঁবুটাতে, কোরির কথার খেই ধরল এনডি, দারুণ মজা পাচ্ছে যেন বলতে। ধাতব দুটো সিলিন্ডার দেখাল। তামার একটা টি-এর মত সরু পাইপ দিয়ে যুক্ত করা হয়েছে সিলিন্ডার দুটোর মুখ। টির ছোট দুটো মাথা সিলিন্ডারে লাগানো, লম্বা মাথাটা চলে গেছে তাঁবুর নিচ দিয়ে ভেতরে। তাঁবুর সমস্ত দরজা-জানালা বন্ধ করে দিলে বাতাস আটকে যাবে। ক্যানভাসের লম্বা লম্বা বেলুনের মত কতগুলো জিনিস দেখাল সে। তখন এগুলো দিয়ে তাঁবুর কানাগুলো মাটির সঙ্গে চেপে রাখা হবে।

হট ডগ তো মনে হচ্ছে না এগুলোকে, মুসা বলল।

বাহ্, এ সময়েও খাবারের চিন্তা, এনডি বলল। সত্যি তোমার স্নায়ু ভীষণ শক্ত। না, হট ডগ নয়। এগুলোকে আমরা বলি স্যান্ড স্নেক। কানাগুলোকে এ জিনিস দিয়ে চেপে দিলে এক বিন্দু গ্যাসও আর বেরোতে পারে না।

আর ভেতরে যারা থাকে, এনডি থামতেই কোরি বলল, দশ মিনিটের মধ্যে খতম। জ্যান্ত কোন প্রাণীই আর এরপর বেঁচে থাকতে পারে না।

কি জিনিস রাখা হয় তাবুটাতে? জিজ্ঞেস করল কিশোর।

হাসল এনডি। কি জিনিস? ধরো স্মাগলিঙের মাল। দেখবে নাকি? এসো।

তাবুর দরজা দিয়ে ভেতরে নিয়ে আসা হলো ওদের। নানা আকারের প্রচুর বাক্স সাজিয়ে রাখা হয়েছে ভেতরে। বেশির ভাগ বাক্সের গায়েই বার্মিজ আর থাই ভাষায় লেখা দেখতে পেল কিশোর। তার মনে পড়ল, ওই দুটো দেশ, বিশেষ করে মিয়ানমার হলো হেরোইন চোরাচালানিদের স্বর্গরাজ্য। তারমানে মাদকদ্রব্যের ব্যবসা করে কেইন।

তাঁবুর মধ্যে কাঠের তৈরি একটা কেবিন দেখা গেল। ওটাও অস্থায়ী। তবে লোহার ফ্রেম দিয়ে এমন করে নাট-বল্ট লাগিয়ে আটকানো, বেশ মজবুত, বোঝা যায়। দরজার বাইরের দিকে লাগানো লোহার চ্যাপ্টা ডাণ্ডাটা খুলে দিল কোরি। আড়াআড়ি লাগিয়ে দরজা আটকে রাখা হয়েছিল। টান দিয়ে পাল্লা খুলল। তারপর দুজনকে ঠেলে দিল দরজার অন্যপাশে। পরক্ষণে আবার পাল্লা লাগিয়ে ডাণ্ডা তুলে দিল।

ঘুটঘুটে অন্ধকার।

দেখি, ঘোরো তো, মুসা বলল। তোমার হাতের বাঁধনটা খুলতে পারি নাকি। নিজেরটা তো নিজে পারব না।
কে? মুসা নাকি? অন্ধকার থেকে ভেসে এল একটা কণ্ঠ।
জিনা! একসঙ্গে বলে উঠল কিশোর আর মুসা।
ঘরের এক প্রান্ত থেকে দৌড়ে আসার শব্দ হলো।
সত্যি! তোমরা! আমার বিশ্বাস হচ্ছে না! দুজনকেই ছুঁয়ে দেখতে লাগল জিনা।
বিশ্বাস না হওয়ার কিছু নেই, কিশোর বলল। যে হারে সূত্র রেখে এসেছ, খুঁজে বের করতে বরং দেরিই করে ফেলেছি। আরও আগে বের করা উচিত ছিল।
আমাকে যে এখানে আটকে রেখেছে, কার্ডটা দেখে বুঝেছ, না?
বুঝলেও নিজে নিজে আসিনি। ওরাই আমাদের এখানে ধরে নিয়ে এসেছে। নাও, এখন বাধনগুলো খোলো তো আমাদের। সব কথা পরে শুনব। তা তুমি ভাল আছ তো?
এ অবস্থায় কি আর ভাল থাকা যায়, প্রথমে মুসার বাঁধনটা খুলতে শুরু করল জিনা। রোজ এসে একবার করে খাবার দিয়ে যায়। ফাস্ট ফুড। একই বার্গার আর ফ্রাই খেতে খেতে জিভ পচে গেছে আমার।
চাবির রিঙে ছোট্ট একটা টর্চ আছে জিনার। সেটা কিশোরের হাতে তুলে দিল। ব্যাটারি প্রায় শেষ। সারাক্ষণ জ্বালালে কিছুই থাকত না। অন্ধকারেই বসে থেকেছি। দিনের পর দিন এ ভাবে থাকাটা যে কি কষ্টের!
পরে শুনব, কিশোর বলল। এখন বেরোনোর চেষ্টা করা দরকার।
আমি অনেক চেষ্টা করেছি, পারিনি। তোমরা পারো নাকি দেখো।
বন্ধ, জানে, তবু প্রথমে গিয়ে দরজায় ধাক্কা মেরে দেখল কিশোর।
তাড়াতাড়ি করা দরকার, মুসা বলল। গ্যাস ছেড়ে দিলে আর বেরোনো লাগবে না কোনদিন।
গ্যাস! বুঝতে পারল না জিনা।
তাকে বুঝিয়ে দিল মুসা। শুনে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না জিনা। আপনাআপনি হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল যেন তার। বসে পড়ল মাটিতেই। বিষাক্ত গ্যাসের সাহায্যে কি করে গুদামে পোকা মারা হয়, জানে সে।
কিশোর কোন কথা বলছে না। কাজে ব্যস্ত। পেনলাইটের সামান্য আলো দিয়ে ছাতের একটা গ্রিল আবিষ্কার করে ফেলল।
ওদিক দিয়ে বাতাস আসে, মুসার দিকে ঘুরে তাকাল সে। মুসা, এসো তো এখানে। তোমার কাঁধে চড়ে দেখি কিছু করতে পারি কিনা।
গ্রিলটার নিচে এসে দাঁড়াল মুসা। তার কাঁধে চড়ল কিশোর। জিনা মুসাকে এমন করে ধরে রাখল, যাতে সে ঠিকমত দাঁড়িয়ে থাকতে পারে, কিশোরের কাজে

ব্যাঘাত না হয়।
জিনার কী-রিঙটা আলো ছাড়াও আরও নানা ভাবে সাহায্য করল। একটা চাবি দিয়ে গ্রিলের স্ক্রুগুলো খুলে ফেলল কিশোর। ঠেলা দিয়ে সরাতে গিয়ে বুঝল, কেবিনের ওপরও ভারী জিনিসপত্র রাখা হয়েছে। গ্রিলের কিনারে চেপে বসেছে ওগুলো।
রাজ্যের যত জিনিস চাপিয়ে দিয়েছে, হাঁপাতে হাঁপাতে বলল সে। হাত ওপর দিকে তুলে রাখতে রাখতে পেশীতে ব্যথা শুরু হয়েছে।
পারছ না? ওপর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল মুসা। কিশোরের ভার বইতে বইতে সে-ও ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছে।
সরাতেই হবে, কিশোর বলল। বেরোনোর এটাই একমাত্র পথ।
কিসের শব্দ! উদ্বিগ্ন শোনাল জিনার কণ্ঠ।
খবরদার, শ্বাস নেবে না! চিৎকার করে উঠল কিশোর। গ্যাস ছেড়ে দিয়েছে!
দুই হাতে প্রাণপণে গ্রিলটা ধরে ঠেলতে লাগল সে। তার চাপে বাঁকা হয়ে যাচ্ছে মুসা। কিন্তু সরল না।
নড়তে শুরু করল অবশেষে গ্রিলটা। শেষ বারের মত জোরে ঠেলা মেরে পাশে সরিয়ে দিল কিশোর। দুড়ম-দাড়ম করে কি সব যেন পড়ল কেবিনের ছাত থেকে গড়িয়ে।
গ্রিলের ফোকরের দুই প্রান্ত চেপে ধরে নিজেকে টেনে তুলতে শুরু করল সে। মাথাটা ঢুকিয়ে দিল ফোকরের ভেতর দিয়ে। ফোকর গলে উঠে এল ওপরে। ছাতে উঠে বসল।
দম বন্ধ করে রেখেছে।
হামাগুড়ি দিয়ে ছাতের কিনারে চলে এল সে। লাফ দিয়ে মাটিতে নামল।
দরজার ডাণ্ডাটায় তালা দেয়া না থাকলেই হয় এখন। তালা থাকলে খুলতে পারবে না। বের করে আনতে পারবে না মুসা আর জিনাকে।
কতক্ষণ আর দম আটকাবে? শ্বাস টানল। ভয়ানক বিষাক্ত, তীব্র ঝাজাল গ্যাস মেশানো, বাতাস ঢুকে গেল নাক দিয়ে। জ্বালা করে উঠল কণ্ঠনালী। ফুসফুসে চাপ অনুভব করল।
দৌড় দিল দরজাটার দিকে।
টর্চের সামান্য আলো ব্যবহার করে দেখল, তালা নেই।
দ্রুতহাতে ডাণ্ডাটা সরিয়ে খুলে ফেলল দরজা।
জিনা! মুসা! ডাক দিল সে।
হাঁসফাঁস করছে ওরা দুজনে। জিনার গোঙানি শোনা গেল। ফাঁসাসে কণ্ঠে মুসা কি বলল, বোঝা গেল না।

শ্বাস নিচ্ছ কেন? চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। জলদি বেরিয়ে এসো!
বলল বটে, কিন্তু সে নিজেই আর দম না টেনে থাকতে পারবে না। গলার মধ্যে ঘড়ঘড়ানি শুরু হয়ে গেছে। আগুন ধরে গেছে যেন ফুসফুসে। মাথার ভেতরটা ঘোলাটে হয়ে যাচ্ছে। চিন্তার শক্তি হারাচ্ছে। কি করবে?
ইচ্ছে করছে মাটিতে শুয়ে পড়ে গভীর ঘুমের রাজ্যে হারিয়ে যেতে।

.

গ্যাসের শিকার হওয়া চলবে না এখন কোনমতে!
নিজেকে বোঝাল কিশোর।
কোন একটা অস্ত্রের জন্যে মরিয়া হয়ে তাকাতে লাগল চারপাশে। টর্চের আলো এত কমে গেছে যে, যে কোন মুহূর্তে নিভে যাবে। তার আগেই খুঁজে বের করতে হবে কিছু একটা।
কেবিনের সামান্য দূরে একটা বেঞ্চ দেখতে পেল। ওঅর্কবেঞ্চ। তাতে দুচারটা যন্ত্রপাতি পড়ে আছে। শাবল, হাতুড়ি, এ সব।
কিন্তু আসল জিনিসটা কই?
যেটা খুঁজছে সে?
দেখতে পেল। দুলে উঠল বুকের মধ্যে। তাড়াতাড়ি ছুটে গেল।
থাবা দিয়ে তুলে নিল মরচে পড়া ছুরিটা।
দরজার কাছে ফিরে এল। বহু কষ্টে অজ্ঞান হওয়া থেকে বিরত রাখছে নিজেকে।
ঘোলাটে লাল একটা গোল রিঙ সৃষ্টি করে জ্বলছে টর্চটা। তবে দরজাটা কোথায় আছে দেখার জন্যে যথেষ্ট।
সেদিকে তাকিয়ে ডাক দিল, মুসা! বেরিয়ে এসো জলদি!
সাড়া পেল না।
মুসা!
এই যে! দরজার কাছ থেকে শোনা গেল তার ফ্যাসফেসে কণ্ঠ।
জিনার শক্তি প্রায় শেষ। তাকে ধরে ধরে নিয়ে আসছে মুসা।
বেরিয়ে এল দরজা দিয়ে।
তাবুর দরজাটা কোন দিকে আছে, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। মুসাদেরকে আসতে বলে আন্দাজে সেদিকে দৌড় দিল কিশোর।
দরজাটা পাও গেল না। কিন্তু তাবুর দেয়াল ঠেকল হাতে। মরচে পড়া ছুরিটা চালাল পাগলের মত। ধার বলতে নেই। তবু চোখা মাথাটা কাজে লাগল।
যেন দুঃস্বপ্নের ঘোরে ছুরির খোঁচা মারতে মারতে ফেঁড়ে ফেলল ক্যানভাসের খানিকটা জায়গা। পেছনে তাকিয়ে ডাক দিল, মুসা!
এই যে আমি!

ঠিক এই সময় নিভে গেল টর্চ।
কাজ প্রায় শেষ। আর দরকারও নেই এটার। তবে টর্চটার প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে গেছে কিশোরের মন। তাই ফেলতে পারল না। ভরে রাখল পকেটে।
বাইরে বেরিয়ে এল সে। তাঁবুর কাছেই হুমড়ি খেয়ে পড়ল মাটিতে। মুখ হাঁ করে ডাঙায় ভোলা মাছের মত খাবি খেতে খেতে বাতাস টানতে লাগল।
ফুসফুস ভরে গেল সাগর থেকে আসা তাজা হাওয়ায়।
কমে আসতে লাগল জ্বলুনি। বুকের চাপ। মাথাটা পরিষ্কার হয়ে আসছে।
পেছনে গোঙানির মত আওয়াজ শুনে ফিরে তাকিয়ে দেখল মুসা আর জিনাও তার মত মাটিতে পড়ে বাতাস টানছে।
পুরো এক মিনিট পর কথা বলল জিনা, উহ, নরক থেকে বেঁচে এলাম!
তাহলেই বোঝো, পোকামাকড়ের কত কষ্ট! শুকনো হাসি হাসল মুসা। ওদেরকে যে কত ভাবে মারি আমরা!
জ্বালায় বলেই তো মারি, জিনা বলল।
আমাদের কাছে জ্বালানো মনে হয়। আসলে তো ওরা বাঁচতে চায়, খাবার খেতে চায়। আমাদের যন্ত্রণা দেয়ার জন্যে মোটেও করে না।
উঠে বসল কিশোর। কথা বোলো না। কাছাকাছিই থাকতে পারে ওরা। কথা শুনলে আবার এসে ধরবে। এবার এমন ব্যবস্থা করবে, যাতে কোনমতেই আর বাঁচতে না পারি।
হামাগুড়ি দিয়ে বনের দিকে এগোল ওরা। উঠে দাঁড়ালে যদি চোখে পড়ে যায় এই ভয়ে।
গাছপালার ভেতরে এসে উঠে দাঁড়াল। হাঁটতে শুরু করল বন থেকে বেরোনোর জন্যে।
বনের বাইরে বেরোতেই একটা গাড়ি চোখে পড়ল। হলুদ রঙের একটা সিডান। গায়ে বড় একটা পোকার ছবি। নিচে কোম্পানির নাম লেখা।
ভেতরে কেউ নেই, এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার পর কাছে এল ওরা। নামটা পড়ে বুঝে গেল কিশোর, গাড়িটা এখানে কেন। কয়েকটা প্রশ্নেরও জবাব পেয়ে গেল। বলল, পোকা-মারা কোম্পানির গাড়ি। পেশাদার লোককে নিয়ে এসেছে ওরা। নিয়মিত বোধহয় পোকা মেরে রেখে যায় লোকটা। আমাদের তাঁবুর ভেতরে ভরে মারার কারণটা বুঝেছ?
না, মাথা নাড়ল মুসা।
অ্যাক্সিডেন্ট হিসেবে দেখানোর জন্যে। বলবে, ভুলক্রমে দুর্ঘটনায় মারা গেছি আমরা।

এত ঝামেলা না করে হাঙর কিংবা অ্যালিগেটরের পুলে ফেলে দিলেই কি ভাল করত না? চিহ্নও থাকত না আমাদের।
ওরকম কিছু করলেই বরং পুলিশের সন্দেহ বাড়ত। ওরা জানে, আমরা উধাও হয়ে গেলে সেটা নিয়ে তদন্ত হবে। আমাদের বাড়ি থেকে লোক আসবে। ডেপুটি গেকোর কথার দুই পয়সা দাম দেবে না। কারণ ঘুষখোর পুলিশটার সব কথা বলে দেবে রবিন। মিয়ামি পুলিশ যাবে তখন গাল আইল্যান্ডে। সূত্র ধরে ধরে গিয়ে হাজির হবে কেইনের বাড়িতে। সহজে ছাড়া হবে না তাকে। কোনখানে তার কয়টা বাড়ি আছে বের করে ফেলবে পুলিশ। এ বাড়িটাতে আসবে। হাঙর আর অ্যালিগেটরের পুল দেখলে বুঝে যাবে আমাদের কি গতি করেছে কেইন।
গ্যাসের মধ্যে পড়ে মরলেও তো বুঝত।
না, অন্য কথা বোঝাতে পারত তখন কেইন। বলত জিনার খোঁজে আমরা গিয়ে তার তাঁবুতে ঢুকেছি। ঠিক এ সময় পোকা মারার জন্যে গ্যাস ছেড়েছে পোকা-মারা কোম্পানির লোক। আমরা যে ভেতরে আছি, জানার কথা নয় লোকটার। পুলিশকে বিশ্বাস করিয়ে ফেলত কেইন। তিন-তিনটা খুন করেও তখন ধোয়া তুলসি পাতা হয়ে থাকত সে।
কত্তবড় শয়তান! দাঁতে দাঁত চাপল মুসা। ওকে ধরে একবার হাঙর, একবার অ্যালিগেটরের পুলে যদি চুবাতে পারতাম, রাগটা কমত!
রাগ পরে কমিয়ো, হাসল কিশোর। এখন দেখো, গাড়িটা স্টার্ট দিতে পারো নাকি। হাতের কাছে যখন পেয়েই গেছি, পালানোর জন্যে রেডি থাকি।
দরজায় তালা দেয়ার প্রয়োজন মনে করেনি পোকা-মারা কোম্পানির লোক। চাবিটাও ইগনিশনেই আছে। মোচড় দিতেই গুঞ্জন তুলল ইঞ্জিন। স্টার্ট নেবে।
হয়েছে, থামাও! মুসার পাশে উঠে বসল কিলোর। কার-টেলিফোনটা টেনে নিল। ফোন করল মিয়ামি পুলিশকে।
ফোন ধরল যে ডিউটি অফিসার, তার নাম ডিটেকটিভ ওয়ারেন। কোন ভূমিকার মধ্যে না গিয়ে সরাসরি জিজ্ঞেস করল কিশোর, রাগবি ডাগোকে ধরতে চান? স্মাগলার এবং গ্যাংলীডার?।
সঙ্গে সঙ্গে জড়তা চলে গেল অফিসারের কণ্ঠ থেকে। কে বলছেন?
আমার নাম কিশোর পাশা। ঠিকানা দিচ্ছি, ভাল করে বুঝে নিন। এখানে এলেই আমাকে দেখতে পাবেন। শুধু রাগবি না, পুরো দলটাকেই ধরতে পারবেন।
ঠিকানা জানা নেই কিশোরের, কিভাবে কিভাবে কোনখানে আসতে হবে বলে দিল ডিটেকটিভ ওয়ারেনকে। পেছনে খুট করে শব্দ হতেই তাড়াতাড়ি ফোন রেখে দিল কিশোর। তার মনে হলো, আরও কিছু যেন বলতে চেয়েছিল ডিটেকটিভ ওয়ারেন। কিন্তু সে-সময় আর নেই।

তাড়াতাড়ি ফোন রেখে গাড়ি থেকে নেমে এল সে।
শব্দটা যেদিক থেকে হয়েছে সেদিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। কাউকে আসতে দেখা গেল না। তারমানে কোন বুনো প্রাণী হবে। শেয়াল কিংবা ব্যাকুন।
মুসা জিজ্ঞেস করল, নামলে কেন? চলো, বেরিয়ে যাই।
বেরোবে কি করে? গেট তো খোলে রিমোট কন্ট্রোলে।
গুতো মেরে ভেঙে ফেলব।
আমার মনে হয় না ভাঙতে পারবে। কেইন সিনেমা দেখেনি, এ কথা জোর দিয়ে বলতে পারবে না। গাড়ি নিয়ে যে হরহামেশা গেট ভেঙে বেরিয়ে যায় হিরোরা, এটা তার অজানা নয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যাতে না ভাঙা যায় সে ভাবেই তৈরি করা হয়েছে গেটটা।
তাহলে কি করব? বসে থাকলে তো ধরা পড়ে যাব।
দেখি, কয়েক মিনিট অপেক্ষা করি। পুলিশকে কাছে আসার সময় দিই। আমাদের এদিকে শত্রুপক্ষের কাউকে আসতে দেখলে কেটে পড়ব। যদি না আসে, কয়েক মিনিট পর অ্যাকশনে যাব। শুধু পুলিশের আশায় বসে থাকলে হবে না। আমাদেরও প্রচুর কাজ আছে। কেইন আর ড্যাগোকে হাতে যখন পেয়েছি, প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়ব না। নেমে এসো। লুকিয়ে থাকি।
গাড়ির কাছেই ঝোঁপের আড়ালে গিয়ে বসল তিনজনে।
হ্যাঁ, এবার বলো তো, জিনাকে জিজ্ঞেস করল কিশোর, ধরল কি করে ওরা তোমাকে?
সামনে দিয়ে এসে গাড়িটার পথরোধ করল, জিনা বলল। তারপর এনডি আর কোরি নেমে এসে পিস্তল দেখিয়ে ধরে নিয়ে গেল আমাকে।
হারম্যান কেগ ছিল না ওদের সঙ্গে?
এই কেগটা আবার কে?
বুঝলাম। তারমানে চেনো না একে। কেন তোমাকে কিডন্যাপ করল সেই কথাটা বলো দেখি আগে।
জেরি আঙ্কেলের ডকটা ভাঙার সময় এনডিকে দেখে ফেলেছিলাম আমি, জিনা বলল। বোটের মধ্যে লুকিয়ে ছিল সে। বোট চালাচ্ছিল আরেকটা লোক। পরে আর কখনও দেখিনি তাকে। এনডিকে যে দেখেছি, সেটা বুঝে ফেলেছিল সে। পরের দিন যখন সৈকতে গেলাম, আবার তাকে দেখতে পেলাম কেইনের বাড়িতে। কোরির সঙ্গে ধরাধরি করে একটা বোট থেকে মাল নামাচ্ছিল। বাক্সের গায়ে বার্মিজ লেখা। আমাকে এনডির দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখল এনডি।
কেন তোমাকে কিডন্যাপ করা হলো, সেটা তো বুঝলাম, কিশোর বলল, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি আমাদের খোঁজ পেল কি করে ওরা? ফ্লোরিডা থেকেই আমাদের পিছে

লেগেছিল। গাড়ির চাকা কেটে দিয়ে ভয় দেখিয়ে আমাদের তাড়াতে চেয়েছে।
সেটা আমারই বোকামির জন্যে, চাপা ক্ষোভের সঙ্গে বলল জিনা। আমাকে যখন ধরে নিয়ে গেল ওরা, কেইনের সামনে হাজির করল, তাকে হুমকি দিয়েছিলাম। তোমাদের নাম করে বলেছিলাম, তোমরা আমাদের বন্ধু। আমার নিখোঁজ হওয়ার খবর শুনলে অবশ্যই আমাকে উদ্ধার করতে আসবে তোমরা। সে-কারণেই নিশ্চয় সাবধান হয়ে গিয়েছিল ওরা। তোমাদের ব্যাপারে খোঁজ-খবর করে নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল, তোমরা বিপজ্জনক। সেজন্যে গাল আইল্যান্ডে ঢোকার আগেই তোমাদের বিদায় করতে চেয়েছিল।
হু, চুপ হয়ে গেল কিশোর।
কেগকে চেনো না, মুসা বলল, কিন্তু তার বাড়িতে তোমার ঘড়ি পাওয়া গেল কিভাবে?
কেগের বাড়িতে আমার ঘড়ি! আমি তো ভেবেছিলাম ঘড়িটা আমি কেইনের বাড়িতে ফেলে এসেছি। কেগকে আমি চিনিই না...
আমি বুঝে গেছি, কিশোর বলল। তোমার কিডন্যাপিঙের দায় অন্য কারও ঘাড়ে চাপিয়ে নিজেরা বেচে যেতে চেয়েছিল। এর জন্যে কেগের চেয়ে উপযুক্ত তোক আর কে আছে? করে বীমার দালালি, অথচ গাল আইল্যান্ডে এসে সময় কাটাচ্ছে পচা পচা ছবি এঁকে। চালচলন রহস্যময়। স্থানীয় লোকও নয় সে। মিয়ামি থেকে পুলিশ এসে তদন্ত চালালে ঘুষখোর গেকোটার সাহায্যে সহজেই তাকে ফাঁসিয়ে দিতে পারত। সেজন্যে ফাঁদ তৈরিও করে রেখেছিল ওরা। কেগের গাড়িটা চুরি করে সেটার সাহায্যে তোমাকে কিডন্যাপ করে, তোমার ঘড়ি নিয়ে ফেলে রেখে আসে তার বাড়ির টেবিলে। তোমার ছবি থেকে তার গাড়ির নম্বর বের করে আমরাও তো তাকে সন্দেহ করা শুরু করে দিয়েছিলাম।
কেইনটা আসলেই পাজি! মুসা বলল। আমরা যখন প্রথম ঢুকলাম তার বাড়িতে, এমন ভঙ্গি করল, যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না।
ফ্রিজের দরজায় আটকানো বাবার ছবিটা পেয়েছিলে? জিজ্ঞেস করল জিনা।
হ্যাঁ, মাথা ঝাঁকাল মুসা। রাখলে কখন?
আমাকে ছেড়ে দেয়ার জন্যে কেইনের সঙ্গে যখন চেঁচামেচি করছি আমি, নীরা লেভিন নামে একটা বেটি এসে ঘরে ঢুকল। এনডিকে আমার পাহারায় রেখে মেয়েলোকটাকে বের করে দিয়ে আসতে গেল কেইন। পানি খাওয়ার ছুতোয় ফ্রিজের কাছে গিয়ে তখন চুম্বকের সাহায্যে আটকে দিয়ে এলাম ছবিটা।
ভালই করেছিলে, মুসা বলল। কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছি না। কার্ডটা পাঠালে কি করে?

এ বাড়ি থেকেই জোগাড় করেছিলাম ওটা, জিনা জানাল। দোতলার একটা অফিস ঘরে সামান্য সময়ের জন্যে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল আমাকে। টেবিলে রাখা মিয়ামির সমুদ্রপাড়ের ছবিওয়ালা কার্ডটা দেখেই ফন্দি এল মাথায়। বোকা পিকোটাকে ফাঁকি দিয়ে চুরি করলাম ওটা। একটা কলমও চুরি করলাম। বাথরুমে গিয়ে লিখলাম। দরজা দিয়ে বের করে আমাকে তাবুতে নিয়ে যাওয়ার সময় দরজার পাশের ডাকবাক্সে ফেলে দিলাম, যেটা থেকে পিয়ন এসে চিঠি নিয়ে যায় পোস্ট করার জন্যে। রাতের বেলা ছিল বলেই এত কাজ করতে পেরেছি, দিনে হলে পারতাম না।

তার জন্যে বোকা পিকোটাকে একটা ধন্যবাদ দেয়া উচিত তোমার, মুসা বলল।

জবাব দিতে যাচ্ছিল জিনা, দূর থেকে আসা সাইরেনের শব্দ শুনে থেমে গেল।

সোজা হয়ে বসল কিশোর। চলো, সময় হয়েছে।

পোকা-মারারা তো এল না, মুসা বলল। এনডি আর কোরিরও দেখা নেই।

ঘড়ি দেখল কিশোর। খুব বেশিক্ষণ তো হয়নি। আমরা মরেছি কিনা, একেবারে শিওর হয়ে তারপর আসবে ওরা।

গেটের দিকে ছুটল তিনজনে।

হেলিকপ্টারটা চোখে পড়তে থেমে গেল কিশোর। দাঁড়াও দাঁড়াও, এক কাজ করা যাক। অকেজো করে দিয়ে আসতে হবে ওটাকে, যাতে স্টাট না নেয়। পালাতে না পারে কেইন।

ঠিক। আমি যাচ্ছি। হেলিকপ্টারের দিকে দৌড় দিল মুসা।

বাকি থাকল বোটটা, ছুটতে ছুটতে জিনাকে বলল কিশোর। গাড়িতে করে পালাতে গেলে পুলিশের সামনে পড়ে যাবে ওরা। বেরোতে পারবে না। আমি বোটটার ব্যবস্থা করে আসি। তুমি কোথাও লুকিয়ে পড়ো। খবরদার, কোনমতেই ওদের হাতে পোড়ো না আর। তাহলে তোমাকে ব্যবহার করে পালানোর ব্যবস্থা। করে নেবে ওরা।

ঘন গাছপালা আর ঝোঁপঝাড়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল কিশোর। সামনে সমুদ্র। বোটহাউসটা দেখা যাচ্ছে। সাগর থেকে একটা চওড়া চ্যানেল বেরিয়ে এসেছে। সেটার মুখেই বানানো হয়েছে বোটহাউসটা। বোটহাউসের বাইরে নোঙর করে রেখেছে একটা বোট। ইয়টটা রয়েছে ভোলা সমুদ্রে। ওটাতে যেতে চাইলে বোটে করে যেতে হবে। বোটটা নষ্ট করে দিলেই যাওয়ার উপায় থাকবে না আর।

পানির কিনারে এসে জুতো খুলে ফেলল কিশোর। ঝাঁপ দিয়ে পড়ল পানিতে। সাঁতরে এগোল বোটের দিকে।

কিশোরের কথা অমান্য করল না জিনা। কোন ঝুঁকি নিতে গেল না। একটা ঝোঁপের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। তাকিয়ে রইল বাড়িটার দিকে।

ফর্সা হয়ে আসছে পুবের আকাশ। একটা দুটো করে পাখি ডাকতে আরম্ভ করেছে।
এগিয়ে আসছে সাইরেনের শব্দ।
সামনের দরজা দিয়ে ছুটে বেরোল হঠাৎ পিকো। দৌড় দিল ড্রাইভওয়ে ধরে। কিছুটা এগিয়ে রিমোট কন্ট্রোল তুলে সুইচ টিপে গেটটা খুলে ফেলল।
অবাক হয়ে গেল জিনা। পুলিশকে ঢোকার সুযোগ করে দিচ্ছে নাকি লোকটা?
বুঝল পরক্ষণেই। খোলা গেট দিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে গেল পিকো। পুলিশের আসার সঙ্কেত পেয়েই পালাচ্ছে ভীতু লোকটা।
সামনের দরজা দিয়ে হুড়মুড় করে বেরিয়ে এল আরও তিনজন। ডগলাস কেইন, রাগবি ড্যাগো আর নীরা লেভিন। খোলা গেটের দিকে তাকিয়ে দ্বিধা করল ওরা। কি যেন বলল কেইন। শব্দ শুনলেও এত দূর থেকে কথাগুলো বুঝতে পারল নাজিনা। নিশ্চয় পিকোকে গালাগাল করছে।
উত্তেজিত ভঙ্গিতে হাত তুলে হেলিকপ্টারটার দিকে দেখাতে লাগল কেইন। রাগবি দেখাতে লাগল পানির দিকে। বোঝা গেল সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না ওরা, কোন পথে পালাবে। কেইন বলছে হেলিকপ্টারে করে যেতে, ড্যাগো বলছে বোটে করে। শেষমেষ হেলিকপ্টারের দিকেই ছুটল ওরা।
মুচকি হাসল জিনা। মনে মনে বলল, যাও, দেখোগে ওড়াতে পারো কিনা! একবার মুসার হাত পড়লে তোমাদের বাপেরও সাধ্য নেই ওটা আর এত তাড়াতাড়ি ওড়াতে পারো।
পেছনে হট্টগোল শুনে ফিরে তাকাল জিনা। এনডি আর কোরি দৌড়ে আসছে। ভীষণ উত্তেজিত। কেন, সেটাও অনুমান করতে পারল সে। নিশ্চয় কেবিনে ঢুকে ওদেরকে না পেয়ে তাজ্জব হয়ে গেছে ওরা। বসুকে খবরটা দিতে আসছে। কিন্তু সাইরেনের শব্দ শুনে আর বসদেরকে হেলিকপ্টারের দিকে দৌড়াতে দেখে থমকে গেল ওরা। বুঝল, পরিস্থিতি সুবিধের নয়।
যেতে যেতে চিৎকার করে আদেশ দিল কেইন, ওদিকে যাচ্ছ কোথায়, গাধা কোথাকার! জলদি বোট নিয়ে পালাও! ইয়টটা নিয়ে চলে যাও গাল আইল্যান্ডে। আমরা হেলিকপ্টারে করে যাচ্ছি।
পৌঁছে গেছে পুলিশ। গেট দিয়ে ঢুকল প্রথম গাড়িটা। পেছনে একে একে আরও চারটা। পুরো বহর নিয়ে চলে এসেছে ওরা। রাগবি ড্যাগোকে ধরার এমন চমৎকার মওকা কোন ভাবেই হাতছাড়া করতে রাজি নয়।
গাড়ি-বারান্দায় এসে ব্রেক করল সামনের গাড়িটা। ঝটকা দিয়ে খুলে গেল দুদিকের দরজা। প্রথমেই যাকে নামতে দেখল জিনা, দেখে অবাক হয়ে গেল।
রবিন!

বুঝতে পারল না, পুলিশের সঙ্গে ও এল কি করে?
রবিনকে দেখে আর লুকিয়ে থাকতে পারল না জিনা। লাফ দিয়ে ঝোঁপ থেকে বেরিয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটল গাড়ি-বারান্দার দিকে।
দেখল, ইভাও নামছে গাড়ি থেকে। জিনা তো আর জানে না, কিশোর রবিনকে বলে এসেছে মধ্যরাতের পর ওরা মোটেলে ফিরে না গেলে মিয়ামি পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। ডিটেকটিভ ওয়ারেন রবিনের আসার সংবাদটাই জানাতে চেয়েছিল কিশোরকে। লাইন কেটে না দিলে ওই সময়ই রবিনের সঙ্গে কথা বলতে পারত কিশোর।

.

চব্বিশ ঘণ্টা পর নিজেদের ভাড়া করা ভ্যানটায় করে আবার গাল আইল্যান্ডে ফিরে চলল তিন গোয়েন্দা। এবার ওদের সঙ্গে রয়েছে জিনা আর ইভা। মিয়ামি পুলিশের সঙ্গে দীর্ঘ সিটিঙের পর, পুরো রিপোর্ট লিখে দিয়ে একটা হোটেলে গিয়ে উঠেছিল গোয়েন্দারা। পুলিশের অনুরোধে-অন্তত একটা দিন যেন থেকে যায় ওরা। ওদেরকে দরকার হতে পারে।
হোটেলে বিশ্রাম নিয়ে শরীরটা ঝরঝরে হয়ে গেছে ওদের। গাড়ি চালানোর সময় মনের আনন্দে শিস দিতে শুরু করল মুসা।
ঘুরপথে না গিয়ে অ্যালিগেটর অ্যালিতে গাড়ি ঢুকিয়ে দিল সে। কিশোর জিজ্ঞেস করলে বলল, দিলের বেলা না দেখে যাচ্ছি না আমি, সে-রাতে কাদের খাবার হতে যাচ্ছিলাম।
দেখো, এখন সত্যি সত্যি না খাবার হয়ে যাও, সাবধান করল বটে কিশোর, কিন্তু আপত্তি করল না। কারণ দিনের আলোয় অ্যালিগেটরে ভরা জলাভূমিটা দেখার লোভ সামলাতে পারল না সে-ও।
রবিন আর জিনারও আগ্রহ আছে। ইভার নেই। বহুবার দেখেছে সে। তবে বাধা দিল না। কিছু বলল না। ওরা দেখতে চাইছে, দেখুক।
নিরাপদেই পেরিয়ে এল বিশাল জলাভূমিটা। কোথায় পড়তে যাচ্ছিল রাতের বেলা, দিনের আলোয় দেখে শিউরে উঠল মুসা। সত্যি ভয়ানক জায়গা! বড় বাঁচা বেচেছে।

.

কজওয়ে ধরে গাল আইল্যান্ডে যখন ঢুকছে ওরা, মাথার ওপর উঠে এসেছে সূর্যটা। তীব্র হয়ে উঠেছে এ অঞ্চলের কড়া রোদ।
গাল আইল্যান্ডে ফিরে মোটেলে ঢোকার পথেই দেখা হয়ে গেল হারম্যান কেগের সঙ্গে। সবুজ গাড়িটা রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে গাড়ি থামাতে বলল কিশোর।

নেমে গেল ওরা দল বেঁধে। গাড়িটা থেকে খানিক দূরে ঝড়ে উপড়ে পড়া একটা পাম গাছের ওপর ছাতার নিচে বসে গভীর মনোযোগে পামের জটলার ছবি আঁকছে সে। রোদ থেকে বাঁচার জন্যে বালিতে খাড়া করে গেঁথে দিয়েছে বড় একটা ছাতা।

ছেলেমেয়েদের সাড়া পেয়ে মুখ ঘুরিয়ে তাকাল। মুহূর্তে স্থির হয়ে গেল হাত। থেমে গেল পেন্সিল। তোমরা!

হ্যাঁ, আমরা, হাসিমুখে জবাব দিল কিশোর। আজ আর কোন অভিযোগ নিয়ে আসিনি আপনার কাছে। আসল কিডন্যাপাররা ধরা পড়েছে।...জিনা, হারম্যান কেগ।

মাথা নাড়ল জিনা, জীবনেও দেখিনি একে।

উঠে এল কেগ। ভুরু কুঁচকে জিনাকে দেখতে লাগল।

পরিচয় করিয়ে দিল কিশোর। সংক্ষেপে জানাল সব।

খোদা বাঁচিয়েছে আমাকে! জোরে নিঃশ্বাস ফেলে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল। কেগ। ওর ঘড়িটা যে আমার ঘর থেকে নিয়ে গেছ, একটা কাজের কাজ করেছ। চুরি করে আমার ঘরে ঢুকেছিলে বলে এক বিন্দু রাগ নেই আর আমার।

কিন্তু একটা কথা বলুন তো, কিশোর বলল, বীমার দালালি ছেড়ে আপনি এতদিন ধরে এই গাল আইল্যান্ডে এসে বসে আছেন কেন?

অবাক হয়ে গেল কেগ। আমি বীমার দালালি করি কে বলল তোমাকে?

ভুলে যাচ্ছেন কেন, আমরা গোয়েন্দা। কেইন আর ড্যাগোর মত অপরাধীকে ধরিয়ে দিয়ে এলাম, আর আপনি কি কাজ করেন, সেটা বের করতে পারব না?

তা ঠিক, মাথা ঝাঁকাল কেগ। আর মিথ্যে বলব না। সত্যি কথাটাই বলি। বীমার দালালি আমার পেশা নয়। আমি এ লাইনে নতুন। মানুষকে পলিসি গছানো যে কি কঠিন ব্যাপার, যে এ কাজ না করেছে সে বুঝবে না। অনেক চেষ্টা-চরিত্র। করে যা-ও বা একজনকে রাজি করালাম, এমন একটা প্যাঁচে ফেলে দিল আমাকে যে, পারলে কোম্পানির ম্যানেজার আমাকে পুলিশে দেয়। কিছুটা সেই ভয়ে, আর মনের দুঃখে এসে এই স্বেচ্ছা নির্বাসন নিয়েছি।

পচা পচা ছবি আঁকার জন্যে, হাসল মুসা। গলা লম্বা করে কেগের হাতের ছবিটা দেখল। এগুলো কি পামের জটলা, না মুঠি বাধা ছাগলের শিং? শিঙের মাথায় ওগুলো কি? তুলোর পোঁটলা?

স্তব্ধ হয়ে গেল কেগ। ধীরে ধীরে হাসি ফুটল গম্ভীর মুখে। তারপর অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। ঠিক বলেছ। আমি জানি আমার আঁকা ভাল হয় না। কিন্তু এত সহজে সত্যি কথাটা আমার মুখের ওপর কেউ বলেনি আর। শুধু এ কথাটার জন্যে তোমাদেরকে একটা দাওয়াত দিয়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে।

খাওয়ার দাওয়াত তো? সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তাবটা লুফে নিল মুসা। বলুন, কবে আসতে হবে?
কেগকে ধন্যবাদ দিয়ে, হাসাহাসি করতে করতে গাড়িতে ফিরে এল ওরা।
মোটেলের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই গাড়ির শব্দ শুনে অফিস থেকে ছুটে বেরিয়ে এলেন মিস্টার ব্রুক। গাড়ির কাছে এসে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলতে লাগলেন, এসেছ তোমরা! বাঁচা গেল। দেরি দেখে আমি তো চিন্তায়ই পড়ে গিয়েছিলাম...
হ্যাঁ, চাচা, গাড়ি থেকে নামতে নামতে জবাব দিল ইভা। অ্যালিগেটর অ্যালিতে থেমেছিলাম। জলাভূমিটা দেখতে চেয়েছিল ওরা।
অ। টেলিফোনে সব শুনেও নিশ্চিত হতে পারছিলাম না, মিস্টার ব্রুক বললেন। মনে হচ্ছিল, ড্যাগো আর কেইন সহ ধরা তো পড়েছে মাত্র চার পাঁচজন। কিন্তু ওদের দলে আরও লোক আছে নিশ্চয়। যারা তখন ওবাড়িটাতে ছিল না। প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে রাস্তায় যদি কিছু করে তোদের?
কিছু যে করেনি, দেখতেই তো পাচ্ছ, হেসে বলল ইভা।
ড্রাইভিং সীট থেকে লাফ দিয়ে নেমে এল মুসা। কিন্তু কথাটা হলো আঙ্কেল, আপনার দুশ্চিন্তা কমেছে, কিন্তু আমার যে বেড়ে যাচ্ছে।
অবাক হয়ে তার দিকে তাকালেন মিস্টার ব্রুক। ইভাও অবাক।
কেন, এখন আর দুশ্চিন্তা কিসের? জানতে চাইলেন মিস্টার ব্রুক। সব ঝামেলা তো শেষ।
দুশ্চিন্তাটা হলো, কেউ খাওয়ার কথা বলছে না, মুখ গোমড়া করে বলল মুসা। নাড়িভুড়ি হজম হয়ে গেলে কোন মানুষ বাঁচে বলে আমার জানা নেই।
হা-হা করে হেসে উঠলেন আঙ্কেল ব্রুক।
চমকে গেল ইভা। চাচাকে এ ভাবে হাসতে বহুকাল দেখেনি।
হাসতে হাসতে মিস্টার ব্রুক বললেন, ভাল কথা মনে করেছ তো। তোমাদের অপেক্ষায় থেকে থেকে পেট বলে যে একটা জিনিস আছে, ভুলেই গিয়েছিলাম। চলো চলো, কুপারের ওখানেই গিয়ে খাওয়াটা সেরে আসি। আমরা যে বিজয়ী হয়েছি, লাঞ্চ দিয়ে সেটা সেলিব্রেট করব।
তা-ই চলুন। মিস্টার কুপারকেও জানাতে পারব, তার রেস্টুরেন্টটা বেঁচে গেছে। কেইনের শয়তানি বন্ধ হয়েছে। আবার আসবে ট্যুরিস্ট, জমে উঠবে ব্যবসা।
সেটা জানে না মনে করেছ? সুখবরটা অনেক আগেই দিয়ে দিয়েছি ওকে।
আরও একবার জানাব আমরা, চলুন।
আবার গাড়িতে উঠল সবাই। দলে এবার যুক্ত হলেন মিস্টার ব্রুক।
কুপারস ডিনারের সামনে এনে গাড়ি রাখল মুসা। গাড়ি থেকে নেমে সারি দিয়ে ভেতরে ঢুকল সবাই। তাড়াহুড়ো করে চেয়ার টানাটানি করে এনে টেবিল গুছিয়ে

দিল কুপার আর ম্যাগি। আরাম করে বসল সবাই। পনেরো মিনিটের মধ্যেই বিরাট এক ট্রে বোঝাই করে বার্গার আর স্টেক স্যান্ডউইচ নিয়ে হাজির হলো ম্যাগি।

কেইনের বাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজেছে পুলিশ, খেতে খেতে গোয়েন্দাদের জানালেন মিস্টার ব্রুক। নানা রকম দামী দামী চোরাই মালে ভর্তি ছিল বাড়ির নিচতলার স্টোররুম। বড় বড় মার্কেটের দোকান থেকে চুরি গেছে ওসব। লিস্ট আছে মিয়ামি পুলিশের কাছে। সেই সঙ্গে চোরাই পথে আনা প্রচুর ইলেকট্রনিক সামগ্রী, বিশেষ করে কম্পিউটারের পার্টস, বেআইনী ভাবে আনা। গ্যাংলীডার রাগবি ড্যাগো দক্ষিণ ফ্লোরিডাতেও তার ব্যবসা বিস্তার করতে চেয়েছিল। দলে ঢুকিয়ে নিয়েছিল স্মাগলার কেইনকে।

খালাস পেয়ে যাবে না তো? প্রশ্ন করল জিনা।

না, তা পাবে না, মাথা নাড়লেন মিস্টার ব্রুক। প্রথমেই আমার এ কথাটা মনে হয়েছে। পুলিশকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। ওরা বলল, না, ওর বিরুদ্ধে এত বেশি প্রমাণ আছে ওদের হাতে, কোনমতেই ছাড়া পাবে না কেইন। আর ড্যাগো তো আগে থেকেই অভিযুক্ত হয়ে আছে। মুখ তুললেন মিস্টার ব্রুক। আমাদের দ্বীপ থেকে কেন তাড়াতে চেয়েছিল ওরা, বলেছে কিছু?

কেইন আর ড্যাগো অন্তত আমাদের সামনে মুখ খোলেনি, কিশোর বলল। পরে কি করবে জানি না। তবে নীরা বেগম জেরার মুখে ক্যানারি পাখির মত গান গাওয়া শুরু করেছিল। আর পিকোটাকেও ধরে ফেলেছে পুলিশ। সে তো এমন কাণ্ড করল, যেন পেটে যা আছে উগরে দিতে পারলে বাঁচে।

পিকো কে?

কেইনের বিসকেইনি বের বাড়ির পাহারাদার।

ও। তা কি বলল?

পুরো দ্বীপটাই কিনে ফেলতে চেয়েছিল কেইন, ছুরি দিয়ে স্টেক কেটে কাঁটা চামচে গেঁথে মুখে পুরল কিশোর। ওদের হেডকোয়ার্টার বানাতে চেয়েছিল। চোর-ডাকাত স্মাগলারদের স্বর্গদ্বীপ। ফ্লোরিডার পশ্চিম উপকূলে সুন্দর, ছিমছাম, নিরিবিলি একটা দ্বীপের চেয়ে ভাল হেডকোয়ার্টার ওদের মত অপরাধীরা আর কোথায় পাবে? স্থলপথ, জলপথ, আকাশপথ, সব দিক থেকে ঢোকা যায়।

হুঁ, তা ঠিক। আমার গাছগুলো কে চুরি করেছে, বলেছে নাকি? জানতে চাইলেন মিস্টার ব্রুক।

ওই দুই শয়তানই লোক দিয়ে করিয়েছে, কিশোর জানাল। এনডি আর কোরি। আপনি যে ভেবেছেন বিক্রির জন্যে নিয়ে গেছে, তা না; আসলে বিরক্ত করে করে আপনাকে বিয়ে করার জন্যে।

সে তো বোঝাই যাচ্ছে এখন, মাথা দোলালেন মিস্টার ব্রুক। আর টাকা খেয়ে ওদের সহায়তা করে এসেছে শয়তান গেকোটা।
তাই তো, গিরগিটিটার কথা তো ভুলেই গিয়েছিলাম, খেতে খেতে মুখ তুলল মুসা। ওটার কি গতি করেছে মিয়ামি, পুলিশ? নারকেল গাছে তুলে দিয়ে গেছে, যেখানে ওর আসল বাসা?
হাসলেন মিস্টার ব্রুক। না, নারকেল গাছে তোলেনি। তবে শাসিয়ে দিয়ে গেছে, দ্বীপের কারও ব্যাপারে যেন আর নাক না গলায়। ওর জায়গায় একজন অফিসারকে বসিয়ে গেছে অস্থায়ী ভাবে দ্বীপে পুলিশের দায়িত্ব পালনের জন্যে। বলে গেছে যত শীঘি পারে কাউন্টিতে নালিশ করে ওর ডেপুটিগিরি খতম করে ওকে জেলে ভরার ব্যবস্থা করবে।
মজার ব্যাপারটা কি জানেন? আবার আগের কথায় ফিরে এল কিশোর। নীরা লেভিন কিন্তু ওদের সঙ্গে থেকেও জানত না কেইনের আসল ব্যবসাটা কিসের। তাকে বলা হয়েছিল এক্সপোর্ট-ইমপোর্টের ব্যবসা আছে কেইনের। সে একজন বিরাট বড়লোকের স্ত্রী হওয়ার স্বপ্নে বিভোর ছিল। সেজন্যেই পুরো দ্বীপটা কিনে নেয়ার ব্যাপারে সহায়তা করে আসছিল কেইনকে। একটু-আধটু অপরাধ করে ফেলেছিল।
বহু জায়গা এখন খালি পড়ে আছে দ্বীপে, মিস্টার ফ্রক বললেন। সব নীরার কেনা, তার নিজের নামে। অনেকেই তার কাছে জমি বেচে দিয়ে চলে গেছে। অনেকে বাড়িঘরের কাজ শুরু করেছিল মাত্র, তাদের জায়গাও কিনে নিয়েছে নীরা।
তার অত সাধের কেইন তো গেছে চোদ্দ শিকের আড়ালে, মুসা বলল। এখন এসে ওসব জায়গা ভোগ করুক। ইচ্ছে করলে তাবু খাঁটিয়ে বাস করতে পারে।
যদি সে-ও বেরোতে পারে শিকের আড়াল থেকে, ফোড়ন কাটল রবিন।
তা পারতেও পারে, কিশোর বলল। যে রকম খেপেছে কেইনের ওপর, ওর বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতেও দ্বিধা করবে না। তার শাস্তির মেয়াদ কমিয়ে তখন তাড়াতাড়িই ছেড়ে দেয়া হবে জেল থেকে।
তা তো হলো, জিনা বলল। কিন্তু আমরা এখন কি করব? বাড়ি ফিরে যাব?
উঁহু, অত তাড়াতাড়ি না, জোরে জোরে মাথা নাড়ল মুসা। কিছুই দেখা হলো না এখানকার সমুদ্র। শুনেছি, পুরানো আমলে আশেপাশে প্রচুর জাহাজডুবী হয়েছে। সমুদ্রে ডুব দিয়ে দিয়ে গুপ্তধন খুঁজব। তা ছাড়া কেগের দাওয়াতটার কথা ভুলে যাচ্ছ কেন? না খেয়ে চলে গেলে নিরাশ হবে না ভদ্রলোক?

ভলিউম ৬০ – শুঁটকি শত্রু – তিন গোয়েন্দা – রকিব হাসান
প্রথম প্রকাশ: ২০০৫
ফ্যাশন শোতে যাচ্ছি ভাবতেই দারুণ লাগছে, কিশোর পাশা বন্ধুদের উদ্দেশে বলল। এইমাত্র ওরা ওদের প্রিয় দোকান ফ্যাশন হাউজ -এ প্রবেশ করল।
যে ড্রেস পরে মডেলিং করব সেটা কি ওরা দিয়ে দেবে নাকি? প্রশ্ন করল রবিন মিলফোর্ড।
মাথা নাড়ল মুসা আমান।
রবিন! তোমার ক্লজিটের যেরকম ঠাসাঠাসি অবস্থা, কবে যে দরজাটা ভেঙে যাবে!
রবিন হাসল বন্ধুর দিকে চেয়ে।
গেছে অলরেডি!
ছেলেরা মহা উত্তেজিত। ফ্যাশন হাউজ মস্ত দোকান। ওটার ভিতরেই শো হবে। রকি বীচের বেশ কয়েকজন ছেলে-মেয়ে মডেল। কিশোর আর রবিনও রয়েছে তাদের সঙ্গে।
আরি! সবিস্ময়ে বলে উঠল কিশোর। ফ্যাশন হাউজকে তো কখনোই এমন সাজে দেখিনি।
দোকানটার দিকে দৃষ্টি বুলাল তিন গোয়েন্দা। আগাগোড়া বিশাল এক লাল কার্পেট ফেলা হয়েছে। কার্পেটের দুধারে সারি সারি চেয়ার। প্রত্যেকটা চেয়ারের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয়েছে একটা করে রঙিন বেলুন।
কাপড়ের ব্ল্যাকগুলোর উপরে কার্ডবোর্ডে লিখে রাখা হয়েছে: ব্যাক টু স্কুল।
ধ্যাত, বিরক্তি প্রকাশ পেল মুসার কণ্ঠে। গরমের ছুটি শেষ হতে আরও তিন সপ্তা বাকি, অথচ এখনই স্কুলে ফিরে যেতে বলছে!
মুচকি হাসল কিশোর।
ভালই তো, ব্যাক টু স্কুল বলছে, কিন্তু আসলে তো ফ্যাশন শো!
কিশোর, দেখো, বলে উঠল রবিন। দেয়াল ঘড়ির দিকে আঙুল তাক করেছে। একটা বেজে গেছে। শোয়ের আর এক ঘণ্টা বাকি।
স্টোরের মালিক মিরা ব্যস্ততার সঙ্গে ওদের পাশ কাটিয়ে চলে গেল। তাকে ও তার সেলসগার্ল রীটাকে চেয়ার গুনতে দেখল ছেলেরা।
মিরার মাথায় খাটো, কালো চুল। চোখজোড়া নীল। কালো প্যান্ট ও চকচকে লাল ব্লাউজ ওর পরনে।
রীটা পরেছে স্ট্রাইপড় টি শার্ট ও ট্যান প্যান্ট। বাদামী চুলের মেয়েটির মুখ ভর্তি ফুটকি চিহ্ন।
মিরা আর রীটা আমাদের চেয়ে কম এক্সাইটেড না, বলল গোয়েন্দাপ্রধান।

নার্ভাসও বলতে পারো, যোগ করল রবিন। মুসার দিকে ফিরল। শোতে নাম না দেয়ায় এখন খারাপ লাগছে না তোমার?
মাথা নাড়ল মুসা।
জিন্স আর সকার শার্টের মডেলিং করতে দেবে না, খারাপ লাগবে কেন?
রবিন চোখ নাচাল, কিন্তু হেসে ফেলল কিশোর। রবিন আর মুসার পছন্দ এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে।
আমাদের বরং সুবিধেই হয়েছে, বলল কিশোর। মুসা আমাদের আউটফিট বদলাতে সাহায্য করতে পারবে।
অন্যান্য যেসব ছেলে-মেয়েরা মডেল হবে, তারা আসতে শুরু করেছে। জুলি মরগ্যান আর রুডি মার্শকে দেখতে পেল ওরা। পরমুহূর্তে এমন একজনকে দেখল, ওরা যাকে আশা করেনি।
শুঁটকি টেরিও নাম লিখিয়েছে নাকি? গুঙিয়ে উঠল কিশোর।
ও মনে হয় দুটি প্যান্টের মডেলিং করবে, বলে হেসে ফেলল রবিন।
আমি কিন্তু কথাটা শুনতে পেয়েছি, রবিন মিলফোর্ড! খ্যাক করে উঠল শুঁটকি। তিন গোয়েন্দার কাছে হেঁটে এল। মেয়েদের মত পনিটেইল রেখেছে শখ করে।
গোয়েন্দাদের আবার মডেলিং করার শখ হলো কবে থেকে?
আজকে থেকে, জবাবে বলল গোয়েন্দাপ্রধান।
দাঁতে দাঁত পিষে মাথা নাড়ল টেরি।
তুমি এখানে কেন, টেরি? কিশোর প্রশ্ন করল।
চোখ জ্বলে উঠল টেরির।
ডয়েল নিউজে আর্টিকল লিখছি আমি।
এ আর নতুন কথা কী? মুসা বিড়বিড় করে বলল।
ডয়েল নিউজ শুঁটকির নিজের খবরের কাগজ। বাসায় বসে কম্পিউটারে নিজেই লেখে।
ফ্যাশন শো-র নতুন ড্রেসগুলো সম্পর্কে লিখবে, তাই না? রবিন বলল।
ধূর্ত হাসল টেরি।
না, বলল। গসিপ কলাম লিখব ঠিক করেছি।
কিশোর একদৃষ্টে চেয়ে টেরির দিকে। কী ধরনের গুজব রটাতে চাইছে শুঁটকি?
গসিপ রটানো কি ঠিক, টেরি? বলল অবশেষে। বিশেষ করে মিথ্যে গুজব।
চুলে আঙুল চালাল টেরি।
মিথ্যে গুজব রটা কে বলল তোমাকে?
তুমি তো আগেও অনেক বানোয়াট গপ্পো কেঁদেছ, টেরি, বলল মুসা। আমরা তো চিনি তোমাকে।

রেগে গেল শুঁটকি।
দেখো, বাজে কথা বলবে না। বানাবার কোন দরকারই পড়বে না, বলল। রসাল খবরের অভাব হবে না এখানে।
এই বলে চলে গেল টেরি। এক গাদা সোয়েটার দেখতে লাগল মন দিয়ে।
শুঁটকি যখন এসে হাজির হয়েছে, বলল রবিন। তখন এর চাইতে খারাপ আর কী হতে পারে?
মুসা দরজার দিকে আঙুল দেখাল।
কেন শিপটনের ব্যাপারে কী বলবে?
কিশোর ঘুরে তাকাল। দেখতে পেল কেন শিপটন ঢুকছে। সঙ্গে ওর যমজ দুই ভাই মানি আর পেনি। যমজ বাচ্চা দুটো মডেল হবে।
আমরা শো করব! চেঁচিয়ে উঠল মানি।
আমরা সবার চেয়ে সুন্দর! যোগ করল পেনি।
মুখে আইসক্রীম লেগে আছে, তাও? মুসা বলল।
কোন বিকার হলো না যমজদের। হাসি মুখে পাণ্ডা বার চকোলেট আইসক্রীম খেয়ে চলেছে।
কিশোরের এবার নজর গেল কেনের মাথায় পরা কালো বেরে টুপির দিকে।
তোমার জাদুকরের পোশাকের সঙ্গে মানাবে টুপিটা, বলল ও। ও জানে, কেন বড় হয়ে ম্যাজিশিয়ান হতে চায়।
আমি ঠিক করেছি ম্যাজিশিয়ান হব না, বলল কেন। পকেটে হাত ভরে ভাঁজ করা এক কাগজ বের করল। শিল্পী হব।
কাগজটা তুলে ধরল। সাদা একটা ছোপ ছাড়া আর কিছু ধরা পড়ল না কিশোরের চোখে।
কী পড়েছিল? প্রশ্ন করল মুসা। দুধ?
তুমি গ্রেট আর্টের কিছুই জানো না, কাটখোট্টা গলায় বলল কেন। পেইন্টিংটায় আঙুল রাখল। এটা মেরু ভালুকের ছবি। তুষারঝড়ের মধ্যে পড়েছে।
ঘাড় কাত করল কিশোর। কোথায় মেরু ভালুক আর কোথায়ই বা তুষারঝড়?
এরপর কী আঁকবে ওদেরকে বলো না, ভাইকে বলল মানি।
আমার পরের প্রজেক্ট হচ্ছে, ঘোষণা করল কেন। পোকা-মাকড়দের ছবি আঁকা।
তেলাপোকা? সবিস্ময়ে বলল রবিন।
মাথা ঝাঁকাল কেন।
তবে আঁকব কালো ভেলভেটের ওপর। প্রদর্শনীতে যেমনটা দেখা যায় আর
খাইছে! অত তেলাপোকা পাবে কোথায়? মুসা বলল।

জোগাড় হয়ে গেছে অলরেডি, জানাল কেন। শুধু কালো ভেলভেট এখনও হাতে পাইনি।
মিরা এসময় সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করল।
যারা ফ্যাশন শোতে অংশ নিচ্ছে, তারা আমার সঙ্গে স্টকরুমে চলো প্লিজ। চলো! উত্তেজিত কণ্ঠে বলল রবিন।
কেন শিপটন পিছনে রয়ে গেল। অন্যরা মিরাকে অনুসরণ করে স্টোরের পিছনদিকের রুমটায় চলে এল। ডাঁই করে রাখা গাদা গাদা বাক্স আর কাপড়ের র‍্যাক দেখা গেল এখানে।
ওদের জানা আছে কে কোন ড্রেস পরবে। কদিন আগে রিহার্সাল হয়ে গেছে। মিরা যার যার পোশাক বাছাই করে দেবার পর নেমট্যাগ ঝুলিয়ে দিয়েছে।
কিশোরের জন্য বেছে রাখা লাল জ্যাকেটটা ঝুলছে, গোলাপি রঙের প্লাস্টিকের হ্যাঁঙ্গার থেকে।
মিরা এক হাত উঁচিয়ে ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল।
শো চলার সময় তোমরা বাক্সগুলোর পেছনে চেঞ্জ করতে পারবে, জানিয়ে দিল। মেয়েরা ডান দিকে, আর ছেলেরা বাঁ দিকে।
মানি জুলি মরগ্যান ও অন্যান্য মেয়েদের উদ্দেশে বলল, উঁকি দিয়ো না যেন।
পেনি হাতে ধরা পাণ্ডা বার দোলাল।
তাকালে ভাল হবে না কিন্তু!
ছোট বাচ্চাদের লজ্জা-শরম একটু বেশিই থাকে, হাসি চাপল কিশোর।
মানি, পেনি, বলল মিরা। চারদিকে কাপড়-চোপড় রয়েছে, এখানে আইসক্রীম খেয়ো না।
কিন্তু পাণ্ডা বার পকেটে রাখলে তো গলে যাবে, আদুরে আদুরে গলায় বলল মানি।
ওই দেয়ালটার কাছে একটা ছোট ফ্রিজ আছে, আঙুল তাক করে বলল মিরা। ওখানে রেখে দাও।
গজগজ করতে করতে যমজরা ফ্রিজটার দিকে এগিয়ে গেল।
আচ্ছা, এবার বলো, বলল মিরা, ফ্যাশন শো সম্পর্কে তোমাদের কারও কোন প্রশ্ন আছে?
কিশোর হাত তুলল।
এই আগস্ট মাসের গরমে আমরা শীত-পোশাকের মডেলিং করছি কেন?
চমৎকার প্রশ্ন করেছে, কিশোর, সপ্রশংস কণ্ঠে বলল মিরা। মৌসুম আসার আগেই পোশাক প্রদর্শনী করার নিয়ম। লোকে যাতে আগেভাগে কিনে রাখতে পারে।

খাইছে! তারমানে ফেব্রুয়ারী মাসে বেদিং সুট বিক্রি করা হবে? মুসা ঢোক গিলল।
এ সময় রীটাকে হন্তদন্ত হয়ে স্টকরুমে ঢুকতে দেখা গেল। ওর হাতে বড়সড়, চারকোনা একটা বাক্স।
এটা এইমাত্র এসে পৌঁছেছে, মিরা, বলল। প্যারিসের লুলু থেকে।
কোটটা পাঠিয়ে দিয়েছে! মিরার কণ্ঠে উত্তেজনা। বাক্সটা খুলে ফেলল ঝটপট। হাসি ফুটল ওর ঠোঁটে। এত তাড়াতাড়ি পেয়ে যাব ভাবিনি।
বাক্স থেকে সাবধানে ছেলেদের একটা কোট বের করল মিরা। চকচকে রুপোলী বোতামওয়ালা কালো মখমলের এক কোট।
দুর্দান্ত! কিশোর অস্ফুট মন্তব্য করল।
এক্সকিউজ মি! অপরিচিত এক কণ্ঠ।
সবাই ঘুরে দাঁড়াল কণ্ঠস্বরটা লক্ষ্য করে। রুপোলীচুলো এক মহিলা, সোনার ইয়ারিং পরে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে। দামি, সুদৃশ্য এক হ্যান্ডব্যাগ কাঁধ থেকে ঝুলছে।
আপনি কি মিরা নায়ার? প্রশ্ন করলেন।
মিরা আয়ার।
আমি মিসেস হগার্ড, বললেন অচেনা ভদ্রমহিলা। আমার বাচ্চাদের জন্য কিছু হেয়ার ব্যারেট কিনতে চাই।
আপনার মেয়েদের বয়স কত? মিরা জিজ্ঞেস করল।
মিসেস হগার্ড তার হাতব্যাগের ভিতরে হাত ভরে দিলেন। দুটো খুদে ইয়র্কশায়ার টেরিয়ার বের করে আনলেন পরমুহূর্তে। মাত্র তিন বছর।
ডগি! চেঁচিয়ে উঠল মানি।
আদর করি চলো! পাল্টা চেঁচাল পেনি।
মিসেস হগার্ড কুকুর দুটোকে মাটিতে নামিয়ে দিলেন। কোটটার দিকে দৃষ্টি তার। হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করলেন।
এরকম ব্ল্যাক ভেলভেট সচরাচর দেখা যায় না। আমি এটা কিনব।
এটা তো ছোটদের কোট, মিসেস হগার্ড, বলল মিরা। আপনার গায়ে ফিট করবে না।
আমার জন্যে না তো! ঘোষণা করলেন, মিসেস হগার্ড। আমার সোনামণিদের কোটে নতুন কলার চাই। কালো ভেলভেটটা দারুণ মানাবে?
আপনার কুকুর দুটো কি আগস্টেও কোট পরে নাকি? রুডি মার্শ প্রশ্ন করল।
মাথা ঝাঁকালেন ভদ্রমহিলা।
এয়ারকুলারে ঠাণ্ডা লাগে ওদের।
মিরা মাথা নাড়ল।

সরি। ফ্যাশন শোর জন্য কোটটা আমাদের দরকার। বিক্রি করতে পারছি না।
উঁহ, যত্তসব আদিখ্যেতা, খ্যাক করে উঠলেন মিসেস হগার্ড। তারপর কুকুর দুটোকে তুলে নিয়ে গটগট করে বেরিয়ে চলে গেলেন।
মিসেস হগার্ড রকি বীচের সবচেয়ে বড় বাড়িটায় থাকেন, বন্ধুদের উদ্দেশে ললল কিশোর। চাচার সঙ্গে একদিন হাঁটতে বেরিয়েছিলাম, তখন দেখিয়েছিলেন।
অত বড় বাড়িতে এত ছোট কুকুর রাখেন? মুসা বলল।
মিরা এসময় কোটটা তুলে ধরল আবার।
কে, বলে সবার উপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিল সে। পরবে এটা?
ছেলেরা সবাই হাত তুলল। মিরা কিশোরের দিকে চেয়ে মুচকি হাসল।
আমি? ঢোক গিলে বলল কিশোর।
হ্যাঁ, তুমি, বলল মিরা। কিশোরকে কোটটা পরতে সাহায্য করল। তোমার জ্যাকেটটা অন্য কেউ পরবে।
তোমাকে দারুণ মানিয়েছে, কিশোর, রবিন তারিফ করে বলল।
নিজেকে রাজপুত্র মনে হচ্ছে কিশোরের। কিন্তু বেশিক্ষণ থাকল না সুখকর অনুভুতিটা। কেননা গর্জে উঠেছে রুডি মার্শ।
এটা অন্যায়! কোটটা আমাকে পরতে দেয়া উচিত!

.
কিশোর হতচকিত।
রুডির দিকে চেয়ে রয়েছে সবাই। রুডি বয়সে কিশোরের চাইতে বড়। স্কুলে প্রায়ই ফ্যাশনদুরস্ত পোশাক পরে আসে।
তোমাকে পরতে দেয়া উচিত একথা কেন বলছ, রুডি? জিজ্ঞেস করল মিরা।
কারণ আমি পিকচার পার্ফেক্ট মডেলিং স্কুলে ক্লাস করেছি, বলল। কোমরে ভঙ্গি নিয়ে হাত রেখে পাঁই করে এক পাক ঘুরে নিল। সবাই মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল ওর দিকে।
মিরা হেঁটে এল কিশোরের কাছে। কোটের হাতা দুটো ধরে টানল।
হাতা দুটো তোমার জন্য একটু বড় হয়ে গেছে, বলল। ঠিক ফিট করেনি।
কিশোর আঙুল বাড়িয়ে দিল।
কই, ঠিকই তো আছে, বলল।
একটু লম্বা ছেলেকে এটা ভাল মানাবে, বলল মিরা।
আমার মত! খোশমেজাজে বলে উঠল রুডি।
আমি দুঃখিত, কিশোর, বলল মিরা।
মনটা খারাপ হয়ে গেল কিশোরের। শোতে এটা পরতে পারবে ভেবে খুশি হয়ে গিয়েছিল। মনে হলো ওর মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়া হলো বুঝি।

ঠিক আছে, ঠিক আছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে কোট খুলে দিল ও।
রুডির হাতে কোটটা তুলে দিচ্ছে, এসময় কেন শিপটনকে পিছনের কামরায় উঁকি মারতে দেখল। ওর চেহারায় ধূর্ততার আভাস।
ছেলেটা সব সময় একটা না একটা মতলব ভাজে, মনে মনে বলল গোয়েন্দাপ্রধান। ওর মতলবটা কী এখন?
রুডি কোটটা পরল। তারপর হাসি মুখে বারবার ঘুরে ঘুরে সবাইকে দেখাল।
খাইছে! ওর কি মাথাও ঘোরে না নাকি? ফিসফিস করে বলল মুসা।
সবাই ফ্লোরে চলো, ডাকল মিরা। কোথায় মডেলিং করবে দেখে নাও।
তিন গোয়েন্দা ওকে অনুসরণ করবে, এমনিসময় প্যাড আর কলম হাতে ওদের সামনে লাফিয়ে পড়ল শুঁটকি টেরি।
আমি কাপড়ের র‍্যাকের পেছনে লুকিয়ে ছিলাম, বলল ও। দারুণ একটা নিউজ হবে।
কীসের নিউজ? কিশোরের প্রশ্ন।
তুমি কোটটা পেয়েও হারালে।
শ্রাগ করল কিশোর।
তাতে কী?
তাতে এই, তুমি হিংসায় জ্বলে-পুড়ে মরছ। তুমি চাইবে প্রতিশোধ নিতে!
আবার শুরু হলো, ভাবল কিশোর, শুঁটকির নোংরা খেলা।
কোটটা আমার গায়ে লাগেনি, বলল কিশোর।
চলে এসো, কিশোর, বলল রবিন, বুঝতে পারছি ও ফালতু খবর রটানোর সুযোগ খুঁজছে।
স্টকরাম ত্যাগ করল ছেলেরা। প্রচুর লোকজনকে ঢুকতে দেখা গেল স্টোরে। ফ্যাশন শো দেখতে এসেছে।
স্টোরের চারধারে চোখ বুলাল কিশোর। মিসেস হগার্ড হেয়ার ব্যারেটের একটা ব্ল্যাক ঘোরাচ্ছেন। কেন শিপটন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নানারকম মুখভঙ্গি করছে।
এই কার্পেটটা হচ্ছে তোমাদের রানওয়ে, বলল মিরা। স্টকরুমের বাইরে পেতে রাখা লালরঙা লম্বা কার্পেটটা দেখাল।
রুডি একটা হাত উঠাল।
মডেলিং স্কুলে আমরা একে ক্যাটওয়ক বলতাম।
মিয়াও! মিয়াও! পেনি বেড়াল ডাকল।
হেসে উঠল মিরা।
রানওয়েতে হাঁটা-চলা প্র্যাকটিস করা যাক, বলল। মানি, পেনি, আগে তোমরা।

পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করল যমজরা।
ওকে, বলল মানি। রেডি, সেট, গো!
সবার চোখের সামনে কার্পেটের উপর ছোটাছুটি শুরু করল দুভাই।
কী করছ কী তোমরা? মিরা জবাব চাইল।
রানওয়েতে দৌড়চ্ছি, জবাব দিল পেনি।
এটা নামেই রানওয়ে, শুধরে দিল মিরা। তোমরা আস্তে-ধীরে, সুন্দর করে হাঁটবে, সবাই যাতে তোমাদের ড্রেস দেখতে পায়।
সব কজন ছেলে-মেয়ের প্র্যাকটিস শেষ হলে দেয়াল ঘড়ি দেখল মিরা।
দুটো বাজে প্রায়, বলল ও। সবাই প্রথম প্রস্থ আউটফিট পরে ফেলল।
সবাই ছুটল স্টকরুমের দিকে। বাক্সের পিছনে গিয়ে কাপড় পাল্টাচ্ছে। জুতো, স্কার্ফ আর সোয়েটার উড়তে লাগল চারদিকে।
আমার ব্লু টাইটস কোথায়?
ভেস্টটা খুঁজে পাচ্ছি না!
কিশোর তার লাল জ্যাকেটটা পরছে। রবিন বেচারাকে সুট পরতে হবে। টাই বাঁধতে ওকে কসরত করতে হচ্ছে রীতিমত।
মুসা, হাঁক ছাড়ল। এদিকে একটু আসবে?
টাই বাধা সত্যি বড় ঝামেলার কাজ, কাজটা করে দিয়ে বলল মুসা।
কিশোর, সবার আগে তুমি, বলল মিরা। রেডি তো?
ধড়াস করে উঠল কিশোরের হৃৎপিণ্ড।
রেডি।
রীটা সিডি প্লেয়ার চালু করে দিল, কিশোর যেই ঘর থেকে বেরোবার জন্য পা বাড়াল।
লাল কার্পেটে পা রেখে চারধারে দৃষ্টি বুলিয়ে নিল কিশোর। একটা চেয়ারও খালি পড়ে নেই। পেটের ভিতর প্রজাপতি উড়ছে ওর।
কিশোর ব্যাক-টু-স্কুল জ্যাকেটের মডেলিং করছে, শ্রোতাদের উদ্দেশে ঘোষণা করল মিরা।
লাল কার্পেটের উপর দিয়ে সাবধানে, ধীর গতিতে হাঁটছে কিশোর। শেষপ্রান্তে পৌঁছে মৃদু হেসে ঘুরে দাঁড়াল।
থ্যাংক ইউ, কিশোর, মিরা বলল।
কিশোর স্টকরুমে ফিরে যাচ্ছে, এ সময় যমজরা ওর গায়ের উপর এসে আছড়ে পড়ল।
সরোহ! চেঁচিয়ে উঠল মানি।
হাতে বেলুন নিয়ে ছুটতে ছুটতে চলে গেল যমজরা।

এখন আপনাদের সামনে আসছে মানি আর পেনি, মিরার ঘোষণা এল। ওরা দেখাবে, যমজরাও আলাদা ড্রেস পরে।
ফ্যাশন শো-র বাকি সময়টুকু দারুণ উত্তেজনার মধ্যে কাটল। কিশোর আর রবিন আরও তিন ধরনের আউফিটের মডেল হলো।
এবার কালো ভেলভেট কোটের মঞ্চে আসার পালা।
সবাইকে একেবারে তাক লাগিয়ে দেব, আত্মবিশ্বাস ঝরে পড়ছে রুডির কণ্ঠে। ঝটপট কোটটা পরে নিয়ে বেরিয়ে গেল ও।
দেখা যাক ও কেমন করে, বলল মুসা।
তিন গোয়েন্দা স্টকরুমের ভিতর থেকে উঁকি মেরে চেয়ে রইল।
এবার আপনাদের সামনে আসছে, গর্ব ভরে বলল মিরা, আমাদের সেরা আউটফিট!
ঠোঁটে অহঙ্কারের হাসি নিয়ে, রানওয়ে ধরে গটগট করে হেঁটে গেল রুডি।
রবিন? মুসা? কিশোর ধীর কণ্ঠে বলল। আমি যখন কোটটা পরি তখন কি ওটার পেছনে ওই মস্ত ফুটোটা ছিল?
প্রশ্নই ওঠে না, দৃঢ়কণ্ঠে জানাল মুসা। চোখ ছানাবড়া।
কিশোরের বাহু চেপে ধরল রবিন। কে কাটল কোটটা?
কে জানে। কোটটার নীচে কালো লাইনিং আছে, ফিসফিস করে বলল কিশোর। হয়তো কারও চোখে পড়বে না।
কিন্তু ঠিক এসময় ছোট এক ছেলে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে।
মা, মা, দেখো! চেঁচিয়ে উঠল। কোটের পিছনে কত বড় ফুটো!

.

খাইছে! বলে উঠল মুসা।
গোটা স্টোরে পিনপতন নিস্তব্ধতা। রুডি কাঁধের উপর দিয়ে কোটের পিছন দিকটা দেখার চেষ্টা করছে।
সুইস পনিরের মত দেখাচ্ছে, দর্শকদের মধ্য থেকে একটি মেয়ে বলে উঠল।
লজ্জায় মুখ লাল হয়ে গেল রুডির। এক দৌড়ে ফিরে এল স্টকরুমে।
আজকের মত শো এখানেই শেষ হচ্ছে, লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলমেন, ত্বরিত বলল মিরা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।
স্টকরুমে ঢোকার সময় কিশোরকে ধাক্কা দিয়ে প্রায় ফেলেই দিচ্ছিল রুডি।
সবাই আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করছে! চিৎকার করে বলল। কোটটা খুলে ফেলেছে গা থেকে। আমি সুপারমডেল হতে চেয়েছি-ক্লাউন নয়!
দর্শকরা তোমাকে দেখতে তো পেয়েছে অন্তত, খুরি গলায় বলল জুলি মরগ্যান।
ওর দিকে দুমুহূর্ত চেয়ে থাকল রুডি। তারপর দৌড়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

আমি দোষের কী বললাম? জুলি অবাক গলায় প্রশ্ন করল।
মিরা স্টকরুমে এসে ঢুকল। সোজা গিয়ে দাঁড়াল রুডির র‍্যাকের সামনে।
মেঝেতে এটা কেন? বলে একটা কাচি তুলে নিল। এটা তো আমার সিউয়িং বাস্কেটে থাকে।
তারমানে এই কাঁচিটা দিয়েই অপকর্মটা করা হয়েছে, মনে মনে বলল কিশোর।
কাজটা যে করেছে সে খোলাখুলি স্বীকার করো, বলল মিরা। কথা দিচ্ছি, আমি কিছু বলব না।
কেউ স্বীকার করল না দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলল মিরা।
আমি সারা দিন স্টোরেই থাকব। কারও কিছু বলার থাকলে গিয়ে বলে এসো, কথাগুলো বলে ঘর ত্যাগ করল।
হাহ-হাহ-হা!
হাসির শব্দে ঘুরে তাকাল তিন গোয়েন্দা।
আমি জানতাম এরকম একটা কিছু ঘটবে। খুশি ধরছে না শুঁটকির।
তুমি এত নীচ! ঘৃণা ঝরল রবিনের কণ্ঠে। ফ্যাশন শো বরবাদ হয়ে গেল আর তুমি মজা পাচ্ছ!
কী করব বল, বলল শুঁটকি। প্যাড দোলাল। আমার দরকার ছিল গসিপ, পেয়েও গেছি।
একটু পরে ওকে ঘর ত্যাগ করতে দেখল তিন গোয়েন্দা।
ইচ্ছা করছিল কষে দুঘা লাগিয়ে দিই, দাতে দাঁত পিষে বলল মুসা।
বাদ দাও শুঁটকির কথা, বলল কিশোর। আমাদের সামনে অনেক কাজ পড়ে আছে।
কীরকম? রবিন জিজ্ঞেস করল।
জানতে হবে না, কে কোটটা কাটল?
ঝিক করে উঠল রবিনের দুচোখের তারা।
তারমানেই রহস্য, বলল হাসি মুখে।
কথায় আছে না, চেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে, বলল মুসা।
ওর কথা শুনে হেসে ফেলল গোয়েন্দাপ্রধান।
মুসা এসময় হাতঘড়ি দেখল।
ড্যাডি একটু পরেই চলে আসবে আমাদের নিতে।
নো প্রব্লেম। আগে কাপড় পাল্টে নিই, তারপর ক্লু খুজব, বলল কিশোর।
অন্য মডেলরা বাড়ি চলে গেছে। রয়ে গেছে শুধু কিশোর, মুসা আর রবিন।
কিশোর আর রবিন পোশাক পাল্টাবার পর, একটা বাক্সের উপর বসল তিনজন।

ক্লু বলতে এখন পর্যন্ত ওই কাঁচিটাই, বলল গোয়েন্দাপ্রধান। নীচের ঠোঁটে চিমটি কাটল।
রবিনের মুখে চিন্তার ছাপ।
একটা ব্যাপার বুঝলাম না, কিশোর, বলল ও। ঘর ভর্তি লোকের মধ্যে কোটটা কাটল কে?
আর আমি তো সর্বক্ষণ এই স্টকরুমেই ছিলাম, জানাল মুসা।
হু, বলল কিশোর। কিন্তু মিরা আমাদেরকে যখন রানওয়েতে নিয়ে যায় তখন কিন্তু এখানে কেউ ছিল না। অন্তত পনেরো মিনিট।
কালপ্রিট তখনই সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে ঢুকে পড়ে এখানে, বলল মুসা।
মাথা ঝাঁকাল কিশোর।
কাঁচিটা একটা জোরাল সূত্র। আরও কিছু পাওয়া যায় কিনা দেখি এসো।
ছেলেরা পিছনের কামরাটা তন্নতন্ন করে খুঁজল। হঠাই তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠল রবিন।
পেয়েছি। পেয়েছি!
কী পেয়েছ? সূত্র? কিশোর প্রশ্ন করল।
না! বলল রবিন। লাল রঙের এক বেরে টুপি তুলে ধরে দেখাল। আমার নতুন জ্যাকেটের সাথে ভাল মানাবে। সুন্দর না?
এই? হতাশ কণ্ঠে বলল মুসা। আমি ভাবলাম কী না কী।
আমরা ক্লু খুঁজছি, রবিন, বলল কিশোর। কাপড় না।
রবিন দীর্ঘশ্বাস ফেলে টুপিটা রেখে দিল।
কালো কোটটা যে র‍্যাক থেকে ঝুলছিল তার নীচে চোখ রাখল কিশোর। পরমুহূর্তে চকচকে কিছু একটা দৃষ্টি কাড়ল ওর।
রবিন, মুসা, এদিকে এসো! জরুরী কণ্ঠে ডাকল বন্ধুদের।
চকচকে জিনিসটা কুড়িয়ে নিয়েছে গোয়েন্দাপ্রধান। বড় বড় মুক্তোখচিত সোনার এক ক্লিপ-অন ইয়ারিং।
চেনা-চেনা লাগছে না? বলল মুসা।
হাতের তালুর উপর ইয়ারিংটা গড়িয়ে দিল কিশোর।
হু। মিসেস হগার্ডের কানে এরকম ইয়ারিং দেখেছি।
কোট র‍্যাকের কাছে আসার ওঁর কী দরকার পড়ল? সপ্রশ্ন কণ্ঠে বলল রবিন।
আঙুল মটকাল মুসা।
কুকুরদের জন্য উনি কোটটা চাইছিলেন।
কিশোর ক্লুটা পকেটে রাখল।

প্রথম সাসপেক্টকে পাওয়া গেল, বলল ও নীচের ঠোঁটে চিমটি কেটে। মিসেস হগার্ড।
আর কে কাটতে পারে কোটটা? মুসার প্রশ্ন।
নিচু মনের কেউ, বলল রবিন।
ছেলেরা পরস্পর মুখ তাকাতাকি করল।
শুঁটকি! বলে উঠল একসঙ্গে।
শুঁটকি গুজব রটানোর জন্য ছোঁকছোঁক করে বেড়াচ্ছিল, বলল গোয়েন্দাপ্রধান। স্টোরি বানানোর জন্য ও নিজেই ওটা কেটে থাকতে পারে।
শুঁটকির নামটাও মনে গেঁথে নিল কিশোর।
কেন শিপটনকেও আমার সন্দেহ হচ্ছে, জানাল।
কেন শিপটন? জিজ্ঞেস করল রবিন। ও কোট কাটতে যাবে কেন?
ওর পেইন্টিঙের জন্য কালো ভেলভেটের দরকার, বলেছিল না? বলল কিশোর। তা ছাড়া ওকে আমি কোটটার দিকে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে থাকতে দেখেছি।
মাথা দোলাল রবিন।
ক্রমেই জটিল হয়ে উঠছে কেসটা।
শুরুতেই তিনজন সাসপেক্ট আর দুটো কু পাওয়া বিরাট ব্যাপার, খুশি মনে বলল কিশোর। কাল আবার দেখা করছি আমরা। আলোচনা হবে কেসটা নিয়ে।

.

সেদিন সন্ধ্যায় মেরি চাচীকে সালাদ তৈরি করতে সাহায্য করছিল কিশোর।
সুপারমডেল হতে কেমন লাগল তোর? শসা কাটার ফাঁকে জিজ্ঞেস করলেন চাচী।
লেটুস ছিঁড়ছিল কিশোর, মুখ তুলে চাইল।
মডেলিঙের কাপড়-চোপড় পরতে ভালই লাগে, চাচী, বলল ও। কিন্তু গোয়েন্দা আছি গোয়েন্দাই থাকতে চাই।
তারমানে চকচকে শু-র চেয়ে তোর ক্লু বেশি পছন্দ?
হেসে ফেলল কিশোর। কেসের কথাটা চাচীকে বলতে যাবে এসময় তোর বেলের শব্দ।
দেখ তো কে এল, বললেন চাচী। আমার হাত ভেজা।
যাচ্ছি, বলল কিশোর।
দরজার কাছে চলে এল ও। পীপ হোল দিয়ে উঁকি দিল। কেউ নেই।
কে? গলা চড়িয়ে বলল কিশোর।
সাড়া পেল না দেখে দরজাটা আস্তে আস্তে খুলল ও। দোরগোড়ায় পড়ে রয়েছে এক টুকরো কাগজ।

কী এটা?
ওটা তুলে নিয়ে গুঙিয়ে উঠল কিশোর। ডয়েল নিউজ। কাগজের শিরোনামে রয়েছে: গুজব! গুজব! গুজব!
শুঁটকি দ্রুত কাজে নেমে গেছে, ভাবল কিশোর। পড়তে গিয়ে মাথা ঘুরে উঠল ওর। লেখাটা বাংলা করলে দাঁড়ায়:
বলতে পারেন কোন তথাকথিত গোয়েন্দা ভেলভেটের চমৎকার কোটটা কেটেছে? - জনশ্রুতি, সে নাকি হিংসায় পাগল হয়ে গিয়েছিল। বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেছে, সে ফ্যাশন শোতে মডেলিংও করেছে। গোয়েন্দাগিরি ছেড়ে তবে কি সে ইঁদুরের মত কাপড় কাটতে লেগেছে? খাসা! পাঠক, ভেবে দেখুন তো ছন্দে কীসের সঙ্গে মিলছে?
কিশোর কাগজটা থেকে মুখ তুলে ঢোঁক গিলল।
খাসা আর পাশা!

.
পরদিন। মুসা আর রবিনের সঙ্গে কথা বলছে কিশোর।
শুঁটকি কোট কাটার জন্য আমাকে দায়ী করছে, দুঃখ করে বলল।
ওরা আজও ফ্যাশন হাউজে চলেছে, যদি আর কোন ক্লু পায়।
শুঁটকি তোমাকে দোষ দিচ্ছে কেন? মুসা প্রশ্ন করল।
কোটটা আমার পরার কথা ছিল, কিন্তু শেষমেশ রুডিকে পরতে দেয়া হ তাই।
যাকগে, নাম তো আর উল্লেখ করেনি শয়তানটা, রবিন বলল।
করার দরকার পড়েনি, জানাল কিশোর। ইঙ্গিতই যথেষ্ট।
মন খারাপ কোরো না, কিশোর, বন্ধুকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল মুসা। রকি বীচের কটা ছেলে-মেয়ে ওর ফালতু কাগজ পড়ে?
এসময় দুটো ছোট মেয়ে ওদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। কিশোরের দিকে চেয়ে মুখ টিপে হাসাহাসি করতে লাগল ওরা।
কিশোর পাশার কথাই লিখেছে, একজন বলল।
আমিও পড়েই বুঝতে পেরেছি, বলল অপরজন। হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল দুজনে।
ভাল, দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল কিশোর।
মেইন স্ট্রীট ধরে হাঁটছে এখন তিন বন্ধু। রবিন আচমকা বাহু চেপে ধরল কিশোরের।
আমরা শুঁটকির কথা বলছিলাম না? বলল। ওই দেখো, ফ্যাশন হাউজ থেকে কে বেরোচ্ছে।
টেরিকে দেখা গেল এক মহিলার সঙ্গে বেরিয়ে আসছে দোকান থেকে। দেখে মনে হলো মহিলা ওদের গভর্নেস হতে পারে।

মহিলার হাতে প্রকাণ্ড এক শপিং ব্যাগ। শুঁটকির পনিটেইল হাঁটার ছন্দে লাফাচ্ছে।
কী কিনল, কে জানে, বলল রবিন।
শয়তান জাদুকরের হ্যাট আর ঝাড় হবে আর কী? আওড়াল মুসা।
কাছেই এক ফুড শপে গিয়ে ঢুকল মহিলা। শুঁটকি বাইরে দাঁড়িয়ে জানালায় চোখ রাখল। ও যেই ঘুরে দাঁড়াল, চমকে উঠল কিশোর।
মুসা! রবিন! জরুরী কণ্ঠে বলল। শুঁটকির পনিটেইলে একটা কালো বো। দেখে মনে হচ্ছে ভেলভেট।
কোটের সেই ভেলভেট নয় তো? মুসার জিজ্ঞাসা।
ওটা হলে তো হাতেনাতে ধরেই ফেলব।
এখান থেকে দেখে কী মনে হচ্ছে, ওটাই? রবিন জানতে চাইল উত্তেজিত কণ্ঠে।
কোটের ভেলভেটটা ছিল পুরু আর মোলায়েম, জানাল কিশোর। জীবনেও ভুলব না।
মুসা চোখ সরু করে রাস্তার ওপারে চেয়ে রয়েছে।
ওর ঘাড়টা চেপে ধরে কেড়ে নিয়ে আসি বো-টা? দাঁতের ফাঁকে বলল।
না, না, আপত্তি করল কিশোর। কাজটা কৌশলে সারা যায় কিনা দেখো।
সেটা সম্ভব ও যদি চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে তবেই, বলল রবিন। কিন্তু শুঁটকি তো সর্বক্ষণ ছটফট করছে।
এসময় ফ্যাশন হাউজের জানালায় চোখ সেঁটে গেল কিশোরের। পুরোদস্তুর পোশাক পরা একটা ম্যানিকিন। ঠিক ওদের বয়সী একটি কিশোরের মত লাগছে। ওটাকে দেখেই বুদ্ধি খেলে গেল গোয়েন্দাপ্রধানের মাথায়।
শুঁটকিকে ঠায় দাঁড় করিয়ে রাখার একটা উপায় পেয়েছি, ধীরে ধীরে বলল ও।
কীভাবে? রবিন কৌতূহলী হলো।
ওর দিকে ঘুরে দাঁড়াল কিশোর।
রবিন, ডামি সাজবে?
মানে?
মানে খুব সোজা-ম্যানিকিন, বলল কিশোর।
বলতে চাইছ আমাকে পুতুলের মত কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে?
হাসল কিশোর।
আমিও থাকব, বলল। ও যদি ফাঁদে ধরা দেয় তবেই কেল্লা ফতে। মুসা। ওর মাথা থেকে খুলে নেবে বো-টা।
পারবে না, মুসা? রবিন বলল। আলগোছে ওর পিছনে গিয়ে এক টানে খুলে নিতে?

পারব না মানে, বলে উঠল মুসা। পায়ের দিকে আঙুল ইশারা করল। স্নিকার পরি কী করতে?
মুসা এপারে অপেক্ষা করতে লাগল। ওদিকে, কিশোর আর রবিন তড়িঘড়ি হেঁটে চলে এল শুঁটকির কাছে।
হাই, টেরি, বলল কিশোর।
শুঁটকি ঘুরে দাঁড়ালে ওর কালো বো নড়ে উঠল।
আমার আজকের গসিপ কলামটা দেখেছ? বাঁকা হেসে প্রশ্ন করল।
দেখেছি, বলল কিশোর। কিন্তু কাকে নিয়ে লিখেছ তা বুঝিনি।
আমিও বুঝিনি, সায় জানিয়ে বলল রবিন।
কিশোর তিন পর্যন্ত গুণল। তারপর কাঠ-পুতুল বনে গেল। ওর দেখাদেখি একই কায়দা ধরল নথিও।
এ আবার কী? শুঁটকি অবাক।
বুঝতে পারলে না? মাথায় দুহাত রেখে বলল রবিন। আমরা ডামি।
তাতে কোন সন্দেহ নেই, তীব্র তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল শুঁটকি।
আমরা ম্যানিকিন, শুধরে দিল কিশোর।
কী কারণে, জানতে পারি? সুর করে প্রশ্ন করল শুঁটকি।
মিরা আমাদেরকে ওর জানালায় দাঁড়িয়ে কাপড়ের মডেলিং করতে বলেছে, বলল গোয়েন্দাপ্রধান। তাই ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা প্র্যাকটিস করছি।
শুঁটকি ওর কথায় কান না দিয়ে হাঁটা ধরল।
পাগলামি আর কাকে বলে!
তা তো বলবেই, ফুট কাটল কিশোর। করে দেখতে গেলে বোঝা যায় কত কঠিন।
তোমার দ্বারা সম্ভব না, যোগ করল রবিন।
থমকে দাঁড়িয়ে গেল শুঁটকি।
কী বলতে চাও তোমরা? খেঁকিয়ে উঠল। পারি কিনা দেখতে চাও? পরমুহূর্তে, শূন্যে হাত দুটোকে নিথর রেখে চিবুক সোজা করল ও।
দারুণ তো! প্রশংসা করল কিশোর মনে মনে। শুঁটকি মুসার দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়েছে বলে আরও খুশি হলো।
দেখি কতক্ষণ ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারো, চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিল ও।
চোখের কোণে লক্ষ করল মুসা রাস্তা পার হচ্ছে। পা টিপে টিপে শুঁটকির দিকে এগোচ্ছে ও।
সব ঠিকঠাক, ভাবল কিশোর।
হঠাৎ জোরাল গুঞ্জনের শব্দ কানে এল ওর। মাথার উপরে একটা মাছি চক্কর কাটছে!

ভনন! ভনন! ভনন!
হাত নেড়ে ওটাকে সরাতে চাইছে কিশোর। কিন্তু ওকে তো কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।
ঠিক ওর নাকের ডগায় এসে বসল মাছিটা।
জলদি করো, মুসা-বলল মনে মনে। নাক চুলকাচ্ছে, অথচ হাত দেওয়ার উপায় নেই। জলদি!
কিন্তু হলো না। নাক সুড়সুড় করে উঠলে হাঁচি পেয়ে গেল ওর।
ওকে হাঁচতে দেখে চমকে উঠল রবিন। ফলে, দুজনেরই ভঙ্গি গেল বদল হয়ে।
এসময় চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল শুঁটকি।
মুসা আমান! চেঁচিয়ে উঠল। তুমি আমার পিছনে কী করছ?
শ্রাগ করল মুসা। হাতে ওর কালো বোটা। আমার বো! বলে পিছনে হাত দিয়ে পনিটেইল স্পর্শ করল শুঁটকি। তুমি আমার ভেলভেট বো চুরি করেছ!
মুসা তোমার বো চুরি করেনি, জোর দিয়ে বলল কিশোর।
করেছে! গর্জন ছাড়ল পুঁটকি। আর তুমি ওকে দিয়ে চুরিটা করিয়েছ!
আমি? বলল কিশোর।
শুঁটকি মাথা ঝাঁকাল।
জি। তুমি যে শুধু কাঁচি চালাও তাই না, তুমি একটা চোরও!
কিশোর ছোঁ মেরে মুসার হাত থেকে বো-টা কেড়ে নিল।
আমি যদি কাঁচি চালাই, তা হলে এটা কী?
শুঁটকির নাকের সামনে বো-টা দোলাচ্ছে, এসময় এক টুকরো কাগজ দেখতে পেল কিশোর-পিছনে স্ট্যাপল করা। ফ্যাশন হাউজের প্রাইস ট্যাগ।
একটু আগে কিনেছি ওটা, ঐ কুঁচকে বলল শুঁটকি। বাইরে এসে পরেছি। ওটা দিয়ে দাও বলছি!
আঙুলে বো-টার স্পর্শ নিল কিশোর। ওই কোটটার মত পুরু আর মোলায়েম নয়।
সরি, টেরি, বলে বো-টা বাড়িয়ে দিল কিশোর। আমরা আসল কাট আপকে ধরতে চাইছি বলে নাটকটা করতে হলো।
থাবা মেরে কেড়ে নিল জিনিসটা শুঁটকি।
তাকে ধরতে আবার এসব করতে হয় নাকি? আমি তো কাগজে সূত্র দিয়েই দিয়েছি।
ছেলেরা পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করল।
ইন ফ্যাক্ট, বলে নাক উঁচু করল বঁটকি। আমি ডয়েল নিউজকে ডেইলি পেপার করব ভাবছি। যাতে প্রতিদিন গসিপ কলাম লিখতে পারি।
খাইছে! আওড়াল মুসা।

শুঁটকি বো-টা বেঁধে নিল লম্বা চুলে। তারপর যার সঙ্গে এসেছিল, সেই মহিলাকে বেরোতে দেখে এগিয়ে গেল।
চলো, আমরা ফ্যাশন হাউজে যাই, প্রস্তাব করল কিশোর। মিরা হয়তো তদন্তের কাজে হেল্প করবে আমাদের।
কিন্তু ওরা যখন স্টোরের ভিতরে ঢুকল, মিরা ওদেরকে ক্লু দিতে রাজি হলো না।
একবার শুধু একটু উঁকি মেরেই চলে আসব, বলল রবিন।
মাথা নেড়ে সাফ নিষেধ করে দিল মিরা।
এখন থেকে স্টকরূম বন্ধ থাকবে।
ও, আচ্ছা, বলল গোয়েন্দাপ্রধান। স্টোরের সামনের দিকে হেঁটে এসেছে, জুয়েলারি কাউন্টারের উপর একটা কাগজ চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে দেখতে পেল। ডয়েল নিউজের একটা কপি।
তাই তো বলি, ফিসফিস করে বলল কিশোর। মিরাও আমাকে সন্দেহ করছে!
শুঁটকির মাথাটা ভেঙে দিতে ইচ্ছা করছে আমার! দাঁত কিড়মিড় করে বলল মুসা। ওকে হাতের কাছে পেলে দেখে নিতাম।
দোকান ত্যাগ করল ওরা। বাইরে এসে এক বেঞ্চির উপর বসল।
শুঁটকিকে সন্দেহ তালিকা থেকে বাদ দেয়া যায়, বলল গোয়েন্দাপ্রধান।
তারপরও দুজন থাকে, বলল রবিন। মিসেস হগার্ড আর কেন শিপটন।
কেন তোমার বাসার কাছেই থাকে, কিশোর, বলল মুসা। লাঞ্চের পর ওকে চেক করলে হয় না?
লাঞ্চের পর কিশোর তো প্রায়ই বাঘাকে নিয়ে হাঁটতে বেরোয়, বলল রবিন। ঠিক না, কিশোর?
মাথা ঝাঁকাল কিশোর। পরমুহূর্তে মাথায় একটা বুদ্ধি ঝিলিক দিয়ে গেল ওর।
মানি আর পেনি তো কুকুর ভালবাসে, তাই না? বন্ধুদের উদ্দেশে বলল।
হ্যাঁ, একসঙ্গে জানাল রবিন ও মুসা।
ওরা যখন বাঘাকে আদর করবে, সেই সুযোগে আমরা কেনের ওপর তদন্ত চালাব, বাতলে দিল কিশোর।
সাবাস! বলে উঠল মুসা।

.

কিশোরের বাসায় ফিরে এল তিন বন্ধু। মেরি চাচী রবিন ও মুসাকে খেয়ে যেতে বললেন। ওরা বাসায় ফোন করে অনুমতি নিয়ে নিল।
মেরি চাচীর বানানো টিউনা সালাদ স্যান্ডউইচ চিবোতে চিবোতে বেরিয়ে পড়ল তিন গোয়েন্দা। বাঘাকে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে এল কেন শিপটনদের ব্লকে।
ওর ঘরটা সার্চ করতে না হলেই বাঁচি, বলল রবিন।

ওর পোষা ইগুয়ানার জন্য বলছ? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
না, বলল রবিন। নাক টিপে ধরল। ওর মোজার দুর্গন্ধের জন্য।
ওরা গিয়ে দেখল মিসেস শিপটন বাগান পরিচর্যা করছেন। ওদেরকে দেখে হাসলেন ভদ্রমহিলা, বাঘাকে হাত বুলিয়ে আদর করলেন।
কেমন আছ তোমরা? কুশল জানতে চাইলেন।
ভাল, মিসেস শিপটন, বলল কিশোর। কেন, মানি, পেনি ওরা বাসায় আছে?
হ্যাঁ, জানালেন তিনি। মানি-পেনি উপরতলায় ফিঙ্গার পেইন্টিং করছে। কেন আছে পিছনের উঠনে। ও-ও আঁকাআঁকি করছি।
কেন কি তেলাপোকা আঁকছে? নাক কুঁচকে প্রশ্ন করল রবিন।
হ্যাঁ, বললেন মিসেস শিপটন। কালো রঙের কীসের ওপরে যেন।
কালো? চমকে গেল কিশোর।
মিসেস শিপটন, স্বাভাবিক গলায় বলল ও। আমরা কেনের সাথে একটু কথা বলে আসি?
মাথা নেড়ে সম্মতি দিলেন মিসেস শিপটন।
বেশ তো, যাও না। ও খুশি হবে বন্ধুদের দেখলে।
বন্ধুদের শুনে শ্বাস টানল মুসা, স্পষ্ট শুনতে পেল কিশোর।
ধন্যবাদ, মিসেস শিপটন, বলল ও। শিকল ধরে টানল বাঘাকে।
বাড়িটাকে এক পাক দিয়ে পিছনে এল ওরা।
ওই যে! গলা খাদে নামিয়ে বলল কিশোর।
ইজেল সামনে নিয়ে বসেছে কেন শিপটন। পাশে ছোট টেবিলের উপর। কাঁচের এক জার রাখা।
দিলে তো আলো বন্ধ করে, তিন গোয়েন্দা কাছিয়ে এলে বিরক্তির সুরে বলল কেন। আর আমার বিলিকেও ভয় পাইয়ে দিয়েছে তোমাদের কুকুরটা।
বিলি কে? কিশোরের প্রশ্ন।
কাঁচের জারটা দেখাল কেন। জারের ভিতরে ইয়া বড় এক তেলাপোকা।
ঘেন্নায় নাক কুঁচকে গেল রবিনের।
লোকে বিলিকে পানির পোকা বলে, ব্যাখ্যা করল কেন। কিন্তু আমি ওকে স্রেফ একটা বড়সড় তেলাপোকা মনে করি।
কালো এক টুকরো জিনিসের উপর তেলাপোকাটাকে আঁকছে কেন দেখে নিল কিশোর।
নীচের দিকে চোখ গেলে আরেকটা জিনিস নজরে এল। কেন শিপনের পাশে একই ধরনের জিনিসের আরেকটা ছোটখাট তূপ।
কালো ভেলভেটের উপর আঁকছে নাকি, কেন? কিশোর জিজ্ঞেস করল।

পেইব্রাশ তুলে ধরল কেন।
হতেও পারে, নাও হতে পারে, বলল।
কিশোর হাত বাড়াল জিনিসগুলোর উপর।
কোথায় পেয়েছ?
কেন শিপটন তার আগেই ধপ করে বসে পড়ল ওগুলোর উপর।
তাতে তোমার কী? পাল্টা প্রশ্ন করল।
মুসা এগিয়ে এল কেনের কাছে।
গতকাল ফ্যাশন হাউজে যে ভেলভেটের কোটটা কাটা হয়েছে এগুলো সেই কাপড়।
তুমি কেটেছিলে ওটা, কেন? কিশোর জবাব চাইল।
শ্রাগ করল ছেলেটি।
হয়তো, হয়তো নয়।
বাঘা দৌড়ে গেল। কেন বসেছে, সেই আসনটা কামড়ে ধরে টানতে লাগল।
অ্যাই, সরাও ওকে! চেঁচিয়ে উঠল কেন।
কিশোর বাঘাকে সরিয়ে নেবে, এ সময় কারা যেন খিলখিল করে হেসে উঠল।
যমজ ভাইদেরকে ডাক দিল কেন শিপটন। কুকুরটাকে দেখে যাও।
ছেলেরা ঘুরে দাঁড়াল। যমজ ভাইরা বাড়ির পিছন থেকে উঁকি দিয়ে দেখছে।
পরমুহূর্তে কুকুর দেখে সোৎসাহে ছুটে এল।
সভয়ে শ্বাস চাপল কিশোর। রঙমাখা হাত নিয়ে ছুটে আসছে দুভাই।
.
করো কী! করো কী! চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। কিন্তু কে শোনে কার কথা। বাঘাকে নানা রঙে রঙিন করার খেলায় মেতে গেল যেন দুভাই। শীঘি সবুজ, লাল, হলদে ডোরা আঁকা হয়ে গেল বাঘার সারা গায়ে।
হয়েছে, হয়েছে! বলে মুসা যমজদের টেনে সরিয়ে দিল।
কিশোর কেন শিপটনের পেইন্টিংটা কেড়ে নিয়ে শূন্যে তুলে ধরল।
দিয়ে দাও বলছি! কেন গর্জে উঠল।
আগে বলো কালো কাপড়টা কোথায় পেয়েছ, বলল কিশোর।
বলছি, বলছি, দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল কেন। এত যখন শোনার শখ।
কালো জিনিসটা তুলে নিল কেন। ঝাড়া দিল বার কয়েক। অসংখ্য ফুটো দেখা গেল ওটার মধ্যে।
এটা ছিল আমার জাদুকরের আলখেল্লা, বলল ও। যখন আমি গ্রেট ম্যাজিশিয়ান হতে চাইতাম।
কাটলে কেন? রবিনের প্রশ্ন।

রেখে কী লাভ? বলল কেন। আমি তো এখন বড় শিল্পী।
কিশোর ভাল মত স্পর্শ করে দেখল কাপড়টা। ভেলভেট নয়। হতাশ হয়ে পড়ল ও।
এবার দয়া করে আমাকে একটু কাজ করতে দাও, বলল কেন শিপটন। কালকে বিকেলে আমার প্রথম আর্ট শো কিনা।
শিয়োর, বিমর্ষ কণ্ঠে বলল কিশোর।
আমরা তোমাকে আর বিরক্ত করব না, বলল মুসা।
বাঁচালে, হাঁফ ছেড়ে বলল কেন শিপটন।
কেন আর যমজদের কাছ থেকে বিদায় নিল তিন গোয়েন্দা। বাইরে বেরিয়ে এল।
কেন শিপটন একদম পরিষ্কার, বলে বাঘার দিকে চাইল কিশোর। কিন্তু বাঘা নয়। শুঁটকি শত্রু
এখন বাকি থাকলেন শুধু মিসেস হগার্ড, বলল রবিন।
এখনই যাব আমরা, কিশোর? মুসা জিজ্ঞেস করল।
মাথা নাড়ল গোয়েন্দাপ্রধান।
কালকে যাই, প্রস্তাব করল। বাঘাকে গোসল করাতে হবে তো।
নোংরা একটা থাবা মাথায় রাখল বাঘা, তারপর জোরে বার দুয়েক হুফ-হুঁফ করে উঠল।

.

একদম নড়বি না, চুপ করে বসে থাক! ইয়ার্ডে বাঘার গা ঘষছে কিশোর, চলে গেছে বাসায়।
বিশাল মেটাল বেসিনটা থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এল বাঘা। সারা গায়ে সাবা, মাখা।
হতাশ হয়ে মাথা নাড়ল কিশোর। লাল-হলুদ-সবুজ রং এখনও লেগে রয়েছে বাঘার লোমে।
ঠিক আছে, বাঘা, আমাকে গোসল করাতে দিলি না তো, বলল কিশোর, কালকে তোকে ড্যাশিং ডগ পেট সেলুনে নিয়ে যাব। তারপর দেখব বিদঘুঁটে রং নিয়ে ঘুরিস কী করে।
এই কথা শুনে বাঘা গা ঝাড়া দিল। ছিটকে সরে গেল কিশোর।
আর এসময় কার যেন তীক্ষ্ণ চিৎকার ওর কানে এল। মুখ তুলে চেয়ে দেখে সাবান-পানির ছিটে মেখে দাঁড়িয়ে রয়েছে রুডি মার্শ।
রুডি!
থ্যাংকস আ লট, কোনমতে আওড়াল রুডি। দিলে তো ধোয়া কাপড়টার বারোটা বাজিয়ে।

বাঘা আসলে বুঝতে পারেনি, সাফাই গাইল কিশোর।
কিন্তু তুমি পেরেছিলে,কাটখোট্টা জবাব দিল রুডি।
তারমানে?
তুমি বুঝেশুনে ঠাণ্ডা মাথায় কালো কোটটা কেটে দিয়েছিলে, বলল রুডি। কেননা তুমি ওটা পরতে পারেনি। রকি বীচের সব ছেলে-মেয়েরা এই কথাই বলছে।
চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল কিশোরের। গুজবটা এভাবে বাতাসের বেগে ছড়িয়ে পড়বে ভাবতে পারেনি ও।
ওরা ফালতু কথা বলছে, রুডি, বলল ও মৃদু কণ্ঠে। আমি কখনোই অমন ছোটলোকি কাজ করব না।
অথচ করেছ, চিবুক বাড়িয়ে দিয়ে বলল রুডি। এবং একাজে অন্যদের সাহায্যও নিয়েছ।
এক কপি ভেজা ডয়েল নিউজ তুলে ধরল রুডি।
পড়ে দেখো!
গসিপ ছাপা হয়েছে প্রথম পৃষ্ঠায়। জোরে জোরে পড়ল কিশোর: প্রিয় বন্ধুর জন্য কারা সব কিছু করতে প্রস্তুত? সূত্র দিচ্ছি: সাদা-কালো।
কান গরম হয়ে গেল গোয়েন্দাপ্রধানের। রবিন আর মুসার প্রতি ইঙ্গিত করেছে শুঁটকি।
একদম বাজে কথা! দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করল ও। কিন্তু রুডি মার্শ ততক্ষণে দুপ দাপ পা ফেলে গেটের দিকে চলেছে।
কিশোর হাঁটু গেড়ে বসে বাঘার ভেজা শরীরে হাত বুলোতে লাগল।
রহস্যটার কিনারা না করলেই নয়, মনে মনে বলল। শুঁটকি আমার প্রিয় বন্ধুদের ঘাড়েও দোষ চাপিয়েছে!

.

সে রাতে চাচা-চাচীর সঙ্গে ডিনারে বসে প্রসঙ্গটা তুলল কিশোর।
চাচা, শুঁটকি একটার পর একটা মিথ্যে গুজব রটাচ্ছে। কী করব আমি?
তোর উচিত মাথা গরম না করা, পরামর্শ দিলেন চাচা। চিকেনে গোলমরিচের গুঁড়ো ছিটালেন। সত্য কখনও চাপা থাকে না।
তোর চাচা ঠিক কথাই বলেছে, বললেন মেরি চাচী। দেখিস, মিথ্যে বেশিদিন টিকবে না।
দীর্ঘশ্বাস ফেলল কিশোর। ষড়যন্ত্রের জাল যত শীঘ্রি ছিন্ন হয় ততই মঙ্গল।

.

পরদিন সকালে মুসা আর রবিনের সঙ্গে দেখা করল ও। বাঘাকে নিয়ে ড্যাশিং ডগ পেট সেলুনের উদ্দেশে রওনা হলো ওরা।

শুঁটকির এতদূর বাড় বেড়েছে যে সাদা-কালোর কথা পর্যন্ত তুলে ফেলেছে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠল রবিন।
ওর যা খুশি বলুক,বন্ধুকে শান্ত করার জন্য বলল মুসা। আমাদের কী?
মেইন স্ট্রীট দিয়ে হাঁটছে ওরা। সাইডওয়কে রঙিন চকে লেখা একটা মেসেজ চোখে পড়ল কিশোরের। লিখেছে; কিশোর পাশার নাম এখন থেকে কোট-কাটা কিশোর।
কিশোরকে মাথা নাড়তে দেখে ওর হাত চেটে দিল বাঘা।
গুজবটা ওরা মেইন স্ট্রীটেও পর্যন্ত ছড়িয়ে দিয়েছে!
ড্যাশিং ডগে গিয়ে ঢুকল ছেলেরা।
কিশোর আগে এখানে আসেনি। গোলাপি রঙের আসবাব দিয়ে সাজানো সেলুনটা। সুন্দর সব কুকুরের ছবি সেঁটেছে দেয়ালে।
হ্যালো। আমার নাম রয়, ডেস্কের পিছনে বসা লোকটি বলল। কী দরকার বলো।
ইঙ্গিতে বাঘাকে দেখাল কিশোর।
লোকটি বহুবর্ণ বাঘার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল।
এসময় দরজা খুলে গেল।
আরে, মিসেস হগার্ড যে! বলে উঠল লোকটা। আসুন, আসুন।
চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল কিশোর।
দরজার কাছে, কোলে খুদে কুকুর দুটো নিয়ে দাঁড়িয়ে মিসেস হগার্ড।
কুকুর দুটোর গায়ে ছোট লাল কোট-আর গলায় দামি চকচকে কালো ভেলভেটের কলার!

.

কিশোর, ফিসফিস করে বলল মুসা। দেখেছ?
উপরে-নীচে মাথা নাড়ল কিশোর। মিসেস হগার্ডের দিকে চেয়ে রয়েছে। ভদ্রমহিলা কথা বলছেন রয়ের সঙ্গে।
বেশ গরম লাগছে এখানে, বললেন মিসেস হগার্ড।
একেই বোধহয় বলে আগস্টের ডগ ডে, বলল রয়।
আমার কাছে সারা বছরই ডগ ডে! কুকুর দুটোকে বুকের সঙ্গে চেপে ধরে বললেন ভদ্রমহিলা।
জলদি লুকিয়ে পড়ো, কিশোর বলল বন্ধুদের উদ্দেশে। আমি চাই না উনি আমাদেরকে দেখে ফেলুন।
বাঘার শিকল ধরে টান দিল কিশোর। ঘাপটি মারল গোলাপি রঙের এক পর্দার পিছনে। ওর দেখাদেখি একই কাজ করল মুসা ও রবিন।
কিশোর! গলা নামিয়ে ডাকল রবিন। আমরা একা নই। দেখেছ!

ঘুরে তাকাল কিশোর। উঁচু টেবিলে বসে দুটো কুকুর। কোকড়াচুলো এক পুড়ল, আর তোয়ালে মোড়া এক বুলডগ।
শশ, কুকুর দুটোকে লক্ষ্য করে বলল কিশোর। ঠোঁটে আঙুল রেখেছে।
বিশ্বাস করতে পারো, মিসেস হগার্ডের কুকুরদের গলায় কালো ভেলভেটের কলার! মুসা ফিসফিসে কণ্ঠে বলল।
হু, মাথা ঝাঁকাল কিশোর। দেখা যাক, ঘটনা কদ্দুর গড়ায়।
হঠাৎ মৃদু এক গর্জন কানে এল ওদের। নীচের দিকে তাকাল কিশোর। ছোট্ট এক ইয়র্কি পর্দার আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছে।
মিসেস হগার্ডের ঝাড়ন, বলল মুসা। এই যা, ভাগ!
অপর ইয়র্কিটাও এসে উঁকি মারছে। গা গুঁকছে বাঘার। এবার ডাক ছাড়তে শুরু করল।
খাইছে!
কী হচ্ছেটা কী ওখানে? সামনে থেকে শোনা গেল রয়ের গলা।
বাঘা পাল্টা ঘেউ-ঘেউ করে পর্দার নীচ দিয়ে সঁত করে বেরিয়ে গেল। তিন গোয়েন্দা ওর পিছু-পিছু ছুটল।
বাঘা, ফিরে আয় বলছি! কিশোর হাঁক ছাড়ল।
খুদে ইয়র্কি দুটো বাঘাকে তাড়া করে বেড়াতে লাগল ওয়েটিং রুম জুড়ে।
এক মহিলা ম্যাগাজিন পড়ছিলেন, চেঁচিয়ে উঠলেন। এক ভদ্রলোক তাঁর চিহুয়াহুয়া চেপে ধরলেন বুকের সঙ্গে।
কুকুর তিনটে সোফা আর চেয়ার টপকে ছুটে বেড়াচ্ছে।
ওই, ধাড়ি কুকুরটা আমার সোনামণিদেরকে তাড়া করছে! তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলেন মিসেস হগার্ড।
ব্যাপারটা ঠিক তার উল্টো! বাঘাকে ধরার চেষ্টারত কিশোর বলল।
কুকুরগুলোর লাথি খেয়ে এদিক-সেদিক উড়ছে ম্যাগাজিন। কোনদিকে হ্রুক্ষেপ নেই ওদের। ঘরময় ছোটাছুটি করেই চলেছে। তার সঙ্গে সমান তালে চলেছে হাঁক-ডাক।
স্টপ! গর্জে উঠল রয়। ডাউন! হীল!
ইয়র্কি দুটো বাঘার গায়ে লাফিয়ে উঠে ঘেউ-ঘেউ করতে লাগল। বাঘা কেউ-কেঁউ করে নালিশ জানাল। শেষমেশ আর না পেরে দৌড়ে এসে আশ্রয় নিল কিশোরের কাছে। ওর মাথা চাপড়ে আদর করল কিশোর। ওদিকে মিসেস হগার্ড তার কুকুরছানাদের পরম আদরে কোলে তুলে নিলেন।
আমার সোনামণিদের কোট আরেকটু হলেই ছিঁড়ে দিয়েছিল ধাড়িটা, চোখ পাকিয়ে বললেন।

মুসার হাতে বাঘার শিকলটা ধরিয়ে দিল কিশোর। গিয়ে গেল মিসেস হগার্ডের কাছে।
কালো কলার দুটো কোথায় পেলেন, মিসেস হগার্ডঃ
তোমার চাই নাকি? জবাবটা দিল রয়। আরও আছে আমার কাছে।
কিশোর ঘুরে দাঁড়াল।
আমার ডগি ফ্যাশন কালেকশনের কোট ওগুলো, জানাল রয়। আজ ডিসপ্লে দেব। বলে একটা বাক্স ডেস্কের নীচ থেকে টেনে বের করল।
বাক্সের ভিতর উঁকি দিল কিশোর। খুদে হ্যাট, সোয়েটার আর কোটে ঠাসা ওটা। অনেকগুলোরই দেখা গেল কালো ভেলভেটের কলার।
রয় কাল আমাকে এগুলো দেখিয়েছে, বললেন মিসেস হগার্ড। কালো ভেলভেটের কলারওয়ালা কোট দেখেই মনে ধরে যায় আমার।
তা হলে ফ্যাশন হাউজের কালো কোটটা কিনতে চাইছিলেন কেন? কিশোর প্রশ্ন করল।
ওটা তো দারুণ দেখতে, বললেন ভদ্রমহিলা। আমার নাতনীকে খুব মানাত।
আপনার নাতনী? বলে পকেট থেকে মুক্তার ইয়ারিংটা বের করে দেখাল কিশোর। কালকে এটা ফ্যাশন হাউজে পেয়েছি আমরা।
ইয়ারিং দেখে হাসলেন মিসেস হগার্ড।
কোটের সাইয দেখছিলাম, বললেন। তখন হয়তো পড়ে গেছে। স্টকরুমে তখন আমি ছাড়া কেউ ছিল না।
আচ্ছা, তা হলে ব্যাপারটা এই, মনে মনে বলল কিশোর। ইয়ারিংটা ফিরিয়ে দিল।
আচ্ছা, চলি, বললেন মিসেস হগার্ড। রয়কে দেখাতে এসেছিলাম আমার সোনামণিদের নতুন পোশাকে কেমন দেখাচ্ছে।
সেলুন ত্যাগ করছেন তিনি, খুদে কুকুর দুটো শেষবারের মত ঘেউ-ঘেউ করে গেল বাঘার উদ্দেশে।
আমার কাছে চমৎকার এক ডেনিম জ্যাকেট আছে, বলে হাতে হাত ঘষল রয়। বাঘাকে খুব মানাবে। দেখাব?
দরকার নেই, জানাল কিশোর। গোসল করালেই ওর রূপ খুলে যাবে।
বাঘার শিকল ধরল রয়।
এক ঘণ্টা পরে এসে নিয়ে যেয়ো।
ড্যাশিং ডগ ত্যাগ করল ছেলেরা।
মিসেস হগার্ডও ফসকে গেল, হতাশ কণ্ঠে বলল রবিন। এখন আর বাকি থাকল কে?
নীচের ঠোঁটে চিমটি কাটল গোয়েন্দাপ্রধান।

কেউ না। অথচ যা করার শীঘ্রি করতে হবে, বলল। নইলে শুঁটকি যাতা কথা লিখতেই থাকবে।
মেইন স্ট্রীট ধরে হাঁটছে, ছোটখাট এক জটলা চোখে পড়ল ওদের।
কী হচ্ছে ওখানে? মুসা জিজ্ঞেস করল।
আর্ট শো, বলে কাছিয়ে গেল কিশোর।কেন শিপটনের আর্ট শো!
সাইডওয়কে সারি দিয়ে রাখা কেনের আর্টওয়র্ক। পিঁপড়ে, ফড়িং অবশ্যই বিলির ছবি শোভা পাচ্ছে সেখানে।
তুমি কোথা থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছ? এক লোক শিল্পীকে প্রশ্ন করল।
বিলির কাঁচের জারটা উঠিয়ে দেখাল কেন।
পাথরের তলা থেকে।
কিশোর লক্ষ করল একটা পেইন্টিং অন্যগুলোর চাইতে আলাদা। পোকা মাকড়ের বদলে বাদামী-সাদা এক ছোপ।
রবিনেরও দৃষ্টি কেড়েছে ছবিটা।
কেউ মনে হয় পোকাটাকে মাড়িয়ে দিয়েছিল, বলল।
পোকার মত লাগছে না আমার কাছে, কিশোর বলল।কাছ থেকে খুঁটিয়ে পরখ করল। বাদাম আর চকোলেট চিপ ছিটিয়ে তৈরি করা হয়েছে প্রলেপটা। আইসক্রীম।
মুসা একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে ছোপটার দিকে।
খাইছে! পাণ্ডা বার আইসক্রীম! চেঁচিয়ে উঠল ও।
আর খেয়াল করে দেখো, বলল কিশোর। ছবিটার নীচে কেন, শিপটনের সই নেই। আছে মানি আর পেনির।
কালো পটভূমিটা পরিচিত ঠেকল কিশোরের চোখে। হাত বাড়াল ছোঁয়ার জন্য। পুরু আর মোলায়েম।
রবিন। মুসা! উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল কিশোর। এটাই সেই কালো কোটের ভেলভেট!

.

খপ করে কে যেন চেপে ধরল কিশোরের কব্জি। চেয়ে দেখে মানি। হাসছে কান অবধি।
হাত ছাড়িয়ে নিল কিশোর। পাণ্ডা বার আইসক্রীমের ছবিটা দেখিয়ে বলল, ওটা এল কোত্থেকে?
গর্বের হাসি হাসল মানি।
কেনের প্রদর্শনীতে সুযোগ পেয়ে ঢুকে পড়লাম।
তোমার পছন্দ হয়েছে? পেনি জিজ্ঞেস করল।

না, সাফ জবাব দিল কিশোর। চেরি ভ্যানিলা পাণ্ডা বার হলে পছন্দ হত।
পরস্পর মুখ তাকালাকি করল যমজরা। চোখে হতাশা।
ওটা তো আইসক্রীমের দাগ, তাই না? গোয়েন্দাপ্রধানের কণ্ঠে কৈফিয়ত তলবের সুর।
না তো! ফস করে বলে দিল মানি।
তা হলে কী ওটা? মুসার জিজ্ঞাসা।
উম…মেরু ভালুক, পেনি জানাল।
কাদা-ধসের মধ্যে পড়ে গেছে, জোগান দিল মানি।
কিশোর কালো ভেলভেটের দিকে আঙুল তাক করল।
বুঝলাম, কিন্তু ওই কালো ভেলভেট এল কোত্থেকে?
এটাই তো সেই ফ্যাশন হাউজের কোটের কাপড়টা, জোর দিয়ে বলল রবিন।
যমজরা গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়াল। চোখে-মুখে আতঙ্ক।
মানি, পেনি, ফালতু প্রশ্নের জবাব দেয়ার দরকার নেই। হঠাৎ শোনা গেল পরিচিত এক কণ্ঠ।
চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল কিশোর। পিছনে দাঁড়িয়ে শুঁটকি টেরি স্বয়ং।
সবাই জানে কিশোর পাশা কোটটা কেটেছে, বলল গোটা শহরে রটে গেছে এ কথা।
তোমার সৌজন্যে, ফোড়ন কাটল রবিন।
শুঁটকি প্লাস্টিকের মানিব্যাগ বের করল।
ছবিটা কিনব আমি। বিছানার পাশে ঝুলিয়ে রাখব।
খবরদার! গর্জে উঠল মুসা। তুমি ছবিটা কিনতে পারবে না। তুমি চাইছ সরাই যাতে মনে করে তোমার কথাই ঠিক-কিশোরই কোটটা কেটেছে। তোমার শয়তানী আমাদের বুঝতে বাকি নেই, শুঁটকি
কী সব উল্টোপাল্টা বকছ! বলে উঠল শুঁটকি।
মানি হাত পেতে দিল শুঁটকির সামনে।
পঞ্চাশ সেন্ট।
একমাত্র প্রমাণ হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে দেখে বিচলিত হয়ে পড়ল রবিন। অসহায়ের মত চেয়ে রয়েছে কিশোরের মুখের দিকে।
গটগট করে এসময় কেন শিপটনের কাছে পৌঁছে গেল মুসা।
ওটা দাও দেখি, বলে ছোঁ মেরে জারটা কেড়ে নিল ওর হাত থেকে।
আরে, করো কী? হাহাকার করে উঠল কেন। বিলি আমাদের শোয়ের সুপারস্টার। মোনালিসার মত।

অ্যাই, শুঁটকি, জারটা তুলে ধরে বলল মুসা। বিলিকে হ্যালো বলো। নইলে দেব গায়ে ছেড়ে।
বি-বি-বিলি? তোতলাচ্ছে রীতিমত শুঁটকি।
কিশোর আর রবিন ওর পিছনে দাঁড়ানো।
বিলি সারা সপ্তা জারের ভিতর রয়েছে, বলে ঢাকনা খুলতে শুরু করল। মনে হয় পাণ্ডা বার আইসক্রীম চাখতে ওর খারাপ লাগবে না।
শুঁটকি বিলির দিকে চেয়ে রয়েছে। চিবুক কাঁপতে শুরু করল হঠাৎ। পাণ্ডা বার পেইন্টিংটা খসে পড়ল হাত থেকে। পরমুহূর্তে বাপরে বলে চিৎকার করে উঠল।
দাঁড়াও, দাঁড়াও। শুঁটকিকে লেজ গুটিয়ে পালাতে দেখে চেঁচিয়ে উঠল মানি। ছবি কিনবে না?
ইতোমধ্যে কেন শিপটন এসে জারটা নিয়ে নিয়েছে মুসার হাত থেকে। কিশোর যমজদের কাঁধ জড়িয়ে ধরল।
ব্যাপারটা কী বলো তো, ভাইয়ারা, আদরের সুরে বলল। সত্যি কথা বললে তোমাদেরকে আইসক্রীম কিনে দেব।
মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল যমজদের। কিশোরকে ওরা বিশ্বাস করে।
বলছি, বলল মানি। মিরা ম্যাডাম মিনি ফ্রিজে পাণ্ডা বর রাখতে বলেছিল। কিন্তু আমাদের মাথায় শয়তানী চাপল কোটটা আইসক্রীম মাখিয়ে নষ্ট করব।
তারপর? তাগিদ দিল কিশোর।
সবাই যখন লাল কার্পেটে প্র্যাকটিস করছে, আমরা স্টকরুমে ফিরে গিয়ে ফ্রিজ থেকে পাণ্ডা বার বের করি, বলল মানি।
তারপর কোটে আইসক্রীম ঘসে দাও, বলল মুসা।
হ্যাঁ, পেনি বলল। পরে ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে আমরা কাঁচি দিয়ে কোটটা কেটে দিই।
কিশোর বলল, যাতে কোটে আইসক্রীম লেগে থাকতে দেখে কেউ তোমাদের ধরতে না পারে! এমনকী গন্ধও যেন না পায়।
হ্যাঁ, বলল মানি। টুকরোটা আমি প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে রাখি। সেজন্যেই এখন কাপড়টার গায়ে দাগ দেখতে পাচ্ছ।
কেন শিপটনের দিকে ঘুরে দাঁড়াল কিশোর।
তুমি জানতে তোমার ভাইরা এ কাজ করেছে?
নাহ, কথাটা স্রেফ উড়িয়ে দিল কেন। আমি ভেবেছি ওটা ফিঙ্গার পেইন্টিং।
যমজদের হাতের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হানল কিশোর। রঙিন চকের গুঁড়ো লেগে রয়েছে আঙুলে আর তালুতে।
তোমরা দেয়ালে আমার সম্পর্কে আজেবাজে কথা লিখেছ, ঠিক না?

মাথা নিচু করে ফেলল যমজরা।
বিশ্বাস করো, বলল মানি, টেরির কথায় আমরা তোমার নামে ওসব লিখেছি। যাতে তোমার ওপর সবার সন্দেহ আরও বেশি করে পড়ে। আমাদের কোন দোষ নেই।
তোমাদের খেল খতম, কঠিন গলায় বলল মুসা। এখনই মিরার কাছে গিয়ে সব খুলে বলবে তোমরা?
তা হলে তো আর কখনও মডেল হতে পারব না! পেনি ভয়ার্ত কণ্ঠে বলে উঠল।
মানি হাত নেড়ে কথাটাকে উড়িয়ে দিল।
তাতে বয়েই গেল। ওই সোয়েটারগুলো ভীষণ কুটকুট করে।
তিন গোয়েন্দা যমজদেরকে সোজা ফ্যাশন হাউজে নিয়ে এল। দুই অপরাধী মিরার সামনে দাঁড়িয়ে অকপটে সব স্বীকার করল।
তোমরা তো দোষ করেছই, বলল মিরা। আমিও কম দায়ী না। খামোকা কিশোরকে সন্দেহ করেছি। তাছাড়া আমার উচিত ছিল সর্বক্ষণ ঘরটা পাহারা দেওয়ার ব্যবস্থা করা।
মাফ-টাফ চেয়ে নিল যমজরা। তারপর কিশোরের কাছ থেকে আইসক্রীমের পয়সা নিয়ে এক ছুটে বেরিয়ে গেল দোকান ছেড়ে।
এত সুন্দর কোটটা নষ্ট হয়ে গেল, বলল রবিন, খারাপ লাগছে!
ভেবো না, বলল মিরা। রকি বীচে অমন কোট অনেক দেখতে পাবে তোমরা।
তাই? কিশোর অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।
মৃদু হাসল মিরা।
হ্যাঁ, ফ্যাশন শো-র পরে পাঁচটা কোটের অর্ডার পেয়েছি। ফুটো ছাড়া অবশ্য।
হেসে ফেলল তিন গোয়েন্দা।
দোকান থেকে বেরিয়ে এল ওরা। স্বস্তি বোধ করছে কিশোর। মস্ত বড় এক পাথর যেন নেমে গেছে বুকের উপর থেকে।
শুঁটকিকে ফোন করে এখনই সব জানানো দরকার, বলল রবিন। যাতে আজেবাজে লেখা বন্ধ করে।
প্রস্তাবটা নিয়ে দুমুহূর্ত ভাবল গোয়েন্দাপ্রধান। তারপর মাথা নেড়ে নিষেধ করল।
দরকার কী, বলল। মিথ্যে যদি বাতাসের বেগে রটতে পারে, তবে সত্যিটাও জানাজানি হতে দেরি হবে না।
আজকের দিনটা পিযা প্যালেসে সেলিব্রেট করবে ঠিক করল ওরা।
কিন্তু তার আগে ড্যাশিং ডগ থেকে বাঘাকে নিয়ে আসি চলো, বলল রবিন।
ড্যাশিং ডগের দিকে হাঁটা দিল তিন গোয়েন্দা।

ভলিউম ৬০ – টাইম ট্রাভেল – তিন গোয়েন্দা – রকিব হাসান

প্রথম প্রকাশ: ২০০২

অকারণে সময় নষ্ট করছি আমরা, ফিসফিস করে বলল দুজনের মধ্যে লম্বা লোকটা। তার নাম মাজুল। নতুন কিছুই আবিষ্কার করেননি ডক্টর স্টিভেনস। করলে এতদিনে জেনে যেতাম।

সব সময়ই বড় বেশি অধৈর্য তুমি, গাজুল, তিরস্কার করল দুজনের মধ্যে বেঁটে লোকটা।

ব্রেন স্পেশালিস্ট বিখ্যাত বিজ্ঞানী ডক্টর জ্যাক স্টিভেনসের বাড়িতে লকিয়ে আছে ওরা। রান্নাঘরের আলমারির আড়ালে রয়েছে এখন। তিনি নতুন কোন ফরমুলা আবিষ্কার করেছেন কিনা জানতে এসেছে। যদি করে থাকেন, হয় ফরমুলাটা চুরি করবে, নয়তো কপি করে নিয়ে যাবে।

ফরমুলা যদি না-ই পাই, তাহলে আরেক কাজ করব, গাজুল বলল। এসেছি যখন, একেবারে খালি হাতে ফিরব না। আর কিছু না হোক, মনিবের জন্যে কয়েকটা গোলাম ধরে নিয়ে যাব। কি বলো?

ঠিক, ভাল বুদ্ধি, উল্লসিত হয়ে মাথা ঝাঁকাল মাজুল। কিন্তু বুদ্ধিমান গোলাম পাব কোথায়? শহরটার লোকজনকে দেখে বোঝা যাচ্ছে একেবারে আদিম অবস্থাতেই রয়ে গেছে এরা। বুদ্ধিশুদ্ধিও বড় কম। বেশি বোকা।

বোকারা কিন্তু ভাল গোলাম হয়, গাজুল বলল। কথা শোনানো যায়।

তা বটে। কিন্তু বোকা লোক যে পছন্দ করেন না মনিব, মাজুল বলল। যাকগে। আমার খিদে পেয়েছে।

আলমারির আড়াল থেকে সে বেরোনোর উপক্রম করতেই খপ করে তার হাত চেপে ধরল গাজুল। পাগল হলে নাকি? ডক্টর স্টিভেনস ঘোরাফেরা করছেন এদিকেই। দেখে ফেললে আমাদের লুকিয়ে থাকার কষ্টটাই মাটি হবে।

কিন্তু আমার খিদে পেয়েছে যে!

উনি এদিক থেকে চলে গেলেই বেরোব আমরা। খিদে তো আমারও পেয়েছে। ফিসফিস করে বলল গাজুল। খিদের কথা বাদ দাও। যা বলছিলাম। আচ্ছা, এক কাজ তো করা যায়। বোকাগুলোকে চালাক করার জন্যে মগজশক্তি রসায়ন ব্যবহার করতে পারি। কয়েকটা অল্পবয়েসী কিশোর ছেলেকে ধরে নিয়ে যাই চলল। অল্প বয়েসী ছেলেগুলোর প্রচুর শক্তি থাকে শরীরে। খাটতে পারে। মগজটাকে উন্নত করে নেয়া গেলে ভাল গোলাম হবে। দেখলে খুশি হবেন বস।

হ্যাঁ, তা হবেন। কিন্তু পছন্দসই ওরকম কয়েকটা বোকা ছেলে পাব কোথায় আমরা?

জবাব দেয়ার জন্যে মুখ খুলতে যাচ্ছিল গাজুল। কলিং বেল বাজানোর শব্দে থেমে গেল। এক মুহূর্ত কান পেতে রইল চুপচাপ। তারপর বলল, মনে হচ্ছে ডক্টর স্টিভেনসের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে কেউ।

.

কলিং বেলের বোতাম টিপে দিয়ে দরজার গোড়ায় বিছানো খড়ের বানানো ম্যাটের ওপর থেকে পিছিয়ে গেল কিশোর পাশা। ঘরের ভেতরে ঘণ্টা বাজার শব্দ শুনতে পেল।

ফিরে তাকাল তার দুই সহকারী মুসা আর রবিনের দিকে, কাজটা কি ঠিক হচ্ছে?

হচ্ছে। অনিশ্চিত ভঙ্গিতে মাথা চুলকে জবাব দিল রবিন, আঙ্কেল জ্যাক আমাদের সাহায্য করতে না পারলে দুনিয়ার আর কেউ পারবে না।

দরজার গায়ে লাগানো পিতলের নামফলকটার দিকে তাকিয়ে আছে মুসা। তাতে লেখা:

ডক্টর জ্যাক স্টিভেনস, ব্রেন এক্সপার্ট

রকি বীচ সাইন্স ল্যাবরেটর।

কিন্তু সত্যিই যদি আমাদের বোকা ভেবে বসেন তিনি?মুসার কণ্ঠেও অস্বস্তি।

এটা আর নতুন কি? করুণ শোনাল কিশোরের কণ্ঠ। সবাই তো আজকাল তা-ই ভাবছে আমাদের। কোনদিন, কখনই আর মনে হচ্ছে স্কুলের সবচেয়ে বুদ্ধিমান ছেলে হতে পারব না আমরা।

ওই যে যা বললাম, কিশোরের কথার সঙ্গে যোগ করল রবিন, আঙ্কেল জ্যাক যদি আমাদের বোকা ভেবে বসেনও, তিনি সাহায্য করতে না পারলে দুনিয়ার আর কেউ করতে পারবে না। তবে, আমি শিওর, তিনি আমাদের ফিরিয়ে দেবেন না। এটুকু ভরসা না থাকলে কি আর আসতাম।

বাড়ির ভেতরে পদশব্দ কানে এল ওদের। এগিয়ে আসছে।

মাথা চুলকানো বন্ধ করে হাতটা সরিয়ে আনল রবিন।

কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে টেনেটুনে কাপড়-চোপড় ঠিক করল কিশোর। অস্বস্তি বোধ করছে। প্যান্টের পকেটে দুই হাত ঢুকিয়ে দিল।

মুসার মুখ দেখে মনে হলো ডক্টরকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দৌড় মারবে। পালানোর জন্যে যেন অস্থির হয়ে উঠেছে সে। সবই এগুলো বোকামির লক্ষণ।

খুলে গেল দরজা। একটা মুহূর্ত ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইলেন আঙ্কেল জ্যাক। তারপর বড় বড় হয়ে গেল চোখ। খুশি খুশি গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন, আরে রবিন! তোরা! কি মনে করে?

সাদা এলোমেলো চুল, ছড়ানো সাদা দাড়ি, গোলগাল লাল টকটকে হাসিখুশি মুখ, সব মিলিয়ে আঙ্কেল জ্যাককে দেখতে একেবারে সান্তা ক্লজের মত লাগছে। তার

চওড়া কাঁধ, বড় বড় হাতের থাবা। মস্ত ভুড়ি নেচে ওঠে হাসার সময়।
সব সময় সাদা পোশাক পরেন তিনি। সাদা সোয়েটার, সাদা প্যান্ট, সাদা জুতো। ল্যাবরেটরিতে কাজ করার সময় গায়ে দেন সাদা কোট।
অ্যাই চেরি, ভেতরের দিকে তাকিয়ে স্ত্রীর উদ্দেশ্যে গলা চড়িয়ে হাঁক দিলেন তিনি, দেখে যাও কে এসেছে! গমগমে কণ্ঠস্বর। সরে জায়গা করে দিলেন তিন গোয়েন্দাকে ঢোকার জন্যে।
রান্নাঘর থেকে খাবারের গন্ধ নাকে এসে লাগল। রোস্ট। সম্ভবত মুরগী। চট করে রবিনের দিকে তাকাল মুসা।
খেতে বসেছিলে? আঙ্কেলকে জিজ্ঞেস করল রবিন। না বসবে?
না, শেষ করে ফেলেছি, আঙ্কেল জ্যাক বললেন। তোর আন্টি রান্নাঘরে, এঁটো থালা-বাসন মাজছে। কেন, খিদে পেয়েছে?
মাথা নাড়ল রবিন, না, আমরা খেয়ে এসেছি।
রান্নাঘরের দরজার দিকে ফিরে আবার হাঁক দিলেন আঙ্কেল জ্যাক, চেরি? এই চেরি? রবিনের দিকে তাকালেন, তারপর? হঠাৎ কি মনে করে?
দ্বিধা করতে লাগল রবিন। ইদানীং খুব বোকা হয়ে গেছি আমরা, আঙ্কেল।
ভুরু কুঁচকালেন আঙ্কেল জ্যাক, বোকা হয়ে গেছিস মানে?
কি ভাবে বোঝাব ঠিক বুঝতে পারছি না, কিশোর আর মুসার দিকে তাকাতে লাগল রবিন। শেষে কিশোরকে বলল, তুমিই বলো।
দীর্ঘশ্বাস ফেলল কিশোর। আমরা যে কতখানি বোকা হয়ে গেছি, একটা দিনের ঘটনা বললেই বুঝতে পারবেন...

.

স্কুল ছুটির পর দেখা কোরো তোমরা আমার সঙ্গে, ক্লাসে গম্ভীর ভঙ্গিতে আমাদের বললেন ক্লাসটিচার মিস্টার ক্রেগ।
কিন্তু আমরা তো কিছু করিনি! অবাক হয়ে প্রতিবাদ জানালাম। জানামতে শাস্তি দেয়ার জন্যেই কেবল স্কুল ছুটির পর কাউকে থাকতে বলেন ক্লাসটিচার।
মিস্টার ক্রেগ শিক্ষক হিসেবে খুব ভাল। ভদ্রলোক। সব ছাত্রছাত্রীরাই তাকে পছন্দ করে। আমরাও করি।
দেখা করতে বলেছেন যখন, করতেই হবে।
স্কুল ছুটির ঘণ্টা বাজল। সব ছেলেমেয়েরা বেরিয়ে গেল। বসে রইলাম কেবল আমি, মুসা আর রবিন।
তিনটে পরীক্ষার খাতা বের করলেন মিস্টার ক্রেগ। মুখ তুলে তাকালেন তোমাদের খাতা।

মাথার চুলে হাত বোলালেন তিনি। চোখের পাতা সরু করে তাকালেন খাতাগুলোর দিকে। তারপর ঘোষণা করলেন, এই সেমিস্টারের অংক পরীক্ষায়ও সাংঘাতিক খারাপ করেছ তোমরা। পুরোপুরি ফেল।
ঢোক গিললাম। রবিন গুঙিয়ে উঠল। আর মুসা চোখ নামিয়ে তাকিয়ে রইল নিজের জুতোর দিকে
তিনজনেই এতটা খারাপ করবে কল্পনাই করতে পারিনি, নিরাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন তিনি। এতটা খারাপ তো তোমরা ছিলে না কখনও। কি হয়েছে তোমাদের, বলল তো?
নির্বাক হয়ে রইল মুসা আর রবিন। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, জানি না, স্যার। কিছুই ঢোকে না মাথায়। কিছু বুঝতেও পারি না। অনেক কিছুই মনে থাকে না। অতীতের অনেক কথা মনে করতে পারি না। মনে হয় বিসুরণ ঘটেছে। আমাদের।
কিন্তু বিস্মরণের সঙ্গে বোকামির সম্পর্ক কি?
জানি না, স্যার, বিড়বিড় করে বললাম।
বোকার মত মাথা চুলকে যাচ্ছে রবিন।
মুসা কোন কথা বলছে না।
খাতাগুলো আমাদের সামনে নাড়তে নাড়তে জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার ক্রেগ, অন্য সব কথা থাক। অংকে তোমরা কেন খারাপ করেছ, সেটা বরং পর্যালোচনা করে দেখি। খাতাগুলো ডেস্কে নামিয়ে রেখে জিজ্ঞেস করলেন তিনি, তোমাদেরকে যে রিভিউ শীটগুলো দিয়েছিলাম, পড়েছ ওগুলো?
পড়েছি, স্যার, একসঙ্গে জবাব দিলাম তিনজনে।
বহুত মাথা ঘামিয়েছি এ নিয়ে, রবিন বলল।
কিন্তু এত কঠিন, যোগ করল মুসা, কিছুই বুঝতে পারিনি।
চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা দোলালেন মিস্টার ক্রেগ। তোমাদের যে কিছু হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই আমার। সাহায্য দরকার? প্রয়োজন মনে করলে আমি তোমাদের সাহায্য করতে পারি। কি করতে পারি, বলো?
কি জানি, তা-ও তো বুঝতে পারছি না, স্যার, মাথা চুলকানো বেড়ে গেল রবিনের।
আসলে, অংক আমাদের মাথায় ঢোকে না, স্যার, আমি জবাব দিলাম। অংক একেবারেই বুঝি না।
তুমি অংক বোঝা না এ কথা বিশ্বাস করতে বলো আমাকে? ভুরু কুঁচকে বললেন মিস্টার ক্রেগ। আসলে পড়ালেখা বাদ দিয়ে নিশ্চয় গোয়েন্দাগিরি নিয়ে বেশি বেশি মেতে উঠেছ। পড়াশোনায় পুরো ফাঁকি দিচ্ছ।...যাকগে, যা হবার হয়েছে। এবারকার মত ছেড়ে দিলাম। এখন থেকে লেখাপড়ায় ভালমত মনোযোগ দেবে। কি, বুঝেছ?

বুঝেছি, স্যার, মিস্টার ক্রেগকে এ ভাবে রেগে যেতে দেখে অবাক হলাম
কয়েক মিনিট পর স্কুল থেকে বেরিয়ে বাড়ির দিকে হাঁটা দিলাম তিনজনে।
গরমকাল। অথচ প্রচণ্ড ঝোড়ো হাওয়া বইছে। রাস্তার মোড় পেরিয়ে এসে হাসাহাসি হই-চই কানে এল। টেরি আর তার দুই দোস্ত টাকি ও কড়ি খেলছে। আমাদের দেখে ফিরে তাকিয়ে টিটকারি দিতে শুরু করল ওরা। ইদানীং ওরাও আমাদের চেয়ে ভাল রেজাল্ট করে।
এতটা বোকা কি করে হয়ে গেলাম আমরা? বাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে আপনমনেই বিড়বিড় করল রবিন।
ফিরে তাকাল মুসা, মাথার মধ্যে কিছু নেই আমাদের। মাঝে মাঝে এতই মন খারাপ হয়ে যায়, ইচ্ছে করে যেদিকে দুচোখ যায় চলে যাই।
কিশোর থামলে রবিন বলল, এবার আমার কথা শোনো…

.

কিশোর যেদিনকার কথা বলল, সেদিন স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে হলঘরে ঢুকতেই দেখা হয়ে গেল রিনিতার সঙ্গে।
রিনিতা আমার ছোট। আমার খালাত বোন। আমাদের বাড়িতে থাকতে এসেছে। ওর মা মারা গেছেন ক্যান্সারে। বাবা একসঙ্গে নিজের কাজকর্ম আর মেয়ের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে গেছেন। শেষে মাকে অনুরোধ করেছেন মেয়েটাকে কিছুদিন দেখাশোনা করার জন্যে। একটু গুছিয়ে নিয়েই আবার তিনি মেয়েকে নিয়ে যাবেন।
রিনিতাকে নিয়ে এসেছে মা। স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছে।
কার্পেটে পা ছড়িয়ে বসে খেলছে রিনিতা। হাতের কাছে, আশেপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে নানা রঙের অসংখ্য প্লাস্টিকের টুকরো। আমার দিকে তাকিয়ে মাতব্বরি চালে ভুরু নাচাল। এত দেরি কেন?
রিনিতা আমাকে সব সময় খোঁচায়। নানা ভাবে যন্ত্রণা দেয়। একটা কথা বলতে পারি না। বললেই গিয়ে দশখান করে বানিয়ে বানিয়ে মার কাছে বিচার দেয়। মাও রিনিতার পক্ষ নিয়ে আমাকেই বকে। রাগে গা জ্বলে। মনে মনে ভাবি, এই বিচ্ছু মেয়েটাকে বাড়িতে নিয়ে আসাটাই হয়ে গেছে এক মস্ত ভুল।
যাই হোক, রিনিতার প্রশ্ন শুনে আগে হলে হয়তো রেগে উঠতাম। জবাব দিতাম, সেটা জেনে তোমার কি লাভ? নিজের চরকায় তেল দাও। কিন্তু ইদানীং বোকা হয়ে যাওয়ার পর কেমন মানসিক ভাবেই দুর্বল হয়ে পড়েছি। দীর্ঘশ্বাস ফেলে মিনমিন করে জবাব দিলাম, স্কুলের পরেও থাকতে হয়েছে।
কেন? ফেলটেল করেছ নাকি? ঠাসানি দিয়েছে টিচার?
প্রশ্নটা এড়ানোর জন্যে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি করছ?

হাঁদা নাকি? মুখ ঝামটা দিল রিনিতা। দেখছ না খেলছি প্লাস্টিকের টুকরোগুলো দিয়ে প্রথমে একটা ঘর বানাব। বাস স্টেশন। তারপর একটা বাস। স্টেশনের সামনে রাখব। কিন্তু দেখো না, ঠিকমত জোড়াই লাগাতে পারছি না। মায়ার জন্যে অপেক্ষা করছি। ও এলে একটা ব্যবস্থা হবেই।
দেখি, আমাকে দাও তো।
দূর, আমার হাতটা ঠেলে সরিয়ে দিল রিনিতা, তুমি কি লাগাবে? তুমি তো একটা হাঁদা। কালকে মনে নেই, সাধারণ একটা বাক্স বানাতে দিলাম, তাই পারলে না। স্কুলে এত দেরি করলে কেন? পড়া পারেনি বলে টিচার আটকে নাকি?
ঘাবড়ে গেলাম। কোন প্রসঙ্গই সহজে ভোলে না রিনিতা। ওর এ সব কথা, মার কানে গেলে জিজ্ঞেস করতে আসবে। তখন পড়ব আরও বিপদে।
থাক থাক, সাহায্য করতে চেয়েছিলাম, ভাল লাগল না, রিনিতাকে বলে তাড়াতাড়ি পালিয়ে এলাম সেখান থেকে।

.

রবিন থামলে মুসার দিকে তাকালেন আঙ্কেল জ্যাক। এবার তোমার কোনও ঘটনার কথা বলো।
হাত ওল্টাল মুসা। কি আর বলব? আমারগুলোও.ওদের চেয়ে ভাল কিছু না।
তারমানে তুমি কিছু বলতে চাও না?
মাথা নাড়ল মুসা। শুধু একটা কথাই বলি, এ ভাবে মাঝে মাঝেই বিপদে পড়তে হয়, অপদস্থ হতে হয় আমাদের তিনজনকে।
হু, গম্ভীর ভঙ্গিতে মাথা দোলালেন আঙ্কেল জ্যাক। চেয়ারে বসে সামনের দিকে ঝুঁকলেন। এক এক করে তাকালেন রবিন, কিশোর ও মুসার দিকে। তাহলে তোমাদের ধারণা তোমরা বোকা হয়ে গেছ?
কোন সন্দেহ নেই আর তাতে, এক আঙুল দিয়ে গাল চুলকাল কিশোর।
বিস্কুট আর দুধ এনে সামনে রেখে গেছেন চেরি আন্টি। কিন্তু ছুঁয়েও দেখল না কিশোর কিংবা রবিন। এমনকি মুসাও খাবারের দিকে একবার তাকিয়ে সেই যে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, আর তাকাচ্ছে না। বোকা হয়ে যাওয়াতে খাবারের লোভও যেন চলে গেছে তার। চেয়ারে পিঠ খাড়া করে শক্ত হয়ে বসে আছে তিনজনে। কোলের ওপর হাত রেখে।
আসলে হয়তো বোকা নই আমরা, কিশোর বলল। কিন্তু চালাকও নই। মাথায় ঘিলু বলতে কিছু নেই আমাদের।
বোকা নই মানেটা কি? রবিন বলল। বোকাই আমরা।
একেকটা রামছাগল, মুসা বলল। গাধা। চেহারাটা গাধার মত হলে সারাক্ষণ ব্যা-ব্যাই করতাম।

কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করলেন আঙ্কেল জ্যাক। চোখের পাতা সরু করে টাইম ট্রাভেল চিন্তিত ভঙ্গিতে তাকালেন ওদের দিকে। আমাকে কি করতে বলো?
ইয়ে… বলতে গিয়ে চুপ হয়ে গেল কিশোর। দ্বিধা করতে লাগল।
শেষে রবিন বলল, তুমি একজন বুদ্ধিমান লোক, তাই না আঙ্কেল? তুমি একজন বিজ্ঞানী।
মাথা ঝাঁকালেন আঙ্কেল জ্যাক।
আর বিজ্ঞানীদের সারাক্ষণই মাথা খাটানোর কাজ করতে হয়, ঠিক?
আবার মাথা ঝাঁকালেন আঙ্কেল জ্যাক।
এবং তুমি একজন ব্রেন স্পেশালিস্ট, তাই তো? আবার প্রশ্ন করল রবিন।
তৃতীয়বার মাথা ঝাঁকালেন আঙ্কেল জ্যাক।
সেজন্যেই এসেছি আপনার কাছে, এতক্ষণে যেন কথা খুঁজে পেল কিশোর। কারণ আপনিই আমাদের বুদ্ধিমান বানানোর একটা উপায় বের করতে পারবেন।
আঙ্কেল, অনুরোধের সুরে বলল রবিন, সত্যিই কি আমাদের জন্যে তুমি কিছু করতে পারো না? বুদ্ধি খানিকটা বাড়িয়ে দিতে পারো না আমাদের?
চিবুক ডললেন আঙ্কেল জ্যাক। সোজা হলেন চেয়ারে।
হ্যাঁ, অবশেষে জবাব দিলেন তিনি, পারি। এমন একটা ওষুধ আমি দিতে পারি, যেটাতে মনে হচ্ছে কাজ হবে।
কি ওষুধ? একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল তিন গোয়েন্দা।
.
আবার সামনে ঝুঁকলেন আঙ্কেল জ্যাক। জবাব দিতে গিয়ে হঠাৎ ঘুরে তাকালেন রান্নাঘরের দরজার দিকে।
কি হলো, আঙ্কেল? জানতে চাইল রবিন।
আবার ওদের দিকে ঘুরলেন তিনি। শুনলে না? মনে হয় চেরি। অনিশ্চিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন তিনি। অদ্ভুত একটা অনুভূতি হচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন আমাদের ওপর নজর রেখেছে কেউ।
দরজার দিকে তাকাল কিশোর। রবিন আর মুসার চোখও ঘুরে গেল সেদিকে। অস্বাভাবিক কোন কিছু চোখে পড়ল না।
কই? কিশোর বলল। দেখছি না তো কিছু।
কাঁধ ঝাঁকালেন আঙ্কেল জ্যাক। টপ সিক্রেট কোন কাজ করার সময় সব বিজ্ঞানীরই বোধহয় এ রকম অনুভূতি হয়। সাদা সোয়েটশার্টের আস্তিন টেনে নামালেন তিনি। গভীর ভাবে ভাবছেন মনে হচ্ছে কোন বিষয় নিয়ে।
আঙ্কেল, অস্থির হয়ে উঠল রবিন, তোমার কি মনে হয় আমাদেরকে সাহায্য করতে পারবে?

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত চুপ করে রইলেন আঙ্কেল জ্যাক। তারপর জবাব দিলেন, আঁঃ..হ্যাঁ, পারব।
উত্তেজিত ভঙ্গিতে চেয়ারের হাতলে চাপড় মারল মুসা। সত্যি বলছেন? সত্যি পারবেন?
মাথা ঝাঁকালেন আঙ্কেল জ্যাক। হ্যাঁ। এ মুহূর্তে আমি অবশ্য এ ধরনেরই একটা জরুরী গবেষণায় ব্যস্ত। জিনিসটা তোমাদের ওপর প্রয়োগ করে দেখা যেতে পারে। কিন্তু…
কিন্তু কি? আগ্রহে সামনে ঝুঁকে এল মুসা।
আবার রান্নাঘরের দরজার দিকে তাকালেন আঙ্কেল জ্যাক। জিনিসটা ভীষণ বিপজ্জনক।
ঘন ঘন চোখের পাতা পিটপিট করল কিশোর।
অস্ফুট শব্দ করে উঠল রবিন।
ঢোক গিলল মুসা। তাহলে?
বিপজ্জনক হবে কিনা ঠিক বুঝতে পারছি না, আবার বললেন আঙ্কেল জ্যাক। তবে হতেও পারে।
হোক বিপজ্জনক কিশোর বলল। কাজ হবে তো?
মাথা দোলালেন আঙ্কেল জ্যাক, হ্যাঁ, তা হবে। কাজ হতে বাধ্য। আমি টেস্ট করেছি। টেস্ট করা না থাকলে তোমাদের ওপর প্রয়োগ করতে যেতাম না মরে গেলেও।
তাহলে…তাহলে প্রয়োগ করে দেখোনা আমাদের ওপর, অধৈর্য হয়ে উঠল রবিন।
হ্যাঁ, করুন না, অসুবিধে নেই, কিশোর বলল। মুসাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কি বলো?
আমিও রাজি, মুসা বলল।
ভ্রূকুটি করলেন আঙ্কেল জ্যাক। আবার একবার হারিয়ে গেলেন গভীর চিন্তায়।
তারপর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে আচমকা ওদেরকে চমকে দিয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। বেশ। তাই করব। তোমাদের ওপর প্রয়োগ করব ওই ওষুধ। দেখা যাক, আমার গবেষণা কতখানি সফল হয়।
ওদেরকে লিভিং রুমে বসিয়ে রেখে উঠে গেলেন আঙ্কেল জ্যাক। নিজের মনে গুনগুন করতে করতে ঢুকে গেলেন গবেষণাগারের মধ্যে। কয়েক মিনিট পর গুনগুন করতে করতেই গিয়ে ঢুকলেন রান্নাঘরে।
রান্নাঘরের টেবিলে বসে মুদী দোকানের ফর্দ করছেন চেরি আন্টি। মুখ তুলে তাকালেন। সুন্দরী, মাথায় সোনালি চুল, মোলায়েম বাদামী চোখ, মুখে আন্তরিক

হাসি। কি ব্যাপার, জ্যাক? বাচ্চাগুলোর সঙ্গে তোমার টপ সিক্রেট ব্যক্তিগত আলোচনা শেষ হলো? ওদের সঙ্গে কথা বলতে যেতে পারি এখন?
আন্টিকে বসে থাকতে ইশারা করলেন আঙ্কেল জ্যাক। আনমনে বিড়বিড় করলেন, বেচারারা!
আলমারি খুলে শিশি-বোতল আর বয়াম ঘাটতে শুরু করলেন তিনি।
পাশে এসে দাঁড়ালেন চেরি আন্টি। কি হয়েছে? ওদেরকে এত বিমর্ষ দেখলাম কেন? কি বলতে এসেছে তোমাকে?
যা খুঁজছিলেন পেয়ে গিয়ে ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে উঠলেন আঙ্কেল জ্যাক। আঙুরের রস ভর্তি একটা ছোট বোতল বের করলেন।
স্ত্রীর দিকে ঘুরলেন তিনি। রবিন আর তার দুই বন্ধুর কি করে যেন মগজে গেঁথে গেছে ওরা বোকা হয়ে গেছে।
আঙুরের রসের বোতল থেকে চোখ সরিয়ে স্বামীর দিকে তাকালেন চেরি আন্টি। বুঝলাম না। বোকা হয়ে গেছে মানে?
বোকা হয়ে গেছে মানে বোকা হয়ে গেছে। বোতলটার দিকে তাকিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে মাথা ঝাঁকালেন আঙ্কেল জ্যাক। বড় মুষড়ে পড়েছে বেচারারা। ওরা আমার কাছে এসেছে এমন কোন ওষুধ আছে কিনা জানতে যেটা ওদের বুদ্ধিমান বানিয়ে দিতে পারে।
হাঁ হয়ে ঝুলে পড়ল চেরি আন্টির নিচের চোয়াল। ওদেরকে কী বলেছ তুমি? বলেছ তো ওরা ঠিকই আছে, অকারণ দুশ্চিন্তা করে করে...
ঠোঁটে আঙুল রেখে আন্টিকে চুপ থাকতে ইশারা করলেন আঙ্কেল জ্যাক। ফিসফিস করে বললেন, শুকনো কথায় আত্মবিশ্বাস তৈরি হবে না ওদের। কোন কারণে আত্মবিশ্বাস নষ্ট হয়ে গেছে–এটাই হলো ওদের সমস্যা। নিজেদের ওপরই আর কোন আস্থা নেই ওদের।
কি করবে তাহলে? জিজ্ঞেস করলেন চেরি আন্টি।
এই যে, ওষুধ দিচ্ছি, জবাব দিলেন আঙ্কেল জ্যাক। ল্যাবরেটরি থেকে কম্পিউটারে একটা লেবেল প্রিন্ট করে এনেছি।
বোতলটা কাউন্টারে রাখলেন আঙ্কেল জ্যাক। লেবেলটা বের করে দেখালেন আন্টিকে। তাতে লেখা: বুদ্ধি বাড়ানোর টনিক।
লেখাটার দিকে তাকিয়ে ভ্রূকুটি করলেন চেরি আন্টি, এ রকম কোন ওষুধের কথা তো জন্মেও শুনিনি।
দরাজ হাসি ছড়িয়ে পড়ল আঙ্কেলের মুখে। আমিও শুনিনি। তবে ওদের আমি বলব এটা আমার নিজের আবিষ্কৃত ওষুধ, বুদ্ধি বাড়ায়। ওদের বিশ্বাস

জন্মানোটাই হলো আসল কথা। ওষুধে কাজ করছে এটা ভাবতে আরম্ভ করলেই আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে।
জোরে নিঃশ্বাস ফেললেন চেরি আন্টি। দেখো কাজ হয় কিনা।
তাড়াহুড়া করে লিভিং রুমের দিকে চলে গেলেন তিনি। ছেলেদের সঙ্গে কথা বলার জন্যে।
বোতলের দিকে মনোযোগ দিলেন তিনি। সুন্দর করে লেবেলটা লাগিয়ে দিলেন বোতলের গায়ে। তারপর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভালমত দেখলেন আঙুরের রস লেখা আসল লেবেলটা কোনখান দিয়ে দেখা যায় কিনা।
হয়েছে, সন্তুষ্ট হয়ে নিজেই ঘোষণা দিয়ে জানালেন নিজেকে। চমৎকার। পুরানো লেবেলটা দেখা যায় না। এটাকে মগজ উন্নত করার কিংবা বুদ্ধি বাড়ানোর ওষুধ ভাবতে আর আপত্তি কোথায়?
ভাগ্যিস, বুদ্ধিটা এসেছিল মাথায়। আপনমনে হাসলেন, আঙ্কেল জ্যাক। বোতলটা হাতে নিয়ে রওনা দিলেন লিভিং রুমের দিকে।
এই সময় টেলিফোন রাজল। ফোনটা রয়েছে ল্যাবরেটরিতে। হলের শেষ মাথার ঘরটা ল্যাবরেটরি।
কাউন্টারে বোতলটা রেখে ছুটলেন ফোন ধরার জন্যে।\ এই সুযোগে লুকানোর জায়গা থেকে বেরিয়ে এল মাজুল আর গাজুল।
ল্যাবরেটরির দরজার দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল গাজুল, এটাই আমাদের সুযোগ।
কি করবে? লিভিং রুমের দরজার দিকে তাকাতে তাকাতে জিজ্ঞেস করল মাজুল।
দেখোই না কি করি।
বোতলটা তুলে নিয়ে মুখটা খুলে ফেলল গাজুল।
কি করছ? জানার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে মাজুল।
আহ, চুপ থাকো না! ওরা শুনতে পেলে দৌড়ে আসবে দেখার জন্যে। আমার প্ল্যানটাই তখন বাতিল। গোলাম বানানোর জন্যে আর ধরে নিয়ে যাওয়া যাবে না ছেলেগুলোকে।
আর কিছু না বলে চুপচাপ তাকিয়ে রইল মাজুল।
বোতলটাকে কাত করে সমস্ত রস সিংকে ফেলে দিল গাজুল। কোমরে ঝোলানো একটা ব্যাগ থেকে আরেকটা বোতল বের করল। সেটা থেকে পানির মত রঙহীন তরল পদার্থ ঢালল প্রথম বোতলটায়। ছোট ছোট নানা রঙের শিশিও আছে ব্যাগটাতে। আঙুরের রসটা যে রঙের ছিল, সে-রকম রঙ মিশিয়ে দিল বোতলের

তরল পদার্থে। দেখতে অবিকল আঙ্কেল জ্যাকের রেখে যাওয়া আঙুরের রসের মতই রঙ হয়ে গেল জিনিসটার।
সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল গাজুল। কিছু বুঝলে? আমাদের ল্যাবরেটরিতে তৈরি করা মগজ উন্নত করার সত্যিকারের ওষুধ মিশিয়ে দিলাম। মগজশক্তি রসায়ন মানুষের ব্রেনের ওপর কতখানি কাজ করবে জানি না। তবে আশা করি বোকা ছেলেগুলোর এবার খানিকটা হলেও বুদ্ধি বাড়বে। আর তা হলেই হয়ে গেল আমাদের কাজ।
লেবেল লাগানো আঙুরের রসের বোতুলটার মুখ লাগিয়ে আবার আগের জায়গায় রেখে দিল গাজুল।
ল্যাবরেটরির দিক থেকে পায়ের শব্দ শোনা গেল।
জলদি। তাড়া দিল গাজুল। আলমারির পেছনে।
বোতলটার দিকে তাকিয়ে আছে মাজুল। কোন মানুষকে কখনও এ ফরমুলা খাওয়ানো হয়নি। কি ঘটবে কে জানে! যদি রিঅ্যাকশন হয়? মগজের ওষুধ, বলা যায় না, পাগলও তো হয়ে যেতে পারে। মরে গেলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই।
সঙ্গীর কাঁধে জোরে এক ঠেলা মেরে আলমারির দিকে ঘুরিয়ে দিল গাজুল। মারা গেলে আর কি করব। গবেষণা করতে গেলে এ রকম দুচারজন মারা যেতেই পারে। দেখা যাক কি হয়...চলো চলো...

.

রান্নাঘরে ফিরে এলেন আঙ্কেল জ্যাক।
বোতলটা তুলে নিয়ে লিভিং রুমের দিকে এগোলেন তিনি। কানে আসছে চেরি আন্টি আর ছেলেদের কথাবার্তা, হাসাহাসির শব্দ।
দরজার কাছে এসে এক মুহূর্ত দাঁড়ালেন তিনি। তারপর মুচকি হেসে ঢুকে পড়লেন ঘরের মধ্যে। বোতলটা তুলে দেখালেন ছেলেদের। এই যে, তোমাদের ওষুধ।
বোতলটা প্রথমে কিশোরের হাতে দিলেন তিনি।
ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল কিশোর। চোখের পাতা সরু হয়ে এল। সন্দেহ ফুটল তাতো বুদ্ধি বাড়ানোর ওষুধ?
মুখভঙ্গি নির্বিকার করে রেখে মাথা ঝাঁকালেন আঙ্কেল জ্যাক। হ্যাঁ, আমার নিজের ফরমুলা। বহু বছর ধরে এর ওপর গবেষণা করেছি আমি।
চেরি আন্টির পাশে কাউচে বসে পড়লেন তিনি। জিনিসটা কি ভাবে কাজ করে ব্যাখ্যা করে বোঝানো খুব কঠিন। বুদ্ধিমান মানুষদেরই সহজে মাথায় ঢুকতে চাইবে না, আর তোমরা তো বোকাই হয়ে গেছ। তবু বলি, এটা হলো নিউরন আর

প্রোটনের ব্যাপার-স্যাপার। তার যুক্ত হয়েছে মগজে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ প্রবাহের নিয়ম-কানুন…
অত কঠিন কঠিন কথা শুনতে গিয়ে মাথা ঘুরে যাবার জোগাড় হলো মুসার। বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করল, কা-কা-কাজ হবে তো?
ভয়ে ভয়ে বলল রবিন, মগজ বদলে দেবে? কিশোরের হাতের বোতলটার দিকে তাকাল সে।
না, তা বদলাবে না, আশ্বস্ত করলেন আঙ্কেল জ্যাক। আড়চোখে পরস্পরের দিকে তাকালেন তিনি আর চেরি আন্টি। আবার ছেলেদের দিকে ফিরলেন আঙ্কেল জ্যাক। সোজা করে বলতে গেলে তোমাদের মগজের বুদ্ধি, চলাচলের রাস্তার মধ্যে যে প্রতিবন্ধকতাগুলো সৃষ্টি হয়েছে, যার জন্যে বোকা হয়ে গেছ তোমরা, সেটা দূর করতে সাহায্য করবে এই ওষুধ। তোমাদের মগজের মহাসড়কটা খুলে দেয়ার ব্যবস্থা করেছি আমি। মগজে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ প্রবাহকে আরও খোলাখুলি ভাবে প্রবাহিত করতেও সাহায্য করবে এই ওষুধ।
এত বড় জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতার পরেও সন্দেহ যেতে চাইল না কিশোরের। বোতলটার দিকে তাকাল আবার। তো কি করব আমরা এখন? কতটা করে ওষুধ খেতে হবে?
পুরোটাই, আঙ্কেল জ্যাক বললেন। তিন দাগ ওষুধ আছে এখানে। সমান সমান তিন ভাগ করে খেয়ে ফেলবে আজ রাতে।
তারপর? রবিনের প্রশ্ন।
তারপর, স্রেফ ভুলে যাবে এটার কথা। মনে করারও আর প্রয়োজন নেই। জোর করে চালাক হওয়ার চেষ্টা কোরো না। সব কিছু ভুলে গিয়ে পড়ালেখায় মন দেবে। কোন কাজকেই অবহেলা করবে না। যত বেশি পরিশ্রম করবে, যত বেশি মনোযোগী হবে, তত দ্রুত বুদ্ধি খুলতে থাকবে তোমাদের।
তার গোল লাল টকটকে মুখে কোমল হাসি ছড়িয়ে পড়ল। তারপর দেখো কি ঘটে। আমার বিশ্বাস, তোমাদের মনের কষ্ট দূর হবে।
সত্যিই বুদ্ধিমান হব তো? সন্দেহ যাচ্ছে না কিশোরের।
হবে হবে…
বাইরে গাড়ির হর্নের শব্দ হলো। দুবার খাটো, একবার লম্বা।
ওই যে, বোধহয় হ্যারি এল। আমার সহযোগী বিজ্ঞানী। উঠে দাঁড়ালেন আঙ্কেল জ্যাক। জরুত্রী মীটিং আছে তার সঙ্গে।
ঠিক আছে, আমরা তাহলে যাই, বোতলটা হাতে নিয়ে কিশোরও উঠে দাঁড়াল। রবিন, যাবে না?
হ্যাঁ হ্যাঁ, যাব তো বটেই।

কি হয় জানিও, আঙ্কেল জ্যাক বললেন। আরেকটা কথা, এটা আমার অতি গোপন একটা আবিষ্কার। কাউকে বোলো না।
বলবে না কথা দিয়ে, আঙ্কেল আর আন্টি দুজনকেই ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এল ওরা।
বোতলটা কোটের পকেটে ভরে রাখল কিশোর।
মুসা জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাবে?
চলো, আগে আমাদের বাড়িতেই যাই। দেরি না করে ওষুধটা খেয়ে ফেলি। তারপর তোমাদের যেখানে ইচ্ছে যেও।
কিশোরদের বাড়িতে ঢুকে সোজা মুসা আর রবিনকে নিজের ঘরে নিয়ে এল কিশোর। ওদেরকে ওখানে বসিয়ে রেখে নিচতলায় গিয়ে উঁকি মেরে দেখে এল মেরিচাচী কোথায়।
তিনি ওখানে নেই। তারমানে তার অফিসে। কাজে ব্যস্ত। ইয়ার্ডের কর্মচারী বোরিস আর রোভার গেছে রাশেদ পাশার সঙ্গে পুরানো মাল কিনতে।
দ্রুত তিনটে গ্লাস তুলে নিয়ে আবার ওপরতলায় উঠে এল সে। টেবিলে রাখল ওগুলো। সমান তিন ভাগে ভাগ করল ওষুধটাকে।
সত্যি সত্যি কাজ হবে তো? হালকা লালচে রঙের তরল পদার্থটার দিকে তাকিয়ে থেকে ফিসফিস করে বলল মুসা। আমার এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না।
নিজের গ্লাসটা তুলে নিল রবিন। আঙ্কেল জ্যাকের ওপর বিশ্বাস রাখতে পারো। অসম্ভব বুদ্ধিমান। আমাদের সঙ্গে মিথ্যে বলবেন না।
হাসি ফুটল কিশোরের মুখে। কাণ্ডটা কি হবে ভাবো তো? বুদ্ধিমান হয়ে যাব আমরা। আর আমাদেরকে বোকা বলার সাহস পাবে না কেউ। কি সাংঘাতিক ব্যাপারই,না হবে।
হ্যাঁ, সাংঘাতিক, রবিন একমত হলো তার সঙ্গে।
একসঙ্গে গ্লাস তুলল ওরা। গ্লাসে গ্লাসে টোকা লাগিয়ে টোস্ট করল বড়দের মত করে।
উজ্জ্বল আলোয় ঝিক করে উঠল রঙিন তরল।
খেতে কেমন লাগবে আল্লাহই জানে, দ্বিধা করছে কিশোর।
যেমনই লাগে খেয়ে ফেলা যাক, রবিন বলল। যত দেরি করব, ততই ভয় বাড়বে।
একসঙ্গে ঠোঁট লাগিয়ে গ্লাসে চুমুক দিল তিনজনে। ইঞ্চিখানেক ওষুধ থাকতেই গ্লাসটা নামিয়ে রাখল মুসা। বিচ্ছিরি স্বাদ! আর এত ঘন!
খেয়ে ফেলো, মুসা, খেয়ে ফেলো, কিশোর বলল। কাজে লেগেও যেতে পারে।
বোকা থাকা চলবে না আমাদের, যোগ করল রবিন।

আবার গ্লাস ঠোঁটে ঠেকাল ওরা। কোনমতে মুখে ঢেলে গিলে ফেলল। গ্লাসগুলো নামিয়ে রাখল।

ঠোঁটে লেগে থাকা ওষুধ চেটে মুসা বলল, জঘন্য। এত ভয়াবহ স্বাদের জিনিস জীবনে মুখে দিইনি।

হু। মিকশ্চারও অত খারাপ না, কিশোর বলল দুনিয়ার সবচেয়ে বাজে স্বাদের ওষুধ। কয়েকবার ঢোক গিলে স্বাদটা জিভ থেকে নামিয়ে দেয়ার চেষ্টা করল সে। ওয়াক ওয়াক করল। মনে হচ্ছে বেরিয়ে চলে আসবে। মুসার দিকে তাকাল। চিউয়িং গাম আছে নাকি?

পকেটে হাত দিল মুসা।

কি, চালাক চালাক লাগছে? জিজ্ঞেস করল রবিন।

উম।...মনে তো হচ্ছে, জবাব দিল কিশোর।

রাইনসরাস বানান করো তো।

উ?

রাইনসরাস। করো। বানান করো।

দ্বিধা করতে লাগল কিশোর। ভাবছে। তারপর বলল, আর-আই-এন-ও...

থামো থামো, হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে লাগল রবিন। কাজ করছে না ওষুধ।

এত দ্রুত নিশ্চয় কাজ করে না এই ওষুধ, মুসা বলল। সময় দিতে হবে। ওই যে আঙ্কেল বললেন, চিন্তার রাস্তার প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করতে হবে..নিশ্চয় অতিরিক্ত ময়লা পড়ে গেছে। সাফ হতে সময় লাগবে।

জোরে নিঃশ্বাস ফেলল রবিন। তা লাগুক। বুধবারের মধ্যে হয়ে গেলেই বাঁচি।

কেন? বুধবার কেন?

ভুলে গেছ, বুধবারে অংক পরীক্ষা?

হাই তুলতে শুরু করল কিশোর। হঠাৎ করেই ঘুম পাচ্ছে আমার।

আমারও, রবিন বলল।

আমি তো চোখই টেনে খুলে রাখতে পারছি না, টেবিলের ওপরই মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়তে চাইল মুসা। বাড়ি যাওয়া এখন আমার পক্ষে দুঃসাধ্য!

থাক, যাওয়ার দরকার নেই, কিশোর বলল। রাতে আমাদের এখানেই থেকে যাও। বাড়িতে ফোন করে জানিয়ে দাও রাতে ফিরবে না।

ঘুমজড়িত স্বরে মুসা জবাব দিল, আমার ফোন করার ক্ষমতাও নেই।

.

পা টিপে টিপে ওপরতলায় উঠল মাজুল আর গাজুল।

না দেখে কিসে যেন পা বেধে হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল মাজুল।

চাপা গলায় ধমকে উঠল গাজুল, আহ, আস্তে। দেখে হাঁটো। সারা বাড়ির লোক সব জাগিয়ে দেবে দেখছি।
মাজুল বলল, এখানে কেন এলে, এখনও বলোনি কিন্তু।
মগজশক্তি রসায়ন তোমারও খাওয়া উচিত, বিরক্তকণ্ঠে বলল গাজুল। আর গাধা, এখানে এসেছি শিওর হতে, ওষুধটা খেল কিনা ছেলেগুলো, ওষুধে কাজ হলো কিনা দেখতে।
ভারী পায়ে অন্ধকার হল ধরে হেঁটে চলল দুজনে। কিশোরের শোবার ঘরের সামনে এসে থামল। উঁকি দিল ভেতরে।
ওই যে একটা ছেলে, ফিসফিস করে বলল গাজুল।
বাকি দুটো কোথায়? এ বাড়িতেই তো ঢুকতে দেখলাম। আর বেরোয়নি।
আছে অন্য কোন ঘরে। গেস্টরুমে।
নিঃশব্দে ঘরে ঢুকল দুজনে। টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল। তিনটে গ্লাস পড়ে আছে। সব কটাতেই লালচে ওষুধের তলানি।
একটা গ্লাস তুলে নিয়ে তাঁকে দেখল গাজুল। হাসি ফুটল মুখে। মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, হ্যাঁ, খেয়েছে। তিনটে খালি গ্লাস। তিনজনেই খেয়েছে।
ফিরে তাকিয়ে দেখল বিছানার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে মাজুল।
কিশোরের মুখের কাছে ঝুঁকে দেখতে লাগল। টাইম ট্রাভেল
দেখতে দেখতে কুঁচকে গেল তার ভুরু।
হাত নেড়ে ডাকল, গাজুল, এদিকে এসো তো?
কি হলো?
দেখো তো মরেটরে গেল নাকি!
শঙ্কিত হয়ে উঠল গাজুল। তাড়াতাড়ি বিছানার কাছে এসে দাঁড়াল। কিশোরের নাকের কাছে হাত দিয়ে দেখল। ফিরে তাকিয়ে ধমক দিয়ে বলল, উহ, পিলে চমকে দিয়েছিলো তোমাকে গাধা কি আর সাধে বলি। দিব্যি তো নিঃশ্বাস পড়ছে।
লজ্জিত ভঙ্গিতে মাথা চুলকাল মাজুল। নাকের কাছে হাত দিয়ে দেখার কথা মনেই হয়নি।
তা তো হবেই না। হয় তোমাকেও ওষুধ খাওয়ানো দরকার, নয়তো বাড়ি ফিরে ওঅর্কশপে গিয়ে মগজটা খুলে দেখা দরকার কোথায় কি গোলমাল হলো। তোমার এ সব বোকামির কথা মনিব শুনলে হয়তো তোমাকে বিকল বানিয়েই ফেলে রাখবে। কিংবা হাওয়া করে দেবে।
ভয় দেখা দিল মাজুলের চোখে। না–না, দোহাই তোমার, বসকে বোলো না, প্লীজ। তুমি না আমার বন্ধু।
হু। এখন থেকে মাথাটা খেলানোর চেষ্টা করবে।

করব। করব।
চলো, বেরিয়ে যাই, গাজুল বলল। দেখা তো হলো।
বাকি ছেলে দুটোকে দেখবে না?
না, দরকার নেই। তিনটে গ্লাসে ওষুধ, তারমানে তিনজনেই খেয়েছে। আর এই ছেলেটা যখন ভাল আছে, বাকি তিনটেও থাকবে, সন্দেহ নেই তাতে।

.

কিশোর! এই কিশোর কিশোর।
ডাক শুনে চোখ মেলল কিশোর। দেখল জানালার পর্দা সরিয়ে দিচ্ছেন মেরিচাচী। রোদ এসে পড়েছে ঘরে।
ওঠ, ওঠ। আর কত ঘুমাবি? স্কুলে যাবি না? হাসলেন চাচী। হাসিটা সকালের সোনালি রোদের মতই উজ্জ্বল।
উঠে বসল কিশোর। মুখের কাছে হাত নিয়ে এসে দীর্ঘ হাই তুলল। ঘুমটা যেতে চাইছে না চোখ থেকে। হিংসে হলো চাচীর ওপর। রোজ সকালে এত হাসিখুশি থাকেন কি করে চাচী। তার মনে হতে লাগল ওরকম মেজাজে থাকতে হলে মগজ ভরা বুদ্ধি থাকা দরকার। যার যে জিনিসটার ঘাটতি থাকে সব সময় সেটা নিয়েই মাথা ঘামায় মানুষ।

.

স্কুল বাসে ওঠার পর অন্য দিনের তুলনায় পরিস্থিতির বিশেষ কোন উন্নতি হলো না ওদের বেলায়। সামনের দিকের একটা সীটে জানালার কাছে বসল কিশোর। জায়গা না পেয়ে মুসা আর রবিন চলে গেল পেছনের দিকে।
ব্যাগটা কোলের ওপর রেখে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল কিশোর। দিনটা মেঘাচ্ছন্ন হয়ে আছে। ধূসর, মেঘে ঢাকা ভারী আকাশ। বৃষ্টির সম্ভাবনা। গাছপালা আর ঝোপঝাড়ের মাথায় হালকা কুয়াশা।
ফিরে তাকাল সে। পাশের সীটে বসেছে শারিয়া আর রয়। ওদের ক্লাসের দুজন সবচেয়ে ভাল ছাত্র। নিজের অজান্তেই গুঙিয়ে উঠল সে। দা নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকার ক্রসওয়ার্ড পাজল নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে ওরা।
ভাল ছাত্র বলে দুজনের খুব অহঙ্কার। প্রতিটি সূত্র এত জোরে জোরে বলছে, যাতে বাসের সবাই শুনতে পায়। বুঝতে পারে ওরা টাইমসের ক্রসওয়ার্ড পাজলের মত জটিল জিনিসের সমাধান করছে।
ক্লাসের আর কেউ এর সমাধান করতে পারে না, তিক্তকণ্ঠে ভাবল কিশোর। অসম্ভব কঠিন। সেজন্যেই বাসে উঠেই প্রতিদিন এটা নিয়ে মাথা ঘামানো শুরু করে যেন সবাইকে, বিশেষ করে কিশোবদেরকে বুঝিয়ে দেয়ার জন্যে যে ওরা কতখানি বোকা।

হাই কিশোর, ডেকে বলল রয়, এ জিনিসটা ঠিক বুঝতে পারছি না। সাহায্য করবে?
কিশোরের দিকে তাকিয়ে পিত্তি জ্বালানো হাসি হাসল শারিয়া, আমরা বোকা বনে গেছি।
কিশোরের বলতে ইচ্ছে করল, বোকা বনলে বনেই থাকো না। কিন্তু আরেকটা জিনিস মনের কোণে খচখচ করছিল বলেই আগ্রহী চোখে ফিরে তাকাল। ওষুধে কাজ হয়েছে কিনা, ওরা বুদ্ধিমান হয়েছে কিনা বোঝা দরকার।
রয় জিজ্ঞেস করল, এমন একটা বোকা গাধার নাম বলল তো, যেটার বানান সাত অক্ষর দিয়ে হয়।
গাধা তো এক রকমই হয়, জবাব দিল কিশোর। আর সেটার বানান তিন অক্ষরে...।
উঁহু, আঙুল নাড়ল রয়, এই গাধাটার বানান সাত অক্ষর দিয়েই হয়।
হেসে কুটিকুটি হতে লাগল শারিয়া।
এটা আমার মস্ত সুযোগ, কিশোর ভাবছে, মগজটা বুদ্ধিমান হয়েছে কিনা বোঝার। বহু সময় তো পার হয়েছে। এতক্ষণে ওষুধে ক্রিয়া করে ফেলার কথা। ইস, আঙ্কেল জ্যাকের ফরমুলাটা যদি কাজ করত। জবাবটা কি হবে, ভাবতে লাগল সে।
পারছ না? হাসতে হাসতে বলল রয়। দাঁড়াও, সূত্র দিয়ে দিই। দেব?
ফ্যালফ্যাল করে তার দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর।
ঠিক আছে, দিচ্ছি,রয় বলল। কে-আই-এস-এইচ...
তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে উঠল শারিয়া, ও-আর-ই।
প্রচণ্ড রসিকতায় মজা পেয়ে হো হো করে হেসে উঠল দুজনে। ওদের সঙ্গে যোগ দিল আরও কয়েকজন ছেলেমেয়ে। শুঁটকি টেরি আর তার বন্ধুরাও রয়েছে সেই দলে।
রাগে, হতাশায়, দুঃখে চোখে পানি চলে এল কিশোরের। সীটের মধ্যে এলিয়ে পড়ল। দৃষ্টি জানালার বাইরে। ভেসে বেড়ানো কুয়াশা আর ধূসর আকাশ মনটা আরও খারাপ করে দিল তার।
এত বোকা কি করে হয়ে গেলাম আমি। ভাবছে সে। এতটাই বোকা! মগজটাতে কি হলো আমার।
পেছনের সীট থেকে শোনা গেল আচমকা রবিনের চিৎকার। হায় হায়, আমার ব্যাগ।
ফিরে তাকাল কিশোর। কি হয়েছে, রবিন?
আমার স্কুল ব্যাগ, জবাব দিল রবিন। আনতে ভুলে গেছি।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুসা বলল, আমি ব্যাগ এনেছি, কিন্তু টিফিন আনিনি। ভুলে গেছি। লাঞ্চের সময় খাব কি?
সীটের সারির মাঝখান দিয়ে বাসের দুলুনির সঙ্গে সঙ্গে দুলতে দুলতে এগোল রবিন। চিৎকার করে অনুরোধ করতে লাগল ড্রাইভারকে, আমার ব্যাকপ্যাক, বই খাতা, সব বাড়িতে ফেলে এসেছি। প্লীজ, বাসটা ঘোরান। ফিরিয়ে নিয়ে চলুন। প্লীজ।
সরি, নির্বিকার কণ্ঠে জবাব দিল ড্রাইভার। বিশালদেহী একজন মোটাসোটা মহিলা। ঠোঁট থেকে ঝুলছে একটা দাঁত খোঁচানোর কাঠি। ফিরেও তাকাল না রবিনের দিকে।
কিন্তু আমার জিনিসগুলো তো দরকার, মরিয়া হয়ে বলতে লাগল রবিন। নইলে, নইলে ক্লাস করব কি করে? স্কুলে গিয়ে কি করব?
মুসাও উঠে এসেছে তার পেছন পেছন। ড্রাইভারকে অনুরোধ করতে লাগল সে-ও।
সরি নির্বিকার কণ্ঠে একই জবাব দিল মহিলা।
মনটা আরও খারাপ হয়ে গেল কিশোরের। আরও দমে গেল। এত বোকা তো ছিল না ওরা। হঠাৎ করে এমন কি ঘটে গেল যে মগজের এই অবস্থা হয়ে গেল?
দিনকে দিন খারাপের দিকেই যাচ্ছে। ভাল হওয়ার কোনই লক্ষণ নেই।
তার মনে হতে লাগল, আজকে বাসে ওঠার পর থেকে যা যা ঘটল এরচেয়ে খারাপ কিছু আর ঘটতে পারে না।
কিন্তু তার ধারণা ভুল।

.

ব্ল্যাকবোর্ডে লিখতে লিখতে থেমে গেলেন মিস্টার ক্রেগ। চক হাতে ঘুরে দাঁড়ালেন। কি হলো, কিশোর? এত হাসি কিসের?
ক্লাসের সবগুলো চোখ এখন কিশোরের দিকে।
হাসি থামানোর চেষ্টা করছে কিশোর। কিন্তু এমন একটা ছবি ওর হাতে ধরিয়ে দিয়েছে টেরির দোস্ত কডি, না হেসে থাকতে পারছে না সে। তাকালেই হাসি। মিস্টার ক্রেগের কিম্ভুত একটা ছবি এঁকেছে কডি। নাক দিয়ে দুটো কালো ক্রিমি বেরিয়ে আসছে।
ছবির নিচে টেরি ক্যাপশন লিখে দিয়েছে: পেট পচা। তাই ক্রিমিও পেটে থাকতে চায় না।
এই লেখাটাই বেশি হাসাচ্ছে কিশোরকে। ছবিটা দেখে তার মনে হচ্ছে: শিল্পী বটে কড়ি! ছবি আঁকায় ওর যে এত ভাল হাত, কই জানা ছিল না তো!

অংক করাচ্ছেন মিস্টার ক্রেগ। সারা ক্লাসের মনোযোগ সেদিকেই ছিল। পিনপতন নীরবতা। কেবল ব্ল্যাকবোর্ডে মিস্টার ক্রেগের চক ঘষার কিচকিচ শব্দ। এর মাঝে কিশোরের হো হো করে হেসে ওঠাটা যে কতটা বেমানান লেগেছে, ভাবতেই এখন সিঁটিয়ে গেল সে।
গাধা! গাধা আর কাকে বলে!
এগিয়ে এলেন মিস্টার ক্রেগ। কিশোরের কাছে এসে দাঁড়ালেন। তার হাতের ছবিটার দিকে তাকালেন।
আচমকা হাত বাড়িয়ে কেড়ে নিলেন ছবিটা দেখার জন্যে চোখের সামনে নিয়ে গেলেন।
ঢোক গিলল কিশোর। মুখ তুলে তাকাল টিচারের দিকে। হাসি নেই তার মুখে। ভীষণ গম্ভীর।
আরও নীরব হয়ে গেছে ঘরটা। নিঃশ্বাসের শব্দও শোনা যাচ্ছে।
তুমি এঁকেছ? জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার ক্রেগ। ফিসফিসানির মত শোনা গেল তাঁর কণ্ঠ।
না, কোনমতে জবাব দিল কিশোর। কান ঝাঁ-আঁ করছে। ঘাড় গরম হয়ে যাচ্ছে। বুঝতে পারছে লাল হয়ে যাচ্ছে মুখ।
হু। কে কছে তাহলে? মোলায়েম কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার ক্রেগ।
আঁ!... কডির কথা বলবে কিনা ঠিক করতে পারছে না কিশোর। জানি না!
আমার ছবি নাকি? মিস্টার ক্রেগের প্রশ্ন।
তা-তাও তো বুঝতে পারছি না, স্যার, বলেই হা-হা করে হেসে উঠল কিশোর। আটকাতে পারল না হাসিটা।
গাধা! মস্ত গাধা! মনে মনে গাল দিল নিজেকে।
নীরবতা নেই আর ঘরে। সবাই হাসছে এখন। মিস্টার ক্রেগ বাদে।
হাসি থামার অপেক্ষা করতে লাগলেন তিনি। তারপর ছবিটা কিশোরের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, আঁকাটা ঠিক হয়নি। আমার চুল আরও লম্বা। নাকটা আরও খাটো।
হাঁপ ছেড়ে বাচল কিশোর। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। আল্লাহ্ আঁচিয়েছেন আমাকে, ভাবল। মিস্টার ক্রেগ ধমক দেননি। স্কুল ছুটির পর থাকতে বলেননি। শাস্তি দেননি। বড় বাঁচা বেঁচে গেলাম।
কিন্তু নিঃশ্বাসটা একটু আগেভাগেই ফেলেছে কিশোর। তখনও অনেক কিছু বাকি।
ক্লাসটাকে যখন আজ এতটাই সরগরম করে তুলতে পারলে, কিশোর পাশা, মিস্টার ক্রেগ বললেন, যাও না, ব্ল্যাকবোর্ডে গিয়ে সবাইকে দেখিয়ে দাও

সমীকরণটা কি ভাবে করতে হবে।
সমীকরণ? আমি?
বুকের মধ্যে হাতুড়ির বাড়ি পড়া শুরু হলো কিশোরের। উঠে দাঁড়াতে গিয়ে দেখে পায়ে শক্তি পাচ্ছে না। কোনমতে টলতে টলতে এগিয়ে গেল ব্ল্যাকবোর্ডের দিকে। সমীকরণটা পড়তে গিয়ে মাথা চুলকানো শুরু করল।
আরও একবার ভাবল মগজ উন্নত করার ওষুধটার কথা। এখনও কি ওষুধের কার্যকারিতা শুরু হওয়ার সময় হয়নি?
ইস্, যদি জেনে যেত কি করে সমাধান করতে হবে সমীকরণটার? কি মজাই না হতো। খসখস করে লিখে যেত মিস্টার ক্রেগ আর সহপাঠীদের বিস্মিত চোখের সামনে। ওকে আর বোকা বলার সাহস পেত না কেউ। বোকা তো সে ছিলও না। কিন্তু কেন যে...
ওষুধে কি কাজ শুরু করেছে?
যদি খালি...যদি খালি...
চকে লিখে রাখা অংকগুলোর দিকে তাকিয়ে হঠাৎ কেমন যেন অন্য রকম লাগতে শুরু করল তার।
মনে হলো যেন একটা তীব্র বিদ্যুৎ তরঙ্গ খেলে গেল সমস্ত দেহে।
খাড়া হয়ে উঠল হাতের লোম। ভয়ে না মগজের কোন প্রতিক্রিয়ার কারণে, বুঝতে পারল না।
পারবে সে, বুঝে গেল। সমাধান করে ফেলতে পারবে সমীকরণটার।
কি হলো, কিশোর? চুপ করে আছো কেন? পেছন থেকে বললেন মিস্টার ক্রেগ।
অক্ষর আর নম্বরগুলোর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল সে, কোনটার সমাধান করব, স্যার? কিভাবে?
হেসে উঠল সারা ক্লাস। ব্যঙ্গের হাসি।
ঠিক আছে, প্রথমে এক্স থেকেই শুরু করি, গলা কাঁপছে কিশোরের।
একটুকরো চক তুলে নিয়ে লিখতে আরম্ভ করল সে।
লিখতে গিয়ে বেশি চাপ দিয়ে চকই ভেঙে ফেলল। অর্ধেকটা চক উড়ে গিয়ে পড়ল মেঝেতে। তাকাল না সে।
বুকের মধ্যে কাঁপছে। হচ্ছে তো অংকটা?
অদ্ভুত এক ভয়ের অনুভূতি। এ রকম অনুভূতি জীবনে হয়নি তার।
অবশেষে লেখা শেষ হলো। ফিরে তাকাল মিস্টার ক্রেগের দিকে। অনিশ্চিত ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল, হয়েছে, স্যার?
বোর্ডের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোয়াল শক্ত হয়ে গেল মিস্টার ক্রেগের মুখ।

কঠিন হয়ে গেল দৃষ্টি।
অস্থির ভঙ্গিতে চুলে আঙুল চালালেন টিচার। চঞ্চল চোখের মণি দ্রুত ঘুরছে ব্ল্যাকবোর্ডের লেখাগুলোর ওপর।
আশ্চর্য! বিড়বিড় করলেন তিনি। অবিশ্বাস্য!
হাসিটা চওড়া হলো কিশোরের।
ঢোক গিললেন মিস্টার ক্রেগ। চোখের পাতা সরু করে আনলেন। এগুলো কি করলে? এতক্ষণ ধরে লিখলে, কিছুই তো হয়নি।
তারমানে, স্যার? হাসি মুছে গেল কিশোরের মুখ থেকে, হয়নি?
উঁহু। হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন টিচার। যে ভাবে লেখা শুরু করলে, আমি তো ভাবলাম পেরেই ফেলবে…কিন্তু কথাটা শেষ হলো না তার।
তারমানে, স্যার…ভুল? ঢোক গিলল কিশোর। ভাঙা ভাঙা স্বর বেরোল কোলাব্যাঙের মত।
পুরোপুরি ভুল, হতাশ ভঙ্গিতে জানালেন মিস্টার ক্রেগ। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত।
ফুটো বেলুনের মত চুপসে গেল কিশোর। তবে কেউ আর এখন হাসছে না তার দিকে তাকিয়ে। সবারই যেন দুঃখ হচ্ছে তার জন্যে।
কিশোরকে কেউ সাহায্য করতে পারবে? মিস্টার ক্রেগ বললেন। রবিন, মুসা-তোমরা তো কিশোরের বন্ধু। পারবে তার অংকটা করে দিতে?
না, স্যার, জবাব দিল রবিন। আমি আমার বইপত্রই আনতে ভুলে গেছি। তা ছাড়া এই চ্যাপ্টারটা আমি পড়িওনি।
মাথা চুলকে মুসা বলল, আমি, স্যার, আমার লাঞ্চবক্স আনতেই ভুলে গেছি।
.
জানালার ঠিক বাইরেই ঝোঁপের মধ্যে লুকিয়ে ঘরের ভেতরে নজর রেখেছে দুই জোড়া চোখ।
মাজুলের দিকে ঘুরল গাজুল। নাহ্, এই অপদার্থগুলোকে দিয়ে হবে না। তিনটেই গাধা, গাধা, গাধা!
বিরক্তিতে চোখ-মুখ কুঁচকে ফেলল সে। থু থু করে থুতু ফেলল মাটিতে।
তারমানে মগজশক্তি রসায়নেও কোন কাজ করছে না? জানালা দিয়ে আবার ক্লাসরুমের ভেতরে তাকাল মাজুল।
উঁহু, করছে না। মানুষ হলো একেবারে নিচু জাতের প্রাণী। বুদ্ধিশুদ্ধি বলতে কিছু নেই ওদের।
কি আর করা, মাজুল বলল। অকারণে আর এদের পেছনে লেগে না থেকে চলো আর কাউকে খুঁজি। এ স্কুলের কোনটাকে দিয়েই মনিবের কোন কাজ হবে না। বুদ্ধিমান মানুষ দরকার আমাদের। বুদ্ধিমান গোলাম।

.
মগজের ওষুধটা তো কাজ করছে না, আঙ্কেল, টেলিফোনে ককিয়ে উঠল রবিন।
তাকে বলো, মগজ খুলছে না আমাদের পাশে থেকে বলে দিল কিশোর।
বলো, আগের মতই বোকা রয়ে গেছি,মুসা বলল।
কিশোরের ঘরে বসে কথা বলছে ওরা।
তোদেরকে ধৈর্য ধরতে বলেছিলাম, আঙ্কেল বললেন। গবেষণাগারে কোনও ধরনের মেশিন চলছে। সেটার গর্জনকে ছাপিয়ে চিৎকার করে কথা বলতে হচ্ছে তাকে।
কিন্তু আমরা তো ঠিকঠাকমতই ওষুধ খেয়েছি, বলো না, কিশোর বলল। কাজ হচ্ছে না কেন? যা ভয়ঙ্কর একটা দিন কাটিয়েছি...আর...আর...
বরং আগের চেয়ে বোকা হয়ে গেছি, ফোনে আঙ্কেলকে জানাল রবিন।
এটা তোর ভুল ধারণা, আঙ্কেল জবাব দিলেন। তা ছাড়া এ ধরনের মগজ উন্নয়নকারী ওষুধগুলো রাতারাতি কাজ করে না। রক্তের সঙ্গে পুরোপুরি মিশে যেতে প্রচুর সময় নেয়। তোদেরকে এখন...
মেশিনের শব্দ থামল।
কিসের শব্দ হচ্ছিল, আঙ্কেল? জিজ্ঞেস করল রবিন।
ব্লেন্ডার মেশিন, আঙ্কেল জানালেন। গাজরের রস মেশাচ্ছি।
কিন্তু...আমরা কখন বুদ্ধিমান হব? রবিন নিশ্চিন্ত হতে পারছে না। কালকে আমাদের অংক পরীক্ষা। আমরা চাইছি ভাল একটা গ্রেড পেতে।
ভাল, গ্রেড তো পরের কথা, কিশোর বলল। পাস করব কিনা সন্দেহ। আমি শুধু পাস করলেই খুশি।
ঘাড় কাত করে মুসাও কিশোরের সঙ্গে একাত্ম হলো। সেকথা আঙ্কেলকে জানাল রবিন।
পাস করবে না মানে? আঙ্কেল বললেন। অবশ্যই পাস করবে। কি বলেছিলাম তোদের, ভুলে গেছিস? ভাল করে পড়ালেখা করতে হবে। বেশি বেশি করে পরিশ্রম করতে হবে। ওষুধটার কথা মন থেকে উধাও করে দিয়ে একেবারে ভুলে যেতে হবে। তারপর দেখ না, কি ভাবে কাজ করছে। আগামীকালকের। পরীক্ষার জন্যে ভাবনা নেই। পাস করে যাবি।
কিন্তু, মাথা চুলকাল রবিন, এতক্ষণেও কি রক্তে মিশে যায়নি?
বললাম তো ওষুধটার কথা ভুলে যেতে, আঙ্কেল জ্যাক বললেন। কাল আবার ফোন করিস আমাকে। আমি জানি, কালকে তোরা ভাল খবর দিতে পারবি।
তাকে ধন্যবাদ আর গুডবাই জানিয়ে রিসিভার নামিয়ে রাখল রবিন।

ভাল খবর, তিক্তকণ্ঠে বিড়বিড় করল কিশোর। মেঝেতে রাখা ব্যাকপ্যাকটাতে ধা করে এক লাথি মারল, যেন সমস্ত দোষ ওটার। ভাল খবরটা কি আকাশ থেকে পড়বে? অংকে তো গোল্লা পাব।
ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল মুসা। কোন চ্যাপ্টারটা পড়তে হবে তাই তো জানি না।
স্কুলের কাউকে ফোন করে জেনে নেব নাকি? রবিন বলল। রয়, কিংবা শারিয়া, কিংবা অন্য কেউ বলব আমাদের সঙ্গে এসে বসে পড়তে?
মাথা খারাপ নাকি তোমার? কিশোর বলল। ওরা আমাদের সঙ্গে বসে কস্মিনকালেও পড়বে না। আমাদের বোকামিকে ওরা রীতিমত ভয় পায়, এড়িয়ে চলে। বুঝতে পারো না সেসব? ব্যাকপ্যাকে আবার লাথি মারতে গিয়ে আঙুলে পেল ব্যথা। আঁউ করে উঠল।
এ সব রাগারাগি আর চিন্তা-ভাবনা করার চেয়ে এসো বসে বসে পড়ি, রবিন বলল। আঙ্কেল কি করতে বলেছেন, শুনলে না? মন দিয়ে পড়তে বলেছেন। ওষুধের কথা ভুলে যেতে বলেছেন।
হু, চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল কিশোর। বের করো তো দেখি অংক বইটা। আর রিভিউ শীটটা।
গলাটা শুকিয়ে গেছে, মুসা বলল। কোকটোক কিছু আনো না।
যাচ্ছি, বলে দরজার দিকে রওনা হলো কিশোর।
বারান্দায় বেরিয়েই উহ করে এক চিৎকার দিয়ে বুক চেপে ধরল।
কি হলো, কি হলো! বলে দৌড়ে এল মুসা ও রবিন।
হাসি শোনা গেল গলির মাথা থেকে। বলে উঠল হাসি হাসি একটা বালককণ্ঠ, ডার্টটা এত জোরে আঘাত করবে বুঝতে পারিনি।
জ্বলন্ত চোখে সেদিকে তাকাল কিশোর। চিৎকার করে উঠল, তুমি কখন এলে?
রবিন আর মুসাও বারান্দায় বেরিয়ে এসেছে। বারান্দার মাথায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল আট বছর বয়েসী ছেলেটাকে। ওর নাম ডন। মেরিচাচীর বোনের ছেলে। ওর বাবা আইব্রাম হেনরি স্টোকার অনেক বড় বিজ্ঞানী। অ্যারিজোনায় থাকে ডনরা। মাঝে মাঝেই বেড়াতে আসে সে। বেশির ভাগ সময়ই একা আসে।
কোথায় পেলে ওই ডার্ট? রাগে আবার চিৎকার করে উঠল কিশোর। ডার্ট কোন খেলনা জিনিস হলো না। আরেকটু..আরেকটু হলেই তো খুন করে ফেলেছিলে আমাকে।
না, তা করব কেন? এগুলো খেলনা ডার্ট, এগিয়ে আসতে আসতে জবাব দিল ডন।
কিন্তু ব্যথা তো কম লাগল না, রাগ যাচ্ছে না কিশোরের। আর লাগালেও ঠিক হৃৎপিণ্ডের ওপরে।

তাই তো লাগাব, মেঝে থেকে ডার্টটা কুড়িয়ে নিতে নিতে নির্বিকার ভঙ্গিতে জবাব দিল ডন। তাতে পয়েন্ট বেশি। পঞ্চাশ পয়েন্ট। তবে সবচেয়ে বেশি পয়েন্ট মাথায় লাগাতে পারলে। মাথায় একশো। পেটে তিরিশ। হাতে আর পায়ে দশ পয়েন্ট করে।

ভাগো এখান থেকে ধমকে উঠল কিশোর। বুকের আহত জায়গাটা ডলতে ডলতে বলল, আবার কেন মরতে এসেছ এখানে? একা এলে নাকি?

কিশোরের ধমকে হাসি মুছল না ছেলেটার। বরং মজা পাচ্ছে। তার কাজ সে করে ফেলেছে। হ্যাঁ, একা। থাকব কিছুদিন। বাবা গেছে বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে। ফিরতে দেরি হবে।

তারমানে জ্বালিয়ে মারবে! বিড়বিড় করল কিশোর। নিজের জ্বালাতেই বাঁচি না…

তার কথা যেন কানেই ঢুকল না ডনের। মুসার দিকে তাকাল, ডার্ট ছোঁড়াছুঁড়ি খেলবে নাকি, মুসাভাই?

নাহ, শুকনো কণ্ঠে জবাব দিল মুসা। কালকে অংক পরীক্ষা। পড়তে হবে।

পরীক্ষা দিয়ে আর কি করবে। ফেল করবে জানা কথা। তারচেয়ে এসো, ডার্ট খেলা যাক..

ধৈর্য হারাল কিশোর। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল, তুমি যাবে এখান থেকে।

চমকাল না ডন। স্নায়ুর জোর সাংঘাতিক। ভুরু কুঁচকে কিশোরের দিকে তাকাল, কি হয়েছে তোমার, কিশোরভাই? অমন করছ কেন?

জবাব দিল না কিশোর।

কিন্তু তার চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে বোধহয় বুঝতে পারল ডন, পরিস্থিতি স্বাভাবিক নয়। আর কিছু না বলে চলে গেল সে।

পরদিন স্কুলে অংক পরীক্ষার পর কিশোর আর রবিনের কাছে এসে দাঁড়াল মুসা। পরীক্ষাটা কিন্তু খারাপ হয়নি, যাই বলো।

কাঁধ ঝাঁকাল কিশোর। সবগুলো প্রশ্নেরই জবাব দিয়েছি আমি। এটাকে শুভলক্ষণই বলতে পারো।

আমার অবশ্য কিছু কিছু জায়গায় ভাবতে হয়েছে, রবিন বলল। তিন নম্বর সমীকরণটা তো রীতিমত ভাবনায় ফেলে দিয়েছিল। তবে সমাধান করে ফেলেছি। ঠিক হলো কিনা বোঝা যাবে মিস্টার ক্রেগের দেখার পর।

তবে কেন যেন মনে হচ্ছে, কিশোর বলল, এবার পাস করে ফেলব। যদিও শিওর হতে পারছি না।

ওদের পেছনে রয়ের সঙ্গে কথা বলতে শুনল শারিয়াকে। একেবারেই সহজ।

পানির মত, রয় জবাব দিল।

অকারণেই জোরে জোরে হাসতে লাগল দুজনে।

তিন গোয়েন্দাকে ব্যঙ্গ করল কিনা ওরা বোঝা গেল না। কিন্তু রাগ হতে থাকল মুসার। শুঁটকির চেয়ে কোন অংশেই ভাল না এই ছেলেমেয়ে দুটোও। এখন ওদের সময় খারাপ, তাই কিছু বলল না।
আরও কঠিন অংক দিতে পারেন না, স্যার? ডেকে বলল রয়।
দেখা যাক, পরের বার, জবাব দিলেন মিস্টার ক্রেগ।
কিশোর, হেসে জিজ্ঞেস করল রয়, তোমাদের কেমন হলো?
আশা করি তোমাদের চেয়ে ভাল হবে, গম্ভীর স্বরে জবাব দিল কিশোর।
বিশ্বাস করল না রয় কিংবা শারিয়া। হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল দুজনে।

.

পরীক্ষার ফল জানাব এখন, পরদিন বিকেলে ঘোষণা করলেন মিস্টার ক্রেগ।
ডেস্কের সারির মাঝখান দিয়ে হেঁটে হেঁটে খাতাগুলো বিতরণ করতে লাগলেন তিনি।
সব মিলিয়ে খুশিই হয়েছি আমি, মিস্টার ক্রেগ বললেন। কঠিন প্রশ্ন করেছিলাম। মোটামুটি সবাই ভাল করেছ তোমরা।
রয়ের টেবিলের সামনে দাঁড়ালেন তিনি। ভাল করেছ, রয়।
কিশোর ভাবছে, আমি কেমন করলাম? ডেস্কের ওপর দুই হাত রাখা। খুলছে আর মুঠোবদ্ধ হচ্ছে আঙুলগুলো। পাস করেছি তো? শুধু পাস করলেই আমি খুশি।
ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল মুসা আর রবিনের দিকে। পেছনের সারিতে পাশাপাশি বসেছে ওরা। মুসার কোন ভাবান্তর নেই। লেখাপড়ায় খুব ভাল সে কোনকালেই ছিল না। এখন আরও খারাপ হয়েছে। কিন্তু কিশোর আর রবিনের জন্যে ব্যাপারটা ভীষণ দুঃখজনক। বুদ্ধিমান বলে যারা চিরকাল সবার ঈর্ষার কারণ হতো, আজ তারাই অন্যের করুণার পাত্র। কেন এমন হয়ে গেল, সেটা একটা বিরাট রহস্য কিশোরের কাছে। কিন্তু এতই বোকা হয়ে পড়েছে সে, রহস্যটা উদঘাটনের কথাও ভাবছে না। আর ভেবেও লাভ হবে না। ক্ষমতাই নেই।
অস্বস্তি ভরা চোখে কিশোরের দিকে তাকাল রবিন। কথা বলল না।
খোদা, মনে মনে প্রার্থনা করল কিশোর, কোনমতে যেন পাস করে যাই। ফেল করার লজ্জা আর সহ্য করতে পারছি না। খোদা! খোদা! প্লীজ।
খাতা দেয়া শেষ করলেন মিস্টার ক্রেগ। ডেস্কে ফিরে গেলেন।
স্যার, আমার খাতাটা? কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল কিশোর।
ফিরে তাকালেন মিস্টার ক্রেগ। হাসলেন। হ্যাঁ, তোমাদেরটা বাকি আছে। মুসা আর রবিনেরটাও দেব না। ছুটির পরে আমার সঙ্গে দেখা করবে তোমরা তিনজনে।
সর্বনাশ! একেবারে দমে গেল কিশোর।

নিশ্চয় খারাপ সংবাদ! খুব খারাপ।
ছুটির পর ছেলেমেয়েদের বেরিয়ে যাওয়ার অপেক্ষা করতে লাগলেন মিস্টার ক্রেগ।
সবাই বেরিয়ে গেল। কিশোর, মুসা আর রবিন বাদে।
ওদের খাতা তিনটে বের করলেন মিস্টার ক্রেগ। শক্ত করে ধরে রেখে তাকালেন ওদের দিকে। তীক্ষ্ণ কুটি করলেন। ভাজ পড়ল কপালে।
তোমাদের জন্যে দুঃখ হচ্ছে আমার, সত্যি, মোলায়েম কণ্ঠে বললেন তিনি। বড় বেশি হতাশ করলে তোমরা আমাকে।

.
দীর্ঘশ্বাস ফেলল কিশোর।
চোখ নামাল রবিন। মেঝের দিকে তাকিয়ে রইল।
তারমানে…তারমানে আবার ফেল করলাম। বিড়বিড় করল মুসা।
জবাব দিলেন না মিস্টার ক্রেগ। লম্বা লম্বা পায়ে গিয়ে জানালার কাছে দাঁড়ালেন তিনি। তাকিয়ে রইলেন মেঘে ঢাকা ধূসর আকাশের দিকে।
দোষটা বোধহয় আমারই ছিল, ওদের দিকে পেছন দিয়ে রেখেছেন তিনি। ভাল করার জন্যে অনবরত চাপ দিয়ে যাচ্ছিলাম তোমাদের ওপর। মরিয়া হয়ে তাই এ কাজটা করে বসলে।
আচমকা ঝটকা দিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন ওদের দিকে। কিন্তু কল্পনাই করতে পারিনি এ ভাবে আমাকে ঠকাবে তোমরা। নকল করে লিখবে।
নকল। বুঝতে পারল না কিশোর।
হাঁ হয়ে গেছে রবিন।
মুসা তাকিয়ে আছে চোখ বড় বড় করে।
তিনজনেই ভাল করেছ তোমরা, মিস্টার ক্রেগ বললেন। খুব ভাল। প্রতিটি অংকের সমাধান করেছ। একটা অংকও ভুল হয়নি। কি প্রমাণ হয় এতে? দেখে দেখে লিখেছ। তিনটে খাতা তুলে নিয়ে ওদের দিকে ছুঁড়ে দিলেন তিনি। কেন করলে এ কাজ? আমাকে খুশি করার জন্যে নকল ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না?
কিন্তু…আমরা তো নকল করিনি। কিশোর বলল।
খুব মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করেছি আমরা, রবিন বলল। আর কিছুই করিনি।
তাই তো, মুসা বলল। কোন রকম চালাকি করিনি আমরা।
আসলে তো মগজ উন্নত করার ওষুধ খেয়ে বুদ্ধি বেড়ে গেছে আমাদের, ভাবল কিশোর। কিন্তু টিচারকে বলল না সেকথা।

খাতার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে নম্বর দেখে বিস্ময়ে অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে আসতে থাকল রবিনের মুখ থেকে। বিশ্বাস করতে পারছে না। তবে কি সত্যি কাজ করেছে মগজ উন্নত করার ওষুধ? বুদ্ধিমান হয়ে গেছে ওরা?

তোমাদেরকে আমি পছন্দ করি, মিস্টার ক্রেগের কথা শুনে মুখ তুলে তাকাল রবিন। তাই এবার আর প্রিন্সপ্যালের কাছে পাঠালাম না। তবে এরপর আর এ ধরনের অন্যায় করলে কিন্তু আর মাপ করব না।

কিন্তু...স্যার...আমরা...কথা বের করতে পারছে না মুসা।

সত্যি বলছি, নকলটকল কিছু আমরা করিনি, কিশোর বলল।

অধৈর্য ভঙ্গিতে চোখ ওল্টালেন মিস্টার ক্রেগ। আঙুল তুলে নাড়লেন। বললাম তো, এবারকার মত মাপ করে দিলাম। এ কাজ কেন করেছ, তা-ও বুঝতে পারছি। দাও, দেখি, টেস্ট পেপারগুলো ছিঁড়ে ফেলি। কাল আবার নতুন খাতা দেব। নতুন প্রশ্নপত্র।

কিন্তু, স্যার, আমরা... বলতে গেল কিশোর।

বললাম তো, নতুন করে পরীক্ষা দিতে হবে তোমাদের, কোন কথা শুনতে চাইলেন না মিস্টার ক্রেগ মনোযোগ দিয়ে পড়বে আজ রাতে। যাতে পাস করতে পারো। আজকের কথা তাহলে আর মনে রাখব না আমি।

.

টিচারের ধমক আর রাগারাগি নিয়ে মাথাই ঘামাল না ওরা। আনন্দে নাচতে নাচতে রাড়ি ফিরল।

বুদ্ধিমান হয়ে গেছি আমরা, কিশোর বলল। মগজের স্থবিরতা কেটে গেছে। বোকামি শেষ।

সব আঙ্কেল জ্যাকের কৃতিত, রবিন বলল। তিনিই আমাদেরকে বুদ্ধিমান বানিয়ে দিয়েছেন। ভেবে দেখো, কিশোর, দুনিয়ায় কি একটা সাংঘাতিক অবস্থার সৃষ্টি করতে যাচ্ছেন তিনি। সমস্ত বোকাদেরকে তো বুদ্ধিমান বানাবেনই, মগজ উন্নত করার ওষুধ বেচে বেচে নিজেও কি পরিমাণ বড়লোক হয়ে যাবেন, কল্পনা করতে পারো?

সব বোকাদের নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা নেই, জবাবটা দিল মুসা। আমি শুধু আমাদের কথা ভাবছি। তুমি কল্পনা করতে পারো, স্কুলে সব বিষয়েই এ প্লাস পেয়ে গেলে কি একটা সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটে যাবে?

এখনই অত আশা করে ফেলাটা বোধহয় ঠিক হচ্ছে না, গম্ভীর সুরে কিশোর বলল। সব বিষয়ে এ প্লাস পাওয়ার বিষয়টা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলা উচিত। নইলে পরে দুঃখ পেতে হবে। নিশ্চয় আমাদের ভাগ্য ভাল, সব। প্রশ্ন কমন

পড়েছিল, তাই ওই পরীক্ষাটায় আমরা ভাল করে ফেলেছি। সবগুলোতেই যে এমন করব, তা না-ও হতে পারে। দেখা যাক, আগামী কাল কি
ওটাতেও এ পেয়ে যাব, জোর দিয়ে বলল রবিন, এ ব্যাপারে আর কোন সন্দেহ নেই আমার। এমনকি সেটা পাওয়ার জন্যে পড়তেও হবে না আমাদের। মহা উল্লাসে ব্যাকপ্যাকটাকে ওপরে ছুঁড়ে দিয়ে লুফে নিল সে।
বাকি পথটা যেন উড়ে পেরোল তিনজনে।
রবিনদের বাড়িতে ঢুকল ওরা। লিভিং রুমে ঢুকে রিনিতাকে দেখতে পেল। কতগুলো প্লাস্টিকের টুকরো জোড়া দিয়ে ম্যাপ বানানোর চেষ্টা করছে সে।
এখনও এই নিয়েই পড়ে আছো, রবিন বলল। এক খেলা খেলতে বিরক্ত লাগে না তোমার?
না লাগে না, রিনিতা জবাব দিল।
মুসা হেসে জিজ্ঞেস করল, দেব জোড়া লাগিয়ে?
দিলে তো ভালই হতো। কিন্তু তোমরা হাঁদারা কি পারবে? মাথায় গোবর ছাড়া কিছু নেই।
দাও তো দেখি, হাত বাড়াল কিশোর।
থাক থাক, যেটুকু করেছি, সেটাও নষ্ট করার দরকার নেই, কিশোরের হাতটা সরিয়ে দিল রিনিতা।
আরে দিয়েই দেখোনা, রবিন বসে পড়ল রিনিতার পাশে। কিশোর আর মুসাও বসল।
প্রথমেই ইনস্ট্রাকশন শীট–যেটা দেখে দেখে সাজাতে হয়, সেটা ছিঁড়ে কুটি কুটি করল রবিন।
চিৎকার করে উঠল রিনিতা, হায় হায়, এ কি করলে! সাজাব কি করে এখন? কাঁদতে শুরু করল সে।
হেসে উঠল রবিন। ওই শীটের আর প্রয়োজন পড়বে না।
দ্রুতহাতে জোড়া দিতে শুরু করল সে। তাকে সাহায্য করল কিশোর আর মুসা।
কয়েক মিনিটের মধ্যেই প্লাস্টিকের মস্ত একটা ওয়ার্ল্ড ম্যাপ তৈরি হয়ে গেল।
চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইল রিনিতা। বিশ্বাস করতে পারছে না। তারপর বিস্ময়টা যেন বিস্ফোরিত হলো তার। চিৎকার করে উঠল, কি ভাবে করলে।
পানির মত সহজ, হাসতে হাসতে বলল রবিন।
তুমি কি ভেবেছিলে চিরকালই আমরা হাঁদা থেকে যাব, হেসে বলল রবিন।
কিশোর কিছু বলল না। নীরবে উপভোগ করতে লাগল ব্যাপারটা।

.
জানালা দিয়ে চুরি করে পুরো ব্যাপারটাই লক্ষ করল গাজুল আর মাজুল।

মাজুল অবাক, তারমানে সত্যি সত্যি ওষুধে কাজ হয়ে গেল।
হাসিমুখে মাথা ঝাঁকাল গাজুল।কেন, নিজের চোখেই দেখলে। যাক, বাঁচা গে, বারা। নতুন করে আর কারও খোঁজ করা লাগল না। আমাদের গোলাম আমরা। পেয়ে গেছি।

.

আঙ্কেল জ্যাক, টেলিফোনে বলল রবিন, শুনলে তুমি বিশ্বাস করবে না।
রিসিভারে ভেসে এল আঙ্কেল জ্যাকের বিমল হাসি। কি বিশ্বাস করব না?
অংক পরীক্ষায় আমরা সাংঘাতিক ভাল করে ফেলেছি, উত্তেজিত কণ্ঠে জানাল রবিন। যে ওষুধটা তুমি আমাদের দিয়েছিলে, কাজ করেছে ওটা।
জোরে জোরে হাসলেন আঙ্কেল। আমার কি মনে হচ্ছে জানিস? ওষুধে আসলে কিছু হয়নি। হয়েছে তোদের মনোযোগ দিয়ে পড়ালেখার কারণে।
রবিনের দুই পাশে দাঁড়ানো মুসা আর কিশোর। টেলিফোনে কি বলছেন আঙ্কেল শোনার জন্যে রিসিভারের কাছে ঝুঁকে এল দুজনে।
রবিনের কাছ থেকে রিসিভারটা কেড়ে নিয়ে কিশোর বলল, উঁহু, পড়ালেখার জন্যে কিছু হয়নি। আপনার ওষুধই আমাদেরকে বুদ্ধিমান বানিয়ে ছেড়েছে। নিশ্চিন্তে আপনি এটাকে বোতলজাত করে বাজারে ছাড়তে পারেন। দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ধনী হয়ে যাবেন।
হু, সে-রকম ওষুধ ছাড়তে পারলে সত্যিই হব।...তরে তোমাদের উপকার হয়েছে শুনে খুশি হলাম, আঙ্কেল জ্যাক জবাব দিলেন। কিন্তু তাই বলে পড়ালেখা যেন আবার বন্ধ করে দিও না। পরীক্ষায় ভাল করার জন্যে ওটাই হলো সবচেয়ে জরুরী।
আরও কিছুক্ষণ উত্তেজিত তিন কিশোরের সঙ্গে কথা বলে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন আঙ্কেল জ্যাক। স্ত্রীর দিকে ফিরলেন।
অংক পরীক্ষায় অসাধারণ ভাল করে ফেলেছে ওরা, হাসতে হাসতে বললেন তিনি। আত্মবিশ্বাস মানুষকে কোথায় নিয়ে যায় এই ঘটনাটাই তার প্রমাণ। আমি দিলাম ওদেরকে আঙুরের রস, আর ওরা ভাবছে...! হাহ হাহ হা!

.

পরদিন স্কুল বাসে চড়ার আগে দুই সহকারীকে বলল কিশোর, সাবধান, আমরা যে বদলে গেছি এটা যাতে কেউ বুঝতে না পারে। বুঝতে দেয়া ঠিক হবে না।
কিন্তু রবিন সামলে নিলেও মুসা সামলাতে পারল না। বুদ্ধিমান হয়ে গিয়ে তার আচার-আচরণই পাল্টে গেছে।
গাড়িতে সীটে বসে নিত্যদিনকার মতই নিউ ইয়র্ক টাইমস ক্রসওয়ার্ড পাজলের সমাধান করছে ওরা। আজ ওদের পাশের সীটে বসেছে মুসা। ইচ্ছে করেই। জানে,

সে, রবিন কিংবা কিশোর যে-ই ওদের পাশে বসুক না কেন, সমস্যায় ফেলে মজা করতে চাইবে। রোজই তাই করে। ওরা যে ভাল ছাত্র, সেটা যে কোন ভাবেই হোক জাহিরের চেষ্টা করে।
অপেক্ষা করতে লাগল মুসা।
বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। ফিরে তাকাল রয়। জিজ্ঞেস করল, এই, বলো তো চার অক্ষরের একটা গাধার নাম, যেটার প্রথম অক্ষর এম দিয়ে শুরু।
হেসে উঠল পাশে বসা শারিয়া। টেরিয়ার ডয়েল সহ আরও অনেক ছেলেমেয়েই হেসে উঠল।
আজ রয়কেই গাধা মনে হচ্ছে মুসার। রোজ একই রকম প্রশ্ন করে। নতুনত্ব নেই।
কোন রকম জড়তা কিংবা আড়ষ্টতা না রেখে শান্তকুণ্ঠে জবাব দিল মুসা, চার অক্ষরের পারব না, তবে তিন অক্ষরের গাধার নাম বলতে পারব। যেটার প্রথম অক্ষর আর দিয়ে শুরু।
মুহূর্তে হাসি মুছে গেল রয়ের। কালো হয়ে গেল মুখ। বাহ, কালটুসটার তো মুখ খুলে গেছে আজ। সেই সঙ্গে একটু যদি বুদ্ধি খুলত।
টান দিয়ে রয়ের হাত থেকে ভাজ করা খবরের কাগজটা কেড়ে নিল মুসা।
আরে আরে কি করছ। চিৎকার করে উঠল শারিয়া! দাও, দাও।
দিল না মুসা। তোমরা যে জিনিসটার সমাধান করতে পারো না, দেখাও আমাকে। বলে দিচ্ছি। নাকি সবই বলে দেব?
বলপেন বের করে কাগজের ওপর লিখতে শুরু করল মুসা। এত দ্রুত, চোখ কপালে উঠে গেল শারিয়া আর রয়ের।
খসখস করে লিখে কাগজটা ফিরিয়ে দিল মুসা। নাও, দেখো এবার।
কাগজের দিকে তাকানোর জন্যে ঝুঁকে এল রয় ও শারিয়া। মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি হয়ে গেল। অস্ফুট একটা চিৎকার বেরিয়ে এল শারিয়ার মুখ থেকে। চোখ বড় বড় করে তাকাল রয়। চোখে অবিশ্বাস। কি করে করলে?
হাসিমুখে কাঁধ ঝাঁকাল মুসা। সহজ। একেবারেই সহজ। অক্ষরজ্ঞান যদি ভাল থাকে তোমার, ক্রসওয়ার্ড পাজল মেলানো কোন ব্যাপারই না।

.

স্কুলে সেদিন ক্লাসে তিন গোয়েন্দাকে অংক পরীক্ষায় বসালেন মিস্টার ক্রেগ। বাকি সবার জন্যে অন্য পড়া।
তিন গোয়েন্দাকে অভয় দিয়ে বললেন, তাড়াহুড়া নেই। ভাবনা-চিন্তা করে সুন্দরমতই জবাব দাও। কোনটা যদি না পারো, ফেলে রাখো, পরে আমার কাছ থেকে জেনে নিও। ঠিক আছে?
প্রশ্নপত্র আর খাতা নিয়ে যার যার ডেস্কে ফিরে এল কিশোর, মুসা ও রবিন।

ডেকে বললেন মিস্টার ক্রেগ, আন্দাজে করলে কিন্তু হবে না। পরে ধরব। কি ভাবে করলে বুঝিয়ে বলতে হবে আমাকে। এগুলো যদি পেরে যাও, আরও কঠিন প্রশ্ন দেয়া হবে। কি, বুঝলে?
মাথা ঝাঁকাল তিনজনেই।
দশ মিনিট পরই মিস্টার ক্রেগের কাছে টেস্ট পেপার নিয়ে হাজির হলো কিশোর। কিছু কিছু সমীকরণ তিন ভাবে করে দেখিয়েছে সে।
সব প্রশ্নের জবাব দিতে রবিনের লাগল বারো মিনিট, মুসার চোদ্দ। ওরাও কিশোরের মত একই কাজ করেছে। মোট কথা যতভাবে করা যায় এই অংকগুলো, সব ভাবেই করেছে।
অবাক হয়ে ওদের দিকে তাকালেন মিস্টার ক্রেগ। খাতার দিকে তাকালেন। কি ব্যাপার? পারছ না? খুব কঠিন মনে হচ্ছে?
করেছি তো, স্যার? শান্তকণ্ঠে জবাব দিল কিশোর।
খাতার দিকে তাকালেন মিস্টার ক্রেগ। প্রথমে দ্রুত দেখলেন ফলগুলো। তারপর ধীরে ধীরে।
আ-আবার তো সেই একই কাণ্ড করেছ। কথা আটকে যেতে শুরু করল মিস্টার ক্রেগের। সবগুলোই তো কারেক্ট। ভাল, ভাল। তারমানে সারারাত বসে পড়াশোনা করেছ তোমরা?
পড়িইনি, স্যার, কোন কিছু না ভেবেই বলে ফেলল মুসা। বইয়ের দিকেই তাকাইনি একবারও। অংক একটা অতি সহজ সাবজেক্ট।

.

স্কুল ছুটির পর রবিনদের বাড়ির পেছনের খোলা জায়গায় বল খেলছে তিনজনে। খেলছে মানে এ ওর কাছে ছুঁড়ে দিয়ে লোফালুফি করছে।
বেশ কয়েক দিন মেঘে ঢাকা থাকার পর মেঘ কেটে গিয়ে বেরিয়ে এসেছে সূর্য। আকাশের ধূসর রঙ আর নেই। বাতাস চমৎকার। বসন্তকালের মত।
স্কুল ছুটি হওয়ার আগেই সমস্ত হোমওঅর্ক করে ফেলেছি আমি, মুসা বলল। রবারের বলটাকে রবিনের দিকে ছুঁড়ে মারল সে।
মিস করল রবিন। ধরতে পারল না। বলটা চলে গেল পাতাবাহারের বেড়ার দিকে। পেছন পেছন দৌড়ে গেল সে।
কিন্তু তোমাকে তো বলেছিলাম সাবধানে থাকতে, কিশোর বলল। আমরা যে বুদ্ধিমান হয়ে গেছি অত তাড়াহুড়া করে জানান দেয়ার কি প্রয়োজন ছিল? আর মিস্টার ক্রেগের অত ভুল ধরারই বা কি দরকার ছিল?
তাই তো, বল নিয়ে ফিরে এসেছে রবিন। যতবার তিনি ভুল করছিলেন, হাত তুলছিল সে।

কিন্তু এত ভুল করতে থাকলে না তুলে কি করব? মুসা বলল। বোর্ডে লিখতে গিয়ে ম্যাসাচুসেটস বানানও তিনি ভুল লিখলেন। বলব না? কাউকে না কাউকে তো ভুলটা ধরিয়ে দিতেই হবে। টিচার বলে কি মাপ?
কিন্তু, মুসা… বলতে গেল কিশোর।
শুনল না মুসা। তার কথা বলে গেল, সিভিল ওঅর কবে শুরু হয়েছে, সালটা পর্যন্ত তিনি ভুল বললেন। শুধরে দেব না?
কিন্তু তোমার বার বার হাত তোলা দেখে কি রকম ভঙ্গি করছিল সবাই খেয়াল করেছ? রবিন বলল। ভাবখানা যেন টিচারের ভুল ধরিয়ে দিয়ে তুমি মস্ত অপরাধ করে ফেলছ। আসলেই তোমার চুপ করে থাকা উচিত ছিল। তোমার ভয়ে শেষে। পড়ানোই বাদ দিয়েছেন তিনি। এ রকম পর্যদস্ত করাটা অবশ্য ঠিক হয়নি তোমার।
কিশোর আর মুসার মুখে ঠিক হয়নি শুনতে শুনতে রাগ হয়ে গেল মুসার। এত জোরে ছুঁড়ে মারল বলটা, আবারও ধরতে পারল না রবিন। দৌড় দিল ঝোঁপের দিকে। বল খুঁজতে ঢুকে পড়ল ঝোঁপের মধ্যে। খানিক পরেই শোনা গেল তার চিৎকার, কিশোর, জলদি এসো।
কি হলো? বলে দৌড় দিল কিশোর। পেছনে ছুটল মুসা।
ওরা দুজনও ঝোপে ঢুকল।
মাটির দিকে দেখাল রবিন, দেখেছ? জুতোর ছাপ।
ঝুঁকে বসে ভালমত দেখে গম্ভীর ভঙ্গিতে মাথা দোলাল কিশোর, হু। তাজা ছাপ। অনেক বড় পা। ঘটনাটা কি? আমাদের ওপর নজর রাখছিল নাকি?
ওই দেখো, মুসা বলল, ওদিক দিয়ে বেরিয়ে গেছে ছাপগুলো।
ছাপ অনুসরণ করে ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল ওরা।
পেছনের উঠান পার হয়ে রবিনদের লিভিং রুমের জানালার কাছে এসে শেষ হয়েছে। মাটিতে গম্ভীর হয়ে বসা ছাপগুলো প্রমাণ করে ওখানে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেছে ছাপের মালিকেরা। উঁকিঝুঁকি মেরেছে ঘরের ভেতর।
আর কোন রকম সূত্র পাওয়া গেল না।
এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর, কিন্তু আমাদের ওপর নজর রাখতে এল কে? এবং কেন?

.

সাতদিন পর।
স্কুলে তার লকারের সামনে দাঁড়িয়ে আছে কিশোর। ব্যাকপ্যাকে জিনিসপত্র ভরছে। স্কুল ছুটি হয়েছে। বাড়ি যাবে।

উল্টোদিকের লকারের সামনে দাঁড়ানো রয়। হাসিমুখে তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করল কিশোর, হাই রয়, দিনকাল কেমন যাচ্ছে?
মাথা ঝাঁকিয়ে দায়সারা জবাব দিল রয়, ভাল।
আমাদের বাড়ি যাবে? কম্পিউটার গেম খেলব।
মুখ বাঁকাল রয়। নাহ।
কেন? এসো না, কি হয়েছে, অনুরোধ করল কিশোর।
কাঁধ ঝাঁকাল রয়। উঁহু। তোমার সঙ্গে পারব না। একটা গেমও জিততে পারব। মগজ অতিরিক্ত খুলে গেছে তোমার, বুদ্ধি বেড়ে গেছে।
কিন্তু…
দড়াম করে লকারের দরজা বন্ধ করে দিয়ে তাড়াহুড়া করে ওখান থেকে সরে গেল রয়।
তাকে ধরতে যাবে কিনা ভাবছে কিশোর, কথা কানে এল। ঘুরে তাকিয়ে দেখে টেরি আর তার দুই দোস্ত টাকি ও কডি। ওপথ দিয়েই যাচ্ছে।
ওদের পথরোধ করল কিশোর। অনুরোধের সুরে বলল, টেরি, কেমন আছো? চলো না আমাদের বাড়িতে। খেলবে।
আঁতকে উঠল টেরি। ওরিব্বাপরে! তোমার সঙ্গে? না বাবা, দৈত্যের সঙ্গে খেলতে আমরা রাজি না। এই টাকি, চল চল!
প্রায় দৌড়ে চলে গেল টেরি আর তার দোস্তরা।
মুখ কালো করে দাঁড়িয়ে রইল কিশোর। এতটাই বুদ্ধিমান হয়ে গেছে ওরা, অস্বাভাবিক মানুষে পরিণত হয়েছে, সবাই এখন ওদের ভয় পায়।
মন খারাপ করে দাঁড়িয়ে আছে কিশোর। এ সময় সেখানে এসে হাজির মুসা আর রবিন। ওদেরও মন খারাপ। মুসার মুখ দেখে মনে হলো কেঁদে ফেলবে।
কি হয়েছে? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
কেউ আমাদের সঙ্গে খেলতে রাজি হয় না, করুণ সুরে মুসা বলল।
যাকে বলি, সেই পালায়, রবিন বলল। সবাই আমাদেরকে বলে ফ্রীক।
কেউ কেউ বলে জিন-ভূতের আসর হয়েছে, কেউ বলে কবরস্থানে গিয়ে প্রেতাত্মা ঢুকিয়েছি মগজে…শুনতে শুনতে আর ভাল লাগে না, মুসা বলল।
অতিরিক্ত বুদ্ধিমান হয়ে যাওয়াটাও যে এতটা বিপজ্জনক, সেটা তো জানতাম না, রবিন বলল।
বিপজ্জনক তো বটেই, প্রচণ্ড দুঃখেরও, মুসা বলল। এরচেয়ে তো বোকা থাকাটাই ভাল ছিল।
না, তা ছিল না, মাথা নাড়ল কিশোর। অস্বাভাবিক থাকাটাই বিপজ্জনক, সেটা বোকাই হোক আর বুদ্ধিমানই হোক। তিনজনেরই বুদ্ধি এখন এক রকম হয়ে

গেছে আমাদের। কারও চেয়ে কেউ কম নই, তাই নিজেরাও আর আগের মত খেলতে পারছি না। কি যে করব বুঝতে পারছি না।
বুদ্ধি দিল রবিন, চলো, আবার আঙ্কেল জ্যাকের কাছে যাই। তাকে গিয়ে বলি, আমাদের স্বাভাবিক বুদ্ধিটা ফিরিয়ে দেয়ার কোন ব্যবস্থা করতে পারেন কিনা।
পারলে তো ভালই হতো... চিন্তিত ভঙ্গিতে ব্যাকপ্যাক পিঠে ফেলল কিশোর।
হলরুম ধরে এক সারিতে এগিয়ে চলল ওরা।
আগে আগে চলছে রবিন।
সামনে দুটো ছায়া পড়েছে হলরুমের মেঝেতে।
ধাক্কা লাগবে ভেবে আচমকা দাঁড়িয়ে গেল রবিন।
তার পিঠের ওপর এসে পড়ল মুসা। কি হলো?
নীরবে হাত তুলে দেখাল রবিন।
একপাশ থেকে বেরিয়ে এল ছায়া দুটো।
বাবা! মা! তোমরা? অবাক হলো রবিন।
ওদের দেখে দাঁড়িয়ে গেলেন মিস্টার ও মিসেস মিলফোর্ড। গম্ভীর থমথমে চেহারা।
পেটের মধ্যে খামচি দিয়ে ধরার মত অনুভূতি হলো রবিনের। কিছু ঘটেনি তো? জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে, মা?
জবাবটা তোমরাই ভাল দিতে পারবে, এক এক করে রবিন, মুসা, ও কিশোরের ওপর দৃষ্টি ঘুরে. এল মিস্টার মিলফোর্ডের। রবিনের ওপর এসে স্থির হলো আবার। মিস্টার ক্রেগ আমাদের ডেকে পাঠিয়েছেন। মুসার মা-বাবা আর কিশোরের চাচা-চাচীকেও ডেকেছেন।
কি করেছ তোমরা? মিসেস মিলফোর্ড জিজ্ঞেস করলেন।
কই, কিছু তো করিনি, জবাব দিল কিশোর।
কিছু করিনি আমরা। রবিন বলল।
এসো আমাদের সঙ্গে। প্রিন্সপ্যাল মিসেস অ্যান্ডারসনের ঘরে যেতে বলা হয়েছে আমাদের।
মিসেস অ্যান্ডারসন? ভুরু কুঁচকাল মুসা। তার ওখানে যাব কেন? কোন অপরাধ তো করিনি আমরা। হচ্ছেটা কি?
ইচ্ছে না থাকলেও যেতে হলো। দশ সেকেন্ড পর পিন্সপ্যালের অফিসের সামনের ঘরে ঢুকল ওরা। সামনের ঘরটা খালি। চারটে প্রায় বাজে। কর্মচারীদের সবার ছুটি হয়ে গেছে। বাড়ি চলে গেছে সেক্রেটারিরা।
পেছনের ঘর, অর্থাৎ মিসেস অ্যান্ডারসনের অফিসের দরজার দিকে এগোল সবাই। ঢোকার আগেই দরজায় বেরিয়ে এলেন তিনি। স্বাগত জানালেন ওদের।

ডেকে ঘরে নিয়ে গেলেন। সেখানে ঘরের মাঝখানে একটা লম্বা টেবিলের সামনে বসা দেখা গেল কিশোরের চাচা-চাচী আর মুসার বাবা-মাকে। টেবিলের একধারে বসা মিস্টার ক্রেগ।:আরও একজন লোক আছেন সেখানে, মিস্টার বেলসন। স্কুল। পরিচালকদের সভাপতি। সবাই গম্ভীর।
মিসেস অ্যান্ডারসন এমনিতে হাসিখুশি, আন্তরিক, সবার সঙ্গেই উষ্ণ ব্যবহার করেন। কিন্তু এখন তিনিও গম্ভীর। রবিনের বাবা-মাকেও বসতে অনুরোধ করলেন তিনি।
শীতল দৃষ্টিতে তিন গোয়েন্দার দিকে তাকালেন মিস্টার বেলসন। ফ্যাকাসে চামড়া, চকচকে টাক, কঠোর চেহারা। ধূসর সুট আর সরু নীল টাই পরেছেন। যতবার দেখেছে তাকে গোয়েন্দারা, এই একই পোশাকে। এগুলো ছাড়া যেন আর কোন কাপড় নেই তার।
বাইরের ঘর আর অফিসের মাঝের দরজাটা লাগিয়ে দিয়ে এলেন মিসেস অ্যান্ডারসন। ঘুরে গিয়ে বসলেন নিজের চেয়ারে। নিজের দুই হাতের দিকে তাকালেন। মুখ তুললেন। আসার জন্যে ধন্যবাদ দিলেন সবাইকে। ভঙ্গি দেখেই বুঝতে পারছে কিশোর, অস্বস্তিতে ভুগছেন মিসেস অ্যান্ডারসন।
কি ভাবে কথাটা শুরু করব ঠিক বুঝতে পারছি না, অবশেষে শুরু করলেন তিনি। অদ্ভুত এক সমস্যায় পড়ে গেছি আমরা।

.

সমস্যা! মিসেস মিলফোর্ড বললেন। কুটি করলেন ছেলেদের দিকে তাকিয়ে।
গোয়েন্দাগিরি করতে গিয়ে কোন রকম অঘটন ঘটিয়েছে নাকি ওরা? জানতে চাইলেন মেরিচাচী।
আবার নিজের দুই হাতের দিকে তাকালেন মিসেস অ্যান্ডারসুন। হাত দুটো টেবিলের ওপর ফেলে রেখে মুখ তুললেন। না, কোন ধরনের অঘটন ওরা ঘটায়নি। কোন অপরাধ কিংবা অন্যায়ও করেনি। সমস্যাটা অন্য রকম।
কিশোর, মুসা, রবিনের মুখের ওপর থেকে ঘুরে এল মিসেস অ্যান্ডারসনের দৃষ্টি। আবারও বলছি, কি ভাবে কথাটা শুরু করব আমি বুঝতে পারছি না। কিন্তু না। বললেও চলছে না।
সোয়েটারের আস্তিনে বেরিয়ে থাকা একটা সুতো টেনে ঘেঁড়ার চেষ্টা করলেন মিস্টার ক্রেগ।
কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করলেন মিস্টার বেলসন। নড়েচড়ে বসলেন চেয়ারে।
স্কুলের সবাইকে ঘাবড়ে দিচ্ছে কিশোর, মুসা ও রবিন, অবশেষে কথাটা যেন ছুঁড়ে দিলেন মিসেস অ্যান্ডারসন। শুধু তাই না, টিচারদেরকেও ওরা ভয় পাইয়ে দিয়েছে।

কিন্তু, আমরা… বলতে গেল কিশোর।

হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিলেন মিসেস অ্যান্ডারসন। তিন গোয়েন্দার অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে বললেন, মহাবুদ্ধিমান হয়ে গেছে আপনাদের ছেলেগুলো। আগে কেন বুঝতে পারিনি সেটাও এক রহস্য। তবে গত হপ্তা দুয়েক ধরে যা ঘটছে, তাতে আর কোন সন্দেহ নেই আমাদের।

মহাবুদ্ধিমান? চোয়াল ডললেন রাশেদ পাশা। চোখ তুলে তাকালেন তিন গোয়েন্দার দিকে। মহা না হোক, তবে ওরা যে আর দশটা সাধারণ ছেলের চেয়ে বুদ্ধিমান সেটা আমরা অনেক আগে থেকেই জানি।

সেটা তো আমরাও জানতাম, মিসেস অ্যান্ডারসন বললেন। কিন্তু গত কিছুদিন ধরে অদ্ভুত কাণ্ড করে বেড়াচ্ছে ওরা। কিছুদিন এতটাই বোকা হয়ে রইল, যে ক্লাস পরীক্ষার সমস্ত টেস্টে ফেল করতে থাকল। আচার-আচরণে বোকামির চূড়ান্ত। কিন্তু গত দিন পনেরো ধরে হয়েছে উল্টোটা বুদ্ধিমত্তার চূড়ান্ত।

কিন্তু বুদ্ধিমত্তার মধ্যে খারাপটা কি দেখলেন, তা তো বুঝতে পারছি না, না বলে আর পারলেন না মুসার আম্মা মিসেস আমান।

তা ঠিক, মাথা ঝাঁকালেন মিসেস অ্যান্ডারসন। খারাপ কিছু নেই। প্রতিটি পরীক্ষায় একশোতে একশো নাম্বার পায় ওরা। ক্লাসের যত বই আছে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আগাগোড়া মুখস্থ। বইয়ের পর বই, বইয়ের পর বই পড়ে শেষ করে ফেলে ওরা, একটা অক্ষরও ভোলে না সেগুলোর। যে কোন বিষয়ের ওপর রচনা লিখতে দিলেও, যত কঠিন সাবজেক্টই হোক, বিশ-তিরিশ পৃষ্ঠার রচনা লিখে ফেলে অনায়াসে।

এটা তো দারুণ খবর! হাসলেন মেরিচাচী। সাংঘাতিক। তারমানে গোয়েন্দাগিরির ভূত গেছে মাথা থেকে। আজকাল পড়াশোনার প্রতি বেশি মনোযোগী হয়েছে।

ঠিকই বলেছেন, এটা দারুণ খবরই, মোলায়েম স্বরে মিসেস অ্যান্ডারসন বললেন। সাংঘাতিক। কিন্তু মোটেও ভাল অর্থে নয়। বুদ্ধি এত বেশি বেড়ে গেছে, ক্লাসে সারাক্ষণ টিচারদের ভুল শুধরে দিতে থাকে। পাঠ্যবইতে ভুল খুঁজে পায়। ওদের কাণ্ড-কারখানায় ওদেরকে রীতিমত ভয় পায় এখন সহপাঠীরা। তারা জানে, কোন প্রতিযোগিতাতেই আপনাদের ছেলেদের সঙ্গে পারবে না ওরা। ওদের ধারণা, অস্বাভাবিক…মানে, অলৌকিক কোন ব্যাপার ঘটছে কিশোর, মুসা আর রবিনকে ঘিরে।

না না, খারাপ কিছু ঘটাচ্ছে না ওরা, মেরিচাচীকে কথা বলার জন্যে মুখ খুলতে দেখে তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন মিস্টার ক্রেগ। ঝুঁকে এসেছেন সামনের দিকে। খুবই ভাল ছেলে ওরা। আসলে, যা করছে তার ওপর ওদের কোন হাত নেই। অনেক বেশি জানে ওরা। অনেক, অনেক বেশি। এই বয়েসের ছেলেদের তুলনায়

সীমাহীন জ্ঞান ওদের, অস্বাভাবিক জ্ঞান। যেটা সত্যিই বিপজ্জনক, বুঝতেই পারছেন। স্কুলের পরিবেশের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে ওরা।
আমি লক্ষ করেছি, মিস্টার বেলসন বললেন, ছেলেমেয়েরা এখন আর ওদের সঙ্গে খেলতে চায় না, কথা বলতে চায় না, দূরে দূরে থাকে, সব সময় এড়িয়ে থাকার চেষ্টা করে। স্কুলের পরিবেশের জন্যে মোটেও সেটা ভাল কিছু নয়, বুঝতেই পারছেন।
ঘরের সবগুলো চোখ এখন ওদের দিকে, দেখতে পাচ্ছে কিশোর। দুরুদুরু করছে বুকের মধ্যে। তার মনে হচ্ছে ঘটনাটা বাস্তবে ঘটছে না। যেন স্বপ্নের মধ্যে রয়েছে ওরা। অতিরিক্ত বুদ্ধিমান হয়ে যাওয়াটা যে এতখানি বিপজ্জনক কল্পনাই করতে পারেনি কোনদিন।
তারমানে আর সবার কাছ থেকে আলাদা হয়ে গেছে ওরা। আলাদা করে ফেলা হচ্ছে ওদেরকে। ভবিষ্যতে আরও কি ঘটতে পারে কল্পনা করে মেরুদণ্ড বেয়ে নেমে গেল শীতল শিহরণ।
তারমানে কোন ধরনের ফ্রিকে পরিণত হয়েছি আমি? মনে মনে নিজেকে প্রশ্ন করল সে।
আমার কোন বন্ধু থাকবে না। সবাই আমাকে ঘৃণা করবে।
টিচাররাও আমাকে ঘৃণা করতে শুরু করেছে, কারণ আমি ওদের ভুল ধরে দিই।
তাহলে কি ঘটবে আমার?
দুই সহকারীর দিকে তাকাল সে। মুসা আর রবিন-ওরাও আর তার সহকারী থাকতে চাইবে না। কারণ ওদের মগজও তার মত একই রকম বুদ্ধিমান হয়ে গেছে।
মাথা নিচু করে আছে মুসা।
নিজের নখ খুঁটছে রবিন।
দুজনেই ভয় পেয়েছে। প্রচণ্ড ভয়।
চুপ করে আছো কেন? মিসেস অ্যান্ডারসন বললেন। কিছু বলো তোমরা।
আচমকা বলে উঠল রবিন, কি বলব? এর কোন ব্যাখ্যা আমরা দিতে পারব না।
একটা জিনিস হতে পারে… বলতে গেল মুসা।
খপ করে তার হাত চেপে ধরল কিশোর, না না, মুসা, বোলো না। আঙ্কেল জ্যাককে আমরা কথা দিয়েছি কারও কাছে ফাস করব না।
কিন্তু না বললে দেখছ না কি রকম বিপদে পড়ে যাচ্ছি? রবিন বলল। না বলে পারা যাবে না।
কি না বলে পারা যাবে না? ধমকের সুরে বললেন রবিনের মা। আমার ভাই কি করেছে? বলো, জলদি! না বললে আমিই ওকে জিজ্ঞেস করছি। ফোনের দিকে

হাত বাড়ালেন তিনি।
মগজ উন্নত করার ওষুধ খাইয়ে দিয়েছে আমাদেরকে, বলে ফেলল রবিন।
রবিন, থামো! চিৎকার করে উঠল কিশোর।
কিন্তু যা বলার বলে ফেলেছে রবিন। আর গোপন রাখা যাবে না। সুতরাং বাকিটাও বলে ফেলল রবিন, আমাদেরকে এক বোতল মগজ উন্নত করার ওষুধ দিয়েছিল আঙ্কেল জ্যাকবুদ্ধি বাড়ানোর জন্যে। হঠাৎ করে কেন জানি বোকা হয়ে গিয়েছিলাম আমরা। তার কাছে গিয়ে সব বুলোম। বুদ্ধি বাড়ানোর ওষুধ নিয়ে গবেষণা করছে আঙ্কেল জ্যাক, আমাদের কাকুতি-মিনতি শুনে একটা বোতল দিয়ে দিয়েছিল, তিনজনে ভাগ করে খাওয়ার জন্যে। এবং তাতে কাজ হয়ে গেছে। ওষুধ আমাদের বুদ্ধি বাড়িয়ে দিয়েছে।
কিন্তু এত বোকাই বা হয়ে গিয়েছিলে কেন, হঠাৎ করে? মেরিচাচী প্রশ্ন করলেন।
টিচারদের দিকে তাকালেন। বোকা যে হয়ে গিয়েছিল, সেটা আমিও লক্ষ করেছি।
মিস্টার আমান বললেন, আমিও।
তাহলেই তো বোঝা যাচ্ছে, মিস্টার ক্রেগ বললেন, একটা পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল ওদের।
একটা নয়, দুটো, দুই আঙুল তুললেন মিস্টার মিলফোর্ড। একবার অতিরিক্ত বোকা হয়ে যাওয়া, একবার অতিরিক্ত বুদ্ধিমান। কিশোরের দিকে তাকালেন তিনি। চালাকটা কি করে হলে, তা তো বুঝলাম। কিন্তু বোকা হলে কি করে?
মাথা নাড়ল কিশোর, জানি না!
চুপ হয়ে গেল সবাই।
ঘরে পিনপতন নীরবতা।
দীর্ঘক্ষণ পর জোরে নিঃশ্বাস ফেলে নীরবতা ভাঙলেন মিসেস অ্যান্ডারসন। কোন ধরনের জাদু-করা-ফরমুলা এ রকম বুদ্ধিমান বানিয়েছে তোমাদেরকে আমি জানি না, তিন গোয়েন্দাকে বললেন তিনি। তবে একটা কথা জানি। এ স্কুল তোমাদেরকে ছাড়তে হবে। আর তোমাদেরকে এখানে রাখা সম্ভব হবে না আমাদের পক্ষে।
আরও কিছুদিন পর।
কিশোরদের লিভিং রুমে বসে আছে তিন গোয়েন্দা। টিভি দেখছে।
...এই তিনটে ছেলে স্কুল বোর্ডের সঙ্গে আইনী লড়াই লড়ছে এখন, রিপোর্টার বলছে। প্রশ্ন উঠেছে, শিক্ষার জন্যে ওদের কি আর স্কুলে পড়ার দরকার আছে? স্কুল বলছে, নেই। ওদের অভিভাবকেরা বলছে, আছে। সুতরাং লড়াইটা চলছেই...

পাশের ঘরে ফোনে কথা বলছেন মেরিচাচী। তার এক বান্ধবীর সঙ্গে। না, আমাদের উকিল বলছে, জিতটা আমাদেরই হবে।...না না...নিশ্চয় নিশ্চয়... অন্য স্কুলের খোঁজেও রয়েছি আমরা। একটা প্রাইভেট স্কুলের সঙ্গে কথাও বলেছি। নিতে রাজি হয়েছে ওরা।...কি বললেন?...ও, আঙ্কেল জ্যাক। তিনি তো নেই এখন এখানে। সুইডেন চলে গেছেন একটা বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে যোগ দিতে। তার স্ত্রীও গেছেন সঙ্গে।...নাহ, কোনভাবেই তার সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হচ্ছে না।

সামনের দরজার বেল বাজল।

খুলতে যাওয়ার জন্যে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েও বসে পড়ল কিশোর।

নিশ্চয় আরেকজন সাংবাদিক। একই প্রশ্ন করতে থাকবে। গত কয়েক দিনে কম করে হলেও ডজনখানেক সাক্ষাৎকার দিয়েছে ওরা।

আগে ভাবত রেডিও-টেলিভিশনে সাক্ষাৎকার দেয়াটা মজার ব্যাপার। কিন্তু এখন আর মজা নেই। লোকে যখন ওদেরকে ফ্রীক ভাবতে আরম্ভ করেছে। স্কুল থেকেও যখন বাড়িতে বসে থাকতে হচ্ছে, স্কুলে যেতে দেয়া হচ্ছে না ওদেরকে। তা ছাড়া.কে দেখবে এখন ওদের অনুষ্ঠান? কেউ তো ওদের পছন্দ করে না।

ওই ওষুধ আমাদের জীবনটাকেই ধ্বংস করে দিয়েছে, ভেবে মনটা তেতো হয়ে গেল কিশোরের।

সোফা থেকে উঠে এসে দাঁড়াল দরজার কাছে। টেলিফোনে মেরিচাচী কি বলছেন ভাল করে শোনার জন্যে। এখন আর রবিনের আম্মার সঙ্গে নয়, একটা টিভি কোম্পানিকে ধমকাচ্ছেন তিনি, না, কোনমতেই যাবে না। ওই মগজ উন্নত করার ওষুধে কোন আগ্রহ নেই আমাদের।...বুঝলাম আপনাদের কোম্পানি খুব ভাল ফলের রস বানায়, কিন্তু আমার ছেলে আপনাদের বিজ্ঞাপন করতে যাবে না। সরি।

আস্তে করে সরে চলে এল কিশোর। আবার আগের জায়গায় এসে বসল। কানে আসছে মেরিচাচীর রাগত কণ্ঠ।

কার সঙ্গে কথা বলছেন? রবিন জিজ্ঞেস করল।

টেলিভিশন। আমাদের দিয়ে বিজ্ঞাপন করাতে চাইছে, বিষণ্ন কণ্ঠে বলল কিশোর।

আগের দিনের কথা মনে পড়ল রবিনের। একটা লোক এসে বলল ওদের এজেন্ট হতে চায়। সাংঘাতিক এক পরিকল্পনা নিয়ে এসেছে সে। ওদেরকে ব্যবহার করে জুতো, ক্যান্ডি, সুগার কনের বিজ্ঞাপন করতে চায়। টেলিভিশনে শনিবার। সকালের কমিক শোতেও ওদের দিয়ে অভিনয় করাতে ইচ্ছুক। তাতে, তার ধারণা কোটি কোটি ডলার আয় হয়ে যাবে খুব সহজেই।

ভালই তো, রাজি হয়ে যাচ্ছিল মুসা। কোটিপতি হয়ে যাব আমরা। বিখ্যাত হয়ে যাব।
হু, তা তো বটেই, মুখ বাঁকিয়েছে কিশোর, বিখ্যাত ফ্রীক। অস্বাভাবিক মানুষ। সবাই আমাদেরকে আঙুল তুলে দেখাবে। আমাদের নিয়ে রসিকতা করবে। কোনদিন যদি স্বাভাবিক হইও আবার, মানুষ আর আমাদেরকে স্বাভাবিক ভাবে নেবে না।
করুণ কণ্ঠে রবিন বলেছে, টাকা-পয়সা খ্যাতি কিছুই চাই না আমি। আমি শুধু স্বাভাবিক মানুষ হয়ে স্কুলে ফিরে যেতে চাই। সবার সঙ্গে স্বাভাবিক মানুষের মত মিশতে চাই।
পরিবারের লোকজন চাইছে ওরা অপেক্ষা করুক। সাবধান থাকুক। হুট করে কোন কিছুতে সই করে না দিক। অন্তত স্কুলে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে আইনী লড়াইটার একটা কিনারা না হওয়া পর্যন্ত।
কিন্তু তাই বলে যে তোক আসা বন্ধ হচ্ছে তা না। নানা ধরনের লোক। খবরের কাগজ, বিজ্ঞাপন এজেন্ট, দোকানদার তো আছেই, প্রচুর ছেলেমেয়েরাও আসছে ওদের কাছে পড়ার জন্যে। আরেক দল আসছে ওদের পরামর্শ নিতে। কোন না কোন সমস্যায় পড়েছে ওরা। কি করলে সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে, সেটা জানতে।
তারপর, সেদিন বিকেলেরই ঘটনা। পেছনের আঙিনায় খেলছে কিশোর, রবিন আর মুসা। ওদের সঙ্গে ডন। এই সময় ড্রাইভওয়েতে ঢুকল একটা কালো রঙের ট্রাক। ফ্রিসবি খেলছিল ওরা। খেলা থামিয়ে ফিরে তাকাল। লম্বা, গাঢ় রঙের সুট পরা দুজন লোককে সদর দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে দেখল।
খেলা বাদ দিয়ে সেদিকে রওনা হলো ওরা। লোকগুলো কেন এসেছে দেখতে।
ততক্ষণে দরজা খুলে দিয়েছেন মেরিচাচী। ঘরে ঢুকেছে লোকগুলো।
মিসেস পাশা, একটা লোককে বলতে শুনল, আপনার স্বামীর সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই আমরা। এখান থেকে যাব মিস্টার মিলফোর্ড আর মিস্টার আমানের বাড়িতে। একটা টেস্টের ব্যাপারে কথা বলতে এসেছি।
টেস্ট? বুঝতে পারলেন না মেরিচাচী। কুটি করলেন।
হ্যাঁ, জবাব দিল লোকটা। ইউনিভার্সিটি রিসার্চ ল্যাব থেকে এসেছি আমরা। আপনাদের ছেলেদের আমরা ল্যাবরেটরিতে নিয়ে যেতে চাই। ওদেরকে নিয়ে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করব। এই যেমন ইনটেলিজেন্স টেস্ট। বেশ কিছু টেস্ট করব আমরা।
ঘরে ঢুকেছে তিন গোয়েন্দা। ওদের দিকে ফিরে তাকাল অন্য লোকটা। আমরা দেখতে চাই কতখানি বুদ্ধিমান তোমরা। হয়তো সরকারের কাছেও তোমরা

মূল্যবান হয়ে উঠবে। দেশের জন্যে নিশ্চয় কাজ করতে চাও তোমরা, চাও না?
জবাব দিল না ওরা। নির্বাক হয়ে তাকিয়ে রইল গম্ভীর চেহারার লোকটার দিকে।
দেশের জন্যে কাজ তো সবাই করতে চায়, ওদের হয়ে জবাব দিলেন মেরিচাচী।
মাত্র কয়েক ঘন্টার জন্যে ওদেরকে চাই আমরা, প্রথম লোকটা বলল। প্রথমে ওদের লিখিত পরীক্ষা নেব আমরা। তারপর ডাক্তারদের সঙ্গে ওদের ইন্টারভিউ। এবং, তারপর অবশ্যই সার্জারি।
সার্জারি? তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল মেরিচাচীর কণ্ঠ।
হা। ওদের মগজ থেকে কিছু কোষের নমুনা নিতে চান ডাক্তাররা।
.
আর শোনার অপেক্ষা করল না মুসা। চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল ওরা। খোলা দরজা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল। ওর ভয়টা সংক্রমিত হলো রবিন আর কিশোরের মাঝেও।
দুড়দাড় করে সামনের সিঁড়ি দিয়ে নেমে বেড়ার দিকে দৌড় দিল তিনজনে।
পেছন পেছন চিৎকার করতে করতে ছুটল ডন, আরে দাঁড়াও দাঁড়াও। মুসাভাই, তোমার ফ্রিসবিটা নেবে না?
ফিরেও তাকাল না ওরা। ছুটতেই থাকল। পাতাবাহারের বেড়ার একটা ফোকরে মাথা ঢুকিয়ে দিয়ে মুচড়ে মুচড়ে বেরিয়ে চলে এল অন্যপাশে। থামল না। দৌড়াতেই থাকল।
পড়শীদের বাড়ি পেরোল। মোড় নিয়ে ছুটল আরেক দিকে। পেছনে জুতোর শব্দ। ডাকতে ডাকতে আসছে সেই দুজন লোক। সামনে আরেকটা বাড়ি। পাতাবাহারের পুরু বেড়ার ওপাশে ঘন ঝোপ। সোজা তার মধ্যে গিয়ে ডাইভ দিয়ে পড়ল মুসা। রবিন আর কিশোরও ঢুকল ওর পেছন পেছন।
কিন্তু এখানেও নিরাপদ নয় বুঝতে পেরে লাফিয়ে উঠে আবার দিল দৌড়। বাড়ির আঙিনা পার হয়ে বেরিয়ে এল একটা সরু গলিতে। ছুটল সেটা ধরে। মেইন রোডের দিকে।
মেইন রোডে ওঠার আগে আবার মোড় নিল। গোটা ছয়েক ব্লক পেরোনোর পর দম নেয়ার জন্যে থামল। ফোঁস ফোঁস করে হাঁপাচ্ছে। হাপরের মত ওঠানামা করছে বুক। হাটুতে ভর দিয়ে বাঁকা হয়ে হাপাতে লাগল কিশোর। বসে পড়ল রবিন। মুসা কোমরে হাত দিয়ে হাঁপাচ্ছে।
ব্যাটারা আসছে নাকি? হাঁপানোর ফাঁকে কোনমতে বলল রবিন।
ফিরে তাকাল মুসা। না। দেখতে তো পাচ্ছি না। সামনের দিকে তাকাতেই চোখে পড়ল পরিচিত একটা বাড়ি। আরে, রয়দের বাড়ির কাছে চলে এসেছি।

কোন রকম দ্বিধা না করে বাড়িটার দিকে দৌড় দিল ওরা। একছুটে ঢুকে পড়ল পেছনের আঙিনায়। পেছনের একটা জানালায় এসে থাবা দিতে দিতে চিৎকার করে ডাকল মুসা, এই, বাড়ি আছো? রয়?
কয়েক সেকেন্ড পর দরজা খুলে দিল রয়। তিন গোয়েন্দাকে দেখে চোখ বড় বড় হয়ে গেল। তোমরা?
হ্যাঁ, রয়, হাঁপানো বন্ধ হচ্ছে না মুসার। না জিরালে আর হবে কি করে। ভেতরে আসতে পারি? তাড়া খেয়ে পালিয়ে এসেছি আমরা।
আঁ! হ্যাঁ, এসো না, এসো। সরে ঢোকার জায়গা করে দিল রয়। রান্নাঘরে নিয়ে এলো কিশোরদেরকে। সেখানে শারিয়া আর ইমাকে বসে থাকতে দেখা গেল। টেবিলে বইখাতা ছড়ানো। তিন গোয়েন্দাকে দেখে ওরাও অবাক।
দরজাটা লাগিয়ে দাও, রয়কে অনুরোধ করল কিশোর।
ঘটনাটা কি? রয় জিজ্ঞেস করল।
শ্রাগ করল কিশোর। শার্টের বোতাম খুলে দিল। ঘেমে নেয়ে গেছে। কপাল বেয়ে ঘাম ঝরছে।
আমরা পালিয়ে এসেছি, কিশোর বলল। আর কোন উপায় না দেখে শেষে তোমাদের বাড়িটায় ঢুকে পড়েছি।
টেবিলের কাছে এগিয়ে গেল সে। বইখাতাগুলোর দিকে তাকাল। কি করছ? স্কুলের পড়া?
একটা মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল শারিয়া। তারপর জবাব দিল, ইতিহাস পড়ছি। ভীষণ কঠিন। মনে হচ্ছে সারা সেমিস্টার, ধরে পড়েও শেষ করতে পারব না।
মুখ থেকে বের করে গোলাপী রঙের একটা বাবলগামের বেলুন বানাল ইমা। এক মুহূর্ত ঠোঁটে আটকে রেখে আবার ভেতরে ঢুকিয়ে ফেলল। তোমরা কি স্কুলে ফেরত যাচ্ছ?
যেতে পারি, কিশোর বলল। জানি না এখনও।
আবার এক মুহূর্তের নীরবতা। কিশোরদেরকে তার বাড়িতে দেখে ভ্যাবাচ্যাকা এগোতে যাবে, হঠাৎ পাশের একটা ঝোপ থেকে বেরিয়ে ওদের সামনে এসে দাঁড়াল মাজুল আর গাজুল।

.

হাঁ করে তাকিয়ে আছে তিন গোয়েন্দা। বুঝতে পারছে না এই দুজন আবার কারা। অন্য কোন ব্রেন রিসার্চ ইনস্টিটিউটের লোক না তো? এরা আবার মগজের কোন অংশটা চায়?
পায়ে পায়ে এগিয়ে আসতে শুরু করল লোকগুলো। ভঙ্গিটা কেমন যান্ত্রিক। ধীরে ধীরে পা ফেলছে। একতালে। একসঙ্গে।

কিশোরের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সজাগ করে দিল ওকে। বলে দিতে লাগল, লোকগুলো বিপজ্জনক।
সামনে এসে দাঁড়াল গাজুল আর মাজুল।
কে আপনারা? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
তোমাদের নতুন প্রভুর চর, দুজনের মধ্যে লম্বা লোকটা, গাজুল বলল।
আমাদের মনিবের সেবা করার জন্যে নিয়ে যাব তোমাদেরকে, মাজুল বলল। গোলাম বানাব তোমাদের।
গোলাম! লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। কারা ওরা? এ প্রশ্নের জবাব তার অতি বুদ্ধিমান মগজও দিতে পারছে না। রসিকতা করছেন, তাই না?
আমরা রসিকতা করি না, শীতল কণ্ঠে জবাব দিল গাজুল।
অন্য কোন গ্রহ থেকে এসেছেন নাকি আপনারা? মুসা জিজ্ঞেস করল ভয়ে ভয়ে। কণ্ঠস্বর অমন কেন? কেমন যান্ত্রিক। সিনেমায় দেখা রোবটগুলোর মত।
না, আমরা ভিনগ্রহবাসী নই, এই পৃথিবীরই মানুষ। তোমাদের কথাবার্তাই তো বরং আমাদের কাছে বিশ্রী লাগছে। কেমন আদিম আদিম। তোমাদের শোধরাতে সময় লাগবে। তবে শোধরাতে পারব। একবার আমাদের ঘাঁটিতে নিয়ে নিই। তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে।
লোকগুলো রসিকতা করছে না, বুঝতে পারল কিশোর। পালানোর তাগিদ অনুভব করল।
আচমকা নড়ে উঠল সে। রবিনের হাত ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে চিৎকার করে বলল, মুসা, পালাও।
তিনজন তিন দিকে দৌড় মারল ওরা। প্রাণপণে ছুটতে লাগল।
কিছুদূর এসে পেছনে পায়ের শব্দ না শুনে ফিরে তাকাল মুসা।
কিশোর, ওরা আসছে না।
ফিরে তাকাল কিশোর আর রবিন।
আগের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে লোকগুলো। চেহারাতেও তেমন কোন ভাবান্তর নেই। রাগ, হতাশা, ক্ষোভ, কোন কিছু নেই। নির্বিকার। ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে ওরা যেন জানে কোনমতেই পালাতে পারবে না তিন গোয়েন্দা। ধরা পড়বেই।
দীর্ঘ একটা মুহূর্ত স্থির তাকিয়ে থেকে ঘুরে দাঁড়াল আবার কিশোর। হাঁটতে শুরু করল।
কোথায় যাবে? রবিনের প্রশ্ন।
বাড়িতে।
কিন্তু লোকগুলো? রসিকতা করছিল?

না। আমাদেরকে ধরার নতুন কোন ফন্দি আঁটছে ওরা। বুঝতে পারছি না কি করবে।

.

স্যালভিজ ইয়ার্ডের পেছনের গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকল ওরা।

সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল মেরিচাচীকে।

গাড়ির চাবি হাতে গ্যারেজের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন রাশেদ পাশা।

নেমে এলেন মেরিচাচী। কিশোরের সামনে দাঁড়ালেন। এত দেরি করলি কেন?

আবার দুটো লোক আমাদের ধরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল, জবাব দিল কিশোর।

কারা ওরা?

কি জানি। অদ্ভুত নাম, গাজুল আর মাজুল। বলল ওদের মনিবের জন্যে আমাদের নিয়ে যেতে চায় ওরা। গোলাম বানাবে।

চট করে রাশেদ পাশার দিকে তাকালেন মেরিচাচী। কি কাণ্ডই না শুরু হলো। যন্ত্রণা! এর একটা বিহিত করা দরকার। পুলিশে ডায়ারি করাব নাকি? কি বলো?

দেখা যাক, চিন্তিত ভঙ্গিতে গাল চুলকালেন রাশেদ পাশা। আগে স্কুলের সমস্যাটার একটা ফয়সালা করে আসি। কিশোর, তোরা ভেতরে যা। আমরা না আসা পর্যন্ত ঘর থেকে বেরোবি না। কাউকে ঢুকতে দিবি না। কারও সঙ্গে কথা বলবি না। যে-ই আসে আসুক।

পেছনের দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকল তিনজনে।

চকলেটের গন্ধ আসছে।

খিদেটা চাগিয়ে উঠল মুসার। নিশ্চয় কেক বানাচ্ছিলেন আন্টি। দেখো তো, কোথায় আছে?

এই যে, এখানে, কাউন্টারের ওপাশ থেকে জবাব এল। মাথা তুলল ডন। একটা ট্রে বের করে কাউন্টারের ওপরে রাখল। তাতে ইয়া বড় এক কেক। এক টুকরো কেটে নিয়ে আয়েশ করে চিবাচ্ছে সে।

এত দৌড়াদৌড়ি ও এত পরিশ্রম গেছে যে, কিশোর আর রবিনেরও খিদে লেগেছে। কেকটা দেখে আর সহ্য হলো না। দৌড়ে গেল তিনজনেই। ঝাঁপিয়ে পড়ল কেকের ওপর।

দেখতে দেখতে সাবাড় করে ফেলল অত বড় কেকটা।

রেফ্রিজারেটর থেকে কোকের বোতল বের করল কিশোর। তিনটে গ্লাসে ঢালল। রবিন আর মুসার হাতে একটা করে গ্লাস তুলে দিয়ে নিজে নিল তৃতীয়টা। ডনকে বলল, তুমি খেতে চাইলে ঢেলে নাও।

রবিন বলল কিশোরকে, চলো, লিভিং রুমে গিয়ে বসি। সিনেমা-টিনেমা দেখে সময় কাটাই।
কিন্তু লিভিং রুমে ঢুকেই থমকে দাঁড়াতে হলো ওদের। হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে গাজুল আর মাজুল।
মাজুলের দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিত করল গাজুল।
মুহূর্তে ডনের পাশে চলে এল মাজুল। তার কলার চেপে ধরল। লাফ দিয়ে ডান হাতে বেরিয়ে এসেছে একটা পিস্তলের মত জিনিস। সেটা তুলে তাক করল একটা পাথরের ফ্লাওয়ার ভাসের দিকে। টিপে দিল ট্রিগার।
আগুনে পানি পড়লে ছ্যাৎ করে যেমন শব্দ হয়, তেমনি একটা শব্দ করে মুহূর্তে নেই হয়ে গেল জিনিসটা। একেবারে গায়েব।
হাঁ হয়ে গেল তিন গোয়েন্দা।
তাহলে বুঝলে তো, হাসিমুখে বলল গাজুল, তোমাদেরও কি অবস্থা করতে পারি আমরা। কিন্তু করব না। কারণ গোলাম বানানোর জন্যে বহু কষ্টে তোমাদের খুঁজে বের করেছি আমরা। গোলাম হওয়ার উপযুক্ত বানিয়েছি। বোকা থেকে বুদ্ধিমান বানিয়েছি। এখন তোমরা আমাদের কাছে মূল্যবান। তবে তাই কলে ওই বাচ্চা ছেলেটাকেও কিছু করব না, তা ভেবো না। আমাদের কাছে ওর এক কানাকড়ি দাম নেই।
পিস্তলটা ডনের মাথায় ঠেকিয়ে চাপ দিল মাজুল।
ব্যথা লাগল। চিৎকার করে উঠল ডন। লাথি মারল মাজুলের হাঁটুতে।
পাটা সরিয়ে নিল মাজুল। ব্যথা পেল কিনা বোঝা গেল না। কারণ টু শব্দও করল না সে। তবে পিস্তলের নলের মুখটা আরও ঠেসে ধরল ডনের মাথায়।
ব্যথায় ককাতে লাগল ডন।
পা বাড়াল মুসা।
উঁহু, আঙুল নেড়ে সাবধান করল গাজুল, কোন কিছু করার চেষ্টা করলে ও মারা যাবে, ডনকে দেখাল সে। ও মরে যাবার পরও তোমাদেরকে ছাড়া হবে না। হয় আমাদের কথা মানবে, নয়তো মরবে।
কি করতে বলেন আমাদের জিজ্ঞেস করল কিশোর।
কোন রকম ঝামেলা না করে আমাদের সঙ্গে চলো, গাজুল বলল।
কোথায়?
যেখানে আমি নিয়ে যাব।
আরেকবার ডনের দিকে তাকাল কিশোর। মাজুলের হাতের পিস্তলটার দিকে তাকাল। শুধু আমি গেলে হয় না?
না, তোমাদের তিনজনকেই যেতে হবে।

রবিন বলল, ঝামেলা বাধিয়ে লাভ নেই, কিশোর। তুমি গেলে আমিও যাব। ডন বাঁচুক।
আমিও যাব, দ্বিধা না করে বলল মুসা।
হাসি ফুটল গাজুলের মুখে। মানুষদের এ ধরনের আন্তরিকতাগুলো আমাকে অবাক করে। কেমন বোকার মত অন্যের জন্যে প্রাণ দিতে রাজি হয়ে যায়। যাকগে, আমার কি। মাজুলের দিকে তাকাল সে। মাজুল, আমি ওকে না বলা পর্যন্ত এখানে থাকো। ওকে আটকে রাখো। আমি ওদের নিয়ে যাচ্ছি। ও-কে বললে তুমিও চলে আসবে।
এটাকে কি করব? ডনের কথা জিজ্ঞেস করল মাজুল।
তোমার যা খুশি, গাজুল বলল।
তাহলে আমরা যাব না, সঙ্গে সঙ্গে বেঁকে বসল কিশোর। ওকে বাঁচানোর জন্যে আমরা যেতে রাজি হয়েছি। আমাদেরকে কথা দিতে হবে ডনের কোন ক্ষতি হবে না।
এক মুহূর্ত ভাবল গাজুল। ঘাড় কাত করল। ঠিক আছে, কথা দিচ্ছি। ছেলেটার কোন ক্ষতি হবে না। এখন চলো।
আপনার কথার বিশ্বাস কি?
আমরা কথা দিলে কথা রাখি, এটাই আমাদের নিয়ম। সেজন্যে ভেবেচিন্তে কথা দিই। নাও, চলো তো এখন, দেরি হয়ে যাচ্ছে।

.

বাইরের আঙিনায় একটা কালো কাঁচে ঢাকা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।
কিশোর, মুসা আর রবিনকে এনে সেটাতে তুলল গাজুল। ইঞ্জিন স্টার্ট দিল।
ইয়ার্ড থেকে বেরিয়ে গাড়ির গতি যতটা সম্ভব বাড়িয়ে দিল গাজুল। শহর থেকে বেরোতে সময় লাগল না। সোজা চলল বুনো অঞ্চলের দিকে।
বনের মধ্যে ঢুকল গাড়ি। আঁকাবাকা কাঁচা রাস্তা পার হয়ে এসে ঢুকল বনের মাঝখানের এক টুকরো খোলা জায়গায়।
গাড়ি থেকে তিন গোয়েন্দাকে নামতে বলল গাজুল।
অবাক হয়ে কিশোর দেখল, খোলা জায়গাটায় বিশাল একটা গোলকের মত জিনিস দাঁড়িয়ে আছে। আটটা পা। গায়ে নাম লেখা: টাইম ট্রাভেল-৭।
নামটা স্মৃতির পাতায় কোথায় যেন অনুরণন তুলল। চেনা চেনা মনে হচ্ছে তার, কিন্তু চিনতে পারছে না গোলকটাকে। কোথায় দেখেছে এ জিনিস? মনে করতে পারল না।
গোলকের কাছে তিন গোয়েন্দাকে নিয়ে এল গাজুল। মোবাইল ফোনের মত একটা যন্ত্র বের করে কথা বলল। গুঞ্জন উঠল গোলকের ভেতরে। আট পায়ের

মাঝখানে একটা গোল চাকতির মত ঢাকনা খুলে গিয়ে ঝুলে পড়ল ধীরে ধীরে। মই নেমে এল গোলকের পেটের ভেতর থেকে। সেটা বেয়ে উঠে যেতে আদেশ করল গাজুল।
উঠে গেল তিন গোয়েন্দা। জিনিসটাকে স্পেসশিপের মত লাগল ওদের কাছে। ভেতরে আলো এত উজ্জ্বল, চোখ মিটমিট করতে লাগল ওরা।
চারপাশে তাকিয়ে দেখতে লাগল কিশোর। ছোট ছোট ডজনখানেক খুপরিমত চোখে পড়ল। এমন করে সাজানো, মৌচাকের মত দেখতে। মৌচাকের ভেতরে যেমন খুপরি করা থাকে।
গাজুলকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল তারই মত আরেকজন। ধাক্কা দিয়ে দিয়ে নিয়ে গিয়ে তিন গোয়েন্দাকে ঢোকাল একটা কিউবের মত দেখতে চারকোনা ঘরে। জেলখানার দরজার মত দরজাটা ঠেলে দিল। রূপালী রঙের শিকগুলো ঝলমল করছে। মৃদু আলোকিত টিউব লাইটের মত। তালা লাগানোর শব্দ কানে এল ওদের।
এ তো দেখি খাঁচার মধ্যে এনে ভরেছে আমাদের, মুসা বলল। জানোয়ারের খাঁচা।
রূপালী রঙের একটা সরু গলি ধরে চলে গেল লোকগুলো। খাঁচার দেয়ালে হেলান দিয়ে বসল গোয়েন্দারা। তীব্র আলো চোখে সইয়ে নেয়ার অপেক্ষা করছে। বুকের মধ্যে দুরুদুরু করছে হৃৎপিণ্ডটা।
নিশ্চয় এখুনি উড়াল দেবে এই জিনিসটা, রবিন বলল। আর কোনদিন আমরা আমাদের বাড়িঘর দেখতে পাব না। বাবা-মা, বন্ধু-বান্ধব কাউকে দেখব না। শেষ দিকে ভারী হয়ে এল তার কণ্ঠস্বর।
বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে মুসা বলল, তবু যাই হোক, ডনকে তো বাঁচাতে পারলাম। কি বলো, কিশোর?
নীরবে মাথা ঝাঁকাল শুধু কিশোর।
সত্যি কি বাঁচাতে পারলাম? রবিনের প্রশ্ন। কি, মনে হয় তোমার, কিশোর, মাজুল আর গাজুল কথা রাখবে?
শিওর হওয়ার তো কোন উপায় নেই। তবু ভালটাই আশা করি। ধরে নিলাম রাখবে।
তা তো বুঝলাম, দুই হাতে শিক চেপে ধরল রবিন। কিন্তু আমাদের কি হবে এখন?
এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার একটা উপায় বের করতেই হবে আমাদের, ফিসফিস করে বলল কিশোর। একবার এটা উড়ে গেলে বাড়ি ফেরার পথ চিরদিনের জন্যে বন্ধ হয়ে যাবে আমাদের।
চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বল আঁচাটার চারপাশে তাকাল সে। যে দরজাটা দিয়ে ঢুকেছে ওরা সেটা ছাড়া বেরোনোর আর কোন দরজা নেই। আছে কেবল খাঁচার পর

খাঁচা, ওপরে, নিচে, চারপাশে মুরগীর খাঁচা একটার ওপর আরেকটা যেমন করে সাজিয়ে রাখা হয় সেভাবে।
দরজার শিকগুলোতে হাত বুলিয়ে দেখল কিশোর। এমন ভাবে মিশে রয়েছে, দেখাই যায় না কোথায় আছে। হাত বোলাতে বোলাতে বলে উঠল সে, দাঁড়াও দাঁড়াও, কোথায় আছে বুঝতে পারছি!
দরজার শিক ধরে টান দিল সে। ঠেলা দিল। ঝাঁকি দিল। পাশে ঠেলে সরানোর চেষ্টা করল। প্রথমে ডানে, তারপর বাঁয়ে।
নাহ, নাড়াতেই পারছি না, জোরে এক নিঃশ্বাস ফেলে বলল সে।
তিনজনে মিলে ঠেললে কেমন হয়? মুসা বলল।
উঁহু, লাভ হবে না, মাথা নাড়ল কিশোর। নিরেট ধাতু। কিছুই করতে পারব না। তার ওপর রয়েছে তালা। আর মজার ব্যাপারটা হলো, তালাটা দেখতেও পাচ্ছি না আমরা। কিন্তু জানি, আছে ওটা ওখানে। কোন হুড়কো-টুড়কোও দেখা যাচ্ছে না, দেখো।
ভুরু কুঁচকে বলল রবিন, কিছুই করতে পারছি না। অথচ মজাটা দেখো, অতি বুদ্ধিমান হওয়ার কারণে স্কুল থেকেই বের করে দিল আমাদেরকে। বুদ্ধিমান হয়ে তাহলে লাভটা কি হলো?
লাভ হবে, কিশোর বলল। ভাবতে থাকলে।
তাহলে ভাবছ না কেন?
উজ্জ্বল শিকগুলোর ফাঁক দিয়ে বাইরে তাকাল কিশোর। গাজুলকে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখল। কখন কোনখান দিয়ে এসে উদয় হয়েছে বুঝতেও পারেনি গোয়েন্দারা। ঠিক তার পেছনে মাজুলকে উঁকি দিতে দেখল কিশোর।
গাজুল বলল, আমাদের কথা আমরা রেখেছি। ছেলেটাকে ছেড়ে দিয়ে এসেছে মাজুল। এখন আমরা রওনা হব। স্নায়ু শান্ত করো। আমাদের যদি শোনাতে না চাও জোরে কথা বলবে না। এতক্ষণ যা যা বলেছ, কন্ট্রোল প্যানেল থেকে সব শুনতে পেয়েছি আমরা।
আমাদের ছেড়ে দিন, হাতজোড় করে অনুরোধ করল মুসা। দোহাই আপনাদের। আমরা গোলাম হতে পারব না।
হ্যাঁ, ঠিক, তার সঙ্গে সুর মেলাল কিশোর। ভাল গোলাম আমরা কোনদিনই হতে পারব না। বেকার ধরে নিয়ে যাচ্ছেন আমাদের। আপনাদের মনিব আমাদের পেয়ে মোটেও খুশি হবেন না। বরং প্রচণ্ড রেগে যাবেন। আপনারা জানেন না, আমাদের স্বভাব-চরিত্র একটুও ভাল না। কাজ করতে ইচ্ছে করে না আমাদের। কেউ আমাদের কথা শোনাতে পারে না। সব সময় খালি কুচিন্তা ঘোরে আমাদের

মগজে। ক্ষতিকর চিন্তা। এ রকম শয়তান মানসিকতার কাউকে দিয়ে কি আর গোলামের কাজ করানো যায়?
কিন্তু আমরা করাব, গাজুল বলল। গোলামদের কি ভাবে কাজ করাতে হয় জানা আছে আমাদের।
মাজুলকে নিয়ে চলে গেল সে।
নিজেদের সম্পর্কে এত এখারাপ কথা বলেও লাভ হলো না। গুঙিয়ে উঠল
শিক চেপে ধরে দাঁড়িয়ে রইল তিনজনে।
আর কিছু করার নেই, কি বলো? ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে বলল মুসা। কোনই লাভ হলো না। কিছুই করতে পারব না আমরা।
কিন্তু উপায় আছে কিনা ভাবতে দোষ কি? রবিন বলল। অতি বুদ্ধিমান হয়ে গেছি আমরা। বুদ্ধি খরচ করে যদি নিজেদের বাঁচাতেই না পারলাম, তাহলে আর এ বুদ্ধি দিয়ে করবটা কি?
স্থির দৃষ্টিতে রবিনের দিকে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তাকিয়ে রইল কিশোর। ঠিক। কাজেই যদি না লাগল এত বুদ্ধি দিয়ে করবটা কি? এই বুদ্ধির জন্যেই যত যন্ত্রণা। আজ আমাদের এই দুরবস্থা। গোলাম বানানোর জন্যে ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আমাদেরকে।
মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল তার দুই সহকারী।
দীর্ঘ একটা মুহূর্ত নীরব হয়ে রইল তিনজনে। তাকিয়ে রইল ওদের সামনের রূপালী রঙের মৌচাকের মত খুপরিগুলোর দিকে।
তারপর ঘুরে তাকাল রবিন। বিড়বিড় করে বলল কিশোরকে, ভাবো। ভেবে বের করো না কিছু।
নাহ, হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে জবাব দিল কিশোর, কোন উপায় দেখছি না। কিছুই বের করতে পারছি না। কিছু না। তোমরা চেষ্টা করো না।
তুমি পারছ না আর আমরা পারব কোত্থেকে? হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গিতে বলল মুসা।
আমি এখন ভাবতেই পারছি না কিছু, কিশোর বলল। মগজের ভেতরটা কেমন ঘোলাটে হয়ে উঠেছে। স্পষ্ট হচ্ছে না কিছু। এই গোলকনটাতে ঢোকার পর থেকেই ধীরে ধীরে ভারী হয়ে যাচ্ছে মাথাটা।
কিশোরের চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রবিন। কি বুঝল কে জানে। ঢোক গিলল। চোখ বড় বড় হয়ে গেল। চিৎকার করে উঠল হঠাৎ, আমারও হচ্ছে এ রকম! মগজের ওষুধ! নিশ্চয় কার্যকারিতা হারাচ্ছে! শেষ হয়ে যাচ্ছে ওষুধের ক্ষমতা!

কাঁপতে শুরু করল খাঁচাটা। দুলতে শুরু করল। ঢেউয়ের মধ্যে পড়া নৌকার মত। পেছনে শোনা গেল ইঞ্জিনের জোরাল গর্জন। শক্ত করে শিক চেপে ধরল
থরথর করে কাঁপতে শুরু করেছে পুরো গোলকটা।
উড়াল দিচ্ছে এটা চিৎকার করে উঠল মুসা। উড়ে যাচ্ছে। এখন কি করব?

.

ওখানে নেমে হয়তো ওদের বোকা বানাতে পারব, কম্পিত কণ্ঠে বলল মুসা। হয়তো কথা বলতে পারব ওদের মনিবের সঙ্গে। বাড়ি পাঠিয়ে দিতে অনুরোধ করব। পাঠিয়ে দিতেও পারেন।
কি কারণটা আছে দেয়ার? খাঁচার রূপালী শিকে কপাল ঠেকিয়ে বলল কিশোর, মোটেও বুদ্ধিমান মনে হচ্ছে না আর নিজেকে। স্পষ্ট করে কিছুই ভাবতে পারছি না। কিছু বুঝতেও পারছি না।
বুঝতে তো আমিও পারছি না, রবিন বলল। কেন এমন হচ্ছে? বেশি ভয় পাওয়ার জন্যে? গাজুল ঠিকই বলে গেছে যদি শান্ত হতে পারি আমরা, স্নায়ুকে শান্ত করতে পারি, হয়তো... কথা শেষ না করেই চুপ হয়ে গেল সে।
ওর দিকে তাকিয়ে থেকে মুসা বলল, আমাদেরকে অতি বুদ্ধিমান বানানোর চেষ্টা করেছিল ওরা। নামার পর যখন দেখবে আবার বোকা হয়ে গেছি আমরা, কি করবে তখন? মেরে ফেলবে? নাকি বাড়ি পাঠিয়ে দেবে?
জবাব দেয়ার সময় পেল না রবিন কিংবা মুসা।
মাজুল এসে হাজির হয়েছে খাঁচার সামনে। গর্জে উঠে বলল, তোমাদের মিথ্যে কথা শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছে আমাদের। কি ভেবেছ তোমরা? মিথ্যে বলে আমাদের ফাঁকি দিতে পারবে? একটা কথা জেনে রাখো, মগজশক্তি রসায়নের কার্যকারিতা কখনও কমে না, মরার আগে কোনদিন কমবে না। অতএব ভাওতাবাজি বন্ধ করো।
কিন্তু, আপনি বুঝতে পারছেন না, কিশোর বলল, আমাদের বেলায় কমেছে...
চুপ, গোলামের দল। ধমকে উঠল মাজুল। আমাদের বোকা বানাতে পারবে না। কতগুলো কাগজ খাঁচার ফাঁক দিয়ে ঠেলে দিল সে।
কাগজগুলো হাতে নিল কিশোর। বোকার মত তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করল, কি এগুলো?
দেখতে পাচ্ছ না? ধাঁধা, মাজুল বলল। মগজকে ব্যস্ত রাখো। বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হবে।
নিরাসক্ত ভঙ্গিতে কাগজগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। কি করে আপনার ধারণা হলো, এ সব ছাইপাশ আমাদের ভাল লাগবে?
ভাল লাগুক বা না লাগুক, তোমাদেরকে এগুলোর সমাধান করতেই হবে, একঘেয়ে কণ্ঠে বলল মাজুল। মগজটাকে সাফ রাখতে হবে তোমাদের। ভোতা

মগজ একদম পছন্দ করেন না আমাদের মনিব।
কিন্তু কিন্তু আমরা তো…
ওসব বুঝিটুঝি না। করতেই হবে তোমাদেরকে।
মস্ত বড় একটা ভুল করছেন আপনারা, রবিন বলল। অকারণে আমাদের টেনে না নিয়ে গিয়ে বাড়ি ফিরিয়ে দিয়ে আসুন। আমাদেরকে দিয়ে কোন উপকার হবে না আপনাদের। কোন কাজ হবে না। গোলাম হওয়ার উপযুক্ত নই আমরা।
জবাব দিল না মাজুল। ঘুরে রওনা হয়ে গেল। ফিরে গেল কন্ট্রোল ডেকে।
ও…ও আমাদেরকে বিশ্বাস করল না, গুঙিয়ে উঠল কিশোর। সত্যিই যে ওষুধের কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বিশ্বাস করানো গেল না ওকে।
কি করব আমরা এখন? কেঁদে ফেলবে যেন রবিন।
মাথায় হাত দিয়ে চুপচাপ বসে থাকল মুসা। কোন কথা বলল না।
প্রথম ক্রসওয়ার্ড পাজলটার দিকে তাকাল কিশোর। পড়ে শোনাল রবিন আর মুসাকে। বলল, চার অক্ষরের শব্দ, উল্টো দিকে যেতে হবে।
চিবুক ডলল রবিন। ম! অনেকক্ষণ ধরে ভাবল। সূত্রটা কি বলল তো আবার। ভুলে গেছি।
ভুলে তো যাবেই, এত কঠিন। আমিও মাথামুণ্ড কিছু বুঝতে পারছি না। দূর বাদ দাও এটা। দেখি তো পরেরটা…
গলা বাড়িয়ে দেখল রবিন। তিন অক্ষরের…এই, মুসা, দেখো না পারো নাকি।
পারব তো না-ই, আমার দেখতেও ইচ্ছে করছে না, নিরাসক্ত গলায় বলে চোখ ফিরিয়ে আরেক দিকে তাকিয়ে রইল মুসা।
নীরব হয়ে গেল তিনজনে।
কিন্তু হাল ছাড়ল না কিশোর। কাগজটার দিকে তাকিয়ে থেকে বিড়বিড় করল, ডগ দিয়ে শুরু করলে কেমন হয়? ডগ মানে কুকুর।
হাতের পেন্সিলটা নামিয়ে কাগজে ডগ শব্দটা লিখতে গিয়ে থেমে গেল সে। কোনটাতে লিখব? সাদা ঘরটায় না কালো ঘরটায়?
মনে হয় সাদা ঘরটায়, রবিন বলল। না না, কালো ঘরটায়। ধূর, বুঝতে পারছি না। এক কাজ করো। সাদাটাতেই লেখো।
পেন্সিল নামাল আবার কিশোর। খসখস করে ঘষল কাগজে। আরি, লেখা বেরোচ্ছে না কেন?
বেরোবে কি করে? ধরেছই তো উল্টো করে,রবিন বলল।
আমি আগেই দেখেছি, তিক্ত:হাসি হেসে বলল মুসা। ইরেজারের দিকটা দিয়ে লেখা শুরু করেছে সে।
তাহলে বললে না কেন? কিশোর বলল।

ইচ্ছে করল না।
চোখের পাতা সরু করে পেন্সিলের পেছনে লাগানোরবারটার দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। বিড়বিড় করে বলল, ইরেজার কি জিনিস?
চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইল রবিন। তাই তো! আমিও তো জানি না।
কিশোরের হাত থেকে কাগজ আর পেন্সিল খসে পড়ে গেল। করুণ কণ্ঠে বলে উঠল, আবার বোকা হয়ে গেছি আমরা!... আগের চেয়ে হাদা!
কেঁপে উঠল রবিন। কান্নার সুরের মত ফোঁপানি বেরিয়ে এল গলা থেকে। কোন সন্দেহ নেই তাতে। ওষুধের ক্রিয়া শেষ হয়ে গেছে। মস্ত ক্ষতি করে দিয়ে গেছে আমাদের। একেবারে বোকা বানিয়ে ফেলেছে।
আতঙ্কিত হয়ে পড়ল কিশোর। জোরে জোরে মাথা নাড়তে শুরু করল। কি করব আমরা এখন? এতটাই বোকা হয়ে গেছি পালানোর কোন বুদ্ধিই আর কোনদিন বের করতে পারব না।
ভেউ ভেউ করে কাঁদতে শুরু করল রবিন।
তার কান্না দেখে মুসারও কান্না পেতে লাগল। মুখটাকে করুণ করে তুলে কিশোরকে জিজ্ঞেস করল, বেরোব কি ভাবে আমরা এখন? বুদ্ধি ঘোলা হয়ে গেছে। বাঁচার তো কোন উপায়ই আর বের করতে পারব না।
দেয়ালে হেলান দিয়ে ধাতব মেঝেতে বসে থাকল ওরা। চোখে শূন্য দৃষ্টি।
খাঁচার দরজার কাছে এসে দাঁড়াল গাজুল আর মাজুল।
পৌঁছে গেছি আমরা, গাজুল জানাল।
এমন ভঙ্গিতে কিশোর, মুসা আর রবিন তিনজনেই মাথা আঁকাতে লাগল যেন সদ্য ঘুম থেকে উঠেছে।
কখন নামলাম? মুসার প্রশ্ন। কোন শব্দ তো শুনলাম না। ঝাঁকুনি তো লাগল না।
কতক্ষণ লাগল আসতে? রবিন অবাক। কখন রওনা হয়েছি, মনে করতে পারছি না।
হাতঘড়ির দিকে তাকাল কিশোর। এ জিনিসটা দিয়ে সম্ভবত সময় মাপা যায়। কিন্তু কি ভাবে মাপতে হয়, ভুলে গেছি।
খপ করে কিশোরের হাত চেপে ধরল রবিন। চোখের সামনে তুলে ধরে বলল, একটা বড় কাটা দেখা যাচ্ছে। আরেকটা ছোট কাটা। কোনটা দিয়ে কি হয়, বলো তো?
হেই, বাজে বোকো না! ধমকে উঠল গাজুল। তোমাদের বকবকানি শোনার সময় আমাদের নেই। মনে করেছে তোমাদের চালাকি আমরা ধরতে পারিনি। খুব ভালমতই পেরেছি। আমরা জানি কতখানি বুদ্ধিমান তোমরা।

খাঁচার একটা শিক চেপে ধরল গাজুল। তালা খোলার শব্দ হলো। এক ধরনের গুঞ্জন। তারপর পিছলে সরে গেল কয়েকটা শিক লাগানো একটা ফ্রেম। খুলে গেল দরজা।
জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছে গাজুল আর মাজুল।
আমি খুব উত্তেজিত বোধ করছি, মাজুল বলল।
আমিও করছি, গাজুল বলল। আর উত্তেজিত হবই না বা কেন। এত চমৎকার তিনটে গোলাম নিয়ে এসেছি মনিবের জন্যে। তিনি ভীষণ খুশি হবেন।
উত্তেজিত আমরাও হচ্ছি, কিশোর বলল। মনিব দেখব। কখনও তো দেখিনি। তা ভাই মনিব জিনিসটা কোন ধরনের জীব? শিং আছে? লেজ কয়টা?
রবিন বলল, তাই তো! মনিব দেখব। বাচ্চা মেয়ের মত হাততালি দিতে লাগল, কি মজা! কি মজা! মুসার দিকে তাকাল। মুসা, তোমার আনন্দ লাগছে না?
না, ভয়ে ভয়ে বলল মুসা। যদি কামড়ে দেয়?
চুপ! চুপ করো! গর্জে উঠল গাজুল। বেরোও। এসো আমাদের সঙ্গে। আমাদের প্লেন ল্যান্ড করেছে মনিবের গম্বুজের ভেতরে। বেরোতে বেশি দেরি করলে মনি ভীষণ রেগে যাবেন।
ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল মুসা, গম্বুজের ভেতরে। বলেন কি! ঢুকল কি করে?
সে গেলেই দেখতে পাবে, গর্বের সঙ্গে জবাব দিল গাজুল। পরক্ষণে বদলে গেল মুখের ভাব। ধমক দিয়ে বলল, খবরদার, বেশি কথা বলবে না। তোমাদের মনে রাখা উচিত, তোমরা গোলাম। কোন প্রশ্ন করবে না। কৌতূহল দেখাবে না। কথা বলতে যখন বলা হবে শুধু তখনই বলবে। মনে থাকবে?
নাহ্, থাকবে না, জোরে নিঃশ্বাস ফেলে জবাব দিল কিশোর। কি জানি কি হয়ে গেছে আমাদের, কিছুই মনে থাকে না। যাকগে, মন নিয়ে অত চিন্তার কিছু নেই। তা আমাদের কাজটা কি? কি কি গোলামি করতে হবে?
মনিবের ব্যক্তিগত গোলাম হিসেবে তোমাদের কাজ হবে তার ল্যাবরেটরিতে থাকা, সারাক্ষণ সহযোগিতা করা। যেহেতু তোমরা অতিবুদ্ধিমান গোলাম, তোমরা তাঁর সমস্ত অংক করে দেবে, গাজুল বলল। কঠিন কঠিন সব ক্যালকুলেশন। অবশ্য সবই কম্পিউটারে। তোমরা...
আতঙ্কে চোখ বড় বড় হয়ে গেল কিশোরের। কম্পিউটার! অংক! এগুলো আবার কি জিনিস?
তাকে ধমক লাগাল রবিন, গাধা নাকি! অংক কি জিনিস বোঝো না? নম্বর, নম্বর। একগাদা নম্বর।
নম্বর না, সংখ্যার হিসেব, অধৈর্য ভঙ্গিতে চিৎকার করে উঠল গাজুল।

কিন্তু নম্বরের হিসেব তো আমরা কিছুই জানি না, বোকার মত রবিন আর মুসার দিকে তাকাতে লাগল কিশোর। কি ভাবে কি করব, বলো তো? শেষে আমাদেরকে তাড়িয়ে দেবেন মনিব...।
উঁহু, শিং দিয়ে গুতো মারবে, শুধরে দিল তাকে মুসা। গাজুল-মাজুল যে ভাবে মনিবের নামে ভয় পাচ্ছে, আমার মনে হয় তার শিংগুলো খুব চোখা আর বড় বড়...
এই থামবে তোমরা! চিৎকার করে বলল মাজুল। গাজুলের দিকে ফিরল। ঘটনাটা কি বলো তো ওদের? এমন করছে কেন?
ও কিছু না, গাজুল জবাব দিল, ভয় পেয়েছে। ওদের কথায় কান দিও না। আমরা জানি ওরা কতখানি বুদ্ধিমান। চলো চলো, মনিবের সঙ্গে দেখাটা সেরে ফেলি।
হ্যাঁ, চলো।
তিন গোয়েন্দার দিকে তাকাল গাজুল। কি হলো, হাঁ করে দেখছ কি? বেরোতে বললাম না? নাকি লেজারের শক দেয়া লাগবে।
নির্বোধের মত প্রশ্ন করল কিশোর, সেটা আবার কি জিনিস? শিঙের চেয়ে খারাপ?
হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল মাজুল। নাহ, মনে হচ্ছে ধরে প্রথমে ক্লিনিং রুমে নিয়ে যেতে হবে এগুলোকে। লাল রক্তের ওপর আর আস্থা রাখতে পারছি না আমি।
তবে কি নীল রক্তও আছে? বেফাস প্রশ্ন করে ফেলল যেন কিশোর।
নীল নেই, তবে রূপালী রক্ত আছে। তোমাদের লাল রক্তের চেয়ে অনেক বেশি ক্ষমতাশালী, নষ্ট প্রায় হয়ই না, আর রাসায়নিক পদার্থ পরিবহনের ক্ষমতাও লাল রক্তের চেয়ে অনেক অনেক বেশি। সত্যিই যদি তোমরা জান না করে থাকো, তোমাদের বুদ্ধি কমে গিয়ে থাকে, লাল রক্ত সব ফেলে দিয়ে দেহে রূপালী রক্ত ভরলেই আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। নাও, চলো এখন।
গোলকযান থেকে ওদেরকে বের করে লম্বা একটা রূপালী হলওয়েতে নিয়ে এল গাজুল-মাজুল। ঘরের সব কিছুই যেন ক্রোম আর আয়নায় তৈরি। গোলকনটার মতই এখানেও সব কিছু চকচকে, যেন রূপালী আগুনের আভায় জ্বলছে।
হাঁটার সময় পায়ের শব্দ জোরাল হয়ে কানে বাজে। দ্রুত হাঁটছে গাজুল আর মাজুল। ওদের সঙ্গে সমতা রাখার জন্যে রীতিমত দৌড়াতে হলো তিন গোয়েন্দাকে।
চকচকে একটা ডাবল ডোরের সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। দাঁড়াতেই আপনাআপনি যেন পিছলে নিঃশব্দে খুলে গেল দরজার পাল্লা। গাজুল-মাজুলের পিছু পিছু রূপালী একটা বড় বাক্সের মধ্যে এসে ঢুকল গোয়েন্দারা।

এই এলিভেটর আমাদেরকে ক্লিনিং রুমে নিয়ে যাবে, গাজুল বলল। মনে রাখবে, তোমরা গোলাম। কারও সঙ্গে কথা বলবে না তোমরা।
পেছনে নিঃশব্দে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। ওপর দিকে ওটার টান অনুভব করল কিশোর। বুঝতে পারল ওপরে উঠছে এলিভেটর।
এত বুদ্ধিমান তিনটে ছেলেকে গোলাম হিসেবে ধরে এনেছি দেখলে কেউ বিশ্বাস করতে পারবে না, খুশি খুশি গলায় গাজুলকে বলল মাজুল। মনিব আমাদের ওপর খুব খুশি হবেন। সবাই হিংসে করবে আমাদের। তাই না?
তা করবে, জবাব দিল গাজুল। ঝামেলা পাকানোর ওস্তাদ ওরা, বোঝ যাচ্ছে, তবে গোলাম হিসেবে খারাপ হবে না।
থামল এলিভেটর। দরজা খুলে গেল। পিঠে ধাক্কা তো মেরে নামতে আদেশ করা হলো তিন গোয়েন্দাকে। আরও বেশি উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত একটা হলওয়েতে নামল ওরা। কাঁচের মত চকচকে মসৃণ দেয়াল আর মেঝে থেকে আলোর আভা বেরোচ্ছে। আয়নার তৈরি ছাত। এত উজ্জ্বল, তাকানো যায় না সেদিকে। আপনা থেকেই চোখের পাতা বুজে আসে।
রবিনের শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে গেল ভয়ের শীল শিহরণ। আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। হঠাৎ করেই ভাবনাটা চলে এল মাথায়, অন্য কোন গ্রহে নিয়ে আসা হয়নি তো ওদের? চারপাশের পরিবেশ তো বটেই, গাজুল-মাজুলের আচরণও সন্দেহজনক। ওদের কথাবার্তা ঠিক স্বাভাবিক মানুষের মত নয়। স্বাভাবিক মানুষের মত চিন্তা-ভাবনাও করে না ওরা। তারমানে অন্য কোন গ্রহেই ওদেরকে নিয়ে আসা হয়েছে! কিডন্যাপ করা হয়েছে ওদেরকে। ভিনগ্রহবাসীদের রাজার গোলাম বানানোর জন্যে।
মুসা কিছু ভাবতে পারছে না। আতঙ্কে চিন্তাশক্তিই যেন ভোতা হয়ে গেছে ওর।
আর লম্বা, চকচকে হলওয়ে ধরে হাঁটার সময় কিশোরের মনে হচ্ছে, বাস্তবে নেই ওরা, স্বপ্নের মধ্যে রয়েছে। কিন্তু সে জানে, এটা বাস্তব। মুসা আর রবিনের চেয়ে কম ভয় পাচ্ছে না সে।
হল পার হয়ে এসে মস্ত একটা ছড়ানো জায়গা। চারকোনা বাক্সের মত অসংখ্য ছোট ছোট ঘর। কাঁচের বাক্সের মত। তার ভেতরে গাজুল-মাজুলের মত ছোট ঘোট মানুষেরা শুয়ে আছে। যেন মানুষ বানানোর কারখানা এটা।
চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে দেখছে তিন গোয়েন্দা। হাঁ হয়ে ঝুলে পড়েছে মুসার নিচের চোয়াল। বাক্সগুলোর উল্টো দিকের মস্ত দেয়ালের একটা দরজা নিঃশব্দে খুলে গেল। বেরিয়ে এল একজন মানুষ। যান্ত্রিক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, এই রোবটগুলোকে আনলে কোত্থেকে? এদের জন্ম তো এখানে হয়েছে বলে মনে হয় না।

না, এরা রোবট নয়, মানুষ, জবাব দিল গাজুল।
অ! বিড়বিড় করল লোকটা।
কিন্তু মানুষ আনতে গেলে কেন? জিজ্ঞেস করল আরেকটা লোক। জ্বালাবে তো। জালিয়ে মারবে।
জ্বালানোর কারণটা বন্ধ করে নিলেই হবে, গাজুল বলল। তখন গোলাম হিসেবে এদের তুলনা হবে না। তাড়াতাড়ি করা দরকার। অপেক্ষা করতে করতে মনিব শেষে খেপে যাবেন।
আরেকটা ওরকম বাক্সওয়ালা ঘর পেরিয়ে এল ওরা। এটার মেঝে থেকে ছাত পর্যন্ত বোঝাই কাঁচের বাক্স। সবগুলো মানবশিতে ভর্তি। যেন ইনকিউবেটরে রাখা ডিম ফুটে মুরগীর বাচ্চা বেরোনোর মত করে জন্ম দেয়া হয়েছে এই শিশুদের।
দূর থেকে অদ্ভুত বাজনার শব্দ ভেসে এল। বৈদ্যুতিক করাত দিয়ে কাঠ চেরাই করার সঙ্গে মৌমাছির গুঞ্জন মিশিয়ে দিলে যে রকম শুনতে লাগবে, শব্দটা অনেকটা সেই রকম। একঘেয়ে। শুনতে শুনতে কেমন যেন ঝিম ধরে আসে।
এই যে এটাই, একটা বিশাল ঘর দেখিয়ে বলল গাজুল। এসে গেছি ক্লিনিং রুমের কাছে। এখানেই তোমাদেরকে ধোলাই করা হবে। ডানে ঘোররা।
থেমে গেল কিশোর। ডানে-বাঁয়ে তাকাতে লাগল। ডানদিকটা কোন দিকে? বুঝতে পারছি না তো। ডান কোনদিকে হয়?
তাই তো! হাবার মত চারপাশে তাকাতে লাগল মুসা। ডান কোনটা?
হাত তুলে দুদিকে দেখিয়ে মুসাকে বোঝাতে চাইল রবিন, একবার এদিকে ডান। একবার এদিকে ডান। চতুর্দিকই ডান দিক। কিন্তু কোনদিকে যাব কিভাবে মনে রাখব? কোনদিকে যাচ্ছি, সেটা মনে রাখা তো আরও কঠিন।
থামো! চিৎকার করে উঠল গাজুল। এ সব বদমাশি বন্ধ করো! বোকামির ভান করে এখনও ফাঁকি দেবার চেষ্টা। ভেবেছ আমি কিছু বুঝতে পারছি না, না? এসো, এদিক দিয়ে এসো।
বড়, উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত একটা ঘরে ওদেরকে ঠেলে দিল সে। বড় বড় রূপালী রঙের ধাতব টেবিল সাজানো রয়েছে ঘরটাতে। দেয়াল ঘেঁষে বসানো অদ্ভুত সব ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করছে টেকনিশিয়ানরা।
দেয়ালের সাইজ দেখে মনে হয় মাইলখানেক লম্বা। আয়না বসানো ছাতের কাছাকাছি বেরিয়ে থাকা ঝোলা বারান্দার মত দেখতে ক্যাটওয়াকে চলাফেরা করছে টেকনিশয়ানরা। ওখানেও যন্ত্রপাতি বসানো। নানা ধরনের শব্দ বেরোচ্ছে ওগুলো থেকে। তবে কোনটাই তেমন উচ্চকিত কিংবা জোরাল নয়। কানে পীড়া দেয় না।

তার নিজের চেয়ে লম্বা আরেকজন লোককে হাতের ইশারায় ডাক দিল। গাজুল। লোকটা কাছে এলে বিজাতীয় ভাষায় তাকে কি যেন বলতে লাগল সে। এক বর্ণও বুঝতে পারল না তিন গোয়েন্দা।
কথা শেষ হলে ওদের দিকে ফিরে তাকাল সে। নতুন গোলামদের দেখার জন্যে অপেক্ষা করে আছেন মনিব। প্রথমে তোমাদের ভেতরের যন্ত্রপাতি সব ধোলাই করে সাফ করা হবে। তবে প্রথমেই সেটা করতে গেলে মারা যেতে পারো তোমরা, তাই দেহের সমস্ত লাল রক্ত বের করে ফেলে রূপালী রক্ত ভরতে হবে আগে, আমাদের মত। রূপালী রক্ত ভীষণ টেকসই। যত ধোলাইই করা হোক না কেন, মরবে না তখন আর। বুদ্ধিতেও কোন রকম গোলমাল যদি থেকে থাকে, সব ঠিক হয়ে যাবে।
আবার লম্বা লোকটার দিকে ফিরে তাকিয়ে কি যেন বলল গাজুল।
দেয়ালের দিকে ফিরে তিনজন লোককে ডেকে কথা বলল লম্বা লোকটা। অদ্ভুত সেই ভাষার এক বর্ণও বুঝতে পারল না তিন গোয়েন্দা। গাট্টাগোট্টা তিনজন লোক এগিয়ে এল। হাতে তিনটে কিম্ভুত যন্ত্র। প্রতিটি যন্ত্র থেকে একটা করে মোটা নল বেরিয়ে আছে। নলের মাথায় চোখা সুচের মত জিনিস। সেগুলো গোয়েন্দাদের দিকে বাড়িয়ে দিল ওরা।
কি-কি-কি করছেন আপনারা! চিৎকার করে উঠল কিশোর।
ভয় নেই, ডান হাতটা বাড়াও তো, গাজুল বলল। একটুও ব্যথা পাবে না। সুচের মাথায় ব্যথানিরোধক লাগানো আছে। এক দিক দিয়ে তোমাদের লাল রক্ত বেরোতে থাকবে, আরেক দিক দিয়ে রূপালী রক্ত ঢুকবে। দেখবে, দুনিয়াটাই পাল্টে গেছে তখন। খুব আরাম পাবে। নাও, হাতটা বাড়াও। তাড়াতাড়ি করো। মনিব অপেক্ষা করছেন।
মুসা আর রবিনের দিকে তাকাল কিশোর। ওদের চোখেও আতঙ্ক।
কিশোর বলল, তারমানে…তারমানে আপনাদের দেহেও রূপালী রক্ত?
হেসে মাথা ঝাঁকাল গাজুল। হ্যাঁ। আমাদের দেহে আর যন্ত্রপাতিতে আরও কিছু পরিবর্তন আছে, যেগুলো তোমাদের নেই। আমাদের মগজটাও অন্য রকম, তোমাদের মত না।
কোনও ধরনের রোবট না তো? কথাটা মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল রবিনের।
মাথা ঝাঁকাল গাজুল, তা বলতে পারো। রোবটমানব। তবে রোবট হয়ে অসুবিধে নেই। মানুষ হওয়ার চেয়ে রোবট হওয়া অনেক শান্তির। কথা অনেক হলো। নাও, দেখি, ডান হাতটা বাড়াও তো এখন। আধঘণ্টার মধ্যেই দুঃখ-কষ্ট, বাড়ির জন্যে মন কেমন করা-কোন কিছুই থাকবে না আর তোমাদের।

.

কিশোরের হাতটা ধরার জন্যে হাত বাড়াল একজন রোবটমানব।
চিৎকার করে উঠল কিশোর, না না!
ততক্ষণে রবিনের হাত চেপে ধরেছে একটা রোবট।
কিন্তু মুসাকে ধরতে যেতেই আচমকা ঘুরে দৌড় মারল সে। চিৎকার করে বলতে লাগল, কিশোর, রবিন, পালাও?
রূপালী টেবিলগুলোর ফাঁক-ফোকর দিয়ে ছুটতে থাকল ওরা। প্রথমে কিছু বুঝতে পারল না কর্মরত রোবটরা। তারপর গাজুলের চিৎকারে তাড়া করে এল কয়েকজন।
ফিরে তাকাল কিশোর। গাজুল-মাজুল সহ আরও সাত-আটটা রোবট ওদের পিছু নিয়েছে।
প্রাণপণে ছুটতে লাগল তিন গোয়েন্দা। বেরিয়ে এল আরেকটা আয়না বসানো চকচকে হলরূমে। এত উজ্জ্বল, এত তীব্র আলো, চোখ মেলে রাখাই কঠিন হয়ে যাচ্ছে।
কোথায় যাচ্ছি? চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল রবিন।
জানি না! জবাব দিল কিশোর। কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, কোথায় যাচ্ছি কি করে বলব?
অন্ধের মত হোঁচট খেয়ে পড়ল সামনের দিকে। দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে চিৎকার বেরিয়ে এল আপনাআপনি।
সাড়াশির মত কঠিন আঙুল চেপে ধরল ওকে পেছন থেকে।
ছাড়া পাওয়ার জন্যে চিৎকার-চেঁচামেচি, ধস্তাধস্তি শুরু করল সে।
কিন্তু ধরা পড়ে গেছে। রবিন আর মুসাও ছাড়া পাওয়ার জন্যে চিৎকার করছে। হাত-পা ছুঁড়ছে। লাভ নেই। রোবটমানবেরা ওদের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী।
কাছে এসে দাঁড়াল গাজুল-মাজুল।
গম্ভীর কণ্ঠে গাজুল বলল, অকারণ চেষ্টা, গোলামেরা। এখান থেকে পালিয়ে বাঁচতে আর পারবে না তোমরা কোনমতেই।
বাড়ি যাওয়া আর হবে না তোমাদের কোনদিন, হাসতে হাসতে বলল মাজুল। আর যদি হয়ও, লাল রক্ত নিয়ে যেতে পারবে না। রূপালী রক্ত নিয়ে যেতে হবে। তা-ও কোনও অপারেশনে, যদি মনিব মনে করেন তোমাদেরকে পাঠানো দরকার।
দরজার দিকে ফিরে তাকাল গাজুল। যন্ত্রহাতে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে সেই তিনজন রক্তবদণকারী টেকনিশিয়ান। হাত নেড়ে তাদেরকে ডেকে বলল গাজুল, এসো। বদলে দাও।
তিন গোয়েন্দাকে যারা ধরেছে তাদের উদ্দেশে বলল সে, শক্ত করে ধরে রাখো। ছাড়বে না।

দরজায় দাঁড়ানো একজন টেকনিশিয়ান বলল, এখানে না বদলে ক্লিনিং রুমেই নিয়ে এসো না। রক্ত বদলানোর পর তো ধোলাই করার জন্যে সেখানে নিতেই হবে।
কি যেন ভাবল গাজুল। তারপর বলল, ঠিক আছে, নিয়ে চলো।
আবার ক্লিনিং রুমে নিয়ে আসা হলো তিন গোয়েন্দাকে। রুপালী টেবিলে তোলা হলো। চিত করে শুইয়ে দিয়ে হাত-পা চেপে ধরা হলো।
যন্ত্রের সুইচ টিপে দিতে লাগল টেকনিশিয়ানরা। মৃদু গুঞ্জন তুলে চালু হয়ে গেল মেশিন। সবার চোখ এখন এদিকে। ক্যাটওয়াকে যারা কাজ করছিল, কাজ। থামিয়ে দিয়ে তারাও তাকিয়ে আছে।
আর...আর বোধহয় বাঁচতে পারলাম না, গুঙিয়ে উঠল মুসা। গাজুল ঠিকই বলেছে। আমরা শেষ।
ফুঁপিয়ে উঠল রবিন। কান্নার মত স্বর বেরোল গলা থেকে।
কিশোর তাকিয়ে আছে তার পাশে দাঁড়ানো রোবটমানবের হাতের যন্ত্রটার দিকে। সুচের মত জিনিসটা তার ডান হাতের ওপর নিয়ে এসেছে রোবট। হাতের শিরা খুজছে ফুটিয়ে দেয়ার জন্যে।
চামড়া স্পর্শ করল সুচ।
তীক্ষ্ণ একটা ব্যথা।
শিরার মধ্যে বিধে গেল সুচ।
শীতল আতঙ্ক যেন গ্রাস করল কিশোরকে। অবশ হয়ে এল হাত-পা। মাথার মধ্যে অদ্ভুত এক অনুভূতি। মুক্তির আর কোন উপায় নেই। কিছুই করার নেই। আর। হাল ছেড়ে দিয়ে চোখ বুজল।
ঠিক এই সময় ক্যাটওয়াকের কাছ থেকে গমগম করে উঠল একটা ভারী কণ্ঠ, কোথায়? কই? কাদের নিয়ে আসা হয়েছে?
কণ্ঠটা কেমন চেনা চেনা লাগল কিশোরের।
চোখ মেলল আবার।
ক্যাটওয়াকের দিকে তাকিয়ে কণ্ঠের মালিককে দেখেই স্থির হয়ে গেল। বুঝতে পারল কেন চেনা চেনা লাগছিল। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না।
ক্যাটওয়াকে দাঁড়িয়ে আছেন স্বয়ং ডক্টর মুন! মহাক্ষমতাধর অসাধারণ ক্ষমতাশালী সেই বিজ্ঞানী, যার সঙ্গে বহুবার মোলাকাত হয়েছে ওদের।
ডক্টর মুনকে দেখে নিশ্চিত হলো রবিন, ভিনগ্রহে নয়, পৃথিবীতেই রয়েছে ওরা, ডক্টর মুনের কোনও গোপন আস্তানায়।
তিন গোয়েন্দাকেও দেখতে পেলেন ডক্টর মুন। বিমল হাসি ফুটল তাঁর মুখে। আদেশ দিলেন, অ্যাই ছাড়ো। ছেড়ে দাও ওদের।

বিনীত ভঙ্গিতে গাজুল বলল, রক্ত বদলানো এখনও শেষ হয়নি, মালিক।
না হোক, আদেশ দিলেন: ডক্টর মুন। নিয়ে এসো ওদেরকে আমার চেম্বারে।
রবিনের দিকে ফিরে তাকিয়ে ফিসফিস করে মুসা বলল, মনে হচ্ছে বেঁচে গেলাম এ যাত্রা।
কি জানি! জবাব দিল রবিন। কিংবা হয়তো আরও বড় কোন বিপদে পড়তে যাচ্ছি। ডক্টর মুনকে আমরা যে পরিমাণ ভুগিয়েছি এতকাল, এবার নিশ্চয় প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়বেন না।
সাদা আলো জ্বলছে ডক্টর মুনের চেম্বারে। তবে ক্লিনিং রুমের মত এত উজ্জ্বল চোখ ধাঁধানো নয়, চোখে পীড়াদায়কও নয়।
ঘুরে গিয়ে মস্ত ডেস্কের ওপাশে বসলেন ডক্টর মুন। তার দুই পাশে গিয়ে দাঁড়াল দুজন বডিগার্ড। ওরা স্বাভাবিক লাল রক্তের মানুষ নাকি রোবটমানব, দেখে বোঝার উপায় নেই। গম্ভীর, ভাবলেশহীন চেহারা।
তিন গোয়েন্দাকে ধরে নিয়ে ঘরে ঢুকেছে তিনজন প্রহরী। তাদের সঙ্গে গাজুল-মাজুল।
ডেস্কের সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দেয়া হলো গোয়েন্দাদেরকে। হাসিমুখে তাদের দুই পাশে এসে দাঁড়াল গাজুল-মাজুল।
আপনার জন্যে নতুন গোলাম নিয়ে এলাম, মালিক, মাথা নুইয়ে কুর্নিশ করে বলল গাজুল।
ভীষণ বুদ্ধিমান ওরা, যোগ করল মাজুল।
ভুরু কুঁচকে তিন গোয়েন্দার দিকে তাকিয়ে রইলেন ডক্টর মুন। কিন্তু ওরা বুদ্ধিমান হয় কি করে? ওদেরকে তো বোকা বানিয়ে দিয়েছিলাম আমি।
বুঝতে পারল না গাজুল। বোকা বানিয়ে দিয়েছিলেন?
হ্যাঁ, ডক্টর মুন বললেন। আমাদের একটা টাইম ট্র্যাভেল মেশিন নিয়ে পালিয়েছিল ওরা। নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রেখেছিল লেকের পানিতে। ওটাতে চড়েই কিছুদিন আগে ফিরে এসেছিল আবার।
তারপর? কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইল গাজুল।
মগজের মান নামানোর ওষুধ দিয়ে দিলাম বোকা বানিয়ে। ফেরত পাঠিয়ে দিলাম বাড়িতে। ওরা আমার পুরানো শত্রু। আমার কাজে বার বার বাগড়া দিয়েছে। বহু ক্ষতি করেছে। মেরে ফেলা যেত, কিন্তু তার কোন প্রয়োজন মনে করলাম না। এমন একটা কিছু করে দিতে চাইলাম, যাতে আমার কোন ক্ষতি করতে না পারে আর কোনদিন। ভাবলাম, কি করলে সেটা সম্ভব? বোকা বানিয়ে দিলে। বুদ্ধি না থাকলে আমার বিরুদ্ধে লাগতে পারবে না আর কখনও।

হাসিমুখে গাজুল জানাল, শাস্তি ওদের ভালমতই হয়েছে, মালিক। স্কুলে টিচার, বন্ধু-বান্ধবরা সারাক্ষণ ওদের নিয়ে দূর-দূর ছ্যা-ছ্যা করেছে, ইয়ার্কি মেরেছে, হাসাহাসি করেছে। তবে ইদানীং সেই অবস্থাটা আর ছিল না। তবে ওদের ভয় পাওয়া শুরু করেছিল পরিচিতজনেরা। ফ্রীক ভাবতে আরম্ভ করেছিল।
তার মানে?
মগজশক্তি রসায়ন দিয়ে বুদ্ধিমান বানিয়ে ফেলেছি। এত বেশি বুদ্ধিমান হয়ে গেছে ওরা এখন, ওদের বুদ্ধিমত্তার যন্ত্রণায় টিকতে না পেরে স্কুল থেকেই বের করে দিয়েছে ওদেরকে টিচাররা। বন্ধু-বান্ধবরা ভয়ে মিশতে চায় না। খুব ভাল গোলাম হবে আপনার, মালিক।
হুঁ, চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা দোলালেন ডক্টর মুন। ভুল করেছ। মস্ত ভুল। স্বাভাবিক বুদ্ধি যখন ছিল এদের, তখনই এরা আমার ক্ষতি করেছে একের পর এক। আগের চেয়েও বুদ্ধি যদি বেড়ে গিয়ে থাকে তাহলে তো দানবে পরিণত হয়েছে এখন। এদের এত বুদ্ধিমান রাখা যাবে না কোনমতেই। আমার ল্যাবরেটরিই ধ্বংস করে দিয়ে বেরিয়ে যাবে কোনদিন। তবে ওষুধ খাইয়ে যখন ফেলেছই, দেখা যাক কি রকম বুদ্ধিমান ওরা হয়েছে, তারপর আবার বোকা বানিয়ে দিলেই হবে। আর স্মৃতিশক্তিটাও ঠিক আছে কিনা দেখতে হবে।...কিশোর পাশা, বলো তো আমি কে?
আপনি আমাদের মালিক, নির্বিকার ভঙ্গিতে জবাব দিল কিশোর।
মুসা, রবিন, তোমরা বলো তো আমি কে?
আপনি গাজুল-মাজুল-হাজুল-বাজুল সবার মালিক, জবাব দিল মুসা।
রবিন বলল, আপনি রোবটমানব টাকরাভুম ওরফে গাকরা মিয়া।
রাগ ঝিলিক দিয়ে উঠল ডক্টর মুনের চোখে। কোনমতে দমন করলেন। ঝট করে তাকালেন একবার গাজুল-মাজুলের দিকে। কুঁকড়ে গেল ওরা।
গাজুল বলল, ওরা বোকা সাজার ভান করছে। কিন্তু গলায় জোর নেই তার।
মাজুল বলল, মালিক, ওদের অংক দিয়ে দেখুন। মুহূর্তে করে ফেলবে। যত কঠিনই দেন না কেন।
আবার কিশোরের দিকে তাকালেন ডক্টর মুন। দুই আঙুল তুলল। বল তো এখানে কটা আঙুল?
নির্দ্বিধায় জবাব দিল কিশোর, সাড়ে দশটা।
মুসাকে জিজ্ঞেস করলেন ডক্টর মুন, তুমি বলো, দুই আর তিন যোগ করলে কত হয়।
বিশ।

হাঁদারাম! ধমকে উঠল রবিন। দুই আর তিন যোগ করলে বিশ হয় নাকি? একুশ হয়, একুশ একুশ।
আরে কি শুরু করলে কি তোমরা? কিশোর বলল। আমরা যে বুদ্ধিমান হয়ে গেছি, এটা বুঝিয়ে দিতে চাও নাকি? তাহলে তো ধরে গোলাম বানাবে।
তাড়াতাড়ি জিভ কাটল রবিন, না না, তা কেন বোঝাব। এই মুসা, দুইয়ে আর তিনে এগারো হয়, বুঝলে? বারো বললেও অবশ্য ভুল হবে না।
হা-হা করে হাসল কিশোর। গাধাটা কি বলেরে!
গাধা! গাধা! করে সমানে চেঁচাতে লাগল মুসা আর রবিন। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাবার মত হি-হি করে হাসতে লাগল।
যথেষ্ট হয়েছে। চিৎকার করে উঠলেন ডক্টর মুন। থামো!
রাগত চোখে গাজুলের দিকে অকালেন আবার তিনি। ঘামতে আরম্ভ করেছে গাজুল।
কর্কশ কণ্ঠে ডক্টর মুন বললেন, কি, কোথায় বুদ্ধিমান? আগের চেয়ে তো হাদা হয়েছে আরও। এত বোকা তো আমিও বানাইনি। বললাম না মগজশক্তি রসায়ন লাল রক্তে কাজ করে না।
হাত কচলে গাজুল বলল, কিন্তু মালিক, আমি সত্যি বলছি, বুদ্ধিমত্তার জন্যে ওদেরকে স্কুল থেকে বের করে দেয়া হয়েছে।
তাহলে বোকা হলো কি করে? ভুরু নাচালেন ডক্টর মুন।
ধীরে ধীরে পেছনে সরে যেতে লাগল মাজুল।
ধমকে উঠলেন ডক্টর মুন, যাচ্ছ কোথায়?
পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে গেল মাজুল।
কঠিন কণ্ঠে গাজুল-মাজুলের উদ্দেশে বললেন ডক্টর মুন, নিশ্চয় রিঅ্যাকশন হয়েছে ওষুধে। আমি নিশ্চিত, লাল, রক্তে কাজ করে না এই ওষুধ। আর করলেও বেশিদিন কার্যকর থাকে না। গর্জে উঠলেন হঠাৎ তোমাদের পাঠানো হয়েছে স্বাভাবিক মগজের বুদ্ধিমান মানুষকে ধরে আনতে। এ কাকে নিয়ে এলে তোমরা? কে বলেছিল আমি নিজে হাঁদা বানিয়ে রাখা কতগুলো ছেলেকে ওষুধ খাইয়ে বুদ্ধিমান বানিয়ে ধরে আনতে? তোমরা আমাকে ঠকিয়েছ!
ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল গাজুল আর মাজুল।
করজোড়ে বলল গাজুল, ভুল হয়ে গেছে, মালিক। এবারের মত মাফ করে দিন।
ডক্টর মুন বললেন, ভাল করেই জানো তোমরা এখানকার নিয়ম। এখানে ভুলের কোন ক্ষমা নেই। বিজ্ঞান গবেষণায় সামান্যতম ভূলও বিরাট ক্ষতির কারণ হয়ে ওঠে। তোমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখলে ভবিষ্যতে আরও বড় কোন ভুল করে বসবে। আমার ল্যাবরেটরিতে এ ধরনের রিস্ক আমি নিতে পারি না। কষ্ট করার ভয়ে

হাতের কাছে পাওয়া বোকাদেরকে ওষুধ খাইয়ে যারা বুদ্ধিমান বানানোর চেষ্টা করে, তাদের মত অলসদের দিয়ে আমার কোন উপকার হবে না।
ডেস্কের ড্রয়ারের দিকে ডান হাতটা নেমে গেল ডক্টর মুনের।
কি ঘটতে যাচ্ছে বুঝে গিয়ে চিৎকার করে উঠল গাজুল, না না, মালিক, আর কোনদিন ভুল হবে না…
তার কথা শেষ হওয়ার আগেই হাতটা বেরিয়ে এল আবার ডক্টর মুনের। হাতে একটা বড় পিস্তলের মত অস্ত্র। গাজুলের দিকে তাক করে টিপে দিলেন ট্রিগার। নলের মুখ থেকে বেরিয়ে এল একটা সাদা আলোকরশ্মি।
মুহূর্তে নেই হয়ে গেল গাজুল। সে যেখানে ছিল সেখানে টেনিস বলের সমান একটা রূপালী ধোঁয়ার কুণ্ডলী তৈরি হলো। ধীরে ধীরে উঠে যেতে লাগল ছাতের দিকে।
ঘুরে দরজার দিকে দৌড় মারল মাজুল।
কিন্তু দুই পা-ও যেতে পারল না। সাদা আলোকরশ্মি এসে লাগল তার পিঠে। চোখের পলকে গাজুলের অবস্থা হলো তারও।
হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইল তিন গোয়েন্দা। ডক্টর মুন বাদে সবার চোখে আতঙ্ক দেখতে পেল।
অস্ত্রটা আবার ড্রয়ারে রেখে দিলেন ডক্টর মুন। প্রহরীদের বললেন, নিয়ে যাও এদের। টেকনিশিয়ানদের বলো, রক্ত বদলাক, কিংবা যত খুশি পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাক এদের ওপর। যদি কাজের উপযুক্ত করতে পারে, ভালো, নয়তো গায়েব করে দিক। হাবা দিয়ে আমাদের কোন কাজ হবে না। ওদের বাড়িতে ফেরত পাঠানোরও আর কোন যুক্তি নেই। যাও, নিয়ে যাও।

.

আবার ক্লিনিং রুমে নিয়ে আসা হলো তিন গোয়েন্দাকে।
ঘরে ঢুকেই ঝাড়া দিয়ে হাতটা ছাড়িয়ে নিল মুসা। কিশোরকে যে রোবটটা ধরেছে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিশোরকে ছাড়ানোর পর দুজনে মিলে রবিনকে ছাড়াল। তারপর দিল দৌড়।
আচমকা মুসাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে রবিনকে লক্ষ্য করে ডাইভ দিল কিশোর। তাকে সঙ্গে নিয়ে পড়ল মেঝেতে। ঠিক ওই মুহূর্তে দুটো সাদা আলোকরশ্মি ছুটে গেল ওদের মাথার ওপর দিয়ে। অল্পের জন্যে বাঁচল।
ঘাড় ফিরিয়ে মুসার কি অবস্থা দেখল কিশোর।
মুসাও উপুড় হয়ে শুয়ে আছে মাটিতে।
হাঁচড়েপাঁচড়ে উঠে দাঁড়িয়ে আবার ছুটতে শুরু করল ওরা। পালানোর পথ খুঁজছে।

কোন পথ দেখতে পেল না।
পালানোর কোন উপায় নেই।
একধারে জটলা করছে কয়েকজন রোবটমানব। সেদিকে গেলে ধরা পড়তে হবে নিশ্চিত।
এখানে থাকলে
কিন্তু ভাবার সময় পেল না কিশোর। চিৎকার করে উঠল, সরে যাও!
আবার তিনটে আলোকরশ্মি ছুটে এল ওদের দিকে। অল্পের জন্যে বাঁচল এবারও। কাঁধে আগুনের আঁচের প্রচণ্ড তাপ লাগল কিশোরের। রশ্মিটা সামান্য নিচে নামলেই গায়ে লাগত তার, হাওয়া হয়ে যেত সে।
এদিকে দিয়ে এসো! চিৎকার করে উঠল মুসা।
হতভম্ব একজন রোবট-টেকনিশিয়ানকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে বাঁক নিয়ে কতগুলো বাক্সের পেছনে ঢুকে গেল সে। রবিন ছুটল তার পেছনে।
ক্ষণিকের জন্যে ফিরে তাকাল কিশোর! এগিয়ে আসছে তিন প্রহরী। ওদের হাতে লেজার-পিস্তল উদ্যত। কিন্তু ট্রিগার টিপতে সাহস পাচ্ছে না। কেন সেটা বোঝা যাচ্ছে। টিপলেই রশ্মি গিয়ে লাগবে কাঁচের বাক্সের গায়ে। হাওয়া হয়ে যাবে বাক্সে ভরে রাখা রোবটশিশুরা।
মুসা আর রবিনের মত কিশোরও কাজে লাগাল সুযোগটা। ছুটে বাক্সের পেছনে চলে এল।
দরজাটা চোখে পড়ল। সেদিকেই ছুটছে মুসা আর রবিন। বেরোনো• যাবে ওটা দিয়ে? পেছন থেকে চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল কিশোর।
চেষ্টা করে দেখা যাক। আর তো কোন উপায়ও নেই। ছোটা বন্ধ করল না মুসা।
পেছনে কানে আসছে চিৎকার আর পদশব্দ। দরজার কাছে সময়মত পৌঁছতে পারবে কিনা বুঝতে পারল না কিশোর। ভারী দম নিল সে। তারপর প্রাণপণে ছুটতে শুরু করল দরজাটার দিকে। ছোটাও কঠিন। আয়না বসানো মেঝেতে পিছলে যেতে চায় পা।
ওদের ধরতে না পারায় হই-হট্টগোল আর চিৎকার-চেঁচামেচি বেড়ে গেছে কয়েকগুণ। দুপদাপ পা ফেলে ছুটে আসছে বহু লোক।
খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল মুসা আর রবিন। ওদের সামান্য পরেই কিশোরও বেরোল।
কানে এল মুসার চিৎকার। পরক্ষণেই রবিনের। দেয়ালে গিয়ে ধাক্কা খেয়েছে। মুসা। সামলাতে না পেরে তার গায়ের ওপর গিয়ে পড়েছে রবিন।
সামনে খোলা জায়গা নেই। দরজাও নেই।

মরিয়া হয়ে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে চেঁচিয়ে উঠল কিশোর, আলমারি! একটা আলমারিতে ঢুকেছি আমরা।
তারমানে দরজাটা ছিল মস্ত আলমারির।
আর কোন পথ নেই, ককিয়ে উঠল রবিন। আটকা পড়লাম!
আলমারির দেয়ালে রূপালী রঙের একটা হাতলের ওপর দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে। কিশোরের। আচমকা হাত বাড়িয়ে হাতলটা ধরে হ্যাঁচকা টানে নিচে নামিয়ে দিল।
মুহূর্তে দুদিক থেকে পিছলে সরে এসে লেগে গেল আলমারির দরজা। চালু হয়ে গেল আলমারি।
চেঁচিয়ে উঠল মুসা, আলমারি নয়, আলমারি নয়, কোন ধরনের লিফট।
অনন্তকাল ধরে যেন নেমেই চলল লিফটটা। আসলেই চলছে কিনা যখন সন্দেহ হতে লাগল ওদের, ঠিক সেই সময় ঝাঁকি লাগল। স্থির হয়ে গেল লিফট। পিছলে দুদিকে সরে গিয়ে আবার খুলে গেল দরজা।
লিফট থেকে বেরিয়ে এল ওরা।
ফুটবল মাঠের সমান বিশাল একটা জায়গায় ঢুকল। কাঁচে ঢাকা মস্ত গম্বুজের মত ছাত। অসংখ্য গোলকশান দেখতে পেল সেখানে। সারি দিয়ে রাখা। হেলিকপ্টার কিংবা বিমান রাখার ছাউনির মতই এটা গোলকন রাখার ছাউনি। গোলকগুলোর গায়ে নাম লেখা টাইম ট্রাভেল। আলাদা করে বোঝার জন্যে নম্বর দেয়া রয়েছে, যেমন টাইম ট্রাভেল-১, টাইম ট্রাভেল-২, ইত্যাদি।
সেগুলোর দিকে ছুটল ওরা।
একটা গোলকের ওপর চোখ পড়তেই থমকে দাঁড়াল রবিন। এই কিশোর, দেখো, আমাদেরটা না? নম্বর মিলে যাচ্ছে।
নিচের ঠোঁট কামড়াল কিশোর। গোলকশানটার দিকে তাকিয়ে বলল, সে রকমই তো মনে হচ্ছে। আমাদের নয় ওটা, ডক্টর মুনের। তবে ওটাই নিয়ে গিয়ে লেকের পানিতে লুকিয়ে রেখেছিলাম আমরা।
গোলকনটার দিকে দৌড় দিল সে।
এ জিনিস চালানোর ওস্তাদ হয়ে গেছে এখন মুসা। দরজা খুলে উঠে পড়ল। কিশোর আর রবিন উঠে বসতেই লাগিয়ে দিল দরজাটা। প্রথমেই টিভি মনিটরটা অন করে দিল। ল্যাবরেটরির ভেতর থেকে ছুটে বেরোতে দেখল প্রহরীদের।
কিশোরের দিকে তাকাল মুসা, কোন সুইচটা টিপব? আজ আর ভুল করতে রাজি না।
সেদিনকার কথাটা মনে পড়ে গেছে এখন তিনজনেরই। কিশোর বুঝতে পারল, বুদ্ধি স্বাভাবিক হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হারানো স্মৃতিও ফেরত এসেছে। প্রচণ্ড গরম পড়েছিল সেদিন। মুসা প্রস্তাব দিয়েছিল, লেকের পাড় থেকে হাওয়া খেয়ে

আসতে। কাঁটাতারের বেড়া পেরিয়ে নিষিদ্ধ এলাকায় ঢুকতেই গোলক্যানটার কথা পাড়ল কিশোর। অনেকদিন চড়া হয় না। লেকের পানিতে লুকানো আছে। পানি থেকে তুলে চেপে বসেছিল ওটাতে ওরা। কিশোর প্রস্তাব দিয়েছিল, চড়াই যখন হলো, বেড়িয়ে আসা যাক। কিন্তু কোথায় বেড়াবে? অনেক সুইচের মধ্যে বড় একটা লাল সুইচ আছে। সেটাই টেপার সিদ্ধান্ত নিল। যা থাকে কপালে ভেবে ওই সুইচটাই টিপে দিয়েছিল। এবং তারপর তো কয়েক মাস ধরে চরম ভোগান্তি••এখানে আসার পর ডক্টর মুন ওদেরকে বোকা করে কাউকে সঙ্গে দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। নিজের গোলকনিটা রেখে দিয়েছিলেন এখানেই…
আরে বলো না, কোনটা টিপব? মুসার উত্তেজিত কণ্ঠ ভাবনার জগৎ থেকে বাস্তবে ফিরিয়ে আনল কিশোরকে। জলদি বলো! চলে এসেছে তো ওরা।
নিচের ঠোঁটে ঘন ঘন চিমটি কাটতে লাগল কিশোর। মনিটরের দিকে তাকিয়ে দেখল গোলকযানের কাছাকাছি চলে এসেছে প্রহরীরা। বলল, লালটাই টেপো আবার। টেলিভিশনের সুইচ অন-অফ করার মত মনে হচ্ছে জিনিসটা। একবার টিপলে অন, পরের বার টিপলে অফ। একবার টিপে ডক্টর মুনের। হেডকোয়ার্টারে পৌঁছেছি, নিশ্চয় দ্বিতীয়বার টিপলে আগের জায়গায়-অর্থাৎ যেখান থেকে এসেছে সেই লেকের পানিতে ফিরে যাবে যানটা।
যদি না যায়? অন্য কিছু করে? রবিন বলল।
কিছুই করার নেই, জবাব দিল কিশোর। এখানে থাকলেও মরতে হবে। তারচেয়ে চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি। ঝুঁকিটা নিতেই হবে।
হাত বাড়াল মুসা।
একবার দ্বিধা করে টিপে দিল লাল সুইচটা।
কয়েকটা সেকেন্ড যেন কিছুই ঘটল না। তারপর একটা ঝাঁকুনি। মনিটরে দেখা গেল চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল প্রহরীরা। তারমানে গম্বুজ থেকে বেরিয়ে এসেছে গোলকন।
স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে কিশোরের দিকে তাকিয়ে রবিন বলল, ভাগ্যিস বোকার অভিনয় করার বুদ্ধিটা বের করেছিলে। আর কোনভাবেই ফাঁকি দেয়া যেত না ওদের।
হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করল মুসা, আমার অভিনয়টা কেমন হয়েছে?
এত বাস্তব অভিনয় হলিউডের সবচেয়ে বড় অভিনেতারাও করতে পারবে কিনা সন্দেহ, হেসে বলল কিশোর। ডক্টর মুন তো বটেই, গাজুল-মাজুলের মত রোবটমানবেরাও শেষ পর্যন্ত সেই ফাঁকিতে পড়ে গেল। এরচেয়ে ভাল অভিনয় আর কি হতে পারে?

ঝপ করে পানিতে পড়ার শব্দ হলো একসময়। মনিটরে দেখতে পেল ওরা একটা পরিচিত লেক।
পানিতে ফাপা বলের মত ভেসে রইল গোলকযানটা।
নিরাপদেই রকি বীচে ফিরে এসেছে। কিন্তু বিশ্বাস হতে চাইছে না ওদের। শেষে দরজা খুলে উঁকি দিয়ে দেখে এল রবিন।
জরুরী কণ্ঠে কিশোর বলল, তাড়াতাড়ি এটা ডুবিয়ে দিয়ে চলো পালাই এখান থেকে। বলা যায় না, যে কোন মুহূর্তে টাইম ট্রাভেলার নিয়ে আমাদেরকে ধরতে হাজির হয়ে যেতে পারে ডক্টর মুনের রোবটবাহিনী। চলো চলো, জলদি করো!
যানটাকে তীরের কাছাকাছি নিয়ে আসা হলো। সুইচ টিপে লম্বা মইয়ের মত সিঁড়ি বের করে তীরে ঠেকাল মুসা। নেমে পড়ল তিনজনে। বাকি কাজ। এখন রিমোট কন্ট্রোলের মাধ্যমে সারতে হবে। পকেট থেকে ছোট্ট যন্ত্রটা বের করল কিশোর। গোলক্যানের কন্ট্রোলবোর্ডের ওপরেই রাখা ছিল। নামার আগে পকেটে ভরেছে। সুইচ টিপে প্রথমে মই সূরাল। তারপর দরজা বন্ধ করল। সবশেষে আরেকটা সুইচ টিপতেই নিঃশব্দে পানিতে তলিয়ে গেল যানটা।

.

দুই দিন পর।
স্কুলে হাজির হয়েছে তিন গোয়েন্দা।
মামলায় স্কুল কর্তৃপক্ষ হেরেছে। আবার ভর্তি করে নিতে বাধ্য হয়েছে। তিনজনকে।
অংকের ক্লাসে একটা কঠিন সমীকরণ দিয়ে গম্ভীর মুখে জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার ক্রেগ, কে করতে পারবে? মুসা, তুমি পারবে?
মাথা নাড়ল মুসা, এত কঠিন অংক আমাকে দিয়ে হবে না, স্যার।
অবাক হলেন মিস্টার ক্রেগ। রবিনের দিকে তাকালেন। তুমি পারবে?
চেষ্টা করে দেখতে পারি, স্যার।
ব্ল্যাকবোর্ডে এসে চক দিয়ে অংকটা করল রবিন। ফিরে তাকাল মিস্টার ক্রেগের দিকে।
মাথা ঝাঁকালেন তিনি, ঠিক পথেই এগিয়েছিলে, কিন্তু দুটো জায়গায় ভুল রয়ে গেছে। ক্লাসের দিকে তাকালেন তিনি। ভুল দুটো আর কেউ ধরতে পেরেছ? শুধরে দিতে পারবে?
রয় বা শারিয়া কেউ জবাব দিল না। একমাত্র হাত তুলল কিশোর। সে এসে ঠিক করে দিয়ে গেল অংকটা।
হাসি ফুটল মিস্টার ক্রেগের মুখে। কি ব্যাপার? আজ মুসা পারলই না, রবিন ভুল করল, করতে পারলে কেবল তুমি। সেই আগের মত। ঘটনাটা কি?

হেসে জবাব দিল কিশোর, আবার আমাদের মগজ স্বাভাবিক হয়ে গেছে, স্যার। প্রথমে মগজ ভোতা করার ওষুধ দিয়ে বোকা বানিয়ে দেয়া হয়েছিল আমাদের, তারপর মগজ উন্নত করার ওষুধ খেয়ে হয়ে গেলাম ক্ষতিকর রকম বুদ্ধিমান। দুটো ওষুধের পরস্পরবিরোধী রিঅ্যাকশনেই সম্ভবত আবার স্বাভাবিক পর্যায়ে চলে এসেছে আমাদের মগজ। একেবারে আগের মত। অরিজিন্যাল আমরা।
পরস্পরবিরোধী রিঅ্যাকশনের ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না।
ভাল ব্যাখ্যা আমিও দিতে পারব না, স্যার। তবে বিষে বিষক্ষয়ের মত হয়েছে ব্যাপারটা। এর সঠিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সম্ভবত আঙ্কেল জ্যাক দিতে পারবেন।
হু, মাথা ঝাঁকালেন মিস্টার ক্রেগ। দেখি, একদিন মিস্টার জ্যাককেই গিয়ে ধরব। কি ওষুধ দিয়ে তিনি এই কাণ্ড করিয়েছেন, জানতে হবে। যাই হোক, আবার যে তোমাদেরকে আগের অবস্থায় ফিরে পেয়েছি, এতে আমি খুব খুশি। ক্লাসের দিকে তাকালেন তিনি। তোমরা কি বলো?
হাততালি দিয়ে মিস্টার ক্রেগের কথা সমর্থন করল সবাই।

ভলিউম ৬০ – শুঁটকি বাহিনী – তিন গোয়েন্দা – রকিব হাসান
প্রথম প্রকাশ: ২০০৫
গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে সাইকেল চালাচ্ছে মুসা। হঠাৎ এমন বিকট এক চিৎকার দিয়ে উঠল, আশেপাশে কেউ থাকলে রীতিমত আঁতকে যেত।
তার মনে হলো, ঘাড়ের ওপর একটা মাকড়সা পড়েছে। রোমশ পায়ের খোঁচা লাগছে।
ঝট করে হাত উঠে গেল ঘাড়ের কাছে। কাত হয়ে পড়ে যাচ্ছিল সাইকেলটা। ব্রেক কষে পা নামিয়ে দিয়ে দাঁড় করাল।
হাত দিয়ে বুঝল, মাকড়সা নয়, একটা মরা পাতা। প্রচণ্ড রাগ হলো। দলামোচড়া করে ছুঁড়ে ফেলে দিল পাতাটাকে।
রাগ হলো নিজের ওপরও। ডাক্তারের কথার প্রতিধ্বনি করল সে মনে মনে, দেখো, মুসা, এই অকারণে ভয় পাওয়াটা ছাড়তে হবে তোমাকে। নইলে কোনদিনই আর স্বাভাবিক জীবন ফিরে পাবে না। ভয়কে প্রশ্রয় দিলেই ভয় বাড়ে। যত দিন যাবে, এই ভয় পাওয়ার রোগটা বাড়তেই থাকবে তোমার। মনে রেখো, বার বার মানুষের একই দুর্ঘটনা ঘটে না।
কিন্তু যদি ঘটে!
নিজেকে আবার ধমক লাগাল মুসা। গ্রীনহিলসে থাকতে স্কুলে তোতলা মুসা খেতাব হয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয় খেতাবটা ছিল ভূত-কাতুরে। দুটোরই কারণ-ভয়।
এখানেও যদি সেটা চালু করতে না চাও তো সাবধান হয়ে যাও আজকে থেকেই, নিজেকে বোঝাল সে। নিজেই নিজের ভীতুপনার কথা ঢোল পিটিয়ে জানিয়ে দিও না। জানতে দিও না তুমি পোকা-মাকড় দেখলে ভিরমি খাও, ভূত দেখলে বেহুঁশ; ভয় পেলে তোতলানি ছাড়া কথা বেরোতে চায় না!
গ্রীনহিলস থেকে চলে এসেছে মুসারী। তার বাবা এখন থেকে রকি বীচেই কাজ করবেন ঠিক করেছেন। রবিনরা এসেছে আরও আগেই।
রকি বীচ মিডল স্কুলে পড়ে রবিন আর কিশোর। মুসাও সেখানেই ভর্তি হয়েছে। আজ তার নতুন স্কুলে প্রথম দিন।
গাছপালার ভেতর দিয়ে চলে গেছে পথ। সকালের ঠাণ্ডা বাতাস লাগছে গালে। সূর্যটা এখনও একটা লাল বলের মত বাড়িঘরের ছাতের ওপর ভাসছে। গাছের পাতায় উজ্জ্বল লাল আর হলুদের মিশ্রণ। এ বছর শীতটা বোধহয় তাড়াতাড়িই পড়তে যাচ্ছে।
একটা বড় গাড়ি চলে গেল পাশ দিয়ে। তাতে বোঝাই ছেলেমেয়ে আর কুকুর। ছেলেমেয়েগুলোও চেঁচামেচি করছে, কুকুরগুলোও। পাল্লা দিয়ে। মুসাকে দেখে

জানালার কাঁচে থাবা তুলে দিয়ে ঘেউ ঘেউ শুরু করল একটা কুকুর। একটা মেয়ে জানালা দিয়ে হাত বের করে নাড়ল তাকে উদ্দেশ্য করে।
চেনে না, অতএব হাত নাড়ার জবাব দিল না মুসা। গীয়ার বদল করল। রাস্তা এখানে বেশ ঢালু।
কিছুদূর এগিয়ে দেখল রাস্তার দুই পাশ ধরে হাঁটছে বেশ কিছু ছেলেমেয়ে। পরনে পরিষ্কার জামা-কাপড়। পিঠে ব্যাকপ্যাক। কলরব করতে করতে স্কুলে চলেছে ওরা। বেশির ভাগই তার বয়েসী।
ওদের দিকে নজর থাকায় রাস্তার পাথরটা চোখে পড়েনি তার। সামনের চাকার নিচে পড়ল। লাফিয়ে উঠল চাকা। অনেক চেষ্টা করেও কোনমতেই সামলাতে পারল না। পড়ে গেল।
পাকা রাস্তায় পড়েছে। প্রচণ্ড ব্যথা পেল। ঝটকা দিয়ে দুই হাত উঠে গেল ওপর দিকে। সাইকেলটা পড়ল তার গায়ের ওপর। হ্যাঁন্ডেলের একটা পাশ খোঁচা মারতে লাগল পাঁজরে।
ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল সে। সাইকেলটা ঠেলে সরাতে গেল গায়ের ওপর থেকে।
এই সময় গাড়িটাকে আসতে দেখল।
একটা বাচ্চার তীক্ষ্ণ চিৎকার কানে এল। গাড়িতে রয়েছে বাচ্চাটা।
মাথা উঁচু করল মুসা।
পেছনের সীটে বসা বাচ্চাটাকে দেখতে পেল। ড্রাইভিং সীটে কেউ নেই।
ঢাল বেয়ে সোজা তার দিকে ছুটে আসছে গাড়িটা। ক্ষণিকের জন্যে হতবুদ্ধি হয়ে গেল মুসা। আতঙ্কিত।
বাচ্চাটার চিৎকার বাস্তবে ফিরিয়ে আনল তাকে। চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। সাইকেলের হ্যাঁন্ডেলটা কাত হয়ে পড়ল রাস্তার ওপর। পা দিয়ে ঠেলে যতটা পারল সরিয়ে দিল রাস্তা থেকে। গাড়ির চাকার নিচে পড়লে আর চালানোর যোগ্য থাকবে না।
দ্রুত নেমে আসছে গাড়িটা।
রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে চোখ মিটমিট করতে লাগল মুসা। সত্যি কি ড্রাইভার নেই?
ভাল করে দেখল। না, সত্যি নেই।
মাত্র কয়েক ফুট দূরে আছে আর গাড়ি।
চিৎকার করে কাঁদছে বাচ্চাটা।
আরেকটা চিৎকার কানে এল মুসার। ওপর দিকে রাস্তার মাথার দিকে তাকাল সে। আমার খোকা! আমার খোকা! বলে চিৎকার করতে করতে পাগলের মত

ছুটে আসছে এক মহিলা। হাত ছুঁড়ছে ওপর দিকে। সোনালি চুল ঝাঁকি খাচ্ছে ঘাড়ে। লাল জ্যাকেটের কোনা বাতাসে উড়ছে।
বড় করে দম নিল মুসা। সরে গেল একপাশে।
আসছে গাড়িটা! আসছে!
ভাবছে না সে। ভেবেচিন্তে কাজ করার সময় নেই এখন।
নিজেকে তৈরি করে নিল সে। শক্ত হয়ে গেল প্রতিটি মাংসপেশি।
গাড়িটা পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় হাত বাড়িয়ে ধরতে গেল ড্রাইভারের পাশের দরজার হাতল।
মিস করল।
দরজায় বাড়ি লাগল হাতটা। প্রচণ্ড ব্যথা পেল। কিন্তু টু শব্দ করল না। ঝাঁপ দিল গাড়িটাকে লক্ষ্য করে। বডিতে বাড়ি খেয়ে পড়ে গেল রাস্তার ওপর। হাঁটুতেও ব্যথা পেল। তা-ও শব্দ করল না।
চেঁচামেচি কানে আসছে রাস্তার দুই পাশ থেকে। মুখ ফিরিয়ে মহিলাকে দেখতে পেল। বাচ্চার নাম ধরে চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে আসছে।
গাড়ির দিকে তাকাল মুসা। দ্রুত গড়িয়ে নেমে যাচ্ছে। নিচের দিকে রাস্তার শেষ মাথায় আরেকটা রাস্তা আড়াআড়ি ক্রস করেছে প্রথমটাকে। লাল ট্র্যাফিক লাইট জ্বলছে। রাস্তা পেরোচ্ছে ছেলেমেয়েরা। বেশ ভিড় ওখানটায়।
জলদি ওঠো, মুসা!-নিজেকে তাগাদা দিল সে। বাচ্চাটাকে বাঁচাও!
লাফিয়ে উঠে দৌড় দিল মুসা। ঢাল বেয়ে ছোটা কঠিন। রাস্তায় পড়ে আছে আলগা পাথর। পা পড়লেই সড়াৎ। কোন কিছুই দমাতে পারল না। তাকে। মাথা ঘুরছে। বাচ্চাটার তীক্ষ্ণ চিৎকার বাজছে কানের পর্দায়। পৌঁছে গেল গাড়ির কাছে।
পেছনে থেকে কিছুই করতে পারবে না। পাশে যেতে হবে।
দুই হাত সামনে বাড়িয়ে প্রাণপণে দৌড়াতে লাগল।
হাতলটা ধরতে চায়।
নাহ! আর বোধহয় পারা গেল না! পারল না ধরতে!
চোখ পড়ল রাস্তা পেরোতে থাকা ছেলেমেয়েগুলোর ওপর।
সরো! সরো তোমরা! ওদের উদ্দেশে চিৎকার করে উঠল সে।
গাড়ির পেছনের জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে খুদে খুদে গোলাপী রঙের আঙুলগুলো দিয়ে কাঁচ আঁকড়ে ধরার ব্যর্থ চেষ্টা করছে বাচ্চাটা।
নিজের অজান্তেই গতি বেড়ে গেল মুসার।
জোরে…আরও জোরে…
থাবা দিয়ে ধরতে গেল আবার হাতলটা। আবার মিস করল!

তৃতীয়বারের চেষ্টায় ধরে ফেলল হাতলটা। শক্ত হয়ে চেপে বসল আঙুলগুলো। ছাড়ল না কোনমতেই। গাড়ির পাশে পাশে দৌড়াচ্ছে। একই সঙ্গে টেনে খোলার চেষ্টা করছে দরজাটা।
খুলে গেল দরজা।
মাথা নিচু করে ডাইভ দিল সে। গীয়ে পড়ল সীটের ওপর।
হাত ছুঁড়ছে আর চিৎকার করছে বাচ্চাটা। জড়সড় হয়ে আছে পেছনের সীটে।
সেদিকে তাকানোর সময় নেই। গাড়ির মধ্যে নিজেকে ঠেলেঠুলে সোজা করল মুসা। পা নেমে গেল নিচের দিকে। ব্রেক প্যাডালটা ছুঁতে চাইছে।
পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চেপে ধরল ওটা।
দুলে উঠল গাড়ি। হোঁচট খেয়ে দাঁড়িয়ে গেল। ভয়াবহ ঝাঁকুনি।
ড্যাশবোর্ডে ঠুকে গেল মুসার কপাল। তীব্র ব্যথা ছড়িয়ে গেল সমস্ত শরীরে। যন্ত্রণায় আপনাআপনি চিৎকার বেরিয়ে এল মুখ থেকে। বুজে গেল চোখের পাতা।
গাড়ির প্রচণ্ড ঝাঁকুনি থামিয়ে দিয়েছে বাচ্চাটার চিৎকারও। সীটবেল্ট না থাকলে উড়ে এসে পড়ত সামনের দিকে। যত চিৎকার-চেঁচামেচি এখন গাড়ির বাইরে। কারও মুখ বন্ধ নেই।
আনন্দ আর স্বস্তি জুড়িয়ে দিল যেন মুসার শরীর। পেরেছে সে! সময়মত থামাতে পেরেছে গাড়িটা!
সারা গায়ে ব্যথা। কপাল দপদপ করছে। মাথা ঘুরছে বনবন করে। তুলে রাখতে পারছে না। চোখের সামনে সব যেন উজ্জ্বল লাল। লাল বদলে। সাদা হলো। সাদা আলোটা হাতুড়ির মত বাড়ি মারছে যেন মাথার মধ্যে।
বেহুশ হয়ে যাচ্ছে, বুঝতে পারল।
মায়ের চিৎকার চমকে দিল তাকে। চোখের সামনে থেকে সাদা পর্দার মত সরে গেল বিচিত্র আলোটা। কানের পেছনে চিৎকার করে উঠেছেন মা, আমার খোকা! আমার খোকা!
টের পাচ্ছে মুসা, ঝটকা দিয়ে খুলে গেল পেছনের দরজা। গাড়িতে মাথা ঢুকিয়ে দিয়েছেন মহিলা। বাচ্চার সীট-বেল্ট খুলে নিয়ে তাকে কোলে তুলে নিলেন।
আপ্রাণ চেষ্টা করছে মুসা, যাতে বেহুঁশ না হয়। শরীর কাঁপছে থরথর করে।
অবশেষে মাথা সোজা করল সে। হ্যান্ডব্রেক তুলে দিয়ে বেরিয়ে এল গাড়ি থেকে। টলে উঠল। মাথা ঘুরছে এখনও। কপালে হাত বোলাল।
গাড়িটাকে ঘিরে ধরেছে ছেলেমেয়েরা। একযোগে কলরব করছে সবাই। সবার চোখ মুসার দিকে।

বাচ্চাকে বুকের সঙ্গে চেপে ধরে ছুটে এলেন মা।
এত সাহসী ছেলে জীবনে দেখিনি আমি! বাচ্চার গা থেকে একটা হাত সরিয়ে এনে সে-হাতে জড়িয়ে ধরলেন মুসাকে। তোমার মত সাহস দুনিয়ায় আর কারও নেই! ঘোষণা করে দিলেন তিনি। কি নাম তোমার, বাবা?
মুসা আমান! কোনমতে বলল মুসা। উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় কান গরম হয়ে যাচ্ছে তার।
এগিয়ে এল স্কুলের ছেলেমেয়েরা। কেউ প্রশংসা করতে লাগল, কেউ বা চাপড়ে দিল পিঠ।
দুই গাল বেয়ে পানির ধারা নেমেছে মায়ের। গাড়ি থেকে নেমে একটা চিঠি পোস্ট করতে গিয়েছিলাম, জানালেন তিনি। হ্যান্ডব্রেকটা তুলে দিতে ভুলে গিয়েছিলাম হয়তো। কি মনে হতে ফিরে তাকিয়ে দেখি গাড়িটা নেমে যাচ্ছে...শুধু আমার ছেলেটাকেই না, কতজনকে যে তুমি আজ বাঁচিয়ে দিলে, মুসা!
তাই কি! বিড়বিড় করল মুসা। প্রচণ্ড শকটা হজম করতে সময় নিচ্ছে। মাথা ঘোরা সারেনি এখনও। পায়ের নিচে যেন মাটি নেই। শূন্যে ভাসছে সে।
মুসাকে ছেড়ে দিয়ে বাচ্চাকে বুকের এক পাশ থেকে আরেক পাশে সরালেন মা। ভিড়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, মুসা করলটা কি দেখলে তোমরা? সাইকেল থেকে চলন্ত গাড়িতে ঝাঁপ-এমন দৃশ্য কেবল সিনেমাতেই দেখা যায়।
না না, ঠিক বলেননি আপনি!-বলতে চাইল মুসা, ঘটনাটা ঠিক এ ভাবে ঘটেনি। কিন্তু কথা বেরোল না মুখ দিয়ে। সবাই তাকিয়ে আছে তার দিকে। প্রশংসা করছে। পিঠ আর কাঁধ চাপড়ানোর ধুম পড়ে গেছে। প্রতিবাদ করারও সুযোগ পেল না সে।
আরেকটু হলে নিজেই মরত! বলে চলেছেন মুহিলা। কিন্তু অন্যকে বাঁচানোর জন্যে প্রাণের পরোয়া করেনি। অত সাহস জীবনে দেখিনি আমি!
মহিলার কথা সমর্থন করে সম্মিলিত চিৎকার উঠল।
দুই হাত জিনসের পকেটে ঢুকিয়ে দিল মুসা। দেহের কাঁপুনি থামানোর চেষ্টা করছে।
নিজেকে ওর অত সাহসী লাগছে না। হিরো মনে হচ্ছে না। কারণ ঘটনাটা ঘটেছে অন্যভাবে। লাফ দিয়ে সাইকেল থেকে গাড়ির ওপর পড়েনি। বরং সাইকেল থেকে পড়ার পর গাড়িটাকে ছুটে আসতে দেখে নিজেকে বাঁচানোর জন্যে লাফিয়ে সরে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু পেছনের সীটে অসহায় বাচ্চাটাকে দেখে কি যেন কি হয়ে গিয়েছিল, ছুটতে শুরু করেছিল পেছন পেছন...ব্যস, ওই পর্যন্তই।
চিৎকার-চেঁচামেচি, স্বাগত জানানোর পালা চলছেই। কেউ থামতে চাইছে না।

মুখ বন্ধ রেখেছে মুসা। কপাল ব্যথা সত্ত্বেও মুখে হালকা একটা হাসি ফোঁটাতে বাধ্য হলো। সবাই এখন তাকে ছেড়ে সরে গেলে বাঁচে। স্বস্তিতে দম নিতে পারে।
কিন্তু আবার তাকে জড়িয়ে ধরলেন মহিলা। আরেকবার কতজ্ঞতা জানালেন। তারপর গাড়ির দিকে এগোলেন। বাচ্চাকে আবার পেছনের সীটে বসিয়ে সীট-বেল্ট আটকে দিতে লাগলেন।
কাঁধের ওপর আরেকটা হাত পড়ল। চাপ বাড়ল আঙুলগুলোর। কানের কাছে শুনতে পেল পরিচিত কণ্ঠস্বর, মুসা!
ফিরে তাকাল মুসা। হাসিমুখে তার দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর পাশা।
হাঁপ ছেড়ে বাঁচল মুসা।
টেনে তাকে ভিড়ের ভেতর থেকে সরিয়ে নিয়ে চলল কিশোর। এদিক ওদিক তাকিয়ে ডাক দিল, রবিন, এসো তো এদিকে! ওকে ধরো! কিভাবে টলছে দেখো,। পড়ে যাবে।
গাড়ির ড্রাইভিং সীটে বসে ফিরে তাকালেন মহিলা। কিশোরর কথা কানে গেছে। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, ডাক্তারের কাছে নেয়া লাগবে?
না না, লাগবে না! তাড়াতাড়ি জবাব দিল মুসা। বসলেই ঠিক হয়ে যাবে।
রাস্তার পাশে মুসাকে নিয়ে এল কিশোর আর রবিন।
সামনে এসে দাঁড়াল দুটো ছেলে। একজন ঢ্যাঙা, গায়ে মাংস বলতে নেই। মুখে প্রচুর তিল। পরনে নীল শার্ট, ফেড জিনস, দুই হাঁটুর কাছে ইচ্ছে করে ছিঁড়ে রাখা-স্মার্টনেস-যা দুচোখে দেখতে পারে না মুসা; ভিখিরি মানসিকতা মনে হয়। খোঁচা খোঁচা চুল। এক কান ফুটো করে তাতে একটা রূপার রিঙ পরেছে।
সঙ্গের ছেলেটা খাটো, মোটা, লম্বা লম্বা চুল। নাকের ওপর মস্ত এক আঁচিল। চোখের পাতা সরু সরু করে মুসাকে জিজ্ঞেস করল, হিরোগিরি দেখানোর নেশা আছে মনে হয় তোমার?
টেরা কথা শুনে চোখ গরম করে তাকাল মুসা, কে তুমি?
খিকখিক করে হাসল সঙ্গের ঢ্যাঙা ছেলেটা। হাসিটা শুনলে রাগ লাগে। সঙ্গীকে ধমক দিয়ে বলল, আই, টাকি, থামো তো তুমি! মুসার দিকে তাকাল, ও একটু বেশি কথা বলে। ওর কথায় কিছু মনে কোরো না। হাত বাড়িয়ে দিল, আমি টেরিয়ার ডুয়েল।
হাতটা ধরল মুসা। পাশে তাকিয়ে দেখল কিশোর আর রবিন গম্ভীর।
টেরির দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচাল কিশোর, কেন ওকে নিয়ে টানাটানি করছ, শুঁটকি দেখছ না ওর শরীর খারাপ লাগছে?
তুমি আবার এর মধ্যে কথা বলতে আসো কেন, টেটনা শার্লক? মুসাকে দেখিয়ে বলল, হিরোদের আমার পছন্দ। কারণ আমি নিজেও একজন হিরো তো।

অবশ্যই ওকে আমার দলে নিয়ে নেব। মুসার দিকে তাকাল, আজই স্কুলে প্রথম যাচ্ছ, তাই না?
মাথা ঝাঁকাল মুসা।
হাসিমুখে টেরিকে বলল কিশোর, তোমার অবগতির জন্যে জানানো দরকার, শুঁটকি, মুসা আমান আমার অনেক পুরানো বন্ধু। গ্রীনহিলস থেকে এসেছে ও। বিশ্বাস না হলে রবিনকে জিজ্ঞেস করে দেখো।
রবিনের দিকে তাকাল টেরি।
মাথা ঝাঁকাল রবিন, হ্যাঁ।
মুখের আলো দপ করে নিভে গেল টেরির। হাসি উধাও। আঙুল ঢিল হয়ে গেল টেরির। খসে পড়ে গেল মুসার হাতটা। বড়ই হতাশ। ভেবেছিল, মুসার মত একজনকে দলে টেনে নিতে পারলে তার দলের সুনাম বাড়বে, শক্তিশালী হবে দল। কিন্তু টেটনা শার্লকটা যে আগেই ওকে বগলদাবা করে বসে আছে, কে জানত!
মুহূর্তে কিশোর আর রবিনের মত মুসাও টেরির শত্রু হয়ে গেল। চোখের পাতা সরু সরু করে মুসার দিকে তাকাল সে। বলল, হিরো না ছাই! মহিলাটা একটা ইয়ে। এমন সাহস নাকি আর জীবনে দেখেনি! আহা!
মুসাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল কিশোর, কেন, চোখের সামনেই তো দেখলে কি কাণ্ডটা করল! এরপরেও অবিশ্বাস? তোমার দলের সমস্ত ছুঁচোগুলোর সাহস এক করলেও মুসার সমান হবে না, তা জানো?
তাই নাকি? খিকখিক করে হাসল টেরি। ভাল জমবে মনে হচ্ছে। এবার!
চ্যালেঞ্জ করছ?
করছি।
সাহস নেই, সাফ বলে দিল টাকি।
অ্যাই, তুমি থামো, টাকিমাছ!
বাংলা শব্দটা বোঝে না টাকি। গর্জে উঠল, রোজই ট্যাকিমাছ ট্যাকিমাছ করো! পেয়েছ কি? কোন্‌দেশী গালি এটা? আজ তোমাকে বলতেই হবে! কি মানে এর?
গালি নয়, বাংলাদেশী একটা অতি লোভনীয় খাবারের নাম এটা, হেসে জানিয়ে দিল রবিন। টাকি হলো এক ধরনের মাছ, মরিচ-পেঁয়াজ দিয়ে ভর্তা করে খেতে নাকি খুব টেস্ট। ঠিক আছে, বাংলা পছন্দ না হলে ইংরেজিতেই ডাকা হবে তোমাকে। ট্যাকি-ফিশ! কি, এবার ভাল লাগছে নামটা!
বিকৃত হয়ে গেল টাকির মুখ। দেখিয়ে ছাড়ব একদিন কে কাকে ভর্তা বানিয়ে খায় …

আহা, তোমরা এমন ঝগড়া শুরু করলে কেন… কথা শেষ না করেই বিকট এক চিৎকার দিয়ে উঠল মুসা। থাবা মারল পায়ে। সুড়সুড়ির কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখল, লম্বা একটা ঘাসের ডগা লেগেছিল পায়ে। লজ্জা পেয়ে হাসল। আমি মনে করেছিলাম শুয়াপোকা…।
ভুরু কুঁচকে গেছে টেরির। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল মুসার দিকে। ধীরে ধীরে পাতলা হাসি ফুটল ঠোঁটে। কিশোরের দিকে ফিরে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, কই, ভয় নাকি পায় না?
এটাকে কি ভয় বলে?
তাহলে কি বলে?
চমকে যাওয়া, গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিল কিশোর। পায়ে সুড়সুড় করলে তুমিও থাপ্পড় মারবে।
মারব, কিন্তু চিৎকার করব না।
দেখাব পায়ে লাগিয়ে? রবিন, ওই ফুল গাছটাতে দেখলাম কালো কালো শুয়াপোকায় ভরে গেছে। কিলবিল করছে। এত বড় বড় লোম। যাও তো, কাঠিতে করে নিয়ে এসো তো একটা।
রবিন যাওয়ার জন্যে পা বাড়াতেই হাত তুলল টেরি, থামো, থামো…দাঁড়াও! কিশোরের দিকে তাকাল। গাল চুলকাল এক আঙুলে। তারমানে তোমার দোস্ত ভয় পায় না বলতে চাও?
হ্যাঁ, চাই। মনে মনে মুসার মুণ্ডপাত করছে কিশোর। প্রথম পরিচয়েই দিয়েছে নিজের দুর্বলতা টেরির কাছে ফাঁস করে।
টাকি বলল, প্রমাণ দিতে পারবে?
উত্তেজনায় টেরির গালের তিলগুলো যেন ঝিকমিক করে উঠল লাল কালো তারার মত। মুহূর্তে শয়তানি বুদ্ধি খেলে গেল ওর কুটিল মগজে। ঠিক, ঠিক, প্রমাণ! বাজি হয়ে যাক একটা!
বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে ভেবে আবার থামাতে গেল মুসা, না না, প্লীজ…
তুমি থামো! মুসাকে কথাই বলতে দিল না কিশোর। তুমি এখানকার হালচাল কিছু জানো না। যা বলার আমি বলছি। টেরির দিকে তাকাল, কত টাকা?
টাকির দিকে তাকাল টেরি। দুজনের মুখেই কুটিল হাসি।
ঘড়ি দেখল টেরি। কিশোরের দিকে মুখ তুলল, তোমার যত ইচ্ছে। ভয় পেলে বাজিতে হারবে কালটু-আমান। টাকাটা কার পকেট থেকে দেবে সেটা তোমাদের মাথাব্যথা।…এই টাকি, চলো। স্কুলের দেরি হয়ে যাচ্ছে।
.

দূর, টিভিতে কিছু নেই, বিরক্ত হয়ে রিমোটটা সোফার ওপর ছুঁড়ে ফেলল কিশোর। কম্পিউটার গেমগুলোও বিরক্তিকর! কি করা যায় বলো তো?
চুপ করে রইল মুসা আর রবিন। কি করলে ভাল লাগবে ওরাও বুঝতে পারছে না।
কিশোরদের লিভিং-রূমে বসে আড্ডা দিচ্ছে তিন গোয়েন্দা।
শনিবারের ধূসর এক বিকেল। ঘরের জানালায় একটানা আঘাত হেনে চলেছে বৃষ্টির ফোঁটা। পেছনের আঙিনায় পুরু হচ্ছে খসে পড়া পাতার আস্তর। প্রবল বাতাসে কেঁপে কেঁপে উঠছে গাছের ডালগুলো।
চিলেকোঠায় যাবে? জিজ্ঞেস করল কিশোর। জায়গাটা দারুণ। অন্ধকার। ছমছমে। যত দুনিয়ার বাক্স-পেটরা আর পুরানো জিনিসে বোঝাই। প্রচুর বইপত্র-ম্যাগাজিন। এক ধরনের উত্তেজনা আছে চিলেকোঠায়।
না রে, ভাই, আমি ওখানে যাব না, সাফ মানা করে দিল মুসা।
যে কোন অন্ধকার জায়গাকে তার ভয়। সেটা চিলেকোঠাই হোক আর পাতাল-ঘর। আলোকিত ঘরে থাকাটাই তার পছন্দ।
তাহলে আর কি করা! ভিডিওতে সিনেমা দেখি। উঠে ওপাশের দেয়াল ঘেঁষে রাখা আলমারিটার সামনে চলে গেল কিশোর।
প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ল বাইরে। কেঁপে উঠল মুসা। ভয় ভয় লাগছে। তার। সাপকে ভয়, মাকড়সাকে ভয়, পোকা-মাকড়, ইঁদুর, অন্ধকার, ভূত, আরও অনেক কিছুকে ভয়। ইদানীং বজ্রপাতকেও ভয় পায়।
আলমারি থেকে কয়েকটা ভিডিও ক্যাসেট বের করে আনল কিশোর।
একটা ক্যাসেট হাতে নিয়ে ওপরে লাগানো ট্যাগটা পড়ল মুসা। সবগুলোই হরর ছবি নাকি?
মাথা ঝাঁকাল কিশোর, হ্যাঁ।
তাহলে আমি দেখব না।
রবিনের দিকে তাকাল কিশোর, তুমি?
আমার আপত্তি নেই। কিন্তু মুসা যদি ভয় পায়....একজনকে সারাক্ষণ ভয়ের মধ্যে রেখে ছবি দেখে আমরাও মজা পাব না।
হতাশ হয়ে ক্যাসেটগুলো টেবিলের ওপর রেখে দিল কিশোর। মুসাকে নিয়ে এক বিরাট সমস্যা হয়েছে। এত ভয় পেলে কি করা! কোন রহস্যের সমাধান করতে গেলেও মনে হচ্ছে আর যোগ দিতে পারবে না মুসা। যা করতে দেয়া হবে তাকে, ভয়ে পিছিয়ে আসবে।
কি করবে ভাবছে, এই সময় চমকে দিল দরজার ঘণ্টা। বেজে উঠল টুং-টাং টুং-টাং করে।
চাচা-চাচী মার্কেট থেকে ফিরল নাকি? না, এত তাড়াতাড়ি তো ফেরার কথা নয়।

ফিরে তাকাল কিশোর।
আই, দরজা খোলো, মু-স্মুসা! শোনা গেল একটা তীক্ষ্ণ কণ্ঠ। আমরা জানি, তুমি এখানে বসেই আড্ডা দিচ্ছ।
শুঁটকি টেরির গলা। চিনতে পারল তিনজনেই।
চোখ বড় বড় হয়ে গেল মুসার। তাকে মু-স্মুসা বলে ডেকেছে! শুঁটকি জানল কিভাবে?
কিশোরও অবাক। উঠে গেল দরজা খুলে দিতে।
ঘরে ঢুকল টেরি, টাকি এবং আরও তিনজন। হাত দিয়ে রেনকোট থেকে বৃষ্টির পানি ঝাড়তে লাগল টাকি। ভেজা জুতো নিয়েই উঠে আসতে গেল কর্পেটের ওপর। হাতটা বাড়িয়ে ঠেকিয়ে দিল কিশোর। বাড়ি বয়ে এসেছে, শত্রু হলেও অদ্রতা করল না। সৌজন্য দেখিয়ে ওদের ভেজা রেনকোট আর ম্যাকিনটশগুলো রেখে এল হ্যাঁঙারে। জুতোর তলা ভালমত মুছিয়ে নিল ডোরম্যাটে। কার্পেটে কাদা-পানি দেখলে কাউকেই আস্ত রাখতেন না মেরিচাচী। সবচেয়ে বেশি বকাটা খেতে কিশোর।
খোঁচা খোঁচা চুল থেকে আঙুল দিয়ে পানি ঝাড়ল টেরি। মুসার দিকে তাকিয়ে হাসল। মুসার মনে হলো, ইবলিসের হাসি।
মুসার হাতের পপকর্নের বাটি থেকে এক খাবলা পপকর্ন তুলে নিয়ে মুখে পুরল।
হাই, মু-স্মুসা! ভুরু নাচাল লাল-চুল একটা ছেলে, ওর নাম কডি। তার সঙ্গী বাকি দুজন নিটু আর হ্যারল্ড ফ্যাকফ্যাক করে হাসল।
সব একই ক্লাসে পড়ে, মুসাদের ক্লাসে। হাসি, কথাবার্তা, আচরণে টেরির ফটোকপি একেকটা। সেজন্যেই দোস্ত হতে পেরেছে। টেরি ওদের নেতা হবার যথেষ্ট কারণ আছে। টেরির বাবার অনেক টাকা। টেরি হাত খরচ পায় প্রচুর। সেগুলো দুই হাতে খরচ করে বন্ধুদের পেছনে। নেতা হবার প্রধান কারণ সেটাই।
মু-স্মুসা ডাক শুনে পেটের মধ্যে খামচে ধরল মুসার। হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসতে চাইছে।
আ-আ-আমাকে এ রকম করে ডা-ডা-ডাকছ কেন? রাগ করে বলল মুসা।
যে-যে-যে রকম করে কথা বলছ, সে-সে-সে রকম করেই তো ডাকছি! খিকখিক করে হাসল টেরি। ভেবেছ জানি না? গ্রীনহিলসে যে স্কুলে পড়তে তুমি, সেটাতে পড়ে আমার কাজিন নিনা। আবার পপকর্ন নেয়ার জন্যে হাত বাড়াল সে।
বাটিটা সামনে বাড়িয়ে দিল মুসা। তাতে কি? চেহারা স্বাভাবিক রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করছে।
বাটিটা নিজের হাতে নিয়ে নিল টেরি। কিছুক্ষণ চুপচাপ চিবাল। অপেক্ষা করিয়ে রাখল মুসাকে। তারপর মুচকি হেসে বলল, নিনা আমাকে সব বলে দিয়েছে, মু-

ম্যুসা। পোকা-মাকড় থেকে শুরু করে দুনিয়ার তাবৎ জিনিসকে ভয় পাও তুমি। ভয় পেলে তোতলাতে থাকো। নিজের ছায়া দেখলে প্যান্ট ভিজিয়ে ফেল।
হাঁ করে ওর দিকে তাকিয়ে আছে মুসা।
নিনা আমাকে বলেছে, গত বছর দুপুরবেলা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলে। রাস্তায় মানুষ ছিল না। নিনা আর তার এক বান্ধবী বনের ভেতর থেকে নাকি স্বরে কথা শুরু করল। তুমি নাকি বেদিশা। পাশের খালে দিলে ঝাঁপ। সাতরে ওপারে উঠে প্রায় বেহুশ। এমন কাণ্ড করেছিলে, তুমি মরে গেছ। ভেবে ভড়কে গিয়ে নিনা আর তার বান্ধবী ঝেড়ে দিয়েছিল দৌড় বাড়ির দিকে।
মুখ কাচুমাচু করে কিছু বলতে যাচ্ছিল মুসা, তাকে থামিয়ে দিয়ে হো হো করে হেসে উঠল কিশোর। মিথ্যে বলার আর জায়গা পেলে না! ভূতের ভয়ে পানিতে ঝাঁপ দেবে মুসা আমান? ভূতের ঘাড় মটকে দেবে। কতদিন অমাবস্যার রাতে ভূত খুঁজে বেড়িয়েছে ও। আর তুমিও যেমন, টেরি! তোমার মিথ্যুক বোনটা এসে কি না কি বানিয়ে বলল, আর তুমিও তার কথা বিশ্বাস করলে। অবশ্য তোমার আত্মীয় তো, ভাল আর কোত্থেকে হবে। কিংবা হয়তো নিনা কিছুই বলেনি, তুমি নিজেই বানিয়েছ। মুসাকে হিংসে করো তুমি। ওর মতো দুঃসাহসী তুমি আরও চোদ্দবার জন্মালেও হতে পারবে না।
কিশোরের দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচাল টাকি। মুখে হাসি। তাই নাকি? তাহলে স্কুলে তোতলা মুসা খেতাব হয়ে গিয়েছিল কেন? মু-ম্যুসা বলে খেপাত কেন?
টা-টা-টা-ট্রাকির মত শয়তানগুলো সবখানেই আছে বলে।
তোমার সঙ্গে কথা বলছি নাকি? মুসার দিকে তাকাল টাকি। কেন খেপাত, বলো? নাকি এটাও মিথ্যে?
ঘেমে যাচ্ছে মুসা। গ্রীনহিলসে থাকতে শেষ দিকে সহপাঠীদের খেপানোর জ্বালায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে গিয়েছিল তার। ভেবেছিল, রকি বীচে এসে বাঁচল। কিন্তু অত্যাচারটা তো এখানে আরও বেশি হবে মনে হচ্ছে! বলতে গেল, আসলে একদিন একটা মা-মা-মা-মা-মা...
টাকির শয়তানি ভরা হাসিটা চওড়া হলো। কালো চোখের তারায় ঝিলিক। জিভ দিয়ে চুক চুক শব্দ করল। কথা বের করতে পারছ না? আহারে! মোলায়েম কণ্ঠে বলল সে। ঠিক আছে, আপাতত তোমার তোতলামি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না আমরা। তুমি যে সাহসী সেটা প্রমাণ করে দাও।
হ্যাঁ, প্রমাণ করে দাও, এক সুরে কথা বলে উঠল টেরি। পপকর্নের খালি বার্টিটা ঠাস করে টেবিলে রাখল সে। তুমি যে সাহসী সেটা প্রমাণের জন্যে একটা ছোট্ট পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছি আমরা।

জানালায় বিদ্যুতের আলোর ঝিলিক। ভয়ানক শব্দটা আসছে! অগ্রাহ্য করার জন্যে টেরিকে জিজ্ঞেস করল মুসা, পরীক্ষা? কিসের পরীক্ষা?
গুড়ম করে বিকট শব্দ হলো। নাক-মুখ কুঁচকে ফেলল সে। আপনাআপনি বন্ধ হয়ে গেল চোখের পাতা। চোখ মেলে শুনল, কিশোর বলছে, কি পরীক্ষা?
কডির কাছে আছে, সহকারীর দিকে ফিরল টেরি। এনেছ না?
হ্যাঁ, ঘাড় কাত করল কডি। নিজে ভিজেছি, কিন্তু এগুলোকে ভিজতে দিইনি। জানি, কাজের জিনিস। এক ফোঁটা পানিও লাগেনি গায়ে। জ্যাকেটের নিচ থেকে লম্বা একটা কাঁচের বয়াম টেনে বের করল সে।
কি-কি-কি আছে ওর মধ্যে? নিজের অজান্তেই আবার তোতলানো শুরু করল মুসা।
বয়ামটা টেরির হাতে তুলে দিল কডি।
টেরি সেটা তুলে ধরল মুসার চোখের সামনে।
.
মাকড়সা!
কালো, কুৎসিত, রোমশ অসংখ্য মাকড়সা কিলবিল করছে বয়ামটার মধ্যে। হেঁটে বেড়াচ্ছে বয়ামের দেয়ালে, একে অন্যের গায়ের ওপর।
মুসার নাকের কাছে বয়ামটা ঠেলে দিল টেরি। ঝাঁকি দিল বয়ামে। বয়ামের দেয়াল বেয়ে ওঠা মাকড়সাগুলো খসে পড়ল তলায়। প্রচণ্ড আক্রোশে খামচা-খামচি শুরু করে দিল।
মুসাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে টেরি, বুঝতে পারল কিশোর। থাবা দিয়ে টেরির হাত থেকে কেড়ে নিল বয়ামটা। মাকড়শাগুলো দেখতে দেখতে জিজ্ঞেস করল, এত মাকড়সা জোগাড়ের কারণ? ভেজে খাও নাকি তোমরা?
খিকখিক করে হাসল টেরি। আমরা খাব কেন? তোমার দোস্তকে খাওয়াতে নিয়ে এলাম।
সাংঘাতিক রসিকতা করে ফেলেছে যেন টেরি। হাসাহাসি শুরু করে দিল তার দোস্তরা।
ভড়কে গেল মুসা। সর্বনাশ! সত্যি সত্যি খেতে বলবে নাকি!
ঘাবড়ে গেছে রবিনও। শুঁটকি-বাহিনীকে বিশ্বাস নেই। ওদের পক্ষে সব সম্ভব। মুসার জন্যে দুশ্চিন্তায় সাদা হয়ে গেল তার মুখ।
সেদিন বাজির কথা বললে না, কিশোরকে বলল টাকি। সেজন্যেই তো নিয়ে এলাম।
ভাল করেছ, আড়চোখে মুসার দিকে তাকাল কিশোর।

মুসার মুখ দেখে মনে হলো বেহুশ হয়ে যাবে। পোকা-মাকড়ের মধ্যে মাকড়সাকে সবচেয়ে বেশি ভয় তার। ভয়ঙ্কর-দর্শন প্রাণীগুলোর ওপর থেকে চোখ সরাতে পারছে না। একনাগাড়ে কামড়া-কামড়ি, খামচা-খামচি করে যাচ্ছে। অদ্ভুত ওগুলোর কুস্তি-যুদ্ধ।
তা কি করতে হবে মুসাকে? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
কিছুই না, জবাব দিল টেরি। বয়ামের মধ্যে ওর হাতটা কেবল পাঁচটা মিনিট ঢুকিয়ে রাখতে হবে।
হাঁ হয়ে গেল মুসা। উঠে দৌড়ে পালানোর কথা ভাবতে লাগল। কানে এল কিশোরের কথা, কোন সমস্যা নেই। পাঁচ মিনিট কেন, পাঁচ ঘণ্টা বয়ামে হাত ঢুকিয়ে রাখতে পারবে মুসা। রবিনের দিকে তাকিয়ে সমর্থন চাইল, কি বলো, রবিন? মুসাকে আমরা চিনি।
মিনমিন করে কি বলতে গেল রবিন। তাকে থামিয়ে দিয়ে কিশোর বলল, মাকড়সাকে তুমি ভয় পাও, এই তো বলতে চাও? তা তো পাই। আমিও পাই। কিন্তু মুসা পায় না।
কিশোর, দোহাই তোমার, থামো!-বলতে গেল মুসা। বলতে পারল না।
মাকড়সাগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে মুসা। ভুরু নাচাল কিশোর, ভাবছ কি? ঢোকাও হাত। তোমার কতটা সাহস, দেখিয়ে দাও না শুঁটকিগুলোকে!
এক বিন্দু সাহস নেই আমার, তুমি তো ভাল করেই জানো!-বলতে ইচ্ছে করলু মুসার, পারল না। দাঁত চেপে রাখতে রাখতে চোয়াল ব্যথা হয়ে গেছে। মুক্তির উপায় খুঁজছে। উঠে ছুটে পালাবে দরজা দিয়ে? উঁহু, স্কুলে আর যেতে পারবে না পরদিন। টিকতে পারবে না রকি বীচে। রবিনের দিকে তাকাল অসহায় চোখে। সেখানেও সাহায্যের কোন আশা দেখল না। হঠাৎ কি যেন কি হয়ে গেল মগজে। ঝটকা দিয়ে হাত বাড়াল, দেখি, দাও বয়ামটা!
সরিয়ে নিল কিশোর, আরে রাখো রাখো। আগে কথা শেষ করে নিই। টেরির দিকে তাকাল সে, কি বুঝলে? ভেবেছিলে মুসা আমান মাকড়সা দেখলেই কুঁকড়ে যাবে? বমি করে ফেলবে? কিংবা ছুটে পালাবে? কোনটাই তো করল না ও। প্রমাণ কি হলো না, ও যে ভয় পায়নি?
না, হলো না, জোরে জোরে মাথা নাড়ল টেরি। হাত ঢোকাতেই হবে। এবং পাঁচ মিনিট রাখতে হবে। এটাই শর্ত।
কত টাকা বাজি?
তুমিই বলো।
তুমি বলো।
দশ লাখ হলে কেমন হয়? হেসে বলল কডি।

কঠিন কণ্ঠে জবাব দিল কিশোর, তোমাকে বেচলে হবে দশটা পয়সা? ফুটানি তো করো টেরির পয়সায়।
জ্বলে উঠল কডির চোখ। মুখ কালো করে ফেলল। কিন্তু কিশোরের কথার জবাব দিতে পারল না।
পঞ্চাশ ডলার? টাকি বলল।
তোমাকেই বা কথা বলতে কে বলেছে? খেঁকিয়ে উঠল কিশোর। আমি টেরির মুখ থেকে শুনতে চাই।
টেরি বলল, আমার আপত্তি নেই।
বয়ামটার দিকে তাকাল রবিন। দেয়াল বেয়ে উঠছে কালো কালো মাকড়সাগুলো। খসে পড়ছে। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিচেরগুলোর সঙ্গে মারামারি বেধে যাচ্ছে। যে যাকে পারছে কামড়াচ্ছে। বিষাক্ত হলে সর্বনাশ হবে। মস্ত ঝুঁকি নিতে যাচ্ছে কিশোর। মুসাকে এ ভাবে বিপদের মধ্যে ঠেলে দেয়ার কারণ বুঝতে পারছে না।
আমারও না, টেরির কথার জবাব দিল কিশোর। তবে আরেকটু বেশি হলে ভাল হত। যাকগে, টাকাটা তো আসলে কিছু না। তোমরা দেখতে চাইছ মুসার সাহস।
দাও বয়ামটা, হাত বাড়াল টেরি।
দিয়ে দিল কিশোর।
টেবিলে রাখল সেটা টেরি। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ধাতব মুখটা খুলে ফেলল। সহকারীদের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, ঘড়ি দেখবে কে?
আমি, সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল টাকি। অতি আগ্রহ তার। নিজের হাত ঘড়িটা নিয়ে এল চোখের সামনে।
মুসার দিকে তাকাল টেরি। গম্ভীর কণ্ঠে বলল, পাঁচ মিনিট।
ঘড়ি ঠিক আছে তো ওর? কিশোরের প্রশ্ন।
মাথা ঝাঁকাল টেরি, না থাকলে আরও পাঁচ-ছয়টা ঘড়ি আছে।
সবাই ঘিরে এল মুসাকে।
মাঝখানে এসে দাঁড়াল কিশোর। মুসার দিকে তাকিয়ে সাহস দিল, দাও হাত। কি হবে? মাকড়সার বিষেও যে তোমার কিছু হয় না দেখিয়ে দাও ওদের। গ্রীনহিলসে তো এতবড় মাকড়সাটা কামড়েছিল, মারা গেছ? মরনি। এগুলোর কামড়েও কিছু হবে না তোমার। নিশ্চিন্তে হাত ঢোকাও।
কিশোরের আচরণ অদ্ভুত ঠেকছে মুসার কাছে। ও তার সঙ্গে শত্রুতা করছে, না তার ভাল চায়, বুঝতে পারছে না। গ্রীনহিলসে বেড়াতে যাওয়া কিশোরের সঙ্গে রকি বীচের এই কিশোরকে মেলাতে পারছে না সে। কোথায় যেন একটা গণ্ডগোল!

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আছে টাকি। সেকেন্ডের কাটাটা বারোর ঘরে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠল, শুরু!
লম্বা দম নিল মুসা। হাত কাঁপছে। বয়ামের মধ্যে ঢোকানোর সময় দেখে ফেলবে না তো ওরা!
আঙুলের মাথা ঢোকাল প্রথমে। ঠাণ্ডা লাগছে কাঁচের ছোঁয়া। চোখ বন্ধ করে আচমকা হাতের পুরোটাই ঠেলে দিল ভেতরে।
কয়েক সেকেন্ড কিছুই ঘটল না।
তারপর হাতের উল্টোপিঠে সুড়সুড়ে অনুভূতি। চোখ মেলে দেখল হাত বেয়ে উঠতে শুরু করেছে মাকড়সাগুলো।
নিজের অজান্তেই গোঙানি বেরিয়ে এল মুখ থেকে। ঠেকাতে চেয়েছিল। পারল না। সেটা ঢাকার জন্যে জোর করে হাসি ফোঁটাল মুখে।
কপালে ঘাম জমছে। বেশি হয়ে গেলে ফোঁটা হয়ে ঝরে পড়বে। ঘামাটা কি দেখতে পাচ্ছে কেউ?
না, বয়ামের মধ্যে হাতটা ছাড়া আর কোনদিকে চোখ নেই কারও।
হাতের তালুতে সুড়সুড়ি দিচ্ছে মাকড়সাগুলো। রোমশ পাগুলো বেয়ে বেয়ে উঠে আসছে কব্জির কাছে।
তিরিশ সেকেন্ড! ঘোষণা করল টাকি।
মুসার মনে হলো তিরিশ বছর।
কম করে হলেও বারোটা মাকড়সা এখন আঁকড়ে ধরে আছে তার হাত। চামড়া চুলকাচ্ছে। সারা শরীরেই চুলকানিটা ছড়িয়ে পড়ল যেন।
এক মিনিট! চিৎকার করে জানাল টাকি।
এখনও চার মিনিট বাকি, টেরি বলল। হাসিমুখে মুসার দিকে ঝুঁকল। কি বের করে আনবে? না পারবে?
পারবে না!-বুঝে গেছে মুসা।
হাতের উল্টোপিঠে নাচানাচি শুরু করেছে মাকড়সাগুলো। কাঁটা কাঁটা রোমের খোঁচা লাগছে। দুটো মাকড়সা কব্জি পার হয়ে বেয়ে বেয়ে উঠে আসতে লাগল কনুইয়ের কাছে। থাবা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিল ওগুলোকে। পা ধরে তুলে নিয়ে গিয়ে জানালা দিয়ে দুটোকেই বাইরে ফেলে এল কিশোর।
কুট করে কামড় মারল একটা মাকড়সা। ঝাঁকি দিয়ে হাতটা বের করে আনতে চাইল মুসা।
পারল না। বয়ামের মধ্যে আটকে গেছে হাতটা।
.
বের করার জন্যে হাত মোচড়াতে শুরু করল মুসা। শক্ত হয়ে গেছে মুঠো।

যত চেষ্টা সব বিফল। হাত আর বেরোল না।
দুই মিনিট, ঘোষণা করল টাকি।
কি করছ তুমি? ভুরু নাচাল টেরি। হাত নাড়াচ্ছ কেন ওরকম করে?
মাথা ঝাঁকাল মুসা।
দেখলে তো? হাসিমুখে টেরির দলের দিকে তাকাল কিশোর। মুসার সাহস দেখলে! পাগলের মত কামড়াচ্ছে, তা-ও হাত বের করছে না ও!
পারলে তো কখন বের করে ফেলতাম!-কাঁদতে ইচ্ছে করছে মুসার।
আবার বের করার চেষ্টা করল হাতটা। পারল না। আটকেছে ভালমতই।
রবিন শঙ্কিত হয়ে আছে, বিষের ক্রিয়ায় কখন চোখ উল্টে দিয়ে পড়ে যায় মুসা। ভয়ঙ্কর এ খেলা ভাল লাগছে না তার।
বুড়ো আঙুলে কামড় মারল একটা মাকড়সা। দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করল মুসা। চিৎকার করল না।
বের করা দরকার হাতটা! কি করা যায়। বাড়ি মেরে ভেঙে ফেলবে নাকি বয়ামটা? কিশোর কোন সাহায্য করবে না, বুঝে গেছে। রবিনের দিকে তাকাল।
অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রবিন। একেবারে চুপ। বোবা হয়ে গেছে যেন। কি করবে সে-ও বুঝে উঠতে পারছে না। একটা ব্যাপার বুঝতে পারছে, টেরির কাজিন নিনা সত্যি কথাই বলেছে, যতই হেসে উড়িয়ে দেয়ার ভান করুক না কেন কিশোর। আজ যদি মুসা বাজিটা হারে, খেপানো শুরু হবে তাকে। গ্রীনহিলসের মত এখানেও জীবনটা নরক হয়ে যাবে ওর।
মুসার হাতের দুই পাশ দিয়েই এখন ওঠানামা করছে মাকড়সাগুলো। কব্জির কাছে ঘোরাফেরা করছে।
আবার তীক্ষ্ণ ব্যথা। আবার কামড়।
হাতটা বের করতে না পারলে নিস্তার নেই।
মাথা ঘুরছে মুসার। ঘরটা পাক খাচ্ছে চরকির মত। বেহুঁশ হয়ে যাবে না তো!
সুড়সুড়ি আর চুলকানি কোনমতে সহ্য করেছে। কিন্তু কামড়? এক কামড় খেয়েই তো মরতে বসেছিল। ভয়টা তখন থেকেই বেড়েছে। ভয় পাওয়াটা রোগ হয়ে গেছে। গ্রীনহিলসে নদীর ধারে বসে মাছ ধরছিল। গাছের ওপর থেকে টুপ করে ঘাড়ে পড়েছিল একটা মাকড়সা। কামড়ে দিল। থাবা দিয়ে ওটাকে ঘাড় থেকে ফেলে তীক্ষ্ণ ব্যথাটা ডলে সারানোর। চেষ্টা করেছিল সে। কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যে তীব্র যন্ত্রণা শুরু হলো। মাথা ঘুরতে লাগল। এবং বেহুঁশ।
চব্বিশ ঘণ্টা পর হাসপাতালে জ্ঞান ফিরল। ডাক্তার বললেন, ভাগ্যিস ওটা ব্ল্যাক উইডো স্পাইডার ছিল না। তাহলে মরে যেত মুসা। তবে যেটাতে কামড়েছে

সেটাও কম বিষাক্ত নয়। মুসার ভাগ্য ভাল, সময়মত চিকিৎসা পেয়েছে। নইলে বাঁচা কঠিন হয়ে যেত।
তিন দিন পর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেল সে। কামড়ের জায়গাটায় টিপ দিলে ব্যথা লাগত। এক মাসেরও বেশি ছিল সেই ব্যথা। সবই জানে কিশোর। তারপরেও মাকড়সার বয়ামে হাত ঢোকাতে তাকে বাধ্য করল!
মাথা ঘুরছে। তারমানে এই মাকড়সাগুলোও বিষাক্ত!...যাচ্ছে...বেহুঁশ হয়ে যাচ্ছে ও...
পাঁচ মিনিট! ঘোরের মধ্যে শুনতে পেল টাকির ঘোষণা।
মাথা ঝাড়া দিল মুসা। পরিষ্কার করতে চাইল ভেতরটা।
গুঙিয়ে উঠল টেরি। মাথা নেড়ে তিক্তকণ্ঠে বলল, জিতেই গেল!
একে অন্যের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করতে লাগল পাঁচজনেই। হতাশ।
দুই হাত মাথার ওপর তুলে নাচতে লাগল কিশোর। চিৎকার করে বলল, রবিন, আমার জিতে গেছি! জিতে গেছি! পেয়ে গেলাম পঞ্চাশটা ডলার! ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে যেন টাকার জন্যেই এতসব করেছে সে।
মুসার দিকে তাকাল। হয়েছে, মুসা। সময় শেষ। হাত বের করে আনো।
ঢোক গিলল মুসা। গলাটা শুকিয়ে তুষের মত খসখসে হয়ে গেছে। হৃৎপিণ্ডটা এত জোরে লাফাচ্ছে, কথা সরছে না মুখ দিয়ে।
বয়ামের মধ্যে ওর হাত আটকে গেছে যখন বুঝতে পারবে, কি করবে টেরি? বলবে, না হয়নি, আবার নতুন করে শুরু করো?
জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট চেটে মুসা বলল, না, বের করব না। আমার মজা লাগছে। আরও কিছুক্ষণ রাখব।
আঁ! হাঁ হয়ে গেল টেরি।
সব কটা চোখ এখন মুসার দিকে। সবগুলো চোখে বিস্ময়। ওর হাতের দিকে তাকাল রবিন। হাত বেয়ে উঠে আসছে মাকড়সাগুলো। বিড়বিড় করল, পাগল হয়ে গেল নাকি!
ঠিক, তা-ই হয়েছে! চিৎকার করে উঠল কডি। আতঙ্কে মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তারমানে ভীতু...
কিশোর তার কথা কানেও তুলল না। দেখলে তো, টেরির পিঠে এত জোরে থাপ্পড় মারল সে, উপুড় হয়েই পড়ে যাচ্ছিল টেরি, আমাদের মুসা আমানের সাহস! পাঁচ মিনিট ওর জন্যে কিছু না। ও আরও রাখতে চায়। আরও পাঁচ মিনিট হয়ে যাক। কি বলো?
কিশোর, প্লীজ... বলতে গেল মুসা।

শুনল না কিশোর। দাও, টাকা দাও, টেরির দিকে হাত বাড়াল সে। পঞ্চাশ ডলার। কি ভেবে ফিরিয়ে আনল হাতটা। দাঁড়াও দাঁড়াও, সময়টা যেহেতু ডাবল করা হবে, টাকাটাও ডাবল…

কিশোর…কাতর অনুনয় ফুটল মুসার চোখে।

টাকার জন্যে ভাবছ তো? কিশোর বলল। কোন চিন্তা নেই। তোমার কাছে এখন না থাকলে আমি দিয়ে দেব। তবে আমারও দেয়া লাগবে না। জানি তো, তুমি হারবে না। টেরির দিকে তাকাল, কি, একশো ডলারের কথা শুনেই ঘেমে যাচ্ছ?

কি যে বলো! ঠিক আছে, দেবো একশো! রাজি হয়ে গেল টেরি।

মুসার হাতের ওপর হাঁটাহাঁটি করছে মাকড়সাগুলো। আবার কুট করে কামড়ে দিল একটা। ব্যথায় দপদপ করছে হাতটা।

মারা যাচ্ছি আমি!-হাল ছেড়ে দিল মুসা। আর বাঁচব না! আজ এই ঘরেই আমার মৃত্যু হবে! হায় খোদা, শেষ পর্যন্ত মাকড়সার কামড়ে মরণ লেখা ছিল আমার কপালে!

পরের বার অন্য কিছু ভেবে বার কোরো, টেরিকে উপদেশ দিচ্ছে কিশোর। তবে পারবে না। কোন কিছুকেই ভয় পায় না মুসা, হেসে রবিনের দিকে তাকাল। সমর্থনের আশায় বলল, তাই না, রবিন?

মুখ চুন করে আছে রবিন। বুঝতে পারছে, টেরিকে খোঁচাচ্ছে কিশোর! উস্কে দিচ্ছে। প্রকারান্তরে সে নিজেই প্রস্তাব দিচ্ছে, আরেকটা বাজি হোক।

দশ মিনিটও শেষ।

হাসি উধাও হয়ে গেছে টেরি-বাহিনীর।

টেরিকে বলল কিশোর, যাও, তোমাদের একশো ডলার মাফ করে দিলাম। নিতে লজ্জা লাগছে। এত সহজ বাজি। মনে হচ্ছে টাকাটা নিলে ঠকানো হবে তোমাদের।

তাই নাকি? অপমানে মুখ কালো হয়ে গেল টেরির। বেশ, মনে থাকল কথাটা। পরের বার যাতে ভয় পায়, এমন কিছুই নিয়ে আসব।

বাজির টাকাটাও বাড়াতে হবে তাহলে।

বাড়াব। যত বলল। এত সহজে ছাড়া পাবে না ও।

হ্যাঁ, সুর মেলাল টাকি, পরের বার ওকে মু-ম্মুসা বানিয়েই ছাড়ব।

দলবল নিয়ে বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে গেল টেরি।

মুসার দিকে তাকিয়ে হাসল কিশোর, কত সহজেই না টাকা রোজগার করা যায়, তাই না?

আমি যাচ্ছি মারা, আর তুমি করো টাকার চিন্তা! ককিয়ে উঠল মুসা। জলদি খোলো আমার হাত! বয়ামে আটকে গেছে!

মাথা ঝাঁকাল কিশোর, কিছু যে একটা হয়েছে, বুঝতেই পারছিলাম।
তাহলে পাঁচ মিনিটের পরই বিদেয় করে দিতে পারতে ওদের, ঝঝাল কণ্ঠে বলল রবিন।
জবাব দিল না কিশোর। মুসাকে বলল, তোমার হয়েছে আমাজনের বাদরের অবস্থা। জানো না কি করে বাদর ধরে ওরা?
দোহাই তোমার, কিশোর, লেকচার থামাও! চিৎকার করে উঠল মুসা। আগে বয়ামটা খোলার ব্যবস্থা করো। নইলে আজ ঠিক কবরে যেতে হবে আমাকে।
খোলার ব্যবস্থাই তো করছি। না শুনলে বুঝবে কি করে কেন আটকে আছে হাতটা? আমাজনের শিকারিরা একটা বাঁশের মধ্যে ফল রেখে দেয়। বানরে হাতটা ঢোকায়। ফলটা তুলে নিয়ে যতই বের করতে চায় হাত আর বেরোয় না। ফলও ছাড়ে না, হাতও বেরোয় না। প্রথমে লোভ, তারপরে আতঙ্ক। মাথা যায় গরম হয়ে। কি করবে বুঝতে পারে না। শিকারি এসে ধরে ফেলে। কেন এমন হয় জানো? হাতটা ঢোকানোর সময় আঙুলগুলো সোজা থাকে, সরু থাকে, ফলটা তুলে নিলেই মুঠো বড় হয়ে যায়, বাঁশের ফাঁকে আটকে যায়…
হাতের দিকে তাকাল মুসা। এখনও মুঠো করে আছে। খুলে নিল আঙুলগুলো। সহজেই বেরিয়ে এল হাতটা। ধপাস করে বসে পড়ল সোফায়। আ-আ-আমি একটা গা-গাধা!
গা-গাধাই হও আর যা-ই হও, সত্যি তোমার সাহস আছে…
ইয়ার্কি মারছ! আমি এদিকে মরে যাচ্ছি….উহ! হাত ডলতে লাগল মুসা।
দেখি, কি হয়েছে? এগিয়ে এল কিশোর। হাতটা তুলে নিল। বাপরে, কি ফোলা ফুলেছে! আগে বের করা গেলে এটাও দেখাতাম টেরিদের-তোমার সাহসের আরও বড়াই করা যেত; এত যন্ত্রণার পরেও বের করনি বলে। যাকগে, যা গেছে গেছে…।
কিশোরের কাণ্ড দেখে রেগে গেল রবিন, তোমার হলো কি, কিশোর!…ফালতু কথা বাদ দিয়ে আগে দেখো কোন ক্রীমটিম আছে কিনা।
আছে, আছে। নিয়ে আসছি। দৌড়ে চলে গেল কিশোর।
মুসার দিকে তাকাল রবিন, বেশি ব্যথা করছে?
ব্যথার চেয়েও চুলকাচ্ছে বেশি।
হু, তারমানে বিষাক্ত না মাকড়সাগুলো।
তা তো নয়ই। আমাকে যেটা কামড়েছিল সেটার মত হলে কখন মরে যেতাম…
আঁউক! করে এক চিৎকার দিয়ে উঠল মুসা।
কি হলো! লাফ দিয়ে এগিয়ে এল রবিন।

জবাব না দিয়ে পাগলের মত জামার ভেতরে হাত ঢুকিয়ে হাতড়াতে শুরু করল মুসা। একটা মাকড়সা বের করে এনে ছুঁড়ে ফেলে দিল মেঝেতে। রাগের চোটে পা দিয়ে মাড়িয়ে ভর্তা করল। কার্পেট নষ্ট হওয়ার পরোয়া করল না। মেরিচাচীর বকা খাবে এখন কিশোর। দুঃখ অনেকটা কমল ওর।
ক্রীম নিয়ে ফিরে এল কিশোর। হাতটা লম্বা করো, মাখিয়ে দিই।
ওষুধের প্রভাবে চুলকানিটা কমল। তবে কামড়ের কারণে যে সব জায়গা ফুলে গেছে ওগুলো ফুলেই রইল।
মাকড়সাগুলো বিষাক্ত ছিল না, দেখেই চিনেছিলাম... কিশোর বলল। বাথরুমে গিয়ে ঠাণ্ডা পানি ঢালো, সেরে যাবে। আমি দেখি, ফ্রিজে কি কি পাওয়া যায়।
থাক, আর লোভ দেখাতে হবে না, উঠে দাঁড়াল মুসা। গরু মেরে জুতো দান!
বাথরুমে এসে ঢুকল মুসা। পানি ঢালায় সত্যি কাজ হলো। আয়নার দিকে তাকাল। কি রকম বিকৃত করে রেখেছে মুখটা। স্বাভাবিক করল। পরক্ষণে একটা কথা মনে পড়তে আপনাআপনি বিকৃত হয়ে গেল আবার। হুমকি দিয়ে গেছে টেরি, পরের বার আর এত সহজে ছাড়বে না। কি নিয়ে যে হাজির হবে, খোদাই জানে!
সত্যি, মাকড়সার বয়ামে যে ভাবে হাতটা ঢুকিয়েছিলে তুমি, কিশোর বলল, আমি পারতাম না।
আর আমি হলে ঢোকাতামই না, রবিন বলল। ভীতু, কাপুরুষ, যা খুশি বলে বলুকগে আমাকে টেরি।
রোজ রোজ ওসব শোনার চেয়ে সাহস দেখিয়ে মুখটা বন্ধ করে দিলেই কি ভাল না?
ঘুষি মেরে ওর নাক ফাটিয়ে দিতাম আমি...
টেরি তো একলা নয়। কজনের ফাটাবে?
মাকড়সার বয়ামে হাত ঢোকানোর পরের আরেক শনিবার। কিশোরদের বাড়িতেই আড্ডা দিচ্ছে তিন গোয়েন্দা। সেদিনও কিশোরের চাচা-চাচী বাড়িতে নেই।
গত শনিবারের মত বৃষ্টি হচ্ছে না। আকাশ পরিষ্কার। তবে ঠাণ্ডা পড়েছে বেশ।
কিশোর আর রবিনের তর্কে যোগ দিতে পারল না মুসা। মানসিক অশান্তিতে রয়েছে সে। ভয়ানক দুশ্চিন্তা। পুরোটা সপ্তাহ ধরে তাকে ভয় দেখিয়েছে টেরি, কালটু-আমান, এবার দেখব কেমন তোমার সাহস। এমন প্ল্যান করেছি, তোতলাতেও ভুলে যাবে।
কি করতে যাচ্ছে, জানতে চেয়েছে মুসা।
মুচকে হেসেছে টেরি, ভঙ্গি করেছে সিনেমার দুষ্ট ভিলেনের মত। আগেই বলব কেন...

জানালার কাঁচে শব্দ হতে ধড়াস করে উঠল মুসার বুক। ভাবল টেরিরা এসে গেছে।
কিন্তু না, বারান্দার নয়, বাইরের দিকের জানালায় শব্দ হয়েছে। বোধহয় ডালটাল বাড়ি খেয়েছে।
কিশোর আর রবিনের তর্ক তুঙ্গে উঠেছে, এই সময় ফোন বাজল। উঠে গিয়ে ধরল কিশোর। মিনিটখানেক কথা বলে ফিরে এল হাসিমুখে, টেরিরা আসছে।
আঁতকে উঠল মুসা, মানা করে দিলে না কেন?
মানা করব কেন? ও ব্যাটাদের কাছে হারব নাকি?
কি বলল?
জানতে চাইল, তুমি আছো নাকি। বাড়িতে অন্য কেউ আছে কিনা।
আমি যাই, উঠে দাঁড়াল মুসা।
আরে কি করছ! হাত ধরে টেনে ওকে বসিয়ে দিল কিশোর। মুখে চুনকালি মাখাবে নাকি শেষে! কোনও দিন আর স্কুলে গিয়ে শান্তি পাবে মনে করেছ?
আ-আ-আমি বাবাকে বলে অন্য শহরে চলে যাব। অন্য স্কুলে ভ-ভ ভর্তি হব…
তাতে লাভটা কি? ওখানে গিয়েও তো ভূ-ভই করবে। মূল জিনিসটা না উপড়াতে পারলে শান্তি পাবে না কোনখানে গিয়েই।
উড়ে চলে এল যেন টেরিরা। কয়েক মিনিটের মধ্যেই বেল বাজল।
মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠল মুসার। আমি বাথরুম থেকে আসি!
কেন?
মাথায় পানি দেব।
দরকার নেই, বসে থাকো। ওরা বুঝে যাবে তুমি ভয় পেয়েছ। দরজা খুলে দিতে চলল কিশোর। যেটা তুমি নও, সেটা মানুষকে বোঝাতে যাও কেন?
কিশোর, তুমি বুঝতে পারছ না, অনুরোধের সুরে বলল মুসা, আমার সাহস সত্যি নেই। আগে যা-ও বা ছিল, মাকড়সাটা কামড়ে দেবার পর আর ছিটেফোঁটাও নেই…
আবার বেল বাজল। অস্থির হয়ে গেছে টেরির দল।
দরজা খুলে দিল কিশোর।
খুলতে এত দেরি কেন? মাথা ঢুকিয়ে উঁকি দিল টেরি। প্যান্ট বদলাচ্ছে নাকি মু-ম্মুসা! খিকখিক করে হাসল সে।
কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল কিশোর, প্যান্ট বদলাবে কেন?
ভয়ে খারাপ করে ফেলেছে হয়তো…
ওই তো সোফায় বসে আছে। কেন, সেদিন মাকড়সা নিয়ে এসে শিক্ষা হয়নি? কথা কম বলো, হুমকি দিল কিশোর। নইলে বাজিটা অন্য রকম হবে বলে দিলাম।

কি রকম? টাকা বাড়াবে? পেছন থেকে জিজ্ঞেস করল টাকি।
না। হেরে গেলে গায়ের কাপড় খুলে রেখে বাড়ি যেতে হবে তোমাদের।
কডি বলল, না না, টাকাই ভাল…।
কেন, নিজেরাই ঘাবড়ে গেলে? ভুরু নাচিয়ে হাসল কিশোর।
অ্যাই, তুমি চুপ থাকো! ধমক লাগাল কডিকে টেরি। কিশোরের দিকে তাকাল, তাহলে বাজিটা এখনও বহাল আছে শিওর হতে এলাম। ওটা গিয়ে নিয়ে আসতে হবে তো আমাদের। বাজি যদি না-ই থাকে শুধু শুধু ঝামেলা…
তোমরা কি, বলো তো? রেগে উঠল কিশোর। ফোনেই তো বলে দিলাম যা বলার…
কিন্তু প্ল্যান বদলেছি আমরা।
বদলেছ মানে?
প্রথম যে জিনিসটা আনার কথা ছিল, সেটা আনিনি।
সেটা কি ছিল?
আনতে চাই না যখন, শুনে আর কি করবে?
তাহলে এখন কি আনতে চাও?
ফিরে তাকাল টেরি। বন্ধুদের জিজ্ঞেস করল, কি, আগেই বলে দেব?
বলল, টাকি বলল। জেনেশুনে আগে থেকে মনের জোর বাড়িয়ে রাখুক মু-ম্যুসা। অত নির্দয় যে নই আমরা, সেটাও বুঝুক।
মাথা ঝাঁকিয়ে কিশোরের দিকে ফিরল আবার টেরি।
উত্তর্ণ হয়ে আছে মুসা। টেরি কি বলে শোনার জন্যে। রবিনেরও কান খাড়া।
টেরি বলল, একটা সাপ আনব। বড়। বিষাক্ত। ওটার মুখে চুমু খেতে হবে তোমাদের তোতলা মু-ম্যুসাকে। পারবে নাকি জিজ্ঞেস করো।
বলে কি! হাঁ হয়ে গেল মুসার মুখ।
কিন্তু কিশোরের হাসি এক বিন্দু মলিন হলো না। দূর! ভেবে ভেবে শেষে এই জিনিস বের করেছ? হায়রে কপাল, এই না হলে শুঁটকির বুদ্ধি! এ তো মাকড়সার চেয়েও সোজা!
বলছ!
তো আর কি বলব? জানো, কত সাপ ঘেঁটেছে মুসা? এক ভারতীয় বেদের সঙ্গে ভাব হয়ে গিয়েছিল মুসার, গ্রীনহিলসে থাকতে, নির্বিকার কণ্ঠে বলে চলল কিশোর। সাপ খেলানো শিখেছে তার কাছে। তারপর থেকে তো মুসার জয়-জয়কার। মেলা হলেই সার্কাসের লোকের ডাক আসত তার কাছে। ডেকে নিয়ে যেত। কত যে প্রশংসা আর পুরস্কার পেয়েছে সে।
তাই নাকি? সন্দেহ দেখা দিল টেরির চোখে।

কেন, বিশ্বাস হচ্ছে না?
নিনা তো সাপ খেলানোর কথা কিছু বলল না?
ও তোমার বোন। তোমার মতই চরিত্র। ও কি আর কারও ভালটা বলতে যাবে?
দমে গেল মনে হলো শুঁটকি। ফিরে তাকাল বন্ধুদের দিকে। আবার ফিরল কিশোরের দিকে। হাসি ফোঁটাল মুখে। ও তুমি যা-ই বলো, নিজের চোখে না দেখে বিশ্বাস করছি না আমি। বারান্দায় বেরিয়ে গেল সে। সহকারীদের বলল, অ্যাই, চলো হে, নিয়ে আসিগে।
কিশোরের মিথ্যের বহর শুনে রবিনও হতবাক। কিশোর দরজা লাগিয়ে ফিরে আসতেই বলে উঠল, এ সব বাহাদুরি না করলে কি চলত না?
না, চলত না। শঠে শাঠ্যং। ওরা যেমন, ওদের ওভাবেই জবাব দিতে হবে।
কি-কি-কিন্তু কেউটে আনে না র‍্যাটল আনে, মুসা বলল, ঠিক আছে কিছু সাপের মুখে চুমু খাব কি করে!
খাবে। তাতে অসুবিধে কি? মুচকি হাসল কিশোর।
তোমার কি হয়েছে বলো তো, কিশোর! তুমি আমাকে কায়দা করে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে চাইছ নাকি? খুনের মোটিভটা কি? কি করেছি আমি? আমার তো কোন টাকা-পয়সা জমানো নেই, ইনশুরেন্স-ফিনশুরেন্সও নেই…
চুপ করে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকো। সাপ ওরা আনবে না।
যদি আনে?
যদি আনে, তখন দেখা যাবে। তবে আমার এত কথার পর সাপ ওরা আনবে না, লিখে রাখতে পারো। ওদের ধারণা হয়ে গেছে, সাপকে তুমি ভয় পাও না। এনে লাভ হবে না।
কিন্তু শুঁটকি টেরিকে বিশ্বাস নেই। নিশ্চিন্ত হতে পারল না মুসা।
*
বার বার ঘড়ি দেখছে কিশোর। অনেকক্ষণ হয়ে গেছে, টেরিরা গেছে, এখনও আসার নাম নেই।
রবিন বলল, আসবে না নাকি?
না এলেই তো ভাল, মুসা বলল। আসছে না দেখে তুমিও মনে হয় হতাশ! তোমরা কি আমাকে পাগল পেয়েছ…
কথা শেষ হলো না মুসার। দরজার বাইরে থেকে ভেসে এল আতঙ্কিত চিৎকার, কিশোর, দরজাটা খোলো তো, ভাই! জলদি
লাফ দিয়ে উঠে ছুটে গেল কিশোর। হাতল ঘুরিয়ে হ্যাঁচকা টানে খুলে ফেলল দরজা।
দরজায় দাঁড়ানো টাকি। চিৎকার দিয়ে উঠল, জলদি এসো! সর্বনাশ হয়ে গেছে!

বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা।
কডির পেছনে হ্যারল্ড আর নিটুকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল মুসা। তারপর দেখতে পেল টেরিকে।
দুই হাত দিয়ে দুই চোখ চেপে ধরে রেখেছে টেরি। টকটকে লাল রক্ত গড়িয়ে নামছে গাল বেয়ে।
তাকে ধরে ধরে নিয়ে ঘরে ঢুকল নিটু আর হ্যারল্ড।
তোমার চাচা-চাচী বাড়ি আছে, কিশোর? চিৎকার করে বলল কডি। আমাদের সাহায্য দরকার!
না। কি হয়েছে? জানতে চাইল কিশোর।
একটা বড় বিষাক্ত সাপ নিয়ে এসেছিলাম আমরা, টাকি জানাল। ঝাপির ঢাকনা তুলতেই পালাল ওটা। টেরি ছুটল ওটার পেছনে। জঞ্জালের মধ্যে ঢুকে পড়ল সাপটা। দৌড়ে ধরতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে লোহা-লক্কড়ের মধ্যে পড়ে দেখো কি অবস্থা হয়েছে ওর!
শিকের খোঁচা লেগে একটা চোখ গলে বেরিয়ে চলে এসেছে, আবার চিৎকার করে উঠল কডি।
আহ্! গুঙিয়ে উঠল টেরি।
ধীরে ধীরে ডান হাতটা নামাল চোখের ওপর থেকে। হাতের তালু মেলে দেখাল।
খুলে চলে আসা রক্তাক্ত বিশাল চোখটার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল তিন গোয়েন্দা।
আহ, আমাকে...আমাকে বাঁচাও, মুসা! গোঙাতে গোঙাতে বলল টেরি। তোমার অভিশাপেই অমন হয়েছে। প্লীজ, কিছু একটা করো!
ডাক্তার ডাকো, ডাক্তার! চিৎকার করে বলল কডি। অ্যামবুলেন্স!
আহ...বাচাও আমাকে...কি যন্ত্রণা...মাগোহ! ক্রমাগত গোঙাচ্ছে টেরি।
ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে খুলে আসা চোখটা। পেটের মধ্যে মোচড় দিচ্ছে মুসার। মুখে হাত চাপা দিল বমি ঠেকানোর জন্যে।
অস্ফুট শব্দ করে উঠল কিশোর।
রবিনও তাকাতে পারছে না চোখটার দিকে। মুসা তাকিয়ে আছে।
দাঁড়িয়ে আছো কেন তোমরা... ককাতে ককাতে টেরি বলল। কিছু একটা করো না!...উফ, কি ব্যথা!
চোখটার দিকে তাকিয়েই আছে মুসা।
ছুটে গেল হঠাৎ। টেরির হাত থেকে এক থাবায় চোখটা তুলে নিয়ে লজেন্সের মত ছুঁড়ে দিল মুখের মধ্যে। চুষতে শুরু করল।
.

চিৎকার করে উঠল কিশোর।
ঘৃণায় মুখ বাঁকাল রবিন।
ভীষণ চমকে গিয়ে টাকিও চেঁচিয়ে উঠল। হাঁ হয়ে গেছে কডি আর বাকি তিনজন।
টেরির দিকে ফিরে চোখটা এ গাল-গাল করতে থাকল মুসা।
হাসতে শুরু করল টেরি। অন্য হাতটা নামিয়ে আনল চোখের ওপর থেকে।
ঠোঁট ফাঁক করে জিভের ডগায় চোখটা বসিয়ে সামনে ঠেলে দিল মুসা।
টাকি হাসল। হাসতে লাগল কডি, নিটু আর হ্যারল্ড।
মুখ থেকে চোখটা হাতের তালুতে ফেলে দিল মুসা। ছুঁড়ে দিল টেরির দিকে। দেখতে একেবারে আসল চোখের মত। প্ল্যাস্টিকের। মলের কার্ড স্টোর থেকে কিনেছ, তাই না? আজই দেখে এলাম, সকাল বেলা। হ্যালোউইন ডিসপ্লেতে সাজিয়ে রেখেছিল।
হ্যাঁ, ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল টাকি।
কিশোরের দিকে তাকাল টেরি। পেপার টাওয়েল আছে? নকল রক্তটা মুখ থেকে মুছে ফেলতাম। ফোঁটা পড়ে কাপড় নষ্ট হচ্ছে।
কিশোর চলে গেল পেপার টাওয়েল আনতে।
ফিরে এল মিনিটখানেকের মধ্যে। বড় একটা কাগজের দলা তুলে দিল টেরির হাতে। দেখলে তো? আমরা সবাই ভয় পেয়ে গেলাম, কিন্তু চোখের পাপড়িটাও একবার কাঁপেনি মুসার। তা, এটাই তোমার দুই নম্বর চ্যালেঞ্জ নাকি? বললাম না, মুসাকে ভয় দেখাতে হলে সত্যিকারের ভয়াল জিনিস দরকার।...যাও, আজও নেব না টাকা। এত সহজ কাজের জন্যে টাকা নিতে নিজের কাছেই খারাপ লাগে।
চোখটা টোকা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলল টেরি। কিশোরের কাঁধে বাড়ি খেয়ে কার্পেটে পড়ল সেটা।
এটা আমাদের চ্যালেঞ্জ নয়, শার্লক পাশা, টাকি বলল, সামান্য রসিকতা করলাম তোমাদের সঙ্গে। দেখলাম চেষ্টা করে মু-স্মুসা রাক্ষসটার রাতের খাওয়াটা মাটি করতে পারি কিনা।
বরং খিদেটা আরও বাড়িয়ে দিলে ওর, টাকি মাছ! কিশোর বলল। টাকি মাছের ভর্তা খাওয়ার জন্যে প্রাণ এখন আনচান করতে থাকবে ওর।
ভাবছে মুসা, কি সাংঘাতিক বাঁচা বেঁচে গেছে। ভাগ্যিস মলে দেখে এসেছিল চোখটা। নইলে বমি করে ভাসিয়ে ফেলত এতক্ষণে।
মাটি থেকে চোখটা তুলে নিয়ে হ্যারল্ডের দিকে ছুঁড়ে মারল কডি। হ্যারল্ড আবার মারল নিটুকে। ঘরের মধ্যে চোখ ছোঁড়াছুঁড়ি খেলা শুরু করে দিল ওরা।
মুখ থেকে লাল রঙ মুছে ফেলল টেরি। কাগজটা দলা পাকিয়ে আচমকা টোকা দিয়ে ছুঁড়ে দিল মুসার মুখ লক্ষ্য করে।

বোধহয় সেদিকে নজর থাকাতেই চোখটা ধরতে মিস করুল কডি। একটা ল্যাম্পের ওপর গিয়ে পড়ল সেটা। নড়ে উঠল ল্যাম্পটা, কিন্তু পড়ল না।
কি করছ! ধমকে উঠল কিশোর। সামান্য ভদ্রতাটাও শেখনি নাকি? চাচা-চাচী এসে পড়বে এক্ষুণি। তোমাদের এ সব করতে দেখলে খুশি হবে না। টেরির দিকে ফিরল সে, তারমানে সাপ তুমি আননি?
মাথা নাড়ল টেরি। না, পরে ভেবে দেখলাম, ঠিকই বলেছ তুমি, সাপ জিনিসটা ভয়াল কিছু না। যে কেউ হাতে নিতে পারে।...ভাগ্যক্রমে আবারও জিতে গেলে তুমি হিরো মিয়া। মুসার কাঁধে চাপড় দিল সে। তবে তোমাকে আমি মু-স্মুসা না বানিয়ে ছেড়েছি তো আমার নাম টেরিয়ার ডয়েল নয়।
ভালই হবে, কিশোর বলল। শেষ পর্যন্ত বাপের দেয়া নামটা বদলে আমাদের দেয়া নামটাই ব্যবহার করতে হবে তোমাকে-টকি টেরি।...কিন্তু হেরে গিয়েও অত বড় বড় কথা কেন? মুসাকে ভয় পাওয়ানো তোমাদের কমো নয়। বাজি আর তোমরা কোন কালেই জিততে পারলে না।
তাই নাকি? মুখ বাঁকাল টাকি। টেরির প্ল্যান কি, কল্পনাও করতে পারবে না তোমরা। বাজির টাকাটা আগেভাগেই দিয়ে রাখতে পারো আমার কাছে। হেরে তোমরা যাবেই।
তোমাদের আসলে লজ্জা-শরম একেবারেই নেই, নিমের তেতো ঝরল কিশোরের কণ্ঠে। দুই-দুইবার টাকা মাপ করে দিলাম, আর এখন টাকা দেয়ার কথা তুলছ। জেতার বেলায় নাম নেই, আগেই টাকা দিই, তাই না। যাও, টাকা আমরা নেবই না। বাজি হবে অন্যভাবে। টেরি বলেছে, মুসাকে হারাতে না পারলে তার নাম টেরিয়ার ডয়েল নয়। খুব ভাল কথা। এবারের বাজি, হারলে আমরা যে নামে ডাকব ওকে, সেটা বহাল করতে হবে। ওর নাম হবে স্রেফ শুঁটকি। সারা স্কুলে ছড়িয়ে চাউর করে দেব সেটা আমরা।
তা দিও, পারলে, দমল না টাকি। ওর প্ল্যানটা জানলে এখনই প্যান্ট খারাপ করে বাথরুমে দৌড়াত তোমাদের মু-স্মুসা মিয়া।
কি প্ল্যান? দুর্বল কণ্ঠে জানতে চাইল মুসা।
টেরির তিলে-পড়া মুখে মুচকি হাসি ফুটল। আগাম ইঙ্গিত চাইছ তো? বেশ বলছি। আমাদের একটা ফিউনরল পারলার আছে, জানো তো?
জানি, জবাবটা দিল কিশোর। তাতে কি?।
হাসি ছড়িয়ে পড়ল টেরির সারা মুখে। তাতে? নিজের বুদ্ধির তো খুব বড়াই করো। আন্দাজ করে নাও।
.

সোমবার লাঞ্চের সময় ক্লাস থেকে বেরিয়ে ক্যাফিটেরিয়ার দিকে। রওনা হয়েছে মুসা আর কিশোর। রবিনকে দেখতে পেল না। সে বেরিয়েছে ওদের আগে। ডেকে নিয়ে গেছে নাইনথ গ্রেডের মরফি।
হলের মোড় ঘুরতেই কানে এল হই-চই, রাগত চিৎকার।
অন্যপাশে এসে টাকিকে দেখতে পেল মুসা আর কিশোর। ওদের দেখে চিৎকার করে বলল, জলদি যাও! রবিনকে পেটাচ্ছে মরফি।
দৌড়ে গেল দুই গোয়েন্দা। রবিনের কলার চেপে ধরেছে মরফি। বিশালদেহী ছেলেটার সঙ্গে পাত্তাই পেল না রবিন। তাকে শূন্যে তুলে নিয়ে গিয়ে ঠেসে ধরল টাইলস বসানো দেয়ালে।
ছাড়ো! ছাড়ো আমাকে ছাড়া পাওয়ার জন্যে ছটফট করছে রবিন।
খলখল করে হেসে উঠল মরফি, না ছাড়লে কি করবে? মারবে? মারো! মারো!
রবিনকে মাটিতে নামাল সে। কাঁধ দিয়ে প্রচণ্ড এক গুলো লাগাল রবিনের বুকে। কলার ছাড়ল না। হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেল একটা লকারের কাছে। হ্যাঁচকা টানে লকারের দরজা খুলে তার মধ্যে ঠেসে ভরতে শুরু করল।
অ্যাই, মরফি! ও কি করছ! এতক্ষণে যেন সংবিত ফিরে পেল কিশোর। ধমকে উঠল, ছাড়ো ওকে! রবিনকে সাহায্য করার জন্যে এগোতে গিয়েও কি ভেবে এগোল না। থমকে গিয়ে মুসার দিকে তাকাল, হাঁ করে চেয়ে দেখছ কি? ছাড়াও না ওকে! শিক্ষা দিয়ে দাও মরফিকে!
আ-আ-আমি! এখানে সবার সামনে তোতলানো নিরাপদ নয়, ভুলে গেছে মুসা। পিছিয়ে গেল এক পা।
যাও! যাও! মুসাকে ঠেলে দিল কিশোর। একমাত্র তুমিই ওর সঙ্গে পারবে।
হা হা, যাও না, হিরো মিয়া, টাকি বলল। তুমি তো কোন কিছুকেই ডরাও না। গায়ে-গতরেও বড়ই। একচোট দেখিয়ে দাও মরফিটাকে। বড় বাড় বেড়েছে পাজিটার। যাকে পায় তাকেই মারে।
ঢোক গিলল মুসা, কিন্তু…আমি…আমি…
আরে আমি আমি করছ কেন? তোমার বন্ধুকে পেটাচ্ছে দেখতে পাচ্ছ না? বন্ধুর জন্যে মায়া-দরদ নেই? নাকি ভয় পেয়ে গেলে?
যাও, আবার মুসার পিঠে ঠেলা মারল কিশোর। মরফি তোমার কাছে নস্যি। তুষের মত উড়িয়ে দাও ওকে। ভেঙে চুরচুর করো!
লকারে ঢুকিয়ে রবিনকে ঠেলতেই আছে মরফি। বুকে হাত দিয়ে ঠেসে ধরে রেখে বলল, বলল, গু খাই!
তা কেন বলব! হাঁপাতে হাঁপাতে বলল রবিন। ফুসফুসে চাপ পড়াতে গলা দিয়ে ঘড়ঘড় শব্দ বেরোল।

হাতটাকে মুঠো করে তার বুকে প্রচণ্ড এক গুতো মারল মরফি। ব্যথায় কাতরে উঠল রবিন। আবার বলল মরফি, বলো জলদি, গু খাই! নইলে ছাড়ব না।
না, বলব না!
তাতে যেন খুশিই হলো মরফি। রবিনকে অত্যাচার করার সুযোগ পেল। ওর পেটে ঠেসে ধরল মুঠো পাকানো হাতটা। জোরে চাপ দিতে লাগল।
আর্তনাদ করে উঠল রবিন।
তুমি কি, মুসা? তিরস্কার করল কিশোর। এখনও যাচ্ছ না! প্রচণ্ড এক ধাক্কা মারল মুসার পিঠে।
মরফির গায়ের ওপর গিয়ে পড়ল মুসা।
হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল মরফি। কোনমতে সামলে নিল। ঝাড়া মেরে পিঠ থেকে সরিয়ে দিল মুসাকে। তারপর সোজা হয়ে ঘুরে দাঁড়াল।
পিছিয়ে গেল মুসা।
হেসে উঠল টাকি, ভয় পেয়েছে, ভয় পেয়েছে, তোতলাটা ভড়কে গেছে...
কিন্তু ওর মুখের কথা শেষ হলো না। মাথা নিচু করে তীব্র গতিতে ছুটে গেল মুসা। মরফির পেটে লাগল মাথাটা। হুক করে সমস্ত বাতাস বেরিয়ে। এল মরফির মুখ দিয়ে। ব্যথায় নীল হয়ে গেল মুখ। নিগ্রোর খুলির ভয়ঙ্কর আঘাতে বাঁকা হয়ে গেছে। দমল না তারপরেও। হাত বাড়াল মুসার কলার ধরার জন্যে। সরে গেল মুসা। প্রচণ্ড রাগে অন্ধ হয়ে তাকে ধরার জন্যে ছুটে এল সে।
চট করে এক পাশ থেকে একটা পা সামনে বাড়িয়ে দিল কিশোর। কারও চোখে পড়ল না সেটা। মরফিরও না। হোঁচট খেয়ে উড়ে গিয়ে মেঝেতে পড়ল সে।
ছেলেমেয়েরা ঘিরে দাঁড়িয়েছে ওদের। দুই দলেরই সমর্থক আছে। হট্টগোল করছে সবাই। চেঁচিয়ে উৎসাহ দিচ্ছে।
মরফি পড়ে যেতেই হাততালি দিতে শুরু করল মুসার পক্ষের সমর্থকরা। হাসতে লাগল। শিস দিল।
কাবু হয়ে গেছে মরফি। হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে দাঁড়াল। মুখ টকটকে লাল।
হঠাৎ জেগে ওঠা আবেগ কেটে গেছে মুসার। ভয়টা ফিরে এসেছে। মরফি যখন হুমকি দিল, দেখে নেব আমি! ছাড়ব না!-এক পা পিছিয়ে গেল মুসা।
সামনে এসে দাঁড়াল কিশোর। এখনও বাহাদুরি? বড় বড় কথা! যাও যাও, যা পারো কোরো। মুসা আমান কাউকে ভয় পায় না।
জ্বলে উঠল মরফির চোখ। পারলে কিশোরকেই মেরে বসে। কিন্তু সাহস করে উঠতে পারল না। লকার থেকে রবিনও বেরিয়ে চলে এসেছে ততক্ষণে। তিনজনের সঙ্গে কোনমতেই পারবে না বুঝে মানে মানে কেটে পড়ল ওখান থেকে।

তার সঙ্গে চলে গেল তার সমর্থকরা।
বাকি সবাই প্রচুর চিৎকার-চেঁচামেচি করছে। কেউ শতমুখে প্রশংসা করতে লাগল মুসার। কেউ বা এসে পিঠ চাপড়ে দিয়ে আন্তরিকতা প্রকাশ করল।
চারপাশে তাকিয়ে টাকিকে কোথাও দেখল না কিশোর। মুচকি হাসল সে। টেরির আরেকটা প্ল্যান বরবাদ হয়েছে।
*
লাঞ্চের পর আবার ক্লাস। সবাই আরেকবার হিরোর সম্মান দিতে লাগল মুসাকে। মেজাজটা তাই ওর ফুরফুরে লাগছে। আত্মবিশ্বাস ফিরে আসতে শুরু করেছে। যে ভাবে এগোচ্ছে, এখানে তাকে তোতলা মুসা বলার সাহসই পাবে না হয়তো আর কেউ। বিশেষ করে মরফিকে পেটানোর পর।
কিন্তু ক্লাস শেষে এমন একটা ঘটনা ঘটল, আবার চুরমার হয়ে গেল তার বিশ্বাস। ফিরে এল পুরানো ভয়টা। ঘণ্টা বাজার পর ক্লাস থেকে বেরিয়ে লকারের দিকে এগোচ্ছে, হঠাৎ কানে এল টেরি আর টাকির কথা। নিজের নাম শুনে থমকে দাঁড়াল মুসা। কান খাড়া করে শুনতে লাগল।
টাকি বলছে, সত্যি করবে?
নিশ্চয়ই, জবাব দিল টেরি। মরফি হাদাটা যে এমন করে কেঁচে দেবে সব কে জানত!...তবে আমি কেলোটাকে মু-স্মুসা না বানিয়ে ছাড়ব না।
একটা থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে মুসা। মনে হলো, টেরি আর টাকি তাকে দেখেছে। তাই নিজেরা কথা বলার ছলে ইচ্ছে করেই এ সব শোনাচ্ছে।
কিন্তু বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে, টেরি, টাকি বলল। এত ভয়ানক!...নাহ এতটা করা ঠিক হবে না।
এতটাই করব! শুধু তাই না, দরকার হলে আরও ভয়ঙ্কর কিছু করতেও দ্বিধা করব না আমি।

.

কয়েক রাত পর। মুসাদের ডাইনিং রুমের টেবিলে হুমড়ি খেয়ে আছে তিন গোয়েন্দা। সবাই মিলে হোমওঅর্ক করছে। মুসার বাবা-মা বাড়ি নেই। বাড়িতে সে একা। তাই ফোন করে আনিয়ে নিয়েছে দুই বন্ধুকে। তিনজনেই গভীর মনোযোগে অঙ্কের সমস্যা সমাধানে ব্যস্ত।
এই সময় দরজার ঘণ্টা বাজল। এতটাই চমকে গেল মুসা, কাগজে চাপ লেগে পেন্সিলের সীস ভেঙে গেল। হঠাৎ করেই মনে হলো তার, নিশ্চয় টেরির দল। আবার এসেছে তার সাহস পরীক্ষা করতে।
এত আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই-মনে মনে নিজেকে বোঝাল মুসা। দেখাই যাক না আগে কে এসেছে।

উঠে দরজা খুলতে এগোল সে। পেছন পেছন চলল কিশোর।
দরজা খুলে দিল মুসা। ঠিকই অনুমান করেছে সে। টেরির বাহিনীই। ঘরে ঢুকল টাকি। গায়ে নীল জ্যাকেট। মাথায় উলের স্কি হ্যাট। বাপরে বাপ, বাইরে কি ঠাণ্ডা!
টান দিয়ে টুপিটা খুলে নিয়ে অস্বস্তিভরে চারপাশে তাকাতে লাগল সে। মুসা, সত্যি ভাই, আমি দুঃখিত। অনেক বোঝানোর চেষ্টা করেছি ওকে। থামাতে পারিনি?
তাই নাকি? মুসার আগেই জবাব দিল কিশোর, কিসের দুঃখ? কাকে থামাতে পারনি।
উঠে এসে রবিনও দাঁড়াল ওদের পেছনে। আরে ধূর, কিসের থামাথামি! হাত নেড়ে বলল সে। বুঝতে পারছ না, নাটক করে মুসাকে ঘাবড়ে দেয়ার চেষ্টা করছে।
কিন্তু তাতে কোনই লাভ হবে না, বুড়ো আঙুল নাড়ল কিশোর। ঘটে সামান্যতম ঘিলু থাকলে এতদিনে বুঝে যাওয়া উচিত ছিল ওদের, মুসাকে ওরা ভয় দেখাতে পারবে না।
কিন্তু, দেখো, কিশোর, শান্তকণ্ঠে বলল টাকি, মুসা তোমার বন্ধু। উত্তেজিত করে করে এ ভাবে ওকে বিপদের মধ্যে ঠেলে দেয়া তোমার উচিত হচ্ছে না। তোমরা জানো না টেরি এবার কি করতে চলেছে। অনেক বোঝানোর চেষ্টা করেছি ওকে। শুনল না। সে করবেই করবে। এ বাজি তাকে জিততেই হবে।
অজানা আশঙ্কায় মেরুদণ্ড বেয়ে শীতল শিহরণ বয়ে গেল মুসার। সেদিন স্কুলে আড়ালে দাঁড়িয়ে শোনা কথাগুলো মনে পড়ে গেল। ভাঁজ হয়ে আসতে চাইল হাট।
টাকি যাতে বুঝতে না পারে, সেভাবে সরে গিয়ে একটা কাউচের হেলান খামচে ধরে দাঁড়িয়ে রইল। ভাবছে, বাদ দেয়া দরকার এ খেলা! টেরিকে বিশ্বাস নেই। বাজি জেতার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে সে। কি করবে কে জানে!
আমি টেরির সঙ্গে একমত হতে পারলাম না বলেই তোমাদের সতর্ক করে দিতে এলাম, টাকি বলল। ভয়ানক কোন বিপদ যদি ঘটে যায় পরে আমাকে দোষ দিতে পারবে না।
ঢোক গিলল মুসা।
ভয়ানক কোন বিপদে যদি পড়ে কেউ, শীতল কণ্ঠে জবাব দিল কিশোর, তো পড়বে তোমার ওস্তাদ শুঁটকি আর বাকি চামচাগুলো। মুসার কিছু হবে না। তোমার ওস্তাদকে গিয়ে বলে দাও, ইচ্ছে সে করতে পারে। তবে এবার আর টাকা মাপ করব না আমরা। দুশো ডলার যেন রেডি রাখে।
টাকাটা বরং তোমরাই নিয়ে যেয়ো পকেটে করে। মুসার দিকে তাকাল টাকি, মুসা, মনে রেখো বিপদটা তোমার হবে, আর কারও না।

কটাক্ষটা যে তাকে উদ্দেশ্য করেই করা হয়েছে, বুঝতে পারল কিশোর। তুমি আসলে বেশি কথা বলো। কে বলেছে তোমাকে ভালমানুষী দেখাতে আসতে? মুসা চ্যালেঞ্জটা নিয়েছে, যত বিপজ্জনকই হোক। ওসব বোলচাল না ঝেড়ে কি করতে হবে এখন তাকে, সেটা বলো।
হতাশ ভঙ্গিতে জোরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল টার্কি। টুপিটা মাথায় দিল আবার। যাবেই?
মাথা ঝাঁকাল কিশোর, হ্যাঁ।
বেশ। কোট-টোটগুলো পরে এসো আমার সঙ্গে।
*
টাকির সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা। দরজায় তালা দিল মুসা। ওর বাবার কাছে বাড়তি চাবি আছে। দরজা খুলতে অসুবিধে হবে না।
অক্টোবরের ঠাণ্ডা রাত। তা ছাড়া শীতটা এবার তাড়াতাড়ি পড়াতে ঠাণ্ডাটা জাকিয়ে বসেছে। তার ওপর রয়েছে ঝোড়ো বাতাস, লনের শুকনো ঝরা পাতায় ঘূর্ণি তুলছে। পাতাহারা শূন্য গাছগুলো বাতাসের ঝাপটায় যেন পাতার শোকেই গুঙিয়ে উঠছে বারবার, বিচিত্র শব্দে আর্তনাদ করছে।
বৃষ্টির দুচারটা ঠাণ্ডা ফোঁটা এসে পড়ল মুসার কপালে। গায়ের কালো পারকাটার জিপার টেনে দিল সে। মাথায় তুলে দিল হুড।
টাকির সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে রাস্তার মোড়ে চলে এল তিন গোয়েন্দা। সশব্দে বড় রাস্তা ধরে চলে গেল একটা বাস। ভেতরে যাত্রী মাত্র। দুতিনজন।
বাসটা চলে গেলে নির্জন রাস্তা পেরোল ওরা। হাঁটতে থাকল।
কোথায় চলেছে জানে মুসা। আগেই ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছে টেরি। বলার সময় টেরির তিলে ভরা মুখটার উজ্জ্বলতা কল্পনা করে মনে মনে দমে গেল সে।
একটা পার্কিং লটের পেছনে পাতাবাহারের বেড়ার কাছে এসে থামল ওরা। ওপাশে অন্ধকার লম্বা একটা বিল্ডিং। সামনে কাঠের সাইনবোর্ডের ওপর জ্বলছে হলুদ স্পটলাইট। লেখাগুলো পড়া যায়: দা এন্ডলেস স্লীপ!
অনন্ত ঘুম! বাংলায় বিড়বিড় করল কিশোর।
ফিরে তাকাল রবিন। বুঝতে পারল, বোর্ডের লেখাগুলোর বাংলা অনুবাদ করেছে কিশোর। চুপ করে রইল।
ফিউনরল পারলারটার মালিক টেরির বাবা।
বাড়িটার দিকে তাকিয়ে গায়ে কাঁটা দিল মুসার। ভেতরে কি লাশ আছে এখন? মানুষের মৃতদেহ? নিশ্চয় আছে-নিজের প্রশ্নের জবাব নিজেই দিল মনকে মুসা। ফিউনরল পারলার মানেই তো লাশ রাখা, কবর দেয়ার আগে গোসল করানো, কাপড় পরানো, সুগন্ধি মাখিয়ে কফিনে ভরার জন্যে তৈরি করার জায়গা।

পারকার পকেটে যতটা যায়, হাত দুটো ঠেলে ঢোকাল সে। পাশে দাঁড়ানো কিশোরের দিকেও তাকাতে ইচ্ছে করছে না। টেরিকে এতখানি আগে বাড়তে দেয়ার জন্যে সে-ই দায়ী। কি দরকার ছিল এ সব বাজি ধরাধরির!

অ্যাই যে, এসে গেছে আমাদের সুপারহিরো! কানের কাছে কথা বলে উঠল কডি, চাপড়ে দিল মুসার পিঠ।

এত চমকে গেল মুসা, মনে হলো দশ হাত শূন্যে লাফিয়ে উঠেছে।

ছায়া থেকে বেরিয়ে এল নিটু আর হ্যারল্ড। কডির পাশে দাঁড়াল।

টেরি কোথায়? জানতে চাইল কিশোর।

এক ঝলক ঝোড়ো বাতাস কাঁপুনি তুলল পাতাবাহারের বেড়ায়। আধো অন্ধকারে বেড়ার ওপরের অংশের কাঁপুনি দেখে মনে হলো এঁকেবেঁকে চলে গেল একটা বিরাট সাপ। বাতাসের ঝাপটায় মাথার হুড পেছনে খসে পড়ল মুসার। সঙ্গে সঙ্গে কপালে লাগল বৃষ্টির ফোঁটা।

টেরিকে আটকে ফেলেছে, জবাব দিল টাকি।

আটকে ফেলেছে? মুসা অবাক। কই, আগে তো বলনি?

মাথা ঝাঁকাল টাকি, হ্যাঁ, আটকে ফেলেছেন, ওর বাবা। চুপি চুপি বেরোতে যাচ্ছিল টেরি, ধরা পড়ে গেছে।

মজাটা আর উপভোগ করতে পারল না আজকে, হেসে বলল কডি।

মজা না ছাই! তেতো হয়ে গেছে মুসার মন।

চিন্তা কোরো না, মুসা, কড়ি বলল। ত্রাহি চিৎকার করে কিভাবে ছুটে পালিয়েছ তুমি, মুখে বলেই সেটার ছবি দেখিয়ে দেব আমরা ওকে।

ত্রাহি চিৎকার মুসা নয়, তোমরা করবে, গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিল কিশোর। সেই সঙ্গে মাতম। চাপড়ে চাপড়ে রক্তাক্ত করে ফেলবে কপাল, এতগুলো টাকা পকেট থেকে বেরিয়ে যাওয়ার শোকে।

ফিউনরল পারলারের দিকে তাকাল আবার মুসা। সাধারণ দেখতে, অনেক লম্বা, একতলা একটা বাড়ি। অস্বাভাবিক কিছু নেই। কিন্তু মুসার কাছে ভয়ানক অস্বাভাবিক লাগল। কালো, অশুভ, ভুতুড়ে একটা বাড়ি-হরর সিনেমার বাড়িগুলোর মত।

ভেতরে সারি দিয়ে রাখা কফিনগুলো কল্পনা করল সে। ধাতব টেবিলে চিত করে ফেলে রাখা অসংখ্য লাশ।...কফিনের ডালা একের পর এক উঠে যেতে শুরু করল...দেখা দিল পচে বিকৃত হয়ে যাওয়া লাশের মাথা... সবুজ হয়ে যাওয়া লাশগুলো বেরিয়ে আসতে লাগল...টলছে, গোঙাচ্ছে। এগিয়ে আসতে লাগল মাংস খসে পড়া ফোলা ফোলা হাত বাড়িয়ে দিয়ে। বড় বড় ময়লা নখওয়ালা

আঙুলগুলো বাঁকা করে রেখেছে তাকে খামচে ধরার জন্যে। বসে যাওয়া কোটরে নিষ্প্রাণ চোখগুলোর দিকে তাকানো যায় না...।
থামো! আর এগিয়ে না! নিজেকে ধমকে উঠল মুসা। মনে মনে। বেপরোয়া কল্পনার রাশ টেনে থামানোর চেষ্টা করল।
ঢোক গিলল একবার। মাথা ঝাড়া দিল। হাত দিয়ে মুছল বৃষ্টি ভেজা কপাল। টাকির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, কি করতে হবে আমাকে, বলো!

.

মুসার প্রশ্ন হাঁ করিয়ে দিল টাকি আর তার তিন দোস্তকে। সবার আগে সামলে নিল কডি। নিষ্ঠুর, শীতল হাসি হাসল। সে তাতে যোগ দিল নিটু আর হ্যারল্ড।
টাকি হাসল না। গম্ভীর হয়ে বলল, আমি তোমাকে এখনও কাজটা না করতে অনুরোধ করব, মুসা।
কেন, তোমার হঠাৎ এত মুসার জন্যে দরদ উথলে উঠল কেন? কিশোর বলল। ওর নাটকে কান দিয়ো না, মুসা। কথা বুলে ভয় দেখিয়েই ও তোমাকে কাবু করে ফেলার চেষ্টা করছে।... শোনো টাকি, আমি বলি কি, অকারণে সময় নষ্ট না করে টাকাগুলো দিয়ে বিদেয় হও। টেরিকে গিয়ে বোলো, বাজিফাজি খতম। কত আর বলব, মুসা কোন কিছুকে ভয় করে না।
না দেখে কিছু বিশ্বাস করব না। হাত তুলে বাড়িটা দেখাল টাকি। মুসা, পেছনের ওই জানালাটা দেখতে পাচ্ছ?
পাতাবাহারের ওপর দিয়ে গলা লম্বা করে তাকাল মুসা। সবগুলো জানালাই অন্ধকার। কোনটাতে আলো নেই। সমস্ত বাড়িটায় আলো বলতে শুধু ওই একটাই, বোর্ডের ওপরের স্পটলাইট। এ পরিবেশে হলুদ আলোটাকেও কেমন ভুতুড়ে লাগছে।
দেখছ না জানালাটা? জিজ্ঞেস করল টাকি।
মাথা ঝাঁকাল মুসা।
ওটা দিয়ে ঢুকতে হবে তোমাকে।
ঢুকতে হবে!
কেন, ঘাবড়ে গেলে?
হেসে উঠল টাকি বাদে টেরির বাকি তিন সহচর।
আমি বলতে চাইছি, কাজটা বেআইনি হবে না? কণ্ঠস্বর যতটা সম্ভব স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করল মুসা। টেরির বাবা কি জানেন?
আরে নাহ! পাগল নাকি! টাকি বলল।
কডি বলল, টেরির বাবা জানলে আমাদের সবাইকে ধরে জ্যান্ত পুঁতে ফেলবেন।

যেন মস্ত এক রসিকতা করে ফেলেছে কডি। হো হো করে হেসে উঠল নিটু আর হ্যারল্ড। পিঠে চাপড় মারতে শুরু করল পরস্পরের।
আস্তে! সাবধান করল টাকি। অত জোরে হেসো না। কেউ শুনে ফেলবে।
ধূর, এ সব বাঁচালের দলের সঙ্গে কে গেম খেলতে যায়! রেগে উঠল কিশোর। এই টাকি, আমাদের টাকা দিয়ে দাও, আমরা চলে যাই। বসে বসে এখানে যত খুশি প্যাচাল পাড়োগে তোমরা। আমি সারারাত ঠাণ্ডার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে পারব না।
কাজটা সহজ, মুসার কাঁধে হাত রেখে আন্তরিক স্বরে বলল টাকি। বাড়ির পেছনের জানালাটার দিকে ইঙ্গিত করল আবার। জানালাটা খুলবে। চৌকাঠে উঠে বসবে। লাফ দিয়ে নামবে নিচে। সামনে প্রথম যে কফিনটা পড়বে সেটার মধ্যে ঢুকে শুয়ে পড়বে।
কিন্তু...কিন্তু... বলতে গেল মুসা। কিশোরের জন্যে পারল না।
কিশোর বলল টাকিকে, ব্যাস, এই? শুধু এটুকুর জন্যে এত ভণিতা? এ কোন কাজ হলো! নাহ, টাকার কোন মায়াদয়া নেই তোমাদের।
কিশোর, শোনো... আবার বলতে গেল মুসা, কফিনে ঢোকার কথা শুনেই ঘাবড়ে গেছে। ক-ক...।
শুনল না কিশোর। টাকিকে বলল, ভয় দেখানোর মত আর কিছুই কি মাথায় আসে না তোমাদের? না এলে হাতজোড় করে সাহায্য চাও, আমিই নাহয় বলে দেব একটা কিছু।
কিশোরের কথাবার্তায় অবাক হচ্ছে রবিন। টেরির দলকে উস্কে দিয়ে মুসাকে বার বার এ ভাবে বিপদের মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে কেন কিশোর? কারণটা কি?
কিশোর বলল, মুসা, যাও না, চট করে সেরে চলে এসো কাজটা। আজ আর টাকা না নিয়ে ছাড়ছি না ওদের কাছ থেকে। দুই-দুইবার মাপ করলাম, আর কত। যাও, যাও।
টাকিকে জিজ্ঞেস করল মুসা, আমি ঢুকলাম কিনা, কি করে জানছ তোমরা?
আমরা চেয়ে থাকব, জবাব দিল টাকি। পেছনের জানালায় দাঁড়িয়ে সবাই দেখব আমরা।
টেরির বাবার লোক যদি আমাদের ধরে ফেলে?
ধরবে না। আর কোন মানুষই থাকে না এখানে, লাশগুলো বাদে।
লাশকে নিশ্চয় ভয় পাও না তুমি? ফ্যাকফাঁক করে হাসল কডি।
হ্যাঁ, পাই!-মুসা বলল। তবে শুনিয়ে নয়, মনে মনে। লাশকে ভয় পায় না কে!
তার কথার সমর্থনেই যেন আরেক ঝলক বাতাস কাঁপিয়ে দিয়ে গেল। পাতাবাহারের বেড়াকে। বাতাসের শব্দকে লাগল প্রেতাত্মার দীর্ঘশ্বাসের মত।

কেঁপে উঠল মুসা। কপালে আঘাত হানছে বৃষ্টির ফোঁটা। বৃষ্টি বেড়েছে। হুডটা আবার তুলে দিল সে।
যাও, মুসা, তাগাদা দিল কিশোর, কাজটা যত তাড়াতাড়ি পারো শেষ করে চলে এসো। বাড়ি যাই। এই ছাগলগুলোর চেহারা দেখতেও বিরক্ত লাগছে আমার।
দেখো, মুখ সামলে কথা বলো! রেগে গেল কডি।
কেন, মারবে নাকি? মরফির কি অবস্থা করে ছেড়েছে মুসা, বলে বলে কল্পনায় ছবি দেখায়নি তোমাদের দোস্ত টাকি? খোঁচাটা ঠিকই দিয়ে দিল কিশোর। তোমার ওস্তাদ টেরিই তো ঘুস দিয়ে পাঠিয়েছিল ওকে, নাকি?...এসো হয়ে যাক তাহলে আরেকটা বাজি, মারামারির...
কিশোর, প্লীজ! নতুন আর কোন চ্যালেঞ্জে যেতে চায় না মুসা।
থেমে গেল কিশোর।
বাড়িটার দিকে তাকাল মুসা। পারবে কি? লাশ ভর্তি ঘরে ঢুকে কফিনের মধ্যে শুতে পারবে?
বেড়ার কাছ থেকে বাড়িটা মাইলখানেক দূরে মনে হলো তার। যে হারে পা কাঁপছে হেঁটে জানালা পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে কিনা সন্দেহ হলো।
সত্যি কথাটা বলে ফেল, মুসা!-ভাবল সে। জানিয়ে দাও ওদের, এ কাজ তুমি পারবে না। বলে দাও, এত সাহস তোমার নেই। ল্যাঠা চুকে যাক। কিন্তু এর পরে যে কি হবে ভাবতেই দমে গেল সে। এতগুলো টাকা গচ্চা যাবে। তার ওপর রয়েছে তোতলা মুসা খেতাব নিয়ে টিকে থাকা।
না, মুসা, কোন উপায় নেই আর তোমার। ভাল ফাঁদে জড়িয়েছ তুমি। সব রাগ গিয়ে পড়ল কিশোরের ওপর। কিশোরই তাকে এ রকম করে ফাঁসিয়েছে! টেরির দলের সঙ্গে অতটা বাড়াবাড়ির কি কোন প্রয়োজন ছিল?
আমি যাচ্ছি, বলল সে। কপালের ওপর থেকে হুডটা সরিয়ে দিল। বাতাসের অনুকূলে মাথা নিচু করে রেখে, গাছের বেড়া ফাঁক করে ঠেলে বেরিয়ে এল অন্যপাশে। পার্কিং লটে ঢুকল।
আধাআধি গিয়েছে, এই সময় হঠাৎ জ্বলে উঠল উজ্জ্বল আলো। সরাসরি তার গায়ে এসে পড়ল।
বরফের মত জমে গেল মুসা।
দুই হাত চোখের ওপর এনে রাস্তার দিকে তাকাল। ড্রাইভওয়ে দিয়ে V একটা ভ্যান ঢুকছে। ওটার হেডলাইটের আলো।
বুকের মধ্যে দুরুদুরু করছে মুসার। চকিতে পিছিয়ে গেল। তারপর ঘুরে দিল দৌড়। প্রায় ডাইভ দিয়ে এসে পড়ল পাতাবাহারের বেড়ার ওপর।
কে ও? জিজ্ঞেস করল টাকি।

আমি কি করে জানব? হাঁপাতে হাঁপাতে জবাব দিল মুসা।
বাতাসে কম্পমান বেড়ার আড়ালে লুকিয়ে রইল সবাই। ভ্যান থেকে নামতে দেখল দুজন লোককে। কপালের ওপর টেনে দিয়েছে হ্যাট। চেহারা বোঝা যাচ্ছে না।
পেছনের দরজা খুলল একজন। লম্বা কালো একটা প্ল্যাস্টিকের ব্যাগ টেনে নামাল।
লাশের ব্যাগ।
নীরবে তাকিয়ে রইল ছেলেরা। ভারী ব্যাগটা ধরাধরি করে ভেতরে নিয়ে গেল লোক দুজনে।
একটু আগে মারা গেছে নিশ্চয়, বিড়বিড় করল টাকি। রাতেও আসা
বন্ধ নেই। কেঁপে উঠল সে।
তুমি না বললে কেউ আসবে না? ফিসফিস করে বলল মুসা।
আসার তো কথা ছিল না। তবে ওরা বাইরের লোক। তুমি ভেতরে থাকতে থাকতে আবার যদি কেউ আসে, লুকিয়ে পোড়া। লুকানোর জন্যে অনেক কফিন আছে। নিচু স্বরে হাসল সে। তোমার তো বেজায় সাহস। পারবে না?
নিটু আর হ্যারল্ড নীরবে হাসল।
দম আটকে রাখতে রাখতে ফুসফুস ব্যথা শুরু হয়ে গেল মুসার। মনে হলো ফেটে যাবে। ফোঁস করে ছেড়ে দিল বাতাস।
ধরা পড়ার বেশি ভয় যদি করো, কডি বলল, এখনও সময় আছে, হার স্বীকার করে নাও। কষ্ট করার আর দরকারই নেই তোমার। কি বলো?
হার স্বীকারের কথা আসছে কেন? এতক্ষণে কথা বলল কিশোর। লোকগুলো গেলেই গিয়ে ঢুকবে ও। ঢুকতেই তো যাচ্ছিল।
পারকার পকেটে দুই হাত ঢুকিয়ে দিল মুসা। হুডের নিচে মুখ লুকানোর চেষ্টা করল। আতঙ্কিত চেহারাটা কাউকে দেখাতে চায় না।
ফিউনরল পারলারের পাশের একটা জানালায় আলো জ্বলল। সবুজ পর্দা টানা জানালায় ভুতুড়ে লাগল আলোটা।
মিনিট দুয়েক পর আবার নিভে গেল। বেরিয়ে এল লোকগুলো। ভ্যানের কাছে এসে পেছনের দরজাটা লাগাল দড়াম করে। সামনে গিয়ে উঠে বসল।
চলে গেল গাড়িটা।
ফিরে তাকাল মুসা। সবগুলো চোখের দৃষ্টি তার দিকে।
আমি যাচ্ছি, নিচু স্বরে বলল সে।
দ্বিতীয়বার বেড়া. ফাঁক করে ঠেলে বেরোল পার্কিং লটে। এগিয়ে চলল বাড়িটার দিকে।

পেছন পেছন চলল বাকি সবাই। ভেজা, পাকা চত্বরে ওদের জুতোর শব্দ হতে লাগল।
বাড়িটার পেছনে পাতাশূন্য গাছগুলো বাতাসে দুলে দুলে যেন হাত নেড়ে তাড়ানোর চেষ্টা করতে লাগল ওদের।
বাড়ির পেছনে এক চিলতে ঘাসে ঢাকা জমি আছে। পাকা চতুর থেকে সরে ওখানে পা দিতেই ফচ্ করে ভেজা মাটিতে ডেবে গেল মুসার জুতো। তারপর যতবার পা ফেলল ফচ ফচ করতেই থাকল।
পেছনের জানালাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। দপদপ করে লাফাচ্ছে কপালের কাছে শিরাটা। কাঁচের গায়ে নাক ঠেকিয়ে উঁকি মেরে ভেতরে দেখার চেষ্টা করল। কিছুই দেখতে পেল না। ভেতরে অতিরিক্ত অন্ধকার। কোন রকম আলো নেই। থাকলেও পর্দার জন্যে ভেতরের জিনিস দেখা যেত না।
দাঁড়িয়ে আছো কেন? জানালা খোলো, তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল টাকি। কণ্ঠস্বরে মনে হলো ভয় পাচ্ছে।
কাঁচের গায়ে পুটুর পুটুর আওয়াজ তুলছে বৃষ্টির ফোঁটা। দুই হাত বাড়িয়ে কাঠের ফ্রেম চেপে ধরে ঠেলা দিল মুসা। সহজেই ওপর দিকে উঠে গেল পাল্লাটা। দমকা বাতাসে দুলে উঠল জানালার দুদিকের পর্দা। জীবন্ত মনে হচ্ছে ও দুটোকে।
জানালার চৌকাঠের ওপর দিয়ে ভেতরে উঁকি দিল মুসা। এইমাত্র যে লাশটা আনা হলো, কোথায় রেখে গেল ওটা? কিছুই চোখে পড়ছে না।
তীব্র একটা দুর্গন্ধ এসে ধাক্কা মারল নাকে।
উঁহ, কি গন্ধ! নাক কুঁচকে ফেলল মুসা।
লাশের গন্ধ, একপাশ থেকে বলল কডি। পচা, ফুলে ওঠা লাশ।
ওর কথায় কান দিয়ো না, কিশোর বলল, ওটা ফরমালডিহাইডের গন্ধ। লাশের গায়ে মাখানো হয়।
পেটের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠল মুসার। গন্ধটা সহ্য করতে পারছে না।
হার স্বীকার করবে? মুসার কাঁধে আবার আন্তরিক ভঙ্গিতে হাত রাখল টাকি। দেখো, টাকা-পয়সা হাতের ময়লা। প্রাণই যদি না বাঁচল টাকা দিয়ে কি করবে? বলো, ভয় পেয়েছ। পেয়েছি শুধু একটা শব্দ উচ্চারণ করলেই ছেড়ে দেব।
না! তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠল কিশোর। মুসা আমান ভয় পায় না! ভয় শব্দটা ওর অভিধানেই নেই। বিশ্বাস না হয় রবিনকে জিজ্ঞেস করে দেখো। কি বলো, রবিন?
নীরবে মাথা ঝাঁকাল রবিন।
মুসা, উঠতে পারবে? ঠেলা দেব? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
না, লাগবে না, দুই হাতে চৌকাঠ চেপে ধরল মুসা। দেয়ালে পা বাধিয়ে বেয়ে উঠে গেল ওপরে। অন্যপাশে পা ঝুলিয়ে দিয়ে চৌকাঠে বসল।

.
পর্দার কোনাগুলো বাতাসে উড়ে এসে পেঁচিয়ে ধরতে গেল যেন মুসার গলা।
প্রথম কফিনটা, মনে করিয়ে দিল টাকি, অন্য কোন কফিনে ঢুকলে কিন্তু হবে না। যাও, নামো। ডালা খুলে ঢুকে পড়ো।
আমরা কিন্তু তাকিয়ে রইলাম, কড়ি বলল।
ইস, আমার ক্যামেরাটা কেন যে আনলাম না, আফসোস করতে লাগল হ্যারল্ড। আতঙ্কে পাগলের মত চিৎকার করতে করতে ছুটে পালাচ্ছে মুসা আমান-এমন একটা দৃশ্যের ছবি তোলার সুযোগ আর জীবনে পাব না।
থামো! কঠিন স্বরে ধমকে উঠল কিশোর। একদম চুপ! ফাজলেমি মার্কা আর একটা কথা বললে ভাল হবে না বলে দিচ্ছি!
ওদেরকে ঝগড়ার সুযোগ দিল না মুসা। লাফিয়ে নামল ভেতরে। ধীরে ধীরে সোজা করল শরীরটা।
বাতাসে পর্দা দোলাচ্ছে। একটা পর্দার নিচের অংশ আলতো বাড়ি মারছে তার পিঠে। আরেকটা পর্দার কোনা এসে আবার পেঁচিয়ে ধরতে গেল গলা।
টান দিয়ে গলা থেকে পর্দাটা সরিয়ে সামনে তাকাল সে। অন্ধকারে দেখার চেষ্টা করল।
কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ফিরে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, আলো জ্বালব? কিছু তো দেখছি না।
না, আলো জ্বালানো চলবে না, টাকি বলল। ঠিক আছে, কফিনটা কোনখানে দেখানোর ব্যবস্থা করছি। একটা টর্চ বের করে জানালার ফ্রেমের ওপর হাত বাড়িয়ে দিয়ে জ্বালল সে। ম্লান একটা গোল আলো গিয়ে পড়ল মেঝেতে।
কয়েক পা এগিয়ে গেল মুসা। আলোটা স্থির হয়ে আছে এক জায়গায়।
পেছনে আরেকটা টর্চ জ্বলে উঠল। কড়ি জ্বেলেছে। আলো দুটো খুদে স্পটলাইটের মত ঘুরে বেড়াতে লাগল মেঝেতে।
সেই আলোর আভায় যতটা সম্ভব ঘরটা দেখে নিতে লাগল মুসা। ছাত একেবারেই নিচুতে। ওর মাথার ফুট দুই ওপরে। পাশাপাশি রাখা দুটো ধাতব টেবিল দেখতে পেল। একটা খালি। আরেকটার ওপর লম্বা কোন জিনিস প্ল্যাস্টিকের চাদর দিয়ে ঢাকা। তলায় কি আছে বুঝতে অসুবিধে হলো না ওর।
একদিকে একটা ডেস্কের ওপর রাখা কাগজ ফড়ফড় করছে বাতাসে। দেয়াল ঘেঁষে রাখা একসারি ফাইলিং কেবিনেট। নানা রকম কয়েল আর টিউব। হাসপাতালের ঘরের মত। ওগুলোর পাশে নিচু টেবিলের ওপর সাজিয়ে রাখা কালো রং করা কফিনের সারি। টর্চের আলোর আভায় চকচক করছে।
খাইছে! ঝুলে পড়ল মুসার নিচের চোয়াল।

ভয় পাচ্ছো, কালটু মিয়া? কড়ি জিজ্ঞেস করল। হাতের আলোটা ঝটকা দিয়ে উঠে এল মুসার মুখের ওপর।
আলো নামাও, গাধা কোথাকার! দেখব কি করে? ধমকে উঠল মুসা।
কফিনগুলো তো দেখলে, টাকি বলল। ওই যে, প্রথম কফিনটা। যাও। টর্চের আলো ফেলে কোন কফিনটাতে ঢুকতে হবে দেখিয়ে দিল সে।
ভয় পাচ্ছে! নিটু বলল। এই, জানালার কাছ থেকে সরে যাও তোমরা। মু-ম্মুসাকে পালানোর পথ করে দাও।
ও পালাবে না, পালাবে না, পালাবে না! চিৎকার করে উঠল কিশোর। কতবার বলব? তোমাদের মত মুরগীর কলজে নাকি ওর? ...যাও, মুসা, এগোও। শুয়ে পড়োগে কফিনটার মধ্যে। টাকা আয়ের খুব সহজ রাস্তা।
সহজ, তবে তোমার জন্যে-মনে মনে বলল মুসা। ঈশপের গল্পের একটা উপমা মনে পড়ল: তোমাদের জন্যে খেলা বটে, আমার জন্যে মরণ! কফিনগুলোর ওপর চোখ বোলাতে বোলাতে ভাবল, সত্যি কি পারবে ঢুকতে? কেমন লাগবে? ভেতরের গন্ধটা কেমন?
বুকের মধ্যে হাতুড়ি পিটাচ্ছে। জানালার দিকে ফিরল সে। জিজ্ঞেস করল, কফিনে শুয়ে কি ডালা নামিয়ে দিতে হবে?
ঢোকো, অধৈর্য কণ্ঠে টাকি বলল, শুধু ঢুকলেই হবে। আর কিছু করতে হবে না তোমাকে, মু-ম্মুসা! বাকিটা যার করার সে-ই করবে, রহস্যময় শোনাল তার কথা। জলদি করো। বাইরে যা ঠাণ্ডা।...পারবে? না পারলে চলে এসো।
পারবে না মানে? জোরগলায় বলল কিশোর। অবশ্যই পারবে। এ কোন ব্যাপার হলো!
ধীর পায়ে কফিনগুলোর দিকে এগিয়ে চলল মুসা। টর্চের আলো দুটো স্থির হয়ে আছে পেছনের সবুজ দেয়ালে। কফিনের ডালা নামানো।
যাও, মুসা, যাও! ঢুকে পড়ো! ও কোন ব্যাপারই না তোমার জন্যে! জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে মুসাকে অভয় দিল কিশোর। তাতে আরও পিত্তি জ্বলে গেল মুসার। অন্যকে পরামর্শ দেয়া সোজা!
ও এত দেরি করছে কেন? অস্থির হয়ে উঠেছে কডি। মুসার দুর্গতি দেখার জন্যে তর সইছে না যেন আর।
কফিনের ডালার ওপর হাত নামাল মুসা। কাঠের অনুভূতিটা মসৃণ, শীতল। এত জোরে লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ডটা, শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।
ডালা তোলো, মুসা-নিজেকে বোঝাল সে। তারপর ঢুকে পড়ো ভেতরে। কি আর হবে? খাট আর চৌকির মত কফিনও কাঠেরই তৈরি। সাধারণ বাক্সের মত। নিচে গদি আছে। বাক্সের ভেতরে শুলে বিছানার মতই লাগবে।

সবুজ দেয়ালে নড়ে উঠল দুটো আলোর একটা। আবার স্থির হলো।
ডালার কিনার চেপে ধরে ভারী দম নিল মুসা। টেনে উঁচু করে ঠেলে দিল ওপর দিকে। পুরোটা খুলে ফেলল। তারপর তাকাল ভেতরে।
তীক্ষ্ণ চিৎকার বেরিয়ে আসতে শুরু করল গলার গভীর থেকে।

.

কাচের চোখের মত নিষ্প্রাণ দুটো চোখ। কালচে ঠোঁটে স্থির হয়ে আছে রক্ত পানি করা অস্বাভাবিক হাসি। নিচের ঠোঁটের ওপর নেমে এসেছে ওপরের পাটির একটা মাত্র দাঁত। ওই একটাই। মুখে আর কোন দাঁতই নেই। কপালে আর গালে গভীর কাটা দাগ। হাত দুটো বুকের ওপর আড়াআড়ি রাখা।
চিত হয়ে আছে লাশটা। স্তব্ধ। নিথর।
চিৎকারটা বেরোয়নি মুসার মুখ থেকে। নিজে নিজেই বন্ধ করেছে না অতিরিক্ত ভয়ে আটকে গেছে, বলতে পারবে না।
জানালার কাছ থেকে ডেকে জিজ্ঞেস করল কিশোর, মুসা, কি হয়েছে?
এ-একটা…লা-লা-লাশ, কাঁপা কণ্ঠে জবাব দিল মুসা। কফিনের দিকে আঙুল তুলল।
বললাম না ও ভয় পাবে, হারল্ডের কণ্ঠ কানে এল তার। চেঁচিয়ে গলা ফাটাবে।
তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে বিকৃত হাসি হাসতে লাগল তার বন্ধুরা।
কডি বলল, আমি শিওর, এইমাত্র যে লাশটা আনল, ওটাই রেখে গেছে ওই কফিনে।
আবার হেসে উঠল ওরা।
অত হাসির কি হলো? ধমকে উঠল মুসা। এখানে একটা মানুষের লাশ রয়েছে। মৃতদেহ। এতে হাসির কি দেখলে? দেখি আলোটা নামাও নিচের দিকে।
পেটের মধ্যে মোচড় দিচ্ছে তার। গলাটা এমন শক্ত হয়ে গেছে, নিঃশ্বাস ফেলার সময় চাপা শিসের মত শব্দ বেরোচ্ছে।
টর্চের আলো নিচে নামল। কিন্তু কফিনের গায়ে পড়ছে আলো, ভেতরে ঢুকতে পারছে না। কোনমতেই চেহারাটা স্পষ্ট হচ্ছে না।
ভয় পাচ্ছ নাকি? জিজ্ঞেস করল টাকি।
ও পারবে না, ঘোষণা করে দিল হ্যারল্ড।
তারমানে আমরা জিতে গেলাম, বলল কডি। দুশো ডলার!
গায়ের জোরের জেতা নাকি? কাজই শেষ হলো না এখনও, কর্কশ শোনাল কিশোরের কণ্ঠ। মাথাটা ঠেলে দিল জানালার ভেতরে। মুসা, ঢুকে পড়ো। শুয়ে পড়ো লাশটার ওপর। ও কিছু না। পারবে তুমি।…ও, দেখতে পাচ্ছো না? …এই, আলোগুলো ঠিকমত ফেলো তোমরা। না দেখলে কোথায় ঢুকবে?

লাশের ওপর শোব?
কি হবে? এক বিছানায় শোয় না দুজন মানুষ? তফাৎ শুধু বিছানার জায়গায় বাক্স, আর গরমের জায়গায় ঠাণ্ডা লাগবে স্পর্শটা। তোমার যে একবিন্দু ভয় লাগছে না, বুঝতে পারছি আমি।
ভয় না-মুনে মনে বলল মুসা, লাগছে আতঙ্ক!
যাও, ওঠো! কিশোর বলল।
কফিনটার দিকে ঘুরল মুসা। জানালার বাইরে চুপ হয়ে গেল সবাই। অস্পষ্ট আলোতে আরেকবার লাশটার দিকে তাকাল সে। তারপর যা থাকে কপালে ভেবে চেপে ধরল কফিনের কিনার।
ফরমালডিহাইডের তীব্র গন্ধ যেন পাক খেয়ে বেড়াচ্ছে চারপাশে। অসুস্থ বোধ করছে মুসা। বমি ঠেলে আসতে লাগল।
কফিনের ওপর ঝুঁকল সে। পারবে তো?
নাহ, পারবে না!
কফিনের কিনার ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে আসতে গেল।
কানে এল গোঙানির শব্দ।
ঘাড়ের রোম খাড়া হয়ে গেল তার।
অস্পষ্ট আলোতে একটা নড়াচড়া লক্ষ করল।
পরক্ষণে ঝটকা দিয়ে উঠে এল হাতটা। লাশের হাত। খামচে ধরল তার পারকা।
চিৎকার করার জন্যে আবার মুখ খুলল সে। এবারেও কোন শব্দ বেরোল না।
হাতের মুঠিটা শক্ত হলো।
থাবা মারল অন্য হাতটা।
হ্যাঁচকা টানে মুসাকে কফিনের মধ্যে উপুড় করে ফেলল।
না! বলে চিৎকার দিয়ে টানাটানি করে সরে আসতে চাইল মুসা।
উঠে বসল লাশটা। পারকা ছাড়ল না। টানছে, টেনে নিয়ে যাচ্ছে কাছে।
কাঁচের মত চোখজোড়া তাকিয়ে আছে নিষ্পলক।
গাল আর কপালের কাটা দাগটা অনেক গভীর আর স্পষ্ট লাগছে এখন।
ছাড়ো, ছাড়ো! বলে লাশের কব্জি চেপে ধরল মুসা। ঠেলে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করল।
ঝাড়া দিয়ে একটা হাত ছাড়িয়ে নিল লাশটা। গলা পেঁচিয়ে ধরল মুসার। কায়দা মত ধরতে পেরেছে এবার। টেনে নিয়ে যেতে শুরু করল কফিনের মধ্যে।
মুখটা লাশের বুকে চেপে বসতে দেরি নেই। গায়ের জোরে এক ঝাড়া মারল মুসা। একই সঙ্গে মুক্ত হাতটা দিয়ে প্রচণ্ড ধাক্কা মারল বুকে।

ছুটে গেল লাশের হাত। হঠাৎ ছুটে যাওয়ায় তাল সামলাতে না পেরে মেঝের ওপর পড়ে গেল মুসা।
ভারী একটা দেহ লাফ দিয়ে এসে পড়ল তার গায়ের ওপর। হুক করে বাতাস বেরিয়ে গেল ফুসফুস থেকে। আপনা-আপনি মুখ থেকে বেরিয়ে এল শব্দটা, খাইছে! পরক্ষণে চিৎকার করে উঠল, সরো, সরো ওপর থেকে, শয়তান কোথাকার!
কিন্তু সরল না জ্যান্ত হয়ে ওঠা লাশ। ওটার সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু করল মুসা। গড়িয়ে সরে আসতে চাইল নিচ থেকে। দুই হাত বুকে ঠেকিয়ে ধাক্কা মারতে লাগল।
কিন্তু লাশের গায়ে শক্তি কম না। দুই হাতে মুসার বাহু খামচে ধরে পেটের ওপর বসে রইল ওটা।
চলল ধস্তাধস্তি। টানাটানি। গোঙানো। বুকের পাঁজর ব্যথা করছে মুসার। মাথা ঘুরছে। ভূতের সঙ্গে লড়াই করে আর কতক্ষণ টিকবে, বুঝতে পারছে না।
আচমকা ঝটকা দিয়ে উঠে গেল তার ডান হাতটা। দুর্বল জায়গা মনে করে লাশের চুল চেপে ধরে মারল হ্যাঁচকা টান।
একটানে খুলে নিয়ে এল মাথাটা!

.

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত বোকা হয়ে ওটার দিকে তাকিয়ে রইল মুসা। ওটা যে মাথা নয় বুঝতে সময় লাগল। কাটা দাগগুলো কুচকে গেছে। বেরিয়ে থাকা একমাত্র দাঁতটা সহ ধসে পড়েছে ঠোঁট দুটো। একটা মুখোশ। রবারের মুখোশ।
বড় করে ঢোক গিলে লাশের মুখের দিকে তাকাল সে। শুঁটকি টেরি!
টেরি? কফিনের মধ্যে ঢুকে শুয়েছিল? আগেই সন্দেহ করা উচিত ছিল তার। যখন দেখেছে, দলের সঙ্গে টেরি নেই। তারপর ও ঢোকার জন্যে এগিয়ে যেতেই ভেতরে ঢুকল ভ্যানটা, যেন আর সময় পেল না। ভ্যানের লোকগুলোকে ঠিক করে রেখেছিল টেরি, সময় মত লাশ ভরার ব্যাগে করে টেরিকে এনে কফিনে রেখে গেছে ওরা। সেজন্যেই বার বার বলে দিয়েছিল টাকি, সামনে যে প্রথম কফিনটা পড়বে, সেটাতে ঢুকতে। তারপরেও আরও নিশ্চিত হওয়ার জন্যে টর্চের আলো ফেলে দেখিয়ে দিয়েছে।
ইস, আমি একটা গাধা! মনে মনে নিজেকে গাল দিল মুসা। মাথার চুল টেনে ছিঁড়তে ইচ্ছে করল। কিন্তু ওর চুল এতই ছোট করে ছাঁটা, কোকড়া হয়ে তারের জালের মত বসে আছে, ধরাই যায় না। তাই আপাতত ছেঁড়ার হাত থেকে বেঁচে গেল চুলগুলো। ছুঁড়ে ফেলল হাতের মুখোশটা।

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে দুজনে। মুখ ফাঁক। দুজনেই হাঁপাচ্ছে। দম নিতে ব্যস্ত।
মুসা ভাবছে, এখুনি লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াবে টেরি। হাসতে হাসতে নিজের বিজয় ঘোষণা করবে। কারণ, মুসা ভয় পেয়ে চিৎকার করেছে। সবাই শুনেছে সেটা।
কিন্তু তাকে অবাক করে দিয়ে বিমূঢ়ের মত মাথা নাড়তে লাগল টেরি। কি করে বুঝলে তুমি, ওর মধ্যে আমি আছি?
জ্বলে উঠল ছাতে লাগানো আলো। উজ্জ্বল আলোয় চোখ মিটমিট করতে করতে ফিরে তাকাল মুসা। দেখল, জানালা গলে ঘরে ঢুকেছে টাকি। বাকি সবাইও ঢুকছে।
এগিয়ে এসে মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলা মুখোশটা তুলে নিল টাকি। হাতে পেঁচাতে শুরু করল নরম রবারে তৈরি জিনিসটা।
রবিন আর কিশোর এসে দুদিক থেকে ধরে মুসাকে টেনে দাঁড় করাল।
বিমূঢ়তা কাটেনি টেরির। মুসার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বিড়বিড় করল, আমি, সেটা কি করে জানলে?
জবাব দিল না মুসা। সে নিজেও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে। টেরি রয়েছে, কল্পনাই করেনি। সত্যিকারের লাশ ভেবেছে।
ঘটনাটা যে কাকতালীয়ভাবে মুসার পক্ষে চলে এসেছে, কিশোরও অনুমান করে নিয়েছে সেটা। মুসা সত্যি কথাটা ফাস করে দেয়ার আগেই। সুযোগটা কাজে লাগাল, মুসাকে বোকা বানানো তোমার কর্ম নয়, টেরি, সে তো আগেই বলেছি। নইলে কি আর এত টাকা বাজি ধরতাম।
আমার মাথায়ই ঢুকছে না, মেঝেতে পা ছড়িয়ে দিয়ে, দুই হাত পেছনে নিয়ে গিয়ে তাতে ভর দিয়ে শরীরটা উঁচু করে রেখেছে টেরি। আমি ভেবেছি, দেখামাত্র লেজ তুলে দৌড় দেবে তুমি। কিংবা বাবাগো-মাগো চিৎকার দিয়ে ভিরমি খেয়ে পড়বে।
খলখল করে হেসে উঠল কিশোর। তাহলেই বোঝো, শুঁটকি, তোমার ক্ষমতা। হাত বাড়াল, আজ আর মাপ করছি না। টাকাটা দিয়ে দাও। তোমরা হেরেছ।
কিন্তু কথা যেন কানেই ঢুকছে না টেরির। শক পাওয়া মানুষের মত বিড়বিড় করেই চলল, তুমি টেনে আমার মুখোশ খুলে নিলে! জানো বলেই নিয়েছ। কি করে জানলে? কি করে?
মুসার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল কিশোর। মাথা নেড়ে ইঙ্গিতে বোঝাল-বোলো না, খবরদার!
চুপ করে রইল মুসা। সে যে ভয় পেয়েছে, আতঙ্কে আরেকটু হলে অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিল–জানতে পারলেই আবার পেয়ে বসবে টেরির দল।

শুঁটকি না হলে এ রকম ছাগুলে বুদ্ধি কেউ করে? তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে হাত নাড়ল কিশোর। ছ্যাহ! মুখোশ পরে মরা লাশ সাজে। মুসা আমান তো বিরাট ব্যাপার, একটা দুধের বাচ্চাও ধরে ফেলতে পারত এটা। আসল লাশকেই যে ভয় করে না, সে তোমাকে ভয় পাবে ভাবলে কি করে?
এতক্ষণে যেন সংবিত ফিরল টেরির। উঠে দাঁড়াল। তাই নাকি?
লজ্জা থাকলে আবার তাই নাকি বলছ। তুমি তো জ্যান্ত মানুষ, সত্যিকারের মরা লাশ থাকলেও কফিনে ঢুকতে পারবে মুসা, ঘোষণা করে দিল কিশোর। সামান্যতম বুক কাঁপবে না ওর। একবার মর্গে ঢুকে আমি আর রবিন ভয়ে দিলাম দৌড়, হাসতে হাসতে গিয়ে লাশের গালে গাল ঘষতে লাগল সে।
কিশোর, দোহাই তোমার! চুপ করো! আর থাকতে না পেরে চিৎকার করে উঠল মুসা। মুঠো শক্ত হয়ে গেছে তার। এই জঘন্য খেলা...
দেখলে, কি বিনয়? প্রশংসা পর্যন্ত সইতে পারছে না।
চোখের পাতা সরু হয়ে এল টেরির। মুসার কাঁধ থেকে টোকা দিয়ে লাশ বাধা দড়ির একটা টুকরো ফেলল। ওর চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, আসল লাশকেও তাহলে ভয় পাও না?
ইয়ে... বলতে গেল মুসা।
না, পায় না, মুসাকে কথা বলতে দিল না কিশোর।
ওর দিকে ঘুরল টেরি। বেশ। একটা শেষ বাজি। মুসার সর্বশেষ পরীক্ষা...।
তুমি ওর পরীক্ষা নেয়ার কে? রেগে উঠল রবিন।
বেশ, পরীক্ষা নয়, হাসল টেরি, ফাইন্যাল চ্যালেঞ্জ।
চ্যালেঞ্জ, শব্দটা এমন ভঙ্গিতে বলল টেরি, ভয় পেয়ে গেল মুসা।
পাঁচশো ডলার বাজি, কিশোরকে বলে মুসার দিকে তাকাল টেরি। সহসাই আবার দেখা হবে আমাদের, মু-স্মুসা। খুব শীঘ্রি। এখানে। এই ঘরে।
হাত বাড়াল কিশোর, টাকাটা! মাপ চাইলে অবশ্য মাপ করে দিতে পারি।
দ্বিধা করল টেরি। তারপর পকেটে হাত ঢোকাল। বের করে আনল শূন্য হাতটা। আনতে ভুলে গেছি। একবারেই নিও।

.

পরের রাতে অস্থির হয়ে পায়চারি করছে মুসা। এর একটা বিহিত Wil করতেই হবে। বন্ধ করতে হবে এই যন্ত্রণা। এ ভাবে সারাক্ষণ মানসিক চাপের মধ্যে থাকার চেয়ে তোতলা মুসা হওয়া বরং অনেক ভাল।
কিশোরকে ফোন করল সে। তৃতীয়বার রিঙ হতে তুলে নিল কিশোর, হালো, কিশোর পাশা বলছি।
আমি। মুসা।

ও, মুসা। কি খবর? থার্ড চ্যাপ্টারের অঙ্কগুলো মিলছে না তো?
জাহান্নামে যাক অঙ্ক! অঙ্ক নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না আমি। এত মানসিক চাপ নিয়ে হোমওঅর্ক করা যায় না।
মানসিক চাপ? অবাক হলো কিশোর। কিসের?
কিসের, জানো না?
টেরির ফাইন্যাল চ্যালেঞ্জ।
অ, হাসল কিশোর, ওটা কোন চাপ হলো নাকি? যাব আবার। লাশের কফিনে শুয়ে দেখিয়ে দেবে তুমি। ব্যস, হয়ে গেল। পাঁচশোটা কড়কড়ে ডলারও এসে যাবে, তুমিও হিরো হয়ে যাবে স্কুলে। কেউ আর তোমাকে তোতলা মুসা বলে খেপাবে না।
খেপালে খেপাক! মড়ার সঙ্গে শুতে পারব না আমি। মর্গের মিথ্যে কথাটা কেন বললে ওদের?
মুসা, এখন এ সব সাধারণ কথা নিয়ে আলোচনার সময় নেই। অঙ্কগুলো শেষ করতে হবে। রাখি? পরে দেখা হবে।
ফোন রেখে দিল কিশোর।
রাগে জ্বলতে লাগল মুসা। রবিনকে ফোন করল।
সব কথা শুনে রবিন বলল, কিশোরের কাজ-কারবার আমারও কেমন অবাক লাগছে। কিন্তু বিনা কারণে তো কিছু করে না ও। ওর মনে কি আছে ও-ই জানে।
টেরির এই শয়তানিটা বন্ধ করা দরকার।
হ্যাঁ, দরকার।
তাহলে কিছু একটা করো। সাহায্য করো আমাকে। আমি ভাবলাম, রকি বীচে এসে কত না আরামে থাকব। কিন্তু এ যে গ্রীন হিলসের চেয়েও খারাপ অবস্থা।
অস্থির হয়ো না, মুসা। টেরির দল তোমার কিছু করতে পারবে না।
রবিনের কথায় খানিকটা সান্ত্বনা পেল মুসা।
ফোন রেখে দিয়ে বিছানায় বসল।
প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বেজে উঠল আবার। ভাবল রবিন করেছে। কিন্তু কানে ঠেকানোর সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠল একটা ব্যঙ্গভরা কণ্ঠ, কি ব্যাপার, মু মুসা? কার সঙ্গে এত বকরবকর করছিলে? তোমার প্রেতাত্মার সঙ্গে?
টা-টা-ট্রাকি!
হ্যাঁ, টা-টা-ট্রাকি! শোনো, টেরি বলেছে, ফাইন্যাল বাজিটা হবে কাল রাতে। ফিউনরল পারলারেই। কাল রাত, মনে রেখো। ভুললে, বাজি হারবে।
*

পরদিন। পাশাপাশি হাঁটছে কিশোর আর মুসা। পরিষ্কার রাত। সেদিনের মত বৃষ্টি নেই। তবে কনকনে ঠাণ্ডা। একফালি ফ্যাকাশে চাঁদ ভেসে বেড়াচ্ছে বাড়ি-ঘরের ছাতের ওপর নীলচে-ধূসর আকাশে। গাছগুলো আজ শান্ত, নিথর।
টেরিদের বাড়ির বাইরে তাকে আর তার বন্ধুদেরকে পাওয়া গেল। কিশোরদের জন্যে দাঁড়িয়ে আছে। কিশোররা আসতে সবাই মিলে দল বেঁধে চলল ফিউনরল পারলারে।
নিটু আর হ্যারল্ড একটা টেনিস বল লোফালুফি করতে করতে চলেছে। ধরতে গিয়ে বার বার মিস করছে নিটু। অন্ধকার লন থেকে গিয়ে খুঁজে খুঁজে বের করে আনছে বলটা।
টেরি, টাকি, কডি তিনজনেই গম্ভীর। আজ রাতে ওরা ফালতু কিছু করতে চায় না।
আগের দিনের দুশো, আজকের পাঁচশো-মোট সাতশো ডলার, এনেছ? জানতে চাইল কিশোর।
টেরি বলল, জেতো আগে, তারপর দেখা যাবে।
তারমানে টাকাটা তোমার মেরে দেয়ার ইচ্ছে?
মোটেও না। তুমি টাকা এনেছ কিনা, তাই বলো।
টাকার প্রয়োজন হবে না আমাদের, দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল কিশোর। কারণ বাজিটা হারছি না আমরা। মুসার পিঠে চাপড় দিয়ে বলল, মুসা, রবিন আর আমার একটা সমস্যাই হবে।
কি?
এতগুলো টাকা কি করে খরচ করব।
অ, তাই তো! এতক্ষণ খেয়াল করলাম না, আশ্চর্য! রবিন কোথায়?
শরীর খারাপ। জ্বর। সেদিন রাতে ঠাণ্ডা লেগেছে। শুয়ে আছে কম্বলের তলায়।
আহহা, মিস করল। দেখতে পারল না। আজকের দেখাটাই সবচেয়ে জরুরী ছিল।
দেখো, কিশোর বলল, তোমাকে আগেভাগে বলে দিচ্ছি, কোন রকম ফালতু নাটক করতে যাবে না। দেখতে দেখতে অসহ্য হয়ে গেছি। সত্যিকারের ভয় দেখানোর মত কিছু করতে পারলে করো, নইলে চলো, চলে যাই। ফিরে গেলে সব টাকা এবারেও মাপ করে দিতে রাজি আছি আমি।
তারমানে ঘাবড়ে গেছ! খিকখিক করে হাসল টেরি। মানে মানে কেটে পড়তে চাইছ। তা হবে না। কালটুটাকে মু-স্মুসা বানিয়েই ছাড়ব আমি।...আজকে আর নকল কিছু নয়। একটা আসল লাশ আছে।
হাঁটার সময় হঠাৎ ফুটপাতের কিনার থেকে মুসাকে ধাক্কা মেরে রাস্তায় নামিয়ে দিল কুডি। কি, কালটু, লাশের কথা শুনে পানি আছে কলজেতে? সত্যি কথাটা

স্বীকার করে ফেলো না ছাই।
এমন জোরে এক ধাক্কা মারল কিশোর, ফুটপাত থেকে রাস্তায় পড়ে একেবারে চিত হয়ে গেল কডি। এবার হাত দিয়ে দেখো তো তোমার কলজেতে পানি আছে নাকি?
উঠে দাঁড়াল কডি। ঘুসি পাকিয়ে ছুটে আসতে গেল কিশোরের দিকে। ততক্ষণে সামলে নিয়েছে মুসা। রুখে দাঁড়াল কডিকে।
ঘটনা অন্য দিকে মোড় নিচ্ছে দেখে ধমক দিয়ে কডিকে থামাল টেরি।
নীরবে পথ চলল এরপর সবাই। আর কোন অঘটন ঘটাল না।
পাতাবাহারের বেড়ার ধারে পার্কিং লটের পেছনে আগের দিনের জায়গায় এসে দাঁড়াল ওরা। অন্ধকারের মধ্যে বোবা হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে যেন ফিউনরল পারলারটা। আজ রাতে বৃষ্টি নেই। বাতাসও নেই। সব কেমন থমথমে। এক ধরনের ভুতুড়ে নিস্তব্ধতা। মৃত্যুর মত নিথর।
টেরির পিছু পিছু পেছনের জানালাটার দিকে এগিয়ে চলল সবাই। পার্কিং লটের পাকা চত্বরে জুতো ঘষার শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই।
বিল্ডিঙের পেছনের ঘন অন্ধকারের মধ্যে এসে ঢুকল ওরা। বন্ধ জানালাটা খুলল টেরি। মুসাকে ইঙ্গিত করল আগে ভেতরে ঢোকার জন্যে।
দ্বিধা করতে লাগল মুসা। কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, সত্যি সত্যি লাশ আছে?
মাথা ঝাঁকাল টেরি। আছে। সত্যিকারের মড়া। আজ সকালে রেখে গেছে। সেজন্যেই তো আজকে আসতে বললাম।
মড়াটা এখনও তাজা, রসিকতার ঢঙে বলল হ্যারল্ড।
কেউ তার কথায় হাসল না।
ভ্যান থেকে কালো ব্যাগে ভরে সেদিনকার লাশ নামানোর দৃশ্যটা মনে পড়ল মুসার। সেদিন অবশ্য ভেতরে টেরি ছিল। কিন্তু দৃশ্যটা ভয়ানক। গায়ে কাঁটা দিল তার।
টেরি বলল, যাও, মু-ম্মুসা। আজ দেখব তোমার সাহস কেমন। জলদি করো। কে, কখন লাশ রাখতে চলে আসবে ঠিক নেই। ঠেলা দিয়ে মুসাকে জানালার চৌকাঠে তুলে দিল সে। যাও, যাও, তোমার কাজ শুরু করো।
শেষবারের মত সবার দিকে ফিরে তাকাল মুসা। ভঙ্গি দেখে মনে হলো চিরকালের জন্যে যাচ্ছে, আর কোনদিন দেখা হবে না ওদের সঙ্গে।
তারপর লাফ দিয়ে নামল ভেতরে।
সঙ্গে সঙ্গে নাকে এসে ধাক্কা মারল ফরমালডিহাইডের বিশ্রী, তীব্র বা গন্ধ। আগের দিনের চেয়ে অনেক বেশি। নাক টিপে ধরল সে। মুখ দিয়ে শ্বাস নিতে লাগল।

পেছনে খসখস শব্দ। তারপর জুতো পায়ে ধপ করে নামিয়ে নামল কেউ। বাইরে যারা ছিল সবাই জানালা গলে এক এক করে ঢুকতে শুরু করেছে।
আলো জ্বেলে দিল টেরি। ছাত থেকে ভূতের জ্বলন্ত কানা চোখের মত তাকিয়ে রইল ম্লান আলোটা। রহস্যময় করে তুলল ঘরের পরিবেশ। আলো আঁধারির খেলা। লম্বা লম্বা, উদ্ভট ছায়া সৃষ্টি করেছে টেবিল আর কফিনগুলোর আনাচে-কানাচে।
মুসার মনে হলো ওই ছায়ার মধ্যে ঢুকলে আর জ্যান্ত বেরোনোর আশা নেই। দ্বিধা করতে লাগল সে। কিশোরের দিকে তাকাতে মাথা ঝাঁকাল সে।
সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে কফিনের সারির দিকে এগোল মুসা। সবগুলোর ডালা নামানো। মলিন আলোতেও চকচক করছে কালো পালিশ করা বাক্সগুলোর গা।
কাঁধে হাতের চাপ পড়ল। ফিরে তাকাল মুসা। পিত্তি জ্বালানো কুৎসিত হাসিতে ভরে গেছে টেরির মুখ। সমস্যাটা কি তোমার? এত দ্বিধা কেন? ভয় লাগছে?
জবাব দিল না মুসা। কফিনের সারির ওপর দৃষ্টি স্থির। কাঁধে হাতের চাপ বাড়ল। চাইলে সুযোগ একটা দিতে পারি তোমাকে। ফিরে তাকাল মুসা। সুযোগ? মাথা ঝাঁকাল টেরি। বুঝতে পারছি, প্যান্ট ভেজানোর সময় হয়েছে তোমার। মেঝেতেও পড়বে। পরিষ্কার করবে কে? তারচেয়ে তোমাকে বেরিয়ে যেতে দেয়া উচিত।
হেসে উঠল তার সঙ্গীরা।
কার প্যান্ট খারাপ হয় আজ, দেখা যাবে, রহস্যময় কণ্ঠে বলল মুসা। ফালতু কথা বাদ দিয়ে কোটাতে ঢুকতে হবে তা-ই বলো! ।
চোখের পাতা সরু সরু হয়ে এল টেরির। গলাবাজিটা থাকবে না হে, কা-কা-কালটু মিয়া! বুড়োটা মরেছে বড় সাংঘাতিক মরা। ক্যান্সারে ভুগে ভুগে জ্যান্ত থাকতেই বিকৃত হয়ে গিয়েছিল শরীরটা। তোমাকে অবশ্য বেশিক্ষণ সঙ্গ দিতে হবে না ওকে। হাত মেলাবে। তারপর কফিনে ঢুকে দুই গালে চুমু খাবে। ব্যস।... এসো আমার সঙ্গে।
মুসা ভয় পেয়েছে কিনা বুঝতে পারল না টেরি। অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ল, ভয় তো পেয়েছ বোঝাই যাচ্ছে। টাকাটা দিয়ে দাও আমাদের, চলে যাও। এখন দিলে আর পাঁচশো দিতে হবে না; আগের বার যেটা ছিল, দুশো-সেটা দিলেই চলবে।
মুসা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুঁটকিটার বকবক শুনছ কেন? ফরমালডিহাইডের চেয়ে বেশি দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে ওর গা থেকে, বমি আসছে আমার, শীতল কণ্ঠে কিশোর বলল। যাও, সেরে ফেলো কাজটা।
ফ্যাকফ্যাক করে হাসল টেরি। একটু পরেই বোঝা যাবে কার গা দিয়ে বেশি গন্ধ বেরোয়। ধোপাও ধুতে চাইবে না তোমাদের কাপড়।
কোন কফিনটাতে ঢুকতে হবে? জিজ্ঞেস করল মুসা।

একটা কফিনের সামনে গিয়ে দাঁড়াল টেরি। সাহায্য করতে ডাকল টাকিকে। দুজনে মিলে চেপে ধরে তুলতে শুরু করল ভালাটা।
লাশটার ওপর চোখ পড়ল মুসার। ধড়াস করে উঠল বুকের মধ্যে।
চিত হয়ে শুয়ে আছে লাশটা। কালো স্যুট, সাদা শার্ট, কালো টাই। দুই পাশে লম্বা হয়ে পড়ে আছে হাত দুটো। আঙুলগুলো মোমের মত ফ্যাকাশে।
মাথার চুল উঠে গেছে রোগের কারণে। পাতলা ফুরফুরে চুলগুলো যত্ন করে আঁচড়ে দেয়া হয়েছে পেছন দিকে। ঠেলে বেরিয়ে আছে বড় বড় লাল তিলে ভরা কপাল। চোয়াল বসা। মুখে মাংস বলতে নেই। চোখ বোজা। ঠোঁটের রঙ দেখে মনে হয় ড্রাকুলার মত রক্ত খেয়েছিল, শুকিয়ে কালচে– বাদামী হয়ে আছে। মারা যাওয়ার আগে মুখের মধ্যে রক্ত চলে এসেছিল। বোধহয়, সেখান থেকেই দুএক ফোঁটা বেরিয়ে ঠোঁটে লেগে গেছে। মুখের চামড়ার রঙটাও স্বাভাবিক নয়, ফ্যাকাশে কমলা।
দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তাকিয়ে রইল মুসা। তারপর কফিনের ওপর ঝুঁকল।
যাও, কিশোর বলল, কোন অসুবিধে নেই। সব ঠিক আছে।
ফিরে তাকাল মুসা, কি-কি-কিন্তু লা-লা-লাশটা যদি সত্যি সত্যি খামচে ধরে?
হেসে উঠল কডি। মুসার দিকে আঙুল তুলে বলল, কা-কা-ক্কালটু মুসার চেহারা দেখো। আজকে সত্যি সত্যি পেসাব করে দেবে।
হেসে উঠল নিটু আর হ্যারল্ড।
লাশের পায়ের দিকটাতে রয়েছে টাকি। ডালা থেকে হাত সরায়নি। সে হাসল না। লাশটার চকচকে কালো জুতো আলোয় চমকাচ্ছে। অস্বস্তিভরে তাকিয়ে আছে সেদিকে।
মুসাকে ডাকল টেরি, নাও, হাত মেলাও বুড়োর সঙ্গে। যদি সাহস থাকে।
ঢোক গিলল মুসা। লাশটার দিকে তাকিয়ে আছে চিন্তিত ভঙ্গিতে। মুখ তুলে দেখল বাকি কফিনগুলো।
ওগুলোর দিকে তাকাচ্ছ কেন? এটাতে ঢুকতে বলা হচ্ছে তোমাকে। পারবে? জিজ্ঞেস করল টেরি। নাকি হার স্বীকার করে নেবে? এটা কিন্তু সত্যি সত্যি লাশ। আজ আর কোন ফাঁকিবাজি নেই।
কফিনগুলো দেখাল মুসা, ওগুলোতে লাশ নেই?
আছে হয়তো, জানি না থাকলেও বহুদিনের। পচা-গলা। মুচকি হাসি ফুটল ঠোঁটে, কেন, তাজাটা পছন্দ হচ্ছে না? পচাগুলোর গালে চুমু খাবে?
তাড়াতাড়ি মুখ ফেরাল মুসা। আ-আমি…ঠিক আছে, ঢুকছি!
প্রথমে হাত মেলাও, তারপর ভেতরে ঢোকো। কোলাকুলি করো, দুই গালে চুমু খাও, এবং বেরিয়ে এসো।

ভারী দম নিল মুসা। বাতাসটা আটকে ফেলল ফুসফুসে, ছাড়ল না। তারপর আস্তে বাড়িয়ে দিল ডান হাতটা। চোখ বুজল।
ভাবছে, সত্যি সত্যি মরা মানুষের সূঙ্গেই হাত মেলাতে যাচ্ছে?
ধরল হাতটা। বাপরে! কি ভয়ানক ঠাণ্ডা! তারমানে আসল লাশই!
চোখ মেলল।
ঝাঁকি দাও, টেরি বলল।
ঝাঁকি দিল মুসা। একবার। দুবার। শক্ত হয়ে গেছে হাতটা। নড়তে চাইল না।
কি বুঝলে, পচা শুঁটকি? ভুরু নাচাল কিশোর। তোমরা হেরে যাচ্ছ, লিখে রাখতে পারো।
দেখাই যাক না, টেরি বলল, মাত্র তো শুরু করেছে। এবার ভেতরে ঢোকো। উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ো লাশটার ওপর।
দ্বিধা করতে লাগল মুসা।
কডি বলল, ভয় পাচ্ছে কা-কা-কালটুটা...
চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল মুসা। ডান হাতটায় যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। ঠাস করে শব্দ হলো। মাগ্গোহ্! বলে মুখ চেপে ধরল কডি। ভয়ানক স্বরে মুসা বলল, সাবধান করে দিলাম। কোনদিন যদি আর ওভাবে ব্যঙ্গ করো, একটা দাঁতও রাখব না, মনে রেখো।
আহত নেকড়ের মত জ্বলে উঠল কডির চোখ। পাল্টা আঘাত হানার জন্যে হাত তুলতে গিয়েও থমকে গেল। মরফিকে কিভাবে পিটিয়েছে মুসা, শুনেছে টাকির মুখে।
ঘটনার আকস্মিকতায় স্তব্ধ হয়ে গেছে টেরি-বাহিনী। মুসার এই রূপ দেখেনি আর। নতুন দৃষ্টিতে তাকাল তার দিকে।
কডিকে পুরোপুরি উপেক্ষা করে ঘুরে দাঁড়াল মুসা। কফিনের মধ্যে ঝুঁকল। প্রচণ্ড রাগ মনে। পাথর হয়ে গেছে যেন মনটা। দুনিয়ার কোন কিছুকেই আর পরোয়া করে না এ মুহূর্তে। কমলা রঙের ভয়ঙ্কর মুখটাকেও আর ভয়ানক লাগছে না দেখতে। সহজেই চুমু খেতে পারবে ওই গালে।
সব কটা চোখের দৃষ্টি এখন মুসার ওপর।
কফিনের কিনার খামচে ধরে উঠতে যাবে, ঠিক এই সময় মচমচ করে উঠল কি যেন।
থমকে গেল সে। সোজা হয়ে দাঁড়াল।
আবার মচমচ।
ফিরে তাকাল মুসা। টেরির চোখে ভয় দেখতে পেল। তার দোস্তদের চোখেও।
কিসের শব্দ? ফিসফিস করে বলল টাকি। জোরে বলতে ভয় পাচ্ছে।

নিশ্চিত হলো মুসা, আজ আর কোন চালাকির মধ্যে যায়নি টেরির দল। তাহলে ঘাবড়াত না। সত্যিকার লাশের সঙ্গেই মুসাকে কোলাকুলি করতে নিয়ে এসেছে ওরা।
আবার শব্দ।
অন্য কফিনগুলোর দিকে তাকাল মুসা।
একটা কফিনের ডালা নড়ে উঠতে দেখল। আরেকটা। তারপর আরেকটা।
ধীরে ধীরে খুলে যাচ্ছে কফিনগুলোর ডালা।

.

রক্ত পানি করা চিৎকার দিয়ে লাফিয়ে সরে এল মুসা। টলতে টলতে ও সরে গেল দেয়ালের দিকে।
কফিনের সারির দিকে তাকাল। ডালা ঠেলে তোলা হাতগুলো দেখতে পাচ্ছে। পচে ফুলে ওঠা সবজে-লাল হাত। দুর্ঘটনায় ডলা লেগে বিকৃত হয়ে যাওয়া বেগুনি হাত। মোমের মত সাদা ফ্যাকাশে হাত।
আ-আ-আমরা বি-বি-ব্বিরক্ত করেছি ওদের, ভালমত তোতলাতে শুরু করল মুসা। মি-মি-মৃত মানুষের ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছি। প-প প্রতিশোধ নিতে আ-আ-আসছে।
একটা কফিনের ডালা পুরোপুরি উঠে গেছে। কুৎসিত, খসখসে গোঙানি শোনা গেল ওটার ভেতর থেকে। একটা মড়া উঠে বসল। পুরানো হতে হতে সবুজ হয়ে গেছে চামড়া। পচা-গলা মাথাটা ঘুরিয়ে তাকাল টেরির দিকে। চোখ খোলার চেষ্টা করছে। কিন্তু সেলাই করে পাতা দুটো লাগিয়ে দেয়া হয়েছিল বলে খুলতে পারছে না।
গোঙানি, উহ্-আহ্, জোরাল গভীর দীর্ঘশ্বাস-নানা রকম ভয়ঙ্কর শব্দে ভরে গেল ঘরের বাতাস।
অন্য একটা কফিন থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করল আরেকটা মড়া। পচে, ফুলে বীভৎস হয়ে গেছে মুখটা। রক্তশূন্য চামড়ার রঙ মোমের মত। লাশ তো, তাই স্বাভাবিক মানুষের মত ক্ষিপ্রতা নেই বোধহয় গায়ে, ধীরে সুস্থে, বেশ ভারী পায়ে নামছে।
তৃতীয় লাশটাও উঠে বসেছে এখন। বেগুনী লাশ। নাকের ফুটো দিয়ে বেরিয়ে আসা সাদা সাদা কৃমিগুলোকে ঝুলতে দেখে পেট গুলিয়ে উঠল মুসার।
বিকট চিৎকার বেরিয়ে এল টেরির মুখ থেকে।
অ-অ-অসম্ভব! কডি বলল। এ হতেই পারে না!
মড়াদের বিরক্ত করেছি আমরা! আতঙ্কিত কণ্ঠে বলল কিশোর। ওদের ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছি। ওরা আমাদের ছাড়বে না …

ঝটকা দিয়ে খুলে গেল একটা কাঠের আলমারির দরজা। দড়াম করে গিয়ে পাল্লাটা বাড়ি খেল শক্ত দেয়ালে।
পা টেনে টেনে বেরিয়ে এল একটা ভয়ঙ্কর-দর্শন লাশ। নিশিতে পাওয়া মানুষের মত ঘোরের মধ্যে হাঁটছে। ওটার চোখের পাতাও সেলাই করে লাগানো। খুলতে পারছে না। মাথার চামড়া অর্ধেক ছিলে এসে ঝুলে রয়েছে কপালে। সামনে দুই হাত বাড়িয়ে থপ থপ করে পা ফেলে এগোতে লাগল ধরার জন্যে।
চিৎকার করে উঠল মুসা।
চিৎকার করে উঠল কিশোর।
টেরি আর টাকি সরে চলে এল মুসার কাছে।
আরেকটা রক্ত জমানো গোঙানি শোনা গেল। ফিরে তাকাল সবাই। আরও একটা লাশ বেরিয়ে এসেছে। মাথায় চওড়া কানাওয়ালা হ্যাট। গায়ে ঢলঢলে একটা ট্রেঞ্চ কোট, নিজের আকারের চেয়ে অনেক বড়। টলতে টলতে এগিয়ে আসতে লাগল মুসাদের দিকে।
কুঁজো হয়ে এগোচ্ছে। লাশের চেহারা ঢেকে দিয়েছে হ্যাঁটের কানা। সামান্য মুখ তুলতেই যেটুকু অংশ চোখে পড়ল, তাতেই বুকের রক্ত পানি হয়ে যাওয়ার কথা অতি বড় সাহসীরও।
মুখের অর্ধেকটা আছে, বাকি অর্ধেকের মাংস গায়েব। খসে পড়ে গেছে। হাড়গুলো শুধু দেখা যাচ্ছে। শূন্য কোটর থেকে ঝুলছে একটা মরা ইঁদুর।
আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল কিশোর।
কুৎসিত গোঙানি। ঘড়ঘড়ানি। আর চাপা দীর্ঘশ্বাস। চলছে একটানা।
দুর্ঘটনায় মৃত লম্বা, বেগুনি রঙের থেঁতলানো, বিকৃত লাশটা নেতৃত্ব দিচ্ছে মড়াদের। মাথা নিচু করা, চোখ বোজা। অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাঁটছে। এক পা বাড়িয়ে দিচ্ছে সামনে, থমকাচ্ছে, তারপর আরেকটা পা ফেলছে।
থমকে দাঁড়াল হঠাৎ।
ঝুঁকি লেগে কাঁধ থেকে খসে পড়ে গেল একটা হাত। বিশ্রী শব্দ করে মেঝেতে পড়ল। লাফ দিয়ে চলে গেল একটা টেবিলের নিচে।
হাত খসে পড়াতে যেন কিছুই হয়নি লাশটার। পরোয়াই করল না। একটা সেকেন্ড বিরতি দিয়েই আবার আগের মত এগিয়ে আসতে শুরু করল।
জলদি পালাও! চিৎকার করে উঠল হ্যারল্ড। আতঙ্কে কুঁচকে গেছে চোখ-মুখ।
কিন্তু দেরি করে ফেলেছে।
জানালার দিকটাকে আড়াল করে অর্ধচন্দ্রাকারে সারি দিয়ে ওদের কোণঠাসা করে ফেলেছে লাশের দল।
দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে সবার।

কফিনের লাশটার দিকে তাকাল মুসা। একমাত্র মড়া, যেটা একইভাবে পড়ে রয়েছে। কফিন থেকে উঠে আসেনি। আসার কোন লক্ষণও দেখাচ্ছে না।
ওটার দিকে নজর নেই কারও। তাকিয়ে আছে এগিয়ে আসতে থাকা লাশগুলোর দিকে। টেনে টেনে হাঁটার কারণে জুতো ঘষার খসখস শব্দ হচ্ছে মেঝেতে।
চিৎকার করে উঠল আবার কিশোর, মুসা, কিছু একটা করো!
আমাকে বলছ! কেঁপে উঠল মুসার গলা। আমি করব?
থামাও ওদের! চেঁচিয়ে উঠে মুসাকে সামনে ঠেলে দিল টেরি। মুসা ...তুমিই পারবে! আমাদের মধ্যে একমাত্র তোমারই সাহস আছে!
আমার! বিশ্বাস করতে পারছে না যেন মুসা।
হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার! বাজিটা জিতে গেছ তুমি! সাইরেনের মত কাঁপা কাঁপা শব্দে নিঃশ্বাস বেরোচ্ছে টেরির নাক দিয়ে। এমন ভয় পাওয়াই পেয়েছে, এতটাই ফ্যাকাশে হয়ে গেছে মুখের চামড়া, তিলগুলোও এখন অদৃশ্য। তুমি জিতে গেছ! তুমি জিতে গেছ! তুমি জিতে গেছ! তিনবার বললাম। তারমানে তোমার জেতা নিয়ে কারও সন্দেহ নেই আর। দোহাই তো-তো-তোমার, মুসা, ক-ক-করো কিছু...
আতঙ্কে তোতলানোর সঙ্গে চন্দ্রবিন্দুও যোগ হয়ে গেছে টেরির উচ্চারণে।
মুরগির মত কঁক-কঁক করতে বলছ? মড়াগুলো ভয় পাবে তাতে?
আরে না না! কঁক-কঁক না! ওগুলোকে...
ও, জবাই করব! মুরগির মত?
পা-পা-প্পারলে তাই করো!
কিন্তু ছুরি কোথায়? অসহায় ভঙ্গিতে কিশোরের দিকে তাকাল মুসা।
শু-শু-শুঁটকির কাছে... কথাটা আটকে গেল কিশোরের। বের আর করতে পারল না।
দুই হাত নাড়তে লাগল টেরি, ছু-ছু-ছুরি-টুরি কিছু নেই আ-আ-আ ...
গেছে আজ! হতাশ ভঙ্গিতে কপাল চাপড়াল কিশোর। স-স-সব কটাকে তোতলা বানিয়ে দিয়েছে ভূ-ভূ-ভূ-ভূ... কোনমতেই বের করতে পারছে না শব্দটা। বের করার জন্যেই যেন জোরে এক ধাক্কা মারল মুসার পিঠে এবং হড়হড় করে স্পষ্ট কথা বেরিয়ে এল, দৈত্যগুলোকে ঠেকাও! বাঁচাও আমাদের!
ধাক্কা খেয়ে সামনে গিয়ে পড়ল মুসা।
একটা লাশ ওকে ধরে না ফেললে হুমড়ি খেয়ে পড়ত মেঝেতে। পচা, মাংস খসা বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরল ওকে লাশটা।

.

ছাড়ো! ছাড়ো আমাকে! গলা ফাটিয়ে চিৎকার শুরু করল মুসা, ভয় নয়, হুমকি। কেঁচোর মত শরীর মোচড়াচ্ছে, ছটফট করছে, আ য লাশের বাহু থেকে বেরিয়ে

আসার জন্যে। নইলে ভূতগিরি। ঘুচিয়ে দেব আজ জন্মের মত!
কিন্তু চোখ বোজা, সবুজ দানবটা ছাড়ল না ওকে। ঝাড়া লাগতে জট পাকানো চুলের বোঝা থেকে ঝরঝর করে ঝরে পড়তে লাগল মাছির সাদা সাদা শুয়াপোকা। পচা মুখটা নিয়ে এল চোখের সামনে। বাহুর চাপ আরও বেড়েছে। চাপ দিয়ে ভর্তা করে দেবে যেন হাড়-পাজরা।
হুটোপুটি শোনা গেল পেছনে।
কোনমতে ঘাড় ঘুরিয়ে মুসা দেখল, সামান্য সুযোগের পুরো সদ্ব্যবহার করেছে টেরিরা, পড়িমড়ি করে জানালার দিকে দৌড়ে যাচ্ছে। মজা দেখার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকার কথা কল্পনায়ও আনছে না আর ওরা।
সবার আগে জানালার কাছে পৌঁছল কডি। মুহূর্তে উড়ে চলে গেল যেন বাইরে।
মুসার কোমর জড়িয়ে ধরে কানের কাছে ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করতে লাগল সবুজ মড়াটা।
সেসব দেখার সময় নেই নিটু আর হারল্ডের। কার আগে কে জানালা টপকাবে এই নিয়ে হুড়াহুড়ি শুরু করল। ধাক্কা দিয়ে দুজনকে দুই পাশে ফেলে বেরোনোর চেষ্টা করল কিশোর। তাতে গেল সব জট পাকিয়ে, তিনজনের কেউ বেরোতে পারল না। মাথার ওপর দিয়ে ডাইভ দিল টাকি। কপাল ঠুকে গেল চৌকাঠে। ব্যথাটাকে পাত্তাই দিল না সে। ডিগবাজি খেয়ে গিয়ে পড়ল, জানালার বাইরে। ফাঁক পেয়ে তার পর পরই বেরিয়ে গেল টেরি। ওর ঠ্যাং ধরে বেয়ে ওঠার চেষ্টা করেছিল কিশোর। পারল না। পড়ে গেল মেঝেতে। টেরির পর একে একে বেরোল নিটু আর হ্যারল্ড।
হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। জানালায় উঠে বসল। চিৎকার করে ডাকতে লাগল, টেরি! টাকি! কডি! তোমাদের ঈশ্বরের দোহাই লাগে! আমাকে নিয়ে যাও। ফেলে পালিও না...
কিন্তু কেউ তার কথার জবাব দিল না। কাদা-পানিতে জুতো ফেলার ছপছপ শব্দ শোনা যাচ্ছে কেবল।
লাফিয়ে অন্যপাশে নেমে গেল কিশোর। তার জুতোর শব্দও মিলিয়ে গেল ধীরে ধীরে।
চুপ হয়ে গেছে মুসা। তাকে নড়তে-চড়তে না দেখে সবুজ মড়াটাও শান্ত হয়ে গেছে। চাপ দিচ্ছে না আর। ঝটকা দিয়ে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে পিছিয়ে এল মুসা।
দৌড়ে এল জানালার কাছে। মুখ বাড়িয়ে উঁকি দিল জানালার বাইরে।
আবছা অন্ধকারে অনেকগুলো ছায়ামূর্তিকে ছুটে যেতে দেখল পাতাবাহারের বেড়ার দিকে।
মড়াগুলোর দিকে ফিরল আবার মুসা। মুচকি হাসি ফুটেছে মুখে। সবুজ মড়াটাকে উদ্দেশ্য করে বলল, পালিয়েছে সব। চলো, এই সুযোগে কেটে পড়া যাক।

টান দিয়ে মুখ থেকে মুখোশটা খুলে নিল সবুজ মড়া। বেরিয়ে পড়ল রবিনের হাসিমুখ। কিশোর কোথায়?
ভঙ্গি দেখে যে কেউ ভাববে ভূতের তাড়া খেয়ে পালিয়েছে, হাসতে হাসতে বলল মুসা। ওর কাণ্ড দেখেই আরও ভড়কে গেছে শুঁটকি-বাহিনী।
কাণ্ড তুমিও কম করনি। উহ্, দুজনে মিলে যা শুরু করলে, হাসি চেপে রাখাই কঠিন হয়ে গিয়েছিল আমার জন্যে!
তোমাদের অভিনয় আরও ভাল হয়েছে, মেঝেতে চোখ পড়ল মুসার। মাছির পোকাগুলোর দিকে। অনড় পড়ে আছে। আজকাল প্ল্যাস্টিক দিয়ে কত রকমের জিনিস যে তৈরি করছে খেলনাওলারা। মুখ তুলল। দারুণ হয়েছে। ছদ্মবেশ। কারও বাপেরও চেনার সাধ্য ছিল না। ...সত্যি সত্যি ভূত ভেবে আরেকটু হলে আমিও পালাচ্ছিলাম!
*
আধঘন্টা পর।
স্যালভিজ ইয়ার্ডে তিন গোয়েন্দার ব্যক্তিগত ওঅর্কশপে গাদাগাদি করে বসেছে ওরা সাতজন। কিশোর, মুসা, রবিন, তাদের দুই বন্ধু টম ও বিড, এবং ওদের দুজনের বন্ধু বারটি আর ডিউক।
হাসতে হাসতে পেট ব্যথা হয়ে গেছে ওদের। তা-ও থামছে না হাসি। হসির দমকে কয়েকবার করে পানি এসেছে চোখের কোণে। মুছেছে, আবার হেসেছে।
ও, হাসতে হাসতেই কাহিল হয়ে গেছি! মুসা বলল। কিশোর, আর সহ্য করতে পারছি না। ফ্রিজে কিছু নেই তোমাদের?
বসো। নিয়ে আসছি।
কয়েক মিনিটের মধ্যেই গোট চারেক পিৎসা আর বড় এক জগ। কমলার রস নিয়ে হাজির হলো কিশোর।
খাবারের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল সবাই। খিদে পেয়েছে সবারই।
খেতে খেতে মুসা বলল, কিশোরের প্ল্যানটা যে এ ভাবে কাজে দেবে, ভাবতে পারিনি। সত্যি বলতে কি, শুরুতে তো রাগই হচ্ছিল আমার ওর ওপর, টেরির দলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে শত্রুতা করছে ভেবে।
আর এখন? হেসে জিজ্ঞেস করল রবিন।
সেটা কি বুঝিয়ে বলতে হবে?
না, তা হবে না। তোমার রাগ হয়েছে, তাতে আর দোষ কি, ওর আচরণে আমিই অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারিনি, তোমার ভয়ের রোগটা সারানোর জন্যেই এই চালাকি করেছিল সে...

প্রশংসাটা বেশি হয়ে যাচ্ছে, বাদ দাও এবার, হাত তুলল কিশোর। মুসা, তোমার ভয়টা গেছে তো?
এক্কেবারে মাথা কাত করল মুসা।
আর কিছুকে ভয় পাবে না কখনও?
জীবনেও না।
তা তো হলো, বিড বলল। কিন্তু শুঁটকির গোষ্ঠী বাজির টাকা মিটিয়েছে?
দেবে আর কখন? হাসতে হাসতে বলল কিশোর। প্রাণ নিয়ে পালানোর পথ পাচ্ছিল না, আবার টাকা। জানালার কাছে যা হুড়াহুড়িটা করল... দৃশ্যটা মনে করে হো-হো করে হেসে উঠল আবার সে।
হাসিটা সংক্রমিত হলো সবার মাঝে।
আরেক দফা হাসাহাসি আর চোখ মোছামুছির পর কিশোর বলল, চিন্তা নেই, আশা করি কাল স্কুলেই আদায় করে ফেলতে পারব টাকাটা।
যদি দিতে না চায়?
তোমরা তো আছই। আবার এমন এক প্যাঁচে ফেলব, সেধে এসে পায়ে ধরে দিয়ে যাবে।
*
খেয়েদেয়ে কিশোরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে স্যালভিজ ইয়ার্ড থেকে বেরিয়ে এল মুসা, রবিন, টম, বিড ও তাদের বন্ধুরা। গেট পর্যন্ত তাদের এগিয়ে দিয়ে গেল কিশোর।
সবাই এক জায়গায় থাকে না। একসঙ্গে যতদূর যাওয়া যায়, গেল, তারপর আলাদা হয়ে যার যার বাড়ির দিকে রওনা হতে লাগল একে একে।
সবার শেষে আলাদা হলো মুসা আর রবিন।
নির্জন রাস্তা ধরে হনহন করে হেঁটে চলল মুসা। একটা জায়গায় দুধারে গাছের সারি। ঘন ঝোঁপঝাড়। তার মধ্যে দিয়ে চলে গেছে পথ।
সেখানটায় এসে থমকে দাঁড়াল মুসা। ভয়ে ভয়ে তাকাল অন্ধকারের দিকে। বুঝতে পারছে, মুখে যতই বলুক ভয় পাবে না, ভূতের ভয় সে মন থেকে তাড়াতে পারবে না কোনদিন।
চারপাশে তাকাল অন্য কোন পথচারী আছে কিনা সেই আশায়। কিন্তু এত রাতে কে আর বেরোবে অকারণে। কাউকে দেখল না।
অনন্তকাল ধরে দাঁড়িয়েও থাকা যায় না। দোয়া-দরূদ পড়ে ফুঁ দিয়ে নিল বুকে। তারপর যা থাকে কপালে ভেবে দিল ভো দৌড়। টেরির কপাল খারাপ, দৌড়টা দেখতে পেল না। এ মুহূর্তটার জন্যে। পঞ্চাশ হাজার ডলার বাজি ধরতেও দ্বিধা করত না তাহলে সে।

ভলিউম ৯০ – খেপা জাদুকর – তিন গোয়েন্দা – শামসুদ্দীন নওয়াব – সেবা প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ: ২০০৭

তুমি কিন্তু, মুসা, পড়াশোনায় ফাঁকি দিচ্ছ, টিচাররা ইদানীং কথাটা বারে বারে আওড়াচ্ছেন। আমার শেষ রিপোর্ট কার্ড দেখে বাবা-মাও ঠিক একথাটাই বলেছে।

লোকে হয়তো ভাবতে পারে, লেখাপড়ায় মন দিলেই হয়। কিন্তু আমি ব্যাপারটাকে দেখি এভাবে: বই-পত্র থাকবেই। অঙ্ক, ইতিহাস, বিজ্ঞানও থাকবে বহাল তবিয়তে। কিন্তু টিভিতে খেলা দেখা কিংবা নিজে বাস্কেটবল খেলায় সময়টা চলে গেলে আর পাব না। গত শুক্রবার অবশ্য কোচ বলেছেন, আমাকে আরও ভাল করতে হবে। নইলে বাদ দিয়ে দেবেন দল থেকে। আর বাবা-মা যদি আমার টিভি দেখা বন্ধ করে দেয় তো আমি মোটেও অবাক হব না।

তবে একটা কাজ আমি কখনোই ছাড়ব না। সেটা হচ্ছে কাগজ বিলি করা। আমার আয়ের একমাত্র উৎস। কাজেই কাক ডাকা ভোরে বিছানা ছাড়ি আমি, গ্রীনহিলসবাসীদের ঘরে ঘরে কাগজ পৌঁছে দেওয়ার মহান দায়িত্বটা সুষ্ঠুভাবে পালন করি।

আজ সকালে দেখি আমার ক্রেতাদের তালিকায় আরেকটি নাম যোগ হয়েছে। বিল হার্ট। নামটা আগে শুনিনি, তবে ১০০ মেইন স্ট্রীট বেশ পরিচিত শুনিয়েছে আমার কানে। এটাই কি সেই ভুতুড়ে বাড়িটা, আমার জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই যেটাকে খালি, পড়ে থাকতে দেখছি? কে এল ওখানে?

বাইকে চেপে কাগজ বিলি শুরু করলাম। কিন্তু শেষ বাড়িটার কাছাকাছি। হতেই বুক ধুকধুক করতে লাগল। ওই যে, প্রাচীন বাড়িটা দাঁড়িয়ে রয়েছে বিষাদের প্রতিমূর্তি সেজে। শেষ কবে রং করা হয়েছে কে জানে। সামনের উঠনে এক ফুট উঁচু হয়ে আগাছা জন্মেছে। ছেলেপিলেরা রাস্তার শেষ মাথায় দাঁড়িয়ে থাকা এ বাড়িটাকে হানাবাড়ি ভাবে। আমিও তার ব্যতিক্রম নই। কথাটা এতটাই ছড়িয়েছিল যে, রাশেদ চাচা একবার আমাদেরকে বাড়ির ভিতরটা ঘুরিয়ে নিয়ে গেছেন, ভয় ভাঙানোর জন্য। তাতেও অবশ্য ভয় কাটেনি আমার। সূঙ্গে রাশেদ চাচা ছিলেন, তার উপর দিনের আলো- ভূত দেখা দেবে কেন।

দুরু দুরু বুকে, গোটানো কাগজ ছুঁড়ে দিতে তৈরি হলাম ভাঙাচোরা বারান্দার উপরে। কিন্তু থমকে গেলাম শেষ মুহূর্তে। মান্ধাতা আমলের এক চেয়ারে বসে ধূসর চুলো দাড়িওয়ালা এক লোক। বলে দিতে হলো না ইনিই বিল হার্ট।

গুড মর্নিং, মুসা, বললেন তিনি।

আঁতকে উঠলাম। আমার নাম জানেন বলে নয়, কাগজের সাবসক্রিপশন বিভাগ থেকে নামটা জেনে নিতেই পারেন। চমকেছি ওঁর কণ্ঠস্বর শুনে। রক্ত চলকে উঠেছে বুকের মধ্যে। ইচ্ছে করল এখুনি পালাই। কিন্তু মি. হার্টের পরের মন্তব্যটা আমাকে জায়গায় জমিয়ে দিল।

স্কুলে সমস্যা হচ্ছে, কী, তাই না? লজ্জার কথা। জ্ঞান হচ্ছে শক্তি। কথাটা মনে রেখো।

এতটাই বিস্মিত হয়ে গেছি মুখে কথা ফুটল না। ইনি জানলেন কী করে পরীক্ষায় আমার ফল কেমন হয়েছে? একটু সুস্থির হয়ে জিজ্ঞেস করতে যাব, মি. হার্ট উঠে পড়লেন। সদর দরজা খুলে পা রাখলেন ভিতরে। হাতে গোটানো এক খবরের কাগজ। খাইছে! আমি তো এখনও ওঁকে কাগজটা দিইনি! আর দেরি নয়, পই পই করে প্যাডেল মেরে স্কুলে চলে এলাম। স্কুলে এসে এত খুশি আগে কোনওদিন হইনি।

কিন্তু বাকি দিনটা কাটল আরও অদ্ভুতভাবে।

মিসেস রবসন যখন শুনলেন আমি আজও হোমওয়র্ক করিনি তখন সবার সামনে বিদ্রূপ করলেন। কেউ কেউ হেসে উঠল। কান গরম হয়ে গেল আমার। কোনও টিচারের উচিত নয় ক্লাসে এভাবে কাউকে অপমান করা। আর করেনও যদি, ক্লাসের সবার উচিত একতা দেখানো- অপমানিত যাতে আরও কষ্ট না পায়। সত্যি বলতে কী, বাস্কেটবল কোচ ম্যাকমোহন যখন সহজ শট মিস করলে কারও উদ্দেশে ধমকে ওঠেন, আমি কখনোই হাসি না। এরপর ইতিহাস ক্লাস। মি. হবসন কালকে একটা অধ্যায় পড়ে আসতে বলেছিলেন। আজ পরীক্ষা নেবেন। কিন্তু হয়েছে কী, আমি ভুলে বইটা ফেলে যাই লকারে। (পরীক্ষার প্রশ্ন দুটো নিয়ে হিমশিম খাচ্ছি, এসময় আমার চোখ চলে গেল হলওয়ের দিকে। অন্ধকার কোণে কার যেন ছায়ামূর্তি। ধক করে উঠল বুকের ভিতরটা, যখন টের পেলাম ওটা বিল হার্ট। ঠায় দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছেন আমার উদ্দেশে। মুখে অদ্ভুত এক টুকরো হাসি। উনি ওখানে কী করছেন? শিউরে উঠলাম রীতিমত। ভদ্রলোককে আমি ভয় পেতে শুরু করেছি।

দম বন্ধ হয়ে আসছে আমার। ক্লাসরুম থেকে ছুটে পালাতে মন চাইছে। কার জন্য অপেক্ষা করছেন মি. হার্ট? সত্যি বলতে কী, পরীক্ষার চাইতে ওঁকে অনেক বেশি ভয় পাচ্ছি আমি। ইতিকর্তব্য ঠিক করতে না পেরে প্রায় সাদা খাতাই জমা দিলাম। তারপর ডেস্কে ফিরে গিয়ে, বাহু ভাজ করে মাথা রাখলাম।

এর কয়েক মিনিট পর। আশ্চর্য কাণ্ড, শুনতে পেলাম মি. হবসন আমার প্রশংসা করছেন। আমার উত্তর নাকি নির্ভুল হয়েছে। কথাটা শুনে চেয়ার থেকে পড়েই যাচ্ছিলাম আরকী। এবার কেন কে জানে, করিডরের দিকে চকিতে এক ঝলক

চাইলাম। ফাঁকা। স্বস্তি বোধ করলাম- যতক্ষণ না কানে প্রতিধ্বনিত হলো অদ্ভুত এক খলখল হাসি। হার্ট, কোনও সন্দেহ নেই। আমার স্থির বিশ্বাস, পরীক্ষার খাতায় ওলটপালটটা সে-ই করেছে। কিন্তু কীভাবে? এবং কেনইবা? ক্লাসের সেরা ছাত্রী, নাক উঁচু লুসি শেরিংহ্যাম আমার দিকে প্রশংসার দৃষ্টিতে চেয়ে। বলতে বাধা নেই, ভাল লাগল আমার।

একটু পরে, বেল বেজে উঠল। মাথা থেকে সরিয়ে দিলাম বিল হার্টের চিন্তা।

তবে সেটা বেশিক্ষণের জন্য নয়।

আমাদের পাশের বাসায় নতুন ভাড়াটে এসেছে। মলি নামে এক মেয়ে আছে তাদের। আমার বয়সী। সবজান্তা ধরনের। ওর সঙ্গ বিরক্তিকর লাগে। আমার।

যা হোক, বাইক চালিয়ে ড্রাইভওয়েতে যেই ঢুকেছি, ওদের দরজা দিয়ে মাথা বের করল মলি। আমার অপেক্ষাতেই ছিল যেন।

তোমাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি?

করলেই তো। বাইকটা গ্যারেজে ঢুকিয়ে ঝটপট সটকে পড়ার ইচ্ছা। প্রশ্নের জবাব দিতে ভাল লাগে না আমার। তা ছাড়া মলি ঠিক সময়টাও বেছে নেয়নি।

যা বলার বলে ফেলো, বললাম। আমার প্রিয় টিভি শো এখুনি শুরু হয়ে যাবে। ওকে অবশ্য সে কথা জানালাম না।

আচ্ছা, এখানে নাকি একটা ভুতুড়ে বাড়ি আছে? প্রশ্ন করল ও।

কে বলেছে?

সেদিন কয়েকটা ছেলে-মেয়ে বলাবলি করছিল। আমি অবশ্য ওদের কথা বিশ্বাস করিনি। তবে ওদেরকে খুব সিরিয়াস দেখাচ্ছিল।

ভুতুড়ে বাড়ি আবার কী? খেঁকিয়ে উঠলাম প্রায়। কল্পনায় অবশ্য বিল হার্টের ছবি ঝিলিক দিয়ে গেল। বারান্দায়, হলওয়েতে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। এ মুহূর্তে আমি বিল হার্ট আর মলির কাছ থেকে নিস্তার চাই।

কী ব্যাপার? তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে ভূত দেখেছ?

কথাগুলো ঘাই মারল মাথার মধ্যে।

আমি খুব ক্লান্ত। খিদেও পেয়েছে। তুমি এসব আজেবাজে চিন্তা মাথা থেকে বাদ দাও তো।

ঠিক এসময় মা দরজা দিয়ে উঁকি দিল।

তোরা ভেতরে আয়। কোকো বানিয়েছি।

ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে আমার দিকে চেয়ে মৃদু হাসল মলি।

বিকেলটা আমি তোমাদের বাসায় থাকছি। আমার বোনকে নিয়ে মা ডাক্তারের কাছে গেছে।

অতিকষ্টে বিরক্তি চাপা দিলাম। আজকেই কিনা মলিকে এসে জুটতে হলো! কোথায় মনটা হালকা করার জন্য টিভি দেখব তা না, এখন ওকে সময় দিতে হবে। কাকে? যে আমাকে আজ সারাদিনের অদ্ভুতুড়ে ঘটনাগুলো নিজের অজান্তেই মনে করিয়ে দিচ্ছে।
কোকোটা যথেষ্ট গরম। একবার ভাবলাম ওটা নিয়ে নিজের ঘরে চলে যাই, কিন্তু মা সেটা পছন্দ করবে না। অতিথির সঙ্গে অভদ্রতা করলে কপালে খারাবি আছে। কিন্তু কীসের অতিথি? আমি ওকে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে এসেছি নাকি?
অগত্যা মলির সঙ্গে বসে থাকতে হলো। ও একঘেয়ে সুরে পড়াশোনার গল্প করে যাচ্ছে। কবে কী গ্রেড পেয়েছে শুনে বুঝলাম মেয়েটি ছাত্রী হিসেবে ভাল। শেষমেশ যখন ভাবছি ওর কথা ফুরিয়েছে, দেখি আমার নোটবইয়ের দিকে চেয়ে রয়েছে একদৃষ্টে। ওটার ভিতর থেকে বেরিয়ে আছে আমার ইতিহাসের উত্তরপত্র।
আমি শুধু নিজের কথা বকে যাচ্ছি, অথচ তুমি এ-প্লাস পেয়ে বসে আছ, বলল।
মা সিঙ্কে কাপ ধুচ্ছিল, ঘুরে দাঁড়াল।
কীরে, এত ভাল করেছিস কিছু বললি না যে?
বলিনি কারণ আমি নিজে তো কিছুই করিনি। যা ঘটেছে সেটা ব্যাখ্যা করব কীভাবে? পরীক্ষার জন্য যদি তৈরি হয়েও যেতাম, এত ভাল করতে পারতাম? প্রশ্নই ওঠে না। মা এখন আশা করবে আমি সব পরীক্ষাতেই ভাল। করতে থাকব আমার পক্ষে যেটা অসম্ভব। এই মলি মেয়েটাই যত নষ্টের গোড়া। কী দরকার ছিল তোর এত বকবক করার? আর আমিই বা কাগজটা লুকিয়ে রাখলাম না কেন? কাগজটা নষ্ট করে ফেলব আমি, কিন্তু তার আগে উত্তরগুলো পড়ে দেখতে হবে নিজের ঘরে গিয়ে!
মা আমার গায়ের কাছে দাঁড়িয়ে, সারা মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত। হাত বাড়ানো। কাগজটা নোটবই থেকে টেনে বের করেছি, দেখি অপরিচিত অদ্ভুত হস্তাক্ষরে কী সব যেন বিজি বিজি করে লেখা। মা দাঁড়িয়ে রয়েছে বলে এখন পড়া সম্ভব নয়। কিন্তু গ্রেড সম্পর্কে মন্তব্য করার পর সরু হয়ে এল মায়ের চোখজোড়া।
জ্ঞানই শক্তি। বি, এইচ। ঠিক কথা। কে রে এই বি, এইচ?
স্কুলে নতুন এসেছে, কোনওমতে আওড়ালাম। পুরোপুরি মিথ্যে বলা হলো না।
মলি- মিস নাক গলিয়ে- সাগ্রহে নোটটা দেখছে।
এটা কী ধরনের হাতের লেখা? দেখে মনে হচ্ছে মধ্য যুগের লোক।
মজা করে লিখেছে। মায়ের কাছ থেকে কাগজটা নিয়ে এক দৌড়ে উপরে, নিজের ঘরে চলে গেলাম। দরজা লাগিয়ে দিয়ে চোখ রাখলাম আয়নায়। মলি ঠিকই বলেছে। আমাকে আতঙ্কিত দেখাচ্ছে। দেখাবেই তো, ভয় তো পেয়েছি।

বিছানায় বসলাম। একা হতে পেরে স্বস্তি বোধ করছি। চারদিকে নজর বুলালাম। ঘরের কোথাও কোনও পরিবর্তন নেই, অথচ আমার কেমন জানি বিচিত্র এক অনুভূতি হচ্ছে। অস্বাভাবিক এক দিন কাটল আজ। কিশোর আর রবিনও নেই যে ওদের সাথে এ নিয়ে আলাপ করব। উইকএন্ডে হিরন চাচার বাসায় বেড়াতে গেছে ওরা। এখনও আসেনি। আমি যেতে পারিনি কাগজ দিতে হয় বলে।

দরজায় টোকা পড়তেই চমকে উঠলাম। মা এসেছে।

তোর শরীর ভাল তো, মুসা?

হ্যাঁ, মা। একটু ক্লান্ত শুধু। খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিলেই সেরে যাবে।

ঠিক আছে। কিছু লাগলে বলিস।

আচ্ছা।

ভয়ানক ক্লান্তি লাগছিল। খানিকক্ষণের মধ্যেই সম্ভবত ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম যখন ভাঙল তখন অন্ধকার। নাইট টেবিলে রাখা ঘড়িটা দেখলাম। তিনটে বাজে! ভীষণ খিদে পেয়েছে। মুখ ধুয়ে নীচে নেমে এলাম।

কাউকে না জাগিয়ে বড় এক বাটি দুধ আর সিরিয়াল নিলাম। খাওয়া সেরে ঠিক করলাম বেরিয়ে পড়ব কাগজ বিলি করতে। একটু আগেভাগেই বেরোতে চাইছি, বিল হার্টকে যদি এড়াতে পারি সেই আশায়।

ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টারে গিয়ে দেখি আমিই প্রথম। আজ সবার আগে বিল হার্টের বাসায় গেলাম। তার দেখা পেলাম না। বারান্দা লক্ষ্য করে কাগজ ছুঁড়ে দিলাম। ঠিক জায়গায় পড়ল কিনা দেখার জন্য দাঁড়ালাম না। বুক ভরে শ্বাস নিলাম। নিজের চালাকিতে মৃদু হাসি ফুটল ঠোঁটে। মন বলছে, আজকের দিনটা ভাল কাটবে।

হঠাত্র একটা কথা মাথায় আসতে মনটা দমে গেল। কাল সন্ধ্যায় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, হোমওয়র্ক করার আগেই। আতঙ্ক জেঁকে বসল মনের মধ্যে। ইংরেজি ক্লাসের জন্য সংক্ষিপ্ত রচনা, দশটা অঙ্ক এবং বিজ্ঞান মেলার জন্য প্রজেক্ট তৈরির পরিকল্পনা কিছুই করা হয়নি। আর এখন গিয়ে যে হোমওয়র্ক করতে বসব তারও উপায় নেই। এক গাদা কাগজ এখনও বিলি করা বাকি।

অবশেষে স্কুলে পৌঁছলাম। ক্লাসের সবাই একে একে মিসেস রোজের ডেস্কে তাদের লেখা জমা দিচ্ছে। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে শেষমেশ এগিয়ে গেলাম টিচারের উদ্দেশে। তাকে জানালাম, শরীর খারাপ ছিল বলে রচনা লিখতে পারিনি। আবার একটা অর্ধসত্য ঝাড়তে হলো।

কী বলছ তুমি, অবাক কণ্ঠে কাগজের স্তূপের দিকে চাইলেন তিনি। তোমার লেখাটাই তো সবার ওপরে।

খাইছে! নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলাম না। কিন্তু স্বচক্ষে যা। দেখছি তাকে অস্বীকার করি কীভাবে? আমার হাতের লেখায় একটা রচনা সত্যিই রাখা আছে ওখানে। কান গরম হয়ে গেল আমার। মিসেস রোজ হতভম্বের মত আমার দিকে চেয়ে।
কোনও সমস্যা, মুসা? আমাকে বলতে পারো।
এস্তপায়ে ডেস্কের দিকে ফিরে চললাম।
জি না, কোনও সমস্যা নেই। ভুলে যাইনি যে সেটাই ভুলে গিয়েছিলাম। মানে হোমওয়র্কের কথা বলছি আর কী।
ভাগ্যিস কেউ আমার আবোল তাবোল বকুনি শোনেনি। নিজেকে বড়ই বোকা আর বিভ্রান্ত লাগছে।
এবং ব্যাপারটা সেখানেই শেষ হলো। অঙ্কের হোমওয়র্ক সারা হয়ে গেছে। সায়েন্স প্রজেক্টের নকশাও তৈরি। বাস্কেটবল প্র্যাকটিসের পর বাইকে চেপে যখন বাড়ির পথ ধরলাম, মনে হলো কোনও ফেরেশতা বুঝি সাহায্য করছে আমাকে। আর করবে না-ই বা কেন? আমি কি ছেলে হিসেবে খারাপ?
সাইকেল চালাচ্ছি নির্জন এক গলি ধরে। শর্টকাট হয় এপথে এলে। এখানে পৌঁছে গতি বাড়িয়ে দিই আমি। কেননা সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে জায়গাটায় কেমন জানি ভয়-ভয় করে।
সামনের চাকায় একটা ন্যাকড়া জড়িয়ে গেছে। ব্রেক কষলাম। ঝুঁকে পড়ে ওটা সরাতে গেছি, চোখের কোণে লক্ষ করলাম কী যেন নড়ে উঠল একটা গাছের পিছনে। বুকটা ধড়াস করে উঠল লোকটিকে চিনতে পেরে।
সরি, আজকে ভোরে তোমার সাথে দেখা হয়নি। অবশ্য হোমওয়র্ক করতে বেশ সময় লেগে যায়, এমনকী আমারও। যাকগে, তোমার টিচাররা নিশ্চয়ই খুশি হয়েছেন?
ভয় পেয়েছি তাতে কোনও সন্দেহ নেই, কিন্তু হার্টকে সেটা বুঝতে দেওয়া যাবে না। মুখটাকে কঠোর করে বুড়োর চোখে চোখে চাইলাম।
কে আপনি? কী চান? আমার হোমওয়র্ক করে দিচ্ছেন কেন? গ্রীনহিলসে এত ছেলে-মেয়ে থাকতে আমাকে এত খাতির কীসের?
খলখল করে চেনা হাসিটা হেসে উঠল বুড়ো। শিউরে উঠলাম।
আমাদের ঠিকমত পরিচয় হয়নি। তুমি বোধহয় জেনে গেছ আমি বিল হার্ট। তোমার প্রথম প্রশ্নের জবাব পেলে। আর আমি কী চাই সেটা সময় হলেই জানতে পারবে।
উধাও হয়ে গেল সে। আমার কপট সাহসও উবে গেল কর্পূরের মত। এতটাই কাঁপছি, বাইকে চড়তে কষ্ট হলো রীতিমত। বাড়ির উদ্দেশে পেডাল মারছি, হার্টের

খেপাটে হাসিটা বেজে চলল মাথার মধ্যে বারে বারে।
হাঁপাতে হাঁপাতে বাড়ি এসে পৌঁছুলাম। হাঁপানোরই কথা। বাইক রেসে বিশ্ব রেকর্ড করেছি কিনা আজ।
কিশোর আর রবিনের কথা খুব মনে হচ্ছে। ওদের সঙ্গে আলাপ করা দরকার। হিরন চাচার বাসায় ফোন করলাম।
একবার রিং বাজতেই রিসিভার তুলল কিশোর। ওর হ্যালো শোনামাত্র বুকটা ভরে গেল।
হাই, কিশোর। আমি মুসা।
আরে, কী খবর? কেমন আছ?
ভাল। তোমরা?
ভাল। রবিন একটু বাইরে গেছে। সব কেমন চলছে ওখানে?
এই তো, চলছে আরকী। হাতে সময় আছে তো?
নিশ্চয়ই। কী বলবে বলে ফেলো। মনে হচ্ছে ইন্টারেস্টিং কিছু ঘটেছে।
এই না হলে বন্ধু। ঠিক ধরে ফেলেছে কিশোর। ওকে হার্ট ও আজগুবী ঘটনাগুলোর কথা খুলে বললাম। একটা শব্দও অবিশ্বাস করল না ও।
তো তোমার কী মনে হয়? প্রশ্ন করলাম।
সাবধানে থেকো। লোকটা পাগল-টাগল হতে পারে। ওকে কাগজ না। দিলে হয় না?
হাত খরচার ব্যাপারটা ভুলে যেয়ো না।
বেবি সিটিং করতে পারো, প্রস্তাব করল গোয়েন্দাপ্রধান।
পরমুহূর্তে হেসে উঠলাম দুজনেই। বছরখানেক আগে ম্যাকলিনদের দুই ছেলেকে বেবি সিট করি আমি। তিন আর পাঁচ বছরের বাচ্চা দুটো পুরো বাড়িটাকে তছনছ করে ছেড়েছিল। ওদের পরবর্তী শিকার ছিলাম আমি। প্রাণের দায়ে কিশোরকে ফোন করি। ও তক্ষুনি চলে আসে। ছেলে দুটোকে ভিডিও দেখতে বসিয়ে দেয় আর আমি সেই ফাঁকে বাড়িটা গোছগাছ করে ফেলি। মিসেস ম্যাকলিন ডেন্টিস্টের কাছ থেকে ফিরে দেখেন বাচ্চারা টিভির সামনে ঘুমাচ্ছে। তিনি মহাখুশি হন দৃশ্যটা দেখে। আমি আর কিশোর দুজনেই সম্মানী পাই। সত্যি বলতে কী, মিসেস ম্যাকলিনের সুপারিশের জোরেই খবরের কাগজের কাজটা জুটে যায় আমার।
মাকে লন্ড্রিরুম থেকে উপরে উঠে আসতে শুনলাম। কিশোরকে জানালাম, শীঘি আবার কথা হবে।
হ্যাঁ, বলল ও। ফোন করাতে খুব খুশি হয়েছি। আমার কথাগুলো মনে রেখো। আর কী হলো আমাকে জানিয়ো।

রিসিভার রেখে দিয়ে নিজের ঘরে চলে এলাম। কিশোরের সঙ্গে কথা বলে মনটা হালকা লাগছে। কিন্তু আমাকে তো হার্টের সঙ্গে ঠিকই বোঝাপড়া করতে হবে। বাবা-মাকে কিছু জানানোর দরকার নেই। পড়াশোনায় ফাঁকি দিচ্ছি, অথচ জাদুবলে ভাল ফল করছি শুনলে তারা বিশ্বাস করবে না। আমাকে সোজা ধরে নিয়ে যাবে মনোচিকিৎসকের কাছে। না, ব্যাপারটা আমার একারই সামলাতে হবে।
মার গলা শোনা গেল এসময়।
মুসা, মলি এসেছে তোর কাছে।
গুঙিয়ে উঠলাম।
আসছি।
কী চায় মেয়েটা?
নেমে এসে জানতে পারলাম, অতিপ্রাকৃত বিষয় নিয়ে রচনা লিখতে হবে মলিকে। ও চায় আমি ওকে বিল হার্টের হানাবাড়িতে নিয়ে যাই। ঠিকানাটাও টুকে রেখেছে।
এই উইকএন্ডে নিয়ে যেতে পারবে? জানতে চাইল।
আমার দিকে আশা ভরা দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে রয়েছে ও। ওকে বলতে যাচ্ছিলাম, গ্রীনহিলসে কোনও ভুতুড়ে বাড়ি নেই, এবং ১০০ মেইন স্ট্রীটের বাড়িটা ঘুরে দেখে এসেছি আমরা, কোনও ভূতের দেখা পাইনি, এবং ওখানে এখন, লোক বাস করে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে একটা বুদ্ধি খেলে গেল। মলি আমার সাক্ষী হতে পারে। হার্ট হয়তো ওকেও ভেলকি দেখাবে। মলি তখন আমার কথা সমর্থন করবে। এভাবে হয়তো বুড়োকে শহর থেকে খেদানো সম্ভব হবে।
ঠিক আছে, বললাম। রবিবার, সকাল এগারোটার দিকে এসো।
মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল মলির।
সত্যি বলছ? অসংখ্য ধন্যবাদ!
দৌড়ে বেরিয়ে গেল ও- আমি মত পরিবর্তনের আগেই। নিজের ঘরে ফিরছি, ভাবলাম কাজটা ঠিক করছি কিনা। হার্ট যদি সত্যি সত্যি কোনও পাগলামি করে বসে? মলির যদি কোনও বিপদ হয় তবে আমি দায়ী হব। কিন্তু ও-ই তো ওখানে যেতে চেয়েছে। আমি তো ওকে সাধিনি। মাঝে মাঝে জীবনে ঝুঁকি নিতে হয়।
কিশোরের পরামর্শটা নেব ঠিক করলাম। বিল হার্টকে কাগজ দেব না। বসকে বলব ১০০ মেইন স্ট্রীটে অন্য কাউকে পাঠাতে।
কিন্তু আমার বস মিসেস ব্র্যাডম্যানের কম্পিউটার ফাইলে বিল হার্ট নামে . কোন গ্রাহক নেই।
ব্লকের শেষ মাথার পোড়ো বাড়িটার কথা বলছ? জানতে চাইলেন তিনি। ওখানে তো কেউ থাকে না।

হ্যাঁ। আমার মনে হয় ভুল হয়েছে। সরি। উনি আর কোনও প্রশ্ন করার আগেই রিসিভার রেখে দিলাম। আমি অবশ্য অতটা অবাক হইনি।
পরদিন সকালে হার্টের বাড়ি বাদে আর সবখানে কাগজ বিলালাম। মনটা খুশি হয়ে গেল। লোকটাকে জড়ানো গেছে। কিন্তু স্কুলে ঘটল আরেক কাণ্ড।
অঙ্কের ক্লাসে যে খাতাটা জমা দিয়েছিলাম সেটা ফেরত দেওয়া হয়েছে। দশটা অঙ্কই নির্ভুল হয়েছে। মোটেই চমকালাম না। এবার মিসেস রবার্টস বোর্ডে একটা অঙ্ক লিখে আমাকে সমাধান করতে বললেন। খাইছে! উনি আমাকে আদর্শ ছাত্র মনে করছেন, নাকি আমার সামর্থ্য নিয়ে সন্দেহ করছেন বুঝতে পারলাম না।
চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ধীর পায়ে হেঁটে গেলাম। কী বিপদেই না পড়েছি! চক তুলে নিয়ে গলা খাকারি দিলাম, তারপর বেদম কাশতে শুরু করলাম।
পানি খাবে, মুসা? জিজ্ঞেস করলেন মিসেস রবার্টস।
ওঁর দিকে তাকানোর সাহস পেলাম না। ফলে আমার অভিনয়টা বিশ্বাসযোগ্য হলো কিনা বুঝলাম না। মাথা ঝাঁকিয়ে এক দৌড়ে বেরিয়ে এলাম ক্লাসরুম ছেড়ে। আরেকজনকে ডাকা হলো সমাধানটা করার জন্য।
প্রচণ্ড টেনশনের পর হলওয়ের শীতল, শান্ত পরিবেশ স্বস্তি দিল আমাকে। একটা ড্রিঙ্ক নিতে পারলে ভাল হয়। কাছের ফাউন্টেনের উদ্দেশে এগিয়ে গেলাম। আশা করছি কমলার ঠাণ্ডা রস পান করতে পারব। ঝুঁকে পড়ে নব ঘোরাতে যাব, কানে এল পরিচিত এক কণ্ঠস্বর। বিল হাট।
তুমি ক্লাসে আমার সাহায্য নিতে পারতে।
পাঁই করে ঘুরে দাঁড়ালাম।
আপনি কী করছেন এখানে?
তোমাকে আবার বোর্ডে ডাকা হবে। টিচার জানেন তুমি অভিনয়। করেছ। আমরা তিনজনই জানি অঙ্কটা তুমি কষতে পারবে না।
সরে যান আমার কাছ থেকে। হুমকিটা চেষ্টা করেও গলায় ফোঁটাতে পারলাম না।
আমাকে তোমার দরকার। নইলে ক্লাসসুদ্ধ ছেলে-মেয়ের সামনে কান। কাটা যাবে। তা ছাড়া টিচারও ভাববেন অঙ্কগুলো তুমি অন্য কাউকে দিয়ে করিয়েছ।
কিন্তু আমি জানতাম না- পায়ের শব্দ পেয়ে মুখ বন্ধ করলাম। ক্লাসরুমের দরজায় দাঁড়িয়ে মিসেস রবার্টস।
তোমার পানি খাওয়া হয়নি?
মাথা ঝাঁকিয়ে, গোমড়ামুখে ক্লাসে ফিরে গেলাম।
স্বীকার করতেই হচ্ছে, হার্ট আমার মুখ রক্ষা করেছে। অঙ্কটা করে ক্লাসের সামনে বুঝিয়ে দিতে পেরেছি। মিসেস রবার্টসকেও সন্তুষ্ট করা গেছে। এমনকী ম্যাথ ক্লাব প্রেসিডেন্ট ক্রিস কেয়ার্নস এতটাই প্রভাবিত হয়েছেন, ক্লাস শেষে ক্লাবের পরবর্তী

সভায় যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এসবের পিছনে হার্টের হাত রয়েছে। কিন্তু কী জাদু খাটাচ্ছে সে এখনও ধরতে পারিনি। আর কেনই বা এসব করছে তা-ই বা কে জানে।

আমাদের ইংরেজি টিচার মিসেস রোজ আমার রচনা পড়ে দারুণ খুশি। সবার সামনে জোরে জোরে পড়ে শোনাতে বললেন। আপত্তি করার কারণ, নেই। হার্ট কী লিখেছে জানার কৌতূহল আমারও আছে।

চমৎকার ঝরঝরে ভাষায় লেখা রচনাটায় কোনও জ্ঞান গর্ভ কথা নেই। পড়ে মনে হবে কোনও কিশোর ছেলেই লিখেছে। কেউ কেউ তো রচনাটা শুনে হাততালি দিয়ে অভিনন্দনও জানাল।

সায়েন্স ক্লাসে আমার প্রজেক্টের বর্ণনা শুনে ড্যানি মরিসন আমার পার্টনার হতে চাইল। ড্যানি বিজ্ঞানের মেধাবী ছাত্র। দুজনেই আমরা মানব দেহের হৃৎপিণ্ড নিয়ে কাজ করতে চাইছি।

কিন্তু বেচারা কি জানে আমি এই প্রজেক্টের প-ও তৈরি করিনি। এক খেপা জাদুকর তার আশ্চর্য ক্ষমতাবলে সাহায্য করছে আমাকে। কী তার স্বার্থ এখনও জানা হয়নি আমার। আমাকে সঙ্গে নিয়ে পুরস্কার জেতার কথা ভাবলে শেষটায় ঠকতে হবে ড্যানিকে।

শর্টকাট এড়িয়ে খানিকটা দেরি করে বাড়ি পৌঁছালাম। শীঘ্রিই টের পেলাম পুরো ব্যাপারটাই আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। মা দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল। আমাকে দেখে বুকে জড়িয়ে ধরল। মনে হলো হঠাৎ করে বড় অঙ্কের লটারি জিতে গেছে বুঝি। আসলে তা না। মিসেস রোজ আর মিসেস রবার্টস মাকে ফোন করে আমার পড়াশোনায় উন্নতির কথা জানিয়েছেন। তাতেই মার আনন্দ ধরছে না। বাবাকেও ফোন করে জানিয়েছে। বাবা এতটাই খুশি হয়েছে, রাতে বাইরে খেতে নিয়ে গিয়ে সুখবরটা উদ্যাপন করতে চায়। হ্যাঁ, এসব ঘটনার উপর আমার কোন হাত থাকছে না।

রাতে রেস্টুরেন্ট থেকে ফিরে নিজের রুমে ঢুকেছি, ক্লজিটের কাছে কিছু একটা কিংবা কেউ একজন গুটিসুটি মেরে রয়েছে দেখতে পেলাম। খাইছে! কম্পিত হাতে আলো জ্বালোম।

একগাদা ময়লা কাপড় ওখানে জড় করে রেখেছিলাম। নিজেই ভুলে গেছি। নাহ, বিল হার্ট আমাকে পেয়ে বসেছে! ভেবেছিলাম ও-ই বুঝি ঘরের কোণে হাজির হয়ে আমাকে ভয় দেখাতে এসেছে।

শুক্রবার দিনটা খুব স্বাভাবিকভাবে কাটল। ক্লাসে বিশেষ কোনও ঘটনা ঘটেনি, কেউ আচমকা মাটি খুঁড়ে উদয় হয়নি। মনটা খারাপই হয়ে গেল। আশা

করেছিলাম নিশ্চয়ই অদ্ভুত কোনও ঘটনা ঘটবে। রাতে ঘুমানোর সময়। ধারণা করলাম, বিল হার্ট সম্ভবত শহর ত্যাগ করেছে।
শনিবার ঘুম ভাঙার পর ঝরঝরে বোধ করলাম। আজ কাগজ দিচ্ছি না। এক ছেলে বাড়তি পয়সা কামানোর জন্য আমার রুটে কাজ করার অনুমতি চেয়েছিল, আমি আপত্তি করিনি।
বাবা-মা আজ রাতে পার্টিতে যাবে। তাই মা আমাকে গাড়িতে করে ভিডিওর দোকানে নিয়ে গেল ছবি বাছাই করতে।
সন্ধেবেলা পপকর্ন, চিপস আর এক মগ সোডা নিয়ে ছবি দেখতে বসলাম। মনের যা অবস্থা তাতে দুটো ছবির মধ্যে কমেডিটাই আগে দেখব ঠিক করলাম।
ভিসিআর চালু করলাম, কানে এল নানা ধরনের বিচিত্র কাঁচ-কাঁচ শব্দ। সিঁড়ি, ছাদ, দেয়াল- সবখান থেকে শব্দ আসছে। বাবা বলে এর মানে হচ্ছে বাড়িটা থিতু হচ্ছে। কিন্তু আমাদের বাড়িটা তো যথেষ্ট পুরানো। এতদিনেও থিতু হতে পারল না?
ভিসিআরের ভলিউম বাড়িয়ে দিয়ে গা এলিয়ে বসতে চেষ্টা করলাম। ইস, কিশোর আর রবিন থাকলে কী ভালই না হত! তিনজন একসঙ্গে থাকলে ভয়-ডর কোথায় পালাত! রবিবার মলির সঙ্গে দেখা করার কথা। মনটা দমে গেল। কাজটা সেরে ফেলতে হবে ঝটপট। হার্ট মনে হয় শহরে নেই, কাজেই মলির দেখার মত কিছু পাওয়াও যাবে না ও বাড়িতে। বাড়ির বাইরে দিয়ে দ্রুত এক পাক মেরে ফিরে আসতে হবে।
আরে ধুর, সাত-পাঁচ ভাবতে গিয়ে ছবির খেই হারিয়ে ফেলেছি। রিওয়াইন্ড করতে হবে খানিকটা। এসময় শব্দ হলো আবারও। মাথার উপরে ককিয়ে উঠল মেঝের কাঠ। মনে হলো বাড়িতে আমি একা নই, কেউ একজন আছে আমার সঙ্গে।
ঘড়ি দেখলাম। আটটা বাজে। বাবা-মার ফিরতে আরও কয়েক ঘণ্টা দেরি। ধ্যাত্তেরি, এসব নিয়ে মাথা ঘামাব না। খেই হারানো জায়গাটা খুঁজে পেয়ে ছবিতে মন দিলাম।
বাইরে বাতাসের দাপাদাপি। গাছের ডালে ডালে বাড়ি খাচ্ছে খটাখট। হঠাই জানালার শার্সিতে আঘাত হানল কী যেন। চমকে উঠলাম। ঘুরে বসে খড়খড়ি তুলে দিলাম। কিন্তু জানালার কাঁচে গাল ঠেকিয়েও কিছু দেখতে পেলাম না।
সহসা আমার শ্বাসের বাষ্প থেকে একটা মুখাবয়ব ফুটে উঠল। জানালার ওপাশ থেকে সরাসরি আমার দিকেই চেয়ে রয়েছে বিল হার্ট!
খড়খড়ি হাতড়াতে লাগলাম, মরিয়ার মত নামাতে চাইছি। কাজটা সেরে টিভি অফ করলাম। এটা কমেডি দেখার সময় নয়। পিছনের দরজার সঙ্গে একটা চেয়ার ঠেকনো দিলাম। পুলিশে খবর দেব? লাভ হবে না। ওরা যখন পৌঁছবে হার্ট

ততক্ষণে হাওয়া। সামনের দরজা দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে চিৎকার শুরু করব নাকি? নাহ, লোক হাসিয়ে কাজ কী।
এ মুহূর্তে হাতে একটা অস্ত্র-টস্ত্র থাকা উচিত। ঘরের চারদিকে নজর বুলিয়ে নিলাম। বুক এতটাই ধড়ফড় করছে, ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তাও করতে পারছি না।
শব্দটা কীসের? মাথার উপরে এলোমেলো পায়ে হাঁটছে কেউ। কে? হার্ট? না। ও উপরে যাবে কেন? ও তো বাইরে। নির্ঘাত অন্য কেউ ঢুকে বসে আছে।
আমি আত্মরক্ষা করব কী দিয়ে? কিছু খুঁজে না পেয়ে অগত্যা তুলে নিলাম রিমোট কন্ট্রোলটা। আর কিছু না হোক, কষে বাড়ি তো দিতে পারব।
পায়ের শব্দ এখন সিঁড়িতে। ধীরে ধীরে নেমে আসছে, লুকানোর জায়গা দরকার। বাবার লাউঞ্জ চেয়ারটা কাজে দেবে মনে হলো। কামরার কোনায় রয়েছে ওটা। অনায়াসে গা ঢাকা দেয়া যাবে চেয়ারটার পিছনে। অনাহূত অতিথি আমাকে দেখার আগেই আমি তাকে দেখতে পাব। মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে অপেক্ষায় রইলাম।
হঠাই টেলিফোনের শব্দে আঁতকে উঠতে হলো। একটানা বেজেই চলেছে। অবশেষে থামল, তবে মাত্র এক মিনিটের জন্য। টেলিফোন যে করেছে তার জরুরী দরকার মনে হচ্ছে। কালকের ট্রিপের ব্যাপারে মলি করল নাকি? কিশোর কিংবা রবিন করেনি তো আমার খোঁজ নেওয়ার জন্য?
টেলিফোনটা আর গোটা বাড়ি হঠাৎ করেই নিঝুম হয়ে গেল। কানে আসছে কেবল মুষলধারে বৃষ্টি আর বাতাসের শোঁ-শোঁ শব্দ। আশা করলাম, খারাপ আবহাওয়ার কারণে হার্ট তার হানাবাড়িতে ফিরে যাবে।
পায়ে খিল ধরে যাচ্ছে, কিন্তু নড়ার সাহস পেলাম না। এই যাহ, বাতি চলে গেল! পাওয়ার ফেইল করেছে নাকি কেউ ইচ্ছে করে কাজটা করল বুঝতে পারলাম না। রিমোট কন্ট্রোল দিয়ে টিভি অন করার চেষ্টা করলাম। হলো না।
বুকের মধ্যে আতঙ্ক ক্রমেই জমাট বাঁধছে।
এসময় সদর দরজায় টোকার শব্দ হলো। পরপর তিনবার। উঠে দাঁড়ালাম, পা কাঁপছে। কে এল এই দুর্যোগের মধ্যে? হার্ট না তো? আমার নাম ধরে ডাকছে। না, হার্ট না অন্য কেউ।
মুসা, আছ নাকি? আমি মিস্টার ল্যাম্পার্ড।
মলির বাবা। বাঁচলাম, বাবা!
আঁধারে হাতড়ে হাতড়ে সদর দরজার কাছে পৌঁছলাম। খুলে দিলাম।
ভীষণ চিন্তা হচ্ছিল। ঘুমিয়ে পড়েছিলে নাকি? প্রশ্ন করলেন ভদ্রলোক।
না, মানে... কী বলব? এক খেপা জাদুকর আমাকে জ্বালাতন করছিল? নাকি এটা বলব, আশঙ্কা করছি কেউ গোপনে বাড়ির মধ্যে ঢুকে বসে আছে?

তোমার মা ফোন করেছিলেন। ওঁদের গাড়ি ট্রাবল দিচ্ছে। ফলে রাতে ফিরতে পারছেন না। তুমি রাতটা আমাদের বাসায় থাকবে।
খুশি মনে রাজি হয়ে গেলাম আমি।
ফ্ল্যাশলাইটটা নাও। আমি এখানে দাঁড়াচ্ছি, তোমার যা যা লাগে নিয়ে এসো। তোমার মা এখানেও ফোন করেছিলেন, কিন্তু সাড়া পাননি। তুমি। টেলিফোনের শব্দ পাওনি?
আমি বাথরুমে ছিলাম, অজুহাত দিলাম। একটু পরে দুএকটা কাপড় আর টুথব্রাশ ভরে নিলাম প্লাস্টিকের ব্যাগে। তারপর উড়ে নেমে এলাম সিঁড়ি দিয়ে। আমি তৈরি।
জ্যাকেট নিয়ে নাও।
আচ্ছা। কোট ক্লজিট খুলে সামনে যেটা পেলাম নিয়ে নিলাম। কাজ হবে না। এটা মার। দ্বিতীয়বারে ঠিকঠাক জিনিস বেছে নেওয়া গেল। এবার যাওয়া যায়।
মলি আর মিসেস ল্যাম্পার্ড আমাদের জন্য কিচেনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কুকি আর দুধ নিয়ে বসে দুর্যোগ সম্পর্কে আলোচনা শুরু করলাম আমরা। মি. ল্যাম্পার্ড ফোন করে বাবা-মাকে আশ্বস্ত করলেন। আমিও কথা বললাম। তাদের সঙ্গে। রবিবার বিকেল নাগাদ ফেরার আশা করছে বাবা-মা।
মিসেস ল্যাম্পার্ড যখন লিভিং রুমে আমার জন্য সোফা বেড তৈরি করছেন, আমি আর মলি তখন গল্প করতে লাগলাম কিচেনে।
তোমার রিপোর্টের কদ্দূর? অতিপ্রাকৃত বিষয়ের রিপোর্টটার কথা, বলছি।
অনেকটা এগিয়েছে। প্রচুর তথ্য জোগাড় করেছি লাইব্রেরি থেকে। গলা খাদে নামাল ও। কাল যাচ্ছ তো আমার সাথে? মেইন স্ট্রীটের হানাবাড়িটায়?
নিশ্চয়ই। আবহাওয়া ভাল থাকলে কেন যাব না? ফিসফিস করে বললাম।
মুখে হাসি ফুটল মলির।
আমার বন্ধু ও বাড়ির বুড়োটাকে চেনে, বললাম আমি। তার নাকি অলৌকিক ক্ষমতা আছে।
চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল মলির।
কীরকম?
এই যেমন আচমকা উদয় হওয়া, চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া এসব আরকী।
বলো কী!
হ্যাঁ, আরও আছে। আমার বন্ধু হোমওয়র্ক করতে ভুলে গেলে বুড়োটা করে জমা দেয়, অথচ ও টেরও পায় না। যেসব পড়া ও কস্মিনকালেও তৈরি করেনি সেগুলো অনায়াসে পেরে যায়। শুনতে হয়তো ভালই লাগে, কিন্তু

পুরো ব্যাপারটা কেমন যেন ঘোলাটে হয়ে যাচ্ছে।
তারমানে?
মেয়েটা বেশ সহজভাবেই কথাগুলো নিচ্ছে।
আমার বন্ধু তার বাবা-মা, টিচার আর ক্লাসমেটদের চোখে ধুলো দিতে চায় না। আর বুড়োটা নাকি বলেছে, এসব উপকারের বিনিময়ে সময় হলেই সে কিছু একটা দাবি করবে। বুক ভরে শ্বাস নিয়ে নিলাম। আমি যেটা জানতে চাইছি, তোমার গবেষণায় এধরনের কিছু কি জানতে পেরেছ?
হ্যাঁ, মনে হচ্ছে উন্মাদের পাল্লায় পড়েছে তোমার বন্ধু। এরা অনেক কিছু পারে।
কীভাবে বুঝলে?
অদৃশ্য হওয়া, হোমওয়র্ক করে দেয়া—
আমি আসলে এতক্ষণ আমার কথাই বলছিলাম।
সে আমি আগেই বুঝেছি। তোমার পরীক্ষার খাতা দেখে ফেলেছিলাম, মনে নেই? আন্টি যেরকম আশ্চর্য হলেন, যে কেউই বুঝবে তোমার গ্রেডের কী অবস্থা। কিছু মনে করলে না তো আবার?
না, না।
বিছানা তৈরি হয়ে গেছে, খবর দিলেন মিসেস ল্যাম্পার্ড। আমাদেরকে শুতে যেতে বললেন। শুনে খুশি হলাম। ভয়ানক ক্লান্তি লাগছিল।
আধো ঘুমে কানে এল বিল হার্টের ভুতুড়ে কণ্ঠস্বর।
তড়াক করে উঠে বসে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম। বুড়ো হাজির হয়ে গেছে।
কেমন আছ, মুসা? তোমার সাথে দেখা হওয়াতে ভাল লাগছে।
আমার লাগছে না। এখন আমাকে একটু শান্তিতে ঘুমাতে দিন।
বিদঘুটে হাসিটা হাসল হার্ট।
ঘুম? তুমি তো এখানে ঘুমাতে আসনি।
কী বলছেন এসব উল্টোপাল্টা? এবার কামরার চারপাশে নজর বুলালাম। সিংহাসনসদৃশ এক চেয়ারে বসে আমি, মলিদের সোফা বেডে নয়। অন্ধকার, প্রাচীন এক দুর্গে কীভাবে জানি হাজির হয়ে গেছি- বরঞ্চ বলা উচিত মাটির নীচের এক কারা কক্ষে। পরনে আমার চিরচেনা পাজামার বদলে হুডওয়ালা বাদামি এক আলখেল্লা। কোমরে সোনার তৈরি ফিতে পায়ে রাজা-বাদশাদের মত নাগরা জুতো। আমাকে এ অবস্থায় দেখলে কিশোর আর রবিনের চোখ কপালে উঠে যাবে।
কী হচ্ছে কী এখানে? আমি কোথায়?
আমার কামরায়। খুশি হয়েছ নিশ্চয়ই? সম্মানটার কথা ভাবো।

সম্মান অন্য কাউকে দেখান। এটা কি গ্রীনহিলস? চারধারে চোখ বুলিয়ে টেলিফোন্স খুঁজলাম। হার্টের অগোচরে পুলিশে ফোন করতে পারলে
প্রশ্নই ওঠে না। আমার মত মহা ক্ষমতাধর মানুষ ওরকম একটা সাধারণ জায়গায় কী করবে?
লোকটা নিঃসন্দেহে পাগল। মলি ঠিকই বলেছিল।
ভয় পেয়েছি বুঝতে দেওয়া চলবে না।
আপনি আমার কাছে কী চান ঝটপট বলে ফেলুন। সাহস জড় করে বললাম।
অত তাড়া কীসের? তুমি তো কোথাও যাচ্ছ না। তবে এতই যদি কৌতূহল তো শোনো, আমার একজন ছাত্র দরকার। বয়স হচ্ছে, একজন সহকারী পেলে ভাল হয়।
বয়স হচ্ছে কথাটা একটুও বাড়িয়ে বলেনি। বুড়োকে দেখে মনে হয়। অন্তত তিনশো বছর বয়স।
থাক সে সব চিন্তা। আমাকে পালাতে হবে। ঘরটার চারদিকে দৃষ্টি বুলালাম, কিন্তু একটা জানালাও চোখে পড়ল না।
নিশ্চয়ই জানালা খুঁজছ?
কথাটা শুনে চমকে উঠলাম। বুড়ো মন পড়তেও জানে নাকি?
হাত দোলাল হার্ট।
জানালা, বলে খলখলিয়ে হেসে উঠল উন্মাদের মত।
সটান উঠে দাঁড়িয়ে উঁকি দিলাম জানালা দিয়ে। না, আমরা গ্রীনহিলসে নেই। এমনকী নিরেট জমির উপরও নয়। ভেসে রয়েছি মেঘের রাজ্যে।
যাও না, যত খুশি চেঁচাও, সাহায্য চাও- কেউ শুনবে না। কেউ দেখবে না। আঙুলের তীক্ষ্ণ ডগা নাড়ল আমার উদ্দেশে। সত্যি বলতে কী, তুমি চলে যেতে চাও শুনে আমি কিন্তু বেশ অপমানিত বোধ করছি।
না, মানে আমার বাবা-মা দুশ্চিন্তা করবে কিনা। তা ছাড়া স্কুলের এক ছেলে আমার ওপর ভরসা করে বসে আছে। দুজন মিলে বিজ্ঞান মেলার জন্যে প্রজেক্ট তৈরি করার কথা।
তুমি যদি গ্রীনহিলসে ফিরে যাওয়ার রাস্তা খুঁজে নিতে পারো, তবে বলতেই হবে তুমি আমার চাইতেও বড় জাদুকর। হাহ, হাহ্, হা। পরমুহূর্তে, বিদ্যুৎ ঝলকের মত উবে গেল বুড়ো।
এত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও হার মানতে রাজি হলো না মন। নিশ্চয়ই উদ্ধারের কোনও না কোনও রাস্তা আছে। কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে, এই বিপদে আমি পড়লাম কীভাবে?
খাইছে, একী!
এই যে, মুসা, এদিকে। কিশোরের কণ্ঠস্বর।

হ্যাঁ, এদিকে। রবিন বলে উঠল।
পাঁই করে ঘুরে দাঁড়ালাম। কাউকে দেখতে পেলাম না, কিন্তু মনে হলো ওদের কণ্ঠস্বর ভেসে এসেছে দেয়ালের কাছ থেকে হার্টের এক পোরট্রেটের পিছন থেকে। ছবিটা যে এঁকেছে তার প্রশংসা করতে পারলাম না। কেননা বুড়ো দেখতে মোটেই অমন সুন্দর নয়।
কোথায় তোমরা? প্রশ্ন করলাম মরিয়ার মতন।
তাড়াতাড়ি করো! সময় নেই। হার্টের ছবিটা নামিয়ে ফেলো। ওটার পিছনে একটা চাবি পাবে, জবাব দিল কিশোর।
ভারী ছবিটা নামাতে গিয়ে ধুলোয় দম আটকে মরার দশা হলো। দুহাতে জড়িয়ে গেছে মাকড়সার জাল। কিশোরের কথা মত পুরানো এক চাবি ঠিকই পাওয়া গেল ক্যানভাসের গায়ে। সাঁটিয়ে রেখেছে আঠা দিয়ে। টান মেরে খুলে আনলাম ওটা।
পেয়েছি, জানালাম।
আস্তে কথা বলো, বলল কিশোর। নইলে ওরা শুনে ফেলবে। ওই বুকশেলফগুলো দেখতে পাচ্ছ?
আগে খেয়াল করিনি, কিন্তু এখন দেখতে পেলাম এক দিকের পুরো দেয়ালজুড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।
তিন নম্বর তাকে, বইয়ের পিছনে একটা তালা আছে। চাবিটা ঢুকিয়ে বায়ে মোচড় দাও, নির্দেশ দিল কিশোর।
ওর কথা মত কাজ করলাম। খাইছে, দেয়ালের একাংশ ধীরে ধীরে খুলে গেল। কিশোর আর রবিন ওপাশে দাঁড়িয়ে।
তোমাদেরকে পেয়ে কী যে খুশি লাগছে! বলে উঠলাম।
আমাদেরও। কিন্তু এখন একটা মুহূর্তও নষ্ট করা যাবে না। দরজাটা লাগিয়ে দাও, জরুরী কণ্ঠে বলল রবিন।
আমরা যাচ্ছি কোথায়? প্রশ্ন করলাম।
এই সুরঙ্গ দিয়ে ফিরে যাব পৃথিবীতে, জানাল কিশোর।
তুমি এতসব জানলে কীভাবে? এস্ত পায়ে হাঁটার ফাঁকে জিজ্ঞেস। করলাম। তোমরা কতক্ষণ ছিলে এখানে? এই কদিন আগেই না ফোনে কথা হলো?
পরে সব শুনো।এখন জলদি চলো, তাগাদা দিল নথি।
সুরঙ্গটা অন্ধকার আর সেঁতসেঁতে। ভয়-ভয় করছে। বন্ধুদের মনের অবস্থাও সহজেই অনুমান করা যায়। হঠাৎই গমগম করে উঠল একটি কণ্ঠস্বর।
চললে কোথায়?

ধড়াস করে উঠল বুকের ভিতরটা। আমাদের সামনে যেন মাটি খুঁড়ে উদয় হলো হার্ট, আপাদমস্তক কুয়াশায় ঢাকা। মুখের চেহারা থমথম করছে, বুকের সঙ্গে আড়াআড়িভাবে বাহু ভাঁজ করা। আগে লক্ষ করিনি, ওর ডান হাতের আঙুলে শোভা পাচ্ছে প্রকাণ্ড এক হীরের আংটি। ওটা এতটাই উজ্জ্বল আলো দিচ্ছে, কপালে হাত রেখে ছাউনি তৈরি করতে হলো আমার।
আমার পিছন পিছন এসো।
না! চেঁচিয়ে উঠলাম। না!
মুসা, মুসা, উঠে পড়ো।
এক চোখ মেলে পিটপিট করে চাইলাম। সোফা বেডে শুয়ে আছি। মিস্টার ও মিসেস ল্যাম্পার্ড, মলি, এমনকী খুদে লরাও উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে। তড়াক করে উঠে বসলাম। পিঠে অনুভব করলাম উষ্ণ রোদ। কেমন জানি বিভ্রান্ত, অপ্রস্তুত বোধ করছি।
কঠিন দুঃস্বপ্ন দেখেছ মনে হচ্ছে, মলি বলল।
তুমি ভাল আছ তো, মুসা? মিসেস ল্যাম্পার্ড প্রশ্ন করলেন। উদ্বেগ প্রকাশ পেল কণ্ঠে।
মাথা ঝাঁকালাম। অস্বস্তি বোধ হচ্ছে। অন্যের বাড়িতে কে চায় এরকম বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে পড়তে?
নাস্তা খেতে এসো, বললেন মিসেস ল্যাম্পার্ড। তোমরাও এসো।
মলি গেল সবার শেষে।
আজকের আবহাওয়াটা চমৎকার, মুসা, বলল ফিসফিস করে। হানাবাড়িতে হানা দেয়ার জন্যে একেবারে পারফেক্ট।
গুঙিয়ে উঠলাম। ওকে বোঝাব কী করে যে দশটা বুনো ঘোড়াও আমাকে ১০০ মেইন স্ট্রীটে টেনে নিয়ে যেতে পারবে না?
সিদ্ধান্ত নিলাম, বাবা-মা ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করব। তারপর অজুহাত দেখাব তারা বাড়ি থেকে বেরোতে দিচ্ছে না। কিন্তু মলি ভাল মেয়ে। ওকে ঠকাতে মন চাইল না। মুখ-টুখ ধুয়ে নতুন কাপড় পরলাম, সেঁটে নাস্তা করার পর মনটা খোশ হয়ে গেল।
আমার সাইকেলটা বাসায়। মলির সঙ্গে ওদের ড্রাইভওয়ের সামনে দেখা করব ঠিক করলাম। আমাদের গ্যারেজের উদ্দেশে এগোলাম। কম্বিনেশন লক চেপে দরজা খুললাম।
পা রাখলাম ভিতরে। বাইকের কাছে হেঁটে গিয়ে কিক স্ট্যান্ডে লাথি মারতে যাব, আচমকা খটাস করে লেগে গেল গ্যারেজের দরজা। এরকম হওয়ার তো কথা নয়! কালিগোলা অন্ধকারে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম।

ভড়কে গেছ, তাই না? সেই কণ্ঠস্বর আবার!
হার্টকে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু ঠিক হাজির হয়ে গেছে সে।
দেখুন, আপনি কিন্তু না বলে ঢুকেছেন আমাদের বাড়িতে। ভালয়-ভালয় চলে যান, নয়তো পুলিশ ডাকব।
আহাহা, বন্ধুর সাথে কেউ এভাবে কথা বলে? তোমাকে কতখানি সাহায্য করেছি এরই মধ্যে ভুলে গেলে?
আমি মোটেই আপনার বন্ধু নই। আর আমি আপনার কাছে কখনোই কোনও সাহায্য চাইনি।
সাহায্য বন্ধ করতেও বলনি। আমার পরিশ্রমের ফসল ভোগ করছ। তুমি। টিচারদের চোখের মণি হয়ে উঠেছ রাতারাতি।
কী চানটা কী আপনি? আমার কাগজ বিলির পয়সা? সরি, খরচ করে ফেলেছি।
পুরো এক মিনিটের জন্য নিশ্চুপ হয়ে গেল হার্ট। তারপর সিরিয়াস হয়ে উঠল।
আমি তোমাদের খবরের কাগজের কম্পিউটারের গোপন কোড ব্যবহার করতে চাই।
খাইছে, এসব কী বলছে বুড়ো? ঠিক শুনছি তো?
কিন্তু কেন?
বলা যাবে না।
বলেন, বলবেন না। থাকগে, ওসব কোড-ফোড় আমার জানা নেই। আমার কাজ শুধু কাগজ বিলি করা।
অফিসের বড় কাউকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবে।
ওরা জানতে চাইবে কী দরকার আমার।
অজুহাত দিয়ে দেবে কিছু একটা। তুমি তো অজুহাত খাড়া করার ওস্তাদ।
মুসা! তুমি কি ভেতরে? মলি এসে গেছে।
এখুনি আসছি, পাল্টা চেঁচালাম। তারপর হার্টের উদ্দেশে বললাম, যদি আপনার কথা না শুনি?
তোমার গ্রেড খারাপ হয়ে যাবে। বাবা-মা হতাশ হয়ে পড়বেন। গুজব ছড়াবে, তুমি একটা ঠগ- অন্যকে দিয়ে হোমওয়র্ক করাও।
বুঝেছি। ঘামতে শুরু করেছি। কিন্তু আপনি নিজে কেন কোডটা জোগাড় করছেন না? আপনার তো অনেক ক্ষমতা।
পারলে কী আর তোমাকে বলতাম? ওটা আমার ক্ষমতার বাইরে।
গ্যারেজের দরজাটা খুলে দিন, প্লিজ।
আমার কথাগুলো ভেবে দেখো। অনেক কিছু নির্ভর করছে এর ওপর। আর একটা কথা মনে রেখো: আমি কিন্তু বন্ধু হিসেবে যতটা ভাল শত্রু হিসেবে ঠিক

ততটাই ভয়ঙ্কর।
দরজা খুলে গেল। উষ্ণ রোদে ঝলমলিয়ে উঠল গ্যারেজ। হার্ট নেই। বাইরে বেরিয়ে এসে দম নিলাম বুক ভরে।
এত দেরি করলে যে?
সরি। মলিকে কী বলব ভেবে পেলাম না। মলি, ও বাড়িতে গেলে কিন্তু বিপদ হতে পারে।
কেন? তুমি না বলেছ—
হ্যাঁ, কিন্তু কখন কী হয়ে যায় কেউ বলতে পারে?
মলির মুখের চেহারায় এতটাই বিস্ময় ফুটল, গ্যারেজের ভিতরকার সমস্ত কথা ওকে খুলে বলতে হলো। শুনে তো খেপেই গেল ও।
মুসা, তোমার উচিত পুলিশকে জানানো।
হ্যাঁ, ওরা তো আমার কথা বিশ্বাস করার জন্যে বসে আছে!
আমি যাব তোমার সাথে।
কী লাভ? হার্টকে একমাত্র আমিই দেখেছি। ওরা ভাববে মশকরা করছি আমি।
তা ঠিক। যাকগে, একজন পুলিশ অফিসারকে সাথে করে বাড়িটা থেকে ঘুরে আসলে কেমন হয়? পুলিশ দেখলে বুড়ো হার্ট হয়তো এ শহর ছেড়ে পালাবে।
প্রস্তাবটা উড়িয়ে দিতে পারলাম না।
তবে, মলি, এটা নিয়ে কারও সাথে আলাপ করতে যেয়ো না। তাতে আমার বিপদ বাড়বে বই কমবে না।
ঠিক আছে। এবার চলো, থানায় যাই।
দুজনে থানায় গিয়ে পৌঁছলাম। বাইকে তালা দিলাম না।
এখান থেকে কে চুরি করবে আমাদের বাইক? ভিতরে প্রবেশ করে, মেইন ডেস্কের উদ্দেশে এগোলাম। ওখানে বসে অফিসার ওয়া ফোনে কথা বলছিলেন। রিসিভার রেখে তিনি আমাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন কী চাই।
ঢোক গিলে বলতে শুরু করলাম, আমরা একটা রিপোর্ট- হঠাই জিভ জড়িয়ে এল, অফিসারকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে থাকতে দেখে।
মলি এসময় হস্তক্ষেপ করল।
আমরা রিপোর্ট করতে এসেছি- উদ্ভট এক লোক সম্পর্কে।
কপাল ঘষলেন অফিসার।
কেউ তোমাদেরকে বিরক্ত করছে?
কথাটা লুফে নিলাম আমি।
শুধু আমাকে।
কী নাম তার?

বিল হার্ট।
চিনি বলে মনে হচ্ছে না।
শহরে নতুন এসেছে, মলি বলল।
তোমার সাথে কী করছে সে?
মলি বলে উঠল, মুসার হোমওয়র্ক, টেস্ট...
কনুইয়ের গুঁতো দিলাম। অফিসারের চোখজোড়া সরু হয়ে এসেছে। গতিক সুবিধের নয়। আমাকে হুমকি দিচ্ছে।
বাবা-মা কাউকে জানিয়েছ? অভিযোগ করতে হলে বড় কাউকে লাগবে।
ওর বাবা-মা শহরের বাইরে আছেন।
ও। এমুহূর্তে আমি বেশি কিছু করতে পারছি না। তবে মিস্টার হার্ট সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেব। তার ঠিকানা জানো?
খাইছে! এবার আসছে অবিশ্বাসের পালা।
১০০ মেইন স্ট্রীট।
ওই পোড়োবাড়িটায় লোক এসেছে তা হলে। হুম। ঠিক আছে, আমরা চোখ-কান খোলা রাখব। আর হ্যাঁ, তোমরা কিন্তু সাবধানে থাকবে।
মাথা নেড়ে বেরিয়ে এলাম। পুলিশে রিপোর্ট করে মনে একটু সাহস পাচ্ছি। বাইকে চড়তে যাব এসময় ভয়ঙ্কর চিন্তাটা মাথায় এল।
এই, মলি, হার্ট যদি জেনে যায় আমরা এখানে এসেছিলাম? ও তো কীভাবে কীভাবে সবই জেনে ফেলে। খেপে গিয়ে যদি কিছু একটা করে বসে?
তা তো ঠিকই, বলল মলি। আইডিয়া। একটু রিস্কি, তবে কাজ হতে পারে। অন্তত চেষ্টা করে দেখা যায়।
বলো শুনি।
হার্টকে বলো কম্পিউটার কোড কীভাবে পেতে পারে ও।
কেন বলতে যাব?
ওকে বাড়ি থেকে বের করার জন্যে। ভিতরে ঢুকতে পারলে হয়তো ব্লু টু পেতে পারি আমরা। জানা যেতে পারে অনেক কিছু।
কী বলব ওকে?
সোজা। নিজেই একটা কোড বানাবে। পরে যখন ও পেপার সিস্টেমে ঢুকতে না পেরে অভিযোগ করবে, বলে দেবে তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে ঠিক মত কোডটা টুকতে পারনি।
কিন্তু ও তো আমাকে জ্বালাতন করতেই থাকবে।
বলবে, কাগজের লোকটা মহা ব্যস্ত। তাকে বারবার বিরক্ত করলে চাকরি থাকবে না। অথচ চাকরিটা তোমার সাঙ্ঘাতিক দরকার।

দেখা যাক, মলির বুদ্ধি কাজে লাগে কীনা। ব্যর্থ হলে মহা বিপদ হয়ে যেতে পারে।
আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ শুরু হয়ে গেছে। এক ঝোঁপের পিছনে গা ঢাকা দিয়ে বসে রয়েছি মলি আর আমি, হার্টকে দেখছি বাড়ি ছেড়ে বেরোচ্ছে। এখন অবধি বেশ মসৃণভাবেই সব কিছু ঘটে চলেছে। হার্টের সদর দরজার তলা দিয়ে একটা চিরকুট ঢুকিয়ে দিই আমি, বেল টিপে, ও আমাকে দেখতে পাওয়ার আগেই সাইকেলে চেপে হাওয়া হয়ে যাই।
হার্ট দৃষ্টিসীমার আড়াল না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম আমরা। এবার বাড়ির পিছনদিকের উদ্দেশে দৌড় দিলাম। দরজাটার কাছে এসে নবে মোচড় দিলাম। খোলা!
বেআইনীভাবে অন্যের বাড়িতে ঢোকার জন্যে জেল খাটতে হবে না তো? ফিসফিস করে বলল মলি
ভয় পেয়ো না। হার্ট নিজেই তো বেআইনী লোক। নিঃশব্দে প্রবেশ করলাম আমরা।
জঘন্য দশা বাড়িটার ভিতরে। ছাদ থেকে ঝুলছে বড় বড় মাকড়সার জাল। হাতে গোনা যে কয়টা ফার্নিচার রয়েছে, তার উপরে পুরু ধুলোর আস্তরণ। বাতাসে বাসি, দম বন্ধ করা গন্ধ। জানালা খোলা হয়নি যেন বহু বছর। ভাগ্য ভাল, ফ্ল্যাশলাইট সঙ্গে এনেছিলাম। চারদিকে গাঢ় অন্ধকার।
আমরা এখন বাড়ির সামনের দিকে। কোনও সূত্র-টুত্র চোখে পড়েনি। লম্বা এক সার সিঁড়ি উঠে গেছে উপরতলায়। মলির দিকে চাইলাম। উঠব আমরা? মলির সমস্ত দায়-দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছি আমি। ওর বাবা-মা খুবই ভাল ব্যবহার করেছেন আমার সঙ্গে। ওর কিছু হলে নিজেকে ক্ষমা করতে পারব না... শিউরে উঠলাম ভাবনাটা মাথায় আসতেই।
মলি কনুইয়ের গুঁতো দিল আমাকে।
ওটা স্টাডিরুম মনে হচ্ছে।
ও ঠিকই বলেছে। একমাত্র ও জায়গাটাই বুড়ো ব্যবহার করে বলে মনে হলো আমার কাছে। চারধারে বইয়ের তূপ। তাক, বুককেস আর প্রকাণ্ড এক ডেস্কের উপরে বড় বড় মোমবাতি। সম্ভবত এখানেই বেশিরভাগ সময় কাটায় হার্ট।
ডেস্কের কাছে চলে এলাম। মানুষের হৃৎপিণ্ড সংক্রান্ত এক বই উপুড় হয়ে পড়ে আছে। তারমানে আমার সায়েন্স প্রজেক্টে সাহায্য করতে চায় হার্ট। ইতিহাসের উপর ইয়া মোটা এক বইও দেখতে পেলাম। নাহ, বুড়ো খাটছে– আমার জন্য।
খাইছে, এসব কী ভাবছি আমি? ও তো আমাকে বশ করে ওর চামচা বানাতে চায়। আমার উপকারের জন্য তো কিছু করছে না।

কিন্তু আমাকে ও বেছে নিল কেন? উত্তরটা এখন আমি জানি। পড়াশোনায় ফাঁকি দিচ্ছিলাম, নিজেকে ফেলে দিয়েছিলাম ফাঁদে। ফাঁদে পড়া মানুষ স্বাভাবিকভাবেই বেপরোয়া। তাকে দিয়ে সব কিছুই করানো সম্ভব। হ্যাঁ, ঠিক লোককেই বেছে নিয়েছে হার্ট।
মলির কথায় সংবিৎ ফিরে পেলাম।
এটা দেখো! খোলা এক নোটবই দেখাল ও। প্রথম পাতায়, হার্টের প্রাচীন হস্তাক্ষরে লেখা, গ্রীনহিলস শাসনের পরিকল্পনা। ওটা পড়ে মলির চাইতে কম চমকাইনি আমি।
বুড়োর কিছু একটা মতলব আছে জানতাম, কিন্তু তাই বলে তলে তলে। এত?
পাতা উল্টে গেলাম নোটটার। হার্টের উদ্ভট পরিকল্পনা সম্পর্কে একটা ধারণা পাচ্ছি: শহরের একমাত্র খবরের কাগজটার মাধ্যমে নাগরিকদের উপর প্রভাব বিস্তার করবে সে। গোপনে কম্পিউটার ব্যবহার করে, সমস্ত আর্টিকল নিজের ইচ্ছে মত পরিবর্তন করবে, কোনও কোনওটা নতুন করে লিখবে। এভাবে পাঠকদের কাছে বিল হার্টকে উপস্থাপন করবে। এরপর ক্রমেই জোরাল হতে থাকবে তার বক্তব্য। সুযোগমত টিভি আর রেডিও সেন্টারও দখলে নিয়ে আসবে। তার শাসন মেনে নিতে বলা হবে শহরবাসীকে। তার রাজত্বে নাকি। বেকার থাকবে না, অপরাধী থাকবে না, মানুষ সুখে-শান্তিতে বসবাস করবে। ব্যাটা! পাগল আর কাকে বলে! একা একজন মানুষ, এভাবে কেউ কোনওদিন ক্ষমতা বিস্তার করতে পারে?
পড়াশোনা করা ভাল, মুসা। কিন্তু তাই বলে লোকের ব্যক্তিগত নোটবই?
আমি চমকে উঠলাম কেন? হার্টের স্বভাবই তো যখন-তখন উদয় হওয়া। হাত কাঁপছে, খসে পড়ে গেল নোটবইটা।
মলি চেষ্টা করেও আতঙ্কটা চাপা দিতে পারল না।
ব্যক্তিগত? গ্রীনহিলস দখল করে নিয়ে শাসন করতে চান, সেটা ব্যক্তিগত ব্যাপার হলো? বলে উঠল ও।
হ্যাঁ, গলা মেলালাম আমি।
এশহরটা আর সব শহরের চাইতে ভাল। কিন্তু এটাকে আরও ভাল করে গড়ে তোলা যায়। সেটাই চাইছি আমি। এরমধ্যে দোষটা কোথায়? আমার তো কারও ক্ষতি করার ইচ্ছে নেই। আমার অধীনে সবাই সুখে থাকবে, একথা গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি।
হার্টের কথায় প্রায় পটেই গিয়েছিলাম আমি। সত্যি বলতে কী, কথাগুলো শুনতে কিন্তু খারাপ নয়।
মলি আমার মনের কথা পড়ে ফেলল।

তার বিনিময়ে কী দিতে হবে শহরের বাসিন্দাদেরকে?
বেশি কিছু না, শুধু আমার শাসন নিঃশর্তে মেনে নিতে হবে। এবার আমার উদ্দেশে ঘুরে দাঁড়াল ও। আমি কিন্তু তোমার আচরণে দুঃখ পেয়েছি, মুসা। তোমাকে বেছে নিয়েছিলাম আমাকে সাহায্য করার জন্যে। অথচ তুমি কিনা আমার প্ল্যান বানচাল করতে চাইছ! আমার এখন তোমাকে শেষ না করে উপায় নেই। এবং তোমার বান্ধবীকেও।
হাত দুলিয়ে একটা আলোকিত মোমবাতি হাজির করল হার্ট। আমার ভীতি এখন বাস্তবে পরিণত হতে চলেছে। মলির দিকে চাইলাম। দুচোখে অশ্রু টলমল করছে ওর।
ওকে যেতে দিন। ও আপনার কোনও ক্ষতি করবে না। আমাকে নিয়ে যা ইচ্ছে হয় করুন। শুধু ওকে ছেড়ে দিন, প্লিজ। অনুনয় করে বললাম।
তোমার মনোভাবের প্রশংসা করতেই হয়। আমি রীতিমত মুগ্ধ। মলির দিকে চাইল পাগলা বুড়ো। আহারে, বেচারীর একদম কাঁচা বয়স। কিন্তু কী করব বলো, ও যে অনেক বেশি জেনে গেছে। মুখের চেহারা কঠোর হলো তার। এসো আমার সঙ্গে।
আমাদেরকে ঠেলা-ধাক্কা দিয়ে নেমে যেতে লাগল সরু এক সার সিঁড়ি ভেঙে। মলির হাত ধরলাম আমি। এর বেশি আর কীই বা করার আছে। আমার।
হঠাৎই রাগ উঠে গেল। কোথায় পালাল ভয়-ভীতি! আমাদেরকে শাস্তি দেওয়ার কে এই উন্মাদ বুড়োটা? নিজেকে কী মনে করে ও?
রাগের মাথায় কষে ফ্ল্যাশলাইটের বাড়ি মেরে বসলাম বুড়োর মাথায়। কিন্তু কোনও প্রতিক্রিয়া হলো না, সম্ভবত বুড়ো কিছু অনুভবই করেনি। অবিশ্বাস্য! জাদুকররা কি মানুষ নয়? যাকগে, হয়তো এ-ই ভাল হলো। ক্রুদ্ধ বুড়ো পাল্টা কী ব্যবস্থা নিত কে জানে, বাবা।
আমাদেরকে সেলারে নামিয়ে নিয়ে এল ও। আলকাতরা অন্ধকার। মলি মেঝেতে বসবে না কিছুতেই, বুড়োকে বলল চেয়ার এনে দিতে। আঙুল মটকাল বুড়ো, আর চোখের পলকে এসে গেল দুটো চেয়ার।
আমাদেরকে নিয়ে কী করবেন আপনি? প্রশ্ন করলাম। আগেভাগে জেনে রাখা ভাল। প্রস্তুত থাকতে পারব।
চমৎকার প্রশ্ন, তবে এখন জবাবটা দেওয়া যাচ্ছে না। এখনও ঠিক করে উঠতে পারিনি কিনা। ভাবছিলাম তোমাদের দুজনকে জিম্মি করব। তোমাদের বিনিময়ে শহরের ক্ষমতা হাতবদল করতে নিশ্চয়ই অরাজি হবে না ওরা?
যাক, মেরে ফেলার চিন্তা অন্তত করছে না বুড়ো। হাতে সময় যত বেশি পাওয়া যাবে, পালানোর সুযোগও তত বেশি।

কিন্তু আপনি কি এভাবে ক্ষমতা দখল করতে পারবেন? দেশে আইন আছে, পুলিশ আছে…
থাকুক, আমি একদিনের জন্যে হলেও ক্ষমতা চাই, উন্মাদের মত বলল বুড়ো।
কার পাল্লায় পড়েছি আমরা! মনে মনে বললাম।
কোনও কিছুর দরকার হলে চেঁচিয়ো। তবে কেউ উদ্ধার করতে আসবে এই আশা কোরো না। খলখল করে হেসে সিঁড়ি ভেঙে উঠতে লাগল হার্ট।
সব দোষ আমার, মুসা। আমি দুখিত, বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলল মলি।
না, দোষ হার্টের। ও একটা শয়তান জাদুকর, ক্ষমতার মোহে অন্ধ। অ্যাই, মন খারাপ কোরো না। আমাদের বাবা-মা নিশ্চয়ই বসে থাকবে না, শীঘ্রি খোঁজাখুঁজি শুরু করবে। পুলিশে খবর দেবে। অফিসার ওয়া নিশ্চয়ই হাত গুটিয়ে বসে থাকবেন না। তারা হয়তো ইতিমধ্যে বুড়োর ব্যাপারে খোঁজ-খবর নেয়া শুরু করে দিয়েছেন।
এর মধ্যে অনেক হয়তো আছে।
না হয় ভাল দিকটাই দেখো। তোমার রিপোর্টের কাজে আসবে এমন অনেক কিছুই পেয়ে গেছ তুমি।
আমি এখন আর ও নিয়ে মোটেই ভাবছি না।
ভাবা উচিত।
ঠাট্টা করছ? আমরা মস্ত বিপদে পড়েছি, মুসা।
আচ্ছা, তুমি তো রিপোর্ট তৈরির জন্যে অনেক পড়াশোনা করেছ। পাগল জাদুকরকে খুন করার মত কিছু কি পেয়েছ?
এক মুহূর্ত ভেবে নিল মলি।
না। তবে একটা সিনেমার কথা মনে পড়ছে। একটা ডাইনীর গায়ে এক বালতি পানি ছুঁড়ে দেয়ার পর সে কুঁচকাতে কুঁচকাতে অদৃশ্য হয়ে যায়। ওতে কাজ হতে পারে।
গতরাতের কথা মনে পড়ল। হার্ট তখন আমার জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে। ঝড় শুরু হওয়ার পর ও চলে যায়।
এত সোজা না-ও হতে পারে, তবে চেষ্টা করে দেখা যায়।
সোজা কোথায়? এখানে পানি আছে কিনা সন্দেহ।
ফ্ল্যাশলাইট জ্বালোম। উঠে দাঁড়িয়ে পা টিপে টিপে হাঁটতে লাগলাম ঘরময়। দুঃস্বপ্নে দেখা কারাগারে আটকা পড়েছি যেন।
ঘুরে দাঁড়ালাম বো করে।
কারা যেন ডাকল আমার নাম ধরে। কান পাতলাম। হ্যাঁ! অবিশ্বাস্য! ওরা এসে পড়েছে আমার প্রিয় দুই বন্ধু। আমাদেরকে খুঁজে পেয়েছে!

আমরা নীচে আছি, কিশোর, রবিন! সেলারে! চেঁচালাম আমি। এখন আর ভয় করে লাভ কী? আমাদের জীবন হুমকির মুখে। শুধু কি তাই? গোটা শহরের উপর চরম বিপদ নেমে আসতে পারে।
কিশোরের কণ্ঠস্বর কাছিয়ে এল।
আমি জানি তুমি কোথায়। সাহস রাখো। আমরা তোমাকে ঠিক বের করে আনব।
অদ্ভুত কাণ্ড- কিশোর আর রবিন কোত্থেকে চলে এল! আমি তো স্বপ্নেও এমনটা ভাবিনি!
মলি ওদেরকে চেনে। আমাদের ড্রাইভওয়েতে পরিচয় হয়েছিল।
গোয়েন্দাপ্রধান কিশোর আর নথি বিশেষজ্ঞ রবিন। একসঙ্গে বহুবার বিপদে পড়েছি, আবার উদ্ধারও পেয়েছি। আমাদেরকে এই বিপদ থেকে রক্ষা কেউ যদি করতে পারে তো ওরাই পারবে।
মলি আর আমি অপেক্ষা করছি। মনে হচ্ছে কয়েক যুগ পেরিয়ে গেল বুঝি। এসময় খুলে গেল সেলারের দরজা। হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে এল প্রায়, যখন দেখলাম কিশোর আর রবিনকে ঠেলে সিঁড়ি দিয়ে নামাচ্ছে পাগলা
ওদের ভাব-ভঙ্গি দেখে মনে হলো, হর-হামেশাই বুঝি ওরা পাগল জাদুকরের কবলে পড়ে। কিশোরের হাতে কমলার রসের গেলাস। একটুখানি চলকে পড়ল।
তোমাদের সঙ্গী জুটেছে, বলল হার্ট। ব্যাপারটা রীতিমত উপভোগ করছে সে। এদের দুজনকে আমার উঠানে ঘেঁক-ছোঁক করতে দেখে ধরে এনেছি। (হাতের কাছে কিছু পেলে ঠিক ছুঁড়ে মারতাম। তুই, ব্যাটা, উড়ে এসে জুড়ে বসেছিস। তোর উঠান কবে থেকে হলো?
এটাকে নিজের বাড়ি মনে কোরো, বাছারা। হাতে অনেক কাজ, নইলে তোমাদের সাথে বসে খানিক গল্প করা যেত। তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল ও। বুড়ো দূর হওয়ায় ভীষণ খুশি হলাম আমি।
আমার আর মলির দিকে চেয়ে হাসল কিশোর আর রবিন। যে পরিস্থিতিতেই হোক, ওদেরকে দেখতে পাওয়াটা দারুণ ব্যাপার।
তুমি ঠিকই বলেছিলে, আমার উদ্দেশে বলল কিশোর। বুড়ো আস্ত পাগল একটা!
ও অবিকল হার্টের নকল করে দেখালে হেসে উঠলাম সবাই। এবার বন্ধুদের সঙ্গে হাত মিলালাম।
আমার তো বিশ্বাসই হচ্ছে না। তোমরা এখানে কী করছ? জিজ্ঞেস করলাম।
একই প্রশ্ন তো আমাদেরও। আজ সকালে ফিরে এসেছি আমরা। তোমার বাসায় ফোন করলাম, কেউ ধরল না। তখন আমরা ছুটে গেলাম তোমার ওখানে। গিয়ে দেখি আঙ্কল-আন্টি মাত্র ফিরেছেন। তাঁরা বললেন তুমি মলদের বাসায়। গেলাম

সেখানে। মলির মা জানালেন তোমরা বাইক নিয়ে বেরিয়েছ। খানিকটা চিন্তিত মনে হলো তাঁকে, বলল কিশোর।
তারপর দুইয়ে-দুইয়ে চার মিলিয়ে এখানে চলে এসেছে ওরা।
এখন প্রথম কাজ হচ্ছে, এখান থেকে পালানো। কোনও আইডিয়া? প্রশ্ন করলাম।
আমরা সংখ্যায় বেশি। এটাকে কাজে লাগাতে হবে, বলল রবিন।
ওর ক্ষমতা আরও বেশি। ভুলে যেয়ো না, ও জাদুকর, তা ছাড়া বদ্ধ উন্মাদ, বলল মলি।
ওই বিশ্রী জানালাটা ভেঙে ফেলি এসো, প্রস্তাব করলাম আমি। ফ্ল্যাশলাইট দিয়ে কাজটা করা যেতে পারে।
শব্দ হবে। ট্র্যাপ ডোর আছে কিনা খুঁজে দেখি বরং, বলল কিশোর। হয়তো আছে, হার্ট জানে না।
পরমুহূর্তে তল্লাশী শুরু করলাম আমরা। লজ্জিত বোধ করছি আমি। আমার জন্যই সবাই মিলে এখন বিপদের মধ্যে পড়েছে। কী দরকার ছিল আমার ওদেরকে হার্টের কথা জানাতে যাওয়ার? বুড়োর সঙ্গে বোঝাপড়া যা করার আমিই না হয় করতাম। যাকগে, যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে। এখন আমার দায়িত্ব, বন্ধুদেরকে নিয়ে এখান থেকে নিরাপদে বেরিয়ে যাওয়া।
বুড়ো কিশোর আর রবিনকে এখানে নামানোর পর সেলারের দরজা লাগিয়েছিল? ওকে একটু অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল। শ্বাস চেপে রেখে, সন্তর্পণে সিঁড়ির মাথায় উঠে এলাম। দরজার নব ঘোরালাম। বন্ধ, তবে কজাগুলোকে ততটা শক্ত মনে হলো না। হয়তো আলগা করা যাবে।
শব্দ হতে পারে, এই ভয়ে সিঁড়ি ভেঙে নামতে চাইলাম না। তার বদলে, বন্ধুদেরকে ফিসফিসিয়ে বললাম, বল্ট খোলার মত কিছু একটা পায় কিনা খুঁজে দেখতে। খুঁজল ওরা, কিন্তু তেমন কিছু পাওয়া গেল না।
এ দিকে রবিনের চোখে পড়েছে, ফাটা এক পাইপ বেয়ে টপ-টপ করে পানি ঝরছে।
পানিটা ধরে রাখা দরকার, বলল ও। হয়তো খাওয়া যাবে না, কিন্তু অন্য কাজে লাগতে পারে।
একটা ভাঙাচোরা বালতি খুঁজে পেয়ে মলির হাতে দিলাম।
পানি থিয়োরি প্রয়োগ করে দেখা যাক, কাজ হয় কী না, নেমে এসে বললাম ঠাট্টা করে।
পাইপের নীচে বালতিটা রাখল মলি। টিনের উপর পানি পড়ার শব্দ জোরাল হয়ে উঠলে, একটা ছেঁড়া কম্বল দিয়ে বালতির তলা মুড়ে দিল। শব্দ থামলেও পানি জমতে এখন সময় নেবে। কেননা, কম্বল শুষে নিচ্ছে পানি। কিন্তু মলির বিষণ্ন

মুখের চেহারা আমাকে বিচলিত করে তুলল। ও কী ভাবছে। বুঝতে বেগ পেতে হলো না। আমরা কি আদৌ কোনওদিন বেরোতে পারব এখান থেকে?
চরম হতাশায় কাঠের এক বীমে কষে লাথি ঝাড়লাম আমি। জিনিসটা এতটাই প্রাচীন, গোটা বাড়ি কেঁপে উঠল থরথর করে। খাইছে! একটু পরেই দেখি হন্তদন্ত হয়ে হার্ট এসে হাজির। খেপে আগুন।
তোমরা কিন্তু বেশি বাড়াবাড়ি করছ। তোমাদের সাথে ভাল ব্যবহার করার এই ফল?
ভাল ব্যবহার-? জীবনে এত অবাক হইনি আমি। রেগে গিয়েছি। ভীষণ।
এখন আর মাফ চেয়ে কাজ হবে না, বাধা দিয়ে বলল হার্ট। আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। আমার উদ্দেশে চোখ টিপল বুড়ো।
খাইছে! বুঝে গেছি এরপর কী ঘটতে চলেছে। হাত দোলাল ও, পরমুহূর্তে হাতে এসে গেল লম্বা এক দড়ি। এবার তর্জনী উল্টে, বাংলা ছবির ভিলেনের মত কাছে ডাকল মলিকে। বেচারী ভয়ে আধমরা। আমার পিছনে আড়াল নিল।
আমি আগেও বলেছি, হার্ট। ওকে ছেড়ে দিন।
কেন বুঝতে পারছ না, আমি চাইলে অনেক আগেই তোমাদের ক্ষতি করতে পারতাম। এই খাম্বার সাথে তোমাদের বেঁধে রাখব। তোমাদের ভালর জন্যই। তা হলে আর কোনও বিপদ-আপদ হবে না তোমাদের। দুপা এগিয়ে হাত বাড়িয়ে দিল মলির উদ্দেশে। এসো, বাছা।
কিশোর কাছিয়ে এসেছে আমার দিকে। এক হাতে তখনও কমলার রস শক্ত করে ধরা, অপর হাত বাড়াল আমার কাছ থেকে ফ্ল্যাশলাইটটা নেওয়ার জন্য। বুঝলাম, বুড়োর মাথায় বাড়ি মারতে চায়। কিন্তু ওতে যে কাজ হবে না মুখ ফুটে বলতে পারলাম না।
তার বদলে আরও শক্ত করে ধরে থাকলাম ফ্ল্যাশলাইটটা। ও ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে ওটা কেড়ে নিতে চেষ্টা করল। তার ফল হলো এই, বুড়ো। হার্টের সারা শরীরে চলকে পড়ল কিশোরের কমলার রস।
নড়বারও সাহস পেলাম না আমরা। তীব্র প্রতিক্রিয়া হবে আশঙ্কা করেছিলাম, ভাবিনি অমন তীক্ষ্ণ চিৎকার শুনতে পাব।
হার্ট বুড়ো গর্জাচ্ছে আর যন্ত্রণায় ছটফট করছে।
বাঁচাও, কোনমতে আওড়াতে পারল। আমার চামড়া পুড়ে যাচ্ছে আ-গু-নে।
আগুনের শিখা নেই, কিন্তু মৃদু ফট-ফট শব্দ শুনতে পাচ্ছি। নাকে এল মাংস পোড়া গন্ধ।
এবার আমাদের চোখের সামনে, ধীরে ধীরে সঙ্কুচিত হতে শুরু করল খেপা জাদুকর। খাইছে!

অ্যাসিড! আর্তনাদ ছাড়ল। অ্যাসিডে আমার মাংস পুড়িয়ে দিচ্ছে!
দৃশ্যটা ভয়ঙ্কর। আমরা চারজন নির্বাক দাঁড়িয়ে দেখছি। এক চুল নড়ার সাধ্য নেই।
শেষমেশ কিশোর খালি গেলাসটার লেবেল পরীক্ষা করে দেখল।
কমলার রসে অ্যাসকরবিক অ্যাসিড আছে। হার্টের শরীরটা সাধারণ মানুষের মত ছিল না। যে কারণে পুড়ে গেছে কমলার রসে, ব্যাখ্যা দিল।
দীর্ঘশ্বাস ফেলল রবিন।
আর কিছু ঘটার আগেই এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া দরকার। জানালাটা কোথায়?
নোংরা জানালাটার নীচে পড়ে থাকা জিনিসপত্র সরালাম আমরা। জাদুবলে হাজির করা হার্টের চেয়ার দুটো টেনে আনতে চাইলাম। কিন্তু ও দুটো এমনভাবে কাঁপতে লাগল, এবড়োখেবড়ো জমির উপর দিয়ে হিঁচড়ে নেওয়া হচ্ছে যেন।
মেঝের উপর আলো ফেললাম ফ্ল্যাশলাইটের। লক্ষ করলাম, চেয়ার দুটো দাঁড়িয়ে প্রাচীন এক কবর ফলকের উপর।
ওটার পাশে বসে পড়লাম হাঁটু গেড়ে। দেখতে পেলাম এ্যানিটে লেখা রয়েছে: এখানে ঘুমন্ত বিল হার্টের অনন্ত আত্মা। কোনও তারিখ নেই, নেই কোনও প্রিয়জনের ভালবাসার বাণী।
হার্ট কি জাদুকর ছিল? ওকি এখানে বাস করত? নাকি ও অন্য কোনও বিল হার্টের বংশধর? নাকি ও এই মৃত ব্যক্তির নাম নিয়েছিল বিশেষ কোনও কারণে? এসব প্রশ্নের জবাব জানা যাবে না আর কোনওদিনই।
রবিন আর মলি একটা চেয়ার শক্ত করে ধরে থাকল, আর কিশোর খুঁজে নিল জানালাটার ছিটকিনি।
অবাক কাণ্ড, ছিটকিনি খোলাই ছিল। অব্যবহৃত পড়ে থাকায় এঁটে গিয়েছিল। খানিক চেষ্টা-চরিত্র করার পর অবশেষে খোলা গেল।
মলি বেরোল সবার আগে। তারপর রবিন আর কিশোর। আমার পালা এলে, হার্ট শেষ বার যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানে হেঁটে গেলাম- তন্নতন্ন। করে খুঁজে দেখলাম ওর দেহাবশেষ পাওয়া যায় কিনা। কিন্তু কিছু নেই। কিছুই না।
কে বলবে জলজ্যান্ত এক অস্তিত্ব এই খানিক আগেও এখানে দাঁড়িয়ে হম্বিতম্বি করছিল?
হয়তো হার্টের মত অপার্থিব আত্মার মৃত্যু নেই। হয়তো অন্য ধরনের কোন জীবনে আবারও জন্ম নেবে সে।
এত কিছুর পরেও, ওর সঙ্গে দেখা হয়েছে বলে মোটেও দুঃখিত নই আমি। ও আমাকে সচেতন করে তুলেছে অন্য এক ভুবন সম্পর্কে।

ও কি সত্যি সত্যি আমাদের ক্ষতি করত?
আমি জানি না। শুধু এটুকু জানি, ও নিজের মত করে শাসন করতে চেয়েছিল গ্রীনহিলসের মত ছোট্ট এক শহর। জায়গাটা সুন্দর, এখানকার বাসিন্দারাও ভাল।
হার্টের উদ্দেশ্য হয়তো ভাল ছিল, কিন্তু যে পন্থা ও নিয়েছিল সেটা ঠিক ছিল না।
ভুল তো মানুষও করে, তাই না?
হার্ট হয়তো শহরসুদ্ধ মানুষের মনোযোগ আর শ্রদ্ধা আশা করেছিল। এরকম মানুষ কি দুনিয়াতে নেই? আছে, অগুনতি। পিছু ফিরে চাইলে, উপলব্ধি করি ও আমার উপর অতটা খেপে গিয়েছিল কেন।
আমি আসলে ওর স্বপ্ন ভেঙে খানখান করে দিয়েছিলাম। আমাকে পাশে চেয়েছিল ও। কিন্তু আমি করেছি শত্রুতা।
হার্টের একটা কথা বিশেষভাবে মনে রেখেছি আমি। ও বলত, জ্ঞানই শক্তি।
ওর কাছে শক্তিটাই ছিল মূলমন্ত্র। তবে ওর কথার আরেকটা অর্থও আছে। ও আমাকে বোঝাতে চেয়েছিল, শিক্ষাকে গুরুত্ব দিতে হয় শিক্ষা মানুষের জীবনে অত্যন্ত জরুরী এক বিষয়।
আমার সাবেক প্রতিপক্ষকে সম্মান জানাতে গিয়ে এখন পড়াশোনায় মন দিয়েছি আমি। সাধ্যমত চেষ্টা করছি শিক্ষকদের খুশি করতে।
আমি, মুসা আমান, এখনও দুনিয়ার সেরা ছাত্র নই। কিন্তু খেপা জাদুকরকে ধন্যবাদ, আমি এখন ছাত্র হিসেবে আগের চাইতে অনেকই ভাল।

ভলিউম ৯০ – সাগরে শঙ্কা – তিন গোয়েন্দা – শামসুদ্দীন নওয়াব – সেবা প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ: ২০০৫

তুমি শিওর, গলাটা আঙ্কেল ডিকের? ভুরুজোড়া কুঁচকে জিজ্ঞেস করল মুসা।

না, জবাব দিল কিশোর। শিওর না। বলছি তো, মুখে রুমাল চেপে রেখেছিল লোকটা। ভালো করে বুঝে ওঠার আগেই, ওই কটা কথা বলে কেটে দিল লাইন।

আশ্চর্য! বলল জিনা।

সত্যি, খুবই রহস্যময় ব্যাপার! মন্তব্য করল রবিন। ঠিক কখন? বাসার, না সরাসরি হেডকোয়ার্টারের ফোনে?

এই তো, সন্ধের একটু আগে। ইয়ার্ডে ছিলাম। ওঅর্কশপের লাল বাতিটা জ্বলছে-নিভছে দেখে দৌড়ে এসে রিসিভার তুলতেই শুধু বলল, সহজ তিন দিয়ে আসব। রাত নয়টা। হেড-কোয়ার্টারে সবাই হাজির থাকবে। জরুরি!

তুমি কিছুই বলার সুযোগ পাওনি?

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম: কে বলছেন? কিন্তু কোনও উত্তর না দিয়ে রেখে দিল রিসিভার। তখন তোমাদেরকে খবর দিলাম।

শুঁটকি টেরির শয়তানি না তো?

নাহ! এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল কিশোর। বড় মানুষ।

তোমার কি মনে হয় সত্যি-সত্যিই কোনও বিপদে পড়েছেন আঙ্কেল? আবার জানতে চাইল মুসা।

আমার সেই রকমই ধারণা, বলল কিশোর। গত ছয়টা মাস একবারও যোগাযোগ করেননি, একটা টেলিফোনও না। এমন তো সাধারণত হয় না। শেষবার একটু আভাস পেয়েছিলাম, ভয়ঙ্কর একটা দস্যুদলের পিছনে লেগে বিপদে আছেন। উল্টে তারাই নাকি ধাওয়া শুরু করেছিল তাকে। কিন্তু এর বেশি আর কিছু জানাতে রাজি হলেন না।

মনে হচ্ছে আঙ্কেল ডিকই, বলল রবিন। উনি ছাড়া আমাদের সহজ তিনের কথা আর কেউ জানবে কী করে?

ভাগ্যিস আমাদের প্রোগ্রামটাবাতিল হয়ে গেছে, বলল জিনা। নইলে আজ এসে কাউকে পেতেন না আঙ্কেল ডিক।

বিখ্যাত পক্ষিবিশারদ ডক্টর জন গার্ডনারের সঙ্গে এবারের ছুটিতে প্রশান্ত মহাসাগরের চ্যানেল আয়ল্যান্ডস ন্যাশনাল পার্কে এক্সকারশনে যাওয়ার কথা। ছিল ওদের। জিনার বাবা ডক্টর জোনাথন পারকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। ওরা সোৎসাহে ক্যামেরা-বিনকিউলার সব ঝেড়ে-মুছে নিয়ে গুছিয়ে ফেলেছিল

ব্যাগ। কিন্তু আজ সকালে খবর পাওয়া গেল ভণ্ডুল হয়ে গেছে সে-প্রোগ্রাম। ডক্টর গার্ডনার গতকাল সন্ধ্যায় গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করে এখন হাসপাতালে।
অপেক্ষার প্রহর আর কাটতে চায় না।
পেরিস্কোপটা তাক করে রেখেছে মুসা গেটের দিকে, মাঝে মাঝেই উঠে গিয়ে দেখে আসছে ওদের সবার প্রিয় আঙ্কেল ডিক এলেন কি না। নটা বাজার ঠিক একমিনিট যখন বাকি, হাঁসফাঁস আওয়াজ পেল সবাই। না, সহজ তিনের দিকটায় না; দুই সুড়ঙ্গের মুখে।
চমকে সবাই ফিরল দুই সুড়ঙ্গের দিকে। গ্যালভানাইযড পাইপের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল চাপদাড়ি আর ইয়া বড় বাবরি চুলওয়ালা তাগড়া এক লোক।
লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল ওরা সবাই।
ছিহ্! আঙ্কেল ডিকের গলায় কথা বলে উঠল ষণ্ডা লোকটা। হামাগুড়ি দিতে দিতে কনুই দুটো গেছে আমার! মাঝখানে এসে তো মনে হচ্ছিল দম আটকে মারাই যাব বুঝি! সবার মুখের দিকে চেয়ে ওদের হতভম্ব ভাব দেখে বলল, এ-রকম হাঁ করে রইলে কেন সবাই? ও, আমাকে চেনা যাচ্ছে না বুঝি?
মাথার চুল ধরে টান দিতেই বেরিয়ে পড়ল বিরাট একখানা চকচকে টাক। দাড়িতে টান পড়তে খসে এল সেটাও। তারপর একটা হাত চলে গেল গলার কাছে-চড়চড় করে উঠে এল পাতলা রাবারের মুখোশ। একগাল হাসলেন। ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর ডিক কার্টার।
কী ব্যাপার, আঙ্কেল? একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল। কিশোর। এ-রকম লুকোচুরি কীজন্যে?
বসের হুকুম, বললেন ডিক কার্টার। তোমাকে বোধহয় বলেছিলাম, একদল দুষ্কৃতকারীর পেছনে কাজ করছিলাম। অত্যন্ত শক্তিশালী, ভয়ঙ্কর একটা দল। কী করে যেন টের পেয়ে গিয়ে এখন ওরাই আমার পেছনে ধাওয়া করতে লেগেছে। সমস্ত তথ্য-প্রমাণ কেড়ে নিয়ে স্রেফ খুন করে ফেলতে চায়। আমাকে হারিয়ে যেতে বলা হয়েছে, গায়েব হয়ে যেতে বলা হয়েছে পৃথিবীর বুক থেকে। তাই যাব, তবে যাওয়ার আগে তোমাদের চারজনের কাছে চারটে জিনিস দিয়ে যাব। এগুলো যত্ন করে লুকিয়ে রাখতে হবে। আমি যদি আগামী ছয় মাসের মধ্যে ফেরত না নিই তা হলে কাউকে কিছু না বলে সব নষ্ট করে। ফেলতে হবে। পারবে?
খুবই সহজ কাজ, বলল কিশোর। আপনি নিজে কোথায় লুকাবেন বলে। ভাবছেন? দেশেই, না কি বাইরে কোথাও?
এখনও ঠিক করিনি। ভাবছি...।
এক কাজ করেন না, হঠাৎ করে বলে উঠল রবিন, চ্যানেল আয়ল্যান্ডস ন্যাশনাল পার্কে গিয়ে ক্যাম্প করলেই পারেন-ওখানে কেউ খুঁজে পাবে না আপনাকে।

একদম বিরান এলাকা। আমাদেরও যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু ডক্টর গার্ডনার হঠাৎ গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করে এখন হাসপাতালে। যেন হঠাৎ মাথায় খেলেছে কথাটা, এমনি ভঙ্গিতে বলে উঠল, আরে! আপনিই তো অরনিথলজিস্টের ভান করতে পারেন। পারেন না? যেন এক্সকারশনে নিয়ে যাচ্ছেন কয়েকজন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীকে?

আঙ্কেল! মুসার কণ্ঠের জরুরি ভাব খট করে কানে লাগল সবার। কে একজন চোরের মত ঢুকছে গেট দিয়ে। দেখেন তো চিনতে পারেন কি না।

চট করে পেরিস্কোপের কাছে চলে গেলেন ডিক কার্টার। এক নজর দেখেই দম আটকে ফেললেন। কিছুক্ষণ দেখবার পর চাপা গলায় বললেন, বাব্বা! এখান পর্যন্ত পৌঁছে গেছে!

আরেক রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে ধরব ব্যাটাকে?

মুসার কাঁধে হাত রাখলেন আঙ্কেল। নাহ্, আমি বরং যাই। তোমাদের কাছে কিছু রাখা তো দেখছি এখন আর নিরাপদ নয়। তোমাদের জন্যেই বিপজ্জনক।

এক মিনিট, আঙ্কেল! ডিক কার্টার সত্যিই চলে যেতে উদ্যত দেখে কিশোর বলল, আমাদের এই মোবাইল হোমে আপনি সম্পূর্ণ নিরাপদ। ইচ্ছে করলেই আমরা ঢোকার সব পথ বন্ধ করে দিতে পারি। এখুনি তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে না গিয়ে শান্ত হয়ে বসেন। ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করলে একটা বুদ্ধি বেরিয়ে যাবেই। কথাগুলো বলে চারটে সুইচ অফ করে দিল কিশোর, নিঃশব্দে বন্ধ হয়ে গেল মোবাইল হোমে ঢুকবার বা বেরোবার সব পথ।

প্রথমে শোনা যাক, খাওয়া হয়েছে আপনার? যেহেতু প্রশ্নটা মুসার, খাওয়ার কথাটা প্রথমে তো আসবেই।

একদম ভরপেট, মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন ডিক।

আমরাও খেয়ে নিয়েছি। কাজেই কারও কোনও তাড়া নেই, বলল মুসা। তা হলে এবার শোনা যাক, রবিনের প্ল্যানটা কেমন লাগল আপনার।

চুপচাপ কিছুক্ষণ ভাবলেন ডিক কার্টার। তার কারণে ছেলে-মেয়েদের কোনও ক্ষতি বা বিপদ হতে দেবেন না তিনি কিছুতেই। কিন্তু চিন্তা করে রবিনের প্রস্তাবে কোন খুঁতও বের করতে পারলেন না। ঠিকই তো, একজন অরনিথলজিস্ট বা ন্যাচারালিস্ট তো ছাত্র নিয়ে এক্সকারশনে যেতেই পারেন। আর ওরকম নিরিবিলি জায়গায় তাকে খুঁজতে যাবে না কোনও দুবৃত্ত।

মোটামুটি খারাপ লাগছে না, মুচকি হেসে বললেন তিনি। তবে তোমাদের গার্জেনদের কাছে কেমন লাগবে তা তারাই বলতে পারবেন। তারা অনুমতি দিলে…

ধরে নিন, অনুমতি পেয়ে গেছি। তা হলে?

তা হলে আর কী, কাল সকাল দশটায় বেরোবে তোমরা নিজ নিজ বাড়ি থেকে। সাড়ে দশটায় পৌঁছবে বাস স্টেশনে। টিকেট কাটবে ভেনচুরার। ওখানেই রেল স্টেশনে দেখা করব আমি তোমাদের সঙ্গে। অবশ্যই ভিন্ন নাম ও ভিন্ন চেহারায়। নাম-ধরো, প্রকৃতিবিজ্ঞানী ডক্টর ওয়ালটার। কার্পিনটেরিয়ায় পৌঁছব আমরা ট্রেনে।
তারপর?
তারপর ভেসে পড়ব বোট নিয়ে।
খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল সবার চেহারা। চারটে ছোট ছোট প্যাকেট বের করলেন আঙ্কেল পকেট থেকে। প্রত্যেকের হাতে একটা করে দিয়ে বললেন, তোমাদের যার যার বাসায় লুকিয়ে রাখবে এগুলো। গুরুত্বপূর্ণ কাগজ। আমি চললাম এখন। আমি বেরিয়ে যাওয়ার দশমিনিট পর তোমরাও একজন। একজন করে এখান থেকে বেরিয়ে বাড়ি চলে যাবে। ঠিক আছে?
এবার পকেট থেকে মিশকালো একটা পাতলা রাবারের মুখোশ বের করে পরে ফেললেন ডিক কার্টার। হাতে কালো গ্লাভস পরে নিয়ে সাদা একটা মাঙ্কিক্যাপ চাপালেন মাথায়। এখন দেখে কারও সাধ্য নেই যে বলে এই লোক। খাস নাইজেরিয়ান নিগ্রো নয়।
পেরিস্কোপে চোখ রাখো, বললেন তিনি কিশোরকে। যদি দেখ আমাকে কেউ অনুসরণ করছে, তা হলে বাইরের সিকিউরিটি লাইটটা একবার নিভিয়েই জ্বেলে দেবে।
আপনি তখন ওর ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বেন? জিজ্ঞেস করল জিনা।
না। আমার লোকেরা লাফিয়ে পড়বে। ধরে নিয়ে গিয়ে আটকে রাখবে অন্তত একমাস। আর এই ছদ্মবেশে যদি ওকে ফাঁকি দিতে পারি তা হলে তো কেটেই পড়লাম নির্বিঘ্নে।

.

রাতে হাজার হাজার পাখির স্বপ্ন দেখল রবিন, ছবির পর ছবি তুলছে ও। কিশোর স্বপ্ন দেখল, ট্রেন থেকে নামতে পারছে না, কোন স্টেশনে যে নামতে হবে ভুলে গেছে বেমালুম। মুসা দেখল, ওর প্রাণপ্রিয় কিকোকে কেড়ে নিতে চায় ট্রেযার আয়ল্যান্ডের খোঁড়া জলদস্যু লং জন সিলভার। আর জিনা দেখল, হঠাৎ বেঁকে বসেছে ওর বদরাগী বাবা, চ্যানেল আইল্যান্ডসে যেতে দেবে না।
সকাল ঠিক সাড়ে দশটায় পৌঁছে গেল ওরা বাস স্টেশনে। ঠিক সময় মতই ছাড়ল বাস, ভেনচুরায় পৌঁছে গেল সময় মতই। তারপর রেল স্টেশনে গিয়ে অপেক্ষা। ট্রেন আসে, যায় কিন্তু আঙ্কেলের দেখা নেই। এর-ওর মুখের দিকে তাকিয়ে

বুঝবার চেষ্টা করে ইনিই ছদ্মবেশী আঙ্কেল কি না। হয় তারা লক্ষই করে না, নয়তো ওদের দিকে মুচকি হেসে মাথা ঝাঁকিয়ে চলে যায় আর এক দিকে।
দূরো! বিরক্তি প্রকাশ করল মুসার তোতাপাখি কিকো।
শঙ্কিত হয়ে উঠছে ওরা ক্রমে। কোনও বিপদ-আপদ হলো না তো। আঙ্কেলের? ধরা পড়ে গেল শত্রুপক্ষের হাতে?
ইয়া মোটা এক লোক হাসিমুখে এগিয়ে এল ওদের দিকে। ওদের ব্যাগ ব্যাগেজ, গগলস-ক্যামেরা-বিনকিউলার দেখে সবাই বুঝতে পারছে ওরা কোথাও এক্সকারশনে চলেছে, কিন্তু এই লোক পারছে না। গায়ে পড়ে আলাপ জুড়ল। কোথায় চলেছে, সাগরে না পাহাড়ে, কোন দিকে, কতদিনের জন্য, বড় কাউকে সঙ্গে দেখা যাচ্ছে না কেন–সব কিছুই তার জানা চাই। রবিন কাটা কাটা জবাব দেওয়ায় ফিরল মুসার দিকে।
পড়ো তো, খোকা। বলো, বিএটি ব্যাট, সিএটি ক্যাট… নরম গলায় বলল কিকো।
আরে! দারুণ পাখি তো! সব কটা দাঁত বেরিয়ে পড়ল মোটা লোকটার।
ইয়াহ! দ্যাস রাইট! জবাব দিল কিকো খোশমেজাজে। এবার যাও।
যাওয়ার নাম করে না লোকটা। মুগ্ধ চোখে দেখছে কিকোকে। কিন্তু যেই হাত বাড়াল আদর করবে বলে, তীক্ষ্ণ ঠোঁট দিয়ে এক ঠোকর লাগিয়ে দিল কিকো ওর মাংসল হাতে। রাগী কুকুরের মত ধমক দিল, গর-র-র-র-র-র-র-র!
মুহূর্তে হাসি মুছে গেল মোটার মুখ থেকে। এক লাফে পিছিয়ে গিয়ে ভুরু কুঁচকে বলল, অসম্ভব পাজি তো পাখিটা! দ্রুতপায়ে মিলিয়ে গেল সে ভিড়ে।
আরও বিশ মিনিট অপেক্ষার পর পুরু লেন্সের চশমা পরা, পাকা দাড়িওয়ালা বুড়ো এক স্বাস্থ্যবান লোক এগিয়ে এসে দাঁড়াল ওদের কাছে। হাঁটু পর্যন্ত লম্বা এক কোট পরে আছে, পিঠে ঝুলছে একটা দামি ফিল্ডগ্লাস, মাথায় ফেল্ট ক্যাপ। গলার আওয়াজ শুনে জানে পানি এল ওদের সবার।
এই যে! ছেলেমেয়েরা ঠিক সময় মত পৌঁছে গেছ দেখছি! ভেরি গুড, ভেরি গুড!
গুড আফটারনুন, ডক্টর ওয়াল্টার, গলাটা একটু চড়িয়ে বলল কিশোর। কেমন আছেন, সার? আমরা সবাই তৈরি।
সবার সঙ্গে হাত মেলালেন তিনি। তারপর বললেন, এবার রওনা হব আমরা। এসো আমার সঙ্গে। এই যে এদিকে।
আশপাশ থেকে যারা কথাগুলো শুনল তারা বুঝে নিল, বুড়ো প্রফেসর কানে একটু কম শোনেন। তারই তত্ত্বাবধানে কোনও স্টাডি টুরে চলেছে কয়েকটা ছেলেমেয়ে।
এই যে! পোর্টারকে ডাক দিলেন ডিক কার্টার। তোমার বারোতে এই ব্যাগগুলোও তুলে নাও তো, বাছা। দেড়টার গাড়িতে আমাদের রির্ভেশন আছে, কম্পার্টমেন্টটা

খুঁজে বের করে মালগুলো তুলে দাও ওতে। ঠিক আছে?
পোর্টার ওদেরকে রিযার্ভ করা কামরায় তুলে দিয়ে মজুরির সঙ্গে মোটা বখশিশ পেয়ে খুশি মনে বিদায় নিল। সবকিছু গুছিয়ে রেখে ডাইনিং কারে গিয়ে লাঞ্চ সেরে এল ওরা। তারপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল আঙ্কেলের আনা ম্যাপের উপর। দ্বীপ তো অনেক, অ্যানাকোপা, সান্তাক্রুয, সান্তা রোযা, স্যান মিগুয়েল হিল; আবার প্রতিটি বড় দ্বীপের আশপাশে অসংখ্য ছোট-ছোট দ্বীপ রয়েছে। এমনও কিছু আছে, যেখানে কোনদিন মানুষের পা পড়েনি। ম্যাপ দেখতে গিয়ে বুকের ভিতরটা শিউরে শিউরে উঠছে রবিনের-মন ভরে পাখি দেখা যাবে এবার। মুসা ভাবছে, এক-আধটা পাফিনের সঙ্গে যদি ভাব করা যেত, তা হলে দারুণ মজা হোত। কিশোর স্বপ্ন দেখছে, নীল সাগরের স্বচ্ছ জলের উপর মাথা। জাগানো ছোট্ট কোনও দ্বীপে তাঁবুতে বসে গল্পের বই পড়ছে ও, মাথার উপর দিয়ে উড়ে চলে যাচ্ছে একের পর এক সাদা মেঘের ভেলা, বিশাল আকাশটা পার হয়ে হারিয়ে যাচ্ছে আরও দূরে কোথাও।
কেউ ওর দিকে খেয়াল দিচ্ছে না দেখে কিকো বলল, দূরো!
কার্পিনটেরিয়া দুই ঘণ্টার পথ।
বেশ বড়সড় বন্দর-শহর কার্পিন্টেরিয়া।
ট্রেন থেকে নেমেই মোটর বোট তৈরি আছে কি না দেখতে ট্যাক্সি নিয়ে। চলে এল সবাই হারবারে। সাগরের ধারে জোর হাওয়া, জিনার চুল আর আঙ্কেলের নকল দাড়ি ওড়াচ্ছে। মুসাকে দরজা বন্ধ করতে বলে ওর কাঁধে ঘুরে বাতাসের দিকে মুখ করে বসল কিকো। পালক এলোমেলো হয়ে যাওয়া একেবারেই পছন্দ করে না ও।
হ্যাঁ, পৌঁছে গেছে। নাম: সীগাল। সহকর্মী যিনি বোটটা চালিয়ে নিয়ে এসেছেন, তার জানা আছে কী ছদ্মবেশ নিয়ে চলেছেন ডিক কাটার। হাসি মুখে এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা জানালেন।
গুড আফটারনুন, ডক্টর ওয়াল্টার! সবাইকে শুনিয়ে জোরে জোরে বললেন। তিনি। কেমন আছেন, সার? ভালো? সমুদ্রযাত্রার জন্যে আবহাওয়াটা কী চমৎকার না? ট্রেনে কোনও কষ্ট হয়নি তো, সার?
না, হয়নি। থ্যাঙ্কিউ। যথেষ্ট পরিমাণ খাবার তোলা হয়েছে তো, মারফি? সবকিছু রেডি?
সব রেডি, সার। ছয়মাস নিশ্চিন্তে চলবে। উঠে পড়ন, সার। তিন গোয়েন্দা ও জিনার দিকে চেয়ে হাসলেন তিনি, তোমরাও ব্যাগ-ব্যাগেজ নিয়ে।
উঠে পড়ো। আবার ফিরলেন ডিক কার্টারের দিকে, আপনাদেরকে খোলা সাগরে ছেড়ে দিয়ে আমি ডিঙ্গি নিয়ে ফিরে আসব।

সবাই দেখতে পেল, মোটর-বোটের পিছনে বাঁধা ছোট্ট একটা ডিঙ্গি দুলছে ঢেউয়ে। উঠে পড়ল ওরা সীগালে। একনজরেই ওদের পছন্দ হয়ে গেল নতুন রং করা ঝকঝকে বোটটা। সামনের দিকে ছোট্ট একটা ক্যাবিন। খাবারের স্টক দেখে খুশিতে চকচক করে উঠল মুসার চোখ। টিনের পর টিন সাজানো রয়েছে, হরেক রকম খাবারে ভর্তি। ছোট একটা রিফ্রিজারেটরেও খাবার ঠাসা। খোলা আসমানের নীচে সাগরের নির্মল হাওয়ায় কী রকম খিদে লাগে জানা আছে ওর। আর সেই সময় এই সব খাবার খেতে কী যে মজা লাগবে!

দক্ষ হাতে বন্দর থেকে বের করে খোলা সাগরে নিয়ে এলেন মারফি ওদের। তারপর স্যালিউট করে নেমে গেলেন দাঁড় টানা বোটে।

গুড লাক, সার, একগাল হাসলেন তিনি। ওয়ায়্যারলেস সেটটা ব্র্যান্ড নিউ, সার। ওটা নিয়মিত ব্যবহার করতে বলে দিয়েছেন বস। আপনি ঠিক আছেন কি না জানতে চান তিনি –প্রতিদিন অন্তত একবার। এক্সট্রা ব্যাটারি, আর নতুন এক সেট রিপেয়ার কিটও রয়েছে ওর সঙ্গে। আশাকরি কোনও সমস্যা হবে না। হপ্তা দুয়েক পর ছেলেমেয়েদের নিতে আসব। হাত নাড়লেন হাসিখুশি মানুষটা সবার উদ্দেশে, গুড টাইম অ্যান্ড গুড লাক!

ছপাৎ-ছপাৎ দাঁড় বেয়ে ফিরে চললেন তিনি বন্দরে। দূরত্ব বাড়ছে দুই বোটের। ছোট হতে হতে বিন্দু হয়ে মিলিয়ে গেল বোটটা। সোজা দক্ষিণ

পশ্চিম দিক বরাবর ছুটছে ওদের বোট।

বাপস! বিরাট একটা হাঁফ ছেড়ে বললেন আঙ্কেল। রওনা হলাম তা হলে! এখানে আর কারও চোখে ধরা পড়বার ভয় নেই। এই জঘন্য দাড়ি, ভারী চশমা আর এই বিটকেল কোটের কবল থেকে বাঁচতে হবে এবার! মুসা, হুইলটা কিছুক্ষণ ধরতে পারবে না? পাঁচ মিনিট লাগবে আমার স্বমূর্তি ধারণ করতে।

খুশি মনে হুইলের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল মুসা। ঘণ্টায় দশ নট গতিতে ছুটছে মোটর-বোট। এই গতিতে চললে পাঁচ-কি-ছয় ঘণ্টায় পৌঁছে যাবে ওরা অ্যানাকোপা, সান্তা ক্রু, সান্তা রোযা ছাড়িয়ে স্যান মিগুয়েল হিল দ্বীপের কাছাকাছি। সন্ধের আগেই অবশ্য ছোট একটা দ্বীপ বেছে নিয়ে বোট ভিড়াতে হবে তীরে। কাল সকালে আবার চলা, মনের মতন দ্বীপ খোঁজা।

আকাশ পরিষ্কার। দিগন্তবিস্তৃত স্বচ্ছ, নীল প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে বিন্দুর মতই ছোট ওরা। চারপাশে কেউ নেই, কিছু নেই। মনের মধ্যে বাঁধন কেটে বেরিয়ে পড়বার উল্লাস। খুশিতে শিউরে উঠল তিন গোয়েন্দা আর জিনা। সবাই বুঝল সবার মনের অবস্থা, হাসল একসঙ্গে।

খাইছে! বলল মুসা, পুকুরটা বেশ বড় তো!

পাঁচ মিনিটেই ফিরে এলেন আঙ্কেল ডিক তার ঝকঝকে টাক আর গালভরা হাসি নিয়ে। সাবধান করলেন সবাইকে, কোট খুলেছ, ঠিক আছে; কিন্তু ভুলেও কেউ রোদ লাগিয়ো না গায়ে। বাতাস যদিও ঠাণ্ডা, রোদটা ভীষণ কড়া: জ্বালিয়ে দেবে চামড়া, একেবারে ফোস্কা ফেলে দেবে!

সামনে যতদূর দেখা যায় সুনীল সাগর। অলস ভঙ্গিতে আকাশ পাড়ি দিচ্ছে সাদা মেঘ, যেতে যেতে পাল্টাচ্ছে আকার-আকৃতি-ভালুক হয়ে যাচ্ছে। গণ্ডার, কিংবা হাতি; তারপর হয়তো দাড়িসহ সান্তা ক্লজ বা আব্রাহাম লিঙ্কন।

শোনো, গোয়েন্দাসকল! বক্তৃতার ঢঙে শুরু করলেন ডিক কার্টার। হাওয়ায় ফুলে আছে তার সাদা শার্টের পিঠ। মনে রাখবে, ছুটি কাটাতে এসেছি আমরা এবার এখানে, গা শিউরানো কোনও রোমহর্ষক রহস্যের খোঁজে নয়। ঠিক আছে? রহস্য-রোমাঞ্চ অনেক হয়েছে। গত তিন-তিনবার যখনই। আমরা একসঙ্গে হয়েছি, ঘাড়ে চেপে গেছে বিপদ আর ভয়ঙ্কর সব অভিজ্ঞতা। এইবার অন্তত আমরা ছুটিটা কাটাতে চাই শান্তিতে। ঠিক আছে?

হিয়ার, হিয়ার! বলল রবিন। আমরাও তাই চাই। সবসময়ে তাই চেয়েছি। কিন্তু আমাদের রাশির দোষ, কী করে যে বিপদ-আপদ এসে জোটে…

দ্বীপ কোথায়? জিজ্ঞেস করল জিনা। কাছে-পিঠে একটাও তো দেখা যাচ্ছে না।

কাল সকালে উঠে দেখবে দ্বীপের অভাব নেই, বললেন আঙ্কেল। কোটায় উঠতে চাও, সিদ্ধান্ত নেবে তোমরাই।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলো, তারপর সঁঝ হয়-হয়। রঙের ছোপ লাগতে শুরু করেছে সাদা মেঘের গায়ে। রাতের খাবার খেয়ে নিল ওরা একটু সকাল সকালই। ক্যাবিনের স্টোরে টাটকা পাউরুটি পাওয়া গেল, সেই সঙ্গে রয়েছে। বড়সড় একটা চকোলেট কেক আর স্ট্রবেরি জ্যামের শিশি।

কাল বাসি হয়ে যাবে, বললেন আঙ্কেল, পাউরুটি আর কেক আজই শেষ করে ফেলো। এখানে কোনও দ্বীপে কোনও ফার্মহাউস আছে কি না জানি, থাকলেও সেখানে টাটকা রুটি পাওয়া যাবে কি না কে জানে। না পেলেও অবশ্য কিছু এসে যায় না, আমাদের স্টোরে, বিস্কিটের টিনের অভাব নেই। তবে ধরে নিতে পারো, দুই সপ্তাহের মধ্যে চকোলেট কেক আর মিলছে না।

জিনা টোস্ট করে নিয়ে এল পাউরুটি, সবাই মিলে মজা করে খেল জেলি। আর মাখন লাগিয়ে নিয়ে। ভেড়ার মাংসের দুটো টিন খুলে নিয়ে সেটাও চলল পাশাপাশি। পেট পুরে খেল সবাই। আরও টিন খোলা হবে কি না জানতে চাইলে সবার আগে হাত জোড় করল মুসাই-আর জায়গা নেই পেটে। তারপর একগ্লাস পানি খেয়ে চা করে আনল সে সবার জন্য।

সোনালী আলোয় বিশ্ব-চরাচর রাঙিয়ে দিয়ে অস্ত গেল সূর্য। পশ্চিম সাগরটাকে মনে হচ্ছে তরল সোনা। কিশোরের হাতে হুইল দিয়ে ম্যাপ খুললেন ডিক। এই হচ্ছে সান্তা রোযা। এর পরেই দেখা যাচ্ছে একটা পাথুরে দ্বীপ। ছোট একটা জেটিও আছে। কিছু লোকজনও আছে এখানে। আমরা আজকের মত এখানেই বোট ভিড়াতে পারি। তাঁবু আছে সঙ্গে, রাতটা ডাঙায়। কাটিয়ে কাল সকালে মনের মত দ্বীপের খোঁজে বেরিয়ে পড়া যাবে। কী বলো তোমরা?
সবাই একবাক্যে রাজি।
বাতাস ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। সবাই কোট চড়াল গায়ে। সাগরের নীল রঙটা এখন বদলে সবজে-ধূসর হয়ে গেছে। ম্যাপের সেই পাথুরে দ্বীপটা দেখা দিল এই সময়ে। দশ মিনিটের মধ্যে দ্বীপের পাথুরে জেটিতে গিয়ে ভিড়ল মোটর বোট। জেটিতে দেখা হলো এক বৃদ্ধ জেলের সঙ্গে। এই অসময়ে বোট ভিড়তে দেখে বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে গেছে তার চোখ। অল্প কথায় তাকে বুঝিয়ে বলল আঙ্কেল তাদের উদ্দেশ্য। স্বস্তির ভাব ফুটল জেলের চেহারায়।
ও, তাই বলেন। পাখ-পাখালি দেখতে এসেছেন। আঙুল তুলল সে, উ উ-ই যে, ওদিকে হাজার-হাজার, না, লাখ-লাখ পাখি দেখতে পাবেন। তা, আজ রাতে থাকবেন কোথায়? আমার বাড়িতে এত লোকের জায়গা হবে না।
তাঁবু আছে আমাদের কাছে, বললেন আঙ্কেল। ডিনারও সেরে নিয়েছি সাগরে। তুমি যদি কাল সকালে খানিকটা খাঁটি দুধের ব্যবস্থা করতে পার, তা-ই আমাদের বিরাট উপকার হবে। মালাই আর টাটকা মাখনও নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে তোমাদের এখানে, তাই না? এ প্রচর, প্রচর, বলল জেলে। আমি গিয়ে বউটাকে বলি। কাল সকাল সাতটার মধ্যে পেলে চলবে তো?
চলবে। আমরা এবার তা হলে ঘুমাবার ব্যবস্থা করে ফেলি। ঠিক কোথায়। তাঁবু গাড়লে ভালো হয়, বলো তো, মুরুব্বি?।
জায়গা দেখিয়ে দিল বৃদ্ধ জেলে। তারপর ছুটল বাড়ির দিকে।
পরদিন সকালে জেলে-বউয়ের পাঠানো পুরু করে সর দেওয়া পরিজ, বিশটা হাত-রুটির সঙ্গে গোটা দশেক গরমাগরম ভাজা রূপচান্দা মাছ, সের দুইয়েক ভেড়ার মাংসের সিককাবাব, এক জগ ভর্তি খাঁটি গরুর দুধ, আর প্ল্যাস্টিকের দুটো ঠোঙায় ঘরে তৈরি মাখন ও পনির নিয়ে হাজির হলো বুড়ো। পাঁচজনে পেট পুরে খাওয়ার পরেও বেঁচে গেল অনেক। জিনা সেগুলো তুলে রাখল বোটের ফ্রিজে।
তাঁবু খুলে বিছানা-বালিশ মোটর-বোটে উঠিয়ে ফেলল তিন গোয়েন্দা। রওনা হওয়ার আগে বুড়োর হাতে টাকা দিতেই চমকে উঠল সে। অর্ধেকটা বাড়িয়ে ধরল ফেরত দেবে বলে।

এত কীসের? বলল সে। অর্ধেকও তো দাম হয় না এই সামান্য জিনিসের। তা ছাড়া, বাড়ির তৈরি জিনিস, মাছগুলো আমার নিজের ধরা। এত টাকা তো নিতে পারব না, বাছা!
সব তোমাকে কে দিচ্ছে, মুরুব্বি? বললেন আঙ্কেল। তোমার গিন্নির খাটনির জন্যে বাকি অর্ধেক। যাও এখন, রওনা হওয়ার সময় গোলমাল কোরো না তো!
বোট ছেড়ে দিল ওরা। তীরে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ল জেলে-বুড়ো, মুখে। হাসি। দু-ঘণ্টা চলবার পর দূরে দেখা গেল ছড়ানো ছিটানো অনেকগুলো দ্বীপ। ওগুলোর উপর উড়ছে হরেক জাতের পাখি। চোখে বিনকিউলার তুলল রবিন।
বাতাসটা আজ আর ঠাণ্ডা নয়, রোদের তেজ টের পাওয়া গেল কিছুক্ষণ পরেই। কেমন একটা ভ্যাপসা গরম। আঙ্কেলকে বারবার আকাশের দিকে চাইতে দেখে তিন গোয়েন্দা বুঝল, ঝড়-তুফানের ভয় করছেন তিনি।
চওড়া ব্রিমের একটা হ্যাট মাথায় দিয়ে বোটের কিনারে বসে একহাত পানিতে ডুবিয়ে রেখেছে জিনা। মাঝে মাঝে হাত তুলে মুখে পানির ছিটে দিচ্ছে। তাই দেখে মুসা বলল, চারদিকে চোখ-কান খোলা রেখো, জিনা। আশপাশে হাঙর থাকলে কখন কুচ করে কেটে নেবে হাতটা, টেরও পাবে না।
সড়াৎ করে হাত তুলে নিল জিনা। তাকাল আঙ্কেল ডিকের মুখের দিকে। তাকে হাসিমুখে মাথা নাড়তে দেখে মুসার উদ্দেশে একবার ভ্রুকুটি করে আবার হাত দিল পানিতে। দিয়েই সঙ্গে সঙ্গে তুলে নিল আবার।
কী যেন ঠেকল হাতে! বলে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, পানিতে ভাসতে ভাসতে চলে যাচ্ছে একটা কমলার খোসা। জেলিফিশ মনে করে ভয় পেয়েছিল। হেসে দৃষ্টি আকর্ষণ করল আঙ্কেলের, আঙুল তুলে দেখাল খোসাটার দিকে।
খোসাটা দেখে হাসলেন না আঙ্কেল।
আরে! এখানে, সাগরের মাঝখানে, এটা আসে কী করে! নিশ্চয়ই জেলেরা কমলা নিয়ে আসবে না মাছ ধরতে? আরও কেউ কি এসেছে এদিকে পাখি দেখতে? একটু যেন চিন্তায় পড়লেন আঙ্কেল। নাহ, তারা কমলার মত ভারী ফল বইতে যাবে কেন?
কমলার খোসাটা বেশ অনেকক্ষণ ভাবাল ডিক কার্টারকে।
পাখির রাজ্যে চলে এসেছে ওরা। এখন কেবল পছন্দমত একটা দ্বীপ বাছাই করা।
দেখা গেল, ওদেরকে মোটেও ভয় পাচ্ছে না পাখিগুলো। বরং কৌতূহলী হয়ে কাছে এসে ভালো করে দেখছে। পাগল হওয়ার দশা হলো রবিনের। বিনকিউলার আর নামাচ্ছে না চোখ থেকে। পটাপট নাম বলছে, এই যে, এটা রেযারবিল; ওই দেখো, লিটল অক; আরে...আরে, একটা শ্যাগ ডাইভ দিয়ে। পড়ল পানিতে,

দেখো, দেখো পানির নীচেও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ওটাকে, এই ধরল মাছ! উঠে আসছে এবার!
সবাই হাসছে ওর কাণ্ড দেখে। শক্তিশালী বিনকিউলার দিয়ে ও যা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে, খালি চোখে আর সবাই সেটা দেখবে কী করে!
ই-ই-উ-উ-উ! ই-ই-উ-উ-উ! মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে একটা গ্রেট গাল। পাখার বিস্তার কমপক্ষে চারফুট।
কিকোর শখ হলো ওটাকে একটু শাসন করবে। বিশ-পঁচিশ ফুট উঠে শূন্যে একটা ডিগবাজি খেয়েই ছেড়ে দিল মুখ। দরজা বন্ধ করা, পা মুছে ঘরে। ঢোকা থেকে শুরু করে চোপরাও, একদম চুপ পর্যন্ত বলে গেল। ঘাবড়ে গিয়ে আরও উপরে উঠে গেল গ্রেট গাল, ডেকে উঠল আবার, ই-ই-উ-উ-উ!
অবিকল নকল করল কিকো ডাকটা। তাই শুনে ছোট একটা চক্কর দিয়ে ভালো করে দেখবে বলে কিকোর দিকে এগিয়ে এল গালটা। অত বড় পাখিটা কাছে চলে আসছে দেখে ভয় পেল এবার কিকো। বাবারে, গেছি! বলে ডাইভ দিয়ে এসে মুসার কাঁধে বসে পড়ল। বিস্মিত গ্রেট গাল আর একপাক ঘুরে মাথা কাত করে দেখল কিকোকে, তারপর চলে গেল নিজের কাজে।
গাধা কোথাকার! বকা দিল ওকে মুসা। বাহাদুরি দেখাতে গিয়ে মরবি একদিন ওদের হাতে! যেদিন ছিঁড়ে কুটিকুটি…
তুই চুক কর্! পাল্টা ধমক মেরে থামিয়ে দিল সে মুসাকে। ডিক কার্টারের দিকে চোখ গরম করে তাকিয়ে বলল, আঙ্কেল, পড়তে বসো। কোনও কথা শুনতে চাই না আমি!
দ্বীপটার কাছাকাছি এসে পাখির কলরবে কান ঝালাপালা হওয়ার দশা হলো ওদের। পাথরের একটা টিলা ছেয়ে আছে হাজার হাজার পাখিতে। বেশির ভাগই ধবধবে সাদা গ্যানিট আর বাদামি গিলিমট। হাঁ করে চেয়ে দেখল ওরা পাখির আনাগোনা। দলে দলে ফিরে আসছে পাখি, দলে দলে চলে যাচ্ছে। সাগরে মাছ ধরতে।
এখানে ক্যাম্প করতে রাজি হলো না রবিন। ওর টার্গেট পাফিন। পাফিন কলোনিতে নেমে ওদের জীবনযাত্রা আর বিচিত্র কর্মকাণ্ডের ছবি তুলতে চায় ও কাছ থেকে।
একের পর এক অনেকগুলো দ্বীপ দেখল ওরা। একেক দ্বীপে একেক ধরনের পাখির আধিক্য। সূর্য যখন ঠিক মাথার উপর, তখন পাওয়া গেল পাফিনদের কলোনি।
মহা উত্তেজিত হয়ে উঠল রবিন। পারলে লাফিয়ে নেমে যায় বোট থেকে। আরি সর্বনাশ! দেখো, কিশোর, টাটেড আর হড়, দুরকম পাফিনই আছে! কপাল ভালো

আমাদের। এত দক্ষিণে হর্নড পাফিন সাধারণত আসে না-ঠাণ্ডা এলাকা পছন্দ ওদের, অ্যাটলান্টিক পাফিনদের মত।
কোনটা টাফটেড আর কোনটা হর্নড? জিজ্ঞেস করল মুসা। চোখ টিপল কিশোরের দিকে চেয়ে।
টাফটেডগুলোর সারা গা কালো, শুধু মুখটা সাদা; উজ্জ্বল- হলুদ, লম্বা ঠোঁট, ঠোঁটের আগাটা লাল; চোখের চারপাশে হলদেটে চক্কর আঁকা। আর হর্নড় পাফিনের পিঠ কালো, কিন্তু বুক-পেট সাদা, ঠোঁটের রং প্রায় একই, তবে দুপাশে কিছুটা নীলচে ভাব আছে।
আরে! চেঁচিয়ে উঠল জিনা। পানির নীচে পাখা ঝাঁপটাচ্ছে কেন? মনে হচ্ছে উড়ছে!
ওটাই ওদের ডুব-সাঁতার, বলল রবিন। দারুণ না? পা ব্যবহার করে কেবল পানির ওপরে সাঁতার কাটবার সময়। দ্বীপে নেমে…
আগে খেয়ে নেয়া যাক, বললেন ডিক কার্টার। তারপর একপাক ঘুরে দেখা যাবে বোট রাখার উপযোগী ভালো জায়গা পাওয়া যায় কি না।
অল্প পানিতে নোঙর ফেলে খেয়ে নিল ওরা দুপুরের খাবার। ভ্যাপসা গরমে ঘামছে সবাই। হঠাৎ কান খাড়া করল মুসা। কীসের আওয়াজ!
একটা প্লেনের শব্দ পাচ্ছি যেন? বলল মুসা আপন মনে।
চট করে উঠে দাঁড়ালেন ডিক কার্টার। বহুদূরে ঝিলিক দিল প্লেনের গা। ইঞ্জিনের ক্ষীণ শব্দটা এবার শুনতে পেল সবাই।
আশ্চর্য! এখানে প্লেন! বললেন ডিক। এদিকে তো প্লেন চলাচলের কোনও রুট নেই, এখানে কী করছে ওটা?
.
আঙ্কেলকে এত অবাক হতে দেখে সবাই তাকাল তার মুখের দিকে। রবিনের বিনকিউলারটা চেয়ে নিয়ে চোখে তুললেন ডিক। কিন্তু ততক্ষণে মেঘের আড়ালে চলে গেছে উড়োজাহাজ, দেখা গেল না।
সী প্লেন, না কি সাধারণডাঙার? নিজেকেই যেন প্রশ্ন করলেন ডিক। সত্যিই আশ্চর্য!
কেন? আশ্চর্য কেন? প্রশ্ন তুলল জিনা। আজকাল তো প্লেন সবখানেই যাচ্ছে।
জবাব দিলেন না ডিক কার্টার। বিনকিউলার ফেরত দিলেন রবিনকে। দ্বীপটার চারপাশে পুরো একপাক ঘুরবার আগেই পশ্চিম পাশে বোট রাখবার মত একটা জায়গা পাওয়া গেল। সরু একটা চ্যানেল। পাথুরে দুই পাড়ের মাঝে অনায়াসে একটা বোট ঢুকবার মত চওড়া ফাটল। পানি যথেষ্ট গভীর। দেখামাত্র জায়গাটার নাম রেখে দিল ওরা গোপন চ্যানেল।

এখানে রাখলে বাতাসের পুব-পশ্চিম দুদিকের ঝাঁপটা থেকেই রক্ষা পাবে বোট, বললেন আঙ্কেল। তা ছাড়া পানিতে নামবার ঝামেলা নেই, ডেক থেকে পা বাড়ালেই পাহাড়ের ওই তাকটা ডিঙিয়েই ওঠা যাচ্ছে দ্বীপে।
পাহাড়ি দ্বীপ, কিন্তু পুবদিকে ঢালু হয়ে ক্রমে প্রায়-সমতল হয়ে গেছে। তারপর আবার একটা মাঝারি আকারের পাহাড়। একটা অগভীর ঝরনাও দেখা গেল, সামনের পাহাড় থেকে নেমে সাগরে গিয়ে পড়েছে।
বোটটাকে দুপাশের দুটো পাথরের সঙ্গে কষে বেঁধে নাক কুঁচকালেন আঙ্কেল। বাপরে-বাপ! ভয়ানক দুর্গন্ধ তো! পুব-দক্ষিণে চলো, দেখি দুর্গন্ধমুক্ত এলাকা পাওয়া যায় কি না। নইলে টেকা যাবে না, পালাতে হবে এখান থেকে।
সামনে পা বাড়াতেই উপরের কোনও তাক থেকে ঠাস করে ডিম পড়ল একটা আঙ্কেলের পায়ের কাছে, জুতোয় ভরল হলুদ কুসুম! উঁচু তাকের উপর জায়গার দখল নিয়ে ঝগড়া চলছে গ্যানিট আর গিলিমটের মধ্যে। তারই ফলশ্রুতিতে এই বোমাবর্ষণ। উপর দিকে মুখ তুলে চেঁচিয়ে প্রশংসা করলেন আঙ্কেল, গুড শট, মম্!
হেসে উঠল সবাই। সামনে এগোল ওরা। উঠে গেল পাহাড়ের চড়ায়। ওখানে দাঁড়িয়ে দূরে দূরে ছড়ানো ছিটানো অনেকগুলো দ্বীপ দেখা গেল। উঁচুতে থাকায় চারপাশটা দেখেশুনে দিক বাছাই করতে সুবিধে হলো। ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করেই দুই পাহাড়ের মাঝখানের সী-পিঙ্ক আর হিদারের ঝোপে ছাওয়া উপত্যকায় পাফিনদের বাসা দেখতে পেল ওরা। হাজার হাজার গর্ত খুঁড়ে মাটির নীচে কলোনি বানিয়েছে ওরা।
ঠোঁটগুলো খেয়াল করেছ? জিনা বলল, দেখার মত না?
বিরাট, বলল মুসা। কিছুটা কিকোর মত।
সেজন্যেই এদের আরেকু নাম সী-প্যারট, বলল রবিন। দেখেছো, একটু ভয় পাচ্ছে না মানুষ দেখে!
কিংবা আমাদের মানুষ বলে গণ্য করছে না! টিপ্পনি কাটল মুসা। প্যাটপ্যাট করে চেয়ে রয়েছে কেমন, দেখো? আর দুলে দুলে হাঁটারই বা কী স্টাইল!
আর এই যে, দেখো, দেখো, বলল জিনা। ইনি হচ্ছেন পাফিনদের মুসা আমান, খিদে লেগেই আছে পেটে-চললেন সাগরে মাছ ধরে খেতে।
কয়েকটা পাফিনকে দেখা গেল, ব্যস্ত ভঙ্গিতে পা দিয়ে মাটি আঁচড়াচ্ছে, বাসা বানাবে মাটির নীচে। ফোয়ারার মত মাটি ও বালুকণা ছিটকে পড়ছে পিছন দিকে।
আমার মনে হয় গোটা দ্বীপটাই ফোঁপড়া করে দিয়েছে ওরা বাসা বানিয়ে বানিয়ে, বললেন ডিক। সাবধানে পা না ফেললে গর্তে পড়ে পা মচকাবে।

অররররররর, অ, অররর, ককক!
গম্ভীর, মোটা, কর্কশ গলায় ডাকছে ওরা। মুসার কাঁধে বসে অবিকল একই সুরে জবাব দিল কিকো। কয়েকটা পাফিন ঘাড় বাঁকিয়ে অবাক, নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে দেখল কিকোকে। ওদের এগোতে দেখে একটা পাফিনও নিজের জায়গা ছেড়ে নড়ল না। এঁকেবেঁকে সাবধানে চলতে হচ্ছে ওদের, পাছে কারও গায়ে পা লেগে বেয়াদবি হয়ে যায়!
কিন্তু বেয়াদবি হয়েই গেল। চলতে চলতে হঠাৎ হাত-খানেক সেঁধিয়ে গেল মুসার পা, মুহূর্তমাত্র দেরি না করে ঠোকর দিল ভিতরে বিশ্রামরত ক্রুদ্ধ পাফিন।
ওরেব্বাপ! গেছি রে! বলে সড়াৎ করে পা বের করে নিল ও। লাল হয়ে গেছে জায়গাটা। সাবধানে এগোল সে এবার।
চারদিকে শুধু নানান সুরে অররররররর, অরর, ককক! শব্দ। গর্তের। ভিতরে, বাইরে, আকাশে, সাগরে-সবখানে এই একই আওয়াজ। নিচু, মোটা গলায় ডেকে চলেছে হাজার-হাজার পাফিন।
উপত্যকা পেরিয়ে দ্বীপের পুব দিকে আরেক পাহাড়ের কাছে চলে এল ওরা, খুঁজছে ক্যাম্প করবার মত উপযুক্ত জায়গা। ঝরনার ধারে পাহাড়ের গা। ঘেঁষে একটা জায়গা পছন্দ হলো জিনার। সবাই বসে পড়ল ওখানে। ঠিক হলো, এখানেই তাঁবু টাঙাবে ওরা। পাহাড়ের গা থেকে চওড়া একটা কাশি বেরিয়ে থাকায় নীচটা স্টোর হিসাবে ব্যবহার করা যাবে। তা ছাড়া পুব দিক থেকে ঝড়-বৃষ্টি এলে পৌঁছবে না ওখানে। চমৎকার আশ্রয় পাওয়া যাবে।
পাহাড়ের ধারে সুন্দর একটা লেগুন, দেখেই পছন্দ হলো কিশোরের। বলল, আঙ্কেল, মোটর-বোটটা ওখানকার চেয়ে এখানে অনেক নিরাপদে থাকবে মনে হয়। ঝড়-তুফানে সাগরে ঢেউ উঠলে দুপাশের পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে চুরমার হওয়ার ভয় নেই এখানে।
ঠিক বলেছ, কিশোর! লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন আঙ্কেল ডিক। কিছুতেই স্বস্তি হচ্ছিল না ওখানে রেখে, কেমন যেন করছিল মনের ভেতরটা। এখন বুঝতে পারছি, কেন। ওখানে বোট রাখা ঠিক হয়নি। আমি এখনই গিয়ে নিয়ে আসছি ওটা। এখান থেকে মাল-সামান নামাতেও অনেক সুবিধে হবে। বলেই পিছন ফিরে হাঁটা ধরলেন তিনি। সঙ্গে আসবে কি না জিজ্ঞেস করায় হাত নেড়ে বারণ করলেন মুসাকে। মেসেজ পাঠাবার কাজটাও সেরে নেব এই ফাঁকে। তোমরা বিশ্রাম নাও, আধঘণ্টার মধ্যে আসছি আমি।

.

বোটটা বালির সঙ্গে ঘষা খেয়ে ঘ্যাঁশশ করে থামতেই তীরে গিয়ে দাঁড়াল তিন গোয়েন্দা।

নোঙরটা ছুঁড়ে দেন, আঙ্কেল, বলল মুসা।
ঝপাৎ করে হাঁটুপানিতে পড়ল নোঙর। মুসা গিয়ে তুলে আনল ওটা উপরে। এদিকে বালিতে বেশ গভীর একটা গর্ত তৈরি করে ফেলেছে কিশোর ও রবিন। নোঙরটা ওর ভিতর ফেলে চারপাশ থেকে বালি টেনে ভরল গর্তটা, তারপর পা দিয়ে চেপে চেপে শক্ত ভাবে আটকাল।
ব্যস, ব্যস, হয়েছে, বললেন আঙ্কেল বোটের উপর থেকে। এবার আমি। দরকারি মালপত্রগুলো একে-একে নামিয়ে দিচ্ছি, ধরো তোমরা।
প্রথমে এল তাঁবু। মুসা ওটা নিয়ে তুলে দিল পারে দাঁড়ানো কিশোরের হাতে, কিশোর দিল মাঝামাঝি অবস্থানে দাঁড়ানো রবিনকে, রবিন রেখে এল পাহাড়ের ধারে জিনার কাছে। এইভাবে খুব অল্প সময়েই বিছানা-বালিশ, নীচে বিছাবার প্ল্যাস্টিক শীট আর হরেক রকম খাবার ভরা শতখানেক ক্যান, কিছু তৈজসপত্র, একটা পোর্টেবল চুলো হাতে হাতে চলে এল জিনার কাছে; ব্যস্ত হাতে কার্নিশের নীচে সেগুলো গুছিয়ে রাখছে জিনা।
সবাইকে কাজ করতে দেখে কিকোও ঠোঁটে করে তাঁবু টাঙাবার গোটা কয়েক কাঠের গোজ এনে দিল জিনাকে। অবাক হয়ে ওর কাজ দেখছে। পাফিনগুলো, তাই দেখে গর্বের সঙ্গে সন্তুষ্টচিত্তে ডাক ছাড়ল কিকো, অররররররর, অ, অররর, ককক!
তবুটা টাঙানো হলো কার্নিশের ঠিক সামনে।
সবকিছু গুছিয়ে রেখে, সবার বিছানা পাতা সারা হতে হতে বিকেল হয়ে গেল। ঘেমে নেয়ে উঠেছে তিন গোয়েন্দা। মুসা প্রস্তাব দিল, চলো, কয়টা ডুব দিয়ে আসি ঠাণ্ডা পানিতে।
চলো, বলল কিশোর, উফ, মনে হচ্ছে যেন চুলোর মধ্যে আছি!
সবার আগে ঘাড়ে তোয়ালে ফেলে উঠে দাঁড়ালেন আঙ্কেল। জিনা পানিতে নামল না, কিন্তু তীরে এসে দাঁড়াল কিকোকে নিয়ে। আধঘণ্টা মহানন্দে গোসল করে ক্লান্তি দূর হলো। পানি থেকে উঠে তাঁবুর বাইরে খেতে বসল সবাই।
খেতে খেতে গল্প করছে ওরা। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল জিনা, আরে, আরে! দেখো কাণ্ড! সবাই তাকিয়ে দেখল, কাছের একটা গর্ত থেকে বেরিয়ে হেলেদুলে ওদের দিকে এগিয়ে আসছে একটা পাফিন। মনে হচ্ছে, টেবিলে। সাপার দিয়ে খেতে ডাকা হয়েছে!
অররররররর! জবাব দিল পাফিন।
হেসে উঠল সবাই। সোজা এসে থামল পাফিন অপ্রস্তুত, বিব্রত কিশোরের হাঁটুর কাছে। মাথা তুলে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে ওর মুখের দিকে। বেরসিক কিশোরের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চায়।

লজ্জা পেলেও পাখিটার যেন অসম্মান না হয়, তাই ভেবে ওর ঘাড় চুলকে দিল কিশোর। অররররররর! বলে সন্তুষ্টি প্রকাশ করল পাফিন। কী করবে বুঝতে না পেরে একটুকরো স্যান্ডউইচ এগিয়ে দিল কিশোর ওর দিকে। কপ করে ওটা গিলে নিয়ে আর একটু কাছ ঘেঁষে এল সে। আরও চায়।

কিশোরের অবস্থা দেখে হেসে উঠল সবাই। রবিনও এবার একটুকরো মাংস এগিয়ে দিল, কিন্তু না, সবার কাছ থেকে খাবে কেন সে? রবিনের হাত থেকে নিয়ে কিশোর যখন এগিয়ে দিল, গিলে নিল বিনা দ্বিধায়। ওর নাম রেখে দিল জিনা-সখা। নামটা পছন্দ হলো সবারই। নিজেই চলে এসেছে সে বন্ধু হবে বলে, তাই ওর নাম সখা।

কিশোরের হাঁটুতে গা ঠেকিয়ে বসে থাকল সখা কিছুক্ষণ, তারপর কী মনে করে হেলেদুলে চলে গেল নিজের বাসায়। পরমুহূর্তে গর্ত থেকে বেরিয়ে এল সে তার বিবিসাহেবাকে নিয়ে। বিবিটা আকারে সামান্য ছোট, তবে ঠোঁটজোড়া অনেক বেশি রঙচঙে। কিশোরের গা ঘেঁষে বসল ওরা দুজন স্বভাবসুলভ গাম্ভীর্য বজায় রেখে। বিবিসাহেবার নাম রেখে দিল মুসা-সখি।

সবার মনোযোগ নবাগতদের দিকে বুঝতে পেরে বিরক্ত বোধ করল কিকো। মাথাটা একপাশে কাত করে কড়া চোখে তাকাল সে পাফিন-জোড়ার দিকে, হাতমুখ ধুয়ে আসতে বলল। নির্বিকার ভঙ্গিতে চেয়ে রইল ওরা। ওদের কাছে পাত্তা না পেয়ে অন্যদিকে ঘাড় ফিরিয়ে হাই তুলবার মত আওয়াজ করল কিকো।

দেখাদেখি হাই তুললেন আঙ্কেলও। অস্তগামী সূর্যের দিকে চেয়ে বললেন, সন্ধে হয়ে এল। নাহ! ক্লান্তি লাগছে তো খুব। বহুত খাটনি গেছে আজ। তোমরা জাগলে জাগো, আমি শুয়ে পড়লাম।

গরম লাগছে, আঙ্কেল, বলল মুসা। আমরা আর একটা ডুব দিয়ে আসি ঠাণ্ডা পানিতে।

আমারও তো লাগছে! বলে উঠে পড়লেন আঙ্কেল ডিকও। চলো, আমিও যাব।

জিনা রয়ে গেল। ঝরনার ধারে কটা কাপড় ধুয়ে ওখানেই স্নান সেরে নেবে। পাফিন জোড়া কিছুটা হেঁটে, কিছুটা উড়ে অনুসরণ করল ছেলেদের, এই শেষবিকেলে আর পানিতে নামল না, শান্ত ভঙ্গিতে তীরে বসে দেখছে ওদের কাজ-কারবার।

পানিতে নেমেই ক্লান্তি দূর হয়ে গেল আঙ্কেলের। তাড়া করলেন তিন গোয়েন্দাকে। ওরাও তিন দিক থেকে পানি ছিটিয়ে তাকে ঘায়েল করবার চেষ্টা করে যখন দেখল পারছে না, তখন ডুব দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। একটু পরেই দেখা গেল শূন্যে উঠে যাচ্ছেন ডিক, তারপর ঝপাৎ করে পড়লেন পানিতে-কিশোর ও মুসা দুজন দুপাশ থেকে তার দুই পা ধরে টেনে তোলায় ভারসাম্য হারিয়েছেন।

দূর থেকে ওদের চিৎকার চেঁচামেচি শুনে মুচকি হাসল জিনা। এখনও ছেলেমানুষ রয়ে গেছেন আঙ্কেল ডিক। খেলছেন তিন গোয়েন্দার সঙ্গে সমানে। সমান! একটা কাঠের গুঁড়ির উপর কাপড় কাঁচতে কাঁচতে হঠাৎ ঘাড় কাত করল ও। কী রে? কীসের শব্দ? আবার সেই প্লেন না তো!
উঠে দাঁড়িয়ে পশ্চিমে তাকিয়েই দেখতে পেল জিনা প্লেনটা। দূর থেকে খুব ছোট লাগছে। কী যেন পড়ল নীচে প্লেন থেকে। কী ওটা? প্যারাশুট? কোনও বিপদে পড়ল না কি আবার? কিন্তু প্লেনের চলায় কোনরকম অস্বাভাবিক কিছু দেখা গেল না, একই ভঙ্গিতে চলতে চলতে এক সময়ে মিলিয়ে গেল দূরে। শব্দ মিলিয়ে গেছে আগেই।
গোসল সেরে তাঁবুতে ফিরে গ্রাউন্ডশীট বিছিয়ে সুবার বিছানা রেডি করে ফেলল জিনা। অতিরিক্ত গরম পড়েছে বলে তাঁবুর ফ্ল্যাপদুটো তুলে দিল ও। একটু পরেই গল্প করতে করতে ফিরে এল ছেলেরা। ঘুমাবার সব আয়োজন একদম তৈরি দেখে থমকে দাঁড়ালেন আঙ্কেল তাঁবুর সামনে।
ওয়ান্ডারফুল! বললেন তিনি। ভারি লক্ষ্মী মেয়ে তো তুমি, জিনা! সবকিছু গোছানো-বিছানো সারা! এ-ই তো চাই! ভেরি গুড, ভেরি গুড!
প্রশংসা পেয়ে খুশিতে লাল হয়ে উঠল জিনার মুখ। সেটা ঢাকবার জন্য প্লেনের প্রসঙ্গ তুলল।
প্লেনটা দেখলেন, আঙ্কেল?
হায় খোদা! না তো! কীসের প্লেন? অবাক হলেন ডিক।
ওই যেটা দেখলে আপনার মুখটা শুকিয়ে যায়, বলল জিনা।
কই, আমরা তো কোনও আওয়াজ পাইনি?
আমরা যেরকম হই-চই করছিলাম, বলল রবিন, শুনতে না পাওয়ারই তো কথা।
ওটা থেকে কী যেন নীচে পড়ল দেখলাম। সাদা মত।
সত্যিই কালো হয়ে গেল আঙ্কেলের মুখটা। হাসি মিলিয়ে গেছে, কুঁচকে গেছে ভুরু জোড়া। প্যারাশুট?
ঠিক বোঝা গেল না। অনেক বেশি দূরে ছিল। প্যারাশুট হতে পারে, আবার ধোয়াও হতে পারে। মনে হলো, কী যেন নামছে ধীরে ধীরে। আপনি এমন করছেন কেন, ব্যাপারটা কি খুবই অস্বাভাবিক?
হ্যাঁ-মানে, না। প্লেনের ব্যাপারটা কেমন একটু গোলমেলেই ঠেকছে আমার কাছে। মানে, গোলমেলে হতেও পারে। তোমরা দুশ্চিন্তা কোরো না। তবে এখুনি একবার বোটে যেতে হবে আমাকে। রেডিওতে একটা মেসেজ পাঠানো দরকার। এটা হয়তো কিছুই না-কিন্তু আবার গুরুত্বপূর্ণ কিছু হতেও পারে।
.

নরম মাটিতে পায়ের গভীর ছাপ ফেলে চলে গেলেন ডিক কার্টার।
কী হতে পারে, কিশোর? জিজ্ঞেস করল– মুসা। আবার একটা রোমাঞ্চকর ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছি নাকি? তোমার কী মনে হয়? এই পাখির রাজ্যে কী করছে প্লেনটা?
কী জানি! দুই হাতের তালু চিত করল কিশোর। কিশোর নড়ে উঠতেই ওর পায়ে ঠেস দিয়ে ঘুমিয়ে পড়া সখা পড়ে যাচ্ছিল তাল হারিয়ে, কোনওমতে সামলে নিল।
আরে, এরা তো পিছু ছাড়ে না! রাতে আবার এই তাঁবুতে থাকার বায়না ধরবে নাকি?
যেন সমস্যাটা বুঝতে পেরেছে, এমনি ভঙ্গিতে দুজন দুজনের দিকে তাকাল সখা-সখি, তারপর হেলেদুলে বেরিয়ে গেল তবু ছেড়ে। কিন্তু বাইরে গিয়েই তাঁবুর পাশে গর্ত খুঁড়তে লেগে গেল। দূরে যাবে না, কিশোরের কাছাকাছিই থাকবে ওরা।
পায়ে হেঁটে বেরিয়ে গেল কিকোও, যেন দেখবে ওদের কাজ ঠিকমত হচ্ছে কি না। বালি ও মাটি ছিটে এসে পড়ল ওর গায়ে। রেগে গিয়ে ধমক দিল ও, অররররররর!
নরম গলায় সবিনয়ে উত্তর দিল ওরা, অররররররর, ককক! কিন্তু কাজ বন্ধ করল না।
আধঘণ্টার মধ্যেই ফিরে এলেন ডিক কার্টার।
শুয়ে পড়েছে সবাই, তবে জেগেই আছে।
মেসেজ গেল? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
হ্যাঁ।
ঢলে পড়ল সবাই গভীর ঘুমে।

.

পরদিন সকালে উঠে দেখা গেল, গতকালকের সেই ভ্যাপসা ভাবটা আর নেই। মনে হয়, ঝড়টা আসতে আসতেও ঘুরে গেছে অন্য কোনও দিকে। চনমনে। রোদ উঠেছে। সবাইকে হাসতে শুনে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল কিশোর, মাথার কাছে বসে রয়েছে ওর দুই বন্ধু-সখা ও সখি।
ঘাড়ে ভোয়ালে ফেলে ছুটল তিন গোয়েন্দা সাগরের দিকে। ওদের মাথার উপর দিয়ে উড়ে আগেই পৌঁছে গেল পাফিন জুটি। মস্ত চঞ্চু নিয়ে ঢেউয়ের সঙ্গে উঠছে-নামছে জোকারের ভঙ্গিতে। তারপর ডুব দিল। পাখা ঝাঁপটে অত্যন্ত দ্রুত ছুটল ওরা পানির নীচ দিয়ে। একটু পরেই উঠে এল ঠোঁটে করে মাছ নিয়ে।
আমাদের একটা মাছ দিলে ভেজে খাওয়া যেত নাস্তার সময়, বলে সখার ঠোঁটে ধরা মাছটা নেওয়ার চেষ্টা করল মুসা। কিন্তু ছাড়ল না সখা, ঠোঁটজোড়া উপর দিকে তুলে কোত করে গিলে ফেলল আস্ত মাছটা।

এদেরকে আমাদের জন্যে মাছ ধরা শেখাতে পারলে কিন্তু মন্দ হোত না, বলল রবিন। তা হলে টাটকা প্রোটিন পাওয়া যেত অঢেল।
কয়েকটা ডুব দিয়েই ফিরে এল ওরা ক্যাম্পে। নাস্তা খেতে খেতে আলোচনা চলল দিনটা কীভাবে কাটাবে।
চলো, গোটা দ্বীপটা, আজ ঘুরেফিরে দেখা যাক কোথায় কী আছে, প্রস্তাব দিল জিনা। রবিন ছবি তুলতে পারবে যত খুশি। কী বলো? সবাই একবাক্যে রাজি দেখে ফিরল ডিক কার্টারের দিকে। আপনি কী করবেন, আঙ্কেল? আমাদের সঙ্গে দ্বীপ ঘুরে দেখতে যাবেন, না কি বিশ্রাম?
সকাল থেকে চুপচাপ আছেন ডিক। মাথা নিচু করে নাস্তা খাচ্ছিলেন, জিনার প্রশ্ন শুনে মুখ তুললেন।
তোমরা তো দেখতে পাচ্ছি সারাদিনের কাজ জুটিয়েই ফেলেছ। আমি ভাবছি, আজ বোটটা নিয়ে আশপাশের দ্বীপগুলো একটু ঘুরে দেখে আসব।
আমাদের না নিয়েই? অবাক হলো জিনা। আপনার সঙ্গে আমরাও যেতে পারি। কাল না হয় এই দ্বীপ ঘুরে দেখা যাবে।
প্রথমবার আমি একাই যেতে চাই, বললেন ডিক। গম্ভীর। তোমাদের নিয়ে দ্বীপে-দ্বীপে ঘুরতে বেরোব আরেকদিন। আজ আমি একা যাব।
কী ব্যাপার, আঙ্কেল? জিজ্ঞেস করল মুসা। কিছু একটা ঘটেছে মনে হচ্ছে? কী সেটা?
কই, না, বললেন ডিক, কিছুই ঘটেনি। তোমাদের নিয়ে যাওয়ার আগে আমি নিজে আশপাশটা একটু দেখে নিতে চাই। তা হলে ভালো ভালো জায়গা তোমাদের ঘুরিয়ে দেখাতে পারব।
মোটর-বোট নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন ডিক কার্টার। ইঞ্জিনের শব্দ মিলিয়ে যেতেই বড় করে একটা শ্বাস ছাড়ল মুসা। বলল, মনে হয়, ওই অ্যারোপ্লেনের রহস্য ভেদ করতে গেলেন আঙ্কেল। কী যেন লুকাচ্ছেন আমাদের কাছে।
ভালোয় ভালোয় এখন ফিরে এলে বাঁচা যায়, বলল জিনা। নইলে আটকা পড়ব আমরা এই নির্জন দ্বীপে। কেউ জানবে না কোথায় আটকে আছি।
দিনটা আনন্দেই কাটল। উপত্যকার পাফিন কলোনি তো দেখলই, পাহাড়ে উঠে কাছ থেকে হরেক রকম পাখির প্রচুর ছবি তুলল রবিন। পুব পাহাড়ের মত পশ্চিম পাহাড়ের গায়েও কয়েকটা কার্নিশের নীচে গর্ত মত জায়গা দেখাল ওদের মুসা। বলল, ঝড় পশ্চিম থেকে এলে আমাদের আস্তানার চেয়ে এই জায়গাটা অনেক বেশি নিরাপদ। অসুবিধে একটাই-পানি
সারাদিন ওদের সঙ্গে সঙ্গে থাকল সখা-সখি। ওরা ডাঙায় হাঁটলে খানিক হেঁটে, খানিক উড়ে ওদের সঙ্গ দেয়; পানিতে নামলে ঝপাং করে পাশে নেমে সাঁতার

কাটে, ডুব দেয়।
কিকো বুঝে নিয়েছে, কিশোরের সঙ্গেই পাখি দুটোর যত আহ্লাদ আর ঘেঁষাঘেঁষি; মুসার প্রতি তেমন আগ্রহ নেই-তাই অনিচ্ছাসত্ত্বেও মেনে নিয়েছে ওদের উপস্থিতি। মুসার দিকে আসতে দেখলে কড়া ভাষায় তার পেটেন্ট ধমক মারে: নাক ঝাড়ো, গাধা কোথাকার! রুমাল কোথায় তোমার? অথবাঃ কতবার বলেছি তোমাকে পা মুছে ঘরে ঢুকতে? ব্যাড বয়! কিংবাঃ চুপ, একদম চুপ! চোপরাও! দূরো!
সাগরের তীর ধরে পুরো দ্বীপটা ঘুরে দেখে ফিরে এল ওরা নিজেদের আস্তানায়। সন্ধের আগেই সাপার খেয়ে নিল। আশা করছে এই বুঝি এসে পড়লেন আঙ্কেল। কিন্তু সূর্য ডুবে গেল, গোধূলির সব রঙ মুছে গেল পশ্চিমের আকাশ থেকে; ডিক কার্টারের দেখা নেই। তারা ফুটল আকাশে, তারপর চাঁদ উঠল-সাগরের পানিতে তৈরি হলো লম্বা এক ঝিলমিলে রুপালি আলোর পথ; তবু দেখা নেই ডিক কার্টারের।
সারাদিনের ঘোরাফেরায় ক্লান্ত শরীর, শুয়ে পড়ল ওরা যে-যার বিছানায়, কিন্তু চোখের পাতা এক করতে পারল না কেউই। রাত নয়টার দিকে বোটের আওয়াজ পেল প্রথমে মুসা, তার একমিনিট পর আর সবাই। টর্চ নিয়ে ছুট দিল ওরা লেগুনের দিকে।
আমরা তো ভাবলাম বুঝি পথ হারিয়ে ফেলেছেন! বলল জিনা অনুযোগের সুরে।
চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলে, তাই না? হাসল আঙ্কেল। না, পথ হারাইনি। আসলে দিনের বেলায় এই দ্বীপের কাছে আসতে সাহস পাইনি, পাছে অ্যারোপ্লেনওয়ালাদের কেউ দেখে ফেলে। আমি জানতাম, তোমরা চিন্তা করবে; কিন্তু উপায় ছিল না। তবে ফিরে তো এসেছি, তাই না?
কী লুকাচ্ছেন, আঙ্কেল? সরাসরি প্রশ্ন করল কিশোর। দিনে আসতে সাহস পাননি কেন? কেউ দেখে ফেললে কী ক্ষতি হোত?
একটু আমতা আমতা করে বললেন আঙ্কেল ডিক, ঠিক কী তা বলতে পারব না, কিশোর। তবে আমার ধারণা, গোলমেলে কিছু একটা চলছে এই দ্বীপের আশপাশে কোথাও। ভেবেছিলাম, পাখি দেখার ছলে এখানে-ওখানে টু মারলে, সারাদিন দ্বীপগুলোর কাছাকাছি ঘোরাফেরা করলে কিছু হয়তো চোখে পড়বে। কিন্তু কিছুই পড়ল না।
আপনার চোখে পড়েনি কিছু, বলল জিনা। কিন্তু আপনি নিজে কারও চোখে পড়েননি তো? কোনও দ্বীপ থেকে লুকিয়ে কেউ দেখেনি তো আপনার সন্দেহজনক ঘোরাফেরা?
কথাটা ঠিকই বলেছ, জিনা। একটু ঝুঁকি তো ছিলই। যদিও এই বিরান এলাকায় কেউ এসে ওদের গোপন কার্যকলাপে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারে, এই সম্ভাবনার

কথা একটি বারের জন্যে ওদের কারও মাথায় খেলবে, আমার তা মনে হয় না। নজর রাখার জন্যে লোক বসানোর প্রশ্নই ওঠে না।
তার পরেও আমার মনে হয়, আপনার এই ঝুঁকি নেয়া উচিত হয়নি, নিজের বক্তব্য থেকে নড়ল না জিনা। আপনি ইতিমধ্যেই একটা বিপদে আছেন। আপনার কিছু সন্দেহ হয়ে থাকলে কী জানতে হবে বুঝিয়ে দিয়ে আমাদেরকে পাঠাতে পারতেন। কারও কোনও সন্দেহ না জাগিয়ে আমরাই ঘুরেফিরে দেখে আসতে পারতাম।
একটু ইতস্তত করে কিশোরের দিকে ফিরলেন আঙ্কেল ডিক।
তোমার কী মনে হয়, কিশোর?
আমার মনে হয় জিনা যা বলেছে, ঠিকই বলেছে, সংক্ষেপে জবাব দিল। কিশোর।
আমারও তাই মনে হয়, মুসা বলল আরও কম কথায়।
যদিও এর আগে আমরা এ নিয়ে নিজেদের মধ্যে একটি শব্দও উচ্চারণ করিনি, বলল রবিন, আমারও তাই মত।
তা হলে তো দেখছি ভুলই হয়ে গেছে! বললেন ডিক কার্টার। আমার ভুলে তোমাদেরকেও বিপদে ফেলে দিলাম কি না ভাবছি এখন। যাই হোক, যা হবে মোকাবিলা করব। কী বলো?
সবাই একমত হলো এই ব্যাপারে। আঙ্কেলের খাওয়া হয়ে যেতেই শুয়ে পড়ল সবাই। আবহাওয়ায় আবার ফিরে এসেছে সেই গুমোট ভাবটা।
পরদিন রোদ উঠল কড়া। একটুও বাতাস না থাকায় ভ্যাপসা, গুমোট ভাব বাড়ল অনেক।
উপত্যকার মাঝামাঝি জায়গায় পাফিনের ছবি তুলছিল রবিন, বাকিরা ওকে পরামর্শ দিয়ে ছবির মান উন্নয়নের চেষ্টা করছিল, মাঝে মাঝে পোজ দিচ্ছিল পাখির পাশে বসে; এমনি সময়ে দেখা গেল একটা প্লেন আসছে সোজা এই দ্বীপের দিকে।
সবাইকে মাটিতে শুয়ে পড়তে বলে নিজেও শুয়ে পড়লেন ডিক কার্টার। মাথার উপর তিনটে চক্কর দিয়ে চলে গেল প্লেন।
তাঁবুটা মনে হয় দেখতে পায়নি, বলে উঠে বসলেন ডিক।
দেখে থাকলেও আমাদের করার কিছু নেই, বলল কিশোর।
এত থাকতে এই দ্বীপটাই পরীক্ষা করতে এল কেন? প্রশ্ন তুলল মুসা।
বোটটা, বলল রবিন। ওটা দেখা যাচ্ছে বহুদূর থেকে।
প্লেন দেখলেই এখন থেকে গা ঢাকা দিতে হবে আমাদের, বললেন। আঙ্কেল। আর ধোয়া উঠতে পারে এমন আগুন জ্বালানো যাবে না। খুঁজতে এসে যখন তিন-তিনবার চক্কর দিল, লক্ষণটা ভালো ঠেকছে না আমার কাছে।

দিনটা আনন্দেই কাটল, কিন্তু বেলা যতই বাড়ল, ততই বাড়ল গরম; খানিক পরপরই নামল ওরা সাগরে। কিশোরের সঙ্গে সখা-সখিও নামে, খেলে, ডুব দিয়ে মাছ ধরে আনে। বার কয়েক পানির নীচ থেকে উঠে কিশোরের মুখের দিকে চেয়েছে সখা। একবারও কিশোরের মুখে মাছ দেখতে না পেয়ে। হঠাৎ করেই বুঝে ফেলেছে সে, তার বন্ধু ডুব দিচ্ছে ঠিকই, কিন্তু মাছ ধরতে পারছে না একটাও। পরের বার লম্বা ঠোঁটে করে তিনটে মাছ সাজিয়ে নিয়ে এল সে কিশোরের জন্য, কিশোর না নেওয়া পর্যন্ত ছাড়ল না।

ভালোই হলো, কিশোর, হাসিমুখে বললেন আঙ্কেল, দিচ্ছে যখন নিয়ে নাও। সাপারে ভেজে খাওয়া যাবে।

খাওয়ার ভান করে পকেটে পুরল কিশোর মাছগুলো। যখন সাগর থেকে উঠল তখন ওর হাফপ্যান্টের দুই পকেট ভর্তি ডজনখানেক মাছ। সন্ধ্যায় খাওয়ার সময় লেজ ধরে ঝুলিয়ে একটা ভাজা মাছ সাধল কিশোর পাফিনদের। সখি মুখ ফিরিয়ে নিল, কিন্তু সখা গপ করে গিলে নিল ভাজা মাছটা। তারপর একটু দূরে গিয়ে বসল। তার মানে, আর খাবে না; ভাজা মাছ একটুও ভালো। লাগেনি তার, বন্ধু সেধেছে বলে অনুরোধে ঢেঁকি গিলেছে।

আকাশের দিকে চেয়ে চিন্তায় পড়লেন আঙ্কেল। মেঘের গতিবিধি সুবিধের ঠেকছে না। ঝড় বোধহয় এসেই গেল! বললেন তিনি। ভাবছি তবুটা টিকবে তো?

আকাশে মেঘ থাকায় আঁধার ঘনিয়ে এল আজ সন্ধে লাগতেই। খাওয়া সেরেই শুয়ে পড়ল ওরা। খানিক গড়িয়ে নিয়ে ঘড়ি দেখলেন ডিক কার্টার।

যাই, বললেন তিনি। রোজকার মেসেজ পাঠাতে হবে। ভালো কোন খবরও পেয়ে যেতে পারি। তোমরা ঘুমিয়ে পড়ো। আমার আধ ঘণ্টা থেকে এক ঘণ্টা লাগবে বড়জোর।

ঘুম জড়ানো গলায় মুসা জিজ্ঞেস করল, আমরা কেউ আসব সাথে?

না-না, কোনও দরকার নেই। আমি এই যাব আর আসব।

তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেলেন ডিক কার্টার। ডানার নীচ থেকে মাথাটা বের করে ঘাড় কাত করে দেখল কিকো, তারপর আবার ঘুমিয়ে পড়ল ডানার ভিতর মাথা গুঁজে।

এদিকে মোটর-বোটের ক্যাবিনে বসে অনেক চেষ্টা করেও হেড-অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছেন না ডিক কার্টার। আসন্ন ঝড়ের কারণে রেডিও থেকে কেবল সাই-সুই, খড়খড়-ঘড়ঘড় স্ট্যাটিক শব্দ আসছে। অথচ আজ খুবই জরুরি কিছু কথা আছে তার।

দশ মিনিট বিফল চেষ্টার পর সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি, এই খোলা জায়গা থেকে মেসেজ পাঠানোও যাবে না, রিসিভও করা যাবে না। প্রথম যেখানে বোট

ভিড়িয়েছিলেন সেই গোপন চ্যানেলে যেতে হবে। সেখানে জায়গাটার তিন দিক পাহাড় দিয়ে ঘেরা বলে যোগাযোগ করা খুব সম্ভব সহজ হবে।
ইঞ্জিন চালু করে সাবধানে সরু চ্যানেলের ভিতর ঢুকে পড়লেন ডিক কার্টার। বোটটা শক্ত করে বেঁধেই হুমড়ি খেয়ে পড়লেন ট্রান্সমিটারের উপর। রেডিওর নব নাড়াচাড়া করতে করতে একবার তার মনে হলো খোলা সমুদ্রের দিক থেকে অস্পষ্ট একটা শব্দ যেন এগিয়ে আসছে। এদিকে। ট্রান্সমিটার বন্ধ করে দিয়ে কান পাতলেন তিনি। বাতাস বাড়ছে, চোখা পাথরে বেধে শিসের মত শব্দ হচ্ছে। এ ছাড়া আর কোনও আওয়াজ কানে এল না।
আবার রেডিও অন করে মেসেজ পাঠালেন তিনি। হেড-কোয়ার্টার থেকে জরুরি একটা মেসেজের জন্য ট্রান্সমিটারের সামনে অপেক্ষা করতে বলা হলো। তাকে। ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করছেন ডিক কার্টার, সেই সঙ্গে নবগুলো সামান্য নেড়েচেড়ে ফাইন টিউন করবার চেষ্টা করছেন। এমনি সময়ে ডেকে পায়ের শব্দ পেয়ে চোখ তুললেন। ধরেই নিয়েছেন, তার দেরি দেখে ছেলেদের কেউ উঠে এসেছে বিছানা ছেড়ে।
মুখ ফিরিয়ে নিতে গিয়েও স্থির হয়ে গেলেন ডিক কার্টার। ক্যাবিনের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে ছেলেদের কেউ নয়, নাকের হাড় ভাঙা, কঠোর চেহারার এক দীর্ঘদেহী, কুৎসিতদর্শন লোক। আঙ্কেলকে দেখেই চমকে উঠল লোকটা, আঙ্কেলও চমকে গেছেন ওকে দেখে।
আরে! আপনি! বলে উঠল লোকটা। আপনি কী করছেন এখানে? কতটা জেনে ফেলেছেন…
কথা শেষ হওয়ার আগেই ঝপ দিলেন ডিক কার্টার। কিন্তু প্রস্তুত ছিল লম্বা লোকটা। সাঁই করে চালাল হাতের মোটা লাঠি। খটাশ শব্দে ছেলা চাদিতে পড়ল বাড়িটা। কাটা কলাগাছের মত মেঝেতে পড়লেন ডিক, তার আগেই জ্ঞান হারিয়েছেন।
পকেট থেকে একটা হুইসেল বের করে বাজাল কুৎসিতদর্শন লোকটা। প্রায় একই চেহারার গাট্টাগোট্টা আরেকজন এসে মাথা গলাল ক্যাবিনের দরজা দিয়ে।
দেখেছ কে? লাঠি দিয়ে ঠেলে ডিককে চিৎ করল প্রথম লোকটা। এখানে এই লোক! তাজ্জব কারবার না? তোমার কি মনে হয় কিছু সন্দেহ করেছে?
নিশ্চয়ই করেছে, তা নইলে এখানে কেন? বলল দ্বিতীয়জন। ঘ্যাশর ঘ্যাশর করে লাল দাড়ি চুলকাল। বেধে ফেলো ওকে নিয়ে গিয়ে কথা বলাতে হবে।
হাত-পা বেঁধে ছোট একটা ডিঙ্গি নৌকায় তোলা হলো ডিক কার্টারের জ্ঞানহীন দেহ। বেশ কিছুটা দূরে খোলা সাগরে বড়সড় একটা মোটর-বোট আলো নিভিয়ে

চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে নোঙর ফেলে। ডিঙ্গির দড়িদড়া খুলে, হাতে বৈঠা তুলে নিতে গিয়েও থমকাল প্রথমজন।
এর সঙ্গে আরও কেউ আছে বলে মনে হয়? জিজ্ঞেস করল সে দাড়িওয়ালাকে।
বোটে তো একা একেই পেলাম।
না, আর কেউ নেই, জবাব দিল দ্বিতীয়জন। গতকালও একাই ছিল, আর কাউকে দেখা যায়নি বোটে। থাকলে আমরা দেখতে পেতাম। ব্যাটা কাল রাত করে ফিরে ভেবেছে কাকপক্ষিও টের পায়নি কোথায় গেল। এদিকে আমরা যে সারাক্ষণ নাইটগ্লাস দিয়ে ওকে চোখে চোখে রেখেছিলাম, তা তো আর জানে না।
আমারও মনে হয় না আর কেউ আছে এর সঙ্গে, বলল প্রথম লোকটা। কিন্তু তার পরেও, বোটটা ভেঙেচুরে ডুবিয়ে দিলে হোত না?
ঠিক আছে, বলল লাল দাড়ি। কেবল ট্রান্সমিটার আর ইঞ্জিনটা। তা হলেই যথেষ্ট।
সীগালে উঠে একটা হাতুড়ি খুঁজে নিল লম্বা লোকটা। দুই ঘায়েই চুরমার হয়ে গেল ট্রান্সমিটার, ইঞ্জিনটা সম্পূর্ণ অকেজো করতে লাগল আট-দশ ঘা। ফিরে এসে হাতে বৈঠা তুলে নিল লোকটা। দুজন মিলে ডিক কার্টারের অচেতন দেহটা নিয়ে গিয়ে তুলল ওদের মোটর-বোটে। নোঙর তুলে নিয়ে রওনা হয়ে গেল বোটটা সোজা পশ্চিম দিকে। গোটা কয়েক রাত-জাগা সামুদ্রিক পাখি ছাড়া কেউ সাক্ষী রইল না এই ঘটনার।
*
পরদিন সকালে সবার আগে ঘুম ভাঙল মুসার, মায়ের ডাকে।
ওঠ, মুসা, কত ঘুমাস? স্কুলে যাবি না?
ধড়মড় করে উঠে বসে মুসা দেখল ওর মাথার কাছে রাখা ব্যাগের উপর থেকে ডাকছে ওকে কিকো। হাত বাড়িয়ে ওর ঝুঁটি চুলকে আদর করল মুসা। খুশি হয়ে কাঁধে এসে বসল কিকো।
এবার ঘাড় ফিরিয়ে মুসা দেখল কখন তাঁবুতে ঢুকে পড়েছে সখা-সখি। অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে বসে আছে ওরা দুজন কিশোরের মুখের দিকে চেয়ে।
অররররর! নরম গলায় ডাকল সখা।
চোখ মেলল কিশোর। সখা-সখিকে মুখের সামনে বসে থাকতে দেখে মুসার দিকে ফিরে হাসল ও। লাজুক হাসি। তারপর বলল, হ্যালো, মুসা। আঙ্কেলকে দেখছি না যে? আগেই উঠে পড়েছেন?
তাই তো মনে হয়, বলল মুসা। মনে হয় গোসল করতে গেছে। চলো, আমরাও যাই। অ্যাই, রবিন! অ্যাই, জিনা! ওঠ, কত ঘুমাস, ইস্কুল যাবি না?
হাসল জিনা। বলল, হ্যাঁ, এবার পড়তে বসো…
ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে কিকো বলল, পাঁচের পাতা খোলো সবাই। বলো…

কিকোর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ওরা সবাই একসঙ্গে বলে উঠল, বিএটি ব্যাট, সিএটি ক্যাট!
গুড বয়! গুড বয়! প্রশংসা করল কিকো, সেই সঙ্গে যোগ করল, বদমাস কোথাকার! রুমাল কোথায় তোমার?
সবাই তোয়ালে কাঁধে ফেলে ছুটল সাগরের দিকে। হেঁটে ওদের সঙ্গে পাল্লা দিতে না পেরে উড়ে চলল সখা-সখি। সাগর-তীরে আঙ্কেলকে না দেখে অবাক হলো ওরা।
এই সাত-সকালে গেল কোথায় আঙ্কেল? বলল জিনা। পরমুহূর্তে চমকে উঠল, হায়, খোদা! বোট গেল কই?
তাই তো! বোটটা গায়েব হয়ে গেছে! হাঁ করে চেয়ে রইল ওরা বোটটা যেখানে নোঙর করা ছিল সেই দিকে।
মনে হয় ট্রান্সমিশনের সুবিধা হবে মনে করে আমাদের সেই গোপন চ্যানেলে নিয়ে গেছে আঙ্কেল মোটর-বোট, বলল রবিন।
চলো, তা হলে গিয়ে দেখা যাক, বলল মুসা। আন্দাজের ওপর নির্ভর না করে আসলে কী হয়েছে জানা দরকার।
পাফিন কলোনি পেরিয়ে পাহাড়ে উঠল ওরা, তারপর সরু গিরিপথ পেরিয়ে পৌঁছল গোপন জেটির ধারে। দেখা গেল, ঢেউয়ের তালে তালে নিশ্চিন্তে দুলছে বোটটা ওখানে। ডেকের উপর না দেখে ওরা ধরেই নিল ক্যাবিনে রয়েছেন আঙ্কেল।
পাহাড়ের কার্নিশ থেকে খুব সহজেই ডেকে চলে এল ওরা। ক্যাবিনের খোলা দরজার সামনে এসে অবাক হলো ওরা-আঙ্কেল নেই ক্যাবিনে। তা হলে গেল কোথায়?
আশপাশেই কোথাও হয়তো গেছেন, এসে যাবেন এখুনি, বলল রবিন।
ঘুরে দাঁড়াতে গিয়েও থমকে গেল কিশোর। মুসার বাহুতে চাপ দিতে সে-ও ঘুরল। কী ব্যাপার, কিশোর?
চেয়ে দেখো! আঙুল তুলে রেডিওটা দেখাল কিশোর।
দেখল মুসা। ফিসফিস করে বলল, খোদা! কে করল! কেন? ক্যাবিনের ভিতরে ঢুকেই মেঝেতে রক্ত দেখতে পেল ও। তারপর চোখ পড়ল ইঞ্জিনের উপর। গুঙিয়ে উঠল মুসা।
ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেছে সবার। দৌড়ে চলে এল মুসার পাশে। কিছু বলতে হলো না, একনজর দেখেই বুঝে নিল সবাই কী হয়েছে। হাতুড়িটা পড়ে আছে। একপাশে। ভেঙেচুরে নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে ইঞ্জিনটা।

আঙ্কেল কোথায়? সরাসরি কিশোরকে প্রশ্ন করল জিনা। যেন সব প্রশ্নের উত্তর আছে ওর কাছে।
ধরে নিয়ে গেছে, বলল কিশোর। কাল রাতে কেউ এসেছিল এখানে। একটু ভেবে বলল, ওরা জানে না, আমরাও আছি আঙ্কেলের সঙ্গে, তাই আমাদের খোঁজ করেনি। যাই হোক, আমরা আটকা পড়ে গেছি এই দ্বীপে। একটাও মেসেজ পাঠাতে পারব না আমরা কোথাও। এই বোটের ইঞ্জিন বা রেডিও কারও কোনও কাজে আসবে না আর।
হ্যাচ তুলে দেখতে গেল কিশোর বোটের তলাটা আস্ত আছে কি না।
চোখে অবিশ্বাস নিয়ে চেয়ে আছে ওরা ভাঙা ইঞ্জিনটার দিকে। মনে হচ্ছে স্বপ্ন দেখছে বুঝি। জিনাকে দেখে মনে হলো কেঁদে ফেলবে এখুনি।
জিনার কাঁধে একটা হাত রাখল মুসা। হাসল অভয় দিয়ে।
ঘাবড়াও মাত, জিনা। কিশোর আছে আমাদের সঙ্গে। এর চেয়েও বড় বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়েছি আমরা এর আগে। পাইনি?
হ্যাঁ, মাথা ঝাঁকাল ও। ফ্যাকাসে চেহারায় রঙ ফিরে আসছে জিনার। মুসার দৃঢ় কণ্ঠে আত্মবিশ্বাস। ভয় দূর হয়ে গেল ওর অনেকখানি, আস্থা ফিরে পেল নিজের উপর। বলল, থ্যাঙ্কিউ, মুসা।
কীভাবে যেন পরিস্থিতির গুরুত্ব টের পেয়ে গেছে কিকো। চুপচাপ স্তব্ধ হয়ে বসে আছে মুসার কাঁধে, তাকাচ্ছে এর-ওর মুখের দিকে। এমনকী সখা সখিও গুরুগম্ভীর ভঙ্গিতে ডেকের উপর পাশাপাশি বসে চুপচাপ একদৃষ্টে দেখছে ওদেরকে।
কী করা যায় এখন? যদিও রবিন উচ্চারণ করল কথাটা, এ-প্রশ্ন ওদের সবারই। এখনই স্থির করতে হবে ওদের কর্মপন্থা।
ক্যাবিনের রিফ্রিজারেটার থেকে গোটাকয়েক ক্যাডবেরি চকোলেটের বার বের করে ফেলেছে মুসা। সবার হাতে একটা করে ধরিয়ে দিয়ে বলল, আমাদের প্রথম কাজ আজই এখান থেকে খাবারের টিনগুলো সরিয়ে নিয়ে গিয়ে কোথাও লুকিয়ে রাখা। বলেই কামড় দিল চকোলেটে। এক টুকরো ক্যাডবেরি কিকোকেও দিল ও।
কোথায় লুকাবে? জিজ্ঞেস করল, জিনা। গোটা দ্বীপে কোথাও লুকাবার কোনও জায়গা আছে?
আছে, হাসল মুসা। অসংখ্য বাসা আছে পাফিনের, ওদের গর্তে লুকিয়ে রাখব আমরা ক্যানগুলো।
আর দ্বিতীয় কাজ? ফিরে এসে প্রশ্ন করল কিশোর।
দ্বিতীয় কাজ পাহাড়ের মাথায় আগুন জ্বেলে ধোয়ার সিগনাল দেয়া।

কাকে সিগনাল দেয়া? শত্রুপক্ষকে? ভুরু কুঁচকে উঠল জিনার। আর কে আছে এই বিরান এলাকায় যে তোমার সিগনাল দেখে সাহায্য করতে আসবে?
হ্যাঁ, ধরা পড়বার ভয় আছে, বলল কিশোর। তবে সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনাও আছে। আমাদের খুঁজতে লোক আসবে এদিকে। আঙ্কেল কোনও মেসেজ পাঠাতে পেরে থাকলে তো আসবেই, না পারলেও আসবে।
এই কয়েকশো দ্বীপের মধ্যে ওরা কোথায় খুঁজে পাবে আমাদের?
যেখানে ধোয়া দেখা যাবে সেইখানে, বলে চওড়া হাসি দিল মুসা। যদি শত্রু এসে হাজির হয়, লুকাবার চেষ্টা ছাড়া আর কিছু করার নেই আমাদের।
কোথায় লুকাবে?
এবার উত্তর দিল কিশোর। ওরা এদিকে এলে ওদিকে, আর ওদিকে গেলে এদিকে।
খাবারের টিনগুলো বয়ে নিয়ে যাওয়ার কী দরকার? এখানে থাকলে...
স্রেফ চুরি হয়ে যাবে, বলল মুসা। কাল রাতে তাড়াহুড়োয় হয়তো দেখতে পায়নি। তবে দুই-একদিনের মধ্যেই আসবে আবার। তখন একটা টিনও রেখে যাবে না।
তা ছাড়া ওই টিনগুলো ওদের চেয়ে আমাদের অনেক বেশি দরকার, বলল রবিন। কেউ এসে উদ্ধার না করা পর্যন্ত টিকতে হবে তো আমাদের। কতদিন পর কেউ আসবে তা কে জানে!
তা হলে কাজ ভাগ করে নেয়া যাক, বলল কিশোর। মুসা আর আমি খাবারের টিন সরাব। জিনা আর রবিন সাগরের তীর থেকে ভেসে আসা কাঠের টুকরো কুড়িয়ে পাহাড়ে উঠে আগুন জ্বালার ব্যবস্থা করবে। ঠিক আছে?
কিছু আধ-ভেজা শৈবালও তুলে নিয়ো, পরামর্শ দিল মুসা। তা হলে ধোয়া হবে বেশি। জিনা আর রবিন রওনা হতে যাচ্ছিল, ওদের থামাল মুসা। আরে, যাও কই! আসল কথাটাই তো ভুলে বসে আছ। কাজ করতে হলে শক্তি লাগবে না? নাস্তা করেছ আজ?
খাওয়ার কথা ভোলে না মুসা। সবাই খেয়াল করল, সত্যিই তো, খাওয়ার কথা মনে ছিল না কারও। ওখানেই ডেকে বসে বিস্কিট, ভেড়ার মাংসের সিক কাবাব, পেয়ারার জেলি, ক্রাফটের পনির আর নেসলের কনডেন্সড মিল্ক দিয়ে নাস্তা সেরে নিল ওরা। তারপর প্রথমবারের মত চারটে ব্যাগে যত ক্যান আঁটে ভরে নিয়ে আস্তানার উদ্দেশে রওনা হলো চারজন। তাঁবুতে পৌঁছেই ভাগ হয়ে যাবে ওরা দুই দলে। দুজন হবে টোকাই, অপর দুজন কুলি।
পাহাড়ের চড়াই-উতরাই বাইতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠল ওরা সবাই। ঘেমে একেবারে নেয়ে উঠল। কখন হাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে খেয়াল করেনি। অসহ্য গুমোট গরম।

আকাশের দিকে চেয়ে দেখল কিশোর, ঝাপসা মেঘের আস্তরণের ওপাশে জ্বলছে সূর্য। চারপাশে কেমন যেন লালচে একটা ভাব।
একেকবারে তিনজনের বোঝা টানছে কিশোর ও মুসা, তাঁবুর পাশে ঢেলে রেখেই ছুটছে আবার, কিন্তু তারপরেও বোট সাফ করে সব টিন আনতে আনতে দুপুর হয়ে গেল। প্রতিবার ওদের সঙ্গে থাকল, কিকো। সখা-সখি তাঁবুতে পৌঁছেই ছুট দেয় সাগরের দিকে। ওখানে একটা-দুটো ডুব দিয়ে গোটা কয়েক মাছ গিলে নিয়ে উড়ে গিয়ে কিশোরের অপেক্ষায় বসে থাকে বোটে।
ওদিকে রবিন ও জিনা সাগরতীরে জোয়ার-রেখার উপর থেকে ভেসে আসা কাঠের টুকরো কুড়িয়ে দুই ব্যাগ ভর্তি করে নিয়ে গেল সমতল-মাথার এক পাহাড়ের চূড়ায়। প্রথম দিকে পাখিরা কলস্বরে আপত্তি জানালেও আগুন ও ধোয়া দেখে সরে গেল ওখান থেকে। জিনা আগুনটা ভালোমত জ্বালতে না জ্বালতেই আর এক ব্যাগ শুকিয়ে আসা শ্যাওলা নিয়ে হাজির হলো রবিন। মুসার কথাই ঠিক, শুকনো কাঠের আগুনে আধ-ভেজা শ্যাওলা পড়তেই দশগুণ বেড়ে গেল ধোয়া। এর পর থেকে ব্যাগ ভরে কখনও শুকনো কাঠ, কখনও আধ-ভেজা শ্যাওলা নিয়ে এল রবিন, আর সেসব ব্যবহার করে প্রচুর ধোয়া তৈরির দায়িত্ব নিল জিনা।
ঘন ধোয়ার স্তম্ভ সোজা আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে দেখে একগাল হাসল। মুসা। বলল, কারও না কারও চোখে পড়বেই, কী বলো, কিশোর?
মাথা ঝাঁকাল কিশোর। শত্রুপক্ষের চোখে আগে না পড়লেই বাঁচা যায়। কোনও বোট এদিকে আসছে দেখলেই লুকাতে হবে আমাদের...অবশ্য যদি লুকাবার জায়গা পাওয়া যায়।
সব খাবার আনা হয়ে গেলে পঞ্চাশটা গর্তে ঢুকিয়ে দিল ওরা দেড়-দুশো টিন। বাকিগুলো তাঁবুর পিছনের গুহায় রাখা হলো সাজিয়ে। তারপর রবিন ও জিনাকে সাহায্য করতে গেল ওরা পাহাড়চূড়ায়।
চোখ গরম করে তাকাচ্ছ কেন, জিনা? জিজ্ঞেস করল মুসা। আমরা আবার কী করলাম?
হাসল জিনা। জিজ্ঞেস করল, লাল হয়ে গেছে?
একদম। একেবারে ব্যোম ভোলানাথ! ওকে চুলোর সামনে থেকে সরে যাওয়ার ইঙ্গিত করল, দেখি, সরো। আমাকে একটু সুযোগ দাও তোমাদের ওপর চোখ গরম করবার। তোমরা লাকড়ি আনো। রাতেও কিছুক্ষণ আগুন। জ্বালতে হলে প্রচুর কাঠ দরকার।
কাঠের অভাব নেই। এসব সাগরের স্রোতে ভেসে আসা কাঠ। জোয়ার নেমে গেলে রয়ে যায় তীরে। ভরা কটালে আরও উপরে উঠে রোদে শুকিয়ে ঝনঝনে হয়ে

রয়েছে সব।
হয়েছে এবার, একগাদা কাঠ জমে যেতে বলল কিশোর। চলো, গোটা কয়েক ডুব দিয়ে এসে খেয়ে নেয়া যাক। তারপর বিশ্রাম। সন্ধের পর আবার জ্বালব আগুন।
দুই টিন স্যামন আর এক টিন টিউনা, সেদ্ধ গাজর আর রসে ডুবানো নাশপতি খোলা হলো। সেই সঙ্গে থাকল প্রচুর পরিমাণে মাখন দেওয়া বিস্কিট আর জেলে-বউয়ের ঘরে-তৈরি পনির। খেয়ে-দেয়ে ঢেকুর তুলবার মত শব্দ করে সবাইকে হাসাল কিকো। কিশোরের দুপাশে বসে সামান্য খেয়ে ভদ্রতা রক্ষা করল সখা-সখি। তারপর উড়ে চলে গেল সাগরে। জ্যান্ত মাছ ছাড়া চলে না ওদের।
বিকেল পাঁচটা থেকেই বাতাসের বেগ বাড়ল। ঢেউয়ের উচ্চতা ও আক্রোশও বাড়ছে সেই সঙ্গে পাহাড়ের গায়ে বাড়ি খেয়ে শব্দ তুলছে ঝপাস-ঝপাস। সামুদ্রিক পাখিগুলো বাসা ছেড়ে উঠে পড়েছে আকাশে। গলা ফাটিয়ে কলরব করছে। মহা ফুর্তি। একবারও পাখা না ঝাঁপটে শুধু ডানা মেলে বাতাসে গা ভাসিয়ে চলে যাচ্ছে এক-দুমাইল। মুসার কাঁধে বসে চুপচাপ বিরক্ত দৃষ্টিতে দেখছে ওদের কিকো। গাল বা গিলিমটের মত গ্লাইড করতে পারে না ও। বেশি বাতাস পছন্দও করে না। বাতাস আরও বাড়ল। তাঁবুর ফ্ল্যাপদুটো পাখির ডানার মত ঝাঁপটাচ্ছে বাতাসে, উড়িয়ে নিয়ে যেতে চায় আকাশে, একটু পরপরই টান দিয়ে উপড়ে তুলতে চাইছে খুঁটিগুলোকে।
পশ্চিম দিগন্ত থেকে উঠে আসা রাগী চেহারার কালো মেঘের আড়ালে চলে গেছে সূর্য। বাতাসের বেগ বাড়ছে। বোঝা যাচ্ছে বাড়বে আরও। তাঁবুর খুঁটিতে হেলান দিয়ে মেঘের খেলা দেখছে মুসা। ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, এল তা হলে! গত কদিন ধরে আসব আসব করছিল যে তুফান।
রাতে বাড়বে আরও, যেন আবহাওয়ার পূর্বাভাষ প্রচার করছে, এমনি ভাবে বলল রবিন। তাঁবুটা উড়িয়ে না নিয়ে যায়! লক্ষণ তো তেমন একটা সুবিধের লাগছে না।
এই কথাটা রেডিওতে প্রচার না করে যদি পেপারে ছাপতে, তা হলে বাচতাম, বলল মুসা।
কী করে বাঁচতে?
পেপারে ছাপলে আজ আর ঝড়ই উঠত না, জানাল মুসা। আবহাওয়া অফিস যা বলে, হয় ঠিক তার উল্টোটা। কেন জান?
কেন? জিজ্ঞেস করল জিনা।
খোদার ওপর খোদকারি পছন্দ করেন না খোদা। রোজ সকালে উঠেই পেপারটা নিয়ে বসেন। যদি দেখেন লিখেছে প্রচণ্ড ঝড়-তুফান হবে, বজ্র-বিদ্যুৎ সহ মাঝারি থেকে ভারী বর্ষণ ইত্যাদি... সঙ্গে সঙ্গে মেজাজ খিঁচড়ে যায় তার, দাঁত কিড়মিড় করে বলেন; দাঁড়া দেখাচ্ছি! দেখি কী করে ঝড় ওঠে!

এতক্ষণে বুঝলাম, বলল কিশোর, কেন এ-কয়দিন আসি-আসি করেও আসতে পারেনি তুফানটা। পেপারওয়ালারাই তা হলে এতদিন ঠেকিয়ে রেখেছিল! এই বলে বাইরে গিয়ে তাঁবু টাঙানোর খুঁটিগুলো আবার একবার পরীক্ষা করে দেখে এল। নাহ, যথেষ্ট শক্তই মনে হচ্ছে। যতবড় ঝড়ই আসুক মুসার গাড়া খুঁটি তুলতে পারবে না।

যে-যার টর্চ হাতের কাছে রাখো, ঘোষণার ভঙ্গিতে বলল রবিন। যখন তখন দরকার হতে পারে।

দেখতে দেখতে রাত আটটা বেজে গেল। ঘণ্টাখানেক আগেই চারদিক আঁধার হয়ে আসায় সখা-সখি বিদায় নিয়ে নিজেদের গর্তে গিয়ে ঢুকেছে। সাড়ে আটটার দিকে হালকা কিছু খেয়ে নিয়ে সকাল-সকাল বিছানায় গেল তিন গোয়েন্দা ও জিনা। চোখ বুজে শুনছে হু-হুঁ হাওয়ার মাতম, আর পাথুরে পাড়ে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের ভয় জাগানো ঝপাস-ঝপাস শব্দ।

ঘুমাতে যাও, পাজি ছেলে, ঘুমাতে যাও! কিকোর গলা নকল করে বলল রবিন।

সঙ্গে সঙ্গে ধমকে উঠল মুসার মাথার কাছ থেকে কিকো, চোপরাও! বোকার মত কথা বোলো না! যাও, হাত-মুখ ধুয়ে পড়তে বসো!

হেসে উঠল সবাই।

পরমুহূর্তে চমকে উঠে বসল ওরা মেঘের বিকট গর্জনে। মনে হলো। হাজারটা কামান গর্জে উঠেছে একসঙ্গে। হঠাৎ করেই কয়েকগুণ বেড়ে গেল বাতাসের বেগ। ভয় পেয়ে মুসার কাঁধে এসে বসল কিকো। ওর ঝুঁটিতে হাত বুলিয়ে অভয় দিল মুসা।

আরে! ভিজে গেলাম তো! বলে উঠল কিশোর। বৃষ্টি ঢুকছে কোথা দিয়ে?

ঝিলিক দিল বিদ্যুৎ। মুহূর্তের জন্য জলজ্যান্ত ভেজা পাহাড় আর তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সাগরটা দেখতে পেল ওরা দিনের মত স্পষ্ট, তারপরই ছবিটা মিলিয়ে গিয়ে অন্ধকার হয়ে গেল সব আবার। কড়াৎ করে বাজ পড়ল এইবার।

ফড়াৎ-ফড়ৎ ডানা ঝাঁপটাচ্ছে তাঁবুর ফ্ল্যাপদুটো।

গেল বুঝি তাঁবুটা! বলল জিনা।

না, দ্বিমত প্রকাশ করল কিশোর। খুঁটিগুলো খুবই শক্ত করে লাগিয়েছি। মুসা আর আমি! এত সহজে…

বলতে না বলতেই জোর বাতাসে ফুলে ফেঁপে উঠল তাঁবুটা, চটাস করে চপেটাঘাতের মত ফ্ল্যাপের বাড়ি লাগল মুসার গালে, তারপর হুশ করে উড়ে চলে গেল তাঁবু, পাগলা হাওয়ার সঙ্গে উধাও হয়ে গেল রাতের অন্ধকারে।

যাহ!

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে বিছানার উপর বসে থাকল ওরা খোলা আকাশের নীচে। মাথার উপর উড়ন্ত মেঘ ছাড়া কিছু নেই। সই-সাঁই বইছে বাতাস। অঝর বৃষ্টিতে ভিজছে সবকিছু।
সবার আগে বিহ্বলতা কাটিয়ে উঠল মুসা। টর্চ জ্বেলে দেখল, কার্নিশের নীচে গুহামত জায়গাটাও ভিজছে সমানে।
আর বসে থেকে কী হবে? বলল ও বিছানা ছেড়ে উঠতে উঠতে, চলো দেখি পশ্চিম-পাহাড়ে আশ্রয় পাওয়া যায় কি না। কিংবা সীগালে।
মুসার হাতে টর্চ জ্বলে উঠতেই সম্বিত ফিরে পেয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে সবাই। ঝটপট গ্রাউন্ডশীট সহ যে-যার বিছানা তুলে নিয়ে চাদরের মত করে গায়ে মাথায় জড়িয়ে নিয়ে ছুটল ওরা মুসার পিছন পিছন। বৃষ্টি তো না, যেন বরফগলা পানি পড়ছে আকাশ থেকে। অল্পক্ষণেই শীতে কাপ ধরে গেল ওদের শরীরে।
মুহুর্মুহুঃ বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে বলে টর্চের আলো ফেলবার দরকার পড়ছে না। পাফিন কলোনির উপর দিয়ে সী-পিঙ্ক আর হিদার মাড়িয়ে যত দ্রুত সম্ভব চলেছে ওরা পশ্চিমে। মুসার ঠিক পিছনেই রয়েছে জিনা, ওর চাদরের একটা অংশ খামচে ধরে রেখেছে। হঠাৎ একটা টান অনুভব করল ও। হাত থেকে ছুটে গেল চাদর। হাওয়ার হুঙ্কার ছাপিয়ে অস্পষ্ট একটা আর্তনাদ কানে এল। যেন। ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল জিনা।
মুসা! মুসা-আ! কী হলো?
কোনও উত্তর নেই। কিশোর ও রবিন এসে পৌঁছল। কী হয়েছে? মুসা। কোথায়?
কিশোরের হাতে জ্বলে উঠল টর্চ। মুসা নেই সামনে কোথাও। চারপাশে আলো বুলিয়েও দেখা গেল না ওকে। এই ছিল, এই নেই-আচমকা গায়েব হয়ে গেছে মুসা। রবিন ভাবছে, তুফানে উড়িয়ে নিয়ে গেল?
মুসা! মুসা! চেঁচিয়ে ডাকল কিশোর। উত্তরে কানে এল শুধু বাতাসের হাহাকার ধ্বনি। এবারে সবাই মিলে তারস্বরে হাঁক ছাড়ল ওরা মুসার নাম। ধরে।
কিশোরের মনে হলো আবছা ভাবে কানে এল মুসার গলা। কিন্তু কোনদিক থেকে? আবার আওয়াজটা এল, মনে হলো কিশোরের পায়ের কাছ থেকে আলোটা নীচের দিকে ফেলেই ভয়ে আতা উড়ে গেল কিশোরের। সী-পিঙ্ক আর আগাছার মাঝখানে মুসার কল্লাটা পড়ে আছে কেবল, ধড়টা নেই! ভয়ে আঁতকে উঠল জিনা।
দেখা গেল ঝকঝকে সাদা দাঁত বের করে হাসছে মুসার কাটা মুণ্ডু। চেঁচিয়ে উঠে দৌড়ে সরে গেল জিনা কয়েক পা। তাই দেখে রবিনও পিছিয়ে গেল কয়েক কদম। মাথার পাশে বসেই ব্যাপারটা টের পেল কিশোর।
চোট লাগেনি তো, মুসা? জিজ্ঞেস করল কিশোর।

না। তোমার টর্চটা দাও। আমারটা ছুটে গেছে হাত থেকে। মনে হচ্ছে বেশ বড়সড় একটা গর্তে পড়েছি। দেখি, এখানেই আমাদের সবার জায়গা হয়ে যেতে পারে।
কিশোর হাতের টর্চটা দিল মুসাকে। রবিনের টর্চের আলোয় দেখা গেল অদৃশ্য হয়ে গেছে মুসার কাটা মুণ্ডুটা। একপা-দুইপা করে এগিয়ে এল জিনা ও রবিন। আগাছার ফাঁকে মাটিতে গর্ত দেখে বুঝতে পারল ঘটনাটা কী ঘটেছে। জানে পানি এল এতক্ষণে। হেসে উঠল ওরা স্বস্তি ফিরে পেয়ে।
সী-পিঙ্ক আর আগাছার ফাঁকে আবার দেখা দিল মুসার মুণ্ডু।
হ্যাঁ। বিরাট গর্ত, বলল ও, সবার জায়গা হবে। একে একে নেমে এসো তোমরা।
প্রথমে জিনা, তারপর নামল রবিন। মুসার টর্চটা মাটিতে পড়ে আছে দেখতে পেয়ে ওটা হাতে নিয়ে নামল কিশোর। টর্চের আলোয় গর্তের ভিতর চারপাশ দেখে খুশি হলো সবাই। ঝড় তুফান থেকে বাঁচতে হলে এই জায়গার তুলনা নেই।
মনে হয়, খরগোশ আর পাফিন মিলে তৈরি করেছে এই গর্ত, বলল রবিন। ওই দেখো, কয়েকটা সরু গর্ত দেখা যাচ্ছে পাফিনের, এখান থেকে বেরিয়ে গেছে বাইরের দিকে।
নাহ, বলল মুসা। আগেই এই গর্তটা ছিল। ওরা খুঁড়ে ওপরের মাটি ভুসকা করে রেখেছে বলে পড়ে গেছি। যেভাবেই হোক, একটা আশ্রয় পাওয়া গেছে কপাল গুণে। একফোঁটা বৃষ্টি ঢুকছে না, মনে হয় নিশ্চিন্তে ঘুমানো যাকে এখানে।
সারাদিনের পরিশ্রমের পর ক্লান্তির শেষ সীমায় পৌঁছে গিয়েছে ওরা সবাই। এখানে ঢুকে ঝড়-বৃষ্টি-বজ্র-বিদ্যুচ্চমক মনে হচ্ছে অনেক দূরের কোনও ব্যাপার। হচ্ছে, হোক। মাটিতে বিছানা ফেলে শুয়ে পড়ল ওরা, ঘুমিয়ে পড়তেও দেরি হলো না একটুও।
*
বেঘোরে ঘুমাল ওরা সারাটা রাত। পরদিন বেশ বেলা হয়ে গেল উঠতে মাটির নীচে অন্ধকার বলে টের পায়নি কখন সকাল হয়েছে। তা ছাড়া ক্লান্তও ছিল খুব।
সবার আগে ঘুম ভাঙল জিনার। প্রথম কিছুক্ষণ ও বুঝতেই পারল না কোথায় আছে। সামান্য আলো আসছে মাথার উপরের গর্ত দিয়ে।
অররররর! নিচু, মোটা গলার আওয়াজ এল। চমকে উঠে বসল জিনা। আবার আওয়াজ হলো, অররররর! অঅ, ককক!
টর্চ জ্বালল জিনা। দেখা গেল দুটো পাফিন নেমে এসেছে ঢালু গর্ত বেয়ে, ওদেরকে এখানে দেখে অবাক হয়েছে। আলোটা পছন্দ না হওয়ায় চলে গেল ওরা গর্ত বেয়ে উপরে।
গুড মর্নিং, এভরিবডি! বলল মুসা। উঠে বসল বিছানায়। অবশ্য এখন যদি মর্নিং হয় তবেই। বলা যায় না, দুপুরও হতে পারে। যা খিদে লেগেছে!

সবাই উঠে পড়ল ওরা।
ইশ! বলে উঠল জিনা, তবুটা উড়ে যাওয়ায় কী সাঙ্ঘাতিক ভয় যে লেগেছিল…
তারচেয়ে বেশি ভয় পেয়েছিলে আমার গলাকাটা মুণ্ডু দেখে, বলল মুসা।
হেসে উঠল সবাই।
আমিও, বলল রবিন। বাপ-রে! তুমি ওই বিটকেল হাসিটা না দিলেও পারতে!
আবার হাসল ওরা মুসার সেই হাসিটা কল্পনার চোখে দেখে।
আরে! পড়ে গিয়ে আমি মরি আমার জ্বালায়, আর একেকজন দৌড় দিচ্ছে একেক দিকে! হাসব না তো কী?
বাইরে থেকে কোনও আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে না, বলল কিশোর। মুসা, তোমার কাটা মুণ্ডুটা একটু উঁচু করে দেখো তো বাইরের কী হাল।
গর্ত দিয়ে মাথা তুলেই চেঁচিয়ে উঠল মুসা, কোথায় ঝড়-বৃষ্টি-অন্ধকার? পরিষ্কার নীল আকাশ। চারপাশে ঝলমলে রোদ। চলো, চলো, বেরিয়ে পড়ি!
আগাছা সরিয়ে দিতেই রোদ এসে পড়ল গর্তের ভিতরে। চট করে ঘড়িটা দেখে নিয়ে কিশোর বলল, দশটা বাজে। চলো, দেখা যাক ক্ষয়-ক্ষতি কী হলো।
প্রথমে ঠেলে তোলা হলো মুসাকে, তারপর টেনে তুলল ও একে একে সবাইকে। আগাছাগুলোকে একটু টেনে-টুনে দিতেই অদৃশ্য হয়ে গেল গর্তটা। বাইরে থেকে বুঝবার উপায় নেই কোথায় ওটা। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রবিন বলল, দারুণ একটা লুকাবার জায়গা পাওয়া গেছে তো! থ্যাংকিউ, মুসা! ভাগ্যিস কাল কাটা পড়েছিলে!
সবার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।
সত্যিই! বলল জিনা। শত্রু এলে আমরা এখানে লুকাতে পারব। একটু দ্বিধায় পড়ল ও, কিন্তু লুকাব যে, মুখটা খুঁজে পাব তো? আমি তো এখনই হারিয়ে ফেলেছি জায়গাটা!
আমি হারাইনি, বলল মুসা। দাঁড়াও, চিহ্ন দিয়ে রাখি। একটা ঝোঁপের ডালে সাদা রুমাল বাঁধল ও। বেশ কয়েক গজ দূর থেকেও দেখা যাচ্ছে রুমালটা। হারালে চলবে না। আমাদের তাঁবুটা যদি খুইয়ে থাকি, তা হলে হয়তো এখন থেকে এখানেই রাত কাটাতে হবে আমাদের। খানিকটা দূরে সরে গিয়ে গোটা উপত্যকার উপর চোখ বুলিয়ে বুঝে নিল গর্তটার সঠিক অবস্থান, তারপর ঘুরে হাঁটা ধরল আস্তানার দিকে।
আগে দুটো ডুব দিয়ে নিলে হোত না? প্রস্তাব পেশ করল রবিন। কাদা মেখে একেবারে নোংরা হয়ে গেছি।
কোনও জবাব না দিয়ে চলতে চলতেই ঘুরে গেল মুসা সাগরের দিকে। কী শান্ত দেখাচ্ছে আজ সাগরটাকে! অথচ গতরাতে বিজলির আলোয় একমুহূর্তের দেখা

উত্তাল সাগরের সেই ভয়ঙ্কর ছবিটা জীবনে ভুলতে পারবে না ওরা।
দূর থেকে ওদের দেখে উড়ে চলে এল সখা-সখি। কুশল জিজ্ঞেস করল, অররররররর! অররররররর!
কিশোরের পাশে পানিতে নামল ওরাও। গোসল শেষে নাস্তা খেতে চলল ওদের সঙ্গে। পটেড মিট খুব পছন্দ সখা-সখির।
যেখানে তাঁবু ছিল, সেইখানে এসে বসল ওরা নাস্তা খাওয়ার জন্য। পেয়ালা-বাসন, চামচ, কাটা যেখানে যা ছিল সেইখানেই পাওয়া গেল সব। কার্নিশের নীচে সাজানো খাবারের টিনগুলোও পাওয়া গেল যেটা যেখানে ছিল। শুধু তাঁবুটা নেই।
পেট পুরে খেয়ে নিল ওরা, তারপর লেগে পড়ল কাজে। প্রথম কাজ: ভেজা জামা-কাপড়-বিছানা-চাদর রোদে দিয়ে শুকিয়ে নেওয়া। তবে প্রধান কাজ: চোখ-কান খোলা রাখা। সাগরে কোনও বোট বা আকাশে উড়োজাহাজ দেখলেই গা ঢাকা দিতে হবে ওদের।
ভেজা কাপড় কড়া রোদে শুকাতে দিয়ে আগুনের কী অবস্থা দেখতে গেল ওরা পাহাড়ের মাথায়। নিভে গেছে আগুন, কাঠগুলোও ভেজা। ওগুলোও শুকাবার জন্য ছড়িয়ে দিল ওরা। স্থির হলো, বিকেলে আবার জ্বালা হবে আগুন। তার আগে আরও কিছু কাঠ ও শ্যাওলা সগ্রহ করতে হবে, খুঁজে দেখতে হবে তাঁবুটা, আর দেখে আসতে হবে ওদের বোটের কী অবস্থা।
একে একে সব কাজই সারা হলো। তবুটা পাওয়া গেল না দ্বীপের কোথাও। রবিন বলল, হয়তো মাইলের পর মাইল উড়ে অন্য কোনও দ্বীপে গিয়ে পড়েছে ওটা-ভয়ে পালিয়েছে দ্বীপের সব পাখি। আজ রাতে কি আমরা আবার ওই গর্তে গিয়ে ঢুকব?
আকাশের দিকে চেয়ে মাথা নাড়ল কিশোর। বৃষ্টি আসার কোনও লক্ষণ নেই। গর্তের ভেতর কেমন যেন ভ্যাপসা গরম, আমরা খোলা আকাশের নীচে বিছানা পাতব।
প্রচুর কাঠ নিয়ে গিয়ে তোলা হলো পাহাড়ের মাথায়। জামা-কাপড় শুকিয়ে গেলে ভাজ করে গ্রাউন্ডশীট দিয়ে ঢেকে রাখা হলো। আগুনটা ভালো মত ধরে যেতেই অল্প অল্প করে ভেজা শৈবাল আর সী-পিঙ্ক ছাড়া হলো ওতে। ঘন, সাদা ধোয়া উঠল আকাশের দিকে।
নীল সাগরের উপর চোখ বুলাচ্ছিল রবিন, হঠাৎ বলে উঠল, দেখো তো, মুসা; কী ওটা, পানিতে ভাসছে? এদিকেই আসছে মনে হয়। কাঠ হলে, জ্বালানো যাবে।
জাহাজ ভাঙা মনে হচ্ছে, খালি চোখে দেখে বলল মুসা। তারপর চোখে তুলল বিনকিউলার। গম্ভীর হয়ে গেল ওর চেহারা। বলল, ওটা সীগালের কাঠ, রবিন।

আরও অনেকগুলো টুকরো দেখা যাচ্ছে আশপাশে। জোয়ারের ঢেউয়ে ঢেউয়ে এগিয়ে আসছে এদিকে।
একটু আগে খেয়াল করলে আমরা হয়তো বাঁচাতে পারতাম বোটটাকে, বলল কিশোর।
কীভাবে? জিজ্ঞেস করল জিনা। ইঞ্জিনটা তো চুরমার করে দিয়ে গিয়েছিল ওরা?
হয়তো পাল টাঙিয়ে ওটা আমরা সরিয়ে আনতে পারতাম। যাক গে, যা হবার তা তো হয়েই গেছে। এখন আর কিছু করার নেই।
সন্ধের একটু আগে কান খাড়া করল মুসা।
আবার অ্যারোপ্লেনের শব্দ পাচ্ছি!
কাউকে বলতে হলো না কোনদিকে তাকাতে হবে। সবাই একসঙ্গে ঘুরে গেল পশ্চিমে। রবিন-মুসা দুজনেই বিনকিউলার তাক করল ওই দিকে।
কী একটা ফেলল প্লেনটা। কী ওটা, মুসা? প্যারাশুট?
হ্যাঁ, ছোট একটা প্যারাশুট, বলল মুসা। কী যেন ঝুলছে নীচে, দুলছে এদিক-ওদিক। মানুষ? না। তা হলে কী? ওই জায়গায় কী ফেলছে ওরা প্যারাশুটে ঝুলিয়ে? নিশ্চয়ই ওখানেই কোথাও শত্রুদের আস্তানা। ওরা আমাদের ধোয়া দেখতে পাচ্ছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কালই যদি এখানে সার্চপার্টি পাঠায় আমি অবাক হব না। তুমি কী বলো, প্রধান?
ঠিক। কাল সারাদিন পালা করে পাহারা দিতে হবে, বলল কিশোর।
ডিক কার্টার বলেছিলেন, শোনো, গোয়েন্দাসকল! মনে করিয়ে দিল জিনা, ছুটি কাটাতে এসেছি আমরা এবার এখানে, গা শিউরানো কোনও রোমহর্ষক রহস্যের খোঁজে নয়। রহস্য-রোমাঞ্চ অনেক হয়েছে। গত তিন তিনবার যখনই আমরা একসঙ্গে হয়েছি, ঘাড়ে চেপে গেছে বিপদ আর ভয়ঙ্কর সব অভিজ্ঞতা। এইবার অন্তত আমরা ছুটিটা কাটাতে চাই শান্তিতে।
মনে হচ্ছে, মৃদু হেসে বলল রবিন, চতুর্থবারেও জড়িয়ে গেলাম আমরা। গা শিউরানো বিপদ আর রোমহর্ষক কোনও রহস্যের জালে।
আশপাশে শত্রু আছে জানি, বলল রবিন। তারপরেও আমরা আগুন জ্বেলে চলেছি কেন? আমরা কি ওদেরও ইনভাইট করছি?
না, বলল কিশোর। উদ্ধার পেতে হলে আমাদের কোনও না কোনও বিপদসঙ্কেত পাঠাতেই হবে। আঙ্কেলের সিগনাল বন্ধ হয়ে গেছে পরশু রাত থেকে। আমাদের খোঁজে ওঁর ডিপার্টমেন্ট থেকে কেউ না কেউ আসবেই, ধোয়া দেখলে বোট ভিড়াবে এই দ্বীপে।
আর শত্রু এসে বোট ভিড়ালে? প্রশ্ন তুলল জিনা, উত্তরটাও নিজেই দিল। আমরা লুকিয়ে থাকব মুসা যেখানে কল্লা হারিয়েছে, সেই গর্তে। কিন্তু...তন্নতন্ন। করে

খুঁজবে ওরা গোটা দ্বীপ।
খুঁজবে, তবে অত বেশি না, জবাব দিল কিশোর। কাউকে না দেখলে ধরেই নেবে, আঙ্কেলের লোকজন এসে আগেই উদ্ধার করে নিয়ে গেছে। আমাদের।
যুক্তিটা পছন্দ হলো সবারই। আতঙ্ক দূর হয়ে গেল সবার মন থেকে। সন্ধে পর্যন্ত ধোয়ার জন্য শ্যাওলা আর সী-পিঙ্ক ফেলল ওরা আগুনে। তারপর ধোয়া যখন আর দেখা যাবে না, তখন আগুনের উপর অনেকগুলো কাঠ চাপিয়ে দিয়ে নেমে এল ওরা ক্যাম্পসাইটে।
খাওয়া-দাওয়া সেরে চলে এল ওরা মুসার গর্তের কাছে। গর্ত থেকে বেশ কিছুটা দূরে ঘন হিদারের উপর গ্রাউন্ডশীট বিছিয়ে শুয়ে পড়ল ওরা খোলা আকাশের নীচে। আকাশ ভরা ঝলমলে তারা, মৃদুমন্দ হাওয়া আর দূর থেকে ভেসে আসা সাগরের শব্দে ভারী হয়ে এল ওদের চোখের পাতা। একটু দেরি করে চাঁদটা যখন উঠল, ওরা তখন গভীর ঘুমে অচেতন।
পরদিন আবহাওয়া আরও সুন্দর। রবিনকে ছবি তুলবার ছুটি দিয়ে আগুনের পরিচর্যায় থাকল কিশোর আর জিনা। উপত্যকায়, পাহাড়ের উপর, ব্যালকনিগুলোতে গিয়ে কাছ থেকে হরেক জাতের পাখির হরেক পোজের ছবি তুলল রবিন মনের সুখে। আর বিনকিউলার নিয়ে মুসা গিয়ে বসে থাকল সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ের চূড়ায়। দ্বীপের চারপাশের সাগর বহুদূর পর্যন্ত দেখা যাবে ওখান থেকে। এদিকে কোনও বোট আসতে দেখলেই ও সাবধান করবে সবাইকে। যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে লুকিয়ে পড়বার।
আমাদের আস্তানায় কার্নিশের নীচে রাখা টিনগুলো সরিয়ে না ফেললে কেউ এলেই দেখতে পাবে, বলল জিনা।
খুব খাটনির কাজ, বলল কিশোর। ওগুলো না সরিয়ে আগাছা দিয়ে ঢেকে দিলে কেমন হয়?
দি আইডিয়া! বলল জিনা। আমি এখনই গিয়ে ঢেকে রেখে আসছি।
এত সুন্দর করে ঢাকল যে রবিনকে ডিউটিতে বসিয়ে রেখে আস্তানায়। ফিরেই হায়-হায় করে উঠল মুসা।
আরে! আমাদের খাবারের টিনগুলো গেল কোথায়? আর এই আগাছাগুলোই বা এখানে জন্মাল কখন?
কয়েকটা ঝোঁপ সরিয়ে ওকে তলার টিন দেখানো হতেই শত মুখে প্রশংসা করল মুসা জিনার। ওর নাকি মনে হয়েছিল এই আগাছা ওখানে সবসময়েই ছিল, খেয়াল করেনি ও।
বোঝা গেল, ওগুলো কারও চোখে পড়ে যাওয়ার ভয় নেই।

দুই দিন পেরিয়ে গেল কোনও উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছাড়াই। একবার শুধু। প্লেনের আওয়াজ পাওয়া গিয়েছিল, দেখা যায়নি। সীগালের ভাঙা কাঠের টুকরো ভেসে এল আরও অনেকগুলো। ওরা গোসল করছে, খাচ্ছে, ঘুমাচ্ছে, যে-যার ডিউটি পালন করছে নিয়ম ধরে। কিকো কাছে কাছে থাকে মুসার, কিশোরের পায়ে পায়ে ঘোরে সখা-সখি।

একবার আরেকটা পাফিন কিশোরের খুব কাছে চলে আসায় পাফিনের লড়াই দেখবার সুযোগ পেয়ে গেল ওরা। অররররর! ডাক ছেড়ে প্রথমে হুঁশিয়ার করল ওটাকে সখা, তারপরও কথা শুনছে না দেখে রাজহাঁসের ভঙ্গিতে গলা লম্বা করে মাথা নিচু করে ছুটে গেল সে আগন্তুকের দিকে। সেটাও একই ভঙ্গিতে আক্রমণ প্রতিহত করবার প্রস্তুতি নিল। দুজনই কামড়ে ধরল পরস্পরের চঞ্চ, তারপর শুরু হলো পাছড়া-পাছড়ি। মিনিট তিনেক চলল বাঘে-মোষে লড়াই, তারপর হঠাৎ রণে ভঙ্গ দিয়ে ছুটে পালিয়ে গেল সখার প্রতিদ্বন্দ্বী। ফিরে এসে বসল বিজয়ী কিশোরের পাশে, একদৃষ্টে চেয়ে রইল ওর মুখের দিকে।

তৃতীয় দিন দুপুরে দেখা গেল বোট। খাওয়া-দাওয়ার পর পাহাড়ের মাথায় পাহারায় ছিল মুসা। একটু বাতাস উঠেছে আজ। অলস দৃষ্টিতে ঢেউয়ের মাথায় সাদা ফেনা দেখছিল ও একটা পাথরে হেলান দিয়ে বসে। ভাবছিল আঙ্কেলের কথা। কোথায় এখন আঙ্কেল ডিক? শত্রুর কবল থেকে পালাতে পেরেছেন? ওদেরকে উদ্ধার করবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন এখন? না কি খুন হয়ে গেছেন ওদের হাতে?

হঠাৎ দূর-সাগরে সামান্য নড়াচড়া চোখে পড়ল ওর। মুহূর্তে সোজা হয়ে বসল মুসা। হাতে চলে এসেছে বিনকিউলারটা। চোখে তুলে ফোকাস অ্যাডজাস্ট করতেই পরিষ্কার দেখতে পেল ও বোটটা। ছোট একটা মোটর বোট। সোজা আসছে এই দ্বীপ লক্ষ্য করে।

এতদিনে আসছে শত্রুপক্ষ! ভাবল মুসা। উঠে দাঁড়াতে গিয়ে বসে পড়ল আবার। ওরাও ফিল্ডগ্লাস দিয়ে তাকিয়ে নেই তো এদিকে? আস্তে করে গড়িয়ে নীচের ধাপে নামল ও। মাথা নিচু করে আরও কিছুদূর নেমে বোটটা দৃষ্টিপথ থেকে আড়াল হতেই দৌড় দিল ও কিশোর-রবিন-জিনাকে সাবধান করতে।

কতদূর? মুসাকে হন্তদন্ত হয়ে এদিকে আসতে দেখেই জিজ্ঞেস করল কিশোর। পৌঁছবে কতক্ষণে?

মিনিট দশেক, বলল মুসা।

উঠে দাঁড়িয়েছে সবাই। গোসল করে পরবে বলে কিছু কাপড় রাখা ছিল কার্নিশের তলায়, ওগুলো বগলদাবা করেই ছুটল ওরা মাটির নীচে গর্তে লুকাবে বলে। ছুটতে ছুটতেই রবিন জিজ্ঞেস করল, আগুন? জ্বলতেই থাকবে?

জ্বলুক, বলল কিশোর। ওটার ধোয়া দেখেই তো আসছে।
আগাছা সরিয়ে জামা-কাপড় ফেলা হলো প্রথমে। রুমালটা খুলে নিয়ে একটা লাঠি পুঁতেছিল মুসা গর্তটা চিনতে সুবিধে হবে বলে, সেই লাঠিও তুলে নিয়ে লুকিয়ে ফেলা হলো হিদার ঝোঁপের নীচে। এই কদিন যেখানে ঘুমিয়েছে তার নীচের হিদার চ্যাপ্টা হয়ে রয়েছে দেখে সেটা ঠিকঠাক করল কিশোর। তারপর চারপাশটা একবার দেখে নিয়ে সবার শেষে নেমে গেল গর্তে। মুসাকে দুজন মিলে তুলে ধরতেই ও যত্নের সঙ্গে চারপাশ থেকে আগাছা টেনে ঢেকে দিল গর্তের মুখ।
অপেক্ষা করছে ওরা। ধড়াস-ধড়াস লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ড ওদের বুকের ভিতর।
ফিসফিস করে কথা বলতে পারব তো? জানতে চাইল জিনা।
কথা যত কম বলা যায় ততই ভালো, বলল কিশোর। শোনা দরকার এখন আমাদের। কাছে পিঠে কেউ এলে সবাই কান খাড়া রাখব। ওদের কথা শুনে বুঝতে হবে ওরা শত্রু না মিত্র। মিত্র এসে যদি আমাদের না পেয়ে ফিরে যায়, সেটা খুবই দুঃখজনক ব্যাপার হবে।
চুপ হয়ে গেল সবাই। মাঝে মাঝেই শ্বাস চেপে রেখে কান খাড়া করছে।
শ্‌শ্‌শ্‌শ্‌! ঠোঁটে আঙুল তুলল মুসা। কারা যেন আসছে!
বলতে না বলতেই ওদের পিলে চমকে দিয়ে আগাছা সরিয়ে গর্তে নামল সখা-সখি। আবছা আঁধারে কিশোরকে খুঁজছে।
ইশশ! আর একটু হলেই হার্টফেল করতাম! বলল কিশোর। খবরদার! একটা টু-শব্দ করবি না!
অররররর! মোটা গলায় বলল সখা।
রেগে গিয়ে ধাক্কা দিল কিশোর ওর গায়ে। অবাক হয়ে সরে গেল সখা। এই প্রথম তার প্রিয় বন্ধুর কাছ থেকে খারাপ ব্যবহার পেল সে। অভিমান করে হেলেদুলে পাফিনের সরু গর্তের দিকে চলল সে, পিছনে সখি। কিশোর ফিরে ডাকল না দেখে গর্ত বেয়ে উঠে গেল ওরা উপরে। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল সবাই।
আবার কিছু শুনতে পেয়ে ফিসফিস করল মুসা, চু-উ-প! পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি। আসছে এদিকে!
*
একটু পর সবাই শুনতে পেল, এগিয়ে আসছে পায়ের শব্দ। পরমুহূর্তে শোনা গেল গলার আওয়াজ। ...গোটা দ্বীপ ভালো মতো খুঁজে দেখতে হবে। আগুন
তো আর আপনিই জ্বলছে না, কেউ না কেউ ইন্ধন জোগাচ্ছে।
কেউ থাকলে অবশ্যই ধরা পড়বে, বলে উঠল আরেকজন। এই ছোট্ট দ্বীপে লুকাবার মত তেমন জায়গা তো দেখি না। পাহাড়ে নেই। আর এই উপত্যকায় তো ওই বিদঘুঁটে পাখিগুলো ছাড়া দেখাই যাচ্ছে আর কেউ নেই।

খশ্‌শ্‌ করে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালবার শব্দ শোনা গেল। বোঝা গেল সিগারেট ধরাচ্ছে একজন। কাঠিটা ফেলে দিতেই হিদার ঝোঁপের ফাঁক গলে এসে পড়ল ওটা জিনার হাঁটুর উপর। চেঁচিয়ে উঠতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল ও কোনমতে।
একদম কাছে! ভাবছে ওরা। লোকগুলো দাঁড়িয়ে আছে ওদের গোপন গর্তের ঠিক পাশেই!
এই দেখো! আচমকা ভিন্ন স্বরে বলে উঠল ওদের একজন। এটা কী? চকোলেটের মোড়ক না? কাছেই কোথাও লুকিয়েছে ডিক কার্টারের সঙ্গী! খুব কাছেই কোথাও!
একটা হার্টবিট মিস হয়ে গেল মুসার। ওর মনে পড়ল, হাত ফসকে বাতাসে উড়ে গেছিল একটা খোসা, অতটা গুরুত্ব দেয়নি তখন-তাই কুড়িয়ে নেয়নি।
আরে! কিকো গেল কোথায়? কিছুক্ষণ আগে নেমে গেছে ওর কাধ থেকে, মনে আছে, কিন্তু আশপাশে হাত বুলিয়ে কোথাও পেল না ওকে মুসা। ওকে চুপ করে থাকবার ইশারা দেওয়া হয়নি। এখন যদি লোকদুজনের পায়ের নীচ থেকে জোরে কথা বলে ওঠে, ওদের কোনও কথার উত্তর দিয়ে বসে, তা হলেই সর্বনাশ।
কিকোকে পাওয়া যাচ্ছে না, তার কারণ অন্ধকার গর্তে বিরক্তি বোধ করায় সখা-সখির পিছন পিছন সে-ও উঠে গেছে ঢালু গর্ত বেয়ে উপরে। গর্তমুখে গায়ে গা ঠেকিয়ে বসে আছে স্বামী-স্ত্রী, হলুদ চক্র আঁকা ছোট্ট গোল চোখ মেলে নিষ্পলক চেয়ে রয়েছে এখন বাইরে দাঁড়ানো লোক দুজনের দিকে।
দেখো, দেখো! বলল লম্বা লোকটা। জোকারদুটোকে দেখো কী রকম ড্যাবড্যাব করে চেয়ে রয়েছে! কী বিটকেলে রঙচঙে ঠোঁট দেখো না! কী নাম এগুলোর?
গাল-গিলিমট-পাফিন! চড়া গলায় বলে উঠল কিকো, যেন জবাব দিচ্ছে প্রশ্নের।
লাফিয়ে উঠল লোক দুজন। বিস্ফারিত চোখে দেখছে পাখি দুটোকে। কিকোকে দেখতে পেল না, কারণ সখা-সখির পিছনে বসে আছে ও, ঠোকর খাওয়ার ভয়ে ওদের ঠেলে বাইরে বেরোবার সাহস হয়নি।
শুনলে? ফিসফিস করে বলল লম্বা লোকটা।
মনে হলো যেন কথা বলল কেউ, উত্তর দিল তার সঙ্গের গাট্টাগোট্টা লোকটা।
পাখি দুটো কথা বলল? লম্বুর গলায় অবিশ্বাস।
কী জানি, অনিশ্চিত কণ্ঠে বলল পাশের জন।
আবার কথা বলে! ধমকে উঠল কিকো কড়কড়ে গলায়, কোনও কথা শুনতে চাই না আমি! অহ-হো, অহ-হো!
রীতিমত আঁতকে উঠল ওরা। চোখে ভয়। আর কোনও সন্দেহ নেই-কথা বলছে গর্তের মুখে বসে থাকা শান্তশিষ্ট পাখি দুটো।

আরে! সত্যিই কথা বলছে! কী করে সম্ভব?
হয়তো শিখিয়েছে কেউ। খুব সম্ভব এগুলোকে পাফিন বা সী প্যারট বা। ওই রকম কিছু বলে।
কী হলো, কথা কানে যায় না? আবার এল কর্কশ কণ্ঠের ধমক। তোমাকে কতবার বলেছি, আমার মুখের ওপর কথা বলবে না! রাগী কুকুরের গর্জন ছাড়ল এবার কিকো।
তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ওরা সখা-সখির ঠোঁটের দিকে। কিকোকে দেখতে পাচ্ছে না ওরা।
অবিশ্বাস্য, তাই না? বলল ল। এখানে এই দ্বীপে কে কথা শেখাবে ওদের?
ঠোঁট ফাঁক করল সখা, নিচু গলায় বলল, অররররররর!
ওইদ্দ্যাখো! বলে উঠল গাট্টাগোট্টা। এবার আমি নিজের চোখে দেখেছি। ওরাই কথা বলছে এতক্ষণ ধরে।
কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, শেখাল কে ওদের? এই সাগরে…।
বাদ দাও তো! বিরক্ত কণ্ঠে বলল বেঁটে, এদের পেছনে সময় নষ্ট না করে চলো, যে-কাজে এসেছি সেটা সারি। তীর ধরে গোটা দ্বীপ একপাক ঘুরব। আমরা। দুজন দুদিক থেকে। কেউ থাকলে ধরা পড়তেই হবে।
চলো, বলল লম্বু। বোটটা চুরমার হয়ে যাওয়ায় খারাপই লাগছে। আস্ত থাকলে প্রচুর খাবার পাওয়া যেত ওতে।
এমনি সময়ে স্টার্ট নিল একটা মোটর সাইকেল। কিকোর শব্দ-ভাণ্ডারে এটা নতুন সংযোজন। রওনা হতে গিয়েও পাথরের মত জমে গেল দুই আগন্তুক। তাজ্জব হয়ে তাকাল পরস্পরের মুখের দিকে।
কসম খেয়ে বলতে পারি, কাছেই কোথাও স্টার্ট নিয়েছে একটা মোটর বাইক! বলল লম্বু।
আমিও শুনেছি, বলল বাটকু। চলো, চলো এখান থেকে। আমরা আজগুবি আওয়াজ শুনতে শুরু করেছি।
পা চালাল ওরা। অস্পষ্ট হতে হতে দূরে মিলিয়ে গেল লোকদুটোর গলার আওয়াজ। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল জিনা ও তিন গোয়েন্দা।
যেন দিগ্বিজয় করেছে এমনি ভঙ্গিতে ফিরে এল কিকো মুসার কাছে। কাতর কণ্ঠে বলল, বাবারে! গেছি এবার! ইশশ, এত্তো আঁধার! খাইছে!
আর একটু হলেই তো দিয়েছিলি সব ফাঁস করে! আয় এদিকে। আর একটা কথা বলবি তো তোর ঠোঁট বেঁধে দেব আমি রুমাল দিয়ে।
অররররররর! পাফিনের ভাষায় জবাব দিল কিকো। মুসার কাঁধে বসে মাথা লুকাল ডানার নীচে। বকা খেয়ে অভিমান হয়েছে ওর।

অনেক-অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকল ওরা মাটির নীচের গর্তে। আর কারও পায়ের বা গলার আওয়াজ পাওয়া গেল না।
আর কতক্ষণ এভাবে বসে থাকতে হবে? ফিসফিস করে জানতে চাইল। জিনা। পায়ে ঝিঁঝি ধরে গেছে আমার।
আর আমার লেগেছে খিদে, বলল মুসা। কিন্তু এখন মাথা বের করলে হাতে-নাতে ধরা পড়ে যেতে পারি। ইশশ! কয়েকটা টিন যদি এখানে এনে রাখতাম!
আরও কিছুক্ষণ গেল। কিশোর সবে ভাবছে, এখন বোধহয় ঝুঁকি নিয়ে উঁকি দেওয়া যায়, এমনি সময়ে দূর থেকে একটা শব্দ ভেসে এসে মধু বর্ষণ করল ওদের কানে। ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়েছে ওরা মোটর-বোটের।
রবিন নড়ে উঠতে যাচ্ছিল, ওর হাতে চাপ দিল কিশোর।
আর পাঁচটা মিনিট যেতে দাও। তারপর মুসাকে ঠেলে তুলব ওপরে। কেউ যদি কাছেপিঠে থাকে, ও একটা হাসি দিলেই দৌড়ে পালাবে।
হেসে উঠল সবাই। একই সঙ্গে সবাই কথা বলতে শুরু করল ওরা, কেউ আর আস্তে বলবার প্রয়োজন বোধ করছে না। বুঝে ফেলেছে, কেটে গেছে। বিপদ।
মোটর-বোটের শব্দ শোনা গেল মিনিট দুয়েক, তারপর ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল দূরে।
আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর কিশোর আর রবিন মিলে মুসাকে ঠেলে তুলল বুক পর্যন্ত। প্রথমে কান পাতল ও, তারপর চারদিকে তাকাল। ধারে কাছে কেউ নেই দেখে ইশারা করল মুসা। আর একটু তোলা হলে নিজেই গর্তের দুপাশে হাত রেখে উঠে পড়ল ও উপরে। উঠেই গড়িয়ে দিল শরীরটা, তারপর দুই কনুইয়ে ভর দিয়ে বিনকিউলার তুলল চোখে।
অনেক দূরে দেখা গেল ফুলস্পীডে ছুটছে মোটর-বোটটা, ক্রমে ছোট হয়ে যাচ্ছে আরও। নিশ্চিন্ত হয়ে গর্তের কাছে মুখ নিয়ে ডাকল সবাইকে মুসা।
চলে এসো। অল ক্লিয়ার।
কিশোর বেরিয়ে আসতেই কাছের একটা গর্তের মুখে অপেক্ষারত সখা ও সখি নড়ে উঠল। হেলেদুলে এগিয়ে এসে ওর গা ঘেঁষে দাঁড়াল। ও একটু আদর করে দিতেই বর্তে গিয়ে নিজেদের ভাষায় ধন্যবাদ জানাল, অররররর! অ! ককক!
সবাই চলে এল ঝরনার ধারের আস্তানায়, আগাছা সরিয়ে বেশ কয়েকটা টিন বের করে খোলা হলো। খেতে খেতে গল্প করছে ওরা।
একটুর জন্যে বেঁচে গেছি আমরা, বলল কিশোর।
আমার তো সারাক্ষণ ভয় করছিল, এই বুঝি দড়াম করে ঘাড়ের ওপর পড়ে ওদের একটা! বলল রবিন।

আর হঠাৎ হাঁটুর ওপর দেশলাইয়ের গরম ছ্যাকা খেয়ে আমি চেঁচিয়ে উঠতে গিয়েও কী করে যে সামলেছি নিজেকে!
আর আমাদের কিকো মিয়া তো আর একটু হলেই মহা বিপদে ফেলতে যাচ্ছিল সবাইকে, বলল মুসা। ছি, কিকো, লজ্জায় মাথা কাটা গেছে আমার! শত্রুদের সঙ্গে গল্প জুড়লি তুই কোন্ আক্কেলে?
সরে গেল কিকো।
পিছন ফিরে গোমড়া মুখে কেমন গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দেখো! হাসতে হাসতে বলল জিনা। গোস্‌সা হয়েছে!
মুচকি হেসে কিশোরের পাশে বসা সখা-সখিকে ডাকল মুসা আদর করে। এই যে, স-খা! স-খি! লক্ষ্মী ছেলে! আমার কাছ থেকে একটু খাবে না? এসো তো, এদিকে এসো।
ঘাড়টা সামান্য একটু ফিরিয়ে কটমট করে Tইল কিকো সখার দিকে। কিন্তু ও হেলেদুলে এগিয়ে এসে মুসার হাত থেকে একটুকরো মাংস নিতে যাচ্ছে দেখে আর সহ্য করতে পারল না।
ব্যাড বয়, ব্যাড বয়, নটি বয়! চেঁচিয়ে উঠল সে। বেচারা কিকো, আহা। রে বেচারা কিকো! ব্যাড বয়, নটি বয়!
ধমকে নিরস্ত করা যাচ্ছে না দেখে বিকট এক চিৎকার ছেড়ে তেড়ে গেল সে বে-আদবটার দিকে। কাছে গিয়েই ঠোকর দিল সে সখার মাথায়। সখা পাল্টা তেড়ে উঠতেই পিছিয়ে গেল দুই পা, তারপর গলা ফুলিয়ে টানেলে ঢোকা রেল-ইঞ্জিনের বিকট আওয়াজ ছাড়ল। এক দৌড়ে কিশোরের পাশে চলে গেল সখা-সখি। ওখান থেকে ভীত-সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে কিকোর দিকে, কিকো এক পা এগোলে ছুটে গিয়ে ঢুকবে নিজেদের গর্তে।
হাসতে হাসতে পেট ফাটবার উপক্রম হলো ওদের সবার। প্রতিদ্বন্দ্বীদের ভাগিয়ে দিয়ে বিচিত্র ভঙ্গিতে ক্লাউনের মত দুলে-দুলে পাশে হেঁটে মুসার দিকে চলল কিকো, মুখে কপচে চলেছে, আহা রে, কিকো! আহা রে, কিকো! ব্যাড বয়, নটি বয়!
মুসা ছোট একটা মাংসের টুকরো দিতেই ওটা মুখে পুরে ওর কাঁধে চড়ে বসল কিকো। ওখান থেকে গর্বিত দৃষ্টিতে দেখছে সখা-সখিকে। ওদের উদ্দেশে বলল, অররররর!
হয়েছে, কিকো, বলল মুসা। আমার কানের কাছে অররর করতে হবে না।
রাতে কি আমাদের গর্তে ঢুকতে হবে, না কি বাইরে ঘুমাতে পারব? জিজ্ঞেস করল জিনা। মানে, রাতে কোনও বিপদের ভয় আছে?

মনে হয় না, বলল কিশোর। দিনেই পায়নি খুঁজে, রাতে কি আবার ওরা। আসবে এই ভূতুড়ে দ্বীপে? তবে গর্তের কাছাকাছিই আমাদের থাকতে হবে, বিপদ দেখলে যেন চট করে ঢুকে পড়তে পারি।
লোকদুটোর চেহারা দেখতে পারলে হোত, বলল রবিন। গলার আওয়াজ আমার একটুও ভালো লাগেনি। শুনলেই বোঝা যায় বদমাশ লোক।
আমাদের সবারই হাতের কাছে একটা করে লাঠি রাখা দরকার, বলল মুসা। তারপর চলে গেল অন্য প্রসঙ্গে। আগুন তো নিভিয়ে দিয়ে গেছে। আমরা কি আজই আবার জ্বালব?
কাল, জবাব দিল কিশোর।
আগুন জ্বাললেই ওরা কিন্তু পরিষ্কার বুঝে নেবে, কেউ না কেউ এ-দ্বীপে আছেই, প্রশ্ন তুলল জিনা। আমাদের জন্যে রিস্কি হয়ে যাবে না ব্যাপারটা?
তা হবে, মেনে নিল কিশোর। তবে এ-ছাড়া আর কোনও উপায়ও নেই আমাদের। কারও মনোযোগ আকর্ষণের একমাত্র উপায় আগুন আর ধোয়া। আমাদেরকে যদি কেউ উদ্ধার করতে আসে, আঙ্কেল ডিকও উদ্ধার পাবেন। শুধু আমাদেরই নয়, আগুনটা আঙ্কেলেরও একমাত্র ভরসা। ওটা আমরা চালু রাখব।
বেচারা আঙ্কেল, বলল জিনা। উধাও হতে চেয়েছিলেন, তা-ই হয়েছেন।
পরদিন আবার জ্বলল আগুন। ওই আগুনেই সখা-সখির আনা মাছ ভাজা করবার ব্যবস্থা করল জিনা। দিনে তিনবার কিশোরের জন্য মাছ ধরে আনে ওরা ঠোঁটে করে। চমৎকার লাগে পাহাড়ের উপর খোলা আকাশের নীচে বসে টাটকা মাছ ভাজা করে খেতে। নির্বিকার, নিস্পলক চোখে তাকিয়ে ওদের খাওয়া দেখে পাফিন-জোড়া; সাধলে সখা যদি বা এক-আধটা খায়, সখি একদম না।
সারাক্ষণ বিনকিউলার নিয়ে পালা করে সতর্ক পাহারা দেয় রবিন ও মুসা। ডিউটিতে ঢিল নেই, এটা ওদের বাঁচা-মরার প্রশ্ন। সূর্য যখন মাথার উপর, খিদে-খিদে একটা ভাব মাত্র আসতে শুরু করেছে মুসার; এমনি সময়ে ডাকল সে কিশোরকে। বহুদূরে বিন্দুর মত একটা বোট দেখতে পেয়েছে সে।
আরেকটা বোট! কিশোর, আরেকটা বোট আসছে এই দিকে! বিনকিউলার চোখে তুলে কিশোর জিজ্ঞেস করল, ওই আগের বোটটাই নাকি, মুসা?
সেটা না, জবাব দিল মুসা। এটা অন্য একটা মনে হচ্ছে। আসছেও ভিন্ন। দিক থেকে। সেটা অবশ্য চালাকি হওয়ারই সম্ভাবনা; আমরা যাতে মনে করি, শত্রু না, বন্ধু আসছে উদ্ধার করতে।
কী করে বুঝব সেটা? জিজ্ঞেস করল জিনা। আবার লুকাব আমরা মাটির। নীচে? যদি ওদিকে এরা না যায়?

বিনকিউলার এগিয়ে দিল কিশোর জিনার দিকে। মুসার দিকে ফিরে বলল, একজন আসছে এবার, মুসা। আমাদের খুঁজতে যদি নামে, কোথাও নোঙর ফেলতেই হবে ওকে, তখন খুব সহজেই বোটটা দখল করে নিতে পারি। আমরা। তুমি কী বলো?

আরে, তাইতো! চমকে গেল মুসা। ছোট হলেও আমাদের চারজনের সুন্দর জায়গা হয়ে যাবে ওতে। গুড আইডিয়া!

দখল করবে? অবাক হয়ে গেল রবিন। কীভাবে?

সেটা পরে বলছি, তার আগে ভেবে দেখা যাক, এটা কি আমাদের উদ্ধার করতে আসছে? কী মনে হয়, মুসা?

না। সাফ জবাব দিল মুসা। যারা জানে আমরা এখানে চার-পাঁচজন আছি, তারা আমাদের উদ্ধার করবার জন্যে এত ছোট মোটর-বোট পাঠাতেই পারে না। এটা আমাদের মিত্র বোট নয়। শত্রুপক্ষের চালাকি ছাড়া কিছু না।

হ্যাঁ, বলল কিশোর, আমারও তাই ধারণা। চাপের মুখে আঙ্কেল যদি বলে দিয়ে থাকেন চারটে কিশোর ছেলেমেয়ে আছে এই দ্বীপে, ওদের ধরবার জন্যে একজন আসবে এখানে বন্ধুবেশে, নিরাপদ কোথাও নিয়ে যাওয়ার নাম। করে ধরে নিয়ে গিয়ে বন্দি করে রাখবে আঙ্কেলের সঙ্গে।

আমরা নিশ্চয়ই ওর সঙ্গে কোথাও যাচ্ছি না? বলল জিনা।

না, মাথা নাড়ল কিশোর। প্ল্যানটা বলছি, দেখো তোমাদের পছন্দ হয় কি না। মুসা আর আমি লুকিয়ে থাকব এখানেই, রবিন আর জিনা যাবে ওর সঙ্গে দেখা করতে।

তারপর? ভয়ে বিস্ফারিত হয়ে গেল জিনার দুই চোখ।

তারপর তোমরা কায়দা করে লোকটাকে নিয়ে গিয়ে ফেলবে মুসার গর্তে। ওখানেই অনেকগুলো খাবারের টিন দিয়ে ওকে বন্দি করে রেখে ওর বোট নিয়ে আমরা পগার পার হয়ে যেতে পারি।

প্ল্যানটা হজম করবার জন্য অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল বাকি তিনজন। কিন্তু... কিন্তু ওকে আমি গর্তে ফেলব কী করে! আপত্তি তুলল রবিন। আমি বললেই বা ও ওখানে নামবে কেন?

না, বললে নামবে না, হাসল মুসা। ওকে ভুলিয়ে ভালিয়ে গর্তের কাছে। নিয়ে যেতে হবে, তারপর পায়ে পা বাধিয়ে একটা ল্যাঙ, প্রয়োজনে সামান্য একটু ধাক্কা– এটুকু পারবে না? পানির মতন সহজ কাজ!

সহজ কাজটা তুমিই করো না, বলল রবিন। আমি বরং কিশোরের সঙ্গে কঠিন কাজগুলো করি। মুসাকে বিনা দ্বিধায় মাথা কাত করতে দেখে বলল, কিন্তু, ধরো,

ওকে গর্তে ঢোকাতে পারলে না, তখন কী হবে? মোটর-বোট নিয়ে কী করব আমরা?
সোজা ছুটবে সাগরের দিকে। তারপর রাত হয়ে গেলে ইঞ্জিন বন্ধ করে। ফিরে আসবে চুপি চুপি। আমরা খুঁজে নেব তোমাদের। তবে এসবের কোনও দরকার পড়বে না, ঠিকই ব্যাটাকে ঢোকাব আমি গর্তে। এ-নিয়ে তোমরা কোনও দুশ্চিন্তা কোরো না।
এবার ফিরল জিনা মুসার দিকে। আমার কী করতে হবে?
তোমার বিশেষ কিছুই করতে হবে না। সঙ্গে মেয়ে দেখলে আমার সব কথা বিশ্বাস করবে ও। তুমি খালি সায় দেবে আমার কথায়, আর ওর প্রতিটি কথা বিশ্বাস করছ, এরকম ভান করবে।
হিংস্র হয়ে উঠবে না তো?
আরে, না। ও যে কত নিরীহ তা-ই প্রমাণ করার জন্যে ব্যস্ত থাকবে। খুব সম্ভব নিজেকে প্রকৃতিবিজ্ঞানী হিসেবে পরিচয় দেবে। ও যত মিথ্যা বলবে, আমরাও বলব ততই।
বেশ কাছে চলে এসেছে কিন্তু, বলল কিশোর। লোক ওই এক জনই। সানগ্লাস পরে আছে রোদ থেকে বাঁচার জন্যে।
আরে, নাহ! বলল জিনা। ভয়ঙ্কর চোখ দুটো আড়াল করবার জন্যে। ব্যাটা সোজা এগোচ্ছে সীগাল যেখানে রাখা ছিল সেই গোপন চ্যানেলের দিকে। শত্রুপক্ষের লোক না হয়েই যায় না! আমরা কি বেরোব আড়াল থেকে?
হ্যাঁ, তোমরা দুজন। পাগলের মত হাত নাড়বে ওর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে।
উঠে পড়ল মুসা আর জিনা। ধোয়ার পাশে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ল লোকটার উদ্দেশে। এইদিকেই তাকিয়ে ছিল লোকটা, হাত নেড়ে সাড়া দিয়ে চলে গেল গোপন চ্যানেলের দিকে। বোঝা গেল খুব ভালো করেই জানে সে এই দ্বীপে কোথায় নোঙর ফেলতে হবে।
ধীরে-সুস্থে পাথরের আড়ালে আড়ালে রওনা হয়ে গেল কিশোর ও রবিন কিকোকে নিয়ে। কিছুটা ঘুরপথে যেতে হবে ওদের, তবে লোকটার চোখের আড়ালে যে থাকতে পারবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।
বোট বেঁধে রেখে লোকটা উপত্যকায় নেমে আসছে দেখতে পেয়ে মুসা আর জিনাও নামতে শুরু করল পাহাড় থেকে।
পা কাঁপছে আমার, বলল জিনা। মনে হচ্ছে অবশ হয়ে গেছে হাঁটুজোড়া।
একটু পরেই ঠিক হয়ে যাবে, বলল মুসা। ভয় লাগলে কথা বোলো না, যা বলার আমিই বলব।

উপত্যকা পেরিয়ে মুসা আর জিনার কাছে চলে এল মাঝারি উচ্চতার বঁটার কাঠির মত চিকন লোকটা। হাড়গিলে চেহারা, একটা হাফপ্যান্ট আর পুলওভার পরনে-দেখলেই বোঝা যায়, বদরাগী। হাত-মুখ আর সরু পা-দুটো রোদে পোড়া। চিবুকে অল্প কয়েকটা বেমানান কাঁচা-পাকা দাড়ি। উঁচু কপাল বাড়তে বাড়তে মাথার অর্ধেকটা দখল করে নিয়েছে, চুল শুরু হয়েছে তার পর থেকে।
হ্যালো, হ্যালো, হ্যালো! হাসিখুশি অমায়িক ভঙ্গিতে শুরু করল লোকটা এই দ্বীপে মানুষ আছে জানতে পেরে একেবারে তাজ্জব হয়ে গেছি!
কে জানাল আপনাকে? জিজ্ঞেস করল মুসা।
কেউ না। ধোয়া দেখে টের পেলাম। কী করছ তোমরা এখানে? পিকনিক, এক্সকারশন, না কি আর কিছু?
তা বলতে পারেন, বলল মুসা! সরাসরি উত্তর এড়িয়ে গেল। আপনি এসেছেন কেন?
আমি একজন অরনিথলজিস্ট, বলল লোকটা, চোখ পাকিয়ে ভয় দেখাবার ভঙ্গিতে। এর মানে অবশ্য তোমাদের জানার কথা নয়।
মনে মনে হাসল মুসা। ব্যাটা, চাপা মারার জায়গা পাও না। মুখে বলল, অরনি-ওরনি-ওমনিবায়োলজিস্ট? কী সেটা?
মূঢ় মুসার অজ্ঞতায় হাসল আগন্তুক। বলল, এর মানে, পাখিদের জীবনবৃত্তান্তের চর্চা। পক্ষিপ্রেমিকও বলতে পার। যারা পাখি ভালোবাসে, পাখির অভ্যাস ও আচরণ সম্পর্কে জানার চেষ্টা করে। বুঝেছ? পাখি সংক্রান্ত বিদ্যা বলতে পার একে।
তা হলে এইজন্যেই এসেছেন আপনি এখানে? জিজ্ঞেস করল জিনা। পাখিদের আচার-আচরণ সম্পর্কে জানতে?
হ্যাঁ। অনেক বছর আগেও একবার এসেছিলাম, তখন আমি ছাত্র। তখনই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, সুযোগ পেলে আবার আসব একদিন। তোমাদের ধোয়া দেখে অবাক হয়ে দেখতে এসেছি। তা আগুন কীজন্যে? খেলছিলে? জাহাজডুবিতে বিপন্ন নাবিক?
আবারও এড়িয়ে গেল মুসা লোকটার প্রশ্ন। কৌতূহলী ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল, নিশ্চয়ই অনেক-অনেক কিছু জানেন আপনি পাখি সম্পর্কে?
না, মানে, সামুদ্রিক পাখি সম্পর্কে আমি খুব বেশি জানি না, সবিনয়ে বলল পক্ষিবিশারদ। তবে জানব। সেজন্যেই এতদিন পর এসেছি আবার। ডাঙার পাখি সম্পর্কে বলা যায় যৎসামান্য কিছুটা জানি।
ব্যাটা ভয় পেয়েছে, ভাবল মুসা। ধোকাবাজ! রবিন থাকলে এখন পাখি সম্পর্কে প্রশ্ন করে ব্যাটার দুই কান দিয়ে ধোয়া বের করে দিতে পারত।

আমাদের দুটো পোষা পাফিন আছে, বলল জিনা হঠাৎ। দেখবেন ওগুলো?
তাই নাকি? কী বললে, পোষা পাফিন? নিশ্চয়ই দেখব, নিশ্চয়ই দেখব। একগাল হাসি নিয়ে জিনার দিকে চাইল পাখি-বিজ্ঞানী। এতক্ষণে যেন খেয়াল হলো নিজের পরিচয় দেওয়া হয়নি। বলল, ভালো কথা, আমার নাম ওয়েনস্টেইন-প্রফেসর টমাস আর, ওয়েনস্টেইন। তোমাদের?
ওর নাম জিনা পার্কার, আর আমি মুসা আমান। পাফিন দুটো সত্যিই দেখবেন আপনি, মিস্টার আইনস্টাইন? তা হলে এইদিকে যেতে হবে। গর্তের দিকে হাঁটতে শুরু করল মুসা।
আইনস্টাইন নয়, প্রফেসর ওয়েনস্টেইন। চলো, কিন্তু তার আগে তোমাদের গাইড বা গার্জেন হিসেবে যিনি এসেছেন, তার সঙ্গে একটু কথা বলতে পারলে ভালো হোত, আপনভোলা একটা ভঙ্গি ওয়েনস্টেইনের। ভালো। কথা, তোমাদের বোট যে দেখলাম না কোথাও?
বোটটা ঝড়ে ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে, বলল মুসা। মনে মনে বলল, ন্যাকা! জানো না কিছু!
তাই বুঝি? সেজন্যেই নোঙর ফেলতে গিয়ে ছেঁড়া দড়িদড়া আর কাঠের টুকরো দেখলাম? আহ-হা! কী ভয়ঙ্কর! তা হলে তোমরা বাড়ি ফিরবে কী করে?
কেন? তোমারটায় চড়ে! মনে মনে বলল মুসা। মুখে বলল, সাবধান! পাফিনের খোঁড়া অসংখ্য গর্ত রয়েছে কিন্তু এখানে। বেকায়দা পা পড়লে মচকে যেতে পারে।
আরে, সর্বনাশ! কত পাখি! দাঁড়িয়ে পড়ল ওয়েনস্টেইন। জীবনেও তো এত পাফিন একসঙ্গে দেখিনি আমি! অসাধারণ, সিম্পলি অসাধারণ একটা দৃশ্য! পাহাড়ের ওপরও দেখছি হাজার হাজার রয়েছে হরেক জাতের পাখি! দারুণ ব্যাপার তো! আচ্ছা, সত্যিই কি তোমাদের পোষা পাফিন আছে?
হ্যাঁ। সাগর থেকে মাছ ধরে এনে খেতে দেয় আমাদের, বলল মুসা। গর্তের কাছে চলে এসেছে এবার ওরা।
বলো কী! থমকে দাঁড়াল ওয়েনস্টেইন, তার দুই চোখে অবিশ্বাস। এ-ও কি সম্ভব?
ভয়ে ধুকধুক করছে জিনার বুক। মুসার ল্যাঙ খেয়ে যদি লোকটা গর্তে না পড়ে? যদি তেড়ে মারতে ওঠে ওদের? কিংবা পকেট থেকে রিভলভার বের করে? লোকটার হাফপ্যান্টের পকেট তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ করল ও। কিন্তু হাবিজাবি ভরা প্যান্টের পকেট এমনই ফুলে আছে যে বোঝা গেল না কিছু। ইশারায় ওকে একটু পিছিয়ে থাকতে বলল মুসা। দুই পা পিছিয়ে গেল জিনা।
হ্যাঁ, বলল মুসা। নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। পা বাড়াল সামনে। চলুন, এক্ষুনি দেখাচ্ছি আপনাকে।

গর্তের পাশে চিহ্ন হিসাবে ওরা যে ছোট্ট খুঁটিটা গেড়ে রেখেছিল, সেটাতে হোঁচট খেল ওয়েনস্টেইন, আর ঠিক সময় বুঝেই ল্যাঙ মারল তাকে মুসা। হুড়মুড় করে গর্তের পাশে পড়ল পক্ষিপ্রেমিক। একটুও দেরি না করে, সামলে উঠবার আগেই ঠেলা দিয়ে গর্তে ফেলে দিল তাকে মুসা। ধুপ করে শব্দ হলো, ককিয়ে উঠল ওয়েনস্টাইন, বাবা রে!
হিদারের ঝোপে লুকিয়ে রাখা লাঠিটা তুলে নিল এবার মুসা। ঝোঁপ। সরিয়ে নীচে তাকাল। আবছা আঁধারে বসে আছে প্রফেসর টমাস আর. ওয়েনস্টেইন। চোখ তুলে মুসাকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠল, পাজি ছেলে কোথাকার! ধাক্কা দিলে যে? এর মানে কী?
মুসা দেখল, আছাড় খেয়ে সানগ্লাসটা ছিটকে চলে গেছে কোনদিকে। চোখ দুটো দেখে তেমন ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছে না আর। ব্যথা পেয়েছে মানুষটা, এক হাতে মাথার একপাশ ডলছে। চেহারায় ভীত-সন্ত্রস্ত, উদ্ভ্রান্ত একটা ভাব।
দুঃখিত, বলল মুসা। তবে এটা না করে আমাদের আর কোনও উপায় ছিল না, ডক্টর আইনস্টাইন। আমাদের ধরতে এসে নিজেই ধরা পড়েছেন, ব্যস, মামলা খতম। এখন আর ভান করে কোনও লাভ হবে না, জনাব। আমরা ভালো করেই জানি কোন বদমাশদের দলে কাজ করছেন আপনি।
কী বকছ আবোল-তাবোল? উঠে দাঁড়াল ওয়েনস্টেইন গর্তের ভিতর। মাথাটা দেখা যাচ্ছে কেবল। সঙ্গে সঙ্গে মাথার উপর লাঠি তুলল মুসা।
খবরদার! বসে পড়েন নীচে! হিংস্র ভঙ্গিতে ধমক দিল ও। নইলে এক বাড়িতে ছাতু করে দেব মাথাটা! আঙ্কেল ডিককে ধরে নিয়ে গেছেন আপনারা-অস্বীকার করতে পারবেন? এবার আমরা ধরেছি আপনাকে। ওঠার চেষ্টা করেই দেখেন না একবার কী করি!মারের ভঙ্গি করল ও এবার।
চট করে বসে পড়ল ভীত-সন্ত্রস্ত ওয়েনস্টেইন।
সত্যিই মারবে তুমি? জিজ্ঞেস করল জিনা। গলাটা কাঁপছে।
একশো বার! বলল মুসা। আঙ্কেল ডিকের কথা চিন্তা করো, চিন্তা করো কীভাবে চুরমার করেছে ওরা আমাদের সীগাল। আমরা আটকা পড়েছি এখানে, কার বা কাদের জন্যে? একে এখন ছেড়ে দিলে কী ঘটবে জানো না? বিশজন লোক নিয়ে ফিরে আসবে আবার। দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিয়ো না একটুও।
অ্যাই, শোনো, এদিকে তাকাও, মুসার বক্তব্য শেষ হতেই চেঁচিয়ে উঠল। ওয়েনস্টেইন। ঘটনাটা কী খুলে বলবে? কী সব প্রলাপ বকছ তোমরা? পাখির দ্বীপে পাখি দেখতে আসা নিশ্চয়ই অপরাধ বা বে-আইনি কিছু নয়? তোমরা দুই ছোঁড়াছুঁড়ি ভুলিয়ে-ভালিয়ে এখানে এনে আমাকে ল্যাঙ মেরে গর্তে ফেলেছ। মাথায় প্রচণ্ড ব্যথা পেয়েছি আমি। এখন বলছ এখান থেকে বের হতে চেষ্টা

করলেই মেরে মাথা ফাটাবে! এরকম জঘন্য ছেলেমেয়ে আমি তো জীবনেও দেখিনি!
দুঃখিত, বলল মুসা। এ ছাড়া আমাদের আর কী করবার ছিল? বুঝতেই পারছেন, আপনারা আমাদের মোটর-বোটটা নষ্ট করেছেন, ধরে নিয়ে গেছেন আমাদের গার্জেন আঙ্কেল ডিককে এখন একটা বোট আমাদের খুবই দরকার। বাকি জীবন তো আমরা এখানে থেকে যেতে পারি না!
কথা শুনে বিস্ময়ে এতই বিমূঢ় হয়ে পড়ল যে আধ মিনিট হাঁ করে চেয়ে রইল লোকটা মুসার মুখের দিকে। তারপর লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। পরমুহূর্তে বসে পড়ল আবার মুসাকে লাঠি তুলতে দেখে। ওখান থেকেই গলা ফাটিয়ে চেঁচাল, অ্যাই, শোনো! তোমরা কি সত্যিই আমার বোট নিয়ে চলে যাচ্ছ? এমন বাড়াবাড়ির কথা জীবনে শুনিনি আমি আর! দাঁড়াও, তোমাদের গার্জেনকে একবার পেয়ে নিই! তাকে দিয়ে তোমাদের পিঠের ছাল তুলিয়ে ছাড়ব আমি!
জিনা, বলল মুসা। আমি তো নড়তে পারছি না এখান থেকে। কিশোর আর রবিনকে খবরটা যে দিতে হয়!
আমি গিয়ে ডেকে আনছি, বলে উঠে দাঁড়াল জিনা।
দৌড়ে চলে গেল সে গোপন চ্যানেলের উদ্দেশে। একটু পরেই ফিরে এল ওদের নিয়ে। ঘটনার মোটামুটি বর্ণনা দেওয়া হয়ে গেছে আগেই। গর্তের মুখে এসে দাঁড়াল সবাই।
কী পরিচয় দিচ্ছে নিজের? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
পক্ষিবিশারদ! বলল মুসা। অ্যালবার্ট আইনস্টাইন...
সত্যিই?
না, সত্যি না! গর্জন ভেসে এল মাটির নীচ থেকে। আমি টমাস রবসন ওয়েনস্টেইন। দয়া করে নামটা মনে রাখার চেষ্টা করো, বে-আদব ছোকরা! এমন অসভ্য ছেলেপিলে জীবনে দেখিনি আমি! দাঁড়াও, নালিশ করলে টের পাবে বেত কাকে বলে!
দেখেছ, কিশোর, রাগে ফুঁসছে কী রকম? এজন্যে ওঁকে দোষ দিতে পারবে না। ওমনিবায়োলজির প্রফেসর-যা-তা কথা না!
অরনিথলজি! হুঙ্কার ভেসে এল গর্তের ভিতর থেকে। বোকা ছেলে কোথাকার! মুসাকে ছেড়ে কিশোরের প্রতি মনোযোগ দিল সে এবার। আমাকে বের করো এখান থেকে! সাবধানে গর্তের মুখ দিয়ে মাথা তুলল সে। একটা চোখ রেখেছে মুসার হাতের লাঠিটার উপর। প্রয়োজন পড়লেই টুপ করে ডুব দেবে।
প্রয়োজন পড়ল। সই যাতে ঠিক থাকে সেজন্য মোটা লাঠিটা প্রফেসরের চাদিতে একবার চুঁইয়ে মাথার উপর তুলল মুসা, কিন্তু নামিয়ে আনতে গিয়ে দেখল

টার্গেটটা অদৃশ্য হয়েছে।
শোনেন, জনাব আইনস্টাইন, ভুরু কুঁচকে চেহারাটা ভয়ঙ্কর করে তুলে বলল মুসা, এর পরেরবার আর কোনও ওয়ার্নিং না দিয়েই ডাণ্ডা চালাব আমি। ঠিক যেভাবে আপনি চালিয়েছিলেন ধরে নিয়ে যাওয়ার সময় আঙ্কেল ডিকের • মাথায়। মিথ্যে বলে লাভ নেই, ডেকের ওপর রক্ত দেখেছি আমরা!
মাথা খারাপ নাকি ছোকরার! বলল লোকটা আপন মনে। কী বলছে। এসব? শোনো, তোমরা ছাড়া আর কেউ নেই এই দ্বীপে? তোমাদের একটা কথাও আর শুনব না আমি। বড় কে আছে ডাকো তাকে, আমি কথা বলব। যদি মনে করে থাকো এখানে আমাকে আটকে রাখতে পারবে, তা হলে বলব বোকার স্বর্গে আছ তোমরা। ছিহ! এইরকম পাজি ছেলেমেয়ে দেখিনি আমি জীবনে!
এতক্ষণ রবিনের কাঁধে বসে তামাশা দেখছিল কিকো, এইবার মুখ খুলল, ঘুমাতে যাও, পাজি ছেলে, ঘুমাতে যাও! রবিনের কাঁধ থেকে নেমে গর্তের কিনারে চলে গেল সে। কড়া গলায় বলল, কী হলো, কথা কানে যায় না?
হাঁ করে চেয়ে রইল ওয়েনস্টেইন কিকোর দিকে। তারপর ফেটে পড়ল রাগে। ধমকে উঠল কিকোর উদ্দেশে।
যা এখান থেকে! একটা পাখিরও বকা খেতে হবে নাকি আমাকে? যা, গেলি!
ঝুঁটিটা একবার খাড়া করে নামিয়ে নিল কিকো, ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, চোপরাও! একদম চুপ! কোনও কথা শুনতে চাই না আমি! যাও, হাত-মুখ ধুয়ে এসো!
তুই যা!
রাগী কুকুরের গর্জন ছাড়ল এবার কিকো। ছিটকে সরে গিয়ে দেয়ালের গায়ে সেঁটে দাঁড়াল ওয়েনস্টেইন।
এমনি সময় একপাশের সরু, ঢালু গর্ত দিয়ে বড়সড়, রঙচঙে ঠোঁট নিয়ে নেমে এল একটা পাফিন। ভিতরে মানুষ দেখে কর্কশ, গম্ভীর গলায় আপত্তি জানাল, অররররররর! অ-অ! ককক!
চমকে ওইদিকে ফিরেই চক্ষুস্থির হয়ে গেল প্রফেসরের।
যাহ! যাহ! শূ! তাড়াবার চেষ্টা করল সে ওটাকে।
পাফিনটা যখন ঢাল বেয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে, গর্তের কিনার থেকে কিকেও ডেকে উঠল: অররররররর! অ-অ! ককক!
এসব কী পাগলামি শুরু হলো? এরাই পাগল, না কি আমিই পাগল হয়ে গেছি? একেবারে ভেঙে পড়ল পক্ষিপ্রেমিক।
উপরে চারমাথা এক করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেষ্টা করছে তখন ওরা চারজন।
একে নিয়ে এখন কী করা? জানতে চাইল রবিন। এখানেই ফেলে রেখে যাব? কথাবার্তা তো আপনভোলা প্রফেসরের মতই লাগছে অনেকটা।

ওটা অভিনয়, বলল মুসা। অরনিথলজির কিছু জানে না ও! জানলে নিরীহ একটা পাফিনকে দেখে ভয় পেয়ে যা-যা করে তাড়ায়? কপাল ভালো যে। অস্ত্র নিয়ে আসেনি, তা হলে এতক্ষণে কাবু করে ফেলত আমাদের।
কিশোর কী বলে শুনবার জন্য ওর মুখের দিকে চাইল সবাই।
বোটটা সীগালের চেয়ে খানিকটা ছোট হলেও এটার ক্যাবিনে আমাদের চারজনের জায়গা হয়ে যাবে, বলল কিশোর। কয়েক দিনের আন্দাজ খাবারও নেয়া যাবে সঙ্গে।
মুসা জিজ্ঞেস করল, দাড়ের সুবিধে রয়েছে এতে? প্রয়োজনে ইঞ্জিন বন্ধ করে দাঁড় বেয়ে নিঃশব্দে চলতে পারব আমরা?
পারব। দুই জোড়া দাঁড় দেখলাম পাটাতনে।
ঠিক আছে, বলল রবিন। বোট এখন আমাদের দখলে। ইচ্ছে করলেই এই দ্বীপ ছেড়ে চলে যেতে পারি আমরা। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যাব কোথায়? সাহায্যের আশায় আর-কোনও দ্বীপে? সোজা কার্পেন্টেরিয়ায়? নাকি প্রথমে নিজেরাই চেষ্টা করব আঙ্কেলকে উদ্ধার করার?
যা-ই করি, তাড়াতাড়ি করতে হবে, বলল জিনা। এই লোকটা ফিরে না গেলে শীঘ্রি অন্য বোট নিয়ে আসবে আরও লোক।
ঠিক, মন্তব্য করল কিশোর। হাতে সময় বেশি নেই। দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমাদের। কার কী মত বলে ফেলো জলদি।
তোমার মতামত শুনি আগে, বলল মুসা।
আমি আগে আঙ্কেলকে উদ্ধার করতে চাই, যদি সম্ভব হয়, স্পষ্ট ভাষায়। জানাল কিশোর। এমনিতেই দেরি হয়েছে অনেক, আরও দেরি হলে খারাপ। কিছু ঘটে যেতে পারে ওঁর কপালে।
আমারও তাই মত, একসঙ্গে বলে উঠল বাকি তিনজন।
ব্যস, সিদ্ধান্ত তা হলে হয়ে গেল। এবার হাতের কাজগুলো ভাগ করে নিয়ে সেরে ফেলা যাক, বলল কিশোর।
কিন্তু কাজ ভাগ করবার আগেই চেঁচিয়ে উঠল বন্দি। খালি কথা, কথা আর কথা! খিদেয় মরে যাচ্ছি আমি, পিপাসাও লেগেছে। তোমরা কি আমাকে না-খাইয়ে মারবে, না কিছু খেতে-টেতে দেবে? যা করবে জানিয়ে দাও সাফ সাফ!
না-খাইয়ে মারাই উচিত ছিল, বলল মুসা। তবে আমরা যেহেতু আপনাদের মত অমানুষ নই, দেব খেতে।
তিনটে টিন খলে গর্ত দিয়ে নামিয়ে দিল জিনা। বেশ কিছু বিস্কিটও দেওয়া হলো, আর এক বালতি পানি। গোগ্রাসে গিলতে শুরু করল ছদ্মবেশী প্রফেসর। লোকটার খাওয়া দেখে বাকি সবারও খিদে লেগে গেল। রবিন আর জিনা গিয়ে

আগাছা সরিয়ে হাতের কাছে যা পাওয়া গেল, কোনও বাছ-বিচার না করে দশ-বারোটা টিন নিয়ে এল। তবে ক্যান ওপেন করে একের পর এক লোভনীয় খাবারই বেরোতে শুরু করল।
গরু ও মুরগির মাংস, মশলাদার সেদ্ধ মটরশুটি, মাখন দেওয়া বিস্কিট, ফুট স্যালাড, ভাজা আমন্ড আর সল্টেড কাজুবাদাম দিয়ে পেট পুরে খেয়ে উঠল ওরা। বাদাম পেয়ে কিকো তো মহাখুশি।
রাতেই বেরিয়ে পড়ব নাকি আমরা? নিচু গলায় জানতে চাইল রবিন।
না, জবাব দিল কিশোর। রাতে টের পাব না কোনদিকে চলেছি। কাল খুব ভোরে আইনস্টাইন যখন ঘুমিয়ে থাকবে, তখন রওনা হব আমরা। মুসা, তুমি ডাণ্ডা নিয়ে বসে থাকো গর্তের মুখে, আমি এখনই বোটটা নিয়ে আসি এদিকের লেগুনে। রবিন আর জিনা, আমাদের ব্যাগ-ব্যাগেজ আর কয়েকদিন চলার মত খাবারের টিন নিয়ে গিয়ে রাখো সাগরতীরে। আজই সবকিছু বোটে তুলে ফেলব আমরা। কাল সকালে শুধু বিছানা-বালিশ আর কয়েক বালতি ঝরনার পানি নিয়ে উঠে পড়ব আমরা মোটর-বোটে।
আমরা নেই, টের পেয়ে আইনস্টাইন যখন গর্ত থেকে বেরিয়ে আসবে, আমরা তখন অর্ধেক সাগর পেরিয়ে গেছি! মুচকি হেসে বলল জিনা। বেচারার জন্যে দুঃখই হচ্ছে আমার।
আমার হচ্ছে না, বলল মুসা। লোকটা আঙ্কেলের শত্রু, কাজেই আমারও শত্রু। তারপরেও আমরা ওকে অঢেল খাবার দিয়ে যাব। ওর খোঁজে ওর লোকজন যদি দশদিন পরেও আসে, ও সেই দশটা দিন আরামেই থাকবে।
এত দ্বীপের মধ্যে আঙ্কেলকে খুঁজতে আমরা কোন দ্বীপে যে যাব! বলল রবিন। চেষ্টা না করলে নিজের কাছেই অপরাধী হয়ে থাকব চিরকাল। কিন্তু তেমন একটা ভরসাও তো পাচ্ছি না।
চেষ্টা করে দেখতে হবে, মাথা ঝাঁকাল কিশোর। আমাদের বিপদে এর আগে কয়েকবার ঝাঁপিয়ে পড়েছেন আঙ্কেল। এখন তাঁর বিপদে আমাদেরও এগিয়ে যাওয়া দরকার। শুধু যদি জানতাম কোনদিকে এগোতে হবে। তবে যতদূর মনে হয়, পশ্চিমের কোনও একটা দ্বীপে হেডকোয়ার্টার করেছে ওরা।
এরপর ব্যস্ত হয়ে পড়ল ওরা। কিশোর বোট নিয়ে এল লেগুনে, রবিন আর জিনা বেশিরভাগ মালপত্র তুলে ফেলল বোটে। কীসে ঘুমাবে ভেবে ওয়েনস্টেইনের বিছানা নিয়ে এল কিশোর বোট থেকে। গর্ত দিয়ে নামিয়ে দেওয়া হলো সেগুলো নীচে। কথা বলা বৃথা জেনে চুপ হয়ে গেছে পক্ষিবিশারদ। একটি কথা না বলে বিছানা-বালিশ-চাদর বিছিয়ে ঘুমাবার প্রস্তুতি নিয়ে নিল গর্তের ভিতর।

অনেকগুলো খাবারের টিন আর একটা ক্যান ওপেনারও নিল সে হাত বাড়িয়ে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই চিৎকার শুরু করল।
তোমাদের খেলাধুলা অনেক তো হলো, এবার আমাকে ওপরে উঠতে দাও! মাটির নীচে কবরের মত লাগছে আমার! দাঁড়াও, বিচ্ছু কোথাকার! একবার তোমাদের পেয়ে নিই হাতের মুঠোয়, উচিত শিক্ষা পাবে তোমরা! এসবের কী মানে, যদি কেউ বলে দিত!
হয়েছে, বলল মুসা। আর অভিনয় করতে হবে না মিস্টার আইনস্টাইন! আপনি ভালো করেই জানেন, আমরা পরস্পরের শত্রু। আপনি যদি একটু মুখ খোলেন, আমরাও কিছুটা নমনীয় তো নিশ্চই হবো। আমরা জানতে চাই, ঠিক কোন দ্বীপে আটকে রাখা হয়েছে মিস্টার ডিক কার্টারকে। এ বারবার এই নামটা শুনছি-কে এই ডিক কার্টার? অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল বন্দি। শোনো, তোমরা যদি ডাকাত-ডাকাত, জলদস্যুর খেলা খেলো, এর তো একটা শেষ আছে, না কি? কয়েকটা দুষ্টু ছেলেমেয়ে একজন ভদ্রলোককে মাটির নীচের গর্তে আটকে রেখেছে, এমন নজির পৃথিবীর কোথাও নেই; আমি তো অন্তত শুনিনি।
আমিও না, বলল মুসা। কিছু যদি স্বীকার করতে না চান, মিস্টার আইনস্টাইন, তা হলে আপনার চুপ করে থাকাই ভালো। শুধু জেনে রাখুন, আমরা সবাই সব জানি।
আচ্ছা বজ্জাত ছেলে দেখছি! বলে মুখ বন্ধ করল বন্দি।
দূরো! বজ্জাত কোথাকার! বলে গর্তের কিনারায় গিয়ে বসল কিকো। দাঁড়াও আসছি! দেখাচ্ছি মজা! অ্যাই, পা বন্ধ করো, দরজা মুছে ঘরে ঢোকো!
নিজের কানকেও বিশ্বাস হচ্ছে না প্রফেসরের। তার সঙ্গে এই অভদ্র ভাষায় কথা বলছে, ওটা কি সত্যিই কাকাতুয়া? না কি এ সবকিছুই স্বপ্ন?
তোর…তোর ঘাড়টা মুচড়ে দেব আমি! বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল ওয়েনস্টেইন।
হা-হা করে হেসে উঠল কিকো। পরমুহূর্তে টানেলে ঢোকা রেল-ইঞ্জিনের বিকট শব্দ করল। মাটির নীচের বদ্ধ জায়গায় ভয়ঙ্কর শোনাল আওয়াজটা। ধপ করে বিছানায় বসে পড়ল বন্দি। পরাজিত, বিধ্বস্ত। বিড়বিড় করছে: মাথা খারাপ! মাথা খারাপ! মাথা খারাপ হয়ে গেছে সবার!
সবকিছু বোটে তুলে গুছিয়ে রেখে ফিরে এল ওরা মুসার কাছে। এখন বাকি থাকল কেবল বিছানা-বালিশগুলো নিয়ে কাল সকালে বোটে উঠে পড়া।
সন্ধে হয়ে গেছে। গর্তের কাছেই ঘুমানোর আয়োজন করতে যাচ্ছিল রবিন ও জিনা, হঠাৎ মুখ দিয়ে শ্‌শ্‌শ্‌শ্‌শ্‌ শব্দ করল মুসা।
যে যেখানে যে-ভঙ্গিতে ছিল মূর্তির মত জমে গেল সবাই।
কী! চাপা স্বরে জানতে চাইল কিশোর।

একটা ইঞ্জিনের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। এইদিকেই আসছে!
কই, আমি তো কিছু শুনতে পাচ্ছি না! ফিসফিস করে বলল রবিন। আমার মনে হয়…
চুপ! থামিয়ে দিল ওকে কিশোর। গর্তমুখ থেকে একটু দূরে সরিয়ে নিয়ে গেল সবাইকে। বিছানা-বালিশ নিয়ে এখনই উঠে পড়ব আমরা বোটে।
অররররর! নিজের মতামতটা জানিয়ে দিল সখা।
যে-যার বিছানা তুলে নিয়ে রওনা হয়ে গেল নোঙর ফেলা বোটের দিকে। বিনা বাক্য-ব্যয়ে মেনে নিয়েছে ওরা প্ল্যানের এই হঠাৎ পরিবর্তন। এতক্ষণে সবার কানেই ধরা পড়েছে শব্দটা।
আইনস্টাইনের খোঁজে আসছে তার সাঙ্গপাঙ্গরা, বোটের দিকে হাঁটতে হাঁটতে বলল মুসা। কিন্তু আমরা যাচ্ছি কোথায়?
ওদের চোখের আড়ালে, জবাব দিল কিশোর। এই বোটই এখন আমাদের একমাত্র ভরসা। ওরা এদিক এলে আমরা যাব ওদিকে, ওদিক গেলে এদিকে। এটা ওদেরকে কেড়ে নিতে দেয়া যাবে না কিছুতেই।
খোলা লেগুন থেকে বোটটা সরিয়ে নিল ওরা পাহাড়ের আড়ালে, তারপর বন্ধ করে দিল ইঞ্জিন।
অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না কিছুই, কিন্তু অগ্রসরমান ইঞ্জিনের শব্দটা শোনা যাচ্ছে পরিষ্কার। অনেক কাছে এসে পড়েছে মোটর-বোট। এখন আর কোনও সন্দেহ নেই, এই দ্বীপ লক্ষ্য করেই আসছে ওটা। ছায়ার মত দেখা গেল ওটাকে, বেশ বড়সড় একটা বোট, সোজা গিয়ে ঢুকল গোপন চ্যানেলে।
ইঞ্জিন বন্ধ হতেই কানে এল ব্যালকনিতে বসা কয়েকটা সামুদ্রিক পাখির প্রতিবাদের শব্দ। যারা ভয় পেয়ে আকাশে উঠে পড়েছিল, তারা ফিরে আসতেই সব চুপ হয়ে গেল আবার।
মনে হয় এতক্ষণে গর্ত থেকে বেরিয়ে পড়েছে আইনস্টাইন, বলল জিনা।
হ্যাঁ, জবাব দিল রবিন। এবার তোমার নামে নালিশ করবে তোমার আব্বার কাছে!
অররররর! রবিনের কথায় সায় দিল সখা।
চমকে উঠে সবাই দেখল ডেকের একপাশে গায়ে গা ঠেকিয়ে বসে আছে। সখা-সখি। হেসে উঠল সবাই ওদের আনুগত্যের নমুনা দেখে।
যাই হোক, হাই তুলে জিজ্ঞেস করল জিনা, এবার আমরা কী করব? রওনা হয়ে যাব যে-কোনও একদিকে?
মাথা নাড়ল কিশোর। ভোর না হওয়া পর্যন্ত এখানেই থাকব আমরা। আকাশ একটু ফরসা হয়ে এলেই রওনা দেব। বেশ অনেকটা দূর দাঁড় বেয়ে সরে যাওয়ার

পর ইঞ্জিন স্টার্ট দেব আমরা, যাতে আওয়াজ শুনে কেউ পিছু ধাওয়া না করতে পারে।
তা হলে নোঙর ফেলে বিশ্রাম নিয়ে নিলেই পারি আমরা, বলল মুসা। একজন পাহারায় থাকলেই যথেষ্ট।
নোঙর নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল রবিন ও মুসা। গ্রাউন্ডশীট বিছিয়ে বিছানা পেতে ফেলল জিনা ডেকের উপর। চমৎকার হাওয়া, মাথার উপর তারা ভরা আকাশ, সাগরের ঢেউয়ে মৃদুমন্দ দোল-কিশোর ঠায় বসে আছে পাহারায়, বাকি তিনজন শুয়ে পড়েছে, কিন্তু ঘুম নেই ওদের কারও চোখে।
আপন মনে মুখস্থ বুলি আওড়াতে শুরু করল কিকো। মুসা ওকে থামতে বলায় উল্টে ধমক দিল, তুই চুক কর!
উঠে বসে মুসা ওর ঠোঁটে টোকা দিয়ে শাসন করতে গিয়ে দেখল, চট করে ডানার নীচে ঢুকিয়ে ফেলেছে মাথাটা। মৃদু হেসে বলল ও, বদমাশ কোথাকার! চালাকের ধাড়ি!
ডানার নীচ থেকে হালকা গলায় জবাব এল, দূরো!
অনেকক্ষণ কেটে গেল চুপচাপ। জিনার চোখ লেগে এসেছিল, ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। ইঞ্জিনের আওয়াজ! স্টার্ট নিয়েছে মোটর-বোট।
তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে কিশোর গোপন চ্যানেলের দিকে।
মুসা! ডাকল ও।
বুঝতে পেরেছি, বস, বলেই কনুই চালাল মুসা রবিনের পাঁজরে। উঠে পড়ো, নথি। নোঙর তুলে ফেলতে হবে। ওরা, এদিকে এগোলে সরতে হবে আমাদের।
তার মানে, নোঙরের রশি ধরে টানতে টানতে বলল রবিন, মুসার ওমনিবায়োলজিস্টকে উদ্ধার করে ফেলেছে ওরা। চলে যাচ্ছে এখন। এতক্ষণে জেনে গেছে চারটে ছেলে-মেয়ে ওকে গর্তে ফেলে আটকে রেখে চলে গেছে ওর বোট নিয়ে। শুনে নিশ্চই আচ্ছামত বকেছে ওকে-এবার ফিরে যাচ্ছে নিজেদের আস্তানায়।
জলদি করো! তাগাদা দিল কিশোর। বাতি জ্বেলেছে! এবার যদি আমাদের খুঁজতে আসে তা হলে বিপদ হবে!
ব্যাপারটার গুরুত্ব উপলব্ধি করে দ্রুত হাত চালাল মুসা ও রবিন। বোটের ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে ফেলেছে কিশোর ইতিমধ্যে। গভীর সাগরের দিকে পিছিয়ে। যাচ্ছিল বোট, কিন্তু রিভার্স গিয়ার দিল কিশোর। থেমে দাঁড়াচ্ছে ওদের বোট।
কী হলো! বলে ঘাড় ফিরিয়ে চাইল মুসা ও রবিন কিশোরের দিকে।
চেয়ে দেখো, একটা আঙুল তুলল কিশোর গোপন চ্যানেলের দিকে। দেখা গেল বোট ঘুরিয়ে নিয়েছে ওরা। খোঁজাখুঁজির মধ্যে না গিয়ে সোজা রওনা হচ্ছে

আস্তানার দিকে। আমরাও বেঁচে গেলাম অযথা খোঁজাখুঁজির হাত থেকে। ওরা একটু এগোলেই পিছু নেব আমরা, সহজেই জেনে যাব কোথায়। আটকে রেখেছে আঙ্কেলকে।
ভালোই হবে, বলল জিনা! আঁধারে দেখতে পাবে না আমাদেরকে, আমাদের বোটের আওয়াজও শুনতে পাবে না নিজেদের শব্দের জ্বালায়।
ঠিক, হাসল মুসা। তবে সতর্ক থাকতে হবে আমাদের। কোনও কারণে। ওরা যদি ইঞ্জিন বন্ধ করে, আমাদেরও চট করে বন্ধ করতে হবে। নইলে টের পেয়ে যাবে পিছনে লেগেছি আমরা।
পশ্চিম বরাবর রওনা হয়ে গেল শত্রু-বোট। আধমাইল পিছনে থেকে ওদেরকে অনুসরণ করছে আইনস্টাইনের বোট। পালা করে হুইল ধরছে ওরা। যখন যার হাতে হুইল, সতর্কতার সঙ্গে চোখ রাখছে সে সামনের মোটর বোটের উপর-গতি কমলেই বন্ধ করে দেবে ইঞ্জিন।
ডেক-রেইলের পাশে বসে দিব্যি দোল খাচ্ছে সখা-সখি। মাঝে মাঝে গলা লম্বা করে দেখে নিচ্ছে কিশোরকে। বোঝাই যাচ্ছে, মন স্থির করে নিয়েছে ওরা-কিশোর যেখানেই যাক, ওরা থাকবে সঙ্গে। ওদের ভালবাসা দেখে মুগ্ধ জিনা। বলেই ফেলল, আমার রাফিয়ানের থেকে কোনও দিক দিয়ে কম না!
ঘুমের পাট চুকে গেছে বলে মুসার কাঁধে জায়গা নিয়েছে কিকো। বকবক করছে আপন মনে। মাঝে মাঝে হাঁচির মত শব্দ করেই বলে উঠছে, মরে। গেলাম! ডাক্তার! ডাক্তার ডাকো!

.

অনেক-অনেকক্ষণ চুপ করে থাকবার পর রবিন বলে উঠল, আলোটা দেখতে পেয়েছ, মুসা? জ্বলছে-নিভছে?
কোন দিকে?
সামনেই, কিন্তু একটু ডাইনে। মনে হচ্ছে, এসে গেছে ওদের ঘাটি; সিগনাল পাঠিয়ে পথ দেখাচ্ছে কেউ ওদের। ওই দেখো, আলোর দিকে ঘুরে গেল ওদের বোটের নাকটা।
যাত্রাপথের শেষে চলে এসেছি প্রায়, বলল কিশোর। এদিকে চাঁদটাও উঠি-উঠি করছে। ওদেরকে ত্যাগ করতে হবে আমাদের এখুনি, নইলে দেখে ফেলবে।
বলতে না বলতেই ঝাপসা একটা চাঁদ বেরিয়ে এলো মেঘের আড়াল থেকে। ওই আলোতে সামনের দ্বীপটা তো দেখতে পেলই, অনেকটা বামে আরও একটা দ্বীপ চোখে পড়ল ওদের। দশ-বারো মাইল হবে দুটোর দূরত্ব।
হুইল ঘুরিয়ে বোটের নাকটা তাক করল কিশোর দূরের দ্বীপটার দিকে। মুসাকে বলল সামনের বোটটা ওদের ঘাঁটিতে পৌঁছবার একটু আগে যেন জানায় ওকে।

মিনিট বিশেক কাটল চুপচাপ।
ব্যস, হয়েছে, বলল মুসা। এবার ইঞ্জিন বন্ধ করতে পারো, কিশোর। এই গতিতে যতটা পারা যায় যাব, তারপর বৈঠা বাইব। ওরা প্রায় পৌঁছে…
কথা শেষ হওয়ার আগেই ইগনিশন সুইচ অফ করে দিল কিশোর, হুইল ঘুরিয়ে দিক পরিবর্তন করল একটু।
পিছন দিকে গিয়ে নোঙর ফেলব, বলল কিশোর। কেমন বুঝছ, সেকেন্ড, দ্বীপটা?
মনে হচ্ছে, আমাদেরটায় পাহাড়ও আছে, আবার সৈকতও আছে। নামতে কোনও অসুবিধে হবে না, আড়ালও পাওয়া যাবে।
পিছন দিয়ে ঘুরে দ্বীপের কাছে গিয়ে চাঁদের আলোয় মোটামুটি পরিষ্কারই দেখতে পেল ওরা। বেশি পাহাড় নেই বটে, তবে ছোটখাট টিলা রয়েছে মেলাই। বালু আর ছোট নুড়ি পাথরের ঢালু তীর।
দাঁড় বন্ধ করে তৈরি হয়ে নাও তোমরা, বলল কিশোর। সোজা ডাঙায় নাক তুলে দিচ্ছি, বোট থামলেই লাফিয়ে নেমে যাবে তোমরা। টেনে বেশ কিছুটা ওপরে তুলে রাখতে হবে এটাকে।
প্রথমে লাফিয়ে নামল মুসা ও রবিন, দুই সেকেন্ড পর লাফ দিয়ে নামল কিশোর ও জিনা। চারজন মিলে সৈকতের বেশ কিছুটা উপরে তুলে ফেলল বোট, তারপর নোঙর গাড়ল শক্ত করে। ভাটার শেষে জোয়ার এলেও এখন আর ভেসে যাবে না ওদের বাহন।
ক্লান্তির শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে ওরা। সাগরতীরেই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়তে যাচ্ছিল মুসা, দুই হাত ধরে টেনে তুলল ওকে কিশোর ও রবিন। মুসা বোঝাবার চেষ্টা করল: কোনও অসুবিধে নেই এখানে ঘুমালে, কেউ জানে না। ওরা এই দ্বীপে, এটা আর একটা পাখির দ্বীপ ছাড়া কিছুই নয় কিন্তু কোনও কথা শুনল না ওরা, ওকে তুলে নিয়ে এগোল সামনের টিলার দিকে। রবিন কাছে পৌঁছে টর্চ জ্বালতেই দেখা গেল টিলার গায়ে চমৎকার একটা গুহার মত গর্ত রয়েছে, ঠিক যেন ওদের ঘুমানোর জন্যই মাপ দিয়ে তৈরি হয়েছে ওটা। মেঝেটা শুকনো, কর্কশ, মোটা বালি। ভিতরে সামুদ্রিক শ্যাওলার কিছুটা সোদা গন্ধ, কিন্তু অসহ্য নয় মোটেও। ধপাস করে বসে পড়ল ওরা বালির উপর।
বোট থেকে বিছানা নিয়ে আসবার কথা বলল জিনা, কিন্তু কেউ আর উঠতে পারল না। ওখানেই ঢলে পড়ল ঘুমে। শোয়াটা একটু বে-কায়দা হওয়ায় হালকা নাক ডাকছে মুসার। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল কিকো মুসার মাথার কাছে, সামনে ঝুঁকে বুঝবার চেষ্টা করল তার প্রাণপ্রিয় মুসা এরকম শব্দ করছে কেন, তারপর সিদ্ধান্ত নিল ব্যাপারটা গুরুতর কিছু নয়। এবার উঠে বসল গুহার ভিতরে পড়ে থাকা একটা পাথরের উপর। এক-আধবার হালকা ভাবে শব্দটা নকল করল,

তারপর ডানার নীচে মাথা গুঁজল। আর গুহামুখে গায়ে গা ঠেকিয়ে বসে পড়ল সখা-সখি, ঠিক যেন পাহারাদার।
পরদিন সকালে হেলেদুলে কিশোরের পাশে গিয়ে দাঁড়াল সখা-সখি। দুপাশ থেকে ডাকল দুজন, অররররর!
চোখ মেলল কিশোর। দেখল সকালের নাস্তা হাজির। ঠোঁটে করে ছয় সাতটা মাছ ধরে এনেছে ওরা। ভোরবেলাই পেট পুরে মাছ খেয়ে এসেছে ওরা। সাগর থেকে, তারপর নিয়ে এসেছে কিশোরের জন্য। মাছগুলো সাজিয়ে দিল ওরা কিশোরের বুকের উপর, বিশাল চঞ্চু খুলে আর বন্ধ করে দেখাল ওগুলো কী করতে হবে; তারপর, সন্তুষ্টচিত্তে গলার ভিতর থেকে গম্ভীর আওয়াজ বের করল, অররররর!
জেগে গেছে সবাই। হাসিমুখে চেয়ে রয়েছে কিশোরের দিকে। নাক কুঁচকাল কিশোর খুশি ঢাকবার জন্য। বলল, এহ! মাছের আঁশটে গন্ধ করে দিল গায়ে! এখন গোসল না করে উপায় নেই।
সবাই গিয়ে নামল সাগরে। গোসল সেরে পোর্টেবল চুলো আর গোটা কয়েক খাবারের টিন নিয়ে ফিরে আসবে গুহায়। আমন্ড বাদামের টিন খুঁজতে গিয়েই ট্রান্সমিটারটা পেয়ে গেল জিনা। ওটা হাতে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখল কিশোর, কিন্তু বুঝতে পারল না কীভাবে অপারেট করা যায়। আঙ্কেলেরটা অন্য রকম ছিল। না জেনে এটা ঘাঁটাঘাঁটি করা ঠিক হবে না, এটুকু পরিষ্কার বুঝল ও। হয়তো এটা এমন ভাবে সেট করা আছে, এর মাধ্যমে সাহায্য চাইলে সোজা এসে হাজির হবে শত্রুপক্ষ।
মাছের তেলে মাছ ভেজে খেল ওরা; সেইসঙ্গে বিস্কিট, ফল, দুধ, পনির, জেলি, বাদাম আর সবজি তো আছেই। ভরপেট খেয়ে নিল ওরা সকালেই।
চলো, নাস্তার পর প্রস্তাব দিল রবিন, টিলার ওপর উঠে দেখি ওই দ্বীপে। ওরা কী করে।
সবচেয়ে উঁচু টিলাটায় উঠবে বলে স্থির করল ওরা, কারণ ওখান থেকে এই দ্বীপেরও কোথায় কী আছে দেখে নেওয়া যাবে একনজরে।
প্রথমে একটা ছোট টিলার উপর উঠে চওড়া একটা ঘাসে ছাওয়া উপত্যকা পাওয়া গেল, তারপর সেই উঁচু টিলা। অর্ধেক উঠেই টের পাওয়া গেল বেশ ছোট এই দ্বীপটা-তিন দিকেই সাগর দেখা যাচ্ছে কাছাকাছি। চূড়ায় পৌঁছে। ওপাশটায় নজর দিয়েই তাজ্জব হয়ে গেল ওরা। আশ্চর্য সুন্দর একটা নীল পানির লেগুন, তার ওপাশে আরেকটা দ্বীপ বা এই দ্বীপেরই আরেক অংশ। লেগুনের পানি আয়নার মত স্বচ্ছ, স্থির। খোলা সমুদ্রের দিকের দুই প্রান্ত ছোট বড় নানান আকার-আকৃতির পাথরখণ্ড দিয়ে আটকানো-কোথাও ছোট টিলার সমান উঁচু,

কোথাও আবার বাইরের সাগর থেকে মাত্র এক কি দুই হাত উঁচু। লেগুনটাকে দেখে মনে হচ্ছে উত্তাল সমুদ্রের মাঝখানে অপূর্ব সুন্দর একটা নিস্তরঙ্গ দিঘি। এতই সুন্দর যে মনে হচ্ছে আসলে স্বপ্ন দেখছে ওরা, সত্যি-সত্যি এরকম একটা লেগুন থাকতেই পারে না।

হাঁ করে চেয়ে রইল ওরা এক মাইল লম্বা আর আধ মাইল চওড়া এই প্রাকৃতিক লেকের দিকে। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে সবাই চাইল দূর দিগন্তের ছোট্ট দ্বীপটার দিকে। আবছা মত দেখা যাচ্ছে জেটিতে ভিড়ানো কয়েকটা বোট।

হঠাৎ চমকে আকাশের দিকে চাইল সবাই। ভ্রমরের গুঞ্জনের মত শব্দ আসছে। বাড়ছে শব্দটা। দূরে দেখতে পেল ওরা প্লেনটা, সোজা এইদিকেই আসছে। কাউকে কিছু বলতে হলো না, শুয়ে পড়ল সবাই একটা পাথরের আড়ালে। উড়তে উড়তে লেগুনের উপর এসে পড়ল প্লেনটা, তারপর উড়ন্ত অবস্থাতেই কী-একটা পড়ল ওটা থেকে। দেখতে দেখতে ছাতার মত হয়ে গেল জিনিসটা, বড়সড় একটা বস্তা ঝুলছে ছাতার নীচে।

মুহূর্তের মধ্যে নানান কথা খেলে গেল ওদের মাথায়। ব্যাপার কী? কোনওরকম বৈজ্ঞানিক গবেষণা-বোমা-অ্যাটম বোম? কী ওটা?

প্যারাশুটটা দুলতে দুলতে নেমে আসছে লেগুনে। নীচের প্যাকেটটা দেখা গেল চকচকে কী দিয়ে মোড়া, কিশোরের কাছে মনে হলো ওয়াটারপ্রুফ প্ল্যাস্টিক হবে। পানিতে পড়েই তলিয়ে গেল জিনিসটা। প্যারাশুটটা কয়েক মুহূর্ত গোল হয়ে ভেসে থাকল শান্ত পানিতে, তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল পানির নীচে।

ওই দেখো, বলল রবিন। চক্কর দিয়ে আবার আসছে। আরও একটা ফেলবে মনে হচ্ছে।

একটা নয়, পরপর আরও দুটো প্যাকেট ফেলা হলো প্লেন থেকে। আগেরটার মত এগুলোও ঠিক একই ভাবে কোনও চিহ্ন না রেখে তলিয়ে গেল লেকের পানিতে। শেষ একটা চক্কর দিয়ে চলে গেল প্লেনটা, মিলিয়ে গেল। দূরে।

নীচের ঠোঁটে চিমটি দিচ্ছে কিশোর।

আশ্চর্য! কী করছে ওরা? বলল ও। পানিতে ফেলছে কেন ওগুলো? কী আছে ওই প্যাকেটগুলোতে?

পারমাণবিক বর্জ্য হতে পারে? প্রশ্ন করল রবিন।

উঁহু, এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল কিশোর। তা হলে স্টীলের কন্টেইনার হাত ওগুলো, ওয়াটারপ্রুফ প্ল্যাস্টিক জড়ানো থাকত না। অন্য কিছু।

চলো না, বোটটা নিয়ে গিয়ে দেখি লেগুনের তলায় কিছু দেখা যায় কি না, বলল জিনা।

হাসল মুসা। বোট নিয়ে ঢুকবে কোন দিক দিয়ে, শুনি? চারদিক ঘেরা না? জিভ কাটল জিনা। তারপর বলল, যাই হোক, ওখানে কোনও ভাবে গিয়ে যদি ডুব দিয়ে দেখা যেত!
অররররররর! সমর্থন জানাল সখা। সখি বলল, অররররর! কাজটা যে কত সহজ তা বোঝাবার জন্য পাহাড়ের চূড়া থেকে একসঙ্গে কঁপ দিল ওরা দুজন, উড়ে গিয়ে বসল লেগুনের পানিতে। পরমুহূর্তে ব্যস্ত হয়ে পড়ল মাছ ধরায়।
চলো, আমরাও যাই, বলে ঝাঁপ দেওয়ার ভঙ্গি করল মুসা। তারপর বলল, চলো, কিশোর। গরমে ঘামাচি উঠে যাচ্ছে পিঠে। ওই লেগুনের পানিতে গোটা কয়েক ডুব দিতে না পারলে শান্তি হবে না আমার।
আমারও, তর্জনী আর বুড়ো আঙুল দিয়ে নীচের ঠোঁটে শেষ একটা টান দিয়ে বলল কিশোর। চলো, রবিন। পথ দেখাও।
তরতর করে নামতে শুরু করল রবিন, তার পিছন পিছন চলল আর সবাই। বিশ মিনিটেই পৌঁছে গেল ওরা লেগুনের তীরে।
জামা খুলে ঝাঁপিয়ে পড়ল তিন গোয়েন্দা স্বচ্ছ, নীল পানিতে। ধীর ভঙ্গিতে সাঁতার কেটে এগিয়ে যাচ্ছে বস্তা তিনটে যেখানে পড়েছিল সেইদিকে।
আগে একটা ডুব দিয়ে দেখে আসি কতটা গভীর, বলেই লম্বা করে দম নিয়ে ডিগবাজি খেয়ে ডাইভ দিল মুসা।
লেগুনটা বেশ গভীর। অনেকদূর নামল মুসা, কিন্তু তল পর্যন্ত পৌঁছুতে পারল না। দম ফুরিয়ে আসতেই উঠে এল সে উপরে। খানিক হাঁপিয়ে নিয়ে মুখ খুলল।
নীচে যেতে পারিনি। অনেক গভীর। তলে দেখলাম, গাদাগাদা বস্তা পড়ে আছে, চকচকে প্ল্যাস্টিক দিয়ে মোড়ানো। এবার খানিকটা সামনে গিয়ে ডুব দেব। মনে হলো ওদিকটায় পানি কিছু কম। গজ বিশেক এগিয়ে গিয়ে চিত হয়ে একটু বিশ্রাম নিয়ে নিল মুসা, তারপর বলল, দাঁড়াও, এইবার অন্তত ছুঁয়ে দেখে আসব।
এবার কিশোরও সঙ্গে গেল। ওর সঙ্গে ডুব দিল সখা-সখিও। মুসা ডুব দিতে যাচ্ছে দেখে আগেরবারের মতই ঠিক শেষমুহূর্তে শূন্যে উঠে এদিক ওদিক চেয়ে রবিনের কাঁধে চাপল কিকো। পানিতে নেমে ছেলেদের এই সব ছেলেমানুষি ওর একদম না-পছন্দ। বলল, দূরো!
দুজনই ওরা পৌঁছে গেল এবার, দুজনেই টিপে দেখল নরম প্যাকেটের ভিতর শক্ত কী যেন-কিন্তু ঠিক কী তা বুঝে উঠবার আগেই বুক ভরে বাতাস নেওয়ার জন্য পাগল হয়ে উঠল ওরা। পা দিয়ে নীচের পাথরে ধাক্কা দিয়ে ছুটল উপর দিকে।
খানিক হাঁপিয়ে নিয়ে কিশোর বলল, একটু ওইদিকে চলো। মনে হলো ওখানে উঁচু পাথরের ওপর একটা বস্তা দেখলাম। আঙুল তুলে ডানপাশটা দেখাল ও। সবাই সরে গিয়ে স্থির হয়ে থাকল ওখানে।

কিশোর ও মুসাকে জিরিয়ে নেওয়ার সুযোগ দিয়ে এবার ডুব দিল রবিন। বিশ সেকেন্ডের মধ্যেই ফিরে এল ও। রীতিমত ঘাবড়ে গেছে। ওর চোখে-মুখে। ভয়ের চিহ্ন দেখে কাছে এগিয়ে এল কিশোর ও মুসা।
কী দেখতে পেলে?
ফেটে গেছে বস্তা। ভেতরের জিনিস সব ছড়িয়ে রয়েছে চারপাশে। কিশোর, এখনই আমাদের পালানো দরকার এখান থেকে!
কী আছে আগে দেখে আসি একবার, বলে একই সঙ্গে ডুব দিল কিশোর ও মুসা। প্রায় এক মিনিট পানির নীচে থাকল ওরা, তারপর উঠে এসেই বিনা বাক্য-ব্যয়ে সাঁতার কাটতে শুরু করল তীরের দিকে।
কী? কী দেখলে পানির নীচে? অস্থির ভাবে পায়চারি করছিল জিনা লেকের পারে, ওরা কাছে আসতেই জিজ্ঞেস করল কৌতূহল চাপতে না পেরে।
অস্ত্র! বলল মুসা। পিস্তল-রিভলভার থেকে নিয়ে রাইফেল-মেশিন গান বাজুকা-রকেট লঞ্চার সব রকম! অসংখ্য!
শুকনো কাপড় গায়ে দিয়ে তীরে একটা পাথরে হেলান দিয়ে বসল ওরা।
ব্যাপার কী? প্রশ্ন করল রবিন। কী মনে হয়, কিশোর? আশ্চর্য না? বাতিল মাল? নইলে পানিতে ফেলছে কেন এসব?
না, মাথা নাড়ল কিশোর। তা হলে এত যত্নের সঙ্গে ওয়াটারপ্রুফ প্ল্যাস্টিক দিয়ে মুড়িয়ে প্যাক করত না, ফেলার সময় প্যারাশুট ব্যবহার করত না। বাতিল অস্ত্র ডাম্প করছে না ওরা, ভালো অস্ত্র লুকিয়ে রাখছে লোকচক্ষুর অন্তরালে।
লুকিয়ে রাখছে! কপালে উঠল জিনার চোখ। কী করবে ওরা এগুলো। দিয়ে?
এরা খুব সম্ভব অস্ত্র চোরাচালানী। কোনও জায়গা থেকে হাজার হাজার অস্ত্র এনে জমা করছে এখানে। পরে চাহিদা মত সাপ্লাই দেবে। সরকার উচ্ছেদ করে ক্ষমতা দখল করতে চায় এমন সব বিদ্রোহী গ্রুপের কাছে এসবের খুব চাহিদাসম্ভবত দক্ষিণ আমেরিকা কিংবা মধ্য বা দূর প্রাচ্যের কোনও দেশে যাবে এসব অস্ত্র। বাংলাদেশেও যেতে পারে।
ঠিক তাই, এই রকমই কিছু হবে, কথাটা সমর্থন করল মুসা। গোলমাল তো লেগেই আছে দুনিয়াময়। ওদের অস্ত্র দরকার, আর এদের টাকা।
কিন্তু এখান থেকে এগুলো তুলবে কী করে? প্রশ্ন তুলল কিশোর। বোট যদি লেগুনে ঢোকানো না যায়, কীসে করে নেবে ওরা অস্ত্রগুলো? একটা কিছু ব্যবস্থা নিশ্চই আছে,..কী সেটা?
এর জবাব নেই ওদের কারও কাছে।
আমার মনে হয়, বলল রবিন, প্লেন থেকে কিছু ফেলা হচ্ছে দেখেই আঙ্কেল ডিকের সন্দেহ হয়েছিল। তাই একা একা সীগালে করে সারাদিন সূত্র খুঁজেছিলেন

দ্বীপগুলোয়। টের পেয়ে ধরে নিয়ে গেছে ওরা।
যাদের কারণে পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছিল তাকে, এরাই তারা কি না কে জানে! বলল জিনা।
পাথরে হেলান দিয়ে গল্প করছিল ওরা, এমনি সময়ে উপরের একটা পাথরে বসা কিকো চ্যা করে সতর্ক করল ওদের। হাঁটুর উপর ভর দিয়ে উঁচু হয়েই মাথাটা নামিয়ে নিল মুসা।
একটা বোট আসছে, কিশোর! জরুরি কণ্ঠে বলল সে। সোজা আসছে। এই দিকেই। ব্যারিয়ারের কাছে চলে এসেছে প্রায়। এখুনি নোঙর ফেলবে। এখন লুকাই কোথায়?
এদিক-ওদিক চেয়ে কাছেই পানিতে ভেসে আসা একগাদা সামুদ্রিক শৈবালের দিকে আঙুল তাক করল কিশোর। ওর নীচে। খালি নাকটা জাগিয়ে রাখব আমরা।
ঝপাঝপ পানিতে পড়ল ওরা। মাথার উপর শৈবাল টেনে ঝুপ করে ফেলল। চোখের কাছে শুধু ফাঁক রাখল সামান্য। কিকোকে কাঁধে নিয়ে তার উপর এক বোঝা শৈবাল চাপিয়ে সাবধান করে দিল মুসা, চু-উ-উ-প!
ওকেও পাল্টা সাবধান করল কিকো। তারপর চুপ হয়ে গেল।
ওদের কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে গেল সখা-সখি। এ আবার কী রকম খেলা! যাই হোক, কোন স্তূপের নীচে কিশোর আছে আন্দাজ করে নিয়ে একজন উঠে বসল ওর মাথার উপর, অপরজন সাঁতার কাটছে মাথার চারপাশে। মনে মনে হাসল কিশোর। পাফিন দুটোকে দেখলে কেউ কল্পনাও করতে পারবে না যে চার-চারটে ছেলেমেয়ে লুকিয়ে আছে এইখানে।
খোলা সমুদ্র থেকে লেগুনে ঢুকবার কোনও রাস্তা নেই, তাই প্রাচীরের পাশে বোট ভিড়িয়ে নোঙর ফেলল ওরা। শব্দ শুনে বোঝা গেল নিচু পাথরের ওপাশে খুব কাছেই পারে নামল কয়েকজন। আসছে এইদিকে। তামাকের গন্ধ নাকে আসায় বোঝা গেল সিগারেট ধরিয়েছে ওরা। কথা বলছে নিজেদের মধ্যে। কান খাড়া হয়ে গেল জিনা ও তিন গোয়েন্দার।
শেষ চালান তো পৌঁছে গেল, ভারী গলায় বলল একজন। মনে হয়। মালে ছেয়ে গেছে গোটা লেগুনের তল।
হ্যাঁ। এখন তোলা শুরু করতে হবে, বলল আরেকজন। কথা শুনলে মনে হয় ধমক মারছে। তবে তার আগে আমাদের পরিষ্কার ভাবে জানতে হবে ঠিক কী তথ্য পাঠিয়েছে ওই লোকটা তার হেডকোয়ার্টারে। কিন্তু ব্যাটা তো একটা কথাও বলছে না!

তৃতীয় একজনের গলা ভেসে এল, এত চেষ্টা করেও যখন একে দিয়ে, কথা বলানো গেল না, তখন আমাদের চীফকে জরুরি মেসেজ পাঠানো দরকার। আমার তো মনে হয়, ওয়াশিংটন থেকে আরও টিকটিকি পৌঁছে যাবার আগেই যতটা পারা যায় তুলে ফেলা ভালো।
দ্বিতীয় লোকটার কী অবস্থা? এ-ও কি কথা বলবে না?
এটা তো আগেরটার চেয়েও কড়া মাল! বলল প্রথম জন। মনে হয় হলিউড থেকে এসেছে নামজাদা কোনও অভিনেতা! কোনও কথা স্বীকার করানো যায় না, মেজাজ দেখায়, নালিশ করবার ভয় দেখায়; খালি অরনিথো অরনিথো করছে, আর হাবাগোবার অভিনয় চালিয়ে যাচ্ছে সমানে। কী আহ্লাদ! একই দ্বীপে ধরা পড়ল, অথচ ওরা দুজন কেউ নাকি কাউকে চেনে না!
পানির নীচে দাঁত দিয়ে জিভ কাটল মুসা। কার কথা বলছে এরা, ওয়েনস্টেইন নয় তো? কথা শুনে মনে হচ্ছে, ওরা যেমন তার একটা কথাও বিশ্বাস করতে পারেনি, শত্রুপক্ষের লোক মনে করে শায়েস্তা করেছে; এরাও ঠিক সেই একই ব্যবহার করছে তার সঙ্গে-বিশ্বাস করছে না তার একটা কথাও
এদেরকে অনির্দিষ্ট কাল বন্দি করে রাখা কিন্তু খুবই রিস্কি, বলল তৃতীয় লোকটা।
দ্বিতীয়জন বলল, ঠিক বলেছ। অর্ডারও এসে গেছে। আজই সন্ধের সময় ওদেরকে বোটে তুলে ফেলতে হবে। মাঝরাতে এমন এক জায়গায় পাঠিয়ে দেব, যেখান থেকে কেউ কখনও ফেরে না। দুনিয়ার কেউ কোন চিহ্ন খুঁজে পাবে না ওদের। গত একটা বছর আমাদের জ্বালিয়ে মেরেছে এই কার্টার বদমাশটা! অযথা জেরা করে এখন আর সময় নষ্ট করা যায় না। ওটাকে যত শীঘ্রি খতম করে দেয়া যায়, ততই মঙ্গল।
শৈবাল স্তূপের নীচে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা চারজন। বুকের ভিতরটা কাঁপছে, কিন্তু ধরা পড়ার ভয়ে নড়ল না একটুও। লোকগুলো কথা বলতে বলতে সরে গেল দূরে। বোঝা গেল ওরা দেখতে এসেছে এক-আধটা বোঁচকা ডাঙায় পড়ল কি না। মিনিট বিশেক পর মোটর-বোটের ইঞ্জিন স্টার্ট নিল, আওয়াজটা দূরে মিলিয়ে যেতে মাথার উপর থেকে শৈবাল সরিয়ে উঠে পড়ল ওরা ডাঙায়।
সখা-সখি আবার ব্যস্ত হয়ে পড়ল মাছ ধরায়।
মাথার উপর থেকে শৈবাল সরাতেই ক্ষোভে ফেটে পড়ল কিকো, বলি, কী হচ্ছে এসব! অ্যাঁ? এসব কী? আহা রে, কিকো! আহা রে বেচারী কিকো! হ্যাঁচ্চো, হ্যাঁচ্চো! মরুকগে ডাক্তার, দূরো!
তীরে উঠে বড় একটা পাথরের আড়াল থেকে নজর রাখল ওরা বোটটার উপর। নাক বরাবর সোজা শত্রুদ্বীপের দিকে চলেছে বোট! জেটিতে গিয়ে নোঙর না

ফেলা পর্যন্ত তাকিয়েই থাকল ওরা। তারপর ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সবাই একসঙ্গে।
একে অপরের দিকে চাইল ওরা, তারপর প্রশ্ন করল একই সঙ্গে, এইবার?
কিশোর কী বলে শুনবে বলে সবাই তাকাল ওর মুখের দিকে।
মহা বিপদ এখন আঙ্কেলের, বলল কিশোর। কাউকে খবর দেওয়ার উপায় নেই, কাউকে জানাবার উপায় নেই কিচ্ছু। যা করবার আমাদেরই করতে হবে।
যেমন? কী করার কথা ভাবছ? প্রশ্ন করল রবিন।
এখন যখন নিঃসন্দেহে জানতে পারলাম, সামনের ওই দ্বীপেই বন্দি হয়ে আছেন আঙ্কেল, ওখানেই যাব আমরা তাকে উদ্ধার করতে।
কীভাবে? প্রশ্ন করল জিনা। আমাদের, মানে, আইনস্টাইনের বোট নিয়ে গেলে ওরা দেখে বা শুনে ফেলবে না?
রাতে যাব আমরা, বলল কিশোর। আর শেষ এক মাইল যাব বৈঠা বেয়ে। চলো, গুহায় ফিরে গিয়ে আলোচনা করে দেখি ভালো কোনও প্ল্যান বেরোয় কি না।
হ্যাঁ, বলল জিনা। এখানে নিরাপদ বোধ করছি না। বোটটা এখনও আছে দেখতে পেলে শান্তি পাব কিছুটা।
রবিনের পিছু নিয়ে পাহাড় বেয়ে উঠল ওরা, তারপর নেমে গেল উপত্যকায়। ওখান থেকেই দেখা গেল বোটটা। জোয়ারের পানি সরে যাওয়ায় বালু আর নুড়ি পাথরের উপর উঠে আছে নাকটা। টিলা থেকে দৌড়ে নেমে গেল ওরা বোটের কাছে। বোট থেকে ভেজা কাপড় বদলে, পছন্দ মত খাবারের, টিন বাছাই করে নিয়ে চলে এল ওরা টিলার সেই গুহায়।
ভরপেট খেয়ে নিল ওরা সাতজন। সখার দেখাদেখি সখিও আজকাল এক আধটা ক্যাড় সার্ডিন গিলে নেয়-তবে বোঝা যায়, কাঁচা মাছের মত অতটা মজা লাগছে না ওর, সম্ভব হলে খাওয়ার সময় দুই আঙুলে টিপে ধরে রাখত নাক।
খাওয়ার সময় হাসিখুশি একটা ভাব বজায় রাখবার চেষ্টা করল মুসা, কিন্তু তেমন সাড়া মিলল না কারও কাছ থেকে। লেগুনে অস্ত্রের সন্ধান পাওয়া, আর ডিক কার্টারের খুন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা–এই দুটো ব্যাপার গভীর ছাপ ফেলেছে ওদের মনের উপর। সেই সঙ্গে বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়বার আগে মানসিক প্রস্তুতিরও প্রয়োজন রয়েছে। খাওয়ার সময় জমল না কোনও গল্প, ধরতে গেলে মুখ বুজেই খেয়ে উঠল ওরা দুপুরের খাবার।
অনেকক্ষণ চুপ করে থাকবার পর কথা বলল জিনা।
আমার মনে হয়, সন্ধে লাগার সাথে সাথেই আমাদের রওনা হয়ে যাওয়া। উচিত। বেশি দেরি হয়ে গেলে... কথাটা আর শেষ করল না ও। সহজ স্বীকারোক্তি দিল, বুক কাঁপছে আমার।

সে তো আমাদের সবারই কাঁপছে, বলল কিশোর। তার পরেও, আমরা ছেলেমানুষ, আঙ্কেলকে উদ্ধার করবার জন্যে যাব বলে যে মনস্থির করেছি, এ-ই তো বেশি। সফল হব কি বিফল হব, কেউ বলতে পারে না। তবে ঠিকই বলেছ, বেশি দেরি করা চলবে না।

আচ্ছা, ওই অ্যালবার্ট আইনস্টাইন সম্বন্ধে কী মনে হয়? প্রশ্ন করল রবিন।

খোদা! এক প্যাঁচ ঘুরল মুসার চোখ দুটো। মনে তো হচ্ছে, এই ভদ্রলোকের ব্যাপারে আমাদের মস্ত ভুল হয়ে গেছে। সত্যিই হয়তো উনি একজন পক্ষিবিশারদ প্রফেসর। ভাগ্যিস বাড়িটা লাগিয়ে দিইনি!

অবশ্য ছোট্ট একটু ভালো দিকও আছে এর, মৃদু হেসে বলল কিশোর। এই বোটটা শত্রুপক্ষের নয় জানার পর এবার হয়তো আমরা ওর ট্রান্সমিটারটা ব্যবহারের চেষ্টা করে দেখতে পারব।

কোন ওয়েভলেংথে মেসেজ পাঠাতে হবে তা কি জানা আছে আমাদের? প্রশ্ন তুলল জিনা।

না, জানা নেই, বলল কিশোর। একটু ভেবে আবার বলল, ঠিকই বলেছ, জিনা। না জেনে ওটা ঘাটাঘাটি করতে যাওয়া ঠিক হবে না। শত্রুপক্ষ টের পেয়ে গেলে বিপদ হতে পারে।

সন্ধের একটু আগে গুহার সামনে বসে গল্প করছে ওরা, এই সময় উত্তর পুব দিক থেকে এল প্রচণ্ড জোর আওয়াজ। আকাশের দিকে চোখ গেল সবার। দেখা গেল মস্ত এক সী-প্লেন আসছে এদিকে। আধমাইল দূর থেকেই নীচে নামা শুরু হলো ওটার। একটু পরেই হারিয়ে গেল পাহাড়ের আড়ালে। পরিষ্কার বোঝা গেল কোথায় নামতে যাচ্ছে প্লেনটা। লেগুন! অস্ত্র সরানোর কাজ শুরু হয়ে গেল ওদের!

অদম্য কৌতূহল চাপতে না পেরে রওনা হয়ে গেল ওরা কী হচ্ছে দেখবে বলে। পাহাড়ের মাথায় উঠে পরিষ্কার দেখা গেল, বিশাল সী-প্লেনটা ভাসছে মাঝ লেগুনে। বাতি জ্বেলে কাজ করছে ওরা। ঘড়ঘড় শব্দ হচ্ছে উইঞ্চের। প্যারাশুটে হুক বাধিয়ে তুলে আনা হচ্ছে প্যাকেটগুলো।

বিরাট গ্যাং! ভাবল কিশোর। কয়েকটা মোটর-বোট আছে, প্লেন আছে, সী-প্লেন আছে; এ ছাড়া অস্ত্র-শস্ত্র আর বিশাল নেট-ওঅর্ক তো আছেই। এত বড় প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আমরা নিরস্ত্র চারটে ছেলে-মেয়ে তো কিছুই না! আমাদের অছে কেবল আইনস্টাইনের কাছ থেকে চুরি করা ছোট্ট একটা মোটর-বোট আর চারটে বুক ভরা সাহস। চেষ্টার ত্রুটি করব না আমরা, কিন্তু কী হতে যাচ্ছে কে জানে!

ফিরে গেল ওরা ওদের বোটের কাছে। জোয়ার এসে যাওয়ায় মনে হচ্ছে তীর থেকে কিছুটা দূরে সরে গেছে। এই কথা ভেবে আগেই লম্বা একটা রশি দিয়ে বড় একখানা পাথরের সঙ্গে বেঁধে রেখেছে মুসা বোটটাকে। এখন রশি ধরে টান দিতেই সুড়সুড় করে কাছে চলে এল বোট। উঠে পড়ল ওরা।
যাত্রার আগে দুই হাত আসমানের দিকে তুলল মুসা।
অ্যায়, খোদা! একজন বন্ধুকে দুষ্ট লোকের কবল থেকে মুক্ত করতে চলেছি আমরা। আমরা দুর্বল, তুমি আমাদের সাহায্য করো। আমরা ছোট্ট এই কজন যেন শত্রুকে ড্যাম ডিফিট দিয়ে আমাদের প্রিয় আঙ্কেল ডিক আর ওই আইনস্টাইনটাকে ছিনিয়ে এনে নিরাপদে বাড়ি ফিরতে পারি। আমেন!
স্টার্ট হয়ে গেল ইঞ্জিন। ডেক রেইলের পাশে বসে আছে সখা-সখি। মুসার কাঁধে ওর শুভাকাঙ্ক্ষী কিকো।
রওনা হয়ে গেল বোট শত্রুদ্বীপের উদ্দেশে।
উজ্জ্বল একটা তারাকে গাইড হিসাবে ধরে নিয়েছে কিশোর। অন্ধকার ভেদ করে এগিয়ে চলেছে ওদের বোট। বাতি নেভানো।
আধঘণ্টা পর কিশোরের বাহু স্পর্শ করল মুসার হাত।
ওই যে আলোটা দেখতে পাচ্ছ? উ-উ-ই যে! সিগনাল বাতির মত জোরালো না। তবে ওই দ্বীপেই জ্বলছে আলোটা।
মাথা ঝকাল কিশোর। হুইলটা সামান্য ঘুরিয়ে কোর্স ঠিক করে নিল। তারপর বলল, এবার কিকোকে একটু সামলে রেখো, সেকেন্ড। এখন যদি হেসে ওঠে বা জোরে কথা বলে পানির ওপর দিয়ে ভেসে সোজা ওদের কানে। পৌঁছে যাবে সেটা। ইঞ্জিন বন্ধ করছি আমি।
কিকো কোনও শব্দ করবে না, বলল মুসা।
শ্‌শ্‌শ্‌শ্‌শ্‌! বলে উঠল কিকো।
ঠিক, বলল মুসা। গুড বয়-কিকো! শ্‌শ্‌শ্‌শ্‌শ্‌!
বন্ধ হয়ে গেল ইঞ্জিন। কিছুক্ষণ চলবার পর থেমে দাঁড়াল বোটটা। সরে যাচ্ছে স্রোতের টানে।
চোখে বিনকিউলার তুলল মুসা। আমার মনে হয় ওটা জেটির বাতি, বলল ও। নড়ে না। আবছা ভাবে কয়েকটা বোটও দেখতে পাচ্ছি।
এইবার তা হলে দাঁড় বেয়ে এগোনো যাক, বলেই একটা বৈঠা তলে নিয়ে বসে পড়ল কিশোর। বাকি তিনজনও হাতে তুলে নিল বৈঠা। চারজন একসঙ্গে বাইছে বলে ভালোই গতি পেল ভারী বোটটা। ভূতের মত নিঃশব্দে এগোল ওরা শত্রুদ্বীপের দিকে। বৈঠা বাওয়ার মৃদু শব্দ চাপা পড়েছে বোটের গায়ে ছোট-ছোট ঢেউ ভাঙার লপ-লপ শব্দে।

বাজে কয়টা? ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল কিশোর মুসার কানে কানে। কারণ মুসার রিস্টওয়াচে আছে লুমিনাস ডায়াল।
তেরো-চোদ্দোটা! একই রকম ফিসফিস করে জবাব দিল কিকো। ও ভেবেছে ওকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে।
কিকো, চুপ করে থাকো, বলল মুসা। কিশোরকে বলল, নটা পঁয়ত্রিশ।
সাড়ে দশটা নাগাদ পৌঁছে যাবে ওরা-ভাবল কিশোর। এসব নির্জন, নিঝুম এলাকায় সাড়ে দশটা মানে গভীর রাত। আশা করা যায় পাহারাদার ছাড়া ঘুমিয়ে থাকবে বাকি সবাই। বেশি চোখ খোলা থাকলে মুশকিল।
কী যেন আমার পায়ে ঘষা খেল! হঠাৎ বলে উঠল জিনা।
কিছু না, বলল রবিন। ডেকময় ঘুরে বেড়াচ্ছে সখা-সখি। একটু আগে আমার পা ঘেঁষে গেছে।
নিজেদের নাম শুনে ডেক-রেলের পাশ থেকে ঘড়ঘড়ে গলায় সাড়া দিল একজন, অররররর!
শ্‌শ্‌শ্‌শশ! বকা দিল কিকো।
আধ ঘণ্টা পর অল্প একটু বিশ্রাম নিয়ে নেবে বলে থামল ওরা। আলোটা লণ্ঠন থেকে আসছে, বোঝা গেল। সম্ভবত আসতে বা যেতে নিজেদের বোটগুলোর সুবিধে হবে বলেই জ্বালে এটা রাতে। রবিন আর জিনাকে বৈঠা তুলে ফেলতে বলল কিশোর। এর পর কেবল দুইজন বাইরে।
শব্দ করছে না কেউ। প্রয়োজনে কানের কাছে মুখ নিয়ে অস্ফুট স্বরে কথা বলছে। অমঙ্গল আশঙ্কায় ধুকধুক করছে বুক। শ্বাস আটকে আসছে গলার কাছে। সবার মাথায় একই চিন্তা: যে বোটে আঙ্কেলকে রাখবার কথা বলল দ্বিতীয় লোকটা, সেটা খুঁজে পাবে তো ওরা? সত্যিই রাখা হয়েছে তো, না কি বদল হয়েছে পরিকল্পনা? কজন গার্ড আছে বোটে?
শত্রুদ্বীপের একেবারে গায়ের কাছে চলে এল ওরা। দূরত্ব আর একশো গজও নেই।
কীসের শব্দ? একটা আওয়াজ কানে আসতেই ছানাবড়া হয়ে গেল জিনার চোখ। কেমন যেন অদ্ভুত আওয়াজটা!
ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে মুসা বলল, ও কিছু না। রেডিও বাজছে। ব্যান্ড মিউজিক।
ভালোই হলো, চাপা গলায় বলল কিশোর। আমাদের বৈঠার শব্দ পাবে ওরা। ওই দেখো, মুসা!-আবছা ভাবে ছোট একটা জেটি দেখা যাচ্ছে লণ্ঠনের আলোয়। ওদের অজান্তে ওখানে আমাদের বোটটা ভিড়ানো যাবে বলে মনে হয়? আর ওই যে বাতির কাছাকাছি, একটা বোট না ওটা?

তাই তো মনে হচ্ছে! বলল মুসা চাপা গলায়। আবার ওর বিনকিউলারটা তুলল চোখে। হ্যাঁবোটই। বেশ বড়সড় একটা বোট। ওটায় করেই লেগুনে। গিয়েছিল ওরা দুপুরে। আমার বিশ্বাস ওটার হোল্ডেই হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পাওয়া যাবে আঙ্কেল আর আইনস্টাইনকে।
ব্যান্ডের আওয়াজ আসছে ডেকের ওপর থেকে, বলল রবিন। খুব সম্ভব পাহারাদারটা শুনছে বাজনা। ডেকের ওদিকটায় কিন্তু আলো নেই।
প্রশ্ন হলো, পাহারাদার-টা না কি–রা? প্রশ্ন তুলল কিশোর।
আমার ধারণা–টা, জবাব দিল মুসা। হ্যাচ বন্ধ করে দিলে নীচে দুজনকে আটকে রাখতে একজনের বেশি লোক লাগে না। ওই দেখো, শুয়ে শুয়ে সিগারেট ফুকছে ব্যাটা-আগুনের আভা দেখলাম।
রবিনও সমর্থন জানাল, হা, সিগারেটই।
তোমরা তো খালি কথাই বলছ, বলল জিনা কাঁপা গলায়। কিছু করবে কখন?
ভয়ে কাঁপছে জিনা। ওর কাঁধে একটা হাত রাখল কিশোর।
চিন্তা কোরো না, জিনা। কিছু করবার আগে অবস্থাটা ভালো করে বুঝে নিচ্ছি। কীভাবে কী করলে ঝুঁকি কম, অথচ সাফল্যের সম্ভাবনা বেশি। আলোচনা করে বুঝে নিচ্ছি আমরা। কারণ, ভুল হয়ে গেলে সেটা শুধরে নেবার সময় পাব না পরে আর। যখন কাজে নামব, দেখবে ঝটপট হয়ে গেল সব।
মুসা বলল, শোনো, প্রধান, আমার প্ল্যানটা বলি। তুমি আর আমি যদি সাঁতার কেটে ওই জেটিতে গিয়ে বোটে উঠতে পারি, তা হলে অপ্রস্তুত গার্ডকে কাবু করা খুব কঠিন হবে না। ওটাকে পানিতে ফেলে হ্যাচ খুলে আঙ্কেলকে বের করে আনতে আধ মিনিটও লাগবে না। ইচ্ছে করলে ওদের বোটটা দখল করে নিয়ে আমরা…
দাঁড়াও, দাঁড়াও, হাত তুলল কিশোর। এক-এক করে ভেবে দেখা যাক সমস্যাগুলো নিয়ে। তোমার প্ল্যানটা খুবই ভালো। তবে এখনও আমরা জানি না ওই বোটে আঙ্কেল ডিক আছেন কি না। আর এমন হওয়া খুবই সম্ভব যে, গার্ডকে কাবু করতে পারলাম না আমরা। যদি একাধিক গার্ড থাকে তা হলে তো একেবারে সাড়ে-সর্বনাশ। আমাদের আক্রমণটা ব্যর্থ হয়ে যাবে। কাজেই প্রথমে আমাদের বুঝে নিতে হবে কোন প্ল্যানটা খাটবে এখানে।
কীভাবে বুঝবে সেটা? প্রশ্ন রবিনের।
মুসার প্ল্যান অনুযায়ী আমি আর ও নিঃশব্দে সাঁতার কেটে পৌঁছব ওই ডকে। আলোর আওতার বাইরে কোথাও উঠে প্রথমে ভালো করে চারপাশের অবস্থাটা বুঝে নেব। তারপর যা ভালো বুঝব, করব। রবিন আর জিনার কাজ ভাগ করে দিল ও এবার। তোমরা দুজন সাবধানে বোটটা ঘুরিয়ে সমুদ্রের দিকে মুখ করে

রাখবে, কিন্তু নোঙর ফেলবে না। তারপর একজন বোট যেন অন্য দিকে সরে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখবে, আর অন্যজন তৈরি হয়ে থাকবে মুহূর্তের নোটিসে ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে রওনা হওয়ার জন্যে। ঠিক আছে?
এই শুরু হতে চলেছে অ্যাকশন। উত্তেজনা, বিপদের আশঙ্কা, সেই সঙ্গে যা করতে এসেছে সেটা করবার দৃঢ় সঙ্কল্প ফুটে ওঠায় চেহারা অন্যরকম হয়ে। গেছে ওদের। জ্বলজ্বল করছে চোখগুলো।
আর একটি কথাও হলো না। কিকো আর সখা-সখিকে জিনা ও রবিনের জিম্মায় রেখে ধীরে-সুস্থে কাপড় ছাড়ল কিশোর ও মুসা। তারপর খালি গায়ে শুধু হাফপ্যান্ট পরে আস্তে করে নেমে গেল ঠাণ্ডা পানিতে। হাত-পা পানির উপরে না তুলে ব্রেস্টস্ট্রোক সাঁতার কেটে নিঃশব্দে এগিয়ে চলল ওরা জেটির দিকে। কাছে গিয়ে আরও পরিষ্কার শোনা গেল বাজনা। কিশোর ভাবল, এ পর্যন্ত ভাগ্যের সহায়তা পাওয়া যাচ্ছে প্রতি পদে। ভালো। আর অল্প কিছু সময় সহায়তা বজায় থাকলে কেল্লা ফতে করে বেরিয়ে যেতে পারব।
সযত্নে আলো পরিহার করে উঠে পড়ল ওরা জেটিতে। বোটটা সরাসরি আলোর নীচে নয় বলে ধন্যবাদ দিল ভাগ্যকে। মুসার হাতে একটা ফুট তিনেক লম্বা মোটাসোটা লাঠি দেখে ভুরু নাচাল কিশোর। ওর কানের কাছে মুখ এনে মুসা বলল, পানি থেকে উঠবার সময় পেয়েছে ওটা, ভাসছিল তীরের কাছে।
এগোচ্ছে ওরা বোটের দিকে, এমনি সময়ে উঁচু পর্দায় নেকড়ের মত টানা লম্বা একটা ডাক শুনে থমকে দাঁড়াল। হাই তুলেছে গার্ড। পরমুহূর্তে নব ঘুরিয়ে বন্ধ করে দিল রেডিওটা। নীরব হয়ে গেল সব কিছু।
চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল ওরা। না সামনে, না পিছনে কোনও দিকে যেতে পারছে না। দশ মিনিট পর দেখা গেল জ্বলন্ত সিগারেটের টুকরো ডেক থেকে ছিটকে গিয়ে পড়ল সাগরের পানিতে, কিন্তু নতুন আরেকটা ধরাল না লোকটা। নড়েচড়ে আরাম করে শুতে গিয়ে মুখ দিয়ে গোটাকয়েক বিচিত্র কাতর ধ্বনি বের করল সে, তারপর আর একবার ডেকে উঠল নেকড়ের ডাক।
ধৈর্যের প্রতিমূর্তি হয়ে চুপচাপ ছায়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা। ঠাণ্ডায় কাঁপছে শরীর। তারপর একসময় কাঙ্ক্ষিত শব্দটা ভেসে এল কানে। নাক ডাকছে লোকটার।
এর সঙ্গে আর কেউ নেই তো? কিশোরের কানের কাছে মুখ নিয়ে চাপা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল মুসা।
মনে হয় না, নিচু গলায় জবাব দিল কিশোর। থাকলে কথা বলত। চলে এসো।
পা টিপে এগোল ওরা। ছায়ায় ছায়ায় এগিয়ে উঠে পড়ল বোটের ডেকে। খালি পায়ে থাকায় সামান্যতম শব্দও হলো না। ঘুমন্ত গার্ডের দিকে ভয়ে ভয়ে তাকাল ওরা, তারপর ওকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল হ্যাঁচের কাছে।

মানুষের গলার আওয়াজ পেয়ে আবার থমকে দাঁড়াল কিশোর। এবার শব্দটা এসেছে ডেকের নীচ থেকে। এক হাতে মুসার বাহু চেপে ধরতেই চমকে উঠল ও, লাফিয়ে উঠতে গিয়েও সামলে নিল নিজেকে। আঙুল দিয়ে নীচের দিকে দেখাল কিশোর। কান পাতল দুজনে।

নীচের হোল্ডে কথা বলছে কারা যেন। কারা? আঙ্কেল আর ওয়েনস্টেইন? নিশ্চিত হওয়ার উপায় কী? কে জানে, হয়তো দস্যুদলের লোকজন তাস পিটছে আর গল্প করছে। হ্যাচ খুলে যদি দেখা যায় শত্রুপক্ষের লোক, তা হলে ধরা পড়া আর এড়ানো যাবে না। ওরা চেঁচিয়ে উঠলেই জেগে যাবে গার্ড, পাশে। শোয়ানো রাইফেলটা তাক করে অ্যারেস্ট করবে ওদের।

আগে শুনে দেখি কী বলছে ওরা! মুসার কানে কানে বলল কিশোর। হ্যাঁচের সরু ফাঁক দিয়ে আলো আসছে ভিতর থেকে। উবু হয়ে কান ঠেকাল ওরা ওখানে। কিন্তু গলার আওয়াজ পাওয়া গেলেও কথা বোঝা গেল না একটাও।

হতাশ হয়ে উঠে পড়তে যাচ্ছিল ওরা, এমনি সময়ে একজন খুক করে কেশে গলা পরিষ্কার করল। মুহূর্তে বুঝে ফেলল ওরা কে রয়েছে নীচে। ওটা আঙ্কেলের কাশি। কোনও সন্দেহ নেই, নীচের এই হোল্ডেই আটকে রাখা হয়েছে আঙ্কেল ডিককে। তিনিই কথা বলছিলেন এতক্ষণ। ঝিরঝিরে একটা স্বস্তির পরশ অনুভব করল ওরা শরীরে। এখন আঙ্কেলকে নীচের ক্যাবিন থেকে বের করতে পারলেই আর কোনও চিন্তা নেই-তিনিই দায়িত্ব তুলে নেবেন নিজের কাঁধে। আবার মুসার কানে ঠোঁট ঠেকাল কিশোর।

তুমি লাঠি হাতে ঘুমন্ত লোকটার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে থাকো গিয়ে, আমি দেখছি এই দিকটা! ওকে আগেই মেরে বোসো না, যদি কোনও কারণে জেগে গিয়ে উঠে বসতে যায় তা হলে আবার ঘুম পাড়িয়ে দেবে। ভেতরে শত্রুপক্ষের লোক আছে কি না জানি না আমরা। আঙ্কেল বেরিয়ে আসার আগেই যদি কেউ চেঁচিয়ে উঠে ওর ঘুম ভাঙিয়ে দেয়, মুশকিল হতে পারে। বুঝতে পেরেছ?

মাথা ঝাঁকিয়ে ঘুমন্ত লোকটার মাথার কাছে গিয়ে দাঁড়াল মুসা। হ্যাঁচের বোল্ট খুলতে গিয়ে কিশোর খেয়াল করল থরথর করে কাঁপছে ওর হাত। ভয় পেয়েছিল, হ্যাচ-কাভার তুলতে গেলে কাঁচ-কাঁচ আওয়াজ হবে বুঝি, কিন্তু হাতল ধরে টান দিতেই নিঃশব্দে খুলে গেল ওটা। নীচ থেকে একরাশ আলো ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর উপর।

হ্যাচ খুলবার সামান্য খুট-খাট শব্দ কানে যেতেই উপর দিকে চাইল। ক্যাবিনের লোক দুজন। ঠিকই আন্দাজ করেছিল ওরা-একজন আঙ্কেল ডিক, অপরজন প্রফেসর ওয়েনস্টেইন। কিশোরকে উঁকি দিতে দেখেই লাফিয়ে উঠে। দাঁড়ালেন

আঙ্কেল ডিক, বিস্ময়ে দুই চোখ বিস্ফারিত। কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু কিশোর ঠোঁটের উপর তর্জনী রাখল। তাই দেখে চট করে গিলে ফেললেন কথাটা।
বেরিয়ে আসেন, আঙ্কেল! ফিসফিস করে বলল কিশোর। জলদি! গার্ডটাকে সামলাতে হবে!
ভাগ্যের সহায়তায় চমৎকার মসৃণ ভাবে এগোচ্ছিল সবকিছু, কিন্তু শেষ মুহূর্তে সব গুবলেট করে দিলেন প্রফেসর আইনস্টাইন। কিশোরকে চিনতে পেরেই লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। এরাই তাঁকে মাটির নীচে বন্দি করে তার বোট নিয়ে পালিয়েছিল! হেঁড়ে গলায় জোরে চিৎকার করে উঠলেন তিনি, ধরো, ধরো! এই ঘোড়াগুলোর কথাই বলেছিলাম! ধরো ওকে!
আস্তে! চুপ, চুপ! চুপ করেন! ধমকে উঠল কিশোর। কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। লাফিয়ে উঠে বসেছে গার্ড লোকটা। হ্যাঁচের গর্ত দিয়ে উজ্জ্বল আলো আসছে দেখে ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়াতে গেল। ওর মাথা লক্ষ্য করে গায়ের জোরে লাঠি চালাল মুসা। কিন্তু কপাল মন্দ, দীর্ঘদিন পানিতে ভিজে পচে গেছে কাঠ, মচাৎ শব্দে দু-টুকরো হয়ে গেল ওটা।
মুসার লাঠির বাড়ি টেরও পায়নি লোকটা, দিশেহারার মত চেঁচিয়ে উঠল সে, কে! কী! কী হচ্ছে এসব? হ্যাচ-কাভার খুলল কে?
ঝাঁপিয়ে পড়ে কিল-ঘুসি মেরে ওকে পানিতে ফেলবার চেষ্টা করল মুসা, কিন্তু প্রচণ্ড শক্তি লোকটার গায়ে, খপ করে ধরে ফেলল মুসার হাত, মুচড়ে নিয়ে গেল ওর পিঠের কাছে।
ছুটে এসে লাথি চালাল কিশোর লোকটার তলপেট লক্ষ্য করে। উহ! বলে সামান্য একটু বাকা হলো গার্ড, কিন্তু কাবু হলো না। বামহাতে চেপে ধরল সে কিশোরের চুলের মুঠি, তারপর হ্যাচকা টানে ফেলে দিল ওকে ডেকের উপর।
অররররর! পায়ের কাছে বিদঘুঁটে আওয়াজ শুনে লাফিয়ে উঠল গার্ড। পায়ে সখার ভারী ঠোঁটের জোরালো কয়েকটা ঠোকর খেয়ে গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল সে। পরমুহূর্তে বজ্জাত কোথাকার! দাঁড়া আসছি! বলে। কোত্থেকে উড়ে এসে ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল কিকো। নাকে-মুখে কিকোর নখের খামচি এবং কপালে ও চোখের পাশে তীক্ষ্ণ ঠোঁটের খটাখট কয়েকটা ঠোকর খেয়ে মরণ চিৎকার ছাড়ল সে।
এদিকে হোল্ডের বাতি অফ করে দিয়ে তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসেছেন ডিক কার্টার। মুসার বেকায়দা অবস্থা দেখে একলাফে এগিয়ে এসে প্রচণ্ড এক ঘুসি মেরে ফেলে দিলেন গার্ডকে ডেকের উপর, তারপর ওর একটা হাত ধরে হিড়হিড় করে ডেকের উপর দিয়ে হেঁচড়ে টেনে নিয়ে গেলেন হোল্ডে ঢুকবার গর্তের কাছে। আরেকটা চিৎকার দেওয়ার সুযোগ পেল গার্ড, তারপর ওকে

ভিতরে ছুঁড়ে দিয়ে খটাশ করে লাগিয়ে দিলেন ডিক হ্যাচ-কাভার, তারপর হ্যাচ-বোল্ট।
ওই বে-আক্কেল লোকটা গেল কোথায়? জিজ্ঞেস করলেন তিনি এবার, ওয়েনস্টেইন না কী যেন নাম? সব গুবলেট করে দিয়েছে ব্যাটা চেঁচিয়ে উঠে!
একটু সরে দাঁড়িয়ে হাঁ করে দেখছেন ওয়েনস্টেইন ওদের কাণ্ড-কারখানা, কোনও জবাব না দিয়ে গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন। ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। কিশোর। ওর দিকে ফিরে আঙ্কেল বললেন, তোমরা নিশ্চই ওই লোকটার বোট নিয়ে এসেছ? চলো, দেখি, এটাকে দখল করা গেলে ওরটা ওকে ফেরত দিয়ে এটা নিয়েই রওনা হব আমরা।
এই আঁধারে ইঞ্জিনটা চালু করব কী করে! বলল মুসা।
চলো তো আগে, দেখি কী করা যায়।
প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে, আর দমাদম আওয়াজ করছে গার্ড হ্যাচ-কাভারের গায়ে। অন্ধকার হাতড়ে হুইলের কাছে পৌঁছল ওরা। কিন্তু দ্বীপে আকাশ ভেঙে পড়েছে ততক্ষণে।
অনেকগুলো জোরালো বাতি জ্বলে উঠল তীরে। লোকজনের দৌড়-ঝাঁপ আর চেঁচামেচির আওয়াজ শোনা গেল। একদল লোক এগিয়ে আসছে জেটির দিকে।
নাহ, বললেন ডিক কার্টার, এটার আশা ছাড়তেই হচ্ছে। নোঙর তুলে, জেটির বাধন খুলে রওনা হওয়ার আগেই এসে যাবে লোকজন। তোমাদের বোট কোথায়, কিশোর?
কাছেই। সাঁতার কেটে যেতে হবে। জিনা আর রবিন আছে ওতে। আমরা পৌঁছলেই স্টার্ট দেবে ইঞ্জিন।
ভেরি গুড! চলো তা হলে ঝাঁপ দিই। ওয়েনস্টেইন! কোথায় আপনি? আপনি আসবেন আমাদের সঙ্গে?
আমি সা-সা-সা-সাঁতার জানি না, তোতলাতে শুরু করলেন পক্ষিপ্রেমিক।
বেশ তো, আমরা তিনজন নাহয় সাহায্য করব, বললেন ডিক কার্টার। নির্ভয়ে ঝাঁপ দিতে পারেন আপনি।
কিন্তু কিছুতেই সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়বার সাহস সঞ্চয় করতে পারলেন না ওয়েনস্টেইন। তার উপর চারদিক থেকে টর্চ হাতে এগিয়ে আসছে সশস্ত্র শত্রু। কুঁকড়ে সরে গেলেন তিনি দূরে।
আর অপেক্ষা করা যায় না। একসঙ্গে ডাইভ দিয়ে পানিতে পড়ল তিনজন। গোপনীয়তার তোয়াক্কা না করে ফ্রী-স্টাইল সাঁতার কেটে দ্রুতবেগে ছুটল ওরা বোটের দিকে। হাত বাড়িয়ে ডেকে উঠতে সাহায্য করল ওদেরকে রবিন ও জিনা।

ওদিকে হই-হল্লা করতে করতে ঘাটে লাগানো বোটের ডেকে উঠে এল দশ-পনেরো জন লোক। গার্ডের নাম ধরে ডাকছে ওরা। কী ঘটেছে জানে না। এখনও। দমাদম হ্যাচ-কাভার পিটাচ্ছে গার্ড, কিন্তু সেদিকে খেয়াল না দিয়ে প্রথমে ওরা ধরল ভয়ে কুঁকড়ে জড়সড় হয়ে থাকা ওয়েনস্টেইনকে।
এখন কি ইঞ্জিন চালু করা ঠিক হবে? আওয়াজ হলেই তো ওরা টের পেয়ে–
রবিনের পিঠ চাপড়ে দিলেন ডিক। উপায় নেই। টের পেলেও কিছুই করার নেই আমাদের। তাড়া করবে ওরা। ওদের থেকে যতটুকু এগিয়ে থাকতে পারি ততটুকুই লাভ।
বলতে না বলতেই ইঞ্জিন চালু করল জিনা। জেটির হই-চই থেমে গেল কয়েক মুহূর্তের জন্য। সব কটা লোক ঘাড় ফিরিয়ে চাইল এদিকে। ওরা ভেবেছিল ওদের হাত থেকে পালিয়ে গিয়ে আশপাশেই কোথাও লুকিয়ে আছেন। ডিক কার্টার, কিংবা সাঁতরে পাড়ি দেওয়ার চেষ্টা করছেন প্রশান্ত মহাসাগর-ধরা পড়া কেবল সময়ের ব্যাপার। আরেকটা বোটের অস্তিত্ব সম্পর্কে কিছুই জানত না। কয়েক মুহূর্তের জন্য ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেও বেশ দ্রুতই টের পেয়ে গেল ওরা পরিস্থিতিটা। হুড়োহুড়ি পড়ে গেল ওদের মধ্যে। যেমন করে হোক, ঠেকাতে হবে ওই বোট! কিছুতেই পালাতে দেওয়া যাবে না ওটাকে!
ক্র্যাক!
প্রথমে একটা রাইফেল গর্জে উঠল, তারপর যার হাতে যে অস্ত্র আছে সে তাই দাগতে শুরু করল আন্দাজের উপর ইঞ্জিনের শব্দ লক্ষ্য করে।
শুয়ে পড়ো! বললেন ডিক। জলদি!
ডেকের উপর শুয়ে পড়ল তিন গোয়েন্দা ও জিনা। নিজেও যতটা পারা যায় নিচু হয়ে হুইল ধরলেন আঙ্কেল। কয়েকটা গুলি খুব কাছ দিয়ে চলে গেল। খোলা সমুদ্রের দিকে। দুয়েকটা গাঁথল বোটের গায়ে, তবে ক্ষতি হলো না। কারও। তার পরেই আর্তনাদ করে উঠল কিকো, এবং চেঁচাতেই থাকল।
লাফিয়ে উঠে বসল মুসা।
শুয়ে পড়ো, মুসা! বললেন আঙ্কেল।
কিন্তু কিকো…
খারাপ কিছু হলে এখন পর্যন্ত চেঁচাচ্ছে কী করে? যা বলছি তাই করো, মুসা। শুয়ে পড়ো। একটু পরেই রেঞ্জের বাইরে চলে যাব আমরা, তখন দেখা যাবে কী হয়েছে।
সত্যিই, খানিক পরেই গোলাগুলি বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু স্বস্তি বোধ করবার আগেই হালকা ভাবে আরেকটা শব্দ কানে এল ওদের। শত্রুদ্বীপের জেটিতে স্টার্ট নিয়েছে একটা মোটর-বোটের ইঞ্জিন। বোটটা ঘুরিয়ে নিয়ে এইবার শুরু হবে ধাওয়া!

আসছে ওরা, বললেন আঙ্কেল। কপাল ভালো, রাতটা অন্ধকার-চাঁদ নেই। ট্যাঙ্কে যতক্ষণ ডিজেল থাকবে, আমরা চলতেই থাকব; তারপর দেখা যাবে কী আছে ভাগ্যে।
তাড়া শুরু করেই জোরালো একটা সার্চলাইট জ্বালল পিছনের বোট সামনে বাম থেকে ডানে ঝাটা দেওয়ার ভঙ্গিতে ঘুরাচ্ছে আলোটা।
আলোর আওতা থেকে সামান্য একটু এগিয়ে আছি আমরা, বললেন আঙ্কেল। কিন্তু এই ছোট্ট বোট তো নড়তেই চায় না! কিকো, তুমি থামবে? কিছু হয়নি তোমার! চুপ করো!
উঠে বসল ওরা চারজন। কিকো এসে বসল মুসার কাঁধে। মুসা দেখল থরথর করে কাঁপছে কিকো। কোথাও লেগেছে কি না বুঝবার জন্য ওর সারা গায়ে হাত বুলাল ও, পা দেখল, ঠোঁট দেখল–কিন্তু কিছুই পেল না। তা হলে? তা হলে ওভাবে চিৎকার করছিল কেন? ভয়ে?
কোথাও কিছু হয়নি, বলল মুসা। অথচ এমন ভাব দেখিয়েছে যেন এখুনি ধড়ফড় করে মারা যাবে! ছিহ, কিকো, তোমার জন্যে লজ্জা হচ্ছে আমার!
আহা রে, বেচারি কিকো! ডাক্তার ডাকো, ডাক্তার!
ওর ঝুঁটিটা চুলকে দিতে গিয়ে চমকে উঠল মুসা। ঝুঁটির একটা অংশ গুলি লেগে ছিঁড়ে গেছে!
এ ও জানে টিকটিকির লেজের মত কাকাতুয়ার ঝুঁটি আবার গজায়। কিন্তু আর একটু নীচে লাগলে কী সর্বনাশ হোত ভাবতেই হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল মুসার। কিকো মারা গেছে এই কথাটা ভাবতেই পারে না ও।
নীচের ঠোঁটে চিমটি দিচ্ছিল কিশোর। বলল, সোজা না গিয়ে আমরা লেগুনের পাশের দ্বীপটায় ফিরে যাই না কেন? তা হলে হয়তো ওদের চোখ ফাঁকি দেয়া সম্ভব হতে পারে। আঙ্কেল! ওরা ধরেই নেবে, সোজা ছুটব আমরা। জান-প্রাণ নিয়ে। একটু বামে কাটেন। ওদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমরা পারব না।
বিতর্কে না গিয়ে সামান্য বামে ঘুরালেন ডিক বোটের নাকটা। তারপর প্রশ্ন করলেন, কতদূর সেই দ্বীপ?
আর ছয়-সাত মাইল, বলল মুসা।
ফিরে যাচ্ছ, তার মানে তোমরা কাছেই ওই লেগুন-দ্বীপে ছিলে? আমি তো মহা দুশ্চিন্তায় মরে যাচ্ছিলাম তোমাদের কথা ভেবে। বোকার মত আমি ওদের হাতে ধরা পড়ে গায়েব হয়ে যাওয়ার পর থেকে এই কদিন কী করলে তোমরা?
আর একটু বামে ঘোরান, আঙ্কেল, বলল মুসা। আমরাও আপনার কথা ভেবে খুব চিন্তায় পড়েছিলাম। দ্বীপে চলেন আগে, তারপর শুনবেন সব কথা, দেখবেন স্বচক্ষে।

ডিক কার্টারকে নিয়ে সামনে থেকে সরে গেছে বোটটা টের পেল না শত্রুপক্ষ। সোজা নাক বরাবর ছুটল ওরা, মাঝে মাঝে সার্চ লাইটের আলো ফেলে, দেখছে সাগরের উপরটা। আর কিছুক্ষণ এই ভাবে চললে হারিয়ে যাবে ওদের দৃষ্টি বা শ্রুতির আড়ালে। বড় করে একটা শ্বাস ফেললেন ডিক কার্টার। বললেন, যাক কিছুক্ষণের জন্যে হলেও, বাঁচা গেল!

অররররররর! ভারী, গম্ভীর গলায় উত্তর এল খুব কাছ থেকে। চমকে লাফিয়ে উঠলেন আঙ্কেল, তারপর হেসে ফেললেন।

হায় খোদা! এখনও সখা-সখি তোমাদের সঙ্গে?

বলতে না বলতেই জোরে হাঁচি দিল একটা, তারপর বার কয়েক খ-খক কেশে উঠে বন্ধ হয়ে গেল বোটের ইঞ্জিন।

তেল শেষ, বললেন, ডিক কার্টার তিক্ত কণ্ঠে। তা তো হবেই, এটা ওয়েনস্টেইনের বোট না! এবার কী করা, গোয়েন্দা-প্রধান?

বৈঠা, বলল কিশোর। আপনি হুইলটা ধরে রাখেন, আঙ্কেল, আমরা। চারজন বৈঠা বাইব।

জিনা, লক্ষ্মী মেয়ে, তুমি উঠে এসে হুইলটা ধরো তো! বললেন আঙ্কেল ডিক, আমি এই তিন গোয়েন্দাকে দেখিয়ে দিই বৈঠা বাওয়া কাকে বলে!

ছপ-ছপ দাঁড়ের মৃদু শব্দ তুলে এগিয়ে চলেছে বোট। দূরে আবছা মত দেখা গেল, তারপর ক্রমে বড় হতে থাকল দ্বীপ।

পাথরে ধাক্কা লেগে তলা ভাঙবে না তো আবার? জিজ্ঞেস করলেন আঙ্কেল।

না, বলল মুসা। চলেন না, দেখাচ্ছি। বালি আর নুড়ি-পাথরের চমৎকার সৈকত আছে দ্বীপের অপর পাশে।

চমৎকার সৈকতে পৌঁছবার আগেই জোর এক ঝাঁকি খেল মোটর-বোট। খড়মড় আওয়াজ এল তলা থেকে, মনে হলো ভেঙেচুরে সর্বনাশ হয়ে গেল। বুঝি। চেষ্টা করেও বোট নড়ানো গেল না এক ইঞ্চি।

পাথরে উঠে পড়েছে, বললেন ডিক কার্টার। এখন আর সাধাসাধি করেও নড়াতে পারবে না। জোয়ার এলে তখন আপনিই ভেসে উঠবে। মনে হচ্ছে, রাতটা এখানেই কাটাতে হবে। দাঁড়াও, আগে দেখি, তলাটা ফেঁসেছে কি না। টর্চ আছে না তোমাদের?

রবিন এগিয়ে দিল টর্চ। আলো জ্বেলে পুরো বোট ভালো মত পরীক্ষা। করলেন আঙ্কেল, তারপর বিরাট একটা নিঃশ্বাস ছাড়লেন স্বস্তির। যাক, বাবা! বাঁচা গেল। কিন্তু শীতে যে একেবারে কাবু করে ফেলল, কিশোর! তোমাদের সমান হলে না হয় তোমাদের একটা শুকনো কাপড় ধার করা যেত, এখন কী করি বলো তো?

সমাধান আছে আমার কাছে, বলল জিনা। পাফিন দ্বীপ ছেড়ে আসার সময় আপনার ব্যাগটাও এনেছি আমরা সঙ্গে করে।
হিহি-হিহি-হিহি-হিহি! বাবা রে! জলদি করো, জিনা!
এতক্ষণে কিশোর আর মুসারও শীত লাগতে শুরু করেছে। ভেজা কাপড় ছাড়বার সময় পায়নি ওরাও। ঝটপট কাপড় পাল্টে নিল সবাই। নিজের জামা কাপড় ফিরে পেয়ে আঙ্কেল যার পর নাই খুশি। শার্টের উপর একটা জাম্পার চাপিয়ে আরাম করে বসলেন তিনি সবার মধ্যমণি হয়ে।
এবার অল্প-সামান্য খেয়ে নিলে কেমন হয়? বলল মুসা।
আছে কিছু? সাগ্রহে জিনার দিকে চাইলেন আঙ্কেল।
জিনাকে খাবারের আয়োজন করতে দেখে খুশি হয়ে কাছে সরে এল সখা সখি। কিকো নড়েচড়ে বসল মুসার কাঁধে।
খাওয়া-দাওয়ার পর ডেকের উপর গ্রাউন্ড-শীট বিছিয়ে আঙ্কেলকে ঘিরে বসে পড়ল ওরা। জিনা বলল, আজ এত কাণ্ডের পর কিছুতেই ঘুমাতে পারব না।
শুনে সবাই বলল, ঠিক, ঠিক!
কাজেই এবার পাফিন-দ্বীপে আলাদা হয়ে যাওয়ার পর থেকে কী-কী ঘটল শোনাতে পারি আমরা একে অপরকে, বললেন আঙ্কেল।
আপনার গল্পটা আগে শুনি, আঙ্কেল, আবদার ধরল জিনা। উহ, আপনাকে ফিরে পেয়ে কী যে ভালো লাগছে না! ক্যাবিনের মেঝের ওপর রক্তের দাগ, ইঞ্জিন-রেডিও চুরমার হয়ে গেছে এসব দেখে আমরা কী যে সাংঘাতিক ভয় পেয়েছিলাম!
হ্যাঁ। ভাঙচুরের কথা ওরা বলেছে আমাকে, বললেন ডিক কার্টার। ওদের কথাবার্তায় বুঝলাম, দ্বীপে যে তোমরা আছ সেকথা ওরা জানে না, কাজেই আমিও কিছু বললাম না। অল্পক্ষণ চুপ করে থাকলেন তিনি, তারপর বললেন, সত্যি বলতে কী, বলার আমার তেমন কিছুই নেই। হেড-অফিসে একটা মেসেজ পাঠাবার চেষ্টা করছিলাম, একটা মেসেজ আসারও কথা ছিল-এমনি সময়ে মাথায় ডাণ্ডা মেরে আমাকে ঠাণ্ডা করে দিল কে যেন। হাত পা বাঁধা অবস্থায় জ্ঞান ফিরল আমার অচেনা এক দ্বীপে। অসংখ্য প্রশ্ন করা হলো আমাকে। আশ্চর্যের ব্যাপার, দেখলাম, যাদের রোষ থেকে বাঁচবার জন্যে আমাকে গা-ঢাকা দিতে বলা হয়েছিল, এতদূর সরে আসার পরেও ঠিক তাদেরই সঙ্গে ধাক্কা লেগে গেছে আমার। আমি জানতাম না, এদিকেই কোথাও আস্তানা গেড়েছে ওরা, এদিকেই বে-আইনী তৎপরতা চালাচ্ছে। আমার ধারণা ছিল ফ্লোরিডার ওদিকে আস্তানা ওদের। সেই রকম একটা ভুল ধারণা ওরাই। ঢুকিয়েছিল আমার মাথায়।

আর আপনিও, পড়বি তো পড় মালীর ঘাড়ে! বেড়াতে এসে ঠিক ওদের খপ্পরেই পড়েছেন! কিশোরের কাছে শোনা কাজী নজরুল ইসলামের লিচু চোর কবিতার সেই মালীর কথা বলল রবিন। ওরা নিশ্চয়ই ধরে নিয়েছে, ওদের গন্ধ শুঁকে শুঁকেই এখানে এসে হাজির হয়েছেন আপনি?

হ্যাঁ, বললেন ডিক কার্টার। এর আগে এই দলের কয়েকটা অপারেশন আমি বানচাল করে দিই। স্বভাবতই, ওদের মধ্যে সামান্যতম জনপ্রিয়তা নেই আমার। চুনোপুঁটি কয়েকজন ধরা পড়ে, কিন্তু রাঘব বোয়ালদের ধরার আগেই ডুব দেয় ওরা গভীর জলে। ওখান থেকে ঘোষণা করেছে আমার মৃত্যু পরোয়ানা। দলের সবার ওপর নির্দেশ আছে আমাকে দেখা মাত্র খুন করতে হবে। তবে সম্ভব হলে খুন করবার আগে জেনে নিতে হবে দলের কোন লোকটা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

যতই বোঝাতে চেষ্টা করি যে আমি কিছুই জানি না, ততই সন্দেহ গাঢ় হয় ওদের। ওদের বদ্ধমূল ধারণা, ওদেরই কেউ জানিয়ে দিয়েছে আমাকে দলের গোপন কর্মকাণ্ড আর আস্তানার কথা। সেই লোকটার নামটা বের করবার জন্যেই আমাকে ধরার সঙ্গে সঙ্গে মেরে না ফেলে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করেছে ওরা এই কদিন: আমি কতটা জানি, কে বলেছে আমাকে আর কতটা জানিয়েছি আমি আমার হেড-অফিসে। আসলে তো তেমন কিছুই জানি না আমি, যেটুকু জেনেছি নিজের থেকেই জেনেছি, কেউ বলেনি আমাকে। কাজেই কী বলব? ওদের সন্তুষ্ট করা সম্ভব হয়নি আমার পক্ষে। শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে আজ রাতেই আমাকে শেষ করে দেবে বলে স্থির করেছিল। তোমরা গিয়ে ভজকট করে দিলে ওদের প্ল্যানটা!

সত্যিই আপনি জানেন না ওরা কী চোরাচালান করছে? জিজ্ঞেস করল রবিন।

চোরাচালান করছে...তাই তো জানি না! অবাক হয়ে রবিনের মুখের দিকে চাইলেন আঙ্কেল। আমি শুধু জানি বে-আইনী কিছু করছে। প্রচুর টাকা কামাচ্ছে। আন্দাজ করেছিঃ সম্ভবত অস্ত্র। কিন্তু তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, তোমরা আমার চেয়ে অনেক বেশি জানো। এবার তোমাদের গল্প শোনাও দেখি।

আপনারটা আগে শেষ হোক, বলল রবিন। আইনস্টাইন গিয়ে আমাদের নামে কী বলল?

আর বোলো না! এপাশ-ওপাশ, মাথা দোলালেন আঙ্কেল। প্রথমে তো বুঝতেই পারছিলাম না কী ব্যাপার। আমার সহযোগী হিসেবে তোমাদের না এনে এমন একজন লোককে ধরে নিয়ে এসেছে, যাকে জীবনে দেখিনি কোনদিন। আমরা দুজন যত অবাক হই ওরা ততই মুচকি হাসে। তারপর ধীরে ধীরে জানা গেল, কয়েকটা অসম্ভব পাজি বদমাশ ছেলেমেয়ের পাল্লায় পড়েছিল সে পাফিন-দ্বীপে।

বুঝলাম কাদের কথা বলছে, কিন্তু মুখ বন্ধ রাখলাম। আস্ত পিশাচ হিসেবে বর্ণনা করল ও তোমাদের। এমন ছেলেমেয়ে নাকি সে জীবনে দেখেনি।
লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করল মুসা।
আসলে ভুল হয়েছিল আমাদের। আমরা ধরেই নিয়েছিলাম উনি শত্রুপক্ষের লোক, মিথ্যেকথা বলে আমাদের ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিয়ে গিয়ে বন্দি করার জন্যে পাঠানো হয়েছে ওঁকে।
কাজেই আমরাই বন্দি করেছি ওঁকে, বলল জিনা। ল্যাঙ মেরে ফেলেছি। একটা গর্তে…
তারপর ওঠার চেষ্টা করলেই খটাং করে লাঠির বাড়ি মেরেছি ওর চাঁদিতে, তাই না? বললেন আঙ্কেল ডিক। আমি কল্পনাও করতে পারি না তোমাদের পক্ষে এমন রক্তপিপাসু পিশাচ হয়ে ওঠা সম্ভব। উনি বললেন মেয়েটাই নাকি মেরেছে বেশি!
হায়, খোদা! একেবারে আসমান থেকে পড়ল জিনা। কী মিথ্যুক! বিশ্বাস করেন, আঙ্কেল, আমরা কেউ ওকে একটা টোকাও দিইনি। হ্যাঁ, ভয় দেখিয়েছি, তাও আমি না, মুসা। কিন্তু…
ছেলেরা শত্রু মনে করে একটা-দুটো ঘা লাগালে আমি অবাক হতাম না, কিন্তু তুমি মেরেছ শুনে আমি তো তাজ্জব। যাই হোক, ওর ভাষ্য হলো: ওকে মেরে-ধরে গর্তে আটকে ওকে ডাকাতের হাতে ফেলে দিয়ে তোমরা ওর বোট নিয়ে পালিয়ে গেছ। সত্যি কথা বলতে কী, ওর সব কথা শুনে হাসি চাপতে পারিনি আমি। মানতেই হবে, গাটস আছে তোমাদের।
শত্রুরা ওর একটা কথা বিশ্বাস করেনি, সোজা ধরে নিয়ে এসেছে। এখানে। এখনও ওদের বিশ্বাস: ও ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চের জাদরেল কোনও অফিসার, ছদ্মবেশে আছে।
লোকটা একে মিথ্যুক, ভীতু, কাপুরুষ; তার ওপর বুদ্ধু! খেপে গেছে জিনা। এই লোক পাশ করে প্রফেসর হলো কী করে? আমি হলে তো ওকে দশে তিন নম্বরও দিতাম না!
লোকটা যদি চিৎকার না দিত, বলল কিশোর, তা হলে আজ আমরা এই বিপদে পড়তাম না। দিব্যি শত্রুপক্ষের বোট নিয়ে এতক্ষণে পেরিয়ে যেতে পারতাম অর্ধেক পথ। ও-ও বাচত, আমরাও বাঁচতাম।
ঠিক। এবার বলো শুনি তোমরা কী কী করলে।
রবিনকে কনুই দিয়ে গুঁতো দিল জিনা। শুরু করল রবিন।
শুনতে শুনতে ছানাবড়া হয়ে গেল আঙ্কেলের চোখ। লেগুনে অস্ত্র লুকানোর কথা শুনে রীতিমত উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। চোরাচালানীদের গোটা অপারেশনটা পরিষ্কার হয়ে গেল তার কাছে।

ইশ্‌শ্‌! একটা মেসেজ যদি পাঠাতে পারতাম এখন হেড-অফিসে! মাল সহ হাতে-নাতে ধরে ফেলতাম সব কটাকে! যাই হোক, তোমাদের সত্যি তুলনা হয় না! কেবল ভালো বলে প্রশংসা করলে অর্ধেকও বলা হয় না–সেই সঙ্গে তোমরা বুদ্ধিমান আর দুর্দান্ত সাহসী!
গোটা ব্যাপারটায় আমরা যেমন রোমাঞ্চ অনুভব করেছি, বলল কিশোর, তেমনি একেক সময় ভয়ও পেয়েছি সাঙ্ঘাতিক।
রীতিমত গর্ব বোধ করছি আমি তোমাদের জন্যে, বললেন আঙ্কেল ডিক। আমার মৃত্যু যখন নিশ্চিত, কারও ঠেকাবার উপায় নেই, আমিও হাল ছেড়ে দিয়ে অবধারিত নিয়তিকে মেনে নিয়েছি, ঠিক সেই সময়ে তোমরা গিয়ে শত্রুর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এলে আমাকে। গলার স্বর হঠাৎ কোমল হয়ে এল আঙ্কেলের। একটা কথা সত্যি করে বলবে, কিশোর? ব্যাপারটা কিছুতেই মাথায় ঢুকছে না আমার। ওয়েনস্টেইনের বোটটা দখল করেই তোমরা নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে না ছুটে বিপদ মাথায় নিয়ে এদিকেই ঘুরঘুর করছিলে কেন?
আসলে আমাদের সামনে দুটো রাস্তাই খোলা ছিল, আঙ্কেল, বলল কিশোর। নিজেরা পালিয়ে যাওয়া, অথবা আপনাকে সঙ্গে নিয়ে পালানো। সবাই মিলে আমরা শেষেরটাই বেছে নিলাম।
কিছুক্ষণ চুপচাপ। ভাবাবেগ সামলাবার চেষ্টা করে বিফল হলেন তিনি। ডিক কার্টারের বিশাল দুই বাহু একই সঙ্গে বুকে জড়িয়ে ধরল ওদের চারজনকে।
এ কী বলব জানি না, ধরা গলায় বললেন তিনি। তোমরা ছোট মানুষ, কিন্তু তোমাদের মত অকৃত্রিম বন্ধু পাওয়া যে-কোনও বড় মানুষের জন্যেও যে কতবড় সৌভাগ্য! ভয়কে জয় করে বন্ধুর বিপদে প্রাণ বাজি রেখে ঝাঁপিয়ে পড়া। যে কতবড় মহৎ কাজ, কত বড় সাহসের কাজ...কত বড়... বলতে বলতে হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠলেন আঙ্কেল ডিক। থরথর করে কাঁপছেন তিনি। টপটপ করে কয়েক ফোঁটা চোখের পানি পড়ল ছেলেমেয়েদের মাথায় পরম আশীর্বাদের মত।
অনেক রাতে গল্প শেষ করে ঘুমে ঢলে পড়েছিল সবাই। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই পুবদিকের আকাশটা প্রথমে ফরসা হয়ে এল, তারপর সোনালী আভা দেখা দিল ওখানে-রঙ ধরছে দিগন্তের কাছাকাছি মেঘের গায়ে। কালো সাগরটা
প্রথমে ধূসর হলো, তারপর অল্পক্ষণেই হয়ে উঠল তরল সোনা।
হঠাৎ করেই অসংখ্য পাখির কলকাকলিতে ভরে উঠল চারপাশ। গিলিমট, করমর্যান্ট, গ্যানিট, পাফিন আর সীগাল বেরিয়ে এল যার-যার বাসা থেকে। গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে, আর ঝপাঝপ নামছে পানিতে। নেমেই ডুব। খিদে নাস্তা দরকার!

অবাক হলো রবিন। এত পাখি তো ছিল না গতকাল! উঠে বসেই তাজ্জব হয়ে গেল সে।
আরে! এ কোথায় আছি আমরা? এটা তো সেই লেগুন-দ্বীপ না! ভুল দ্বীপের ডুবো-পাথরের ওপর চড়ে বসে আছি! আমাদের ন্যাভিগেটর সাহেব গেল কোথায়?
তাই তো! উঠে বসল মুসা। রাতে মনে হচ্ছিল শহরের রাস্তাঘাট সব চেনা হয়ে গেছে আমার। এখন দেখছি সম্পূর্ণ ভুল শহরে নিয়ে এসেছি বোট!
নাহ, ঝালাপালা করে দিল কান! এই চেঁচামেচিতে ঘুমানো যাবে না! বলে উঠে পড়লেন ডিক কার্টার। বোটটা কোথায় ঠিক কীভাবে আটকাল দেখে ফিরে এলেন ডেকে। বললেন, ক্ষতি হয়নি বোটের। তবে ভালো মতই ফেঁসেছে, জোয়ার না আসা পর্যন্ত বসে থাকতে হবে এখানেই। অবশ্য জোয়ার এলেই বা কী লাভ? দাঁড় বেয়ে তো আর সাগর পাড়ি দেয়া যায় না।
অথচ ওরা আমাদের খোঁজে বোট বা প্লেন পাঠানোর আগেই একটা কিছু করা দরকার, বলল মুসা।
কী সেটা? প্রশ্ন রবিনের।
চোখ মেলল কিশোর। বলল, কী আবার! ভালো করে খুঁজে দেখা। ফিরে যাওয়ার মতো যথেষ্ট পরিমাণে তেল না নিয়ে সমুদ্রযাত্রায় বেরিয়ে পড়েছেন আইনস্টাইন, তা হতেই পারে না। নিশ্চয়ই কোথাও লুকানো আছে তেল।
ঠিক বলেছ, কিশোর, এক লাফে উঠে দাঁড়াল রবিন ও জিনা। তেল না থেকেই পারে না!
সবাই মিলে খুঁজতে গিয়ে ডেকের দুটো তক্তা তুলে চারটে তেলের টিন পেল মুসা, আর ডিক কার্টার পেলেন আইনস্টাইনের ট্রান্সমিটারটা। এমন জোরে চেঁচিয়ে উঠলেন যে, সবাই ভয় পেল: এই বুঝি এসে পড়ল শত্রুপক্ষের বোট।
এটা তোমাদের চোখে পড়েনি, কিশোর?
পড়েছে তো, বলল কিশোর। জিনা খুঁজে বের করেছিল ওটা। কিন্তু ঘাটাঘাটি করতে সাহস পাইনি। যদি ভুল করে শত্রুদের আস্তানাতেই মেসেজ পাঠিয়ে বসি! তারপর স্রেফ ভুলে গেছি ওটার কথা।
আচ্ছা। এবার এটার এরিয়ালটা খুঁজে বের করো দেখি। ওটা পেলে চেষ্টা করে দেখা যেত কোনও মেসেজ পাঠানো যায় কি না। কারও চোখে পড়েছে, ছয়-সাত ফুট লম্বা রডের মতো দেখতে...
ওই তো, পিছনের ওই শেলফে দেখেছি আমি ও-রকম একটা জিনিস, বলল জিনা। রডটা বের করে আনল ও। ওটা দেখেই একগাল হাসি ফুটল আঙ্কেল ডিকের মুখে।

দেখা যাক এটা দিয়ে কাজ হয় কি না, বলে ট্রান্সমিটার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন ডিক কার্টার।
অল্পক্ষণেই ভুরু জোড়া কুঁচকে গেল তার। কিছু একটা গোলমাল আছে যন্ত্রটায়। খড়খড় আওয়াজ করল, লাল-নীল-সবুজ বাতি জ্বলল এখানে-ওখানে, কিন্তু না কোনও মেসেজ গেল, না এল। অনেক ভাবে চেষ্টা করলেন তিনি। নিজের কোড নাম্বার জানিয়ে বার বার মেসেজ পাঠালেন, লোকেশন দিলেন, উত্তরের জন্য অপেক্ষা করলেন, কিন্তু কোনও সাড়া মিলল না। রেডিওটা খারাপ, না কি ট্রান্সমিটার-রেডিও দুটোই খারাপ বোঝা গেল না। সকাল থেকে দশটা পর্যন্ত চেষ্টা করে শেষে হাল ছেড়ে দিলেন তিনি।
বেলা এগারোটার দিকে এল জোয়ারের প্রথম ঢেউ। ততক্ষণে চার টিন তেল থেকে দুই টিন ঢালা হয়ে গেছে ট্যাঙ্কে। ডেকে উঠে এসে বিনকিউলারটা চোখে তুলেই চমকে গেল রবিন। বহুদূরে ছোট্ট একটা বিন্দুর মত দেখা যাচ্ছে। কী যেন।
মুসা! ডাকল ও আতঙ্কিত কণ্ঠে, দেখো তো কী ওটা?
ছুটে এসে বিনকিউলার চোখে তুলল মুসা। ফোকাস অ্যাডজাস্টা করে বলল, একটা বোটের মতই তো দেখা যাচ্ছে মনে হয়!
দেখি, আমাকে দাও, বলে মুসার কাছ থেকে নিয়ে চোখে তুললেন ডিক কার্টার। পরমুহূর্তে রক্ত সরে গেল তার মুখ থেকে। সেরেছে! এইদিকেই তো আসছে সোজা!
জোয়ারের চতুর্থ ঢেউয়ের সঙ্গে দুলে উঠল ওদের বোট, পঞ্চম ঢেউটা আসতেই আলগা হয়ে ভেসে উঠল পাথরের উপর থেকে। সঙ্গে সঙ্গে ইঞ্জিন। চালু করল কিশোর, রিভার্স গিয়ার দিয়ে কয়েক গজ পিছিয়ে নিল বোট। তারপর নাকটা ঘুরিয়ে নিয়ে ছুট লাগাল যেদিক থেকে শত্রুপক্ষের বোট আসছে তার উল্টো দিকে। যতক্ষণ ওদের নাগালের বাইরে থাকা যায়–সেই চেষ্টা ছাড়া আর কিছু করবার নেই এখন ওদের। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।
দুপুর সাড়ে-বারোটার দিকে দুইশো গজের মধ্যে চলে এল পিছনের মোটর-বোট। ঠিক তখনই এলো প্রথম গুলিটা। রাইফেল চালাচ্ছে ওরা পলায়নপর বোট লক্ষ্য করে।
সবাইকে ডেকের উপর শুয়ে পড়বার নির্দেশ দিয়ে হুইল ধরলেন আঙ্কেল নিজে। যতটা সম্ভব নিচু হয়ে রয়েছেন তিনি গুলি এড়াবার জন্য। ওদেরকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করবার উদ্দেশ্যে এঁকেবেঁকে বোট চালাচ্ছেন তিনি এখন। বেলা একটার দিকে একশো গজের মধ্যে এসে গেল পিছনের বোট। গুলিগুলো খুব কাছ দিয়ে পাশ কাটাচ্ছে এবার। দু-একটা খট শব্দে লাগছে এসে বোটের গায়ে।

এমনি সময়ে আরেকটা জোরালো শব্দে আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকাল ওরা চারজন। পুব দিক থেকে উড়ে আসছে বিরাট এক সী-প্লেন!
দপ করে নিভে গেল ওদের সব আশা-ভরসা। এক রামে রক্ষে নেই, সুগ্রীব দোসর! পিছনে চেয়ে অবাক হলো ওরা, বেশ অনেকটা পিছিয়ে পড়েছে শত্রুদের মোটর-বোট। মাথার উপর জোর আওয়াজ তুলে একটা পাক দিল সী-প্লেন, তারপর নেমে পড়ল সাগরে। জিনার মনে হলো, গতকালকের অস্ত্র উদ্ধারকারী সী-প্লেনটাকে এবার লাগানো হয়েছে ওদের পিছনে।
বোটের ইঞ্জিন বন্ধ করে ডেকের ওপর বেরিয়ে এসো! লাউড হেইলারের মাধ্যমে ভেসে এল একটা কর্কশ গলা। নইলে গুলি চালাব!
আর কিছু করবার নেই। ইঞ্জিন বন্ধ করে মাথার উপর হাত তুলে ডেকে বেরিয়ে এলেন ডিক কার্টার। সী-প্লেন থেকে একটা রো-বোটে করে তিনজন সশস্ত্র লোক এগিয়ে আসছিল, হঠাৎ দাঁড়ানো লোকটা চেঁচিয়ে উঠল, আরে! ডিক কার্টার না? শত্রু মনে করে তোমাকেই আক্রমণ করতে যাচ্ছিলাম নাকি?
মাথার উপর থেকে হাত নামিয়ে হাসলেন আঙ্কেল ডিক। তোমাকে দেখে কতটা যে খুশি হয়েছি তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না, রিকি। আর একটু হলেই দ্বিতীয়বারের মত বন্দি হতে যাচ্ছিলাম পেছনের ওই লোকগুলোর হাতে। আমার মেসেজ তা হলে পেয়েছ তোমরা?
আঙ্কেলের গলার স্বস্তি একটানে দাঁড় করিয়ে দিল জিনা ও তিন গোয়েন্দাকে।
লাউড অ্যান্ড ক্লিয়ার! কিন্তু তুমি বোধহয় আমাদের একটা কথাও শুনতে পাওনি। আরে, তোমার পুরো দলবল হাজির দেখছি! চলো, উঠে পড়ো প্লেনে। গত কদিন তোমার খবর না পেয়ে বসের তো মাথা খারাপ হওয়ার দশা!
ওদের গ্রেফতারের কী ব্যবস্থা? জানতে চাইলেন ডিক কার্টার। বোট ঘুরিয়ে নিয়ে পালাচ্ছে এখন ওরা।
তোমাদের তুলে নিয়ে আমরাই ধরব ওদের। আরও চারটে সী-প্লেন আর আটটা মোটর-বোট রওনা হয়ে গেছে। একটু পরেই শুরু হবে আমাদের চিরুনি অভিযান। একজনও পালাতে পারবে না। আরে, আরে! এগুলো কী! এরাও যাবে নাকি?
অররররররর! জবাব দিল সখা।
ওদের সঙ্গে সখা-সখিও রো-বোটে উঠে পড়ছে দেখে হাঁ করে চেয়ে রইলেন আঙ্কেলের কলিগ রিকি। তারপর হুশ-হাশ করে তাড়িয়ে নামিয়ে দিলেন ওদেরকে পানিতে। ঝট করে চাইল কিশোর আঙ্কেলের মুখের দিকে। আঙ্কেলকে মাথা নাড়তে দেখে মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল ওর। ওর কাঁধে। একটা হাত রাখলেন ডিক কার্টার।

এটাই ওদের বাড়িঘর, কিশোর। এখানেই জন্ম, এখানেই বড় হয়েছে, মারাও যাবে এখানেই। এখান থেকে উপড়ে ভিন্ন পরিবেশে নিয়ে গেলে রীতিমত কষ্ট হবে ওদের। বিশ্বাস করো, আর কদিন পরে ডিম পাড়বে, বাচ্চা তুলবে ওরা, ভুলে যাবে তোমাদের কথা। নিজেদের চেনাজানা পরিবেশেই থাক ওরা, কী বলে?

কোনও জবাব দিল না কিশোর। চেয়ে রইল ওর ভক্ত দুজনের দিকে। ঢেউয়ের তালে তালে দুলছে সখা-সখি। মনে পড়ছে ওদের যেচে এসে ভাব করবার কথা, নিঃস্বার্থ ভালবাসার কথা, ওর জন্য মাছ ধরে আনবার কথা, ওকে মারছে দেখে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়বার কথা। চুপচাপ চেয়ে রইল ও ওদের দিকে। দুফোঁটা পানি এসে গেল চোখে। কিশোরের চোখে পানি টলমল করতে দেখে ডুকরে কেঁদে উঠল জিনা। মুসা আর রবিনও চোখ মুছল শার্টের হাতায়।

সখা-সখিকে ওখানেই ছেড়ে সী-প্লেনে উঠে পড়ল জিনা ও তিন গোয়েন্দা। জানালা দিয়ে দেখা গেল, রো-বোটকে ঘিরে সাঁতার কাটছে ওরা, অপেক্ষা করছে কখন বড় পাখিটার পেট থেকে বেরিয়ে আসবে কিশোর। রো বোটটাও অদৃশ্য হলো বড় পাখির পেটে। অবাক হয়ে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল ওরা। ডাকল কিশোরকে, অররররররর! অ-অ! ককক!

বড় পাখিটা যখন দৌড় শুরু করল, ওরাও সঙ্গে আসবার চেষ্টা করল, কিন্তু পাল্লা দিয়ে পারল না। পিছিয়ে পড়ে হারিয়ে গেল সখা-সখি, চিরতরে।

যতক্ষণ দেখা যায় তাকিয়ে থাকল কিশোর, তারপর চোখ সরিয়ে নিল। ভাবছে, লেগুনটা চিনিয়ে দিয়েই মিলবে ছুটি। বাকি সব কাজ করবে এখন। সরকারী লোকজন।

এখানে আর এক মুহূর্তও ভাল লাগছে না ওর।

প্রথম সুযোগেই ফিরে যাবে ওরা রকি বিচে। ওখানে আবার সেই স্কুল, পড়া, হোমওঅর্ক, খেলা; চাচা-চাচির অফুরন্ত আদর-ভালবাসা আর নতুন কোনও রহস্য-রোমাঞ্চের জন্য ব্যাকুল প্রতীক্ষা।

ভলিউম ৯০ – হিমগিরিতে সাবধান! – তিন গোয়েন্দা – শামসুদ্দীন নওয়াব – সেবা প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ: ২০০৪

রাশেদ চাচার সঙ্গে স্নোশু মাউন্টেন স্কি লজে এসেছে তিন গোয়েন্দা। তিন দিনের ছুটি কাটাতে। স্নোশু লজ স্কি স্কুলে স্কিইং শিখবে ওরা। স্কুলটিতে সবাই ক্লাস করতে পারে, শিক্ষানবীশ থেকে শুরু করে অভিজ্ঞ খেলোয়াড় প্রত্যেকে।

আমার এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না আমরা সত্যি সত্যি এখানে রয়েছি, বলল কিশোর। আইসক্রিমের উপর বাদাম কুচি ছড়িয়ে দিল। কাঠের প্যানেল ঘেরা বিশাল ডাইনিং রুমটার চারধারে দৃষ্টি বুলাল ও।

আশপাশে সবাই যার যার আইসক্রিম নিয়ে ব্যস্ত। জানালার বাইরে হালকা তুষারপাত হচ্ছে। স্নোশু পাহাড়ের উঁচু চূড়ার পিছনে ধীরে ধীরে অস্ত যাচ্ছে সূর্য।

স্কি করতে দারুণ লাগে আমার, বলল কিশোর।

আমারও, সায় জানাল রবিন।

আরেকটু শেখা হয়ে গেলে দেখবে আরও ভাল লাগছে, বলল মুসা। তিনজনের মধ্যে ওর অভিজ্ঞতাই সবচেয়ে বেশি।

ছেলেরা জনাকীর্ণ কামরাটার ওপাশে, রাশেদ চাচার টেবিলের কাছে এসে দাঁড়াল। চাচা কফি পান করছেন।

এখানকার সবাই কি স্কি স্কুলে এসেছে নাকি? বন্ধুদের নিয়ে বসবার ফাঁকে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

না এলেই বাঁচি, বলল মুসা। আমি এনজয় করতে চাই, লোক বেশি হয়ে গেলে সব মাটি হবে।

চিন্তার কিছু নেই, মুসা, মৃদু হেসে বললেন চাচা। আমি শিয়োর, তুমি সাধ মিটিয়ে স্কি করতে পারবে।

হ্যাঁ, যোগ করল রবিন। তোমার লাকি লকেটটা আছে না?

মুসা তার হট ফাজ আইসক্রিমের খানিকটা চামচে তুলে নিয়ে মাথা ঝাঁকাল।

মুসার ওই লকেটটার কথা বলছ? আঙুল দেখিয়ে প্রশ্ন করল কিশোর।

আইসক্রিমটুকু গিলে নিল মুসা। তারপর খুদে রুপোলী স্কি দুটো স্পর্শ করল। ভেলভেটের রিবন দিয়ে গলার সঙ্গে ঝুলছে।

এটা আমার লাকি লকেট। জিনিসটা দারুণ দেখতে, তারিফ করল কিশোর।

ঘরের এক মাথায় ছোট্ট এক মঞ্চ। সেদিকে ছেলেদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন রাশেদ চাচা।

ওরা কী যেন ঘোষণা দিতে যাচ্ছে, বললেন।

ছেলেরা ঘুরে বসল। খাটো মত, কোঁকড়াচুলো এক ভদ্রলোককে মঞ্চে উঠে মাইক্রোফোনের সামনে এসে দাঁড়াতে দেখল। উপস্থিত সবার মনোযোগ কামনা করলেন তিনি।
তিন গোয়েন্দা কথা বন্ধ করল। কিন্তু পাশের টেবিলের ছেলে দুটো লোকটার কথায় কর্ণপাত করল না। হো-হো করে হাসাহাসি করছে। এক চামচ আইসক্রিম চামচে তুলে নিয়ে একজন ছুঁড়ে মারল আরেকজনের উদ্দেশে।
দ্বিতীয় ছেলেটি ঝট করে সরে গেল। আইসক্রিম উড়ে আসছে সোজা রবিনকে লক্ষ্য করে।
রবিন দেখতে পেয়ে মাথা নামাল। ফলে, ওর পিছনে মেঝেতে গিয়ে পড়ল। আইসক্রিমটুকু।
অ্যাই, কী করছ তোমরা? চেঁচিয়ে উঠল রবিন। আরেকটু হলেই তো আমার সোয়েটারটা নষ্ট হত।
ছেলে দুটি একদৃষ্টে ওর দিকে চেয়ে রয়েছে। অবিকল একই রকম দেখতে। যমজ। বয়সে তিন গোয়েন্দার চাইতে খানিকটা ছোট।
প্রথমজন আরেক চামচ আইসক্রিম তুলে নিয়ে রবিনের দিকে লক্ষ্যস্থির করল।
অ্যাই, সাবধান, গর্জন ছাড়ল মুসা।
রাশেদ চাচা এবার এদিকে মনোযোগ দিতে বাধ্য হলেন। ছেলে দুটির দিকে চেয়ে মাথা নাড়লেন তিনি।
তার নিষেধ অমান্য করবার সাহস পেল না ওরা। ভাল মানুষের মত ঘুরে। বসে মঞ্চের দিকে মন দিল।
স্নোশু মাউন্টেনে সবাইকে স্বাগতম, মঞ্চে দাঁড়ানো ভদ্রলোক বললেন। আমি টনি গ্রেগ, স্কি স্কুলের ডিরেক্টর। এখানে যারা উপস্থিত তাঁদের মধ্যে কতজন আমাদের স্কি স্কুলে এসেছেন, বলবেন কি?
অনেক লোক হাত তুলল। তাদের মধ্যে কিশোর আর রবিনও রয়েছে। মুসা মুখে দুআঙুল পুরে শিস দিয়ে উঠল।
মৃদু হাসলেন টনি গ্রেগ।
কথা দিতে পারি, সময়টা আপনারা উপভোগ করবেন এবং অনেক কিছু শিখতেও পারবেন। আমি এখন আপনাদের সঙ্গে আমাদের ইন্ট্রাকটরদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি।
ইন্ট্রাকটরদের পরনে কালো স্কি প্যান্ট ও উজ্জ্বল লাল জ্যাকেট।
লোকগুলোকে এই ড্রেসে হেভী মানিয়েছে তো, অস্ফুটে প্রশংসা করল। রবিন।
আপনাদের খাওয়া হয়ে গেলে লজের যেখানে খুশি স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াতে পারেন-কোন বাধা নেই। হলের ওপাশে গেম রুম রয়েছে, আর লাউঞ্জে আছে

ফায়ারপ্লেস, ছুটিটা সবার আনন্দে কাটুক এই কামনা করে বিদায় নিচ্ছি!
চলো, গেম রুমটা দেখে আসি, বন্ধুদের উদ্দেশে বলল কিশোর। রাশেদ চাচা একটু পরে যোগ দেবেন ওদের সঙ্গে।
তিন গোয়েন্দা ঝটপট আইসক্রিম খেয়ে শেষ করল। তারপর যার যার জ্যাকেট তুলে নিয়ে হাঁটা দিল গেম রুমের উদ্দেশে। রবিন ওর গোলাপী স্কি হ্যাটটা পুরেছে জ্যাকেটের পকেটে।
ওখানে মনে হয় স্কিইং ভিডিও দেখাচ্ছে, জানালার পাশে প্রকাণ্ড টেলিভিশনটা ইশারায় দেখাল মুসা।
এদের কাছে হয়তো স্টার কোয়েস্টও আছে, দেয়ালে ভিডিওর সারি লক্ষ করে বলল কিশোর। ওর প্রিয় এক ছায়াছবির উপর ভিত্তি করে তৈরি ওই গেমটা। চলো তো দেখি।
ছেলেরা গেমগুলোর দিকে এগোচ্ছে, পিছনে ছুটন্ত পদশব্দ শোনা গেল। পরমুহূর্তে কে যেন খুব জোরে ধাক্কা দিল রবিনকে।
হুমড়ি খেয়ে আরেকটু হলেই একটা টেবিলের উপর পড়ে যাচ্ছিল রবিন। কিশোর শেষ মুহূর্তে ওর বাহু চেপে ধরাতে বেঁচে গেল।
রবিন, লাগেনি তো? জিজ্ঞেস করল ও।
না। কিন্তু আমার নতুন স্কি হ্যাটটা ছিনিয়ে নিয়ে গেছে যমজ বিচ্ছু দুটো, চেঁচিয়ে উঠল নথি।
হ্যাট, হ্যাট, কে নিল হ্যাট? গেয়ে উঠল যমজরা।
তিন গোয়েন্দার পিছনে দাঁড়িয়ে ওরা। যার হাতে হ্যাটটা ছিল সে শূন্যে ছুঁড়ে দিল।
অ্যাই, বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু! বলে হ্যাটটা ধরবার জন্য হাত বাড়াল রবিন।
অপর যমজটা ওর আগেই লুফে নিল হ্যাটটা। এবার সে ওটা ছুঁড়ে দিলে দ্বিতীয়জন হাত বাড়িয়ে দিল।
মুসা এক লাফে এগিয়ে এসে হ্যাটটা থাবা মেরে ছিনিয়ে নিল। ও ঘুরে দাঁড়িয়ে কটমট করে চাইতে ছেলে দুটো ভয়ে দিল দৌড়।
মুসাকে ধন্যবাদ দিয়ে হ্যাটটা আবার জ্যাকেটের পকেটে ঢোকাল রবিন।
কিম-জিমের দুষ্টুমি আর গেল না, এক কিশোর কণ্ঠ বলে উঠল।
কিশোর ঘুরে দাঁড়াল। গেম রুমের দরজার কাছে ওদের সমবয়সী এক কিশোর দাঁড়িয়ে। কালো চুল ছোট করে ছাঁটা ওর, চোখজোড়া সবুজ।
ওদেরকে চেনো নাকি? কিশোর প্রশ্ন করল।
গত বছর ওরা আমার সাথে বিগিনার্স ক্লাসে ছিল, তিন গোয়েন্দার দিকে এগিয়ে এল ছেলেটি। সব সময় সমস্যা পাকায় দুই ভাই।

জোড়া সমস্যা, আওড়াল মুসা।
ছেলেটি মুসার দিকে চাইল।
বাহ, তোমার লকেটটা তো চমৎকার!
মুসা রুপোলী স্কি দুটো স্পর্শ করল।
ধন্যবাদ। এটা আমার নতুন লাকি লকেট। এটা ছাড়া স্কি করব না আমি।
তুমি বুঝি ভাল স্কি জানো?
শ্রাগ করল মুসা।
তেমন কিছু না। অল্প কয়েকবার স্কি করেছি আরকি। তবে স্কি ভালবাসি আমি। অপেক্ষা করে আছি কখন ক্লাস শুরু হবে।
আমিও স্কি স্কুলে এসেছি, জানাল ছেলেটি। আমার নাম উডি বোর্ডার। এসময় আরেক কিশোর এসে উডির পাশে দাঁড়াল। এ আমার ছোট ভাই মারি বোর্ডার, বলল উডি।
হাই, হাসিমুখে বলল মারি।
পাল্টা হাসল কিশোর। বন্ধুদের সঙ্গে ওদের পরিচয় করিয়ে দিল।
চলো, স্কি ভিডিও দেখি, বলল উড়ি। ওদেরকে পিছনে নিয়ে টিভির সামনে রাখা প্রমাণ সাইযের কাউচটার কাছে এসে দাঁড়াল।
ছেলেরা বসে পড়লে, স্ক্রীনের স্কিয়ারের দিকে চোখ রাখল কিশোর। কমলা রঙের কয়েকটা পতাকার আশপাশ দিয়ে স্কি করছে সে।
আমি ওর মত পারব না, ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল গোয়েন্দাপ্রধান।
হেসে উঠল মারি।
আমিও না। সবে শুরু করেছি। উডির সাথে গতবছর আসতে পারিনি, ফ্লু হয়েছিল।
রবিন আর আমিও বিগিনার, জানাল কিশোর। আমাদেরকে হয়তো একই ক্লাসে দেবে।
তুমি কোন লেভেলে, মুসা? উডি জিজ্ঞেস করল।
ইন্টারমিডিয়েট, বলল মুসা। চোখ ওর পর্দায় সাঁটা। পাথর আর গাছ পালা এড়িয়ে, একেবেকে স্বচ্ছন্দ গতিতে নেমে আসছে স্কিয়ার।
আমিও, জানাল উডি। প্রত্যেক বছর এখানে একটা কনটেস্ট হয়। প্রতি ক্লাস থেকে একজন করে সেরা স্কিয়ার বেছে নেয়া হয়। এ বছর আমার গ্রুপ থেকে আমি জিতব।
এই কনটেস্টে জিতলেই কী আর না জিতলেই কী! চড়া গলায় বলে উঠল একটি কণ্ঠ।

ঘুরে দাঁড়াল ওরা। দেখতে পেল এক কিশোর এগিয়ে আসছে। কদমছাট চুল ছেলেটির মাথায়।
স্কিইঙে কোন মজা নেই, বলল ও।
কে বলেছে? চ্যালেঞ্জ জানাল মুসা।
ছেলেটি ভ্রূ কুঁচকে তাকাল।
আমি বলছি, দৃঢ় কণ্ঠে বলল।
মজা নেই তো তুমি এখানে কী করছ? রবিনের প্রশ্ন।
বাবা-মার চাপে পড়ে আসতে হয়েছে।
বিল, দরজার কাছ থেকে হাঁক ছাড়লেন এক মহিলা।
আসি, মা, চেঁচিয়ে উঠল ছেলেটি। তারপর বিদায় না নিয়েই ঘুরে দাঁড়িয়ে গটগট করে হাঁটা দিল।
আজব সব চরিত্র এখানে এসেছে দেখতে পাচ্ছি, বলল রবিন।
স্কি করতে ভয় পায় হয়তো, বলে লকেটে আঙুল ছোঁয়াল মুসা। আমার মত ওরও একটা গুড লাক চার্ম দরকার।
ওটা কি সত্যি সত্যি, পয়মন্ত? জানতে চাইল উডি। আমি একবার পরতে পারি? এ মুহূর্তের জন্য স্থির হয়ে গেল মুসা। কিশোর জানে, লকেটটা খুলবার ইচ্ছে নেই ওর। কিন্তু অবশেষে ভেলভেটের রিবনটা খুলে উডির হাতে তুলে দিল মুসা।
ধন্যবাদ। উডি নিজের গলায় বাঁধল রিবনটা। এটা মিনিট খানেক পরে থাকলে আমারও ভাগ্য ফিরতে পারে।
রাশেদ চাচাকে এসময় ঘরে ঢুকতে দেখল কিশোর।
চল, যাওয়া যাক, ডাকলেন তিনি ওদেরকে।
তিন গোয়েন্দা জ্যাকেট পরে নিল। তারপর উডি আর মারির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রাশেদ চাচাকে অনুসরণ করল।
আরে! লকেটটার কথা তো বেমালুম ভুলেই গেছি, বলল মুসা। ফিরে এল ও।
উডি লকেটটা গলা থেকে খুলল।
পরিয়ে দেব? প্রশ্ন করল।
মুসা সায় জানালে লকেটটা ওকে পরিয়ে দিল উডি। পয়মন্ত স্কি দুটো স্পর্শ করতে হাসি ফুটে উঠল মুসার মুখে।
রাশেদ চাচার পিছু পিছু লজ থেকে বাইরের তারাজ্বলা, ঠাণ্ডা রাতে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা। উডি আর মারিও লজ ত্যাগ করেছে।
বাই! মারি দরজার কাছ থেকে ওদের উদ্দেশে বলল।
কিশোর ঘরে তাকিয়ে নতন বন্ধদের উদ্দেশে হাত নাড়ল। মারি পাল্টা হাত নাড়লেও উডির এদিকে খেয়াল নেই। ওর মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে। চকচকে

তুষার।
কালকেও এরকম ঠাণ্ডা পড়বে নাকি! বলল রবিন। গোলাপী হ্যাটটা চেপে বসাল।
যত ঠাণ্ডাই পড়ক, বলল কিশোর, বুট ঝাড়া দিল। আমরা ঠিকই এনজয় করব!
কমিনিটের মধ্যেই ভাড়া করা অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছে গেল ওরা। লিভিংরুমের জানালা দিয়ে রঙবেরঙের গন্ডোলা কার দেখা যাচ্ছে। স্কি করতে আসা অতিথিদেরকে প্রতিদিনই পাহাড় চূড়ার রেস্তোরাঁয় পৌঁছে দেয় এসব গন্ডোলা।
অ্যাপার্টমেন্টের ভিতর বেজায় ঠাণ্ডা। কিশোর ঝটপট ওর ফ্লানেলের গরম স্লীপিং সুটটা পরে নিয়ে দাঁত ব্রাশ করে ফেলল।
দুসারি বাঙ্ক বেড রয়েছে এই বেডরুমটিতে। তিন গোয়েন্দা এটাতে উঠেছে। একটা বেডের নীচের বাঙ্কে লাফ দিয়ে উঠে পড়ল কিশোর। গুটিসুটি মেরে শুয়ে পড়ল গরম কম্বলের তলায়।
রবিন বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে আরেকটা বাঙ্কে আশ্রয় নিল।
উহ, ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে বলল, তাড়াতাড়ি ব্রাশ করে এসো, মুসা। ঘুমানোর আগে স্কিইং সম্পর্কে কিছু কথা জেনে নিতে চাই।
এখুনি আসছি, বলে এক দৌড়ে বাথরুমে চলে গেল মুসা।
একেবারে হাড় কাঁপানো শীত, বলল কিশোর।
যা বলেছ, বলল রবিন।
এসময় হঠাৎ মুখ ভর্তি টুথপেস্টের ফেনা নিয়ে দৌড়ে এল মুসা। টুথব্রাশ আঁকাচ্ছে।
কী হয়েছে, মুসা? কিশোর জিজ্ঞেস করল। আমার লকেটটা খোয়া গেছে!
কিশোর ঠাণ্ডার কথা ভুলে, এক লাফে নেমে পড়ল বিছানা থেকে।
দাঁত ব্রাশ করার সময় পড়ে যায়নি তো?
খুঁজে দেখেছি, জানাল মুসা। কোথাও নেই।
আরেকবার খুঁজি চলো, বলল গোয়েন্দাপ্রধান।
বাথরুমে গিয়ে খুঁজে দেখল। কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না লকেটটা।
শেষ কখন পরে ছিলে মনে আছে?
শ্রাগ করল মুসা, তারপর সিঙ্কের নীচে আরেকবার পরীক্ষা করল।
উডি লজের ভিতর বেঁধে দিয়েছিল। তারপর জানি না।
দুপদাপ পা ফেলে বাঙ্কের কাছে চলে এল ও। মই বেয়ে কিশোরের উপরের বেড়ে উঠে গেল।
ছুটির দিনগুলো আমাকে এখানেই হয়তো পড়ে থাকতে হবে, বিছানায়। শুয়ে বলল। লাকি লকেটটা ছাড়া স্কি করতে পারব না আমি।

কেন পারবে না, বলল রবিন। ওসব কুসংস্কার মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দাও তো, মুসা।
কুসংস্কার নয়, জোর গলায় বলল মুসা। এক হুজুর দোয়া পড়ে ওতে ফুঁ দিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন ওটা গলায় থাকলে কোন বিপদ-আপদ আমাকে
স্পর্শ করতে পারবে না। বরঞ্চ নানা কাজে সাফল্য আসবে।
কিশোর তোমার লকেট খুঁজে দেবে, চিন্তা কোরো না, আশ্বাস দিল রবিন।
ওটা গেছে, আর পাওয়া যাবে না, মুসা নিরাশ কণ্ঠে বলল।
রবিন কিশোরের দিকে এক ঝলক চাইল, কিন্তু মুখে কিছু বলল না। ও নিজের বাঙ্কে উঠে পড়লে বাতি নিভিয়ে দিল কিশোর।
বিছানায় শুয়ে চোখ বুজল কিশোর। ঘুম আসতে দেরি আছে। মুসার লকেটটা গেল কোথায়?
তোরা এখনও ঘুমোচ্ছিস? রাশেদ চাচা ওদের ঘরে উঁকি দিয়ে বলে উঠলেন। উঠে পড়।
ছেলেরা পোশাক পরে কিচেনে চলে এল।
দারুণ গন্ধটা কীসের? রবিন প্রশ্ন করল।
নাক টানল কিশোর।
এখুনি রহস্যের সমাধান করে দিচ্ছি, বলল। প্যানকেক!
কেস খতম, বললেন চাচা, এটা আমার স্পেশাল আইটেম। নে, শুরু কর।
কিশোর লক্ষ করল, আশ্চর্য হলেও সত্যি মুসার খাওয়ায় মন নেই। লকেট হারিয়ে ভেঙে পড়েছে বেচারা।
নাস্তা সেরে স্কি ভাড়া নেওয়ার জন্য লজের উদ্দেশে হাঁটা দিল ওরা। কিশোর হাঁটছে ধীর গতিতে, মাটিতে চোখ রেখে। কাল রাতে বাসায় ফিরবার সময় হয়তো কোথাও পড়ে গিয়ে থাকতে পারে লকেটটা, ভাবছে ও।
লকেটটা খুঁজে পেল না কিশোর। ফলে অন্য আরেকটা চিন্তা উদয় হলো ওর মাথায়। রাশেদ চাচাকে এগোতে বলে বন্ধুদের নিয়ে গেম রুমের দিকে পা বাড়াল গোয়েন্দাপ্রধান।
আমি স্কি শপে আছি, বলে গেলেন চাচা। ওখান থেকে তোদেরকে বুট আর স্কি নিতে হবে।
গেম রুমে পৌঁছে বন্ধুদেরকে আইডিয়াটা খুলে বলল কিশোর।
এখানে পাওয়া যাবে মনে করো? মুসা জিজ্ঞেস করল।
জানবার একটাই উপায়, বলল কিশোর।
তিন গোয়েন্দা গোটা ঘর তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখল। লকেটটা নেই।

সরি, মুসা, বলল কিশোর। তখন যে বললে লকেটটা ছাড়া স্কি করবে না, ওটা নিশ্চয়ই কথার কথা?
ত্যাগ করল মুসা।
হ্যাঁ, তাই তো, বলে হাসবার চেষ্টা করল ও।
স্কি শপে তিন গোয়েন্দা ও রাশেদ চাচা স্কি বুট পরে, পোল আর স্কি তুলে নিল।
তিন গোয়েন্দার প্রত্যেকের স্কিতে ওদের নাম লেখা টেপ সেঁটে দিল কেরানী।
কোটা কার কি এখন আর গুলিয়ে ফেলার ভয় থাকল না, বলল লোকটা।
ছেলেরা তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে, চাচার পিছু পিছু শপ ত্যাগ করল। ভারী স্কি বুট পায়ে থপথপিয়ে হাঁটতে হচ্ছে। এত কিছু হাতে ধরে রাখা কঠিন হয়ে পড়ল। হাত ফস্কে যতবারই পোল পড়ে যাচ্ছে, হেসে ফেলছে রবিন।
ওই যে, অন্যান্য স্টুডেন্টরা, বাইরে বেরিয়ে এসে বলল কিশোর। ইস্ট্রাক্টরদের ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে ছোটদের বড়সড় এক দল।
আমি রেগুলার ট্রেইলে স্কি করব, বললেন চাচা। লাঞ্চের সময় লজে দেখা হবে। হ্যাভ ফান! চলে গেলেন তিনি।
ছেলেরা তড়িঘড়ি এগোল দলটার সঙ্গে যোগ দিতে। টনি গ্রেগ লিস্টে ওদের নাম দেখে নিলেন। কিশোর আর রবিন যাচ্ছে জুলিয়ার বানি ক্লাসে, বললেন। দীর্ঘাঙ্গী এক সোনালী মাথা মহিলার উদ্দেশে মাথা ঝাঁকালেন। বেশ কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী ইতোমধ্যে জড় হয়েছে তার পাশে।
আর আমি? পরম আগ্রহে প্রশ্ন করল মুসা।
কিশোর স্বস্তির শ্বাস ফেলল। যাক, মুসা ওর তথাকথিত পয়মন্ত লকেটটা নিয়ে বেশি মাথা ঘামাচ্ছে না।
তুমি পড়েছ জ্যাকর্যাবিট ক্লাসে। ভিক্টর তোমাদের টিচার, বললেন টনি গ্রেগ। কোকড়া বাদামী চুলের এক লোককে দেখিয়ে দিলেন। চোখে বড় ফ্রেমের সানগ্লাস তার।
মুসা বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, পোল আর স্কি হাতে দ্রুত পায়ে সেদিকে এগোল।
জুলিয়া টিচারের উদ্দেশে এগোবার সময় হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল রবিন।
এহ হে, দেখো না আমাদের সাথে কে জুটেছে, বলল ফিসফিসিয়ে। কালকের সেই অভদ্র ছেলেটা।
বিল নামের কিশোরটি গতরাতে বিদায় না নিয়েই চলে গিয়েছিল ওদের কাছ থেকে।
জুলিয়া টিচারের পাশেই দাঁড়িয়ে বিল।
উহ, ভীষণ শীত, অভিযোগ করল ছেলেটি।

ওকে পাত্তা না দিলেই হলো, রবিনকে বলল কিশোর।
মারি চলে এলেই আমাদের লেসন শুরু হবে, বানি গ্রুপের উদ্দেশে বললেন জুলিয়া।
কিশোর আশপাশে তাকিয়ে মারিকে খুঁজল। টনি গ্রেগের সঙ্গে ওকে কথা বলতে দেখল। কোমরে দুহাত রেখে মাথা নাড়ছে। অবশেষে ঘুরে দাঁড়িয়ে এগিয়ে এল এদিকে।
কিছু হয়েছে নাকি? কিশোর কৌতূহলী হলো।
আমি চেয়েছিলাম আমার ভাইয়ের ক্লাসে থাকতে, জানাল মারি। কাঁধের উপর দিয়ে জ্যাকর্যাবিটদের দিকে চাইল।
কিন্তু তুমি না আমাদের বলেছ ভাল স্কি করতে জানো না, বলল রবিন।
উডি তো বলে তেমন কঠিন কিছু না, বলল মারি। তোমরা না পারলেও আমি ঠিকই পারব।
মারির কথা-বার্তা আজকে কেমন অন্যরকম লাগল ছেলেদের কাছে।
অ্যাই, তোমরা শোনো, জুলিয়া তাঁর বানি ক্লাসের উদ্দেশে বললেন। ওদের বুট শক্ত করে বেঁধে দিয়ে দেখিয়ে দিলেন কীভাবে স্কি পরতে হয়।
আমরা এখন হাঁটা প্র্যাকটিস করব, জানালেন।
আমি জানি কীভাবে হাঁটতে হয়, কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠল মারি। স্কি পায়ে কয়েক পা এগোল, দুপা সোজা করল।
ধুর, বিরক্তিকর, ঘ্যান ঘ্যান করতে শুরু করল বিল।
ছুটিটা মাটি করে ছাড়বে নাকি মারি আর বিল মিলে? মনে মনে বলল রবিন।
মুচকি হাসলেন জুলিয়া।
চিন্তা কোরো না, বিল, বেশিক্ষণ বিরক্তি লাগবে না।
বানি ক্লাস হাঁটা দিয়ে শুরু করল। তারপর ঘোরা প্র্যাকটিস চলল।
বিল ঘুরতে গিয়ে ফ্যাসাদে পড়ে গেল। দুটো স্কি আড়াআড়ি হয়ে আটকা পড়ল ও।
ওর চিৎকার শুনে জুলিয়া গিয়ে মুক্ত করলেন ওকে।
এবার এই ছোট পাহাড়টার পাশ দিয়ে হেঁটে উপরে উঠব আমরা, সবার ঘোরা শেখা হয়ে গেলে জানালেন জুলিয়া।
তেমন কঠিন না, হাসি মুখে মন্তব্য করল রবিন, উপরে উঠবার সময়।
কিন্তু থেমে দাঁড়িয়ে নীচে যখন তাকাল, আবিষ্কার করল পাহাড়টা যথেষ্ট উঁচু আর খাড়া। পাহাড়তলী থেকে এতটা বোঝা যায়নি।
এবার? রবিন ভয়ে-ভয়ে জানতে চাইল।
এবার সড়সড় করে নীচে নামা, বললেন জুলিয়া।

পা ভেঙে যাবে তো, প্রতিবাদ করল বিল।
হাঁটু ভাঁজ করে বুটের আগায় শরীরের ভার চাপিয়ে দাও, ব্যাখ্যা করলেন জুলিয়া। এরকম।
স্বচ্ছন্দ গতিতে নীচে নেমে গেলেন তিনি। ওখান থেকে গলা ছাড়লেন। কিশোর, নেমে এসো।
কোন অসুবিধে হলো না কিশোরের। এরপর একে একে অন্যরাও নেমে এল। এবার থেমে দাঁড়ানো শিখবার পালা।
মারি একটু পরে ঝুলন্ত কেবল চেয়ারের দিকে আঙুল তাক করল। আমাদেরকে চূড়ায় নেবেন কখন? এগুলো তো বাচ্চাদের শেখায়।
কিশোর মুখ তুলে চাইল।
স্কি লিফট চেয়ারে বসে মুসা আর উডি। ঢালের চূড়ায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ওদেরকে।
ভিক্টরের ক্লাস ট্রেইলের খানিকদূর পর্যন্ত স্কি করে তারপর এই পাহাড়ের মাথায় মিলবে আমাদের সাথে, বললেন জুলিয়া।
বেশ খানিকক্ষণ বাদে, ছাত্র-ছাত্রীদেরকে তিনি আবার ছোট পাহাড়টার চূড়ায় তুলে আনলেন।
ভিক্টর ও তার জ্যাকব্যাবিটরা অপেক্ষা করছিল ওদের জন্য।
অ্যাই, মুসা, বলল কিশোর। কেমন লাগছে?
দারুণ, সোল্লাসে বলল মুসা।
কোন সমস্যা হচ্ছে না তো? রবিনের প্রশ্ন।
সমস্যা বলতে ওই যমজ ভাই দুটো। ওরা আমার ক্লাসে পড়েছে।
কিম আর জিমকে জ্যাকর্যাবিটদের সঙ্গে দেখা গেল। কিশোরকে তাকাতে দেখে একটা ভাই চোখ টিপল।
ভাগ্যিস ওরা আমাদের দলে নেই, নিচু গলায় বলল রবিন। বিল আর মারির জ্বালাতেই তো জুলিয়া টিচার অস্থির।
সবাই লাইন আপ করো, দুই দলের উদ্দেশেই হাঁক ছাড়লেন ভিক্টর। আমরা একসাথে ঢাল বেয়ে নামব।
কিশোর ওর দলের মধ্যে সবার আগে।
গুড লাক, বলল রবিন। সে কিশোরের পিছনে।
কিশোর পোলে ধাক্কা দিয়ে তরতর করে নেমে চলল ঢাল বেয়ে। নীচে পৌঁছে নিখুঁতভাবে থেমে দাঁড়াতে পারল। হাসি ফুটল ওর মুখে।
হঠাৎ এ সময় কার যেন চিৎকার কানে এল ওর।

যথাসম্ভব দ্রুত ঘুরে দাঁড়াল কিশোর। সতর্ক ছিল যাতে স্কি ক্রস হয়ে আটকা না পড়ে।
মুসা রবিনের পিছু পিছু পাহাড় বেয়ে হড়হড় করে নেমে আসছে।
সাবধান, রবিন! চেঁচিয়ে উঠেছে ও। খাইছে! আমি থামতে পারছি না!
কাঁধের উপর দিয়ে চাইল রবিন। ফলে স্কি দুটো আড়াআড়ি হয়ে মাটিতে পড়ে গেল।
মুসা ঘুরবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো। ওর একটা স্কি ঢুকে গেল রবিনের স্কির নীচে।
মুসা হোঁচট খেয়ে সোজা বন্ধুর গায়ের উপরে পড়ল!
কিশোর ঢাল বেয়ে যতটা সম্ভব উঠে আসতে লাগল বন্ধুদের সাহায্যে।
বানি ও জ্যাকর্যাবিটরা তাদের টিচাররা কী করেন দেখবার জন্য অপেক্ষা করছিল। ভিক্টর ও জুলিয়াকে দুই গোয়েন্দার উদ্দেশে নামতে দেখে উডি, মারি, বিল আর জনাকয় ছাত্র তাদের পিছু নিল।
ভিক্টর ও জুলিয়া তুষারের ঝড় তুলে রবিন ও মুসার কাছে এসে থামলেন।
ছেলেদেরকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করলেন ভিক্টর।
কিশোর ইতোমধ্যে পৌঁছে গেছে ওখানে।
তোমাদের লাগেনি তো? উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করল।
ওদের হয়ে জবাব দিলেন ভিক্টর।
আরে না, কিছু হয়নি। একটু ঘাবড়ে গেছে শুধু।
এবার সবাই নীচে নেমে এল।
কে করল কাজটা? নীচে পৌঁছে বলল মুসা। তুষারে মাখামাখি ওর জামা কাপড়।
আমি তো দেখলাম তুমি, বলল রবিন। তুষার মেখে সাদা হয়ে গেছে। সে-ও।
তর্ক বাড়াবার সুযোগ দিলেন না জুলিয়া।
স্কি করতে গেলে এরকম হয়েই থাকে, বুঝেছ? বললেন ওদের উদ্দেশে। আমাদের এখন বাকিদের নামাতে হবে।
তোমরা এখানেই থেকো, দলের উদ্দেশে বললেন ভিক্টর।
ইন্সট্রাক্টর দুজন স্কি করে রওনা হয়ে গেলেন।
কিশোর বড়দের চলে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিল।
কী ব্যাপার বলো তো?
চোখ সরু করল মুসা।
আমাকে পিছন থেকে ধাক্কা দিয়েছে।
পড়ে গেলে সবাই একথা বলে, বলে উঠল মারি। ঠিক না, উডি?
শ্রাগ করল উডি।
তাই তো মনে হয়।

রবিন ওর স্কি পোল দুটো তুষারে গেঁথে দিয়ে সটান সোজা হয়ে দাঁড়াল।
দেখো, আমার বন্ধু যদি বলে থাকে ওকে ধাক্কা দেয়া হয়েছে, তার মানে সত্যিই ধাক্কা দেয়া হয়েছে, জোরাল গলায় বলল।
আমি তো আগেই বলেছিলাম স্কিইঙে কোন মজা নেই, মুসার উদ্দেশে বলল বিল।
মুসা ওর কথা কানে নিল না। ওকে তখনও ক্রুদ্ধ দেখাচ্ছে।
আমার লাকি লকেটটা থাকলে এসব ঘটত না।
হারিয়ে গেছে নাকি? মারি প্রশ্ন করল।
মাথা ঝাঁকাল মুসা।
অদ্ভুত তো, বলল উডি। তুমি বলেছিলে ওটা ছাড়া স্কি করতে পারবে না। আর সত্যি সত্যি পড়ে গেলে।
আমাকে ধাক্কা দেয়া হয়েছে, দৃঢ় তোমার পেছনে কে ছিল?
জিজ্ঞেস করল কিশোর।
খেয়াল করিনি, জানাল মুসা। অন্যরাও লক্ষ করেনি অপকর্মটা কার।
ইতোমধ্যে বাদবাকিরা পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছে গেছে।
লাঞ্চ টাইম, ঘোষণা করলেন ভিক্টর।
লাঞ্চের পর মুসার সঙ্গে ক্লাস পাল্টাপাল্টি করে দিয়েন আমার, জুলিয়াকে বলল মারি। আমি তো একবারও পড়িনি।
উঁহু, সোজা নিষেধ করে দিলেন টিচার।
কিশোর আর রবিন ওদের স্কি খুলে ফেলেছে।
ওরা লজের বাইরে স্কি র‍্যাকের উদ্দেশে এগোলে, মুসা ওদের আগে আগে চলল।
রবিন ঝুঁকে এল কিশোরের কানের কাছে।
বেচারী মুসা। প্রথমে সিলভার স্কি হারাল, তারপর ঠেলা খেল। কে করল কাজটা? কেনই বা?
ভ্রূ কুঁচকে গেল কিশোরের। নীচের ঠোঁটে চিমটি কাটল.।
ইচ্ছা করে হয়তো ঠেলেনি, বলল। কিন্তু তা হলে ক্ষমাই বা চাইল না। কেন?
ভয় পেয়েছে হয়তো। কিংবা যমজ দুটোর মত বিচ্ছু। কাল রাতে আমার সোয়েটারে আরেকটু হলেই আইসক্রিম লেগে যাচ্ছিল, অথচ সরি বলেনি।
লজের দরজার ঠিক বাইরে, স্কি র‍্যাকের এক কোণে স্কি দুটো হেলান দিয়ে রাখল মুসা।
জলদি এসো, বন্ধুদেরকে তাড়া দিল। খাইছে রে আল্লা, খিদেয় নাড়ি ভূঁড়ি তো সব জ্বলে যাচ্ছে।
কিশোর আর রবিনও র‍্যাকে স্কি রাখল। ফিতেওয়ালা পোল দুটোও ঝুলিয়ে দিল স্কির ডগা থেকে।

তারপর স্কি বুট পায়ে, সবাই মিলে থপথপিয়ে প্রবেশ করল লজের ভিতরে। স্কি বুট পুরে হাঁটতে কিশোরের ভাল লাগছে। জিনিসটা শক্ত, কিন্তু পায়ে থাকলে নিজেকে সত্যিকারের স্কিয়ার মনে হয়।
উডি আর মারি ডাইনিং রুমের বাইরে হলঘরে দাঁড়িয়ে ছিল। তোমরা ঠিক আছ তো? উডি প্রশ্ন করল মুসা আর রবিনকে।
হ্যাঁ, জানাল মুসা। মাথা ঝাঁকাল রবিন।
হঠাৎ করে পড়ে-উড়ে গেলে অনেকে ভয় পেয়ে যায়, বলে চলল উডি। আবারও স্কি করবার কথা ভাবতে ভয় লাগে।
আমি আগেও এরকম পড়েছি, বলল মুসা। নতুন কিছু না।
উডি, তুমি আমাকে প্র্যাকটিসে সাহায্য করবে বলেছিলে, মারি বলল। তাড়াতাড়ি চলো। বাচ্চাদের ক্লাসে পড়ে থাকতে চাই না আমি।
দুই ভাই হনহন করে চলে গেল।
তিন গোয়েন্দা ক্যাফেটেরিয়ার ভিতর রাশেদ চাচাকে দেখতে পেল। ওদের জন্যই অপেক্ষা করছিলেন।
কেমন কাটল সময়টা? জিজ্ঞেস করলেন চাচা।
দারুণ, জানাল কিশোর।
শুধু একটা ব্যাপার ছাড়া, মুসা বলল। কে যেন ধাক্কা দিয়েছিল আমাকে।
আমি জানি কে, বলল রবিন। ও হচ্ছে—
হঠাই তীক্ষ্ণ চিৎকার ছাড়ল রবিন।
কিম আর জিম! তবে রে, বিচ্ছু কোথাকার–
যমজদের একজন রবিনের গোলাপী স্কি হ্যাটটা ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। অপরজন নিজের লাল স্টকিং ক্যাপটা চাপিয়ে দিয়েছে ওর মাথায়। কান অবধি ঢাকা পড়ে উদ্ভট দেখাচ্ছে বেচারী নথিকে।
মাথা থেকে টেনেটুনে স্টকিং ক্যাপটা খুলে ফেলল ও।
ওরা আবার আমার হ্যাট চুরি করেছে!
যমজরা হল পেরিয়ে গেম রুমের উদ্দেশে ছুট দিল। ওদেরকে ধাওয়া করল তিন গোয়েন্দা।
দিয়ে দাও ওটা! গর্জন ছাড়ল নথি।
এটা যখন যার তখন তার-জাদুর হ্যাট কিনা, প্রথমজন কথাগুলো বলে। রবিনের হ্যাটটা পরে ফেলল।
রবিন ওটা কেড়ে নিতে হাত বাড়াল। ছেলেটা ঝট করে মাথা নামাল।
পারলে ধরো দেখি!
এক ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। দোরগোড়ায় ধাক্কা খেল মি, গ্রেগের সঙ্গে।

উফ, বলে উঠে মি. গ্রেগের দিকে চাইল যমজ।
এসময় এক মহিলা উদয় হলেন মি. গ্রেগের পাশে।
কিম, জিম, তোমরা ভুলে গেছ? বললেন। মাউন্টেনটপ ক্যাফেতে আজ আমাদের লাঞ্চ করার কথা। গন্ডোলায় চড়বে না?
চড়ব না মানে? দ্বৈত সঙ্গীত গাইল যমজরা।
প্রথম জন রবিনের হ্যাটটা খুলে ছুঁড়ে দিল ওর উদ্দেশে। অপরজুন রবিনের হাত থেকে কেড়ে নিল লাল স্টকিং ক্যাপটা।
মুসা দাঁত কিড়মিড় করে এগোতে যাচ্ছিল, কিশোর ইশারায় ওকে থামতে নির্দেশ দিল। ছেলে দুটো মহা বিচ্ছু হতে পারে, কিন্তু বয়সে তো ছোট। ওদের সঙ্গে লাগতে যাওয়ার কোন ইচ্ছে নেই ওর।
দাঁড়াও,যমজদের উদ্দেশে বলল গোয়েন্দাপ্রধান। তোমরা কি একটা স্কি আকৃতির রুপোলী লকেট দেখেছ?
হ্যাঁ, বলে উঠল দ্বিতীয় ভাই। ওসব তো মেয়েরা পরে।
মুসা চোখ পাকিয়ে তাকাল, কিন্তু তার আগেই ঘুরে দাঁড়িয়ে মার সঙ্গে বেরিয়ে গেল দুভাই।
ওদের গন্ডোলা আটকে যাক, আর না নামুক, থমথমে গলায় বলল মুসা।
ইতোমধ্যে রাশেদ পাশা এসে যোগ দিয়েছেন ওদের সঙ্গে। হেসে উঠলেন তিনি।
লাঞ্চ করবি না? আয়।
সবাই ওরা ফিরে গেল ক্যাফেটেরিয়ায়। সামনে ধূমায়িত খাবারের প্লেট নিয়ে বসল।
তোদের নতুন রহস্যের কথা বল, রাশেদ চাচা কিশোরকে উদ্দেশ্য করে বললেন।
তুমি রহস্যের কথা জানলে কী করে, চাচা? জিজ্ঞেস করল কিশোর। পানির গ্লাসে চুমুক দিল।
মুচকি হাসলেন চাচা।
একটু-আধটু গোয়েন্দাগিরি তো আমিও জানি, না কি? গেম রুমে যমজ ভাইদেরকে প্রশ্ন করলি শুনলাম। আর সকালে কী যেন খুঁজছিলি মনে পড়ে গেল। ব্যস, দুইয়ে দুইয়ে চার মিলিয়ে ফেললাম।
আমার লকেটটা, বলল মুসা। কাল রাত থেকে পাচ্ছি না।
পাহাড়ে আজকে কে যেন পিছন থেকে ধাক্কা দিয়েছে মুসাকে, বলল। রবিন। লকেটটা যে চুরি করেছে সে হতে পারে!
তোমারও কি তাই মনে হয়, চাচা? কিশোর প্রশ্ন করল।
জানিসই তো, বললেন চাচা। কোন সিদ্ধান্তে আসতে হলে তথ্য প্রয়োজন। চেয়ারে হেলান দিলেন। মুসাকে কি কেউ ইচ্ছে করে ঠেলা দিয়েছে? নাকি ওটা নিছকই

একটা অ্যাক্সিডেন্ট?
নীচের ঠোঁটে চিমটি কাটল গোয়েন্দাপ্রধান।
দুটো ঘটনা আমাদের মনে রাখতে হবে, বলল।
সবাই উৎসুক দৃষ্টিতে চাইল ওর দিকে।
এক হচ্ছে, মুসার লাকি লকেটটা হারিয়ে গেছে। এবং দুই, পাহাড়ের ঢালে মুসাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। ব্যাপারটা চাচা যেমন বললেন ইচ্ছাকৃত কিংবা অ্যাক্সিডেন্ট, দুরকমই হতে পারে।
এবার আসি সন্দেহভাজনদের তালিকায়।
কারা তোর সাসপেক্ট? রাশেদ চাচা জানতে চাইলেন।
নীচের ঠোঁটে আবারও চিমটি কাটল কিশোর।
যমজ দুটো, কিম আর জিম, বলল ও। কোটা কে বলতে পারব না, কাজেই দুটোকেই রাখছি আমার সন্দেহের তালিকায়। ওদের যে কোন একজনের পক্ষে মুসাকে ধাক্কা দেয়া সম্ভব।
ওরা কেন করতে যাবে কাজটা? রাশেদ চাচা প্রশ্ন করলেন।
স্রেফ দুষ্টামি, বলল রবিন। ছেলেমানুষী।
মৃদু হাসলেন চাচা।
ব্যস, এরা দুজনই তোদের সাসপেক্ট, আর কেউ না?
ঘ্যানঘেনে বিল? রবিন জিজ্ঞেস করল।
ও ছিল ঘটনাস্থলে, বলল কিশোর। স্কিইং পছন্দ করে না ও। ক্লাসটা তাড়াতাড়ি শেষ করে দেয়ার জন্যে মুসাকে ধাক্কা দিয়ে থাকতে পারে।
আর কেউ? মুসা বলল।
উডি আর মারি কাছাকাছি ছিল।
ওরা মুসাকে ধাক্কা দিতে যাবে কেন? রাশেদ চাচা জিজ্ঞেস করলেন।
দুমুহূর্ত ভেবে নিল কিশোর।
মারি বানি ক্লাসে থাকতে চায় না, জ্যাকর্যাবিটে যেতে চায়, বলল।
ও ভেবেছিল আমি পড়ে গেলে ইন্ট্রাক্টর আমার সাথে ওকে পাল্টাপাল্টি করে দেবেন, বলল মুসা। কথাটা বলেও ফেলেছে।
কিন্তু উডি? চিন্তিত কণ্ঠে বলল কিশোর। মারিকে জ্যাকর্যাবিট ক্লাসে আনার জন্যে ও কি মুসাকে ফেলে দিতে পারে?
কাজটা তোদের। গোয়েন্দাগিরি করে জবাবটা তোদেরকেই খুঁজে বের করতে হবে, বললেন চাচা।
মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল কিশোর। বিল, উডি আর মারির নাম গেঁথে নিল মনের মধ্যে।

আমাদের চোখ-কান খোলা রাখতে হবে, বন্ধুদের উদ্দেশে বলল। আজকে বিকেলের ক্লাসে নতুন কোন ক্ল পেয়ে যেতে পারি।
সে আর বলতে, বলল মুসা। আমরা সতর্ক থাকব।
লাঞ্চের পর চাচার কাছ থেকে বিদায় নিল ছেলেরা। তারপর থপথপ করে দরজার উদ্দেশে পা বাড়াল।
হঠাৎ থমকে দাঁড়াল মুসা।
আরে, আমার স্কি জোড়া এখানে কেন?
দরজার এপাশে দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা, ও দুটো।
তুমি শিয়োর এগুলো তোমার? কিশোর প্রশ্ন করল।
টেপ দিয়ে নাম লেখা রয়েছে, আঙুল তাক করে দেখাল মুসা।
ওই দেখো। আর কোন সন্দেহ আছে?
কেউ হয়তো ভুল করে নিয়ে ফেলেছিল, পরে বুঝতে পেরে এখানে রেখে গেছে, বলল গোয়েন্দাপ্রধান।
কিংবা ওই যমজ বিচ্ছু দুটো হয়তো ইয়ার্কি মেরেছে, বলল রবিন। চারপাশে দৃষ্টি বুলাচ্ছে।
আশপাশে যমজদের দেখা গেল না।
যাক, পাওয়া তো গেছে স্কি দুটো, স্বস্তির সঙ্গে বলল মুসা। স্কি আর পোল তুলে নিয়ে বন্ধুদের অনুসরণ করল ও।
কিশোর আর রবিন যথাস্থানে ওদের স্কি খুঁজে পেল। তিন বন্ধু স্কি পরে নিল।
জুলিয়া টিচার আর বিল ঢালের নীচে দাঁড়িয়ে। ভিক্টরকে উডি, মারি আর কয়েকজন জ্যাকর্যাবিটের সঙ্গে দেখা গেল।
কিশোর আর রবিনকে দেখতে পেয়ে হাত নাড়ল বিল।
জলদি এসো। ঠাণ্ডায় জমে গেলাম!
পরে দেখা হবে, বলে পোলে চাপ দিল মুসা।
কিন্তু এক চুল নড়তে পারল না ও।
আরও জোর খাঁটিয়ে আবারও চাপ দিল।
অবস্থা যে কে সেই।
আমার স্কিতে কী যেন হয়েছে, চেঁচিয়ে উঠল মুসা। নড়ছে না!
স্কি খুলে ফেলল মুসা। উল্টে দিল। চাকা চাকা বরফে ভরে আছে তলা দুটো!
জুলিয়া স্কি করে চলে এলেন ছেলেদের কাছে।
কী হয়েছে?
মুসা ওর স্কি জোড়া ইন্ট্রাক্টরকে দেখাল।
লাঞ্চের সময় লজের ভিতর রেখেছিলে নাকি? প্রশ্ন করলেন জুলিয়া।

মাথা নাড়ল মুসা।
না, বাইরেই রেখেছি। কিন্তু কে যেন ভিতরে নিয়ে গেছে।
এবার বোঝা গেল, মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন জুলিয়া। তোমার স্কিজোড়া ভিতরে থাকার ফলে গরম হয়ে যায়। বাইরে যখন পা রেখেছ তুষার গেছে। গলে। কিন্তু বাইরে এতটাই ঠাণ্ডা, পানি আবার জমে গেছে। আর তাই তোমার। স্কির নীচে বরফ দেখতে পাচ্ছ।
এগুলো পরে স্কি করা যাবে না, হতাশ কণ্ঠে বলল মুসা। আমার কপালটাই খারাপ!
ভিক্টর, উডি আর মারি স্কি করে চলে এল।
কী হয়েছে? ভিক্টর প্রশ্ন করলেন।
জুলিয়া ঘটনাটা জানালেন।
মুসার স্কি বরফ হয়ে আছে।
আমরা যখন লাঞ্চ করছিলাম, সেই ফাঁকে কেউ একজন ওগুলো ভেতরে রেখে দেয়, বলল রবিন।
খুব খারাপ কথা, বলল মারি। তা হলে তো মুসার আর ক্লাস করা হচ্ছে না। ওর জায়গাটা আমি নিতে পারি।
তার দরকার পড়বে না, জোরাল গলায় বললেন জুলিয়া।
হ্যাঁ, সায় দিলেন ভিক্টর, আমি মুসাকে নিয়ে যাচ্ছি। ও আরেক জোড়া স্কি ভাড়া করে নেবে।
স্কি খুলে মুসার সঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করলেন তিনি।
গোটা ক্লাসটায় কিশোর মুসার জমে-যাওয়া স্কিজোড়ার কথাই শুধু ভাবল। কেউ একজন ওকে সরাতে চাইছে। কে সে?
বিকেল নাগাদ বানি ক্লাসের রোপ টো ব্যবহার করা শেখা হয়ে গেল। এরপর পাহাড়ের অনেকখানি উঁচু থেকে নেমে এল ওরা। দারুণ মজা পেল কিশোর। কিন্তু ওর মাথায় কেবলই ঘুরপাক খেল রহস্যটার চিন্তা।
তোমাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে স্নোম্যান বানানোর পার্টিতে, ক্লাস শেষে বললেন জুলিয়া। সবার জন্যে প্রচুর হট চকোলেটের ব্যবস্থা থাকবে।
হট চকোলেট আমার ভাল্লাগে না, সাফ জানিয়ে দিল বিল। জিভ পুড়ে যায়।
স্নোম্যান তো বাচ্চারা বানায়, আওড়াল মারি।
পার্টি জমাতে এদের দুজনের জুড়ি মেলা ভার, ব্যঙ্গের সুরে কিশোরকে বলল রবিন।
দুই বন্ধু চলল মুসার সঙ্গে দেখা করতে।
লকার রুম নানা ক্লাসের ছেলে-মেয়েদের ভিড়ে গিজগিজ করছে।

উহ, টায়ার্ড হয়ে গেছি, বলে নিজের জুতোজোড়া পরে নিল রবিন।
আমি হইনি, বলল মারি। আমি সারা দিন-রাত স্কি করতে পারব।
উডি ওর জুতোজোড়া তুলে নিল। ফিতে দিয়ে বাঁধা ও দুটো। একটা ফিতে ধরে টান দিতেই আলাদা হয়ে গেল দুপাটি।
কীভাবে করলে? রবিন উৎসুক কণ্ঠে জানতে চাইল।
একে বলে স্লিপ নট, বলল মারি। উডি আমাকে শিখিয়ে দিয়েছে কীভাবে বাঁধতে হয়।
আঙুল ঠাণ্ডা হয়ে গেলে এটা খুব কাজে আসে, ব্যাখ্যা করল উডি।
অবশ্য সাবধান থাকতে হয়, মারি বলল। নইলে যখন তখন খুলে যেতে পারে।
রাশেদ চাচা লকার রুমের বাইরে অপেক্ষা করছিলেন ওদের জন্য।
কীরে, কেমন কাটল তোদের বিকেলটা?
ভাল, জানাল মুসা। তবে আমার লাকি লকেটটা থাকলে আরও ভালভাবে স্কি করতে পারতাম।
ভাগ্যটাও হয়তো ভাল থাকত, বলল রবিন।
কিশোর চাচাকে মুসার জমাট বাঁধা স্কির কথা জানাল।
কপাল খারাপ, মন্তব্য করলেন চাচা।
আরেকটা সূত্র, বলল গোয়েন্দাপ্রধান। গেঁথে নিল মনে।
ওরা সবাই মিলে এরপর লজের পিছনের তুষারাবৃত মাঠটার উদ্দেশে এগোল। গিয়ে যখন পৌঁছল, জায়গাটা তখন লোকে লোকারণ্য।
তোরা মজা কর, বললেন চাচা। আমি সব মালপত্র জড় করে ঘরে নিয়ে যাই। একটু পরে দেখা হবে।
আচ্ছা, বলল কিশোর।
একটা তুষার কুকুর বানানো যাক, চাচা চলে গেলে প্রস্তাব করল রবিন।
রাফিয়ানের মত, সোৎসাহে সায় জানাল মুসা।
ভাল হচ্ছে না কিন্তু! মারির গলা ভেসে এল। পরমুহূর্তে তুষারের একটা বল ছুঁড়ে দিল ও ভাইকে লক্ষ্য করে।
কিম আর জিম তুষারমানব বানাচ্ছিল। ওটার আড়ালে ঝট করে বসে পড়ল উডি।
ফলে, মারির ছোঁড়া বলটা যমজদের তুষারমানবের মাথার খানিকটা অংশ ভেঙে দিল।
সরি,বলল মারি।
নো প্রবলেম, বলল যমজদের একজন।
জিম আর আমি একটা তুষারানো বানাচ্ছি। একটা মাত্র চোখ থাকবে ওটার।

আর লম্বা একটা নাক, জিম বলল। দানোটার নাকের জায়গায় একটা কাঠি গুঁজে দিল ও।
উডি আরেকটা তুষারের বল ছুঁড়ে মারল মারির উদ্দেশে। লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো।
উফ! বলে উঠল এইমাত্র পার্টিতে যোগ দেওয়া বিল। কোট থেকে ঝেড়ে ফেলল তুষার। আমি এসব ফালতু খেলার মধ্যে নেই! চলে গেল গট গট করে।
বিল বেচারার সময়টা একেবারেই ভাল কাটছে না, মনে মনে বলল কিশোর।
তুষার কুকুরের দেহ তৈরির জন্য একটা বল পাকাল ও।
দানোটার নাক ফুল, কিশোরের কানে এল যমজদের একজনের কণ্ঠ। চোখ তুলে চাইল ও।
তুষারানোর নাকে কী একটা ঝুলিয়ে দিল এক ভাই।
চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল গোয়েন্দাপ্রধানের।
ওটা পেলে কোথায়? চেঁচিয়ে উঠল।
অ্যাই! মুসা চিৎকার ছেড়ে দৌড়ে গেল ওর লকেটটা কেড়ে নিতে।
কিন্তু তার আগেই কিম ওটা হাত করে ফেলেছে।
অ্যাই, জিম, ধর! ভাইয়ের উদ্দেশে ছুঁড়ে দিল।
জিম লুফে নিল ওটা।
তবে রে! মুসা ওর দিকে তেড়ে যেতে কিমের দিকে ছুঁড়ে দিল।
কিন্তু কিমের আগেই এক লাফে এগিয়ে এসে ওটা লুফে নিল উডি।
গুড ক্যাচ, উডি, বলল মুসা।
এসো, বেঁধে দিই, বলল উডি।
শক্ত করে বেঁধো। আবার যাতে পড়ে না যায়। রুপোলী লকেটটা স্পর্শ করে বলল মুসা। ওর হাসি কান পর্যন্ত গিয়ে ঠেকেছে।
উডি মুসাকে লকেটটা পরিয়ে দিচ্ছে, হেসে উঠল মারি।
উডি, স্লিপ নট দিয়ো না যেন।
যমজদের উদ্দেশে ঘুরে দাঁড়াল কিশোর।
তোমরা বলেছিলে মুসার লকেট দেখোনি।
ওটা ওরাই নিয়েছিল, গর্জে উঠল রবিন।
বিশ্বাস করো আমরা নিইনি, কিম ফ্যাকাসে মুখে জানাল। খুঁজে পেয়েছি।
লজের পাশে মাটিতে আঙুল তাক করল জিম।
তুষারে পড়ে ছিল, বলল।
কিশোর জিমের নির্দেশিত জায়গাটার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল। তুষারে অসংখ্য পদচিহ্ন। কে বলবে কার পায়ের ছাপ ওগুলো।
মুসার লকেট ওখানে গেল কীভাবে?

কেউ নিশ্চয়ই ফেলেছে। মুসার গলা থেকে খসে পড়েনি তো?
উডি আর মারি তুষারমানব বানাচ্ছে জায়গাটার কাছেই। যমজদের তুষারদানবটাও কাছাকাছি রয়েছে। আর একটু আগেই এ পথ মাড়িয়ে গেছে। বিল।
দীর্ঘশ্বাস ফেলল গোয়েন্দাপ্রধান। মুসার লকেট পাওয়া গেল। কিন্তু এর ফলে আরও জটিল হলো রহস্য।
সে রাতে, ডিনারের পর বাঙ্কে বসে সারা দিনের ঘটনাগুলো উল্টেপাল্টে ভেবে দেখল কিশোর।
কিশোরের বাঁ পাশে বসেছে রবিন।
আমার ধারণা, যমজ ভাইগুলো মুসার স্কি সরিয়েছে।
কিশোরের ডান দিকে মুসা বসা।
যমজরা কাজটা করেনি, বলল। ওরা মাউন্টেনটপ কাফেতে লাঞ্চ করতে গিয়েছিল।
হয়তো বেরিয়ে যাওয়ার সময় কাজটা করেছে, রবিন নাছোড়বান্দার মত বলল।
মাথা নাড়ল কিশোর।
ওরা মার সাথে ছিল।
ঠিক আছে, বলল রবিন। ধরে নিলাম স্কি সরায়নি। কিন্তু কোনভাবে লকেটটা হাতানো ওদের পক্ষে অসম্ভব কিছু না। মনে নেই বারবার আমার হ্যাট কেড়ে নিচ্ছিল?
হতে পারে, আস্তে করে বলল কিশোর। কিন্তু মোট তিনটে দুর্ভাগ্যের শিকার হয়েছে মুসা। আমি শিয়োর, কাজটা একজনের।
কাজেই যমজদের নাম বাদ দেয়া যায়, বলল ও। কিম আর জিম তো একজন হতে পারে না।
তোমার সন্দেহ তালিকায় তো উডি, মারি আর বিলের নাম আছে, বলল মুসা। আমাকে যখন ধাক্কা দেয়া হয় তিনজনই আশপাশে ছিল।
নীচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর।
উডি আর মারি পরের ক্লাস শুরুর আগেই প্র্যাকটিস করতে চলে গিয়েছিল, বলল ও।
ওরা মুসার স্কি সরিয়ে থাকতে পারে, বাকিটুকু যোগ করল রবিন।
আমরা যখন বাইরে বেরোই, বিল ক্লাস শুরুর জন্যে অপেক্ষা করছিল, স্মৃতি হাতড়ে বলল গোয়েন্দাপ্রধান। ও-ও আগেই বেরিয়ে এসে কাজটা সারতে পারে।
সন্দেহ তালিকার নামগুলো একে একে মনে করল কিশোর।

মারি বানি ক্লাসে থাকতে চায়নি। ও কি মুসার স্কি সরিয়েছে? জ্যাকর্যাবিট ক্লাসে ঢুকবার জন্য ও-ই কি মুসাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল?
হতে পারে, ভাবল কিশোর। কাজটা উডিও করে থাকতে পারে। কেন? ভাইকে সাহায্য করবার জন্য।
কিন্তু বিল তোমার স্কি সরাতে যাবে কেন, মুসা? প্রশ্ন করল কিশোর।
কে জানে, বলল মুসা। হয়তো ওর স্কিইং পছন্দ নয় বলে চায় না অন্য কেউ এনজয় করুক।
দীর্ঘশ্বাস ফেলল কিশোর। এখন আর ভাবনা-চিন্তা করতে ভাল লাগছে। না।
এখনও রহস্যটার সমাধান করতে পারলাম না, হতাশ কণ্ঠে বলল।
মুসা ওর লকেটটা স্পর্শ করল।
কিন্তু আমার লকেটটা তো খুঁজে পেয়েছ, বলল ও। অন্তত আমার দুর্ভাগ্যের অবসান হবে।
তাই যেন হয়, বলল গোয়েন্দাপ্রধান। কিন্তু মনের গভীরে কু-ডাক ডাকছে ওর কপালে আরও দুর্ভোগ আছে ওদের।

.

স্কি লিফট চেয়ারের এক কোনা দিয়ে পা ঝুলিয়ে বসে আছে রবিন। চট করে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল ও।
বাপরে! অনেক নিচু!
বানি ক্লাস সারা সকাল প্র্যাকটিস করেছে। স্কি লিফটে এই প্রথম চড়বার সুযোগ পেয়েছে ওরা।
এটা অতটা খারাপ লাগছে না, বিল মারিকে বলছে, শুনতে পেল কিশোর। ওদের পিছনের চেয়ারে রয়েছে ওরা।
তেমন ভাল লাগারই বা কী আছে, দ্বিমত প্রকাশ করল মারি। স্রেফ একটা চেয়ার লিফট বই তো নয়।
মারি কোন কিছুতেই খুশি হওয়া যাবে না ভেবে নিয়ে গোঁ ধরে বসে আছে, মনে মনে বলল গোয়েন্দাপ্রধান।
চূড়ায় পৌঁছে, সেফটি বার তুলে দিল কিশোর ও রবিন। স্কি পায়ে সিধে উঠে দাঁড়িয়ে হড়কে নেমে এল লিফট থেকে। জুলিয়ার পাশে গিয়ে থেমে দাঁড়াল।
সবাই রেডি তোমরা? গোটা ক্লাস হাজির হলে বললেন জুলিয়া। গুড। এসো, স্কি করা যাক!
উম, আমি কি হেঁটে নামতে পারব? রবিন প্রশ্ন করল।
নিশ্চয়ই পারবে, বলল কিশোর।
স্কি ক্রস হয়ে না গেলেই হলো, বাতলে দিল বিল।

মারি ঠেলেঠুলে লাইনের সামনে চলে এল।
আমি আগে। আমি চাই না কেউ আমার সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়ুক আর আমাকেও পড়তে বাধ্য করুক।
শ্রাগ করলেন জুলিয়া।
বেশ তো, যাও।
হাসি ফুটল ওর মুখে। পোলে চাপ দিয়ে ঢাল বেয়ে নামতে লাগল।
কিশোরের পালা এলে, বুক ভরে শ্বাস টানল ও। তারপর নামতে শুরু করল।
অসম্ভব দ্রুত গতিতে নেমে যাচ্ছে ও! মুহূর্তের জন্য ভড়কে গেল। কিন্তু এই ছুটিতে অনেক কিছু শিখেছে। গতি ধীর করে আনতে পেরে মনটা খুশি হয়ে উঠল ওর।
বিকেলের বাকি সময়টুকু ঢাল বেয়ে নামা অনুশীলন করল ওরা।
তোমরা সবাই খুব ভাল করেছ, ক্লাস শেষে প্রশংসা করলেন জুলিয়া। কাল সকালে স্কিইং প্রতিযোগিতা আছে। তারপর মাউন্টেনটপ কাফেতে পুরস্কার বিতরণী।
আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, টিচার, হাসি মুখে বলল কিশোর। সময়টা দারুণ এনজয় করেছি।
হ্যাঁ, সুর মেলাল বিল। যতটা খারাপ লাগবে ভেবেছিলাম স্কিইং ততটা খারাপ না।
হাসি ফুটল জুলিয়ার মুখে।
শুনে খুশি হলাম। পুকুরের ধারে আজ রাতে দেখা হবে, স্কেটিং পার্টিতে। আঙুল তুলে দূরে পুকুরটা নির্দেশ করলেন। গুড লাক টুমরো!
মারি তুষারে পোল দাবিয়ে রওনা হলো।
আমার ভাগ্যের প্রয়োজন নেই, কাঁধের উপর দিয়ে বলল। কারণ আমি জিততে চলেছি। তোমরা সব হারু পাট্টি।

.

সে রাতে ছেলেরা স্কেটিং পার্টিতে পৌঁছবার পর, মুসা ঝটপট স্কেট পরে নিয়ে আইস হকি খেলতে গেল।
কিন্তু স্কেটের ফিতে লাগাতে অনেক সময় নিয়ে নিল কিশোর আর রবিন।
কিশোর লক্ষ করল, একাকী এক খাবারের টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে মারি। ড্রিঙ্ক আর স্ন্যাকস দেখা যাচ্ছে টেবিলের উপর।
এক কাজ করা যাক, ফিসফিস করে বলল কিশোর। মারির জন্যে একটা। ফাঁদ পাতি।
কীভাবে? রবিন জানতে চাইল।
ও যদি মুসার স্কি সরিয়ে থাকে, তবে ও দুটো দেখতে কেমন ও জানে, ঠিক না?
মাথা ঝাঁকাল রবিন।

সটান উঠে দাঁড়াল কিশোর।
এসো। আমার মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে।
মারির উদ্দেশে স্কেট করে এগোল ও।
কী প্ল্যান? নিচু গলায় জবাব চাইল রবিন, বন্ধুর নাগাল পেতে চেষ্টা করছে। কী করব আমরা?
স্রেফ আমার সাথে তাল দিয়ে যেয়ো, ফিসফিসিয়ে জানাল কিশোর। টেবিলের পাশে এসে থেমে দাঁড়াল। হাই, মারি!
মারি সবে মাত্র এক কাপ হট কোকো শেষ করেছে।
ও, তোমরা? ভালই হলো। আমি একা-একা বোর হচ্ছিলাম। উডি আইস হকি খেলতে গেছে। এসো, আমরা স্কেট করি।
অ্যাই, মারি, বলল কিশোর, রবিন স্কি কিনতে চাইছে। ওরা তিনজন পুকুরটাকে ঘিরে ধীরে ধীরে চক্কর কাটছে।
আমি? সবিস্ময়ে বলে উঠল রবিন। পরক্ষণে কিশোরের কনুই খেয়ে বলল, হ্যাঁ, চাইছিই তো।
মুসা প্রথমে যেরকম ভাড়া করেছিল তেমনি স্কি ওর পছন্দ, বলে চলল কিশোর। ও দুটো ভাল ছিল। তোমার কী মনে হয়?
শ্রাগ করল মারি।
হতে পারে। আমি সেভাবে লক্ষ করিনি।
মারির মুখের চেহারার অভিব্যক্তি খুঁটিয়ে পরখ করল কিশোর। মিথ্যে বলছে বলে মনে হলো না।
বুদ্ধিটা কাজে দিল না। অন্য কিছু চেষ্টা করে দেখতে হবে, সিদ্ধান্ত নিল গোয়েন্দাপ্রধান।
তোমার কি এখনও জ্যাকর্যাবিট ক্লাসে যাওয়ার ইচ্ছা? প্রশ্ন করল। হেসে উঠল মারি।
কী বোকামিটাই না করছিলাম, বলল। উডির ক্লাসে গেলে আমাকে ওর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে হবে। ও আমার চাইতে অনেক ভাল স্কি করে। এখন ওর ক্লাসে ও সেরা আর আমার ক্লাসে আমি। দুজনই জিতব।
অন্য কেউও তো জিততে পারে, বলল রবিন। তুমি অত নিশ্চিত হচ্ছ কী করে?
আবার হেসে উঠল মারি।
এখন তুমি বোকামি করছ, বলল।
মারি! উডির গলা শোনা গেল। চলে এসো। জিততে হলে আমাদের আরেকজন প্লেয়ার চাই।

আসছি, চেঁচিয়ে বলল মারি। পরে দেখা হবে, কিশোর আর রবিনের উদ্দেশে বলে চলে গেল।
রবিন জ্বলন্ত চোখে ওর গমনপথের দিকে চেয়ে রইল।
ও নিজেকে বিরাট কিছু একটা ভাবে, বলল।
হ্যাঁ, বলল কিশোর। ও এখনও আমাদের সন্দেহভাজন-যদিও ফাঁদটা কাজ করল না।

.

পরদিন সকালে নাস্তার পর, রাশেদ চাচার সঙ্গে তিন গোয়েন্দা স্কি লজের উদ্দেশে হাঁটা ধরল। প্রতিযোগিতার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে ছেলেরা।
সামনের ধাপগুলোর কাছে মাত্র এসে পৌঁছেছে, এমনিসময় ছুটতে ছুটতে আসতে দেখল মারিকে।
হাই, হাঁপাতে হাঁপাতে বলল। আগের জায়গায় না, আজকে আমাদেরকে পুকুর পাড়ে জড় হতে বলেছে। কথা কটা বলেই দৌড়ে চলে গেল।
তাড়াতাড়ি চলো, তাগাদা দিল মুসা। পুকুরটা কম দূর না।
ভাল দেখে একটা জায়গা বেছে ফেলি, সোৎসাহে বললেন রাশেদ চাচা। প্রতিযোগিতা দেখবার জন্য মুখিয়ে আছেন। গুড লাক, বয়েজ!
তিন গোয়েন্দা স্কি বুট পরে নিল। পুকুরের দিকে স্কি করে যথাসম্ভব দ্রুত রওনা দিল ওরা।
লোকজন সব গেল কোথায়, ওখানে পৌঁছে বলল মুসা।
এক মহিলা যন্ত্রপাতি রাখবার শেডের পাশে বসে। স্নোমোবাইল পালিশ করছে।
তোমরা কি পথ হারিয়েছ নাকি, বাছারা?
স্কেটিং প্রতিযোগিতা তো এখানেই হবে, তাই না? কিশোর জানতে চাইল।
মাথা নাড়ল মহিলা।
না, ওদিকে। বিগিনার্স স্লোপের নীচের দিকে আঙুল, নির্দেশ করল সে। এখুনি মনে হয় শুরু হয়ে যাবে।
ধক করে জ্বলে উঠল মুসার চোখজোড়া।
দাঁড়াও, আগে ওই মারি শয়তানটাকে বাগে পেয়ে নিই, দেখাব মজা!
দৌড় দাও, তুরিত বলে উঠল কিশোর। এখনও হয়তো সময় আছে।
স্কি বুট পরে দৌড়ব কীভাবে! আর্তস্বর ফুটল রবিনের কণ্ঠে। সময়মত কিছুতেই পৌঁছতে পারব না। কোন আশা নেই!
মনে হচ্ছে কেউ তোমাদেরকে ভুল ইনফর্মেশন দিয়েছে, বলল মহিলা। এক কাজ করো, আমার স্নোমোবাইলে উঠে পড়ো। আমি পৌঁছে দিচ্ছি।

তিন গোয়েন্দা ওদের স্কি রেখে দিল স্নোমোবাইলের পিছনে, স্লেডের ভিতর। তারপর উঠে বসল স্নোমোবাইলে। একটু পরেই ঢালের উদ্দেশে সা-সঁ করে ছুটে চলল।

থ্যাংকস, স্নোমোবাইল থেমে পড়লে মহিলাকে আন্তরিকভাবে বলল কিশোর।

এক লাফে নেমে পড়ে, ছোঁ মেরে খুলে নিল স্কিজোড়া। ছুটল জুলিয়া টিচারের কাছে। রবিন ওর পায়ে পায়ে ছুটছে।

মুসা ওদের পাশ কাটিয়ে লিফটের উদ্দেশে ধেয়ে গেল। জ্যাকর্যাবিট ক্লাসের বাদবাকিরা ইতোমধ্যে শূন্যে উঠে পড়েছে।

তোমরা দেরি করে ফেলেছ, কুঁচকে বললেন জুলিয়া।

আমাদের দোষ নেই, সাফাই দিল রবিন। একজন আমাদেরকে পুকুরের দিকে পাঠিয়ে দিয়েছিল। তীব্র চোখে মারির দিকে চাইল ও। কিন্তু মারি চোখে চোখ ফেলল না।

টিচার, মৃদু কণ্ঠে বলল কিশোর। আপনার সাথে একটু কথা ছিল। আমার সাথে? বলো না।

জুলিয়া টিচারকে এক পাশে নিয়ে গেল কিশোর। মিনিট খানেক দুজনের মধ্যে কী কথা-বার্তা হলো কেউ জানতে পারল না।

কথা সেরে ফিরে এসে স্কি পরে নিল কিশোর। রবিন ইতোমধ্যে তৈরি হয়ে গেছে। এবার স্কি লিফটে চড়ল ওরা।

ডায় যখন উঠে আসছে, মুসাকে দেখতে পেল তীব্র গতিতে নেমে যাচ্ছে স্কি পায়ে। কিশোরের মনে হলো, চমৎকার স্কি করছে ওর বন্ধু।

মুহূর্ত পরে নেমে এল উডি, সে-ও কম যায় না। ওর মান ভিডিওতে দেখা স্কিয়ারদের কাছাকাছি প্রায়।

অবশেষে চুড়োয় এসে পৌঁছল ওরা। এবার বানি ক্লাসের প্রতিযোগিতার পালা।

বিল ঢালের মাঝামাঝি জায়গায় গিয়ে পড়ে গেল। বাকি পথটুকু পিছলে নেমে গেল। কিন্তু উঠে দাঁড়ালে দেখা গেল দাঁত বের করে হাসছে।

এবার মারি তুষারে স্কি পোল দুটো গেঁথে জোরে চাপ দিল–এতটাই জোরে যে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল স্কির সামনে! উঠে দাঁড়িয়ে ঠেলা দিল আবার। এবার আর কোন সমস্যা হলো না।

ছেলেটার সাহস আছে, তারিফ করল কিশোর। পড়ে গেছে বলে ঘাবড়ায়নি।

ওর পেট ভর্তি হিংসে, হিসিয়ে উঠল রবিন। কী কাজটা করল আমাদের সাথে!

আচ্ছা, কিশোর, জুলিয়া টিচারের সাথে তোমার কী কথা হলো?

মুচকি হাসল কিশোর।

সময় মত সবই জানতে পারবে।

এরপর কিশোর। বুক ভরে শ্বাস টেনে রওনা হলো ও দমকা বাতাস পাশ কাটাচ্ছে। এঁকেবেঁকে তুষারাবৃত ট্রেইল ধরে নেমে আসছে সে।
দারুণ দেখিয়েছ! নীচে পৌঁছবার পর সপ্রশংস কণ্ঠে বলল মুসা।
থ্যাংকস, বলল কিশোর। তুমিও খুব ভাল করেছ।
লোকজন হাততালি দিচ্ছে, সেদিকে চাইল কিশোর। রাশেদ চাচা হাসি মুখে হাত নাড়ছেন ওর উদ্দেশে।
রবিনও নেমে এল খানিক বাদে। গতি ধীর, তবে একবারও পড়েনি ও।
চিৎকার করে ওকে উৎসাহ জোগাল কিশোর আর মুসা।

.

আমি জানতাম কাজটা মারির! লাঞ্চ টেবিলে বলল রবিন। আরেকটু হলেই কনটেস্ট মিস করতাম আমরা। এতেই সব প্রমাণ হয়!
কিশোর ওর সন্দেহ তালিকা থেকে বিলের নাম মুছে দিল। ছেলেটি স্কিইং পছন্দ করতে শুরু করেছে, কাজেই সে এখন আর সন্দেহভাজন নয়।
বাকি রইল শুধু উডি আর মারি। মারি যেহেতু ওদেরকে মিথ্যে কথা। বলেছে, তার মনে সে-ই অপরাধী।
নীচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। কিছু একটা মাথায় আসি-আসি করেও আসছে না। বড় অস্থিরতা বোধ হচ্ছে ওর।
বিকেলে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে যখন যাচ্ছে তিন গোয়েন্দা, তখনও কিশোরের মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে রহস্যটার চিন্তা।
ও কেন করল এরকম? গন্ডোলা লিফটের দিকে পা বাড়িয়ে বিড়বিড় করে আওড়াল গোয়েন্দাপ্রধান।
কার কথা বলছ? মুসা জিজ্ঞেস করল।
আমাদের ধারণা ছিল এসব কিছুই মারি করেছে, কারণ সে জ্যাকব্যাবিট ক্লাসে যেতে চেয়েছে, জানাল কিশোর। তারপর তো ঠিক করল যাবে না। তা হলে তোমার সাথে এসব করে ওর কী লাভ? কোন অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না। অবশ্য…
মুসা ওর লকেটের ভেলভেট রিবনটা নাড়াচাড়া করছে। পড়ন্ত বিকেলের আলোয় ঝিকিয়ে উঠল রুপোলী স্কি দুটো। ব্যাপারটা দৃষ্টি কেড়ে নিল কিশোরের।
ঠিক এ সময় ওর মনে পড়ে গেল উডি কীভাবে স্লিপনট বাঁধতে হয়। জানে। এবং মুসাকে লকেট পরাবার সময় মারি ঠাট্টা করে ভাইকে বলেছিল, স্লিপনট যেন না বাঁধে।
মনে পড়েছে! বলে উঠল কিশোর। গন্ডোলা লাইনটা এক ঝলক দেখে নিল। তারপর বন্ধুদের হাত ধরে হন্তদন্ত হয়ে পা চালাল।

ভিড় ঠেলে এসে দাঁড়াল উডি আর মারি ওদের বাবা-মার সঙ্গে যেখানে দাঁড়িয়ে। পরের গন্ডোলা এলে উড়িদের পিছনে বন্ধুদের ঠেলে তুলে দিল ও। নিজেও উঠে পড়ল। ভরে গেছে গন্ডোলা।

আপনারা পরেরটায় আসুন, উডির বাবা-মাকে উদ্দেশ্য করে বলল গন্ডোলা অপারেটর।

পাহাড়ের গা ঘেঁষে ক্রমেই উঠে চলেছে গন্ডোলা। কিশোর উডি আর মারির মুখোমুখি হলো।

উডি, আমি জানি মুসার পেছনে যে লেগেছিল সে আর কেউ নয়, তুমি।

উডি শ্রাগ করে জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে রইল।

তুমি কী বলছ আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

মারির দিকে দৃষ্টি স্থির করল গোয়েন্দাপ্রধান।

উডি তোমাকে পাঠিয়েছিল, তাই না, আমাদেরকে পুকুরের পাড়ে যেতে বলার জন্য?

উডির দিকে এক নজর চাইল মারি।

না, বলল। আমি ভেবেছিলাম ওখানেই প্রতিযোগিতাটা হবে।

কিশোর অত সহজে ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নয়। মারির কাছ ঘেঁষে বসল ও।

উডিই তোমাকে বলেছে মিথ্যে খবরটা দিতে। আমাদের কাছে গোপন করে লাভ নেই, মারি। আমরা সবই জেনে গেছি। মুসার লাকি লকেটটা উডিই চুরি করেছে। আর পাহাড়ের ঢালে মুসাকে ও-ই ধাক্কা দিয়েছে।

কোন প্রমাণ আছে? বিস্ফোরিত হলো উড়ি। তোমার কেন মনে হলো। ওর পচা লকেটটা আমি নিয়েছি?

স্লিপনটার জন্য, ঠাণ্ডা গলায় বলল গোয়েন্দাপ্রধান। মুসার লকেটে স্লিপনট ব্যবহার করোনি তুমি?

মুহূর্তের জন্য মনে হলো উডি বুঝি অস্বীকার করবে। কিন্তু ভাইয়ের দিকে এক পলক চেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

হ্যাঁ, শান্ত কণ্ঠে বলল। খুব ঢিলে করে স্লিপনট বেঁধেছিলাম যাতে লকেটটা খুলে পড়ে যায়। মুসা লজের বাইরে যেতেই ওটা তুষারের উপর পড়ে যায়। ও টেরও পায়নি।

তারপর যমজরা ওটা খুঁজে পায়, বলল কিশোর।

মাথা ঝাঁকাল উডি।

অন্য অকাজগুলোও আমার। মারির কোন দোষ নেই।

কিন্তু কেন করতে গেলে এসব? মুসা কৈফিয়ত দাবি করল।

জবাবটা আমি দিচ্ছি, বলল কিশোর। তোমার আত্মবিশ্বাস নষ্ট করবার জন্যে। গত বছরের প্রতিযোগিতায় স্কি করতে গিয়ে উডি পড়ে যায়, এমনকী ফিনিশও করতে পারেনি। সবাই ওকে নিয়ে হাসাহাসি করে। এবার তাই ও মরিয়া হয়ে ওঠে জেতার জন্য। ওর ধারণা হয় লকেটটা পরা থাকলে মুসার সাথে ও পারবে না। ঠিক বলেছি?

মাথা নিচু করে বসে রইল উড়ি।

আমি চাইনি মুসা লাকি লকেটটার জন্যে বাড়তি কোন সুবিধা পাক, স্বীকার করল ও। কেউ খেলে জিতলে আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু, কিশোর, তুমি গত বছরের এতসব কথা জানলে কীভাবে?

জুলিয়া টিচার, মুচকি হেসে বলল গোয়েন্দাপ্রধান।

গন্ডোলা এ সময় চূড়ায় পৌঁছে ঝাঁকুনি খেয়ে থেমে গেল। উডি লাফিয়ে নেমে ঝেড়ে দিল দৌড়।

মারিও নেমে পড়ল।

আমি দুঃখিত, বলে সে-ও ভাইয়ের পিছন পিছন ছুটল।

.

মাউন্টেনটপ ক্যাফেতে এখন উত্তেজিত গুঞ্জনধ্বনি। বানি ক্লাসের পুরস্কার বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করলেন জুলিয়া।

রবিন জিতল সবচাইতে স্টাইলিশ স্কি প্রতিযোগীর পুরস্কার। বিল জিতে নিল মানসিকতা পরিবর্তনের জন্য সেরা পুরস্কার।

মারিকেও পুরস্কার দেওয়া হলো-বীরত্বের স্বীকৃতি। পড়ে যাওয়ার পরও ফিনিশ করেছে সে।

সব শেষে, যে পুরস্কারটার জন্য সবাই উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছ, ঘোষণা করলেন জুলিয়া।

সব দিক বিবেচনার পর বানি গ্রুপের সেরা স্কিয়ার নির্বাচন করা হয়েছে, বলে একটু বিরতি নিলেন টিচার, সবাই উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করছে। কিশোর পাশাকে।

হাসি মুখে জুলিয়া টিচারের হাত ঝাঁকিয়ে দিল কিশোর।

ক্লাসের সবাই কোন না কোন পুরস্কার পেয়েছে। কেউ হারেনি।

এবার জ্যাকর্যাবিট ক্লাসের বিজয়ীর নাম ঘোষণা করা হবে। শ্বাস বন্ধ হওয়ার জোগাড় হলো কিশোরের।

সবাই তোমরা কঠোর পরিশ্রম করেছ, বললেন ভিক্টর। তবে সবচেয়ে প্রতিশ্রুতিবান খেলোয়াড় হিসেবে বিচারকমণ্ডলী বেছে নিয়েছেন মুসা আমানকে।

খাইছে! কান অবধি হাসি পৌঁছল মুসার। পুরস্কার নিতে গেল হাসতে হাসতে।

কিম আর জিম পেল সবচেয়ে দ্রুতগামী যমজ স্কিয়ারের পুরস্কার। ছুটে গিয়ে পুরস্কার নিয়ে আবার ছুটতে ছুটতে ফিরে এল ওরা।
এবং বিচারকদের বিবেচনায় সেরা স্কিয়ারের পুরস্কার পাচ্ছে, বললেন ভিক্টর। উডি বোর্ডার।
উডির নাম ঘোষণা করা হলে হাততালি দিল কিশোর। কিন্তু মুখ গোমড়া। করে বসে রইল রবিন।
তিন গোয়েন্দার টেবিলের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল উডি, লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দিল মুসা।
কগ্রাচুলেশন্স, উডি!
উডির মুখের চেহারায় বিস্ময়ের অভিব্যক্তি।
সত্যি বলছ, মুসা?
নিশ্চয়ই, খোলা মনে বলল মুসা। তুমি ন্যায্যভাবেই কনটেস্ট জিতেছ। তুমিই এবারের সেরা খেলোয়াড়।
উষ্ণ ঝাঁকুনি দিল উডি মুসার হাত ধরে। তারপর গলা খাদে নামিয়ে বলল, আমি সত্যিই দুঃখিত, মুসা। আমাকে মাফ করে দিয়ো।
ঠিক আছে, ঠিক আছে, সহাস্যে বলল মুসা। আগামী বছর কিন্তু এমন কোরো না!
আর লজ্জা দিয়ো না, বলে পুরস্কার আনতে গেল উডি।
রবিনও এবার বন্ধুদের সঙ্গে যোগ দিল হাততালিতে।

ভলিউম ১০৪/২ – খাবারচোর – তিন গোয়েন্দা – শামসুদ্দীন নওয়াব – সেবা প্রকাশনী

কিশোর, মুসা আর রবিন বাঘাকে নিয়ে পিছন দিক দিয়ে বেরিয়ে এল। গেটের কাছে যখন ছিল ধূসরচুলো এক কিশোরকে দেখতে পায় ওরা। মুখে ফুটি-ফুটি দাগ। দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ও এখানে কী করছে? প্রশ্ন করল রবিন।

শশশ, বলল কিশোর। ছেলেটার নাম জিম কেলি। কিশোরদের পাড়ায় থাকে। ফিফথ গ্রেডে পড়ে-তিন গোয়েন্দার চাইতে এক ক্লাস উপরে।

তোমার কুকুর আছে, আমার নেই, জিম বলল কিশোরকে। ওর কণ্ঠে বেদনা আর ঈর্ষার মিশ্র অনুভূতি। ওকে একটু আদর করতে দেবে?

নিশ্চয়ই।

আহা, আমার যদি একটা কুকুর থাকত তা হলে আর কিছুই চাইতাম না, বলল জিম।

একটা পুষলেই পারো, এত যখন পছন্দ, বলল মুসা।

মা রাজি নয়, বলে বাঘার গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করল জিম। ওকে কটা খেলা শেখাতে পারি? উঠে দাঁড়িয়েছে।

এখন নয়, কিশোর জবাব দেওয়ার আগেই বলে বসল রবিন। আমরা এখন ওর সাথে খেলব।

তা ছাড়া এত ছোট বয়সে খেলা শিখতে পারবে কিনা সন্দেহ, বলল কিশোর। কদিন পরে এসো, কেমন?...চকোলেট খাবে? জিমকে জিজ্ঞেস করে বন্ধুদের মধ্যে চকোলেট বিলি করল ও।

না, চকোলেটে আমার অ্যালার্জি আছে, বলল জিম।

তুমি তা হলে পরে এসো, বলল রবিন।

ঘাড় কাত করে সায় জানাল জিম। ধীর পায়ে চলে গেল।

ঘুরে দাঁড়াল কিলোর।

বাঘা কোথায়? জিজ্ঞেস করল। সিঁড়ির তলা থেকে বাঘা সহসা দৌড়ে এল ওর দিকে।

ব্যাকইয়ার্ডে বাঘাকে নিয়ে এল তিন বন্ধু। পরের আধঘণ্টা ওর সঙ্গে খেলা করল ওরা। একটা কাঠি চিবাল বাঘা। গোল হয়ে চক্কর কেটে দৌড়ে বেড়াল।

এবার কুকুরছানাটকে কোলে তুলে নিল কিশোর।

কিশোর! ড্রাইভওয়ে থেকে এসময় শাণিত এক কণ্ঠ ভেসে এল।

কিশোর মুখ তুলে চেয়ে দেখে মেরি চাচী কোমরে দুহাত রেখে, দাঁড়িয়ে। ভ্রূ কুঁচকানো।

তোরা কি মাফিনগুলো খেয়েছিস? জানতে চাইল।
তো, মাথা নেড়ে বলল কিশোর।
সত্যি করে বল, রেগে গেছে মেরি চাচী।
আমরা খাইনি, জানাল রবিন।
তা হলে কে খেল? প্রশ্ন করল মেরি চাচী। তিনটে মাফিন নেই!
মুখ লাল হয়ে গেল কিশোরের। চাচী কি খাবার চুরির দায় চাপাচ্ছে ওর উপরে?
আমরা ওগুলো খাইনি, বলতে গিয়ে প্রায় ককিয়ে উঠল কিশোর।
কেউ একজন নিয়েছে, বলল চাচী। বাঘা নিলেও আমি অবাক হব না।
না, জোর গলায় জানাল কিশোর। ও সারাক্ষণ আমাদের সাথেই ছিল।
খাইছে, কিন্তু ও তো একবার পালিয়ে গিয়ে সিঁড়ির তলায় লুকিয়ে ছিল, মনে নেই? বলল মুসা।
দেখলি? ও দরজা ঠেলে ঢুকে মাফিনগুলো তো খেয়েছেই কাগজের কাপগুলোও রাখেনি, বলে উঠল মেরি চাচী।
না! চেঁচিয়ে উঠল কিশোর।
ছানাদেরকে সব সময় চোখে চোখে রাখতে হয়, মৃদু তিরস্কার করল মেরি চাচী। এখন ও হয়তো অসুস্থ হয়ে পড়বে। তোকে আগেই বলে দেয়া উচিত ছিল- চকোলেট কুকুরছানাদের জন্যে ভাল নয়।
ভিতরে শশব্যস্তে ঢুকে পড়ল মেরি চাচী।
মনটা খারাপ হয়ে গেল কিশোরের। মেরি চাচী প্রথমে তিন গোয়েন্দাকে দোষী ভাবল, তারপর অপরাধী ঠাওরাল বাঘাকে!
চাচীর মাফিন কে নিল খুঁজে বের করতে হবে, বলল কিশোর।
রহস্য পাওয়া গেছে। সুপার্ব! বলে উঠল মুসা।
এসো, আমরা কু খুঁজি, বলল কিশোর।
বাঘার লাল কলারে একটা লাল ফিতে বাঁধল ও। এবার বাঘাকে নিয়ে ড্রাইভওয়ে ধরে হনহনিয়ে কিচেনের দরজার উদ্দেশে এগোল। ওকে অনুসরণ করল মুসা আর রবিন। স্ক্রীন ডোরের কাছে হঠাত্র থমকে দাঁড়াল কিলোর।
খাইছে, কী ব্যাপার! আরও মাফিন খোয়া গেছে? মুসার প্রশ্ন।
না বলে তর্জনী তাক করল কিশোর। দেখো, কু। বাঘার ফিতেটা রবিনের হাতে দিল ও। এবার ঝুঁকে পড়ল ভাল করে দেখার জন্য। স্ক্রীন ডোরের কিনারে কিছু একটা আটকে রয়েছে।
কী ওটা? কাছিয়ে এল মুসা।
জুতোর ফিতে, বলল কিশোর। সূত্রটা দরজার কাঠামো থেকে খুলে তুলে ধরল। ফিতেটায় সাদা-কালো ডোরা। ছইঞ্চি লম্বা ফিতেটা ময়লা আর। ছেঁড়া।

হুম, এটা বোধহয় চোরের জুতোর, বলল কিশোর।
কী করে বুঝলে? রবিন জানতে চাইল।
কারণ আমার এ ধরনের কোন ফিতে নেই। চাচীরও নেই। এমনকী চাচারও, বলল কিশোর।
আচ্ছা, এটা জিমের নয় তো! প্রশ্ন করল মুসা। মাফিনগুলো হয়তো ও-ই নিয়েছে।
হতে পারে, বলল কিশোর। তবে আমার তা মনে হয় না। মনে নেই ও বলেছিল চকোলেটে ওর অ্যালার্জি আছে? মনে হয় না ও নিয়েছে।
কিচেনের চারধারে চকিতে নজর বুলিয়ে নিল কিশোর। ওখানে আর কোন সূত্র পেল না। তড়িঘড়ি বেরিয়ে এল বাইরে।
গুঁড়ো পাই কিনা খুঁজি এসো, বলল ও।
এই যে, একটা গুঁড়ো! চেঁচিয়ে উঠল মুসা। সাইডওয়কের দিকে ইশারা করল।
কোথায়? জিজ্ঞেস করল রবিন। বাঘার ফিতে চেপে দৌড়ে এল ড্রাইভওয়ে ধরে।
এসময় বাঘা জোরে টান দিল ফিতেয়। রবিনের হাত থেকে ছুটে দৌড়ে চলে এল কিশোরের কাছে। মাটি খুঁকে চাটতে লাগল গুঁড়ো।
খাইছে, ও কু সাবড়ে দিয়েছে, বলে উঠল মুসা।
রবিন, তোমার না ওকে ধরে থাকার কথা, বলল কিশোর। ধরছ না কেন?
কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। বাঘা কিশোরের পায়ের তলা দিয়ে তীরবেগে ছুটে চলে গেল।
ফিরে আয় বলছি! ডাক ছাড়ল কিশোর। বাঘার পিছু ধাওয়া করল।
কিন্তু কুকুরটা ব্লকের শেষ মাথায় দৌড়ে গিয়ে উধাও হয়ে গেল।
ফিরে আয়, বাঘা! দৌড়চ্ছে আর চেঁচাচ্ছে কিশোর।
মুসা আর রবিন পিছু পিছু ছুটল কিশোরের। ব্লকের শেষ মাথায় পৌঁছে থমকে দাঁড়াল ওরা। বাঘা নেই!
কোথায় গেছে দেখতে পেয়েছ? শ্বাসের ফাঁকে প্রশ্ন করল রবিন।
না, জানাল কিশোর। অদৃশ্য হয়ে গেছে।
সরি, আমার শক্ত করে ধরে রাখা উচিত ছিল,বলল রবিন।
ঠোঁট কামড়াল কিশোর। গেল কোথায় বাঘা?
আচমকা এসময় ওদের পাশে ঝোপের মধ্যে নড়াচড়ার শব্দ উঠল।
পরমুহূর্তে, ঝোপের ভিতর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল বাঘ।
কিশোর হাত বাড়াল ওর ফিতেটা ধরতে, কিন্তু ও কোনা ঘুরে আবারও দৌড়ে চলে গেল।
দাঁড়া! ফিরে আয় বলছি! চেঁচাল কিলোর। দৌড় দিল ও।

পিছু ধাওয়া করল মুসা আর রবিনও। মিসেস বার্বাটভের সামনের উঠন অবধি ওরা অনুসরণ করল বাঘাকে। বাড়ির সামনে এক ফ্লাওয়ার বেডের সামনে উবু হয়ে বসা মিসেস বার্বাটভ। ওঁর গোলাপি-হলুদ ফুলছাপা ব্লাউজটা চমৎকার মানিয়েছে বাগানের ফুলগুলোর সঙ্গে।
হোয়া? কী ব্যাপার? বাঘা দৌড়ে এসে তার গায়ে লাফাতে থাকলে অবাক কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন ভদ্রমহিলা।
ওকে একটু ধরুন। ও আমার কুকুর! চেঁচাল কিশোর।
ঝট করে বাঘার ফিতে ধরে ফেললেন মিসেস বার্বাটভ। কিশোর দৌড়ে এসে ফিতেটা চেপে ধরল শক্ত করে।
এভাবে আর পালাস না বকে দিল বাঘাকে।
হ্যালো, কিশোর, হাসি মুখে বললেন মিসেস বার্বাটভ। কুকুরটা খুব জ্বালাচ্ছে বুঝি?
আর বলবেন না, বলল কিশোর। খুব সমস্যা করছে।
কুকুরছানারা অমন করেই। তা কী ধরনের সমস্যা করছে? প্রশ্ন করলেন মিসেস বার্বাটভ।
খোয়া যাওয়া মাফিনগুলোর কথা বলল কিশোর। আরও জানাল চাচী বাঘাকে দায়ী করেছে।
বলো কী? আমার এখান থেকেও তো খাবার চুরি গেছে, বললেন ভদ্রমহিলা।
তাই নাকি? কখন? কিশোরের প্রশ্ন।
কালকে। গাড়ির বনেট থেকে কিছু সদাই খোয়া গেছে।
খাইছে, কী হয়েছিল? মুসা জিজ্ঞেস করল।
আমি পাঁচ ব্যাগ সদাই কিনেছিলাম, ব্যাখ্যা করলেন মিসেস বার্বাটভ। চার নম্বর ব্যাগটা বাসায় নিয়ে যাচ্ছি এসময় একটা ফোন আসে। পাঁচ মিনিটের মত ফোনে কথা বলি। ফিরে এসে দেখি পাঁচ নম্বর ব্যাগটা হাওয়া!
মনে হচ্ছে এলাকায় খাবারচোরের উৎপাত শুরু হয়েছে, বলল রবিন।
বলতে চাই না, কিন্তু আমি মনে হয় ধরতে পেরেছি কাজটা কার, বললেন মিসেস বার্বাটভ।
কার? সাগ্রহে প্রশ্ন করল কিশোর।
ঠোঁট কামড়ালেন মিসেস বার্বাটভ। ওঁর ভঙ্গি দেখে মনে হলো, না জেনে গুজব রটাতে চান না।
জর্জ বেস্ট, আমার ইয়ার্ডে কিছু কাজ করিয়েছি ওকে দিয়ে, শেষমেশ বললেন।
আমি চিনি লোকটাকে। আমরাও তাকে দিয়ে কয়েকবার কাজ করিয়েছি। অনেকেই করিয়েছে, বলল কিশোর।

হ্যাঁ, ও বিশ্বাসী লোক ছিল, কিন্তু ইদানীং সে হার্ডওয়্যার স্টোরের চাকরিটা হারিয়েছে। পকেটে হয়তো পয়সা নেই, তাই খিদের জ্বালা সইতে না পেরে চুরি শুরু করেছে, বললেন মিসেস বার্বাটভ।
কিন্তু আপনি তাকে গতকাল আশপাশে দেখেছেন? কিশোরের জিজ্ঞাসা।
হ্যাঁ, আমার লন মো করছিল। আমি মুদি দোকান থেকে ফেরার পরপরই চলে গেছে সে।
একই সময়ে অন্য আর কাউকে দেখেছেন?
মিসেস বার্বাটভ মাথা চুলকে কী যেন ভাবলেন।
হ্যাঁ, বললেন অবশেষে। ওই ছেলেটা, রয় হার্ভে।
জুলিয়ার ভাই? কৌতূহলী রবিন প্রশ্ন করল। জুলিয়া ফোর্থ গ্রেডে পড়ে। তবে অন্য স্কুলে।
হ্যাঁ, ও রাস্তায় স্কেট করছিল। আমি যখন মালপত্র নামাচ্ছিলাম।
ও কিন্তু বিশালদেহী ছেলে। রাগবি খেলে, বলল রবিন।
কিশোরের মনে পড়ল, জুলিয়া প্রায়ই বলে প্রচুর খায় ওর ভাই। ও-ই হয়তো পাড়ায় স্কেট করছে আর মানুষের খাবার চুরি করে বেড়াচ্ছে।
ওর স্কেটের ফিতের রং কী কে জানে, বলে উঠল কিশোর।
খেয়াল করিনি, তবে অন্য একটা কথা মনে পড়ে গেল, বললেন মিসেস বার্বাটভ।
কী? মুসার প্রশ্ন।
থাবার ছাপ। মোইং শেষে স্প্রিংকলার অন করে জর্জ। ফলে ঘাস ভেজা ছিল। ড্রাইভওয়েতে, আমার গাড়ির পাশে কুকুরের ভেজা পায়ের ছাপ দেখেছি।
ওটা বাঘার ছাপ নয়, বলল রবিন। ও গতকাল বাঁধাই ছিল।
ও আচ্ছা, বলে হেসে উঠলেন মিসেস বার্বাটভ।
হুম, মনে মনে বলল কিশোর। কুকুরের থাবার ছাপ একটা সূত্র। বাড়ি ফেরার জন্য অস্থির হয়ে উঠল ও। গোয়েন্দা নোটবইতে তথ্যগুলো টুকবে।
মিসেস বার্বাটভের কাছ থেকে বিদায় নিল ওরা। এবার মুসা আর রবিনকে বিদায় জানাল কিশোর। ওদের বাড়ি ফেরার সময় হয়েছে।
ফিতে শক্ত করে ধরে বাঘাকে হটিয়ে নিয়ে বাড়ি ফিরল কিশোর।
হঠাত্র প্রকাণ্ড এক ট্যান কুকুর বেরিয়ে এল এক গাছের আড়াল থেকে। কুকুরটা নোংরা, কলার নেই গলায়। দেখে মনে হলো বেওয়ারিশ। কিশোর চট করে চিনে ফেলল ওটাকে। পাড়ায় ছুটোছুটি করে বেড়াতে দেখেছে আগে। মা বাঘা ফিতেয় টান দিল কুকুরটার কাছে যাওয়ার জন্য। কিন্তু কিশোর তা হতে দিল না।
যাবি না, বাঘাকে শাসাল ও।
বড় কুকুরটাকে রাস্তা পেরোতে দেখে একটা চিন্তা এল ওর মাথায়।

অ্যাই, দাঁড়া।
কুকুরটা কানে তুলল না ওর কথা।
এই কুকুরটাই কি মিসেস বার্বাটভের গাড়ির কাছে থাবার ছাপ ফেলে এসেছে? এটাই কি খাবারচোর ?
উঁহু, সিদ্ধান্তে এল শেষমেশ। কুকুর বড় এক ব্যাগ ভর্তি সদাই বইবে কীভাবে?
হন্তদন্ত হয়ে বাড়ি ফিরে বাঘাকে পিছনের উঠনে রাখল ও।
এখানে থাক, বলল। আমি এখুনি, আসছি।
এক দৌড়ে বাড়ি ঢুকে নিজের কামরায় উঠে এল ও। ডেস্ক থেকে নীল নোটবইটা তুলে নিল। এক হাতে নোটবই আর অন্য হতে কলম নিয়ে তড়িঘড়ি নেমে এল নীচে।
কিন্তু স্ক্রীন ডোর ঠেলতেই চমকে উঠল ও।
পিছনের গেটের পাশে দাঁড়িয়ে জর্জ বেস্ট। ওর কোলে বাঘা!
বুক ধড়াস-ধড়াস করছে কিশোরের। বাঘার সঙ্গে কী করছে জর্জ বেস্ট?
গাঁট্টাগোঁট্টা, বয়স্ক লোকটার কাছে ছুটে গিয়ে তার বাহু চেপে ধরল। উদ্বিগ্ন কিশোর।
আমার কুকুরকে ছেড়ে দিন! চেঁচিয়ে উঠল।
আমি তো ওকে ব্যথা দিচ্ছি না, ভরাট স্বরে বলল লোকটা। এই একটু নেড়েচেড়ে দেখছি আর কী।
মোটা, পেশীবহুল হাত দিয়ে বাঘার গলী চুলকে দিচ্ছে সে। এবার, মাটিতে নামিয়ে দিল।
সুন্দর কুকুর! মৃদু হেসে বলল কিশোরকে।
আপনি এখানে কী করছেন? কিশোর জবাব চাইল।
তোমার চাচা আমাকে ইয়ার্ডে কিছু কাজ করতে বলেছেন। তোমার চাচী গ্যারেজে গেছেন আমার জন্য হোস আনতে।
খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জর্জের মুখের চেহারা পরখ করল কিশোর। দেখে মনে হলো না মিথ্যে বলছে। তবে সন্দেহ পুরোপুরি কাটল না ওর। প্রথমে মিসেস বার্বাটভের সদাই যখন চুরি গেল ও তখন ওখানে। আর এখন মাফিন খোয়া যাওয়ার দিনে কিশোরদের বাড়িতে!
চকিতে জর্জের জুতোর দিকে চাইল কিশোর-দেখে নিল ফিতে জোড়াও। ফিতে দুটো বাদামি, সাদা-কালো ডোরা কাটা নয়। কিচেনের দরজায় পাওয়া সূত্রটার সঙ্গে কোন মিল নেই।
তুমি ভয় পেয়ে গেছ নাকি? বলল জর্জ।
না, একটু চমকে গেছিলাম আরকী।

বাঘাকে পিছনে নিয়ে উঠন পেরোল ও। বসল এক গাছের তলায় গিয়ে। নোটবইটা উল্টে সাদা এক পাতা বের করল।
উপরে লিখল: হারানো মাফিন-রহস্য
নীচে লিখল:
সন্দেহভাজন
জর্জ বেস্ট, রয়হার্ভে, জিম কেলি।
এবার লিখল:
সূত্র ১. ছেঁড়া সাদা-কালো জুতোর ফিতে
সূত্র ২. খুঁড়ো, যেটা বাঘা সাবড়ে দিয়েছে
সূত্র ৩. মিসেস বার্বাটভের গাড়ির কাছে কুকুরের ভেজা পদচিহ্ন
জর্জের জুতোর ফিতে-বাদামি।
জিম-চকোলেটে অ্যালার্জি আছে।
রয়-প্রচুর খায়!
সন্দেহভাজনদেরকে আর সূত্রগুলো নিয়ে মাথা ঘামাতে চাইল। কিশোর। কিন্তু বাঘা তা হতে দিল না। বারবার কিশোরের কোলে চড়ে কান চেটে দিচ্ছে।
নাম বলছি, ধমকে বলল কিশোর।
এসময় গেটের কাছ থেকে হাঁক ছাড়ল মেরি চাচী।
কীরে, মাফিনগুলোর কী খবর? চোখের তারা নাচিয়ে প্রশ্ন করল।
জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাল কিশোর।
ও তোমার মাফিন চুরি করেনি!
হয়তো…হয়তো নয়, কিশোরকে জ্বালানোর জন্য বলল চাচী। কিন্তু ও যদি খেয়ে না থাকে তবে কে খেল?
সেটাই তো জানতে চাই আমি, মনে মনে বলল কিশোর।

.

পরদিন সকাল। বিছানা থেকে নেমে সোজা নীচে চলে এল কিশোর। আজ শনিবার।
গুড মর্নিং, কিশোর, কিচেনে কিশোরকে হন্তদন্ত হয়ে ঢুকতে দেখে বলল রাশেদ চাচা।
হাই, চাচা, বলল কিশোর।
কিচেনের ছোট কামরাটায় গিয়ে ঢুকল ও। ক্রেটের দরজার হুড়কো খুলে দিল। ব্ল্যাঙ্কেট থেকে লাফিয়ে পড়ল বাঘা। লেজ নাড়তে নাড়তে ছুটে এল।
বাঘাকে এক পাত্র পানি আর কিছু খাবার দিল কিশোর। এবার মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসল।

এসময় কিশোরের গাউনের বেল্ট ধরে জোরসে টান দিল বাঘা।
দেখো, ও পার্কে যেতে চায়! বলল কিশোর। আমিও।
নাস্তা খেয়ে তারপর যাবি, বলল রাশেদ চাচা।
নাস্তার পরে আর বাঘাকে নিয়ে পার্কে গেল না কিশোর। ব্লু জিন্স, টেনিস শু আর টিশার্ট পরে নিল। তারপর বাঘাকে নিয়ে বেড়া ঘেরা পিছনের উঠনে চলে এল। ও যখন পার্কে থাকবে, যত খুশি ছোটাছুটি করুক বাঘা।
পার্কে পৌঁছে ঘাসের বুকে হেঁটে বেড়াল ও, ড্যাণ্ডেলিয়ন তুলল। তারপর দৌড়ে চলে এল দোলনার কাছে।
দুলতে শুরু করেছে এসময় একজনকে দেখতে পেল-রয় হার্ভের মত দেখতে।
পিকনিক টেবিলগুলোর কাছে স্কেট করছে ও।
দোলনা থেকে লাফিয়ে নেমে টেবিলগুলোর কাছে শশব্যস্তে চলে এল কিশোর।
কাছিয়ে এলে দেখতে পেল বড়সড় এক, পরিবার তাদের সমস্ত খাবার সাজিয়েছে দুটো টেবিলে। তবে এখনও খাওয়ার পাট শুরু করেনি। ফ্রিসবি খেলছে।
এসময় রয় স্কেট করে চলে এল এক টেবিলের কাছে। চোখের পলকে প্লেট থেকে একটা কুকি ছোঁ মেরে তুলে নিল। মুখ হাঁ হয়ে গেল কিশোরের। ওটা একটা চ কালেট চিপ কুকি।
রয় এবার স্কেট করে চলে গেল দ্রুতগতিতে!
দাঁড়াও! ফিরে এসো! চিৎকার ছাড়ল কিলোর। কিন্তু থামল না রয়।
কিশোর ওর পিছু ধাওয়া করল। কাঁধের উপর দিয়ে কিশোরের দিকে চাইল রয়। ওর মুখে ধূর্ত হাসি দেখতে পেল কিশোর।
এবার কুকিটা মুখে চালান করে দিয়ে পার্ক থেকে বেরিয়ে গেল। মুহূর্তের মধ্যে চলে গেল দৃষ্টিসীমার আড়ালে।
পিকনিক টেবিলগুলোর দিকে ফিরে চাইল কিশোর। পরিবারটা ফিসবি খেলছে। একটা কুকি খোয়া গেছে বলে কারও কোন মাথা ব্যথা নেই।
কিশোর ঠিক করল বাড়ি ফিরবে। হাঁটছে, সাইডওয়কে একটা আঁচড়ানির শব্দ শুনতে পেল। ঘুরে দাঁড়াতেই দেখতে পেল বেওয়ারিশ ট্যান কুকুরটা দুলকিচালে ওর পিছে পিছে দৌড়চ্ছে। মনে হচ্ছে অনুসরণ করছে।
না, আসিস না, আমার কুকুর আছে, বলে উঠল কিশোর। কথাগুলো বলামাত্র কুকুরটা কিশোরের কাছে এসে ওর হাত উঁকল।
থাম, দৃঢ় কণ্ঠে বলল কিশোর। থাম।
এবার রাস্তা পেরোল ও। পিছু ফিরে চাইল। উল্টোদিকের সাইডওয়কে বসে কুকুরটা। মনে হলো থাম মানে বোঝে ওটা।

কুকুরটার থাকার জায়গা নেই, দুঃখজনক। দেখতে একটু রুক্ষ হলেও স্বভাব ভাল কুকুরটার।
হঠাই ভরাট এক কণ্ঠস্বর গমগম করে উঠল।
হাই, আবার দেখা হয়ে গেল।
কে? চারধারে নজর বুলিয়েও কাউকে দেখতে পেল না কিশোর।
এই যে এখানে, বলল কণ্ঠটি। মাথা নামাও। কিশোর মাথা নামিয়ে দেখতে পেল জর্জ বেস্টকে। এক প্রতিবেশীর ঝোপের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে। হাতে মোটা চামড়ার দস্তানা। গর্ত খুঁড়ছে।
ওহ, হাই, ভয় পেয়ে গেছিলাম। কী করছেন আপনি? কিশোর পিছে সরে প্রশ্ন করল। কিছু মাটিচাপা দিচ্ছেন নাকি?
না, আগাছা সাফ করছি। তবে সহজে উপড়ানো যাচ্ছে না এগুলোকে, হেসে বলল জর্জ।
হুম, ভাবল কিশোর, আজকে আজব এক দিন। প্রথমে রয় হার্ভের। সঙ্গে দেখা হলো। তারপর বেওয়ারিশ কুকুরটা ওকে অনুসরণ করতে শুরু করল। আর এখন ও যেখানে যাচ্ছে সেখানেই জর্জ বেস্টকে দেখতে পাচ্ছে।
সন্দেহভাজনরা আমাকে যেন অনুসরণ করছে, ভাবল ও।
ড্রাইভওয়েতে পৌঁছে, দৌড়তে দৌড়তে পিছনের উঠনে চলে এল কিশোর। কোলে তুলে নিল বাঘাকে।
.
সেদিন ডিনারের পর চাচার সঙ্গে হাঁটতে বেরোল কিশোর। জর্জ বেস্ট যে বাড়িটায় কাজ করছিল সেটা পেরিয়ে হাঁটতে লাগল ওরা।
আচ্ছা, চাচা, তুমি জর্জ বেস্টকে বিশ্বাস করো? প্রশ্ন করল কিশোর।
নিশ্চয়ই। কেন রে?
কারণ যখনই খাবার চুরি যায় সে আশপাশে থাকে, বলল কিশোর।
চাচাকে ও খুলে বলল কীভাবে সদাই চুরি যায় মিসেস বার্বাটভের বাড়ি থেকে। এবং মাফিনগুলো খোয়া যাওয়ার পরপরই জর্জ বেস্টকে দেখা গেছে ওদের বাড়িতে।
এতে কিছু প্রমাণ হয় না, বলল চাচা।
আমি জানি, কিন্তু–
ঠিক এ সময় রবি রেসের বাসার পিছন থেকে একটা শব্দ শোনা গেল। জর্জ এ বাড়িতেই আগাছা সাফ করছিল।
কিশোর জমে গেল। ভয় পেয়েছে। এবার আবারও শব্দটা শুনতে পেল।
কীসের শব্দ? জিজ্ঞেস করল ও।

জানি না, বলল রাশেদ চাচা। আর্তনাদের মত শোনাল!
চিৎকারটা রবি রেসের ব্যাকইয়ার্ড থেকে এসেছে, বলল রাশেদ চাচা। পিছনের গেটের উদ্দেশে ধেয়ে গেল ওরা।
হ্যাল্লো, রবি, গলা ছেড়ে বলল রাশেদ চাচা। সব ঠিক আছে। তো?
রবি রেস মুখ তুলে চাইলেন। হাতে ধরা স্পেটুলাটা নাড়লেন।
এবার ওদের সঙ্গে কথা বলতে গেটের কাছে হেঁটে এলেন।
হাই, পাশা। হাই, কিশোর, বললেন। বললে বিশ্বাস করবে না, কিন্তু কে যেন আমার পিকনিক টেবিল থেকে এইমাত্র চারটে হ্যামবার্গার চুরি করে নিয়ে গেছে!
তাই নাকি? প্রশ্ন করল কিশোর। চোখের তারা জ্বলে উঠল ওর। আবারও খাবার চুরি!
কীভাবে চুরি গেল? জিজ্ঞেস করল রাশেদ চাচা।
গ্রিলে হ্যামবার্গার করছিলাম। একটা প্লেটে চারটে বার্গার সাজিয়ে টেবিলে রাখি। তারপর বাড়ির ভিতরে যাই সালাদ আনতে। বেরিয়ে এসে দেখি হ্যামবার্গার হাওয়া, বললেন রবি রেস।
কোন বেওয়ারিশ কুকুর হয়তো খেয়ে নিয়েছে, রাশেদ চাচা বলল।
উঁহু, বলে স্পেটুলা দিয়ে নির্দেশ করলেন রবি। গোটা ইয়ার্ড ঘিরে বেড়া। গেটও বন্ধ ছিল। কুকুর এখানে ঢুকবে কীভাবে?
জর্জ বেস্টের ব্যাপারে… শুরু করল কিশোর।
কী? প্রশ্ন করলেন রবি।
আজকে তাকে আমি এখানে দেখেছি।
তা দেখতে পারো। ও কয়েক ঘণ্টা আগেই বাড়ি ফিরে গেছে, জানালেন রবি।
হেসে উঠল রাশেদ চাচা।
রহস্য বেশ জমাট বেঁধেছে দেখা যাচ্ছে। আমার ভাতিজা রহস্য ভালবাসে জানোই তো? ও হয়তো কালকের মধ্যেই রহস্যের সমাধান করে ফেলবে।
মৃদু হাসলেন রবি।
অত সময় কই? আজ রাতে ডিনার করতে হবে না?
ফিরতি পথে চুপ করে রইল কিশোর। চিন্তামগ্ন।
পেয়েছি! বাড়ি পৌঁছতেই বলে উঠল ও।
কী? চাচার জিজ্ঞাসা।
মিস্টার রবির পেছনের বাসাটা। ওখানে জুলিয়া থাকে, বলল কিশোর।
তো? তোর ধারণা জুলিয়া খাবারগুলো চুরি করেছে! চোখ টিপে বলল রাশেদ চাচা।
না, ওর বড় ভাই রয় হার্ভে। চলে গিয়ে দেখি রয় বাসায় আছে। কিনা।

এখন না, অনেক রাত হয়ে গেছে। যা করার কালকে করিস, বলল চাচা।

.

পরদিন ঝটপট নাস্তা করল কিশোর। তারপর পোশাক পাল্টে নিল।

তবে বাড়ি ত্যাগের আগে ডিটেকটিভ নোটবইটা খুলল। একটা তালিকা করল কেন রয় হার্ভেকে সন্দেহ করছে।

কিশোর লিখল:

১. সদাই চুরির দিনে মিসেস বার্বাটভের বাড়ির বাইরে দেখা গেছে। ওকে।

২. চকোলেট চিপ কুকি চুরি করেছে ও। এর মানে চকোলেট চিপ পছন্দ ওর। ও কি চকোলেট চিপ মাফিনও চুরি করেছে?

৩. ওর বাড়ি রবি রেসের বাড়ির ঠিক পিছনে।

এবার তড়িঘড়ি নীচে নেমে এল ও। বাঘার লাল কলারে লাল ফিতে বেঁধে দিল।

এত সকাল সকাল কই চললি? চাচী জিজ্ঞেস করল। কিশোর আর বাঘাকে কিচেন দরজার দিকে এগোতে দেখেছে।

জুলিয়াদের বাড়িতে। হারানো মাফিনের রহস্য এখনও ভেদ করতে পারিনি। তার সাথে যোগ হয়েছে এক ব্যাগ সদাই, চারটে বার্গার আর একটা চকোলেট চিপ কুকি।

ওহ, তোর বাঘা হয়তো চুরিগুলো করেনি, বলল চাচী।

অবশ্যই না। এত খাবার ও চুরি করবে কীভাবে?

ঠিকই বলেছিস। আমার আসলে ওকে দোষ দেওয়া ঠিক হয়নি।

বাদ দাও, হওয়ার হয়েছে, বলে দরজার দিকে পা চালাল কিশোর।

বাঘাকে নিয়ে বেরিয়ে এল ও। তাজা বাতাস আর ঝলমলে রোদ পেয়ে ফুর্তি ধরে না বাঘার। লেজ নাড়ছে আর কিশোরের পা চাটছে।

ওর কাণ্ড দেখে হেসে ফেলল কিশোর।

ওরা জুলিয়ার বাসার কাছে পৌঁছে সাইডওয়কে মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়ে রইল।

এবার মাথা নুইয়ে পা টিপে টিপে হার্ভেদের ব্যাকইয়ার্ডের উদ্দেশে এগোল কিশোর।

অ্যাই, তুমি এখানে কী করছ? পিছন থেকে একটি কণ্ঠস্বর বলে উঠল।

আঁতকে উঠল কিশোর। বাঘা ডাক ছাড়ল। ওদের পিছনে দাঁড়িয়ে জুলিয়া।

ওহ, আহ, হাই, বলল কিশোর।

আমাদের ব্যাকইয়ার্ডে কী করছ তুমি?

লাল হয়ে গেল কিশোরের মুখের চেহারা। কী জবাব দেবে?

শেষমেশ ঠিক করল জুলিয়াকে সত্যি কথাটা বলে দেবে।

চটপট খাবারচোরের কথা ব্যাখ্যা করল ও। এবং জুতোর ফিতেটার কথা বলতেও ভুলল না। আরও জানাল পার্কে কীভাবে রয়কে কুকি চুরি করতে দেখেছে।
কাজেই আমি তোমার ভাইয়ের ওপর গোয়েন্দাগিরি করতে এসেছি, স্বীকার করল ও। ওর কোন জুতোয় কিংবা স্কেটে সাদা কালো ফিতে আছে কিনা দেখব।
চোখ সরু করল জুলিয়া।
ও, তুমি এ জন্যে এখানে এসেছ?
হ্যাঁ।
দারুণ! হাততালি দিয়ে উঠল জুলিয়া। আমি তোমাকে সাহায্য করব। শুনে খুব মজার কাজ বলে মনে হচ্ছে।
মৃদু হেসে মাথা ঝকাল কিশোর।
চলো, রয় ঘরে নেই। ওর রুমে গিয়ে ঢুকি। বলল জুলিয়া।
কিন্তু আমার কুকুরের কী হবে?
পিছনের বারান্দায় ওকে আটকে রাখতে পারো, বলল জুলিয়া।
কিশোর বাঘাকে একবার জড়িয়ে ধরল।
ভাল হয়ে থাকিস,বলল।
এবার বারান্দার রেলিঙের সঙ্গে ফিতেটা বেঁধে দিল ও। তারপর জুলিয়ার সঙ্গে তড়িঘড়ি বাড়ির ভিতর ঢুকল। সিঁড়ি বেয়ে সন্তর্পণে দোতলায় উঠে এল। হলের শেষ প্রান্তে রয়ের কামরা।
নাক টিপে ধরো। ও নোংরার হদ্দ। কাপড়চোপড় ধোয় না, সতর্ক করল জুলিয়া।
নাক না টিপলেও শ্বাস চেপে রাখল কিশোর। অন্যের ঘরে ঢুকছে বলে কেমন ভয়-ভয় করছে।
বলেছিলাম না? দরজা খুলে বলল জুলিয়া। কিশোর মাথা ঝাঁকিয়ে ঢোক গিলল। মেঝেময় টি শার্ট আর মোজা ছড়ানো। ময়লা কাপড় উঁই করা বিছানার উপরে।
এখানে ও ঘুমায়। কীভাবে, ভাবল কিশোর।
জুলিয়া একজোড়া পুরানো কালো হাই-টপ তুলে ধরল।
ও রোজ এগুলো পরে। আজকে অবশ্য স্যাণ্ডেল পরেছে, বলল ও।
জুতোজোড়া দেখে নিল কিশোর। কালো ফিতে।
ওর ইন-লাইন স্কেটজোড়া কোথায়? প্রশ্ন করল।
ক্লজিটে, জানাল জুলিয়া।
ঘরের ওপ্রান্তে প্রকাণ্ড এক ওয়াক-ইন ক্লজিট আঙুল ইশারায় দেখাল ও।
দেখতে পারি?
নিশ্চয়ই জানাল জলিয়া।
কিশোর আর জুলিয়া ক্লজিট খুলে পা রাখল ভিতরে।

এই যে, বলে ভারী এক স্কেট তুলল জুলিয়া। তবে ফিতে নীল সবুজ।
মাথা ঝাঁকাল কিশোর। এবার ঝুঁকে বসল এক সার জুতো দেখার জন্য। ক্লজিটের পিছনের দেয়ালে সার বেঁধে রাখা হয়েছে ওগুলোকে।
একজোড়া বাদামি লোফার-ফিতে নেই।
একজোড়া সাদা হাই-টপ-সাদা ফিতে।
একজোড়া পুরানো, ছেঁড়া সবুজ বাস্কেটবল শুনোংরা সবুজ ফিতে।
এবং একজোড়া ধূসর চামড়ার রানিং শু-উজ্জ্বল নীল ফিতে।
নাহ, এগুলো নয়, বলল কিশোর। ওর আর কোন জুতো আছে?
না, শুধু রাগবি ক্লিটস। ওগুলো কালো। ফিতেগুলোও কালো।
আচ্ছা, চলো, বলল কিশোর।
কিন্তু জুলিয়া ক্লজিট থেকে যেই বাইরে পা রাখতে যাবে, দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল দরজা।
অ্যাই, দরজা খোলো! চেঁচাল জুলিয়া। সর্বশক্তিতে ঠেলা দিল। ক্লজিটের দরজায়, কিন্তু নড়ল না ওটা।
আটকা পড়েছে ওরা!
বাঁচাও! বাঁচাও! চেঁচাল জুলিয়া। দুমাদুম কিল মারছে ক্লজিটের দরজায়।
কিশোরও ঠেলা দিল দরজায়, কিন্তু খুলতে পারল না।
নবটা ঘোরানো যাচ্ছে না। আটকে গেছে! চেঁচিয়ে বলল কিশোর। ক্রমাগত দরজায় কিল মেরে চলল ওরা, কিন্তু কোন কাজ হলো না।
হঠাই দরজার ওপাশ থেকে কাউকে খিকখিক করে হাসতে শুনল ওরা।
হি হি হি, খুদে ইঁদুরের গুষ্টি! রয়ের কণ্ঠ। ঠিক হয়েছে। অন্যের ঘরে উঁকি দেয়ার উচিত শাস্তি হয়েছে। তোমাদেরকে আর ছাড়ছি না!
দরজা খোলো, রয়, এক্ষুনি, চেঁচাল জুলিয়া।
না, তোমরা ফাঁদে পড়েছ। চিরদিনের জন্যে!
খোলো, নইলে মাকে বলে দেব, চেঁচাল জুলিয়া।
মুহূর্তের জন্য নীরব হয়ে গেল ঘরটা। এবার দরজাটা খুলে গেল ঝটকা দিয়ে। ট্যান শর্ট, ঘামে ভেজা টি-শার্ট আর স্যাণ্ডেল পরে রয় দাঁড়িয়ে।
আহা রে, মাকে বলে দেব! ভেঙাল রয়! কী বলবে? আমার ঘরে চুরি করতে ঢুকে গোয়েন্দাগিরি করছিলে? যাও, বেরোও এখান থেকে!
জুলিয়াকে বোকো না, সব দোষ আমার। আমি বের করার চেষ্টা করছি কে এলাকায় খাবার চুরি করছে, বলল কিশোর।
তো?
তো কালকে তোমাকে দেখেছি পার্কে কুকি চুরি করতে। চোখ উল্টাল রয়।

পিকনিকের একটা ছেলে আমার বন্ধু। আমরা একে অন্যের কুকি ছিনিয়ে নিই। এটা আমাদের একটা খেলা।
ওহ, বলে গলা খাঁকরে নিল কিশোর। কিন্তু কালকে রাতে? তুমি কি বেড়া টপকে রবি রেসের বাসায় ঢুকেছিলে? খাবার চুরি করেছিলে ওখান থেকে?
হেসে উঠল রয়।
আমি কাল রাতে বাসাতেই ছিলাম না। বন্ধুদের সঙ্গে সিনেমা দেখতে গেছিলাম।
ওহ, বলল কিশোর। মুখের চেহারা রক্তবর্ণ।
বেরোও এখান থেকে, জুলিয়া, বলে বোনের বাহু চেপে ধরল রয়। তুমিও, গোয়েন্দা কিশোর।
নিঃশব্দে বেরিয়ে এল ওরা।
এবার দীর্ঘশ্বাস ফেলল কিশোর।
তোমাকে বিপদে ফেলার জন্যে দুঃখিত।
ও কিছু না, বলল জুলিয়া। বরং বেশ একটা অ্যাডভেঞ্চার হয়ে গেল। তোমার আর কোন সাহায্য দরকার?
না, ধন্যবাদ। যাই, বাড়ি যাই।
ঠিক আছে, বলল জুলিয়া। পরে আবার এসো। আবারও গোয়েন্দাগিরি করা যাবে।
বাঘার ফিতে খুলতেই ও লালাফি, টানাটানি আরম্ভ করল। লেজ
যেন বলতে চাইছে, এসো! এখান থেকে বেরিয়ে যাই।
জুলিয়াদের ড্রাইভওয়ের শেষ মাথায় চলে এল কিশোর। কিন্তু বাঘা ওকে বাঁ দিকে টানল।
বোকা কোথাকার, বাসা ওদিকে নয়।
কিন্তু বাঘা ওকে টেনেই চলল। শেষমেশ হাল ছেড়ে দিল কিশোর।
ঠিক আছে, তোর জন্যে ঘুরপথে বাসায় যেতে হবে দেখছি।
ব্লক ধরে অল্প কিছুদূর এগোল ওরা। জিম কেলিকে সামনের উঠনে দেখতে পেল। কিশোরকে দেখামাত্র ডেকে উঠল ও।
অ্যাই, কিশোর, তোমার কুকুরটাকে একটু আদর করতে দেবে? ওকে কটা খেলা শেখাতে পারি? দৌড়ে এল কিশোরের কাছে।
এখন নয়, বলে বাঘাকে পিছনে টেনে ধরে রাখল ও। জিম যাতে ওকে ভয় দেখাতে না পারে।
জিম কুঁকে বসে গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল বাঘার। জিমের মুখ চেটে দিল কুকুরটা। এবার জিমের জুতো কামড়াতে লাগল।
আরি, ও তো আমার জুতো চিবোচ্ছে। ওকে থামাও।

বাঘাকে টেনে সরাতে গিয়ে একটা জিনিস চোখে পড়ল কিশোরের। বুকের ভিতরে ধড়াস করে উঠল ওর।
সরাও না ওকে! আমার জুতোর ফিতে চিবিয়ে খেয়ে ফেলছে তো! চেঁচিয়ে উঠল জিম।
জানি, বলল কিশোর। সরাসরি জিমের চোখে চোখে চাইল। ও তোমার জুতোর ফিতে চিবোচ্ছে। এবং দুটো ফিতে ম্যাচ করেনি!
তোমার জুতোর একটা ফিতে নতুন, এবং সাদা। অন্যটা পুরানো আর সাদা-কালো, বলল কিশোর।
বাঘার কাছ থেকে পা-টা সরিয়ে নিল জিম। ওর ফিতে খুলে গেল।
তাতে কী? বলে ঝুঁকে বসল বাঁধার জন্য। আমার ফিতে ছিঁড়ে গেছে।
জানি। কোথায় ছিঁড়েছে তাও জানি, আমাদের বাসায়-তুমি যখন চকোলেট চিপ মাফিন চুরি করছিলে! বলল কিশোর।
মিথ্যে কথা। ঝটপট জবাব দিল জিম। আমি চকোলেট খাই না। চকোলেটে আমার অ্যালার্জি।
তা ঠিক, ভাবল কিশোর। কিন্তু ও যদি মাফিন চুরি না-ই করে থাকে তা হলে ওর জুতোর ফিতে স্ক্রীন ডোরে আটকাল কীভাবে?
আমার কাছে প্রমাণ আছে। আমার পকেটে, বলে ঘেঁড়া ফিতেটা বের করে দেখাল কিশোর।
জিম চুপ করে আছে।
গড় ফলাফী ও চ দেখলে! তোমার জুতোর ফিতের সাথে হুবহু মিলে গেছে। এতে প্রমাণ হয় তুমি গত শুক্রবার আমাদের কিচেনে ঢুকেছিলে।
আহ… হ্যাঁ,বলল জিম। তবে ঢুকেছিলাম কেউ আমার নাম ধরে ডেকেছে ভেবে। দরজা খুলি আমি, কিন্তু কেউ ছিল না বলে চলে আসি।
ওর কথা বিশ্বাস করল না কিশোর। কিন্তু ও কিছু বলার আগেই হাত থেকে ঝটকা মেরে ফিতে ছুটিয়ে নিল বাঘা।
থাম! ফিরে আয়! চেঁচাল কিশোর। বাঘাকে ধাওয়া করে। বাড়িটাকে পাক খেয়ে জিমদের পিছনের উঠনে চলে এল।
ওকে অনুসরণ করল জিম।
উঠনের এক টুলশেডের উদ্দেশে সোজা ছুটল বাঘা। দরজায় ঝাঁপিয়ে পড়ে ভিতরে ঢোকার জন্য আঁচড়াতে লাগল। একই সঙ্গে তারস্বরে ঘেউ-ঘেউ করছে।
ভেতরে ঢুকিস না! চিৎকার ছাড়ল জিম।
কিশোর বাঘাকে অনুসরণ করে শেডের কাছে এল। হাত রাখল দরজার হাতলে।
খুলো না! খুলো না! জিমের চিৎকার।

কেন? বলে ঘুরে দাঁড়াল কিশোর।
জবাব দিল না জিম। কী লুকোতে চাইছে ও, ভাবল কিশোর।
জিম ওকে থামাতে পারার আগেই হাতল ধরে টান দিল কিশোর।
পরমুহূর্তে সাত করে সেঁধিয়ে পড়ল বাঘা। গন্ধ শুঁকছে।
বাদামি এক কাগজের ব্যাগ। সদাই রাখার!
মিসেস বার্বাটভের সদাই! আমি জানতাম! কিশোর বলে উঠল। তোমার জুতোর ফিতেটা দেখামাত্র বুঝে গেছি তুমিই চোর!
বোঁ করে ঘুরে দাঁড়িয়ে কোমরে হাত রাখল ও। জ্বলন্ত চোখে জিমের দিকে চেয়ে। মাথা নুয়ে পড়েছে ছেলেটির।
হ্যাঁ, স্বীকার করছি চকোলেট চিপ মাফিনগুলো আমিই নিয়েছি। আর মিসেস বার্বাটভের গাড়ি থেকে সদাইয়ের ব্যাগও।
আর মিস্টার রেসের ব্যাকইয়ার্ড থেকে হ্যামবার্গার? প্রশ্ন করল কিশোর।
ডানে জুলিয়া হার্ভেদের বাড়ির দিকে চকিতে চাইল। কাছেই। বাড়িটা। জুলিয়াদের বাড়ির ঠিক পিছনেই রবি রেসের বাড়ি। জিম সহজেই ওখানে পৌঁছতে পারে।
হ্যাঁ, হ্যামবার্গারগুলোও আমি নিয়েছি, স্বীকার করল জিম। কিন্তু তুমি জানলে কীভাবে?
আছে, বলে মুচকি হাসল কিশোর। খুশি লাগছে ওর। এই-ই? নাকি আরও খাবার সরিয়েছ।
আর সরাইনি, বলে মাটির দিকে দৃষ্টি নামাল জিম। একটু পরে চোখে মিনতি নিয়ে কিশোরের দিকে চাইল। কাউকে বোলো না, প্লিজ।
কেন করলে এসব?
আমার জন্যে করিনি। করেছি আমার কুকুরের জন্য। কিশোরের প্রশ্নের জবাবে বলল।
তোমার কুকুর? কিন্তু তোমার তো কুকুর নেই।
বেওয়ারিশ কুকুর। আমি ওকে জিপসি বলে ডাকি। ওকে খেতে দেই, যে কারণে রয়ে গেছে।
ওহ, মাথা নেড়ে বলল কিশোর। বুঝতে পেরেছে কোন্ কুকুরটার কথা বলছে জিম-বেওয়ারিশ ট্যান কুকুরটা।
জিপসি আমাকে ফলো করছিল, মিসেস বার্বাটভ যেদিন বাড়ি ফেরেন, বলে চলল জিম। উনি বাড়ির ভিতর গেলে সদাই সরাই আমি।
সেজন্যেই ড্রাইভওয়েতে কুকুরের পায়ের ছাপ দেখা গেছে, আওড়াল কিশোর। জিপসি তোমার সাথে ছিল।
হ্যাঁ।

এবার শেডে রাখা সদাইয়ের ব্যাগটা নজরে এল কিশোরের।
কিন্তু ওটা তো এখনও প্রায় ভর্তি।
কাগজ দিয়ে ঠাসা। ন্যাপকিন, পেপার প্লেট, টিসু পেপার এবে। আর এক বাক্স ম্যাকারনি। খাবার বলতে ছিল এক প্যাকেট হ্যামবার্গার মিট।
কিশোর কাছ থেকে দেখল। জিমের কথাই ঠিক। বেশিরভাগই কাগজের জিনিস, তবে মাংসের রসের একটা দাগও রয়েছে।
বাঘা এটার গন্ধই পেয়েছিল, হঠাই অনুভব করল কিশোর। ঝুঁকে বসে বাঘাকে জড়িয়ে ধরল।
বাঘা লেজ নেড়ে কিশোরের নাক চেটে দিল।
সেদিন জিপসিকে মাংস খাইয়েছি, বলল জিম। তারপর খাবার গেল শেষ হয়ে। তাই তোমাদের বাসায় মাফিন দেখে তুলে নিই।
কাজটা ঠিক করনি। কুকুরদের জন্যে চকোলেট ভাল না। বলে কিশোর এক মুহূর্ত চিন্তা করল। জিপসি এখন কোথায়? চারধারে নজর বুলাল।
তোমাকে আসতে দেখে গ্যারেজে আটকে রেখেছি। তুমি আমার মাকে বলে দেবে না তো? জিম আকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করল।
জিমদের বাসার পিছনে দড়াম করে উঠল এক স্ক্রীন ডোর।
ওকে আর বলতে হবে না। আমি সবই শুনেছি, বললেন মিসেস কেলি। দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলেন।
ওহ, না! বলে উঠল জিম, মাথা চাপড়াল।
জিমের কাছে হেঁটে এলেন মিসেস কেলি, ছেলেকে জড়িয়ে ধরলেন।
জিম, আমি খুব দুঃখ পেয়েছি তুই খাবার চুরি করছিস শুনে।
কিন্তু, মা- জিম শুরু করেছিল।
না, আমাকে শেষ করতে দে, বাধা দিয়ে বললেন মিসেস কেলি। আমার বোঝা উচিত ছিল তুই কুকুর কতখানি ভালবাসিস।
মার দিকে চাইল জিম।
খাবার চুরির জন্যে আমি দুঃখিত। কিন্তু জিপসি আমাকে পছন্দ করে। আমিও ওকে পছন্দ করি।
বুঝলাম। এখন প্রথম কাজ হচ্ছে মিসেস বার্বাটভকে এগুলো ফেরত দেয়া। আর তুই তাঁর কাছে ক্ষমা চাইবি।
মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল জিম।
হ্যামবার্গারের টাকা আমি দিয়ে দেব। এরপর মিসেস পাশার কাছে মাফিন চুরির জন্য মাফ চাইবি। মিস্টার রেসের কাছেও।
আচ্ছা, মৃদু স্বরে বলল জিম।

সদাইয়ের ব্যাগটা তুলে নিতে যাবে, ওর মা বাধা দিলেন।
এক মিনিট। আগে জিপসিকে গ্যারেজ থেকে বের কর। আমি ওকে দেখতে চাই- ও যেহেতু এখন থেকে এ বাড়িতেই থাকবে। বললেন মিসেস কেলি।
মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল জিমের।
মা, সত্যি বলছ? আমি ওকে রাখতে পারব?
হ্যাঁ, কেউ যদি ওকে ফেরত না চায়। তবে আগে ওকে ভেটের কাছে নিতে হবে, কটা শটের জন্য।
মুখ বেজার হয়ে গেল জিমের।
ওর কষ্ট হবে। হেসে উঠল কিশোর।
চিন্তা কোরো না। কুকুররা খুব একটা মাই করে না।
বাঘার ফিতে তুলে নিল কিশোর।
আচ্ছা, আমি যাই।
ধন্যবাদ, কিশোর, বললেন মিসেস কেলি।
মৃদু হাসি ফুটল কিশোরের ঠোঁটে। রহস্যের সমাধান হলো আবার জিমও একটা কুকুর পেল।
তবে আরও বেশি খুশি লাগছে এই ভেবে, চাচীর কাছে প্রমাণ করতে পারবে বাঘা চোর নয়। ও মাফিন চুরি করেনি।

.

বাড়ি ফিরে নিজের ঘরে চলে এল কিশোর। নীল নোটবইটা বের করল। সাদা এক পাতা উল্টে লিখল:
অবশেষে, মাফিন-রহস্যের সমাধান হলো, দোষ না করেও দোষী হতে কেমন লাগে বুঝলাম আমি। খুব খারাপ লাগে। এখন থেকে আমি আর কাউকেই অযথা দোষী ভাবব না। (বিশেষ করে জর্জ বেস্টকে!)।
বি: দ্র: বাঘা গন্ধ শুঁকে আমাকে রহস্যটা ভেদ করতে সাহায্য করেছে। আমার বাঘা দুনিয়ার সেরা কুকুর।
কেস শেষ।

ভলিউম ১০৪/২ – গোরস্থানে সাবধান! – তিন গোয়েন্দা – শামসুদ্দীন নওয়াব – সেবা প্রকাশনী

কাহিনি রচনা: কাজী শাহনুর হোসেন
তিন গোয়েন্দায় রূপান্তর: শামসুদ্দীন নওয়াব
প্রথম প্রকাশ: ২০০৮

এটা দেখুন, মা বলল এক মহিলাকে। মার গ্রীনহাউসে বসে কফি পান করছে তারা। গ্রীনহিলস শহরের একটি প্রাচীন গোরস্থানের এক সমাধিস্তম্ভের ছবি দেখাচ্ছে মা। গরমের দিন। আকাশ মেঘলা।

কবরের মাথায় স্থাপন করা কোন কোন পাথরখণ্ড, অর্থাৎ হেডস্টোন, তিনশো বছরের পুরানো! মা ইদানীং প্রাচীন হেডস্টোনের ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। অ্যাঙ্গেল আর কৌতূহল জাগানো লিপি খুব টানছে মাকে।

আমি যাই, বলে উঠে পড়লেন মার বান্ধবী। জিনিসপত্র গোছগাছ। করে নিলেন। মনে হচ্ছে ঝড় আসবে।

টোয়াং! মা আর তার বান্ধবী আঁতকে উঠলেন। কিশোর ওর ইলেকট্রিক গিটারে উদ্ভট এক কর্ড বাজিয়েছে। শব্দটা এমনই, কানে লাগারই কথা।

উপস, সরি, লাল হয়ে গেছে ওর মুখের চেহারা। কেউ শুনে ফেলেনি তো!

রবিন করতাল বাজিয়ে ব্যে ড্রামে বাড়ি দিল।

মনে হয় না শুনতে পেয়েছে, বলল ও। লিভিং রুম থেকে গ্রীনহাউসের দিকে চাইলাম আমরা।

সবার বাসায় যাওয়ার ব্যবস্থা আছে তো? মা চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল। ঝড় আসবে কিন্তু।

ডুগি হেঁটে যাবে, পাল্টা চেঁচালাম। রাশেদ চাচা পাঁচটার সময় কিশোরকে তুলে নেবেন আর রবিনকে নেয়ার জন্যে শীঘি আন্টি আসবেন।

মুসা, আমার উদ্দেশে বলল কিশোর, মনে হচ্ছে বড় ধরনের ঝড় আসছে। জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে রয়েছে। পিছনের উঠনে গাছগুলোকে পাগলা হাওয়ায় দুলতে দেখছে।

তাই তো মনে হচ্ছে, বললাম।

.

সেরাতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে নানান কথা ভাবছিলাম। বাবা-মা ঘুমিয়ে পড়েছে, কিন্তু আমার চোখে ঘুম নেই।

আমাদের শহরে বড় বড় প্রাচীন গাছ আছে। আমাদের বাড়ির আশপাশের গাছগুলো দুলছে না, নুয়ে পড়েছে। ভয় হচ্ছে, বাড়ির উপর না এক-আধটা ভেঙে পড়ে।

প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে। কখন গাছ ভাঙার প্রথম শব্দটা কানে আসবে সে অপেক্ষাই করছি। তীব্র শোঁ-শোঁ শব্দে বয়ে যাচ্ছে বাতাস। বাবার অ্যান্টিকের দোকান, কিউরিও শপ-এর সাইনবোর্ডটা কীভাবে কাঁচ কাঁচ শব্দে সামনে-পিছনে দুলছে অনুমান করতে পারছি। পুরানো বাড়িটার শাটারগুলো বাজের শব্দ তুলে বাড়ি খাচ্ছে দেয়ালের গায়ে।

এবার অন্য এক শব্দ কানে এল। বুকের ভিতরটা ধড়াস করে উঠল। নিথর শুয়ে রইলাম। কীসের শব্দ ওটা? কম্বল আঁকড়ে ধরেছি।

আধ সেকেন্দ্রে জন্য মনে হলো শাটারের শব্দ। থপ! খাইছে, পরমুহূর্তে মনে হলো এ বাড়িতে তো কোন শাটার নেই!

কয়টা পড়েছে? ফোনে কাকে যেন জিজ্ঞেস করল মা। চারধারে নজর বুলোম। উজ্জ্বল রোদ চুঁইয়ে ঢুকছে জানালার ফাঁক-ফোকর দিয়ে।

স্থানীয় হিস্টোরিকাল সোসাইটির কেউ একজন মাকে ফোন করেছেন পরামর্শের জন্য। রাতের ঝড়ে অনেক গাছ-পালা, বেড়া আর প্রাচীন গোরস্থানের বেশ কিছু হেডস্টোন উপড়ে পড়েছে।

বিছানা ছেড়ে উঠে আয়নায় চোখ রাখলাম। নিজের প্রতিবিম্ব দেখে মনে হলো যেন ভূত দেখেছি।

মুসা, মা ডাকল, আমাকে ক্রসরোডের পাশের গোরস্থানটায় যেতে হচ্ছে। কালরাতে বেশ কিছু হেডস্টোন পড়ে গেছে। যাবি?

এখুনি আসছি, চেঁচালাম। মার সঙ্গে পুরানো বাড়ি কিংবা কবরস্থানে যেতে ভাল লাগে আমার। মা ইতিহাসের অনেক খুঁটিনাটি জানে। পুরানো আমলের মানুষ... এবং ভূতেদের কথাও তার নখদর্পণে।

মা ভুতুড়ে বাড়ির ব্যাপারে খুবই আগ্রহী। এ বিষয়ে নানা ধরনের বই আছে তার।

মাঝে মাঝে ভূতেরা টের পায় না যে তারা মারা গেছে, মা বলেছে আমাকে। মনে করে এখনও বেঁচে আছে। প্রিয় জায়গাগুলোতে ঘুরে বেড়ায় তারা। প্রিয়জনদের দেখার জন্য রাতের পর রাত ঘোরে। ব্যাপারটা দুঃখজনক। তবে আমরা ওদের পথ খুঁজে পেতে সাহায্য করতে পারি।

খাইছে, তারমানে? জিজ্ঞেস করেছি আমি। তুমি ভূতকে কীভাবে সাহায্য করবে?

ওদেরকে এই বলে শুরু করতে হবে যে তোমরা...মারা গেছ।

ভুতুড়ে ব্যাপার, বলেছি আমি।

তা না। ওরা কারও ক্ষতি করে না। ওরা স্রেফ নিজেদের রাস্তা খুঁজে পেতে চায়।

ওদের রাস্তা কোথায়? আমার প্রশ্ন।

পরের স্তরে। আত্মার স্তর বলে যেটাকে।

কিন্তু মানুষ ভূতের সাথে কথা বলে কীভাবে?

যেভাবে আমরা মানুষের সাথে কথা বলি, এমন দায়সারা ভাবে বলল মা, ব্যাপারটা যেন টেলিফোনে কথা বলার মতই স্বাভাবিক।

.

আমরা এখন ছোট্ট এক গির্জার সিঁড়ি ভেঙে উঠছি।

কালো সুট পরা একবৃদ্ধ এগিয়ে এলেন আমাদের উদ্দেশে। পরনে মান্ধাতা আমলের পোশাক। ভদ্রলোক মিনিস্টার কিনা কে জানে।

মিসেস আমান! আপনি আসাতে আমি খুব খুশি হয়েছি। বললেন ভদ্রলোক। আমার নাম রয় ম্যাকয়।

গ্ল্যাড টু মীট ইউ, মিস্টার ম্যাকয়, হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল মা। এ আমার ছেলে মুসা।

আমার কাঁধ চাপড়ে দিলেন মি. ম্যাকয়। ঠোঁটে মৃদু হাসি। ভদ্রলোকের ছোঁয়া এতটাই হালকা, টেরই পেলাম না আমি।

হেডস্টোনগুলো কোথায় পড়েছে আসুন দেখিয়ে দিই, বললেন। মি. ম্যাকয়। ছোট এক পথ ধরে প্রাচীন গোরস্থানের উদ্দেশে এগোলাম আমরা। কাল রাতে কেউ মনে হয় এখানে এসেছিল। হেডস্টোনগুলোকে ইচ্ছেমত সরিয়েছে, বললেন ভদ্রলোক।

অমন আবহাওয়ার মধ্যে কারা এল, মাথা নেড়ে বলল মা।

অনেকেই বোঝে না জিনিসগুলো কত দামী, এগুলোর যে ঐতিহাসিক মূল্য আছে, বললেন মি. ম্যাকয়। এলাকার অনেকেরই পূর্বপুরুষদের কবর আছে এখানে। এখন মুশকিল হচ্ছে, যেভাবে নাড়াচাড়া করা হয়েছে, আবার ঠিক জায়গামত সেট করা যাবে কিনা সন্দেহ। এত বছর পর কোন্টা কার কবর বুঝব কী করে?

মা ইতোমধ্যে কবরগুলোর মাঝখান দিয়ে হাঁটতে শুরু করেছে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পাথরগুলো দেখছে আর প্যাডে কী সব টুকছে।

কিছু ভাঙচুরের ঘটনাও ঘটেছে, মাটির দিকে চেয়ে হিজিবিজি করে নোট নিচ্ছে। দুএকটা পাথর ভেঙে দুআধখানা করা হয়েছে।

মি. ম্যাকয় বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন।

আমি জানি, বললেন।

কিছু কিছু পাথর মেরামত করা যাবে, মা বলল। গ্রীনহিলস ইউনিভার্সিটির ল্যাবে নিয়ে যাওয়া দরকার।

তা হলে তো খুবই ভাল হয়, বললেন মি. ম্যাকয়। আশ্বস্ত দেখাচ্ছে তাকে। আমরা কৃতজ্ঞ থাকব।

আমরা কোথায়? ভাবলাম। আশপাশে তো ওঁকে ছাড়া আর কাউকে দেখছি না।

আমি একটা ভ্যানের ব্যবস্থা করব, মা বলল।
বিমর্ষ দেখাল মি. ম্যাকয়ের চোখজোড়া।
কিন্তু কবরগুলোর কী হবে? প্রশ্ন করলেন। পাথরগুলোকে ঠিকঠাকমত বসাব কীভাবে?
আপনি শুনলে আশ্চর্য হবেন, মা বলল। এগুলোর রেকর্ড আছে। কোন কোন ডকুমেন্ট তিনশো বছরের পুরানো। প্রাচীন ভিলেজ রেকর্ড ঘাঁটলে অনেক কিছু জানা যাবে। সবগুলো পাথর রিপ্লেস করতে না পারলেও বংশের নাম এবং এ ধরনের ব্যাপারগুলো জানতে পারব।
মি. ম্যাকয় আমাদের সঙ্গে গাড়ি পর্যন্ত হেঁটে এলেন। লিকলিকে লোকটা সামান্য ঝুঁকে পড়েছেন। এক মাথা তুষারশুভ্র চুল। ওঁকে ভাল লেগেছে আমার।
আমি বিকেলে লোকজন নিয়ে ফিরব, মা বলল। গাড়ি চলতে শুরু করলে মি. ম্যাকয় হাত তুলে আমাদের উদ্দেশে নাড়লেন। মুহূর্তের জন্য অন্যদিকে চেয়েছিলাম, এবার গোরস্থানের উদ্দেশে তাকাতেই দেখি মি. ম্যাকয় নেই। খাইছে, অথচ অত্যন্ত ধীরে হাঁটেন ভদ্রলোক।

.

মার সঙ্গে আবারও গোরস্থানে এসেছি আমি। ভ্যানে হেডস্টোনগুলো বোঝাই দেওয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে নেওয়া হচ্ছে মেরামতের জন্য। এক প্রফেসরকেও মা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। শক্তসমর্থ কিছু ছাত্রও হাজির হয়েছে।
ভ্যান নিয়ে লোকজন চলে গেলে, আমি আর মা আরেকবার ঘুরে দেখলাম গোরস্থানটা।
মিস্টার ম্যাকয় কোথায় গেলেন? চারধারে নজর বুলিয়ে বলল মা। অদ্ভুত ব্যাপার। আমি ভেবেছিলাম বিকেলে উনি থাকবেন। ঝুঁকে পড়ে কাছ থেকে কিছু একটা দেখছে। মুসা, দেখ, হাতছানি দিয়ে ডাকল আমাকে।
কাছিয়ে গেলাম। ছোট এক হেডস্টোন, ঘাসের উপর পড়ে। ওতে খোদাই করা: মিশেল রবার্টস। জন্ম আগস্ট ১২, ১৯৮৭। মৃত্যু ডিসেম্বর ৬, ১৯৯৬।
মাত্র নবছর বয়স ছিল ওর, মা বলল। ব্যথিত দেখাচ্ছে তাকে। ভ্যানে তোলার সময় এটা মনে হয় চোখ এড়িয়ে গেছে। পাথরে একটা আঙুল ছোঁয়াল মা। আমরা মিশেলকে এখানে ফেলে রাখতে পারি না।
এ-ই হচ্ছে আমার মা, মনে মনে বললাম। একটা হেডস্টোনকে মিশেল বলে ডাকছে।
এটা গাড়িতে তুলতে তোর হেল্প দরকার, বলল মা।
আমার সোয়েটশার্টে মুড়ে গাড়ির পিছনের সিটের মেঝেতে হেডস্টোনটা নামিয়ে রাখলাম আমরা।

অনেক দেরি হয়ে গেছে। এখন আর ওখানে যাওয়া যাবে না। তোর বাবাকে বলেছি রাতে স্প্যাঘেটি আর মিটবল করব। এখন পর্যন্ত বাজারই করা হয়নি! মা গাড়ি চালানোর সময় চিন্তামগ্ন হলো। আগে বাসায় যাব। নইলে আমরা যখন মার্কেটে থাকব মিশেলকে কেউ গাড়ি থেকে চুরি করে নিয়ে যেতে পারে।
হেডস্টোনটাকে আমরা গ্রীনহাউসে বয়ে নিয়ে গেলাম।
তুই আমার সাথে শপিঙে যাবি? মা প্রশ্ন করল।
যাব, মা। এখুনি আসছি। মিনিট খানেক গ্রীনহাউসে থাকলাম আমি। হেডস্টোনটা টানছে আমাকে। কাছ থেকে পাথরটা দেখছি, ভাবছি খোদাই করা লেখাগুলো কতই না পুরানো, এসময় গ্রীনহাউসের ভিতর দিয়ে বয়ে গেল এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস-এক সেকেণ্ডের জন্য। কাঁচের দেয়াল ভেদ করে চাইলাম। একখণ্ড মেঘ ভেসে যেতেই মুহূর্তের জন্য কালো হয়ে গেল আকাশ। ঠাণ্ডায় শিউরে উঠলাম।
কাল রাতের ঝড়টা কেমন হলো, বাবা? সন্ধেয় ডিনারে বসে প্রশ্ন করলাম।
ঝড়? কীসের ঝড়? আমাকে জ্বালানোর জন্য বলল বাবা। মিটবলগুলো দারুণ হয়েছে। আরেকটু স্প্যাঘেটি নিবি, মুসা?
মাথা নাড়লাম।
কাল রাতের ঝড়ের সময় একটা শব্দ শুনেছ?
কই না তো। শুধু বাতাসের শব্দ শুনেছি, বলল বাবা। কীগো, তুমি শুনেছ? মার উদ্দেশে জানতে চাইল। পরক্ষণে আবার আমার দিকে চোখ ফেরাল।
বাতাসের শব্দে ঘুম আসছিল না। তারপর তোমরা শুতে যাওয়ার পর দড়াম দড়াম করে শাটার বাড়ি খাওয়ার মত শব্দ হচ্ছিল, বললাম।
এখানে তো শাটার নেই। হয়তো পাশের বাড়িতে শব্দ হয়েছে, বলল বাবা।
পরদিন পাশের বাসায় গিয়ে জানালাগুলো পরখ করলাম। শাটার নেই। এবার আমার সত্যিই অবাক হওয়ার পালা। তবে কি গাছের ডালের শব্দ ছিল ওটা? সি আমাদের পিছনের উঠনে চলে এলাম, আমার বেডরুমের জানালাগুলো যেখানে। ছাদের দিকে চাইলাম। অস্বাভাবিক কিছুই চোখে পড়ল না। বাড়ি, জানালার ধারি সব খুঁটিয়ে লক্ষ করলাম। কোনও ডাল-পালা চোখে পড়ল না, কিংবা বাড়ির এমন কোন জায়গা যেখানে বাড়ি খেতে পারে গাছের ডাল। তা হলে?
শুনেছি তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু কীসের শব্দ ছিল ওটা?

.

পরের কদিন ব্যস্ত হয়ে পড়লাম সাঁতার নিয়ে। ঝড়ের কথা মনেই থাকল না।
সেদিন সন্ধেয় পিত্যা খাওয়ার পর রাশেদ চাচা আমাদেরকে নিয়ে গেলেন সিডি ভাড়া করতে। আমরা ভূতের এক সিনেমা বাছলাম। ঠিক করলাম ঘর অন্ধকার করে তারপর দেখব। মজার ব্যাপার হলো, সিনেমাতেও ঝড় আর ভারী বৃষ্টির সিন

রয়েছে। সেসঙ্গে বাতাসের শোঁ-শোঁ গর্জন। ঠিক আমাদের শহরের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া ঝড়টার মতন।
এবার ছবিতে কী যেন বাড়ি খেতে লাগল।
অ্যাই, তোমরা জোরাল কোন শব্দ শুনতে পাচ্ছ? কাল রাতের ঝড়ের মতন? বলে উঠলাম আমি।
কই না তো, বলল কিশোর।
বন্ধুদেরকে সে রাতের শব্দটার কথা জানালাম। আরও বললাম, আমি ছাড়া আর কেউ শব্দটা শোনেনি।
আমিও শুনিনি, রবিন বলল।
এবার হঠাৎই জমে গেলাম আমরা। ছবির দড়াম-দড়াম শব্দটা জোরাল হয়েছে। এক মহিলা শুয়ে রয়েছে প্রাচীন এক পোড়া বাড়িতে। ব্ল্যাঙ্কেট ক্রমেই টেনে তুলেছে চিবুক পর্যন্ত। ঘরের বিশাল কাঠের দরজাটা দেখা গেল। কাছ থেকে দেখাচ্ছে। খুব শক্তিশালী কেউ একজন বাড়ি দিচ্ছে দরজায়। ফলে, কাঠ ভেঙে ছিটকে পড়ছে। এবার ডোরনবটা মোচড় খেল!
খাইছে!
দরজা খুলতেই দেখা গেল বাইরে কেউ নেই। তা হলে বাড়ি দিচ্ছিল কে?
ছবি শেষ হলে বাড়ি চলে এলাম।

.

রাতে ঘুমিয়ে পড়েছি। অন্তত ঘণ্টা দুয়েক ঘুমিয়েছি। তবে নিশ্চিত নই। হঠাই ঘুম ভেঙে গেল। কটা বাজে কে জানে। বিছানা ছেড়ে জানালার কাছে গেলাম। বিদ্যুৎ নেই। ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছে না, তা হলে পাওয়ার অফ কেন? বিরক্তি বোধ করলাম।
ফ্ল্যাশলাইটটা তুলে নিয়ে হল ধরে দ্রুত পায়ে এগোলাম। কী ঘটছে দেখতে চাই। বাবা-মা ঘুমোচ্ছে। গোটা বাড়ি শান্ত। স্ট্রীটলাইটের নীল আলোয় লিভিং রুমে কেমন এক ভুতুড়ে আভা। অদ্ভুত তো, ভাবলাম। কারেন্ট না থাকলে রাস্তার আলো জ্বলছে কীভাবে?
বাবার প্রকাণ্ড গ্র্যাণ্ডফাদার ঘড়িটা ক্রমাগত টিকটিক করে চলেছে। নিস্তব্ধ পরিবেশে বড্ড কানে লাগছে শব্দটা। পেটের ভিতরে শিরশিরে অনুভূতি হচ্ছে।
ঢং! আঁতকে উঠলাম। ঘড়িটা ঘণ্টা দিচ্ছে। আবার, তারপর আবার। তিনটে বাজে। মাঝরাত। এজন্যই সব কিছু কেমন ভুতুড়ে লাগছে। বুক ধড়ফড়ানি কমে শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হতে খানিক সময় লাগল।
এবার দেখতে পেলাম ওটাকে-গ্রীনহাউসে যে ম্লান আলোটাকে জ্বলতে দেখেছিলাম। আলোটা যেন ভাসছে। মার স্কার্ফ বাতাসে ছেড়ে দিলে যেভাবে ধীরে ধীরে নীচে নেমে আসে ঠিক সেরকম। বুকের ভিতরে ধড়াস করে উঠল।

আলোটা জ্বলছে হেডস্টোনটা যেখানে ছিল সেখানে!
লিভিংরুম থেকে বেরিয়ে এলাম। আতঙ্কিত। একটা টুলে হোঁচট খেয়ে আরেকটু হলে পড়েই যেতাম। হাত কাঁপছে, শক্ত করে ফ্ল্যাশলাইটটা চেপে ধরে রেখেছি। একইসঙ্গে ওটাকে জ্বেলে রেখে পিছাতে চাইছি।
হেডস্টোনটা যেখানে রাখা হয়েছিল। কিন্তু মা তো মিশেলকে কদিন আগেই পৌঁছে দিয়েছে ইউনিভার্সিটিতে এবং বাইরে থেকে প্রতিফলিত করার মত যথেষ্ট আলো জ্বলছে না, মিশেল যদি এখনও ওখানে থেকেও থাকে।
নিঃশব্দে দরজাটা বন্ধ করে উড়ে গিয়ে বিছানায় পড়লাম। থরথর করে কাঁপছি। বোঝার চেষ্টা করছি ঘটনাটা কী। গ্রীনহাউসে কিছু একটা ছিল, এবং সেটা সামান্য একটা আলো নয়। এমন কিছু জ্বলছিল আগে যেটা ওখানে ছিল না।
ঘড়ির দিকে চাইলাম। পিটপিট করছে। তারমানে কারেন্ট এসেছে। ল্যাম্প জ্বেলে রাতের টেবিলে খুঁজে পেলাম ঘড়িটাকে। তিনটা দশ। ঘড়িটাকে রিসেট করলাম। এবার বিছানায় শুয়ে স্বস্তির শ্বাস ফেললাম। আশা করছি সব আবার স্বাভাবিক হয়ে যাবে।\
স্বস্তির ভাবটা বেশিক্ষণ থাকল না। বালিশটা ঠিকঠাক করে মাথা রাখতে যাব এসময় কানে এল শব্দটা। দুম! দুম! তড়াক করে সিধে হয়ে বসলাম। চোখ বিস্ফারিত। শব্দটা এবার আর বাইরে থেকে নয়, কাছ থেকে আসছে। ঠিক আমাদের ভাড়া করা সিনেমার হানাবাড়িটার মতন।
ঘরের অপর প্রান্তের উদ্দেশে ভীতিমাখা চোখে চেয়ে রয়েছি আমি। শ্বাস নিতেও ভুলে গেছি যেন। শব্দটা আসছে বাড়ির ভিতর থেকে! ঢোক গিলোম। আসলে শব্দটা আসছে আমার ক্লজিট থেকে!
পরদিন সকালে টলতে টলতে কিচেনে গিয়ে ঢুকলাম। প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে। রোদ ঝলসাতে দেখে বুকে সাহস পেলাম। মা ফোনে কথা বলছে।
কিন্তু এটা কী করে হয়, গ্রীনহাউস থেকে তাকে বলতে শুনলাম।
আমরা ওঁর সাথে কথা বলেছি, গোরস্থানটা একসাথে ঘুরে বেড়িয়েছি। মিস্টার ম্যাকয়। সাদাচুলো বয়স্ক ভদ্রলোক। ১ ক্যাবিনেটে হাতড়ালাম সিরিয়ালের খোঁজে। মা কিছুক্ষণের জন্য চুপ হয়ে গেল।
একটু কুঁজো মত মানুষটা। চমৎকার ব্যবহার। কালো সুট পরা ছিল। না, টাক্সেডো নয়। আমরা ওঁকে মিনিস্টার-টিনিস্টার কিছু ভেবেছিলাম, মা বলে চলেছে।
সিরিয়ালের বাটি নিয়ে গ্রীনহাউসের দিকে এগিয়ে গেলাম, যাতে মার কথা-বার্তা শুনতে পাই। মাকে বিস্মিত শোনাচ্ছে। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে সিরিয়াল খাচ্ছি আমি। রাতে যা-ই দেখি না কেন, এখন সব কিছু স্বাভাবিক।
হ্যাঁ, মেরামতের কাজ ভালভাবে এগোচ্ছে, মা বলে চলেছে।

আমি মিস্টার ম্যাকয়কে নিজের মুখে বলতে চেয়েছিলাম কথাটা। হেডস্টোনগুলোর ব্যাপারে ভীষণ উদ্বিগ্ন ছিলেন ভদ্রলোক।

মা আরও কিছুক্ষণ কথা বলার পর বলল, হ্যাঁ। আমি মিস্টার ম্যাকয়কে বলেছিলাম গ্রামের পুরানো রেকর্ড ঘাঁটব। হেডস্টোনগুলোর বেশিরভাগকেই জায়গামত বসাতে পারব বলে মনে করছি।

আরও কিছু কথার পর মা ফোন রেখে দিল। এবার আমার দিকে চাইল। চোখে কৌতূহলী দৃষ্টি।

মিস্টার ম্যায়ের কথা মনে আছে?

কী হয়েছে তার?

গির্জার কেউ নাকি এই নামের কাউকে চেনে না, মা বলল।

খাইছে!

কী হলো?

কিছু না। আমি…আমরা… রাতের ঘটনাটা কীভাবে বলব ভাবলাম।

কী হয়েছে রে তোর? মা প্রশ্ন করল। আমার কাঁধ চাপড়ে দিল।

তারমানে মিস্টার ম্যাকয় বলে কেউ নেই, তাই তো?

হ্যাঁ। তার সাথে দেখা করে বলতে চেয়েছিলাম কাজ ভালভাবে এগোচ্ছে। যাকগে, আমি এখন হিস্টোরিকাল সোসাইটিতে যাব। প্রাচীন ভিলেজ রেকর্ড দেখতে। খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। তুই যাবি আমার সাথে? মা বলল।

রাজি হয়ে গেলাম।

সঙ্গে কী কী নেব জড় করে ফেলি, মা বলল। পরক্ষণে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। একটা ব্যাগে ম্যাগনিফাইং গ্লাস, রুলার, কলম, নোটবুক আর কপি মেশিনের জন্য ভাঙতি নিয়ে নিল। জর্জ ওয়াশিংটনের চেয়েও প্রাচীন কারও কোনও লেখা পড়তে চলেছে মা। এ ব্যাগ কাঁধে নিয়ে গ্রীনহাউস থেকে বেরিয়ে পড়ল মা। পা বাড়াল গ্যারেজের দিকে।

আচ্ছা, কাল রাতে আমি ভূত দেখিনি তো? ম্লান আলোটা তা কীসের? আর মি. ম্যায়ের ব্যাপারটা আসলে কী?

কিন্তু গ্রীনহাউসের আলোটা নয়, আমাকে ভাবাচ্ছে ক্লজিটের দুম, দুম! শব্দটা। একমাত্র আমিই শুনতে পাচ্ছি আওয়াজটা। রাতের বেলা অমন শব্দ হতে থাকলে আমি ঘুমাব কীভাবে?

একটু পরে, রওনা হলাম আমরা। পৌঁছেও গেলাম। মা পুরানো দলিলের পাতা উল্টে যাচ্ছে একের পর এক। আমি খানিকটা বিরক্তি বোধ করছি।

মা হঠাৎই চমকে উঠল।

আশ্চর্য তো। এটা কীভাবে সম্ভব? ফিসফিস করে বলল। দৌড়ে গেলাম মার কাছে।
কী হলো? কিছু জানতে পারলে? প্রশ্ন করলাম।
অবিশ্বাস্য। এটা দেখ, মুসা, মা বলল, হলদেটে কাগজে হাতের লেখায় নাম আর তারিখের সারি। সাবধান, কাগজটা ধরিস না। দেখতে পাচ্ছিস? মার নির্দেশিত জায়গাটায় চোখ রাখলাম। কী লিখেছে পড়।
রয়...ম্যাকয়... মেরুদণ্ড বেয়ে হিমস্রোত বয়ে গেল আমার। মা
আরেকটু পড়লাম। ১৭০৩। মা-মিস্টার ম্যাকয়। কিন্তু এর মানে...
মুসা, বলে ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা নামিয়ে রাখল মা। এরমানে আমরা ভূতের দেখা পেয়েছি।
মিস্টার ম্যাকয়? ঢোক গিলোম। কিন্তু আমরা ওঁকে দেখেছি। ওঁর সাথে কথাও বলেছি। আমরা
আমরা সত্যিকারের এক ভূতের সঙ্গে কথা বলেছি, মা বলল। তার চোখে দূরের দৃষ্টি। টেবিলে আঙুলের তবলা বাজাচ্ছে। চিন্তামগ্ন।
মা, মিস্টার ম্যাকয় বলছিলেন আমরা কৃতজ্ঞ থাকব।
আমরা বলতে তিনি কী বুঝিয়েছিলেন?
সঙ্গের ভূতেদের, বলল মা। বাহু ঘষল। হঠাত্র ঠাণ্ডা লাগতে শুরু করেছে। উনি এখানে আছেন, মুসা।
খাইছে।
কাছেপিঠে ভূত থাকলে ঘর হঠাৎ করেই ঠাণ্ডা হয়ে যেতে পারে।
ভয় পাচ্ছি আমি। এখন বুঝলাম গ্রীনহাউস কেন সেদিন ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। তারমানে কাল রাতে ওখানে অদ্ভুতুড়ে কিছু একটা ব্যাপার ঘটেছিল! মাকে বলতে চাই না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে আমার দফা রফা।
আজব না ব্যাপারটা? মা বলল।
আজব বলে আজব। বাসায় যে ঘটনাগুলো ঘটল তার সঙ্গে মি. ম্যায়ের কোন সম্পর্ক নেই তো? যদি থেকে থাকে তা হলে মি. ম্যায়ের দলে ভূতের সংখ্যা কত?
এটুকু জানি, রাতে শোয়ার সময়টা আমার জন্য দুঃস্বপ্ন হয়ে উঠবে। কে জানে, জেগেই রাত কাটাতে হয় কিনা।
শোনো না, বাবাকে ডিনারের টেবিলে বলল মা। হলদে কাগজে বাদামি কালিতে লেখা ছিল ওটা। আমরা দুজনেই দেখেছি। তাই না রে, মুসা? আমার দিকে চেয়ে বলল। এ হু? ও হ্যাঁ, ঘরের মধ্যে বললাম। শোয়ার সময় কী হবে তাই নিয়ে চিন্তিত আমি।
দলিলটা খাঁটি কিনা আমি বলে দিতে পারব, বাবা বলল মাকে।

আমার কাছে অনেক পুরানো রেকর্ড আছে।
কিন্তু, বাবা, দলিলটা যদি ভুয়াও হয়, মিস্টার ম্যায়ের ব্যাপারটা কী হবে? আমরা তাঁকে দেখেছি, তাঁর সাথে কথা বলেছি। এবং রেকর্ডে তার নামটাও লেখা আছে।
বাবা শ্রাগ করল।
জানি না, স্বীকার করল। এখন তো হ্যালোউইন না যে কেউ মান্ধাতা আমলের ড্রেস পরে চার্চে যাবে।
বুড়ো মানুষটাকে আমার খুব সিনসিয়ার মনে হয়েছিল। ওরকম কেউ একজন নেই শুনে দুঃখ পেয়েছি, থাকলেই খুশি হতাম, মা বলল।
মার কথা শুনে শিউরে উঠলাম। মনে পড়ল মি. ম্যাকয় আমার উদ্দেশে মৃদু হেসে কাঁধ চাপড়ে দিয়েছিলেন, অথচ আমি তার হাতের স্পর্শ অনুভব করিনি। এর মানে একটাই...এবং আমি সেটা ভাবতে চাই না।
কালকে দলিলগুলো দেখব, বলল বাবা। মিসেস ফিনলেকে বলব দোকানটা দেখে রাখতে।
নীরবে বসে রইলাম। খাবার নাড়াচাড়া করছি। এবার হঠাই একটা বুদ্ধি ঘাই মারল মাথায়।
মা, আজ রাতে আমি বাসায় বন্ধুদেরকে ডাকতে পারি? থাকার জন্যে! প্রশ্ন করলাম। স্কুল বসতে আরও সপ্তাহখানেক বাকি। সময়টা মোক্ষম। আওয়াজটা একা সহ্য করতে হবে না আমাকে। কিংবা গ্রীনহাউসের আলোটা।
বাবা-মা আপত্তি করল না। তড়াক করে টেবিল ছেড়ে কিশোর আর রবিনকে ফোন করলাম। ওরা বাসায় অনুমতি নিয়ে চলে আসবে। যাক, এবার অন্তত একা থাকতে হবে না আমাকে।
সে রাতে নীচে বাবার কম্পিউটার রুমে কম্পিউটার গেম খেলে। কিছু সময় পার করলাম আমরা।
হঠাই অনুভব করলাম কেমন ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা লাগছে। খাইছে! অদৃশ্য কেউ এসে হাজির হলো নাকি?
তোমরা ভূতে বিশ্বাস করো? মাউস নেড়েচেড়ে বলল কিশোর।
অনেকেই করে, বলল রবিন। তা ছাড়া নানারকম অভিজ্ঞতা তো আমাদের নিজেদেরই হয়েছে।
তা ঠিক, বলল কিশোর।
বোর্ড গেম খেলে, কিচেনে স্ন্যাক খেয়ে শেষমেশ আমার ঘরে চলে এলাম তিনজনে।
টিভিতে সত্যিকারের ভুতুড়ে অ্যাডভেঞ্চার শশা এখুনি শুরু হবে, বলল কিশোর।

আমার ঘরে যখন শব্দটা শুরু হবে তখন দেখা যাবে কার কত বড় বুকের পাটা, মনে মনে বললাম।
তোমাদেরকে একটা কথা বলতে চাইছিলাম, শুরু করেছিলাম।
শো শুরু হচ্ছে, বলল রবিন। পর্দায় চোখ সঁটা। পলায়নপর এক লোককে ধাওয়া করছে আধ পচা এক জীব।
কিশোর আর রবিনকে বার দুয়েক বলার চেষ্টা করলাম, আমরা শুয়ে পড়ার পর এঘরে ভুতুড়ে কাণ্ডকারখানা ঘটতে পারে, কিন্তু কোন সুযোগই দিল না ওরা। খানিক পরে, ক্লান্ত হয়ে পড়লাম সবাই। এবার শোয়ার আয়োজন করতে হয়।
ঝড়টার কথা মনে আছে? চিত হয়ে শুয়ে আরেকবার চেষ্টা করলাম। বলেছিলাম না একটা দুম, দুম শব্দ শুনেছি, যেটা আমি ছাড়া আর কেউ শোনেনি?
হ্যাঁ, তো? কিশোর বলল।
মানে
কীভাবে বলব বুঝতে পারছি না। আমি এখনও ওটা শুনতে পাচ্ছি, বলে ফেললাম ফস করে।
এখন শুনলে? রবিনের প্রশ্ন।
না, মানে প্রতিদিন গভীর রাতে শুনি। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যায় আর শব্দটা শুনতে পাই।
হয়তো বাড়ির পিছনে রেকুনেরা শব্দ করে, বাতলে দিল কিশোর।
বাইরেটা চেক করে দেখেছি আমি, বললাম। যাকগে, শব্দটা কিন্তু আসছে আমার ক্লজিটের ভিতর থেকে।
চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল ওদের। হাঁ করে ক্লজিটের দিকে চেয়ে রইল। ওদের ভাব-ভঙ্গি দেখে মনে হলো ভিতর থেকে এই বুঝি একটা ভিনগ্রহী বেরিয়ে এল!
তোমার কাছে ফ্ল্যাশলাইট আছে? প্রশ্ন করল কিশোর। আমি আমারটা নিয়ে এসেছি।
আমিও, জানাল রবিন।
গুড। আমরা অপেক্ষা করতে থাকি। তা হলে কিছু ঘটলে তৈরি থাকতে পারব, বলল কিশোর।
হঠাই ঘর ঠাণ্ডা হয়ে উঠলে কেঁপে উঠলাম আমরা। প্রদীপটা নিভু নিভু হয়ে এল। পরস্পর মুখ তাকাতাকি করলাম তিন বন্ধু।
দুম!
শব্দটা শুরু হয়েছে।
আঁতকে উঠল রবিন।
কিশোরের মুখের চেহারা ফ্যাকাসে।

জিনিসটা কী দেখা দরকার, বললাম।
বাতি জ্বলছে, কাজেই ফ্ল্যাশলাইটের প্রয়োজন নেই
অন্তত এখনও না।
এসো, ডাকলাম ওদেরকে। ক্লজিটের দরজাটা খুলি। ক্লজিটের কাছে হেঁটে গেলাম। বন্ধুরা আমার সঙ্গে আসেনি।
দুম!
ভিতরে কী আছে জানতেই হবে, জোর গলায় বললাম।
এবার একটানে ক্লজিটের দরজাটা খুললাম। সভয়ে ঢোক গিলোম। বিশাল ক্লজিট, ভিতরে হেঁটে ঢুকে পড়া যায়। দূরের কিনারা থেকে স্নান আলো আসছে। ওখানে আমার ক্যাম্পিং গিয়ার রয়েছে। মুখের সামনে থেকে কাপড়-চোপড় সরালাম। পরমুহূর্তে যা দেখলাম, কেউ বিশ্বাস করবে না।
কোঁকড়াচুলো এক মেয়ে দাঁড়িয়ে আমার ক্লজিটে। পরনে পায়ের পাতা পর্যন্ত ঝুল-খাওয়া প্রাচীন পোশাক। ক্লজিটের ভিতরে ফ্রীজারের হিম। থরথর করে হাঁটু কাঁপছে আমার। তবে সে সঙ্গে মাথাও কাজ করছে। আলোটা কোথায় দেখেছি মনে পড়ে গেছে। আতঙ্ক চেপে বসল বুকে।
ক্লজিটের কাছ থেকে পিছাতে শুরু করলাম। মেয়েটার দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারছি না, আবার মুখে কথাও জোগাচ্ছে না।
শেষমেশ মুখ খুলতে পারলাম।
কে… কে তুমি?
আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল মেয়েটি।
আমি মিশেল। তোমাকে আমার দরকার, জন!
বুকের ভিতরটা ধড়াস করে উঠল। মিশেল তো মারা গেছে।
আমি জন নই। কে জন? প্রশ্ন করলাম।
আমার ভাই, জবাব এল। ওকে খুঁজে পাচ্ছি না। মাকেও পাচ্ছি না। তুমি আমার মাকে দেখেছ?
মেয়েটি ওর প্রিয়জনদের খুঁজছে। শিউরে উঠলাম।
পিছিয়ে এসে দড়াম করে দরজাটা লাগিয়ে দিলাম। ভয় পেলাম, শব্দে বাবা-মা জেগে না যায়। ক্লজিটের দরজায় হেলান দিয়ে হাঁপাচ্ছি। চোখ বিস্ফারিত।
আমার দিকে চেয়ে রয়েছে কিশোর আর রবিন।
তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে ভূত দেখেছ, বলল কিশোর।
ঠিকই বলেছ। তোমরা দেখতে চাও? ক্লজিটের দরজা খুললেই দেখতে পাবে। লম্বা ড্রেস পরে দাঁড়িয়ে আছে, জবাবে বললাম।
অসম্ভব, বলল রবিন।

মোটেই না। নিজের চোখেই দেখো।
আচ্ছা, দেখছি, বলে ফ্ল্যাশলাইটটা তুলে নিল কিশোর।
ওটার দরকার হবে না, জানালাম।
আমার দিকে চেয়ে রইল ওরা, কী বলছি বুঝতে পারছে না। তবে শীঘ্রিই টের পাবে। ক্লজিটের উদ্দেশে এগোল দুজনে।
আমিও যোগ দিলাম ওদের সঙ্গে। নিজেই খুলে দিলাম দরজাটা। উঁকি মারলাম ভিতরে।
আলোটা তখনও জ্বলছে। ঠাণ্ডা বাতাসে নিজের শ্বাস-প্রশ্বাস দেখতে পাচ্ছি। ভিতরে পা রাখলাম। মিশেলকে খুঁজছি। কোথায় গেল, ও! পিছনের কোনার দিকে এগোলাম, ওকে যেখানে দেখেছিলাম। বন্ধুরা অনুসরণ করল আমাকে।
কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না, বলল কিশোর।
ও এখানেই আছে, বললাম। এবার অনুভব করলাম আমাকে কীসে যেন টানছে, অনেকটা গায়ের চামড়ার কাছে আসা ভ্যাকিউম ক্লিনারের হোসের মতন। আমাকে কাছে টানছে ওটা।
হাত বাড়ালাম অনুভব করার জন্য। বরফ পানি চলকে উঠল বুকের মধ্যে। হাতটা স্রেফ দেয়াল ভেদ করে চলে গেছে।
খাইছে!
আরি, এটা দেখো, বন্ধুদেরকে হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকলাম।
তোমরা নাও বিশ্বাস করতে পারো, কিন্তু এই দেয়ালে একটা গর্ত আছে। দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু হাতটা যদি এভাবে বুলাতে থাকো…
দেয়ালে হাত বুলালাম, এবার বাহু থেকে কাঁধ অবধি ঢুকিয়ে দিলাম ভিতরে।
দেখেছ? এখানে এক ধরনের ওপেনিং আছে, বললাম।
কিশোর আর রবিনের চোখ ছানাবড়া।
কোথায় ওপেনিং? রবিনের প্রশ্ন।
আমার ধারণা এটা চলে গেছে আত্মাদের জগতে-মানে ওপারে।
কিছু দেখতে পাচ্ছ? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
আগে কেন ভাবিনি জানি না, কিন্তু আমি মাথা গলিয়ে দিলাম ফাঁকটার মধ্য দিয়ে। কিন্তু ওপাশে কী আছে বলতে পারার আগেই ধপাস করে পড়ে গেলাম। আর পড়েছি আত্মাদের পৃথিবীতে। সে
অন্যপাশে নিজেকে আবিষ্কার করলাম আমি। কিন্তু ফিরে যাওয়ার পথ খুঁজে পেলাম না। আতঙ্কিত হয়ে চারধারে নজর বুলালাম। বহুদূর থেকে প্রতিধ্বনির মত কানে আসছে কিশোর আর রবিনের ডাক।
মুসা, কোথায় তুমি? মুসা! আমার নাম ধরে ডাকছে।

ভয়ে আর ঠাণ্ডায় হাত-পা জমে যাওয়ার দশা। খোলা জায়গাটা খুঁজে পেলে আবারও ক্লজিটে ফিরে যেতে পারতাম কিন্তু কোথায় সেই ওপেনিং? কানে আসছে শুধু দূরাগত ডাক। হারিয়ে গেছি আমি।
আমি, মুসা আমান, ওপারে-জীবিত-এবং-নিখোঁজ।
কোন কিছুতে হোঁচট খাইনি আমি, তারপরও পড়ে গেছি ফোকরটা দিয়ে। মনে হচ্ছে ভ্যাকিউম ক্লিনারের মাধ্যমে আমাকে শুষে নেওয়া হয়েছে।
ভীত আর বোকা-বোকা লাগছে। হাত দিয়ে চারধার চাপড়াচ্ছি। মার বাগানের মত স্যাঁতসেঁতে ভাব আর ধুলোর গন্ধ এখানে। মনে হচ্ছে ভেজা মাটিতে বসে আছি। ঠাণ্ডাটা অনুভব করতে পারছি। অন্ধকার সত্ত্বেও হলদেটে আকাশ দেখতে পাচ্ছি। পেটের ভিতরটা হঠাই গুলিয়ে উঠল।
এবার একটা আলো দেখতে পেলাম। মনে হলো একটা গাড়ি। আলোটা কাছিয়ে এলে ভাল করে দেখা গেল। চারধারে নজর বুলালাম। খাইছে, বাড়িগুলো কোথায়? আর রাস্তাটাই কেন ধুলোয় ভরা? এবার চাকার কাঁচকোচ শব্দ শুনতে পেলাম। ক্যারিজ বয়ে দুলকিচালে আমার দিকে ছুটে আসছে এক ঘোড়া। আজব কাণ্ড, ভাবলাম। কেউ তো আজকাল ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে না। এ শহরের কেউ না। এ শতাব্দীরই কেউ না…
আরি! ক্যারিজটার পথ থেকে ঝট করে পা সরিয়ে নিলাম। চালকের দিকে মুখ তুলে চাইলাম। হাস্যকর পোশাক তার পরনে। লোকটার মুখের দিকে চাইতেই আঁতকে উঠলাম।
ফ্যাকাসে মুখে চোখ নেই, শূন্য কোটর!
কিশোর, রবিন, তোমরা কোথায়? আর্তনাদ ছাড়লাম।
গাড়ির হেডলাইট নয়, ওয়াগনের এক পোল থেকে একটা লণ্ঠন ঝুলছে। চোখ সরু করে চাইলাম। ক্যারিজের পিছনে বসে এক মহিলা। এ-ও ফ্যাকাসে। ছোট এক বনেট পরা। খাইছে, এরও চোখ নেই।
তারমানে গোরস্থানে পৌঁছে গেছি আমি! দুপাশ হাতড়ালাম। ঘাস, শুকনো পাতা, আর একটা হেডস্টোন। সভয়ে হাত সরালাম। আঠাল ভাব! এটা গোরস্থান ঠিকই- তবে ১৬৯০ সালের! মনে হচ্ছে দুঃস্বপ্ন। দেখছি, কিন্তু আসলে তা না। ক্লজিট থেকে এখানে এলাম কীভাবে?
শার্টের বুকে হাত মুছলাম। নিজের দিকে চাইলাম।
এ হতে পারে না! চেঁচিয়ে উঠলাম। হাত-শরীর ভেদ করে মাটি অবধি দেখতে পাচ্ছি। ভূত হয়ে গেছি আমিও!
মুসা, আমি তোমার সাথে আছি, হঠাই এক লোকের কণ্ঠস্বর বলে উঠল। ঝট করে ঘুরে দাঁড়ালাম কণ্ঠটা লক্ষ্য করে। অস্পষ্ট, কুয়াশাচ্ছন্ন বাতাস ভেদ করে

মিটমিট করে চাইলাম, ভাল করে দেখতে চেষ্টা করছি। একণ্ঠটা আগেও শুনেছি।
দাঁড়ানোর চেষ্টা করো, কণ্ঠটা বলল। কেউ একজন আমার হাত ধরে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল। হাতটা অসম্ভব হালকা। এরমানে ___।
মিস্টার ম্যাকয়? ককিয়ে উঠলাম, মুখে কথা ফুটছে না। ___ থেকে দেখলাম। মি. ম্যাকয়। মা ঠিকই বলেছিল। এটা অন্য ভুবন। মি. ম্যাকয় আসলেই ভূত! এবং তাঁর সঙ্গে অন্যান্য ভূতেরা আছে!
মিস্টার ম্যাকয়? আমি এখান থেকে ফিরে যেতে চাই। আমাকে সাহায্য করুন, জড়ানো গলায় বললাম। আমি বাড়ি যাব!
চিন্তা কোরো না, মৃদু হেসে শান্ত স্বরে বললেন মি. ম্যাকয়।
ভয়ের কিছু নেই। শুধু দরজাটা খুঁজে নিতে হবে। ওটা কাছেপিঠেই, আছে।
একটু স্বস্তিবোধ করলাম। আশ্বাস পেয়েছি মি. ম্যায়ের কথায়।
কিন্তু দরজাটা কীসের? জিজ্ঞেস না করে পারলাম না।
যেটা দিয়ে আমরা এক জগৎ থেকে অন্য জগতে যাই, জবাব পেলাম।
আমরা বলতে কারা?
হেসে উঠলেন মি. ম্যাকয়।
সবাই, মুসা, প্রত্যেকে।
আপনি আমাকে শিগগির পার করে দিন, মিস্টার ম্যাকয়, অধৈর্য হয়ে বললাম। আগামী সপ্তাহে আমার স্কুল। তা ছাড়া সাঁতারের দলে নাম লিখিয়েছি আমি।
আবারও হেসে উঠলেন মি. ম্যাকয়।
ঘাবড়িয়ো না। চারপাশটা একটু ঘুরে দেখি এসো।
কী জন্যে?
দরজাটা খুঁজব না? ওটা মনে হয় এপাশেই আছে। বাতাসে হাত খ. চালালেন মি. ম্যাকয়। ভঙ্গিটা দেখে মনে হলো মাকড়সার জাল সরাচ্ছেন। একবার, দুবার, তিনবার চেষ্টা করলেন।
মিয়া এবার সহসাই ওঁর হাত ও কব্জি অদৃশ্য হয়ে গেল। ঠিক আমার ক্লজিটের গর্তটার মত একটা ফাঁক। হাতটা টেনে বের করে আবারও বাড়িয়ে দিলেন। ফের উধাও হয়ে গেল ওটা। টি
ওটা এখানে, বললেন, আমার চোখে চোখ রাখলেন। শিউরে উঠলাম।
মুসা, মুসা, তুমি শুনতে পাচ্ছ? জবাব দাও! কিশোরের উদ্বিগ্ন কণ্ঠ এখনও দূরাগত প্রতিধ্বনির মত শোনাচ্ছে।
মি. ম্যাকয়ের দিকে চাইলাম।
জবাব দাও, বাছা। ওরা শুনতে পাবে, বললেন তিনি।

আমি এখানে! চেঁচালাম। দরজাটা খুঁজে পেয়েছি! এখুনি আসছি! মি. ম্যাকয়ের দিকে ঘুরে দাঁড়ালাম। আচ্ছা, মিশেলের ব্যাপারটা কী? আমরা ওর হেডস্টোন খুঁজে পেয়েছিলাম। তারপর থেকে ও আমার ক্লজিটে দেখা দিচ্ছে।
মি. ম্যাকয়কে গম্ভীর দেখাল। ভয় পেয়ে গেলাম।
কী হলো? ত্রস্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম। আশঙ্কা করছি, ভয়ঙ্কর কিছু একটা শুনব।
তোমরা যখন মিশেলের হেডস্টোনটা বাসায় নিয়ে গিয়েছ তখন মিশেলও তোমাদের সাথে বাসায় চলে গেছে, ব্যাখ্যা দিলেন।
কিন্তু কেন?
ও তোমার মাধ্যমে আসতেই থাকবে, বাছা। ওর হেডস্টোনটা কোথায় ছিল খুঁজে পাচ্ছি না আমরা। মিশেল কারও সঙ্গ চাইছে, কেয়ার চাইছে। চাইছে কেউ একজন ওর সাথে থাকুক-এপারে।
একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম মি. ম্যাকয়ের দিকে। নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছি না।
এটা অনেকটা ঘুমের মধ্যে হাঁটার মত ব্যাপার। নিজের মা আর পরিবার হারিয়ে অস্থির হয়ে আছে মিশেল। ও একজন বন্ধু খুঁজছে, যার সাহায্যে পৃথিবীর মায়া ছেড়ে আমাদের এখানে চলে আসতে পারে, বলে গেলেন মি. ম্যাকয়। ইজি।
আমি ওর বন্ধু হতে চাই না। আমাকে আমার জগতে ফেরত পাঠান, মি. ম্যাকয়কে বললাম।
শরীরটা ঠেলে দাও, যেখান থেকে এসেছ আবার সেখানে ফিরে যেতে পারবে।
মাথাটা গলাতেই হুমড়ি খেয়ে পড়লাম ক্লজিটের ভিতরে। কিন্তু মি. ম্যাকয় কী যেন বলছেন শুনে ঘুরে চাইলাম।
সাবধান, মুসা! অন্য দরজাগুলো দিয়ে ঢুকে পোড়া না যেন!
অন্য দরজা মানে? চেঁচিয়ে উঠলাম। সেগুলো আবার কোথায়?
কিন্তু জবাব পাওয়ার আগেই বন্ধুরা টেনে বের করে নিল আমাকে।
তোমার সাথে জরুরী আলাপ আছে, বলল কিশোর।
কী এত জরুরী আলাপ? ডুগি প্রশ্ন করল। সকালে উঠেই ওকে ফোন করেছি আমরা, ঝটপট চলে আসতে বলেছি।
কুঁকড়ে গেলাম আমি। ডুগি কি বিশ্বাস করবে এসব কথা? আমাকে পাগল ঠাওরাবে না তো?
কসপ্তা আগে ঝড়টা হয়ে যাওয়ার পর থেকে এখানে অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটছে, বললাম ডুগিকে।
যেমন? অ্যামপ্লিফায়ার অফ করে প্রশ্ন করল ও।
সত্যিকারের ভুতুড়ে অ্যাডভেঞ্চারের মত, বলল রবিন।

হ্যাঁ, একেবারে সত্যি। এবং ঘটছে মুসার ক্লজিটের ভিতরে, জানাল কিশোর।
ডুগিকে কাল রাতের ক্লজিটের ঘটনা, মি. ম্যাকয় ও মিশেলের কথা, গোরস্থানে আমার অভিজ্ঞতা সবই খুলে বললাম আমরা। কীভাবে। আমি দরজা গলে পড়ে যাই-এবং কোথায় হাজির হই তাও জানালাম।
আজ রাতে আবারও মুসার ঘরে থাকব আমরা, বলল রবিন। তবে এবার আমরা তৈরি থাকব।
কীসের জন্য তৈরি, খোদা মালুম।
আমিও থাকব, বলে উঠল ডুগি।
ভেরি গুড, খুশির গলায় বললাম আমি।

.
আরি, আন্টির গ্রীনহাউসে ওটা কীসের আলো? প্রশ্ন করল রবিন।
আমাকে জিজ্ঞেস কোরো না, মনে মনে বললাম। মি. ম্যাকয় কি এটার কথাই বলতে চেয়েছিলেন?
সাবধান, মুসা! অন্য দরজাগুলো দিয়ে ঢুকে পোড়া না যেন! এখনও তার কথার প্রতিধ্বনি কানে বাজছে।
আমি থামাতে পারার আগেই সোজা গ্রীনহাউসে গিয়ে ঢুকল ডুগি। একদৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে আলোটার দিকে। এ দাঁড়াও! ফিসফিস করে পিছু ডাকলাম। চাই না বাবা-মা জেগে যাক। ডুগি!
দৌড়ে গেলাম, কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। ডুগি অদৃশ্য। গ্রীনহাউসে আরেকটা দরজা ছিল! তার ভিতর দিয়ে পড়ে গেছে ডুগি!
গলা শুকিয়ে গেল। কাঠ-পুতুল হয়ে গেছি। ওপারে পৌঁছে কতটা আতঙ্কিত বোধ করবে ডুগি কল্পনা করলাম। এখন আমাদের সমস্যা শুধু ভূতেদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া নয়। ডুগিকে যেভাবে তোক ফিরিয়ে আনতে হবে।
কিন্তু কীভাবে?
মুসা, আমি কোথায়? চেঁচিয়ে উঠল ডুগি। সন্ত্রস্ত। ওপার থেকে প্রতিধ্বনি তুলছে ওর কণ্ঠ। বাঁচাও! জলদি এসো! আমাকে নিয়ে যাও! আমি হাত-পায়ের ভিতর দিয়ে মাটি দেখতে পাচ্ছি। বাঁচাও!
চারধারে নজর বুলিয়ে বন্ধুদেরকে খুঁজলাম। কোথায় ওরা? ডেনে আলো জ্বলছে। কম্পিউটার অন করেছে ওরা। ওখানে ভয়ানক ঠাণ্ডা। তার মানে ভূত এবং আরও দরজা, মি. ম্যাকয় যেমনটা বলেছিলেন।
কী করছ তোমরা? চেঁচালাম। এখন গেম খেলার সময় নয়। ডুগি ওপাশে পড়ে গেছে!

শান্ত হও, মুসা, বলল কিশোর। আমি তোমার উপকারই করছি। এই ভূতের গেম থেকে বের করে ফেলব ওদের পরের মুভটা কী।
এটা কি যুদ্ধ নাকি? শীঘি এসো তোমরা। ডুগি পড়ে গেছে। এখানে আরেকটা ওপেনিং আছে! ওকে খুঁজতে যেতে হবে। রবিন কোথায়?
তারমানে? ও তো এখানেই আছে।
চারপাশে দৃষ্টি বুলালাম। কামরাটা ঠাণ্ডা আর ফাঁকা। পরস্পরের দিকে চাইলাম আমরা। উপলব্ধি করলাম, রবিনও পড়ে গেছে। আরেকটা দরজা! আমাদের অজানা এরকম আরও কটা দরজা আছে? কাল সকালে বাবা কিংবা মা যদি কোনও একটার ভিতর দিয়ে পড়ে যায়?
কিশোর, মুসা, বাঁচাও! আমি পড়ে গেছি! রবিনের কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনি তুলল।
তোমরা আমাকে বাঁচাও! আমি ভূত হয়ে যাচ্ছি! আর্তনাদ ছাড়ল ও। এরপর আর ওর গলা শুনলাম না।
হাঁটুতে জোর পাচ্ছি না। কিশোর বাক্যহারা।
আমাদেরও ওখানে ঢুকতে হবে, বললাম ওকে।
তাই তো মনে হচ্ছে, বলল ও।
রবিন! চেঁচালাম, তুমি কথা বলতে থাকো যাতে আমরা তোমার গলা পাই। ডুগিও ওখানে আছে, খুঁজে দেখো! বেশি দূরে কোথাও যেয়ো না। ডুগিকে খুঁজে নিয়ে এক সাথে থাকো। আমরা আসছি!
আমরা আমার রুমে দৌড়ে এলাম ফ্ল্যাশলাইট নিতে। তারপর ক্লজিটের ভিতরে ডাইভ দিলাম পানিতে ঝাপানোর ভঙ্গিতে। যত দ্রুত সম্ভব পৌঁছতে হবে ওপারে।
গোরস্থানের ভেজা মাটিতে গড়িয়ে পড়লাম আমরা। কেমন পুরানো ছাতা গড়া গন্ধ ভক করে নাকে এসে লাগল।
অদ্ভুত জায়গা, চারধারে চেয়ে মন্তব্য করল কিশোর।
ভয় পাচ্ছ?
না, তুমি তো ঠিকমতই ফিরে গিয়েছিলে।
হ্যাঁ, এসো ওদেরকে খুঁজে নিয়ে এখান থেকে জলদি সটকে পড়ি।
ফ্ল্যাশলাইট চেপে ধরলাম আমরা। আমার শার্ট ধরে থাকল কিশোর, আমরা যাতে আঁধারে আলাদা হয়ে না যাই।
কিশোর, মুসা! রবিনের গলা।
নোড়ো না! আমরা এখুনি আসছি, অভয় দিয়ে বললাম।
সামনেটা হাতড়াচ্ছি, সামনে-পিছনে ফ্ল্যাশলাইট বুলাচ্ছি। ঠিকমত দৃষ্টি চলছে না।
কিশোর, মুসা! আমাদের বাঁচাও। আমরা- ফের রবিনের কণ্ঠ।
বাঁচাও, মুসা! আমি হারিয়ে যাচ্ছি! ককিয়ে উঠল ডুগি। রবিন! রবিন!

তোমরা একসাথে আছ? চেঁচালাম আমি।
ছিলাম, কিন্তু রবিন একটা গর্তে পড়ে গেছে! হায়, খোদা, ওটা একটা কবর! খোলা এক কবরে আটকা পড়েছে ও! চেঁচাল ডুগি। কী বিপদেই না পড়া গেছে। কি আরেকটু সামনে বেড়ে হাতড়াতে লাগলাম অন্ধের মতন। ফ্ল্যাশলাইটের আলো ক্রমেই ঝাপসা হয়ে আসছে। ভোলা কোন কবরে পড়ে গেলে মহাবিপদ হয়ে যাবে! আমি এখনই কবরে যেতে চাই না।
শেষমেশ ধাক্কা খেলাম ডুগির সঙ্গে।
মুসা! থ্যাঙ্ক গড! এটা কোন্ জায়গা? কুঁপিয়ে উঠল ও।
এটা ওপারের ভুবন, ডুগি, বললাম।
কিন্তু তারমানে এরা সব ভূত! আর আমরাও ভূত হয়ে যাচ্ছি। বাপ রে, আমি বাড়ি যাব!
সাহস হারিয়ো না। একটা ওপেনিং খুঁজে পেলেই ফিরে যেতে পারব আমরা। রবিনকেও উদ্ধার করতে হবে। তুমি শান্ত থাকো।
বুক ভরে শ্বাস টানল ও।
ঠিক আছে, বলল। কিন্তু হঠাই এক হাত তুলে চোখ ঢাকল ডুগি। অপর হাতে নির্দেশ করছে অন্য কিছু একটা। মুসা, ওরা কারা?
মুসা! ওরা আমাদের দিকেই আসছে! পিছন থেকে চেঁচাল কিশোর।
একদল ছায়ামূর্তিকে আমাদের উদ্দেশে আসতে দেখলাম।
খাইছে, কারা ওরা? কী ওরা?
মিস্টার ম্যাকয়, আর্তনাদ ছাড়লাম। আমাদের বাঁচান! শুনতে পাবেন কিনা জানি না, কিন্তু চেঁচাতেই লাগলাম।
কিশোর, ডুগি আর আমি পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে রয়েছি। নিস্পন্দ। ছায়ামূর্তিগুলোকে আমাদের দিকে ভেসে আসতে দেখলাম। ক্রমেই কাছিয়ে আসছে। মুখ দেখতে পাচ্ছি-ফ্যাকাসে, চোখ নেই। ওরা সব ওপারের জীব!
মুসা, আমাকে এখান থেকে বের করো! গর্তের ভিতর থেকে চেঁচিয়ে উঠল রবিন।
হ্যাং অন পাল্টা চেঁচালাম। হাল ছেড়ো না!
এসময় রক্ত হিম করা এক গোঙানির শব্দ কানে এল। পরক্ষণে ওদের ফ্যাকাসে, চোখহীন মুখগুলোকে কাছিয়ে আসতে দেখলাম। হাঁ করা মুখ থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে।
আআহহহহ, চোয়াল ঝুলিয়ে গুঙিয়ে উঠল ওরা। বীভৎস দৃশ্য। টিভি শো হলে সুইচ অফ করে দিতাম।
আআহহহহ!
চোখ ঢেকে আর্তনাদ ছাড়লাম আমরা।

হল ধারাল নখ বাগিয়ে আমাদের দিকে দুহাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসছে কুৎসিত মূর্তিগুলো। ওদের ফ্যাকাসে, হাড্ডিসার মুখের চেহারা কাছ থেকে দেখতে পাচ্ছি। টলতে টলতে আরও খানিকটা এগিয়ে এল। চোখের কোটর থেকেও পচা গন্ধ বেরোচ্ছে নরকের জীবগুলোর। মি. ম্যাকয় আর মিশেলকে দেখলে ভয় করে না, অথচ এরা যে কী ভয়ঙ্কর বলে বোঝানো যাবে না!

প্রেতাত্মাগুলো এগিয়ে আসছে, চোখ বুজে দাঁড়িয়ে রইলাম আমরা পরস্পরকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে। এবার হঠাই পিছন থেকে চেনা এক কণ্ঠ কানে এল।

তোমরা এক পাশে সরে যাও, বাছারা, মি. ম্যাকয় বললেন। ভাগ্যিস উনি আমার ডাক শুনতে পেয়েছেন। ওরা চটপটে না। এসো আমার সাথে।

না! চেঁচিয়ে উঠল ডুগি। আপনার সাথে কেন যাব? আপনি কে না কে।

উনি আমার পরিচিত, ডুগি, বলে ওর বাহু ধরে টানলাম। বন্ধু মানুষ।

আমাদেরকে ধরতে যাবে এসময় আমরা ছায়ামূর্তিগুলোর হাত এড়ালাম। সামনে হাত বাড়িয়ে, গোঙাতে গোঙাতে চলে গেল ওরা, মুখ-চোখ থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। দুর্গন্ধে টেকা দায়।

ওরা কোথায় যাচ্ছে? ওরা এত কুৎসিত কেন? মি. ম্যাকয়কে প্রশ্ন করলাম।

এরা স্রেফ ঘুরে বেড়ায়। বেঁচে থাকতে এরা চোর-ডাকাত জলদস্যু ছিল। তাই এখানে এসে শান্তি পায়নি। অস্থির হয়ে ঘুরে বেড়ায় আর অন্যদেরকেও দলে টানতে চায়। কাজেই ওদেরকে দেখলে পথ ছেড়ে দৌড়ে সরে দাঁড়াবে।

শিউরে উঠলাম। কুৎসিত জীবগুলো যখন আমাদেরকে ধরতে আসছিল তখন ফ্ল্যাশলাইট হারিয়ে ফেলেছি কিশোর আর আমি।

এসো, তোমাদের বন্ধুকে সাহায্য করতে হবে, মি. ম্যাকয় বললেন।

আমাদের বন্ধু একটা কবরে পড়ে গেছে। ওকে বের করে নিয়ে বাড়ি ফিরতে চাই, মি. ম্যাকয়কে বললাম।

তা হলে দেরি করা যাবে না, গম্ভীর দেখাল মি. ম্যাকয়কে।

পেট মুচড়ে উঠল।

কেন?

দরজাগুলো শীঘ্রিই বন্ধ হয়ে যাবে, কেন বলতে পারব না। তোমরা যদি আজ রাতে ফিরে যেতে না পারো তবে আমাদের সাথে, থেকে যেতে হবে। চিরদিনের জন্যে।

এবার আসল কথা জানা গেল! ভয়ে অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল। মি. ম্যাকয় কখনোই বলেননি দরজাগুলো বন্ধ হওয়ার কথা…বলেননি আমরা চিরজীবনের জন্য আটকা পড়তে পারি ওপারের ভুবনে!

একথা আগে বলেননি কেন? পা চালিয়ে তাঁর নাগাল ধরে প্রশ্ন করলাম আমি।

তোমরা ভয় পাবে বলে, বললেন মি. ম্যাকয়। এক জগৎ থেকে অন্য জগতে চলাচলের সময় মনটাকে স্বচ্ছ রাখতে হয়।
কিশোর! মুসা! জলদি এসো! এখানে ভীষণ ঠাণ্ডা! রবিনের চিৎকার।
মি. ম্যাকয় অদৃশ্য হয়ে গেলেন মুহূর্তের মত, তারপর ফিরে এলেন একটা মই নিয়ে। খাইছে, ঠিক একজন জীবিত মানুষের মত লাগছে এখন তাঁকে।
এই যে, মই নামিয়ে রবিনের উদ্দেশে বললেন, এটা দিয়ে উঠে এসো, বাছা!
মই বেয়ে হাঁচড়েপাঁচড়ে উঠে এল রবিন। ও পুরোটা উঠতে পারার আগেই কিশোর, ডুগি আর আমি মিলে টেনে তুললাম ওকে।
জলদি করো! হাতে সময় নেই! দরজাগুলো বন্ধ হয়ে যাবে! তাগাদা দিয়ে বললাম।
কী বললে? রবিন কিছুই বুঝতে পারছে না।
চলে এসো! বললাম।
তাড়াহুড়ো করতে হবে, তারপরও পৌঁছতে পারব কিনা জানি না। দরজাগুলো খুঁজে পাওয়া কঠিন। নতুন দরজা প্রতিনিয়ত খুলছে আর পুরানোগুলো বুজে যাচ্ছে। বাবা-মার জন্য ভয় পাচ্ছি। তারা হয়তো কাল সকালে ঘুম থেকে উঠে নিজেদেরকে আবিষ্কার করবে সপ্তদশ শতাব্দীতে।
মিস্টার ম্যাকয়, সবচেয়ে কাছের দরজাটা কোথায়? আমরা রেডি! চেঁচিয়ে বললাম।
পরমুহূর্তে আমার পাশে উদয় হলেন তিনি।
এদিকে, ইঙ্গিত করে অনুসরণ করতে বললেন। গোরস্থানের মাঝামাঝি পৌঁছে হাত উপরে-নীচে নাড়তে লাগলেন। আমার ধারণা এটা তোমার বেডরুম।
রবিন আতঙ্কিত।
যদি না হয়? বলল। মি. ম্যাকয়কে অনুসরণ করতে রাজি নয় ও।
আমাদের এখন যেতে হবে, তাড়া দিলাম। জলদি করো!
হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে মি. ম্যাকয়, আমরা অনুগমন করব বলে অপেক্ষা করছেন।
এসো, হাতে সময় কম, বললেন তিনি।
রবিন দ্বিধা না করলে এতক্ষণে বাড়ি পৌঁছে যেতাম আমরা। ওকে অনুরোধ-উপরোধ করছি, কিন্তু বান্দা নড়বে না। বিরাট ভুল। দু সেকেণ্ডের মধ্যে ঠাণ্ডা বাতাস আর পচা দুর্গন্ধ অনুভব করলাম আমরা।
ওই দেখো, ওরা আমাদের দিকেই আসছে, চেঁচিয়ে উঠল ডুগি।
লাথি মেরে কবরস্থানের মাটি ছিটিয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে।
দুর্গন্ধময় প্রেতাত্মারা। আমরা সরে যাওয়ার আগেই আমাদের গায়ের উপর এসে পড়ল। আমাদেরকে ফেলে দিল মাটিতে। চারদিক অন্ধকার। দুর্গন্ধে প্রাণ

ওষ্ঠাগত।
হাঁচড়েপাঁচড়ে উঠে দাঁড়িয়ে নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করলাম। আমি এখন বলতে গেলে অদৃশ্য। এতটাই স্বচ্ছ, মিলিয়ে গেছি প্রায়!
আর দেরি কোরো না। এখানে থাকলে আমরাও ভূত হয়ে যাব! চিৎকার ছাড়লাম বন্ধুদের উদ্দেশে।
ডুগির হাত আর রবিনের বাহু চেপে ধরলাম। ওদেরকে যে ধরেছি টেরই পেলাম না প্রায়। ওরাও অদৃশ্য মত হয়ে গেছে। কিন্তু কিশোর কোথায়? হঠাৎ ওর চাপা গোঙানি কানে এল।
বাঁচাও! ভূতগুলো আমাকে ধরে ফেলেছে! নড়তে পারছি না আমি!
আমরা আর বাড়ি ফিরে যেতে পারব না, হাহাকার করে উঠল রবিন। ডুগি নিপ। ঘটনার আকস্মিকতায় স্তব্ধ।
তোমরা এখান থেকে নোডড়া না, ওদেরকে বললাম। কিশোরকে উদ্ধার করতে হবে। ওকে আমিই টেনে এনেছি এসবের মধ্যে।
প্রেতাত্মাদের হাত থেকে ওকে বাঁচাব কীভাবে জানি না, কিন্তু যা করার দ্রুত করতে হবে এটা জানি। দরজার কাছে মি. ম্যাকয় আর কতক্ষণ অপেক্ষা করবেন?
রবিন বেয়ে উঠেছিল সেই মইটা আঁকড়ে ধরলাম। ভূতের দল মেঘের মত ভেসে চলে যাচ্ছে। কিশোর ওদের আলখিল্লা কিংবা অন্য কোন কিছুর আড়াল থেকে সাহায্যের জন্য চেঁচাচ্ছে। ওর গলা পাচ্ছি, কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না।
মইটা হিঁচড়ে ওদের পিছনে দৌড়ে গেলাম। নাগাল পেয়ে মইটা তুলে প্রেতেদের উপর নামিয়ে আনলাম। জিনিসটা ভারী হলেও আমি সর্বশক্তিতে আঘাত করেছি।
ভূতের দলকে ভেদ করে চলে গেল মইটা। ওরা যেন দুর্গন্ধময় মাকড়সার ঝুলের কালো এক মেঘ। কিন্তু এতে কাজ হলো! বিচ্ছিন্ন কুয়াশার মত ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল ওরা। মইটা আবারও তুলে ধরলাম। আবারও কুয়াশার মত ছড়িয়ে গেল ভূতগুলো। এবার মাটিতে বসে থাকতে দেখলাম কিশোরকে। দুহাত দিয়ে মাথা ঢেকে রেখেছে। প্রকাণ্ড এক বুদ্বুদের মতন স্বচ্ছ দেখাচ্ছে ওকে। ভূতগুলো কোথায় হারিয়ে গেছে দেখার জন্য দাঁড়ালাম না।
দৌড়ে গেলাম ওর কাছে।
উঠে পড়ো! তুমি এখন ফ্রী! এসো! বাহু ধরে একটানে দাঁড় করিয়ে দিলাম। ওজনহীন মনে হলো ওকে।
এবার রবিন আর ডুগির কাছে দৌড়ে গেলাম।

জলদি করো! মি. ম্যাকয়ের ডাক কানে এল। কোন ভূতকে দেখে আগে কখনও এতটা স্বস্তি পাইনি। পরস্পরকে চেপে ধরে যথাসম্ভব দ্রুত টলতে টলতে তাঁর কাছে পৌঁছলাম।
এটাই কি দরজা? প্রশ্ন করলাম।
ঢুকে পড়ো, বাছা। দেরি কোরো না। ঢুকে পড়ো! ঢুকলেই বুঝতে পারবে কোথায় রয়েছে।
জন!
খাইছে! কণ্ঠটা চিনতে পারলাম। ঘুরে দাঁড়ালাম ধীরে ধীরে।
মিশেল! ভুলেই গিয়েছিলাম ওর কথা! মিশেল, ওর হেডস্টোন আর আমার ভূতশিকারি মা ছিল বলেই এই ভূতের রাজ্যে আটকা পড়েছি আমরা।
লম্বা ড্রেস পরে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে মেয়েটি, মুখের চেহারা বিষণ্ন।
জন! আমাকে ছেড়ে যেয়ো না! প্লিজ! কেঁদে উঠল। ওর চোখজোড়া ছায়াময়, গভীর আর অতলস্পর্শী। ওর এখনও ধারণা আমি জন-ওর ভাই। ভাবনাটা ঘাবড়ে দিল আমাকে। ও ছোট হলে কী হবে ওকেও ভয় পাই আমি।
মিস্টার ম্যাকয়! অনুনয় করলাম। ওকে নিয়ে কী করব? আমি এখানে ওর সাথে থাকতে পারব না, আবার সাথে করে নিয়েও যেতে পারব না!
তুমি তোমার মত চলে যাও, মৃদু কণ্ঠে বললেন তিনি। আমরা মিশেলকে বাড়ি পৌঁছে দেব। তোমার মার কাজের ফলে মিশেলের মাকে খুঁজে বের করা গেছে। এখন এসো! হয়।
অদৃশ্য ফোকরের ভেতরে অলিম্পিক সাঁতারুদের মত করে ডাইভ দিলাম আমরা। জীবন-মৃত্যুর মধ্যে দৌড় প্রতিযোগিতা হচ্ছে আমাদের। এমনকী রবিনও এবার আর ইতস্তত করল না।

.

ডুগি মাথা ডলছে।
মুসা, ক্লজিটে এত জিনিস ঠুসেছ কেন? তোমার স্কেটে লেগে মাথায় ব্যথা পেয়েছি। বলল।
গুণে ফেললাম ঝটপট। চার! সবাই ঠিকঠাক মত ফিরতে পেরেছি।
এতক্ষণ এসব কী ঘটল বলো তো? কিশোর বলল।
এ নিয়ে কালকে কথা বলা যাবে, বলল রবিন।
বিছানায় ক্লান্ত শরীর এলিয়ে দিলাম আমরা। বুজে এল চোখ।

.

বাসার কাউকে কিছু বলিনি আমরা। বললে বিশ্বাস করবে না, অযথা ঝামেলা বাড়িয়ে লাভ কী? আসলে কেউই বুঝবে না এবং বিশ্বাসও করবে না। ওখানে

নিজেরা গেলে বিশ্বাস করত।
তা তোমাদের ভাগ্য ভাল, তোমরা অমন বিপদে পড়নি। যারা পড়েছে। তাদের পরামর্শটা নাও। মাঝরাতে যদি তোমার ক্লজিট থেকে দুপ-দাপ শব্দ আসে তা হলে স্রেফ উপেক্ষা করবে।
আমারও তা-ই করা উচিত ছিল।

ভলিউম ১০৪/২ – নেকড়ের বনে – তিন গোয়েন্দা – শামসুদ্দীন নওয়াব – সেবা প্রকাশনী

উলফ লেক বাস স্টেশনে বাস থেকে নামলাম। কড়া রোদ লাগছে চোখে। কপালে হাত রেখে রোদ আড়াল করে তাকালাম ছোট্ট পার্কিং লটটার দিকে। সিডার আঙ্কেল ও জুলি আন্টি এসেছেন কি না দেখছি।

আঙ্কেল-আন্টির চেহারা মনে নেই আমার। শেষ দেখেছি চার বছর বয়েসে। তবে আশা করি এত বছর পরেও ঠিকই চিনতে পারব।

উলফ লেকের বাস স্টেশনটা খুবই ছোট। মস্ত একটা পার্কিং লটের মধ্যে ছোট্ট একটা কাঠের ছাউনি। লোকজনের ভিড় নেই।

কটা সুটকেস? গর্জনের মত শোনাল ড্রাইভারের কণ্ঠ। অক্টোবরের ঠাণ্ডা আবহাওয়াতেও ওর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। ধূসর ইউনিফর্মের বগলের কাছটা ঘামে ভেজা।

একটা, জবাব দিলাম।

বাস স্টেশনের অন্য প্রান্তে, একটা গ্যাস স্টেশন ও একটা ছোট জেনারেল স্টোর। তার ওপাশে বন। ডাল আঁকড়ে থাকা শরতের হলদে-বাদামী পাতাগুলো রোদে চকচক করছে। ঝরে পড়া শুকনো পাতা মৃদু সরসর শব্দ তুলে গড়িয়ে যাচ্ছে পার্কিং লটে।

ঘোঁতঘোঁত করে ঘুরে দাঁড়াল ড্রাইভার। হ্যাঁচকা টানে তুলে ফেলল। ব্যাগেজ কম্পার্টমেন্টের দরজা। কালো রঙের একটা সুটকেস টেনে বের করল। এটা?

মাথা ঝাঁকালাম। হ্যাঁ। ধন্যবাদ।

উলফ লেকে একমাত্র আমিই নেমেছি।

ঠাণ্ডা বাতাসে গায়ে কাঁটা দিল আমার। শীতের পোশাক সুটকেসে ভরে দিয়েছে তো মা

খুব তাড়াহুড়া ছিল মা-বাবার। ভুলে যদি না দিয়ে থাকে তো বিপদেই পড়ব।

আমাদের স্কুলের হ্যালোউইনের ছুটির ঠিক আগে এভাবে জরুরি কাজে ডাক পড়বে ওদের, গ্রীন হিলস ছেড়ে চলে যেতে হবে, ভাবেনি। যাওয়ার আগে অন্তত দুই সপ্তাহ আমার থাকার মত একটা জায়গা ঠিক করে দিতে হয়েছে। দুসপ্তার বেশিও থাকতে হতে পারে আমার, ঠিক নেই। মুসারা সপরিবারে বেড়াতে চলে গেছে। আর কিশোররা রকি বিচ থেকে আসেনি এবার। ওরা এলে আমার থাকার অসুবিধে হত না। যাই হোক, অনেক চিন্তাভাবনা করে শেষে সিডার আঙ্কেল আর জুলি আন্টিকেই পছন্দ হয়েছে মা-বাবার। সিডার আঙ্কেল আমার দূর সম্পর্কের চাচা।

আমার কাঁধে ঝোলানো ক্যামেরার ব্যাগটা সোজা করলাম। বাসযাত্রার পুরো সময়টাই ওটা আমার কোলের ওপর রাখা ছিল। ব্যাগেজ কমার্টমেন্টে রাখিনি, ঝাঁকুনিতে গড়াগড়ি খেয়ে নষ্ট হয়ে যাবার ভয়ে।

এই ক্যামেরাটা এখন আমার কাছে সবচেয়ে দামি জিনিস। এটা ছাড়া কোথাও যাই না আমি। এমনকী চোখের আড়াল করতেও রাজি নই।

চত্বরের ওপর দিয়ে সুটকেসটা আমার দিকে ঠেলে দিল ড্রাইভার। দড়াম করে লাগিয়ে দিল ব্যাগেজ কম্পার্টমেন্টের দরজা। বাসে উঠতে গিয়ে ফিরে তাকাল আমার দিকে। নিতে আসবে কেউ?

আসবে, জবাব দিয়ে আবার তাকালাম সিডার আঙ্কেল আর জুলি আন্টি আসছেন কিনা দেখার জন্য।

কাদায় মাখামাখি নীল রঙের একটা ভ্যানকে চাকার তীক্ষ্ণ শব্দ তুলে পার্কিং লটের দিকে এগোতে দেখলাম। হর্ন বাজল। প্যাসেঞ্জার সিটের জানালা দিয়ে বেরিয়ে এল একটা হাত। আমার উদ্দেশে নাড়াচ্ছে কেউ।

ওই যে, এসে গেছে। বাস ড্রাইভারকে বললাম আমি। সাড়া না পেয়ে ফিরে তাকিয়ে দেখি বাসে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিয়েছে ও। কেমন হিসহিস শব্দ করল বাসটা, গোঙাল, তারপর চলতে শুরু করল।

অ্যাই, রবিন! ভ্যান থেকে ডাকলেন আমাকে জুলি আন্টি।

আমার সুটকেসটা তুলে নিয়ে প্রায় লাফাতে লাফাতে এগোলাম। ওদের দিকে। আমার কাছে এসে ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষল ভ্যানটা। ড্রাইভিং সিট থেকে নামলেন সিডার আঙ্কেল। অন্যপাশে প্যাসেঞ্জার সিট থেকে নেমে দৌড়ে এলেন জুলি আন্টি।

দুজনেই বেশ মোটাতাজা। ওঁদেরকে দেখে অতি পেটুক নেকড়ের চেহারা ভেসে উঠল চোখের সামনে। দুনিয়ায় এত প্রাণী থাকতে কেন যে নেকড়ের কথা ভাবলাম, জানি না।

জুলি আন্টি আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, রবিন, তোমাকে দেখে কী যে খুশি হয়েছি! তুমি আসাতে খুব ভাল লাগছে!

আমাকে ছেড়ে দ্রুত পিছিয়ে গেলেন তিনি। এহহে, আমি তোমার, ক্যামেরা কেসটা নষ্ট করে দিচ্ছি!

না না, ঠিক আছে, কেসের ফিতে ঘুরিয়ে ক্যামেরাটা অন্যপাশে সরাতে সরাতে জবাব দিলাম, এত নরম না যে নষ্ট হবে।

হাসিমুখে আমার সঙ্গে হাত মেলালেন সিডার আঙ্কেল, তারপর পিঠে চাপড় দিলেন। বাতাসে উড়ছে তাঁর কোঁকড়া কালো লম্বা চুল।

বয়েসের তুলনায় অনেক বড় হয়ে গেছ, আমার আপাদমস্তক দেখলেন তিনি। তা বাসে আসতে কেমন লাগল?

প্রচুর ঝাঁকুনি, জবাব দিলাম। একটা গর্তও তো বাদ দেয়নি ড্রাইভার, সবগুলোতে চাকা ফেলেছে। আর আমার পাশের ভদ্রলোক সারাক্ষণ হিক্কা তুলেছেন, একনাগাড়ে।

জুলি আন্টি হাসলেন। বাহ্, বেশ মজার যাত্রাই তো!

আমার ক্যামেরা কেসের দিকে চোখ নামালেন সিডার আঙ্কেল। মনে হচ্ছে ছবি তুলতে খুব পছন্দ করো?

মাথা ঝাঁকালাম। হ্যাঁ। বড় হয়ে ফটোগ্রাফার হবার ইচ্ছে আছে আমার। আপনাদের দুজনের মত। তিনি

হাসি চওড়া হলো ওঁদের। খুশি হয়েছেন মনে হলো।

কিন্তু দ্রুত মলিন হয়ে গেল সিডার আঙ্কেলের হাসি। খুব কঠিন পেশা। প্রচুর ঘোরাঘুরি করতে হয়, দূর-দূরান্তে যেতে হয়। এক জায়গায় বেশিদিন থাকতে পারি না আমরা।

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন জুলি আন্টি। সে-কারণেই এতকাল তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি। আবার আমাকে জড়িয়ে ধরলেন তিনি।

আমি আশা করেছিলাম আপনাদের সঙ্গে কোথাও ছবি তুলতে যাব, আমি বললাম। আপনাদের কাছ থেকে ছবি তোলার টেকনিক শিখব।

নিশ্চয় যাবে, হেসে উঠলেন সিডার আঙ্কেল। আমরা যা যা জানি, সবই শেখাব তোমাকে।

বেশ কিছুদিন তো থাকবে, জুলি আন্টি যোগ করলেন। কোনও চিন্তা নেই, ফটোগ্রাফি শেখার প্রচুর সময় পাবে।

তবে এই পার্কিং লটে দাঁড়িয়ে থাকলে প্রচুর সময় আর থাকবে না, কমে যাবে, হেসে বললেন সিডার আঙ্কেল। একটানে আমার সুটকেসটা তুলে নিয়ে ভ্যানের পিছনে ফেললেন তিনি। না গাড়িতে চড়লাম আমরা। কয়েক সেকেণ্ড পরেই বাস স্টেশন ছেড়ে রওনা হলো ভ্যান, শহরের দিকে।

পোস্ট অফিসের পাশ কাটালেন আঙ্কেল। তারপর ছোট একটা মুদি দোকান, আর একটা ধোপর দোকান। একটা রাস্তা পেরিয়ে এসে বনে ঢুকলাম আমরা। ঘন বন চারপাশ থেকে যেন গ্রাস করে নিল আমাদের।

মাত্র এই কটা দোকানপাট? অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

রবিন, জুলি আন্টি বললেন, এসেছ তো বন দেখতে, শহর নিয়ে এত মাথাব্যথা কেন?

হ্যাঁ, শহরটা ছোট না বড়, তাতে কিছু যায় আসে না, সিডার আঙ্কেল বললেন। গাছপালার মাঝখান দিয়ে চলে যাওয়া রাস্তায় তীক্ষ্ণ। মোড় নিল গাড়ি।
না, এমনি জিজ্ঞেস করলাম, জবাব দিলাম। আমি আসলে বনের ভিতরই ঘুরে বেড়াতে চাই। বনের ছবি তুলেই একশো রোল ফিল্ম
খরচ করে ফেলব! ঘোষণা করার মত জানিয়ে দিলাম।
প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেল গাড়ি। লাফিয়ে উঠল আমার শরীর। আরেকটু হলেই ছাতে বাড়ি খেত মাথা।
আস্তে চালাও, জন। জুলি আন্টি বললেন। আমার দিকে ফিরে বললেন, তোমার আঙ্কেল আস্তে চালাতে জানেই না। এত তাড়াহুড়া করে, যেন রকেট নিয়ে ভিনগ্রহে চলেছে, আলোর গতিতে চলতে হবে।
আলোর কথায় মনে পড়ল, বাইরের আলোতে ছবি তোলার কিছু চমৎকার কায়দা শিখিয়ে দেব তোমাকে, রবিন, সিডার আঙ্কেল বললেন। গতি কমানোর বদলে আরও জোরে গ্যাস পেডাল চেপে ধরলেন তিনি।
আমাদের স্কুলে একটা ছবি তোলার প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে হবে আমাকে, ওঁদের জানালাম। তার জন্যে ভাল কিছু ছবি দরকার আমার, হ্যালোউইনের ছবি, যাতে প্রতিযোগিতায় জিততে পারি।
ও পেয়ে যাবে। হ্যালোউইনের এখনও দুদিন বাকি।
শুনেছি, হ্যালোউইনের সময় মায়ানেকড়ে বেরোয়। ওগুলোর। একটা ছবি পেলে…
আমার কথা শেষ হলো না। পথের পাশের একটা সাইনবোর্ডে গুঁতো মারল গাড়ি। সিট থেকে প্রায় উড়ে গিয়ে ধাক্কা খেলাম দরজায়। প্রচণ্ড ঝাঁকুনি। জানালার দিকে তাকিয়ে রইলাম অসহায় দৃষ্টিতে। সামনে থেকে গর্জন করে ছুটে আসা একটা ট্রাকের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে গাড়ি।
তীক্ষ্ণ চিৎকার বেরিয়ে এল আমার গলা চিরে।
নিজের চিৎকার বলে মনেই হলো না।
প্রচণ্ড ঝকি খাচ্ছে আমাদের গাড়ি। সিটে বসে থাকতে পারলাম না। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলাম মেঝেতে।
রাস্তার পাশে ঘাসের ওপর গাড়ি সরিয়ে নিয়েছেন সিডার আঙ্কেল।
ভারি গর্জন তুলে লাল রঙের একটা ঝিলিমিলির মত আমাদের পাশ কাটাতে দেখলাম ট্রাকটাকে। রেগে গিয়ে হর্ন চেপে ধরে রেখেছে ড্রাইভার।
গাছের নীচে এনে গাড়ি থামালেন সিডার আঙ্কেল। কোঁচকানো মুখটা লাল হয়ে গেছে। দুই হাত পিছনে নিয়ে গিয়ে মাথা রাখলেন তাতে।
জন, কী হয়েছে? মোলায়েম কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন জুলি আন্টি।

সরি, বিড়বিড় করলেন সিডার আঙ্কেল। ভারি দম নিলেন। ঠিক মনোযোগ দিতে পারছিলাম না।
আরেকটু হলেই তো মেরে ফেলছিলে আমাদের। প্যাসেঞ্জার সিট থেকে মুখ ঘুরিয়ে আমি কেমন আছি দেখলেন জুলি আন্টি। রবিন, ঠিক আছ তো তুমি?; উচীর জানা নয়
আছি, জবাব দিলাম। এখানে যে এত উত্তেজনা, কল্পনাই করিনি! রসিকতার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কথা বলতে গিয়ে গলা কাঁপছে।
আমার খাপ সহ ক্যামেরাটা মেঝেতে পড়ে গেছে। তুলে নিয়ে খাপের ভিতর থেকে ক্যামেরাটা বের করে দেখলাম। মনে হলো ঠিকই আছে।
ছা আবার ইঞ্জিন স্টার্ট দিলেন সিডার আঙ্কেল। রাস্তায় তুলে আনলেন গাড়িটাকে।
আমি সত্যিই দুঃখিত, বিড়বিড় করলেন তিনি। এখন থেকে আরও সাবধানে চালাব।
আবার নিশ্চয় উলফদের কথা ভাবছিলে, তাই না? অভিযোগের সুরে বললেন জুলি আন্টি। রবিনকে মায়ানেকড়ের কথা বলতে শুনে ওদের নিয়ে ভাবতে আরম্ভ করেছ আবার, আর তাতেই…
আহ্, থামো তো, জুলি! ধমকে উঠলেন সিডার আঙ্কেল। ওগুলোর কথা বোলো না এখন। রবিন মাত্র এল। বাড়ি পৌঁছার আগেই ওকে ভয় দেখিয়ে কাবু করে ফেলতে চাও?
কিন্তু ও-ই তো মায়ানেকড়ের কথা তুলল।
উলফরা কারা? সামনে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করলাম। তাই
থাক, বাদ দাও, তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল সিডার আঙ্কেলের কণ্ঠ। বসো আরাম করে।
জুলি আন্টি বললেন, বাড়ির কাছে চলে এসেছি।
মনে হলো দুজনেই আমার প্রশ্নটা এড়াতে চাইছেন। দক
অন্ধকার লাগছে জায়গাটা। সরু রাস্তার দুই পাশে গাছের মাথা এমনভাবে গায়ে গায়ে লেগে গেছে, রোদ ঢুকতে দিচ্ছে না।
পাশ দিয়ে সরসর করে সরে যাচ্ছে গাছগুলো। হলুদ আর লাল পাতার ঝিলিক দেখছি শুধু। গভীর ভাবনা মনে। আমার আঙ্কেল-আন্টিকে কেমন আজব চরিত্র মনে হচ্ছে। উলফদের কথা বলাতে আন্টির ওপর এমন খেপে উঠলেন, কেন আঙ্কেল?
জায়গাটাকে উলফ লেক বলে কেন? জিজ্ঞেস করলাম।
যেহেতু ম্যাপে লিখে ফেলা হয়েছে, রসিকতা করতে চাইলেন আন্টি।
এখানকার বনে নাকি প্রচুর নেকড়ে ছিল একসময়, তাই ওই নাম, মৃদুকণ্ঠে জানালেন সিডার আঙ্কেল।

স্বর নামিয়ে প্রায় ফিসফিস করে বললেন জুলি আন্টি, সত্যি কথাটা রবিনকে বলে দিলেই পারো।নভীর
চুপ থাকো! হিসিয়ে উঠলেন আঙ্কেল। কেন শুধু শুধু ভয় দেখাচ্ছ ওকে? o
প্যাসেঞ্জার সিটের জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন জুলি আন্টি।
কিছুক্ষণ চুপচাপ রইলাম আমরা।
মোড় নিল গাড়ি। ছোট একটা গোলাকার জায়গা চোখে পড়ল। চক্রের ভিতর পাশাপাশি তিনটে বাড়ি। তার ওপাশে ছড়িয়ে আছে বন।
ওই যে আমাদের বাড়ি, মাঝখানেরটা, হাত তুলে দেখালেন। সিডার আঙ্কেল।
তাকিয়ে রইলাম। ছোট একটা চারকোনা সাদা বাড়ি। সামনে সুন্দর করে ছাঁটা লন। লম্বা, নিচু, র‍্যাঞ্চ-স্টাইলের আরেকটা বাড়ি রয়েছে সাদা বাড়িটার ডান পাশে। ধূসর দেয়াল। জানালাগুলো কালো রঙ করা।
বাঁ পাশের বাড়িটা বেড়ে ওঠা ঝোপঝাড়ে প্রায় ঢাকা পড়েছে। বাড়ির সামনে লম্বা লম্বা ঘাস। বড় একটা গাছের ডাল ভেঙে পড়ে ওই বাড়িতে গাড়ি ঢোকার রাস্তাটা প্রায় বন্ধ করে দিয়েছে।
মাঝের বাড়িটার ড্রাইভওয়েতে গাড়ি ঢোকালেন সিডার আঙ্কেল।
ছোট বাড়িতে থাকতে আমাদের অসুবিধে হয় না, মাত্র দুজন তো মানুষ।
ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেললেন জুলি আন্টি। হ্যাঁ। তা ছাড়া এক জায়গায় তো বেশিদিন থাকতে পারি না, সব সময় শুধু ঘুরে বেড়ানো, বড় বাড়ি দিয়ে কী হবে।
আবার আমার দিকে ঘুরলেন তিনি। পাশের বাড়িতে একটা মেয়ে থাকে, আমাদের পড়শি। ডানের র‍্যাঞ্চ-স্টাইল বাড়িটা দেখালেন। বাড়িতে থাকে ও। বারো বছর বয়েস, তোমার বয়েসী, তাই না?
মাথা ঝাঁকালাম।
ওর নাম নিনা। খুব সুন্দরী। স্বভাবও ভাল। ওকে বন্ধু বানাতে পারবে। তা হলে আর একা একা লাগবে না।
কোন ছেলে নেই? জিজ্ঞেস করলাম।
ওই বাড়িতে নেই, জবাবটা দিলেন সিডার আঙ্কেল।
ড্রাইভওয়ের শেষ মাথায় এসে গাড়ি থামালেন তিনি। নামলাম আমরা। মাথার ওপর দুই হাত তুলে আড়মোড়া ভাঙলাম আমি। দেহের সমস্ত পেশি ব্যথা করছে। ছয় ঘণ্টারও বেশি বাস আর গাড়িতে কেটেছে আমার। এ ভ্যানের পিছন থেকে আমার সুটকেসটা বের করে আনলেন সিডার আঙ্কেল।
বাঁয়ের বাড়িটার দিকে তাকালাম। ভাঙাচোরা, পোড়ো বাড়ির মত লাগছে। অন্ধকার। জানালার কিছু খড়খড়ি খসে পড়েছে। সামনের বারান্দার খানিকটা দেবে গেছে।

ড্রাইভওয়ে পেরিয়ে কয়েক পা এগোলাম ভাঙা বাড়িটার দিকে। আন্টিকে জিজ্ঞেস করলাম, ওখানে কে থাকে, আন্টি
ওটার ধারেকাছে যাবে না। চেঁচিয়ে উঠলেন সিডার আঙ্কেল।
ওখানে কারা থাকে এ নিয়েও কোন প্রশ্ন করবে না! ওই বাড়ির কাছ থেকে দূরে থাকবে, ব্যস!
রহস্যের গন্ধ পেলাম। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম আমি, ওই বাড়ির কাছে যেতেই হবে আমাকে। কেন কাছে যেতে নিষেধ করা হয়েছে, জানতে হবে। কিশোর হলেও এই কাজটাই করত।
শান্ত হও, জন, জুলি আন্টি বললেন। তুমি নিষেধ করেছ, রবিন আর ওখানে যাবে না। আমার দিকে ঘুরলেন তিনি। ফিসফিস করে বললেন, ওই বাড়িতে উলফরা থাকে। আর কোনও প্রশ্ন নয়, ঠিক আছে?
ওই বাড়ি থেকে দূরে থাকবে, চাপা গর্জন করে উঠলেন সিডার আঙ্কেল। এসো, গাড়ি থেকে মালপত্র নামাই।
আবার তাকালাম ভাঙা বাড়িটার দিকে। তারপর আঙ্কেলকে সাহায্য করতে এগোলাম।
মালপত্র নামাতে বেশিক্ষণ লাগল না। আমাকে গেস্টরুমে নিয়ে এলেন জুলি আন্টি। আমার জিনিসপত্র গোছগাছ করে দিতে লাগলেন। সিডার আঙ্কেল গেলেন রান্নাঘরে, মুরগীর মাংস দিয়ে স্যাণ্ডউইচ বানাতে।
আমার ঘরটা খুবই ছোট। দেয়াল আলমারিটা খুদে। পোকামারা ওষুধের গন্ধ বেরোচ্ছে ওটা থেকে। জুলি আন্টি বললেন, কিছুক্ষণ জানালা-দরজা খোলা রাখলেই এ গন্ধ চলে যাবে।
জানালাটা খুলে দিলাম। উলফদের বাড়ির দিকে মুখ করে আছে জানালাটা। মরচে পড়া এক চাকার একটা লোহার ঠেলাগাড়ি বাড়ির একপাশ ঘেঁষে পড়ে রয়েছে। জানালাগুলো অন্ধকার। পুরু হয়ে ধুলো জমে আছে।
তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জানালাটার দিকে তাকিয়ে আছি। ভাবছি, উলফদের নিয়ে এত উদ্বেগ কেন সিডার আঙ্কেলের?
জুলি আন্টির কাছে ফিরে এলাম। ড্রেসারের সবচেয়ে ওপরের ড্রয়ারটাতে আমার শার্টগুলো রাখছেন তিনি। ঘরটা খুবই ছোট। তবে থেকে আরাম পাবে। ডেস্কের ওপরটা পরিষ্কার করে দিচ্ছি। ওটাতে বসে লেখাপড়া করতে পারবে। ১
লেখাপড়া? বিড়বিড় করলাম। মনে পড়ল, বাবা বলে দিয়েছেন, উলফ লেকে যতদিন থাকব, এখানকার স্কুলে যেতে হবে আমাকে। পড়া বাদ দিলে চলবে না।
সোমবার সকালে নিনা তোমাকে স্কুলে নিয়ে যাবে, জুলি আন্টি। বললেন। সে-ও তোমার মতই সিক্সথ গ্রেডে পড়ে। দর

অচেনা জায়গায় আজব পরিবেশে একটা নতুন স্কুলে যাওয়ার কথা ভাবতে ভাল লাগল না আমার। ক্যামেরাটা তুলে নিলাম। বনে যাচ্ছি। ছবি তুলব।

লাঞ্চটা সেরেই যাও, আন্টি বললেন। লম্বা ধূসর চুলে আঙুল চালাতে চালাতে গেস্টরুম থেকে বেরিয়ে, ছোট্ট হল পেরিয়ে পথ দেখিয়ে আমাকে রান্নাঘরে নিয়ে এলেন তিনি।

কাজ করতে করতে ফিরে তাকালেন সিডার আঙ্কেল। তিনটে গ্লাসে কমলার রস ঢাললেন। গোল একটা ডাইনিং টেবিলে রেখেছেন স্যাণ্ডউইচগুলো।

আমি কিংবা জুলি আন্টি কিছু বলার আগেই পিছনের দরজায় টোকার শব্দ হলো। জুলি আন্টি খুলে দিলেন। ঘরে ঢুকল একটা মেয়ে। নিশ্চয় নিনা। গতকাল; লম্বা, হালকা-পাতলা দেহ ওর। আমার চেয়ে ইঞ্চি দুয়েক লম্বা হবে। জুলি আন্টি ঠিকই বলেছেন। মেয়েটা সুন্দরী। কালো চুল, জলপাই রঙের চোখ, আর চমৎকার হাসি। ঢিলেঢালা সবুজ রঙের একটা সোয়েটার গায়ে দিয়েছে। পরনে কালো প্যান্ট।

আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন জুলি আন্টি। দুজনেই হাই বললাম দুজনকে। নতুন কারও সঙ্গে পরিচিত হতে গেলে বিব্রত বোধ করি আমি, তবে মেয়েটার মধ্যে কোন আড়ষ্টতা নেই।

জুলি আন্টি নিনাকে স্যাণ্ডউইচ খেতে বললেন।

না, থ্যাংকস, জবাব দিল নিনা, আমি খেয়ে এসেছি।

রবিনকে আনতে বাস স্টপেজে গিয়েছিলাম, নিনার দিকে তাকিয়ে বললেন জুলি আন্টি। সেজন্যেই লাঞ্চ খেতে দেরি হলো।

স্যাণ্ডউইচ তুলে নিয়ে কামড় বসালাম। খাওয়া শুরু করার আগে বুঝতে পারিনি কতটা খিদে পেয়েছে।

নিনা, রবিনকে নিয়ে বনের ভিতর থেকে ঘুরে এসো না? সিডার আঙ্কেল বললেন। উলফ লেকের বন কী জিনিস দেখিয়ে আনো। বড় সবাই হাসল, আমি বাদে। এর মধ্যে রসিকতাটা কোনখানে বুঝতে পারলাম না।

প্রচুর ফিল্ম নিয়ে এসেছি, নিনাকে বললাম। সব শেষ করব এখানে। নিজের অজান্তেই চেপে ধরলাম ক্যামেরা, কেসটা।

ভালই হবে, নিনা বলল। শরতের পাতা যা রঙ ধরেছে না, উফ।

সিডার আঙ্কেল ও জুলি আন্টিকে গুডবাই জানিয়ে সামনের দরজার দিকে এগোলাম আমরা। শেষ বিকেলের লাল সূর্যটা গাছের মাথা ছুঁয়েছে। পড়ন্ত রোদ ঘাসের ওপর আমাদের লম্বা ছায়া ফেলল।

জন এই এই, আমার ছায়া মাড়িয়ে দিচ্ছ তো তুমি! হেসে উঠল নিনা। পায়ের ছায়া দিয়ে লাথি মারল আমার ছায়াটাকে। এ

আউ! করে চেঁচিয়ে উঠে ব্যথা পাওয়ার ভান করলাম। ওর ছায়াকে ঘুসি মারলাম আমার হাতের ছায়া দিয়ে।
লাথি দিয়ে, ঘুসি মেরে, খানিকক্ষণ ছায়ায় ছায়ায় যুদ্ধ চালালাম আমরা। দুই পায়ে লাফিয়ে উঠে ওর ছায়াটা নেমে এল আমার ছায়ার ওপর। মাটিতে পড়ে গিয়ে মরে যাওয়ার ভান করলাম।
দুই সেকেণ্ড পড়ে থেকে উঠে বসলাম। হেসে গড়িয়ে পড়ছে নিনা। মুখের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে ওর লম্বা চুল।
দ্রুতহাতে কেস থেকে ক্যামেরাটা বের করে ওর একটা ছবি তুলে ফেললাম।
হাসি থেমে গেল ওর। মুখের ওপর থেকে চুলগুলো সরিয়ে দিল। আমার ছবি তুললে কেন?
তলতে ইচ্ছে করল, জবাব দিলাম।
উঠে দাঁড়ালাম। আবার ক্যামেরাটা তুলে নিলাম চোখের সামনে। উলফদের বাড়ির দিকে ঘুরলাম। কয়েক পা এগোলাম বাড়িটার দিকে, ভিউফাইণ্ডারের ফ্রেমে নিয়ে আসার জন্য।
আমার হাত চেপে ধরল নিনা।
আরে! চেঁচিয়ে উঠলাম।
ছবি তুলো না! খসখসে স্বরে আমাকে সাবধান করে দিল নিনা। ওরা দেখে ফেলবে।
তাতে কী? শাটার টিপে দিলাম। সামনের অন্ধকার জানালায় কিছু একটা নড়তে দেখে গায়ে কাঁটা দিল।
কেউ কি তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে?
ক্যামেরা নামালাম।
এসো, আমাকে টান দিল নিনা। বনে যাবে, নাকি যাবে না?
তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি উলফদের বাড়িটার দিকে। জানো, ওই বাড়িটার কথা জিজ্ঞেস করায় ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন সিডার আঙ্কেল। ঘটনাটা কী, বলো তো?
সত্যিই জানি না, আমার হাতটা ছেড়ে দিল নিনা। ইদানীং উলফরা খুব অদ্ভুত আচরণ করছে। একটিবারের জন্যে বাড়ির বাইরে বেরোয় না। অথচ আগে এমন ছিল না। জানালায় মাঝে মাঝে অদ্ভুত ছায়া দেখা যায়, তা-ও রাতের বেলা। নানা রকম ভয়াল গল্প শোনা যায় ওদের ব্যাপারে।
ভয়াল গল্প? কী গল্প?
জবাব দিল না নিনা। দেবে যাওয়া ভাঙা বারান্দা, ছাতের ধূসর। মলিন টালিগুলোর দিকে তাকিয়ে সরু হয়ে এল ওর চোখের পাতা। চলো, এখান থেকে

চলে যাই।
বাড়ির পাশ দিয়ে প্রায় দৌড়ে চলল ও, পিছন দিকে। কিন্তু আমি ওর সঙ্গে গেলাম না। বরং ড্রাইভওয়ে পেরিয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে চললাম উলফদের বাড়িটার দিকে। সামনের চত্বরের বড় বড় ঘাসের জঙ্গলের মধ্যে পা রাখলাম।
দাঁড়াও! কোথায় যাচ্ছ তুমি? চেঁচিয়ে ডাকল নিনা।
ক্যামেরাটা কোমরের কাছে ধরে সোজা বাড়িটার দিকে এগোলাম। ওর প্রশ্নের জবাব দিলাম, দেখতে।
রবিন, প্লিজ। নিনা বলল। উলফরা আমাদের মত ছেলেমেয়েদের দেখতে পারে না। ওদের বাড়ির কাছে যাওয়াটা পছন্দ করে না। প্লিজ, চলে এসো। বনে যাই আমরা।
ফিরে তাকালাম নিনার দিকে। কী হয়েছে, নিনা? এত ভয় পাচ্ছ কেন?
ও কিছু বলার আগেই ভাঙা বারান্দার পচা কাঠের তক্তায় সাবধানে পা রাখলাম আমি। সামনের জানালাটার দিকে তাকালাম।
যে অস্তগামী সূর্যের লাল আলো ভরে দিয়েছে যেন জানালার কাঁচ। একটা মুহূর্তের জন্য মনে হলো আগুন ধরে গেছে জানালাটায়।
চোখ সরাতে বাধ্য হলাম।
কাঁচ থেকে রোদ সরে গেলে আবার তাকালাম জানালাটার দিকে। নিজের অজান্তেই অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে গেল মুখ থেকে।
জানালার ওপাশের পর্দা দেখা যাচ্ছে। ছেঁড়া। ফালি ফালি করে ফেলা হয়েছে। ও নখ দিয়ে চিরে ওই অবস্থা করেছে যে কোনও ভয়াল জানোয়ার।
নিনা, পর্দার অবস্থা দেখে যাও, ডেকে বললাম। চোখ সরাতে পারছি না ছেঁড়া পর্দা থেকে।
ড্রাইভওয়েতে দাঁড়িয়ে আছে ও। সিডার আঙ্কেলের বাড়িটার দিকে পিছন করে। দুই হাত বুকের ওপর ভাঁজ করা। জবাব দিল, না, আমি দেখতে চাই না।
কিন্তু পর্দাগুলো…
আমি তো বলেছি ওরা আজব মানুষ, তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল নিনার কণ্ঠ। জানালার কাছে তোমাকে উঁকিঝুঁকি দিতে দেখলে ভীষণ রেগে যাবে। চলে এসো, রবিন।
পিছিয়ে এলাম জানালার কাছ থেকে। বেরিয়ে থাকা একটা পচা তক্তায় পা বেধে আরেকটু হলেই উল্টে পড়ে যাচ্ছিলাম। নেমে এলাম নীচে।
তুমি বনে যাবে, নাকি যাবে না? অধৈর্য ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল নিনা।
সরি, চলো। নিনার কাছে এসে বললাম, উলফদের ব্যাপারে যা যা জানো বলল আমাকে। যত ভয়ালই হোক, আমি শুনব।

না, বলব না, চাপা খসখসে কণ্ঠে জবাব দিল নিনা। প্রায় দৌড়ে চলল সিডার আঙ্কেলের বাড়ির পিছন দিকে। হলুদ আর লাল রঙের পাতাওয়ালা গাছগুলোতে শেষ বিকেলের ছায়া।
প্লিজ! বললাম আমি।
বলব, তবে কয়েক দিন পরে, জবাব দিল নিনা। পূর্ণিমা চলে গেলে।
এখন বললে অসুবিধে কী?
না, এখন বলা যাবে না।
নিনার কথায় অবাক হলাম। ঘটনাটা কী? এখানে সবাই এমন রহস্যময় আচরণ করছে কেন? আমার আঙ্কেল-আন্টি, নিনা, সবাই যেন আমার কাছে কী লুকোতে চাইছে।
নিনার দৃষ্টি অনুসরণ করে আকাশের দিকে তাকালাম। মস্ত একটা গোল চাঁদ উঠেছে গাছের মাথায়, যদিও দিনের আলো মিলিয়ে যায়নি এখনও।
কেঁপে উঠল নিনা। পূর্ণিমাকে এখানে সবাই ভয় পায়। চলে। যাওয়ার পর শান্তি।
কেন? পূর্ণিমা এলে ক্ষতিটা কী?
উলফদের বাড়ির দিকে ফিরে তাকাল নিনা। জবাব দিল না।
কী হলো? জবাব দাও না কেন?
ভয় লাগে। পূর্ণিমা যাক, তারপর।
কেন, পূর্ণিমা না গেলে ক্ষতি কী?
আছে, ক্ষতি আছে।
তা হলে তোমার ক্ষতি হচ্ছে না কেন?
আমি পূর্ণিমার অনেক আগেই এসেছি। অমাবস্যার সময়। তখন শুনেছি সব। এখন বললে ওরা শুনে ফেলতে পারে।
ওরা কারা?
জবাব দিল না নিনা।

.

বনের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চললাম আমরা। পাতার ফাঁক দিয়ে চুঁইয়ে নামছে যেন ফিকে হয়ে আসা রোদের আলো। মাটিতে নেমে ছোট ছোট সোনালি বিন্দু হয়ে ঝিলমিল করছে। মরা পাতা আর শুকনো ডালে আমাদের পা পড়ে শব্দ হচ্ছে।
বুড়ো একটা গাছ খুঁজে বের করলাম আমরা। প্রচুর গাঁটওয়ালা কাণ্ড গাছটার। বুড়ো মানুষের মত নুয়ে পড়েছে। বয়স্ক মানুষের মতই কুঁচকে গেছে ছাল। মোটা মোটা ধূসর শিকড়ের গোড়া বেরিয়ে পড়েছে মাটি থেকে।
কী সাংঘাতিক! না বলে পারলাম না। কেস থেকে টেনে বের করলাম ক্যামেরাটা।
হাসল নিনা। গাছের ছবি তুলবে?

হ্যাঁ। গাছটার চেহারা দেখেছ! এক্কেবারে জ্যান্ত মনে হচ্ছে।
আবার হেসে উঠল নিনা। গাছ তো জ্যান্তই হয়।
আসলে, আমি বলতে চাইছি ভূতুড়ে, বিড়বিড় করে বললাম।
ঝুঁকে পড়া পুরানো গাছটার ছবি তুলতে শুরু করলাম। পিছিয়ে এসে সামান্য কাত হয়ে থাকা একটা বার্চ গাছের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ালাম, যাতে হাত দুটো স্থির রাখতে পারি। গাছটাকে এমনভাবে ফ্রেমবন্দি করতে চাইলাম যাতে ওটাকে মানুষের মত দেখায়।
ওই অ্যাঙ্গেলে ছবি তোলার পর গাছটাকে ঘিরে চক্কর দিতে থাকলাম। ওটার খাঁজ, ছালের ভাঁজ, সব কিছু দেখে বোঝার চেষ্টা করলাম কোন অ্যাঙ্গেলে তুললে অন্যরকম ছবি উঠবে, যেটাকে আলাদা কিছ মনে হবে। একটা ডাল লম্বা হয়ে গিয়ে মাটি ছুঁয়েছে মনে হচ্ছে একজন মানুষ কাত হয়ে আছে
এই অ্যাঙ্গেল থেকে একটা ছবি তুললাম।
এরপর হাঁটু গেড়ে বসলাম। শিকড়গুলোকে মনে হলো মাটি খুঁড়ে বেরিয়ে আছে সরু সরু পা। এই অ্যাঙ্গেল থেকে তুললাম কয়েকটা ছবি।
মৃদু গুঞ্জন শুনে মুখ ফিরিয়ে তাকালাম। ছোট একটা গাছে ফুলের ওপর উড়ছে একটা হামিংবার্ড। খুদে পাখিটাকে ফ্রেমবন্দি করার চেষ্টা করলাম।
কিন্তু পাখিটা অতিরিক্ত ক্ষিপ্র। আমি শাটার টেপার আগেই উড়ে চলে গেল।
উঠে দাঁড়ালাম। মাটিতে বসে আছে নিনা। দুই হাতে শুকনো পাতা কচলাচ্ছে। মুড়মুড় করে ভেঙে ডো গুড়ো হচ্ছে পাতাগুলো।
গরমকাল যে চলে গেছে ওই পাখিটা কি জানে না? বিড়বিড় করলাম।
শূন্য দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে নিনা। আমার কথা যেন। ভুলেই গেছে।
আঁ, কী বললে? ও, পাখি। সরি, রবিন, আমি পাখিটাকে দেখিনি। উঠে দাঁড়াল ও।
ওদিকে কী? গভীর বনের দিকে আঙুল তুলে জিজ্ঞেস করলাম।
উলফ লেক, জবাব দিল নিনা। আরেক দিন নিয়ে যাব। এখন চলো, বাড়ি যাই। সূর্য ডোবার আগেই বন থেকে বেরোনো দরকার।
হঠাৎ করেই মনে পড়ল, বনে নেকড়ে থাকার কথা বলেছিলেন সিডার আঙ্কেল। আর নেকড়ের নামেই উলফ লেকের নামকরণ হয়েছে।
নেকড়েরা এখন আর থাকে না, তাই না? আমি বললাম, ওখান থেকে চলে গেছে।
মাথা ঝাঁকাল নিনা। হ্যাঁ, চলে গেছে।
তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার শোনা গেল এ সময়। খুব কাছে থেকে। আমার পিছনে। অনেকটা নেকড়ের ডাকের মত।
চমকে উঠলাম।

পিছাতে গিয়ে বার্চ গাছটায় ধাক্কা খেলাম। গাছের গায়ে বাড়ি খেল ক্যামেরাটা। তবে হাত থেকে পড়ল না।
নিনা... ওর দিকে তাকিয়ে থেমে গেলাম। বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে গেছে নিনার চোখ।
ও কিছু বলার আগেই ঝোপের ভিতর থেকে হুড়মুড় করে বেরিয়ে এল দুটো ছেলে। মাথা পিছনে হেলিয়ে চিৎকার করে উঠল নেকড়ের মত।
ও, তোমরা! বলে উঠল নিনা। মুখ বাঁকাল বিরক্তিতে।
দুজনেই ওরা স্বাস্থ্যবান, নিয়মিত ব্যায়াম করে মনে হলো। হয়তো স্কুলের ফুটবল, ভলিবল টিমেরও সেরা খেলোয়াড়। দুজনেরই কালো চুল, বাদামী চোখ। আমার দিকে তাকাল। ওদের দুই চোখে, যেন নেকড়ের মতই ক্ষুধার্ত দৃষ্টি।
ভয় পেলে নাকি? আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল একজন। উত্তেজনায় জ্বলজ্বল করছে চোখ। গায়ে গাঢ় বাদামী রঙের সোয়েটার, পরনে কালো ডেনিম জিনস। গলায় জড়ানো লম্বা একটা গোলাপি রঙের মাফলার।
তা তো পেয়েছিই, ব্যঙ্গ করে জবাব দিল নিনা। যা চেহারা তোমাদের। দুঃস্বপ্নে দেখার মত!
দ্বিতীয় ছেলেটার পরনে উলের কাপড়ের ঢোলা শার্ট। পরনের খাকি প্যান্টটা এত লম্বা, ঝুল মাটিতে গড়াচ্ছে। মাথা পিছনে হেলিয়ে আবার নেকড়ের মত তীক্ষ্ণ হাঁক ছাড়ল।
আমার দিকে ফিরল নিনা। ওরা আমার ক্লাসে পড়ে। ওর নাম টনি, লাল মাফলারওয়ালা ছেলেটাকে দেখাল ও। আর এর নাম রজার।
তুমি আসবে, নিনা আমাদের বলেছিল, হাসিমুখে বলল টনি।
তা উলফ লেক কেমন লাগছে? ভুরু নাচাল রজার।
কি কালো চোখ মেলে দুজনেই তাকিয়ে আছে আমার দিকে। যেন আমি একটা বিচিত্র প্রাণী।
মাত্র তো এলাম, জবাব দিলাম। কিছুই না দেখে কী করে বলি উলফ লেক কেমন? 18
চোখে চোখে তাকাল দুজনে। আমার দিকে ফিরে টনি বলল, ঠিক, সবই দেখা দরকার। বনের কিছু নিয়ম-কানুন এখনই জেনে নাও।
যেমন? প্রশ্ন করলাম।
আমার পায়ের দিকে আঙুল তুলে টনি বলল, বিছুটি গাছের ওপর কখনও দাঁড়াতে নেই।
চট করে সরে গিয়ে মাটির দিকে তাকালাম।
হেসে উঠল ওরা দুজন।

বিছুটি-টিছুটি কিছু নেই। আমার সঙ্গে মজা করেছে টনি।
প্রচণ্ড রাগ হলো। কিন্তু লাগতে গেলে পারব না ওদের সঙ্গে। বাধ্য হয়ে চুপ করে রইলাম। ওই মুহূর্তে মুসার কথা ভেবে মনটা খারাপ লাগল। ইস্, মুসা থাকলে এভাবে আমার সঙ্গে শয়তানি করে পার পেত না ছেলেগুলো।
তোমরা হলে গে বিড়ালের বমি। আমার সঙ্গে ছেলে দুটোর আচরণে নিনাও রেগে গেছে।
তা হলে এই বমি দিয়ে নাস্তা করে ফেলো! টনি জবাব দিল।
হেসে উঠল দুই পাজি। জোরে চাপড় মারল একে অন্যের পিঠে।
হতাশার ভান করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল নিনা। আহা, কী রসিকতা! কিন্তু এখন তো হাসি আসছে না, পরে চেষ্টা করে দেখব হাসা যায় কি না।
আবার নেকড়ের মত ডেকে উঠল ছেলে দুটো।
হঠাৎ করে আমার ক্যামেরার দিকে হাত বাড়াল টনি। দেখি?
না, সরে গেলাম। খুব দামি জিনিস। কাউকে এটা ধরতে দিই না।
কত দামি! মুখ বাঁকাল টনি। কীসের তৈরি? সোনার। দেখি তো। ধরার জন্য আবার থাবা মারল ও।
আমার ছবি তোলো, দুই আঙুল মুখে পুরে ঠোঁটের দুই কোণ টেনে ধরল রজার, জিভ বের করে দিল।
হ্যাঁ, এবার চেহারাটার অনেক উন্নতি হয়েছে, নিনা বলল।
আমার ছবি তোলো! আবার বলল রজার।
আহ, কী শুরু করলে তোমরা! ধমকে উঠল নিনা। ছাড়োনা ওকে!
দুঃখ পাওয়ার ভান করল রজার। আমার ছবি তোলে না কেন?
জন্তু-জানোয়ারের ছবি তোলে না ও! নিনা বলল।
হেসে উঠল টনি। আমার হাত থেকে ক্যামেরাটা কেড়ে নিল।
আরে, আরে! আমার ক্যামেরা দাও! নেয়ার জন্য থাবা মারলাম। ধরতে পারলাম না।
রজারের দিকে ক্যামেরাটা ছুঁড়ে দিল টনি। রজার ওটা নিয়ে নিনার ছবি তোলার ভান করল। চেঁচিয়ে উঠল, হায় হায়, তোমার চেহারা দেখেই ক্যামেরার লেন্স ফেটে গেল!
আমি তোমার নাক ফাটিয়ে দেব! নিনা জবাব দিল।
ওটা সত্যিই দামি ক্যামেরা, আমি বললাম। নষ্ট হলে…
থাবা দিয়ে রজারের হাত থেকে ক্যামেরাটা কেড়ে নিয়ে আমার হাতে ___নিনা।
ক্যামেরাটা শক্ত করে ধরলাম, থ্যাংকস।

ভয়ঙ্কর ভঙ্গিতে আমার দিকে এগোতে শুরু করল ছেলে দুটো। চোখের তারা জ্বলছে। ওদের কঠিন চেহারা, চোখের শীতল দৃষ্টি আবার আমাকে বুনো জানোয়ারের কথা মনে করিয়ে দিল।
ওকে ছাড়ো বলছি। চাবুকের মত শপাং করে উঠল নিনার কণ্ঠ।
না, কিছু করছি না তো, জবাব দিল রজার। এমনি একটু মজা করছিলাম। ওর ক্যামেরা নষ্ট করব না।
আমিও কিছু মনে করিনি, ক্যামেরাটা সরিয়ে রাখলাম ওর নাগালের বাইরে।
অন্ধকার হয়ে আসা আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকাল রজার। পাতার ফাঁক দিয়ে আমি শুধু ধূসরতা দেখলাম। দেরি হয়ে যাচ্ছে, বিড়বিড় করল ও।
হাসি মলিন হয়ে গেল টনির। চলো, পালাই। দ্রুত দৃষ্টি ঘুরে এল একবার চারপাশের বনে। ছায়া ঘন হচ্ছে। ঠাণ্ডা বাড়ছে।
শুনলাম, কী একটা খেপা জানোয়ার নাকি বনের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, মৃদুস্বরে বলল রজার।
রজার, তুমি থামবে! গুঙিয়ে উঠল নিনা।
না, সত্যি বলছি, রজার বলল। একটা হরিণের মাথা দেখে এলাম। স্রেফ টেনে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে।
মাথাটা আমিও দেখেছি, টনি বলল। মলিন হয়ে আসা আলোতেও ওর কালো চোখে আতঙ্ক দেখা গেল। সত্যিই বলছে, ভাঁড়ামো করছে না আর এখন। ভয়ঙ্কর।
হরিণের চোখ দুটো আমাদের দিকে তাকিয়ে ছিল, রজার বলল। কাটা গলায় পোকা কিলবিল করছে।
ওয়াক! দুই হাতে মুখ ঢেকে যেন বমি ঠেকাল নিনা। সব বানিয়ে বলছ, তাই না?
না না, সত্যি। মুখ তুলে চাঁদের দিকে তাকাল টনি। পূর্ণিমা এসে গেছে। আর জানোই তো পূর্ণিমার সময় আজব আজব জানোয়ারেরা বেরিয়ে আসে তাদের গোপন আস্তানা থেকে। মৃদু স্বরে কথা বলছে ও, প্রায় ফিসফিস করে। বিশেষ করে হ্যালোউইনের রাতে, চাঁদটা যখন পুরো গোল হয়ে যায়।
গায়ে কাঁটা দিল আমার। ঘাড়ের কাছে শিরশির করে উঠল। হঠাই ঠাণ্ডা হয়ে এল হাত-পা।
মাটিতে পড়ে থাকা হরিণের মাথাটার কথা ভাবলাম।
নিষ্প্রাণ, কালো চকচকে চোখ জোড়া আমার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখলাম কল্পনায়।
হ্যালোউইনে কী সাজবে? নিনাকে জিজ্ঞেস করল টনি।
জানি না, মাথা নাড়ল নিনা। এখনও কিছু ঠিক করিনি। আমার দিকে ঘুরল ও। তুমি কী সাজবে, রবিন?

মায়ানেকড়ে।
কাজ চমকে উঠল ছেলে দুটো। পরস্পরের দিকে তাকাল।
হাসি মুছে গেল ওদের মুখ থেকে। নির্বাক হয়ে গেল।
কী হলো? জিজ্ঞেস করলাম।
জবাব নেই।
এই, কী হলো তোমাদের? আবার জিজ্ঞেস করলাম।
মাটির দিকে চোখ নামাল রজার। উলফ লেকে মায়ানেকড়ের অভাব নেই, বিড়বিড় করল ও।
মানে! ভুরু কোঁচকালাম। কী বলছ? এই, মায়ানেকড়ের অভাব। নেই মানে?
কিন্তু জবাব দিল না ওরা।
আচমকা ঘুরে দ্রুত হেঁটে অদৃশ্য হয়ে গেল বনের ভিতর।
ভয় দিক হলাম বন থেকে ফিরে দেখি, ডিনার রেডি করে বসে আছেন আঙ্কেল-আন্টি।
ডিনারে আসতে দেরি করে ফেললাম, সরি, বললাম। আসলে সময়ের খেই হারিয়ে ফেলেছিলাম। বনের ভিতর থেকে আসতে ইচ্ছে করছিল না। এত সুন্দর।
নিনাকে ডিনার খেয়ে যেতে বললেন জুলি আন্টি। রান্নাঘরের ছোট্ট টেবিলটা ঘিরে গাদাগাদি করে বসলাম আমরা। বড় বাটি থেকে মুরগীর গরম সুপ চামচ দিয়ে মুখে তুলতে থাকলাম।
দারুণ সুপ বানান আপনি, আন্টি, নিনা বলল।
জুলি আন্টি হাসলেন। ঠোঁটের কোনা বেয়ে এক ফোঁটা সুপ গড়িয়ে পড়ছে। মোছর জন্য ন্যাপকিন টেনে নিলেন তিনি।থ্যাংক ইউ, নিনা। হাতের কাছে খাওয়ার উপযুক্ত যত রকম জিনিস পাই সবই। ফেলে দিই তো ওই সুপের মধ্যে, তাতেই বোধহয় স্বাদ বেড়ে যায়।
জানালার দিকে চোখ চলে গেল সিডার আঙ্কেলের। চাঁদের দিকে তাকালেন। তারপর তাকালেন উলফদের বাড়িটার দিকে।
একটা অদ্ভুত গাছের ছবি তুলেছি আমি, বললাম। বুড়ো মানুষের মত কজো হয়ে ঝকে রয়েছে গাছটা।
জবাব দিলেন না সিডার আঙ্কেল। তাকিয়ে আছেন জানালার বাইরে।
জন, রবিন কিছু বলছে তোমাকে, রুক্ষ হয়ে উঠল জুলি আন্টির কণ্ঠ।
অ্যাঁ? হ্যাঁ হ্যাঁ! টেবিলের দিকে ফিরে তাকালেন সিডার আঙ্কেল। জোরে জোরে মাথা ঝাঁকি দিয়ে যেন মগজের ভিতর জমাট বাঁধা ভাবনাগুলো তাড়িয়ে দিতে চাইলেন। সরি। কী বলছিলে? তাতে
বনের ভিতরের বুড়ো গাছটার কথা আবার বললাম তাকে।

ওই ছবিগুলো ডেভেলপ করতে তোমাকে সাহায্য করব আমি, আঙ্কেল বললেন। কালকেই করে দেব। চিলেকোঠার ছোট্ট বাথরুমটায় ডার্করুম বানিয়েছি আমি। এখানে সবই ছোট ছোট। আরও বড় একটা বাড়ি দরকার আমাদের, ইদানীং যে সব কাজ করছি তার জন্যে।

আপনি এখন কীসের ছবি তুলছেন? জিজ্ঞেস করলাম।

নিশাচরদের, জবাব দিলেন তিনি। আবার জানালার বাইরে তাকালেন। তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে আমিও তাকালাম। উলফদের পিছনের জানালাটার দিকে তাঁর নজর। অন্ধকার হয়ে আছে জানালাটা।

নিশাচর জানোয়ারের ছবি তুলছি আমরা, জুলি আন্টি জানালেন। এমন সব জানোয়ার, যেগুলো শুধু রাতেই বেরোয়।

পেঁচা? নিনার প্রশ্ন।

অ্যাঁ! হ্যাঁ! মাথা ঝাঁকালেন জুলি আন্টি। বনের ভিতর দারুণ দারুণ সব পেঁচা দেখেছি আমরা, তাই না, জন? ভাবভঙ্গিতে মনে হলো, কিছু যেন লুকোতে চাইছেন তিনি।

সিডার আঙ্কেলের অন্যমনস্কতা, বার বার বাইরে তাকানো, অকারণেই জুলি আন্টির কণ্ঠস্বর রুক্ষ হয়ে ওঠা, তারপর এখনকার এই লুকোতে চাওয়া ঠিক স্বাভাবিক মনে হলো না আমার কাছে। কোথায় যেন কী একটা রহস্য রয়েছে।

জানালার দিক থেকে ফিরে তাকালেন সিডার আঙ্কেল। ভরা চাঁদের রূপালী জ্যোত্সা যেন ধুয়ে দিচ্ছে জানালার কাঁচ। নিশাচরেরা ক্যামেরার ছবি হতে পছন্দ করে না, বলে এক টুকরো গাজর তুলে নিয়ে ধীরে ধীরে চিবাতে শুরু করলেন তিনি। ওরা আড়ালে থাকতেই ভালবাসে।

মাঝে মাঝে ঘণ্টার পর ঘণ্টা একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। আমাদের, আন্টি বললেন। কখন উঁকি দেয় তার জন্যে অপেক্ষা করতে হয়।

আমাকে একদিন সঙ্গে নেবেন? অনুরোধের সুরে বললাম। চুপচাপ থাকব আমি, কথা দিচ্ছি। টু শব্দ করব না।

এক টুকরো মুরগীর মাংস খেলেন সিডার আঙ্কেল। যাবে, সে-তো খুব ভাল কথা। পরক্ষণেই গম্ভীর হয়ে গেলেন। তবে হ্যালোউইনের পরে।

ফিরে দেখলাম এখন জানালার বাইরে তাকিয়ে আছেন জুলি আন্টি। চিন্তিত ভঙ্গিতে বললেন, চাঁদটা ভরতে বাকি আছে, কিন্তু এখনই এত উজ্জ্বল।

বাইরে তো মনে হচ্ছে দিনের আলো, সিডার আঙ্কেল বললেন। দ্রুত একটা পরিবর্তন ঘটল চেহারায়।

কীসের?

ভয়ের?

ঠিক বুঝলাম না।
অস্থির মনে হচ্ছে ওঁদেরকে। বার বার জানালার বাইরে কী দেখছেন? উলফদের বাড়িতে কী আছে?
প্রশ্নটা না করে পারলাম না আর, আঙ্কেল, কিছু হয়েছে?
না না, কী হবে? চোখের পাতা সরু করে আমার দিকে তাকালেন আঙ্কেল।
আমার মনে হয়…
হ্যালোউইনের দিন কী পরবে, ভেবেছ কিছু? আমাদের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন জুলি আন্টি। প্রসঙ্গ বদল করার জন্যই, বুঝতে পারলাম।
ভাবছি, এ বছরও জলদস্যুই সাজব, নিনা জবাব দিল। চকলেট মিল্ক শেষ করেছে ও। গ্লাসের কিনার চাটছে। মাথায় রুমাল বাঁধব। এক চোখে কালো পট্টি বাঁধব।
পুরানো কিছু কাপড় আছে আমার আর কলিনের, জুলি আন্টি, বললেন। সেগুলো পরে দেখতে পারো। আমার দিকে ফিরলেন তিনি। রবিন, তুমি কী পরবে?
মায়ানেকড়ে সাজব, বলতে গিয়েও থেমে গেলাম। মনে পড়ল, এ কথাটা বলে আরেকটু হলেই মারা পড়েছিলাম। এত চমকে গিয়েছিলেন সিডার আঙ্কেল, গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রায় দুর্ঘটনা ঘটিয়ে ফেলেছিলেন।
মৃদু হেসে বললাম, আমিও ভাবছি জলদস্যুই সাজব।
বাটির বাকি সুপটুকু খেয়ে শেষ করলাম।
তখনও কল্পনাই করতে পারিনি, আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আকাশের যখন মাঝখানে চলে যাবে চাঁদটা, কী ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখতে পাব।
ডিনার শেষ হতেই উঠে দাঁড়াল নিনা। বলল, আমি যাই, অনেক দেরি করে ফেলেছি। মা বকবে।
তাড়াহুড়া করে বেরিয়ে গেল ও।
আমি আমার ছোট্ট বেডরুমটায় এসে ঢুকলাম।
কাপড় বদলালাম। পরনের কাপড়গুলো ঢুকিয়ে দিলাম ড্রেসারের ভিতর। যতটা সম্ভব গোছগাছ করে রাখতে চাইলাম ছোট্ট ঘরটাকে, নইলে হাঁটাচলার জায়গা থাকবে না।
ডেস্কে বসে মা-বাবাকে চিঠি লিখলাম। জানালাম, আমি ভাল আছি। লিখলাম, গ্রীন হিলসে ফিরে প্রচুর ভাল ভাল ছবি আমি দেখাতে পারব ওদের। কি চিঠি লেখা শেষ হলো। এখনও ঘুম পাচ্ছে না। তবু শুয়ে পড়াই ভাল।
পাজামা নেয়ার জন্য আলমারির দিকে এগোলাম। কিন্তু থেমে গেলাম জানালার বাইরে চোখ পড়তে। পায়ে পায়ে কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম।

তাকিয়ে আছি কমলা আলোর দিকে।
উলফদের বাড়ির একটা জানালায় দেখা যাচ্ছে ওই আলো!
দুটো গাছের মাঝখান দিয়ে আসাতে কাঁপা কাঁপা দেখাচ্ছে আলোটা।
বাতাসে কাঁপছে গাছগুলোর পাতা। ফ্যাকাসে কমলা আয়তাকার আলো দেখা যাচ্ছে বাড়ির পিছন দিকের নীচতলার একটা ঘরের জানালায়।
জানালাটা কি বেডরুমের?
আমার ঘরের জানালার কাঁচে নাক ঠেকিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালাম। কমলা আয়তাকার আলোটার ওপাশে কী আছে দেখার : চেষ্টা করছি।
উলফদের কাউকে কি দেখতে পাব? দম আটকে অপেক্ষা করতে লাগলাম।
বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না।
জানালার ওপাশে ছায়া নড়তে দেখলাম। ধূসর একটা ছায়ামূর্তি ধরা পড়ল কমলা আলোয়।
মানুষের ছায়া?
বুঝতে পারলাম না।
নড়ে উঠল ছায়াটা। একটা জন্তু, মনে হলো আমার।
তারপর মনে হলো, না না, মানুষই।
মিস্টার উলফ নাকি?
আরও জোরে নাক চেপে ধরলাম জানালার কাঁচে। আরও ভাল করে দেখতে চাইলাম।
উঁহু, মানুষ না।
বড় কুকুর?
নাকি মানুষই?
স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি না।
জানালা থেকে সরে গেল ছায়াটা।
তারপর তীক্ষ্ণ চিৎকার শোনা গেল।
কুৎসিত, ভয়ানক শব্দ। আধা-মানুষ, আধা-জানোয়ারের। এ রকম শব্দ আগে কখনও শুনিনি।
মেরুদণ্ডে ঠাণ্ডা শিহরণ বয়ে গেল আমার।
আবার শোনা গেল সেই ডাক। ঘন হয়ে গেল আমার নিঃশ্বাস।
জানালার কাছে ফিরে এল ছায়াটা। এখন আর মানুষের মত লাগছে না। মাথা হেলিয়ে দিয়ে, চোয়াল ফাঁক করে আবার ডেকে উঠল ওটা। নিশ্চয় ভয়ঙ্কর কোনও জানোয়ার।
ওই জানোয়ারটার ছবি তুলতে হবে।

চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়ালাম। মাঝখানের ছোট্ট পরিসর পেরিয়ে এসে প্রায় ডাইভ দিয়ে পড়লাম ডেস্কের ওপর।
ক্যামেরার জন্য হাত বাড়ালাম।
কিন্তু কোথায় ওটা?
ডেস্কের ওপর পাগলের মত হাতড়ে বেড়াচ্ছে আমার আঙুলগুলো।
কিন্তু ক্যামেরাটা পেলাম না।
সারা ঘরে ঘুরে বেড়াতে লাগল আমার দৃষ্টি। সব কিছুই জায়গামত রয়েছে। ড্রেসারটাতে রাখলাম নাকি?
না, ওখানেও নেই।
হাঁটু গেড়ে বসে বিছানার তলায় উঁকি দিলাম।
নেই।
হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেলাম আলমারিটার কাছে। টান দিয়ে। দরজা খুললাম। খুঁজে দেখলাম ভিতরে। নেই ওটা।
আবার শোনা গেল তীক্ষ্ণ চিৎকার। নেকড়ের ডাকের মত।
পরক্ষণে শোনা গেল আরেকটা একই রকম ডাক। একসঙ্গে ডেকে উঠল যেন দুটো নেকড়ে। সাইরেনের শব্দের মত তীক্ষ্ণ হয়ে এসে ঘুরতে থাকল আমার ঘরের ভিতর।
জানালা খোলার শব্দ শুনলাম। ধুপ করে ভারি একটা শব্দ। মাটিতে পায়ে পড়াম। মাটিতে লাফিয়ে পড়ার। ঘোঁতঘোঁত শোনা গেল। তারপর হাঁটার শব্দ। ঠিক আমার ঘরের বাইরে।
জানালার দিকে ছুটলাম। বুকের মধ্যে বাড়ি মারছে হৃৎপিণ্ডটা। বাইরে তাকালাম। আসতে দেরি করে ফেলেছি। কাউকে চোখে পড়ল না। নিভে গেছে উলফদের জানালার কমলা আলো। আবার অন্ধকার হয়ে গেছে বাড়িটা।
থিরথির কাঁপছে গাছের ডাল। নীল-কালো আকাশের পটভূমিতে কালো দেখাচ্ছে। পাতাগুলো চিকচিক করছে। উজ্জ্বল জ্যোত্সায় যেন নেয়ে যাচ্ছে।
দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তাকিয়ে রইলাম। বুকের কাঁপুনি বন্ধ হওয়ার অপেক্ষা করছি। কান পেতে আছি তীক্ষ্ণ চিৎকার ও ভারি পায়ের শব্দ শোনার আশায়।
শুধুই নীরবতা এখন। আবার মনে পড়ল ক্যামেরাটার কথা।
জানালার কাছ থেকে যেন জোর করে ঘোরালাম নিজেকে। ঘর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে হলওয়ে পেরিয়ে ছুটলাম লিভিং রুমের দিকে। ভুল করে ক্যামেরাটা ওখানে রেখে আসিনি তো?
না। লিভিং রুমেও নেই। রান্নাঘরে খুঁজলাম। সেখানেও নেই।
জুলি আন্টি! সিডার আঙ্কেল! ডাক দিলাম। জবাব এল না।

হল ধরে দৌড়ে চললাম। আমার ঘরটা পেরিয়ে এলাম। পেরিয়ে এলাম বাথরুম ও গরম কাপড় রাখার বড় আলমারিটা। হলের শেষ প্রান্তে তাদের ঘর। চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আমার ক্যামেরাটা দেখেছেন?

ধাক্কা দিয়ে খুলে ফেললাম তাদের বেডরুমের দরজা। অন্ধকার ঘর। ছবি ডেভেলপ করার ঝাঁঝাল রাসায়নিক গন্ধ নাকে ঢুকল। তাতে মনে পড়ল, বনের ভিতর নিশাচর জীবের ছবি তুলতে বেরিয়েছেন দুজনে।

ঘরে আমি একা।

ভারি দম নিলাম। নিজেকে বোঝালাম, শান্ত হও রবিন। কোন ভয় নেই। এখানে তুমি নিরাপদ।

মাথা ঠাণ্ডা করো। তা হলেই খুঁজে পাবে ক্যামেরাটা। ঘরেই আছে ওটা। মাথা গরম করে ফেলেছ বলে দেখতে পাচ্ছ না।

ফুসফুসের বাতাস ছেড়ে দিয়ে আবার ভারি দম নিলাম। আবার ছাড়লাম। মনে হলো কমে আসছে ভিতরের উত্তেজনা।

ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। দরজাটা লাগিয়ে দিয়ে এগিয়ে চললাম হলওয়ে দিয়ে। অর্ধেকটা এসেছি, এই সময় আবার কানে এল মৃদু শব্দ। আবার শোনা গেল পায়েব শব্দ। বরফের মত জমে গেলাম। কান পেতে আছি। কোথা থেকে আসছে? পিছনের দরজার কাছে। কিন্তু কে? নিশ্চয় উলফদের জানালা দিয়ে বেরোনো জনোয়ার দুটো।

দেয়াল ঘেঁষে বসে পড়লাম। সারা শরীর কাঁপছে।

ঢোক গিলোম। কান পেতে শুনছি দরজা ধাক্কাননার শব্দ। এখান থেকে বেরোতে হবে আমাকে!

এই বাড়িটা থেকেই বেরিয়ে যেতে হবে। ব সিডার আঙ্কেল আর জলি আন্টিকে জানাতে হবে, ভয়ঙ্কর কিছু রয়েছে পাশের বাড়িতে।

কিন্তু আমার পা দুটো যেন রবার হয়ে গেছে। এ দুটোয় ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াতে পারব কিনা সন্দেহ।

কাঁপা কাঁপা পায়ে উঠে দাঁড়ালাম। এক পা বাড়ালাম। তারপর আরেক পা।

রান্নাঘরে এসে দরজাটা একটানে খুলে ফেললাম। চেঁচিয়ে উঠলাম কে? কে ওখানে?

আমি, নিনা, জবাব দিল একটা ছায়ামূর্তি।

নিনা! হাঁ করে তাকিয়ে আছি। তু-তুমি এত রাতে?

হ্যাঁ। আব্বা-আম্মা বাড়িতে নেই। গেছে আমার এক আন্টির বাড়িতে, হ্যালোউইনের দাওয়াত দিতে। রাতে ফিরবে বলেও মনে হয় না। একা থাকতে

ভাল লাগছিল না, তাই চলে এলাম। একটু থেমে জিজ্ঞেস করল নিনা, কিন্তু তোমার গলা এমন কাঁপছে কেন?
তোমাকে দেখে আমি ভাবলাম… বলতে গিয়েও বলতে পারলাম না। কথাগুলো যেন আটকে গেল গলায়।
কী ভাবলে?
না, কিছু না!
কিছু তো বটেই। কী হয়েছে?
প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, নিনা, আমার ক্যামেরাটা কোথায় জানো? সারা বাড়ি খুঁজেও পাচ্ছি না…
না, জানি না! গুঙিয়ে উঠল নিনা। বনের ভিতর ফেলে আসনি তো?
নিঃশ্বাস ভারি হয়ে গেল আমার। কী জানি! হবে হয়তো…
পেটের ভিতর এক ধরনের অস্বস্তিকর খামচে ধরা অনুভুতি হচ্ছে।
টনি আর রজার চলে যাবার সময় তোমার হাতেই ছিল, দেখেছি, নিনা বলল। কিন্তু এখানে ফেরার পর আর দেখেছি কিনা মনে করতে পারছি না।
হুঁ! বিরক্ত ভঙ্গিতে মাথা নাড়লাম। ওটা আনতে হবে, নিনা। সারারাত বনের ভিতর ফেলে রাখতে পারব না।
না না! চেঁচিয়ে উঠল নিনা। আজ রাতে ওই বনের ভিতর যেয়ো না।
আমাকে যেতেই হবে!
রাতের বেলা ওই বন মোটেও নিরাপদ নয়। ভীষণ বিপজ্জনক।
ঘুরে দাঁড়িয়ে হলওয়ে ধরে ছুটলাম। আমার ঘরে ঢুকে জ্যাকেট গায়ে দিলাম। আলমারিতে একটা টর্চ পেলাম। সুইচ টিপে দেখলাম। ব্যাটারি আছে। আলো বেশ উজ্জ্বল।
বেরিয়ে এসে সিঁড়ির গোড়া থেকে নিনাকে বললাম, কয়েক মিনিটের মধ্যেই ফিরে আসছি।
না না, প্লিজ, রবিন। ককিয়ে উঠল নিনা। আমার কথা শোনো! আজ রাতে বনের মধ্যে যেয়ো না!
কিন্তু আমাকে যেতেই হবে। এত দামি ক্যামেরাটা নষ্ট হতে দিতে পারি না।
কী যেন ভাবল নিনা। ঠিক আছে, একটু অপেক্ষা করো। আমি জ্যাকেটটা পরে আসি।
কিন্তু বনের ভিতর পড়ে থেকে দামি ক্যামেরাটা নষ্ট হতে দেবার কোন ইচ্ছেই আমার নেই। তোমার আসতে দেরি হবে। ততক্ষণ সহ্য হবে না আমার। তা ছাড়া দুটো বাড়িকেই খালি ফেলে সবার চলে যাওয়া উচিত হবে না। তুমি তোমাদের বাড়ি পাহারা দাও। এ বা দিকেও খেয়াল রেখো। আমি যাব আর আসব।

বাইরে বেরিয়ে পাল্লার ছিটকানি তুলে দিলাম। নেমে এলাম সিঁড়ির নীচে।
চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে যেন সব কিছু।
বাড়ির পাশ ঘুরে দৌড়ে চললাম পিছন দিকে।
হঠাৎ করেই ভারি কালো মেঘে ঢেকে দিল চাঁদ, যেন আমাকে যন্ত্রণা দেয়ার জন্যই।
রাতের বাতাস খুবই ঠাণ্ডা। ভেজা ভেজা। দৌড়াতে দৌড়াতেই জ্যাকেটের জিপার তুলে দিলাম।
উলফদের বাড়ির দিকে ফিরে তাকালাম। কাউকে চোখে পড়ল না। পিছনের জানালাটা খোলা। কিন্তু বাড়িটা পুরোপুরি অন্ধকার। একটা আলোও নেই কোথাও।
ভারি শিশিরপাতে ভিজে পিচ্ছিল হয়ে আছে ঘাস। কপালে ঠাণ্ডা ফোঁটা পড়ল।
বৃষ্টি।
ক্যামেরাটার কথা ভেবে গুঙিয়ে উঠলাম। ভোলা জায়গায় পড়ে আছে নিশ্চয়। পানি পড়লে আমার এত দামি ক্যামেরাটা যাবে! বৃষ্টি আসার আগেই ওটা খুঁজে বের করতে হবে।
আমার পায়ের কাছে হুটোপুটি করছে ছোট ছোট জানোয়ার। থেমে গেলাম।
না। জানোয়ার নয়। মরা পাতা। জোর বাতাসে অন্ধকারে ঘাসের ওপর দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে।
মাথা নিচু করে একটা ডালের তলা দিয়ে এসে বনে ঢুকলাম। পুরানো গাছগুলো থরথর করে কাঁপছে, মড়মড় শব্দ করছে।
দূর থেকে ভেসে আসা পেঁচার ডাক আঙ্কেল ও আন্টির কথা মনে করিয়ে দিল আমাকে। ক্যামেরা হাতে বনের ভিতরেই আছেন কোথাও দুজনে। ভয় লাগছে, তাদের সামনে পড়ে যাব না তো?
বনের ভিতরের আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে এগিয়ে চললাম। বৃষ্টির আরেকটা বড় ফোঁটা পড়ল কপালে। মাটিতে ফোঁটা পড়ার টুপুর-টাপুর শব্দ হচ্ছে।
পুরানো, ঝুঁকে থাকা গাছটা নজরে আসতে থেমে গেলাম। বিকেল বেলা এই গাছটারই ছবি তুলেছিলাম। টর্চের আলো ফেললাম গাছের গোড়ায়।
যাক, পথ হারাইনি, ঠিকমতই এসেছি, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বিড়বিড় করে বললাম। ৪ পড়ে থাকা একটা গাছের ডাল ডিঙিয়ে এলাম। বাতাসের বেগ বাড়ছে। গাছের পাতায় হুসহুস শব্দ হচ্ছে। নড়ছে জোরে জোরে। থেকে থেকেই ডেকে উঠছে দূরের পেঁচাটা।
টর্চের আলোটা কমে গিয়ে আবার উজ্জ্বল হলো। গোলাকার আলোকরশ্মি আমার আর গাছগুলোর মাঝে একটা সুড়ঙ্গ তৈরি করেছে যেন। ত। ক্যামেরার

কেসটা চোখে পড়তেই চেঁচিয়ে উঠলাম। চ্যাপ্টা একটা শিকড়ের ওপর রেখেছি ওটা। কিন্তু ক্যামেরা ফেলে রেখে যাওয়ার মত এতবড় একটা ভুল কীভাবে করলাম মাথায় ঢুকছে না। উত্তেজিত হলে কত কী-ই না করে মানুষ!

ছুটে গিয়ে তুলে নিলাম ক্যামেরাটা। ফিরে পেয়ে এত খুশি হয়েছি, মনে হচ্ছে জড়িয়ে ধরে আদর করি। সাবধানে টর্চের আলোয় দেখতে লাগলাম।

ওপরে কয়েক ফোঁটা বৃষ্টির পানি পড়েছে। মুছে ফেললাম। ফিরে চললাম বাড়ির দিকে। টু বৃষ্টি থেমে গেছে আপাতত। মনের আনন্দে গুন গুন করে গান গাইতে লাগলাম। বাড়ি ফেরার তর সইছে না যেন। মনে হচ্ছে এক লাফে রাস্তাটুকু পেরিয়ে বাড়ি চলে যাই। o ক্যামেরাটা আমার কাছে ভীষণ মূল্যবান। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, কখনও আর কোনভাবেই কোথাও ফেলে যাব না এটা।

রাগত একটা শব্দ শুনে গুনগুন থামিয়ে দিলাম।..

গর্জন করে উঠেছে একটা জানোয়ার। গলার গভীর থেকে বেরোচ্ছে চাপা গরগর শব্দ।

হাত থেকে টর্চ খসে পড়ল আমার।

আবার গর্জন করে উঠল জানোয়ারটা।

আমার পিছনে কোথাও!

নিচু হয়ে তুলে নিলাম টর্চটা। দুর্বল লাগছে দুই হাঁটু। ঠাণ্ডা ভয়ের স্রোত ছড়িয়ে পড়ল যেন সারা শরীরে।

আবার গর্জন শোনা গেল। রাগত গরগর।

জোর করে সামনে পা বাড়ালাম। এখান থেকে পালাতে হবে আমাকে।

সামনে মাথা তুলে রেখেছে বড় একটা ঝোপ। ক্যামেরাটা শক্ত করে চেপে ধরে দৌড়ে চলে এলাম ঝোপের অন্যপাশে। হাঁটু গেড়ে বসলাম।

ঝোপের আড়ালে বসে হাঁপাচ্ছি। দম ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করছি। বুকের মধ্যে বাড়ি মারতে থাকা হৃৎপিণ্ডটার গতি কমাতে চাইছি।

ঝোপের ঘন পাতার জন্য ওপাশে দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু জানোয়ারের গরগর শুনতে পাচ্ছি। যতটা সম্ভব নামিয়ে রেখেছি মাথা, যাতে আমাকে না দেখে। তবে আমার গায়ের গন্ধ পেয়ে গেলে আর কিছু করার থাকবে না। খোদা, গন্ধ যেন না পায়-প্রার্থনা করলাম মনে মনে।

মাটিতে ভারি কী যেন আছড়ে পড়ল। তীক্ষ্ণ চিৎকার। মনে হলো, কোন কিছুর ওপর হামলা চালিয়েছে।

ভয়ার্ত কাতর আর্তনাদ করে উঠল অন্য একটা জানোয়ার। আতঙ্কিত চিৎকারের শব্দটা মাঝপথেই কাটা পড়ে গেল।

কেটে দেয়া হলো আসলে।

ঝোপের আড়ালে ঝুঁকে বসে আছি। পা কাঁপছে। সারা শরীর কাঁপছে। কানে আসছে ধস্তাধস্তির শব্দ।
এত কাছে, মনে হচ্ছে উঠে দাঁড়ালেই হাত বাড়িয়ে হামলাকারী ও তার শিকারকে ছুঁতে পারব।
প্রতিটি গোঙানি, প্রতিটি ভয়ার্ত ককানি কানে আসছে।
ধুপ করে শব্দ হলো। আরেকটা চাপা গর্জন। আরেকটা অসহায় কাঁতরানি।
মাংস ঘেঁড়ার শব্দ।
চিবানোর শব্দ। চোয়াল খটখটানির শব্দ। আরও চিবানো। জানোয়ারের ঢেকুর তোলা। আবারও মাংস ছেঁড়ার শব্দ। ঘটনাগুলো ঘটছে আমার ঠিক সামনেই, ঝোপের ওপাশে।
চোখ বুজলাম। কী ঘটছে, কল্পনা করার চেষ্টা করলাম। আবারও ধুপ করে শব্দ। তারপর নীরবতা। বাতাসের গতি বাড়ছে।
সামনে হিসিয়ে উঠল কী যেন। তারপর আবার চুপ। চোখ মেলোম। কম্পিত পায়ে উঠে দাঁড়ালাম। এ ভারি পায়ের শব্দ কানে এল। পায়ের চাপে ভাঙছে শুকনো ডাল পাতা।
দ্রুত এগিয়ে আসছে পায়ের শব্দ। আমার দিকে।
আমাকে ধরতে আসছে জানোয়ারটা?
তার নিজেকে সামলাতে পারলাম না। চাপা আতঙ্কিত চিৎকার বেরিয়ে গেল আমার গলা চিরে।
শক্ত হাতে ক্যামেরাটা চেপে ধরে ঘুরে দাঁড়ালাম ঝোপের দিক থেকে। দৌড়ানো শুরু করলাম।T
আমার পিছনে ভারি হাঁপানোর শব্দ হচ্ছে। ফিরে তাকালাম না।
ছুটতে ছুটতে ঢুকে পড়লাম বনের গভীরে। ডানে পানি পড়ার শব্দ কানে আসছে। কিংবা পানি বয়ে যাবার। নিশ্চয় উলফ লেক। কিন্তু দেখার জন্য থামলাম না।
পাশ দিয়ে যাবার সময় ডালে ঘষা লাগল আমার গাল। ব্যথা ছড়িয়ে পড়ল মুখ জুড়ে।
হাত দিয়ে চেপে ধরলাম গাল। দৌড়ানো বন্ধ করলাম না।
অন্ধের মত দৌড়াচ্ছি। অন্ধকারে দৌড়ে চলেছি। টর্চটা কোথায়? মনে পড়েছে। ঝোপের কাছে ফেলে এসেছি।
লম্বা নলখাগড়ার বনে ঢুকলাম। গাছগুলো শপাং শপাং করে বেতের মত বাড়ি মারছে আমার গায়ে। শিশির ও বৃষ্টিতে ভিজে আছে। ভিজিয়ে দিচ্ছে আমাকে।
মাটিতে অর্ধেক গেঁথে থাকা একটা পাথরে পা পড়ল আমার। পিছলে গেল পা। বহু কষ্টে সামলে নিয়ে আছাড় খাওয়া থেকে বাঁচলাম।

নলখাগড়ার বন থেকে বেরিয়ে এলাম। লাফিয়ে পেরিয়ে এলাম একটা উঁচু হয়ে থাকা গাছের শিকড়।
জোরে জোরে হাঁপাচ্ছি। সেই শব্দকে ছাপিয়ে কান পেতে শোনার চেষ্টা করলাম পিছনে পায়ের শব্দ আমাকে অনুসরণ করছে কি না। জানোয়ারের গর্জন শোনা যায় কি না। এ টি
এখনও কি জানোয়ারটা আমাকে তাড়া করছে?
মসৃণ একটা গাছের ডাল ধরে দাঁড়িয়ে গেলাম। এত বেশি পা কাঁপছে, মনে হচ্ছে খাড়া থাকতে পারব না। প্রায় ঝুলে পড়লাম ডালটা ধরে। স্বাভাবিকভাবে দম নেয়ার চেষ্টা করলাম।
তারপর ফিরে তাকালাম পিছনে।
কিছুই নেই।
গর্জন নেই। ঘোঁতঘোঁতানি নেই। ছুটে আসা ভারি পায়ের শব্দ হচ্ছে না মাটিতে। 1
হাঁপানো থামছে না আমার। কিছুতেই কমাতে পারছি না ঘন ঘন। শ্বাস নেয়া। পুড়ে যাচ্ছে যেন ফুসফুস। মুখের ভিতরটা শুকিয়ে কাঠ। ঢোক গিলতে পারছি না।
আমি ঠিক আছি, নিজেকে বোঝালাম। আপাতত আমি নিরাপদ।
গভীর অন্ধকারে কী আছে দেখার চেষ্টা করছি।
আর ঠিক এই সময় মাথায় পড়ল ওটা।
চমকে গিয়ে প্রথমে চিৎকার করে উঠলেও পরে বুঝলাম জিনিসটা কী। একটা পাখির বাসা। মাটি দিয়ে তৈরি ভাঙা বাসাটা মাথার ওপরের কোনও ডাল থেকে খসে পড়েছে বাতাসে।
কিন্তু কী কাণ্ড! পড়ার আর সময় পেল না! আর পড়বি তো পড়, একেবারে আমারই মাথায়!
চুলে আটকে যাওয়া একটা শুকনো কুটো ঝেড়ে ফেললাম। ক্যামেরাটা শক্ত করে চেপে ধরে চারপাশে তাকালাম।
কোথায় রয়েছি?
সামনের গাছগুলো কেমন বেঁকে রয়েছে মনে হচ্ছে। যেন হেলে পড়তে চাইছে একে অন্যের গায়ের ওপর। নলখাগড়া বনের কিনারে নিচু একটা পাথরের স্তূপ চোখে পড়ল।
হারিয়ে গেছি, বুঝতে পারলাম। তার
আকাশের দিকে তাকালাম। চাঁদ নেই। ভারি মেঘে ঢাকা পড়েছে চাঁদ-তারা সব কিছুই। আবছা আভা ছড়িয়ে আছে বনতলে।
ফিরে যাব কীভাবে?

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অন্ধকারের দিকে তাকালাম। রাস্তা খুঁজলাম। পরিচিত কিছু খুঁজলাম।
কিছুই দেখলাম না।
লেকটা খুঁজে পেলে হয়তো পরিচিত সেই জায়গাটায় ফিরে যেতে পারব, যেখানে বুড়ো বাঁকা গাছটা রয়েছে, যেখানে ক্যামেরাটা পেয়েছি।
কিন্তু কোনদিকে রয়েছে উলফ লেক?
পুরো এক পাক ঘুরে চারপাশে তাকালাম।
গায়ে কাঁটা দিল। জ্যাকেটে ঝরে পড়ল বৃষ্টির ঠাণ্ডা ফোঁটা।
আবারও চমকে গেলাম।
যা পড়ছে, তাতেই চমকাচ্ছি।
কী করব?
বনবন করে ঘুরছে যেন মগজটা।
চিৎকার করে ডেকে সাহায্য চাইব?
আমার আঙ্কেল-আন্টিকে ডাকব? জোরে চেঁচালে হয়তো আমার ডাক তাদের কানে পৌঁছবে।
কিন্তু আমার চিৎকার সেই জানোয়ারটার কানেও যেতে পারে।
এখনও কি আমাকে খুঁজছে ওটা? কাছাকাছিই কোথাও আছে?
সাহায্যের জন্য চিৎকার করলে বিপদ বাড়ার সম্ভাবনা আছে ভেবে বাদ দিলাম চিন্তাটা। রাত
কী করব তা হলে এখন? কী?
যে কোনও একদিকে হাঁটা শুরু করব? তারপর যা হয় হোক?
না। আন্দাজে ওরকম হাঁটতে গেলে পথ হারানোর সম্ভাবনা বেশি। ভোর হওয়ার অপেক্ষা করাই ভাল। এই অন্ধকারে কোনভাবেই বাড়ি ফিরতে পারব না। দিনের আলোয় পথ চিনে যাওয়াটা সহজতর হবে।
কিন্তু বনের ভিতর রাত কাটানোটাও ভীষণ বিপজ্জনক। টুপুর টাপুর শব্দ শোনা গেল আবার। বৃষ্টি শুরু হয়েছে। বেশ জোরেই নেমেছে এবার। বরফের মত ঠাণ্ডা পানি, ঝোড়ো বাতাসের ঝাঁপটায় সুচের মত বিধছে মুখে।
এখানে থাকা যাবে না, বুঝতে পারলাম।
বাড়ি যাওয়ার চেষ্টাই করতে হবে। হাঁটতে শুরু করলাম। তাড়াহুড়া না করে সাবধানে হাঁটছি। যেদিক থেকে এসেছি, সেদিকেই যাচ্ছি কিনা জানি না। তবে পরিচিত ঝোপটা চিনতে পেরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। এখানে বসেই জানোয়ারের গর্জন শুনেছিলাম। ভাগ্য ভাল, টর্চটাও খুঁজে পেলাম। এমন জোরে আঁকড়ে ধরলাম, যেন ওটাই আমার জীবন-মরণ।

এরপর কোনদিকে যাব? অনুমানের ওপর নির্ভর করে আবার চলা শুরু করলাম। মিনিটখানেক পরেই কোন কিছুতে হোঁচট খেলাম।
নরম কোনকিছু।
কীসে হোঁচট খেয়েছি দেখতে গিয়ে আতঙ্কিত চিৎকার বেরিয়ে এল মুখ থেকে।
টর্চলাইটটা কাঁপছে হাতের মুঠোয়। কাঁপা আলোয় বীভৎস একটা দৃশ্য ফুটে উঠল চোখের সামনে।
হাঁ করে তাকিয়ে আছি একটা জানোয়ারের দেহের দিকে। না না, দুটো জানোয়ার। কী কী ওগুলো? চেনা কঠিন। নখ দিয়ে কেটে ফালাফালা করে ফেলা হয়েছে।
টুকরো টুকরো করে ভেঁড়া। দড়ি
মাংস ঘেঁড়ার শব্দ শুনেছিলাম, মনে পড়ল। এগুলোকেই ছিঁড়ছিল জানোয়ারটা। পেটের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠল।
কী ধরনের জানোয়ার ওটা?
অন্য জানোয়ারকে এভাবে ছিঁড়ে ফেলতে পারে, কোন ধরনের জীবের এত শক্তি?
শিরশির করে উঠল মেরুদণ্ড।
জোর করে দৃষ্টি সরালাম অন্য দিকে।
একনাগাড়ে বৃষ্টি পড়ছে এখন। ক্যামেরাটা জ্যাকেটের নীচে ঢোকালাম। দৌড়াতে শুরু করলাম আবার।
ভয়ঙ্কর এই দৃশ্য সহ্য করা যায় না। যতটা সম্ভব দূরে পালাতে হবে।
চারপাশ থেকে ঝাঁপটা মারছে বৃষ্টিমেশানো বাতাস। আগে বাড়তে দিতে চায় না যেন আমাকে। কিন্তু আমিও থামব না। তাই
ভয় আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে চলল।
ওই ভয়াল জানোয়ারটা এখনও নিশ্চয় ঘুরে বেড়াচ্ছে বনের ভিতরে। এখনও নিশ্চয় শিকার খুঁজে বেড়াচ্ছে। আশেপাশেই কোনখানে।
জুতো ভিজে গেছে। পিচ্ছিল হয়ে গেছে মাটি। নরম কাদায় উঠছে আর পড়ছে পা দুটো। বার বার পিছলে পড়তে পড়তে বাচছি।
কতক্ষণ দৌড়ালাম বলতে পারব না। লেকের মধ্যে পড়তে পড়তে বাঁচলাম। লেকের ধারে পৌঁছে গেছি। বৃষ্টির পানিতে ভরে গেছে। নিচু পাড় ছাপিয়ে উপচে পড়ছে। যে
ঘুরে দাঁড়ালাম। আত্মবিশ্বাস ফিরে এসেছে খানিকটা। লেকের আশেপাশেই কোথাও রয়েছে সেই পায়েচলা সরু পথটা, যেটা ধরে বাড়ি থেকে এসেছি।
দুলন্ত গাছের মাঝখানে রাস্তাটা খুঁজে পেতে দেরি হলো না। বনের ভিতর থেকে বেরোতে পারব তো?

চেষ্টা করতে দোষ নেই।
কিছুদূর এগোতেই ধরে এল বৃষ্টি। তবে সর্বনাশ যা করার করে দিয়ে গেছে। এত কাদা, পা ফেললেই মাটিতে বসে যাচ্ছে জুতো। দৌড়ানো অসম্ভব করে তুলেছে।
ঝুঁকে থাকা বুড়ো-মানুষ গাছটার দেখা মিলল অবশেষে।
এই তো পাওয়া গেছে! এই তো পাওয়া গেছে। চেঁচিয়ে উঠলাম। হাত উঁচু করে বাতাসে ঘুসি মারতে লাগলাম আনন্দে। বাড়ির কাছাকাছি প্রায় পৌঁছে গেছি।
কয়েক মিনিট পরেই বন থেকে যেন ছিটকে বেরিয়ে এলাম। পৌঁছে গেলাম আমার আঙ্কেল সিডারের বাড়ির পিছনের আঙিনায়।
খুব খুশি লাগছে! উড়তে ইচ্ছে করছে!
ঘরের ভিতরের উষ্ণতায় পৌঁছানোর জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছি। ভেজা কাপড় খুলে শুকনো কিছু পরতে না পারলে শান্তি নেই।
কিন্তু আঙিনার মাঝামাঝি পৌঁছে থমকে দাঁড়ালাম।
তাকিয়ে আছি আমার টর্চের গোলাকার আলোটা যেখানে পড়েছে। সেদিকে।
ভেজা ঘাসে অদ্ভুত কিছু পায়ের ছাপ। গম্ভীর হয়ে বসা ছাপগুলো চলে গেছে উলফদের বাড়ির দিকে।
ভাল করে দেখার জন্য নিচু হলাম। মানুষের পায়ের ছাপের মত লাগল না ওগুলো। অনেকটাই লম্বা, চওড়াও বেশি, মানুষের পা কিংবা জুতোর চেয়ে অন্যরকম।
জানোয়ারের পায়ের ছাপ। আলোটা সামনে বাড়িয়ে রেখে পায়ের ছাপ ধরে এগিয়ে চললাম। চলে এলাম উলফদের আগাছা জন্মে থাকা পিছনের আঙিনায়।
অদ্ভুত ছাপগুলো কোথায় গেছে দেখে আরেকবার অবাক হলা। সোজা গিয়ে শেষ হয়েছে উলফদের শোবার ঘরের জানালায়।
পরদিন সকালে নাস্তা করতে রান্নাঘরে ঢুকে দেখি ফোনে কথা বলছেন জুলি আন্টি। আমার দিকে পিছন করে আছেন। আমি আঙ্কেলকে গুড মর্নিং বলতেই আন্টি ঘুরে তাকালেন আমার দিকে। রাগ ঝিলিক দিয়ে উঠল চোখের তারায়।
হ্যাঁ, আমি বুঝতে পেরেছি, ফোনে বললেন তিনি। ঠিক আছে, ঠিক আছে, আর কখনও ঘটবে না এ রকম।
সিডার আঙ্কেলের পাশে বসলাম। সাদা একটা কফির মগে চুমুক দিচ্ছেন। চোখ জুলি আন্টির দিকে।
না, আর ঘটবে না, টেলিফোনে আবার বললেন জুলি আন্টি। ভুরু কোঁচকালেন। আর যেন না যায় দেখব আমি। না। আপনার ওপর নজর রাখেনি, মিস্টার উলফ।
বুঝলাম, কার সঙ্গে কথা বলছেন আন্টি।

অসন্তুষ্ট ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন সিডার আঙ্কেল। আমি তোমাকে ওই বাড়িটার কাছে যেতে নিষেধ করেছিলাম, রবিন। আমি চাই না ওরা আমাকে ফোন করুক।
সরি, বিড়বিড় করলাম। কিন্তু…
গতরাতে যা ঘটেছে সব তাঁকে জানাতে চাইলাম। যা যা দেখেছি, সব।
কিন্তু ঠোঁটে আঙুল রেখে আমাকে চুপ থাকতে ইশারা করলেন আঙ্কেল। আন্টি যতক্ষণ ফোনে কথা বলছেন, ততক্ষণ যাতে কিছু না বলি।
না। আমার ভাতিজা আপনার বাড়ির ছবি তোলেনি, মিস্টার …, উলফ, জুলি আন্টি বললেন। না, বললাম তো, আর আপনাকে বিরক্ত করবে না। এখুনি ওর সঙ্গে কথা বলছি আমি। হ্যাঁ। ঠিক আছে। গুড বাই।
রিসিভার রেখে সিডার আঙ্কেলের দিকে তাকালেন তিনি। দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বিড়বিড় করলেন, কী লোক।
সাবধান হতে হবে আমাদের, জবাব দিয়ে চোখের পাতা সরু করে আমার দিকে তাকালেন সিডার আঙ্কেল। ওদের কিছু করতে দেয়া চলবে না।
কিন্তু আমি অদ্ভুত জিনিস দেখেছি… বলতে গেলাম।
শুনলেন না আঙ্কেল। বাধা দিয়ে বললেন, ওরা তোমাকে দেখে ফেলেছে, রবিন। কাল রাতে নাকি ওদের বাড়ির কাছে ঘোরাফেরা করছিলে। ভীষণ রেগে গেছে তাতে।
মগে কফি ঢেলে নিয়ে টেবিলে এসে বসলেন জুলি আন্টি। কপালে এসে পড়া এক গাছি ধূসর চুল হাত দিয়ে সরিয়ে দিলেন।
ও কাল রাতে বাইরে গিয়েছিলে কেন? আঙ্কেল জিজ্ঞেস করলেন।
আমি সত্যি দুঃখিত। কিন্তু এ ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না। আমার ক্যামেরাটা বনে ফেলে এসেছিলাম। সারারাত বনে পড়ে থাকলে, বৃষ্টির মধ্যে, নষ্ট হয়ে যেত।
কিন্তু উলদের বাড়ির কাছে গিয়েছিলে কেন? জুলি আন্টি জিজ্ঞেস করলেন।
বুনো জানোনায়ারের চিৎকার শুনলাম ওঁদের বাড়ির ভিতরে। অদ্ভুত পায়ের ছাপ গিয়ে শেষ হয়েছে বেডরুমের জানালার নীচে।
শান্ত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন সিডার আঙ্কেল। কফির কাপে লম্বা চুমুক দিলেন। নিশ্চয় ওদের কুকুরের পায়ের ছাপ, বলে জুলি আন্টির দিকে তাকালেন তিনি।
কুকুর? প্রায় চেঁচিয়ে উঠলাম। শুভ।
মাথা ঝাঁকালেন দুজনেই। মস্ত দুটো জার্মান শেফার্ড কুকুর আছে ওদের, জুলি আন্টি বললেন। সাংঘাতিক হিংস্র।
নেকড়ের মত বড়, সিডার আঙ্কেল বললেন। এক টুকরো টোস্ট নিয়ে তাতে মাখন লাগানো শুরু করলেন।

জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেললাম। দুটো জার্মান শেফার্ড! তীক্ষ্ণ চিৎকার আর ভেজা ঘাসে পায়ের ছাপের একটা মানে পাওয়া গেল এতক্ষণে। কিন্তু কেন যেন মনটা খুঁতখুঁত করতেই থাকল আমার।

স্কুলে যাবে না? জুলি আন্টি জিজ্ঞেস করলেন। যে কোন সময় নিনা চলে আসবে।

আমি রেডি, জবাব দিলাম। ঢক ঢক করে শেষ করে ফেললাম এক গ্লাস কমলার রস। গত রাতে আমি যখন বনের ভিতর গিয়েছিলাম... এ দুজনকে হাঁ করে আমার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে থেমে গেলাম।

তারপর বললাম, একটা জানোয়ারকে দেখলাম ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলা হয়েছে। নিষ্ঠুরভাবে খুন করা হয়েছে ওটাকে।

মাথা ঝাঁকালেন সিডার আঙ্কেল। মৃদুস্বরে বললেন, রাতের বেলা বন খুব বিপজ্জনক হয়ে যায়।

বা রাতের বেলা তোমার বনে যাওয়া আমাদের পছন্দ না, রবিন, আমার চুলে আঙুল চালাতে চালাতে জুলি আন্টি বললেন, কথা দাও, আর কখনও যাবে না।

যাব না, বিড়বিড় করলাম। আ মি ই আমি জবাব দেবার আগেই দরজার ঘণ্টা বাজল। রান্নাঘরে ঢুকল নিনা। জিনিসপত্রে ফুলে থাকা একটা ব্যাকপ্যাকের ভারে বাঁকা হয়ে আছে।রেডি?

মাথা ঝাঁকিয়ে চেয়ার পিছনে ঠেলে সরিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। হ্যাঁ, রেডি। কেমন জানি লাগছে আমার, একটা অপরিচিত স্কুলে যেতে।

টিচার মিস্টার রোভারকে তোমার ভালই লাগবে, নিনা বলল। ভারি মজার লোক। আর খুব ভাল মানুষ।

আমার ব্যাকপ্যাক আর জ্যাকেট নিয়ে, জুলি আণ্টি ও সিডার আঙ্কেলকে গুডবাই জানিয়ে সামনের দরজার দিকে রওনা হলাম।

বাইরে এসে গেটের দিকে এগোলাম। ফিরে তাকালাম উলফদের বাড়ির দিকে। বেডরুমের যে জানালাটা খোলা দেখেছিলাম, সেটা এখন বন্ধ। পুরো বাড়িটা অন্ধকার, সব সময় যেমন থাকে।

তোমার ক্যামেরাটা পেলে? নিনা জিজ্ঞেস করল।

মাথা ঝাঁকালাম। হ্যাঁ। কিন্তু মরতে মরতে বেঁচেছি। গতরাতের ভয়াবহ অভিযানের কথা খুলে বললাম ওকে।

গম্ভীর হয়ে গেল নিনা। তোমাকে আমি আগেই সাবধান করেছিলাম, রবিন। রাতের অন্ধকারে ভয়ানক হয়ে যায় বনটা।

হলুদ রঙের একটা স্কুল বাস ভারি শব্দ তুলে পাশ কাটাল আমাদের। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে নিনার নাম ধরে ডাকল কয়েকটা ছেলেমেয়ে। ওদের উদ্দেশে হাত নাড়ল নিনা।

আকাশের অনেক নীচে ঝুলে আছে যেন সকালের সূর্যটা। রাস্তার পাশের ঘাস আঁকড়ে রয়েছে শিশিরকণা। ঠাণ্ডা বাতাস যেন মচমচে, চাপ দিলেই ভেঙে যাবে।
আরেকটা ব্লক পেরোলেই স্কুলে পৌঁছে যাব, নিনা বলল। অস্বস্তি লাগছে?
জবাব দিলাম না। উলফদের কথা ভাবছি আমি। ওদের বাড়ির ভিতর থেকে আসা চিৎকারের কথা জানিয়ে নিনাকে বললাম, দুটো জার্মান শেফার্ড কুকুর নাকি আছে ওঁদের। যেমন বড়, তেমনি হিংস্র।
কে বলল ওদের কুকুর আছে? তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল নিনার কণ্ঠ।
থমকে দাঁড়ালাম। কী বললে?
উলফদের কোন কুকুরই নেই, নিনা বলল আবার। কখনও কুকুর পুষতে দেখিনি ওঁদের।
তা হলে আমার আঙ্কেল বললেন কেন?
যাতে তুমি ভয় না পাও, নিনা বলল।
উলফদের যদি কুকুর না থাকে, অদ্ভুত ওই পায়ের ছাপগুলো তা হলে কীসের?
মাথা নাড়ল নিনা। ওর জলপাই-সবুজ চোখের তারা স্থির হলো, আমার চোখের দিকে। রবিন, এখনও বুঝতে পারনি? কিছুই অনুমান করতে পারনি?
কী অনুমান করব? বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলাম।
উলফরা মায়ানেকড়ে!
অবাক হলাম আমি। তবে বিশ্বাস করলাম না। হেসে উড়িয়ে দিলাম নিনার কথা। এই কম্পিউটারের যুগেও মায়ানেকড়ের কথা বিশ্বাস করে মানুষ?
উলফ লেকের মানুষরা করে, নিনা বলল।
তুমি আমাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছ, বললাম ওকে। কিন্তু এত সহজে আমি ভয় পাই না। একটা জার্মান শেফার্ডকে আমি দেখেছি। উলফদের জানালার কাছে এসে চিৎকার করছিল।
হতাশ ভঙ্গিতে মুখ বাঁকাল নিনা। ওটা কুকুর না।
তা হলে কী? মায়ানেকড়ে? অন্যে যে যা বলে বলুক, তুমি অন্তত ওসব আজগুবি কথা বলে আমাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা কোরো না, বুঝলে? সব
কিন্তু স্কুলে একটা মস্ত চমক অপেক্ষা করছিল আমার জন্য। ছাত্রছাত্রীরা তো বটেই, এমনকী সিক্সথ গ্রেডের শিক্ষক মিস্টার রোভার পর্যন্ত সারাটা সকাল মায়ানেকড়ের আলোচনা করে কাটালেন।
চল্লিশের কাছাকাছি বয়েস তাঁর। বেঁটে, মোটা। পাতলা হয়ে আসা বাদামী চুল। গোলাকার লাল মুখ। চশমার পুরু কাঁচের ওপাশে কালো চোখ। গায়ে হলুদ সোয়েটার। সব মিলিয়ে তাকে একটা পাকা নাশপাতির মত মনে হলো আমার।

কি তবে নিনা ঠিকই বলেছে। মানুষ হিসেবে তিনি অতি চমৎকার। আন্তরিক ভঙ্গিতে আমাকে স্বাগত জানালেন তিনি। ক্লাসের অন্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। দ্রুত পরিবেশটা সহজ করে দিলেন আমার জন্য।
পিছনের দরজার কাছে একটা সিট ঠিক করে দিলেন আমাকে। নিনা বসে সামনের সারিতে।
ঘরের অন্যপ্রান্তে জানালার কাছে বসা দেখলাম রজার ও টনিকে। আমার দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল ওরা, তবে হাই-হ্যালো কিছু বলল না।
কেমন দুমড়ানো, ক্লান্ত মনে হলো ওদেরকে। পরনের পোশাক অতিরিক্ত কুঁচকানো। এলোমেলো, উস্কোখুস্কো চুল। সারারাত মনে হয় জেগেই ছিল, ভাবলাম।
এই আজব ভাবনা কেন এল আমার মাথায়, বুঝলাম না।
নাম ডাকার পর নিজের ডেস্কের কিনারে উঠে বসলেন মিস্টার রোভার। পুরো ঘরে ঘুরে এল তার নজর। আমাদের সুস্থির হয়ে বসার সুযোগ দিলেন।
লাইক্যানথ্রপি কি জিনিস জানো তোমরা? ভারি পাওয়ারের কাঁচের ওপাশে জ্বলজ্বল করে উঠল তাঁর চোখ। তারই
শব্দটা জীবনে প্রথম শুনলাম। কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে কয়েকটা হাত উঠে গেল।
রজারকে বলতে বললেন টিচার।
লাইক্যানথ্রপি মানে মানুষের নেকড়েতে রূপান্তরিত হওয়া, জবাব দিল রজার।
অর্থাৎ মায়ানেকড়ে! বলল টনি।
মাথা ঝাঁকালেন মিস্টার রোভার। হ্যাঁ, মায়ানেকড়ে। অনেকে। লাইক্যাপি স্টাডি করে। কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করলেন তিনি। যেহেতু এ সপ্তাহের শেষেই হ্যালোউইন-আর এ বছর হ্যালোউইনের রাতেই হচ্ছে পূর্ণিমা-ভাবলাম, কিছুটা সময় লাইক্যানথুপি নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। অনেকেই বিশ্বাস করে, মায়ানেকড়েকে জ্যান্ত করে তুলতে পূর্ণিমার পূর্ণ চাঁদের প্রয়োজন। তবে তাদের ধারণা ভুল। যদিও একটা কথা ঠিক, চাঁদ যত বড় হতে থাকে, মায়ানেকড়েরাও ততই শক্তিমান হতে থাকে।SIR
পায়ের ওপর পা তুলে আরাম করে বসলেন তিনি। দুশো বছর আগে ইয়োরোপে কীভাবে মায়ানেকড়ের কিংবদন্তী চালু হয়, সেই গল্প বললেন। জ্যোৎস্নারাতে একজন স্বাভাবিক মানুষ মায়ানেকড়ের কামড় খেলে সে-ও মায়ানেকড়ে হয়ে যায়।
কামড় খেয়ে যারা মায়ানেকড়ে হয়, তাদের এই অভিশাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার কোন উপায় নেই, মিস্টার রোভার বললেন। চাপকণ্ঠে। কথা বলছেন তিনি, যেন

আবহটাকে ভূতুড়ে রূপ দিতে চাইছেন। একবার মায়ানেকড়ে হয়ে গেলে যতই স্বাভাবিক জীবন যাপনের চেষ্টা সে করুক না কেন, চাঁদের আলোয় নেকড়ে হবেই।
মেয়েরাও? নিনা জিজ্ঞেস করল।
হেসে উঠল কয়েকটা ছেলেমেয়ে।
হ্যাঁ, মেয়েরাও, গম্ভীর স্বরে জবাব দিলেন মিস্টার রোভার। মায়ানেকড়েদের অতিরিক্ত রাগ। বার বার চিৎকার করতে থাকে। শিকারের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায় বনের ভিতর।
গাঁজা! বিড়বিড় করল সামনের সারিতে বসা একটা ছেলে।
হেসে উঠল অনেকেই।
টিচার হাসলেন না। অনেকে আবার জাদু করা নেকড়ের চামড়া পরেও মায়ানেকড়ে হয়, বলতে থাকলেন তিনি। চামড়া পরে পূর্ণিমার রাতে চাঁদের দিকে তাকিয়ে তিনবার নেকড়ের মত জোরে জোরে হাঁক দিলেই সে মায়ানেকড়ে হয়ে যাবে। গা থেকে চামড়া খুলে নিলে আবার মানুষের রূপ ফিরে পাবে। এভাবে চামড়া পরে যারা মায়ানেকড়ে হয়, তাদের বেশির ভাগই অতি কৌতূহলের শিকার। ওই চামড়া কোনভাবে পুড়িয়ে ফেলা গেলে গায়েও দিতে পারবে না, আর মায়ানেকড়েও হতে পারবে না। এক ভয়ানক যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাবে।
গুল! আবার বলল লাল চুলওয়ালা ছেলেটা।
অনেকেই হাসল। উত্তেজিত স্বরে কথা বলতে লাগল ছেলেমেয়েরা।
থামানোর চেষ্টা করলেন মিস্টার রোভার। লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। হলুদ সোয়েটারের নীচের দিকটা টেনে নামিয়ে দিলেন। পায়চারি শুরু করলেন চকবোর্ডের সামনে।
মায়ানেকড়ে আছে, কে কে বিশ্বাস করো? জিজ্ঞেস করলেন তিনি।
খুক করে চাপা হাসি হাসলাম। আমার ধারণা কেউ হাত তুলবে না।
কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে ঘরের বেশির ভাগ ছেলেকে হাত তুলল।
তোমরা বিশ্বাস করো! মিস্টার রোভার জিজ্ঞেস করলেন।
হ্যাঁ, করি, রজার বলল।
আমিও করি, সুর মেলাল টনি।
ফিরে তাকিয়ে দেখলাম কঠিন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। দুজনে।
শিহরণ খেলে গেল আমার দেহে। সমস্যাটা কী ওদের? অবাক হয়ে ভাবলাম। এমন উদ্ভট আচরণ করছে কেন?
.

ক্লাস শেষ হলে ঘরের পিছনে আমার কাছে চলে এল রজার ও টনি। ঘরের বাইরে লকারের দরজা লাগানোর জোরাল শব্দ হচ্ছে। হাসাহাসি করছে ছেলেমেয়েরা, উঁচু স্বরে কথা বলছে। দেয়ালে প্রতিধ্বনি তুলছে। ওদের হট্টগোল।
চুপচাপ আমার দিকে তাকিয়ে রইল দুজনে।
ব্যাকপ্যাকের জিপার লাগাতে লাগাতে জিজ্ঞেস করলাম, কী ব্যাপার?
আমাদের উদ্দেশে হাত নেড়ে বেরিয়ে গেলেন মিস্টার রোভার। এক হাতে ব্রিফকেস। ক্লাসরুমে আমরা তিনজন ছাড়া কেউ নেই।
কেমন লাগছে? টনি জিজ্ঞেস করল।
নতুন স্কুলে সবকিছু নিশ্চয় অন্যরকম লাগছে? রজারের প্রশ্ন।
হ্যাঁ, কিছুটা, জবাব দিলাম। তবে এ নিয়ে ভাবছি না, দু-তিন সপ্তাহের বেশি তো আর এখানে থাকতে হচ্ছে না আমাকে।
তোমার ভাগ্য ভাল, চলে যাওয়ার সুযোগ আছে, রজার বলল। টনি আর আমি পড়ে গেছি ফাঁদে। আটকে গেছি এই জঘন্য জায়গাটায়। কোনও দিন আর এখান থেকে বেরোতে পারব বলে মনে হয় না।
অত খারাপ নয় কিন্তু উলফ লেক। ব্যাকপ্যাকটা কাঁধে তুলে নিলাম আমি।
আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাৰিয়ে আছে ছেলে দুটো। ঢালা প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল টনি। রজার কড়ে আঙুলে পরা একটা রূপার আংটি ঘুরিয়ে চলেছে অনবরত।
অবশেষে নীরবতা ভাঙল টনি। মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, মায়ানেকড়ে আছে, বিশ্বাস করো না তুমি, তাই না?
আমি? আসলে… বলতে গিয়ে দ্বিধায় পড়ে গেলাম।
তুমি তো হাত তোলনি, রজার বলল। তারমানে তুমি বিশ্বাস করো না।
আসলেই আমি বিশ্বাস করি না, জবাব দিলাম। একুশ শতকে এসে এই কম্পিউটারের যুগে কে বিশ্বাস করবে মানুষ নেকড়ে হয়ে যায়? না, আমি করি না।
আমি জানি, আমার জায়গায় কিশোর হলেও ঠিক এই জবাবটাই দিত।
স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়েই আছে ওরা।
কিন্তু মায়ানেকড়ে আছে, গম্ভীর মুখে বলল রজার। আমরা সেটা প্রমাণ করতে পারব।
কেন বাজে বকছ?
বললাম তো, প্রমাণ করতে পারব, রজার ওর কথায় অটল। থাকল। একটা মায়ানেকড়ে আমি তোমাকে দেখাতেও পারব।
একটা সত্যিকারের মায়ানেকড়ে, টনি বলল।
থাক, লাগবে না, আমি বললাম। আমি…

চাইলে ওটার ছবিও তুলতে পারবে তুমি, বাধা দিয়ে বলল রজার।
হ্যাঁ। যত ইচ্ছে ছবি, সুর মেলাল ওর বন্ধু।
তর্ক থামিয়ে চুপ করে ভাবতে লাগলাম। ছবি তোলার প্রতিযোগিতায় মায়ানেকড়ের ছবি দেখাতে পারলে আমার প্রথম পুরস্কার পাওয়া ঠেকায় কে?
সত্যিকারের একটা মায়ানেকড়ে দেখতে চাও? টনি জিজ্ঞেস করল।
মায়ানেকড়ের ছবি তুলতে চাও? সুর মেলাল রজার।
আমার দিকে তাকিয়ে আছে দুজনে।
চাই, কোনরকম দ্বিধা না করে জবাব দিলাম।
হেসে উঠলেন জুলি আন্টি। নিনা, অদ্ভুত লাগছে তোমাকে! গালে হাত ঠেকালেন তিনি।
থ্যাংক ইউ। নাটকীয় ভঙ্গিতে বাউ করল নিনা। থ্যাংক ইউ।
ডিনারের পর কস্টিউম দেখাতে এসেছে ও। হ্যালোউইনের সময় কী পরবে দেখাচ্ছে। বেশ কিছু পুরানো পোশাক থেকে কাপড় ছিঁড়ে জোড়া দিয়ে সেলাই করেছে। ঢোলা প্যান্টের এক পা বাদামী আরেক পা সবুজ। হাঁটুর কাছে চেক কাপড়ের তালি। হলুদ, লাল, নীল, সবুজ এমন কোনও রঙ নেই, যে রঙের কাপড় নেই শার্টটাতে। শার্টের ওপর জ্যাকেট পরেছে, ওটা আরও বেশি রঙচঙে। পুরানো কম্বল কেটে বানানো হ্যাটটা বার বার কাত হয়ে গিয়ে মুখের ওপর এসে পড়ছে।
আসলে কী সেজেছ তুমি? জিজ্ঞেস করলাম। বাতিল কাপড়ের আড়ত?
নিনা হাসল না। পুরানো বাতিল পুতুল। চিনতে পারছ না? কম্বলের কাপড়ের একটা ছেঁড়া মাথা ধরে টান দিল ও।
জুলি আন্টি ও সিডার আঙ্কেল দুজনেই হাসতে লাগলেন। ওদেরকে হাসতে দেখে ভাল লাগল আমার। ডিনারের সময় খুব ক্লান্ত আর মন খারাপ দেখাচ্ছিল ওঁদের। আমার সঙ্গে প্রায় কথাই বলেননি।
বাতিল পুতুল নিয়ে একটা গানও আছে, জুলি আন্টি বললেন। তোমার মনে আছে, জন?
মাথা নাড়লেন সিডার আঙ্কেল। কোন কথাই আর এখন মনে করতে পারি না। সকালে ঘুম থেকে ওঠার কথা যদি মনে থাকে, নিজেকে ভাগ্যবান ভাবব।
ধূর, তোমার সঙ্গে কথা বলে মজা নেই! জুলি আন্টি বললেন। কনুই দিয়ে আলতো গুতো মারলেন স্বামীর পিঠে। তারপর বাতিল পুতুলের গান ধরলেন।
কিম্ভুত ভঙ্গিতে কোমর দুলিয়ে হাত ওপরে তুলে নাচ আরম্ভ করল নিনা। সেলাই ছুটে গিয়ে জ্যাকেটের একটা হাতার অনেকখানি ঝুলে পড়ল। সবাই হাসলাম।
তোমার কস্টিউম কই, রবিন? জুলি আন্টি জিজ্ঞেস করলেন। যাও, গিয়ে পরে এসো। দেখি, কেমন লাগে।

আমি…আমি এখনও জোগাড় করতে পারিনি, বললাম।
চলল, কিছু পুরানো কাপড় নিয়ে আসি। আজ রাতেই তোমাকে একটা কস্টিউম বানিয়ে দেব, জুলি আন্টি বললেন।
কিন্তু কস্টিউম নিয়ে মাথাব্যথা নেই আমার। সামনের জানালা দিয়ে বার বার অন্ধকার হয়ে আসা আকাশের দিকে তাকাচ্ছি। কী করতে যাচ্ছি, ভাবছি।
বনের ভিতর লেকের কাছে টনি ও রজারের সঙ্গে দেখা করার কথা আমার। স্কুলে ওদের সঙ্গে এই কথাই হয়েছে। সাথে করে ক্যামেরাটা নিয়ে যেতে হবে আমাকে।
ওরা বলেছে, প্রতি রাতেই চাঁদ যখন মাঝ আকাশে ওঠে, মায়ানেকড়ে আসে ওই জায়গাটাতে। চাঁদের দিকে তাকিয়ে হাঁক ছাড়ে, কথাটা বলার সময় উত্তেজনায় ফিসফিসে হয়ে গিয়েছিল রজারের কণ্ঠ। তারপর মুখ নামিয়ে চুক চুক করে লেকের পানি খায়।
দাঁড়াও না, আগে দেখো ওটাকে, তারপর বুঝবে কী জিনিস! টনি বলেছে। আধা-নেকড়ে আধা মানুষ! বুঝলে তো? আধা-জন্তু আধা মানুষ!
দুজনের দিকে চোখ সরু করে তাকিয়েছি। ওরা সত্যি বলছে কিনা বোঝার চেষ্টা করেছি। ভাবভঙ্গি দেখে ধাপ্পা মনে হয়নি। মনে হচ্ছিল, সত্যি কথাই বলছে।
কিন্তু এটা কি সম্ভব? সত্যিই কি আছে মায়ানেকড়ে?
উলফদের জানালায় দেখা অদ্ভুত প্রাণীটার কথা ভাবলাম। বনের ভিতরে দুটো প্রাণীর হিংস্রতার কথাও ভাবলাম। ঘাড়ের কাছে শিশির করে উঠল আমার।
মাঝরাতে দেখা করবে আমাদের সঙ্গে? টনি জিজ্ঞেস করেছিল।
রাতের বেলা বনে যাবার কোন ইচ্ছেই আমার ছিল না, বিশেষ করে একবার ঘুরে সেখানে কী আছে দেখে আসার পর।
কিন্তু আমি যে ভয় পেয়েছি সেটা জানতে দিতে চাইনি ওদের।
তা ছাড়া প্রতিযোগিতায় জেতার জন্য একটা অন্যরকম ছবি আমার দরকার। মায়ানেকড়ের ছবি নিয়ে যেতে পারলে নিঃসন্দেহে প্রথম পুরস্কার পাব! এর ধারেকাছেও আসতে পারবে না অন্য কোন ছবি।
কাজেই চুপি চুপি বাড়ি থেকে বেরিয়ে বনের মধ্যে দেখা করব। কথা দিলাম টনি ও রজারকে। কিন্তু যতই অন্ধকার হচ্ছে, ততই আমার ___ অস্বস্তি বাড়ছে। এ জানালার বাইরে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে পেটের ভিতরে মোড় দিতে থাকল আমার। ঠাণ্ডা হয়ে গেল হাতের তালু। ঘামে আঠা হয়ে যাচ্ছে।
রবিন, কী ভাবছ? জুলি আন্টির প্রশ্নে ভাবনার জাল ছিন্ন হয়ে গেল আমার।
অ্যাঁ! চোখ মিটমিট করে তাকালাম। মাথা ঝাড়লাম।
হেসে উঠল সবাই।

জানালা দিয়ে এমন করে বাইরে তাকিয়ে আছ যেন ভূত দেখেছ, নিনা বলল।
না, চাঁদ দেখছিলাম, কোনমতে বললাম।
একে বলে চাঁদের অসুখ! রসিকতা করলেন সিডার আঙ্কেল।
ঘরের সবাই ভাল মেজাজে আছে, শুধু আমি বাদে। মনে হলো, আমারও ওদের সঙ্গে যোগ দেয়া দরকার। কিন্তু বনের ভিতরে যাওয়ার ভাবনাটা আমাকে সহজ হতে দিল না।
একটু পরে বাড়ি চলে গেল নিনা। আণ্টি ও আঙ্কেলকে গুড-নাই। জানিয়ে আমিও নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলাম।
বিছানার পাশে রাখা টেবিল ঘড়িটা দেখলাম। দশটা বেজে পনেরো।
আরও অন্তত দুই ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে।
ক্যামেরাটা পরীক্ষা করে নিলাম। নিশ্চিত হলাম, হাই-স্পিড ফিল্ম ভরা আছে।
তারপর একটা ফটোগ্রাফি ম্যাগাজিন টেনে নিয়ে পড়তে বসলাম। দ্রুত সময় পার করে দেয়ার জন্য।
কিন্তু আমার চোখ দুটোই শুধু তাকিয়ে আছে ম্যাগাজিনের দিকে। পড়তে পারছি না। মনোযোগ দিতে পারছি না।
একটু পর পরই ঘড়ির দিকে নজর চলে যাচ্ছে, কটা বাজে দেখার জন্য।
অপেক্ষার মুহূর্তগুলো এত দীর্ঘ হয় কেন?
অবশেষে, বারোটা বাজার দশ মিনিট আগে ম্যাগাজিনটা বন্ধ করে রাখলাম। গায়ে একটা বাড়তি সোয়েটার চাপালাম। তার ওপরে জ্যাকেট। ক্যামেরা কেসটা তুলে নিয়ে কাঁধে ঝোলালাম। আলো নিলাম। তারপর পা টিপে টিপে এগোলাম বেডরুমের দরজার দিকে।
এতক্ষণে নিশ্চয় বনে চলে গেছেন আমার আঙ্কেল ও আন্টি, নিশাচর জীবের ছবি তুলতে। কিন্তু ঝুঁকি নিলাম না। যদি ঘরে থেকে থাকেন। সেজন্য নিঃশব্দে চললাম, যাতে ওঁরা শুনে না ফেলেন।
অন্ধকারে দরজার নব ধরে মোচড় দিয়ে টান দিলাম।
নব ঘুরল, কিন্তু দরজা খুলল না।
আরে!
আবার মোচড় দিয়ে হ্যাঁচকা টান দিলাম।
এবারও খুলল না।
বিশ্বাস করতে পারছি না।
দরজায় তালা দিয়ে রাখা হয়েছে, যাতে বেরোতে না পারি।
নাকি পাল্লাটা আটকে গেল?

জোরে জোরে টানতে লাগলাম। জোরে ধাক্কা দিয়েও দেখলাম। কোন কাজ হলো না। পাল্লা খুলল না। তালাই দেয়া হয়েছে। বাইরে থেকে।
রাগে ঝটকা দিয়ে দরজার কাছ থেকে ঘুরে দাঁড়ালাম।
আমাকে তালা দিয়ে রেখে গেলেন কেন আঙ্কেল ও আণ্টি? অবাক লাগছে আমার। গতরাতে বেরিয়েছিলাম বলে? বনের ভিতর মরতে মরতে বেঁচেছিলাম, তাই?
ব্যাপারটা মেনে নিতে পারলাম না। রাগে চিৎকার করে উঠলাম।
দৌড়ে গেলাম জানালার কাছে। পর্দা সরিয়ে খড়খড়ির হাতল চেপে ধরলাম। টান দিলাম ওপর দিকে।
কয়েক ইঞ্চি উঠে গেল খড়খড়ি। অস্ফুট শব্দ করে উঠলাম।
জানালাটায় লোহার ডাণ্ডা লাগানো।
নিশ্চয় আঙ্কেল লাগিয়েছেন। কখন লাগালেন? বিকেলে?
আমি এখন বন্দি, নিজেকে বললাম। খাঁচায় বদ্ধ জানোয়ারের মত আটকে রেখে যাওয়া হয়েছে আমাকে।
আবার চিৎকার করে উঠলাম অসহায় রাগে।
জানালার চৌকাঠে উঠে দাঁড়ালাম। দুই হাতে চেপে ধরে ডাণ্ডাগুলো টেনে খোলার চেষ্টা করলাম।
কিন্তু নড়লও না ওগুলো।
ডাণ্ডা ধরে টানাটানি করছি, এই সময় কানে এল চাপা গর্জন।
ডাণ্ডা থেকে আপনাআপনি সরে এল আমার হাত। তীক্ষ্ণ চিৎকার বেরিয়ে গেল গলা চিরে।
বরফের মত জমে গেছি।
আবার শোনা গেল গর্জন। আগেরবারের চেয়ে জোরে।
কাছে। খুব কাছে।
তীক্ষ্ণ চিৎকার ছড়িয়ে পড়ল। উলফদের বাড়ি থেকে আসছে।
মুখটা নিয়ে গেলাম ডাণ্ডার কাছে। উঁকি দিয়ে তাকালাম। ওদের বেডরুমের জানালা খুলে গেছে। তবে বাড়িটা পুরোপুরি অন্ধকার। কোথাও কোন আলো নেই।
তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি অন্ধকারের দিকে। মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়েছে চাঁদ। বাড়িটা দেখতে পাচ্ছি অস্পষ্টভাবে।
ডাণ্ডায় কপাল চেপে ধরে ভালমত দেখার চেষ্টা করলাম। জানোয়ারের ঘোঁতঘোঁত কানে এল। তারপর ধুপ করে একটা শব্দ।

উলফদের জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়েছে একটা আবছা ছায়ামূর্তি। তারপর আরেকটা ধুপ। আরও একটা মূর্তি লাফিয়ে পড়ল জানালা দিয়ে, চারপায়ে ভর দেয়া।

একটা মূর্তি আকাশের দিকে মুখ তুলে তীক্ষ্ণ হাঁক ছাড়ল। বিলাপের মত মনে হলো ডাকটা।

হাঁটতে শুরু করল প্রাণী দুটো। চারপায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে পিছনের আঙিনা পেরিয়ে চলে যাচ্ছে বনের দিকে।

কী ওগুলো? কুকুর? নেকড়ে? মানুষ? অন্ধকারে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি না।

তাকিয়েই আছি। রূপালী জ্যোৎস্না এসে যেন ধুয়ে দিতে লাগল। বাড়িটাকে। মেঘ সরে গেছে চাঁদের ওপর থেকে।

তবে দেরি হয়ে গেছে আমার। অনেক দেরি। প্রাণী দুটো উধাও। অসহায় আক্রোশে ডাণ্ডার ওপর কিল মারতে শুরু করলাম।

লেকের কিনারে আমার জন্য অপেক্ষা করছে টনি ও রজার। ওখানে যাবার কোন উপায় নেই আমার। অথচ যাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে আছি আমি।

কী ভাববে ওরা? ভাববে আমি একটা ভীতুর ডিম। একটা দারুণ ছবি তোলা থেকে বঞ্চিত হলাম। রাগে দড়াম করে লাগিয়ে দিলাম জানালাটা।

কাল রাতে! জোরে জোরে বললাম। কাল রাতে অবশ্যই আমি বেরিয়ে যাব এখান থেকে। আঙ্কেল ও আন্টি ঠেকাতে পারবে না আমাকে।

কাল রাতে বনে যাব আমি, আবার বললাম নিজেকে।

মায়ানেকড়ের রহস্য ভেদ করে ছাড়ব!

দুঃস্বপ্ন দেখলাম। মায়ানেকড়ের তাড়া খেয়ে যখন পাগলের মত দৌড়াচ্ছি, হঠাৎ ভেঙে গেল ঘুম। বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা লাফাচ্ছে। দেখি সিডার আঙ্কেলের বাড়িতে আমার ঘরে শুয়ে আছি। ঘামে নেয়ে গেছে সারা শরীর।

সকাল হয়ে গেছে। হাতমুখ ধুয়ে এসে রান্নাঘরে ঢুকলাম। কী করে কাজটা করতে পারলেন! অভিযোগের সুরে বললাম। আমাকে না বলে আমার ঘরে তালা লাগালেন কেন?

হাতের কফির মগটা টেবিলে নামিয়ে রেখে আমার দিকে তাকালেন জুলি আন্টি। চোখে অস্বস্তি। ফিরে তাকালেন সিডার আঙ্কেলের দিকে। জন, মনে হচ্ছে ওকে সব বলে দেয়াই ভাল।

আমার দিকে চোখ সরু করে তাকালেন সিডার আঙ্কেল। কাল রাতেও কি বেরোনোর চেষ্টা করেছিলে তুমি?

ইয়ে... দ্বিধায় পড়ে গেলাম। আমি কী করার পরিকল্পনা করেছিলাম, ওঁদের বলা যাবে না। বললাম, আসলে ঘরটা তখন একটা খাঁচা মনে হচ্ছিল আমার। খাঁচায়

থাকতে কার ভাল লাগে? আমার বয়েস বারো হয়ে গেছে, আমি আর এখন ছোট নই…
সরি বাধা দিয়ে বললেন জুলি আন্টি। রান্নাঘরের ঘড়িটার দিকে তাকালেন তিনি। একটা বড় বাটিতে আমাকে কর্নফ্লেক ঢেলে দিলেন।
তোমার ভালর জন্যেই আটকে রেখেছিলাম আমরা, সিডার আঙ্কেল বললেন। উত্তেজিত ভঙ্গিতে হাতের ন্যাপকিনটা ভাজ করতে লাগলেন। এ ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না আমাদের। আগের রাতের মত বনের ভিতর তোমাকে একা একা ঘুরতে দেয়া ঠিক হত না। রাতের বেলা বনটা নিরাপদ থাকে না।
তোমার দায়িত্ব এখন আমাদের ওপর, কর্নফ্লেকের বাটিটা টেবিলে আমার দিকে ঠেলে দিলেন জুলি আন্টি। তোমার আব্বা আম্মাকে আমরা কথা দিয়েছ তোমাকে নিরাপদে বাড়িতে ফেরত পাঠাব। তোমাকে আটকে রাখা হয়নি, রবিন। বরং আমরা চেয়েছি…
কিন্তু…কিন্তু…
আমি কথা শেষ করার আগেই.সিডার আঙ্কেল বললেন, তা ছাড়া গতকাল উলফরা পুলিশকে খবর দিয়েছে।
কী করেছে? চেঁচিয়ে উঠলাম। আমাকে বাধা দেয়ার জন্যে ওরা পুলিশকে খবর দিয়েছে?
মাথা ঝাঁকালেন আঙ্কেল। ওরা অভিযোগ করেছে, তুমি ওদের ওপর নজর রাখো।
ওরকম কিছুই করিনি আমি! রেগে গেলাম। কথাটা মোটেও ঠিক না। আমি ওদের ওপর নজর রাখিনি। আমি কিছুই করিনি।
ঠিক আছে, ঠিক আছে, টেবিলের পাশ ঘুরে এগিয়ে এসে আমার কাঁধে হাত রাখলেন জুলি আন্টি। উলফদের নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না। শুধু ওদের বাড়ির কাছে যেয়ো না, ব্যস।
আন্টির দিকে ফিরে তাকালাম। ফস করে বলে ফেললাম, কেন, ওরা কি মায়ানেকড়ে?
দম আটকে ফেললেন সিডার আঙ্কেল।
হেসে উঠলেন জুলি আন্টি। নিনা বলেছে বুঝি?
ইয়ে…হ্যাঁ, দ্বিধা করে জবাব দিলাম।
মাথা নাড়লেন আন্টি। কী সব যে ভাবে না নিনা!
উলফরা আসলে আজব স্বভাবের, একেবারেই অমিশুক, বাড়ি থেকে বেরোয়ই না, সিডার আঙ্কেল বললেন। জানালা দিয়ে ওদের বাড়িটার দিকে তাকিয়ে বললেন, কুকুর দুটোও বিশ্রী স্বভাবের। যেমন মনিব, তেমন কুকুর।
নিনা, বলেছে ওদের নাকি কুকুর নেই, বললাম।

রেগে গেলেন সিডার আঙ্কেল। নিনাকে বলে দিয়ে এ সব উল্টোপাল্টা কথা যেন না বলে!
মানে?
মানে আর কী! ও তোমাকে ভয় দেখায়। কিন্তু শুধু শুধু ভয় দেখাবে কেন? দরজার ঘণ্টা বাজল। নিনা আমাকে স্কুলে নিয়ে যেতে এসেছে।
বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়ে খুশিই হলাম। তবে রাতে আমাকে ঘরে আটকে রাখার কথাটা নিনাকে বললাম না। উলফদের কুকুরটার কথাও আর তুললাম না। নিনাও আমার কাছে সব বলে না, কিছু গোপন করে। তাই ঠিক করেছি, রহস্যের সমাধান আমি একাই করব।
স্কুলে পৌঁছে আমার জ্যাকেটটা লকারে ঝুলিয়ে রেখে ক্লাসের দিকে এগোলাম। মোড় ঘুরতেই রাস্তা আটকে দাঁড়াল টনি ও রজার। তা আমার জন্যই অপেক্ষা করছিল ওরা। দ্রুত এগিয়ে এল আমার দিকে। শঙ্কিত হলাম। রাতে লেকের পাড়ে না যাওয়ার একটা জবাব খুঁজতে থাকলাম মনে মনে। পিছাতে পিছাতে দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেল আমার। উত্তেজনায় জ্বলছে ওদের চোখ।
এই, রবিন! আঙুল দিয়ে আমার কাঁধে খোঁচা মারল টনি।
মায়ানেকড়ে দেখেছ? রজার জিজ্ঞেস করল।
আমতা আমতা করতে লাগলাম। কী জবাব দেব বুঝতে পারছি না। দেখো… আমার আঙ্কেল-আন্টি…
থেমে গেলাম। ওরা এমন করে তাকিয়ে আছে কেন আমার দিকে?
বিচিত্র হাসি ছড়িয়ে পড়ল টনির মুখে। কাল রাতে বনের ভিতর খুব মজা পেয়েছিলে, তাই না?
মায়ানেকড়েটা দেখতে কেমন ছিল? ভুরু নাচাল টনি। ছবি তুলেছ?
ধাক্কা দিয়ে দুজনকে সরিয়ে দেয়ালের কাছ থেকে সরে এলাম। তারমানে কাল রাতে ওখানে যাওনি তোমরা?
হা হা করে হেসে উঠল ওরা। ঠাস ঠাস করে চাপড় মারতে লাগল একে অন্যের পিঠে।
হাসতে হাসতে রজার বলল, তোমার মত পাগল নাকি যে রাত দুপুরে বনের ভিতর মায়ানেকড়ে দেখতে যাব?
হেসে পরস্পরের পিঠে আবারও চাপড় মারল ওরা।
আমাকে তালা আটকে রাখার রাগটা চলে গেল। ভাগ্যিস যাইনি। তা হলে কী বোকাটাই না বনতাম।
তো? টনি জিজ্ঞেস করল। আমাদের না দেখে খুব অবাক হয়েছিলে, না?

না। তোমাদের কথা মনেই ছিল না আমার, জবাব দিলাম। কেন জানো? মায়ানেকড়ের ছবি তোলা নিয়ে এতই ব্যস্ত ছিলাম, আর কিছু ভাবারই সুযোগ পাইনি।
তাই? চেঁচিয়ে উঠল টনি।
কী দেখলে? রজারের কণ্ঠে সন্দেহ।
একটা মায়ানেকড়েকে অনুসরণ করে গেলাম, মনে মনে হাসছি। লেকে নেমে পানি খেল ওটা।
গুল মারার আর জায়গা পেলে না, টনি বলল।
মায়ানেকড়ে না ঘোড়ার ডিম দেখেছ। আসলে স্বপ্নে দেখেছ, বলল রজার।
কিন্তু আমি প্রমাণ করে দিতে পারি, বললাম। অনেকগুলো ছবি তুলেছি।
দেখি? টনি বলল।
এখনও ডেভেলপ করা হয়নি, জবাব দিলাম।
আমার দিকে তাকিয়ে সত্যি বলছি কিনা বোঝার চেষ্টা করছে। ওরা। হাসিতে ফেটে পড়ছি মনে মনে। জোর করে মুখের ভাব স্বাভাবিক রাখছি। কি
ঘণ্টা বাজল।
লেট করে ফেলেছি। চেঁচিয়ে উঠল রজার।
হল ধরে ক্লাসের দিকে দৌড় দিলাম আমরা। হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে সিটে বসলাম। ঠিক দুই সেকেণ্ড পর ক্লাসে ঢুকলেন মিস্টার রোভার।
সারাটা সকাল ধরে যে কী পড়ালেন তিনি, কিছুই মাথায় ঢুকল না আমার। বসে বসে ভাবতে থাকলাম, আগামীকাল যখন ছবি দেখতে চাইবে টনি ও রোজার, কীভাবে দেখাব?

.
চুপি চুপি ঘর থেকে বেরিয়ে যাব আজ রাতে, উলফদের বাড়ির ছবি তুলব, টেলিফোনে ফিসফিস করে বললাম। তুমিও চলে এসো।
রবিন, ফিসফিস করছ কেন? তীক্ষ্ণ হয়ে আমার কানে বেজে উঠল নিনার কণ্ঠ।
কালো রঙের পুরানো মডেলের টেলিফোন সেটটা রাখা আছে লিভিং রুমের টেবিলে। পাশের ঘরে ডিনারের জন্য খাবার তৈরিতে ব্যস্ত আঙ্কেল ও আন্টি। এখান থেকেও দেখতে পাচ্ছি। নিচুস্বরে নিনাকে বললাম, নিনা, বাড়ির পাশে লুকিয়ে থাকব আমি। বেডরুমের জানালা দিয়ে যা-ই বেরোক, সেটার ছবি তুলব…
জুলি আন্টি ঘরে ঢুকে পড়ায় চুপ হয়ে গেলাম।
ডিনার রেডি, রবিন, তিনি বললেন। কার সঙ্গে কথা বলছ?

নিনা, জবাব দিলাম। আমি খেতে যাচ্ছি, নিনাকে বললাম। পরে কথা বলব। লাইন কেটে দিলাম।

.

ইচ্ছে করেই বড় বড় হাই তুলতে লাগলাম। আঙ্কেল-আন্টিকে বোঝালাম আমার খুব ঘুম পেয়েছে। দশটার কিছু পরে আমার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। কয়েক মিনিট পর দরজার বাইরে তালা লাগানোর মৃদু শব্দ কানে এল। আবার আমাকে ঘরে বন্দি করেছেন আঙ্কেল ও আন্টি।

তবে এবার আমি তৈরি। ওঁদেরকে বোকা বানিয়েছি।

ডিনারের আগে একদলা বাবলগাম ঢুকিয়ে দিয়েছি লকের হুকটা দরজার যে ফুটোতে ঢোকে সেটাতে। তালাটা লাগেনি।

আবার একটা বাড়তি সোয়েটার গায়ে দিলাম। ভালমত দেখে নিলাম ক্যামেরাটা। তারপর অপেক্ষার পালা।

মাঝরাতের সামান্য আগে ক্যামেরা কেসটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিলাম। সহজেই খুলে ফেললাম বেডরুমের দরজা। পা টিপে টিপে বেরিয়ে এলাম ঘরের বাইরে, উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে।

দ্রুত একবার চোখ বোলালাম উলফদের বাড়িটার ওপর। তারপর শিশিরভেজা ঘাস মাড়িয়ে প্রায় দৌড়ে চললাম নিনাদের বাড়ির দিকে।

কোথাও আলো নেই। পিছনের স্টর্ম ডোরটা বন্ধ করেনি। বাতাসে বার বার খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে পাল্লাটা, হাত নেড়ে যেন ডাকছে।

নিঃশব্দে চলে এলাম বাড়ির অন্যপাশে নিনার বেডরুমের জানালার কাছে। কাঁচের শার্সিতে চাঁদের রূপালী আলো পড়ে সাদা দেখাচ্ছে।

ভিতরে উঁকি দিয়ে কিছু দেখলাম না। তবে কয়েক ইঞ্চি খুলে রয়েছে জানালার পাল্লা।

নিনা? ফিসফিস করে ডাকলাম। নিনা, জেগে আছ?

ভিতরে নড়াচড়ার শব্দ হলো। পর্দা সরে গেল।

কে? ঘুমজড়িত স্বরে জিজ্ঞেস করল নিনা।

আমি পায়ের বুড়ো আঙুলের মাথায় ভর দিয়ে দেহটা উঁচু করলাম। রবিন! জানালার কাছে আসবে একটু?

রবিন? এত রাতে? নিনা জিজ্ঞেস করল।

উলফদের ছবি তুলব, বললাম ওকে। যাবে আমার সাথে?

ছবি? কিন্তু এত রাতে! আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম...

প্রতি রাতেই ওদের বাড়ি থেকে নেকড়ের ডাক শুনি, আমি বললাম। তারপর কী যেন বেডরুমের জানালা দিয়ে মাটিতে লাফিয়ে নামে। সিডার আঙ্কেল বলেন;

ওগুলো নাকি কুকুর…
আমি তো তোমাকে বলেছিই, বাধা দিয়ে বলল নিনা, উলফরা কুকুর পোষে না। তুমি যা দেখো, ওগুলো মায়ানেকড়ে। আমি জানি, তুমি আমার কথা বিশ্বাস করো না। কিন্তু যা বলি, সত্যি। সিডার আঙ্কেল আর জুলি আন্টিও জানেন, এটাই সত্যি। তুমি ভয় পাবে, সেজন্যে তোমাকে জানাতে চান না।
জলদি কাপড় পরে নাও, নিনা। বেরিয়ে এসো। আমি চাই, আমার মতই তুমিও নিজের চোখে দেখো মায়ানেকড়েগুলোকে।
তুমি পাগল, রবিন! বাড়ি যাও! জানালার কাছে এসে দাঁড়াল নিনা। খড়খড়ি আরও খানিকটা তুলে দিয়ে মুখ বের করল।
আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি না, বলল ও। ভয়ানক বিপজ্জনক। বনের ভিতর মরা জানোয়ার পড়ে থাকতে দেখেছিলে না-কেটে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করা? উলফরা তোমাকে দেখতে পেলে তোমারও ওই অবস্থাই করবে।
ওর কথা শুনে ঘাড়ের কাছে শিরশির করে উঠল আমার। কিন্তু এ রহস্যের সমাধান আমাকে করতেই হবে। তা ছাড়া প্রতিযোগিতার জন্য ছবি তুলতে আমি মরিয়া। আমিই হব পৃথিবীর প্রথম ফটোগ্রাফার, যে মায়ানেকড়ের ছবি তুলতে পেরেছে।
আমাদের দেখবে না ওরা, নিনাকে বললাম। বাড়ির পাশের ঝোপের ভিতর লুকিয়ে থাকব।
আমার ভীষণ ভয় করছে, রবিন। আমি তোমার সঙ্গে যাব না। তুমিও যেয়ো না। বাড়ি ফিরে যাও।
প্লিজ! ওর হাত চেপে ধরলাম। বেরিয়ে এসো। তুমিও তো মায়ানেকড়ে দেখতে চাও, চাও না?
না! ঝাড়া দিয়ে হাতটা সরিয়ে নিল নিনা। বাড়ি যাও। এটা ছেলেখেলা নয়। ভয়ানক বিপদে পড়বে।
শোনো, নিনা…
কিন্তু জানালা লাগিয়ে দিল ও। আরেকবার ঘাড়ের কাছে শিরশির করে উঠল আমার। ভুলই করছি হয়তো। উলফরা ধরতে পারলে…
চাপা গর্জন শুনে চমকে উঠলাম। জমে গেলাম বরফের মত।
আরেকবার শোনা গেল চাপা গর্জন।
নিজের অজান্তেই চিৎকার বেরিয়ে গেল আমার মুখ দিয়ে।
হাঁটু ভাঁজ হয়ে যাচ্ছে আমার। ভারি, কাঁপা কাঁপা, লম্বা দম নিয়ে ঘুরে দাঁড়ালাম, ভূতুড়ে প্রাণীটার মুখোমুখি হওয়ার জন্য।
কিন্তু না।

কি নেই ওখানে।
কিছুই নেই আমার পিছনে। তিনি
ঢোক গিলোম। মুখের ভিতরটা শুকনো কাঠের মত লাগছে।
আবার গর্জন শোনা গেল। উলফদের বাড়ির পিছন থেকে আসছে শব্দটা।
জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়তে তৈরি হচ্ছে ওরা, বুঝতে পারলাম। প্রতিরাতেই এই শব্দ শুনি আমি, যখন বেডরুমের জানালা দিয়ে বেরিয়ে আসে ওরা।
খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি আমি। বেরিয়ে প্রথমেই আমাকে চোখে পড়বে ওদের।
আমার পা কাজ করতে চাইল না। দাঁতে দাঁত চেপে, ভারি দম নিয়ে, মনের জোরে নিজেকে নড়ালাম।
ভেজা ঘাসে পিছলে যাচ্ছে আমার জুতো। আছাড় খেতে খেতে বাঁচলাম একবার।
একটা ঝোপের কাছে চলে এলাম। আমার আঙ্কেল-আন্টি ও উলফদের বাড়ির মাঝখানে রয়েছে ঝোপটা। এই
হাঁটু গেড়ে বসে পড়লাম। জোরে জোরে হাঁপাচ্ছি। বুকের মধ্যে এমনভাবে বাড়ি মারছে হৃৎপিণ্ডটা, বুক ব্যথা করতে লাগল।
মাথা নোয়ালাম। ক্যামেরা কেসের ফিতেটা চেপে ধরলাম।
তীক্ষ্ণ, দীর্ঘ একটা চিৎকার ভেসে এল উলফদের জানালার কাছ থেকে। চাঁদের আলোয় চকচক করছে ওদের বাড়ির পাশটা।
আঙিনাটা প্রায় দিনের মত পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। শিশিরে ভিজে চিকচিক করছে সবকিছু।
ঝোপের আড়ালে বসে গাছের প্রতিটি পাতা, ঘাসের ডগা দেখতে পাচ্ছি আমি।
ক্যামেরা কেসের জিপার ধরে টানলাম। তাড়াতাড়ি বের করতে চাইলাম ক্যামেরাটা। হাতে বেশি সময় নেই। কিন্তু এমনভাবে হাত কাঁপছে, জিপার টেনে খুলতে পারলাম না। তিন
আরেকটা গর্জন জানালার দিকে ফিরে তাকাতে বাধ্য করল আমাকে
একটা ছায়া নড়ল।
একটা পা বেরিয়ে এল। ক
আরেকটা পা। একটা ছায়ামূর্তি লাফিয়ে নামল মাটিতে। মনে অতি দ্রুত ঘটে গেল ঘটনাগুলো। সময় যেন ছুটে চলেছে।
আমার চোখ জানালার দিকে। জিপার খোলার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।
আরেকটা দেহ বেরিয়ে এল উলফদের ঘরের অন্ধকার জানালা দিয়ে। মাটিতে নামল।

দেহ টান টান করল মূর্তি দুটো। কারণ দুজন মানুষ। নেকড়ে নয়। মানুষ? পরনে কী ওদের? আলখেল্লা? লম্বা হয়ে ঝুলে আছে। আমার দিকে পিছন করে রয়েছে ওরা। মুখ দেখতে পাচ্ছি না।
দুই হাত কোমরে রেখে, পিঠ বাঁকা করে মাথাটা পিছনে হেলিয়ে যেন লম্বা করে ফেলতে চাইছে পেশিগুলোকে।
তারপর চাঁদের দিকে মুখ তুলে চিৎকার করে উঠল।
ঘোরো! ঘুরে দাঁড়াও! ঝোপের আড়ালে বসে কাঁপতে কাঁপতে নীরবে বলতে থাকলাম। প্লিজ, ঘুরে দাঁড়াও। আমি তোমাদের মুখ দেখতে চাই।
ওরা চলতে শুরু করতেই অস্পষ্ট একটা গোঙানি বেরিয়ে গেল আমার মুখ থেকে। ভারি আলখেল্লাটা ওদের গায়ে শক্ত হয়ে জড়িয়ে যাচ্ছে জ্যান্ত প্রাণীর মত।
এতক্ষণে বুঝলাম, ওগুলো কাপড়ের আলখেল্লা নয়, জানোয়ারের চামড়া।
নেকড়ের চামড়া না তো?
আবার গোঙানি বেরিয়ে এল আমার মুখ থেকে। এত জোরে কাঁপতে শুরু করলাম, হাত থেকে ছুটে গেল ক্যামেরা কেস। দুই হাঁটু পেঁচিয়ে ধরলাম হাত দিয়ে।
আবার চেঁচিয়ে উঠল মূর্তি দুটো। রোমশ দুই হাত মাথার ওপর তুলে ধরেছে। থাবা থেকে বেরিয়ে আসছে ধারাল নখ।
দুই থাবার নখ ঘষে যেন পরখ করে নিল শিকারের ওপর কতটা কার্যকরী হবে ওগুলো। গর্জন করছে, ঘোঁতঘোঁত করছে। চারপায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াল।
এখন আর মানুষ নেই ওরা। জানোয়ার…নেকড়ে…পিশাচ…
নিনা ঠিকই বলেছে। সত্যি কথা বলেছে, উলফরা মায়ানেকড়ে। চাঁদের আলোয় ওরা পিশাচ হয়ে যায়। নেকড়ের রূপধারী পিশাচ।
কাঁপা হাতে আবার তুলে নিলাম ক্যামেরা কেসটা। আবার জিপার খোলার চেষ্টা করলাম। সফল হলাম এবার। অবশেষে খুলতে পারলাম আমারটা।
এই সময় ঘুরে দাঁড়াল ওরা। আমার দিকে মুখ করে দাঁড়াল। দুটো নেকড়ে।
লোমে ঢাকা কপালের নীচের অক্ষিকোটর থেকে তাকিয়ে আছে কালো একজোড়া চোখ। লোমে ঢাকা চোয়াল ফাঁক হয়ে বেরিয়ে পড়ল ধারাল দাঁতের সারি।
মায়ানেকড়ে। উলফরা মায়ানেকডে।
পরস্পরের গায়ে নাক ঘষতে লাগল মায়ানেকড়ে দুটো। চাপা গরগর করছে। হাঁটু গেড়ে বসে ক্যামেরা তুললাম।
অন্তত একটা ছবি তুলতেই হবে আমাকে। ভোলো, তোলো, দেরি কোরো না! আদেশ দিলাম নিজেকে।

ভীষণ কাঁপছে আমার হাত। ক্যামেরাটা স্থির রাখতে পারছি না।
তোলো! তোলো!
চোখের সামনে তুলে আনলাম ভিউফাইণ্ডার। আরেকটু উঁচু করলাম মাথা, ঝোপের ওপর দিয়ে ভাল করে দেখার জন্য।
উহ! দেহটা উঁচু করতে যেতেই ভাঙা চোখা ডালের খোঁচা খেলাম গালে।
ক্যামেরাটা ছুটে গেল হাত থেকে।
ঘাসের ওপর পড়ল। ঘুরে তাকাল পিশাচ দুটো। দেখে ফেলল নাকি আমাকে!
মাটিতে পেট ঠেকিয়ে শুয়ে পড়লাম উপুড় হয়ে।
ওঠানামা করছে আমার বুক। মুখ দিয়ে দম নিচ্ছি এখন। দেহটাকে স্থির রাখার, পুরোপুরি নিঃশব্দ থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করছি।
ওরা কি আমাকে দেখেছে?
না তাকিয়ে থাকতে পারলাম না। আবার মাথা উঁচু করলাম। ঝোপের ভিতরের ফাঁক দিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম।
রোমশ নাক উঁচু করে বাতাস শুঁকছে ওরা। আমার গন্ধ পেয়েছে? জেনে গেছে আমি এখানে রয়েছি?
লাফিয়ে ঝোপ ডিঙিয়ে এসে আমার দেহটাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করবে এখন?
আবার বাতাস কল ওরা। চাপাস্বরে ঘোঁতঘোঁত করছে। কিন্তু এল না ওরা। ঘুরে দাঁড়াল। চারপায়ে ভর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটল বনের দিকে। সে ওদের পায়ের শব্দ, চাপা গর্জন আর ঘোঁতঘোঁতানি যখন আর একেবারেই শোনা গেল না, তখন উঠে বসলাম। হাত বাড়িয়ে তুলে নিলাম ক্যামেরাটা।
আমার এত সাধের ক্যামেরা!
কোন ছবিই তুলতে পারিনি। একটা ছবিও না।
কম্পিত পায়ে উঠে দাঁড়ালাম। লেন্স থেকে শিশির মুছলাম। ফিরে তাকালাম বনের দিকে।
ঠিক করলাম, ওদের অনুসরণ করব আমি।
ছবি আমাকে তুলতেই হবে। এ রকম সুযোগ আর জীবনে পাব না।
মায়ানেকড়ের ছবি তুলতে পারলে প্রতিযোগিতায় প্রথম হওয়া শুধু নয়, বিখ্যাত হয়ে যাব আমি। পত্রিকার পাতায় আর ম্যাগাজিনের কভারে আমার ছবি ছাপা হবে। আমার ভোলা উলফদের মায়ানেকড়ে হওয়া ছবিগুলো ফ্যান্সি ফটো গ্যালারিতে শোভা পাবে।
কল্পনা করলাম, আমাকে নিয়ে কতটা গর্ব বোধ করছেন বাবা-মা, সিডার আঙ্কেল ও জুলি আন্টি।

আঙ্কেল-আন্টির কথা মনে পড়তেই আতঙ্কিত হলাম। এখন নিশ্চয় বনের মধ্যে রয়েছেন ওঁরা, নিশাচর জীবের ছবি তোলায় ব্যস্ত।
দুটো মায়ানেকড়ে যে বনে ঢুকেছে এটা নিশ্চয় জানেন না তাঁরা। জানেন না, পিশাচ দুটো শিকারের সন্ধানে বনে গেছে।
ওঁরা ওখানে নিরাপদ নন, বুঝতে পারলাম।
মায়ানেকড়ের পিছু নিয়ে বনে ঢোকাটা নিরাপদ তো নয়ই, স্রেফ পাগলামি, বুঝতে পারছি। কিন্তু ওদের পিছু নেয়াটা এখন আমার জন্য জরুরি। ছবি তোলার ব্যাপারটা তো আছেই, আঙ্কেল-আন্টিকেও সাবধান করে দিতে হবে।
ক্যামেরাটা কেসে ভরে কাঁধে ঝোলালাম। তারপর পিছনের আঙিনা ধরে এগিয়ে চললাম বনের দিকে, মায়ানেকড়ের পায়ের ছাপ অনুসরণ করে। শিশিরে ভেজা মাটিতে ছাপগুলো খুব স্পষ্ট।
বনে ঢুকলাম। সেই পথটায় এসে পড়লাম, যেটা দিয়ে প্রথম দিন ঢুকেছিলাম। আঁকাবাঁকা পথ ধরে এগিয়ে চললাম। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে চুঁইয়ে আসছে চাঁদের আলো, মাটিতে বিচিত্র আলো-আঁধারি সৃষ্টি করেছে। কেমন ভুতুড়ে করে তুলেছে পরিবেশটা। ই মায়ানেকডে দুটোকে ধরতে বেশিক্ষণ লাগল না আমার। পুরানো। সেই বুড়ো-মানুষ গাছটার কাছে এসে ওদের ঘোঁতঘোঁত শুনতে পেলাম। তারপর হামলা চালানোর প্রাণ কাঁপানো গর্জন।
থমকে দাঁড়ালাম। উঁকি দিলাম ঝোপের আড়াল থেকে। মায়ানেকড়ে দুটোকে দেখলাম। মুখ হাঁ করে, থাবা বাড়িয়ে ঝাঁপ দিল ও দুটো।
কোনও প্রাণীকে আক্রমণ করেছে ওরা! কার ওপর হামলা চালাল? কোনও জানোয়ার? নাকি মানুষ! আমার আঙ্কেল-আন্টিকে আক্রমণ করেছে?

.

শিকার নিয়ে ধস্তাধস্তি করছে ওরা।
যন্ত্রণাকাতর আর্তনাদ শোনা গেল। তারপর চিত হয়ে থাকা একটা প্রাণীর চারটে খুর ওপর দিকে উঠে যেতে দেখলাম।
না, মানুষকে আক্রমণ করেনি। একটা হরিণ ধরেছে। হরিণের বাচ্চা।
খুন করে ফেলবে ওটাকে।
ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করবে।
কী করব? নিজেকে প্রশ্ন করলাম। কীভাবে বাঁচাব ওটাকে?
ভাবতে পারছি না। কোনও উপায় খুঁজে পাচ্ছি না। তবুও বিনা চেষ্টায় ছেড়ে দিতে রাজি নই। মাথাটা পিছনে হেলিয়ে নেকড়ের মত চিৎকার করে উঠলাম।
গাছে গাছে প্রতিধ্বনি তুলল আমার চিৎকার।
থমকে গেল মায়ানেকড়ে দুটো। মাথা ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকাল।

খুব সামান্যই সুযোগ পেল বাচ্চাটা। তবে সেটার সদ্ব্যবহার করতে দেরি করল না। মায়ানেকড়ের থাবার নীচ থেকে বেরিয়ে ছুটে পালাল। হারিয়ে গেল গাছপালার আড়ালে।
ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল মায়ানেকড়ে দুটো। বাতাস শুঁকতে লাগল। চাঁদের আলোয় ওদের লাল চোখ ঝকঝক করে জ্বলছে। চাপাস্বরে গর্জন শুরু করল।
মাথা নিচু করে ছুটে আসছে আক্রমণের ভঙ্গিতে। নিশ্চয় আমিই এখন ওদের লক্ষ্য।
নড়তেও ভয় পাচ্ছি।
তবু টলতে টলতে পিছিয়ে গেলাম দুই কদম। দৌড়ানোর সময় নেই। মনে হলো মায়ানেকড়ের পায়ের দাপটে মাটি কাঁপছে। চিৎকার করতে মুখ খুললাম। স্বর বেরোল না।
পিশাচ দুটোর দাঁতে দাঁত ঘষার কুৎসিত শব্দ হচ্ছে। চোখ যেন জ্বলন্ত কয়লার টুকরো।
আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে সামনের দিকে হাত দুটো বাড়িয়ে ধরলাম।
কিন্তু আমাকে আক্রমণ করল না নেকড়ে দুটো।
আমার পাশ কাটিয়ে চলে গেল। ডানে মোড় নিল তীব্র গতিতে। পাশাপাশি দৌড়াচ্ছে দুটোতে। ভয়ঙ্কর গর্জন করছে।
বাদামী রঙের একটা বড় খরগোশ এসে দাঁড়িয়েছে রাস্তার ওপর।
ওটার দিকেই লক্ষ্য ওগুলোর। সহজেই ধরে ফেলল খরগোশটাকে। কিছুই করতে পারল না ছোট্ট জানোয়ারটা।
একটা নেকড়ে এক কামড়ে ওটার ঘাড় ভেঙে দিল। অন্য নেকড়েটা পেটে কামড় বসাল।
দ্রুত হাতে কেস থেকে বের করে আনলাম ক্যামেরাটা।
ভিউ ফাইণ্ডার চোখের সামনে তুলে আনার সময় লক্ষ করলাম প্রচণ্ড হাত কাঁপছে। দুই হাতে ধরে স্থির করলাম ক্যামেরাটা।
শাটার টিপে দিলাম।
খরগোশটাকে টেনে ছেঁড়ার সময় ছবি তুললাম একটা। আরেকটা তুললাম পাশাপাশি দাঁড়িয়ে খাওয়ার সময়।
খরগোশটার কিছুই অবশিষ্ট রাখল না ওরা। খাওয়া শেষ হলে ঠোঁট চাটল, তারপর দুলকি চালে অদৃশ্য হয়ে গেল গাছপালার ভিতর।
দুই হাতে ক্যামেরাটা উঁচু করে ধরে ওগুলোর পিছু নিলাম।
মনে হচ্ছে ঘোরের মধ্যে রয়েছি আমি। ভাবনাগুলো পরিষ্কার হচ্ছে।

আরেকটু হলেই গেছিলাম আজ। খরগোশটা না এলে এতক্ষণে আমি মায়ানেকড়ের খাবার হয়ে যেতাম।

ছবি ভোলা হয়ে গেছে। কিন্তু বন থেকে এখনই বেরোতে পারব না।

আমার আঙ্কেল-আন্টিকে সাবধান করে দিতে হবে। ওঁদের খুঁজে বের করে বলতে হবে, উলফদের ব্যাপারে ভুল করেছেন। কী ভয়ানক বিপদের মধ্যে রয়েছেন, জানাতে হবে ওদের।

আতঙ্কে ধড়াস ধড়াস করছে আমার হৃৎপিণ্ডটা। থরথর করে হাত পা কাঁপছে। দুর্বল লাগছে। আমি যেন আমি নই। মনে হচ্ছে আমার ভিতর থেকে বেরিয়ে গিয়ে বাইরে থেকে তাকিয়ে আছি নিজের দেহটার দিকে।

পিশাচগুলোর কাছ থেকে বেশ খানিকটা দূরত্ব রেখে অনুসরণ করে চললাম। ফিরে তাকালে চট করে গাছ কিংবা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়ব। ক্যামেরাটা উঁচু করে রেখেছি, ছবি তোলার জন্য।

লেকের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ওগুলো। পানির কিনারে গিয়ে দাঁড়াল। লম্বা জিভ বের করে কুকুরের মত পানি খেতে লাগল।

দেখে এখন বোঝার উপায় নেই ওরা মানুষ। পুরোপুরি নেকড়েতে রূপান্তরিত হয়েছে। জ্বলন্ত চোখগুলো শিকারি জানোয়ারের চোখের মত জ্বলছে।

অনেকক্ষণ ধরে পানি খেয়ে পেট ভরল ওরা। আরও কয়েকটা ছবি তুললাম।

নিনা আমার সঙ্গে না এসে ভুল করেছে। স্বচক্ষে দেখা থেকে বঞ্চিত হয়েছে এক অবিশ্বাস্য দৃশ্য। আর

হঠাৎ ঝটকা দিয়ে পানি থেকে মাথা তুলল পিশাচ দুটো। ঘুরে দাঁড়াল। নাক উঁচু করে বাতাস শুঁকতে লাগল।

আমার গন্ধ পেল নাকি ওরা?

মোটা একটা গাছের আড়ালে সরে গেলাম আমি। নিঃশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। সি কিছুক্ষণ পর সাবধানে আবার মুখ বাড়িয়ে উঁকি দিয়ে দেখি লেকের পাড় ধরে চলে যাচ্ছে ওরা। কিছুটা সময় দিয়ে, গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে দূরত্ব রেখে আবার পিছু নিলাম ওগুলোর।

.

সারাটা রাত মায়ানেকড়ে দুটোকে অনুসরণ করলাম আমি। এক রোল। ফিল্ম শেষ করে আরেকটা ঢোকালাম। পিছনের দুই পায়ে ভর দিয়ে চাঁদের দিকে মুখ তুলে যখন চিৎকার করছিল ওরা, সেই দৃশ্যের ছবি তুলেছি। ছবি তুলেছি আরও কিছু ভয়ঙ্কর দৃশ্যের। এ ছবি তোলার পাশাপাশি জঙ্গলে খুঁজে বেড়িয়েছি আমার আঙ্কেল আন্টিকে। মরিয়া হয়ে উঠেছি ওদের সাবধান করার জন্য, কী দেখেছি বলার জন্য।

ভীত, উত্তেজিত অবস্থায় পিশাচগুলোর পিছনে চলতে চলতে সময়ের হিসেব রাখিনি। মনে হচ্ছিল অদ্ভুত এক দুঃস্বপ্নের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি। সমস্ত ঘটনা অবাস্তব।

অবশেষে সূর্যের এক চিলতে লাল আলো এসে পড়ল মাটিতে। কখন যে ভোর হয়েছে খেয়ালই করিনি।

ধীরে হাঁটছে এখন মায়ানেকড়ে দুটো। তাড়াহুড়া নেই। খেয়ে খেয়ে পেট ভরিয়েছে। ভারি করে ফেলেছে শরীর।

বনের ভিতর থেকে বেরিয়ে ওদের বাড়ির পিছনের আঙিনায় চলে গেল। হেঁটে গেল বেডরুমের জানালার নীচে।

গাছের আড়ালে লুকিয়ে দেখছি। কাছে যেতে ভয় পাচ্ছি। ক্রমেই ওপরে উঠছে সূর্যটা, আলো বাড়ছে। এখন যদি ঘুরে দাঁড়ায় নেকড়ে দুটো, আমাকে দেখে ফেলবে।

ক্যামেরা উঁচু করলাম। আর মাত্র কয়েকটা শট বাকি।

সামনের দুই পা উঁচু করে দেয়ালে রেখে পিছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল ওরা।

স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে আছি। চামড়ার আলখেল্লা খুলছে ওরা।

রোমশ চামড়া যেন সাপের খোলসের মত খুলে যাচ্ছে গা থেকে। এই অবস্থায় একটা ছবি তুললাম।

থাবা থেকে চামড়া সরে যেতেই অদৃশ্য হয়ে গেল নখ। ছবি তুললাম এটারও। চামড়া উল্টে সরে গিয়ে বেরিয়ে পড়ল মানুষের হাত-পা। তারপর শরীর থেকেও চামড়া সরে গেল।

আমার দিকে পিছন ফিরে আছে ওরা। চামড়ার আলখেল্লা খুলে ফেলল। উলফদের চেহারা কেমন দেখার জন্য অস্থির হয়ে আছি। গা থেকে আলখেল্লা খুলে মাটিতে রাখল ওরা। তারপর ঘুরে দাঁড়াল।

ওদের মুখ দেখে চমকে উঠলাম। তবে ক্যামেরার শাটার টিপতে ভুললাম না।

সকালের রোদ পড়েছে ওঁদের মুখে।

অনেক কষ্টে চিৎকার ঠেকালাম। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না। আতঙ্কিত হয়ে তাকিয়ে আছি।

উলফরা নয়, আমার আঙ্কেল-আন্টিই মায়ানেকড়ে!

আড়মোড়া ভাঙলেন সিডার আঙ্কেল ও জুলি আন্টি। আঙুল চালিয়ে চুল ঠিক করলেন। হাত দিয়ে টেনেটুনে গায়ের কাপড় ঠিক করলেন। নিচু হয়ে তুলে নিলেন নেকড়ের চামড়া দুটো।

বনের দিকে তাকালেন আঙ্কেল। ঝট করে সরে গেলাম একটা গাছের আড়ালে।

আমাকে কি দেখে ফেললেন?

থরথর করে কাঁপছি। চেঁচিয়ে উঠতে চাইলাম : না না, আমি বিশ্বাস করি না! এ হতে পারে না!
গাছের গায়ে নিজেকে ঠেসে রেখে নিজের মুখ চেপে ধরে রাখলাম। কোনমতেই বেরোতে দিলাম না চিৎকারটা।
ভাবতে হবে আমাকে। এখন কী করব?
ওদের সঙ্গে আর আমার থাকা চলবে না, বুঝে গেছি। দুটো মায়ানেকড়ের সঙ্গে এক বাড়িতে বাস করা অসম্ভব।
কিন্তু কোথায় যাব? কে আমাকে সাহায্য করবে? আমার কথা কে বিশ্বাস করবে?
নেকড়ের চামড়া দুটো ভাঁজ করছেন আঙ্কেল-আন্টি। তারপর জুলি আন্টিকে বেডরুমের জানালায় উঠতে সাহায্য করলেন সিডার আঙ্কেল। আন্টি ভিতরে যেতেই তিনিও লাফিয়ে উঠে ভিতরে ঢুকে গেলেন।
উলফদের কথা ভেবে দুশ্চিন্তা হলো। ওঁরা কোথায়? আঙ্কেল-আন্টি যে ওদের বাড়িতে ঢুকছেন, কিছু বলছেন না কেন? কেন বাধা দিচ্ছেন না? নাকি ওদের খুন করে ফেলেছেন আমার আঙ্কেল-আন্টি।
ভয়ঙ্কর সম্ভাবনার কথাটা মাথায় ঢুকতে শিউরে উঠলাম।
কয়েক মিনিট পর সিডার আঙ্কেল ও জুলি আন্টি বেরিয়ে এলেন জানালা দিয়ে। তাড়াহুড়া করে ড্রাইভওয়ে পেরিয়ে নিজেদের বাড়ির দিকে চলে গেলেন।
গাছে ঠেস দিয়ে আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। উলফদের বাড়ির দিকে চোখ। মনে ভাবনার ঝড়।
দৌড়ে পালাতে ইচ্ছে করছে। রাস্তায় বেরিয়ে ছুটে সরে যেতে চাইছি আঙ্কেলের বাড়ি থেকে দুরে, বহুদুরে।
কিন্তু প্রচণ্ড কৌতূহল আমাকে ছুটতে দিল না। উলফদের কী হয়েছে দেখতেই হবে। সত্যিটা না জেনে কিছুতেই যেতে পারব না। আমি এখান থেকে। তা ছাড়া নিনা রয়েছে। ওকেও নিয়ে যেতে হবে। এই বিপদের মধ্যে ওকে রেখে যাওয়া চলবে না।
আরও কিছুক্ষণ বাড়ি দুটোর দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করলাম। কারও ছায়াও দেখলাম না, কোথাও কোন নড়াচড়া নেই। নিজের
গাছের কাছ থেকে সরে এলাম। একছুটে ঢুকে পড়লাম উলফদের বাড়ির পিছনের ঘাসে ঢাকা আঙিনায়। ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে আমার আঙ্কেল-আন্টির বাড়িটার দিকে তাকালাম। ওঁদের বেডরুমের জানালা বন্ধ। খড়খড়ি নামানো।
আবার সোজা হয়ে, দম আটকে দৌড় দিলাম। চলে এলাম উলফদের বেডরুমের জানালার নীচে। জানালার চৌকাঠ ধরে ভিতরে উঁকি দিলাম। অন্ধকার। কিছুই

চোখে পড়ছে না।
বিড়বিড় করে নিজেকে বললাম, ঢুকে পড়ো! দেরি করে লাভ নেই! না জানালার চৌকাঠ ধরে নিজেকে টেনে তুললাম ওপরে। চৌকাঠে বসে পা ঘুরিয়ে দিয়ে লাফিয়ে পড়লাম ঘরের ভিতরে। আবছা অন্ধকার চোখে সয়ে আসতে কয়েক সেকেণ্ড লাগল। চায়
কিছুই নেই ঘরে। এক র একটা আসবাব নেই। দেয়ালে নেই ছবি কিংবা আয়না। কাঠের মেঝেতে কার্পেট নেই। পুরু হয়ে জমে আছে ধুলো।
শোবার ঘরের সামনের দরজার দিকে তাকাতে চোখে পড়ল নেকড়ের চামড়া দুটো। সুন্দর করে ভাঁজ করে দরজার পাশে রেখে দেয়া হয়েছে।
ভারি দম নিয়ে সাবধানে এগোলাম খোলা দরজাটার দিকে। ওপাশের হলওয়েতে উঁকি দিলাম। শোবার ঘরের মতই এটাও আসবাবশূন্য।
কেউ আছেন? ডাক দিলাম। এই, কেউ আছেন?
জবাব নেই।
পা টিপে টিপে এগিয়ে চললাম হলওয়ে ধরে বাড়ির সামনের দিকে। যে কটা দরজা পড়ল, সবগুলোর ভিতরে উঁকি দিলাম।
প্রতিটি ঘরই খালি। মেঝেতে পুরু ধুলোর আস্তরণ।
লিভিং রুমের মাঝখানে এসে দাঁড়ালাম। কোনও আসবাব নেই। বাতি নেই।
কেউ থাকে না এখানে! জোরে জোরে বলে ফেললাম। আমার কথা প্রতিধ্বনিত হলো চারপাশের দেয়ালে।
উলফরা কোথায়?
ওদের খুন করে খেয়ে ফেলেছেন আমার আঙ্কেল-আন্টি-ভয়ঙ্কর এই ভাবনাটা আরও বদ্ধমূল হতে থাকল মনে। খরগোশ মেরে ছিন্নভিন্ন করে ওটাকে গোগ্রাসে গেলার দৃশ্যটা কল্পনা করলাম। ক্যামেরায় তোলা আছে সেই ছবি। হরিণ ছানাটাকে আক্রমণের কথাটাও ভাবলাম।
নিনাকে সাবধান করে দিতে হবে। কেউ নিরাপদ নয় এখানে।
নিনা আর ওর বাবা-মাকে সাবধান করে দিতে হবে। তারপর পালাতে হবে এই এলাকা থেকে, যতদূরে পারি।
ঘুরে দাঁড়িয়ে দ্রুত ফিরে চললাম। শোবার ঘরে এসে জানালার
চৌকাঠ ডিঙিয়ে বাইরে লাফিয়ে নামলাম।
গাছের মাথায় এখনও মস্ত একটা লাল বল হয়ে আছে সূর্যটা। ঘাসের ডগায় ঝিলমিল করছে ভোরের শিশির।
নিনা নিশ্চয় বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েছে এতক্ষণে, ভাবলাম। আর যদি না জেগে থাকে তো আমাকেই ওর ঘুম ভাঙাতে হবে।

উলফদের জানালার দিক থেকে ঘুরে দাঁড়ালাম। ছুটতে শুরু করলাম নিনাদের বাড়ির দিকে।
বড়জোর ছয়-সাত কদম এগিয়েছি। থমকে দাঁড়ালাম জুলি আন্টির।
চিৎকারে, রবিন, কোথায় যাচ্ছ তুমি!
চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়ালাম। হাঁটু ভাঁজ হয়ে পড়েই যাচ্ছিলাম প্রায়। টলে উঠে কোনমতে সামলে নিলাম।
রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন জুলি আন্টি। জিজ্ঞেস করলেন, রবিন, এত সকালে উঠলে যে? আজ তো শনিবার। চোখের পাতা সরু করে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকালেন তিনি।
আমি…ইয়ে… এমন কাঁপুনি উঠে গেছে শরীরে, কথা বেরোচ্ছে মুখ দিয়ে।
এত তাড়াহুড়া করে কোথায় যাচ্ছ? আণ্টি জিজ্ঞেস করলেন। তার পিছনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম সিডার আঙ্কেলকে।
ওই তো…নিনাদের বাড়িতে… কোনমতে জবাব দিলাম। ওর সঙ্গে কথা আছে… আজ রাতে কী পোশাক পরব, সেটা নিয়ে আলোচনা করব।
আণ্টির মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। আমার কথা কি বিশ্বাস করেছেন? তাই তাকে
মনে হয় না।
এত ভোরে নিনাদের বাড়ি যাচ্ছ? শপাং করে উঠল তার কণ্ঠ। হাত নেড়ে ডাকলেন, এসো। আগে নাস্তা খেয়ে যাও।
দ্বিধা করছি। ভাবনাগুলো বনবন করে ঘুরছে যেন মাথার ভিতর।
দৌড় দেব নাকি? দৌড়ে রাস্তায় বেরিয়ে ছুটতে থাকব?
কিন্তু কতদূর যেতে পারব? ওঁরা আমাকে ধরে ফেলবেন।
আমার আঙ্কেল-আন্টি, দুজনেই মায়ানেকড়ে। ধরতে পারলে কী করবেন? আমাকে দিয়ে নাস্তা করে ফেলবেন?
না। দৌড়ানোটা ঠিক হবে না। এখনও সময় হয়নি। পালানোর আগে নিনাকে সাবধান করে দিতে হবে। ওকেও সঙ্গে নিতে হবে।
গুটি গুটি পায়ে এগোলাম। স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন আন্টি। ঘরে ঢুকতেই মৃদুকণ্ঠে আমাকে গুড মর্নিং জানালেন সিডার আঙ্কেল। বললেন, বেশি তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়েছ।
মাথা ঝাঁকিয়ে নাস্তা খেতে টেবিলে বসলাম।
সারারাত কাজ করেছি আমি আর কেরি, বড় করে হাই তুললেন সিডার আঙ্কেল। চমঙ্কার কিছু ছবি তুলেছি।

মিথ্যে কথা! চিৎকার করে বলতে চাইলাম। আমি আপনাদের অনুসরণ করেছি। আপনারা কী করেছেন দেখেছি। আপনারা কী জিনিস, জানি আমি। আমার সামনে উলফদের কাছে আন্টির ফোন করাটা পুরোই ফাঁকিবাজি। আমাকে দেখানোর জন্যে। উলফরা আমার নামে পুলিশের কাছে নালিশ করেছে, এটাও আপনাদের বানানো কথা!

কিন্তু কিছু বললাম না। তাকিয়ে আছি কর্নফ্লেকের বাটির দিকে।

দুটো মায়ানেকড়ের সঙ্গে নাস্তা, খেতে বসেছি–ভাবনাটা পেটের ভিতর মোচড় দিতে থাকল আমার। সারাটা রাত বনের ভিতর ঘুরে বেড়িয়েছেন আমার আঙ্কেল-আন্টি, অসহায় জানোয়ারগুলোকে ধরে ধরে নিষ্ঠুরভাবে খুন করেছেন।

একটা মুহূর্তও আর বসে থাকতে পারব না, ভাবলাম। উঠে। দাঁড়াতে গেলাম।

আমার কাঁধে হাত রাখলেন সিডার আঙ্কেল। শান্ত হও, রবিন। বসো। নাস্তা খাও, মোলায়েম স্বরে বললেন তিনি।

কিন্তু, আমি… কী বলব বুঝতে পারছি না। এতটাই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছি, খেতে ইচ্ছে করছে না। আমার কাঁধ থেকে তার হাতটা সরিয়ে দিতে পারলে ভাল হত। আমার গা কাঁপছে।

খাও। না খেলে শরীর ঠিক থাকবে না, আঙ্কেল বললেন। হ্যালোউইন উৎসব দেখতে বেরোবে না? অনেক রাত পর্যন্ত বাইরে থাকতে হবে।

নাস্তা খাও, নাস্তা খাও, জুলি আন্টি বললেন। কাজে লাগবে।

আমার কর্নফ্লেক খাওয়া দেখতে লাগলেন ওঁরা। শীতল দৃষ্টিতে দেখছেন আমাকে। জোর করে গলা দিয়ে নামাচ্ছি।

ওঁদেরকে অনুসরণ করেছিলাম, ওদের গোপন কথা জেনে গেছি, নিশ্চয় বুঝে ফেলেছেন।

তাই আমাকে যেতে দিতে চান না।

আমাকে নিনাদের ওখানে যেতে হবে, শান্ত রাখার চেষ্টা করলাম আমার কণ্ঠস্বর। চেয়ার পিছনে সরিয়ে উঠে দাঁড়াতে গেলাম।

কিন্তু আবার আমার কাঁধ চেপে ধরলেন সিডার আঙ্কেল। আঙুলগুলো চেপে বসল কাঁধে।

এসো আমার সঙ্গে, আদেশের সুরে বললেন তিনি।

আমার কাঁধে শক্ত হয়ে চেপে থাকল আঙ্কেলের হাত। আমাকে ঠেলে নিয়ে চললেন গ্যারেজের দিকে। দ্রুত হাঁটছেন। একটা কথাও বলছেন না।

একবার ভাবলাম, ঝাড়া দিয়ে কাঁধ থেকে তাঁর হাত ছুটিয়ে দৌড় দিই।

কিন্তু কতদূর যেতে পারব?

আমার কাঁধ ছেড়ে দিলেন তিনি। কী করবেন আমাকে?

আপনাদের পিছু নেয়াটা ঠিক হয়নি আমার, ফিসফিস করে বললাম, গলা দিয়ে কথা বেরোতে চাইছে না। আমি…আমি কাউকে বলব না, যা দেখেছি।
আমার কথা যেন কানেই ঢুকল না তাঁর। গ্যারেজের কোনায় এসে লম্বা হাতলওয়ালা একটা জিনিস তুলে নিলেন।
আমার দিকে ওটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, আমাকে একটু সাহায্য করতে হবে। প্রচুর কাজ। একা পারব না।
কাজ? ঢোক গিলোম।
মাথা ঝাঁকালেন সিডার আঙ্কেল। এটা দিয়ে ঘাস কাটা হয়। এ জিনিস আর দেখেছ কখনও?
না। যন্ত্রের হাতল ধরা হাতটা কেঁপে উঠল আমার। ব্যবহার করা খুব সহজ, তিনি বললেন। গ্যারেজের পিছনের এই ঘাসগুলো কেটে সাফ করতে হবে তোমাকে।
ঠিক আছে, করব, আবার যেন ঘোরের মধ্যে চলে গেছি আমি।
আর খেয়াল রেখো, উলফদের উঠানে যেন কাটা ঘাস না পড়ে, সাবধান করে দিলেন তিনি। আমি শিওর, তোমার ওপর নজর রাখবেন তাঁরা। কিছু করতে দেখলেই আমাদের কাছে নালিশ করবেন।
ঠিক আছে। চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করল, কেন শুধু শুধু মিথ্যে বলছেন! উলফ বলে তো কেউ আর এখন নেই! নিশ্চয় আপনারাই খুন করে খেয়ে ফেলেছেন!
আমিও তোমার সঙ্গে কাজ করব, হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছলেন তিনি। দুজনে মিলে এই আগাছাগুলোকে এমন একটা শিক্ষা দেব যাতে কোনদিন আর বাড়ার সাহস না দেখায়। আজকে এই প্রথম হাসতে দেখলাম ওঁকে।
তাঁর সহজ আণ অবাক করল আমাকে। দ্বিধায় ফেলে দিল। কিন্তু নিজের চোখে নেকড়ের খোলস বদলে মানুষে রূপান্তরিত হতে দেখেছি। এটা কি চোখের ভুল ছিল?

.

সারাদিন আঙ্কেলের সঙ্গে আঙিনায় কাজ করলাম আমি। যখনই আমি একটুক্ষণের জন্য থেমে বিশ্রাম নিতে যাই, শীতল দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকেন তিনি।
প্রচণ্ড ভয় পেয়েছি। যন্ত্র ফেলে দিয়ে দৌড়ে পালাতে চাইছি।
কিন্তু নিনাদেরকে সাবধান না করে যেতেও পারছি না। কী রকম বিপদের মধ্যে রয়েছেন, সেটা ওঁদেরকে জানানো দরকার। নিনাকেও আমার সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে।

ডিনারের আগে নিনার সঙ্গে দেখা হলো না। আমাদের খাওয়া প্রায় শেষ, এই সময় হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকল ও।
কেমন? কী রকম লাগছে আমাকে? বাতিল পুতুলের পোশাক পরা নিনা নাচার ভঙ্গিতে চক্কর দিয়ে ঘুরে দেখাল।
খুব সুন্দর। জুলি আন্টি বললেন।
আমার দিকে তাকিয়ে ভ্রুকুটি করল নিনা। রবিন, এখনও তো রেডি হওনি। উৎসব দেখতে যাবে না?
হ্যাঁ, যাব, আমি বললাম। একটু দাঁড়াও, কাপড় বদলে আসি। বেশিক্ষণ লাগবে না। তুমি বরং এসো, আমাকে সাহায্য করবে।
প্রায় টানতে টানতেই নিনাকে আমার ঘরের দিকে নিয়ে চললাম।
বাইরে চমৎকার জ্যোত্স, এত সুন্দর চাঁদ উঠেছে, নিনা বলল। দারুণ জমবে আজ হ্যালোউইন উৎসব।
ঘরে টেনে ঢোকালাম ওকে। দরজা লাগিয়ে দিলাম। শোনো, একটা ভয়ানক খবর আছে।
কপালের ওপর এসে পড়া টুপিটা ওপরে ঠেলে দিল ও। ভয়ানক খবর?
হ্যাঁ। সিডার আঙ্কেল আর জুলি আন্টি দুজনেই মায়ানেকড়ে।
কী বললে! চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসার জোগাড় হলো নিনার।
সব কথা খুলে বললাম ওকে। গত রাতে যা যা দেখেছি, সব। ফিসফিস করে কথা বলছি। জানালাম, ওঁদের নেকড়ের চামড়া উলফদের বাড়িতে লুকিয়ে রাখেন।
কিন্তু উলফরা... বলতে গেল নিনা।
উলফরা নেই, আস্তে কথা বলার কথা ভুলে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম। বাড়িটা শূন্য। ওখানে নিয়ে গিয়ে চামড়া লুকান আঙ্কেল ও আন্টি। ওঁদের মেরে খেয়ে ফেলেছেন কিনা কে জানে!
দীর্ঘ একটা মুহূর্ত আমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল নিনা। এখন...এখন কী করব আমরা? সিডার আঙ্কেল ও জুলি আন্টি দুজনেই এত ভাল মানুষ...
যখন মানুষ থাকেন তখন ভাল, বাধা দিয়ে বললাম। মায়ানেকড়ে হয়ে গেলে পিশাচ হয়ে যান! তোমার আব্বা-আম্মাকে জানানো দরকার। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে চলে যেতে হবে আমাদের। সাহায্য আনতে হবে। পুলিশকে জানাতে হবে।
কিন্তু...কিন্তু... কথা বলতে পারছে না নিনা। চোখে-মুখে। আতঙ্ক।
হঠাৎ করেই বুদ্ধিটা মাথায় এল আমার। বললাম, নিনা, মায়ানেকড়েরা খোলস বদল করে। মিস্টার রোভার বলেছিলেন, যদি সেই চামড়া পুড়িয়ে ফেলে, আর তখন মায়ানেকড়ে হতে পারে না, ভয়ঙ্কর এক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পায়।

মাথা ঝাঁকাল নিনা। হ্যাঁ। তা বলেছেন। কিন্তু…
আর কোন কিন্তু নেই, উত্তেজিত কণ্ঠে বললাম।
ওই চামড়া পুড়িয়ে ফেলব আমরা, যেভাবেই হোক।
লিভিং রুমে রয়েছেন আঙ্কেল-আন্টি। ওঁদের নড়াচড়ার শব্দ পাচ্ছি। আমার ঘরের জানালা দিয়ে উঁকি দিলাম। মস্ত একটা গোল সাদা চাঁদ উঁকি দিয়েছে গাছপালার আড়ালে। তার ওপরে কয়েক গাছি কালো মেঘ যেন সাপের মত শরীর মোচড়াচ্ছে।
টেনে আমাকে জানালার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে এল নিনা। ফিসফিস করে বলল, চামড়াগুলো লুকিয়ে ফেলতে পারি আমরা!
লুকিয়ে ফেলব? আমিও ফিসফিস করেই জবাব দিলাম। কী হবে তাতে?
স তা হলে আর ওগুলো খুঁজে পাবেন না তোমার আঙ্কেল-আন্টি, নিনা জবাব দিল। ভালয় ভালয় রাতটা পার করে দিতে পারলেই হয়। নেকড়েতে রূপান্তরিত হতে পারবেন না আর তাঁরা।
ঠিক বলেছ! একটা রাত নেকড়ে না হয়ে পার করে দিতে পারলে হয়তো ভাল হয়ে যাবেন তারা, আর মায়ানেকড়ে হবেন না।
মাথা ঝাঁকাল নিনা। চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে। কাজ হতেও পারে… হঠাৎ থেমে গেল ও। না, না, দাঁড়াও! আরও ভাল বুদ্ধি এসেছে মাথায়! আমরা নিজেরাই চামড়াগুলো পরে ফেলতে পারি!
কী বললে? নিঃশ্বাস ভারি হয়ে গেল আমার। পরে ফেলব? কেন?
কারণ চামড়া লুকিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারব না। তোমার আঙ্কেল আন্টি কোথাও খুঁজতে বাকি রাখবেন না। বাড়ির ভিতরে, গ্যারেজে, উঠানের ঝোপঝাড়ে, সবখানে খুঁজবেন। কিন্তু আমাদের গায়ে খোঁজার কথা ভাববেন না। কল্পনাই করবেন না আমরা ওগুলো পরে ঘুরে বেড়াচ্ছি।
কিন্তু চামড়া পরে আমরাও যদি মায়ানেকড়ে হয়ে যাই?
হব না, মাথা নাড়ল নিনা। মিস্টার রোভার কি বলেছেন ভুলে গেছ? বলেছেন, চামড়া পরে পূর্ণিমার চাঁদের দিকে তাকিয়ে তিনবার নেকড়ের মত চিৎকার করতে হবে, তা হলেই মায়ানেকড়ে হওয়া যাবে। আমরা চিৎকার করব না।
হু! চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা দোলালাম। তবে আমাদেরকে দূরে সরে থাকতে হবে যাতে সূর্য ওঠার আগে কোনমতেই ওঁদের নজরে না পড়ি।
কাজ হবে কিনা, অর্থাৎ আঙ্কেল-আন্টিকে মুক্ত করতে পারব কি না, নিশ্চিত নই। কিন্তু আর কোন উপায়ও দেখছি না। দুজনেই প্রচণ্ড ভয় পেয়েছি আমরা। দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছি।

সকাল পর্যন্ত চামড়া পরতে না পারলে হয়তো সুস্থ হয়ে যাবেন। আঙ্কেল-আন্টি, মায়ানেকড়ে হওয়ার অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবেন।
চলো, আর দেরি করে লাভ নেই, আমি বললাম।
হ্যাঁ, চলো, নিনা বলল। তাড়াতাড়ি কাপড় বদলে নাও। তুমি এসো, আমি ততক্ষণে উলফদের বাড়িতে গিয়ে একটা চামড়া পরে ফেলি। গ্যারেজের পিছনে আমার সঙ্গে দেখা কোরো। তোমার চামড়াটা আমি নিয়ে আসব।
দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল নিনা। লিভিং রুমে ঢুকল। অঙ্কেল আন্টিকে গুডবাই বলল। আমি কাপড় পরে বাইরে গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করব, জানাল।
সামনের দরজা লাগানোর শব্দ শুনলাম। তারমানে বেরিয়ে গেছে নিনা।
*
যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাপড় পরে আমিও বেরিয়ে এলাম। আঙ্কেল আন্টির অলক্ষে বেরিয়ে এলাম বাড়িটা থেকে।
কথামত উলফদের গ্যারেজের পিছনে আমার জন্য অপেক্ষা করছে নিনা। পরনে একটা নেকড়ের চামড়া। আরেকটা চামড়া হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।
ওর দিকে তাকিয়ে দম আটকে ফেললাম ক্ষণিকের জন্য। নেকড়ের রোমশ নাকের দুই পাশের ফুটো দিয়ে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর চোখ দুটো।
জিজ্ঞেস করলাম, চামড়া পরে কেমন লাগছে?
চুলকাচ্ছে, ঘোঁতঘোঁত করল নিনা। আর ভীষণ গরম। আরেকটা চামড়া আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, পরে ফেললো। জলদি করো। চাঁদটা দেখো, ওপরে উঠে যাচ্ছে। শীঘি এগুলো খুঁজতে আসবেন আঙ্কেল-আন্টি।
চামড়াটা নিলাম ওর কাছ থেকে। নরম লোমে ডেবে গেল আমার হাত। ভাঁজ খুলে উঁচু করে ধরলাম। ফিসফিস করে বললাম, এই পোশাকে আমাদের দেখলে সবাই ভাববে হ্যালোউইনের সাজ সেজেছি। কেউ কিছু সন্দেহ করতে পারবে না।
নেকড়ের মাথায় মাথা ঢুকিয়ে দিলাম। কাপড়ের ওপর আমার গায়ে আলখেল্লার মত ঝুলে রইল চামড়াটা। দুই থাবার ভিতর হাত ঢোকালাম। দুই পায়ের ভিতর পা। মুখের কাছে চমৎকার ফিট করে গেল নেকড়ের লম্বা নাকওয়ালা মুখটা।
ইস, ঠিকই বলেছ তুমি, ভীষণ চুলকায়! গুঙিয়ে উঠলাম। এত গরম। এই জিনিস পরে হাঁটতে পারব বলে তো মনে হচ্ছে না।
হাত-পা টানটান করো, ঢিল হয়ে আসবে, ফিসফিস করে বলল নিনা। চলো। এখান থেকে পালাই।
পিছনের উঠান ধরে আগে আগে এগিয়ে চলল ও। ওদের বাড়ির পাশ দিয়ে বেরিয়ে এসে রাস্তায় উঠলাম আমরা।

পাশের ব্লকে ছেলেমেয়েদের হট্টগোল কানে এল। বনের ভিতরে ভিতরে বাড়িঘর এখানে। যার যার বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে ওরা। এ বাড়ি ও বাড়ি ঘুরছে আর উপহার জোগাড় করছে।
অন্য ছেলেমেয়েদের সাথে থাকাটাই নিরাপদ, আমি বললাম। আলাদা থাকার চেয়ে ওদের সঙ্গে থাকলে…
ঠিকই বলেছ, নিনাও একমত হলো। রাস্তা পেরিয়ে এলাম দুজনে। এ নেকড়ের চামড়া পরে অসহ্য গরম লাগছে। মাথা থেকে কপাল বেয়ে ঘাম ঝরতে শুরু করল আমার
কয়েকটা ব্লক পার হয়ে এলাম। ছেলেমেয়েগুলো বয়েসে আমাদের চেয়ে ছোট। আমাদের দিকে কৌতূহলী চোখে তাকাচ্ছে। হ্যালোউইনে মায়ানেকড়ে সেজেছি মনে করে আমাদের দেখে ভয় পাচ্ছে না ওরা।
রাস্তার মোড় ঘুরে আরও কয়েকটা ব্লক পেরিয়ে এলাম।
ওই দেখো, কারা! আমার বাহুতে কনুই দিয়ে গুঁতো দিল নিনা।
ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখি একজন মহিলা আর একটা রোবট উপহারের ব্যাগ নিয়ে হেঁটে চলেছে একটা বাড়ির সামনের লন দিয়ে।
টনি ও রজার, নিনা বলল।
ওদের সঙ্গেই থাকি, চলো, আমি বললাম। ঘাস মাড়িয়ে ওদের দিকে দৌড়াতে শুরু করলাম। নেকড়ের থাবা নেড়ে ডাকলাম, এই শোনো! দাঁড়াও!
আমাদের দিকে ফিরে তাকাল দুজনে।
দাঁড়াও! রোমশ লম্বা নাকটা উঁচু করে ধরলাম।
চেঁচিয়ে উঠল দুজনে। হাত থেকে ব্যাগ ছেড়ে দিল। তারপর বাঁচাও! বাঁচাও! বলে ঘুরে দিল দৌড়।
আমাদের দেখে পিলে চমকে গেছে ওদের! হাসতে হাসতে বলল নিনা।
হ্যাঁ, জবাব দিলাম। মজাই পেলাম খানিকটা প্রতিশোধ নিতে পেরে। পাজি দুটো বহুত জ্বালান জ্বালিয়েছে আমাকে।
তবে বেশিক্ষণ হাসার সুযোগ পেলাম না।
আমাদের পিছনে পাকা রাস্তায় ভারি পায়ের শব্দ ছুটে আসতে শুনলাম।
ফিরে তাকিয়ে দেখি রাস্তা ধরে দৌড়ে আসছেন আঙ্কেল-আন্টি। ভয়ানক উত্তেজিত মনে হলো।
ওই যে! আমাদের দিকে হাত তুলে চিৎকার করে বললেন আঙ্কেল। ধরো ধরো ওদের! ধরো!
আঙ্কেল-আন্টিকে ওভাবে মরিয়া হয়ে আমাদের দিকে দৌড়ে আসতে দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়লাম।

নোড়ো না! দাঁড়াও! চিৎকার করে বললেন জুলি আন্টি, তাঁর কণ্ঠে অনুরোধের সুর, ওই চামড়াগুলো আমাদের দরকার!

নড়তে চাইলাম। পারলাম না। আমার পায়ে যেন শিকড় গজিয়ে গেছে। জোরে এক ধাক্কা দিয়ে আমাকে নড়িয়ে দিল নিনা। দৌড় দিলাম দুজনে।

মরিয়া হয়ে দৌড়াচ্ছি। পাগলের মত। মানুষের বাড়ির লন মাড়িয়ে, উঠান ধরে। একটা বাড়ির পিছনের আঙিনা দিয়ে ছুটে এসে প্রায় ঝাঁপ দিয়ে পড়লাম বড় একটা ঝোপের ভিতর।

আমাদের পিছনে লেগে রয়েছেন আঙ্কেল-আন্টি। প্রাণপণে দৌড়াচ্ছেন। চিৎকার করে বলছেন, দিয়ে দাও! আমাদের চামড়াগুলো দিয়ে দাও।

ওদের রুদ্ধশ্বাস চিৎকার কানে বাজছে আমাদের। কথাগুলো কেমন ভূতুড়ে শোনাচ্ছে, প্রতিধ্বনি তুলছে : আমাদের চামড়াগুলো দিয়ে দাও! আমাদের চামড়াগুলো দিয়ে দাও!

ঝোপ থেকে বেরিয়ে আবার ছুটলাম। অন্ধকার ছায়ার মত বাড়িগুলোর পাশ কাটাচ্ছি দ্রুত। ভারি নেকড়ের চামড়া পরা অবস্থায় ছুটতে কষ্টটা বেশি হচ্ছে। ঘেমে গোসল করে ফেলছি। বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করছে হৃৎপিণ্ডটা। মনে হচ্ছে আছাড় খেয়ে পড়ে যাব।

আরেকটা মোড় ঘুরলাম। আরেকটা বাড়ির পিছনের আঙিনা পেরোলাম। আমাদের সামনে দেখলাম বড় বড় গাছ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে।

বনের কাছে পৌঁছে গেছি আমরা। একছুটে বনে ঢুকে পড়লাম দুজনে। লম্বা ঘাস মাড়িয়ে গাছপালার ফাঁক দিয়ে ছুটলাম। আঙ্কেল আণ্টি পিছু ছাড়েননি। আমাদের পিছনে লেগে রয়েছেন। একই কথা বলে চলেছেন বার বার : আমাদের চামড়াগুলো দিয়ে দাও! আমাদের চামড়াগুলো দিয়ে দাও!

সবুজ গাছপালায় ছাওয়া একটা নিচু পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উঠে চললাম আমরা। আমার নেকড়ে-পায়ে বাড়ি লেগে গড়িয়ে পড়তে লাগল আলগা পাথর। ধুড়স করে আছাড় খেল নিনা। চার হাতপায়ে ভর দিয়ে ওঠার চেষ্টা করল।

আমাদের চামড়াগুলো দিয়ে দাও!. আমাদের চামড়াগুলো দিয়ে দাও! আঙ্কেল-আন্টির তীক্ষ্ণ একঘেয়ে চিৎকার যেন মাথার ভিতরে ঝাঁকি দিতে শুরু করেছে আমার।

মাথা ঘুরছে আমার।

হাঁপাতে হাঁপাতে ওঁদের দিকে ফিরে তাকালাম আমি ও নিনা।

চাঁদটা... ফিসফিস করে আমাকে বলে চাঁদের দিকে হাত তুলল নিনা। পূর্ণ চাঁদ, রবিন। দেখো, একেবারে মাঝআকাশে।

নিনা যখন ফিসফিস করে কথা বলছে, আঙ্কেল-আন্টি তখন হাঁটুতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছে। মাথা পিছনে হেলিয়ে চাঁদের দিকে মুখ তুলে দিয়েছে। উজ্জ্বল জ্যোত্সায় ওদের মুখে আতঙ্ক দেখতে পাচ্ছি। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় ভুগছেন যেন।
হাঁ হয়ে গেল মুখ। তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার বেরিয়ে এল। বিলাপের মত শোনাল সেই চিৎকার।
দুই হাতে মাথা খামচাতে শুরু করলেন ওঁরা। চুল ছিঁড়তে লাগলেন। ব্যথা সইতে না পেরে চোখ বুজে আর্তনাদ করতে থাকলেন। বুকের গভীর থেকে ভিতরের সবকিছু উলটপালট করে যেন বেরোচ্ছে সেই যন্ত্রণাকাতর চিৎকার।
নিনা, এ-কী করলাম আমরা! প্রায় কেঁদে ফেলার জোগাড় হলো আমার।
চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে চিৎকার করেই চলেছেন আঙ্কেল-আন্টি।
থেমে গেলেন একটা সময়।
হাত সরিয়ে আনলেন মাথা থেকে। চিৎকার বন্ধ করলেন। ভঙ্গি দেখে মনে হলো শান্তির পরশ ছড়িয়ে পড়ছে সারা শরীর জুড়ে।
তাকিয়ে আছি ওঁদের দিকে। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন দুজনে। একে অন্যকে উঠতে সাহায্য করলেন। কাপড় ঝেড়ে দিলেন। চিরুনির মত আঙুল চালালেন চুলে।
অবশেষে যখন মুখ তুলে তাকালেন আমাদের দিকে, দেখলাম, গাল বেয়ে পানি পড়ছে দুজনেরই। কাঁদছেন।
থ্যাংক ইউ, আন্টি বললেন।
আমাদেরকে বাঁচানোর জন্যে ধন্যবাদ! ককিয়ে উঠলেন সিডার আঙ্কেল।
তারপর দৌড়ে এলেন দুজনেই। আমাদের জড়িয়ে ধরলেন।
ভয়ঙ্কর অভিশাপ থেকে মুক্তি দিলে আমাদের! জুলি আন্টি বললেন। গাল বেয়ে পানি গড়াচ্ছে এখনও। মাঝ আকাশ পেরিয়ে গেছে চাঁদ। এখনও যেহেতু রূপান্তরিত হইনি, আর হব না-আমাদের অভিশাপ কাটল। এখন আর আমরা মায়ানেকড়ে নই!
কী বলে যে ধন্যবাদ দেব তোমাদের! সিডার আঙ্কেল বললেন। তোমাদের সাহস আর বুদ্ধিমত্তার জন্যেই বাঁচলাম আমরা।
এত প্রশংসায় বিব্রত বোধ করছি। প্রসঙ্গ এড়াতে জিজ্ঞেস করলাম, আঙ্কেল, উলফদের কী হয়েছে, জানেন?
হাসলেন আঙ্কেল। তোমরা নিশ্চয় ভাবছ, ওদের খেয়ে ফেলেছি। না, খাইনি। রহস্যময়ভাবে একদিন উধাও হয়ে গেল ওরা। কয়েক দিন বাড়ি থেকে বেরোতে না দেখে খোঁজ নিতে গিয়েছিলাম। দেখি, বাড়ি খালি। তখনই পেয়েছি নেকড়ের চামড়া দুটো। আমাদের অভিশপ্ত জীবনের শুরুও সেদিন থেকেই।

কোথায় গেছে ওরা?
জানি না। সেটা এখনও রহস্য।
তারমানে আরেকটা রহস্যের সমাধান করতে হবে এখন আমাদের, ভালই, ভাবলাম। বললাম, উহ্, ভয়ানক গরম! জঘন্য জিনিস, খোলা দরকার! গায়ের নেকড়ের চামড়ায় চাপড় দিলাম। ভীষণ চুলকাচ্ছে!
হ্যাঁ, খুলে ফেলো, আঙ্কেল বললেন। আর ওগুলো গায়ে রাখার দরকার নেই।
চল, বাড়ি যাই, জুলি আন্টি বললেন। সত্যিকারের একটা উৎসব করব আজ। আনন্দ করব। অনেক দিন পর মনটা আজ খুব হালকা লাগছে।
বাড়ি ফিরে চললাম। সারাটা পথই প্রায় হাসাহাসি করতে করতে এলাম।
রান্নাঘরের দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকলাম আমরা।
জুলি আন্টি বললেন, ঘরে বানানো ডোনাট, আর মগভর্তি গরম গরম চকলেট। কেমন মনে হচ্ছে?
দারুণ! দারুণ! একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলাম আমি ও নিনা।
***

তিন গোয়েন্দা ভলিউম ১০৯/২ – আবার মায়ানেকড়ে – কাহিনি রচনা : রকিব হাসান / রূপান্তর : শামসুদ্দীন নওয়াব – সেবা প্রকাশনী – প্রথম প্রকাশ : ২০০৯

এখন মধ্যরাত।

বনের ভিতরে হেঁটে চলেছি আমি আর বাবা।

রবিন, আস্তে, এত শব্দ কোরো না! বাবা বলল। ওরা শুনে। ফেলবে তো!

আমিও শব্দ না করেই চলার চেষ্টা করছি। কিন্তু বনতলে শুকনো। ঝরা পাতা এড়িয়ে চলা খুব কঠিন। পা পড়বেই, আর পড়লেই শব্দ হয়।

আমি রবিন, রবিন মিলফোর্ড। হাই স্কুলে পড়ি। গ্রীনহিলসে থাকি।

আমার বাবার নাম রজার মিলফোর্ড। সাংবাদিক। মোটামুটি প্রভাবশালী লোক।

মাঝে মাঝেই নানা উদ্ভট খেয়াল চাপে বাবার মাথায়। এই যে, এবার যেমন মায়ানেকড়ে চেপেছে ঘাড়ে। ধরার জন্য পাগল হয়ে গেছে। আর তাই, ব্র্যাটভিয়ায় মায়ানেকড়ে আছে খবর পেয়ে এক মুহূর্তও দেরি করেনি, সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসেছে।

বার্ষিক পরীক্ষা শেষে লম্বা ছুটি পেয়েছি। ভেবেছিলাম গ্রামের বাড়িতে দাদুর কাছে বেড়াতে যাব। কিন্তু বাবা আমাকে ধরে নিয়ে। এসেছে ব্র্যাটভিয়ায়। আমার আসার মোটেও ইচ্ছে ছিল না। মায়ানেকড়েতে আর আমার কোন আগ্রহ নেই, বরং ভয় পাই। ওগুলোর কাছ থেকে দূরে থাকতে পারলে খুশি হই। কিন্তু কী আর করা। বাবা নিয়ে এসেছে।

গাছের ডালপালা কাঁপিয়ে বয়ে গেল ডিসেম্বরের ঠাণ্ডা বাতাস। কেঁপে উঠলাম।

গাছপালাগুলো অতিরিক্ত ঘন এখানে। গায়ে গায়ে জড়াজড়ি করে আছে। মায়ানেকড়ে লুকানোর উপযুক্ত জায়গা। সাবধান না হলে যে কোন মুহূর্তে আড়াল থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এসে ঘাড়ে পড়বে। তারপর ধারাল দাঁত আর নখ দিয়ে কীভাবে আমার দেহটাকে ছিন্নভিন্ন করবে, কল্পনা করে শিউরে উঠলাম।

মায়ানেকড়ে বড় ভয়ঙ্কর! অভিশপ্ত এদের জীবন। দিনে সাধারণ। মানুষ থাকে, স্বাভাবিক কাজকর্ম করে, রাতে হয়ে ওঠে রক্তলোলুপ পিশাচ। লোকে বলে, ভাল মানুষকে মায়ানেকড়েতে কামড়ালে নাকি সেই মানুষটাও মায়ানেকড়ে হয়ে যায়। পূর্ণিমার আগে শুরু হয় এদের উৎপাত। কারও কারও মতে, পূর্ণিমার রাতসহ আগের দুরাতে চাঁদ উঠলে মানুষ থেকে এরা মায়ানেকড়েতে রূপান্তরিত হয়। বেরিয়ে পড়ে তাজা মাংসের সন্ধানে। সারারাত শিকার ধরে বেড়ায়। ভোরের আলো ফুটলে আবার মানুষ হয়ে যায়। তার আগেই কেউ যদি ওটার নাম ধরে ডাকে, কিংবা মাথায় তিনবার চাপড় দেয়, তাহলেও নাকি মানুষ হয়ে যায়।

মুখ তুলে তাকালাম আকাশের দিকে। গোল চাঁদটা কেমন ঝুলে রয়েছে। জ্যোৎস্নার রূপালী আলো যেন ধুয়ে দিচ্ছে গাছগুলোর মাথা। ভূতুড়ে পরিবেশ

বনের ভিতরে। বাবার ধারণা, এই পরিবেশে। মায়ানেকড়ে বেরোবেই। তাজা মাংসের জন্য জানোয়ার শিকার করবে। বাগে পেলে মানুষকেও ছাড়বে না।
ভাবতেই গায়ে কাঁটা দিল আমার। দাঁড়িয়ে গেলাম। বাতাসে ভেসে আসছে নানারকম বুনো জানোয়ারের ডাক। বিলাপের মত আর্তনাদ কোনওটার। কোনওটা চাপা কুঁই কুঁই করছে। কোনওটা আবার ভয়ানক গর্জনে বন কাঁপাচ্ছে।
রবিন, হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছো কেন? ফিরে তাকিয়ে ফিসফিস করে বাবা বলল। ওভাবে থাকলে তো ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে।
ঝট করে ওপর দিকে তাকিয়ে দেখলাম, মাথার ওপর বড় কোনও ডাল আছে কিনা, আর সে-ডালে মায়মায়ানেকড়ে ঘাপটি মেরে আছে কিনা।
তারপর মরা পাতা এড়িয়ে বাবার পিছন পিছন যতটা সম্ভব নিঃশব্দে এগোনোর চেষ্টা করলাম।
দ্রুত এগোচ্ছে বাবা।
বাবা, আস্তে! তোমার সঙ্গে হেঁটে পারছি না তো! কিন্তু গতি কমাল না বাবা। রীতিমত দৌড়াচ্ছে।
বাবা, প্লিজ! চেঁচিয়ে উঠে দৌড় দিলাম বাবার পিছন পিছন।
আশ্চর্য। হঠাৎ কী হলো বাবার? আমি বলা সত্ত্বেও আমার জন্য। অপেক্ষা করছে না। গতিও কমাচ্ছে না।
বাবা! দাঁড়াও! আমি আর পারছি না! হাঁপাতে হাঁপাতে বললাম।
পা ব্যথা করছে আমার। একটা গাছের শিকড়ে হোঁচট খেয়ে পড়লাম। খসখসে বাকলে ঘষা লেগে গাল কেটে রক্ত বেরিয়ে এল।
কোনমতে উঠে আবার দৌড়ানো শুরু করলাম।
কিন্তু আমি যত দৌড়াই, বাবা তারচেয়েও জোরে ছোটে। আমাকে কাছে যেতে দেয় না। এটা কী রকম হচ্ছে! এমন করছে কেন?
বাবা! আবার ডেকে বললাম, থামো! দাঁড়াও!
অবশেষে থামল বাবা। ঘুরে তাকাল আমার দিকে। চিৎকার করে উঠলাম। আতঙ্কে।
বাবার মুখে বড় বড় লোম গজাচ্ছে। মানুষের মুখ বদলে গিয়ে নেকড়ের আদল তৈরি হচ্ছে। মায়ানেকড়ে হয়ে যাচ্ছে বাবা!
আমার দিকে তাকিয়ে জিভ চাটল। বড় বড় দাঁত দেখলাম। এখনও দুই পায়ে ভর দিয়ে মানুষের মত দাঁড়িয়ে আছে ভূতুড়ে প্রাণীটা। মাথা হেলিয়ে মুখ তুলে চাঁদের দিকে তাকিয়ে হাঁক ছাড়ল।
চিৎকার করতে চাইলাম। স্বর বেরোল না। দৌড় দিতে চাইলাম। পা কথা শুনল না।

সারা গা লোমে ভরে গেল প্রাণীটার। হাত দুটোও রূপান্তরিত হলো। পায়ে।
চারপায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল ওটা। জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। তারপর গর্জন করে উঠল। আত্মা কাঁপিয়ে দিল আমার।
স্বপ্ন! স্বপ্ন! নিজেকে বললাম। দুঃস্বপ্ন দেখছি আমি!
আর স্বপ্নের কথা ভাবতেই ঘুমটা ভেঙে গেল। এত ঠাণ্ডার মধ্যেও ঘেমে গেছি। কাত হয়ে শুলাম। একটা তাঁবুতে রয়েছি আমি। ক্যাম্প খাটে শোয়া। হঠাৎ আঁচড়ের শব্দ কানে এল। তবু কাটার চেষ্টা করছে যেন কোন জানোয়ার। তাঁবুতে ঢুকতে চায় নাকি? আবার কী ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখছি? দম আটকে ফেললাম। আঁচড়ের শব্দ বাড়ছে। লাফ দিয়ে উঠে বসলাম। হাতে চিমটি কাটলাম। ব্যথা লাগল। কই, স্বপ্ন তো দেখছি না! জেগেই রয়েছি! আগেরটা স্বপ্ন ছিল। কিন্তু এটা একদম বাস্তব! ধড়াস ধড়াস করছে হৃৎপিণ্ডটা। আঁচড়ের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে বুকের কাঁপুনিও বেড়ে যাচ্ছে।
আর থাকতে না পেরে, কম্বল সরিয়ে বিছানা থেকে লাফিয়ে নামলাম। শার্ট-প্যান্ট পরাই আছে। পায়ে মোজা। অন্ধকারে হাতড়ে ক্যাম্প, খাটের পাশে মাটিতে রাখা জুতো জোড়া বের করে পরলাম।
কীসে আঁচড় কাটছে দেখতে যেতে ভয় লাগছে। মায়ানেকড়ে না।
এই, যা যা! ধমক দিলাম। যা, পালা! আমাকে একটু ঘুমোতে কিন্তু গেল না ওটা! হাঁটু কাঁপছে আমার।
শান্ত হও, রবিন, নিজেকে বোঝালাম। কীসে কাটছে, দেখো আগে। মায়ানেকড়ে না-ও হতে পারে। হয়তো অন্য কিছু। বনে তো জন্তু-জানোয়ারের অভাব নেই।
ঘেমে গেছে হাতের তালু। শার্টে ডলে মুছলাম। ভারী দম নিলাম। উঠে দাঁড়ালাম। আমি দাঁড়াতেই আঁচড়ের শব্দ থেমে গেল। চলে গেল নাকি ওটা? দরজার দিকে এগোলাম। পর্দা ফাঁক করে বাইরে উঁকি দিলাম। আঁচড়ের শব্দটা যেখানে হচ্ছিল, সেদিকে তাকিয়ে কিছুই দেখলাম না।
ঘন গাছপালায় ছাওয়া বন। অন্ধকার আকাশের পটভূমিতে লম্বা গাছগুলোকে কালো দেখাচ্ছে। তিন দিন আগে এই বনে এসেছি বাবার সঙ্গে। আর প্রতি রাতেই মায়ানেকড়ের ভয়ানক দুঃস্বপ্ন তাড়া করে ফিরছে আমাকে।
সত্যিই কী মায়ানেকড়ে আছে এই বনে?
তাঁবুর পর্দা আরেকটু ফাঁক করলাম। মাথা আরেকটু বের করলাম বাইরে। চারপাশে তাকালাম। নাহ্। কোন প্রাণী চোখে পড়ল না। নিশ্চয় আমার ওঠার শব্দ শুনে চলে গেছে।
ছোট্ট একটুকরো খোলা জায়গায় তাঁবু ফেলেছে বাবা। সন্ধ্যাবেলা তাঁবুর সামনে অগ্নিকুণ্ড জ্বেলেছিল। ছাইয়ের নীচে ধিকিধিকি আগুন রয়ে। গেছে বোধহয়

এখনও। সাদা ধোয়ার ফিতে সাপের মত এঁকেবেঁকে উঠে যাচ্ছে।
বাবার তাঁবুটার দিকে তাকালাম। কোন শব্দ নেই ভিতরে। আঁচড়ের শব্দও সেই যে থেমেছে, আর হচ্ছে না। বাইরে পা রাখলাম।
গাছের পাতায় বাতাসের মৃদু সরসর ছাড়া পুরো বনটাই নীরব। কনকনে ঠাণ্ডায় কেঁপে উঠলাম। মুখ তুলে তাকালাম চাঁদের দিকে।
আমার তাঁবুর কাছ থেকে আরেকটু সরে এলাম। কান পেতে আছি।
কোন শব্দ নেই আর। নিশাচর জানোয়ার, পেঁচার ডাক, কিছুই শোনা যাচ্ছে না। ভূতুড়ে নীরবতা। আবার লাফানো শুরু করল হৃৎপিণ্ডটা।
বাবা বলেছে, এই অভিযানে আসার দুটো কারণ। এক, একটা মায়ানেকড়ে ধরা। আর দুই, মায়ানেকড়ে সম্পর্কে আমার ভয় দূর করা। বাবা মনে করে, ছেলেদের এত ভীতু হওয়া উচিত নয়।
যাই হোক, বাবার একটা উদ্দেশ্যও সফল হয়নি। মায়ানেকড়েও ধরতে পারেনি, আর আমারও ভয় দূর হয়নি। বরং এখন এই বন। থেকে পালাতে পারলে বাঁচি।
আবার তাকালাম চাঁদের দিকে। বাবা আমাকে সাবধান করে দিয়ে বলেছে, একা একা রাতে কখনও বাইরে বেরোবে না। এই বনে
মায়ানেকড়ে আছেই। তা ছাড়া এখন শুক্লপক্ষ। চাঁদের আলোয় মায়ানেকড়েরা শিকার ধরতে বেরোবেই।
হ্যাঁ, যা বলছিলাম, আবার লাফানো শুরু করেছে হৃৎপিণ্ডটা। আমার বুকের খাঁচায় যেন হাতুড়ি পিটানোর শব্দ করছে।
নিজের তাঁবুতে যেতে ভয় লাগছে। একা একা আর ঘুমাতে পারব না। বাবার তাঁবুতে থাকব ঠিক করলাম। তবে ভয় পেয়েছি, এ-কথা বলা যাবে না। বলতে হবে আমার পেটে ব্যথা।
বাবার তাঁবুর কাছে এসে আস্তে পর্দা সরিয়ে ভিতরে উঁকি দিলাম। বাবা? বাবা!
জবাব নেই। তাঁবুতে নেই বাবা।
পিছনে খসখস শব্দ হলো। চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে তাকালাম। কান পেতে শুনছি।
বনের মাটিতে পড়ে থাকা শুকনো পাতা মাড়িয়ে এগিয়ে আসছে। ভারি পায়ের শব্দ।
নিশ্চয় বাবা আসছে! ভেবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। যাক, কাছাকাছিই রয়েছে বাবা। হাঁটতে লাগলাম শব্দ লক্ষ্য করে।
ছোট্ট খোলা জায়গাটা থেকে এসে বনে ঢুকলাম। একটা সরু পায়েচলা রাস্তা দিয়ে হেঁটে চললাম। চাঁদের আলো পথ দেখাচ্ছে। আমাকে।

বাবাকে ডাকতে গিয়েও ডাকলাম না। কাছাকাছি মায়ানেকড়ে থাকলে আমার ডাক শুনে চলে আসবে। ভালুকও আসতে পারে। শুনেছি, মানুষের মাংসেও অরুচি নেই ব্র্যাটভিয়ার ভালুকের।
শব্দ লক্ষ্য করে এগিয়ে চলেছি। কিন্তু বুঝতে পারছি না ঠিক কোনখান থেকে আসছে শব্দটা।
একটা দো-রাস্তার মুখে এসে পড়লাম। কোনদিকে যাব এখন? সোজা সামনে, যেটা দিয়ে এগোচ্ছি? নাকি পাশেরটা?
দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে পায়ের শব্দ। দূরে চলে যাচ্ছে। মনে হলো, পাশের রাস্তাটা ধরেই যাচ্ছে।
সেটা ধরে দৌড়ানো শুরু করলাম। ছুটতে ছুটতে ঢুকে পড়লাম বনের আরও গভীরে। গাছপালা অনেক ঘন এখানে। কালো পর্দা তৈরি করে যেন আকাশ আড়াল করে দিয়েছে গাছের মাথা। চাঁদের আলো ঢুকতে দিচ্ছে না।
অন্ধকারে পথ না দেখায়, হোঁচট খাচ্ছি। গাছের ডাল সড়াৎ সড়াৎ বাড়ি খাচ্ছে নাকেমুখে। আর না ডেকে পারলাম। চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, বাবা, তুমি কোথায়?
সাড়া এল না। থেমে গিয়ে কান পাতলাম। কোথাও কোন শব্দ নেই আর এখন।
এত নীরব হয়ে গেল কেন বনটা? গায়ে কাঁটা দিল আমার। মনে হচ্ছে সব অবাস্তব, একটা মস্ত দুঃস্বপ্নের মধ্যে রয়েছি।
হঠাৎ মট করে শুকনো কুটো ভাঙার শব্দ হলো। নিশ্চয় বাবা!
শব্দ লক্ষ্য করে দৌড় দিলাম। মোড় নিয়ে এঁকেবেঁকে চলে গেছে। রাস্তা। গাছের বড় বড় ডাল এসে পড়েছে রাস্তার ওপর, অনেক নিচুতে, সেগুলো পার হতে গিয়ে বার বার মাথা নিচু করতে হচ্ছে আমাকে। গাছের পাতা থেকে কুয়াশা পানি হয়ে টুপটাপ ঝরে পড়ছে মাথায়।
দম নিতে, থামলাম আবার। নাহ্, বাবাকে আর খুঁজে পাব না! এত অন্ধকার, কিছুই দেখা যায়। কোথায় চলেছি, তা-ও জানি না।
বাবা! বাবা! কোথায় তুমি? মায়ানেকড়ের কানে যাবার ঝুঁকি নিয়েও চিৎকার করে ডাকলাম।
আরেকটা ডাল ভাঙার শব্দ হলো। আমার মাথার ওপর। বরফের মত জমে গেলাম। মৃদু গর্জন কানে এল। তারপর আবার আরেকটা ডাল ভাঙার শব্দ।
ওপর দিকে তাকালাম। একজোড়া জ্বলন্ত চোখের দিকে চোখ। পড়ল আমার।
কি ওটা? জানোয়ার?
না অন্য কিছু? ভালমত দেখার সময় পেলাম না। গাছ থেকে লাফিয়ে নামল ওটা। সরে দাঁড়াতে গিয়ে টলে উঠলাম। চিৎকার করতে মুখ খুললাম। স্বর বেরোল না।

অর্ধেক মায়ানেকড়ে, অর্ধেক মানুষ

একটা জন্তু চার পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গা-ভর্তি লোমগুলো চাঁদের আলোয় চকচক করছে।

আমার দিকে তাকিয়ে চাপা গরগর করতে লাগল। মুখ দিয়ে লালা গড়াচ্ছে।

আতঙ্কে নিঃশ্বাস ভারি হয়ে এল আমার। এক পা পিছিয়ে গেলাম।

প্রাণীটার মুখ মায়ানেকড়ের মত। দেহটা মানুষের। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। বড় বড় দাঁত।

আতঙ্কিত হয়ে ঘুরে দৌড় দিতে যাব, ভয়ঙ্কর এক গর্জন করে আমার ওপর লাফিয়ে পড়ল ওটা।

কাঁধে তীক্ষ্ণ ব্যথা লাগতে যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠলাম। আমার কাঁধে দাঁত বসিয়ে দিয়েছে ওটা। মাথা চক্কর দিচ্ছে আমার।

কিছু দেখতে পাচ্ছি না। চোখের সামনে আঁধার হয়ে আসছে। সবকিছু।

মনে হলো, অন্ধকারে নীচে পড়ে যাচ্ছি। পড়ছি...পড়ছি...

গরম নিঃশ্বাস ঘাড়ে লাগতে ভূতুড়ে প্রাণীটা ফিরে এসেছে ভেবে চেঁচিয়ে। উঠলাম, অ্যাই, যা! ভাগ! ভাগ! বাবা, বাঁচাও!

আমার কাঁধে একটা হাত পড়ল। না না, হাত না, থাবা! নিশ্চয় মায়ানেকড়ের থাবা!

বাঁচাও, বাঁচাও! বলে চেঁচিয়ে উঠলাম আবার।

রবিন, কী হয়েছে? স্বপ্ন দেখছিলে? ওঠো, ওঠো।

খুলে গেল আমার চোখের পাতা। আমার ক্যাম্প খাটের কিনারে বসে আছে বাবা। আমার মুখের ওপর ঝুঁকে রয়েছে। একটা হাত আমার কাঁধে।

রবিন, কী হয়েছে তোমার? বাবার চোখ উদ্বেগে ভরা।

উঠে বসলাম। ক্যাম্প খাটে শুয়ে আছি! আশ্চর্য!

তাঁবুতে এলাম কীভাবে? কিছুই মনে করতে পারলাম না। তবে কী বেরোইনি? কিন্তু স্পষ্ট মনে আছে, আঁচড়ের শব্দ পেয়ে আমি তাঁবু থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলাম।

পায়ের শব্দ শুনে বনের ভিতর দিয়ে গেছি। মায়ানেকড়ে দেখেছি। আমার কাঁধে কামড়ে দিয়েছে।

ঘটনাটা যে বাস্তব ছিল, কাঁধের দপদপে ব্যথাই সেটা বুঝিয়ে দিল। না। ওটা দুঃস্বপ্ন ছিল না। সত্যি সত্যি মায়ানেকড়ের খপ্পরেই পড়েছিলাম।

তাঁবুতে ফিরলাম কী করে? বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম।

আমি তুলে এনেছি, বাবা বলল। জানোয়ারটাকে তোমার গায়ের ওপর চেপে থাকতে দেখলাম। তাড়িয়ে দিয়েছি। বাবার মুখ উত্তেজনায় লাল।

সত্যিই চলে গেছে? তুমি শিওর? জোরে নিঃশ্বাস ফেলে বালিশে হেলান দিলাম।

হ্যাঁ, সত্যিই চলে গেছে। আজকের রাতটা কোনমতে পার করতে পারলেই আর দুশ্চিন্তার কিছু নেই।
দুশ্চিন্তার কিছু নেই মানে? শুক্লপক্ষ শেষ হতে তো এখনও অনেক দেরি। পূর্ণিমা হবে। তার পরদিন কৃষ্ণপক্ষ শুরু হলে মানুষটা আর মায়ানেকড়েতে রূপান্তরিত হবে না, তাই না?
হ্যাঁ।
তাহলে আসবে না কেন?
অনেকখানি এগিয়েছি। কাল রাতের আগেই ওটাকে খুঁজে বের করে ধরে ফেলব আমি।
কিন্তু আমি ধরতে যেতে চাই না! চেঁচিয়ে উঠলাম। আমি কাল বাড়ি যেতে চাই!
এবার সত্যি সত্যি একটা মায়ানেকড়ে ধরতে পারব আমি! আমার কথা যেন কানেই ঢোকেনি বাবার।
কাজটা খুবই বিপজ্জনক, বাবা, আমি বললাম।
বিপজ্জনক? মাথা নাড়ল বাবা। দিনের বেলা মায়ানেকড়ের কোন ক্ষমতা থাকে না, রবিন। আমাদের মতই স্বাভাবিক মানুষে পরিণত হয়।
বাবা, তুমি কোথায় গিয়েছিলে? আমি তোমার তাঁবুতে খুঁজে পাইনি। তারপর পায়ের শব্দ শুনে তুমি ভেবে পিছু নিয়েছিলাম।
ঘুম আসছিল না। গড়াগড়ি করতে করতে বার বার মনে হচ্ছিল, চাঁদ উঠেছে। নিশ্চয় এখন শিকারের সন্ধানে বেরিয়েছে মায়ানেকড়ে। তাই বেরিয়ে পড়েছিলাম। যাকগে, দুশ্চিন্তা বাদ দিয়ে তুমি এখন। ঘুমোও।
খাট থেকে উঠে গিয়ে পর্দা সরিয়ে তাঁবুর বাইরে পা রাখল বাবা। ফিরে তাকিয়ে বলল, ভালমত একটা ঘুম দাও, সকালে দেখবে ঝরঝরে হয়ে গেছে শরীর। আগামীকাল অনেক কাজ, পরিশ্রম করতে হবে। আমার ধারণা, একটা স্মরণীয় দিন হয়ে থাকবে আমাদের জন্য।
বাবা পর্দাটা ছেড়ে দিতেই ঝাঁকি দিয়ে সরে এসে আবার ঝুলতে লাগল ওটা।
শুয়ে পড়লাম। কম্বলটা টেনে দিলাম গলার কাছে। জোরাল বাতাস টান দিয়ে দিয়ে তাঁবুর পর্দা সরিয়ে দিতে চাইছে।
দুলন্ত পর্দাটার দিকে তাকিয়ে মনে হলো, তাঁবুটা তাঁবু না হয়ে ঘর, আর পর্দাটা পর্দা না হয়ে দরজা হলে ভাল হতো, তালা লাগিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারতাম।
ধূর, এরচেয়ে যদি গ্রামে দাদুর বাড়ি যেতাম, কত ভাল হত! চোখ বুজলাম।
গ্রীনহিলসে বাসায় থাকলেও ভাল হতো। বন্ধুদের সঙ্গে খেলতে পারতাম।
ঘুম ঘুম লাগছে এখন।

স্কুলের এই ছুটিটা শেষ হয়ে গেলেও বাঁচতাম! আমার স্কুল কামাই হবে ভেবে বাধ্য হয়ে মায়ানেকড়ে খোঁজা বাদ দিয়ে বাসায় চলে যেত বাবা।
এ রকম নানা কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লাম।
তবে ঘুমটা গাঢ় হলো না। বিছানায় ছটফট, গড়াগড়ি করতে করতে আবার দুঃস্বপ্ন দেখতে লাগলাম।
পালাচ্ছি…অন্ধকারে আমি পালাচ্ছি, একটা হিমশীতল বনের ভিতর দিয়ে।
রাস্তায় এসে পড়া ডালের নীচ দিয়ে ছুটছি।
আকাশে পূর্ণ চাঁদ। জানোয়ারের মত চারপায়ে ভর দিয়ে ছুটে। চলেছি আমি।
মাটিতে পড়ে থাকা শুকনো পাতায় পা পড়ে মর্মর ধ্বনি উঠছে। ভেজা মাটির গন্ধ লাগছে নাকে। একটানা দৌড়ে চলেছি আমি। কুকুরের মত জিভ বের করে হাঁপাচ্ছি।
নাহ্! এই দুঃস্বপ্ন দেখাটা বন্ধ করতে হবে স্বপ্নের মধ্যেই বললাম।
জোর করে জেগে উঠলাম। চোখ মেলোম। বাতাসের জন্য হাঁসফাস করছি। বিড়বিড় করলাম, এটা দুঃস্বপ্নই ছিল। ভয়ঙ্কর আরেকটা দুঃস্বপ্ন।
তাঁবুর ভিতর অন্ধকার। এখনও রাত, বুঝতে অসুবিধে হলো না। বিছানায় উঠে বসলাম। হাঁপাচ্ছি। এই সময় চোখ পড়ল পায়ের দিকে। চমকে উঠলাম।
বিছানার পায়ের কাছে দুটো কালো চোখ অন্ধকারেও চকচক করছে।
নিশ্চয় মায়ানেকড়ে!
আমাকে মেরো না, প্লিজ! ফিসফিস করে বললাম। জোরে বলার সাহস পাচ্ছি না।
মায়ানেকড়েটা নড়ল না।
স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে আমার দিকে। চকচকে চোখজোড়া দিয়ে যেন সম্মোহিত করার চেষ্টা করছে আমাকে।
ধড়াস ধড়াস করছে আমার বুক। চোখ সরাতে পারছি না। যেন আঠা দিয়ে ওই দুটো চোখের সঙ্গে আমার চোখ সেঁটে দেয়া হয়েছে।
চেঁচাও, রবিন, চেঁচাও! চেঁচাও! বাবাকে ডাকো! নিজেকে বলতে লাগলাম।
বাবা! আচমকা চিৎকারটা যেন বিস্ফোরিত হয়ে বেরিয়ে গেল আমার মুখ থেকে।
বাবা!
ঝটকা দিয়ে চোখ দুটো অন্যদিকে ঘুরে গেল। তাঁবুর পর্দাটা দেখল। একটা থাবা উঁচু করল। আমার ক্যাম্প খাটে কিছু একটা ছুঁড়ে দিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে গেল।
আশ্চর্য! মানুষের মত দুই পায়ে ছুটে পালিয়েছে, ছায়ামূর্তিটা। পলকের জন্য গায়ের ঢোলা আলখেল্লাও দেখেছি। নেকড়ে নয়, মানুষ! কে লোকটা?
বাবা!

কী হয়েছে, রবিন? বাবার তাঁবু থেকে জবাব শোনা গেল। আমি তাঁবুতেই আছি, তোমার কাছাকাছি। ভয় নেই।
লাফ দিয়ে নামার সময় এত তাড়াহুড়ো করলাম, টান লেগে কাত হয়ে গেল ক্যাম্প খাটটা। তাঁবুর দেয়ালে আছড়ে পড়ে আরেকটু হলেই ভাবুটা ধসিয়ে দিয়েছিল।
কী? তাঁবুতে ঢুকল বাবা। রবিন, কী হয়েছে? চেঁচাচ্ছ কেন?
বাবা, একজন লোক এসেছিল! গলা কাঁপছে আমার। হাত তুলে দেখালাম লোকটা কোথায় দাঁড়িয়ে ছিল।
তোমাকে কিছু করেনি তো?
না, কিছু করেনি।
কিন্তু এতরাতে কে? বিড়বিড় করল বাবা। নিশ্চয় মায়ানেকড়েটাই মানুষের রূপ ধরে তোমার কাছে এসেছিল। ঘুরে দাঁড়াল বাবা। দেখি তো, কোথায় গেল!
কিন্তু… আমি কথা শেষ করার আগেই বেরিয়ে গেল বাবা।
খাটটা তুলে সোজা করলাম। গায়ের কাঁপুনি এখনও থামেনি আমার। খাটে বসলাম। বিড়বিড় করে নিজেকে প্রশ্ন করলাম: মায়ানেকড়েই যদি হয়ে থাকে, তাঁবুতে ঢুকল কেন ওটা?
জবাব পেলাম না। বসে আছি তো আছিই। বাবা আর আসে না। উদ্বেগ বাড়ছে আমার। মনে এলোমেলো ভাবনা। শেষে ডাক দিলাম, বাবা? জবাব এল না। বাবা, তুমি কোথায়?
এবারও জবাব নেই। ভয়টা বাড়ল আমার। বাবার কিছু ঘটেনি তো? সাংঘাতিক কিছু?
মায়ানেকড়েটা তাকে ধরার জন্য ঘাপটি মেরে ছিল না তো? যেই বাগে পেয়েছে, অমনি খপ করে ধরেছে!
গেলে ভাল করতাম! ভেবে খাট থেকে উঠে দাঁড়ালাম। একজনের জায়গায় দুজন থাকলে সুবিধে।
বাইরে বেরোতে গিয়ে মেঝেতে চোখ পড়ল। থমকে দাঁড়ালাম। সাদা চকচকে কী একটা যেন পড়ে রয়েছে তাঁবুর কোণে।
কি ওটা? এগিয়ে গিয়ে তুলে নিলাম।
একটা দাঁত। বেশ বড়। নিশ্চয় হিংস্র কোন মাংসাশী জানোয়ারের। মোটা, শক্ত সুতোয় দাঁতটা হারের লকেটের মত করে বাঁধা।
বিচিত্র জিনিসটা হাতে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখতে লাগলাম।
এল কোথা থেকে এটা?

মায়ানেকড়ে! হ্যাঁ, এখন মনে পড়েছে। আমার খাটে ছুঁড়ে দিয়েছিল। খাটটা উল্টে গিয়েছিল। তখন এটা মাটিতে পড়ে গেছে।
হারের সুতো ধরে উঁচু করলাম। মনে হলো, মায়ানেকড়ের দাঁত নইলে এতবড় দাঁত আর কোন প্রাণীর হবে?
বাবাকে খুঁজে বের করা দরকার। মায়ানেকড়েতে যেহেতু ছুঁড়ে দিয়ে গেছে, নিশ্চয় এটার কোন ক্ষমতা আছে। কী ক্ষমতা, বাবা দেখলে বলতে পারবে।
ছুটে বাইরে বেরোলাম। পড়লাম একেবারে বাবার সামনে। দরজার ঠিক বাইরেই দাঁড়িয়ে আছে।
তোমাকে না দেখে দুশ্চিন্তা হচ্ছিল বাবা, তাই দেখতে যাচ্ছিলাম।
ওটাকে পেলাম না, রবিন। কুটি করল বাবা। রাতে ওদের নাগাল পাওয়া খুবই কঠিন। কাল দিনের বেলা চেষ্টা করতে হবে।
দেখো, বাবা। দাঁতটা উঁচু করে দেখালাম। তাঁবুতে ঢুকে এটা আমার বিছানায় ছুঁড়ে দিয়েছিল মায়ানেকড়েটা। মায়ানেকড়ের দাঁত না তো?
হাতে নিল বাবা। দেখতে দেখতে বলল, আশ্চর্য! মায়ানেকড়ে এটা তোমাকে দিল কেন?
এটার কোন ক্ষমতা আছে?
মাথা নাড়ল বাবা। জানি না। তবে দিয়ে গেছে যখন, নিশ্চয় কোনও রহস্যময় কারণে বিপদ-আপদ থেকে তোমাকে মুক্ত রাখতে চায় ॥ হারটা আবার ফিরিয়ে দিয়ে বলল, নাও, গলায় পরে ফেলো।
মাথা গলিয়ে হারটা গলায় নামিয়ে আনলাম। আমার বুকের কাছে চামড়ায় অদ্ভুত দাঁতটার স্পর্শ লাগতে গায়ে কাঁটা দিল। শিউরে উঠলাম। বোধহয়, ঠাণ্ডায়।
তাড়াতাড়ি ফিরে এলাম তাঁবুতে। খাটে শুয়ে কম্বল টেনে দিলাম মাথার ওপর।
রবিন! রবিন! জলদি এসো! পরদিন বাবার চিৎকারে ঘুম ভাঙল আমার।
তাড়াতাড়ি খাট থেকে নামলাম।
জলদি এসো তীক্ষ্ণ স্বরে ডাকল আবার বাবা। নিশ্চয় মায়ানেকড়ে দেখেছে। দৌড়ে বেরোলাম তাঁবু থেকে।
পাগলের মত চারপাশে তাকালাম। মায়ানেকড়ে দেখলাম না।
বাবা কড়াইয়ের ওপর ঝুঁকে রয়েছে। নীল জিনসের প্যান্ট আর লাল রঙের শার্ট পরেছে। মাথায় দিয়েছে একটা নীল রঙের ক্যাপ।
কী হয়েছে, বাবা? জিজ্ঞেস করলাম। চেঁচাচ্ছ কেন?
ডিম ঠাণ্ডা হয়ে গেল, হেসে জবাব দিল বাবা।
ধুর, হেসো না তো, হতাশ হয়ে বললাম।

তুমি কী ভেবেছিলে মায়ানেকড়ে দেখে ডেকেছি? কড়াই থেকে হাতা দিয়ে দুটো প্লেটে ডিম তুলল বাবা। একটা আমাকে দিল। চিন্তা নেই, আজ একটাকে ধরবই আমি।
চামচে করে খানিকটা ডিম তুলে মুখে পুরলাম। কিন্তু গিলতে পারলাম না। বিস্বাদ লাগছে। কারণটা বুঝলাম না।
বাবা কাপে কফি ঢালছে।
তার অলক্ষে মুখের ডিমটা ফেলে দিলাম। সত্যিই কোন বিপদ হবে না তো?
তা তো হতেই পারে, বাবা জবাব দিল। তাই বলে কী পিছিয়ে থাকব? তবে ভয় নেই, আগেই বলেছি, দিনের বেলা মায়ানেকড়ের কোন ক্ষমতা থাকে না।
হয়তো থাকে, তুমি জানো না।
উঁহু, থাকে না।
এত শিওর হচ্ছ কী করে?
তোমার কী ধারণা, ভালমত খোঁজ-খবর না নিয়েই আমি এসেছি?
বাবার কথায় শঙ্কামুক্ত না হলেও আর কিছু বললাম না।
নাস্তা শেষ করে বাবা বলল, তাঁবু গোটাও।
আমার তাঁবুটা গোটালাম। বাবার তাঁবুটা বাবা গোটাল। বড় বড় দুটো সবুজ ব্যাকপ্যাকে সমস্ত জিনিসপত্র ভরলাম। তারপর পিঠে বেঁধে রওনা হলাম গভীর বনের দিকে।
কোনদিকে যেতে হবে কী করে বুঝছ? বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম।
এই যে, ছাপ অনুসরণ করে। নরম কাদামাটিতে গভীরভাবে বসা মায়ানেকড়ের পায়ের ছাপ দেখাল বাবা।
দেখে কেঁপে উঠলাম।
ঘন বনের ভিতর দিয়ে চলেছি। গাছপালা সূর্য ঢেকে দিয়েছে। কাঁধের ব্যাকপ্যাক অন্য কাঁধে সরানোর জন্য থামলাম। চারপাশে তাকিয়ে ভাবলাম, এত অন্ধকার কেন বনটা? এত বিষণ্ন!
বাবা! দাঁড়াও! ব্যাকপ্যাকটা কাঁধ বদল করলাম।
কিন্তু বাবা থামল না। জোর কদমে এগিয়ে চলেছে। লাফাতে লাফাতে
পায়ে যেন স্প্রিং লাগানো। মায়ানেকড়ে ধরার জন্য অস্থির। হঠাৎ থমকে দাঁড়াল।
দৌড়ে এলাম বাবার কাছে।
ওই যে! ফিসফিস করে বাবা বলল। আমি ওটাকে দেখতে পাচ্ছি! উত্তেজনায় গলা কাঁপছে তার।
আঁকাবাঁকা, মোচড় খাওয়া পথটা ধরে দৌড়াতে শুরু করল বাবা।

আমিও ছুটতে লাগলাম তার পিছন পিছন। বুকের ভিতর ধড়াস। ধড়াস বাড়ি মারছে হৃৎপিণ্ডটা।
আরও জোরে দৌড়াতে লাগল বাবা। রাস্তা থেকে নেমে গাছপালার ভিতর দিয়ে এঁকেবেঁকে ছুটল।
সামনে একঝলক বাদামী রঙ দেখলাম। আবার দাঁড়িয়ে গেলাম।
ওই যে! ধূর! আমি ভেবেছিলাম মায়ানেকড়ে! প্রাণীটার দিকে তাকিয়ে আছে বাবা।
আমিও দেখেছি।
ভীত চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে ছোট একটা বাদামী রঙের শিয়াল।
হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল বাবা। নাহ্, এখন যে সকাল, দিন, মায়ানেকড়েরা মানুষের রূপ নিয়ে আছে, ভুলে যাওয়া উচিত হয়নি আমার। যাক, একবার করেছি, আর ভুল করব না।
ফিরে এসে আবার রাস্তায় উঠল বাবা। আবার এগিয়ে চলার পালা।
বনের ভিতরে পাখির কোলাহল। এত পাখি, আর এভাবে কখনও ডাকতে শুনিনি। বিচিত্র চিৎকারে কান ঝালাপালা করছে।
আরেকটু এগিয়ে মুখ তুলে তাকিয়ে চমকে গেলাম। কালো রঙের পাখিতে বোঝাই গাছের ডালগুলো। শত শত। পাশাপাশি গা ঘেঁষে বসেছে। পাখিগুলোর চোখ টকটকে লাল। লম্বা, চোখা ঠোঁট খুলছে আর বন্ধ করছে কট কট শব্দে।
এই পাখি আর আগে কখনও দেখিনি।
পাখিগুলোর ওপর থেকে চোখ ফেরাতে পারছি না। গা ছমছম করছে। মনে হচ্ছে হাজার হাজার লাল ভূতুড়ে চোখ যেন কুটিল দৃষ্টিতে আমাদের দেখছে। বার বার ঠোঁট খুলে, বন্ধ করে আমাদেরকে যেন কোনও ভয়ঙ্করের ইঙ্গিত দিচ্ছে।
ওরা কী রেগে গেছে? পাখিগুলোর দিকে তাকিয়ে থেকে বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম।
না, ওগুলোর খিদে পেয়েছে।
তাকিয়ে আছি পাখিগুলোর দিকে। মানুষখেকো?
বাবা জবাব দিল না।
ওগুলোর দিকে তাকিয়ে আমার মনে হতে থাকল, যে-কোন মুহূর্তে ঝাক বেঁধে আমাদের ঠোকরাতে আসবে। এত পাখি একসঙ্গে হামলা চালালে কিছুই করতে পারব না। এ ভয় পেলেও পাখিগুলোর ওপর থেকে চোখ ফেরাতে পারছি না। যেন আঠা দিয়ে ওগুলোর গায়ে আমার দৃষ্টিটা লাগিয়ে দেয়া হয়েছে।
বাবা, বলো না, ওরা মানুষখেকো নাকি? জবাব না পেয়ে জোর করে চোখ সরালাম পাখিগুলোর দিক থেকে।

রাস্তার দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলাম।
শূন্য রাস্তা। বাবাকে দেখা যাচ্ছে না।
বাবা, কোথায় তুমি? চিৎকার করে ডাকলাম।
জবাব নেই। আবার চিৎকার করলাম। সাড়া এল না।
গাছপালার ভিতর দিয়ে ছুটতে শুরু করলাম। এদিক ওদিক তাকিয়ে বাবাকে খুঁজতে খুঁজতে। কিন্তু কোথাও দেখলাম না তাকে।
ইস, কেন যে পাখিগুলোর দিকে তাকিয়ে ছিলাম? গুঙিয়ে উঠলাম।
বনের ভিতর ঘুরে বেড়াচ্ছে আমার মরিয়া দৃষ্টি।
আমি এখন কোথায়? নিজেকে প্রশ্ন করতে গিয়ে প্রায় কেঁদে ফেললাম। গাছগুলো তো সব প্রায় একই রকম লাগছে! এই বন থেকে আমি আর কোনদিন বেরোতে পারব না! আমাকেও কেউ খুঁজে পাবে না এখানে! বাবা! বাবা! কোথায় তুমি?
চিৎকার করে বাবাকে ডাকতে ডাকতে বুনোপথ দিয়ে ছুটলাম।
আমার তীক্ষ্ণ ডাক প্রতিধ্বনি তুলল বনের গাছে গাছে। কিন্তু কোন জবাব পেলাম না। বাবার কোন চিহ্নই দেখলাম না।
জোরে জোরে হাঁপাচ্ছি। ক্লান্ত হয়ে গেছি। আমার গলা শুকিয়ে। কাঠ। চিৎকার করে করে কণ্ঠনালী খসখসে হয়ে গেছে।
ধীরে হাঁটছি এখন। নীরবে এগিয়ে চললাম বনের ভিতর দিয়ে।
তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে চলেছি, গাছপালার মধ্যে বাবাকে খুঁজছে আমার চোখ। তার লাল শার্ট, সবুজ ব্যাকপ্যাক দেখতে চাইছে।
নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করলাম। কিন্তু প্রতিটি শব্দ–সেটা যত সামান্যই হোক–তার সরসরানি, মটু করে শুকনো কুটো ভাঙা, বুনো প্রাণী কিংবা পাখির ডাক চমকে দিচ্ছে আমাকে, লাফিয়ে উঠছে হৃৎপিণ্ড, ভয়ে।
সামনে ধীরে ধীরে চওড়া হচ্ছে রাস্তাটা। দুপাশে গাছপালা কমে আসছে। রোদের আলো বাড়ছে।
তারপর, হঠাৎ করেই বেরিয়ে এলাম একটা খোলা জায়গায়।
রোদ ঝলমল করছে গোলাকার জায়গাটুকুতে। আনন্দে চেঁচিয়ে উঠতে গিয়েও সামলে নিলাম।
খোলা জায়গার একপ্রান্তে একটা ছোট কাঠের তৈরি কেবিন। চিমনি দিয়ে ধোঁয়া উঠছে।
পা টিপে টিপে দরজার কাছে এসে দাঁড়ালাম। ঠেলা দিতেই ফাঁক হয়ে গেল পাল্লাটা। ভিতরে উঁকি দিলাম। ঘরে একটা চারপায়া, পুরানো একটা টেবিল, আর নড়বড়ে দুটো চেয়ার। একপাশে ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বলছে। একধারে বেড়া ঘেষে রাখা কতগুলো কাঠের বাক্স।

ঘরে আর কী কী আছে গলা বাড়িয়ে দেখার চেষ্টা করলাম। হঠাৎ বাজখাই কণ্ঠে পিছন থেকে হাক শোনা গেল, কী চাই?
এমন এক লাফ মারল কলজেটা, মনে হলো জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাব।
ফিরে তাকিয়ে দেখি, একজন বুড়ো মানুষ দাঁড়িয়ে। চুলে কতকাল যে তেল-সাবান আর চিরুনি পড়েনি কে জানে। মস্ত গোঁফ। খোঁচা খোঁচা দাড়ি। মাংসহীন তোবড়ানো চোয়ালের ফাঁকে বসে গেছে গালের কুঁচকানো চামড়া। লম্বা নাকটা ঈগলের ঠোঁটের মত বাঁকা হয়ে নেমে এসেছে মস্ত গোঁফের ওপর। চোখের মণি দুটো অসম্ভব উজ্জ্বল আর চকচকে। কাঁধে ঝুলছে একটা লম্বা মোটা কাপড়ের ঝোলা। নীচের দিকটা ঝুলে রয়েছে। কিছু আছে ভিতরে।
কী চাও, খোকা? আবার জিজ্ঞেস করল বুড়ো।
আমি…আমি পথ হারিয়েছি, কোনমতে বললাম।
এসো, ভিতরে এসো। ধাক্কা দিয়ে দরজাটা পুরো খুলে ঘরে ঢুকে গেল বুড়ো।
আমিও ঢুকলাম। দরজার খিল লাগিয়ে দিল বুড়ো। এ-সব জায়গায় দরজা খোলা রাখা ঠিক না। কখন আবার কী এসে হাজির হবে, কে জানে!
এসো। বসো। হাড়সর্বস্ব আঙুল দিয়ে আমার কাঁধ চেপে ধরে চেয়ারের কাছে ঠেলে নিয়ে এল লোকটা। চাপ দিয়ে বসিয়ে দিল। তার মত একজন বুড়ো মানুষের গায়ের জোর অবাক করল আমাকে।
এ রকম ভয়ানক জায়গায় এলে কেন? বুড়োর বরফশীতল চাহনি। দেখে ঠাণ্ডা শিহরণ নেমে গেল আমার মেরুদণ্ড বেয়ে।
আমি যাই! উঠে দাঁড়াতে গেলাম।
বসো! কড়া আদেশ যেন শপাং করে উঠল চাবুকের মত। এই বন বড় ভয়ানক জায়গা। বুঝতে পারছি তুমি শহুরে ছেলে। এখনও যে ভালুকের পেটে যাওনি সেটাই আশ্চর্য! খানিকটা নরম হলো বুড়োর স্বর। বনের ভিতর একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছিলে কেন?
একা ছিলাম না, বাবার সঙ্গে বেরিয়েছিলাম, জবাব দিলাম। পিছনে চলতে চলতে হঠাৎ মুখ তুলে দেখি বাবা নেই।
চিন্তার কথা! গম্ভীর হয়ে গেল লোকটা।
ঘাবড়ে গিয়ে বললাম, আপনি বলতে চান, আমার বাবাকে মায়ানেকড়েতে ধরে নিয়ে গেছে?
যতদূর জানি, দিনের বেলা মায়ানেকড়েরা বেরোয় না। এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে লোকটা বলল, কী হয়েছিল, সব খুলে বলো তো আমাকে।
কেন আমরা ব্র্যাটভিয়ায় এসেছি, বললাম তাকে। শুনে আরও গম্ভীর হয়ে গেল বুড়ো। বলল, মায়ানেকড়ে কিন্তু এখানে সত্যিই আছে।

আছে?
আছে। লোকের কথা তো আর মিথ্যে না। তুমি বসো। চা খাও। ততক্ষণে যদি তোমার বাবা তোমাকে খুঁজতে খুঁজতে এখানে না আসেন, আমি তোমার সঙ্গে তাকে খুঁজতে বেরোব।
প্রথমে ঝোলা থেকে একটা বড় সাপ বের করে দেয়াল ঘেঁষে রাখা একটা বাক্সে ঢোকাল বুড়ো। তারপর স্টোভ জ্বেলে একটা পুরানো কেটলিতে চায়ের পানি চাপাল। ফিরে এসে আমার মুখোমুখি চেয়ারে বসল।
আপনি নিশ্চয় সাপ ধরেন?
কী করে বুঝলে?
এই যে, ঝোলা থেকে সাপ বের করে রাখলেন, দেখলাম তো। সবগুলো বাক্সেই কি সাপ আছে?
না। বাক্সগুলো সব ভরে গেলে প্রথমে সাপের বিষ বের করে নেব। তারপর বিষসহ সে-সব সাপ শহরে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দিয়ে আসব। এটাই আমার পেশা।
পানি গরম হলে দুটো তোবড়ানো টিনের কাপে চা বানিয়ে এনে একটা আমাকে দিল বুড়ো, আরেকটা নিজে নিল। কাপে চুমুক দিয়ে বলল, কয়েক বছর আগের কথা। আমি আসার আগে এই কেবিনে একজন সন্ন্যাসী থাকতেন। একদিন শহর থেকে এল সেই অহঙ্কারী লোকটা। সব ছারখার করে দিল।
অহঙ্কারী লোক?
হ্যাঁ, বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল বুড়ো। বনে শিকার করতে এসে সন্ন্যাসীর কেবিনে ঢুকেছিল। তাঁর সঙ্গে বেয়াদবি করেছিল। সন্ন্যাসী ওকে কি করেছিলেন, কেউ জানে না। তবে কেবিন থেকে বেরিয়ে টলতে টলতে গভীর বনের দিকে চলে যায় লোকটা।
সন্ন্যাসী?
হ্যাঁ, সন্ন্যাসী। কেন?
না, এমনি। তাঁবুতে ঢুকে যে লোকটা ওকে মায়ানেকড়ের দাঁতটা দিয়েছেন, তিনিই সেই সন্ন্যাসী কি না ভাবছে রবিন। জিজ্ঞেস করল, সন্ন্যাসী এখন কোথায়?
তা তো বলতে পারব না। অহঙ্কারী লোকটা মায়ানেকড়ে হয়ে যাওয়ার কয়েক দিন পর এই কেবিন ছেড়ে চলে গেছেন। তবে গাঁয়ের লোকে মাঝে মাঝে দেখে ওঁকে। বনে ঢোকেন। কোথা থেকে আসেন, কোথায় যান, কেউ জানে না।
হুঁ! চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল রবিন। তারপর বলল, হ্যাঁ, বলুন, অহঙ্কারী লোকটার কী হলো?
লোকটা যেদিন বনে ঢুকল, তার দুদিন পর ছিল পূর্ণিমা। গোল হয়ে এসেছিল চাঁদ। সারারাত নেকড়ের অস্থির ভয়ঙ্কর ডাক শোনা গেল বনের মধ্যে। বনের

বাইরে গ্রাম থেকে অনেকেই শুনেছে সেই ডাক।
পরদিন সূর্য ওঠার পর থেমে গেল ডাকাডাকি। গ্রামের কয়েকজন দুঃসাহসী, লোক বনে ঢুকল, রাতে কী ঘটেছিল জানার জন্যে। বনের মধ্যে অনেক প্রাণীর মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখল ওরা। ভয়ঙ্কর আক্রোশে যেন ছিন্নভিন্ন করে ফেলা হয়েছে দেহগুলো। কোনটা খাওয়া, কোনটা আধখাওয়া।
আরও একটা জিনিস চোখে পড়ল ওদের, নেকড়ের পায়ের ছাপ। ব্যাপারটা খুব রহস্যময় লাগল ওদের কাছে।
পরের রাতেও শোনা গেল নেকড়ের ডাক। তারপর দিন বনে ঢুকে সেই একই রকম বীভৎস দৃশ্য দেখল ওরা। ঠিক করল, রাতে বনের মধ্যে লুকিয়ে থেকে দেখবে, এ-সব কার কাজ।
তৃতীয় পূর্ণিমা। সন্ধ্যাবেলায়ই গাছে উঠে লুকিয়ে রইল ওরা। রাত বাড়ল। চাঁদের আলো উজ্জ্বল হলে ওরা দেখল, একটা বড় গাছের ডাল থেকে লাফিয়ে নামল একজন মানুষ। ওকে চিনতে পারল ওরা। সেই অহঙ্কারী লোকটা। সন্ন্যাসীর কেবিনে ঢোকার আগে ওদের গ্রাম হয়েই এসেছিল। যাই হোক, ওদের চোখের সামনে নেকড়ে হয়ে লোকটা। চাঁদের দিকে মুখ তুলে হাঁক ছাড়ল।
একটা খরগোশ পালাচ্ছিল সামনে দিয়ে। চোখের পলকে ওটাকে ধরে আস্তই চিবিয়ে খেয়ে ফেলল।
আর বনে থাকতে সাহস হলো না গ্রামবাসীদের। টপাটপ গাছ থেকে নেমে দৌড়ে পালাল। গাঁয়ে ঢোকার আগে আর থামল না কেউ।
ওদের ভাগ্য ভাল ছিল, তাই পালাতে পেরেছিল।
তারপর, আরও কিছু লোক ওই আজব প্রাণীটাকে ধরতে বনে গিয়েছিল। কিন্তু ওরা আর ফেরেনি। জোরে নিঃশ্বাস ছাড়ল বুড়ো।
তারপর থেকে রাতের বেলা এই বনে কেউ ঢোকে না।
বাবাকে কিছু করবে না তো? শঙ্কিতকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল রবিন।
না মনে হয়। এখন তো দিন। রোদ ওঠার পর আর কোন ক্ষতি করে না মায়ানেকড়েরা! দিনে কোন ক্ষমতা থাকে না। টেবিলের ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে আমার একটা হাত ধরল বুড়ো। হেসে জিজ্ঞেস করল, তোমার হাত দেখে ভাগ্য বলে দেব?
জবাব না দিয়ে হাতের তালু মেলে দিলাম।
এই যে তোমার ভাগ্যরেখা। লম্বা একটা হাড়সর্বস্ব আঙুলের ডগা আলতো করে ঠেলে দিল বুড়ো আমার হাতের তালুতে
ভাল করে দেখার জন্য সামনে ঝুঁকলাম। শার্টের ভিতর থেকে বেরিয়ে গিয়ে ঝুলতে লাগল আমার গলায় পরা দাঁতটা।

দেখে আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠল বুড়ো। মায়ানেকড়ের চিহ্ন! কোথায়। পেলে? কোথায় পেলে ওটা? বেরোও! বেরোও আমার ঘর থেকে!
চিৎকার করতে করতে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল বুড়ো।
ফায়ারপ্লেসের পাশ থেকে একটা কয়লা খোঁচানোর সিক তুলে নিল।
চারপায়া থেকে লাফিয়ে উঠে দরজার দিকে ছুটলাম।
ঘর থেকে বেরিয়ে খোলা জায়গাটা ধরে দৌড় দিলাম। একটা পাথরে হোঁচট খেয়ে ধুড়স করে পড়ে গেলাম।
পিছনে আসছে বুড়ো। হাতে সিক। মায়ানেকড়ের চিহ্ন! ভাগো! ভাগো এখান থেকে! একনাগাড়ে চেঁচিয়ে চলেছে ও।
হাঁচড়েপাঁচড়ে উঠে দাঁড়িয়ে লেংচাতে লেংচাতে একদৌড়ে বনে ঢুকে পড়লাম। রাস্তাটা কোনদিকে আছে জানি না। দেখার সময়ও নেই।
গাছপালার ভিতর দিয়ে অন্ধের মত ছুটলাম। গাছের শিকড়ে পা বেধে যাচ্ছে। হাতে-মুখে লাগছে গাছের ডাল। সড়াৎ সড়াৎ বাড়ি খাচ্ছি। কিন্তু কোন কিছুর পরোয়া করলাম না।
ছুটতেই থাকলাম যতক্ষণ না বুড়োর চিৎকার ক্ষীণ হয়ে এল।
দৌড়াতে দৌড়াতে পা ব্যথা করছে, তবু থামলাম না। আরও কিছুদূর এগিয়ে তারপর থামলাম।
এতক্ষণে চিন্তা করার সুযোগ পেলাম। বুঝলাম না, দাঁতটাকে এত ভয় পেল কেন বুড়ো।
পিছনে কুকুরের ডাক শোনা গেল। উত্তেজিতস্বরে ডাকছে কুকুরগুলো।
মায়ানেকড়ে দেখল! চমকে গেলাম।
পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়ালাম।
না, মায়ানেকড়ে দেখেনি। তবে তাতে আমার উৎসাহিত হবার কিছু নেই। ভয়ঙ্কর বুনো কুকুর ওগুলো। দশ-বারোটা হবে। কুৎসিত চেহারা। কাদামটি লেগে থাকা নোংরা লোম। হলদে চোখের দৃষ্টি দেখলে অতিবড় দুঃসাহসীরও প্রাণ কেঁপে যাবে। ঝুলে পড়া নীচের চোয়াল থেকে লালা গড়াচ্ছে।
চাপা গরগর করে হাড্ডিসার মাথাগুলো নামাল ওরা। আমাকে ঘিরে ঘুরতে শুরু করল। কট কটু করে যেন বাতাসে কামড় দিচ্ছে।
যে-কোন মুহূর্তে এই কামড়টা আমার পায়ে পড়বে।
একটা গাছের দিকে দৌড় দিলাম। পাগলের মত গাছটাকে জড়িয়ে ধরে বেয়ে ওঠার চেষ্টা করলাম।
প্রচণ্ড জোরে ঘেউ ঘেউ করে ছুটে এল কুকুরগুলো। লাফিয়ে উঠল। থাবা মারতে লাগল গাছের গায়ে।

একটা কুকুর লাফিয়ে উঠে আমার জুতো কামড়ে ধরল। মাথা ঝাঁকি দিয়ে আমাকে টেনে নামানোর চেষ্টা করল।
চেঁচিয়ে উঠে হ্যাঁচকা টান মারলাম। পা থেকে জুতো খুলে গেল। জুতোটা মুখে নিয়ে উড়ে গিয়ে মাটিতে পড়ল কুকুরটা।
আরেকটা কুকুর আমার মোজা কামড়ে ধরল।
লাথি মেরে ফেলে দিলাম ওটাকে। হাতে ভর দিয়ে নিজেকে টেনে, তোলার চেষ্টা করলাম।
হঠাৎ পিছলে গেল হাত। চেঁচিয়ে উঠলাম। চিত হয়ে পড়লাম। মাটিতে। একেবারে ক্ষুধার্ত কুকুরগুলোর মাঝখানে।
আমাকে ওভাবে পড়তে দেখে থমকে গেল কুকুরগুলো।
জিভ বের করে হাঁপাতে হাঁপাতে দেখছে আমাকে। যেন আমার উদ্দেশ্য বোঝার চেষ্টা করছে।
যখন বুঝল, কিছু করার সাধ্য নেই আমার, ধীরে ধীরে সামনে এগোতে শুরু করল আবার।
আমি জানি, উঠে বসতে গেলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে। ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করবে।
চাপা গরগর করে ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগোচ্ছে ওগুলো। মায়ানেকড়ের দাঁতটার কথা মনে পড়ল আমার।
সাপুড়ে বুড়ো দাঁতটা দেখে ভয় পেয়েছিল। কুকুরগুলোও পেতে পারে।
আস্তে করে একটা হাত তুলে আনলাম গলার কাছে।
আরও কাছে এসেছে কুকুরগুলো। ওগুলোর দুর্গন্ধে ভরা গরম নিঃশ্বাস লাগছে আমার মুখে।
শার্টের ভিতরে হাত ঢোকালাম। কাঁপা হাতে গলায় পরা সুতোটা ধরলাম। আরও কাছে চলে এসেছে কুকুরগুলো। সুতোয় বাঁধা দাঁতটা খুঁজে বেড়াল আমার আঙুল। কোথায় ওটা? কোথায়? গরগরানি বেড়েছে কুকুরগুলোর। যে কোন মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়বে। মরিয়া হয়ে দাঁতটা খুঁজতে লাগলাম। সুতোটাকে টানছি। টানছি। কিন্তু দাঁতটা পেলাম না।
মাথা উঁচু করলাম। জোরে এক টান দিলাম সুতো ধরে।
অবশেষে পেলাম ওটা। আমার গায়ের নীচে চাপা পড়ে ছিল। দুই আঙুলে টিপে ধরলাম। কুকুরগুলো ঝাঁপিয়ে পড়তে এল। দাঁতটা উঁচু করে ধরলাম।
মাঝপথে যেন ধাক্কা খেয়ে থেমে গেল কুকুরগুলো। পাথরের মূর্তির মত স্থির।
চিৎকার-চেঁচামেচি বন্ধ। নীরবে তাকিয়ে রয়েছে দাঁতটার দিকে।
তারপর, হঠাৎ নড়ে উঠল। ভয়ার্ত কুঁই কুঁই শব্দ করে লেজ গুটিয়ে পিছিয়ে গেল। সরে গেল আমার কাছ থেকে। দৌড়ে পালাল। হারিয়ে গেল গাছপালার আড়ালে।

জোরে নিঃশ্বাস ছাড়লাম। বড় বাঁচা বেঁচেছি! সত্যি চলে গেছে কুকুরগুলো? সত্যি? বিশ্বাসই হচ্ছে না আমার।
প্রচণ্ড ক্ষমতা এই দাঁতটার! হাতের তালুতে চেপে ধরলাম।
আমার জীবন বাঁচিয়েছে! এখন থেকে যত্ন করে রাখতে হবে এটাকে!
আবার শার্টের ভিতর ঢুকিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ালাম। খুলে যাওয়া জুতোটা তুলে নিয়ে পরলাম আবার। তারপর বাবাকে খুঁজতে চললাম।
বনের ভিতর ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে একটা পায়েচলা পথের ওপর এসে পড়লাম।
বনটা এখন নীরব। কালো রঙের ওই পাখিগুলোকে আর দেখতে পাচ্ছি না। কট কট শব্দও নেই।
একটা কাঠবিড়ালী কিংবা খরগোশও চোখে পড়ছে না। কোনও প্রাণী দেখছি না। কোনও শব্দই নেই।
তবে এখন আর ভয় পাচ্ছি না আমি।
শার্টের ভিতর হাত ঢুকিয়ে দাঁতটা ছুঁয়ে দেখলাম। অদ্ভুত এক নিরাপত্তাবোধ এনে দিয়েছে আমাকে ওটা।
কতক্ষণ হাঁটলাম বলতে পারব না।
বনের নতুন কোনও অংশে চলে এসেছি, না আগের বনটাতেই রয়েছি, বুঝতে পারলাম না।
বাবা! অ্যাই বাবা! গাছপালার মধ্যে দিয়ে চলতে চলতে চিৎকার করে ডাকলাম। আমার ডাক ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে।
কিন্তু বাবা জবাব দিল না।
অস্বস্তিতে ভুগছি। নাড়ির গতি বাড়ছে। আবার চিৎকার করে ডাকলাম, বাবা, শুনতে পাচ্ছ? জবাব নেই।
বাবা! কোথায় তুমি?
রবিন, তুমি কোথায়? জবাব এল এবার। কথাগুলো যেন শান্তির পরশ বোলাল আমার কানে।
বাবা! এই যে, এখানে! চেঁচিয়ে উঠলাম। তুমি কোথায়?
ওপরে তাকাও, রবিন। এখানকার সবচেয়ে উঁচু গাছটা খুঁজে বের করো।
ওপরে তাকিয়ে গাছের মাথা দেখলাম। করেছি, বাবা! আমি আসছি!
জলদি করো! বাবার কণ্ঠ উত্তেজনায় ভরা। আমি ওটাকে পেয়েছি, রবিন! মায়ানেকড়েটাকে ধরেছি!
দৌড়াতে শুরু করলাম। কিন্তু ইচ্ছের বিরুদ্ধে এগোচ্ছি। আসলে আমি পিছনে ফিরে পালাতে পারলে খুশি হতাম। মায়ানেকড়েটাকে আর দেখতে চাই না আমি। ইতিমধ্যেই দুবার দেখেছি। রাতের বেলা। গাছ থেকে লাফিয়ে নেমে যখন আমার

কাঁধ কামড়ে দিয়েছিল, তখন একবার, আর তাঁবুর ভিতরে খাটের পায়ের কাছে দ্বিতীয়বার, যখন আমাকে দাঁতটা ছুঁড়ে দিয়েছিল। তৃতীবার আর ওটার দিকে তাকাতে চাই না।
উঁচু একটা গাছের ফাঁকে বাবার লাল শার্ট দেখতে পেলাম। আমার কপাল থেকে ঘাম বেয়ে মুখে পড়ছে। ছুটে বেরোলাম একটা খোলা জায়গায়। বিস্ময়ে চমকে উঠলাম। বাবার মায়ানেকড়ে দেখে চেঁচিয়ে বললাম, বাবা, তোমার কী মাথা খারাপ হলো?
বাবা, তুমি আমার সঙ্গে মজা করছ, তাই না? আবার বললাম।
গাছের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বাবা। গর্বিত ভঙ্গিতে তাকাচ্ছে তার শিকারের দিকে। অতি সাধারণ চেহারার, বিষণ্ন, টাকমাথা এক মধ্যবয়েসী মানুষকে শিকল দিয়ে বেঁধেছে। হাতদুটো পিছমোড়া করে বাঁধা। পায়ে কড়া লাগানো। তাতেও মোটা শিকল।
সামান্য কুঁজো হয়ে আছে মানুষটা। পরনে সাদামাঠা প্যান্ট ও শার্ট। চোখে চশমা।
মায়ানেকড়ে কোথায়, বাবা? জিজ্ঞেস করলাম। হাসিমুখে হাত তুলে মানুষটাকে দেখাল বাবা।
মাথা নাড়লাম। একে তুমি মায়ানেকড়ে বলছ? এ তো একটা মাছি মারতে পারবে না।
আমার কথায় সাহস পেয়ে যেন বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল লোকটা। হাঁচি দিল।
সর্দি লেগেছে, দেখো! বাবাকে বললাম। মনে হচ্ছে লোকটা অসুস্থ। অকারণে বেঁধেছ ওকে। খুলে দাও, বাবা।
রুমাল আছে? নাক টানতে টানতে জিজ্ঞেস করল লোকটা।
এই যে! পকেট থেকে রুমাল বের করে দিলাম।
রবিন, দিয়ো না! চেঁচিয়ে উঠল বাবা। থাবা দিয়ে আমার হাত সরিয়ে দিল। ও চালাকি করছে!
বনে এসে মায়ানেকড়ের খোঁজ করতে করতে বাবার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, ভাবলাম।
আবার হাঁচি দিল লোকটা।
বাবা, ও মায়ানেকড়ে, শিওর হলে কী করে? ছোটখাট মানুষটার অসহায়ত্ব দেখে মায়াই লাগছে আমার।
মায়ানেকড়ের পায়ের ছাপ অনুসরণ করে এগিয়েছি। ওর ঘরের কাছে গিয়ে শেষ হয়েছে ছাপ। তারপর আর কোন চিহ্ন নেই। হঠাৎ করেই পায়ের ছাপ উধাও। ভুরু নাচাল বাবা। ও মায়ানেকড়ে নয় তো কী?
কিন্তু গতরাতে আমি মায়ানেকড়েটাকে দেখেছি। এর সঙ্গে কোন মিলই নেই।

মায়ানেকড়ে হয়ে যাবার পর মানুষের সঙ্গে আর কোন মিল থাকে না ওদের।
হ্যাঁ, আপনার ছেলে ঠিকই বলছে-আপনি যা ভাবছেন তা আমি নই, মিনতি করে বলল লোটা। আমাকে ছেড়ে দিন।
চুপ! ধমকে উঠল বাবা। তুমি বললেই আমি ছাড়ি! আমাকে গাধা পেয়েছ?
মস্ত ভুল করছেন আপনি! গুঙিয়ে উঠল লোকটা। আমি মায়ানেকড়ে নই। আমার কথা বিশ্বাস করুন।
আমার মনে হয় ও ঠিকই বলছে, লোকটার সঙ্গে সুর মেলালাম।
ওর কথায় কান দিয়ো না, রবিন।
বাবার ওপর আমার বিশ্বাস আছে। ভুল সাধারণত করে না বাবা। কিন্তু এবার নিশ্চয় করেছে। এই নিরীহ, অতি সাধারণ লোকটা মায়ানেকড়ে, রাতের বেলা রোমশ, বিশাল ভয়ঙ্কর প্রাণীতে পরিণত হয়, এ কথা কোনমতেই বিশ্বাস করতে পারলাম না।
বিকেলের রোদ গায়ে পড়েছে লোকটার। চকচকে টাকে বিন্দু বিন্দু ঘাম।
আমি মায়ানেকড়ে নই! আমার দিকে তাকিয়ে গুঙিয়ে উঠল লোকটা। বিশ্বাস করো। আমি মাছ-মাংসও খাই না, শুধু নিরামিষ।
যখন মানুষ থাকো তখন খাও না, কিন্তু মায়ানেকডে হয়ে গেলে কাঁচা মাংসই গপ গপ করে খাও! এখন চুপ থাকো! বেশি কথা বোলো না! হাত মুঠো করে বাতাসে নাচাল বাবা। আমার স্বপ্ন সত্যি হয়েছে। আমিই প্রথম একটা জ্যান্ত মায়ানেকড়ে ধরেছি।
চোখ চকচক করছে বাবার। কখনও তাকে এত খুশি দেখেছি বলে মনে পড়ে না।
ওকে আমরা বাড়ি নিয়ে যাব, বাবা বলল, টিভিতে হাজির করব। সারা দুনিয়াকে দেখাব। আমার কাঁধে হাত রাখল বাবা। আমরা অসাধ্য সাধন করেছি, রবিন। এখানকার কাজ শেষ। চলোএখন, যাই।
শিস দিতে দিতে মাটিতে নামিয়ে রাখা ব্যাকপ্যাকটা তুলে নিয়ে কাঁধে ফেলল বাবা।
তুমি আগে আগে হাঁটো, বাবা বলল আমাকে। আমি পিছনে থাকব। আর এই জানোয়ারটা মাঝে হাঁটবে। পায়ে শিকল বাঁধা আছে। দৌড়ে পালাতে পারবে না।
লোকটার পিঠে জোরে এক ধাক্কা দিয়ে বাবা বলল, হটো।
বাবার গায়ে যা জোর, এক হাতে উঁচু করে ঝোলাতে ঝোলাতে নিয়ে যেতে পারে লোকটাকে। প্রচণ্ড ধাক্কায় উপুড় হয়ে পড়তে পড়তে সামলে নিল লোকটা। পায়ে শিকল থাকায় ফুটখানেকের বেশি ফাঁক করতে পারছে না পা। চিৎকার করে বলল, আপনি ভুল করেছেন, মস্ত ভুল! আমি আপনাকে বলেছি, আমি

মায়ানেকড়ে নই, আমি একজন উদ্ভিদ বিজ্ঞানী। আমার নাম হিউগ রেন। আমি ফার শিকারি। ফাঁদ পেতে জন্তু-জানোয়ার ধরি।
হ্যাঁ হ্যাঁ, বটেই তো, ব্যঙ্গ করে বাবা বলল। তুমি ফার শিকারি হলে আমি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট।
আপনি আমার সঙ্গে এই ব্যবহার করতে পারেন না, তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠল লোকটা। আমি পুলিশকে বললে আপনি ভীষণ বিপদে পড়বেন।
পুলিশকে জানালে আমি বিপদে পড়ব না, তুমি পড়বে।
কিন্তু আমার মনে হলো, ভুলটা বাবাই করছে। পুলিশকে জানালে বাবাই বিপদে পড়বে। নিরপরাধ একজন মানুষকে ধরে শিকল দিয়ে বাধার অপরাধে জেলেও যেতে হতে পারে তাকে।
কয়েক দিন পর, জাহাজে করে বাড়ি ফিরে চললাম আমরা। জাহাজটা মালবাহী, কার্গো শিপ। যাত্রী বলতে আমি, বাবা, আর হিউগ রেন।
ব্র্যাটভিয়ার ভয়াল বন থেকে বেরিয়ে এসেছি। বাড়ি ফিরছি। আমার খুশি হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু পারছি না। কেন, ঠিক বুঝলাম না।
হাতকড়া পরা রেনকে দেখে সন্দেহ দেখা দিল ক্যাপ্টেনের চোখে। খালাসিরা ভিড় করে এল।
বাবা ওদের বোঝাল, এই লোকটা ভয়ানক খুনী।
ক্যাপ্টেন জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে পুলিশে দিচ্ছেন না কেন?
লোকটা মায়ানেকড়ে বললে, ভয়ে হয়তো ক্যাপ্টেন বাবাকে জাহাজেই উঠতে দেবেন না। পুলিশের কাছেই তো নিয়ে যাচ্ছি, বলে বাবা তার আইডেনটিটি কার্ড বের করে দেখাল। খবরের কাগজের লোক জেনে আর কিছু বললেন না ক্যাপ্টেন।
জাহাজের খোলে কার্গো হোল্ডে অন্যান্য মালপত্রের সঙ্গে রাখা হলো রেনকে।
বেচারা! অন্ধকার, ভাপসা গন্ধে ভরা কার্গো হোল্ডে থাকতে হবে ওকে পুরো সাতটা দিন আর রাত।
একটা কেবিন দেয়া হয়েছে আমাকে আর বাবাকে। নরম বিছানায় শুয়ে চোখ বুজে রেনের কথা ভাবছি।
কার্গো হোল্ডে ওকে নামানোর সময় ওর আতঙ্কিত, জড়সড় হয়ে যাওয়া চেহারাটা চোখে ভাসছে।
সর্দি আরও বেড়েছে বেচারার। চোখ লাল। নাক দিয়ে অনবরত পানি গড়াচ্ছে। বড়ই করুণ দৃশ্য।
লোকটার জন্য মায়া হচ্ছে আমার।

বাবার দিকে তাকালাম। ডেস্কে বসে মোবাইল ফোনে কথা বলছে। তার এক সহকর্মী সাংবাদিক বন্ধুর সঙ্গে। মায়ানেকড়েটাকে নিয়ে বড় বড় পরিকল্পনা করছে দুজনে।
খোলা সাগরে পড়তে প্রচণ্ড দুলতে লাগল জাহাজ। মাথা ঘুরছে আমার। সি-সিক হয়ে পড়ছি। গা গোলাচ্ছে।
লম্বা দম নিতে লাগলাম। ঢোক গিলোম। বমি ঠেকানোর চেষ্টা করলাম।
সাগর উত্তাল হয়ে উঠবে, বড় বড় ঢেউ হবে, সারাটা পথই এমন ৫ থাকবে, সাবধান করেছিলেন ক্যাপ্টেন। ঝড়ও আসতে পারে।
এখন যা অবস্থা, সারাপথ এমন হলে বেঁচে আর বাড়ি ফিরতে পারব বলে মনে হয় না!
খবরের কাগজকে তো অবশ্যই জানাতে হবে, তবে পরে, ফোনে বলছে বাবা। টিভিতে লাইভ শো? অস্থির ভঙ্গিতে চুলে আঙুল চালাল বাবা। তা তো হবেই। মায়ানেকড়েটা কীভাবে মানুষ থেকে মায়ানেকড়েতে রূপান্তরিত হয়, দেখাব না? সেটাই তো আসল। তবে আগামী পূর্ণিমাটা যাক। আমরা আগে দেখি। দেখে শিওর হই। তারপর।
উত্তেজনা সইতে না পেরেই বোধহয়, উঠে দাঁড়াল বাবা। ছোট্ট ঘরটায় অস্থির ভঙ্গিতে পায়চারি শুরু করল। কানে ফোনটা লাগানোই আছে। ক্রমে জোরাল হচ্ছে তার কণ্ঠস্বর।
একপাশে অনেকখানি কাত হয়ে গেল জাহাজ। যখন মনে হলো, উল্টে যাবে, আবার সোজা হলো। তারপর অন্যপাশে কাত হলো।
জাহাজের সঙ্গে যেন দুলছে আমার পাকস্থলীটা। মাথা ঘুরছে। বমি পাচ্ছে।
একটু ধরুন তো, আমার দিকে তাকিয়ে আছে বাবা। ফোনটা কান থেকে সরিয়ে বলল, রবিন, কী হয়েছে? অসুস্থ লাগছে? তোমার চেহারা এমন হয়েছে কেন?
আমার ভাল লাগছে না, বাবা, গুঙিয়ে উঠলাম। এই দুলুনি সহ্য করতে পারছি না।
সি-সিকনেস, বাবা বলল। জাহাজে ওঠার অভ্যাস না থাকলে প্রথম প্রথম সবাই এ রকম অসুস্থ হয়ে পড়ে। দু-একদিন গেলেই ঠিক হয়ে যায়। ডেকে চলে যাও, খোলা বাতাসে। ভাল লাগবে। আমি ফোনটা শেষ করে আসছি।
টলতে টলতে কেবিন থেকে বেরিয়ে এলাম। ডেকটা ওপরে।
প্রচণ্ড দোল খাচ্ছে জাহাজ। সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সময় গোঙানি ঠেকাতে পারলাম না। ডেকে বেরিয়ে আরেকটু হলেই হুমড়ি খেয়ে পড়ছিলাম।
বাইরে খুব ঠাণ্ডা। সেইসঙ্গে বাতাস। তবে আমার গরম হয়ে ওঠা গায়ে লাগতে অনেকটা আরাম পেলাম।

লম্বা দম নিলাম। বাতাসে নোনা গন্ধ। পেটের ভিতরের পাক দেয়া কমে এল। মাথা ঘোরাও কমছে। রেলিঙে হেলান দিয়ে অন্ধকার সাগরের দিকে তাকালাম।
রাতের আকাশের সঙ্গে সাগরের পানি যে ঠিক কোনখানটায় মিলেছে, দেখা যায় না।
কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঠেছে নিশ্চয়। তবে মেঘে ঢাকা। তারাও দেখা যাচ্ছে না।
বাবার অপেক্ষা করছি। জোরাল বাতাস এসে গায়ে আছড়ে পড়ল। প্রচণ্ড দোল খেল জাহাজ।
রেলিং চেপে ধরলাম। বাতাস যে এভাবে ধাক্কা দিতে পারে, জানতাম না।
ঝড় আসছে! দূর থেকে ভেসে এল একজন খালাসির চিৎকার।
আরেক দফা জোরাল বাতাস এসে আছড়ে পড়ল জাহাজের গায়ে। সেইসঙ্গে নিয়ে এল ঢেউ। পাহাড়ের সমান।
পাগলের মত দুলছে জাহাজটা।
ডেকের ওপর দিয়ে বয়ে গেল ঢেউভাঙা পানি। আমার জুতো ভিজিয়ে দিল।
দুহাতে রেলিং চেপে ধরে বাঁচাও! বাঁচাও! বলে চেঁচিয়ে উঠলাম। বাতাসের গর্জনে চাপা পড়ল আমার চিৎকার।
আরেকটা কালো পানির ঢেউ ভাঙল জাহাজের গায়ে। প্রাণপণে রেলিং আঁকড়ে রেখেছি। চেঁচিয়ে চলেছি একনাগাড়ে। আরও একটা ঢেউ ভাঙল ঠিক আমার সামনে।
পানি বয়ে গেল আমার ওপর দিয়ে। নাকেমুখে ঢুকে গিয়ে খকখক করে কেশে উঠলাম।
পানি ভীষণ ঠাণ্ডা। আর কেমন ভারি ভারি। মনে হলো অন্ধকারের তলায় চাপা পড়েছি। রেলিংটা উধাও। হাত ছুটে গেছে। ডেকটাও অদৃশ্য হলো।
ঢেউ আমাকে টেনে নিয়ে চলল খোলা সাগরের দিকে। যেখানে ঘুরপাক খাচ্ছে কালো পানি, তাণ্ডবনৃত্য জুড়েছে।
চেঁচাতে চাইলাম। স্বর বেরোচ্ছে না আর।
সাঁতার কাটার চেষ্টা করলাম। হাত-পা অসাড়।
ঢেউ আমাকে উঁচু করে তুলে রেলিঙের ওপর দিয়ে সাগরে টেনে নিতে চাইছে।
হাল ছেড়ে দিয়ে চোখ বুজলাম। অন্ধকার ঢেউয়ের হাতে সঁপে দিলাম নিজেকে।
কীসে যেন টেনে ধরল আমাকে। অক্টোপাসের কথা মনে পড়ল! আমার গোড়ালি চেপে ধরেছে!
টানছে আমাকে। ঢেউয়ের প্রচণ্ড টানের সঙ্গে লড়াই করে আমাকে আটকে রাখতে চাইছে।
ধীরে ধীরে টেনে সরিয়ে নিতে লাগল আমাকে।

আবার কাশলাম। মুখ থেকে নোনা পানি ছিটালাম। ডেকে মুখ ঠেকিয়ে উপুড় হয়ে পড়ে আছি।
থরথর করে কাঁপছি ঠাণ্ডা আর আতঙ্কে।
ঘন ঘন দম নিয়ে নিজেকে স্বাভাবিক করতে চাইলাম। গড়িয়ে চিত হলাম। কে আমাকে বাঁচিয়েছে দেখতে গিয়ে চমকে উঠলাম। এ কি!
কেমন আছো? হাঁটু গেড়ে বসে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে হিউগ রেন।
আ-আপনি বেরোলেন কীভাবে? জিজ্ঞেস করলাম।
হাতকড়াটা ঠিকমত লাগেনি। খুলে ফেললাম। বদ্ধ জায়গায় দম নিতে পারছিলাম না। তাই খোলা হাওয়ায় বেরিয়েছি। চশমা খুলে
ভেজা কাপড়ে মুছতে লাগল রেন। চশমা ছাড়া কিছু দেখি না।
আপনি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন! তোমার ভাগ্য ভাল, ঢেউ যখন তোমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, ঠিক সেই সময় আমি চলে এসেছিলাম, রেন বলল। পা চেপে ধরলাম। টানাটানিতে একবার তো মনে হচ্ছিল আমাকে সুদ্ধ নিয়ে যাবে। সময়মত জাহাজটা অন্যপাশে কাত হয়ে গেল, তাই বাঁচলাম।
অবাক হয়ে লোকটার দিকে তাকিয়ে আছি। এই লোক মায়ানেকড়ে হয় কীভাবে? বনে থাকতেও বিশ্বাস হয়নি, এখন তো আরও হচ্ছে না।
ওর বিষণ্ন চোখ দুটোর দিকে তাকালাম। মায়ানেকড়ের চোখের সঙ্গে কোন মিলই নেই। চশমা ছাড়া দেখতেও পায় না। ওকে ধরে ভুল করেছে বাবা…
রবিন, তোমার কী হয়েছে? আমার দিকে ছুটে এল বাবা। রেনকে চিনতে পেরে চেঁচিয়ে উঠল, আরে, তুমি! ছুটলে কী করে? খপ করে তার হাত চেপে ধরল।
বাবা, ওকে ছেড়ে দাও, আমি বললাম। ও আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে।
ও ভয়ানক বিপজ্জনক! বাবা বলল। ওর কাছাকাছি থাকাও ঠিক না তোমার।
কিন্তু বাবা, বললাম তো ও আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে। ঢেউ আমাকে, টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। ও টেনে না ধরলে এতক্ষণে সাগরে হারিয়ে যেতাম। তাকিয়ে দেখো এখন? সত্যিই কী ওকে খারাপ মনে হয়?
মায়ানেকড়ে যখন মানুষের রূপে থাকে, তখন কিছুই বোঝা যায় না, রবিন, বাবা বলল। তুমি এখন যেমন আছে, ঠিক তেমনই দেখাবে তোমাকেও যদি মায়ানেকড়ে হয়ে যাও। আমি বলে দিচ্ছি, ওর ব্যাপারে সাবধান না হলে ভয়ানক বিপদে পড়বে। মনে রেখো কথাটা।
আপনি ভুল করছেন, রেন বলল। বাবার থাবা থেকে হাত ছাড়ানোর জন্য মোড়ামুড়ি করছে। আমাকে ছেড়ে দিন। বাড়ি যেতে দিন। কথা দিচ্ছি, কাউকে কিছু বলব না। পুলিশের কাছে নালিশ করব না। যা ঘটেছে, সব ভুলে যাব।

ওর কথা কানেই তুলল না বাবা। তাঁচকা টানে সরিয়ে নিল আমার কাছ থেকে। চেঁচিয়ে খালাসিদের ডাকতে লাগল।
বাবা আর খালাসিরা মিলে রেনকে আবার কার্গো হোল্ডে নিয়ে গেল। একটু পরে ফিরে এসে আমাকে কেবিনে নিয়ে চলল বাবা। যেতে যেতে বলল, এবার ভালমত টেনেটুনে দেখেছি। আর হাতকড়া খুলতে পারবে না।
কিন্তু হাতকড়া খুলে যাওয়ার ঘটনাটা ঠিক স্বাভাবিক মনে হলো না আমার। মায়ানেকড়ের দাঁতটার কথা মনে পড়ল। এবারও এটাই আমাকে বাঁচায়নি তো? কোনও অলৌকিক ক্ষমতাবলে হাতকড়া খুলে দিয়ে রেনকে পাঠিয়ে দেয়নি তো আমার কাছে?
আমাকে কেবিনে রেখে চলে গেল বাবা। নিশ্চয় কোনও কাজে।
ভেজা জামাকাপড় বদলে শুকনো কাপড় পরলাম। তারপর বিছানায় বসে ছোট্ট গোল জানালাটা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলাম। না, সাগরের উত্তাল ঢেউ দেখছি। জাহাজের গায়ে বিপুল গতিতে ক্রমাগত বাড়ি মেরে চলেছে।
আবার পাক দিচ্ছে পেটের ভিতর। বমি আসতে চাইছে।
রাতের আকাশের দিকে তাকালাম। ভারি মেঘ কেটে যাচ্ছে। মেঘের ফাঁকে লুকোচুরি খেলছে চাঁদ
আবার মাথা ঘুরছে আমার। কাঁধে দপদপে ব্যথা।
আমাকে মায়ানেকড়েতে কামড়ানোর কথা বাবাকে বলিনি এখনও। তাকে উদ্বেগের মধ্যে ফেলতে চাইনি। তবে এখন এমন ব্যথা করছে, না বলে বোধহয় আর পারব না।
শার্টের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দিলাম। কাঁধের কাছে আহত জায়গাটা ডলতে গিয়ে আঁউ করে উঠলাম।
বিছানা থেকে লাফিয়ে নেমে দৌড় দিলাম বাথরুমে।
একটানে শার্ট খুলে ফেললাম। আয়নায় তাকালাম নিজের দিকে।
এ কি!-আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠলাম।
কাঁধের জখমটা লাল হয়ে আছে। কিন্তু চেঁচিয়েছি অন্য কারণে। কুৎসিত এক গোছা লোম গজিয়েছে জায়গাটায়।
মরিয়া হয়ে ডলতে শুরু করলাম জায়গাটা। তুলে ফেলতে চাইলাম চুলগুলো।
লাভ হলো না। বরং প্রচণ্ড ব্যথা পেলাম।
এই চুল কীসের? এত কুৎসিত! চিন্তিত ভঙ্গিতে আবার শার্টটা গায়ে দিয়ে ঢেকে ফেললাম চুলগুলো।
বাথরুম থেকে বেরোতেই দেখি কেবিনে ঢুকছে বাবা।
বাবা, একটা জিনিস দেখাব তোমাকে।

এক সেকেণ্ড। গায়ের ভেজা হলুদ রেইনকোটটা খুলল বাবা। বাথরুমের হুকে ঝোলাল।
বাবা… আবার বলতে চাইলাম।
এক মিনিট, রবিন! ডেস্কের সামনে গিয়ে চেয়ারে বসল বাবা। মোবাইল ফোন বের করল। একটা জরুরি কথা সেরে নিই।
বিশ মিনিট পরও বাবার জরুরি কথা শেষ হলো না। আবার। অফুরন্ত কথা বলে চলেছে তার উকিলের সঙ্গে।
আমার কাঁধের চুলগজানো জায়গাটা জ্বলছে, সেইসঙ্গে প্রচণ্ড চুলকানি।
বাবা, আমার কথাটা শোনো! প্রায় ফিসফিস করে বললাম।
শুনব। শুনব। আমার দিকে তাকালও না বাবা। আবার গিয়ে বিছানায় উঠলাম।
হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে বালিশে মাথা রেখে চিত হলাম। চাদরটা টেনে দিলাম গলার কাছে। তাকিয়ে আছি বাবার দিকে। টেলিফোনে কথা বলছে। দুনিয়ার আর কোনদিকে খেয়াল নেই। এত খুশি বহুকাল দেখিনি তাকে।
বাবার এই আনন্দটা নষ্ট করতে চাইলাম না। কাঁধের কথাটা বললেই দুশ্চিন্তায় পড়ে যাবে।
থাক, বলব না। ব্যথা আর কয়েক গাছা চুলই তো। বেশি তো না।
তাই আমার গোপন কথাটা তখনকার মত চেপে গেলাম। বাবাকে জানালাম না। তবে জানানো উচিত ছিল। তাহলে অনেক ঝামেলা আর সমস্যা থেকে বাঁচতে পারতাম।
নিরাপদেই রেনকে নিয়ে বাড়ি পৌঁছলাম আমরা। জাহাজঘাটা থেকে বাড়ি পৌঁছানো পর্যন্ত সারাক্ষণ সঙ্গে ছিলেন বাবার সাংবাদিক বন্ধু। গাড়ি থেকে শুরু করে, সমস্ত ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। তাই কোন ঝামেলায় পড়তে হয়নি আমাদের।
বাড়ি ফিরে দেখি, মা নেই। বাবা আর আমার জন্য একটা নোট রেখে গেছে। তার এক অসুস্থ বোনকে দেখতে গেছে আটলান্টায়। কবে ফিরবে ঠিক নেই।
বাবার সাংবাদিক বন্ধু আমাদের বসার ঘরের মাঝখানে মজবুত একটা লোহার খাঁচা এনে রেখেছেন। তাতে ভরা হলো রেনকে।
এখনও আমার বিশ্বাস হয় না, ছোটখাট ওই অসুস্থ মানুষটা মায়ানেকড়ে।
আমার আশঙ্কা, ভীষণ বিপদে পড়তে যাচ্ছে বাবা। পূর্ণিমার সময় রেন মায়ানেকড়েতে রূপান্তরিত না হলে ওকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে। বাবা। ও গিয়ে তখন পুলিশকে জানাবে। পুলিশ বাবাকে ধরে নিয়ে গিয়ে হাজতে ভরবে। পাগলাগারদেও পাঠাতে পারে।

আগামীকাল রাতে ত্রয়োদশী। মোটামুটি গোল হয়ে যাবে চাঁদটা। আরও দুদিন পর পূর্ণিমা। সাপুড়ে বুড়ো বলেছিল, এই তিনটে রাতই খুব খারাপ। মানুষ মায়ানেকড়েতে রূপান্তরিত হয়।

পরদিন বিকেলে আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু মুসার বাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম। জিজ্ঞেস করলাম, কিশোরের কোন খবর আছে কি না। ও জানাল, কয়েক দিন আগে চিঠি দিয়েছে কিশোর। ওদেরও স্কুল ছুটি। তবে এবার গ্রীনহিলসে আসতে পারবে না। ওর চাচা রাশেদ পাশা ওকে আর মেরিচাচীকে নিয়ে অন্যখানে বেড়াতে যাবেন। হতাশ হলাম। কিশোর থাকলে ভাল হতো। রেনকে নিয়ে কী করব, আলোচনা করতে পারতাম।

মায়ানেকড়েটার কথা মুসাকে জানালাম।

লাফিয়ে উঠল মুসা, চলো, দেখব!

কিন্তু বাবা তো এখুনি কাউকে দেখাতে নিষেধ করেছেন।

আমাকে দেখালে কিছু বলবেন না।

তা অবশ্য ঠিক। ভেবে নিয়ে বললাম, চলো।

এই সময় ঘরে ঢুকল মুসার কুকুর ড্যানি। কুকুরটাকে নতুন জোগাড় করেছে ও। বিদেশী একটা ছোট জাতের কুকুর।

উহ্-হুঁ! তোর কথা তো ভুলেই গিয়েছিলাম রে, ড্যানি। রবিন, তুমি বাড়ি যাও। আমি আসছি।

কোথায় যাবে?

ড্যানিকে একটু হাঁটিয়ে নিয়ে আসি। হ্যাঁনসবেরিতে ডগ শো হবে। ভাবছি, ওকে নিয়ে যাব। এবার ফাস্ট প্রাইজটা বাগাতেই হবে। তাই ওর পিছনে খাটতে হচ্ছে।

বাড়ি ফিরে এলাম। কিছুক্ষণ পর আমাদের বাড়ি এল মুসা।

ওকে বসার ঘরে রাখা খাঁচাটা দেখালাম। ওই যে।

খাঁচার চারপাশে ঘুরতে লাগল মুসা। রেনকে খুঁটিয়ে দেখল। চোখে হতাশা।

খাঁচার মেঝেতে আসনপিড়ি হয়ে বসেছে রেন। বুকের ওপর ঝুলে পড়েছে মাথা। বাঁকা হয়ে আছে কাঁধ।

মুসাকে ঘুরতে দেখে মাথা তুলল ও। মুখে মলিন হাসি ফুটল। তারপর আবার মাথা নিচু করল।

কিন্তু, রবিন, এ তো একজন মানুষ। স্বাভাবিক মানুষ। ওকে আটকে রেখেছ কেন? এ তো অন্যায়…

আমি কী করব? ভোতাস্বরে জবাব দিলাম। বাবা ওকে ধরে এনেছে। ও নাকি মায়ানেকড়ে।

জোর দিয়ে একই কথা বলল মুসা, এ লোক মায়ানেকড়ে হতেই পারে না।

কী বলব?
রেন যে মায়ানেকড়ে নয়, এটা তো আমিও জানি।
নাহ, এ লোকটাকে মোটেও মায়ানেকড়ে মনে হচ্ছে না আমার।
খাঁচা ঘেঁষে দাঁড়াল মুসা।
ও কী করছে আমি বুঝে ওঠার আগেই শিকের ফাঁক দিয়ে হাত ঢুকিয়ে দিল।
লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল রেন।
মুসা, খাঁচার কাছ থেকে সরো! চেঁচিয়ে উঠলাম।
ভয় নেই, চকলেট দিলাম, মুসা বলল এমনভাবে নিল, যেন কতকাল খাবার পায় না। খেতে দাও না নাকি?
নিশ্চয়, বিড়বিড় করলাম। সকালেও তো পেট ভরে খাইয়েছে। ওকে বাবা।
চকলেট নিয়ে মুসাকে ধন্যবাদ দিল রেন। মোড়ক খুলতে খুলতে বলল, আমার নাম হিউগ রেন। আমি মায়ানেকড়ে নই, বুঝলে। ওরা ভুল করছে। বার বার বলছি। শুনছে না।
চোখের পাতা সরু করে আমার দিকে তাকাল মুসা। চেঁচিয়ে বলল, তোমার বাবা পাগল হয়ে গেছেন! বদ্ধ উন্মাদ!
আহ, আস্তে বলো!
আস্তে বলব কেন? তোমার বাবা তো সত্যি সত্যি পাগল। নেহায়েত তোমাকে কথা দিয়েছি, কাউকে বলব না। নইলে এখুনি। গিয়ে পুলিশকে জানাতাম।
আর একটা কথাও না বলে বেরিয়ে গেল মুসা।
রেনের দিকে তাকালাম। আবার আসনপিড়ি হয়ে বসেছে খাঁচার কোণে। কামড় দিয়ে চকলেটের একটা কোণা ভেঙে মুখে পুরল।
খুবই করুণ অবস্থা ওর। ওর জন্য খারাপ লাগছে আমার।
ভাবছি, কিছু একটা করা দরকার। এভাবে আটকে রাখাটা ঠিক, হচ্ছে না।
কিন্তু কী করব? কী করতে পারি আমি?

.

পরদিন কয়েকটা টুকিটাকি জিনিস কিনতে বাজারে গেলাম। বাজার সেরে আর বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করল না আমার। রেনের দিকে তাকানোর ভয়ে। তাকালেই মায়া লাগে। ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করে। বাবাকেও বোঝাতে পারি না, আমিও সহ্য করতে পারি না। বিপদেই পড়া গেছে! ওর বিষণ চোখ দুটোর দিকে তাকালে রীতিমত কষ্ট হতে থাকে আমার। খাঁচার ভিতর বন্দি জানোয়ারের মত যখন অসহায় ভঙ্গিতে পায়চারি করে, তখন আরও খারাপ লাগে।
কিন্তু বাড়ি তো ফিরতেই হবে। ভাবলাম, যাব, কিন্তু রেনের দিকে। তাকাব না।

ঘরে ঢুকে আস্তে করে দরজা লাগালাম। কোনদিকে না তাকিয়ে নিজের ঘরের দিকে যাচ্ছি, কানে এল রেনের মোলায়েম কণ্ঠ, রবিন, এলে?
জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেললাম। হ্যাঁ, এলাম।
একবার এদিকে আসবে?
কি আর করব? খাঁচার দিকে এগোলাম।
রবিন, বাবা, আমার কথা শোনো। উঠে দাঁড়িয়েছে রেন। খাঁচার শিকে গাল চেপে ধরে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আমি মায়ানেকড়ে নই। আমাকে ধরে আনার আগে বন বিভাগের লোকের সঙ্গে কথা বলা উচিত ছিল তোমার বাবার। ওরা তাকে বোঝাতে পারত। আমার নাম সত্যিই হিউগ রেন। বন বিভাগের অনুমতি নিয়েই আমি বনে জানোয়ার। শিকার করি।
আমি দুঃখিত, মাথা নেড়ে বললাম। আমি কিছুই করতে পারব না।
ব্যাগটা মেঝেতে নামিয়ে রাখলাম। ব্যাগের পকেট হাতড়ে বত সাইজের একটা চকলেট বের করে বাড়িয়ে দিলাম।
কোথায় পেলে ওটা? আমি সোজা হতেই জিজ্ঞেস করল রেন
দোকান থেকে কিনেছি।
চকলেট না, আমি ওটার কথা বলছি। আমার গলার দিকে তাকিয়ে আছে ও। মায়ানেকড়ের দাঁত!
সেটা তো আপনিই ভাল বলতে পারবেন, অন্ধকারে ছিল ছুঁড়লাম। রেনের মুখের দিকে তাকিয়ে তার প্রতিক্রিয়া দেখতে চাইছি। বনের ভিতর মায়ানেকড়ে হয়ে, আমার তাঁবুতে ঢুকে আপনি দেননি?
দাঁতটার দিকে তাকিয়ে আছে রেন। চেহারায় পরিবর্তন ঘটল না
আমি মায়ানেকড়ে নই। আমি একজন ফার শিকারি।
তাহলে এটার কথা জিজ্ঞেস করলেন কেন? জিজ্ঞেস করলাম।
অদ্ভুত একটা জিনিস গলায় ঝুলিয়ে রেখেছ তো, তাই।
খাঁচার শিকের ফাঁক দিয়ে চকলেটটা বাড়িয়ে ধরলাম।
আমাকে তুমি সাহায্য করো, রবিন, রেন বলল।
সরি, মাথা নাড়লাম। সত্যিই আপনাকে সাহায্য করতে ইচ্ছে। করছে। কিন্তু আপনাকে ছেড়ে দিলে বাবা ভীষণ রেগে যাবে।
কিন্তু তুমি কী চাও, তোমার বাবাকে ধরে নিয়ে গিয়ে পাগলাগারদে ভরুক পুলিশ? লোকে হাসুক? বন্ধুদের ইয়ার্কির যন্ত্রণায় রাস্তায় বেরোতে পারবে না তুমি, স্কুলে যেতে পারবে না। তোমার জীবনটাও নরক হয়ে যাবে।
তো?

আমাকে ছেড়ে দাও। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, রবিন, আমাকে ছেড়ে দেয়ার কথা কাউকে কিছু বলব না। আমাকে ছেড়ে দাও। তাতে তোমার বাবার উপকারই করা হবে।
স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি লোকটার দিকে। ওর চোখের আকুতি দেখছি।
ছেড়ে দেব? সত্যিই দেব ছেড়ে?
প্রশ্নটা প্রচণ্ড গতিতে ঘুরপাক খাচ্ছে আমার মগজে।
ভাবলাম, জাহাজে আমার জীবন বাঁচিয়েছে ও। ওর কাছে এমনিতেই ঋণী হয়ে আছি। তা ছাড়া বাবাকে ভুল করা থেকে
নোটাও আমার কর্তব্য। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম, রেনকে ছেড়ে দেব। বাবা কোন ড্রয়ারে চাবি রাখে জানি। ড্রয়ার থেকে চাবিটা বের করলাম। খুলে দিলাম খাঁচার তালা।
খাঁচা থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল রেন। থ্যাংক ইউ, রবিন! থ্যাংক ইউ! তোমার কথা আমার মনে থাকবে!
আমার ডান হাতটা ধরে ঝাঁকিয়ে দিল ও। তারপর দৌড়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।
ঘণ্টাখানেক পর, ড্রাইভওয়েতে বাবার গাড়ি ঢোকার শব্দ শুনলাম।
ঘরে ঢুকে আমার দিকে তাকিয়ে হেসে জিজ্ঞেস করল বাবা, কি, এত উত্তেজিত কেন? আজ রাতে মায়ানেকড়ে হয়ে যাবে রেন, সেটা দেখার জন্যে?
না, বাবা, আমতা আমতা করে বললাম। তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।
চলো, বসার ঘরে।
না, দাঁড়াও, আমি ওর হাত আঁকড়ে ধরলাম। ওখানে এখন যেয়ো না।
কেন? কী হয়েছে? আমার চোখে স্থির হলো বাবার দৃষ্টি।
আমি…আমি রেনকে ছেড়ে দিয়েছি।
কী করেছ?ঝাড়া দিয়ে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে দৌড়ে বসার ঘর ঢুকল বাবা। শূন্য খাঁচাটার দিকে তাকিয়ে রইল। চোখে অবিশ্বাস। কী করে পারলে? চেঁচিয়ে উঠল বাবা। ইশশ! কী করে করতে পারলে এমন একটা কাজ! ঘরের ভিতর পায়চারি শুরু করল বাবা।
লোকটার জন্য আমার মায়া হচ্ছিল, বাবা, মিনমিন করে বললাম। তা ছাড়া, আমি…আমি তোমাকে ভয়ানক একটা ভুল করতে দিতে চাইনি। সবাই তোমাকে নিয়ে হাসাহাসি করত, বাবা।
তুমি জানো, তুমি কী করেছ? পায়চারি থামিয়ে আমার মুখোমুখি দাঁড়াল বাবা। তুমি একটা মায়ানেকড়েকে ছেড়ে দিয়েছ! এত জোরে, চেঁচিয়ে বলল বাবা, গলার দুই পাশের রগ ফুলে উঠল। আজ রাতে ওটা কী করবে, জানো তুমি?

মায়ানেকড়েতে পরিণত হবে, তারপর নিরীহ মানুষ মারতে শুরু করবে। আর তারজন্য দায়ী থাকবে তুমি।
কিন্তু বাবা…
আর একটা কথাও তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই না আমি! চিৎকার করে বলল বাবা। তোমার মুখ দেখতে চাই না। তুমি এখন তোমার ঘরে যাও।
নিজের ঘরে এসে বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়লাম। আমি জানি,। ঠিক কাজই করেছি, নিজেকে বোঝালাম।
কিন্তু বাবা কী আমাকে কোনদিন ক্ষমা করবে?
হ্যাঁ, বাবার চিৎকার কানে এল। ফোনে তার সাংবাদিক বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছে। তুমি ব্যবস্থা করো। দরকার হয় পুলিশের কাছে গিয়ে তাদের বুঝিয়ে বলো। সূর্য ডোবার আগেই ওটাকে ধরতে না পারলে মহাসর্বনাশ হয়ে যাবে।
আবারও ভুল করতে যাচ্ছে বাবা। রেন মায়ানেকড়ে হতেই পারে না।
কিন্তু হঠাৎ এ রকম অসুস্থ বোধ করছি কেন?
মাথা ব্যথা করছে। কেমন শূন্য লাগছে মাথার ভিতরটা।
চোখ বুজলাম।
আবার যখন চোখ মেলোম, দেখি, বাইরে অন্ধকার হয়ে গেছে। বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।
বিছানায় উঠে বসলাম। বনবন করে ঘুরতে শুরু করল যেন ঘরটা।
কী হয়েছে আমার? পেট খালি বলেই বোধহয় এমন লাগছে। খেলেই ঠিক হয়ে যাবে, ভাবলাম।
বিছানা থেকে নামলাম। দেয়ালে লাগানো আয়নার দিকে চোখ পড়তে চিৎকার করে উঠলাম।
নাকের নীচে বড় বড় গোঁফ গজাতে শুরু করেছে আমার। হাতে, পায়ে, বড় বড় লোম। মানুষের মুখ মিলিয়ে গিয়ে সেখানে একটা জানোয়ারের মুখ দেখা দিচ্ছে।
হাঁ করলাম। বড় বড় দাঁত বেরোচ্ছে মাড়ী থেকে।
সর্বনাশ! মায়ানেকড়ে হয়ে যাচ্ছি আমি! গুঙিয়ে উঠলাম।
জানালার দিকে দৌড় দিলাম। ঝাঁপ দিয়ে পড়লাম বাইরে। মাটিতে নামলাম চারপায়ে ভর দিয়ে। হাতের জায়গায় দুটো পা-ও
মাটিতে পড়েই ছুটতে আরম্ভ করলাম। আমাদের পিছনের আঙিনা দিয়ে দৌড়ে চললাম। রাস্তায় বেরিয়ে এলাম।
দৌড়… দৌড়… আমার তপ্ত চামড়ায় আরামের পরশ বোলাচ্ছে ঠাণ্ডা বাতাস…
চোখ মেললাম।
চোখে রোদ পড়তে ঝট করে বন্ধ করে ফেললাম আবার।

আমি কোথায়?
ভঙ্গিতে চারপাশে তাকালাম।
আমার বেডরুমের মেঝেতে পড়ে আছি কেন? বিছানা থেকে পড়ে উঠে দাঁড়ালাম। হাত-পা টান টান করলাম। বড় করে হাই তুললাম।
এত ক্লান্তি। যেন সারারাত ঘুমাইনি।
ঘুমানোর জন্য অস্থির হয়ে উঠলাম। কিন্তু পারব না। এখন বিছানায় পড়ে থাকলে রেগে যাবে বাবা। হাই তুলতে তুলতে নাস্তা করার জন্য খাবারঘরের দিকে চললাম।
এক গ্লাস কমলার রস, দুই টুকরো রুটি, আর মাখন বের নিয়ে খেতে বসলাম। একটা তাকে রাখা ছোট টেলিভিশনটা চালু করা। বাবা রেখেছে। খেতে বসে বাবা টেলিভিশন দেখতে পছন্দ করে।
কাল রাতে দুই মহিলা আর একজন পুরুষের ওপর ভয়ঙ্কর হামলা চালিয়েছে একটা অজানা প্রাণী, টেলিভিশনের খবরে বলল।
আশঙ্কাজনক অবস্থায় দুই মহিলাকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
অজানা প্রাণীর ভয়ঙ্কর হামলা? আমাদের এই ছোট্ট শহরে?
ঘটনাটা কী? অবাক হয়ে ভাবলাম। টেলিভিশনের দিকে তাকিয়ে আছি।
একজন ভদ্রমহিলা সব দেখেছেন। তিনি এখন আমাদের সঙ্গে আছেন। কী দেখেছেন, আমাদের জানাবেন। ক্যামেরার চোখ ঘুরে গেল সাতাশ-আটাশ বছর বয়েসের এক মহিলার দিকে।
একটা মায়ানেকড়ের মত বুনো জানোয়ার! বলতে গিয়ে গলা কাঁপছে মহিলার। জীবনে এ রকম জানোয়ার দেখিনি আমি। ভয়ানক! ভয়ানক!
মায়ানেকড়ের মত দেখতে! খোদা! গুঙিয়ে উঠলাম।
চিবানো বন্ধ করে তাকিয়ে আছি টেলিভিশনের দিকে। তৃতীয় লোকটির কী হলো, বলুন? প্লিজ! চিৎকার করে উঠলাম। বলুন! ও কী। মারা গেছে?
তৃতীয় লোকটি…
দম আটকে ফেললাম।
…কয়েকটা আঁচড় লেগেছে। জরুরি বিভাগে চিকিৎসা করে ছেড়ে দেয়া হয়েছে তাকে।
ফোঁস করে বের করে দিলাম ফুসফুসে আটকানো দমটা। স্বস্তির নিঃশ্বাস।
কয়েকটা কুকুরকেও আক্রমণ করেছে ভয়ানক প্রাণীটা, রিপোর্টার বলছে। ছোট একটা বিদেশী কুকুরকে খেয়ে ফেলেছে।
খোদা! এ কী করলাম আমি? একা একাই চেঁচিয়ে বললাম। সব আমার দোষ। মায়ানেকড়েটাকে ছেড়ে দিয়েছি আমি। রেন আমাকে মিথ্যে কথা বলেছে।

টেলিভিশন বন্ধ করে দিলাম। আর শুনতে চাই না।
রেন সত্যিই একটা মায়ানেকড়ে, গুঙিয়ে উঠে বিড়বিড় করলাম। বাবার কথাই ঠিক! তার কথায় সন্দেহ করা উচিত হয়নি আমার।
পেটের ভিতর পাক দিয়ে উঠল। সারা শরীর কাঁপতে লাগল।
বাবা আমাকে কোনদিন, কোনওদিন ক্ষমা করবে না।
সারা দুনিয়া আমাকে ক্ষমা করবে না।
টলতে টলতে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিলাম। চিরকাল এখানে লুকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে।
মেঝেতে চোখ পড়ল। আমার কিছু কাপড়চোপড় ছড়িয়ে পড়ে আছে। এখানে কেন?
সরিয়ে রাখার জন্য তুলে নিলাম। ভাল করে তাকাতেই মুখ দিয়ে অস্ফুট চিৎকার বেরিয়ে গেল আপনাআপনি।
আমার একটা শার্ট আর প্যান্ট। গতকাল যেগুলো পরেছিলাম। ছিঁড়ে ফালা ফালা। রক্তের দাগ লাগা।
আমার কাপড়ে রক্ত কেন? কী করেছি? গায়ে তো কোথাও জখম নেই।
চোখ বুজে মনে করার চেষ্টা করলাম, গতরাতে কোথায় ছিলাম? কী করেছি?
মনে পড়ল, শরীর খারাপ লাগছিল। তারপর ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।
সর্বনাশ! হঠাৎ সব কথা মনে পড়ে গেল আমার। আয়নার দিকে তাকিয়েছিলাম। তাতে একটা রোমশ প্রাণীকে আমার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখেছি। জানালা দিয়ে বাইরে লাফিয়ে পড়েছিলাম।
ঝট করে চোখ চলে গেল জানালার দিকে।
হ্যাঁ, এখনও খোলা।
সব মনে পড়েছে। মায়ানেকড়ে হয়ে গিয়েছিলাম। চার পায়ে ছুটছিলাম।
মায়ানেকড়ে হয়ে গিয়েছিলাম! হাত-পা প্রবলবেগে কাঁপতে শুরু করেছে আমার। কাল রাতে আমিই তা হলে হামলা চালিয়েছি ওই মানুষ আর কুকুরগুলোর ওপর!
বিছানায় বসে ভাবতে লাগলাম। কাঁধে মায়ানেকড়ের কামড় খেয়ে আমিও মায়ানেকড়ে হয়ে গেছি। হতাশ ভঙ্গিতে জোরে জোরে মাথা নাড়তে লাগলাম।
এই কারণেই আমাকে দাঁতটা দিয়েছিল, বুঝতে পারছি এখন। স্বজাতি হিসেবে আমাকে ক্ষমতাবান করেছিল, বনের ভিতর আমাকে বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করতে চেয়েছিল, যেহেতু আমি ছোট।
পেটের ভিতর খামচে ধরা অনুভূতি হচ্ছে।
গতরাতে ওই ভয়ানক কাণ্ডগুলো আমিই ঘটিয়েছি, রেন নয়। তারমানে আমাকে ফাঁকি দিয়ে বেরোয়নি। মিথ্যে কথা বলেনি।

উঠে গিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়ালাম।
এখন আর লোম নেই মুখে।
ডোরাকাটা দাগ নেই।
থাবা নেই।
হাঁ করলাম। শ্বদন্ত নেই। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। তারপরই মনে পড়ল চাঁদের কথা।
আজকে পূর্ণিমার আগের দিন। আজও চাঁদ উঠবে। গোল চাঁদ। আর চাঁদ উঠলেই মায়ানেকড়েতে পরিণত হব।
উহ্, এখন আমি কী করব?
কেউ যদি আমাকে বাঁচাত!
আমাকে সাহায্য করত!
ঘরে বন্দি করে রাখত আমাকে! যাতে আমি বেরোতে না পারি।
আর কাউকে জখম করতে চাই না আমি!
বাবা! বাবা! বেডরুম থেকে ছুটে বেরোলাম। বসার ঘরে চিলাম। বাবা, আমিই মায়ানেকড়ে! রেন নয়!
কিন্তু বসার ঘরে বাবা নেই।
বাবা! কোথায় তুমি?
জবাব এল না।
ছোট টেবিলে একটুকরো কাগজ দেখলাম। ফ্লাওয়ার ভাস চাপা দেয়া।
এগিয়ে গিয়ে ভাস সরিয়ে কাগজটা তুলে নিলাম। বাবা লিখে রেখে গেছে:
রবিন
গতরাতে মায়ানেকড়েটা হামলা চালিয়েছে। থানায় যাচ্ছি পুলিশের সঙ্গে কথা বলতে! কখন ফিরব জানি না। স্কুল থেকে সোজা বাড়ি ফিরবে। রাতে শক্ত করে দরজা-জানালা আটকে রাখবে। কোন কারণেই বেরোবে না।
-বাবা।
এখন আমি কী করব? গুঙিয়ে উঠলাম।
নিজের বেডরুমে নিজেকে আটকে রাখা ছাড়া আর কোন উপায় দেখলাম না। এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে বেরোতে না পারি। আর বেরোতে না পারলে কাউকে জখমও করতে পারব না।
স্কুলে আজ যাব না। রাতের জন্য তৈরি হতে হবে। তাতে সময় লাগবে।
তাড়াতাড়ি কাপড় বদলে বাড়ি থেকে বেরোলাম। বাজারের একটা হার্ডওয়্যারের দোকান থেকে বেশ কিছু বড় বড় পেরেক, মোটা দড়ি, আর কাঠের দোকান থেকে শক্ত তক্তা কিনলাম।

দোকানদাররা আমাকে চেনে। এ-সব দিয়ে কী হবে, জিজ্ঞেস করল। বললাম, বাবা নিতে বলেছে। কী করবে জানি না। জিনিসগুলো নিয়ে দ্রুত বাড়ি ফিরলাম। দেরি না করে কাজে লাগলাম।

প্রথমেই জানালার পাল্লাগুলো পেরেক গেঁথে এমনভাবে বন্ধ করলাম, যাতে টানাটানিতে না খোলে। শেষ পেরেকটাতে হাতুড়ির শেষ বাড়িটা দিয়েছি, এমন সময় টেলিফোন বাজল। ধরলাম। মুসা করেছে।

রবিন? আমি বিশ্বাস করতে পারছি না! ছোট্ট ওই মানুষটা মায়ানেকড়েতে পরিণত হয়েছে!

সত্যি কথাটা মুসাকে বলতে গিয়েও বলতে পারলাম না। বলতে পারলাম না, আমিই মায়ানেকড়ে।

ওই দানবটা বেরোল কীভাবে? মুসা জানতে চাইল।

আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম।

তুমি ছেড়ে দিয়েছিলে? চেঁচিয়ে উঠল মুসা। পাগল হয়ে গিয়েছিলে, না কী?

কেন, পাগল হব কেন? আমিও চেঁচিয়ে উঠলাম। তুমিই তো বলছিলে, রেন মায়ানেকড়ে হতে পারে না। আমার বাবা পাগলামি করছে। রেনকে ছেড়ে দিতে চাপাচাপি করেছিলে।

কিন্তু সেটা তো কুকুরটাকে খাওয়ার আগে! মুসা বলল। আমার ড্যানিকে খেয়ে ফেলার আগে!

মোলায়েম গোঙানি বেরোল আমার মুখ থেকে।

গতরাতে আমি ড্যানিকে খেয়েছি! আমার বন্ধুর কুকুরটাকে খেয়ে। ফেলেছি!

মুসা, এখন রাখি। আমার শরীর ভাল নেই। শুতে যাচ্ছি। ওকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে রিসিভার রেখে দিলাম।

পেটের ভিতর মোচড় দিচ্ছে। বমি আসছে।

বহু কষ্টে ঠেকালাম। টলতে টলতে নিজের ঘরে ফিরলাম। জানালাগুলো টেনেটুনে দেখলাম। পেরেকগুলো ঠিকমত লেগেছে কী না দেখে নিশ্চিত হলাম।

তারপর দরজার পাল্লা লাগালাম। তাতে আড়াআড়ি তক্তা বসিয়ে পেরেক ঠুকে আটকে দিতে লাগলাম। সবশেষে কোমরে মোটা দড়ি বেঁধে এমন গিঁট দিলাম, যাতে কোনমতেই খুলতে না পারি। দড়ির আরেকমাথা বাঁধলাম ভারি ড্রেসিং টেবিলটার সঙ্গে।

টান দিয়ে দেখলাম। না, খুব শক্ত হয়েছে। আজ রাতে আর বেরোতে পারব না। এই দড়ি আর পেরেক আমাকে আটকে রাখবে।

বিছানায় বসে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে অপেক্ষা করছি।

ধীরে ধীরে অস্ত যেতে দেখলাম সূর্যটাকে।

গোধূলি থেকে রাত। আকাশে গোল চাঁদ। শিরশিরানি শুরু হয়েছে আমার চামড়ায়।
আয়নার সামনে দাঁড়ালাম। হাতে, মুখে, সারাদেহে, লোম গজাতে আরম্ভ করেছে। আমার পিঠ আর বুকে দপদপানি ব্যথা। চামড়ায় জ্বলুনি। ফুলতে শুরু করেছে পেশি। তীক্ষ্ণ ব্যথা ছড়িয়ে পড়ল শরীরে। পেশির চাপে ছিঁড়ে যাচ্ছে পরনের কাপড়।
মুখটা বদলে গিয়ে মায়ানেকড়ের মুখ হয়ে যাচ্ছে।
মাটী ফুড়ে বড় বড় দাঁত বেরোনোর সময় যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠলাম।
হাত-পায়ে যেন আগুন ধরে গেছে। আঙুল মিলিয়ে গিয়ে থাবা তৈরি হচ্ছে। তীক্ষ্ণধার নখ বেরোচ্ছে সেগুলো থেকে।
জ্বরে পুড়ছে যেন গা। পেটে রাজ্যের খিদে।
কুৎসিত, ভয়ঙ্কর হাঁক ছেড়ে কামড়াতে লাগলাম দড়িটা। কিছুটা কেটে হ্যাঁচকা টান দিতেই পট করে ছিঁড়ে গেল।
বুনো চিৎকার দিয়ে থাবা মারলাম দরজায় আটকানো তক্তায়। ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে খুলে পড়ল ওটা।
ছুটে বেরোলাম দরজার বাইরে। বাড়ির বাইরে এলাম।
ছুটতে শুরু করলাম চারপায়ে ভর দিয়ে। রাতের ঠাণ্ডা বাতাস পরশ বোলাচ্ছে তপ্ত চামড়ায়।
ছুটছি, ছুটছি। রক্তলালসায় দৌড়ে চলেছি রাস্তা দিয়ে। মাংস দরকার এখন আমার। কাঁচা মাংস।
মায়ানেকড়ের চোখ দিয়ে অন্ধকারে দিনের মত পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি আমি। দুটো ছেলেকে পাশাপাশি হাঁটতে দেখলাম।
ওদের আমি চিনি। আমার সঙ্গে একই স্কুলে পড়ে। তীব্র খিদেয় মোচড় খেতে লাগল যেন পাকস্থলীটা।
ওদের ঘামের গন্ধ নাকে আসছে। নরম, তাজা মাংসের সুগন্ধ। পাচ্ছি। লম্বা জিভ বের করে ঠোঁট চাটলাম।
ছায়ায় গা ঢেকে চুপি চুপি এগোলাম ওদের দিকে।
কীসের শব্দ? আচমকা থেমে গেল একটা ছেলে। মুখ ঘুরিয়ে ফিরে তাকাল আমার দিকে।
তাড়াতাড়ি একটা গাছের আড়ালে সরে গেলাম।
এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে, সন্দেহজনক কিছু চোখে না পড়ায় আবার এগিয়ে চলল ওরা। গতি বাড়িয়ে দিয়েছে এখন।
ওদের ঘামের গন্ধ পাচ্ছি। ওরা যে ভয় পেয়েছে, তা-ও বুঝতে পারছি।

খিদে যেন আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছি। খেতে হবে আমাকে। খেতেই হবে। এখুনি।
আবার দাঁড়িয়ে গেল ওরা। ফিরে তাকাল।
কেউ আমাদের অনুসরণ করছে, প্রথম ছেলেটা বলল।
জানি, দ্বিতীয় ছেলেটা বলল। আমারও একই ধরনের অনুভূতি হচ্ছে। গা ছমছম করছে। কেঁপে উঠল ও।
এত আস্তে হাঁটলে হবে না। দৌড়াও।
ছুটতে শুরু করল ওরা।
ছায়া থেকে বেরিয়ে আমিও ছুটলাম। ভারি, চাপা গরগর শব্দ, বেরিয়ে এল গলার গভীর থেকে।
চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল ওরা। আতঙ্কে বড় বড় হয়ে গেছে চোখ। চেঁচিয়ে উঠল মেয়েটা।
মায়ানেকড়ে! ছেলেটা বলল। আবার মেয়েটার হাত চেপে ধরে টান দিল। ছুটতে শুরু করল ওরা।
চার পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে আমিও ছুটলাম।
ওই যে! ওই যে মায়ানেকড়ে! ধরো, ধরো! আমার পিছনে হট্টগোল শুনলাম।
ঘুরে দাঁড়ালাম। একটা পুলিশের গাড়ি আসছে। জানালা দিয়ে মুখ বের করে আমার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করছেন একজন পুলিশ অফিসার।
পিছনের জানালা দিয়ে আরেকটা মুখ বেরোতে দেখলাম। বাবা!
জলদি থানায় ফোন করুন। আরও লোক আসতে বলুন। উত্তেজিতকণ্ঠে বাবা বলল।
গাড়িটা ছুটে আসতে লাগল আমার দিকে।
ওটাকে দেখেছি। পিছু নিয়েছি। ওয়্যারলেসে কথা বলছেন অফিসার। থানার ডিউটি অফিসারের সঙ্গে কথা বলছেন।
জোরে দৌড়াতে শুরু করলাম।
ঝটকা দিয়ে খুলে গেল গাড়ির দরজা। লাফিয়ে নেমে আমার দিকে ছুটে আসতে লাগলেন দুজন পুলিশ অফিসার।
পালাচ্ছে!
ধরো!
আমার কানে বাজতে থাকল যেন তাদের চিৎকার।
চারপায়ে ছুটছি। হাঁপাচ্ছি। বুকের ভিতর লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ডটা। তবে গতি কমালাম না। বরং আরও জোরে দৌড়ানোর চেষ্টা করলাম।

একটা মোড়ের কাছে পৌঁছলাম। ছুটে রাস্তা পেরোলাম। পিছনে। সাইরেনের শব্দ। ফিরে তাকালাম। লাল-নীল আলোগুলো তীব্র ঝিলিক দিয়ে দিয়ে ঘুরছে।
জোরে! আরও জোরে! দৌড়াও! থেমো না! নিজেকে বললাম।
পিছনে দুপদাপ পায়ের শব্দ। ছুটে আসছে আমার দিকে।
স্কুলের দিকে ছুটলাম। মাঠে ঢুকে পড়লাম।
কিছুতেই পালাতে দেবেন না! বাবার চিৎকার কানে এল। ঝনঝন করে খুলল আর বন্ধ হলো লোহার গেটটা।
মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ফিরে তাকালাম। গেটের কাছে ভিতরের দিকে সারি দিয়ে দাঁড়িয়েছে পুলিশ।
কয়েকটা গাড়ির ব্রেক কষে দাঁড়ানোর শব্দ হলো। ওগুলোর হেডলাইটের তীব্র আলো এসে পড়ল মাঠে।
চোখ মিটমিট করলাম। সামনে এগিয়ে আসছে বাবা। ধীরে ধীরে আমার দিকে এগোচ্ছে।
তোমাকে ঘিরে ফেলা হয়েছে। আর পালাতে পারবে না, বাবা বলল। তোমার জারিজুরি খতম।
হ্যাঁ, নোড়ো না। ওভাবেই থাকো। আমার দিকে এগোতে এগোতে আবার বলল বাবা।
গেটের কাছে দাঁড়ানো পুলিশেরা নড়ছে না। নীরবে তাকিয়ে রয়েছে আমার দিকে।
হেডলাইটের আলোয় আমিও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছি বাবার দিকে তাকিয়ে।
নিঃশ্বাসের শব্দ কানে এল। আমার পিছন থেকে।
পাক খেয়ে ঘুরলাম। দেরি হয়ে গেছে। আমার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে কয়েকজন পুলিশ।
একজন বিশালদেহী দুঃসাহসী পুলিশ অফিসার আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। দুই হাতে আমার পেট পেঁচিয়ে ধরলেন। ধস্তাধস্তি করতে করতে মাটিতে ফেলে দিলেন। অসম্ভব জোর তার গায়ে।
কিন্তু আমি এখন মায়ানেকড়ে। যত জোরই থাক, একজন মানুষ আমার সঙ্গে শক্তিতে পারার কথা নয়।
বিকট চিৎকার দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে তার হাতে কামড় বসানোর চেষ্টা করলাম।
ঝটকা দিয়ে হাত সরিয়ে নিলেন অফিসার। তবে আমাকে ছাড়লেন না। বাকি পুলিশেরা তাঁকে সাহায্য করতে এগোল। সবার হাতে বড় বড় লাঠি। আমাকে বাড়ি মারার জন্য উঁচু করে ধরল।
মরিয়া হয়ে ডানে, বাঁয়ে তাকালাম।
কোন পথ নেই।

চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলা হয়েছে আমাকে। একটাই উপায়, গায়ের লোকটাকে সরিয়ে ফেলে কাঁটাতারের বেড়া ডিঙিয়ে পালানো।
প্রচণ্ড গর্জন করে উঠে ঝাড়া মারলাম। গায়ের ওপর থেকে ফেলে দিলাম অফিসারকে। তারপর ছুটলাম বেড়ার দিকে।
ছুটতেই ছুটতেই লাফ দিলাম।
কিন্তু বেরিয়ে যেতে পারলাম না। আটকে গেলাম বেড়ার ওপরে। আরও জোরে লাফ দেয়া উচিত ছিল। বেরিয়ে যেতে পারতাম তাহলে। পিছনের দুই পা কাটাতারে বেধে গেল। পেটের ওপর ঝুলে রইলাম।
আমার ভারে ডেবে গেল বেড়ার ওপরের দিকটা।
কয়েকজন পুলিশ এসে বেড়া ঝাঁকাতে শুরু করল। কয়েকজন লাঠি দিয়ে দমাদম বাড়ি মারতে লাগল আমার দেহের পিছনে। বেড়াটাও আমার ভার রাখতে পারছে না। প্রায় উল্টে পড়লাম মাটিতে। বেড়ার ভিতর দিকে।
লাফিয়ে উঠলাম পরক্ষণে। দৌড় দিলাম স্কুল বাড়িটার দিকে।
সিঁড়ির কাছে পৌঁছলাম। গেটটা খোলা। আর কোন উপায় না দেখে সিঁড়ি বেয়ে ছাতে উঠে গেলাম।
দল বেঁধে ছাতে উঠে এল পুলিশ।
কোণঠাসা করে ফেলতে চাইল আমাকে। ওরা জানে, মায়ানেকড়ে হই আর যা-ই হই, দোতলার ছাত থেকে লাফিয়ে পড়লে বাঁচব না। আর বাঁচলেও হাড়গোড় ভেঙে অকেজো হয়ে যাব। অনেক উঁচু।
আমাকে ঘিরে ফেলল পুলিশ।
সিঁড়ির কাছ থেকে বাবার চিৎকার কানে এল, ছাড়বেন না! ওকে ছাড়বেন না!
কিন্তু আমি দমলাম না। দৌড় দিলাম। আমাকে ছুটে আসতে দেখে লাফিয়ে সরে দাঁড়াল কয়েকজন পুলিশ। ওদের চক্র ভেঙে বেরিয়ে আসার সময় আরও দু-তিন ঘা লাঠির বাড়ি খেলাম।
ছাতের কিনারে এসে লাফিয়ে পড়লাম পাশের বাড়িটার ছাতে। সেখান থেকে অন্য ছাতে।
অনেকটা নিরাপদ আমি এখানে। ওরা আমাকে ধরতে পারবে না। বুঝে বিশ্রাম নিতে বসলাম। কিন্তু এত সহজে হাল ছাড়ার পাত্র নয় পুলিশ। মাথার ওপরে একটা হেলিকপ্টারের শব্দ শুনলাম।
মুখ তুলে তাকালাম। সোজা আমার ওপর নেমে আসছে পুলিশের হেলিকপ্টার। ওটার তীব্র উজ্জ্বল সার্চলাইটের আলো নীচের দিকে ফেলে ছাতে ছাতে খুঁজে বেড়াচ্ছে আমাকে।

গর্জন করে উঠলাম। একতলার ছাতে রয়েছি এখন। নীচে একবার মাটির দিকে তাকিয়ে দ্বিধা করলাম। তারপর লাফ দিলাম। বিড়ালের মত চারপায়ে ভর দিয়ে নিরাপদেই নামলাম মাটিতে। সরে এলাম বাড়ির ছায়ায়।
পাগলের মত কর্কশ চিৎকার করে চলেছে সাইরেন। মানুষের কলরব। টায়ারের আর্তনাদ, আর গাড়ির ইঞ্জিনের ভারি গোঁ-গোঁ শব্দ। দমকলের একটা গাড়ি আর বড় কয়েকটা লরি এসে ঘিরে ফেলেছে। আমাকে।
পিছনের আঙিনায় ঢুকে পড়লাম।
বাড়ির সমস্ত আলো জ্বলে উঠল। সাইরেন বেজেই চলেছে। বাড়ির লোকেরা হট্টগোল শুরু করেছে।
দিলাম দৌড়। কিন্তু এত পরিশ্রম সইতে পারছে না আমার ফুসফুস। মনে হলো পুড়ে যাচ্ছে।
থামো! নিজেকে বললাম।
বিশ্রাম নাও।
লুকানোর ভাল জায়গা খোঁজো।
আঙিনার একপ্রান্তে একটা ছাউনি ঘর দেখলাম। পুরোপুরি অন্ধকার।
পা টিপে টিপে নিঃশব্দে চলে এলাম ওটার কাছে। মাথা দিয়ে দরজায় ঠেলা দিলাম। তালা কিংবা খিলটিল কিছু লাগানো নেই। খুলে গেল পাল্লা।
ভিতরে ঢুকে পড়লাম। তারপর আবার মাথা দিয়ে ঠেলে লাগিয়ে দিলাম পাল্লা। প্রচুর খড় রয়েছে ঘরে। একটা সাইকেল ঠেস দিয়ে রাখা একজায়গায়। ওটার কাছে দুটো খড়ের গাদার ফাঁকে ঢুকে পড়লাম।
পা কাঁপছে আমার। ব্যথা করছে।
বুকটা ওঠানামা করছে জোরে জোরে। লম্বা দম নিয়ে শান্ত করতে চাইলাম ফুসফুসটাকে।
ধীরে ধীরে কমে আসছে আমার হৃৎপিণ্ডের লাফানি।
সব ঠিক হয়ে যাবে, নিজেকে বোঝালাম। এখানে তুমি নিরাপদ। ভোর হতে দেরি নেই। আলো ফুটলেই মানুষে রূপ নেবে। তখন এক ফাঁকে এখান থেকে বেরিয়ে বাড়ি চলে যেতে পারবে।
লম্বা হয়ে শুয়ে চোখ মুদলাম। আর ঠিক তখুনি ঝটকা দিয়ে খুলে। বেড়ার গায়ে দড়াম করে বাড়ি খেল দরজার পাল্লা।
বড় টর্চের তীব্র আলো চোখ ধাঁধিয়ে দিল আমার।
এই যে এখানে! চিৎকার করলেন একজন অফিসার। ঘরের। বাইরে দাঁড়ানো ঊর্ধ্বতন অফিসারের উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে বললেন, সার, এই যে এখানে ও!
লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। দ্রুত একবার সারা ঘরে ঘুরে বেড়াল আমার দৃষ্টি।

একটা জানালাও নেই। একটা ছাড়া আর কোন দরজাও নেই। বেরিয়ে যাওয়ার কোন রাস্তা দেলাম না।
দরজার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে বিকট চিৎকার দিয়ে ভয়। দেখানোর চেষ্টা করলাম অফিসারকে।
এবং ভুলটা করলাম।
কোমরের খাপ থেকে পিস্তল খুলে আমার দিকে তাক করলেন। অফিসার। সার, জলদি আসুন! একা আটকাতে পারব না। আবার পালাবে।
পা বাড়ালাম।
থামো! আমার দিকে তাকিয়ে ধমক দিলেন অফিসার। দাঁড়াও ওখানে। নইলে গুলি করব!
পিস্তলের ট্রিগারে চেপে বসতে শুরু করল তার আঙুল।
গুলি করবেন না! গুলি করবেন না! ও আমার ছেলে! বাবার চিৎকার শুনতে পেলাম। দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকে পড়েছে।
অবাক কাণ্ড! বাবা কী করে বুঝল, আমি?
অফিসারকে ঠেলে সরিয়ে পাশে এসে দাঁড়াল বাবা। আমাকে দেখে বোঝার চেষ্টা করল, আমি ভাল আছি কী না। দরজা দিয়ে বাইরে আকাশের দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করল, আলো ফুটতে আর কত দেরি। আমাকে বলল, ভোর হয়ে গেছে। বসে থাকো এখানে। আলো ফুটলেই তুমি নিরাপদ।
অফিসারকে নিয়ে বেরিয়ে গেল বাবা। বাইরে থেকে দরজাটা লাগিয়ে দিল।
কিন্তু ও খুনী! বাইরে থেকে অফিসারের রাগত কণ্ঠ কানে এল আমার।
ওকে শেষ করে দেয়া দরকার! বলল আরেকটা কণ্ঠ।
নিজের দেহের দিকে তাকালাম। এখনও মায়ানেকড়েই আছি আমি। মানুষ হতে আর ঠিক কতক্ষণ লাগবে, জানি না।
বেড়ার ফাঁক দিয়ে বাইরে উঁকি দিলাম। এখনও অন্ধকার।
সূর্য ওঠার অপেক্ষায় রইলাম। বুকের ভিতর জোরে জোরে লাফাচ্ছে উত্তেজিত হৃৎপিণ্ডটা।
মিস্টার মিলফোর্ড, আপনি ভুল করছেন, তৃতীয় আরেকটা ভারি কণ্ঠ বলল, ওই ভয়ানক প্রাণীটা আপনার ছেলে হতে পারে না!
ধাক্কা লাগল দরজার পাল্লায়। খুলে গেল আবার ঝটকা দিয়ে। ওকে মেরে ফেলাই ভাল!
কাঁপতে কাঁপতে একটা খড়ের গাদার আড়ালে লুকালাম।
না না; বললাম তো, ও আমার ছেলে! বাবা বলল। আবার টান দিয়ে লাগিয়ে দিল পাল্লাটা।

জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেললাম। চামড়ায় শিরশিরে অনুভূতি।
তর্কাতর্কি শুরু হলো বাইরে। পুলিশরাও একমত হতে পারছে না। কেউ বলছে, মেরে ফেলো। কেউ বলছে, থাক না, দেখা যাক।
বাইরে উত্তেজনা বাড়ছে। এদিকে আমার দেহটা আবার রূপান্তরিত হতে শুরু করেছে।
ধূর, মেরেই ফেলা ভাল। এ-সব শয়তান বাঁচিয়ে রাখা উচিত না। লোকের হট্টগোলের সঙ্গে উত্তেজনাও বাড়ছে।
জলদি! জলদি! তাড়াতাড়ি বদলে যাও! নিজের দেহের দিকে তাকিয়ে বললাম। বেশি দেরি হয়ে যাওয়ার আগেই।
আমার পায়ের চামড়া পুড়ছে। মাথা ব্যথা করছে। চামড়ার জ্বলুনিতে মনে হচ্ছে, গা থেকে আলাদা হয়ে যাবে।
যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠলাম। চেঁচাতে চেঁচাতে গলা ব্যথা হয়ে গেল।
ওই যে, শুনুন, কেমন চিৎকার করছে! ও আপনার ছেলে হতেই পারে না, মিস্টার মিলফোর্ড। ওটা একটা ভূত! শয়তান! নরকের ইবলিস!
গুলি করছেন না কেন? আরেকটা কণ্ঠ বলল।
আবার খুলে গেল দরজার পাল্লা। ঘরে ঢুকলেন একজন পুলিশ অফিসার। হাতে পিস্তল।
বাবা! দুর্বলকণ্ঠে ডাকলাম।
পিছন থেকে দৌড়ে এল বাবা। ঠেলা দিয়ে অফিসারকে সরিয়ে ছুটে এল আমার দিকে। রবিন! রবিন! আমাকে জড়িয়ে ধরল। ভেবো না! সব ঠিক হয়ে যাবে!
আমার দেহের দিকে তাকালাম। আমার মানবদেহ। পুরো স্বাভাবিক হয়ে গেছে।
ওনার ছেলেই তো! সত্যিই রবিন! চাপা ফিসফিসানি শুনতে পেলাম চারপাশ থেকে।
বাবা, কী করে বুঝলে তুমি? আমার কণ্ঠ এখনও দুর্বল। কী করে বুঝলে আমি মায়ানেকড়ে হয়ে গেছি?
ওটা। আমার গলায় ঝোলানো দাঁতটা দেখাল বাবা। ওটা দেখেই বুঝেছি, তুমি। তবে অনেক দেরিতে দেখেছি, তুমি ছাউনির দিকে দৌড়ে যাবার সময়। ইস্, আরও আগে দেখলে ভাল হত। অনেক ঝামেলা কমত।
হাতের মুঠোয় চেপে ধরলাম দাঁতটা।
আবার এটা আমার জীবন বাঁচাল।
চলো, বাড়ি চলো, বাবা বলল।
ছাউনি থেকে বেরিয়ে এলাম। সকালের রোদ যেন হুল ফোঁটাল আমার চোখে। তাড়াতাড়ি বুজে ফেললাম। আবার যখন মেলোম, দেখি, অনেকগুলো কৌতূহলী

চোখ আমাকে দেখছে।
আমাদের হাতে দিন, থানায় নিয়ে যাই, বাবাকে বললেন একজন অফিসার। কঠিন হাতে আমার হাত চেপে ধরলেন।
ওকে ছেড়ে দিন, প্লিজ, অনুরোধের সুরে বাবা বলল।
কিন্তু মিস্টার মিলফোর্ড, আপনি তো বুঝতেই পারছেন না, ওকে ছেড়ে রাখাটা উচিত হবে না। বলে সহকর্মীদের দিকে তাকালেন। তিনি।
মাথা ঝাঁকিয়ে সমর্থন জানাল সবাই।
ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে আমাদের ঘিরে ফেলল।
বাবা! দুর্বলকণ্ঠে ককিয়ে উঠলাম। আমাকে থানায় নিয়ে কী করবে?
ছেড়ে দিন ওকে, প্লিজ! আবার বলল বাবা। বাড়ি নিয়ে যাই। ও ইচ্ছে করে কারও ক্ষতি করেনি। ওর চিকিৎসা দরকার।
কিন্তু রাতে আবার যখন চাঁদ উঠবে, তখন? অফিসার বললেন। আবার তো মায়ানেকড়ে হয়ে যাবে। বুঝলাম, নিজের ইচ্ছেয় ক্ষতি করে না। কিন্তু যেভাবেই হোক, করে তো।
আর পারবে না, বাবা বলল। আমি কথা দিচ্ছি, ও আর বেরোতে পারবে না। কারও ক্ষতি করতে পারবে না। সব দায়-দায়িত্ব আমার।
চুপ করে থেকে একটা মুহূর্ত ভাবলেন অফিসার-ইন-চার্জ। তারপর পিছিয়ে গেলেন।বেশ, নিয়ে যান। একটা সুযোগ দিলাম।
আরেকটা কথা, বাবা বলল। দয়া করে এ কথাটা ফাস করবেন না। আমার ছেলে মায়ানেকড়ে হয়ে যায়, এটা জেনে গেলে ও আর শহরে টিকতে পারবে না।
মাথা ঝাঁকালেন পুলিশ অফিসার।
পুলিশের গাড়িতে করেই আমাকেসহ বাবাকে আমাদের বাড়িতে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা হলো। সারারাতের ছোটাছুটিতে এতই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, গাড়ির সিটে নেতিয়ে পড়লাম।
বাড়ি পৌঁছতে পৌঁছতে অনেকটা ভাল বোধ করলাম। বাড়িতে ঢুকে বসার ঘরের দিকে এগোনোর সময় বললাম, আরও আগেই তোমাকে জানাতাম। তুমি দুঃখ পাবে বলে জানাইনি।
কখন ঘটল এটা? কীভাবে? আঙুল চালিয়ে চুল সমান করল বাবা। চোখে বিষণ্নতা। চেয়ারে বসে শার্টের ওপরের দিকের দুটো বোতাম খুলে দিল। তার চওড়া কাধ সামনের দিকে ঝুলে পড়েছে।
বনের মধ্যে সেরাতে যখন আমার ওপর মায়ানেকড়েটা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, বাবাকে জানালাম। আমার কাঁধে কামড়ে দিয়েছিল। তখনই তোমাকে বলা উচিত ছিল। কিন্তু ওই যে বললাম, তুমি দুঃখ পাবে বলে জানাইনি।

হুঁ! বিষণ ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল বাবা। দোষটা আমারই। মায়ানেকড়ে ধরার জন্য এমন পাগল হয়ে গিয়েছিলাম! তোমার দিকে নজর রাখা উচিত ছিল আমার। এটা ঘটতে দেয়াই ঠিক হয়নি।
দুই হাতের তালুতে মাথা চেপে ধরল বাবা। বিড়বিড় করে বলল, তবে তোমাকে একটা ধন্যবাদ দেয়া দরকার, রবিন।
ধন্যবাদ? কীসের জন্য, বাবা?
রেনকে ছেড়ে দেয়ার জন্য। মুখ তুলে আমার দিকে তাকাল বাবা। ও মায়ানেকড়ে নয়। তুমি ঠিকই বলেছিলে। সারা দুনিয়ার সামনে, আমি খেলো হয়ে যেতাম, সবাই আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করত, গাধা বনে যেতাম।
উঠে দাঁড়াল বাবা। পায়চারি শুরু করল।
ভেবো না। সব ঠিক হয়ে যাবে। দৃঢ়কণ্ঠে বাবা বলল।
তোমাকে ভাল করার জন্য সবরকম চেষ্টা আমি করব। সবচেয়ে বড় ডাক্তারকে দিয়ে চিকিৎসা করাব। দরকার হলে ওঝা, কবিরাজ, ফকির, সবার কাছে নিয়ে যাব। মায়ানেকড়েকে ভাল করার কোন না কোন উপায় নিশ্চয় আছে...
ফোন বাজল। রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল বাবা।
অন্যপ্রান্তের কথা শুনতে শুনতে সরু হয়ে এল চোখের পাতা। শক্ত হলো মুখের পেশি। বলল, অসম্ভব! এ হতেই পারে না!
তারপর আরও কিছুক্ষণ শোনার পর রিসিভার নামিয়ে রাখল।
কী হয়েছে, বাবা? কোনও সমস্যা?
থানা থেকে ফোন করেছিল। ভারি দম নিল বাবা। ছয়জন মানুষের ওপর হামলা চালিয়েছে একটা মায়ানেকড়ে।
আমি কিছু করিনি! করার সুযোগই পাইনি! লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালাম চেয়ার থেকে। তুমি তো জানো!
হ্যাঁ, জানি, বাবা বলল। তুমি নও। সারারাত তোমাকে চোখে চোখে রাখা হয়েছে। তোমাকে যখন স্কুলের মাঠে আটকে ফেলা হয়েছে, ঠিক সে-সময় শহরের আরেকদিকে ঘটনাটা ঘটেছে।
তাহলে কে, বাবা? অবাক হয়ে বাবার দিকে তাকিয়ে আছি।
রেন। এ ছাড়া আর কে? প্যান্টের পকেটে হাত ঢোকাল বাবা।
ও আমাদের মিথ্যে কথা বলেছে। ও সত্যিই মায়ানেকড়ে। তোমাকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছে।
রেনের চেহারাটা কল্পনা করলাম। এ রকম একজন মানুষ মায়া নেকড়েতে রূপান্তরিত হয়, বিশ্বাস হচ্ছে না আমার এখনও। কিন্তু বিশ্বাস না করেও উপায় নেই। মানুষগুলো জখম হয়েছে, সেটা তো ঠিক।

আজ রাতে তো পূর্ণিমা, তাই না, বাবা? গলা কাঁপছে আমার।
হ্যাঁ, মাথা ঝাঁকাল, বাবা। কাল থেকে কৃষ্ণপক্ষ। আগামী শুক্লপক্ষের আগে আর মায়ানেকড়েতে পরিণত হবে না। ততদিন নিশ্চিন্ত থাকতে পারব। শুধু আজকের রাতটা ভালয় ভালয় কাটাতে পারলেই হয়।
চোখ বুজে ভাবতে লাগল বাবা। কী করবে? জিজ্ঞেস করলাম।
আচমকা চোখ মেলে আমার দিকে তাকাল বাবা। একটা বুদ্ধি এসেছে মাথায়। আজ রাতে পুলিশ নিয়ে রেনকে খুঁজতে বেরোব। সবাইকে রাইফেল নিতে বলব।
ভাবতে কষ্টই হচ্ছে, রবিন, অন্যদিকে চোখ ফেরাল বাবা। রেনকে দেখামাত্র গুলি করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।
সূর্য অস্ত যাচ্ছে। বাবা তৈরি হচ্ছে। বসে বসে দেখছি আমি।
আলমারি থেকে তার রাইফেলটা বের করল বাবা।
ম্যাগাজিনের চেম্বারে রূপার তৈরি বুলেট ভরল। আগেই তৈরি করিয়ে রেখেছিল। ব্র্যাটভিয়ায়ও এই বুলেট নিয়ে গিয়েছিল সঙ্গে করে।
মায়ানেকড়ে মারতে কী সত্যিই রূপার বুলেট লাগে, বাবা? গায়ে। কাঁটা দিল আমার।
লোকে তো তাই বলে। সত্যি-মিথ্যে জানি না। কিন্তু ঝুঁকি নেব কেন?
এখন আমরা নিশ্চিত, হিউগ রেন সত্যিই মায়ানেকড়ে।
সময় হয়েছে, বাবা বলল। চলো।
বসার ঘরে নিয়ে এসে বাবা আমাকে খাঁচায় ঢুকতে বাধ্য করল।
এখানেই তুমি নিরাপদ, খাঁচার দরজার মস্ত তালাটা লাগিয়ে দিল। বাবা।
বসার ঘরের জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম। আকাশে চাঁদ দেখা যাচ্ছে।
রেনের কথা ভাবলাম। ভাবলাম, জাহাজে আমাকে বাঁচানোর কথা।
গলায় ঝোলানো মায়ানেকড়ের দাতাটা চেপে ধরলাম। রেনই এ জিনিসটা আমাকে দিয়েছে।
আসলে, দুবার আমার জীবন বাঁচিয়েছে ও। একবার নিজে, আরেকবার এ জিনিসটার সাহায্যে-বনের ভিতর বুনো কুকুরের দল এটা দেখেই আমাকে ছেড়ে পালিয়ে যায়।
সুতরাং ওকে আমার বাঁচানোর চেষ্টা করা দরকার। অন্তত সাবধান করাটা তো জরুরি।
খাঁচার শিক চেপে ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে চেঁচিয়ে বললাম, কে আমাকে মুক্ত করবে? কে ছেড়ে দেবে খাঁচা থেকে?
দরজার ঘণ্টা বাজল।
এসো! এসো! চেঁচিয়ে ডাকলাম। জলদি এসো!

দরজা খুলে উঁকি দিল মুসা।
খাঁচায় ঢুকে কী করছ, রবিন? মজা করছ নাকি?
না, মজা করছি না, বিড়বিড় করলাম। একটা বুদ্ধি এসেছে আমার মাথায়। মায়ানেকড়েটা আমার সঙ্গে চালাকি করেছে। মিষ্টি কথায় আমাকে ভুলিয়ে আমাকে দিয়ে তালা খুলিয়েছে। তারপর আমাকে খাঁচায় আটকে রেখে চলে গেছে। জলদি, আমাকে বের করো। বাবাকে সাবধান করতে হবে।
ঘরের চারপাশে চোখ বোলাল ও। চাবিটা কই?
তাই তো! চাবিটা কোথায়?
আমাকে তালা দিয়ে চাবি কোথায় রাখছে বাবা, খেয়াল করিনি। চাবি কোথায় রেখেছে দেখিনি।
ডেস্কের ড্রয়ারে দেখো তো! মুসাকে বললাম।
ড্রয়ার হাতড়ে দেখে মুসা বলল, এখানে নেই।
কিন্তু চাবিটা তো খুঁজে বের করতেই হবে আমাদের!
মাথা ঠাণ্ডা করো, রবিন, মুসা বলল। আমার মাথায় আরেকটা বুদ্ধি এসেছে…
কিন্তু আমাদের হাতে সময় নেই!
আরে শোনো না, চাবির দরকার হবে না আমাদের।
হবে না?
না। আমি গিয়ে তোমার বাবাকে খুঁজে বের করে রেনের চালাকির কথা বলব। আঙ্কেল এসে খুলে দেবেন তোমাকে।
উঁহু, আমার পছন্দ হলো না।
কেন হলো না?
কেন হলো না? কেন হলো না?
কি জবাব দেব?
কারণ… জানালার বাইরে তাকালাম। ওখানে তোমাকে এখন যেতে দিতে চাই না আমি। চাঁদ উঠেছে। এখন বাইরে যাওয়াটা বিপজ্জনক।
হ্যাঁ, তা ঠিক। দ্বিধা করছে মুসা।
ঠিক আছে, চাবিটাই খুঁজে বের করি।
বাড়ির ভিতর খুঁজতে গেল ও। এদিকে শিরশিরানি শুরু হয়ে গেছে। আমার চামড়ায়।
কিন্তু আমি যে মায়ানেকড়েতে রূপান্তরিত হচ্ছি, মুসাকে দেখতে দিতে চাই না। কী করব? কী করব তাহলে?
জলদি করো, মুসা। জলদি! চেঁচিয়ে বললাম। কণ্ঠের আতঙ্ক চাপা দিতে পারছি না।

চামড়া জ্বলতে শুরু করেছে আমার।
মাথা ব্যথা শুরু হয়েছে।
চাবিটা বাবা কোথায় রাখল? সঙ্গে করে নিয়ে যায়নি তো? গুঙিয়ে উঠলাম।
তারপর মনে পড়ল বিস্কুটের টিনটার কথা। বাড়ির সমস্ত বাড়তি চাবি ওই খালি টিনে রাখে মা-বাবা।
মুসা, রান্নাঘরের তাকে বিস্কুটের একটা খালি টিন আছে, ওটায় দেখো! চেঁচিয়ে বললাম।
পেয়েছি! একটু পরেই দৌড়ে এসে বসার ঘরে ঢুকল মুসা। উল্লসিত ভঙ্গিতে চাবিটা শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে লুফে নিল।
জলদি করো! খোলো! খোলো!
খুলছি তো। অস্থির হচ্ছ কেন? খাঁচার তালাটা খুলে দিল ও।
এক দৌড়ে বাড়ি চলে যাও! খাঁচা থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এলাম আমি। এখুনি। দেরি কোরো না।
টের পাচ্ছি পিঠে লোম গজাতে শুরু করেছে।
পাগল নাকি! এইমাত্র তো বললে, চাঁদ উঠেছে, এখন বাইরে বেরোনো ঠিক না!
কিন্তু এখানে থাকাও উচিত হবে না তোমার। অন্যদিকে তাকিয়ে বললাম। মায়ানেকড়েটা এখানে ফিরে আসতে পারে...অনেকদিন খাঁচাটায় থেকেছে... মায়ানেকড়েরা পুরানো জায়গায় ফিরতে ভালবাসে।
তাই নাকি?
ও, তুমি জানো না। কিন্তু আমি জানি। বাবা বলেছে। দৌড় দাও। জলদি!.
দরজার দিকে ছুটল মুসা।
পেশিতে ব্যথা করছে আমার।
দরজার নবে হাত দিয়েছে মুসা।
হাতের দিকে তাকালাম। হলুদ আর কালো লোম গজানো শুরু হয়ে গেছে।
মনে মনে বললাম, ফিরে তাকিয়ো না, মুসা! বেরিয়ে যাও! এদিকে তাকিয়ো না, প্লিজ!
নব ঘোরাল মুসা। গুড লাক, রবিন। আমাকে বলল ও।
জবাব দিলাম না। দাঁড়িয়ে আছি। আতঙ্কে যেন অবশ হয়ে গিয়ে।
দরজা খুলল ও।
ডানে তাকাল, বাঁয়ে দেখল। কিন্তু পিছনে আমার দিকে তাকাল না। একবারও।
বিড়বিড় করে বলল, এখন বেরোনো বোধহয় নিরাপদ।
জবাব দিলাম না।
চাঁদটা দেখছে ও।

মাথা ব্যথা করছে আমার। আধা মানুষ আধা জন্তুতে পরিণত হয়ে গেছি।
আমি যাচ্ছি, রবিন, মুসা বলল। ফোন কোরো।
যাও, মুসা, বেরিয়ে যাও। মনে মনে বললাম। ঘুরো না এদিকে। চলে যাও, প্লিজ!
সাবধানে থেকো। বলে বেরিয়ে গেল মুসা। দরজাটা লাগিয়ে দিল।
ছুটে এলাম জানালার কাছে। চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছে। রাস্তা। দিয়ে দৌড়াচ্ছে মুসা।
পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলাম আমি। দাঁত বেরোনোর প্রচণ্ড ব্যথা মাড়ীতে। যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠলাম। শেষ হয়েছে রূপান্তর। পুরোপুরি মায়ানেকড়ে হয়ে গেছি। আমাদের বাড়ির ছায়ায় জড়সড় হয়ে দাঁড়ালাম। ভাবছি। কোথায় যাব? কোথায় আছে রেন? সময়মত কী খুঁজে বের করতে পারব ওকে? ধড়াস ধড়াস করছে বুকের ভিতর।
মায়ানেকড়ে! মায়ানেকড়ে! মহিলাকণ্ঠে চিৎকার শোনা গেল।
বরফের মত জমে গেলাম।
বাঁচাও! বাঁচাও! আমাকে মেরে ফেলল! আবার শোনা গেল।
আমিও দেখতে পেলাম মায়ানেকড়েটাকে। আমাদের বাড়ি থেকে সামান্য দূরে আরেকটা বাড়ির পিছনে।
মহিলার দিকে তাকিয়ে মুখ ভেঙচে গরগর করছে ওটা। এক পা। এক পা করে এগিয়ে যাচ্ছে তার দিকে। বাড়ির দেয়ালে পিঠ ঠেকেছে। মহিলার। কোণঠাসা করে ফেলেছে তাকে মায়ানেকড়েটা।
গর্জন করে দৌড় দিলাম।
এক লাফে নিচু দেয়াল ডিঙিয়ে ছুটলাম। ঝাঁপিয়ে পড়লাম মায়ানেকড়েটার গায়ে।
গর্জে উঠে কাত হয়ে পড়ে গেল মায়ানেকড়েটা। চমকে গেছে। সামলে নিয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল পরক্ষণে।
চোখ বড় বড় করে দেখছে মহিলা। আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠে, পাক খেয়ে ঘুরে গিয়ে দৌড় দিল।
মায়ানেকড়েটার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি আমি। আমাকে ঘিরে। চক্কর দিতে শুরু করল ওটা।
ধারাল দাঁত বের করে মুখ ভেঙচাল। হুমকি দিল আমাকে।
আমিও একইভাবে পাল্টা হুমকি দিলাম।
এদিকে! এই রাস্তায়! একজন পুলিশ অফিসারের চিৎকার শোনা গেল। মায়ানেকড়ের ডাক শুনলাম বলে মনে হলো।

মনে হচ্ছে ওই বাড়িটার পিছন থেকে আসছে! বাবার গলা। শুনলাম। কোনমতেই যেন পালাতে না পারে!
এসে গেছে পুলিশ। ঘিরে ফেলবে এখন, বুঝতে পারলাম।
মায়ানেকড়েটার দিকে তাকালাম। কান খাড়া করে ফেলেছে। ওটা জ্বলন্ত চোখ ডানে-বাঁয়ে তাকাচ্ছে। লুকানোর জায়গা খুঁজছে।
এখন ওকে সাহায্য করব কী করে?
কী করে বাঁচাব?
আবার মানুষরূপে ফিরে এলেই কেবল বাঁচতে পারবে ও। ছোট্ট একজন টাকমাথা মানুষকে দেখলে কেউ ভয়ঙ্কর প্রাণী ভেবে গুলি চালাবে না।
রাইফেলে বাবার গুলি ভরার দৃশ্যটা কল্পনা করলাম। সত্যি কী রূপার বুলেট মায়ানেকড়ে মেরে ফেলে?
মায়ানেকড়ে থেকে মানুষ হওয়ার উপায় কী?
ভাবো! ভাবো! নিজেকে তাগাদা দিলাম।
হ্যাঁ! মনে পড়েছে।
মায়ানেকড়েকে মানুষরূপে ফিরিয়ে আনতে চাইলে তার নাম ধরে ডাকতে হয়।
সেটা করতে পারি।
ওর নাম আমি জানি।
কাজ হবে তো? পরীক্ষা করে দেখা যাক।
মায়ানেকড়েটা আমার দিকে ফিরে তাকাল। আমিও ওটার জ্বলন্ত চোখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।
রেন! চেঁচিয়ে উঠলাম। হিউগ রেন!
কিন্তু আমার মায়ানেকড়ের মুখ দিয়ে শব্দগুলো শুধু ঘোঁতঘোত হয়ে বেরোল।
কিছুই ঘটল না।
দুজন দুজন করে যাও, অফিসার-ইন-চার্জের গলা শোনা গেল। ভালমত খোজো।
মায়ানেকড়েকে মানুষে রূপান্তরিত করার আরও একটা উপায়। আছে। সেটা কী?
রাতের আকাশকে চিরে দিল সাইরেনের শব্দ।
ঠিকমত ভাবতে পারছি না।
ভাবো, রবিন! ভাবো!
হ্যাঁ! পেয়েছি!
মায়ানেকড়ের মাথায় তিনবার থাবা দিলে ওটা মানুষ হয়ে যায়।
কিন্তু থাবা দেব কীভাবে? এক জায়গায় তো স্থির থাকছে না।
শব্দ শুনলাম মনে হলো! একজন অফিসারের গলা কানে এল। কাছাকাছিই আছে!

আর সময় নেই।
লাফ দিয়ে এগিয়ে গেলাম মায়ানেকড়েটার কাছে।
ওটা কিছু বোঝার আগেই পা উঁচু করে মাথায় থাবা মারতে লাগলাম।
একবার। দুবার। তিনবার। তারপর লাফিয়ে সরে গেলাম। কই? কিছুই তো ঘটল না। গর্জে উঠল মায়ানেকড়েটা। জ্বলন্ত চোখে তাকাল আমার দিকে।
এদিকে, মিস্টার মিলফোর্ড! একটা উত্তেজিত কণ্ঠ শোনা গেল। ঠিকই বলেছেন, ওই বাড়িটার পিছনে!
ভারি জুতোর শব্দ ছুটে এল রাস্তা দিয়ে। কী করা যায়? কী করা যায়? হঠাৎ মাথায় এল বুদ্ধিটা।
আমার গলায় ঝোলানো দাঁতটা থাবার সাহায্যে খুলে আনলাম। আঙুল নেই, তাই থাবা থেকে ফসকে পড়ে গেল মাটিতে।
নখ দিয়ে বহু কষ্টে তুলে নিয়ে মায়ানেকড়েটার গলায় ঝুলিয়ে দিলাম।
ঠিক এই সময় সেখানে এসে হাজির হলেন একজন পুলিশ অফিসার।
চোখের পলকে একটা ঝোপে ঢুকে পড়লাম। অফিসারের চিৎকারে তার দলবল এসে হাজির হলো।
বরফের মত জমে গিয়ে যেন ওদের দিকে তাকিয়ে আছে। মায়ানেকড়েটা। আতঙ্কিত। কোণঠাসা। হাঁপাচ্ছে জোরে জোরে।
রাইফেল তুলল পুলিশেরা।
আমি গুলি করছি! একজন অফিসার বললেন।
আতঙ্কে পাথর হয়ে যেন তাকিয়ে আছি। ট্রিগারে চেপে বসল অফিসারের আঙুল। তারপর গুলি ফোঁটার প্রচণ্ড শব্দ।
ঝটকা দিয়ে আকাশের দিকে উঠে গেল রাইফেলের নল। অফিসার ট্রিগার টেপার আগের মুহূর্তে ঠেলা দিয়ে নৃলটা ওপরের দিকে তুলে দিয়েছে বাবা। কারও কোন ক্ষতি না করে শূন্যে উঠে গেল বুলেট।
গুলি করবেন না! পরক্ষণে শোনা গেল বাবার চিৎকার। ওটা আমার ছেলে!
ঝোপের ভিতরে লুকিয়ে থেকে মুচকি হাসলাম। আমার মায়ানেকড়ের মুখে হাসিটা কেমন দেখাল জানি না। দাঁত বদলের বুদ্ধিটা কাজে লেগেছে। বাবা ভাবছে ওটা আমি। রেনের জীবন বাঁচল।
মায়ানেকড়েটাকে ঘিরে ফেলল পুলিশ। জাল ছুঁড়ে আটকে ফেলল। কয়েকজনে মিলে চেপে ধরল মাটিতে। একনাগাড়ে গর্জন। করছে মায়ানেকড়েটা। কামড়ানোর চেষ্টা করছে। জালের ভিতরে শরীর মোচড়াচ্ছে।
আড়ালে থেকে আমি সবই দেখছি। মনে মনে প্রার্থনা করছি, প্লিজ, ওর কোন ক্ষতি করবেন না, ক্ষতি করবেন না!

পা ছুঁড়ছে মায়ানেকড়েটা। ধস্তাধস্তি বন্ধ করছে না। নিজেকে ছাড়ানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছে। কিন্তু জালে আটক থেকে এত লোকের বিরুদ্ধে কিছু করতে পারছে না।
জালের মধ্যে রেখেই মোটা দড়ি দিয়ে ওটার পা বেঁধে ফেলা হলো। ছটফট করছে শুধু এখন মায়ানেকড়েটা। চাপা গোঙানি বেরোচ্ছে গলা দিয়ে।
আমার মায়ানেকড়ের চোখ দিয়ে অন্ধকারেও ওর চোখের বিষণ্নতা দেখতে পাচ্ছি। ও বুঝে গেছে, পরাজিত হয়েছে। তবু শেষবারের মত নিজেকে মুক্ত করার জন্য মস্ত হাঁ করে কামড়ে দিতে চাইল একজন পুলিশের হাতে।
জালের ফাঁক দিয়ে ওর হাঁ করা মুখে লাঠি ঢুকিয়ে দিল একজন। লাঠির দুই মাথা ধরে মাথাটাকে মাটিতে চেপে ধরল।
সাবধান, ব্যথা দেবেন না! উদ্বেগে কাঁপছে বাবার গলা। পরাজিত প্রাণীটার দিকে তাকিয়ে আছে। কী করে আবার খাঁচা থেকে বেরোল ও, বুঝতে পারছি না। আমি কথা দিচ্ছি, আর এমন ঘটনা ঘটবে না।
আবারও বাবার অনুরোধ রাখল পুলিশ। মায়ানেকড়েটাকেসহ বাবাকে গাড়িতে করে বাড়ি পৌঁছে দিল।
পুলিশ চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। তারপর সাবধানে, ছায়ায় গা ঢেকে বাড়ি ফিরে এলাম।
বসার ঘরের দরজা দিয়ে ভিতরে উঁকি দিলাম।
এটা তোমার দোষ নয়, রবিন। তুমি তো আর ইচ্ছে করে মায়ানেকড়ে হতে যাওনি। মোলায়েম- স্বরে বলতে বলতে মায়ানেকড়েটাকে খাঁচায় ভরছে বাবা। তাকে সহায়তা করছে কয়েকজন পুলিশ।
মায়ানেকড়ের মুখ থেকে লাঠিটা সরিয়ে আনল একজন। জালটা। সরাল আরেকজন। খাঁচার মেঝেতে পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে রইল। মায়ানেকড়েরূপী মানুষটা। আবার মানুষ হয়ে গেলে দড়ি খুলে দেয়ার কথা ভাবছে নিশ্চয় বাবা।
আরও শক্ত একটা খাঁচা জোগাড় করতে হবে তোমার জন্য, রবিন। দরজা লাগিয়ে তালা আটকে দিল বাবা। ভেবো না, সব ঠিক হয়ে যাবে।
পুলিশ চলে গেলে আমি ঘরে ঢুকলাম।
রেন, তুমি! হাঁ হয়ে গেছে বাবা। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, দুটো মায়ানেকড়ে! এতদিন একটা ধরতে পারছিলাম না, আর এখন আমার বসার ঘরে দু-দুটো মায়ানেকড়ে! আমি কী জেগে আছি?
লাফ দিয়ে আমার কাছ থেকে সরে গেল বাবা।
মেঝেতে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লাম। মৃদু গরগর করে বোঝানোর চেষ্টা করলাম, আমি তার কোন ক্ষতি করব না।

গুড, মোলায়েম স্বরে বাবা বলল। এ রকম শান্ত হয়ে থাকো। তাহলে কিছু করব না।
চেয়ারে বসল বাবা। আমার দিকে তাকাল আবার। খাঁচার মায়ানেকড়েটার দিকে তাকাল। আবার আমার দিকে ফিরল।
সরি, বিড়বিড় করল বাবা। আর কোন উপায় নেই আমার। তোমাদের দুজনকেই পুলিশের হাতে তুলে দিতে হবে।
ঝট করে মাথা উঁচু করলাম। বলে কী বাবা? যা বলছে, সত্যি সত্যি করবে সেটা?
সারা শহরে মানুষ, এতজনের জীবনের ঝুঁকি নিতে পারি না আমি। একজনকে সামাল দেয়াই কঠিন, দুজনের দায়িত্ব নিতে পারব না।
না! পুলিশের হাতে ধরা দেব না! কিছুতেই না! ভাবলাম।
আমি সত্যি দুঃখিত, বাবা বলল। সারাটা জীবন একটা মায়ানেকড়ে ধরার স্বপ্ন দেখেছি আমি। এ ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারিনি। ভুল করেছি, মস্ত ভুল। তার খেসারত এখন দিতেই হবে আমাকে। বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা নিচু করল বাবা।
মত বদলেছে বাবা। আমাদের নিজের কাছে রাখতে চাইছে না আর। কিন্তু আমি তার ছেলে। নিজের ছেলেকে পুলিশের হাতে তুলে দিতে চায়। মানতে পারছি না কোনমতে মত তাকে বদলাতেই হবে।
লাফিয়ে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল বারা। পায়চারি করতে করতে বলল, কী করতে হবে বুঝে গেছি। সব ঠিক হয়ে যাবে! কথাটা বলে যেন নিজেকেই সান্ত্বনা দিতে চাইল। যত বড় বড় ডাক্তার আছে, সবার কাছে যাব। ওঝার কাছে যাব। পীর-ফকির-দরবেশ, সবার হাতেপায়ে ধরব।
হ্যাঁ! আমি জানি! বাবা যে একটা উপায় বের করবেই, জানি। নিজের ছেলেকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়ে শান্তিতে থাকতে পারবে না।
এ-সব কিছুর জন্য আমি দায়ী, বাবা বলছে। সব দোষ আমার। আমি মায়ানেকড়ে ধরতে না গেলেই আর এই বিপদে পড়তে হত না। তবে এক হিসেবে ভালই হলো। তোমার সঙ্গে সঙ্গে রেনকেও হয়তো ভাল করতে পারব। দুজনকে জেলের ভিতর বন্দি করে রেখে ডাক্তার-বৈদ্যের খোঁজে দুনিয়া চষে ফেলব আমি! তোমাদের সুস্থ করে তারপর আমার শাস্তি।
টেলিফোনের কাছে গিয়ে দাঁড়াল বাবা। থাবা দিয়ে রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল। হ্যালো! থানা? আমি, রজার মিলফোর্ড। আমার ঘরে এখন দুটো মায়ানেকড়ে। লোক পাঠান। এখুনি নিয়ে যাক।
কোন ডাক্তার আমাদের ভাল করতে পারবে কিনা, নিশ্চিত নই। করতে না পারলে অকারণেই সারাটা জীবন জেলের ভিতর কাটাতে হবে। সেটা আমি পারব না।

সারাজীবন খাঁচায় আটকে থাকতে রাজি নই আমি। তারচেয়ে বাবাকে ঠেকাই, যাতে আমাদেরকে পুলিশের হাতে দিতে না পারে।
লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালাম।
হ্যাঁ হ্যাঁ, ও এখানেই আছে, টেলিফোনে বাবা বলছে।
রেনের দিকে তাকালাম। পা ছুঁড়ে দড়ি খোলার চেষ্টা করছে। বাবার কথা সে-ও শুনেছে। আমার মতই নিশ্চয় সারাজীবন খাঁচায় আটকে থাকতে রাজি নয়। গর্জন করে উঠল। হাঁ করা মুখের ফাঁকে লালা লেগে থাকা বড় বড় দাঁতগুলো চকচক করে উঠল।
ওর দাঁতের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বুদ্ধিটা মাথায় এল। কী করতে হবে বুঝে গেছি।
যা করার এখুনি করতে হবে। আমাদের দুজনের সমস্যার। সমাধান।
বাবার সাহায্য আমাদের দরকার হবে। তাকে দিয়েই খাঁচার তালাটা খোলাতে হবে।
আর সেটা করাতে হলে বাবাকেও আমাদের দলে আনতে হবে। মায়ানেকড়ে বানাতে হবে।
লাফ দিয়ে বাবার গায়ে পড়তে যা, ঠিক এই সময় দরজার কলিং বেল বাজল।
খুলে দিল বাবা।
বাইরে থেকে শোনা গেল, এটা কি মিস্টার রজার মিলফোর্ডের বাড়ি?
আমি রজার মিলফোর্ড, বাবা বলল। আপনি?
আমি সেক্সটন ব্র্যাডম্যান, জবাব শোনা গেল। ভিতরে আসতে পারি? জরুরি কথা আছে।
আসুন, সরে পথ করে দিল বাবা।
একটা কালো ব্যাগ হাতে ঘরে ঢুকলেন একজন মধ্যবয়েসী ভদ্রলোক। গায়ে আলখেল্লা। চোখ দুটো কালো, চকচকে। লম্বা লম্বা। পায়ে এগিয়ে এলেন আমার দিকে।
চেনা চেনা লাগল তাঁকে। ওই আলখেল্লা, ওই চোখ, কোথায় দেখেছি?
হঠাৎ মনে পড়ে গেল। বনের ভিতর! ব্র্যাটভিয়ার বনে তাঁবুতে ঢুকে যে মানুষটা আমাকে অলৌকিক ক্ষমতাশালী দাঁত দিয়েছিলেন, ইনি সেই লোক, কোন সন্দেহ নেই।
আমার দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচালেন, দাঁতটা গলা থেকে খুললে কেন? বেনকে বাঁচাতে? সেজন্যেই তো অশুভ চিন্তা মাথায় ঢুকছে। এক্ষুনি তো তোমার বাবাকে কামড়ে দিতে যাচ্ছিলে।
আপনি...আপনি...বাবা বলল।

নাম তো বললামই। আমি একজন অকালটিস্ট। ভূতপ্রেত, ভ্যাম্পায়ার, মায়ানেকড়ে নিয়ে কারবার আমার, ওদের নিয়ে গবেষণা করি। ব্র্যাটভিয়ার বনে অনেক দিন থেকেছি। রবিন যে সাপুড়ের কেবিনে ঢুকেছিল, ওটা আমিই বানিয়েছিলাম।

তারমানে...তারমানে আপনিই সেই সন্ন্যাসী, যিনি অহঙ্কারী লোকটাকে মায়ানেকড়ে বানিয়েছিলেন? মনে মনে জিজ্ঞেস করলাম।

মুচকি হেসে মাথা ঝাঁকালেন ব্র্যাডম্যান। পরিষ্কার বুঝতে পেরেছেন আমার না-বলা প্রশ্ন। বললেন, পরে আবার সারিয়েও তুলেছি। প্রচুর শাস্তি হয়েছে ওর। পূর্ণিমার পর এসে আমার হাতেপায়ে ধরে কান্নাকাটি শুরু করল। অনেক করে ক্ষমা চাইবার পর ওকে ওই অভিশপ্ত জীবন থেকে মুক্তি দিয়েছি।

এগিয়ে এসে ব্র্যাডম্যানের দুই হাত চেপে ধরলেন মিস্টার মিলফোর্ড। প্লিজ, আপনি আমার ছেলেকে ভাল করে দিন! প্লিজ!

ভূতপ্রেত নিয়ে কারবার করা খুব বিপজ্জনক, মিস্টার মিলফোর্ড। কোনমতেই মায়ানেকড়ে ধরতে যাওয়া উচিত হয়নি আপনার। ভাগ্যিস, রবিনকে আমি বনে দেখে ফেলেছিলাম। ওকে ভাল লেগে গিয়েছিল। আমার চোখে না পড়লে মস্ত ক্ষতি হয়ে যেত ওর। যাই হোক, ওকে আর রেনকে আমি সারিয়ে তুলব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

কিন্তু গ্রীনহিলসে যে মায়ানেকড়ের উৎপাত হচ্ছে আপনি জানলেন কী করে?

টেলিভিশনে দেখে, ব্র্যাডম্যান জবাব দিলেন। খবরটা দেখে আর। এক সেকেন্ডও দেরি করিনি। পরের প্লেনটাই ধরেছি।

কাজটা করতে কোনও উপকরণ লাগবে?

সব আছে। শুরু করছি, তবে তার আগে কথা দিতে হবে আপনাকে, জীবনে আর এ-সব বিপজ্জনক কাজ করতে যাবেন না।

আরও করি? একবারে শিক্ষা হয়নি?

বেশ, আসুন এখন। আমাকে হেল্প করুন। মেঝেতেই বসে পড়লেন ব্র্যাডম্যান। কালো ব্যাগ খুলে তা থেকে তার জিনিসপত্র বের করতে শুরু করলেন।

প্রথমে তিন রঙের তিনটে চক দিয়ে চক্র আঁকলেন তিনি। তাতে বড় একটা তারা আঁকলেন। আমার দিকে তাকিয়ে ডাকলেন, রবিন, এসো। বোসো এই চক্রের ভিতর।

আমার ভিতর কোথায় যেন একটা আক্রোশ মতো তৈরি হচ্ছে। বিদ্রোহ করতে চাইছে মগজ।

ঝট করে একটা শিকড়ের টুকরো আমার দিকে উঁচু করে ধরলেন অকালটিস্ট। কঠিন দৃষ্টিতে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে ধমকে উঠলেন, জলদি এসো!

শয়তানি করে লাভ হবে না! এসো! এসো বলছি!
সেই চোখের দৃষ্টি অগ্রাহ্য করতে পারলাম না। শিকড়ের টুকরোটা যেন চুম্বকের মত টেনে নিয়ে চলল আমাকে। ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলাম। চক্রটার ভিতর ঢুকে তারাটার ওপর দাঁড়ালাম।
আমার মাথায় হাত রেখে বিড়বিড় করে কীসব পড়তে শুরু করলেন ব্র্যাডম্যান।
ঘোরের মধ্যে চলে যাচ্ছি...
হঠাৎ দেখি, ব্র্যাডম্যান ঘরে নেই। আমি সেই আগের মত বসার ঘরে দাঁড়িয়ে আছে। রেন খাঁচায় আটকানো। বাবা আমার দিকে পিছন ফিরে কাকে ফোন করছে। বোধহয় পুলিশকে।
উঁহু, আর সুযোগ হাতছাড়া করব না। আঁপিয়ে পড়লাম বাবার কাঁধে।
চমকে উঠল বাবা। ব্যথায় চিৎকার করে উঠল। হাত থেকে খসে পড়ল রিসিভার।
তারপর দেখি, রাস্তা দিয়ে চারপায়ে দৌড়ে চলেছি আমি আর রেন। বাবা পিছন পিছন আসছে। মানুষই আছে। মায়ানেকড়ে হয়নি এখনও।
দুটো মায়ানেকড়ের গর্জনে জেগে উঠল আমাদের প্রতিবেশীরা। ঘরে ঘরে আলো জ্বলে উঠল। আতঙ্কিত হয়ে তারা দেখল, রাস্তা দিয়ে ছুটে চলেছে দুটো মায়ানেকড়ে আর একজন মানুষ। ঘোরের মধ্যে রয়েছে যেন মানুষটা।
থেকে থেকেই গর্জে উঠছে মায়ানেকড়ে দুটো।
রাতের ঠাণ্ডা বাতাসের মধ্যে দৌড়ে চলেছে।
দৌড়ে চলেছে উজ্জ্বল জ্যোৎস্নার মধ্যে।
কিছুক্ষণের মধ্যে বাবাও মায়ানেকড়ে হয়ে যাবে।
এভাবেই সমস্যাটার সমাধান করেছি আমি। জেলে যাওয়া ঠেকিয়েছি।
শহরের পাশে যে বন আছে, সেই বনটাই এখন আস্তানা হবে আমাদের।
তবে খুব বেশিদিন আমাদেরকে লুকিয়ে থাকতে হবে না, জানি। খুব শীঘ্রি আমাদের তিনজনের কামড়ে আরও অনেকে মায়ানেকড়ে হয়ে যাবে। তারাও কামড়াবে। মানুষ, পশু, যাকে পাবে তাকেই। সারা শহরে একটা প্রাণীও আর স্বাভাবিক থাকবে না। পুলিশও না।
দেখতে দেখতে এক আজব শহরে পরিণত হবে আমাদের শহরটা।
মায়ানেকড়ের শহর!
বনে ঢুকলাম। দেখি, নেকড়েতে গিজগিজ করছে বন। কিন্তু ওরা কেউ আমাদের বন্ধু হলো না। আমাদের দেখেই কামড়াতে এল।
আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠলাম।
শীত করতে লাগল। ভীষণ ঠাণ্ডা। কাঁপুনি উঠে গেছে...

ঘোর কেটে গেল। চোখ মেলে দেখি ঘরের মেঝেতে পড়ে আছি। আমার মুখের ওপর ঝুঁকে রয়েছেন মিস্টার ব্র্যাডম্যান। আমাকে চোখ মেলতে দেখে হাসলেন। ফিরে তাকালেন পাশে বসা বাবার উদ্বিগ্ন। মুখের দিকে। বললেন, মিস্টার মিলফোর্ড, ও ভাল হয়ে গেছে। নিয়ে গিয়ে ওকে ওর ঘরে শুইয়ে দিন। কম্বল দিয়ে ভালমত ঢেকে দেবেন। তাহলেই কাঁপুনি বন্ধ হয়ে যাবে।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙলে দেখি নিজের বিছানায় শুয়ে আছি। নাস্তার টেবিলে বাবা জানাল, ব্র্যাডম্যান চলে গেছেন। রেনকে সুস্থ করে নিয়ে গেছেন ব্র্যাটভিয়ায়। বলে গেছেন, ভয় নেই, আর কখনও মায়ানেকড়ে হব না আমি।

***

তিন গোয়েন্দা ভলিউম ১০৯/২ – টি-রেক্স-রহস্য – কাহিনি রচনা : কাজী শাহনূর হোসেন / রূপান্তর : শামসুদ্দীন নওয়াব – সেবা প্রকাশনী – প্রথম প্রকাশ : ২০০৯

হাই স্কুলের উদ্দেশে হনহন করে এগোচ্ছে কিশোর, মুসা আর রবিন। জুলাইয়ের তিন তারিখ। সবার পরনে টি-শার্ট আর শর্টস। ফিতেয় বাঁধা বাঘা সবার আগে আগে চলেছে। কান দুটো ঝুলে পড়েছে ওর। পথে যা পাচ্ছে শুঁকছে।

ইস, টনির সাথে কখন যে দেখা হবে, বলল কিশোর, তর সইছে না আমার।

টনি হার্পার রাশেদ পাশার বন্ধুর ছেলে। মন্টানায় থাকে।

পোস্টকার্ডে বলেছে আমাদের জন্যে কী নাকি বিশাল এক। সারপ্রাইয আছে। কী সেটাই তো বুঝতে পারছি না, বলল রবিন।

চিঠিটা পড়ে শোনাও, মুসা বলল কিশোরকে।

পকেট থেকে পোস্টকার্ডটা বের করল কিশোর। ওরা প্লিজেন্ট স্ট্রীটে থমকে দাঁড়াতেই জোরে জোরে পড়ল ও:

হাই, কিশোর, মুসা, রবিন

আমি জুলাইয়ের ৩ তারিখে গ্রীনহিলসে বিশাল এক সারপ্রাইয নিয়ে হাজির হব। দুপুরবেলা আমার সাথে হাই স্কুলের মাঠে দেখা কোরো। এখন বিদায়।

তোমাদের বন্ধু

টনি

সারপ্রাইযটা হয়তো বড়সড় কোন পিত্যা, বলল মুসা।

তুমি তাই দোয়া করতে থাকো, বলল রবিন।

ওই যে মিস্টার থিয়োডর প্যান্ট, বলল কিশোর। সেণ্টার পার্কের দিকে ঘুরে চাইল। ওদের বন্ধু থিয়োডর প্যান্ট দাঁড়িয়ে গোলাপ বাগানে। হাতে ওয়র্ক গ্লোভস আর বেলচা। তার কুকুর রুড সোয়ান পণ্ডের হাঁসগুলোর দিকে চেয়ে রয়েছে।

কিশোর ফিতে ছেড়ে দিতেই বাঘা দৌড়ে গেল খুদে কুকুরটার কাছে।

হাই, মিস্টার প্যান্ট, ডাকল রবিন।

কী খবর তোমাদের? সাদাচুলো ভদ্রলোক বললেন। কাল রাতে, ফায়ারওয়র্ক দেখবে না? সুইমিং পুলের পাশে ওরা সেটআপ করছে। দেখলাম।

আমরা সবাই যাব, বলল মুসা। আপনি আর রড যাবেন তো?

আমি যাব, বললেন মি. প্যান্ট। কিন্তু বুড়ো রুড বাসায় থাকতেই ভালবাসে। শব্দ পছন্দ করে না ও।

বাঘাও বাড়িতে থাকছে, জানাল কিশোর। ও তো জন্মদিনের মোমবাতিও সহ্য করতে পারে না!

মি. প্যাণ্ট মৃতপ্রায় এক গোলাপ চারা খুঁড়তে লাগলেন। পাতা। কিংবা কুঁড়ি কিছুই নেই ওটার। ঠেলাগাড়ির উপরে তরতাজা এক গোলাপ চারা দেখা গেল। নতুন

পাতা চকচক করছে।
নতুন চারাটা প্ল্যান্ট করতে হাত লাগাতে চাও? ওদের উদ্দেশে প্রশ্ন করলেন মি. প্যান্ট।
ঘড়ি দেখল কিশোর।
চাই, কিন্তু আমাদের এক বন্ধু আসবে হাই স্কুলে। ওর সাথে দেখা করতে হবে। ওর নাম টনি হাপার। ভবিষ্যতে টিচার হওয়ার জন্য পড়াশোনা করছেন।
মন্টানা থেকে আমাদের জন্যে সারপ্রাইয নিয়ে এসেছে, বলল। রবিন।
এখানে বেশি সময় লাগবে না, মি. প্যান্ট বললেন। ঝটপট কাজ ভাগ করে দিলেন তিনি।
গর্তের ভিতরে এক মুঠো সার ঢালল রবিন। কিশোর বেলচা দিয়ে গর্তে খানিকটা আলগা মাটি ভরল। মুসা গর্তটায় পানি দিল গার্ডেন হোস দিয়ে।
আজ রাতে হয়তো বৃষ্টি হবে, মেঘের দিকে চোখ তুলে চেয়ে বললেন মি. প্যান্ট।
নতুন চারাটা ঠেলাগাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গর্তে বুনলেন তিনি। লক্ষ রাখলেন চারা যাতে সিধে হয়ে থাকে।
দারুণ দেখাচ্ছে, বললেন মি. প্যান্ট। তোমরা তিনজন দুর্দান্ত গার্ডেনার। কিশোর, তুমি হুইলবারোটা শেডে রেখে এসো, আমি মাটি ভরছি।
কিশোর বেলচাটা মি. প্যান্টের হাতে দিয়ে ঠেলাগাড়িটা ঠেলে নিয়ে গেল গার্ডেন শেডের কাছে। পুরানো এক স্ক্রুড্রাইভার দরজাটাকে আটকে রেখেছে। কিশোর দরজা খুলে ভিতরে ঢুকিয়ে দিল হুইলবারোটা।
ঠাসাঠাসি অবস্থা ছোট্ট শেডটার। তাকগুলোতে রাখা পট, জার, সারের থলে, পেইল, গার্ডেনিং সংক্রান্ত বই, এবং যন্ত্রপাতি। ইটের মেঝেতে আঁকশি, বেলচা, গোটানো হোস আর গার্ডেনিঙের সাজ সরঞ্জাম।
শেডের পিছন দিকে একগাদা খালি বারল্যাপ ব্যাগের গায়ে ঠেলাগাড়িটাকে ঠেস দিয়ে রাখল কিশোর। এবার ক্রুড্রাইভারটা যথাস্থানে বসিয়ে চলে এল।
কিশোর অন্যদের কাছে যেই পৌঁছেছে, অমনি লাল এক গাড়ি বাঁক ঘুরে হাই স্কুলের দিকে সাঁ করে চলে গেল। গাড়িটার হুডের নীচ থেকে ধোয়া বেরোচ্ছিল।
তোমাদের বন্ধু নাকি? মি. প্যান্ট প্রশ্ন করলেন। মন্টানা থেকে ওটায় চেপে এসেছে?
আমরা এখন যাই, বলল কিশোর। টনির সাথে দেখা করবেন, মিস্টার প্যান্ট?
এখন নয়, বললেন মি. প্যান্ট। রুড আর আমি খেয়েদেয়ে একটু ঘুমাব। সাহায্যের জন্যে তোমাদেরকে ধন্যবাদ।
ছেলেরা বাঘাকে নিয়ে লাল গাড়িটার উদ্দেশে দৌড় দিল। ইতোমধ্যে থেমে দাঁড়িয়েছে ওটা। ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছে লম্বা এক তরুণ। মাথায় কোঁকড়া,

কালো চুল। চওড়া কাঁধ। পরনে টি-শার্ট, কাট অফ জিন্স, আর লাল হাই-টপ স্নিকার্স।
এটা তো টনি নয়, বলল কিশোর। তরুণের উদ্দেশে এগিয়ে গেল ওরা।
তরুণ ঘুরে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ল।
হাই, তোমরা নিশ্চয়ই কিশোর, মুসা আর রবিন। আমি রয় হাডসন। আমি টনি আর ওর বন্ধু জনের সঙ্গে কাজ করি। ওরা এখুনি এসে পড়বে।
রয় গাড়ির হুড খুলতেই আরও ধোঁয়া গলগল করে বেরিয়ে এল। সামনের সিট থেকে এক জগ পানি নিল ও, রেডিয়েটরের ক্যাপ খুলল। তারপর হঠাৎই চেঁচিয়ে উঠে মুখে আঙুল পুরল।
এতদিনে আমার শিক্ষা হওয়া উচিত ছিল, বলে মাথা নাড়ল। পকেট থেকে একটা ব্যাণ্ড-এইড বের করল। তারপর মোড়ক খুলে সবুজ ব্যাণ্ড-এইডটা আঙুলে পেঁচিয়ে লাগাল।
ঠিক এসময় লম্বা এক ফ্ল্যাটবেড ট্রাক রয়ের গাড়ির পাশে এসে থেমে দাঁড়াল। বাদামী এক তেরপলে ঢাকা ট্রাকের বেড, বিশাল, ফোলা কোন কিছুকে ঢেকে রেখেছে। গোটা জিনিসটা দড়ি দিয়ে বাঁধা।
ড্রাইভারের আসন থেকে নেমে এল লম্বা, পাতলা এক লোক। পরনে জিন্স, শর্ট-স্লীভ শার্ট, আর কাউবয় হ্যাট।
হাউডি, তিন বন্ধুর উদ্দেশে উদ্ভাসিত হাসল টনি। হাই! একসঙ্গে বলে উঠল ওরা।
প্যাসেঞ্জার্স সিট থেকে এক লোক নেমে এল। খাটো, ছিপছিপে লোকটির কালো চুল পনিটেইল করে বাঁধা। পরনে ওয়র্ক সুট, ব্যাগি শর্টস আর হাতা কাটা ফ্লানেলের শার্ট।
এ হচ্ছে আমার রুমমেট আর প্রিয় বন্ধু জন ওয়েদারবার্ড। বলল টনি। জন, এরা কিশোর, মুসা আর রবিন।
জন ট্রাকটাকে পাক খেয়ে ওদের দিকে এগিয়ে এল। মুখে বন্ধুভাবাপন্ন হাসি, চোখের মণি কালো। শার্টের পকেট কলম দিয়ে ঠাসা। বেল্টে আটকানো চাবির গোছা হাঁটার ফাঁকে টুংটাং শব্দ করল।
জনের সঙ্গে হাত মেলাল ছেলেরা। বাঘার সঙ্গে টনি আর জন পরিচিত হতেই দুজনকেই ভেজা চুমো উপহার দিল ও।
কাজে লেগে পড়া যাক, আকাশের দিকে চেয়ে বলল জন। মাঝরাতে বৃষ্টি নামবে, বাজি ধরতে পারি। দড়ি-দড়া খুলতে শুরু করল ও।
রয় ওর গাড়িতে উঠে পড়ল।
আসার পথে হোটেলটা পড়েছিল, বলল ও। যাই, রুমটা দেখে নিই। গাড়ি চালিয়ে চলে গেল ও। হুডের তলা থেকে এবার সামান্য ধোয়া বেরোল।

আমরা হাত লাগাব? প্রশ্ন করল রবিন।
জন মৃদু হাসল ওর দিকে চেয়ে।
তবে তো খুবই ভাল হয়।
আমরা দড়িগুলো খুলছি, তোমরা গোটাও, বলল টনি। মাটিতে শুইয়ে রাখলেই হবে।
বাঘাকে দাঁড়াতে বলে কাজে লেগে পড়ল ছেলেরা। কমিনিট বাদে সব দড়ি-দড়া খোলা হয়ে গেল। জন আর টনি তেরপলটা টেনে মাটিতে নামাল।
এ কিশোর যখন দেখল কী আছে ওটার নীচে তখন লাফিয়ে পিছ হটল। ও সরাসরি চেয়ে রয়েছে এক টির‍্যানোসরাসের মাথার দিকে!
এ হচ্ছে টিরোন, হেসে উঠে বলল টনি। একসঙ্গে জুড়লে ওকে আরও দারুণ দেখায়।
ঢোক গিলল কিশোর।
কোথায় পেয়েছেন ওটাকে? প্রশ্ন করল।
আমরা কিনেছি, বলল টনি।
দাঁত বের করে হাসল মুসা।
ডাইনোসর স্টোর থেকে?
না, যে টিরোনকে তৈরি করেছে তার কাছ থেকে, বলল টনি। সে চেয়েছিল একটা ডাইনোসর থিম পার্ক করবে, কিন্তু মাঝখানে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। পেপারে অ্যাড দিয়েছিল। তাই দেখে আমরা। টিরোন আর ট্রাকটা কিনেছি।
ইস, ডাইনোসর দিয়ে আপনারা কী করবেন? প্রশ্ন করল রবিন।
টাকা তুলব, বলল টনি। জন আর আমি বাচ্চাদেরকে ডাইনোসর সম্পর্কে শেখাব। ছোটখাট একটা জাদুঘর দেয়ার ইচ্ছে আছে। আমাদের।
টিরোন হবে তার প্রধান আকর্ষণ, যোগ করল জন।
টিরোনকে প্রথম যখন বার্নে দেখি তখন এখনকার মত টুকরো টুকরো ছিল। আমি একটা কম্পিউটার প্রোগ্রাম ডেভেলপ করে ওকে দিয়ে চলাফেরা করাচ্ছি, কথা বলাচ্ছি। ওকে নিয়ে গোটা দেশ ঘুরে টাকা জোগাড় করি আমরা, ডোনেশন তুলি।
রয়ও কি টিচার নাকি? প্রশ্ন করল কিশোর।
না, ওর সাথে আমাদের ওয়াইয়োমিঙে পরিচয়। ও কাজ খুঁজছিল, তাই ওকে হায়ার করেছি আমরা। জানাল টনি। ও হোটেল রুম বুক করা, ফ্লায়ার বানানো, শো করার পারমিশন জোগাড় করা এসব কাজ করে। জাদুঘর তৈরি হলে সেখানেও কাজ করতে চায় ও।
ট্রাক বেড়ে উঠল জুন।

টনি, এটাকে জুড়ে ফেলি এসো, বলল ও।
কীভাবে জোড়েন? প্রশ্ন করল কিশোর।
সোজা। ইরেক্টর সেট দিয়ে মডেল বানানোর মতই, জানাল জন। ট্রাক বেডে রাখা এক বাক্স বড় নাট, বোল্ট আর তার দেখাল ও।
টিরোন কীসের তৈরি? রবিনের প্রশ্ন। ভারী নাকি?
না, জানাল টনি। জনের কাছ থেকে টিরান্যোসরাসের লেজটা নিয়ে আলতো করে মেঝেতে শুইয়ে দিল।
বেশিরভাগটাই ফাইবার গ্লাস আর রবার। হাড়গুলো অ্যালুমিনিয়াম। দাঁত, পায়ের নখ আর চোখ প্লাস্টিকের।
ছেলেরা আলগোছে দুইঞ্চি লম্বা একটা দাঁত স্পর্শ করল।
দেখতে একদম সত্যিকারের মত! বলল মুসা।
সাবধান, কিছু কিছু কিনারা কিন্তু খুব ধারাল, বলল জন। হেসে সবুজ ব্যাণ্ড-এইডে মোড়া একটা আঙুল নাচাল।
রয়ের লাল গাড়ি হাজির হলে সবাই সেদিকে চাইল। রয় গাড়ির ভিতর থেকে এক গাদা কাগজ হাতে বেরিয়ে এল।
তোমরা হেল্প করবে? বলল ও। শহরে এই ফ্লায়ারগুলো ছড়িয়ে দিতে পারবে?
রবিনের হাতে ফ্লায়ারগুলো দিল রয়। সবচেয়ে উপরেরটায় চোখ রাখল ও। এক টিরান্যোসরাসের ছবির নীচে এই কথাগুলো লেখা:
এসো, কথা-বলা টিরান্যোসরাস টিরোনের সাথে পরিচিত হও!
হাই স্কুলের পিছনে, জুলাইয়ের ৪ তারিখে, দুপুরবেলা। মাথা পিছু এক ডলার করে দর্শনী।
তোমরা তিনজন ফ্রী পাবে, বলল টনি। রবিনের কাঁধের উপর দিয়ে চাইল।
খাইছে! বলল মুসা।
কাদেরকে দেব এগুলো? প্রশ্ন করল কিশোর।
যাকে খুশি, বলল রয়। যারা ডাইনোসর ভালবাসে।
রবিন ফ্লায়ারগুলো তিন ভাগ করল। সবাই একটা করে স্তূপ নিল।
আপনারা একটু বাঘাকে দেখে রাখবেন? প্রশ্ন করল কিশোর।
নিশ্চয়ই, জানাল রয়।
ছেলেরা ফ্লায়ার নিয়ে মেইন স্ট্রীটের উদ্দেশে এগোল।

.

এক ঘণ্টা বাদে ফিরে এল ওরা।
কালকে পুরো শহর টিরোনকে দেখতে আসছে! জানাল কিশোর।
খুব ভাল! ওকে এখন কেমন লাগছে তোমাদের? প্রশ্ন করল টনি।

পিছনের পা আর লেজের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে টিরোন। ওর দেহ আর লেজ একটা স্কুল বাসকে ছাড়িয়ে গেছে, ও লম্বায় প্রায় কিশোরদের বাড়ির সমান। বাঘা ওর একটা প্লাস্টিকের পায়ের নখ শুঁকছে।
কী বলব...মানে... কথা হারিয়ে ফেলেছে কিশোর। হেসে উঠল টনি আর জন।
এটা তো ছোট, বলল জন। প্রাপ্তবয়স্ক টি-রেক্স-এর চাইতে অনেক বড়। এসো, তোমাদেরকে দেখাই এটার পেটের ভিতরে কী আছে।
একটা চাবি বের করে টিরোনের একপাশে ছোট্ট এক ফুটোয় ঢোকাল ও। চাবি মোচড় দিতেই খুদে এক ধাতব রিং লাফিয়ে বেরিয়ে এল। জন রিংটা ধরে টানতেই কজা লাগানো এক দরজা হাট হয়ে খুলে গেল।
খাইছে! দেখাই যায়নি! বলে উঠল মুসা।
রবারের এক ওয়েজ তুলে নিল জন। দরজাটা খোলা রাখতে ব্যবহার করল ওটাকে! এবার দোরগোড়া দিয়ে হাত বাড়িয়ে টেনে নামাল ভাঁজ করা একসার কজা লাগানো সিঁড়ি।
দেখো, বলল ও।
ছেলেরা সিঁড়িতে হাঁটু গেড়ে বসে ডাইনোসরের পেটের ভিতর উঁকি দিল। দেয়ালগুলোকে সাপোর্ট দিচ্ছে অ্যালুমিনিয়ামের বার। এক সার হুক যন্ত্রপাতি, দড়ির কুণ্ডলী আর তার ধরে রেখেছে। কোন জানালা নেই। ভিতরে বেজায় গরম।
এক টুকরো কার্পেট দিয়ে আংশিক ঢাকা মেঝেটা। কার্পেটের মাঝখানে ছোট এক টেবিলের উপরে একটা ল্যাপটপ কম্পিউটার। মেঝের উপর দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে গেছে এক গোছা ধূসর কম্পিউটারের তার। কয়েকটা তার ডাইনোসরটার বুক বেয়ে উঠে উধাও হয়ে গেছে ঘাড় ও মাথার ভিতরে।
কম্পিউটার সব করে, বলল জন। আমি টিরোনের লেজ, মুখ। আর সামনের পা নাড়াতে পারি স্রেফ মাউস ক্লিক করে।
ছেলেদেরকে নিয়ে টিরোনের পেটের ভিতরে ঢুকল ও।
টিরোনের মাথায় একটা লাউডস্পিকার বসিয়েছি, ব্যাখ্যা করল জন। খুদে এক মাইক্রোফোন দেখাল ছেলেদেরকে। এতে কথা বললে মনে হয় টিরোন কথা বলছে।
খাইছে, ওকে দিয়ে এখন কথা বলাতে পারবেন? মুসার প্রশ্ন।
সেজন্য কালকে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে, বলল জন। আমরা জার্নি করে খুব ক্লান্ত। অন্তত দশ ঘণ্টা ঘুমাব।
ছেলেরা আর জন বেরিয়ে এল টিরোনের পেট থেকে। দরজা। লাগিয়ে দিল জন।
আপনারা কি শাংরি-লায় উঠেছেন? প্রশ্ন করল রবিন।

টনি আর রয় উঠেছে, বলল। আমি এখানেই বিছানা পেতে, নেব। ট্রাকের ভিতর থেকে একটা স্লীপিং ব্যাগ বের করে মাটিতে ফেলল ও।
আপনি বাইরে ঘুমান কেন? কিশোরের প্রশ্ন। দাঁত বের করে হাসল জন।
ওদের দুজনের নাক ডাকে, বলে টনি আর রয়কে ইঙ্গিতে দেখাল। তা ছাড়া তারার আলোয় ঘুমাতে ভাল লাগে আমার। প্লাস, টিরোনকেও গার্ড দেয়া হয়। সকালে আমি হোটেলে গিয়ে ওদের শাওয়ার ইউয করব।
ভাল বার্গার কোথায় পাওয়া যায় বলতে পারো? রয় জিজ্ঞেস করল ছেলেদের। আর সকালের নাস্তা?
কেলি'স ডিনার! এক বাক্যে জানাল কিশোর।
রবিন মেইন স্ট্রীটের দিকে আঙুল তাক করল।
ওটা পেট শপ আর ফিটনেস সেন্টারের মাঝখানে।
ধন্যবাদ। কালকে দেখা হবে, বলল টনি।
ওরা তিনজন লাল গাড়িটায় উঠল। মেইন স্ট্রীটের উদ্দেশে গাড়ি হাঁকাল রয়। এসময় মাথার উপরে বাজ গুড়গুড় করে উঠলে, বাড়ির দিকে দৌড় দিল তিন বন্ধু।
রাতে বাজের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল কিশোরের। জানালা দিয়ে ঝড় দেখতে লাগল ও। বিজলী চমকালে টিরোনের কথা ভাবলা-আঁধারে, বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে।
পরদিন সাড়ে এগারোটা নাগাদ হাই স্কুলে হাজির হয়ে গেল। কিশোর। মুখ তুলে চাইল টিরোনের দিকে। নীল আকাশের নীচে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে বিশাল টির‍্যানোসরাসটা। মুখ বন্ধ
দৃষ্টি দূরে প্রসারিত। রাতের ঝড়ের ফলে ঘাস এখনও ভেজা, সূর্যের তাপে মিশে যাচ্ছে কুয়াশা।
টনি, জন আর রয়কে আশপাশে দেখা গেল না। কিশোর ট্রাকটার কাছে গিয়ে জানালা দিয়ে উঁকি দিল। সিটের উপর ছড়ানো জনের স্লীপিং ব্যাগ।
একটু পরে, পৌঁছে গেল রবিন আর মুসা।
তার খানিক পরেই, টিরোনের পাশে লাল গাড়িটা দাঁড় করাল রয়। বেরিয়ে এসে হেঁটে এল ছেলেদের উদ্দেশে।
মর্নিং বলল সে। কী ঝড়টাই না হলে বাপরে বাপ!
মাটিতে বসে একজোড়া স্যাণ্ডেল পরল ও। ওর ভেজা জুতোজোড়া একসঙ্গে ফিতেয় বেঁধে ঝুলিয়ে দিয়েছে গাড়ির অ্যান্টেনা থেকে।
টনি আর জন সেন্টার পার্কের ভেতর থেকে হেঁটে বেরিয়ে এল।

হাই, টনি বলল ছেলেদের উদ্দেশে। রয়, তুমি দারুণ এক, ব্রেকফাস্ট মিস করলে। ওই কেলি দুর্দান্ত ওয়্যাফল বানায়া
মাথা ঝাঁকাল রয়।
আমার বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করছিল না।
একে একে দর্শকরা আসতে শুরু করেছে। মেরি চাচী, মিসেস আমান আর মিসেস মিলফোর্ডও এসেছেন।
দর্শক বাড়তে দেখে খুশি হয়ে উঠল টনি।
বাহ, চমৎকার! বলল ও। জন, তুমি টিরোনকে রেডি করো, আমি আর রয় টাকা কালেক্ট করি।
টনি আর জন দর্শকদের কাছ থেকে এক ডলার করে তুলল। হাত ভর্তি টাকা এসে গেলে ট্রাকের ক্যাবের ভিতরে তালা মেরে রেখে দিল। ওদের দুজনকে দুতিনবার করে কাজটা করতে হলো-এত দর্শক এসেছে।
খাইছে, ওরা বহুত টাকা কামাবে, বলল মুসা। এখানে অন্তত দুশো মানুষ আছে।
টনি ট্রাকবেড়ে উঠে পড়ল কর্ডলেস এক মাইক্রোফোন হাতে।
আসার জন্যে আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ, জানাল ও।
সবাই চুপ করলে পরে, টনি ব্যাখ্যা করল কেন ওরা টাকা তুলছে।
আমাদের জাদুঘরটা আগামী সামারের মধ্যে বানাতে চাই। আশা করি আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ ওটা দেখতে যাবেন। মাইকটা ডাইনোসরের দিকে তাক করল ও। আপনারা আমার বন্ধু টিরোনের সাথে পরিচিত হোন। টিরোন, তুই তোর সম্পর্কে দর্শকদের কিছু জানা।
কিছুই ঘটল না। টিরোন নীরবে ঠায় দাঁড়িয়ে। মুখে টু শব্দটি নেই।
টিরোন লজ্জা পাচ্ছে, বলল টান। এবার জোরাল গলায় বলল, টিরোন? বন্ধুদেরকে হাই বলবি না? লেজটা একটু নাড়া না।
কেউ কেউ হেসে উঠল, কিন্তু টিরোন নট নড়ন চড়ন নট কিছু।
ছোট দর্শকদের কেউ কেউ অসহিষ্ণু হয়ে উঠল। কিশোরের পিছনে বসা একটি ছেলে আওড়াল, টাকা ফেরত পাব কিনা কে জানে।
এবার হঠাৎই টিরোনের লেজটা ডান থেকে বাঁয়ে নড়ে উঠল। ওর
ছোট ছোট সামনের দুবাহু উপরে-নীচে দুলে উঠল। মুখ হাঁ হয়ে গেল। এবং টিরোন ভরাট কণ্ঠে বলে উঠল, হাই!
হাই, টিরোন! দর্শকরা বিপুলভাবে সাড়া দিল।
আমি কী ধরনের ডাইনোসর জানেন আপনারা? প্রশ্ন করল টিরোন। কিশোর চিনতে পারল জনের কণ্ঠ আসছে টিরোনের মুখ দিয়ে।
সবাই হাত তুলল।

টির‍্যানোসরাস! ছোট-বড় সবাই বলে উঠল।
ঠিক, আমি টির‍্যানোসরাস রেক্স। বলল টিরোন। আজ সকালে পেট পুরে নাস্তা করেছেন কতজন?
বেশিরভাগ মানুষ এক হাত ওঠাল।
ভাল, বলল টিরোন, প্রকাণ্ড মাথাটা নাড়ল। প্রায় সত্তর মিলিয়ন বছর আগে, আমি অন্যান্য ডাইনোসরদের দিয়ে নাস্তা সারতাম।
হেসে উঠল সবাই। টনি ট্রাক থেকে লাফিয়ে পড়ে তিন বন্ধুর সঙ্গে বসল।
জন ভাল জমিয়ে ফেলেছে, তাই না? বলল ও।
টিরোন তো দেখছি দারুণ কথা বলে, বলল কিশোর। মাথা ঝাঁকাল টনি।
হ্যাঁ, জন মেকানিকাল কিছু পেলে একেবারে জিনিয়াস। প্রথমটায় ভয় পাইয়ে দিয়েছিল আমাকে। আমি তো ভেবেছিলাম কম্পিউটারে গড়বড় হয়ে গেছে বুঝি।
ডাইনোসরদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে অনেক তথ্য দিল টিরোন। কী খেত, কীভাবে বাচ্চাদের বড় করত এসব আরকী।
শো প্রায় আধ ঘণ্টা চলল।
আশা করি আপনারা লাইব্রেরিতে গিয়ে ডাইনোসর সম্পর্কে আরও অনেক কিছু জানবেন, বলল টিরোন। খুদে খুদে বাহু নেড়ে বিদায় জানাল। আগামী গ্রীষ্মে আপনাদের সঙ্গে আমাদের মন্টানায় দেখা হবে।
বাচ্চাদের অনেকে চেঁচিয়ে উঠল, বাই, টিরোন! লোকজন বিদায় নিতে শুরু করল।
খাইছে, দারুণ লাগল! আপনারা এখন পর্যন্ত কতগুলো স্কুলে গেছেন? জিজ্ঞেস করল মুসা।
মাথা চুলকাল টনি।
মনে নেই, গোটা পঞ্চাশেক হবে বোধহয়। রয়ের কাছে হিসেব আছে। আমরা মন্টানায় ফিরে যাওয়ার আগে হয়তো আরও গোটা বিশেক স্কুলে শো করব।
জন টিরোনের পেটের ভিতর থেকে বেরিয়ে ওদের দিকে এগিয়ে এল।
দারুণ হয়েছে, সপ্রশংস কণ্ঠে বলল টনি। কিন্তু শুরুতে কী হয়েছিল?
শ্রাগ করল জন।
ল্যাপটপের একটা তার ঢিলে ছিল। কাজ করছিল না।
যাক, ফিক্স করতে পেরেছ এই বেশি, বলে উঠে দাঁড়াল টনি।
গরম লাগছে, যোগ করল। আইসক্রিম খেলে কেমন হয়? সব গোছগাছ করার পর কেলির ওখানে যাব আমরা, কেমন?
মুসার পোয়াবারো, বলল রবিন
আমরা কি কোন সাহায্য করতে পারি?

পকেট থেকে একটা প্লাস্টিকের ব্যাগ বের করল টনি। কাগজগুলো যদি কুড়াতে পারো ভাল হয়, বলল।
টনি যখন ট্রাকের দিকে এগোল, তিন বন্ধু ছড়িয়ে পড়ে কুড়োতে লাগল।
কিশোর দুমড়ানো মোচড়ানো এক ফ্লায়ার ভোলার জন্য ঝুঁকছে, এসময় একটা চিৎকার শুনতে পেল। মুখ তুলে চাইল ও। চিৎকারটা টিরোনের কাছ থেকে এসেছে, খোলা দরজার সামনে জড় হয়েছে টনি, জন আর রয়।
একশো ফীট দূর থেকেও কিশোর শুনতে পেল। টনির গলা, আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।
টিরোনের উদ্দেশে দৌড়ে গেল তিন বন্ধু।
কী হয়েছে? প্রশ্ন করল কিশোর!
আমাদের টাকা চুরি গেছে! বলল রয়।
খাইছে, যে টাকাটা এইমাত্র ওঠালেন? মুসার প্রশ্ন।
মাথা নাড়ল টনি।
না, সেটা আছে। রাবার ব্যাণ্ডে মোড়া মোটা দুটো টাকার তাড়া দেখাল ও। আগেকার টাকার সাথে এটা রাখতে গিয়ে দেখি টাকা নেই!
টিরোনের পেটের ভিতরে মেঝের দিকে আঙুল তাক করল কিশোর। টেবিল, চেয়ার আর কার্পেট সরানো হয়েছে। টেবিল-চেয়ার যেখানে ছিল মেঝের সেখানটায় এখন চৌকো এক গর্ত। কজা লাগানো এক দরজা খোলা, বেরিয়ে পড়েছে এক কম্পার্টমেন্ট। ফাঁকা।
টাকাগুলো এখানেই লুকিয়ে রাখতাম, বলল, জন। ডাফেল ব্যাগে ভরে। মন্টানা থেকে আসার পর থেকে এখানেই ছিল।
কত টাকা ছিল? প্রশ্ন করল মুসা।
টনির মুখের চেহারা ফ্যাকাসে।
এতদিন যা জমিয়েছিলাম সব, বলতে গিয়ে গলা কেঁপে গেল ওর। প্রায় পাঁচ হাজার ডলার।
ছজোড়া চোখ চেয়ে রইল ফাঁকা কম্পার্টমেন্টটার দিকে।
চোর এল কখন বুঝতে পারছি না, বলল রয়।
মুহূর্তের জন্য চোখ মুদল টনি।
ডাফেল ব্যাগটা কালকে ওখানে রেখেছিলাম, বলল ও। টিরোনকে সেটআপ করার পর।
তারমানে টাকাটা চুরি গেছে কাল বিকেল আর আজ সকালের মধ্যে, জানাল জন। ঘটনাটা কাল রাতে ঘটেনি, কারণ আমি এখানেই ঘুমিয়েছিলাম।

আমি অফিসার ফলেটকে ডেকে আনছি, বলল রবিন। উনি এখানকার পুলিস চীফ।
উনি আর এখন কী করবেন? প্রশ্ন করল টনি। টাকাটা তো অনেক আগেই চুরি গেছে।
অফিসার ফলেট অনেক বদমাশকে ধরেছেন, জানাল কিশোর।
মুসা মাটির দিকে চাইল, রোদের তাপে শুকিয়ে গেছে।
উনি এখান থেকে কিছু ক্লু পেতে পারেন, বলল ও।
পুলিস ডাকাই উচিত, টনি, বলল জন। টাকাটা ফেরত পাওয়ার জন্যে আমাদের সবরকম চেষ্টাই করতে হবে।
আমি এখুনি আসছি! বলে দৌড় দিল রবিন।
এই টাকায় কেউ হাত দিতে পারবে না, বলল টনি। শার্ট খুলে। নোটগুলো ভিতরে ঠেসে দিল।
মুসা কিশোরের বাহুতে চিমটি কাটল। ও মুখ তুলে চাইতেই মুসা ভ্রূ দেখিয়ে ওর সঙ্গে যেতে বলল।
মুসাকে অনুসরণ করল কিশোর।
বলতে খারাপ লাগছে, বলল মুসা, কিন্তু চুরিটা এই তিনজনের মধ্যে একজন করেছে। চিবুক দেখাল টনি, জন আর রয়ের উদ্দেশে।
ওরা চুরি করতে যাবে কেন? প্রশ্ন করল কিশোর। টনি আর জন সত্যি সত্যি জাদুঘরটা বানাতে চায়। আর রয় ওখানে কাজ করবে।
কিন্তু আর কার কাছে চাবি আছে, কিংবা টিরোনের ভিতরে যে গোপন জায়গা আছে সেটার কথা ওরা ছাড়া আর কে জানে? জোর দিয়ে বলল মুসা।
মাথা ঝাঁকাল কিশোর। ছোট্ট এক নুড়িতে লাথি মারল।
আমি বিশ্বাস করি না টনি এমন কাজ করতে পারে, বলল।
এসময় রবিন আর অফিসার ফলেটকে হন্তদন্ত হয়ে আসতে দেখা গেল। ডাইনোসরটার কাছে ফিরে গেল কিশোর আর মুসা।
অফিসার ফলেট নিজের পরিচয় দিয়ে পকেট থেকে নোটবুক আর কলম বের করলেন।
রবিনের কাছে সব শুনলাম, বললেন। তিন যুবকের দিকে চাইলেন, আপনাদের নাম জানতে পারি?
সবার নাম টুকে নিলেন অফিসার ফলেট
টাকাটা শেষবার কোথায় দেখেছেন বলতে পারবেন? প্রশ্ন। করলেন।
দরজা ভেদ করে ফাঁকা কম্পার্টমেন্টটা দেখাল জন।

ওখানে ছিল, শুধু যখন আমরা রাস্তায় থাকতাম তখন ট্রাকে আমাদের সাথে রাখতাম।
কাল বিকেলে ডাফেলটা কম্পার্টমেন্টের ভিতরে রেখেছি আমি, বলল টনি। তখনই শেষবার দেখেছি টাকাগুলো। না, টাকাগুলো ব্যাঙ্কে রাখলে ভাল হত না? অফিসার ফলেট প্রশ্ন করলেন।
আমরা ভেবেছিলাম ডাইনোসরের ভিতরেই টাকাগুলো নিরাপদ, বলল টনি। আমরা ছাড়া আর কেউ গোপন কম্পার্টমেন্টটার কথা জানত না। টাকাগুলো মন্টানায় আমার ব্যাঙ্কে রাখার ইচ্ছা ছিল।
কম্পার্টমেন্টটা কি লক করা ছিল? পুলিস চীফের প্রশ্ন। নোটবইতে টুকছেন।
মাথা নাড়ল টনি।
না, কিন্তু আমরা সব সময় বাইরের দরজাটা বন্ধ রাখি।
কি হোলটা পরখ করলেন অফিসার ফলেট। রবারের ওয়েজটা সরিয়ে কজার উপরে দরজাটাকে আগু-পিছু করলেন।
এই দরজার চাবি কার কাছে আছে? জিজ্ঞেস করলেন।
আমার কাছে একটা আছে, জানাল জন। চাবির রিং ট্যাপ করল।
নিজের চাবিগুলো তুলে ধরল টনি।
আর আমার কাছে আছে অন্যটা, বলল ও।
প্যাডে নোট নিলেন অফিসার ফলেট।
তো মিস্টার টনি কাল বিকেলে কম্পার্টমেন্টে টাকাগুলো রেখেছিলেন, বললেন তিনি। তারপর আজ সকালে, শো-র পরে, মিস্টার জন টাকা খুঁজতে গিয়ে দেখেন টাকা নেই। ঠিক?
না, ঠিক তা নয়, জানাল জন। শো-টা আমি করেছি, কিন্তু টাকা নেই সেটা প্রথমে জেনেছে টনি।
টাকাগুলো কাল রাতে চুরি হয়নি তো? অফিসার প্রশ্ন করলেন। আপনারা রাতে কোথায় ঘুমিয়েছিলেন?
রয় আর আমি হোটেলে ঘুমিয়েছি, জানাল টনি। টাকাটা ছিল কম্পার্টমেন্টে। সব সময় তাই থাকে। জন বাইরে ঘুমোয়। টিরোনকে পাহারা দেয়।
অফিসার ফলেটকে বিভ্রান্ত দেখাল।
টিরোন কে?
আমাদের ডাইনোসরটার নাম টিরোন, ব্যাখ্যা করল রয়।
অফিসার ফলেট জনের দিকে চাইলেন।
আপনি রাতে এখানে ঘুমিয়েছেন? বৃষ্টির মধ্যে?
মৃদু হাসল জন।

না, বৃষ্টি শুরু হলে স্লীপিং ব্যাগ নিয়ে ট্রাকের ভিতরে ঢুকে পড়ি।
অফিসার ফলেট প্যাডে আরও কী-সব নোট নিয়ে টনির দিকে ঘুরে চাইলেন।
আপনি যখন ঘুমাচ্ছিলেন তখন কেউ কি চাবিটা চুরি করতে পারে?
মাথা নাড়ল টনি।
দরজা বন্ধ ছিল।
জনের দিকে চাইলেন অফিসার ফলেট।
আপনার চাবি, মিস্টার জন? ওটা কোথায় ছিল, আপনি যখন এখানে ঘুমাচ্ছিলেন?
চাবির গোছাটা তুলে ধরল জুন।
স্লীপিং ব্যাগের ভিতরে আমার বেল্টে ক্লিপ করা ছিল, জানাল।
অফিসার ফলেট দরজাটা ধাক্কা মেরে খুলে কম্পিউটারের দিকে চাইলেন।
টিরোনকে অপারেট করে কে? জিজ্ঞেস করলেন।
আমি, জানাল জুন। আর আমার কম্পিউটার।
তো আপনাদের জানা মতে, আজ সকালে ডাফেল ব্যাগটা মেঝের। নীচে লুকানো ছিল, অফিসার ফলেট মত প্রকাশ করলেন।
হ্যাঁ, জানাল জন।
টিরোনের ভিতরে উঁকি দিলেন অফিসার ফলেট।
মিস্টার জন, আপনি লুকানো টাকার ঠিক ওপরে কম্পিউটার নিয়ে বসে ছিলেন, তাই না?
মাথা ঝাঁকাল জন।
তবে আমার ধারণা ততক্ষণে টাকা চুরি হয়ে গেছে, বলল ও।
শো-র পরে, টনি যখন টেবিল সরিয়ে কার্পেট টানে ডাফেল ব্যাগটা তখন হাওয়া।
অফিসার ফলেট ওয়েজটা যথাস্থানে রাখলেন যাতে দরজাটা ঈষৎ খোলা থাকে।
এবার তিন যুবকের দিকে চাইলেন তিনি।
আপনারা আমার অফিসে চলুন। আপনারা কাল এখানে আসার পর থেকে যা যা ঘটেছে সব আমাকে লিখে দেবেন। ছোটখাট বিষয়ও বাদ দেবেন না, যতই গুরুত্বহীন মনে হোক না কেন।
এতে কতক্ষণ লাগবে? প্রশ্ন করল রয়। আমাদের আরও অনেক স্কুলে শো করতে যেতে হবে কিনা।
তা হলে আর দেরি না করে আসুন আমার সঙ্গে, বললেন অফিসার ফলেট।
তিন বন্ধু তিন যুবককে পুলিস স্টেশনের দিকে যেতে দেখল। ওদের মাথার উপর দিয়ে টিরোন বড় বড় প্লাস্টিকের চোখ মেলে চেয়ে রয়েছে।

কী বিশ্রী ব্যাপার! বলল কিশোর। টনি এল আমাদের সাথে দেখা করতে আর ওর টাকা কিনা খোয়া গেল।
কেউ কাজটা করল কীভাবে মাথায় আসছে না, রবিন বলল। কাল বিকেলে আমরা সবাই এখানে ছিলাম, আর জন টিরোনকে রাত্রিবেলা পাহারা দিয়েছে। তা ছাড়া, শো-র সময় ও টিরোনের ভিতরে বন্ধ অবস্থায় ছিল।
হয়তো জনই চোর, বুলল মুসা। কাল রাতে কিংবা আজ শো-র সময় হয়তো কাজটা করেছে। দরজা বন্ধ হবার পর ও কী করেছে কেউ জানে না।, কিন্তু আমরা তো জানি ও কী করেছে, বলল কিশোর। কম্পিউটার নিয়ে কাজ করছিল, নইলে টিরোন নড়ত না, কথাও বলত না।
তা ঠিক, বলল মুসা। টিরোন প্রথমে কয়েক মিনিট নড়েনি, মনে, আছে? জন তখন হয়তো ডাফেল ব্যাগটা সরাচ্ছিল!
মাথা নাড়ল কিশোর।
জন ওর প্রিয় বন্ধুর টাকা চুরি করবে বলে মনে হয় না।
ঠিক এসময় অফিসার কীন তাঁর ক্রুজারে চেপে পৌঁছলেন। এক গাদা হলদে টেপ আর কাঠের কটা স্টেক নিয়ে নেমে এলেন গাড়ি থেকে।
হাই, কিডস, বললেন তিনি। উত্তেজনার খোরাক পাওয়া গেছে, তাই না?
টেপ আর স্টেকগুলো মাটিতে নামিয়ে রেখে টিরোনের কাছে হেঁটে এলেন। ওয়েজটা তখনও যথাস্থানে ছিল, দরজাটা আরেকটু ফাঁক করার সুযোগ দিল তাঁকে। ভিতরে উঁকি দিলেন তিনি।
বাপরে, ভিতরে পাই বেক করা যাবে, বললেন। টিরোনকে ঘিরে মাটিতে স্টেক খুঁজতে শুরু করলেন অফিসার। কীন। এবার স্টেকগুলোতে ক্রাইম-সিন টেপ দিয়ে ঘিরে দিলেন। ডাইনোসরটাকে।
চলো, কেলির ওখানে যাই, বলল মুসা। আমার মগজ একটা ড্রিঙ্ক চাইছে।
সেন্টার পার্কের ভিতরে ঢুকে পড়ল ছেলেরা। হাঁটছে।
জনকে তোমার সত্যিই চোর মনে হয়? মুসাকে প্রশ্ন করল রবিন।
হ্যাঁ, জানাল মুসা। ওর কাছে চাবি আছে, আর টাকা কোথায় লুকানো থাকে তাও ওর জানা।
রয়ের ব্যাপারে কী ভাবছ? ও টনি কিংবা জনের চাবি দিয়ে কাজট করতে পারে না? প্রশ্ন করল নথি।
করার সুযোগ থাকলে ওরা অফিসার ফলেটকে কথাটা জানাত, বলল মুসা।
চোর অন্য কেউও তো হতে পারে, বলল কিশোর। ডালা খুলতে জানে এমন কেউ।
কিন্তু জন বাইরে ঘুমোচ্ছিল, বলল রবিন। ওর পাশ দিয়ে চোর আসবে কীভাবে?

সেজন্যেই আমি জনকে সন্দেহ করছি, বলে কেলিস ডাইনারের দরজা টেনে খুলল মুসা।
জানালার কাছে এক বুঁদ দখল করল ওরা। একটা টিরোন ফ্লায়ার টেপ দিয়ে কাঁচে সাঁটা। কেলি হাত নেড়ে এগিয়ে এল।
হাই, কেলি বলল। ডাইনোসর শো দেখতে যাওনি?
শো শেষ, বলল মুসা। কিন্তু ওদের টাকা চুরি গেছে।
মুসার পাশে বসল কেলি।
কে কার টাকা চুরি করল?
রবিন টিরোনের পেটে লুকানো টাকার কথা জানাল।
আহারে বেচারারা, উঠে দাঁড়িয়ে বলল কেলি। আজ সকালে ব্রেকফাস্ট করতে এসেছিল। তখন কী এক্সাইটেড দেখলাম ওদেরকে!
অফিসার ফলেট কেসটা দেখছেন, রবিন বলল।
গুড! মুসা, তোমার তো জিভ বেরিয়ে পড়েছে। ফ্রেশ লেমোনেড হলে কেমন হয়? জিজ্ঞেস করল কেলি।
ছেলেরা সায় জানালে, তিনটে উঁচু গ্লাস নিয়ে এল কেলি
স্ট্র দিয়ে লম্বা টান দিল মুসা।
তো তোমরা আমার সাথে একমত যে জনই চোর?
লেমোনেড নাড়ল কিশোর।
আমি নই। যে পাহারার দায়িত্বে ছিল সে এত বোকা নয় যে চুরি করবে, বলল ও। সেক্ষেত্রে আঙুল তো ওর দিকেই উঠবে।
মাথা ঝাঁকাল মুসা।
ও শো-র সময় ডাফেল ব্যাগটা নিয়ে থাকতে পারে, বলল ও।
কীভাবে? জিজ্ঞেস করল রবিন।
খুব সহজ, বলল মুসা। নিজেকে ও টিরোনের ভিতরে লক করে। টেবিল আর কার্পেট সরায় ও, ডাফেল ব্যাগটা নিয়ে, কার্পেট আর টেবিল জায়গামত রেখে দেয়। মাত্র এক মিনিটের কাজ।
তারপর? ডাফেল ব্যাগটা কোথায় রাখল? জবাব চাইল কিশোর।
মুসার দিকে চেয়ে রয়েছে ও আর রবিন, জবাব আশা করছে।
চোখ পিটপিট করল মুসা। চুমুক দিল লেমোনেডে। এ ব্যাপারটা এরকম ঘটেছে, বলল ও। জন টিরোনের ভিতরে ছোট্ট খুপরিটা বানিয়েছে, তাই তো বলেছে? ও যদি ওরকম আরেকটা খুপরি বানিয়ে থাকে, যেটার কথা শুধু ও-ই জানে? টাকাগুলো যদি ওখানেই লুকিয়ে রেখে থাকে!
মুসার দিকে চাইল কিশোর।

তুমি ভাবছ টাকা এখনও টিরোনের ভেতরেই রয়েছে?
হতেই পারে, বলল মুসা। কেউ তো ওখানে খুঁজবে না।
রবিন চাইল মুসার দিকে।
তোমার মত খুঁতখুঁতে স্বভাবের মানুষ ছাড়া।
চলো, টিরোনের ভিতরটা খুঁজে দেখি আমরা, লেমোনেল্ড শেষ করে বলল মুসা। আমার ধারণা যদি ঠিক হয়, তা হলে প্রথম সুযোগেই ব্যাগটা হাতিয়ে নেবে জন।
মুসার কথায় কিন্তু যুক্তি আছে, বলল রবিন। খুঁজে দেখতে অসুবিধে কী?
ছেলেরা টেবিলে টাকা রেখে, কেলির উদ্দেশে হাত নেড়ে, ফিরে চলল হাই স্কুলের দিকে।
একটু পরে, হলদে ক্রাইম-সিন টেপ দিয়ে ঘেরা টিরোনের দিকে চেয়ে রইল তিন বন্ধু। অফিসার কীন চলে গেছেন।
টেপের ভিতরে যাওয়া বেআইনী, বলল কিশোর।
আমরা বলব দেখিনি, বাতলে দিল মুসা।
হ্যাঁ, ঝকঝকে দিনের আলোয় হলদে টেপ চোখে পড়েনি তিনজনের কারওই বলল কিশোর।
আমরা রাতে আসতে পারি না? রবিন বলল।
মাথা নাড়ল কিশোর।
আজ রাতে আমরা বড়দের সাথে ফায়ারওয়র্ক দেখতে যাচ্ছি।
মুসা এক হাত দিয়ে কিশোরের কাঁধ জড়িয়ে ধরল।
হ্যাঁ, বলল ও। সবার চোখ যখন আকাশের দিকে তখন আমরা লুকিয়ে এখানে চলে আসতে পারি।
শেষমেশ সায় জানাল কিশোর।
আমি রাজি হচ্ছি শুধু টনির জন্যে, বলল ও।
এ সময় ছেলেদের কানে কুকুরের ডাক ভেসে এল। মি, প্যান্ট আর রুডকে পার্কের গোলাপঝাড় পরীক্ষা করতে দেখল ওরা। হাই বলার জন্য হেঁটে ওদিকে গেল তিন বন্ধু।
ডাকাতির কথাটা শুনেছেন? রবিন প্রশ্ন করল।
হ্যাঁ, ছেলেগুলোর জন্য খারাপ লাগছে, বললেন মি, প্যান্ট।
কোন সুরাহা হলো?
মাথা নাড়ল কিশোর।
তবে আজ রাতে হতে পারে, বলে কিশোরকে আলতো কনুই মারল মুসা।
ঝাড়গুলো সুন্দর লাগছে, বললেন মি, প্যান্ট। তবে এই মরা। চারাটা সরাতে হবে। কিশোর, তুমি একটু হুইলবারোটা আনবে?

শেডে দৌড়ে গেল কিশোর। ঠেলাগাড়িটা যেখানে রেখে গিয়েছিল সেখানেই রয়েছে, বারল্যাপ ব্যাগগুলোর গায়ে ঠেস দেওয়া। কিশোর বেরিয়ে আসবে, কাদামাখা পায়ের ছাপ চোখে পড়ল ইটের উপর।
ঠেলাগাড়িটা মি, প্যান্টের কাছে নিয়ে এল ও।
ধন্যবাদ, বলে মরা চারাটা ঠেলাগাড়িতে তুললেন মি. প্যান্ট। এটাকে স্কুলের ডাম্পস্টারে ফেলে দেব। এবার রুডকে নিয়ে হেঁটে চলে গেলেন।
ওই যে টনি আর রয়! বলে ডাইনোসরটার দিকে আঙুল তাক করল মুসা।
ওরা দুজন ক্রাইম-সিন টেপের সীমানার বাইরে দাঁড়িয়ে। টনি কী সব বলছে আর টিরোনের এক পাশের এক দরজার দিকে ইঙ্গিত করছে। জবাব দিচ্ছে রয়, মাথা নাড়ছে।
ছেলেরা কিছু শুনতে পেল না, দূরে রয়েছে। একটু পরে, দুই যুবক রয়ের গাড়িতে উঠে চলে গেল।
জন ওদের সঙ্গে ছিল না।
অফিসার ফলেই মনে হয় জনকে সাসপেক্ট হিসেবে আটকে, রেখেছেন, বলল কিশোর। পেটের ভিতরের মিষ্টি লেমোনেড হঠাৎই তেতো লাগল ওর।
বাড়ি ফেরার পথে ছেলেরা চুরিটা নিয়ে কথা বলল।
মুসা হঠাৎই থমকে দাঁড়াল। কালো চোখের মণিতে ধূর্ততার ছায়া।
জেনে ফেলেছি কে টাকা চুরি করেছে, ফিসফিস করে বলল ও।
কে? কিশোরের জিজ্ঞাসা।
টিরোন! বলল মুসা। সবাই যখন ঘুমিয়ে ও তখন ব্যাঙ্কে গিয়ে একটা ডাইনো ডিপোজিট করেছে!
মুসাকে ঠেলা দিল কিশোর। আর রবিন চোখ উল্টাল।
বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগে একসঙ্গে ফায়ারওয়র্ক দেখতে যাবে ঠিক করল ওরা।
আমার বাসায় স্লীপিং ব্যাগ নিয়ে চলে এসো, বলল কিশোর। চাচা-চাচী বলেছে ফায়ারওয়র্কের পর বাইরে ঘুমোতে পারি আমরা।
কালো পোশাক পরব, ঠিক আছে? বলল মুসা।
সাড়ে আটটায় মুসা আর রবিনের পরিবার মিলিত হলো : কিশোরদের বাসায়। পিকনিক টেবিলের উপর স্লীপিং ব্যাগ স্তূপ করে রেখেছে তিন বন্ধু। বড়রা এনেছেন ব্ল্যাঙ্কেট, পপকর্ন আর বাগ প্রে। এ তিনটি পরিবার মেইন স্ট্রীটে হেঁটে গিয়ে বয়ে মোড় নিল। বাঁয়ে আরেকটা মোড় ঘুরে সুইমিংপুলের দিকে পা চালাল। ওখানেই ফায়ারওয়র্ক সেটআপ করা হয়েছে।
তোমরা তিনজন কালো ড্রেস পরেছ কেন? মি. মিলফোর্ড প্রশ্ন করলেন। তোমাদেরকে নিনজার মত লাগছে।

মশা যাতে না কামড়ায় সেজন্যে, বলল রবিন। কিশোরের দিকে। চাইল।
অন্যদেরকে পিছনে নিয়ে হাঁটছে তিন গোয়েন্দা।
ভাল বলেছ, কেউ শুনছে না নিশ্চিত হয়ে বলল মুসা।
একটু পরে, সবাই হাজির হলো টাউন পুলে। কয়েকশো লোক ইতোমধ্যেই জড় হয়েছে। পুলের কাছে, টেনিস কোর্ট আর বেসবল মাঠে ব্ল্যাঙ্কেট আর চেয়ারের ছড়াছড়ি।
ফায়ার ট্রাক কাছেই পার্ক করা, যদি দরকার পড়ে।
টনি, জন আর রয়কে দেখতে পাচ্ছি, বলল মুসা।
বেসবেল মাঠ ঘিরে রাখা ফেলে হেলান দিয়ে বসা ওরা। চলো ওদের সাথে বসি।
তা সম্ভব নয়, বলল রবিন। পরে আমাদেরকে পালাতে হবে না?
তা হলে অন্তত হাই বলি চলো, বলল কিশোর।
হ্যাঁ, জনকে অপরাধী মনে হয় কিনা সেটাও দেখা যাবে, মন্তব্য করল মুসা।
ছেলেরা ব্ল্যাঙ্কেট আর চেয়ার এড়িয়ে পথ করে নিল। টনি সবার আগে ওদেরকে দেখতে পেয়ে উঠে দাঁড়াল।
হাউডি, হাত নেড়ে বলল ও। আমাদের সাথে বসবে? রয় আর জনও হাই বলল, কিন্তু উঠে দাঁড়ায়নি।
ইচ্ছে ছিল, কিন্তু পারব না, বলল মুসা। বাবা-মার সাথে থাকতে হবে।
অফিসার ফলেট ভাল মানুষ, বলল টনি। আমার বিশ্বাস উনি টাকাটা বের করতে পারবেন। আমরা টিরোনকে নিয়ে কাল চলে যাচ্ছি।
কোথায়? প্রশ্ন করল রবিন।
প্রথমে নিউ হ্যাঁভেন, তারপর অন্যান্য শহরে, বলল রয়।
আমাদেরকে আরও অনেক টাকা কামাতে হবে তো।
জন আলোচনায় যোগ দিল না। ওর চোখজোড়া সামনের দিকে স্থির।
গুড ইভনিং, একটি কণ্ঠ বলল। শাংরি-লা হোটেলের ম্যানেজার মি. লিস্টার। কফীট দূরে এক লন চেয়ারে বসে আছেন তিনি। সবাই হাই বলল। রুমটা কমফোর্টেবল লাগছে তো? টনি আর রয়ের উদ্দেশে বললেন মি. লিস্টার।
চমৎকার, জবাব দিল টনি।
ঠিক এসময় মাথার উপরে আকাশ নীল আলোয় আলোকিত হয়ে গেল।
উহ! চেঁচিয়ে উঠল দর্শকরা।
ওরা শুরু করছে! বলল রবিন। আমরা যাই।
কালকে কেলির ওখানে ব্রেকফাস্ট করলে কেমন হয়? টনি প্রশ্ন করল। তোমাদের সাথে দেখা না করে যেতে চাই না।
ঠিক আছে। কখন? বলল কিশোর।

আমাদেরকে ভোরে উঠতে হবে টিরোনকে পার্ট পার্ট করে ট্রাকে তোলার জন্যে, বলল টনি। নটা হলে কেমন হয়?
আমরা পৌঁছে যাব, বলল কিশোর। বড়দের সঙ্গে যোগ দিতে হাঁটা ধরল তিন গোয়েন্দা। টেনিস কোর্টের কাছে একটা জায়গা বেছে নিল ওরা। এখান থেকে তিন যুবকের উপর চোখ রাখতে পারবে।
টনি কী বলল শুনেছ? প্রশ্ন করল রবিন। কালকে টিরোনকে টুকরো টুকরো করবে ওরা!
কাজেই জন যদি ওখানে টাকা লুকিয়ে রেখে থাকে, তবে তার আগেই ওকে সেটা সরাতে হবে, বলল মুসা।
কথাটা অন্য কারও বেলাতেও খাটে, যোগ করল কিশোর।
জনই চোর, আমি তো বলছি, বলে চলল মুসা। ও কীভাবে চুপচাপ বসেছিল দেখনি? ও-ই দোষী।
ছেলেরা আরও কিছুক্ষণ ফায়ারওয়র্ক দেখল। মাথার উপরে আকাশ নানান রং ধারণ করছে-কালো, লাল, সাদা, নীল। জনতা হাততালি, শিস দিচ্ছে, চেঁচাচ্ছে।
আমাদের সটকাতে হবে, গলা খাদে নামিয়ে বলল মুসা। বড়সড় একটা ছুঁড়লেই।
একটু পরে, হলদে আলো ছড়িয়ে পড়ল আকাশে। সবাই চোখ তুলে দেখছে, আলগোছে সরে পড়ল তিন বন্ধু।
ইস্ট গ্রীন স্ট্রীট ধরে ছুট দিয়ে হাই স্কুলের লনে চলে এল ওরা।
চাঁদের আলোয় ডাইনোসরটার ছায়া বিস্তার পেয়েছে খেলার মাঠের মাঝামাঝি অবধি। ওদের পিছনে, আকাশ তখন আলোকিত। বাতাসের দোলায় স্টেকের গায়ে পতপত করে বাড়ি খাচ্ছে হলদে টেপ।
এখন কী? প্রশ্ন করল কিশোর। এখানে আসতে চাইনি আমি, শুধু তোমাদের জন্যে আসলাম।
আমিও, বলল রবিন, কিন্তু ডাফেল ব্যাগটা যদি এখনও টিরোনের ভিতর থেকে থাকে তবে আজ রাতেই ওটা আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে!
কাজটা সেরে ফেলা যাক, বলল মুসা। পাঁচ মিনিট লাগবে। টাকাটা খুঁজে না পেলে ফিরে গিয়ে ফায়ারওয়র্ক দেখব।
হলদে টেপের নীচ দিয়ে সন্তর্পণে ভিতরে ঢুকল ওরা। টিরোনের কালো ছায়া ঢেকে রেখেছে ওদেরকে। রবারের ওয়েজটা দরজাটাকে। এক ইঞ্চি খুলে রেখেছে। মুসা ওটা সরিয়ে দরজা খুলে দিল।
কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না! বলল কিশোর। আঁধারে কী খুঁজব আমরা?
দাঁড়াও, বলে পকেট থেকে খুদে এক ফ্ল্যাশলাইট বের করল রবিন। সুইচ অন করে, ভাঁজ করা সিঁড়ির পাশ দিয়ে আলো ফেলল টিরোনের পেটের ভিতরে।

টেবিল আর কার্পেট এখনও এক পাশে সরানো। কম্পার্টমেন্টের ঢাকনা তোলা, ভিতরটা ফাঁকা। রবিন এবার বাতি বন্ধ করল।
সিঁড়িটা টেনে নামাল কিশোর, এবং ওরা নেমে এল টিরোনের পেটে। কিশোর সিঁড়িটা ভাঁজ করতেই দরজা লাগিয়ে দিল মুসা।
অন্ধকার, গুমোট এক গুহায় এখন ওরা।
গরমে তো সেদ্ধ হয়ে গেলাম! আঁধারে অভিযোগ করল মুসা।
কিশোর বসেছে হাঁটুতে ভর দিয়ে। ছোট টেবিলটার উপরে রেখেছে একটা বাহু। ডাফেল ব্যাগের খুপরিটা সামনে, তবে দেখতে পাচ্ছে না।
কাজটা ঝটপট সেরে ফেলা যাক, বলল কিশোর। চাচা-চাচী টের পাওয়ার আগেই ফায়ারওয়র্কের ওখানে ফিরতে হবে।
রবিন ফ্ল্যাশলাইট রেখে ছোট্ট খুপরিটার মধ্যে আলো ফেলল।
মুসা, তোমার গোপন কম্পার্টমেন্টটা দেখাও, বলল ও।
চোখের সামনে নিশ্চয়ই থাকবে না, বলল মুসা। এমন জায়গা খোজো যেটার কথা কেউ ভাববে না।
হাঁটু গেড়ে বসে পিছনের দুপায়ের চারপাশটা হাতড়াতে লাগল। কিশোর। বড় বড় বোল্ট দিয়ে বাকি দেহের সঙ্গে জোড়া ও দুটো।
পাগুলো মনে হয় ফাপা, বলল ও।
মুসা হাতড়াতে হাতড়াতে একটা হাত ঢুকিয়ে দিল এক পায়ের মধ্যে।
এখানে কিছু নেই, জানাল।
অপর পা-টা খুঁজল কিশোর, কিন্তু ভিতরে কিছুই পেল না।
মাথার ভিতরে নেই তো? রবিন বলল। টিরোনের বুক আর ঘাড়ের কাছে উঠে এল ওর ফ্ল্যাশলাইটের আলো। উপরে একটা ফাঁকা গর্ত-মাথাটা যেখানে থাকে।
খুঁজে দেখা যাক, বলল কিশোর। উঠে দাঁড়িয়ে টিরোনের মাথার গর্তে হাত ভরার চেষ্টা করল। নাহ, নাগাল পাচ্ছি না।
এক সেকেণ্ড, বলল মুসা। ল্যাপটপ কম্পিউটারটা টেবিল থেকে নামিয়ে মেঝেতে রাখল। এবার কিশোরের দিকে ঠেলে দিল টেবিলটা।
টেবিলে উঠে আবারও হাত বাড়াল কিশোর। এবার বাহু অবধি ঢুকে গেল টিরোনের মাথার মধ্যে। হাতটা নাড়াচাড়া করল ও।
শুধু কম্পিউটারের তারের গোছা, বলল ও। তবে আমার হাত, নীচ পর্যন্ত যাচ্ছে না।
আমি ভিতরে ঢুকতে পারব? প্রশ্ন করল নথি।
মনে হয়, বলল কিশোর। মাথাটা ফাঁপা।
তোমার মাথার মত, হেসে বলল মুসা।

আমাকে উঠতে দাও, বলল রবিন। আমি টেবিলে দাঁড়াব, তারপর তোমরা আমাকে তুলে দেবে।
জায়গা বদলে নিল কিশোর আর রবিন। মুখে ফ্ল্যাশলাইট ধরে রাখল মুসা। ও আর কিশোর রবিনকে ঠেলে তুলে দিল টিরোনের গলার কাছে। মাথার ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল রবিন, শুধু দুপা বেরিয়ে রইল। এবার পা উধাও হয়ে গেল এবং নীচের দিক থেকে ওর মুখ উঁকি দিল বন্ধুদের উদ্দেশে।
এখানে তারের সাথে জোড়া একটা ছোট স্পিকার ছাড়া কিছু নেই, বলল ও। আর এক সার দাঁত।
দেয়ালের চারধারে আলো বুলাল মুসা।
টাকা লুকানোর কোন জায়গা তো দেখছি না, বলল ও।
তো কী করব আমরা? কিশোর প্রশ্ন করল।
আগে তাজা বাতাস নিয়ে নিই, বলল মুসা। কিশোরের হাতে ফ্ল্যাশলাইটটা দিয়ে দরজার দিকে পা বাড়াল।
ফ্ল্যাশলাইটটা বন্ধ করল কিশোর।
বেশি ফাঁক কোরো না। আমি ধরা পড়তে চাই না!
মুসা দরজাটা ঠেলা দিল। নড়ল না ওটা।
হেল্প, কিশোর, দরজাটা আটকে গেছে।
ছেলেরা দরজায় কাঁধ ঠেকিয়ে ধাক্কা দিল।
আমরা বন্ধ করার সময় মনে হয় বড় হয়ে গেছে, বলল মুসা। রবারের জিনিসটা দিয়ে ভোলা রাখতে ভুলে গেছিলাম আমরা।
কিশোর ফ্ল্যাশলাইট অন করে আলোটা ধরল রবিনের উদ্দেশে।
এটা তোমাকে দিলে মুখের ভেতর দিয়ে আলো ফেলতে পারবে? প্রশ্ন করল। চেঁচালে কেউ হয়তো শুনতে পাবে।
মাথা নাড়ল রবিন।
মুখটা বন্ধ।
আমাদেরকে অন্য কিছু ট্রাই করতে হবে, বলে ফ্ল্যাশলাইট দোলাল কিশোর। আমি এখানে সারা রাত থাকব না!
পেয়েছি, বলে উঠল মুসা। জনের কম্পিউটার ব্যবহার করতে হবে। টিরোনের মুখ খোলা গেলে মাইক্রোফোন আঁর স্পিকার দিয়ে সাহায্যের জন্যে চেঁচানো যাবে।
ফায়ারওয়র্কের যা শব্দ হচ্ছে, কেউ শুনবে না, বলল নথি। তবে আমার মাথায় আরেকটা আইডিয়া এসেছে। তুমি টিরোনের মুখ খুলতে পারলে আমি বেরিয়ে আসতে পারি।
রবিন, টিরোনের মাথাটা মাটি থেকে অনেক উঁচুতে, বলল কিশোর।

মুসার দিকে চাইল ও।
মই হিসেবে ব্যবহার করার মত কিছু আছে?
হঠাই কিশোরের হাত থেকে ফ্ল্যাশলাইটটা কেড়ে নিল মুসা। হুকগুলোর উপর না পড়া পর্যন্ত দেয়ালে আলো বুলিয়ে গেল।
যা ভেবেছিলাম, বলল ও।
কী? কিশোরের প্রশ্ন।
মুসা হাত বাড়িয়ে এক গোছা দড়ি নিল।
এটা দিয়ে রবিনকে টিরোনের মুখ থেকে মাটিতে নামানো যায়!
কিশোর রবিনের দিকে মুখ তুলে চাইল।
পারবে?
মাথা ঝাঁকাল রবিন।
টিরোনের মুখ অনেক বড়।
মুসার মুখের মত, বলে বন্ধুর দিকে চেয়ে হাসল গোয়েন্দাপ্রধান।
খুব মজার কথা বলেছ, বিরস কণ্ঠে বলল, মুসা। কিশোরকে ফ্ল্যাশলাইটটা দিয়ে, ল্যাপটপের সামনে বসে পড়ল। অন করে কটা কি চাপল।
স্ক্রীনে কয়েকটা আইকন ফুটে উঠল। একটায় লেবেল দেখা গেল: টিরোন। মুসা ওটাতে ক্লিক করতেই একটা উইণ্ডো এল, কয়েকটা চয়েস নিয়ে। তার একটা শব্দ হলো: মাউথ।
খাইছে, রেডি হও, রবিন, বলে উঠল মুসা।
মাউথ-এ ক্লিক করল মুসা। এক সেকেণ্ড পরে ঘর-ঘর করে একটা শব্দ শুনল কিশোর।
কাজ হয়েছে! চেঁচিয়ে উঠল রবিন। টিরোনের মুখ খুলে যাচ্ছে!
কিশোর ফ্ল্যাশলাইটটা মেঝেতে রেখে দড়ির এক প্রান্ত বাধল ফোল্ডিং সিঁড়ির সঙ্গে। মুসা অপরপ্রান্তে একটা লুপ তৈরি করল, রবিন যাতে ভিতরে ঢুকতে পারে। টেবিলে দাঁড়িয়ে রবিনকে লুপটা দিল ও।
ভয় পাচ্ছ না তো? প্রশ্ন করল কিশোর।
সোজা তো, বলল রবিন।
তুমি নামার জন্য রেডি না হওয়া পর্যন্ত আমরা দড়িটা ধরে রাখব, বলল মুসা। দাঁতগুলো থেকে সাবধান!
ওকে, আমাকে একটা মিনিট সময় দাও। রবিনের মুখটা অদৃশ্য হয়ে গেল। খানিকটা আলগা দড়ি ওর সঙ্গে নেমে গেল। অল রাইট। চেঁচাল ও। আমাকে আস্তে আস্তে নামাও।

ছেলেরা অনুভব করল রবিনের ওজন চাপায় দড়িটা শক্ত ঠেকছে। আস্তে আস্তে দড়িটা ছাড়ছে ওরা। হাতের তালু জ্বলছে কিশোরের।
এবার দড়িটায় পুরোপুরি ঢিল পড়ল।
নেমেছে ও? প্রশ্ন করল মুসা।
দুজনেই শুনতে পেল টিরোনের এক পাশের দরজায় কেউ ধুপ ধাপ শব্দ করছে।
আমি এখুনি আসছি! চেঁচাল রবিন।
কিশোর আর মুসা বাঁকা এক দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসল। ফ্ল্যাশলাইটের আলো ম্লান হয়ে আসছে, তাই কিশোর ওটা বন্ধ করে। দিল।
এখানে এয়ারকণ্ডিশনার থাকলে ভাল হত, বলল মুসা। টি-শার্ট দিয়ে মুখের ঘাম মুছল।
তোমার জন্যে খাবার ভর্তি ফ্রিজ থাকলে আরও ভাল হত, ফুট কাটল কিশোর।
হেসে ফেলল মুসা।
ছেলেরা আঁধারে বসে রইল। চোখে ঘাম ঢুকছে টের পেল কিশোর।
সেদ্ধ হয়ে গেলাম, গুঙিয়ে উঠল মুসা।
একটু সহ্য করো, বলল কিশোর। একটু পরে, বাইরে একটা শব্দ হতে শুনল ওরা।
ঢোক গিলল মুসা।
জন টাকাটা নিতে আসেনি তো?
কিশোর দরজার কাছে গিয়ে কান ঠেকাল। দরজাটা খুলে গেল, এবং কিশোর আরেকটু হলেই টনির গায়ের উপর পড়তে যাচ্ছিল।
ভাল বিপদেই পড়েছিলে তোমরা, বলে কিশোরের চোখে ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেললেন অফিসার ফলেট। ভাগ্যিস টনিকে ফায়ারওয়র্কের ওখানে পেয়েছিলাম।
টনি সিঁড়িটা নামিয়ে দিল, কিশোর আর মুসা যাতে মাটিতে নেমে আসতে পারে।
ধন্যবাদ, ভিতরে গলে যাচ্ছিলাম, বলল মুসা।
রবিন আমাদেরকে সব বলেছে, বলল টনি। তোমরা টাকাটা খুঁজে পাওনি।
মাথা নাড়ল কিশোর।
সরি।
আমার ধারণা চোর ব্যাগটা নিয়ে সটকে পড়েছে, বললেন অফিসার ফলেট।
মাথা ঝাঁকাল টনি।
ঘটনাটা ঘটেছে কাল রাতে আমরা ঘুমোতে যাওয়ার পরে, বলল ও। কিন্তু কীভাবে ঘটল বুঝতে পারছি না।
অফিসার ফলেট তার লাইটের আলো ফেললেন মাটিতে।
কাল রাতে বৃষ্টি হয়েছিল, বললেন।
চোর যদি পায়ের ছাপও রেখে যেত, সেগুলো ধুয়ে মুছে যেত।

পায়ের ছাপ, ভাবল কিশোর।
গার্ডেন শেডে ভেজা পায়ের ছাপ দেখেছি আমি, বলল ও। আঁধার ভেদ করে গোলাপ বাগানের দিকে আঙুল তাক করল। মিস্টার প্যাণ্টের জন্যে আমি হুইলবারো আনতে গেছিলাম।
তারমানে বৃষ্টির পর কেউ ওখানে ঢুকেছিল, বলল রবিন। এবং সেটা মাঝরাতে!
পায়ের ছাপগুলো হয়তো চোরের, বললেন অফিসার ফলেট। কিশোরের কাঁধে একটা হাত রাখলেন। চলো, আমাকে দেখাবে।
অন্ধকার লন পেরিয়ে দলটিকে পিছনে নিয়ে চলল কিশোর।
ওই যে, ছোট্ট গার্ডেন শেডটার কাছে পৌঁছে বলল ও।
তোমরা এখানে থাকো, মুসা, রবিন আর টনিকে উদ্দেশ্য করে বললেন অফিসার ফলেট। ওঁর ফ্ল্যাশলাইটের আলো ঝুঁড্রাইভারটা খুঁজে নিল। ওটা সরিয়ে দরজা খুললেন তিনি। আলো ফেললেন মেঝের উপর। কাদাটে, শুকনো পদচিহ্ন চলে গেছে দরজা থেকে শেডের পিছন পর্যন্ত।
এটা একটু ধরো, বলে ফ্ল্যাশলাইটটা কিশোরের হাতে দিলেন অফিসার। দরজার পাশে দাঁড়াও, যাতে আলোটা পাই আমি।
অফিসার ফলেট ভিতরে পা রেখে পদচিহ্ন পরীক্ষা করতে হাঁটু গেড়ে বসলেন। এবার শেডের ভিতর হাঁটাহাঁটি করে, একজন মানুষের লুকিয়ে থাকার উপযোগী সম্ভাব্য সব জায়গা নিরীখ করলেন।
শেডের পিছনে, ঠেলাগাড়িটা সরালেন তিনি। পায়ের পাতা দিয়ে খোঁচা দিলেন বারল্যাপ স্যাকগুলোর গায়ে। এবার কয়েকটা ব্যাগ সরিয়ে মেঝেতে রাখলেন।
কিশোর তাঁকে ঝুঁকে পড়ে অন্য ব্যাগগুলোর নীচ থেকে কিছু একটা বের করতে দেখলেন।
টনি, আপনি এখানে একবার আসুন, হাঁক ছাড়লেন।
দরজা দিয়ে মাথা গলিয়ে দিল টনি।
আপনারা কি এটাই খুঁজছেন?
অফিসার ফলেটের হাতে কালচে-বাদামী এক ডাফেল ব্যাগ। পেট মোটা, মনে হয় ভিতরে কিছু আছে। এক পাশে লম্বা এক যিপার।
টনির মুখে হাসি ধরে না।
হ্যাঁ, এটাই তো আমাদের ব্যাগ! সোল্লাসে বলে উঠল।
অফিসার ফলেট শেড থেকে ব্যাগটা বের করে মাটিতে রাখলেন। ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় যিপারটা খুললেন তিনি। ভিতরে রবার ব্যাণ্ডে বাধা নোটের তাড়া।
অফিসার ফলেট মুখ তুলে চাইলেন টনির দিকে।
এটা কি আপনার টাকা? প্রশ্ন করলেন। মাথা ঝাঁকাল টনি।

আশা করি পুরোটাই আছে।
ওটা কী? জিজ্ঞেস করল কিশোর। ক্যানভাস ডাফেলের এক পাশ দিয়ে ম্লান সবুজ কিছু একটা বেরিয়ে রয়েছে।
ব্যাণ্ড-এইড, বলল রবিন।
ছুঁয়ো না, সাবধান করলেন অফিসার। পকেট থেকে ছোট্ট এক প্লাস্টিকের ব্যাগ বের করলেন। কলমের নিব দিয়ে খুঁচিয়ে ব্যাগের ভিতরে ব্যাণ্ড-এইডটা ঢুকিয়ে, মুখ বন্ধ করে দিলেন।
জিনিসটা কার হতে পারে? অফিসার বললেন। প্লাস্টিক ব্যাগের উপর আলো ধরলেন।
রয় কালকে এরকম একটা ব্যাণ্ড-এইড পরেছিল, বলল রবিন। গাড়ির রেডিয়েটরে আঙুল পুড়ে গেছিল ওর।
আমি জনের আঙুলেও ওরকম একটা দেখেছি, জানাল মুসা।
আমরা সবাই এগুলো ইউয করি, বলল টনি। জিন্সের পকেট থেকে একটা ব্যাণ্ড-এইড বের করল ও।
টনির ব্যাণ্ড-এইড আর ব্যাগের ভিতরেরটা অবিকল একই রকম।
আপনারা সবাই এই একই ব্যাণ্ড-এইড ইউয করেন? অফিসার ফলেট টনিকে জিজ্ঞেস করলেন।
মাথা ঝাঁকাল টনি।
প্রায়ই আমাদের আঙুল কাটে, বলল টনি। তাই আমি এক বাক্স ব্যাণ্ড-এইড কিনেছি। সবাই কয়েকটা করে পকেটে রাখি।
অফিসার ফলেট ডাফেল ব্যাগটা এক ঝলক দেখে নিলেন।
ব্যাগটা শেষবার কার কাছে ছিল?
টাকাটা শুধু আমিই ব্যাগে রাখি, জানাল টনি। ব্যাগটা কম্পার্টমেন্টে রাখার সময় হয়তো আমার ব্যাণ্ড-এইড আঙুল থেকে খসে পড়ে গেছিল।
কিংবা হয়তো ব্যাগ চুরির সময় চোরের আঙুল থেকে ব্যাণ্ড-এইড খসে পড়েছে, বললেন অফিসার ফলেট। সেটা যে কেউই হতে পারে। টুনিকে খুঁটিয়ে লক্ষ করলেন।
কথা বলার আগে দুমুহূর্ত ভেবে নিল টনি।
আমাদের মধ্যে থেকে কেউ একজন চুরিটা করেছে বলে মনে হচ্ছে, বলল ও। কিন্তু আমি তো চুরি করিইনি, জন আর রয় করেছে। বলেও বিশ্বাস করি না।
ডাকাত কি অন্য কেউ হতে পারে? কিশোর জবাব চাইল।
কিন্তু কে? প্রশ্ন করলেন অফিসার ফলেট। টনি আর জন ছাড়া আর কারও কাছে তো ডাইনোসরের চাবি থাকে না।

হ্যাঁ, কিন্তু জন আমার প্রিয় বন্ধু, বলল টনি।
ছোট ব্যাগ আর কলমটা পকেটে চালান করলেন অফিসার ফলেট।
জন আর রয়ের মধ্যে কার পক্ষে ডাফেল ব্যাগটা হাতানো সহজ? প্রশ্ন করলেন টনিকে।
মাটিতে চোখ রাখল টনি।
মনে হয় জন, বিড়বিড় করে আওড়াল। কাল রাতে ও টিরোনের পাশে ঘুমিয়েছে।
টনির কাঁধে একটা হাত রাখলেন অফিসার।
আমি জনকে নিয়ে আসছি, আপনি ততক্ষণ আমার অফিসে ওয়েট করুন, বললেন। ও কি এখনও ফায়ারওয়র্ক দেখছে?
মনে হয়, জানাল টনি।
টাকাটা আমাদের সেফে থাকবে, কথার খেই ধরলেন অফিসার ফলেট। একটু পরেই থানায় আপনার সাথে দেখা হচ্ছে।
হতচকিত উনি ঘুরে দাঁড়িয়ে মেইন স্ট্রীটের দিকে হাঁটা দিল। কমুহূর্ত পরে মিশে গেল রাতের আঁধারে।
তিন গোয়েন্দার দিকে চাইলেন অফিসার ফলেট।
চলো, তোমাদের গার্জেনরা হয়তো চিন্তা করছেন।
তিন গোয়েন্দা অফিসারকে অনুসরণ করে তাঁর ক্রুজারের ব্যাকসিটে উঠল। অফিসার মেইন স্ট্রীট ধরে গাড়ি চালালেন।
সুইমিং পুলের আকাশে তখনও রঙিন আলো ছড়াচ্ছে আতশবাজি। টেনিস কোর্ট আর বেসবল মাঠের মাঝখানে গাড়ি পার্ক করলেন অফিসার।
ছেলেরা তাঁকে বেসবল মাঠের ফেন্সের দিকে পা বাড়াতে দেখে, বড়দের খুঁজতে গেল।
কীরে, এতক্ষণ কোথায় ছিলি তোরা? প্রশ্ন করলেন মেরি চাচী। আমি তো ভেবেছিলাম এলিয়েনরা তোদেরকে কিডন্যাপ করেছে বুঝি।
ঘড়ি দেখল কিশোর। ওরা প্রায় আধ ঘণ্টা গরহাজির ছিল।
অফিসার ফলেটকে দেখা যাবে এরকম এক জায়গা বেছে নিয়ে বসল ওরা। অফিসার হেঁটে গেলেন জনের কাছে, দুজনে দাঁড়িয়ে কথা বলল মিনিট খানেক। অফিসার এবার জনকে নিয়ে তাঁর ক্রুজারের উদ্দেশে এগোলেন। গাড়িটা মেইন স্ট্রীটে উঠে হারিয়ে গেল।
জন কাজটা করেছে বিশ্বাস হয় না, বলল রবিন।
ঘাসের উপর শুয়ে পড়ল মুসা।
টিরোনের এখন কী হবে তাই ভাবছি, বলল ও।
কী আর হবে, টনি আর রয় জনের জায়গায় অন্য লোক নেবে, বলল কিশোর।

রয় কোথায়? প্রশ্ন করল রবিন।
জনের সাথে ছিল না? পাল্টা জিজ্ঞেস করল কিশোর।
না, জানাল মুসা। শুধু জনকেই দেখলাম। রয় হয়তো হোটেলে ফিরে গেছে। ঝড়ের জন্যে কাল রাতে নাকি ঘুমোতে পারেনি।
কাল রাতের ঝড়ের কথা মনে পড়ল কিশোরের। শেডের মেঝেতে কাদাটে পদচিহ্নগুলোর কথাও মাথায় এল। আর কল্পনায় ভেসে উঠল সকালে, গাড়ির অ্যান্টেনা থেকে রয়ের ভেজা স্নিকার্স ঝোলার দৃশ্য।
আমার মনে হচ্ছে আমরা সবাই জনকে খামোকা দোষী ভাবছি, হঠাৎই বলে উঠল কিশোর। আমার ধারণা টাকাটা রয় চুরি করে গার্ডেন শেডে লুকিয়ে রেখেছিল!
কিন্তু ওর কাছে তো চাবি নেই, বলল মুসা।
আমার মনে হয় রয় জানত বৃষ্টি হলে জন বাইরে ঘুমোবে না। জন যখন বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচতে ট্রাক ক্যাবে ঢুকেছে, সে সময় রয় ঢোকে টিরোনের ভিতরে।
কীভাবে? রয়ের কাছে তো চাবি নেই, আবারও বলল মুসা।
টনি যখন ঘুমোচ্ছিল তখন রয় ওর চাবিটা হাত করে, বলল কিশোর। রয় ডাফেল ব্যাগটা চুরি করে শেডে লুকিয়ে রাখে, তারপর দৌড়ে হোটেলে ফিরে যায়। নিশ্চয়ই শেড থেকে ব্যাগটা নিয়ে টাকা। হাতাত।
হঠাৎই শ্বাস টানল রবিন।
রয় এখন হয়তো ওখানেই আছে! বলল ও। আমরা যেভাবে সটকে পড়েছিলাম সেই একই কায়দা করেছে ও!
চলো! বলল কিশোর। মিস্টিক গ্রীনহাউসের পাশ কাটিয়ে, বুক নুকের পিছন দিয়ে, গোলাপ বাগানের উদ্দেশে ছুটে চলল ওরা। দস্তুরমত হাঁফাচ্ছে, শেডের থেকে গজ দশেক দূরে, গোলাপ ঝাড়ের পিছনে ঘাপটি মেরে বসল তিনজন। খোলা দরজা দিয়ে আলোর রেখা বেরিয়ে এসেছে।
ভেতরে কেউ আছে! হিসিয়ে উঠল মুসা।
ছেলেরা পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল। বারল্যাপ ব্যাগগুলোর সামনে হাঁটু গেড়ে বসা এক ছায়ামূর্তি। লোকটা উঠে দাঁড়াতে বোঝা গেল ওটা রয়।
কী করা যায়? ফিসফিস করে বলল রবিন।
স্ক্রুড্রাইভারটা আছে, বলল মুসা। ওটা দিয়ে ওকে আটকে দেব!
না, চলো অফিসার ফলেটের কাছে যাই, বাধা দিয়ে বলল কিশোর।
মাথা নাড়ল মুসা।
অত সময় নেই! টাকাটা না পেলে রয় পগার পার হয়ে যাবে! গুঁড়ি মেরে শেডের দিকে এগোতে লাগল ও। আউচ! চেঁচিয়ে উঠল।
কী হলো? ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল রবিন।

কাঁটা!
আচমকা রয় ঝড়ের বেগে বেরিয়ে এল শেড থেকে। ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেলল মুসার উপরে। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই মুসার বাহু চেপে ধরল ও।
টাকাটা কী করেছ? কর্কশ কণ্ঠে জানতে চাইল।
ওকে ছেড়ে দিন! গর্জে উঠল রবিন। ও আর কিশোর দৌড়ে গেল মুসার পাশে।
হ্যাঁ, ওকে ছেড়ে দিন! ভরাট এক কণ্ঠস্বর গমগম করে উঠল। শেডের আড়াল থেকে উদয় হয়েছেন অফিসার ফলেট। সঙ্গে জন।
এক ঘণ্টা পর। কিশোরদের ব্যাকইয়ার্ডে স্লীপিংব্যাগে শুয়ে তিন গোয়েন্দা।
আমি এখনও বুঝতে পারছি না রয় টনির চাবি হাতাল কীভাবে, বলল রবিন।
খুব সোজা, বলল মুসা। আমি অনেক আগেই বুঝে গেছি।
কিশোর মাথা তুলে ওর দিকে চাইল।
দয়া করে বলবেন কি?
নাটুকে দীর্ঘশ্বাস ফেলল মুসা।
রয় শুনেছিল জন কাল রাতে বৃষ্টি হতে পারে বলেছে। ও জানত জন গা বাঁচানোর জন্য অন্য কোথাও আশ্রয় নেবে। তখনই টাকা চুরির বুদ্ধিটা মাথায় আসে ওর। টনি ঘুমিয়ে পড়লে চাবিটা নেয় সে।
কিন্তু রয় টনির রুমে ঢুকল কীভাবে? প্রশ্ন করল কিশোর।
ঢুকতে হয়নি, ওরা একই রুমে ঘুমিয়েছে, জানাল মুসা।
তুমি জানলে কীভাবে? রবিনের জিজ্ঞাসা।
হাসল মুসা।
মিস্টার লিস্টারের সাথে ফায়ারওয়র্কের ওখানে দেখা হয়েছিল, মনে আছে? উনি টনি আর রয়কে জিজ্ঞেস করেছিলেন রুমটা কেমন। রুমগুলো কেমন জানতে চাননি।
ভাগ্যিস অফিসার ফলেট সময় মত শেডে হাজির হয়েছিলেন, বলল কিশোর। উনি জানলেন কীভাবে যে রয়, ওখানে গেছে?
জন মনে হয় তাকে বোঝাতে পেরেছিল, বলল মুসা। জন হয়তো বুঝতে পেরেছিল চাবিটা হাতানোর একমাত্র সুযোগ রাতের বেলা, টনি যখন ঘুমিয়ে। আর জনের তো জানাই ছিল, টনি আর রয় একই রুমে থাকছে।
তোমার মাথায় বুদ্ধি ঠাসা, বলল কিশোর।
ধন্যবাদ, জানাল মুসা।
ইউ আর ওয়েলকাম, বলল কিশোর।
আমি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হলে তোমাকে এফ.বি.আই. চীফ করব, বলল রবিন।

হাই তুলল মুসা।
না, আমাকে বরং খাদ্যমন্ত্রী কোরো।
আঁধারে ফিক করে হেসে ফেলল তিন বন্ধু। মাথার উপরে তারা। মিটমিট করছে, ধীরে ধীরে ঘুমে তলিয়ে গেল ওরা।

তিন গোয়েন্দা ভলিউম ১০৯/২ – বনের ডায়েরি – শামসুদ্দীন নওয়াব – সেবা প্রকাশনী – প্রথম প্রকাশ : ২০০৯

গরমের এক দিনে পেনসিলভেনিয়ার ফ্রগ ক্রীকে রহস্যময় এক ট্রীহাউস উদয় হয়।

তিন গোয়েন্দা বেড়াতে গিয়েছিল হিরু চাচার বাসায়। ওরা ট্রীহাউসটা আবিষ্কার করে। ওখানে উঠে দেখে ওটা বই দিয়ে ঠাসা।

ওরা শীঘ্রি টের পায় ট্রহাউসটা জাদুর। বইয়ে উল্লেখিত বিভিন্ন জায়গায় ওদেরকে নিয়ে যেতে পারে। ওদের শুধু একটা ছবি নির্দেশ করে সেখানে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করতে হয়। ব্যস, পৌঁছে যায়। সেখানে।

ঘটনাক্রমে ওরা জানতে পারে ট্রীহাউসটা মরগ্যান লে ফে-র। সে রাজা আর্থারের সময়কার এক জাদুকরী লাইব্রেরিয়ান। টাইম আর স্পেসে ভ্রমণ করে বই জোগাড় করা তার কাজ। তারপর...

লাইব্রেরি থেকে ফ্রগ ক্রীক উডসের পাশ দিয়ে ফিরছিল তিন বন্ধু। বাঘা এবার ওদের সঙ্গে এসেছে। সে ছুটছে আগে আগে।

বাঘা! ডাক ছাড়ল কিশোর।

হুফ! হুফ! গর্জাল বাঘা। দৌড়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়ল।

চলো, ভিতরে যাই, প্রস্তাব করল মুসা।

তিন বন্ধু ছুটল বাঘার পিছু পিছু। শেষ বিকেলের আলোয় আলোকিত বনভূমি।

দড়ির এক মইয়ের কাছে থেমে দাঁড়িয়েছে বাঘা। সবচাইতে উঁচু এক ওক গাছ থেকে নেমেছে ওটা। পৌঁছেছে ম্যাজিক ট্রহাউসে।

তিন বন্ধুর জন্য অপেক্ষা করল বাঘা। হাফাচ্ছে। লেজ নাড়ছে।

ওকে কোলে তুলে নিল রবিন। তারপর চালান করে দিল কিশোরের ব্যাকপ্যাকে।

মুসা মইটা ধরে বাইতে শুরু করল। ট্রীহাউসে উঠে এল ওরা।

এবার আমরা কোথায় যাব? প্রশ্ন করল মুসা।

চারধারে নজর বুলিয়ে নিল কিশোর। মরগ্যান ওদের জন্য সবসময় একটা রিসার্চ বই রেখে যায়।

হুফ! হুফ! কোনায় পড়ে থাকা এক বইতে থাবা মারল বাঘা। কিশোর ওটা তুলে নিয়ে জোরে জোরে নামটা পড়ল: ওয়াইল্ড লাইফ অভ ইণ্ডিয়া।

খাইছে, ইণ্ডিয়া, বলে উঠল মুসা। সে তো বহুদূর।

হ্যাঁ, বাংলাদেশের পাশে, বলল কিশোর।

তবে আর দেরি কীসের? চলো রওনা হয়ে যাই, বলল নথি।

বইটার প্রচ্ছদে তর্জনী রাখল কিশোর।

আমরা ওখানে যেতে চাই, বলল।

বাতাস বইতে শুরু করল। ঘুরতে লাগল ট্রহাউসটা। বন-বন করে ঘুরছে। এবার সব কিছু নিথর। একেবারে স্থির। কিন্তু মাত্র এক মুহূর্তের জন্য...
কোলাহলে ভরে রয়েছে উষ্ণ বাতাস।
কাহ-কো!
ইইই-ইইই!
আক-অলক!
কী হচ্ছে এখানে? প্রশ্ন করল কিশোর।
জানালা দিয়ে বাইরে চাইল তিন বন্ধু। কমলা আভা ছড়িয়ে ডুবে গেছে সূর্য। জঙ্গলের কিনারে, নদীর ধারে এক গাছে এখন ট্রীহাউস। বনভূমির উঁচু গাছ-পালা থেকে নানা ধরনের শব্দ আসছে। ঠিক এসময় দুটো প্রাণী লাফিয়ে পড়ল জানালার ধারিতে।
খাইছে! চেঁচিয়ে উঠে, লাফিয়ে পিছু হটল মুসা।
হেসে ফেলল রবিন।
হুফ! হুফ! ডাক ছাড়ল বাঘা।
দুটো খুদে বানর উঁকি মেরে ওদেরকে দেখছে। কালো মুখে হালকা ধূসর পশম। দেখে মনে হলো খুদে পার্কা পরে রয়েছে।
হাই, বলল রবিন। আমি রবিন। ও কিশোর। ও মুসা। আর ও বাঘা। তোমাদের নাম কী?
কাহ-কো, কাহ-কো, বানর দুটো কিচিরমিচির করে বলল।
ভাল, বলল রবিন। বন্ধুদের দিকে চাইল। এদের নাম রানী আর টিটো রাখলে কেমন হয়?
ফাইন, বলল মুসা।
এরা মনে হয় ভাই-বোন, বলল রবিন।
রানী আর টিটো হু-হুঁপ শব্দ করল। মনে হলো রবিনের কৌতুক শুনে হাসছে। ওদের হলদে চোখ চিকমিক করছে।
বানর দুটো এবার গাছ থেকে নেমে যেতে লাগল। লম্বা লেজ আর বাহু ব্যবহার করে ডাল থেকে ডালে স্বচ্ছন্দে দোল খেয়ে চলে যাচ্ছে ওরা। মাটিতে লাফিয়ে পড়ে মুখ তুলে চাইল।
আসছি! বাঘাকে নিয়ে এসো, কিশোর, বলল রবিন। তারপর মই বেয়ে নামতে শুরু করল।
কিশোর চটপট ওয়াইল্ড লাইফ অভ ইণ্ডিয়া বইটার পাতা উল্টাল। ধূসর বানরদের একটা ছবি খুঁজে পেল ও। পড়ল:
এই জাতের বানরদের নাম লাঙ্গুর। এর অর্থ যার লম্বা লেজ আছে।

রবিনের হাসির শব্দ শোনা গেল নীচ থেকে। বনভূমির কল কাকলীর সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে ওর হাসির শব্দ।
হুফ! হুফ! ডাকল বাঘা।
ওকে, ওকে, বলল কিশোর।
বই আর বাঘাকে প্যাকে রাখল ও। এবার মই বেয়ে তরতর করে। নামতে লাগল। ওকে অনুসরণ করল মুসা।
নদী তীরে বানর দুটোর সঙ্গে খেলা করছিল রবিন।
কিশোর মাটিতে নামিয়ে দিল বাঘাকে।
রানী লাফিয়ে এগিয়ে এসে কিশোরের হাত ধরল। লাঙ্গুরটার থাবাটা অনেকটা মানুষের বাচ্চার হাতের মত।
রানী বনভূমির দিকে টানল কিশোরকে। আর টিটো টানল রবিনকে। ওদের পিছু পিছু ছুটল বাঘা। তার পিছনে মুসা পা বাড়াল।
লাঙ্গুর দুটো উঁচু, পাতাবহুল গাছে অনায়াসে উঠে পড়ছে। এবার ডাল থেকে ডালে দোল খেতে লাগল জাঙ্গল জিমের বাচ্চাদের মতন।
রবিন দৌড় দিল ঝুলন্ত বানর দুটোর নীচ দিয়ে। ওর পিছন পিছন ছুট দিল বাঘা।
দাঁড়াও! দাঁড়াও! ডাকল মুসা। ও আর কিশোর তড়িঘড়ি ওদের অনুসরণ করল।
রবিন, আস্তে! আমরা এখানকার কিছুই চিনি না।
মুসার কথা বুঝেই যেন লাঙ্গুর দুটো শ্লথ হয়ে গেল। রবিনের নাগাল ধরল কিশোর আর মুসা। জঙ্গল ভেদ করে হাঁটতে লাগল ওরা।
অদ্ভুত জায়গা, বলল কিশোর।
সায় জানাল রবিন।
অস্তরাগের আগুন লেগেছে যেন বনের গাছ-গাছালিতে।
গরম বাতাসে মিষ্টি একটা গন্ধ।
নীল ময়ূরেরা পেখম মেলে দিয়েছে।
এ গাছ থেকে ও গাছে উড়ে যাচ্ছে হলদে পাখির দল।
ফাঁকা এক টুকরো জমিতে লাল ফুল খাচ্ছে খুদে হরিণ।
খাইছে, ঠিক যেন স্বর্গ, বলে উঠল মুসা।
হ্যাঁ, কিন্তু বইয়ের নামটা ভুলো না। ওয়াইল্ড লাইফ বলতে ভয়ঙ্কর জীব-জন্তুও বোঝায়, সাবধান করল কিশোর।
একটা গাছের পাশ কাটানোর সময় মুসা লম্বা, গভীর দাগ দেখতে পেল। থমকে দাঁড়াল ও।
কী হয়েছিল এখানে? বলল।
রবিন শ্রাগ করে হেঁটে চলল।

প্যাক থেকে বইটা বের করল কিশোর। লম্বা, গভীর দাগ কাটা একটা গাছের ছবি খুঁজে পেল।
জোরে জোরে পড়ল: বাঘেরা গাছের গুঁড়িতে ঘষে ঘষে থাবার নখ ধারাল করে। যার ফলে বাকলে লম্বা লম্বা দাগ পড়ে।
খাইছে! মুসা ভয়মাখা চোখে গাছটার দিকে চাইল।
বলেছিলাম না? বলল কিশোর। এখানে বাঘ আছে। একটু আগেই এখান দিয়ে গেছে।
বলো কী? বাঘ! বলে উঠল রবিন।
কিশোর আরও পড়ল: বুনো বাঘ বছরে প্রায় পাঁচ হাজার পাউণ্ড কাঁচা মাংস খায়।
খাইছে! অস্ফুটে বলল মুসা। কণ্ঠে ভীতি। কিশোর পড়ে চলল: বাঘ সাধারণত হাতিদের ঘাঁটায় না। এবং বেশিরভাগ ছোট বিড়ালের মতন, বাঘও বুনো কুকুরদের এড়িয়ে চলে। ঘাউ করে উঠল বাঘা।
বুনো কুকুরদের, তোর মত পুঁচকেকে না, বাঘাকে বলল কিশোর। বাঘ তোকে এক মিনিটের মধ্যে সাবড়ে দেবে।
বাঘা গর্জন ছাড়ল আবারও। এসময় রানী আর টিটো ডাক ছাড়তে লাগল। কু-কু-কু! ময়ূরেরা ডাকল কক! কক! খুদে হরিণটা ছোট ছোট ডাক ছেড়ে মাটিতে ক্ষুর দাপাল।
কী ব্যাপার? প্রশ্ন করল রবিন। বাঘাকে প্যাকে তুলে নিই, বলল কিশোর।
তা-ই করল ও। বাঘা এখন নিরাপদ। প্যাক থেকে মাথা বের করে। রাখল কুকুরটা।
অল সেট? খুদে কুকুরটাকে প্রশ্ন করল কিশোর। বাঘা গর্জাল আবারও।
এবার গভীর, ভয়ঙ্কর এক গর্জন জবাব দিল। ওদেরকে ঘিরে ফেলেছে যেন।
ঘাড়ের চুল দাঁড়িয়ে গেল মুসার।
খাইছে!
বাঘ! বলল রবিন।
হুফ! হুফ! ডাক ছাড়ল বাঘা। রানী আর টিটো খিঁচিয়ে উঠল গাছ থেকে।
ওরা আমাদেরকে ওদের কাছে যেতে বলছে! বলল রবিন। এসো! একটা ডাল ধরে উঠে গেল।
ব্যাকপ্যাক চড়াতে গিয়ে হাত কাঁপতে লাগল কিশোরের। একটা ডাল ধরে মাটি থেকে উঠে পড়ল ও। নিজেকে তুলে নিল গাছে। মুসাও বসে রইল না।
বনভূমি আবারও কেঁপে উঠল গর্জনের শব্দে।
খাইছে!
কু-কু-কু! লাঙ্গুর দুটো গাছের আরও উঁচু ডালে উঠে গেল।

তিন বন্ধু ওদেরকে অনুসরণ করল।
গোধূলি নেমে এসেছে জঙ্গলে। কিশোর নীচের দিকে চাইল। মাটি দেখতে পাচ্ছে না। কান পাতল ও। রক্তহিম করা গর্জনটা শুনতে চাইছে। বাতাসে আতঙ্কিত জীব-জন্তুদের চিৎকার।
বাঘটা হয়তো চলে গেছে, বলল রবিন।
কিশোর চাইল রানী আর টিটোর দিকে। জড়াজড়ি করে রয়েছে। লাঙ্গুর দুটো। কালো মুখে ভয়ের ছাপ।
হয়তো যায়নি, বলল মুসা।
বাঘের সামনে না পড়ে জঙ্গল পার হব কীভাবে? প্রশ্ন করল নথি।
সেটাই তো ভাবছি, বলল কিশোর। আঁধার হয়ে আসছে। একটু পরে আমরা কিছুই দেখতে পাব না।
রানী আর টিটো ডাক ছাড়ল আবারও। গাছের গুঁড়ির নীচে আঙুল দেখাচ্ছে।
হুফ! হুফ! কিশোরের প্যাক থেকে ডেকে উঠল বাঘা।
ওরা কি বাঘটাকে দেখতে পাচ্ছে? প্রশ্ন করল কিশোর। বুক ধড়ফড় করছে। ডাল-পাতা ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না ও।
এবার, অনেক নীচে, নড়ে উঠল গাছের গুঁড়িটা।
খাইছে, সাপ! বলে উঠল মুসা।
গুঁড়িটাকে ঘিরে পাক খাচ্ছে সাপটা। গায়ে কালো কালো ছোপ। গাছের গুঁড়ির মতন মোটা!
অজগর, শ্বাসের ফাঁকে বলল কিশোর।
গুঁড়ি বেয়ে পাক খেয়ে উঠে আসছে অজগর।
বিষাক্ত নাকি? প্রশ্ন করল রবিন।
বইটা বের করল কিশোর। ম্লান হয়ে আসা আলোয় অজগরের একটা ছবি বের করল। জোরে জোরে পড়ল:
অজগর বিষাক্ত সাপ নয়।
যাক, বাবা, বলে উঠল রবিন।
এখনই এত খুশি হয়ো না, বলে আরও পড়ল কিশোর:
অজগর শিকারকে পিষে মারে।
তারপর আস্ত গিলে খায়। বড়সড় একটা হরিণকেও গিলে ফেলতে পারে অজগর।
খাইছে!
বিপদ! বলল কিশোর। জীবন-মৃত্যুর সমস্যা।
রানী আর টিটো কিচিরমিচির করছে তিন বন্ধুর উদ্দেশে।

পুরু লতা চেপে ধরল বানর দুটো। হেলে পড়ল পিছনে। এবার ঝাঁপ দিল গাছ থেকে!
ট্র্যাপি শিল্পীদের মত শূন্যে দোল খেল বানর দুটো। ঝোপ-ঝাড় আর লম্বা লম্বা ঘাসের উপর দিয়ে দোল খেয়ে পৌঁছে গেল অন্য এক গাছে।
তিন বন্ধুর উদ্দেশে ডাক ছেড়ে হাত নাড়ল।
ওরা চাইছে আমরা ওদেরকে কপি করি! বলল রবিন।
রবিন একটা লতা চেপে ধরল।
কিশোর চাইল অজগরটার দিকে। প্রকাণ্ড সাপটা তখনও পাক খেয়ে উঠে আসছে গাছে। ওদের ডালের কাছে পৌঁছে গেছে প্রায়।
লম্বা শ্বাস টানল কিশোর। এবার একটা লতা চেপে ধরল সে-ও। মুসা ধরল অপর আরেকটা।
হেলে পড়ো, রানী আর টিটোর মত, বলল রবিন।
পিছনে হেলে পড়ল তিন বন্ধু।
এক, দুই, তিন-গো! বলে উঠল রবিন।
গাছ থেকে দোল খেল ওরা।
পেট খালি হয়ে গেছে কিশোরের। হু-হুঁ বাতাস বয়ে যাচ্ছে কানের পাশ দিয়ে। পাতা আর ডাল চাপড় মারল ওকে।
হঠাৎই, কানফাটা গর্জনে কেঁপে উঠল বনভূমি।
অগ্নিশিখার মত ঝোপ থেকে লাফিয়ে পড়ল একটা বাঘ!
হলদে চোখজোড়া ঝলসে উঠল জানোয়ারটার। বেরিয়ে পড়েছে। ধারাল ছোরার মতন দাঁত। অল্পের জন্য থাবা লাগল না ওদের কারও গায়ে!
আআআহহ! চেঁচিয়ে উঠল ওরা।
ঝোপ মাড়িয়ে ছুটে গেল বাঘটা।
তিন বন্ধু দোল খেয়ে উঠে গেল লাঙ্গুরদের গাছে।
কিশোর একটা পা বাধিয়ে চেপে ধরল গাছের গুঁড়ি। লতাটা ছেড়ে দিয়ে আঁকড়ে ধরল একটা ডাল।
বাপরে বাপ! বলল ও। চমকিত।
লাঙ্গুর দুটো ওর পিঠ চাপড়ে সাবাস দিল যেন।
দারুণ মজা লেগেছে, বড় এক ডালে বসে বলল রবিন।
মজা? পাগল নাকি তুমি? বলল অপর এক ডালে বসা মুসা।
দোল খেতে ভাল লেগেছে, বলল রবিন। তবে বাঘটাকে দেখে ভয় পেয়েছি।
এসময় গাছটা দুলতে শুরু করল। নুয়ে পড়েছে ডাল।
খাইছে!

বাঘেরা কি গাছে চড়তে পারে? জিজ্ঞেস করল রবিন।
সম্ভবত, বলল কিশোর। গুঁড়িটা জড়িয়ে ধরে চোখ বুজল।
নীচে থেকে চিবানোর আর ভাঙচুরের জোরাল শব্দ ভেসে এল।
গর্জে উঠল বাঘা।
গোঙানির শব্দ বেরোল কিশোরের গলা দিয়ে।
বাঘ গাছটাকে খেয়ে ফেলছে, বলল মুসা। ৯ হেসে ফেলল রবিন।
হুপ-হুপ শব্দ করল রানী আর টিটো। কথাটা শুনে ওরাও যেনজা পেয়ে হাসছে।
হুফ! হুফ! ডাক ছাড়ল বাঘা।
কী হলো! বলল মুসা। চোখ বুজে ফেলেছিল।
দেখো! বলল রবিন।
একটা শুঁড়। হাতির।
শুঁড়টা ওদের শোঁকার জন্য কিলবিলিয়ে উঠল যেন। এবার গাছ থেকে পাতা নিয়ে সরে গেল।
চলল, দেখি কী ব্যাপার! বলল রবিন।
বাঘা তখনও প্যাকের ভিতরে, রবিনকে অনুসরণ করে নিচু এক। ডালে নেমে এল কিশোর আর মুসা।
প্রায়ান্ধকার জঙ্গলের দিকে চোখ সরু করে চাইল ওরা। ছায়া-ছায়া অন্ধকারে এক পাল হাতি দেখতে পেল।
একটা হাতি দাঁড়িয়ে ওদের গাছের নীচে, পাতা খাচ্ছে। অন্যগুলো ঘাস চিবোচ্ছে।
অ্যাই, দারুণ একটা বুদ্ধি মাথায় এসেছে আমার, হঠাৎই বলল রবিন।
কী সেটা? প্রশ্ন করল কিশোর।
বাঘটাকে কীভাবে এড়াতে হবে জানি আমি, বলল রবিন। আমাদের বইটাতে আছে না বাঘ হাতিদের ঘাঁটায় না?
আছে তো, বলল কিশোর।
কাজেই আমরা হাতির পিঠে চেপে জঙ্গল পার হব, বলল রবিন।
কিশোর ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকাল।
বুদ্ধিটা ভাল। কিন্তু—
কোন কিন্তু নয়। আমি আগে চড়ব, বলল রবিন।
আরও খানিকদূর নেমে হাতির পিঠের কাছাকাছি হলো ও। একটা ডাল থেকে সাবধানে পা নামাল। ওর পা হাতিটার পিঠ স্পর্শ করলে, ডালটা ছেড়ে দিল। এবার ধীরে সুস্থে বসে পড়ল।
হাতিটা মৃদু গুড় গুড় শব্দ করে ভর বদল করল।

ভয় পাস না, আমি তোর কোন ক্ষতি করব না, মোলায়েম স্বরে বলল রবিন। বিশালদেহী জানোয়ারটার পিঠে হাত বুলিয়ে দিল।
ধন্যবাদ, মায়া।
মায়া? প্রশ্ন করল মুসা।
হ্যাঁ, এটাই ওর নাম। এইমাত্র আমাকে বলেছে, বলল রবিন।
হুঁ, বলল মুসা।
হুফ! হুফ! এসো তোমরা, ভয়ের কিছু নেই, ডাকল রবিন।
দীর্ঘশ্বাস ফেলল কিশোর। ডাল থেকে দোল খেল ও আর মুসা। মায়ার উপরে ঝুলছে, এসময় ডাল থেকে নিজেদেরকে নামিয়ে আনল ওরা।
দু'পা হাতিটার উপর রেখে সাবধানে রবিনের সামনে বসল কিশোর। মুসা বসল পিছনে।
আবারও গুড়-গুড় করে উঠল মায়া।
ওকে বলো ভয় না পেতে, বলল রবিন। ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দাও।
ভয় পাসনে, মায়া, বলল কিশোর। হাতিটার মাথা চাপড়ে দিল। জানোয়ারটার চামড়া কর্কশ আর কুঁচকানো।
হাতিটা শুঁড় কুঁকড়ে পিছনে এনে কিশোরের মাথায় রাখল।
হাই, কিশোর বলল মৃদু কণ্ঠে।
কান ঝাঁপটাল মায়া।
রানী আর টিটো মায়ার সামনে দোল খেয়ে নেমে এল। কিচিরমিচির করে কী সব যেন বলল হাতিটাকে। মায়া ওদের উদ্দেশে শুড় নাড়ল। লাঙ্গুর দুটো জঙ্গল ভেদ করে লাফাতে লাফাতে ছুটল।
ওদেরকে অনুসরণ করল মায়া।
পালের বাদবাকিরা এক সারে অনুসরণ করল ওকে। গদাইলশকরী চালে চলেছে মায়া। মুসার মনে হলো মহাসাগরের ঢেউয়ের উপর চড়ে ভেসে যাচ্ছে বুঝি।
গাছ-গাছালির উপরে পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে।
কোথায় যাচ্ছি আমরা? মুসার প্রশ্ন।
চিন্তা কোরো না, বলল রবিন। রানী আর টিটো জানে কোথায় যেতে হবে।
হুফ! হুফ! বাঘা ডাক ছাড়ল কিশোরের ব্যাকপ্যাক থেকে।
তুইও নিশ্চিন্ত থাক, ছোট কুকুরটাকে আশ্বস্ত করল কিশোর।
জোনাকী জ্বলছে। চাঁদ গাছ-পালা ভেদ করে আলোকিত করে। রেখেছে পথ। হাতির পাল ধীরেসুস্থে চলেছে।
এসময় দূরাগত নিচু এক গর্জন শোনা গেল।
বাঘটা নাকি? ভাবল কিশোর।

হাতির দল শব্দটাকে পাত্তা দিল না। উষ্ণ বনভূমি ভেদ করে হেঁটে চলেছে ওরা। ঝুলে পড়া লতা-পাতার নীচ দিয়ে, আর ধোঁয়াটে ফাঁকা জমি ভেদ করে হেলেদুলে চলেছে পালটা।
রানী আর টিটো লাফাতে লাফাতে আগে আগে চলেছে। দুটো ছায়া তিন বন্ধুকে পথ দেখাচ্ছে।
আমরা ট্রীহাউস থেকে অনেক দূরে চলে যাচ্ছি, বলল কিশোর।
ভয় পেয়ো না, বলল রবিন।
হঠাই, দীর্ঘ এক গর্জন চিরে দিল রাতের নিস্তব্ধতা।
শিরদাঁড়া বেয়ে ঠাণ্ডা স্রোত নেমে গেল কিশোরের।
হুঙ্কারটা শোনা গেল আবারও। শেষমেশ ওটা রূপ নিল। গোঙানিতে। গোটা বনভূমি যেন কাতরাচ্ছে।
মনে হচ্ছে খুব কষ্ট পাচ্ছে, বলল মুসা।
হ্যাঁ, বলল কিশোর।
কিন্তু হাতির পাল এগিয়েই চলল।
ঢুলুনি মত এসে গেল কিশোরের। ব্যাকপ্যাকে নাক ডাকছে বাঘার।
শীঘ্রি কিশোরের মাথা আশ্রয় নিল মায়ার পিঠে। একটু পরেই ভাঙা-ভাঙা স্বপ্ন দেখতে লাগল ও।
ক্যক!
অক! অক! অক!
ধীরে ধীরে স্বপ্ন থেকে জেগে উঠল কিশোর। চমকে চোখ মেলল ও।
আবছা সূর্যের আলো ঘিরে রেখেছে ওকে।
আমি কোথায়? আতঙ্কিত কিশোর ভাবল।
এবার মনে পড়ল-ভারতে, এক হাতির পিঠে!
উঠে বসল ও। কুয়াশা ভেদ করে দেখতে পেল কর্দমাক্ত এক নদীর তীরে দাঁড়িয়ে রয়েছে মায়া।
হাই তুলল কিশোর। রবিন আর মুসা কোথায়?
অন্য হাতিগুলো উজানে। শুড় দিয়ে পরস্পরকে পানি ছিটাচ্ছে।
জঙ্গলের কিনারে বাঘা, রানী আর টিটো। লম্বা ঘাস শুকল বাঘা। লাঙ্গুর দুটো ফুল খেল।
গুড মর্নিং! চেঁচিয়ে উঠল রবিন।
ভাটিতে বড়, কালো এক পাথরের উপর বসে ও। খালি পা। পানিতে ভেজা।
হাই, বলল কিশোর। নামলে কীভাবে?
বাঘা আর আমি পিছলে কাদায় নেমে পড়েছি, জানাল রবিন।

তোমরাও চেষ্টা করো। তবে আগে স্নিকার্স আর ব্যাকপ্যাক ফেলে। দাও।
রবিন মায়ার পাশে চলে এল। গোড়ালি অবধি ডুবে গেছে কাদায়।
কিশোর জিনিসপত্রগুলো ছুঁড়ে দিল রবিনের দিকে। মায়ার রুক্ষ, কুঁচকানো চামড়ায় হাত বুলাল।
তোকে অনেক ধন্যবাদ, মৃদু কণ্ঠে বলল।
শুঁড় দিয়ে ওকে স্পর্শ করল হাতিটা।
হাতিটার শরীরের পাশ দিয়ে হড়কে নেমে গেল ও আর মুসা-প্রথমে দুপা নামাল-পড়ে গেল কাদার মধ্যে।
নদীতে ধুয়ে নাও, বলল রবিন।
ওদের ব্যাকপ্যাক আর জুতো পাথরের উপর রাখল ও। ওদিকে কিশোর আর মুসা ঠাণ্ডা পানিতে নামল।
হাত-পা ধুয়ে চারধারে নজর বুলাল কিশোর।
পালের বাদবাকি হাতির সঙ্গে যোগ দিয়েছে মায়া। সকালের কুয়াশায় অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছে ওদেরকে।
চারদিকে অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য।
হলদে-নীল পাখিরা ডানা মেলে দিয়েছে। ঝুলন্ত লতা দুলছে। মৃদুমন্দ বাতাসে। পানিতে ভাসছে বড় বড় ফুল।
এবার অদ্ভুত এক প্রাণী দেখতে পেল মুসা। দেখে মনে হলো একটা শিং আর দুটো কান বেরিয়ে এসেছে পানি থেকে। একটা কান একটা মাছি তাড়াল।
গণ্ডার! গণ্ডার! চেঁচিয়ে উঠল মুসা।
পানিতে নামল রবিন।
বইটা দেখি, বলল কিশোর।
প্যাকের কাছে তড়িঘড়ি চলে এল ও। টি-শার্টে হাত মুছল। ইণ্ডিয়া বুকটা বের করল।
পানি থেকে শিং বেরিয়ে আসা এক ছবি। পড়ল ও:
একশিঙা গণ্ডার বনের নদীতে গা ধোয়। গণ্ডাররা বিপজ্জনক নয়। কিন্তু যেহেতু ওরা চোখে ভাল দেখে না, তাই ভুল করে কখনও কখনও ধেয়ে আসে। জোরাল শব্দ সাধারণত থামিয়ে দেয় ওদেরকে। আরও খানিকটা পড়ল কিশোর: ভারতীয় গণ্ডার বিলুপ্তপ্রায় প্রাণী। পোচাররা ওদের হত্যা করে ওষুধ আর গুড-লাক চার্ম হিসেবে শরীরের নানান অংশ বিক্রি করে।
কিশোর নোটবই বের করতে যাবে, এসময় পানিতে ছলাৎ করে বিরাট এক শব্দ উঠল।
খাইছে! বলে উঠল মুসা।

কিশোর মুখ তুলে চাইল।
নদী থেকে উঠে পড়েছে গণ্ডারটা। প্রাচীন এক জলাভূমির দানোর মত দেখাচ্ছে ওটাকে।
বাপ রে! বলে উঠল কিশোর।
খুদে খুদে চোখে রবিনের দিকে চাইছে গণ্ডারটা।
এবার ঘোত করে শব্দ করে মাথা নামাল। শিংটা সোজা রবিনের উদ্দেশে তাক করা।
জোরে শব্দ করো! চেঁচাল মুসা।
রবিন হাতে তালি দিয়ে চেঁচাল, আমরা শান্তি চাই!
থমকে গেল গণ্ডারটা। ঘোত করে উঠল। তারপর আবার ডুব দিল পানিতে।
হেসে উঠল রবিন।
আমি কিছু নোট নিয়ে নিই, বলল কিশোর।
হুফ! হুফ! বাঘার ডাক ভেসে এল বনভূমির কিনারা থেকে।
আমি বাঘাকে নিয়ে আসি, বলল রবিন।
নদী থেকে উঠে দৌড়ে গেল কুকুরটার কাছে। কিশোর ওর নোটবইতে একশিঙা গণ্ডার সম্পর্কে কিছু তথ্য টুকে নিল। এ কিশোর, মুসা, চেঁচাল রবিন। ছুটে আসছে ও, বাঘাকে পায়ের কাছে নিয়ে। জলদি এসো!
কী হয়েছে? প্রশ্ন করল মুসা।
ভয়ঙ্কর ব্যাপার! বলে উঠল রবিন।
কিশোর ব্যাকপ্যাকে জিনিসপত্র পুরে, মুসাকে নিয়ে রবিনকে অনুসরণ করল।
বাঘা ওদের কাছে কাছেই রইল। নার্ভাস ভঙ্গিতে কিচিরমিচির করছে আর লাফাচ্ছে রানী ও টিটো।
কিশোর কাছিয়ে আসতে, একটা বাঘকে দেখতে পেল। কাত হয়ে। পড়ে রয়েছে জানোয়ারটা। নিস্পন্দ। চোখ বোজা। সামনের একটা থাবা আটকা পড়েছে ফাঁদে।
মরে গেছে? মুসার জিজ্ঞাসা।
না, এখনও শ্বাস নিচ্ছে, জানাল রবিন। কাল রাতে মনে হয় আটকা পড়েছে। সেজন্যেই আমরা গোঙানির শব্দ পাচ্ছিলাম।
কী করা যায়? কিশোরের প্রশ্ন।
একে মুক্ত করতে হবে! বলল রবিন। বাঘটার দিকে এগোল।
দাঁড়াও! দাঁড়াও! ওকে চেপে ধরল কিশোর। ওটা মানুষখেকোও হতে পারে।
ও আটকা পড়ল কীভাবে? প্রশ্ন করল মুসা।
বই খুলল কিশোর।

পোচাররা ইস্পাতের ফাঁদ পেতে বাঘ ধরে, বলল ও। ব্যাপারটা বেআইনী। বাঘ ধরে মেরে ফেলে ওরা, তারপর নানা। অংশ বিক্রি করে দেয়। গণ্ডারের মত বাঘও অনেক কমে এসেছে। পোচারদের ঠেকানো না গেলে বাঘও একসময় বিলুপ্ত হয়ে যাবে।
ওকে আমাদের বাঁচাতে হবে, বলল মুসা।
বইটাতে ইস্পাতের ফাঁদের এক ছবি আছে। ওটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরখ করল কিশোর। ফাঁদটা বিপজ্জনক আর মারাত্মক মনে হলো ওর কাছে।
ঠিক আছে, বলল ও। বন্ধুদেরকে ছবিটা দেখাল। আমি এই দিকটা চেপে ধরব। তাতে ফাঁদটা খুলে যাবে। তোমরা তখন ওর পা-টা টেনে বের করবে। পারবে না?
পারব, বলল মুসা। বাঘা, বস। খুদে কুকুরটা বসে পড়ল।
তিন বন্ধু বাঘটার দিকে এগোলে নীরবে ওদেরকে লক্ষ করতে লাগল লাঙ্গুর দুটো।
এমন রাজকীয় জানোয়ারের এরকম বিপদ দেখে কষ্ট পেল কিশোর। বাঘটার প্রকাণ্ড মাথাটা কমলা রঙের। গায়ে ডোরাকাটা দাগ।
ফাঁদে আটকা-পড়া পা থেকে রক্ত ঝরছে। ধীরে, নিঃশব্দে লিভারটায় চাপ দিল কিশোর। বার উঠে গেল বাঘের পা থেকে। বাঘটা তখনও ঘুমিয়ে। আস্তে আস্তে, পা-টাকে মুক্ত করল মুসা।
গেট ওয়েল, রবিন বলল ফিসফিস করে। বাঘটা নড়ল না। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল ওরা। পা টিপে টিপে পিছু হটছে।
কু! কু! কু! সতর্ক করল রানী আর টিটো। ঘুরে দাঁড়াল তিন বন্ধু।
উঠে পড়েছে বাঘটা। একদৃষ্টে ওদের দিকে চেয়ে। চোখজোড়া ধক-ধক করে জ্বলছে।
পাগলের মত চারধারে নজর বুলাল কিশোর। পালাবে কোথায়?
বাঘটা গর্জে উঠল ওদের উদ্দেশে।
এবার ধীর পায়ে, নিঃশব্দে এগিয়ে আসতে লাগল।
বিশাল বাঘটা খোঁড়াতে খোঁড়াতে তিন বন্ধুর দিকে ক্রমেই কাছিয়ে
আসতে লাগল।
হাততালি দিল কিশোর।
আমরা শান্তি চাই! চেঁচিয়ে উঠল।
কিন্তু বাঘটা এগিয়েই আসছে। চোখ জ্বলছে। ঠোঁট কুঁকড়ে গেছে।
হুফ! হুফ! রবিনের উদ্দেশে ক্রুদ্ধ ডাক ছাড়ল বাঘা।
বাঘা পালাতে বলছে! বলল রবিন।
কিশোরের হাত চেপে ধরে তীরের দিকে টানল।

মুসা, এসো! জরুরী কণ্ঠে বলল।
দাঁড়াও, বাঘার কী হবে? চেঁচিয়ে উঠল কিশোর।
চিন্তা কোরো না! বলল রবিন।
কালো পাথরটার আড়ালে কিশোরকে টেনে নিয়ে গেল ও।
বাঘা তো মারা পড়বে, বলল মুসা।
ওর কিচ্ছু হবে না-আমি জানি! বলল রবিন।
বাঘার ডাক এখন তীব্র গর্জনে রূপ নিয়েছে।
হুফ! হুফ! গররর! গররর!
বাঘার হুঙ্কার ক্রমেই জোরদার হচ্ছে।
শুনে তো বাঘার গলা মনে হচ্ছে না, বলল কিশোর।
এবার হঠাই নীরবতা নেমে এল। আশ্চর্য এক নৈঃশব্দ্য।
বাঘা? ডাকল রবিন। এতক্ষণে ওকে উদ্বিগ্ন মনে হলো।
মাথা তুলল নথি। পাথরের উপর দিয়ে উঁকি দিল তিন বন্ধু।
ঘাসের উপরে পরম সাহসিকতায় দাঁড়িয়ে বাঘা।
বাঘটা খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলে যাচ্ছে। একটু পরে গাছ-পালার আড়ালে উধাও হয়ে গেল।
গোটা বনভূমি যেন রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছিল-শেষমেশ নীরবতা ভঙ্গ করল রবিন।
তোর তুলনা নেই, বাঘা, বলল ও।
লাঙ্গুর দুটো হাততালি দিয়ে লাফাতে লাগল।
হুফ! হুফ! আবারও যেন খুদে কুকুর হয়ে গেল বাঘা। লেজ নেড়ে দৌড়ে এল তিন বন্ধুর কাছে।
ওকে কোলে তুলে নিল রবিন।
তুই আমাদের জীবন বাঁচিয়েছিস,বলল ও।
বাঘটাকে খেদালি কীভাবে? বাঘার মাথা ঘষে দিয়ে প্রশ্ন করল মুসা। তুই কি বুনো কুকুর হয়ে গেছিলি নাকি?
বাঘা হাঁপাচ্ছে। ওদের হাত চেটে দিল।
কিশোর বনভূমির দিকে চাইল।
ট্রীহাউসটা কোথায় আল্লাই জানে, বলল ও। রানী আর টিটো কিশোরের উদ্দেশে কিচকিচ করে কী সব বলল। এবার বাহু নেড়ে, দৌড় দিল তীর ধরে।
ওরা ওদেরকে ফলো করতে বলছে, বলল রবিন। এসো।
পাথর থেকে জিনিসপত্র তুলে নিল ওরা। এবার তীর ধরে বানর দুটোর পিছু নিল।
সকালের আলোয় কাঁপছে পানি। শূন্যে লাফ দিচ্ছে রুপোলী মাছ।

রানী আর টিটোর সঙ্গে সঙ্গে ছুটছে বাঘা। শীঘ্রি ওরা একটা বাকের আড়ালে হারিয়ে গেল।
ওদেরকে অনুগমন করল তিন বন্ধু। বাঁক ঘুরতেই দেখতে পেল বুদ্ধাসনে বসে রয়েছে এক লোক। লাঙ্গুর দুটো তার কাছে বসা।
লোকটির দুচোখ বোজা। মুখে সাদা দাড়ি-গোঁফ। গায়ের রং বাদামী। মুখের চেহারায় প্রশান্তির ছাপ।
রানী আর টিটো মানুষটার চুল সমান করে দিল নিজেদের থাবা দিয়ে। গালে হাত বুলাল।
লোকটি মৃদু হেসে ফিসফিস করে ওদের সঙ্গে কথা বলল। চোখ। বন্ধ।
বাঘা লোকটির কাছে গিয়ে তার দুহাত চেটে দিল।
এখনও চোখ খোলেনি লোকটি। তবে বাঘার গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করল।
নক, নক, মৃদু কণ্ঠে বলল রবিন।
কেউ আছে এখানে? লোকটি প্রশ্ন করল।
মুখ ফেরাল তিন বন্ধুর উদ্দেশে। এখন চোখ ভোলা, তবে ওদেরকে দেখতে পাচ্ছে বলে মনে হলো না। মানুষটি অন্ধ, উপলব্ধি করল কিশোর।
হাই, আমি রবিন।
আমি কিশোর।
আমি মুসা।
মৃদু হাসল অন্ধ মানুষটি।
ভাল, মাথা ঝাঁকিয়ে বলল। তোমরা আমার কাছে এসেছ?
হ্যাঁ, জানাল কিশোর।
তিন বন্ধু লোকটির দুপাশে বসল।
আপনি জঙ্গলে থাকেন? রবিনের প্রশ্ন।
হ্যাঁ।
আপনি কি সন্ন্যাসী? কিশোর জানতে চাইল।
হ্যাঁ। একা থাকি বলে প্রকৃতি থেকে অনেক কিছু শিখতে পারি।
কীভাবে শেখেন? প্রশ্ন করল মুসা।
কান পাতলেই শোনা যায়, শেখা যায়।
কান পেতে কী শোনেন আপনি? জানতে চাইল কিশোর।
বানরদের কিচিরমিচির, হাতির ডাক, বাঘের গর্জন, বল লোকটি। এতদিন ধরে শুনছি যে মনে হয় সব মিলেমিশে বনদের একটা মাত্র কণ্ঠ হয়ে গেছে।
কণ্ঠটা কি আপনাকে বলেছে কালকে রাতে একটা বাঘ ফাঁদে পড়েছিল? প্রশ্ন করল রবিন।

হ্যাঁ, বলল সন্ন্যাসী।
সে কি এ-ও বলেছে, আমরা ওকে বাঁচানোর পর ও আমাদেরকে আক্রমণ করতে চেষ্টা করেছিল? জিজ্ঞেস করল মুসা।
মৃদু হাসল অন্ধ মানুষটি।
নদী থেকে আমাকে একটা জলপদ্ম এনে দাও, বলল সে।
কিশোর বুঝে পেল না হঠাৎ প্রসঙ্গ পাল্টাল কেন সন্ন্যাসী।
কিন্তু রবিন তড়াক করে লাফিয়ে উঠে ছুটে গেল নদীতে। বড় দেখে একটা ফুল ছিঁড়ে নিল ও। কাদাটে শিকড়সুদ্ধ উঠে এসেছে ওটা। অন্ধ মানুষটির কাছে ফুলটা নিয়ে গেল ও।
ধন্যবাদ, জানাল লোকটি।
ফুলটার পাপড়ি আর কাদামাখা শিকড় স্পর্শ করল।
ময়লা, ঘন কাদায় ভাল জলপদ্ম ফোটে, বলল সে। এর সৌন্দর্যের সঙ্গে এর কুৎসিত দিকটাও মিশে রয়েছে। বুঝতে পেরেছ।
হ্যাঁ, বলল তিন বন্ধু।
তোরা যখন বাঘটাকে বাঁচিয়েছ তখন তার সম্পূর্ণ অস্তিত্বকেই বাঁচিয়েছ, বলল অন্ধ মানুষটি। তোমরা ওর অপরূপ সৌন্দর্য আর ভয়ঙ্কর রূপ দুটোকেই বাঁচিয়েছ। একটা ছাড়া অন্যটাকে কল্পনা করা যায় না।
হ্যাঁ…ঠিক বলেছেন, বলল কিশোর।
তোমরা এই জলপদ্মটাকে এ জঙ্গলের পক্ষ থেকে গ্রহণ করো। তোমরা যেহেতু আমাদের ভয়ঙ্কর বন্ধুকে রক্ষা করেছ, বলল অন্ধ মানুষটি। ওকে ছাড়া আমাদের দুনিয়া অসম্পূর্ণ।
সন্ন্যাসীর কাছ থেকে ফুলটা নিল রবিন।
ধন্যবাদ,বলল ও।
হুফ! হুফ! লেজ নাড়ল বাঘা।
হাততালি দিল রানী আর টিটো।
আমরা এখন বাড়ি ফিরতে চাই, বলল কিশোর। পথটা যদি চিনতে পারতাম।
চিন্তা কোরো না, বলল সন্ন্যাসী। তোমাদের গাছ-বাড়ি কাছেই রয়েছে। হাতির পাল বড় চক্কর কেটে হেঁটেছে। কাজেই তোমরা যেখান থেকে শুরু করেছিলে সেখানেই ফিরে এসেছ।
সত্যি? বলে উঠল মুসা।
আকাশের দিকে তর্জনী তাক করল অন্ধ মানুষটি।
কাছের এক গাছে ওদের ম্যাজিক ট্রীহাউস।
খাইছে, অস্ফুটে বলল মুসা।

বলেছিলাম না চিন্তার কিছু নেই? বলল রবিন। তিন বন্ধু জুতো মোজা পরে সটান উঠে দাঁড়াল।
বিদায় নেওয়ার আগে সন্ন্যাসীর হাত স্পর্শ করল রবিন।
আপনাকে ধন্যবাদ, বলল ও। সব কিছুর জন্যে।
মুহূর্তের জন্য ওর হাতটা ধরে রইল সন্ন্যাসী। এবার একে একে কিশোর আর মুসার হাত ধরল। কিশোর সারা দেহে শীতল এক পরশ অনুভব করল।
ধন্যবাদ, সন্ন্যাসীকে বলল ও আর মুসা।
রানী আর টিটো কিচকিচ করে লম্বা বাহু বাড়িয়ে দিল। তিন বন্ধু লাঙ্গুর দুটোকে জড়িয়ে ধরল।
আমরা তোদেরকে ভুলব না, বলল রবিন।
তোরা দুর্দান্ত টুর গাইড, বলল কিশোর।
গুড-বাই, বলল মুসা।
এবার ওরা মসজিক ট্রী হাউসের উদ্দেশে পা বাড়াল। বাঘা ছুটল ওদের পিছন পিছন।
মইয়ের কাছে পৌঁছে বাঘাকে প্যাকে তুলে নিল কিশোর। এবার মই বাইতে লাগল।
জলপদ্মটা রয়েছে রবিনের কাছে।
ও আর মুসা কিশোরকে অনুসরণ করল।
ট্রীহাউসে প্রবেশ করে, পেনসিলভেনিয়ার বইটা তুলে নিল কিশোর। কিন্তু ইচ্ছা প্রকাশের আগে, জানালা দিয়ে বাইরে চাইল।
দূরে, দেখতে পেল মায়া আর তার সঙ্গী-সাথীরা নদীতে নাইছে।
লতা ধরে ঝুলছে রানী আর টিটো।
বাঘটা ঘাসে বসে রোদ পোয়াচ্ছে, চাটছে পায়ের ক্ষত।
হরিণ চরছে। গাছে-গাছে রঙিন পাখি।
সন্ন্যাসী গুহার সামনে বসে। ঠোঁটে স্মিত হাসি। মুখের চেহারায় প্রশান্তি।
বইটা খুলল কিশোর। ফ্রগ ক্রীক উডসের একটা ছবিতে আঙুল
রাখল।
আমরা ওখানে ফিরতে চাই, বলল ও।
ঘুরতে শুরু করল ট্রী-হাউসটা। বাতাস বইতে আরম্ভ করল। ক্রমেই জোরাল হচ্ছে বাতাসের বেগ। এবার সব কিছু নিথর। একদম স্থির।
চোখ মেলল কিশোর।
ট্রী-হাউসে চুঁইয়ে এসে পড়েছে পড়ন্ত বিকেলের ম্লান রোদ।

আচ্ছা, রবিন, তুমি জানলে কীভাবে বাঘা আমাদেরকে পাথরের পিছনে লুকাতে বলছে? প্রশ্ন করল মুসা।
শ্রাগ করল রবিন।
কেন জানি মনে হলো। মনে হয় ব্যাপারটা ওর চোখে পড়তে পেরেছিলাম।
তাই নাকি রে? বাঘাকে প্রশ্ন করল কিশোর।
খুদে কুকুরটা ঘাড় কাত করে ওর দিকে চেয়ে রইল।
চোখজোড়া নেচে উঠল বাঘার, ও যেন অনেক রহস্য জানে।
দারুণ দেখিয়েছিস তুই, বলল মুসা। তোর সামনে বুনো কুকুরও ফেল।
খুশিতে লেজ নাড়ল বাঘা।
ওকে প্যাকে তুলে নিল কিশোর। এবার একে একে দড়ির মই বেয়ে নেমে এল তিন বন্ধু।
মাটিতে নেমে, মুখ তুলে ট্রী-হাউসটাকে দেখল।
বাই! বলল রবিন।
হুফ! হুফ!
গাছ-গাছালির মাঝ দিয়ে পথ করে নিল ওরা।
গোধূলিবেলায় পাখিরা গান গাইছে। কাঠবেড়ালী খেলা করছে। গাছের ডালে।
ভারতের জঙ্গল থেকে ঘুরে আসার পর ফ্রগ ক্রীক উডসকে নিতান্ত নিরীহ দেখাল ওদের চোখে।
একটু পরেই, রাস্তায় উঠে এল ওরা। বাড়ির উদ্দেশে হাঁটছে, আলো মরে এল।
ভিতরে ঢোকার আগে সিঁড়ির ধাপে বসল তিন বন্ধু।
আমার দুটো প্রশ্ন আছে, বলল রবিন। সন্ন্যাসী যদি চোখে না-ই। দেখতে পান তা হলে ব্রীহাউসের কথা জানলেন কীভাবে? আর আমরা
যে সারা রাত হাতির পিঠে ঘুরেছি সেটাই বা বুঝলেন কী করে?
সোজা ব্যাপার। উনি দিব্য দৃষ্টিতে দেখেছেন। আর বনদেবতার কণ্ঠ তো আছেই, বলল কিশোর।
হুম, সায় জানাল রবিন।
চোখ বুজে কান পাতল ও।
রাস্তা দিয়ে একটা গাড়ি চলে গেল।
একটা কাঠঠোকরা ঠুকঠুক করছে। ঝিঁঝি ডাকছে।
একটা স্ক্রীন ডোর খুলে গেল।
হিরু চাচার খানসামা জন বলল, ডিনার খেতে এসো।
সব কটা শব্দ যেন একটাই শব্দ হয়ে কানে বাজল। বাড়ি ফেরার আনন্দে বুক ভরে শ্বাস টানল রবিন।

***

তিন গোয়েন্দা ভলিউম ১১৪ – অরণ্যের প্রতিশোধ – শামসুদ্দীন নওয়াব – সেবা প্রকাশনী – প্রথম প্রকাশ : ২০১০

বাঁ হাত চেপে ধরে এক ছুটে রান্নাঘরে ঢুকলাম। হাতের তালু থেকে বেরিয়ে আছে একটা রেযর ব্লেড। ব্লেডের চারপাশ ঘিরে রক্ত, আমার কব্জি থেকে চুঁইয়ে পড়ছে সরু ধারায়।

চাচী! মুখ বিকৃত করে হাতটা তুলে ধরলাম।

আমার হাতের দিকে এক ঝলক চাইল মেরি চাচী, তারপর আবারও চুলোয় চাপানো গরুর মাংসের প্যানে চোখ ফিরল।

বেশ ভাল দেখাচ্ছে। তবে এবার নিশ্চয়ই সব কেচাপ শেষ। করিসনি?

হতাশায় গুঙিয়ে উঠলাম। চাচীর হয়েছেটা কী? কিচেন লাইটের আলোয় ঝিকোচ্ছে রেযর ব্লেডটা।

ওটা গেঁথে রয়েছে আমার হাতে। ব্যথায় জান যাচ্ছে আমার।

চাচী, এবারেরটা কেচাপ নয়, সত্যিকারের রক্ত! কব্জি চেপে ধরলাম যাতে ফ্যাকাসে হয়ে যায় হাত, যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠলাম।

চকিত চাউনি বুলাল চাচী।

হাত ধুয়ে খেতে বস।

চাচী, রক্ত পড়ে মারা যাচ্ছি আমি! টলে উঠে বললাম।

এ সময় হাসি মুখে কিচেনে প্রবেশ করল রাশেদ চাচা।

কীরে, তোর হাতে কী?

হাতটা বাড়িয়ে দিলাম। সাদা মেঝেতে টপ টপ করে রক্ত পড়ছে।

চাচা, হাত কেটে ফেলেছি!

আমার কাছে এসে হাতটা নিজের হাতে নিল চাচা।

হুঁ, খুব খারাপ অবস্থা দেখতে পাচ্ছি। আয় অপারেশন করে দিই! আমাকে টেনে নিয়ে এল কিচেন কাউন্টারের কাছে। তারপর এক টানে ড্রয়ার খুলে একটা ঝকঝকে ছুরি বের করল।

চাচী! চেঁচিয়ে উঠলাম। শরীর মুচড়ে সরে যাওয়ার। করলাম, কিন্তু চাচা ছাড়ল না। ছুরিটা দোলাচ্ছে। ঝলসে উঠল ফলাটা। চাচী! চেঁচালাম আবারও।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে চাচী ঘুরে দাঁড়াল আমাদের দিকে।

চাচী এবার তোকে বাঁচাতে পারবে না! চোখ বিস্ফারিত চাচার। আমি সত্যি ছুটতে চেষ্টা করছি, কিন্তু কিচেন কাউন্টারে আমার বাহু। চেপে ধরল সে। কব্জির কাছ থেকে কেটে ফেলতে হবে। মাথার উপরে ছুরিটা সাঁই করে তুলে ধরল।

ছুরিটার দিকে চাইলাম। চাচা হঠাৎই হেসে উঠল।

পড়ে গেল ছুরিটা।

কাঠের কাউন্টারে এতটাই জোরে গেঁথে গেল, চমকে উঠলাম আমি। হেসে ফেলল চাচা।
ডিনার তৈরি। খুনোখুনি বাদ দিয়ে খেতে এসো, এসময় ডাকল। চাচী।
চাচীর দিকে চাইলাম আমরা। দুবাহু ভাঁজ করে রেখেছে বুকের কাছে। এক হাতে বার্গার-টার্নার ধরা।
চাচা আমার উদ্দেশে চোখ টিপে, ছুরিটা সরিয়ে রাখতে গেল।
ওটা আর আমার নাইফ ড্রয়ারে রেখো না, চাচী বলল। গাজর কাটতে গিয়ে রক্ত চলকে বেরোক চাই না আমি। হেসে ফেললাম। আমি। এবার আমার দিকে দৃষ্টি পড়ল চাচীর। ডিনারের পর সব কাজ সারবি। তারপর আটটার আগে হোমওয়ক করে ফেলা চাই, বুঝলি?
ঘাড় কাত করে সায় জানালাম। কিচেন থেকে বেরিয়ে বাথরুমে গেলাম হাত ধুতে। চাচীর কাছে কোনও পাত্তাই পেলাম না। পুরো একটা ঘণ্টার চেষ্টা পানিতে গেল।
ব্লেডটা আসল না, রবারের। তবে দেখতে একদম আসলের মতন। ফলায় রূপালী-ধূসর রঙ মাখিয়ে কোনাগুলোকে দেখতে চকচকে আর ধারাল করে তুলেছিলাম। অপর প্রান্তটা এমনভাবে কেটে ফেলেছিলাম, দেখে যাতে মনে হয় আমার হাতে গেঁথে গেছে। স্পিরিট গ্লু দিয়ে আটকে রেখেছিলাম। কর্ন সিরাপ আর রেড ডাই। ছিল বিকল্প রক্ত হিসেবে।
এসবই রাশেদ চাচার জিনিস। চাচা ইদানীং ছায়াছবির স্পেশাল এফেক্টসের কাজ করছে।
একটু পরে, ডিনারে বসলাম আমরা।
এবারের হ্যালোউইনে কী কস্টিউম চাস তুই? জিজ্ঞেস করল চাচা।
খাওয়ার সময় বিরক্তিকর আলোচনা না করলে হয় না? বলল চাচী।
হেসে ফেলল চাচা।
এবার নতুন কিছু চাই আমি, সোৎসাহে বলে উঠলাম। নিজেই কিছু একটা করব। এমন কিছু যাতে স্কুলের ছেলে-মেয়েরা দেখে ভিরমি খায়। আমি আসলে বিচিত্র কিছু একটা করে এমনকী চাচাকেও চমকে দিতে চাই।
তোমার কী মনে হয়, ও পারবে নিজের আইডিয়া দিয়ে তোমাকে ভয় দেখাতে? চাচী জিজ্ঞেস করল।
চাচা চাইল চাচীর দিকে।
পারা তো উচিত, ডিনার খেয়ে নে, আমি তোকে কিছু স্কুইব দেখাব। তারপর দুজনে মিলে আলোচনা করে কিছু একটা আইডিয়া বের করে ফেলব।
দুটো সবুজ বিন জোর করে গিলোম। তারপর প্লেটটা নিয়ে গেলাম সিঙ্কের কাছে। গার্বেজ ডিসপোসালে এঁটো-কাঁটা ফেলে চাচার স্টাডির দিকে পা বাড়ালাম।

কই যাস? চাচীর কণ্ঠ থামিয়ে দিল আমাকে। কাজগুলোর কী হবে?
ঘুরে দাঁড়ালাম।
ওহ, চাচী, চাচা আমার জন্যে বসে আছে।
আর আমি সারা বিকেল বসে আছি তুই কাঠ নিয়ে আসবি বলে। আগুন নেই, টোস্টেড মার্শম্যালোও নেই, সাফ জানিয়ে দিল চাচী।
আমি মার্শম্যালো পছন্দ না করলেও চাচা করে। কাজেই রাজি হতে হলো।
ঠিক আছে, যাব।
পিছনের উঠনে চলে এলাম। বিস্তর আগাছা জন্মেছে। চাচা মো করার সময় পায় না, কাজ নিয়ে এতটাই ব্যস্ত, আমার দুএক সপ্তাহ লেগে যাবে আগাছা সাফ করতে।
উঠনে ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে গাছের পাতা। স্ট্রীটলাইটের হলদে আলো এখান অবধি পৌঁছয়নি। পিছনের বারান্দায় বাতিটাকে ঘিরে ঘুমাক খাচ্ছে কুয়াশা। ধূসর আঙুল দিয়ে যেন সব কিছু আঁধার আর স্যাঁতসেঁতে করে তুলেছে।
ঠাণ্ডায় শিউরে উঠলাম। বাতাসের দোলায় কুণ্ডলী পাকিয়ে গেল কুয়াশা। শুকনো পাতা খটখটিয়ে উঠল শুকনো হাড়ের মতন। বুকের কাছে দুবাহু ভাজ করে কাঠের গাদার উদ্দেশে এগোলাম।
চাচা কদিন আগে ট্রাক ভর্তি কাঠ এনেছে। আমাদের সাধারণত কাঠের দরকার হয় না। কিন্তু আজকে বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। ফলে, চাচী চাইছে চাচার স্টাডিতে আগুন জ্বেলে, কিছু একটা পড়বে-টড়বে। আর আমি দেখব চাচা কী করে।
পাতার স্তূপে পা চালালাম। পাতা ভেদ করে চলে গেল পা। আগাছা ঘষা খেল আমার জিন্সে, মনে হলো আঁকড়ে ধরতে চাইছে বুঝি। চারদিক নিঃশব্দ। হৃৎস্পন্দনের শব্দও শুনতে পাচ্ছি। বাড়ির দিকে চকিত চাউনি বুলালাম। আলো জ্বলছে দেখে স্বস্তি পেলাম। এবার কেঁপে উঠে আলোর কাছ থেকে দূরে হেঁটে গেলাম।
পিছনের ফেন্সের কাছে জমাট বেঁধেছে অন্ধকার। স্ট্রীটলাইট কিংবা বারান্দার আলো এখান অবধি পৌঁছয়নি। কাঠের গাদার চারপাশে ঘাসহীন। ফেন্সের গায়ে ঠেস দিয়ে রাখা কাঠের পটাকে ভীতিকর দেখাল আমার চোখে। গাদা করা গুঁড়িগুলোকে দেখে কাঠ নয়, সাপ বলে ভুল হতে পারে।
ছোট ডালগুলোর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম। আবছা আলোয় দেখে মনে হচ্ছে কিলবিল করছে, গা মোচড়াচ্ছে।
চোখ পিটপিট করে, আবছায়া আর গুঁড়িগুলোর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাইলাম।
এসময় নড়ে উঠল কী যেন।

একটা গুঁড়ি দুলে উঠেছে। শাণিত নখের খটাখট শব্দ কানে এল। কিছু একটা কর্কশস্বরে ককিয়ে উঠল। তারপর সব চুপচাপ।
গুঁড়িতে পায়ের ডগা দিয়ে ঠেলা দিলাম। ইঁদুর-টিদুর ঢুকল নাকি? মনে মনে আশা করছি মাকড়সার দল এখানে জাল বোনার সময় পায়নি। কাঠ তুলতে গিয়ে হাতে ঝুল লেগে গেলেই মেজাজ বিগড়ে যায় আমার।
একটা কাঠ তুলে নিতে ঝুঁকলাম। সই করে বা বাহুতে তুলে নিলাম ওটা। রুক্ষ বাকলে ছড়ে গেল চামড়া। দ্বিতীয়টা তুলতে যেতেই নড়ে উঠল হাতের কাঠটা। মনের ভুল আরকী।
পরমুহূর্তে, কীসে যেন কামড়ে দিল আমাকে।
চেঁচিয়ে উঠলাম। হাত থেকে কাঠটা ফেলে দিয়ে লাফিয়ে পিছু হটলাম। বাহু যেন পুড়ে যাচ্ছে। চামড়া জ্বালা করছে। যেখানটায় কামড় খেয়েছি চেপে ধরলাম। বাহুতে আর আঙুলে লেপ্টে গেছে চটচটে কী যেন। হাতটা টেনে সরিয়ে আনলাম। আঙুলগুলো জুড়ে গেছে। নাকে আসছে পচা গন্ধ।
মাটিতে পড়ে থাকা গুঁড়িটার দিকে চাইলাম। কী লেগে ছিল ওতে?
লাথি মারলাম ওটায়। নড়ে উঠল। আঁধারে চোখ সয়ে এসেছে। কোনও কিছু গুঁড়িটার কাছ থেকে সরে যায় কিনা লক্ষ করলাম। কিছুই নড়াচড়া করল না। খসে পড়েছে কামড়ে দেওয়া প্রাণীটা। পায়ের পাতা দিয়ে উল্টে দিলাম গুঁড়িটাকে। এবার পিছনে সরে এলাম। কলিজা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।
আঁধারে দেখলাম, গুঁড়ির বাকলটা দেখতে বাকলের মত নয়। মুখের চেহারার মত। পুরানো, মৃত এক মুখ। চোখজোড়া বোজা। সরু-সরু দাগগুলো নাক, জ্ব, দাড়ি এসব ইঙ্গিত করছে। মানুষের মুখের মত নয়। বিকৃত। মুখগহ্বরের কাছে একটা গর্ত, তরল জাতীয় কিছু একটা গলগল করে মাটিতে পড়ছে।
_ আমার ধারণা হলো আঁধারে চোখে ভুল দেখছি আমি। গুঁড়িটাকে আবারও জুতোর ডগা দিয়ে উল্টে দিলাম।
উল্টে গেল ওটা। দীর্ঘশ্বাসের মত এক শব্দ কানে এল। মুখ তুলে চাইলাম। বাতাসের শব্দ। চোখ নামিয়ে মুখটাকে আবারও দেখার চেষ্টা করলাম। মুখের বদলে বাকল আর করাত দিয়ে যেখানটায় ছোট-ছোট ডাল-পালা কাটা হয়েছে সে দাগগুলো চোখে পড়ল।
কষে লাথি মারলাম গুঁড়িটাকে। মাটিতে দাপালাম পা। এটা স্রেফ একটা কাঠের গুঁড়ি। মোটেই নড়েনি। নিশ্চয়ই কোনও পোকা-টোকা আমাকে কামড়েছে। কিন্তু চামড়ায় বসে যাওয়া তীক্ষ্ণ দাঁতগুলো এখনও অনুভব করছি আমি।
বাহু ঘষে খানিকটা আঠা খসালাম। দুর্গন্ধ। জিনিসটা মেখে রয়েছে আমার বাহু আর আঙুলে-যেতে চাইছে না।

জিন্সে হাত মুছে আরেকটা গুঁড়ি নিতে হাত বাড়ালাম। আমার আঙুল স্পর্শ করার আগেই পড়ে গেল ওটা। অন্যগুলোর উপর ধাক্কা খেয়ে আমার দিকে গড়িয়ে এল। সভয়ে পিছু হটলাম। অল্পের জন্য আমার পায়ে পড়েনি। পায়ের ডগা দিয়ে নাড়লাম গুঁড়িটাকে। সামান্য নড়ে উঠে নিথর পড়ে রইল।
আরও গোটা দুই গুঁড়ি টেনে বের করলাম। তিনটে হয়ে গেলে হনহনিয়ে বাড়ির পথ ধরলাম। বারবার পিছু ফিরে কাঠের স্তূপটার দিকে চাইছি। পরশুদিন হ্যালোউইন। তাই কেমন জানি গা ছমছম করছে।
পিছনের দরজায় পৌঁছে সবচাইতে খারাপ ভুলটা করলাম। বারান্দার আলোয় পা রেখে হাতের গুঁড়িগুলোর দিকে চোখ নামিয়ে চাইলাম।
এক জোড়া মৃত, শূন্য চোখ পাল্টা চাইল আমার উদ্দেশে। টলে উঠলাম। হাত থেকে খসে পড়ে গেল কাঠ। কী দেখলাম! এটা গাছ। স্রেফ একটা মরা গাছ। মরা কাঠ। আর কিছু নয়। চোখ বুজে ফেলেছি।
চোখ যখন মেলোম, চোখ নয় কাঠের গুঁড়ি পড়ে থাকতে দেখলাম ঘাসের উপর। যে গাঁটগুলো থেকে ডাল কাটা হয়েছে সে। জায়গাগুলো দেখতে খানিকটা শূন্য কোটরের মত লাগছে। অতটা ভয় পাওয়া আমার উচিত হয়নি। আসলে বারান্দায় ম্লান আলো ভুতুড়ে করে তুলেছে পরিবেশ। ফলে, মরা কাঠ দেখেই ভড়কে গেছি আমি।
ঘেমে গেছে শরীর। হয়তো কোন জাতের মাকড়সা কামড়ে দিয়েছে আমাকে। হয়তো বিষের কারণে চোখে ভুল দেখছি। মোটকথা, শরীর খারাপ করছে আমার।
গুঁড়িগুলো ফেলে রেখেই, বাড়ির ভিতরে পা বাড়ালাম। গায়ের চামড়া ঠাণ্ডা, অথচ ভিতরে ভিতরে পুড়ে যাচ্ছে।
চাচী! চেঁচিয়ে উঠলাম। দড়াম করে লাগিয়েছি পিছনের দরজা। হঠাৎই আলো দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলাম। চাচা-চাচীকেও কাছে পেতে চাইছি।
বাহুর দিকে চাইলাম। কিছু নেই, না কোনও ক্ষত, না আঁচড়ের দাগ। ব্যথার জায়গায় একটা আঙুল রাখলাম ধীরে ধীরে। স্বচ্ছ, হলদে এক ধরনের রস। বেরিয়ে এল আঙুলের চাপে। প্রচণ্ড জ্বলুনি।
চাচী! চেঁচালাম আবারও। বাহুতে হাত চাপা দিয়ে দৌড়ে গেলাম তাকে খুঁজতে।
চাচার স্টাডিতে ঢুকতেই চাচা-চাচী মুখ তুলে আমার দিকে চাইল। সব কথা গড়গড় করে বলতে শুরু করলাম। চাচী আমার হাত সরিয়ে বাহুর দিকে চাইল।
কই, ফোলা-টোলা কিছুই তো নেই, অবিশ্বাসের সুরে বলল।
কিন্তু আমাকে কামড় দিয়েছে, ব্যথা করছে…
সব কাজ না করার ফন্দি…

না, চাচী, আমাকে কীসে যেন কামড়েছে!
ভ্রু কুঁচকে গেল চাচীর। সটান উঠে দাঁড়াল।
স্প্রে লাগাবি চল। তারপর কাঠ নিয়ে আসবি। এবার আর কোনও অজুহাত শুনতে চাই না।
চাচী আমার কথা বিশ্বাস করেনি।
কিশোর, ওখানে কিছুই নেই। তুই আমার গার্ডেনিং গ্লাভস পরে কাজটা সেরে ফেল, বলল।
কাঁধ ঝুলে পড়ল। ঘুরে দাঁড়িয়ে বেরিয়ে এলাম। চাচীর গ্লাভস লণ্ডি রুম থেকে বের করে সঙ্গে একটা ফ্ল্যাশলাইট নিলাম। বাইরে ঠাণ্ডা। অন্ধ ভূতের মতন নেচে বেড়াচ্ছে ফ্ল্যাশলাইটের আলো। কপাল থেকে ঘাম মুছে আগাছার জঙ্গলে পা রাখলাম।
কাঠ এখানেই ফেলে রেখে গেছিলাম, এখন দেখতে পাচ্ছি না। চারদিকে আলো বুলিয়ে আগাছা যেখানে চেপ্টে গেছে সেখানটায় ধরলাম। ওখানে গুঁড়ি পড়ে থাকার কথা।
এ সময় কী যেন খসখস করে উঠল আমার পিছনে।
পাঁই করে ঘুরে দাঁড়ালাম।
শব্দটা থেমে গেছে। কেউ যেন আগাছার মধ্যে চলাফেরা করছিল। বিড়াল হতে পারে।
শেষমেশ যেখানে ফেলেছিলাম তার দশ ফুট দূরে খুঁজে পেলাম একটা গুঁড়ি। অতদূরে গেল কী করে?
গুঁড়িটার দিকে চোখ রেখে পায়ে পায়ে পিছনের দরজা দিয়ে সেঁধিয়ে পড়লাম।
চাচী এবার আর আমাকে কাঠ আনিনি দেখেও কিছু বলল না।
কিশোর, তোর মুখ শুকনো কেন? শরীর খারাপ নাকি? উদ্বিগ্ন স্বরে প্রশ্ন করল।
মাথা ঝাঁকালাম। চাচীকে বলতে চাইলাম গুঁড়িটার নড়াচড়া সম্পর্কে। কিন্তু আমি নিজেই তো বিশ্বাস করি না নিজে থেকে নড়েছে। ওটা। চাচীকে কী বলব?
চাচী, মাকড়সার কামড়ে কি মানুষ উল্টোপাল্টা দেখে?
আমার হাত থেকে ফ্ল্যাশলাইটটা নিল চাচী।
না। এখন শুয়ে থাকগে যা।
মাথা ঝাঁকিয়ে পা বাড়ানোর আগে এক ঝলক চাউনি বুলালাম পিছনের দরজার দিকে।
পরদিন সকালে বাহুটা সামান্য আড়ষ্ট ঠেকল।
কিশোর, চাচী ডাকল। নাস্তা খেতে আয়।
বিছানা ছাড়লাম। সোয়েটশার্ট আর জিন্স পরে নিলাম। মুখে ছিটালাম পানি।

বাহুতে এখন আর ব্যথা নেই। তবে বড় চুলকাচ্ছে। শার্টের হাতা গোটালাম।
একী! হাত থেকে কনুই পর্যন্ত, আমার চামড়া রুক্ষ বাকলের মত দেখাচ্ছে। হলদে রস চুঁইয়ে বেরোচ্ছে কিনারাগুলো দিয়ে।
চাচী! ডাক ছাড়তে গিয়ে ককিয়ে উঠলাম। গলা শুকিয়ে কাঠ। কাঁপা-কাঁপা আঙুলে চামড়া স্পর্শ করলাম। চামড়া বলে মনে হলো না। রুক্ষ। কাঠের মত।
বাথরুমে গিয়ে সিঙ্কের উপর ঝুঁকে পড়লাম। মখের দিকে চাইলাম। অন্যরকম কিছু লাগল না। সামান্য একটু ফ্যাকাসে শুধু। বাহুর দিকে চোখ নামালাম। 1 জিনিসটা কনুই থেকে কব্জি পর্যন্ত ছেয়ে গেছে। দেখে মনে হচ্ছে বাকল সেঁটে রয়েছে বাহুতে।
আমার ধারণা, সামান্য সাবান ঘষলেই উঠে যাবে। লম্বা করে শ্বাস টানলাম।
ব্রাশ নিয়ে, সিঙ্কো গরম পানি ভরলাম। এবার ঘষতে শুরু করলাম। খানিকটা উঠে এল। বাকলের নীচ থেকে চুঁইয়ে বেরোল দুর্গন্ধময় আরও হলদে আঠা। ঘষা থামিয়ে ঘৃণায় মুখ সরিয়ে নিলাম।
কিশোর, স্কুলে যাবি না?
বাহুর দিকে চাইলাম। জিনিসটা কী বুঝতে পারছি না। কিনারাগুলো চুলকোচ্ছে আর পুড়ছে। আঁচড়াতে সাহস হলো না। জিনিসটা যা-ই হোক, ছড়াচ্ছে।
পানি বন্ধ করে, একটা তোয়ালে জড়ালাম বাহুতে। এবার কিচেনের উদ্দেশে পা বাড়ালাম।
চাচী? ডাকলাম।
আমার দিকে চাইল চাচী। নাস্তা তৈরি করছিল।
বাহু থেকে তোয়ালেটা সরিয়ে দিলাম।
মুহূর্তের জন্য, ফ্যাকাসে হয়ে গেল চাচীর মুখের চেহারা। এবার ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল। ঘুরে দাঁড়িয়ে কাজে ব্যস্ত হলো, সিঙ্কে ডিশ রাখছে।
এবার বুঝতে পারলাম কেন এত দেরি। কস্টিউম নিয়ে পড়ে ছিলি। মেকআপটা ভাল হয়েছে, কিন্তু এসব নিয়ে পড়ে থাকলে হবে?
এটা মেকআপ নয়। কাল রাতে আমাকে কীসে যেন কামড়েছে। এখন দেখতে পাচ্ছি হাতটা অন্যরকম হয়ে গেছে, চুলকাচ্ছে।
চাচী ঘুরে দাঁড়াল আমার দিকে। এগিয়ে এসে একটা হাত রাখল কপালে।
জ্বর নেই। কাজেই স্কুল মিস করার কোন কারণও নেই। তুই কি কস্টিউমটা নিয়ে কাজ করতে চাস বলে বাড়িতে থাকতে চাইছিস? জিজ্ঞেস করল।
না, চাচী, সত্যি সত্যিই আমার শরীর খারাপ। ডাক্তার দেখানো দরকার!
চাচী বাহু ভাঁজ করে জ কুঁচকাল।

এর আগেরবার খামোকা ডাক্তার হপকিন্সকে ভুগিয়েছিলি। মনে নেই, তোর চাচার লাল কলম দিয়ে হাম বানিয়েছিলি? ভদ্রলোক এখনও মনে করে রেখেছেন ঘটনাটা।
কিন্তু এবারেরটা মিথ্যে নয়! নিজেই দেখো! চাচীর দিকে বাহু বাড়িয়ে দিয়ে এক টুকরো কাঠ তুলে নিলাম। পচা পাতার হলদে দুর্গন্ধময় রস বেরিয়ে এল।
চাচী নাক-মুখ চেপে ধরে অন্যদিকে চাইল।
তোর মাথায় এরচেয়ে ভাল কস্টিউমের আইডিয়া এল না? তুই ঠিক তোর চাচার মত হয়েছিস। যাকগে, লাঞ্চ নিতে ভুলিস না। আর স্কুলের কোন মেয়েকে তোর স্টান্টবাজি দেখাতে যাস না যেন।
চাচী আমার হাতে একটা বাদামি ব্যাগ ধরিয়ে দিয়ে, ঠেলে দিল। পিছনের দরজার দিকে।
অনেক বলে-কয়েও বাহুর দিকে চাচীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারলাম না।
এখন স্কুলের সময়। সন্ধেয় তোর কাজ দেখব। এখন আর কোন অজুহাত নয়, সাফ জানিয়ে দিল চাচী।
আমার পিঠের উপর দরজা লেগে গেল দড়াম করে। চাচাকে বলে দেখা যেতে পারে। আচ্ছা, চামড়ার জিনিসটা যদি আরও ছড়ায়? যদি সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে তখন কী হবে? আমার সারা মুখ গাছের মত হয়ে যাবে না তো?
সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে বাস স্টপে চলে এলাম।
বাসে একাকী বসে রইলাম। বাহু ঢাকা পড়েছে সোয়েটশার্টের তলায়। গোটা বাহু চুলকাচ্ছে, আর পুড়ে যাচ্ছে। বাকল ঘিরে মনে। হচ্ছে লাল পিঁপড়ে কামড়ে বেড়াচ্ছে। বাকলের নীচের অবস্থা আরও খারাপ। হাড় ব্যথা করছে। মাংসপেশী আড়ষ্ট। মুঠো শক্ত করতে কষ্ট হচ্ছে। আঙুলগুলো আঁকড়ে আসছে।
বাসে বসে রয়েছি, এক টুকরো বাঁকা কাঠের ছোট টুকরো বেরিয়ে এল নখের নীচ দিয়ে। বাঁ হাতের উপর ডান হাত চাপিয়ে দিলাম।
মুখ তুলে চাইতেই দেখি, এক ছেলে আমার দিকে চেয়ে। চোখ সরিয়ে নিল ও। মুখের চেহারা ছাই বর্ণ।
শার্টের হাতায় হাত ঢেকে বাসের জানালা দিয়ে বাইরে চাইলাম।
বুকের মধ্যে ধড়াস-ধড়াস করছে হৃৎপিণ্ড। এসব কী ঘটছে। আমার সঙ্গে?
স্কুলে পৌঁছে, সোজা নার্সের অফিসে গিয়ে ঢুকলাম।
কী, কিশোর, তোমার এবারের কস্টিউম কী? মমির অভিশাপ? নাকি পোড়া মুখ? নাকি আরও ভয়ংকর কিছু?
এক পা থেকে অপর পায়ে ভর সরালাম।
আমার শরীর খারাপ করছে।

আমাকে বসতে দিলেন নার্স। আমার তাপমাত্রা নিলেন। জিভ বের করতে বললেন। হার্টবিট কান পেতে শুনলেন। এবার আমার দিকে চাইলেন।
একদম সুস্থ।
বড় করে ঢোক গিলে বাহু বাড়িয়ে দিলাম। তারপর শার্টের হাতা গোটালাম। বাহুতে ছড়িয়ে পড়েছে শক্ত, বাদামি বাকল। শিকড়ের
কিলবিলে কী সব যেন বেরিয়ে এসেছে নখের তলা দিয়ে।
মিসেস গিলক্রিস্ট পিছু হটলেন। আমার বাহুর দিকে দুমুহূর্ত চেয়ে থেকে দরজার কাছে হেঁটে গেলেন।
ক্লাসে যাও। এসব স্টান্ট দেখিয়ে ছুটি পাবে না।
কিন্তু…
আর কোনও কথা নয়। তুমি কি চাও তোমার বাসায় ফোন করে কমপ্লেন করি?
অগত্যা হাতা টেনে বেরিয়ে এলাম।
ক্লাসে সবার শেষে ঢুকলাম আমি। চুপচাপ ডেস্কে গিয়ে বসলাম।
রবিন ঝুঁকে পড়ল ওর ডেস্ক থেকে।
বাসের কয়েকটা ছেলের কাছে তোমার কস্টিউমের কথা শুনলাম। কই, দেখি?
মিসেস হকিন্স আমাদের পাশ দিয়ে হেঁটে গেলেন। চুপ করে গেল রবিন। পরে, বলল। ক্লাস শুরু হলো।
মিসেস হকিন্সের কোন কথা আমার কানে ঢুকছে না। বাহুর চুলকানিটা বন্ধ হয়েছে। এবার কাঁধে শুরু হয়েছে। চামড়া পুড়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে পোকা হাঁটছে চামড়ার উপর দিয়ে। ডেস্কের নীচে বা হাত রাখলাম। সোয়েটশার্টের হাতা দিয়ে ঢেকে রেখেছি। দেখতে চাই না আমি।
লাঞ্চ বেল বাজলে মুসা আর রবিন উঠে এল আমার কাছে।
কই, দেখি? বলল রবিন। তুমি করেছ নাকি রাশেদ চাচা করে দিয়েছেন?
উঠে দাঁড়িয়ে শার্টের হাতা গোটালাম।
ঠাট্টা নয়, সত্যি।
তাই বুঝি? দেখাও না। বাইরে বেরিয়ে এলাম আমরা। লাঞ্চ বেঞ্চির উদ্দেশে এগোলাম।
বেঞ্চে বসে বন্ধুদের দিকে চেয়ে রইলাম। ব্যাগ থেকে আপেল বের করে কামড় দিল মুসা। ওরা নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবে আমার কৃথা। করলে পাশে কাউকে পাব আমি।
চারধারে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে শার্টের হাতা টেনে উঠালাম।
রবিনের চোখ ছানাবড়া। মুখ হাঁ।
খাইছে! বলে উঠল মুসা। আপেল নামিয়ে রাখল। ধরে দেখি?

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলাম।
আঙুল দিয়ে আমার বাহুতে মৃদু খোঁচা দিল ও।
হঠাৎই কান্না পেয়ে গেল। ওর স্পর্শ অনুভব করিনি আমি। ভারী ঠেকছে বাহু, ওটা যেন আর আমার নয়।
এটাই তোমার সেরা কস্টিউম…
মুসা, এটা কিন্তু সত্যিসত্যিই হয়েছে! চোখ কটমট করে চেঁচিয়ে উঠলাম।
হাত সরিয়ে পিছনে সরে গেল ও।
খেপছ কেন? তুমি এটা দেখিয়ে সবাইকে বোকা বানাতে চাও, আমি তোমাকে সাহায্য করব।
বোকা কোথাকার, বললাম তো এটা স্টান্ট নয়-সত্যি। তুমি তো হাত দিয়েই দেখলে। কাঠের মত। আমার সারা শরীর গাছ হয়ে যাচ্ছে। কাল রাতের ঘটনা ওদেরকে খুলে বললাম। কাঠ আনতে গিয়ে কীভাবে কামড় খাই। বাহুর দিকে তাকালাম। শিরদাঁড়া বেয়ে ঠাণ্ডা স্রোত নেমে গেল।
আমি একটু ছুঁয়ে দেখি, বলল রবিন। পরমুহূর্তে শিউরে উঠল।
আমার মনে হয় গুঁড়িটা আমাকে কামড়ে দিয়েছে, বললাম।
দুর্দান্ত হয়েছে এবারের কস্টিউমটা, বলল রবিন।
তোমরা কেন বিশ্বাস করছ না? মরিয়ার মত বলে উঠলাম।
রবিনকে হাত বাড়িয়ে ধরতে গেলাম। কিচকিচ করে উঠল বাহু, কনুই ভাঁজ করতে পারছি না।
মুসা আর রবিন অন্যান্য ছেলে-মেয়েদেরকে আমার কস্টিউমের। কথা বলতে গেল। একটু পরে দেখতে পেলাম আমাকে দেখিয়ে ওরা কী সব বলাবলি করছে।
খিদে নেই, বড্ড তেষ্টা পেয়েছে। আরেকটা টেবিলে গিয়ে বসলাম। খানিক বাদে উঠে দাঁড়ালাম। খেলার মাঠের এক কিনারে গিয়ে বসে পড়লাম।
ওদিকে, টেবিলে বসে ছেলে-মেয়েরা আলোচনা করছে। হ্যালোউইনে তারা কী পরবে। বানোয়াট সব পোশাক। ধুলোয় আঙুল চালালাম। মিথ্যে সব কিছু এমুহূর্তে অসহ্য লাগছে আমার। ঘৃণা হচ্ছে হ্যালোউইনকে। এ ঘটনা বছরের অন্য কোন সময় ঘটলে এখন আমি হাসপাতালে চিকিৎসা নিতাম। কিন্তু এখন হ্যালোউইনের আগে কেউ আমার কথা বিশ্বাস করবে না।
এক মুঠো ধুলোমাটি ছেড়ে দিলাম আঙুলের ফাঁক দিয়ে। কালো মাটির দলা পড়ল মাঠে। এক দলা মাটি আটকে গেল আমার দু আঙুলের ফাঁকে। মুখে আঙুল পুরে মাটি চাটলাম।
কিছু বুঝে ওঠার আগেই এক মুঠো মাটি চালান হয়ে গেছে, আমার মুখের ভিতরে। ঝুঁকে পড়ে থু-থু করে ফেলে দিলাম। মুখ মুছে নিলাম। তবে তাতে কোন

লাভ হলো না। মাটির স্বাদ ভাল লেগেছে আমার।
যে দ্রুত গতিতে রূপান্তর ঘটছে আমার, হ্যালোউইনের পর পর্যন্ত অপেক্ষা করলে অনেক দেরি হয়ে যাবে।
স্কুল কেমন হলো? কাগজ থেকে চোখ তুলে প্রশ্ন করল রাশেদ চাচা। কিচেনে ঢুকেছি আমি।
চাচাকে বাহু দেখাতে ইচ্ছে করছে না। যদি বিশ্বাস না করে? কিন্তু করতে হবে। স্টান্ট দেখিয়ে চাচাকে ধোকা দেওয়া সম্ভব নয়। চাচা নিশ্চয়ই বুঝবে আমারটা আসল।
সোয়েটশার্টের হাতা তুলে বাহু বের করলাম।
চাচা, দেখো।
চাচা এক ঝলক চাইল বাহুর দিকে, তারপর মৃদু হেসে শিস দিয়ে উঠল। কাগজটা নামিয়ে রেখে আমাকে হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকল।
কী এটা?
আমার বাহুটাকে এমুহূর্তে কাঠের গুঁড়ির মতন দেখাচ্ছে। বাকলটা আরও শক্ত হয়েছে। আঙুলের তলা দিয়ে বেরনো শিকড়গুলো আরও জড়িয়ে-পেঁচিয়ে গেছে। এখন আর টান দিয়ে বাকল তোলা সম্ভব হচ্ছে না, শুধু কিনারাগুলো ছাড়া। বাকল ছড়িয়ে পড়েছে ঘাড় থেকে পিঠ অবধি। চিড়চিড় করে জ্বলছে। পিঠ চুলকোতে গেলে বাহুতে ব্যথা লাগছে।
আঙুলের গাঁট দিয়ে আমার বাঁ বাহুতে টোকা দিল চাচা। ঐ কুঁচকে গেছে।
ব্যাপারটা সিরিয়াস।
মাথা ঝাঁকালাম। চোখভরে পানি আসছে। কাঁদতে চাই না। চাই চাচা একটা কিছু করুক।
গুঁড়িটা আমাকে কামড়ে দিয়েছে, চাচা। আমাকে বদলে দিচ্ছে।
আমার দিকে ভ্রূ তুলে চাইল চাচা।
আধা মানুষ আধা গাছ, এভাবেই রাখবি? নাকি পুরোটাই করবি?
চাচা! এটা সত্যিকারের কাঠ। বাহু তুলে ধরলাম। আঙুলগুলো নাড়তে গেলে শব্দ করে উঠল। একটা আঙুলও ঠিকমত নড়ল না।
নিশ্চয়ই। আইডিয়াটা ভাল। সত্যিকারের কাঠ লাগিয়ে একেবারে তাক লাগিয়ে দিয়েছিস। সারাদিন ধরে আঠা দিয়ে এক টুকরো এক টুকরো করে লাগিয়েছিস, তাই না? কোন্ আঠা ব্যবহার করছিস তুই? আমার ঘাড়ের কাছের বাকল খুঁটল চাচা। তারপর নাক কুঁচকে সরে গেল। এহ, পচা গন্ধ। তোর চাচী খুব খেপাবে।
অতি কষ্টে নিজেকে সামলালাম। চাচাকে বিশ্বাস করাতে হবে আমার কথা।
এটা আঠা নয়, চাচা, রস। জিনিসটা আমাকে গাছ করে দিচ্ছে!

আমার কাঁধে হাত রাখল চাচা। তার দিকে চাইলাম। মাথা। ঝকাল চাচা, মুখের চেহারা গম্ভীর।
আমি কাউকে বলব না এটা বানোয়াট। আমি তোর কাজ দেখে গর্ব বোধ করছি।
চাচা, আমার ডাক্তার দেখানো দরকার! উদ্গত অঞ্চ চেপে বললাম।
তা হলে তো গাছের ডাক্তার ডাকতে হয়। বলে আমার উদ্দেশে। চোখ টিপে আবার কাগজ নিয়ে বসল চাচা।
পা টেনে টেনে নিজের ঘরে চলে এলাম। দরজা লাগিয়ে দিলাম। সজোরে। বিছানায় গা ছেড়ে দিয়ে পড়ে রইলাম। বালিশে মুখ গুঁজে রেখেছি। চাচা সত্যি আমার কথা বিশ্বাস করেনি। কেউই করেনি। সবার ধারণা, হ্যালোউইনের জন্য দুর্দান্ত এক কস্টিউম নিয়েছি আমি। অথচ অপুর্ব(!) এই কস্টিউম ধীরে ধীরে গ্রাস করে নিচ্ছে আমার দেহ।
কী করব এখন? পিঠ চুলকোচ্ছে, গায়ের থেকে যেন খসে পড়বে চামড়া।
শুয়ে থেকে বাহুর দিকে চাইলাম। নিজের বাহু বলে মনে হলো। না। কেটে ফেলতে ইচ্ছা করছে এটাকে। এটা আমার শরীরের অংশ নয়। আমার মাংসপেশী আটকা পড়েছে গাছের বাকলের নীচে। নড়াচড়া করতে পারছে না।
ফাঁদে পড়ে গেছি আমি!
জিনিসটা বুকের কাছে চলে এলে কী হবে? আমার শ্বাস-প্রশ্বাস কি থেমে যাবে? হৃৎপিণ্ডের কী অবস্থা হবে? মুখের ভিতরে পৌঁছে। গেলে কি আর কথা বলতে পারব? খিদে পেয়েছে আমার। কিন্তু এ খিদে অন্য খিদে।
মাটি খেতে সাধ হচ্ছে! জিভে জল আসছে মাটি খাওয়ার কথা ভাবলে। কিন্তু সেটা সম্ভব না! বালিশ এতটাই জোরে চেপে ধরলাম, ফ্যাকাসে হয়ে গেল আঙুলের গাঁট।
উহ্, এখানে এত গরম কেন? মনে হচ্ছে গরমকাল এখনও ফুরোয়নি।
উঠে গিয়ে বাথরুমের কল ছাড়লাম। ঝুঁকে পড়ে মুখ ডুবিয়ে দিলাম পানিতে। পানি গিলছি। পেট ফুলে ওঠা না পর্যন্ত একটানা পান করলাম। মাটি খাওয়ার চাইতে এ-ও বরং ভাল।
এবার সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে নিজের দিকে চাইলাম।
ঘাড় থেকে মুখের দিকে চলে এসেছে বাকল।
ঘাড়ের কাছ থেকে সোয়েটশার্ট সরিয়ে দিলাম। এখানটায় এত গরম লাগছে কেন? আহা, নকুল ক্ষতের মত যদি এটাকে টেনে তুলে ফেলতে পারতাম! কিংবা যদি কেটে ফেলা যেত। কিন্তু কাজটা করতে সাহস হলো না। যদি দেখা যায় বাকলের নীচে শুধু হলদে দুর্গন্ধময় আঠা? কেটে ফেললে আবারও যদি গজায়? কিংবা গজাল না, কিন্তু হলদে তরল চুঁইয়ে চুঁইয়ে বেরোতেই থাকল, তখন?

এবার মাথায় অন্য একটা বুদ্ধি এল।
এটার হাত থেকে বাঁচার হয়তো আরেকটা উপায় আছে। পিছনের উঠনে এখনও পড়ে রয়েছে গুঁড়িগুলো।
সন্তর্পণে বাইরে বেরিয়ে এসে গ্যারেজে ঢুকলাম। আমার হাতে চাচার কুঠার। এবার পা বাড়ালাম কাঠের গাদার উদ্দেশে। গুঁড়িগুলো আমার দুরবস্থার জন্য দায়ী। ওরা মৃত নয়। কিন্তু আমি যদি ওদেরকে মেরে ফেলতে পারি তা হলে হয়তো ওরা থামবে।
সূর্য ডুবে গেলেও আলো রয়েছে যথেষ্ট। ভারী, ভেজা কুয়াশা নেমে আসছে আকাশ থেকে। চারধারে চোখ বুলিয়ে, আগাছা ভেদ করে এগোলাম। ষষ্ঠেন্দ্রিয় জানান দিচ্ছে কেউ আমার অলক্ষে লক্ষ করছে আমাকে। আমি জানি কী সেটা।
কাঠের স্তূপের কাছে পৌঁছলাম। গুঁড়িগুলোকে মানুষের মুখের চেহারার মতন লাগছে। একটা গুঁড়িতে লাথি মারতেই গড়িয়ে গেল। আমি ওদের মুখ দেখতে চাই না।
এসব বন্ধ করো! চেঁচিয়ে উঠলাম। ভীত। ঠোঁট ভিজিয়ে নিলাম। দুহাতে শক্ত করে চেপে ধরে রেখেছি কুঠারটা। এবার এক কাঁধের উপর তুলে সজোরে নামিয়ে আনলাম। কোন্ গুঁড়িটায় আঘাত হানলাম জানতে চাই না আমি। শুধু চাই ওদের মৃত্যু। মুক্তি চাই ওদের হাত থেকে চিরদিনের জন্য।
কুঠারটা গেঁথে গেল কাঠে, দেবে গেল বাকলের ভিতরে।
পরমুহূর্তে, অসহ্য যন্ত্রণা করে উঠল আমার বাঁ বাহুটায়।
বহু চেপে ধরলাম। কুঠার ফেলে দিয়ে পড়ে গেলাম হাঁটুর উপরে। তীব্র ব্যথা। মিনিটখানেক মাটিতে পড়ে রইলাম নিথর। তারপর কোনমতে উঠে দাঁড়াতে পারলাম। পিছনের দরজার কাছে গিয়ে বাড়ির গায়ে হেলান দিলাম।
হলদে রস বেরিয়ে আসছে বাহুর এক দাগ থেকে। সদ্য জন্মানো দাগটা দেখে মনে হচ্ছে কুঠারের কাটা বুঝি। হাত চাপা দিয়ে ব্যথা কমাতে চেষ্টা করলাম। বাহু থেকে পিঠ অবধি ছড়িয়ে পড়ছে তীব্র যন্ত্রণা।
মুখ দিয়ে শ্বাস নিচ্ছি, হেলান দিলাম পিছনে। চাচী যদি আজকে আগুন জ্বালতে চাইত তা হলে কী হত? গুঁড়ি পোড়াতে যদি চাইত? অসুস্থ বোধ করলাম। কাঠ পোড়ালে হয়তো আমার গায়েও আগুন ধরে যেত।
আজ রাতে আগুন জ্বালতে দেওয়া যাবে না। আমার সঙ্গে যা ঘটল তার পর তো প্রশ্নই ওঠে না।
ভিতরে গেলাম আমি।
চাচা-চাচী লিভিংরূমে। তাদের নিচু গলার কথা-বার্তার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। কাছিয়ে গেলাম যাতে শুনতে পারি।

কিশোর বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলছে না তো? চাচীর কণ্ঠ ক্লান্ত আর উদ্বিগ্ন শোনাল।
উঁকি মেরে দেখি সোফায় বসে চাচী। তার পাশে চাচা।
মজা করছে করতে দাও। আমিও প্রথম প্রথম করেছি। শীঘ্রি থেমে যাবে, চাচা জবাবে বলল।
চাচার বাহুতে হাত রাখল চাচী।
তোমাদের দুজনের মধ্যে কার স্টান্ট যে বেশি ভয়ঙ্কর বুঝি না, বাবা!
মৃদু হাসল চাচা।
কে জানে, এই গুণ কাজে লাগিয়ে ও একদিন হয়তো অনেক বড় হবে।
চাচীর মুখেও স্মিত হাসি ফুটল।
হ্যালোউইন পর্যন্ত কিছু বলব না আমি। তারপর কিন্তু এসব বন্ধ করতে হবে। এই প্রথম ওর কস্টিউম দেখে ভয় পেয়েছি আমি। আমি এসব আর দেখতে চাই না।
চাচী আর চাচার গলা খাদে নেমে গেল। সরে এলাম আমি। অন্ধকার হল-এ এসে বাহুর দিকে চাইলাম। আমিও এসব আর দেখতে চাই না। কিন্তু কীভাবে মুক্তি পাব এটার হাত থেকে? হাসপাতালেও কি এর চিকিৎসা আছে? মনে তো হয় না।
বাকল এখন আমার বুকে ছড়িয়েছে। চামড়া বেয়ে গুঁড়ি মেরে পায়ের দিকে চলেছে। আর কদিন সময় আছে আমার হাতে? একদিন? হয়তো। কিন্তু হ্যালোউইনের পরে কতখানি বাকি থাকবে আমার? আসল আমার কথা ভাবছি।
কিছু একটা করতে হবে, এবং দ্রুত। কাঠগুলো কোত্থেকে এসেছে জানতে পারলে হয়তো কোন সমাধান পেতে পারি। জঙ্গল। সম্পর্কে জানে এমন কেউ হয়তো আমাকে সাহায্য করতে পারবে।
হল ধরে এগিয়ে চাচার স্টাডিতে ঢুকলাম।
স্টিলের বাক্সে মেকাপের সরঞ্জাম রাখে চাচা। সার বেঁধে ওগুলো রাখা হয়েছে তার ডেস্কের পাশে। একগাদা কাগজ ছেয়ে রেখেছে। ডেস্ক, ফোন আর অন্যান্য সব কিছু।
ডেস্কের উপর ঝুঁকে পড়ে কাগজগুলোয় চোখ বুলালাম। বেশির ভাগই বিলের মতন দেখাল। কয়েকটা হলদে পোস্ট-ইট নোটে হিজিবিজি করে লেখা: মো লন। শেষমেশ খুঁজে পেলাম।
গোলাপি এক স্লিপে লেবেল সাঁটা: শেরিংহ্যাম নার্সারি, কাঠের অর্ডার দেয়া হয়েছিল এখানে। বিলটা ভাঁজ করে পকেটে রাখলাম। কাল স্কুলের পর ওখানে গিয়ে খোঁজ-খবর নেব।
ডিনারে, চাচা-চাচী এমন সহজ আচরণ করল, আমার বাহু নিয়ে যেন কোন সমস্যা নেই। ডিনারের পর সিঙ্কে প্লেট নিয়ে গেলাম। চাচী আমার চুল এলোমেলো

করে দিল।
আজ রাতে আগুন জ্বাললে কেমন হয়? কয়েকটা মার্শম্যালো, কিছু চকোলেট আর গ্রাহাম ক্র্যাকার রয়ে গেছে, বলল।
চাচী, ভয়ানক গরম লাগছে।
আমার দিকে চাইল চাচী।
কোথায় গরম?
তুমি আগুন জ্বাললে আমি পুড়ে যাব। ঠাট্টার ভঙ্গিতে বলতে চেষ্টা করলেও গলা ধরে এল। কথাটা তো আক্ষরিক অর্থেই সত্যি।
চাচী চাচার দিকে এক ঝলক চাইল।
ঠিক আছে…
আজ রাতে না, বলে উঠলাম আমি। হাসার চেষ্টা করলাম।
আগুন জ্বাললে আমার আঠা গলে যাবে।
এবার হাসি ফুটল চাচীর মুখে।
বুঝেছি। ঠিক আছে, আমরা না হয় আরও দুএকদিন আগুন জ্বালব না।
খানিক পরে নিজের ঘরে চলে এলাম।
বাহুতে আর কোন অনুভূতি নেই। ঘাড় আর মুখে চুলকানি, জ্বালা-পোড়া। কালকে আমাকে কেমন দেখাবে তা নিয়ে ভাবতে চাই না। শুধু কামনা করছি নার্সারিতে পৌঁছবার আগে পর্যাপ্ত সময় পাব।
ঘুম ভাঙতে, মুখে হাত বুলিয়ে ছুটে গেলাম।
বা চোখ ঢাকা পড়েছে বাকলের নীচে। পাজামা টপ খুললাম। বুকেও ছড়িয়েছে জিনিসটা। বাঁ পা-টা কেঠো, আড়ষ্ট ঠেকছে। বাঁ হাতের দিকে চাইলাম।
আঙুলগুলো লম্বা হয়ে গেছে। ডাল-পালার মত বাঁকা। এমনকী বাঁকাতেও পারছি না। ডান বাহুতে এমন জ্বলুনি শুরু হয়েছে। হাতে সময় বেশি নেই।
কাপড় পরতে অনেক সময় লেগে গেল। ঢোলা জিন্স পরতে হলো। শার্টের হাতায় বাঁ হাত ঢোকাতেই কাঁচ-কোচ শব্দ হলো। তুলে ধরে রাখতে ভাল লাগল।
এবার দেখতে পেলাম উঁচিয়ে রাখলে গাছের ডালের মত দেখায়। ডান হাতে বাঁ হাতের কব্জি চেপে ধরে বাহুটাকে নীচে নামিয়ে আনলাম। নামতে চাইছিল না, টেনে নামাতে হয়েছে। সামনে কঠিন সময়।
পা টেনে টেনে কিচেনের পাশে এলাম।
চাচী আমার দিকে ঘুরে দাঁড়াতেই তার মুখের চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। রেযর ব্লেডের স্টান্টের সময় তার কাছ থেকে এই বিস্ময় আশা করেছিলাম আমি। এখন নয়, কেননা এবারেরটা তো সত্যি।

কিছু বললাম না। বলার চেষ্টাও করলাম না। মুখের ভিতরটায় চুলকানি আর জ্বালা-পোড়া শুরু হয়েছে। মুখের ভিতরে পিঁপড়ে যেন পিলপিল করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।
এবারের ফার্স্ট ইযটা তুই-ই পাবি, বলল চাচা। কিচেনে এসে ঢুকেছে। যদি বলিস তো তোকে আজকে নিয়ে আসতে পারি।
মাথা নাড়লাম। একটা পরিকল্পনা এসেছে মাথায়।
রবিনের বাসায় যাব স্কুলের পরে, বললাম। কণ্ঠস্বরটা নিচু আর ভারী শোনাল। গলায় একটা হাত রাখলাম। মুখের ভিতরটা শুকনো ঠেকছে। মুখের অর্ধেকটা ঢেকে দিয়েছে বাকল।
চাচী আমার দিকে চাইল।
কিশোর, এই পোশাকে খেতে পারবি তো?
খিদে নেই। কেমন জানি জড়িয়ে গেল কথাগুলো।
কমলার রসে ঐ রাখল চাচী।
তা হলে অন্তত এটা খেয়ে যা।
তেষ্টা পেয়েছিল। পান করলাম। বিস্বাদ লাগল। বাইরে তাকাব না পণ করেছি। মাটির টান অনুভব করছি দস্তুর মত-গতকাল কী ভালই না লেগেছিল মাটির স্বাদ।
গাড়ি করে স্কুলে যাওয়ার পথে চাচা কয়েকবার জিজ্ঞেস করল কীভাবে পোশাকটা বানিয়েছি। জড়ানো, অস্পষ্ট স্বরে উত্তর দেওয়ার। পর চাচা বলল, এ নিয়ে পরে কথা বলবে।
সে সময় পেলে হয়, বললাম মনে মনে। চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে করেছে।
বাইরে কুয়াশা, আঁধার-স্যাঁতসেঁতে ভাব। চাচার পরনে মোটা সোয়েটার। অথচ সাধারণ শার্ট আর জিন্সেই ঘেমে নেয়ে যাচ্ছি। আমি।
গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম।
এই পোশাকে ঠিকমত নড়াচড়া করতে পারবি তো? চাচার প্রশ্ন।
ঝুঁকে পড়ে জানালার কাঁচ ভেদ করে চাইলাম। হাসার চেষ্টা করলাম, কিন্তু মুখের বা পাশটা নড়ল না। অস্পষ্ট জবাব দিয়ে চাচার দিকে চেয়ে রইলাম। অদ্ভুত এক ভুতুড়ে অনুভূতি-এবারই হয়তো শেষ দেখা-তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকতে বাধ্য করল। এবার মাথা ঝাঁকিয়ে ঘুরে দাঁড়ালাম। চোখের দৃষ্টি ঝাপসা।
স্কুলে গোটা দুই ভ্যাম্পায়ার আমার পাশ দিয়ে দৌড়ে চলে গেল। দুটো গোলাপি ভূত চেয়ে রইল আমার দিকে, আমি এখন খোঁড়াতে খোঁড়াতে উঠন পেরোচ্ছি। বাঁ পা চুলকাতে শুরু করেছে। দাপাতে ইচ্ছে করছে, এতটাই চুলকাচ্ছে আর জ্বালা-পোড়া করছে। কিন্তু হাটু ভাঁজ করতে পারলাম না।

অ্যাই, কিশোর!
ঘুরে দাঁড়াতে রবিনকে দেখতে পেলাম। বুকের উপর রুপোলী এক ট্র্যাশ ক্যান পরেছে ও। মুখের রং রুপোলী। হাতে কুঠার। ধারাল ফলা দেখে সরে দাঁড়ালাম একপাশে।
আমি টিনের কাঠুরে! কুঠার দুলিয়ে বলে উঠল ও। লক্ষ করলাম কুঠারটা রবারের। স্বস্তির শ্বাস ছাড়লাম। দাঁত বের করে হাসল রবিন। আজকে রাতে সবাইকে ভড়কে দেব!
আরও কয়েকটা ছেলে-মেয়ে ঘিরে ধরল আমাকে। ওদের একজন হাত বাড়িয়ে আমার বাহু স্পর্শ করল।
আমি কাউকে ভয় দেখাতে চাই না, আওড়ালাম। অবাক চোখে। সবাই চেয়ে রইল আমার দিকে। রবিন হাসল আবারও।
তুমি তো এর মধ্যেই সবাইকে ভয় পাইয়ে দিয়েছ, বলল।
মেজাজটা সহসাই বিগড়ে গেল। এরা মনে করছে আমি হ্যালোউইনের পোশাক পরেছি। এদেরকে এমন ভয় দেখাব যাতে চিরদিন মনে থাকে। ওদেরকে ভয় দেখিয়ে বিশ্বাস করিয়ে ছাড়ব। ওদের বুঝিয়ে দেব এমন ঘটনা ওদের জীবনেও ঘটতে পারে।
মুখের কাছে হাত এনে নাকের বাকল টেনে তুললাম। দুটো মেয়ে আর্তনাদ ছাড়ল। আরও দুজন ছেলে পিছু হটল। মুখে হাত ঘষে মাখিয়ে নিলাম হলদে রস। এবার হাতটা বাড়িয়ে দিলাম ওদের উদ্দেশে।
তোমাদেরকে আমার মত করে দেব! চেঁচিয়ে উঠলাম।
মেয়ে দুটো ঘুরেই দিল দৌড়। বেল বাজলে সবাই ক্লাসের উদ্দেশে ছুটল। আমি বাহুটা নামিয়ে ফেললাম।
দুর্দান্ত! বলে রবিন ঠং-ঠুং শব্দ তুলে হেঁটে এল আমার কাছে।
তোমারটাই সেরা। সবাই যা ভয় পাবে না! আমার দিকে চেয়ে। চওড়া হাসল। একবার শুধু চামড়া তুললেই হলো।
ডান কাঁধ ঝুলে পড়ল আমার।
এসব দেখাব কখন? আমার আরও কাজ আছে।
ভ্রূ কুঁচকে চাইল নথি।
বলো কী? নতুনদেরকে ভয় দেখাতে হবে না?
আচ্ছা, মুসা কোথায়? শ্রাগ করে জিজ্ঞেস করলাম।
দেখছি না তো। হয়তোঁ আছে কোথাও, জানাল রবিন।
ক্লাসের দিকে পা বাড়ালাম আমরা।

স্কুল আগে আগে ছুটি দিলেও আমার মনে হচ্ছিল সময় যেন আজ আর ফুরোচ্ছেই না। সেরা কস্টিউম আমারটাই হলো। মিসেস হকিন্স আমার ডান হাতে রিবন বেঁধে দেওয়ার সময় অদ্ভুত চোখে চাইলেন। স্কুল থেকে বেরিয়েই রিবনটা ছুঁড়ে ফেলে দিলাম।
রবিনের মাকে অনুরোধ করলাম আমাকে নার্সারিতে ছেড়ে দেওয়ার জন্য। ওঁকে বললাম চাচার সঙ্গে ওখানে দেখা হবে আমার। রবিন আমার উপর অভিমান করে রয়েছে। কথা বলল না। গাড়ি থেকে নেমে ওদেরকে চলে যেতে দেখলাম।
কাউন্টারের পিছনে বসা মহিলা আমার দিকে চেয়ে হাসল। প্রশংসা করল আমার কস্টিউমের। অতিকষ্টে জিজ্ঞেস করতে পারলাম কে বেচেছিল কাঠগুলো। মহিলা এমনভাবে হাসল যেন কৌতুক করেছি আমি।
রীড তোমাকে হেল্প করতে পারবে। ও পিছনে আছে।
পিছনে চলে এলাম। মাটিতে গাঁথা গাছগুলোকে দেখে জিভে জল এল আমার।
সোনালীচুলো এক যুবক কাঠ গাদা করছিল। কাঠগুলোর দিকে চাউনি বুলালাম। কোন চোখ-মুখ নেই, কাজেই কাছিয়ে গেলাম।
রীড? ডাকলাম। শব্দটা আড়ষ্ট শোনাল।
কাজ থামিয়ে আমার দিকে ঘুরে তাকাল লোকটা। একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে, আপাদমস্তক জরিপ করে নিল। এবার এক পা এগিয়ে এল।
চমৎকার কস্টিউম পরেছ।
ত্যাগ করলাম।
ধন্যবাদ।
একটা দস্তানা খুলে আমার মুখে হাত বুলাল ও। কোন অনুভূতি হলো না আমার।
দারুণ। আসল বাকল। গাছ থেকে খুলতে নিশ্চয়ই কয়েক ঘণ্টা সময় লেগেছে। গাছটাকে মেরে ফেলনি তো?
না, জানালাম।
স্কুলে লেখা নোটটা বের করে ওর হাতে দিলাম। চাচার স্টাডি। থেকে জোগাড় করা বিলটাও দিলাম।
নোট আর বিলটা এক পলক দেখে নিয়ে আমার দিকে চাইল ও।
এমন অদ্ভুত কথা আমি আগে কখনও শুনিনি। এই কাঠগুলোর জন্যে এত চিন্তা করছ কেন?
নোটটার দিকে আঙুল তাক করলাম।
আরও খানিকদূর পড়ে মাথা নাড়ল ও।
ক্লাস অ্যাসাইনমেন্ট? রিপোর্ট করবে? মাথা ঝাঁকাল, ও। আমরা আমাদের সময় বুক রিপোর্ট করতাম। তুমি জানতে চাইছ তোমাদের কেনা কাঠ কোথা থেকে

এসেছে? এবং এর মধ্যে স্পেশাল কোন ব্যাপার আছে কিনা। বিলটা দেখে নিয়ে মাথায় হাত বুলাল ও। গত সপ্তাহে কাটা হয়েছে। নিশ্চয়ই বুড়ো অ্যাশ হবে।
আমার বাহুর দিকে চাইল আবারও।
বুঝেছি। অ্যাশের বাকল কোত্থেকে পেয়েছ বুঝতে পারছি। ওই গুঁড়িগুলো থেকে। গাছও ছিল বটে একখান। আশি ফুট লম্বা। ওরেগন অ্যাশ। ল্যাটিফোলিয়া বলা হয়। শীতে গান ঋরে। গাছটা কাটার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু কী করব-আধমর ছিল, পরের ঝড়টা এলেই পড়ে যেত।
কথা বলেই চলল ও, বেশির ভাগই আমার জন্য অপ্রয়োজনীয়। শেষমেশ জিজ্ঞেস করতে পারলাম, কোথায়?
কথাটা জড়িয়ে গেল। আমার দিকে চেয়ে রইল ও।
ও, আচ্ছা, জিজ্ঞেস করছ ওটা কোথায়? তুমি হয়তো চেনো জায়গাটাকে। মাথায় হাত বুলাল আবারও। পার্ক স্ট্রীটের পুরানো কবরগুলোয় যে অ্যাশ গাছগুলো আছে ওটা তারই একটা।
গোরস্থানে যখন পৌঁছলাম, সূর্যটা তখন অগ্নিগোলার মত ফেটে পড়তে চাইছে। আকাশের বাদবাকি অংশ ঢাকা পড়েছে ছায়ার আড়ালে। লনেও বিস্তৃত হয়েছে ছায়া-শুকনো বাদামী পাতার অনেকখানি অবধি গ্রাস করেছে।
রীড আমাকে আর কিছু বলেনি। গাছ-পালা নিয়ে অনেক কথা বলেছে। আমার প্রশ্নগুলোয় চোখ বুলিয়েছে। কারও চামড়া বাকলের মত হয়ে গিয়েছে কিনা-প্রশ্নটা পড়ে হেসেছে।
পার্ক স্ট্রীট শহরের পুরানো এলাকায় পড়েছে। কবরস্থানের অন্ধ গলি ওটা।
এ শহরের অন্যপ্রান্তে নতুন এক কবরস্থান বানানো হয়েছে। সেটা পার্ক স্ট্রীটের মত ভুতুড়ে না। পার্ক স্ট্রীটটা গা ছমছমে বলেই আমরা সব সময় এখানে আমাদের হ্যালোউইন শেষ করি।
ভূতের গল্প বলি আমরা। ক্লাসের নতুন ছেলে কিংবা মেয়েটিকে কবরগুলোর মাঝখান দিয়ে দৌড়তে বলি।
রবিন আর মুসা আজকে এখানে আসবে কিনা কে জানে।
এক কিনারে এক সার গাছ। লোহার বেড়া দিয়ে ঘেরা বাদবাকি অংশ।
কবরগুলোর দিকে চাইলাম। মার্কারগুলোকে পাত্তা দিলাম না। কিন্তু অস্তরাগের, পটভূমিতে দাঁড়িয়ে থাকা লম্বা, প্রাচীন গাছগুলোকে পছন্দ হলো না আমার।
মরচে ধরা লোহার গেট দিয়ে ঢুকে, গাছ-গাছালির উদ্দেশে পা চালালাম। দানবের মত দাঁড়িয়ে ওরা। আশি ফুট লম্বা, নার্সারির লোকটা বলেছিল। আশপাশের বাড়ি-ঘরের চাইতেও লম্বা। কবে থেকে ওগুলো এখানে আছে কে জানে।

পা ব্যথা করছে। জুতো খুলে ফেলতে ইচ্ছে করছে, তবে অতটা ঝুঁকতে পারব কিনা জানি না। এসময় শব্দটা কানে এল। ১. চোখ নামিয়ে চাইলাম। শেষ বিকেলের আলোয় পায়ের কাছে। কিলবিলিয়ে উঠল গাছের শিকড়। এবার ঘুরে গিয়ে ঢুকে পড়ল মাটির গভীরে। ঝটকা মেরে পা সরালাম। লাফিয়ে সরে আসতেই এক গোছা ঘাস উঠে এল।

বসে পড়ে, পা তুলে মাটি থেকে শিকড়টা টেনে বের করতে চেষ্টা করলাম। প্রান্তগুলো, তখন কিলবিল করছে। থাবড়া মারলাম। মনে প্রাণে চাইছি এ অবস্থা থেকে যাতে মুক্তি পাই। শেষমেশ আমার স্নিকার্স পেঁচিয়ে ধরল শিকড়গুলো। চিত হয়ে শুয়ে আকাশের দিকে চেয়ে রইলাম। ভাল চোখটা বন্ধ করলাম। আমি আগের মত হতে চাই। মনে হলো বুকের উপর চেপে বসেছে জিনিসটা। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। কী হবে?

উঠে দাঁড়িয়ে লন ধরে আবারও পা বাড়ালাম। যদূর সম্ভব মেটো পথ ধরে চলেছি। দ্রুত হাঁটছি। পায়ের দিকে চাইছি না, কিন্তু গজিয়ে ওঠা কিলবিলানো শিকড়গুলোকে অনুভব করতে পারছি।

ডান পা আর বাহুতে ছড়িয়ে পড়েছে চুলকানি। বুকের ভিতরটা পুড়ে যাচ্ছে। পেটও। শরীরের বা পাশটা পুরোপুরি অবশ।

আমার সামনে সারিবদ্ধ সৈন্যের মত দাঁড়িয়ে এক সার গাছ।

মাঝখানে ফাঁকা একটু জায়গা। ওখানে, সমতল এক গুঁড়ির অংশবিশেষ।

কাছিয়ে গেলাম। মাটিতে ছায়া ফেলেছে গাছগুলো। বিষণ্ন পরিবেশ। কুয়াশা উঠছে মাটি থেকে।

পশ্চিমা বাতাস বইছে। থমকে দাঁড়িয়ে মুখ তুলে চাইলাম। সূর্য ডুবে গেছে। আকাশে চাঁদ নেই। একটা তারাও চোখে পড়ল না। কী করছি এখানে নিজেও জানি না। মনে পড়ছে না। কী করতে এসেছিলাম?

ভুলে গেছি। কী যেন খুঁজতে এসেছিলাম এখানে, তাই না?

গাছগুলো মৃদু মর্মরধ্বনি করছে। ঘুরে দাঁড়িয়ে দৌড় দিতে চাইলাম, কিন্তু শিকড় গেঁথে গেছে মাটিতে। পা তুলতে পারছি না। কান্নার মত ককিয়ে উঠে বাঁ পা চেপে ধরে টান দিলাম।

গাছের রুক্ষ বাকল যেন মোলায়েম হয়ে বদলে গেছে। মুখ উদয় হয়েছে। মানুষের মুখ নয়। প্রাচীন মুখ। ঘৃণায় বিকৃত। পটাপট খুলছে চোখ। মাটিতে পড়ে যাওয়ার জোগাড় হলো আমার। শূন্য কোটর। শুধু নিখাদ অন্ধকার।

মাথার উপরে চাবুক কষল ডাল-পালা। তবে বাতাস থেমে গেছে।

আমার চারপাশে ঘিরে দ্রুত উঠে আসছে কুয়াশা। ভারী, ঘন নিঃশব্দ।

পায়ের দিকে চোখ নামালাম। পা নয়, শিকড়ের দিকে। আতঙ্কে বুকের ভিতরে আর্তচিৎকার তৈরি হলো। আমি এখানে এসেছি মাটিতে শিকড় গাঁথতে, কে যেন মাথার ভিতরে বলল। কণ্ঠস্বরটা নিচু আর ভারী-এবং ভীতিকর।
গুঁড়ি ককিয়ে উঠল। গাছগুলো ঝুঁকে পড়ল আমার উপরে। ওদের নগ্ন ডাল ফিসফিস করছে, নড়ছে, মরা পাতা ঝরছে আমার চারপাশে।
এখানেই থাকো, কণ্ঠস্বরটা বলল আবারও। অন্য কণ্ঠগুলো গলা মেলাল-এখানেই থাকো।
অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাঁ হাতটা তুললাম। না! প্লিজ, যেতে দাও আমাকে! চিৎকার ছাড়তে চাইলাম। কিন্তু মুখ খোলে কার সাধ্য। শুধু ফুঁপিয়ে উঠলাম, কেঁদে ফেললাম, গাছটা যখন আমাকে গ্রাস করতে শুরু করল। মাথার উপরে উঠে গেল আঙুলগুলো। বেড়ে চলেছে। ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠতে চাইলাম। যতক্ষণ না কিছু একটা, ওগুলোকে টানা বন্ধ করল, বাড়তেই লাগল।
আমাদের সঙ্গে থাকো। শেষ শব্দটা ফিসফিস করে আমার চারধারে ঘুরতে লাগল। মাটি থেকে উঠে এসেছে কথাটা। আমার জায়গা এখন এখানে। কুঠারের ঘায়ে কাটা পড়েছে যে গাছটা আমাকে তার জায়গা নিতে হবে। শিউরে উঠলাম। ঝাঁকুনি খেল আমার ডাল-পালা।
আমার পিছনে ঝনঝন করে উঠল কিছু একটা। বহুদূর থেকে এল যেন শব্দটা। ক্রমেই কাছিয়ে আসছে। অন্য কোথাও শুনেছি এই একই শব্দ।
বহু কষ্টে ঘুরে দাঁড়াতে পারলাম। পিঠটা কাঁচ-কোচ করে উঠল। ডান চোখে খুব সামান্যই দেখতে পাচ্ছি। শব্দটা জোরাল হতেই দেখতে পেলাম ওদেরকে। চারটে কিশোর এদিকেই আসছে। একজনের পরনে রুপোলী পেপাশাক। রবিন। মুসাকেও দেখতে পাচ্ছি।
আমার চারপাশ ঘিরে থাকা গাছগুলো নড়ে উঠল। খটখটিয়ে উঠল ডাল-পালা। কুঠার। ওদের চারজনের মধ্যে একজনের হাতে। কুঠার। খেপে উঠেছে গাছগুলো। আমি মাথা নোয়ালাম। ভয় পাচ্ছি ওদের উগ্র মেজাজকে।
একটা কণ্ঠস্বর বলে উঠল, দৌড়ে গিয়ে গাছগুলোকে ছুঁতে পারবে? আমার কুঠারটা দিয়ে হিট করে আবার দৌড়ে ফিরে আসবে!
গলাটা পরিচিত লাগল। রবিন? রবিন-মুসারা অন্যান্যদের সঙ্গে প্রতিবারের মত এখানে এসেছে। একে অন্যকে ভয় দেখাতে।
মনে পড়ে গেল আমি এখানে শিকড় নামাতে আসিনি। উপায় খুঁজতে এসেছি যাতে ব্যাপারটা এড়াতে পারি। ভয়, জেঁকে বসল বুকে। আমাকে পালাতে হবে। এখুনি সরে না পড়লে আর পারব না। কাঠের ভিতরে বন্দি হয়ে পড়েছি সত্যিকারের আমি।

মাথার উপরে, গাছগুলো আরও দীর্ঘ দেখাচ্ছে। বিনা বাতাসে দোল খাচ্ছে ওরা। ফট করে উঠল একটা ডাল। পিছনে হেলে মুখ। তুলে চাইলাম। আমার পাশের গাছটার একটা ডাল আলগা হয়ে ঝুলছে। পড়ে যাবে যেন যে কোন মুহূর্তে। আলো পড়তেই সরে গেল বাকল, মুখটা দেখতে পেলাম। ওরা ঠিক এভাবেই আটক করেছে আমাকে। নিজেদের একটা করে ডাল ফেলে দিয়েছিল আধ-মরা গাছটার উপর, কাটা হয়েছিল যেটাকে। এবার ওরা রবিন, মুসা আর অন্যদের পিছনে লেগেছে।

না! মাথার মধ্যে শব্দটা তৈরি হলো, কিন্তু আমার তো মুখ নেই যে প্রকাশ করব।

টিনের কাঠুরের পোশাক পরা রবিন আরও কাছিয়ে এল।

ঠিক আছে, আমি করে দেখাচ্ছি তোমাদেরকে।

রীতিমত কসরৎ করে পা দুটো তোলার চেষ্টা করলাম। ওকে সতর্ক করতে হবে। ওদেরকে ভয় দেখিয়ে তাড়াব এখান থেকে। ওরা আহত হওয়ার আগেই। ওরা কামড় খেয়ে আমার মত কাঠের বাকলে মুড়ে যাওয়ার আগেই কাজটা করতে হবে।

অতিকষ্টে ডান পা তুলতে পারলাম, ফলে ঘুরে দাঁড়ানো গেল।

রবিন থমকে দাঁড়াল। মুখটা হাঁ। ওর মুখের চেহারা দেখে বুঝলাম ও টের পায়নি ওটা আমি। সশব্দে ডান হাতটা নীচে নামিয়ে গেটের দিকে ইঙ্গিত করলাম।

চলে যাও! কথাগুলো বলতে চেয়েও পারলাম না। তার বদলে ককিয়ে উঠল আমার ডালগুলো। বুকের গভীর থেকে উঠে এল হাহাকার।

রবিনের মুখের চেহারা ছাই বর্ণ। নকল কুঠারটা ফেলে দিয়ে ঘুরেই দৌড় দিল।

ওর বুকের টিনটা ঠং-ঠং করে উঠল। মুসা আর অন্যান্যরাও আর্তনাদ ছেড়ে ওর পিছু নিল। আমার পিছনে মুখওয়ালা ডালটা ফটাস করে ভেঙে পড়ল। রবিন কুঠারটা যেখানে ফেলে গেছে ঠিক তার উপরে। মুখটা বেঁকে গিয়ে কামড় বসাল কুঠারটায়।

ঘুরে দাঁড়ালাম। দেহ আড়ষ্ট। এতটাই ক্লান্তি বোধ করছি, নড়ার সাধ্য নেই। ওরা জিতে গেছে। আমি মারা যাচ্ছি ভিতরে ভিতরে। একমাত্র চোখটা বুজে ফেললাম। দুনিয়াটা পাল্টে গেছে। বাতাস, মাটি আর আকাশটা অনুভব করছি আমি। অন্যান্য গাছগুলো ঝুঁকে পড়েছে আমার উপরে। ডালগুলো অশুভ ভঙ্গিতে নিচু হয়ে দোল খাচ্ছে আমার উদ্দেশে।

আমি থাকব এখানে, যদি থাকতেই হয়। আমি এখানে অন্য কারও জায়গা নেব। কিন্তু অন্যদেরকে তোমাদের ছেড়ে দিতে হবে। অন্যদের কোন ক্ষতি তোমরা করতে পারবে না-গাছগুলোকে মনে মনে বললাম।

আমার ছড়ানো আঙুলের ফাঁক দিয়ে বয়ে যাচ্ছে বাতাস। গাছগুলো আমার কথা শুনতে পাচ্ছে কিনা জানি না। কিন্তু আমি ওদের কথা শুনতে পাচ্ছি। ওদের মরা পাতা ফিসফিস করছে আমার সঙ্গে। মাথার ভিতরে ওদের কণ্ঠস্বর-হারানো বন্ধু সম্পর্কে কথা বলছে ওরা।

আমার পায়ের পাতা থেকে মাটির গভীরে দেবে যাচ্ছে শিকড়। বুকের বাকল শক্ত হচ্ছে ক্রমেই। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন থেমে গেছে, সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে হলদে রস।

মাথা কাত করে রস বইতে দিলাম। এবং আমি হয়ে গেলাম ওদের একজন।

ঠাণ্ডা লাগছে।

ধীরে ধীরে, এক চোখ মেলার চেষ্টা করলাম। এবার অপরটা। চারদিকে অন্ধকার। দৃষ্টি চলছে না। কেঁপে উঠলাম। বেশ কয়েক দিন ঠাণ্ডা লাগছে না আমার। সেই সেদিন থেকে…

সহসা উঠে বসলাম।

আঁধারে চেয়ে থেকে, মুখের সামনে হাত রাখলাম। আমার হাত! আঙুল বন্ধ করলাম, তারপর আবারও খুললাম। হাত নামিয়ে পায়ের মাংসপেশী আর হাড় অনুভব করলাম, ছেঁড়া জিন্সের উপর দিয়ে। মরা পাতা আমার পা ছেয়ে রেখেছে। হাত ঝাঁপটিয়ে ঝেড়ে ফেলে দিলাম। দুটো পা। বাকল ছাড়া দুটো পা কাঁপা-কাঁপা হাতে মুখ স্পর্শ করলাম। চামড়া মসৃণ, স্বাভাবিক ত্বক। পায়ের পাতায় হাত বুলোলাম। গাঁটওয়ালা, বাঁকা শিকড় উধাও। একেবারে স্বাভাবিক। মানুষের পা।

ঝরা পাতার বিছানায় শুয়ে চিৎকার ছাড়লাম। হা-হা করে হাসছি। খুশিতে গড়াগড়ি দিলাম।

ওরা আমাকে ছেড়ে দিয়েছে। ওদের মত পরিবর্তন হয়েছে! কিন্তু এর পরপরই অন্য এক চিন্তা ঘাই মারল মাথায়। ওরা কি সত্যি সত্যি ছাড় দিয়েছে আমাকে? নাকি পুরো ব্যাপারটা আবার শুরু হবে? গড়াগড়ি বন্ধ করে হাঁটুর উপর বসলাম। আঁধারে চোখ সইয়ে নিতে চেষ্টা করছি।

আমার সামনে প্রাচীন, মোটা গুঁড়ির সারি। নীরব। অনড়। সটান। উঠে দাঁড়িয়ে ওদের কাছে হেঁটে গেলাম। আঁধারে, কালো আকাশের পটভূমিতে ওরা ডাল-পালা বাগিয়ে ধরল বিশাল ছায়ার মতন। আমাদের পায়ের কাছে ঘুরপাক খাচ্ছে কুয়াশার কুণ্ডলী।

গাছগুলো নড়ে উঠল। পাতা আর ডালের শব্দ পেলাম। বাতাসে নড়ছে। চোখ বুজলাম। কোন কণ্ঠস্বর আমার ভিতরে কথা বলছে না। কিছু অনুভব করলাম, ভারী কমলের মত কিছু একটা মুড়ে ফেলছে আমাকে।

চোখ খুলে, কেটে ফেলা গাছের গুঁড়িটার দিকে চেয়ে রইলাম একদৃষ্টে। এবার অন্যান্য গাছের দিকে চোখ ফিরালাম। কিছুক্ষণের জন্য আমি ছিলাম ওদেরই একজন। কিg এরমধ্যেই স্বপ্নের মত সব ভুলে গেছি! শুধু একটা অনুভূতি রয়ে গেছে আমার সঙ্গে। এমন এক অনুভূতি, তুমি যেন তোমার প্রিয়জনদের সঙ্গে রয়েছ। আমার ধারণা, বন্ধুদেরকে রক্ষা করতে চেয়েছি বলে ওরা ছেড়ে দিয়েছে আমাকে।

এগিয়ে গিয়ে মরা গুঁড়িটায় হাত রাখলাম। এইসব গাছেরা জানে বন্ধুকে কীভাবে রক্ষা করার চেষ্টা করতে হয়। সেজন্যই ওরা রক্ষা করেছে আমাকে নিজেদের প্রতিশোধের হাত থেকে। নতুন বন্ধুদের সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটা ধরলাম বাড়ির পথে।

তিন গোয়েন্দা ভলিউম ১১৪/২ – কালঘুম – শামসুদ্দীন নওয়াব – সেবা প্রকাশনী – প্রথম প্রকাশ : ২০১০

টিপু কিবরিয়া রচিত 'ঘুমালে বিপদ' কাহিনিটি তিন গোয়েন্দায় রূপান্তর করেছেন শামসুদ্দীন নওয়াব

কিশোর জোর এক চটাশ! শব্দের সঙ্গে কাৎরে উঠতেই চমকে গেল মুসা। ভ্রূ কুঁচকে তাকাল ওর দিকে। কী হলো?

চেহারা বিকৃত করে খসড়-খসড় শব্দে গোড়ালি চুলকাল কিশোর। বলল

নমরুদের বিপক্ষের সৈন্যরা জ্বালাচ্ছে বড়।

কুঁচকে উঠল মুসার। বুঝতে পারেনি। কারা?

মশা!

মশা? বিস্মিত হলো মুসা। মশা কামড়ালে অমন চেঁচিয়ে উঠতে হবে? আমি তো মশাকে পাত্তাই দিই না!

বিড়বিড় করে বলল কিশোর, পাত্তা ঠিকই দাও, কিন্তু এখন স্বীকার করবে না। বন্ধুর দিকে তাকাল। নাও, চাল দাও।

বোর্ডের দিকে হতাশ চোখে তাকাল মুসা। কালো নিয়ে খেলছে, অবস্থা। কাহিল। কোনটা চালবে বুঝতে পারছে না। হাতি, নৌকা, ঘোড়া সব একটা করে আছে। সৈন্য মোটে তিনটে আছে, আর সব ফরসা করে দিয়েছে। কিশোর। অথচ ও নিজে কিশোরকে তেমন বাগেই পায়নি। একটা ঘোড়া, একটা হাতি আর দুটো সৈন্য খেয়েছে কেবল।

ওর রাজাকে প্রায় কোণঠাসা করে ফেলেছে কিশোর। ঠুটো জগন্নাথের মত অবস্থা রাজার, ঢাল নেই তলোয়ার নেই নিধিরাম সর্দার। একটু ভুল করে বসলেই বারোটা বাজিয়ে দেবে কিশোর। মাত হয়ে যাবে ও।

দাবা চমৎকার খেলে কিশোর। ওদের পাড়ার অনেকের মধ্যে ও সেরা, কেউ কখনও হারাতে পারেনি। মুসা প্রায়ই চেষ্টা করে সে-রেকর্ড ভাঙার, সময় পেলেই ওকে ধরে নিয়ে আসে ওদের বাড়িতে।

কিন্তু ওই পর্যন্তই। মুসার রেকর্ড ভাঙার স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে গেল, আজও। এরইমধ্যে কম করে হলেও অন্তত পঞ্চাশবার হেরেছে ও। আজও সেই অবস্থা। মুসার ধারণা কিশোরের জটিল মাথায় কুটিল ষড়যন্ত্র চলছে ওকে ফাসাবার। সুযোগ খুঁজছে ও। পেলেই গা করে চেপে ধরবে।

একটা বদ স্বভাবও আছে তিন গোয়েন্দা প্রধানের। খেলার সময় প্রতিপক্ষকে চাল দেয়ার আগে ঠিকমত চিন্তা ভাবনার সুযোগ দেয় না। নিজের চালের সময় মিনিটের পর মিনিট মাথা খাটায়, অথচ প্রতিপক্ষকে এক মিনিট ভাবতে দেখলেই আপত্তি তোলে। সব সময়।

হয়তো ওর সন্দেহ প্রতিপক্ষকে বেশি চিন্তার সুযোগ দিলে ও হেরে যাবে। আসলে কিন্তু তা নয়। কিশোরকে প্রায় কখনোই হারতে দেখেনি ওরা কেউ। তবু ওই বদকস্মটা করাই চাই। এই যেমন এখন মশার কথা তুলে বাগড়া দিল, এরপর আবার কী করে বসে কে জানে!

কী হলো, চাল দাও! তাড়া লাগাল কিশোর। ভয়ে ভয়ে ঘোড়াটাই চালল মুসা। আড়াই ঘর চাল দিয়ে ওটাকে মন্ত্রীর সহজ টোপে পরিণত করল।

যদি ওটা খেয়েই বসে, তা হলে খবর আছে কিশোরের। তবে মনে হয়।, তেমন কিছু ঘটবে। ওটা যে ফাঁদ, কিশোর বোধহয় বুঝতে পারবে। ঘটলও তা-ই, ওদিকে তাকালই না পাজিটা।

বরং মন্ত্রী এগিয়ে নিয়ে এল ওর, ঠুটো জগন্নাথ রাজার দিকে। আরও কোণঠাসা করে ফেলল। মনে মনে জিভ কাটল মুসা। কিশোরের জন্য ফাঁদ পাতার আগে বরং একটা কিছু এনে রাজাকে আড়াল দেয়া দরকার ছিল। কিন্তু এখন সে সুযোগ নেই। অন্য পথ দেখতে হবে। মাথা চুলকাতে লাগল মুসা।

তোমার আগের ঘরটা বড় ছিল, বলল কিশোর। এত ছোট ঘরে থাকছ কী করে? দম বন্ধ হয়ে আসে না?

চোখ তুলে বন্ধুর দিকে তাকাল মুসা। তারপর নজর বোলাল পিচ্চি রুমের উপর। ঘরের ব্যাপারে মিথ্যে বলেনি কিশোর। সত্যিই ঘরটা খুবই ছোট। দশ বাই দশ। একটা সিঙ্গেল খাট, পড়ার টেবিল, চেয়ার ও ক্লজিট–এতেই ভরে গেছে। নড়াচড়া করার জায়গা নেই। একটু বেখেয়াল হলে এটা-ওটার সঙ্গে ঠোকর খেতে হয়। কয়েকবার পেটে গুঁতো লেগে খুব ব্যথা পেয়েছে ও। কখনও দম বন্ধ হয়ে আসে।

আমি যেমন, আমার রুমও তেমন, এমনই তো হবে, গম্ভীর চেহারা করে হাতি দিয়ে ওর একটা সৈন্য খেয়ে নিল মুসা। অসুবিধে হয় না। গত কয়েকদিনে অভ্যেস হয়ে গেছে। মা বলেছে পরে কোনও বড় রুম দেয়া হবে আমাকে। কিশোরের দিকে ঝুঁকে এল মুসা। ভাল করে দেখো তো, গোঁফের রেখা ফুটেছে আমার?

কিশোর ওর দিকে তাকাল। ঠোঁট মুড়ে হাসল কেবল, কিছু বলল না। তারপর খেলায় ডুবে গেল আবার। কয়েক মুহূর্ত পর নৌকো দিয়ে মুসার একমাত্র ঘোড়াটা খেয়ে বলল, চেক, এবার সামাল দাও দেখি।

এই ভয়টাই করছিল মুসা। হার হলো আজও। তিন গোয়েন্দা প্রধানের। সঙ্গে দাবায় কখনোই এটে উঠতে পারে না ও। সত্যিই খেলতে পারে কিশোর! গেল বার সাব-জুনিয়র জাতীয় প্রতিযোগিতায় এক পয়েন্টের জন্য চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি।

কিশোর উঠে দাঁড়াল। আজ নিয়ে কবার হারলে, মনে আছে?

কাল এসো, কথাটা পাত্তা না দিয়ে বলল মুসা। ঠিকই তোমাকে হারাব।

আসব, ঘর থেকে বেরিয়ে গেল কিশোর। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দরজায় উদয় হলো আরেকটা মুখ।
মুসার মামাত বোন, তানজিয়া। হ্যালো, মিস্টার মুসা, দাবা-জগতের ভবিষ্যৎ বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন, কেমন আছ?
রাগিয়ে না তানজিয়া, একটু রেগেই গেল মুসা। একদিন ঠিকই তা-ই হব আমি, নিশ্চিত থাকতে পারো।
বেশ-বেশ, আমরাও চাই তুমি তা-ই হয়ে বিশ্বে হইচই ফেলে দাও।
তানজিয়ার পাশে এসে দাঁড়াল শাওনি, ওর ফুপাত ভাই। প্রায় তানজিয়ারই সমবয়সী।
মুসার এই খালাত ভাই ও মামাত বোন এবছরটা থাকবে ওদের বাড়িতে। বড়রা আলাপ করছেন, ওদের রকি বিচ স্কুলেই ভর্তি করা হতে পারে। হয়তো, সেজন্যই তানজিয়া পেয়েছে ওর আগের ঘরটা। বাড়তি ঘর দুটোর একটায় উঠেছে শাওনি। তাতেই মুসার মনে দাগা লেগে গেছে। নিজে ও বাধ্য হয়ে থাকছে ইঁদুরের এই গর্তে।
মুসা সাহেবের দাবা প্র্যাকটিস কেমন চলছে? হাসতে হাসতে বলল শাওনি।
ভাল না, মুসা বলল। আজও হেরে গেলাম কিশোরের কাছে।
হতাশ হওয়ার মত কিছু হয়নি, শাওনি মাথা ঝাঁকাল। হারতে হারতে একদিন দেখবে জিতে গেছ।
তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ক, শাওনি ভাই।
এই ঘরে কী করে থাকো তুমি, মুসা? ভ্রূ কুঁচকে বলল তানজিয়া।
এখানে দম বন্ধ হয়ে আসে আমার। এই শাওনি, চলো, পালাই খাঁচা
মাথা দুলিয়ে সায় দিল শাওনি। তানজিয়াকে অনুসরণ করে বেরিয়ে গেল।
রবিনের দেয়া একটা বই নিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিল মুসা।
বাড়ির সবচেয়ে ছোট ঘরটা সত্যি এখন ওর। এমন কী ওদের গেস্ট রুমটাও এটার চেয়ে ঢের বড়।
সত্যি গত কয়েকদিনে দম বন্ধ হয়ে আসছে ওর। খাঁচায় বন্দি পাখির মত মনে হচ্ছে নিজেকে। এত ছোট ঘরে মানুষ থাকতে পারে? অবশ্য মন খিঁচড়ে থাকলে এসব মনে হয় ওর, অন্য সময় নয়।
বইটা মেলে ধরে পড়তে শুরু করল মুসা। জাস্টিন কেস নামের এক মহাকাশচারীকে বন্দি করেছে শয়তান পিঁপড়ে সম্রাট। এগিয়ে আসছে সে... এগিয়ে আসছে...
পড়তে পড়তে তন্দা এসে গেল মুসার। একমহর্তের জন্য ঘুমিয়েই পড়ল নাকি? আচমকা মুখের উপর পিঁপড়ে সম্রাটের গরম শ্বাস অনুভব করল!

ওয়াক! কেমন যেন বিশ্রী গন্ধ, ঠিক কুকুরের খাবারের মত।
এমন সময় একটা আওয়াজ কানে এল ওর।
চোখ মেলে তাকাল।
যতটুকু ভেবেছিল, তার থেকেও ভয়াবহ একটা মূর্তি দেখা গেল। কাল্পনিক পিঁপড়ে সম্রাটের চেয়েও ভয়াবহ।
ওটা বাঘের মাসী, তানজিয়ার প্রিয় পুশি! মুসার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত।
পুশি! বিরক্ত গলায় চেঁচিয়ে উঠল ও। সরে যা! ভাগ!
চেঁচানিতে কাজ হলো না কোনও। ঝাঁপ দিল পুশি।
ডজ দিয়ে সরে গেল মুসা। একইসঙ্গে থাবা দিয়ে বিছানা থেকে ফেলে দিল ওটাকে।
দাঁতের ওপর থেকে ঠোঁট সরে গেছে পুশির। আবার ঝাঁপ দিল মুসাকে লক্ষ্য করে।
কিন্তু বিছানার নাগাল পেল না। বিছানায় উঠতে হলে জোরে লাফ দিতে হবে।
বিছানার এক কোণে দাঁড়িয়ে তারস্বরে চেঁচাল মুসা। যা, ভাগ!
এমন সময় দরজায় তানজিয়া ও শাওনিকে দেখা গেল। হাসছে।
মুসার উপর নজর স্থির রেখে পেটে শুয়ে কয়েক পা পিছিয়ে গেল পুশি। এবার আর মিস হবে না বুঝতে বাকি নেই মুসার।
নাও না ওকে, তানজিয়া! কাতর স্বরে বলল মুসা, অসহায় চোখে বোনের দিকে তাকাল।
হাসির বেগ বেড়ে গেল ওদের দুজনের। আমার বেড়ালকে তোমার, এত অপছন্দ কেন বুঝি না! বলল তানজিয়া।
তানজিয়ার বেড়াল পুশিকে দেখলে সত্যি খুব বিরক্ত হয় মুসা। পুশিও ওকে পছন্দ করে না।
প্লিজ, তানজিয়া, ওটাকে সরিয়ে নাও।
লাফিয়ে বিছানায় উঠল পুশি।
নেমে পড়ল মুসা। ড্রইং রুমে গিয়ে সোফায় বসল। সুস্থির হয়ে টিভি অন করল।
মিঁয়াও মিঁয়াও মিহি ডাক ছাড়তে ছাড়তে কিচেনের দিকে দৌড়ে গেল। খুদে শয়তানটা।
শয়তান বিড়াল! ভাবল মুসা টিভি দেখতে দেখতে। বাগে পেয়ে নিই, এমন ঠ্যাঙানি লাগাব, বাপের নাম ভুলিয়ে দেব একদিন।
দরজায় এসে দাঁড়ালেন মা। হাতে ব্যাগ। উনি ফেরার পথে বাসার সামনের ডিপার্টমেন্টাল স্টোর থেকে প্রায়ই বাজার করে আনেন।
ছেলেকে এক টুকরো হাসি উপহার দিয়ে বেরিয়ে গেলেন উনি। কিচেনের দিকে এগোবার ফাঁকে বললেন, তানজিয়া, আজ তুমি রাধবে। শরীর খুব ম্যাজম্যাজ

করছে আমার। মেয়েদের রান্নাটান্না শিখতে হয়, তাই ভাই-ঝিকে প্রথম থেকেই শেখাচ্ছেন উনি।
তানজিয়ার জবাব শোনা গেল, আচ্ছা, ফুপু।

.

মাংসটা মোটেই সেদ্ধ হয়নি, খেতে বসে মুসা বলল। চিবাতে চিবাতে দাঁত খসে পড়ল! জানটাও বেরিয়ে যাবে এরপর।
থামবে তুমি? চোখ রাঙাল তানজিয়া। আর কেউ তো কিছু বলছে না! তুমি বললেই তো চলবে না!
খাওয়ার ফাঁকে নীরবে হাসলেন মা। বাবাও। কেউ কিছু বলছেন না।
খাওয়ায় মন দিল মুসা। একটু পর তানজিয়া বলল, ফুপু, আমি গেস্ট রুমের ক্লজিটে কিছু কাপড় রাখি? আমারটা একদম ভরে গেছে। আর জায়গা নেই।
রেখো, অনুমতি দিলেন তিনি। এর
অসম্ভব! আপত্তি করল মুসা। তানজিয়ার ক্লজিট আমার গোটা ঘরের চেয়েও বড়।
তাতে কী? ভ্রূ কুঁচকে উঠল তানজিয়ার।
আমারটা এ বাড়ির সবচেয়ে ছোট ঘর! প্রতিবাদী কণ্ঠে বলল মুসা। নড়াচড়া করা যায় না ভালমত। মুসার মনে হলো, মামাত বোন আর খালাত ভাই এসে সব দখল করে নিল, ওর জন্য কিছুই আর থাকল না।
তুমি একটা বাঁদর, বেশি নড়াচড়া করো! বললেন মা। তাই ওই ঘরে অমন মনে হয় তোমার।
মায়ের কথা শুনে দমে গেল মুসা। মনের কষ্ট লুকিয়ে নরম স্বরে বলল, মা, আমার একটা বড় ঘর দরকার। আমি গেস্ট রুমে চলে যাই?
ডানে-বাঁয়ে মাথা দোলাতে দোলাতে মা সরাসরি বললেন, না।
কেন, মা?
ওটা গেস্ট রুম, গেস্টদের জন্যে।
গেস্ট? কাঁদো কাঁদো গলায় বলল মুসা। তানজিয়া তো আমার আগের ঘরটা ছেড়ে গেস্ট রুমে থাকতে পারে?
তোমার নানা-নানি…
ওঁরা তো বছরে বড়জোর একবার আসেন, তা-ও দুতিন দিনের জন্যে। আমার এখনকার ঘরে দুতিন দিন ঘুমাতে তাঁদের কোনও অসুবিধে হবে না। শুধু রাতটুকু, বাকি সময় তো সারাবাড়ি ঘুরে বেড়ান ওঁরা।
দুজন মানুষ ঘুমানোর ঘর নয় ওটা, শান্ত স্বরে বললেন মিসেস রাফাত।
কিন্তু, মা…

কোথায় ঘুমাও, এ নিয়ে এত মাথা-ব্যথা কেন তোমার? বললেন উনি। কুম্ভকর্ণের মত ঘুমাও তুমি, ঘুমে বোধহয় বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। টর্নেডোর মধ্যে খোলা মাঠে ঘুমাতেও তোমার কোনও অসুবিধে হবে না। তা হলে ঘর নিয়ে এত চিন্তা কীসের?
মা, সত্যি! আমার একটা বড় ঘর দরকার। শুধু কী ঘুমাই? ওটায় আমি বাসও করি। অতটুকু ঘরে মানুষ বাস করতে পারে না।
বেশ, ঠিক আছে, বললেন মিসেস রাফাত। আগে ওই ঘরের জিনিসপত্র সরাতে হবে। আগামী শনিবার…
শনিবার? বিষম খেল মুসা। আজই আমি…
বাড়াবাড়ি কোরো না, মুসা, এবার রেগে উঠলেন মা। এখন তোমার ঘরে যাও।
আমার ঘর! এই বাড়িতে আমার কোনও ঘর আছে নাকি? মনে মনে চেঁচিয়ে বলল মুসা। চেহারা থমথম করছে ওর।
এবার যাও, মুসা! বললেন মিস্টার রাফাত।
চেয়ার পিছনে ঠেলে উঠে পড়ল মুসা। রাগে-অপমানে কাঁপতে কাঁপতে ছুটল নিজের ঘরের দিকে।
দরজা বন্ধ করে বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়ল ও। বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে থাকল, পড়েই থাকল।

.

কাজটা ঠিক করল না, মা, বিড়বিড় করে নিজেকে শোনাল মুসা। তুমি বলেছ শনিবার দিন, কিন্তু তানজিয়া চোখের ইশারা করেছে, তুমি আমাকে ফাঁকি দিচ্ছ। ফারিহার সব কথা শোনো তোমরা, এমন কী শাওনিরও। যা চায়, তাই দাও ওদেরকে। আর আমাকে… গলা বুজে এল ওর। মন শান্ত। হতে বিদ্রোহ করার সিদ্ধান্ত নিল।
গেস্ট রুমটা কেউ ব্যবহার করছে না, ভাবল ও। কাজেই মার কথা শুনব না আমি। আজ থেকে ওই ঘরেই ঘুমাব।
সবাই কখন ঘুমিয়ে পড়বে সে অপেক্ষায় থাকল মুসা। যখন নিশ্চিত হওয়া গেল, সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, ধীরে ধীরে উঠে বসল। ঘর থেকে বেরিয়ে বেড়াল-পায়ে এগোল গেস্ট রুমের দিকে।
আজ রাতে ওখানেই ঘুমাবে, সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। দুনিয়ার কোনও শক্তি ওকে বাধা দিতে পারবে না। ২। এ নিয়ে বাসায় হয়তো তুলকালাম কাণ্ড ঘটে যাবে, ভাবছে মুসা হাঁটতে হাঁটতে। ও অবাধ্য হলে মা ভীষণ রেগে যান, ওকে হয়তো চড় লাগাবেন ধরে। তাতে কী! মুসা মরতে রাজি, তবু আজ থেকে গেস্ট রুমেই ঘুমাবে ও।

সকালে ঘুম ভাঙার পর কী ঘটবে, বুঝতে পারছে না। তবে কপালে যে খারাবি আছে, এটুকু বুঝতে পারছে। হয়তো ওর জীবনটাই বদলে যাবে কাল থেকে।
সকালে ঘুম ভাঙতে মুসার মনে হলো পা দুটো ঠাণ্ডা হয়ে আছে।
কম্বলের তলা দিয়ে বেরিয়ে থাকার কারণে হয়তো, ধারণা করল ও। উঠে বসে কম্বল ঠিক করতে গিয়ে পায়ের দিকে নজর পড়তেই চমকে উঠল।
কার পা ও-দুটো? ওর?
তা হলে এত বড় লাগছে কেন? দানবের মত বিশালু না হলেও, যথেষ্ট বড়। গতকাল সাইজ যা ছিল, তার চাইতে অনেক বড়। তার মানে কি সে লম্বা হয়ে গেছে?
এক রাতের মধ্যে?
ছোটরা নির্দিষ্ট একটা বয়স পর্যন্ত বড় হয়, জানে মুসা। তারপর আর দেহ বাড়ে না, বয়স বাড়তে থাকে কেবল। আর সে বেড়ে ওঠার গতি এত ধীর যে চট করে কারও নজরে পড়ে না।
কিন্তু একরাতের মধ্যে ও এত বড় হলে কী করে?
কী ঘটেছে ওর বেলায়?
পা টিপে টিপে গেস্ট রুম থেকে বেরিয়ে এল মুসা। কিচেন থেকে সবার গলা ভেসে আসছে। নাস্তা-পর্ব চলছে।
ভয়-ভয় লেগে উঠল মুসার। আজ খুব সকালে ঘুম থেকে ওঠার ইচ্ছে ছিল, যাতে কেউ টের না পায় ও গেস্ট রুমে রাত কাটিয়েছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, দেরি হয়ে গেছে। সবাই জেগে গেছে। ব্যাপারটা মা জানতে পারলে কী ঘটবে বুঝতে পারছে না ও। কাল খুব বাহাদুরি ফলিয়ে গেস্ট রুমে ঘুমাতে গেলেও, এখন ভয় করছে। ব্যাপারটা মা জানতে পেরেছেন কি না কে, জানে!
সবার অগোচরে বাথরুমের সামনে এসে দাঁড়াল ও। সবকিছু কেমন যেন ছোট ছোট লাগছে।
বাথরুমের দরজার হাতলটা যখন ধরল, কেন যেন মনে হলো ওটা জায়গা বদল করেছে। রাতে কেউ এসে ওটাকে নীচে লাগিয়ে দিয়েছে।
ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল মুসা। মনে হলো, সিলিঙ অনেক নীচে নেমে এসেছে। লাইট জ্বেলে আয়নার সামনে এসে দাঁড়াল।
কে ওটা! ও?!! নাকি আর কেউ!!!
নিজের প্রতিবিম্বের উপর থেকে চোখ সরাতে পারল না। চেহারাটা ওরই, কিন্তু তারপরও কেমন যেন অন্যরকম হয়ে গেছে। গালদুটো একটু ফোলা
ফোলা লাগছে। কালও নাকের নীচের গোঁফের রেখাটা এত স্পষ্ট ছিল না। ঠোঁট দুটোও এক রাতের মধ্যে পুরু হয়ে উঠেছে। এবং কালকের চেয়ে কম করে হলেও

ছয় ইঞ্চি লম্বা হয়ে গেছে ও।
আমি... আমি বড় হয়ে গেছি? ভাবল ও কাঁপতে কাঁপতে। একরাতের মধ্যে কম করে হলেও কয়েক বছর বয়স বেড়ে গেছে আমার! তার মানে... কাল ওর বয়স ছিল তেরো, আজ হয়েছে সতেরো-আঠারো! এ কী আজব কাণ্ড!
না, না... একশো মাইল বেগে চিন্তার ঝড় বইছে ওর মাথায়। এ হতে পারে না। নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখছি আমি। বাস্তবে এসব ঘটতে পারে না।
একমিনিট চোখ বুজে থাকব আমি, ভাবল ও। যখন খুলব, নিশ্চয়ই আবার আগের মুসা হয়ে যাব।
চোখ বুজল মুসা। এক হাজার এক, এক হাজার দুই করে ষাট পর্যন্ত গুনল।
তারপর ধীরে ধীরে তাকাল।
নাহ, কিছুই তো স্বাভাবিক হয়নি। সব আগের মতই আছে।
ও আসলেই এখন সতেরো-আঠারো বছরের তরুণ!
বুকের মধ্যে হৃত্যন্ত্রের লাফালাফি চলছে। রিপ ভ্যান উইঙ্কলের গল্প জানা আছে ওর। একশো বছর ঘুমিয়ে কাটিয়েছিল সে। ঘুম ভাঙার পর দেখল সব বদলে গেছে।
ওর বেলায়ও তা-ই ঘটেছে নাকি? ভাবল মুসা। টানা কয়েক বছর ঘুমিয়ে কাটিয়েছে ও?
হাত-মুখ ধুয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে কিচেনের দিকে ছুটল মুসা। অস্বাভাবিক কিছু ঘটে থাকলে মা-বাবা, ফারিহা-শাওনি-তানজিয়া নিশ্চয়ই দেখতে পাবে।
কয়েক পা এগিয়েছে, এমনসময় হোঁচট খেল মুসা। পা দুটোকে নিয়ন্ত্রণ করতে কষ্ট হলো, মস্তিষ্কের নির্দেশ মানছে না ওরা।
কিচেনের সামনে এসে আবারও হোঁচট খেল।
মা! চেঁচিয়ে উঠল মুসা গলা ছেড়ে। বাবা! ভাল করে দেখো তো আমাকে!
তাঁরা দুজন ওর দিকে ঘুরে তাকালেন।
এ কী! এখনও তৈরি হওনি দেখছি, খাওয়া থামিয়ে শান্ত কণ্ঠে বললেন মা।
কিন্তু মা! মার কথা খেয়াল না করে বলল ও মরিয়া হয়ে। আমি বড় হয়ে গেছি! একরাতের মধ্যে কম সে কম চার-পাঁচ বছর বড় হয়ে গেছি!
তা-ই নাকি! হাসলেন মা। বাবার উপর দিয়ে নজর ঘুরিয়ে এনে ওর উপর স্থির করলেন। আচ্ছা, এখন জলদি খেয়ে নাও, তারপর কলেজের পোশাক পরে এসো। পনেরো মিনিটের মধ্যে বেরোব আমরা।
হ্যাঁ, জলদি যাও, আদেশের সুরে বলল তানজিয়া। তোমার জন্যে আজ আমাদের সবার দেরি হয়ে যাবে।

বাঘের চোখে মামাত বোনের দিকে তাকাল ও। কিছু বলতে গিয়ে মুখ বন্ধ করে ফেলল।
পাশাপাশি বসেছে তানজিয়া ও শাওনি। হাঁ করে দুজনকে পালা করে দেখল মুসা। ওর বয়স যদি আঠারোই হয়, তো তানজিয়া আপুর হবে অন্তত উনিশ। শাওনি মুসার দুই-তিন বছরের বড়। তার মানে এখন শাওনির অন্তত বিশ বছর হওয়ার কথা।
কিন্তু ওদের তা হয়নি।
যেমন ছিল, চোদ্দো আর পনেরো বছর বয়স ওদের। ফারিহাও যেমন ছিল তেমনি আছে!
ওরা সবাই ছোট রয়ে গেছে! অসম্ভব! উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠল মুসা। এ হতে পারে না, কিছুতেই?
এমন করে হেসে উঠল তানজিয়া, যেন মজা পেয়েছে।
বাবা! মরিয়া কণ্ঠে বলল মুসা। অস্বাভাবিক কিছু একটা ঘটে গেছে। আমার মধ্যে। কাল আমার বয়স ছিল তেরো–আজ আঠারো হয়ে গেছে!
পাগল হয়ে গেল নাকি ও? হেসে উঠল শাওনি। ওর গলা শুনে বিস্মিত হলো মুসা।
মা-বাবা দুজনই তাড়াতাড়ি নাস্তা সারায় ব্যস্ত। ছেলের কথা কানে ঢুকছে না।
কাছে গিয়ে মার হাত ধরে ঝাঁকাতে লাগল মুসা। মা! তানজিয়া আমার চেয়ে এক বছরের বড়, শাওনি দুই-আড়াই বছরের। ফারিহা আমার তিন-চার বছর ছোট। কিন্তু আজ আমি এত বড় হই কী করে? বাবার দিকে ঘুরে তাকাল। তোমরা আমাকে দেখে কিছু বুঝতে পারছ না? আমি যে বড় হয়ে গেছি বুঝছ না?
কী শুরু করলে তুমি সাত সকালে? একটু বিরক্ত হলেন মা। কী আবোল তাবোল বকছ? তুমি যা ছিলে, তা-ই আছ। জলদি খেয়ে নাও।
খাওয়া শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন মা। আজ আমার শপিং করতে হবে। তোমরা তৈরি হয়ে নাও। আমরা যাওয়ার পথে তোমাদের নামিয়ে দিয়ে যাব।
কিন্তু, মা…
আবার! জলদি টেবিলে বোসো।
কী করার আছে মুসার? বাবা-মা ওর কথায় কান দিচ্ছেন না। তাদের আচরণে মনে হচ্ছে সবকিছু আগের মত স্বাভাবিকই আছে।
অথচ…
নাস্তা নাকে-মুখে গুঁজে কিচেন থেকে বেরিয়ে এল মুসা। ক্লজিট থেকে স্কুলের পোশাক বের করতে গিয়ে আহাম্মক বনে গেল। ওর আগের ড্রেস সব উধাও হয়ে গেছে। যেসব আছে, আগে কখনও চোখে দেখেনি। সব যেন ওর গায়ের মাপেই তৈরি।

অদ্ভুত কাণ্ড!
এসব তানজিয়া বা শাওনির কোনও ফিচলামি নয়তো? ওর সাথে ইয়ার্কি করছে না তো? ফারিহাটাও ওদের সঙ্গে মিশে…
শুধু ড্রেস নয়, জুতো-স্যাণ্ডেলও ওর বর্তমান সাইজের উপযোগী।
নিশ্চয়ই ওরা আমাকে বোকা বানাতে চাইছে, ভাবল মুসা।
কিন্তু তা-ই বা হয় কী করে? এসব না হয় ওদের কাজ, কিন্তু ওর বড় হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা কী? ওদের পক্ষে এমন কাজ কি সম্ভব?
এমনসময় ঘরে ঢুকল পুশি।
ওহ, না! চেঁচিয়ে উঠল মুসা। যা ভাগ, বেরিয়ে যা বলছি!
তানজিয়ার বেড়ালটা ওর কথা শোনার কোনও গরজ দেখাল না। এগিয়ে এসে মুসার পায়ের কাছে দাঁড়াল। আজ কোনও ত্যাড়ামির লক্ষণ নেই ওটার মধ্যে। কোনও বদ মতলব নেই। যেন দুনিয়াতে আসার একমাত্র উদ্দেশ্য ওর পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে লেজ দোলানো।
অস্বাভাবিক কিছু ঘটছে এই বাড়িতে, কাপড় পরার ফাঁকে ভাবল মুসা। ও নিশ্চিত, কোথাও কোনও গড়বড় ঘটে গেছে। বাসার প্রতিটি প্রাণী বদলে গেছে। এমন কী পুশি পর্যন্ত।
কী হলো, মুসা, জলদি এসো! মা তাড়া দিলেন।
বেরিয়ে এল মুসা। বাবা এর মধ্যে গ্যারাজ থেকে গাড়ি বের করে তৈরি। অন্যরাও উঠে পড়েছে। মুসাও উঠল।
কিছুক্ষণের মধ্যে মুসার স্কুলের সামনে এসে পৌঁছল গাড়ি। দরজা খুলে নেমে হাঁটা ধরেছিল ও, কিন্তু থামতে বাধ্য হলো।
মুসা! মাথা দোলালেন মা। কোথায় যাচ্ছ তুমি?
কেন, স্কুলে! বিস্মিত হলো ও।
চলি, ফুপু, বলে তানজিয়া নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। শাওনি ও ফারিহাও।
মুসার স্কুলের দিকে এগিয়ে গেল ওরা।
হাঁ করে ওদের দিকে চেয়ে রইল মুসা। বিস্ময়ের যে ধাক্কাটা খেয়েছে, সেটা এত বড় যে সামলে নিতে পারছে না।
দুষ্টুমি রেখে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ো, বাবা ঝঝের সঙ্গে বললেন। আমাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে।
ফিরে এসে গাড়িতে উঠল হতভম্ব মুসা। আসল ঘটনা কিছু বুঝতে না পেরে হাঁ করে চেয়ে থাকল বাবার দিকে। কখন যে গাড়ি রকি বিচ কলেজের সামনে থেমে দাঁড়িয়েছে, খেয়ালই করেনি।
কী হলো, মার ডাকে সংবিৎ ফিরে পেল ও। কী চিন্তায় পড়লে আবার!

নামছ না কেন? বাবা তাড়া লাগালেন।
ও যখন বুঝল গাড়িটা কোথায় দাঁড়িয়েছে, সশব্দে ঢোক গিলল।
কলেজ! ভয়ে আতা উড়ে গেল ওর। কলেজে গিয়ে আমি কী করব?
মুসা! মা বললেন চরম বিরক্তির সঙ্গে। তোমার কী হয়েছে বলো তো! আজ এমন করছ কেন? জলদি নামো!
রোবটের মত গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াল ও। এ ছাড়া আর কী করার আছে!
যাও, দেরি হয়ে যাচ্ছে, বাবা বললেন। ছেড়ে দিলেন গাড়ি। ওর। চোখের সামনে দিয়ে ধুলো উড়িয়ে সাঁ করে চলে গেলেন বাবা-মা।
ঘুরে দাঁড়িয়ে ভয়ে ভয়ে বিশাল কলেজ বিল্ডিংটার দিকে তাকাল ও। গলা-বুক শুকিয়ে সাহারা মরুভূমি।
কপালে আজ কী আছে আল্লা মালুম।
ঘণ্টার আওয়াজ কানে আসতেচমকে উঠল ও। বড় বড় ছেলে-মেয়েরা দ্রুত ক্লাসরুমে ঢুকে যাচ্ছে।
অ্যাই ছেলে, এখানে দাঁড়িয়ে কী করছ? পিছন থেকে এক টিচারের ডাকে আতঙ্কে লাফিয়ে উঠল মুসা। ক্লাসে যাও! ঘণ্টা পড়ে গেছে শুনতে পাও না? বলতে বলতে সামনে এগিয়ে গেলেন উনি।
স্কুলের প্রথম দিনটার কথা মনে পড়ে গেল ওর। সেই দিন আর আজকের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। আজও সেদিনের মতই নিজেকে অসহায়-এতিম মনে হলো। চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে হলো, কিন্তু লজ্জায়, তা-ও পারছে না। এতবড় ধাড়ি ছেলে কলেজের ক্যাম্পাসে দাঁড়িয়ে চেঁচালে মান-ইজ্জত থাকবে নাকি?
এইটুথ গ্রেডের ছাত্র মুসা। স্কুল পাস করতে এখনও বেশ কয়েকবছর বাকি। তারপর না কলেজ!
অথচ…
এখন কী করব আমি? ভাবল মুসা। কী করা উচিত আমার? কোথায় যাব? কোন ক্লাসে ঢুকব? ফার্স্ট ইয়ারে নাকি সেকেণ্ড–কোন ক্লাসের ছাত্র আমি, সেটাও তো জানি না।
বিশাল দেহের একটা ছেলে গটগট করে ওর দিকে এগিয়ে এল। সামনে এসে ঝুঁকে ওর মুখের দিকে তাকাল।
জোর করে হাসার চেষ্টা করল মুসা। তিন গোয়েন্দার অন্য দুই সদস্য যদি দেখত সে-হাসি, সারা জীবন ওকে নিয়ে হাসাহাসি করত।
নড়ল না ছেলেটা। কটমট করে তাকিয়ে আছে, পারলে চিবিয়ে খায়। মুখে কোনও কথা নেই। ওর নাকের সামনে মুখ এনে কড়া চোখে চেয়ে আছে।

এক পা পিছাল মুসা। শুকিয়ে ওঠা ঠোঁট জিভ দিয়ে ভেজানোর চেষ্টা করল। কোনওমতে বলল, ইয়ে, মানে আমি কোন ক্লাসের ছাত্র জানি না। মানে... আমি...আমার বয়সী ছেলেমেয়েদের ক্লাসরুম কোনটা জানা আছে তোমার?
পরমুহূর্তে বুঝতে পারল প্রশ্নটা করা উচিত হয়নি। কারণ এটা কোনও প্রশ্নই হয়নি।
বাঁদর! রাগে ফেটে পড়ল ছেলেটা। বহুত জ্বালাতন করেছ, এবার পেয়েছি! পালাবে কোথায়! চলো আমার সঙ্গে!
কোথায়! বিস্ময়ে দম আটকে এল মুসার। বলে কী গুণ্ডা ছেলেটা?
আমি তোমার কী করলাম! তোমার সঙ্গে যাব কেন? আমি তো তোমাকে চিনিই না!
বিশাল থাবা দিয়ে ওর কাঁধ খাবলে ধরল ছেলেটা। আঁকাতে লাগল।
চেনো না, না? ন্যাকামি হচ্ছে? ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে গেটের দিকে। চলো বলছি!
উহ! গুঙিয়ে উঠল মুসা। আরে! কী করছো! ব্যথা লাগছে তো! ছটফট করে উঠল মুসা।
ঠিক এমনি সময়ে বই-খাতা হাতে গেট দিয়ে ঢুকলেন টাক-মাথা একজন বয়স্ক টিচার। চেহারা দেখলেই মনে হয় সবসময় ধমকের মুডে আছেন।
আজ ছুটির পর! মুসার কাঁধ ছেড়ে দিয়ে বলল ধেড়েটা। টেরটি পাবে তুমি, বাছাধন! আমার সঙ্গে চালাকি? বলেই সোজা হয়ে দাঁড়াল সে। ধীর পায়ে চলে গেল নিজের পথে।
হাঁপ ছেড়ে দ্রুতপায়ে সামনে এগোল মুসা।
সামনে যে-ক্লাস রুম পড়ল, ঢুকে গেল সেটাতেই। একেবারে পিছনের সীটে বসে পড়ল গিয়ে। অচেনা ছেলেটার রক্তচক্ষুর কথা মনে হতে এখনও কেমন যেন লাগছে। কী দোষ করেছে ও?
কয়েক মুহূর্ত পর এক মহিলা টিচার ঢুকলেন ক্লাসে। চুপ হয়ে গেল ক্লাস। ব্ল্যাকবোর্ডের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন।
এসো তা হলে আজকের কাজ শুরু করা যাক, বললেন উনি। তোমাদের বইয়ের সাতান্ন পৃষ্ঠা খোলো দেখি।
এটা কীসের ক্লাস? ভাবল মুসা। পাশের ছেলেটার সামনের খোলা বইটা দেখার সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল।
হায় খোদা! এ যে দেখছি যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধে হয়!
এ হতে পারে না।
ওটা অঙ্ক বই!

অঙ্কে সে রীতিমত কাঁচা-ক্লাস এইটের অঙ্কই ঠিকমত মাথায় ঢোকে। কলেজের অঙ্ক করবে কীভাবে?
হঠাৎ খেয়াল করল, টিচার ওরই দিকে চেয়ে আছেন।
মুসা! তোমার কী এখন এই ক্লাসে থাকার কথা?
না! উঠে দাঁড়াল ও। ভুল হয়ে গেছে, ম্যাডাম। যাচ্ছি।
ইচ্ছে করলে থাকতে পারো, অসুবিধে নেই।
না, না, ঠিক আছে! বলেই দৌড়ে বেরিয়ে গেল ও।
এখন?
এখন কী করব আমি? ভাবল ও করিডরে দাঁড়িয়ে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ সময় পার করে দিল।
একসময় ঘণ্টা পড়ল। হলের ও-মাথা থেকে এগিয়ে এলেন একজন টিচার। খাটো, সাদা-কালো একমাথা কোঁকড়া চুল। সামনের ক্লাস রুমে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন মুসাকে দেখে।
আজও তুমি দেরিতে এসেছ? ভ্রূ কুঁচকে বললেন তিনি। এসো এসো, জলদি ঢোকো ক্লাসে।
গোবেচারার মত ক্লাসে ঢুকল ও। মনে মনে দোয়া-দরুদ পড়ছে, যেন ক্লাসটা কোনওমতে ম্যানেজ করে নিতে পারে।
কিন্তু আসলেই ফাটা কপাল ওর।
এটা ইংরেজি সাহিত্যের ক্লাস।
এখানে পড়ানো হচ্ছে আনা কারেনিনা। একে ওটা বিরাট বই, তারওপর ক্লাসের প্রত্যেককে ওটা থেকে একটু একটু করে পড়তে হয়। সবচেয়ে বড় কথা, পড়তে পারলেও মুসা আগের কাহিনি জানে না।
তুমি সবার শেষে এসেছ, মুসা, সার বললেন। তাই আজ তোমাকে দিয়েই শুরু করতে চাই। শুরু করো, সাতচল্লিশ পৃষ্ঠা থেকে।
উঠে দাঁড়াল মুসা। উসখুস করতে লাগল। ইয়ে... মানে... সার, আজ আমি ইংরেজি বইটা আনতে ভুলে গিয়েছি।
বেশ করেছ, হাসির ভঙ্গি করলেন উনি। ওর পাশের ছেলেকে বললেন, রয়, তোমার বইটা ওকে একটু ধার দাও দেখি।
রয় মার্টিন এগিয়ে দিল বইটা।
ধন্যবাদ, বিড়বিড় করে বলল মুসা। পা কাঁপছে ঠকঠক্ করে। ঘাম ছুটে যাওয়ার অবস্থা।
পৃষ্ঠা সাতচল্লিশ, আবারও বললেন সার।

বই খুলল ও। নির্দিষ্ট পৃষ্ঠা বের করল। অজান্তে একটা লম্বা শ্বাস বেরিয়ে এল। পৃষ্ঠাটা বিশাল, কঠিন কঠিন সব শব্দ দিয়ে ভরা। ওগুলো পড়ে বোঝার চেয়ে সাঁতার কেটে সাগর পাড়ি দেয়াও অনেক সহজ হবে।
দাঁতভাঙা রাশান নাম-কীভাবে উচ্চারণ করবে মুসা? এক ক্লাস ছাত্র ছাত্রীর সামনে বেইজ্জত হতে চলেছে বুঝতে বাকি নেই ওর।
ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। প্রথম বাক্যটা দেখে নড়াচড়া দূরে থাক, শ্বাস নিতেও ভুলে গেছে। হৃৎপিণ্ডের গতি থেমে পড়ার অবস্থা।
বিরাট বাক্য। শুধু বিশাল বললে কমই বলা হবে, বি-শা-ল। যেন লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে শুরু হয়ে টেক্সাসে গিয়ে থেমেছে ওটা। এক বাক্যেই পুরো পৃষ্ঠা কাবার!
ওদিকে নীরবতার সাগরে ডুবে গেছে পুরো ক্লাস। একটা পিন পড়লেও তার শব্দ শোনা যাবে।
ছাত্র-ছাত্রীরা হাঁ করে চেয়ে আছে মুসার দিকে। যেন চিড়িয়াখানার আজব কোনও জন্তু ও, খাঁচা ভেঙে পালিয়ে এসেছে। চোখেমুখে ওদের নীরব কৌতূহল।
চিন্তিত ভঙ্গিতে নীচের ঠোঁট মুখে পুরে চুষতে লাগল মুসা। কী করবে দিশে পাচ্ছে না। সারের মুখের দিকে তাকাতে পারছে না লজ্জায়। পৃষ্ঠার শুরুতেই একটা বিরাট নাম আছে, ওটা উচ্চারণের সাধ্য ওর নেই!
মাথা নীচু করে এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে বইয়ের দিকে।
কী হলো! নড়েচড়ে বসলেন সার। চুপ করে আছ কেন, পড়ো!
লম্বা একটা দম নিয়ে শুরু করল মুসা, দ্য ইয়াং প্রিন্সেস কিটি শেরব্... শেরবা... শেরবি...
দাঁত ভাঙার অবস্থা হতে থেমে পড়ল বাধ্য হয়ে।
শেরবেট স্কায়া, শুদ্ধ করে দিলেন সার। হাসলেন। শেরবি নয়। নামটা আগের প্রত্যেকটা ক্লাসে বহুবার উচ্চারণ করা হয়েছে, মুসা। এতদিনে তোমার মুখস্থ হয়ে যাওয়ার কথা।
কী কায়া? কি বললেন সার? উনি বলে দেয়ার পরও ওর দ্বারা বিদঘুঁটে শব্দটা উচ্চারণ করা সম্ভব হলো না। দেহটা আঠারো বছরের হলে কি হবে, ওর আসল বয়স তো তেরো। তেরো বছরের একটা ছেলের পক্ষে কি এত বিচ্ছিরি শব্দ উচ্চারণ করা সম্ভব? মোটেই না।
রয় মার্টিন, বইটা ওর কাছ থেকে নিয়ে তুমি পড়ো দেখি, মেজাজ খাট্টা করে আদেশ দিলেন সার।
তা-ই করল ছেলেটা, উঠে দাঁড়িয়ে জোরে জোরে পড়তে শুরু করল। গল্পটা বোঝার চেষ্টা করল মুসা। কিন্তু একটা শব্দও মাথায় ঢুকল না, এ ধরনের শব্দ জীবনে শোনেইনি, বুঝবে কী করে?

ভীষণ ক্লান্ত লাগছে ওর। অজান্তে হাই তুলল একটা।
বিরক্ত লাগছে নাকি, মুসা? প্রশ্ন করলেন সার। ব্যাপারটা দূর করে দিচ্ছি, দাঁড়াও। রয় মার্টিন, থামো। থামল ও। মুসা, ও যেটুকু পড়ল, এবার তুমি তার অর্থ বলো।
অর্থ! উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠল, মুসা। একি অনর্থ কাণ্ড! অর্থাৎ ঘটনা খুলে বলতে হবে?
হ্যাঁ, উপর-নীচে মাথা দোলালেন সার।
নীরবে কয়েকটা মুহূর্ত কাটিয়ে দিল মুসা।
কখন ক্লাস শেষ হবে? ভাবছে মনে মনে।
অর্থ? এবার বিড়বিড় করে নিজেকে শোনাল। কুঁচকে উঠল, এমন ভঙ্গি করল, যেন গভীর চিন্তায় ডুবে গেছে। ইয়ে… মানে…সার…
ক্লাসের সবগুলো চোখ মুসার উপর স্থির। গিলছে ওকে। কয়েকটা ছেলে মজা পেয়ে হাসছে নীরবে।
অধৈর্য হয়ে উঠলেন সার। কী হলো, বলো! খালি বল খেলে বেড়ালেই চলবে? পড়াশোনা করতে হবে না?
কী করা উচিত মুসার? কী-ই বা করার আছে। একটা বর্ণও তো বুঝতে পারেনি, কী ঘোড়ার ডিম বলবে? ক্লাস থেকে পালানোর ফিকিরে আছে। চট করে মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল।
ইয়ে… সার, আমার খুব বাথরুম পেয়েছে।
চাপা হাসির রোল পড়ল। সারের ঠোঁটে এক টুকরো হাসির আভাস ফুটে উঠতে না উঠতে মিলিয়ে গেল। গম্ভীর হয়ে উঠলেন।
যাও, বললেন উনি। তাড়াতাড়ি এসো।
লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল মুসা। দৌড়ে বেরিয়ে গেল।
আপাতত এই বিপদ থেকে তো উদ্ধার পাওয়া গেছে, ভেবে ও খুশি।
ত্রস্ত পায়ে করিডর ধরে এগিয়ে চলল মুসা। একশো মাইল বেগে দুইশো রকমের চিন্তা বয়ে যাচ্ছে মাথায়। অনিশ্চিত ভঙ্গিতে সামনে এগোচ্ছে ও। একটা দরজার সামনে এসে ব্রেক কষল। উপরে লেখা: রিচার্ড স্যালন, প্রিন্সিপাল।
কী মনে করে দাঁড়িয়ে পড়ল। ভেতরে ঢুকব? ভাবল মুসা। প্রিন্সিপাল সারকে খুলে বলব সব?
কিন্তু ভিতরে যাওয়া কি উচিত হবে? নতুন কোনও সমস্যা যদি তৈরি হয়? তখন কী হবে!
নাহ্, ঢুকব না। ঘুরে দাঁড়াতে যাচ্ছিল ও, এমন সময় ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় জানান দিল কেউ তেড়ে আসছে ওর দিকে। এমন কেউ, যাকে মোটেই আশা করেনি ও।

ও… তুমি তা হলে এখানে? সেই বিশালদেহী ছেলেটার গলা শুনে আঁতকে উঠল মুসা। আর দেরি করতে পারছি না। চলো! ওইদিকটায় চলো! হাত বাড়াল কলার চেপে ধরবে বলে।
হঠাৎ করে প্রিন্সিপালের অফিসটাকে এ-মুহূর্তে নিরাপদ জায়গা বলে মনে হলো মুসার। এই ধেড়ে ছোঁড়া যে-ই হোক না কেন, প্রিন্সিপালের অফিসে ঢুকে ওকে ধোলাই দেয়ার সাহস পাবে না।
আমার কাজ শেষ হওয়ার পর, মারফতি হাসি ফুটল ছেলেটার মুখে, তোমাকে আর চেনা যাবে না। হাঃ হাঃ হাঃ।
চট করে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়ল মুসা। ডেস্কের পিছনে হ্যাংলা পাতলা এক লোককে বসে থাকতে দেখা গেল। মাথা জুড়ে চকচকে টাক। নাকের নীচে বাহারি গোঁফ। ঘরে আর কেউ নেই। কুতকুতে চোখ তুলে ওর দিকে তাকালেন প্রিন্সিপাল।
কে? ও তুমি? বললেন গমগমে কণ্ঠে। এত শুকনো লোকের গলা এমন মোটা হতে পারে, ভাবাই যায় না। কোন ইয়ারের ছাত্র যেন?
কয়েকবার জোরে জোরে দম নিল মুসা। উজবুকের মত চেয়ে আছে সারের দিকে। কেন এসেছে, ভয়ে, উত্তেজনায় সব গুলে খেয়ে হজমও করে ফেলেছে।
ও, হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে। ফার্স্ট ইয়ার।
ইয়ে… সার… আমতা আমতা করতে লাগল মুসা। কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না।
বসো, মুসা, সামনের চেয়ার দেখিয়ে শান্ত স্বরে বললেন সার। ভয় একটু একটু করে কেটে যাচ্ছে। প্রিন্সিপালকে যতটা কড়া ভেবেছিল, দেখা যাচ্ছে ততটা নন। এখন বলো কী হয়েছে।
কোথাও বড় ধরনের কোনও গণ্ডগোল হয়ে গেছে, সার, শুরু করল মুসা। তারপর হড়বড় করে বলে ফেলল, এই মুহূর্তে এখানে আমার থাকার কথা নয়। আমি কলেজের ছাত্র নই, সার।
একটু একটু করে ভ্রূ কুঁচকে উঠল প্রিন্সিপালের। মানে! তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না আমি, মুসা।
সার, আমি স্কুলের ছাত্র, গলা দিয়ে আপনাআপনি কান্নার মত একটা আওয়াজ ঠেলে বেরিয়ে এল মুসার। আমি ক্লাস এইটে পড়ি। কলেজের ছাত্র নই।
অনিশ্চিত ভঙ্গিতে ওর দিকে চেয়ে রইলেন প্রিন্সিপাল। চেহারায় অস্বস্তি। উঠে হাত বাড়িয়ে মুসার কপাল ছুঁয়ে দেখলেন তিনি।
মুসা বুঝতে পারল ওর জ্বর উঠেছে কি না তাই চেক করছেন সার। ওর কথা নিশ্চয় পাগলের প্রলাপ ভাবছেন উনি।
তাই হবে। নইলে কপাল ছুঁয়ে দেখবেন কেন?

হাসির ভঙ্গি করলেন প্রিন্সিপাল। শান্ত, নরম স্বরে ধীরে ধীরে বললেন, মুসা, এই কলেজেরই ছাত্র তুমি। আমার কথা বোঝা গেছে? কে বলল তুমি ক্লাস এইটে পড়ো?

আমি... আমি জানি আমাকে দেখে কলেজের ছাত্র বলেই মনে হয়, আমতা আমতা করে বলল ও। কিন্তু আসলে আমি স্কুলের ছাত্র। একটু আগে ইংলিশ ক্লাসে সেটা প্রমাণ হয়ে গেছে। প্রথম শব্দটা উচ্চারণ করতে গিয়ে আমার দাঁত ভাঙার জোগাড় হয়েছিল। আমি সত্যি...

শান্ত হও, মুসা, ওকে মাঝপথে থামিয়ে দিলেন প্রিন্সিপাল। তুমি ভুল করছ। একটা ফাইল বের করে খুলে ধরলেন। ঝুঁকে তীক্ষ্ণ চোখে ওটা দেখল মুসা। ছাত্র-ছাত্রীদের নামের তালিকা ওটা। দেখো, চেয়ে দেখো।

সবার উপরে নিজের নামটা দেখে চোখ আলু হয়ে উঠল মুসার। এ কী করে সম্ভব! ও স্বপ্ন দেখছে না তো?

চোখ বুজল। লম্বা করে দম নিয়ে তাকাল।

নাহ্, স্বপ্ন নয়। যা ঘটছে সব সত্যি। কঠোর বাস্তব।

দেখলে? হাসলেন প্রিন্সিপাল। কলেজেরই ছাত্র তুমি, মুসা। ফাঁকিবাজও নও, তোমার রেজাল্ট অন্তত তা-ই বলে। এখন বলল, কেন তুমি পড়া দেখে ভয় পাচ্ছ?

কিন্তু... কিন্তু... আগে আমি কখনও কলেজের পড়া... প্রতিবাদ করার চেষ্টা করল মুসা।

কী ঘটছে এসব? এসবের মানে কী?

একলাফে কয়েকটা বছর বয়স বেড়ে গেল কীভাবে? মাঝখানের বছরগুলো কোথায় গেল? কেন মনে করতে পারছে না ও?

আপনি বুঝতে পারছেন না, সার, মরিয়া হয়ে বলল মুসা। কাল আমার বয়স ছিল তেরো। আজ সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর দেখি আমার বয়স অনেক! আমার দেহ বড় হয়ে গেছে। কিন্তু আমার মনের বয়স বাড়েনি, তেরোই রয়ে গেছে!

আমি জানি, জবাব দিলেন প্রিন্সিপাল।

আমি জানি তুমি গোয়েন্দাগিরি করতে ভালবাসো, বলে চলেছেন উনি। কিন্তু তোমার মাথা নষ্ট হয়ে গেছে সেটা আমাকে বিশ্বাস করতে বলো তুমি?

দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন সার। মুসার বুঝতে বাকি রইল না বিরক্ত হচ্ছেন উনি। একটু একটু করে রেগেও উঠছেন।

পদার্থবিদ্যার ক্লাস শুরু হবে, বললেন সার। এখন ক্লাসে যাও।

জ্বি?

ফিজিক্সের ক্লাস শুরু হবে, আবারও বললেন সার, এখানে বসে থেকে সময় নষ্ট কোরো না, যাও!

কিন্তু, সার, আমি কিছুই বানিয়ে বলিনি, যা বলেছি, সত্যি বলেছি।
আর একটা কথাও নয়, উঠে দাঁড়ালেন প্রিন্সিপাল। থমথমে গলা। যাও, ক্লাসে যাও।
নিরুপায় হয়ে উঠে দাঁড়াল মুসা। ধীর পায়ে বেরিয়ে এল প্রিন্সিপালের অফিস থেকে। সেই বিশাল ছেলেটার খোঁজে চারদিকে তাকাল ভয়ে ভয়ে।
নেই। আশপাশে কোথাও নেই ও। করিডর ফাঁকা।
এই নরক থেকে পালাতে হবে, ভাবল মুসা। যেভাবে হোক পালাতে হবে। ক্লাসের দিকে না গিয়ে হনহন করে গেটের দিকে হাঁটতে শুরু করল ও।
গেটের কাছাকাছি এসে কেউ ওকে ফলো করছে কি না বুঝবার জন্য পিছনে তাকাল। নাহ্, কেউ নেই।
কিন্তু গেট দিয়ে বেরোতেই কারও সাথে ধাক্কা খেল জোরে।
আরেকটু হলে মাটি শোকার ব্যবস্থা হয়েছিল আর কী! পড়তে পড়তে কোনও মতে সামলে নিল নিজেকে।
উহ্! নীরবে চেঁচিয়ে উঠল ওর অন্তরাত্মা।
পাশেই একটা মেয়েকে রাস্তায় বসে থাকতে দেখা গেল। চারদিকে বই খাতা ছড়িয়ে আছে। মেয়েটার সাথেই ধাক্কা খেয়েছে ও, বুঝতে অসুবিধে হলো না।
লজ্জিত ভঙ্গিতে এগিয়ে গেল মুসা। তুমি ব্যথা পাওনি তো? মিমি করে বলল।
আমি... আমি দুঃখিত।
নীরবে মাথা দোলাল মেয়েটা। না, ঠিক আছে। ভুল তো আমারও হয়েছে।
দুঃখিত, আবারও বলল মুসা। তোমাকে দেখতে পাইনি। দিনটা আমার ভীষণ বাজে যাচ্ছে আজ।
ঠিক আছে, ঠিক আছে, হাসল মেয়েটা। আমি ব্যথা পাইনি।
মেয়েটার বয়স বারো-তেরোই হবে। মিষ্টি চেহারা। মাঝ পিঠ পর্যন্ত নেমে এসেছে বেণী করে বাঁধা ঘন চুল। ধূসর চোখে ওর দিকে চেয়ে আছে মেয়েটা।
বই-খাতা তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে।
দাঁড়াও, আমি হেল্প করছি, বলে মেয়েটার পাশে বসে পড়ল মুসা। ঝুঁকতেই মাথার সাথে মাথা ঠুকে গেল দুজনের।
উহ! গুঙিয়ে উঠল মুসা। এই দেখো, আবার তোমাকে ব্যথা দিলাম। আসলে নিজেই ব্যথা পেয়েছে।
আমি কিছু মনে করিনি, বলল মেয়েটা হাসতে হাসতে। বই-খাতা তুলে উঠে দাঁড়াল ওরা।
আমার নাম সানজানা।
আমি মুসা।

তোমার কী হয়েছে, মুসা? ওকে তীক্ষ্ণ চোখে পরখ করতে করতে বলল সানজানা। তাড়া আছে বুঝি খুব?
কী বলার আছে মুসার! এর মধ্যে ওর উপর দিয়ে কত ধকল গেছে, কীভাবে বোঝাবে ওকে?
আমাকে তাড়াতাড়ি এখান থেকে সরে পড়তে হবে, জবাব দিল ও। তারপর শুধরে নিয়ে বলল, তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরতে হবে। পরে আবার দেখা হবে।
হন-হন করে হাঁটতে শুরু করল মুসা। প্রিন্সিপাল সার যদি জানতে পারেন ও কলেজ থেকে ভেগেছে, তা হলে সাড়ে সর্বনাশ। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কেটে পড়া উচিত।
বাসায় ফিরে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল মুসা। আপাতত ঝামেলার হাত থেকে বাঁচা গেছে ভেবে খুশি।
ড্রইং রুমে ঢুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল সোফার উপর।
ওহ, কী একটা দিন গেল রে বাবা! ভাবল মনে মনে। এমন দিন যেন কারও জীবনে কখনও না আসে।
কলেজের ওই বিশালদেহী রহস্যময় ছেলেটার কথা মনে হতেই আতঙ্কিত হয়ে উঠল মুসা। বিশাল থাবা ছেলেটার, একটা ঘুসি যদি মুখের উপর পড়ত, দ্বিতীয়টা পড়ার জায়গা থাকত না।
আজ মোটামুটি নিরাপদেই বাসায় ফেরা গেছে।
কিন্তু কাল?
কাল কী হবে?

.

তানজিয়া আর শাওনি স্কুল থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত টিভি দেখে কাটাল মুসা।
ওরা এখন পিচ্চি। মুসাকে দেখাশোনা করবে কী, উল্টে মুসারই ওদেরকে দেখেশুনে রাখতে হবে।
আনা কারেনিনায় একটু নজর বোলাতে হয়। কারণ ক্লাস ভর্তি ছাত্র ছাত্রীর সামনে আর বেইজ্জত হতে চায় না ও। কিন্তু যে সমস্ত খটমটে নাম, বাবা! পড়তে গেলে মাথা ব-বন্ করে। উচ্চারণ করতে গেলে দাঁত খসে পড়ার অবস্থা হয়।
কলেজের কথা মনে হতেই চোখের সামনে বিশালদেহী ছেলেটার চেহারা, ভেসে উঠল। কাল ওকে কীভাবে সামাল দেবে ও?
সাহায্যের জন্য কিশোরের কাছে যাবে কি না ভাবল একবার। পর মুহূর্তে চিন্তাটা বাতিল করে দিল। বিপদটা ওর, অযথা আরেকজনকে জড়াতে যাওয়া কেন? একাই এ বিপদের মোকাবিলা করবে ও, সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল মুসা।

.

রাত হলো। ঘুমাতে যাওয়ার সময় ঘনিয়ে এল। নিজের রুমে এসে দেখল তানজিয়া ঘুমাচ্ছে ওর বিছানায়।
সুতরাং ধীর পায়ে গেস্ট রুমের দিকে এগিয়ে চলল মুসা। নিঃশব্দে ঢুকে দরজা লাগিয়ে শুয়ে পড়ল।
এই বিপদ থেকে কীভাবে উদ্ধার পাব আমি? ভাবতে ভাবতে চোখ বন্ধ করল ও। এসব কী ঘটছে জানা নেই। কেন ঘটছে, জানে না।
কী করা উচিত, বুঝতে পারছে না।
কীভাবে আগের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারবে ও?
চোখ মেলল মুসা। খোলা জানালা দিয়ে সূর্যের আলো এসে পড়ছে মুখের উপর। সকাল হয়ে গেছে।
সবার আগে কলেজের কথা মনে পড়ল ওর। সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভিতরটা শুকিয়ে উঠল। আবার চোখ বুজল। মরে গেলেও আর কলেজে যাচ্ছি না ভাবল মনে মনে। কিছুতেই না। কেন যেন বিছানায় শুয়ে থাকাই সবচেয়ে : নিরাপদ বলে মনে হলো। যেন তাতেই সব সমস্যার হিল্লে হয়ে যাবে।
মুসা! মার ডাক ভেসে এল। জলদি ওঠো! এত বেলা পর্যন্ত ঘুমায় নাকি কেউ!
উঠতে ইচ্ছে করছে না। আরও কিছুক্ষণ পড়ে ঘুমাতে ইচ্ছে করছে।
মুসা!
এবার মার কণ্ঠ কেমন যেন অন্যরকম ঠেকল ওর কানে। এত জোরে চেঁচান না কখনও উনি। ব্যাপার কী?
লাফ দিয়ে বিছানায় উঠে বসল মুসা। পা ঝুলিয়ে দিল।
দাঁড়াও, দাঁড়াও।
এ কী!
তীক্ষ্ণ চোখে পায়ের দিকে তাকাল মুসা। অন্যরকম লাগছে না? আগের মত মনে হচ্ছে না?
হ্যাঁ, তাই তো! আগের পা ফিরে পেয়েছে মুসা!
তার মানে... তার মানে আমি আবার আগের দেহ ফিরে পেয়েছি, ভাবল ও। তেরো বছর বয়সে ফিরে গেছি!
চোখের সামনে দুহাত তুলে ধরল। ছোট হাত। আর যাই হোক, এ হাত ষোলো বছরের কোনও ছেলের হাত হতে পারে না।
মুসা আবার নিজেকে ফিরে পেয়েছে। কোনও ভুল নেই তাতে।
গেস্ট রুম থেকে বেরিয়ে বাথরুমে ঢুকল ও। আয়নার সামনে দাঁড়াল।
জলদি এসে নাস্তা সেরে নাও! তাড়া লাগালেন মা।
কানে ঢুকল না। নিজেকে দেখায় মগ্ন।

হ্যাঁ, ওই তো সেই মুসা, দাঁড়িয়ে আছে আয়নার সামনে। তেরো বছরের মুসা।
ইয়াহ্ হু! চাপা আনন্দে ফেটে পড়ল ও। খুশিতে এমন এক লাফ দিল যে আরেকটু হলে বাথরুমের ছাদে ঠুকে যেত মাথা।
সব সমস্যার হিল্লে হয়ে গেছে। ওকে আর কলেজে যেতে হবে না আজ! ওই ব্যাটা নচ্ছার ভালুকের মুখোমুখিও হতে হবে না। কী মজা!
দুঃস্বপ্নের পালা শেষ হয়েছে তা হলে। আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে। এসেছে ও। সব ঠিক হয়ে গেছে।
মুসা, দেরি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু, মার ডাকে সংবিৎ ফিরল ওর।
কিন্তু তার কণ্ঠ অন্যরকম লাগছে কেন? ঠাণ্ডা লেগেছে? ভাবল ও। ঘরে এসে স্কুল ড্রেস পরে তাড়াতাড়ি কিচেনের দিকে এগোল মুসা।
ঝড়ের বেগে কিচেনে ঢুকল। মা, আজ কিন্তু আমি…
সামনের দৃশ্য দেখে গলায় কথা আটকে গেল ওর। কিচেন টেবিলে বসে আছেন দুই অপরিচিত মানুষ। একজন মহিলা, একজন পুরুষ। জীবনে কখনও দেখেনি মুসা ওঁদের।
হাঁ করে কী দেখছ? বললেন মহিলা। তাড়াতাড়ি নাস্তা সেরে নাও। স্কুলে যেতে হবে না?
আমার মা-বাবা কোথায়? অনিশ্চিত গলায় বলল মুসা। চোখদুটো। এখনও রসগোল্লার মত হয়ে আছে। ফারিহা, শাওনি ভাই, তানজিয়া?
দৃষ্টি বিনিময় করলেন দুজন।
শরীর খারাপ করেছে নাকি, সান? বললেন পুরুষ লোকটা।
সান? মানে ছেলে? মুসা কেন তাঁর ছেলে হতে যাবে?
মহিলা উঠে দাঁড়ালেন। এগিয়ে এসে মুসার কপালে হাত রেখে বললেন, কই, জ্বর-টর তো নেই দেখছি। তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও দেখি। আজ তোমার বাবা তোমাকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে আসবেন।
কে আমার বাবা! বলল হতভম্ব মুসা। আমার বাবা-মাকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন আপনারা?
কী আবোল-তাবোল বকছ? বিরক্ত গলায় বললেন ভদ্রলোক। লুকিয়ে রেখেছি মানে?
আপনাদের তো চিনি না আমি! আপনারা..
চুপ করো! ধমক লাগালেন এবার মহিলা। এ সব কী বলছ তুমি? দেরি করে স্কুলে গেলে বকা খেতে হবে, সে খেয়াল আছে?
এমন সময় একটা বেড়াল ঢুকল রান্নাঘরে। জীবনে ওটাকে এই প্রথম দেখল মুসা। এগিয়ে এসে আহ্লাদী ভঙ্গিতে ওর পায়ের সঙ্গে গা ঘষতে লাগল বেড়ালটা।

ছোটখাট এক লাফ দিয়ে সরে গেল মুসা। এটা আবার কোত্থেকে আমদানী হলো? পুশি কোথায়, পুশি?
পুশি? অবাক হলেন মহিলা। পুশি কে? দেখো মুসা, বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু!
ভয় পেয়ে গেল মুসা। এসব কী ঘটছে ওদের বাড়িতে? মাথার মধ্যে কেমন যেন করছে। হৃৎপিণ্ডের গতি বেড়ে গেছে দ্বিগুণ। দুপা অবশ হয়ে আসছে। দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে ওর।
ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল ও। কোনওমতে বলল, আপনারাই আমার বাবা-মা, এ কথা বলতে চান? শেষদিকে গলা কাঁদো কাঁদো হয়ে উঠল ওর।
ঝুঁকে ওর মাথায় একটা চুমু খেলেন ভদ্রমহিলা। বলতে চাওয়ার দরকার কী? তাই তো সত্যি। আমি তোমার মা, ইনি বাবা। ওটা তোমার বেড়াল-মাস্টার।
আমার কোনও বোন নেই? মামাত?
না, বললেন বাবা। তুমি আমাদের একমাত্র ছেলে।
তোমার যদি বোন থাকত, প্রশ্রয়ের সুরে বললেন মা। তোমার সবকিছুতে ভাগ বসাত। সেটা কী ভাল হত?
খেপে উঠল মুসা। থা-থা-থামুন! উত্তেজনায় খানিক তোতলাল।
অনেক মিষ্টি মিষ্টি কথা শুনিয়েছেন আপনারা আমাকে। আর নয়। এবার বলুন আমার আসল বাবা-মা কোথায়? এসব কী ঘটছে? আমাদের বাড়িতে আপনারা কেন?
ওর মা-বাবা নজর বিনিময় করলেন। তারপর একযোগে তাকালেন ওর দিকে। হতবিহ্বল চাউনি।
মা বলছেন না কেন আপনারা কারা! ধৈর্য হারিয়ে চেঁচিয়ে উঠল মুসা।
আমার আসল পরিবারের অন্য সবাই কোথায়?
বাবা উঠে দাঁড়িয়ে ওর হাত চেপে ধরলেন। শার্ট ভেদ করে তার নখ মাংসে গেঁথে যাওয়ার জোগাড় হলো। জলদি চলো। আর সময় নেই। চড়া। গলায় আদেশ দিলেন।
না! কাতরে উঠল মুসা। ব্যথা পেয়েছে। যাব না আমি!
সকাল হতে না হতে অনেক উঁচড়ে পাকামো করে ফেলেছ। চলো এখন!
কিছু করার নেই মুসার। বাবার টান খেয়ে এগোতে হলো। গাড়ির পাশে এসে দাঁড়াল। দেখল ওদের পুরানো মডেলের টয়োটা করোলার জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে ঝকঝকে নতুন একটা ফিয়াট। ১. ধমক খেয়ে গাড়িতে উঠে বসল মুসা। এমনসময় বেরিয়ে এলেন মহিলা। ব্যস্ত পায়ে এগিয়ে এলেন গাড়ির দিকে। আজ তোমার হয়েছে কী, মুসা, বলো তো! বই-টিফিন, পানি ছাড়াই স্কুলে যাচ্ছ যে বড়,

খোলা জানালা দিয়ে ওগুলো এগিয়ে দিলেন। ধরো এগুলো। তারপর আদর করে ওর নাক টিপে দিলেন।
ধ্যাৎ! বিরক্ত হলো ও। কী করছেন! ওর মা কখনও এই কাজ করেন না। কাজেই এসবে অভ্যস্ত নয় মুসা।
গাড়ি স্টার্ট দিলেন নকল বাবা। মাথা দুলিয়ে দ্বিতীয় মা বললেন, দেখো, স্কুলে কারও সাথে মারামারি বাধিয়ে বোসো না যেন কালকের মত।
ওঁরা সিরিয়াস, বুঝতে পেরে অদ্ভুত অনুভূতি হলো মুসার। অভিনয় করছেন না তারা। সত্যি সত্যি ভাবছেন যে তারাই মুসার মা-বাবা। ওঁদের। আসল ছেলেটা গেল কোথায়? তার নামও মুসা?
কিন্তু তা কী করে সম্ভব?
কী আশ্চর্য!
সারা শরীরে কাপ ধরে গেল মুসার।
এসবের মানে কী?
পরশু ও ছিল তেরো বছরের কিশোর। গতকাল হঠাৎ করে বয়স বেড়ে হয়ে গেল। তারপর আজ… আজ আবার বয়স তেরোয় নেমে এসেছে, তবে পরিবার বদলে গেছে। অন্য এক পরিবারের সদস্য আজ মুসা। ও কি স্বপ্ন দেখছে আসলে?
গাড়ি চালাচ্ছেন সেই পরিবারের প্রধান, ওর নতুন বাবা। জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে আছে মুসা।
আমরা কোথায় যাচ্ছি? দুর্বল গলায় জানতে চাইল।
তোমার স্কুলে, জবাব দিলেন তিনি। মুহূর্তের জন্য পাশে তাকালেন। কেন, তোমার কী মনে হয় আমরা হাওয়া খেতে বেরিয়েছি?
কিন্তু এটা তো আমার স্কুলের রাস্তা নয়।
চরম বিরক্তি নিয়ে মাথা এপাশ-ওপাশ করলেন মানুষটা। বোঝাই যায়। মুসার উপর ক্রমে চটে উঠছেন। পরিস্থিতি অসহ্য করে তুলেছে ও।
একটা স্কুলের সামনে থেমে দাঁড়াল গাড়ি। কিন্তু ওটা মুসার স্কুল নয়। এটা ওদের স্কুলের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রকি বিচ কুইন্স হাইস্কুল। ওর সম্পূর্ণ অচেনা।
এসে গেছি। নেমে পড়ো এবার, হাত বাড়িয়ে দরজা খুলে দিলেন তিনি।
আস্তে করে নেমে পড়ল মুসা। কী করবে মাথায় খেলছে না।
যাও, স্কুলে যাও। আমি চললাম।
চলে গেলেন বাবা।
এখন? ভাবল ও। এখন কী করব?
বয়স নিয়ে আপাতত কোনও সমস্যা না থাকলেও অন্য এক পরিবারের ছেলে হয়ে গেছে ও। সম্পূর্ণ ভিন্ন স্কুলের ছাত্র।

এমন আজগুবি কথা কেউ শুনেছে কখনও?
ও কি জেগে আছে, না ঘুমিয়ে? দুঃস্বপ্ন দেখছে?
কানের লতিতে চিমটি কাটল জোরে। কই, না, ব্যথা লাগে তো! সামনে বড় এক পাথরের টুকরো পড়ে থাকতে দেখে আরও নিশ্চিত হতে লাথি ঝেড়ে বসল। উফ! ব্যথা লেগেছে।
তার মানে ও জেগে আছে। এসব দুঃস্বপ্ন নয়, সত্যি।
গেট পেরিয়ে স্কুল কম্পাউন্ডে ঢুকে পড়ল মুসা–এ ছাড়া আর কোথায়। যাবে? আর কী করার আছে? ছেলেমেয়েরা এগিয়ে যাচ্ছে স্কুল ভবনের দিকে। তাদের দেখাদেখি মুসাও এগোল। এই স্কুলের নিয়ম-কানুন কিছুই জানা নেই। এমন কী কোন্ ক্লাসে পড়ে ও, তাও না। সামনে এক মেয়েকে দেখল মুসাওরই বয়সী হবে। হাঁটার সাথে তাল মিলিয়ে পেণ্ডুলামের মত দুলছে ওর বেণী, মাঝ পিঠ পর্যন্ত চুল মেয়েটার। কুচকুচে কালো।
কী মনে হতে ঘুরে তাকাল মেয়েটা। মিষ্টি করে হাসল ওর দিকে ফিরে।
ওকে চেনা চেনা লাগছে না? ভাবল মুসা। কোথায় যেন দেখেছে আগে।
কোথায়?
জবাবে মুসাও হাসল। নার্ভাস হাসি।
তোমার নাম কী? মেয়েটাকে কোথায় দেখেছে মনে করার চেষ্টার ফাঁকে বলল ও।
সানজানা।
সানজানা!
হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে এখন। কাল কলেজ থেকে পালানোর সময় এই মেয়ের সাথেই ধাক্কা খেয়েছিল ও।
আমার নাম মুসা, কাল তোমার সাথে দেখা… কথা শেষ না করে থেমে গেল।
মেয়েটা কি ওকে চিনতে পেরেছে? বুঝতে পারছে না মুসা। চেনার কথা নয় অবশ্য। কাল আর আজকের মুসার মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। সানজানার পক্ষে কি কল্পনা করা সম্ভব এই মুহূর্তে যে-ছেলেটার সাথে সে কথা বলছে, গতকাল তার বয়স বেশি ছিল? কলেজের ছাত্র ছিল সে?
ক্লাস শুরু হতে এখনও দেরি আছে, নীরবতা ভাঙল সানজানা। ওই গাছটার নীচে বসি গিয়ে, চলো।
চলো, যন্ত্রচালিতের মত ওকে অনুসরণ করল মুসা।
মেয়েটা যে খুব মিশুক, বুঝতে বাকি রইল না ওর। চমৎকার মিষ্টি ব্যবহার। জীবনটা দুঃস্বপ্নে পরিণত হওয়ার পর যতজনের সাথে দেখা হয়েছে মুসার, তাদের মধ্যে একেই ওর সবচেয়ে ভাল লেগেছে।

বড় একা লাগছে মুসার। অদ্ভুত ঘটনাগুলো কাউকে বলা দরকার, বুঝতে পারছে। এমন কাউকে, যে ওর সব কথা শুনবে, বিশ্বাস করবে এবং সমস্যাটা বুঝতে পারবে।
এই মেয়ে হয়তো বুঝবে, ভাবল মুসা। অন্তত ওকে দেখে সেরকমই মনে হয়। ভরসা করা যায়।
বসে পড়ল ওরা গাছের ছায়ায়।
কেশে গলা পরিষ্কার করে নিল মুসা। সানজানা! ভাল করে দেখো তো আমাকে চেনা চেনা লাগছে কি না!
কপাল কুঁচকে তাকাল ও। কিছুক্ষণ দেখল মুসাকে।
হ্যাঁ, লাগে, বলল ও। তোমাকে নিশ্চয়ই স্কুলের আশপাশে কোথাও দেখেছি।
মেয়েটাকে সবকিছু খুলে বলার সিদ্ধান্ত নিল মুসা। এসব আজগুবী কথা ও বিশ্বাস করবে বলে মনে হয় না। তবু বলবে। কাউকে না কাউকে না বলা। পর্যন্ত স্বস্তি পাবে না ও। আমি তা বলছি না। বলতে চাইছি...
কী? বলো!
তুমি কাল রকি বিচ কলেজের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলে না?
হ্যাঁ। ওই কলেজের সামনে দিয়েই বাসায় ফিরি আমি।
গতকাল কারও সাথে তোমার ধাক্কা লেগেছিল? আমার চেয়ে বড়। এই ধরো মোলো-সতেরো বছর বয়স, এমন কারও সাথে? ঠিক কলেজের সামনে?
মুখ খুলতে যাচ্ছিল মেয়েটা, কিন্তু কিছু একটা চোখে পড়তে বন্ধ করে ফেলল। ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকাল মুসা।
দুই ছেলেকে এদিকে আসতে দেখা গেল। বয়সে তরুণ, তাগড়া গড়ন। একজন লম্বা, অন্যজন খাটো। কালো জিন্স ও কালো টি-শার্ট পরনে। একজনের মাথায় নীল স্কার্ফ বাধা। হাতের মজবুত পেশি দেখানোর জন্যই যেন হাতা গুটিয়ে রেখেছে অন্যজন।
কারা ওরা? দেখে ষোলো-সতেরোর মত বয়স মনে হয়। নিশ্চয়ই স্কুলের ছাত্র নয়। তা হলে এখানে কী করছে ওরা?
সোজা মুসাদের দিকে এগিয়ে আসছে।
বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডের লাফালাফি নতুন উদ্যমে শুরু হয়ে গেছে মুসার। ছেলেদুটো যে বিপজ্জনক বুঝে ফেলল চট করে।
আগুন চোখে মুসাকেই দেখছে।
ও-ও-ওরা কারা? ভয়তাড়িত কণ্ঠে বলল মুসা।
জবাব দিল না সানজানা। সময় নেই।
হঠাৎ মুসাকে দেখিয়ে চেঁচিয়ে উঠল এক ছেলে, ওই তো ব্যাটা!

সঙ্গে সঙ্গে হুঙ্কার ছাড়ল অন্যজন, ধ ব্যাটাকে!
পরমুহূর্তে একশো মাইল বেগে তেড়ে এল ওরা।
ওরা কারা, মুসা জানে না। এখন কিছু জানার সময়ও নেই। জান। বাঁচানো ফরজ। লাফ দিয়ে উঠেই দে ভোঁ দৌড়।
প্রাণপণে দৌড়ের ফাঁকে পিছন ফিরে তাকাল। সত্যি সত্যি তাড়া করেছে নাকি বদমাশ দুটো?
ধর ব্যাটাকে! তখনই আবার চেঁচিয়ে উঠল ওদের একজন।
ওদের বাধা দিল সানজানা। দাঁড় করিয়ে কী যেন বোঝাতে লাগল।
ধন্যবাদ, সানজানা, দৌড়ের ফাঁকে বিড়বিড় করে বলল মুসা। এক দৌড়ে মাঠ পেরিয়ে স্কুলের সীমানার বাইরে চলে এল।
আরও খানিকটা গিয়ে যখন নিশ্চিত হলো ওরা আর তাড়া করছে না, তখন থামল। হাঁ করে হাঁপাতে লাগল।
সানজানা।
ওর জন্যই এ-যাত্রা বেঁচে গেল মুসা। এখানে দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করা। নিরাপদ নয়। হাঁটতে লাগল আবার। তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরতে হবে।
চারদিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করল কোথায় আছে। ঘরবাড়ি সব অপরিচিত। বাড়ির ফিরতি পথের দিকে হাঁটতে লাগল মুসা। বুঝতে পারছে, শয়তান দুটো যে-জন্যই হোক, ওকেই পিট্টি লাগাতে আসছিল, সানজানাকে নয়।
কিন্তু কেন?
কাল কলেজেও একটার পাল্লায় পড়েছিল মুসা। বাগে পেলে সত্যি যে মেরে ভর্তা করে দিত ওকে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।
আজ ওর নতুন, আজব পৃথিবীতে ওটা নেই অবশ্য, কিন্তু নতুন আপদ ঠিকই জুটেছে।
একটা নয়, দুটো!
নিজেকে বড় অসহায় মনে হচ্ছে মুসার। কারও সাহায্য দরকার। মুসা জানে না এসব কী ঘটছে। এত সমস্যা মোকাবিলা করার ক্ষমতা নেই ওর। এত মানসিক চাপ সহ্য করার ক্ষমতা মানুষের থাকে?
হাঁটছে তো হাঁটছে মুসা। কিছুক্ষণ পর সামনে একটা বাসা দেখতে পেয়ে। থেমে পড়ল।
আরে, এটাই তো ওদের বাসা! চিনতে পেরে এক দৌড়ে ঢুকে পড়ল মুসা। কিন্তু বাবা-মা বাসায় নেই। আঙিনা পার হয়ে দরজায় থামল ও। দরজায় তালা ঝুলছে। ঘুরে ওদিকের বাগান পার হয়ে রান্নাঘরের সামনে থামল। ওখানে দরজার ছিটকিনিটা একটু নড়বড়ে। উপরের একটা ফাঁক দিয়ে চেষ্টা করলে খোলা যায়।

তা-ই করল ও। কয়েক সেকেণ্ড চেষ্টা করতেই ছিটকিনি খুলে গেল।
ওর সত্যিকারের বাবা-মা গায়েব। ফারিহা, তানজিয়া, শাওনি ভাইও নেই।
কিন্তু এমন কেউ হয়তো থাকতে পারে, ভাবল মুসা, যে ওকে সাহায্য করতে পারে। উদ্ধার করতে পারে এই ম-হা-বি-প-দ থেকে।
হয়তো ওর বাবা-মা কোথাও বেড়াতে গেছেন ফারিহা, তানজিয়া ও শাওনি ভাইকে নিয়ে। কোনও আত্মীয়ের বাসায় গেছেন হয়তো।
একটা বুদ্ধি এল ওর মাথায়। মার এক খালাতো বোন থাকেন শহরের আরেক প্রান্তে। প্রায়ই ওখানে মা বেড়াতে যান। একবার টেলিফোন করে দেখবে ওঁকে, ঠিক করল ও। কপাল ভাল হলে বলা যায় না, ওখানে পেয়েও যেতে পারে মা-বাবাকে।
নির্দিষ্ট নাম্বারে ডায়াল করল ও। জবাবে মহিলা কণ্ঠ ভেসে এল।
লিলি খালা! উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠল ও। আমি মুসা।
কে? গম্ভীর হয়ে উঠল কণ্ঠটা।
মুসা! রকি বিচ থেকে!
এ নামের কাউকে তো আমি চিনি না, ধীরে ধীরে বললেন মহিলা। মনে হয় ভুল নাম্বারে ফোন করেছ তুমি।
না, লিলি খালা, শুনুন!
আমার নাম লিলি নয়, ঘটাং করে রিসিভার রেখে দেয়ার শব্দ শোনা, গেল।
অনিশ্চিত চোখে টেলিফোন সেটের দিকে চেয়ে রইল মুসা। সঠিক নাম্বারে টেলিফোন করেছে ও, সে ব্যাপারে কোনও ভুল নেই। তবে কণ্ঠটা যে।
ওর লিলি খালার নয়, সেটা বুঝতেও কোনও ভুল হয়নি। তা হলে কে উনি?
তবু আরেকবার চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কী? হয়তো রং নাম্বারে গিয়েছিল সেবার কলটা।
হ্যালো? একই কণ্ঠ ভেসে এল ওপাশ থেকে।
অন্যভাবে শুরু করল এবার মুসা। ফারিহা, তানজিয়া বা শাওনি ভাইকে একটু দেয়া যাবে? খুব জরুরী দরকার।
আবার তুমি! এখানে ওসব নামের কেউ থাকে না। রং নাম্বার।
পরমুহূর্তে লাইন কেটে যাওয়ার শব্দ শুনতে পেল মুসা। প্রাণপণে স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করছে ও। কিন্তু সম্ভব হচ্ছে না। যার বুকের মধ্যে ইস্পাতের হৃৎপিণ্ড আছে, সে-ও হয়তো এ পরিস্থিতিতে স্বাভাবিক থাকতে পারবে না। মুসা তো একে ছোট্ট, তার ওপর রক্তমাংসের মানুষ।
হাত-পা কাঁপছে ওর ঠঠ করে। ঘেমে গোসল হয়ে গেছে।

চট করে তিন গোয়েন্দাদের অন্য দুজনের কথা মনে পড়ল মুসার। প্রথমে ঠিক করেছিল ওদের কারও সাহায্য ছাড়া নিজের বিপদ নিজে মোকাবিলা করবে। কিন্তু সমস্যা আস্তে আস্তে এত জটিল হয়ে উঠেছে যে ওর আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরতে শুরু করেছে। বুঝতে পারছে ওর একার পক্ষে সমাধান করার মত সমস্যা নয় এটা। অনেক বড়, অনেক কঠিন সমস্যা।
কিশোরদের নাম্বারে ডায়াল করল মুসা। কিন্তু আশ্চর্য! ফল হলো, সেই একই। কিশোর নামের কোনও ছেলে নাকি থাকে না ওই বাসায়।
আশ্চর্য! অদ্ভুত!
রবিনদের বাসায় রবিন নেই!
ওর দুই বন্ধু হাওয়া হয়ে গেছে।
মুসার চেনা পুরো পৃথিবীটাই যেন নেই হয়ে গেছে। সম্পূর্ণ নতুন, অপরিচিত, আজব এক পৃথিবীর বাসিন্দা সে এখন।
এখানে সবাই ওর অপরিচিত, কাউকে চেনে না মুসা।
না, না, ঠিক হলো না।
একজনকে অন্তত চেনে, সে সানজানা।
কিন্তু ওর টেলিফোন নাম্বার তো মুসা জানে না! কীভাবে যোগাযোগ করবে? মেয়েটার পুরো নাম, বাসা কোথায় কিছুই জানে না। জিজ্ঞেস করতে মনে ছিল না।
এমন সময় সামনের দরজা খুলে গেল। সকালের সেই মহিলা, ওর মা। শপিং ব্যাগ হাতে ঘরে ঢুকলেন।
ছেলেকে দেখে অবাক হলেন তিনি। কী ব্যাপার, মুসা! অসময়ে বাসায় কেন তুমি? স্কুল থেকে চলে এসেছ কেন?
আমি ওই স্কুলের ছাত্র নই, রাগের সাথে বলল ও। তাই।
তার মানে? খেপে উঠলেন মহিলা।
চুপ করে থাকল মুসা। ওর সমস্যা কী করে বোঝাবে ও এই মহিলাকে? ইনি তো ওর মা নন। আসল মা-ই বুঝতে চায় না…
পৃথিবী থেকে গায়েব হয়ে গেছেন ওর আসল মা। কী করে, কখন ব্যাপারটা ঘটল জানা নেই ওর। শুধু জানে, ও অন্য এক জগতে বিচরণ করছে।
অজানা এক শিহরণে কেঁপে উঠল মুসার পা থেকে মাথা পর্যন্ত। এমন এক পৃথিবী এটা, যেখানে ও একা। একদম একা। যেখানে কাউকে চেনে না। ও। এমন কী ওর বাবা-মাকে পর্যন্ত না।
যাও, শরীর খারাপ লাগলে একটু শুয়ে থাকোগে, বললেন ওর মা।

সারা দুপুর-বিকেল টিভির সামনে বসে কাটাল মুসা। স্ক্রীনে চোখ স্থির থাকলেও মাথার মধ্যে হাজারটা চিন্তার ঝড় বয়ে গেছে।
মনে মনে নিজের উপর বিরক্ত মুসা। কেন সে ওঁদেরকে নিজের মা-বাবা ভাবতে পারছে না? বাবা-মা হিসেবে ওদের যে তুলনা হয় না সেটা তো দেখাই যাচ্ছে। তারপরও...
হয়তো এঁদের সঙ্গেই বাকি জীবন কাটিয়ে দিতে হবে ওকে। হয়তো আসল মা-বাবা ভাই-বোনকে কোনওদিন ফিরে পাবে না। তাই যদি হয়, তা হলে বাস্তবকে যত তাড়াতাড়ি মেনে নেয়া যায়, ততই মঙ্গল। তাতে মনের চাপ কমে যাবে।
কোনও মতে রাতের খাওয়া সেরে উঠে পড়ল। নিজের রুমের সামনে এসে থমকে দাঁড়াল। দরজায় তালা ঝুলছে। দেখেই বোঝা যায় এই রুম ব্যবহার করা হয় না।
কী আর করা!
বাধ্য হয়ে গেস্ট রুমের দিকে এগোল ও ক্লান্ত পায়ে।
ঘুমাতে যাচ্ছ? পিছন থেকে বলে উঠলেন মা। যাও, সোনা!
বিরক্তি লাগল মুসার। আমি কি কচি খোকা নাকি যে কথায় কথায় সোনা-সোনা করতে হবে?
সকালে তাড়াতাড়ি উঠো, কেমন? বলতে বলতে কিচেনের দিকে এগোলেন উনি।
সকাল!
একেকটা সকাল তো আগের দিনের সকালের তুলনায় অদ্ভুত চেহারা। নিয়ে হাজির হয় মুসার সামনে। অন্তত পরপর দুই সকাল তা-ই ঘটেছে।
কাল সকালে কী হবে কে জানে।
ঘুমিয়ে পড়তে ভয় করছে মুসার। অজানা ভয়ে অবশ হয়ে আসছে হাত পা। জেগে ওঠার পর নতুন কোনও অদ্ভুত পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে না
আর কিছু না হোক, অন্তত একটা ব্যাপার ঘটলে খুশি হবে। সকালে উঠে যদি দেখে এই নকল মা-বাবা নেই হয়ে গেছেন, তা হলে ভীষণ খুশি হবে মুসা। কিন্তু ভাবল ও। আর এদের জায়গায় বড় কোনও আপদ এসে, জুটলে তখন?
হয়তো ঘুম থেকে উঠে দেখা যাবে পুরো পৃথিবীই বদলে গেছে। সূর্য উঠছে দক্ষিণ দিক থেকে।
তখন?
বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়ল মুসা। দুচোখ বুজে আসছে ঘুমে। চোখ খোলা রাখতে নিজের বিরুদ্ধে রীতিমত লড়াই করতে হচ্ছে।
মনে মনে আল্লাকে ডাকল মুসা। বলল, আগের মত যেন সবকিছু স্বাভাবিক দেখতে পাই। বাবা-মা, ফারিহা, তানজিয়া আপু ও শাওনি ভাইকে যেন ফিরে

পাই। খোদা, সবকিছু আবার স্বাভাবিক করে দাও তুমি। বাবা-মার অবাধ্য হব না কখনও। প্লিজ…

.

কখন ঘুমিয়ে পড়েছে জানে না মুসা। চোখ মেলল একেবারে সকালে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উঠল না। কয়েক মুহূর্ত পড়ে রইল বালিশে মুখ গুঁজে। কিছু পরিবর্তন হয়েছে কি না বোঝার চেষ্টা করল।

ভিতর থেকে হইচই ভেসে আসছে। সারা বাড়ি যে তোক ভর্তি বুঝতে অসুবিধে হলো না কোনও।

অ-নে-ক মানুষ!

একটু একটু করে হৃৎপিণ্ডের গতি বাড়ছে মুসার।

সারাজীবন নিরিবিলি পরিবেশ পছন্দ করে এসেছে ও। তাই এ বাড়িতে হঠাৎ এত মানুষের সমাগম দ্বিধায় ফেলে দিয়েছে। কালকের বাবা-মা যে গায়েব হয়ে গেছেন, তাও কীভাবে যেন বুঝে ফেলেছে।

সব চিন্তা মাথা থেকে ঠেলে সরিয়ে দিল মুসা। আগের চিন্তা আগে করা দরকার। প্রথমেই জানা দরকার আজ ওর বয়স কত।

উঠে বসে দুহাত চোখের সামনে মেলে ধরল।

নাহ্, ছোটই আছে। বয়স বাড়েনি, বরং মনে হচ্ছে যেন কমেছে।

তাড়াতাড়ি বাথরুমের দিকে এগোল মুসা। ভিতরের উত্তেজনা ঝেড়ে ফেলার প্রাণান্ত চেষ্টা চালাল।

উত্তেজিত হয়ে কী লাভ? ভাবল ও। অমোঘ নিয়তির হাতে নিজেকে সঁপে দেয়া ছাড়া কী করার আছে এই মুহূর্তে? যা ঘটছে সেটাই বাস্তব, এবং একে মেনে নেয়া ছাড়া কোনও উপায় নেই।

বাথরুমে ঢুকে দরজা ভেজিয়ে দিল মুসা। মনে হলো আজ যেন আয়নাটা একটু উপরে উঠে গেছে। ভাল করে নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকাল।

পরক্ষণে চমকে উঠল–একি! এ যে একটা… একটা প্রায় শিশুর মুখ!

আর যাই হোক, ওর বয়স যে এখন তেরো নয়, তাতে কোনও সন্দেহই। রইল না ওর। খুব বেশি হলে আট বছর হবে আজকের মুসার বয়স।

এ কী আশ্চর্য!

আট! ভাবল ও তটস্থ হয়ে। আট বছর বয়সে ও কোন ক্লাসে ছিল মনে করার চেষ্টা করল। থ্রি! হ্যাঁ, থ্রির ছাত্র ছিল তখন মুসা।

তার মানে, মুসা আবার গ্রির ছাত্র বনে গেছে!

আচমকা পিঠে ব্যথা লেগে উঠল ওর। কেউ অথবা কিছু একটা পিঠে আঁচড় কাটছে বলে মনে হলো। আত্মা উড়ে গেল ওর।

ভিতর থেকে আপনাআপনি ঠেলে বেরিয়ে আসা চিৎকারটা। ঠেকানোর মরিয়া চেষ্টা চালাল। কিন্তু ব্যর্থ হলো শেষ পর্যন্ত।
বাড়ি কেঁপে উঠল ওর তারস্বরের চিৎকারে।
কিছু একটা ঝাঁপিয়ে পড়েছে ওর পিঠের উপর।
চিকন, রোমশ মুখ দেখা গেল আয়নায়। অদ্ভুত একটা জন্তু বসে আছে কাঁধের উপর।
যা, ভাগ, যা! উদ্বাহু নৃত্য শুরু করে দিল মুসা।
মজা পেয়ে ইইইই! ইইইই! শব্দ করতে লাগল জটা।
প্রচণ্ড ভয় পেয়ে দৌড়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল মুসা। ছুটল করিডরের মাঝখান দিয়ে। ইয়া তাগড়া এক লোকের সাথে ধাক্কা খেল।
বাঁচান! মরিয়া হয়ে চেঁচিয়ে উঠল। এটার হাত থেকে বাঁচান আমাকে!
ওর কাঁধের উপর থেকে জন্তুটাকে তুলে নিলেন মানুষটা। হাসতে হাসতে। ঢলে পড়ার দশা হলো তাঁর।
কী ব্যাপার, মুসা? কোনওমতে বললেন। ক্যাস্টেমকে এত ভয় পাওয়ার কী হলো? জন্তুটাকে কোলে নিয়ে আদর করতে লাগলেন তিনি।
ক্যাস্টেম?
ওটা একটা বানর!
ওর চুল নেড়ে দিলেন ভদ্রলোক। বললেন, জলদি তৈরি হয়ে নাও। রিহার্সালের কথা ভুলে গেছ?
রিহার্সাল? কীসের রিহার্সাল?
আহাম্মকের মত তাঁর দিকে চেয়ে রইল মুসা। পেশিবহুল বিশাল দেহ। কোঁকড়া কালো চুল। মুখে ঘন দাড়ির জঙ্গল।
লোকটার পোশাক দেখে মুসার চোয়াল ঝুলে পড়ার দশা হলো। উজ্জ্বল লাল রঙের কস্টিউম পরে আছেন তিনি। সোনালি, একটা জমকাল বেল্ট কোমরের কাছে বাধা। যাত্রার নায়কের মত দেখাচ্ছে।
হায় আল্লা! মনে মনে আঁতকে উঠল ও। এই লোক কে? ওর আজকের বাবা নাকি? সর্বনাশ!
এ কীসের পাল্লায় পড়ল ও?
রান্নাঘর থেকে এক মহিলার কণ্ঠ ভেসে এল, ওগো, শুনছ?
ওর দিকে একই ধরনের এক সেট পোশাক এগিয়ে দিয়ে লোকটা বললেন, তাড়াতাড়ি এগুলো পরে নাও। তারপর খেতে এসো, জলদি।
মুসা জানে এই লোকটাই ওর বাবা। অন্তত আজকের জন্য। কাল সে ছিল এক পরিবারের সদস্য, আজ জুটেছে আরেক পরিবারের সঙ্গে।

অ্যাই! আবার সেই মহিলার গলা ভেসে এল। খেতে আসছ না কেন? দেরি হয়ে যাচ্ছে তো তোমার!
ওই মহিলা এখন নিশ্চয়ই ওর মা–ভাবল মুসা।
অনেকগুলো পিচ্চি হাউকাউ করছে। বাঁদরের মত লাফালাফি করছে সারাবাড়ি। বিভিন্ন বয়সের, মনে হচ্ছে এক ডজনের কম হবে না। না, গুনে দেখা গেল ছয়টা। আধ ডজন। তাই বা কম কীসে?
নতুন পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা চালাচ্ছে নিরুপায় মুসা। ওর নিজের বয়স আট। ছয়-ছয়টাবোন ওর এখন, এবং একটা পোষা বানরও আছে এ পরিবারে। অদ্ভুত নাম-ক্যাস্টেম। মাকে অবশ্য এখনও দেখেনি ও–তবে বাবাকে যেটুকু দেখেছে; তাতেই কাজ হয়ে গেছে। ভীষণ হতাশ হয়েছে মুসা। অমন উজবুক মার্কা পোশাক পরা এক লোক ওর বাবা–চিন্তা করা যায়?
এবং ওকে পরার জন্য যে পোশাক দেয়া হয়েছে, সেটাই বা কম যায় কীসে? ব্যায়ামবিদ বা নাচের শিল্পীরা কোমরের কাছে যে জোড়া.দেয়া ওয়ান পীস, আঁটসাঁট পোশাক পরে, ঠিক তেমনি এক টাইট আউটফিট। ওটার বিচ্ছিরি রং চোখে জ্বালা ধরিয়ে দেয়। নীচের অংশ ক্যাটকেটে নীল, তার উপর সাদা স্ট্রাইপ। উপরের অংশে নীলের ওপর বড় বড় সাদা তারা ফুটে আছে। সব মিলে কী বিচ্ছিরি!
এই জঘন্য পোশাক কেন পরতে হবে ওকে?
কীসের রিহার্সালের কথা বললেন ওর বাবা?
কোনও নাটকে অভিনয় করতে হবে? ভাবতে গিয়ে কলজের পানি শুকিয়ে বরফ হয়ে উঠল। নাটকে অভিনয়ের কথা কল্পনাও করতে চাইছে না মুসা। ওর ধারণা পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন কাজ ওটা। অভিনেতাদের অতিমানব মনে হয়, তা না হলে কীভাবে ওরকম কঠিন কাজটা করেন তারা?
ভাবতে ভাবতে কস্টিউম পরে নিল মুসা। অবাক হয়ে খেয়াল করল, শরীরে এমনভাবে ফিট হয়েছে ওটা, দেখে মনে হচ্ছে মুসার দ্বিতীয় চামড়া বুঝি। একেবারে জোকারের মত লাগছে ওকে দেখতে।
ধীর পায়ে কিচেনের দিকে এগোল ও।
কিচেন তো নয়, যেন মাছের বাজার। বাঁদরামি করছে হাফ ডজন পিচ্চি। এ ওকে গুতো মারছে, ও তাকে চাটি মারছে। খাবার ছোঁড়াছুঁড়ি করছে। হাউকাউ, হাসাহাসি
সে এক বিতিকিচ্ছিরি কাণ্ড!
লম্বা, একহারা গড়নের এক মহিলা প্লেটে পাউরুটি সাজাচ্ছেন। মাথায় মেঘের মত ঘন, লম্বা চুল। পরনে টকটকে লাল একটা ম্যাক্সি।

আমার নতুন মা, ভাবল মুসা।
একটা প্লেট টেনে নিয়ে খাওয়া শুরু করল।
সুপার হিরোর পোশাকে মুসাকে আজ দারুণ কিউট লাগছে, তাই না? খোঁচা লাগাল এক মেয়ে। ওর বড় বোনদের একজন হবে হয়তো।
একদম বাদরের মত লাগছে, দাঁত বের করে বলল এক ছেলে, ভাই বোধহয়। মুসার চেয়ে বছর দুয়েকের বড় হবে হয়তো। ক্যাস্টেমের বড় ভাইয়ের মত, বলে হাসিতে ফেটে পড়ল ছেলেটা। ওর চিবুকে এত জোরে এক ঠোকা মেরে বসল যে মাথার ভিতরে খবর হয়ে গেল মুসার। কিউট লিটল মুসা, বলে চলেছে সে, খুদে সার্কাস-তারকা।
সার্কাস!
মুখ থেকে রুটির টুকরো পড়ে গেল মুসার। সর্বনাশ! এ কী শুনছে ও? সার্কাস! কীসের সার্কাস? কয়েকবার সার্কাসে কাজ করেছে ও। তা-ই বলে এখন ও পেশাদারি ভাবে…
মাথা ঘুরতে শুরু করল মুসার।
অদ্ভুত কস্টিউম।
বানর।
হ্যাঁ, এতক্ষণে এসবের কারণ একটু একটু খোলাসা হতে শুরু করেছে। দুহাতে মাথা চেপে ধরল মুসা। সাহেবুল সুলতান মুসা, সার্কাস বয়! গলা ছেড়ে যদি কিছুক্ষণ ভ্যাঁ-ভ্যাঁ করে কাঁদতে পারত, তা হলে বুকটা একটু জুড়াত।
মুসার মনে হলো ওর ভাই ওকে হিংসে করছে। ও নিজে সার্কাস তারকা হতে পারলে খুশি হত যেন। এজন্যই এত খোঁচা মেরে কথা বলছে সে।
এ ছেলে যদি হিরো হতো তা হলে বরং ভালই হত। বাঁচা যেত। আর যা-ই হোক, সার্কাস তারকা হওয়ার কোনও খায়েশ নেই মুসার।
মুসার সাথে অমন করছ কেন তোমরা? মা ধমকে উঠলেন। এমনিতেই ও টেনশনে আছে। শেষ পর্যন্ত তোমাদের খোঁচাখুঁচিতে সব গুবলেট করে। ফেলবে হয়তো, দেখো।
একে একে সবার উপর দিয়ে তীক্ষ্ণ নজর বোলাল মুসা। প্রত্যেকের পরনে উজ্জ্বল রঙের কস্টিউম দেখে ভাবল, পরিবারের সবাই সার্কাসের পাত্র পাত্রী নাকি?
ও আজ সার্কাস-পরিবারের সদস্য!
গলায় রুটি আটকে গেল। সার্কাস পছন্দ করে মুসা, কিন্তু আজ সার্কাসই ওর জীবন! ভাবতে ভাল লাগল না। ও এখন খুদে সার্কাস-তারকা!
ফাটা কপাল আর কাকে বলে!

রিহার্সালের সময় হয়ে এল! তাড়া লাগালেন বাবা। কালো একটা হ্যাট মাথায় চাপালেন। চলো সবাই!
পুরানো, লক্কর-ঝক্কর মার্কা একটা ভ্যানে চেপে বসল ওরা।
বাবা ড্রাইভিঙ সীটে। মা তাঁর পাশে।
পিছনে গাদাগাদি করে বসেছে মুসাসহ তাঁদের অন্য ছয় ছেলে-মেয়ে। ছয় বাঁদরের বাঁদরামি একমুহূর্তের জন্যও থেমে নেই। এত দুষ্টু ছেলেমেয়ে
জীবনে দেখেনি মুসা। একটু পরপর পিচ্চি এক মেয়ে ওকে চিমটি কাটছে। আরেকটা অনবরত মুসার পেটে খোঁচা মারছে।
এক সময় বিরক্ত হয়ে ধমকে উঠল মুসা, অ্যাই, কী হচ্ছে! কেন বিরক্ত করছ?
কেন যে এত বাজে একটা পরিবারের সদস্য হতে গেল মুসা! এর চেয়ে কালকেরটা তো অনেক ভাল ছিল।
বেশ কিছুক্ষণ পর অনেক উঁচু, বিশাল এক তাঁবুর সামনে এসে দাঁড়াল ভ্যান।
নামো সবাই! হুকুম দিলেন বাবা। নিজেও নেমে পড়লেন।
ভাইবোনদের অনুসরণ করে তাঁবুর ভিতরে চলে এল মুসা। ভিতরটা দারুণ পরিপাটি করে সাজানো। কয়েকজন সার্কাসম্যানকে প্র্যাকটিস করতে দেখা গেল। একেবারে তাঁবুর সিলিঙের কাছে টাঙানো একটা দড়ির উপর দিয়ে হাঁটা প্র্যাকটিস করছে এক লোক। নীচে নেট বিছানো আছে, পা ফসকে গেলে ওটার উপরেই পড়বে, হাত-পা ভাঙবে না। মাঝখানের গোল করে ঘেরা জায়গায় একটা হাতি পিছনের দুপায়ে খাড়া হয়ে আছে মাহুতের নির্দেশে। নাচের ভঙ্গি করছে। দুতিনজন ভড় দর্শক হাসানোর প্র্যাকটিস করছে।
আমাকে কী করতে হবে? ভাবল মুসা। ওর দুই বোন একটা মই বেয়ে তর তর করে বেশ খানিকটা উপরে উঠে গেল। তারপর সিলিং থেকে নেমে আসা দুই দড়ির মাথায় ঝুলন্ত আড়া ধরে দুলতে শুরু করল অদ্ভুত দক্ষতার সঙ্গে। তাই দেখে আত্মা উড়ে গেল মুসার।
ওই কাজ ওর দ্বারা কোনওদিনই সম্ভব না। হার্টফেল করবে ও নির্ঘাত।
এসো, মুসা, তাড়া লাগালেন বাবা। কাজে চলো।
তাকে মই রেখে সামনে এগিয়ে যেতে দেখে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল মুসা। ওকে তা হলে দড়ি ধরে ঝুলতে হচ্ছে না।
বাঁচলাম! ভাবল সে সামনে এগোতে এগোতে।
না, বাঁচেনি।
ভুলটা একটু পরেই ভাঙল মুসার।
ওকে নিয়ে বাবা তাঁবুর পিছনদিকে চলে এলেন। অনেকগুলো জীব জন্তুর খাঁচা দেখে অজানা আশঙ্কায় কেঁপে উঠল মুসা।

একটা খাঁচার দরজা খুলে দিলেন বাবা।
এসো, মুচকি হেসে বললেন। ঢুকে পড়া।
চোয়াল ঝুলে গেল মুসার। চোখ আলু করে সামনে চেয়ে রইল। নিজের চোখকেও বিশ্বাস করা যাবে না।
ব-ব-বলেন কী! দুর্বল গলায় ইঁদুরের মত কিচকিচ্ করে উঠল ও। ভে ভেতরে তো সিংহ!
বিশাল এক হাঁ করে এমন এক গর্জন ছাড়ল সিংহটা, সারা তাঁবু কেঁপে উঠল। থরথর করে কেঁপে উঠল মুসাও। কাঁপা পায়ে কোনওমতে দুপা পিছাল।
তাতে কী? ভয় নেই, এসো। ভয় পেয়ে দূরে সরে থাকলে কোনওদিন ওকে বশ করতে পারবে না তুমি। এসো।
নড়তে পারল না মুসা।
শক্তি আছে নাকি যে নড়বে!
বাবা ওকে ঠেলে ঢুকিয়ে দিলেন খাঁচার মধ্যে। এবং পরমুহূর্তে দরজা লেগে গেল দড়াম করে।
খাঁচার দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াল মুসা। ঠাণ্ডা স্টীল বারের ছোঁয়ায় দ্বিগুণ বেড়ে গেল কাঁপুনি। ভয়ে চোখ উল্টে যারার দশা। পা এত জোরে কাঁপছে যে ভয় হলো মুখ থুবড়ে পড়েই যাবে যে-কোন মুহূর্তে।
সিংহটা এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ওর দিকে। দৃষ্টিতে আগুন ঝরছে যেন।
ওর বাবা লায়ন টেমার, কখন খাঁচায় ঢুকেছেন খেয়াল করেনি মুসা। ওর পাশে দাঁড়িয়ে আছেন উনি, হাতে চাবুক। তাই দেখে কিছুটা ভরসা হলো।
নতুন একটা ট্রিক শিখব আজ আমরা, বললেন উনি হাসতে হাসতে, যেন ব্যাপারটা খুবই মজার। ওটার পিঠে চড়বে তুমি।
ছেলেকে সামনে ঠেলে দিলেন বাবা।
এই মরেছে! তাজ্জব হয়ে ভাবল মুসা। ভদ্রলোক ওর সঙ্গে ঠাট্টা করছেন নাকি? মানুষ চড়বে সিংহের পিঠে? কাঁপাকাপি বেড়ে গেল ওর।
হে খোদা! বাঁচাও আমাকে। এ কীসের মধ্যে এনে ফেললে আমাকে?।
এ কেমন ধরনের বাবা? ভাবল মুসা কাঁপতে কাঁপতে। নিজের ছেলেকে সিংহের খাবার বানাতে চলেছেন!
স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে পশুরাজ। নড়াচড়ার কোনও লক্ষণ নেই। মুসাও স্থির। এক দৃষ্টিতে ওটার দিকে চেয়ে আছে। দুচোখ আলু হয়ে আছে।
আচমকা এমন এক হাঁক ছাড়ল ওটা, সারা এলাকা থরথর করে কেঁপে উঠল। আরেকটু হলে হার্টফেলই করে বসত হয়তো মুসা।

ওটার গরম নিঃশ্বাস এসে পড়ল ওর মুখের উপর। আতঙ্কে ঘাড়ের খাটো খাটো চুল সড়সড় করে দাঁড়িয়ে গেল।
নড়ে উঠল পশুরাজ। মুসার দিকে ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগোতে শুরু করল। হাতের চাবুক দিয়ে মেঝেতে জোর এক বাড়ি লাগালেন বাবা। পরমুহূর্তে গলা ছেড়ে হেঁকে উঠলেন, হেইয়া!
ঠোঁট চাটতে চাটতে পিছাতে শুরু করল পশুরাজ।
সামনে যাও, মুসা, হুকুম দিলেন বাবা। উঠে পড়ো হারকিউলিসের। পিঠে। শক্ত করে কাধ ধরে থাকবে, নড়াচড়া করবে না। আমার চাবুকের বাড়ির তালে তালে দেখো কী সুন্দর খাঁচার চারদিকে ঘুরে বেড়ায় ওটা তোমাকে নিয়ে। এগোও, জলদি।
কথা জোগাল না মুসার মুখে। অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে লোকটার দিকে চেয়ে আছে।
উজবুকের মত ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছ কেন আমার দিকে? হারকিউলিসকে তুমি একটুও ভয় পাও না। কী বলো, পাও?
না, মোটেই না। একশো পারসেন্ট সত্যি বলেছেন আপনি, ভাবল মনে মনে। হাসবে না কাঁদবে ভেবে পেল না। মানুষটার মাথা খারাপ হয়ে গেল না, তো? এসব কী বলছেন? বেশিরভাগ সময় জন্তু-জানোয়াররা ওকে খুব পছন্দই করে, কিন্তু তাই বলে সিংহের মত এরকম হিংস্র একটা প্রাণী…
চাবুক চালালেন উনি। আমি জানি–আমার ছেলে ভীতু হতে পারে না, গম্ভীর গলায় বললেন তিনি। যা বলছি জলদি করো, যাও!
পরমুহূর্তে গলা নামিয়ে প্রায় ফিসফিস্ করে বললেন, অযথা ভয় পাচ্ছ তুমি, মুসা। হারকিউলিস খুব ভাল। এখন পর্যন্ত কাউকে একটা আঁচড়ও দেয়নি। তোমাকেও দেবে না।
ঠিক ওর পায়ের কাছে চাবুকের বাড়ি মারলেন আবার। যাও!
কিন্তু কীভাবে তা সম্ভব? সত্যি যদি ও সার্কাস-পরিবারের সদস্য হত, তা হলে না হয় একটা কথা ছিল। কিন্তু এ কেমন কথা? ঘুম থেকে জেগে দেখল। সে এমন একটা পরিবারের ছেলে, আর কথা নেই বার্তা নেই ‘বাবা’ ওকে টেনে-হিঁচড়ে সিংহের খাঁচায় ঢুকিয়ে দিলেন।
স্বপ্নেও ভাবা যায়?
মুসা যে এখনও ধড়ে প্রাণ নিয়ে দুপায়ে দাঁড়িয়ে আছে, প্যান্ট-ট্যান্ট ভিজিয়ে বিতিকিচ্ছিরি কাণ্ড ঘটিয়ে বসেনি, তা-ই তো বেশি।
চিন্তার ঝড় বইছে মুসার মাথায়। আর একমুহূর্তও এই খাঁচায় থাকতে ইচ্ছে করছে না। প্রাণে বাঁচতে চাইলে পালাতেই হবে। সিংহের পিঠে ওঠার আগেই হয়তো হার্টফেল করবে ও।

আবার চাবুক হাঁকালেন বাবা। লাফিয়ে পিছিয়ে গেল মুসা।
একটানে দরজা খুলেই লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল। কোনদিক দিয়ে কী ঘটে গেল কিছুই বুঝতে পারলেন না ওর বাবা।
মরিয়া হয়ে খিচে দৌড় লাগাল মুসা! মাথা ঝিমঝিম করছে ওর। ভিতর থেকে কেউ যেন বলছে, জলদি লুকাও, মুসা। বাঁচতে চাইলে শীগগির কোথাও লুকিয়ে পড়ো।
তবু থেকে বেরোতেই সামনে একটা পার্কিং লট দেখতে পেয়ে সেদিকেই এগোল মুসা। অনেকগুলো গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।
একটার আড়ালে পৌঁছে থেমে পড়ল। এবং পরমুহূর্তে সানজানার সাথে ধাক্কা খেল।
তুমি! মেয়েটাকে দেখে বিস্মিত হলো মুসা। পরমুহূর্তে বিস্ময়ের ধাক্কা সামলে সচকিত হয়ে উঠল। বাবা এখনই এসে পড়লেন বলে। আগে জান, বাঁচানো ফরজ।
আমাকে কোথাও লুকাতে হবে, সানজানা, রুদ্ধশ্বাসে বলল মুসা। মহাবিপদে পড়েছি।
বিপদ! কীসের বিপদ?
সিংহের খাবার হতে চলেছি আমি, কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল ও আমাকে বাঁচাও, সানজানা!
একটা গাড়ির দরজা খোলার চেষ্টা করল সানজানা। খুলল না, লক করা।
হায় আল্লা! আচমকা চাপা গলায় গুঙিয়ে উঠল মুসা। সানজানা, ওই দেখো!
ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে সামনে তাকাল মেয়েটা। কালো পোশাক পরা গতকালকের সেই দুই তরুণ ওদের দিকেই এগিয়ে আসছে অমোঘ নিয়তির মত।
ভুল হলো। ওদের দিকে নয়, মুসার দিকে!
ভাবার সময় নেই। ঝেড়ে দৌড় লাগাল মুসা। কিন্তু কোথায় যাবে? কোথায় লুকাবে?
লুকানোর জায়গা নেই।
না, আছে। তাঁবু। সার্কাসের তাঁবু।
কালো পোশাক পরা ওই দুটো ছেলের চেয়ে এখন সিংহটাকেও অনেক নিরাপদ মনে হচ্ছে ওর। অগত্যা তাঁবুতেই আবার ঢুকে পড়ল মুসা।
তাঁবুর মধ্যে ঢুকে পড়েছে ও! চেঁচিয়ে উঠল লম্বা ছেলেটা।
এবার ব্যাটাকে পালাতে দেয়া যাবে না, বলল খাটোটা। চলো, আমরাও ভেতরে যাই।
ঢুকে পড়ল ওরা।

ওদিকে রুদ্ধশ্বাসে ছুটছে মুসা। এমন শেয়াল-দৌড় ও জীবনে দৌড়েছে। কিনা সন্দেহ। সোজা সিংহের খাঁচার সামনে এসে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগল। যে-জায়গাটাকে একটু আগেও যমের মত ভয় পাচ্ছিল ও, সেটাকে এখন নিরাপদ মনে হতে ভিতরে ঢুকে পড়ল।
তারপর আগুপিছু চিন্তা না করেই খাঁচার দরজা লাগিয়ে দিল।
এদিকে দুই কালো পোশাক পরা তরুণ এসে পড়েছে। খাঁচার কাছে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ হাঁপিয়ে নিল ওরা। নিজেদেরকে সুস্থির হওয়ার সময় দিল। তারপর ক্রুদ্ধ চোখে তাকাল মুসার দিকে।
এবার? কোথায় পালাবে, বাছাধন? কোমরে হাত রেখে মাথা ঝাঁকাল একজন।
চারপাশে দ্রুত নজর বোলাল মুসা। বাবা নেই। খাঁচায় সে একা। হারকিউলিসের সাথে। রাগে গরগর আওয়াজ করছে ওটা।
রাগ করিসনে, বাপ! শান্ত হ... ওটার উদ্দেশে বিড়বিড় করে বলল মুসা। কোনও পরিবর্তন দেখা গেল না। খাঁচার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আগের মতই গজরাচ্ছে পশুরাজ।
রহস্যময় ছেলেদুটো খাঁচার দরজা ধরে মরিয়া হয়ে ঝাঁকাতে শুরু করল। খুলে গেল দরজা। টুক করে ভিতরে ঢুকে পড়ল ওরা।
পালানোর চেষ্টা কোরো না, লম্বু সতর্ক করল।
এত মানুষ দেখে হুঙ্কার দিল সিংহটা। সার্কাসের বুড়ো সিংহ, অন্যজনকে বলতে শুনল মুসা। এ একটু বেঁটে। আমাদের কিছু করার ক্ষমতা নেই ওর!
কিন্তু মুখে যাই বলুক, ওদের ভিতরের ভয় মুসার চোখে ধরা পড়ে গেল। যতই বাহাদুরি ফলাক, ভিতরের অস্বস্তির ভাবটা চেহারায় পরিষ্কার ফুটে উঠেছে।
আরেক হুঙ্কার ছাড়ল হারকিউলিস–আগের চেয়ে জোরে। সামনে এগোতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ওরা।
মুসা পিছিয়ে গেল।
সিংহটার ওপাশে আড়াল নেয়ার ইচ্ছে আছে। ওর আর বদমাশ দুটোর মাঝখানে যদি সিংহটা থাকে, ওরা এগোতে সাহস করবে না।
লঘু সতর্ক পায়ে সামনে এগোতে শুরু করল। এবার ওর দিকে তাকিয়ে। হুঙ্কার ছাড়ল হারকিউলিস।
ঘাবড়ে গেল ছেলেটা, যতটুকু এগিয়েছিল, তার চেয়েও পিছিয়ে গেল।
ওদের উপর থেকে আগ্রহ হারিয়ে মুসার দিকে তাকাল হারকিউলিস। মনে হয় বোঝার চেষ্টা করছে কার মাংস বেশি সুস্বাদু হবে।
বাঁচতে চাইলে বেরিয়ে যাও তোমরা, গলায় জোর ফোঁটানোর চেষ্টা করল ও। আজ এখনও পর্যন্ত হারকিউলিসকে খেতে দেয়া হয়নি। ওটা কিন্তু ক্ষুধার্ত।

ভয়ে ভয়ে ওটার দিকে তাকাল দুই বদমাশ।
হারকিউলিস আমাকে কিছু করবে না. সির ভঙ্গি করল মুসা। কারণ আমি ওর মাস্টার। আমি হুকুম করলে ও তোমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।
নজর বিনিময় করল ওরা। দুর্বল গলায় একজন বলল, মিথ্যে কথা!
অন্যজনের চেহারায় অনিশ্চয়তা।
সত্যি! তোমরা চাইলে প্রমাণ করে দেখাতে পারি।
বাঁটু পিছিয়ে গেল। লম্বু ওর হাত ধরে টেনে নিয়ে এল সামনে। ভয় পাচ্ছ কেন! বিড়বিড় করে বলল। ঘোড়াটা আমাদের বোকা বানাতে চাইছে।
হারকিউলিস! চেঁচিয়ে উঠল মুসা। ধরো ওদের... ওর কথা শেষ হবার আগেই এমন এক হুঙ্কার ছাড়ল পশুরাজ, মাটি থরথর করে কেঁপে উঠল।
না, ঝাঁপিয়ে পড়বার দরকার পড়ল না হারকিউলিসের। তার আগেই লেজ, তুলে দৌড় লাগাল ছেলেদুটো। চোখের পলকে খাঁচা থেকে বেরিয়ে দরজা বন্ধ করে হাঁপাতে লাগল।
ঠিক আছে, হুমকির সুরে লম্বু বলল। যাচ্ছি। কিন্তু তাই বলে মনে কোরো না তুমি পালাতে পারবে। আবার আসব আমরা! তোমাকে শায়েস্তা করে ছাড়ব।
কি চাও তোমরা আমার কাছে? কণ্ঠ কেঁপে গেল মুসার। আমি কী দোষ করেছি? বলো, কী দোষ করেছি আমি? কেন পিছু লেগেছ আমার?
আসলে কাউকেই খাওয়ার আগ্রহ ছিল না হারকিউলিসের। কারণ ওটা মানুষখেকো নয়। মাংস খায় ঠিকই, কিন্তু সেসব ওটার প্রতিদিনের রেশনের মাংস, তাজা মানুষের নয়। খাঁচা থেকে বেরোতে চাইছে ওটা আসলে, বন্দিদশা থেকে মুক্তি চায়। এই জন্যই রাগ ঝাড়ছে।
টু করে বেরিয়ে এল মুসা। চেয়ে চেয়ে দেখল কেবল হারকিউলিস।
চুপি চুপি তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল ও। যে ভ্যানে করে এসেছিল, সেটায় উঠে বসে থাকল। আর সবার প্র্যাকটিস শেষ হওয়ার অপেক্ষায় থাকল। অনেকক্ষণ পর ফিরল ওর নতুন পরিবারের সদস্যরা। ওকে ভালমানুষের মত গাড়িতে বসে থাকতে দেখে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন বাবা।
সারাদিন কোথায় ছিলে তুমি?
জবাব দিল না ও। ভ্যানে উঠে পড়ল সবাই। বাড়ির পথে চলতে শুরু করল লক্কর-ঝক্কর গাড়ি।
সামনে মা-বাবার মাঝখানে বসেছে মুসা। নইলে বোনেরা ওকে খুঁচিয়ে শেষ করে দিত।
আমার খুব খারাপ লাগছে, অভিযোগের সুরে বলল মুসা। ঘুমানো দরকার।

কাল আবার প্র্যাকটিসে আসতে হবে মনে থাকে যেন, গাড়ি চালনার ফাঁকে মাথা দোলালেন বাবা। কাল কিন্তু কোনও ওজর-আপত্তি চলবে না ॥ বলে দিলাম।
জবাব দেয়ার বদলে হাই তুলল মুসা। ও জানে কাল কখনও আসবে না। অন্তত এই সার্কাস-পরিবারের সদস্য আর থাকবে না ও কাল।
কাল নতুন এবং হয়তো আরও ভীতিকর পরিবেশ এসে হাজির হবে ওর সামনে। অথবা ভাল কিছুও ঘটতে পারে। সেই আশাই করছে ও।
খেয়েদেয়ে তাড়াতাড়ি বিছানার দিকে এগোল মুসা। আট বছরের ছোট থাকতে একদম ভাল লাগছে না। তার উপর এই সার্কাস-পরিবার একেবারে অসহ্য ঠেকছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই পরিবারের হাত থেকে উদ্ধার পেতে চায় ও।
ওর রুমে বাদরামি করছে ভাই-বোনেরা। সুতরাং আবার সেই গেস্ট রুমেই যেতে হলো ওকে বাধ্য হয়ে।
শুয়ে এপাশ-ওপাশ করছে কেবল, ঘুমাতে পারছে না। নানান চিন্তায় মাথা ভারী হয়ে আছে, ঘুরছে।
কাল ওর জন্য নতুন কী চমক আসছে, সে কথা ভাবছে।
পাঠক, তোমরা যদি ঠিক এমনি পরিস্থিতিতে পড়তে যদি জানতে, আগামীকাল ঘুম থেকে ওঠার পর নতুন কোনও পৃথিবীর বাসিন্দা হবে তুমি, অথচ সেই পৃথিবীটা কেমন হবে তা তোমার জানা নেই, তা হলে তুমি কী ঘুমাতে পারতে?
না মনে হয়।
মুসাও ঘুমাতে পারছে না।
আগামীকাল উঠে যদি দেখি আমি ফুটবল প্লেয়ার হয়ে গেছি, কী যে দারুণ হত! ভাবল ও। যদি পৃথিবীর সেরা ফুটবল প্লেয়ার হতে পারতাম ম্যারাডোনা বা প্লাতিনির মত!
অথবা কোটিপতি কোনও বাবা-মার সন্তান! যা চাইতাম, তাই পেতাম, দারুণ ব্যাপার হত!
অথবা পাঁচশো বছর ভবিষ্যতে যাওয়া যেত যদি! অথবা যদি একজন মহাকাশচারী হতে পারতাম!
মুসা জানে এসব কিছুই ঘটবে না। কারণ ওর কপাল খারাপ। অন্তত এখন পর্যন্ত যা যা ঘটেছে, তাতে এই সত্যই প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে।
সবকিছুকে ছাপিয়ে আসল পৃথিবীতে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছেটা ওর মাথা চাড়া দিয়ে উঠল।
সেদিন কী আসবে আর কখনও?
ওর আসল পরিবারে ফিরে যেতে পারবে মুসা? বাবা, মা, ফারিহা, তানজিয়া, শাওনি ভাইকে ফিরে পাবে? মনে হলো কতযুগ যেন ওদের দেখে না।

খারাপ লেগে উঠল মুসার।
অবশেষে ভোরের দিকে দুচোখ বুজে এল ওর।
.
যখন ঘুম ভাঙল, তখনও আলো ভালমত ফোটেনি। ঘুমজড়ানো চোখে রুমের চারদিকে নজর বোলাল মুসা।
এখন আমি কে? ভাবল। ঘরটা তো স্বাভাবিকই আছে মনে হচ্ছে। বাড়ির ভিতরে কোনও সাড়াশব্দ নেই। সার্কাস-পরিবার গায়েব হয়ে গেছে বুঝতে অসুবিধে হলো না মুসার।
লাফ দিয়ে উঠে বসল। নেমে দাঁড়াল বিছানা থেকে। দুপা ভীষণ দুর্বল লাগছে।
ব্যাপার কী?
ধীর পায়ে বাথরুমের দিকে এগোল মুসা। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে যা দেখল, তাতে মাথা ঘুরে উঠল বন্ন করে।
হায় আল্লা!
আজকে আগের সবকিছুকে ছাড়িয়ে গেছে মুসা।
এ অসম্ভব!
অকল্পনীয়!
অবিশ্বাস্য।
মুসা এখন থুথুড়ে এক বুড়ো!
না! দুর্বল কণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠার চেষ্টা করল ও। এ হতে পারে না!
এ মেনে নেয়া যায় না।
কিছুতেই না।
বুড়ো হয়ে বাঁচতে চায় না মুসা।
এর চেয়ে মরে যাওয়া ভাল।
দুর্বল পায়ে গেস্ট রুমে ফিরে এল ও। মনে হচ্ছে একেকটা পায়ের ওজন কয়েক মণ করে বেড়ে গেছে। সহজে তোলা যায় না।
রুমে এসে বিছানায় বসে কিছুক্ষণ হাঁপিয়ে নিল মুসা, যেন কয়েক মাইল পথ দৌড়ে এসেছে। টপটপ করছে হৃৎপিণ্ড।
শুয়ে চোখ বুজল।
আবার ঘুমাতে হবে। বুড়ো হয়ে বাঁচতে চায় না ও কিছুতেই। ওর বয়স এখন মাত্র তেরো, জানে মুসা। কাজেই এত তাড়াতাড়ি বুড়ো হতে চায় না ও।
এবং ঘুমানো ছাড়া এই বিপদের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার কোনও পথ নেই।
একসময় ঘুমিয়ে পড়লও মুসা। যখন জেগে উঠল, টের পেল বদলে গেছে ও। এখন আর বুড়ো নেই।

আগের মত দুর্বল লাগছে না। বরং ভিতরের শক্তি অনেক বেড়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে। হয়তো এখন আমি একজন ফুটবল খেলোয়াড়, আশান্বিত হয়ে ভাবল ও।
উঠে বসে চোখ ডলল কয়েক মুহূর্ত। আচমকা হাতের দিকে নজর যেতেই আঁতকে উঠল।
ওর চামড়া সবুজ হয়ে গেছে!
সবুজ কেন?
আর আঙুলগুলোই বা অমন অদ্ভুত কেন? মানুষের আঙুল অমন হয় নাকি?
জোরে জোরে শ্বাস টানল ও। অজানা আশঙ্কায় বুক কাঁপছে। বুকের খাঁচায় বাড়ি মারছে হৃৎপিণ্ড।
এবার কী ঘটেছে ওর পোড়া কপালে?
একমুহূর্ত সময় নষ্ট না করে বাথরুমে চলে এল মুসা। আয়নার সামনে দাঁড়াল। এবং যথারীতি সশব্দে আঁতকে উঠল নিজের প্রতিবিম্ব দেখে।
দানব হয়ে গেছে মুসা!
কুৎসিত, ভয়ানক এক দানবে পরিণত হয়েছে ও!
গলা দিয়ে আপনাআপনি একটা গোঙানি ঠেলে বেরিয়ে এল।
এ হতে পারে না, মরিয়া হয়ে বলবার চেষ্টা করল ও। কিছুতেই না।
কিন্তু কথা নয়, কলজে পানি করা হুঙ্কার বের হলো গলা দিয়ে। মনের ভীষণ চাপ সহ্য করা কঠিন হয়ে উঠল।
না! ভয়ে কাঁটা দিল মুসার সারা গায়ে। ভিনগ্রহের আজব এক জন্তুর মত ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে এখন ওকে। এমন কী কথা পর্যন্ত বেরোচ্ছে না গলা দিয়ে।
বিশাল দেহ পেয়েছে মুসা। উচ্চতা কম করে হলেও সাত ফুট হবে–গায়ে প্রচণ্ড শক্তি। চামড়ার রং সবুজ, তার মধ্যে কালো স্ট্রাইপ। অনেকটা রাস্তার জেব্রা ক্রসিঙের মত। বাতাসে ভেসে বেড়ানো নানান শব্দ আসছে কানে। ঘ্রাণশক্তিও অনেক বেড়ে গেছে। অনেকটা কুকুরের মত।
ভিনগ্রহের কুৎসিত প্রাণীর মত লাগছে ওকে দেখতে। নাক-মুখ-চোখ কান সবই আছে। চোখদুটোর সাইজ কমলালেবুর সমান। বোচা নাক। জঘন্য! সরু, চোখা কান।
হাতের আঙুল অস্বাভাবিক লম্বা–সেগুলোর আগায় লম্বা নখ। দেখে গা ঘিঘিন করে উঠল মুসার।
এর চেয়ে বুড়ো হয়ে থাকাও অনেক ভাল ছিল। যতবার ও ঘুম থেকে জাগছে, ততবারই অবস্থা খারাপের দিকে যাচ্ছে। এ কী অসহ্য যন্ত্রণায় পড়ল। মুসা?
এর শেষ কোথায়?
কী করে এর হাত থেকে মুক্তি মিলবে?

সানজানার কথা মনে পড়ল মুসার। ও নিজে যে জগতেই থাকুক, ভোজবাজির মত উদয় হয় মেয়েটা। এবং এ পর্যন্ত প্রতিবারই কালো পোশাক পরা বিপজ্জনক দুই তরুণের হাত থেকে বাঁচানোর ব্যাপারে ওকে সাহায্য করেছে মেয়েটা। সানজানা আসলে ওকে সাহায্য করতে চায়। সেই জন্যই বারবার আসে?
যেভাবে হোক, ওকে খুঁজে বের করতে হবে
সিদ্ধান্ত নিল মুসা। মন বলছে ওকে খুঁজে বের করা সম্ভব। মেয়েটা ওর ধারেকাছেই কোথাও আছে। গত কদিনের কথা ভেবে সিদ্ধান্তে পৌঁছল মুসাহা, সানজানা ওকে উদ্ধার করতেই চায়। নিশ্চয়ই ও কোনও বিশেষ মেয়ে হবে। কাজেই সানজানাই এখন ওর একমাত্র ভরসা।
বিশাল দানবীয় শরীর নিয়ে সারাবাড়ি ঘুরে বেড়াল মুসা।
ফাঁকা। জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ নেই। খাঁ-খাঁ করছে বাড়িটা। ওকে সাহায্য করার কেউ নেই।
মুসা ভেবেছিল এখন ও হয়তো কোনও দানব-পরিবারের সদস্য হয়ে গেছে। দানব বাবা-মা, ভাই-বোন আছে হয়তো।
কিন্তু না, বাড়িতে ও ছাড়া আর কোনও প্রাণী নেই।
মনে মনে খুশি হয়ে উঠল মুসা। এ বরং ভালই হয়েছে। এখন ও যা খুশি তাই করতে পারবে। বাধা দেয়ার বা শাসন করার মত কেউ নেই।
ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তায় চলে এল মুসা। চেঁচিয়ে ডাকার চেষ্টা করল, সানজানা! সানজানা, তুমি কোথায়?
কিন্তু কোনও কথা বেরোল না মুখ দিয়ে। যা বেরোল তা রক্ত ঠাণ্ডা করা দুর্বোধ্য হুঙ্কার।
আচমকা ওর সামনে ব্রেক কষল একটা গাড়ি। জানালা দিয়ে মাথা বের করে দিল ড্রাইভার। চোখ আলু করে চেয়ে থাকল মুসার দিকে।
ভয় পাবেন না! চেঁচিয়ে উঠল ও। কিন্তু গলা দিয়ে ফুটল অন্য কিছু, কথা নয় আকাশ বাতাস কাঁপানো এক গর্জন।
প্রথমে একটা চিৎকার দিল ড্রাইভার। তারপর গাড়ির গতি দ্রুত তুলল। কিন্তু বেশি দূর যেতে পারল না, আরেকটা গাড়ির সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটিয়ে বসল। ইস্পাত ও কাঁচ ভাঙচুরের ভয়াবহ আওয়াজ হলো।
কেউ আহত হয়েছে কি না দেখার জন্য এগোল মুসা। অন্য গাড়িতে এক মহিলা আর এক শিশুকে দেখা গেল।
না, আঘাত পায়নি কেউ। তবে গাড়ি দুটোর বেশ ক্ষতি হয়েছে।
চোখের সামনে অদ্ভুত প্রাণীটাকে দেখতে পেয়েই গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল সবাই। চিৎকার করতে করতে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল যে যেদিকে পারে।

এগিয়ে চলেছে মুসা। ওর প্রত্যেক পদক্ষেপে মাটি কেঁপে উঠছে। রাস্তার লোকজন থমকে দাঁড়াচ্ছে, বিস্ফারিত চোখে চেয়ে থাকছে কয়েক মুহূর্ত, তারপর রুদ্ধশ্বাসে উল্টোদিকে ছুটছে। দেখতে দেখতে হারিয়ে যাচ্ছে চোখের আড়ালে।
সানজানা, ভাবছে মুসা, সানজানাকে খুঁজে বের করতেই হবে যে-করে হোক।
মাথার মধ্যে কেবল সানজানার চিন্তা ধরে রাখতে চাইছে মুসা। কিন্তু এ পারছে না। এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে সব।
খিদে!
প্রচণ্ড খিদেয় পেটের মধ্যে নাড়িভুড়ি মোচড় মারছে। প্রিয় খাবারগুলো ওর চোখের সামনে ভাসছে। কিন্তু ওগুলো তো কোনও দানবের খাবার হতে পারে না। ওর এখন দরকার শক্ত, কঠিন খাবার।
একটা গাড়ি খেয়ে দেখলে মন্দ হত না–ভাবল মুসা। নিশ্চয়ই খুব মজার, সুস্বাদু হবে।
ওদিকে হুলস্থুল কাণ্ড শুরু হয়ে গেছে। হই-চই, চেঁচামেচিতে মুসার দানবীয় কানেও তালা লাগার দশা। লোকজন যে-যেদিকে পারছে ছুটে পালাচ্ছে। চারদিকে মহা বিশৃঙ্খলা।
যাজকের পোশাক পরা এক লোককে বলতে শোনা গেল, পৃথিবী শেষ! এসব পৃথিবী শেষ হওয়ার লক্ষণ!
বলে আর দাঁড়াল না লোকটা। ঘুরেই দিল দৌড়।
মানুষ যতই ভয় পাক, কাউকে আঘাত করার ইচ্ছে নেই মুসার। সানজানাকে খুঁজছে ও। ভীষণ দরকার এখন মেয়েটাকে।
কিন্তু তার আগে পেট ঠাণ্ডা করতে হবে। খিদেটা ভীষণ চাগিয়ে উঠেছে।
দানবীয় পা ফেলে একটা গাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল মুসা। ঝকঝকে নতুন গাড়ি। ওটা দেখেই দ্বিগুণ বেড়ে গেল খিদে। পানি এসে গেল জিভে।
দানবীয় হাত দিয়ে গরিলার যুদ্ধ ঘোষণার মত দমাদম নিজের বুক চাপড়াতে লাগল মুসা।
তাই দেখে গাড়ির ভিতরে বসা ড্রাইভার থরথর করে কাঁপতে শুরু করল। কী করবে দিশা খুঁজে পাচ্ছে না। সামনে-পিছনে কোনওদিকেই যাওয়া চলবে না। রাস্তায় অজস্র গাড়ির জ্যাম লেগে গেছে।
একটা ওয়াইপার টান দিয়ে খুলে ফেলল মুসা। স্বাদ পরীক্ষা করে দেখা দরকার।
উমমমম! দারুণ তো!
ঝটকা মেরে গাড়ির দরজা খুলে ফেলল ড্রাইভার। চোখ কপালে তুলে বেরিয়ে এল। গলার সমস্ত শক্তি এক করে চেঁচিয়ে উঠল। বাঁচাও! বাঁচাও! বলতে বলতে

ছুটল যেদিকে দুচোখ যায়। এদিকে চমৎকার একটা খাবার সামনে পেয়ে খুশি হয়ে উঠেছে মুসা।
এক টানে একদিকের দরজা ছুটিয়ে ফেলল। ষ্টার হ্যাঁণ্ডেল খুলে মুখে পুরে দিল।
দারুণ তো! ভাবল মুসা। কোঁৎ করে গিলে ফেলল।
এবার কামড়ে দরজার একটা অংশ মুখে পুরে ফেলল।
চাকুম! চাকুম!! চাকুম!!!
রেজরের মত ধারাল দাঁত দিয়ে কড়মড় করে চিবাল মুসা।
মজা পেয়ে চাকুম চাকুম শব্দ করছে। দেখতে দেখতে পুরো দরজা সাবাড় করে ফেলল মুসা। তারপর একটা সিট খুলে নিল। চামড়াটা দারুণ। সুস্বাদু। ফোম প্যাডিং শুকনো হলেও খেতে মন্দ লাগছে না। মাখনবিহীন টোস্ট বিস্কিটের স্বাদ আছে এতে।
স্টিয়ারিং হুইলটা টান মেরে খুলে ফেলতেই একটা সাইরেনের শব্দ কানে এল ওর।
সেরেছে!
সোজা হয়ে সামনে তাকাতে দেখল একটু দূরত্ব রেখে চারদিক থেকে অসংখ্য মানুষ ওকে ঘিরে ফেলেছে।
প্রত্যেকের চোখে-মুখে বিস্ময়, যেন পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য দেখছে। ভয় তাড়িত কণ্ঠে চেঁচামেচি করছে। সামনে এগোতে চায়, কিন্তু সাহস নেই। মুসার দিকে আঙুল নির্দেশ করে কী সব বলাবলি করছে ওরা।
ইয়াল্লা! বাচ্চা ছেলের মত চেঁচিয়ে উঠল এক মাঝবয়সী লোক। কী ওটা! রাক্ষস নাকি, আস্ত গাড়িটা চিবিয়ে খেয়ে নিচ্ছে!
দানব গাড়ি খাবে না তো কাঁচকলা খাবে নাকি? বিরক্ত হয়ে ভাবল মুসা। একটু একটু করে এগিয়ে আসছে সাইরেনের শব্দ।
এবার দেখল অসংখ্য পুলিশ ওকে দূর দিয়ে ঘিরে ফেলেছে।
রাস্তা পরিষ্কার করুন, লাউড স্পিকারে একটা গম্ভীর কণ্ঠ ভেসে এল। পিছিয়ে আসুন সবাই, সরে দাঁড়ান।
এখনই পালাতে হবে, সিদ্ধান্ত নিল মুসা, নইলে খবর আছে। স্টিয়ারিং হুইলটা ছুঁড়ে ফেলেই ছুটতে শুরু করল ও। ভয় পেয়ে লোকজন ফোয়ারার পানির মত চারদিকে ছিটকে পড়ে পথ করে দিল ওকে।
থামাও ওটাকে! দানবটাকে ধরো!
পুলিশের কয়েকটা গাড়ি সম্মিলিত সাইরেন বাজাচ্ছে। সে-শব্দে আকাশ কাঁপছে। মুসার কানে তালা লাগার অবস্থা।

পুলিশের হাতে ধরা পড়লে কপালে খারাবি আছে বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে। দানব মুসার। নির্ঘাত ওকে মেরে ফেলবে তারা।
পালাতে হবে।
এক্ষুণি পালাতে হবে।
ছুটছে মুসা। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে। দৌড়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দুহাত সামনে-পিছনে করছে। চিৎকার করতে করতে পিছনে ছুটে আসছে জনতার দঙ্গল, পুলিশ বাহিনী। কিন্তু একটা দানবের সঙ্গে পারা সোজা নয়। লম্বা পায়ে দৌড়ে এদের অনেক পিছনে ফেলে দিল মুসা।
মাঝখানে ব্যবধান বাড়ছে ক্রমে।
আরও বাড়ছে!
আরও বাড়ছে!
এক সময় মুসা বুঝতে পারল ওদের ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে এসেছে ও। দৌড়াতে দৌড়াতে শহর ছাড়িয়ে নির্জন শহরতলিতে চলে এসেছে। আপনা আপনি দৌড়ের গতি কমে এল।
এবং আচমকা থেমে দাঁড়াল মুসা সামনেই সানজানাকে দেখতে পেল। ওর দিকেই দৌড়ে আসছে মেয়েটা।
মুসার সামনে এসে থেমে দাঁড়াল। ভয় পাওয়ার কোনও লক্ষণ নেই। মেয়েটার মধ্যে, চিনতে পেরেছে হয়তো।
ব্যস্ত হয়ে মুসা কিছু বলার ব্যর্থ চেষ্টা করল। তাতেই যা বোঝার বুঝে নিল সানজানা। মুসার বাহু ধরে টানতে শুরু করল।
মেয়েটাকে অনুসরণ করল ও।
হাঁটছে।
হাঁটছে।
বেশ কিছুক্ষণ হাঁটার পর একটা গ্রামকে পাশ কাটাল ওরা। মুসার জানতে ইচ্ছে করছে সানজানা ওকে কোথায় নিয়ে চলেছে। কিন্তু জানে কথা বলার ক্ষমতা নেই ওর। কথা বলার চেষ্টা করলে মুখ দিয়ে ভয়ঙ্কর গর্জন বেরিয়ে আসবে। তাতে ভয় পেতে পারে সানজানা। সুতরাং মুখ বুজে ওকে অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নিল মুসা। মেয়েটা নিশ্চয়ই ওর কোনও ক্ষতি করবে না।
হাঁটছে তো হাঁটছেই ওরা।
আরও কিছুক্ষণ হাঁটার পর একটা জঙ্গলের মধ্যে চলে এল ওরা। জঙ্গল ভেদ করে এগিয়ে চলল। যত এগোচ্ছে, তত গম্ভীর হচ্ছে অরণ্য।
সানজানার প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল মুসার অন্তর। যা বোঝার বুঝে নিয়েছে সে। মেয়েটা ওকে লোকচক্ষুর আড়ালে গভীর বনের মধ্যে লুকিয়ে রাখতে চাইছে

হয়তো।
সরু, জংলা পথ ধরে এগিয়ে চলেছে দুজন। সামনে সানজানা, পিছনে মুসা। একটু পরপর মেয়েটা পিছন ফিরে তাকাচ্ছে। মুসা ওকে অনুসরণ করছে কি না দেখে নিচ্ছে।
অবশেষে ছোট, পাকা একটা পুরানো বাড়ির সামনে শেষ হলো ওদের দীর্ঘ পথচলা। গাছপালা বাড়িটাকে ঢেকে রেখেছে প্রায়। দূর থেকে কিছুই বোঝার উপায় নেই।
লুকানোর চমৎকার জায়গা এটা, ভাবতে গিয়ে খুশি হয়ে উঠল মুসা। কিন্তু সানজানা এটার খবর কীভাবে জানল ভেবে অবাকও হচ্ছে যথেষ্ট। হয়তো এই গ্রামে ওদের আসা-যাওয়া আছে। হয়তো কোন আত্মীয় থাকেন।
সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে এই বাড়িতে দিব্যি মাসের পর মাস কাটিয়ে দেয়া যাবে। কিন্তু খাবার? খাবার কোথায় পাবে মুসা?
খাওয়ার কথা মনে হতেই পেটের ভিতরে নতুন করে মোচড় দিয়ে উঠল। তবে ব্যাপারটাকে পাত্তা দিল না মুসা।
এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলল সানজানা। মুসাকে নিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল।
তখনই ওদের সামনে এসে দাঁড়াল দুটো ছায়া।
প্রথমে ছায়াই মনে করেছিল মুসা।
পরমুহূর্তে ভুল ভাঙল।
ছায়া কোথায়, মানুষ!
কালো পোশাক পরা!
ওদের দেখে ভূত দেখার মত চমকে উঠল মুসা।
এ কী করে হয়?
কালো পোশাক পরা সেই দুই ছেলের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে মুসা।
ওদের মধ্যে একজন কথা বলে উঠল। তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, সানজানা। ব্যাটাকে আমাদের কাছে ধরে আনার জন্যে ধন্যবাদ। দারুণ তোমার কর্তব্যজ্ঞান। ধন্যবাদ।
হা-আ-আ-আ-আ-উ-উ-উ-উ-ম-ম-ম-ম!
দুহাত শূন্যে ছুঁড়ল মুসা পাগলের মত। হিংস্র হয়ে উঠেছে।
সানজানা বিশ্বাসঘাতিনী! বিশ্বাসঘাতকতা করেছে!
পালাতে হবে–ভাবল বিশাল দানবীয় মস্তিষ্কের মধ্যে আটকে পড়া মুসার কচি মন। বাঁচতে চাইলে পালাতে হবে এই নরক থেকে। নইলে…
আর ভাবার সময় নেই।
দরজার দিকে এগোতে গিয়েছিল মুসা। কিন্তু পারল না।

শক্ত একটা জালের মধ্যে ওকে বন্দি করে ফেলল ওরা।
প্রচণ্ড শক্তিতে চার হাত-পা ছুঁড়তে লাগল মুসা। জাল ছেঁড়ার আপ্রাণ চেষ্টা চালাল। হলো না। উল্টে আরও পেঁচিয়ে গেল জাল। বেরোবার পথ নেই।
শক্ত নেটের মধ্যে বন্দি হলো মুসা!
দেহের সমস্ত শক্তি এক করে বুক চাপড়াতে লাগল চাপা ক্ষোভে। বন জঙ্গল কাঁপিয়ে হুঙ্কার ছাড়তে লাগল একের পর এক। কিন্তু লাভ হলো না, এরই মধ্যে শক্ত করে নেটের মধ্যে বেঁধে ফেলা হয়েছে ওকে।
আমাকে ছেড়ে দাও! বলার চেষ্টা করল ও। তীক্ষ্ণ নখর, দাঁত দিয়ে নেট ছেঁড়ার প্রাণান্তকর চেষ্টা চালাল আবারও। জালটা অদ্ভুত কোনও জিনিসের তৈরি। ভীষণ মজবুত। ছেঁড়া গেল না কিছুতেই।
তারপরও অনেকক্ষণ পা ছুঁড়ল মুসা। কাজের কাজ কিছু হলো না। মাঝখান থেকে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। মেঝের উপর শুয়ে পড়ল।
এক দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে আছে সানজানা এবং কালো পোশাক পরা ছেলেদুটো। চেহারায় স্বস্তি, বিজয়ের আনন্দ।
জানে কাজটা হবে না, তারপরও কেন যেন মুসার মনে হলো ওর পক্ষে কথা বলা সম্ভব। তা-ই মুখ খুলল।
কীভাবে আমাকে এমন বিপদে ফেলতে পারলে তুমি? সানজানাকে বলার চেষ্টা করল। তোমাকে আমি বন্ধু ভেবেছিলাম।
তর্জন-গর্জন ছাড়া কিছুই বেরোল না গলা দিয়ে। মেয়েটা মুখ নীচু করে চেয়ে আছে ওর দিকে। মুসার বক্তব্য বুঝতে পারছে না।
বুকের উপর হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে দুই ছেলে। কেমন জব্দ! জ্বলন্ত দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে আছে খাটো ছেলেটা। কথাটা সে-ই বলল।
তোমরা কারা? বলতে চাইল মুসা। কী চাও তোমরা? এসব কী ঘটছে?
জবাব দিল না কেউ।
লম্বা ছেলেটা বলল, অল রাইট। পেছনের রুমে ওকে বন্দি করে রাখি, চলো।
দুর্বল গলায় আবার গর্জন ছাড়ল মুসা। পাত্তা না দিয়ে এগিয়ে এল ওরা তিনজন। কাজে হাত লাগাল। জালের তিন প্রান্ত ধরে ছ্যাচড়াতে হ্যাঁচড়াতে মুসাকে নিয়ে চলল আরেক ঘরে।
ছোট্ট, অন্ধকার একটা ঘরে নিয়ে এল ওরা মুসাকে। তারপর বাইরে থেকে দরজায় তালা লাগিয়ে দিয়ে চলে গেল।
অসহ্য নীরবতা চেপে বসেছে পরিবেশে। কোথাও কোনও সাড়াশব্দ নেই। পাখিরাও ডাকতে ভুলে গেছে।

ঘরের চারদিকে নজর বোলাল মুসা। আবছা আঁধারে দেখা গেল রুমে ও ছাড়া আর কেউ নেই, কিছু নেই। লোহার গরাদওয়ালা একটা জানালা আছে শুধু অনেক উঁচুতে, সিলিঙের কাছাকাছি। জেলখানার মত।
গরাদগুলো দেখে পেটের খিদেটা চাগিয়ে উঠল। জালের মধ্যে বন্দি না থাকলে এখনই ওগুলো দিয়ে ভোজ সারা যেত। কিন্তু কপাল মন্দ। নেট এত শক্ত হয়ে শরীরে এঁটে আছে যে একচুল নড়তে পারল না মুসা।
বাধ্য হয়ে চুপ করে শুয়ে থাকল ও অসহায়ের মত। কিছু একটা ঘটবার অপেক্ষায় আছে। কিন্তু কিছুক্ষণ পেরিয়ে যাবার পরও ওরা ফিরে এল না। হয়তো পাশের ঘরেই আছে ওরা, ধারণা করল মুসা। কিন্তু কী করছে বোঝার উপায় নেই।
জানালা দিয়ে দেখা গেল দিনের আলো ম্লান হয়ে আসছে।
সন্ধে নামছে।
মুসা বুঝতে পারছে ঘুমানো ছাড়া এখন কিছু করার নেই ওর। ঘুম থেকে জাগার পর আবার যেন নিজেকে মানুষ হিসেবে ফিরে পায়, এই আশা নিয়ে। এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল ও।
ঘুম ভাঙতেই মুসা টের পেল ব্যথায় জান বেরিয়ে যাবার দশা ওর।
ইয়াল্লা! ভাবল ও। কাল কী খেয়েছিলাম আমি? মনে হচ্ছে ওর পাকস্থলীতে লোহা-লক্কড় নাচানাচি শুরু করেছে।
এমন সময় সব মনে পড়ে গেল।
গাড়ি!
গাড়ি খেয়েছিল ও কাল। ওর পাকস্থলী এখন সত্যিই লোহার টুকরোয় ভর্তি!
ওয়াক! বহু কষ্টে ভিতর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসা বমির বেগ ঠেকাল মুসা। উঠে বসল। নিজের হাত-পা দেখল।
হ্যাঁ, আবার নিজেকে ফিরে পেয়েছে মুসা, মানুষ হয়ে গেছে।
স্বস্তির শ্বাস ফেলল শব্দ করে।
শক্ত জালটা একপাশে পড়ে আছে। কাটা। কী করে ঘটল ব্যাপারটা?
মুসা ঘুমিয়ে থাকতে কেউ এসে কেটে দিয়েছে। কে সে?
কিন্তু আমি এখন কে? ভাবল ও।
সরু সরু হাত-পা, পায়ের পাতা পায়ের তুলনায় বড়ই মনে হচ্ছে। তবে দানবের পাতার মত অত বড় নয়। ও এখন আবার একটা কিশোরে পরিণত হয়েছে। তেরোর আশপাশেই হবে বয়স। একটু বেশিও হতে পারে–চোদ্দ বা পনেরো।
তাতে কিছুই যায়-আসে না। ও এখন আর দানব নেই, সেটাই আসল।
সেটাই একমাত্র স্বস্তির কথা।

কিন্তু এখনও গভীর বনের সেই রহস্যময় বাড়ির মধ্যে ও বন্দি, বুঝতে পারল মুসা। এখনও বন্দি।
অবশেষে সফল হয়েছে রহস্যময় ছেলেদুটো। ওকে ধরতে পেরেছে। তবে সানজানার সাহায্য ছাড়া কাজটা সম্ভব হত কি না সন্দেহ। মেয়েটাকে বন্ধু ভেবেছিল মুসা, সে-ই কিনা…
মুসার কাছে কী চায় ওরা? ওকে নিয়ে কী করতে চলেছে?
উঠে দাঁড়াল ও। হাই তুলতে তুলতে আড়মোড়া ভাঙল। জানালার ওপাশে গাছের ডালে বসে একটা দাঁড়কাক ডাকছে কর্কশ কা-কা শব্দে।
দরজা খোলার চেষ্টা করল মুসা। ওপাশ থেকে বন্ধ। মুখ তুলে জানালার দিকে তাকাল। গরাদের সরু ফাঁকের মধ্য দিয়ে বেরোনো ওর পক্ষে সম্ভব নয়।
তার মানে পালানোর পথ নেই।
এমন সময় বাইরে থেকে তালা খোলার শব্দ উঠল।
ওরা আসছে!
ঘরের এক কোণে সরে দাঁড়াল মুসা। ভয় লাগছে। ঠোঁট চাটল কয়েকবার।
খুলে গেল দরজা। দুই সঙ্গীকে নিয়ে ভিতরে ঢুকল সানজানা নামের মেয়েটা।
মুসা? আবছা আঁধারে ওকে দেখতে না পেয়ে অনিশ্চিত গলায় ডাকল ও। কোথায়… এক কোণে ওকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে থেমে গেল সে।
আমাকে কেন এখানে ধরে এনেছ তোমরা? ম্লান স্বরে বলল মুসা।
ও আবার কথা বলতে পারছে বুঝতে পেরে এই পরিস্থিতিতেও খুশি হয়ে উঠল মুসা। আর যা-ই হোক, অন্তত বিশ্রী গর্জন তো বেরোচ্ছে না গলা দিয়ে।
আমাকে যেতে দাও!
ছেলেদুটো আপনমনে মাথা দোলাল। যেন ওর আবদার শুনে মজা পেয়েছে।
সে কী! কথা বলে উঠল খাটো জন। যেতে দেব বলে এতদূর ধরে আনা হয়েছে নাকি তোমাকে!
একযোগে এগিয়ে এল দুজন। হাত একবার মুঠো পাকাচ্ছে, একবার খুলছে।
আমাকে যেতে দাও, প্লিজ!
ঝট করে দরজা লাগিয়ে দিল সানজানা।
ইঞ্চি ইঞ্চি করে ওর দিকে এগোতে লাগল দুই মৃত্যুদূত!
মরিয়া হয়ে ঘরের চারদিকে নজর বোলাতে লাগল মুসা। পালানোর পথ নেই জেনেও পথ খুঁজছে।
দরজার দিকে ছুটতে গেল। কিন্তু হলো না। দরজা আর.ওর মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে লম্বু আর বাটকু।

আমরা তোমাকে মারব না, মুসা, শান্ত স্বরে বলল সানজানা। আমরা তোমাকে সাহায্য করতে চাই, সত্যি।
আরেক পা এগিয়ে এল ওই দুই তরুণ। সঙ্গে সঙ্গে দুপা পিছিয়ে মাঝখানের দূরত্ব বাড়াল মুসা। সানজানার কথা বিশ্বাস করতে পারছে না। অন্তত ছেলেদুটোর ভঙ্গি দেখে কোনওমতেই মেনে নেয়া সম্ভব নয় যে, ওরা ওকে সাহায্য করতে চায়।
ভয় পেয়ো না, মুসা, সানজানা বলল। তোমার সাথে আমাদের জরুরী কিছু কথা আছে।
হঠাৎ মুসার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল মেয়েটা। মুসাকে শান্ত করার আন্তরিক চেষ্টা করছে। মুসাও ব্যাপারটা বুঝতে পারল।
কিন্তু ছেলেদুটোর মধ্যে আন্তরিকতার ছিটেফোঁটাও নেই। আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে সানজানার দুপাশে দাঁড়িয়ে আছে ওরা।
এসব কী ঘটছে খুলে বলো, প্লিজ, নিজেকে শান্ত রাখার আপ্রাণ চেষ্টার ফকে বলল মুসা।
কেশে গলা পরিষ্কার করে নিল সানজানা। রিয়্যালিটি ওয়ার্প বা বাস্তব ঘূর্ণির মধ্যে আটকা পড়েছ তুমি, তাই তোমার এই অবস্থা।
ওর বলার ভঙ্গি দেখে অবাক হলো মুসা। এমনভাবে বলছে, যেন ব্যাপারটা সম্পর্কে অগাধ জ্ঞান রাখে মুসা।
ঠাট্টা করতে ছাড়ল না ও, হ্যাঁ, হ্যাঁ, রিয়্যালিটি ওয়ার্প, হাসির ভঙ্গি করল। আমি জানি এই কারণেই অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটছে।
ইয়ার্কি রাখো! ধমক লাগাল লম্বু। এটা কোনও ঠাট্টার বিষয় নয়। আমাদের অনেক ভুগিয়েছ তুমি।
শান্ত হও, ব্যাবলা, ডান হাত তুলল সানজানা। আমি বোঝাচ্ছি ওকে।
মুসার দিকে ঘুরল সে। নরম সুরে বলল, রিয়্যালিটি ওয়ার্ল্ড কী তা তুমি নিশ্চয়ই জানো না, তাই না?
হ্যাঁ, জবাব দিল ও। জানি না। তবে জিনিসটা যে ফালতু কিছু, তা বেশ বুঝতে পারছি।
প্রথম যে রাতে তুমি তোমাদের গেস্ট রুমে ঘুমালে, সে রাতে রিয়্যালিটির একটা গর্তে গিয়েছিলে তুমি।
কিছু বুঝতে না পেরে দুপাশে মাথা দোলাল মুসা।
রিয়্যালিটির গর্ত! আমাদের গেস্ট রুমে!
মাথা ঝাঁকাল সানজানা। এক বাস্তবে ঘুমাও তুমি, জেগে ওঠো আরেক বাস্তবে। অর্থাৎ ব্যাপারটা এরকম

এক হয়ে ঘুমাও, জেগে ওঠো অন্য কিছু হয়ে। এখনও ওই গর্তের মধ্যে আটকে আছ তুমি। এখন তুমি যতবার ঘুমাবে, ততবার বাস্তব আর অবাস্তবের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলতে থাকবে। বাস্তব হয়ে। যাবে অবাস্তব আর অবাস্তব হবে বাস্তব।
ব্যাপারটা থামিয়ে দাও, তা হলেই তো হয়ে যায়, বলল মুসা।
থামিয়ে দেব! চেঁচিয়ে উঠল বাটু।
আহ্, মিজু, থামো তো! বলল সানজানা।
কিন্তু... কিন্তু... তোমরা... কথা খুঁজে না পেয়ে থেমে গেল মুসা। মাথা ঘুরছে।
তুমি আইন ভঙ্গ করছ, মুসা, বলল সানজানা। যতবার তুমি বদলে যাচ্ছ, ততবারই রিয়্যালিটির আইন ভঙ্গ করছ।
আমি কী ইচ্ছে করে বদলাচ্ছি! প্রতিবাদ করল ও। আর তোমাদের রিয়্যালিটির আইন সম্পর্কে কিছুই জানি না আমি। কাজেই ভাঙার প্রশ্নই আসে না। কী জিনিস সেটা?
আমি জানি তুমি ইচ্ছে করে করছ না, গলা খাঁকারি দিল সানজানা। কিন্তু সেটা দেখার বিষয় নয়। আইন ভাঙা হচ্ছে, সেটাই আসল। তোমার একেক পরিবর্তনের সাথে সাথে তুমি অনেক মানুষের বাস্তব আর অবাস্তব বোধের মধ্যে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছ। কোনটা বাস্তব আর কোনটা অবাস্তব, সেটা তারা বুঝতে পারছে না তোমার কারণে।
তোমরা বুঝতে পারছ না কেন! উত্তেজনায় প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মুসা।
আমি চাই ব্যাপারটা বন্ধ হোক! এজন্যে যা করার দরকার, করব। আমি আবার স্বাভাবিক জগতে ফিরে যেতে চাই।
চিন্তা কোরো না, দাঁত খিচাল ব্যাবলা। আমরা সব ঠিক করে দেব।
আমরা রিয়্যালিটি পুলিশ, বলল সানজানা। বাস্তবতাকে নিয়ন্ত্রণ করা আমাদের দায়িত্ব। তাই প্রথম থেকেই তোমার ওপর নজর ছিল আমাদের। রিয়্যালিটির গোড়ায় কুড়াল মেরে আইনের চোখে বিরাট বড় অপরাধ করেছ তুমি। তোমাকে ধরতেও আমাদের কম বেগ পেতে হয়নি।
কেন! কেন তোমরা আমাকে ধরেছ?
আমাদের চোখের সামনে বারবার তুমি আইন ভাঙবে, হাত মুঠো করে ঘুসি দেখাল মিজু। আর আমরা চেয়ে চেয়ে দেখব, কীভাবে ভাবতে পারলে তুমি?
চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ কী যেন ভাবল মুসা। তর্জনীর ডগা কপালে ঠুকল। কিন্তু আমাদের গেস্ট রুমে রিয়্যালিটির গর্ত এল কোত্থেকে?
প্রাকৃতিক নিয়মে, জবাব দিল সানজানা। আরও কিছুদিন হয়তো থাকবে ওটা। তারপর আবার প্রাকৃতিক নিয়মে সরে যাবে। ওই ঘরে সেই রাতে কারও থাকার কথা ছিল না। তুমি বেয়াড়া ছেলে, কারও কথা না মেনে ওই ঘরে গিয়ে ঘুমিয়েছ!

আচ্ছা, তা হলে ওই গেস্ট রুমই সব অনর্থের মূল, তা-ই না? ওই অপয়া ঘরে ঘুমিয়েছিলাম বলেই তোমাদের, আমার সবার এত দুর্ভোগ পোহাতে হলো?
হ্যাঁ।
আর কখনও ওই রুমে আমি ঘুমাব না! শপথ করার ভঙ্গিতে বলল মুসা। এখন যেমন আছি, তেমন বেঁচে থাকতে আমার কোন আপত্তি নেই। আগের জীবনে ফিরে না-ই বা গেলাম।
মাথা দোলাল সানজানা। কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেছে, মুসা। তুমি গর্তের এত গভীরে চলে গেছ যে সেখান থেকে আর ফিরে আসা সম্ভব নয়। এখন তুমি যেখানেই ঘুমাও, বদলে যাবে, রিয়্যালিটি আইন বারবার লঙ্ঘিত হবে।
তার মানে… তার মানে আমাকে তা হলে তোমরা আর কখনও ঘুমাতে দেবে না?
আসলে ঠিক তা নয়, বলে দুই সঙ্গীকে পালা করে দেখল সানজানা। তারপর গভীর চোখ মেলে তাকাল ওর দিকে।
আমি দুঃখিত, মুসা। সত্যি সত্যি খুব দুঃখিত। ছেলে হিসেবে তুমি চমৎকার। তোমাকে ভীষণ ভাল লেগেছিল আমার। কিন্তু এখন করার কিছু নেই। আইনের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারি না আমি।
মা-মানে… কী-কী বলতে চাও তুমি! সাদা কাগজের মত ফ্যাকাসে হয়ে উঠল মুসার চেহারা।
মুসার একটা হাত নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল সানজানা। সত্যি আমরা নিরুপায়। তোমাকে আমরা ঘুম পাড়িয়ে দেব। চিরতরে।
ঝাঁকির উপর ঝাঁকি খেল মুসা। এত মানসিক চাপ সহ্য করা কঠিন হয়ে পড়ল।
সা-সানজানা, এ-এ কী বলছ তুমি? তোতলাতে লাগল।
ও ঠিকই বলেছে, জোর দিয়ে বলল ব্যাবলা।
এ হতে পারে না! ফিসফিস করে বলল মুসা। পড়িমরি করে দরজার দিকে ছুটতে চাইল। কিন্তু মিজু আর ব্যাবলা তৈরি হয়েই ছিল। দুদিক থেকে ওর দুবাহু জাপটে ধরল ওরা।
পালাতে পারবে না, হাসল মিজু। শুধু শুধু চেষ্টা কোরো না।
ছেড়ে দাও আমাকে! চোখের কোণে পানি চিকচিক করে উঠল মুসার। মেরে ফেলো না, প্লিজ!
ওদের শক্ত থাবা থেকে ছোটার প্রাণপণ চেষ্টা করল ও। কিন্তু লাভ হলো না। জন্মের মত শক্ত হয়ে এঁটে বসেছে মুঠো। ছুটছে না। বলিষ্ঠ দুই যুবকের সঙ্গে ওর পেরে ওঠার কথা নয়। ভয়, উত্তেজনা আর ঘটনার আকস্মিকতায় মুসা এত দুর্বল হয়ে পড়েছে যে শক্তিতে এখন সানজানার সঙ্গেও পারবে বলে ভরসা হলো না।
দেয়ালের সঙ্গে ওকে ঠেসে ধরে থাকল দুই যুবক।

প্লিজ, সানজানা! আমার কথা শোনো, আবেদন ঝরল ওর কণ্ঠে। আগের পৃথিবীতে ফিরে যাওয়ার কোনোই উপায় নেই?
আছে, কাশল মেয়েটা। যে ঘরে তুমি সবসময় ঘুমাও, অর্থাৎ তোমার অপ্রিয় ওই ছোট্ট রুমটায় একবার ঘুমাতে পারলেই তুমি স্বাভাবিক জীবন...
এত সহজ উপায় থাকতে তোমরা আমাকে মেরে ফেলতে চাইছ কেন? ওকে বাধা দিয়ে বলে উঠল মুসা।
সহজ মনে হলেও আসলে সহজ নয়, কঠিন হাসি ফুটল সানজানার মুখে। তার প্রমাণ এর মধ্যেই তুমি বেশ কয়েকবার পেয়েছ। প্রতিবার তুমি প্রথমে তোমার ঘরেই ঘুমাতে গিয়েছিলে, কিন্তু পরিস্থিতি তোমাকে বাধ্য করেছে গেস্ট রুমে গিয়ে ঘুমাতে। সুতরাং ওই রুমে তুমি কখনও ঘুমাতে পারবে না। এবং স্বাভাবিক জীবনে আর ফিরেও যেতে পারবে না।
কিন্তু কিন্তু আর একবার চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কী?
সমস্যা তাতে আরও বাড়বে। বহু কষ্ট করে তোমাকে আটকানো গেছে। কাজেই এখন ছেড়ে দেয়ার ঝুঁকি নেয়া সম্ভব নয়।
আর কিছু বলার নেই ভেবে চুপ করে থাকল মুসা। মৃত্যুর প্রহর গোনা ছাড়া আর কিছু করার নেই।
আমরা ফিরে আসব, বলল সানজানা। হাসির ভঙ্গি করল। অযথা তুমি ভয় পাচ্ছ। কোনদিক দিয়ে কী ঘটে যাবে, কিছুই টের পাবে না তুমি, দেখো। কোনও ব্যথা লাগবে না।
দরজা বন্ধ করে চলে গেল ওরা। বাইরে থেকে তালা লাগানোর আওয়াজ শোনা গেল।
হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে ঘরের চারদিকে নজর বোলাল মুসা। পালানোর পথ খুঁজছে। চারদিকে দেয়াল। উপরে সিলিং। নীচে মেঝে। ছোট্ট একটা জানালা আছে, কিন্তু ওটার গরাদের ফাঁক দিয়ে বের হওয়া যাবে না। তা ছাড়া। জানালাটাও অনেক উপরে, নাগাল পাবে না ও।
আসলে এটা একটা জেলখানা, বুঝল ও। রিয়্যালিটি পুলিশের জেলখানা।
পাশের ঘর থেকে ওদের অস্পষ্ট কথাবার্তা কানে আসতেই দরজার কাছে। ছুটে গেল মুসা। কান পেতে শুনতে চেষ্টা করল।
ঘুমের ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিতে হবে ওকে, মিজুর গলা শোনা গেল। পুরো এক গ্লাস খাওয়াতে হবে নইলে ব্যাটা আবার জেগে উঠবে।
কিন্তু যদি বেঁকে বসে? সানজানাকে বলতে শোনা গেল। যদি খেতে না চায়, তখন?
নিশ্চয়ই খাবে! জোর দিয়ে বলল ব্যাবলা। ও খাবে না ওর ঘাড়ে। খাবে। এই দায়িত্বটা আমাকে দাও।

কাঁপতে কাঁপতে দরজার কাছ থেকে সরে এল মুসা। আর শুনতে চায় না। পাগলের মত পায়চারি শুরু করল।
ওরা ওকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে দেবে! তা হলে চিরতরে ঘুমিয়ে পড়বে ও! কোনওদিন আর ভাঙবে না সে ঘুম!
কালঘুম!
রিয়্যালিটির গর্তে পড়ার পর থেকে একের পর এক বিপদে পড়েই চলেছে ও। কিন্তু এই বিপদের কোনও তুলনা হয় না। এর চেয়ে ভয়ঙ্কর বিপদ আর কী হতে পারে?
মৃত্যুর ঘণ্টা বাজছে ওর!
অসহায়ভাবে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা ছাড়া আর কিছু করার নেই!
কিন্তু তারপরও মনের কোণে এক চিলতে আশার আলো দেখতে পেল ও। কেন, কীসের আলো, তা নিজেও জানে না।
ওর অবচেতন মন বলছে, এ যাত্রা তুমি বেঁচে যেতেও পারো, মুসা!
আচমকা একটা ব্যাপার মনে পড়ল। এর আগের একেক বিপদ থেকে কীভাবে উদ্ধার পেয়েছে ও?
মুসা ঘুমিয়েছে, ঘুম থেকে ওঠার পর আরও কঠিন বিপদে পড়েছে ঠিক, তবে আগেরটা কেটে গেছে।
ঘুম ভাঙার পর মহাবিপদে পড়েছে সত্যি, কিন্তু এখনকারটার চেয়ে বড় বিপদ আর কী হতে পারে?
ভাবতে গিয়ে ওর মনের আশার আলোটা একটু উজ্জ্বল হলো।
এখন যদি ও আবার ঘুমিয়ে পড়ে, তা হলে নতুন আরেক রিয়্যালিটিতে জেগে উঠবে। এবং বদলে যাবে। দানব যখন হয়েছে, তখন পাখি হওয়াও অসম্ভব নয়, কিংবা বেড়াল।
তার মানে…তার মানে… এই বন্দিদশা থেকে…
কিন্তু সমস্যা হলো এই মুহূর্তে কীভাবে ঘুমানো সম্ভব? মাথা চরকির মত চক্কর খাচ্ছে। একশো মাইল বেগে দুইশো রকমের চিন্তার টর্নেডো বয়ে চলেছে।
কিন্তু তবু চেষ্টা করতে হবে, ভাবল ও। চট করে শক্ত মেঝেতে শুয়ে পড়ল। হাতে সময় খুব কম। ওরা ফিরে আসার আগেই ঘুমিয়ে পড়তে হবে।
বিছানা নেই।
বালিশ নেই।
কম্বল নেই।
দিনের আবছা আলো আসছে জানালা দিয়ে।

তা ছাড়া মাথার উপরে মৃত্যু ঝুলছে জেনে ঘুম দেয়া বড় কঠিন কাজ কারও পক্ষেই সম্ভব নয়।
তবু তোমাকে পারতেই হবে, মুসা, নিজেকে মনে মনে শোনল ও। তোমার খালাতো-মামাতো ভাই-বোনরা তোমাকে সবসময় বলত, তুমি ঘুমে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন, টর্নেডোর মধ্যে খোলা মাঠে ঘুমাতেও অসুবিধে হবে না। তোমার। কাজেই তোমার পারা উচিত, মুসা, তোমাকে পারতেই হবে।
মা-বাবার কথা মনে পড়ল। মনে হলো দীর্ঘ কয়েক যুগ ওঁদের দেখে না ও। ফারিহা, তানজিয়া আপু, শাওনি ভাই
ওদেরকেও দেখে না কত যুগ।
আবার ওদের সবাইকে ফিরে পেতে চায় মুসা। ফিরে পেতে চায় প্রিয়। বন্ধু কিশোর-রবিন-রেমন-জিনা-শ্যারনকে।
ভাবতে ভাবতে চোখ বুজল মুসা। ছোট বেলায় মা সুর করে ছড়া কেটে ঘুম পাড়াতেন। তার একটা ছিল:
ঘুম পাড়ানি মাসিপিসি
মোদের বাড়ি এসো
খাট নেই পালঙ্ক নেই
খোকার চোখে বোসা…
ছড়াটা মনে করার চেষ্টা করল মুসা। হ্যাঁ, মনে পড়েছে। নিজেই নিজেকে সেটা সুর করে শোনাতে লাগল ও।
তারপর… তারপর একসময় তলিয়ে গেল ঘুমের অতলে।
চোখ মেলে তাকাল মুসা। চোখ ডলল। আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম? নিজেকে প্রশ্ন করল।
হ্যাঁ, তা-ই তো!
এখন কোথায় ও?
উপরে তাকাল, সিলিঙ চোখে পড়ল।
চারদিকে তাকাল। দেয়াল।
একটা দরজা।
অনেক উপরে একটা জানালা-জেলখানার মত। লোহার গরাদ রয়েছে। ওটায়।
না! ফিসফিস করে বলল ও। আমি এখনও সেই বাড়িতেই?
হ্যাঁ, তা-ই। এখনও বনের মধ্যে সেই বাড়িতে বন্দি ও।
বন্দি।
ভেস্তে গেছে ওর পরিকল্পনা।
এখন কী করবে?

নাআআআআআ!
রাগে, হতাশায়, মত্যভয়ে মাথার চুল টেনে ছিঁড়তে ইচ্ছে হলো মুসার। কাজ হয়নি ওর পরিকল্পনায়। আর কোনও বুদ্ধি মাথায় আসছে না। মাথার মধ্যে মগজ বিস্ফোরিত হতে পারে যে-কোন মুহূর্তে। এখন কী করবে ও? জানে না। কিছু খেলছে না মাথায়। উদ্ধার পাওয়ার যে ক্ষীণ আশার আলো দেখা দিয়েছিল, তা বিলীন হয়ে গেছে। সব শেষ হয়ে গেছে। বাঁচার আর কোনও উপায় নেই!
পাশের ঘর থেকে ওদের গলা ভেসে আসছে। নিশ্চয়ই ওকে ঘুমের ওষুধ খাওয়ানোর প্রস্তুতি চলছে। নাকি প্রস্তুতি শেষ? এখনই আসবে ওরা?
একটু পরেই ওকে চিরতরে ঘুম পাড়িয়ে দেয়া হবে? বাবা-মা-ভাই বোনের সঙ্গে, বন্ধু-বান্ধবীদের সঙ্গে আর কোনওদিন দেখা হবে না!
রিয়্যালিটি পুলিশ এত নির্দয় কেন? কেন এত কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ওরা? কাজটা কি ঠিক হলো?
কোনও অন্যায় তো করিনি আমি, ভারত মুসা। অন্তত নিজের ইচ্ছেয় নয়। যা করেছে, না জেনে, ভুলে করে বসেছে। ওরা কি এটাকে ক্ষমা করে দিতে পারত না?
যত ভাবছে, তত রাগ বাড়ছে ওর। সহ্য করতে না পেরে আবার চেঁচিয়ে উঠল, নাআআআআআ!
কিন্তু, এবার কণ্ঠস্বর কেমন যেন অন্যরকম শোনাল।
নাআআ!
না বলছে মুসা। কিন্তু শুনতে পেয়েছে অন্যকিছু।
নিশ্চিত হতে আবারও বলল, না!
আওয়াজ হলো, ইইই!
গলাটা ওরই। কিন্তু আওয়াজটা মানুষের গলার মত শোনাল না।
শোনাল অন্য কিছুর মত।
সে আবার কী! তাজ্জব হয়ে ভাবল মুসা।
মুখ নিচু করে নিজের দিকে নজর দিল মুসা।
এতক্ষণ মনে ছিল না। উত্তেজনায় এতই বেহাল দশা, ঘুম থেকে জাগার পর ওর যে বদলে যাবার কথা, তা বেমালুম ভুলেই গিয়েছিল।
হ্যাঁ, বদলে গেছে মুসা।
ইয়াল্লা! একী!
এতটুকুন হয়ে গেছে ও। এখন খুব বেশি হলে আট ইঞ্চি হবে ও লম্বায়।
ছোট, সরু দুই থাবায় পরিণত হয়েছে হাতদুটো। গায়ে ধূসর পশম। পিছনে লম্বা, মোটা লেজও আছে।

কাঠবিড়ালী! আঁতকে উঠল মুসা।
ও এখন একটা কাঠবিড়ালী!
চট করে জানালাটার দিকে নজর গেল ওর। এখন গরাদের সরু ফাঁক দিয়ে ওর পক্ষে বের হওয়া কোনও সমস্যাই নয়। একেবারে জলবৎ তরলং।
আর একমূহুর্ত সময়ও নষ্ট করল না মুসা। চোখের পলকে দেয়াল বেয়ে অনায়াসে উঠে পড়ল। বেরিয়ে এল ফাঁক গলে।
মুক্তির আনন্দে ধেই-ধেই করে খানিক নেচে নিল।
ইয়াহহু!
তারপর যত দ্রুত সম্ভব বন-বাদাড় ভেঙে বাড়ির খোঁজে ছুটল। কিছুক্ষণ পর শহরে ফেরার রাস্তা পেয়ে গেল ও, ওটা ধরে ছুটতে শুরু করল তুফান বেগে।
শহরে পৌঁছে দেখা গেল সব আগের মতই স্বাভাবিক। দানবকে নিয়ে যে তুলকালাম কাণ্ড ঘটেছিল, তার চিহ্নই নেই।
আসলে আগের রিয়্যালিটিতে নেই ও, বুঝতে পারল মুসা। আরেক বাস্তবে আছে এখন। ও এখন কাঠবিড়ালী।
বাতাসে নাক টানল মুসা। নানান রকমের সুগন্ধে ম ম করছে চারপাশ। নিজের ঘ্রাণশক্তির প্রশংসা না করে পারল না। এখন গন্ধ শুঁকে শুঁকে সহজেই নিজের বাসা খুঁজে বের করতে পারবে।
লাফাতে লাফাতে ছুটল মুসা। কিন্তু রাস্তা পেরোতে গিয়ে ঝামেলা ঘটিয়ে বসল। উত্তেজনার চোটে মার সতর্কবাণীর কথা ভুলেই বসেছিল।
উনি সবসময় বলতেন দুদিকে ভাল করে দেখে নিয়ে তবে রাস্তা পার হবে।
ওর অসতর্কতার সুযোগে বাঁ দিক থেকে ছুটে এল যন্ত্র-দানব একটা ট্রাক ড্রাইভার ওকে দেখতেই পায়নি। মানুষই চোখে পড়ে না ওদের, ও তো ছোট্ট একটা কাঠবিড়ালী!
ভাবার সময় পেল না মুসা। আচমকা চোখের সামনে পাহাড় সমান উঁচু চাকা দেখে আঁতকে ওঠারও সময় পেল না। কেবল প্রাণের সহজাত তাগিদে সরে যাওয়ার দুর্বল চেষ্টা করল একবার।
কিন্তু দেরি হয়ে গেছে।
সভয়ে চোখ বুজল মুসা।
ভাবল, এভাবেই মরণ লেখা ছিল কপালে?
গাড়ির চাকার নীচে ভর্তা হয়ে মরব?
রাস্তার সঙ্গে চাকার তীব্র ঘর্ষণের আওয়াজ উঠল।
দাতমুখ খিঁচিয়ে কড়া ব্রেক কষেছে ড্রাইভার। প্রায় জায়গায় দাঁড় করিয়েছে গাড়ি। তারপর আচমকা নীরব হয়ে গেল চারদিক।

ধীরে ধীরে, ভয়ে ভয়ে চোখ খুলল মুসা। একটা চাকা ওর ছোট্ট মাথাটার মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে থেমেছে। খুব সামান্যর জন্য এ যাত্রা প্রাণটা রক্ষা পেয়েছে ওর।
গাড়িটার নীচ থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল মুসা, রাস্তা পেরোল। আবার চলতে শুরু করল ট্রাক।
রাস্তার কিনারা দিয়ে বাড়ির পথ ধরল মুসা। একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করতে করতে তেড়ে এল ওর দিকে। উপায় নেই দেখে চট করে পাশের একটা গাছে উঠে পড়ল ও। নইলে বাঁচতে পারত না ওটার হাত থেকে
গাছটার নীচে সামনের দুপা তুলে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ দাঁত খিঁচাল কুকুরটা। গাছের গা আঁচড়াল তীক্ষ্ণ নখ দিয়ে। ভয় দেখাল মুসাকে।
কিন্তু ওর তরফ থেকে কোনওরকম উৎসাহ না পেয়ে এক সময় আগ্রহে ভাটা পড়ল ওটার। চলে গেল।
গাছ থেকে নেমে আবার চলতে শুরু করল মুসা।
গাড়ি, মোটরসাইকেল, সাইকেল, মানুষ, কুকুর, বেড়াল ইত্যাদির বাধা পেরিয়ে অবশেষে ওদের বাসার সামনে এসে দাঁড়াল।
চিরচেনা বাসা চোখে পড়তে মন আনন্দে নেচে উঠল। ওটা দেখে জীবনে কখনও এত খুশি হয়নি ও।
সানজানা বলেছে, ওর ছোট্ট ঘরে যেখানে ঘুমাত, সেখানে একবার ঘুমাতে পারলেই আবার স্বাভাবিক জীবন ফিরে পাবে ও। রিয়্যালিটির গর্ত থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে।
কীভাবে কাজটা সম্ভব, সেই চিন্তা মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে ওর। একটা কাঠবিড়ালীর পক্ষে কাজটা যে কঠিন, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।
সমস্যা আরও আছে।
বাসায় এখন ওর আসল বাবা-মা থাকেন কি না জানা নেই। ও এখন যে বাস্তবে আছে, সেখানে এই বাসার অধিবাসী কারা কে জানে!
মুসা মনেপ্রাণে আশা করছে ওর পরিবারকেই যেন পাওয়া যায় বাসায়। তা হলে কাজটা ওর জন্য হয়তো সহজ হবে কিছুটা।
নইলে…
ওর ঘরের জানালার গা ঘেঁষে বেড়ে ওঠা মস্ত ওক গাছটায় উঠে পড়ল মুসা। যে-ডালটা একেবারে জানালার কাছ দিয়ে গেছে, সাবধানে ওটার মাথায় চলে এল।
জানালার কাঁচের ভিতর দিয়ে নিজের ঘরে উঁকি দিল।
নিজের সেই অপছন্দের ঘরটাকে আজ এত ভাল লাগল, যা বলে বোঝানো সম্ভব নয় ওর।
ওই তো ওর বিছানা!

সেই চেয়ার!
সেই টেবিল!
সেই বইপত্র!
সব জায়গামতই আছে।
কিন্তু ভিতরে ঢোকার উপায় নেই। জানালা বন্ধ। ছোট্ট থাবা দিয়ে কাঁচের পাল্লা খোলার চেষ্টা করল মুসা। কাজ হলো না। খুলল না পাল্লা।
গাছের এ-ডাল ও-ডাল করে অন্য জানালাগুলোও পরখ করে দেখল মুসা। সবগুলো বন্ধ।
নাহ, জানালা দিয়ে ঢোকা সম্ভব নয়। দরজা দিয়ে ঢোকা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। কাজটায় ঝুঁকি আছে। কেউ দেখে ফেললে নিশ্চয়ই দূর! দূর! করে তাড়িয়ে দেবে ওকে। তবু চেষ্টা করতে হবে। তীরে এসে তরী ডুবলে আফসোসের সীমা থাকবে না।
বাসায় কেউ আছে? সামনের জানালার ওপাশে ড্রইং রুম। ভিতরটা ভাল করে দেখার চেষ্টা করল মুসা। পরক্ষণে আনন্দে মন নেচে উঠল।
ওই তো মা! ওর আসল মা! ফারিহা, তানজিয়া আপু, শাওনি ভাই!
সবাই আছে দেখছি! ফিরে এসেছে! আপনজনদের পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ল মুসা। উত্তেজিত হয়ে উঠল। এ ডাল থেকে ও ডাল করল কিছুক্ষণ।
এমন সময় হঠাৎ পুশির মিয়াও ডাক কানে আসতে জমে গেল।
ওহ, হ্যাঁ। ওই ব্যাটার কথা দিব্যি ভুলে বসেছিল মুসা। ওটাকে দেখে মনের খুশি খুশি ভাবটা মারাত্মক এক হোঁচট খেল।
ইঁদুর জাতীয় যে-কোনও প্রাণীকে তাড়া করা বেড়ালদের প্রিয় খেলা
জানা আছে মুসার। এরইমধ্যে জানালা দিয়ে ওকে দেখতে পেয়ে খেপে উঠেছে বাঘের মাসি। কী যন্ত্রণা!
ফারিহা হঠাৎ মুখ তুলে তাকাল। মুসার দিকে আঙুল তুলে কী যেন বলল মাকে।
হা! ভাবল মুসা। ফারিহা, এসো। এসে আমাকে নিয়ে যাও। জানালা খোলো, প্লিজ! আমাকে ভেতরে নিয়ে যাও। আমি কাঠবিড়ালী নই, তোমার ভাই, মুসা।
উঠে এসে জানালাটা খুলল ফারিহা। ওমা! ওকে বলতে শোনা গেল। কী সুন্দর কাঠবিড়ালী! জলদি দেখে যাও।
ইতস্তত করতে লাগল মুসা। একলাফে ভিতরে ঢুকে পড়তে ইচ্ছে করছে। কিন্তু পুশির কথা মনে হতে দমে গেল।
সাহস হচ্ছে না।
অ্যাই শাওনি ভাই! ফারিহা ডেকে উঠল। পুশিকে সরাও তো! দেখছ না, ওকে ভয় পাচ্ছে কাঠবিড়ালীটা?

সামান্য একটা কাঠবিড়ালীর উপর তোর কত টান, ফারিহা! মনে মনে ভাবল মুসা। নাহ, ওসব সেন্টিমেন্টকে এখন পাত্তা দেয়া ঠিক হবে না। চিন্তাটাকে মাথা থেকে দূর করে দিল ও।
দেখল, শাওনি ভাই পুশিকে কোলে নিয়ে ড্রইং রুম থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। ফারিহার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে তানজিয়া।
অ্যাই, কাঠবিড়ালী! আহ্লাদী ভঙ্গিতে ডাকল তানজিয়া।
আয়, আর কোনও ভয় নেই।
লাফিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল মুসা।
দেখলে, ফুপু! খুশিতে চিচিক্ করে উঠল তানজিয়ার দুচোখ।
ডাকতেই কী সুন্দর ভেতরে চলে এল! আমাকে পছন্দ হয়েছে মনে হয়। ভাবছি এটাকে পুষব, আমি।
উঁহু! বাধা দিলেন মা। সেটি হবে না। কাঠবিড়ালী রোগজীবাণু ছড়ায়।
শুনেও শুনল না মুসা। কথাটা এক কান দিয়ে শুনে আরেক কান দিয়ে বের করে দেয়া বুদ্ধিমানের কাজ মনে করে তা-ই করল ও। কথাটা যে কোনও ছেলের জন্য অপমানজনক, কিন্তু মা তো জেনেশুনে বলেননি। কাজেই ভুলে যাওয়াই উচিত।
ভিতরে ছুটল মুসা। মাথায় একটাই চিন্তা–নিজের ঘরে গিয়ে লুকিয়ে থাকা। এবং ঘুমিয়ে পড়া। তা হলেই..
আরে আরে! ধরো ধরো! চেঁচিয়ে উঠলেন মা। ঢুকে পড়ল তো ভেতরে!
ওকে ধরতে ছুটে এল তানজিয়া ও ফারিহা।
পিছন থেকে মার চেঁচামেচি শুনতে পেল মুসা। তানজিয়া, ফারিহা, শীগগির তাড়িয়ে দাও ওটাকে।
কিন্তু কী করে তাড়াব!
আগে ওটাকে ধরতে হবে তো।
সামনে কিচেন পেয়ে সুড়ৎ করে ঢুকে পড়ল মুসা। তানজিয়া ও ফারিহা পিছন পিছন এসে আস্তে করে দরজা বন্ধ করে দিল। আটকা পড়ে গেল মুসা। ফাঁদে পড়ে গেছে।
আয়, ডাকল তানজিয়া। ভয় নেই, আমার কাছে আয়।
পাগলের মত লেজ দোলাতে লাগল মুসা। পালানোর পথ খুঁজছে। ওর মিষ্টি কথায় মন ভুলছে না।
ইঞ্চি ইঞ্চি করে ওর দিকে এগোতে থাকল তানজিয়া। ও যাতে ভয় না পায়, সেদিকে খেয়াল রাখছে।
চট করে টেবিলের নীচে ঢুকে পড়ল মুসা। ঝাঁপ দিয়েও ধরতে ব্যর্থ হলো তানজিয়া। শিকার হাতের তলা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

আরও কিছুক্ষণ ধরে ছুটোছুটি চলল দুই বোনের। এ-মাথা থেকে ও মাথা, চেয়ারের তলা থেকে টেবিলের তলা–এই চলল।
এক সময় মুসা ক্লান্ত হয়ে পড়ল।
পিছাতে পিছাতে দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেল।
বাঁয়ে তাকাল, ওদিকে সাইডবোর্ড।
ডানে, ফ্রিজ।
পিছনে দেয়াল।
সামনে তানজিয়া আর ফারিহা।
ধরা পড়ে গেল মুসা। সৎ করে ছুটে এল একটা হাত। মুঠো করে ধরল। ওর ঘাড়। আরেকটা হাত ছুটে এসে ওর পিঠ জাপটে ধরল।
ধরেছি! আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল তানজিয়া, যেন বিশ্ব জয় করেছে। ফুপু, ধরেছি ওটাকে!
দরজা খুলে শাওনি ঢুকল আগে, পিছনে মা। জলদি ওটাকে বাইরে ফেলে দিয়ে এসো, যাও! বললেন তিনি।
কেন, ফুপু! আবেদন ফুটল তানজিয়ার কণ্ঠে। কাঠবিড়ালীটা কী। সুন্দর!
রাগে মুসার ছোট্ট দেহ কেঁপে গেল। তানজিয়া ওকে পুষতে চাইছে! ওর পোষা জন্তু হয়ে কিছুতেই বাঁচতে চায় না মুসা।
কিন্তু এ ছাড়া উপায় কী? নইলে তো নিজের ঘরে ঢোকার সুযোগ পাবে না। ঘুমানো তো অনেক পরের কথা।
না! কড়া গলায় বললেন মা। ওসব কিছুতেই ঘরে রাখা যাবে না। ফেলে দিয়ে এসো, যাও!
আচ্ছা, হতাশা ফুটল তানজিয়ার কণ্ঠে। যাচ্ছি।
কিচেন থেকে বেরিয়ে এগোনোর ফাঁকে বিড়বিড় করে বলল ফারিহা, খালার আদেশ।
একটা কাঠবিড়ালী পুষলে কী এমন পৃথিবী উল্টে যেত? বলল তানজিয়া, কেউ কী পোষে না?
পোষে, হতাশ হয়ে ভাবল মুসা। অনেকেই পোষে।
সামনের দরজা খুলল তানজিয়া। ওর গায়ে আদরের পরশ বুলিয়ে বলল, বিদায়, বন্ধু। তোকে পোষার খুব ইচ্ছে ছিল আমার। কিন্তু ফুপুর জন্যে পারলাম না। কিছু মনে করিস না।
বলল বটে, কিন্তু ছাড়ল না মুসাকে। কী মনে করে দরজা বন্ধ করে দিল আবার। শক্ত করে ধরে আছে মুসাকে।
পা টিপে টিপে নিজের রুমে চলে এল তানজিয়া। পিছনে ফারিহাও।

ঘাবড়াস না, ছোট্ট বন্ধু, ফিসফিস করে বলল। আপাতত রেখে দিচ্ছি। তোকে। কিন্তু বেশিক্ষণ রাখা সম্ভব হবে না বোধহয়।
বিছানার তলা থেকে একটা খাঁচা বের করল ও। দরজা খুলে ওকে ভিতরে ঠেলে দিল।
না! প্রতিবাদ করার চেষ্টা করল মুসা। আমাকে খাঁচায় পুরো না, প্লিজ! ছেড়ে দাও!
কিন্তু কাঠবিড়ালীর গলায় তো আর কথা ফোটে না! তাই কিছুই বুঝল না তানজিয়া-ফারিহা। আবার বন্দি হলো মুসা।
ফাটা কপাল আর কাকে বলে!
এখন কী হবে? ভয়ে দিশেহারা হয়ে ভাবল মুসা। খাঁচায় বন্দি ও। কথা বলার ক্ষমতাও নেই। তার মানে…
আরেকটা ভীতিকর চিন্তা পাগল করে তুলল ওকে। এই পিচ্চি খাঁচার মধ্যে যদি ও ঘুমিয়ে পড়ে?
কী ঘটবে?
পরেরবার কী হয়ে জাগবে ও?
সানজানা মিথ্যে বলেনি
ওর ঘরে গিয়ে ঘুমানোর আশা এই জনমে বোধহয় পূরণ হবে না!
চোখের সামনে বোনের বিরাট মুখটা দেখতে পেল মুসা। খিদে পেয়েছে? বলল তানজিয়া। দাঁড়া, খাবার নিয়ে আসছি।
তানজিয়া আর ফারিহা চলে গেল।
দুজন ফিরল কিছুক্ষণ পর।
এই যে, নিয়ে এসেছি, বলল তানজিয়া।
ছোট একটা বাটিতে করে কিছু ছোলা নিয়ে এসেছে ওরা। দরজা খুলে। বাটিটা ভিতরে ঠেলে দিল।
ছোলা মোটেই পছন্দ নয় মুসার। কিন্তু খিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে। তা-ই বাধ্য হয়ে খেতে হলো।
এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল। এক মুহূর্ত পর শাওনি ভাইয়ের গলা শোনা গেল, তানজিয়া, তোমার টেলিফোন।
ফারিহা, এসো তো একটু, ডাক দিলেন মা।
আসছি, উঠে দাঁড়াল তানজিয়া ও ফারিহা। দৌড়ে বেরিয়ে গেল ওরা।
হতাশ ভঙ্গিতে বসে কুটকুট করে ছোলা খাচ্ছিল মুসা। তানজিয়া যে খাঁচার দরজা বন্ধ না করেই চলে গেছে, বুঝতে বেশ সময় লাগল।
ইয়াহ্ হু! ব্যাপারটা চোখে পড়া মাত্র কাঠবিড়ালীর ভাষায় চেঁচিয়ে উঠল মুসা। বোনের বোকামির প্রমাণ পেয়ে আনন্দ আর ধরে না।

সামনের থাবা দিয়ে ধাক্কা মেরে দরজা খুলে ফেলল ও। খাঁচা থেকে বেরিয়ে সতর্ক পায়ে দরজার দিকে এগোল। কান খাড়া।
উঁকি দিয়ে দেখল করিডর খালি। কারও পায়ের শব্দ পাওয়া গেল না। এই তো সুযোগ!
দ্রুত ওর ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল।
দরজা বন্ধ। কাঠবিড়ালীর ছোট্ট থাবা দিয়ে মরিয়া হয়ে ওটা ঠেলল কিছুক্ষণ, লাভ হলো না। খুলল না দরজা।
আর কী করার আছে ওর?
কপাল খারাপ।
পায়ের শব্দ কানে আসতে সচকিত হলো মুসা। তানজিয়া ফিরে আসছে।
মুসা জানে তানজিয়া ওকে দেখে ফেলার আগেই পালাতে হবে এখান থেকে। নইলে আবার খাঁচায় বন্দি হতে হবে।
এক ছুটে ড্রইং রুমে চলে এল ও। জানালা, কি খোলা? হ্যাঁ, ভোলাই
দৌড়ে সোফার পিছনে, চেয়ারের তলায় চলে এল মুসা। দেয়াল বেয়ে উঠে জানালা দিয়ে বেরিয়ে এল সুড়ৎ করে। লাফিয়ে পড়ল উঠনে। পরক্ষণে পাশের একটা গাছে উঠে পড়ল দ্রুত। একটা ডালে বসে নিজেকে সুস্থির। হওয়ার সময় দিল।
নিজের ঘরে ঢুকতে পারেনি মুসা। ব্যর্থ হয়েছে। এখন ওর একটা কাজই কেবল করার আছে।
ঘুমাতে হবে। বলা যায় না, হয়তো আবার মানুষ হয়ে জেগে উঠতে পারে। সেটাই একমাত্র ওর ভরসা। সে ক্ষেত্রে বাঁচার একটা উপায় হবে হয়তো। নইলে....
যে করে হোক ওর ঘরে ঢুকতেই হবে। ঘুমাতে হবে। নইলে...
আর ভাবতে পারছে না।
রিয়্যালিটি পুলিশ ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এবং ওরা যে মুসাকে খুঁজে বের। করবেই, তাতে কোনও ভুল নেই। ওদের চোখ ফাঁকি দেয়া যায় না।
আর একবার ধরা পড়লে ওকে বাঁচাতে পারবে না কেউ।
পিঠে প্রচণ্ড ব্যথা পেয়ে জেগে উঠল মুসা। দেখল গাছের নীচে চিত হয়ে পড়ে আছে। ব্যাপার বুঝতে কয়েক সেকেণ্ড লাগল। চিন্তা করতে করতে গাছের উপর ঘুমিয়ে পড়েছিল। ভাগ্যিস নিচু ডালে বসেছিল। নইলে হাড়গোড় একটাও আস্ত থাকত না। পাউডার হয়ে যেত।
ঘুম তো ভাঙল, কিন্তু এখন ও কে? কী?
পরমুহূর্তে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল মুসা। আবার তেরো বছরের কিশোরে পরিণত হয়েছে ও। তবে নিজেকে ফিরে পায়নি, অর্থাৎ তেরো বছরের এক কিশোর ও হয়েছে

ঠিকই, কিন্তু মুসা হতে পারেনি।
নিজেকে দেখে হাসি পেল মুসার। কুমড়োপটাশ মার্কা স্থূল দেহ। এই জন্যই গাছের ডাল ওর ভার সইতে পারেনি। দেহের এখানে সেখানে চর্বি থলথল করছে।
কিন্তু এটা কোনও সমস্যা নয়। আবার ও মানুষ হতে পেরেছে, সেটাই। বড়। এখন ও কথা অন্তত বলতে পারবে।
এবং এখন নিজের ঘরে ঢোকার একটা সুযোগ পেয়েও যেতে পারে ও।
বুক চিতিয়ে সামনের দরজার দিকে এগোল মুসা। দরজা বন্ধ। কলিং বেলে চাপ দিল। একটু একটু করে উত্তেজিত হয়ে উঠছে।
কে দরজা খুলবে বুঝতে পারছে না মুসা। মনে মনে আশা করছে সেই মানুষটি ওর পরিবারের কেউ যেন হয়।
খুলে গেল দরজা।
মা! খুশিতে আত্মহারা হয়ে চেঁচিয়ে উঠল মুসা। মা! আমি ফিরে এসেছি! আমি মুসা!
চোখ কুঁচকে উঠল মার।
কে? কণ্ঠে সন্দেহ ফুটল। মুসা! মুসা কে? এই নামের কাউকে চিনি বলে তো মনে পড়ছে না।
সে কী, মা! আকাশ থেকে আছড়ে পড়ল ও। অবশ্যই চেনো! আমি তোমার ছেলে, মুসা!
অনিশ্চিত চোখে ওর দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি।
ফারিহা, তানজিয়া ও শাওনি এসে দাঁড়াল মার পিছনে। ছেলেটা কে, ফুপু? জিজ্ঞেস করল তানজিয়া।
ফারিহা! চেঁচিয়ে উঠল ও। শাওনি ভাই! আমি মুসা, আমি ফিরে এসেছি!
এ কে, শাওনি? জানতে চাইল তানজিয়া।
চিনি না তো! কপাল কুঁচকে দেখছে ওকে শাওনি।
হায় খোদা! ভাবল মুসা। এসব কী হচ্ছে! মুখ ঘুরিয়ে আর বসে থেকো না তুমি। আমার দিকে তাকাও। বিপদ থেকে উদ্ধারের এত কাছাকাছি এসেও কী…
আবেদন ফুটল ওর কণ্ঠে। প্লিজ, মা। আমাকে ভেতরে ঢুকতে দাও, আমাকে ঘুমাতে হবে। আমার ঘরে ঘুমাতে দাও। এ আমার জীবন-মরণ সমস্যা।
কিন্তু আমরা তো চিনতে পারছি না, তোমাকে, বললেন মা। মুসা নামের কাউকে চিনি না আমরা। মনে হয় ভুল বাসায় এসে পড়েছ তুমি।
পাগল না তো? শাওনি বলে উঠল।
অথবা ধান্দাবাজ, বলল তানজিয়া।
না, আমি ওসব কিছু নই,ব্যস্ত হয়ে বলতে চাইল ও। মা…

মুখের উপর ঠাস করে দরজা বন্ধ করে দিলেন মা।
হতাশায় অন্তর ছেয়ে গেল মুসার। ঘুরে রাস্তার দিকে তাকাল।
এখন? কী করবে ও?
সামনের দৃশ্য দেখে আত্মা উড়ে গেল মুসার।
তীর বেগে ওর দিকে ছুটে আসছে সেই তিনজন।
সানজানা, মিজু আর ব্যাবলা।
রিয়্যালিটি পুলিশ!
আবার ধরা পড়ে গেছে মুসা!
ওই তো! আঙুল তুলে চেঁচিয়ে বলল সানজানা। ওই তো! জলদি চলো! তিনজন সোজা দৌড়ে এল ওর দিকে।
ধরো, ধরো!
ঘুরেই দৌড় দিল মুসা। কিন্তু কাজটা যে এ মুহূর্তে ওর জন্য কত কঠিন, টের পেতে দেরি হলো না। মোটাদের জন্য দৌড়ানো সত্যিই কঠিন।
চট করে মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল মুসার। পাশের বাড়ি ঘুরে ছুটে চলে এল ওদের বাড়ির পিছন দিকে। এদিকটা ঝোপ জঙ্গলে ভর্তি। ছোট একটা ঝোপের আড়ালে ঘাপটি মেরে বসে পড়ল।
কয়েক মিনিট পর পায়ের শব্দ উঠল। হাঁপাচ্ছে ওরা তিনজনই।
কোথায় গেল? সানজানার গলা শোনা গেল।
ওদিকে গেছে মনে হয়, সামনে আঙুল তুলে দেখাল ব্যাবলা। জলদি চলো।
চলে গেল ওরা।
এতক্ষণ দম নেয়ার কথা মনে ছিল না মুসার, নড়াচড়া দূরে থাক্। অনেকক্ষণ ধরে আটকে রাখা দম ছাড়ল এবার আস্তে আস্তে।
এ যাত্রা বাঁচা গেছে। কিন্তু জানা আছে ওদের হাতে ধরা পড়তেই হবে। ওকে।
যে কাজ করলে এদের হাত থেকে বাঁচা যায়, তা কীভাবে করা সম্ভব ভেবে অস্থির হয়ে উঠল মুসা। মা পর্যন্ত ওকে চিনতে পারলেন না। এর চেয়ে আশ্চর্য আর কী হতে পারে? কিছুতেই ওকে বাসায় ঢুকতে দেবেন না মা। এবং ভিতরে যেতে না পারা পর্যন্ত ওর কোনও আশাও নেই।
এখন একটাই পথ খোলা আছে ওর সামনে, চুপি চুপি ঢোকা। রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে ওকে। সবার ঘুমিয়ে পড়ার অপেক্ষায় থাকতে হবে। তারপর চোরের মত…
অপেক্ষার পালা শুরু হলো। ঝোপের আড়ালে ঘাপটি মেরে বসে থাকল ও। বসে থাকতে থাকতে ব্যথা হয়ে গেল হাত-পা। বাধ্য হয়ে ওখানেই ঘাসের উপর শুয়ে

পড়ল। রিয়্যালিটি পুলিশের ভয়ে ঝোপের আড়াল থেকে বেরোতে পারছে না। ওদের চোখে পড়া চলবে না।
ক্লান্তিতে চোখ বুজে আসছে। জেগে থাকতে খুব কষ্ট হচ্ছে। তবু ঘুমানো চলবে না। নতুন আর কোনও সমস্যায় পড়তে রাজি নয় মুসা।
ধীরে ধীরে গড়িয়ে চলেছে সময়। অবশেষে এক যুগ পর রাত নামল। একটু একটু করে গম্ভীর হলো, নীরব হয়ে এল চারদিক।
সময় হয়েছে মনে হতে উঠে দাঁড়াল মুসা। আড়মোড়া ভেঙে জড়তা কাটাল।
বাসার দিকে তাকাল। মা-বাবা জেগে আছেন এখনও। বাতি জ্বলছে। ফারিহা, তানজিয়া আর শাওনি ভাই মনে হয় ঘুমিয়ে পড়েছে। ওদের ঘরে বাতি নেভানো।
মা-বাবার ঘরের বাতিও নিভে গেল একসময়। আঁধার হয়ে গেল পুরো বাড়ি। তবু আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল মুসা। সবাই গভীর ঘুমে তলিয়ে যাওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর ধীর পায়ে বাসার সামনের দিকে চলে এল। ওদের ড্রইং রুমের একটা জানালায় গরাদ নেই। ওটার সামনে এসে দাঁড়াল।
যা ভেবেছিল তা-ই।
বন্ধ।
আবার চলে এল পিছন দিকে। কিচেনের দরজা খুলে ফেলল কায়দা। করে, নিঃশব্দে ঢুকে পড়ল।
যাক্, হাঁপ ছেড়ে বাঁচল মুসা। সবুরে মেওয়া ফলেছে তা হলে। অবশেষে বাঁচার উপায় জুটল।
রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে সমস্ত দরজা-জানালা ঠিকমত লাগানো। আছে কি না পরখ করে দেখেন বাবা। আজও নিশ্চয়ই করেছেন। কিন্তু তাতে কী? এই দরজাটা যে বিশেষ কায়দায় খোলা যায়, তা তো উনি জানেন না।
একটু একটু করে মুসার নিভু নিভু আশার আলোটা উজ্জ্বল হচ্ছে আবার। এখন সামনে আর একটাই বাধা ওর ঘরের দরজা। ওটা খোলা থাকলে হয়।
বেড়াল-পায়ে এগোল ও করিডর ধরে। নিজের ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। হ্যাঁ, খোলা! জীবনে কখনও এত খুশি হয়েছে কি না মনে করতে পারল না মুসা। এবার ভিতরে ঢুকে একটা ঘুম দেবে ও, ব্যস, তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে। আবার আগের মুসা হয়ে যাবে ও।
খুশিতে ধেই-ধেই করে নাচতে ইচ্ছে করছে। চেঁচিয়ে ঘুমিয়ে পড়া শহরকে জাগাতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু সেসব কিছুই করল না ও। টুক করে ঢুকে পড়ল ঘরে। ওই তো ওর বিছানা। শূন্য! শুয়ে পড়লেই হলো।
এগিয়ে গিয়ে আস্তে আস্তে বিছানা ঝাড়ল ও। তারপর জুতো খুলে উঠে। পড়ল। নরম বিছানায় গা এলিয়ে দিল।

আবার নিজের বিছানায় ঘুমাতে যাচ্ছে মুসা, সেই আনন্দে দিশেহারা। গলা ছেড়ে গান গেয়ে উঠতে ইচ্ছে হচ্ছে।
এখন যদি কেউ দেখে ফেলে ওকে, কী ভাববে? চোর? নিশ্চয়ই তা-ই। মা-ই যখন চিনতে পারলেন না…
সমস্ত চিন্তা মাথা থেকে দূর করে সকালের কথা ভাবল মুসা। কী ঘটবে কাল? নিজেকে সত্যি কি ফিরে পাবে ও? সানজানার কথা সত্যি হলে তা-ই তো হওয়া উচিত।
ঘুমে দুচোখ জড়িয়ে এল মুসার। ভারী হয়ে উঠল শ্বাস-প্রশ্বাস।
মেয়েটা সত্যি বলেছে কি না আর কয়েক ঘণ্টা পরই প্রমাণ হয়ে যাবে।
একসময় ঘুমের অতলে তলিয়ে গেল মুসা।
নাকেমুখে গরম লেগে উঠতে ঘুম ভাঙল মুসার। সূর্যের আলো।
চোখ মেলে তাকাল। কোথায় আছে ও এখন? দ্রুত চারদিকে নজর বোলাল। ছোট্ট একটা ঘরের মধ্যে আছে ও। এই বাড়ির সবচেয়ে ছোট ঘর। ওরই ঘর!
হার্টবিট বেড়ে গেল মুসার। সানজানা কি সত্যি বলেছিল? স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পেরেছে ও?
দেরি সহ্য হলো না। তড়াক করে উঠে পড়ল মুসা। দরজার সাথে লাগানো ছোট্ট আয়নার সামনে এসে দাঁড়াল।
হ্যা!!!
ও আবারও মূসা হয়ে গেছে। নিজেকে ফিরে পেয়েছে ও!
ইয়াহ্হু! আনন্দে অস্থির হয়ে দুহাত শূন্যে ছুঁড়ল মুসা। এমন সময় দরজাটা একটু ফাঁক হলো। নাক ঢুকিয়ে দিল পুশি। ভিতরে ঢুকে ডাক ছাড়তে শুরু করল। অন্য সময় হলে বিরক্ত হতো মুসা, কিন্তু আজ হলো না।
বরং ওটাকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে লাগল। ছাড়া পাওয়ার জন্যে উল্টে পুশিই মরিয়া হয়ে লাফালাফি শুরু করে দিল। মুসাকে একদম পছন্দ করে না ওটা।
মুসা! কিচেন থেকে মা ডেকে উঠলেন।
ওর আসল মা!
মুসা! পুশিকে ব্যথা দিচ্ছ কেন? ছেড়ে দাও।
ব্যথা দিচ্ছি না; মা! জবাব দিল ও। আদর করছি।
পুশিকে ছেড়ে কিচেনের দিকে ছুটল ও। ডাইনিং টেবিলে সবাইকে দেখে খুশিতে ঝম করে উঠল ওর চেহারা। বাবা, মা, ফারিহা, তানজিয়া, শাওনি ভাই–সবাই আছে।

সবাইকে ফিরে পেয়ে খুশিতে দম আটকে এল ওর। ধেই-ধেই করে নাচার ইচ্ছেটা দমন করল বহু কষ্টে।
বোনের গলা জড়িয়ে ধরল আহ্লাদী ভঙ্গিতে। বলল, ফারিহা! আমার ছোট্ট ফারিহা!
অ্যাই! বিস্মিত কণ্ঠে বলল ফারিহা। ছাড়ো, ছাড়ো তো আমাকে!
বোনকে ছেড়ে ছুটে গেল ও শাওনির দিকে। একইভঙ্গিতে ওর গলা জড়িয়ে ধরে বলল, শাওনি ভাই, তুমি ভাল আছ তো?
কী হয়েছে তোমার, মুসা? কপাল কুঁচকে উঠল তানজিয়ার। আমি জানি কাল রাতে ভূতেরা তোমাকে কিডন্যাপ করেছিল। ওরা তোমার ব্রেন ওয়াশ করে দিয়েছে।
খেয়াল করল না মুসা। এগিয়ে এসে বোনের বেণী ধরে টান দিল।
উহ! চেঁচিয়ে উঠল তানজিয়া। ব্যথা পাচ্ছি তো!
এবার, মার দিকে এগোল মুসা। জড়িয়ে ধরে তার গালের সঙ্গে গাল ঘষতে লাগল।
দুষ্ট ছেলে কোথাকার! হেসে বললেন উনি। আদর করার ভঙ্গিতে চাপড় মারলেন পিঠে। বোসো, নাস্তা খেয়ে নাও।
বাবা বাদ থাকেন কেন?
বাবা, বলে হাত বাড়াল মুসা।
অবাক হলেও আপত্তি করলেন না তিনি। হ্যাণ্ডশেক সেরে বললেন, লক্ষ্মী ছেলের মত জলদি খেয়ে নাও। দেরি হয়ে যাচ্ছে আমাদের।
বসে পড়ল মুসা। খাওয়ায় মন দিল। সব আবার স্বাভাবিক হয়ে গেছে। ও যে হারিয়ে গিয়েছিল, কেউ খেয়াল করেনি।
আর কখনও ওই গেস্ট রুমে ঘুমাচ্ছি না আমি, মনে মনে শপথ করল ও। কক্ষনো না। নিজের ছোট্ট ঘর নিয়ে আর কোনও অভিযোগ নেই, ক্ষোভও নেই। সারাজীবন ওই ঘরে থাকতেও আর আপত্তি নেই।

.

স্কুল জীবনের সবচেয়ে সুন্দর একটা দিন কেটেছে আজ মসার। প্রতিটি ক্লাসে পড়া পেরেছে। কোন এক জাদুর কাঠির ছোঁয়ায় কঠিন বিষয়গুলোও সহজ মনে হয়েছে আজ। অন্তত কলেজের আনা কারেনিনার চেয়ে অনেক সহজ ছিল।
রবিন আর কিশোরকে সব খুলে বলেছে মুসা। রবিন বিশ্বাস করেনি। কিশোর বিশ্বাস করবে কি করবে না ভাবছে এখনও। যাদের নিজেদের অদ্ভুত
সব অভিজ্ঞতা আছে, সেই তিন গোয়েন্দা সদস্যরা কেন বিশ্বাস করবে না। ভেবে ওদের উপর খেপে আছে মুসা।

টিফিন পিরিয়ডে ফুটবল খেলতে নেমে মুসা দেখল, আজ দারুণ খেলছে ও। গোলও করতে পেরেছে একটা।
ছুটির পর ক্লাস থেকে বেরোতেই থমকে দাঁড়াল মুসা কিছু একটা চোখে পড়তে। একটা মেয়ে! এদিকেই আসছে। ওরই বয়সী হবে বোধ হয়। মাঝ পিঠ পর্যন্ত ঘন চুল বেণী করে বাঁধা। ধূসর চোখে ওর দিকে চেয়ে আছে মেয়েটা।
কে ও?
সানজানা!
জায়গায় জমে গেল মুসা। হাত-পা হিম হয়ে এল। ভাগবে না দাঁড়িয়ে থাকবে, বুঝে উঠতে পারছে না।
তার মানে রিয়্যালিটি পুলিশ এখনও আমার পেছনে লেগে আছে? ভাবল ও। নিজের চেষ্টায় স্বাভাবিক জগতে ফিরে এসেছে মুসা। ওকে চিরতরে ঘুম পাড়ানোর আর কোনও অধিকার নেই ওদের। তারপরও..
পালাতে হবে, ভাবল মুসা। ঝেড়ে দৌড় দেবে বলে রেডি হলো।
এরমধ্যে একেবারে কাছে চলে এসেছে মেয়েটা। হাসছে ওকে দেখে।
নাহ! সানজানা নয় ও। ওদের ক্লাসেরই মেয়ে, অন্য সেকশনে পড়ে অবশ্য। কী যেন নাম! মনে পড়ছে না।
যাক বাবা! তা-ও ভাল। হাঁপ ছাড়তে ছাড়তে ভাবল ও। বাঁচা গেল! ও যে-ই হোক, সানজানা যে নয়, তাতেই মুসা মহাখুশি।
কিশোর আর রবিন কখন পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে, খেয়াল করেনি মুসা।
কী হলো, মুসা! ওর কাঁধে হাত রাখল রবিন।
কিশোর ভারিক্কি.ঢঙে পকেট থেকে একটা গাম বের করে মুখে পুরল। অমন হাঁ করে ওই মেয়েটাকে গিলছিলে যে, ব্যাপারটা কী!
হেসে ফেলল মুসা। দুই বন্ধুর কাঁধে হাত রাখল। চলো, যে যার বাসায় যাই।

.

ড্রইং রুমে ঢুকে মাকে দেখতে পেয়ে অবাক হলো মুসা। টিভি দেখছেন একা একা। এসময় তার বাসায় থাকার কথা না। ব্যাপার কী?
মা, তুমি তো বলেছিলে বিকেলে বাজারে যাবে!
হাসলেন উনি। আজ যাব না। বাসায় বিশেষ একটা কাজ আছে।
বিশেষ কাজ!
জানতে ইচ্ছে করছে, তা-ই না? টিভির সুইচ অফ করলেন মা।
হ্যাঁ, তা…
ঘরের চারদিকে নজর বোলাল মুসা। সবকিছু স্বাভাবিকই আছে মনে হচ্ছে। ওদেরই ড্রইং রুম এটা।

বিশেষ কাজটা কী, মা?
আবার হাসলেন উনি। উত্তেজিত মনে হচ্ছে।
ভুলে গেলে? আর তিনদিন পর না তোমার জন্মদিন!
আসলেই ভুলে গিয়েছিল মুসা। এতবড় বিপদে পড়লে মানুষ বাবার নাম। পর্যন্ত ভুলে যায়, জন্মদিন তো কোন ছার।
তোমার জন্যে বিশেষ একটা সারপ্রাইজ আছে, মুসা, রহস্য ঝরল মার কণ্ঠে। এসো আমার সাথে।
মার পিছন পিছন ওর ঘরের বন্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়াল মুসা। কীসের সারপ্রাইজ? ভাবছে মনে মনে।
সারপ্রাইজটা কি আমার রুমে? জিজ্ঞেস করল ও।
জবাব দিলেন না মা। ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলে বললেন, দেখো।
ভিতরে উঁকি দিল মুসা। মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত অনেকগুলো কার্টন দেখে কোঁচকাল। ওদের স্টোর রুমে ছিল এগুলো।
দারুণ!
এগুলোর মধ্যে কী মা, আমার জন্যে গিফট? খুশি হয়ে উঠল ও।
গিফট? এত গিফট কেউ পায় নাকি?
ঠিক বলেছেন মা। তবু যা আশা করেছিল মুসা, সেটাই যদি হতো, দারুণ হতো! দেখে শেষ করা যেত না।
তা হলে… কীসের সারপ্রাইজ? অনিশ্চয়তা ফুটল মুসার চেহারায়।
মুসা, শুরু করলেন মা। বিষয়টা নিয়ে আমি অনেক ভেবে দেখেছি। আসলে তুমিই ঠিক। তোমার ঘরটা সত্যিই খুব ছোট। তা-ই এটাকে স্টোর। রুম বানানো হয়েছে।
কী বললে? বিস্ময়ের এতবড় এক ধাক্কা খেল মুসা, আরেকটু হলে মাথা ঘুরে পড়েই যেত।
হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছ তুমি।
ওকে সঙ্গে নিয়ে গেস্ট রুমের সামনে এসে দাঁড়ালেন মা। দরজা খুলে দিয়ে বললেন, কী, খুব খুশি লাগছে, না?
ইয়াল্লা! মনে মনে আঁতকে উঠল মুসা।
এ হতে পারে না! কিছুতেই না!
অসম্ভব!
মাথা ঝাঁকালেন মা হাসতে হাসতে।
তোমার নতুন ঘরে তোমাকে স্বাগতম, মুসা।
মা… মা… এর চেয়ে বেশি কিছু বলা সম্ভব হলো না মুসার পক্ষে।

ওর বিছানা, চেয়ার, টেবিল, বইপত্র সবকিছু সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে গেস্ট রুমে। হা করে তা-ই দেখছে ও। চেহারা আস্ত আহাম্মকের মত।
খুশি হওনি তুমি, মুসা? মার চেহারায় বিস্ময় ফুটল। এই ঘরে থাকবে বলে অন্তত নয়শো নিরানব্বইবার আমার কাছে বলেছ তুমি, বলোনি?
হ্যাঁ, তা… ইয়ে, মা… শেষ করতে পারল না মুসা। হাঁ হয়ে গেল মুখ। ভিতর থেকে চাপা এক দুর্বোধ্য গোঙানি বেরিয়ে এল।
***

তিন গোয়েন্দা ভলিউম ১১৪ – বুদ্ধির খেলা – শামসুদ্দীন নওয়াব – সেবা প্রকাশনী – প্রথম প্রকাশ : ২০০৫

সকাল। পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ড। ইয়ার্ডের মূল অফিসের ছাদে রঙিন টালি। ওখানে মেরি চাচীর কাঁচঘেরা চেম্বার, ছাপার মেশিনের ওপাশে জঞ্জালের স্তূপ উঁচু হয়ে থাকায় ওঅর্কশপ থেকে দেখা যায় না। তবে এখন ওয়র্কশপে নেই তিন গোয়েন্দা, আছে বাতিল মালের নাচে চাপা পড়া ওদের হেডকোয়ার্টার, মোবাইল হোমে।

আধ-পোড়া ডেস্কে বসে জটিল একটা জ্যামিতি নিয়ে মগ্ন কিশোর, মুসা ব্যস্ত মটর সাইকেলের একটা নষ্ট কারবুরেটর মেরামত করতে, আর রবিন ভ্রু কুঁচকে উচ্চারণ করে করে পড়ছে একটা বাংলা বই।

ক্রিং ক্রিং করে বেজে উঠল ফোন।

বইটা নামিয়ে রেখে সবাই যাতে ওর কথা শুনতে পায় সেজন্য স্পিকারের সুইচটা অন করে রিসিভার তুলল রবিন। বইয়ের এই এক সুবিধে, যখন ইচ্ছে রেখে দিয়ে কাজ সেরে আসা যায়। নাটক-সিনেমার মতো নয় যে, গেলাম তো কাহিনী এগিয়ে যাবে, ফিরে এসে আর তাল রাখা মুশকিল।

হ্যালো? তিন গোয়েন্দার হেডকোয়ার্টার এটা।

হ্যালো, কে? ওদিক থেকে প্রশ্ন করা হলো।

কোঁচকানো ভ্রূ আরও কঁচকে গেল রবিনের। বাড়ির কলিং বেল টিপে দৌড়ে পালিয়ে যাওয়া যদি শয়তানি হয়, তা হলে ফোন করে নিজের পরিচয় না দিয়ে কে ধরল সেটা জানতে চাওয়া বিশ্রী একটা অভদ্রতা।

আপনি কে তা বলুন।

আমি শ্যারন, অস্থির শোনাল গলাটা। কে, রবিন?

শ্যারন মেয়েটা ওদেরই সমবয়সী। এই কিছুদিন আগে ওদের স্কুলে একই ক্লাসে ভর্তি হয়েছে। হাসিখুশি সহজসরল আর কৌতুকপ্রিয়। সহজেই তিন গোয়েন্দার সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে ওর। এমনকী জিনার সঙ্গেও খাতির হয়ে গেছে শ্যারনের। এতোটাই যে, দুদিন আগে বাবা মার সঙ্গে দক্ষিণ আমেরিকায় বেড়াতে যাওয়ার সময় জিনা ওর। হেফাজতেই রাফিয়ানকে রেখে গেছে। বিনা পয়সায় ডগ-হাউসে রাফিয়ানকে রেখেছে শ্যারন।

হ্যাঁ, আমি রবিন। কী ব্যাপার, শ্যারন, তোমার গলা শুনে মনে। হচ্ছে খারাপ কিছু হয়েছে।

খানিক নীরবতা, তারপর ফুঁপিয়ে উঠল শ্যারন। আমি ফেঁসে গেছি, রবিন। তোমাদের সাহায্য খুব দরকার। পুলিশ আমাকে জেরা করছে। ভাব দেখে মনে হচ্ছে না জানি কতো বড় অপরাধ করেছি আমি। কথার ফাঁকে ফাঁকে ফেঁপাচ্ছে

শ্যারন। তোমরা তো গোয়েন্দা, তোমরা হয়তো পুলিশকে বোঝাতে পারবে আসলে আমার কোনও দোষ নেই।
বন্ধুদের দিকে তাকাল রবিন। কী হয়েছে, শ্যারন? কোথায় তুমি?
ইতিমধ্যে জ্যামিতির খাতা নামিয়ে রেখে সোজা হয়ে বসেছে। কিশোর। মুসার হাতে এখনও কারবুরেটর ধরা, মুখটা একটু হাঁ হয়ে আছে। দুজনেরই মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে রবিন আর শ্যারনের ফোনালাপ।
কাজের জায়গায়। গলা কাঁপছে শ্যারনের। পেট মোটেলে। কোটিপতি হার্বার্ট রকফেলারের শখের কুকুরটা চুরি হয়ে গেছে। আমার বস খেপে আছেন আমার ওপর। আমার ডিউটির সময়েই চুরিটা হয়েছে বলে ধারণা করছে সবাই। বস্ আভাস ইঙ্গিতে বলতে চাইছেন, আমি এই কুকুর-চুরির সঙ্গে কোনও না কোনও ভাবে জড়িত।
কোটিপতি হার্বার্ট রকফেলার ছুটি কাটাতে নিজস্ব ইয়টে করে বিশ্বভ্রমণে বেরিয়েছেন, খবরের কাগজে পড়েছে ওরা। যাওয়ার আগে
রকি বিচের নতুন পেট মোটেলে নিজের শখের কুকুরটাকে রেখে গেছেন। ভদ্রলোক। নামীদামী বড়লোক যাঁরা তাঁদের অনেকেই ইদানীং বাইরে গেলে ওই পেট মোটেলে নিজেদের কুকুর রেখে যান। ওখানে ডিলাক্স রুমে কুকুর রাখতে হলে প্রচুর খরচ করতে হয়, সবার পক্ষে সেটা সম্ভব নয়।
নীরব সমঝোতা হয়ে গেল তিন গোয়েন্দার ভিতর। রবিন বলল, চিন্তা কোরো না, শ্যারন, আমরা আসছি।
ফোন রেখে দিল শ্যারন। রিসিভার নামিয়ে রাখল রবিনও। কিশোর বলল, কুকুর অপহরণ করেছে কেউ। নিশ্চয়ই অনেক টাকা মুক্তিপণ দাবী করবে। শুনেছি রকফেলার সাহেবের জানের জান ওই বিরল প্রজাতির কোলিটা।
কুকুরটা কোলি সেটা তুমি জানলে কী করে? জ নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল মুসা।
রবিন বলল, পেপারে পড়োনি? দুর্লভ কুকুর। কয়েকটা ফ্যাশন শোতে চ্যাম্পিয়ানও হয়েছে।
নীচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। একটা ব্যাপার তোমরা খেয়াল করেছ? অভিজাত এলাকা থেকে একটা স্পিঞ্জ কুকুরও নিখোঁজ, হয়েছে। কালকের পেপারে ওটার মালিক বিজ্ঞাপন দিয়েছেন, যে, ওটা ফেরত এনে দিতে পারবে তাকে তিনি পাঁচশো ডলার পুরস্কার দেবেন।
পড়েছি, বলল রবিন।
মুসা জিজ্ঞেস করল, তোমার কি ধারণা ওটাও কুকুর চোরের কাজ, কিশোর?
হতে পারে, একটু দ্বিধা করে বলল কিশোর। ওটার মালিকও পয়সাওয়ালা মানুষ। কিন্তু যদি কাজটা কুকুর চোরের হয়ও, তখন পর্যন্ত কেউ মুক্তিপণ চায়নি।

মোবাইল হোম থেকে বেরিয়ে এলো ওরা, মেরি চাচীকে অফিসেই পেল। তাঁকে বলে এবার ওরা চড়ে বসল মুসার : তোবড়ানো ফোক্সওয়াগেনে। বিকট কয়েকটা মিস ফায়ার করে স্টার্ট নিল এঞ্জিন, রওনা হয়ে গেল ওরা।
শ্যারন পেট মোটেলে পার্টটাইম চাকরি নিয়ে মনে করেছিল জম্ভজানোয়ারের সঙ্গে সময়টা দারুণ কাটবে ওর, বলল রবিন। এখন ওকে সন্দেহ করা হচ্ছে। দুঃখজনক।
ডগ-হাউস পেট মোটেলটা শহরের উত্তর প্রান্তে। শুনেছিল, তবু ওটার সামনে পৌঁছে খানিকটা অবাক না হয়ে পারল না তিন গোয়েন্দা। বাইরে থেকে বাড়িটা দেখতে একদম মানুষের হোটেলের মতোই। গেটের উপর একটা নিয়ন সাইন। তাতে লেখা: ঘর খালি আছে।
গাড়িপথটা বেঁকে চলে গেছে একটা বিরাট পোর্টিকোর নীচে। ওখানে গাড়ি থামাল মুসা। নামল ওরা। সামনের কাঁচ দিয়ে দেখা যাচ্ছে অফিসের ভিতর উপস্থিত শ্যারন, চীফ ইয়ান ফ্লেচার এবং আরও কয়েকজনকে।
কাঁচের দরজা ঠেলে অফিসে ঢুকল ওরা, চলে এলো রেজিস্ট্রেশন কাউন্টারের সামনে। ওখানেই শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে আছে শ্যারন। তিন গোয়েন্দা ঢোকার পর ফ্যাকাসে চেহারায় একটু রং ফিরে এলো ওর। ওদের দেখে হাসলেন ইয়ান ফ্লেচার। কি, রহস্যের গন্ধ পেয়ে হাজির হয়ে গেছ? জানলে কীভাবে যে এখান থেকে রকফেলারের কুকুরটা চুরি গেছে?
কিশোর জবাব দেওয়ার আগেই মরচে রঙা চুলওয়ালা এক প্রৌঢ় ভ্রূ কুঁচকে গম্ভীর চেহারায় বলে উঠলেন, কারা এরা?
ও কিশোর পাশা, ওদের পরিচয় জানালেন পুলিশ চিফ।
কিশোর বলল, আমরা গোয়েন্দা। যে-কোনও রহস্য সমাধানে আগ্রহী। ছিঁচকে চুরি থেকে শুরু করে ডাকাতি-রাহাজানি-খুন, এমনকী ভৌতিক রহস্যের তদন্তেও পিছ-পা নই।
মনে হলো ওদের নাম আগে শোনেননি ভদ্রলোক, চোখ সরু করে। চীফের দিকে তাকালেন।
তোমরা সত্যিই তিন গোয়েন্দা? উত্তেজিত একটা স্বর জানতে চাইল। বক্তা এইমাত্র পিছনের দরজা দিয়ে অফিসে এসে ঢুকেছে। তরুণী মেয়েটা ওদের চেয়ে বছর পাঁচেকের বড় হবে। পরনের কাপড় কোঁচকানো, চুলগুলো এলোমেলো হয়ে আছে। ওয়াউ, পত্রিকায় তোমাদের কথা অনেক পড়েছি।
ও আয়োলা মর্টন, বলল শ্যারন। আয়োলা রাতে ডিউটি করে।
ব্যগ্র হয়ে এগিয়ে এসে তিন গোয়েন্দার সঙ্গে একে একে হাত মেলাল তরুণী। স্মিত হেসে বলল, আমাকে অগোছাল দেখাচ্ছে বলে দুঃখিত। দুহাতে গাউনের

ভাজ দূর করতে চেষ্টা করল। মিস্টার লেবউফ যখন ডাকলেন তখন আমি ঘুমিয়ে ছিলাম।
কাউকে না কাউকে তো দায়িত্ব নিতেই হবে, কড়া গলায় বললেন: মোটেল-মালিক গ্রেগ লেবউফ। শ্যারনকে আমি বরখাস্ত করছি।
কিন্তু আমি চুরির ব্যাপারে কিছুই জানি না, মিস্টার লেবউফ, ফ্যাকাসে মুখে প্রতিবাদ করল শ্যারন। আপনি এভাবে আমাকে অপমান। করবেন না।
হয়তো সত্যিই জানো না, বুকে হাত বাঁধলেন লেবউফ। তবে আমি আর আমার স্ত্রী এই মোটেলের মালিক। কাকে হায়ার করব আর কাকে ফায়ার করব সেটা আমাদের ইচ্ছে। তিন গোয়েন্দার দিকে তাকালেন তিনি। আমি গ্রেগ লেবউফ।
এবার মুখ খুললেন ইয়ান ফ্লেচার। আমার অফিসাররা পরীক্ষা করে দেখেছে, চোর এসেছিল কেনেলের পেছন দিকের দরজা খুলে। তালাটার ওপর কারিগরী ফলানো হয়েছে। আঁচড়ের দাগ পাওয়া গেছে।
আমরা একটু ঘুরে দেখতে পারব? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
কেউ যদি কোলির চোরটাকে ধরতে পারে তা হলে ওরাই পারবে, জোর দিয়ে বলল আয়োলা। ওরা বিখ্যাত গোয়েন্দা।
মৃদু হেসে প্রশংসাটুকু গ্রহণ করল কিশোর, তারপর আবার তাকাল চীফ আর মিস্টার লেবউফের দিকে। ইয়ান ফ্লেচার হাতের ইশারায় ওদেরকে সঙ্গে আসতে বলে পা বাড়ালেন ভিতরের দিকে। তাকে অনুসরণ করল তিন গোয়েন্দা। ওদের পিছু নিল বাকিরা।
একটা দরজা পার হয়েই কেনেল। এখানে খাঁচার ভিতর সাধারণ কাস্টোমারদের কুকুর রাখা হয়। চওড়া করিডরের দুপাশে সারি সারি দরজা। ওগুলো বড়লোক কাস্টমারদের শখের কুকুরদের বিলাশবহুল ঘর। ওগুলোর ভিতর সোফা, টেলিভিশন আর আরামদায়ক ফোমের খাটও আছে। ওগুলোর একটাতেই ছিল কোটিপতি হার্বার্ট রকফেলারের কোলি।
পরিচিত একটা ভউ-ভউ ডাক শুনতে পেল তিন গোয়েন্দা। আওয়াজ লক্ষ করে তাকাতেই দেখতে পেল রাফিয়ানকে। মাঝারি আকারের একটা খাঁচার ভিতর থেকে ঘনঘন লেজ নাড়ছে আর ছটফট। করছে রাফিয়ান। মুক্তি পেলেই ছুটে আসবে, সেজন্য অস্থির হয়ে আছে। রাফিয়ানের ডাক শুনে নানা আকারের খাঁচার ভিতর থেকে ডেকে উঠল। আরও কয়েকটা বিভিন্ন জাতের কুকুর। পকেট থেকে বিস্কুট বের করল মুসা, ছোট প্যাকেটটা খুলে রাফিয়ানকে দিল। আয়োলাও অন্যান্য খাঁচার কুকুরগুলোকে ডগ-বিস্কুট বিলি করছে।
করিডরের শেষ মাথায় থামলেন ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্লেচার, স্টিলের তৈরি দরজাটা দেখালেন কিশোর, মুসা আর রবিনকে। এখান দিয়েই চোরটা ঢুকেছিল। এবার

হাত নেড়ে বিদায় চাইলেন তিনি, মিস্টার লেবউফকে বললেন, চিন্তা করবেন না, তদন্ত করব আমরা। দেখা যাক চোরটাকে ধরতে পারি কি না। স্টিলের দরজা খুলে বেরিয়ে গেলেন। তিনি। একটু পরই তার গাড়ির আওয়াজ দূরে মিলিয়ে গেল।

দরজার ওপাশে চলে গেছে কিশোরও, পকেট থেকে ছোট্ট একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস বের করে তালাটা পরীক্ষা করে দেখতে শুরু করল। চাবি ঢোকানোর ফুটোর আশেপাশে আঁচড়ের দাগ ওর চোখ এড়াল না। এবার ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ও। রাস্তা দেখা যায় এখান থেকে। সহজেই এখানে আসতে পারবে চোর, ছোট দরজাটা তালাবদ্ধ থাকলে শুধু। তিনফুট উঁচ একটা দেয়াল টপকাতে হবে তাকে।

কী বুঝলে? দরজার কাছ থেকে কিশোরকে জিজ্ঞেস করলেন গ্রেগ লেবউফ।

শ্যারনের অপমানটা এখনও ভুলতে পারেনি কিশোর, নিরাসক্ত গলায় বলল, চীফ ফ্লেচার যেমন বলেছেন, দেখে মনে হচ্ছে দরজাটা জোর করে খোলা হয়েছে।

ভদ্রলোকের দিকে তাকাল ও। কোন ঘরে কোলিটা ছিল?

দরজা থেকে ডানদিকের প্রথম ঘরটা দেখালেন লেবউফ। দরজার তালা বন্ধ থাকে না। তাতে খাবার দিতে আর দেখাশোনা করতে সুবিধে। একবার বাইরের স্টিলের দরজার তালা খুলে ভেতরে ঢোকার পর সহজেই ওটার কাছে যেতে পেরেছে চোর।

খাবার দিতে গিয়েই আমি টের পাই কোলিটা নেই, বলল শ্যারন। প্রথমে এসেই অফিসের কাজগুলো সেরেছিলাম আমি, তারপর আসি খাওয়া দিতে।

অফিসের কাজ সারতে কতোক্ষণ লাগে? জিজ্ঞেস করল রবিন। ওর হাতে নোটবুক আর কলম।

একঘণ্টা মতো, জবাব দিল শ্যারন। তারপর যখন দেখলাম কোলিটা নেই, তখনই বুঝলাম কোথাও কোনও মস্ত গোলমাল হয়ে গেছে। হার্বার্ট রকফেলার বিশ্বভ্রমণে বেরিয়েছেন, কাজেই ওটাকে আর কারও নিয়ে যাবার কথা নয়। এমনিতে কাউকে কোলিটা ছুঁতেও দেন না তিনি। খারাপ কিছু ঘটেছে বুঝতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে মিস্টার লেবউফকে ফোন করি আমি।

আর আমি ফোন করি পুলিশে, বললেন লেবউফ।

সকাল সাতটা থেকে তোমার ডিউটি, ঠিক? শ্যারনকে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

হ্যাঁ। আমি সাতটার সময় এসে আয়োলার কাছ থেকে দায়িত্ব বুঝে নিই।

আয়োলার দিকে ফিরল কিশোর। আপনি যখন শ্যারনকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে ঘুমাতে গেলেন, তখন কোলিটা ছিল?

সত্যি বলতে কী, আমি খেয়াল করিনি, জানাল আয়োলা। কিন্তু সারারাত ডিউটি করেছি, কোনও অস্বাভাবিক শব্দ শুনিনি। জোর দিয়েই বলতে পারি, আমার

ডিউটির সময় কিছু ঘটেনি।
ডগ-হাউস শুরুর সময় থেকেই আমাদের সঙ্গে আছে আয়োলা, আয়োলার পক্ষ টেনে বললেন লেবউফ। ও যদি বলে অস্বাভাবিক কোনও শব্দ শোনেনি, তা হলে সেটাই ঠিক। ওকে পুরোপুরি বিশ্বাস করি আমরা।
আরও কেউ চাকরি করে এখানে? জিজ্ঞেস করল মুসা।
না, জানালেন লেবউফ। আমি আর স্ত্রী লরা ছুটির দিনগুলোতে কাজ চালিয়ে নিই। ব্যবসাটা আরও বড় করতে টাকা জমাচ্ছি আমরা, হলিউডের ডগ-হাউস ন্যাশনাল মোটেলটা কিনতে চাই। ফাস্ট ফুডের পর এতো ভাল ব্যবসা আর হয় না।
করিডরের খালি খাঁচাগুলোর দিকে তাকাল কিশোর। লেবউফ ওর। চাহনি লক্ষ করেছেন। বললেন, ব্যবসা এখনও ততোটা জমে ওঠেনি। কিন্তু শীঘ্রি অবস্থা ফিরবে। সেজন্যেই আমি চাই না ডগ মোটেল নিয়ে বাজে প্রচারণা হোক। অথচ খবরের কাগজওয়ালারা এখন আমার পেছনে উঠে পড়ে লাগবে। রকফেলার কোটিপতি, তার ব্যাপারে খবর ছাপতে সাংবাদিকরা এক পায়ে খাড়া।
এ প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল আয়োলা, ফিরে গেল মুসার প্রশ্নে। বলল, আমি যখন এখানে প্রথম কাজে যোগ দিলাম, তখন আরও দুজন কর্মচারী ছিল। তাদের একজন অ্যানিমেল টেকনিশিয়ান। অন্যজন এক মহিলা। নাম জেসিকা স্প্রিংগার। দুজনের কেউ এখন আর এখানে চাকরি করে না।
হ্যাঁ, কথাটা ঠিক, বললেন লেবউফ। নিক মিলহিজার নাম ছিল ওই ছোকরা টেকনিশিয়ানের। কুকুরের স্বাস্থ্য দেখভাল করতে তাকে চাকরিতে নিয়েছিলাম আমরা। পশুর ডাক্তার রাখলে যে খরচ হতো তার চেয়ে অনেক কম টাকাতে তাকে চাকরিতে নিই। ডাক্তারের বদলে তাকে দিয়েও আমাদের কাজ চলে যাচ্ছিল। নিক মিলহিজার আর জেসিকা প্রিংগারের বদলে এখনও কাউকে চাকরিতে নিইনি আমরা।
নিক মিলহিজার চাকরি করল না কেন? জিজ্ঞেস করল কিশোর। রবিন নোটবুকে তথ্যটা টুকে নেওয়ার জন্য কলম বাগিয়ে ধরল।
ওকে বরখাস্ত করেছি, বললেন লেবউফ। কুকুরের গু পরিষ্কার করতে রাজি হয়নি সে। বলেছিল ওটা অ্যানিমেল টেকনিশিয়ানের কাজ নয়।
আমি মিলহিজারকে চিনি, তথ্য জোগাল আয়োলা, সে কুকুরচুরির সঙ্গে কোনওভাবেই জড়িত থাকার মতো মানুষ নয়।
নোটবুকে তথ্যটা টুকে নিল রবিন। মুসা ঢুকে গেছে কোলির ঘরে। কোনও সূত্র পাওয়া যায় কি না খুঁজে দেখছে।
আর জেসিকা স্প্রিংগার? জিজ্ঞেস করল কিশোর।

দিনের ডিউটি ছিল তার, জানাল আয়োলা।
ভাল চাকরি পেয়ে চলে গেছে জেসিকা, বললেন লেবউফ। নতুন পেটফুড সুপারস্টোরে কাজ নিয়েছে সে।
এমন কারও কথা আপনি মনে করতে পারেন যে আপনার ওপর খেপে আছে? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
কারিনা মুর, এক মুহূর্ত দ্বিধা না করে বললেন লেবউফ। পত্রিকায় যেদিন ডগ মোটেল চালু হবার কথা শুনল সেদিন থেকেই আমার পেছনে। লেগেছে সে।
পাশের বাড়িতেই থাকেন উনি, জানাল আয়োলা মর্টন।
বিড়াল পোষে কারিনা মুর, বললেন লেবউফ। অন্তত শতখানেক বিড়াল আছে তার বাসায়। কুকুর অসম্ভব ঘৃণা করে মহিলা। কোর্টে পিটিশনও করেছিল, যাতে আমি ডগ-হাউস চালু করতে না পারি। জুরির সিদ্ধান্তে যখন আমি জিতলাম, আরও খেপে গেল সে। বাড়িটা বানানোর সময় পিকেটিংও করেছে। পত্রপত্রিকায় কড়া কড়া সব চিঠি দিয়েছে। সেগুলো ছাপাও হয়েছে। গত সপ্তাহে তার একটা চিঠি ছাপা হয়েছে। তাতে সে অভিযোগ করেছে, পুরো এলাকায় কুকুরের গায়ের দুর্গন্ধে টেকা যাচ্ছে না।
আমি তো কোনও গন্ধ পাচ্ছি না, বলল মুসা। কোলির ঘর থেকে এই মাত্র বেরিয়ে এসেছে ও।
সবকিছু ঝকঝকে তকতকে পরিষ্কার, খেয়াল করল কিশোর।
হুমকি দিয়ে কিছু ফোন আসছে ইদানীং, বলল আয়োলা। আমি নিজের পরিচয় দিলেই রেখে দেয়। চাপা গলায় কথা বলে, পুরুষ না মেয়ে বোঝা যায় না। ঠিক জানি না, তবে সে কারিনা মুরও হতে পারে।
কোলিটা চুরির সঙ্গে এইসব ফোনকলের যোগাযোগ আছে মনে করছেন? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
জানি না, বলল আয়োলা।
পাওয়া যাবে কোলিটাকে? উদগ্রীব দেখাল শ্যারনকে।
তদন্ত করব আমরা, আশ্বাস দিল মুসা।
রবিন বলল, সাধ্যমতো সবকিছুই করব।
তার মানে তোমরা তদন্ত করছ? ভ্রু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন গ্রেগ লেবউফ।
শ্যারন আমাদের বান্ধবী, বলল কিশোর। ওর জন্যে এটুকু করা আমাদের কর্তব্য।
একমাস ধরে শ্যারনের সঙ্গে কাজ করছি, অথচ একবারও ও বলেনি ও বিখ্যাত তিন গোয়েন্দার বন্ধু, বলল আয়োলা।
এখানে দাঁড়িয়ে বকবক করলে কোলিটা ফেরত আসবে না, রুক্ষ স্বরে বললেন লেবউফ। কাজ আছে আমার, আমার সঙ্গে আর কোনও কথা না থাকলে আমি

চললাম। তিন গোয়েন্দার দিকে তাকালেন তিনি। ওরা নীরব দেখে গটগট করে হেঁটে রিসেপশন অফিসের দিকে ফিরে চললেন।
আয়োলা বলল, আমাকেও আপাতত যেতে হচ্ছে। বাসায় ফোনে যোগাযোগ করে বাবা-মাকে জানাতে হবে আমি কোথায় আছি। বাড়তি ডিউটি করতে হবে আমাকে। ফিরতে দেরি হবে। নিজের অফিসে ঢুকে দরজাটা ভিড়িয়ে দিল সে।
তিন গোয়েন্দা আর শ্যারন ফিরে এলো রিসেপশন অফিসে। ভিতরে ঢুকেই কিশোর জিজ্ঞেস করল, মিস্টার লেবউফ, আগের কর্মচারীদের কারও কাছে মোটেলের চাবি রয়ে গেছে?
না, ফিরিয়ে দিয়েছে। ঠিক যেমন শ্যারন এখন দেবে। হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি গম্ভীর চেহারায়। এ পার্স খুলে নিজের চাবির রিং থেকে ডগ-হাউসের চাবিটা আলাদা করল শ্যারন ফ্যাকাসে চেহারায়, তারপর ওটা দিয়ে দিল মিস্টার লেবউফকে।
আমি চাই না মানুষ মনে করুক দায়িত্বজ্ঞানহীন কর্মচারী রাখি। আমি, নির্দয়ের মতো বললেন লেবউফ।
শ্যারন প্রতিবাদ করল, আমার ডিউটির সময় আবিষ্কার হয়েছে। কুকুরটা নেই, কিন্তু ওটা কখন চুরি গেছে সেটা কেউ জানে না।
এমন কোনও প্রমাণ নেই যে চুরির সঙ্গে শ্যারন কোনও ভাবে জড়িত, বলল কিশোর।
কিন্তু ওকে বরখাস্ত করার মতো যথেষ্ট কারণ ঘটেছে বলে আমি মনে করি, কড়া চোখে কিশোরকে দেখলেন লেবউফ। শ্যারনের দিকে তাকালেন। ...আর নিয়মিত ভাড়া দেয়ার সাধ্য না থাকলে যাওয়ার আগে তোমার নেড়ি কুত্তাটাকেও নিয়ে যেয়ো।
রাফিয়ানের কথা বলা হচ্ছে!
মুসার কালো মুখটা আরও কালো হয়ে গেল। রবিন খুকখুক করে। কাশল। কিশোরের চেহারা মারাত্মক গম্ভীর।
অসহায় দেখাল শ্যারুনকে। মুখটা রক্তশূন্য। তিন গোয়েন্দার দিকে তাকাল শ্যারন। তা হলে এখন কী হবে? রাফিয়ানকে কোথায় রাখব? আমাদের অ্যাপার্টমেন্টে কুকুর রাখার নিয়ম নেই।
কোনও চিন্তা কোরো না, আশ্বাস দিল কিশোর। ও আমার কাছে থাকবে। আমার বাঘার সঙ্গে ভাল খাতির ওর। দুজন মিলে খেলা করে সুন্দর সময় কাটাতে পারবে। নিয়ে এসো ওকে। আমরা বাইরে অপেক্ষা করছি।
মনে হলো কিশোরের কথায় ভরসা পেল শ্যারন, রিসেপশন থেকে বেরিয়ে কেনেলের দিকে গেল ও। মোটেলের সামনের পোর্টিকোতে গাড়ির পাশে চলে

এলো তিন গোয়েন্দা।
একটু পরই ফিরল শ্যারন, এক হাতে বাদামী রঙের রাফিয়ানের শেকল ধরে রেখেছে। বন্ধুদের সামনে এসে দাঁড়াল, মুখে ম্লান হাসি। শেকলটা কিশোরের দিকে বাড়িয়ে দিল। এই যে নাও। খুব খারাপ লাগছে আমার। ঈশ্বর জানেন জিনা কী মনে করবে।
শেকলটা নিল কিশোর। মুসা বলল, কিছু মনে করবে না ও। কী ঘটেছে শুনলে বরং এভাবে তোমাকে অপমান করেছে বলে রেগে যাবে মিস্টার লেবউফের ওপর।
ভউ! ভউ!
কিশোরের গাল চেটে দেওয়ার চেষ্টা করল রাফিয়ান, লম্বা লেজটা ঘনঘন নাড়ছে আনন্দে। কিশোর চট করে মুখটা সরিয়ে নেওয়ায় বিন্দুমাত্র দেরি না করে ঘুরেই রবিনের গাল চেটে দিল।
রিসেপশনের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন মিস্টার লেবউফ। নিষ্ঠুরভাবে বললেন, চোরের রুচি আছে, এটাকে নিয়ে যায়নি।
ও মাংগ্রল হতে পারে, কিন্তু ও খুব ভাল মানুষ, কড়া গলায় বলল শ্যারন। রাফিয়ান ওই আদুরে কোলির চেয়ে অনেক কাজের।
ভউ! হুফ্! হ্যাহ, হ্যাহ্!
শ্যারনের হাত চাটার ফাঁকে যেন সায় দিল রাফিয়ান।
পার্স খুলে একটা কাগজ বের করল শ্যারন, ওটা গোল করে মুড়িয়ে বলল, রাফি, ধরু!
সঙ্গে সঙ্গে আলতো করে ওটা শ্যারনের হাত থেকে নিয়ে নিল। রাফিয়ান। এবার শ্যারন নির্দেশ দিল, দিয়ে দে ওটা।
মুখ আলগা করে মোড়ানো কাগজটা শ্যারনের দিকে বাড়িয়ে ধরল রাফিয়ান।
লক্ষ্মী ছেলে। পার্স থেকে বিস্কুট বের করে ওকে দিল শ্যারন। মিস্টার লেবউফের দিকে তাকিয়ে বলল, বসতে বললে বসে ও, গড়াগড়ি খেতে বললে তা-ও পারে, কাউকে দেখিয়ে ছুঃ বললে তার দিকে ছুটে যায় ঘেউঘেউ করতে করতে। কিন্তু কখনও কামড়ায় না ও। বললে হ্যান্ডশেকও করে। পারবে মিস্টার রকফেলারের কোলি এতোকিছু করতে?
জবাব দিলেন না মিস্টার লেবউফ, শুধু মুখ বাঁকালেন।
গাড়িতে করে শ্যারনকে ওদের অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের সামনে নামিয়ে দিল তিন গোয়েন্দা, তারপর রাফিয়ানকে নিয়ে ফিরে চলল স্যালভিজ ইয়ার্ডের উদ্দেশে। ইতিমধ্যে নিজেদের ভিতর আলোচনা করে ঠিক করে ফেলেছে, ক্যাপ্টেন ইয়ান

ফ্লেচারকে জানাবে ওদের সন্দেহের কথা। কেউ বা কোনও দল বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে কুকুর চুরি করছে।
ইয়ার্ডের ভিতর গাড়ি ঢুকিয়ে নামল তিন গোয়েন্দা, রাফিয়ানকে ছেড়ে দিল উঠানে। বাঘার গায়ের গন্ধ পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে বাঘার সঙ্গে খেলা করতে ছুটল রাফিয়ান।
চলো কিছু পেটে দেয়া যাক, বলল মুসা। মনে হচ্ছে জীবনে কোনদিন খাইনি কিছু।
বাড়ির ভিতর ঢুকল ওরা। সোজা কিচেনে চলে এলো। জানালার পাশেই ফ্রিজ, ওটার দরজা খুলল মুসা, টার্কির রোস্ট আর পাউরুটি বের করে মাইক্রোওয়েভ আভেনে ভরল। হাসি-হাসি চেহারায় কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু কিশোর আর রবিনের চেহারা দেখে থমকে গেল।
জানালার সামনে দাঁড়িয়ে বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে আছে কিশোর রবিন। ঝট করে ঘুরল মুসা ওরা কী দেখছে বোঝার জন্য। ওর শিরদাঁড়া বেয়ে ঠাণ্ডা একটা স্রোত বয়ে গেল।
রবিন সম্বিত ফিরে পেয়ে বলে উঠল, নিয়ে গেল!
হ্যাঁ, নিয়েই যাচ্ছে বটে! দুহাতে রাফিয়ানকে জাপ্টে ধরে তুলে নিয়ে ছুটছে এক হালকা-পাতলা লোক। রাবারের মুখোশ পরে আছে সে, চেহারা দেখার উপায় নেই। এক পলকে যেন উড়ে বেরিয়ে গেল, লোকটা ইয়ার্ডের দরজা দিয়ে।
চলো! তাগাদা দিল কিশোর। জানালা টপকে নীচে নেমেই ছুটতে শুরু করল ও। পলকের জন্য ভাবল, বাঘা কেন পিছু নিচ্ছে না। কিশোরের পিছনে দৌড় দিল রবিন আর মুসা। তিনজনই প্রাণপণে
ছুটছে। না, ইয়ার্ডের গেট পেরিয়ে, থমকে দাঁড়াল ওরা। একরাশ ধুলো উড়িয়ে রওনা হয়ে গেছে পুরোনো একটা ধূসর গাড়ি। ওটার একটা দরজা হলদে রং করা। ক্রমেই দূরে চলে যাচ্ছে, তারপর বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল গাড়িটা! রাফিয়ানের ভউ-ভউ অস্পষ্ট হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে!
এক দৌড়ে মুসার ফোক্সওয়াগেনের কাছে ফিরে এলো ওরা, দেরি না করে লাফ দিয়ে চড়ে বসল। ছুটল ওরা কুকুর-চোরের পিছনে। বড় রাস্তায় উঠে ধূসর গাড়িটার মতোই বামদিকের বাঁক ঘুরল মুসা। স্টিয়ারিং হুইলের উপর ঝুঁকে বসেছে ও। সহজে কুকুর-চোরকে হারাতে চায় না বলে পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে গাড়ি চালাচ্ছে।
ওই যে! দূরে ধূসর গাড়িটা দেখতে পেয়ে বলে উঠল রবিন। আবার বাঁক নিচ্ছে!
আধ মিনিট পর বাঁক নিল মুসাও। ধূসর গাড়িটা ওদের কয়েকশো গজ সামনে। হলুদ দরজাটা বেমানান লাগছে এতোটা দূর থেকেও। দরজাটা বোধহয় কোনও

জাঙ্ক ইয়ার্ড থেকে সগ্রহ করেছে, মন্তব্য। করল মুসা।
গাড়ি যেমনই হোক, ওটায় বিল্ট-ইন কার-ফোন আছে, বলল কিশোর। গাড়ির পিছনের অ্যান্টেনাটা দেখা যাচ্ছে। হাইওয়ের দিকে যাচ্ছে লোকটা।
অ্যান্টেনাটা দেখতে পাচ্ছি, বলল, মুসা। একটা ধীরগতির ডেলিভারি ট্রাক পাশ কাটাল ও।
ধূসর গাড়িটা ঢালু রাস্তার একটা অংশ পেরিয়ে এক্সপ্রেসওয়ের দিকে চলেছে।
দূরত্ব কমছে, জানাল মুসা।
একেবারের বামদিকের লেনে সরে গেল ধূসর গাড়ির কুকুরচোরা ড্রাইভার। দুপুর এখন। রাস্তায় গাড়িঘোড়ার ভিড়। তবুও তাকে হারাল না মুসা। ধূসর গাড়ি থেকে আর দুটো গাড়ি পিছনে আছে ওরা এখন।
চাকার তীক্ষ্ণ আওয়াজ তুলে হঠাৎ ডানদিকে সরে গেল ধূসর গাড়ি।
সামনের ওই রাস্তা পার হওয়ার আইল্যান্ড-ছাড়া জায়গাটার দিকে যাচ্ছে, ফোক্সওয়াগেনের এঞ্জিনের গর্জনের উপর দিয়ে বলল মুসা। দক্ষ হাতে গাড়ি চালিয়ে অনুসরণ করল ও ধূসর গাড়িটাকে।
লাইমস্টোন স্ট্রিটে পড়ল এবার ওরা। দুপাশে বন্ধ ওয়্যারহাউস আর ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের বাড়িঘর। বন্দরের দিকে চলেছে ওরা। জায়গাটা বিশেষ সুবিধার নয়। চুরি-ডাকাতির জন্য কুখ্যাত।
গাড়ির গতি কমাল মুসা। লোকটা দুব্লক সামনে ডানদিকে মোড় নিয়েছে।
একটু পরই মোড়টা ঘুরল ওরাও।
একটা পরিত্যক্ত ওয়্যারহাউসের খোলা দরজা দিয়ে ধূসর গাড়িটাকে ঢুকে যেতে দেখল তিন গোয়েন্দা। আর ঠিক তখনই খকখক করে কেশে উঠে বন্ধ হয়ে গেল ফোক্সওয়াগেনের এঞ্জিন।
যাহ! হতাশ গলায় বলল মুসা, আবার প্লাগে, ময়লা চলে এসেছে।
বা তুমি প্লাগ পরিষ্কার করে এসো, আমরা লোকটার পেছনে যাচ্ছি। গাড়ি থামতেই নেমে পড়ল কিশোর। রবিন আর ও এগোল ওয়্যারহাউসটার দিকে।
দেখে তো মনে হচ্ছে কেউ নেই ওয়্যারহাউসে, কাছাকাছি পৌঁছে। মন্তব্য করল রবিন।
গোটা এলাকাই পরিত্যক্ত, সায় দিল কিশোর। ওদের পাশ কাটাল ময়লা কাপড় পরা এক লোক, সজিভরা ঠেলাগাড়ি নিয়ে বাজারে চলেছে।
ওয়্যারহাউসের ফটকটা বিশাল। দরজাটা টেনে নামিয়ে বন্ধ করা হতো। এখন উপরে তুলে রাখা হয়েছে। খোলা দরজাটাকে হাঁ করা। দৈত্যের কালো মুখ-গহ্বরের মতো লাগল।

নিশ্চয়ই ভেতরে আছে লোকটা, বলল রবিন। আমাদের যাওয়া কি ঠিক হবে? হয়তো অন্ধকারে আমাদের ধরার জন্যেই খাপ পেতে বসে আছে।
ঠিকই বলেছ, বলল কিশোর। আগে চলো বাইরে থেকে একবার। ঘুরে দেখি জানালা দিয়ে কিছু দেখা যায় কি না, তারপর ঢুকব।
দরজার এক ফুট দূরে দেয়ালের গা ঘেঁষে দাঁড়াল কিশোর, তারপর সরতে শুরু করল একদিকে। রবিন একবারও দরজার দিকে না তাকিয়ে পার হয়ে গেল ওটা, তারপর কিশোরের মতোই দেয়াল ঘেঁষে অন্যদিকেচলল।
ওয়্যারহাউসের বেশিরভাগ জানালারই কাঁচ ভাঙা। একটা আস্ত জানালার উপরে রকি বিচ স্টোরেজ লেখা অস্পষ্ট সাইনবোর্ড দেখতে পেল রবিন।
ওদের পরিকল্পনায় কোনও লাভ হলো না। ভিতরটা অন্ধকার। বাইরে দিনের উজ্জ্বল আলো আছে বলে জানালাগুলো দিয়ে কিছুই দেখতে পেল না ওরা। আবার দরজার কাছে ফিরে এলো দুজন। বুঝতে পারছে, মুসা থাকলে আরেকটু ভরসা পাওয়া যেত।
কোনও আওয়াজ তো পাচ্ছি না, ফিসফিস করল রবিন।
দরজার কোনা থেকে সাবধানে উঁকি দিল কিশোর, ধুলোর মধ্যে প্রাচীন গাড়িটার চাকার দাগ দেখতে পেল। ঠোঁটে আঙুল তুলে রবিনকে সতর্ক করে ভিতরে পা বাড়াল কিশোর! রবিনও চলে এলো ওর পাশে। দুজনই হুশিয়ার হয়ে আছে, যাতে আওয়াজ না হয়।
চোখ সয়ে আসতেই জানালা দিয়ে যে আলো আসছে সেই আবছায়ায় ওরা দেখতে পেল ভিতরে কেউ নেই। গাড়িটা বিরাট ঘরের কোথাও দেখা যাচ্ছে না।
ঘরটা লম্বায় অন্তত একশো পঞ্চাশ ফুট হবে। চওড়াতেও তার কম নয়। সিমেন্টের মেঝেতে সরু সরু আঁকাবাঁকা ফাটল ধরেছে। পুরু হয়ে ধুলো জমেছে ঘরের ভিতর। খেয়াল করতেই ওরা দেখতে পেল, ঘরটার মাঝখানে বামদিকে একটা পথ আছে। ওখান থেকে আলোর আভা আসছে।
চাকার দাগ ওদিকেই গেছে, বলল কিশোর।
গাড়ির চাকার ছাপগুলো নোটবুকে হুবহু এঁকে নিল রবিন, তারপর ওদিকটা লক্ষ করে এগোল দুজন।
সাবধানে থাকতে হবে, নিচু স্বরে বলল রবিন। যথেষ্ট সময় পেয়েছে লোকটা। হয়তো ডাণ্ডা নিয়ে তৈরি হয়ে আছে, দুই বাড়িতে ঠাণ্ডা করে দেবে আমাদের।
আস্তে করে মাথা দুলিয়ে সায় দিল কিশোর, তারপর নীরবে ইশারা করল। কিশোর কী বলতে চায় বুবাতে অসুবিধা হলো না রবিনের, নিঃশব্দে ওয়্যারহাউসের ডানদিকের দেয়ালের পাশে সরে গেল ও। সাবধানে এগোচ্ছে আলোর আভা আসা বাকটার দিকে।

এদিকে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল কিশোর। কিছু একটা শুনতে পেয়েছে ও। মনে হলো যেন আঁচড়াচ্ছে কেউ। ভ্রূ কুঁচকে উঠল কিশোরের। রাফিয়ান নাকি?
কিশোর থামতেই রবিনও থেমে দাঁড়িয়েছে। একই আওয়াজ ওর কানেও গেছে। পরস্পরের দিকে তাকাল ওরা।
মনে মনে দশ গুনল কিশোর, আর কোনও আওয়াজ শুনতে পেল না। আঁচড়াচ্ছে না আর কেউ। নিঃশব্দে বাঁক ঘুরল কিশোর। রবিনও ওর ঠিক পিছনেই আছে।
এদিকে আরেকটা খোলা দরজা। ওটা দিয়ে আসা উজ্জ্বল আলোয়। ক্ষণিকের জন্য চোখ ধাঁধিয়ে গেল ওদের। সামলে নিয়ে দেখল, এদিকেও ধূসর গাড়িটার চিহ্নমাত্র নেই। রাফিয়ানকেও দেখা গেল না। ওয়্যারহাউসের এই অংশটাও ফাঁকা একটা ঘর। ওয়্যারহাউসের ধুলোভরা মেঝে আর তাতে চাকার দাগ ওদের নীরবে বলে দিল কী ঘটেছে। এক দরজা দিয়ে ঢুকে আরেক দরজা দিয়ে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেছে কুকুর-চোর।
এলাকাটা চেনে লোকটা, বলল কিশোর, নীচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে। এই ওয়্যারহাউসটা সম্বন্ধেও জানে।
জানত এভাবে হয়তো আমাদের ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব, বলল রবিন। এই ওয়্যারহাউসটা কাদের সেটা জানতে হবে।
একটা জিনিস রবিনের চোখে পড়েছে। উবু হয়ে ওটা তুলল ও, কিশোরকে দেখাল। ইংরেজি এস-এর মতো একটা বাঁকানো হুক। জিজ্ঞেস করল, কী হতে পারে?
কুকুরের লাইসেন্স আটকানো হয় এধরনের হুক দিয়ে, বলল কিশোর। আমার বাঘারও আছে এরকম একটা। রবিনের কাছ থেকে নিয়ে জিনিসটা বুক পকেটে পুরল ও। তারপর বলল, আওয়াজটা শুনেছ না? ওই যে আঁচড়ানোর আওয়াজ? ওটা কোত্থেকে এলো?
গাড়ির শব্দ শুনতে পেল ওরা। এঞ্জিনের দিক-ঢ়িক-চিক-চিক আওয়াজটা ওদের বলে দিল মুসা আসছে ওর ফোক্সওয়াগেন নিয়ে। প্লাগগুলো পরিষ্কার করে ফেলেছে। কচ্ছপের গতিতে বাঁক ঘুরল মুসা, হেডলাইটের ম্লান আলোয় ওদের দেখতে পেয়ে থামল। ও গাড়ি থেকে নামতেই কী ঘটেছে জানাল ওরা।
আঁচড়ানোর আওয়াজটা ইঁদুরের হতে পারে? জিজ্ঞেস করল মুসা।
মনে হয় না, একটু ভেবে উত্তর দিল কিশোর। দরজার পাশে একটা অফিসের দিকে হাত তুলল ও। এক সময় ওটা ম্যানেজারের অফিস ছিল। পোকায় কাটা দরজায় এখনও ম্যানোর লেখা আছে, বাকিটা ঘুণ পোকা খেয়ে ফেলেছে। ওখানে খুঁজে দেখা দরকার। তোমরা দেখো গাড়িটা কোনদিকে গেছে আন্দাজ করতে পারো কি না।

চাকার দাগ অনুসরণ করে এগোল মুসা আর রবিন। কিশোর চলল। অফিসটার দিকে।
দরজার নবে মোচড় দিল কিশোর। তালা খোলাই আছে। খুলে গেল দরজা। ভেতরে ঢুকল কিশোর। ঘরটায় গা ছমছমে গাঢ় অন্ধকার। জানালাগুলো পেরেক আর তক্তা মেরে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কিশোর ঢুকতেই ঘড়ঘড় আওয়াজ করে উঠল একটা কুকুর।
রাফিয়ান? মৃদু স্বরে ডাকল কিশোর।
গর্জনটা থেমে গেল।
রাফিয়ান? আবার ডাকল কিশোর।
সাবধান! খানিকটা দূর থেকে সতর্ক করল রবিন। ফিরে এসেছে। ও। রাফিয়ান কখনও এভাবে গর্জায় না।
দেয়াল হাতড়ে বাতির সুইচ খুঁজল কিশোর। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল, পরিত্যক্ত ওয়্যারহাউসে নিশ্চয়ই ইলেক্ট্রিসিটির কানেকশন অনেকদিন আগেই বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে। একটা পায়া-ভাঙা চেয়ারে হোঁচট খেল কিশোর। আবার গর্জনটা শুনতে পেল। এবার অনেক কাছে! দরজা দিয়ে আসা আবছা আলোয় দেখতে পেল...
ছায়া থেকে বেরিয়ে আসছে ওটা। বিরাট একটা কুকুর। আলো পড়ে ওটার হলদে চোখ দুটো আগুনের মতো জ্বলজ্বল করছে। দাঁত খিঁচিয়ে গর্জে উঠল আবার। আতঙ্কের স্রোত টের পেল কিশোর, মেরুদণ্ড বেয়ে একটা ঠাণ্ডা কিছু যেন নেমে যাচ্ছে। কুকুরটা রাফিয়ান নয়!
মস্ত এক পিট বুল!
হঠাৎ ঝাঁপ দিয়ে সামনে বাড়ল হিংস্র জন্তুটা। পিছিয়ে যেতে চেষ্টা করল কিশোর, কিন্তু চেয়ারটায় আবার হোঁচট খেলো। পড়তে পড়তে সামলে নিল নিজেকে।
কুকুরটার বড় বড় ঝকঝকে দাঁতগুলো অল্প আলোয় ভয়ঙ্কর দেখাল। একেবারে শেষ মুহূর্তে কিশোর বুঝতে পারল, ওর গলা লক্ষ্য করে লাফিয়ে উঠছে কুকুরটা! নাগালে পেলেই এক কামড়ে কণ্ঠনালী ছিঁড়ে ফেলবে!
দুহাতে গলা বাঁচাতে চেষ্টা করল কিশোর।
কুকুরটা দুপায়ে দাঁড়িয়ে উঠতেই ঝাঁকি দিয়ে মাথাটা পিছনে সরিয়ে নিল। ও। ওর গলায় কামড় বসাতে পারল না পিট বুল, তবে হাতে ওটার দাঁতের স্পর্শ পেল কিশোর। যে-করে হোক ঠেকাতে হবে ভয়ঙ্কর জন্তুটাকে।
পিট বুল কাছে চলে আসায় ওটার গলাতে একটা মজবুত চেইন কলার দেখতে পেল ও। জানোয়ারটা মাটিতে পা নামিয়েই আবার দুপায়ে খাড়া হয়ে উঠল। ওটার লক্ষ্য কিশোরের কণ্ঠনালী।

একেবারে শেষ মুহূর্তে সরে গেল কিশোর, হাত বাড়িয়ে ক্রোমের তৈরি কলারটার ঘাড়ের কাছে শক্ত করে ধরে ফেলল ও। ঝুঁকি খেয়ে থেমে গেল পিট বুল। রাগে গর্জন করে উঠল। ঘাড় ফিরিয়ে কামড় বসাতে চেষ্টা করল কিশোরের হাতে।
হাত লম্বা করে কলার ধরে ওটাকে দূরে সরিয়ে রাখল কিশোর। মেঝে থেকে এক ইঞ্চি উপরে ঝুলছে কুকুরটার সামনের পা দুটো। পিছনের পায়ে যেন ব্রেকড্যান্স জুড়ে দিল।
ছেড়ো না! দ্রুত পায়ে ভিতরে ঢুকল রবিন। শক্ত করে ধরে রাখো। টেবিলের পাশে পড়ে আছে জঞ্জাল, তার ভিতর ইলেক্ট্রিকের একটা ছেঁড়া তার চোখে পড়েছে ওর। কুঁজো হয়ে তুলে নিল ওটা রবিন। তারটা মাত্র আড়াই ফুট লম্বা, তবে ওতেই কাজ চালাতে হবে।
প্রাণের ভয়ে শক্ত করে কলারটা ধরে আছে কিশোর। কলারের ভিতর দিয়ে তারটা ঢুকিয়ে গিঠ দিল রবিন। এবার দুজন মিলে গর্জনরত কুকুরটাকে সরিয়ে আনতে চেষ্টা করল। দুজন দুদিকে টান দেওয়ায় কাজটা অতোটা কঠিন হলো না। টেবিলের পায়ার সঙ্গে তারের আরেক প্রান্ত প্যাঁচ দিয়ে আটকাল রবিন। শক্ত করে গিঠ দিল। নীরবে সমঝোতা হয়ে গেল ওর কিশোরের সঙ্গে। এবার ঝট করে সরে এলো দুজন পিট বুলের কাছ থেকে।
তার খুলে না এলে বাঁচোয়া, হাঁফাতে হাঁফাতে বলল কিশোর।
পিট বুল ঝাঁপিয়ে পড়তে চেষ্টা করায় ইলেক্ট্রিকের তারটা গিটারের তারের মতো টানটান হয়ে গেছে, তবে খসে এলো না। আরও কয়েকবার লাফঝাঁপ মেরে ছুটতে পারবে না বুঝতে পারল পিট বুল। কিশোরের দিকে রক্তচক্ষু মেলে মেঝেতে বসল এবার ওটা।
কামড় লেগেছে? জিজ্ঞেস করল রবিন।
না, জানাল কিশোর। এখনও হাঁফাচ্ছে। মিউনিসিপ্যালিটিতে ফোন করতে হবে। এটাও হয়তো চুরি যাওয়া কুকুরের একটা। ওখান থেকে কুকুর-ধরা এসে এটাকে নিয়ে যাক।
কে চুরি করবে এরকম একটা রাগী কুকুর? অবিশ্বাস ঝরল রবিনের গলায়। করবেই বা কীভাবে? আমাকে এক লাখ ডলার দিলেও তো এটার ধারেকাছে যেতে চাইব না আমি।
অফিসের ভিতর চোখ বুলাল কিশোর। হলদে হয়ে যাওয়া কয়েকটা কাগজ আর ক্যান্ডির খোসা ছাড়া ঘরে আর কিছু নেই বলে মনে হলো ওর।
নীচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। মনে হয় না এখানে কুকুরটা বেশিক্ষণ ছিল। বোঝা যায় খাবার আর পানির অভাবে পড়েনি। অথচ এখানে ওদুটো জিনিস নেই।

সম্ভবত রাফিয়ানকে যে চুরি করেছে, সে-ই এটাকে এখানে রেখে গেছে, বলল রবিন। আমরা ঢোকার আগে যথেষ্ট সময় পেয়েছে লোকটা।
আমারও মনে হয় ওই লোকই রেখে গেছে, সায় দিল কিশোর।
দরজার সামনে এসে দাঁড়াল মুসা। কী ব্যাপার? গর্জন করে কী?
একটা পিট বুল, জানাল রবিন। আরেকটু হলেই কিশোরকে মেরে ফেলেছিল। ওর গলা ছিঁড়ে ফেলতে চেয়েছিল।
কুকুরটার আকার থেকে মুসার চোখ কপালে উঠল। খাইছে!
জানালার ব্লাইন্ড তুল কিশোর, ঘরে যাতে আলো আসে। কিশোরের কথায় ঘরটা সার্চ করতে শুরু করল ওরা। তিনজনই সতর্ক দূরত্ব বজায় রাখল পিট বুলের কাছ থেকে। বসে বসে আগুনঝরা চোখে ওদের দেখছে ওটা এখন।
ময়লা ঘটছে তিন গোয়েন্দা। কয়েকটা পেপার ক্লিপ আর সাপ্লাই ফর্ম ছাড়া আর কিছু পাওয়া গেল না। ভাঙা ডেস্কটা খালি।
জরুরি কিছু নেই, মন্তব্য করল কিশোর। মুসার দিকে তাকাল।
ধূসর গাড়িওয়ালা কোনদিকে গেছে আন্দাজ করতে পারলে?
ধুলোর মধ্যে চাকার দাগ ডানদিকে বাঁক নিয়েছে, জানাল মুসা। তারপর গাড়িটা রাস্তায় উঠে যাওয়ায় আর আর কোনও চিহ্ন নেই।
আমরাও ডানদিকেই যাব, বলল কিশোর। হয়তো তদন্তের কাজে লাগে এমন কিছু পাওয়া যেতেও পারে।
মুসার ফোক্সওয়াগেনের কাছে ফিরল ওরা। গ্লাভ কম্পার্টমেন্ট খুলে একটা প্ল্যাস্টিকের ব্যাগ বের করে তার ভিতর এস-এর মতো হুকটা রেখে দিল কিশোর। এবার মোবাইল ফোনটা বের করে মিউনিসিটিপ্যালিটির নাম্বারে ডায়াল করল, ঠিকানা জানি কোথায় পিট বুলটাকে পাওয়া যাবে।
ওকে জানানো হলো, মিউনিসিপ্যালিটির লোক এসে ওটাকে নিয়ে যাবে; যতোদিন মালিকের খোঁজ না পাওয়া যায়, ততোদিন সরকারী খরচে ওটার রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে।
হঠাৎ করেই বাংলাদেশের কথা মনে পড়ল কিশোরের। বাংলাদেশে বেওয়ারিশ কুকুর ধরে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলে মিউনিসিপ্যালিটির লোকরা। ব্যাপারটা খুব নিষ্ঠুর।
বন্দরের ধার দিয়ে চলে যাওয়া রাস্তা ধরে চলেছে মুসার ফোক্সওয়াগেন। কোথাও নেই ধূসর গাড়িটা। আধঘণ্টা খুঁজে হাল ছেড়ে দিল ওরা।
জিনা ফিরলে কী বলবে? স্যালভিজ ইয়ার্ডের দিকে রওনা হয়ে জিজ্ঞেস করল মুসা। রিয়ারভিউ মিররে কিশোরের দিকে তাকিয়ে আছে ও।

জিনা স্রেফ খুন করে ফেলবে আমাদের। শ্যারনকেই বা কী বলবে? রাফিয়ান নিখোঁজ হয়ে গেছে শুনলে কী ভাববে ও?
দেখি শ্যারন কী বলে, মোবাইল ফোনটা আবার গ্লাভ কম্পার্টমেন্ট থেকে বের করল কিশোর, শ্যারনদের অ্যাপার্টমেন্টের নাম্বারে ডায়াল করল। বাড়িতে বোধহয় কেউ নেই, অ্যানসারিং মেশিন ক্লিকক্লিক শব্দ করে চালু হলো। কী ঘটেছে জানিয়ে ফোন রেখে দিল কিশোর। আপন মনে বলল, জিনারা কোন হোটেলে উঠবে বলে যায়নি, কাজেই ওকে খবরটা জানানোর কোনও উপায় নেই। হয়তো ও ফিরে আসার আগেই রাফিয়ানকে আমরা উদ্ধার করতে পারব।
বিকেল হয়ে গেছে। রোদের রং লালচে। সাগর থেকে ভেসে আসা। বাতাসে লোনাজলের গন্ধ।
স্যালভিজ ইয়ার্ডে ঢুকে কিশোরদের বাড়ির সামনে গাড়ি পার্ক করল মুসা। নামার পর ওরা শুনতে পেল কিচেনে ফোন বাজছে। মেরি চাচী অফিসে, বাসায় কেউ নেই। ভিতরে ঢুকল ওরা, কিশোর ফোন তুলল। ডগ-হাউস থেকে রিং করেছে আয়োলা। কিশোর ধরায় দুএকটা কথার পর আফসোস করে বলল, খুব অন্যায় আচরণ করা হয়েছে শ্যারনের সঙ্গে। সত্যি দুঃখ লাগছে ওর জন্যে। ওর তো কোনও দোষ ছিল না।
আমিও তা-ই মনে করি, বলল কিশোর। ওকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করাটা ঠিক হয়নি। তবে শক্ত মনের মেয়ে শ্যারন, আঘাতটা ঠিকই সামলে উঠবে।
কোলিটা খুঁজে পাবার ব্যাপারে তদন্ত এগোল? জিজ্ঞেস করল আয়োলা।
হাতে কিছু সূত্র এসেছে, জানাল কিশোর।
আশা করি, তোমরা পারবে, বলল তরুণী। কোলিটা চুরি হয়ে যাবার পর থেকে মিস্টার লেবউফ সবার সঙ্গে খুব দুর্ব্যবহার করছেন।
বুঝতে পারছি তার কেমন লাগছে, বলল কিশোর। কেউ একজন আমাদের এখান থেকে রাফিয়ানকেও চুরি করে নিয়ে গেছে।
মানে শ্যারন যে-কুকুরটা তোমাদের দিল, ওটা?
হ্যাঁ।
সর্বনাশ! কাজটা কার জানতে পেরেছ?
না, তবে জানব।
পুলিশে ফোন করেছ?
এখনও করিনি। তবে পুলিশ কোলিটাকে খুঁজছে। এখান-ওখান থেকে কুকুরচুরি হচ্ছে বুঝতে পারছি। এসব যদি একই লোকের কাজ হয়ে থাকে, তা হলে পুলিশ তাকে ধরলেই রাফিয়ানের খোঁজও পাওয়া যাবে।

তা ঠিক, সায় দিল আয়োলা। ...ঠিক আছে, রাখি তা হলে। কাস্টোমার এসেছে। যদি মনে করো আমার কোনও সাহায্য তোমাদের কাজে আসবে, তা হলে যোগাযোগ করতে দ্বিধা কোরো না।
কথাটা বলার জন্য ধন্যবাদ, বলল কিশোর। আগামীকাল হয়তো। ডগ-হাউসে তদন্ত করতে আসতে পারি আমরা।
বিদায় নিয়ে ফোন রেখে দিল ও, মুসা আর রবিনকে জানাল ফোনে, কী আলাপ হয়েছে, তারপর বলল, আজকে আর কিছু করার নেই। চলো, বাঘার খোঁজ করতে হবে। বাঘা কোথায় ছিল যখন রাফিয়ানকে নিয়ে গেল লোকটা?
বাড়ি থেকে বেরিয়ে পিছনের উঠানে চলে এলো ওরা। কিশোরের প্রশ্নের জবাবটা সহজেই জানা হয়ে গেল ওদের। একটা খুঁটির সঙ্গে চেইন দিয়ে বাঘাকে বেঁধে রেখে রাফিয়ানকে নিয়ে গেছে লোকটা। ওদের দেখে খুশিতে ঘনঘন লেজ নাড়াচ্ছে বাঘ। ওকে বাধনমুক্ত করতে করতে কিশোর বলল, আগামীকাল সকালে আমরা প্রথমেই যাব বিড়ালমানবী কারিনা মুরের সঙ্গে দেখা করতে। ভদ্রমহিলা কী বলেন শোনা দরকার।

.

পরদিন সকালে নাস্তার পর হাজির হয়ে গেল রবিন আর মুসা। দুজনই উত্তেজিত। খবরের কাগজে মিস্টার রকফেলারের কুকুরটার মুক্তির জন্য এক লাখ ডলার দাবি করা হয়েছে। স্পিঞ্জটার জন্য পাঁচ হাজার ডলার। এক সপ্তাহের মধ্যে কুকুরগুলোর মালিকদের বিজ্ঞাপন দিয়ে জানিয়ে দিতে হবে তারা টাকা দিতে রাজি আছে কি না। রাজি না থাকলে কুকুরের লাশ পাঠানো হবে বলে হুমকি দিয়েছে ডগন্যাপার। খবরটা কিশোরও পড়েছে। নাস্তা খেতে খেতে টুকটাক আলাপ সারল ওরা, কিশোর জানাল শ্যারন ফোন করেছিল, একেবারে ভেঙে পড়েছে রাফিয়ানের নিখোঁজ হওয়ার খবরটা পেয়ে। ওকে সান্ত্বনা দিয়েছে কিশোর, জোর দিয়ে বলেছে, রাফিয়ানকে ওরা উদ্ধার করবেই, যে-করে হোক।
কিশোরের নাস্তা শেষ হতেই চাচীকে বলে বেরিয়ে পড়ল তিনজন। গাড়ি চালাতে চালাতে মুসা বলল, কুত্তাচোরাটাকে আজকেই ধরতে পারলে ভাল হয়।
মৃদু হাসল, কিশোর। জিনার মুখোমুখি হবার চেয়ে কুকুর অপহরণকারীর মোকাবিলা করতে বেশি রাজি তুমি, কী বলো, মুসা?
অবশ্যই! নির্দ্বিধায় স্বীকার করল মুসা।
জিনা খেপে গেলে পিট বুলের চেয়েও ভয়ঙ্কর। কুকুর চোর কিছুতেই ওর চেয়ে বেশি ভয়ঙ্কর হতে পারে না।
ডগ-হাউসের দিকে চলেছে ওরা। রবিন বলল, মিস্টার লেবউফ যেমন বলেছিলেন, কারিনা মুর যদি তেমনি ক্ষ্যাপাটে কিসিমের মানুষ হন, তা হলে তার

কাছ থেকে কিছু জানা খুব কঠিন হবে।
কোর্টে তার বিরুদ্ধে কেস পর্যন্ত করেছিলেন মহিলা, বলল মুসা।
সে-কারণেই কারিনা মুর আমাদের প্রধান সন্দেহভাজন, নীচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর।
ডগ-হাউস পার হয়ে গেল ওরা। লক্ষ করল, এই ব্লকে কারিনা। মুরের বাড়িটাই একমাত্র আবাসিক, অন্য বাড়িগুলো সব অফিস। কারিনা মুরের বাড়িটা ডগ-হাউস থেকে মাঝখানের একটা ঝোপঝাড় গজানো। জমির কারণে বিচ্ছিন্ন।
ছোটখাটো দোতলা বাড়িটার সামনে গাড়ি রেখে এঞ্জিন বন্ধ করল মুসা। নেমে পড়ল ওরা গাড়ি থেকে।
বাড়ির সবগুলো জানালা বন্ধ। পিছন দিকে একটা বন্ধ গ্যারেজ দেখতে পেল ওরা। ওটার জানালার কাঁচগুলোতে রং করা হয়েছে, যাতে ভিতরে কী আছে দেখা না যায়। গোটা বাড়ি তিনফুট উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা, মাঝখানে একটা ছোট দরজা। ওটা ভিড়ানো আছে, ঠেলে ভিতরে ঢুকল ওরা।
এ মুসা, তুমি গ্যারেজটা খুঁজে দেখো, বলল কিশোর। আমি আর রবিন যাচ্ছি মহিলার সঙ্গে কথা বলতে।
মাথা ঝাঁকিয়ে লম্বা লম্বা পায়ে গ্যারেজের দিকে এগোল মুসা। কিশোর-রবিন চলল বাড়ির দরজা লক্ষ্য করে। দুবার বেল বাজানোর পর ভিতর থেকে সাড়া পেল ওরা। দরজাটা সামান্য ফাঁক হলো। ডাকাত ঠেকানোর চেইন খোলা হয়নি এখনও। উঁকি দিলেন এক মহিলা। তার ঘন চুলগুলো গাঢ় লাল রং করা। ভ্রূ নাচালেন ওদের দেখে।
মিস কারিনা মুর? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
কে জানতে চায়? খসখসে গলায় পাল্টা প্রশ্ন করলেন মহিলা।
নিজের আর রবিনের পরিচয় দিল কিশোর, তারপর বলল, আমরা কারিনা মুরের কাছে এসেছি ডগ-হাউসের একটা কুকুর চুরির ব্যাপারে কিছু কথা জিজ্ঞেস করতে।
আমিই কারিনা মুর, বললেন মহিলা। কুকুর চুরির ব্যাপারে কিছু জানি না আমি। জানতে চাইও না।
আমাদের কিছু প্রশ্ন ছিল, বলল কিশোর।
এক মুহূর্ত দ্বিধা করলেন কারিনা মুর, তারপর বললেন, তোমাদের চেহারা দেখে বুঝতে পারছি নাছোড়বান্দা টাইপের ছেলে তোমরা, সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত আমাকে রেহাই দেবে না। ঠিক আছে, ভেতরে এসো। চেইন খুলে দরজাটা ফাঁক করলেন তিনি, হাতের ইশারায় ওদের ভিতরে আসতে বললেন।

সামনে থেকে দেখে ওরা বুঝতে পারল, যা ধারণা করেছিল তার চেয়ে বয়সে অনেক কম হবেন মিস মুর। ওদের কল্পনায় ছিল সাদা। চুলওয়ালা বুড়ি এক মহিলা। চোখে তার জ্বলন্ত দৃষ্টি। কথায় কথায় ঘঁাৎ করে ওঠেন। বাস্তবে কারিনা মুর তেমন নন দেখে খানিকটা স্বস্তিই পেল কিশোর আর রবিন। মহিলার বয়স তিরিশের কাছাকাছি হবে। একটা গেঞ্জি পরে আছেন। ওটার বুকে বড় বড় করে লেখা: আমি বিড়াল ভালবাসি।

লিভিংরুমে চোখ বুলিয়ে কিশোর আর রবিন বুঝতে পারল বিড়াল কতোটা ভালবাসেন কারিনা মুর। জানালার তাক আর বুকশেলফের উপর সারি সারি সিরামিকের বিড়াল-মূর্তি। ঘরের দেয়ালে ঝোলানো প্রতিটি ছবিতে অন্তত একটা বিড়াল আছেই। এসব তো নিষ্প্রাণ। ঘরে শুয়ে বসে আছে জ্যান্ত বিড়ালের পাল। একসঙ্গে এতো বিড়াল কখনও দেখেনি কিশোর-রবিন। সবখানে বিড়াল হাজির। সংখ্যায় পঞ্চাশটার কম হবে না। কাউচের উপর, চেয়ারের উপর, ডাইনিং রুমের টেবিলের উপর-কোথায় নেই বিড়াল। একটু পরপর কিচেন থেকে ডাইনিংরুম আর ডাইনিংরুম থেকে কিচেনে দৌড়ে ঢুকছে বের হচ্ছে বিড়ালের দল।

বসো, বললেন কারিনা মুর। দেখো, আমার বিড়ালের ওপর বসে পোড়ো না যেন।

কাজটা কঠিন, মন্তব্য করল রবিন। আস্তে করে দুটো বিড়াল নামিয়ে চেয়ার খালি করে তাতে বসল ও। ওর পাশের হ্যাঁসোকটা খালি আছে, ওটাতে বসল কিশোর। একটা ইযিচেয়ারে বসেছেন কারিনা মুর।

বিড়াল আপনি খুবই ভালবাসেন, তা-ই না? আলাপ শুরু করার জন্য বলল কিশোর।

ওরা প্রকৃতির সবচেয়ে সুন্দর সৃষ্টি, মৃদু হাসলেন কারিনা মুর।

ঘরের ভিতর চোখ বুলাল কিশোর। সবগুলো বিড়ালই আপনার?

বিড়াল কখনও কারও হয় না, জবাব দিলেন মহিলা। ওরা শুধু। এই বাড়িটাকে নিজেদের বলে ধরে নিয়েছে। বিশেষ করে ওই জঘন্য। কুকুরের মোটেলটা খোলার পর ওদের অনেকেরই আর যাবার জায়গা ছিল না।

ডগ-হাউস থেকে একটা কোলি কুকুর চুরি গেছে, সে-ব্যাপারে আপনি কিছু জানেন? জিজ্ঞেস করল কিশোর।

না। দৃঢ় শোনাল কারিনা মুরের কণ্ঠ। কেবল নিউজ চ্যানেলে কিছু বলেনি, কাজেই জানি না। কিন্তু এতে করে যদি ওই বিচ্ছিরি ডগ হাউসটা বন্ধ হয়ে যায় তো আমি খুশিই হবো।

ডগ-হাউস চালু করার আগে মিস্টার লেবউফকে আপনি চিনতেন? নোটবুক খুলে রেখেছে রবিন তথ্যগুলো টুকে রাখার জন্য।

শুনেছি আপনি ডগ-হাউস যাতে চালু না হয় সেজন্যে অনেক চেষ্টা করেছেন, বলল কিশোর।
ডগ-হাউস খুলে এলাকাটার সর্বনাশ করতে চাইছে জানার আগে লোকটার নামও শুনিনি আমি, বললেন কারিনা মুর। ঠিকই বলেছ তোমরা, আমি ডগ-হাউস যাতে না হয় সেজন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। ভেবো না আমি হাল ছেড়ে দিয়েছি। ওই কেনেল ভয়ানক দুর্গন্ধ ছড়ায়। তা ছাড়া, কুকুরগুলো যখন চেঁচাতে শুরু করে, তখন আমার বিড়ালগুলো ঘুমাতে পারে না। আবারও কেস লড়ব আমি। এবার জিততেও পারি।
চট করে ঘরের ভিতরটা একবার দেখে নিল কিশোর। মহা আয়েশে ঘুমাচ্ছে বেশিরভাগ বিড়াল। আর গন্ধ যা ওর নাকে আসছে সেটা কিচেনে রাখা বিড়ালের খাবারের গন্ধ।
কাছেই ম্যান্টেলের ওপর রাখা একটা ছবিতে চোখ আটকে গেল। কিশোরের। ফ্রেমের ছবিতে বিড়াল নেই, শুধু মানুষের ছবি দেখে সামান্য বিস্মিতই হলো ও।
হাত দিয়ে ম্যান্টেল দেখাল ও। পারিবারিক ছবি?
হ্যাঁ। প্রায় সবাই দেশের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে বলে কারও সঙ্গে দেখাই হয় না বলতে গেলে। শুধু হারল্ড এখনও এখানে আছে। ছবিতে লম্বা চুলওয়ালা একজন যুবককে দেখালেন কারিনা মুর। হ্যারল্ড আমার সৎ ভাই। এখানেই বন্দরে কাজ করে।
রবিন জিজ্ঞেস করল, মালবাহী জাহাজের মালামাল, নামানোর কাজ?
না। ড্রাই-ডকে। একটা ক্রুজ শিপ মেরামত করছে ওরা এখন।
ডগ-হাউসের ব্যাপারে তার মনোভাব কেমন? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
ঠিক আমার মতো। হঠাৎ কড়া চোখে কিশোর আর রবিনের দিকে তাকালেন কারিনা মুর। অ্যাই, তোমরা নিশ্চয়ই ওই চুরির ব্যাপারে হারল্ড বা আমাকে সন্দেহ করছ না?
প্রমাণ ছাড়া কাউকে অভিযুক্ত করতে এখানে আসিনি আমরা, শান্ত স্বরে বলল কিশোর। কিন্তু আরেকটা প্রশ্ন আছে আমার। ডগ-হাউসে ইদানীং কিছু ফোনকল আসছে...
কিশোরকে থামিয়ে দিলেন কারিনা মুর। আমার যদি লেবউফকে কিছু বলার থাকে, তা হলে তার মুখের ওপর বলব আমি। বুঝতে পেরেছ? যা বলার সরাসরি বলব। উঠে দাঁড়ালেন তিনি। যথেষ্ট সময় দিয়েছি তোমাদের। এবার তোমরা এলে আমি খুশি হবো।
.

রবিন আর কিশোর কারিনা মুরের সঙ্গে কথা বলতে বাড়িতে ঢুকে যাওয়ার পর গ্যারেজের রং করা জানালা দিয়ে ভিতরে কী আছে দেখার চেষ্টা করল মুসা। রং যে-ই করে থাকুক, কাজে কোনও খুঁত রাখেনি। ভিতরের কিছুই দেখা যাচ্ছে না। মুসার মনে হলো, গ্যারেজে কিছু
লুকিয়ে রাখা হয়েছে কি না কে জানে।
।গ্যারেজের পাশে একটা দরজা দেখতে পেল ও। নব মুচড়ে ওটা খোলার চেষ্টা করে দেখল। কাজ হলো না। তালা মারা। সামান্য আওয়াজ হয়েছে। কোলি, জার্মান স্পিঞ্জ আর রাফিয়ান যদি ভিতরে থাকত, তা হলে নিশ্চয়ই এতোক্ষণে চিৎকার জুড়ে দিত। নব ধরে আবারও শব্দ করল ও। ডাকল না কোনও কুকুর। নিশ্চিত হওয়ার জন্য দরজায় কান ঠেকাল মুসা।
এবার শুনতে পেল। তবে গ্যারেজের ভিতর থেকে নয়, আওয়াজটা আসছে রাস্তার দিক থেকে। আওয়াজটা চিনতে পারল ও। কোনও গাড়ির দরজা খোলার শব্দ। কিন্তু গাড়িটা আর কোনও গাড়ি নয়, ওর। ফোক্সওয়াগেন! কেউ ওর গাড়ির দরজা খুলেছে!
কিশোর আর রবিন কথা সেরে গাড়ির কাছে চলে গেছে তা হলে, ভাবল মুসা। দেরি না করে গাড়ির দিকে পা বাড়াল ও।
ফোক্সওয়াগেনের ড্রাইভারের পাশে প্যাসেঞ্জারের দরজাটা খোলা। ভিতরে কে যেন নড়ছে। চেহারা দেখতে পাচ্ছে না মুসা, কিন্তু স্পষ্ট
বুঝতে পারল, যে-ই হোক না কেন মানুষটা, রবিন বা কিশোর নয়।
এই মাত্র বাড়িটা থেকে বেরিয়ে এসেছে রবিন-কিশোর!
তা হলে গাড়ির ভিতর কে?
কিশোর-রবিন! গাড়ির ভেতর কে যেন ঢুকেছে, দৌড়াতে শুরু করল মুসা। থমকে দাঁড়াল কিশোর আর রবিন, তারপর পিছু নিল ওর।
মুখোশ পরা লোকটা ঝুঁকে গ্লাভ কম্পার্টমেন্ট হাতড়ে কী যেন খুঁজছে।
গাড়ির কাছে আগে পৌঁছুল মুসা, কড়া গলায় জিজ্ঞেস করল, কী করছেন আপনি আমার গাড়ির ভেতর?
দরজার সামনে দাঁড়িয়েছে ও, এদিক দিয়ে লোকটা বের হতে পারবে না।
ঝাঁকি খেয়ে সিধে হলো উলের টুপি আর রাবারের মুখোশ পরা লোকটা। ভূতের মতো লাগছে তাকে দেখতে। রাত হলে মুসা এর ধারেকাছেও যেত না, কিন্তু এখন সকালের উজ্জ্বল রোদে ভয় কীসের!
সাহায্য করতে রবিন আর কিশোরও ছুটে আসছে। এবার বাগে পাবে ওরা লোকটাকে। তিনজন ঝাঁপিয়ে পড়লে হালকা গড়নের লোকটা গায়ের জোরে

কিছুতেই পারবে না ওদের সঙ্গে। কুকুরচুরি রহস্যের সমাধান বোধহয় হয়েই গেল। এবার বোধহয় রাফিয়ানের খোঁজও পাওয়া যাবে।
এক পলকে চিন্তাগুলো খেলে গেল মুসার মাথায়। পরক্ষণেই হতভম্ব হয়ে যেতে হলো ওকে। গ্লাভ কম্পার্টমেন্টে রাখা রবিনের কয়েকটা পত্রিকা ওর মুখে সজোরে ছুঁড়ে মেরেছে লোকটা। চোখ বাঁচাতে হাত দুটো মুখের সামনে তুলল মুসা, এক পা পিছিয়ে গেল। ওর দ্বিধার সুযোগে মুহূর্তের মধ্যে ড্রাইভিং সিটে পিছলে সরে গেল লোকটা, তারপর ওদিকের দরজা খুলে নেমেই ঝেড়ে দৌড় দিল ফাঁকা জমির ঝোপঝাড় লক্ষ করে।
সামলে নিয়ে মুসা দেখল, ঝোপের ভিতর ঢুকে যাচ্ছে মুখোশ পরা চোর। চোখের পলকে ঝোপের আড়ালে চলে গেল লোকটা। দৌড়ে কয়েক পা গিয়েই থেমে দাঁড়াল মুসা। একটা গাড়ির এঞ্জিন গর্জে উঠেছে। দ্রুত ছুটল গাড়িটা। এঞ্জিনের আওয়াজ দূরে সরে যাচ্ছে। এখন আর লোকটাকে ধরা যাবে না। ফোক্সওয়াগেনের কাছে ফিরল মুসা। রবিন আর কিশোর চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল ওর দিকে।
চেহারা দেখতে পেয়েছ? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
না। মাথা নাড়ল মুসা। গ্লাভ কম্পার্টমেন্টে কী যেন খুঁজছিল। গাড়িটা রেখেছিল ঝোপের ওদিকের রাস্তায়। আমাকে চমকে দিয়ে পালিয়ে গেছে।
পরেরবার ধরা যাবে, সান্ত্বনা দিল রবিন।
কিশোর বলল, কী খুঁজছিল জানা দরকার। গাড়িচোর নয় তো?
গাড়িতে উঠল ওরা। হ্যান্ডব্রেক খুলে এঞ্জিন স্টার্ট দিল মুসা। পিছনের সিট থেকে রবিন বলল, মুসার গাড়ি চুরি করবে না কোনও চোর। চোরদের একটা প্রেস্টিজ আছে না! এ-জিনিস বেচবে কোথায়? যারা চোরাই মাল কেনে তারা কিনবে তো না-ই, বরং টিটকারি দেবে চোরকে।
গম্ভীর চেহারা করে গাড়ি চালাচ্ছে মুসা, কিছু বলল না। ওর পাশেই বসে আছে কিশোর, গ্লাভ কম্পার্টমেন্ট ঘেঁটে বলল, কাগজপত্র সব ঠিকই আছে। ভাগ্যিস মোবাইল ফোনটা বাসায় রেখে এসেছ বলে ওটা নিতে পারেনি। ওয়্যারহাউসে যে কুকুরের হুকটা পেয়েছিলাম, ওটা নিয়ে গেছে। বোধহয় আঙুলের ছাপ ছিল। আগেই ওটা পুলিশের কাছে দেয়া দরকার ছিল আমাদের, পরে দেব ভেবে ভুল করেছি।
আর কিছু নেয়নি? ড্রাইভিঙের ফাঁকে জিজ্ঞেস করল মুসা।
না।
খিদে লেগে গেছে, প্রসঙ্গ পাল্টাল মুসা। সেই কখন নাস্তা করেছি, সব হজম হয়ে গেছে।

তা হলে বন্দরের দিকে চলো, বলল কিশোর। ওখানে সাগরের তীরের কোনও একটা রেস্তোরাঁয় বার্গার খাওয়া যাবে। তারপর ওখান থেকে যাব কারিনা মুরের সৎ ভাইয়ের খোঁজ করতে। রেস্তোরাঁগুলোর কাছেই ড্রাই-ডক। এ লাইমস্টোন স্ট্রিট ধরে এগিয়ে চলল ওরা, বন্দরে সাগর-তীরে ছোট একটা রেস্তোরাঁর সামনে থামল। ভিতরে কাস্টোমার অনেক। গমগম করছে গোটা রেস্তোরাঁ। ওরা বসল কিচেনের দরজার কাছেই একটা টেবিলে।

কী দেব? এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল এক তরুণী ওয়েইট্রেস। তার পোশাকে নাম লেখা আছে। রাফেলা জুলিয়ান।

মুসা অর্ডার দিল। বার্গার, আলুর চপ, পিজা আর কোক। ওয়েইট্রেস চলে যাবার পর ও জিজ্ঞেস করল, কী জানা গেল কারিনা মুরের সঙ্গে কথা বলে?

রবিন আর কিশোর খুলে বলল মহিলার সঙ্গে কী কথা হয়েছে। কিশোর শেষে যোগ করল, মিস্টার লেবউফ আর তার ডগ-হাউস দুচোখে দেখতে পারেন না কারিনা মুর। তাঁর সৎ ভাই হারল্ড মুরেরও ডগ-হাউস সম্বন্ধে একইরকম মনোভাব। উনি বোনের বাড়িতেই থাকেন।

তা হলে আমার গাড়িতে হুক খুঁজছিল যে-লোকটা সে তো কারিনা মুরের ভাই হারল্ড মুরও হতে পারে, বলল মুসা। যদি কাজে না গিয়ে থাকে, তা হলে নিশ্চয়ই দেখেছে তার বোনের বাড়ির সামনে গাড়ি রেখেছি আমরা। এবার ও বন্ধুদের জানাল গ্যারেজে খুঁজতে গিয়ে কোনও ফায়দা হয়নি। জানালায় রং এতো পুরু যে, ভেতরের কিছু দেখা যায় না। তবে আমি শিওর, ওই গ্যারেজের ভেতর কোনও কুকুর নেই।

ওয়েইট্রেস ওদের জন্য খাবার নিয়ে এলো। কিশোর তাকে জিজ্ঞেস করল, এখানে অনেকদিন ধরে কাজ করেন, মিস রাফেলা?

অনেক বেশিদিন ধরে, মিষ্টি হেসে জবাব দিল ওয়েইট্রেস। আমার ইচ্ছে ছিল দুবছর আগেই আমি দুনিয়া কাঁপানো এক সুপারমডেল হয়ে যাব। কিন্তু এখনও হতে পারিনি। কাজেকর্মে একটু পিছিয়ে পড়েছি বলতে পারো।

বুঝতে পারছি আপনার কেমন লাগে, বলল কিশোর। মুসাকে দেখাল। এই যে, নিল আর্মস্ট্রঙের স্যাঙাত লাল লেগউইক। পরের রকেটেই মহাকাশে যাওয়ার জন্যে মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে ও। কিন্তু যেতে আর পারছে না কিছুতেই।

আবার হাসল রাফেলা জুলিয়ান। আমাদের এখানে মহাকাশচারীরা প্রায় আসে না বললেই চলে।

রাফেলা জুলিয়ানের সঙ্গে সহজ, সুন্দর একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। বুঝে কিশোর চট করে প্রশ্ন করল, নভোচারী তো সহজে আসে না, কিন্তু হলুদ দরজাওয়ালা ধূসর কোনও পুরোনো গাড়ি চালিয়ে কেউ আসে?

গাড়িটা দেখেছি, বলল রাফেলা। প্রায়ই এদিক দিয়ে যাওয়া আসা করে। প্রাচীন একটা জঞ্জাল।
আর ওটার ড্রাইভার? গাড়িটা কে চালায় দেখেছেন?
দেখেছি। এক যুবক। তবে চেহারা খেয়াল করে রাখিনি। এখনও যদি এখানে এসে ঢোকে তো চিনতে পারব না।
কিশোর জিজ্ঞেস করল, শেষ কবে গাড়িটা দেখেছেন মনে করতে পারেন? না। সামান্য সময় চিন্তা করল ওয়েইট্রেস, তারপর বলল, গতকাল। গতকাল দেখেছি এদিক দিয়ে যেতে।
প্রসঙ্গ পাল্টাল কিশোর। রাস্তার মাঝখানে একটা পরিত্যক্ত ওয়্যারহাউস আছে, ওখানে কখনও কাউকে ঢুকতে বের হতে দেখেছেন? বা কোনও গাড়ির যাওয়া আসা চোখে পড়েছে?
না। আমি মাঝেমধ্যে ওটার কাছে গাড়ি রাখি, কিন্তু কাউকে কখনও দেখিনি। ভ্রূ নাচাল রাফেলা জুলিয়ান কিশোরের দিকে তাকিয়ে। কী। ব্যাপার বলো তো? তোমরা কি গোয়েন্দা না কি?
নিজেদের পরিচয় দিল কিশোর, তারপর আবার জিজ্ঞেস করল, ওয়্যারহাউসের দরজা সবসময় খোলা থাকে?
মাথা ঝাঁকাল রাফেলা। তা-ই তো দেখেছি। একটু থেমে জিজ্ঞেস করল, ওই গাড়ির ড্রাইভারের ব্যাপারে জানতে চাইছ কেন, টাকা পাও তোমরা তার কাছে?
না, খুঁজছি সে একটা কুকুর চুরি করেছে বলে, জানাল মুসা।
কাউন্টারের কাছে রিংটিং করে একটা বেল বেজে উঠল। ডাকছে,, হাতের ইশারা করে কিচেনের দিকে চলে গেল রাফেলা জুলিয়ান।
খেতে শুরু করল মুসা। মাঝে মাঝে কোকে চুমুক দিচ্ছে। রবিন। আর কিশোরও ব্যস্ত হয়ে পড়ল। খাওয়া শেষে মিষ্টি হিসাবে আপেলের পাই নিল ওরা। মুসা সেই সঙ্গে পিচও খেল। বিল আসার পর তিনজন ভাগ করে মিটিয়ে দিল টাকাটা।
কাউন্টারের পাশের পে-ফোন থেকে রকি বিচের সরকারী কর। বিভাগে নির্দিষ্ট নাম্বারে ফোন করল কিশোর। কর অফিসে মিস্টার ভিক্টর সাইমনের পরিচিত এক ভদ্রলোক কাজ করেন। তিনি ওদেরও পরিচিত। রিচার্ড বার্লিসন নাম তাঁর। পাওয়া গেল তাঁকে। কিশোরের কথা শুনে বললেন, ঠিক আছে ওয়্যারহাউসটার মালিক কে সেটা খুঁজে বের করে রাখব। আমার মোবাইল ফোন নষ্ট। কাজটা অফিসের কোনও ব্যাপার নয়, কাজেই অফিসের ফোনটা ব্যবহার করতে চাই না। দুঘণ্টা পর তোমরা অফিসে এলে আশা করি জানাতে পারব যা জানতে চাও।
ওদের হেডকোয়ার্টারের ফোন আর মোবাইল ফোন-দুটোর নাম্বারই তাকে দিল কিশোর, ধন্যবাদ জানিয়ে ফোন রেখে দিল। বন্ধুদের কাছে ফিরে এসে বলল,

ড্রাই-ডক খুবই কাছে, চলো হেঁটেই যাওয়া যাক।
হাত নেড়ে জুলিয়ানের কাছ থেকে বিদায় নিল ওরা, তারপর বেরিয়ে এলো রাস্তায়।
ড্রাই-ডকে যে ক্রুজ শিপটা মেরামত হচ্ছে ওটার নাম স্টার অভ বারমেট। তিন তলা সমান উঁচু হবে অন্তত। বিশাল ডক থেকে র‍্যাম্প আর গ্যাঙওয়ে দুপাশ দিয়ে উঠে গেছে ওটার উপর। সূর্য বাঁচিয়ে ক্রেনের মাথা আর বুমগুলোর শীর্ষ দেখার জন্য তিন গোয়েন্দাকে চোখের উপর হাত রাখতে হলো। জাহাজের উপর ঝুঁকে আছে ওগুলো, দেখলে মনে হয় সরু রাস্তার দুধারে দাঁড়ানো বড় বড় গাছ রাস্তাটাকে উপর থেকে ঢেকে রেখেছে।
ওই যে ফোরম্যানের ঘর, জাহাজের বোর সামনে ভ্রাম্যমাণ একটা ধাতৰ কুটির দেখাল কিশোর। শিপইয়ার্ডের চওড়া দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকল ওরা। চারপাশে কর্মীদের ব্যস্ততা, মেশিনের গুঞ্জন।
দরজা দিয়ে ঢুকতেই শক্ত হ্যাট পরা একজন লোককে দেখতে পেল ওরা। তাঁর হ্যাঁটে ফোরম্যান শব্দটা লেখা রয়েছে। ভদ্রলোকের সামনে থেমে নিজেদের পরিচয় দিল কিশোর, তারপর কার খোঁজে এসেছে জানাল।
হ্যারল্ড মুর? নামটা আউড়ালেন ফোরম্যান। দাঁড়াও, দেখে বলতে হবে। পকেট থেকে একটা কালো রঙের নোটবুক বের হলো তাঁর। কাগজ উল্টাতে উল্টাতে ফোরম্যান আপনমনে বললেন, আজকে দেখেছি বলে মনে পড়ছে না। আজকের উপস্থিতির তালিকা পেয়ে চোখ বুলাতে শুরু করলেন, তারপর দেখা শেষে মুখ তুললেন। নোপ। আজকে ওর আসার দিন নয়।
বিদায় নিয়ে ড্রাই-ডক থেকে বেরিয়ে আসার পর মুসা বলল, আমাদের কাজ কিছুই এগোচ্ছে না।
চলো, সৈকত ধরে কিছুক্ষণ ঘুরি, প্রস্তাব করল রবিন। রাফেলা বলেছে কালকে সে ধূসর গাড়িটা দেখেছে। কপাল ভাল হলে আমরাও হয়তো ওটার দেখা পেয়ে যাব।
হাঁটতে হাঁটতে নীচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর, আপনমনে তদন্তের কথা বলতে শুরু করল, আমরা এক মহিলাকে চিনি, যিনি বিড়াল ভালবাসেন আর কুকুর ঘৃণা করেন। কিন্তু ডগ-হাউস বন্ধ করতে যা কিছু তিনি করেছেন, সবই আইনত সঠিক। আমাদের হাতে, এমন কোনও প্রমাণ নেই যে কোলিটা চুরি হওয়ার সঙ্গে তিনি কোনভাবে জড়িত। এদিকে হারল্ড মুর যেহেতু কাজে আসেনি, সে আমাদের গাড়িতে খুঁজে থাকতে পারে। হুকটা হয়তো সে-ই নিয়ে গেছে। এমনও হতে পারে সে কারিনা মুরের সঙ্গে আমাদের কথাবার্তা শুনেছে, তারপর ঠিক করেছে এ-ব্যাপারে নিজে সে কিছু করবে।

সবই আন্দাজ, বলল মুসা। আমাদের হাতে নিরেট প্রমাণ নেই।
হাঁটছে ওরা, এদিক ওদিক চোখ বুলাচ্ছে। কোথাও ধূসর গাড়িটা চোখে পড়ছে না। হাঁটতে হাঁটতে সেই পরিত্যক্ত ওয়্যারহাউসের কাছে। চলে এসেছে ওরা। একবার খুঁজে দেখা যায় ওখানে, বলল রবিন। হয়তো নতুন কিছু চোখে পড়ে যেতে পারে।
ফটকটা দেখছি বন্ধ, বিড়বিড় করল কিশোর, তারপর গলা চড়িয়ে বলল, জুলিয়ান বলেছিল না দরজা সবসময় খোলা থাকে?
ধীরে চলা একটা লাল পিকআপ ট্রাক পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল ওরা, তারপর রাস্তা পার হয়ে ওয়্যারহাউসের দরজার কাছে চলে এলো। ঘুরেফিরে দেখল, দুদিকের দুটো দরজাই বন্ধ; তালা মারা।
এতোদিনে সম্পত্তি রক্ষা করার ব্যাপারে মালিকের হুঁশ হয়েছে, বলল মুসা।
কিশোর সামনের ফটকের এক পাশে ছোট্ট একটা কাগজ দেখাল। ওতে লেখা: এই ওয়্যারহাউস বিক্রি হইবে।
অবশ্য এমনও হতে পারে কেউ চায় না আমরা ভেতরে ঢুকতে পারি, বলল কিশোর।
আবার মস্ত বাড়িটার পিছনে চলে এলো ওরা। একটা জানালা নীল ক্যানভাস দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে। ক্যানভাসটা তুলল মুসা। ভিতরে। তাকিয়ে বলল, একটা ডেস্ক দেখতে পাচ্ছি। একটা চেয়ারও আছে। এটা সেই ঘর, যেটাতে পিট বুলটাকে ছেড়ে গিয়েছিল কুত্তাচোরা। অফিসটা পরিষ্কার করা হয়েছে।
পাশ থেকে উঁকি দিল কিশোর, মেঝেতে পড়ে থাকা হলদে কাগজটা ওর চোখে পড়ল। একটা জিনিস ওর নজরে পড়েছে। মুসাকে বলল, ক্যানভাসটা তুলে রাখো, আমি ওই কাগজটা চাই। জানালার কিনারা দিয়ে ঝুঁকে মেঝে থেকে পুরোনো খবরের কাগজটা সাবধানে তুলে আনল ও। ওটার ভাঁজ থেকে ছোট একটা ভিজিটিং কার্ড খসে পড়ল নীচে। ওটা তুলল কিশোর। বলল, গতকাল এটা চোখে পড়েনি। মুসা আর রবিনকে কার্ডটা দেখাল ও।
এক্সেলসিয়র ল্যাবোরেটরিজ, জোরে জোরে পড়ল রবিন। এখানে সব ধরনের পরীক্ষা করা হয়।
স্বাভাবিক ভাবেই ঠিকানা দেওয়া আছে কার্ডে। রকি বিচের উত্তর প্রান্তে ল্যাবোরেটরিটা। আমাদের তদন্তের সঙ্গে এই ল্যাবোরেটরির কোনও সম্পর্ক থাকতে পারে? জিজ্ঞেস করল মুসা।
ব্যাপারটা কাকতালীয়ও হতে পারে, নীচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর, হয়তো ওয়্যারহাউসে কাজ করত এমন কেউ ফেলে গেছে।

এমনও হতে পারে আসলে এটা ফেলে গেছে রাফিয়ানের অপহরণকারী। কার্ডটার অপর পিঠ দেখল ও, সঙ্গে সঙ্গে জ্ব সঁচকে উঠল। পেন্সিল দিয়ে একটা নাম লেখা আছে পিছনে। ম্যানর। পকেটে রেখে দিল কিশোর। আপনমনে বলল, এই ম্যানরটা কে হতে পারে?

আল্লাহ্ জানেন, বিড়বিড় করল মুসা। রবিন কাঁধ ঝাঁকাল।

ওয়্যারহাউসের মালিক কে সেটা আগে জানতে হবে আমাদের, বলল কিশোর। চলো, সরকারী কর অফিসে যেতে হবে।

রেস্তোরাঁর সামনে ফিরে এলো ওরা, ফোক্সওয়াগেন চেপে রওনা হলো মূল শহরের দিকে। গাড়ি চালাচ্ছে মুসা, চলেছে টাউন স্কয়ারে। দুপুরের এই সময়ে ওখানে গাড়ি পার্ক করা বিরাট ঝামেলার কাজ। তবে মুসা পারল। একটা দামি স্পোর্টস্ কার খালি জায়গাটায় ঢোকার আগেই তোবড়ানো ফোক্সওয়াগন ঢুকিয়ে ফেলে বন্ধুদের দিকে চেয়ে বিজয়ীর হাসি হাসল মুসা।

চলো, গাড়ির দরজায় তালা মারার পর বলল মুসা, দেরি করতে চাই না। আমার আবার খিদে লেগে গেছে।

আশ্চর্যজনক হলেও রাস্তায় গাড়ির ভিড় তেমন একটা নেই। যাত্রীর দিকের দরজা খুলে নেমে পড়েছে রবিন, এবার কিশোর নামল। রবিন আর মুসা ফুটপাথে উঠে গেছে। একটা ফ্যাকাসে লাল পিকআপ ট্রাক বাঁক ঘুরতে দেখল কিশোর। ফোক্সওয়াগেনের দরজাটা বন্ধ করতে করতে শুনতে পেল এঞ্জিনের গর্জন। হঠাৎ গতি বাড়িয়ে ছুটে আসছে ট্রাকটা।

মুখ তুলে ও দেখল, রাস্তার মাঝখান থেকে সরাসরি ফোক্সওয়াগেনকে লক্ষ্য করেই তেড়ে আসছে ট্রাক। করে কী! চিৎকার করল মুসা। কিশোর, সাবধান!

ফোক্সওয়াগেনের সামনে দুফুট ব্যবধানে আরেকটা গাড়ি রাখা আছে, সেই ফাঁকটার দিকে দ্রুত এগোল কিশোর। পা বাড়িয়েই টের পেল, বড় বেশি দেরি করে ফেলেছে। সোজা সামনের গাড়ির নাকে দড়াম করে গুঁতো মারল ট্রাক। প্রচণ্ড ধাক্কার কারণে গাড়িটার হ্যান্ডব্রেক ওটাকে জায়গায় রাখতে পারল না। পিছলে গেল, চাকাগুলো। হড়কে পিছাতে শুরু করল গাড়িটা। মুসার ফোক্সওয়াগেন আর ওটার মাঝখানের ফাঁক নিমেষে কমে আসছে। রবিন আর মুসা স্পষ্ট বুঝতে পারল, দ্রুত সরতে না পারলে চিড়েচ্যাপ্টা হয়ে যাবে কিশোরের পা!;

ঝট করে ফোক্সওয়াগেনের বোঁচা নাকের উপর উঠে পড়ল কিশোর। আরেকটু হলেই পিছলে পড়ে যাচ্ছিল, ওয়াইপার দুটো ধরে তাল সামলাল। ঠিক তখনই সামনের গাড়িটার পিছনের দিক ফোক্সওয়াগেনের সামনের বাম্পারে ধাক্কা মারল। বাড়ি খেয়ে থরথর করে কেঁপে উঠল গাড়ি দুটো। লাফ দিয়ে

ফোক্সওয়াগেন থেকে পাশের ফুটপাথে নামল। কিশোর। পিকআপ ট্রাক ততোক্ষণে পিছিয়ে গেছে, স্টিয়ারিং হুইলের পিছনে বসা লোকটার মুখ এক পলকের জন্য দেখতে পেল তিন গোয়েন্দা। একটা রাবারের মুখোশ পরে আছে সে। গর্জন তুলে ছুটতে শুরু করল ট্রাক, সামনের বাঁকটা ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল।
কয়েকজন পথচারী থেমে দাঁড়িয়েছে। উদ্বিগ্ন চেহারায় ঘিরে ফেলল ওদের। সবাই জানতে চাইছে কিশোর আহত হয়েছে কি না, তাকে হাসপাতালে নিতে হবে কি না। তেমন কিছু হয়নি বলে তাদের ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় করল কিশোর। ওর পাশে চলে এসেছে রবিন আর মুসা।
রবিন বলল, ইচ্ছে করে কাজটা করেছে লোকটা।
একেবারে শেষ মুহূর্তে টের পেয়েছি কী করতে যাচ্ছে, ব্যথায় বিকৃত মুখে জানাল কিশোর, দুহাতে গোড়ালি মালিশ করছে। লাইসেন্স নাম্বারটা খেয়াল করেছ কেউ? বুদ্ধির খেলা।
না, হতাশ দেখাল মুসাকে। তবে যাবার সময় আমার গাড়িতে ঘষা খেয়েছে তার ট্রাকের পাশ। লাল রং লেগে গেছে।
ঠিক এই রঙের একটা ট্রাক দেখেছি আমি বন্দরের কাছে, বলল রবিন। মনে নেই? ওয়্যারহাউসে যাবার সময় পাশ কাটাল যেটা।
মনে পড়েছে, বলল মুসা। তখন লোকটা আস্তে আস্তে যাচ্ছিল।
হয়তো আমাদের নজরে রাখছিল, সেটাই আস্তে যাবার কারণ, বলল কিশোর। বোধহয় আমাদের গাড়ি অনুসরণ করে এখানে এসে হাজির হয়েছিল। টাউন স্কয়ারে চোখ বুলাল কিশোর। উদ্বিগ্ন পথচারীরা খারাপ কিছু ঘটেনি বুঝে যার যার মতো সরে পড়েছে। কিশোর আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল, মুসার কাঁধে ভর দিয়ে বলল, লোকটা অনেক আগেই ভেগেছে। চলো, কর অফিসে যাওয়া যাক।
রাস্তা পার হয়ে কর অফিসে ঢুকল ওরা। কিশোর চেনে তেতলার কোথায় বসেন ভদ্রলোক, সেখানে চলে এলো। তার প্রাইভেট সেক্রেটারি ওদের দেখে একটা কাগজ বাড়িয়ে দিয়ে বলল, মিস্টার বার্লিসন মিটিঙে ব্যস্ত। ধারণা করেছিলেন তোমরা আসতে পারো। এটা আমার কাছে রেখে গেছেন তোমরা এলে দেবার জন্যে।
কাগজে লেখা: দুঃখিত, কিন্তু ব্যস্ততার কারণে আগামী কয়েক ঘণ্টা কারও সঙ্গে দেখা করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠবে না। অফিসে নতুন কম্পিউটার বসানো হচ্ছে, আমি সেটার দায়িত্বে আছি। জিনিসটা এখনও ঠিক মতো কাজ করছে না। তবে আজ বিকেলের মধ্যেই চালু হয়ে যাবে। তখন ওয়্যারহাউসের মালিক কে সেটা জানাতে পারব। আমি ভুলিনি। পরে যোগাযোগ কোরো।

অফিস থেকে বেরিয়ে এসে কিশোর বলল, আয়োলাকে আমরা বলেছিলাম আজকে ডগ-হাউসে, তদন্ত করতে যেতে পারি। চলো, গিয়ে দেখা যাক সে ওখানে আছে কি না।
তার আগে লাঞ্চ, গাড়িতে উঠে বলল মুসা।
বার্গার হাউসের সামনে থামল ওরা, কিশোর-রবিন একটা করে বার্গার আর কোক নিল। মুসা তিনটে বার্গার সাবড়ে দিল, সেই সঙ্গে দুই ক্যান কোক
খাওয়া শেষে পে-ফোন থেকে ডগ-হাউসের নাম্বারে ফোন করল কিশোর। ফোন তুললেন মিস্টার লেবউফের স্ত্রী। কিশোরের জিজ্ঞাসার জবাবে জানালেন, আজকে দুপুরটা ছুটি নিয়েছে আয়োলা মর্টন, তারপর বললেন, ওকে আমাদের রাতের শিফটের জন্যে দরকার হবে।
কিশোর জিজ্ঞেস করল, আপনাদের ওখানে আর কোনও সমস্যা হয়েছে?
না, সব ঠিক আছে, জানালেন মহিলা। আমার মনে হয় চুরিটা করে দূরে কোথাও চলে গেছে চোর। মুক্তিপণ চেয়ে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছে পরে। একটু থামলেন তিনি, তারপর বললেন, তুমি চাইলে আয়োলার অ্যাপার্টমেন্টের ফোন নাম্বার দিতে পারি। বেশিরভাগ সময়েই ও বাড়ি থাকে না, তবে আনসারিং মেশিন আছে ওর।
অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের ঠিকানা আর ফোন নাম্বারটা মুখস্থ করে নিল। কিশোর। মহিলাকে ধন্যবাদ দিয়ে লাইন কেটে আবার ফোন করল আয়োলার নাম্বারে।
ওপ্রান্তে রিসিভার তোলার আওয়াজ পেল, তারপর পরিচিত কণ্ঠ শুনে বলল, মিস আয়োলা? আমি কিশোর পাশা।
হাই! বলে উঠল আয়োলা। তদন্তের কাজ এগোল? আমার ফোন নাম্বার পেলে কোথায়?
মিসেস লেবউফের কাছ থেকে, বলল কিশোর। তদন্তের ব্যাপারেই আপনার সঙ্গে কিছু আলাপ ছিল। আমরা কি আপনার বাসায় আসতে পারি? ফ্রী আছেন আপনি?
আমার অ্যাপার্টমেন্ট একেবারেই অগোছাল, ক্ষমাপ্রার্থনার সুরে। বলল আয়োলা, এসো, অন্য কোথাও দেখা করি।
আমরা বার্গার হাউসে আছি, ঠিকানা দিয়ে বলল কিশোর। এখানে দেখা করবেন?
কোনও অসুবিধে নেই। পনেরো মিনিটের মধ্যে চলে আসব আমি। ফোন রেখে দিল আয়োলা মর্টন।
ঠিক পনেরো মিনিটের মাথাতেই হাজির হলো তরুণী। বাস থেকে নেমে এগিয়ে এলো বার্গার হাউসের দিকে। সামনের আঙিনায় ওর জন্য অপেক্ষা করছিল কিশোর-মুসা-রবিন, ওদের দেখে হাসল আয়োলা, হাত মিলিয়ে বলল, কী খবর?

হঠাৎ এতো জরুরি তলব? তদন্তের কাজ এগিয়েছে নিশ্চয়ই? ছেড়ে যাওয়া বাসটা দেখাল তরুণী, তারপর ব্যাখ্যা করল, আমার গাড়ি মেরামত করতে দিয়েছি।...এবার বলো কী জন্য ডেকেছ।
বলছি, মুসাকে ইশারা করল কিশোর।
বার্গার হাউস থেকে চারটে কোকের ক্যান কিনে নিয়ে এলো মুসা, তারপর রাস্তা পেরিয়ে পার্কের বেঞ্চে বসল ওরা চারজন। মাথার উপর ছায়া দিচ্ছে ওক গাছের ঘন সবুজ পাতা। ঝিরঝিরে বাতাস বিলি কাটছে ওদের চুলে।
যেজন্যে আপনাকে ডাকা, শুরু করল কিশোর, মিস্টার লেবউফ মনে করেন মিস কারিনা মুর কুকুরচুরির সঙ্গে কোনও না কোনও ভাবে জড়িত। আমরা যেটা জানতে চাইছি সেটা হলো, আপনার উপস্থিতিতে কারিনা মুর কি হুমকিমূলক কিছু করেছেন?
ফোন করা হয়েছে কয়েকবার, আগেই বলেছি, বলল আয়োলা, দুঢোক কোক খেল। কিন্তু আমি প্রমাণ করতে পারব না যে ওসব ফোন কারিনা মুরই করেছে।
আর তাঁর ছোট ভাই? হারল্ড মুর? সে কি ফোন করে থাকতে পারে? বা কুকুর চুরির সঙ্গে তার সম্পর্ক থাকা সম্ভব?
কী যেন ভাবল আয়োলা, তারপর আস্তে করে মাথা নাড়ল। না, মনে হয় না। হারল্ডকে আমি চিনি। কয়েকদিন আমাকে দাওয়াত দিয়ে খাওয়াতে চেয়েছে সে, যেতে পারিনি। রাতের ডিউটি করতে হলে সামাজিকতার আর উপায় থাকে না। জানো, লোকটা কী বলেছিল? বলেছিল ডগ-হাউস বন্ধ হয়ে যাবেই, তারপর তার সঙ্গে ঘুরতে যেতে অনেক সময় হাতে পাবো আমি।
ডগ-হাউস যখন প্রথম চালু হলো তখন যে-মহিলা ওখানে কাজ করতেন, বলল কিশোর, জেসিকা স্প্রিংগার। তিনি তো চাকরি ছেড়েছেন আরও ভাল একটা কাজ পেয়ে, ঠিক?
চাকরিটা সে ভাল চাকরি পেয়েছে বলেই শুধু ছাড়েনি, বলল আয়োলা। আসলে মিস্টার লেবউফ যখন তার বদলে নিজের স্ত্রীকে ম্যানেজার করলেন, তখন সে আর চাকরি করতে চায়নি। জেসিকা স্প্রিংগার এতো বিস্মিত হয়েছিল কেন সেটা আমার মাথায় ঢোকে না।
এমন ঘটনা তো হরহামেশাই ঘটে। এ তথ্যগুলো দ্রুতহাতে নোটবুকে টুকে নিচ্ছে রবিন। মুসা জিজ্ঞেস করল, মিস্টার লেবউফ বা তাঁর স্ত্রীকে কোনওরকম হুমকি দিয়েছিলেন জেসিকা স্প্রিংগার?
ভীষণ খেপে গিয়েছিল। যা-তা বলছিল। পাগলের প্রলাপ সব। নানারকম হুমকি দিয়েছিল। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছিল তার যেসব ডিগ্রি আছে তাতে সে-ই আসলে ম্যানেজার পদের জন্যে উপযুক্ত। তারপরও নিজের স্ত্রীকে ম্যানেজার করে

পার্শিয়ালটি করেছেন মিস্টার লেবউফ। হুমকি দিয়ে বলেছিল, বোমা মেরে পুরো বিল্ডিং সে ধসিয়ে দেবে। খুব খেপেছিল মহিলা।
কিশোর জিজ্ঞেস করল, ডগ-হাউসের চাকরি ছাড়ার পর, জেসিকা প্রিংগারের সঙ্গে কথা হয়েছে আপনার?
দুএকবার হয়েছে, বলল আয়োলা। তার নতুন অফিসে ফোন করেছিলাম কেমন আছে জানতে।
এখন তো তিনি পোষা প্রাণীদের খাবারের দোকানে কাজ করেন? জিজ্ঞেস করল মুসা।
হ্যাঁ। ওখানে ম্যানেজারের কাজ পেয়েছে। রকি বিচ মলের উল্টোদিকেই দোকানটা। অনেক বড় দোকান। ভাল ব্যবসা করে।
আরেকজনের কী হলো? কোকে চুমুক দিয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর। যাকে বরখাস্ত করা হয়েছিল? সেই অ্যানিমেল টেকনিশিয়ান?
বা চট করে ঘড়ির দিকে একবার তাকাল আয়োলা। নিক মিলহিজার? কাঁধ ঝাঁকাল তরুণী, উঠে দাঁড়াল। তার ব্যাপারে কিছু জানি না। এবার আমাকে যেতে হবে। ও, একটা কথা, যদি তোমরা জেসিকা প্রিংগারের সঙ্গে দেখা করো, তা হলে আমার তরফ থেকে তাকে হ্যালো বোলো।
মুসা জিজ্ঞেস করল আয়োলা মর্টনকে গাড়ি করে বাড়ি পৌঁছে দেবে। কি না। জবাবে ধন্যবাদ দিল আয়োলা, তারপর জানাল তার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।
বিদায় নেওয়ার আগে কিশোর বলল, আমাদের মনে যদি আরও কোনও প্রশ্ন আসে তা হলে আপনাকে জিজ্ঞেস করতে পারব তো?
নিশ্চয়ই! মৃদু হাসল আয়োলা মর্টন, হাত নেড়ে বিদায় নিয়ে বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে দাঁড়াল। আধ মিনিটের মাথায় একটা বাস এলো। ওটায় উঠে পড়ল। রওনা হয়ে গেল বাস।
এবার কী করা যায়? নোটবুক পকেটে রাখতে রাখতে জিজ্ঞেস করল রবিন।
আগে কোক শেষ করি, তারপর ভাবা যাবে, মুসা জবাব দিল।
কিশোর বলল, তাড়াতাড়ি শেষ করো। আমরা ওই পেট-শপে যাব।
বিশ মিনিট পর রকি বিচ মলের কাছে পৌঁছোল তিন গোয়েন্দা। একটা পার্কিং লটের পিছনের দিকে বিরাট পেট-শপটা। সামনে বিশাল ব্যানারে লেখা: এখানে জন্তু-জানোয়ারের সবধরনের খাবার পাওয়া যায়।
দোকানের সামনে গাড়ি রেখে নামল ওরা, ভিতরে ঢুকে একজন ক্লার্ককে জিজ্ঞেস করতেই জেসিকা স্প্রিংগারকে দেখিয়ে দিল সে।

মহিলার বয়স তিরিশের কাছাকাছি হবে। সোনালী চুল, বেণি করেছেন। একটা ক্যাশ রেজিস্টারের সামনে দাঁড়িয়ে ক্লার্ককে বলছেন কী যেন। অপেক্ষা করল ওরা, জেসিকা স্প্রিংগারের কথা শেষ হতেই কিশোর সামনে বেড়ে নিজেদের পরিচয় দিল। এবার বলল, ডগ হাউসের ব্যাপারে আমাদের কিছু প্রশ্ন ছিল।

জেসিকা স্প্রিংগারের হাসি মুহূর্তের মধ্যে মিলিয়ে গেল। কঠোর আর শীতল হয়ে গেল নীল চোখ জোড়ার দৃষ্টি। ক্লার্কের দিকে ফিরে বললেন অফিসে পাওয়া যাবে তাঁকে, তারপর তিন গোয়েন্দাকে হাতের ইশারায় সঙ্গে আসতে বলে দোকানের পিছনের দিকে পা বাড়ালেন।

উঁচু করে রাখা দুসারি খাবারের বাক্সের ভিতর দিয়ে সরু করিডর ধরে হাঁটছে ওরা। কিশোর লক্ষ করল, জন্তু বুঝে সাজানো হয়েছে পুরো দোকানটা। একদিকে কুকুরের খাবার, আরেকদিকে বিড়ালের। আরও আছে খরগোশ আর নানা জাতের পাখি এবং চারপেয়েদের খাবারের সেকশন। মাছের জন্যও বিরাট একটা সেকশন রাখা হয়েছে। তার পাশেই অজগরের জন্য খাবার। দোকানের ভিতর কুকুরের ঘেউঘেউ আর টিয়া পাখির টিটি আওয়াজে কানে তালা লেগে যাওয়ার দশা।

পত্রিকায় পড়েছি কুকুর চুরি আর মুক্তিপণ চাওয়ার ব্যাপারটা, হাঁটতে হাঁটতে বললেন জেসিকা স্প্রিংগার। একটা শপিং কার্টকে পাশ কাটালেন। দুপাশ থেকে ফর্কলিফটে করে খাবারের বাক্স আর বস্তা ওঠানো-নামানো চলছে। কেনাবেচা যেখানে হয় তার পিছনের অংশে অন্য কয়েকটা অফিসের পাশে জেসিকা প্রিংগারের অফিস। ভিতরে ঢুকবার পর হাতের ইশারা করলেন মহিলা। বসো।

বসল তিন গোয়েন্দা। সরাসরি কাজের কথায় এলো কিশোর। শুনলাম মিস্টার লেবউফ আর আপনার সম্পর্ক ভাল নয়। চাকরি ছাড়ার সময় নাকি ঝগড়াঝাটি হয়েছিল।

বলার মতো তেমন কিছু নয়, সহজ গলায় বললেন মিস জেসিকা। যখন সে চেইন ডগ মোটেল খুলল তখন তার আচরণ দেখে আমার মনে হয়েছিল ডিসট্রিক্ট ম্যানেজারের পদটা সে আমাকেই দেবে। পরে সে মত বদলায়, নিজের বউকে ম্যানেজার করে।

জানা যায় তারপর আপনি নানা ধরনের হুমকি দেন তাঁকে, নরম গলায় বলল কিশোর।

তা দিই, স্বীকার করে নিলেন জেসিকা স্প্রিংগার। মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল আমার। তোমরা কী শুনেছ আমি জানি না, তবে কোনও কুকুর চুরি করার কথা কখনোই বলিনি আমি। সামনে ঝুঁকে কিশোরের চোখে তাকালেন মিস জেসিকা।

লেবউফ আমাকে মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। সিদ্ধান্ত পাল্টে আমার বদলে নিজের বউকে ম্যানেজার করে সে।
আপনি তো এখানে ম্যানেজার, বলল মুসা। এই কাজটা ডগ হাউসে কাজ করার চেয়ে ভাল নয়?
ভুল শুনেছ তোমরা, চেয়ারে হেলান দিলেন মিস জেসিকা। আমি এখানে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার।
ভদ্রমহিলার বলার ভঙ্গিতে গর্বের সামান্যতম চিহ্নও খুঁজে পেল না কিশোর। মহিলা নিশ্চয়ই মনে করেন না এই চাকরিটা ডগ-হাউসের চাকরির চেয়ে ভাল।
আবার বলতে শুরু করলেন জেসিকা স্প্রিংগার। এখানে আমাকে শুধু ম্যানেজারিয়াল কাজই নয়, অন্য অনেক কাজই করতে হয়। অফিস ছুটির পর আমি ট্রাক থেকে মালও নামাই। অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার পদটা আসলে গালভরা একটা নাম। কেরানির কাজও করতে হয়। আমাকে। মোট কথা, যখন যে-কাজে দরকার পড়ে, সে-কাজই করতে হয়।
আপনারা তো দেখছি জন্তু-জানোয়ারের খাবার বিক্রির পাশাপাশি ওগুলো বিক্রিও করেন, বলল মুসা। পরক্ষণেই যোগ করল, ডগ-হাউস থেকে যে কোলি কুকুরটা চুরি গেছে ওটা খুব দামি কুকুর।
আমরা শুধু বাচ্চা কুকুর বিক্রি করি, প্রতিবাদের সুরে বললেন জেসিকা। আর ওগুলো কেনা হয় নামকরা ব্রিডারদের কাছ থেকে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত ফাইল সংরক্ষণ করি আমরা।
মিস জেসিকা স্প্রিংগারের পিছনের ফাইল কেবিনেটে অনেকগুলো লেবেল আঁটা রয়েছে। পিওরব্রিডস লেখা একটা লেবেল কিশোরের নজর কাড়ল। মিস জেসিকার টেবিলেও কয়েকটা ফাইল রয়েছে। তার একটাতে লেখা: ক্যানাইন অ্যাডপশন্স, অর্থাৎ ওটাতে পাওয়া যাবে কোন্ কুকুর কে কিনেছেন।
চোখ তুলে কিশোর লক্ষ করল ওর দিকেই তাকিয়ে আছেন জেসিকা স্প্রিংগার। বললেন, তোমরা যদি মনে করো এখানে কোনও চোরাই কুকুর আছে, তা হলে খুঁজে দেখতে পারো। টেবিলের ফাইলগুলোর উপর একটা বিড়ালের ম্যাগাজিন রাখলেন তিনি। এবার তার গলা কড়া শোনাল। আমাদের ফাইল বাইরের কারও দেখার অনুমতি নেই।
চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল কিশোর।
যাদের কাছে আমরা জন্তুজানোয়ার বিক্রি করি তাদের ব্যাপারে গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়, বললেন জেসিকা। তবে তোমরা ঘুরে দেখতে চাইলে নিক মিলহিজার ফিরলে ঘুরে দেখাতে পারবে।
নিক মিলহিজার এখানে চাকরি করেন? ভ্রু কুঁচকে উঠল মুসার।

ডগ-হাউসে যিনি চাকরি করতেন তিনিই? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
করলে তোমাদের কোনও অসুবিধে আছে? জেসিকা প্রিংগারের চেহারায় বিরক্তির ছাপ পড়ল।
না, তা নেই, নিজের সেরা বিনয়ী হাসিটা উপহার দিল কিশোর। কিন্তু দুজন মানুষ যদি এক জায়গায় কাজ করে, যারা ডগ-হাউস থেকে রাগারাগি করে বেরিয়ে এসে অন্যখানে কাজ নিয়েছে, তা হলে প্রশ্ন। উঠতেই পারে।
তোমার কথাটা আমি ধরলাম না, বললেন জেসিকা। তবে এবার, তোমরা আসতে পারো। অনেক কাজ পড়ে আছে আমার।
আমরা নিক মিলহিজারের সঙ্গে কথা বলতে চাই, উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল কিশোর। সেটা সম্ভব?
এখন নয়। ও একটা ডেলিভারি দিতে গেছে। ফাইলে চোখ নামালেন জেসিকা।
কখন ফিরবেন উনি? রবিনের প্রশ্ন।
জানি না। অফিসের দরজা দেখালেন জেসিকা। এবার তোমরা এসো। আমাকে কাজ করতে হবে।
এতো সাহায্য আর আতিথেয়তার জন্যে ধন্যবাদ, শুকনো গলায় বলল মুসা।
জেসিকা স্প্রিংগারের অফিস থেকে বেরিয়ে এলো তিন গোয়েন্দা।
আমরা কুকুরের খাবার কিনলে হয়তো উনি খুশি হতেন, মন্তব্য করল মুসা। হাত তুলে স্টোররুমের হাজার হাজার পাউন্ড পেট-ফুড দেখাল ও। খাবারগুলো আছে বিশ পাউন্ডের ব্যাগে। একটার উপর আরেকটা রেখে দেয়ালের মতো উঁচু করা হয়েছে ব্যাগগুলো। পুরো দশফুট উঁচু। বস্তার সারি সারি দেয়ালের মাঝখানে সরু করিডর।
ওয়্যারহাউসে কাজকর্মের আওয়াজ হচ্ছে, গুদামের কাছেও ভেসে আসছে সেই শব্দ। ধপ করে একটা আওয়াজ শুনতে পেল ওরা, যেন খাবারের কোনও ব্যাগ উপর থেকে পড়েছে। ওরা যেখানে আছে তার সামনে বাঁক ঘুরে চওড়া একটা করিডরে হাজির হলো একটা হলদে ফর্কলিফট। ইলেক্ট্রিক মটরের গুঞ্জন ক্রমেই জোরাল হচ্ছে। ওদের পাশের আরেকটা করিডরে চলে গেল ওটা।
ওরা যে করিডরে আছে সেটা এতো সরু যে দুজন একসঙ্গে হাঁটা যায় না। দুপাশে খাবারের বস্তার দেয়াল। সামনে হাঁটছে মুসা। কী যেন বলতে যাচ্ছিল ও, এমন সময় থপ করে একটা জোর শব্দ হলো। হঠাৎ ওর একদিকের ডগ-ফুডের বস্তার দেয়াল নড়ে উঠল। মুসার সামনে ধপাস করে পড়ল একটা বস্তা।
সাবধান! চিৎকার করে বলল মুসা। এদিকে আমরা আছি!
এখনও কাত হচ্ছে বস্তার দেয়াল। ওদিক থেকে ঠেলা দিচ্ছে সেই ফর্কলিফট।

উপর দিকে তাকাল মুসা। দেখল যে-কোনও মুহূর্তে দেয়ালের বড় একটা অংশ ধসে পড়বে।
মুসা! পিছিয়ে এসো! চেঁচাল কিশোর।
গলা কেঁপে গেল রবিনের। মুসা! জলদি!
কিশোর আর রবিন দ্রুত পিছাতে শুরু করেছে।
একবার উপরে তাকিয়েই মুসা বুঝে ফেলল ওর পক্ষে আর সরে। যাওয়া সম্ভব নয়। অজান্তেই মাথা ঢাকল ও দুহাত দিয়ে। ধপাধপ পড়তে শুরু করেছে বিশ পাউন্ড ওজনের বস্তা!
প্রথম বস্তাটাই ওর মাথার উপর পড়ল। পরের দুটো ওর কাঁধে। ওজনের কারণে বসে পড়তে হলো মুসাকে। আরও কয়েকটা বস্তার আঘাতে কাত হয়ে পড়ে গেল ও মেঝেতে। জলপ্রপাতের পানি যেমন অবিরাম পড়ে, তেমনি করে বস্তার পর বস্তা পড়তে শুরু করল ওর উপর। এক পাশের পুরো দেয়াল ধসে পড়ছে! টন টন ডগ-ফুডের বস্তার নীচে জীবন্ত কবর হয়ে গেল ওর।
অন্তত এক টন ওজনের অনেকগুলো বস্তা পড়ে ঢেকে ফেলেছে মুসাকে। মিহি ধুলো উড়ছে চারপাশে, সামনেটা ঠিক মতো দেখা যায় না। পাঁচ সেকেন্ড হলো, থেমে গেছে বস্তা পড়া। ধুলোর মধ্যে দিয়ে এস্ত পায়ে এগোল রবিন আর কিশোর।
রবিন ডাকল, মুসা! মুসা!
জবাব নেই!
মুসা! গলা আরও চড়ে গেল রবিনের। তারপর কিশোরকে পাগলের মতো বস্তা সরাতে দেখে হাত লাগাল ও-ও।
শ্বাসের ফাঁকে কিশোর বলল, তাড়াতাড়ি, রবিন, মুসা দম আটকে মারা যেতে পারে!
একটা একটা করে বস্তা সরাচ্ছে ওরা, ছুঁড়ে ফেলছে পিছনে। দোকানের কেউ এখনও জানে না এখানে কী ঘটেছে। কাউকে আসতে দেখা গেল না। ফর্কলিফটের এঞ্জিনের আওয়াজ দূরে চলে যাচ্ছে।
পনেরো-বিশটা বস্তা সরানোর পর একটা গোঙানি শুনতে পেল ওরা। আরও কয়েকটা বস্তা সরিয়ে ফেলার পর মুসার মাথা আর কাধ। দেখতে পেল।
মুসা, আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? উদ্বিগ্ন গলায় জিজ্ঞেস করল কিশোর। রবিন আর ও ব্যস্ত হাতে মুসার শরীরের উপর থেকে বস্তা সরাচ্ছে।
মুসা নড়ে উঠল। গা থেকে শেষ দুটো বস্তা সরিয়ে উঠে বসল ও, হাত দিয়ে কোমর ডলতে ডলতে বিড়বিড় করে বলল, খাইছে! খাবার ভালোবাসি আমি, কিন্তু তাই বলে এতো খাবার!
কাঁধ ধরে মুসাকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল রবিন আর কিশোর।

কোমর ডলছে মুসা, মুখ বিকৃত করে বলল, খাইছে! আমার কপালে আজকে হেভি খাবার ছিল!
কিছু ভাঙেটাঙেনি তো? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
না, বেঁচেই থাকব মনে হচ্ছে, জবাব দিল মুসা।
ধুলো সরে গেছে। ভাঙা দেয়ালের ওপাশে বেশ খানিকটা দূরে। ফর্কলিফটা দেখতে পেল ওরা। যন্ত্রটার ড্রাইভিং সিটে কেউ নেই!
মুসা ঠিক আছে বুঝে হাতের ইশারা করল কিশোর, ফিরে চলল ওরা জেসিকা স্প্রিংগারের অফিসে। নক না করেই দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল কিশোর। ওর ঠিক পিছনেই থাকল মুসা আর রবিন।
মা কাগজে কী যেন লিখছিলেন জেসিকা, দরজা খোলার আওয়াজে মুখ তুলে তাকালেন। ওদের দেখে ভ্রু কুঁচকে উঠল তাঁর। এখানে এখনও কী করছ তোমরা?
এই মাত্র আমাদের খুন করতে চেয়েছিল কেউ, বলে উঠল রবিন।
তা-ই না কি? বিদ্রুপের হাসি হাসলেন জেসিকা। গল্প বলতে হলে অন্য কোথাও গিয়ে বলো।
রবিন ঠিকই বলেছে, জোর দিয়ে বলল মুসা। আরেকটু হলেই আমার কোমর ভেঙে দিয়েছিল।
র চকিতে চিন্তার ছাপ খেলে গেল জেসিকার চেহারায়, এবার তিনি বললেন, সত্যিই যদি কোনও কিছু ঘটে থাকে তো সে-ব্যাপারে আমি কিছু জানি না। দেখতেই পাচ্ছ আমি এখানে ব্যস্ত ছিলাম। উঠে দাঁড়ালেন তিনি। চলো, দেখা যাক কী ঘটেছে।
অফিস ছেড়ে দুর্ঘটনার জায়গায় তিন গোয়েন্দার সঙ্গে এলেন তিনি। ধসে পড়া বস্তার তূপ দেখে বললেন, বাড়িয়ে বলেছ তোমরা। কে তোমাদের খুন করতে চাইবে! বস্তাগুলো বড় বেশি উঁচু করে সাজিয়ে রাখা হয়েছিল, পড়ে গেছে।
কয়জন ক্লার্ক আছে আপনাদের সেল্স্ ফ্লোরে? জিজ্ঞেস করল কিশোর, নীচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে।
ছয়জন। ইচ্ছে করলে তাদের সঙ্গে কথা বলে দেখতে পারো। আমি অফিসে যাচ্ছি। পা বাড়িয়েও থেমে দাঁড়ালেন জেসিকা:স্প্রিংগার। ঘাড় ফিরিয়ে কিশোরের দিকে তাকালেন। তোমরা নিক মিলহিজারকে খুঁজছিলে। ওই যে মিলহিজার। পুরু কাঁচের জানালার ওপাশে একজনকে হাত তুলে দেখালেন তিনি।
তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকাল ওরা। পেট প্রভিশন কোম্পানির একটা ভ্যান থেকে নামছে সোনালী চলের এক চিকন-চাকন যুবক।
আমরা তা হলে আসি, বিদায় নিল কিশোর জেসিকা স্প্রিংগারের কাছ থেকে, বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বলল, চলো, ভদ্রলোকের সঙ্গে বাইরেই কথা বলি।

অটোমেটিক দরজার ইলেকট্রনিক ফিল্ডের ভিতর যেতেই স্বয়ংক্রিয় ভাবে খুলে গেল দোকানের দরজাটা। বেরিয়ে এলো ওরা। মিস্টার মিলহিজার! ডাকল কিশোর।
ভ্যান মাত্র লক করেছে নিক মিলহিজার, ওদের দিকে ফিরে তাকাল। তিন কিশোরকে দেখে তার চেহারায় কৌতূহলের ছাপ ফুটে উঠল।
কী ব্যাপার?
তার সামনে গিয়ে থামল তিন গোয়েন্দা, সময় নষ্ট না করে কিশোর বলল, আমরা শুনেছি আপনি ডগ-হাউসে চাকরি করতেন। নিজেদের পরিচয় দিল ও।
ঠিকই শুনেছ, গম্ভীর হয়ে গেল নিক মিলহিজারের চেহারা।
কিশোর জিজ্ঞেস করল, চাকরিটা ছাড়লেন কেন?
লেবউফ যেসব কাজ আমাকে দিয়ে করাতে চেয়েছিল তা আমার পছন্দ হয়নি। আমি রেজিস্টার্ড অ্যানিমেল টেকনিশিয়ান। তার মানে বোঝো? ভেটেরিনারিয়ানের সঙ্গে কাজ করার যোগ্যতা আছে আমার। বলতে পারো পশুর নার্স। আর লেবউফ আমাকে বলেছিল কুকুরের গু পরিষ্কার করতে!
তারপর থেকে এখানে কাজ করছেন? জানতে চাইল মুসা।
হয়তো মনে হতে পারে কাজটা তেমন কিছু নয়, খানিকটা কৈফিয়তের সুরেই বলল মিলহিজার। কিন্তু এখানে আমাকে অন্তত অপমান করা হয় না। তা ছাড়া, এখানে দায়িত্ব দেয়া হয় আমাকে।
ঠিক বুঝলাম না, বলল কিশোর। দায়িত্ব বলতে কী বোঝাচ্ছেন?
পশুরা কী খাবে আর কখন খাবে সেটা আমিই ঠিক করি।
ডগ-হাউসে তা করতেন না?
না। ক্ষণিকের জন্য অপ্রস্তুত দেখাল মিলহিজারকে, তারপর জিজ্ঞেস করল, আমাকে এতো সব প্রশ্ন করছ কেন?
মিস্টার রকফেলারের কোলি কুকুরটা ডগ-হাউস থেকে চুরি গেছে, বলল কিশোর। আমরা সেই কুকুর-চোরকে খুঁজছি। সে-কারণেই আপনাকে প্রশ্ন করা।
কুকুরচুরির খবরটা পেপারে পড়েছি। কুকুরের জন্য তো মুক্তিপণ পর্যন্ত চেয়েছে। কালে কতোকিছু যে দেখব! কিশোরের চোখে তাকাল মিলহিজার। তা আমাকে চোর ভাবছ না কি!
অবশ্যই না, তাড়াতাড়ি বলল কিশোর। তদন্তের খাতিরে অনেককেই অনেক কথা জিজ্ঞেসা করছি আমরা। প্রসঙ্গ পাল্টাল ও।
আপনি যখন ডগ-হাউসে ছিলেন তখন তো আপনার কাছে ওখানকার চাবি ছিল। সেই চাবি কি আপনি জমা দিয়েছিলেন চাকরি ছাড়ার সময়?
নিশ্চয়ই! লেবউফের সামনে চাবিটা মেঝেতে ছুঁড়ে দিয়ে বেরিয়ে আসি আমি।

মিস জেসিকা বললেন আপনি ডেলিভারি দিতে গিয়েছিলেন, বলল মুসা। অ্যানিমেল টেকনিশিয়ানরা কি সাধারণত এধরনের কাজ করে থাকে?
মৃদু হাসল মিলহিজার। না, তা করে না। তবে জেসিকা ম্যানেজার হওয়ার চেষ্টা করছে। সে-কারণেই আমার সাহায্য করা। ওর সাফল্য মানে আমারও সাফল্য।
আর একটা প্রশ্ন, বলল কিশোর। আপনি কি এইমাত্র দোকানে ফিরেছেন?
নিশ্চয়ই! কেন?
না, এমনি। তদন্তে সহায়তা করার জন্য নিক মিলহিজারকে ধন্যবাদ দিল কিশোর, তারপর বলল, দরকার পড়লে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে তো?
নিশ্চয়ই! হাত নেড়ে দোকানের দিকে পা বাড়াল নিক মিলহিজার।
গাড়িতে উঠে মুসা আর রবিনের দিকে তাকাল কিশোর, জিজ্ঞেস করল, জেসিকা প্রিংগারের অফিসে অস্বাভাবিক কিছু তোমাদের চোখে পড়েছে?
না তো, এঞ্জিন স্টার্ট দিল মুসা।
অস্বাভাবিক কিছু দেখেছি বলে মনে পড়ছে না, বলল রবিন।
জানোয়ার রাখার বড় বড় কয়েকটা প্ল্যাস্টিকের খাঁচা দেখোনি?
ওই দোকান তো জন্তু-জানোয়ার বিক্রিও করে, বলল মুসা।
নিশ্চয়ই সেই সঙ্গে খাঁচাও বিক্রি করে। এক জায়গায় অনেকগুলো দেখেছি ওই জিনিস। কোনও কোনওটা তো এতো বড় যে সেইন্ট বার্নার্ড কুকুরও রাখা যাবে।
মিস জেসিকার অফিসে যেগুলো ছিল সেগুলো ব্যবহৃত। ওগুলোর একটা কোলি কুকুরটা রাখার মতো বড়।
কিন্তু মিস জেসিকা তো বলেছেন তারা শুধু বাচ্চা কুকুর বিক্রি করেন! চট করে তথ্যটা নোটবুকে টুকল রবিন।
মুসা জিজ্ঞেস করল, তা হলে বড় কুকুরের খাঁচা কীসের জন্য? আরও একটা ব্যাপার, ফাইল নিয়ে ওরকম গোপনীয়তাই বা কীসের? ফাইলে কী আছে যে তিনি ওগুলো আমাদের দেখাতে চাননি?
জানতে হবে সেটা, নীচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। আজ রাতেই জানব। রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর আসব, আবার। ততোক্ষণে দোকানটা বন্ধ হয়ে যাবে। দোকানে ঢোকার চেষ্টা করব। পেছন দিকের কয়েকটা জানালা খোলা দেখেছি, গ্রিল নেই। একটা জানালাও যদি খোলা থাকে, তা হলে কাজটা সহজই হবে। হয়তো মিস জেসিকার অফিসের ওই ফাইলগুলোর একটায় কোলি সম্বন্ধে কিছু পাওয়া যেতেও পারে।
আমি বাদ, বলল মুসা। কোমরটা একেবারে গেছে। ব্যথায় নড়তে কষ্ট হচ্ছে। রাতের খাবারের পর ব্যথার ট্যাবলেট খেয়ে সোজা। ঘুম দেব আমি।
রবিন? নথির দিকে তাকাল কিশোর।

চলে আসব, বলল রবিন। তোমার বাসায় রাত কাটাব বললে মা আপত্তি করবে না।
তা হলে এই কথাই রইল, সিটে হেলান দিয়ে বসল কিশোর।
রবিনকে আগে বাড়িতে নামিয়ে দিল মুসা, তারপর কিশোরকে স্যালভিজ ইয়ার্ডে নামিয়ে দিয়ে বাড়ির পথ ধরল।

.

সে-রাতে আটটার সময় পেট সুপারস্টোরের উল্টোদিকে পার্কিং লটে থামল একটা ফোক্সওয়াগেন গাড়ি। এটা মুসারটার মতো অতোটা তোবড়ানো নয়, রঙও আলাদা। নামল কিশোর আর রবিন। রবিন গাড়ি লক করার পর কিশোর বলল, চলো, আগে পেছন দিকের জানালাগুলো খোলা আছে কি না দেখি।
কপাল ভাল ওদের, একটা জানালা অল্প একটু ফাঁক হয়ে আছে। জানালা বন্ধ করা যার দায়িত্ব সে একটু বেখেয়াল।
উঠব কীভাবে? উঁচু জানালাটার দিকে তাকাল রবিন।
আমি বসছি, বলল কিশোর। তুমি আমার পিঠের ওপর উঠে জানালা দিয়ে ঢুকে পড়ো। পরে আমাকে টেনে তুলবে।
ধরা পড়লে কিন্তু কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে।
জানি। ঝুঁকি তো কিছু নিতেই হবে। পিঠ টনটন করছে, শীঘ্রি জানালা খোলো।
জানালা সামান্য ফাঁক হয়ে থাকলেও ছিটকিনি ঠিকই আটকানো আছে। পাঁচ মিনিট কসরত করে ওটা খুলতে পারল রবিন। ততোক্ষণে কিশোরের মনে হলো রবিনের ওজন শনৈঃ শনৈঃ বাড়ছে।
রবিন একবার ঢুকে পড়ার পর কিশোরের ঢুকতে তেমন কোনও অসুবিধে হলো না। হাত ধরে খানিকটা তুলল ওকে রবিন, বাকিটা দেয়ালে পা বাধিয়ে কিশোরই পারল।
পেটশপে কোনও সিকিউরিটি সিস্টেম নেই। হয়তো ভাবা হয়েছে। জন্তু-জানোয়ারের দোকানে চোর ঢুকবে না।
টর্চ জ্বেলে দেখল একটা স্টোররুমের ভিতর আছে ওরা। গুদামের দরজাটা ভিড়িয়ে রাখা হয়েছে, ওটা ঠেলে মূল দোকানের ভিতর ঢুকল দুজন, চলে এলো মালপত্র বিক্রি করার কাউন্টারগুলোর কাছে। পড়ে যাওয়া বস্তাগুলোকে আবার তুলে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। কাজটা নিক মিলহিজারকেই করতে হয়েছে কি না ভাবল কিশোর। বস্তা ফেলার পিছনে সে-ও থাকতে পারে, কথাটা মন থেকে মুছে ফেলল না। গোয়েন্দাদের কোনও সম্ভাবনাই বাদ দিতে নেই।
দোকানের পিছনে অফিসগুলোর কাছে চলে এলো ওরা।

তুমি অন্য অফিসগুলোয় ঢু মারো, রবিনকে বলল কিশোর। আমি যাচ্ছি মিস জেসিকার অফিসের ফাইলগুলো দেখতে।
আস্তে করে মাথা ঝাঁকিয়ে পাশের একটা অফিসে ঢুকল রবিন। কিশোর ঢুকে পড়ল মিস জেসিকার অফিসে। টর্চের আলোয় দেখল, ডেস্কটা খুব অগোছাল হয়ে আছে। আগেরবারও ব্যাপারটা খেয়াল করেছে কিশোর। মহিলা গোছানো স্বভাবের নন।
একটা একটা করে কাগজপত্র পরীক্ষা করে দেখতে শুরু করল ও। ইনভয়েস, বিজ্ঞাপন, বিজ্ঞাপনের খসড়া, আর চাকরিপ্রার্থীদের দরখাস্ত। ডেস্কের ডানদিকের ড্রয়ার ঘেঁটে কর্মচারীদের একটা ফাইল পেল। ওটাতে নিক মিলহিজারের দরখাস্ত দেখে পড়তে শুরু করল কিশোর গভীর মনোযোগে।

.

ওদিকে রবিন একটা অফিসে ঢুকে উল্লেখযোগ্য কিছু না দেখে বেরিয়ে এলো। এবার চলল দোকানের আরেক দিকে। ওর উদ্দেশ্য ফর্কলিং দেখা। সম্ভবত ওটার গায়ে আঙুলের ছাপের কোনও অভাব নেই। তবে তাতে কোনও কাজ হবে না। বস্তা পড়ার পর জিনিসটা আবার সরিয়ে রাখা হয়েছে। দোকানের কর্মচারীদের আঙুলের ছাপ পেলেও কিছু প্রমাণ করা যাবে না।
চট করে টর্চ নিভিয়ে ফেলল রবিন। ওর মনে হয়েছে একটা আওয়াজ শুনতে পেয়েছে। কিশোর নাকি? ডাকা ঠিক হবে না। যদি অন্য কেউ হয়? চোর? খানিক অপেক্ষা করে টর্চটা আবার জ্বালতে গিয়েও থেমে গেল রবিন। আবার আওয়াজটা হয়েছে। জেসিকা। স্প্রিংগারের অফিসের পাশের একটা অফিস থেকে শব্দটা আসছে বলে মনে হলো।
নিঃশব্দে সেদিকে এগোল রবিন। খেয়াল করল, দরজাটা সামান্য ফাঁক হয়ে আছে।
কান পাতল কাছাকাছি গিয়ে। না, কোনও আওয়াজ নেই। আস্তে করে ঠেলা দিয়ে দরজাটা খুলল ও। টর্চ জ্বেলে অফিসের ভিতরে আলো ফেলল। এটা একটা সাপ্লাই রুম। মেঝে পরিষ্কার করার সাবান আর মোমের পিপে দেখতে পেল। ভিতরে ঢুকল ও। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে টের পেল, ভুল করে ফেলেছে। দরজার পাল্লার আড়াল থেকে একটা ছায়া বের হতে দেখল ও চোখের কোণে। নড়ার আগেই একটা ঝাড়র হাতল সজোরে নেমে এলো ওর মাথার তালুতে। খুব জোরে লাগল আঘাতটা। জ্ঞান হারিয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল রবিন।

.

এদিকে এখনও জেসিকা প্রিংগারের ফাইল ঘাঁটছে কিশোর। নিক মিলহিজারের দরখাস্ত ছাড়া ওদের তদন্তের জন্য জরুরি আর কিছু এখনও পায়নি ও। কুকুর

যেগুলো বিক্রি হয়েছে সবগুলো বাচ্চা। কোথাও কোলির কোনও উল্লেখ নেই। রকি বিচ ব্যানার পত্রিকার একটা কাটিং দেখতে পেল। ওটাতে লেখা: সত্যিই কি কুকুরদের জন্য মোটেল চালু হবে?
আর্টিকেলে বিস্তারিত ভাবে লেখা হয়েছে কারিনা মুরের কথা। কীভাবে তিনি কোর্টে লড়েছেন তা জানা যাবে আর্টিকেলটা পড়লে। শেষদিকটা পড়ল কিশোর। ওখানে লেখা: ডগ-হাউসের শেষ দেখে ছাড়বেন বলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কারিনা মুর।
দ্রু কুঁচকে উঠল কিশোরের। এটা সগ্রহে রেখেছেন কেন জেসিকা স্প্রিংগার? কতোটা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কারিনা মুর? তিনি কি ডগ-হাউস বন্ধ করতে বেআইনী কিছুও করতে পারেন?
কয়েকটা হ্যান্ডবিল নজর কাড়ল, ওর। পেট সুপারস্টোর জg জানোয়ারদের একটা শো করবে। মালিকদের খাঁচায় করে তাদের পোষা প্রাণী আনতে বলা হয়েছে। তাদের যদি খাঁচা না থাকে, তা হলে দোকান। থেকে খাঁচা সরবরাহ করা হবে। একারণেই হয়তো মিস জেসিকার অফিসে এই ব্যবহৃত খাঁচাগুলো রাখা আছে, ভাবল কিশোর।
কাগজপত্র আগের মতো রাখতে রাখতে একটা আওয়াজ শুনতে পেল ও। কাজ থামাল না কিশোর। ধরেই নিয়েছে আওয়াজটা রবিন করেছে।
মাথার উপর আঘাতটা এলো হঠাৎ করেই। মেঝেতে পড়ে যেতে যেতে জ্ঞান হারানোর আগে ওর শেষ চিন্তা হলো: আওয়াজটা তা হলে রবিনের নয়!
অন্তত ঘণ্টাখানেক পর জ্ঞান ফিরল ওর। মাথার ব্যথায় কপাল কুঁচকে উঠল। উঠে বসতে চেষ্টা করল কিশোর। মাথায় কিসের যেন বাধা পেল। নতুন করে ব্যথা পেয়ে গুঙিয়ে উঠল কিশোর। কোথায় আছে ও? ছাদটা এতো নীচে নেমে এলো কী করে?
আস্তে আস্তে অন্ধকারে চোখ সয়ে এলো ওর। আগের চেয়ে ভাল দেখতে পাচ্ছে এখন। যা দেখল তাতে অবাক না হয়ে পারল না। স্টিলের গরাদগুলো খুব কাছাকাছি বসানো। খাঁচার ভিতর বন্দি করা হয়েছে ওকে? কিশোর ডাকল, রবিন?
জবাব এলো না কোনও। চারপাশে বিরাজ করছে কবরের নীরবতা।
মাথাটা যেন ছিঁড়ে পড়তে চাইছে। নড়তে চেষ্টা করল না আর। কিশোর। খুব অসুবিধেজনক অবস্থায় আছে ও। জায়গার অভাবে হাঁটু দুটো বুকের কাছে ভাঁজ করা। বুঝতে পারছে দাঁড়ানোর উপায় নেই। অন্ধকারে চোখ আরও সয়ে আসার পর বুঝতে পারল, একটা বাক্সের ভিতর আছে ও। দরজাটা তালা মারা। দুপাশে ছোট ছোট দুটো জানালা আছে, ওগুলোতেও স্টিলের গরাদ দেওয়া। এবার

কিশোর নিশ্চিত ভাবেই বুঝতে পারল কোথায় আছে। ডোবারম্যান বা জার্মান শেফার্ড রাখা যাবে এমন একটা খাঁচায় ওকে ঢুকিয়ে তালা মেরে দিয়েছে কেউ!
দরজায় ধাক্কা দিল কিশোর। ঝনঝন করে আওয়াজ হলো, তবে দরজার তালা এভাবে খোলা যাবে না।
কিশোর, তুমি? দুর্বল একটা কণ্ঠস্বর জিজ্ঞেস করল।
কাছেই আছে রবিন। খুব কাছাকাছি কোথাও। কোথায়? রবিন তুমি কোথায়?
আমি তোমার প্রতিবেশী, জবাব দিল রবিন।
মাথা বাঁচিয়ে সাবধানে একটা জানালা দিয়ে উঁকি দিল কিশোর। পাশের খাঁচার জানালায় রবিনের মুখ দেখতে পেল। ওকেও খাঁচার ভিতর পুরে তালা মেরে দেওয়া হয়েছে!
কাজটা কার দেখতে পেয়েছ? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
না, দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল রবিন। পেছন থেকে আঘাত করেছিল।
আমাকেও, বলল কিশোর। কেউ একজন আমাদের আগে আগে চলছে। আমরা যা করছি সবই সে আগে থেকে আন্দাজ করতে পারছে।
মুসা থাকলে বলত এসব ভূতের কাণ্ড, বিড়বিড় করল রবিন। তিনটা কুকুর চুরি করেছে বলে এতো ঝুঁকি নিচ্ছে কেন লোকটা? জানছেই বা কীভাবে যে, আমরা কখন কোথায় যাব?
প্রসঙ্গ পাল্টাল কিশোর। আমি নিক মিলহিজারের চাকরির দরখাস্তটা পড়েছি। লোকটা বন্দরের কাছেই থাকে। ওয়্যারহাউস থেকে জায়গাটা সামান্য দূরে।
পুলিশকে জানালে হয় না? জিজ্ঞেস করল রবিন। হলদে দরজাওয়ালা গাড়ির মালিককে পুলিশ ধরলেই সব রহস্যের কিনারা হয়ে যাবে।
পুলিশকে যে জানাব, বের হতে হবে না এখান থেকে? তা ছাড়া, কোনও প্রমাণ ছাড়া পুলিশের কাছে যাবই বা কীভাবে? যা করার আমাদেরই করতে হবে। আগের কাজ আগে। প্রথমে এখান থেকে বের হতে হবে।
কীভাবে?
ওর বন্দিশালা ভাল করে দেখল কিশোর। খাঁচাটা দুটো প্ল্যাস্টিকের অংশ দিয়ে তৈরি। নীচের অর্ধেক আর উপরের অর্ধেক জোড়া দেওয়া হয়েছে ছোট ছোট কয়েকটা বল্টু দিয়ে। ওগুলো আছে বাইরের দিকে দুপাশে দুটো কার্নিশের গায়ে।
গায়ের জোর খাটাতে হবে, বলল কিশোর। এগুলো প্ল্যাস্টিকের তৈরি। নতুন গার্বেজ ক্যানগুলোর মতো। একদিকের দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দুপা এক করে জানালায় গায়ের জোরে ঠেলা দিল ও। বেঁকে গেল জানালার শিকগুলো। এবার পা সরিয়ে এনে ওগুলোর উপর লাথি মারতে শুরু করল কিশোর।

একের পর এক লাথি মারছে ও। শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে ঠেলা দিচ্ছে জানালার গরাদে। চারবার লাথি মারতেই ওর পা ভাঙা জানালা দিয়ে বেরিয়ে গেল। গরাদগুলো ফ্রেমসহ ছিটকে কংক্রিটের মেঝেতে পড়ে পিছলে দূরে সরল।
দেরি না করে জানালা দিয়ে হাত গলিয়ে দিল কিশোর, ওর আঙুল প্রথম বল্টটাকে খুঁজে নিল। শক্ত করে আটকানো আছে বল্টু, কিন্তু কয়েক মিনিট একটানা চেষ্টার পর ঘুরতে শুরু করল। আরও আধমিনিট পর খুট করে মেঝেতে পড়ল ওটা।
কাজ হচ্ছে? ওপাশ থেকে জিজ্ঞেস করল রবিন।
সময় লাগবে, জানাল কিশোর। পরক্ষণেই প্রশ্ন করল, তুমি চুপচাপ বসে আছো কেন?
আগে দেখি তুমি পারো কি না, তারপর চেষ্টা করব, বলল রবিন। মাথার ব্যথাটা ভোগাচ্ছে।
আবার কাজে লেগে পড়ল কিশোর। দ্বিতীয় বল্টটা খোলা সহজই হলো। তিন নম্বরটা শক্ত ছিল, কিন্তু মিনিট চারেক ওটার পিছনে লেগে থেকে ওটাও খুলতে পারল ও। এদিকের বল্টু সবগুলোই খসে গেছে। এবার হাঁটুতে ভর দিয়ে পিঠ উঁচু করল কিশোর। ছাদে পিঠ ঠেকতেই দাঁতে দাঁত চেপে উপর দিকে ঠেলা দিল। যেদিকের বল্টু খুলেছে। সেদিকেই চাপটা বেশি দিচ্ছে।
ছাদ খসে আসছে, শ্বাসের ফাঁকে বলল কিশোর। একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার ঠেলা দিল। প্ল্যাস্টিক বেঁকে যাচ্ছে, তারপর বল্টগুলো থেকে উপড়ে বেরিয়ে এলো ওদিকের উপরের কার্নিশ। ছাদটা খসে যেতেই চারপাশের দেয়াল টপকে বেরিয়ে পড়ল কিশোর, রবিনের খাঁচার বল্ট খুলতে তিন মিনিটও লাগল না। রবিন বের হতেই ও জিজ্ঞেস করল, এখন মাথার কী অবস্থা?
ঘেউ! জবাব দিল রবিন, তারপর বলল, আগের চেয়ে ভাল।
সত্যি, কুকুরের খাঁচায় বন্দি হওয়াটা অত্যন্ত অপমানজনক, মন্তব্য করল কিশোর।
তুমি যদি কাউকে না বলো, তা হলে আমিও কাউকে বলব না, ষড়যন্ত্রের ভঙ্গিতে বলল রবিন। মুসাকেও না।
এমন কী ঘটেছে যে বলতে হবে, মুচকি হাসল কিশোর। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, সাড়ে নটা বাজে। দেরি হয়ে গেছে, তবু চলো একবার নিক মিলহিজারের বাসায় ঢু মেরে আসি।
ওয়াটার স্ট্রিট ধরে ধীর গতিতে এগিয়ে চলল রবিনের ফোক্সওয়াগেন। গাড়ি চালানোর ফাঁকে ও বলল, ঠিকানাটা বামদিকের কোনও বাড়ির। সেভেন-এইটি-

ওয়ান। হাত তুলে পুরোনো একটা রংচটা বাড়ি দেখাল রবিন। ওই যে, ওই অ্যাপার্টমেন্ট ভবনটাই হবে।
অ্যাপার্টমেন্ট নম্বরটা লিখে নিয়েছিলে? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
চার দিয়ে কী যেন, লিখিনি, বলল রবিন। খুঁজে বের করতে
বাড়িটার সামনে গাড়ি থামিয়ে নামল ওরা। অনেকগুলোঅ্যাপার্টমেন্টে আলো জ্বলছে।
মেইলবক্সে মিলহিজারের নাম থাকতে পারে, মন্তব্য করল কিশোর।
সদর দরজা খোলাই আছে, ভিতরে ঢুকল ওরা। একদিকের দেয়ালে মেইলবক্সের সারি। ওখানে গিয়ে নামগুলো পড়তে শুরু করল ওরা। বেশিরভাগ মেইলবক্সের গায়েই কোনও নাম নেই। কয়েকটায় টাইপ। করা নাম আছে, বাকি কয়েকটায় পেন্সিল দিয়ে নাম লেখা।
চারতলায় চারটে অ্যাপার্টমেন্ট আছে, বলল কিশোর। একটা মেইলবক্সেও নিক মিলহিজারের নাম লেখা নেই।
এটাতে লেখা আছে মন্টোগোমারি, বলল রবিন।
তার মানে ফোর-সি বাদ। মেইলবক্সের সারির পাশে বুলেটিন বোর্ডে চোখ বুলাল কিশোর। বাড়ির মালিকের তরফ থেকে একটা নোটিশ আছে। গত ফেব্রুয়ারি থেকে ফোর-ডি খালি পড়ে আছে, ভাড়াটে চায়।
তা হলে বাকি রইল ফোর-বি আর ফোর-এ, বলল রবিন। চলো, গিয়ে নক করে দেখি।
সিঁড়ির খোঁজে এগিয়ে গেল ওরা। সিঁড়ির মাথায় একটা দরজা আছে। ওটা বন্ধ। ধাক্কা দেওয়ার পরও খুলল না।
দরজায় সিকিউরিটি সিস্টেম আছে, বলল কিশোর। ইন্টারকমে চারতলার অ্যাপার্টমেন্ট দুটোর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।
এক্সকিউয মি, ওদের পিছন থেকে বললেন এক বয়স্ক ভদ্রলোক। এই মাত্র ফয়ারে ঢুকেছেন তিনি। ওরা সরে দাঁড়াতেই তালা দিয়ে দরজা খুলে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করলেন।
ইন্টারকমের আর দরকার পড়ল না, দরজাটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগেই খপ করে ধরল কিশোর।
সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত পায়ে উঠছে ওরা, চারপাশ থেকে টেলিভিশন, বাচ্চার কান্না আর মহিলাদের ঝগড়ার আওয়াজ শুনতে পেল। চারতলার ল্যান্ডিঙে বাতি নষ্ট, ফলে অন্ধকার। যে-অ্যাপার্টমেন্টটা ভাড়া হবে সেটার দরজায় ঝুলছে একটা প্ল্যাস্টিকের ব্যাগ, ওটার ভিতর আগের ভাড়াটের কাছে আসা চিঠিপত্র।

ফোর-এর ভাড়াটে জেগে আছে, বলল কিশোর। অ্যাপার্টমেন্টের ভিতর থেকে এতো জোরে ডেকসেট বাজার আওয়াজ আসছে যে গলা। চড়িয়ে কথা বলতে হচ্ছে ওকে।
কলিং বেল খুঁজে না পেয়ে দরজায় জোরে জোরে থাবড়া দিল কিশোর। বেশ কিছুক্ষণ পর ভিতর থেকে একটা কণ্ঠস্বর জিজ্ঞেস করল, ইয়াহ? কী চাই?
রবিনের দিকে এক পলক তাকাল কিশোর, তারপর চেঁচাল, বিগ ব্রাদার পেস্ট কন্ট্রোল। মিস্টার মিলহিজার আমাদের ডেকেছেন।
পেস্ট কন্ট্রোল? মোটা গলাটা প্রায় খেঁকিয়ে উঠল। এতো রাতে কী?
পোকামাকড় সহজে বিশ্রাম নেয় না, জবাব দিল কিশোর। সে কারণে আমরাও বিশ্রাম নিই না।
আমি ডাকিনি, ঘোঁৎ করে উঠল পুরুষ কণ্ঠ।
এটা কি ফোর-এ? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
এবার মহা বিরক্ত হয়ে দরজা খুলল ভাড়াটে। বছর পঞ্চাশেক বয়স হবে লোকটার। গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। ময়লা প্যান্ট আর কোঁচকানো গেঞ্জি পরে আছে।
কিশোর-রবিনকে পালা করে দেখল সে। কে তোমাদের ডেকেছে বললে যেন?
রবিন পকেট থেকে নোট বুক বের করে একটা খালি পাতায় চোখ বুলাল। মিস্টার নিক মিলহিজার।
ওই নামে এখানে কেউ নেই।
আমরা বোধহয় অ্যাপার্টমেন্ট নম্বর ভুল লিখেছি, বলল কিশোর। বোধহর উল্টোদিকের কোনও অ্যাপার্টমেন্টে থাকেন উনি। চিনবেন ওঁকে আপনি। বয়সে যুবক। চুলগুলো কাঁধ পর্যন্ত লম্বা।
চিনি বলেই তো মনে হচ্ছে, বলল কোঁচকানো গেঞ্জি। কিন্তু যতোদূর জানি আজ বিকেলেই সে বাড়ি ছেড়ে দিয়েছে। নানারকম আওয়াজ পাচ্ছিলাম, বেরিয়ে দেখি বাক্সপ্যাটরা নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছে।
তার নাম কি নিক মিলহিজার?
আমাকে দেখে কি এ-বাড়ির কেয়ারটেকার মনে হয় না কি! চোখ সরু করে কিশোরকে দেখল ময়লা প্যান্ট। জানি না তার নাম কী। জানতে চাইও না।
মিস্টার মিলহিজারের কি কোনও কুকুর আছে? জিজ্ঞেস করল। কিশোর। সহজে দমে যেতে রাজি নয় ও।
এই বাড়িতে কোনও কুকুর রাখার অনুমতি নেই।
কোনও রুমমেট ছিল?
আর কোনও কথা বলতে চাই না, বলল লোকটা।

গুড নাইট! বিরক্ত করলাম বলে দুঃখিত, বলল রবিন। ওর মুখের উপর দড়াম। করে বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা।
অত্যন্ত ভদ্রলোক, শুকনো গলায় বলল কিশোর। করিডরের উল্টোদিকের অ্যাপার্টমেন্টের দরজার দিকে তাকাল ও। দরজাটা দাগে ভরা। ছোট একটা পেরেকে ফোর-বি লেখা কাগজ ঝুলছে।
ওটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল কিশোর। ওর পাশেই রবিন। দরজাটা একটু ফাঁক হয়ে আছে।
খোলা, বলল কিশোর।
আস্তে করে ঠেলা দিল রবিন, আরও কয়েক ইঞ্চি খুলে গেল দরজা। ভিতরে উঁকি দিল ওরা। সামনের ঘরে একটা আসবাবপত্রও নেই। কেউ থাকে বলে মনে হলো না।
দমকা বাতাসে হঠাৎ অনেকখানি খুলে গেল দরজা। রবিন আর কিশোর একটা ছায়ামূর্তি দেখতে পেল ঘরের ভিতর। বেসবল ক্যাপ পরে আছে, এতো নিচু করে টেনে পরেছে যে, ক্যাপের বেড়ে থাকা সামনের অংশের কারণে তার চেহারা দেখা গেল না।
মিস্টার মিলহিজার? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
যদি লোকটা নিক মিলহিজারও হয়ে থাকে, কোনও জবাব দিল না। সে। তার বদলে, ছোট একটা ক্যান তুলে ধরল সে, তারপর রবিন কিশোর কিছু বুঝে ওঠার আগেই ওদের চোখে-মুখে স্প্রে করল সে ওটা থেকে। হিসহিস আওয়াজ করে বাষ্পের মতো তরল ছিটে এসে লাগল ওদের মুখে। সঙ্গে সঙ্গে চোখে চলে গেল দুই গোয়েন্দার হাত। জিনিসটা যা-ই হোক, অসম্ভব জ্বলুনি শুরু হয়ে গেছে ওদের চোখে। চোখ ডলতে শুরু করল ওরা। কিছু দেখতে পাচ্ছে না!
ধাক্কা দিয়ে কিশোর-রবিনকে সরিয়ে দেওয়া হলো, পায়ের আওয়াজ পেল ওরা। ওদের পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে লোকটা। সিঁড়িতে ধুপধাপ শব্দ শুনতে পেল, দ্রুত নেমে যাচ্ছে আক্রমণকারী।
চোখ মেলতে চেষ্টা করল কিশোর। কষ্ট হলো, তবে পারল। কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না। চরম আতঙ্কের একটা স্রোত নেমে গেল ওর শিরদাঁড়া বেয়ে। ও কি অন্ধ হয়ে গেল?
কিছু দেখতে পাচ্ছি না আমি! প্রায় ফুঁপিয়ে উঠল রবিন।
আমিও না, বিড়বিড় করল কিশোর। আতঙ্ক সামলে নিতে চেষ্টা করে বলল, বোধহয় আমাদের চোখে মরিচের গ্যাস ছুঁড়ে চলে গেছে লোকটা। চিরস্থায়ী ক্ষতি হয়ে যাবার আগেই চোখ ধুয়ে ফেলতে হবে।

অ্যাপার্টমেন্টের দরজাটা বন্ধ করেনি, বলল রবিন। ভেতরে পানি পাওয়া যাবে হয়তো।
হাতড়ে হাতড়ে দরজায় ধাক্কা খেয়ে ভিতরে ঢুকল ওরা। তুমি বামদিকের দেয়াল ধরে ধরে যাও, বলল কিশোর। আমি ডানদিকে দেয়াল ধরে যাচ্ছি। যে আগে কিচেন বা টয়লেট পাবে সে জানাবে।
ঠিক আছে। দেয়ালে রবিনের হাত ঘষা খাওয়ার আওয়াজ পেল কিশোর। নিজেও রওনা হয়ে গেল ও।
তিন মিনিট পর রবিনের ডাক শুনতে পেল কিশোর। বেসিন পেয়েছি। আমি কথা বলছি, তুমি আওয়াজ অনুসরণ করে এসো।
পানি পড়ার শব্দ পেল কিশোর। আস্তে আস্তে ওদিকে এগোল। কোনও আসবাবপত্র দেখিনি, কাজেই হোঁচট খাবে না কিছুতে, বলল রবিন। পানিতে কাজ হচ্ছে, অস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আমি এখন।
বুকের ভিতর স্বস্তির একটা ঢেউ অনুভব করল কিশোর। তা হলে মরিচের গ্যাসই, ক্ষতিকর অন্য কিছু নয়!
বেসিনের কাছে পৌঁছে গেল ও। ওর হাত ধরে জায়গামতো দাঁড় করিয়ে দিল রবিন। চোখে-মুখে পানির ছিটা দিতে শুরু করল কিশোর। মিনিটখানেক পর দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেল আবার। প্রথমেই রবিন জিজ্ঞেস করল, লোকটা কে তা চিনতে পেরেছ?
না মাথা নাড়ল কিশোর, চোখে পানির ছিটা দিল। শুধু ক্যাপটা দেখতে পেয়েছি। মুখটা ছায়ার মধ্যে ছিল। তুমি চিনতে পেরেছ?
আমি শুধু দেখেছি তার অ্যারোসোল স্প্রে ক্যান, বলল রবিন। বিরক্তি ভরে মাথা নাড়ল। বারবার আমাদের বোকা বানাচ্ছে লোকটা। আমরা গোয়েন্দা, আমরা তার পেছনে লাগব কী, সে-ই সর্বক্ষণ আমাদের পেছনে লেগে আছে।
ঠিকই ওকে ধরে ফেলব আমরা, আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল কিশোর। আগে এসো, অ্যাপার্টমেন্টটা সার্চ করে দেখি কিছু পাওয়া যায় কি না।
বেডরুম আর ক্লজিটগুলো খুঁজে দেখতে শুরু করল কিশোর, রবিন গেল লিভিংরুম আর কিচেনে। ভাড়াটে সবকিছু পরিষ্কার করে রেখে যায়নি বটে, তবে কোনও সূত্রও পাওয়া গেল না।
কিছু নেই, শেষপর্যন্ত বলল কিশোর। কুকুর ছিল তারও কোনও চিহ্ন পাওয়া গেল না। ভাড়াটের বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণই নেই।
দীর্ঘশ্বাস ফেলল রবিন। আমাদের মোবাইল হোমের ফোনের আনসারিং মেশিনে হয়তো ওয়্যারহাউসটার মালিক সম্পর্কে কোনও খবর থাকতে পারে। মিস্টার বার্লিসন হয়তো ফোন করেছিলেন।

হ্যাঁ, চলো, যাওয়া যাক। দরজার দিকে পা বাড়াল কিশোর।
অ্যাপার্টমেন্ট ভবন থেকে বেরিয়ে সোজা গাড়িতে উঠল ওরা, ফিরে চলল স্যালভিজ ইয়ার্ডের উদ্দেশে। ইয়ার্ডে পৌঁছে আগে চাচীকে জানাল ওরা ফিরেছে, তারপর মোবাইল হোমে ঢুকল দুই গোয়েন্দা। আনসারিং মেশিনে সত্যিই খবর পাওয়া গেল। মিস্টার বার্লিসন জানিয়েছেন তাঁদের অফিসের কম্পিউটার এখনও ঠিক হয়নি, হলেই ওয়্যারহাউসের মালিক কে সেটা তিনি জেনে নিয়ে জানাবেন।
আজ রাতে আর কিছু করার নেই, হতাশ হয়ে বলল রবিন। চলো, ঘুমিয়ে পড়ি গিয়ে। কাল সকাল থেকে আবার নতুন করে তদন্ত শুরু করা যাবে।
হ্যাঁ, চলো, সায় দিল কিশোর।
মোবাইল হোম থেকে বেরিয়ে এলো ওরা। কিশোরের ঘরে চলে এলো। কাপড় পাল্টে নিয়ে শুয়ে পড়ল। ক্লান্তির কারণে ঘুমিয়ে পড়তে বেশিক্ষণ লাগল না ওদের।

.
পরদিন সকাল সকাল মুসা এসে হাজির হলো।
ওকে বসে পড়তে বলে ওর জন্য আরও কয়েকটা পাউরুটি চড়ালেন চাচি টোস্টারে। একসঙ্গে নাস্তা সারল ওরা, খাওয়ার ফাঁকে রবিন আর কিশোর মুসাকে জানাল কাল রাতে কী ঘটেছে; সযত্নে চেপে গেল কুকুরের খাঁচায় বন্দি হওয়ার কথাটা, তারপর চলে এলো মোবাইল হোমে।
মোবাইল হোমে ঢুকেই মুসা বলল, এবার বলে ফেলো, রবিন, ঠিক কী ঘটেছিল। দোকানের ভেতরে ঢোকার কথা বলার পরপরই তোমার মুখটা লজ্জায় লাল হয়ে যেতে দেখেছি আমি নাস্তা খাবার সময়। কিছু একটা গোপন করছ তোমরা দুজন। সকালের পেপারে পড়লাম পেট সুপারস্টোরে চোর ঢুকেছিল। কিছু চুরি করেনি। কিন্তু দুটো খাঁচা নষ্ট করে দিয়ে গেছে।
কিশোর হাসি চাপল। আমি শুধু এটুকুই বলতে পারি, পেট শপে ঢোকার পর একসময় নিজেকে রবিনের খাঁচায় বন্দি পশু বলে মনে হচ্ছিল।
আর চেপে রাখতে পারল না রবিন, খুলে বলল কীভাবে ওদের বোকা বানিয়ে কুকুরের খাঁচায় ভরে রেখে গিয়েছিল কুকুর- চোর লোকটা।
এবার তদন্তের কাজ, গম্ভীর কিশোর। ভাব দেখে মনে হলো ওকে
কেউ কুকুরের খাঁচায় বন্দি করেনি। আগে ফোন করতে হবে পুলিশ চিফের কাছে। পুলিশ স্টেশনের নাম্বারে ডায়াল করল ও। অফিসেই পাওয়া গেল চিফ ইয়ান ফ্লেচারকে। সাধারণ দুএকটা কথার পর কিশোর জিজ্ঞেস করল, কুকুর চুরি রহস্যের ব্যাপারে তদন্ত এগোল, সার?

নাহ,হতাশ শোনাল চিফের কণ্ঠ। একটু থেমে বললেন, কুকুর চুরি বলেই অফিসারদের কেউ তেমন গা করছে না। গুরুত্ব দিচ্ছে না কেউ ব্যাপারটাকে। ঢিলেঢালা ভাবে তদন্ত চলছে, হাতে সূত্র বলতে কিছুই নেই। ...তোমাদের কী অবস্থা?

কুকুর-চোর আমাদের কাছ থেকে রাফিয়ানকে চুরি করে নিয়ে গেছে, জানাল কিশোর। আমাদের হাতেও জোরাল কোনও সূত্র নেই, তবে হাল ছেড়ে দিচ্ছি না আমরা। ...আর কোনও কুকুর চুরি গেছে, সার?

গেছে। তোমাদের কাছে ই-মেইল করছি। রিপোর্টটা পড়ে নিয়ো।

অনেক ধন্যবাদ, সার।

হাসলেন ইয়ান ফ্লেচার, ফোন রাখার আগে বললেন, বেস্ট অভ লাক।

কম্পিউটার প্রিন্টার চালু করে তিনটে কাগজের শিট বের করল কিশোর।

পুলিশ চিফ ইয়ান ফ্লেচার ইন্টারনেটে তিন পৃষ্ঠার একটা রিপোর্ট পাঠিয়েছেন ওদের জন্য, সেটায় চোখ বুলাল ওরা।

রকি বিচের বিভিন্ন অভিজাত এলাকা থেকে বড়লোকদের আরও দুটো কুকর চুরি গেছে। সেই সঙ্গে চুরি হয়েছে মধ্যবিত্তদের কয়েকটা নেড়ি কুত্তাও। পুলিশ এখনও কেসটায় তেমন একটা গুরুত্ব দিচ্ছে না। তবে রকফেলারের কারণে উপরমহলের চাপ আসতে শুরু করেছে।

কী বুঝব এ থেকে? জিজ্ঞেস করল মুসা। পয়সাওয়ালাদের কুকুরগুলো না হয় নিয়েছে মুক্তিপণের আশায়, কিন্তু নেড়ি কুকুর দিয়ে কী করবে সে?

নীচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। মনে হচ্ছে লোকটার টাকার খুব দরকার। কিন্তু ভয়ঙ্কর লোক নয় সে। নইলে কুকুরের বদলে মানুষের বাচ্চাই চুরি করত। ধরা পড়লে যাতে কম শাস্তি হয় সেদিকে লোকটার খেয়াল আছে। পয়সাওয়ালাদের কুকুর নিচ্ছে মুক্তিপণের জন্যে, আর মধ্যবিত্তদের কুকুরগুলোকে নিচ্ছে বিশেষ কোনও উদ্দেশ্যে। সেটা কী তা আমরা এখনও জানি না।

আন্দাজ করো মধ্যবিত্তদের কুকুর সে কেন নেবে, বিড়বিড় করল রবিন। মধ্যবিত্তরা তো যথেষ্ট মুক্তিপণও দিতে পারবে না। কুকুর বিক্রির দোকান আছে না কি লোকটার!

হতে পারে না, এক কথায় নাকচ করে দিল কিশোর। ধাড়ি কুকুর কে কিনবে? নীচের ঠোঁটে আবারও চিমটি কাটল কিশোর। তবে বিক্রি যে করতে চায় তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ড্রয়ার ঘেঁটে একটা ভিসিটিং কার্ড বের করল ও। এক্সেলসিওর ল্যাব।

ভ্রূ কুঁচকাল মুসা। তো কী হলো?

আমার ধারণা নেড়ি কুকুরগুলো সে কোনও রিসার্চ ল্যাবোরেটরিতে বিক্রি করার চেষ্টা করছে, বলল কিশোর। সে-কারণেই ওগুলো চুরি করা।
ভিযিটিং কার্ডটা ওখানে যে-কেউই ফেলে যেতে পারে, বলল মুসা।
তা পারে, কাঁধ ঝাঁকাল কিশোর। তবে আপাতত এই কার্ড ছাড়া আর কোনও সূত্র নেই আমাদের হাতে।
কার্ডটার দিকে চুপ করে তাকিয়ে থাকল রবিন। খানিকক্ষণ নীরবতায় কাটল, তারপর কিশোর বলল, আমার ধারণাটা সঠিক কি না সেটা জানার জন্যে এক্সেলসিওর ল্যাবে যেতে হবে। অনেক মানুষই আজকাল পশুপাখির ওপর নিষ্ঠর পরীক্ষা-নীরিক্ষার বিরুদ্ধে। তবুও আজও রিসার্চ চলছে। কোনও ল্যাব হয়তো গোপনে ডগন্যাপারের কাছ থেকে কুকুর কিনছে। তা-ই যদি হয়, তা হলে বলতে হবে সহজে টাকা। করার ভাল একটা পথ পেয়ে গেছে আমাদের ডগন্যাপার।
রাফিয়ানকে বিক্রি করার আগেই লোকটাকে ঠেকাতে হবে, শুকনো গলায় বলল রবিন। হয়তো আমাদের সফলতার ওপর নির্ভর করছে রাফিয়ানের জীবন-মরণ।
রিসিভার তুলে এক্সেলসিওর ল্যাবের নাম্বারে ডায়াল করল। কিশোর। এতো সকাল সকাল ল্যাব খোলেনি, একটা মেশিন জবাব দিল। রেকর্ড করা মেসেজে বলা হলো, সকাল সাড়ে নটায় ল্যাবোরেটরি খুলবে।
ঘড়ি দেখল কিশোর। এখনও নয়টা বাজতে দশ মিনিট বাকি।
চিফ ইয়ান ফ্লেচারের ই-মেইল থেকে পাওয়া নাম্বারগুলোয় ফোন করতে শুরু করল কিশোর। স্পিকারের সুইচ অন করে রেখেছে, যাতে বন্ধুরাও কথা শুনতে পায়।
কুকুর যা চুরি হয়েছে বেশিরভাগই চুরি হয়েছে বাড়ির সামনের উঠান থেকে। ওগুলোর মালিকরা কোনও লোককে বাড়ির সামনে ঘোরাঘুরি করতে দেখেননি। কোনও হলদে দরজাওয়ালা গাড়ি বা লাল ট্রাকও কারও নজরে পড়েনি। অনেকেই তাদের কুকুর হারিয়ে ভেঙে পড়েছে। কিউটি ছিল আমার মেয়ের সবচেয়ে ভাল বন্ধু, এক মহিলা জানালেন। ওকে হারিয়ে খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে রোনা। জানি না এই দুঃখ ও ভুলবে কী করে।
আমরা কিউটিকে খুঁজে বের করতে আপ্রাণ চেষ্টা করব, কথা দিল। কিশোর।
ও ফোন রাখার পর মুসা বলল, বাচ্চাদের কুকুর যে-লোক চুরি করে তাকে বিশেষ কোনও শাস্তি দেয়া উচিত।
মোবাইল হোমের দেয়ালে টাঙানো ঘড়িটার দিকে তাকাল রবিন। এখন যদি আমরা রওনা হই তা হলে পৌঁছুতে পৌঁছুতে ল্যাব খুলে যাবে।
উঠল ওরা।

রকি বিচের দক্ষিণে একটা পার্কের পাশে এক্সেলসিওর ল্যাবোরেটরিজ। এক তলা লম্বাটে সাদা বাড়িটাতে জানালা প্রায় নেই বললেই চলে। দেখে মনে হয় মিলিটারির ব্যারাক। সামনে বড় একটা। সাইনবোর্ডে লেখা: এক্সেলসিওর ল্যাবোরেটরিজ লিমিটেড।
পার্কিং লটে গাড়ি থামিয়ে নামল ওরা, চলে এলো ভিটির লেখা একটা অফিসের সামনে। এখানেই দর্শনার্থীদের বসানো হয়।
ল্যাবের লবিতে আছে একটা অপেক্ষা করার জায়গা আর অন্যপাশে সাদা কাউন্টার। রিসেপশনিস্ট এক তরুণী, বছর বিশেক বয়স হবে তার, ইন্টারকমে কথা বলছে।
সুইচবোর্ডে ম্যানর নামটা দেখতে পেল কিশোর। ভিযিটিং কার্ডের পিছনেও এই একই নাম আছে।
রিসেপশনিস্ট ইন্টারকমের রিসিভার নামিয়ে রাখার পর ওদের দিকে চোখে কৌতূহল নিয়ে তাকাল। এই বয়সী কয়েকটা ছেলে ল্যাবে কেন তা জানতে চায়। সে কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই কাঁচের দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকলেন সাদা কোট পরা মাঝবয়সী একজন ভদ্রলোক। ঢুকে ওদের দেখেই জিজ্ঞেস করলেন, কী করতে পারি আমরা তোমাদের জন্যে, বয়েজ?
নিজেদের পরিচয়, দিল কিশোর।
আমি ডক্টর ব্লেক, ল্যাব কোট পরা ভদ্রলোক জানালেন।
আমরা এসেছি মিস্টার ম্যানরের সঙ্গে দেখা করতে, বলল কিশোর। ভদ্রলোক ল্যাবোরেটরিতে কী কাজ করেন তা ওর জানা নেই।
অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে তোমাদের? জিজ্ঞেস করলেন ব্লেক।
না, কিন্তু জরুরি কাজে এসেছি। কেন এসেছে জানাল কিশোর। রাফিয়ানকে যতো দ্রুত সম্ভব উদ্ধার করতে হবে।
এসো আমার সঙ্গে। ওদের পথ দেখিয়ে ল্যাবের ভিতর ঢুকলেন ব্লেক। সুইং-ডোর পেরিয়ে কাজের জায়গায় চলে এলো ওরা। করিডরের দুপাশে সারি সারি অফিস। শেষে দুটো বড় বড় ল্যাবোরেটরি।
প্রথম অফিসটাই মিস্টার ম্যানরের। ভিতরে ঢুকে ওরা খেয়াল করল ডেস্কের উপর নেমপ্লেটে ডক্টর লেখা আছে।
ডক্টর শ্যন ম্যানরের বয়স তিরিশের বেশি হবে না। কাঁধ পর্যন্ত দীর্ঘ বাদামী চুলগুলো খোঁপা করে রেখেছেন। চোখে কালো ফ্রেমের ভারী চশমা। দেখলেই বোঝা যায় লেখাপড়া ছাড়া আর কিছু বোঝেন না।
পরিচয়ের পালা এবার সারল মুসা। ডক্টর ব্লেক ওদের বসতে ইশারা করে নিজেও বসলেন।

বসবার পর কিশোর জিজ্ঞেস করল, এই ল্যাবে কি জন্তু জানোয়ারের ওপর এক্সপেরিমেন্ট করা হয়?
নিশ্চয়ই, বললেন ডক্টর ম্যানর। এখন আমি কুকুরদের ওপর পরীক্ষা চালাচ্ছি। সয়া বেড় ডায়েটে বিভিন্ন কুকুরের ওজন কতোটা বাড়ে সেটাই আমার পরীক্ষার বিষয়বস্তু। হাতের ইশারায় একদিকের দেয়াল দেখালেন তিনি। ওখানে ঝকঝকে খাঁচায় ছোট আকারের বেশ কয়েক জাতের কুকুর রাখা আছে। সবগুলোই নাদুসনুদুস। ওদের তাকাতে দেখে লেজ নাড়তে শুরু করল কয়েকটা।
বলবেন আপনারা কোত্থেকে কুকুর সংগ্রহ করেন? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
নড়েচড়ে বসলেন ডক্টর ম্যানর। তোমরা যদি অ্যানিমেল রাইটস অর্গানাইযেশন থেকে এসে থাকো, তা হলে আমি তোমাদের নিশ্চিন্ত করছি...
আমরা ওরকম কোনও সংগঠন থেকে আসিনি, বলল মুসা। এবার ও ওদের তদন্তের ব্যাপারে খুলে বলল। আমাদের মনে হচ্ছে চোর হয়তো ল্যাবোরেটরিগুলোতে কুকুর বিক্রি করছে। ল্যাবগুলো হয়তো জানেও না যে ওগুলো চোরাই কুকুর।
গত কয়েকদিনে আপনাদের কেউ কুকুর বিক্রির প্রস্তাব দিয়েছে? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
আমাকে দেয়নি, জানালেন ডক্টর ব্লেক।
ভ্রূ কুঁচকে চেয়ারে হেলান দিলেন ডক্টর শ্যন ম্যানর। আমাকে দিয়েছে, বললেন। পার্কিং লটে আমাকে থামিয়েছিল এক যুবক। এই এক সপ্তাহ হবে। বলেছিল মালিকছাড়া কুকুর সংগ্রহ করে দিতে পারবে সে, প্রতিটা পড়বে দুহাজার ডলার করে।
চেয়ারে সোজা হয়ে বসল কিশোর। দেখতে কেমন ছিল সে?
অতোটা খেয়াল করিনি। তবে চুলগুলো বাদামী ছিল। এই আমার মতো। বয়স পঁচিশের বেশি হবে না। চেহারা বলতে পারব না, চোখে সানগ্লাস ছিল। কপাল পর্যন্ত ঢাকা ছিল নাবিকদের উলের টুপিতে।
তার কাছ থেকে কোনও কুকুর কিনেছেন আপনি?
না। যুবককে দেখে আমার মনে হয়নি সে কোনও ভাল ব্রিডারের কোম্পানিতে কাজ করে। আমার কাছে একটা কার্ড চাইল, দিয়ে দিলাম। বলল পরে যোগাযোগ করবে। আমি রাজি হলাম। তখন আর কথা না বাড়িয়ে চলে গেল সে।
তাকে যেতে দেখেছেন আপনি?
অবশ্যই!!
কী গাড়ি চালাচ্ছিল সে?

এক মুহূর্ত ভাবলেন ডক্টর ম্যানর, তারপর বললেন, একটা পিকআপ ট্রাক। লাল একটা পুরোনো পিকআপ ট্রাক।
আপনি তো তাকে কার্ড দিয়েছেন, বলল কিশোর। সে-ও কি আপনাকে কোনও কার্ড দিয়েছে?
না। জিজ্ঞেস করায় বলল শেষ হয়ে যাওয়ায় ছাপতে দিয়েছে। কার্ড। তবে একটা নাম্বার দিয়েছে সে। টেবিলের উপরের কাগজগুলো হাতড়ে একটা স্লিপ খুঁজে বের করে কিশোরের দিকে বাড়িয়ে দিলেন তিনি। এই যে। নিতে পারো এটা তোমরা। আমার কাজে আসবে না। প্রতিষ্ঠিত ব্রিডার না হলে কারও কাছ থেকে কুকুর কিনি না আমরা।
নিজেদের কার্ড দিল কিশোর দুই ডক্টরকে, তারপর যুবক আবার যোগাযোগ করলে ওদের জানাতে অনুরোধ করে ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে এলো ওরা। ফিরতি পথ ধরে মুসা বলল, লোকটা ল্যাবোরেটরিতে কুকুর বিক্রি করতে চায়।
স্যালভিজ ইয়ার্ডে চলেছে ওরা। কিন্তু লোকটা কে হতে পারে? আপনমনে বলল রবিন। বর্ণনা অনুযায়ী নিক মিলহিজার আর হারল্ড মুর-দুজনের যে-কেউ হতে পারে লোকটা। এদিকে ডক্টর ম্যানরের চুলগুলোও বাদামী। লম্বাও কাঁধ পর্যন্ত। পাতলা-সাতলা লোক। তাকেও কি আমরা সন্দেহের মধ্যে রাখব?
আপাতত, বলল কিশোর।
আবার আমাদের পেছনের ওই লোকটাও সেই কুকুর চোর হতে পারে, গম্ভীর চেহারায় বলল মুসা। রিয়ারভিউ মিররে পিছনে তাকিয়ে আছে ও।
ঘুরে তাকাল রবিন আর কিশোর। ওদের পিছন পিছন আসছে একটা লাল পিকআপ ট্রাক। ছায়ার মধ্যে থাকায় ড্রাইভারের মুখটা দেখা গেল না। গতি বাড়িয়ে কাছাকাছি চলে আসছে পিকআপটা। এবার ড্রাইভারের মুখ ঢাকা মুখোশটা দেখতে পেল ওরা। সর্বক্ষণ বড় বড় দাঁত বের করে হাসছে ওটা। মুসার ফোক্সওয়াগেনের পিছনে এসে জোরে গুতো দিল পিকআপ!
গতি বাড়াও! বলে উঠল রবিন।
সম্ভব না! জানাল মুসা। হুইলের পিছনে ঝুঁকে বসেছে। রাস্তাটা বড় বেশি সরু!
পাগল নাকি লোকটা! ফ্যাকাসে মুখে বলল রবিন।
দড়াম করে আবার আঘাত হানল পিকআপ ট্রাক। গাড়ির চেয়ে। অনেক ভারী ওটা। যে-কোনও সময় ফোক্সওয়াগেনটাকে ঠেলে ফেলে দেবে রাস্তা থেকে! নিজেদের সিট বেল্ট ঠিক আছে কি না দেখে নিল। তিন গোয়েন্দা।
আমাদের পাশ কাটাচ্ছে, রিয়ারভিউ মিররে চোখ মুসার।
রাস্তা থেকে ঠেলে সরিয়ে দিতে চায় বোধহয়, বিড়বিড় করল কিশোর।

গাড়ির পাশে চলে এসেছে পিকআপটা। ড্রাইভারের মুখোশটা এখন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ওটা না থাকলে চেহারাটা এখন স্পষ্ট দেখা যেত। এক হাতে স্টিয়ারিং ধরে আছে লোকটা। আরেক হাত নীচে নামানো। ঝট করে ওটা তুলল সে। এক পলকও লাগল না রবিন আর কিশোরের বুঝতে তার হাতে ওটা কী।
পিস্তল! চেঁচিয়ে উঠল রবিন।
কালো রঙের ভয়ঙ্করদর্শন একটা সেমি-অটোমেটিক পিস্তল তাক করছে লোকটা! সরাসরি মুসার দিকেই যেন তাক করছে সে!
সঙ্গে সঙ্গে ব্রেকে চেপে বসল মুসার পা। চাকাগুলো আটকে গেল, গাড়িটা পিছলে এগোতে শুরু করল হড়হড় করে। দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। পিকআপ।
কিন্তু তবুও বেশি দেরি হয়ে গেছে। ট্রিগার টেনে দিয়েছে লোকটা!
ছপাৎ!
মুহূর্তে ওদের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল পিকআপ ট্রাকটা। ফোক্সওয়াগেনের গোটা উইন্ডশিল্ড লাল রঙের তরলে ভরে গেছে। সামনের কিছু দেখতে পাচ্ছে না মুসা। আবার ব্রেকে পা চেপে বসল ওর। রাস্তাটা মনে করতে চেষ্টা করল। ওটা কি সোজা গেছে, না বাঁক আছে কোনও?
ধুপ করে একটা আওয়াজ হলো। ঝাঁকি খেয়ে থামল। ফোক্সওয়াগেন। মুসা বুঝতে পারল সামনে বাঁক নিয়েছিল রাস্তা।
গতি কমিয়ে আনায় সাঙ্ঘাতিক কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি। রাস্তার ধারের ল্যাম্পপোস্টে গুতো খেয়ে থেমে গেছে ওদের গাড়ি।
জানালা দিয়ে মাথা বের করে দিল মুসা, তারপর বলল, চলে গেছে পিকআপ। লাল রং না সরিয়ে গাড়ি চালানো যাবে না। আরেকবার আমাদের বোকা বানিয়ে দিয়ে গেল লোকটা।
উইন্ডশিল্ড ওয়াইপার চালু করল মুসা, সেই সঙ্গে চাপ দিল পানির সুইচে। খানিকটা পাতলা হলো রং।
গাড়ি থেকে নেমে পড়ল তিন গোয়েন্দা। রংটা শুঁকে দেখল কিশোর, তারপর বলল, ল্যাটেক্স পেইন্ট। লোকটার হাতে রং ছুঁড়বার পিস্তল ছিল ওটা।
গাড়ি মোছার তোয়ালে দিয়ে রংটা যতোটা সম্ভব ওঠাল ওরা। এবার ড্রাইভার অন্তত সামনের দিকটা দেখতে পাবে।
পরে বাকিটা পরিষ্কার করা যাবে, বলল কিশোর, নীচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে। সেন্টার স্ট্রিটে যে কারওয়াশটা আছে ওখান থেকে রং তুলে নেব। আবার রওনা হলো ওরা। ডক্টর ম্যানরের দেওয়া নাম্বারে মোবাইল থেকে ডায়াল করল কিশোর। আনসারিং মেশিন জবাব দিচ্ছে। জায়গাটা রকি বিচ সায়েন্টিফিক সাপ্লাই। মেশিনটা বীপ দেওয়ার পর ফোনে বলতে শুরু করল কিশোর, আমরা রকি

বিচের নতুন ল্যাবোরেটরি থেকে ফোন করছি। আমাদের ল্যাবের নাম কেমিকেল অ্যানালিসিস অ্যান্ড টেস্টিং। নতুন খুলেছি। আমরা, কাজেই সবকিছু এখনও কেনা হয়ে ওঠেনি। সে-কারণেই ফ্রোন করা। ভিটামিন সাপ্লিমেন্ট টেস্টের জন্যে আমাদের পঁচিশটা কুকুর দরকার। আপনারা সাপ্লাই দিতে পারবেন? মোবাইল হোমের টেলিফোন নাম্বার দিয়ে কানেকশন কেটে দিল কিশোর।
কেমিকেল অ্যানালিসিস অ্যান্ড টেস্টিং? জিজ্ঞেস করল মুসা, হাসছে। কুকুর চাইছ তুমি, অথচ ল্যাবের নাম সংক্ষেপ করলে হয় ক্যাট!
কিশোর আর রবিন মুচকি হাসল, কিছু বলল না।
কার ওয়াশে গিয়ে গাড়ি ঢোকাল মুসা। ওয়েইটিং রুমে বসল ওরা। সঙ্গে সঙ্গে কাজে লেগে পড়ল অ্যাটেন্ডেন্ট। কিছুক্ষণের মধ্যেই শক্তিশালী পানির ধারায় উইন্ডশিল্ড থেকে উঠে যেতে শুরু করল লাল রং।
হঠাৎ কিশোরের দিকে ফিরল রবিন, কাল রাতে কি নিক মিলহিজারই আমাদের চোখে গ্যাস মেরেছিল?
বলা যায় না, বলল কিশোর। বড় বেশি অন্ধকার ছিল। লোকটা যে-কেউ হতে পারে। এমনকী লোকটার চুল লম্বা কি না সেটাও দেখতে পাইনি। কিন্তু অ্যাপার্টমেন্টটা মিলহিজারেরই। চাকরির দরখাস্তেও ওই ঠিকানাই দিয়েছিল সে। কিন্তু নিজের অ্যাপার্টমেন্টে আমাদের ওপর সে এভাবে হামলা করবে বলে মনে হয় না। তাতে করে তাকে সহজেই আমরা সন্দেহ করতে পারি এটা সে বুঝবে।
তা ঠিক, বলল মুসা। কে ছিল কে জানে!
লোকটা যে-ই হোক, এতোক্ষণে বুঝে গেছে আমরা অতো সহজে হাল ছাড়ব না। কিশোর গম্ভীর।
তুমি ঠিকই বলেছিলে, কিশোর, বলল মুসা। এসব যে-ই করে বেড়াক, লোকটা সে পেশাদার নয়। এখনও সত্যিকারের ভয়ঙ্কর কিছু সে করেনি। পেইন্ট গানের কারণে দুর্ঘটনা হতে পারত, কিন্তু সম্ভাবনা। কম ছিল। আমাদের নানা ভাবে ভয় দেখিয়ে নিরস্ত করতে চেষ্টা করছে। সে। পেশাদার লোক হলে আমাদের থামাতে ভয়ঙ্কর কোনও ব্যবস্থা নিয়ে বসত এতক্ষণে। হয়তো গুম করে ফেলারই চেষ্টা করত।
ঠিক, বলল কিশোর। তা ছাড়া, পেশাদার কেউ হলে এখনও কুকুর বিক্রির জন্যে চেষ্টা করত না। চুরির আগেই কুকুর বিক্রির ব্যবস্থা করে রাখত।
কুকুরগুলোর কিছু হওয়ার আগেই ওগুলোকে উদ্ধার করতে হবে, দৃঢ় শোনাল মুসার গলা। নইলে রাফিয়ানের ব্যাপারে কী জবাব দেব আমরা জিনাকে?
একটা ব্যাপার খেয়াল করেছ? বলল কিশোর। চাকরি হারানোর কারণে গ্রেগ লেবউফের ওপর কিন্তু খেপে নেই কি মিলহিজার। ব্যাপারটা একটু অস্বাভাবিক

নয়?
কিছুটা অস্বাভাবিক তো বটেই, বলল মুসা। টেকনিক্যাল সাহায্যের জন্যে তাকে চাকরিতে নিয়ে পরে কুকুরের হাগু পরিষ্কার করতে বলেছিলেন লেবউফ। নিক মিলহিজারের খানিকটা হলেও খেপে। থাকার কথা।
হয়তো অভিনয় করছে, মন্তব্য করল রবিন।
আমি হারল্ড মুরের কথা ভাবছিলাম, বলল কিশোর। ফোরম্যানের কথা শুনে মনে হলো কাজে সে প্রায়ই যায় না। তার মানে এটাও হতে পারে যে, কুকুর চুরি করার জন্যে যথেষ্ট সময় পায় সে। প্রতিটা কুকুর দুহাজার ডলার করে ল্যাবগুলোতে বিক্রি করতে পারলে অন্য কাজের তার কী দরকার! চলো, আজ একবার ড্রাই-ডকে ঘুরে আসি। তার সঙ্গে কথা বলে দেখা দরকার মনে কোনও সন্দেহ জাগে কি না।
আরও দশ মিনিট অপেক্ষার পর গাড়িটা ফেরত পেল ওরা, এইমাত্র ধোওয়ায় ঝকঝক করছে। ওয়াশের বিল মিটিয়ে দিয়ে সোজা চলল ওরা বন্দর এলাকার দিকে। ড্রাই-ডকে পৌঁছে দেখল বিশাল জাহাজ স্টার অভ বারমেট ছেয়ে ফেলেছে শ্রমিকের দল। মনে হচ্ছে সারি সারি পিঁপড়ে নিয়ম ধরে কাজ করে চলেছে। ক্রেনে করে মালামাল তোলা নামানো হচ্ছে।
শেডের কাছে ওরা পৌঁছোতেই ফোরম্যান এগিয়ে এলেন। কী খবর ছেলেরা? হারল্ড মুরকে খুঁজছ নিশ্চয়ই? আজকে আছে ও, তোমাদের কপাল ভাল। জাহাজের বোর দিকে আঙুল তুললেন তিনি। ওই যে ওখানেই আছে। কাজে ইদানীং এতো ফাঁকি দিচ্ছে যে ভেবেছিলাম ওকে বাদই দিয়ে দেব।
আমরা ওঁকে বেশিক্ষণ আটকে রাখব না, বলল কিশোর।
গুড, খুশি হলেন ফোরম্যান। তিন গোয়েন্দাকে পরার জন্য তিনটে শক্ত হ্যাট দিয়ে বললেন, ফাঁকি না মেরে অন্তত কিছু কাজ তো করুক ও!
ভদ্রলোককে ধন্যবাদ দিয়ে হ্যাট মাথায় চাপিয়ে এগোল ওরা।
সূর্যের নীচে কাজ করে বাদামী হয়ে গেছেন হারল্ড মুর। চেহারা দেখে মনে হলো রাগী মানুষ। কাজ নিয়ে ব্যস্ত। চারজন সঙ্গীর সঙ্গে একটা স্কিডে ফার্নিচার তুলছেন। মোটা মোটা দড়ি দিয়ে সব বাঁধা। দড়িগুলো আবার শেকল আর স্টিলের কেবলের সঙ্গে আটকানো হয়েছে। সব মালামাল একটা বুম উপরে তুলে নেবে, পৌঁছে দেবে জাহাজে।
তিন গোয়েন্দাকে এগোতে দেখে ফিরে তাকালেন হারল্ড মুর। ভাব দেখে মনে হলো ছেলেদের দেখে বিরক্ত।
নিজেদের পরিচয় দিয়ে কেন এসেছে জানাতেই কিশোরকে বললেন, এসবের জন্যে সময় নেই আমার হাতে। তা ছাড়া, কোনও কোলি চুরির সঙ্গে আমার

কোনও সম্পর্ক নেই।
কিশোর চট করে প্রশ্ন করল, কোলি চুরির ব্যাপারেই আমরা এসেছি সেটা আপনাকে কে বলল?
তাতে তোমাদের কী? মুখটা লাল হয়ে গেল হারল্ড মুরের। তবুও বলছি। আমার বোন বলেছে। কোলিটা চুরি যাওয়ায় ওই জঘন্য ডগ-হাউস যদি বন্ধ হয়ে যায় তো আমি বলব যে কোলিটাকে চুরি করেছে তার মেডাল পাওয়া উচিত।
কিছু মনে না করলে বলবেন কি আপনি কোন্ ধরনের গাড়ি ব্যবহার করেন? জিজ্ঞেস করল মুসা।
মনে করছি আমি, ঘোঁৎ করে উঠলেন মুর। তোমাদের কোলি আমি চুরি করিনি বলেছি, এখন এটাও বলছি, শুনে রাখো, তোমাদের কোনও প্রশ্নের জবাব আমি দেব না।
আর আপনার বোন? না দমে জিজ্ঞেস করল কিশোর। অনেকের ধারণা কুকুর চুরির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক আছে।
আমি বলছি নেই! খেঁকিয়ে উঠলেন মুর। কেউ যদি এধরনের কথা বলে তা হলে তাকে আমার মুখোমুখি হতে হবে, জবাবদিহি করতে হবে আমার কাছে। তিন গোয়েন্দার নাকের সামনে মুঠো নাচালেন তিনি।
শান্ত হোন, ঘাবড়ে গিয়ে বলল রবিন।
কিশোর বলল, আমরা কুকুরচুরির ব্যাপারে আপনাকে বা আপনার বোনকে দায়ী করছি না। আমরা শুধু চোরাই কুকুর উদ্ধার করতে চাইছি।
কিশোরের দিকে ফিরে তাকালেন মুর। তা হলে যারা ওসব চুরি করছে তাদের গিয়ে প্রশ্ন করোগে যাও।
দমল না কিশোর, জিজ্ঞেস করল, আপনি কি গ্রেগ লেবউফ এবং তাঁর স্ত্রীকে চেনেন?
না। চিনতে চাইও না। তবে শুনেছি কাল রাতে ওখানে ট্রাক থেকে দুজন লোক কয়েকটা কুকুর নামিয়েছে। কী করছিল তারা বুঝতে পারেনি আমার বোন।
কী ধরনের ট্রাক? নীচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর।
আমি জিজ্ঞেস করিনি। আমার বোনও কিছু বলেনি।
ওটা কি কোনও কোম্পানির ভ্যান ছিল? জিজ্ঞেস করল মুসা।
প্রেসিডেন্টের লিমাযিন হলেই বা আমার কী? সঙ্গীদের দিকে একবার তাকালেন মুর। দেখো, এবার তোমরা যাও। আমার অনেক কাজ পড়ে আছে।
হারল্ড ঠিকই বলেছে, যুবকের এক সঙ্গী বলল, দেখতেই পাচ্ছ। ব্যস্ত আমরা।
আমি আসছি, তেনজিং, বললেন মুর। তুমি লেগে পড়ো। তিন গোয়েন্দার দিকে ফিরলেন।

তোমাদের অনেক প্রশ্নের জবাব আমি দিয়েছি। শুনেছি আমার বোনকেও তোমরা বিরক্ত করেছ। এবার শেষবারের মতো সতর্ক করে দিচ্ছি, ওকে জ্বালাতন করতে যেয়ো না। গেলে পরিণতি ভাল না-ও হতে পারে।
আপনি কি আমাদের ইমকি দিচ্ছেন? জিজ্ঞেস করল মুসা। কালো মুখটা থমথম করছে।
না, সাবধান করছি।
কিন্তু আপনার বোনের কাছে যেতে হবে আমাদের, বলল কিশোর। কাল রাতে তিনি কী দেখেছেন সেটা জানা জরুরি।
এরপর আর তোমাদের সতর্ক করব না। মাটিতে থুতু ফেললেন হারল্ড মুর। এবার দূর হও এখান থেকে।
হ্যারল্ড মুরের সঙ্গীরা পরস্পরের দিকে তাকাল। বোধহয় দরকারে তারাও ওদের জোর করে সরিয়ে দেবে এখান থেকে, তারই প্রস্তুতি নিল।
ইশারা করলেন হারল্ড মুর। কাছেই প্রাণ ফিরে পেয়ে গর্জে উঠল একটা ডিজেল এঞ্জিন। কেবলে বাঁধা ফার্নিচার উপরে উঠতে শুরু করল। ফিরে চলল তিন গোয়েন্দা। হারল্ড মুর শুনতে পাবে না এমন দূরত্বে পৌঁছে কিশোর বলল, এখন আমরা জানি কারিনা মুরের ভাইকে কোথায় পাওয়া যাবে। এবার চলো কারিনা মুরের ওখানে, তাকে জিজ্ঞেস করতে হবে কাল রাতে তিনি কী দেখেছেন।
প্ল্যাস্টিকের পাইপ ভরা স্টিলের ক্যারিয়ারের পাশ দিয়ে কিশোর আগে আগে চলেছে, পিছনে রবিন আর মুসা। পার্কিং এরিয়ার দিকে যাচ্ছে ওরা, এমন সময়ে ডক থেকে একটা চিৎকার শুনতে পেল ওরা।
না! কেবল ছেড়ে দিয়ো না!
ঘুরে তাকাল মুসা কে চিৎকার করছে বোঝার জন্য। ঠিক তখনই আরেকটা চিৎকার শুনতে পেল ওরা।
সাবধান!
মেঝেতে একটা ছায়া ক্রমেই বড় হচ্ছে! মুসা আর রবিনের মাথার উপর তাকাল কিশোর।
জাহাজের স্টেটরুমের ফার্নিচার ভরা স্কিডটা সরাসরি মুসা আর রবিনের উপরই পড়তে যাচ্ছে!
কেবল ছিঁড়ে গেছে! চেঁচাল একজন কর্মী।
কিশোর স্পষ্ট দেখতে পেল, লোকটা ঠিকই বলেছে। সেফটি কেবল ছিঁড়ে গেছে। ফার্নিচার নীচে পড়ছে! পড়ছে ঠিক রবিন আর মুসার উপর!
রবিন-মুসা! সাবধান! কিশোরের গলা চিরে বেরিয়ে এলো শব্দগুলো।

উপরের দিকে একবার তাকিয়েই চট করে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল মুসা, রবিনকে ঠেলা দিয়ে সরিয়ে নিল একটা স্টিলের র‍্যাকের কাছে। ওটাতে ছয়ফুট লম্বা শতখানেক প্ল্যাস্টিকের পাইপ আছে। র‍্যাকের নীচে রবিনকে ঠেলে ঢুকিয়ে দিল ও, নিজেও ঢুকে পড়ল।
ভারী ফার্নিচার ভরা স্কিড মাটিতে পড়ে চুরমার হয়ে গেল। ওটার এক কোনা আঘাত করল স্টিলের র‍্যাকে। উপরের দুটো তাক থেকে পাইপগুলো উড়াল দিল, যেন বিস্ফোরণ ঘটেছে। র‍্যাকের বাকি পাইপগুলো পড়ে গেল মেঝেতে।
হতভম্ভ কিশোর দেখল পাইপের নীচে সম্পূর্ণ চাপা পড়ে গেছে রবিন আর মুসা।
তবে ফার্নিচার ওদের উপর পড়েনি। হালকা পাইপগুলো। রবিন আর মুসাকে উঠে বসতে দেখল।
লেগেছে? জিজ্ঞেস করল মুসা।
একটুও না, জানাল রবিন।
স্বস্তির শ্বাস ছাড়ল কিশোর। একটুর জন্য নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেছে রবিন আর মুসা।
ফোরম্যান দৌড়ে এসেছে, চেহারায় নিখাদ উদ্বেগ। হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন, ভাগ্যিস গায়ে পড়েনি!
কর্মীরা তিন গোয়েন্দা আর ফোরম্যানকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। একজনের দেখাদেখি বাকিরাও ব্যস্ত হয়ে পড়ল পাইপ সরিয়ে নিতে।
আরেকটু হলেই গিয়েছিলে, বললেন ফোরম্যান। কেবলটায় দোষ ছিল।
ডকের উপর চোখ বুলাল কিশোর। হারল্ড মুর বেশ খানিকটা দূরে কাজ করছে। দুর্ঘটনা দেখেও এগিয়ে আসেনি সে।
মিস্টার মুর এসে দেখছেন না কেন, ফোরম্যানকে বলল কিশোর।
তাঁর সঙ্গের কর্মীরাই তো ঝুমটা নিয়ে কাজ করছিল।
এড়িয়ে যাচ্ছে আমাদের, বললেন ফোরম্যান। ওর বোধহয়। ওকেই দায়ী করব আমি।
কেবলটা দেখল কিশোর। মনে হলো না ধারাল কিছু দিয়ে ওটা কাটা হয়েছে। সম্ভবত ওজনের কারণে এমনিই ছিঁড়ে গেছে।
ফোরম্যান বললেন, এধরনের দুর্ঘটনা ঘটলে সেটা আমরা তদন্ত করে দেখি। কিশোরের দিকে তাকালেন। বুঝতে পারছি তুমি ভাবছ এসবের পেছনে হারল্ড মুরের হাত থাকতে পারে। যদি ব্যাপারটা দুর্ঘটনা না হয় তা হলে আমি তোমাদের জানাব।
নিজেদের কার্ড দিয়ে ফোরম্যানের কাছ থেকে বিদায় নিল ওরা। শেষবারের মতো হারল্ড মুরকে একবার দেখে গাড়ি স্টার্ট দিল মুসা। এবার রওনা হলো ওরা

কারিনা মুরের বাড়ি লক্ষ্য করে।
বারান্দাতেই দাঁড়াও, কিশোর কলিং বেল বাজানোর পর দরজা সামান্য ফাঁক করে বলে উঠলেন কারিনা মুর। হারল্ড বলেছে তোমাদের সঙ্গে কথা বলাও আমার ঠিক হয়নি। তোমাদের বাড়িতে ঢুকতে দিতে নিষেধ করে দিয়েছে ও।
তা হলে মিস্টার মুরের সঙ্গে কথা হয়েছে আপনার এ-ব্যাপারে? জিজ্ঞেস করল মুসা।
কথা হয়েছে দশ মিনিটও হয়নি। বলেছে তোমরা শিপইয়ার্ডে গিয়েছিলে, সেখানে দুর্ঘটনা ঘটায় তাকে সন্দেহ করে ফোরম্যানের সঙ্গে কথা বলেছ। তিক্ত হাসলেন কারিনা মুর। আমার ছোট ভাই একটা মশাও মারতে পারে না।
মিস্টার মুরের কাছে শুনলাম কাল রাতে আপনি ডগ-হাউসের সামনে থেকে একটা ট্রাকে করে কুকুর নামানো দেখেছেন, বলল কিশোর। তিনি কি ঠিক বলেছেন?
ঠিকই বলেছে। ব্যাপারটা আমার কাছে স্বাভাবিক বলেও মনে হয়নি।
কেন? ঠিক কী দেখেছেন আপনি?
বিচ্ছিরি চেহারার দুই যুবক-যুবতী। বলতে নেই, তা ছাড়া আলোও কম ছিল, কিন্তু ওদের দেখে মনে হচ্ছিল হরর সিনেমা থেকে উঠে এসেছে। তখন মনে হয়েছিল হয়তো তারা রাবারের মুখোশ পরে আছে।
কতোগুলো কুকুর নামিয়েছে তারা?
পাঁচ-ছয়টা তো হবেই। বলা মুশকিল। ট্রাক থেকে কুকুর নামিয়ে ওই জঘন্য ডগ-হাউসে ঢুকল। আমি কিচেনে গিয়েছিলাম দুধ আনতে, কাজেই পরে কী হলো আর দেখতে পারিনি। পরে আবার যখন ওদিকে তাকালাম, দেখি ট্রাকটা নেই।
রাত তখন কতো হবে বলবেন কি?
সাড়ে তিনটা বা পৌনে চারটা তো হবেই। ঘুম আসছিল না।
খুকখুক করে কাশল কিশোর। আপনি বলেছেন ট্রাক থেকে তারা কুকুর নামিয়েছে। ট্রাকটা কি কোনও কোম্পানির ট্রাক ছিল?
জানি না। একটা পিকআপ ট্রাক। খুব পুরোনো জিনিস।
কোন রঙের ছিল বলতে পারবেন?
বাইরে তখন অন্ধকার ছিল। তবে আমার মনে হয়েছে ওটার রং লাল বা তামাটেই হবে।
পরস্পরের দিকে তাকাল তিন গোয়েন্দা।
তারপর আপনি মিস্টার মুরের ঘুম ভাঙিয়ে জানালেন কী দেখেছেন? জিজ্ঞেস করল কিশোর।

এই যে আবার তোমরা হ্যারিকে সন্দেহ করতে শুরু করেছ, গলার স্বরে মনে হলো কারিনা মুর রেগে যাচ্ছেন। আমার আর হ্যারির উপরে দোষ চাপিয়ে কোনও ফায়দা হবে না। আমরা কোনও বেআইনী কাজে নেই। দরজাটা বন্ধ করে দিচ্ছিলেন কারিনা মুর, হাত তুলে তাঁকে ঠেকাল মুসা।
মিস্টার মুর তখন বাসায় ছিলেন, তাই না? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
ঘুমাচ্ছিল ও। তোমাদের আর একটা কথারও উত্তর দেব না আমি। ভেবেছ কারণ ছাড়াই যার-তার কাছে জবাবদিহি করব? থাবড়া দিয়ে দরজার উপর থেকে মুসার হাতটা সরিয়ে দিয়ে দড়াম করে দরজা লাগিয়ে দিলেন কারিনা মুর।
দীর্ঘশ্বাস ফেলল কিশোর। গোয়েন্দাগিরি করতে হলে কতোরকম ব্যবহার যে পেতে হয় মানুষের কাছ থেকে! গাড়িটার দিকে পা বাড়াল ওরা। কিশোর বলল, কারিনা মুরের কথা যদি ঠিক হয়, তা হলে তাঁর ভাই হারল্ড মুর আমাদের দোকানের ভেতর খাঁচায় বন্দি করেনি। মরিচের গ্যাস চোখে মারাটাও তার কাজ নয়।
তবে তার কথা থেকে একটা ব্যাপার জানা গেল, বলল মুসা। লাল ট্রাক নিয়ে এসেছিল এখানে কেউ। ট্রাকটা কে চালায় সেটা বের করতে পারলে হয়তো এই রহস্যের সমাধান হবে।
চলো, এদিকে যখন এসেই পড়েছি তো ডগ-হাউসে একবার একটু উঁকি দেওয়া যাক, প্রস্তাব দিল কিশোর।
ওরা ঢুকে দেখল ফোনে কথা বলছে আয়োলা মর্টন। থ্যাঙ্ক ইউ বলে ফোন রেখে দিল। মৃদু হাসল ওদের দেখে, জিজ্ঞেস করল, তদন্ত কেমন এগোচ্ছে?
শীঘ্রি চোর ধরা পড়ে যাবে, বলল কিশোর। যতোটা আত্মবিশ্বাস ওর গলায় ফুটল ততোটা মোটেও অন্তরে অনুভব করছে না ও।
তা-ই নাকি? দারুণ খবর!
তবে এখনও কয়েকটা সুতো জোড়া দিতে হবে, বলল মুসা।
কিশোর জিজ্ঞেস করল, আপনি তো রাতের ডিউটিতে আছেন তা-ই না?
হ্যাঁ। কিন্তু আজকে আমার ডবল শিফট। মিসেস লেবউফ পত্রিকায় সাক্ষাৎকার দিতে গেছেন। মিস্টার লেবউফ গেছেন হলিউডের মোটেলটা কেনার ব্যাপারে আলোচনা করতে। আমি একা।
কেশে গলা পরিষ্কার করল কিশোর। আমরা শুনলাম গত রাতে এখানে কয়েকটা কুকুর আনা হয়েছে।
গতরাতে মিসেস লেবউফ ডিউটি দিয়েছেন, বলল আয়োলা। মাঝরাতে আমাকে বুঝিয়ে দিয়ে তারপর বিশ্রাম নিতে যান।
তা হলে রাত তিনটে সাড়ে তিনটের সময় আপনিই ডিউটিতে। ছিলেন?

হ্যাঁ। কিন্তু আমি তো কুকুর আনার ব্যাপারে কিছু জানি না! কার কাছে শুনলে রাতে কুকুর আনা হয়েছে?
সেটা আপাতত বলা যাবে না, নরম গলায় বলল কিশোর।
নিশ্চয়ই কারিনা মুরের কাছ থেকে শুনেছ! মুখটা লাল হয়ে গেল আয়োলা মর্টনের।
এখন এ-ব্যাপারে আমরা কিছু বলতে চাই না। নিজের মত থেকে সরল না কিশোর।
রেগে গেছে আয়োলা মর্টন। বলল, মহিলা নির্ঘাত বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যে কথা বলেছে।
কেন উনি মিথ্যে বলবেন?
অন্য কারও ওপর যাতে সন্দেহ পড়ে সেজন্যে। হঠাৎ আয়োলার চেহারায় অপরাধবোধের ছাপ পড়ল। কেমন যেন মিইয়ে গেল সে।
কী ব্যাপার, মিস মটন? জিজ্ঞেস করল মুসা। কোনও সমস্যা?
বিব্রত দেখাল আয়োলাকে। আগে প্রমি করো কাউকে বলবে না।
কী ব্যাপারে প্রমি সেটা না জানলে... কথা শেষ করল না। কিশোর।
রাতে বার কয়েক আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কাউকে বোলো না প্লিজ। আমার চাকরি চলে যাবে।
আসলে আপনি বলতে চাইছেন ডিউটির সময়টা ঘুমিয়ে কাটিয়েছেন? সরাসরি প্রশ্ন করল কিশোর।
অনেকখানি সময় ঘুমিয়েছি, স্বীকার করল আয়োলা। মিস্টার লেবউফ শ্যারনকে বিদায় করে দেয়ার পর থেকে দ্বিগুণ ডিউটি করতে হচ্ছে আমাকে।
আপনি কিছু মনে না করলে আমরা কেনেলটা আরেকবার ঘুরে দেখতে চাই, বলল কিশোর।
কোনও সমস্যা নেই, সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল আয়োলা মর্টন। টুল থেকে নেমে আগে আগে চলল সে। চাবি দিয়ে ভিতরে যাওয়ার দরজাটা খুলল।
ভিতরে ঢুকে কিশোর-মুসা-রবিন দেখল দুপাশের সবগুলো খাঁচাতে এখন কুকুর আছে। ব্যবসা আগের চেয়ে ভাল যাচ্ছে, মন্তব্য করল কিশোর।
হ্যাঁ, আগের চেয়ে ভাল, বলল আয়োলা। তবে মিস্টার লেবউফ এখনও সন্তুষ্ট নন।
এক ক্যান ডগট্রিট বিস্কিট খুলে কুকুরগুলোকে খাওয়াতে শুরু করেছে মুসা, তবে ওর কান খাড়া। হঠাৎ একটা ব্যাপার খেয়াল ও। একটা গোল্ডেন রিট্রিভারের গলার কলারে মালিকের নাম আর ঠিকানা লেখা একটা কার্ডবোর্ড ঝুলছে। কিন্তু পাশের কাঁচার কুকুরটার গলায় ওরকম কোনও কার্ডবোর্ড নেই।
ওটা দেখাল মুসা। এটার মালিক কে?

এখনও আমি ওটার মালিকের নাম টাইপ করে উঠতে সময় পাইনি, লালচে হয়ে গেল আয়োলার চেহারা। আজকে তোমরা এসে শুধু আমার কাজের খুঁতই দেখতে পাচ্ছ। তিন বন্ধুর দিকে পালা করে তাকাল তরুণী, তারপর নরম গলায় বলল, প্লিজ, মিস্টার লেবউফকে কিছু বলে দিয়ো না। এই কাজটা সত্যিই আমার খুব দরকার। গাড়ির তেল, মেরামতির খরচ, অ্যাপার্টমেন্টের ভাড়া... মিইয়ে গেল আয়োলার কণ্ঠ। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে অত্যন্ত শঙ্কিত।

বেশ কয়েকটা কুকুরেরই মালিকের নাম এখনও লেখা হয়নি, বলল মুসা। কেনেলের দরজায় ঝোলানো ক্লিপবোর্ডটা দেখেছে ও। এখানে অন্তত বিশটা কুকুর আছে। আর তাদের মধ্যে নাম লেখা মাত্র পনেরো ষোলোটা।

জানি, দীর্ঘশ্বাস ফেলল আয়োলা। বাকিগুলোর মালিকের নাম লিখে ফেলব আমি। ফোন বেজে উঠল অফিসে। এক্সিকিউয মি, বলে প্রায় দৌড়ে চলে গেল আয়োলা।

কুকুরের লিস্টিতে চোখ বুলাল কিশোর, রবিন আর মুসা ঘুরে ঘুরে কুকুরগুলো দেখছে। খানিক পরই কেনেলের দরজায় আয়োলার মুখ দেখা গেল। বিস্মিত স্বরে সে বলল, ফোনটা কিশোরের!

অফিসে ঢুকল কিশোর, রিসিভার কানে ঠেকিয়ে বলল, কিশোর পাশা বলছি।

রবিন আর মুসাও চলে এসেছে ওর পাশে। কিশোরকে আর কিছু বলতে শুনল না ওরা। কিশোর শুধু রিসিভার কানে ঠেকিয়ে রেখেছে, কথা যা বলার বলছে ওদিকের লোকটা। খানিক পরে রিসিভারটা আয়োলার দিকে বাড়িয়ে দিল কিশোর। রবিন-মুসা খেয়াল করল কিশোর গুডবাই বলেনি।

কী ব্যাপার? রিসিভার নিল আয়োলা।

কী হলো, কিশোর? জিজ্ঞেস করল মুসা।

হুমকি দিল, শুকনো গলায় বলল কিশোর। বলেছে: এক্ষুনি তদন্ত বন্ধ করো, নইলে সাতিক বিপদে পড়ে যাবে।

রবিন প্রশ্ন করল, গলাটা কার চিনতে পেরেছ?

না, দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল কিশোর। মুখে বোধহয় রুমাল চেপে ধরে রেখেছিল। আবছা শোনাচ্ছিল গলাটা। কী বলেছে জানো? বলেছে। আমরা যদি তদন্ত বন্ধ না করি, তা হলে রাফিয়ানের লাশ পৌঁছে যাবে স্যালভিজ ইয়ার্ডে!

কুকুর চোর পরিষ্কার কথা বলেছে, আবার বলল কিশোর। আমরা যদি তদন্ত বন্ধ না করি, তা হলে রাফিয়ানকে খুন করবে সে।

যা বলছে সেটা করাই বোধহয় তোমাদের উচিত হবে, কাঁপা গলায় বলল আয়োলা। ভয়ঙ্কর খারাপ লোক নিশ্চয়ই, নইলে এরকম হুমকি দিত না।

লোকই তা আপনাকে কে বলল? সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করল কিশোর।

গলার আওয়াজে তো বোঝার উপায় ছিল না।
মুহূর্তের জন্য থমকে গেল আয়োলা, তারপর বলল, আন্দাজ করে নিয়েছি কুকুর চুরির পেছনে পুরুষমানুষেরই হাত আছে। তবে বলা যায়। না, মেয়েরাও তো চুরি করে।
আপনাকে আমরা সন্দেহ করছি না, পরিবেশ সহজ করতে বলল কিশোর। সেই প্রথম থেকেই আমাদেরও ধারণা কোনও লোকই কাজগুলো করছে। কিন্তু টেলিফোনে যে হুমকি দিল, তার গলা এতো চাপা শোনাচ্ছিল যে ছেলে না মেয়ে বোঝা যায়নি।
এমন কী হতে পারে হারল্ড মুর ফোনটা করেছিল? জিজ্ঞেস করল আয়োলা। হয়তো বোনের হয়ে নোংরা কাজগুলো সে-ই করছে।
ও ব্যাপারেও আমরা ভেবেছি, বলল কিশোর।
মুসা আলোচনায় যোগ দিল। এমনও হতে পারে নিক মিলহিজারই কুকুরচোর। তাঁর সঙ্গে ইদানীং আপনার যোগাযোগ হয়েছে কোনও?
না, তার সঙ্গে কোনও কথা হয়নি আমার চাকরি ছাড়ার পর থেকে। একসঙ্গে কাজ করতাম, সেই সূত্রে পরিচয়। মিস্টার লেবউফের সঙ্গে ঝগড়া করে চলে যাবার পর আর কোনও খবর রাখিনি।
কাজে কি গাড়ি নিয়ে আসতেন মিলহিজার? প্রশ্ন করল রবিন।
মনে হয়, দ্বিধার ছাপ পড়ল আয়োলার কণ্ঠে। তবে খেয়াল করে দেখিনি।
তাঁর পিকআপ ট্রাক কখনও দেখেননি? চট করে এবার জিজ্ঞেস করল কিশোর।
পিকআপ না গাড়ি তা জানি না। আসলে একেবারেই ভাবিনি এসব নিয়ে।
আর হারল্ড মুর? জিজ্ঞেস করল মুসা। আপনি তো বলেছেন কয়েকবার তাকে বাড়ি থেকে বের হতে দেখেছেন। তিনি কি গাড়ি ব্যবহার করেন?
না। মাথা নাড়ল আয়োলা। বাসের জন্য অপেক্ষা
দেখেছি। টেবিলে রাখা বেশ কিছু কাগজ তুলে নিল তরুণা, ক্ষমাপ্রার্থনার হাসি হাসল।
শোনো, কিছু মনে কোরো না, তবে আমার অনেক কাজ পড়ে আছে, মিসেস লেবউফ আসার আগেই শেষ করতে হবে।
আমরা আর আপনার সময় নষ্ট করবনা, বলল কিশোর। কিন্তু দুটো কথা। এক, মিসেস লেবউফকে চোখ-কান খোলা রাখতে বলবেন। আর দুই, ডিউটির সময় জেগে থাকাই আপনার জন্যে মঙ্গল হবে।
আস্তে করে মাথা দোলাল আয়োলা মর্টন। ওদের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিল।
মুসার গাড়িতে উঠে কিশোর বলল, আমরা ডগ-হাউসে আছি সেটা ডগন্যাপার জানল কী করে? অজান্তেই চারপাশে একবার দেখে নিল ও। মন বলছে লোকটা

কাছাকাছি কোথাও আছে।
রবিন প্রশ্ন তুলল, ফোনটা কিশোরের সেটা জানানোর আগে কতোক্ষণ দেরি করেছে আয়োলা মর্টন?
কয়েক সেকেন্ড, জবাব দিল কিশোর।
রিয়ার ভিউ মিররটা দেখে নিয়ে রওনা হলো মুসা। গাড়ি চালাতে চালাতে জিজ্ঞেস করল, কেন ভাবছ এসবের সঙ্গে আয়োলা মর্টনের কোনও সম্পর্ক আছে? কিশোর, তোমার কি ধারণা সে-ই ফোনে বলেছে ওখানে আছি আমরা?
সম্ভব, বলল কিশোর। হয়তো বলেছে। আমার যতদূর মনে পড়ে ও শুধু ফোন তুলে হ্যালো বলেছিল। তারপরই আমাকে ডেকে দেয়।
তা হলে কাকে সন্দেহ করব আমরা? হাল ছেড়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল রবিন। হারল্ড মুর, নাকি নিক মিলহিজার?
দুজনকেই সন্দেহ করব, বলল কিশোর। আমাদের দরকার প্রমাণ। তার আগেই কাউকে আমরা অভিযুক্ত করতে পারি না। ...আচ্ছা একটা ব্যাপার খেয়াল করেছ? লাল ট্রাক বা হলদে দরজাওয়ালা গাড়ি যদি হারল্ড মুরের হতো তা হলে একবারও কি ওগুলো আমরা ড্রাই ডকে দেখতে পেতাম না?
হয়তো অন্য কোথাও পার্ক করে, বলল মুসা।
নীচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর, তারপর মোবাইল ফোনটা বের করে কর অফিসে ডায়াল করল। এবার মিস্টার বার্লিসনকে পাওয়া গেল। তিনি জানালেন ওয়্যারহাউসটা রয়াল রেস্টোরেশন নামের এক কোম্পানির। ওই একই কোম্পানি ড্রাই-ডকেরও মালিক। বন্দরের ধারেকাছের বেশিরভাগ ওয়্যারহাউস আর দোকানপাটেরও মালিক এই আর.আর.সি।
মিস্টার বার্লিসনকে ধন্যবাদ দিয়ে ফোন রেখে দিল কিশোর, বন্ধুদের জানাল কী জেনেছে।
তা হলে তো ওয়্যারহাউসের পেছনের দরজার কথা হারল্ড মুরের। জানা থাকা স্বাভাবিক, বলল মুসা। ডক কর্মীদের হয়তো ওটা ব্যবহার করারও অনুমতি আছে।
প্রমাণ, আমাদের দরকার অকাট্য প্রমাণ, বলল কিশোর। এবার চলল, ফেরা যাক।
স্যালভিজ ইয়ার্ডে ঢুকে গাড়ি রেখে সোজা কিচেনে চলে এলো ওরা, হালকা নাস্তা সেরে নিল। বেরিয়ে মোবাইল হোমে যাবে ঠিক করেছে, এমন সময় কিচেনের ফোনটা বেজে উঠল। রিসিভার তুলল রবিন। ওপ্রান্তের কথা শুনল হ্যালো বলার পর, তারপর রিসিভার রেখে দিল। মুখটা লালচে দেখাচ্ছে ওর। বলল, লোকটা আমাদের পনেরো মিনিট সময় দিয়েছে মনস্থির করার! তদন্ত বন্ধ করতে হবে,

সেই সঙ্গে একয়দিন তদন্ত করেছি বলে এক হাজার ডলার দিতে হবে, তা হলে রাফিয়ানকে ফেরত দেবে সে! পনেরো মিনিট পর আবার ফোন করবে বলে রেখে দিল।
পনেরোটা মিনিট যেন পনেরো ঘণ্টার সমান দীর্ঘ। অপেক্ষার সময়গুলো যেন কাটতেই চায় না। আবার ফোন বেজে উঠতেই কিশোর ধরল এবার।
কী সিদ্ধান্ত নিলে তোমরা? চাপা একটা গলা জিজ্ঞেস করল। বোধহয় মুখের উপর তোয়ালে রেখে কথা বলছে।
আমরা রাফিয়ানকে ফেরত চাই, বলল কিশোর। সেজন্যে আপনি যা বলবেন সেই মতোই কাজ করব আমরা।
কিশোর আর ডগন্যাপার কথা বলছে, এর ফাঁকে রাশেদ চাচার প্যারালাল ফোনের কলার আইডি বক্স চেক করে দেখল মুসা। রবিন খসখস করে লিখে নিল লোকটা কোন নাম্বার থেকে ফোন করেছে। মোবাইল থেকে ফোন, কোম্পানিতে কল করল এবার মুসা, তাদের জিজ্ঞাসা করে জানা গেল ওটা বে স্ট্রিটের একটা পে-ফোন। জায়গাটা বন্দরের কাছেই।
আমরা শুধু রাফিয়ানকে ফেরত চাই না, অন্য কুকুরগুলোও ফেরত চাই, কিশোরকে বলতে শুনল ওরা।
সুইচ টিপে রিসিভার নামিয়ে কথা বলছে এখন কিশোর, স্পিকারে ডগন্যাপারের কথা শুনতে পেল ওরা। যা বলেছি তা ওই একবারই বলেছি। রাফিয়ানকে ফেরত পাবে, তার বদলে দিতে হবে এক হাজার ডলার। কথা দিতে হবে তদন্ত করবে না আর। নইলে রাফিয়ানের লাশ পাঠিয়ে দেব।
অন্য কুকুরগুলোর কী হবে? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
রাফিয়ানকে ফেরত দেয়ার পরও যদি তোমরা তদন্ত করে তা হলে সাধারণ কুকুর যে-কয়টা আছে, প্রতিদিন ওগুলোর একটা করে মেরে তোমাদের ঠিকানায় পাঠাব। একটু বিরতি, তারপর উগন্যাপার জিজ্ঞেস করল, আর কোনও প্রশ্ন?
না। নীচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর।
বুদ্ধিমান ছেলে, খিকখিক করে হাসল লোকটা। এবার শোনো আমি কী করতে বলি।
রবিনকে ইশারা করল কিশোর, রবিন নোটবুক আর কলম নিয়ে তৈরি হয়ে গেল।
লুকআউট পয়েন্টে আজ মাঝরাতে আসবে। পুবের পার্কিং লটে গাড়ি রাখবে। ড্রাইভার আর প্যাসেঞ্জার, দুদিকের জানালার কাঁচই নামিয়ে রাখবে। তারপর অপেক্ষা করবে। ওখানে তোমাদের পরবর্তী নির্দেশ দেয়া হবে। যদি কোনও চালাকি করতে যাও, যেমন পুলিশে রিপোর্ট করা বা অন্য কিছু, তা হলে রাফিয়ানকে এমন একটা ইঞ্জেকশন দেব যে ওর ঘুম আর ভাঙবে না কোনদিন।

সেক্ষেত্রে আমি আবার ফোন করে তোমাদের জানিয়ে দেব কোথা থেকে রাফিয়ানের লাশ সংগ্রহ করতে হবে। যা বলেছি মনে থাকবে?
থাকবে।
গুড, সন্তুষ্ট মনে হলো লোকটাকে, তারপর বলল, আরেকটা কথা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম।
কী?
তুমি আর ওই কালো ছোকরা এসবের মধ্যে থাকবে না। শুধু তোমাদের বন্ধু যাবে ওখানে। একমাত্র তা হলেই রাফিয়ানকে ফেরত দেব। ঠিক মাঝরাতে। রবিন মিলফোর্ড একা এক হাজার ডলার নিয়ে আসবে। কোনও চালাকি নয়। রাখছি।
ফোনের লাইন কেটে গেল।
পরস্পরের দিকে তাকাল তিন গোয়েন্দা। লোকটা ওদের সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানে। কিন্তু কীভাবে?
এসো একটা পরিকল্পনা করে ফেলি, নীচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর। লোকটার কথা মত রবিন একা যাবে। ড্রাইভিং সিটে ও একাই থাকুক। মুসা, তুমি লুকিয়ে থাকবে পেছনের সিটের সামনে পা রাখার জায়গায়। আমি থাকব গাছের আড়ালে কাছাকাছি কোথাও। লোকটার দৈহিক আকৃতি মনে আছে? পাতলা-সাতলা লোক। একা আসবে বলেই মনে হয়। তা-ই যদি আসে, তা হলে তাকে তিনজন মিলে কাবু করতে খুব একটা অসুবিধে হবার কথা নয়। এবার মুক্তিপণের টাকা। গত গ্রীষ্মে স্যালভিজ ইয়ার্ডে কাজ করে আমরা বারোশো ডলার পেয়েছিলাম। ওখান থেকে একহাজার ডলার নিয়ে যাব আমরা। কারও কোনও কথা? দুই বন্ধুর দিকে তাকাল কিশোর। ওরা কিছু না বলায় আবার ও বলল, চাচীর কাছে অনুমতি নিয়ে নেব আমি। তোমরা আন্টিদের বলতে পারো আজ রাতে আমার বাসায় থাকবে। ঠিক আছে?
নীরবে সায় দিল রবিন আর মুসা। রাতে ওরা বাইরে বের হবে, কাজেই চাচীর অনুমতি আদায় করাটাই সবচেয়ে কঠিন হবে। সেটার দায়িত্ব কিশোর নিয়েছে।
বাসা থেকে অনুমতি পেতে কোনও অসুবিধে হলো না রবিন আর মুসার।
খালি গোয়েন্দাগিরি! কখন কোন বিপদে পড়বে ঈশ্বর জানেন! সর্বক্ষণ ভয়ে ভয়ে থাকি আমি কখন কী হয়ে যায়! নানা কথাই বললেন মেরি চাচী, কিন্তু ওদের বাধা দিলেন না। অনুমতি দিয়ে বলে দিলেন, সাবধানে থাকবি তোরা।। তাঁকে ওরা কথা দিল, কোনও ঝুঁকি নেবে না।
রাত এগারোটার সময় রবিনের গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল রবিন আর মুসা। মুসা শুয়ে আছে পিছনের পা-দানীতে। স্যালভিজ ইয়ার্ডের উপর নজর রাখা হতে পারে ভেবে পনেরো মিনিট পর ওর পুরোনো এইচ হান্ড্রেড এস মটর সাইকেল

নিয়ে ওদের তৈরি নতুন গোপন দরজা, গোপন ছয় দিয়ে বের হলো কিশোর। গোপন ছয় দেয়ালের সঙ্গে মিশে থাকা চুনকাম করা পুরু কাঠের শক্ত একটা ফটক, দেখে বোঝার উপায় নেই ওটা আসলে দেয়াল নয়। বন্দরের দিকে না গিয়ে অন্যদিকে চলেছে। কিশোর। ঘুরপথে বন্দরের কাছের ওই পার্কে পৌঁছোবে। অনেক পথ ঘুরে পিছনে ফেউ লাগেনি বুঝে বন্দরের দিকে চলল ও।
আজ রাতে চাঁদ ওঠেনি। নিশ্চল বাতাসে থোকা থোকা কুয়াশা ভাসছে। পার্কের কাছে গিয়ে মটর সাইকেলের এঞ্জিন বন্ধ করে দিল কিশোর, পুব পার্কিং লটে ঢুকে দ্বিচক্রযানটা পার্ক করে রেখে দেখল প্রাচীন দুটো বিচ গাছের ছাউনির নীচে গাড়ি রেখেছে রবিন। আবছা ভাবে রবিনকে সামনের সিটে বসে থাকতে দেখল ও। মুসা নিশ্চয়ই পিছনে লুকিয়ে শুয়ে আছে।
নির্জন পার্ক থমথম করছে। একটা ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে অপেক্ষায় থাকল কিশোর, চারপাশে নজর বুলাচ্ছে।
অ্যাসফল্টের উপর পড়া আবছা আলো আর কুয়াশার কারণে কিশোরের প্রথমে মনে হলো নড়াচড়াটা ওর চোখের ভুল। তারপর আবার নড়াচড়া দেখতে পেল ও। কালো পোশাক পরা একটা মূর্তি নিঃশব্দে রবিনের গাড়ির দিকে এগিয়ে চলেছে। চোখ কুঁচকে আরও ভাল করে দেখতে চেষ্টা করল কিশোর।
ছায়া থেকে বেরিয়ে এসেছে লোকটা, এখন সরাসরি রবিনের গাড়ির দিকে দৌড়ে চলেছে। টান টান উত্তেজনা অনুভব করল কিশোর। লোকটা গাড়ির প্যাসেঞ্জার সাইডের জানালা দিয়ে কী যেন ছুঁড়ে দিয়েছে ভিতরে। কী? কে এই লোকটা? কিশোর চিন্তা করল, ধাওয়া করবে নাকি ও? নিজেকে সাবধান করল, পরিকল্পনা মতো কাজ করতে হবে। আগে মুসা আর রবিন লোকটাকে ধরুক, তারপর সাহায্য করতে হাজির হবে না থেমে দৌড়ে চলে গেল লোকটা।
কিশোর? ছোট্ট মাইক্রোফোনে রবিনের গলা শুনতে পেল কিশোর।
কী, রবিন?
লোকটা একটা চিঠি ফেলে গেছে। কাগজের ভাঁজ খোলার আওয়াজ শুনতে পেল কিশোর। জোরে জোরে পড়ল রবিন গাড়ির ভিতরের হলদে বাতির আলোয়। ওর পড়া শেষ হতে কিশোর জানতে চাইল লোকটার চেহারা ও দেখেছে কি না।
না। শুধু পিঠ দেখেছি।
নির্দেশ মতো কাজ করো। মুসা তৈরি তো?
হ্যাঁ। ঠিক পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করব আমি এখানে, তারপর গাড়ি থেকে বের হবো।

পাঁচটা মিনিট যেন পাঁচ বছর, সময়টা আর পার হতে চায় না। তারপর বের হলো রবিন। দরজা বন্ধ করে দিল। মুসা এখনও শুয়ে আছে পিছনের পাদানীতে। বদলে গেছে ওদের পরিকল্পনা। লোকটা রাফিয়ানকে নিয়ে আসেনি, বদলে পরবর্তী নির্দেশ লেখা কাগজ দিয়ে উধাও হয়ে গেছে।

পার্কিং লট পার হচ্ছে রবিন, হাতে মানিব্যাগ। কিশোরকে বুঝিয়ে দিচ্ছে মুক্তিপণের টাকা নিয়ে যাচ্ছে ও। অন্য কোথাও ওকে দেখা করতে বলেছে ডগন্যাপার।

কিশোর অস্বস্তি নিয়ে দেখল, সিঁড়ি বেয়ে অবর্ভেশন ডেকে উঠছে রবিন। ওখানে সমুদ্রের উপর বেড়ে থাকা একটা কাঠের প্ল্যাটফর্মে মুক্তিপণ আর বন্দিবিনিময় হবে। তখন অন্তত চারশো ফুট উঁচতে থাকবে। রবিন। নীচে রুক্ষ পাথুরে সৈকত। মুসা বের হলো এবার গাড়ি থেকে। ছায়ায় মিশে নিঃশব্দে রবিনের পিছু নিয়ে চলেছে সে। অপেক্ষা করল কিশোর।

ডগন্যাপারের দেওয়া কাগজে লেখা আছে রবিনকে অব্যার্ভেশন ডেকে যেতে হবে। সেদিকেই চলেছে মুসাও। সিঁড়ি বেয়ে উঠছে। চোর! ট্র্যান্সমিটারে রবিনের চিৎকার শুনতে পেল কিশোর। মুসাকে দৌড় দিতে দেখল। আপনি বলেছিলেন রাফিয়ানকে ফেরত দেবেন!

ঝড়ের বেগে ছুটছে মুসা, দ্রুত সিঁড়ি ভেঙে উঠতে শুরু করল। দেরি করল না কিশোরও, দৌড় দিল অবর্ভেশন প্ল্যাটফর্মের সিঁড়ি লক্ষ করে। আহ্! রবিনের আর্তচিৎকার শুনতে পেল। তার পরপরই ট্রান্সমিটারের কানেকশন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

অন্ধকার পার্কটা যেন ভুতুড়ে, চারপাশে আর কোনও শব্দ। মুসাকেও দেখা যাচ্ছে না। সিঁড়ি টপকে প্ল্যাটফর্মে উঠে গেছে ও। জুতোর ফিতে খুলে যাওয়ায় হোঁচট খেল কিশোর। ওগুলো বাঁধতে গিয়ে। বেরিয়ে গেল মূল্যবান একটা মিনিট। আবার ছুটল ও সিঁড়িগুলোর দিকে। তারপর মত পাল্টাল। ঘুরপথে ছুটল সৈকতের দিকে। ওদিক থেকে প্ল্যাটফর্মে উঠবে। দুদিক দিয়ে তা হলে ঘিরে ফেলা যাবে কুকুর চোর লোকটাকে।

.

ওদিকে প্ল্যাটফর্মের উপর উঠে পড়েছে মুসা। আগেও এখানে এসেছে। কয়েকবার। তবে সবসময় এসেছে দিনে। কিন্তু এখন চারপাশে ঘন কুয়াশার রাজত্ব। এক হাত সামনেও দেখা যায় না। রবিনের অস্ফুট কথা শুনেছে মুসা, বুঝতে পারছে বিপদে পড়েছে রবিন। ওর সাহায্য দরকার। কিন্তু কোথায় রবিন? সাদা কুয়াশার দেয়ালের কারণে কিছুই তো দেখা যাচ্ছে না। কোনও আওয়াজও নেই।

রবিন? ডাকল ও। এখন আর ওদের পরিকল্পনা কাজে আসবে না। রবিন?
প্ল্যাটফর্মের কিনারায় চলে এসেছে ও, আরেকটু হলেই নীচে পড়ত, একেবারে শেষ সময়ে সামলে নিল। এদিক দিয়ে আরেক প্রস্থ সিঁড়ি নেমে গেছে সৈকতে।
জবাব দিল না রবিন।
আরও কয়েকবার ডাকল মুসা, সাড়া নেই কোনও।
গা ছমছম করা নীরবতা। শিউরে উঠল মুসা। এই একটু আগে প্ল্যাটফর্মের উপর দুজনের উপস্থিতি টের পেয়েছে ও। রবিন আর ডগন্যাপার কোথায় গেল?

.

নিস্তব্ধ সৈকত। নির্জন। এতো রাতে কেউ নেই আর। প্ল্যাটফর্মে ওঠার সিঁড়িটা খুব সরু। ওটার কাছে পৌঁছে একটু থামল কিশোর। টর্চ জ্বেলে বালিতে পায়ের ছাপ দেখল। কোনওটাকেই নতুন মনে হলো না। তা হলে কি এদিক দিয়ে নামেনি এখনও ডগন্যাপার আর রবিন-মুসা? সিঁড়ি বেয়ে প্ল্যাটফর্মে উঠে এলো ও। কুয়াশার কারণে নিজেকে ওর প্রায় অন্ধ বলে মনে হচ্ছে। বেশ কিছুটা দূরে একটা আওয়াজ শুনতে পেল। থমকে দাঁড়াল কিশোর। টর্চ নিভিয়ে দিয়েছে। রবিন না মুসা করল আওয়াজটা?
একটা অস্ফুট চিৎকার ভেসে এলো কুয়াশার ভিতর থেকে। রবিন? মুসা? গলা কেঁপে গেল কিশোরের।
কিশোর? আমি এখানে। মুসার গলা। কুয়াশার ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো একটা ছায়ামূর্তি।
রবিন কোথায়?
জানি না, হাঁফাচ্ছে মুসা। ডগন্যাপারের সঙ্গে ছিল। তারপর কোনও গণ্ডগোল হয়ে গেছে।
সব গোলমাল হয়ে গেল, বলল বিব্রত কিশোর। রাফিয়ানকে তো আমরা ফেরত পাই-ইনি, এখন রবিনও নিখোঁজ!
চোরটা নিশ্চয়ই রবিনকে বেশিদূর নিয়ে যেতে পারেনি, বলল মুসা। এক কাজ করি এসো, তুমি প্ল্যাটফর্মের উত্তর দিকটা দেখো, আমি যাচ্ছি দক্ষিণ দিকটা খুঁজতে।
মানসিক ভাবে দুর্বল বোধ করছে মুসা, যতোই জোর দিয়ে কথা বলুক না কেন। পার্শ্ববর্তী টিলার সারিতে দুবার খুঁজেছে ও, রবিনের চিহ্নও দেখেনি। কিছু ফেলে যায়নি রবিন সূত্র হিসাবে। ওকে যে ধরে নিয়ে গেছে সে-ও কোনও চিহ্ন ছাড়াই উধাও হয়েছে। কিশোর চলে যাওয়ার পর একটা কথা মনে এলো ওর। রবিন কোথায় থাকতে পারে

এখন মনে হয় আন্দাজ করতে পারছে ও। এ গুহা! রকি বিচের টিলাগুলোতে গুহার কোনও অভাব নেই। ওগুলোর একটাতে হয়তো লুকিয়ে আছে রবিন। হয়তো ডগন্যাপারের হাতে ধরা পড়েনি ও।
এ্যানিটের টিলায় উঠবার সহজ একটা পথ খুঁজতে শুরু করল মুসা। বামদিকে টিলার গায়ে ঝোপের ভিতর দিয়ে সরু একটা পথ আছে। যদি অবশ্য চোখের ভুল না হয়। ওদিকে এগোল ও। ঠিক তখনই পিছনে একটা আওয়াজ শুনতে পেল। বন্যার স্রোতের মতো স্বস্তি অনুভব করল ও অন্তরে। নিশ্চয়ই রবিন।
মুসা ঘুরবার আগেই, একটা লোহার চেইন ওর গলা পেঁচিয়ে ধরল। পিছন থেকে কেউ জোর টান দিচ্ছে। ভারসাম্য হারাতে শুরু করল মুসা। গলায় শক্ত হয়ে চেপে বসছে চেইনটা। শ্বাস আটকে আসছে। দুহাতে চেইনটা গলা থেকে ছোটাতে চেষ্টা করল ও। আর তখনই একটা রুমাল চাপ দিয়ে ধরা হলো ওর নাকে। রুমালটায় কেমন একটা মিষ্টি গন্ধ। ছুটতে চেষ্টা করল মুসা, কিন্তু ততোক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। ভারি আচ্ছন্ন বোধ করল মুসা। চোখের সামনে দুনিয়াটা যেন চরকির মতো ঘুরছে। জ্ঞান হারাবার আগে ওর শেষ চিন্তা এলো, টিলা থেকে পড়ে গেলে মরতে হবে। তারপরই অচেতন হয়ে লুটিয়ে পড়ল ও।
প্ল্যাটফর্মের উত্তর প্রান্তে চলে এসেছে কিশোর, কোনও লাভ হলো না। রবিন নেই এদিকে। এবার বৃত্তাকারে প্ল্যাটফর্মটাকে ঘিরে এগোল ও। দক্ষিণ দিকে পৌঁছেও মুসার কোনও দেখা পেল না। মুসা? গলা চড়িয়ে। ডাকল কিশোর। মুসা নিশ্চয়ই আশেপাশেই আছে। জবাব দিল না মুসা। বারবার ডাকল কিশোর, কোনও সাড়া নেই।
রবিন আর মুসা অদৃশ্য, রাফিয়ানও নিখোঁজ।
ইতিকর্তব্য ঠিক করে ফেলল কিশোর, সিঁড়ি বেয়ে নেমে ফিরে চলল। রবিনের গাড়ির দিকে। ওটাতে মোবাইল ফোনটা আছে। ওখান থেকে পুলিশ হেডকোয়ার্টারে ফোন করে সাহায্য চাওয়া ছাড়া এখন আর কিছু করার নেই।
প্রথবার রিং হতেই রিসিভার তুললেন একজন পুলিশ অফিসার। তিনিই এই শিফটের অফিসার ইন-চার্জ। জানালেন চিফ ইয়ান ফ্লেচার বাড়ি ফিরে গেছেন ডিউটি শেষে। কিশোরের বক্তব্য শুনে বললেন, পনেরো মিনিটের মধ্যে পার্কে পৌঁছে যাবেন তিনি দুজন সার্জেন্ট নিয়ে।
ঠিক তেরো মিনিটের মাথায় স্কোয়াড কার নিয়ে হাজির হলেন তারা। সরাসরি কাজের কথায় এলেন পুলিশ অফিসাররা।
ঠিক কতোক্ষণ হলো রবিন আর মুসা নিখোঁজ হয়েছে?
ঘড়ি দেখল কিশোর। বিশ মিনিট।

তা হলে ছড়িয়ে পড়ে খুঁজে দেখা যাক, বললেন অফিসার ইন-চার্জ ওরাইলি। অফিসার রনসন, আপনি সিঁড়ির দুপাশের টিলায় খোঁজেন। অফিসার জেমস, আপনি প্ল্যাটফর্মে খুঁজবেন। আমি আর কিশোর দেখব পার্কিং লট।
পার্কিং লটের পুবদিকটা কিশোরের দেখা হয়ে গিয়েছে সেটা অফিসার ওরাইলিকে জানাল ও। দুজন চলল পশ্চিম দিকে খুঁজে দেখতে।
পার্কিং লটের পশ্চিম দিকটা বড় বড় গাছ আর ঝোপ দিয়ে তিন দিক থেকে ঘেরা। মার্কারি লাইটের আলো কুয়াশার চাদর ছিন্ন করতে পারছে না। চারপাশে শুধু হলদে একটা আভা। রবিন পুব দিকের পার্কিং লটে গাড়ি রেখেছিল, কাজেই ডগন্যাপার হয়তো তার বাহন রেখেছে পশ্চিম দিকে। টর্চের দুর্বল আলোয় সতর্ক চোখে মেঝে দেখতে দেখতে চলল কিশোর। এমন কিছু ওর চোখে পড়ল না যা থেকে বোঝা যায় এদিকে গাড়ি রেখেছে চোরটা।
ক্লান্ত আর হতাশ লাগছে কিশোরের, কিন্তু বুঝতে পারছে এখন কোনওমতেই হাল ছেড়ে দেওয়া যাবে না। হয়তো রবিন আর মুসার জীবন নির্ভর করছে সময় মতো ওদের খুঁজে বের করতে পারার উপর। অফিসার ওরাইলির পাশে পাশে হাঁটছে কিশোর, চারপাশে তাকাচ্ছে। কোনও সূত্রের আশায়।

.

মাথাটা যেন ছিঁড়ে পড়বে বলে মনে হলো মুসার। চোখ মেলল ও। কিছু দেখতে পেল না। চোখ বেঁধে রাখা হয়েছে কাপড় দিয়ে। মাথায় হাত দিয়ে তালু কতোটা ফুলেছে বুঝতে চাইল। পারল না। হাত-পা বেঁধে ঠাণ্ডা মেঝেতে ফেলে রাখা হয়েছে ওকে। ।
মিষ্টি গন্ধওয়ালা রুমালটার কথা এবার মনে এলো ওর। আসলে মাথায় আঘাত করা হয়নি, ড্রাগ দিয়ে ওকে অজ্ঞান করা হয়েছিল। সে কারণেই এই তীব্র মাথা-ব্যথা।
আঁচড়ের আওয়াজ শুনতে পেল ও। রাগে গা জ্বলছে মুসার। জীবনে এই প্রথম বারবার ওদের উপর টেক্কা দিয়ে গেছে কোনও লোক। তা-ও লোকটা একটা কুত্তাচোর!
রবিনের কথা মনে এলো। রবিন কোথায়? রবিনই কি আঁচড়ের আওয়াজ করছে? ডাকতে গিয়েও মত পরিবর্তন করল ও। কোথায় আছে জানা নেই ওর। আরও কে আছে তা-ও অজানা। ডগন্যাপার লোকটা ধারেকাছে থাকতে পারে। ডাকাডাকি না করে চুপচাপ থাকবে ঠিক করল ও, দড়ির বাঁধন খোলার চেষ্টা করবে।

.

দুবার করে খোঁজা হলো পার্কিং লট, প্ল্যাটফর্ম আর দুপাশের টিলার উপর। রবিন-মুসার কোনও হদিশ পাওয়া গেল না। ক্লান্ত বিধ্বস্ত কিশোরের অনুরোধের জবাবে অফিসার ওরাইলি বললেন, বুঝতে পারছি। তোমার কেমন লাগছে, বাছা, কিন্তু এখানে বা আশেপাশে ওরা নেই। চিরুনি অভিযান চালিয়েছি আমরা। আর খুঁজে কোনও লাভ নেই। তবু যখন বলছ তো আরেকবার আমরা খুঁজব। তবে এবারই শেষ।

তিন পুলিশ অফিসার পার্কিং লট আর সৈকতের দিকে গেলেন এবার। কিশোর আবার উঠল অবর্ভেশন প্ল্যাটফর্মে। এখানেই শেষ। বারের মতো দেখা গেছে রবিন-মুসা আর ডগন্যাপারকে।

প্ল্যাটফর্মের গায়ে গা লাগানো টিলাগুলো বেশিরভাগ জায়গাতেই খাড়া উঠে গেছে অনেক উপরে। টিলার ধার দিয়ে হাঁটছে কিশোর। ঝোপটা দেখে মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়াল। রুক্ষ টিলার গায়ে ওদিকে যেন সরু একটা পথ দেখা যায়, এদিকটা নেমে গেছে জমিনের দিকে! অব্যার্ভেশন প্ল্যাটফর্ম থেকে নেমে ঝোপের মাঝ দিয়ে পথটা ধরে এগোল ও।

টর্চের আলো ফেলে দেখল আরও বেশ কয়েকটা পায়ের ছাপ আছে। একই লোকের পায়ের ছাপ। ওর আগেও পথটা ব্যবহার করেছে। কেউ। কিছুটা সামনে রুপালি কী যেন একটা টর্চের হলদে আলোয় ঝিকিয়ে উঠল। সামনে বেড়ে ওটা তুলল কিশোর। চিনতে দেরি হলো না। জিনিসটা মুসার ঘড়ি।, শিউরে উঠল কিশোর। ঘড়িটা যেখানে পেয়েছে সেখান থেকে উঁচু টিলার কিনারা মাত্র আধফুট দূরে। তা হলে কি মুসা টিলা থেকে নীচের ওই পাথুরে সৈকতে পড়ে গেছে? তা হলে তো মৃত্যু নিশ্চিত!

.

দড়ির বাঁধন খানিকটা ঢিলে করতে পেরেছে মুসা। খুব দক্ষ হাতে বাঁধা হয়নি ওকে। আরও খানিক চেষ্টা করলে হয়তো নিজেকে মুক্ত করতে পারবে ও।

আঁচড়ানোর আওয়াজটা আবার শুনতে পেল মুসা। আরও খানিক কসরত করার পর ডানহাতটা দড়ির গিঁঠ থেকে ছাড়াতে পারল ও। এখন পর্যন্ত কিডন্যাপারের উপস্থিতির কোনও আলামত টের পাওয়া যায়নি। হাতের বাঁধন খুলে চোখের বাঁধনটাও খুলল মুসা এবার। পায়ের বাধন খুলতেও দেরি হলো না।

প্রায়-অন্ধকার একটা ঘরে আছে ও। অতি সামান্য যে আলোটুকু আসছে সেটা আসছে কয়েকটা জানালার তক্তার ফাঁক দিয়ে আর নীল একটা ডীম লাইট থেকে। জানালার কাঁচ মনে হলো রং করা। জেসিকা স্প্রিংগারের গ্যারেজে আছে কি না ভাবল মুসা।

স্বল্প আলোয় চোখ সয়ে আসার পর একটা লনমোওয়ারের আবছা আকৃতি দেখতে পেল। একটা ওঅবেঞ্চও আছে ঘরে। এবার অন্যদিকে তাকাল ও। ধূসর গাড়িটা দেখতে পেল। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল ও, গাড়িটার চারপাশে এক চক্কর মারল। মাথার ব্যথাটা এখনও যাচ্ছে না। যা দেখবে ভেবেছিল তা-ই দেখতে পেল। গাড়িটার একটা দরজা হলদে রং করা।

গ্যারেজের কোনায় কী যেন নড়ে উঠল। বরফের মতো জমে গেল মুসা, তারপর সাবধানে ওদিকে মনোযোগ দিল। বিরাট একটা তারপুলিন দিয়ে কীসব যেন ঢেকে রাখা হয়েছে। নড়ে উঠল তলার জিনিসটা, তারপর গোঙানির আওয়াজ হলো। দ্রুত ওটার পাশে চলে গিয়ে ক্যানভাসটা সরাল মুসা। নীচে রবিন পড়ে আছে। ওর মতোই হাত-পা-চোখ বেঁধে ফেলে রাখা হয়েছে নথিকে। দ্রুত হাতে রবিনের বাঁধনগুলো খুলে ফেলল ও। জিজ্ঞেস করল, কী অবস্থা, রবিন?

মাথাটা গেছে, বলল রবিন। ছিঁড়ে পড়তে চাইছে যেন! কোথায় আমি?

কারও গ্যারেজে, জানাল মুসা। এখন বুঝতে পারছি আয়োলা মর্টন তার গাড়ি আর অ্যাপার্টমেন্ট আমাদের দেখতে দিতে চায়নি কেন। আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল মুসা, কিন্তু আবার আঁচড়ানোর আওয়াজটা শুনতে পেয়ে, থেমে গেল। এবার আওয়াজটার পরপরই ভউ! হুফ! করে উঠল একটা কুকুর। পরস্পরের দিকে তাকাল দুই গোয়েন্দা। আওয়াজটা ওদের বড় বেশি পরিচিত।

রাফিয়ান!

চুরি যাওয়া কুকুরগুলোর খোঁজ এখন জানে ওরা।

ওই ট্র্যাশব্যাগগুলোর পেছন থেকে আওয়াজটা এসেছে, বলল রবিন।

ময়লা আবর্জনা মাড়িয়ে গ্যারেজের আরেক কোনায় চলে এলো। দুজন। খাঁচাগুলোর সামনে আগে পৌঁছোল মুসা। নয়টা খাঁচা। প্রত্যেকটাতে একটা করে কুকুর রাখা আছে। ঘুমাচ্ছে বেশিরভাগই। ওরা বুঝতে পারল ওগুলোকে ড্রাগ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে।

চোরাই কুত্তা, বলল রবিন। খাঁচার ভিতর হাত ঢুকিয়ে রাফিয়ানের মাথা চুলকে দিল। গরাদে আঁচড় কাটল রাফিয়ান, বের হতে চায়। ভউ! ভউ! করে জোরাল ডাক ছাড়ল পরপর কয়েকবার।

অন্য খাঁচার কুকুরগুলোও নড়েচড়ে ঘুম ভেঙে জেগে উঠছে। শীঘি বিভিন্ন জাতের কুকুরের ডাকে ভরে গেল গ্যারেজের ভিতরটা।

শুকিয়ে গেল রবিন-মুসার মুখ। ওদের যে ধরে এনেছে সে এতো চিৎকার ডাকাডাকি শুনে নিশ্চয়ই কী ঘটল তার খোঁজ নিতে আসবে।

রাফিয়ানের খাঁচার দরজা খুলে দিল রবিন। সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলো রাফিয়ান, রবিনের বুকে দুপা তুলে দিয়ে গাল চেটে দিল।

রাফিয়ান ঠিক আছে, পরম স্বস্তির সঙ্গে বলল মুসা।
দরজায় আওয়াজ পেয়ে ওর স্বস্তি উবে গেল। রবিন ঝট করে দরজার দিকে তাকাল। কে যেন দরজার তালায় চাবি ঢুকিয়েছে! কিডন্যাপার! দ্রুত গ্যারেজের চারপাশে তাকিয়ে লুকানোর জায়গা খুঁজল দুই গোয়েন্দা।
এতো ক্লান্তি লাগছে যে কিশোরের মনে হলো পার্কের কোনও বেঞ্চে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। বাসায় যোগাযোগ করো, বলে দাও কোথায় আছো; আমরা চললাম, বলে তৃতীয়বার খোঁজা শেষে বিদায় নিয়েছেন তিন পুলিশ অফিসার। কাল সকালে আবার তদন্ত শুরু করবেন। ব্যাপারটাকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছেন তাঁরা, কিন্তু এই মাঝরাতে এতো ঘন কুয়াশার মধ্যে তাঁদের আসলেই কিছু করার নেই।
হতাশ হয়েছে কিশোর, কিন্তু তাদের থাকতে অনুরোধ করতে পারেনি। বুঝতে পারছে, ওর-ও বাড়ি ফিরে যাওয়া উচিত। কিন্তু ফিরবে কী করে! কী করে কারও সামনে মুখ দেখাবে ও? বাবা-মাকে ওর বাড়িতে থাকবে বলে এসেছিল রবিন আর মুসা। এখন ওরা নিখোঁজ, হয়তো মারাত্মক বিপদের মধ্যে আছে, আর ও ফিরে যাবে? তা হয় না।
একটা বেঞ্চে বসল কিশোর। অফিসার ওরাইলির বলা বাসায় যোগাযোগ কথাটা বারবার ওর মনের ভিতর ঘুরেফিরে আসছে। মন বলছে কথাটা আগেও কোথাও শুনেছে ও। সত্যিই শুনেছে? কোথায়? কপাল টিপে ধরল কিশোর। মনে হচ্ছে দুনিয়াতে ও ছাড়া আর কেউ নেই। থমথম করছে গোটা পার্ক।
কুকুরচরি রহস্য নিয়ে ভাবতে শুরু করল ও। সেই প্রথম থেকে কী কী ঘটেছে একে একে মনের মধ্যে নেড়েচেড়ে দেখছে।
বাসায় যোগাযোগ করো।
এবার মনে পড়ল ওর। প্রথম যেদিন কোলি চুরির পর ডগ-হাউসে গেল ওরা, তখন আয়োলা মর্টন ফোনে বাসায় যোগাযোগ করবে বলে খানিকক্ষণের জন্য চলে গিয়েছিল। এখন পরিষ্কার মনে পড়ছে। তরুণী বলেছিল বাড়িতে বাবা-মার সঙ্গে যোগাযোগ করে বলবে সে কোথায় আছে। তাকে বাড়তি ডিউটি দিতে হবে সেটা জানাতে গিয়েছিল আয়োলা। কিন্তু পরে অন্য সময় কথায় কথায় বলেছিল চাকরিটা তার খুব দরকার, গাড়ির তেল, মেরামতির খরচ আর অ্যাপার্টমেন্টের ভাড়া দিতে পারা নিয়ে চিন্তিত ছিল। আরও একবার বলেছিল তার অ্যাপার্টমেন্টে ওরা যাতে না যায়, অ্যাপার্টমেন্ট অগোছাল। এখন কিশোর বুঝতে পারছে, আয়োলা চায়নি ওরা তার অ্যাপার্টমেন্টে যাক। গেলে ওরা বুঝে ফেলত বাবা-মাকে ফোন করার কোনও কারণ নেই। আয়োলার। আসলে বাবা-মার সঙ্গে থাকেই না সে!
কোনও সন্দেহ নেই আয়োলা মর্টন মিথ্যে বলেছে।

যাকেই সে ফোন করে থাকুক, তার বাবা-মাকে করেনি।
করেছে ডগন্যাপারকে!
ওরা শ্যারনের বন্ধু জেনে খুব বিস্মিত হয়েছিল আয়োলা। সে কারণেই সে ফোন করে। ফোন করে কুকর্মের সঙ্গীকে জানিয়ে দেয় ওরা। তদন্ত করতে শুরু করেছে। নইলে অতো শীঘ্রি ওদের পিছু লেগে যেতে পারত না ডগন্যাপার। রাফিয়ানের দায়িত্ব ওরা নিয়েছে সেটাও বোধহয় জানিয়েছে। তারপর ডগন্যাপার ওদের অনুসরণ করে স্যালভিজ ইয়ার্ডে পৌঁছে যায়। ওখান থেকে রাফিয়ানকে চুরি করে।
কিন্তু কেন?
উত্তরটা সহজ। আয়োলা মর্টন যেই বুঝল ওরা কোলিটা খুঁজবে, তখনই বুঝতে পারল বিপদে পড়ে যেতে পারে সে। তিন গোয়েন্দার সুখ্যাতি ভাল করেই জানত সে। কুকুর চুরি পুলিশ হয়তো তেমন গুরুত্বের সঙ্গে নেবে না, কিন্তু তিন গোয়েন্দা বান্ধবীর খাতিরে আপ্রাণ। চেষ্টা করবে. চোরকে ধরার। আয়োলা চিন্তা করেছে কী করে তিন গোয়েন্দাকে এই কেস থেকে সরিয়ে দেওয়া যায়। রাফিয়ানকে চুরি করলে ওদের হুমকি দেওয়া যাবে যাতে তদন্ত বন্ধ করে। কিন্তু কিছু একটা গোলমাল হয়ে গিয়েছিল। নইলে ব্যাপারটা এখন কুকুর চুরির চেয়ে অনেক বড় ধরনের অপরাধে পরিণত হয়েছে। কিডন্যাপ করা হয়েছে মুসা আর রবিনকে। কিডন্যাপিঙের শাস্তি অত্যন্ত গুরুতর।
পার্কে যা ঘটল সেটা মনের ভিতর নাড়াচাড়া করল কিশোর। পরিকল্পনায় পরিবর্তন আনা হলো কেন? রবিন বা মুসা কি ডগন্যাপারকে চিনে ফেলেছিল? সে-কারণেই ওদের ধরে নিয়ে গেছে?
বেঞ্চ ছেড়ে উঠল কিশোর, রবিনের গাড়ির কাছে ফিরে এলো। ইগনিশনে চাবি রেখেই বেরিয়েছিল রবিন। গাড়িটা স্টার্ট দিতে অসুবিধে হলো না। সোজা ডগ-হাউসের দিকে ছুটল রবিনের ফোক্সওয়াগেন। গম্ভীর চেহারায় গাড়ি চালাচ্ছে কিশোর। এখনও অনেক সুতো জোড়া লাগছে না, তবে এটা নিশ্চিত যে, রবিন আর মুসার অদৃশ্য হওয়ার সঙ্গে আয়োলা মর্টনের সম্পর্ক আছে।

.
রবিন-মুসা লুকানোর জায়গা খুঁজে বের করে পা বাড়াতে পারার আগেই খুলে গেল দরজা। বাইরে থেকে উজ্জ্বল আলো এসে পড়ল গ্যারেজের ভিতর। ভিতরে ঢুকল লোকটা। এখনও তার মুখ ঢেকে রেখেছে রাবারের সেই মুখোশ। হাতে একটা পিস্তল! তাকে দেখেই বিপদ বুঝে ছোট একটা টেবিলের তলায় গিয়ে ঢুকেছে রাফিয়ান।

পিস্তলটা রবিন আর মুসার মাঝখানে তাক করে ধরল কিডন্যাপার, গম্ভীর গলায় ধমকে উঠল, খবরদার! কোনও চালাকি নয়! একটু নড়েছ কী মরেছ! পিস্তল নাড়াল সে। এবার যা বলছি, করো!

লোকটার নির্দেশে রবিনের হাত-পা আবার বাঁধতে হলো মুসাকে। এক হাতে পিস্তল তাক করে টেপ দিয়ে মুসার কব্জিদুটো বেশ কয়েক প্যাঁচ দিয়ে আটকে দিল লোকটা। কাজ সেরে মুখোশের ভিতর খিকখিক করে হাসল। ভেবেছিলে পার পেয়ে গেলে, না? এতো সহজ নয়!

আপনি কি পাগল হলেন? বলল মুসা। কুকুর চুরি এক কথা আর কিডন্যাপিং সম্পূর্ণ আরেক। ধরা আপনি পড়বেনই। আর তখন ভীষণ কড়া শাস্তি হবে।

দোষটা তোমার বন্ধু রবিনের, বলল মুখোশ পরা লোকটা। ও যদি টাকাগুলো আপোষে দিয়ে দিত তা হলে আমি জানিয়ে দিতাম কোথায় রাফিয়ানকে পাওয়া যাবে। কিন্তু টাকা হাতছাড়া করতে চাইল না ও। তারওপর মুখোশে টান দিল। হয়তো চিনে ফেলেছে, কাজেই ওকে টাকাসুদ্ধ ধরে আনতে হলো।

শীঘ্রি জেলে পচে মরবেন আপনি, বলল রবিন।

অসম্ভব! খিকখিক করে হাসল মুখোশ পরা লোকটা। সাক্ষ্য দেবে কে আমার বিরুদ্ধে? ছোটখাটো কয়েকটা কাজ সেরে নিই, তারপর সমস্ত প্রমাণ নষ্ট করে সরে পড়ব আমি।

আপনার সঙ্গীনিকে, ফেলেই চলে যাবেন? চট করে প্রশ্ন করল মুসা।

ওর... থেমে গেল কিডন্যাপার, তারপর প্রশংসার সুরে বলল, ভেরি গুড, মুসা আমান। আমাকে প্রায় বোকা বানিয়ে দিয়েছিলে।..•□ক, তাতে কিছু আসবে যাবে না। আমার সামনে আর কোনও পথ খোলা রাখোনি তোমরা। এখন ইচ্ছের বিরুদ্ধে কাজ করতে হবে আমাকে।

কী বলতে চান? শঙ্কিত বোধ করতে শুরু করল মুসা। হাতের প্ল্যাস্টিকের টেপ খুলতে চেষ্টা করে দেখল, কাজটা অসম্ভব।

সত্যিই আমার সামনে আর কোনও পথ খোলা নেই, যেন আপন মনে বলছে কিডন্যাপার, তোমাদের চিরতরে গায়েব করে দিতে হবে এখন।

এখন সুখবর হচ্ছে, কুকুরগুলো আপাতত বাঁচবে, ঠাট্টার সুরে বলল পিস্তলধারী কিডন্যাপার। আর দুঃসংবাদ হচ্ছে, মরতে হবে তোমাদের দুজনকে।

রবিন চুপ করে শুনছে লোকটার কথা। মুসা চিন্তা করে দেখল, লোকটাকে যদি কথা বলিয়ে সময় আদায় করা যায়, তা হলে হয়তো বাঁচার একটা সুযোগ ওরা পেতেও পারে। বাঁচার কোনও না কোনও পথ নিশ্চয়ই আছে!

একটু পরই পুলিশ নিয়ে এখানে চলে আসবে কিশোর, জোর দিয়ে মিথ্যেটা বলল মুসা।

তোমাদের বন্ধু জানেও না তোমরা কোথায় আছে, তার সেই খিকখিকে হাসি হাসল কিডন্যাপার।
কথাটা সত্যি হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি, তিক্ত মনে ভাবল মুসা। ওদিকে রবিন লোকটার গলার আওয়াজ থেকে পরিচয় চেনার চেষ্টা করছে। লোকটা কি হারল্ড মুর? মনে তো হচ্ছে না। নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না। আর এই জায়গাটা জেসিকা স্প্রিংগারের গ্যারেজও হতে পারে।
কুকুর চুরি শুরু করলেন কেন? জিজ্ঞেস করল মুসা।
দেহের ভর এক পায়ে চাপাল কিডন্যাপার। তোমাদের বলা যায়, তোমরা তো আর অন্য কাউকে কখনও বলতে পারবে না। খবরের কাগজে পড়েছিলাম ব্রিডাররা ল্যাবগুলোকে কুকুর সরবরাহ করে প্রচুর রোজগার করে। চিন্তা করে দেখলাম আমিও কাজটা করতে পারি। কিন্তু ব্রিডিং শুরু করার মতো টাকা ছিল না আমার। সহজ পথটাই বেছে নিলাম। চুরি করতে শুরু করলাম কুকুর। এরমধ্যেই ছয়টা ল্যাবের সঙ্গে চুক্তিও হয়ে গেছে আমার। তোমাদের খতম করে দিয়েই চলে যাব কাছের একটা গ্রামে। কেউ জানতেও পারবে না আমার মতো এক ভয়ঙ্কর খুনি গ্রামে চলে যাবে। একটু থামল সে, তারপর বলল, জানো একেকটা কুকুর বিক্রি থেকে কতো পাবো আমি? এক হাজার ডলার! রীতিমতো বড়লোক হয়ে যাব। আর তা যদি হতে না-ও পারি, যদিও তার সম্ভাবনা নেই, তবু কুকুরের খাঁচা পরিষ্কার করার চেয়ে এ-কাজটা অনেক ভাল। রকফেলার এক লাখেই কোলি ফেরত নেবে আশা করি। অন্যগুলোও বিকিয়ে যাবে ভাল দরে। লোকটা থামতেই রবিন মুসার দিকে তাকাল। মুসা, কুকুরের খাঁচা পরিষ্কার করার কথা বলেছে, এর মানে বুঝেছ? পায়খানা পরিষ্কার! এখন বুঝতে পারছ কে কিডন্যাপার?
মিস্টার মিলহিজার, পার পাবেন না আপনি, শীতল স্বরে বলল মুসা।
ক্ষণিকের জন্য চুপ হয়ে গেল মুখোশধারী, তারপর মুখোশটা একটানে খুলে ফেলল। ঠিক আছে, তোমাদের বুদ্ধি আছে মানছি। ভালই হলো, মুখোশটা আর পরে থাকতে হবে না। এমনিতেই ওটা পরে গরমে হাঁসফাস করছিলাম। এবার আমি যাচ্ছি, একটা ফোন করতে হবে। কাজটা সেরেই ফিরে আসব তোমাদের ব্যবস্থা করতে। সত্যি আমি দুঃখিত, কিন্তু আমার সামনে আর কোনও পথ খোলা রাখোনি তোমরা। পিছিয়ে গেল নিক মিলহিজার, তারপর দরজাটা বন্ধ করে তালা মেরে দিয়ে চলে গেল।

.

ডগ-হাউসের পোর্টিকোর নীচে রবিনের গাড়ি যখন থামাল কিশোর, তখন মাত্র পুবাকাশে মুখ তুলেছে সূর্য। অফিসের দরজাটা দড়াম করে খুলে গেল, প্রায় ছুটে বের হলো আয়োলা মর্টন। পোর্টিকোতে গাড়িটা যেন খেয়ালও করল না। কাকে

যেন কী সব বলতে বলতে ছুটছে তরুণী। গাড়ির কাঁচ নামাল কিশোর তার কথা শুনবার জন্য। ভিতরের কারও কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করছে আয়োলা, বলছে অত্যন্ত জরুরি কাজ পড়ে যাওয়ায় এক্ষুনি তাকে বাড়ি যেতে হচ্ছে।
সিটে নিচু হয়ে বসল কিশোর, যাতে ওকে দেখতে না পায় আয়োলা মর্টন। তরুণী খানিকটা দূরে চলে যাবার পর মাথা তুলল ও। খুব তাড়াহুড়ো করে ছুটছে তরুণী। সে ডগ-হাউস ভ্যানে চড়ে বসার আগে পর্যন্ত অপেক্ষা করল কিশোর, তারপর ভ্যানটা রাস্তায় নামার পর অনুসরণ শুরু করল। বেশ খানিকটা দূরত্ব বজায় রাখল, যাতে ও পিছু নিয়েছে সেটা সহজে টের না পায়। রবিনের গাড়ির রংটাও ওকে সাহায্য করছে। এই গাড়িটা আয়োলা মর্টন আগে দেখেনি।
ধৈর্য ধরে পিছু লেগে থাকল কিশোর। বুঝতে পারছে আয়োলা মর্টন ওকে রবিন আর মুসার কাছে পৌঁছে দেবে। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল ওর। মোবাইল ফোনটা ব্যবহার করলে কেমন হয়? পুলিশে যদি ফোন করে ও?।
প্রথবার রিং হতেই ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্লেচার ধরলেন। আধমিনিট কিশোরের বক্তব্য শুনেই বললেন, তুমি পেছনে লেগে থাকো। কোন স্ট্রিটে আছো বলো, আমি ব্যারিকেডের ব্যবস্থা করছি।
লাইমস্টোন স্ট্রিট, সার। মে ফ্লাওয়ারের দিকে যাচ্ছি।
আমি ওয়্যারলেস করে দিচ্ছি। লাইন কেটে গেল।

.

এতো তাড়াতাড়ি আপনার কাজ শেষ হয়ে গেল? নিক মিলহিজার ফিরতেই শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করল মুসা।
জবাব না দিয়ে পিস্তলটা কোমরে খুঁজল মিলহিজার। বলল, এটা একটা খেলনা পিস্তল ছিল। যদি আগে জানতে তা হলে আমাকেই বরং বন্দি করে ফেলতে পারতে তোমরা। কিন্তু আফসোস, তোমরা ধরতে পারোনি। এবার পকেট থেকে ছোট একটা চামড়ার থলে বের করল মিলহিজার। ওটা থেকে সিরিঞ্জ আর অ্যাম্পুল বের হলো। সোডিয়া পেনটোবারবিটাল, বলল মিলহিজার। আধ অ্যাম্পুল ইঞ্জেক্ট কর চিরতরে ঘুমিয়ে পড়বে তোমরা। আর কখনও সে-ঘুম ভাঙবে না।
খুন করবেন আপনি আমাদের? অবিশ্বাস ঝরল মুসার কণ্ঠে। হাতের টেপ অনেকখানি ঢিলে করে ফেলেছে ও। আর সামান্য সময় পেলেই হাত দুটো মুক্ত করতে পারবে। খুনের শাস্তি জানেন? মৃত্যুদণ্ড! ইলেকট্রিক চেয়ার।
আমি চলে যাচ্ছি ধরাছোঁয়ার বাইরে, ছোকরা। অনেকবার অনেক ভাবে তোমাদের ভয় দেখিয়ে ঠেকাতে চেয়েছি। এমনকী আমার সেরা সংগ্রহ ভয়ঙ্কর পিট বুল কুকুরটাকেও ঘুমের ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে লেলিয়ে দেয়ার জন্যে রেখে

এসেছি ওয়্যারহাউসের ভিতর। শুধু তা-ই, মরিচের গ্যাস, গায়ের ওপর খাবারের বস্তা ফেলা, কুকুরের খাঁচায় আটকানো-কী না করেছি। তারপরও নাছোড়বান্দা ছোকরা তোমরা শিক্ষা নিলে না। ভয়ঙ্কর হাসি হাসল নিক মিলহিজার। অ্যাম্পুল থেকে সিরিঞ্জে ধীরে ধীরে স্বচ্ছ তরল ভরল। শেষ কথা কিছু বলার থাকলে বলে ফেলল। ওষুধটা খুব দ্রুত কাজ করে কিন্তু। মুসা আর রবিনের শুকনো মুখ দেখল মিলহিজার। ভয় নেই, একদম ব্যথা পাবে না।

দুপা এগোল সে, তারপর থমকে দাঁড়াল। এতোক্ষণে তার খেয়াল হয়েছে একটা খাঁচা খোলা। ওটাতে কুকুর নেই।

তোমাদের রাফিয়ান কই?

টেবিলের তলা থেকে উঁকি দিল রাফিয়ান। সঙ্গে সঙ্গে রবিনও চিৎকার করল, ছুঃ, রাফিয়ান!

একটা তীরের মতো ছুটে বের হলো রাফিয়ান, পরক্ষণেই ঝাঁপিয়ে পড়ল নিক মিলহিজারের উপর। সোজা লোকটার বুকে দুপা তুলে দিল ও। সেই সঙ্গে বিকট ভউ! ভউ! করছে।

মিলহিজার এরকম কিছু ঘটবে ভাবতেও পারেনি। হঠাৎ রাফিয়ানের ওজনটা সামলাতে না পেরে চিৎ হয়ে মেঝেতে পড়ে গেল সে। আর ঠিক তখনই এক ঝটকায় টেপ ছুটিয়ে উঠে দাঁড়াল মুসা। নিক মিলহিজার উঠবার সময় পেল না, মুসা পৌঁছে গেল তার পাশে। ধাক্কা দিয়ে তাকে টuছু করেই পিঠে চড়ে বসে লোকটার দুহাত ভাজ করে ধরে ঠেলল ও উপরের দিকে। ব্যথায় আঁউ করে একটা শব্দ বের হলো মিলহিজারের মুখ দিয়ে। এদিকে রাফিয়ান তার গাল চেটে দিচ্ছে।

উঠবার চেষ্টা করল মিলহিজার, পারল না। হালকা-পাতলা লোক সে, তা ছাড়া মুসার মতো কারাতেও জানে না, অসহায় ভাবে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকল। খানিকক্ষণ পর ব্যথায় বিকৃত স্বরে বলল, বদমাশ ছোকরা, আমার হাত ভেঙে যাচ্ছে!

ভাঙতে দিন, খুব বেশি ব্যথা লাগবে না। অন্তত মরার চেয়ে তো ভালো! নির্বিকার গলায় বলল মুসা। আরেকটু হলেই তো আমাদের খুন করছিলেন!

পাগল না কি! প্রায়, আঁতকে উঠল এবার মিলহিজার। ভয় দেখাচ্ছিলাম। খুনখারাপি করে মরব না কি!

তা হলে অ্যাম্বুলের ওষুধটা?

তরল রিভোট্রিল। ঘুমিয়ে পড়তে তোমরা। আমি পরে পুলিশকে ফোন করে জানিয়ে দিতাম তোমাদের কোথায় পাওয়া যাবে। আবার উঠবার চেষ্টা করল

মিলহিজার। ছাড়ো বলছি, বদমাশ ছেলে! ছেড়ে দাও! কথা দিচ্ছি আমি চলে যাব। খোদার কসম!
যাবেন তো বটেই, বলল রবিন। তবে যাবেন আসলে জেলে। মানুষের কুকুর চুরির অপরাধে।
রবিন, ডাকল মুসা। গড়িয়ে চলে এসো দেখি এদিকে, তোমার হাতের বাঁধন খুলে দিই। একে এক হাতেও আটকে রাখতে পারব এই হোল্ডে।
কসরত শুরু করল রবিন, মিনিট পাঁচেক পর চলে আসতে পারল। নিক মিলহিজারের পাশে। এক হাতে মিলহিজারের দুই কব্জি শক্ত করে ধরে আরও উপরের দিকে ঠেলল মুসা। বাপরে! বলে কাতরে উঠল। মিলহিজার। মুসা অন্য হাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল রবিনের বাধন নিয়ে। ভাল করে বাঁধেনি ও বাঁধবার সময়। মিলহিজারও পরীক্ষা করে দেখেনি। আধ মিনিট লাগল রবিনের হাতের বাঁধন খুলে দিতে। পায়েরটা রবিন নিজেই খুলল। প্রথমেই রাফিয়ানের মাথায় হাত বুলিয়ে দিল ও, তারপর দড়িগুলো দিয়ে আচ্ছামতো বাধল নিক মিলহিজারকে।
দুজন উঠে দাঁড়াল ওরা, ঠিক তখনই দূরে শুনতে পেল পুলিশের গাড়ির সাইরেন। দ্রুত কাছে চলে আসছে সাইরেনের আওয়াজ। ঠিক যেন গ্যারেজের দরজার সামনেই থামল কয়েকটা গাড়ি।.।
দরজা খুলে বাইরে তাকাল রবিন-মুসা, দেখল পুলিশের গাড়ি থেকে নামছেন ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্লেচার। একজন পুলিশ অফিসার হাতকড়া পরানো আয়োলা মর্টনকে ধরে নামালেন। রবিনের ফোক্সওয়াগেন থেকে নামল কিশোর।
গ্যারেজের ভিতর ঢুকল সবাই। রবিন-মুসাকে নিরাপদ দেখে স্বস্তির শ্বাস ফেলল কিশোর।
আয়োলা মর্টনকে দেখেই চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল মিলহিজারের, বলে উঠল, গাধী! সঙ্গে করে পুলিশ নিয়ে এসেছ! তোমার কথায় যদি এই বদমাশ ছোকরাদের না ঘাঁটাতাম তা হলে এখন হয়তো নিশ্চিন্তে থাকতাম আমি। ওদের নেড়ি কুত্তাটাকে চুরি করতে বলেই আমার সর্বনাশ করলে তুমি।
কী! আমি বলেছি! ফুঁসে উঠল আয়োলা মর্টন। আর তুমি? তুমি দুধে ধোঁয়া তুলসি পাতা? মুক্তিপণ চাইলটা কে? আমি ডগ-হাউস থেকে কুকুর চুরি করতে মানা করেছিলাম না? এহ্! বাহাদুর! কিছু হবে না বলে! বলেছিলাম না শ্যারন মেয়েটা তিন গোয়েন্দার বন্ধু, তাকে ঘটালে ধরা পড়ে যাব আমরা!
আপনিই তালায় আঁচড় কেটেছিলেন, মিলহিজার? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
আস্তে করে মাথা দোলাল নিক মিলহিজার ফ্যাকাসে মুখে। পুলিশ মনে করেছিল তালাটা জোরাজুরি করে খোলা হয়েছে।

আর আপনি, আয়োলা, তরুণীর দিকে ফিরল কিশোর। আপনি হুমকি দিয়ে ডগ-হাউসে ফোন আসে বলেছিলেন, সেটা নিশ্চয়ই মিথ্যে? গাড়ি নষ্ট সেটাও নিশ্চয়ই বানানো কথা?

আমি আমার দোষ স্বীকার করে নিচ্ছি, পরাজিতের মতো বলল আয়োলা মর্টন।

আর আপনি আমাদের গাড়ি সার্চ করেছিলেন, মিলহিজার? জিজ্ঞেস করল মুসা।

হ্যাঁ। পিট বুলটাকে ওয়্যারহাউসে সামলাতে গিয়ে এক্সেলসিওর ল্যাবের কার্ডটা পড়ে গিয়েছিল, ওটা খুঁজছিলাম। একটু থামল মিলহিজার, তারপর বলল, দেখো, আমাদের দোষগুলো বড় কিছু নয়। কয়েকটা কুকুর শুধু চুরি করেছি আমরা।

আস্তে করে মাথা নাড়লেন ইয়ান ফ্লেচার। এতোক্ষণ কথা শুনছিলেন। ভুল বললে তুমি, মিলহিজার। মুক্তিপণ চেয়ে বড় অপরাধ করেছ তোমরা, তারপর কিডন্যাপ করেছ রবিন আর মুসাকে। এগুলো মারাত্মক অপরাধ। আমি জানতে চাই ওদের কিডন্যাপ করলে কীভাবে।

হাল ছেড়ে দিল নিক মিলহিজার, স্বীকারোক্তির সুরে বলল, রবিন যখন টাকা হাতছাড়া করতে রাজি হলো না, তারওপর আমার মুখোশ ধরে টান দিল তখন ভাবলাম আমাকে চিনে ফেলেছে। বাধ্য হয়ে ক্লোরোফর্ম দিয়ে ওকে অজ্ঞান করে টিলার কাঁধে রাখলাম। পরে একই ভাবে মুসাকেও অজ্ঞান করলাম। তারপর এক এক করে বয়ে নিয়ে আয়োলার ট্রাকে তুলে নিয়ে এলাম এখানে এই পড়ো বাড়িটাতে। মাছ ধরতে গেলে এখানে থাকি আমি। অনেকদিন ধরেই বাড়িটা আমি মাঝে মাঝে ব্যবহার করি। আশেপাশে লোকালয় নেই, কাজেই কারও চোখে পড়ে যাবার ভয় ছিল না। আমি ঠিক করি ওদের ঘুম পাড়িয়ে কুকুরগুলো নিয়ে বোটে করে আমার গ্রামে চলে যাব। কাছেই ওটা। পরে সময় সুযোগ মতো কুকুরগুলো বিক্রি করব। সম্ভব হলে রকফেলারের কাছ থেকে মুক্তিপণ আদায় করব। কথা ছিল আমি গ্রামে চলে যাওয়ার পর আয়োলাও চলে যাবে ওখানে, বিয়ে করব আমরা।

অনেকগুলো ভুল করেছেন আপনারা, বলল কিশোর। কেনেলে চোরাই কুকুর রাখা ঠিক হয়নি। জেসিকা স্প্রিংগারের চোখে তো ধরা। পড়েছেনই, আমি মিসেস লেবউফকে জিজ্ঞেস করে জেনেছি, ওখানে যেসব কুকুর রাখা হয় সেগুলোর কাগজ পত্র সঙ্গে সঙ্গে তৈরি করা হয়ে যায়। অথচ আয়োলা বলেছিলেন পরে তিনি বাড়তি কুকুরগুলোর মালিকের নাম লিখবেন। এ ছাড়াও, আপনার এখানকার আনসারিং মেশিনেও একটা মেসেজ পাঠাই আমি। ওটা ট্রেস করলেও পুলিশ বুঝে যাবে আপনিই ল্যাবোরেটরিতে কুকুর বিক্রি করতে চাওয়া সেই লোক।

পকেট থেকে একটা কাগজ বের করল রবিন। এখানে আপনার গাড়ির চাকার দাগ আঁকা আছে। ওয়্যারহাউসে এঁকেছিলাম। এটা মিলালেই জানা যাবে আসলে আপনিই সেদিন রাফিয়ানকে চুরি করেছিলেন।
তবে এসবের দরকার পড়বে না, বললেন ইয়ান ফ্লেচার। অনেকদিন ধরে পুলিশে আছি, আমার যদি বুঝতে ভুল না হয়, তা হলে এরা নিজেরাই নিজেদের অপরাধ কোর্টে স্বীকার করে নেবে। তাতে শাস্তি কম হবে এদের।
তা-ই করব আমি, বলল মিলহিজার।
আমিও, তাড়াতাড়ি বলল আয়োলা মর্টন।
তা হলে তো আর কথাই থাকে না, বললেন ইয়ান ফ্লেচার। এই কেস সড় হয়ে গেল। অফিসারদের ইশারা করলেন তিনি। কুকুর গুনে দেখো সবগুলো আছে কি না। ওগুলো ওগুলোর মালিকদের ফেরত দিতে হবে।
আমাদের টাকা আছে নিক মিলহিজারের কাছে, বলল কিশোর। এক হাজার ডলার।
সার্চ করা হলো মিলহিজারকে, টাকাগুলো পেয়ে কিশোরের হাতে তুলে দিলেন চিফ ইয়ান ফ্লেচার।
পরস্পরের দিকে তাকাল তিন গোয়েন্দা। ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে আসছে ওদের। পুলিশ চিফের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এসে রাফিয়ান সহ রবিনের ফোক্সওয়াগেনে উঠল ওরা, রবিন ওদের নিয়ে। চলল স্যালভিজ ইয়ার্ডে।

.

ওরা পৌঁছে মুখ-হাত ধুয়ে মাত্র নাস্তা নিয়ে বসেছে, এমন সময় কলিং বেল বেজে উঠল। দরজা খুলল কিশোর। শ্যারন দাঁড়িয়ে আছে শুকনো মুখে। ওর পাশেই হাস্যোজ্জ্বল জিনা। কিশোরের বুঝতে দেরি হলো না, নিজে রাফিয়ানের নিখোঁজ সংবাদ না দিয়ে জিনাকে সঙ্গে করে এনেছে
শ্যারন, যাতে ওকে জিনার রাগ সামলাতে না হয়।
ইশ, মনে হচ্ছে রাফিয়ানকে কতোদিন দেখি না, কিশোর সরে দাঁড়াতেই ঘরের ভিতর ঢুকল জিনা। রাফিয়ান কোনও শয়তানি করেনি শ্যারন অসহায় দষ্টিতে কিশোরের দিকে তাকাল।
মুচকি হেসে কিশোর বলল, এক ফোঁটাও না। ও আছে তা প্রায় টেরই পাইনি আমরা! শ্যারনের দিকে ফিরল কিশোর। এখন বিশেষ কারণে আমার মনে হচ্ছে মিস্টার লেবউফ লজ্জা পাবেন তোমাকে চাকরি থেকে ছুটিয়ে দিয়েছেন বলে। তিনি যদি অনুরোধ করেন, তা হলে আবার তুমি ওই মোটেলে চাকরিটা নেবে?
অসম্ভব! বলল শ্যারন। ভদ্রলোক শেষদিকে খুব খারাপ ব্যবহার করতেন। রাফিয়ানের কারণে তখন তখনই চাকরি ছাড়তে পারিনি।

কী বলছ এসব? জিজ্ঞেস করল জিনা।
বলার মতো কিছু নয়, হালকা চালে বলল কিশোর।
এ কদিনে কী ঘটেছে জানতে হলে রবিনের নথি পড়তে হবে। জিনাকে। কিন্তু সেটা কি পড়তে দেবে রবিন? তা হলে জিনা জেনে যাবে ওকে আর কিশোরকে কুকুরের খাঁচায় বাস করতে হয়েছিল!

তিন গোয়েন্দা ভলিউম ১১৪ – ভুতুড়ে বিমান – কাহিনি রচনা : কাজী শাহনূর হোসে – তিন গোয়েন্দায় রূপান্তর : শামসুদ্দীন নওয়াব – সেবা প্রকাশনী – প্রথম প্রকাশ : ২০১০

আরিব্বাবা, কিশোর, কী আসছে দেখ! রাশেদ চাচা চেঁচিয়ে উঠল। আমাদের সরাসরি সামনে, বিশালদেহী এক জেট প্লেন রকি বীচে এয়ারপোর্টে ল্যাণ্ড করার জন্য আসছে।

গাড়ির পিছনের দিকে বসে আমি। চাচা গাড়ি চালাচ্ছে, মেরি চাচী পাশে বসা। জেটটাকে নেমে এসে কাছের এক রানওয়েতে ল্যাণ্ড করতে দেখলাম।

মার্ক এরকম জেটে করেই আসবে, বলে আমার দিকে চেয়ে মৃদু হাসল চাচী।

মার্ক আমাদের পরিচিত কেউ না। আমার বয়সী এক ছেলে। অস্ট্রেলিয়ার সিডনি থেকে আসছে। প্রতি বছর রকি বীচ থেকে একজন ছাত্র বিদেশে যায় আর বিদেশ থেকে একজন ছাত্র এখানে আসে; সারা। বছর কোন একটি পরিবারের সঙ্গে থাকে, স্কুলে ভর্তি হয়। এবার স্বেচ্ছায় এ ধরনের ছাত্রের মেজবান হতে চেয়েছে আমাদের পরিবার।

মার্ক ট্রেনে করে এলে ভাল হত, বাইরের কালিগোলা আঁধারের দিকে চেয়ে মন্তব্য করলাম।

কিশোর, এয়ারপোর্টে তোর কী অসুবিধা? হেসে বলল চাচা।

সব এয়ারপোর্টে তো না, বললাম। শুধু রকি বীচ এয়ারপোর্ট।

আসলে ওই আজগুবী গল্পটা শুনে শুনে তোর মাথাটা বিগড়েছে, বলল চাচা।

আমি আসলে মাথা থেকে হারানো বিমানটার কথা তাড়াতে পারছি না।

গল্পটা আরেকবার বলো না শুনি, বলল চাচা। এয়ারপোর্টের ভিতরে ঢুকে পড়েছে গাড়ি।

এখন কোন ভূতের গল্প নয়, শাসনের সুরে বলল চাচী। আমরা নতুন ছেলেটাকে নিতে এসেছি। আমি চাই সবাই স্বাভাবিক থাকুক।

চাচী যা-ই বলুক, আমি মাথা থেকে দূর করতে পারলাম না ভুতুড়ে গল্পটা। বহু বছর আগের কথা। রকি বীচে এয়ারপোর্ট বানানোর সিদ্ধান্ত হয়। এক বছর লেগে যায় কাজ শেষ করতে। অবশেষে জনগণের জন্য খুলে দেওয়া হয়। সেখান থেকেই গোলমালের শুরু।

এখানে তখন ক্যাপ্টেন স্টার নামে এক লোক থাকতেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইউএস আর্মি পাইলট ছিলেন ভদ্রলোক। তিনি ঘোষণা দেন, রকি বীচ এয়ারপোর্টে তিনিই প্রথম বিমান ল্যাণ্ড করাবেন।

কর্তৃপক্ষ তাকে বারণ করে। কেননা ক্যাপ্টেন স্টারের বয়স হয়েছে, কাজটা বিপজ্জনক এবং তাঁর বৈধ কাগজপত্রও নেই।

প্রথম যেদিন এয়ারপোর্ট চালু হয় সেদিন আবহাওয়া ছিল ভারী আর কুয়াশাচ্ছন্ন। এয়ারপোর্টের প্রতিটা ফ্লাইটই বিলম্বিত হয়।
হঠাই টাওয়ারের ফ্লাইট কন্ট্রোলাররা একটা শব্দ শোনেন। আর তাঁদের রাডারে ধরা পড়ে একটা ব্লিপ। ল্যাণ্ডিঙের জন্য একটা প্লেন আসছে!
মুহূর্তের জন্য মেঘমুক্ত হয় আকাশ। ক্যাপ্টেন স্টার তার প্রথম। বিশ্বযুদ্ধের পুরানো বিমান নিয়ে উড়ে আসছেন।
ঠিক এ সময় আরেক গুচ্ছ কুয়াশাচ্ছন্ন মেঘের মধ্যে ঢুকে যায় বিমান। ক্যাপ্টেন স্টারকে এরপর আর কেউ দেখেনি। রাডার থেকে উধাও হয়ে যায় তাঁর বিমান। তাঁকে কিংবা বিমানটাকে আর কেউ কোনদিন দেখতে পায়নি।
আবহাওয়া পরিষ্কার হলে গোটা এলাকা তন্নতন্ন করে খোঁজা হয়। বিমান দুর্ঘটনার কোন চিহ্ন নেই। স্রেফ কুয়াশায় মিলিয়ে গেছে যেন ওটা।
তার পর থেকে গুজব রটে গেছে, ভুতুড়ে বিমান নিয়ে এখনও উড়ে বেড়াচ্ছেন ক্যাপ্টেন স্টার। এখনও ল্যাণ্ড করার এবং তাঁর কথা রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছেন।
অ্যাটেনশন প্লিজ! ফ্লাইট নম্বর ৩৪৫। দুমিনিটের মধ্যে ল্যাণ্ড করবে, ঘোষণা শোনা গেল পিএ সিস্টেম থেকে। সচকিত হয়ে উঠলাম আমি। মার্ক এই ফ্লাইটেই আসছে।
আমরা এখন লাউঞ্জ-টার্মিনাল এরিয়াতে দাঁড়িয়ে। চাচা-চাচী ফ্লাইট কাউন্টারে গেছে শিডিউল বোর্ড দেখতে।
হঠাৎই আকাশে বাতি জ্বলতে দেখলাম, এয়ারপোর্টের উদ্দেশে আসছে। নিশ্চয়ই মার্কের বিমানে! ·
লাউঞ্জের শেষ প্রান্তে সরে গেলাম, বিমানটাকে যাতে ভাল মত রানওয়েতে নামতে দেখতে পারি। আমিই শুধু দাঁড়িয়ে রয়েছি ওখানে। আর সবাই টার্মিনালের মাঝখানে।
অন্ধকার আকাশে মেঘ নেই দেখে স্বস্তি পেলাম। মার্কের বিমান মেঘের কিংবা কুয়াশার মধ্যে হারিয়ে যাওয়ার ভয় নেই।
এসময় সহসা বিশাল এক কুয়াশা কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠল, ঠিক আগুয়ান বিমানটার পথের উপরে। বিমানটা উড়ে এসে ঢুকে পড়ল কুয়াশার মধ্যে। তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল!
ঘুরেই এক দৌড়ে টার্মিনালের মাঝখানে চলে গেলাম। চাচা-চাচীকে খুঁজছি।
চাচা! চাচী! চেঁচালাম। প্যাসেঞ্জার এন্ট্রি ডোরের পাশে দ তারা।
কীরে, কী হয়েছে? চাচা জানতে চাইল।
প্লেন! মার্কের প্লেনটা উধাও হয়ে গেছে! কুয়াশার মধ্যে মিলিয়ে গেছে!
পরস্পর মুখ তাকাতাকি করল চাচা-চাচী।

তোর কল্পনার ঘোড়াকে লাগাম পরা, বলল চাচী। কাছের এক জানালার দিকে আঙুল তাক করল। দেখ। হেসে বলল।
জানালা দিয়ে চাইলাম। ওই তো, বিশালদেহী জেট প্লেনটা। ল্যাণ্ড করেছে, এখন ট্যাক্সিইং করে কাছের এক গেটের সামনে থেমে দাঁড়াচ্ছে।
কিন্তু আমি কুয়াশা দেখেছি! বললাম। ভাগ্য ভাল ক্র্যাশ করেনি! জানালার সামনে এসে দাঁড়াল চাচা। চেয়ে রইল আকাশের দিকে।
কোথায়? কোন মেঘ বা কুয়াশা তো দেখতে পাচ্ছি না। পরিষ্কার, চাঁদ-তারার রাত।
প্যাসেঞ্জাররা নেমে আসছে বিমান থেকে। টার্মিনাল সরগরম হয়ে উঠছে। আমাদের কুয়াশা সংক্রান্ত আলোচনার ওখানেই ইতি। চাচা-চাচী একটা সাইন তুলে ধরল। ওতে লেখা: স্বাগতম, মার্ক! পাশা পরিবার। থেকে।
চাচা-চাচী মার্ককে খুঁজছে, এসময় ওদের বিমানের পাইলটকে এগিয়ে আসতে দেখলাম। দৌড়ে গেলাম তার কাছে।
প্লেনটা ল্যাণ্ড করার সময় লক্ষ করছিলাম আমি। শেষ দিকে কুয়াশা দেখে নিশ্চয়ই অবাক হয়ে গিয়েছিলেন আপনি? প্রশ্ন করলাম।
হাসি মুছে গেল ক্যাপ্টেনের। আমার দিকে এক মুহূর্ত চেয়ে থেকে মাথা নাড়লেন। গোটা ট্রিপের কোথাও কোনও কুয়াশা ছিল না।
চোখ পিটপিট করলাম আমি।
কিন্তু আমি তো দেখেছি, বলে জানালা দিয়ে আঙুল নির্দেশ করলাম। আপনি ল্যাণ্ড করার ঠিক আগে কুয়াশার মেঘে ঢুকে পড়েছিল প্লেন।
ক্যাপ্টেন আমার কাঁধ চাপড়ে দিলেন।
মানুষ এয়ারপোর্টে অনেক উল্টোপাল্টা দেখে। আমি বলছি কোন কুয়াশা ছিল না। হেঁটে চলে গেলেন তিনি।
তাঁর গমনপথের দিকে চেয়ে রইলাম। আমি দেখেছি, আর কন্ট্রোলে বসে উনি দেখবেন না, এটা হয়? মিথ্যে বলে গেলেন কেন ক্যাপ্টেন?
এসময় আমার নাম ধরে ডাকা হলো।
কিশোর! কিশোর! এদিকে!
ঘুরে দাঁড়ালাম। প্যাসেঞ্জার এরিয়াটায় দাঁড়িয়ে চাচা-চাচী। তাদের পাশে আমার বয়সী এক কিশোর। মার্ক।
এগিয়ে গেলাম। চাচী মার্কের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিল।
কেমন আছ, মেট? বন্ধুভাবাপন্ন হাসি হাসল মার্ক। মেট বলতে অস্ট্রেলিয়ানরা বন্ধু বোঝায়।
ভাল। তোমাকে দেখে খুব খুশি হলাম, বললাম। হাত মিলালাম। মার্ক আমার চাইতে খানিকটা খাটো। মাথার চুল হালকা বাদামী, চোখজোড়া ম্লান নীল। একটু

যেন উদাসীনও।
প্লেনে বসে থাকতে থাকতে হাতে-পায়ে খিল ধরে গেছে। লম্বা। জার্নি, বলল ও।
বাসায় যেতে বেশিক্ষণ লাগবে না, চাচী বলল। রাতে ভাল একটা ঘুম দিলে কাল সকাল থেকেই বছর শুরু করে দিতে পারবে।
তবে তো খুব ভাল হয়, বলে হাই চাপল মার্ক। তোমার স্কুলের বন্ধুদের সাথে পরিচিত হওয়ার জন্যে তর সইছে না আমার। শেষের কথাগুলো আমার উদ্দেশে বলল। গাড়িতে গিয়ে বসেছি আমরা।
ওদেরকে তোমার ভাল লাগবে। মার্ক, একটা প্রশ্ন করতে পারি?
নিশ্চয়ই, হাই তুলে বলল ও।
প্লেনটা ল্যাণ্ড করার ঠিক আগ মুহূর্তে কী করছিলে তুমি?
আমার দিকে চাইল মার্ক।
কী আর করব? সিট বেল্ট বেঁধে সিটে বসে ছিলাম। কেন?
জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছিলে?
হয়তো কয়েক মুহূর্তের জন্য।
প্লেনটা কুয়াশার মেঘে ঢুকে পড়েছিল টের পেয়েছিলে?
আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে মার্ক। ওর চোখজোড়া যেন নীলচে দ্যুতি ছড়াল। গাড়ির পিছনের সিট থেকে এমনভাবে আমার দিকে চেয়ে রয়েছে, গা ছমছম করে উঠল আমার।
এবার শান্ত স্বরে বলল ও, না, মেট, কোন কুয়াশা-টুয়াশা চোখে পড়েনি।
মাথা ঝাঁকালাম। বোঝা যাচ্ছে আমি ছাড়া আর কেউ কুয়াশার মেঘটাকে দেখেনি। কিন্তু তা কীভাবে সম্ভব?
তবে একটা ব্যাপার ঘটেছিল, মার্ক বলল।
ঝট করে ঘুরে চাইলাম।
কী?
ল্যাণ্ড করার আগের মুহূর্তে প্লেনের বাতিগুলো নিভে যায়। গোটা কেবিন আঁধার হয়ে গিয়েছিল। পরমুহূর্তে আবার আলো ফিরে আসে।
ওহ, হতাশ কণ্ঠে বললাম। এমন হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। নাহ, কুয়াশা-রহস্য ভেদ করা গেল না।
ড্রাইভওয়েতে গাড়ি ঢুকল। চাচা গাড়ি পার্ক করলে সবাই নেমে পড়লাম। চাচা-চাচী মার্ককে যখন তার রুম দেখাতে নিয়ে গেল, কিচেনে থমকে দাঁড়ালাম আমি। কিচেন টেবিলে কিছু কাগজ ফেলে গেছিল চাচা। তার মধ্যে মার্কের পাঠানো একটা চিঠি রয়েছে। ওর একটা রঙিন ছবিও আছে চিঠির সঙ্গে।

ছবিটা তুলে নিয়ে দুমুহূর্ত জরিপ করলাম। ছবির সঙ্গে ওর সব কিছুরই মিল খুঁজে পেলাম। শুধু একটা বাদে। সেজন্যেই গাড়িতে অমন ভয় পেয়েছিলাম আমি, মার্ক যখন তার স্লান নীল চোখ মেলে আমার দিকে চেয়েছিল। ছবিতে দেখা যাচ্ছে ওর চোখজোড়া গাঢ় বাদামি।
পরদিন স্কুল। ঘুমিয়ে উঠে তরতাজা বোধ করছে মার্ক। আমাদের সঙ্গে যোগ দিল নাস্তার টেবিলে।
কমলার রস আর কর্ন ফ্লেকসে আপত্তি নেই তো? আমরা বেশির ভাগ। দিন সকালে ওগুলো দিয়েই শুরু করি, বলল চাচী।
আমরাও অস্ট্রেলিয়াতে তা-ই করি, বলে সিরিয়ালে চামচ ডোবাল মার্ক।
দুদেশের মিল-অমিল আস্তে আস্তে জানা যাবে, চায়ে দুধ ঢেলে বলল চাচা।
বোধহয় অমিল কম, মিলই বেশি, জানাল মার্ক। অবশ্য আপনাদের এখানে ক্যাঙারু দেখা যাবে বলে মনে হয় না।
হেসে ফেললাম আমরা। মার্ক নীল চোখজোড়া মেলে আমার দিকে চাইল। চোখ দুটো যেন ঝলসাচ্ছে। হঠাই পানির তেষ্টা পেয়ে গেল। আমার।
যাই, পানি খেয়ে আসি, বলে সিঙ্কের দিকে এগোলাম।
পানি? নাস্তার সাথে? বলিস কী? চাচী বলে উঠল। কোনদিন তো খাস না।
তেষ্টা পেয়েছে কী করব, শ্রাগ করে বললাম। চাচী ঠিকই বলেছে। নাস্তায় সব সময় কমলার রস আর দুধ খাই আমি। কিন্তু এখন আমার পানির খুবই দরকার।
ঠাণ্ডা পানির ফসেট অন করে গ্লাস ভরে নিলাম।
ওউ, পরমুহূর্তে চেঁচিয়ে উঠে মুখের পানি ফেলে দিলাম সিঙ্কে।
কী হয়েছে! চাচা-চাচী উঠে দাঁড়িয়ে হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে এল।
পানিটা, কোনমতে আওড়ালাম, ভয়ানক গরম।
ঠাণ্ডা পানি খাবি তো গরম পানি অন করলি কেন? চাচা জিজ্ঞেস করল।
করিনি, বললাম। নীচের ঠোঁটটা অসাড় হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে। ফুলে যাবে। কোল্ড ফসেট অন করেছি। এই দেখো।
ফসেটটা আবারও চালু করলাম। সাবধানে আঙুল ছোঁয়ালাম পানির ঝর্নায়। গরম!
এ কী করে হয়? চাচী প্রশ্ন করল। কোল্ড ফসেট থেকে গরম পানি বেরোয় কীভাবে!
দেখি তো, বলে গরম পানির ফসেট চালু করলাম। আঙুল বাড়ালাম। বরফ শীতল পানি! উল্টে গেছে, বললাম। ঠাণ্ডার জায়গায়
গরম আর গরমের জায়গায় ঠাণ্ডা।
ঠাণ্ডা পানিতে একটা ন্যাপকিন ভিজিয়ে ঠোঁটে চেপে ধরলাম।

বাড়ির নীচে পানির পাইপে মনে হয় কোন গণ্ডগোল হয়েছে। মিস্ত্রি ডাকতে হবে, বলল চাচা।
পুরোটা সময় মার্ক কোন কথা বলেনি। আমার দিকে ম্লান নীল চোখজোড়া মেলে চেয়ে ছিল শুধু। ভঙ্গিটা এমন যেন সম্মোহিত অবস্থায় রয়েছে।
আমাদের দেশেও এসব ছোটখাট মিক্স-আপ ঘটে, বলল ও।
চাচা-চাচী হেসে উঠল। আমি হাসলাম না। মুখের ভিতরটা এখনও ফুলে আছে।
একটু পরে মার্ককে নিয়ে স্কুলের পথ ধরলাম।
হাঁটার ফাঁকে ওর দিকে এক ঝলক চাইলাম। মনে পড়ে গেল কাল রাতে কোন ব্যাপারটা আমাকে অবাক করেছিল।
মার্ক, আমি একটা কথা ভাবছিলাম, বললাম। তুমি অস্ট্রেলিয়া। থেকে আমাদের কাছে যে ফটোটা পাঠিয়েছ, সেটায় তোমার চোখের মণি গাঢ় বাদামি ছিল। কিন্তু আসলে তোমার চোখ হালকা নীল। ব্যাপারটা কী?
মার্ক নিশ্চপ। শেষমেশ আমার দিকে চাইল।
ও, এই কথা? আমি তখন ডার্ক কনট্যাক্ট লেন্স পড়তাম। তারপরে চোখের সমস্যা সেরে গেল, ফলে আর পরার দরকার পড়েনি।
ও, কী হয়েছিল চোখে? আলো সহ্য হত না, বলল মার্ক। লাইট সেনসিটিভিটি।
ব্যাপারটা ভাল বুঝলাম না। তবে, ও নিয়ে আর কথা বাড়ালাম না। স্কুলের কাছাকাছি এসে গেছি।
ওই দেখো, গাড়ি থেকে নামছে রবিন মিলফোর্ড। ও আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের একজন।
রবিন গাড়ি থেকে নেমে মাকে হাত নেড়ে বিদায় জানাল। আন্টি পাল্টা হেসে হাত নাড়লেন। রবিন সাইডওয়কে পা রাখলে, মিসেস মিলফোর্ড রাস্তায় ট্রাফিক আছে কিনা দেখে নিলেন! ফাঁকা। আমি মিসেস মিলফোর্ডের গাড়ির পিছন দিয়ে সাইডওয়কের উদ্দেশে এগোলাম। গাড়িটা তখন সামনের দিকে চুলতে শুরু করেছে।
অ্যাক্সিলারেটরে চাপ দিলেন মিসেস মিলফোর্ড।
কিশোর, সাবধান! চেঁচিয়ে উঠল রবিন। মুখ তুলে চাইলাম। শেষ মুহূর্তে দেখতে পেলাম গাড়িটা ব্যাক করে সোজা আমার দিকে ধেয়ে আসছে!
এক লাফে সরে গেলাম সাইডওয়কের দিকে। সিমেন্টে পড়ে এক গড়ান। দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম ঝটপট। পতনের ফলে সামান্য ব্যথা পেলেও, গাড়ির ধাক্কা থেকে তো বেঁচেছি।
মিসেস মিলফোর্ড ব্রেক চেপে হুড়মুড় করে বেরিয়ে এলেন।

কী হলো কিছুই বুঝলাম না, বিস্মিত কণ্ঠে বললেন তিনি। ফরওয়ার্ড গিয়ার দিয়ে অ্যাক্সিলারেটর চাপলাম, কিন্তু কী কারণে কে জানে গাড়ি গেল পিছন দিকে।
পিছনে আনার চেষ্টা করে দেখুন কী হয়, বাতলে দিলাম।
ঠিক আছে, বলে এঞ্জিন চালু করলেন আবার, ব্যাকগিয়ার দিলেন, গাড়ি এগোল সামনের দিকে! অদ্ভুত কাণ্ড! গিয়ার উল্টোপাল্টা হয়ে গেছে!
আগে তো কখনোই এরকম হয়নি, মন্তব্য করল রবিন।
আজকে সব কিছুই উল্টে গেছে, বললাম।
তোমার জন্যে আজকের দিনটা অপয়া, কিশোর, বলে হেসে উঠল মার্ক।
রবিনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম ওর। এরপর বেল বাজলে। আমরা ক্লাসে গিয়ে ঢুকলাম।
রোল কলের পর মিসেস রবার্টস মার্ককে ডেকে নিলেন। জানালেন, মার্ক বদলি ছাত্র হিসেবে অস্ট্রেলিয়া থেকে এসেছে, আমাদের পরিবারের সঙ্গে থাকছে।
হাই ইয়া, মেটস! মার্ক চেঁচিয়ে বলল।
হাই, মার্ক! পাল্টা সম্ভাষণ জানানো হলো ওকে।
রকি বীচ সত্যিই চমৎকার জায়গা। তোমরা অস্ট্রেলিয়া সম্পর্কে যা জানতে চাও আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারো।
তুমি কি কাছ থেকে ক্যাঙারু দেখেছ? জুলি প্রশ্ন করল।
নিশ্চয়ই। তবে ওদের সাথে লাফানোর কম্পিটিশন দিতে যেয়ো না, পারবে না।
মুসা হাত তুলল।
মার্ক, কোয়ালা ভালুক কি সত্যিকারের ভালুক? খুদে, লোমশ, মিষ্টি প্রাণীগুলোর কথা জানতে চেয়েছে ও।
দুমুহূর্ত ভেবে নিল মার্ক।
আমি জানি না। তবে অস্ট্রেলিয়াতে ফিরে প্রথম যে কোয়ালা ভালুকের সাথে দেখা হবে তাকে জিজ্ঞেস করব।
ছেলে-মেয়েরা হেসে উঠে হাততালি দিল। মার্ককে সবাই পছন্দ করতে শুরু করেছে।
লাঞ্চের সময় ক্যাফেটেরিয়াতে মার্ক, মুসা, রবিন আর আমি জড় হলাম। মুসার সঙ্গে ইতোমধ্যেই পরিচয় হয়ে গেছে মার্কের। রবিন আর মুসা অস্ট্রেলিয়া সম্পর্কে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চলল মার্ককে। বিন্দুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ না করে সাধ্যমত জবাব দিয়ে গেল ও। শেষমেশ মার্ককে রেহাই দেওয়ার জন্য প্রসঙ্গ পাল্টালাম আমি।
আজকে আমাদের বিগ ম্যাচ ভুলে যেয়ো না।

ওরা আমার দিকে ঘুরে চাইল। রকি বীচ সকার টিমের সঙ্গে আজ স্কুল ছুটির পর হোয়াইট লায়ন্স ক্লাবের ফুটবল ম্যাচ। হোয়াইট লায়ন্স আমাদের প্রধান প্রতিপক্ষ। মনে আছে। আমরা মাঠে যাব, জানাল রবিন। তারপর মার্কের উদ্দেশে বলল, মার্ক, তুমি আসছ তো ফুটবল মাঠে?
আমার দিকে অন্তর্ভেদী নীল চোখ মেলে চাইল মার্ক।
তুমি কী বলো, মেট?
নিশ্চয়ই যাবে!
তুমি কোন্ পজিশনে খেলো? মার্ক প্রশ্ন করল।
ডিফেন্স। আজকে যদি ওদেরকে হারাতে পারি তা হলে ভাল ভাবে। শুরু হবে আমাদের সিজন।
আমি যাব, কিশোর। খেলাটা মিস করতে চাই না, জানাল মার্ক।
বিকেলটা কেটে গেল চোখের পলকে। এক সময় তিনটে বাজল। স্কুল ছুটি হয়ে গেল। আর আধ ঘণ্টা পর বড় ম্যাচ। হলওয়ের বাইরে জড় হলাম আমরা।
মার্ককে মাঠে নিয়ে যাব আমরা, বলল রবিন। আমাদের সাথে স্ট্যাণ্ডে বসবে ও।
সামনের দিকে বসা যাবে না? জিজ্ঞেস করল মার্ক।
নিশ্চয়ই যাবে, জানাল মুসা। পায়ে ব্যথা, তাই চলে গেল ও।
ভাল খেলা চাই কিন্তু, মেট, আমার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল মার্ক। সবার শুভ কামনা নিয়ে জার্সি পরতে গেলাম আমি।
একটু পরে, সহ খেলোয়াড়দের সঙ্গে মাঠে নামলাম। দর্শক সারির সামনের দিকে বসেছে আমার ক্লাসমেটরা। রবিন আর মুসার মাঝখানে মার্ক বসা। সবাই হাত নাড়ছে, চিৎকার করে উৎসাহ যোগাচ্ছে–শুধু মার্ক বাদে। হয়তো এটা ওর জন্য নতুন অভিজ্ঞতা, ভাবলাম, তাই ও জানে না কী করতে হবে।
দুদল তৈরি। এখুনি খেলা শুরু হবে। রেফারি বাঁশি বাজালেন।
সেন্টার করেছে লায়নরা। দ্রুতগতিতে বল দেওয়া-নেওয়া করে। আমাদের গোলের দিকে এগিয়ে আসছে ওরা। আমি এগিয়ে গেলাম বাধা দিতে। প্রতিপক্ষের ফরোয়ার্ডের সঙ্গে ধাক্কা লাগতেই পড়ে গেল সে। রেফারির বাঁশি বেজে উঠল। ফাউল। পেনাল্টি। খেলা শুরু হতে না হতেই পিছিয়ে পড়লাম আমরা ০-১ গোলে। দুই মিনিট পর আমাকে তুলে নেওয়া হলো মাঠ থেকে। অবাক কাণ্ড! সাইডলাইনে দেখি জার্সি পরে মার্ক দাঁড়িয়ে। আমার বদলে মাঠে ঢুকল ও।
তোমাকে আজকে নামানোই উচিত হয়নি, বললেন কোচ। মার্ক ছেলেটা কেমন খেলে দেখি। অস্ট্রেলিয়াতে ও নাকি ডিফেন্সে খেলে। লাঞ্চের সময় আমাকে গিয়ে বলেছে দরকার পড়লে ওকে যাতে নামাই।

বোকা হয়ে গেলাম আমি! বেঞ্চে বসে মার্ককে আমার জায়গা নিতে দেখলাম। বসে বসে ভাবতে লাগলাম। পেনাল্টি বক্সের ভিতরে কোন কুক্ষণে ওভাবে ফাউল করতে গেলাম। অথচ আমি দলের সবচাইতে নির্ভরযোগ্য ডিফেণ্ডার। না, মার্ক ছেলেটা আসার পর থেকে একের পর এক দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে। প্রথমে ঠাণ্ডা-গরম পানির ব্যাপারটা ঘটল, তারপর গাড়ি চাপা পড়তে যাচ্ছিলাম। আর এখন খেলার শুরুতেই পেনাল্টি দিয়ে বসলাম। এসব হচ্ছেটা কী?

খেলা শেষ। ০-১ গোলে হেরেছে রকি-বীচ। সব দোষ আমার। মার্ক আমার বদলি হিসেবে নামার পর আর গোল হয়নি। দুর্দান্ত খেলেছে ও।

লকার রুমে চটপট তৈরি হয়ে নিলাম। কারও সঙ্গে কথা বলতে চাই না। সবাই ঘিরে ধরেছে মার্ককে, বাহবা দিচ্ছে। হঠাৎ করেই দলের সবচাইতে জনপ্রিয় খেলোয়াড় হয়ে গেছে ও!

বাইরে বেরিয়ে এলাম। মুসা আর রবিন অপেক্ষা করছিল আমার জন্য।

ব্যাড লাক, কিশোর। ফাউলটা না করলেও পারতে, বলল মুসা।

আমিও ফাউল করতে চাইনি। কী থেকে কী হয়ে গেল। আমি ব্যাপারটা ভুলে যেতে চাই।

খেলা তো আরও আছে, অত চিন্তা করছ কেন, আমার পিঠ চাপড়ে দিল রবিন।

কিন্তু মার্ক কী খেলাটাই না খেলল। একাই সব আক্রমণ রুখে দিল, ওকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন চীনের প্রাচীর, বলল মুসা।

ধন্যবাদ, মুসা, বলল মার্ক, এইমাত্র বেরিয়ে এসেছে লকার রুম থেকে। মুখে চওড়া হাসি, নীল চোখ ঝলকাচ্ছে।

পরের ম্যাচে কোচ হয়তো তোমাকেই প্রথম এগারোয় নামাবেন, বলল রবিন।

আমার তা মনে হয় না। কিশোরই খেলবে। আমি তো বদলি হিসেবে খেলছিলাম, জানাল মার্ক।

চলো, বাড়ি ফিরি, মার্কের উদ্দেশে বললাম।

চলো, মেট, জবাব দিল মার্ক। বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ির পথ ধরলাম আমরা। তোমার বন্ধুগুলো খুব ভাল, একটু পরে বলল মার্ক।

হ্যাঁ, তোমাকে ওদের ভাল লেগেছে, একটু কি ধারাল শোনাল। আমার কণ্ঠ? ঝট করে আমার দিকে চাইল ও।

দেখো, কিশোর, আমি কিন্তু নিজের ইচ্ছায় মাঠে নামিনি। কোচ চেয়েছেন বলেই, বলল ও।

বাসার কাছের মোড়ের উদ্দেশে এগোচ্ছি আমরা।

আমি এর আগে কোনদিন পেনাল্টি দিইনি। তা ছাড়া ওটা এমন। কোন বিপজ্জনক আক্রমণ ছিল না যে গোল হতে পারত, বললাম।

সবুজ বাতি জ্বলে উঠল, কার্ব থেকে নেমে রাস্তা পেরোতে লাগলাম। আমি।
পঞ্চাশটার উপরে ম্যাচ খেলেছি। এরকম ভুল আগে কখনও করিনি।
হঠাৎই এক গাড়ির হর্ন যেন কানের পর্দা ফাটিয়ে দিল। ঘুরে চাইলাম। একটা গাড়ি ছুটে আসছে। রাস্তা থেকে সরার উপায় নেই। চাপা দেবে আমাকে!
গাড়িটা এক পাশে কেটে তীক্ষ্ণ শব্দে থেমে দাঁড়াল। মাত্র ফুটখানেকের জন্য ধাক্কা লাগেনি।
অ্যাই, তুমি বাতি না দেখে রাস্তা পেরোচ্ছিলে কেন? বলল ড্রাইভার। ভাগ্যিস তোমাকে দেখতে পেয়েছিলাম!
কী বলছেন আপনি? আমি বিস্মিত। সবুজ আলো দেখেই তো রাস্তা। পেরোচ্ছিলাম। দূরে দাঁড়িয়ে ট্রাফিক লাইটটা দেখলাম।
নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না! লাল! একটু আগেই তো সবুজ দেখলাম। ঘুরে চাইলাম মার্কের দিকে। তখনও কার্বে দাঁড়িয়ে ও। এবার দৌড়ে এল আমার কাছে।
কিশোর, তুমি ঠিক আছ তো?
হ্যাঁ, বললাম। যদিও ভিতরে ভিতরে রীতিমত কাঁপছি। একই দিনে দুবার গাড়ি চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছি কপাল গুণে।
এখন থেকে ট্রাফিক আইন মেনে চোলো, বলে গাড়ি স্টার্ট করল ড্রাইভার।
মার্ক আর আমি হেঁটে চললাম বাড়ির উদ্দেশে।
তোমাকে অনেকবার ডেকেছি, তুমি শুনতে পাওনি।
আমি কিন্তু বাতি সবুজ দেখেই কার্ব থেকে নেমেছিলাম।
তুমি ভেবেছ সবুজ।
তার মানে?
তুমি আপসেট আছ, মেট। সেজন্যে উল্টোপাল্টা ভাবছ। এটা অস্বাভাবিক না। সবারই কখনও না কখনও এমন হয়।
ওর সঙ্গে তর্ক করলাম না। কিন্তু আমি জানি বাতিটা তখন সবুজই ছিল। হঠাৎ করে ব্যাখ্যাতীত ভাবে লাল হয়ে গেছে।
ডিনারে বসে চাচা-চাচীকে এসব অদ্ভুতুড়ে ঘটনা ব্যাখ্যা করতে হবে বলে উদ্বেগ বোধ করলাম। বৃথা চিন্তা। আমাকে মাঠ থেকে তুলে নেওয়ার কথা শুনে দুঃখ পেল তারা। কিন্তু মার্ক বদলী হিসেবে নেমে দুর্দান্ত খেলাতে যারপর নাই খুশি হলো। মার্ককে নিয়ে রীতিমত মেতে উঠল চাচা-চাচী!
মনে হচ্ছে বাড়িতে নতুন একজন ফুটবল স্টার পাওয়া গেল, বলল। চাচী। খাওয়া শেষে ডেজার্ট নিয়ে এল।
আমার আর সহ্য হলো না।

আমি যাই, অনেক হোমওয়র্ক আছে, বলে উঠে পড়লাম।
তাই? মিসেস রবার্টস তো বললেন ফুটবল ম্যাচের জন্যে আজকে হোমওয়র্ক দেবেন না, বলল মার্ক।
আমার আসলে বাড়তি কাজ আছে। বুক রিপোর্ট করার কথা ছিল গত সপ্তাহে, করিনি। আগামীকাল জমা দেওয়ার তারিখ।
ঠিক আছে, তুই হোমওয়র্ক কর। মার্ক দেখুক আমেরিকান টিভির প্রোগ্রাম ভাল লাগে কিনা, চাচী বলল।
উপরে, নিজের রুমে চলে এলাম। বাতি জ্বেলে দরজা লাগিয়ে দিলাম।
ঘরের ভিতরটা গুমোট লাগছে। খুদে এয়ারকণ্ডিশনারটা চালু করে দিলাম।
বই খুলে পড়তে শুরু করলাম। এটা আমেরিকার বিপ্লবের উপরে লেখা এক ইতিহাস বই। বেশ মজে গেছি। হঠাই অনুভব করলাম দরদর করে ঘামছি আমি। এয়ারকণ্ডিশনারটার দিকে চাইলাম। কাজ করছে তো? শব্দ তো ঠিকই শুনতে পাচ্ছি।
উঠে গেলাম জানালার কাছে। যন্ত্রটায় হাত দিয়ে দেখলাম গরম বাতাস বেরোচ্ছে।
হচ্ছেটা কী এখানে? চেঁচিয়ে উঠে লকটা বন্ধ করে দিলাম। এবার আরও বেশি গরম হাওয়া ছাড়তে লাগল যন্ত্রটা।
দম আটকে আসছে! ঘামে জবজব করছে শরীর। এবার মাথায় ঘাই মারল চিন্তাটা, আজকে সব কিছুই উল্টো হচ্ছে। অফ দিলে যদি আরও গরম হয়ে ওঠে, তবে হাই করে দিলে নিশ্চয়ই বন্ধ হয়ে যাবে।
নবটা ডানে মোচড় দিলাম। নড়ল না! অফ-এ আটকে আছে। তপ্ত বাতাসের হলকা পুড়িয়ে দিচ্ছে আমাকে।
আমার সাহায্য দরকার। চাচাকে ডাকব ঠিক করলাম। ভারি; গরম বাতাসে শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, টলতে টলতে দরজার দিকে এগোলাম। ডোরনবে হাত রেখে, ডান দিকে মুচড়ে ঠেলা দিলাম।
কিছুই ঘটল না! আরও জোরে ধাক্কা দিলাম। খুলল না। অসম্ভব কাণ্ড! আমার বেডরুমের দরজায় লক নেই। তা হলে খুলছে না। কেন?
এদিকে, গরম বাতাস ক্রমেই দুর্বল করে ফেলছে আমাকে
বাঁচাও! চেঁচিয়ে উঠলাম। দুমাদুম কিল মারলাম দরজায়। আমাকে এখান থেকে বের করো! চাচা-চাচী, বাঁচাও! তারস্বরে চেঁচাচ্ছি, তপ্ত বাতাসে ভরে উঠছে ঘরটা। জ্ঞান হারিয়ে ফেলার দশা আমার। হঠাৎই দরজার বাইরে চাচার কণ্ঠ শুনলাম।
কিশোর! কিশোর! নবটা ছেড়ে দে! চেঁচিয়ে বলল।
আমি তো ধরে রাখিনি, দুর্বল কণ্ঠে জবাব দিলাম।

দরজাটা খোলার জন্যে টানছি, কিন্তু খুলছে না! চাচা চেঁচাল।
আমার ঘরের দরজা বাইরে থেকে টানলে কিংবা ভিতর থেকে ঠেললে খোলে।
চোখ মেলোম, কপাল থেকে ঝরে পড়ল ঘাম। পেয়েছি! চাচা, দরজার কাছ থেকে সরে যাও! চেঁচালাম।
ডোরনব ধরে টানলাম। খুলে গেল দরজা। টলতে টলতে বেরিয়ে এলাম হলওয়েতে। চাচা-চাচী চেপে ধরল আমাকে।
কিশোর, কী হয়েছিল? প্রশ্ন করল চাচী। চোখজোড়া আতঙ্কে বিস্ফারিত।
হাঁফানোর ফাঁকে আমার কামরার দিকে তর্জনী নির্দেশ করলাম। খুলে বললাম সব কথা। এয়ারকণ্ডিশনার থেকে কীভাবে গরম বাতাস বেরোচ্ছিল, দরজা কীভাবে আটকে যায়।
কিচেনে চল। তোর একটা ঠাণ্ডা ড্রিঙ্ক দরকার, বলল চাচী।
বেসমেন্টে গিয়ে এয়ারকণ্ডিশনিং ইউনিটটাকে বন্ধ করে দিচ্ছি, চাচা বলল। কালকে পানির ফসেটের সঙ্গে এটাও চেক করিয়ে নেব। সব কটার মধ্যে হয়তো সম্পর্ক আছে। কোথাও নিশ্চয়ই তার ওলট পালট হয়ে গেছে।
কিন্তু দরজার অ্যাকশন উল্টে গেল কীভাবে? ওর সাথে তো তারের কোন সম্পর্ক নেই, বললাম সন্দেহের সুরে।
চাচা দরজাটা এক পলক দেখে নিয়ে কাধ ঝাঁকাল।
বাড়িটা পুরানো। কজাগুলোয় হয়তো জং ধরে গেছে।
একটু পরে, কিচেনে বসে চাচীর বানানো ঠাণ্ডা লেমোনেড়ে চুমুক দিতে লাগলাম।
এখন কেমন লাগছে, বাপ? চাচীর প্রশ্ন।
অনেকটাই ভাল। চাচী, গত চব্বিশ ঘণ্টায় অনেক উল্টোপাল্টা কাণ্ড ঘটেছে, যার কোন ব্যাখ্যা নেই, বললাম।
নিশ্চয়ই আছে। একটু অপেক্ষা করলেই জানা যাবে।
চাচা বেসমেন্ট থেকে ফিরে কিচেনে এসে ঢুকল।
কিশোরের রুমের কানেকশন অফ করে দিলাম। কালকে মিস্ত্রি ডাকব।
মাথা ঝাঁকালাম। লেমোনেড শেষ করে দীর্ঘ শ্বাস ফেললাম। হঠাৎ করেই ভাল লাগতে লাগল, সব যেন স্বাভাবিক হয়ে গেছে। মার্ক আসার পর থেকে এই বোধটারই অভাব অনুভব করছিলাম।
মার্ক!
চেয়ারে সিধে হয়ে বসে চারধারে নজর বুলালাম।
মার্ক কোথায়?
ও বাইরে গেছে, বলে আরও খানিকটা লেমোনেড ঢেলে দিল চাচী।
বাইরে? কোথায়?

রবিন এসেছিল তোদেরকে ডাকতে। ওর বাবা নতুন এক নেচার ভিডিও এনেছেন সেটা দেখাতে। তুই তখন হোমওয়র্ক করছিলি, তাই মার্ক একাই গেছে। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই ফিরবে।
কিশোর, কোথায় যাচ্ছিস? চাচা আমাকে দরজার দিকে পা বাড়াতে দেখে জিজ্ঞেস করল।
ভিডিওটা দেখতে চাই আমি, বলে বেরিয়ে এলাম।
দ্রুত হাঁটছি।
একটু পরে, রবিনের বাসার সামনে চলে এলাম। পড়ন্ত বিকেল, রবিনের বাবা-মা সামনের লনে গার্ডেনিং করছিলেন।
হাই, আঙ্কল, আন্টি, চেঁচিয়ে বললাম।
আরে, কিশোর যে, বললেন মিসেস মিলফোর্ড। তোমার বন্ধুরা পিছনে আছে, মার্কের আনা কী একটা খেলা খেলছে।
খেলা? মার্কের আনা? সেটা আবার কী? বললাম মনে মনে।
মার্ক ছেলেটা সত্যিই ভাল, বললেন মি. মিলফোর্ড। আর নাকি খুব ভাল ফুটবল খেলে।
মৃদু হেসে মাথা ঝাঁকালাম। এবার বাড়ির পিছনের উদ্দেশে পা বাড়ালাম।
আমার পালা! আমার পালা। একটি মেয়ে কণ্ঠ শুনতে পেলাম। পিছনে এসে দেখি রবিন, মুসা, জুলি আর শিনা। সঙ্গে মার্কও রয়েছে।
জুলি চেঁচিয়ে উঠেছিল। মার্ক ওর হাতে একটা বাঁকা জিনিস তুলে দিচ্ছে। বুমেরাং। ছুঁড়ে দিলে আবার ফিরে আসে নিক্ষেপকারীর কাছে।
জুলি ছুঁড়ে দিল ওটা। একটু পরে, হাত বাড়িয়ে লুফে নিল।
সবাই হাততালি দিয়ে উঠল।
আগে অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা এটাকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করত। এখন এটা স্রেফ একটা খেলা। এইমিং আর দূরত্ব বিচার করতে কাজে দেয় জিনিসটা, জানাল মার্ক।
সবাই ট্রাই করেছে, শুধু কিশোর বাদে, বলল শিনা। বুমেরাংটা কিশোরকে দাও।
জুলি আমার হাতে দিল জিনিসটা।
বাড়ির বাঁ দিকের এক কোনায় সরে এলাম। এখান থেকে বুমেরাংটা ছুঁড়ে দিলে সোজা আমার কাছেই ফিরে আসবে।
আমার হাত থেকে উড়ে গেল ওটা।
ফিরে আসবে, কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না, বলল মুসা।
আমরা সবাই চেয়ে রয়েছি যেদিকে ছুঁড়েছিলাম। কেউ টু শব্দটি করছে না।
কী হলো? প্রশ্ন করল রবিন। আমার দিকে চাইল।

হঠাৎই চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল ওর।
কিশোর! চেঁচিয়ে উঠল ও। পরমুহূর্তে ডাইভ দিয়ে আমাকে পেড়ে ফেলল। দুজনে ছিটকে পড়লাম মাটিতে।
চিতিয়ে পড়েছি আমি।
কী, ব্যাপারটা কী? চেঁচিয়ে উঠলাম।
ওই দেখো, তোমার পিছনে! তর্জনী তাক করে বলল রবিন। পিছু ফিরে চাইলাম। বুমেরাংটা উড়ে এসে আমার পিছনে মাটিতে পড়েছে। মাত্র কফিট দূরে।
যেদিকে ছুঁড়েছিলাম তার উল্টো দিক থেকে এসেছে ওটা!
উঠে দাঁড়ালাম। ঝুঁকে পড়ে তুলে নিলাম জিনিসটা।
খাইছে, এটা কী হলো? ছুঁড়লে একদিকে, এল আরেক দিক থেকে! বলে উঠল মুসা।
রবিন আমাকে সময় মত পেড়ে না ফেললে সোজা আমার মাথার পিছনে এসে লাগত, বললাম।
সরি, মেট, বলে বুমেরাংটা আমার হাত থেকে নিল মার্ক, প্যান্টে মুছল। এটার এভাবে কাজ করার কথা নয়। তোমার দিনটাই খারাপ।
আজকের দিনটা আমার শেষ দিন হতে পারত। আমি মারা যেতে পারতাম।
তা হলে আজকের দিনটা তোমার জন্যে শুভ। এতগুলো খারাপ ঘটনা ঘটল, অথচ তোমার কিছুই হলো না, মৃদু হেসে বলল মার্ক।
এরপর আর খেলা চলে না। আমরা ভিতরে গেলাম ভিডিও দেখতে। আলাস্কার বনভূমি রক্ষার উপর এক ডকুমেন্টারি। কোডিয়াক ভালুক, ঈগল, পর্বতমালা এসব নিয়ে তোলা ছবি, আমার যেগুলো ভাল লাগে।
আমার মাথার মধ্যে অবশ্য ঘুরপাক খাচ্ছে দুর্ঘটনাগুলোর কথা। ক্রমেই বিপজ্জনক হয়ে উঠছে ঘটনাগুলো। আমি নিজেকে মোটেই ভাগ্যবান ভাবতে পারছি না।
ভিডিও দেখা হয়ে গেলে আমি আর মার্ক বাড়ির পথ ধরলাম।
মার্ক, ব্যাপারটা কাকতালীয় হতে পারে, ওর দিকে চেয়ে বললাম, কিন্তু যতবারই দুর্ঘটনাগুলো ঘটেছে তুমি আশপাশে ছিলে, প্রতিবারই।
মার্ক শ্রাগ করে মুচকি হাসল।
এভাবে ভাববো না কেন, মেট, আমাদের সবার জীবনেই দুর্ঘটনা ঘটে, তোমার বেলায় সবগুলো হয়তো একদিনেই ঘটে শেষ হয়ে গেছে।
হতে পারে। বললাম বটে, তবে আত্মবিশ্বাসী হতে পারলাম না।
বাড়ি ফিরে সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে উপরে চলে এলাম। মার্ক চাচা-চাচীর সঙ্গে টিভি দেখতে বসল। দরজাটা স্বাভাবিকভাবেই খুলল এবং এয়ার

কণ্ডিশনারটাকে নীরবে জানালায় বসে থাকতে দেখে স্বস্তি বোধ করলাম।
দরজা বন্ধ করে ডেস্কে বসলাম। বইটা খুলে পড়তে লাগলাম। মাঝে মধ্যে নোট নিচ্ছি।
প্রায় দুঘণ্টা পর কাজটা শেষ হলো। হাই উঠছে। ঘুমানোর সময় হলো। পায়জামা পরে হলওয়েতে বেরিয়ে এলাম।
অন্ধকার। চাচা-চাচীর বেডরুমের পাশ কাটালাম। দরজা বন্ধ। কোন সাড়া-শব্দ নেই। তারমানে ঘুমিয়ে পড়েছে।
বাথরুমে গিয়ে বাতি জ্বালোম। তারপর পানির দুটো ফসেটই অন করলাম। এবার সতর্ক আমি। পরখ করে দেখলাম। ঠিকমতই কাজ করছে।
একটু পরে, দাঁত ব্রাশ করতে শুরু করলাম। আয়নায় চোখ পড়তেই বুঝলাম মুখের চেহারায় সারাদিনের দুশ্চিন্তার ছাপ পড়েছে।
ব্রাশ করা হয়ে গেলে বাথরুমের বাতি অফ করে দিলাম। হাঁটা দিলাম আমার কামরার উদ্দেশে। হঠাই থমকে দাঁড়ালাম। মনে হলো একটা শব্দ শুনেছি। নীচে থেকে আসছে। নিচু, চাপা এক শব্দ। এবাড়িতে এরকম আওয়াজ আগে কখনও পাইনি।
সাবধানে ঘুরে দাঁড়িয়ে সিঁড়ির দিকে চাইলাম। চাচা-চাচীর ঘর আবারও পার হয়ে এলাম। এখনও নিস্তব্ধ।
সিঁড়ি ভেঙে ধীরেসুস্থে নামতে লাগলাম। মেইন ফ্লোরে এসে দাঁড়িয়েছি। শব্দটা জোরাল হয়েছে, নীচ থেকে আসছে। মার্ক যে তলায় থাকে সেখান থেকে!
ওর ঘরের উদ্দেশে নেমে যাচ্ছি। ডানদিকে, সিঁড়ির গোড়ায় বন্ধ দরজাটা দেখতে পাচ্ছি। তলা দিয়ে আলো চুঁইয়ে বেরোচ্ছে। মার্ক জেগে আছে এখনও। কথা বলছে কারও সঙ্গে। কেননা দুজনের গলা শুনতে পাচ্ছি!
পা টিপে টিপে নেমে দরজার কাছে এসে দাঁড়ালাম। দরজায় কান পাতলাম।
তুমি ঠিকমতই কাজ করছ, চাপা এক কণ্ঠস্বর বলল। কিন্তু আজকে মাত্র প্রথম দিন। আমার আরও অনেক বড় প্ল্যান আছে।
না! মার্ক জবাবে বলল। আমাকে ছেড়ে দিন। আমি আপনার সঙ্গে থাকতে চাই না!
আমি যা বলব তুমি তাই করবে, হিসিয়ে উঠল অপর কণ্ঠটা। আমি তোমার বস, তুমি আমার বশ।
না, আমাকে আমার মত থাকতে দিন, প্লিজ!
সময় আসুক তোমাকে ছেড়ে দেব। শীঘি। কিন্তু তার আগে পর্যন্ত তোমার দেহ, তোমার আত্মা সব আমার। হেসে উঠল অচেনা কণ্ঠটা।
না, আমি আপনাকে চান্স দেব না!

তুমি নিরুপায়, বলল কণ্ঠটা।
না! চেঁচিয়ে উঠল মার্ক। মনে হলো সাহায্যের জন্য চিৎকার করছে। ও। ডোরনবে হাত রেখে হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে পড়লাম।
মার্ক বিছানায় শুয়ে ছিল। মুহূর্তের জন্য মনে হলো ধোঁয়ার এক কুণ্ডলী দেখলাম, ওর ঠিক মাথার কাছে। কিন্তু চোখের পলকে মিলিয়ে গেল ওটা। মনে হলো মিশে গেল মার্কের শরীরের ভিতরে!
আমি কোন কথা বললাম না। বদলী ছাত্রটির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম। আমি ঘরে ঢুকেছি টের পায়নি ও। চিত হয়ে শুয়ে রয়েছে।
মার্ক, ফিসফিস করে ডাকলাম। তুমি ঠিক আছ?
জবাব নেই। আরেকটু কাছিয়ে গেলাম। একচুল নড়েনি মার্ক। আমার অস্তিত্ব সম্পর্কে যেন জানেই না ও। চোখজোড়া বিস্ফারিত!
মার্ক, তুমি ঠিক আছ? পুনরাবৃত্তি করে, হাত নামিয়ে ওর বাহু স্পর্শ করলাম।
কী ব্যাপার! বলে তড়াক করে সিধে হয়ে বসল ও। এতটাই চমকে গেছি, কয়েক পা পিছু হটে গেলাম।
মার্ক, আমি কিশোর। এই রুম থেকে কথাবার্তার শব্দ পেলাম। মনে। হলো কোনও গণ্ডগোল হচ্ছে।
চোখ পিটপিট করল মার্ক। উপলব্ধি করলাম আমাকে দেখার পর এই প্রথম চোখের পাতা ফেলল ও। হঠাই ঢিল হয়ে এল শরীর। আবারও স্বাভাবিক দেখাতে লাগল ওকে।
না, কোন গণ্ডগোল হয়নি, মেট, মুচকি হেসে বলল, বিছানা থেকে দোল খাইয়ে নামিয়ে আনল পা জোড়া। মনে হয় কিছুক্ষণের জন্যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।
মার্ক, এঘরে তর্কাতর্কি চলছিল।
ত্বরিত হেসে উঠল ও।
মনে হয় আবারও ঘুমের মধ্যে কথা বলছিলাম। বাবা-মা বলে মাঝেমাঝেই নাকি বলি।
ঘুমের মধ্যে কথা? দুঃস্বপ্ন দেখেছ নাকি?
মনে পড়ছে না। উঠে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙল মার্ক। আমার জন্যে চিন্তা কোরো না। হাই তুলল। ঘুমানো দরকার, বলল।
আর কথা বাড়ানোর সুযোগ নেই, তাই ওর কামরা ছাড়লাম। তবে এখনও আতঙ্কিত আমি। ওরকম গলা আগে কখনও শুনিনি। মানুষের গলা বলে মনে হয়নি।
কুয়াশার এক কুণ্ডলীকেও মার্কের মুখের চারপাশে ঘুরপাক খেতে দেখেছি। মার্কের বিমান ল্যাণ্ড করার সময়ও আমিই একমাত্র কুয়াশা দেখতে পেয়েছিলাম।

হয়তো এসবই আমার কল্পনা!
কিন্তু মার্ক আসার পর থেকে যেসব অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে সেগুলো তো কাল্পনিক নয়। এখনকার ঘটনাটাও যোগ হলো সেগুলোর সঙ্গে।
মার্ক কথা বলছিল। ঘুমের মধ্যে নয় বলেই আমার বিশ্বাস। আরও কেউ একজন কিংবা কিছু একটা ওর সঙ্গে কামরায় ছিল। কে কিংবা কী। সেটা না জানা অবধি সাবধান থাকতে হবে আমাকে। নিজের স্বার্থেই।
পরদিন নাস্তার টেবিলে সব কিছুই বেশ স্বাভাবিক মনে হলো। অন্তত উপর-উপর।
আজকে শুক্রবার, চাচী বলল। মার্ক, এই উইকএণ্ডে তুমি কি বিশেষ কিছু করতে বা দেখতে চাও?
হ্যাঁ, দেশে আমি অনেক হাইকিং করি। রকি বীচের আশপাশে বেশ কিছু ইন্টারেস্টিং জায়গা আছে। বেড়াতে গেলে মন্দ হত না, জানাল মার্ক।
ভাল তো। কিশোর, এই উইকএণ্ডে মার্ককে নিয়ে হাইকিং করে আয়, চাচী বলল।
গ্রেট আইডিয়া, চাচা যোগ করল। আমাদের কাছে তাঁবু, স্লিপিং ব্যাগ, ব্যাকপ্যাক সবই আছে।
চাচা, তুমি যাবে না? প্রশ্ন করলাম।
না, কাজ আছে। প্লাম্বার আর ইলেকট্রিশিয়ান আসবে পাইপ আর তার পরীক্ষা করতে।
ক্যাম্পিঙে গেলে মার্কের ভাল লাগবে। আশপাশে দেখার অনেক জায়গা আছে। তা ছাড়া কিশোর আর তুমি একে অন্যকে আরও ভালভাবে চিনতেও পারবে, উৎসাহ জুগিয়ে বলল চাচী।
মার্কের সঙ্গে ক্যাম্পিঙে যেতে মন সায় দিচ্ছে না আমার। কিন্তু যেতে চাই না বলি কী করে? কী বলব? মার্ক ছেলেটা অদ্ভুত? এই দুর্ঘটনাগুলো ওই ঘটাচ্ছে? আমাকে লক্ষ্য করে এগুলো ঘটানো হচ্ছে? নাহ, কেউ বিশ্বাস করবে না।
কিশোর, তুই কিছু বলছিস না যে? চাচী জিজ্ঞেস করল। সবাই আমার দিকে চেয়ে।
কথা দিলাম উইকএণ্ডে মার্ককে নিয়ে ক্যাম্পিঙে যাব। খুব মজা হবে। সিরিয়ালের বাইরের দিকে চোখ নামিয়ে মিথ্যে কথাটা বলতে হলো আমাকে।
ব্রেকফাস্ট সেরে স্কুলের উদ্দেশে রওনা হলাম আমরা।
আমরা স্কুলে ঢুকতেই, কয়েকটা ছেলে-মেয়ে আমাদের দিকে ঘুরে চাইল।
অ্যাই, মার্ক, কেমন আছ? মুসা চেঁচিয়ে উঠল।
শার্টটা দারুণ, মার্ক, মৃদু হেসে বলল রবিন।
মার্ক, কাল রাতে বুমেরাং নিয়ে হেভি মজা হয়েছে, বলল শিনা।

মার্ক সবার মনোযোগ পাচ্ছে। নতুনরা পেয়েই থাকে। এতে আমার মন খারাপের কিছু নেই। আমি যদি অস্ট্রেলিয়া যাই, আমাকে নিয়েও মার্কের বন্ধুদের মধ্যে মাতামাতি হবে।
বেল বাজলে যে যার সিটে বসলাম। মিসেস রবার্টস রোলকল করে। সোজা আমার দিকে চাইলেন।
কিশোর, তোমার বুক রিপোর্ট হয়েছে? জিজ্ঞেস করলেন।
জি, মিসেস রবার্টস, জবাব দিলাম।
যার যেদিন বুক রিপোর্ট, তাকে সেদিন ক্লাসের সামনে দাঁড়িয়ে পাঁচ মিনিট পর্যন্ত বই সম্পর্কে বলে যেতে হয়।
ক্লাসের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। সবার দৃষ্টিনিবদ্ধ আমার দিকে।
মিসেস রবার্ট ডেস্কে বসে টেপ রেকর্ডার অন করলেন। উনি সব সময় আমাদের রিপোর্ট রেকর্ড করেন, পরে যাতে আমরা স্টাডি করতে পারি।
কিশোর আমাদেরকে আমেরিকান বিপ্লবের ওপর পড়া বইটা সম্পর্কে রিপোর্ট করবে, বললেন মিসেস রবার্টস।
গলা খাঁকরে নিলাম। হঠাৎই মাথাটা ঘুরে উঠল বোঁ করে। ঘরটা বনবন করে ঘুরছে। টলতে লাগলাম।
কিশোর, কিশোর, তুমি ঠিক আছ তো? বলে এগিয়ে এলেন মিসেস রবার্ট। গোটা ঘরটা নাচছে আমার চোখের সামনে। মার্কের নীল চোখে চোখ পড়ল আমার। একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে। পরমুহূর্তে চারদিক আঁধার হয়ে গেল।
চোখ খুললাম। সব কিছু অস্পষ্ট লাগছে। চোখ পিটপিট করলাম।
কিশোর, এখন কেমন লাগছে? মহিলা কন্ঠে প্রশ্ন এল।
কাউচে শুয়ে আমি। কামরার চারদিকে নজর বুলালাম। স্কুল নার্স, মিসেস ডনেলি আমার উদ্দেশে স্মিত হাসলেন। তাঁর পাশে বসে ডক্টর রিচার্ডসন, চোখের ডাক্তার।
উঠে বসলাম। আমি এখানে এলাম কীভাবে? ক্লাসে কথা বলতে যাচ্ছিলাম এটুকু মনে আছে।
কিশোর, এখন কেমন আছ বলো। আমার সাথে কথা বলো, বললেন মিসেস ডনেলি।
চোখ ঘষে ওঁর দিকে চাইলাম।
ভাল আছি।
পরস্পরের দিকে চেয়ে মৃদু হাসি বিনিময় করলেন ওঁরা।
গুড। তুমি এখন ঠিক হয়ে গেছ। ডক্টর রিচার্ডসন তোমাকে একটু পরীক্ষা করে দেখবেন।

কেন?
তেমন কিছু না। তোমার চোখ দুটোকে খানিকটা আউট অভ ফোকাস মনে হলো, তাই। বললেন ডাক্তার।
পেন্সিল লাইট দিয়ে আমার চোখ পরীক্ষা করলেন তিনি। তারপর মাথা নাড়লেন। কোন সমস্যা নেই, বলে লাইট নিভালেন। একদম ঠিক আছ তুমি। দরজার দিকে পা বাড়ালেন। কোন সমস্যা হলে আমাকে জানিয়ে।
ঠিক আছে, ডক্টর রিচার্ডসন। একটা প্রশ্ন করতে পারি? জবাব চাইলাম।
নিশ্চয়ই।
লাইট সেনসিটিভিটি নামে কোন চোখের অসুখ আছে? যেজন্যে কন্ট্যাক্ট লেন্স পরতে হয়?
আমার দিকে চাইলেন ডক্টর রিচার্ডসন।
খুবই বিরল এই রোগ। এসব ক্ষেত্রে আমরা স্পেশাল আই-ড্রপ দিই। কন্ট্যাক্ট লেন্স ব্যবহারের প্রশ্নই ওঠে না। এতে চোখের কষ্ট আরও বাড়বে। কেন জিজ্ঞেস করলে কথাটা?
একজনের কাছে শুনেছিলাম কিনা তাই, আসল কথা চেপে গেলাম। আপনাকে ধন্যবাদ।
তারমানে মার্ক তার চোখের রং পরিবর্তন বিষয়ে মিথ্যে কথা বলেছে। ওর বাদামী চোখ হালকা নীল হলো কীভাবে?
ড. রিচার্ডসন চলে গেলে উঠে দাঁড়ালাম আমি।
আমি বরং ক্লাসে ফিরে যাই, বললাম মিসেস ডনেলিকে।
কিশোর, ক্লাসে তুমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলে, তার আগে অদ্ভুত এক, ঘটনা ঘটে, বললেন মিসেস ডনেলি।
অদ্ভুত? মনে করার চেষ্টা করলাম। মিসেস রবার্টস এটা টেপ করেছেন শোনো।
টেপ রেকর্ডারের বাটন টিপলেন তিনি। নিজের গলা শুনতে পেলাম। উদ্ভট সব কথা বলে চলেছি।
টেপ রেকর্ডার বন্ধ করলেন মিসেস ডনেলি।
কিশোর, তুমি ক্লাসে কথা বলছিলে।
মনে পড়েছে।
তোমার কী হয়েছিল বলো তো? অপ্রাসঙ্গিক কথা-বার্তা বলছিলে কেন? আমরা তো ভেবেছিলাম হাসপাতালে নিতে হবে তোমাকে।
তার দরকার নেই। আমি এখন ভাল আছি। কী হয়েছিল? আমার ধারণা এর সঙ্গে মার্ক জড়িত। আমি মরিয়ার মত আমার সন্দেহের কথা কাউকে বলতে চাইছি, কিন্তু কাকে বলব? কেউ তো বিশ্বাস করবে না।

কাজেই মিসেস ডনেলিকে বললাম, কাল অনেক রাত অবধি কাজ করেছি বলে ক্লাসে অসুস্থ হয়ে পড়ি আমি, আবোল তাবোল বকতে থাকি।
ক্লাসরুমে ফিরে এলাম আমি। মুসা আর রবিন দৌড়ে এল আমার কাছে।
এখন কেমন লাগছে? উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করল রবিন।
খাইছে! যে ভয় পেয়েছিলাম! বলল মুসা।
আমি ভাল আছি, আশ্বস্ত করলাম ওদেরকে।
মিসেস রবার্টস আমাকে তার ডেস্কে ডেকে নিলেন।
তোমার রিপোর্ট আগামী সপ্তায় দিলেও চলবে। এখন চুপচাপ বসে থাকো। কোন টেনশন কোরো না।
টেনশন করব না! না করে উপায় আছে? মার্ক, কিংবা তাকে যে নিয়ন্ত্রণ করছে সে ক্রমেই পেয়ে বসছে আমাকে। আমার জীবনটা নরক বানিয়ে ছাড়ছে। ভাগ্যগুণে কিংবা মনের জোরে এখন পর্যন্ত অশুভ শক্তির হাত এড়াতে পেরেছি আমি। কিন্তু এভাবে কতদিন?
বাকি সময়টুকুতে অস্বাভাবিক আর কিছু ঘটল না। স্কুলের ঘণ্টা বাজলে বেরিয়ে এলাম আমরা। আজকের আবহাওয়াটা চমৎকার।
ক্যাম্পিঙের জন্যে আদর্শ ওয়েদার, বলল মার্ক।
আমি চুপ করে রইলাম। মুষলধারে বৃষ্টি নামলে খুশি হতাম। ওর সঙ্গে ক্যাম্পিঙে যেতে মোটেই ইচ্ছে করছে না আমার।
সোমবার দেখা হবে! বলল মুসা। ও আর ডুগি যার যার বাইসাইকেলে চাপল।
মুসা, তোমার সাইকেলটা একটু দেবে? দেশে আমি অনেক সাইকেল চালাই, সোৎসাহে বলে উঠল মার্ক।
নিশ্চয়ই, বলে সাইকেল থেকে নেমে পড়ে ওটা টেনে এগিয়ে দিল মুসা। মার্ক এক লাফে চড়ে বসল সিটে।
দারুণ, বলে ছোট চক্র কেটে ঘুরতে লাগল। হঠাৎই চোখ পড়ল আমার দিকে। ঝিকিয়ে উঠল ওর নীল চোখজোড়া। কিশোর, ডুগিরটায় তুমি চাপো। চলো, এক পাক ঘুরে আসি। টিবি পর্যন্ত রেস দিয়ে যাব। আবার ফিরে আসব।
স্কুলের মাঠে রেস দেয়া ঠিক হবে না, বললাম।
সেফ টিবি পর্যন্ত। আজকে শুক্রবার, কেউ কিছু মনে করবে না।
করতেও পারে।
কী, কিশোর, মার্কের সঙ্গে রেস দিতে ডরাচ্ছ নাকি? ডুগি বলল।
এসময় রবিন, ডুগি আর কয়েকটা ছেলে-মেয়ে ওখানে এসে হাজির হলো।
কী হয়েছে? রবিন প্রশ্ন করল।
মার্কের চ্যালেঞ্জ নিতে ভয় পাচ্ছে কিশোর, ডুগি জানাল।

মোটেই না, দৃঢ় গলায় জানালাম। ডুগি, তোমার সাইকেলটা দাও। সাইকেলে চেপে ছোট করে দুচারপাক দিলাম। অভ্যস্ত হয়ে নিয়ে মাথা কঁকালাম মার্কের উদ্দেশে। আমি তৈরি। কেউ একজন কাউন্ট ডাউন করো।
আমি করছি, বলল মুসা। বাইকাররা, যার যার জায়গা নাও।
পাশাপাশি সাইকেল নিয়ে দাঁড়ালাম মার্ক আর আমি। আমাদের ঠিক সামনে, একশো গজ দূরে ঢিবি। আমরা সাইকেল রেস দিয়ে ওখানে যাব
ঘুরব এবং ফিরে আসব শুরুর জায়গায়। যে আগে আসবে সে বিজয়ী।
অন ইয়োর মার্ক। গেট-সেট, বলল মুসা। বিরতি নিল। সবাই নীরব। মার্ক আমার দিকে চকিত চাউনি হানল। মনে হলো ওর চোখে মুহূর্তের জন্য কুয়াশা দেখলাম। যাও!
সবাই হৈ-হৈ করে উঠল। ছিটকে বেরিয়ে গেলাম মার্ক আর আমি। পাশাপাশি ছুটে চলেছে দুটো সাইকেল। প্রথমে সামান্য এগিয়ে গেলাম আমি, তারপর মার্ক, তারপর আবার আমি। এবার মার্ক নাগাল ধরে ফেলল।
ঢিবির দিকে উড়ে চলেছি যেন আমরা। রেসের জয়-পরাজয় এখুনি নির্ধারিত হয়ে যাবে। যথাসময়ে ব্রেক করে, ঘুরে যে ফিনিশ লাইনে আগে ফিরে আসতে পারবে তারই জিত হবে।
প্রতিযোগিতা নিয়ে এতটাই মগ্ন ছিলাম, অন্য কিছুই মাথাতে ঠাই পায়নি। একটু পরেই অনুভব করলাম সব কিছু স্বাভাবিকভাবেই ঘটছে। বাইকটা মসৃণ গতিতে চলেছে, উল্টোপাল্টা কোন ব্যাপার নেই।
ঢিবিটা আর মাত্র পনেরো গজ দূরে। মার্ক ঠিক আমার পাশে টার্নিং পয়েন্টে। একসঙ্গে পৌঁছলাম আমরা, মার্ক ঘুরে চাইল আমার দিকে, দীপ্তি ছড়াল ওর চোখজোড়া।
চোখ সরিয়ে নিলাম আমি, ঘোরার জন্য ব্রেক চাপলাম। কিন্তু যতবারই ব্রেক চাপছি, বাইক ততই আরও জোরে ছুটছে! ঢিবিটা ঠিক আমার সামনে। থামতে পারছি না আমি। প্রচণ্ড গতিতে খাড়া ঢিবি থেকে তালগোল পাকিয়ে পড়ে যেতে চলেছি আমি!
আগে কখনও এই ঢিবির ঢাল বেয়ে নামিনি। কেউ নামেনি। কাজটা অবৈধ, যেহেতু বিপজ্জনক। ঢিবির চূড়া থেকে যখন উড়ে গেল বাইকটা, আমি শান্ত থাকার চেষ্টা করলাম। ঘাবড়ালে চলবে না।
ব্রেক আর কষলাম না। বাইকটা ঊর্ধ্ব গতিতে ছুটে চলেছে এখনও। আর ধরে থাকতে পারছি না। মনটাও বাইকের গতিতে রেস দিচ্ছে। তলপেট ফাঁকা। বাতাসের ঝাপ্টা এসে লাগছে মুখে। ঢিবির পাদদেশ দ্রুত গতিতে এগিয়ে আসছে!

এবার মাথায় একটা চিন্তা ঘাই মারল। ব্রেক চাপলে যদি বাইক আরও জোরে ছোটে, তা হলে হয়তো উল্টোটাও সত্যি।
পেড়ালে দুপা রেখে বনবন করে ঘুরাতে লাগলাম।
হ্যাঁ, সহসাই ধীর হয়ে এল বাইকের গতি!
ঢাল বেয়ে তখনও নেমে চলেছে বাইকটা, কাজেই নীচে নামা না পর্যন্ত পুরোপুরি থামবে না। তবে গতিটা আমি কমাতে পেরেছি। মিনিট খানেকের মধ্যে ঢিবির নীচে নেমে এসে নিরাপদে থেমে দাঁড়াতে পারলাম।
ঢিবির চূড়ার দিকে চোখ তুলে চাইলাম। ঢোক গিলোম। সবাই দাঁড়িয়ে ঢিবির মাথায়। আমার দিকে চেয়ে তলার উদ্দেশে আঙুল নির্দেশ করছে। হয়তো আমার দুঃসাহসের কথা বলাবলি করছে।
বাইকটাকে হটিয়ে নিয়ে ঢিবি বেয়ে উঠতে লাগলাম।
কিশোর, কী হয়েছিল? প্রায় চেঁচিয়ে উঠল রবিন। আমরা তো ভেবেছিলাম মারাই যাবে বুঝি। নীচে নামতে গেলে কেন?
কোথায় থামতে হবে বুঝতে পারিনি, বলে মার্কের দিকে চাইলাম। তুমি জিতে গেছ, মার্ক।
তুমি বিপদকে জয় করেছ। তুমিই বিজয়ী, মেট, বলল মার্ক। পরীক্ষায় উতরে গেছ তুমি।
কীসের পরীক্ষা? কার কাছে পরীক্ষা? যে বা যা কাল রাতে মার্কের সঙ্গে কথা বলছিল তার কাছে? এই পরীক্ষার পিছনে কি কোন ধরনের পরিকল্পনা ছিল? এর শেষ কখন, কোথায়? মার্ক কি জানত? জানলেও বলবে না। জিজ্ঞেস করেও কোন লাভ নেই। আমাকে স্রেফ সতর্ক থাকতে হবে পরের পরীক্ষাটার জন্য।
আমার ষষ্ঠেন্দ্রিয় বলছে, চূড়ান্ত পরীক্ষা হবে এই উইকএণ্ডে। মার্ক আর আমি যখন ক্যাম্পিঙে যাব।
শনিবার সকালে ক্যাম্পিঙের জিনিসপত্র গোছগাছ করলাম। পাপ টেণ্ট পরিষ্কার করলাম, স্লিপিং ব্যাগ টান-টান করে নিলাম, গ্যাস ল্যাম্প আর ফ্ল্যাশলাইট পরখ করলাম, চাচীর দেওয়া খাবার আর বেভারেজ প্যাক করলাম।
দুজনের পরনেই জিন্স, সোয়েটশার্ট আর ব্যাকপ্যাক, শনিবার বিকেল নাগাদ তৈরি হয়ে গেলাম আমরা ক্যাম্পিঙের জন্য।
কিশোর, তুই যেহেতু এলাকাটা চিনিস, কাজেই তুই-ই লিডার। এটা নিরাপদ এলাকা। রাতে যখন ক্যাম্প করবি নিরাপদ, শুকনো দেখে একটা জায়গা বেছে নিবি। আর মনে রাখবি ডাকলেই যেন একজন আরেকজনের গলা শুনতে পাস, চাচা পরামর্শ দিল।
মনে থাকবে, চাচা, বললাম।

তোদের ভাল সময় কাটুক, চাচী বলল। দুজনকেই জড়িয়ে ধরল। কালকে দুপুরের মধ্যে ফিরে আসবি কিন্তু, মনে থাকে যেন।
সায় জানিয়ে বেরিয়ে পড়লাম আমরা। প্রথম কয়েক ঘণ্টা শহরের পিছনের বনভূমি ভেদ করে এগোলাম।
আমাদের দেশে এরকম বন নেই, বলল মার্ক। শেষ বিকেল। বিশ্রাম নিতে থেমেছি আমরা। জঙ্গলের ভিতরে, এক টুকরো ফাঁকা জায়গায় বসেছি দুজনে, লেমোনেড পান করছি।
জানতাম তোমার ভাল লাগবে, বললাম।
আমি আসলে খানিকটা হোমসিক হয়ে পড়েছি, বলল মার্ক। যেদিন এলাম সেদিন জলাভূমির উপর দিয়ে এসেছিলাম। ঠিক আমার অস্ট্রেলিয়ার মত লেগেছিল। ওখানে হাইকিং করলে কেমন হয়, মেট? রাতে আমরা যদি ওখানে ক্যাম্প করি?
জলাভূমি! মার্ক সবচাইতে ভুতুড়ে জায়গাটা বেছে নিয়েছে রাত কাটানোর জন্য।
জায়গাটা স্যাঁতসেঁতে, বললাম।
তাতে সমস্যা নেই। তবু আর ব্যাগগুলো ওয়াটারপ্রুফ। জায়গাটা একনজর দেখতে খুব ইচ্ছে করছে।
ও নীল চোখ মেলে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইল আমার দিকে। ভয় পেয়েছি বোঝানো যাবে না। জানি পালিয়ে লাভ হবে না। শোডাউন যদি জলাভূমিতে হয় তো হোক।
কাজেই রাজি হয়ে গেলাম আমি। বুকের মধ্যে ধড়ফড় করছে। হৃৎপিণ্ড।
অনেকটা পথ হাইক করে জলাভূমিতে পৌঁছতে হলো। দূর থেকে এয়ারপোর্ট চোখে পড়ছে।
তুমি ওখানে ল্যাণ্ড করেছিলে, বললাম।
হ্যাঁ। চারধারে দৃষ্টি বুলিয়ে নিল ও। আঁধার হয়ে আসছে। এটা রাত কাটানোর জন্যে চমৎকার জায়গা।
দুটো লম্বা উইলো গাছের মাঝে শুকনো এক স্পট খুঁজে নিলাম আমরা। দূরাগত ব্যাঙের ডাক কানে আসছে। কয়েকটা জোনাকি পোকা উড়ে গেল। এখন গোধূলি, অতটা গা ছমছম করছে না। তবে শীঘ্রিই করবে।
পরের বিশটা মিনিট তাঁবু খাটাতে আর ব্যাগ বিছাতে কেটে গেল। এবার ডিনারের ব্যবস্থা করলাম। ফ্র্যাঙ্কস আর বিনস।
মাটিতে বিছানো এক কম্বলের উপর বসেছি দুজনে, নিঃশব্দে ডিনার সারছি। ইতোমধ্যে আঁধার ঘনিয়েছে। প্রদীপ জ্বেলেছি আমি।
মার্ক খাওয়ার সময় একদৃষ্টে প্রদীপের আলোর দিকে চেয়ে রইল। অগ্নিশিখায় স্থির ওর দুচোখ।
আচমকা আড়মোড়া ভেঙে হাই তুলল ও।

ঘুমিয়ে পড়িগে যাই, বলে উঠে দাঁড়াল। তুমি এখন ঘুমাবে নাকি আরও খানিকক্ষণ জেগে থাকবে?
আরেকটু জাগি, বললাম। আসলে প্রচণ্ড ক্লান্তি বোধ করছি, কিন্তু মার্ক গভীর ঘুমে তলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত ঘুমাতে চাই না।
মার্ক তাঁবুতে গিয়ে স্লিপিং ব্যাগে ঢুকল। ঘুমিয়ে পড়ল একটু পরে।
আমি বাইরে প্রদীপের আলোর নিরাপদ আশ্রয়ে বসে থাকলাম। শান্ত, আরামদায়ক পরিবেশ। এখানে কোন বিপদ হবে না, ভাবলাম। ভুল ভেবেছিলাম। এজায়গাটাকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। বরঞ্চ উল্টো-চমৎকার জায়গা। চোখজোড়া ভারী হয়ে আসছে। শিথিল হয়ে আসছে শরীর।
কিশোর, চাপা এক কণ্ঠস্বর কানে এল। অ্যাই, কিশোর, চোখ খোলো।
চোখের পাতা তিরতির করে কেঁপে উঠল। তন্দ্রা কেটে গেছে। কেউ কি ডাকল আমার নাম ধরে?
মার্ক? বলে উঠে বললাম। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম প্রদীপের পাশে বসে।
মার্ক এখন সচেতন নয়, কিশোর। ও তোমার কথা শুনতে পাবে না। আমি পাব। এবং সেটাই তোমার দরকার।
চোখ পিটপিট করলাম। কণ্ঠটা পরিচিত। মার্ক ওর কামরায় এর সঙ্গেই তর্কাতর্কি করছিল। চোখ তুলে চাইতেই কুয়াশাচ্ছন্ন, ধোঁয়াটে এক অবয়ব দেখতে পেলাম। সারা শরীর ধূসর, শুধু একটা জিনিস বাদে। একজোড়া অন্তর্ভেদী, ঝিকিমিকি নীল চোখ!
পরীক্ষা শেষ, কিশোর। তুমি ভাল করেছ, প্রতিবারই পাস করেছ তুমি। তুমি হবে আমার পারফেক্ট হোস্ট।
তারমানে? কয়েক পা পিছিয়ে গেলাম। কে আপনি? কী আপনি?
কিশোর, তুমি জান আমি কে। আমি ক্যাপ্টেন স্টার। ওরা আমাকে ল্যাণ্ড করতে দেয়নি, কিশোর। আমার আত্মা এতদিন ধরে সুন্দর একটা ল্যাণ্ডিঙের জন্যে অপেক্ষা করছিল। সেই সুযোগ পেয়ে গেছি আমি। তুমি আমার আত্মাকে তোমার দেহে ধারণ করবে। তুমি হবে আমার হোস্ট, আবারও বলল ছায়ামূর্তিটা।
তাঁবুর দিকে পিছিয়ে গেলাম। কুয়াশাময় জিনিসটার দিকে চোখ সেঁটে আছে আমার। কিন্তু ক্রমেই সরে যাচ্ছি আমি ইঞ্চি-ইঞ্চি করে।
আপনি মার্কের শরীরের ভিতরে ছিলেন, তাই না? প্রশ্ন করলাম। ছায়াময়কে কথা বলিয়ে সময় পেতে চাইছি।
হ্যাঁ, সেদিন ওর প্লেন যখন কুয়াশার মধ্যে ঢুকল তখন ওর দেহে প্রবেশ করি আমি। ওকে ব্যবহার করে আমি তোমার কাছে আসি। তোমাকে পরীক্ষা করে দেখি, তুমি আমার উপযুক্ত মেজবান হতে পারবে কিনা। তুমি প্রতিটা পরীক্ষায়

পাস করেছ, কিশোর। খলখল করে হাসল, ওটা। তোমাকে দিয়ে উল্টোপাল্টা কাজ করিয়েছি। তোমার সাথে উল্টোপাল্টা ব্যবহার করা হয়েছে। ঠাণ্ডা পানির বদলে গরম পানি, এয়ারকণ্ডিশনার থেকে গরম বাতাস বেরনো-এসবের কথা বলছি। তুমি প্রতিটা পরীক্ষায় উতরে গেছ। শেষমেশ পেডাল মেরে বাইক পর্যন্ত থামিয়ে ফেলেছ। হবে, কিশোর, তোমাকে দিয়ে হবে!

আপনি আমাকে আপনার আত্মার হোস্ট বানাতে চান কেন? জিজ্ঞেস করলাম। আমি থমকে দাঁড়িয়েছি ব্যাকপ্যাকের কাছে। ওটা আমার পিছনে। ডান পায়ের পিছনের অংশ ছুঁয়ে আছে ব্যাকপ্যাকটাকে।

কারণ আমি শেষ পর্যন্ত ল্যাণ্ড করতে চাই, কিশোর। তোমার শরীরে প্রবেশ করে, তোমার মন আর আত্মাকে দখল করে আমি সুযোগটা পেতে চাই! আমি কিশোর পাশা বনে যাব। সবাই যাকে ভালবাসে। আমরা দুজনে মিলে সবার উপরে প্রতিশোধ নেব। এই শহর বহু বছর আগে আমার সাথে যা করেছে তার প্রতিশোধ!

ব্যাগের ভিতরে হাত ঢুকাচ্ছি আমি।

ওরা বহু বছর আগে আপনার সাথে কী করেছিল, ক্যাপ্টেন স্টার? জবাব চাইলাম। আমার কণ্ঠস্বর জোরাল শোনালেও শব্দগুলো মুখ থেকে বের করতে কষ্ট হলো-দাতে দাঁতে বাড়ি খাচ্ছে।

ওরা আমাকে ল্যাণ্ড করতে দেয়নি! আর এই কুয়াশা আমার শরীর দখল করে নেয়। আমাকে বন্দি করে, আকারহীন, অবয়বহীন এক অস্তিত্বে পরিণত করে। নিজের চোখেই তো দেখতে পাচ্ছ! চেঁচিয়ে উঠল ওটা।

মায়াই লাগল ওটার প্রতি। কিন্তু তাই বলে ছায়ামূর্তিটার ধারক হওয়ার কোন ইচ্ছা নেই আমার। এখন, রক্ষা পাওয়ার একটাই মাত্র উপায়। সরাসরি ওটার চোখের দিকে চাইলাম।

ঠিক আছে, আমি রাজি, বললাম।

ধন্যবাদ, কিশোর। দখলের জন্যে প্রস্তুত হও। আমাদের দীর্ঘ প্রতিশোধপরায়ণ জীবন শুরু হোক!

নীল চোখজোড়া ধকধক করে জ্বলছে। কুয়াশা পাকিয়ে উঠে সোজা, সরু এক স্তম্ভে রূপ নিয়েছে। আমার দিকে পাক খেয়ে নেমে আসছে এ

কোন ভুল-চুক করা চলবে না।

আমার হাতে এক কি দুই সেকেণ্ড মাত্র সময়।

কুয়াশা চেপে আসছে আমার উপরে। আর মাত্র কফুট বাকি, এখুনি মাথা ছুঁয়ে ফেলবে!

ব্যাকপ্যাক থেকে এক টানে ফ্ল্যাশলাইটটা বের করলাম। পরমুহূর্তে সুইচ টিপে সোজা তাক করে ধরলাম আগুয়ান কুয়াশার কুণ্ডলীটার উদ্দেশে।
না! করুণ চিৎকার উঠল। আলোয় ধরা পড়েছে কুয়াশা। আলোর রশ্মি ধরে রেখেছি, ক্রমেই সঙ্কুচিত হতে লাগল ওটা। কণ্ঠস্বর ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে এল। শেষ অবধি রইল শুধু অল্প একটুখানি ধোঁয়া আর একজোড়া তীক্ষ্ণ, নীল চোখ। চোখজোড়া আমার দিকে শেষবারের মত অগ্নিদৃষ্টি হেনে আবছা কুয়াশায় মিলিয়ে গেল।
কী ভেবে ফ্ল্যাশলাইট অন করলে, মেট? মার্ক জানতে চাইল।
পরদিন সকাল।
জলাভূমি ভেদ করে বাড়ির পথে চলেছি।
তোমার সাথে পরিচয় হওয়ার পরপরই তুমি একটা কথা বলেছিলে, জবাব দিলাম। বলেছিলে প্লেন ল্যাণ্ড করার ঠিক আগ মুহূর্তে কেবিনের বাতিগুলো নিভু নিভু হয়ে আসে। আমার ধারণা সে সময়ই ক্যাপ্টেনের আত্মা তোমার শরীরে প্রবেশ করে। ওটা হয়তো আলো সইতে পারে না, তাই কাজটা আঁধারেই সেরেছে।
মনে হচ্ছে তোমার কথাই ঠিক, স্বস্তির হাসি হেসে বলল মার্ক। ওর দিকে চেয়ে মুচকি হাসলাম। কুয়াশা উবে যাওয়ার পরপরই ঘুম ভাঙে মার্কের। ওর চোখের দিকে চেয়ে দেখেছি আগের স্বাভাবিক বাদামি রং ফিরে পেয়েছে।
বুড়োর আত্মা আমার শরীরে ঢোকার পর থেকে ভয়ঙ্কর সময় কেটেছে। তোমাকে বলতেও পারি না, সইতেও পারি না-সে এক বিশ্রী অবস্থা, বলল মার্ক।
তোমার তো কোন দোষ নেই। তুমি ওর নিরীহ এক শিকার। আর তুমি যদি কেবিনের বাতি নেভার কথা না বলতে, ফ্ল্যাশলাইট জ্বালার কথা মাথায় আসত না আমার। কাজেই, আমরা দুজনে একসাথে দুষ্ট আত্মাকে হারিয়েছি। আমরা একটা দল হিসেবে কাজ করেছি।
পরস্পরের হাত ঝাঁকিয়ে দিলাম আমরা।
বাসায় ফিরতে কতক্ষণ লাগবে বলতে পারো? মার্কের প্রশ্ন।
দুপুরের মধ্যে পৌঁছে যাব।
এখন কটা বাজে? রিস্টওয়াচ দেখলাম।
এগারোটা প্রায়। ঘড়ির দিকে চেয়ে রয়েছি। হঠাই হাঁটার গতি ধীর হয়ে এল।
কী হলো?
জবাব দিলাম না। দিতে পারলাম না। ঘড়ির দিকে চেয়ে রইলাম একদৃষ্টিতে। বড় কাঁটাটা বারোটার ঘরের উদ্দেশে এগোচ্ছে। ছোট কাটাটা এগারোর ঘরে।
আমার মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে সেকেন্দ্রে কাটা। পিছন দিকে চলেছে ওটা।

ঠিক সে মুহূর্তে, মনে হলো আকাশে পুরানো এক বিমানের এঞ্জিনের শব্দ শুনলাম। মুখ তুলে চাইলাম। কিছু নেই। স্রেফ স্বচ্ছ নীল আকাশ।

তিন গোয়েন্দা ভলিউম ১১৪/২ – মঞ্চনাটক – কাহিনি রচনা: কাজী শাহনূর হোসেন – তিন গোয়েন্দায় রূপান্তর: শামসুদ্দীন নওয়াব – সেবা প্রকাশনী – প্রথম প্রকাশ : ২০১০

গরমের এক দিনে, পেনসিলভেনিয়ার ফ্রগ ক্রীক উডসে রহস্যময় এক ট্রী হাউস উদয় হয়।

তিন গোয়েন্দা হিরু চাচার বাসায় বেড়াতে এসে আবিষ্কার করে ওটা। ট্রী হাউসে উঠে ওরা দেখে ওটা বই দিয়ে ঠাসা।

শীঘ্রি ওরা জানতে পারে ট্রী হাউসটা জাদুর। বইতে উল্লেখ করা নানান জায়গায় ওদেরকে নিয়ে যেতে পারে। ওদেরকে শুধু কোন একটা ছবিতে আঙুল রেখে সেখানে যাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করতে হয়। ওরা যখন অভিযানে বেরোয়, ফ্রগ ক্রীকের সময় তখন স্থির থাকে।

এক পর্যায়ে তিন বন্ধু আবিষ্কার করে ট্রী হাউসটার মালিক মরগ্যান লে ফে। রাজা আর্থারের রাজ্য ক্যামেলটের এক জাদুকরী লাইব্রেরিয়ান এই মরগ্যান। টাইম আর স্পেসে ভ্রমণ করে বই সগ্রহ করে সে।

এবার জিনার বাবা-মার সঙ্গে হিরু চাচার বাসায় বেড়াতে এসেছে। কিশোর আর জিনা।

তারপর…

কিশোর আর জিনা বারান্দায় বসে ছিল। গ্রীষ্মের উষ্ণ সন্ধেয় জোনাকি জ্বলছে।

আরি, উল্কা! বলে উঠল জিনা। আকাশের দিকে তর্জনী তাক করল।

মুখ তুলে চাইল কিশোর। আকাশে আঁকাবাঁকা আলোর ঝলকানিটা শেষ মুহূর্তে দেখতে পেল। ফ্রগ ক্রীক উডসের উপরে দুমুহূর্ত ঝুলে রইল আলোটা। তারপর মিলিয়ে গেল গাছের মাথাগুলোর আড়ালে।

শ্বাস চাপল কিশোর। ঘাড় কাত করে জিনার দিকে চাইল।

ওটা উল্কা না, বলল ও।

ঠিক, বলল জিনা।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল ওরা। ফ্রণ্ট হল-এর ভিতর থেকে ব্যাকপ্যাক তুলে নিল কিশোর।

হিরু চাচা! আমরা একটু বাইরে যাচ্ছি, চেঁচিয়ে বলল। এখুনি ফিরব!

দেরি করিস না কিন্তু! হিরু চাচা বলল।

ঠিক আছে! বলল কিশোর। দরজা লাগিয়ে দিল। জলদি চলো!

উঠনের উপর দিয়ে আড়াআড়ি দৌড় দিল কিশোর আর জিনা। একটু পরে ছুটে চলল রাস্তা ধরে। ছুটতে ছুটতে বনভূমিতে প্রবেশ করল। সবচাইতে বড় ওক গাছটার কাছে এসে থামল। মুখ তুলে চাইল ওরা।

যা ভেবেছিলাম, বলল জিনা।
কিশোর মৃদু হাসল। মুখে কথা জোগাল না ওর।
আমাদের উল্কা, বলল জিনা। জাদুর ট্রী হাউস।
দড়ির মই চেপে ধরে উঠতে লাগল ও। অনুসরণ করল কিশোর।
ট্রী হাউসের ভিতরে ঢোকার পর দুজনেই শ্বাস চাপল। ছায়াময় এক কোণে দাঁড়িয়ে লম্বা, সাদা চুলের অপরূপা এক মহিলা।
কেমন আছ, কিশোর-জিনা? বলল মরগ্যান লে ফে।
মরগ্যান! প্রায় চেঁচিয়ে উঠল কিশোর আর জিনা।
মরগ্যানকে জড়িয়ে ধরল ওরা।
আপনি এখানে কেন? প্রশ্ন করল জিনা। আমাদেরকে কী করতে হবে বলুন।
তোমরা ইতিমধ্যেই আমার জন্যে অনেক করেছ, বলল মরগ্যান, এবং রাজা আর্থার আর ক্যামেলটের জন্যে। এবার আমি চাই তোমরা নিজেদের জন্যে কিছু করো। তোমরা এবার জাদু শিখবে।
বলেন কী, সোসাহে বলে উঠল জিনা। আমরা জাদুকর ইব? আপনি আমাদেরকে জাদু মন্ত্র শেখাবেন?
হেসে উঠল মরগ্যান।
কোন কোন জাদুতে মন্ত্র লাগে না, বলল সে। তোমরা পরের অভিযানগুলোয় একটা করে বিশেষ জাদু খুঁজে পাবে।
কীভাবে? কিশোরের প্রশ্ন।
গোপন এক ছড়া তোমাদেরকে প্রতিটা অভিযানে গাইড করবে, বলল। মরগ্যান। এই নাও।
জিনা মরগ্যানের হাত থেকে ছড়াটা নিয়ে জোরে জোরে পড়ল:
টু ফাইণ্ড আ স্পেশাল ম্যাজিক
ইউ মাস্ট স্টেপ ইনটু দ্য লাইট
অ্যাণ্ড উইদাউট ওয়্যাণ্ড, স্পেল, অর চার্ম
টার্ন ডেটাইম ইনটু নাইট।
দিনকে রাত করা? প্রশ্ন করল কিশোর, তা কীভাবে সম্ভব?
স্মিত হাসল মরগ্যান।
সেটাই তো তোমাদেরকে জানতে হবে, বলল।
কিশোরের মনে অনেক প্রশ্ন ছিল। কিন্তু ও আর কোন কথা জিজ্ঞেস করতে পারার আগেই, আকস্মিক আলোর ঝলকানিতে আলোকিত হয়ে উঠল ট্রীহাউস। আলো থেকে বাঁচতে চোখ বুজে ফেলল ও। চোখ যখন খুলল, মরগ্যান লে ফে উধাও। সে যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে একটা বই পড়ে রয়েছে।

মিরগ্যান আমাদেরকে সব কথা বলেনি, বলল কিশোর।
তবে এই রিসার্চ বইটা রেখে গেছে, বলল জিনা। বইটা তুলে নিল।
এটা থেকে জানা যাবে প্রথমে আমাদের কোথায় যেতে হবে। জানালার প্লান আলোর কাছে বইটা ধরল ও।
প্রচ্ছদে দেখা গেল ব্যস্ত এক নদী, বেশ কিছু নৌকা আর একটা সেতু। শিরোনাম বলছে: মেরি ওল্ড ইংল্যাণ্ড
তারমানে আমরা জাদু খুঁজতে প্রাচীন ইংল্যাণ্ডে যাচ্ছি? বলল জিনা। শুনতে তো দারুণ লাগছে। তুমি রেডি?
হুঁ, বলল কিশোর। ও অবশ্য ভাবছিল মরগ্যানের কাছ থেকে আরও কিছু তথ্য পেলে ভাল হত। কিন্তু ও রিসার্চ বইটার প্রচ্ছদে আঙুল রাখল।
আমরা ওখানে যেতে চাই, বলল।
বাতাস বইতে শুরু করল।
ট্রী হাউস ঘুরতে লাগল।
বাতাস ক্রমেই জোরাল হচ্ছে।
এবার সব কিছু স্থির হয়ে গেল।
একদম নিথর।
গনগনে রোদ এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ট্রী হাউসের ভিতরে। কিশোর চোখ মেলল।
জিনার পরনে অ্যাপ্রন সহ লম্বা এক পোশাক। কিশোরের গায়ে ফোলা। হাতাওয়ালা শার্ট, নী-লেংথ প্যান্ট আর টাইটস। দুজনের পায়েই চামড়ার চটি। কিশোরের ব্যাকপ্যাক বদলে গিয়ে এখন এক চামড়ার ব্যাগ।
কাপড়গুলো অদ্ভুত, বলল কিশোর। ওর গলার স্বর চাপা পড়ে গেল নীচ থেকে আসা ওয়াগনের চাকার গুড়গুড় শব্দে।
কী হচ্ছে এখানে? জিজ্ঞেস করল জিনা।
দুজনেই বাইরে তাকাল।
ট্রী হাউসটা চওড়া, বাদামি এক নদীর কাছে, গাছ-গাছালির এক জটলার মধ্যে নেমেছে। ওয়াগন, ঠেলাগাড়ি আর মানুষ-জন এগিয়ে যাচ্ছে নদীর দিকে। পারাপারের নৌকা, পাল তোলা জাহাজ আর সাদা রাজহাঁস ভেসে বেড়াচ্ছে পানিতে।
বাব্বা, একেবারে জমজমাট! বলল জিনা।
কিশোর ওদের গবেষণার বইটা খুলে পড়ল:
১৬০০ খ্রিস্টাব্দে, এক লাখের বেশি
মানুষ বাস করত ইংল্যাণ্ডের লণ্ডন শহরে। সে
সময় ইংল্যাণ্ড শাসন করতেন রানী

প্রথম এলিজাবেথ। জনগণ তাকে
খুব ভালবাসত।
রানী? ভাল তো, বলল জিনা।
কিশোর নোটবই বের করে তথ্যগুলো টুকে নিল।
এরকম ব্রিজ আগে দেখিনি, বাঁ দিকে চেয়ে বলল জিনা।
কিশোরও ওর সঙ্গে চাইল। নদীর উপরে বিশাল এক পাথুরে সেতু। সেতুটা অনেকটা যেন ছোটখাট এক শহরের মত। ওটায় গিজগিজ করছে বাড়ি-ঘর, দোকান-পাট। এমনকী একটা গির্জাও রয়েছে।
কিশোর সেতুটার একটা ছবি খুঁজে পেল গবেষণার বইটায়। জোরে জোরে পড়ল ও:
লণ্ডন শহরের কেন্দ্রস্থলে ছিল লণ্ডন সেতু।
সেতুটা ছিল টেমস নদীর উপরে। ইতিহাসের নানান
সময়ে সেতুটা ধসে পড়ে। কিন্তু ওটাকে
বারবারই মেরামত করা হয়।
এইবার বুঝেছি, বলে উঠল জিনা। গানটা কোত্থেকে এসেছে। ও গাইল, লণ্ডন ব্রিজ ইয় ফলিং ডাউন, ফলিং ডাউন…
জিনা গান গাইছে, কিশোর নোটবই বের করে তথ্যগুলো লিখে নিল।
এবার জাদুটা খুঁজি চলো বলল জিনা। মরগ্যানের চিরকুটটা পড়ল আবারও:
টু ফাইণ্ড আ স্পেশাল ম্যাজিক
ইউ মাস্ট স্টেপ ইনটু দ্য লাইট
অ্যাণ্ড উইদাউট ওয়্যাণ্ড, স্পেল, অর চার্ম
টার্ন ডেটাইম ইনটু নাইট।
কিশোর চোখ পিটপিট করে আকাশের দিকে চাইল। মেঘশূন্য গাঢ় নীল। আকাশ।
এটা সম্ভব নয়, বলে মাথা নাড়ল ও।
কিন্তু ও গবেষণার বই আর নোট বইটা চামড়ার ব্যাগের ভিতরে ছুঁড়ে দিল। এবার জিনাকে অনুসরণ করে দড়ির মই বেয়ে নামতে লাগল। মাটিতে নেমে নদীর উদ্দেশে হেঁটে চলল।
এহ! বলে নাক টিপে ধরল জিনা।
নদী থেকে দুর্গন্ধ আসছে।
অন্য কেউ অবশ্য দুর্গন্ধটাকে পরোয়া করছে না। লোকজন খোশমেজাজে গাদাগাদি করে নৌকায় উঠছে, কিংবা সেতুর দিকে এগোচ্ছে। সবার মুখের চেহারায় খুশির ছাপ। কোথাও আমোদ-ফুর্তি করতে যাচ্ছে যেন।

এক দল রাস্তার ছেলে কিশোর আর জিনার পাশ দিয়ে চলে গেল। বারো-তেরো বছর বয়স হবে। হাসাহাসি করছে। কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।
জলদি চল! দেরি হয়ে যাবে! একজন চেঁচিয়ে উঠল।
ছেলেগুলো সেতুর পাথুরে তোরণটার উদ্দেশে দৌড় দিল।
কীসের দেরি? প্রশ্ন করল জিনা। ব্রিজের ওপাশে কী আছে? ওদের এত তাড়াহুড়ো কীসের?
কে জানে, বলল কিশোর। গবেষণার বইটা টেনে বের করল। দেখি বইতে কী বলে।
না, চলো আমরাও যাই-নইলে দেরি হয়ে যাবে! বলল জিনা, ছুট দিল।
আচ্ছা, আচ্ছা, বলল কিশোর।
বইটা ঢুকিয়ে রেখে, জিনার পিছু পিছু লণ্ডন ব্রিজের দিকে দৌড় দিল।
পাথুরে তোরণের নীচ দিয়ে লণ্ডন ব্রিজের দিকে পা বাড়াল কিশোর আর জিনা।
সেতুতে ওঠার পর, অবাক হয়ে গেল কিশোর। সেতুটা ভয়ানক কোলাহলমুখর। আর বাতাসে কীসের যেন দুর্গন্ধ। খোয়া বাধানো পথের উপর দিয়ে বাজের মত শব্দ তুলে গড়িয়ে চলেছে ওয়াগনের চাকা। মালগাড়িতে ঠনঠন শব্দে পাত্রে পাত্রে ঠোকাঠুকি। ঘোড়ারা হেষাধ্বনি করছে। দোকানদাররা তারস্বরে চেঁচাচ্ছে।
অ্যাই পাই! পাই!
অ্যাই ভাজা মটরশুটি! ভাজা মটরশুটি!
অ্যাই পিন! পিন!
চাই জুতা! সাবান! লবণ!
এক দোকানীর সঙ্গে কিশোরের চোখাচোখি হয়ে গেল।
কিছু লাগবে, বাবু? চেঁচিয়ে প্রশ্ন করল সে।
না, ধন্যবাদ, চলতে চলতেই বলল কিশোর।
সাবধান! এক মালগাড়ির চালক চেঁচাল।
কিশোর জিনার হাত ধরে রাস্তা থেকে টেনে সরিয়ে আনল। মালগাড়িটা সরু রাস্তা ধরে ওদের পাশ দিয়ে চলে গেল।
দেখো! দেখো! বলে উঠল জিনা। মালগাড়ির পিছনে কাঠের খাঁচায় বন্দি এক ভালুক। সারা গায়ে বাদামী লোম। মাথা নোয়ানো।
মালগাড়িটাকে এগিয়ে যেতে দেখে মাথা নাড়ল কিশোর।
এবার কী? প্রশ্ন করল।
ওদিকে দেখো, বলে মুখ তুলে চাইল জিনা।
কয়েকটি বাড়ির ছাদের কিনারায় কুঁজো হয়ে বসে থাকা কালো রঙের বিশালকায় পাখিগুলোকে আঙুল ইশারায় দেখাল ও। পাখিগুলো ঠায় বসে নীচ

দিয়ে চলে যাওয়া মালগাড়ি, মানুষ-জন আর জীব-জন্তুদের দেখছে। কিশোর শিউরে উঠে নীরব, দানব পাখিগুলোর দৃষ্টি এড়াতে দ্রুত পা চালাল।
শেষমেশ সেতুর শেষ প্রান্তে চলে এল ও আর জিনা। পা রাখল নদীর তীরে। এখানে থমকে দাঁড়িয়ে চারধারে চোখ বুলাল।
ছেলেগুলো গেল কোথায়? বলল জিনা।
কিশোর লক্ষ করল সেতুর সংযোগ রাস্তাটি ধরে এগিয়ে চলেছে জনতা। টোকাই ছেলেগুলোর ছায়া দেখা গেল না।
গবেষণার বইটা বের করল কিশোর। লণ্ডন ব্রিজের ছবি খুঁজে নিল। জোরে জোরে পড়ল:
লণ্ডন ব্রিজ ছিল নদীর দক্ষিণ তীরের সঙ্গে
লণ্ডনের সংযোগ সেতু। লণ্ডনবাসী
ওখানে যেত বিনোদনের জন্য। বেয়ার
গার্ডেন ছিল জনপ্রিয় একটি স্পট।
বেয়ার গার্ডেন? সোৎসাহে বলে উঠল জিনা। কোথায় সেটা?
কিশোর দক্ষিণ তীরের এক ম্যাপ খুঁজে পেল। গোল এক দাগের মধ্যে বেয়ার গার্ডেন চিহ্নিত করা হয়েছে।
এখানে, বলল ও। মুখ তুলে চাইল। আর...এখানে! দূরের কালো, গোল এক বিল্ডিঙে আঙুল রাখল।
দারুণ! বলে উঠল জিনা। বাগান ভর্তি ভালুক দেখতে চাই আমি।
পড়ে দেখি- শুরু করেছিল কিশোর।
গিয়ে দেখি! বলল জিনা। বেয়ার গার্ডেনের উদ্দেশে হাঁটা দিল।
কিশোর বইটা ঢুকিয়ে রেখে ওর পিছু নিল। কাছাকাছি হতেই, জোরাল। চেঁচামেচি আর হাসাহাসির শব্দ শুনতে পেল গোল বাড়িটার ভিতর থেকে।
থেমে দাঁড়াল জিনা।
দাঁড়াও, বলল ও। জায়গাটা মনে হচ্ছে ভাল না। আরেকটু বরং পড়ে দেখো।
কিশোর বইটা আবারও খুলল। জোরে জোরে পড়ল:
বেয়ার গার্ডেন নামের মল্লভূমিতে, দর্শকরা
কুকুরের সঙ্গে ভালুকের লড়াই দেখত।
প্রাচীন ইংল্যাণ্ডে পশুর লড়াই ছিল
প্রচলিত এক খেলা, আজকে এটা
আইন করে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।
কুকুরের সাথে ভালুকের লড়াই? ছি! বলল জিনা। আমি এসব সইতে পারব না!
আমিও না, বলল কিশোর। চলো চলে যাই। হাঁটা দিল।

অ্যাই, কিশোর! ওদিকে তাকাও! বলে উঠল জিনা। কাছের এক মালগাড়ি আঙুল-ইশারায় দেখাল। এই ভালুকটা ব্রিজে আমাদের পাশ দিয়ে গেছিল!
মালগাড়িটার কাছে দৌড়ে গেল কিশোর আর জিনা। ওটার পিছনদিকে একটা খাঁচা। খাঁচার ভিতরে বিশাল এক বাদামি ভালুক।
জানোয়ারটা জবুথুবু হয়ে বসা। মাথা এখনও নিচু। মালগাড়িটায় এক সাইনবোর্ড লাগানো। তাতে লেখা; নাচুনে ভালুক ডন।
ডন? প্রশ্ন করল জিনা। তুমি কি মারামারি করবে?
নিঃসঙ্গ চেহারার ভালুকটা প্রকাণ্ড মাথা তুলে জিনার দিকে চেয়ে রইল। ওটার কালো চোখজোড়া বিষণ্ন। নিচু এক গোঙানি বেরিয়ে এল ওটার বুক চিরে।
বুঝতে পারছি, বলল জিনা। তুমি লড়তে চাও না। তুমি চাইছ আমি যাতে তোমাকে দূরে কোথাও নিয়ে যাই। ভালুকের খাঁচার দরজার দিকে হাত বাড়াল ও।
সরে যাও ওখান থেকে! ক্রুদ্ধ চিৎকার ছাড়ল কে একজন। ওটা আমার ভালুক!
চরকির মতন ঘুরে দাঁড়াল কিশোর আর জিনা। মালগাড়ির চালক রীতিমত তেড়ে আসছে ওদের দিকে।
ও আমার! আমি ওকে বিক্রি করব! গর্জাল লোকটি।
চলে এসো, জিনা, বলল কিশোর। জিনাকে টান দিয়ে রাস্তা ধরে হেঁটে চলা মানুষের ভিড়ের মধ্যে নিয়ে এল।
কিন্তু ডনকে যে আমার উদ্ধার করতে হবে! জরুরী কণ্ঠে বলল জিনা। কাঁধের উপর দিয়ে চাইল। ওই লোকটা ওকে লড়াইয়ের জন্যে বেচে দিতে
জানি, বলল কিশোর। কিন্তু আমরা তো ওকে চুরি করে নিয়ে যেতে পারি না। লোকটা হাজার হলেও ওর মালিক।
চারধারে নজর বুলাল ও। ভালুকটার উপর থেকে জিনার মনোযোগ সরাতে চাইছে। সেই টোকাই ছেলেগুলোকে দেখতে পেল। গোলাকার, সাদা। এক-দালানের দিকে হেঁটে চলেছে ওরা।
সেই ছেলেগুলো! বলে উঠল কিশোর। চলো, দেখি ওরা কোথায় যায়।
ডনের কী হবে?
পরে ভাবা যাবে, জিনার প্রশ্নের জবাবে বলল কিশোর। এখন চলো। ছেলেগুলোকে ফলো করি।
সাদা দালানটার দিকে জিনাকে এগিয়ে নিয়ে চলল সে। কাছে আসার পর, কিশোর সামনে লাগানো সাইনবোর্ডটা পড়ল:
গ্লোব থিয়েটারে নাটক
আ মিডসামার নাইটস ড্রিম
ভাল! ভাবল কিশোর। জিনা নাটক ভালবাসে। স্কুলে অভিনয়ও করে।

থিয়েটারের দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল এক লোক। হাতে একটা বাক্স।
স্ট্যাণ্ডের জন্য এক পেনি! স্ট্যাণ্ডের জন্য এক পেনি! চেঁচাচ্ছে।
টোকাই ছেলেগুলো বাক্সে কয়েন ফেলে ভিতরে প্রবেশ করল।
মাত্র এক পেনি! বলল কিশোর। একদম সস্তা!
কিন্তু আমাদের কাছে তো পেনি নেই, বলল জিনা। তা ছাড়া, আমি চাই ফিরে নিয়ে ভালুকটাকে মুক্তি দিতে।
দীর্ঘশ্বাস ফেলল কিশোর।
মুক্তি যদি দিতেও পারো কী করবে ভালুকটাকে নিয়ে? জিজ্ঞেস করল।
কিছু একটা ভেবে বের করে ফেলব, জানাল জিনা।
মালিকটা যখন কাছেপিঠে থাকবে না তখন ভেবে বের কোরো, বাতলে দিল কিশোর। এখন এই নাটকটা সম্পর্কে কিছু জানা যাক।
চটপট গবেষণার বইটা বের করল ও। গ্লোব থিয়েটারের এক ছবি খুঁজে নিল। ও চায় জিনা ভালুকটার কথা ভুলে যাক, তাই আবেগ ঢেলে পড়ল:
প্রাচীন ইংল্যাণ্ডে প্রথম থিয়েটার গঠিত
হয়। তখনকার দিনে যেহেতু বিদ্যুৎ
ছিল না, দিনের আলোয় নাটক
মঞ্চস্থ হত। প্রায় সবাই নাটক দেখতে
যাওয়ার সামর্থ্য রাখত।
ভাল না? বলল কিশোর।
দীর্ঘশ্বাস ফেলল জিনা।
কিশোর দরাজ, নাটুকে কণ্ঠে পড়তে লাগল:
দর্শনীর তারতম্যের উপরে দর্শকদের বসার
স্থান নির্ভর করত। যারা বেশি
টাকা দিত তারা মঞ্চের উপরে উঁচু গ্যালারিতে
বসত। অন্যরা দাঁড়াত নীচে—
এই, ছেলে! কে একজন চেঁচিয়ে উঠল।
মুখ তুলে চাইল কিশোর।
এক লোক শশব্যস্তে ওদের দিকে এগিয়ে এল। লোকটার পা দুখানা লম্বা, পরিপাটী করে ছাঁটা দাড়ি আর উজ্জ্বল একজোড়া চোখ।
বাহ, তুমি তো ভারী চমৎকার করে পড়তে পারো! বলল লোকটা। আমি ওখান থেকে শুনছিলাম!
কিশোর লাজুক হাসল।

না, সত্যি অসাধারণ তোমার আবৃত্তি! লোকটা বলল। ঠিক তোমার, মতই একটা ছেলে খুঁজছি আমি!
ভাল আবৃত্তি করে এরকম ছেলে দরকার কেন আপনার? লোকটিকে জিজ্ঞেস করল জিনা।
কারণ একটু আগে আমি দুটো পরীকে হারিয়েছি! জবাব এল। কিশোরের দিকে আঙুল নির্দেশ করল। তুমি দুজনেরটাই পড়তে পারবে?
আপনি একটা পাগল, ভাবল কিশোর।
আচ্ছা, চলি, দেখা হবে, বলল ও। জিনাকে কনুইয়ের আলতো তো মেরে এগোতে বলল।
দাঁড়াও, দাঁড়াও, বলল জিনা। লোকটার দিকে ঘুরে চাইল। ও দুজনেরটাই পড়তে পারবে মানে কী? কোথায় পড়তে হবে ওকে?
দুটো ছেলের পরীর অভিনয় করার কথা ছিল, কিন্তু তারা আসেনি, বলল লোকটি। কিন্তু এই ছেলেটা কী সুন্দর আবেগ দিয়ে পড়ে! ও আমাদের উদ্ধার করতে পারবে!
কিশোর একদৃষ্টে চেয়ে রইল। লোকটা জেনেশুনে কথা বলছে তো?
আপনি কিশোরকে আপনার নাটকে নিতে চান? প্রশ্ন করল জিনা।
হ্যাঁ! বলে উঠল, লোকটি। তিন হাজার লোক এসেছে আমার লেখা নাটক দেখতে! তাদেরকে আমরা হতাশ করি কীভাবে!
তিন হাজার? বলল কিশোর।
হ্যাঁ! জানাল লোকটি। এবং তাদের মধ্যে একজন দুনিয়ার সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ মানুষ!
না, সম্ভব নয়। আমি পারব না, বলল কিশোর। আমাদের অন্য কাজ আছে।
দাঁড়াও, দাঁড়াও, বাধা দিল জিনা। ফিরে তাকাল লোকটির দিকে। আপনার দুটো পরী দরকার, তাই না?
হ্যাঁ, বলল লোকটি।
হুম... মাথা কাত করে বলল জিনা। গলা চড়ে গেল ওর। আমিও ভাল আবৃত্তি জানি।
হ্যাঁ! জিনাকে নিয়ে নিন, বলল কিশোর। ও ভাল আবৃত্তি জানে। দুটো পরীর কাজ একাই চালিয়ে নিতে পারবে!
তা তো বুঝলাম, কিন্তু জিনা তো মঞ্চে উঠতে পারবে না, নরম কণ্ঠে জানাল লোকটি।
কেন পারব না? প্রশ্ন করল জিনা।
ভ্রূ উঁচু করল লোকটি।

আইনে মেয়েদের নাটক করা নিষেধ, বলল সে। ছেলেরাই মেয়েদের পার্ট করে।
কিন্তু এটা কেমন কথা! বলে উঠল জিনা।
জানি ভাল কথা নয়। কিন্তু কী করব, আইন বলে কথা, বলল লোকটি। কিশোরের দিকে ঘুরে চাইল। তো, কিশোর! তুমি অভিনয় করছ তো?
না, ধন্যবাদ, বলল কিশোর। পা বাড়াতেই জিনা ওর বাহু চেপে ধরল।
আমি জানি কিশোর কী চাইছে, লোকটিকে বলল ও। আমাকে নিলেই শুধু নাটকে অভিনয় করবে ও।
আমি তা চাইছি না, জিনা, শ্বাসের নীচে বলল কিশোর।
কিন্তু, কিশোর, ভেবে দেখো কত মজা হবে, ফিসফিস করে বলল জিনা। ভয়ের কী আছে! তুমি শুধু তোমার পার্টটা পড়ে যাবে। মুখস্থ তো করতে হচ্ছে না।
কিশোর উপলব্ধি করল জিনা নাটকে অংশ নেয়ার জন্য উন্মুখ। ভালুকটার দিক থেকে ওর মন সরানোর জন্য এটা একটা ভাল পথ হতে পারে।
আচ্ছা, ঠিক আছে, দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল ও। লোকটির দিকে চাইল।
জিনাকে নিলে আমি আপনার নাটকে কাজ করতে রাজি।
লোকটি জিনার দিকে চাইল। জিনা তার দিকে চোখে আশা নিয়ে চেয়ে রয়েছে। মুখে মৃদু হাসি।
লোকটিও পাল্টা হাসল।
বেশ তো, অসুবিধে কী? বলল সে। কিন্তু জিনাকে ভান করতে হবে ও মেয়ে নয়, ছেলে। চুল গোটাতে হবে ওকে। আমরা ওকে অ্যাণ্ডি বলে ডাকব।
ঠিক আছে। ধন্যবাদ, হাসি মুখে বলল জিনা।
থিয়েটারের ভিতরে ট্রাম্পেট বেজে উঠল।
জলদি চল, নাটক এখুনি শুরু হবে! লোকটি বলল। কিশোর আর জিনার হাত ধরে নিয়ে চলল।..
আপনার নামটা তো জানা হলো না, বলল জিনা।
আমার নাম উইল, বলল লোকটা। এসো, কিশোর আর অ্যাণ্ডি! ছায়ার মত দ্রুত চলো।
নামটা শুনে খটকা লাগল কিশোরের। লোকটার চেহারা প্রথম থেকেই কেমন যেন চেনা-চেনা লেগেছে ওর। কে এই উইল?
উইল কিশোর আর জিনাকে এক দরজার ভিতর দিয়ে গ্লোব থিয়েটারের পিছন দিকে নিয়ে এল। এবার ওদেরকে পিছনে নিয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন এক সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল।
উপরে উঠছে, দর্শকদের হাসির শব্দ শোনা গেল। কিশোর নার্ভাস বোধ করল।
এদিকে, বলল উইল।

তাকে অনুসরণ করে জনাকীর্ণ, স্বল্পালোকিত এক কামরায় প্রবেশ করল কিশোর আর জিনা। চারদিকে অভিনেতাদের ব্যস্ত ছোটাছুটি। সবাই যেন তার নিজস্ব জগতে বিরাজ করছে। একজন আলখিল্লা পরছে। আরেকজন কোমরে রশি বাঁধছে। তৃতীয়জন ফিসফিস করে নিজের সাথে কথা বলছে।
আমি তোমাদের পোশাক খুঁজে দিচ্ছি, বলল উইল।
উইল কাপড় ভর্তি বিশাল এক ঝুড়ির মধ্যে হাত ভরে দিল। কিশোর আর জিনা কস্টিউম রুমের চারপাশে নজর বুলাল। কামরাটা চটকদার গাউন, বেগুনী আর নীল আলখেল্লা, সোনালী-রূপালী পরচুলা, হ্যাট, মুখোশে ঠাসা।
চমৎকার, ফিসফিস করে বলল জিনা। একটা গাধার ও একটা সিংহের মুখোশ স্পর্শ করল। এগুলো দারুণ ছদ্মবেশ হতে পারে, তাই না?
জিনার শান্ত-শিষ্ট ভাব দেখে একটু অবাকই হলো কিশোর। ও কি ভুলে গেছে ওদেরকে তিন হাজার মানুষের সামনে দাঁড়াতে হবে? ভাবনাটা মাথায় আসতেই ঢোক গিলল কিশোর। পেটের ভিতরে প্রজাপতির নাচ অনুভব করল।
এই নাও! বলল উইল। ওদের হাতে সবুজ পোশাক, হ্যাট আর চটী তুলে দিল। এগুলো পরে নাও! একদম সময় নেই! শীঘ্রি তোমাদের পালা। আসবে!
কিশোর আর জিনা সাত করে এক পর্দার আড়ালে গিয়ে পোশাক পাল্টে নিল। হ্যাট পরার সময় জিনা ওর পিগটেইল লুকাল।
ওরা বেরিয়ে এলে, উইল দুজনের হাতেই একটা করে গোটানো, ছোট কাগজ তুলে দিল।
এগুলো তোমাদের রোল, বলল সে। শুধু তোমাদের লাইনগুলোই এতে আছে, অন্য কারওটা নেই।
নিজের কাগজটা আনরোল করল কিশোর। ওকে দুটো লম্বা ভাষণ পড়তে হবে।
এক সেকেণ্ড, বলল সে। আমি ভেবেছিলাম অল্প কয়েক লাইন। কিন্তু এ তো দেখছি মহাভারত।
চিন্তা কোরো না, বলল উইল। শুধু মনে রেখো-স্পষ্ট করে আর আবেগ দিয়ে পড়তে হবে। এবং সবচেয়ে বড় কথা একদম স্বাভাবিক থাকতে হবে!
স্বাভাবিক থাকতে হবে! ভাবল কিশোর। টেনশন হচ্ছে, এ অবস্থায়। স্বাভাবিক থাকা যায়?
ঠিক এসময় বেঁটে, গোলগাল এক লোক হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল কস্টিউম রুমে। লোকটার মাথায় কোঁকড়া চুল। গালজোড়া টকটকে লাল। পরনে আপাদমস্তক সবুজ পোশাক।
হায় ঈশ্বর! আতঙ্কিত ফিসফিসে স্বরে বলল সে। এখন কী হবে, উইল?

ভেবো না! দেখো কাদেরকে পেয়েছি! এরা দুজনেই পড়তে পারে! জানাল উইল। কিশোর আর জিনাকে সামনে ঠেলে দিল। কিশোর আর অ্যাণ্ডি, তোমরা রাতের বেলা মনের আনন্দে ঘুরে বেড়ানো পাকের সঙ্গে পরিচিত হও। ও তোমাদেরকে মঞ্চে নিয়ে যাবে। গুড লাক!
জিনা স্মিত হাসল। কিশোর গুঙিয়ে উঠল।
এসো, ছেলেরা! বলল পাক। আমার সঙ্গে এসো!
কিশোর আর জিনাকে পিছনে নিয়ে কস্টিউম রুম ত্যাগ করে হলওয়েতে বেরিয়ে এল পাক। এবার ওদেরকে মঞ্চের পিছনদিকে আঁধার মত এক জায়গায় নিয়ে এল।
অভিনেতারা নীরবে কাছেই দাঁড়ানো, মঞ্চে ওঠার অপেক্ষায়। একজন পরেছে চমৎকার এক সাদা গাউন। অন্যদের গায়ে ছেঁড়াখোঁড়া বাদামি পোশাক।
কিশোর এক ধনুকাকৃতি খিলান ভেদ করে মঞ্চের ছাদ দেখতে পেল। নীলের পটভূমিতে অজস্র তারা আর একটা চাঁদ জ্বলজ্বল করছে। মঞ্চের ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে বিশাল এক জনতা। উপরের গ্যালারি থেকে দেখছে আরও বেশি দর্শক।
ইংল্যাণ্ডের সমস্ত মানুষ এখানে জ্বড় হয়েছে! ভাবল কিশোর। জিনার কথায় আমি রাজি হলাম কীভাবে?
আমি আগে তোমাকে মঞ্চে নিয়ে যাব, পাক ফিসফিস করে কিশোরকে বলল। আমি যখন বলব, হাউ নাও, স্পিরিট! উইদার ওয়াণ্ডার ইউ? তুমি তোমার লাইনগুলো পড়তে শুরু করবে। বুঝতে পেরেছ? বা কোনমতে মাথা ঝাঁকাল কিশোর। ওর গলা শুকনো ঠেকছে। ঢোক গিলতে চেষ্টা করে পারল না।
পাক এবার জিনার দিকে ঘুরে দাঁড়াল।
তুমি পরী রানীর সাথে মঞ্চে যাবে, ফিসফিস করে বলল। মনোলোভা সাদা গাউন পরা অভিনেতাটিকে আঙুল ইশারায় দেখাল ও। ও যখন তোমাকে গান গেয়ে ঘুম পাড়াতে বলবে, তখন তুমি তোমার গানটা শুরু করবে।
সুর? প্রশ্ন করল জিনা।
বানিয়ে নিয়ে যা খুশি একটা, বলল পাক। ওরা যদি উল্টোপাল্টা বলে, চেঁচামেচি করে, তবুও থামবে না। স্রেফ
কারা উল্টোপাল্টা বলবে, চেঁচামেচি করবে? হস্তক্ষেপ করল কিশোর।
গ্রাউণ্ডলিংরা একটু বুনো স্বভাবের হয়ে থাকে আরকী, বলল পাক।
গ্রাউণ্ডলিং কারা? কিশোরের প্রশ্ন।
যে সব উচ্ছঙ্খল লোকেদের বাসায় জায়গা নেই, বলল পাক। ওরা মঞ্চের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। দুএকজন পচা ফল ছুঁড়লেও থেমো না। চালিয়ে যেয়ো।
অনেক হয়েছে আর নয়, ভাবল কিশোর।

মঞ্চে উঠতে পারবে না ও-যখন উচ্ছঙ্খল দর্শকরা পচা ফল ছুঁড়বে, তিন হাজার দর্শক নাটক দেখবে, অসংখ্য লাইন পড়তে হবে-এবং ওকে যে মুহূর্তে অভিনয় করতে হবে।
পাক আর জিনা যখন নাটক দেখছে, আলগোছে সরে পড়ল কিশোর। বেরনোর পথ খুঁজছে। সিঁড়ি খুঁজে পেয়েছে, এমনি সময় ধাক্কা খেল উইলের সঙ্গে।
চললে কোথায়? উইল ফিসফিসিয়ে প্রশ্ন করল।
শরীর খারাপ করছে! বলল কিশোর। আমি পারব না।
আঁতকে উঠল উইল। পরমুহূর্তে কিশোরের কাঁধে দুহাত রেখে শান্ত স্বরে কথা বলল।
এক মুহূর্তের জন্যে চোখ বোজো, কিশোর, বলল
চোখ বুজল কিশোর। বুক ধড়ফড় করছে।
ভয়ের কিছু নেই, ফিসফিস করে বলল উইল। কল্পনা করো তুমি একটা পরী। গরমের এক রাতে বনের ভিতরে রয়েছ। মাথার উপরে রূপালী চাঁদ দেখতে পাচ্ছ? শুনতে পাচ্ছ পেঁচার ডাক? হু-হুঁ।
উইলের গভীর ফিসফিসানি যেন মন্ত্রমুগ্ধ করে দিল কিশোরকে। শরীর মন শিথিল হয়ে এল ওর। রূপালী চাঁদের ছবি ফুটে উঠল মনের পর্দায়। কানে এল পেঁচাঁদের ডাক।
তুমি কি গরমের এক দিনে বনের ভিতরে রয়েছ? প্রশ্ন করল উইল।
কিশোর মাথা ঝাঁকাল।
তুমি এটা বিশ্বাস করলে দর্শকরাও করবে, ফিসফিস করে বলল উইল।
কই, এসো! ফিসফিসাল পাক। মোটাসোটা অভিনেতাটি দৌড়ে এল কিশোরের কাছে। ওকে হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল।
কিছু বুঝে ওঠার আগেই নিজেকে মঞ্চে আবিষ্কার করল কিশোর!
উজ্জ্বল সূর্যালোকে মঞ্চে দাঁড়াল কিশোর। তিন হাজার জোড়া চোখ ওর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে।
হাউ নাও, স্পিরিট! চড়া গলায় বলল পাক। উইদার ওয়াণ্ডার ইউ?
নিজের স্ক্রলের দিকে চোখ নামিয়ে চাইল কিশোর। এবার মুখ খুলল। কোন শব্দ বেরোল না।
এক গ্রাউণ্ডলিং হিসিয়ে উঠল।
হাউ নাও, স্পিরিট! এবারে গলা আরও চড়াল পাক। উইদার ওয়াণ্ডার ইউ?
চোখ বুজল কিশোর। গরমের রাতের অনুভব নিল। গভীর শ্বাস টানল। গলা খাকরাল। ভাষণটার দিকে চাইল।
এবার পড়তে শুরু করল:

ওভার হিল, ওভার ডেল
থ্রু বুশ, থু ব্রায়ার
ওভার পার্ক, ওভার পেল
থ্রু ফ্লাড, থ্রু ফায়ার
আই ডু ওয়াণ্ডার এভরিওয়্যার
সুইফটার দ্যান দ্য মুনস স্ফিয়ার;
অ্যাণ্ড আই সার্ভ দ্য ফেয়ারি কুইন…
কিশোর যখন পড়ছে, দর্শকরা শান্ত হয়ে এল। কিশোর ভুলে গেল ও যে কিশোর। রাতের বেলা বনভূমির ভিতরে, পাকের সঙ্গে কথা বলছে যেন সে।
ওর পড়া শেষ হলে কেউ হিসিয়ে উঠল না কিংবা কোন কিছু ছুঁড়ে মারল না।
পাক তার লাইনগুলো পড়তে আরম্ভ করলে বুক ভরে শ্বাস টানল কিশোর। ওকে আরেকটা ভাষণ পড়তে হবে। বুকের ভিতরে ধড়াস-ধড়াস করছে ওর। ভয়ের কারণে যতটা না তার চাইতে বেশি উত্তেজনার ফলে।
দ্বিতীয় বক্তৃতার সময় তৈরি ছিল কিশোর। এবার স্পষ্টভাবে আর আবেগ ঢেলে পড়ল ও। চেষ্টা করল যথাসম্ভব স্বাভাবিকতা ফুটিয়ে তুলতে। ওর পড়া শেষ হলে দর্শকরা হাত তালিতে ফেটে পড়ল।
কীভাবে মঞ্চ ত্যাগ করল বলতে পারবে না কিশোর। উইল ওর জন্য অপেক্ষা করছিল।
সাবাস! বলে কিশোরের পিঠ চাপড়ে দিল উইল। তুলনাহীন!
লজ্জায় লাল কিশোর উইলের স্ক্রলটা ফিরিয়ে দিল। এত লোকের সামনে পারফর্ম করেছে বিশ্বাস হতে চাইছে না ওর। এবং জিনার কথা মত সত্যিই আনন্দ পেয়েছে ও।
ছায়ার আড়ালে দাঁড়িয়ে জিনার পড়া শেষ হওয়ার অপেক্ষা করতে লাগল কিশোর। পরী রানী এবং অন্যান্য পরীদের সঙ্গে ওকে মঞ্চে উঠতে দেখল ও।
রানী যখন পরীদেরকে বলল তাকে গান গেয়ে ঘুম পাড়াতে, জিনা এগিয়ে গেল। ওর স্ক্রল থেকে পরিষ্কার কণ্ঠে এবং আবেগ ঢেলে গেয়ে উঠল:
ইউ স্পটেড স্নেকস, উইথ ডাবল টং
থর্নি হেজহগস, বি নট সীন;
জিনা এমনভাবে হাত নাড়ল যেন সাপ আর কাঁটাচুয়াদের তাড়িয়ে দিচ্ছে।
নিউটস অ্যাণ্ড ব্রাইণ্ড ওয়র্মস, ড নো রং
কাম নট নিয়ার আওয়ার ফেয়ারি কুইন…
জিনা তর্জনী তুলে গোসাপ আর অতি ছোট চোখবিশিষ্ট পোকাদের শাসাল। দর্শকরা হাসিতে ফেটে পড়ল।

জিনা গান গেয়ে চলল। গানের কথার সঙ্গে মিলিয়ে অঙ্গ ও মুখভঙ্গি করছে। ও এমনকী খানিক নাচও জুড়ে দিল গানটির সঙ্গে।
ওর যখন শেষ হলো, দর্শকরা তখন হাততালি দিচ্ছে, হর্ষধ্বনি করছে আর মাটিতে পা ঠুকছে।
অসাধারণ, অ্যাণ্ডি! জিনা মঞ্চ ত্যাগ করলে বলল উইল।
দারুণ দেখিয়েছ! কিশোর বলল।
ধন্যবাদ! বলল জিনা। স্ক্রলটা উইলকে ফিরিয়ে দিল। আমাকে কি আবার মঞ্চে যেতে হবে?
নাটক শেষ হোক, আমরা সবাই যখন অভিবাদন জানাব তখন যাবে, জানাল উইল।
এসময় দর্শকদের আবারও হাসাহাসি করতে শুনল কিশোর। নাটক দেখতে মন চাইল ওর। কাজেই থিয়েটারের পিছনদিকে আবছায়া এক জায়গা খুঁজে নিয়ে সেখান থেকে দেখতে লাগল।
নাটকের চরিত্রদের কথা-বার্তা সব না বুঝলেও কাহিনিটা ঠিকই বুঝতে পারল ও। প্রেম-ভালবাসা নিয়ে নাটক। কিন্তু কেউই পছন্দের মানুষটিকে বিয়ে করতে পারছে না।
সবচেয়ে মজার অংশটা পরী রাজা ও পরী রানীকে নিয়ে। রাজা পাগল রানীর জন্য। তাই সে রানীর চোখের পাতায় জাদুর ফুলের রস চিপে দেয়, রানী যাতে যাকে প্রথমে দেখবে তার প্রেমে পড়ে যায়।
পাক কাজ করে রাজার পক্ষে। সে আরেকটু কায়দা করতে চায়। গেঁয়ো এক লোককে গাধার মাথা পরায় সে। ঘুম ভাঙতেই রানী গর্দভ মানবটিকে দেখে। জাদুর বলে রানী পাগলের মত লোকটির প্রেমে পড়ে যায়।
পরী রাজা শেষমেশ জাদুর মায়া কাটিয়ে দেয়। গর্দভ মানব যখন ঘুমিয়ে ছিল পাক তখন তাকে আবার মানুষ বানিয়ে দেয়। ঘুম ভাঙার পর লোকটা ভাবে সে স্বপ্ন দেখেছে।
ইতোমধ্যে কিশোরের পাশে, এক দল অভিনেতা জড় হয়েছে নাটকের শেষ দৃশ্যের জন্য।
আমার সিংহের মুখোশটা পাচ্ছি না! একজন হাহাকার করে উঠল। মুখোশ ছাড়া সিংহ সাজব কীভাবে!
আস্তে, মুখোশ ছাড়াও চলবে, বলল উইল। স্রেফ গর্জন ছেড়ো! দুবার হুঙ্কার দিলেই হবে।
অভিনেতাদেরকে মঞ্চের দিকে ঠেলে দিল উইল। ভ্রূ জোড়া মুছে নিল। এবার নজর পড়ল কিশোরের উপরে।

অ্যাণ্ডিকে নিয়ে এসো! বলল সে। নাটক শেষ হয়ে এসেছে প্রায়।
জিনা? কোথায় জিনা? ভাবল কিশোর। বেশ কিছুক্ষণ ওকে দেখেনি ও। কস্টিউম রুমে উঁকি দিল। নেই।
বুকের ভিতরে ধড়াস করে উঠল কিশোরের। মাথায় এল ভয়ঙ্কর এক ভাবনা…
না, ফিসফিসিয়ে বলল।
সিঁড়ি ভেঙে দৌড়ে নেমে এল কিশোর। দরজা খুলল। জিনাকে থিয়েটারের পিছনের গাছ-গাছালির আড়াল থেকে দৌড়ে আসতে দেখে স্বস্তি ফিরে পেল।
এখন অভিবাদন জানানো হবে! বলে জিনার হাত চেপে ধরল। কোথায় গেছিলে? কী করছিলে?
পরে দেখাব! বলল জিনা।
ওরা দুজন দুদ্দাড় করে সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে গেল।
উইল আর কজন অভিনেতা অপেক্ষা করছিল।
পাক তখন মঞ্চে তার শেষ বক্তৃতা দিচ্ছে:
সো গুড নাইট আনটু ইউ অল।
গিভ মি ইয়োর হ্যাণ্ডস ইফ উই বি ফ্রেণ্ডস…
কিশোর! অ্যাণ্ডি! বলল উইল। ওদের হাত চেপে ধরল।
পাক তার বক্তব্য শেষ করল। করতালিতে ফেটে পড়ল দর্শকরা। সে সঙ্গে শিস দিচ্ছে, তারস্বরে চেঁচাচ্ছে।
কিশোর আর জিনা উইল আর অন্যান্য অভিনেতাদের সঙ্গে দৌড়ে মঞ্চে গিয়ে উঠল। জনতার উল্লাসধ্বনির মধ্যে একবার…দুবার…তিনবার মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানাল ওরা।
উইল সামনে এগিয়ে গিয়ে দুহাত উঁচু করল। জনতা ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এল।
আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ, বলল সে। এবং দুনিয়ার সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ মানুষটি, ধন্যবাদ আপনাকেও। তিনি আজকে উপস্থিত থেকে আমাদের সবাইকে কৃতজ্ঞ করেছেন।
মঞ্চের উপরে গ্যালারি, সেদিকে নত হয়ে এক মহিলার উদ্দেশে অভিবাদন জানাল উইল। মুক্তোখচিত সাদা এক পোশাক আঁর পরনে। নেকারে মুখ ঢাকা।
মহিলা উঠে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে নেকাব সরালেন। ফ্যাকাসে, কুঁচকানো চামড়া আর ছোট ছোট কালো চোখ দেখা গেল। মাথায় লাল পরচুলা।
দর্শকরা সশ্রদ্ধ শ্বাস চাপল। ধপ করে হাঁটুর উপর বসে পড়ল সবাই।
রানী এলিজাবেথ দীর্ঘজীবী হোন! বলল উইল।
রানী এলিজাবেথ দীর্ঘজীবী হোন! চেঁচিয়ে উঠল জনতা।
রানী এলিজাবেথ দীর্ঘজীবী হোন! চেঁচাল কিশোর আর জিনা।

রানী স্মিত হাসলেন। তার দাঁতগুলো সব কালো! দর্শকরা ব্যাপারটাকে যেন পাত্তাই দিল না। আরও জোরে উল্লাসধ্বনি করে উঠল।
রানী একটা হাত তুলতেই মুহূর্তে নিশ্চুপ হয়ে গেল জনতা।
আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি, বললেন রানী। এবং আমি সব কজন দক্ষ অভিনেতাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজকে তারা আমাদেরকে উপহার দিয়েছেন বিশেষ এক জাদু-নাটকের জাদু। তাঁরা দিনকে রাত করে দিয়েছেন।
আরি, ফিসফিস করে বলল কিশোর। এই তো-সেই বিশেষ জাদু। ওদের মিশন শেষ হয়েছে।
দর্শকরা আবারও হর্ষধ্বনি করে উঠল। অভিনেতারা মঞ্চত্যাগের পর। উইলকে ঘিরে ধরে অভিনন্দন জানাল।
জিনা একপাশে টেনে নিয়ে গেল কিশোরকে।
পেয়ে গেছি! বলল ও। আমাদের জাদু!
জানি! বলল কিশোর। উইল আমাদেরকে সাহায্য করেছে। চলো ওকে ধন্যবাদ জানাই!
পরে, বলল জিনা। আগে তোমাকে একটা জিনিস দেখাতে চাই। তোমার সাহায্য দরকার! জলদি!
জিনা কিশোরকে পিছনে নিয়ে, নীচে নেমে এসে বাইরে বেরিয়ে এল। লোকজন দলে দলে গ্লোব ছেড়ে বেরোচ্ছে। সূর্য পাটে বসেছে।
এদিকে, বলল জিনা। থিয়েটারের পিছনে, গাছ-গাছালির জটলার উদ্দেশে পা বাড়াল ও।
ও আর কিশোর অন্ধকারময় ছাউনির ভিতরে ঢুকতেই, এক গাছের কাছে। অদ্ভুতদর্শন এক অবয়ব দেখতে পেল কিশোর। বেগুনী এক আলখেল্লা ওটার লোমশ পিঠ ঢাকতে পারেনি। সোনালী এক পরচুলা আর সিংহের মুখোশ লুকোতে পারেনি লোমশ মাথাটা।
ঢোক গিলল কিশোর।
সেই ভালুকটা! তুমি ওকে চুরি করেছ!
করতে বাধ্য হয়েছি, জানাল জিনা। আমি যখন মালগাড়িটার কাছে যাই তখন কেউ ওখানে ছিল না। ওর গায়ে পোশাক পরিয়ে দিই। যাতে এখানে আসার পথে কেউ দেখলে মনে করে ও-ও একজন অভিনেতা।
কিন্তু তুমি ওকে এভাবে চুরি করতে পারো না! বলল কিশোর।
আমি চুরি করিনি। ওকে রক্ষা করেছি, বলল জিনা। ওকে নিয়ে এখন কী করব বুঝতে পারছি না। তুমি কী বলে?
ঠিক এমনিসময় ভালুকের মালিক ধেয়ে এসে জঙ্গলে ঢুকল।

আমার ভালুক কোথায়? গর্জে উঠল। মুখের চেহারা লাল। কটমট করে চেয়ে রয়েছে। মুখ খিস্তি করছে। চোরের দল! চেঁচিয়ে উঠল। ওকে ফিরিয়ে দে! আমি ওকে লড়াইয়ের জন্যে বিক্রি করব!
না! বলল জিনা। লোকটা আর ভালুকটার মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ও নিরীহ ভালুক! যোদ্ধা নয়!
ও ঠিকই বলেছে! কথাটাকে সমর্থন করল কিশোর। তা ছাড়া ভালুক লড়াই ভাল নয়! মোটেই ভাল নয়!
সত্যি কথা, গমগম করে উঠল একটি কণ্ঠ।
কিশোর, জিনা আর ভালুকের মালিক পাই করে ঘুরে দাঁড়াল। জঙ্গলের। কিনারে দাঁড়িয়ে উইল আর পাক।
আপনি সুবিধের লোক নন, ভালুকের মালিকের উদ্দেশে তিরস্কার করে বলল উইল। নিরীহ এক ভালুককে কিনা লড়াইয়ের জন্যে বেচে দিতে চান। যাকগে, আমি একটা নাটক লেখার কথা ভাবছি, যেখানে ভালুকের জন্যে। একটা পার্ট থাকবে। কাজেই এই টাকা কটা নিয়ে কেটে পড়ুন।
ভালুকের মালিকের হাতে কটা সোনার মুদ্রা গুঁজে দিল উইল।
লোকটার চোখজোড়া বিস্ফারিত হয়ে গেল। হেসে উঠল সে।
বেশ তো, ওকে নিতে চান নিন না! বলল। তারপর হাঁটা ধরল।
ধন্যবাদ! চেঁচিয়ে বলল উইল। এবার পাকের দিকে ফিরল। আমাদের নতুন অভিনেতাটিকে আস্তাবলে নিয়ে যাও। সবাইকে বোলো কেউ যেন ওকে ভয় না পায়। ভালুকটা ওদের সবার চাইতে শান্ত।
চল আমার সাথে, বলল পাক। ভালুকটাকে এক হাতে জড়িয়ে ধরে গাছের জটলা থেকে বের করে নিয়ে গেল। মঞ্চ ভাল লাগবে তোর, বুড়ো খোকা।
বাই, পাক! বাই, ডন! বলে উঠল জিনা।
পাক মৃদু হেসে হাত নাড়ল। ভালুকটার দৃষ্টি দুমুহূর্ত স্থির হয়ে রইল কিশোর আর জিনার উপর। ওর চোখে কৃতজ্ঞতার ছাপ। এবার টলতে টলতে চলে গেল পাকের সঙ্গে।
ডনকে সাহায্য করার জন্যে ধন্যবাদ, উইল, বলল জিমা। এবং আমাদেরকেও সাহায্য করার জন্যে।
ধন্যবাদ তো আমি তোমাদেরকে দেব, বলল উইল। তোমাদের জন্যেই তো আজকের দিনটা ভালয় ভালয় পার করা গেছে।
আসলে বলতে চাইছেন রাতটা, বলল কিশোর।
ঠিক বলেছ, বলল উইল। ওহ, এই যে তোমার ব্যাগ। তুমি এটার। কথা ভুলে গেছ। কিশোরের হাতে চামড়ার ব্যাগটা তুলে দিল। এবার ওদের স্ক্রল দুটো তুলে ধরল।

তোমরা এগুলো রাখতে পারো, বলল উইল। কিশোরের হাতে তুলে দিতেই ও স্ক্রল দুটো ব্যাগে ঢুকিয়ে রাখল। এখন কোথায় যাবে তোমরা? প্রশ্ন করল উইল।
লণ্ডন ব্রিজের ওপাশে, জানাল জিনা।
ও, তা হলে চলো তোমাদেরকে আমার নৌকায় করে পৌঁছে দিই। এসো।
ধুলোময় এক পথ ধরে ওদেরকে নদীর দিকে নিয়ে চলল উইল। পড়ন্ত বিকেলের আলো গাছ-পালা ভেদ করে তেরছা হয়ে পড়েছে। শীঘ্রিই ওরা টেমস নদীতে ভেড়ানো ছোট্ট এক দাঁড় টানা নৌকা দেখতে পেল।
উঠে পড়ো, বলল উইল।
ওরা তিনজন একে একে নৌকায় চড়ল। উক থেকে নৌকার বাঁধন খুলল উইল। এবার দাঁড় বাইতে লাগল।
আকাশের বেগুনী-গোলাপী রং প্রতিফলিত হচ্ছে নদীর পানিতে। ছোট ছোট ঢেউ। এমুহূর্তে অল্প কটা সাদা রাজহাঁস ভেসে বেড়াচ্ছে নদীর বুকে। আগের মতই দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে নদীটা, কিন্তু কিশোর এবার আর কিছু মনে করল না। ওর সহ্য হয়ে গেছে।
নোটবই আর পেন্সিল বের করল ও।
কী করছ? উইল জিজ্ঞেস করল।
নোটবইতে কিছু স্মৃতি লিখে রাখতে চাই, জানাল কিশোর।
আমি আমার স্মৃতির বইতে তোমাদের দুজনের নামই লিখে রাখব, বলল উইল।
মুচকি হাসল কিশোর।
আমার একটা প্রশ্ন আছে, উইলের উদ্দেশে বলল জিনা। রানী এলিজাবেথের দাঁতগুলো অমন কালো কেন?
অতিরিক্ত চিনি, বলল উইল।
ওঁর নিশ্চয়ই খুব খারাপ লাগে, বলল জিনা।
না, না। রানী জানেনই না তাকে, কেমন দেখায়। গত বিশ বছর ধরে। আয়না দেখেন না তিনি, জানাল উইল।
সত্যি? জিনা অবাক।
হ্যাঁ, বলল উইল। রানী ভান করেন তার বয়স কম এবং তিনি সুন্দরী। ঠিক তুমি যেমন ভান করেছ তুমি ছেলে, আর ভালুকটা যেমন ভান করেছে ও অভিনেতা। আসলে গোটা দুনিয়াটাই একটা রঙ্গমঞ্চ।
কথাটা মনে ধরল কিশোরের। নোটবইতে টুকে নিল।
পাশ কাটানোর সময় লণ্ডন ব্রিজের দিকে মুখ তুলে চাইল কিশোর। সেতব দোকান-পাটগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। নাটকের দর্শকদের ভিড় পাতলা হয়ে আসছে।

ভীতিকর কালো পাখিগুলোকে আর ছাদে দেখা গেল না। মাটিতে নেমে এসে খাবার খুঁটে খাচ্ছে।
প্রদর্শনী শেষ।
ওরা যখন নদী তীরে পৌঁছল তখন আঁধার ঘনাচ্ছে। বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। উইল তার নৌকা বেঁধে রেখে কিশোর আর জিনার সঙ্গে তীরে নামল।
অনেক ধন্যবাদ, কিশোর বলল। বাকি পথটুকু আমরা নিজেরাই যেতে পারব।
তোমরা কোথায় থাকো? উইল জানতে চাইল।
ফ্রগ ক্রীকে, জানাল জিনা।
কোন দিক দিয়ে যাবে? উইলের প্রশ্ন।
শুনলে আপনি বিশ্বাস করবেন না, বলল জিনা। আমরা দড়ির মই বেয়ে এক ট্রী হাউসে উঠব। ট্রী হাউসটা রয়েছে ওই গাছটার উপরে। তারপর একটা বই খুলে ইচ্ছা প্রকাশ করব শুধু, বলল কিশোর। ব্যস, বইয়ে উল্লেখ করা জায়গায় চলে যাব।
উইল মৃদু হাসল।
জীবনটা বড়ই অদ্ভুত, তাই না?
হ্যাঁ! বলল জিনা।
কিশোর মাথা ঝাঁকাল। জীবনের প্রতি উইলের দৃষ্টিভঙ্গি ভাল লাগে ওর।
এক কাজ করো, বলল উইল। তোমরা না হয় এখানে থেকে যাও। গ্লোব থিয়েটারে নাটক করবে। জিনা, আমি রানীকে অনুরোধ করব মেয়েদের নাটক করার বিধি নিষেধ থেকে তোমাকে বাদ দিতে-কারণ তুমি অসম্ভব ভাল অভিনয় করো। আর আমি তোমাদের দুজনকেই নাটক লেখা শিখিয়ে দেব।
সত্যি? একসঙ্গে প্রশ্ন করল কিশোর আর জিনা।
এর চাইতে আনন্দের আর কিছু কিশোরের কল্পনায় এল না। কিন্তু তারপরই চাচা-চাচীর কথা মনে পড়ল।
কিন্তু আমাদের গার্জেনরা–বলল ও।
আমরা তাদেরকে খুব মিস করব, বলল জিনা।
মৃদু হাসল উইল।
বুঝতে পারছি, বলল সে। এবং তাদের জায়গায় আমি হলে আমিও তোমাদেরকে মিস করতাম। বুকে হাত রাখল উইল। শুভ রাত্রি, শুভ রাত্রি। বিচ্ছেদ বড় মধুর বেদনা।
ঠিক বলেছেন, মাথা ঝাঁকিয়ে বলল জিনা।
বিদায়! বলল উইল। হাত নাড়ল।

কিশোর আর জিনা পাল্টা হাত নাড়ল। এবার গোড়ালির উপর ঘুরে গিয়ে নৌকার দিকে পা বাড়াল উইল।
কিশোর আর জিনা দড়ির মইয়ের কাছে এসে ট্রী হাউসে উঠে পড়ল। ভিতরে ঢুকে; জানালা দিয়ে বাইরে চাইল ওরা।
উইল বৈঠা বেয়ে ফিরে যাচ্ছে। সাদা এক রাজহাঁস পানি কেটে ওর নৌকার পাশে পাশে ভেসে চলেছে। আকাশে উঁকি দিচ্ছে রুপোলী চাঁদ।
সে মুহূর্তে, মধুর বেদনা অনুভব করল কিশোর। প্রাচীন, আনন্দময় ইংল্যাণ্ডে আরও কিছু সময় থাকতে পারলে ভাল লাগত, ওর।
দাঁড়ান, উইল! চেঁচিয়ে উঠল কিশোর।
কিন্তু জিনা পেনসিলভেনিয়ার বইটা তুলে নিয়েছে।
আমরা বাড়ি ফিরে যেতে চাই, বলল সে।
বাতাস বইতে শুরু করল।
ঘুরতে লাগল ট্রী হাউস।
বন-বন করে ঘুরছে।
এবার সব কিছু নিথর।
একদম স্থির।
কিশোর চোখ খুলল।
ওদের পরনে এখন আবার আগের সেই পোশাক। ট্রী হাউসের ঘনায়মান আঁধারে জোনাকির ঝিকিমিকি।
জিনা মরগ্যানের চিরকুটটা তুলে নিল। ছড়াটা পুনরাবৃত্তি করল ও:
টু ফাইও আ স্পেশাল ম্যাজিক
ইউ মাস্ট স্টেপ ইনটু দ্য লাইট
অ্যাণ্ড উইদাউট ওয়্যাণ্ড, স্পেল, অর চার্ম
টার্ন ডেটাইম ইনটু নাইট।
আমরা স্পেশাল ম্যাজিকটা খুঁজে পেয়েছি, বলল জিনা। নাটকের জাদু!
হ্যাঁ।
কিশোর ওর ব্যাকপ্যাক খুলল। উইলের দেয়া স্ক্রল দুটো বের করে নিল। ওরা। আনরোল করার পর কিশোর দেখতে পেল উইল কিছু একটা লিখেছে। জোরে জোরে পড়ল সে:
আমাকে সাহায্য করার জন্য তোমাদের
দুজনকে ধন্যবাদ।
তোমাদের বন্ধু
–উইলিয়াম শেক্সপীয়ার

উইলিয়াম শেক্সপীয়ার! সেই বিখ্যাত নাট্যকার! বলে উঠল জিনা। বিস্মিত।
নাম আর চেহারা দেখেই সন্দেহ হয়েছিল, বলল কিশোর। শেক্সপীয়ারের ছবি তো অনেক দেখেছি।
গবেষণার বইটা বের করল ও। ইনডেক্সে শেক্সপীয়ার খুঁজে নিল। একটা পৃষ্ঠা উল্টে জোরে জোরে পড়ল:
উইলিয়াম শেক্সপীয়ার (১৫৬৪-১৬১৬)। তিনি
সাঁইত্রিশটি নাটক এবং অনেক সনেট আর কবিতা
লিখে গেছেন। অনেকে তাকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ
সাহিত্যিকের মর্যাদা দেয়।
সর্বশ্রেষ্ঠ? বলে উঠল জিনা। আমাদের উইল?
উইলিয়াম শেক্সপীয়ারের অটোগ্রাফের দিকে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইল কিশোর।
অ্যাই, আমরা মরগ্যানের নোটের সাথে আমাদের স্ক্রল দুটো রেখে দিতে পারি, বলল জিনা। তা হলে ও জানতে পারবে আমরা বিশেষ এক জাদু খুঁজে পেয়েছিলাম।
স্ক্রল দুটো ওরা মেঝেতে চিরকুটটার পাশে রেখে দিল। এবার দড়ির মই বেয়ে নামতে লাগল।
জঙ্গলের ভিতর দিয়ে হাঁটছে, মৃদুমন্দ বাতাসে কেঁপে উঠল গাছের পাতা। ছায়ারা সরে সরে যাচ্ছে। পাখিরা অলক্ষে কিচিরমিচির করছে।
জাদুর বনটার কথা মনে আছে? চাপা গলায় বলল জিনা। পরী রানী আর পরী রাজার কথা?
কিশোর মৃদু হেসে মাথা ঝাঁকাল।
আর পাক, রাতের বেলা মনের আনন্দে যে ঘুরে বেড়ায়? বলল জিনা। আর উইল, আমাদের উইল।
কিশোর আবারও মাথা ঝাঁকাল।
দারুণ সময় কেটেছে আমাদের, তাই না? প্রশ্ন করল জিনা।
দীর্ঘশ্বাস ফেলল কিশোর।
হ্যাঁ, বলল ও। এবার গভীর শ্বাস টানল। স্পষ্ট উচ্চারণে গলায় আবেগ ঢেলে বলল:
বড় অদ্ভুত এক দৃশ্য দেখেছি আমি।
স্বপ্ন দেখেছি....

তিন গোয়েন্দা ভলিউম ১১৪/২ – ম্যাজিক শো – রকিব হাসান – সেবা প্রকাশনী – প্রথম প্রকাশ : ২০১০

স্টেজ থেকে আট সারি পিছনে বসেছি আমরা–আমি মুসা আমান, আমার মা-বাবা ও আমার খালাত বোন ফারিহা। স্টেজে খেলা দেখাচ্ছে জাদুকর গ্রেট ক্ল্যাণ্ড। বাড়ি আয়ারল্যাণ্ডে। পৃথিবীর নানা দেশ ঘুরে রকি বিচেও খেলা দেখাতে এসেছে। জ্যাকেটের পকেট থেকে একটা রুমাল বের করে ঝাড়া দিল ও। চারটে ঘুঘু পাখি বেরিয়ে উড়ে গেল। একটা পাখি উড়ে এল আমাদের দিকে। রঙিন কাগজের দলা হয়ে টুপ করে ঝরে পড়ল আমার কোলের ওপর।

সত্যিই অবাক করা জাদুর খেলা। ম্যাজিক আমি অনেক দেখেছি। স্কুলের ট্যালেন্ট শোতে আমি নিজেও ছোটখাট ম্যাজিকে অংশ নিয়েছি। কিন্তু গ্রেট ক্ল্যাণ্ডরের কোন তুলনা হয় না।

রকি বিচের প্যাসিফিক থিয়েটার হলে এই ম্যাজিক দেখানোর ব্যবস্থা। করা হয়েছে। থিয়েটার হলের বাইরে দেয়ালে পোস্টার লাগানো হয়েছে : হুডিনির চেয়ে বড় ম্যাজিশিয়ান গ্রেট ক্ল্যাক্স। প্রথমে বিশ্বাস করিনি। এখন ওর খেলা দেখে বুঝলাম, ঠিকই লিখেছে। একের পর এক অসম্ভব অবিশ্বাস্য সব ম্যাজিক দেখিয়ে চলেছে ও।

শূন্য জগ দুধ দিয়ে ভরে ফেলল, সেই দুধ সাদা বল হয়ে ওপরে উঠে। গেল, ছাতে ড্রপ খেতে লাগল। জগ ওপরে তুলে বলটাকে ডেকৈ এনে আবার তাতে ভরল জাদুকর, আবার দুধ হয়ে গেল বলটা।

একটা লম্বা বেলুনকে ফুলিয়ে নিয়ে কাঁচি দিয়ে কেটে ছয় টুকরো করে ছোট ছোট বেলুন বানাল। একটা বেলুনও ফাটল না কিংবা বাতাস বেরোল না। বেলুনগুলো ছুঁড়ে দিল দর্শকদের দিকে। নেয়ার জন্য হুড়াহুড়ি লাগিয়ে দিল ছেলেমেয়েরা।

ফারিহাও একটা টুকরো কুড়িয়ে আনল। ওর হাত থেকে নিয়ে ভাল করে দেখলাম বেলুনটা। স্বাভাবিক বেলুন। কোথাও কোন ফাঁকিবাজি ধরতে পারলাম না। বাবাও দেখে অবাক হয়ে মাথা নাড়ছে। আমার মতই তারও ম্যাজিকে আগ্রহ আছে। এসব কাণ্ড কীভাবে করছে ক্ল্যাণ্ডর, বুঝতেই পারলাম না। উত্তেজনায়, আনন্দে পাগল হয়ে গেছে যেন মুগ্ধ দর্শকরা।

তাই ছোটদের মধ্য থেকে যখন একজন ভলান্টিয়ার চাইল ক্ল্যাণ্ড, জাদুর খেলায় ওকে সহযোগিতা করার জন্য, চতুর্দিক থেকে অসংখ্য হাত উঠে গেল। ওপরে, আমারটা সহ। কয়েকটা ছেলেমেয়ে তো চেয়ারে দাঁড়িয়ে হাত নাড়তে লাগল, ক্ল্যাণ্ডরের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য। কিন্তু অন্য কারও দিকে তাকাল না ও। শুরু থেকেই আমাদের ওপর নজর ছিল।

ওই ছোট্ট মেয়েটা হলে কেমন হয়, লাল টি-শার্ট পরা? ফারিহাকে দেখিয়ে বলল ও। এই মেয়ে, কী নাম তোমার?
ফারিহা, বোনের হয়ে জবাব দিলাম আমি।
হ্যাঁ, ফারিহা, স্টেজে আসবে, আমাকে সাহায্য করার জন্য? জাদুকর ডাকল।
আমি হাত তুলেছিলাম, ফারিহা তোলেনি, কিন্তু ডাক পড়ল ওরই। যেতে চাইল না ও। চেয়ারে গুটিয়ে গেল।
যাও না, অসুবিধে কী? আমি বললাম। পায়রা, টিয়া, কিছু একটা বানিয়ে দেবে। কুকুরও বানাতে পারে। তবে তাতে কোন অসুবিধে নেই। বাড়ি নিয়ে গিয়ে জেমির সঙ্গে রেখে দেব।
মুসা ভাইয়া, তুমি চুপ করবে! রেগে উঠল ফারিহা। চেয়ারে আরও নিচু করে ফেলল শরীরটা।
আপনারা কি বলেন লেডিজ অ্যাণ্ড জেন্টলম্যান? হাসিমুখে দর্শকদের জিজ্ঞেস করল জাদুকর। ছোট্ট ওই মিষ্টি মেয়েটাকে স্টেজে এনে বাতাসে উড়িয়ে দিলে কেমন হয়?
শুরু হলো চিৎকার-চেঁচামেচি। সবাই অনুরোধ করছে ফারিহাকে। বাবা ওর হাত ধরে টেনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলল, আরে যাও না, ও তোমাকে খেয়ে ফেলবে না। গিয়ে দেখো, মজা পাবে। তোমাকে যে ডেকেছে, এটাই তো তোমার ভাগ্য।
অনিচ্ছাসত্ত্বেও সিঁড়ি বেয়ে স্টেজে উঠে গেল ফারিহা। জাদুকরের মুখোমুখি দাঁড়াল।
ফারিহা, দাঁড়িয়ে থাকো, কোন ভয় নেই! চেঁচিয়ে সাহস দিলাম ওকে।
হাত তুলে দর্শকদের চুপ করতে অনুরোধ করল গ্রেট ক্ল্যাণ্ডর। আমি এই ছোট্ট মেয়েটাকে সবার চোখের সামনে গায়েব করে দেব।
আতঙ্কিত হয়ে পড়ল ফারিহা। স্টেজ থেকে দৌড়ে পালাতে চাইল। ধরে ফেলল ক্ল্যাণ্ডর। হেসে উঠল কিছু খুদে দর্শক।
চিন্তার কিছু নেই, আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল জাদুকর। এই মেয়েটার যদি কিছু হয়ে যায়, একই রকম নতুন আরেকটা মেয়ে এনে দেব আপনাদেরকে।
আবার হাসি।
ঘুরে দাঁড়াল গ্রেট ক্ল্যাণ্ডর। ওর পিছনে বড় একটা কাঠের আলমারি রাখা। লাল রঙ করা। সারা গায়ে সোনালি রঙে নানা ধরনের সাঙ্কেতিক চিহ্ন আঁকা। আলমারিটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দর্শকদের দেখাল জাদুকর। কোথাও কোন। ফাঁকফোকর নেই। গায়ে চাপড় দিয়ে বোঝাল, নিরেট কাঠের তৈরি। আলমারির দরজা খুলল ও। ভিতরে কালো রঙ করা।
ফারিহার দিকে তাকাল ক্ল্যাণ্ডর। অন্ধকারকে তো ভয় পাও না তুমি, তাই না?

চোখ বড় বড় হয়ে গেল ফারিহার। না, পাই। গলা কাঁপছে ওর।
ঠিক আছে, আলোর ব্যবস্থা করছি। আস্তিন ঝুঁকি দিল জাদুকর। পরক্ষণে হাতের মুঠোয় দেখা গেল একটা টর্চ। ফারিহার হাতে দিয়ে বলল, নাও।
টর্চটা নিল ফারিহা। হাতটা কাঁপছে, পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। ভীষণ ভয় পেয়েছে ও। মনে হচ্ছে, টর্চটা ফেলে দেবে হাত থেকে।
ফারিহার হাত ধরে আলমারির কাছে নিয়ে চলল জাদুকর। গায়েব। হওয়ার আগে কাউকে কিছু বলার আছে তোমার? গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞেস করল। ও। ভয়ে ভয়ে মাথা নাড়ল ফারিহা। আলমারির ভিতর ওকে ঠেলে দিল ক্ল্যাণ্ডর। দরজা লাগাল না।
আমি ভাবছি, আলমারির তলায় নিশ্চয় কোনও চোরা দরজা আছে, ট্র্যাপ, ডোরের মত কিছু, ক্ল্যাণ্ডর বাইরের দরজাটা বন্ধ করলেই ওই দরজা খুলে নীচ থেকে ফারিহাকে টেনে নেবে জাদুকরের সহকারী। আমার মনের কথা পড়তে পেরেই যেন একপাশে সরে দাঁড়াল ক্ল্যাণ্ডর। আলমারির দিকে হাত তুলে। আদেশ দিল, ওপরে! কেঁপে উঠল আলমারিটা। দুলতে দুলতে ওপরে। উঠতে শুরু করল। তিন-চার ফুট উঠে থেমে গেল। ভিতরে দাঁড়িয়ে আছে। ফারিহা। আমাদের দিকে চোখ। আতঙ্কে জমে গেছে যেন। দরজার দিকে হাত তুলে ইশারা করল ক্ল্যাণ্ডর। দড়াম করে লেগে গেল দরজার পাল্লা। ভীষণভাবে দুলতে শুরু করল আলমারিটা। দরজার ফাঁক থেকে ধোঁয়ার মত কী যেন বেরোচ্ছে। প্রায় ঢেকে ফেলল দরজাটাকে। তারপর হঠাৎ করেই আবার খুলে গেল পাল্লা। আলমারির ভিতর ফারিহা নেই।
ফারিহার ফিরে আসার অপেক্ষায় রইলাম। খানিকটা ভানভণিতা করে এখুনি হয়তো ফিরিয়ে নিয়ে আসবে ওকে ক্ল্যাণ্ড, জাদুকররা সাধারণত যা করে থাকে। কিন্তু ও সেটা করল না। ফারিহার কথা যেন বেমালুম ভুলে গিয়ে অন্য খেলায় মন দিল। ভিতরে ভিতরে উদ্বিগ্ন হলাম। কোথায় পাঠাল ফারিহাকে? স্টেজের নীচে? ও কি ভয় পাচ্ছে? মাত্র সাত বছর বয়েস ওর অন্ধকারে একা ফেলে রেখেছে? টর্চটার কথা ভেবে খানিকটা ভরসা পেলাম। একেবারে অন্ধকারে থাকতে হবে না ওকে। : শো শেষ হয়ে আসছে। এর মধ্যে একটিবারের জন্য ফারিহার কথা উল্লেখও করেনি জাদুকর। সমস্ত খেলা শেষ করে আবার আলমারির দিকে এগোল ও। বিড়বিড় করে কী সব বলল। তারপর দরজা খুলল।
ভিতরে কেউ নেই। এমন ভঙ্গি করতে লাগল জাদুকর, যেন কোথায় কী একটা মস্ত ভুল হয়ে গেছে। জাদুকরদের এসব অভিনয়ের কথা আমার জানা আছে।
হাত তুলে আবার আদেশ দিল আলমারিটাকে, ওপরে!

লেগে গেল দরজার পাল্লা। কাঁপতে কাঁপতে ওপরে উঠতে লাগল আলমারিটা। তিন-চার ফুট ওপরে উঠে স্থির হলো। ধোঁয়া বেরোতে শুরু করল। আবার ঝটকা দিয়ে খুলে গেল পাল্লা। দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম আমার ছোট বোনটাকে। হাতে জ্বলন্ত টর্চ। ওকে ঘিরে পাক খাচ্ছে ঘন ধোঁয়া। দর্শকদের উন্মত্ত হাততালিতে কানে তালা লাগার জোগাড় হলো।

ক্ল্যাণ্ডর আদেশ দিতেই আপনাআপনি স্টেজে নামল আলমারিটা। হাত বাড়াল ও। এবার নির্দ্বিধায় ওর হাত ধরল ফারিহা। আলমারি থেকে বেরিয়ে এল। ভয় পাচ্ছে না এখন আর। জাদুকরের দিকে তাকিয়ে হাসল বলেও মনে হলো। ক্ল্যাণ্ডরের ঠোঁট নড়তে দেখলাম। কী যেন বলছে ওকে। কিন্তু দর্শকদের হই-চইয়ে কী বলল কিছুই শুনতে পেলাম না।

জাদুকরের হাতে টর্চটা ফিরিয়ে দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে স্টেজ থেকে নেমে এল ফারিহা। সিটের সারির মাঝখান দিয়ে এগিয়ে আসতে দেখছি ওকে। সবাই ওর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কিন্তু কারও দিকে তাকাচ্ছে না ও। মাথা নিচু করে এগোচ্ছে। সিটের নম্বর গুনতে গুনতে আসছে, যেন ভুলে গেছে কোন সিটটায় বসেছিল। অবাক হলাম। জাদুর খেলা খেলতে গিয়ে মাথাটা গুলিয়ে গেল নাকি ওর!

আমাদের কাছে পৌঁছে মুখ তুলে তাকাল ও। বসবে কি না, দ্বিধা করছে। আমি বললাম, কী হলো? চিনতে পারছ না? বোসো।

চুপচাপ বসে পড়ল ফারিহা। আমাদের সঙ্গে কথা বলল না। ক্ল্যাণ্ডরের দিকে তাকিয়ে আছে।

বাউ করছে তখন জাদুকর। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, লেডিস অ্যাণ্ড জেন্টেলম্যান। আজ রাতের শো এখানেই শেষ।

উঠে দাঁড়াল দর্শকরা। জাদুকরের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করছে সবাই। ও যে কতবড় ম্যাজিশিয়ান বার বার বলছে সেকথা। কয়েকবার বাউ করার ভঙ্গিতে মাথা নোয়াল ক্ল্যাণ্ডর, হাত তুলে দর্শকদের শান্ত হতে বলল, যেন জরুরি কিছু বলতে চায়। হাততালি বন্ধ হলো। হট্টগোল থামল। ঘরে পিনপতন নীরবতা। গলা লম্বা করে সবাই সামনে মুখ বাড়িয়ে দিয়েছে, জাদুকর কী বলে শোনার জন্য। কিন্তু কথা না বলে হঠাৎ দুই আঙুলে তুড়ি বাজাল জাদুকর, চোখের পলকে আলোর ঝিলিকের মত অদৃশ্য হয়ে গেল। স্টেজ থেকে। একটা মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল সবাই। তারপর সম্বিত ফিরে পেয়ে যেন হাততালি আর চিৎকারে ফেটে পড়ল। আর সবার মতই আমিও হতবাক। এ রকম আশ্চর্য ম্যাজিক আর কখনও দেখিনি।

তালি দিতে দিতে হাত ব্যথা করে ফেলেছি। ফারিহার দিকে তাকালাম। হাততালি দিচ্ছে না। চোখে অদ্ভুত শূন্য দৃষ্টি। কোন উত্তেজনা নেই চেহারায়। এ যেন আমার বোন নয়, অন্য এক ফারিহাকে দেখছি!

.
গাড়িতে করে বাড়ি ফিরছি। বাবা গাড়ি চালাচ্ছে। পাশে প্যাসেঞ্জার সিটে মা বসেছে। পিছনের সিটে বসেছি আমি ও ফারিহা। জাদুকর ওকে কীভাবে গায়েব করেছিল, জানার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছি আমি। নানা কথা জিজ্ঞেস করতে লাগলাম : কীভাবে ওকে গায়েব করল ক্ল্যাণ্ড, স্টেজ থেকে নিয়ে গিয়ে কোথায় রেখেছিল ওকে, ভয় পেয়েছিল কি না? কিন্তু আমার একটা প্রশ্নেরও জবাব দিল না ও। সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে আছে, সেই একই রকম ভাবলেশহীন চেহারা, চোখে শূন্য দৃষ্টি। যে ফারিহার বকবকানির ঠেলায় একেক সময় পাগল হওয়ার জোগাড় হয় আমার, তাকে এ রকম চুপ করে থাকতে দেখে ভীষণ অবাক লাগছে আমার।
মা! আর সহ্য করতে না পেরে বললাম, ফারিহা কিন্তু অদ্ভুত আচরণ করছে!
ফিরে তাকিয়ে হেসে মা বলল, আসলে তোমাকে খেপাচ্ছে। এখুনি হেসে উঠবে, দেখো। আবার বকবক শুরু করবে।
কিন্তু অনেকক্ষণ পেরিয়ে গেল। হাসল না ফারিহা। কথাও বলল না। একভাবে বসে থেকে শূন্য দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে রইল।
না, কিছু বুঝতে পারছি না! বোধহয় আমাকে যন্ত্রণা দেয়ার জন্যই এ রকম করছে ও। ওর জ্বালাতন করার কৌশলগুলো অদ্ভুত। কখনও আমার ঘরে ঢুকে অকারণেই মুখ ভেঙচায়। রাগের চোটে একেক সময় মনে হয় জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিই। কখনও বা আমি যখন হোমওঅর্কে ব্যস্ত, দরজায় এসে দাঁড়িয়ে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে আমার দিকে, কোন কথা বলে না, আমার ওপর থেকে চোখ সরায় না। ওর ভঙ্গিতে রাগ হতে থাকে আমার। স্নায়ুর ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি হয়। ধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে বের করে দিয়ে মুখের ওপর দরজা লাগিয়ে দিই। মিনিট দশেক পরে ও চলে গেছে। ভেবে আবার যখন খুলি, দেখি একই ভঙ্গিতে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ও, সেই একই রকম বিরক্তিকর ভঙ্গিতে চুপচাপ আমার দিকে তাকিয়ে। আজ আমাকে খেপানোর আরেকটা নতুন ভোল ধরেছে, ভাবলাম।
জাদুকর যদি তোমাকে ফিরিয়ে না আনলেই ভাল করত! রেগেমেগে বললাম।
অকারণে ওকে ধমকাচ্ছ কেন? রেগে গেল মা। চুপ করে আছে, থাক। হয়তো ক্লান্তি লাগছে।
চুপ হয়ে গেলাম।
এতক্ষণে আমার আমার দিকে ফিরে হাসল ফারিহা, মা আমাকে ধমকানোতে বোধহয় আনন্দ পেয়েছে। কেমন ভূতুড়ে লাগল হাসিটা। গা ছমছম করে উঠল আমার। অবাক কাণ্ড! ওর হাসি দেখে আগে তো কখনও এমন হয়নি আমার!

পরদিন আরও বেশি অদ্ভুত আচরণ করল ফারিহা। রোবটের মত একঘেয়ে যান্ত্রিক স্বরে কথা বলে। ঘরের কোন কিছুই যেন চিনতে পারে না। যেন অপরিচিত একটা বাড়িতে ঢুকেছে। ড্রেসারের ওপর রাখা একটা পুতুল হাতে নিয়ে এমনভাবে তাকিয়ে রইল, যেন জীবনেও দেখেনি ওটা।
নাস্তার সময় দুই বাটি সজি খেয়ে ফেলল, যে জিনিস অন্যদিন বকাবকি করেও, মুখে দেয়াতে পারে না ওকে মা। স্কুলে গিয়ে ওর বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলল না, যেন ওদের চিনতে পারছে না। স্কুল ছুটির পর বাড়ি ফিরে টিভিতে ওর সবচেয়ে প্রিয় সিরিয়ালটা দেখতে বসে এমন বিরক্তি প্রকাশ করতে লাগল, যেন এরচেয়ে বাজে নাটক আর হয় না। নাটকের কুকুরটার ভাড়ামি দেখে হাসল না, বরং চোখমুখ কুঁচকে রাখল। খাবার টেবিলে বাবার। রসিকতায় কান দিল না, নিজের প্লেটের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ খেয়ে চলল।
ডিনারের পর লিভিং রুমের মেঝেতে উপুড় হয়ে শুয়ে রং-তুলি নিয়ে ছবি আঁকতে লাগল। বাবা তখন টিভিতে খবর দেখছে। দুজনের কেউ আমার দিকে তাকাল না। একটা মুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে ফারিহার ছবি আঁকা দেখলাম। কোথায় যেন কী একটা অস্বাভাবিক লাগছে আমার কাছে। হঠাৎ বুঝে ফেললাম।
আরে! বললাম আমি, ডান হাতে আঁকা শুরু করলে কবে থেকে?
আমার দিকে মুখ তুলে শূন্য দৃষ্টিতে তাকাল ও।
তুমি না বাইয়া? আবার বললাম। ডান হাতে আঁকছ কী করে? হলোটা কী তোমার?
নির্বিকার ভঙ্গিতে হাতের তুলিটার দিকে তাকাল ফারিহা। আবার ছবি আঁকায় মন দিল।
গা ছমছম করে উঠল আমার। ফারিহার আচরণ মোটেও স্বাভাবিক লাগছে না। বাবার দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করলাম, বাবাও ব্যাপারটা লক্ষ করেছে কি না; কিন্তু বাবার মনোযোগ টিভির দিকে।
রান্নাঘরে এলাম। টেবিলে বসে বাজার করতে কত খরচ হয়েছে, হিসেব করছে মা। মা, আজ ফারিহার কী হয়েছে, বলো তো? খালি উল্টোপাল্টা কাজ করছে। নাকি আমারই মাথা খারাপ হয়ে গেল!
মুখ তুলে তাকাল মা। কেন, কী হয়েছে?
ডান হাতে ছবি আঁকছে ও, আমি বললাম। ও যে বাইয়া, ভুলেই গেছে। যেন। সারাটা দিন রোবটের মত কথা বলল। খেয়াল করনি?
ছোটরা এ রকম উল্টোপাল্টা কাণ্ড করেই থাকে, তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। আবার হিসেবে মন দিল মা।
কিন্তু এটা উল্টোপাল্টা নয়, রীতিমত উদ্ভট। ওর সামনে গেলেই আমার। গা ছমছম করে।

মুখ তুলে তাকিয়ে বিরক্ত ভঙ্গিতে হাতের কলমটা টেবিলে রেখে দিল মা।
মুসা, ওর বয়েসে তুমি কি করেছ জানো? পুরো একটা সপ্তা কুকুর সেজে থেকেছ। শেষে কুকুরের ঘরে গিয়ে টুটুর সঙ্গে ঘুমোতে চেয়েছ।
লজ্জা পেলাম। বললাম, তখন তো পিচ্চি ছিলাম আমি!
সেজন্যই বলছি, হাসল মা। ছোটরা এ রকম উল্টোপাল্টা কাণ্ড করেই থাকে, তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই!
কিন্তু এখন মার এই কথাটা মানতে পারলাম না আমি, অন্তত ফারিহার ব্যাপারে।

.

সেদিন রাত দুটোয় হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল আমার। পিপাসা পেয়েছে। পানি খেতে উঠলাম। ঘর থেকে বেরিয়ে দোতলার বারান্দা ধরে এগোলাম। পুরো বাড়িটাই নীরব হয়ে আছে। ।
এক গ্লাস পানি খেয়ে, আবার পিপাসা পেলে খাওয়ার জন্য আরেক গ্লাস পানি হাতে ওপরে উঠলাম। আমার পাশের ঘরটা ফারিহার। ওটার পাশ কাটানোর সময় হঠাৎ পায়ে ঠাণ্ডা বাতাস লাগল। দরজার নীচের ফাঁক দিয়ে আসছে।
নভেম্বর মাস। রাতে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়ে। বাতাস আসছে, তারমানে জানালা খুলে রেখেছে ফারিহা। এই শীতের মধ্যে জানালা খুলে ঘুমাচ্ছে! অবাক লাগল আমার। গরমকালেও জানালা খুলে শুতে ভয় পায় ও। অথচ এই শীতের মধ্যে…তারমানে, আরেকটা অস্বাভাবিক কাণ্ড করছে ও!
দরজার নব চেপে ধরে আস্তে মোচড় দিলাম। শব্দ করে ওর ঘুম ভাঙাতে চাইলাম না। ধীরে ঠেলে পাল্লা খুলে নিঃশব্দে ঘরে ঢুকলাম। ঠিকই অনুমান করেছি। জানালা খোলা। এক ঝলক জোরালো বাতাস পর্দা দোলাল। গরম কাপড় গায়ে দিয়ে আসিনি। শীতে কেঁপে উঠলাম। হাতের গ্লাসটা ড্রেসারের ওপর রেখে এগিয়ে গিয়ে জানালার পাল্লা লাগালাম। কাঁচের শার্সির ভিতর দিয়ে বড় মেইপল গাছটাকে চাঁদের আলোয় ভূতুড়ে দেখাচ্ছে। পর্দাগুলোও টেনে দিলাম ভালমত।
ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজার কাছে ফিরে যাব, এ সময় ফারিহার বিছানার দিকে। চোখ পড়ল। শূন্য বিছানা। ফারিহা নেই। ওর বেডক্লথগুলোও নেই। খোলা গদিটা দেখা যাচ্ছে। বালিশটার কভার নেই।
দৌড়ে সুইচবোর্ডের কাছে এসে সুইচ টিপে আলো জ্বেলে ঘরের ভিতর খুঁজলাম। বাথরুমে গেছে কি না দেখার জন্য দরজা ধাক্কা দিলাম। পাল্লা খোলা। ভিতরে কেউ নেই।
ঘাবড়ে গেলাম। কেউ ওকে কিডন্যাপ করল না তো! জানালার কাছে। এসে আবার পাল্লা খুললাম। জানালা দিয়ে মাথা বের করে আঙিনাটা দেখলাম। কেউ নেই। কিছুদূরে রাস্তা থেকে কুকুরের ডাক শোনা গেল। নীচে তাকালাম। জানালার

চৌকাঠে পড়া বালিতে দুটো ছোট পায়ের ছাপ চোখে পড়ল। আঙুলগুলো বাইরের দিকে ফেরানো। জানালার কাছের মেইপল
গাছটার দিকে মুখ করে চৌকাঠে দাঁড়িয়ে ছিল কেউ। ফারিহা ছাড়া আর কেউ না, পায়ের ছাপই বলে দিচ্ছে।
ঘরের আলোয় আরেকটা জিনিস দেখতে পেলাম। মেইপল গাছের ডালে বাঁধা একটা সাদা চাদর। অন্ধকারে বাতাসে দোল খাচ্ছে চাদরটা।
জানালার পাল্লা দুটো আবার বন্ধ করলাম। আলো নিভিয়ে বেরিয়ে এলাম ফারিহার ঘর থেকে। দৌড়ে ফিরে এলাম নিজের ঘরে। তাক থেকে টর্চটা নিলাম। জানালা খুলে মাথা বের করে দিলাম ঠাণ্ডা বাতাসে। আলো ফেললাম মেইপল গাছের ডালে বাঁধা চাদরটায়। প্রথম চাদরের এক কোণায় আরেকুটা। চাদর বাঁধা। দ্বিতীয় চাদরটার নীচে একইভাবে গিট দেয়া একটা কম্বল। সামনের লনের প্রায় ঘাস ছুঁয়েছে কম্বলের নীচের কোণা।
স্তব্ধ হয়ে গেছি। রাত দুপুরে এভাবে চাদর আর কম্বল বেঁধে দড়ির মত বেয়ে বেরিয়ে যাবে, বিশ্বাস করতেও কষ্ট হচ্ছে। এত সাহস ও কোথায় পেল? বিছানার কিনারে বসে ভাবতে লাগলাম। কী করা যায়? মাকে ডাকব?
দরজার দিকে এগোলাম। অর্ধেকটা পেরিয়েছি, এ সময় বাইরে একটা মচমচ শব্দ কানে এল। জানালার দিকে ফিরলাম। গাছের ডালপাতাগুলোকে ওপরে-নীচে দুলতে দেখলাম চাঁদের আলোয়। ঝকি খাচ্ছে। নিঃশব্দে জানালার কাছে ফিরে এসে নীচে উঁকি দিলাম। একেবারে সময়মত পৌঁছেছি। চাদর বেয়ে উঠে এসে জানালার চৌকাঠে পা রাখছে তখন ফারিহা!
একটা মুহূর্ত চৌকাঠে দাঁড়িয়ে রইল ও। এত বেশি গরম কাপড় পরেছে, একটা পুঁটুলির মত লাগছে ওকে। দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে প্রথমে একটা দস্তানা খুলে হাতে নিল, তারপর আরেকটা খুলল। দস্তানা দুটো ঘরের ভিতর ছুঁড়ে ফেলে ডালে বাঁধা চাদরের গিট খুলতে শুরু করল। কোনরকম উত্তেজনা কিংবা তাড়াহুড়া নেই ওর মাঝে, পুরোপুরি শান্ত। অথচ মাটি থেকে প্রায় বিশ ফুট ওপরে রয়েছে। চাঁদরুটা খুলে নিয়ে ভিতরে লাফিয়ে পড়ল ও। ভালমত দেখার জন্য আরও খানিকটা মুখ বাড়ালাম জানালার বাইরে। চাদরের কোণা ধরে টেনে দ্বিতীয় চাদর ও কম্বলটা ভিতরে নিয়ে গেল ফারিহা। পাল্লা লাগানোর শব্দ শুনলাম।
যতটা সম্ভব শব্দ না করে আমার জানালার পাল্লা লাগালাম। নিজের বিছানায় শুয়ে চোখ বুজে ভাবতে লাগলাম, যা দেখলাম সত্যি দেখলাম? নাকি স্বপ্ন!
আবার যখন চোখ মেলোম, জানালা দিয়ে রোদ ঢুকছে ঘরে। সকাল। হয়ে গেছে। মনে পড়ল, গতরাতের কথা। নাহ, এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না। নিশ্চয় স্বপ্ন দেখেছি। ফারিহাকে যা করতে দেখেছি, সেটা কেবল স্বপ্নেই সম্ভব, বাস্তবে নয়।

নাস্তা খেতে নীচে নামলাম। ফারিহা আগেই উঠে পড়েছে। চুপচাপ টেবিলে বসে খাচ্ছে। খেতে খেতে আড়চোখে ওর দিকে তাকাচ্ছি। ভেবে পাচ্ছি না, হঠাৎ করেই আমার ছোট্ট বোনটি এতটা দুঃসাহসী হয়ে উঠল কী করে? আর এতটা বদলেই বা গেল কেন? কেন ওর দিকে তাকালে আমার গা ছমছম করে?
রান্নাঘরে ঢুকল মা। উদ্বিগ্ন লাগছে মাকে। ফারিহাকে জিজ্ঞেস করল, আমার গহনায় হাত দিয়েছ আবার? ওগুলো নিয়ে খেলেছ?
নীরবে খেয়ে যাচ্ছে ফারিহা। জবাবও দিল না, মুখও তুলল না।
এই মেয়ে, আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন করেছি, মা বলল। আমার কিছু গহনা খুঁজে পাচ্ছি না। ওগুলো পরে খেলেছিলে তুমি?
দরজায় এসে দাঁড়াল বাবা। মা আর ফারিহার দিকে তাকিয়ে আছে। এক হাতে বাবার ক্যামেরাটা, আরেক হাতে ফিল্মের একটা রোল।
না, ম্যাডাম, মুখ না তুলে জবাব দিল ফারিহা।
পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল মা আর বাবা।
কী হয়েছে, ফারিহা? ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বাবা জিজ্ঞেস করল। ক্যামেরা আর ফিল্মটা রাখল টেবিলে। তুমি এমন করছ কেন? খালাকে ম্যাডাম ডাকছ। অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে কথা বলছ। কোনও সমস্যা হয়ে থাকলে আমাদের বলতে পারো।
কিছু হয়নি, জবাব দিল ফারিহা।
আবার বাবার দিকে তাকাল মা। নীরবে কাঁধ ঝাঁকাল বাবা। ফিল্মটা তুলে নিয়ে বলল, আমি কাজে বেরোচ্ছি। দোকান থেকে কিছু আনতে হবে?
বাবার সঙ্গে লিভিং রুম থেকে বেরিয়ে গেল মা। ফারিহার দিকে তাকালাম আমি। বাবার ক্যামেরটার দিকে চেয়ে আছে ও।
খাওয়া শেষ করে খাবারের এঁটো প্লেট আর বাটি নিয়ে সিংকে চলে এলাম। ধোঁয়া শেষ করে ফিরে তাকিয়ে দেখি, ফারিহা নেই। নেই টেবিলে রাখা বাবার ক্যামেরাটাও।
স্কুলে যাবার সময় হয়েছে। বাস আসবে যে কোন সময়। তৈরি হতে হবে। আমাকে। দৌড়ে ওপরতলায় উঠে নিজের ঘরে ঢুকলাম। কাপড় বদলে ব্যাকপ্যাকটা বাধলাম পিঠে। বারান্দায় বেরিয়ে দেখি, ফারিহার ঘরের দরজাটা খোলা। দরজার কাছে এসে ভিতরে উঁকি দিলাম। বিছানাটা সুন্দর করে গোছানো। বোঝাই যায় না, এই বিছানা থেকে চাদর আর কম্বল তুলে গাছের ডালে বেঁধে নেমে গিয়েছিল ও। নাহ, স্বপ্নই দেখেছি আমি! পা বাড়াতে যাব, এ সময় এমন একটা জিনিস চোখে পড়ল, চমকে উঠলাম।

ফারিহার ড্রেসারের ওপর রাখা পানি ভর্তি একটা গ্লাস। আমিই রেখেছি। পরে ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সময় অতিরিক্ত উত্তেজনায় নিতে ভুলে গেছি। এই গ্লাসটা প্রমাণ করছে, কাল রাতে যা দেখেছি, সত্যি দেখেছি, স্বপ্ন ছিল না!

সেদিন স্কুল থেকে ফিরে, আমার ছিপের এক বাণ্ডিল সুতো খুঁজে বের করলাম। নাইলনের সুতো, খুব শক্ত। ফারিহা নীচতলায় টেলিভিশনে কার্টুন দেখছে। এটাই সুযোগ। নিঃশব্দে ওর ঘরে ঢুকে জানালার হুড়কোর সঙ্গে সুতোর এক মাথা বাঁধলাম। বাণ্ডিলটা আমার জানালার কাছে মেইপল গাছের একটা ডালের ওপর ছুঁড়ে দিলাম। খানিকটা সুতো খুলে গিয়ে বাণ্ডিলের বাকি অংশটা ডালে ঝুলে রইল। পাল্লা লাগালাম। আমার শোবার ঘরে এসে জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে সুতোর বাণ্ডিলটা টেনে আনলাম ঘরের ভিতর।

একটা টিনের মগে আমার সমস্ত পেন্সিল আর কলম রাখি। সেগুলো ডেস্কের ওপর ঢেলে দিয়ে শূন্য মগটা এনে রাখলাম ড্রেসারের কিনারে। সুতোর আরেক মাথা বেঁধে দিলাম মগের হাতলে। মগের ওপর একটা বই রেখে তার ওপর রাখলাম একটা খালি কোকের টিন।

ফারিহার ঘরের জানালাটা এখন খুললেই সুতোয় টান পড়বে, মগে টান লেগে ওপরে রাখা সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে মাটিতে পড়বে ওটা। শব্দ হবে। তাতে আমার ঘুম ভেঙে যাবে। রাতে আমার অজান্তে ঘর থেকে বেরোতে পারবে না ও।

ভীষণ ঠাণ্ডার মধ্যেও সুতোটার কারণে সেরাতে আমার জানালাটা খোলা রাখতে হলো। বাইরে বেরোনোর কাপড় পরে শুলাম

জিনসের প্যান্ট, জ্যাকেট, পায়ে হাইকিং বুট। মাথায় একটা মাংকি ক্যাপও পরেছি, কানের ওপর টেনে দিয়েছি, যাতে গরম থাকে কান। পকেটে টর্চ লাইট তো নিয়েছিই, বাড়তি ব্যাটারিও নিয়েছি। ফারিহা, এত রাতে বাইরে গিয়ে কী করে, দেখতেই হবে আমাকে।

ঘুমানোর চেষ্টা করলাম। ঠাণ্ডা আর উত্তেজনাও ঘুম ঠেকাতে পারল না। ঘুমের মধ্যে দুঃস্বপ্ন দেখতে লাগলাম। একটা পাগলা কুকুর আমাকে তাড়া করে যখন প্রায় ধরে ফেলেছে, ঠিক তখনই প্রচণ্ড শব্দে চোখ মেলোম। প্রথমে কোথায় আছি, কী করছি, কিছু বুঝতে পারলাম না। তারপর মনে পড়ল টিনের মগটার কথা। ঘুমের মধ্যে ওটা পড়ার শব্দ শুনেছি।

লাফ দিয়ে বিছানা থেকে উঠে দৌড়ে গেলাম জানালার কাছে। মুখ বের করে বাইরে উঁকি দিলাম। গাছের ডালে দ্বিতীয় চাদরটা বাধা শেষ করেছে তখন ফারিহা।

পা টিপে টিপে চলে এলাম নীচতলায়। সামনের দরজার ছিটকানি খুলে পাল্লা ফাঁক করলাম কয়েক ইঞ্চি। লনের ঘাসের ওপর ঝুলতে দেখছি ফারিহার কম্বলের

কোণা। ওটা বেয়ে মাটিতে লাফিয়ে নামল ও। দাঁতে কামড়ে ধরে রেখেছে ওর বালিশের কভারটা। ভারি কোন জিনিস রয়েছে। ওটার ভিতরে। মাটিতে নেমে কভারটা দাঁত থেকে হাতে নিয়ে কাঁধে ঝুলিয়ে রওনা হলো রাস্তার দিকে।
আস্তে করে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে নিঃশব্দে ওর পিছু নিলাম। অসম্ভব জোরে হাঁটছে ও। ওর সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে রীতিমত দৌড়াতে হলো আমাকে। এত শক্তি কোথায় পেল ও, বুঝলাম না।
চাঁদের আলোয় অনুসরণ করে চলেছি ওকে। চলেছে তো চলেছেই ও, থামার নাম নেই। একটুক্ষণের জন্য গতি কমাচ্ছে না। ঠাণ্ডার মধ্যেও ঘেমে নেয়ে গেছি আমি। হাঁপাচ্ছি। অথচ ওর যেন কিছুই হচ্ছে না।
শহরের প্রান্তে চলে এসেছি, এ সময় একটা ছেলেকে দেখলাম। বয়েস ফারিহার সমানই হবে। হাতে একটা বাজারের থলে। ভিতরের জিনিসগুলো বেশ ভারি, বহন করার ভঙ্গি দেখেই বোঝা যাচ্ছে। একই দিকে চলেছে। দুজনে, রাস্তার দুই পাশ ধরে। কেউ কারও দিকে তাকাচ্ছে না। দুজনেই চুপচাপ হেঁটে চলেছে যেন ঘোরের মধ্যে, নজর সামনের দিকে।
শহরের কিনারে এসে মূল রাস্তা থেকে আরেকটা সরু রাস্তা ঘুরে বনে ঢুকে গেছে। মোড় নিয়ে সেই রাস্তায় নেমে বনে ঢুকল দুজনে। আমিও ঢুকলাম। রাস্তার বাতি নেই এখানে। তবে চাঁদের আলো আছে। সেই আলোয় পাতাগুলো ভেজা ভেজা দেখাচ্ছে। বনতলে অন্ধকার।
গা ছমছম করছে আমার।
গাছপালার ফাঁকফোকর দিয়ে এগিয়ে চলেছে ছেলেমেয়ে দুটো। ওদের পিছু নিয়ে যতটা সম্ভব নিঃশব্দে হাঁটার চেষ্টা করছি আমি। অন্ধকারে গতি বাড়াতে পারছি না। টর্চ জ্বাললে ফারিহা ও ছেলেটার চোখে পড়ে যাবু।
কতক্ষণ হেঁটেছি বলতে পারব না। তবে অনেকক্ষণ, তাতে কোন সন্দেহ নেই। হঠাৎ আমার পিছনে মট করে শুকনো ডাল ভাঙার শব্দ হলো। ধড়াস করে এক লাফ মারল আমার হৃৎপিণ্ড! তাড়াতাড়ি একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে ফিরে তাকালাম।
প্রথমে কিছু চোখে পড়ল না। তারপর দেখলাম। একটা গাছের পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে এল ও। আরেকটা বাচ্চা ছেলে। ওর পিছনে আরও একজন। আমার পাশ কাটিয়ে চলে গেল ছেলে দুটো, ফারিহা আর অন্য ছেলেটা যেদিকে গেছে।
গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে পা টিপে টিপে ছেলেগুলোর পিছু নিলাম। আরও কিছুটা এগোনোর পর দূরে আলো চোখে পড়ল। যতই এগোচ্ছি, আলোটা বাড়ছে। আরও কাছে আসার পর দেখলাম, বেশ বড়সড় একটা অগ্নিকুণ্ড।

আগুন ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে দশ-বারোটা ছেলেমেয়ে। কেউ কথা বলছে। না। মূর্তির মত স্থির। আগুনের আভায় লালচে দেখাচ্ছে ওদের মুখগুলো। ওদের সঙ্গে ফারিহাকে দেখলাম। ওর পাশে দাঁড়ানো ছেলেটাকে চিনতে পারলাম। আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু রবিনের কাজিন কিটু! রবিনের এক মামার ছেলে। ফারিহার বয়েসী। ফ্লোরিডায় থাকে। রকি বিচে খালার বাড়িতে বেড়াতে এসেছে।

ওদের সবার হাতেই কোন না কোন ধরনের ব্যাগ-কাপড়ের থলে, প্ল্যাস্টিকের ব্যাগ; একমাত্র ফারিহার হাতেই বালিশের কভার।

আমার পিছনে নড়াচড়া টের পেয়ে আবার লুকালাম. একটা বড় গাছের গোড়ায়। ভাবলাম, আবার কোন বাচ্চাটাচ্চা হবে। আড়াল থেকে সাবধানে উঁকি দিয়ে দেখি, বাচ্চা নয়, বড় মানুষ। কালো আলখেল্লা পরা। হুড দিয়ে মাথা ঢাকা। দ্রুতপায়ে এগিয়ে চলেছে আগুনের দিকে।

আমার পাশ দিয়ে গেল লোকটা। গাছের গায়ে নিজেকে চেপে ধরে। মিশিয়ে ফেলতে চাইলাম।

তবে আমার দিকে তাকাল না লোকটা। বোধহয় নিজের চিন্তায় মশগুল। আমার মাত্র দুই হাত দূর দিয়ে চলে গেল ও। আমাকে দেখল না।

পায়ের শব্দ দূরে সরে গেলে বেরিয়ে এলাম গাছের আড়াল থেকে। আগুনের কাছে গিয়ে দাঁড়াল লোকটা, ছেলেমেয়েগুলোর কাছে। আগুনের লাল আভার পটভূমিতে কালো একটা মূর্তি। হুড় দিয়ে এমন করে মুখ-মাথা ঢাকা, চেহারা বোঝা যাচ্ছে না। তবু চেনা চেনা লাগল ওকে। কোথায় যেন দেখেছি।

আলখেল্লার ভিতর থেকে বড় একটা কাপড়ের থলে বের করল লোকটা। সেটার মুখ খুলে সামনে বাড়িয়ে ধরল। এক এক করে ছেলেমেয়েরা এগিয়ে এসে ওদের সঙ্গে আনা থলে থেকে সেই ব্যাগের ভিতর সমস্ত জিনিসপত্র ঢেলে দিতে লাগল। রূপার টি সেট থেকে শুরু করে সোনার ব্রেসলেট, গহনা। ভর্তি গহনার বাক্স, অনেক কিছুই আছে।

ফারিহার পালা এল। বালিশের কভারের ভিতর হাত ঢুকিয়ে কয়েকটা গহনা বের করে লোকটার বাড়িয়ে ধরা ব্যাগের মধ্যে ফেলল ও। নিশ্চয় মার গহনা, যেগুলো খুঁজে পাচ্ছিল না। আবার বালিশের কভারে হাত ঢোকাল ও। এবার বের করল একটা ক্যামেরা। বাবার ক্যামেরাটা। লোকটার ব্যাগে ওটা ফেলার সময় আগুনের আলোয় ফারিহার চোখ চকচক করতে দেখলাম। অদ্ভুত দৃষ্টি সে-চোখে।

জিনিসপত্র সব নেয়া হয়ে গেলে আগুনের দিকে হাত বাড়াল লোকটা। বিড়বিড় করে কী বলল। সঙ্গে সঙ্গে নিভে গেল আগুন।

চাঁদের আলোয় দেখলাম, কালো মূর্তিটা আমার দিকে এগিয়ে আসছে। আবার গাছের আড়ালে লুকালাম। এবারও আমার পাশ দিয়ে চলে গেল লোকটা,

আমাকে দেখল না। এরপর ছেলেমেয়েগুলো চলে গেল আমার পাশ দিয়ে। গাছের গায়ে মিশে রইলাম, যাতে আমাকে দেখতে না পায়। দুরে সরে যেতে থাকল পায়ের শব্দ। আড়াল থেকে বেরোলাম, বনটা নীরব হয়ে যাবার পর।
যখন বাড়ি ফিরলাম, ফারিহার জানালা তখন বন্ধ। মেইল গাছে কম্বল আর চাদরগুলো নেই। সামনের দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকলাম। পা টিপে টিপে উঠে এলাম ওপরতলায়। জানালা খোলা রেখে গিয়েছিলাম। বরফ-শীতল হয়ে আছে আমার ঘর। জানালাটা লাগিয়ে দিয়ে এসে কম্বলের নীচে ঢুকলাম।
তোমার কাজিন কি ইদানীং অদ্ভুত আচরণ করে, খেয়াল করে দেখেছ?
পরদিন স্কুলে জিজ্ঞেস করলাম আমার বন্ধু রবিনকে। লাঞ্চের সময় টিফিন খাচ্ছি। একই বেঞ্চে আমার পাশে বসেছে ও। কিশোর নেই আমাদের সঙ্গে। ওর মামা অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে আছেন। ওঁকে দেখতে বাংলাদেশে চলে গেছে ও।
জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে রবিন। কয়েকটা ছেলেকে ছোটাছুটি করে খেলতে দেখা যাচ্ছে।
অদ্ভুত আচরণ? পাউরুটি চিবাতে চিবাতে আনমনে জিজ্ঞেস করল ও। বুঝলাম না, কী বলতে চাও।
সিনেমার রোবটের মত কথা বলে? এমন কিছু খায়, যা আগে মুখেও তুলত না? এ রকম নানা ধরনের পরিবর্তন।
জানালার দিক থেকে চোখ ফেরাল রবিন। আমার দিকে তাকাল। তুমি কী করে জানলে?
ফারিহাও ইদানীং অস্বাভাবিক আচরণ করছে। বললাম ওকে। ওর দিকে তাকালে গা ছমছম করে, কেমন ভূতুড়ে লাগে। ওর কাজকর্ম কিছুই আর এখন আগের মত মনে হয় না আমার। রবিনের ভাইকেও গতরাতে আমার বোনের সঙ্গে বনে ঢুকতে দেখেছি, উদ্ভট কাণ্ড করেছে দুজনেই, এ কথাটা তখুনি বলতে চাইলাম না ওকে, যদি বিশ্বাস না করে। বরং বললাম, আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, তোমার ভাইও অদ্ভুত আচরণ করে।
হ্যাঁ, করে, মাথা ঝাঁকাল রবিন। জানালা দিয়ে আবার তাকাল খেলার মাঠের দিকে। অসংখ্য ছেলেমেয়ে জড় হয়েছে ওখানে। কয়েক দিন ধরে অদ্ভুত আচরণ করছে–দেখে মনে হয় স্মৃতিবিলোপ হয়েছে ওর। ওর জন্য খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছে আমার।
হুঁ!বাড়ি থেকে স্যাণ্ডউইচ বানিয়ে দিয়েছে মা। সেটার শেষ টুকরোটা, মুখে পুরে চিবাতে লাগলাম। রাত দুপুরে চুপি চুপি ঘর থেকে বেরিয়ে যায় না তোমার কিটু?
হাসল রবিন। বলতে পারব না। সন্দেহও হয়নি, তাই দেখতেও যাইনি। কেন, ফারিহা বেরিয়ে যায় নাকি?

যায়। সেজন্যই তো বলছি। একটা মুহূর্ত চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করলাম, কিটু কবে থেকে ওরকম কাণ্ড শুরু করেছে?
সপ্তাখানেক হলো, যদূর মনে পড়ে, রবিন বলল। জাদুকর ক্ল্যাণ্ডরের ম্যাজিক শো দেখে আসার পর থেকে। কবে যেন সেটা? হ্যাঁ, মনে পড়েছে। গত বৃহস্পতিবার।
ঘাড়ের পিছনে শিরশির করে উঠল আমার। বড়ই কাকতালীয় ব্যাপার। ক্ল্যাণ্ডর কি কিটুকে স্টেজে যেতে বলেছিল?
হ্যাঁ, বলেছিল, রবিন বলল। একটা আলমারির মধ্যে ঢুকিয়ে কিটকে গায়েব করে দিয়েছিল। তোমাকে বলিনি?
না, মাথা নাড়লাম। ফারিহাকেও নিয়ে গিয়ে আলমারিতে ঢুকিয়েছিল। বনের মধ্যে অগ্নিকুণ্ডের সামনে দাঁড়ানো হুড পরা মূর্তিটাকে চেনা চেনা কেন। লাগছিল, বুঝে ফেললাম। আসলে জাদুকর ক্ল্যাণ্ডরকেই দেখেছি।
রবিনকে সব জানালাম। ফারিহা কী করেছে, কীভাবে ওর পিছু নিয়ে বনে গিয়েছি, কী কী দেখেছি, কোন কথাই গোপন করলাম না।
চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল রবিন। হু! তাহলে এখন কী করা যায়?
এক মুহূর্ত চিন্তা করে বললাম, আজ রাতে তোমাদের বাড়িতে ঘুমোব।
কিটু কী করে দেখতে চাও?
বুঝে ফেলেছ। মাথা ঝাঁকালাম। হ্যাঁ। রাতে যদি বেরিয়ে যায় কিটু, ওর পিছু নেব আমরা। যদি বনে ঢোকে, আমরাও ঢুকব। এভাবে জিনিস চুরি করার মানেটা কী, জানা জরুরি।
স্কুল থেকে সোজা রবিনদের বাড়িতে চলে গেলাম। মাকে ফোন করে দিলাম, রাতে আর বাড়ি ফিরছি না।
রবিনের বাবা-মা আর কিটুর সঙ্গে বসেই খেলাম আমরা। রবিনদের বাড়িতে থাকি মাঝে মাঝে, এটা নতুন কিছু নয়, তাই আঙ্কেল-আন্টি কোন প্রশ্ন তুললেন না। কিটু কারও দিকে তাকাল না। চুপচাপ খেয়ে গেল। আচরণ। অনেকটা রোবটের মত।
রাতে খাওয়ার পর রবিনের শোবার ঘরে চলে এলাম ওর সঙ্গে। না ঘুমিয়ে বসে রইলাম বিছানায়, কথা বলে সময় কাটাতে লাগলাম। আমাদের জ্যাকেটগুলো খুলে হাতের কাছেই রেখে দিয়েছি, বাইরে বেরোনোর প্রয়োজন পড়লেই যাতে সঙ্গে সঙ্গে পরে নিয়ে দৌড় দিতে পারি।
মূল্যবান জিনিস বিক্রি করে টাকা পাবে, সেজন্যই ছেলেমেয়েদের দিয়ে চুরি করায় জাদুকর, রবিন বলল।
উঁহুঁ, মাথা নাড়লাম। আমার তা মনে হয় না। যে সব জিনিস দেয়। ছেলেমেয়েরা, সেগুলো এত মূল্যবান নয় যে এর জন্য এত ঝামেলা করবে। জাদুকর। তা ছাড়া,

টাকা চাইলে, শুধু শো দেখিয়েই তো বিরাট ধনী হয়ে। যেতে পারে ও।
তাহলে?
সেটাই তো রহস্য। জানতে চাই।
কিটু কোনখান দিয়ে বেরোয়, জানা নেই আমাদের
ওর ঘরের জানালা, দিয়েও বেরোতে পারে, কিংবা বাড়ির যে কোনও দরজা দিয়ে। রাত বাড়ছে। কথা বলা কমিয়ে দিলাম আমরা, যাতে কিটুর ঘরে সামান্যতম শব্দ হলেও কানে আসে আমাদের।
বালিশে পিঠ দিয়ে আধশোয়া হয়ে রইলাম। হঠাৎ পাঁজরে কনুইয়ের গুঁতো লাগতে চমকে উঠে বসলাম। আগের রাতে ভাল ঘুম হয়নি, তাই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। রবিনের দিকে তাকালাম। ঠোঁটে আঙুল রেখে আমাকে কথা বলতে নিষেধ করল ও। ইশারায় আমাদের পিছনের দেয়ালটা দেখাল। পাশের ঘরে কিটুর নড়াচড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে।
নিঃশব্দে বিছানা থেকে নেমে পড়লাম আমরা। জ্যাকেট পরে নিলাম। জানালার কাছে গিয়ে পর্দা সরিয়ে উঁকি দিলাম। ঘরের দরজার কাছে গিয়ে। পাল্লায় কান ঠেকিয়ে রেখেছে রবিন, বাইরে কী হচ্ছে শোনার জন্য। দম বন্ধ করে অপেক্ষা করছি আমরা।
হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ল রবিন। ছুটে গেলাম। আস্তে পাল্লাটা খুলে ফেলল ও। দরজা দিয়ে সাবধানে দুজনে মুখ বাড়ালাম বারান্দায়। কিটুর ঘরের দরজা খুলে গেছে। বেরিয়ে আসতে দেখলাম ওকে।
কিটুর পিছু নিলাম দুজনে। আরও কয়েকটা ছেলেমেয়েকে দেখলাম, একই দিকে চলেছে। বেশ খানিকটা দূরত্ব রেখে চলেছি আমরা। কেউ কারও দিকে তাকাচ্ছে না ছেলেমেয়েগুলো। মনে হচ্ছে যেন ঘোরের মধ্যে রয়েছে।
শহরের শেষ বাড়িটাও ছাড়িয়ে এলাম। বনে ঢুকে পড়ল ছেলেমেয়েগুলো। আমরাও পিছু নিলাম। চলতে চলতে গাছের ফাঁক দিয়ে আগুনের আলো নাচতে দেখে ওর হাত টেনে ধরলাম।
ওটাই সেই অগ্নিকুণ্ড, হাত তুলে দেখালাম। চলো, উল্টো দিক দিয়ে ঘুরে যাই। এদিক দিয়ে গেলে আলখেল্লা পরা লোকটা আমাদের পিছন থেকে এসে হাজির হবে। কাল আমাকে দেখেনি, তবে রোজ রোজ কপাল ভাল। না-ও হতে পারে। ওর চোখে পড়া চলবে না কোনমতে।
মাথা ঝাঁকাল রবিন।
অনেকখানি ঘুরে অগ্নিকুণ্ডের উল্টো দিকে চলে এলাম আমরা। কথা শোনা যাবে, এমন দূরত্বে একটা ঘন ঝোপের মধ্যে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসলাম। আগুনের

কিনারে ফারিহা আর কিটুর সঙ্গে দাঁড়ানো কয়েকটা ছেলেমেয়েকে চিনতে পারলাম। আমাদের স্কুলেই পড়ে, নীচের ক্লাসে।
পুলিশ অফিসার জন হাওয়ার্ডের ছেলে ডোরি না ওটা? রবিন জিজ্ঞেস করল আমাকে।
মাথা ঝাঁকালাম। ফিসফিস করে বললাম, হ্যাঁ।
গুনে দেখলাম, পনেরোটা ছেলেমেয়ে এসেছে। অগ্নিকুণ্ডের কিনারে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ, সম্মোহিতের মত। সবার হাতেই একটা করে থলে কিংবা ব্যাগ। শুধু ফারিহার হাতে বালিশের কভার।
উপুড় হয়ে শুয়ে আছি আমরা। আগুনের এত কাছে রয়েছি, লাকড়ি পোড়ার পটপট আওয়াজও শুনতে পাচ্ছি।
হঠাৎ ধড়াস করে এক লাফ মারল আমার হৃৎপিণ্ড। গাছপালার অন্ধকার ফুড়ে কালো আলখেল্লা পরা মূর্তিটাকে বেরিয়ে আসতে দেখেছি। আগুনের কাছে এসে দাঁড়াল ও। আগুনের আভা পড়েছে হুড পরা মুখে। গ্রেট ক্ল্যাণ্ডকে চিনতে আজ আর অসুবিধে হলো না।
হিক গ্রুম ব্রুম, এক সারিতে দাঁড়াও, জাদুকর বলল। এক সারিতে ওর সামনে দাঁড়িয়ে গেল ছেলেমেয়েরা। আলখেল্লার ভিতর থেকে বড় একটা কাপড়ের থলে টেনে বের করল ক্ল্যার। মুখ খুলে বাড়িয়ে ধরল।
হিক গ্রুম ব্রুম, তোমাদের জিনিসপত্র এই থলেতে রাখো, আদেশ দিল জাদুকর। এক এক করে এগিয়ে গিয়ে সমস্ত জিনিসপত্র ওর ব্যাগে ঢালতে লাগল ছেলেমেয়েরা। একটা ছোট মেয়ে একটা মানিব্যাগ রাখল জাদুকরের থলেতে। নিজের ব্যাগ থেকে একটা সোনার চেন টেনে বের করল একটা ছেলে। কিটুর পালা এল। রবিন আর আমি দুজনেই গলা লম্বা করে তাকিয়ে আছি। আগুনের আলোয় ঝিকিয়ে উঠল রূপার প্লেটটা, তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল জাদুকরের থলেতে। নিজের খালার রান্নাঘর থেকে প্লেটটা চুরি করে এনেছে কিটু।
ফারিহার পালা এল। বালিশের কভারের ভিতর থেকে একটা সাদা বল। বের করল ও। দেখে আর সহ্য করতে পারলাম না, লাফিয়ে উঠে বসলাম। হায় হায়, ওটা দিয়ে দিচ্ছে! আমার ক্রিকেট বলটা!
হাত ধরে টেনে আমাকে মাটিতে শুইয়ে দিল রবিন। আমার মুখ চেপে ধরল। কানের কাছে রাগত স্বরে ফিসফিস করে বলল, করছ কী, শুনে ফেলবে তো!
সরি, সামলে নিয়েছি নিজেকে। শচীন টেন্ডুলকারের অটোগ্রাফ নিয়েছিলাম ওটাতে। আমার বোন হয়ে ও এ কাজ করবে, ভাবতেই পারিনি।
সারির শেষ ছেলেটাও তার জিনিস ভরে দিল জাদুকরের থলেতে।

শয়তানি হাসি খেলে যেতে দেখলাম ক্ল্যাণ্ডরের মুখে। শীতল চোখ দুটো আগুনের আলোয় চকচক করছে। ছেলেমেয়েদের মাথার ওপর হাত উঁচু করে আদেশের সুরে বলল, হিক গ্রুম ব্রুম, আরও জিনিস চুরি করে নিয়ে এসো। আমার জন্য! আগুনের দিকে হাত নাড়ল ও। কয়েকবার ফটফট করে নিভে গেল আগুন।
সোমবার দুপুরে স্কুলের টিফিন পিরিয়ডে ক্লাসে বসে রবিনের অপেক্ষা করছি। ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে ওর টিফিন বক্সটা আমার কাছে রেখে বেরিয়ে গেছে। এখনও আসছে না। খিদেয় পেট জ্বলছে আমার। থাকতে না পেরে আমার ব্যাগ থেকে একটা আপেল নিয়ে খাওয়া শুরু করলাম।
হঠাৎ একটা বই হাতে ঘরে ঢুকল ও। ভীষণ উত্তেজিত।
কাছে এসে বইটা ফেলল আমার সামনে ডেস্কের ওপর। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, লাইব্রেরি থেকে আনলাম।
দেখলাম, একটা ইংরেজি কবিতার বই। বই খুলে একটা কবিতা বের করে তার ওপর আঙুল চেপে ধরল ও। এটা পড়ো!
দা স্টোলেন চাইল্ড, নামটা পড়লাম আমি। বাই উইলিয়াম বাটলার ইয়েস্ট।
ইয়েস্ট না, ইয়েস্ট না, ইয়েটস! কী উল্টোপাল্টা পড়ছ! ভুরু কোঁচকাল ও। বিখ্যাত আইরিশ কবি, নোবেল পুরস্কার পাওয়া। তার এই কবিতাটা পড়েছিলাম আমি। হঠাৎ মনে পড়ল, তাই বইটার জন্য লাইব্রেরিতে চলে গিয়েছিলাম।
কী আছে এতে?
ক্ল্যাণ্ডর সমস্যার সমাধান। পড়েই দেখো না! তাগাদা দিল রবিন। পড়ো!
জোরে জোরে পড়তে লাগলাম। স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে রবিন।
এ তো পরীর কবিতা, কয়েক লাইন পড়ে বললাম। এতে ক্ল্যাণ্ডর সমস্যার সমাধান দেখলে কোথায়?
আইরিশ লোককাহিনী বলে, রবিন বলল, ওখানকার রূপকথার প্রাণীরা মানুষকে যন্ত্রণা দিতে পছন্দ করে।
লেপ্রেকন জাতীয় কোন প্রাণী?
হ্যাঁ, লেপ্রেকনই! উত্তেজিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল রবিন। আইরিশ লেপ্রেকনরা ভীষণ পাজি। দেখতে মানুষের মত হওয়ায় খুব সহজেই মানুষের সঙ্গে মিশে যেতে পারে এরা।
পুরো কবিতাটা পড়ে ফেললাম। মুখ তুলে তাকালাম ওর দিকে
এবার বুঝলে তো? জিজ্ঞেস করল রবিন।
না, বুঝিনি। এতে বলা হয়েছে, কয়েকটা রূপকথার প্রাণী একটা মানুষের বাচ্চাকে চুরি করেছে।
এত সহজ কথাটা বুঝলে না? অধৈর্য ভঙ্গিতে হাত নাড়ল রবিন।

আইরিশরা বিশ্বাস করে, লেকেরা সুযোগ পেলেই মানুষের বাচ্চা চুরি করে নিয়ে যায়। তাদের জায়গায় চেইনজেলিং রেখে যায়।
চেইনজেলিংটা আবার কী?
নকল, নকল! যে বাচ্চাটাকে চুরি করে, তার নকল, অবিকল এক রকম দেখতে। কেউ বুঝতে পারে না, আসল বাচ্চাটা চুরি হয়ে গেছে।
তাতে লাভটা কী?
এটা লেপ্রেকনের স্বভাব, লাভ-লোকসান ওরাই জানে।
তারমানে তুমি বলতে চাইছ, জাদুকর ক্ল্যাণ্ডর আইরিশ লেপ্রেকন?
হলে অবাক হওয়ার কিছু আছে কি? রবিন বলল। ও যে সব কাণ্ড করছে, তাতে লেপ্রেকন মনে হওয়াটা স্বাভাবিক। যে ফারিহা আর কিটুকে দেখছি এখন আমরা, ওরা হয়তো আসল নয়।
তারমানে…চেইনজেলিং?
আমার তো তা-ই ধারণা, রবিন বলল। নিশ্চয় ক্ল্যাণ্ডর আসল বাচ্চাদের চুরি করে নিয়ে গিয়ে নকল বাচ্চা দিয়ে ভরিয়ে ফেলছে আমাদের শহরটা, ওদেরকে দিয়ে জিনিসপত্র চুরি করাচ্ছে।
ভয়ঙ্কর ব্যাপার!
হ্যাঁ, ভয়ঙ্কর ব্যাপার! আমার কথার প্রতিধ্বনি করল যেন রবিন। চোরাই জিনিসগুলো নিয়ে গিয়ে ক্ল্যাণ্ডর কী করে, সেটার জবাবও পাওয়া গেল।
কী করে?
জমিয়ে রাখে। এটাও ওদের স্বভাব। মানুষের ওপর প্রচণ্ড আক্রোশ ওদের। মানুষের বাচ্চা চুরি করে, ওদের দিয়ে ওদেরই জিনিস চুরি করায়। সেগুলো নিজের ঘরে জমিয়ে রেখে আনন্দ পায়। একটু থেমে রবিন বলল, আমাদের শহরের ছেলেমেয়েগুলোকেও ধরে নিয়ে গিয়ে ওদের জায়গায় চেইনজেলিং পাঠাচ্ছে ক্ল্যাণ্ডর। এই চেইনজেলিংরা ওর কথায় ওঠে-বসে। শহরের কেউ বুঝতেই পারছে না, আসল বাচ্চাগুলো হারিয়ে যাচ্ছে।
আমার মনে হচ্ছে এই ইয়েস্ট লোকটা তোমার মাথা খারাপ করে দিয়েছে, আমি বললাম।
ইয়েস্ট নয়, ইয়েটস! চেঁচিয়ে উঠল রবিন।
আস্তে বলো, নিচুস্বরে বললাম। সবাই তাকাচ্ছে। কিছুদূরে আরেকটা ডেস্কে বসা দুটো ছেলেকে আমাদের দিকে তাকাতে দেখে হেসে বললাম, রবিন একটা পরীর কবিতা পড়ে উত্তেজিত হয়ে গেছে। আমাদের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে আবার খাওয়ায় মন দিল ছেলে দুটো।

ভাল করে ভেবে দেখো, মুসা, ফিসফিস করে বলল রবিন। ফারিহাকে আলমারিতে ভরে গায়েব করে দেয়ার অনেকক্ষণ পর ফিরিয়ে এনেছে। জাদুকর। এত দেরি করল কেন? ব্যাপারটা অস্বাভাবিক লাগেনি তোমার?
তা লেগেছে, অস্বীকার করলাম না।
কেন দেরি হয়েছে, বোঝনি এখনও? ভুরু নাচাল রবিন। ওর মত দেখতে একটা চেইনজেলিং বানিয়েছে। আর তাতেই সময়টা লেগেছে ওদের।
কাদের?
জাদুকরের সহকারীদের।
ওরাও কি লেপ্রেকন?
মনে হয় না। ওর সহকারীরা নিশ্চয় নৌম কিংবা ট্রোল। এরাও রূপকথার প্রাণী। কোন মানুষের নকল বানানোয় ওস্তাদ।

.

ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফিরলাম। রবিনের কথাগুলো কোনমতেই মন থেকে সরাতে পারছি না। ওর ব্যাখ্যাটা অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য। কিন্তু যে অবস্থায়
আলমারি থেকে ফিরে এল ফারিহা, সেটাও তো কম অদ্ভুত নয়। দেখতে অবিকল এক রকম হলেও ও এখন ভিন্ন এক ফারিহা।
কী করব বুঝতে পারছি না। এমন একটা অদ্ভুত অবিশ্বাস্য অবাস্তব গল্প বিশ্বাস করব? মনটা খুঁতখুঁত করতেই থাকল। নাহ্, এর একটা বিহিত করতেই হবে।
বাড়ির সামনের দরজাটা বন্ধ দেখে পিছনের রান্নাঘরের দরজার দিকে এগোলাম। ওটা খোলা থাকতে পারে। এ সময় দেখতে পেলাম কুকুরটাকে। দেয়াল ঘেঁষে আরাম করে শুয়ে ঘুমাচ্ছে। ওকে দেখেই বুদ্ধিটা এসে গেল আমার মাথায়। ডাক দিলাম, জেমি! জেমি!
লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল কুকুরটা। ঠিক আমাদের পোষা নয়, রাস্তার কুকুরই, তবে আমাদের বাড়িতে মাঝে মাঝে এসে থাকে। আঙিনায় ঘুমায়। খাবার দিলে খায়। ফারিহা নাম রেখেছে জেমি। নাম ধরে ডাকলে সাড়াও দেয় কুকুরটা। আমার দিকে তাকিয়ে উত্তেজিত ভঙ্গিতে জোরে জোরে লেজ নাড়তে লাগল। তারপর চিত হয়ে শুয়ে পা তুলে দিল আকাশের দিকে। চাইছে, আমি ওর পেট চুলকে আদর করে দিই।
এখন পারব না, কড়া গলায় বললাম। জরুরি কাজ আছে। আয় আমার সঙ্গে।
কুকুরটাকে নিয়ে ঘরে ঢুকলাম। আলমারি থেকে একটা কুকুরের গলার শিকল আর বেল্ট বের করে জেমির গলায় পরালাম। আগে একটা পোষা কুকুর ছিল আমার। রাস্তা থেকে ধরে এনেছিলাম। অসুখ হয়ে মরে গিয়েছিল কুকুরটা। বেল্ট আর শিকলটা তারই। যাই হোক, জেমি ভাবল, বেড়াতে নিয়ে যাব। দরজার দিকে

দৌড় দিতে গেল। শিকল টেনে থামালাম। টেনে নিয়ে চললাম দোতলায় ওঠার সিঁড়ির দিকে।
দোতলার বারান্দা দিয়ে ফারিহার ঘরের দরজায় এসে থামলাম। থাবা দিলাম পাল্লায়। দরজা শুঁকছে জেমি। লেজ নাড়াচ্ছে।
এসো, ভিতর থেকে ডাকল একটা ভোতা নিরুত্তাপ কণ্ঠ। পাল্লাটা আমি পুরো খোলার আগেই মাথা দিয়ে ঠেলে ফাঁক করে ঘরে ঢুকে পড়ল জেমি। বিছানায় বসা ফারিহার দিকে ছুটল। তারপর হঠাৎ যেন দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে দাঁড়িয়ে গেল। একপাশে মাথা কাত করে রাগে গরগর শুরু করল। মেঝে শুকল। আমার দিকে তাকিয়ে ঘেউ ঘেউ করে কিছু বোঝাতে চাইল। তারপর ফারিহার দিকে তাকিয়ে গজরাতে লাগল।
বই পড়ছিল ফারিহা। বইয়ের পাতা থেকে চোখ সরিয়ে জেমির দিকে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে কুঁকড়ে গেল কুকুরটা, লেজ ঢুকিয়ে দিল দুই পায়ের ফাঁকে। কুঁই কুঁই করে শিকল সহ দরজার দিকে টেনে নিয়ে চলল আমাকে, যেন পালাতে পারলে বাঁচে। এত জোরে ছুটল, আমি ওকে সামলাতে হিমশিম খেয়ে গেলাম। শেষে এক ঝাঁকিতে আমার হাত থেকে শিকলটা ছুটিয়ে নিয়ে। দিল দৌড়।
সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে পিছনের দরজার কাছে ওকে দেখতে পেলাম। দুই পা দিয়ে দরজা আঁচড়াচ্ছে, বাইরে বেরোনোর জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। আবার ওর শিকল ধরে টেনে নিয়ে চললাম। আমার সঙ্গে আর যেতে চাইছে না ও। আবার যখন দোতলায় নিয়ে চললাম, কয়েক ধাপ উঠে সিঁড়ির ওপর বসে পড়ল। অনেক টানাটানি করেও ওকে তুলতে পারলাম না।
অথচ ফারিহাকে অসম্ভব ভালবাসে জেমি। ফারিহাই বেশির ভাগ সময়। কুকুরটার সঙ্গে খেলা করে। কিন্তু এখন ওকে দেখে এতটাই আতঙ্কিত জেমি, ওর সামনে যেতেও নারাজ। আমি জানি, এমন অনেক কিছুই টের পেয়ে যায়। কুকুররা, মানুষ যা পায় না। ফারিহার চেহারা সবাইকে ফাঁকি দিলেও জেমিকে দিতে পারেনি। ওর গায়ের গন্ধ, কণ্ঠস্বর অপরিচিত লেগেছে কুকুরটার কাছে। বুঝে গেছে, ও ফারিহা নয়।
আর কোন সন্দেহ রইল না আমার। রবিনের কথাই ঠিক।
জেমিকে আবার বাইরে ছেড়ে দিলাম। বাইরে বেরিয়ে একটা মুহূর্ত আর দাঁড়াল না, দৌড়ে বেরিয়ে গেল আমাদের বাড়ির সীমানা থেকে।
ফিরে গিয়ে দোতলায় উঠলাম। ফারিহার ঘরের দরজাটা খোলা। ভিতরে উঁকি দিয়ে দেখলাম, আগের মতই বিছানায় বসে আছে ফারিহা, কোন ভাবান্তর নেই।
ফারিহা, দরজায় দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আমার ক্রিকেট বলটা দেখেছ, শচীন টেণ্ডুলকারের সই নিয়েছিলাম যেটায়? ড্রেসারের ওপর ছিল।

বই থেকে মুখ তুলল না ফারিহার চেহারার মেয়েটা, কিংবা, আইরিশ রূপকথার চেইনজেলিংটা। জবাব দিল, না, দেখিনি। ..
কয়েক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে থেকে চুপচাপ দেখলাম ওকে।
কে তুমি? সাহস করে শেষে জিজ্ঞেসই করে ফেললাম। নিজের কানেই বেখাপ্পা আর কর্কশ শোনাল আমার কণ্ঠ। ধড়াস ধড়াস লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ডটা।
মুখ তুলে তাকাল মেয়েটা।
অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম।
কঠিন হাসি ছড়িয়ে পড়ল ওর মুখে। কেন, আমি তোমার খালাত বোন ফারিহা, চিনতে পারছ না??
বদলে গেছে ওর কণ্ঠস্বর। ভয় পেয়ে গেলাম। তাড়াতাড়ি ওর ঘর থেকে বেরিয়ে ছুটে এসে ঢুকলাম নিজের ঘরে। দরজা বন্ধ করে ভিতর থেকে তালা। আটকে দিলাম। বিছানায় বসে দুই হাতে মাথা চেপে ধরে ভাবতে লাগলাম, এরপর কী করব?
আমি এখন শিওর, টেলিফোনে বললাম রবিনকে, তোমার কথাই ঠিক। ওই মেয়েটা আমার বোন নয়। কিন্তু কী করব এখন? কাউকে বিশ্বাস করাতে পারব না আমাদের কথা।
আসল ছেলেমেয়েগুলোকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে ক্ল্যাণ্ডর জানতে হবে আমাদের, রবিন জবাব দিল। ওদের ফিরিয়ে আনতে পারলেই বিশ্বাস করবে।
একজন শয়তান জাদুকর ফারিহাকে চুরি করে নিয়ে আটকে রেখেছে, ভাবতে ভীষণ রাগ হলো আমার। ভয়ও পেলাম। যদি ইতিমধ্যেই ওর কোন ক্ষতি করে ফেলে থাকে জাদুকর!
হঠাৎ একটা বুদ্ধি এল মাথায়। বললাম, কী করে ওদের খুঁজে বের করতে হবে, বুঝে গেছি।
কী করে?
জাদুকরের ম্যাজিক আলমারিতে ঢুকতে হবে আমাকে, জবাব দিলাম।
ওপাশে দীর্ঘ নীরবতার পর রবিন বলল, সেটা করা ঠিক হবে না, মুসা। ভয়ানক বিপজ্জনক কাজ। যদি আর ফেরার পথ না থাকে তোমার?
ফেরার পথ নিশ্চয় আছে, আমি বললাম। আসল ছেলেমেয়েগুলোকে যেখানে নিয়ে যাওয়া হয়, নিশ্চয় সেখান থেকেই বেরিয়ে আসে। চেইনজেলিংরা।
হয়তো, রবিন বলল।
যদি তা-ই হয়ে থাকে, তাহলে ফেরার পথ নিশ্চয় আছে। আসল বাচ্চাগুলো যে পথে যায়, নকলগুলো ঠিক সেপথেই বেরিয়ে আসে। আমি সব জেনেশুনে তৈরি হয়ে যাচ্ছি, সাবধান থাকবযাতে আমাকে আটকে ফেলতে না পারে জাদুকর।

আবার নীরব হয়ে গেল রবিন। কয়েক মুহূর্ত পর জবাব দিল, আমার ভয় লাগছে। এ রকম ঝুঁকি নিয়ে বিপদের মধ্যে ঢাকা তোমার ঠিক হবে না।
যা হয় হোক, ওই আলমারিতে আমি ঢুকবই, জবাব দিলাম। ফারিহা, কিটু, আর যাকে যাকে নিয়ে গেছে, সবাইকে বের করে আনব। যদি আমাকে সাহায্য করতে চাও, আজ সন্ধ্যায় ক্ল্যাণ্ডরের শো শুরু হওয়ার আগেই প্যাসিফিক থিয়েটার হলের সামনে চলে এসো। যদি না আসো, একাই যাব। মোট কথা, ওই আলমারিতে ঢুকবই আমি।
তৃতীয়বারের মত চুপ হয়ে গেল রবিন। বুঝতে পারছি, কিটুর কথা ভাবছে। অবশেষে বলল, ঠিক আছে, আমি যাব।

.

শো শুরু হওয়ার বিশ মিনিট আগে থিয়েটার হলে পৌঁছলাম। টিকেট কাউন্টার থেকে দুটো টিকেট কিনলাম–একটা আমার জন্য, একটা রবিনের জন্য। বার বার ঘড়ি দেখছি আর পায়চারি করছি, ওর আসার অপেক্ষা করছি।
থিয়েটার হলের সামনের অংশটা প্রচুর আলো দিয়ে সাজানো। আমার দুই পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে হাসিখুশি অসংখ্য পরিবার, প্রায় সবার সঙ্গেই বাচ্চা ছেলেমেয়েরা রয়েছে। চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করল : যেয়ো না, যেয়ো না, ওই ক্ল্যাণ্ডর সাধারণ ম্যাজিশিয়ান নয়–ও একটা দুষ্ট লেপ্রেকন, বিদেশী রূপকথার পাতা থেকে উঠে আসা মনস্টার, অসামান্য ক্ষমতার অধিকারী!
কিন্তু বলতে পারলাম না। জানি, কেউ আমার কথা শুনবে না। পাগল ভাববে।
থিয়েটার হলের সামনে দেয়ালে লাগানো গ্রেট ক্ল্যাণ্ডরের ছবিওয়ালা বড় বড় পোস্টার। ছবির নীচে লিখে দিয়েছে : গ্রেট ক্ল্যাণ্ডর হুডিনির চেয়ে বড় জাদুকর। ছবিটার দিকে যতটা সম্ভব কম তাকানোর চেষ্টা করলাম, তাকালে অস্বস্তি বোধ করি, ভয় বাড়ে।
আবার ঘড়ির দিকে তাকালাম। হঠাৎ আমার কাঁধে একটা হাত পড়ল। ভীষণ চমকে গিয়ে চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়ালাম।
সরি, রবিন বলল। তোমাকে চমকে দিতে চাইনি।
ওর টিকেটটা ওর হাতে ধরিয়ে দিলাম। একসঙ্গে বসব না আমরা, বুঝলে। কোনভাবেই ক্ল্যাণ্ডরের সন্দেহ জাগাতে চাই না।
দরজায় দাঁড়ানো দারোয়ানের হাতে টিকেট দিয়ে ভিতরে ঢুকলাম দুজনে। দুই পাশে ছোট ছোট তামার খুঁটি বসিয়ে ওগুলোর মাথায় ছিদ্র করে তার ভিতর দিয়ে লাল দড়ি ঢুকিয়ে বেড়া দেয়া হয়েছে, মাঝখান দিয়ে সরু রাস্তা। সেটা ধরে হেঁটে চললাম। অডিটরিয়ামের দরজার কাছে পৌঁছলাম। ভিতরে ঢুকলাম। দর্শকে ভর্তি হয়ে আছে। হাসি আর উত্তেজিত কথা শোনা যাচ্ছে চতুর্দিকে। শো শুরুর অপেক্ষা

করছে সবাই। অডিটরিয়ামের চারপাশে চোখ বোলালাম। আমার বয়েসী, আমার চেয়ে ছোট-বড়, প্রায় শখানেক ছেলেমেয়ে এসেছে ম্যাজিক দেখতে। এত ছেলেমেয়ের মধ্য থেকে ক্ল্যাণ্ডরের দৃষ্টি আকর্ষণ করব কীভাবে? কী করে নিশ্চিত হব, আমাকেই ভলান্টিয়ার হিসেবে বেছে নেবে ও?

রবিনের দিকে ফিরলাম। আমাদের দুজনকেই কাজ করতে হবে। আমি গিয়ে ওকে আমাকে আলমারিতে ঢোকাতে বলব।

আর আমি? রবিন জিজ্ঞেস করল।

আমি আলমারিতে ঢুকে যাবার পর এমন কিছু করবে তুমি, যাতে আমি কাজ করার সময় পাই। ওপাশে গিয়ে কী দেখব তা তো জানি না, তবে কিছু করার জন্য সময় দরকার হবে। সেই সময়টা তুমি আমাকে করে দেবে।

এখান থেকে দুজনে আলাদা হয়ে গেলাম আমরা। সিটের মাঝখানের গলিপথ ধরে তৃতীয় সারিতে ঢুকে পড়লাম আমি। দুটো পরিবারের মাঝখানে একটা খালি সিট দেখে বসলাম। ফিরে তাকিয়ে দেখি, পিছনের সারিতে চলে গেছে রবিন। আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে যেন অভয় দিতে চাইল।

ঘুরে তাকালাম স্টেজের দিকে। লাল মখমলের পর্দাটা ঝুলে রয়েছে। ওটার ওপাশে কোন শয়তানির খেলা চলছে আমি জানি না। গায়ে কাঁটা দিল। চারপাশের অসংখ্য হাসিখুশি মুখের দিকে তাকালাম আরেকবার।

আবার ফিরে তাকালাম, রবিন কী করছে দেখার জন্য। ওর পাশে বসা। পরিবারটার সঙ্গে ভাব জমিয়ে নিয়েছে। হাসছে, কথা বলছে। ভঙ্গি দেখে, মনে হচ্ছে যেন কতকালের চেনা।

এই সময় আলো কমতে শুরু করল। চুপ হয়ে গেল দর্শকরা। লাল পর্দার ওপর গোল একটা স্পটলাইটের উজ্জ্বল আলো পড়ল। পর্দা সরে গিয়ে শূন্য স্টেজ দেখা গেল। তারপর, স্পটলাইটের আলোর মাঝখানে ধোঁয়ার ফিতে দেখা গেল। কুণ্ডলী পাকিয়ে ওপরে উঠছে ফিতেটা। বাড়তে লাগল ধোঁয়া। মোটা হলো অনেক। এত জোরে পাক খেতে শুরু করল, যেন টর্নেডো হচ্ছে। হঠাৎ করেই সেই ধোঁয়ার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল ক্ল্যাণ্ডর। ওর কালো আলখেল্লার কোনা উড়ছে বাতাসে। দর্শকদের ঘন ঘন হাততালি আর চিৎকার-চেঁচামেচিতে কান ঝালাপালা।

শো শুরু হলো।

নানারকম খেলা দেখাতে লাগল ক্ল্যাণ্ডর, এসব খেলা আগেও দেখেছি; প্রথম যেদিন এসেছিলাম। সেরাতে আনন্দ পেয়েছিলাম, আজ হতে লাগল রাগ।

একই রকম খেলা দেখিয়ে যাচ্ছিল ক্ল্যাণ্ডর, তবে বাধা পড়ল তাতে। বাধা দিলেন অফিসার হাওয়ার্ড। পাঁচ নম্বর সারিতে বসেছেন তিনি। উঠে দাঁড়িয়ে চ্যালেঞ্জ করে

বসলেন জাদুকরকে।
এই যে, মিস্টার ক্ল্যাণ্ডর, হই-হট্টগোলের মধ্যে চেঁচিয়ে বললেন তিনি। পোস্টারে লেখা রয়েছে আপনি হুডিনির চেয়ে বড় জাদুকর।
কপালে হাত রেখে আলো আড়াল করে দর্শকদের সারির দিকে তাকাল ক্ল্যাণ্ডর। অফিসার হাওয়ার্ডের দিকে তাকিয়ে বলল, হ্যাঁ, ঠিকই লিখেছে! বাধা দেয়ায় রেগে গেছে ও।
বেশ, তাহলে দেখব এটা থেকে কী করে মুক্তি পান, একটা হাতকড়া তুলে দেখালেন হাওয়ার্ড। হাতটা আরেকটু উঁচু করলেন তিনি, যাতে সিটে বুসা দর্শকরাও হাতকড়াটা দেখতে পায়। বহু কষ্টে এটা জোগাড় করে এনেছি, পরীক্ষা করে দেখার জন্য। আজ দেখব, সত্যি আপনি হুডিনির চেয়ে। বড় জাদুকর কি না।
চেঁচাতে লাগল দর্শকরা। কেউ জোরে শিস বাজাল। কেউ জোরে পা ঠুকতে লাগল মেঝেতে। রাগত দৃষ্টিতে দর্শকদের ওপর চোখ বোলাল ক্ল্যাণ্ডর। চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করল ও।
এ তো বাচ্চাছেলের খেলা, কর্কশ কণ্ঠে বলল ক্ল্যাণ্ড।
উল্লসিত চিৎকার করে উঠল দর্শকরা। হাতকড়াটা নিয়ে স্টেজে উঠলেন অফিসার হাওয়ার্ড।
দর্শকদের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াল ক্ল্যাণ্ডর। দুই হাত পিছনে নিয়ে এল। ওর কব্জিতে হাতকড়া পরিয়ে তালা লাগিয়ে দিলেন হাওয়ার্ড। পকেটে রাখলেন চাবিটা। চুপ হয়ে গেছে দর্শকরা। পিনপতন নীরবতা। উত্তেজনায় কখন যে সামনে ঝুঁকে বসেছি, বলতে পারব না। আবার ঘুরে দাঁড়াল ক্ল্যাণ্ডর, দর্শকদের মুখোমুখি। ঠোঁট নড়তে আরম্ভ করল ওর। কী বলে শোনার জন্য কান খাড়া। করলাম। বার বার একই কথা, সুর করে ছন্দের মত করে বলে গেল ও, গ্রুক ফ্রক ধ্রুম! গ্রুক ফ্রক ধ্রুম! এক ফুক ধ্রুম!
হঠাৎ ঝটকা দিয়ে হাত দুটো সামনে নিয়ে এল ক্ল্যাণ্ডর। একহাতে ধরে ঝুলিয়ে রেখেছে হাতকড়াটা। দুটো আংটাই ভোলা। দর্শকদের প্রচণ্ড চিৎকারে কানের পর্দা ফাটার জোগাড় হলো। স্তম্ভিত হয়ে গেছেন হাওয়ার্ড। শিকলটা হাতে ধরিয়ে দিয়ে স্টেজ থেকে তাঁকে নামিয়ে দিল ক্ল্যাণ্ডর। গম্ভীর মুখে সিটে ফিরে এলেন হাওয়ার্ড। চোখের বিস্ময় কাটছে না।
স্টেজের দিকে ফিরলাম। ছায়ার মধ্যে আলমারিটা দেখা যাচ্ছে এখন।
আমার পরের খেলার জন্য, দর্শকদের মাঝ থেকে আমি একজন ছোট্ট সহকারী চাই, ক্ল্যাণ্ডর বলল।

অসংখ্য হাত ঝটকা দিয়ে উঠে গেল ওপরে। সিটের সারিগুলোর বা দিকে তাকিয়ে আছে জাদুকর। ওর নজর দেখেই বুঝতে পারছি, কোন বাচ্চাটাকে পছন্দ করেছে ও। মনে হলো, শো শুরু হওয়ার আগে থেকেই বাছাই করে রেখেছিল। হাত লম্বা করে আঙুল তুলে সেদিকে নির্দেশ করল।
লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। তাড়াহুড়া করার জন্য আমার সামনের দুই সারি সিট ডিঙিয়ে স্টেজের কাছে চলে এলাম। আমার কাণ্ড দেখে কাত হয়ে। জায়গা করে দিল অবাক দর্শকরা, তবে সবাই ওরা ছোট ছেলেমেয়ে। বড়রা ধমকে উঠল। কান দিলাম না। যে ছেলেটাকে বাছাই করেছে ক্ল্যাণ্ডর, সে আসার আগেই স্টেজে উঠে ক্ল্যাণ্ডরের মুখোমুখি দাঁড়ালাম।
ভুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকাল জাদুকর। রাগে বাঁকা হয়ে গেছে। ঠোঁটের দুই কোণ। এই ছেলে! হিসিয়ে উঠল ও। ওর গরম নিঃশ্বাস লাগল আমার গলায়। আমি তো তোমাকে ডাকিনি। ভাল চাও তো সিটে ফিরে যাও।
বিশাল হলঘর জুড়ে আবার পিনপতন নীরবতা।
না, সার, ফিসফিস করে বললাম, আমি আপনার সহকারী হব! পিছনের দর্শকদের সারি থেকে হাততালি শোনা গেল। ফিরে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম। উজ্জ্বল আলোর ভিতর দিয়ে দেখা কঠিন। কপালে হাত তুলে আলো আড়াল করে দেখলাম, হাততালি দিচ্ছে রবিন। চেঁচিয়ে সুর করে বলল ও, মুসা তুমি এগিয়ে চলো! আমরা আছি তোমার সাথে! ওর পাশে বসা পরিবারটাও ওর সঙ্গে গলা মেলাল। আরও অনেকেই গলা মেলাল, একইসঙ্গে হাততালি দেয়া শুরু করল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে সমস্ত দর্শকরাই যেন আমার পক্ষে চলে এল। আমাকে নিতে অনুরোধ করছে জাদুকরকে।
আমার দিকে তাকিয়ে ভ্রুকুটি করল ক্ল্যাণ্ডর। আমাকে ভলান্টিয়ার হিসেবে নিতে রায় দিয়েছে দর্শকরা। না নিয়ে আর উপায় নেই ওর। রাগে হিসিয়ে উঠে ফিসফিস করে বলল, কীসের মধ্যে ঢুকতে যাচ্ছ, জানো না তুমি। বেশ, এতই যখন ইচ্ছে, তোমাকেই নিলাম। দর্শকদের দিকে তাকিয়ে হাসল ও। কিন্তু ওই হাসির আড়ালে ওর অস্বস্তিটা টের পেলাম আমি।
আলমারিটা স্পটলাইটের নীচে টেনে আনল ক্ল্যাণ্ডর। দরজা খুলে আগের দিনের মতই দর্শকদের দেখাল ভিতরে কিছু নেই। থাবা দিয়ে বোঝাল, নিরেট কাঠ।
আমার পাশে এসে দাঁড়াল। দর্শকদের শুনিয়ে আমাকে বলল, অন্ধকারকে নিশ্চয় ভয় পাও না তুমি, তাই না?
মাথা নাড়লাম।
দর্শকদের হাসি শোনা গেল। কে একজন বলল, সাহস আছে। ছেলেটার।

আমি কোনদিকে তাকাচ্ছি না, সোজা তাকিয়ে আছি ক্ল্যাণ্ডরের চোখের দিকে। আমি আপনাকে ভয় পাই না, নিচুস্বরে বললাম।
দীর্ঘ একটা মুহূর্ত আমার দিকে তাকিয়ে রইল ও। মনে হলো, আমি যে ওর গোপন কথা সব জানি, সেটা যেন বুঝে গেছে। একটা ভুরু উঁচু করল। তোমাকে বিদেয় করাটা সত্যিই এখন জরুরি হয়ে পড়েছে, ইয়াং ম্যান। জ্বলন্ত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল ও।
লাল আলমারিটার কাছে আমাকে টেনে নিয়ে গেল ক্ল্যাণ্ডর। হঠাৎ করেই হাঁটু কাঁপতে শুরু করল আমার, তবে আমি যে ভয় পেয়েছি ওকে সেটা বুঝতে দিলাম না। আলমারিতে ঢুকে দরজার দিকে ঘুরে দাঁড়ালাম। ভিতরটা বেশ গরম। করাতের গুঁড়ো আর আঠার ঝাঁঝাল গন্ধ।
ক্ল্যাণ্ডরের চোখের দিকে তাকালাম না, সম্মোহিত হওয়ার ভয়ে। দর্শকদের দিকে তাকিয়ে রইলাম। মেঝে থেকে উঠতে আরম্ভ করল আলমারিটা। মনে হলো, এলিভেটরে চড়ছি। দুরুদুরু করছে বুকের ভিতর। হৃৎপিণ্ডটা লাফাচ্ছে। রবিনের দিকে তাকালাম। সাদা হয়ে গেছে ওর মুখ। ঠোঁট কামড়ে ধরেছে। Obr
তারপর, দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা। গাঢ় অন্ধকারে নিমজ্জিত হলাম।
মনে হতে লাগল, গভীর অন্ধকার মহাশূন্য থেকে নীচে পড়ছি আমি। কানের পাশে বাতাসের শোঁ-শোঁ শব্দ। গর্জন করে বয়ে চলেছে যেন ঝোড়ো বাতাস।
ধুপ করে পড়লাম পাথরের মেঝেতে। আমাকে ঘিরে পাক খেতে লাগল ঘন কুয়াশা। দুই কব্জি চেপে ধরল ঠাণ্ডা দুটো হাত। টানাটানি করে ছাড়ানোর চেষ্টা করলাম। পারলাম না। মনে হচ্ছে বরফ-শীতল সাঁড়াশি দিয়ে চেপে ধরা হয়েছে আমার হাত দুটো টেনে খাড়া করল আমাকে। কুয়াশা সরে যাচ্ছে। আলো চোখে পড়ল। অন্ধকার একটা পাথরের সুড়ঙ্গে রয়েছি আমি। দুই দেয়ালে লাগানো মশাল জ্বলছে। যেন প্রাচীন কোনও সময়ে চলে এসেছি।
আমার দুই পাশে প্রায় গায়ের ওপর চেপে রয়েছে দুটো প্রাণী। আমার চেয়ে খাটো। কিন্তু অনেক বেশি চওড়া কাঁধ, ভারি শরীর, গরিলার মত হাতের মস্ত ঠাণ্ডা থাবা দুটোতে প্রচণ্ড শক্তি। পরনে কালো কাপড়ের পোশাক। গল্পের বইয়ে এ রকম প্রাণীর ছবি দেখেছি। আইরিশ রূপকথার দুষ্ট নৌম কিংবা ট্রোল-এর ঠিক কোনটা ওরা, বুঝতে পারলাম না। অদ্ভুত, দুর্বোধ্য, বিচিত্র ভাষায় পরস্পরের সঙ্গে কথা বলছে, একটা বর্ণও বুঝলাম না। কথা। বলার সময় ঘোঁৎ-ঘোৎ আর চি-চি শব্দ বেরোচ্ছে গলা থেকে।
হাত ছাড়ানোর জন্য আবার ধস্তাধস্তি শুরু করলাম। ব্যর্থ হলাম এবারও। অন্ধকার সুড়ঙ্গ দিয়ে আমাকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে চলল ওরা। ইস্পাতের তৈরি

একটা বন্ধ দরজার সামনে এনে দাঁড় করাল। আড়াআড়ি লোহার ডাণ্ডা লাগিয়ে রাখা হয়েছে দরজাটায়। দুই পাশে দেয়ালে গাঁথা দুটো মশাল জ্বলছে।
বিড়বিড় করে কী যেন বলল একটা প্রাণী। আলিবাবার গুহার দেয়ালের মত আপনাআপনি খুলে গেল দরজাটা। মস্ত একটা গুহায় আমাকে টেনে ঢোকাল প্রাণী দুটো। গুহাটা মশালের আলোয় আলোকিত। চারপাশের দেয়াল ঘেঁষে অনেকগুলো ছেলেমেয়েকে দেখলাম, শিকল দিয়ে বাঁধা। ভীত, ক্লান্ত দেখাচ্ছে ওদের। দেয়ালের কাছে একটা খালি জায়গায় আমাকে টেনে নিয়ে গেল প্রাণী দুটো, দেয়ালে গাঁথা আংটা থেকে লোহার শিকল ঝুলছে। এখানে।
হঠাৎ মুসা ভাইয়া, মুসা ভাইয়া! ডাক শুনলাম। কাঁধের ওপর দিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে ফিরে তাকালাম। ফারিহাকে দেখতে পেলাম। পরনে এখনও সেই লাল রঙের টি-শার্ট। অন্য ছেলেমেয়েগুলোর মতই পাথরের দেয়ালের সঙ্গে শিকল দিয়ে বাঁধা রয়েছে ও। চোখ থেকে পানি গড়িয়ে পড়ছে। আরও একবার ধস্তাধস্তি করে প্রাণী দুটোর হাত থেকে ছোটার চেষ্টা করলাম। লাভ হলো না।
আমার কব্জি আর গোড়ালিতে আংটা পরিয়ে আটকে দিল প্রাণী দুটো। তারপর পিছিয়ে গিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। বুঝলাম, ভালমত দেখে নিচ্ছে আমাকে, আমার চেহারার চেইনজেলিং বানানোর জন্য। বানানোর পর আমার নকলটাকে বের করে দেবে জাদুকরের আলমারির ভিতর দিয়ে। আর সেটা দেখে হাততালি দেবে দর্শকরা। লেপ্রেকনের শয়তানি কিছুই বুঝতে পারবে না।
বড় দরজাটা দিয়ে গুহা থেকে বেরিয়ে গেল প্রাণী দুটো। ঝনঝন শব্দে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। ফারিহার দিকে তাকালাম।
কিছু একটা করো, মুসা ভাইয়া, কাতরকণ্ঠে অনুরোধ করল ফারিহা। বাঁচাও আমাদের!
গুহার চারপাশে চোখে বোলালাম। আতঙ্কিত কিটুকেও দেখলাম। বনের ভিতর অগ্নিকুণ্ডের কাছে এদেরকে-না না, এদের চেইনজেলিংকে দেখেছি। মশালের আলোয় প্রতিটি ছেলেমেয়ের মুখের দিকে তাকালাম। রকি বিচ থানার অফিসার জন হাওয়ার্ডের ছেলে ডোরিকে চিনতে পারলাম।
টানাটানি করে শিকল খোলার চেষ্টা করলাম। ব্যথাই পেলাম শুধু, কিছুই করতে পারলাম না। দেয়ালে বাড়ি খেয়ে ঝনঝন শব্দ তুলল লোহার শিকল।
ভাবছি, রবিন এখন কী করছে?
শো প্রায় শেষ। আর একটা কী দুটো খেলা দেখানোর পর আলমারি দিয়ে মুসার চেইনজেলিংটাকে বের করবে জাদুকর–ভাবছে রবিন। জাদুকরকে দেরি করানোর জন্য কিছু একটা করা দরকার। উঠে দাঁড়াল ও। অডিটরিয়াম থেকে

বেরিয়ে এসে দড়ির বেড়া দেয়া সরু রাস্তাটায় অস্থির ভঙ্গিতে পায়চারি করতে লাগল। ভাবনার ঝড় বইছে মাথায়। গলার ভিতরটা শুকিয়ে গেছে। একটা কোকটোক পেলে ভাল হতো। এদিক ওদিক তাকিয়ে একটা ড্রিংকের স্টল দেখে সেদিকে এগোল। ড্রিংক খেতে খেতে দেখল, স্টলের পাশে একটা দরজার গায়ে লেখা : সর্বসাধারণের প্রবেশ নিষেধ।

দরজার নবে মোচড় দিল রবিন। তালা নেই। ফিরে তাকিয়ে দেখল, কেউ দেখছে কি না। না, কেউ তাকাচ্ছে না ওর দিকে। আস্তে করে পাল্লা ঠেলে খুলে দ্রুত চলে এল ভিতরে। টেনে লাগিয়ে দিল আবার পাল্লাটা।

লম্বা একটা করিডর দেখতে পেল ও। বাতিল জিনিসপত্রে ঠাসা–পুরানো বালতি, ঝাড়, ব্রাশ, রঙের টিন, এসব। একটা মইয়ের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখল, ওপরে স্পটলাইট নিয়ন্ত্রণ করছে একজন লোক। ওখানে না থেমে করিডর ধরে এগিয়ে চলল ও। চলে এল স্টেজের পিছন দিকে।

এই, কে তুমি? জিজ্ঞেস করল একটা কণ্ঠ। পাক খেয়ে ঘুরে গেল রবিন। শ্রমিকের পোশাক পরা বিশালদেহী একজন লোককে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকতে দেখল ওর দিকে। এখানে আসার অনুমতি কে দিল তোমাকে?

আ-আমি ট-ট-ট-ট-ট্রম! তুতলে জবাব দিল রবিন। অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ল, আপনাদের ইলেকট্রিশিয়ানের ছেলে।

রুক্ষকণ্ঠে লোকটা বলল, কিন্তু ওর কোন ছেলে আছে বলে তো জানতাম না, কখনও বলেনি। যাকগে, কোন কিছুতে হাত দেবে না, বুঝলে?

স্টেজের পিছনে দাঁড়িয়ে ক্ল্যাণ্ডরকে দেখতে পাচ্ছে রবিন। শেষ খেলাটার আগের খেলাটা দেখাচ্ছে এখন ও। শো শেষ হতে আর মাত্র কয়েক মিনিট বাকি।

কী করা যায় ভাবছে ও। একপাশে একটা মোটরের মত যন্ত্র চোখে পড়ল ওর। ওটার সঙ্গে লাগানো কয়েকটা দাঁতওয়ালা চাকা। ওগুলো গিয়ার, বুঝতে পারল ও। একটা গিয়ারের কেন্দ্রে ঢোকানো লোহার ডাণ্ডায় পেঁচানো দড়ির অন্য মাথাটা পুলির ওপর দিয়ে চলে গেছে ছাতের দিকে। দড়িটা কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে গলা বাড়িয়ে দেখার চেষ্টা করল রবিন। আবার ফিরে তাকাল মোটরটার দিকে।

কোমর থেকে বেল্টটা খুলে নিয়ে লেজের দিকটা দুটো চাকার দাঁতের ফাঁকে খাড়া ঢুকিয়ে দিল। তারপর টান মারল মোটরের একটা লিভার ধরে। গুঞ্জন তুলে চালু হয়ে গেল মোটর, ঘুরতে শুরু করল পুলি, স্টেজের ওপর নেমে যেতে থাকল লাল পর্দাটা। খেলা দেখাতে দেখাতে আচমকা থেমে গেল ক্ল্যাণ্ড। পর্দার দিকে তাকিয়ে আছে অবাক হয়ে। বেল্টের চামড়া ছেঁড়ার শব্দ হলো। দাঁতগুলো আটকে গিয়ে ঘোরা বন্ধ করে দিল। ওদিকে মোটর চলছে। পোড়া গন্ধ আর ধোঁয়া বেরোতে লাগল মোটর থেকে। স্টেজের তিন-চার ফুট ওপরে এসে থেমে গেল পর্দার ঝুল।

ফিরে তাকাতে রবিনের ওপর চোখ পড়ল ক্ল্যাণ্ডরের। প্রচণ্ড রাগে চেঁচিয়ে উঠল, জলদি পর্দা তোলো!
ধাক্কা দিয়ে রবিনকে সরিয়ে দিল শ্রমিকের পোশাক পরা লোকটা। উল্টো দিকে ঠেলে দিল মোটরের লিভার। কঁকি দিয়ে বন্ধ হয়ে গেল মোটর।
আটকে গেছে, ক্ল্যাণ্ডকে জানাল ও। এই ছেলেটা কিছু করেছে... কোন ছেলেটা দেখাতে গিয়ে ফিরে তাকাল লোকটা। রবিনকে দেখল না। ও ততক্ষণে সরে পড়েছে।
অডিটরিয়ামে ফিরে রবিন দেখল, পর্দা সরিয়ে স্টেজের এপাশে বেরিয়ে। আসছে ক্ল্যাণ্ড। হট্টগোল করতে থাকা দর্শকদের উদ্দেশ্যে হাত তুলে বলল, প্লিজ, লেডিজ অ্যাণ্ড জেন্টলম্যান, আপনারা শান্ত হোন। একটা যান্ত্রিক গোলযোগ ঘটেছে। এখনই ঠিক হয়ে যাবে। প্লিজ, শান্ত হোন আপনারা।
পর্দার ঝুল উঁচু করে আবার ওপাশে চলে গেল ক্ল্যাণ্ডর।
গুহার দেয়াল ঘেঁষে তখন শিকলে আটকে রয়েছি আমি, ওপরে অডিটরিয়ামে যে এত কিছু ঘটছে, তার কিছুই জানি না। হঠাৎ করেই আবার খুলে গেল গুহার ইস্পাতের দরজাটা। সেই প্রাণী দুটো ঢুকল। ওদের পিছন পিছন আসছে আরেকজন। কে, দেখতে পাচ্ছি না। কাছে আসার পর যখন আমার দৃষ্টিপথ থেকে সরে দাঁড়াল প্রাণী দুটো, তখন দেখলাম, অবিকল আমার মত দেখতে একটা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। একেবারে আয়নায় দেখা আমার প্রতিরিম্বের মত!
বার বার আমার দিকে আর আমার চেইনজেলিংটার দিকে তাকাচ্ছে প্রাণী দুটো। মিলিয়ে নিচ্ছে কোথাও কোন অমিল আছে কি না। বিড়বিড় করে নিজেদের মধ্যে দুর্বোধ্য ভাষায় কথা বলছে। এপাশ থেকে, ওপাশ থেকে, সমস্ত দৃষ্টিকোণ থেকে আমাকে দেখার পর নকল ছেলেটাকে নিয়ে আবার বেরিয়ে গেল ওরা। সম্ভবত, যেসব জায়গায় খুঁত রয়েছে সেসব মেরামত করতে। নাকি সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে গেছে ওটাকে আলমারি দিয়ে বের করে দেয়ার জন্য? তা হলে তো মরেছি!
তাড়াতাড়ি কিছু একটা করতে বলছে আমাকে ফারিহা। ওর সঙ্গে গলা মিলিয়ে বাকি ছেলেমেয়েগুলোও ওদেরকে মুক্ত করতে অনুরোধ করছে। ওদের মধ্যে বয়েসে বড় আমি। একমাত্র আমিই এখন ওদের আশা-ভরসা। আবার শিকলের আংটা খোলার চেষ্টা করলাম। কিন্তু এত শক্ত শিকল ছেঁড়া সম্ভব হলো না। প্রাণী দুটো আর আসছে না। ক্রমেই দমে যাচ্ছি। মনে হচ্ছে, আলমারিতে ঢুকে ভুল করেছি। অন্যদের সঙ্গে আমিও আটকা পড়েছি লেপ্রেকনের কারাগারে। আর কোনদিন বেরোতে পারব না এই বন্দিশালা থেকে!
আমার বাবাকে বলে গিয়ে, কেঁদে উঠে বলল একটা ছেলে। আমাকে এসে নিয়ে যাক! চোখ তুলে তাকালাম। ডোরি। অফিসার হাওয়ার্ডের ছেলে। আমার বাবাকে

গিয়ে বলো, প্লিজ!
খুব খারাপ লাগছে আমার। বেরিয়ে গিয়ে ওর বাবাকে খবর দেয়াটা যে এত সহজ নয়, বুঝতেই পারছে না ছেলেটা। ও জানে না, এ মুহূর্ত অডিটরিয়ামে বসে অন্য দর্শকদের সঙ্গে ম্যাজিক শো উপভোগ করছেন ওর বাবা। তার ছেলে যে নিখোঁজ হয়েছে, ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেননি। বরং যে লোকটা তার ছেলেকে গায়েব করে দিয়েছে, তার জাদুর খেলা দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে হাততালি দিয়ে নিশ্চয় অভিনন্দন জানাচ্ছেন।
অফিসার হাওয়ার্ডের কথা ভাবতে হঠাৎ করেই বুদ্ধিটা মাথায় এল আমার। জাদুকরের হাতে শিকল পরিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। মন্ত্র পড়ে শিকলের তালা খুলে ফেলেছিল ক্ল্যাণ্ডর। ও বলছিল: গ্রুক ফুক ধ্রুম! গ্রুক ফুক ধ্রুম! গ্রুক ফুক ধ্রুম!
জোরে জোরে সুর করে বললাম কথাগুলো। সঙ্গে সঙ্গে কাঁপতে শুরু করল আমার হাত-পায়ের কড়াগুলো। গরম হয়ে গেল।
আবার বললাম; গ্রুক ফুক ধ্রুম! গ্রুক ফুক ধ্রুম! গ্রুক ফুক ধ্রুম! খসে পড়ে গেল কড়াগুলো। আমি এখন মুক্ত।
ফারিহার কাছে দৌড়ে এলাম। চেঁচিয়ে বললাম, বলো, গ্রুক ফ্রক ধ্রুম? বার বার বলতে থাকো। অ্যাই, সবাই তোমরা সুর করে বলো কথাগুলো। বলে যাও, যতক্ষণ না কড়া খোলে।
অনেকগুলো কণ্ঠ সুর করে গেয়ে উঠল, এক ফ্রক ধ্রুম! গ্রুক ফ্রক ধ্রুম! এক ফুক ধ্রুম!
মুক্ত হয়ে গেল সবাই। আমাকে জড়িয়ে ধরল ফারিহা। ওর চোখে পানি। আমাকে ঘিরে নাচতে শুরু করল ছেলেমেয়ের দল। আনন্দে হই-হই করতে লাগল। দরজার কাছে ছুটে গেলাম। খোলার চেষ্টা করলাম। পারলাম না। এ সময় বাইরে পায়ের আওয়াজ শুনলাম। ক্রমেই কাছে। আসছে।
অ্যাই, সবাই যার যার জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ো! যে যেখানে বাঁধা ছিলে! জলদি! এমন ভান করে থাকো, যেন এখনও শিকলে বাঁধা রয়েছ। আমি না বলা পর্যন্ত কেউ জায়গা থেকে নড়বে না, কেউ কোন কথা বলবে না। যাও!
সবাই দৌড়ে গিয়ে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল। দুই হাত পিছনে। সবাই উত্তেজিত। মুক্তির আনন্দে অস্থির। ব্যাপারটা এখন প্রাণী দুটো লক্ষ না করলেই হয়!
ফারিহা, ডেকে বললাম। আমি তোমার দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকানোর সাথে সাথে চেঁচানো শুরু করবে, যত জোরে পারো, বুঝলে?
মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল ও।
খুলে গেল দরজাটা। প্রাণী দুটো ঘরে ঢুকল, ছেলেটাকে নিয়ে। অবিকল আমার মত দেখতে। কোন খুঁত বের করতে পারলাম না। এমনকী কাপড় চোপড়গুলোও

আমারগুলোর মত। চেঁচিয়ে উঠল ফারিহা।
ভয় নেই, চুপ করে থাকো, আমি বললাম।
আমার সামনে এসে দাঁড়াল প্রাণী দুটো। চেইনজেলিংটাকে দাঁড় করাল আমার পাশে। একবার আমার দিকে একবার চেইনজেলিংটার দিকে তাকিয়ে কোথাও কোন অমিল আছে কি না বোঝার চেষ্টা করছে ওরা। নিজেদের কাজে সন্তুষ্ট মনে হলো ওদের। বিড়বিড় করে দুর্বোধ্য ভাষায় কথা বলছে দুজনে। ওদের কাঁধের ওপর দিয়ে ফারিহার দিকে তাকালাম। ইশারা করল ও।
মাথা ঝাঁকিয়ে ইঙ্গিত করলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে এমন এক বিকট চিৎকার দিল ও, আমি পর্যন্ত চমকে গেলাম। পাথরের দেয়ালে প্রতিধ্বনি তুলল সে-চিৎকার। চোখ-মুখ কুঁচকে ফেলল প্রাণী দুটো। ফারিহার দিকে
ফিরে তাকাল। চেঁচিয়েই চলল ফারিহা। কী হয়েছে বোঝার জন্য ওর দিকে ঘুরে দাঁড়াল প্রাণী দুটো। আমার ইচ্ছে সফল হলো। কাত হয়ে চেইনজেলিংটার কানে কানে হিক গ্রুম ব্রুম, নিজের হাতে শিকল লাগাও! ঠিকই আছে এখানে বলে সরে গেলাম। সামান্যতম দ্বিধা না করে আমার জায়গাটায় সরে এসে নিজের হাতে কড়া লাগিয়ে দিল ওটা।
এতক্ষণে চিৎকার থামাল ফারিহা। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে কী বলল প্রাণী দুটো, তারপর আমাদের দিকে ঘুরল। একবার আমার। মুখের দিকে, একবার চেইনজেলিংটার মুখের দিকে তাকাতে লাগল। দুরুদুর করছে আমার বুকের ভিতর। ভয় পাচ্ছি, ধরা না পড়ে যাই। কিন্তু কিছু বুঝতে পারল না ওরা। সন্তুষ্ট হয়ে আমাকে নিয়ে দরজার দিকে রওনা হলো।
দুজনের পিছনে রয়েছি আমি। ফিরে তাকিয়ে দেখলাম, আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে সবাই। ঠোঁটে আঙুল রেখে ওদের কথা বলতে নিষেধ করলাম। দরজার কাছে পৌঁছে দরজাটা খুলল প্রাণী দুটো। ওদের পাশ কাটিয়ে বাইরে চলে এলাম। একটানে দরজার পাশের দেয়াল থেকে খুলে নিলাম একটা মশাল। জ্বলন্ত দিকটা ওদের মুখের কাছে ঠেলে দিলাম।
চেঁচিয়ে উঠে গুহার ভিতর পিছিয়ে গেল প্রাণী দুটো।
এসো তোমরা! ছেলেমেয়েদের উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে বললাম। জলদি বেরিয়ে এসো!
একদৌড়ে দরজার কাছে চলে এল ওরা। যতক্ষণ না সবাই সুড়ঙ্গে বেরোল, আগুন দেখিয়ে ঠেকিয়ে রাখলাম প্রাণী দুটোকে।
দৌড়াও! থেমো না! ছেলেমেয়েদের বললাম। আমি তোমাদের পিছনেই আসছি!
ফিরে তাকালাম আমার চেইনজেলিংটার দিকে। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওটা, ভাবলেশহীন মুখ। ওই জায়গাটায় এখন আমার থাকার কথা, আর ওটা চলে

যেত জাদুকরের আলমারি দিয়ে বেরিয়ে, আমাদের বাড়িতে ভেবে শিউরে উঠলাম!
প্রাণী দুটোকে গুহার মধ্যে শিকলে আটকে রেখে যেতে পারলে খুশি হতাম। কিন্তু ভিতরে ঢুকলেই যদি দরজাটা বন্ধ করে দেয় ওরা, আর খুলতে পারব না। তাই ঝুঁকি নিলাম না। ওদের দিকে মুখ করে পিছিয়ে যেতে থাকলাম সুড়ঙ্গ ধরে। আগুনের ভয় দেখিয়ে ওদের কাছে আসতে দিচ্ছি না। রাগে বিড়বিড় করে দুর্বোধ্য ভাষায় কিছু বলছে ওরা, বোধহয় আমাকে গালি দিচ্ছে। দিক। বুঝতেও পারছি না। আর পারলেও মাথা ঘামাতাম না। আমার এখন একটাই উদ্দেশ্য, এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া।
সুড়ঙ্গের শেষ মাথায় পৌঁছে দেখলাম, আমার জন্য অপেক্ষা করছে ছেলেমেয়ের দল। হাসি চলে গেছে সবার মুখ থেকে। আবার ভীত হয়ে পড়েছে ওরা। কারণ, সুড়ঙ্গের মুখ বন্ধ!
ভয় পেয়ো না, কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে তাকিয়ে সাহস জোগালাম ওদের। এখান থেকে বেরিয়ে যাবই আমরা, যে করেই হোক!
ঠিক এ সময় ধোঁয়া দেখা গেল। সবাইকে ঘিরে পাক খেয়ে ঘুরছে। কী ঘটছে, বুঝলাম। সুড়ঙ্গের মুখ খুলে দিয়েছে জাদুকর। চেইনজেলিংকে আলমারিতে ঢোকার পথ করে দিচ্ছে। যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে এখন আমাকে!
আচমকা জ্বলন্ত মশালটা প্রাণী দুটোর দিকে ছুঁড়ে দিলাম। ভয়ে লাফ দিয়ে পিছিয়ে গেল ওরা। দৌড় দিলাম সামনে। পিছনে ছুটন্ত পায়ের শব্দ। নিশ্চয় আমাকে ধরতে আসছে প্রাণী দুটো। সামনে ছেলেমেয়েগুলোকে দেখা যাচ্ছে না আর। ধোঁয়ার ভিতর অদৃশ্য হয়েছে। আমিও কোন দিকে না তাকিয়ে ঝাঁপ দিলাম তাতে।
পায়ের নীচে মাটি নেই। মনে হলো শূন্যে উড়ছি। হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে কোথায় যে পড়ছি, কে জানে! এক সময় করাতের গুড়ো আর আঠার। আঁঝাল গন্ধ নাকে এল। বুঝলাম, আলমারিতে ফিরে এসেছি। অনেকগুলো ছেলেমেয়ের সঙ্গে আমিও জড়াজড়ি করতে লাগলাম বদ্ধ জায়গাটায়। ছোট একটা আলমারিতে এতজনের জায়গা হলো কী করে, ভেবে অবাক লাগল।
ঝটকা দিয়ে খুলে গেল আলমারির দরজা। কুয়াশার ভিতর দিয়ে উজ্জ্বল। আলো এসে চোখে লাগল। ধোঁয়ার মত গলগল করে খোলা দরজা দিয়ে। বেরোতে লাগল কুয়াশা। স্টেজের কয়েক ফুট ওপরে শূন্যে ভেসে রয়েছে আলমারিটা। চিৎকার-চেঁচামেচি করে ওপর থেকেই স্টেজে লাফিয়ে পড়তে শুরু করল ছেলেমেয়েরা। দল বেঁধে আমাদেরকে বেরোতে দেখে হাততালিতে ফেটে পড়ল দর্শকরা। হল জুড়ে প্রচণ্ড হট্টগোল। চারদিকে ছুটোছুটি করছে ছেলেমেয়েরা।

চেঁচাচ্ছে। হাসছে। লাফাচ্ছে। নিরাপদে আবার পরিচিত পৃথিবীতে ফিরে আসার আনন্দে অস্থির।
ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে ক্ল্যাণ্ডর। সবার শেষে আলমারি থেকে বেরোলাম আমি। দর্শকদের হাততালি আর হট্টগোল আরও বেড়ে গেল। আমার দিকে ছুটে এল জাদুকর। চোখে চোখে তাকিয়ে রইল। শক্ত করলাম নিজেকে। চোখ সরালাম না। দাঁত খিচাল একবার ক্ল্যাণ্ডর। তারপর ধাক্কা দিয়ে আমাকে সরিয়ে লাফ দিয়ে উঠে পড়ল আলমারিতে। ভিতর থেকে টান দিয়ে দড়াম করে দরজা লাগাল।
তাকিয়ে আছি। দুলতে শুরু করল আলমারিটা। গুমগুম শব্দ আসছে ভিতর থেকে। দুলতে দুলতে ওপরে উঠে গেল ওটা। ঘুরতে লাগল। কালো ধোঁয়া বেরোচ্ছে ছাত থেকে। গা থেকে বৈদ্যুতিক ফুলিঙ্গের মত আলোর কণা বেরিয়ে ছরছর করে স্টেজের ওপর পড়ছে। ক্রমেই ঘোরার গতি বাড়ছে আলমারিটার। কালো ধোঁয়া! ফুলিঙ্গ! সব কিছুর মাঝে ঝাপসা লাল রঙটা বন্ করে ঘুরছে!
পিছিয়ে এলাম। অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে দর্শকরা। সবার চোখ এখন গুঞ্জন তুলে ঘুরতে থাকা আলমারিটার দিকে। হট্টগোল থেমে গেছে।
ঘুরতে ঘুরতে একসময় মিলিয়ে গেল আলমারিটা। রয়ে গেল শুধু কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী। পাক খেয়ে উড়তে উড়তে ছাতের দিকে চলে গেল।
এরপরও বেশ কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইল দর্শকরা। তারপর হঠাৎ করেই লাফিয়ে উঠে আবার করতালি আর চিৎকার-চেঁচামেচিতে ফেটে পড়ল। এমন ম্যাজিক জীবনে দেখেনি কেউ!
সিটের সারির গলিপথ ধরে আমার দিকে দৌড়ে আসতে দেখলাম রবিনকে। মুখে হাসি ছড়িয়ে পড়েছে।
অ্যাই, তোমার নাম কী? কাছে এসে জিজ্ঞেস করল ও।
মুসা।
এবার বলো, আমার নাম কী?
হেসে বললাম, আর পরীক্ষা করতে হবে না, রবিন! আমি চেইনজেলিং নই, তোমার বন্ধু, মুসা। আমি আসল না হলে আমাকে দেখে পালাত না জাদুকর!
মাথা দোলাল রবিন। তা ঠিক।

.

পরদিন স্থানীয় খবরের কাগজে এই ম্যাজিক শো নিয়ে খবর বেরোল। বড় বড় হেডলাইন দিয়ে ক্ল্যাণ্ডরের প্রশংসা করে বেশ ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে প্রথম পৃষ্ঠাতে খবরটা ছেপেছে। শেষ কথা লিখেছে : দুঃখের বিষয় হলো, আজকের শো-টা অনিশ্চিত হয়ে পড়ল। হাজার হাজার টাকার টিকিট বিক্রি করে মাথায় হাত দিয়ে

বসেছে প্যাসিফিক থিয়েটার হল কর্তৃপক্ষ, কারণ ক্ল্যাণ্ডরের বাড়িতে খোঁজ নিয়ে ওকে পাওয়া যায়নি। কোথায় গেছে, কেউ জানে না।
খবরটা পড়ে মুচকি হাসলাম। আমি জানি, কোথায় গেছে। ক্ল্যাণ্ডর আয়ারল্যাণ্ডে, ওর নিজের দেশে। চেইঞ্জেলিংগুলোও নিশ্চয় কোনও অলৌকিক উপায়ে ওর সঙ্গে চলে গেছে। আর জাদুকরের বাড়িতে খুঁজে জিনিসপত্রগুলো সব উদ্ধার করল পুলিশ, ছেলেমেয়েদের দিয়ে যেগুলো চুরি করিয়ে নিয়ে গিয়েছিল ক্ল্যাণ্ড।

তিন গোয়েন্দা ভলিউম ১১৫/২ – পাহাড়ে আতঙ্ক – শামসুদ্দীন নওয়াব – সেবা প্রকাশনী – প্রথম প্রকাশ : ২০১০

মনে হচ্ছে জীবনেও পৌঁছতে পারব না, কিশোর, রবিন আর ডানার কাছে অভিযোগ করল মুসা।

বাসের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল কিশোর।

এরচেয়ে মরা পোকা-মাকড় খাওয়াও ভাল, বলল ও।

শশশ! সাবধান করল মুসা। মিসেস হকিন্স শুনে ফেলবেন। ওদের টিচার মিসেস হকিন্স বাসের সামনের দিকে বসা। আজ তার, পরনে নীল জিন্স আর হাইকিং বুট। তবে গলায় সবুজ লকেটটা ঠিকই ঝুলছে। বেশিরভাগ ছেলে-মেয়ের ধারণা তাদের টিচার ভ্যাম্পায়ার এবং তার লকেটটার বিশেষ ক্ষমতা আছে।

ডানা চোখের উপর থেকে সোনালী চুল সরিয়ে বাসের চারধারে নজর বুলাল। রুবি মাউন্টেনে নেচার হাইকে যাচ্ছে ফোর্থ গ্রেডাররা। বাসে তিল ধারণের জায়গা নেই।

রুবি মাউন্টেনে দারুণ মজা হবে, কিশোরকে বলল ডানা।

মিসেস হকিন্স বলেছেন আজকে আমরা প্রকৃতির কাছে যাওয়ার সুযোগ পাব।

কিন্তু ওখানে আছেটা কী? বলল কিশোর। পচা-পচা কিছু গাছ আর ঝাঁকে ঝাকে মশা।

পাহাড়ের পাদদেশে এক মাটির রাস্তায় ঝাঁকনি খেতে খেতে চলেছে বাসটা। শেষমেশ ব্রেক কষে দাঁড়াল। মিসেস হকিন্স ধীরে। সুস্থে ওদের দিকে ঘুরে চাইলে ছেলে-মেয়েদের কথা বন্ধ হয়ে গেল। মিসেস হকিন্স কখনও গলা চড়ান না, কাজেই সবাইকে মনোযোগী। হতে হলো। বিজাতীয় সুরে কথা শুরু করলেন তিনি।

রুবি মাউন্টেনে গাছ-পালা, জীব-জন্তু অবাধে বাড়ছে, বললেন টিচার। এটা সবার জন্যে শান্তির জায়গা, আর আমাদের সায়েন্স ফিল্ড ট্রিপের জন্যে আদর্শ।

কিশোর গুঙিয়ে উঠতে যাচ্ছিল। রবিন ওর পাজরে আলতো। কনুই মারল। মিসেস হকিন্সের চোখজোড়া ওদের উদ্দেশে ঝলসে গেল, তবে তিনি কথা থামালেন না।

আমাদের সবার ট্র্যাকে থাকাটা জরুরী। এই পাহাড়ে অনেক বুনো জন্তুর বাস। আমরা ওদেরকে বিরক্ত না করলে ওরাও আমাদেরকে কিছু বলবে না।

এবার তিনি ধীরে ধীরে বাসের সিঁড়ি ভেঙে নেমে গেলেন। ছেলে-মেয়েরা স্কুলের ব্যাকপ্যাক তুলে নিয়ে তার পিছনে সারি বাধল। তিন বন্ধু আর ডানা অপেক্ষা করছে বাসের পিছন দিকে।

কপাল ভাল হলে ভালুক কিংবা হরিণ দেখা যেতে পারে, বলল নথি।

ডানা বাসের জানালা দিয়ে বাইরে চাইল। ঘন বনভূমিতে লোমশ দেহ খুঁজছে ওর চোখ।
ট্রেইলে খাবার ফেলো না যেন, সাবধান করল কিশোর।
ভালুকদেরকে ভয় নেই, আশ্বস্ত করল মুসা। উঁচু-উঁচু পাইন গাছের দিকে দৃষ্টি ওর। রুবি মাউন্টেন আমার বাসার ব্যাকইয়ার্ডের মতই নিরাপদ।
এহ, বিশ্রী গন্ধটা কীসের? প্রায় চেঁচিয়ে উঠল কিশোর।
ডানা নাক টিপে ধরল।
বাসটা মনে হয় কোন স্কাঙ্ককে চাপা দিয়েছে।
হয় তাই, বলে নাক ঢাকল মুসা, আর নয়তো ওরা রুবি মাউন্টেনকে জঞ্জালের স্তূপ বানিয়ে ফেলেছে।
জায়গাটা আমার প্রথম থেকেই পছন্দ নয়, বলল কিশোর।
এসো, বাতলে দিল রবিন। বাস থেকে নেমে পড়ি। তাজা বাতাসে ভাল লাগবে।
অন্যান্যদের পিছু পিছু বাস থেকে নেমে পড়ল। তিন গোয়েন্দা আর ডানা। কিন্তু বাইরে বেরনোর পর গন্ধটা কমল তো না-ই বরং বাড়ল।
মনে হচ্ছে অসুস্থ হয়ে পড়ব, বাসের বাইরে দাঁড়িয়ে বলল ডানা। কী জঘন্য গন্ধ!
তুমি মনে হয় সকালে গোসল করনি, ঠাট্টা করে বলল কিশোর।
ডানা জবাব দিতে যাবে, কিন্তু মিসেস হকিন্সকে ওদের দিকে চাইতে দেখে থেমে গেল।
প্রকৃতি বড়ই আজব, বললেন তিনি। গন্ধও অনেক সময় অদ্ভুত লাগে। কিন্তু যেসব জন্তু-জানোয়ার এখানে বাস করে তাদের কাছে এ গন্ধটা স্বাভাবিক।
ঠিক, অচেনা এক কণ্ঠ বলল। ছেলে-মেয়েরা ঘুরে দাঁড়াল। সবুজ প্যান্টে গোজা সবুজ শার্ট, হাইকিং বুট আর চওড়া ব্রিমের হ্যাট পরা এক মহিলাকে দেখতে পেল ওরা। কাঁধ থেকে স্ট্র্যাপে ঝুলছে ক্যামেরা। আমার নাম পপি, আমি রুবি মাউণ্টেনের পার্ক রেঞ্জার।
আমি আজকে তোমাদের হাইক গাইড করব।
আপনার সাথে ক্যামেরা কেন? প্রশ্ন করল ডানা।
আঙুলের নখ দিয়ে ক্যামেরায় টোকা দিলেন মহিলা।
হঠাৎ যদি নতুন ধরনের কোন জন্তুর দেখা পেয়ে যাই তাই।
মিসেস হকিন্স তার স্বভাবসিদ্ধ আধো হাসিটা হাসলেন।
বড় বড় রাস্তা আর শহর গড়ে ওঠার আগে নেচার কীরকম ছিল এরা তা জানতে এসেছে, রেঞ্জার পপিকে বললেন তিনি। আমরা কি এখন শুরু করব?
রেঞ্জার পপি মাথা ঝাঁকালেন।

ফলো মি, বললেন। সবাই কিন্তু ট্রেইলে থাকবে আর...অদ্ভুত কিছু চোখে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জানাবে।
হোঁতকা ম্যাকনামারা হাত তুলল।
অদ্ভুত কিছু বলতে?
গাছ-গাছালির জটলার দিকে চকিতে চাইলেন রেঞ্জার পপি। তারপর মৃদু হাসলেন।
আমি কিছু বলিনি। আমি শিয়োর আমাদেরকে কোন কিছু জ্বালাতন করবে না।
এবার ঘুরে দাঁড়িয়ে সরু ট্রেইল ধরে পা চালালেন। লম্বা-লম্বা গাছের আবছায়ায় হারিয়ে গেলেন ছেলে-মেয়েদেরকে পিছনে নিয়ে, তিন বন্ধু আর ডানা লাইনের শেষে থাকল।
উঁচু এক গাছ থেকে একটা পাখি ডেকে উঠলে চমকে উঠল কয়েকটা মেয়ে।
এরা আগে মনে হয় পাখির ডাক শোনেনি, বলল কিশোর।
অচেনা শব্দ শুনলে ভয় পাওয়াই স্বাভাবিক, ডানা বলল ওকে।
কালো পাখি আর মশা ছাড়া এখানে কিছুই নেই, বলল কিশোর। এগুলো বাড়ির ব্যাকইয়ার্ডেই দেখা যায়। এত দূর আসার দরকার পড়ে না।
তা হলে ওটা কী? প্রশ্ন করল মুসা।
আমি তো কিছুই শুনিনি, জানাল রবিন।
মুসা ওর বাহু চেপে ধরে দাঁড় করিয়ে দিল।
থামলে কেন? কিশোর জবাব চাইল।
শ শ শ, সতর্ক করল মুসা। কী একটা যেন আমাদেরকে ফলো। করছে।
কে জানে কী, বলল কিশোর। তবে ওটার গায়ে ভয়ানক দুর্গন্ধ। আর ক্রমেই কাছিয়ে আসছে।
ওরা চারজন ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। শীঘ্রি ট্রেইলে মিলিয়ে এল। অন্যান্য হাইকারদের চলার শব্দ। ঠিক এমনিসময় ওরা শুনতে পেল। ওদের পিছনে ভারী পদশব্দ। গাছের ফাঁক দিয়ে ওরা যখন উঁকি দিল, কিছুই দেখতে পেল না।
খাইছে, শব্দ শুনে মনে হচ্ছে বড়সড় কিছু, ফিসফিস করে বলল। মুসা। বিশাল সাইযের।
আমাদেরকে মনে হয় ফলো করছে, শিউরে উঠে বলল ডানা।
ঢোক গিলল রবিন।
চলো রেঞ্জারকে খুঁজে বের করি। তিনি নিশ্চয়ই জানবেন ওটা কী।
ওরা চারজন ট্রেইল ধরে হনহন করে পা চালাল।
ক্লাসের অন্যদের নাগাল ধরল ওরা চারজন। কাঁধের উপর দিয়ে বার বার পিছু চাইল ওরা, কিন্তু ভারী পায়ের শব্দটা আর শুনতে পেল না। রেঞ্জার পপি

ওদেরকে ছোট ছোট জীব-জন্তু দেখালেন। কিন্তু তাঁর কোন কথাতেই কান দিল না কিশোর, ওর দৃষ্টি নিবদ্ধ রইল। মাটিতে।
ওরা লাঞ্চের জন্য শেল্টারে ফিরে আসা মাত্রই, রেঞ্জার পপি হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে ট্রেইল ধরে হাঁটা দিলেন।
আপনি আমাদের সাথে পিকনিক করলে খুশি হতাম, মিসেস হকিন্স বললেন।
উঁচু গাছ-পালার জটলার দিকে নার্ভাস দৃষ্টিতে চাইলেন রেঞ্জার পপি।
ধন্যবাদ, কিন্তু...আমি একটা জিনিস খুঁজছি। মনে হয় জানি কোথায় পাবে ওটাকে। রেঞ্জার পপি গ্রীনহিলস স্কুলের ছেলে মেয়েদেরকে একাকী রেখে উধাও হয়ে গেলেন।
বেশিরভাগ ছেলে-মেয়ে শশব্যস্তে এগোল শেল্টারের নীচে বসতে আর লাঞ্চ খেতে। কিন্তু তিন বন্ধু আর ডানা বিশাল এক হেমলক গাছের তলায় বসে পিনাট বাটার স্যাণ্ডউইচ আর প্রেটযেল খেতে লাগল।
আঙুল থেকে পিনাট বাটার চেটে কিশোরের কাঁধে খোঁচা দিল রবিন।
কী ব্যাপার, এত চুপচাপ কেন? প্রশ্ন করল।
বিশ্রী গন্ধটা বোধহয় ওর মাথা গুলিয়ে দিয়েছে, হেসে বলল মুসা।
বন্ধুরা কিশোরের জবাবের অপেক্ষায় থাকল। কিন্তু ওর মুখে কুলুপ আঁটা।
কিশোর আরেক কামড় স্যাণ্ডউইচ খেয়ে রবিনের কথার জবাব দিল।
আমি জঙ্গলের মধ্যে কিছু একটা দেখেছি, বলল ও। এবং আমাদের সাবধান থাকা উচিত।
কী বলছ তুমি? প্রশ্ন করল মুসা। এই পাহাড়ে কীসের কাছ থেকে সাবধান থাকতে হবে?
কিশোর বন্ধুদের সবার চোখের দিকে চাইল। এবার ফিসফিস করে জবাব দিল।
বিগ ফুট!
বিগ ফুট? ওর বন্ধুরা সভয়ে একসঙ্গে বলে উঠল।
শ শ শ, সতর্ক করল কিশোর। একটা আঙুল রাখল ঠোঁটে। ও শুনে ফেলবে।
কে শুনে ফেলবে? রবিনের জিজ্ঞাসা। তোমার কথার মাথা-মুণ্ড কিছুই বুঝছি না।
বিগ ফুট, আবারও বলল কিশোর।
বিগ ফুট এক ধরনের দানো। জঙ্গলে থাকে, বলল মুসা।
প্রশান্ত মহাসাগরের কাছে, যোগ করল রবিন।
এখন বুঝলে তো আমি কী বলতে চাইছি, বলল কিশোর।
আমরা কিছুই দেখিনি, ডানা বলল ওদেরকে। আর আমরা প্রশান্ত মহাসাগরের ধারেকাছেও নেই। তা ছাড়া এসব জঙ্গলে কোন দানো-টানো লুকিয়ে থাকার প্রশ্নই আসে না।

অত শিয়ের হয়ো না, ফিসফিসিয়ে বলে কাঁধের উপর দিয়ে চাইল কিশোর।
এই জঙ্গলের একমাত্র দানো হচ্ছ তুমি, রবিন বলল কিশোরকে।
রবিন ঠিকই বলেছে, বলল মুসা। এখানে দানো আছে তা তুমি হলফ করে বলতে পারো না।
পারি, কিশোর বলল। ট্রেইলে ট্র্যাক দেখেছি আমি। বিগ ফুটের ট্র্যাক!
স্মিত হাসল রবিন।
ওগুলো ছিল আমাদের স্কুলের ছেলে-মেয়েদের ট্র্যাক।
কিশোর গভীর শ্বাস টেনে মাথা ঝাঁকাল।
প্রথমে আমিও তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু এই ট্রাকগুলো বিশাল।
তা হলে রেঞ্জার পপির বুটের ছাপ, বলল ডানা। ওঁর বুট জোড়া বিরাট।
এই ট্র্যাকগুলোর কাছে তাঁর বুটের ছাপ নস্যি, তর্কের সুরে বলল কিশোর। আর এই ট্রাকগুলো যার সে খালি পায়ে ছিল। পায়ের পাতায় ছাপ দেখেছি আমি।
রবিন কিশোরের পিঠ চাপড়ে দিল।
এবার বোঝা গেল। তুমি সম্ভবত কোন জন্তুর থাবার ছাপ দেখেছ, বলল ও।
জন্তু কোন সন্দেহ নেই, গম্ভীর স্বরে বলল কিশোর। এবং সেই জন্তুটা হচ্ছে বিগ ফুট!
মুসা তর্ক করার সুযোগ পেল না, কারণ ঠিক সে মুহূর্তে দীর্ঘদেহী, লোমশ এক লোক টলতে টলতে বেরিয়ে এল বনভূমির ভিতর থেকে। লোকটা অন্তত সাত ফুট লম্বা। পিঠে ঝুলছে লম্বা এক পনিটেইল। দাড়ি তার বেল্টের কলস ছুঁয়েছে প্রায়। সত্যি কথা বলতে কী, সর্বাঙ্গে লোম তার। এমনকী আঙুলের গাঁটগুলোও লোমে ভরা।
কে ওটা? রবিন ফিসফিস করে জানতে চাইল।
ত্যাগ করল মুসা।
হয়তো আরেকজন রেঞ্জার।
হ্যাটটা সুন্দর, ঠাট্টা করে বলল কিশোর। লম্বা, লোমশ লোকটির মাথায় পেল্লায় এক হ্যাট। কাউবয়রা যে ধরনের হ্যাট পরে।
ওটাকে দশ-গ্যালন হ্যাট বলে, ব্যাখ্যা করল রবিন।
আমার মনে হচ্ছে সাড়ে সাতশো গ্যালন, বলল কিশোর।
জঙ্গল এতটাই ঘন লোকটাকে আসতে দেখিনি, ডানা ফিসফিস করে বলল।
আমরা এরকম একটা লোককে মিস করলাম কীভাবে? প্রশ্ন। করল রবিন। ও তো ক্রিসমাস ট্রীর সমান! কথাটা সত্যি, গাছের নীচ দিয়ে হাঁটার সময় মাথা নোয়াতে হয় লোকটিকে।

ও মনে হয় টেক্সাস থেকে এসেছে, মৃদু গলায় বলল ডানা। শুনেছি ওখানে নাকি সব কিছুই বড় বড়। মাথা নোয়াতে নোয়াতে লোকটা কুঁজো হয়ে গেছে।
আগন্তুক সোজা ওদের দিকে হেঁটে এল।
চার বন্ধুর কাছ থেকে কফুট দূরে দাঁড়িয়ে পড়ল সে।
শুনলাম তোমাদের ক্লাস নাকি গাড়ি-প্লেনের আগে প্রকৃতি কেমন ছিল জানতে চায়, গর্জে উঠল লোকটা। তোমাদের রেঞ্জারকে দেখলাম সটকে পড়ল, কাজেই আমি তোমাদেরকে আগেকার মানুষের জীবন সম্পর্কে জানাতে চাই। আমরা নাচ দিয়ে শুরু করব।
ডানা একটা হাত তুললে লোকটা ভ্রু কুঁচকে চাইল।
কী চাও তুমি? ঘাউ করে উঠল।
আপনার নামটা তো জানা হলো না, বলল ডানা।
নাম? থতমত খেল বিশালদেহী।
হ্যাঁ আমরা আপনাকে কী বলে ডাকব? ডানা জিজ্ঞেস করল।
লোমশ চিবুক ঘষে মুহূর্তের বিরতি নিল সে। ছেলে-মেয়েরা পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। এবার জবাব দিল লোকটা।
স্কোয়াশ, শেষমেশ গর্জে উঠল। মিস্টার স্কোয়াশ। এখন শেল্টারে যাও
আমরা দলে দলে ভাগ হব।
ছেলে-মেয়েরা হনহন করে খোলা বিল্ডিংটার দিকে পা চালাল। দাঁড়িয়ে রইল শুধু কিশোর। ওর দৃষ্টি স্থির মি. স্কোয়াশের পিঠে।
চলে এসো, রবিন গলা ছেড়ে বলল কিশোরকে।
কিশোর জবাব দিল না। একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে।
এসো, রবিন বলল আবারও, ফিরে এসে কিশোরের বাহু ধরে টানল।
কিশোর ঢোক গিলে রবিনের দিকে চাইল।
মিস্টার স্কোয়াশের মধ্যে অদ্ভুত কিছু একটা আছে, বলল ও।
জানি, বলল রবিন। কত দিন গোসল করে না কে জানে।
উঁহু, অন্য কিছু, বন্ধুকে বলল কিশোর।
কী?
ঠিক জানি না, বলল কিশোর। কিন্তু জানতে হবে!
মি. স্কোয়াশ একটা মাইক্রোফোন তুলে নিয়ে কথা বলল। তার। কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হলো পাহাড়ে।
তোমরা এখান থেকে যাওয়ার আগে অতীতের জীবনযাত্রা সম্পর্কে জানতে পারবে, ছেলে-মেয়েদেরকে বলল সে।

একটা টেপ প্লেয়ার চালু করল মি. স্কোয়াশ। লাউডস্পিকার। ফাটিয়ে ফেলল ফিডল মিউজিক।
আগে একটু স্কয়্যার নাচ হয়ে যাক, মাইক্রোফোনে চেঁচাল মি. স্কোয়াশ। সবাই একজন পার্টনার খুঁজে নিয়ে ঘুরতে থাকো।
ছেলে-মেয়েরা পার্টনার খুঁজে নিতে ব্যস্ত হলো। মি. স্কোয়াশ এবার নাচটা ওদেরকে শিখিয়ে দিল।
মি. স্কোয়াশ বড় এক বৃত্ত ঘিরে ছেলে-মেয়েদেরকে জড় করল, আরও কিছু স্টেপ যাতে শিখিয়ে দিতে পারে।

.
নাচ শেষে তিন বন্ধু আর ডানা হেমলক গাছটার নীচে বসে লেমোনেড পান করছিল। মি. স্কোয়াশ, মিসেস হকিন্স আর ক্লাসের অন্যান্যরা। রয়েছে শেল্টারে।
মিস্টার স্কোয়াশের পা দুটো কী বিশাল বাপরে বাপ, বলল কিশোর। আমার ধারণা লোকটা বিগফুট।
হেসে উঠল মুসা।
নাচতে গিয়ে তোমার মাথা ঘুরে গেছে, বলল ও। ।
লোকটা যখন হাসল তখন ওর দাঁতগুলো দেখনি? বলল কিশোর। হাল ছাড়ার পাত্র নয় সে।
মানলাম দাঁতগুলো হলদেটে, বলল ডানা। কিন্তু তাতে কী? হয়তো ডেন্টিস্টের কাছে যাওয়ার পয়সা নেই বেচারার।
হয়তো ডেন্টিস্টকে ও খেয়ে ফেলেছে, বাতলে দিল কিশোর।
সবাই জানে বিগফুটের বড় বড় হলুদ দাঁত থাকে। ঠিক মিস্টার
স্কোয়াশের মত।
হতে পারে। কিন্তু আমি শিয়োর বিগফুট পাহাড়ে স্কয়্যার ড্যান্স করে না, বলল রবিন।
রবিন ঠিকই বলেছে, বলল মুসা। মিস্টার স্কোয়াশের দুটো পা হয়তো বিশাল, কিন্তু তাতেই সে দানব হয়ে যায় না।
কিশোর শেল্টারের দিকে চকিতে চাইল। মি. স্কোয়াশ এক কোণে বসে ছেলে-মেয়েদের লেমোনেড পান করা দেখছে।
বিশ্বাস করতে না চাইলে কোরো না, বন্ধুদেরকে বলল কিশোর।
কিন্তু বিগফুট যখন গ্রীন হিলসে দাপিয়ে বেড়াবে তখন মজা টের পাবে!
দিন শেষে ছেলে-মেয়েরা ক্লান্ত হয়ে পড়ল। রুবি মাউন্টেনে ওদের ফিল্ড ট্রিপ প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। মিসেস হকিন্স ছাত্র-ছাত্রীদের মাথা গুনছেন! কিশোর চেয়ে চেয়ে দেখছে মি. স্কোয়াশকে। লোকটা এক গাছের নীচে দাঁড়িয়ে বনভূমির দিকে

চেয়ে রয়েছে। ভাবখানা এমন যেন কিছু শুনতে পেয়েছে। এবার এক ছুটে পিকনিক শেল্টারের পিছনে গিয়ে হারিয়ে গেল গাছের জটলার ওপাশে।
দেখো, বলে রবিনকে আঙুল দিয়ে খোঁচা দিল কিশোর। বিগফুট উধাও হয়ে গেল!
বিদায় পর্যন্ত নিল না, রবিন বলল।
তাকে গিয়ে আমাদের জানানো দরকার আমরা কতটা এনজয় করেছি, বলল ডানা। কিন্তু সে সময় ওরা পেল না, কেননা রেঞ্জার পপি শিস দিতে দিতে ট্রেইল ধরে এগিয়ে এলেন। ওদেরকে পিকনিক শেল্টারের কাছে দেখে মৃদু হাসি ফুটল তাঁর মুখে।
আমি ভেবেছিলাম আপনারা চলে গেছেন বুঝি, মিসেস হকিন্সকে বললেন তিনি।
মিসেস হকিন্স তার আধো হাসিটা হাসলেন।
আমরা স্কয়্যার ড্যান্স শিখতে ব্যস্ত ছিলাম, তবে এখন যাওয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছি।
স্কয়্যার ড্যান্স দারুণ জিনিস, সায় জানালেন রেঞ্জার পপি।
রুবি মাউন্টেনে আরও স্কয়্যার ড্যান্স হওয়া উচিত। ব্যাকপ্যাক আর ক্যামেরা নামিয়ে রেখে বাসে একটা কুলার তুলতে সাহয্য করলেন। কজন ছেলে-মেয়েকে।
কিশোর রেঞ্জার পপির ক্যামেরাটা ইশারায় দেখাল।
যা খুঁজছিলেন পেয়েছেন? জবাব চাইল ও।
না, বললেন মহিলা। একটুর জন্যে মিস করেছি।
কিশোর তাঁকে আরও প্রশ্ন করতে চেয়েছিল, কিন্তু মিসেস হকিন্স ওর কাঁধে হাত রাখলেন। টিচারের লম্বা, সবুজ নখগুলো দেখে পিছিয়ে গেল ও। হনহন করে পা চালিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে যোগ দিল। বাসে ওঠার জন্য।
আমি ক্লান্ত, ওরা বসার পর অভিযোগ করল ডানা।
আমিও, বলল রবিন। তবে আমার ভাল লেগেছে। অনেক কিছু জানতে পারলাম।
মাথা ঝাঁকাল মুসা।
মিস্টার স্কোয়াশ অতীতের অনেক কিছু জানে। জুলিকে বলছিল শুনলাম সে নাকি ওয়েস্ট কোস্টের গহীন পাহাড়ে থাকত।
কিশোর বিনাবাক্যব্যয়ে রবিনের পাশে বসে পড়ল। চারপাশে ছেলে-মেয়েরা ব্যাকপ্যাক রেখে যার যার আসনে বসছে।
আমাকে জানালার পাশে বসতে দেবে? মুসাকে জিজ্ঞেস করল ডানা।
তুমি তো সব সময় জানালার পাশে বসো, অভিযোগ করল মুসা। আমাকে একবার অন্তত বসতে দাও।
ওকে জানালার পাশে বসতে দাও, নইলে বমি করে ভাসাবে, বলল কিশোর।
মুসা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ডানাকে খোলা জানালার পাশে বসার সুযোগ করে দিল। বাসটা মেটে রাস্তার উপর দিয়ে চড়-চড় শব্দ তুলে রওনা দিলে জানালা দিয়ে

বাইরে চোখ রাখল ডানা। রুবি মাউন্টেনের কাছ থেকে ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে ওরা।
ওরা বেশি দূর যায়নি এসময় ডানা সিধে হয়ে বসে আর্তচিৎকার ছাড়ল।
ওই যে একটা বুনো জন্তু!
মুসা উঠে দাঁড়াল। জানালা দিয়ে চোখ রাখল আঁধার ঘনিয়ে আসা জঙ্গলের দিকে।
কয়োটি নাকি? প্রশ্ন করল। না, ডানা শ্বাসের ফাঁকে বলল। কয়োটির চাইতে বড়। অনেক
হরিণ হতে পারে, বলল রবিন।
মাথা নাড়ল ডানা।
না, সারা গায়ে লোম। দুপায়ে দৌড়াচ্ছিল।
তা হলে ভালুক হবে, সিদ্ধান্তে পৌঁছল মুসা।
কই, আমি তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, বলল জুলি। ছেলে মেয়েরা সবাই গাছ-পালার দিকে উঁকি দিল। শুধু কিশোর ঠায় বসে রইল। তাকানোর প্রয়োজন বোধ করছে না সে।
তুমি দেখবে না? মুসার প্রশ্ন।
দেখার দরকার নেই, মৃদু কণ্ঠে বলল কিশোর। আমি জানি ওটা কী!
খাইছে, কিশোরের কী যেন হয়েছে, মুসা রবিন আর ডানাকে শনিবারদিন কথাটা বলল। রুবি মাউন্টেন থেকে গতকাল ঘুরে এসেছে ওরা। এখন স্কুলের খেলার মাঠে জড় হয়েছে। বড় ওক গাছটার নীচে।
কী হয়েছে? প্রশ্ন করল রবিন।
ওকে একটু আগে দেখলাম গ্রীন হিলস লাইব্রেরিতে ঢুকতে, বন্ধুদেরকে জানাল মুসা।
বলো কী! এক সঙ্গে বলে উঠল রবিন আর ডানা। শনিবার সকালে লাইব্রেরিতে যাওয়ার বান্দা তো কিশোর নয়।
সাথে এক গাদা বইও ছিল, বলল মুসা।
দেখতে হচ্ছে, বলল রবিন। ওর ওপর চোখ রাখব আমরা।
ওরা তিনজন খেলার মাঠ আড়াআড়ি পেরিয়ে লাইব্রেরির দিকে ছুটল। সহকারী লাইব্রেরিয়ান মি. লিসেকে সন্তর্পণে পাশ কাটিয়ে নন ফিকশন সেকশনে চলে এল ওরা।
ওই যে কিশোর, ফিসফিস করে বলল মুসা। বড় বড় বই নিয়ে লম্বা এক কাঠের টেবিলে বসা কিশোর। রবিন, মুসা আর ডানা এক শেলফের আড়াল নিতেই

ফটাস করে একটা বই বন্ধু করল। গোয়েন্দাপ্রধান। ওরা আবার যখন উঁকি দিল, কিশোর আরেকটা বই খুলেছে।
দেখি ও কী করছে, ফিসফিস করে বলল ডানা, বন্ধুরা ওকে থামাতে পারার আগেই হামাগুড়ির ভঙ্গিতে মেঝেতে বসে পড়ল ও। এবার নিঃশব্দে, একটু একটু করে কিশোরের পিছনে গিয়ে হাজির হলো। কিশোর কী পড়ছে দেখার জন্য ওর কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি দিল।
ইতোমধ্যে মুসা আর রবিনও গোপন স্থান থেকে পা টিপে টিপে বেরিয়ে এসেছে। কিশোরের হাত থেকে বইটা এক টানে ছিনিয়ে নিল মুসা। বইটার নাম: দ্য বিগ ফুট মনস্টার।
তুমি এখনও এসব আজগুবী ব্যাপার নিয়ে পড়ে আছ? মুসা বলল।
আজগুবি নয়, বলল কিশোর। প্রমাণ। বিগফুট সত্যিই আছে!
বিগ ফুট দেখা গেছে এরকম এক তালিকায় আঙুল নামিয়ে আনল রবিন।
প্রায় সব স্টেটে বিগ ফুট দেখা গেছে, মৃদু কণ্ঠে বলল সে।
মাথা ঝাঁকাল কিশোর।
এই বইতে বলছে বিগফুট দানবরা বসবাসের জন্যে নতুন জায়গা খুঁজছে, কেননা নগরায়নের ফলে আশ্রয় হারাচ্ছে তারা। ওরা। খুব লাজুক ধরনের হয়, তাই নির্জন কোন পাহাড়ের সন্ধানে দুনিয়া। চষে বেড়াচ্ছে।
এটা দেখো, মুসা এক ডজন নামের একটি তালিকা ইঙ্গিত করল। এগুলো গ্রীন হিলস থেকে বেশি দূরে নয়।
হ্যাঁ, বিগ ফুট আমাদের আশপাশেই আছে, বলল কিশোর। কোমরে দুহাত রাখল ডানা।
মিস্টার স্কোয়াশ বিশালদেহী আর তার দাঁতগুলো হলদেটে বলেই তুমি তাকে যা খুশি বলতে পারো না।
মাথা ঝাঁকাল কিশোর।
আমি তো তাকে গালি দিচ্ছি না। শুধু বলতে চাইছি মিস্টার স্কোয়াশই বিগ ফুট।
বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে, মুসা বলল কিশোরকে। বিগ ফুট কাল্পনিক জীব। এই তালিকাটাও বানোয়াট।
টেবিলে দুম করে কিল বসাল কিশোর।
এত এত লোক মিথ্যে বলতে যাবে কোন দুঃখে? কেউ কেউ বিগফুটের অস্তিত্ব সম্পর্কে এতটাই নিশ্চিত যে তারা বিগ ফুটের খোঁজে জীবন পার করে দিচ্ছে। প্রথম যে কাছ থেকে বিগ ফুটের ছবি নিতে পারবে সে বিখ্যাত এবং বড়লোক হয়ে যাবে। বিগ ফুটের দেখা পেলে কোথায় ফোন করতে হবে সে নম্বরও দেয়া আছে। এখানে।

এই নম্বর পাগলদের জন্যে, নরম গলায় বলল নথি।
আমি পাগল নই। এবং সেটা তোমাদের কাছে প্রমাণ করে। ছাড়ব, বলে উঠল কিশোর।
বইটা থেকে পড়তে শুরু করল ও।
বিগ ফুট বাদামী কিংবা কালো লোমে ঢাকা লম্বা এক প্রাণী।
মিস্টার স্কোয়াশের সাথে খানিকটা মিলছে, স্বীকার করল ডানা। কিশোর পড়ে চলল।
বিগ ফুটের গায়ে ভয়ানক দুর্গন্ধ, অনেকটা স্কাঙ্কের মত। আমরা বিশ্রী একটা গন্ধ পেয়েছিলাম, মনে করিয়ে দিল মুসা।
এতেই শেষ নয়, বলল কিশোর। বিগফুটের আরেকটা পরিচিত নাম হচ্ছে সাসকোয়াচ।
শুনতে স্কোয়াশের মত লাগছে, বলে শ্বাস চাপল ডানা।
ঠিক, বলল কিশোর। আরও আছে। এই বইতে তাদের ছবি আছে যারা বিগ ফুটকে দেখেছে।
ওসব ছবিতে কিছু প্রমাণ হয় না, তর্কের সুরে বলল রবিন।
হয় যদি তাদের কাউকে তুমি চেনো, বলল কিশোর। কয়েক পাতা উল্টে অস্পষ্ট এক ছবি বের করল ও। এবার বন্ধুদেরকে দেখাল। সাদায়-কালোয় রেঞ্জার পপি। উনি বিগ ফুট ধরতে গ্রীন হিলসে আছেন।
আমি তারপরও বিশ্বাস করি না, বলল মুসা। আর বিগ ফুট যদি সত্যি সত্যি রুবি মাউন্টেনে ঘাঁটি গেড়ে থাকে তো আমরা কী করব?
আমাদের করার কাজ একটাই আছে, বলল কিশোর। বুক ভরে শ্বাস নিয়ে ধীরে ধীরে বলল, আমরা বিগফুটকে পাকড়াও করব!
কী বলছ এসব উল্টো পাল্টা? লাইব্রেরি ত্যাগ করার সময় বলল মুসা। বিগ ফুট বলে যদি কিছু থাকে, তো সে এক কামড়ে আমাদের সাবাড় করে দেবে।
মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল ডানা।
মুসা ঠিক বলেছে।
আমরা আবার রুবি মাউন্টেনে যাব, ব্যাখ্যা করল কিশোর। একমাত্র তা হলেই প্রমাণ হবে মিস্টার স্কোয়াশ আসলেই বিগফুট।
রবিন শরীরের ভর এক পা থেকে অন্য পায়ে বদলে নিল।
শোনো, আমি বিগ ফুটে বিশ্বাস করি না, বলল ও। কিন্তু এভাবে রুবি মাউন্টেনে যাওয়াটা আমাদের ঠিক হবে না। ভালুক-টালুক কিংবা অন্য কোন বুনো জন্তু আক্রমণ করতে পারে।
ডানা মাথা ঝাঁকাল। চোখ ছানাবড়া।

চলে আসার সময় কিছু একটা দেখেছি আমি। বিশালদেহী। আমার ধারণা জন্তুটা বিপজ্জনক।
খাইছে, আমাদের আস্ত গিলে খাবে, বলল মুসা।
কিশোর ওর ব্যাকপ্যাক তুলে ধরল বন্ধুদের দেখানোর জন্য।
বিগ ফুট ধরতে যা যা লাগে সব আছে এখানে।
কী? অ্যাটম বোমা? রবিনের প্রশ্ন।
চাচার ক্যামেরা। লোড করা আছে। বিগ ফুটের ছবি তুলব আমরা, জানাল কিশোর।
আমাদের ওখানে যাওয়া ঠিক হবে না, বলল মুসা।
ব্যাকপ্যাক পিঠে ঝুলিয়ে নিয়ে সরাসরি মুসার চোখে চোখ রাখল কিশোর।
তুমি না বলেছিলে রুবি মাউন্টেন তোমার বাসার ব্যাকইয়ার্ডের মত নিরাপদ?
শ্রাগ করল মুসা।
তখন তো বিগ ফুটের প্রসঙ্গ আসেনি।
আর আমিও তখন বুনো জন্তুটাকে দেখিনি, ডানা বলল কিশোরকে।
কিশোর বাস স্টপের দিকে হাঁটা দিল।
সেই বুনো জন্তুটাই বিগফুট, আমি যার ছবি তুলতে যাচ্ছি।
তুমি কিন্তু মারা পড়বে, সাবধান করল রবিন।
একা একা ওখানে যাওয়াটা খুব বিপজ্জনক হবে, সতর্ক করল মুসা।
ওর দিকে চাইল কিশোর।
কে বলল একা যাচ্ছি? বলল ও। তোমরাও যাচ্ছ আমার সাথে!
তিন বন্ধু আর ডানা রুবি মাউন্টেনের গোড়ায় সিটি বাস থেকে নেমে পড়ল।
তোমরা ঠিক জান তো এখানেই নামবে? বাস ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল। আমি কিন্তু ছটার আগে ফিরছি না। তখন কিন্তু আঁধার হয়ে যাবে।
কোন অসুবিধা নেই, ড্রাইভারকে বলল কিশোর। আমরা ছটার সময়ই ফিরব।
ড্রাইভার শ্রাগ করে বাস চালু করল। এ মুহূর্তে রুবি মাউন্টেনে যাওয়ার মেটে সংযোগ রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে ছেলে মেয়েরা। জঙ্গলে একটা পাখি ক্য-ক্য করে ডেকে উঠলে আঁতকে উঠল ডানা।
ইস, কেন যে এলাম! কিশোরকে উদ্দেশ্য করে বলল ও।
বিগফুটের ছবি নেয়ার পর তোমার আর আফসোস থাকবে না, বলল কিশোর। ব্যাকপ্যাক থেকে ক্যামেরা বের করে গলায় ঝুলাল। চলো, শেল্টারের দিকে যাই।
বাহ, ক্যামেরাটা সুন্দর তো। কীভাবে ব্যবহার করে জানো? প্রশ্ন করল রবিন।
মুখের চেহারা লাল হয়ে গেল কিশোরের।
অবশ্যই জানি। চাচা গত সামারে শিখিয়ে দিয়েছে।

ছেলে-মেয়েরা রাস্তা ধরে এগোল। শেল্টারের উল্টোদিকে গাছের এক জটলার আড়ালে সেঁধিয়ে পড়ল। অপেক্ষা করছে বিগফুটের জন্য।
অপেক্ষার প্রহর যেন আর ফুরোয় না। মৌমাছি ভনভন করছে, মশা কামড়াচ্ছে।
উফ, খেয়ে ফেলল! বলে শরীর মোচড়াল ডানা।
খুশি থাকো যে বিগফুট তোমার পায়ের পাতা চিবিয়ে খাচ্ছে না, বলল মুসা।
আউচ, ডানা মশার কামড় খেয়ে ককিয়ে উঠে লাফিয়ে পড়ল। কিশোরের সামনে।
আর পারছি না।
কিশোর ডানার মুখে হাত চাপা দিল।
চুপ না করলে আমার কামড় খাবে, বলল ও। বিগফুট আওয়াজ পেলে আর সামনে আসবে না। চুপচাপ বসে থাকো। আমার সামনে থেকে সরো।
ডানা কিশোরের সামনে ঝুঁকে বসে স্থির থাকার চেষ্টা করল। কাজটা সহজ হলো না। চারদিকে পোকা-মাকড়। তা ছাড়া আঁধার ঘনাচ্ছে। বিশাল এক মাকড়সা ওর জুতোর ডগা লক্ষ্য করে এগোলে ঢোক গিলল ও।
বাপরে, অস্ফুটে বলে উঠল ডানা। দেখো।
কিশোর মাথা ঝাঁকিয়ে ক্যামেরা তাক করল। শেল্টারের ওপাশে কটা গাছের দিকে নজর ওর। লোমশ, বিশালকায় এক অবয়ব ওদের দিকে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে।
ওই যে বিগফুট, ফিসফিস করে বলল কিশোর। এবার একের পর এক ছবি নিতে লাগল।
এটাকে সরাও! ডানা গুঙিয়ে উঠে লাফ দিল।
সামনে থেকে সরো, হিসিয়ে উঠল কিশোর। ও ছবি নিচ্ছে আর ডানা ক্রমাগত চেঁচিয়েই যাচ্ছে।
সরাও না! চেঁচিয়ে উঠে শূন্যে পা ছুঁড়তে লাগল ডানা। ওর সাদা জুতো আঁকড়ে ধরে রয়েছে লোমশ মাকড়সাটা।
কী হয়েছে তোমার? ফিসফিস করে প্রশ্ন করল মুসা। তুমি কি চাও বিগ ফুট আমাদের দেখে ফেলুক?
জুতোটা আঙুল ইশারায় দেখাল ডানা। আরেকটু হলেই কেঁদে ফেলবে।
এটাকে ফেলো নইলে আমাকে কামড়াবে!
মাকড়সাটাকে এক ঝলক দেখে নিয়ে চোখ ঘুরাল মুসা। তারপর টু শব্দটি না করে এক ঝটকায় জুতোর উপর থেকে ফেলে দিল।
গেছে, বলল মুসা।
হ্যাঁ, গেছে, সায় জানাল রবিন। বনভূমির যেখানটায় দাঁড়িয়ে ছিল লোমশ জানোয়ারটা সেদিকে ভ্রূ দেখাল। গাছ-পালা ছাড়া এখানে এখন আর কিছু নেই।

ছোট এক মাকড়সাকে এত ভয়! তোমার চেঁচানিতে বিগ ফুট ভয় পেয়ে পালিয়েছে, ডানাকে বলল মুসা।
ওটা ছোট হলো? ডানা তীক্ষ্ণস্বরে চেঁচিয়ে উঠল। আস্ত গ্রীন হিলসের সমান।
কাজ হয়ে গেছে, বলল কিশোর। প্রমাণ এখন আমাদের কাছে।
রেডিয়াম ঘড়ি দেখে নিল রবিন।
এখনই না গেলে বাস মিস করব, বন্ধুদেরকে বলল ও।
এসো, বলল মুসা। মেটে রাস্তাটা ধরে দৌড় দিল বাস স্টপের উদ্দেশে। বন্ধুরা ওর পিছু নিল।
পোকার কামড় খেয়ে জান শেষ, অভিযোগ করল ডানা। ভীষণ জ্বলুনি হচ্ছে।
পিছনে দেখো, হঠাৎই বলে উঠল রবিন। কাঁধের উপর দিয়ে চাইল ওরা চারজন। মি. স্কোয়াশ দানবীয় পা পেলে তেড়ে আসছে। ওদের দিকে। মাথায় কাউবয় হ্যাট চোখে খেপাটে দৃষ্টি।
মুসা সবার আগে বাসটাকে দেখতে পেল।
দাঁড়ান! চিৎকার করল ও। বাস থামানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। ওরা যখন মেটে রাস্তাটার শেষ প্রান্তে, এসময় বাসটা গোঁ গোঁ করে রওনা হয়ে গেল।
আমরা রুবি মাউন্টেনে আটকা পড়ে গেছি! আর্তনাদ ছাড়ল রবিন।
আমরা খতম, বলল কিশোর।
এখনই না, চেঁচাল মুসা। দৌড়াও!
মুসা, ডানা, রবিন আর কিশোর বাসের পিছন পিছন দৌড় দিল।
দাঁড়ান! চেঁচাল ওরা। রাস্তার এক বাঁক ঘুরল। আরেকটু হলেই সিটি বাসটার পিছনে ধাক্কা খেত ওরা।
আমি ভেবেছিলাম তোমরা হিচ হাইকিং করে শহরে ফিরে গেছ, ওরা বাসে উঠলে বলল ড্রাইভার। ভাগ্যিস একজন প্যাসেঞ্জার তোমাদের হাত নাড়া দেখতে পেয়েছিল।
ডানা হাঁফাচ্ছে দস্তুর মত, একটা সিটে নেতিয়ে পড়ল।
থেমেছেন বলে ধন্যবাদ, বলল ও।
আপনি আমাদের জীবন বাঁচিয়েছেন! ড্রাইভারকে বলল রবিন। পিছনের জানালা দিয়ে চাইল ও। দেখতে পেল মি. স্কোয়াশ রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে।
বাস সগর্জনে বড় রাস্তা ধরে গ্রীন হিলসের দিকে ছুটে চলল। কিশোর ওর ক্যামেরা শক্ত করে চেপে ধরে আছে, কিন্তু কেউ কোন কথা বলল না, যতক্ষণ পর্যন্ত রুবি মাউন্টেন আর মি. স্কোয়াশ দৃষ্টিসীমার আড়াল না হলো।
.

পরদিন সকাল। স্কুল বসার আগে ওরা ডেনভারস ডিপার্টমেন্ট স্টোরে মিলিত হলো। ছবি ভর্তি এক খাম কিশোরের হাতে।
এখানে আছে আমাদের প্রমাণ, বলল ও।
দেখি, বলল মুসা।
কিশোর খামটা খুলল, কিন্তু কেউ একজন পিছন থেকে ওর চেপে ধরল।
কিশোর চোখ তুলে চাইতেই রেঞ্জার পপির ক্রুদ্ধ মুখের চেহারা দেখতে পেল।
বাস ড্রাইভারের কাছে শুনলাম তোমরা রুবি মাউন্টেনে গিয়েছিলে। ওখানে কী করতে গিয়েছিলে? প্রশ্ন করলেন।
বিরাট ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছ তোমরা। ওখানে বুনো জীব-জন্তু ঘুরে বেড়ায়।
কিশোর রেঞ্জার পপির হাত থেকে ছুটে খামটা তুলে ধরল।
ওখানকার বুনো জীব-জন্তুদের সম্পর্কে আমরা সবই জানি। এ ও জানি আপনি পালের গোদাটাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু আমরা আগে ওটাকে খুঁজে পেয়েছি। এই ছবিগুলো তার প্রমাণ। মিস্টার স্কোয়াশ ইতিহাস হয়ে যাবে!
কপাল কুঁচকে গেল রেঞ্জার পপির।
তুমি কী বলছ কিছুই বুঝতে পারছি না, বললেন তিনি। বোঝার মত সময়ও নেই, কারণ আমাকে একজন স্কয়্যার নাচ জানা। টিচারের খোঁজ বের করতে হবে।
মিস্টার স্কোয়াশকে নিন না, বলল ডানা।
রেঞ্জার পপিকে বিভ্রান্ত দেখাল।
আমি কোন স্কোয়াশকে চিনি না, যে ছিল সে দুমাস আগে চলে গেছে।
কিশোর বন্ধুদের দিকে চেয়ে
উঁচু করল। কোমরে হাত রাখলেন রেঞ্জার পপি।
বড় কেউ সাথে না থাকলে আর কখনও রুবি মাউন্টেন যাবে। না। বড় ধরনের বিপদ ঘটে যেতে পারে।
রেঞ্জার পপি চলে না যাওয়া অবধি অপেক্ষা করল কিশোর। ওর মুখে অলিম্পিক সোনা জয়ের হাসি।
উনি বিগফুটের খোঁজ করছেন, কিন্তু দেখা পাননি। আমরা পেয়েছি। এই যে প্রমাণ।
আমার কাছে দাও, বলল রবিন। খামটা ছিনিয়ে নিল কিশোরের হাত থেকে। এবার বিনাবাক্যব্যয়ে ছবিগুলো দেখে চলল একটার পর একটা।
বিগ ফুটের ছবি পেলে? মুসার প্রশ্ন।
মাথা নাড়ল রবিন।
একটা ফুটের ছবি তো বটেই। ডানার পায়ের ছবি!

কী? চেঁচিয়ে উঠে ছবিগুলো ছোঁ মেরে কেড়ে নিল কিশোর। ওগুলো এক ঝলকে দেখে নিয়ে জ্বলন্ত চোখে ডানার দিকে চাইল। তোমাকে বলেছিলাম না সামনে থেকে সরতে? খেঁকিয়ে উঠল।
উপস, বলল ডানা। আমিই মনে হচ্ছে গ্রীন হিলসের একমাত্র বিগফুট!
খাইছে, প্রমাণ হলো রুবি মাউন্টেনে বিগ ফুট-টুট বলে কিছু নেই, বলল মুসা।
হাজার হলেও বিগফুট স্কয়্যার নাচ নাচে না, খিল খিল করে হেসে বলল ডানা।
হেসে উঠল রবিন।
কিশোরও না!
***

তিন গোয়েন্দা ভলিউম ১১৫/২ – ভুতুড়ে বর্ম – শামসুদ্দীন নওয়াব – সেবা প্রকাশনী – প্রথম প্রকাশ : ২০১০

টিপু কিবরিয়া রচিত বিপজ্জনক বর্ম কাহিনিটিকে তিন গোয়েন্দায় রূপান্তর করেছেন শামসুদ্দীন নওয়াব।

ঠিক জমল না, বলল কিশোর। পিছিয়ে গেল।

মানুষটার দেহ গিলোটিনের সামনে হাঁটু মুড়ে আছে। ওদিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে কিশোর। মানুষটার দুহাত পিছমোড়া করে বাধা। কয়েক ফুট দূরে মেঝেতে গড়াগড়ি করছে কাটা মাথাটা।

কাটা গলা থেকে আরও রক্ত পড়া উচিত না?

অন্তঃসার শূন্য দুচোখ সরাসরি কিশোরের দিকে চেয়ে আছে। স্থির। হাঁ হয়ে আছে মুখ। তীব্র আতঙ্কে আর্তনাদ করে ওঠার মুহূর্তে মারা গেছে লোকটা।

পুরো জমল না, বলল কিশোর। রোমাঞ্চিত হইনি আমি।

ঠিক বলেছ, কিশোর, মোমের ডামির উপর আরও রক্ত ঢালতে ঢালতে বলল হ্যাগার্ড।

গিলোটিনের তীক্ষ্ণধার স্টিলের ব্লেড বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় চটচটে লাল তরল ঝরতে লাগল।

এবার হয়েছে! বলল কিশোর। সত্যিই কিন্তু একটু ভয় ভয় লাগছে! দারুণ!

ও-য়া-ক! গলা টানল জিনা।

স্কুল ছুটি, রকি বিচ পাবলিক লাইব্রেরিতে পার্ট টাইম চাকরি করে বলে গোবেল বিচে আসতে পারেনি রবিন। খামারবাড়ির কাজে ব্যস্ত মুসা। জিনার বাড়িতে আসবার কথা ছিল, শেষে একাই চলে এসেছে। কিশোর। কদিন বেড়িয়ে যাবে।

চুপচাপ ছিল বলে জিনার কথা ভুলেই গিয়েছিল কিশোর। পুরানো মমির বাক্সটার উপর বসে আছে ও। ভুতুড়ে বর্ম

একবছর বয়সী বাদামি রঙের মাংগ্রল, লম্বা-লেজ রাফিয়ান জিনার পায়ের কাছে বসেছে। ভউ, হউ-হউ, হুফ বলে হঠাৎ জিনার হাত চেটে দিল। যেন বলতে চাইল: আমিও তোমার সঙ্গে একমত।

উঠে দাঁড়াল জিনা। কিশোরের উদ্দেশে বলল, তোমাদের নিয়ে আর পারা গেল না! এ কোন খেলা বলো তো! এমন বিচ্ছিরি কাণ্ডের মধ্যে দারুণের কী দেখলে?

ঝাঁঝের সাথে বলল, ইস, নকল রক্ত ঢেলে ডামিটার কী বাজে অবস্থা করেছে! ওটাকে… ওটাকে…

এইমাত্র ঘরে ঢুকেছেন হ্যারিসন জোনাথন পারকার, জিনার বাবা। বললেন, একেবারে বাস্তব লাগছে কিন্তু!

মমিগুলো ঝাড়পোছ করছিলেন তিনি। দ্যমাকড়সার জাল, ঝুল লেগে আছে জামা-কাপড়ে। মাথা চুল ধুলো-ময়লায় একাকার
গিলোটিনের কাছে এসে দাঁড়ালেন তিনি। তীক্ষ্ণ চোখে কয়েক মুহূর্ত দেখলেন মুণ্ডুহীন ধড়টাকে। একটু একটু করে প্রশংসার হাসি ফুটছে তার ঠোঁটে। দারুণ হয়েছে! প্রশংসা করতেই হয়।
হ্যাগার্ড জাদুঘরের দারোয়ান কাম কেয়ারটেকারের চাকরিটা মনপ্রাণ দিয়ে করছে, মুখে গর্বের হাসি ফুটল তার।
মিস্টার পারকার বুড়ো আঙুল উঁচিয়ে বিলেতি কায়দায় আরেকবার নীরব প্রশংসা করলেন কিশোর ও হ্যাগার্ডের। বললেন, তবে আরেকটু রক্ত ঢাললে দেখতে আরও দারুণ হবে।
প্লাস্টিকের বোতলটা তুলে নিলেন। ছিপি খুলে ডামির ছিন্ন মুণ্ডুতে আরও খানিকটা রক্ত ঢাললেন। কাজ শেষ করে সন্তুষ্ট ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, হ্যাঁ, এইবার হয়েছে। হঠাৎ দেখলে যে-কারও পিলে চমকে যাবে।
ঠিক বলেছেন, আঙ্কেল, কিশোর হাসল।
ওদিকে জিনা নিচু স্বরে বিড়বিড় করে কী যেন বলল।
মিস্টার পারকার ভ্রু কুঁচকে তাকালেন মেয়ের দিকে। ভুলে যাচ্ছ। কেন, এ-ধরনের জাদুঘরের এসবই মূল আকর্ষণ। এগুলো দেখে মানুষ যদি ভয়ই না পেল, আমাদের এত খাটুনি মাঠে মারা যাবে না? নকল রক্ত লেগে আছে মিস্টার পারকারের হাতে। গাল চুলকালেন।
রক্তমাখা ডামি দেখে যতটা ভয় লাগছে, তার চেয়ে জ্যান্ত মানুষের রক্তমাখা মুখ অনেক বেশি ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে।
ভৌতিক জাদুঘরে নানান ভৌতিক দৃশ্যের ব্যবস্থা করতে হয়, বললেন। তবেই খুশি হবে সবাই। আমাদের এই গোবেল বিচে দূর দূরান্ত থেকে আসবে মানুষ।
মিস্টার পারকার বিজ্ঞান চর্চা ও গবেষণার ফাঁকে জাদুঘর চালাবেন ঠিক করেছেন। মাস দেড়েক আগে আমেরিকার চেম্বারস অভ হররস-এর আদলে গোবেল বিচে একটা জাদুঘর খোলার শখ। চাপল তার মাথায়। একজন কেয়ারটেকারের জন্য কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেন। লস অ্যাঞ্জেলেসের বিভিন্ন জায়গা থেকে অনেক লোক ইন্টারভিউ দিতে এল। শেষমেশ পাইন বিচ-এর লোক হেনরি রব। হ্যাগার্ডকে পছন্দ হলো, চাকরি হয়ে গেল তার।
বাড়ির নীচতলায় জাদুঘর বানিয়ে ফেলেছেন মিস্টার পারকার।
চিন্তিত ভঙ্গিতে বললেন উনি, এখন এই জাদুঘরে এমন একটা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে দর্শক রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। শিউরে উঠতে হবে। ভয়ে দম বন্ধ

হয়ে আসবে। তবেই দলে দলে লোক আসবে। ভয় পেতে মানুষ ভালবাসে, সেটা জানো?
বাড়ির পেছনদিকে এলিয়েন ট্র্যাকিং স্টেশন বসিয়েছ, বাবার দিকে তাকিয়ে বলল জিনা। লোকজন কৃত্রিম ভিনগ্রহবাসীর চলাফেরা, কাজকারবার দেখতে পাবে ওখান থেকে। পেছনদিকে আছে দুই মাথাওয়ালা লামা, আরও আছে শিংওয়ালা বিদঘুঁটে সেই জন্তুটা, ঘোড়ার মত।...কী যেন নাম ওটার?
ইউনিকর্ন, কিশোর বলল।
হ্যাঁ, ইউনিকর্ন। তারপর আছে গিলোটিন, মমি, মোমের মূর্তি আর কত ভয়ঙ্কর জিনিস চাই তোমাদের!
মেয়ের দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচালেন মিস্টার পারকার। ভাল কথা মনে করেছ, ওই ইউনিকর্নটার কথা তো খেয়ালই ছিল না। আমার। কিশোরের দিকে ফিরলেন তিনি। ওটা দেখে একেবারে জ্যান্ত মনে হয়, তাই না?
শুধু জ্যান্তই না, আঙ্কেল, বলল গোয়েন্দা-প্রধান। ওটার ঘোড়ার মত দেহ আর বিদঘুঁটে শিং দেখলে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠবে মেয়েদের।
সন্তুষ্ট হলেন মিস্টার পারকার। এই জাদুঘর তৈরি করবার পর থেকে মাঝে মাঝে হাসছেন।
কপাল কুঁচকে কিশোরের দিকে তাকাল জিনা। জাদুঘরের প্রতি কোনও আগ্রহই নেই ওর। এই বিদঘুঁটে, ভয়ঙ্কর সব কারবার ওর পছন্দ নয়। তাই এ নিয়ে বাবার তারিফ শুনতেও ভাল লাগছে না। কিশোর জাদুঘরের প্রশংসা করলেই খেপছে।
জাদুঘরটা সত্যিই দারুণ হয়েছে, আড়চোখে জিনার দিকে তাকিয়ে বলল কিশোর। অনেক মেয়ে তো হার্টফেলই করবে। আসলেই ভয়ঙ্কর সমস্ত কাণ্ড আছে এখানে, আঙ্কেল।
হবে না? বিড়বিড় করে বলল জিনা। কলজের পানি শুকানো। রাজ্যের জিনিস এনে ঠেসে রাখলে ভয়ঙ্কর হবে না কেন? আমার তো মনে হয় টিকিট কেটে একবার যে আসবে, সে তার চোদ্দগুষ্টির কাউকে আর এখানে আসতে দেবে না। কাজ নেই, টাকা খরচ করে মানুষ আসবে ভয় পেতে, হুহ!
শুনে ফেলল কিশোর। কিছু বলতে যাবে, কিন্তু তার আগেই জিনা বলে উঠল, বাবা, এখনও সময় আছে, বন্ধ করো এসব। ড্রইংরুমে মমি, ডাইনিংরুমে কফিন, কিচেনে গুলতি-তলোয়ার; এসব ভাল ঠেকছে না আমার।
আমার কিন্তু ভাল লাগছে, মন থেকে বলল কিশোর।
জবাব দিল না জিনা। চোখ পাকিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল।
আগে ওগুলো ড্রইং, ডাইনিংরুম, আর কিচেনে থাকলেও এখন। পুরো নীচতলায় সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

গোটা বাড়ি জাদুঘর নয়, জাদুঘর শুধু নীচতলাটা।
আঙ্কেল-আন্টি-জিনা উপর তলায় থাকে। আর আছে কয়েকটা গেস্টরুম। নীচের তলার চেয়ে দোতালাটাকে সাধারণ মনে হয়। কিশোরের। উপর তলায় কোনও ঝামেলা নেই। জাদুঘর চালু হলে। যখন-তখন মানুষ উপরে উঠে আসবে না।
মেয়ে ও কিশোরের উদ্দেশে বললেন মিস্টার পারকার, আর দুই সপ্তা পর ক্রিসমাস। গোবেল বিচে আজকাল এমনিতেই লোকজনের আনাগোনা বেশি, ক্রিসমাসের সময় আরও বাড়বে। এই সুযোগটাকে কাজে লাগাতে হবে। রাতারাতি আমার ভৌতিক জাদুঘরের নাম ছড়িয়ে পড়বে। কালো ফ্রেমের চশমার পিছনে মিস্টার পারকারের চোখ জোড়া গম্ভীর হয়ে উঠতে দেখল কিশোর।
গোবেল বিচে ভৌতিক জাদুঘর এই একটাই। এর দর্শনার্থীরা দেখতে পাবে ভৌতিক কাজ কারবার। এখানকার প্রায় প্রতিটি দর্শনীয় জিনিসই ঐতিহাসিক এবং বিখ্যাত।
মোম-হলে ওত পেতে আছে মোমের তৈরি ডামি।
পিছনের পোর্চে ঝুলছে নির্যাতন করার ভয়ঙ্কর সব প্রাচীন যন্ত্রপাতি।
সামনের হলে সাজিয়ে রাখা হয়েছে মধ্যযুগীয় ভয়ঙ্কর সব অস্ত্র।
দর্শনীয় জায়গা বটে, ভাবল কিশোর।
দেখবেন লাইন দিয়ে দর্শক আসবে, বলল হ্যাগার্ড। মিস্টার পারকার সিনিয়র যা পাঠাবেন বলেছেন, সেটা এলে তো কথাই নেই, জাদুঘরের আকর্ষণ আরও বেড়ে যাবে।
মিস্টার পারকার মাথা দোলালেন। কাল ফোন করেছিল আমার ভাই। বলেছে ওটা ট্রান্সপোর্টে পাঠিয়ে দিয়েছে। শীঘি এসে পড়বে। একটা প্রাচীন বর্ম আসছে ভাবতেই... কথা শেষ না করে থেমে গেলেন।
আঙ্কেলের চাচাত ভাই ওটা পাঠিয়েছেন।
আসলে কিশোরেরও তর সইছে না। আগেকার আমলের বর্মপরা সৈন্যদের আলাদা একটা আকর্ষণ আছে। মাত্র কদিনই কেয়ারটেকার হ্যাগার্ডের সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব সৃষ্টির এটাও একটা কারণ। সে বর্মধারী সৈন্য সম্পর্কে অনেক কিছু জানে। একবার বলা শুরু করলে আর থামতে পারে না।
ইতিহাস সম্পর্কে বিস্তর জ্ঞান রাখে লোকটা।
হ্যাগার্ডের বয়স আন্দাজ করা যায় না। তবে দেখে মনে হয়। মিস্টার পারকারের চেয়ে বেশি। ছিপছিপে লম্বা দেহ। সাদা, বাবরি চুল কাঁধ ছুঁয়েছে। ঠোঁটের উপর চওড়া কাঁচাপাকা গোঁফ। লোকটা যখন নিজের প্রিয় বিষয় নিয়ে বলে, তখন তার চোখজোড়া চকচক করতে থাকে। মমি বানানোর কায়দা, গিলোটিনে গলা কাটার

নিয়ম-ইত্যাদি বিষয়ে তার অগাধ জ্ঞান। কখনও কখনও এসব বিষয়ে তাকে বিশেষজ্ঞ মনে হয় কিশোরের।
অতীতের রাজ-রাজড়াদের আমলের বর্মধারী সৈন্য, তলোয়ার, প্রাসাদ, ড্রাগন এসব বিষয়েও যথেষ্ট জ্ঞান লোকটার।
বর্মধারী সৈন্যদের নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলে, বিশেষ করে মধ্যযুগের ইউরোপীয় নাইটদের সম্বন্ধে। তাদের ব্যবহৃত সব ধরনের অস্ত্রের নাম জেনেছে কিশোর লোকটার কাছ থেকেই। নাইটদের যাবতীয় রীতিনীতির ব্যাপারেও বলেছে ওকে। এই রীতিনীতিটাই তাদের নিয়ন্ত্রণ করত। কড়া ট্রেইনিং শেষে লড়াইয়ের কায়দা শিখত। হয়ে উঠত সাহসী বীর।
হ্যাগার্ড ধীর পায়ে কিশোরের পাশে এসে দাঁড়াল। সিনিয়র পারকার চিঠিতে বিশেষ একটা কথা লিখেছেন, ঠোঁটের কোণে হাসি তার। মনে আছে তোমাদের?
হ্যাঁ, মাথা ঝাঁকাল কিশোর। লিখেছেন, তোমাদের জন্যেও বিশেষ একটা উপহার পাঠিয়ে দিলাম।
জিনার চেহারা কালো হয়ে উঠল। সিনিয়র চাচা ওকে আলাদাভাবে কোনও উপহার পাঠাচ্ছেন না বলে মেজাজ খারাপ ওর। চেহারা কুঁচকে রেখেছে।
গত পরশু কিশোর ওর সঙ্গে অদ্ভুত এক বাজি ধরেছিল। দুজনকে সামনা-সামনি বসে পুরো একটা করে বাতাবি লেবু খেতে হবে, লবণ ছাড়া। খাওয়ার সময় বিরতি দেয়া যাবে না। জিনা অর্ধেকটা খেয়ে চেহারার যে অবস্থা করেছিল, এখনও ঠিক সেরকম দেখাচ্ছে।
শেষে বাজিতে অবশ্য ও-ই জিতেছিল। ওকে দুদুটো আইসক্রীম খাওয়াতে হয়েছে কিশোরকে।
সিনিয়র চাচা চিঠিতে আরেকটা কথাও লিখেছেন, কিশোর বলল। যে বর্মটা উনি পাঠাচ্ছেন, সেটা নাকি ভুতুড়ে।
ন্যাকড়া দিয়ে গালের রক্ত মুছতে মুছতে বললেন মিস্টার পারকার, ওটা যদি সত্যি সত্যি ভুতুড়ে হতো...
নিজের অজান্তে শিউরে উঠল জিনা। অজানা শিহরণের স্রোত বয়ে গেল ওর পা থেকে মাথা পর্যন্ত। অস্বস্তি লেগে উঠল।
মিস্টার পারকার, বাসায় আছেন? সামনের পোর্চ থেকে অপরিচিত একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল। নার্ভাস কণ্ঠ। কিছু ডেলিভারি দিতে বা মেরামতির কাজ করতে যারাই আসে ভৌতিক জাদুঘরে, সবার কণ্ঠ এমনই নার্ভাস শোনায়। আমরা জি.এম.আর. ট্রাভেলস থেকে এসেছি। একটা পার্সেল আছে।
এক ছুটে সামনের পোর্চে বেরিয়ে এল সবাই।

দেখা গেল বাসার সামনে একটা ভ্যান দাঁড়িয়েছে। ওটার গায়ে কালো, চ্যাপ্টা হরফে লেখা : জি.এম. আর. ট্রাভেলস।
দুজন লোক ভ্যানের পিছন থেকে কফিনের মত বড় একটা বাক্স টেনে বের করছে। হ্যাঁ, কফিনই বলা চলে।
পোর্চের মাঝখানে থমকে দাঁড়াল কিশোর। জিনার পক্ষে সময়মত ব্রেক কষা সম্ভব হলো না। ধাক্কা খেল কিশোরের পিঠে। পড়তে পড়তে নিজেকে সামলে নিল কিশোর। জিনা ওর কাঁধের উপর দিয়ে। সামনে তাকাল।
কাঠের কফিনটা বেশ লম্বা। দেখেই বোঝা যায় বেশ পুরানো। কফিনের উপর দিকের কয়েকটা তক্তা বাঁকা এবং চিড় ধরা।
ডেলিভারি-ম্যানরা কফিনটাকে লম্বালম্বি দাঁড় করাল। উচ্চতায় তাদের সব কজনকে ছাড়িয়ে গেল ওটা।
মিস্টার পারকার আর হ্যাগার্ড ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন। কফিনটাকে।
কিশোর দ্রুত পায়ে এগিয়ে মিস্টার পারকারের গা ঘেঁষে দাঁড়াল। জিনা ভয়ে ভয়ে এগোল, কিশোরের পাশে দাঁড়াল।
জিনিসটাকে কাঁধে তোলার সময় সঙ্গে আসা লোকদের মুখ দিয়ে যে অদ্ভুত গোঙানি বেরোল, তাতে বোঝা গেল কফিনের ওজন নেহায়েত কম নয়।
ফাটল দিয়ে ভিতরটা দেখার চেষ্টা করল কিশোর। কিন্তু ভিতরে অন্ধকার বলে দেখা গেল না কিছু। সেই বর্ম মনে হয়, নিচু স্বরে বলল।
মিস্টার পারকার কিছু না বলে মাথা ঝাঁকালেন। সাবধান! খুব সাবধান! তাড়াহুড়ো কোরো না। হ্যাঁ, আস্তে এগোও, মানুষগুলোর উদ্দেশে বলে চলেছেন তিনি। বারান্দায় তুলে রাখো। পরে আমরা। ভেতরে ঢুকিয়ে নেব। সরে দাঁড়াও, জিনা। কিশোর, অত কাছে যেয়ো না, সাবধান! তুমি…
আচমকা থেমে গেলেন উনি। বাক্সের দরজা হাঁ হয়ে গেছে অনেকটা, ভিতর থেকে কিছু একটা বেরিয়ে এসেছে। রোদের আলোয় ঝিলিক মেরে উঠল ওটা।
ভাল করে খেয়াল করতে কিশোর বুঝল ওটা বড়সড় একটা কুঠার। বর্মধারীর কুঠার।
ওটার চকচকে লম্বা ব্লেড বাতাসে শিস কেটে কোপ মারার ভঙ্গিতে দ্রুত নীচে নেমে এল। যেন অদৃশ্য কোনও হাত ভিতর থেকে ঘটিয়েছে কাজটা।
একটা চাপা গোঙানি ছেড়ে পিছিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল কিশোর। পারল না। ক্ষুরধার ব্লেডটা ওর ডান পায়ের উপর পড়ছে!
ডান পা নড়ানোর চেষ্টা করল কিশোর। ধীরে ধীরে আঙুল নাড়াচাড়া করল। ভয়ে ভয়ে নীচে তাকাল। না, একটুর জন্য পায়ের উপর পড়েনি।

কাঠের মেঝেতে ডেবে আছে কুঠারের ব্লেড। ডান পায়ের সামান্য আগে পড়েছে। ব্লেডের ওপাশে ওর জুতোর কালো ডগা দেখা যাচ্ছে। এপাশে পা সহ বাকি অংশ। নিখুঁতভাবে কাটা পড়েছে জুতোর ডগা।
হাঁপ ছেড়ে বাঁচল ও। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল যেন। জুতোর কাটা ডগা দিয়ে বেরিয়ে থাকা পায়ের আঙুলগুলো নাড়াল, শ্বাস ফেলল। ওগুলো এখনও পায়ের সাথে এঁটে আছে। পুরো পাঁচটা আঙুলই আছে। একটাও কাটা পড়েনি।
ফোঁস করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন মিস্টার পারকার। কিশোর তার দিকে চেয়ে বোকা বোকা হাসল।
জুতোর ডগা কাটা পড়েছে, আঙ্কেল, লজ্জা পাওয়া ভঙ্গিতে বলল ও। আঙুল কাটেনি। বড় বাঁচা বেঁচে গেছি।
তোমার আরও সাবধান থাকা উচিত ছিল, কিশোর, গম্ভীর গলায় বললেন মিস্টার পারকার। যাও, জুতো পাল্টে এসো।
কিন্তু যেতে ইচ্ছে করছে না কিশোরের। জিনিসটা পুরো না দেখা পর্যন্ত সরতে মন চাইছে না।
হ্যাগার্ড এগিয়ে এসে এক হাত রাখল ওর কাঁধে। বলল, এসো, কিশোর। দৌড় প্রতিযোগিতা হয়ে যাক তোমার আমার মধ্যে।
কথায় কথায় প্রতিযোগিতা করা হ্যাগার্ডের স্বভাব। সব ব্যাপারে ছোট-বড় সবার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে না পারলে যেন তার পেটের খাবার হজম হয় না।
অবশ্য কিশোরও লোকটার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে মজা পায়। কারণ এ পর্যন্ত যতবার প্রতিযোগিতা হয়েছে, কিশোরই জিতেছে প্রত্যেকবার।
দৌড় শুরু হয়ে গেল।
সিঁড়ি ভেঙে ঘরের দিকে ছুটল কিশোর। চোখের পলকে দরজার সামনে পৌঁছে গেল। দরজায় কালো রঙের পটভূমিতে ক্যাটকেটে লাল রঙে লেখা ভৌতিক জাদুঘর।
ঠেলে দরজা খুলে ফেলল কিশোর, ডানে বাঁক নিয়ে এগোল জুতোর র‍্যাকের দিকে। ঝটপট কাটা জুতো খুলে আরেক জোড়া পরে নিল।
এসময় হাঁসফাঁস করতে করতে পৌঁছুল হ্যাগার্ড।
শামুকের মত এলে পারবেন না আপনি কখনও, বলল কিশোর।
তা-ই তো দেখছি, হাসল হ্যাগার্ড।
লোকটাকে খোঁচা দিয়ে কোনও লাভ হয় না। যে খোঁচা গায়ে মাখে না, তাকে খোঁচা দেয়ার সার্থকতা কোথায়? হ্যাগার্ড খেপে না, উল্টে হাসে দাঁত বের করে।
কিন্তু এ যাত্রায় হাসিটা নিষ্প্রাণ। কিশোরের কথা তার কানে গেছে বলেও মনে হলো না। যে-কারণেই হোক, লোকটাকে উত্তেজিত দেখাচ্ছে। বাদামী চোখজোড়া

জ্বলজ্বল করছে। ঠোঁটে দুর্বোধ্য হাসি লেগে আছে।
কিশোরের পাশে এসে দাঁড়াল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, আমি যা দেখলাম, তুমি তা দেখেছ, কিশোর?
ঘুরে দরজার দিকে তাকাল সে। ডেলিভারি-ম্যানরা ভারী কফিনটা বারান্দায় ওঠাচ্ছে।
কী? প্রশ্ন করল কিশোর।
কফিনটার গায়ের লেখাগুলো পড়েছ? জিজ্ঞেস করল সে।
লেবেল? নাহ!
বলো কী! বিস্ময় ফুটল লোকটার চেহারায়।
পড়ার সুযোগ পেলাম কোথায়।
লেবেলে লেখা আছে, মণ্ট্যানার জ্যাণ্ডে ভিলা থেকে ওটা লস অ্যাঞ্জেলেসে পাঠানো হয় প্রথমে। ওখান থেকে এখানে এসেছে।
আসতেই পারে, বলল কিশোর। সিনিয়র পারকার হয়তো মণ্ট্যানা থেকে আনিয়েছেন ওটা।
হ্যাঁ, তাই হবে। কিন্তু আমি ভাবছি অন্য কথা। আমার যদি ভুল হয়... থেমে গভীর ভাবনায় ডুবে গেল হ্যাগার্ড। একটু পর বলল, হ্যাঁ, ভুল না হওয়ারই কথা। জ্যাণ্ডে ভিলা নামে একটা বাড়ি আছে। মণ্ট্যানার হেলেনায়। বাড়িটা তিন শতাব্দী আগের দুর্ধর্ষ ব্রিটিশ সৈন্য নেজার ম্যাণ্ডারের। মার নামে চ্যাপেলের ধাচের বাড়িটা সে বানিয়েছিল।
নেজার ম্যাণ্ডারের কথা এমনভাবে বলছে লোকটা, যেন সে বিখ্যাত কেউ। আসলে উল্টো।
মাথা ঝাঁকাল হ্যাগার্ড। নেজারের কাহিনি জানো তুমি? সে ছিল হাড় বজ্জাত এক সৈন্য। জাত বদমাশ। নিষ্ঠুর। ১৭০৫ সালের দিকে হেন বদ কাজ নেই যা সে করত না। ইংরেজ রাজার আস্কারায় দিনকে দিন বদমায়েশী মাত্রা ছাড়িয়ে যায় নেজারের, চলে আসে আমেরিকায়। সে-সময়ে প্রতাপশালী কয়েকজন বণিকের অনুরোধে এক নামকরা জাদুকর জাদু করে নেজারকে। নিজের বর্মের মধ্যে তাকে চিরতরে বন্দি করে। বর্মের মধ্যে বন্দি অবস্থায় সে মারা যায়। কফিনবন্দি বর্মটা সবার অজান্তে তারই বাড়ির তলকুঠুরিতে লুকিয়ে রাখে জাদুকর। এটা হয়তো সেই বর্মটাই।
তা হলে তো আরও ভাল, কিশোর বলল। যেসব জিনিসে ভূত ভূত গন্ধ আছে, সেসবই তো এখানে দরকার। আমার মনে হয় বর্মটা। পারকার আঙ্কেলের পছন্দ হবে।

মাথা ঝাঁকাল হ্যাগার্ড। আমারও তা-ই মনে হয়, চেহারায় চিন্তার ছাপ ফুটল লোকটার। গলা আপনাআপনি নিচু হয়ে এল।
নেজারের কাহিনির বাকি অংশটুকু তোমার চাচা জানেন কিনা আমি বলতে পারি না।
লোকটার বলার ভঙ্গি কিশোরকে সচকিত করল। রহস্যের গন্ধ পেল ও। আস্তে করে জিজ্ঞেস করল, বাকি অংশটা কী?
শব্দ করে হাসল লোকটা। না না, তেমন কিছু না, নাকের সামনে থেকে মাছি তাড়ানোর ভঙ্গি করল। সে-কথা শুনলে কেউ বিশ্বাস করবে না। আষাঢ়ে গল্পের মত মনে হবে। লোক কাহিনি মতে নেজারের বর্মটা যার কাছে গেছে, তারই কপাল নাকি পুড়েছে। ধ্বংস হয়ে গেছে সে।
সত্যিই যদি ওটা ভুতুড়ে হয়, তা হলে তো জাদুঘরের জন্যে ভালই, তা-ই না?
তীক্ষ্ণ চোখে কিশোরের দিকে তাকাল হ্যাগার্ড। ভুরু কুঁচকে উঠেছে। সামনে ঝুঁকে কিশোরের মুখের কাছে নাক এনে বলল, জাদুঘরের জন্যে ভাল হবে কি না জানি না, তবে আমাদের জন্যে যে ভাল হবে না, সে-ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই।
জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকল লোকটা কয়েক মুহূর্ত। কী যেন ভাবল। তারপর কিশোরের চোখে চোখ রেখে বলল, তুমি তো গোয়েন্দাগিরি করতে পছন্দ করো, তা-ই না?
করি। মৃদু হাসল কিশোর। আপনি কী বলতে চান বুঝতে পেরেছি। বর্মটার ওপর নজর রাখতে হবে আড়াল থেকে, এই তো?
মাথা উপর-নীচ করল সে। হ্যাঁ।, ঠিক আছে, মিস্টার হ্যাগার্ড, কিশোর বলল। আপনি যখন। কাজে ব্যস্ত থাকবেন, তখন আমি চোখ রাখব।
আর তুমি যখন ব্যস্ত থাকবে, কিশোরের কাঁধে হাত রাখল সে, তখন আমি নজর রাখব। ঠিক আছে?
আচ্ছা।
বারান্দায় বেরিয়ে এল দুজন।
কফিন রেখে গাড়িতে ফিরে গেছে লোকগুলো। বারান্দার এক কোণে রাখা আছে কফিনটা।
মিস্টার পারকার আর একমুহূর্ত সময় নষ্ট করতে নারাজ। একটা ক্রোবার হাতে ওটার পাশে হাঁটু মুড়ে বসে পড়লেন তিনি। কফিনের ডালার নীচে ক্রোবারের বাঁকানো মাথাটা ঢুকিয়ে চাড় দিলেন। পেরেক দিয়ে কোনওরকমে আটকে ছিল ডালা, চাপ পড়তেই কড়মড় শব্দে উঠে এল।
মিস্টার পারকার ডালাটা সামান্য তুলে ধরতে হ্যাগার্ড ফাঁক দিয়ে হাত ভরে ওটাকে টান মারতে লাগল উপর দিকে।

জিনা একপাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করছে। কিন্তু কিশোরের চোখে ওর ভিতরের নার্ভাস ভাবটা ঠিকই ধরা পড়ে গেল। নীচের ঠোঁট কামড়াচ্ছে জিনা। ঘাবড়ে যাওয়ার লক্ষণ–কিশোর জানে।
একটু একটু করে উত্তেজনা বাড়ছে কিশোরের। তীক্ষ্ণ চোখে মিস্টার পারকার আর হ্যাগার্ডের কাজ দেখছে।
তাদের যৌথ প্রচেষ্টায় অবশেষে খুলে উঠে এল ডাটা।
কাছে গিয়ে দাঁড়াল কিশোর। জিনা ওর গা ঘেঁষে থামল। ঝুঁকে কফিনের ভিতরে উঁকি দিল ওরা একযোগে।
ফেঁশো জিনিস দেখা গেল ভিতরে। ওগুলো আর কিছু নয়, লম্বা ফালি করে কাটা প্যাকিঙের কাগজ। একই সাইজের।
কাগজ! জিনার কণ্ঠে হতাশা। কিশোরও রীতিমত হতাশ হয়ে পড়েছে।
খালি কাগজ নয়, রহস্য করে বললেন মিস্টার পারকার। হাত ঢুকিয়ে দেখো ওর ভেতরে আসল জিনিসও আছে।
ইয়ে… না, থাক, এক পা পিছিয়ে গেল জিনা। তুমিই দেখো, বাবা।
ভয় করছে? নরম সুরে বলল কিশোর। মনে মনে হাসছে।
মোটেই না, কড়া স্বরে মিথ্যে বলল জিনা। সম্মানে লেগেছে। ভয় পাব কেন? ভয়ের কী আছে! কিশোরের কাছে ছোট হতে রাজি নয়।
আরও কিছু বলার জন্য মুখ খুলেছিল কিশোর। কিন্তু জিনা সে সুযোগ দিল না। কারণ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফুলহাতা জামার আস্তিন গুটিয়ে হাত ঢুকিয়ে দিল ভিতরে। প্যাকিং কাগজের মধ্যে কনুই পর্যন্ত ঢুকে গেল ওর।
নিরেট একটা কিছুর ছোঁয়া পাওয়ার আশায় দ্রুত হাত নাড়াচাড়া করছে জিনা।
খসখস আওয়াজ উঠছে।
সামনে ঝুঁকে আরও ভিতরে হাত ঢোকাল ও।
এই তো পেয়েছি! কিন্তু… কথা শেষ না করে থেমে গেল। পরক্ষণে তীক্ষ্ণ বাঁশির মত চিৎকার করল, ওটা… ওটা আমাকে খামচে ধরেছে! কী… কী ওটা!!
পাগলের মত হাত ছাড়ানোর চেষ্টা করল ও। কিন্তু কিছু একটা আঁকড়ে ধরেছে ওর হাত।
ছাড়ছে না!
একদিকে চেঁচাচ্ছে জিনা, আরেক দিকে হাত ছাড়ানোর চেষ্টা করছে। চেহারা কাগজের মত সাদা হয়ে গেছে।
মিস্টার পারকার আর হ্যাগার্ড একযোগে উবু হলো কফিনের উপর।
দুই জোড়া হাত মুঠো মুঠো করে টুকরো কাগজ তুলল ভিতর থেকে।
একটু সবুর করো, জিনা, গম্ভীর হয়ে বললেন মিস্টার পারকার।

জলদি করো, বাবা! কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল জিনা।
কিশোর বুঝতে পারছে জিনার হাত আটকে গেছে কিছুর সঙ্গে।
মিস্টার পারকার জিনার হাত তুলে আনলেন কফিন থেকে। সঙ্গে বাহুসহ একটা ধাতব হাতও উঠে এল। ওটা ধাতব কাঁধের সঙ্গে আটকে ছিল। এখন খসে পড়েছে।
না হেসে গম্ভীর হয়ে গেলেন মিস্টার পারকার।
জিনা বোকার মত নিজের হাতের দিকে চাইল।
আসলে মুঠো পাকানো ধাতব হাতটার আঙুলে ওর ব্রেসলেট আটকে আছে-খামচায়নি কেউ।
কাণ্ড! মিস্টার পারকার বললেন। দাঁড়াও, খুলে দিচ্ছি।
ধাতব আঙুলগুলো একটা একটা করে সিধে করলেন তিনি।
ছাড়া পেয়েই জিনা একটানে হাত সরিয়ে নিল।
কপাল কুঁচকে কফিনটার ভিতরে তাকাল।
সবার সামনে এভাবে বেইজ্জতি হওয়ায় মরমে মরে যেতে ইচ্ছে করছে। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে নিজের আক্রান্ত হাতের দিকে নজর দিল ও। অন্য হাতে ডলতে লাগল ব্যথা পাওয়া জায়গাটা।
আড়চোখে হ্যাগার্ডের দিকে তাকিয়ে বাপ-বেটির অলক্ষে ভুরু নাচাল কিশোর। সে-ও জবাব দিল একইভাবে।
মিস্টার পারকার কফিনের উপর ঝুঁকে হাত ঢোকালেন ভিতরে। কী একটা জিনিস তুলে আনলেন।
দেখো, কী সুন্দর জিনিস, কিশোরদের উদ্দেশে বললেন।
একটা হেলমেট ধরে আছেন তিনি। অস্তমান সূর্যের কোমল কিরণ পড়াতে ঝিকিয়ে উঠল ওটার চকচকে মসৃণ দেহ।
ওটার দিকে চেয়ে রইল কিশোর মন্ত্রমুগ্ধের মত। অবশেষে বলল, দেখে মনে হচ্ছে জিনিসটা কনে ঠাণ্ডা, তা-ই না, আঙ্কেল?
হেলমেট ওর দিকে বাড়িয়ে ধরলেন মিস্টার পারকার। বললেন, ধরেই দেখো না ঠাণ্ডা না গরম। চোখে দেখে কোনও কিছুর তাপ বোঝা যায়?
হাতে নিতে কিশোর বুঝল যতটা ভেবেছিল তার চেয়েও ভারী জিনিসটা। হাত বোলাল ওটার গায়ে। নিরেট ধাতু যেমন ঠাণ্ডা হয়, এটা মোটেই তেমন নয়, বরং কিছুটা গরমই ঠেকছে। যেন অনেকক্ষণ পরে থাকার পর এইমাত্র খুলে রেখেছে কেউ।
অদ্ভুত একটা শিহরণ বয়ে গেল কিশোরের সারা দেহে। দুহাতে ধরল ও হেলমেটটা।

মিস্টার পারকার কফিন থেকে একটা শিনগার্ড (হাঁটুর নীচের অংশের আবরণ বের করে মেঝেতে রাখলেন। তারপর বের করলেন একটা ধাতব পা।
উত্তেজনায় দুচোখ চকচক করছে তার। ছড়ানো-ছিটানো। কাগজের মধ্যে দ্রুত হাত চলছে।
বর্মের বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বের করে পাশে জড়ো করছেন ব্যস্ত হয়ে।
এই সেই জিনিসই, নীরবতা ভাঙলেন উনি। এটাই হবে ভৌতিক জাদুঘরের সবচেয়ে আকর্ষণীয় জিনিস। শুধু গোবেল বিচে কেন, গোটা ক্যালিফোর্নিতে এমন চমকানো বর্ম দুটো নেই। এটার কথা একবার প্রচার হলেই দলে দলে লোক আসবে এই জাদুঘরে।
হঠাৎ থেমে গেলেন উনি। কপাল কুঁচকে উঠেছে। আবার কফিনের ভিতরে হাত চালাতে শুরু করেছেন। আচমকা থেমে গেলেন।
বোঝা গেল কিছু একটা ঠেকেছে তাঁর হাতে।
এ আবার কী! বলতে বলতে হাত তুলে আনলেন।
উজ্জ্বল এবং চকচকে একটা জিনিস দেখা গেল তার হাতে।
অদ্ভুত, গোল জিনিসটা। একটা সোনালি চেইনের প্রান্তে ঝুলছে।
বড়সড় একটা মার্বেলের মত মনে হচ্ছে ওটাকে।
তবে মার্বেল যে নয়, এক নজর দেখলেই বোঝা যায়।
জিনিসটার ভিতরে নীল ধোঁয়া পাক খাচ্ছে, উঠছে-নামছে। ধোঁয়ার ভিতরে আবার উজ্জ্বল রুপোলি কণা ভেসে বেড়াচ্ছে ছুটন্ত তারার মত।
মিস্টার পারকার কিশোরের হাতে দিলেন ওটা।
চোখের সামনে নিয়ে দেখল কিশোর। আঙ্কেলের দিকে তাকাল। এটাই বোধহয় আমাদের জন্যে সিনিয়র আঙ্কেলের সেই সারপ্রাইজ?
তা-ই মনে হচ্ছে, বললেন মিস্টার পারকার। চট করে জিনাকে দেখে নিয়ে কিশোরকে বললেন, উনি বোধহয় এটা তোমার জন্যেই পাঠিয়েছেন। জিনার তো লকেট আছে।
আমার জন্যে তা হলে কী? গরম স্বরে বলল জিনা।
পরে পাঠাবেন হয়তো।
গম্ভীর হয়ে গেল জিনা। বলল, কিশোরের জিনিস... ও। দেখতেও তো ভাল না। ভেতরে আবার ধোঁয়া।
একমুহূর্ত দ্বিধা করল কিশোর। তারপর চেইনটা গলায় ঝোলাল। মুখ নিচু করে সাদা টি-শার্টের উপর ঝুলে থাকা লকেটটার দিকে তাকাল। দারুণ জিনিস, তা-ই না, আঙ্কেল?
নীরবে একমত হলেন উনি মাথা ঝাঁকিয়ে।

জিনা কিছু বলল না, তবে ওর দৃষ্টিতে ঈর্ষা। তাই জিনিসটা দ্বিগুণ ভাল লাগল কিশোরের।
এগিয়ে এল হ্যাগার্ড।
লকেটটার দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল। তারপর বলল, আমার কী মনে হয়, জানো?
কী?
মনে হয় এটা জাদুর লকেট।
তা-ই বুঝি? বলল কিশোর।
জাদুর লকেট!
বহুদিন পর চমৎকার একটা লকেট উপহার পেয়েছে কিশোর। তাই মনে মনে সিনিয়র পারকারকে লম্বা-চওড়া থ্যাঙ্কস না দিয়ে পারল না।
সত্যি দারুণ একটা জিনিস গিফট করেছেন উনি।
এরমধ্যে কফিনটার ভিতর থেকে বর্মের বাকি অংশগুলো বের করে ফেলেছেন মিস্টার পারকার। ওগুলো জড়ো করে নিয়ে চলল কিশোর সামনের হলের দিকে।
কিশোর ও হ্যাগার্ড ওখানে পৌঁছে বিচ্ছিন্ন টুকরোগুলো একে একে মিস্টার পারকারকে দিল। একটার সঙ্গে আরেকটা জুড়ে নেজারের বর্মটাকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিলেন মিস্টার পারকার।
প্রিয় রাফিয়ানের পিঠে হাত রেখে কিশোরের পাশেই দাঁড়িয়ে আছে জিনা, বাবার কাজ দেখছে।
চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে জিনিসটার প্রতি কোনও আগ্রহই নেই ওর।
একটু পিছু হটে বর্মটার দিকে ভাল করে তাকাল কিশোর।
যোদ্ধা নেজারের গড়ন কেমন ছিল, ওটা দেখে আন্দাজ করতে কষ্ট হলো না ওর। বর্মের দুকাঁধ চওড়ায় এক গজ মত হবে।
পা জোড়া গোলাকার ও নিরেট, ছোটখাটো গাছের গুঁড়ির কথা মনে করিয়ে দেয়।
তিনটে কিশোর অনায়াসে লুকাতে পারবে বর্মটার ব্রেস্টপ্লেটের মধ্যে।
রবিনের কাছ থেকে নিয়ে মধ্যযুগীয় যোদ্ধাদের উপরে লেখা একটা বই পড়েছিল কিশোর। ওই বইতে ছিল মধ্যযুগের, অর্থাৎ ১১০১ থেকে ১৫০০ সাল পর্যন্ত ইউরোপে যত দুর্ধর্ষ লড়াকু লোক ছিল, তাদের জীবন-কাহিনি।
সামনের বর্মটার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে সেই বইটার কথা মনে পড়ে গেল ওর।
কী বিদঘুঁটে! বলল ও বিড়বিড় করে।
শুনে ফেলল হ্যাগার্ড। কিশোরের কাঁধে হাত রেখে বলল, ঠিক বলেছ, কিশোর। আমারও বর্মটাকে বিদঘুঁটেই লাগছে।

চোখ তুলে তাকালেন মিস্টার পারকার। শুনেছি বর্মটা নাকি ভুতুড়ে। তাই যেন হয়। ভূত-প্রেতে আমি বিশ্বাস করি না। এই বর্ম দিয়েই জিনাকে বুঝিয়ে দেব ওসব মিথ্যে।
এমন সময় ফোন বেজে উঠল।
মিস্টার পারকার ধরতে গেলেন।
হ্যাগার্ডও বেরিয়ে গেল। বলে গেল, মোমের জাদুঘরে জরুরী। কাজ পড়ে আছে তার।
কিশোরের দিকে তাকাল জিনা। গলা নামিয়ে বলল, তোমার কি মনে হয়, বর্মটা সত্যি ভুতুড়ে?
হতে পারে, বিজ্ঞের ভঙ্গি করে বলল ও। আবার না-ও হতে পারে। তবে এই মুহূর্তে তোমার চেহারাটা যে ভুতুড়ে দেখাচ্ছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।
কথার খোঁচা ফিরিয়ে দেয়ার জন্যে তৈরি হয়েছিল জিনা।
কিন্তু কিশোর সেই সুযোগ দিল না ওকে। সিঁড়ি বরাবর দৌড় দিল। আণ্টি ডাকছেন নাস্তা করতে!
উপর তলা থেকে আণ্টি আবারও ডাকলেন।
দৌড়ে কিশোরকে হারাতে ছুটল জিনা। দুজন সিঁড়ির কাছে পৌঁছে গেল একইসঙ্গে। ধাপগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে টপকাল। একইসঙ্গে ডাইনিঙে ঢুকল। হারল না কেউ।
কাল একবার ফোন করতে হবে রকি বিচে, ভাবল কিশোর মনে। মনে।
মুসার এক বিখ্যাত মামা মিশর থেকে বেড়াতে আসার কথা। মুসাদের বাসায় উঠবেন। উনি এরমধ্যে আসার তারিখ জানিয়েছেন। কি না জানতে হবে। তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চায় ও।
তা ছাড়া পরশুদিন সাইকেল থেকে পড়ে গিয়ে পায়ে চোট পেয়েছে রবিন, ওর হাল কী তা-ও জানা দরকার।
ভুলে যাবার ভয়ে কালকের করণীয় কাজগুলো একটা কাগজে লিখে ওটা টেবিলক্লথের নীচে রাখল কিশোর।
হরর ছবি আছে রাত সাড়ে নটায়। দেখা দরকার। অবশ্য প্রায়। একঘণ্টা বাকি আছে এখনও।
ইলেকট্রনিক্স গেম ওয়াচ নিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল কিশোর। খেলতে খেলতে একসময় বিরক্তি ধরে গেল, টিভি দেখার এনার্জিও গায়েব হয়ে গেছে ততক্ষণে।
দাঁত ব্রাশ করে এসে পাজামা পরে নিল। তারপর লম্বা হলো। বিছানায়।
চেইনটা গলায় ঝুলছে।
চিত হয়ে শুয়ে চোখের সামনে তুলে ধরল ওটা।

জানালা দিয়ে আসা চাঁদের আলোয় লকেটের ভিতর নীলচে ধোঁয়ার ঘুরপাক দেখল।
ওর কেন যেন মনে হতে লাগল এই অপার্থিব ধোঁয়া সুকৌশলে কিছু একটা আড়াল করে রেখেছে। বড় কিছু।
আরও ভাল করে দেখার জন্য লকেটটা চোখের কাছাকাছি নিয়ে এল ও। সমানে ঘুরপাক খেয়ে চলেছে ভিতরকার ধোঁয়া, মুহূর্তের জন্যও বিরাম নেই।
কখন যেন ঘুমিয়ে পড়ল কিশোর।
থপ থপ!
স্বপ্নের রাজ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে ও।
দেখল হ্যাগার্ড হাফপ্যান্ট পরে সাঁতরে বেড়াচ্ছে একটা কচুরিপানা ভরা পুকুরে।
দৃশ্যপট পাল্টে গেল। দেখল, ইয়া মোটা একটা ছাতিম গাছের ডালে একটা হলুদ মার্বেল ঝুলছে। আর… আর দেখল, একটা ব্রিজের উপর দাঁড়িয়ে আছে নেজার ম্যাগুারের বর্ম।
একের পর এক আরও কত কী যে দেখল ও, তার ইয়ত্তা নেই। এক দৃশ্যের সাথে আরেক দৃশ্যের মিল নেই। সব ছাড়া ছাড়া, আজগুবি।
উদ্ভট।
থপ থপ!
আবারও কানে এল আওয়াজটা।
চোখ খুলে কান পাতল কিশোর।
থপ থপ!
নাহ, শব্দটা স্বপ্নে শুনছে না ও। নিজেকে চিমটি কেটে নিশ্চিত হলো কিশোর। শুনছে বাস্তবে।
উঠে বসে দম বন্ধ করে থাকল কয়েক মুহূর্ত।
থপ থপ!
পা ঝুলিয়ে দিল খাট থেকে। মাথা কাত করে ভাল করে শোনার চেষ্টা করল।
থপ্ থপ!
কিশোর মনে করতে পারছে না নীচতলায় এমন কী আছে যা এরকম আওয়াজ করতে পারে।
আশ্চর্য তো!
পাঁচ দিন হলো এই বাড়িতে আছে কিশোর, এমন আওয়াজ এর মধ্যে আর কখনও শোনেনি।
থপ্ থপ!

উঠে দাঁড়াল কিশোর। হঠাৎ জিনিসটার কথা মনে পড়ে গেল। ওই একটা জিনিসই আছে এ বাড়িতে, যা ওরকম আওয়াজ তুলতে পারে।
বর্ম!
হ্যাঁ, নেজারের বর্ম।
থপ থপ!
সিঁড়ির উদ্দেশে পা বাড়াল কিশোর। নিজেকে জিজ্ঞেস করল, ভয় করছে?
যেতে ইচ্ছে করছে, তা বলা যায় না।
কিন্তু কৌতূহলের কাছে হেরে গেল ভয়।
জাদুঘরের কিচেনটা ঠিক কিশোরের রুমের নীচে। আওয়াজটা ওখান থেকেই আসছে।
থপ থপ!
মুখ নিচু করে লকেটটার দিকে তাকাল কিশোর। ওটার ভিতরের নীলচে ধোঁয়া থপ্ থপ আওয়াজের তালে তালে ঘুরপাক খাচ্ছে, উঠছে-নামছে।
আশ্চর্য!
থপ থপ!
শব্দ অনুসরণ করে নীচে নেমে এল, জাদুঘরের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলল। কিচেনের কাছে পৌঁছে থেমে দাঁড়াল। লম্বা শ্বাস টানল। বার কয়েক, যেন কয়েক মাইল পথ দৌড়ে এসেছে।
সুযোগ এসেছে!
নতুন কোনও এক ভূতের মুখোমুখি হতে যাচ্ছে ও!
কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রমাণ হয়ে যাবে বর্মটা সত্যিই ভুতুড়ে কি।
থপ থপ!
আরেকটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সাবধানে কিচেনের দরজা খুলে ফেলল ও।
থপ থপ!
কাঁপা পায়ে কিচেনে ঢুকল কিশোর। এক-পা দুই-পা করে এগোল কয়েক পা।
থপ্ থপ!
চোখ সরু হয়ে এল কিশোরের।
দেখতে পেয়েছে ওটাকে!
অন্ধকারে ভয়ঙ্কর এক বিভীষিকার মত লাগছে দেখতে!
আর পারল না কিশোর, ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল ওর। কড়া স্বরে বলল, জিনা, তুমি! এত রাতে এখানে কী করছ?
ঝাড়ু হাতে কিচেনের মাঝখানে উঁচ একটা টুলের উপর দাঁড়িয়ে আছে জিনা। ওটার গোড়া দিয়ে থেকে থেকে সিলিঙে শব্দ করছিল এতক্ষণ।

আগুন-ঝরা চোখে ওর দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। হচ্ছেটা কী এসব? ধমকের সুরে বলল ও।
হেসে উঠল জিনা। কিশোরের দিকে আঙুল উঁচিয়ে বলল, তুমি না ভূত শিকারী! এই বাড়িতে ভূত খুঁজবে!
হাসতেই থাকল জিনা। মনে ভূতের সন্দেহ ঢুকিয়ে দিয়ে কিশোরকে টেনে এনে আনন্দে আটখানা। ভাবছে বোকা বানাতে পেরেছে।
রাত-বিরেতে ঘর ঝাঁট দিতে শখ হয়েছে দাও, কিন্তু সিলিঙে ঠোকাঠুকির দরকারটা কী? বলল কিশোর। নীচতলায় এই কাজ করলে ওপরতলায় কার না সন্দেহ হবে? তা ছাড়া আমার কাজই অলৌকিক, অবিশ্বাস্য, রোমহর্ষক আর ভীতিকর সব ঘটনার সমাধান খুঁজে বের করা। তোমার ঝাড়ুর থপথপ শুনে ভাবলাম, দেখি কোন ভূত এই বাড়িতে এল ভিতুর ডিম জিনাকে ভয় দেখাতে। তাই এসেছি, কিন্তু এর মধ্যে এত হাসির কী হলো?
নিজের বুকের উপর ঝুলন্ত নীল লকেটটার দিকে তাকাল কিশোর। থপ্ থপ শব্দ বন্ধ হওয়াতেই বুঝি ভিতরের ধোঁয়ার মেঘ অনেকটা শান্ত হয়েছে।
লকেটটার এমন কাণ্ডের মাথামুণ্ডু কিছু বুঝল না ও।
তোমার কপাল ভাল, মাথা দোলাল কিশোর। আঙ্কেল পারকার জেগে ওঠেননি। উনি শুনলে মনে করতেন সত্যি সত্যি বুঝি ভূত এসেছে এ বাড়িতে। ব্যাপার সত্যি কি না যাচাই করার জন্যে এখানে এসে তোমাকে এই অবস্থায় দেখলে ঝটার বাড়ি একটাও মাটিতে পড়ত না। কী বলে?
এবার যেন রসভঙ্গ হলো জিনার। ঝাড় রেখে দিল। আসলে বাবার কথা ভাবিইনি আমি, বলল দ্বিধা করে। আমার মাথায় ছিল শুধু তোমাকে ভয় দেখানোর চিন্তা।
না, শুধু আমাকে ভয় দেখানোর চিন্তা ছিল না তোমার মাথায়, দুহাত বুকের উপর বেঁধে গম্ভীর হলো কিশোর। ও লক্ষ করেছে, এমন ভঙ্গি করলে মুখের কথার ওজন দ্বিগুণ হয়ে যায়। সহজেই প্রভাবিত হয় প্রতিপক্ষ। তোমার মাথায় ছিল আসলে অনর্থক ঝামেলা। পাকানোর চিন্তা।
অস্বস্তি ঝেড়ে টুল থেকে নেমে দাঁড়াল জিনা। এক পা সামনে বাড়ল। প্রসঙ্গ পাল্টে বলল, তুমি সত্যি বর্মটাকে নিয়ে ভয় পাচ্ছ, তা-ই না?
কাকে কী বলছ? অবাক হলো ও। ভয় পাচ্ছি আমি? না তুমি? বিকেলে কী চেঁচানোটাই না চেঁচালে। আরেকটু হলে গোটা পাড়া জড়ো হয়ে যেত।
বিকেলের কথা বাদ দাও, বলল জিনা। কাঁধের উপর থেকে চুলের গোছা কানের পিছনে গুজল। ভূত-প্রেতে আমি বিশ্বাস করি না, করো তোমরা তিন গোয়েন্দা। তুমি আসলে বিশ্বাস করো বর্মটা ভুতুড়ে, আমি নই।

করতেই পারি। কারণ ভূতের সঙ্গে বহুবার মোলাকাত হয়েছে। আমার। তুমি ভাল করেই জানো সেসবের সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাবও নেই আমার হাতে। ভূতে বিশ্বাস করা আর ভূতের ভয় পাওয়া এক নয়। আজকাল আমি ভূতে বিশ্বাস করি, কিন্তু ভয় করি না। তুমি বিশ্বাস করো না, কিন্তু ভয় পাও। ধরো ওই বর্মটার ব্যাপারে যে কাহিনি চালু আছে, তা যদি সত্যি হয়ে থাকে? থেমে দম নিল কিশোর। তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল জিনার দিকে। তারপর বলল, তুমি চাইবে ভয়ঙ্কর এক সৈনিক ভূতের মুখোমুখি হতে?

দেখো কিশোর, কপাল কুঁচকে বলল জিনা, আমি জানি রহস্যময় বা অলৌকিক সব কাণ্ড-কারখানা শুধু তোমাকে আর রবিন মুসাকে ঘিরেই ঘটে। না হয় মানলাম ভূত বলে কিছু একটা আছে, তাই বলে নিরীহ বর্মটাকেও ভুতুড়ে বলবে তুমি? রাতের বেলায় ওটা হেঁটে বেড়ায়, এমন আজগুবি কথা তুমি বিশ্বাস করো?

আমি হা-না কিছুই বলব না, জবাব দিল গোয়েন্দা-প্রধান।

সেটা জানার একটাই উপায় আছে, এখনই একবার গিয়ে চেক করে দেখা।

জিনা এমন ভান করল, যেন কিশোরের প্রস্তাবটা ওর কানেই যায়নি। বাইরে যতই মুড দেখাক, ভিতরে ভিতরে ও যে ভয়ে কুঁকড়ে গেছে, কিশোরের বুঝতে অসুবিধে হলো না।

চলো, একবার দেখে আসি, আবার প্রস্তাব করল কিশোর।

অসম্ভব! দুপাশে মাথা দোলাল জিনা। আমার আর খেয়ে কাজ নেই যে...

বুঝতে পেরেছি, ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে হেসে উঠল কিশোর, ভয় পেয়েছ তুমি।

কিশোরের সামনে নিজেকে ভিত প্রমাণের কোনও ইচ্ছে নেই জিনার। তা-ই ইচ্ছের বিরুদ্ধে রাজি হতেই হলো। আচ্ছা, চলো, হাল ছাড়া ভঙ্গিতে বলল।

কিচেন থেকে বেরিয়ে অন্ধকার করিডর ধরে এগোল ওরা। বুকের মধ্যে কেমন যেন ধুপধাপ শুরু হলো কিশোরের। দোতলায় বসে থপ। থপ শব্দটা প্রথম শোনার সময়ও এমনটা লেগেছিল।

অকারণে ভয় পেতে রাজি নয় কিশোর। কিন্তু এখন এমন লাগছে। কেন?

আসলে ভুতুড়ে জাদুঘরটাই এর কারণ। এটাকে গভীর রাতে কেমন যেন শ্মশান শ্মশান মনে হলো ওর।

হঠাৎ একটা আওয়াজ কানে এল কিশোরের।

খর-খর-খরখর-খরখর!

ব্ল্যাকবোর্ডে নখ দিয়ে আঁচড় কাটলে যেমন হয়, অনেকটা তেমন শব্দ।

নিজের অজান্তে গায়ে কাঁটা দিল ওর।

থেমে দাঁড়াল।

অমনি শব্দটাও থেমে গেল।
মেঝের আওয়াজ। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ও।
আগেই বোঝা উচিত ছিল, এবাড়ির প্রায় সবকিছু থেকে নানান রকম আওয়াজ হয়। পুরানো, প্রকাণ্ড এই বাড়িটাতে যে-কারণে মজা। লাগে কিশোরের, তার একটা হলো গা শিউরানো এইসব আওয়াজ।
অবশ্য রাতের বেলা ওসব তেমন একটা ভাল ঠেকে না, বিশেষ করে যখন অদ্ভুতুড়ে সংগ্রহগুলোর ভিতর দিয়ে হাঁটতে হয়, তখন।
ভী-ষ-ণ অস্বস্তি লাগে।
গা শিরশির করে। সেই অস্বস্তি এই মুহূর্তে আবার ভর করেছে। ওর উপর।
ভুতুড়ে বর্মটা দেখতে চলেছে ওরা।
ভয়ে কলজে শুকিয়ে গেছে জিনার।
কখন কী করে বসে মেয়েটা, বলা মুশকিল। ওর সামনে। কিশোরের ভয় প্রকাশ পেলে আরও ঘাবড়ে যাবে ও। তাই যতটা সম্ভব মনের ভাব চেপে রেখেছে কিশোর। নিজেকে বারবার বোঝাচ্ছে, ও কিছু নয়, বাতাস।
ডাইনিং রুমে ঢুকল ওরা।
মিস্টার পারকারের সমস্ত কফিন সাজিয়ে রাখা হয়েছে এই রুমে প্রদর্শনের জন্য। তাই এ রুমের নাম রাখা হয়েছে কফিনঘর।
লুকোচুরি খেলার জন্য কফিন-ঘরের তুলনা নেই। লুকানোর জায়গার অভাব নেই এখানে।
দিনের বেলায় অবশ্য।
রাতে?
বুকটা কেঁপে উঠল কিশোরের।
এই গভীর রাতে..
চাপা একটা হেঁচকির আওয়াজ কানে এল কিশোরের। পরক্ষণে টের পেল হেঁচকিটা ও নিজেই তুলেছে। ঝট করে জিনার মুখের দিকে তাকাল।
জিনা যে এখন ওকে টিপ্পনী কাটবে, তাতে কোনও ভুল নেই।
কিন্তু কিশোরকে অবাক করে দিয়ে নিশ্চপ রইল ও।
আসলে এ রুমের থমথমে ভাব বোবা বানিয়ে দিয়েছে ওকে। কিশোরের হাত আঁকড়ে ধরল। পা চলতে চাইছে না ওর, যেন সীসার মত ভারী হয়ে উঠেছে।
ওর হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল কিশোর।
সব কটা কফিনের ডালা বন্ধ। হ্যাগার্ড ঘুমাতে যাবার আগে বন্ধ করে রেখে যায়।
কিন্তু তাতে কী?
কিশোর, জিনা দুজনেরই জানা, ওগুলোর ভিতরে কী আছে!

ওদের সবচেয়ে কাছের কফিনটার ভিতরে আছে মোমের তৈরি ড্রাকুলার ডামি। ওটার বুকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে ঢোকানো আছে একটা কাঠের গোঁজ, বা কীলক।
ডান দিকের কফিনটার মধ্যেও আছে একটা মোমের ডামি। ডামিটা ওয়্যারউলফের।
তার পাশের কফিনটায় আছে একটা আধা গলা লাশের ডামি। ওটার মাথার জায়গায় বসানো আছে একটা আয়না।
বীভৎস দেহের ডামিটাকে দেখার জন্য সামনে ঝুঁকলেই ওই আয়নায় দর্শকদের প্রতিবিম্ব দেখা যায়।
শিরদাঁড়ায় ঠাণ্ডা একটা প্রবাহের ওঠা-নামা টের পেল কিশোর।
সরসর করে খাড়া হয়ে গেল গায়ের সমস্ত রোম। চলার গতি বাড়িয়ে দিল ও।
আমার ভয় করছে, কিশোর, লজ্জার মাথা খেয়ে বলেই বসল জিনা। চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।
দূর, কীসের ভয়! জোর দিয়ে বলার চেষ্টা করল কিশোর। কিন্তু কণ্ঠস্বর বিশ্বাসঘাতকতা করল নাকি? তেমন একটা দৃঢ় শোনাল না।
হঠাৎ চেহারা বিকৃত করে ককিয়ে উঠল কিশোর।
জিনা খপ করে ওর বাহু আঁকড়ে ধরল। কী হলো?
কফিনের কোনায় গুঁতো খেয়েছি, কুঁজো হয়ে হাঁটুতে হাত বোলাতে বোলাতে বলল ও।
তাই বলে ওভাবে চেঁচাবে? ফিসফিস করে বলল জিনা। বাবা জেগে গেলে মজা টের পাবে।
পাশাপাশি হেঁটে চলল কিশোর-কিশোরী।
জিনা হঠাৎ থেমে দাঁড়াল।
কিশোর পাশ ফিরে তাকাল। কী হলো?
চোখ পিটপিট করে কফিনগুলো দেখছে জিনা। বেশ কিছুক্ষণ পর কপালের সামনে থেকে এক গোছা চুল সরাল ও। বলল, সত্যিই যদি এ ঘরে ভূত থেকে থাকে, তা হলে? আমার মনে হয় ওটাকে সপ্তাখানেক সময় দেয়া উচিত আমাদের। নতুন পরিবেশের সাথে পরিচিত হয়ে উঠুক, তারপর না হয়...
জবাব দিল না কিশোর।
ওর মন বলছে, এ বাড়িতে ভূত আছে।
এবং ওটা অভিশপ্ত ভূত।
মিস্টার পারকারের মত ও-ও চায় ভৌতিক জাদুঘরে দেশ-বিদেশ থেকে দলে দলে দর্শনার্থী আসুক। কিন্তু ভুতুড়ে বর্মটা যদি বিপজ্জনক হয়ে থাকে?

হ্যাগার্ডের কথাই যদি সত্যি হয়?
তা হলে বদনাম হয়ে যাবে জাদুঘরের। লোকজন আসতে দ্বিধা করবে। মিস্টার পারকারের এই বিচিত্র হবি ভেস্তে যাবে।
অবশেষে কফিনঘর পেরিয়ে পাশের রুমে ঢুকল ওরা। মিস্টার পারকার আজ সারাটা বিকেল মমি ঝাড়পোছ করে। কাটিয়েছেন এখানে। এত পরিশ্রম করেছেন যে আজ আর তার প্রিয় ল্যাবরেটরিতে যাননি একবারের জন্য। এত ঝাড়া-মোছার পরও প্রতিটি জিনিসে চিকচিক করছে বালু।
ওদের প্রতি পদক্ষেপের সঙ্গে ধুলো উড়ছে। রীতিমত বিরক্তিকর লাগছে ধুলোর অত্যাচার। অবশ্য মেঝেতে ধুলোর ছড়াছড়ির ব্যবস্থা। মিস্টার পারকার ইচ্ছে করেই করেছেন।
তাঁর কথা হলো, ভুতুড়ে জাদুঘর হবে ধুলোমোড়া, যা-তা চেহারার। দেয়াল থেকে ঝুলবে মাকড়সার জাল। পরিবেশ হবে। ভৌতিক, ইত্যাদি।
ওদের হাঁটার তালে তালে মৃদু খসখস শব্দ উঠছে।
মমি হাঁটলেও এমন শব্দ হয়, মুসার কাছে শুনেছে কিশোর। মিশরে মসা নাকি ওই আওয়াজ পেয়েছে।
দূর, এসব কী ভাবছি আমি! নিজের উপর বিরক্ত হলো কিশোর।
হ্যাগার্ড ঘুমাতে যাবার আগে মমি কেসের ঢাকনা লাগিয়ে যেতে ভুল করে না কখনও। কয়েকটা কেস অবশ্য খোলাই থাকে
এখনও। ওগুলোর টুকটাক কাজ চলছে। মিস্টার পারকার নিজে করেন সেসব।
চোখের কোণ দিয়ে পারকার আঙ্কেলের প্রিয় মমিটার দিকে তাকাল ও। মিস্টার পারকার ওটার নাম দিয়েছেন উদাস।
উদাস তার খাড়া কফিনে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।
গজমোড়া বাহু দুটো সামনে বাড়িয়ে রেখেছে।
কোটরের গর্তে বসা চোখজোড়া যেন অন্ধকার ভেদ করে চেয়ে। আছে সোজা কিশোরের দিকে।
আস্তে ঢোক গিলল ও। নিজের অজান্তেই কেশে উঠল। হয়তো সহজ হওয়ার জন্য।
দ্রুত পা চালাল।
কিছুক্ষণ পর নির্দিষ্ট রুমের সামনে পৌঁছল ওরা। রুমের ভিতর দরজার কাছেই কাঠের একটা স্ট্যাণ্ডের উপর দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল বর্মটাকে।
চোখ গোল গোল করে কিশোরের কাঁধের উপর দিয়ে সামনে তাকাল জিনা।
চোয়াল ঝুলে পড়েছে। হাত ইশারা করল ও। সামনে তাকাল কিশোর। সাথে সাথে বেদম এক ঝাঁকি খেল।

জায়গাটা শূন্য!
বর্মটা নেই!
কিশোর! জিনার গলা কেঁপে উঠল। কোথায় গেল ওটা? কোথায় গেল? এখানেই তো ছিল!
বর্মটা গায়েব হয়ে গেছে। ওটার কাঠের স্ট্যাণ্ডটা আছে কেবল।
এর অর্থ বুঝতে পারছ, জিনা? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
পারছি, ঢোক গিলল জিনা। বর্মটা হাঁটাচলা করতে পারে। ওটা... ওটা... আসলেই...
মনে হয় ভুতুড়ে! ওর কথা কেড়ে নিল কিশোর। বদমাশ নেজারের ভূত আছে ওটার মধ্যে। ভূতটা বর্মসহ নড়াচড়া করে। হাঁটাচলাও করতে পারে।
ওটা এখন কোথায় আছে কে জানে! সন্ত্রস্ত কণ্ঠে বলল জিনা। চেহারায় তীব্র আতঙ্কের ছাপ পড়ল। তলকুঠুরিতে লুকিয়ে আছে। হয়তো। নয়তো... নয়তো ওপরতলায় গেছে। এক পা পিছিয়ে মমিঘরে পা রাখল ও। এই রুমেও থাকতে পারে। হয়তো ঘাপটি মেরে বসে আছে অন্ধকারে কোথাও।
চারদিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল কিশোর। আমার তা মনে হয়, বলল ও। ওটার যে সাইজ, এখানে ঘাপটি মেরে থাকা সম্ভব নয়। অন্য কোথাও আছে। এসো, খুঁজে দেখি।
দরকার নেই, পিছিয়ে গেল জিনা। সময় হলে আপনিই ফিরে আসবে। চলো, ফিরে যাই।
বলো কী! কিশোর অবাক হলো। এতদূর এসে ফিরে যাব? তুমি ভাল করেই জানেনা সেটা উচিত হবে না। এই রহস্য ভেদ না করতে পারলে চলবে না।
জিনার ঢোলা জামার আস্তিন ধরল ও। নিয়ে চলল যেদিক থেকে এসেছে, সেদিকে।
এর মধ্যে জানা হয়ে গেছে, নেজার মমিঘরে নেই।
কফিনঘরেও নেই।
কিচেনের অন্ধকার কোণ আর ছায়াগুলো ভাল করে পরখ করল। ওরা, ওখানেও নেই বর্মটা।
তা হলে?
আর কোথায় থাকতে পারে ওটা?
চলো, মোমঘরটা চেক করে আসি, কিশোর বলল।
অসম্ভব! তীব্র প্রতিবাদ জানাল জিনা। ওই ঘরে কেন যেন কখনোই যেতে চায় না ও, ভয় পায়। ওই ঘর ছাড়া যেখানে খুশি চলো।

ঠিক আছে, ওখানে যাব না, বলল কিশোর। কী যেন ভাবছে। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, কনজারভেটরিতে থাকতে পারে।
বাড়ির পিছন দিকে বিশেষভাবে তৈরি একটা কাঁচের ঘর ওটা। বাগান ঘর।
জিনা ওখানে না যাবার উছিলা খুঁজল, কিন্তু যুৎসই কোনও কারণ দাঁড় করানোর সময় পেল না। কিশোর তার আগেই ওকে নিয়ে চলল বাড়ির পিছন দিকে।
এই বাড়িতে যেদিন প্রথম এসেছে কিশোর, সেদিন মিস্টার পারকার, জিনা আর হ্যাগার্ডের মুখে বারবার শুনেও বুঝতে পারেনি কনজারভেটরি কী জিনিস।
শেষে মিস্টার পারকার ওকে বোঝালেন ওটা আর কিছু নয়, এক ধরনের গ্রিন হাউজ।
ওটা প্রকাণ্ড এবং ফাঁকা। ওটার ছাদ আর তিনদিকের দেয়াল কাঁচের।
মিস্টার পারকার ওখানে নানান জাতের শাক-সবজি, গাছপালা লাগিয়ে গবেষণা করেন। কিশোর যতদূর জানে, ওই ঘরটাকে জাদুঘর হিসেবে ব্যবহার করার কোনও ইচ্ছে নেই মিস্টার পারকারের। রুমটা বিশাল, বেঢপ।
তা ছাড়া এখানে জাদুঘর করতে গেলে এখানে-ওখানে বিস্তর মেরামত করাতে হবে। সাময়িক শখের জন্য অত ঝামেলায় যেতে রাজি নন মিস্টার পারকার।
কনজারভেটরির দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে পড়ল কিশোর ও জিনা।
চাঁদের রহস্যময় নীল আলো দেয়াল আর ছাদ ভেদ করে ভিতরে ঢুকছে। একেবারেই অন্যরকম লাগছে জায়গাটাকে।
দেয়াল ঘেঁষে এগিয়ে চলল ওরা পা টিপে টিপে। কতগুলো গাছের আড়ালে চলে এল ওরা। জাদুঘরে ব্যবহার করার জন্য মিস্টার পারকার গাছগুলো লাগিয়েছেন।
ঝুলে থাকা বড় বড় কিছু লতা-পাতার ফাঁক দিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সামনে তাকাল কিশোর।
সামনে ওর নাক বরাবর কিছু একটা ঝিকিয়ে উঠল। যেন কোনও চকচকে জিনিসের উপর চাঁদের আলো পড়েছে।
কিশোর ঠোঁটে তর্জনী ঠেকিয়ে চুপ থাকার ইশারা করল জিনাকে।
ছায়ার ভিতর দিয়ে পাশাপাশি হেঁটে চলল ওরা বেড়ালের মত, নিঃশব্দে।
একটা মাকড়সার জাল আটকে গেল কিশোরের মুখে। বাঁ হাতে চটচটে জালটা সরাল ও। খুব সাবধানে শ্বাস-প্রশ্বাস নিল, কোনও অবাঞ্ছিত শব্দ যাতে না হয়।
নেজার ম্যাণ্ডার!
হ্যাঁ, এখানেই আছে ব্রিটিশ রাজার সৈন্য।
রুমটার ঠিক মাঝখানে প্রমাণ সাইজের একটা ঘোড়ার ডামির পিঠে বসে আছে সে। মাথার উপর খিলানের মত কাঁচের ছাদ।

হঠাৎ কিশোরের মনে হলো নেজারকে নড়তে দেখেছে ও।
চোখের পলক পড়ল না ওর।
এক কদম সামনে বাড়ল।
আম্মু! প্রকাণ্ড, শূন্য কাঁচের ঘরে জিনার তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর ভয়ঙ্কর প্রতিধ্বনি তুলল।
কিশোরের কানে বড় বেশি লাগল আওয়াজটা।
ঘোড়াটার গায়ে হেলান দেয়া রয়েছে একটা মই। মিস্টার পারকার ওটাকে উঁচু জিনিসপত্র সেট করার কাজে ব্যবহার করেন।
ভয় করছে? ফিসফিস করে বলল কিশোর। সব কিছু সহজ চোখে দেখার অভ্যেস করো। আমার মনে হয় পারকার আঙ্কেলই ওটাকে এখানে এনে ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে রেখেছেন।
মুখে বলল বটে, তবে তেমন জোরাল শোনাল না কণ্ঠ।
অবাক হয়ে লক্ষ করল কিশোর, মধ্যযুগীয় অস্ত্রশস্ত্র জাদুঘরে যা ছিল, তার প্রায় সবই কখন যেন সরিয়ে আনা হয়েছে এখানে।
ঘোড়সওয়ারের বাঁ পাশের দেয়ালে ঝুলছে মিস্টার পারকারের সংগ্রহের বর্শাগুলো। সংখ্যায় প্রায় এক ডজন হবে।
কিশোর দেখতে পেল নেজার ম্যাণ্ডারের ডানদিকের দেয়ালে বড়সড় ধাতব তলোয়ার আর ঢাল ঝোলানো আছে।
এক কোণে দেয়ালের সঙ্গে ঠেস দিয়ে রাখা একটা নকল বর্মও দেখা গেল।
জাদুঘরের জন্য এটা সংগ্রহ করেছিলেন মিস্টার পারকার। একটু দূর থেকে দেখলে বোঝার উপায় নেই ওটা আসল না নকল। এমনভাবে রং করা হয়েছে যে ওটা যে আসলে সস্তা, পাতলা টিনের তৈরি, তা বোঝা যায় না।
কিশোরের বেশ ভাল লেগেছে জিনিসটা। তবে সত্যিকারের বর্ম জোগাড় হওয়ার পর ওটার গুরুত্ব ও আকর্ষণ দুটোই কমে গেছে।
দেখেছ, পারকার আঙ্কেল কত কিছু এখানে নিয়ে এসেছেন? কিশোর বলল।
জিনাকে চিন্তিত দেখাল। কিন্তু কেন? বলল ও। কখন আনলেন বাবা? আমাদের চোখে পড়ল না কেন?
আমার মনে হয় পারকার আঙ্কেল হঠাৎ করেছেন কাজটা, বলল কিশোর। রুমটা বড় বলে এটাকেও হয়তো জাদুঘরের অংশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আমাদের অজান্তে এখানে নিয়ে এসেছেন এসব।
নেজারের বর্মের দিকে তাকাল গোয়েন্দা-প্রধান। ওটাকে ভয়ঙ্কর। লাগছে, তাই না?
হ্যাঁ, ফিসফিস করে বলল জিনা। ভয়ার্ত চোখে তাকাল ওটার দিকে।
ঘোড়ায় চেপে থাকা বর্মটা দেখে মনে হলো লড়াই করবার জন্য তৈরি ওটা।

একহাতে লম্বা, চুঁচাল ডগার একটা বর্শা ধরে আছে। অন্য হাতে ঘোড়ার লাগাম ও একটা ঢাল।
ধাতব হেলমেট চাঁদের আলোয় চিকচিক করছে। ঝিলিক মারছে বর্শাটাও।
বর্ম থেকে অদ্ভুত সবুজাভ একটা আলো ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। বর্মের ভিতর থেকেই বেরোচ্ছে।
অবাক না হয়ে পারল না কিশোর।
এ কী করে সম্ভব?
ওটার ভিতরে সবুজ আলো এল কোত্থেকে?
যতটা সম্ভব বর্মের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করল কিশোর। কাছ থেকে ভাল করে দেখার ইচ্ছে। এক পা সামনে এগোতেই পিছন। থেকে ওর হাত টেনে ধরল জিনা। ফিসফিস করে বলল, অ্যাই, কিশোর, কী করছ?
থেমে দাঁড়াল ও। ভাল করে দেখা দরকার।
বাবা যদি জানতে পারেন আমরা এখানে…
কিছুই বলবেন না।
বলবেন, একশো বার বলবেন, কিশোরের মাথার ভিতর থেকে বলে উঠল দ্বিতীয় কিশোর। বর্মটা নিয়ে তোমাকে বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করতে দেখলে পারকার আঙ্কেল রেগে যাবেন। শাস্তি হিসেবে টয়লেটে আটকেও রাখতে পারেন, বলা যায় না। যা রাগী মানুষ! তুমি তো ভাল করেই জানো ওটা পারকার আঙ্কেলের পছন্দের শাস্তি। প্রায়ই জিনাকে টয়লেট-শাস্তি পোহাতে হয়। তোমাকেও ছাড়বেন না, যদি… কি আমি তো পারকার আঙ্কেলের কোনও ক্ষতি করছি না, দ্বিতীয় কিশোরের উদ্দেশে বলল ও। আমি শুধু একটু কাছ থেকে বর্মটাকে দেখতে চেয়েছি, ব্যস। দেখব ওটার ভেতর থেকে কেন ওই সবুজ আলো আসছে। আঙ্কেল আমার কথা শুনবেন, বুঝিয়ে বললে রাগ করবেন না।
আর যা-ই হোক, ঘোড়ার পিঠে ওটাকে কিন্তু দারুণ মানিয়েছে
তা-ই না, জিনা?
জিনা জবাব দিল কি না খেয়াল করল না কিশোর।
ওর মাথায় শুধু একটাই চিন্তা ঘুরপাক খেল–বর্মের ভিতর আলো। এল কোত্থেকে?
বর্মটার খুব কাছে দাঁড়িয়ে আছে এখন কিশোর।
যতদূর সম্ভব হাত বাড়াল সামনে। ঘোড়ার পিঠের নাগাল পাওয়া গেল না। নেজার ঘোড়ার পিঠে চেপে আছে, আর ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে আছে চৌকো একটা প্ল্যাটফর্মের উপর।
নিজেকে এই মুহূর্তে বড় বেশি ছোট মনে হলো কিশোরের।

এখন?
এই দেখো! হঠাৎ করে মাথায় বুদ্ধি খেলে যেতে আপনমনে বলে উঠল ও। হাঁদা হয়ে গেছি আমি! এই জিনিস হাতের কাছে থাকতে আমি কিনা চিন্তা করছি!
মই ধরে বেয়ে উপরে উঠতে লাগল কিশোর।
কিশোর, বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু! নীচ থেকে ফিসফিস। করল জিনা। চলো, ফিরে যাই।
পাত্তা দিল না গোয়েন্দা-প্রধান।
কোনও কিছুকেই পাত্তা দিল না।
শুধু ওর ভিতরের শিরশিরে অনুভূতিটাকে ছাড়া।
মইয়ের ধাপ বেয়ে উপরে উঠতে উঠতে কিশোর খেয়াল করল হাত দুটো ওর মস্তিষ্কের নির্দেশ মানতে চাইছে না বিচ্ছিরি ভাবে কাঁপছে।
কোনওমতে মইয়ের মাথায় উঠে এল ও। বর্মটাকে এখন পরিষ্কার দেখতে পেল।
শ্বাস-প্রশ্বাস অনিয়মিত হয়ে এল ওর।
বর্মটার ব্রেস্ট-প্লেট আর হেলমেটের সূক্ষ্ম কারুকাজ খুঁটিয়ে দেখল ও। ওটার কয়েক জায়গা তুবড়ে গেছে। বুঝতে বাকি রইল না নেজার ম্যাণ্ডার আর যা-ই হোক, দুর্দান্ত যোদ্ধা ছিল।
মুখের আবরণটার দিকে তাকাল ও। এই অংশটা খুলে বর্মধারী। যোদ্ধারা খাওয়া-দাওয়া করত, কথা বলত।
সামনে ঝুঁকল কিশোর। ওটার উপরের সরু ফাঁক দুটোর একটা দিয়ে বর্মের ভিতরটা দেখার চেষ্টা করল। এই ফাঁক দুটো চোখের জায়গায়, ওখান দিয়ে যোদ্ধারা দেখত।
ভিতরটা অন্ধকার।
কিছুই চোখে পড়ল না।
বাঁ হাতে মই আঁকড়ে ধরে ডানহাতে হেলমেটটা ছুঁয়ে দেখল ও।
ভিতরের শিরশিরানি বেড়ে গেল। তবে তা বাইরে প্রকাশ করল কিশোর।
দেখলে তো, ভয় পাওয়ার কিছু নেই, নীচে তাকিয়ে জোর দিয়ে বলার চেষ্টা করল ও।
হাঁ করে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে জিনা। ভয়ে কুঁকড়ে আছে। মুখে কিছু না বললেও কিশোরের উপর ও যে প্রচণ্ড বিরক্ত, তা ওর চেহারাই বলে দিল।
মুখ তুলল কিশোর। বর্মের মুখের ঢাকনা নিয়ে পড়ল। খোলার। চেষ্টা করল ওটা। কাঁকো শব্দ তুলে খুলে গেল।
অপ্রত্যাশিত শব্দটা কাঁপন তুলল ওর সারা দেহে।
হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠল। তবে সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিল ও।

হেলমেটটার মুখোমুখি এখন কিশোর।
কিছুই দেখার নেই ভিতরে।
রাতের চেয়েও নিকষ কালো।
আরও সামনে ঝুঁকে ভিতরে নজর ফেলল কিশোর।
অন্ধকার।
ঘন।
কালিগোলা।
অসহ্য একটা বোটকা গন্ধ নাকে ধাক্কা মারল ওর। যেন পচা জঞ্জালের স্তূপ আছে ভিতরে।
পেটের ভিতর নাড়ি-ভুড়ি পাক খেয়ে উঠল। প্রলম্বিত একটা গোঙানির আওয়াজ কানে এল। কেউ যেন দীর্ঘ একটা টানেলের আরেক মাথায় বসে গোঙাচ্ছে।
আওয়াজটা চড়তে লাগল একটু একটু করে।
দ্রুত ভাবতে চাইল কিশোর। কীসের আওয়াজ?
তীব্র হচ্ছে। প্রলম্বিত হচ্ছে।
কীসের?
কোনও জবাব খুঁজে পেল না।
খানিক পিছনে হেলে দাঁড়াল ও। নড়ে উঠল মইটা। কিশোরের গা কাঁটা দিয়ে উঠল।
কিছু একটা নড়ছে।
হেলমেটের ভিতর!
উঠে আসছে কিছু একটা!
কুচকুচে কালো একটা ছায়া!
তীক্ষ্ণ, প্রলম্বিত গোঙানির আওয়াজটা আরও চড়ছে।
চড়তেই থাকল।
বর্ম নড়ে উঠল। তারপর প্রবলভাবে কাঁপতে শুরু করল।
তীক্ষ্ণ এবং কর্কশ আর্তনাদ করে কালো ছায়াটা ঝড়ের বেগে। বেরিয়ে এল বর্মের ভিতর থেকে।
কিশোরের দিকে ছুটে এল ওটা। মহা আতঙ্কে চোখ বুজে ফেলল ও।
এক জোড়া ডানার ভয়ঙ্কর ফড়ফড় আওয়াজ শুনতে পেল ও মাথার চারপাশে।
ধীরে ধীরে চোখ মেলে দেখল কালো ছায়াটা উড়ে বেড়াচ্ছে ওকে কেন্দ্র করে।
একটু পর সামান্য দূরে সরল ওটা। তারপর তীর বেগে ডাইভ দিল সোজা ওকে লক্ষ্য করে।
আঘাত এড়াতে ঝট করে মাথা নিচু করল কিশোর। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে।

এ পর্যন্ত ওর দেখা সবচেয়ে বড়, কালো আর কুৎসিত বাদুড়টা প্রায় ওর মুখের উপর আছড়ে পড়ল।
ভয়ঙ্কর দুটো লাল জ্বলজ্বলে চোখ দেখতে পেল কিশোর, জমে গেল আতঙ্কে।
মুখ হাঁ হলো ওটার। তীক্ষ্ণ সারিবদ্ধ দাঁত বেরিয়ে আছে। ওটার ভয়ঙ্কর নখর দেখে শিউরে উঠল কিশোর। ওকে আক্রমণ করতে তৈরি।
হিংস্র দানবের মত বাদুড়টা ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগমুহূর্তে নিজের অজান্তে দুহাতে মাথা পেঁচিয়ে ধরল ও। তবু শেষরক্ষা হলো না। ওর বাঁ কানে ডানা দিয়ে বাড়ি মারল ওটা।
আউ! ককিয়ে উঠল কিশোর। নড়াচড়ার কারণে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল। মই থেকে পা ছুটে গেল সড়াৎ করে। তারপর যা হওয়ার তাই।
সোজা পপাত ধরণীতল।
পড়লে কী করে, কিশোর? জিনা ওর পাশে এসে দাঁড়াল দ্রুত। এক হাত সামনে বাড়িয়ে বলল, বেশি লাগেনি তো? এ হাতটা ধরল না কিশোর। রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে নিজের চেষ্টায় উঠে দাঁড়াল। ব্যথায় টনটন করছে সারা গা। মনে হলো একটা হাড়ও আস্ত নেই।
দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথা হজম করার চেষ্টা করল কিশোর।
ডান পায়ের গোড়ালিতে টনটনে ব্যথা, থেঁতলে গেছে যেন মাংস।
ডাইভটা ভালই হয়েছে! তির্যক মন্তব্য করল জিনা। কিন্তু মাছটা ফসকে গেল, এই যা।
লজ্জায় গম্ভীর হয়ে গেল কিশোর।
মাথা নিচু করে পাজামার পিছনটা ঝাড়ল। ওর স্লিপার জোড়া, নেজারের ঘোড়ার পায়ের কাছে পড়ে আছে। পায়ে গলাল ওগুলো।
কমসে কম পঞ্চাশ পাউন্ড হবে বাদুড়টার ওজন, বিড়বিড় করে বলল কিশোর।
ভুরু নাচাল জিনা। গেল কোথায় ওটা? দুহাতে মাথা আড়াল করে ছাদের দিকে তাকাল।
জানি না, জবাব দিল কিশোর। রুমের চারদিকে নজর বোলাল। ওটাকে কোথাও দেখা গেল না।
রাত দুপুরে এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাশা করার কোনও মানে হয় না, জিনা বলল। তুমি থাকো, আমি শুতে চললাম।
যাও, তাৎক্ষণিক জবাব দিল কিশোর।
দ্রুতপায়ে দরজার দিকে এগোল জিনা। রুমের শেষ মাথায়। ছায়াগুলোর মধ্যে হারিয়ে গেল।

কিশোর দীর্ঘশ্বাস ফেলল। মনে মনে নিজেকে বলল, আগেও বলেছি জিনাটা আসলে ভীষণ ভিতু। দেখলে এখন, সামান্য একটা বাদুড়ের ভয়ে তোমাকে একা ফেলে কেমন সটকে পড়ল?
নাকি অন্য কোনও কারণ আছে?
কী এমন কারণ থাকতে পারে? ভাবল কিশোর মনে মনে।
নেজারের ভূতের ভয়?
কে জানে?
এখানে শুধু শুধু দাঁড়িয়ে থাকাটা অনর্থক বলে মনে হলো ওর।
এখানে কি কোনও ভূতের দেখা পেল ও?
না।
দেখল শুধু একটা বাদুড়ের বাঁদরামি।
আবার দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল কিশোর। ক্ষোভ-হতাশা জমল মনে। দরজার দিকে এগোল ধীর পায়ে।
চটা চটাশ আওয়াজ তুলছে ওর স্লিপার।
রুমের মাঝামাঝি পৌঁছে মনে হলো একটা কিছুর নড়াচড়া টের পেয়েছে যেন ও।
হ্যাঁ, ঠিক তাই।
কিছু একটা নড়েছে।
থেমে দাঁড়াল কিশোর। ঘুরে তাকাল বর্মটার দিকে।
চাঁদের আলোয় ঝিক্ করে উঠল কী যেন।
তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল ওটার মুখের দিকে।
বর্মের মুখাবরণটা খোলা ছিল না? হ্যাঁ, ভোলাই তো ছিল। বন্ধ হলো কীভাবে? কে করল?
মাথা ঝাঁকাল কিশোর। চোখ ডলল।
না, তা হয় কী করে?
বাদুড়টার আক্রমণের আগ মুহূর্তে কিশোরই হয়তো নিজের অজান্তে ওটা বন্ধ করেছিল। এখন মনে নেই।
হতেও তো পারে।
পারে না?
আর একমুহূর্তও এখানে নয়, সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল ও। ঘুরে যত দ্রুত সম্ভব পা চালাল।
ফ্লোরে পায়ের আওয়াজ উঠল। তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ঢিপঢিপ করছে হৃৎপিণ্ড
দরজার কাছে পৌঁছে বর্মটার দিকে ঘুরে তাকাল ও। নাহ্, জায়গামতই আছে ওটা।

নেজার নিজের ঘোড়ার পিঠে বসে আছে একইভাবে।
কনজারভেটরি থেকে বেরিয়ে এল কিশোর। নীচতলার কিচেনে ঢুকল। সামনে এগোল কয়েক পা।
কিচেনের জানালা দিয়ে চাঁদের ভুতুড়ে আলো আসছে। সেই সাথে আসছে শীতল বাতাস। কেন যেন কেমন লেগে উঠল কিশোরের।
দেয়ালে ঝোলানো বড়সড় একটা তলোয়ার চাঁদের আলোয় ঝম করে উঠল। ওটার পাশে ঝুলছে এক সেট ভারী শেকল। শেকলের কড়াগুলোকে প্রাগৈতিহাসিক কোনও জন্তুর দাঁতের মত লাগছে।
ক্ষুধার্ত হিংস্র হায়েনার দাঁতের মত। যেন ওর দিকে তাকিয়ে কটাক্ষের হাসি হাসছে।
শান্ত হও, কিশোর, নিজেকে বলল মনে মনে। অযথা ভয় পাচ্ছ। তুমি। অকারণে ভয় পাওয়ার ছেলে তো তুমি নও। এই বাড়িতে পারকার আঙ্কেল নিজ হাতে একটা জাদুঘর গড়েছেন, ওটা ছাড়া আর কিছুই নেই। এ বাড়িকে তুমি নিজের বাড়ির মতই মনে করো। ভয় পাওয়ার মত কিছু নেই এখানে।
কফিনটাকে যেমন দেখে গিয়েছিল, এখনও তেমনি আছে।
কোনও রদবদল হয়নি। হওয়ার কারণও নেই।
নাকি হয়েছে?
ড্রাকুলার কফিনের ডালাটা
খোলা ছিল বলে তো মনে হচ্ছে না! যতদূর মনে পড়ে সামান্য ফাঁক হয়ে ছিল ওটা।
ব্যাপার বুঝতে গিয়ে সময় নষ্ট করল না কিশোর। দ্রুত মমিঘরে ঢুকল।
উদাসকে দেখতে পেল প্রথমেই। সবসময় যেখানে থাকে, সেখানেই আছে সে। চোখে সেই উদাস চাউনি। দুই বাহু আগের মতই সামনে বাড়ানো। দশ মমি-আঙুল প্রসারিত।
দ্রুত ওটাকে পেরিয়ে গেল কিশোর, মনে হলো এখনই বুঝি প্রাণ ফিরে পাবে মমিটা, দুহাতে ওকে আঁকড়ে ধরবে।
কিন্তু না, তেমন কিছুই ঘটল না। ঘটার কারণও নেই।
লম্বা করে দম নিল কিশোর।
মমির ধুলো এসে ঢুকল নাকে। কেশে উঠল খকখক করে। দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলো। মমিঘর থেকে পড়িমরি ছুটে বেরিয়ে এল।
সামনে দরজা। জাদুঘর থেকে বেরোনোর পথ। কাশতে কাশতে ছুটল কিশোর দরজার দিকে।
বাতাস!

বিশুদ্ধ বাতাস দরকার।
দরজাটা প্রকাণ্ড, সাধারণ দরজার প্রায় দ্বিগুণ। অনেকটা কিশোরদের স্কুলের সামনের গেটের মত।
দরজার একপাশে ধাতব হাতল। খুলতে হলে ওটা ধরে ঠেলা দিতে হয়। দরজার হাতল ধরে জোরে ঠেলা দিল কিশোর।
নড়ল না দরজা।
শরীরের সমস্ত শক্তি এক করে আবার ঠেলা দিল ও।
নাহ্, কাজ হলো না। দরজার ভারী পাল্লা এক ইঞ্চিও নড়ল না।
একহাতে দেয়াল হাতড়াতে লাগল কিশোর। সুইচ খুঁজে পেতে সময় লাগল না। বাতি অন করল। মাথার উপরের বৃত্তাকার টিউব জ্বলে উঠল।
পরমুহূর্তে চোখের সামনে অকল্পনীয় দৃশ্যটা দেখে চোয়াল ঝুলে পড়ল ওর।
শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধই হয়ে এল প্রায়। দরজার দুই হাতলের ভিতর বর্মধারীর একটা তলোয়ার শক্ত করে ভরে দিয়েছে কেউ।
হঠাৎ মেজাজ সপ্তমে চড়ে গেল কিশোরের।
তলোয়ারের হাতল ধরে টানল।
সর্বশক্তি দিয়ে।
দাঁতে দাঁত চেপে।
মরিয়া হয়ে।
কিন্তু চুল পরিমাণ নড়ানো গেল না ওটাকে।
ফাঁদে পড়ে গেছে কিশোর।
ফাঁদে আটকে গেছি! কিশোরের স্বগতোক্তি শূন্য রুমের চার দেয়ালে বাড়ি খেয়ে প্রতিধ্বনি তুলল। নিজের কণ্ঠস্বর নিজের কাছেই ভৌতিক লাগল ওর।
তলোয়ারটার ঠাণ্ডা, কঠিন হাতল শক্ত করে ধরল আবার। বুক। ভরে দম নিয়ে হ্যাঁচকা টান মারল। জোরে।
যত জোরে সম্ভব।
হাত ব্যথা হয়ে গেল। পেশি টন্ করছে, মনে হলো ছিঁড়েই যাবে বুঝি।
মাথার শিরা-উপশিরা দপদপ করছে।
রক্ত চলাচলের গতি বেড়ে গেছে।
কিছু লাভ হলো না। ব্যর্থ হলো ওর চেষ্টা।
হাঁপাতে হাঁপাতে তলোয়ারের হাতলে খানিক দমাদম কিল মারল কিশোর।
তবু কাজ হলো না।
কয়েক পা পিছিয়ে এল ও হাঁপাতে হাঁপাতে। তারপর ছুটে গিয়ে দরজায় কষে লাথি ঝাড়ল।

লাভের লাভ তো কিছু হলোই না, উল্টে ব্যথায় টাটিয়ে উঠল পা। দরজা বা তলোয়ারের গোজ, কোনওটাই নড়ল না।
ফাঁদে পড়ে গেছি!
কথাটা বারবার ওর মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল।
যে পথ ধরে এসেছে, সে পথে ফিরে যাওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় নেই কিশোরের। জাদুঘরের ভিতর দিয়ে যেতে হবে। তার মানে আবার মমিঘর, কফিনঘর, ভৌতিক কিচেন পেরোতে হবে। ভয়ঙ্কর জিনিসগুলোর মধ্য দিয়ে যেতে হবে আবার।
কনজারভেটরির শেষপ্রান্তে একটা ব্যাক ডোর আছে। ওটা দিয়ে বেরোনো ছাড়া আর কোনও রাস্তা নেই।
কিন্তু ওই অশুভ রুমটাতে আর যেতে ইচ্ছে করছে না কিশোরের। কোনওমতে ওই দরজা পর্যন্ত পৌঁছতে পারলে তবেই রক্ষে।
না পারলে?
একটু দমে গেল কিশোর। ঘুরে হাঁটতে শুরু করল। মাথার মধ্যে চিন্তার ঝড়।
কীভাবে বন্দি হলো ও? জিনা তো ওই দরজা দিয়েই বেরিয়ে গেছে মাত্র কয়েক মিনিট আগে। এর মধ্যে তৃতীয় কেউ এসে দরজার হাতলে তলোয়ারটা ভরে দিয়েছে। কিন্তু কেন?
কাজটা কীভাবে সম্ভব হলো?
কাজটা যে-ই করে থাকুক, তাকে তো কিশোরের চোখে পড়ার কথা।
অবশ্যই।
কীভাবে ওর চোখ ফাঁকি দিল সে? তাকে কেন দেখতে পেল না ও?
যত ভাবছে কিশোর, তত জট পাকিয়ে যাচ্ছে মাথার মধ্যে।
পা দ্রুত, চলছে ওর। সেসঙ্গে সমান তালে চলছে চিন্তা।
গলার নীল লকেটটা ডানহাতে চেপে ধরে আছে কিশোর। কেন, নিজেই জানে না। তবে শান্তি, স্বস্তি–দুটোই পাচ্ছে ওটার ছোঁয়ায়। মনে হচ্ছে জিনিসটা ওকে সাহস জোগাচ্ছে। যেন বলছে ভয় নেই, আমি আছি।
কখন জাদুঘর পেরিয়ে এসেছে, বলতে পারে না কিশোর। কনজারভেটরির দরজার সামনে এসে থেমে দাঁড়াল।
টেনে খুলল দরজাটা। কাঁচকোচ শব্দ তুলল জং ধরা কবজা।
উঁকি দিল ভিতরে।
নেজার এখনও আছে ওখানে–ডামি ঘোড়াটার পিঠে। তখন যে অবস্থায় দেখে গিয়েছিল ও, সেই অবস্থাতেই আছে।
তবু আশ্বস্ত হতে পারল না কিশোর। মনের খুঁতখুঁতে ভাবটা কিছুতেই গেল না।

মিস্টার পারকারের লাগানো গাছগুলোর পাশে চলে এল। কিশোর। তারপর ওগুলোর ভিতর দিয়ে সাবধানে সামনে এগোল।
বেড়ালের মত নিঃশব্দে। কেন যেন মনে হচ্ছে শব্দ করা ঠিক হবে না।
বর্মটাকে পেরিয়ে যাবার পরও যখন অস্বাভাবিক কিছু ঘটল না, তখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ও।
আর কয়েক কদম দূরেই রয়েছে কাঙ্ক্ষিত দরজা। ওটার কাছে পৌঁছতে পারলেই আর কোনও সমস্যা থাকবে না।
এগিয়ে চলল কিশোর। প্রায় নাগালের মধ্যে এসে পড়েছে। দরজা। আর তিন কি চার কদম…
এমন সময় পিছনে অদ্ভুত একটা শব্দ উঠল।
ক্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ-চ!
কিশোরের হাত-পায়ের শিরায় শিরায় শিহরণ জাগল। বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ড লাফ দিল।
এগিয়ে যাও, কিশোর, নিজেকে বলল ও। ভুলেও পেছন ফিরে তাকিয়ো না। যেভাবেই হোক ওই দরজার কাছে তোমাকে পৌঁছতেই হবে।
কিন্তু না, নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারল না ও, কৌতূহলের কাছে হেরে গেল আরেকবার। থেমে দাঁড়িয়ে ঘুরে তাকাল।
এবং যা দেখল, তাতে এক লহমায় গায়ের তাপমাত্রা কয়েক ডিগ্রি কমে গেল। পরপর দুটো বিট মিস করল হৃৎপিণ্ড।
নেজারের বর্ম!
কিশোরের ঠিক পিছনেই দাঁড়িয়ে আছে!
ওর পাশে উঁচু একটা টাওয়ারের মত লাগছে ওটাকে।
বর্মটা ঘোড়া থেকে নামল কীভাবে?
শব্দ করে ঢোক গিলল কিশোর। গলা-বুক শুকিয়ে কাঠ।
কণ্ঠতালু খটখট করছে। বোঁ-বোঁ করছে দুকান।
বর্মের মুখাবরণের উপর দিকের চোখের সরু দুই ফাঁক দিয়ে ভয়ঙ্কর লাল আভা বেরোচ্ছে! দেখতে দেখতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল!
হঠাৎ করে চরম সত্যি কথাটা উপলব্ধি করল কিশোর। এই বর্মের ভিতরে নেজারের ভূত রয়েছে!
ওটা আরও এক কদম সামনে বাড়তে আবার কাঁচ-কাঁচ শব্দ উঠল। নীরব রাতে ভয়ঙ্কর শোনাল সে-আওয়াজ।
নিজের অজান্তে পিছিয়ে গেল কিশোর।
মনে হচ্ছে সময় যেন থমকে গেছে।

আমি বিশ্বাস করি না, ফিসফিস করে বলল কিশোর। আরও কিছু বলার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলো ও। পা দুটোকে স্বাভাবিক রাখার মরিয়া চেষ্টা চালাল।
কিন্তু পারছে? না। বুক ধকধক করছে।
বর্মের একটা ধাতব বাহু ধীরে ধীরে শূন্যে উঠতে লাগল। অভিযোগের ভঙ্গিতে তর্জনী খাড়া ওটার। আঙুলটা কিশোরের দিকে তাক করে রেখেছে নেজার!
হাতটার দিকে চেয়ে আছে কিশোর। বিস্ময়ে দুচোখ বিস্ফারিত।
এবার! ভারী একটা কণ্ঠস্বর গমগমিয়ে উঠল বর্মের ভিতর থেকে। এবার আমার হাত থেকে তোমার রেহাই নেই, শয়তান জাদুকর!
অ্যাঁ? হাঁ হয়ে গেল কিশোর। কী… কী বলছেন আপনি? আমি জাদুকর?
হ্যাঁ। তুমি-ই সেই শয়তান জাদুকর। ভেবেছ আমার চোখে ধুলো দিয়ে এবারও আমাকে ফাঁকি দেবে? তোমার সে আশা মিথ্যে!
এসব কী বলছেন আপনি? মরিয়া হয়ে বলার চেষ্টা করল কিশোর। জাদুকর হতে যাব কেন আমি? আমার নাম কিশোর। বান্ধবীর বাড়িতে বেড়াতে এসেছি।
চুপ করো! খ্যাকানি মারল নেজার। ওই পাপী মুখে আর কত মিথ্যে কথা বলবে তুমি? জাদুর বলে আমাকে তুমি বন্দি করে রেখেছ এই বর্মের মধ্যে।
আমি?বলল কিশোর। প্রবলভাবে মাথা দোলাল। বুকের উপর নীল লকেটটা দুলে উঠল পেণ্ডুলামের মত।
ওটার ভেতরকার নীল ধোঁয়ার মেঘ আবার অশান্ত হয়ে উঠেছে।
পাক খাচ্ছে অবিরাম।
আপনি ভুল করছেন, বলল কিশোর। আর কারও সাথে আমাকে গুলিয়ে ফেলছেন। আমি সত্যি জাদুকর নই। এর আগে কোনওদিন আপনাকে দেখিনি। বিশ্বাস করতে পারেন, আমি…
চুপ করো! আবারও গর্জে উঠল বর্মবন্দি। ভিতরের আগুন লকলক করে উঠল। মাথাটা সামান্য নোয়াল সে।
ভিতরে কয়েকশো পাউণ্ড জঞ্জাল থাকা সত্ত্বেও ক্ষিপ্র গতিতে আগে বাড়ল ওটা। যত শক্তিশালীই হোক, কোনও মানুষ এত দ্রুত নড়তে পারবে কি না সন্দেহ।
হাতের বর্শাটার উঁচাল প্রান্ত কিশোরের গলায় ঠেকাল নেজার। মরার জন্যে তৈরি হও, শয়তান! চিবিয়ে চিবিয়ে বলল।
বর্শার আলপিনের মত চোখা প্রান্ত কিশোরের গলার চামড়া ফুটো করে দিল।
ভীষণ গরম ঠেকল জিনিসটা।
ভূতটা কিশোরকে খুন করতে চায়!
গলা চিরে ফেলতে চায়!
তারপরও নেজার ম্যাণ্ডারের মনের জ্বালা জুড়াবে বলে মনে হয় না।

তার মত পূর্ণবয়স্ক যোদ্ধার কাছে কিশোর কী-ই বা! কিছুই করার নেই ওর।
তা-ও লোকটা জীবিত হলে একটা কথা ছিল।
মৃত সে।
অশরীরী।
অনেক কষ্টে ঢোক গিলে দুকদম পিছিয়ে গেল কিশোর।
সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এল বর্মবন্দি। দুর্বোধ্য এক গোঙানি ছাড়ল। মুখাবরণের অগ্নিশিখা সাপের চেরা জিভের মত লকিয়ে উঠল।
ভেবেছ বাচ্চা ছেলের রূপ ধরে আমাকে ধোঁকা দেবে, তা-ই না? গমগমে কণ্ঠে বলল বর্মবন্দি। তুমি যখন ডাইনোসরের রূপ ধরেছিলে, তখন আমি তোমার বিরুদ্ধে লড়েছি। যখন আগুনের দেয়াল হয়েছিলে, তখনও পিছপা হইনি। আর এখন...
বর্শাটা আবার কিশোরের গলায় ঠেকাল প্রেতাত্মা। আজ আমি প্রতিশোধ নেব। ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ...।
সাহায্যের আশায় চিৎকার করার চেষ্টা করল কিশোর। পারকার আঙ্কেল ও হ্যাগার্ডকে ডাকার চেষ্টা করল।
কিন্তু মুখ দিয়ে টু শব্দও বের হলো না। চাপা গোঙানির মত আওয়াজ বেরোল কেবল। গলায় শক্তিও নেই।
নেজার ম্যাণ্ডার গলাটা নিচু করে আবার তুলল। ধাতব, খ্যানখেনে গলায় পৈশাচিক হাসি দিল।
বহু কষ্টে আরেক পা পিছাল কিশোর। সঙ্গে সঙ্গে ওটাও এগিয়ে এল এক পা। যেন মাঝখানের ব্যবধান কিছুতেই বাড়তে দিতে রাজি নয়।
আচমকা হাতের বর্শাটা একদিকে ছুঁড়ে মারল নেজার। জোরাল ঠঠ শব্দ তুলে মেঝেতে আছড়ে পড়ল ওটা।
যাক! মনে হয় আমার কথা বিশ্বাস করেছে, ভাবল কিশোর। হাঁপ ছাড়ল।
আরেক পা সামনে এগোল ওটা।
আজকের এই দিনটির জন্যে যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অপেক্ষা করে আছি আমি। তোমাকে তিলে তিলে মারব আমি, জাদুকর! দুচোখ ভরে দেখব তোমার মরণ-যন্ত্রণা, তার ভারী কণ্ঠস্বরে পৈশাচিক রুক্ষতা।
ভয়ে জমে গেল কিশোর।
ওকে বিশ্বাস করেনি নেজার!
মুক্তি দেয়নি!
অনেক কষ্টে মুখ তুলে চাইল কিশোর উপর দিকে।
নড়ার শক্তিও নেই দেহে।

চারদিকে নজর বোলানোর ফাঁকে কিশোর বুঝল লুকানোর জায়গা নেই কোথাও। নেজারের হাত থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব নয়।
মধ্যযুগের যত অস্ত্র আছে মিস্টার পারকারের সংগ্রহে, ঘোড়ার ডামিটার চারদিকে সাজিয়ে রাখা আছে সেসব। ওগুলোর দিকে নজর যেতে ঢোক গিলল ও।
নেজারের হাত থেকে আজ ওর রেহাই নেই।
পারকার আঙ্কেলের এই কনজারভেটরির মধ্যেই তা হলে ওর মরণ লেখা ছিল।
এটা দরকার আমার, লম্বা একটা তলোয়ার তুলে নিয়ে বলল নেজার। এটাও, আরেক হাতে তুলে নিল দশাসই এক গদা।
জিনিস বটে একখানা!
যেমন বিদঘুঁটে, তেমন ভারী। ওটার মাথার অসংখ্য চোখা পেরেক মারমুখো করে পোতা রয়েছে অনেকটা টুথব্রাশের ব্রিসলের মত। তবে অত ঘন নয়। তাতে অবশ্য কিছু আসবে যাবে না। এক ঘা খেলেই কম্ম কাবার।
চক্‌চক্ করছে গদার পেরেকগুলো। থেকে থেকে ঝিকিয়ে উঠছে। তলোয়ার।
কিশোর ভয়ে পিছিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল। ওই গদার পেরেকঠাসা মাথার একটা খোঁচা খেলে কেমন লাগবে ভাবতে গিয়ে গায়ের তাপমাত্রা শূন্যের কোঠায় নেমে গেল।
শুনুন! আচমকা চড়া গলায় চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। হঠাৎ এত শক্তি কোত্থেকে এসে ভর করল গলায়, ভেবে নিজেই অবাক হলো। মারার আগে বাঁচার শেষ চেষ্টার সময় সবারই বোধহয় এমনই বেড়ে যায় জোর। আপনি তো একজন যোদ্ধা, তা-ই না? নিশ্চয়ই আপনার জানা আছে একজন সত্যিকারের যোদ্ধা কখনও নিরস্ত্র কাউকে আক্রমণ করে না?
বর্মটার মুখাবরণের ভিতরের লাল আগুন লল করে উঠল।
ঠিক বলেছ, একমত হলো যোদ্ধার ভূত। আমি কখনও নিরস্ত্র কাউকে আক্রমণ করিনি। কয়েক পা পিছাল। তারপর এক হাতে ইশারায় দেয়ালে ঝোলানো অস্ত্রসম্ভার দেখাল কিশোরকে। ওখান থেকে বেছে নাও যা খুশি।
দুহাত কাঁপছে কিশোরের।
বুকের মধ্যে অনবরত হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে।
কোনওমতে এগিয়ে একটা ঢাল তুলে নিল ও। ঢালটা বেশ বড় আর ভারী। দুহাতে জিনিসটা ধরে ওটা দিয়ে মাথা আড়াল করল।
বাহ্! ভাবল ও। আত্মরক্ষার ভাল একটা ব্যবস্থা হয়ে গেল।
কিন্তু নেজার ম্যাণ্ডার আরও খেপে উঠল। জলদি অস্ত্র বেছে নাও!

তার ভারী ও চড়া নির্দেশে চমকে উঠল কিশোর। ঢালের আড়াল থেকে মাথা তুলল। তারপর কাঁপা হাতে মাঝারি আকারের একটা গদা তুলে নিল।
ঢালটা বাঁ হাতে ধরেছে, গদা ডান হাতে।
মনে হচ্ছে ও দুটোর ওজন কয়েক টন করে হবে। ধরে রাখতেই জান বেরিয়ে যাবার দশা হলো কিশোরের। দুই হাত টন্ট করে উঠল।
লড়বে কীভাবে?
লড়ার চেষ্টা করার সুযোগ পাবে তো?
নেজার ম্যাণ্ডার মাথা পিছনে হেলিয়ে হো-হো করে হেসে উঠল। অপার্থিব হাসি।
লড়াই শুরু হলো।
ঢালের উপর দিয়ে উঁকি দিল কিশোর।
প্রেতাত্মাকে তার গদাটা মাথার উপরে ওঠাতে দেখল ও।
কিশোরের মাথা সই করে দ্রুত নেমে আসতে লাগল ওটা।
চোখা পেরেকগুলো বাতাসে শিস কেটে নীচে নেমে আসার সময়। চাঁদের আলোয় ঝিকমিক করে উঠল।
বিজাতীয় একটা আওয়াজ করে কিশোর শক্ত হাতে ধরল ঢালটা। আগেই মাথা নিচু করে রেখেছে। শরীরের প্রতিটি পেশি টাটা হয়ে উঠেছে।
ওর ঢালে গদার বাড়ি পড়তেই গোটা দেহ কেঁপে উঠল। লোহার সঙ্গে লোহার ঘর্ষণে ফুলঝুরির মত স্ফুলিঙ্গ ছুটল।
একইসঙ্গে ঝন্‌ঝন্‌ জাতীয় একটা শব্দ কানে এল ওর। দ্বিতীয় আঘাত কিশোরের ঢাল যে সইতে পারবে না সে-ব্যাপারে কোনও ভুল নেই।
প্রাণের আশা ছেড়ে দিল কিশোর। বুঝতে পারছে, আসলেই ও হেরে গেছে।
দম বন্ধ করে রেখেছে কিশোর। নিজের হৃৎস্পন্দন শুনছে। শেষ হৃৎস্পন্দন।
বড়জোর আর কয়েক সেকেণ্ড আয়ু আছে ওর। গদার আঘাতে হাড়-মাংস থেঁতলে যেতে আর দেরি নেই।
তারপর সব শেষ।
এক।
দুই।
আড়াই সেকেণ্ড
পৌনে তিন…
কই, কিছুই তো ঘটল না।
ধীরে ধীরে কচ্ছপের মত মাথা তুলল ও ঢালের কিনারা দিয়ে। নিজের ঢালটা ভাল করে দেখল। এখনও অক্ষত আছে, ওটা।

ওর কয়েক পা দূরে বর্মটাকে দেখা গেল। নেজারের চোখবিহীন, চোখের দুই ফুটো নিজের গদার উপর স্থির।
কিশোরও তাকাল ওটার দিকে।
মানে গদাটার অবশিষ্টাংশের দিকে।
কিশোর ওর ঢালটা ধরে রেখেছিল শরীর আড়াল করে, নেজারের গদা আঘাত হেনেছিল ওটায়, আর তাতে ভেঙেচুরে অগুনতি টুকরোয় পরিণত হয়েছে তার গদা। ওটার তীক্ষ্ণ পেরেকগুলো খুলে মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ে আছে।
নেজার যখন অবাক বিস্ময়ে নিজের ভাঙা অস্ত্রের দিকে চেয়ে আছে, কিশোর তখন মাথা তুলে সামনে ঝুঁকে ওর ঢালের সামনের দিকটা দেখে নিল। বড়সড় একটা ট্যাপ চোখে পড়ল।
ব্যস এটুকুই। আর কিছু হয়নি ওটার।
অথচ বারোটা বেজে যাওয়ার কথা ওটার। নিজের সৌভাগ্য দেখে নিজেই অবাক হলো ও।
হচ্ছেটা কী এসব?
প্রচণ্ড এক হুঙ্কার ছেড়ে হাতের অকেজো গদাটা ছুঁড়ে মারল যোদ্ধা। গর্জে উঠল, কোনও জাদুমন্ত্রে এবার কাজ হবে না। এবার আমার হাতেই তোমার মরণ লেখা আছে।
নেজারের অন্য ধাতব হাতে এখনও শোভা পাচ্ছে তলোয়ারটা।
ওটা উঁচিয়ে কিশোরের দিকে এগোল। হুমকি দেয়ার ভঙ্গিতে শূন্যে তলোয়ার চালাল সে। চাঁদের আলোয় ঝিকিয়ে উঠল ভয়ঙ্কর অস্ত্রটা।
মাথা নোয়াল কিশোর।
এখন কী হবে?
পালাও! ভিতর থেকে দ্বিতীয় কিশোর বলল ওকে। শিগগির পালাও, কিশোর!
কিন্তু কোথায় পালাবে ও? পিছনের দরজা আগলে দাঁড়িয়ে আছে। বর্মটা।
ঘুরে যে-পথ দিয়ে ও এসেছিল সে-পথেই হাঁটতে শুরু করল। আবার। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। কিচেনের দিকে যাবে।
পিছনে ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ উঠল।
ভারী ঢালটা ছুঁড়ে ফেলে দিল কিশোর। তারপর দৌড়াতে শুরু করল। টের পেল দম নিতে সমস্যা হচ্ছে। গলা শুকিয়ে গেছে। ঢোকও গেলা যাচ্ছে না।
পিছনের শব্দ ওকে জানান দিল খুব কাছে এসে পড়েছে বর্মবন্দি। পিছনে না তাকিয়েও মনের চোখ দিয়ে দেখতে পেল ওর দিকে লম্বা
একটা ধাতব হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ওটা। যে-কোনও মুহূর্তে ওর ঘাড় ধরবে ওই হাত।

জোর ঠেলা দিয়ে দরজাটা খুলেই কিচেনে ঢুকে পড়ল কিশোর। ফ্লোরে ওর স্লিপার পিছলে গেল। পা দুটো নিয়ন্ত্রণ হারাল।
দুহাত দুদিকে ছড়িয়ে উপুড় হয়ে আছড়ে পড়ল ও। পরমুহূর্তে পিছনে হিশহিশ শব্দ উঠতেই বুঝল হাতে তলোয়ারটা বাতাসে নাচাচ্ছে নেজার ম্যাণ্ডার।
দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথা হজম করে উঠে বসল ও। কিচেনের ভিতর একটা আইল্যাণ্ড আছে। দেখতে অনেকটা রেস্টুরেন্টের কাউন্টারের মত। এই বাড়িতে আগে ওটাকে রান্নাবান্না ও খাবার পরিবেশনের কাজে ব্যবহার করা হতো। পারকার আঙ্কেল ওটাকে অস্ত্রপাতি পরিষ্কার করার কাজে লাগাচ্ছেন।
চট করে উঠে দাঁড়িয়ে ওটার আড়ালে চলে এল কিশোর।
মাথা নিচু করে সামনে এগোতে লাগল। কাউন্টারের শেষপ্রান্তে পৌঁছে ওর মনে হলো, নেজারের নাগালের বাইরে আসা গেছে।
ধীরে ধীরে মুখ তুলে উঁকি দিল ও সামনে।
বর্মবন্দির অতৃপ্ত আত্মা খেপে উঠেছে। তাকে দমানোর ক্ষমতা। নেই কারও।
তার বিরুদ্ধে কীভাবে লড়বে কিশোর?
রুমটার চারদিকে নজর বোলাল ও চকিতে।
দেয়ালে ঝুলন্ত শেকল?
সে তো অনেক দূরে।
শেকলের পাশে ঝোলানো তলোয়ার?
ওগুলো বড় বেশি ভারী, অন্তত কিশোরের পক্ষে।
এরপরই জিনিসটা চোখে পড়ল কিশোরের।
একটা গুলতি।
ওটা রয়েছে কিশোর আর দরজার মাঝামাঝি জায়গায়। কেন যেন কিশোরের মনে হচ্ছে প্রাচীন ওই গুলতিটা হাতে পেলে জীবন্ত দুঃস্বপ্নটার মোকাবিলা করতে পারবে ও।
হয়তো এ যাত্রা বেঁচে যাবে।
ওদিকে কিশোরের অবস্থান টের পেয়ে গেছে নেজার। তার চোখের আগুন ধধ করে জ্বলছে।
রোবটের মত আড়ষ্ট ভঙ্গিতে এগোতে লাগল বর্মবন্দি। কাউন্টারের ওপাশে পৌঁছে থেমে দাঁড়াল।
প্রথমে তলোয়ারটা শূন্যে তুলল। তারপর কিশোরকে লক্ষ্য করে নামিয়ে আনল।
কাউন্টারের উপর আছড়ে পড়ল ভারী অস্ত্রটা। ওটার কী দশা হলো দেখার জন্য অপেক্ষা করল না ও।

আগেই সরে গেছে জায়গা থেকে। গুলতিটার দিকে দৌড়াল ও দম বন্ধ করে। তলোয়ার তুলে ভয়ঙ্কর হুঙ্কার ছাড়ল যোদ্ধা। দ্রুত শূন্যে চালাতে লাগল ওটা–ডান থেকে বায়ে, বা থেকে ডানে।
ক্যাঁচকোঁচ শব্দ তুলে এগোতে লাগল।
গুলতির কাছে পৌঁছে গেল কিশোর। সারাশরীর অবশ হয়ে আসছে। ওটা নামানোর জন্য হাত বাড়াল। গুলতিটা যে লিভারে চলে, সেটায় হাত লেগে গেল ওর নিজের অজান্তে। তারপর কোনদিক দিয়ে কী ঘটে গেল, টের পেল না কিশোর।
পরপর দুটো শব্দ কানে এল। প্রথমে টুং তারপর হুশ্‌শ।
পারকার আঙ্কেল মনে হয় মান্ধাতা আমলের এই গুলতিটায় একটা পাথর আটকে রেখেছিলেন। বর্মটার দিকে ওটাকে ঝড়ের বেগে ছুটে যেতে দেখা গেল।
কিশোর বুঝতে পারল পাথরটা বর্মের গায়ে গিয়ে আঘাত করবে। অবশ্য তাতে যে ওটার তেমন কোনও ক্ষতি হবে না, তা-ও বুঝল। তবু কিশোর খুশি হয়ে উঠল, কারণ দরজার দিকে দৌড়াতে যেটুকু সময় দরকার, তা হয়তো পাওয়া যাবে এর ফলে।
পালানোর একটা সুযোগ তাতে মিলেও যেতে পারে।
পাথরটা নেজারের বুকে আঘাত করল।
সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে কিশোর। ছুট লাগানোর এখনই সময়।
চোখের কোণ দিয়ে দেখল টলে উঠেছে বিশাল বর্মটা। দুবাহু। শূন্যে উঠে গেল নেজারের। হাতের তলোয়ারটা সশব্দে আছড়ে পড়ল মেঝেতে।
মাথা তুলল প্রেতাত্মা।
কিশোরের দিকে তাকাল সরাসরি।
চোখের আগুন অগ্নিগিরির জ্বালামুখের মত বিস্ফোরিত হলো।
পরমুহূর্তে কান ফাটানো আওয়াজ তুলে মেঝেতে আছড়ে পড়ল প্রকাণ্ড বর্মটা।
নিশ্চপ, নিথর হয়ে পড়েই থাকল।
ব্যাপার কী? ভাবল কিশোর।
সামান্য একটা পাথরের আঘাতে কাবু হয়ে গেল অমন একটা বর্ম?
না, হতেই পারে না। এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোনও গড়বড় আছে।
গুলতিটার কাছ থেকে সরে সামনে এগোল কিশোর। ভাল করে বর্মটার দিকে তাকাল।
চার হাত-পা চারদিকে ছড়িয়ে আছে। হেলমেট কাত হয়ে আছে। একদিকে। মুখাবরণের উপরের ফাঁক দুটোর দিকে তাকাল কিশোর।
কী দেখল?

কিছুই না।
কিছুই দেখা গেল না ভিতরে।
অন্ধকার।
বর্মটার ব্রেস্টপ্লেটের ঠিক মাঝে একটা বড়সড়, গভীর ট্যাপ চোখে পড়ল ওর। ওখানেই আঘাত করেছে পাথরটা।
কিশোরের উত্তেজনা একটু একটু করে কমে আসছে। শ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে আসছে ওর। প্রাণ ভরে শ্বাস টানল ও। মনে হলো অনেক দিন পর সজীব বাতাস ঢুকল ওর ফুসফুসে। কী শান্তি!
কিচেন-টেবিলের নীচে পাথরটা পড়ে আছে। এগিয়ে উবু হয়ে ওটা তুলে নিল ও। যতটা ভেবেছিল তার চেয়েও অনেক হালকা ওটা। এরকম একটা জিনিস কোনওমতেই ভারী বর্মধারী এক যযাদ্ধার ভূতকে ধরাশায়ী করবে না।
ও হেরে গেছে! বিড়বিড় করে বলল ও। কিন্তু কী করে? আমি তো কিছুই জানি না!
প্রাণে বেঁচে গেছে ভাবতে গিয়ে খুশি হয়ে উঠল কিশোর।
কিশোর! একটা পরিচিত কণ্ঠ করিডর থেকে ভেসে এল। পরমুহূর্তে কিচেনে ঢুকলেন মিস্টার পারকার, সঙ্গে জিনা। ভাবনার জাল ছিন্ন হলো ওর। এত রাতে এখানে কী করছ তুমি? শুতে যাওনি কেন?
কেন শুতে যাইনি বলব পারকার আঙ্কেলকে? ভাবল ও।
কিন্তু মুখ খোলার সুযোগ পেল না। সুইচ টিপে বাতি জ্বেলে দিলেন মিস্টার পারকার। শূন্য দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল। কিশোর।
সামনে নজর পড়তে খাবি খেলেন মিস্টার পারকার। চেহারা সাদা হয়ে উঠল।
মেঝেতে পড়ে থাকা বর্মটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন। বিস্ময়ে ঝুলে পড়েছে চোয়াল।
মিস্টার পারকার কী ভাবছেন, কিশোর জানে। মুখ ঘুরিয়ে ওর দিকে তাকালেন তিনি। তাঁর চাউনি দেখে কিশোরের আত্মা উড়ে গেল।
নেজার ম্যাণ্ডার কিশোরকে খুন করতে চেয়েছিল, কিন্তু পারেনি। মিস্টার পারকারের চাউনি দেখে ওর মনে হচ্ছে করলেই ভাল ছিল।
পারকার আঙ্কেলকে ও কী করে বোঝাবে…
কিশোর! গমগমে কণ্ঠে হুঙ্কার ছাড়লেন মিস্টার পারকার। আমি তোমাকে ওটা থেকে দূরে সরে থাকতে বলিনি? বর্মটা ইঙ্গিত করলেন।
এক মুহূর্ত কেশে নিয়ে কিশোর বলল, আঙ্কেল, আসলে আমার কোনও দোষ নেই। যা ভাবছেন…
এ সব দোষ ওই বাদুড়টার, ওর কথা কেড়ে নিয়ে বলে উঠল জিনা। বুকের উপর দুহাত ভাঁজ করে দাঁড়িয়েছে বাবার পাশে। চেহারা দেখেই বোঝা গেল কিশোরের

দুরবস্থা দেখে একটু মজাই পাচ্ছে যেন ও। আসলে তোমাকে যে বাদুড়টার কথা বললাম না, বাবা, ওটাই সব নষ্টের গোড়া। ওটা দেখে ভীষণ ঘাবড়ে গেল। কিশোর। নিশ্চয়ই সারাবাড়ি ছোটাছুটি করেছে এতক্ষণ। তাতেই লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে সব। এমন কী বর্মটাও রেহাই পায়নি, দেখো।
খুলে বলো সব, কিশোর, গম্ভীর স্বরে বললেন মিস্টার পারকার।
জিনা, একটু আগে আমাকে একা ফেলে চলে গেল, বলল কিশোর। তখন থেকে যা ঘটেছে... আঙ্কেল, নেজার ম্যাণ্ডারই গণ্ডগোল শুরু করে। আমাকে দাবড়ে বেড়িয়েছে এতক্ষণ। বার বার বলেছে আমি নাকি এক শয়তান জাদুকর। গদা, তলোয়ার দিয়ে আমাকে মারার চেষ্টা করেছে...
থেমে গিয়ে মিস্টার পারকারের দিকে তাকাল কিশোর। প্রতিক্রিয়া বোঝার চেষ্টা করছে। পারকার আঙ্কেল কি ওর কথা আদৌ বুঝতে পারছেন? বুঝলেও বিশ্বাস করছেন?
নাকি...
হঠাৎ কিশোরের মনে হলো পারকার আঙ্কেলের চেহারা থেকে। ঘুম-ঘুম ভাবটা উধাও হয়ে গেছে। চশমার পিছনে তার চোখজোড়া বড় বড় হয়ে উঠেছে।
উৎসাহে?
নাকি বিস্ময়ে?
কে জানে!
ভূত! এগিয়ে এসে ওর কাঁধ আঁকড়ে ধরলেন উনি।
যোদ্ধার ভূত! খুশিতে চক করে উঠল তাঁর দুচোখ। এই নিয়েই তো গবেষণা করছেন তিনি। ওটা ছুটোছুটি করেছে? তোমাকে দাবড়ে বেড়িয়েছে, কিশোর?
মাথা ঝাঁকাল কিশোর। হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।
পারকার আঙ্কেল ওর কথা বিশ্বাস করেছেন বুঝতে পেরে খুশি।
ওয়াণ্ডারফুল! মিস্টার পারকার উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। ওয়াণ্ডারফুল!
আপনি জানেন না ওটা কতটা ভয়ঙ্কর, বলল কিশোর।
ঠিকই বুঝতে পেরেছি আমি। ওটা ভুতুড়ে বর্ম। ওটার মধ্যে আছে এক যোদ্ধার আত্মা। ঠিক না?
বর্মটার দিকে তাকালেন তিনি।
দরজার কাছে পড়ে থাকা ওটার বিচ্ছিন্ন একটা হাত তুলে নিলেন। শূন্যে ঘোরালেন ওটাকে। কী কাণ্ড! কিশোর, জিনা, তোমরা বুঝতে পারছ এর অর্থ কী?
কীসের কী অর্থ, বাবা? জিনা শুধাল।
এই যে বর্মটা, এটা ভুতুড়ে। চকচক করছে আঙ্কেলের চোখ। কত ভূত খুঁজেছেন তিনি। এবার হয়তো একটাকে পাওয়া গেছে। এবার বিজ্ঞান দিয়েই ভূত ব্যাখ্যা

করতে পারবেন বিজ্ঞানীদের কাছে।
এক পা এগিয়ে এল কিশোর। আঙ্কেল, শুনুন। ওটা কেবল ভুতুড়ে বর্মই নয়, বিপজ্জনকও। আরেকটু হলে ওই যোদ্ধার ভূত আমাকে মেরেই ফেলেছিল। তখনই...
থেমে গেল কিশোর। আঙ্কেল ওর কথা শুনছেন না। তাকে কখনও এতটা উত্তেজিত হতে দেখেনি কিশোর।
আশ্চর্য মানুষ!
কিশোর, ও কি সত্যি ওই ঘোড়ায় উঠে বসে ছিল? ওখান থেকে নিজেই নেমে এসেছে? মিস্টার পারকারের চোখে-মুখে চরম উত্তেজনা। চেহারায় আগ্রহ। হেঁটেছে? সত্যিই কথা বলেছে?
হতাশায় কাঁধ ঝুলে পড়ল কিশোরের। হ্যাঁ, হেঁটেছে, জবাব, দিল। কথাও বলেছে। তারপর ওই তলোয়ারটা দিয়ে আমাকে ফালা। ফালা করতে চেয়েছে।
মিস্টার পারকার আনমনা হয়ে উঠলেন। ঘুরে বর্মটার দিকে তাকালেন।
চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে বলল কিশোর, ভূতটা বর্মের মধ্যে আছে। ওটার হাত থেকে আমাদের কারও রেহাই নেই। আমাদের খুন করবে ওটা।
মৃদু হাসলেন মিস্টার পারকার।
ব্যাপারটার গভীরে যাওয়ার কোনও চেষ্টাই করলেন না।
হয়তো ভাবছেন, একটা ভূত বড়জোর ভয় দেখাতে পারে। তাই বলে খুন খারাবি? অসম্ভব।
মিস্টার পারকারের চোখজোড়া চকচক করছে।
বাবা, সত্যিই যদি ভূতটা থেকে থাকে? ফ্যাকাসে চেহারায় জিজ্ঞেস করল জিনা।
যদি মানে? অবশ্যই আছে।
এগিয়ে এসে জিনার কাঁধে হাত রাখলেন। আরেক হাত রাখলেন কিশোরের কাঁধে। আমি সফল হতে চলেছি! চাপা স্বরে বললেন।
ভূত বিষয়ে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেব আমি। ভূত আছে বিজ্ঞানীরা সেটা স্বীকার করবে এরপর!
দোতলায় উঠে এল সবাই। পারকার আঙ্কেল নিজের রুমে ঢুকলেন। বিড়বিড় করে আন্টি তাঁকে কী যেন বললেন। জিনা চলে গেল নিজের রুমে। করিডর ধরে কিশোর এগিয়ে গেল ওর রুমের দিকে।
একা হতে কেমন অস্বস্তি লেগে উঠল ওর। নিজেকে জিজ্ঞেস করল, ভয় করছে তোমার?
অন্তর থেকে কোনও জবাব নেই।

এখন কী করা উচিত ভাবতে চাইল ও? কয়েক মুহূর্ত পর বুঝল, যা করার ওকেই করতে হবে।
কিন্তু সেটা কী?
পারকার আঙ্কেলকে কিছুতেই বোঝানো গেল না বর্মটা কতখানি বিপজ্জনক।
কিশোর বুঝতে পারছে, কিন্তু কাউকে বোঝানো গেল না।
মাথার ভিতরে একশো মাইল বেগে দুইশো রকমের চিন্তার ঝড় বয়ে যাচ্ছে ওর।
ক্লান্তি লাগছে।
মন বিষণ্ন।
সামনেই ওর রুম। এমনসময় একটা আওয়াজ কানে এল। কান। খাড়া করল কিশোর।
আবারও শোনা গেল আওয়াজটা।
অস্পষ্ট।
শব্দটা কিসের বুঝতে পেরেছে কিশোর। সঙ্গে সঙ্গে ওর ঘাড়ের সমস্ত রোম দাঁড়িয়ে গেল।
ঘোড়ার খুরের আওয়াজ ওটা।
পরদিন।
জিনার সাথে ওদের স্কুলে এল কিশোর। গোবেল বিচ গভর্ণমেন্ট হাই স্কুল। রকি বিচের স্কুলগুলোর মত অত কড়াকড়ি নেই এখানে।
জিনার সঙ্গে ওর ক্লাসরুমে, ছেলেদের দিকটায় বসল কিশোর। বেশ কজন টিচারের সঙ্গে পরিচয় হলো। লস অ্যাঞ্জেলেসের একটা স্কুলে পড়ে বলেই কিনা কে জানে, সবারই খাতির পেল ও।
ভাল লাগল স্কুলটা।
স্কুল থেকে ফিরে সোজা ডাইনিং টেবিলে গিয়ে বসল দুজন।
খাওয়া শেষ হতে জাদুঘরে ঢুকল কিশোর, হ্যাগার্ডের সঙ্গে দেখা করবে।
পারকার আঙ্কেল ওর কথায় কান দেননি, কিন্তু কিশোর জানে হ্যাগার্ড দেবে। লোকটা অন্যরকম। বক্তা হিসেবে তার তুলনা নেই, দেখা যাক শ্রোতা হিসেবে কেমন।
কনজারভেটরিতে পাওয়া গেল তাকে। নেজার ম্যাগুারের বর্মের কাছে বসে কাজ করছে।
কিশোর দেখল আবারও স্বাভাবিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে ঘোড়ার ডামির পিঠে চেপে আছে বর্মটা।
বর্মের তলোয়ারটা পালিশ করছে হ্যাগার্ড।
কিশোর ভেতরে ঢুকতে মুখ তুলে তাকাল সে। হাসল।

আপনার সঙ্গে জরুরি কথা ছিল, গম্ভীর কণ্ঠে বলল কিশোর।
খুব জরুরি। আপনি তো ওটার ব্যাপারে সবই জানেন।
কীসের ব্যাপারে? ভুরু কুঁচকে উঠল কেয়ারটেকারের।
বর্মটার ব্যাপারে, বলল ও। নেজার ম্যাণ্ডারের ব্যাপারে আপনি যা বলেছেন, সব সত্যি।
সারও তা-ই বলছিলেন, মাথা ঝাঁকাল লোকটা। আগামী শনিবার জাদুঘর উদ্বোধন করা হবে। বড় ধরনের আয়োজন করা হচ্ছে।
হেনরি রব হ্যাগার্ডের পাশে বসে পড়ল কিশোর।
সত্যিই! অসহায়ভাবে কাঁধ ঝাঁকাল ও। এখনও সময় আছে। উদ্বোধনের আগে বর্মটার ব্যাপারে কিছু একটা করা দরকার, না হলে বড় ধরনের বিপদ ঘটে যেতে পারে।
অবাক হলো কেয়ারটেকার। কী হয়েছে খুলে বলো তো।
লম্বা শ্বাস টানল কিশোর। অন্তত একজন ওর কথা গুরুত্ব দিয়ে শুনতে চেয়েছে। যেভাবে হোক, বড় দুর্ঘটনার হাত থেকে বাঁচাতে হবে পারকার আঙ্কেলকে।
আগামী শনিবার জাদুঘর উদ্বোধন করা হবে। কিন্তু তার আগে। নেজারের ব্যাপারে কিছু ফয়সালা করতে হবে।
নইলে…
হ্যাগার্ডকে গতকাল রাতের পুরো ঘটনা খুলে বলল কিশোর। কিছুই বাদ দিল না।
বলে চলেছে কিশোর, বড় হতে থাকল হ্যাগার্ডের চোখ জোড়া। কিশোরের কথা যখন শেষ হলো, তার দুচোখ কোটর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে প্রায়।
অবাক হয়েছে হ্যাগার্ড, তবে চেহারায় উত্তেজনার চিহ্ন নেই। মিস্টার পারকারের মত উত্তেজিত হয়নি সে।
খানিকক্ষণ ঝিম্ মেরে থাকল লোকটা। আপনমনে মাথা দোলাল, গোঁফে তা দিল।
ভুরু জোড়া কুঁচকে গেল।
চোয়াল শক্ত।
কিশোরের বুঝতে অসুবিধে হলো না গভীর চিন্তায় ডুবে আছে কেয়ারটেকার।
একটু পর ঝট করে উঠে দাঁড়াল হ্যাগার্ড। কিশোরও উঠে দাঁড়াল সঙ্গে সঙ্গে। ওর কাধ চাপড়ে লোকটা বলল, তোমার নিজেকে নিয়ে গর্ব করা উচিত, কিশোর। ভয়ঙ্কর বদ এক সৈন্যের বিরুদ্ধে লড়েছ তুমি। তাকে হারিয়ে দিয়েছ। বাঁচিয়ে দিয়েছ আমাদের সবাইকে।
কিন্তু আবার যদি জেগে ওঠে ওই আত্মা? দ্বিধা করে বলল ও। এমন কি হতে পারে না ওই অতৃপ্ত আত্মা নতুন সুযোগের অপেক্ষায় আছে?

হুঁম! চিন্তিত ভঙ্গিতে গোঁফের, কোণা মোচড়াল হ্যাগার্ড। কী হতে পারে আমি জানি না, কিশোর। তবে এ কথা বলতে পারি কিছু সময়ের জন্যে হলেও যোদ্ধার আত্মাকে অক্ষম করে দিয়েছ তুমি। বর্মটার দিকে তাকাল সে সরু চোখে। এখন ওটাকে দেখে চুপচাপ মনে হচ্ছে, যেন কিছু বোঝে না।
বর্মটার দিকে তাকাল কিশোরও। এটাই যে গতকাল রাতে ওর আত্মা উড়িয়ে দিয়েছিল, দেখে বোঝার উপায় নেই এখন।
চোখের দুই ফোকর দিয়ে যে ভুতুড়ে আলো বের হয়েছে, তা এখন অবিশ্বাস্য মনে হয়।
সত্যিই এখন বর্মটাকে ভদ্র মনে হচ্ছে।
নীচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর।
হ্যাগার্ড হয়তো ঠিকই বলেছে। হয়তো কিছু সময়ের জন্য ও নেজারের প্রেতাত্মাকে দমিয়ে দিয়েছে।
অথবা কে জানে, হয়তো চিরদিনের জন্য।
জাদুঘরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের কথা মনে পড়ে গেল ওর। নামি দামি অনেক লোককে দাওয়াত করেছেন পারকার আঙ্কেল। লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে কয়েকজন রিপোর্টারও আসবে।
সবাই এখানে ভুতুড়ে কিছু দেখতে চাইবে সেটাই স্বাভাবিক। নিজের চোখে ভূত বা ওই জাতীয় কিছু দেখতে চাইবে।
নইলে ভুতুড়ে জাদুঘরের সার্থকতা কোথায়?
নতুন আরেক চিন্তা ঘুরপাক খেতে লাগল কিশোরের মাথায়। ও যদি সত্যিই প্রেতাত্মাটাকে চিরতরে দূর করে দিয়ে থাকে, তা হলে আমন্ত্রিত অতিথিরা ভুতুড়ে কিছু দেখা থেকে বঞ্চিত হবে। জাদুঘরের বদনাম হয়ে যাবে।
হোক।
তবু জেনেশুনে কোনও দুর্ঘটনা ঘটতে দিতে পারে না ও।
আপাতত বর্মটার ওপর নজর রাখা ছাড়া আমাদের আর কিছু করার নেই, বলল কেয়ারটেকার।
কিশোর বুঝল, ভুল বলেনি মানুষটা।
আরও কিছুক্ষণ টুন্টা কাজ করে কিশোরসহ কনজারভেটরি থেকে বেরিয়ে এল হ্যাগার্ড।

.

সে-রাতের কথা।
ঘম আসছে না কিশোরের।
বালিশে হেলান দিয়ে নীল লকেটের দিকে চেয়ে আছে। মন খারাপ।

মন খারাপের কারণ–নেজার ম্যাণ্ডার ফিরে আসতে পারে। মারাত্মক বিপদে পড়তে পারে বাড়ির যে-কেউ। পারকার আঙ্কেলের সাধের জাদুঘর লণ্ডভণ্ড হয়ে যেতে পারে।
আরেকটা কথা ভেবেও খারাপ লাগছে ওর। নেজার ফিরে না। এলে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান জমবে না।
এই ভাবনাটা দুর্বল করে তুলল ওকে।
খোদা, ফিরিয়ে আনা এই যোদ্ধার আত্মাকে, মনে মনে বলতে বাধ্য হলো কিশোর।
ভাবনার সাগরে এতই তলিয়ে গিয়েছিল কিশোর যে প্রথমে আওয়াজটা ঠিকমত শুনতে পেল না।
থপ থপ!
উঠে বসে কান পাতল ও।
থপ থপ!
জিনা! বিড়বিড় করল ও। আবার ভয় দেখাতে চেষ্টা করছে। বিছানা ছাড়ল ও। আমাকে বোকা পেয়েছে নাকি যে বারবার একই
কায়দায় ভয় দেখাবে?
ধীরে ধীরে নীচতলায় নেমে এল ও।
আওয়াজটা আরও জোরাল হলো। এগিয়ে চলল কিশোর শব্দ। লক্ষ্য করে। মনে হয় কিচেনের পিছন থেকে আসছে শব্দটা।
কিচেন? আবার কিচেনে গেছে ও? স্রেফ অবজ্ঞার সাথে মাথা ঝকাল কিশোর। মেয়েটার বুদ্ধি কমে গেল নাকি!
আলো জ্বালার ঝামেলায় না গিয়ে জাদুঘরের ভিতর দিকে এগোল ও। ওখান থেকে বেরিয়ে পা রাখল কিচেনে।
থপ থপ!
আওয়াজটা এবার স্পষ্ট শোনা গেল। কিন্তু জিনাকে দেখা গেল না। কিচেনে ওর টিকির চিহ্ন নেই।
কয়েক মুহূর্ত পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল কিশোর। ভয় একটু একটু করে চেপে ধরছে ওকে।
হঠাৎ কেউ বা কিছু একটা খপ করে ওর বাহু চেপে ধরল। ধড়াস করে লাফিয়ে উঠল কলজে।
সরি, কিশোর।
হ্যাগার্ড।
লোকটাকে দেখতে পেয়ে বড় করে শ্বাস ফেলল ও।
কিন্তু শব্দটা থামেনি।

এখনও চলছে।
অর্থাৎ হ্যাগার্ডেরও নয় কাজটা, জিনার তো নয়ই।
তা হলে?
ঠোঁটে তর্জনী ঠেকিয়ে কিশোরকে চুপ থাকার ইশারা করল কেয়ারটেকার। আমি আসলে তোমাকে ভয় দেখাতে চাইনি, ফিসফিস করে বলল। মমিঘরে কাজ করছিলাম, হঠাৎ আওয়াজটা কানে এল। তোমার কী মনে হয়, কিশোর, ওটা কীসের আওয়াজ?
মনে হয় জিনার কাজ, বিড়বিড় করে বলল কিশোর। কাল রাতে সিলিঙে ঝাটার গোড়া দিয়ে শব্দ তুলে আমাকে ভয় দেখিয়েছে ও। আজও বোধহয় তা-ই করছে।
হ্যাগার্ড পা টিপে টিপে কনজারভেটরির দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। আওয়াজটা এই ঘরের ভেতর থেকেই আসছে। চলো, দেখে আসি।
ঢোক গিলল কিশোর। মনে হলো জিভ ভারী হয়ে গেছে। মুখের ভিতরটা সিরিশ কাগজের মত খটখটে হয়ে আছে।
ওর দিকে তাকিয়ে শুকনো হাসি হাসল হ্যাগার্ড। চেহারায় ভয় নেই, এসো আমার সঙ্গে ধরনের ভাব ফুটিয়ে ঢুকে পড়ল।
বাধ্য হয়ে তাকে অনুসরণ করল কিশোর।
যে-মুহূর্তে ওরা কনজারভেটরির ভিতরে পা রাখল, ঠিক সেই মুহূর্তে থেমে গেল আওয়াজটা।
মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল ওরা দুজন। তারপর একযোগে ঘুরে তাকাল বর্মটার দিকে।
হ্যাঁ, যেখানে থাকার কথা, সেখানেই বসে আছে ওটা। আবার ঘোড়ার পিঠে ওঠানো হয়েছিল ওটাকে আজ সকালে, ওখানেই নাকি মানায়।
চুপচাপ বসে আছে ওটা একই ভঙ্গিতে। মাথা এদিকে ফেরানো। বর্শাটা এক হাতে উঁচু করে ধরে আছে।
সব স্বাভাবিক। অস্বাভাবিক কিছুই চোখে পড়ল না কিশোর বা হ্যাগার্ডের।
আমার ধারণা বোধহয় ঠিক না, নিচু স্বরে বলল হ্যাগার্ড। স্বস্তির শ্বাস ফেলল। আর যাই হোক, শব্দটা ভূত করছে না।
দরজার দিকে ঘুরল হ্যাগার্ড। কিশোরও।
এক পা এগোল কিশোর।
এমন সময় ওর মনে হলো কিছু একটা শা করে চলে গেল মাথার উপর দিয়ে। মাথার এত কাছ দিয়ে গেল যে ওর চুল পর্যন্ত দুলে উঠল।
হ্যাগার্ডও টের পেয়েছে ব্যাপারটা।

মুহূর্তে চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেল তার। পরমুহূর্তে কিছু একটা বিস্ফোরিত হওয়ার আওয়াজ হলো।
লম্বা একটা তীর ফুলের টবগুলোর একটায় আঘাত হেনেছে। তীরটা ভিতরের মাটিতে গেঁথে গেছে ত্রিশ ডিগ্রি কোনাকনি হয়ে। লেজটা তিরতির করে কাঁপছে।
একটা ক্রস-বো থেকে ছোঁড়া হয়েছে ওটা। কিশোর জানে আড়াইশো বছর আগে যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সৈন্যরা এসব আড়ধনু ব্যবহার করত।
হ্যাগার্ড আর কিশোর একযোগে পিছন দিকে তাকাল।
ওটা যে নেজার ম্যাণ্ডারই ছুঁড়েছে, সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চাইল ওরা।
জলদি পালান! হ্যাগার্ডের উদ্দেশে চেঁচিয়ে উঠেই সামনে ছুটল কিশোর। পিছনে খুরের আওয়াজ উঠল আবার।
এগিয়ে আসছে আওয়াজটা।
দ্রুত কমে আসছে ঘোড়া ও কিশোরদের মাঝের দূরত্ব।
ডানে সরে ছুটতে লাগল কিশোর। ঘোড়সওয়ারও ডানে সরে গেছে বলে মনে হলো।
পরক্ষণে বাঁয়ে সরল ও। কাঁধের উপর দিয়ে পিছনে তাকাল।
ওর পিছনেই রয়েছে হ্যাগার্ড। তার পিছনে নেজার।
তার মুখাবরণের দিকে তাকাতে চোখ ধাঁধিয়ে গেল কিশোরের। বর্শাটা উঁচু করে ধরে আছে সে। ওটার চোখা মাথা দেখে আত্মা উড়ে গেল, কারণ বর্শাটা ওর দিকেই তাক করা।
সামনের দরজাটা মনে হলো বহু মাইল দূরে।
অমোঘ নিয়তির মত পিছন পিছন তেড়ে আসছে সাক্ষাৎ মৃত্যুদূত।
জানপ্রাণ বাজি রেখে ছুটছে কিশোর। লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ড। পা। অবশ হয়ে আসছে। তবু ছুটছে ও।
এখনও মনে হচ্ছে দরজাটা কয়েক মাইল দূরে। সারাজীবন ছুটেও ওটার নাগাল পাবে বলে ভরসা হলো না। কিশোরের।
আর হয়তো এক মুহূর্ত। তারপরই বর্শাটা ওর পিঠে গেঁথে দেবে শয়তানটা। ভাবতেই গায়ের সব রোম দাঁড়িয়ে গেল ওর।
ঠিক সে-সময় আরেকটা অদ্ভুত আওয়াজ শোনা গেল। জিভ আর টাকরা এক করে জোরে বাতাস ছাড়ার মত আওয়াজ।
ভয়ে চোখ বুজে ফেলল কিশোর। বুঝতে পারছে নেজারের বর্শা উড়ে আসার আওয়াজ ওটা। এখনই এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেবে ওকে।
কিন্তু কিছুই ঘটল না।

থেমে পড়ল কিশোর। হ্যাগার্ডও। নিজের অজান্তে কেয়ারটেকারের বাহু খামচে ধরেছে কিশোর।
দেয়ালে ঝোলানো পারকার আঙ্কেলের সবগুলো বর্শা একযোগে উড়ে যাচ্ছে ওদের মাথার উপর দিয়ে। ওগুলোর লক্ষ্য। নেজার।
কয়েকটা ঠিক তার সামনের ফ্লোরে পড়ল। মাটিতে ডেবে গিয়ে এদিক-ওদিক কাঁপতে লাগল। কতগুলো বিধল পিছনের ফ্লোরে। সাত-আটটা ডানে আর বাকিগুলো বায়ে।
ঘেরাও হয়ে গেল নেজার।
অকল্পনীয় দৃশ্য!
অদৃশ্য কোনও হাত যেন বর্শার বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেলেছে। তাকে। ঘোড়াটা আচমকা কান ফাটানো ডাক ছাড়ল, খুর দিয়ে সশব্দে মাটি ঠুকছে।
ক্রুদ্ধ গর্জন ছাড়ল নেজার। চোখের দুই গর্তের ভিতরদিকে লাল আগুন জ্বলছে দাউদাউ করে।
হ্যাগার্ডের হাত ছেড়ে দিল কিশোর। উত্তেজনায় বুক ধুপধাপ করছে। সাহস করে সামনে এগোল। বর্শাগুলো পরখ করে দেখবে। কাণ্ডটা কীভাবে ঘটল ভেবে পেল না ও।
কী মনে করে মুখ নিচু করল কিশোর। সঙ্গে সঙ্গে গলায় ঝোলানো লকেটের উপর চোখ পড়ল। ভিতরের ধোঁয়া আবার অশান্ত হয়ে উঠেছে।
ঘুরপাক খাচ্ছে।
উঠছে-নামছে।
নীল আলো ঝিকমিক্ করছে ভিতরে।
নেজারের ভুতুড়ে চোখের চেয়েও উজ্জ্বল আলো।
এইবার আসল ঘটনা বুঝতে পারল ও। ঘটনা আসলে এই লকেটই ঘটাচ্ছে।
আরও একবার নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে ফিরিয়ে এনেছে ওকে।
সামান্য একটা গুলতির পাথর কখনও স্টিলের অতবড় বর্মকে ঘায়েল করতে পারত না। গতকাল রাতে নেজারকে আসলে পাথর দিয়ে ধরাশায়ী করেনি কিশোর, এই লকেটই ওকে বাঁচিয়েছে প্রেতাত্মার হাত থেকে। আজও এটা আরেকবার বাঁচাল ওকে।
এটাই নিজের অলৌকিক শক্তির জোরে বর্শাগুলোর সাহায্যে নেজারকে ঠেকিয়েছে। লকেটটার যে অলৌকিক ক্ষমতা আছে, সে ব্যাপারে কিশোরের আর কোনও সন্দেহ রইল না।
মিস্টার হ্যাগার্ড, ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন? লোকটার দিকে তাকাল ও। চাঁদের আলোয় লকেট উঁচিয়ে ধরল। এই লকেট! এটাই এতসব করল জাদুর বলে!

লকেটটা শক্ত মুঠোয় ধরে বর্মটার কাছে এসে দাঁড়াল ও। হ্যাগার্ড ওর পিছনে দাঁড়িয়ে।
কেউ কোনও কথা বলতে পারল না।
ঘটনার আকস্মিকতায় ভাষা হারিয়ে ফেলেছে দুজনই।
ওদিকে দেয়ালে ঝোলানো তলোয়ারগুলো ঠুং-ঠাং শব্দে পরস্পর ঠোকর খাচ্ছে। কুঠারগুলো এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করছে শূন্যে, যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে ওগুলো।
অবিশ্বাস্য!
অকল্পনীয়!
নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে কষ্ট হলো কিশোরের।
কী মনে করে লকেটটা উঁচিয়ে ধরে নাড়তে লাগল গোয়েন্দা প্রধান।
অমনি ভয়ে নিচু হলো বর্মধারী। আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে একটা ধাতব হাত দিয়ে মুখ আড়াল করল।
তার মুখাবরণের উজ্জ্বল আলো হঠাৎ দপ্ করে নিভে গেল।
শুনতে পাচ্ছ? বর্মটার দিকে তাকিয়ে জোরে বলল কিশোর, এরপর আবার বাড়াবাড়ি করলে ফল ভাল হবে না।
সোজা হয়ে দাঁড়াল ও। বর্মের দিকে লকেটটা বাড়িয়ে ধরে রেখেছে এখনও। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটা তলোয়ার একযোগে ছুটে এসে আঘাত করল বর্মটাকে।
বাঁচার জন্য মরিয়া হয়ে দুহাত চালাল নেজার। কিন্তু তলোয়ারগুলো ঠিকই আঘাত হেনে চলল। ব্যর্থ হলো না একটাও।
লকেট আরও উঁচু করে ধরল কিশোর। কাঁচের গোলকটার উপর চাঁদের আলো পড়ল। ঝলমল করে উঠল ওটা।
হঠাৎ করে ওটার ভিতর থেকে গাঢ় নীল আলোর রশ্মি বেরিয়ে নেজারের দিকে ছুটে গেল।
সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে গেল বর্মটা।
ঝকমক করে উঠল ওটা।
খটমট শব্দ উঠল কয়েক মুহূর্ত ধরে।
এবং তারপরই বিস্ফোরণ হলো!
বুম্‌ম্!
প্রচণ্ড শব্দের সঙ্গে হেলমেট তীরবেগে সিলিঙের দিকে ছুটে গেল।
গনগনে আগুন বেরিয়ে এল বর্মের ভিতর থেকে। পরক্ষণে গোটা বর্মটাই ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে।

নেজারের ব্রেস্ট প্লেটটা আছড়ে পড়ল মেঝেতে। হাত থেকে ছিটকে পড়ে গেল ঢাল। তার পরপরই জোড়া থেকে খসে পড়ল দুই হাত।
দুপা টলমল করে উঠল। এবং পরমুহূর্তে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মেঝেতে আছড়ে পড়ল।
ওদের বিস্ফারিত চোখের সামনে পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেল বর্মটা। অনেকটা টায়ার পোড়ার মত বিচ্ছিরি একটা গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল বাতাসে।
নাক, বুকের ভিতরটা জ্বালা করে উঠল কিশোরের।
ছিন্নভিন্ন ধাতুর একটা স্কুপে পরিণত হয়েছে ভুতুড়ে বর্মটা।
পটার ভিতর থেকে লাল ধোঁয়ার ভুতুড়ে মেঘ উঠছে পেঁচিয়ে পেচিয়ে।
নাক বন্ধ করে এক পা সামনে বাড়ল কিশোর। মৃদু একটা আওয়াজ কানে এল। সাইকেলের টায়ার পাংচার হলে এমন আওয়াজ হয়।
তীক্ষ্ণ চোখে স্তূপটার দিকে তাকাল কিশোর।
চলে গেছে নেজার ম্যাণ্ডার। চিরতরে চলে গেছে।
ও শেষ! ক্লান্ত স্বরে বলল, কিশোর। হেরে ভূত হয়ে গেছে! জীবনে কখনও এত খুশি হয়েছে কি না সন্দেহ। আসলেই যদি আমি জাদুকর হতাম! ভাবল ও।
এমন সময় একটা কণ্ঠ কানে এল ওর। অদ্ভুত, রক্ত পানি করা। স্বর।
দমকা বাতাসে মোমবাতি যেমন দপ্ করে নিভে যায়, তেমনি নিভে গেল কিশোরের আনন্দ।
চুপ করো বোকার হদ্দ! তুমি কিছুই করোনি। যা করার আমিই করেছি সব। সব আমি করেছি।
জমে গেল কিশোর।
সেই জাদুকরের কণ্ঠ?
কনজারভেটরির মধ্যে গমগমে প্রতিধ্বনি উঠল।
ওর চারপাশের কাঁচের দেয়াল কেঁপে উঠল। পায়ের নীচের ফ্লোর পর্যন্ত কেঁপে উঠল থরথর করে।
হঠাৎ হিমশীতল হাওয়ায় ভরে গেল গোটা কনজারভেটরি। কাপ ধরে গেল কিশোরের সারা দেহে।
ভয়ঙ্কর গলাটার উৎসের খোঁজে ঘুরে দাঁড়াল ও।
বোকারাম! তুমি কী মনে করেছ তোমার জাদুশক্তি আছে? হাহ্ হাহ হাহ!
আওয়াজটা কি হ্যাগার্ডের গলা দিয়ে বেরোচ্ছে?
হ্যাগার্ডের?
তা হয় কী করে?

আবারও হেসে উঠল হ্যাগার্ড। শিরদাঁড়ায় শীতল প্রবাহ টের পেল কিশোর। এমন পৈশাচিক হাসি মানুষ হাসতে পারে?
কী ভয়ঙ্কর সেই হাসি! কলজের পানি জমিয়ে দেয় একেবারে।
লোকটার দাঁতগুলো তীক্ষ্ণ আর ছুঁচাল দেখাল। মুখের চামড়া টাটান হয়ে আছে, ঠিক যেন একটা রক্ত-মাংসহীন চামড়ামোড়া খুলি।
কী করবে ভেবে পেল না কিশোর।
মিস্টার হ্যাগার্ড? লোকটার দিকে চেয়ে থাকল ও।
হ্যাগার্ড সোজা হয়ে দাঁড়াল। কিশোরের মনে হলো ওর চারপাশের বাতাসে ঝড় উঠেছে। লোকটা ওর একটা হাত ধরল। মানুষটার হাত এত ঠাণ্ডা, চটচটে কেন? ঘামে গোসল হয়ে গেছে?
মিস্টার হ্যাগার্ড আপনিই কী... থেমে গেল কিশোর।
আমি হ্যাগার্ড নই, গমগম স্বরে বলল সে। আমি সালমি, সালমি বেন কাজেম–সর্বকালের সেরা জাদুকর। এবার তুমি মরার জন্য তৈরি হও!
ধীরে ধীরে দুহাত তুলল হ্যাগার্ড–না, সালমি বেন কাজেম। আঙুলে অনেকগুলো সোনালি আংটি, না আংটি কোথায়?
সাপ ওগুলো! সাপগুলোর জ্বলজ্বলে, লাল চোখগুলো বড় বেশি জ্বলজ্বল করছে।
কিশোরের দিকে হাত বাড়াল জাদুকর। আঙুল থেকে ঝুলছে সাপ। এদিক-ওদিক পিছলে যাচ্ছে, ঘুরপাক খাচ্ছে। বিস্ময়ের ঘোর সামলে উঠতে পারছে না কিশোর।
একটু পর বড় হতে শুরু করল সাপগুলো।
হচ্ছে তো হচ্ছেই!
হিশহিশ করতে করতে এগুলো তার কবজি পেঁচিয়ে সামনে এগোতে লাগল। ওগুলোর কুৎসিত জিভ লক্ করছে কিশোরকে লক্ষ্য করে।
একটা সাপ ছোবল মারার ভঙ্গিতে ঝট করে মাথা বাড়িয়ে দিল। ওর দিকে।
সময়মত সরে গেল কিশোর। ওটার হাঁ দেখে পিলে চমকে উঠল। তীক্ষ্ণধার দাঁত দেখা গেল ওটার।
হাত ঝাড়া মারল জাদুকর। সঙ্গে সঙ্গে কিশোরের চোখের সামনে যেন ভোজবাজির খেলা ঘটে গেল।
হিশহিশ করতে থাকা সোনালি সাপগুলো মুহূর্তে বজ্রে পরিণত হলো। আকাশের বজ্র চমকে ওঠে মুহূর্তের জন্য, কিন্তু কাজেমের হাতের বজ্র লকলক করছে টিউব লাইটের মত।
দূরত্ব সামান্য বলে তুকে বজ্রের তাপের আঁচ পেল কিশোর। হঠাৎ একটা বজ্র ওর দিকে তেড়ে এল। ঝট করে মাথা নোয়াল ও।

দেরি হয়ে গেছে।
চুল পোড়ার বিচ্ছিরি গন্ধ এল নাকে।
ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে পারল না।
মিস্টার হ্যাগার্ড!
লোকটার সঙ্গে ওর রীতিমত বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। আর সে কি না ওকে ধোকা দিয়ে এসেছে?
অকল্পনীয়।
চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে কিশোর। বোকার মত তাকিয়ে আছে। লোকটার দিকে। কী করবে ভাবতে চাইল।
লোকটার দেহের গড়ন পাল্টে যাচ্ছে দেখে ঝাঁকি খেল কিশোর। এত বিস্ময়ের ধাক্কা সামলানো কঠিন।
লোকটার চোখজোড়া জ্বলজ্বল করে উঠল। তবে নেজার ম্যাণ্ডারের চোখের মত নয়।
কেমন শীতল এবং কঠিন।
ফয়েল পেপারের মোড়কের মত চকচক করছে লোকটার চামড়া। দেখতে দেখতে গায়ের রং পাল্টে যেতে থাকল। শুধু রং নয়, চেহারাও পাল্টাতে লাগল লোকটার। দুগালে কোত্থেকে যেন ঘন। চাপদাড়ি এসে জুটল। ধবধবে সাদা চাপদাড়ি।
মাথার উপর এক হাত তুলে ঘোরাল সে। অমনি কোত্থেকে একটা লম্বা রুপোলি ছড়ি চলে এল তার হাতে।
ছড়িটা মাথার উপর দ্রুত চক্রাকারে ঘোরাতে লাগল সে। বাতাসে শশ শব্দ তুলল ওটা। সবেগে ঘুরছে।
একবার... দুবার... তিনবার...
গতি আরও বাড়ছে। আবছা দেখাচ্ছে এখন ছড়িটাকে। মনে হচ্ছে মাথার উপর অস্পষ্ট একটা চাকতি ঘুরছে।
চোখের পলক পড়ল কিশোরের।
হাত থেমে গেল জাদুকরের।
কিশোরের মুখোমুখি হলো সে। লম্বা, পিঙ্গল একটা জোব্বা তার পরনে। পায়ে পিঙ্গল বুট। মাথায় ঝলমলে পিঙ্গল একটা পাগড়ি।
সালমি বেন কাজেমের জোব্বা আর পাগড়িতে সেঁটে থাকা অজস্র মেডেল ঝকমক করছে-রুপোলি চাঁদ, সোনালি তারা, আরও কত কী!
কোনওটা ছোট, কোনওটা বড়।
কোনওটা ঝকমক করছে, কোনওটা ম্লান।

এমন মেডেল ঠাসা পোশাক জীবনে দেখেনি কিশোর। ডেভিড কপারফিল্ড, আমাদের জুয়েল আইচ–ওঁরাও তো জাদুকর। কিন্তু এমন বিদঘুঁটে পোশাক তাদের পরতে দেখা যায় না! অবশ্য পরবেনই বা কেন, ওঁরা তো আর শয়তান জাদুকর নন।

ওগুলোর মধ্যে বড়সড় একটা নীল বৃত্ত দেখতে পেল কিশোর। ওটার মধ্যে নীল ধোঁয়ার মেঘ ঘুরপাক খাচ্ছে। ঠিক ওর লকেটের মত। মুখ নিচু করে ওটার দিকে তাকিয়ে থাকল কিশোর। জুলজুল করছে জিনিসটা।

শোনো, কিশোর, হ্যাগার্ড, মানে সালমি বেন কাজেম বলে উঠল। সারা গায়ে শিরশিরে একটা অনুভূতি জাগল কিশোরের। যেন অজস্র ঘাসফড়িং হেঁটে বেড়াচ্ছে দেহে। তুমি ভেবেছ এসব তুমিই করেছ, তা-ই না? থেমে আবারও একচোট হেসে নিল সে।

জাদুর জ-ও জানা নেই তোমার, আছে? জাদুশক্তি আছে আমার। আসল কথা হলো আমি তোমাকে ব্যবহার করেছি, আমার সবচেয়ে ভয়ঙ্কর। দুশমনকে খতম করার জন্যে।

সালমি তার লম্বা, রুপোলি লাঠিটা তাক করল ধ্বংস হয়ে যাওয়া। বর্মটার দিকে। পিঙ্গল বুট দিয়ে পায়ের কাছে পড়ে থাকা হেলমেটে লাথি ঝেড়ে দিল। ঠুংঠাং শব্দে গড়িয়ে গেল ওটা এক কোনায়।

চাপা হাসল জাদুকর।

প্রতি আশি বছর পরপর নেজার আর আমাকে লড়াইয়ের জন্যে মুখোমুখি হতে হয়, বলতে শুরু করল সে। আমি তাকে হারাতে পারলে যথারীতি ঘুম দেয় সে পরবর্তী আশি বছরের জন্যে। এই আশি বছর সে অপেক্ষায় থাকে পরবর্তী লড়াইয়ের। আমাকে হারানোর অপেক্ষায় থাকে। কারণ আমাকে হারাতে পারলেই... থেমে শ্রাগ করল জাদুকর।

কিন্তু সেটা হবার নয়, আবার বলল সে। তীক্ষ্ণ চোখে কিশোরের দিকে তাকাল।

ঢোক গিলে অজান্তে এক পা পিছিয়ে গেল কিশোর।

নেজার ম্যাণ্ডারের একটা মন্তব্য মনে পড়ে গেল। সে বলেছিল, এর আগে যে জাদুকরের বিরুদ্ধে সে লড়েছে, ডাইনোসরের রূপ ধরেছিল সে, আগুনের দেয়াল হয়েছিল।

ঠিকই বলেছিল নেজার, কিশোরের মনের কথা বুঝতে পেরে বলে উঠল কাজেম। সে তোমাকে সালমি বেন কাজেম মনে করেছিল। ভেবেছিল তোমার মত ছোটখাট, দুর্বল এক ছেলের রূপ ধরেছি বুঝি। আমার পরিকল্পনা আসলে এরকম ছিল না। তবু এতেই কাজ হয়ে গেল। আমার মত এক জাদুকর কেন এইরকম আস্তাকুড়ে এসে উঠেছে, জানো?

জবাব দিল না কিশোর।
কনজারভেটরির চারদিকে তাকাল জাদুকর। চোখমুখ কুঁচকে উঠল।
কারণ আমার ক্ষমতার বলে জানতে পেরেছিলাম আজ হোক কাল হোক নেজার আসবেই এখানে। তোমার বান্ধবীর চাচা বর্মটা মণ্ট্যানা থেকে এখানে পাঠাবে। এক বুড়োর কাছ থেকে কিনে এখানে পাঠানোর অনেক আগে থেকেই জানতাম। অপেক্ষা করতে হলো আমাকে। কারণ তার সঙ্গে লড়াইয়ের নির্দিষ্ট সময় ঘনিয়ে এসেছিল।
অদ্ভুত দৃষ্টিতে কিশোরের লকেটটার দিকে তাকাল কাজেম। ঠোঁট, চাটল জিভ দিয়ে। মুচকি হাসল।
গা শিরশির করে উঠল কিশোরের।
আমার আগেই তুমি ওই লকেট কফিন থেকে তুলে নিয়েছিলে, বলল সে। পরেও ফেলেছিলে সঙ্গে সঙ্গে। ওটাকে ধরা-ছোঁয়ার নির্দিষ্ট একটা নিয়ম আছে। তুমি আগে ছুঁয়ে ফেলায় আমি আর হাত বাড়াতে পারিনি ওটার দিকে। ছিনিয়ে নিতে পারিনি ওটা তোমার কাছ থেকে। পারার কথাও নয়। কারও নেই সে-ক্ষমতা। অন্তত যতক্ষণ না নেজার নতুন করে আশি বছরের জন্যে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এখন...
সম্মোহিতের মত হয়ে গেছে কিশোর অনেকটা।
চুপচাপ জাদুকরের কথা শুনছে।
ক্রুর হাসি ফুটল জাদুকর কাজেমের ঠোঁটে।
মেঝেতে ছড়িয়ে থাকা নেজারের ছিন্নভিন্ন বর্মটার দিকে তাকাল সে। জ্বলজ্বল করছে তার দুচোখ।
হাতের ছড়িটা কিশোরের দিকে তাক করল সে।
ওটার মাথা থেকে সরু একটা আলোর রেখা ছুটে এল কিশোরের দিকে।
ওর বুকে এসে লাগল।
লকেটটা ঝকমক করে উঠল, যেন কাজেমের জাদুর জবাব দিল।
বুক থেকে শূন্যে উঠে পড়ল ওটা, এগিয়ে গেল জাদুকরের দিকে। কিশোরকেও টেনে নিয়ে চলল ওটা।
জাদুর শক্তির কাছে হার মানল কিশোরের শক্তি।
আমার জিনিস তোমার কাছে থাকবে কেন? ছড়ির মাথা দিয়ে লকেটটা স্পর্শ করল জাদুকর। ছিঁড়ে গেল চেইন।
ছড়িটা দোলাতে লাগল জাদুকর। কিশোরকে অবাক করে দিয়ে। ওটার মাথায় সেঁটে থাকল লকেটটা।
আমার জিনিস এখন আমার কাছে, বলল সে।

নেজার আর কোনওদিন আমার সঙ্গে সুবিধে করতে পারবে না। জাদুর এই লকেট আমাকে আরও ক্ষমতাধর করে তুলবে।
মার্বেলটার দিকে তাকাল সে।
শয়তানী হাসিতে চেহারা ভরে উঠল।
কিশোরের দিকে মন দিল জাদুকর। সুন্দর চেহারার খুঁত কী। জানো? ব্রণ। আমার চলার পথে তুমিও এখন তা-ই। বিচ্ছিরি একটা খুঁত, একটা-ঝামেলা। তোমাকে শেষ করে দিতে হবে। গোপন অনেক কথা বলে ফেলেছি তোমাকে। আমি চাই না আর কেউ তা। জানুক। হুম! এখন আমার কী করা উচিত? শেষ কথাটা যেন নিজেকেই বলল সে।
ঠোঁট চাটল সালমি বেন কাজেম।
ভাবছে।
ভাবছে কীভাবে কিশোরকে খতম করা যায়।
ঢোক গিলল কিশোর।
অত্যন্ত সন্তর্পণে পিছিয়ে গেল এক পা। উদ্দেশ্য–খিঁচে দৌড় দেবে, যা থাকে কপালে।
ওসব চিন্তা বাদ দাও, গর্জে উঠল লোকটা। তার ভয়ঙ্কর চাউনি কিশোরকে জমিয়ে দিল। হ্যাঁ, পেয়েছি! তোমাকে নিকেশ করার কায়দা পেয়ে গেছি আমি। তোমাকে আমি একটা বিড়াল বানিয়ে ফেলব। তবে আগে থেকেই সাবধান করে দিচ্ছি–ভুলেও কুকুরের ধারে-কাছে যেয়ো না যেন। হাঃ হাঃ হাঃ।
শ্বাস-প্রশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে এল কিশোরের।
টের পেল হাতদুটো কাঁপছে। ওর কাঁপুনি টের পেয়ে ঠোঁট মুড়ে হাসল জাদুকর।
কিশোরের মাথার উপর হাত তুলে নাড়তে নাড়তে বলল, একদম নড়াচড়া করবে না। ভরা পূর্ণিমায় আমি, জাদুকর সালমি বেন কাজেম চাই, এই ছেলেটা বিড়াল হয়ে যাক... মন্ত্র পড়ার ভঙ্গিতে কথাটা বলে চলল সে।
দুবার বলা শেষ হয়েছে কী হয়নি, এমন সময় তীক্ষ্ণ একটা কণ্ঠ চেঁচিয়ে উঠল, থামো!
থতমত খেয়ে সামনে তাকাল সালমি বেন কাজেম।
একটু একটু করে বড় হয়ে উঠল দুচোখ।
কনজারভেটরির আরেক প্রান্তের ছায়ার ওদিক থেকে এসেছে। নির্দেশটা।
অপার্থিব শোনাল কণ্ঠটা।
কাঁটা দিল কিশোরের গা। বুকের ভিতরটা ধড়ফড় করে উঠল। হৃৎপিণ্ড বন্ধ হয়ে যাওয়ার যোগাড়।

ছায়ার ভিতর থেকে একটা ছায়া-কাঠামো বেরিয়ে এল ধীরে ধীরে। যতই এগোতে থাকল, ততই স্পষ্ট হতে থাকল অস্পষ্ট কাঠামোটা।
ধাতব জুতো পরে আছে ওটা।
পরে আছে চওড়া ব্রেস্টপ্লেট।
মাথায় হেলমেট।
ওটার মুখাবরণের উপর দিকে দুটো ফাঁকা জায়গা। চোখের ফুটো।
বর্মধারী তার এক হাত তুলল।
কাজেমের উদ্দেশ্যে গগমে কণ্ঠে বলল, শয়তান জাদুকর, এবার মরার জন্য তৈরি হও।
নেজার ম্যাণ্ডার!
আবার ফিরে এসেছে!
আড়ষ্ট ভঙ্গিতে এগিয়ে আসছে বর্মধারী।
এক কদম।
দুই কদম।
তিন কদম।
তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বর্মটার দিকে তাকাল কিশোর। এবং বিষম খেল।
নেজার ম্যাণ্ডার নয় ও। মিস্টার পারকারের নকল বর্ম ওটা, জ্যান্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু তা-ই বা কী করে সম্ভব?
এসব হচ্ছেটা কী? চিন্তায় পড়ে ভাবল কিশোর। নেজারের ভূত কি এখন এই বর্মের ভিতরে ভর করেছে?
বর্মধারী যত এগিয়ে আসছে, তত পিছাতে লাগল কিশোর। যদিও বুঝতে পারছে তার চাউনি ওর উপর নয়, জাদুকরের উপর স্থির।
কাজেমের দিকে তাকাল কিশোর। তারপর বর্মধারীর দিকে।
কার ব্যাপারে সতর্ক হওয়া উচিত ওর? কোনজন বেশি খারাপ?
কিন্তু ভাবনা নিয়ে এগোবার সুযোগ পেল না কিশোর। জাদুকরের চোখ ঝিকিয়ে উঠল। কাঁধ ঝাঁকাল সে।
দুহাত বাড়াল দুদিকে।
বিড়বিড় করে মন্ত্র আওড়াতে শুরু করল।
আরও এগিয়ে এল বর্মধারী। চট করে জাদুকরের দিকে এক হাত বাড়াল সে। তার হাত জাদুকরের লাঠির ডগা ছুঁয়ে দিল।
সময় মত সরে যেতে পারল না কাজেম। তার ছড়ির নীল মার্বেলটা নড়ে উঠল। এদিক-ওদিক করতে লাগল।
তারপরই ওটা পড়ে গেল ছড়ির মাথা থেকে।

মরিয়া হয়ে দুহাত আগে বাড়াল জাদুকর। মার্বেলটা পড়ে যাচ্ছে। ওটা ধরতে চায় সে। কিন্তু পারল না। তার আঙুল ছুঁয়ে ফ্লোরে আছড়ে পড়ল খুদে জিনিসটা।
ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।
কান ফাটানো আওয়াজ উঠল একটা। বজ্রপাতের শব্দকে হার মানায় সে আওয়াজ।
ঝিকিয়ে উঠল উজ্জ্বল, নীল আলো।
এতই উজ্জ্বল যে চোখ বুজতে বাধ্য হলো কিশোর।
এরপরই অদ্ভুত একটা য্যযু জাতীয় আওয়াজ কানে এল।
লকেটটা ভেঙেচুরে অগুনতি টুকরোয় পরিণত হয়েছে। অজস্র টুকরো হয়ে ছুটল এদিক-ওদিক।
কাঁচের টুকরোগুলোকে খুদে নক্ষত্রের মত লাগছে।
এক মুহূর্ত পরই ফ্লোর থেকে নীল ধোঁয়ার মেঘ উঠতে দেখা গেল।
উঠতেই থাকল।
লকেটটা যেখানে পড়ে ভেঙেছে, সেখান থেকে অনবরত ধোঁয়া উঠছে। মাটির নীচের কোনও ধোঁয়ার উৎসমুখ যেন খুলে গেছে।
গলগল করে বের হচ্ছে তো হচ্ছেই।
জীবনে অনেক আজব কাণ্ড দেখেছে কিশোর, কিন্তু এমন কাণ্ড দেখেনি।
নীল ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ছে চারপাশে।
শীতের সময় ঘন কুয়াশা যেমন ভেসে বেড়ায়, কনজারভেটরির মধ্যেও তেমনি নীল ধোঁয়া ভেসে বেড়াচ্ছে। তবে এই ধোঁয়া অস্থির ও রহস্যময়।
কিশোরের পা ঢেকে ফেলল নীল ধোঁয়া। শরীরের যেখানেই ধোঁয়া লাগছে, সেখানেই ঠাণ্ডা লাগছে। মনে হলো হাড়ে গিয়ে ঠেকছে। ঠাণ্ডা।
এরপর জাদুকরকে ঘিরে ধরতে শুরু করল ধোঁয়া।
নীল ধোঁয়া তাকে ঘিরে উঠছে তো উঠছেই। থামাথামি নেই। পিঙ্গল জোব্বা পরা লোকটা ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে যাচ্ছে একটু একটু করে।
না! না! আর্তনাদ করে উঠল সে। উন্মত্তের মত দুহাত নাড়তে লাগল উপর-নীচ, এদিক-ওদিক।
ধোঁয়া সরানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছে।
কিন্তু বেয়াড়া ধোঁয়ার মেঘ গিলে ফেলেছে তাকে।
মুখের সামনে থেকে ধোঁয়া সরানোর মরিয়া চেষ্টা করল জাদুকর। পারল না।
খেপার মত বুট দিয়ে ধোঁয়ায় লাথি হাঁকাল অনর্থক।
নীল ধোঁয়া তাতে বরং গাঢ় হলো আরও।

এবার হাল ছেড়ে দিল জাদুকর। অসহায়ের মত কপাল টিপে ধরে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল।
পরক্ষণে ফ্লোর হাতড়াতে শুরু করল পাগলের মত।
কী খুঁজছে লোকটা?
কী?
কী আছে ওখানে, যার জন্য সে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে? ভাবতে লাগল কিশোর। গাঢ় ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে ফ্লোর দেখার চেষ্টা করল।
হ্যাঁ, দেখতে পেল জিনিসটা।
ছোট্ট সোনালি একটা তলোয়ার। ধোঁয়ার মধ্যেও ঝমক করছে।
বিস্ময়ে গুঙিয়ে উঠল কিশোর।
এতদিন ওটা নিশ্চয়ই লকেটটার মধ্যে লুকানো ছিল। জাদুকর ওটার দিকে হাত বাড়াল।
ডাইভ দিল কিশোর।
কেন যেন মনে হলো ওই ছোট্ট জিনিসটা এখন ওকে এই ভয়ঙ্কর বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারবে।
হ্যাঁ, বরাবরের মত এবারও জিত হলো কিশোরের। এতদিন হারিয়ে এসেছে হ্যাগার্ডকে। এবার হারাল জাদুকর সালমি বেন কাজেমকে।
তলোয়ারটা ধরতেই ওর মনে হলো যেন হাতে বৈদ্যুতিক শক লেগেছে। বেদম এক ঝাঁকি খেল।
টান মেরে হাত পিছিয়ে নিল। তবে তলোয়ারটা ছাড়ল না। হাতের সবকটা আঙুল চিনচিন করে উঠল ব্যথায়।
পাত্তা দিল না কিশোর।
শক্ত হাতে ধরে রাখল জিনিসটা। ওর মুঠো থেকে স্ফুলিঙ্গ ছুটতে লাগল। মুঠো সামান্য আলগা করল।
ছোট্ট তলোয়ারটা বড় হতে শুরু করেছে। কিশোরের হাতে বড় হচ্ছে ওটা।
বড় হতেই থাকল।
লম্বা হচ্ছে। ফলা চওড়া, ভারী হচ্ছে।
সৈন্যদের তলোয়ারের মত বড়সড়–লম্বা হয়ে গেল ওটা দেখতে দেখতে।
এবার তলোয়ারটার হাতল ধরল কিশোর শক্ত করে। ওর হাতের মুঠোয় এঁটে বসল ওটা।
. তলোয়ার ধরা হাতটা আগে বাড়িয়ে দ্রুত দোলাল কিশোর। তলোয়ারের ব্লেডে চাঁদের আলো পড়তে কয়েকশো তারার উজ্জ্বলতা নিয়ে ঝিকিয়ে উঠল ওটা।

হঠাৎ হুশ! জাতীয় একটা শব্দ কানে এল কিশোরের। তারপর নেজার ম্যাণ্ডারের বর্মের টুকরোগুলো দেখা গেল শূন্যে ভাসছে।
ওগুলো কিশোরের দিকেই ছুটে আসছে।
শিন গার্ডটা ওর হাঁটুতে জুড়ে বসল আঘাত থেকে পা দুটোকে বাঁচানোর জন্য।
ব্রেস্টপ্লেট এসে সেঁটে গেল ওর বুকে।
বর্মের অন্যান্য অংশ এসে টপাটপ জুড়ে বসতে লাগল দেহের বিভিন্ন অংশে।
এবার সোনালি তলোয়ারটা উঁচু করে ঘুরে দাঁড়াল ও। সালমি বেন কাশেমের মুখোমুখি হলো।
জাদুকরের বিরুদ্ধে কী পারবে ও?
একটা অপশক্তির বিরুদ্ধে?
লোকটার মাথা হঠাৎ পিছনে হেলে পড়ল। ঠোঁট বাঁকিয়ে বিদ্রুপের হাসি হাসতে লাগল সে। মুখের ভিতরে লম্বা ছুঁচাল দাঁত আর আলজিভ পরিষ্কার দেখা গেল তার।
ভীতিকর গর্জন ছাড়ল জাদুকর। তার হাতের দশ আঙুলের ডগায়। বিদ্যুৎ চমকে উঠল–সরু, লকলকে এবং ভয়ঙ্কর বিদ্যুৎ।
ভেবেছ তুমি আমাকে হারাতে পারবে? গর্জে উঠল কাজেম। দমকা বাতাস বয়ে গেল গোটা রুমে। তার ধাক্কায় মনে হলো পড়েই যাবে কিশোর।
নিজেকে সামলে নিল ও। পৃথিবীতে এমন কোনও শক্তি নেই যা আমার জাদুর গুণ নষ্ট করতে পারে, আবারও গর্জে উঠল জাদুকর।
সালমি বেন কাজেম তার দুবাহু প্রসারিত করল দুদিকে।
বিকট রূপ ধারণ করতে লাগল সে, অতিকায় দানবে পরিণত হতে লাগল একটু একটু করে।
হঠাৎ চোখ ধাঁধানো বিদ্যুৎ ঝলকে উঠল জাদুকরের ছড়ি থেকে।
কনজারভেটরি ঝলসে উঠল নীলচে সাদা সেই তেজী আলোয়। চোখ ধাঁধিয়ে গেল কিশোরের। চোখ বুজে গেল আপনাআপনি।
আলোটা কিছুক্ষণ ভেসে রইল রুমের বাতাসে। হিশহিশ, মটমট শব্দ তুলল।
কিশোরের বর্ম ভেদ করে দেহে এসে লাগল তার উত্তাপ। মনে। হলো শরীরটা ঝলসে যাবে।
বোলিং করার ভঙ্গিতে মারাত্মক সেই বিজলিটাকে কিশোরের দিকে পাঠিয়ে দিল সালমি বেন কাজেম। ছুটে এল ওটা সোজা কিশোরের উদ্দেশে।
সময়মত লাফ দিল কিশোর। এক পাশে সরে নিজেকে বাঁচাল এ যাত্রা।
দ্বিতীয় বর্মটা কিশোরের কাছেই দাঁড়িয়ে আছে এখন। হাল ছেড়ো না, কিশোর! ফিসফিস করে বলে উঠল বর্মধারী প্রেতাত্মা।

জিনা! চমকে বলল কিশোর। বিস্মিত। বর্মের ভেতরে তুমি!
হ্যাঁ, জবাব এল ভিতর থেকে।
ব্রেস্ট প্লেটের মাঝখানের ফাঁক দিয়ে পিটপিট করে চেয়ে আছে ও কিশোরের দিকে।
তুমি সত্যিই চমকে দিয়েছিলে, বলল কিশোর।
এখন কী করব! বলল জিনা। লড়বে? নাকি পালাবে?
পালানোর উপায় নেই, ফিসফিস করে জবাব দিল কিশোর। আমাকে লড়তে হবে ওর বিরুদ্ধে–একা।
আপাদমস্তক কেঁপে উঠল জিনা।
ঠনঠন্ আওয়াজ তুলল কিশোরের বর্ম। ভারী এক পা সামনে বাড়িয়ে তলোয়ার উঁচাল ও আধা আত্মবিশ্বাস নিয়ে।
সালমি বেন কাজেম গাছের মত ঠায় দাঁড়িয়ে আছে।
হিংস্র পশুর মত গর্জে উঠল সে বিজাতীয় শব্দে।
কিশোর সরাসরি তার চোখে চোখ রাখল, আক্রমণ করার জন্য জাদুকর তার দুবাহু দুদিকে বাড়াল।
রুপোর ছড়িটা ঘোরাতে লাগল শূন্যে। জোব্বাটা কেমন যেন খসখস শব্দ তুলল।
কিশোর লাফিয়ে পিছু হটল।
মাথা ঝাড়া দিল সে সজোরে। প্রলম্বিত চিৎকার ছাড়ল।
আচমকা জাদুকরের চামড়া চকচক করে উঠল। লম্বা হতে শুরু করল সে।
দুই হাত লম্বা হচ্ছে। আঙুলের নখগুলো হলদে, পৈশাচিক নখরে পরিণত হলো।
পা জোড়াও হয়ে উঠল দানবীয় আকৃতির।
শুধু তা-ই নয়, ধড়টাও প্রকাণ্ড হয়ে উঠল। গোটা দেহটা কোনও মহীরুহের আকৃতি পেয়েছে।
অট্টহাসি হাসতে হাসতে শূন্যে উঠে পড়ল জাদুকর। দেখতে দেখতে কিশোরের মাথার উপরে উঠে গেল।
টলমল পায়ে পিছু হঠল গোয়েন্দা-প্রধান। চোয়াল ঝুলে পড়েছে মহাবিস্ময়ে।
জাদুকরের ঘাড় বকের মত লম্বা হতে লাগল। বাজপাখির ঠোঁটের মত লম্বা হয়ে গেল তার নাক।
সিলিং পর্যন্ত পৌঁছে গেল তার মাথা।
তলোয়ার শক্ত করে ধরল কিশোর।
সম্পূর্ণ তৈরি–কীসের জন্য, নিজেও তা জানে না।
চোখ সরু করে সালমি বেন কাজেমের গাঢ় রঙের আঁকাবাঁকা দেহটার দিকে তাকাল। অতিকায় দেহটা ওর মাথার উপর শূন্যে ভাসছে। যেন ওটা মানুষের নয়

দানবাকৃতির একটা গ্যাস বেলুন!
হঠাৎ ওটা নীচে নেমে আসতে লাগল।
দুহাতে মাথা ঢেকে ফেলল কিশোর। হিহি শব্দ কানে এল। বাতাসে ডানা ঝাঁপটানোর আওয়াজ উঠল।
ঢোক গিলে উপর দিকে তাকাল কিশোর।
একটা প্রাগৈতিহাসিক ডাইনোসরের মুখোমুখি হলো ও।
অতিকায় করালদর্শন ডাইনোসরবিশাল দুটো পিঙ্গল ডানাও আছে ওটার।
প্রকাণ্ড দেহটা আগাগোড়া পিঙ্গল আঁশে ঠাসা। আঁশ থেকে সমানে চটচটে নরম নোংরা আঠাল রস গড়িয়ে পড়ছে।
কী বিচ্ছিরি গন্ধ! দম বন্ধ হয়ে আসতে চায়।
ডাইনোসরের তিনটে চোখ! সমানে পাক খেল ওগুলো।
দুটো লম্বা, কালো, চেরা জিভ ওটার মুখ থেকে বেরিয়ে এসে লকলক করছে।
দুর্গন্ধময় সবুজ লালা ওটার মুখ থেকে ছিটকে পড়ছে। সেগুলোর একেক দলা ফ্লোরে পড়ামাত্র ছাৎ-ছাৎ শব্দ উঠল। নীলচে ধোঁয়া উঠছে সেখান থেকে।
এক পা সামনে এগোল কিশোর। দুহাতে হাতল আঁকড়ে ধরে তলোয়ার চালাল সর্বশক্তি দিয়ে।
ডাইনোসরটা ঝট করে দেহ সরিয়ে নিল। চেরা জিভ দুটো ভয়ঙ্কর ভাবে ওর দিকে এগিয়ে এল। সশব্দে লম্বা শ্বাস টানল ওটা।
পরক্ষণে নিঃশ্বাস ছাড়ল।
পচা, অসহ্য দুর্গন্ধ বাতাস ধাক্কা মারল কিশোরের নাকে। গলা দিয়ে নাড়ি-ভুঁড়ি ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইল। বর্মের ভিতরে বিশুদ্ধ বাতাসের জন্য ওর ফুসফুস হাঁসফাস করতে লাগল।
কিন্তু কোথায় পাবে বিশুদ্ধ বাতাস?
কিশোর দেখল দানবটার প্রকাণ্ড দুই চোয়াল আবার আলগা হয়ে গেছে। লাফিয়ে পিছু হটল ও। ওটার মুখের দুর্গন্ধ অসহ্য লেগে উঠল। প্রাণীটার মুখ দিয়ে আগুনের লম্বা একটা শিখা বেরিয়ে আসতে দেখে আত্মা উড়ে গেল ওর। সেই শিখা ওর পায়ের কাছে এসে আছড়ে পড়ল। মনে হলো পা পুড়ে গেল বুঝি।
মুখ দিয়ে দুর্বোধ্য একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল কিশোরের। পায়ে পায়ে পিছু হটতে বাধ্য হলো ও।
ডাইনোসরটা আবার লম্বা দম নিল।
আরেক হলকা আগুনের মোকাবিলা করতে তৈরি হলো কিশোর।
জিনাকে একটা ফায়ার এক্সটিংগুইশার হাতে ছুটে আসতে দেখল। ও। দুর্ঘটনা এড়াবার জন্য পারকার আঙ্কেল ওগুলোর বেশ কয়েকটা এনে রেখেছেন

জাদুঘরে।
জিনা ওর গা থেকে বর্ম খসিয়ে ফেলেছে। এখন দ্রুত চলাফেরা করতে পারছে।
ডাইনোসরের দিকে এক্সটিংগুইশার তাক করল জিনা। লিভার টেনে ধরল।
প্রথমে ফট! করে একটা আওয়াজ হলো। তারপর হুশশ শব্দে ফেনিল সাদা তরল ছড়িয়ে ছুটল উপর মুখো হয়ে। তীব্র বেগে ছুটে গিয়ে ডাইনোসরের গলায় পড়ল ধারাটা। কিশোরের গায়েও ছিটে এসে লাগল।
জিনার পাশে এসে দাঁড়াল কিশোর।
মুখ তুলে ডাইনোসরটার দিকে তাকাতেই আঁকি খেল ও। ওটা আর ডাইনোসর নেই। সালমি বেন কাজেম হয়ে গেছে।
ফেনিল তরল তার দাড়ি বেয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে। পাগড়ি আর জোব্বাতেও সাদা ফেনা লেগে আছে।
লোকটার হলদে চেহারায় উদ্বেগের ছাপ।
শয়তানের দল! আমার সাথে মশকরা! হুঙ্কার ছেড়ে হাতের লাঠিটা শূন্যে দোলাতে লাগল সে। সেই সঙ্গে বিড়বিড় করে কী সব মন্ত্র আওড়াতে লাগল।
ছড়িটা মাথার উপর ছুঁড়ে মারল সে।
পাক খেতে খেতে উপরে উঠে গেল ওটা। আবার ফিরে এল। ওটা যখন খপ করে ধরে ফেলল কাজেম, তখন আর ওটা ছড়ি নেই, তীক্ষ্ণধার একটা তলোয়ার হয়ে গেছে।
ওটার গা থেকে আলো ঠিকরে বের হলো।
হামলা করবে বলে তলোয়ারটা বাগিয়ে ধরল জাদুকর।
কিশোর, সাবধান! চিৎকার করে ওকে সতর্ক করল জিনা।
দরকার ছিল না অবশ্য। বাঁচার সহজাত প্রবৃত্তির বশে কিশোর আগেই তলোয়ার উঁচিয়ে ধরেছে।
জাদুকর ওর সামনেই দাঁড়িয়ে আছে।
তলোয়ার চালাল সালমি বেন কাজেম। নিজের সোনালি তলোয়ার দিয়ে আঘাতটা ঠেকাল কিশোর। দুই তলোয়ারে সংঘর্ষ হলো বিকট শব্দে।
আগুনের স্ফুলিঙ্গ ছুটল।
কিশোরের হাত কেঁপে উঠল। মনে হলো কাঁধ থেকে হাত ছিঁড়ে যাবে।
বেন কাজেম কিশোরকে লক্ষ্য করে আবার তলোয়ার চালাল।
লাফিয়ে সরে গিয়ে আঘাতটা এড়াল কিশোর।
সালমিও সামান্য পিছিয়ে গেল।
ঘন ঘন দম নিচ্ছে সে। হাঁপিয়ে উঠেছে।
কিশোরের অবস্থা আরও খারাপ।

ক্রুদ্ধ চোখে পরস্পরকে দেখল দুজন। ঘেমে একাকার হয়েছে কিশোর। গাল বেয়ে টপটপ করে গড়িয়ে পড়ছে ঘাম। কপাল বেয়ে গড়িয়ে পড়া ঘাম চোখে পড়তেই চোখ জ্বলে উঠল ওর। বর্মের মধ্যে ওর বুকটা ধুকপুক করছে। যতটা না ভয়ে, তার চেয়ে বেশি উত্তেজনায়।
শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক করার চেষ্টার ফাঁকে সালমি বেন কাজেমের উপর দৃষ্টি স্থির করল কিশোর। লোকটা এখন কী করে বসে বলা যায় না।
জাদুকর তার তলোয়ার ওঠাল।
কিশোর তার ঠোঁট কাঁপতে দেখল। তাকে গোঁ-গোঁ করতে শুনল। গো-গোঁ করে মন্ত্র পড়ছে এখন!
জাদুকর তার তলোয়ার কিশোরের দিকে তাক করল।
কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল। তারপর আচমকা জাদুকরের তলোয়ারের চোখা প্রান্ত থেকে ছরছর করে পিঙ্গল স্ফুলিঙ্গ বেরিয়ে এল। কাঁচের সিলিঙে আঘাত করল। ভেঙে ওদের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল কাঁচের টুকরো।
স্ফুলিঙ্গটার দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থাকতেই হাত-পা অসাড় হয়ে এল কিশোরের। মাথা ঝিম ধরে গেল। ভারী হয়ে এল চোখের পাতা।
লক্ষণ খারাপ।
ওদিকে তাকিয়ো না, কিশোর, মনে মনে নিজেকে নির্দেশ দিল ও। খবরদার, ওদিকে তাকিয়ো না। চোখ সরিয়ে নাও।
কিন্তু কাজ হলো না। নিজের নির্দেশ নিজেই অমান্য করল।
জাদুকরের তলোয়ারের ফুলিঙ্গ রত্নের মত ঝকম করছে।
সম্মোহিতের মত একদৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে থাকল কিশোর। চোখ ফেরাতে পারছে না।
এখনও সময় আছে! মরিয়া হয়ে নিজেকে বলল ও মনে মনে। চোখ ফিরিয়ে নাও। নইলে শেষ হয়ে যাবে তুমি। জাদুকর তোমাকে…
ঘন ঘন চোখের পলক পড়তে লাগল কিশোরের। চোখের পাতা অসম্ভব ভারী ঠেকছে। বুজে আসতে লাগল দুচোখ। প্রায় বুজে এল।
মাথা ঝাঁকাল কিশোর। মাথা আরও ভারী ঠেকল। এত ভারী যে খাড়া রাখতে সমস্যা হলো।
দুচোখ বুজে এল ওর। চিবুক বুকে ঠেকে গেল। দুই হাঁটু বেজায় দুর্বল ঠেকছে। পা জোড়া টলে উঠল। পড়ে পড়ে অবস্থা।
না, কিশোর, না! জিনা চিৎকার করে উঠল। কিশোরের মনে হলো ওর গলা কয়েক মাইল দূর থেকে ভেসে আসছে। চোখ খোলো, কিশোর! প্লিজ, চোখ খোলো!

জানে না কীভাবে, অবশেষে চোখ মেলে তাকাল কিশোর।
পিঙ্গল স্ফুলিঙ্গ ওর চারপাশে ঝরে পড়ছে। ওগুলো গায়ে পড়লে কী ঘটতে পারে, জানে না কিশোর। জানতে চায়ও না। এখন ওসব ভাবার সময় নেই।
শরীরে যেটুকু শক্তি অবশিষ্ট আছে, তা-ই দিয়ে দুহাতে তলোয়ারটা আঁকড়ে ধরে তুলল কিশোর। কাধ সমান উঁচুতে তুলে তৈরি হলো। স্ফুলিঙ্গ ওর কাছে এলেই তলোয়ারের খোঁচায় দূরে সরিয়ে দিল।
কিছু কিছু স্ফুলিঙ্গ তলোয়ারে লেগে চড়চড় শব্দে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে গেল। আর কিছু কিছু তলোয়ারে বাড়ি খেয়ে উপরে উঠে গেল। তারপর আবার পড়তে লাগল।
এবং পড়তে লাগল সালমি বেন কাজেমের মাথায়।
না-আ!! আর্তনাদ করে উঠল জাদুকর।
চমকে উঠল কিশোর।
কিছু স্ফুলিঙ্গ তার পাগড়িতে পড়ল। অমনি হিশহিশ শব্দ উঠল। কিশোর দেখল স্ফুলিঙ্গ তার গায়ের যেখানে পড়ে, সেখান থেকেই নীলচে পিঙ্গল ধোঁয়া পেঁচিয়ে উঠতে শুরু করেছে।
অজস্র ফুলিঙ্গ জাদুকরের জোব্বা ঢেকে ফেলল দেখতে দেখতে। এবং সেই সঙ্গে নীলচে পিঙ্গল ধোঁয়ার মেঘ জমল তাকে ঘিরে।
ধীরে ধীরে ঘন, গাঢ় হয়ে এল ধোঁয়া।
সালমি বেন ক্যাজম সরে যেতে চাইল। কিন্তু না-ছোড় ধোঁয়া তাকে কামড়ে ধরার মত ঘিরে থাকল চারপাশ থেকে। হাত-পা সমানে ছুঁড়েও সে ধোঁয়া সরাতে পারল না।
ঘন, ঢেউ খেলানো ধোঁয়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে অসহায়ভাবে হাত-পা ছুঁড়ছে জাদুকর। ধোঁয়ার হাত থেকে কিছুতেই রেহাই পাচ্ছে না।
না-আ-আ!বোঝা যাচ্ছে অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে তার করে হাত-পা ছুঁড়ছে পাগলের মত।
লাভ হচ্ছে না।
জিনা নিঃশব্দে কিশোরের পাশে এসে দাঁড়াল।
পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ওরা দেখল, নীলচে পিঙ্গল ধোঁয়া পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঢেকে ফেলল জাদুকরকে। ক্রমশ ঘন হচ্ছে ধোঁয়ার প্রাচীর।
-না-না-আ! সমানে চেঁচিয়ে চলেছে সালমি বেন কাজেম। চোখ জোড়া জ্বলজ্বল করছে। চেহারা বিকৃত। হাঁ হয়ে গেছে মুখ। মুখে ঢুকছে ধোঁয়া।
একটু পর আবছা হয়ে এল জাদুকরের কাঠামো।

তার জোব্বার জাদুকরী মেডেলগুলো ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে গেল। কিছুক্ষণ পর তার সাদা দাড়িও ঢেকে গেল নীলচে পিঙ্গল ধোঁয়ায়।
দুচোখ ঢেকে গেল।
এখন তার হাত-পা ছোঁড়া আর দেখতে পাচ্ছে না কিশোর জিনা।
পাগড়ির উপরের অংশটুকু শুধু দেখা যাচ্ছে।
না! না! না! ধোঁয়ার মেঘের ভিতর থেকে তার দুর্বল কণ্ঠের। আর্তনাদ ভেসে আসছে।
এ হতে পারে না। কিছুতেই না। আমার এই পরিণতি কিছুতেই হতে পারে না। শয়তান বিচ্ছুর দল! আমি সালমি বেন কাজেম, পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ জাদুকর। আহ্-না-আ-আ! আমি তোমাদের ছাড়ব না। আমি...
জাদুকরের কণ্ঠস্বর আরও দুর্বল হয়ে এল।
এক সময় আর কথা শোনাই গেল না। ধোঁয়ার মেঘ সমানে ঘুরপাক খাচ্ছে।
বিচ্ছিরি একটা গন্ধ এসে ঝাঁপটা মারল দুই কিশোর-কিশোরীর নাকে। দম বন্ধ হয়ে এল। জিনা কেশে উঠল।
চারদিকে অসহ্য নীরবতা নেমে এসেছে হঠাৎ করেই।
কিশোর আর জিনা ঠায় দাঁড়িয়ে আছে।
কান খাড়া। পরবর্তী ঘটনার অপেক্ষায় আছে।
কোত্থেকে কে জানে এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস এসে শীতল করে তুলল পরিবেশ। ধোঁয়ার ঘন মেঘ দ্রুত কেটে গেল।
ধোঁয়ার সঙ্গে মিলিয়ে গেছে সালমি বেন কাজেম।
নাকি নিজেই উধাও হয়ে গেছে জাদুর বলে?
না, আসলে তা হয়নি।
জাদুকর যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, সেখানে কিছু একটা দেখল কিশোর। সামনে এগিয়ে গেল ওরা।
একটা কুৎসিত, পিঙ্গল শামুক দেখে ঘৃণায় মুখ কুঁচকে ফেলল। জিনা।
ওটা আমাদের আর ক্ষতি করতে পারবে না, বলতে বলতে শামুকটার পাশে এসে দাঁড়াল কিশোর। ফোলা ফোলা লাল দুটো চোখ জ্বলজ্বল করছে শামুকটার শুড়ের শেষ মাথায়। পুরু হয়ে শ্যাওলা জমে আছে ওটার খোলে।
জিনা দুপা এগোল।
ওর উত্তেজিত শ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে কিশোর। হাতের তলোয়ার দিয়ে শামুকটার গায়ে খোঁচা মারল ও। শামুকটার। শুড় কিছুক্ষণ শূন্যে এদিক-ওদিক করল। চোখ দুটো মনে হলো ছিটকে বেরিয়ে আসতে চাইছে। বীভৎস

মাথাটা ঝকাল ওটা। তারপর টলতে টলতে পিছলে সরে যেতে লাগল। কিছুদূর গিয়ে স্থির হলো।
চিরতরে।
মেঝেতে অবশিষ্ট রইল কেবল সালমি বেন কাশেমের পোশাকের রঙের মত পিঙ্গল তরলের পিচ্ছিল একটা দলা।
কিশোর, তুমি... ঠিক আছ... বিড়বিড় করে বলল জিনা। ওর ফ্যাকাসে মুখে হাসি ফুটল। সত্যি তুমি সাঙ্ঘাতিক!
কিশোর হাসল। হেলমেট খুলে ফেলল। ওটার ওজন আর সহ্য করতে পারছে না।
সাঙ্ঘাতিক? মাথার উপর, তলোয়ার ঘোরাল কিশোর। তবে তোমার মত অতটা সাঙ্ঘাতিক নই, জিনা। ওই বর্মটা পরার আইডিয়া কী করে এল তোমার মাথায়?
আসলে তোমার সঙ্গে মজা করার জন্যে ওটার মধ্যে ঢুকেছিলাম, লাজুক মুখে স্বীকার করল জিনা। কিন্তু যখন হ্যাগার্ডের... মানে সালমি বেন কাজেমের কথা কানে এল, তখন নিজেই চমকে উঠলাম। জানতাম বাবা জরুরি একটা কাজে বাইরে গেছেন। মাকে ডাকব ভাবলাম, তারপর মনে হলো তাঁর সাহায্যের আশায় বসে না থেকে ভেতরে ঢুকে পড়া দরকার। ওইলোক তোমাকে বেড়াল বানিয়ে ফেলার মন্ত্র পড়া শুরু করতেই ঘাবড়ে গেলাম আমি। বাধ্য হয়ে ঠিক করলাম জাদুকরের মন্ত্র পড়া থামানোর ঝুঁকিটা নেব।
তোমার এত বুদ্ধি সত্যিই আমার জানা ছিল না, এর বেশি কিছু বলা সম্ভব হলো না কিশোরের পক্ষে। বলার মত অবস্থাও নেই।
হাই তুলে তলোয়ারটা একদিকে ছুঁড়ে মারল ও। এরপর একে একে খুলে ফেলল বর্মের বাকি অংশ। মেঝেতে ওগুলোর স্তূপ জমে গেল।
ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে কাঁধ ঝাঁকাল কিশোর। এমন ওজনদার বর্ম পরে আগের দিনের সৈন্যরা যে কীভাবে লড়াই করত, ভেবে পাই না।
নেজার ম্যাগুারের বর্মের স্তূপের পাশে বসে পড়ল ও।
বর্মটাকে আবার দাঁড় করাতে খুব একটা কষ্ট হবে না পারকার আঙ্কেলের। এবার আর কোনও ভূত-টুতের ভয় নেই। ফেলে দেয়া তলোয়ারটা তুলে নিয়ে ওটা দিয়ে নেজারের একটা জুতোয় খোঁচা মারল ও। দূরে সরে গেল জিনিসটা। এবার একটা গ্লাভ ঠেলে সরাল একপাশে। তারপর তলোয়ার ফেলে দিল।
ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে আসছে আমার, হাই তুলে বলল কিশোর। মনে হচ্ছে এখানেই... এত কিছু ঘটে গেল বিশ্বাসই...
ওর পাশেই কিছু একটা নড়ে উঠতে থেমে গেল। জিনার অস্পষ্ট গোঙানি কানে এল। কিন্তু ওর দিকে তাকানোর সময় পেল না কিশোর।
নেজার ম্যাগুারের একটা গ্লাভের উপর নজর স্থির।

আপনাআপনি গ্লাভটা বর্মের স্তূপ থেকে উঠে এসে তলোয়ারের হাতলের উপর বসল। একে একে সব কটা আঙুল বেঁকে গেল, এঁটে বসল হাতলে।
সোনালি তলোয়ারের হাতল আঁকড়ে ধরল গ্লাভের ধাতব আঙুল।
ও, ক্রাইস্ট! আঁৎকে উঠল জিনা।
হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। এটা কী?
তলোয়ারটা শূন্যে উঠে পড়ল। ভাসতে লাগল বাতাসে।
গভীর একটা গোঙানি শুনতে পেল কিশোর। ভয়ে ওর ঘাড়ের খাটো খাটো চুলগুলো দাঁড়িয়ে গেল।
গোঙানির আওয়াজটা নিচু হতে লাগল। মনে হচ্ছে কয়েক মাইল। দূর থেকে আসছে। অবশ্য পরমুহূর্তে আবার চড়া হয়ে উঠল। মনে হচ্ছে অদৃশ্য কেউ খুব কাছ থেকে গোঙাচ্ছে।
একটু পর মনে হলো চারদিক থেকেই আসছে আওয়াজটা।
আতঙ্কভরা চোখে বর্মের বিচ্ছিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্তূপটার দিকে তাকাল কিশোর। তলোয়ারটার ডগা ঘুরে গেল বর্মের বিচ্ছিন্ন পা দুটোর দিকে। পরমুহূর্তে হুশহুশ শব্দ কানে এল। পা দুটো উঠে পড়ল। শূন্যে। তলোয়ারটার দিকে ছুটে এল। তারপর গতি পরিবর্তন করে যেখানে থাকার কথা, সেখানে এসে স্থির হয়ে গেল।
এরপর তলোয়ারটা ঘুরে গেল বুট জোড়ার দিকে।
কিশোর! ওর বাহু আঁকড়ে ধরল, জিনা। কিশোর, কিছু একটা করো, প্লিজ! জলদি কিছু একটা করো! ও ফিরে আসছে আবার!
সত্যিই তা-ই! বর্মের ভূত তা হলে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়নি। জ্যান্ত হয়ে উঠতে শুরু করেছে। এই মুহূর্তে কিছু একটা করা দরকার। নইলে…
আর ভাবার সময় নেই। নেজার ম্যাণ্ডারের বুটজোড়ার দিকে ছুটল কিশোর। কিন্তু জিনিস দুটো ছোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গে বৈদ্যুতিক শক খেল ও, ঝট করে দুহাত সরিয়ে নিল।
ঠাণ্ডায় দুহাত জমে যাওয়ার জোগাড়। ওগুলো কীভাবে এত ঠাণ্ডা হলো কে জানে!
দুহাত গরম করার জন্য জোরে জোরে ঘষল ও।
বিস্ফারিত চোখে কিশোর দেখল খটমট শব্দ তুলে বুটজোড়া দূরে সরে যাচ্ছে। টাইলের ফ্লোরে আওয়াজটা স্বাভাবিকের চেয়েও চড়া শোনাচ্ছে।
নেজারের লেগ-গার্ড দুটো যেখানে ছিল, সেখানে চলে গেল। বুটজোড়া।
এদিকে গোঙানির আওয়াজ আরও চড়া হয়েছে। কানে তালা। লাগার জোগাড় হলো কিশোর-জিনার।

নেজারের ব্রেস্ট-প্লেটটা শূন্যে উঠে পড়ল। এবং বর্মটার ঠিক মাঝখানে বসে গেল সুন্দরভাবে।
এরপর হাত জোড়া উঠে এল স্তূপ থেকে। নিজের নিজের অবস্থানের দিকে ছুটে চলল। ব্রেস্ট-প্লেট যেখানে কাঁধের সাথে। মিলেছে, সেখান থেকে ঝুলে পড়ল ওদুটো।
যে বাহুতে কোনও হাত নেই, অন্য গ্লাভটা ছুটে গিয়ে সেটার সঙ্গে এঁটে বসল।
কিশোর মনে হলো পাথর হয়ে গেছে। অথবা পাথরের চেয়েও অনড়। টের পেল কপালের শিরা দপদপ করে লাফাচ্ছে ওর। বুকের ভিতর ভয়ঙ্কর ভাবে ধকধক করছে হৃৎপিণ্ড। যে-কোনও মুহূর্তে বিস্ফোরিত হতে পারে ওটা।
জিনা ও কিশোর একযোগে নেজার ম্যাণ্ডারের দিকে তাকাল।
পূর্ণাঙ্গ রূপ নিয়েছে সে, দাঁড়িয়ে আছে ওদের সামনে।
শুধু... তার মাথাটা নেই।
ভয়ঙ্কর শোঁ-শোঁ শব্দ উঠল হঠাৎ। আতঙ্কে কিশোর-জিনার গায়ের রোম দাঁড়িয়ে গেল।
শো-শোঁ আওয়াজটা তুলছে গ্লাভ পরা হাতে ধরা সোনালি তলোয়ারটা। ওটা এবার একটু একটু করে ঘুরছে বর্মের হেলমেটের দিকে।
বাধ্য ছেলের মত হেলমেটটা শূন্যে উঠে বাতাসে ভাসতে লাগল। তারপর বর্মের দিকে এগোতে শুরু করল।
কিশোরদের পেরিয়ে গেল। পরক্ষণে চারপাশে শীতল বাতাস বইতে শুরু করল।
বর্মের উপর গিয়ে স্থির হলো হেলমেটটা। খটমট শব্দ তুলে আস্তে আস্তে বসে গেল নির্দিষ্ট জায়গায়।
দুসেকেন্ড পেরিয়ে গেল।
তারপর...
তারপর ফেসপ্লেটের ভিতরের আগুনটা আচমকা দপ করে জ্বলে উঠল কোন অদৃশ্য হাতের ইশারায়।
জ্বলে উঠল নেজার ম্যাণ্ডারের চোখজোড়া।
লাল।
রক্ত লাল।
নিঃশব্দে তলোয়ার তুলল বর্ম-প্রেতাত্মা।
ওটার চোখা প্রান্ত ঠেকাল কিশোরের বুকে।
এবার কিশোরকে কুচিকুচি করবে প্রেতাত্মা। কোনও সন্দেহ নেই।
শুধু কিশোরকে নয়, জিনাকেও।
সৈনিকের জ্বলজ্বলে চোখের দিকে সম্মোহিতের মত তাকিয়ে থাকল কিশোর।

সামান্য আগে বাড়ল সে। কিশোর টের পেল তলোয়ারের তীক্ষ্ণ ডগা ওর শার্ট ফুটো করে ত্বকে ঠেকেছে।
দম বন্ধ করে অপেক্ষা করছে ও। মূর্তির মত ওর পাশে দাঁড়িয়ে আছে জিনা।
জীবনের শেষ মুহূর্ত কটা গুনছে কিশোর। তলোয়ারে ওর বুক এফোঁড়-ওফোড় হবার অপেক্ষায় আছে।
নেজার তার ভারী মাথাটা ঘোরাল। শামুকের পিঙ্গল তরলের দলাটার দিকে তাকাল। আবার চোখ ফেরাল কিশোরের দিকে।
কে মেরেছে সালমিকে? প্রশ্নটা নেজারের বর্মের ভিতরে কয়েকবার প্রতিধ্বনিত হলো।
কিশোর জবাব দেয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু মুখ দিয়ে কথা বের হলো না।
জিনা ওকে ঠেলে সামনে এগিয়ে দিল।
কিশোর! বলল ও কিশোরের দিকে আঙুল তাক করে। এ মেরেছে সালমি বিন কাজেমকে। জাদুকরের জাদু তারই বিরুদ্ধে লাগিয়ে তাকে খুন করেছে ও।
সৈনিকের প্রেতাত্মা নড়ল না।
আতঙ্কভরা চোখে কিশোর-জিনা দেখল তার গনগনে চোখজোড়া ভাটার মত জ্বলজ্বল করছে।
সত্যি? প্রশ্ন করল সে।
হ্যাঁ, নিজেকে ফিরে পেয়ে বলল কিশোর। এ ছাড়া আর কিছু করার ছিল না আমার। প্রথমে ওই জাদুকর আমাকে একটা বেড়াল বানিয়ে ফেলতে চেয়েছিল, পরে সে স্ফুলিঙ্গ দিয়ে আমাকে খুন করার চেষ্টা করে। ওই স্ফুলিঙ্গ তার দিকে ফেরত পাঠাই আমি ওই সোনালি তলোয়ার দিয়ে।
কথা শেষ করে ইশারায় তলোয়ারটা দেখাল কিশোর। হাত দুটো মস্তিষ্কের নির্দেশ মানতে চাইছে না, থরথর করে কাঁপছে। আবার বলতে শুরু করল ও কাঁপা গলায়, স্ফুলিঙ্গ যখন জাদুকরকে আঘাত করে; তখন পিঙ্গল ধোঁয়ার মেঘে ঢাকা পড়ে যায় সে। তারপর... তারপর শামুক হয়ে যায়। বড়সড় পিঙ্গল একটা শামুক।
শামুক! শামুক হয়ে গেছে ব্যাটা! নেজার অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। দারুণ সাজা হয়েছে বদমাশটার! একদম উচিত সাজা হয়েছে।
জিনা আর কিশোর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে শুনছে নেজারের প্রেতাত্মার স্বগতোক্তি।
হাসছে নেজার। হেসেই চলেছে।
তার মুখাবরণের ভিতরের আগুন এখন আর আগের মত ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে না। হঠাৎ কিশোরের মনে হলো নেজার আসলে ভয়ঙ্কর নয়। মোটেই তেমন লাগছে না এখন তাকে।
এক হাঁটুতে ভর করে বসে পড়ল নেজার। মাথা নোয়াল কুর্নিশের ভঙ্গিতে।

তোমাকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, কিশোর পাশা!। নিজের অজান্তে বিস্মিত চোখে ঝলমলে হেলমেটটার দিকে তাকাল কিশোর।
জিনা প্রায় স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, শুনেছি আপনি ইতিহাসের জঘন্য এক চরিত্র। আপনাকে আমি ঘৃণা করি।
এখনও লোকটা তার তলোয়ার, ধরে আছে। তবে ওটার ডগা। মেঝেতে ঠেকে আছে। করো... যত খুশি ঘৃণা করো। তারপরেও কিশোরের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ।
কোনও চালাকি করছেন না তো? বিস্ময়ের ধাক্কা সামলে নিয়ে বলল জিনা।
এ না-সূচক মাথা নাড়াল সে। কিশোরের দিকে ফিরে বলল, আমাকে মাফ করে দিয়ো, কিশোর। প্রথমে তোমার গলায় লকেট দেখে আমি তোমাকেই সালমি বেন কাজেম মনে করেছিলাম। ভেবেছি ওই শয়তান জাদুকর আমাকে ধোকা দেয়ার জন্যে বাচ্চা ছেলের রূপ ধরেছে। এখন বুঝতে পারছি আমার ধারণা ভুল ছিল, ওই জাদুকরের সঙ্গে তোমার কোনও যোগাযোগ ছিল না। তুমি নির্দোষ। ইতিহাসের কথা বলছ? ইতিহাস বদলে দেয়ার ক্ষমতা। আমার নেই। থাকলে তা-ই দিতাম।
কনজারভেটরির চারদিকে চোখ বোলাল সে।
তোমরা কেউই আমার দুশমন নও। ওই জাদুকর ছাড়া। এখানকার সবাই আমার বন্ধু। এখনও তা-ই আছ।
আমি? নিজের বুকে বুড়ো আঙুল ঠেকাল জিনা। কিন্তু আমি আপনার বন্ধু হতে চাই না। চ হ্যাঁ, তুমি আমার বন্ধু।
নেজার উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল। মিস্টার পারকার বর্মটায় রোজ তেল দেয়া সত্ত্বেও জয়েন্টগুলোর জং এখনও পুরোপুরি যায়নি।
ক্যাঁচকোঁচ শব্দ উঠল। টলে উঠল নেজার। কিশোর তার দিকে এক হাত বাড়াল। কেন যেন মানুষটার জন্য সহানুভূতি হচ্ছে ওর।
আশ্চর্য!
এবার তার হাতটা আর শীতল লাগল না। কেন কে জানে!
সালমি নিশ্চয়ই উদ্ভট কোনও গল্প শুনিয়ে তোমাদের বিভ্রান্ত করেছে? আমি জানি কী হতে পারে সেই গল্প। বলে উঠে দাঁড়াল সে। সে তোমাদের বলেছে আমি পাজি, তা-ই না?
উপর-নীচ মাথা ঝাঁকাল জিনা।
সালমি একটা ঘৃণ্য পশু, নেজার সোজা কিশোরের দিকে চেয়ে আছে। আমি কখনও পাজি ছিলাম না। পাজি ছিল সালমি। আজ থেকে প্রায় তিনশো বছর আগের কথা। ব্রিটেনের রাজার আমল। আমি কাজেমের মেয়েকে ভালবাসতাম।

কিন্তু ব্যাপারটা মেনে নিতে পারেনি সে। কিছুতেই রাজি হলো না আমাদের বিয়েতে। তার ইচ্ছে ছিল মেয়েকে আমার চেয়ে অনেক ধনী, ক্ষমতাধর কারও সঙ্গে বিয়ে দেবে। একদিন তার সঙ্গে তর্কাতর্কি বেধে যায় আমার। এক পর্যায়ে আমি যখন তাকে বলি যে-কোন মূল্যে, আমি তার মেয়েকেই বিয়ে করব, তখন সে ভয়ানক খেপে যায় আমার ওপর। তার সঙ্গে হাতাহাতি শুরু হয় আমার। সুবিধে করতে না পেরে কী সব মন্ত্র পড়ে সে, এই বর্মের মধ্যে আমাকে বন্দি করে। তোমরা জানো না, কেউ জানে না, সেই আমলে ওর মত পাজি জাদুকর দুটো ছিল না। দুনিয়ায়। এখনও বেঁচে আছে ও, বুঝতেই পারছ তার জাদুর গুণ কত ভয়ঙ্কর। সাধারণ মানুষ জানত না তার কথা, গোপনে জাদুচর্চা করত সে। জাদুর বলে বেঁচে ছিল শতাব্দীর পর শতাব্দী। তার এই অস্বাভাবিক আয়ুর কথা লোকে যাতে জানতে না পারে, সেজন্য সত্তর-আশি বছর পরপর জায়গা বদলাত সে। যা হোক, সালমি আমাকে বর্মে বন্দি করার সময় জানায় আমি কেবল সেদিনই মুক্তি পেতে পারি, যেদিন আমি তাকে হারাতে পারব। কিন্তু হারাব কী করে? সে আমাকে বন্দি করে রাখে আমারই বাড়ির তলকুঠুরিতে। আমার বাড়ি তখন এই আমেরিকায়, মন্টানায়। এই বর্মের ভেতরে থেকে খিদে-তেষ্টায় মারা গেলাম আমি একদিন। তারপর ভূত হয়ে গেলাম। কিন্তু আমার বন্দিদশা ঘুচল না। আমার বন্দিত্ব ঘোচাবার একমাত্র উপায় আমার এই সোনালি তলোয়ার।

থেমে কয়েক মুহূর্ত ফ্লোরের দিকে চেয়ে রইল নেজার। চোখে ঘৃণা।

সালমি আমার তলোয়ার তার মার্বেলের মধ্যে লুকিয়ে ফেলে, ফের বলতে শুরু করল নেজার। লকেটটা আমার সঙ্গেই রেখে দেয়। কিন্তু ওটা ব্যবহার করার কোনও ক্ষমতা ছিল না আমার। আমি কিছুতেই লকেটের ভেতর থেকে আমার তলোয়ার বের করতে পারিনি। ওই তলোয়ার ছাড়া দিনকে দিন দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে গেলাম আমি। টের পেয়ে গেলাম, পারব না আর কোনওদিন জাদুকরকে হারাতে। আজ সেই অসাধ্য কাজ করলে তোমরা, কিশোর-জিনা, বলে থামল নেজার, জিনার দিকে তাকাল। কিছু মনে কোরো না তোমরা।

নেজার ম্যাণ্ডার হাসছে।

মুক্তির আনন্দে হাসছে।

তার হাসি জিনার সব ভয় দূর করে দিল। সহজ হয়ে উঠল ও।

কিশোরও সহজ হয়ে এল।

তোমাদের দুঃসাহসিকতার কারণেই অবশেষে আমি বর্মের কারাগার থেকে মুক্তি পেলাম। বর্মের এই কবর থেকে বেরোতে পারলাম। কিন্তু তার আগে...।

নেজার তার তলোয়ার কিশোরের দিকে ঘোরাল। হাতের ইশারায় ওকে কাছে ডাকল। কাছে এসো, কিশোর।

কিশোর! ওর কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করল জিনা। যেয়ো না। কাছে যাওয়া ঠিক হবে না। বলা যায় না, নতুন কোনও দুর্ঘটনা... সন্দেহের চোখে তাকিয়ে আছে ও বর্মটার দিকে।
কিন্তু কিশোরের মনে কোনও সন্দেহ নেই। আসল-নকল চিনতে ওর ভুল হয়নি আজ পর্যন্ত।
কিছু করবে না, ফিসফিস করে জিনার কানের কাছে বলল। কিশোর। ও প্রেতাত্মার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছে। কাজেই নির্দ্বিধায় এগিয়ে গিয়ে বর্মটার সামনে দাঁড়াল।
নেজার তার তলোয়ার ওঠাল। তারপর ধীরে ধীরে নামিয়ে আনল। প্রথমে কিশোরের ডান কাঁধে ছোঁয়াল, তারপর বাঁ কাঁধে।
আমি নেজার ম্যাণ্ডার কিশোরকে তার সৎসাহস ও দুর্দান্ত মনোবলের। জন্য একটি বিশেষ উপাধিতে ভূষিত করছি। আজ থেকে কিশোর... থেমে গেল সে। তারপর আবার বলল, আজ থেকে কিশোরের অন্য নাম–ভিক্টর।
ভিক্টর! ভুরু কোঁচকাল কিশোর।
অর্থ জানো তো? প্রশ্ন করল নেজার।
হ্যাঁ। শত্রু দমনকারী।
ঠিক। তুমি পৃথিবীর জঘন্যতম এক শত্রুকে দমন করেছ। ভিক্টর নামটা তাই তোমার প্রাপ্য। ধন্যবাদ, কিশোর–ভিক্টর।
নেজার সামান্য পিছাল। দুহাতে তলোয়ারটা সামনে ধরে রেখেছে। জিনার দিকে চাইল সে। বলল, বন্ধুরা, চিরকাল তোমাদের কথা মনে থাকবে। আসি, কেমন?
হঠাৎ কোত্থেকে হালকা নীল ধোঁয়া এসে ঘিরে ধরল নেজারকে। এ ধোঁয়া সালমি বেন কাজেমকে ঘিরে ধরা ধোঁয়ার মত উৎকট নয়। এ ধোঁয়া কোমল। ধোঁয়ার মেঘটা নেজারকে ঢেকে ফেলল গরম কম্বলের মত। কিশোর নেজারকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে শুনল।
পাঁচ সেকেণ্ড পর ধোঁয়ার মেঘ কেটে গেল। সেই সঙ্গে নেই হয়ে। গেল নেজার ম্যাণ্ডার।
এই হলো ঘটনা, পরদিন সকালে মিস্টার পারকারকে বলল কিশোর। বুঝতেই পারছেন ওই বর্ম আর কনজারভেটরি আমি ইচ্ছে। করে লণ্ডভণ্ড করিনি...
আর কৈফিয়ত দিতে হবে না তোমাকে, বললেন মিস্টার পারকার। আমি বুঝতে পারছি সব। সত্যিই দারুণ সাহসের পরিচয় দিয়েছ তুমি।
মিস্টার পারকার এক হাত রাখলেন কিশোরের কাঁধে।
কিশোরের পাশেই দাঁড়িয়ে আছে জিনা। মিস্টার পারকার ওর কাঁধে অন্য হাত রাখলেন। আমার মেয়েটাও কম সাহসী নয়, কী বলো, কিশোর?

মাথা দুলিয়ে সায় দিল কিশোর। আমার চেয়ে বেশি।
শয়তান এক জাদুকর কীভাবে আমাদের সবার চোখে ধুলো দিয়েছে! বললেন মিস্টার পারকার। দাঁড়াও, সিনিয়রকে হাতের কাছে পেয়ে নিই একবার। এমন বকা দেব। ও যদি বর্মটা না পাঠাত…
মিস্টার পারকার আছেন? দরজায় নক করে ডাক দিল কেউ।
মিস্টার পারকার, আমরা জি.আর.এম. ট্রাভেলস থেকে এসেছি।
কণ্ঠটা বেশ উত্তেজিত শোনাল।
ব্যাপার কী?
চকিতে মিস্টার পারকারের দিকে তাকাল জিনা। নার্ভাস দৃষ্টি।
মিস্টার পারকার মেয়ের দিকে তাকাল।
জিনা তাকাল কিশোরের দিকে।
পরক্ষণে দৌড় দিল দুজন পোর্কের উদ্দেশে।
কী ওটা? কফিনের মত প্রকাণ্ড একটা বাক্সের দিকে চেয়ে বলল কিশোর। আগন্তুক আর তার সহকারীরা ওটাকে ভ্যান থেকে নামিয়ে আনছে।
বাক্সটার সারা গায়ে অজস্র লাল স্ট্যাম্প। সব কটাতেই ছোট বড় করে লেখা- ভঙ্গুর।
ভ্যানের লোকেরা ধরাধরি করে বাক্সটা পোর্চে নিয়ে এল।
কোত্থেকে এল ওটা? দ্বিধার সাথে জিজ্ঞেস করল কিশোর।
জানি না, মিস্টার পারকার জবাব দিলেন। ভ্যানের লোকদের ধন্যবাদ জানালেন।
ভ্যানটা চলে যাওয়ার পর মিস্টার পারকার তাঁর ক্রোবার নিয়ে এলেন ভিতর থেকে।
বাক্সের পেরেকগুলো খুলে ডালা তুলে ফেললেন।
গোটা বাক্স টুকরো টুকরো প্যাকিং কাগজে ভরা।
নীচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। জিনা নার্ভাস কণ্ঠে বলল, এটার চেহারা তো বিশেষ সুবিধের মনে হচ্ছে না। ভেতরে হাত ঢোকালে না আবার আঁকড়ে ধরে!
আমারও খুব একটা সুবিধের ঠেকছে না, মিস্টার পারকার বললেন। যাই হোক, দেখি কী আছে ভেতরে। বলতে বলতে দুহাত ভিতরে ঢুকিয়ে দিলেন।
পাথরের মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কিশোর।
ভাবছে।
কী দেখতে হবে মিস্টার পারকার হাত বের করার পর?
কোনও হেলমেট, যার ভিতরে ধকধক করে জ্বলছে দুটো ভৌতিক চোখ? নাকি জাদুর কোন লকেট, যার ভিতরে ঘুরপাক খাচ্ছে নীল ধোঁয়া?
নাকি বড়সড় পিঙ্গল কোনও শামুক?

ভেবে পাচ্ছে না কিশোর।
সেকেণ্ড চারেক পর মিস্টার পারকার তার দুহাত বের করলেন। এক হাতে লম্বা, সাদা একটা খাম।
এটা আবার কী? কপাল কুঁচকে ওটা দেখলেন মিস্টার পারকার। খুলব? তোমরা কী বলো?
বললেন ঠিকই, তবে কিশোর বা জিনার জবাবের অপেক্ষা না করে ছিঁড়ে ফেললেন ওটার মুখ। ভিতর থেকে বের করে আনলেন একটা চিঠি। ভাজ খুললেন। মনে হচ্ছে আমাদের সিনিয়রের পাঠানো চিরকুট।
তা-ই নাকি? জিনা আগে বাড়ল। ব্যগ্র কণ্ঠে জানতে চাইল, কী লেখা আছে ওতে?
মিস্টার পারকার গলা খাকারি দিয়ে পড়তে শুরু করল:
প্রিয় হ্যারিসন
জিনিসটা পাঠালাম। ফোন দিতে পারতাম, কিন্তু চিঠির দামই অন্যরকম, তাই চিঠিই দিলাম। জিনিসটা পাঠাতে দেরি হয়ে গেল। এই বর্ম নিয়ে আজগুবি সব গল্প চালু রয়েছে। আমি জানি না সেসব সত্যি কি না। তবে যার কাছ থেকে বর্মটা কিনেছি, সে বলেছে ওটা নাকি আসলেই ভুতুড়ে। তবে এমন ভুতুড়ে কিন্তু নয়, যাতে তোমাদের বড় ধরনের দুর্ঘটনা বা কোনও ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে। মোট কথা, বর্মটা হয়তো ভুতুড়ে, কিন্তু বিপজ্জনক নয়। তোমাদের তো এমন একটা বর্মই দরকার, তা-ই না? কাজের চাপ কমলেই দেখতে আসব ভুতুড়ে জাদুঘর।
কিশোর ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল।
মিস্টার পারকার এবং জিনাও।
কিশোর বলল, ব্যাপার কিছু বুঝলেন, পারকার আঙ্কেল?
হ্যাঁ। সালমি ভালই খেল দেখিয়ে গেল। এখন পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে নেজার ম্যাণ্ডারের বর্ম আমার ভাই পাঠায়নি। ওর নাম-ঠিকানা ব্যবহার করে সে নিজেই… কতবড় দুঃসাহস!
কিন্তু কেন? জিনা প্রশ্ন করল। কেন সে এ কাজ করতে গেল?
কেন আবার। নিরিবিলিতে জানের দুশমনকে খতম করার। জন্যে। আমার জাদুঘরটাকেই বেছে নিয়েছিল সে কাজটা সারবে বলে।
চিঠিটা শেষ করো, জিনা বলল।
চিঠির শেষে বিশেষ দ্রষ্টব্যে লেখা রয়েছে:
জিনা-কিশোর, কফিনের ভেতর তোমাদের জন্যে বিশেষ জিনিস আছে।
জিনার চেহারা থেকে রক্ত সরে গেল। নির্ঘাত কোনও লকেট হবে! বলল কাঁপা গলায়।

তিনজোড়া হাত একযোগে ঢুকে গেল কফিনের ভিতর। সবাই ভাল করেই জানে, আর যা-ই হোক, কোনও লকেট অন্তত নেই ভিতরে।
দুহাতে কাগজ সরাতে লাগল সবাই।
একটা প্যাকেট ঠেকল কিশোরের হাতে। নরম।
বের করে আনল। ফিরোজা রঙের কাগজে মোড়ানো ওটা।
কিশোর-জিনার হৃৎপিণ্ড উত্তেজনায় লাফাতে শুরু করেছে।
কাগজটা ফড়ফড় করে ছিঁড়ে ফেলল কিশোর। সাদা কিছু একটা আছে প্যাকেটের ভিতর।
দুটো টি-শার্ট।
ওগুলো একে একে খুলে ফেলল কিশোর। ওগুলোর বুকে-পিঠে লেখা:
ভূত বিশেষজ্ঞ!

তিন গোয়েন্দা ভলিউম ১১৫/২ – ভূমিকম্প – শামসুদ্দীন নওয়াব – সেবা প্রকাশনী – প্রথম প্রকাশ : ২০১০

গরমের এক দিনে, পেনসিলভেনিয়ার ফ্রগ ক্রীকের বনভূমিতে রহস্যময় এক ট্রী হাউস উদয় হয়।

তিন গোয়েন্দা দড়ির মই বেয়ে ওঠে ওটায়। ওরা আবিষ্কার করে ট্রী-হাউসটা বই দিয়ে ভর্তি।

ওরা শীঘ্রি টের পায় ট্রী হাউসটা জাদুর। বইয়ে উল্লেখিত নানান জায়গায় ওদেরকে নিয়ে যেতে পারে। ওদেরকে শুধু কোন ছবিতে আঙুল রেখে সেখানে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করতে হয়।

এক সময় তিন বন্ধু জানতে পারে, ট্রী হাউসটার মালিক মরগ্যান লে ফে। রাজা আর্থারের ক্যামেট রাজ্যের এক জাদুকরী লাইব্রেরিয়ান সে। টাইম আর স্পেসে ভ্রমণ করে বই সংগ্রহ করার বাতিক তার।

মরগ্যান বলে, ক্যামেলটকে রক্ষার জন্য বিশেষ চারটি জিনিস খুঁজে বের করতে হবে। তাই এবারের অভিযানে বেরোচ্ছে কিশোর আর জিনা। তারপর...

বিছানায় উঠে বসল কিশোর। জানালা দিয়ে বাইরে চাইল।

আকাশ গাঢ় ধূসর। শীঘ্রি সূর্যোদয় হবে।

সময় হয়ে গেছে প্রায়, আপন মনে ফিসফিস করল ও।

গতকাল, জাদুর ট্রী হাউসে মরগ্যানের নোট বলেছিল, কালকে ভোরে চলে এসো।

বিছানা থেকে লাফিয়ে নামল কিশোর। জিন্স আর টি-শার্ট পরে নিল। এবার ব্যাকপ্যাক তুলে নিয়ে পা টিপে টিপে হল-এ বেরিয়ে এল।

জিনার কামরায় উঁকি দিল ও। জিনাকে দেখতে পেল না। সন্তর্পণে নীচে নেমে এসে বেরিয়ে পড়ল সদর দরজা দিয়ে।

বারান্দার সিঁড়ির ধাপে বসে ছিল জিনা। কিশোর ওর পাশে বসল।

কী করছ তুমি? প্রশ্ন করল।

পাখিদের গানের অপেক্ষা করছি, জানাল জিনা। তারপর তোমাকে ডাকতে যেতাম।

আকাশ গাঢ় ধূসর থেকে হালকা ধূসর হতে দেখল ওরা। পাখিরা এবার গান শুরু করল।

টুইট-টুইট, বলল জিনা।

টু শব্দটি না করে, কিশোর আর জিনা বারান্দা ছাড়ল। রাস্তা ধরে ফ্রগ ক্রীক উডসের দিকে চলেছে।

গাছ-গাছালির নীচে ঠাণ্ডা ভাব। বনভূমি ভেদ করে হন্তদন্ত হয়ে দড়ির মইটার উদ্দেশে চলল ওরা। সবচাইতে উঁচু ওক গাছটা থেকে ঝুলছে ওটা। আর গাছের

মাথায় জাদুর ট্রী হাউসটা।
ট্রী হাউসটাতে দড়ির মই বেয়ে উঠল ওরা। ভিতরটা অনালোকিত।
মেঝেতে পড়ে থাকা চিরকুটটা তুলে নিল জিনা। জানালার কাছে ধরে জোরে জোরে পড়ল:
প্রিয় কিশোর ও জিনা
ক্যামেলটের সামনে বিপদ, রাজ্য রক্ষার স্বার্থে
দয়া করে আমার লাইব্রেরির জন্য বিশেষ এই চারটি লেখা খুঁজে দাও:
সামথিং টু ফলো
সামথিং টু সেণ্ড
সামথিং টু লার্ন
সামথিং টু লেণ্ড
ধন্যবাদ
মরগ্যান
গভীর শ্বাস টানল কিশোর।
মরগ্যানের লাইব্রেরির জন্যে কেন এগুলো খুঁজে বের করতে হবে কে জানে, বলল কিশোর। ক্যামেলটকে এগুলো কীভাবে রক্ষা করবে?
জানি না, বলল জিনা। তবে রওনা হওয়া যাক, যাতে রহস্যটা ভেদ করা যায়। আমাদের রিসার্চ বইটা কোথায়?
ট্রী হাউসের চারধারে নজর বুলাল ও।
পেনসিলভেনিয়ার বইটা, ওদেরকে সব সময় যেটা বাড়ি ফিরিয়ে আনে, এক কোনায় পড়ে রয়েছে। ওটার পাশে আরেকটা বই। জিনা। তুলে নিল বইটা।
এটাই সেটা, মৃদু কণ্ঠে বলল। বইটার প্রচ্ছদ দেখাল কিশোরকে। ওতে লেখা:
স্যান ফ্রান্সিসকো, ক্যালিফোর্নিয়া, ১৯০৬
ক্যালিফোর্নিয়া? বলল কিশোর, ভাল!
বইটার প্রচ্ছদে আঙুল রাখল জিনা।
আমরা ওখানে যেতে চাই, বলল ও।
বাতাস বইতে শুরু করল।
ট্রী হাউসটা পাক খাচ্ছে।
বন-বন করে ঘুরছে।
এবার সব কিছু নিথর হয়ে গেল।
একদম স্থির।
সুন্দর ড্রেস, বলল জিনা।
কিশোর চোখ মেলল।

জিনার গায়ে সেইলর কলারওয়ালা নীল-সাদা পোশাক আর সাদা। স্টকিং।
কিশোরের পরনে হাঁটু অবধি বাদামী প্যান্ট, জ্যাকেট, ক্যাপ আর টাই। ওর ব্যাকপ্যাকটা এখন চামড়ার ব্যাগ হয়ে গেছে। দুজনের পায়েই শর্ট লেস-আপ বুট।
এক গির্জার ঘণ্টা বাজতে লাগল।
ঢং, ঢং, ঢং, ঢং, ঢং।
পাঁচবার বেজেছে, বলল কিশোর। তারমানে ভোর পাঁচটা।
হ্যাঁ, বলল জিনা। জানালা দিয়ে বাইরে চাইল।
কিশোরও তাকাল। ভোরের বাতাস তাজা আর ঠাণ্ডা।
এক পাহাড়ের নীচে এক গাছে নেমেছে ট্রী হাউসটা। নির্জন এক পাথর বিছানো রাস্তায় রঙ করা কাঠের বাড়ি-ঘর আর গ্যাস লাইটের সারি দেখা গেল। রাস্তার ট্র্যাক ধরে চলেছে এক ট্রলি কার, পাহাড়ের চূড়ায় বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।
দূরে উঁচু-উঁচু দালান। দালানগুলোর পিছনে সূর্য নীল আকাশে গোলাপী আভা ছড়িয়েছে।
দারুণ লাগছে, বলল জিনা।
হ্যাঁ, বলল কিশোর।
রিসার্চ বইটা বের করে পড়ল:
১৯০৬ সালের ১৮ এপ্রিল, বুধবার
স্যান ফ্রান্সিসকো ছিল মার্কিন
যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম উপকূলের সবচাইতে
বড় শহর। এখানে প্রায় পাঁচ লাখ মানুষ
বাস করত। দেশের অন্যতম তিলোত্তমা
নগরী ছিল এটি।
নোটবই বের করে তথ্যগুলো টুকে নিল কিশোর। ও লিখল:
স্যান ফ্রান্সিসকো-এপ্রিল ১৮, ১৯০৬
পশ্চিমের সবচাইতে বড় শহর
তিলোত্তমা।
চলো, যাই! অধৈর্য কণ্ঠে বলল জিনা।
কিশোর বইটার দিকে চাইল। ও আরও জানতে চায়।
পরে পোড়ো, বলল জিনা। কিশোরের কাছ থেকে বই আর নোটবইটা কেড়ে নিয়ে চামড়ার ব্যাগটায় রেখে দিল। আর সময় নষ্ট। করব না।
ট্রী হাউস ত্যাগ করল জিনা।
গবেষণা করলে সময় নষ্ট করা হয় না, গলা চড়িয়ে বলল কিশোর।

কিন্তু কাঁধে ব্যাগটা ঝুলিয়ে নিয়ে দড়ির মই বেয়ে ঠিকই অনুসরণ করল জিনাকে। দুজনেই ঘাসে নামার পর, কিশোর চারধারে দৃষ্টি বুলিয়ে নিল।
কোথায় যেতে চাও? প্রশ্ন করল ও।
যে কোনখানে! বলল জিনা। আশপাশটা ঘুরে দেখি এসো, টুরিস্টের মত।
ঠিক আছে, বলল কিশোর। কিন্তু ভুলে যেয়ো না মরগ্যানের জন্যে লেখাটা খুঁজে বের করতে হবে।
নুড়ি বিছানো রাস্তাটা ধরে পা চালাল ওরা। পাহাড়ী ঢাল বেয়ে উঠে যাচ্ছে, উঁচু দালানগুলোর মাথা ছাড়িয়ে সূর্য উঠল।
ভোরের প্রথম আলোয় সব কিছুতে সোনালী রং ধরল: পাথর, স্ট্রীটল্যাম্প এবং নীরব বাড়িগুলোর সমস্ত কাঁচের জানালায়।
কী চুপচাপ চারদিক, বলল জিনা।
হ্যাঁ, সবাই মনে হয় ঘুমাচ্ছে, বলল কিশোর।
হঠাৎই গুড়গুড় করে এক শব্দ উঠল।
কিশোর থমকে দাঁড়াল। জিনার হাত চেপে ধরেছে।
কীসের শব্দ? বলল ও।
আওয়াজটা জোরাল হলো। মনে হচ্ছে মাটির নীচ থেকে বাজের শব্দ আসছে।
মাটি কাঁপতে শুরু করল।
খেপাটে শব্দে বেজে চলেছে গির্জার ঘণ্টাগুলো।
গোটা রাস্তা কাঁপছে। মহাসাগরের ঢেউয়ের মত ভেসে যাচ্ছে নুড়িপাথরগুলো।
কী হচ্ছে এসব? চেঁচিয়ে উঠল জিনা।
ছাদ থেকে চিমনি খসে পড়ছে!
গ্যাসলাইট ছিটকে পড়ছে!
রাস্তায় চূর্ণ-বিচূর্ণ হচ্ছে ইঁট।
বসে পড়ে মাথা ঢাকো! চেঁচিয়ে উঠল কিশোর।
মাথায় হাত দিয়ে মাটিতে, গুটিসুটি মেরে বসে পড়ল কিশোর আর জিনা। চারপাশে গুড়-গুড়, ঠনঠন, মড়মড় শব্দ।
এবার দুনিয়া স্থির হলো। গুড়গুড় শব্দটা থেমেছে।
কিশোর আর জিনা মাথা তুলল। বাতাস ধুলোয় ভরা।
থেমেছে, বলল কিশোর।
মনে হয় ভূমিকম্প! বলল জিনা।
হ্যাঁ, সায় জানাল কিশোর।
তোমাকে জায়গাটা সম্পর্কে আরেকটু রিসার্চ করতে দিলে ভাল হত, বলল জিনা।
হুঁ, বলল কিশোর।

ধীরে সুস্থে উঠে দাঁড়াল ও দুপা টলছে। প্যান্ট ঝেড়ে নিতেই, গভীর গুড়গুড় শব্দটা আবারও শোনা গেল-এবার আগের চাইতেও জোরাল।
পরমুহূর্তে আরম্ভ হলো ভয়ঙ্কর ঝাঁকুনি। আগের চেয়ে জোরে।
কিশোর ছিটকে পড়ে গেল মাটিতে। রাস্তা দস্তুর মত দুলছে, কাঁপছে। শক্ত নুড়িপাথরে ঝাঁকি খাচ্ছে ওর দেহ।
জিনা! চেঁচাল ও।
উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করল কিন্তু পড়ে গেল আবারও। ধুলোময় বাতাস ভেদ করে দেখতে পেল, আকাশের পটভূমিতে এপাশ-ওপাশ দুলছে উঁচু-উঁচু বাড়িগুলো!
হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ছে ছাদ!
রাস্তার এমাথায়-ওমাথায় ইঁট, কাঁচ আর কংক্রিটের বৃষ্টি ঝরছে!
মনে হলো যেন দীর্ঘ সময় বাদে ভয়ঙ্কর শব্দ আর দুলুনিটা শেষমেশ থামল।
ধুলোর মেঘ পাক খাচ্ছে কিশোরকে ঘিরে। শ্বাস বন্ধ হয়ে আসার জোগাড়। দৃষ্টি চলে। তবে জিনার কাশির শব্দ শুনতে পাচ্ছে ও।
কিশোর ওকে ডাকার জন্য মুখ খুলল। কিন্তু গলা বুজে গেল ধুলোয়।
কিশোর! কাশির ফাঁকে নাম ধরে চেঁচাল জিনা। কিশোর!
আমি এখানে! বোজা কণ্ঠে বলল কিশোর।
বিপদে পড়ে গেছি, বলল জিনা।
উঠে বসতে চেষ্টা করল কিশোর। সারা গায়ে ব্যথা। কাপড় ছিঁড়ে গেছে। ধুলোয় মাখামাখি। ক্যাপটা উধাও।
কোথায় তুমি? চেঁচাল ও।
এখানে! বলল জিনা।
উঠে দাঁড়াতে গেল কিশোর। কিন্তু পড়ে গেল আবারও। পা জোড়া যেন রবার।
কো-কোথায়? পুনরাবৃত্তি করল ও। চারধারে নজর বুলাল। কিন্তু ঘন ধুলোর কুয়াশা ভেদ করে জিনাকে দেখতে পেল না।
মাটিতে পড়ে গেছি! বলল জিনা।
কণ্ঠস্বর অনুসরণ করে গুঁড়ি মেরে এগোল কিশোর।
কথা চালিয়ে যাও, বলল ও।
এখানে- কাশল জিনা- এখানে!
দুহাতে একটা পাথুরে তাক অনুভব করল কিশোর। রাস্তার বিশাল এক ফাটলের দিকে চোখ নামিয়ে চাইল। ধুলো ভেদ করে ওর ঠিক নীচে জিনাকে দেখতে পেল।
এই তো! কাশির দমকের ফাঁকে বলল জিনা।
আমি তোমাকে টেনে তুলব, ভয় পেয়ো না, বলল কিশোর।

জিনার দুহাত চেপে ধরল ও। ফাটলের ভিতর থেকে টেনে তুলতে চেষ্টা করল, কিন্তু জিনা যথেষ্ট ভারী।
পারছি না, বলল কিশোর।
আমি দাঁড়াতে পারি এমন কিছু একটা দাও, বলল জিনা। তা হলে হয়তো নিজেই বের হতে পারব।
কিশোর উঠে দাঁড়িয়ে টলতে টলতে সরে গেল ফাটলের কাছ থেকে। এক গাদা ইঁট জড় করল ও। এবার ফাটলের কাছে ফিরে গিয়ে একটা একটা করে ইঁট জিনাকে দিল।
জিনা সাবধানে একটার উপর একটা ইঁট সাজাল।
আরও লাগবে, বলল সে।
কিশোর দৌড়ে গেল আরও ইঁট জোগাড় করতে। ওর মনে আতঙ্ক, আরেকবার ভূমিকম্প হলেই ফাটলটা বন্ধ হয়ে যাবে-ভিতরে জিনাকে নিয়ে!
ইঁটগুলো জিনার হাতে দিল ও।
জলদি! জরুরী কণ্ঠে তাগিদ দিল।
জলদিই করছি, বলল জিনা।
মাজানো শেষ হলো জিনার। ইঁটের গাদার উপরে। দাঁড়াল ও। খালি হাত দুটো ব্যবহার করে ধীরে ধীরে টেনে তুলল নিজেকে।
কিশোর ওকে দাঁড়াতে সাহায্য করল। জিনার সারা দেহ ধুলোয় ঢাকা। স্টকিং ছিঁড়ে গেছে। চামড়া ছড়ে গেছে হাঁটুর।
লেগেছে? কিশোরের প্রশ্ন।
সামান্য চামড়া ছড়েছে শুধু, বলল জিনা। তুমি ঠিক আছ তো?
মাথাটা একটু কেমন কেমন লাগছে, বলল কিশোর। আসলে রীতিমত মাথা ঘুরছে ওর।
আমারও, বলল জিনা।
বিরাট ভূমিকম্প হয়ে গেল, বলল কিশোর। কাশল। গলা ধুলোয় বুজে গেছে।
জিনাও কাশল।
বইতে কী বলে? জিজ্ঞেস করল ও।
চামড়ার ব্যাগ থেকে গবেষণার বইটা টেনে বের করল কিশোর। হাত কাঁপছে ওর। পাতা উল্টাতে কষ্ট হচ্ছে।
আমার কাছে দাও, বলল জিনা। বইটা নিয়ে ভাঙা এক রাস্তার ছবি বের করল। জোরে জোরে পড়ল:
১৯০৬ সালের এপ্রিল মাসের ১৮ তারিখ, ভোর ৫:১৩ মিনিটে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের অন্যতম বড় ভূমিকম্পে ঘুম থেকে জেগে ওঠে স্যান ফ্রান্সিসকোর

নাগরিকরা। কেউ কেউ একে মহাকম্পন বলে।
একেবারে কাঁপিয়ে দিয়ে গেছে, বলল কিশোর।
মনে হয় অনেক লোক আহত হয়েছে, বলল জিনা।
চারধারে দৃষ্টি বুলাল ওরা। ধুলোময় বাতাস ভেদ করে, পড়ো পড়ো বাড়ি-ঘর ছেড়ে টলতে টলতে বেরিয়ে আসছে মানুষ-জন। সবার পা খালি, পরনে রাতপোশাক।
বাচ্চারা কাঁদছে। তবে আশ্চর্যজনক ব্যাপার হলো, বড়রা সব চুপ। ফাটা রাস্তা আর ভাঙা বাড়ি-ঘরের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে। তারা।
সবাই শকের মধ্যে আছে, বলল জিনা।
ওদের কেমন লাগছে চিন্তা করো, বলল কিশোর। চারদিকের ধ্বংসস্তূপ দেখে নিল ও। ইতিকর্তব্য ঠিক করে উঠতে পারছে না। স্বচ্ছ চিন্তা বাধা পাচ্ছে।
বইটার দিকে আবারও চাইল জিনা। পড়ল জোরে জোরে: ভূমিকম্পের ঠিক পরপরই ভাঙা চিমনি, চুলো আর প্রদীপ ভয়ানক অগ্নিকাণ্ডের সূচনা করে। আগুন।
জ্বলে প্রায় তিন দিন ধরে, প্রায় গোটা স্যান ফ্রান্সিসকো ধ্বংস হয়ে যায়। আটাশ হাজারের বেশি বাড়ি-ঘর পুড়ে যায়।
ভয়ঙ্কর, বলল কিশোর। দূরে, কালো ধোঁয়ার মেঘ আকাশে কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠেছে।
আগুন লেগেছে! বলল জিনা।
আমাদের চলে যাওয়া উচিত, ভয়ার্ত কণ্ঠে বলল কিশোর। আগুন ছড়িয়ে পড়ার আগেই এশহর ছাড়তে চায় ও।
মরগ্যানের লাইব্রেরির জন্যে তো লেখাটা এখনও জোগাড় হয়নি-সামথিং টু লেণ্ড।
খুঁজি এসো, বলল কিশোর।
ভগ্নস্তূপ ভেদ করে হাঁটা ধরল ওরা। ইঁটের গাদা, কংক্রিটের চাঙড়, আর ভাঙা কাঁচ মাড়িয়ে।
পড়ে থাকা প্রদীপ আর দোমড়ানো ট্রলি-কারের রাস্তা পেরিয়ে এল দুজনে।
বাড়ি-ঘর হেলে পড়েছে এক পাশে। লোক-জন রাস্তায় মাল-পত্র টেনে বের করছে।
এখন আমাদের মিশনের কথা ভুলে যাও, বলল জিনা। মানুষকে সাহায্য করতে হবে।
সাহায্য? কীভাবে? প্রশ্ন করল কিশোর। মাথার ভিতরটা ফাঁকা ফাঁকা লাগছে ওর।
এসো, বলল জিনা।

কিছু লোকের দিকে ইশারা করল ও। তারা পাগলের মত এক বিল্ডিং থেকে কটা থলে টেনে বের করে ঘোড়ায়-টানা এক ওয়াগনে তুলছে।
ওয়াগনটার কাছে দৌড়ে গেল জিনা।
কী করছেন আপনারা? জানতে চাইল।
ব্যাঙ্কের থলেগুলো বন্দরে নিয়ে যেতে চাইছি, বলল ওয়াগনের ড্রাইভার। যাতে নৌকায় করে এগুলো পার করা যায়।
কেন? প্রশ্ন করল কিশোর।
আগুনের হাত থেকে মানুষের টাকা-পয়সা বাঁচাতে হবে না? লোকটা বলল।
আকাশের দিকে তর্জনী তাক করল সে। ধোঁয়ার মেঘ ক্রমেই আরও বড় আর কালো হচ্ছে।
আমরা কি হেল্প করতে পারি? জিনার জিজ্ঞাসা।
কাজ হয়ে গেছে, জানাল ড্রাইভার। তোমরা এখুনি বাসায় চলে যাও। তারপর বাবা-মাকে নিয়ে শহর ছাড়ো।
কিশোরের ইচ্ছে হলো ওয়াগনে চেপে ও আর জিনাও বন্দরে যায়। তা হলে আগুনের কবল থেকে বাঁচতে পারত। কিন্তু দেখতে পেল ওয়াগনে ওদের জায়গা হবে না।
গুড লাক! বলল জিনা।
আমার কথাগুলো মনে রেখো কিন্তু! ড্রাইভার বলল। এবার সে আর তার ঘোড়াগুলো রওনা হয়ে গেল। ওয়াগনটা বড় রাস্তায় পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল পাহাড়ের ওপাশে।
বুঝতে পারছি না কাদেরকে হেল্প করব, বলল জিনা।
কিশোর গভীর শ্বাস টানল। তারপর নোটবই বের করে এলোমেলো হাতে লিখল:
ব্যাঙ্কের টাকা-ওয়াগনে করে বন্দরে-সেখান থেকে নৌকায় তুলে নিরাপদ জায়গায়।
অ্যাই, স্টোরিটা কী? এক মহিলা প্রশ্ন করল। তার কণ্ঠস্বরে জরুরী তাগিদ।
ঝট করে মুখ তুলে চাইল কিশোর।
এক লোক আর এক মহিলা ওদের সামনে দাঁড়িয়ে। মহিলার পরনে লম্বা পোশাক। হাতে নোটবই। লোকটির পরনে বুট। বড়সড় এক ক্যামেরা আর এক তেপায়া স্ট্যাণ্ড বইছে।
কীসের স্টোরি? জিজ্ঞেস করল জিনা।
ব্যাঙ্কের স্টোরিটা। আমার নাম লিণ্ডা। আমি একজন রিপোর্টার, জানাল মহিলাটি।
টেলিভিশনের? প্রশ্ন করল জিনা।

সেটা আবার কী? প্রশ্ন করল লিণ্ডা।
কিছু না, বলল কিশোর। ফিসফিস করে জিনাকে বলল, উনি খবরের কাগজের রিপোর্টার। টিভি এখনও আবিষ্কৃত হয়নি।
ও, আচ্ছা, বলল জিনা। বিব্রত।
ওয়াগনের ব্যাপারটা কী? লিণ্ডা জিজ্ঞেস করল কিশোর আর জিনাকে।
কিশোর ওর নোটবইটার দিকে চাইল।
বন্দরে নিয়ে গিয়ে টাকার থলেগুলো নৌকায় তুলে পাঠিয়ে দেবে, যাতে পুড়ে নষ্ট না হয়।
গুড রিপোর্টিং, বাছা! বলল মহিলা। জন ব্যাঙ্কের একটা ছবি নাও।
ফটোগ্রাফার স্ট্যাণ্ডের উপর ক্যামেরা রাখল। কালো এক পর্দার নীচে মাথা রেখে একটা ছবি তুলল।
নিয়েছি, জানাল।
ফটোগ্রাফার তার যন্ত্রপাতি গুছিয়ে নিচ্ছে, এসময় লিণ্ডা ঘুরে চাইল কিশোর আর জিনার দিকে।
বাড়ি গিয়ে বাবা-মাকে নিয়ে সরে পড়ো, বলল। আগুন ছড়িয়ে পড়ছে।
জানি, বলল জিনা, তিন দিন শেষে, আগুনে স্যান ফ্রান্সিস্কোর প্রায় গোটাটা পুড়ে যাবে।
লিণ্ডাকে কৌতূহলী দেখাল।
কীভাবে জানলে? জবাব চাইল।
আন্দাজে বলেছে, চটপট জানাল কিশোর।
ওর আন্দাজটা ভয়ঙ্কর, বলল লিণ্ডা। বাবা-মাকে বোলো ফেরি না। ধরতে। ফেরি বিল্ডিঙে মানুষের প্রচণ্ড ভিড়। গোল্ডেন গেট পার্কে চলে যাও।
পরামর্শের জন্যে ধন্যবাদ, বলল জিনা।
স্টোরির জন্যেও ধন্যবাদ, বলল লিণ্ডা। এবার সে আর জন দ্রুত পা চালাল।
কিশোর আর জিনা চারধারে নজর বুলাল।
অনেক লোক এখন বাড়ি ছেড়ে পালাচ্ছে। কেউ কেউ পাহাড় টপকে। কেউ বা আবার পাহাড় বেয়ে নেমে এসে।
এক বৃদ্ধা হাঁড়ি-পাতিল ভর্তি ঠেলাগাড়ি ঠেলে নিয়ে চলেছে। এক, মেয়ে বইছে এক সুটকেস ও একটা বিড়াল। এক ছেলের হাতে এক পাখির খাঁচা ও এক মাছের পাত্র দেখা গেল।
একেকজন একেক দিকে যাচ্ছে, বলল জিনা।
গোল্ডেন গেট পার্ক কোথায় কে জানে, বলল কিশোর। আমাদেরও মনে হয় ওখানে যাওয়া দরকার। দেখি তো বইতে কোন ম্যাপ আছে কিনা।

গবেষণার বইটা দেখে নিল কিশোর। স্যান ফ্রান্সিসকোর এক মানচিত্র খুঁজে পেল।
আমরা এখন কোথায়? জিজ্ঞেস করল ও।
স্ট্রীট সাইন খুঁজছে, এক লোককে এক গাদা বই বয়ে নিয়ে। বেরোতে দেখল সুদৃশ্য এক দালান থেকে। এক ঘোড়ায়-টানা ওয়াগনের পিছনদিকে বইগুলো রাখল সে।
কী করছে? কিশোরের প্রশ্ন।
মনে হয় বইগুলো বাঁচাচ্ছে, বলল জিনা।
বই বাঁচাচ্ছে? বলল কিশোর। মহর্তের জন্য নিজেদের নিরাপত্তার কথা বেমালুম ভুলে গেল ও। জলদি চলো, হেল্প করতে হবে!
কিশোর আর জিনা রাস্তা ধরে দৌড়ে গেল বইয়ের ওয়াগনটার কাছে। লোকটি সযত্নে ওয়াগনের পিছনে বইগুলো সাজিয়ে রাখছে। তার সারা শরীরে ধুলো। চশমার কাঁচ ফাটা।
আচ্ছা, স্টোরিটা কী? জিনা প্রশ্ন করল লোকটিকে।
কিশোর হেসে ফেলল। ঠিক খবরের কাগজের রিপোর্টারের মত শুনিয়েছে জিনার কথাগুলো।
দুপ্রাপ্য বইগুলো প্যাভিলিয়নে সরিয়ে নিচ্ছি, বলল লোকটি।
আমরা কি সাহায্য করতে পারি? কিশোরের জিজ্ঞাসা।
নিশ্চয়ই, দরজার পাশে আর অল্প কিছু বই আছে, বলল লোকটি।
ওগুলো নিয়ে এসো! জলদি! মার্কেট স্ট্রীটের আগুন শীঘ্রি এদিকে ছড়িয়ে পড়বে।
কিশোর আর জিনা এক দৌড়ে দালানটার ভিতরে ঢুকে পড়ল। দরজার কাছে বইয়ের ছোট দুটো স্তূপ।
কিশোর আর জিনা একটা করে গাদা তুলে নিল। বইগুলো প্রাচীন আর সুদৃশ্য। কোন কোনটার প্রচ্ছদ চকচকে সোনালী।
ওয়াও, ফিসফিস করে বলল কিশোর।
ও আর জিনা বইগুলো বয়ে নিয়ে গেল বাইরে।
সাবধানে, প্লিজ! বলল লোকটি। প্রত্যেকটা বই অমূল্য সম্পদ-প্রাচীন বাইবেল আর হাতে ছাপা বই।
লোকটা সাবধানী হাতে কিশোর আর জিনার বাহু থেকে বইগুলো নিয়ে ওয়াগনের পিছনে তুলে রাখল।
ধন্যবাদ, বলে হ্যাটটা পিছনদিকে ঠেলে দিল সে। এখুনি বাড়ি চলে যাও! আগুন শীঘ্রিই এখানে পৌঁছে যাবে!
ঘোড়াগুলো পাহাড় বেয়ে যখন উঠছে, জিনা হাত নেড়ে চেঁচিয়ে উঠল, গুড লাক!

লোকটা মনে হয় লাইব্রেরিয়ান, বলল কিশোর। গবেষণার বইটা খুলল ও। বাড়িটার একটা ছবি খুঁজে নিল।
এই যে, বলল। জোরে জোরে পড়ল: লোক-জন বিশেষ বিশেষ জিনিস রক্ষা করার চেষ্টা করে। কিন্তু সবক্ষেত্রে সফল হয়নি। লাইব্রেরির দুপ্রাপ্য বই সরিয়ে নেয়া হয় প্যাভিলিয়ন বিল্ডিঙে। প্যাভিলিয়ন বিল্ডিঙে আগুন ধরে গেলে, সব বই পুড়ে যায়। অথচ মূল বাড়ি, যেটিতে বইগুলো ছিল সেটি পোড়েনি।
হায়, হায়! চেঁচিয়ে উঠল কিশোর, দাঁড়ান, দাঁড়ান!
এ গবেষণার বইটা চেপে ধরে, ওয়াগনের পিছন পিছন দৌড় দিল। জিনাও দৌড়ল ওর সঙ্গে।
দাঁড়ান! দাঁড়ান! দুজনেই চেঁচাল। ভাঙা নুড়িপাথরের উপর দিয়ে যথাসম্ভব জোরে ছুটল ওরা। উঠে যাচ্ছে খাড়া পাহাড় বেয়ে।
চুড়োর কাছে পৌঁছে ড্রাইভার শেষমেশ শুনতে পেল। ওয়াগন দাঁড় করাল সে।
প্যাভিলিয়নে যাবেন না! চেঁচিয়ে বলল কিশোর।
যেখানে ছিল সেখানে ফেরত নিয়ে যান! বলল জিনা।
ওখানে থাকলে বইগুলো পুড়বে না! বলল কিশোর। শ্বাস ফিরে পেতে চাইছে। যে বিল্ডিঙে নিয়ে যেতে চাইছেন বরং সেটাই পুড়ে যাবে!
কিশোর আর জিনার দিকে এমনভাবে তাকাল ড্রাইভার, ওরা যেন বদ্ধ উন্মাদ।
তোমরা নিজেদের নিয়ে ভাবো, বই নিয়ে ভাবতে হবে না, বলল সে, বাসায় বাবা-মার কাছে চলে যাও। লাইব্রেরির ব্যবস্থা আমি করব।
এবার লাগাম আছড়ে পাহাড়-চুড়ো ধরে এগিয়ে চলল ওয়াগন নিয়ে।
দোহাই আপনার, ফিরে আসুন! চেঁচাল কিশোর।
ওরা অসহায় চোখে দেখল ঝাঁকুনি খেতে খেতে, জঞ্জালের উপর দিয়ে গড়িয়ে চলেছে ওয়াগনটা। পাহাড়ের নীচ থেকে ধোঁয়া পাকিয়ে উঠছে।
শুনল না! বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলল কিশোর।
আমরা তো যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলাম, পারিনি, বলল জিনা। আলতো হাতে কিশোরের কাধ স্পর্শ করল।
এতগুলো বই... হারিয়ে গেল কিশোরের কণ্ঠ।
অ্যাই, বলল জিনা, কে যেন ওদিকে কাঁদছে-সাথে দুটো বাচ্চা। আমরা হয়তো ওদেরকে হেল্প করতে পারব।
নীল বাথরোব পরা এক মহিলা বসে ভাঙাচোরা এক পাথুরে দেয়ালের উপর। রুমালে মুখ ঢেকে ফোঁপাচ্ছে।
কালোচুলো দুটি ছেলে মহিলার পাশে বসা। তাদের পরনে ধুলোমাখা, ছেঁড়া পাজামা। দুজনেই খালি পা। ছোট ছেলেটি বড় ছেলেটিকে চারকোনা এক কাঠের

উপর কয়লা দিয়ে লিখতে দেখছে।
জিনা কিশোরকে টেনে নিয়ে গেল পরিবারটির কাছে।
হাই, আমি জিনা, বলল ও।
ছেলে দুটি মুখ তুলে চাইল।
আমি পিটার, ছোটজন বলল। ও আমার ভাই অ্যাণ্ড। আর উনি আমাদের খালা মেরি। কথা বলার সময় ভাইকে আর খালাকে দেখিয়ে দিল।
মেরি খালা কান্নাভেজা চোখে হাসার চেষ্টা করলেন।
কিছু মনে কোরো না, বললেন তিনি, আমার ঘোরটা এখনও কাটেনি।
আমাদেরও, সহানুভূতির কণ্ঠে বলল জিনা।
বাড়িটায় আগুন লেগে যায়, বলল পিটার।
আমরা পালাতে পেরেছি, কিন্তু বেশিরভাগ জিনিস পুড়ে গেছে, বলল অ্যাঞ্জু।
এমনকী জুতোও, বলল পিটার।
কিশোর আর জিনা ছেলে দুটির পায়ের দিকে চাইল। কেটে গেছে, রক্তাক্ত।
আমার বুটজোড়া ছেলেদের বুটের মত, বলল জিনা। একজন এগুলো পরতে পারো।
আমারটাও নাও, বলল কিশোর। ও আর জিনা বুটের ফিতে খুলতে লাগল।
আমরা এমনি এমনি তোমাদের জুতো নিয়ে নিতে পারি না, বলল। অ্যাঞ্জু।
তা হলে ধার নাও, বলল কিশোর।
ছেলে দুটির হাতে জুতো তুলে দিল ওরা।
ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, বললেন মেরি খালা। আবারও কেঁদে ফেললেন।
ছেলে দুটি বুট পায়ে গলাল। এবার পিটার ফিসফিস করে অ্যাঞ্জুকে কী যেন বলল। অ্যাঞ্জু কাঠের টুকরোটা কিশোর আর জিনার দিকে বাড়িয়ে দিল।
তোমরা এটা ধার নিতে পারো, বলল ও।
কাঠের টুকরোয় লেখা দুভাইয়ের একটা কবিতা পড়ল কিশোর আর জিনাঃ
দেয়ার ইজ নো ওয়াটার
অ্যাণ্ড স্টিল লেস সোপ
উই হ্যাভ নো সিটি
বাট লটস অভ হোপ
ধন্যবাদ, বলল জিনা।
দারুণ উপহার এটা, বলল কিশোর। আমাদের মনে আশা জাগানো দরকার ছিল।
তোমাদেরকে ধার দেয়ার মত একমাত্র এটাই আছে আমাদের কাছে, বলল অ্যাঞ্জু।

ধার? বলে উঠল জিনা। কিশোরের দিকে চাইল। আরি, ওরা এইমাত্র আমাদেরকে বিশেষ লেখাটা দিল-সামথিং টু লেণ্ড!
মৃদু হাসি ফুটল কিশোরের মুখে। ওরা এখন বাড়ি ফিরে যেতে পারে।
আপনারা গোল্ডেন গেট পার্কে চলে যান-এক রিপোর্টার আমাদেরকে ওখানে যেতে বলেছে, ছেলে দুটি আর তাদের খালাকে বলল কিশোর।
তোমরা কি ওখানে যাচ্ছ? মেরি খালা জানতে চাইলেন। কান্না বন্ধ হয়েছে তার। মনে হচ্ছে মনের জোর ফিরে পেয়েছেন।
আমরা বাড়ি ফিরে যাব, বলল জিনা।
নিরাপদে ফিরতে পারবে তো? খালার প্রশ্ন।
সায় ফিরলেই আমরা নিরাপদ, বলল কিশোর।
বুট ধার দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ! বলল পিটার। তোমাদের কথা মনে থাকবে!
আমাদেরও মনে থাকবে! বলল জিনা।
তোমরা আমাদের কতটা সাহায্য করেছ নিজেরাও জান না, বলল কিশোর।
সাবধানে যেয়ো, মেরি খালা বললেন।
ঠিক আছে! বলল কিশোর। আপনি ভাববেন না।
পরিবারটি পার্কের দিকে এগোলে হাত নেড়ে বিদায় জানাল ওরা।
কিশোর দীর্ঘশ্বাস ফেলল।
রেডি? প্রশ্ন করল।
হ্যাঁ, জানাল জিনা। যেখান থেকে এসেছিলাম সেখানে ফিরে গেলেই হলো।
রাস্তার দিকে চাইল কিশোর। পাহাড়ের নীচ থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া উঠছে।
কাজটা অত সোজা হবে না, বলল কিশোর।
সাবধানে, বলল জিনা।
ভাঙা নুড়িপাথরের উপর মোজা পরা পা ফেলল ওরা। সতর্ক রইল যাতে কেটে না যায়।
পাহাড় বেয়ে নেমে চলল ওরা। পথে পুলিসদের দেখতে পেল। আহতদেরকে স্ট্রেচারে বইছে।
সৈনিকদের দেখল আগুন থেকে যারা বাঁচার চেষ্টা করছে তাদেরকে পথ নির্দেশ দিচ্ছে।
এক লোক রাস্তা দিয়ে একটা পিয়ানো ঠেলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। আরেক লোক একটার উপর একটা এভাবে এক গাদা হ্যাট পরেছে। এক মহিলা ব্যাগের মধ্যে তার তিনটে কুকুরছানা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে।
সবাই যার যার প্রিয় জিনিস সেভ করার চেষ্টা করছে, বলল জিনা।

সেই লাইব্রেরিয়ানের মত, বলল কিশোর। আর আমরা যেমন কবিতাটা সেভ করার চেষ্টা করছি। কাঠের টুকরোটা আঁকড়ে ধরল।
পাহাড় বেয়ে অর্ধেকটা নেমেছে, এসময় এক সৈনিক ঘোড়া ছুটিয়ে ওদের সামনে চলে এল।
রাস্তা থেকে সরে যাও! আমরা ডিনামাইট বসাচ্ছি! গর্জে উঠল সে।
ডিনামাইট? বলল কিশোর।
বলে কী! বলল জিনা।
মানুষ-জন দিগ্বিদিক ছোটাছুটি শুরু করল। কিশোর আর জিনা মরিয়ার মত চারপাশে নজর বুলাল একটা নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য। এক অলিপথ দেখতে পেল কিশোর।
ওখানে চলো! বলল ও।
এক দৌড়ে অলিপথটায় ঢুকে মাটিতে গুটিসুটি মেরে বসল ওরা।
কিশোর ব্যাগে হাত ভরে দিল গবেষণার বইটার জন্য। ইনডেক্সে ডিনাইমাইট শব্দটা খুঁজে পেল। এবার সঠিক পৃষ্ঠা নম্বর বের করে পড়ল:
আগুন ধরে যাওয়ার পরে মেয়রের মাথায়
একটা আইডিয়া আসে। তার মনে হয়
কিছু বাড়ি যদি ধসিয়ে দেয়া যায়
তবে একটি কাঠের ছাদ থেকে অপর
কাঠের ছাদে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়াতে
পারবে না। ডিনামাইট দিয়ে তিনি কিছু
বাড়ি উড়িয়ে দেয়ার নির্দেশ দেন।
তার পরিকল্পনা কাজ করেনি, আগুন
ছড়িয়ে পড়ে বাড়ি থেকে বাড়িতে, রাস্তা
থেকে রাস্তায়।
ভয়ঙ্কর ব্যাপার, মনে মনে বলল কিশোর।
ও বইটা সরিয়ে রাখতে না রাখতেই বিকট শব্দে ডিনামাইট ফাটল।
ধুলো-মাটি উড়ছে চারদিকে। এমনকী অলিপথটিতেও।
এক হাতে কাঠের টুকরোটা চেপে ধরে থাকল কিশোর।
অপর হাতে চোখ ঢাকল। একই কাজ করল জিনাও।
আরেকটা প্রচণ্ড শব্দে মাটি কেঁপে উঠল।
কিশোর মুখে মাটির স্বাদ পেল। জিনার দিকে চাইল সে। আপাদমস্তক ধুলোয় ধূসরিত ও। নিজের দিকে চোখ নামিয়ে চাইল। কিশোর। ওর অবস্থাও জিনার মত।

ওদের দুজনকে দেখো! কেউ বলে উঠল। একটা স্টোরি পাওয়া গেছে!
মুখ তুলে চাইল কিশোর। খবরের কাগজের রিপোর্টার লিণ্ডা আর ফটোগ্রাফার জন ওদের সামনে দাঁড়িয়ে।
সারা গায়ে ধুলো-মাটি, তারপরও ক্যামেরা সেট আপ করছে জন। আর লিণ্ডা তার নোট বইতে কী সব টুকছে।
কাঠের টুকরোটা তুলে ধরো, বাছা, বলল লিণ্ডা।
হতভম্ব কিশোর মুখে কিছু বলল না, আশা জাগানিয়া কবিতাটা তুলে ধরল।
জন ছবি নিল।
আরেকটা ডিনামাইটের শব্দ মাটি কাঁপিয়ে দিল।
আমাদের সাথে চলো। আমরা পার্কের দিকে যাচ্ছি! বলল লিণ্ডা।
আপনারা যান, আমরা বাসায় যাব, বলল জিনা।
চলো, জন! তোমরা সাবধানে যেয়ো! বলল লিণ্ডা। পালাই চলো!
ফটোগ্রাফারের যন্ত্রপাতি নেয়া হয়ে গেলেই ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দিল। ওরা।
মনে হয় ওরা আমাদেরকে চিনতে পারেনি, বলল জিনা।
আমরাই কি নিজেদের চিনতে পারছি? বলল কিশোর।
আরেকটা বিস্ফোরণের শব্দে মাটি কেঁপে উঠল।
পালাই চলো! বলল জিনা।
লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল ওরা দুজন। ব্যাগের ভিতরে কবিতাটা ঢুকিয়ে রাখল কিশোর। এবার আবার পাহাড় বেয়ে নামতে লাগল।
কিশোর আর জিনা নুড়ি পাথরের উপর দিয়ে দৌড় দিল। ডিনামাইটের কানে তালা লাগানো শব্দ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে ওদের পিছনে।
পাহাড় বেয়ে নেমে আসছে ওরা। আগুনের শিখা ছিটকে ছিটকে যাচ্ছে এক ছাদ থেকে অন্য ছাদে।
আমরা সোজা আগুনঝড়ের দিকে যাচ্ছি, শোরগোল ছাপিয়ে শোনা গেল কিশোরের কণ্ঠস্বর।
যেতেই হবে, এ ছাড়া উপায় নেই, পাল্টা চেঁচাল জিনা। দেরি। করলে ট্রীহাউসে আগুন ধরে যাবে!
পাহাড়ের নীচে, রাস্তা ধরে ভেসে যাচ্ছে ঘন ধোঁয়ার মেঘ। চোখ জ্বালা করছে কিশোরের।
ট্রী হাউসটা কোথায়? চিৎকার করল ও।
এখানে! বলল জিনা।
কিশোর ওকে অনুসরণ করল।
দড়ির মইতে হাত রেখে দাঁড়িয়ে জিনা।

এখনও এখানে আছে! স্বস্তির শ্বাস ফেলল কিশোর।
কেন থাকবে না। আমাদেরকে না নিয়ে ট্রী হাউস যায় কখনও? বলল জিনা। তুমি–
ওঠো! ওঠো! তাগাদা দিল কিশোর।
দড়ির মই বেয়ে উঠতে লাগল জিনা। ওকে অনুগমন করল। কিশোর। ট্রী হাউসে উঠে জানালা দিয়ে বাইরে চাইল ওরা।
চারধারে বাড়িগুলো সব জ্বলছে। কালো ধোঁয়া যেন গিলে খাবে শহরটাকে।
শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে কিশোরের। গলা পুড়ে যাচ্ছে। চোখ জ্বালা করছে।
জিনা পেনসিলভেনিয়ার বইটা চেপে ধরল। ফ্রগ ক্রীকের ছবিটা বের করে তাতে আঙুল রাখল।
আমরা ওখানে যেতে চাই, বলল ও। গুড লাক, স্যান ফ্রান্সিসকো!
গুড বাই, স্যান ফ্রান্সিসকো! বলল কিশোর। বাতাস বইতে শুরু করল। ঘুরতে আরম্ভ করেছে ট্রী হাউস। বন-বন করে ঘুরছে। এবার সব কিছু স্থির হয়ে গেল। একদম নিথর।
ভোরের পাখির গানে মুখরিত বনভূমি।
কিশোর চোখ মেলে দীর্ঘশ্বাস ফেলল।
ফ্রগ ক্রীকে ফিরে এসেছে ওরা। আবার বুক ভরে শ্বাস নিতে পারছে। এখন আর চোখ জ্বালা করছে না। ওর পরনে নিজের পোশাক, পায়ে নিজের স্নিকার্স।
ভাবছি ওদের ভাগ্যে কী ঘটেছিল, উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল জিনা। অ্যাঞ্জু, পিটার আর ওদের খালা, লিণ্ডা আর জন এবং অন্যান্যদের।
কিশোর ওদের গবেষণার বইটা বের করল। পাতা উল্টে শেষ অধ্যায়ে চলে এল। জোরে জোরে পড়ল:
ভূমিকম্পের পর আগুন নেভানো হয়। সারা পৃথিবী
থেকে ত্রাণ পাঠানো হয় স্যান ফ্রান্সিসকোতে। সাহসী
নগরবাসী হাল ছাড়েনি। অনেকে এখুনি
পুনর্নির্মাণ করি এসো লেখা ব্যাজ পরেছিল। দশ
বছরের কম সময়ে স্যান ফ্রান্সিসকো আবার
যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম তিলোত্তমা নগরীতে পরিণত হয়।
যাক, বাবা, স্বস্তির শ্বাস ছেড়ে বলল জিনা। কবিতাটা আছে তো?
প্যাকে হাত ভরে দিল কিশোর। পিটার আর অ্যাঞ্জুর কবিতাটা বের করে আনল। মেঝের উপর রাখল ওটা।
এখন কী হবে? প্রশ্ন করল জিনা।
আচমকা একটা গর্জন শোনা গেল। উজ্জ্বল এক আলো ঝলসে গেল ট্রী হাউসে।

মুখ ঢাকল কিশোর। আঙুলের উপর দিয়ে উঁকি দিতেই, মরগ্যান লে। ফে-কে দেখতে পেল।
মরগ্যান! কিশোর আর জিনা উৎফুল্ল কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল। দুজনেই জড়িয়ে ধরল মরগ্যানকে। মরগ্যানও ওদেরকে আলিঙ্গন করল। আপনার লাইব্রেরির জন্যে লেখা নিয়ে এসেছি! বলল কিশোর। কাঠের টুকরোটা তুলে ধরল জিনা।
এই যে! বলল।
এগিয়ে দিল মরগ্যানের দিকে। কিন্তু মরগ্যান একটা হাত ওঠাল।
আমাকে দিয়ো না, বলল সে। আরেকজনের এগুলো বেশি। দরকার।
হঠাৎই চোখ ধাঁধানো আলো ঝলসে গেল ট্রী হাউসের ভিতর দিয়ে। প্রচণ্ড এক গর্জন উঠল, তারপর নীরবতা।
কিশোর আর জিনা যখন চোখ মেলল, ওরা তখন আর জাদুর ট্র হাউসে নেই।
তার বদলে বিশাল এক ছায়াময় কামরায় দাঁড়িয়ে। ঘরে চমৎকার এক সুগন্ধ-চামড়া, বই আর কাঠ-পোড়া আগুনের।
পেল্লায় এক পাথুরে চুলায় ফট-ফট শব্দে ফাটছে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। দেয়ালগুলোতে সারি সারি লম্বা বইয়ের তাক-বই ভর্তি।
আমার লাইব্রেরিতে স্বাগতম, মৃদু কণ্ঠে বলল মরগ্যান।
বাব্বা, ফিসফিস করে বলল কিশোর। দারুণ তো!
একজন তোমাদের জন্যে অপেক্ষায় আছেন, বলল মরগ্যান।
আমি তাকে বলেছি শীঘি দুজন বিশেষ দূত এসে পৌঁছবে।
কোথায় তিনি? জিনার প্রশ্ন।
মরগ্যান আঙুল তাক করল। গাঢ় নীল পোশাক পরা এক লোক লাইব্রেরির এক কোনায় চেয়ারে বসে। মাথা নোয়ানো তার। কাঁচা পাকা চুল।
ক্লান্ত মনে হচ্ছে, ফিসফিস করে বলল জিনা।
হ্যাঁ, উনি এবং ওঁর নাইটরা পরাজিত হয়েছেন, শান্ত কণ্ঠে বলল মরগ্যান। উনি রাজ্য রক্ষার আশা ছেড়ে দিয়েছেন।
আমরা ওঁকে কীভাবে সাহায্য করতে পারি? জিনার প্রশ্ন।
কিশোরের হাতে ধরা বিশেষ লেখাটির দিকে চোখ নামিয়ে চাইল। মরগ্যান।
এটা দেখালে কাজ হবে? কিশোর জানতে চাইল।
স্মিত হাসল মরগ্যান।
যাও, দেখাও ওঁকে! বলল জিনা।
ওরা কামরাটা পার হয়ে ক্লান্ত মানুষটির সামনে নতজানু হয়ে বসল।
মাফ করবেন, বলল জিনা।
মানুষটি চোখ তুলে চাইলেন। ধূসর চোখের মণিতে বিষণ্ন দৃষ্টি।

আমরা মরগ্যানের দূত। আমরা সাহায্য করতে এসেছি, জানাল কিশোর।
মাথা নাড়লেন মানুষটি।
বুঝতে পারছি না, গভীর, ক্লান্ত স্বরে বললেন তিনি, তোমাদের মত বাচ্চামানুষরা কীভাবে সাহায্য করতে পারে!
কখনও কখনও ছোটরাও অনেক কাজে আসে, বলল জিনা।
কিশোর আর আমি আহত সৈনিকদের সাহায্য করেছি।
আমরা ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদেরও সাহায্য করেছি, যোগ করল কিশোর।
মানুষটি খানিকটা সোজা হয়ে বসলেন।
বাহ, চমৎকার, সপ্রশংস কণ্ঠে বললেন।
কীভাবে করেছি আপনাকে জানাতে চাই, বলল জিনা। গৃহযুদ্ধের সেই তালিকাটা তুলে ধরে দেখাল। আহতদেরকে কীভাবে সাহায্য করতে হয় তা এখানে আছে।
এবার কিশোর স্যান ফ্রান্সিসকো ভূমিকম্পের সময় পাওয়া কাঠের টুকরোটা তুলে ধরল।
এতে বলছে সব হারানোর পরও আশা টিকে থাকে, বলল ও।
বিশেষ লেখা দুটি এক ঝলক দেখে নিলেন মানুষটি। এবার অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে কিশোর আর জিনার দিকে চাইলেন।
এগুলো আমার কাছে নিয়ে আসার জন্যে ধন্যবাদ, বললেন তিনি। তোমরা কি জাদু জানো?
না, না, বলে উঠল জিনা। মরগ্যান জাদু জানে। আমরা সাধারণ ছেলে-মেয়ে।
মানুষটি মৃদু হাসলেন। তাঁকে এখন আগের চাইতে কম ক্লান্ত আর বিষণ্ন দেখাচ্ছে।
আর আমি সাধারণ এক রাজা, মৃদু কণ্ঠে বললেন। দুটো সাধারণ ছেলে-মেয়ে যদি সাহস আর আশা খুঁজে পেতে পারে, তা হলে একজন সাধারণ রাজারও তা পাওয়া উচিত।
ধীরেসুস্থে উঠে দাঁড়ালেন তিনি।
যাই নাইটদের সাথে কথা বলিগে, বললেন। তোমাদের আনা জ্ঞানের কথা ওদেরকে জানাই।
আলখিল্লা জড়িয়ে নিয়ে কিশোর আর জিনার উদ্দেশে বাউ করলেন।
ধন্যবাদ, বললেন। এবার দৃপ্তপায়ে, বেরিয়ে গেলেন মরগ্যানের লাইব্রেরি ছেড়ে।
হ্যাঁ, ধন্যবাদ, বলে ওদের দিকে এগিয়ে এল মরগ্যান।
ইউ আর ওয়েলকাম, বলল ওরা।
এগুলো আপনার লাইব্রেরির জন্যে, বলল কিশোর। বিশেষ লেখাগুলো তুলে দিল মরগ্যানের হাতে।
মরগ্যান স্মিত হাসল।

এখানে যে সব পাঠক আসবে এগুলো তাদের কাজে লাগবে, বলল।
খুব ভাল, বলল জিনা। না, তোমাদের বাড়ি ফেরার সময় হলো, বলল মরগ্যান।
কিশোর মরগ্যানের লাইব্রেরির চারধারে নজর বুলাল। ওর যেতে মন চাইছে না। এত সুন্দর কামরা ও এর আগে দেখেনি।
চিন্তা নেই, তোমরা আবার ফিরে আসতে পারবে, বলল মরগ্যান, ওর মনোভাব বুঝতে পেরেছে। তোমরা অবশ্যই আসবে, কারণ তোমাদের জন্যেই ক্যামেলট রক্ষা পেয়েছে। আপাতত বিদায়।
কিশোর আর জিনা মুখ খুলতে পারার আগেই, আরেকটি চোখ ধাঁধানো আলোর ঝলকানি দেখা গেল।
এবার ওরা পৌঁছে গেল ট্রী হাউসে, ফ্রগ ক্রীক বনভূমিতে-ভোর বেলায়।
বিশ্বাসই হচ্ছে না আমরা মরগ্যানের লাইব্রেরি থেকে ঘুরে এসেছি, বলল জিনা।
কিশোর মৃদু হেসে মাথা ঝাঁকাল।
অবিশ্বাস্য না? বলল জিনা।
হ্যাঁ, বলল কিশোর।
এসময় দমকা হাওয়া প্রবেশ করল ট্রী হাউসের জানালা দিয়ে। ফলে, স্যান ফ্রান্সিসকো নিয়ে লেখা ওদের গবেষণার বইটা খুলে গেল। জিনা বইটার দিকে হাত বাড়াল।
কিশোর! বলল সে। এটা দেখো!
বইটার এক ফটোগ্রাফে আঙুল রাখল। ওটায় দেখা গেল ধুলোয় মাখামাখি এক ছেলে ও এক মেয়েকে। ছেলেটির হাতে এক টুকরো কাঠ। আশা জাগানিয়া সেই কবিতাটি।
জিনা ক্যাপশনটা পড়ে শোনাল:
ভূমিকম্পের পরে, গোটা শহর যখন গ্রাস করে
নিচ্ছে আগুন, তখন দুটি সাহসী ছেলে-মেয়ে
অন্যদের মনে আশা জাগানোর চেষ্টা করে।
হেসে উঠল জিনা।
আমাদের কথা লিখেছে! বলল ও। আমরা স্যান ফ্রান্সিসকো ছেড়ে আসার আগে জন এই ছবিটা নেয়।
কিশোর হেসে উঠে মাথা ঝাঁকাল। বিস্মিত।
বইটা বন্ধ করল জিনা।
আমরা রাজা আর্থারকেও আশা দেয়ার চেষ্টা করেছি, বলল কিশোর। তাই না?
রাজা আর্থার? জিনার প্রশ্ন।

হ্যাঁ, বলল কিশোর। ব্যাক-প্যাক পিঠে নিয়ে দড়ির মই বেয়ে নামতে লাগল। ওটাই মরগ্যানের লাইব্রেরির রহস্য। ক্যামেলটকে রক্ষার জন্যে রাজা আর্থারকে আশা আর সাহস দেয়ার দরকার ছিল, আমরা সেটা দিয়েছি।
উনি রাজা আর্থার নন,বলল জিনা। কিশোরকে অনুসরণ করল।
অবশ্যই রাজা আর্থার, বলে মাটিতে পা রাখল কিশোর। উনি বললেন শোননি উনি একজন সাধারণ রাজা?
কিন্তু রাজা আর্থার তো কোন সাধারণ রাজা নন।
উনি তেমনটাই ভাবেন। আমি জানি উনিই রাজা আর্থার, বলল কিশোর।
স্মিত হাসল ও। বনভূমি ভেদ করে পা চালাল।
জিনা ওকে অনুসরণ করল।
রাজা আর্থার!
পাখির গানে ভোরের বনভূমি ভরপুর, জিনা মরগ্যানের লাইব্রেরিতে ওদের বেড়াতে যাওয়ার কথা ভাবল। বিষাদগ্রস্ত রাজার কথা মনে পড়ল ওর এবং কীভাবে ওদের জোগাড় করা লেখাগুলো তাকে সাহস জুগিয়েছে।
কিশোর মনে হয় ঠিকই বলেছে। ওরা সত্যিই হয়তো ক্যামেলটকে রক্ষায় সাহায্য করেছে রাজা আর্থারকে। আবার কোনদিন হয়তো ওরা
ওখানে ফিরে যাবে।
জলদি চলো! চেঁচিয়ে ডাকল কিশোর। আঙ্কল-আন্টি জেগে ওঠার আগেই।
আসছি! পাল্টা চেঁচাল জিনা। দৌড় দিল কিশোরের পিছু পিছু।
***

তিন গোয়েন্দা ভলিউম ১১৬/২ – আঁধারে কে – শামসুদ্দীন নওয়াব – সেবা প্রকাশনী – প্রথম প্রকাশ : ২০১০

‘খবরটা শুনেছ?’ ডানা প্রশ্ন করল কিশোর, রবিন আর মুসাকে। ওরা চার বন্ধু ওক গাছের নীচে দাঁড়িয়ে, স্কুলের ঘণ্টা পড়ার অপেক্ষা করছে।

‘কী খবর?’ প্রশ্ন করল কিশোর। চিড়িয়াখানার ওরা কি মত পাল্টেছে? বাঁদরের বদলে খাঁচায় তোমাকে রাখবে ঠিক করেছে?’

কিশোরের দিকে জ্বলন্ত চোখে চাইল ডানা।

‘না,’ বলল ও। ‘তোমরা মনে হয় জানো না, আমরা নতুন একজন টিচার পাচ্ছি।’

হাততালি দিয়ে উঠল কিশোর।

‘দারুণ খবর! তারমানে আমরা মিসেস হকিন্সের হাত থেকে বাঁচছি!’

মিসেস হকিন্স ওদের ফোর্থ গ্রেডের টিচার। ভয়ানক কড়া। এক হানাবাড়িতে থাকেন তিনি। কথা বলেন বিজাতীয় উচ্চারণে। বেশিরভাগ ছেলে-মেয়েদের ধারণা ভদ্রমহিলা ভ্যাম্পায়ার।

‘দাঁড়াও,’ বলে কিশোরের বাহু চেপে ধরল মুসা। ‘এত খুশি হয়ো না। আমরা একজন স্টুডেণ্ট টিচার পাচ্ছি। মিসেস হকিন্স ঠিকই বহাল থাকছেন। ‘

ফাটা বেলুনের মত চুপসে গেল কিশোর।

‘এভাবে আমাকে হতাশ করলে?

ওর পিঠ চাপড়ে দিল রবিন।

‘আমি শিয়োর এই স্টুডেণ্ট টিচার নরম ধরনের মানুষ হবেন।’

‘সন্দেহ আছে,’ বলল কিশোর। ‘মিসেস হকিন্সের যে কোন স্টুডেণ্ট টিচারই আজব কিসিমের হতে বাধ্য।’

ঘণ্টা বাজলে আর তর্ক করার সুযোগ পেল না রবিন। ওরা চারজন ক্লাসরুমের উদ্দেশে চলল। কিশোর ওর ডেস্কের ভিতরে একটা পেন্সিল রাখল। মুখ যখন তুলল তখন চোখে পড়ল শুধু কালো আর কালো।

কিশোরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটি শুধু লম্বা নয়। তার বিশাল কাঁধ যেন তিনটে স্কুল ডেস্কের সমান চওড়া। গলাটা এতটাই মোটা শার্টের বোতাম লাগানো যায়নি। লোকটির পরনে কালো শার্ট, কালো টাই আর কালো প্যান্ট। এক কান থেকে ঝুলছে কালো এক দুল। লোকটি কিশোরের দিকে এক ঝলক নজর বুলিয়ে ভ্রূ কুঁচকাল।

‘হাই,’ ককিয়ে উঠে বলল কিশোর।

‘কোন কথা নয়,’ গর্জে উঠল লোকটি। ‘আমি মিস্টার বগি, তোমাদের নতুন স্টুডেণ্ট টিচার। কোন ইয়ার্কি চলবে না। বই বের করে পড়তে শুরু করো। কালকে রিপোর্ট দিতে হবে।’

ডেস্ক থেকে একটা বই তুলে নিল কিশোর। বইয়ের উপর দিয়ে উঁকি মেরে দেখল মি. বগি কামরাময় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ওদের নিয়মিত টিচার মিসেস হকিন্সের দেখা নেই। ক্লাসরুমের প্রতিটি ছেলে-মেয়ে নিঃশব্দে পড়ে চলেছে।
'অ্যাই,' রবিনের উদ্দেশে বলল কিশোর। 'এই লোকের ব্যাপারটা কী বলো তো?'
রবিন শ্রাগ করল।
'চুপ করো,' সতর্ক করল।
কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। কিশোরের ডেস্কের পাশে এসে ওর দিকে মোটা এক আঙুল তাক করলেন মি. বগি।
'সাবধান,' বললেন তিনি। 'পড়া না করলে খবর আছে।'
মি. বগির শরীরে মাংসপেশীগুলো কিলবিল করে উঠলে ঢোক গিলল কিশোর। কিন্তু দমল না ও। স্টুডেন্ট টিচাররা তো আর সত্যিকারের টিচার নন। ডেস্কে রাখা বইটার দিকে চকিতে চাইল কিশোর। এরোপ্লেন নিয়ে লেখা ওটা। এ বিষয়ে পড়ার আগ্রহ নেই কিশোরের, কিন্তু কাগজের বিমান বানালে মন্দ হয় না।
কিশোর ফট করে বইটা বন্ধ করে নোটবই থেকে একটা কাগজ ছিঁড়ল। এবার ভাঁজ করতে লাগল। ও কাগজ ভাঁজ করতে এতটাই ব্যস্ত ছিল, লক্ষই করল না মি. বগি ওর দিকে চেয়ে রয়েছেন। ভ্রূ কুঁচকে উঠছে তাঁর।
'কী হয়েছে তোমার?' পরদিন সকালে কিশোরকে জিজ্ঞেস করল ডানা।
কিশোর পা টেনে টেনে চলেছে। ওক গাছের নীচে ওর জন্য অপেক্ষা করছিল বন্ধুরা। বন্ধুদের কাছে পৌঁছে, বইয়ের ব্যাগটা ধপ করে ফেলে দিয়ে দু'চোখ ঘষে নিল কিশোর।
'মনে হচ্ছে সারা রাত ঘুমোওনি,' বলল মুসা। হাই তুলল কিশোর।
'হ্যাঁ,' স্বীকার করল।
'কেন?' রবিনের জিজ্ঞাসা। 'হোমওয়র্ক করেছ বুঝি?' মাথা নাড়ল কিশোর।
'বুক রিপোর্ট লিখেছ?' মুসার প্রশ্ন।
'কীসের বুক রিপোর্ট?' পাল্টা প্রশ্ন করল কিশোর।
'মিস্টার বগি যেটার কথা আমাদের বলেছিলেন,' রবিন বলল। 'হোমওয়র্ক করার জন্যে নয়, অন্য কোন কারণে সারা রাত জেগে
ছিল কিশোর,' বলল ডানা।
মাথা ঝাঁকাল কিশোর।
'কারণটা হলো আমার বিছানার নীচে সারা রাত ধুপ-ধুপ শব্দ হয়েছে।'
মুচকি হাসল মুসা।
'দানব-টানব হয়তো।'
'কিংবা বগিম্যান,' হেসে বলল ডানা। চোখ ঘুরাল কিশোর।

‘বগিম্যান বলে কিছু নেই।’
‘অত শিয়োর হয়ো না,’ বলল রবিন।
‘আমি হচ্ছি, কারণ আমার বিছানার নীচে উঁকি দিয়েছিলাম, ‘ জানাল কিশোর। ডানার চোখজোড়া বিস্ফারিত। বিছানার নীচে তাকাতে ভয় পায় ও। ওর ধারণা কিছু একটা পাল্টা চেয়ে থাকবে।
‘কী পেলে?’ প্রশ্ন করল।
‘বাঘাকে!’ বলল কিশোর। বাঘা ওর পোষা কুকুর।
‘বাঘা তোমার বিছানার নীচে গেল কী করে?’ মুসা জানতে চাইল।
মাথা নাড়ল কিশোর।
‘জানি না। সারা রাত মেঝেতে লেজ আছড়েছে। একটুও ঘুমোতে দেয়নি।’
কিশোরের কাঁধ চাপড়ে দিল মুসা।
‘আমার কাছে কিছু খবর আছে। শুনলে চাঙা হয়ে উঠবে তুমি,’ বলল। এবার পাঁচটা সবুজ কাগজ দোলাল কিশোরের নাকের নীচে
‘কী এগুলো?’ বলে কিশোর হাত বাড়াল।
মুসা সাঁৎ করে সরিয়ে নিল ওগুলো। এসময় জুলি হেঁটে এসে দাঁড়াল ওদের পাশে।
‘টিকেট। গ্রীন হিলস বম্বার টিকেট!’ বলল মুসা।
‘বাবা বলেছে গ্রীন হিলস ফুটবল দলটা এতটাই শক্তিশালী যে তাদের পেশাদার ফুটবলে নামা উচিত,’ বলল জুলি। ‘সব খেলার টিকেট আছে বাবার কাছে।’
‘আমার বাবা এই উইকএণ্ডের টিকেট পেয়েছে,’ সগর্বে বলল মুসা। ‘আমাকে বলেছে আমি তিনজন প্রিয় বন্ধুকে সাথে নিয়ে যেতে পারি।’
‘সাবাস!’ উল্লসিত কণ্ঠে বলে উঠল কিশোর। ‘আমাদের এখন বাকি সপ্তাহটা পার করতে হবে।’
‘মিস্টার বগির হাত থেকেও বেঁচে থাকতে হবে,’ যোগ করল ডানা।
‘মিস্টার বগিকে আমি ভয় পাই না,’ বলল কিশোর
‘না, কিন্তু বিছানার তলায় বাঘা ঢুকলে পাও,’ বলল মুসা।
ওর দিকে চোখ পাকিয়ে তাকাল কিশোর।
‘সাবধান,’ বলল রবিন। ‘মিস্টার বগি বলেছে ঠিকমত হোমওয়র্ক না করলে খবর আছে।’
‘আমি হোমওয়র্ক করিনি,’ জানাল কিশোর।
‘আমিও, বলল জুলি। ‘তবে এ নিয়ে ভয় পাচ্ছি না। কারণ মিস্টার বগি তো স্রেফ একজন স্টুডেণ্ট টিচার।’

‘তা হতে পারে,’ বলল নথি। ‘কিন্তু আমার মন বলছে তাঁর ব্যাপারে আমাদের সাবধান থাকা উচিত।’
‘গো, বম্বার্স।’ চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। রবিন, মুসা আর ডানাও গলা ফাটিয়ে চিৎকার করল। ক’জন ফুটবল খেলোয়াড় দর্শকদের উদ্দেশে হাত নাড়ার জন্য ঘুরে দাঁড়াল। শনিবারের খেলা শুরু হতে চলেছে। গ্রীন হিলস বম্বারদের ঠিক পিছনে রিচার্সে বসে চার বন্ধু। কালো ইউনিফর্মে দারুণ দেখাচ্ছে দলটিকে। এমনকী তাদের কালো হেলমেটও বিকেলের রোদ পড়ে ঝিকোচ্ছে।
‘মনে হচ্ছে আমি দলের সাথে বসে আছি,’ বলল ডানা। ‘ওদের প্রতিটা মুভ দেখতে পাব আমরা।’
‘এই সিটগুলো দারুণ!’ রবিন বলল মুসাকে।
‘এমনকী জুলির সিটের চাইতেও,’ হেসে বলল কিশোর। জুলি
বসেছে কিশোরের ঠিক পিছনে।
‘শুনে ফেলেছি,’ বলল জুলি।
কিশোর ঘুরে বসে জুলির উদ্দেশে নিষ্পাপ হাসল।
‘আসতে যে পেরেছি এই বেশি,’ বলল জুলি। ‘বাবা আমার রুম পরিষ্কার করছে।’
‘কী ব্যাপার বলো তো?’ কিশোরের প্রশ্ন।
‘কাল রাতের ঘটনা,’ বলল জুলি। ‘হোমওয়র্ক করার কথা, কিন্তু তার বদলে ডায়েরি লিখছিলাম। হঠাৎ আমার বিছানার তলা থেকে ধুপ-ধুপ শব্দ আসতে লাগল।’
‘ঠিক এমনটাই ঘটেছিল কিশোরের বেলাতেও,’ মৃদু কণ্ঠে বলল রবিন। দর্শকরা হৈ-হৈ করতে আরম্ভ করলে ওর কথাগুলো বন্ধুদের কান পর্যন্ত পৌছল না।
‘আর তারপর,’ চেঁচামেচি সামলে কথার খেই ধরল জুলি, ‘হুশ করে একটা শব্দ, আর পরমুহূর্তে চারদিকে ফোয়ারার মত পানি ছিটাতে লাগল। বাবা বলেছে পানির পাইপ নাকি ভেঙেছে।’
‘শশশ!’ বলল মুসা। ‘খেলা শুরু হয়ে গেছে। খেলা দেখতে দাও। সাবাস, গ্রীন হিলস বম্বার্স!’
বম্বারদের রানিং ব্যাক ফুটবল হাতে ছুটে গেল মাঠ ধরে। অন্য দলের খেলোয়াড়দের দেখে মনে হলো তারা গতিজড়তায় ভুগছে। রানিং ব্যাক গোললাইন অতিক্রম করার পর, সবাই উঠে দাঁড়িয়ে হর্ষধ্বনি করে উঠল।
‘কী দৌড়টাই না দৌড়াল,’ বলল রবিন। ‘ইস, বড় হয়ে আমি যদি এরকম খেলতে পারতাম!’
‘এরকম স্পীড খুব কমই দেখা যায়,’ বলল মুসা।

চার বন্ধু বম্বারদের রানিং ব্যাককে জগ করে সাইডলাইনে আসতে দেখল, পানি পানের জন্য। পানির বোতল তুলে নিয়ে হেলমেট খুলল সে।
এবার ঘুরে দাঁড়িয়ে ভ্রূ কুঁচকে স্কুলের ছেলে-মেয়েদের দিকে চাইল।
'খাইছে,' ককিয়ে উঠল মুসা। 'দেখো কে ওটা!'
'গ্রীন হিলস বম্বারের স্টার প্লেয়ার কেন টিচার হতে চাইবে?' প্রশ্ন করল রবিন।
'এ তো জানা কথা,' বলল কিশোর। 'উনি পাগল। তা না হলে কেউ টিচার হয়ে সারা জীবন স্কুলে কাটাতে চায়?'
ডানা আলতো চাপড় মারল কিশোরের বাহুতে।
'মিস্টার বগি পাগল নন,' বলল ও। ওঁর দিনের বেলায় একটা কাজ দরকার তাই। রাগবি প্লেয়াররা বেশি টাকা কামাতে পারে না কিনা।'
'পেশাদার হলে পারে,' বলল জুলি।
মুসা কালো জার্সি পরা খেলোয়াড়দের দিকে আঙুল তাক করল। 'ওঁর পেশাদার প্লেয়ার হওয়া উচিত,' বলল ও। ওঁর যোগ্যতা আছে সেটা উনি নিজেও জানেন।'
গ্রীন হিলস বম্বাররা মাঠে সারি বেঁধে দাঁড়াচ্ছে। বিশালদেহী এক লোক মি. বগির পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলল, 'লেটস গো!'
গ্রীন হিলস বম্বাররা তৈরি। চওড়া কাঁধের বম্বারদের পাশে প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়দের ছেলেমানুষ মনে হচ্ছে।
'ওদের উচিত চাট্টিবাট্টি গোল করে চলে যাওয়া, বলল কিশোর। 'বম্বাররা ওদেরকে গোহারা হারাবে।'
'খেলার কথা আগে থেকে বলা যায় না,' বলল মুসা।
'খেলা শুরুর আগেই এই খেলা শেষ হয়ে গেছে,' গর্বের সুরে বলল কিশোর। 'এ শহরে হয়তো তেমন কিছু নেই, কিন্তু আমাদের এ বছরের দলটা তুখোড় হয়েছে। এতদিনে আমরা ভাল কিছু একটা পেতে চলেছি।'
মি. বগি একটা ফাম্বল সামলে ওঠার পর গ্রীন হিলস স্ট্যাণ্ডের সবাই উল্লাসধ্বনি করে উঠল
'মিস্টার বগি স্টুডেণ্ট টিচার হিসেবে হয়তো আজব,' শোরগোল থেমে গেলে বলল মুসা। কিন্তু তিনি রাগবি প্লেয়ার হিসেবে অসাধারণ।'
'আজব না বলে অদ্ভুতুড়ে বলা যেতে পারে। তাঁর ভাব-ভঙ্গি দেখে মনে হয় হোমওয়র্ক না করলে মাথা চিবিয়ে খাবেন।' বলল ডানা।
'উনি খুব স্বাভাবিক হবেনই বা কীভাবে?' বলল রবিন। 'ওঁকে মিসেস হকিন্সের সঙ্গে ওঠ-বস করতে হয়। মিসেস হকিন্সকে তো কিছুতেই স্বাভাবিক মানুষ বলা যায় না।'

বন্ধুরা মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল। ওদের সবার ধারণা মিসেস হকিন্সের সবুজ লকেটটা তাঁকে বিশেষ ক্ষমতা দিয়েছে। টিচারকে ভীষণ ভয় পায় ওরা।
‘আমরা শেষ,’ ব্যথিত কণ্ঠে বলল জুলি।
‘সে তো স্কুলে,’ বলল কিশোর। ‘এটা ফুটবল মাঠ। স্কুল হাজার বছর দূরে।’
‘পরশু দিন,’ মনে করিয়ে দিল ডানা। ‘তবে হোমওয়র্ক করলে ভয়ের কিছু নেই।’
‘হোমওয়র্ক করার সময় কোথায়?’ জনতা হর্ষধ্বনি করলে তাদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। মি. বগি বম্বারদের এণ্ড জোনের উদ্দেশে ছুটছেন। লাইন পেরিয়ে টাচডাউন করলেন তিনি।
‘সাবাস!’ চিৎকার ছাড়ল উৎফুল্ল কিশোর। লক্ষই করল না মি. বগি সোজা ওর দিকে চেয়ে রয়েছেন।
মুসা ওর ফুটবলটা কিশোরের দিকে ছুঁড়ে মারল। সোমবার সকাল। হোঁতকা ম্যাকনামারার সঙ্গে হেঁটে খেলার মাঠ পেরোচ্ছিল কিশোর। রবিন আর ডানা ওক গাছের নীচে অপেক্ষা করছিল মুসার সঙ্গে। ফুটবলটা উড়ে এল সোজা কিশোরের উদ্দেশে।
‘হেডস আপ!’ চেঁচিয়ে উঠল রবিন, কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। কিশোরের বুকের উপর পড়েছে ফুটবলটা। কিশোর টলে উঠে বসে পড়ল মাটিতে। মুসার ফুটবল গড়িয়ে গেল ম্যাকনামারার পাশ দিয়ে।
‘আমি এতটাই ফাস্ট, কিশোর আমাকে দেখতে পর্যন্ত পায়নি, ‘ ওক গাছের নীচ থেকে সোল্লাসে বলে উঠল মুসা। ‘গ্রীন হিলস বম্বার্স, আমাকে দলে নাও!’
‘তুমি যতটা ভাবছ ততটা ফাস্ট নও,’ খেঁকিয়ে উঠল কিশোর।
‘হ্যাঁচ্চো!’ ম্যাকনামারা হাঁচি দিয়ে কিশোরের দিকে সাহায্যের হাত বাড়াল।
প্যান্টের পিছনটা ঝেড়ে নিল কিশোর।
‘ঘুম-ঘুম না লাগলে ঠিকই ধরে ফেলতাম,’ বলল ও।
‘এত ক্লান্তি কীসের তোমার?’ প্রশ্ন করল রবিন। ‘আমরা তো হোমওয়র্ক আর বিশ্রাম করার জন্যে পুরো দু’দিন পেয়েছি।’
‘আমি গ্রীন হিলস বম্বারদের খেলা দেখেছি,’ বলল কিশোর।
‘আমিও,’ স্বীকার করল ম্যাকনামারা। আবারও হাঁচি দিল।
‘আর একটুও ঘুমোতে পারিনি, কারণ বাতি নিভালেই এমন শব্দ হয় যেন বিছানার নীচে পার্টি হচ্ছে,’ বলল কিশোর।
‘বাঘা কি এখনও তোমার খাটের তলায় ঘুমোচ্ছে?’ রবিন প্রশ্ন করল।
‘না, কিন্তু এখনও শব্দ হচ্ছে,’ বলল কিশোর।
‘শব্দটা শুনলে কি মনে হয় কেউ দেয়ালে নখ আঁচড়াচ্ছে?’ ম্যাকনামারা জিজ্ঞেস করল। মুখের চেহারা মড়ার মতন ফ্যাকাসে।

‘দুপ-দুপ শব্দে কি মনে হয় কেউ মেঝেতে মাথা ঠুকছে?’
‘ঠাণ্ডাটা তোমার মাথায় উঠে গেছে,’ ম্যাকনামারাকে বলল মুসা। ‘ফলে মাথা গেছে গুবলেট হয়ে।’
রবিন আর ডানা হেসে উঠলেও, কিশোরের মুখে হাসির লেশমাত্র নেই।
‘ঠাট্টা করছ না তো? শব্দটা তোমার নিজের তৈরি নয় তো?’ প্রশ্ন করল কিশোর।
ম্যাকনামারা পিছিয়ে গেল যতক্ষণ না ওক গাছে কাঁধ ঠেকে।
‘প্রশ্নই ওঠে না, জানাল।
‘তা হলে আমি কী শব্দ শুনেছি তা তুমি জানলে কীভাবে?’ জবাব চাইল কিশোর।
‘কারণ, আমারও মনে হয়েছে আমার বিছানার তলায় কিছু একটা আছে,’ বলল ম্যাকনামারা।
মুসা জোরে হেসে উঠল
‘তোমার বিছানার নীচে যা জঞ্জাল, কোন কিছু ঢুকবে কীভাবে?’ ম্যাকনামারার অগোছাল ঘরটি সম্পর্কে সবারই জানা আছে।
‘মাও একথাই বলেছিল,’ স্বীকার করল ম্যাকনামারা। ‘আমাকে বাধ্য করেছে বিছানার তলা পরিষ্কার করতে। প্রচুর ধুলো বেরিয়েছে। এ ছাড়াও অন্য জিনিস।’
‘হারানো খেলনা?’ মুসার প্রশ্ন।
মাথা ঝাঁকাল ম্যাকনামারা।
‘কিছু পুরানো জিনিস পাওয়া গেছে। বেশির ভাগই আমার। তবে সবগুলো নয়।’
‘তার মানে?’ কিশোর জিজ্ঞেস করল।
‘ওখানে বিস্কুটের গুঁড়ো আর একটা সোডা ক্যানও ছিল, ফিসফিস করে বলল ম্যাকনামারা।
ম্যাকনামারার পেটে খোঁচা মারল কিশোর।
‘রাতের বেলা তুমি বেশি স্ন্যাক্স খাচ্ছ,’ বলল।
‘ওই বিস্কুটগুলো আমার না,’ ম্যাকনামারা বলল। ‘আমার মনে হয় কেউ—কিংবা কিছু একটা আমার বিছানার নীচে থাকছে!’
হেসে ফেলল ডানা আর মুসা।
‘খাইছে, বিছানার তলায় দানব?’ বলল মুসা।
‘মুসা ঠিকই বলেছে,’ বলল রবিন। ‘তুমি সারাক্ষণই কিছু না কিছু খাচ্ছ। মনে হয় ভুলেই গেছ বিস্কুটগুলো কখন রুমে নিয়ে গেছ।’
‘হতে পারে,’ বলল ম্যাকনামারা, ব্যাকপ্যাকের ভিতরে হাত ভরে দিল। ‘কিন্তু এটার কী ব্যাখ্যা দেবে তোমরা?’
‘খাইছে!’ মুসা এমনভাবে ফিসফিস করে উঠল যেন বারাক ওবামাকে স্বচোখে দেখেছে। ‘এটা পেলে কোথায়?’ ম্যাকনামারার হাত থেকে বলটা নিয়ে চামড়ায়

লেখা স্বাক্ষরটা পড়ল। ‘গ্রীন হিলস বম্বারদের কোচ সাইন করেছেন এটায়।
‘তুমি এটা পেলে কোথায়?’ ডানার প্রশ্ন।
‘বলেছি তো, খাটের তলায়,’ জানাল ম্যাকনামারা।
‘তুমি ওখানে না রাখলে কে রাখল?’ কিশোর জিজ্ঞেস করল। খিলখিল করে হেসে উঠল ডানা।
‘হয়তো বগিম্যান রেখেছে।’
মুসা হেসে উঠল আর কিশোর চোখ ঘুরাল। কিন্তু রবিন ডানার বাহু আঁকড়ে ধরল। ঘন-ঘন শ্বাস নিচ্ছে ও।
‘কী ব্যাপার?’ ডানা জানতে চাইল।
রবিনের মুখের চেহারা ফ্যাকাসে।
‘আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে।’
রবিনের নাকের সামনে আঙুল নাচাল কিশোর।
‘তোমাকে না কতবার বলেছি বেশি বেশি আইডিয়া আসা বিপজ্জনক!’ বলল ও।
‘স্টুডেণ্ট টিচারের চাইতে বেশি বিপজ্জনক নয়,’ বলল রবিন।
‘ম্যাকনামারার বিছানার তলায় বিস্কুটের গুঁড়ো আর ফুটবল পাওয়া গেলে তার সাথে মিস্টার বগির কী সম্পর্ক?’ মুসা প্রশ্ন করল।
রবিন ঢোক গিলে মাঠের চারধারে নজর বুলিয়ে নিল।
‘কারণ,’ শেষমেশ বলল ও, ‘মিস্টার বগিই বগিম্যান!’
কিশোর হেসে উঠে রবিনের পিঠে চাপড় মারল।
‘শেষ পর্যন্ত ছেলে ভুলানো গল্প নিয়ে এসেছ!’
‘ছেলে ভুলানো নয়,’ রবিন বলল। ‘বগিম্যান গ্রীন হিলসে এসেছে, এবং সে একজন গ্রীন হিলস বম্বার।’
‘আর আমি বর্ষসেরা সুপারবল প্লেয়ার,’ বলে হেসে ফেলল মুসা। ‘গ্রীন হিলসে বগিম্যানের কী কাজ?’ ডানার প্রশ্ন।
‘জানি না,’ বলল রবিন। ‘কিন্তু দুয়ে দুয়ে চার মিলে যাচ্ছে। বগিম্যান বিছানার তলায় লুকিয়ে থাকে, আর ভয়ঙ্কর সব শব্দ করে ছেলে-মেয়েদের জাগিয়ে রাখে। মিস্টার বগি আমাদের টিচার হয়ে আসার পর থেকে কিশোরের বেলাতে এমনটাই ঘটে চলেছে।’
‘উনি কিশোরকে বলেছিলেন পড়া না করলে খবর আছে,’ বলল ডানা।
‘সেটা যে কোন টিচারই বলতে পারেন,’ বলল মুসা। ‘তাতে কিছু প্রমাণ হয় না।’
‘কিন্তু এতে হয়।’ রবিন মুসার হাতে ধরা গ্রীন হিলস বম্বারদের ফুটবলটা ইশারায় দেখাল। যখনই খাটের তলায় বগিম্যানের খোঁজ করা হয়, সে অদৃশ্য হয়ে যায়। কিন্তু এবারে বগিম্যান ম্যাকনামারার বিছানার নীচে একটা বল ফেলে গেছে।’

‘তুমি কি বলতে চাইছ বগিম্যান আমার বিছানার নীচে থাকে?’ ককিয়ে উঠল ম্যাকনামারা।
মাথা ঝাঁকাল রবিন।
‘তবে ভয় পেয়ো না, যেহেতু বিছানার তলা পরিষ্কার করেছ ও এখন সম্ভবত তোমার ক্লজিটে আস্তানা গাড়বে।’
ম্যাকনামারাকে দেখে মনে হলো এখুনি মূর্ছা যাবে বুঝি। ‘রবিনের কথায় কান দিয়ো না,’ বলল মুসা। ‘বগিম্যান কখনও ফুটবল খেলে না।’
‘মুসা ঠিক বলেছে,’ বলল কিশোর। এবার মুসার হাত থেকে গ্রীন হিলস বম্বার ফুটবলটা কেড়ে নিল। ‘কিন্তু আমরা খেলি!’
বলটা বগলের নীচে গুঁজে দৌড় দিল ও। ওকে ধাওয়া করল মুসা। ডানা, রবিন আর ম্যাকনামারাও যোগ দিল। গোটা খেলার মাঠে কিশোরকে তাড়া করে বেড়াল ওরা।
মুসা ছিল কিশোরের একদম কাছে। কিশোরকে ট্যাকল করতে হাত বাড়িয়েও সুযোগ পেল না।
কিশোর ওক গাছের পাশ কাটানোর জন্য দৌড়ে যেতেই লম্বা কালো এক ছায়া আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। কিশোর থামতে চেষ্টা করল, কিন্তু জুতোর ফিতেয় পা বেধে গড়িয়ে পড়ল মাটিতে। মুখ তুলে চাইছে তো চাইছেই, শেষমেশ মি. বগির সঙ্গে চোখাচোখি হলো।
‘সাবধান,’ মি. বগি বললেন। ‘নইলে খবর আছে!’
‘আমি ভেবেছিলাম মিস্টার বগি কিশোরকে না জানি কী বলবেন, ‘ স্কুলের পরে বলল মুসা। ‘কিন্তু উনি শুধু ছুটির পরে ওকে দিয়ে হোমওয়র্ক করিয়ে নিচ্ছেন।
‘ম্যাকনামারাকে দিয়েও,’ বলল ডানা। মুসা, রবিন আর ডানা ওক গাছের নীচে দাঁড়িয়ে বন্ধুদের জন্য অপেক্ষা করছে।
‘বুঝতে পারছি না মিস্টার বগি আজ সকালে কীভাবে আমাদের পাকড়াও করলেন,’ বলল ডানা।
‘বগিম্যান যে কোনখানে নিঃশব্দে হাজির হতে পারে,’ মৃদু কণ্ঠে বলল নথি।
‘তুমি কি সত্যিই বগিম্যানে বিশ্বাস কর নাকি?’ প্রশ্ন করল মুসা। ‘মিস্টার বগি কড়া ধাঁচের স্টুডেণ্ট টিচার কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু তিনি মোটেই মানুষের বিছানার নীচে থাকেন না।’
‘হঠাৎ হঠাৎ দেখা দেন তিনি,’ বলল ডানা। ‘বেখাপ্পা সব জায়গায়।’
‘যেমন কিশোর আর ম্যাকনামারার বিছানার তলায়,’ শেষ করল রবিন।
‘আর তোমার কল্পনায়,’ রবিনকে উদ্দেশ্য করে বলল মুসা।

‘ঠাট্টা করছ করো,’ বলল রবিন। ‘কিন্তু আমি হলে মিস্টার বগির হোমওয়র্ক ঠিকঠাক মত করতাম।’
‘বিছানার তলার দানবের সাথে হোমওয়র্কের কী সম্পর্ক?’ মুসার প্রশ্ন।
‘ভেবে দেখো, কিশোর আর ম্যাকনামারা হোমওয়র্ক করেনি। এমনকী করার চেষ্টাও করেনি,’ বলল রবিন।
‘তাতে কী? জুলিও তো হোমওয়র্ক করেনি,’ বলল মুসা।
‘আহহহ!’ হঠাৎই চেঁচিয়ে উঠল ডানা। ‘রবিনের কথাই ঠিক মিস্টার বগিই বগিম্যান!’
কোমরে দু’হাত রাখল মুসা।
‘শেষ পর্যন্ত তুমিও?’ বলল ও।
মুসার বাহু চেপে ধরল ডানা।
‘কেন বুঝতে পারছ না?’ প্রশ্ন করল। ‘জুলি, কিশোর আর ম্যাকনামারা বিছানার নীচে অদ্ভুত শব্দ শুনেছে, এবং মিস্টার বগি বলেছিলেন হোমওয়র্ক না করলে ওদের খবর আছে!’
‘মিস্টার বগি বোঝাতে চেয়েছিলেন ওদেরকে ছুটির পর থাকতে বাধ্য করবেন। তাই বলেছিলেন ওদের খবর আছে,’ ব্যাখ্যা করে বলল মুসা।
‘তুমি যখন এতটাই শিয়োর তখন প্রমাণ করছ না কেন?’ জানতে চাইল রবিন।
মুসা জোরে জোরে মাথা নাড়ল।
‘আমি রবিনের বিছানার নীচে রাত কাটাতে পারব না,’ বলল ও। ‘কাটালে সারা জীবন দুঃস্বপ্ন দেখব।’
‘কাটাতে হবে না,’ বলল রবিন। ‘তুমি শুধু কথা দাও হোমওয়র্ক করবে না।’
‘কিন্তু ওর তো তা হলে সমস্যা হবে,’ বলল ডানা।
‘মিস্টার বগি যে বগিম্যান নন তা প্রমাণ করার এটাই একমাত্র উপায়,’ বলল রবিন। ‘তা যদি উনি না হন, মুসা আরামে ঘুমোবে। কিন্তু উনি যদি বগিম্যান হন, তা হলে সারা রাত বিছানার নীচে শব্দ শুনবে।’
‘আমি বগিম্যান-টগিম্যান মানি না,’ খেঁকিয়ে উঠল মুসা।
‘তা হলে আমি যা বলছি করবে?’ রবিনের জিজ্ঞাসা।
মুসা জবাব দেয়ার আগেই সবুজ এক ভ্যান বাঁক ঘুরে ব্রেক কষে দাঁড়াল। মুসা ওর বাবার ভ্যান দেখামাত্র দৌড়ে গিয়ে জানালা দিয়ে ঝুঁকে পড়ল।
‘ইয়াহু!’ একটু পরে, খুশিতে চেঁচিয়ে উঠে বন্ধুদের কাছে দৌড়ে ফিরে এল ও। ‘বাবা আমাদের জন্যে আরও গ্রীন হিলস বম্বার টিকেট নিয়ে এসেছে। আমরা আজ রাতে খেলা দেখতে যাচ্ছি! আমরা এমনকী খেলার আগে লকার রুমও ঘুরে দেখতে পারব!’

রবিনের মুখের চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেল।
‘কী হলো?’ মুসা জবাব চাইল।
‘আমরা খেলা দেখতে গেলে, আস্তে আস্তে বলল রবিন, ‘হোমওয়র্ক করার সময় পাব না। এর মানে একটাই। বগিম্যান আমাদেরকে বাগে পাবে!’
‘ওরা ন্যাংটো নাকি?’ প্রশ্ন করল ডানা। চোখে হাত চাপা দিয়ে কিশোর, মুসা, রবিন আর মি. আমানকে অনুসরণ করে গ্রীন হিলস বম্বারদের লকার রুমে ঢুকল।
মুসা ডানার হাত সরিয়ে দিল চোখের উপর থেকে।
‘ধুর বোকা,’ বলল। ‘খেলা এখুনি শুরু হবে। সবাই পোশাক পরে রেডি।’
লকার রুমে শোল্ডার প্যাড আর কালো ইউনিফর্ম পরা বিশালদেহী লোকজন গিজগিজ করছে। অতিকায় সব অ্যান্টইটারের মাঝখানে নিজেকে ছোট্ট এক পিঁপড়ে মনে হচ্ছে ডানার। গ্রীন হিলস বম্বারদের কোচ মি. আমানের দিকে চেয়ে মৃদু হেসে হাত ঝাঁকিয়ে দিলেন।
‘আসুন,’ কোচ বললেন। দলের সাথে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই।’
কোচ ঘুরে ঘুরে কজন বিশালদেহী খেলোয়াড়ের সঙ্গে ওদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। ওরা যখন মি. বগির সামনে থেমে দাঁড়াল, ঢোক গিলল ডানা। মি. বগির গালে কালো রং, ভ্রূ কোঁচকানো।
‘তোমরা এখানে কী করছ?’ মি. বগি জিজ্ঞেস করলেন। হেসে উঠলেন কোচ।
‘এরা শহরের সেরা দলের খেলা দেখতে এসেছে,’ মি. বগিকে বললেন।
‘ওদের এখানে না এসে হোমওয়র্ক করা দরকার ছিল,’ মি. বগি ঘাউ করে উঠে বিশাল এক মুঠো দিয়ে ঘুষি বসালেন অন্য হাতের তালুতে।
মি. আমান মুসার কাঁধ চাপড়ে দিলেন।
‘মুসা সব সময় হোমওয়র্ক করে রাখে,’ সগর্বে বললেন মি. বগিকে।
মি. বগি মি. আমানের উদ্দেশে মাথা ঝাঁকিয়ে ডানা, কিশোর, মুসা আর রবিনের দিকে চাইলেন।
‘হোমওয়র্ক করে রেখো, নইলে কিন্তু ধরব,’ সতর্ক করলেন। কালো হেলমেটটা তুলে নিয়ে মাথায় বসালেন। এখন কেবল তাঁর কালো, কুতকুতে চোখজোড়া দেখা যাচ্ছে ফেস মাস্কের আড়াল থেকে।
মুসা ভান করল ভয় পায়নি।
‘গুড লাক,’ ককিয়ে উঠে বলল।
‘চলো,’ গলা ছাড়লেন কোচ। ‘মাঠে চলো।’
লকার রুম থেকে যেন একদল মোষের মত ক্ষুর দাপিয়ে বেরিয়ে এল গ্রীন হিলস বম্বাররা। তিন বন্ধু, ডানা আর মি. আমান দলকে অনুসরণ করলেন। ছেলে-

মেয়েরা রিচার্সে বসার পর মি. আমান পপকর্ন আনতে গেলেন।
‘মিস্টার বগির কথা শুনলে?’ বন্ধুদের প্রশ্ন করল রবিন।
‘হোমওয়র্ক না করলে ধরবেন বলেছেন,’ নাকি সুরে বলল ডানা। ‘আমি, বাবা, বাসায় গিয়ে এখুনি হোমওয়র্ক নিয়ে বসতে চাই।’
‘বোকার মত কথা বোলো না। উনি আমাদেরকে স্রেফ ভয় দেখিয়েছেন,’ বলল কিশোর।
‘তাতে কাজও হচ্ছে,’ বলল ডানা।
রবিন মাঠে জড় হওয়া গ্রীন হিলস বম্বার ফুটবল দলটাকে আঙুল- ইশারায় দেখাল।
‘ভয় পাওয়ার কারণ আছে। বগিম্যান আমাদের পিছে লেগেছে,‘ বলল ও।
‘ধুত্তোরি, মিস্টার বগি মোটেই বগিম্যান নন এবং আমি তা প্রমাণ করে দেখাব,’ বলল কিশোর। ‘এসো।’ কিশোর লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে সিঁড়ি ভেঙে নামতে লাগল।
‘কোথায় যাচ্ছে ও?’ মুসা জানতে চাইল।
‘নিশ্চয়ই কোন বদ মতলব আছে,’ বলল ডানা।
মাথা ঝাঁকাল রবিন।
‘ওকে আমাদের ঝামেলা থেকে বাঁচানো দরকার,’ বলল। ‘সম্ভব নয়। এখুনি খেলা শুরু হবে,’ বলল মুসা।
‘বেশিক্ষণ লাগবে না,’ বলল রবিন। ওরা তিনজন লাফিয়ে উঠে কিশোরের পিছু ধাওয়া করল। কিশোর ‘প্রাইভেট’ লেখা এক দরজা দিয়ে ঢুকছে এসময় ওকে দেখতে পেল মুসা, রবিন আর ডানা।
‘ওটা লকার রুমের দরজা,’ বলল ডানা। ‘কিশোরের ওখানে ঢোকা ঠিক হয়নি।’
‘ওর বড় ধরনের বিপদে পড়ার আগেই ওকে থামাতে হবে, বলল মুসা। দরজা দিয়ে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল তিনজন। ওদের পিছনে দরজাটা লেগে গেল সশব্দে। কালিগোলা আঁধার গ্রাস করল সবাইকে।
‘কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না,’ শিউরে উঠে বলল ডানা।
ও ও ও ও ও হ হ হ হ হ!’
জোরাল এক গোঙানির শব্দ কানে এল ওদের।
‘ও ও ও ও ও হ হ হ হ হ!‘
‘খাইছে, কীসের শব্দ?’ প্রশ্ন করল মুসা।
‘জানি না,’ বলল রবিন, পিছনে দরজার হাতল খুঁজছে পাগলের মত। ‘তবে যাই হোক, এদিকে কাছিয়ে আসছে!’
‘আউচ!’ বলে উঠে লকার রুমের বাতিগুলো জ্বেলে দিল কিশোর।

‘কী হয়েছে তোমার?’ মুসার প্রশ্ন।
কিশোর মেঝেতে বসে পায়ের পাতা ডলতে লাগল।
‘পায়ে ব্যথা পেয়েছি,’ বলল।
ডানা হেসে ফেলল খিলখিল করে।
‘তার মানে তুমি গোঙাচ্ছিলে?’
‘তা হলে কে? বগিম্যান?’ পাল্টা প্রশ্ন করল কিশোর।
জবাব না দিয়ে লকার রুমের চারধারে নজর বুলিয়ে নিল মুসা, রবিন আর ডানা।
‘তুমি এখানে কী করতে এসেছ?’ কিশোরকে জিজ্ঞেস করল রবিন।
‘প্রমাণ করতে যে মিস্টার বগি সম্পর্কে তোমাদের ধারণা ভুল, ‘ বলল কিশোর।
‘কী ধরনের প্রমাণ?’ মুসা জানতে চাইল।
ধূসর ধাতব এক লকারের কাছে চলে এল কিশোর।
‘এখনও শিয়োর না, বলল। ‘তবে দেখলেই জেনে যাব।’ লকারটা খুলে ভিতরে চোখ রাখল ও। ‘মোজার দুর্গন্ধ ছাড়া আর কিছু নেই।’ লকারটা দড়াম করে লাগিয়ে দিল।
ডানা বুকের উপর আড়াআড়ি দু’হাত রাখল।
‘অন্যের লকারে উঁকি দেয়া ঠিক নয়,’ বলল।
‘বগিম্যান সত্যিই আছে কিনা জানতে চাও না?’ কিশোর জিজ্ঞেস করল।
‘তা চাই,’ আস্তে করে বলল ডানা।
‘তা হলে এখানেই খুঁজে দেখতে হবে,’ বলে এক লকারের সামনে দাঁড়াল কিশোর। লকারটায় লেবেল সাঁটা: বি. বগি।
‘আমি দেখি,’ বলে লকারের হাতল ধরে টানল মুসা। ‘আহহহহ!’ বিশাল এক দেহ ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লে আর্তনাদ ছাড়ল ও। ‘খাইছে, বাঁচাও! বগিম্যান!’ ছিটকে পড়ে গেল মাটিতে।
কিশোর মুসার উপর থেকে অবয়বটা সরিয়ে নিতেই গড়িয়ে নিরাপদ দূরত্বে সরে গেল ও।
‘এই তোমার বগিম্যান,’ বলল কিশোর। হেসে উঠে কালো এক ইউনিফর্ম তুলে ধরল। শোল্ডার প্যাড নিয়ে এক রাগবি জার্সি এবং উপরে এক হেলমেট।
‘তুমি না বলে বগিম্যানে বিশ্বাস করো না,’ মুসাকে বলল রবিন। ‘করি না-ই তো,’ মিথ্যে বলল মুসা। ‘কিন্তু ওভাবে একটা ইউনিফর্ম গায়ের ওপর পড়লে সবাই ভয় পাবে।’
‘অনেক হয়েছে,’ বলল ডানা। মুসাকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল। ‘রবিন বগিম্যানের কথা বলে আমাদেরকে ভয় দেখিয়েছে আর লোকে হোমওয়র্ক না

করলে আমাদের দেখে নেবে বলে শাসাচ্ছে। এই ভুতুড়ে লকার রুম থেকে বেরিয়ে সবাই খেলা দেখতে চলো।'

'চলো,' বলে দরজার দিকে পা বাড়াল কিশোর। কিন্তু অতদূর পৌছতে পারল না। প্রকাণ্ড এক থাবা ওর কাঁধ চেপে ধরল।

কিশোরের কী হলো দেখার জন্য অপেক্ষা করল না ডানা। ঝেড়ে দৌড় দিল।

'আহ!' সরাসরি খেলার মাঠের দিকে খোলে এমন এক দরজা খুলে চেঁচিয়ে উঠল ও। টলতে টলতে গ্রীন হিলস বম্বারদের চিয়ারলিডারদের মধ্যে পড়ে গেল। ওরা তখন কালো পম-পম নেড়ে হাত-পা ছুঁড়ছে।

'গেট ডাউন, বুগি-উগি-উগি!' চিয়ারলিডাররা মন্ত্রোচ্চারণের মত করে বলছে। এক চিয়ারলিডার ডানার মুখের সামনে পম-পম নাড়ল।

ডানা যখন আসন খুঁজে পেল মুখের চেহারা টকটকে লাল তার। স্ট্যাণ্ডের দর্শকদের কেউ কেউ ওর পিঠ চাপড়ে দিয়ে জানতে চাইল চিয়ারলিডিং কেমন লাগল।

'এত অপ্রস্তুত আর কখনও হইনি,' জানাল ডানা।

মুসা, রবিন আর কিশোর ওর পাশে এসে বসল। মুসা এক হাতে ডানার কাঁধ জড়িয়ে ধরল।

'ভেবো না। কালকেই কেউ আর এ ঘটনা মনে রাখবে না,' বলল।

'তুমি দৌড় দিলে কেন?' রবিন প্রশ্ন করল ডানাকে। 'বগিম্যান ধরবে ভেবে?'

ঢোক গিলল ডানা।

'কী করব বুঝতে পারছিলাম না। ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম।'

'কোচ এসে আমাদেরকে বললেন লকার রুমে না থাকতে, তাই চলে এসেছি আমরা,' ব্যাখ্যা করল মুসা।

'বলতে চাইছ মিস্টার বগি তোমাকে ধরেননি?' কিশোরকে জিজ্ঞেস করল ডানা।

'না,' কিশোর জানাল। 'কিন্তু উনি টাচডাউন করতে যাচ্ছেন।' মাঠের দিকে তর্জনী নির্দেশ করল ও। খেলা শুরু হয়েছে এবং ইতোমধ্যেই বল এসে গেছে মি. বগির হাতে। দর্শকরা উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে দৌড়তে দেখছে। তাঁর দৌড় যেন থামবেই না। অন্য দল তাঁকে ধরার চেষ্টা করল। কিন্তু ধারে-কাছে ঘেঁষতে পারল না। মি. বগি চল্লিশ গজ লাইনে দৌড়ে গেলেন, তারপর ত্রিশ।

চিয়ারলিডাররা চেঁচাচ্ছে, 'বুগি-উগি-উগি!'

মি. বগি যখন বিশগজ লাইন পেরিয়ে গেলেন, ডানার পিছন থেকে কে একজন চেঁচিয়ে উঠল, 'বগির দৌড় দেখো!'

আরেকজন চেঁচাল, 'বুগি-উগি, বগিম্যান!

মি. বগি পাঁচ গজী লাইন পেরনোর পর, চিয়ারলিডাররা আর জনতা একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল
‘বুগি-উগি করো, বগি!
মি. বগি টাচডাউনের জন্য দৌড়ে গেলে উন্মাদ হয়ে উঠল দর্শকরা।
‘বুগি-উগি!’ গর্জে উঠল তারা।
‘দেখলে?’ মি. আমান বললেন, ছেলে-মেয়েদের পাশে একগাদা পপকর্ন আর সোডা নিয়ে বসলেন। ‘অন্য কাউকে এরকম দৌড়তে দেখেছ?’
রবিন এক প্যাকেট পপকর্ন ও একটা ড্রিঙ্ক নিল।
‘ধন্যবাদ, আঙ্কল,’ বলল মি. আমানকে। কিশোরের দিকে এক প্যাকেট পপকর্ন বাড়িয়ে দিল। ‘আমি একজনকে এরকম দৌড়তে দেখেছি,’ ফিসফিস করে কিশোরকে বলল।
‘কোথায়?’ কিশোরের জিজ্ঞাসা।
‘দুঃস্বপ্নে,’ জবাব দিল নথি 1
কিশোর এক মুঠো পপকর্ন ছুঁড়ে দিল রবিনের দিকে।
‘তুমি এখনও বগিম্যানকে নিয়ে পড়ে আছ?’
‘আমি একাই মিস্টার বগিকে বগিম্যান ভাবছি না,’ রবিন বলল কিশোরকে। ‘দর্শকরা কী বলছে শোনো।’
মি. বগি গোলপোস্টের পাশে খানিকটা নাচ জুড়ে দিতেই হৈ-হৈ করে উঠল চিয়ারলিডার আর দর্শকরা। দর্শকদের স্লোগান শুনে গলায় পপকর্ন আটকাল কিশোরের।
‘গেট দেম, বগিম্যান! গেট দেম, বগিম্যান!’
রবিন কিশোরের দিকে চেয়ে মাথা ঝাঁকাল।
‘দেখলে,’ বলল ও, ‘এমনকী দর্শকরাও জানে মিস্টার বগি যে বগিম্যান!’
‘আমি কাজটা করেছি,’ পরদিন সকালে ওক গাছের নীচে বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হয়ে বলল মুসা। ‘কিংবা বলা উচিত করিনি।’
‘কী বলছ উল্টোপাল্টা?’ কিশোর প্রশ্ন করল।
মুসা চারপাশে নজর বুলিয়ে নিশ্চিত হয়ে নিল কেউ শুনছে না। ‘আমি হোমওয়র্ক করিনি,’ শেষমেশ জানাল।
‘তাতে কী?’ জিজ্ঞেস করল কিশোর। মুসা বড়াই করছে কেন বুঝতে পারছে না ও।
ডানার চোখজোড়া বিস্ফারিত।
‘কিন্তু মুসা তো সব সময় হোমওয়র্ক করে!
দাঁত বের করে হাসল মুসা।

‘এবার নয়। আমি প্রমাণ করতে চাই কিছুই ঘটবে না।’
‘যাতে প্রমাণ হয় মিস্টার বগি বগিম্যান নয়?’ ডানার জিজ্ঞাসা।
‘জানতাম,’ বলল কিশোর। ‘তুমি প্রমাণ করেছ মিস্টার বগি স্রেফ একজন স্টুডেণ্ট টিচার। খারাপ কোন কিছুই ঘটেনি।
‘হয়েছে কী,’ বলে চোখ ঘষল মুসা। ‘তা ঠিক নয়। রাতে ভাল ঘুম হয়নি।’
‘বিছানার নীচে শব্দ শুনেছ?’ রবিনের প্রশ্ন।
মাথা নাড়ল মুসা।
‘না। আমি শুনেছি অদ্ভুত বীপ-বীপ শব্দ। ‘
‘শুনে মনে হচ্ছে ভিনগ্রহবাসী,’ বলল কিশোর। ‘বগিম্যান নয়।’
‘ওটা ছিল আমাদের স্মোক অ্যালার্মের শব্দ,’ ব্যাখ্যা দিল মুসা। ‘ওটা রয়েছে লিভিং রুমে, আমার বেডরুমের ঠিক নীচে। নতুন ব্যাটারি লাগবে।’
রবিন একটা আঙুল তাক করল মুসার উদ্দেশে।
‘এসব ঘটেছে কারণ তুমি হোমওয়র্ক করনি,’ বলল ও। ‘মিস্টার বগি স্মোক অ্যালার্ম গুবলেট করে দিয়ে তোমাকে শাস্তি দিয়েছেন।’
‘আমার ভয় করছে,’ বলল ডানা। ‘মিস্টার বগি আমাদের সবাইকে একে একে ধরবেন। আমাদের খবর আছে!’
‘এত ভয় কীসের? হোমওয়র্ক করলেই তো তুমি নিরাপদ,’ বলল, রবিন।
ডানা শিউরে উঠে সোয়েটারটা টেনেটুনে ভালভাবে গায়ে জড়িয়ে নিল।
‘আমি চাই না কারও ভাগ্যে খারাপ কিছু ঘটুক। নিজেদের বাঁচানোর কি কোনই পথ নেই আমাদের?’ বলল ও।
‘এটা নিয়েই ভাবছি,’ বলল রবিন। ‘সবাই জানে বগিম্যান রাতের আঁধারে মানুষকে ভয় দেখাতে চায়।’
‘তো?’ মুসা বলল।
‘আমরা যদি সবাই লাইট জ্বেলে ঘুমাই?’ বাতলে দিল রবিন। ‘তা হলে হয়তো বগিম্যানের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে।’
‘চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কী,’ সায় জানিয়ে বলল মুসা। ‘আমি জুলি আর ম্যাকনামারাকে বলব।’
‘কিন্তু আজকে কী হবে?’ ডানা জিজ্ঞেস করল। ‘আমার তো ভয় করছে।’
‘ভয় পেয়ো না,’ অভয় দিল মুসা। আজকে সারাদিন মিসেস হকিন্স থাকবেন। মিস্টার বগি কাউকেই ধরতে পারবেন না।’
‘এখানটাতেই ভুল করছ তুমি,’ বলল রবিন। এসময় স্কুল বসার ঘণ্টা বাজল। ‘আজকে মিস্টার বগির একাই পড়ানোর কথা। মিসেস হকিন্স আমাদের বাঁচাতে আসবেন না!’

‘আমরা আশা করছি ভ্যাম্পায়ার টিচার আমাদেরকে বগিম্যানের হাত থেকে বাঁচাবেন! ভালই বলেছ!’ বাঁকা হেসে বলল কিশোর।
‘বগিম্যান টিচার হয়ে আসার পর থেকে আমাদের সাবধান আর সতর্ক থাকা উচিত,’ বলল রবিন।
কিশোর হেসে উঠল।
ছেলে-মেয়েরা স্কুল বিল্ডিঙের দিকে পা বাড়াল।
‘দেখো আমি কী করি, বলল কিশোর। ‘আমি চিরতরে প্রমাণ করে দেব মিস্টার বগি বগিম্যান নন!’
ডানা রবিনের বাহু চেপে ধরল।
‘ও কী করবে?’ ভয়ার্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল।
রবিনের মুখের চেহারা দেখে মনে হলো এইমাত্র প্রিয় বন্ধুকে হারিয়েছে।
‘কিশোরকে যদ্দূর চিনি ও মিস্টার বগি যে বগিম্যান নন সেটা প্রমাণ করার চেষ্টা করবে।’
‘ও না আবার ঝামেলা পাকায়,’ আশঙ্কা প্রকাশ করল মুসা। ‘ওকে ঠেকাতে হবে,’ বলল ডানা। ‘নইলে বগিম্যান আজ রাতে ওকে ধরবে।’
‘বগিম্যানের কথা বাদ দাও,’ বলল মুসা। ‘কিশোরকে না ঠেকালে স্কুলের সব টিচার ওকে ধরবে!’
রবিন, মুসা আর ডানা ক্লাসে ঢোকার সময় দেখতে পেল ওরা দেরি করে এসেছে। কিশোর ইতোমধ্যে কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।
প্রতিটা ডেস্কের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় পেন্সিলগুলো টোকা দিয়ে ফেলে দিচ্ছে ও। সারির শেষ প্রান্তে পৌঁছে, ক্লাসের সামনের দিকে চাইল। মি. বগি এসবের কিছুই দেখতে পাননি। বোর্ডে ম্যাথ প্রবলেম লিখতে ব্যস্ত তিনি।
‘এগুলো প্র্যাকটিস, করলে,’ বললেন তিনি, ‘কালকের টেস্টে তোমরা ভাল গ্রেড পাবে।’
কিশোর এ কথায় কান দিল না। আরেক সারিতে ঢুকে সহপাঠীদের কাগজ ঠেলে ফেলে দিল মেঝেতে।
‘কী করছ!’ খেঁকিয়ে উঠল জুলি। এবার হাত দোলাল। ‘মিস্টার বগি,’ গলা ছেড়ে ডাকল। ‘কিশোর আমাকে ডিস্টার্ব করছে।’
মি. বগি ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়িয়ে কিশোরের দিকে চাইলেন। গোটা ক্লাসরুম নিস্তব্ধ।
‘কিশোর ওর সিটে না যাওয়া পর্যন্ত ওর ওপর নজর রাখব আমি, ‘ গর্জে উঠলেন।

কিশোর বিন্দুমাত্র ভয় পায়নি। প্রমাণ করতে দৃঢ়সঙ্কল্পবদ্ধ মি. বগি বগিম্যান নন। চোখ বুজল ও, যাতে কিছু দেখতে না পায়। এবার সামনে দু'হাত নাড়তে শুরু করল।

'আমার ডেস্ক খুঁজে পাচ্ছি না!' চেঁচিয়ে উঠল।

রবিন, মুসা আর ডানা ক্লাসরুমের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে। তিনজনই কিশোরের কথা ভেবে আতঙ্কিত।

মি. বগি এক পা এগোলেন, এবার আরেক পা। থপ-থপ করে ভারী পা ফেলে কিশোরের ঠিক সামনে এসে দাঁড়ালেন।

চোখ মেলল কিশোর। সরাসরি মি. বগির চোখে চোখে চাইতে হলো ওকে।

'বসে পড়ো। এখুনি,' ঘাউ করে উঠলেন মি. বগি।

কিশোর মাথা ঝাঁকিয়ে ঝটপট চেয়ার খুঁজে নিলে চেপে রাখা দমটা ছাড়ল মুসা।

'কিশোরের মনে হয় শিক্ষা হয়েছে,' ফিসফিস করে রবিন আর ডানার উদ্দেশে বলল।

মাথা ঝাঁকাল রবিন।

'ওর বগিম্যানের সাথে লাগতে যাওয়া ঠিক হয়নি।'

ওরা তিনজন ঝটপট যার যার সিটে গিয়ে বসে ম্যাথ প্রবলেম টুকতে লাগল। প্রতিটা সমস্যার সমাধান করার পর কিশোরের দিকে চোরা চাউনি হানল রবিন। দেখে মনে হলো কিশোর ওর পরিকল্পনা বাদ দিয়েছে। ডেস্কে মাথা নুইয়ে মনোযোগ দিয়ে অঙ্ক কষছে ও।

রবিনের প্রায় সবকটা অঙ্ক করা হয়ে গেছে, এসময় একটা কাগজের প্লেন ঠোকর খেল ওর গালে।

ও মুখ তুলে চেয়ে দেখল, কিশোরের ছোঁড়া এক কাগজের গোলা উড়ে গিয়ে মুসার মাথায় পড়ল।

'ফিল্ড গোল!' হেসে উঠে আরেকটা গোলা ছুঁড়ে দিল কিশোর। ওটা সোজা গিয়ে পড়ল মি. বগির খোলা অঙ্ক বইয়ের মাঝখানে।

'টাচডাউন!' বলল কিশোর। এবার উঠে দাঁড়িয়ে নিজস্ব বুগি-উগি টাচডাউন নাচ জুড়ে দিল

'বসে পড়ো, নইলে বগিম্যান ধরবে!' হিসিয়ে উঠল রবিন।

কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। মি. বগি দুপ-দাপ করে গিয়ে সব কটা বাতির সুইচ অফ করে দিলেন। সূচীভেদ্য অন্ধকারে ঢাকা পড়ল গোটা ক্লাসরুম।

পরদিন সকাল। ঠাণ্ডা বাতাসে খটাখট বাড়ি খাচ্ছে ওক গাছের ডাল- পালা। ডানা শিউরে উঠে জ্যাকেটের যিপার টেনে লাগাল।

‘ওরা এখনও আসছে না কেন?’ বলল ডানা। ও আর মুসা রবিন আর কিশোরের জন্য অপেক্ষা করছে।
চোখ ঘুরাল মুসা।
‘মিস্টার বগি যদি সত্যিকারের বগিম্যান হত তা হলে কালকে কিশোরকে আস্ত গিলে খেত।’
‘সুযোগ পেল কোথায়?’ মনে করিয়ে দিল ডানা। ‘বাতিগুলো নিভিয়ে দেয়ার পরই তো মিসেস হকিন্স এসে গেলেন।
মাথা ঝাঁকাল মুসা।
‘তা ঠিক।’
‘কাজেই মিস্টার বগিকে কিশোরকে ধরার জন্যে গত রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে,’ বলল ডানা। তারপর হয়তো রবিনকেও ধরেছে।’
‘তা নয়,’ বলল মুসা, খেলার মাঠের ওপারে আঙুল তাক করল। কিশোর আর রবিন এদিকে দৌড়ে আসছে।
‘কী ব্যাপার? বগিম্যান তোমাদেরকে ধরেছিল?’ ব্যগ্র কণ্ঠে প্রশ্ন করল ডানা।
দাঁত বের করে হাসল কিশোর।
‘আমি রাতে মড়ার মতন ঘুমিয়েছি,’ জানাল।
‘তা তো ঘুমোবেই,’ দায়সারা কণ্ঠে বলল নথি।
‘খাইছে! তো তুমি শেষমেশ বগিম্যানে বিশ্বাস করা বাদ দিয়েছ?’ মুসা প্রশ্ন করল রবিনকে।
রবিন বন্ধুদের সামনে একটা খবরের কাগজ ঝাঁকাল।
‘বগিম্যান গ্রীন হিলস ছেড়েছে।’ এবার শিরোনাম দেখাল।
‘ ‘বব বগি সেই লোক’ ’ ডানা, মুসা আর কিশোর একসঙ্গে পড়ল।
ঢোক গিলল ডানা।
‘তারমানে রবিন ঠিকই ভেবেছিল! খবরের কাগজ বলছে উনি বগিম্যান ছিলেন।’
‘না, তা বলছে না, বোকা কোথাকার,’ বলল কিশোর। ‘পুরোটা পড়ো।’
কাগজে একটা আঙুল দাবাল ও।
‘এতে বলছে বগি সেই লোক যিনি গ্রীন হিলস বম্বারদের জিতিয়ে দিয়েছেন-এবং দলকে পেশাদার লিগে টেনে নিয়ে গেছেন।’
মাথা ঝাঁকাল রবিন।
‘গ্রীন হিলস বম্বাররা গত রাতে শহর ছেড়েছে,’ জানাল। ‘আবার যদি উনি ফিরে আসেন?’ ডানার প্রশ্ন।
‘আসতে পারেন। গ্রীন হিলস সিটি বগিম্যান বোল গেমের জন্যে!’ বলল কিশোর।
‘তারমানে মিস্টার বগি আর আমাদের ক্লাস নেবেন না?’ ডানা জিজ্ঞেস করল।

মাথা ঝাঁকাল রবিন।
‘ওঁকে অন্য কোথাও স্টুডেণ্ট টিচিং শেষ করতে হবে।’
কিশোর খুশিতে চেঁচিয়ে উঠে নিজস্ব বুগি-উগি টাচডাউন নাচ নেচে নিল।
‘যাক, বাবা, ওঁর হাত থেকে বাঁচা গেছে!’
এসময় ঘণ্টা বাজল।
‘তারপরও আমাদেরকে ম্যাথ টেস্ট দিতে হবে,’ বলল রবিন।
কিশোরের নাচ থেমে গেল।
‘কী টেস্ট?’ জিজ্ঞেস করল ও।
চোখ ঘুরাল ডানা।
‘মিস্টার বগি যে টেস্টটার জন্যে আমাদের প্র্যাকটিস করিয়েছেন,’ কিশোরকে জানাল।
কিশোরের নাকের সামনে আঙুল নাচাল মুসা।
‘তুমি দুষ্টামি করছিলে বলে প্র্যাকটিস করনি। তুমি টেস্টের জন্যে রেডি নও।’
খিলখিল করে হেসে উঠল ডানা।
‘দেখা যাচ্ছে বগিম্যান শেষমেশ কিশোরকে ঠিকই ধরেছে!’
***

তিন গোয়েন্দা ভলিউম ১১৬/২ – জলাভূমির আতঙ্ক – রকিব হাসান – সেবা প্রকাশনী – প্রথম প্রকাশ : ২০১০

‘খাইছে!’ চেঁচিয়ে উঠল মুসা। ‘গাছে লাগল তো!’

ম্যানগ্রোভ গাছের প্রায় পাতা ছুঁয়ে উড়ে গেল হাইড্রোপ্লেন। এক জায়গায় জটলা করে আছে গাছগুলো।

ছোট্ট বিমানের নাকটা টেনে তুলল পাইলট রাস্টি কালাহান। ‘ভয় পেলে?’

‘না!’ হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে ভুরুর ঘাম মুছল মুসা। গলা কাঁপছে। ‘কিন্তু আরেকটু হলেই তো লেগে যেত!’

‘সব সময় রোডেও-মেজাজে থাকে কাজিন রাস্টি,’ রবিন বলল। পিছনের সিটে ঠাসাঠাসি করে বসেছে কিশোরের সঙ্গে।

রাস্টি কালাহান ওর দূর সম্পর্কের ভাই, মায়ের পক্ষের। উইকএন্ডে সোয়াম্পল্যান্ড রোডেও দেখতে তিন গোয়েন্দাকে দাওয়াত করেছে। রকি বিচ থেকে ফ্লোরিডার মায়ামি, সেখান থেকে এই গেইটর সোয়াম্পে উড়ে এসেছে ওরা। সোয়াম্পল্যান্ড গুডস-এ নেমে কিছু প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে নিয়ে চলে যাবে রাস্টির ফিশিং ক্যাম্পে। নিরালা ওই ক্যাম্পটাতেই থাকবে কটা দিন।

একটা ‘কী’র কাছাকাছি এল প্লেন। স্থানীয় লোকেরা দ্বীপকে ‘কী’ বলে। দক্ষিণ ফ্লোরিডার এই এভারগ্লেডে এ রকম হাজার হাজার দ্বীপ ছড়িয়ে আছে।

এক ঝাঁক সাদা পাখি উড়ে গেল। রকি বিচ থেকে কিনে আনা ট্র্যাভেল বুকে ছাপা একটা পাখির ছবির সঙ্গে মিলিয়ে দেখে রবিন বলল, ‘ইগ্রেট!’

‘খিদে পেয়েছে কারও?’ পাখি নিয়ে এখন মাথাব্যথা নেই মুসার। এক মুঠো চিপস মুখে পুরল। ‘বহুক্ষণের জন্যে এটাই হয়তো শেষ খাওয়া।’

‘বহুক্ষণ না, মাত্র কয়েক মিনিট,’ রাস্টি বলল। ‘সোয়াম্পল্যান্ড গুডসে পৌঁছে গেছি। খাবার কিনে নেব।’ করাত-ঘাসে ছাওয়া দিগন্ত বিস্তৃত জলাভূমির মাঝখানে বিশাল এক প্রাকৃতিক দীঘির দিকে এগিয়ে চলেছে প্লেন। নীচে নামছে ক্রমশ।

‘স্কি করে ল্যান্ড করাবেন?’ নীচে পানির দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর।

‘হ্যাঁ,’ রাস্টি জবাব দিল। ‘চাকার বদলে রানার লাগানো থাকে হাইড্রোপ্লেনের তলায়। পন্টুনের মতই কাজ করে রানার। এর সাহায্যে পানিতে ভেসে থাকে প্লেন।’

পানি ছুঁলো রানার। তারপর হাঁসের মত ভেসে সোয়াম্পল্যান্ড গুডসের দিকে এগিয়ে গেল বিমান। কিনারে কাঠের জেটি। সেটায় প্লেন ভিড়াল রাস্টি। ওর সঙ্গে ডাঙায় নামল তিন গোয়েন্দা।

পানির কিনারে মস্ত একটা কাঠের ছাউনি। এটাই সোয়াম্পল্যান্ড গুডস। জেনারেল স্টোর। গেইটর সোয়াম্পের একমাত্র বাণিজ্যিক এলাকা। সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিস পাওয়া যায় এখানে। নৌকা এমনকী ঘোড়াও ভাড়া পাওয়া যায়।

মাটিতে পা দিয়েই ডাফেল ব্যাগ থেকে একটা ল্যাসো টেনে বের করল মুসা-লম্বা দড়ির মাথায় ফাঁস পরানো—এর সাহায্যে গরু ধরে কাউবয়রা।

একটা ডক পোস্ট লক্ষ্য করে ল্যাসো ছুঁড়ল ও। 'রকি বিচে পার্কিং মিটারগুলোর ওপর প্রচুর প্র্যাকটিস করেছি। একটাও মিস করিনি। গরু ধরার জন্যে আমি এখন রেডি।'

হাসল কিশোর। 'মিটার আর গরু এক জিনিস নয়। একটা অচল, আরেকটা সচল। সচল প্রাণীর গায়ে ফাঁস পরানো অনেক কঠিন।'

জেনারেল স্টোরের বারান্দায় সবে পা রেখেছে ওরা, পার্কিং লটের দিক থেকে গর্জন শোনা গেল, 'নড়লেই গলা ফাঁক করে দেব!' জলাভূমির আতঙ্ক

ঝট করে ফিরে তাকাল কিশোর। একজন পুলিশ অফিসারের গলায় ছুরি চেপে ধরেছে একজন স্থানীয় ইনডিয়ান।

'আরে, কী করছে!' চেঁচিয়ে বলল রবিন।

রাস্টি সহ সবাই দৌড় দিল সেদিকে।

ওদের দেখে ছুরি নামালো ইনডিয়ান। অফিসারকে ছেড়ে দিল। ধূসর চুলে আঙুল চালাতে চালাতে হাসিমুখে বলল, 'আরে, রাস্টি যে! কেমন আছো?'

'ভাল,' জবাব দিল রাস্টি।

রাস্টির দিকে অবাক চোখে তাকাল রবিন। ওঁকে চেনেন?'

'চিনি, বিশ বছর ধরে, সেই সোয়াম্পল্যান্ড গুডস খোলার সময় থেকেই। ও ডিন ওয়াটারম্যান।

'একটু আগে কী করছিলেন আপনি?' ডিনকে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'আমার গলায় ছুরি চেপে ধরে ডাকাতটা কীভাবে হুমকি দিচ্ছিল ডেপুটি ক্যানারকে দেখাচ্ছিলাম।' ছুরিটা খাপে ভরে রাখলেন ডিন।

'ডাকাত!' ভুরু কুঁচকে গেছে রবিনের।

'হ্যাঁ,' ডিন জানালেন। 'দুদিন আগে মায়ামির একটা ব্যাংকে পঞ্চাশ লাখ ডলার ডাকাতি হয়েছে। প্রচণ্ড ঝড় হচ্ছিল সে-সময়।'

'কিন্তু আপনার গলায় ছুরি চেপে ধরেছিল কেন?' জানতে চাইল রাস্টি।

'পুলিশ রোড ব্লক দিয়েছিল। গাড়িতে করে পালাতে পারবে না বুঝে সোয়াম্পল্যান্ড গুডসে এসে ঢুকল ওরা। এখানে গাড়ি ফেলে আমার একটা

এয়ারবোট নিয়ে পালিয়েছে। বোটের চাবি দেয়ার জন্যে আমার গলায় ছুরি চেপে ধরেছিল।'
কিশোর ও রবিনের দিকে ফিরে রাস্টি বলল, 'করাত-ঘাসের ভিতর দিয়ে সহজেই ছুটে যেতে পারে এয়ারবোট।'
'জানি,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'মাত্র কয়েক ইঞ্চি পানিতেও চলতে পারে।'
ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছিলেন এতক্ষণ ডেপুটি শেরিফ গ্রেগ ক্যানার। পেন্সিলের পিছনটা ঠুকলেন নোটপ্যাডে। ডিনকে বললেন, 'চলুন, তদন্তটা সেরে ফেলা যাক। আপনি বলছিলেন ডাকাতদের চেহারা দেখতে পাননি।
'না, পাইনি। কালো হুড দিয়ে মুখ মাথা সব ঢেকে রেখেছিল, ' ডিন জবাব দিলেন।
'ডাকাতদের বোটটা খুঁজে পেয়েছে পুলিশ?' কিশোর জানতে চাইল।
'আমার এয়ারবোটটার কথা জিজ্ঞেস করছ তো?' ভুরু কোঁচকালেন ডিন।
'না,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'আমি বলছি ডাকাতদের বোটটার কথা। এই জায়গাটার নাম ফ্রগ'স পেনিনসুলা, তাই তো?' ডিন মাথা ঝাঁকালে আবার বলল কিশোর, 'তারমানে এটা উপদ্বীপ। তিন পাশ থেকে ঘিরে রেখেছে পানি। পুলিশের তাড়া খেয়ে পেনিনসুলায় এসে আটকা পড়ত ডাকাতরা, যদি বোটে করে পালাতে না পারত।
ভুরু উঁচু করলেন ডেপুটি ক্যানার। 'ভাল কথা বলেছ তো! এটা তো ভাবিনি! খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে।' নোটবুকে দ্রুত নোট করে নিলেন তিনি। 'প্রচুর রহস্য উপন্যাস পড়ো বুঝি?'
'পড়ে মানে?' রাস্টি বলল। 'রহস্যের মধ্যেই বাস করে ওরা। রহস্যের সমাধান করা ওদের নেশা। রকি বিচে ওরা বিখ্যাত গোয়েন্দা। অসংখ্য জটিল রহস্যের সমাধান করেছে, পুলিশকে সহায়তা করেছে...
রাস্টির প্রশংসা থামানোর জন্য তাড়াতাড়ি বাধা দিল কিশোর, 'তবে এখানে রহস্য সমাধান করতে আসিনি আমরা, ছুটি কাটাতে এসেছি।'
খড়খড় করে উঠল স্কোয়াডকারের রেডিও-স্পিকার। গাড়ির জানালার কাছে গিয়ে কাত হলেন ডেপুটি ক্যানার। রেডিওতে পাঠানো মেসেজ শুনে নিয়ে ডিনকে জানালেন, 'কোস্ট গার্ড। আপনার ছিনতাই হওয়া এয়ারবোটটার সন্ধান পাওয়া গেছে।'
'কোথায়?' ডিন জানতে চাইলেন।
'ফ্লোরিডা বে'র পানির নীচে। ঝড়ে ডুবে গেছে। নিশ্চয় বেঘোরে মারা পড়েছে ডাকাতগুলো। তীর থেকে অত দূরে, দশ ফুট উঁচু ওই ঢেউয়ের মধ্যে বোট ডুবলে কোনমতেই বাঁচা সম্ভব নয়। তারমানে, বোটের সঙ্গে সঙ্গে ডাকাতির মালও এখন

সাগরের তলায়।' স্কোয়াডকারে উঠলেন ক্যানার। 'কথাটা গোপন রাখলে ভাল হয়। পঞ্চাশ লাখ ডলার পানির নীচে আছে শুনলে পঙ্গপালের মত ছুটে যাবে মানুষ।'
স্কোয়াডকারটা চলে গেলে কিশোর বলল, 'ম্যাপে দেখলাম ফ্লোরিডা বে তো বিশাল।'
'হ্যাঁ,'
মাথা ঝাঁকাল রাস্টি। 'গাল্ফ অভ মেক্সিকোর অংশই বলা চলে।'
'ঝড়ের মধ্যে কোন্ সাহসে সাধারণ একটা এয়ারবোট নিয়ে খোলা সাগরে গেল ডাকাতেরা?' নিজেকেই যেন প্রশ্ন করল কিশোর। চিমটি কাটল নীচের ঠোঁটে। ঝড়ের মধ্যে উত্তাল সাগরে যে ওটা ডুবে যাবে, নিশ্চয় জানত ওরা।'
'হয়তো কোনও দ্বীপে পৌছানোর চেষ্টা করছিল,' রবিন বলল। 'কিংবা কিউবায় যাবার মতলব করেছিল।'
'মরিয়া হয়ে গেলে মস্ত ঝুঁকি নেয় মানুষ,' রাস্টি বলল। 'থাকগে, এসব নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই, আমাদের নিজেদেরই অনেক কাজ পড়ে আছে। চলো, আস্তাবলে যাই।' পার্কিং লটের পাশে লম্বা সরু একটা কাঠের ছাউনি দেখাল ও। পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করল। 'রবিন, এই নাও, শপিং লিস্ট। স্টোরে গিয়ে জিনিসগুলো বের করো। মুসা...' ঘুরে তাকিয়ে মুসাকে না দেখে থেমে গেল রাস্টি।
পার্কিং লটের পাশে জাঙ্কইয়ার্ডে মুসাকে দেখতে পেল রবিন। একটা পুরানো মরচে পড়া গাড়ির সাইড মিররে ল্যাসো প্র্যাকটিস করছে।
জেনারেল স্টোরে ঢুকল রবিন। দরজার ওপরে ঝোলানো ঘণ্টা বেজে উঠল। লিস্ট দেখে প্রথমে টিনের খাবারগুলো বের করে কাউন্টারে জড় করতে লাগল ও। পিছনে আবার ঘণ্টা শুনে ফিরে তাকিয়ে দেখে দরজায় দাঁড়িয়ে আছে লম্বা, পেশিবহুল একজন লোক। লাল চুল লাল দাড়ি এলোমেলো হয়ে আছে।
'এই, স্নরকেলিং ইক্যুইপমেন্ট বিক্রি করো তোমরা?' ভারি কণ্ঠস্বর লোকটার।
'স্নরকেল!' হাসল রবিন। 'জলাভূমির ঘাসের দঙ্গলে ডাইভিঙের জায়গা কোথায়?'
লোকটা হাসল না। 'আমি কী-ওয়েস্টে যাচ্ছি।'
'সে তো বহুদূর। এখান থেকে কম করে হলেও একশো মাইল।' রেগে উঠল লোকটা। 'এত কথা বলো কেন? স্নরকেলিং ইক্যুইপমেণ্ট আছে না নেই?'
'আমি এই দোকানে চাকরি করি না।' মাথা ঘুরিয়ে ইঙ্গিতে দোকানের পিছন দিক দেখাল রবিন। 'ওখানে তাকের ওপর ডুবুরির যন্ত্রপাতি দেখেছি।' নিজের কাজে মন দিল ও।

দরজার ঘণ্টা বাজল আবার। মাথা ঘুরিয়ে রবিন দেখে লোকটা চলে গেছে। কৌতূহল হলো ওর। লোকটা কোথায় যায় দেখার জন্য দরজার বাইরে বেরিয়ে এল। ডকের শেষ মাথায় বাঁধা একটা এয়ারবোটে উঠতে দেখল ওকে। বোটে আরেকজন লোক দাঁড়ানো। এদিকে পিছন ফিরে আছে। চেহারা দেখা যাচ্ছে না। মাথায় একটা সাদা কাউবয় হ্যাট। ব্যান্ডে কালো আর কমলা রঙ করা পালক গোঁজা।

লাল চুলওয়ালা লোকটাকে ভালমত দেখার জন্য ডকের দিকে এগোল রবিন। লোকটার ঘোঁৎ-ঘোঁৎ কানে এল, 'নাহ্, এভাবে হবে না!'

সাদা হ্যাট পরা লোকটার চেহারা দেখার আর সুযোগ হলো না রবিনের। হঠাৎ গোড়ালিতে জড়িয়ে গেল কী যেন। হ্যাঁচকা টান লেগে পা'টা সরে গেল মাটি থেকে। উপুড় হয়ে পড়ে যাচ্ছে ও।

জলাভূমির ঘোলা নোনাপানিতে পড়ে গেল রবিন।

'সরি, রবিন!' ঝুঁকে একটা হাত বাড়িয়ে দিল মুসা। রবিনকে টেনে তুলল ডকের ওপর। ওর পা থেকে দড়ির ফাঁস খুলে নিল। 'একটা সচল নিশানার ওপর প্র্যাকটিস করতে চেয়েছিলাম। গরুর কাছাকাছি, মানে, সচল প্রাণী বলতে একমাত্র তোমাকেই পেলাম।'

'যাক, এতবড় একটা সম্মান দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ,' তিক্তকণ্ঠে বলল রবিন। 'পরেরবার দয়া করে আমাকে বাদ দিয়ে গরুর কাছাকাছি অন্য কোন প্রাণী বেছে নিয়ো। দেখো তো, কেমন ভিজিয়ে দিয়েছো।'

আস্তাবলের দিক থেকে দৌড়ে এল কিশোর। 'কী হয়েছে, রবিন?'

'কিছু না,' জবাব দিল রবিন। 'ডুবুরির যন্ত্রপাতি কিনতে একটা লোক দোকানে ঢুকেছিল। লাল চুল লাল দাড়ি। বলল, কী-ওয়েস্টের দিকে যাচ্ছে। ডাইভিং ইক্যুইপমেন্ট আছে কিনা জিজ্ঞেস করল আমাকে। আমি বললাম, আমি এখানে চাকরি করি না। সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেল লোকটা। কোথায় যায় দেখার জন্যে আমিও বেরোলাম। একটা এয়ারবোটে উঠল ও। ওর সঙ্গে সাদা হ্যাট পরা আরেকজন লোক। হ্যাটের ব্যান্ডে কালো আর কমলা রঙের পালক গোঁজা।'

পানির ওপর দিয়ে তাকাল রবিন। সকালের সূর্য চোখে লাগছে। কপালে হাত রেখে আড়াল করল। 'ওই যে, যাচ্ছে!'

সরু একটা খাঁড়ির দিকে এগোচ্ছে এয়ারবোট। কয়েকটা গাছের আড়ালে হারিয়ে গেল।

'খুব তাড়া মনে হচ্ছে ওদের,' কিশোর বলল।

'এই যে, নিয়ে এসেছি!'

রাস্টির ডাক শুনে ফিরে তাকাল ছেলেরা। দুটো ঘোড়া আর একটা খচ্চর নিয়ে এগোতে দেখল রাস্টি ও ডিনকে।
‘এতদূর থেকে এত পথ পাড়ি দিয়ে যখন এসেই পড়লে, ‘ নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল রাস্টি, ‘আসল কাউবয় হওয়ার স্বাদটা নিয়েই যাও। উইকএন্ডের জন্যে ডিন তোমাদেরকে এগুলো ধার দিয়েছে।’
ধূসর ঘোড়াটা ইঙ্গিতে দেখালেন ডিন। ‘ওর নাম গ্রে স্টোন। দ্বিতীয় ঘোড়াটা সাদা রঙের একটা পিন্টো, গায়ে ছোট ছোট বাদামী দাগ। ‘আর ও সোয়াম্প রাইডার।’
বিকট স্বরে হাঁক ছাড়ল খচ্চরটা। ‘আরে আস্তে, আস্তে।’ বুড়ো খচ্চরটার গলায় হাত বুলিয়ে আদর করলেন ডিন। ‘এর নাম বুড়ো জন। রোডেওতে অংশ নিতে আসা লোকেরা আমার আস্তাবল খালি করে সব নিয়ে গেছে, রেখে গেছে একমাত্র এই বুড়োগুলোকেই।’
‘এতেই চলবে, মিস্টার ওয়াটারম্যান,’ রবিন বলল। ‘একটা কিছু তো পেলাম। পায়ে হেঁটে তো আর রোডেওতে যেতে হচ্ছে না।’
‘এরা এখানেই থাক। বিকেল বেলা এসে নিয়ে যেয়ো,’ রাস্টি বলল। ‘এখন চলো, ফিশিং ক্যাম্পে। পেটে খিদে নিয়ে নিশ্চয় অতিথিরা আমাদের পথ চেয়ে বসে আছে।’
দশ মিনিট পর হাইড্রোপ্লেন একটা ছোট দ্বীপের কিনারে নামল। গেইটর সোয়াম্পের পানি এখানে মিলিত হয়েছে ফ্লোরিডা বে’র সঙ্গে। নদীর মোহনার মতই জায়গাটা, জলাভূমির বাড়তি পানি সাগরে পড়ছে।
‘এই দ্বীপের নাম কালাহান’স-কী,’ গর্বের সঙ্গে জানাল রাস্টি ‘আমার দাদার-দাদার নামের সঙ্গে মিলিয়ে একশো বছর আগে রাখা হয়েছিল এই নাম।’
নয়া চাঁদের মত চেহারা দ্বীপটার। বালিতে ভর্তি। পূর্ব তীর ঘেঁষে খুঁটির ওপর বসানো ডজনখানেক কেবিন। ছোট দ্বীপটার নিচু উত্তরাঞ্চল ঘন করাত-ঘাসে ছাওয়া।
ভাসমান ডকের মুরিঙে প্লেন বাঁধতে বাঁধতে রাস্টি বলল, ‘কালাহান’স ফিশিং ক্যাম্পে স্বাগতম। এখানে ফিশিং ক্যাম্প করেছি বলে সবাই আমাকে পাগল ভাবে, কিন্তু আসল সমঝদাররা ঠিকই চিনে নিয়েছে জায়গাটা।’
‘আমার কিন্তু খুব ভাল লাগছে,’ চারপাশে তাকিয়ে বলল রবিন। ‘এত শান্ত। এত চুপচাপ।’
কিন্তু শান্ত পরিবেশ খানখান হয়ে গেল হঠাৎ গর্জে ওঠা শটগানের শব্দে।
‘কে গুলি করল?’ চোখ বড় বড় করে তাকাচ্ছে মুসা।
‘নিশ্চয় হ্যারিস, আমার কেয়ারটেকার,’ উদ্বিগ্ন শোনাল রাস্টির কণ্ঠ। ‘ওর একটা শটগান আছে। কিন্তু কীসের ওপর গুলি চালাল তা তো বুঝতে পারছি না!’

‘চলুন, দেখি,’ বলে শব্দটা যেদিক থেকে এসেছে সেদিকে ছুটতে শুরু করল কিশোর।
করাত-ঘাস গম ক্ষেতের মত ঘন। ঘাসের ডগা কোথাও কোথাও সাত ফুট উঁচু। এর মধ্যে ঢুকে নিজেকে যেন হারিয়ে ফেলল কিশোর। চারপাশে ঘাস ছাড়া আর কোন কিছুই চোখে পড়ছে না।
‘ওরে বাবারে, খেয়ে ফেললরে!’ চিৎকার শোনা গেল।
ঘাস ঠেলে সেদিকে ছুটল কিশোর। ঘাসের লম্বা পাতার ধারাল কিনারা হাতের চামড়ায় আঁচড় কাটছে। এসে পড়ল দাঁড়টানা ছোট একটা নৌকার কাছে। নৌকায় একজন লোক বসা। গালে ধূসর দাড়ি। হাতের শটগানের নল থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। থরথর করে কাঁপছে লোকটা।
মুসাকে সঙ্গে নিয়ে রাস্টিও এসে দাঁড়াল। ‘কী হয়েছে, হ্যারিস!’
‘অ্যালিগেইটর!’ নৌকার পাটাতনে ফেলে রাখা একটা দাঁড়ের অর্ধেকটা দেখাল ও, বাকি অর্ধেকটা নেই। ‘দেখুন, কীভাবে কেটেছে। ক্ষুরের মত ধারাল দাঁত। আস্ত একটা দানব। পনেরো ফুটের কম না। একটা চোখ সাদা। এ রকম অ্যালিগেইটর জীবনে দেখিনি আমি!’
কিশোর জানে, অ্যালিগেইটর হলো কুমির প্রজাতির এক ভয়ঙ্কর প্রাণী। অনেক সময় মানুষখেকো হয়ে ওঠে।
‘ওই দাঁড় দিয়ে আর নৌকা বাওয়া যাবে না,’ রাস্টি বলল। ‘নৌকাটা টেনে আনতে হবে।’
ঘাসের ওপর দিয়ে নৌকাটাকে ডাঙায় টেনে আনা হলো। ফিরে তাকাল কিশোর। দানবীয় অ্যালিগেইটরটা ওদের পিছু নিল কিনা দেখল। কিন্তু স্থির হয়ে আছে পানি। দূরে একটা অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়ল হঠাৎ। পাশের একটা দ্বীপে পাশাপাশি দুটো সাইপ্রেস গাছ আছে, অবিকল একই রকম দেখতে। একটা গাছের উঁচু ডালে একজন মানুষ বসা। ওদের দিকেই তাকিয়ে আছে মনে হলো।
‘মিস্টার কালাহান, ওই দ্বীপে কেউ থাকে?’ কিশোর জিজ্ঞেস করল।
কিশোরের দৃষ্টি অনুসরণ করে ফিরে তাকাল রাস্টি। টুইন সাইপ্রেস-কী’তে? নাহ্, গত একশো বছর ধরে খালি পড়ে আছে। কেন?’
‘কিন্তু একটা লোক…’ থেমে গেল কিশোর। উধাও হয়ে গেছে লোকটা। ‘আশ্চর্য! এক সেকেন্ড আগেও তো ছিল!’
‘নিশ্চয় আজব কিটি’ হ্যারিস বলল।
‘আজব কিটি!’ ভুরু কুঁচকে তাকাল কিশোর।
‘আজব! আজব!’

‘তোমার কাছে আজব! আর তোমার কিছু মাথামোটা বন্ধুর কাছে!’ রেগে উঠল রাস্টি। ছেলেদের দিকে তাকাল। ‘ডিন ওয়াটারম্যানের নাতি কিটি। মিশুক না, এটা ঠিক। তবে আজব বলতে যা বোঝায় তা-ও না। বেশিরভাগ সময় জলাভূমিতে কাটায়, পূর্বপুরুষদের মত। সৌখিন মাছশিকারি আর টুরিস্ট এসে জায়গাটাকে যেভাবে ওলট-পালট করে দিচ্ছে, সেটা ওর পছন্দ না। টুইন সাইপ্রেস-কী’র একটা বিশেষ মর্যাদা আছে ওর কাছে।’
‘আরে,’ এদিক ওদিক তাকাতে লাগল কিশোর, ‘রবিন গেল কোথায়?’
‘রবিন!’ চিৎকার করে ডাকল মুসা। ‘কোথায় তুমি?’
‘এই যে এখানে,’ সাড়া দিল রবিন। ‘তোমরা কোথায়?’
শটগানের গুলির শব্দ শোনার মিনিটখানেক পর ঘাসের জঙ্গলে ঢুকেছিল ও। কোমরসমান উঁচু ঘাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে এখন। সঙ্গীদের কাউকে চোখে পড়ছে না। পানিতে একটা কাঠের টুকরো ভাসতে দেখে তুলে নিল। একটা দাঁড়ের অর্ধেকটা
হুস করে পানির ওপর মাথা তুলল এক বিশাল অ্যালিগেইটর। মস্ত হাঁ করে রবিনকে লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিল ওটা।
ভাঙা দাঁড় দিয়ে ঠেকানোর চেষ্টা করল রবিন। দাঁড়টা কামড়ে ধরল অ্যালিগেইটর। মাথা ঝাঁকি দিয়ে হ্যাঁচকা টানে কেড়ে নিল। চিবিয়ে টুকরো টুকরো করে ফেলল।
লম্বা ঘাসের ভিতর দিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়তে পড়তে ছুটল রবিন। ঠিক পিছনেই রয়েছে অ্যালিগেইটরটা। কোনমতে এসে ডাঙায় উঠল ও। ফিরে তাকাল। ডাঙায় উঠল না আর অ্যালিগেইটরটা। জলাভূমির কালো ঘোলাপানির ভিতর তলিয়ে যাওয়ার আগে অদ্ভুত একটা সাদা চোখ দিয়ে রবিনের দিকে তাকিয়ে রইল যেন দীর্ঘ একটা মুহূর্ত।
রবিনের চিৎকার শুনে পানির কিনার ধরে দৌড় দিল কিশোর। কয়েক কদম পিছনে রয়েছে রাস্টি, মুসা আর হ্যারিস।
‘রবিন, কী হয়েছে?’ কাছে এসে জিজ্ঞেস করল মুসা।
‘আরেকটু হলেই অ্যালিগেইটরের নাস্তা হয়ে যাচ্ছিলাম,’ হাঁপাতে হাঁপাতে জবাব দিল রবিন।
এতক্ষণে কেয়ারটেকারের সঙ্গে ছেলেদের পরিচয় করিয়ে দেবার সুযোগ হলো রাস্টির। ‘ও হ্যারিস স্মিথ, ক্যাম্পের কেয়ারটেকার, এবং আমার স্টিয়ার-রোপিং পার্টনার।’
স্টিয়ার-রোপিং হলো গরুর গলায় ফাঁস পরানোর খেলা, জানে রবিন। হাত বাড়িয়ে দিল। ‘আমি রবিন।’

‘আমাকে শুধু হ্যারিস ডাকলেই চলবে। বিশ্বাস করো আর না করো, একটা কথা বলি, ওই দানব অ্যালিগেইটরটাকে আমাদের পিছনে লেলিয়ে দিয়েছে আজব কিটি। অলৌকিক ক্ষমতা আছে ওর। জলাভূমির প্রাণীকে জাদু করে ওদের দিয়ে যা খুশি করাতে পারে।’
‘আবার শুরু করলে!’ হ্যাট দিয়ে হ্যারিসের কাঁধে আলতো বাড়ি মারল রাস্টি।
‘আজব কিটিটা কে?’ রবিন জানতে চাইল।
‘ডিন ওয়াটারম্যানের নাতি,’ জবাব দিল কিশোর। টুইন সাইপ্রেস-কী’তে গাছের ওপর ওকে কীভাবে বসে থাকতে দেখেছে, বলল।
‘কী হয়েছে?’ ভারি পুরুষকণ্ঠে হাঁক শোনা গেল। ফিশিং ক্যাম্পের দিক থেকে আসতে দেখা গেল একজন লোককে। মাথায় সোনালি চুল, নীল চোখ, পুরু গোঁফ। পিছন পিছন আসছে আরও চারজন, তাদের তিনজন পুরুষ, একজন মহিলা।
‘একটা অ্যালিগেইটর আমাদের আক্রমণ করেছিল, মিস্টার বার্নার!’ জবাব দিল হ্যারিস। ‘বিশাল অ্যালিগেইটর। দুটো ক্যানু জোড়া দিলেও অত লম্বা হবে না। আরেকটু হলেই আমাকে খেয়ে ফেলছিল!’ রবিনকে দেখাল ও। ‘ওকেও নাকি আক্রমণ করেছিল।’
পানির কিনারে গিয়ে দাঁড়ালেন বার্নার। নিচু হয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কী যেন দেখতে লাগলেন। দুই হাতে লম্বা ঘাস সরিয়ে উঁকি দিলেন ভিতরে। ‘দেখে যাও।’
এগিয়ে গেল ছেলেরা। ঘাসের মধ্যে মরা পাতা আর জলজ ঘাস জড় করে রাখা হয়েছে।
‘অ্যালিগেইটরের বাসা!’ চিনতে পেরে আচমকা চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক চ্যানেলে ও দেখেছে এ রকম বাসা।
‘আশপাশে একটা মা-অ্যালিগেইটর আছে,’ মিস্টার বার্নার বললেন। ‘ওই পাতার নীচে ডিম আছে। ডিমের কাছে কাউকে আসতে দেখলেই তেড়ে আসছে।’
‘আশ্চর্য!’ রাস্টি বলল। ‘সাগরের এত কাছে তো কখনও ডিম পাড়ে না অ্যালিগেইটর। পানি এখানে অতিরিক্ত নোনা। আমি তো জানতাম, জলাভূমির দুর্গম জায়গায় মানুষ ও বোটের কাছ থেকে দূরে কোথাও ডিম পাড়ে ওরা।’
‘ঠিকই জানেন, বার্নার বললেন। ‘কিন্তু এই বিশেষ অ্যালিগেইটরটা যে কোন কারণেই হোক দ্বীপের এই কিনারটাকে ডিম পাড়ার জন্যে বেছে নিয়েছে।’
‘তারমানে অ্যালিগেইটরটা মানুষখেকো, হ্যারিস বলল। ‘মানুষকে ভয় পায় না বোঝাই যাচ্ছে। খুঁজে বের করে ওটাকে মেরে ফেলা দরকার।’
‘সমস্যাটা নিয়ে পরে ভাবা যাবে,’ রাস্টি জবাব দিল। ‘দুপুর হয়ে গেছে। চলো, কেবিনে যাই। খেয়ে নিয়ে রোডেওতে যেতে হবে।’

শুকনো কাপড় পরল ছেলেরা। তাজা ট্রাউট ভাজা আর জইয়ের রুটি দিয়ে লাঞ্চ সারল। তারপর রাস্টির চ্যাপ্টা তলাওয়ালা পন্টুন বোটে উঠল। ফিশিং ক্যাম্প থেকে অতিথিদের মেইনল্যান্ডে আনা-নেয়া করে এই ফেরিবোট।

ক্যাম্পে আরও কয়েকজন অতিথির সঙ্গে তিন গোয়েন্দার দেখা হলো। তাদের মধ্যে আছে টনি ও রনি ওয়াকার নামে দুই ভাই, আর হার্ভে কাসনার নামে এক লোক। রোডেওতে প্রতিযোগিতা করতে এসেছে এদের বেশির ভাগই। কাফ-রোপিং, অর্থাৎ বাছুরের গলায় ফাঁস পরানোর খেলায় অংশ নেবে টনি ও রনি। ব্রঙ্কো বাস্টিং মানে বুনো ঘোড়াকে পোষ মানানোর খেলায় অংশ নেবে হার্ভে কাসনার। আর গুজ বার্নার হবে ওয়াইল্ড-বুল রাইডার-খেপা-ষাঁড়ের পিঠে চড়ে টিকে থাকার খেলা।

সোয়াম্পল্যান্ড গুডস-এ পৌঁছল ফেরিবোট। রোডেও গ্রাউন্ডে যাওয়ার জন্য অতিথিদের নিয়ে ওয়াটারম্যানের পিকআপ ট্রাকের পিছনে চড়ল রাস্টি। ছেলেদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলল, 'আমরা গেলাম। তোমরা এসো।'

ধুলো উড়িয়ে ছুটল ট্রাক।

দুটো ঘোড়া আর খচ্চরের মধ্যে কে কোনটাতে চড়ে যাবে এ নিয়ে কোন ওজর-আপত্তি হলো না। নিজের ইচ্ছেতেই বুড়ো জনের পিঠে চড়ল মুসা।

ভালমত ট্রেনিং দেয়া হয়েছে তিনটে জানোয়ারকেই। দুই লেনের রাস্তা ধরে যাওয়ার সময় গাড়ি, ট্রাক কিংবা ঘোড়ায় টানা গাড়িগুলোর কাছে ঘেঁষল না। দূর দিয়ে এগিয়ে চলল। রাস্তার গাড়িঘোড়াগুলো সব সোয়াম্পল্যান্ড রোডেওতে চলেছে।

চলতে চলতে রাস্তায় মাইলফলক চোখে পড়লেই ল্যাসো ছুঁড়ছে মুসা।

'কেমন বুঝছ?' ছয় নম্বর মাইলফলকটা থেকে ফাঁস খুলে নিয়ে হাসিমুখে দুই বন্ধুর দিকে তাকাল মুসা।

'মুসা, তোমার এই ল্যাসো ছোঁড়া বন্ধ করো,' অধৈর্য হয়ে বলল রবিন। 'যে হারে সময় নষ্ট করছো, প্রতিযোগিতার পুরোটাই মিস করব আমরা।'

বিনা প্রতিবাদে দড়িটা কুণ্ডলী পাকিয়ে রেখে দিল মুসা। বাকি পথ আর একবারের জন্যও খুলল না।

.

রোডেওতে রাস্টি আর হ্যারিসের সঙ্গে দেখা হলো ওদের। দ্রুত রোডেও গ্রাউন্ডটা ঘুরিয়ে দেখানোর জন্য নিয়ে চলল রাস্টি। জানাল, জায়গাটার মালিক ক্লিন্ট গিবসন নামে একজন কোটিপতি। একটা ক্যা র‍্যাঞ্চের কিছুটা অংশকে আলাদা করে প্রতি বছর রোডেওর আয়োজন করেন। এ সময় ট্রাক ভর্তি করে রোডেওর জন্য জিনিসপত্র আর গরুঘোড়া নিয়ে আসা হয়। মেইন রোডেও রিঙের চারপাশ

ঘিরে দর্শকদের জন্য জায়গা করে দেয়া হয়েছে, এর নাম গ্র্যান্ডস্ট্যান্ড। রিঙের একপাশে বিশাল সামিয়ানা টাঙানো।
‘ওখানে কী?’ রবিন জানতে চাইল।
‘ফার্মের জিনিসপত্রের প্রদর্শনী, রোডেও রেজিস্ট্রেশন টেবিল, খাবারের দোকান এসব। আয়োজনটা সব মিলিয়ে সেই পুরনো দিনের কার্নিভালের মত।’
‘দূরের ওই বিল্ডিংগুলো কীসের?’ হ্যারিসকে জিজ্ঞেস করল কিশোর।
‘একটা গোলাঘর।
বাকিগুলোতে বাঙ্কহাউস, রোডেও রাইডারদের জন্যে,’ হ্যারিস বলল। ‘পার্কিং লটের শেষ মাথায় ট্রেইলারগুলোতে থাকেন বিচারক ও রোডেও ভাঁড়েরা।’
মূল সামিয়ানাটায় ঢুকল ওরা। প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে হে রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিতে হয়। রাস্টি আর হ্যারিস লাইনে দাঁড়াল গিজগিজ করছে কাউবয় আর দর্শক। সেদিকে তাকিয়ে রবিন জিজ্ঞে করল, ‘প্রতিযোগীরা কোনখান থেকে আসে?’
‘বেশির ভাগই স্থানীয়, ফ্রগ’স পেনিনসুলার বাসিন্দা,’ রাস্টি জানাল। ‘বাকিরা পেশাদার, বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা। রোডেও হবে শুনলেই ছোটে, যেখানেই হোক।’
‘মাত্র দশ ডলার কম, মিস্টার গিবসন,’ সারির সামনে থেকে চেঁচিয়ে বলল লম্বা, হালকা-পাতলা একটা টিনেজ ছেলে।
‘সরি, ইয়াং ম্যান,’ জবাব দিলেন সাদা চুল আর গালে পোড় দাগওয়ালা একজন ভদ্রলোক। তিনিই মিস্টার গিবসন। ‘কাল রো বুল-রাইডিং শুরু হওয়ার আগে যদি দশ ডলার পূরণ করে দি পারো, তোমাকে আমি খেলায় নেব, যাও, কথা দিলাম। কিন্তু আ রাতে শুধু ব্রঙ্কো বাস্টিঙেই খেলতে হবে তোমাকে।’
‘ঠিক আছে!’ হতাশ ভঙ্গিতে দীর্ঘশ্বাস ফেলল ছেলেটা। বার বার একটা মুদ্রা টোকা দিয়ে শূন্যে ছুঁড়ে লুফে নিচ্ছে।
রেজিস্ট্রি খাতায় নাম লিখে নিয়ে একটা অফিশিয়াল নম্বর দিলেন ওকে মিস্টার গিবসন।
ছেলেটা ফিরে তাকাতেই রবিনের সঙ্গে চোখাচোখি হলো। ‘কী দেখছ?’ ভুরু নাচাল ছেলেটা। মারমুখো ভঙ্গি। হতাশায়ই বোধহয়।
‘কিছু না,’ ঝামেলা এড়ানোর জন্য বলল রবিন।
‘দাঁড়াও না, আজ রাতে সবাইকে দেখিয়ে দেব আমি,’ অহঙ্কার ফুটে বেরোচ্ছে ছেলেটার চেহারায়। ‘ব্রঙ্কো-রাইডিং প্রতিযোগিতায় জিতবই।’
আবার মুদ্রাটা ওপরে ছুঁড়ে দিল ও। সোনার মোহর, চিনতে পারল রবিন। চোখ বড় বড় হয়ে গেল ওর। পকেটে টাকা নেই, দশ ডলারের জন্য খেলায় অংশ নিতে

পারছে না, অথচ সোনার মোহর নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে!
‘আমার নাম বিল ওয়াটমোর। বোর্ডের লিস্টে একেবারে প্রথম দিকে দেখতে পাবে আমার নাম।’ অহঙ্কারী ভঙ্গিতে চোখা চোয়ালটা উঁচু করে ধরল ছেলেটা। ‘কারণ, আমি জিতবই।’
কিশোর লক্ষ করল, কাছেই একটা সুভনির স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে গুজ বার্নার স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ছেলেটার দিকে। এগিয়ে এল, ‘এই ছেলে, বেশি বড় বড় কথা হয়ে যাচ্ছে না?’
‘আমি ছেলে নই, মিস্টার,’ ভুরু কুঁচকে তাকাল বিল। ‘ছেলে বলার বয়েস পার হয়ে এসেছি। কে আপনি?’
‘আমার নাম গুজ বার্নার। আমি একজন ব্রঙ্কো বাস্টার। গত বছর নর্থ ডাকোটার ফার্গোতে দেখেছি তোমাকে, তাই না?’
‘অ্যা!’ হঠাৎ করেই আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলল যেন বিল।
‘আমি প্রথম হয়েছিলাম,’ হাসিমুখে বলল বার্নার। ‘যে রকম বড়াই করছ, ওর অর্ধেক ক্ষমতাও যদি তোমার থাকে, স্পন্সরের অভাব হবে না তোমার। প্রতিযোগিতার জন্যে তোমার রেজিস্ট্রেশনের টাকাটা দিয়ে দেবে। তবে তোমার পুরস্কারের টাকা থেকে একটা ভাগ অবশ্যই কেটে নেবে।’
‘স্পন্সর পাওয়ার উপযোগী আমি, তাতে কোন সন্দেহ নেই, ‘ আত্মবিশ্বাস ফিরে এল আবার বিলের।
‘চলো দেখি, তোমার জন্যে একজন স্পন্সর খুঁজে বের করা যায় কিনা,’ বার্নার বলল।
‘আপনি রেজিস্ট্রি করাবেন না?’ জিজ্ঞেস করল হ্যারিস।
‘পরেও করতে পারব।’ বিলের কাঁধে হাত রাখল বার্নার। ওকে নিয়ে চলে গেল।
‘বেশি অহঙ্কার,’ ছেলেটার কথা বলল রাস্টি। রেজিস্ট্রেশন টেবিলের সামনে পৌঁছে গেছে।
‘তাড়াতাড়ি যান,’ রাস্টির হাতে একটা নম্বরের টিকেট ধরিয়ে দিয়ে গিবসন বললেন। ‘আপনার খেলা পনেরো মিনিটের মধ্যেই শুরু হবে।’
‘আমি যাচ্ছি, পরে দেখা হবে,’ কিশোরদের দিকে ফিরে বলল
রাস্টি।
‘গুড লাক!’ রবিন বলল।
তাড়াহুড়া করে চলে গেল রাস্টি।
‘আমার গলা শুকিয়ে গেছে,’ কিশোর বলল। ‘কোকটোক কিছু খাওয়া দরকার। তোমরা খাবে?’
‘খাব তো বটেই,’ মুসা জবাব দিল। ‘সবচেয়ে বড়টা।’

‘তোমরা যাও, আমি নিয়ে আসছি।’
মুসাকে নিয়ে গ্র্যান্ডস্ট্যান্ডের দিকে এগোল রবিন।
কোকের জন্য কনসেশন স্ট্যান্ডের লাইনে দাঁড়িয়েছে কিশোর সামনে দুজন রোডেও প্রতিযোগী তরুণের কথা কানে এল। হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়া শীতকালের ঝড়ে ফ্লোরিডা বে’তে ডুবে যাওয়া ব্যাংক ডাকাতরা মরে গেছে না বেঁচে আছে, এ নিয়ে তর্ক করছে লোকগুলো। কিশোরও তাতে যোগ দিল। কাউন্টারের কাছে পৌঁছতে পৌঁছতে এতটাই খাতির জমিয়ে ফেলল লোকগুলোর সঙ্গে, সেদিন বিকেলে রোডেও প্রতিযোগিতার পর সামিয়ানার পিছনে বারবিকিউতে দাওয়াত পেয়ে গেল।
বড় বড় তিনটে কোকের বোতল হাতে গ্র্যান্ডস্ট্যান্ডের দিকে এগোনোর সময় রাস্টির ফিশিং ক্যাম্প থেকে আসা তিনজন অতিথিকে গভীর মনোযোগে আলোচনা করতে দেখল কিশোর। কানে এল, রনি ওয়াকার বলছে, ‘জলাভূমিতে একটু ঘুরে বেড়ানোর ইচ্ছে ছিল আমার আর টনির, কিন্তু অ্যালিগেইটরটার জন্যে সাহস পাচ্ছি না।’
অ্যালিগেইটরের কথা শুনে কান খাড়া করে ফেলল কিশোর।
‘বেশি সাহস না করাই ভাল,’ বার্নার বলল।
‘আমি তোমাদের সাহায্য করতে পারি,’ ভারি একটা কণ্ঠ ওদের পিছন থেকে বলল। লাল দাড়িওয়ালা একজন লোক সামনে এগিয়ে এল। আমার নাম মরিস মরিসন। সারাজীবন অ্যালিগেইটর ঘাঁটাঘাঁটি করেছি।’ ডান হাতটা উঁচু করে দেখাল ও। কড়ে আঙুলের পুরোটা আর ওর পাশের আঙুলের অর্ধেকটা নেই। ‘পঞ্চাশ ডলার ফি আর দুই রাত সময় দিলে অ্যালিগেইটর সমস্যার সমাধান আমি করে দিতে পারি।’
‘স্পেশাল পারমিশন ছাড়া অ্যালিগেইটর মারা বেআইনী,’ টনি ওয়াকার বলল।
‘অ্যালিগেইটর মারার কথা কে বলছে। আমি ওটাকে ধরে নিয়ে গিয়ে জলাভূমির নির্জন কোন জায়গায় রেখে আসব।’
‘তাহলে পঞ্চাশ ডলার খরচ করা যায়।’ রনি-টনির দিকে তাকাল বার্নার। মানিব্যাগ বের করল। টাকাটা আমিই দিচ্ছি।’
‘তবে আমার একটা অনুরোধ আছে,’ মরিস বলল। ‘আমি রাতের বেলা কাজ করব। ওই সময় আমার আশেপাশে ঘুরঘুর করা চলবে না। বেশি লোকজন দেখলে অ্যালিগেইটরটা লুকিয়ে পড়বে। মাঝরাতের পর থেকে কারফিউ জারি করলাম—গেইটর সোয়াম্পের ধারে কাছে যাবেন না কেউ।’
তিনজনেই মরিসের কথায় রাজি। থেমে দাঁড়িয়েছিল, আবার গ্র্যান্ডস্ট্যান্ডের দিকে পা বাড়াল কিশোর। মুসা আর রবিনকে পাওয়া গেল। কিশোর বলল, ‘রবিন,

তোমার সেই লাল দাড়িওয়ালা লোকটাকে দেখলাম। অ্যালিগেইটরটাকে সরানোর জন্যে তাকে নিয়োগ করেছে গুজ বার্নার।'
'অ্যালিগেইটর শিকারি নাকি লোকটা?' রবিনের প্রশ্ন। 'আমি তো ভেবেছিলাম ও ডুবুরি। স্নরকেল পরে পানিতে ডুব দেয়।'
মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'আমার মনে হয়, দুটোই। অ্যালিগেইটরও শিকার করে, আবার ডুবুরিও। কিন্তু তুমি না বললে কী-ওয়েস্টের দিকে চলে গেছে লাল দাড়িওয়ালা লোকটা?'
ঠিক এই সময় গেট খুলে গেল। ঘোড়ার পিঠে চড়ে শূট থেকে বেরিয়ে রিঙে ঢুকল প্রথম ব্রঙ্কো রাইডার।
'বিল ওয়াটমোর!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা।
পিঠ বাঁকিয়ে লাফানো শুরু করল ঘোড়াটা। অনবরত পিছনের দুই পা ছুঁড়ছে। চাবুকের মত সামনে পিছনে ঝাঁকি খাচ্ছে ওর পিঠে বসা আরোহী। কিন্তু পড়ছে না। শক্ত হয়ে পিঠে চেপে বসে রইল। কিছুক্ষণ পর ঘণ্টা বাজিয়ে ওকে যোগ্য এবং পরের খেলার জন্য নির্বাচিত ঘোষণা করা হলো।
লাফ দিয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে এল বিল। আস্তে করে পা রাখল পুরু ধুলোয় ঢাকা রিঙের মাটিতে। স্বচ্ছন্দ ভঙ্গি। ঢোলা পোশাক পরা, মুখে রঙ মাখা দুজন ভাঁড় বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি করতে করতে ছুটে এসে দু'পাশ থেকে লাগাম ধরে ঘোড়াটাকে সরিয়ে নিয়ে গেল।
'মুসা, ল্যাসো ছুঁড়তে যদি হাত কাঁপে তোমার, ওদের সঙ্গে যোগ দিতে পারো,' ভাঁড়দের দেখিয়ে রসিকতা করল রবিন।
'না জেনে কথা বোলো না,' ঝাঁঝিয়ে উঠল মুসা। 'রোডেও ভাঁড় হওয়া অত সোজা না। ভীষণ কঠিন কাজ। আর খুবই বিপজ্জনক। ওস্তাদ লোক ছাড়া ভাঁড় হতে পারে না।'
দর্শকদের উদ্দেশ্যে বাউ করল বিল। হ্যাট তুলে নাড়ল। রবিন লক্ষ করল, হ্যাটটা সাদা। ব্যান্ডে কমলা ও কালো রঙের পালক পরানো। এয়ারবোটে মরিস মরিসনের সঙ্গে যে লোকটাকে দেখেছিল, তার মাথায়ও এ রকম হ্যাট পরা ছিল।
'রাস্টি আসছে!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা।
শূটের ভিতর দেখা যাচ্ছে রাস্টিকে। ব্ল্যাক ডেভিল নামে একটা কালো ঘোড়ার পিঠে বসে আছে। দরজা খুলে গেল। পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে বেরিয়ে এল ঘোড়াটা। 'কালো শয়তান'ই। নামের সঙ্গে স্বভাবের মিল আছে। পাক খেয়ে ঘুরতে ঘুরতে আরোহীকে পিঠ থেকে ফেলে দেয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু লাগাম ধরে শক্ত হয়ে বসে থাকল রাস্টি। মজা পেয়ে একনাগাড়ে চিৎকার করছে বাচ্চা ছেলের মত। নির্বাচিত ঘোষণা করা হলো ওকেও। ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে এল

ও। বিপুল করতালির মাধ্যমে অভিনন্দন জানাল দর্শকরা। এ অঞ্চলে প্রচুর ভক্ত আছে ওর, বোঝা গেল।
‘হারিক্যানে চড়ে আসবে এখন কিটি ওয়াটারম্যান,’ ঘোষণা দিলেন মিস্টার গিবসন। মুহূর্তে হট্টগোল থেমে গেল। চুপ হয়ে গেল দর্শক।
‘কিটি ওয়াটারম্যান?’ রবিন বলল, ‘কিশোর, হ্যারিসের আজব কিটি না তো? টুইন সাইপ্রেস কীতে যে লোকটাকে দেখেছিলে?’
কিশোর জবাব দেয়ার আগেই ঝটকা দিয়ে খুলে গেল শূটের দরজা। শূন্যে পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে তীব্র গতিতে বেরিয়ে এল আরেকটা ঘোড়া। ভীষণ বেয়াড়া। প্রচণ্ড ঝাঁকি দিয়ে আরোহীকে ফেলার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু আরোহীও কম না। জোঁকের মত লেগে রইল ঘোড়ার পিঠে। নির্বাচিত ঘোষিত হওয়ার ঘণ্টা বাজতেই আলগোছে লাফ দিয়ে নেমে এল ঘোড়ার পিঠ থেকে, তিন গোয়েন্দার একেবারে সামনে।
শীতল কালো চোখ মেলে ছেলেদের দিকে তাকিয়ে রইল কিটি দর্শকদের করতালি থেমে এলে লাফিয়ে রিঙের বেড়া ডিঙাল ও, তিন গোয়েন্দার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে বলল, ‘গেইটর সোয়াম্প থেকে দূরে থেকো, নইলে...’ নইলে কী হবে মুখে না বলে হাত দিয়ে গলায় পোঁচ মেরে বুঝিয়ে দিল।
‘এই শোনো, দাঁড়াও!’ চেঁচিয়ে উঠল রবিন।
কিন্তু ফিরল না কিটি। রিঙের উল্টো দিকের একটা গেট দিয়ে বেরিয়ে গেল।
‘আচ্ছা, হচ্ছেটা কী, বলো তো?’ মুসার প্রশ্ন।
‘জানি না, তবে জানার চেষ্টা করতে যাচ্ছি। তুমি এখানে থাকো, বলে রবিনকে নিয়ে দর্শক বেরোনোর গেটের দিকে ছুটল কিশোর।
বেরিয়ে এসে কিটিকে কোথাও দেখল না। লাল রঙের চওড়া কানাওয়ালা হ্যাট পরা একজন ভাঁড়কে চোখে পড়ল রবিনের, ব্ল্যাক ডেভিলকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে গোলাবাড়ির কাছে আস্তাবলে।
কিটির চেহারা ও পোশাকের বর্ণনা দিয়ে ওরকম কাউকে যেতে দেখেছে কিনা লোকটাকে জিজ্ঞেস করল কিশোর।
আঙুল তুলে গোলাঘরের পিছনের একটা মাঠ দেখাল ভাঁড়।
দূরের বনের দিকে একজন মানুষকে চলে যেতে দেখল কিশোর।
‘জলাভূমিতে যাচ্ছে,’ ভাঁড় জানাল। ‘ওর পিছু নিয়ে লাভ নেই।’
‘কেন?’ মাঠের ওপাশে বনের ভিতর কিটিকে চলে যেতে দেখছে কিশোর।
‘ধরতে পারবে না, তার কারণ,’ ভাঁড় জবাব দিল, ‘এখানকার জলাভূমির প্রতিটি ইঞ্চি ওর চেনা। কোথায় সাপ, কোথায় অ্যালিগেইটরের বাসা, কোথায় চোরাবালি, সব জানে। ওই জলাভূমিতে তোমরা পাঁচ মিনিটও টিকতে পারবে না।’

‘মনে হয় ঠিকই বলছে, কিশোর,’ রবিন বলল। ‘অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। কিটিকে খুঁজে পাব না আমরা।’
‘কিটিকে তারমানে আপনি ভাল করেই চেনেন?’ ভাঁড়কে জিজ্ঞেস করল কিশোর।
‘সারা জীবন এখানে কাটিয়েছি, চিনব না। ও, আমার নাম ডিক, ডিক টোম্যান।’
আচমকা বিরক্ত ভঙ্গিতে চেঁচিয়ে উঠল ব্ল্যাক ডেভিল। পিছনের পায়ে খাড়া হয়ে যেতে চাইছে। তাড়াতাড়ি ঘোড়াটাকে শান্ত করার চেষ্টা করল টোম্যান। ‘সরি, এখন আর কথা বলতে পারব না। ঘরে যাওয়ার জন্যে অস্থির হয়ে গেছে ও।’ মস্ত হ্যাটের কানা ছুঁয়ে মৃদু বাউ করল ভাঁড়। ঘোড়াটাকে টেনে নিয়ে গোলাঘরের দিকে চলে গেল।
মুসাও চলে এসেছে ততক্ষণে। কিশোর বলল, ‘গেইটর সোয়াম্পে কিছু একটা ঘটছে।’
‘কী ঘটছে?’ মুসার প্রশ্ন।
পঞ্চাশ ডলারের বিনিময়ে অ্যালিগেইটরটাকে সরিয়ে দেওয়ার চুক্তি করেছে মরিস, দু’রাত কাউকে জলাভূমিতে যেতে নিষেধ করেছে, এ কথা দুই সহকারীকে জানাল কিশোর। তারপর বলল, ‘মরিসের ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে হবে। রবিন, তোমরা দুজন বিল ওয়াটমোরের ব্যাপারে জানার চেষ্টা করো। মরিসের সঙ্গে ওর সম্পর্কটা কী, বোঝা দরকার। আমি মরিসের খোঁজ নেব।’

.

পরের একটি ঘণ্টা বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ নিল কিশোর। অনেককেই জিজ্ঞেস করল মরিস মরিসনকে চেনে কিনা। ফ্রগ’স পেনিনসুলার স্থানীয় কেউ তো চেনেই না, বাইরে থেকে রোডেও রাইডে অংশগ্রহণ করতে আসা কেউও চেনে না ওকে।
রবিন আর মুসা ওদিকে খুঁজে বেড়াচ্ছে গ্র্যান্ডস্ট্যান্ডে, সামিয়ানার ভিতর। অবশেষে রেজাল্ট বোর্ডের সামনে এসে বিলকে পেল, যেখানে ব্রঙ্কো-রাইডিঙে অংশগ্রহণকারীদের নামের তালিকা টানিয়ে দেয়া হয়েছে।
‘এই, বিল,’ ডাক দিল রবিন।
ফিরে তাকাল বিল। ‘ও, তোমরা।’
‘তোমার খবর কী?’ জানতে চাইল মুসা।
‘আর বোলো না,’ বিড়বিড় করল বিল। ‘দেখো না কী কাণ্ড করে রেখেছে!’
বোর্ডের দিকে তাকাল রবিন। প্রথম দুজন রাস্টি কালাহাল ও কিটি ওয়াটারম্যান। বিলের নাম বারো নম্বরে। রবিন জিজ্ঞেস করল, ‘তোমাকে এত নীচে নামাল কেন? ঘণ্টা না বাজানো পর্যন্ত তো টিকেই ছিলে।’
‘শুধু টিকে থাকলেই হয় না, আরও অনেক ব্যাপার আছে। ঘোড়ার পিঠে বসে থাকার ভঙ্গি, কতটা সাবলীল, কেমন ঘোড়া, এ রকম নানা জিনিস বিবেচনায়

আনা হয়।'
'তোমরা এখানে!' তাড়াহুড়া করে ওদের কাছে এসে দাঁড়াল রাস্টি। 'সোয়াম্পল্যান্ড গুডসে ফিরে যাচ্ছি আমরা। এখুনি যেতে হবে।'
'আমাদের বয়েসীরা একটা বারবিকিউর ব্যবস্থা করেছে,' মুসা জানাল। 'দাওয়াতও পেয়েছি। যোগ দিতে চাচ্ছিলাম।'
'আমার তো কোন তাড়া নেই,' রাস্টি জবাব দিল। 'কিন্তু অতিথিরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। পন্টুন বোটে আমাদের সঙ্গে ফিশিং ক্যাম্পে না গেলে এখানে আটকে পড়বে তোমরা। যাওয়ার আর কোন ব্যবস্থা নেই। '
'আমি ওদের পৌঁছে দিতে পারি,' বিল বলল। 'সোয়াম্পল্যান্ড গুডসে আমার একটা বোট বাঁধা আছে। কালাহান'স ফিশিং ক্যাম্পে যাবে তো ওরা? যাওয়ার সময় আমার পথেই পড়বে।'
'বাড়ি কোথায় তোমার?'
'ফ্রগ'স পেনিনসুলাতেই।'
'গেইটর সোয়াম্প পাড়ি দিয়ে বোটে করে সোয়াম্পল্যান্ড গুডস হয়ে এসেছ?' অবাক মনে হলো রাস্টিকে। 'ফ্রগ'স পেনিনসুলা থেকে হেঁটেও তো এর অর্ধেক সময়ে এখানে চলে আসা যায়।'
জবাব দেয়ার আগে দ্বিধা করল বিল। 'জলাভূমি দিয়ে বোটে চলাচল করতে আমার ভাল লাগে।'
সন্দিহান চোখে বিলের দিকে তাকিয়ে রইল রাস্টি। রবিন লক্ষ করল, অস্বস্তি বোধ করছে বিল। ওর কাছ থেকে তথ্য জানার সুযোগটা হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার ভয়ে তাড়াতাড়ি বলল, 'অনেক ধন্যবাদ তোমাকে, বিল। তোমার সঙ্গেই যাব আমরা। গেইটর সোয়াম্প হয়ে বোটে করে যাওয়াটা নিশ্চয়ই খুব মজার।'
'যা-ই করো, মাঝরাতের আগে যাবে,' রাস্টি বলল। 'অ্যালিগেইটরটাকে সরানোর জন্য টাকা নিয়েছে মরিস। মাঝরাতের পর আর জলাভূমিতে থাকা চলবে না।' পার্কিং লটের দিকে হাঁটতে শুরু করল ও।
'বাঙ্ক-হাউসে গিয়ে চট করে গোসলটা সেরে আসি,' বিল বলল। 'বারবিকিউতে দেখা হবে তোমাদের সঙ্গে।'
বিল চলে গেলে রবিনের দিকে তাকাল মুসা। 'মরিসের কথা বিলকে জিজ্ঞেস করলে না যে?'
'করতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু পরে ভাবলাম বিলের সন্দেহ হয়ে গেলে শেষে কোন প্রশ্নেরই জবাব দেবে না।'
মাথা ঝাঁকাল মুসা। 'তা ঠিক।'

‘প্রথমে এখন কিশোরকে খুঁজে বের করতে হবে,’ রবিন বলল। ‘ও কী জানল, শুনি।’
গরুর খুপরিগুলোর কাছে পাওয়া গেল কিশোরকে। দুজন রোডেও শ্রমিকের সঙ্গে কথা বলছে। রবিন আর মুসাকে দেখে সরে এল কিশোর। ‘এখানে মরিস মরিসনকে কেউ চেনে না।’
বিলের সন্দেহজনক আচরণের কথা কিশোরকে জানাল রবিন। ‘আমার মনে হয় গেইটর সোয়াম্পে অবৈধ কিছু একটা করছে বিল আর মরিস মিলে।’
‘বেআইনীভাবে অ্যালিগেইটর শিকার করছে হয়তো,’ কিশোর বলল। ‘অ্যালিগেইটরের চামড়ার অনেক দাম, চোরাই বাজারে বিক্রি করে।’ চিন্তিত ভঙ্গিতে নীচের ঠোঁটে চিমটি কাটল ও। ‘জলাভূমিতে গিয়ে দেখা দরকার।’
‘আপাতত জলাভূমির কথা বাদ। বারবিকিউতে যাই, চলো,’ বলল মুসা।
.
সামিয়ানার পিছনে গনগনে অগ্নিকুণ্ড ঘিরে বসেছে বেশ কিছু তরুণ- তরুণী। রোডেও শ্রমিকরা খুঁটির মাথায় আলো জ্বেলে দিয়েছে। মস্ত দুটো সিকে গেঁথে গরুর আস্ত রান কয়লার আঁচে পুড়িয়ে কাবাব বানানো হচ্ছে। সুগন্ধ ভুরভুর করছে বাতাসে।
ডেপুটি শেরিফ গ্রেগ ক্যানারকে দেখা গেল ওখানে। পরনে এখন ইউনিফর্ম নেই। সাদা শার্ট, নীল জিনস আর কাউবয় বুট পরেছেন। কথা বলছেন মিস্টার গিবসনের সঙ্গে। কিশোরদের দেখে হাত নাড়লেন।
হাতে একটা ছোট সাইজের কাবাবের সিক নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল বিলকে। থেকে থেকেই সোনার মোহরটায় টোকা দিয়ে শূন্যে ছুঁড়ছে। ‘বুনো ষাঁড়কেও পরোয়া করি না আমি,’ বড়াই করছে ও। ‘কাল দেখো। ব্ল্যাক সাইক্লোনের পিঠে চড়ব।’
‘মিস্টার বার্নার তারমানে একজন স্পন্সর জোগাড় করে দিয়েছেন তোমাকে,’ বিলের কাছে গিয়ে দাঁড়াল কিশোর।
‘হ্যাঁ।’
মোহরটার দিকে ইঙ্গিত করে কিশোর বলল, ‘ওটা কী? তোমার সৌভাগ্যের প্রতীক?’
‘অ্যা? হ্যাঁ, সৌভাগ্যের প্রতীক।’ হাতের মুঠো বন্ধ করে মোহরটা লুকিয়ে ফেলল বিল, যাতে কিশোর আর দেখতে না পায়।
অন্ধকার ছায়া থেকে ক্যাম্পফায়ারের আলোয় বেরিয়ে এল লম্বা, টাকমাথা, কালো চশমা পরা একজন মানুষ। বিলকে বলল, ‘হ্যাঁ, লুকিয়ে ফেলো, খোয়া যাওয়ার আগেই।’

মোহরটা পকেটে ভরল বিল। কিশোরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল, 'ইনি আমার স্পন্সর, মিস্টার ফক্স ডেনভার।'
হাত বাড়িয়ে দিল কিশোর। কর্কশ হাতে কিশোরের হাতটা চেপে ধরে ডেনভার বলল, 'মাছধরা আমার পেশা। রোডেওতে আসি বিনোদনের জন্যে। তোমরা বিলের বন্ধু নাকি?'
'বলতে পারেন। অবশ্য আজই ওর সঙ্গে পরিচয় হলো।'
'ও। তারমানে আমার মতই নতুন পরিচয়।'
'হ্যাঁ,' জবাবটা দিল রবিন। 'সচরাচর এ রকম অপরিচিত রাইডারদেরকেই স্পন্সর করেন নাকি আপনি, সার?'
রবিনের প্রশ্ন শুনে হাসল ডেনভার। 'না, তা করি না। তবে বিলকে দেখে মনে হলো, পারবে, তাই স্পন্সর করলাম। কেন, এ প্রশ্ন কেন?'
'রবিন আসলে বলতে চাইছে বিলের বয়েস কম,' কিশোর বলল। 'আরও অভিজ্ঞ কাউকেই সাধারণত স্পন্সর করা হয় তো।'
'আমার বয়েস কম কে বলল?' রেগে গেল বিল। 'আঠারো! কম হলো? এরচেয়ে কম বয়েসীদেরও স্পন্সর করা হয়। যোগ্যতাটাই আসল কথা।'
কিশোর-রবিন দুজনের কাঁধেই কঠিন হাতের চাপ লাগল হঠাৎ। ওরা দেখল মরিস মরিসন দুই হাতে ওদের কাঁধ ধরেছেন। 'তোমাদের তো এখন ফিশিং ক্যাম্পে বিছানায় থাকার কথা।'
'হ্যাল্লো, মিস্টার মরিসন।' বলে রবিনের দিকে তাকাল কিশোর। 'রবিন, এঁর কথাই তোমাকে বলেছিলাম, অ্যালিগেইটর শিকারি। মিস্টার মরিসন, ও আমার বন্ধু, রবিন।' মুসার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে মুখ ফেরাল ও। কিন্তু কাছাকাছি নেই মুসা। বেশ কিছুটা দূরে আগুনের একেবারে কাছ ঘেঁষে বসেছে, কাবাব ঝলসানো হচ্ছে যেখানে।
মরিসনের সঙ্গে হাত মেলাল রবিন। চট করে তাকাল একবার কিশোরের দিকে। ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল, সকাল বেলা সোয়াম্পল্যান্ড গুডস জেনারেল স্টোরে এই লোকটার সঙ্গেই কথা হয়েছিল। 'আমি তো ভাবলাম,' রবিন বলল, 'কী-ওয়েস্টে চলে গেছেন আপনি।'
চোখের পাতা সরু হয়ে এল মরিসের। মত বদলেছি।'
'বিল ওয়াটমোরের সঙ্গে আপনার আগে থেকেই পরিচয় আছে মনে হচ্ছে?' কিশোরের প্রশ্ন।
'না, নেই।' বিলের দিকে তাকাল মরিস। হাত বাড়িয়ে দিল। 'হাই, বিল।'
ভুরু কুঁচকে গেল কিশোরের।

‘হাই!’ রবিন লক্ষ করল হাত মেলানোর সময় মরিসের কাটা আঙুলের দিকে তাকিয়ে আছে বিল, যেন আগে আর চোখে পড়েনি।
ব্যাপারটা মরিস লক্ষ করল বলে মনে হলো না। কিশোরের দিকে তাকাল। ‘কুইসটনে আমার বাড়ি, লেক ওকিশবির একটা ছোট্ট শহরে। এখানে এসেছি রোডেও দেখতে, আমার এক বন্ধু প্রতিযোগিতা করছে। টাকার প্রয়োজনে অ্যালিগেইটরটা সরানোর কাজ নিয়েছি, পঞ্চাশ ডলার।’ আবার কিশোর ও রবিনের কাঁধ চেপে ধরল ও। ‘কোন প্রশ্ন থাকলে করতে পারো।’
দুজনকে চুপ করে থাকতে দেখে হাত সরিয়ে নিল মরিস। হাঁটতে শুরু করল। পিছু নিতে গেল রবিন। বাধা দিল কিশোর।
‘এসব কী?’ জানতে চাইল ডেনভার।
‘আমিও তো বুঝতে পারছি না,’ রবিন জবাব দিল।
রোডেওর একজন বাদক একটা ট্রাকের পিছনে চেপে এসে হাজির হলো। হাতে একটা বেহালা। নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল, ‘বন্ধুগণ, নাচতে এসো! যার যার জোড়া বেছে নাও!’
খুঁটির মাথায় আলো জ্বেলে ঘিরে দেয়া জায়গাটায় নাচার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ওখানে জড় হয়েছে জনাবিশেক তরুণ-তরুণী
এক ফাঁকে কিশোরকে বলল রবিন, ‘বিল এমন ভান করল, যেন মরিসকে চেনেই না।‘
শুনে ফেলল বিল। ‘এই, কী বলছ?’
শুনেই যখন ফেলেছে আর গোপন করার কোন মানে হয় না। রবিন জিজ্ঞেস করল, ‘বিল, গেইটর সোয়াম্পে কী করছ তোমরা?’
‘মানে?’
‘মানে, কী করছ জানতে চাইছি।’
‘জেরা করছ কেন?’
পিছন থেকে ডেপুটি ক্যানার বলে উঠলেন, ‘করবেই তো। ওরা শখের গোয়েন্দা যে। এটাই তো ওদের কাজ।’
ভয় দেখা গেল বিলির চোখে। পিছিয়ে যেতে শুরু করল।
‘আরে! কোথায় যাচ্ছ?’ বিলকে ধরার জন্য হাত বাড়াল রবিন। আচমকা ঘুরে দৌড় দিল বিল। অগ্নিকুণ্ডের পাশ ঘুরে ওপাশের অন্ধকারে চলে গেল।
‘বিল! আরে এই বিল! দাঁড়াও! দাঁড়াও!’ রবিনও ছুটতে শুরু করল।
অগ্নিকুণ্ডের কাছে বসে নিশ্চিন্তে কাবাব চিবাচ্ছে মুসা। হাত ধরে একটানে ওকে তুলে নিল কিশোর। রবিনের পিছনে ছুটল দুজনে।

অগ্নিকুণ্ডের অন্যপাশে চলে এসেছে, ঠিক এই সময় কারও জুতোয় হোঁচট খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল রবিন।
‘সরি!’ মাটি থেকে রবিনকে টেনে তুলল ফক্স ডেনভার। ‘লাগেনি তো?’
বিলকে আর দেখা যাচ্ছে না। চিন্তিত ভঙ্গিতে ডেনভারের দিকে তাকাল রবিন। ইচ্ছে করে ওকে বাধা দেয়নি তো ডেনভার? জুতো বাড়িয়ে দিয়েছিল, না সত্যিই এটা দুর্ঘটনা?
কাছে এসে দাঁড়াল কিশোর ও মুসা।
ফক্স ডেনভার চলে গেল।
‘চলো,’ রবিনকে বলল কিশোর, ‘ডেপুরি ক্যানারকে জানাই।’ বিকেলের পর থেকে যা যা ঘটেছে, সব ক্যানারকে খুলে বলল ওরা।
‘অদ্ভুত লাগছে,’ ক্যানার বললেন। ‘মরিস মরিসন কিংবা বিল ওয়াটমোর কাউকেই চিনি না আমি। হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। কিটির সঙ্গেও কথা বলা দরকার। কিন্তু ওকে পাওয়াই মুশকিল।’
‘বুল রাইডিঙে প্রতিযোগিতা করার জন্যে কাল বিকেলে কিটি আবার আসবে এখানে,’ কিশোর বলল।
‘ঠিক। কাল বিকেল পাঁচটায়। তখন ধরব ওকে। এখানেই তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে আমার।
‘ঠিক আছে।’ কিশোর জিজ্ঞেস করল, ‘আচ্ছা, ব্যাংক ডাকাতরা যে বোটটাতে করে পালিয়েছে ভাবা হচ্ছে সেটার খোঁজ পেয়েছেন?’
‘নাহ্!’ ভ্রূকুটি করলেন ডেপুটি। ‘এখনও পাইনি। খোঁজা হচ্ছে।’
‘ডাকাতির টাকাও নিশ্চয় পাননি এখনও?’
‘না। মজার ব্যাপারটা হলো, একজন ডাকাতেরও লাশ পাওয়া যায়নি। বেমালুম হাওয়া। ঝড়ের সময় ঢেউয়ের টানে বহুদূরে চলে গিয়ে থাকতে পারে।’
‘আর টাকাগুলোও নিশ্চয় নষ্ট হয়ে গেছে পানিতে ভিজে,’ কিশোর বলল।
‘না, ওই একটা ব্যাপারে আমরা চিন্তিত নই।’
‘মানে?’
‘ওই টাকা পানিতে ভাসে না,’ রহস্যময় কণ্ঠে জবাব দিলেন ক্যানার। ঘড়ি দেখলেন। ‘আমাকে এখন যেতে হবে। গুড নাইট। হ্যাঁ, ডাকাতি নিয়ে তোমাদের মাথা না ঘামালেও চলবে। উন্নতমানের যন্ত্রপাতি আছে কোস্ট গার্ডের। টাকা, লাশ, সবই উদ্ধার করে ফেলবে।’
ডেপুটি চলে গেলে মুসা বলল, ‘আর আমার নাচতে ইচ্ছে করছে না। চলো, ক্যাম্পে যাই।’
‘নাচলে আর কোথায়? সারাক্ষণ তো বসে বসে মাংসই গিললে দেখলাম।’

‘যা-ই হোক, ভরা পেট নিয়ে নাচতে পারব না।’
‘কিন্তু নৌকা ছাড়া যাব কীভাবে?’ রবিনের প্রশ্ন। ‘বিল তো চলে গেছে।’
‘এখানে বসে থেকেই বা কী করব? সোয়াম্পল্যান্ড গুডসে যাই আগে, তারপর দেখি, কোনও ব্যবস্থা হয় কিনা।’
গোলাঘরের দিকে এগোল ওরা। ওদের দেখে ঘোড়া দুটো আর খচ্চরটাকে নিয়ে বেরিয়ে এল ডিক টোম্যান। হেসে বলল, ‘দেরি দেখে আমি তো ভাবলাম ঘোড়া ফেলেই চলে গেছ।’

.

শূন্য হাইওয়ে। আকাশের আধখানা চাঁদের আলোয় কোনমতে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে রাস্তাটা। কিছুক্ষণ নীরবে পথ চলল ছেলেরা। কিশোর-রবিন চুপ। ওদের মনে গভীর ভাবনা। আর মুসা কথা বলারই সুযোগ পাচ্ছে না। খচ্চরটাকে সামলাতেই হিমশিম খাচ্ছে।
‘এমন যদি হয়, মরিস আর বিল গেইটর সোয়াম্পে কিছু পেয়েছে, যেটা জানতে দিতে চায় না কাউকে?’ অবশেষে কথা বলল কিশোর।
‘কী পাবে? ডাকাতির টাকা?’ মুসার প্রশ্ন।
‘ডেপুটি ক্যানার কি বলেছেন, মনে করো। তিনি বলেছেন, ডাকাতরা যা নিয়েছে সে-টাকা পানিতে ভাসে না।’
‘টাকা পানিতে ভাসে না! কথাটা কেমন অদ্ভুত, তাই না?’ রবিন বলল। ‘বিল আর মরিসের ব্যাপারটাও অদ্ভুত। হাত মেলানোর সময় এমন ভান করল, যেন একে অন্যকে চেনেই না। হয়তো সত্যিই চেনে না। আজ সকালে সোয়াম্পল্যান্ড গুডসে সাদা হ্যাট পরা যে লোকটাকে দেখেছি সে অন্য কেউও হতে পারে। চেহারা তো আর দেখিনি।’
‘হ্যাঁ, এটা একটা যুক্তি। আবার এমনও হতে পারে, বিল আর মরিস দুজনেই মিথ্যুক। আমাদের সামনে অভিনয় করেছে।’
‘তাহলে বলতে হয় মস্ত অভিনেতা ওরা।’
সোয়াম্পল্যান্ড গুডসে পৌঁছে দেখা গেল বোট আছে, কিন্তু সবগুলোকেই শিকল দিয়ে বেঁধে তালা লাগিয়ে রেখে চলে গেছেন ডিন ওয়াটারম্যান। তালা খোলা সম্ভব না।
কী করবে চিন্তা করতে লাগল ওরা। হঠাৎ তুড়ি বাজিয়ে মুসা বলল, ‘এসো আমার সঙ্গে।’
জেনালের স্টোরের পিছন দিয়ে ঘুরে ডিনের স্যালভিজ ইয়ার্ডে কিশোর ও রবিনকে নিয়ে এল ও। বিচিত্র চেহারার একটা জলযান দেখিয়ে হেসে বলল, ‘ওই যে আমাদের বাড়ি ফেরার বাহন।’

ভ্রূকুটি করল রবিন। ‘কী ওটা?’
‘প্যাডল বোট। সকাল বেলা ল্যাসো প্র্যাকটিস করার সময় দেখেছি।’
‘ইঞ্জিন কই?’
‘ইঞ্জিন নেই। সাইকেলের মত প্যাডল ঘুরিয়ে চালাতে হয়।’
‘কিন্তু এটাতে করে ফিশিং ক্যাম্পে পৌছতে তো অনন্তকাল লেগে যাবে।
‘উপায় কী? অনন্তকাল লাগলেও একটা সময় তো পৌঁছব। এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে তো যাওয়াই হবে না।’
টেনে-হিঁচড়ে বোটটাকে ডকে নিয়ে এল ওরা। পানিতে নামিয়ে চড়ে বসল। একমাত্র সিটটায় বসল মুসা, যেটাতে বসে প্যাডল খোরাতে হয়। দুই পাশে হাঁটু মুড়ে বসল কিশোর ও রবিন, এমনভাবে যাতে বোটের ভারসাম্য বজায় থাকে। একটু এদিক ওদিক হলেই কাত হয়ে ডুবে যাওয়ার ভয় আছে।
ধীরে ধীরে প্যাডল ঘোরাতে লাগল মুসা। ঘণ্টায় এক মাইল গতিতে চলতে থাকল বোট।
’এই গামলায় করে মাঝরাতের আগে কোনমতেই ক্যাম্পে পৌঁছতে পারব না,’ রবিন বলল। ‘মরিস তো ওদিকে ঘোষণা দিয়ে রেখেছে, মাঝরাতের পর আর পানিতে থাকা যাবে না।
‘যাদের দিয়েছে দিয়েছে, আমাদের তো আর দেয়নি,’ হেসে বলল কিশোর। ‘ভাল বোট না পাওয়াতে এক হিসেবে ভালই হয়েছে। ওর সামনে পড়ে গেলে এত রাতে জলাভূমিতে থাকার একটা ছুতো দেখাতে পারব। বোট জোরে না চললে আমরা কী করব?’
প্যাডল ঘুরিয়ে বোটটা চালানো খুব পরিশ্রমের ব্যাপার। একা একটানা বেশিক্ষণ পারল না মুসা। পালা করে ঘোরাতে লাগল তিনজনে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ক্লান্ত হয়ে পড়ল সবাই।
‘রবিন, চালানো বন্ধ করলে কেন?’ মুসা জিজ্ঞেস করল।
‘পায়ের পেশিতে খিঁচ ধরে গেছে।’
‘তা বললে তো হবে না। ক্যাম্পে পৌঁছতে হলে চালাতেই হবে।’
‘আমার মনে হয় কাছাকাছি চলে এসেছি,’ কিশোর বলল।
ভারি দম নিল রবিন। আবার প্যাডল ঘোরানো শুরু করল।
‘এই, একটু থামো তো!’ আচমকা বলে উঠল মুসা। ‘ওই দেখো!’
বোটের একপাশে কালো আবছামত একটা দ্বীপ দেখা যাচ্ছে, কালো আকাশের পটভূমিতে একজোড়া সাইপ্রেস গাছও চোখে পড়ছে। ওগুলোর সামনে একটা ভুতুড়ে আলো আগেপিছে নড়ে বেড়াচ্ছে, যেন কোন দানবের চোখ।

‘মরিস নিশ্চয় অ্যালিগেইটর ধরতে বেরিয়েছে,’ রবিন বলল। ‘তার বোটের আলো।’
‘আশ্চর্য!’ তাকিয়ে আছে মুসা। ‘আলোটা পানির নীচে!’
‘শব্দ শুনছো!’ ফিসফিস করল রবিন। ‘মানুষ ওরকম শব্দ করে না!’
অদ্ভুত এক ধরনের ঘড়ঘড়ে শব্দ, যেন পানিতে ডুবে টেনে টেনে শ্বাস নিচ্ছে কেউ, নিতে কষ্ট হচ্ছে। এরই ফাঁকে ফাঁকে শোনা যাচ্ছে গুঞ্জনের মত শব্দ।
আলো আর এই শব্দ কীসের না দেখে যাবে না কিশোর। রবিনকে সেদিকে যেতে বলল।
প্যাডল ঘুরিয়ে আলোর দিকে এগোতে শুরু করল রবিন। ওরা চল্লিশ গজ দূরে থাকতে নিভে গেল আলোটা। কেবল আধখানা চাঁদের আলো পানির ওপর আভা সৃষ্টি করে রেখেছে।
‘খাইছে! বুদবুদ!’ আমচকা বলে উঠল মুসা। কণ্ঠের আতঙ্ক চাপা দিতে পারল না।
কিশোর আর রবিনও দেখল পানির নীচ থেকে ওঠা বুদবুদের একটা লম্বা সারি এগিয়ে আসছে বোটের দিকে।
‘কী ওটা?’ রবিনের প্রশ্ন।
‘যা-ই হোক,’ জবাব দিল কিশোর, ‘আমাদের বোটের নীচ দিয়ে যেতে চায়!’
‘অ্যালিগেইটর!’ গলা কাঁপছে মুসার। ‘আজ আর বাঁচব না! মরব সবাই! কোন্ কুক্ষণে যে এই প্যাডল বোটের কথা মাথায় এসেছিল...’ কথা শেষ হলো না ওর।
বোটের তলায় প্রচণ্ড আঘাত হানল কীসে যেন। কাত হয়ে যাচ্ছে বোট।
‘ঝাঁপ দাও, জলদি!’ চেঁচিয়ে উঠল কিশোর।
পুরো কাত হয়ে গেল বোট। একটা পাশ ডুবে গেল। জলাভূমির পানিতে ছিটকে পড়ল তিনজনে।
সঙ্গীদের সাঁতার কাটতে বলে যত দ্রুত সম্ভব দ্বীপের দিকে সাঁতরে চলল কিশোর। সাঁতার কাটার সময় জোরে জোরে পানিতে লাথি মারছে মুসা। আশা, এতে যদি ঘাবড়ে গিয়ে কামড়ে ধরা থেকে বিরত থাকে অ্যালিগেইটরটা।
হঠাৎ ওর পায়ে কাদা ঠেকল। সোজা হয়ে দাঁড়ানো যায়। পানি মাত্র কয়েক ফুট গভীর ওখানে। পা টেনে টেনে হেঁটে এগোল দ্বীপের দিকে। তীরে উঠে দুটো গাছের একটাতে উঠে পড়ল ও। প্রায় টেনে- হিঁচড়ে কিশোর আর রবিনকে তুলে নিল গাছের ডালে। পরিশ্রমে কাহিল হয়ে গেছে।
অ্যালিগেইটরটা কী করছে এতক্ষণে দেখার সুযোগ পেল ওরা। কিন্তু কোথাও চোখে পড়ল না ওটাকে। রহস্যময় সেই আলোও অদৃশ্য।
‘কী করব এখন?’ রবিনের প্রশ্ন।

‘আপাতত একটা আশ্রয় তো পেলাম,’ কিশোর বলল। ‘রাতটা গাছে বসেই কাটাতে হবে। সকাল না হলে আর কিছুই করার নেই।’
কাণ্ডে হেলান দিয়ে গাছের ডালে যতটা সম্ভব আরামে বসার চেষ্টা করল ওরা। সীমাহীন ক্লান্তি। মশার কামড় আর নিশাচর ইগ্রেটের ডাককে উপেক্ষা করে বাকি রাতটা ঘুমিয়ে কাটাল।
সকাল বেলা পাঁজরে খোঁচা খেয়ে ঘুম ভাঙল রবিনের। চোখ মেলে দেখে তীর ঘেঁষে ভেসে রয়েছে পন্টুন বোটটা। একটা মাছধরার ছিপ দিয়ে ওকে খোঁচা দিচ্ছে হ্যারিস স্মিথ।
‘ওখানে কী করছ তোমরা?’ হ্যারিস জিজ্ঞেস করল। ‘এদিকে দুশ্চিন্তায় পাগল হওয়ার জোগাড় আমাদের।’
‘আমাদের খুঁজে বের করলেন কী করে?’ মুসা জানতে চাইল।
‘ওখান থেকেই দেখলাম, গাছে বসে আছো, ছিপের মাথা দিয়ে একশো গজ দূরের দ্বীপটা দেখাল হ্যারিস। খুঁটির ওপর বসানো সারি সারি কেবিন।
‘ফিশিং ক্যাম্প?’ চেঁচিয়ে উঠল রবিন। ‘তারমানে টুইন সাইপ্রেস- কী-তে উঠেছি আমরা!
গাছ থেকে নেমে বোটে উঠল ছেলেরা।
একটা এরোপ্লেনের শব্দ কানে এল। ওদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল রাস্টির হাইড্রোপ্লেন।
‘ভোর থেকে তোমাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে রাস্টি।’ বোটের ইঞ্জিন স্টার্ট দিতে দিতে হ্যারিস বলল, ‘তোমরা ভাল আছো জানিয়ে ওকে নিশ্চিন্ত করা দরকার।’ প্লেনের উদ্দেশে হাত নাড়ল ও।

.

কেবিনে ফিরে প্রথমেই ভালমত সাবান দিয়ে ডলে গোসল করে নিল তিন গোয়েন্দা। শুকনো কাপড় পরল। মুখে, হাতে অজস্র মশার কামড়ের দাগ। শরীরের যেখানেই খোলা পেয়েছে, কামড়েছে।
‘খাইছে! মশা তো না, ড্রাকুলার খালাতো ভাই!’ লোশন লাগাতে লাগাতে বলল মুসা। ‘ঝাঁক বেঁধে এসে নিশ্চয় ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।’
কেবিনের দরজা দিয়ে মাথা ঢুকিয়ে দিল রাস্টি। ‘যাক, ভালই আছো তাহলে।’
‘একে কি ভাল থাকা বলেন?’ মশার কামড় খাওয়া একটা হাত বাড়িয়ে দিল মুসা। অসংখ্য গোটার মত ফুলে উঠেছে কামড়গুলো।
হাসিমুখে ঘরে ঢুকল রাস্টি। গতকাল ও চলে আসার পর থেকে যা যা ঘটেছে সব খুলে বলল কিশোর। ওরা গোয়েন্দা, এটা শোনার পর বিল কীভাবে পালিয়েছিল, জানাল।

‘জলাভূমিতে যে রহস্যময় আলো দেখেছি, সেটার কথা বলবে না?’ ভুরু নাচাল মুসা।
রাস্টি শুনে বলল, ‘চোখের ভুল হতে পারে। ‘ঢেউয়ের মধ্যে চাঁদের আলোকেই অন্য আলো ভেবেছ। কিন্তু আমি ভাবছি অ্যালিগেইটরটার কথা। কাল রাতে তো তোমরা ওটার বাসার কাছে যাওনি। তাহলে হামলা করল কেন?’
‘নিশ্চয় ওটা কিটির পোষা অ্যালিগেইটর,’ মুসা বলল। ‘ওর কথা শোনে। কিটিই ওটাকে আমাদের ওপর লেলিয়ে দিয়েছিল।’
‘উঁহুঁ, আমি মানতে পারলাম না,’ চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল রাস্টি। ‘এক কাজ করি। বিগ সাইপ্রেস সোয়াম্পে আমার এক বন্ধু আছে, সরীসৃপ বিশেষজ্ঞ। অ্যালিগেইটরটার রহস্যময় আচরণের কারণ কেউ যদি জানাতে পারে, সে-ই পারবে।’
‘কথা বলতে হলে তো ওখানে যেতে হবে আপনাকে,’ রবিন বলল। ‘রোডেওর কী হবে? আজ রাতে প্রতিযোগিতায় অংশ নেবেন না?’
‘চলে আসব সময়মত।’
‘আমি যদি আপনার সাথে যাই, কোন অসুবিধে আছে?’ কিশোর বলল।
‘না, অসুবিধে কীসের? চলো।’
‘হাত গুটিয়ে বসে থাকার চেয়ে, আমি আর মুসা গিয়ে বরং যেখানে আমাদের প্যাডলবোট ডুবেছে সে-জায়গাটা দেখে আসি,’ রবিন বলল। ‘দিনের আলোয় দেখলে আসলে কী ঘটেছিল হয়তো বুঝতে পারব।’
‘হ্যাঁ, তা-ই করো,’ কিশোর বলল।
‘একটা বোট লাগবে,’ মুসা বলল। ‘সোয়াম্পল্যান্ড গুডস থেকে ভাড়া নিতে পারি।’
‘হ্যাঁ।’ পায়ের পেশি ডলল রবিন। ‘কাল রাতে প্যাডেল মারতে মারতে জীবন শেষ। জীবনে আর ওই গামলা চালাতে রাজি হবো না আমি।’
কেবিন থেকে একসঙ্গে বেরিয়ে এল চারজনে। হাইড্রোপ্লেনের দিকে এগোচ্ছে ওরা, এ সময় কফির মগ হাতে দৌড়ে এলেন গুজ বার্নার। ‘আবার নাকি তোমরা অ্যালিগেইটরের খপ্পরে পড়েছিলে?’
‘হ্যাঁ, সার,’ কনুইয়ের নীচে চুলকাতে চুলকাতে জবাব দিল মুসা। ‘একদল ড্রাকুলার খপ্পরেও পড়েছিলাম।’
বুঝতে না পেরে হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন বার্নার।
‘বুঝলেন না, সার? মশা, মশা। রক্তচোষা ড্রাকুলার চেয়ে খারাপ। দেখুন না, হাতের কী অবস্থা করেছে।’

‘জলাভূমিতে বাইরে রাত কাটালে কী হয়, শিক্ষা তাহলে হয়েছে, ‘ তীক্ষ্ণ হলো বার্নারের কণ্ঠ।
স্থির দৃষ্টিতে ওঁর দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। সেটা লক্ষ নরম হলো বার্নারের চেহারার কঠোরতা। হাসি ফুটিয়ে বললেন, ‘আজ রাতে নিশ্চয় অ্যালিগেইটরটা ধরে ফেলতে পারবে মরিস। তখন সবাই আমরা নিরাপদ।’
মিস্টার মরিসন কোথায়?’ জিজ্ঞেস করল রবিন। ‘কাল সারারাত তো বাইরেই কাটালাম। ওঁর ছায়াও দেখলাম না।’
‘হয়তো তোমাদের ওদিকটায় যায়নি। অন্য জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেছে।’ রাস্টির দিকে তাকালেন বার্নার। ‘কোথায় যাচ্ছেন আপনারা?’
‘বিগ সাইপ্রেস সোয়াম্প।’
‘ওখানে কী?’
‘অ্যালিগেইটরের খামার।’
মুহূর্তের জন্য বার্নারের মুখে ছায়া নামতে দেখল কিশোর। পরক্ষণে হাসিটা ফিরে এল। ঠিক আছে, যান। ভাল থাকবেন।’ হ্যাটের কানা দু’আঙুলে টিপে ধরে সামান্য মাথা নোয়ালেন তিনি, তারপর কেবিনের দিকে রওনা হলেন তিনি।
মিনিটখানেক পর আকাশে উঠল রাস্টির বিমান। উত্তর দিকে উড়ে গেল।
হ্যারিসের খোঁজে কেবিনগুলোর দিকে এগোল রবিন ও মুসা। বার্নারের কেবিনের জানালার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কথা কানে আসতে থমকে দাঁড়াল রবিন। হাত ধরে টেনে থামাল মুসাকে। শর্টওয়েভ রেডিওতে কথা বলছেন বার্নার, ‘ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই পৌঁছে যাবে ওরা।’
‘ঠিক আছে,’ জবাব শোনা গেল। ‘কী করা যায় দেখছি।’ স্পিকারের খড়খড় শব্দের কারণে কণ্ঠস্বরটা চেনা গেল না। রেডিওর সুইচ অফ করে দিলেন বার্নার।
দ্রুত জানালার কাছ থেকে সরে এল রবিন ও মুসা।
প্রধান কেবিনটায় পাওয়া গেল হ্যারিসকে। বড়শি মেরামত করছে। বলল, ট্রাউট মাছ ধরতে যাবে। রবিন ওদেরকে সোয়াম্পল্যান্ড গুডসে দিয়ে আসার কথা বলায় মুখ গোমড়া করে ফেলল।
বার্নারের রেডিওটার কথা হ্যারিসকে জানাল রবিন।
পাত্তাই দিল না হ্যারিস। ‘এখানে অনেকের কাছেই ওরকম রেডিও আছে। জলাভূমিতে আমরা রেডিও ছাড়া অচল। বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র ব্যবস্থা। আমার কাছেও একটা আছে। তারমানে কি আমাকেও সন্দেহ করবে?’
এর কাছ থেকে কোন সাহায্য পাওয়া যাবে না বুঝে চুপ হয়ে গেল রবিন।

মুসা অনুরোধ করল, ‘গতরাতে আমাদের বোট যেখানে ডুবেছিল, সেখানটা একটু হয়ে যেতে পারবেন? সোয়াম্পল্যান্ড গুডসে যাওয়ার পথেই তো পড়ে।’
মুখটা গোমড়াই করে রাখল হ্যারিস, তবে ‘পারব না’ বলল না।

.

দিনের আলোয় জলাভূমিটাকে রাতের মত অত ভয়ঙ্কর লাগছে না। প্যাডল বোটটাকে পানিতে কাত হয়ে থাকতে দেখল রবিন ও মুসা। পানি কম এখানে। একটা কোণা পানির ওপর বেরিয়ে আছে।
‘ডিনের জিনিস, ওঁকে ফেরত দেয়া উচিত,’ রবিন বলল। পানিতে নামতে হতে পারে ভেবে সাঁতারের পোশাক পরেই এসেছে। তার ওপরে শার্টপ্যান্ট পরেছে। সেগুলো খুলতে শুরু করল।
‘সত্যিই তুমি নামবে ওখানে?’ উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল হ্যারিস। ‘কে জানে ওই ঘোলা পানির নীচে কী আছে!’
‘যা-ই থাক, আমি নামব। আপনারা আমার ওপর চোখ রাখুন, না দেখলে জানাবেন, সঙ্গে সঙ্গে উঠে চলে আসব।’
পন্টুন বোটের গলুইয়ের কাছ দিয়ে পানিতে নেমে গেল রবিন। পানি কম। পায়ের পাতা সোজা করে দাঁড়ালে আঙুল দিয়ে তলার মাটি স্পর্শ করা যায়। ডুবে থাকা বোটটার কাছে এসে দাঁড়াল ও। ফাইবারগ্লাসে তৈরি খোলসের তলায় হাত বুলিয়ে দেখতে লাগল কিছু আছে কিনা। হঠাৎ বলে উঠল, ‘আরে, বোটের নীচে একটা বিরাট ফুটো!’
‘আমি তো আগেই বলেছি, অ্যালিগেইটরের কাজ,’ পন্টুন বোটে দাঁড়ানো হ্যারিস বলল। ‘থুতনি দিয়ে গুঁতো মেরেছে।’
‘থুতনি দিয়ে গুঁতো মেরে বোট ফুটো করেছে?’ বিশ্বাস করতে পারছে না মুসা।
‘আসলে দাঁত দিয়ে কামড়ে বলতে চাইছেন। ‘
‘অ্যালিগেইটরের যে কি ক্ষমতা, তুমি জানো না…’
চেঁচিয়ে উঠল রবিন, ‘ফুটোর ভিতরে কী যেন আটকে রয়েছে। খুব শক্ত করে আটকানো।’
টানাটানি করে জিনিসটা খুলে নিয়ে এল ও। মুসার হাতে দিল। তারপর উঠে এল পন্টুন বোটে।
জিনিসটার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে আছে মুসা ও হ্যারিস। ‘এই হলো কাল রাতের ভুতুরে আলোর রহস্য,’ হাসিমুখে বলল রবিন।
জিনিসটা একটা হেভি-ডিউটি ওয়াটারপ্রুফ টর্চলাইট। গায়ে স্টিকার লাগানো। তাতে লেখা : প্রপার্টি অভ সোয়াম্পল্যান্ড গুডস।

সোয়াম্পল্যান্ড গুডস সরগরম। বিকেল বেলা রোডেও, তাই সকালটাই রোডেওতে আসা টুরিস্টদের কেনাকাটার সময়। রবিন আর মুসাকে দেখেই ভুরু কুঁচকে গেল ডিন ওয়াটারম্যানের। মুখ ঘুরিয়ে ফেললেন। খরিদ্দারদের দিকে বেশি বেশি নজর দিতে লাগলেন। ছেলেরা বুঝল, ওদের এড়াতে চাইছেন তিনি
দোকানে যখন আর একজন খরিদ্দারও রইল না, কথা বলার সুযোগ পেল রবিন, 'একটা এয়ারবোট ভাড়া করতে চাই।'
'বোট নেই।'
কিন্তু কাউন্টারের পিছনের হুকে দুটো চাবি ঝুলতে দেখল রবিন। 'কিছু হয়েছে, মিস্টার ওয়াটারম্যান?'
একটা মুহূর্ত রবিনের দিকে তাকিয়ে রইলেন ওয়াটারম্যান। 'তোমার বাপ-দাদার কবরের ওপর কেউ হাঁটাহাঁটি করলে, কবর মাড়ালে, কেমন লাগবে তোমার?'
ডিন কী বলতে চাইছেন বুঝে গেল রবিন। 'ও, তাহলে কিটি এসে বলে গেছে টুইন সাইপ্রেস-কী'তে আটকা পড়েছিলাম আমরা?
'আটকা পড়েছিলে? কিন্তু কিটি তো বলল সাঁতরে গিয়ে ওই দ্বীপে উঠেছ তোমরা। খোঁজাখুঁজি করেছ।'
'ঠিক বলেনি।'
'ওই দ্বীপটাতে আমার দাদার কবর। আমাদের কাছে দ্বীপটা মহাপবিত্র। কাল রাতে ওখানকার একটা সাইপ্রেস গাছে রাত কাটিয়েছ তোমরা।'
'কাটানোর প্রয়োজন পড়ত না, যদি কিটি আমাদের প্যাডল বোটটা ডুবিয়ে না দিত!' মুসা আর চুপ থাকতে পারল না।
দ্বিধায় পড়ে গেলেন ওয়াটারম্যান। 'জাঙ্কইয়ার্ডে যেটা ফেলে রেখেছিলাম সেটার কথা বলছ?'
'হ্যাঁ। না বলে নিয়েছি, সরি।'
'কিটি ওরকম কাজ করবে না।'
'তাহলে বোটের তলায় এটা এল কীভাবে?' টর্চটা বের করে কাউন্টারে রাখল রবিন। 'আটকে ছিল।' টর্চে লাগানো লেবেলটা দেখাল ডিনকে।
'গতকাল থেকেই টর্চটা খুঁজে পাচ্ছি না।' চোয়াল ডললেন ওয়াটারম্যান। 'মনে হচ্ছে কিটি আমাকে সব কথা বলেনি। '
'ও এখন কোথায়?' জানতে চাইল রবিন।
'সকাল বেলা এসে কিছু জিনিসপত্র বেঁধেছেঁদে নিয়ে গেল। বলল, কয়েকদিন গেইটর সোয়াম্পে থাকবে। পাহারা দেবে। টুরিস্টরা ঘুরতে বেরিয়ে যাতে টুইন সাইপ্রেস-কী'তে উঠে পড়তে না পারে।'
'কিটির সঙ্গে কথা বলতে পারলে ভাল হতো। কোথায় পাওয়া যাবে ওকে?'

কী যেন ভাবলেন ওয়াটারম্যান। দ্বিধা করতে করতে শেষে বলেই ফেললেন, ‘গেইটর সোয়াম্পের পুব ধারে একটা পরিত্যক্ত শিকারির ছাউনিতে ক্যাম্প করে থাকে ও। ওখানে গেলে দেখা হতে পারে।’
‘যাব কীভাবে?’ মুসার প্রশ্ন।
‘বোটে করে।’ এতক্ষণে হাসি ফুটল ওয়াটারম্যানের মুখে। ‘অবশ্যই একটা বোট ভাড়া দেব তোমাদেরকে।’
পাঁচ মিনিট পর এয়ারবোটের চালকের আসনে দেখা গেল মুসাকে। কীভাবে চালাতে হয় বুঝিয়ে দিচ্ছেন ওয়াটারম্যান।
ইগনিশন কী’তে মোচড় দিল মুসা। ঘুরতে আরম্ভ করল পিছনে লাগানো বিশাল ফ্যানটা। প্রবল বাতাসের চাপে বোটের পিছনের ঘাস প্রায় শুয়ে পড়ল পানির ওপর। ইঞ্জিনের প্রচণ্ড শব্দ সহ্য করতে না পেরে কানে হাতচাপা দিল রবিন।
বোটের দড়ি খুলে দিলেন ওয়াটারম্যান।
‘রবিন, হাত সরাও!’ চেঁচিয়ে বলল মুসা। ‘শিকারির ছাউনিতে কীভাবে যেতে হবে, বুঝে নিয়েছ?’
ওয়াটারম্যানের এঁকে দেয়া নকশাটা দেখাল রবিন। ইঙ্গিতে বোঝাল কোনদিকে যেতে হবে।
পূর্ব দিকে রওনা হলো মুসা।
ঘন হয়ে জন্মানো উঁচু ঘাস আর জলজ উদ্ভিদের মধ্যে পথ করে মাত্র কয়েক ইঞ্চি পানির ওপর দিয়েও যেভাবে ছুটে চলে এয়ারবোট, দেখে বিস্মিত হতে হয়।
জায়গামত পৌঁছতে বেশি সময় লাগল না। ইঞ্জিনের শব্দকে ছাপিয়ে চিৎকার করে বলল রবিন, ‘পরের ওই বাঁকটা পেরোলেই দেখা যাবে।’
সত্যিই দেখা গেল। দূর থেকেই কাঠের তৈরি ছাউনিটা চোখে পড়ল ওদের। টিনের চালায় মরচে পড়া। ডেবে গেছে। জানালার পর্দাগুলো ছেঁড়া। পরিত্যক্ত, বোঝাই যায়।
‘লম্বা ঘাসের মধ্যে বোট লুকিয়ে বনের ভিতর দিয়ে হেঁটে যেতে পারি আমরা,’ মুসা বলল। তাহলে কারও চোখে পড়ব না।’
‘ঠিক বলেছো,’ রবিনও একমত।
ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল মুসা। একটা ম্যানগ্রোভ গাছের সঙ্গে বোটের দড়ি বাঁধল। নেমে পড়ল মাটিতে। ম্যানগ্রোভ জঙ্গলের ভিতর দিয়ে হেঁটে চলল দুজনে। মাটি এখানে মোটামুটি শক্ত। পা ডাবছে না তেমন।
কিছুদূর গিয়ে হাত তুলে মুসাকে থামতে ইশারা করল রবিন। দুটো গাছের মাঝখানের ফাঁক দিয়ে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে এখন ছাউনিটা। নীরব। নির্জন। কিটি বা অন্য কোন মানুষের ছায়াও চোখে পড়ছে না।

‘তুমি এখানে থাকো,’ রবিন বলল। ‘কেউ এলে সঙ্কেত দিয়ে আমাকে জানাবে।’
প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে ছাউনির পিছনে একটা জানালার কাছে চলে এল ও। সাবধানে মাথা তুলে জানালা দিয়ে উঁকি দিল। ভিতরে অন্ধকার। কেউ নেই। জানালা টপকে ভিতরে ঢুকল ও।
বাতাস ভেজা। ফাঙ্গাসের ভাপসা গন্ধ। মাছি ভনভন করছে। খোলা জানালাটা দিয়ে ক্রমাগত ঢুকছে-বেরোচ্ছে মাছিগুলো। মেঝেতে খড়ের একটা গদি পাতা। পাশে এক জগ পানি। চোখে আলো সয়ে এলে ঘরের কোণে একটা প্লাস্টিকের বস্তা চোখে পড়ল ওর।
বস্তার ভিতর রয়েছে একটা স্নরকেল, একটা সুইম মাস্ক, আর একটা ছোট যন্ত্র। একটা হাতল আর একটা ডায়াল লাগানো রয়েছে যন্ত্রটায়। ডায়াল ঘোরাতেই গুঞ্জন করে উঠল। সুইম মাস্কের ধাতব ধারগুলোর কাছে যন্ত্রটা আনতেই গুঞ্জনটা অনেক বেড়ে গেল।
‘মেটাল ডিটেক্টর!’ বিড়বিড় করল রবিন। মনে পড়ল, আগের রাতে প্যাডল বোটে বসে জলাভূমিতে অনেকটা এ রকম গুঞ্জন কানে এসেছিল। আরও একটা শব্দের কথা মনে পড়ল। ঘড়ঘড়ে শ্বাস টানার শব্দ।
কলটার ওপর হাত রেখে আপনমনেই হাসল রবিন। অদ্ভুত ওই শ্বাস টানার শব্দ কীসের ছিল, বুঝতে পারছে। মুখে সুরকেল লাগিয়ে পানিতে ডুব দিয়েছিল কেউ। টর্চের আলোয় মেটাল ডিটেক্টরের সাহায্যে পানির নীচে কিছু খুঁজে বেড়াচ্ছিল লোকটা।
হঠাৎ ডেকে উঠল একটা বুনো হাঁস। কান খাড়া করল রবিন।
মুসার সঙ্কেত। কাউকে আসতে দেখেছে ও।
সামনের একটা জানালার কাছে এসে দাঁড়াল রবিন। পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখল একটা ক্যানু এসে তীরে ভিড়েছে। ভোজালীর মত মস্ত একটা ছুরি হাতে ছাউনির দিকে এগিয়ে আসছে কিটি।
তিন লাফে পিছনের খোলা জানালাটার কাছে চলে এল রবিন। নিঃশব্দে জানালা ডিঙিয়ে বেরিয়েই শুয়ে পড়ল মাটিতে। গড়িয়ে গড়িয়ে চলে গেল মাটির একটা ডিবির কাছে। ঢিবিটার গোড়ায় পানি জমে আছে। ভিজে গেল কাপড়। কাদায় মাখামাখি শরীর। তবে কিটির অলক্ষে পালিয়ে আসতে পেরেছে এটাই স্বস্তি।
কেবিনের বেশ কিছুটা দূর দিয়ে ঘুরে মুসার কাছে চলে এল ও।
‘ভিতরে ঢুকেছে কিটি, ফিসফিস করে মুসা বলল। ‘কী দেখলে?’
‘একটা স্নরকেল, একটা সুইম মাস্ক আর একটা মেটাল ডিটেক্টর। কাল রাতে অ্যালিগেইটর গুঁতো মেরে আমাদের বোট ডোবায়নি। মানুষই ডুবিয়েছে। কিটিও হতে পারে। ওসব যন্ত্রপাতি দিয়ে পানির নীচে কিছু খুঁজে বেড়াচ্ছিল ও।’

‘কী খুঁজছিল?’ মুসার প্রশ্ন।
মাথা নাড়ল রবিন। ‘জানি না।’
মরচে পড়া কব্জার ক্যাঁচকোঁচ শব্দ তুলে খুলে গেল ছাউনির দরজা। বেরিয়ে এল কিটি। হাতে স্নরকেল, মাস্ক আর মেটাল ডিটেক্টর।
ঘন ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল মুসা ও রবিন। আড়াল থেকে দেখতে লাগল। ক্যানুটার কাছে হেঁটে গেল কিটি। দুজনকে অবাক করে দিয়ে মেটাল ডিটেক্টরটা আছড়ে ভেঙে ছুঁড়ে ফেলল খাঁড়ির মাঝখানে পানিতে। ভোজালী দিয়ে টুকরো টুকরো করে কাটল স্নরকেল আর মাস্কটা। তারপর ক্যানুতে চেপে চলে গেল।
আরও কিছুক্ষণ চুপ করে রইল দুজনে। অবশেষে কথা বলল মুসা, ‘জিনিসগুলো ওরকম করে ভাঙল কেন? প্রমাণ নষ্ট করল?’
‘না। প্রমাণ নষ্ট করতে চাইলে ওগুলো কেটেকুটে ছাউনির কাছে ফেলে যেত না। কিশোর থাকলে এখন ভাল হতো। ও হয়তো বুঝতে পারত।’
‘এতক্ষণে নিশ্চয় ফিরে এসেছে। চলো, যাই।’
ফিশিং ক্যাম্পে ফিরতেই ছুটে এল উত্তেজিত হ্যারিস। ‘এইমাত্র রেডিওর স্থানীয় সংবাদে খবর শুনলাম বিগ সাইপ্রেস সোয়াম্পে একটা হাইড্রোপ্লেন ক্র্যাশ ল্যান্ডিং করেছে।’
চমকে গেল রবিন। ‘রাস্টি!’
‘কী হয়েছিল?’ ডকে এসে হাজির হয়েছেন গুজ বার্নার।
‘বিগ সাইপ্রেস সোয়াম্পে ক্র্যাশ ল্যান্ডিং, হ্যারিস জানাল। ‘আমার মনে হয় রাস্টির প্লেনটাই।’
‘তাই নাকি!’ চোখ বড় বড় হয়ে গেছে বার্নারের।
‘থাক, আর ভাল সাজার দরকার নেই!’ চেঁচিয়ে উঠল মুসা। ‘কিছুক্ষণ আগে আপনিই ওদের যাওয়ার খবরটা রেডিওতে জানিয়ে দিয়েছিলেন। আপনি বলেননি, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ওখানে পৌঁছে যাবে ওরা? বেশ, কী করা যায় দেখছি।’
হাসলেন বার্নার। ‘বলেছি। এক বন্ধুকে। আমার দুটো ঘোড়া বিক্রি করব। ওগুলোর জন্যে খদ্দের ঠিক করেছে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে পৌছে যাবে ‘ওরা’ বলে ঘোড়াগুলোর কথা বুঝিয়েছি।’
‘আপনার বন্ধুর নাম কী?’
বার্নারকে বিব্রত হতে দেখে বাধা দিল হ্যারিস, ‘দেখো, মুসা, আমার অতিথিদের অভিযুক্ত করে কথা বলার কোন অধিকার তোমার নেই!’
হ্যারিসের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাল মুসা। কড়া একটা জবাব দিতে যাচ্ছিল, এ সময় মেইন কেবিন থেকে বেরিয়ে এল টনি ওয়াকার। ‘হ্যারিস, রেডিওতে রাস্টি

তোমাকে ডাকছে।'
হ্যারিসের সঙ্গে এল মুসা ও রবিন। রিসিভারের সুইচ অন করে হ্যারিস বলল, 'রাস্টি, সত্যিই আপনার সঙ্গে কথা বলছি তো?'
'আমি না, আমার ভূতের সঙ্গে বলছ,' হেসে জবাব দিল রাস্টি। 'ফ্রগ'স পেনিনসুলার পুলিশ স্টেশনে আছি আমি আর কিশোর। ভালই আছি। রবিনদেরকে চিন্তা করতে মানা কোরো।'
থাবা দিয়ে হ্যারিসের হাত থেকে রিসিভারটা কেড়ে নিল রবিন 'কিশোর! কী হয়েছিল?'
'স্যাবটাজ। আরেকটু হলেই গেছিলাম,' রেডিওতে ভেসে এল কিশোরের কণ্ঠ। 'প্লেনের তেলের লাইন নষ্ট করে দেয়া হয়েছে। মরতে মরতে বেঁচেছি। ফিরে আসি। সামনাসামনি সব খুলে বলব।'
'কিছু জেনেছ?'
জেনেছি। চমকে দেয়ার মত খবর। মরিস মরিসন এখানে অ্যালিগেইটরের খামারে চাকরি করত। ক্যাশবাক্স থেকে টাকা চুরি করার অপরাধে ওকে বের করে দিয়েছেন রাস্টির বন্ধু খামারের মালিক মিস্টার ব্রেক জনসন। খামার থেকে তাঁর সবচেয়ে বড় অ্যালিগেইটরটা ডিমসহ গায়েব হয়ে গেছে। রবিন, আমার ধারণা, গেইটর সোয়াম্পের অ্যালিগেইটরটা সেই চুরি যাওয়া অ্যালিগেইটর। খামার থেকে নিয়ে গিয়ে জলাভূমিতে ছেড়ে দেয়া হয়েছে।'
'কিশোর, আমাদের এখানেও খবর আছে। কিটির ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিয়েছি। তোমরা কখন আসছো?'
'ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই। গাড়িতে করে সোজা রোডেও গ্রাউন্ডে চলে যাব। হাইড্রোপ্লেনটা মেরামত করার দায়িত্ব নিয়েছেন মিস্টার জনসন। আগামীকাল তিনি নিজেই ফিশিং ক্যাম্পে পৌঁছে দেবেন বলেছেন।'
ঘড়ি দেখল রবিন। চারটে বেজে পাঁচ। ডেপুটি শেরিফ ক্যানারের সঙ্গে বিকেল পাঁচটায় রোডেও গ্রাউন্ডে দেখা করার কথা ওদের। খুব বেশি সময় নেই আর।
'কিশোর, আমরাও যাচ্ছি। ওখানেই দেখা হবে।'
মুসাকে নিয়ে বাইরে বেরোল রবিন। কী যেন ভাবছে।
'কী ভাবছ?' জানতে চাইল মুসা।
'মুসা, অ্যালিগেইটরের বাসাটা একবার ভাল করে দেখতে চাই।'
'কী দেখবে?'
'জানি না।'
'সময় পাবে?'
'পাব। চলো, যাই।'

দ্বীপের পশ্চিম প্রান্তে রওনা হলো রবিন। যেখানে ওর ওপর হামলা চালিয়েছিল অ্যালিগেইটরটা সেখানে এসে দাঁড়াল। ঘাসের মধ্যে অ্যালিগেইটরের বাসাটা খুঁজে বের করল। বার্নারের মত করেই ঘাস সরিয়ে ভিতরে তাকাল। বাসার ওপর বিছানো মরাপাতা সরাল। ঘাসের মধ্যে মাটি দিয়ে লেপে বাসা বানানো হয়েছে। বাসাটা দেখতে অনেকটা গর্তের মত। মাটির দু'এক জায়গায় কমলা রঙের দাগ। গর্তের তলায় রয়েছে ডিমগুলো।
হাসি ছড়িয়ে পড়ল রবিনের মুখে। মুসার দিকে তাকাল। 'বুঝলে?'
'কিছুই না। আমি অ্যালিগেইটর বিশেষজ্ঞ নই।'
'এটা বোঝার জন্যে বিশেষজ্ঞ হওয়া লাগে না। ওই বাসা মানুষের তৈরি। গর্তের দেয়াল এত নিখুঁতভাবে মাটি দিয়ে লেপতে পারবে না অ্যালিগেইটর। তা ছাড়া দেয়ালে কমলা রঙের দাগ দেখতে পাচ্ছ?'
'কী ওগুলো?'
'মরচের দাগ! বেলচা থেকে লেগেছে। গর্ত বানানোর জন্যে বেলচা দিয়ে মাটি তোলা হয়েছিল।'
'তারমানে ডিমগুলো সত্যি সত্যি অন্য কোনখান থেকে এনে রাখা হয়েছে?'
'অন্য কোনখান থেকে নয়, বিগ সাইপ্রেস অ্যালিগেইটর ফার্ম থেকে।'
'কিন্তু এতবড় জানোয়ারটাকে চুরি করে আনল কীভাবে এখানে?'
'সেটাই তো বুঝতে পারছি না....'
বাঁয়ে ঘাসের মধ্যে খসখস শব্দ শুনে ফিরে তাকাল রবিন। বিশাল এক অ্যালিগেইটরের মাথা চোখে পড়ল। একটা চোখ একেবারে সাদা। ওই চোখ ওর পরিচিত
বাসার দিকে এগোচ্ছে অ্যালিগেইটর।
'খাইছে! রবিন, পালাও!' বলেই ঘুরে ডাঙার দিকে ছুটল মুসা।
পানির কিনার থেকে বহুদূরে এসে থামল মুসা। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'আমরা কি অ্যালিগেইটরের পেটে চলে গেছি?'
'এখনও যাইনি!' হাঁপাচ্ছে রবিনও।
ফিশিং ক্যাম্পে পৌছল ওরা। পন্টুন বোটে করে চলে গেছে অতিথিরা। রবিন আর মুসাও দেরি না করে রওনা হলো। এয়ারবোটে করে সোয়াম্পল্যান্ড গুডসে পৌঁছতে মাত্র পনেরো মিনিট লাগল।
আগের দিন খচ্চর সামলাতে কষ্ট হয়েছে মুসার, তাই আজ ওকে ঘোড়ায় চেপে যেতে বলল রবিন। রাজি হলো না মুসা। বলল, বুড়ো জনের ওপর ওর বিশেষ মায়া পড়ে গেছে। কথা না বাড়িয়ে একটা ঘোড়ার পিঠে চড়ে দ্বিতীয়টাকে টেনে নিয়ে এগোল রবিন। ফেরার সময় ঘোড়াটা কিশোরের প্রয়োজন হবে।

আগের দিনের চেয়ে বেশি লোক এসেছে আজ রোডেওতে। বারবিকিউ করা হয়েছিল যেখানে, সেই জায়গাটার কাছে পাওয়া গেল কিশোরকে।
‘ডেপুটি ক্যানার কোথায়?’ জানতে চাইল রবিন।
‘আমারও তো সেটাই প্রশ্ন!’ জবাব দিল কিশোর। ‘পাঁচটায় থাকার কথা। সাড়ে পাঁচটা বাজে।’
অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। শিকারির কেবিনে যাওয়ার কথা কিশোরকে জানাল রবিন। প্যাডল বোটের নীচে পাওয়া টর্চটার কথা বলল। কিটি ওয়াটারম্যানকে ওর সন্দেহ, সেটাও জানাল।
‘হুঁ!’ মাথা ঝাঁকাল কিশোর। ‘সন্দেহজনক।’
‘মরিস, বিল আর কিটি, হয়তো তিনজনেই জড়িত,’ মুসা বলল। ‘গুজ বার্নারকেই বা বাদ দেব কেন তাহলে?’ বার্নারের ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে আড়ি পেতে শোনা কথাগুলো কিশোরকে জানাল রবিন। ওই লোকটার আচরণও সন্দেহজনক। কিশোর, বিল আর কিটিকে রোডেওতে দেখেছো?’
‘না। ওয়াইল্ড বুল রাইডিং শুরু হবে শীঘ্রি। রিঙে না এলে বাঙ্কহাউসে পাওয়া যাবে।’
‘চলো, যাই। দেখে আসি।’
‘তোমরা যাও,’ কিশোর বলল। ‘আমার কাজ আছে।’
‘ক্যানারের জন্যে অপেক্ষা করবে?’
‘না। মিস্টার সাইমনকে ফোন করব।’
‘কেন?’
‘তথ্য জানার জন্যে।’

.
রকি বিচে ফোন করতে গেল কিশোর, শখের গোয়েন্দা মিস্টার সাইমনের বাড়িতে। রবিন আর মুসা চলে এল বাঙ্কহাউসে। রোডেওর জন্য তৈরি হচ্ছে খেলোয়াড়রা। ভীষণ ব্যস্ততা। কাউবয়রা কেউ বুট পরছে। আগের দিনের জখমে মলম লাগাচ্ছে কেউ। যারা সেদিন খেলবে না, তারা পিছনের টেবিলে বসে তাস খেলছে।
একটা লকারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে বিল ওয়াটমোর। রবিনকে দেখে আরেক দিকে সরে যেতে চাইল। সামনে দাঁড়িয়ে ওকে আটকাল রবিন।
‘আরে, রবিন!’ বিল বলল।
‘বারবিকিউতে ওরকম দৌড়ে পালিয়েছিলে কেন?’
‘সে-কৈফিয়ত কি তোমাদের দিতে হবে?’ রেগে উঠল বিল। ‘ছাড়ো। রিঙে যাব। একটা পাজি ষাঁড়ের পিঠে চড়তে হবে আজ আমাকে। ব্ল্যাক সাইক্লোন।

মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে।'
'বুল রাইডিং খুব বিপজ্জনক খেলা,' মুসা বলল। 'তোমার মত এত কম বয়েসে তো কেউ খেলে না।'
'তাতে তোমাদের কোন অসুবিধে আছে?' রবিনের পাশ কাটিয়ে গিয়ে লকারের সামনে দাঁড়াল বিল। কম্বিনেশন লকের ডায়াল ঘুরিয়ে লকার খুলল। ভিতর থেকে থাবা দিয়ে একটা হ্যাট তুলে নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল।
'ওটা তোমার হ্যাট!'
'হ্যাঁ। কেন, কী হয়েছে?' অবাক মনে হলো বিলকে।
রবিনও অবাক। বিলের হাতে একটা কালো হ্যাট, লাল পালক লাগানো। 'তোমার কমলা-কালো পালক লাগানো সাদা হ্যাটটা কোথায়?'
'সরো, আমি যাই!' রবিনকে ঠেলে সরিয়ে পাশের একটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল বিল 1.
'ও হ্যাট বদল করল কেন?' নিজেকেই যেন প্রশ্ন করল রবিন।
'ওকে যে সন্দেহ করছি, জেনে গেল নাকি?'
'মনে হয়,' মুসা বলল। 'বয়েস কম বলাতে রেগে গেল কেমন দেখলে না। হ্যাটের কথা জিজ্ঞেস করলে, জবাব দিল না...'
'রবিন!' দৌড়ে আসতে দেখা গেল কিশোরকে। 'সাংঘাতিক খবর আছে। গেইটর সোয়াম্পে কী খোঁজা হচ্ছে জেনে গেছি। মিস্টার সাইমনের কাছে জানলাম, ডাকাতরা মায়ামির ব্যাংক থেকে টাকার বান্ডিল চুরি করেনি।'
'তাহলে কী চুরি করেছে?' ভুরু নাচাল মুসা।
'সোনার মোহর!'
'তিনি জানলেন কীভাবে?'
'তাঁকে সব কথা জানিয়ে খোঁজ নিতে অনুরোধ করেছিলাম।'
অবাক হয়ে একটা মুহূর্ত কিশোরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল রবিন। বিড়বিড় করে বলল, 'শিকারির ছাউনিতে মেটাল ডিটেক্টর...এ টাকা পানিতে ভাসে না -ক্যানারের মন্তব্য... বিলের কাছে সোনার মোহর...সব এখন খাপে খাপে বসে যাচ্ছে!'
'একটা কথা ভেবে দেখো, কিশোর বলল। 'এয়ারবোট নিয়ে পালানোর সময় ডাকাতরা যদি বুঝে গিয়ে থাকে ওদের পিছু নেয়া হয়েছে, কী করবে? মালসহ নিশ্চয় হাতেনাতে ধরা পড়তে চাইবে না। জলাভূমির পানিতে মোহরের বস্তা ফেলে দেয়াটা ওদের জন্যে নিরাপদ।'
'কিন্তু তাহলে এত খোঁজাখুঁজি কেন?' রবিনের প্রশ্ন। 'পানিতে বস্তা ফেলে নিশানা রেখে গেলেই তো পরে সময়-সুযোগমত এসে তুলে নিতে পারত।'

‘আমার ধারণা, ওরা ঠেলে ফেলেনি,’ মুসা বলল। ‘ঝড়ের মধ্যে ওদের অজান্তে বোট থেকে পড়ে গেছে। আর তা-ই যদি হয়ে থাকে, এতবড় জলাভূমিতে খুঁজে বের করা খুব কঠিন।’
‘হ্যাঁ, সত্যিই কঠিন।’ নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার কিশোর। মুসার কথাটা ভেবে দেখল। তারপর বলল, ‘তারমানে বিল ওয়াটমোরের আসল পরিচয় জানে এমন কাউকে ওর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা দরকার।’ বাঙ্কহাউসের পিছন দিকে বসা তাস খেলুড়েদের দিকে তাকাল ও। রোডেও ভাঁড় ডিক টোম্যানকে চিনতে পারল। ভাঁড়ের মুখে এখন সাদা মেকআপ নেই, লাল রঙের বিশাল কানাওয়ালা হ্যাটও নেই।
‘মিস্টার টোম্যান?’ টেবিলের দিকে এগোল কিশোর। ‘খেলার মধ্যে বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত। বিল ওয়াটমোরকে নিশ্চয় চেনেন আপনি?’
‘কোন বিল? যে কাল রোডেওতে প্রতিযোগিতা করল?’
‘হ্যাঁ।’
‘চিনি না। কালকেই দেখলাম। কেন?’
‘তার সম্পর্কে জানতে চাই।’
‘জানতে চাইলে বই দেখো।’
‘বই?’
‘রোডেও বুক। মিস্টার গিবসনের কাছে এক কপি আছে। ফ্লোরিডার সমস্ত রোডেও রাইডারদের নাম আর তথ্য ওই বইতে পাবে।’ হাতের তাসগুলো টেবিলে ছুঁড়ে ফেলল টোম্যান। ‘আমার রোডেওর সময় হয়ে গেল। যাই। মেকাপ নিতে হবে।’
টোম্যানকে ধন্যবাদ দিল কিশোর।
উঠে পাশের একটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল টোম্যান।
‘আমি মিস্টার গিবসনের কাছে বই দেখতে যাচ্ছি,’ কিশোর বলল। ‘তোমরা গ্র্যান্ডস্ট্যান্ডে চলে যাও। আমিও আসছি। রাস্টির খেলা মিস করতে রাজি নই।’
‘কিন্তু কিটিকে তো দেখলাম না কোথাও,’ রবিন বলল।
‘দেখা দিতে ভয় পাচ্ছে বোধহয়,’ মুসা বলল।
‘কিটি পাচ্ছে ভয়?’ হেসে মাথা নাড়ল রবিন। ‘ও ভয় পাওয়ার বান্দা নয়। আশেপাশেই আছে কোথাও। মুসা, তুমি গিয়ে ভাল জায়গায় আমাদের জন্য দুটো সিট রাখো। আমি কিটিকে খুঁজতে যাচ্ছি।’
তিনজন তিনদিকে চলল ওরা। মিস্টার গিবসনের ট্রেইলারের কাছে যখন পৌছল কিশোর, ট্রেইলার থেকে তখন বেরোচ্ছেন তিনি। রোডেও বুকটার কথা জিজ্ঞেস করল কিশোর।

‘আমাকে এখুনি মেইন রিঙে অ্যানাউন্সমেন্ট বুদে যেতে হবে।’ কিশোরের মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু ভাবলেন মিস্টার গিবসন। দ্বিধা করে জিজ্ঞেস করলেন, ‘বই দেখাটা কী জরুরি?’
‘হ্যাঁ। মায়ামিতে ব্যাংক ডাকাতির ব্যাপারে কিছু তথ্য দরকার।’
‘কে তুমি?’
‘ফিশিং ক্যাম্পের মালিক রাস্টি কালাহানের বন্ধু। শখের গোয়েন্দা।’
এক মুহূর্ত দ্বিধা করলেন মিস্টার গিবসন। চাবি দিয়ে ট্রেইলারের দরজার তালা খুললেন। ভিতরে ঢুকে ডেস্ক থেকে একটা মোটা বই তুলে নিয়ে কিশোরকে দিলেন। ‘সাবধানে রেখো। দেখা শেষ হলে অ্যানাউন্সার বুদে আমাকে দিয়ে এসো।’
কনসেশন স্ট্যান্ডের কাছে আলো আছে। বইটা উল্টে দেখতে শুরু করল কিশোর। দশ মিনিট পর বন্ধ করল। মুসা ও রবিনের খোঁজে চলল।
বুলেটিন বোর্ডের ‘কাছে মুসাকে পাওয়া গেল। হাতে একটা আধখাওয়া কর্ন ডগ। চেহারায় বিস্ময়।
‘কী হয়েছে, মুসা?’
ঘুরে তাকাল মুসা। ‘লিস্টে ওর নাম নেই। ‘
‘বইতেও খুঁজে পেলাম না। গত তিন বছরে যারা প্রতিযোগিতা
করেছে, তাদের মধ্যে বিলের নাম নেই…’
‘আমি বিলের কথা বলছি না। গুজ বার্নারের কথা বলছি।’
‘কী?’
‘খেতে খেতে মনে হলো লিস্টটা একবার দেখি। কিন্তু বার্নারের নাম নেই। ও বলেছে, নর্থ ডাকোটার ফার্গোতে নাকি ব্রঙ্কো-বাস্টিঙের খেলায় ট্রফি পেয়েছে। অথচ এখানে এসে খেলায় নাম পর্যন্ত লেখায়নি। একজন রোডেও খেলোয়াড়ের জন্যে অস্বাভাবিক না ব্যাপারটা?’
চোখ বড় বড় হয়ে গেল কিশোরের। ‘এক সেকেন্ড!’ হাতের বইটা খুলে দ্রুতহাতে পাতা ওল্টাতে শুরু করল ও। খানিকক্ষণ দেখে মাথা নাড়ল, ‘নাহ্, ব্রঙ্কো-বাস্টিঙে ট্রফি পাওয়া তো দূরের কথা, নামই নেই ওর।’

.

পুরো রোডেও গ্রাউন্ড চষে ফেলল রবিন। আগের দিনের পর কিটিকে আর কেউ দেখেনি।
গরুর ঘরগুলোর কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় ফিসফিসে কথার শব্দ কানে এল ওর। থেমে দাঁড়িয়ে কান পাতল। বিশাল জানোয়ারগুলোর জোরাল নিঃশ্বাস আর ঘোঁৎ-ঘোঁৎ কানে এল। তারপর আবার কথা শোনা গেল।

মাথা নিচু করে, পা টিপে টিপে বেড়ার ধার ঘেঁষে নিঃশব্দে এগিয়ে চলল ও। চলে এল একটা গেটের কাছে। গেটের ওপরে লেখা : ব্ল্যাক সাইক্লোন। ভিতরে একটা মস্ত ষাঁড়, গায়ের রঙ কয়লার মত কালো।
গরুটার কানে কানে কথা বলছে কিটি ওয়াটারম্যান। 'তুই একটা মস্ত যোদ্ধা, সাইক্লোন। আজ তুই আমাকে জেতাবি। পিঠ থেকে ছুঁড়ে ফেলবি না। আজকের রাতটা আমার।' হঠাৎ ঘাড় কাত করে কান পাতল ও। জোরে জোরে বলল, 'কে জানি গেটের বাইরে আড়ি পেতেছে। বেজির মত উঁকিঝুঁকি মারছে। দাঁড়া, দেখে আসি।'
টের পেয়ে গেছে কিটি। আর লুকিয়ে থাকতে পারবে না বুঝে সোজা হয়ে দাঁড়াল রবিন। 'আমি বেজি নই।'
মসৃণ ভঙ্গিতে এক লাফে বেড়া ডিঙিয়ে গেটের বাইরে চলে এল কিটি। রবিনের মুখোমুখি দাঁড়াল।
'বিকেল বেলা আপনাকে দেখেছি,' হেসে বলল রবিন। 'ভোজালী হাতে।'
'শিকারির ছাউনিতে যন্ত্রপাতিগুলো তাহলে তোমরাই রেখে এসেছিলে।'
'আমরা রাখব কেন? স্নরকেল আর মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে আমাদের কী কাজ?'
চোখের পাতা সরু হয়ে এল কিটির। 'অ্যান্টিক খুঁজতে গিয়েছিলে, আমি জানি। সেমিনোলদের গুপ্তধন, তীরের মাথা, এসব জিনিস। দ্বীপে উঠে আমাদের পূর্বপুরুষদের সমাধিস্থানের পবিত্রতাও নষ্ট করে এসেছ।'
'আপনি অযথা আমাদের দোষ দিচ্ছেন, কিটি।'
রবিনের কথা যেন কানেই গেল না কিটির। 'রাস্টি কিন্তু ওরকম না। ও আমাদের পূর্বপুরুষদের শ্রদ্ধা করে, দ্বীপের পবিত্রতাও নষ্ট করতে যায়নি কখনও। কিন্তু তুমি আর তোমার দুই বন্ধু মোটেও ভাল না। বড় বেশি নাক গলানো স্বভাব তোমাদের।'
'আমরা দ্বীপের পবিত্রতা নষ্ট করতে যাইনি, ব্যাংক ডাকাতদের খোঁজ করছি।'
'মিথ্যে কথা বলছ!'
'আপনার দাদাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন।'
'তুমি একটা মিথ্যুক!'
রবিন বুঝল, ওকে মারার ছুতো খুঁজছে কিটি। বাঁচিয়ে দিল মিস্টার গিবসনের একজন কাউহ্যান্ড। দুজনের মাঝখানে এসে দাঁড়াল। 'এই, কী হচ্ছে! বুল রাইডিং শুরু হবে এখুনি। চলো, চলো!'
'পরে দেখব তোমাকে,' রবিনকে শাসিয়ে গটমট করে চলে গেল কিটি।
কিটির আচরণে ক্ষুব্ধ রবিন। তবু কিছুতেই ব্যাংক ডাকাত ভাবতে পারল না ওকে।
.

‘চারজন গেল! টিকতেই পারল না ষাঁড়ের পিঠে। নির্বাচিত হওয়া তো দূরের কথা,’ মুসা বলল।
গ্র্যান্ডস্ট্যান্ডে বসে খেলা দেখছে তিন গোয়েন্দা।
‘কিটিকে খুঁজে পেয়েছি আমি,’ ষাঁড় নিয়ে মাথাব্যথা নেই রবিনের। ‘ডুবুরির যন্ত্রপাতিগুলো ওর, এ কথা তো স্বীকার করলই না, উল্টো আমাদেরকেই দোষ দিল। শিকারির ছাউনিতে ডুবুরির যন্ত্রপাতিগুলো নাকি আমরা রেখে এসেছি।’
বইতে গুজ বার্নার আর বিল ওয়াটমোরের নাম নেই, রবিনকে জানাল কিশোর।
‘তারমানে বার্নারটা একটা ভুয়া,’ রবিন বলল। ‘বিলটাও তাই।’
‘কিটির কথা বাদ দিচ্ছ কেন?’ ভুরু নাচাল মুসা।
‘সত্যি কথা বলতে কী, মুসা, কিটিকেই বরং আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে।’
‘কিন্তু কিটির ছাউনিতে ডুবুরির যন্ত্রপাতি আর মেটাল ডিটেক্টর ও নিজে ছাড়া আর কে রাখবে?’
‘বুঝতে পেরেছি!’ হঠাৎ করেই জবাবটা মাথায় এসে গেল রবিনের। ‘মরিস মরিসন! কোন সন্দেহ নেই! স্নরকেলিং ইক্যুইপমেন্ট পাওয়া যাবে কিনা, ডিনের দোকানে আমাকে জিজ্ঞেস করেছে। আমি একটুক্ষণের জন্যে যখন অন্যদিকে ঘুরেছিলাম, খুব সহজেই একটা টর্চলাইট চুরি করা সম্ভব ছিল ওর পক্ষে। শিকারির ছাউনিটা পরিত্যক্ত ভেবে যন্ত্রপাতিগুলো ওখানে রেখে এসেছিল। ভেবেছিল লুকানোই থাকবে। কী বলো, কিশোর?’
‘ঠিকই অনুমান করেছ,’ মাথা দোলাল কিশোর। ‘গেইটর সোয়াম্পে কাল রাতে অ্যালিগেইটর খোঁজার নাম করে মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে মোহর খুঁজতে গিয়েছিল মরিস। তবে সেটা প্রমাণ করতে হবে আমাদের।’
মাইকে ভেসে এল মিস্টার গিবসনের কণ্ঠ ‘পরের প্রতিযোগী, রাস্টি কালাহান।’
আলোচনা বাদ দিয়ে রিঙের দিকে তাকাল ছেলেরা। রাস্টি এসে চমৎকার খেলা দেখিয়ে গেল। এতক্ষণে আজ প্রথম নির্বাচিত হলো একজন।
‘এরপর আসছে বিল ওয়াটমোর!’ মিস্টার গিবসন জানালেন। ‘ব্ল্যাক সাইক্লোনের পিঠে চড়ে!’
কান খাড়া হয়ে গেল গোয়েন্দাদের। দৃষ্টি ঘুরে গেল খুপরির দিকে, রিঙে ঢোকানোর আগে যেখানে ষাঁড়গুলোকে রাখা হয়। একটা ষাঁড়ের পিঠে বসা দেখল বিলকে। রোডেও ক্লাউন গেট খুলে দিতে প্রস্তুত। কিন্তু হাত তুলে বিল ইঙ্গিত করল, সে এখনও রেডি হতে পারেনি
‘ভয় পাচ্ছে,’ মুসা বলল।
‘হ্যাঁ,’ মাথা ঝাঁকাল কিশোর। ‘কিন্তু ভয়টা কীসের? ষাঁড়ের পিঠে চড়ার, না অন্য কিছু?’

বিলের ইঙ্গিত যেন দেখতেই পায়নি ক্লাউন। গেট খুলে দিল। বিলকে পিঠে নিয়ে তীব্র গতিতে রিঙে ঢুকে পড়ল ষাঁড়। ঝাড়া দিয়ে, পিঠ বাঁকিয়ে, শরীর মুচড়ে আরোহীকে পিঠ থেকে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করছে। গাইড রোপ হাতে নেই। তৈরি হতে পারেনি বিল। অসহায় ভঙ্গিতে ষাঁড়ের পিঠ আঁকড়ে ধরে বসে থাকার চেষ্টা করছে। বিপদটা বুঝে গেছে দর্শকরা। চারদিকে চিৎকার চেঁচামেচি হই-চই।

আচমকা প্রচণ্ড এক মোচড় মারল ব্ল্যাক সাইক্লোন। শরীর বাঁকিয়ে এমন এক ঝাঁকি দিল, আর টিকে থাকতে পারল না বিল। উড়ে গিয়ে পড়ল বেড়ার কিনারে। আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে গেল দর্শক।

গেটের দিকে চোখ গেল মুসার। 'টোম্যান তো কিছু করছে না! টেনে সরাচ্ছে না কেন বিলকে?'

কিশোরও অবাক হয়ে দেখছে। কিছু তো করলই না রোডেও ভাঁড়—যা ওর দায়িত্ব —বরং দৌড়ে রিঙের কাছ থেকে সরে বাঙ্কহাউসের দিকে চলে যাচ্ছে। চেহারা ঢাকা পড়েছে মাথার মস্ত হ্যাটের আড়ালে। চেঁচিয়ে উঠল কিশোর, 'ইচ্ছে করে বিপদে ফেলেছে বিলকে!'

কিছু একটা করা দরকার। লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল ও। দেখাদেখি রবিন আর মুসাও উঠল। কিশোরের পিছন পিছন দৌড় দিল।

নিথর হয়ে পড়ে আছে বিল। একটুও নড়ছে না। মরেই গেল নাকি! ওদিকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে ব্ল্যাক সাইক্লোন। চোখে আগুন। নিঃশ্বাসের ফোঁসফোঁসানির সঙ্গে নাক দিয়ে যেন বাষ্প বেরোচ্ছে। বিলকে ভর্তা বানানোর জন্য মাথা নিচু করে শিং বাগিয়ে ছুটল। চেঁচিয়ে, হাত নেড়ে ষাঁড়টাকে থামানোর চেষ্টা করল মুসা।

চেঁচামেচিতে ফিরে তাকাল ষাঁড়। নিরাপদ জায়গায় বিলকে সরানোর জন্য ছুটে যাচ্ছে রবিন ও কিশোর। মুসাকে তাড়া করল ষাঁড়। ঘুরে বেড়ার দিকে দৌড়াতে শুরু করল মুসা।

খেপা ষাঁড়ের সঙ্গে পারা কঠিন। মুহূর্তে মুসার কাছে চলে এল ওটা। ঠিক পিছনেই রয়েছে। ওটার গরম নিঃশ্বাসও গায়ে লাগছে। সময়মত বেড়া ডিঙাতে না পারলে ষাঁড়ের মারাত্মক শিঙের গুঁতো খেতে হবে।

শেষ মুহূর্তে বাউলি কেটে একপাশে সরে গেল মুসা। বেড়ার রেলিঙ চেপে ধরে লাফ দিল ওপর দিকে। ঠিক ওর নীচে বেড়ার গায়ে লাগল ষাঁড়ের শিঙের গুঁতো। একটুর জন্য বেঁচে গেল মুসা।

ছুটে এল কয়েকজন কাউহ্যান্ড। ষাঁড় সামলাতে ব্যস্ত হলো। বিলকে তুলে গ্র্যান্ডস্ট্যান্ডের অন্যপাশে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে গেল রবিন আর কিশোর। হাঁপাতে হাঁপাতে ওদের কাছে এসে দাঁড়াল মুসা।

খবর শুনে বাঙ্কহাউস থেকে দৌড়ে এল রাস্টি। সহকারী নিয়ে ডাক্তার এলেন বিলকে দেখতে।
‘কী হয়েছে?’ রাস্টি জানতে চাইল।
‘ভুল করে আগেভাগেই গেট খুলে দিয়েছিল রোডেও ক্লাউন, ‘ একজন দর্শক জানাল। ‘অ্যাক্সিডেন্ট।’
‘অ্যাক্সিডেন্ট না,’ রাস্টিকে বলল কিশোর। ‘ষাঁড়টা বিলকে পিঠ থেকে ফেলে দিতেই দৌড়ে পালিয়েছে ভাঁড়।’
‘কোন ভাঁড়?’
‘ডিক টোম্যান।’ জবাবটা দিল বয়স্ক একজন দর্শক। ‘টেন- গ্যালন হ্যাট দেখে চিনেছি।’
‘হ্যাটটা মাথায় দিয়েছিল চেহারা লুকানোর জন্যে,’ ফিসফিস করে রবিনকে বলল কিশোর।
‘তুমি ঠিকই বলেছো,’ রবিন জবাব দিল। ‘একটিবারের জন্যেও ভালমত ওর চেহারা দেখিনি।’
বিলকে পরীক্ষা করে দেখে ডাক্তার বললেন, ‘জ্ঞান হারিয়েছে। ওকে ফ্রগ’স পেনিনসুলায় হাসপাতালে নিতে হবে।’
এ ধরনের জরুরি অবস্থার জন্য সব সময় রোডেও রিঙের বাইরে একটা অ্যামবুলেন্স রেডি থাকে। সেটা থেকে স্ট্রেচার নিয়ে এল ডাক্তারের একজন সহকারী। সাবধানে বিলকে স্ট্রেচারে তোলা হলো।
‘চলো, ডিক টোম্যানকে খুঁজে বের করি,’ রাস্টি বলল।
দর্শকরা চলে গেল। কিশোর বলল, ‘আমি বিলের সঙ্গে হাসপাতালে যাচ্ছি।’
‘যাও,’ রবিন বলল। ‘হুঁশ ফিরলেই সোনার মোহরটার কথা জিজ্ঞেস কোরো। তাকে কে খুন করতে চায়, কেন, জানারও চেষ্টা কোরো।’
‘তা তো করবই। তবে ওর সঙ্গে যাওয়ার আমার আসল উদ্দেশ্য ওকে পাহারা দেয়া, আবার যাতে কেউ হামলা চালাতে না পারে। এবার হয়তো আর ব্যর্থ হবে না খুনী।’
‘সন্দেহভাজন একজন ডাকাতের প্রতি বেশি মায়া দেখানো হয়ে যাচ্ছে না?’ ভুরু নাচাল মুসা।
হাসল কিশোর। ‘মায়াটা কিন্তু তুমিই আগে দেখিয়েছো। রিঙের মধ্যে ষাঁড়টাকে ঠেকাতে তুমি সবার আগে দৌড় দিয়েছিলে।’
হেসে ফেলল মুসা। ‘কিটিকে যেমন রবিনের অপরাধী মনে হয় না, আমারও তেমনি বিলকে মনে হয় না।’

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। ‘তবে কিছু একটা গোপন করছে বিল। আজ রাতেই সেটা জানার চেষ্টা করব।’
‘ঠিক আছে, যাও তুমি,’ মুসা বলল। ‘আমি আর রবিন রাস্টির সঙ্গে যাচ্ছি, ডিক টোম্যানের সঙ্গে কথা বলতে।’
তাড়াহুড়া করে পার্কিং লটের দিকে চলে গেল কিশোর। দূর থেকেই দেখল স্ট্রেচারে করে অ্যামবুলেন্সে তোলা হচ্ছে বিলকে।
অ্যামবুলেন্সের কাছে এসে কিশোর বলল, ‘আমি অনি ওয়াটমোর। বিলের ভাই।’
‘এসো এসো, ভালই হলো,’ ডাক্তার বললেন।
অ্যামবুলেন্সের পিছনে বিলের সঙ্গে উঠে বসল কিশোর।
সাইরেন বাজিয়ে চলতে শুরু করল অ্যামবুলেন্স। বিলের মুখের দিকে তাকাল কিশোর। চোখ বোজা। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বসা। এখনও বেহুঁশ। এই অবস্থায় মোটেও ওকে অপরাধীর মত লাগছে না।

.
রাস্টির পিছনে বাঙ্কহাউসে চলেছে রবিন ও মুসা। রোডেও ভাঁড়কে যেদিকে দৌড়ে যেতে দেখা গেছে।
হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল রবিন। ‘মুসা, দাঁড়াও! টোম্যান বলেছিল মেকাপ নিতে যাচ্ছে। তারমানে ট্রেইলারে। বাঙ্কহাউসে না গিয়ে আগে ওখানে খুঁজে দেখা দরকার আমাদের।’
‘টোম্যানের ট্রেইলারটা পার্কিং লটের পিছনে,’ মুসা বলল। ‘কিন্তু ওখানে খুঁজে কী হবে?’
‘কিশোরের সন্দেহ, রিঙে টোম্যান যায়নি। আর আমার মনে হচ্ছে, ট্রেইলারে গেলেই জবাবটা পেয়ে যাব। এসো।’
ট্রেইলারের দরজা খুলে ভিতরে ঢুকেই থমকে গেল রবিন। সারা ঘর তছনছ। ঝড় বয়ে গেছে যেন ঘরটায়। প্রচুর ধস্তাধস্তি হয়েছে।
মেকাপের জিনিসপত্র আর কাপড়চোপড় ছড়িয়ে আছে সবখানে। মেঝেতে পড়ে থাকা একটা ঢোলা ওভারঅল নড়ে উঠল হঠাৎ। গোঙানি শোনা গেল।
ওভারঅলটা তুলে নিল রবিন। টোম্যানকে দেখা গেল। কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছিল। মাথার একপাশে গোলআলুর মত ফুলে আছে। ‘কী...’ রবিন আর মুসার ওপর চোখ পড়তে বলে উঠল, ‘আমাকে মারলে কেন?’
‘আমরা মারিনি, মিস্টার টোম্যান,’ মুসা জবাব দিল। ‘অন্য কেউ মেরেছে।’
‘মেকাপ টেবিলে বসা ছিলাম...’ পুরোপুরি জ্ঞান ফিরে পায়নি এখনও টোম্যানের। ‘কী চুরি করেছে?’

‘আমার ধারণা, একটা জিনিসই চুরি করেছে,’ জবাব দিল রবিন, ‘আপনার পরিচয়।’
‘মানে?’
‘আপনার পরচুলা, আপনার হ্যাট, আপনার পোশাক,’ বুঝিয়ে দিল মুসা।
টোম্যানের বাঁ হাতে নীল-সাদা ফ্ল্যানেলের কাপড়ের একটা ছেঁড়া টুকরো দেখতে পেল রবিন। ‘আপনার হাতে কী?’
‘মাথায় বাড়ি খাওয়ার আগে ওদের সঙ্গে প্রচুর ধস্তাধস্তি করেছি। মনে হয় একজনের পকেট থেকে ছিঁড়ে রয়ে গেছে কাপড়টা।’
‘চেহারা দেখেছেন?’ মুসার প্রশ্ন।
মাথা নাড়ল টোম্যান।
‘পোশাকটা দেখলে চিনতে পারবেন?’ জিজ্ঞেস করল রবিন।
আবার মাথা নাড়ল টোম্যান। ‘অনেক কাউবয়ই ফ্লানেলের শার্ট পরে। তাদেরই কারও পকেট....
‘ছিঁড়েছেন!’ টোম্যানের কথাটা শেষ করে দিল রবিন। ‘পকেটে কোন জিনিস থেকে থাকলে নিশ্চয় পড়ে গেছে!’
ট্রেইলারের মেঝেতে খুঁজতে শুরু করল রবিন। এক টুকরো ভাঁজ করা কাগজ দৃষ্টি আকর্ষণ করল তার। তুলে নিয়ে খুলল।
‘কী লেখা?’ এগিয়ে এল মুসা।
‘একটা নোট।’ জোরে জোরে পড়ল রবিন, ‘ছেলেটাকে বিশ্বাস করা যাচ্ছে না। ব্যবস্থা করো।’
‘মানে কী?’ বুঝতে পারছে না টোম্যান।
মুসার দিকে তাকিয়ে জবাবটা দিল রবিন, ‘কেউ একজন বিল ওয়াটমোরকে রাস্তা থেকে সরিয়ে দিতে চাইছে।’
এখানে আর কিছু করার নেই। ডাক্তারকে খবর দেবে কিনা জিজ্ঞেস করল রবিন। টোম্যান বলল, ‘লাগবে না। বরফের সেঁক দিলেই সেরে যাবে।’
মুসাকে নিয়ে বেরিয়ে এল রবিন। বাঙ্কহাউসে রাস্টির খোঁজে চলল।
যাওয়ার পথে মাইকে মিস্টার গিবসনের ঘোষণা শুনল। বিলের দুর্ঘটনার পুলিশী তদন্ত না হওয়া পর্যন্ত বুল-রাইডিং প্রতিযোগিতা বন্ধ থাকবে। বন্ধ করে দেয়ার আরও একটা কারণ, ঝড়ের সঙ্কেত দিয়েছে আবহাওয়া অফিস। আরেকটা বড় ধরনের ঝড় এগিয়ে আসছে এই এলাকার দিকে।
বাঙ্কহাউসের সামনে রাস্টির সঙ্গে জটলা করছে কয়েকজন কাউহ্যান্ড। টোম্যানের দুরবস্থার কথা ওদেরকে জানাল রবিন।

‘হুঁ,’ মাথা দুলিয়ে রাস্টি বলল, ‘বুঝলাম, ভুয়া টোম্যান সেজেছিল যে, সে বাঙ্কহাউসের সামনের দরজা দিয়ে ঢুকে কেউ দেখার আগেই পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেছে।’ রবিন ও মুসার দিকে তাকাল। ‘এখানে আর কিছু করার নেই। তাঁবুতে চলো।’

‘ওর নাম বিল ওয়াটমোর, ফ্রগ’স পেনিনসুলাতে থাকে,‘ হাসপাতালের অ্যাডমিশন নার্সকে বলল কিশোর।

‘তুমি ওর ভাই?’ নার্স জিজ্ঞেস করলেন।

আবারও সরাসরি মিথ্যে কথা বলতে অস্বস্তি বোধ করছে কিশোর। ‘ইয়ে…আমি ঠিক ওর ভাই না… বন্ধু।’

‘ডাক্তার বলেছেন মাথায় আঘাত পেয়েছে ও। সামান্য সময়ের জন্যে মানসিক ভারসাম্য কিংবা স্মৃতিও হারিয়ে ফেলতে পারে। তবে চিন্তার কিছু নেই। সেরে যাবে। তোমার বন্ধুর বয়েস কত?’

‘আঠারো।’

দ্রুত কম্পিউটারের কী টিপলেন নার্স। মনিটরের পর্দায় ফুটে ওঠা লেখাগুলোর দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘হ্যাঁ, হাসপাতালের ফাইলে ওর নাম আছে। আরও একবার ভর্তি হয়েছিল। বিল ওয়াটমোর। সিক্স ম্যানাটি লেন। গত বছর টনসিল অপারেশন করিয়েছিল।’

‘গত বছর? তারমানে পনেরো বছর বয়েসে?’

‘উঁহু। তেরো।’ বলেই কিশোরের দিকে ফিরে তাকাল বিস্মিত নার্স।

কিশোরও অবাক। ‘জন্মতারিখ আছে আপনাদের রেকর্ডে?’

‘দেখি। হ্যাঁ, এই তো। আর সাত দিন পরেই পনেরো বছরে পা দেবে ও।’

মাথার মধ্যে সব কেমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে কিশোরের। ‘আপনাদের পে ফোনটা কোথায়?’

নার্সের কাছ থেকে জেনে নিয়ে ফ্রগ’স পেনিনসুলার পুলিশ ডিপার্টমেন্টে ফোন করল ও। ডেপুটি ক্যানারকে পাওয়া গেল না। বিকেল থেকেই ওর কোন খোঁজ নেই।

‘কোথায় গেছে বলতে পারবেন?’ ডেস্ক সার্জেন্টকে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

‘দুপুর একটায় বেরিয়ে গেছে থানা থেকে। বলেছে রোডেওতে যাবে।’

‘আর কিছু বলেননি?’

‘আর…আর…ও হ্যাঁ, বলেছে। ম্যারিনায় যাবে একবার। কী নাকি একটা কাজ আছে।’

‘ম্যারিনা? থ্যাংক ইউ, সার্জেন্ট।’ রিসিভার নামিয়ে রাখল কিশোর। বিলকে যে ঘরে রাখা হয়েছে, তাড়াতাড়ি সেখানে ছুটল।

ঘর অন্ধকার। নিশ্চয় ঘুমের ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে বিলকে। কিন্তু ঘুম থেকেই ডেকে তুলতে হবে। কয়েকটা প্রশ্নের জবাব জানা অতি জরুরি।
‘বিল?’ আস্তে করে ডাক দিল কিশোর। জবাব না পেয়ে আবার ডাকল, ‘বিল?’ এবারও সাড়া পেল না।
সুইচ টিপে বাতি জ্বেলে দিল কিশোর।
শূন্য বিছানা!
বিল ওয়াটমোর নেই!

.

রাস্টির সঙ্গে সামিয়ানায় পৌঁছল রবিন ও মুসা। মিস্টার গিবসনকে ঘিরে ধরেছে তখন প্রতিযোগীরা।
‘সত্যিই তাহলে রোডেও বন্ধ করে দিলেন?’ হতাশ টনি ওয়াকার বলল।
‘একেবারে বন্ধ করিনি,’ জবাব দিলেন গিবসন। ‘আপাতত।’
জোরাল গুঞ্জন উঠল প্রতিযোগীদের মাঝে। সবাই হতাশ।
‘দেখো, মিস্টার গিবসন বললেন, ‘ওরকম একটা দুর্ঘটনার পর রোডেও বন্ধ করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না আমার। তা-ও না হয় ভেবে দেখা যেত, কিন্তু ঝড়? আসবে তো বোঝাই যাচ্ছে। ঝড়ের মধ্যে প্রতিযোগিতা করবে কীভাবে? ঠিক আছে, আজ যাও, কাল আবহাওয়া ভাল থাকলে কিছু করা যায় কিনা দেখব।’
নিজের অতিথিদের উদ্দেশ্যে হ্যারিস বলল, ‘ঝড় আসার আগেই আমাদের ফিশিং ক্যাম্পে ফিরে যেতে হবে। কেবিনে ঢুকে পড়তে হবে।’
আর ওখানে জটলা করল না কেউ। যে যার মত সরে পড়তে লাগল। কাউহ্যান্ডরা জিনিসপত্র গুছিয়ে রোডেও বন্ধ করে দিচ্ছে। অতিথিদের নিয়ে পার্কিং লটের দিকে ছুটল হ্যারিস।
রবিন ও মুসার সঙ্গে এগোল রাস্টি। ‘এবারের রোডেওটার সর্বনাশ করে দিল ওই ডাকাতেরা! তার ওপর ঝড়েও যে কী পেল!’
পার্কিং লটে পৌঁছে দেখা গেল হ্যারিসের পিকআপ ট্রাকের পিছনে উঠে পড়েছে অতিথিরা। রাস্টির জন্য অপেক্ষা করছে হ্যারিস। ওকে দেখামাত্র বলে উঠল, ‘দেরি করছেন কেন? উঠে পড়ুন। তুফানের আগেই পালাতে হবে।’
ট্রাকের অতিথিদের ওপর চোখ বোলাল মুসা। ‘গুজ বার্নার কোথায়?’
তেড়া চোখে ওর দিকে তাকাল হ্যারিস। ‘আমাদের সঙ্গে আর থাকতে রাজি না। ম্যারিনায় চলে গেছে। মোটেলে রাত কাটাবে।’
গাড়ি ছেড়ে দিল ও। চাকার ঘায়ে ধুলো উড়িয়ে পার্কিং লট থেকে গিয়ে রাস্তায় উঠল ট্রাক।

হাসপাতাল থেকে মাইলখানেক পথ হাঁটার পর ৬, ম্যানাটি লেনে পৌঁছল কিশোর। ছোট্ট বাড়িটার ভিতরে অন্ধকার। বিল ওখানে আছে বলে মনে হলো না।
ঘুরে পিছন দিকে চলে এল ও। সাগরের কিনারে। ফ্লোরিডা বে'র কালো পানির দিকে তাকাল। দূরে একপাশে আলো দেখা যাচ্ছে। অনুমান করল, ওটা রাস্টি কালাহানের ফিশিং ক্যাম্প।
বিলদের বাড়ির ডকে বাঁধা একটা ছোট বোট। ডক থেকে নজর রাখার সিদ্ধান্ত নিল কিশোর। তাতে ডকের ওপর তো বটেই, বাড়িটার ওপরও চোখ রাখতে পারবে।
ঘড়ি দেখল। দশটা বেজে তিন মিনিট। বসে পড়ল ও। তীরে এসে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের শব্দ শুনছে। ঠাণ্ডা বাতাসের সাঁই-সাঁই শব্দ। বৃষ্টিটা শীঘ্রি আসছে, বুঝতে পারছে ও।
ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে শরীর। বাতাসের মোলায়েম স্পর্শ আর ঢেউয়ের একটানা শব্দ নেশা ধরিয়ে দেয়। ঝিমুনি এসে গেল ওর। ঘুমিয়ে পড়ল। ঝটকা দিয়ে মাথা তুলল একসময়। ওর মনে হলো মিনিটখানেক পেরিয়েছে। কিন্তু ঘড়িতে দেখে এগারোটা তিরিশ।
পানির দিক থেকে আসছে ইঞ্জিনের মৃদু গুঞ্জন। ধীরে ধীরে বাড়ছে। এদিকেই আসছে। তাড়াতাড়ি উঠে একটা নারকেল গাছের আড়ালে লুকাল ও। বন্ধ হয়ে গেল ইঞ্জিন। ডকের দিকে বোটটাকে ভেসে আসতে দেখল কিশোর। তাতে বসা বিলকে চিনতে অসুবিধে হলো না।
নিজের অজান্তেই কুঁচকে গেল কিশোরের ভুরু। হাসপাতাল থেকে হাঁটাপথে মাত্র এক মাইল। এত সহজ রাস্তা দিয়ে না এসে সোয়াম্পল্যান্ড গুডসে গিয়ে বোট নিয়ে এতটা পথ ঘুরে আসার কী মানে?
বোটটা তীরে টেনে তুলে রাখল বিল। বাড়ির দিকে এগোল।
বিলের বয়েস মাত্র চোদ্দ হলে কী হবে, গায়ে অনেক জোর। একটা বুদ্ধি করল কিশোর। নিঃশব্দে পিছনে গিয়ে আঙুল বাঁকিয়ে পিস্তলের নলের মত বিলের পিঠে ঠেসে ধরল। গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'দাঁড়াও!'
শক্ত হয়ে গেল বিল। কণ্ঠস্বরটা অন্যরকম করে ফেলায় কিশোরকে চিনতে পারেনি। 'প্লিজ, গুলি করবেন না! সোনার মোহরটার কথা কাউকে বলব না আমি! সত্যি বলছি!'
দ্রুত বিলের দেহতল্লাশি করে নিল কিশোর। অস্ত্রটস্ত্র আছে কিনা দেখল। আড়চোখে তাকাল বিল। কিশোরকে চিনতে পেরে চেঁচিয়ে উঠল, 'তুমি!' ঘুরে দাঁড়িয়ে জোরে এক ধাক্কা মারল কিশোরের বুকে। 'আমার পিছনে লেগেছ কেন তুমি? তোমার কারণে আজ আরেকটু হলে মারা পড়েছিলাম আমি।'

ঘুসি মারতে এল বিল। হাতটা ধরে ফেলে জুজিৎসুর প্যাঁচে মুচড়ে পিছনে নিয়ে গেল কিশোর। চাপ দিয়ে বলল, 'যতক্ষণ আমার কথার জবাব না দিচ্ছ, ততক্ষণ ছাড়ছি না আমি। আর এবার সত্যি কথাটা বলবে। তোমার বয়েস কত?'
'আঠারো!' শরীর মুচড়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল বিল।
'কত? সত্যিটা বলো!' হাতের চাপ আরও বাড়াল কিশোর।
যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠল বিল। চোদ্দ! গেইটর সোয়াম্পে কী পেয়েছি সেটা জানতে এসেছ তো? সত্যি বলছি মোহরটা ছাড়া সেমিনোল ইনডিয়ানদের হারানো গুপ্তধনের আর কিচ্ছু পাইনি।'
'সেমিনোল গুপ্তধন?'
'হ্যাঁ। আমাকে বলেছে, মুখ বন্ধ রাখলে গুপ্তধনের একটা ভাগ দেবে।'
'কে বলেছে?'
'আমি সেটা বলতে পারব না। তাহলে আমাকে খুন করে ফেলবে।'
'শোনো, বিল, যে তোমাকে খুন করতে চায় সে একবার খুনের চেষ্টা করে ফেলেছে। আমাদের জন্যে পারেনি। আরেকটা কথা শুনে রাখো, সেমিনোলরা কখনই সোনার মোহর বানায়নি।'
শরীর মোচড়ানো থামিয়ে দিল বিল। 'কী বলতে চাও?'
'তোমাকে মিথ্যে কথা বলেছে ও,' কিশোর বলল। 'তুমি যে মোহরটা পেয়েছ, সেটা এসেছে মায়ামির একটা ব্যাংকের ভল্ট থেকে। পঞ্চাশ লাখ ডলারের মোহর গেইটর সোয়াম্পে হারিয়ে গেছে।'
'বলো কী!' জোরে নিঃশ্বাস ফেলল বিল। 'জানতামই না। কিশোর, আমাকে ছেড়ে দাও। আমি আর পালানোর চেষ্টা করব না।'
ছেড়ে দিল কিশোর। হাত দিয়ে কাপড়ের ময়লা ঝেড়ে নিল বিল। তারপর ওর রহস্যময় আচরণের কারণ খুলে বলতে লাগল, 'শহরের মেইন রোডে একটা অল-নাইট পেট্রোল পাম্পের মালিক আমার বাবা। রোডেওতে কোনমতেই আমাকে যেতে দিতে রাজি হবে না।'
'বয়েস কম বলে?'
'না। বাবা আমাকে আঠারো বছর বয়েসেও যেতে দেবে না। রোডেওতে যাওয়াটাই বাবার পছন্দ না। আমি জখম হব, তাই ভয় পায়।'
বিলের মাথার জখমটার দিকে তাকাল কিশোর।
মাথার ফুলে ওঠা জায়গাটায় হাত দিল বিল। 'এসব জখম নিয়ে বাবার পাম্পের পাশ দিয়ে আসতে ভয় পাচ্ছিলাম। বাবা কিংবা ওর কোনও বন্ধুর চোখে পড়ে গেলে সর্বনাশ হতো। আমার রোডেওতে যাওয়ার আশা একদম শেষ। তাই কোন

ঝুঁকি নিতে চাইনি। বহু পথ ঘুরে বোট নিয়ে গেইটর সোয়াম্পের ভিতর দিয়ে আসতে হয়েছে।'
'এত কষ্ট, তা-ও রোডেও খেলার শখ?'
'রোডেও আমার নেশা! মাত্র এক বছর হলো এখানে এসেছি আমরা। এখনও কারও সঙ্গে বন্ধুত্ব করার সুযোগ হয়নি। প্রয়োজনও মনে করি না। রোডেওই এখন আমার ধ্যান-জ্ঞান।'
'কিন্তু বারবিকিউ থেকে পালিয়েছিলে কেন?'
'ডেপুটি ক্যানার যখন বললেন তোমরা ডিটেকটিভ, ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। আমার গোপন কথা ফাঁস হয়ে যাওয়ার ভয় ছিল। আমার রোডেও খেলার কথা বাবার কানে চলে যাওয়ার ভয়। তা ছাড়া আমাকে যে স্পন্সর করেছে, সে বলে দিয়েছে সেমিনোল গুপ্তধনের কথা গোপন রাখতে, কাউকে যেন না বলি।
'তোমার স্পন্সর?' হঠাৎ করেই মনে পড়ে গেল কিশোরের। 'ফক্স ডেনভার, গুজ বার্নারের মাধ্যমে যার সঙ্গে তোমার পরিচয়?'
'হ্যাঁ। রোডেও শেষ হয়ে গেলে গুপ্তধন খোঁজায় আমাকে সাহায্য করবে বলেছিল।'
'হুঁ!' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল কিশোর। তারমানে আমার ধারণাই ঠিক। ডাকাতেরা ডুবে মরেনি।'
'তা কী করে সম্ভব? যা ঝড় হয়েছিল। পাহাড়ের মত ঢেউ। এ রকম উত্তাল সাগরে এয়ারবোট ডুবলে কেউ বাঁচতে পারবে না।'
'সাগরে আসলে ডোবেইনি ওরা,' জবাব দিল কিশোর। 'সাগরের মোহনায় পৌছে জাহাজে চড়েছে। এয়ারবোটটাকে সাগরে টেনে নিয়ে গিয়ে ডুবিয়ে দিয়েছে। পুলিশকে বোঝাতে চেয়েছে এয়ারবোটে করে সাগর পাড়ি দিতে গিয়ে ঝড়ের সময় ডুবে মরেছে ওরা। সেই জাহাজটা কীসের এবং কার, বুঝতে পারছি। জাহাজটা একটা মাছধরা জাহাজ। মালিক ফক্স ডেনভার।'
'গুজ বার্নার ডাকাতিতে জড়িত এ ধারণা হলো কেন তোমার?' রবিন জিজ্ঞেস করল। রোডেও গ্রাউন্ড থেকে খচ্চরে চড়ে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে এসে খিদে পেয়ে গেছে ওর। নজর রাখছে ফ্রগ'স পেনিনসুলার ম্যারিনায় সাগরপাড়ে তৈরি এখানকার একমাত্র মোটেলটার দিকে 1
'গোড়া থেকেই ওর আচরণ ছিল সন্দেহজনক,' জবাব দিল মুসা। 'আর আজকে হঠাৎ করে ওর ফিশিং ক্যাম্পে না যাওয়ার সিদ্ধান্তটা তো আরও সন্দেহজনক। চুপ করে বসে থাকো। আমার ধারণা, মোটেল থেকে বেরোবেই বার্নার। ওর দোস্তদের সঙ্গে দেখা করতে যাবে। পিছু নিয়ে তখন দেখব কোথায় যায়।'
'কিন্তু কতক্ষণ বসে থাকব? আমার পেটের মধ্যে মোচড় দিচ্ছে।'

‘মোচড়টা আপাতত চেপে রাখো। এখান থেকে মুহূর্তের জন্যেও ওঠা চলবে না।’
‘আমরা আসার আগেই যদি বেরিয়ে গিয়ে থাকে?’
‘আরও পনেরো মিনিট দেখব। এর মধ্যে যদি না বেরোয়, আমি গিয়ে রিসিপশনিস্টের সঙ্গে কথা বলব। ততক্ষণ তুমি এখানে বসে থাকবে।’
‘কিন্তু তোমার ভুলও তো হতে পারে?’
‘না, ভুল আমার হয়নি। বার্নারও এ ডাকাতিতে জড়িত। আমি শিওর, ডিক টোম্যানের মাথায় ও-ই বাড়ি মেরে বেহুঁশ করেছে। ভাঁড়ের পোশাক চুরি করে ভাঁড় সেজে রিঙে ঢুকেছে।’
‘কিন্তু ছদ্মবেশেই যদি ঢুকবে, তা হলে আর রোডেও রাইডার সাজার কী প্রয়োজন ছিল?’
‘যাতে ফিশিং ক্যাম্পের কাছাকাছি থাকতে পারে, জলাভূমিতে হারিয়ে যাওয়া সোনাগুলো পাহারা দিতে পারে, যাতে রোডেও গ্রাউন্ডে আনাগোনা নিয়ে তাকে কেউ সন্দেহ না করে…ওই যে, বেরোচ্ছে! বলেছিলাম না?’
মোটেলের সামনের গেট দিয়েই বেরোল বার্নার। গোপনীয়তার ধার ধারছে না। তারমানে সে কল্পনাই করেনি ওর ওপর কেউ নজর রাখছে। সোজা এগোল ডকের দিকে।
নারকেল গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে ওর পিছু নিল রবিন ও মুসা।
ডকে নোঙর করে রাখা ‘শার্ক’ নামের একটা মাছধরা জাহাজে গিয়ে উঠল
ডকে স্তূপ করে রাখা কতগুলো কাঁকড়া-ধরা ফাঁদের আড়ালে আত্মগোপন করে জাহাজটার ওপর নজর রাখতে লাগল দুজনে। কয়েক মিনিট অপেক্ষা করার পরও বোটের ভিতর থেকে কাউকে বেরোতে না দেখে ফিসফিস করে মুসা বলল, ‘ওই জাহাজে উঠব কী করছে ওরা দেখব।’
‘পাগল হয়ে গেলে নাকি!’ বলল রবিন। ‘পুলিশকে খবর দিলেই তো হয়।’
‘পুলিশকে খবর দেয়ার মত প্রমাণ নেই আমাদের হাতে। অত সময়ও নেই। ডাকাতগুলো কী করে দেখতে হলে এটাই সুযোগ।’
কাঁকড়া-ধরা ফাঁদের আড়াল থেকে বেরিয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে চলল দুজনে। কয়েকটা মাছধরা জাহাজ, সেইলবোট আর ইয়টের সামনে দিয়ে চলে এল শার্ক জাহাজটার কাছে।
রবিনকে মাথা নিচু করে রাখতে বলল মুসা। জাহাজ থেকে আসা আলোর কাছ থেকে দূরে থাকতে বলল। পা টিপে টিপে তক্তার সিঁড়ি বেয়ে জাহাজে উঠে এল দুজনে। পা রাখল ডেকে।
মুসার ভারে মড়মড় করে উঠল তক্তা। বরফের মত জমে গেল ও।

কেউ বেরোল না কেবিন থেকে। রবিনকে নিয়ে আবার এগোল মুসা। ডেকে উঠে নিচুস্বরে বলল, ‘এখানেই থাকো।’
প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে প্রধান কেবিনটার কাছে চলে এল ও। ধীরে ধীরে মাথা উঁচু করল একটা জানালার কাছে। সাবধানে উঁকি দিল ভিতরে।
বদ্ধ কাঁচের জানালার ভিতর দিয়ে গুজ বার্নারকে দেখতে পেল। ফক্স ডেনভারের সঙ্গে কথা বলছে। দুজনেরই চোখেমুখে রাগ। কোনও একটা ব্যাপারে যেন একমত হতে পারছে না।
কথা বোঝা যাচ্ছে না। ভালমত শোনা দরকার। গলা লম্বা করে দিয়ে চারপাশে তাকাতে লাগল মুসা। কেবিনের পিছনের দরজাটা চোখে পড়ল। খোলা।
কেবিনের পাশ ঘুরে দরজাটার কাছে চলে এল ও।
‘সময় থাকতে কেটে পড়া দরকার,’ বার্নারের কথা কানে এল মুসার। ‘ওই ছেলেগুলো আমাকে সন্দেহ করে ফেলেছে। পিছে লেগেছে। ঝড়টা আঘাত হানার আগেই গেইটর সোয়াম্প থেকে মোহরগুলো তুলে নিতে না পারলে আর কখনও পারব না।’
‘তোমার অসাবধানতার কারণেই আজ এতসব সমস্যা,’ ডেনভারের উত্তপ্ত কণ্ঠ শোনা গেল। ‘বস্তাটা রাখলে এয়ারবোটের একেবারে গলুইয়ের কাছে, ওরকম জায়গায় কেউ রাখে? ওখানে না রাখলে পানিতেও পড়ত না, এত ঝামেলাও পোহাতে হতো না আমাদের।’
‘আমাকে বকে কী হবে? ব্যাংকের ভল্টের তালা খুলতে নিয়ে গিয়েছিলে, খুলে দিয়েছি। আমি যেটা পারি না সেই দায়িত্ব আমার ওপর চাপালে কেন?’
হঠাৎ খড়খড় করে উঠল শর্টওয়েভ রেডিওর স্পিকার। ভারি একটা কণ্ঠ ভেসে এল, ‘গেইটর বলছি শার্ককে। হারানো মালগুলো খুঁজে পেয়েছি আমি। তিরিশ মিনিটের মধ্যে জাহাজে পৌছাচ্ছি।’
রাগ চলে গেল ডেনভার আর বার্নারের চেহারা থেকে। হাসি ফুটল। রেডিওর হ্যান্ড রিসিভার তুলে নিল ডেনভার। ‘একটা কাজের কাজই করেছ, গেইটর। শত্রুক্যাম্পের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করেছ? ওভার।
‘বিচ্ছিন্ন করেছি। একটা দারুণ চমকও রেখে এসেছি বিচ্ছুগুলোর জন্যে।’
সাঙ্কেতিক বাক্য ব্যবহার করছে ওরা। রেডিওর কণ্ঠটা মুসার পরিচিত। মরিস মরিসন। বুঝতে পারল, ওর সাঙ্কেতিক নাম গেইটর। হারানো মাল বলে নিশ্চয় সোনার মোহরগুলোকেই বুঝিয়েছে। কিন্তু ‘শত্রুক্যাম্পের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন’ আর ‘দারুণ চমক’ বলে কী বোঝাতে চেয়েছে?
‘ভাল, গেইটরটেইল, ডেনভার বলল। ‘ফ্লোরিডা বে’র নি জায়গায় দেখা হবে। ওভার অ্যান্ড আউট।’

রিসিভার নামিয়ে রাখল ডেনভার। সাদা রঙের একটা হ্যাট তুলে মাথায় দিল। কমলা-কালো পালক লাগানো। কেবিনের দরজার দিকে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। চট করে সরে গেল রবিন। জাহাজের সামনের দিকে ছুটল। গ্যাঙপ্ল্যাঙ্ক বেয়ে আর নামার সময় নেই। নামতে গেলেই ডেনভারের চোখে পড়ে যাবে।
বুনো হাঁসের পরিচিত ডাক কানে এল।
ঝটকা দিয়ে ডানে মাথা ঘোরাতেই চোখে পড়ল মুসাকে। কার্গো হ্যাচের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। পাগলের মত হাত নেড়ে হ্যাচ দেখিয়ে নীচে নেমে যাওয়ার ইঙ্গিত করছে।
তাড়াতাড়ি হ্যাচের কাছে গিয়ে দাঁড়াল মুসা। ঢাকনাটা তুলল। রবিনকে নিয়ে নীচে নেমে এল। জাহাজের স্টোরেজ এরিয়া অর্থাৎ মাল রাখার জায়গা এটা। কিন্তু ‘মাল’-এর নমুনা দেখে হাঁ হয়ে গেল দুজনেই।
হাত-পা বেঁধে, মুখে কাপড় গুঁজে জাহাজের খোলে ফেলে রাখা হয়েছে ডেপুটি ক্যানার আর কিটি ওয়াটারম্যানকে।
গোঁ-গোঁ করে কিছু বলার চেষ্টা করলেন ডেপুটি। হাত তুলে ওপর দিক দেখিয়ে চুপ থাকতে ইশারা করল মুসা।
ওপরে জাহাজের ডেকে পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। শব্দটা সরে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল মুসা ও রবিন। তারপর ক্যানার ও কিটির বাঁধন খুলতে শুরু করল।
মুখ থেকে কাপড় খুলতেই ডেপুটি বললেন, ‘বাঁচালে!’
‘এখানে এলেন কী করে?’ ডেপুটির পায়ের বাঁধন খুলছে রবিন।
‘ডকমাস্টারকে জরুরি একটা কথা জিজ্ঞেস করতে ভুলে গিয়েছিলাম,’ ডেপুটি জানালেন। ‘ডাকাতির রাতে বন্দরে যত জাহাজ ছিল সব স্থানীয়। আমি জানতে এসেছিলাম, এগুলোর মধ্যে কোনওটা ঝড়ের সময় জেটি থেকে সরেছিল কিনা।’
‘শার্ক,’ রবিন বলল।
‘ঠিক। ডকমাস্টারের কাছে শোনার পর ফক্স ডেনভারকে জিজ্ঞেস করতে এসেছিলাম ঝড়ের মধ্যে কোথায় বেরিয়েছিল ও। জবাব না দিয়ে একটা বন্দুক বের করে আমার দিকে তাক করল।’
‘যা বোঝা যাচ্ছে, পুরো দলের মধ্যে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর এই লোকটাই।’
‘দল?’ বুঝতে পারলেন না ডেপুটি ক্যানার
কিটির হাত মুক্ত হলে ও নিজেই মুখে গোঁজা কাপড়টা টেনে বের করল। ‘অ্যালিগেইটর শিকারি, মরিস। মাছ শিকারি, ডেনভার। ওদের পিছু নিয়ে জলাভূমিতে যাওয়ার সময় আমাকে ধরে ফেলল। হাত-পা বেঁধে এখানে নিয়ে এসেছে ডেনভার।’

‘তৃতীয় আরও একজন আছে দলে, গুজ বার্নার,’ রবিন বলল। ‘তালা খোলার ওস্তাদ।’
‘ওরা কারা?’ এখনও বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে কিটি।
‘ডাকাত। মায়ামির ব্যাংক থেকে ওরাই সোনার মোহর চুরি করেছে।’
‘তুমি শিওর?’ ডেপুটি জিজ্ঞেস করল।
‘শিওর।’
‘কথা পরেও বলা যাবে,’ তাগাদা দিল মুসা। ‘এখান থেকে বেরোনো দরকার আগে।’
কিন্তু দেরি যা করার করে ফেলেছে। ইঞ্জিন স্টার্ট নেবার শব্দ হলো। কার্গো হোল্ডে থেকেও বোঝা যাচ্ছে, ডক থেকে সরে যাচ্ছে জাহাজটা।
‘বাহ্, চমৎকার,’ তিক্তকণ্ঠে বলল মুসা।
‘হুঁ, তাহলে ফক্স ডেনভারই হ্যাটটা ধার দিয়েছিল তোমাকে তোমার চেহারা আড়াল করে বয়েস লুকানোর জন্যে,’ কিশোর বলল। বিলের বোটে করে ওর সঙ্গে গেইটর সোয়াম্পে চলেছে।
তীর ঘেঁষে চালাচ্ছে বিল। ‘হ্যাঁ। প্রথম দিন ভুলে আমার হ্যাটটা বাড়িতে ফেলে এসেছিলাম। ডেনভার বলল, হ্যাট ছাড়া আমাকে একেবারেই কচি খোকার মত দেখাচ্ছে, অনভিজ্ঞ রাইডার। তখন আমাকে এক রাতের জন্যে ওর হ্যাটটা ধার দিল।’
‘আর টাকা দিল প্রতিযোগিতায় যোগ দেয়ার জন্যে।’
‘হ্যাঁ। এক শর্তে, সোনার মোহরটা পাওয়ার কথা কাউকে বলতে পারব না।’
‘মোহরটা কোথায় পেয়েছিলে?’
‘রাতের বেলা ঠিক জায়গাটা দেখানো কঠিন, তবে চেষ্টা করব।’
ইঞ্জিন সামলাচ্ছে বিল। গলুইয়ের কাছে বসে আছে কিশোর। নজর রাখছে, যাতে পানিতে ডুবে থাকা মরা গাছে না লাগে, কিংবা ঘাসের দঙ্গল প্রপেলারে জড়িয়ে না যায়।
অবশেষে সেই দ্বীপটার কাছে পৌছল বিল। চিনতে পারল কিশোর। রাতের বেলা সেদিন এটাতেই আটকা পড়েছিল।
‘এখানে পেয়েছ? টুইন সাইপ্রেস-কী!’
না। কাছের আরেকটা দ্বীপের কিনারের অল্প পানিতে। চকচক করছিল। তুলে নিয়েছি। এটার সঙ্গে মিল ছিল দ্বীপের একটা জিনিসের।’
‘ছিল? এখন নেই?’
‘দেখলেই বুঝতে পারবে, কী বলতে চাইছি।’

কয়েক মিনিট পর একটা বাঁক ঘুরে এল বোট। সামনে একটা দ্বীপ, দেখতে টুইন সাইপ্রেস-কী'র মত। তবে একটা বড় পার্থক্য আছে।
'এটাতে মাত্র একটা সাইপ্রেস গাছ,' কিশোর বলল। আরেকটু কাছে যেতে দ্বিতীয় গাছটা চোখে পড়ল। তীরের কাছে কাত হয়ে পড়ে আছে। অর্ধেক পানিতে, অর্ধেক ডাঙায়। 'ও, তারমানে ঝড়ে উপড়ে পড়েছিল!'
'হ্যাঁ, বিল জবাব দিল। 'ঝড়ের আগে বহুবার এসেছি এখানে। প্রায়ই ভুল করতাম। গাছ দুটোর কারণে কোনটা যে আসল টুইন সাইপ্রেস-কী বুঝতে অসুবিধে হতো।'
'তারমানে ডাকাতরাও একই ভুল করেছে,' এতক্ষণে বুঝতে পারল কিশোর। 'মোহরগুলো পড়ে যাওয়ার সময় দুটো গাছ দেখেছিল ওরা। গাছ দুটোকে নিশানা রেখেছিল। ঝড়ে একটা গাছ উপড়ে যাওয়ার পর আর নিশানা ঠিক রাখতে পারেনি। ভুল করে বার বার টুইন সাইপ্রেস-কী'তে খুঁজতে চলে গেছে। ঠিক কোন জায়গাটায় মোহরটা পেয়েছ তুমি?'
'ওই যে, ওখানে,' দেখাতে গিয়ে কেঁপে উঠল বিলের গলা। 'ওই অদ্ভুত আলোটা কীসের?'
পানির নীচে আলো। ওর পঞ্চাশ গজ দূরে নোঙর করা একটা এয়ারবোট।
'মরিস মরিসন, আমি শিওর,' কিশোর বলল। 'ভুলটা নিশ্চয় বুঝে গেছে।'
ইঞ্জিন বন্ধ করতে ইশারা করল ও। এয়ারবোটের পাশে এসে থামল বিলের বোট। এয়ারবোটে একটা শর্টওয়েভ রেডিও দেখতে পেল কিশোর।
'আরে, আলোটার কী হলো?' চেঁচিয়ে উঠল বিল। এয়ারবোটের দিকে নজর ছিল ওদের। মাত্র এক মুহূর্তের জন্য। ওটুকু সময়েই গায়েব হয়ে গেছে আলো।
ভয়ঙ্কর চেহারার একটা জীব লাফিয়ে উঠল পানির ওপর। বিলের পিছনে। প্রচণ্ড শক্তিতে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরল ওকে। তারপর টেনে নিয়ে গেল জলাভূমির পানিতে।
'বিল!' চিৎকার দিয়ে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল কিশোর।
পানির নীচে শক্তিশালী জীবটার সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু করল। রবারের মত চামড়া প্রাণীটার। বড় বড় চ্যাপ্টা পায়ের পাতা। জীবটাকে চিনতে পারল ও। ডুবুরির পোশাক পরা মানুষ।
বিলকে লোকটার হাত থেকে ছাড়াতে পারল না কিশোর। তবে ঠেলেঠুলে বিলকে খানিকটা ওপরে তুলে আনতে পারল যাতে নাক ভাসিয়ে শ্বাস অন্তত নিতে পারে।
আচমকা টান দিয়ে লোকটার মাস্ক খুলে নিল ও। মুখোশের আড়ালে কার মুখ ঢাকা পড়ে ছিল দেখতে পেল। যা সন্দেহ করেছিল তাই। মরিস মরিসন।

বিলকে ছেড়ে দিয়ে সাঁতরে সরে যেতে শুরু করল মরিস। ওর পিছু নেয়ার চেয়ে এখন বিলকে সাহায্য করা জরুরি। ওকে বোটে উঠতে সাহায্য করল কিশোর। নিজে বোটের কিনারে ঝুলে রইল, অর্ধেক শরীর পানিতে। এতক্ষণে আবার মরিসের দিকে তাকানোর সুযোগ পেল। ভেবেছিল, আক্রমণ করবে। কিন্তু যেখানে দেখবে ভেবেছিল, সেখানে নেই লোকটা।

‘ওই তো!’ গলুইয়ের দিকটায় আঙুল তুলে চেঁচিয়ে উঠল বিল। ‘এয়ারবোটে উঠছে!’

কিশোরও দেখতে পেল। পানির নীচ থেকে একটা চটের বস্তা বোটে টেনে তুলছে মরিস। কিশোরও চেঁচিয়ে উঠল, ‘মোহরগুলো পেয়ে গেছে!’

বস্তার মুখ খোলা। দড়ি দিয়ে পেঁচিয়ে বাঁধল মরিস। পানিতে পড়ার সময় নিশ্চয় বস্তার মুখ খুলে গিয়েছিল। দু’চারটা মোহর হয়তো ছিটকে পড়েছিল এদিক ওদিক। ঢেউয়ের ধাক্কায় একটা চলে গিয়েছিল তীরের কাছাকাছি। সেটাই খুঁজে পেয়েছে বিল।

এয়ারবোটের ইঞ্জিন স্টার্ট দিল মরিস। গেইটর সোয়াম্প ধরে ফ্লোরিডা বে’র দিকে রওনা হয়ে গেল। পুল কর্ড টেনে বিলও ওর বোটের ইঞ্জিন স্টার্ট দিল। মরিসের পিছু নিল। কিন্তু গতি এতই কম, বুঝল, এয়ারবোটের সঙ্গে কোনভাবেই পেরে উঠবে না। চিৎকার করে কিশোর বলল, ‘বিল, রাস্টির ফিশিং ক্যাম্পে চলো!’

.

শার্কের কার্গো হোল্ডে ওদিকে শত্রুর বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য সুবিধেমত একটা অস্ত্র খুঁজে বেড়াচ্ছে মুসা।

ভয়ানক উত্তাল সাগর। ভীষণভাবে দোল খাচ্ছে জাহাজ। সোজা হয়ে বসে থাকাও কঠিন। ডেপুটি ক্যানারের পায়ের শেষ গিঁটটা খুলতেও হিমশিম খাচ্ছে রবিন।

‘কিছু পেলে?’ দড়ির চাপে লাল হয়ে যাওয়া হাতের কব্জি ডলছে কিটি।

‘নাহ্, অস্ত্র পাইনি,’ জবাব দিল মুসা। তবে লাইফ জ্যাকেটগুলোর নীচে কী পেয়েছি দেখুন।’ কালো কাপড়ের দুটো হুড তুলে দেখাল ও।

‘হুড**!**’ কিটি অবাক।

‘হ্যাঁ, হুড। এগুলো পরেই নিশ্চয় ব্যাংকে ডাকাতি করতে গিয়েছিল,’ ডেপুটি বললেন। কিন্তু বোটে এল কী করে এগুলো?’

‘ডাকাতি করে পালিয়ে এসে এই জাহাজেই লুকিয়েছিল ডাকাতেরা,’ মুসা অনুমান করল। ‘ওরাই রেখেছে। ডাকাতির পর পুলিশের তাড়া খেয়ে প্ল্যান বদল করেছিল গুজ বার্নার আর মরিস মরিসন। ডিন ওয়াটারম্যানের একটা এয়ারবোট চুরি করে ফ্লোরিডা বে’তে ডেনভারের জাহাজে ওঠার বুদ্ধি করেছিল।‘

‘তারমানে জাহাজে ঠিকমতই উঠতে পেরেছিল, ক্যানার বললেন। ‘গাল্‌ফ্‌ অভ মেক্সিকোর দিকে পালিয়ে না গিয়ে এখানে থেকে যাওয়ার কারণটা কী?’
‘মোহরগুলো আনতে পারেনি ওরা। ঝড়ের সময় ওদের ছিনতাই করে আনা এয়ারবোট থেকে মোহরগুলো গেইটর সোয়াম্পের পানিতে পড়ে যায়। একটু আগে বার্নার আর ডেনভার সেটা নিয়ে ঝগড়া করছিল।’
‘দেখো মুসা,’ ডেপুটি বললেন, ‘পড়ালেখা শেষ করে যদি পুলিশের গোয়েন্দা হতে ইচ্ছে করে, সোজা চলে এসো ফ্রগ’স পেনিনসুলায়, আমি নিজে তোমার জন্যে সুপারিশ করব।’
‘চাকরি তো পরে, আগে বাঁচার চেষ্টা করা দরকার। এখান থেকে বেরোতে হবে।’
‘বেরিয়ে কী করবে?’ কিটির প্রশ্ন। ‘সাঁতরে সাগর পাড়ি দেবে?’
‘এ ছাড়া আর তো কোনও উপায় দেখছি না।’ কিটির দিকে তাকাল মুসা।
‘এখানকার সাগরে হাঙর আছে**?’** জিজ্ঞেস করল রবিন।
‘কিলবিল করছে,’ জবাবটা দিলেন ডেপুটি।
‘ঝড়ের সময় অন্য প্রাণীরা যেখানে প্রাণের ভয়ে অস্থির, তখনও খাওয়াটাই একমাত্র কাজ বলে মনে করে এখানকার হাঙরেরা,’ যোগ করল কিটি।
‘যাক, সুখবর, তিক্ত শোনাল মুসার কণ্ঠ। ‘তাহলে কি কোন উপায়ই নেই?’
‘উপায় একটা আছে,’ ডেপুটি বললেন। ‘রেডিওটা কোনভাবে হাত করতে পারলে কোস্ট গার্ডের সাহায্য চাইতে পারি।’
কেউ কিছু বলার আগেই উঠে দাঁড়াল কিটি। নিঃশব্দে হ্যাচের ঢাকনা ফাঁক করে উঁকি দিল। মাথা নামিয়ে জানাল, ‘জাহাজ চালাচ্ছে ডেনভার। বার্নারকে দেখা যাচ্ছে না।’
‘নিশ্চয় কেবিনে,’ মুসা বলল। ‘ডেনভারের চোখ এড়িয়ে ওখানে যাওয়া যাবে?’
আবার হ্যাচের ঢাকনা ফাঁক করে দেখল কিটি। ‘এসো!’
ঢাকনা সরিয়ে দুই হাতে কার্গো হোল্ডের ফোকরের দুই পাশ চেপে ধরে দোলা দিয়ে বানরের মত ওপরে উঠে গেল কিটি। ওর ক্ষিপ্রতা বিস্মিত করল সবাইকে। কেন ওর নামের আগে ‘আজব’ শব্দটা জুড়ে দেয়া হয়েছে বুঝতে পারল মুসা ও রবিন।
কিটির পিছনে বেরোল ও। জাহাজের গলুইয়ের দিকে ডেনভারের নজর। ওদের দিকে ঘুরতে লাগল ওর মুখ। ডেকে তুলে রাখা নোঙরের পিছনে চট করে বসে পড়ল দুজনে। যে কোন কারণেই হোক, ডেনভারের নজর ওদের ওপর পড়ল না, ওর চোখ আবার গলুইয়ের দিকে ফিরলে রওনা হলো দুজনে।
হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে লাগল দুজনে। মেইন কেবিনের খোলা দরজার কাছে পৌঁছল। ভিতরে উঁকি দিয়ে দেখে নিল কিটি। মুসাকে আসতে ইশারা করল। ঢুকে পড়ল কেবিনে।

কেবিনের সামনের দিকে আরেকটা দরজা। জাহাজের স্লিপিং কোয়ার্টারে যাওয়ার পথ, বুঝতে পারল রবিন। একটা ধাতব ডেস্কের ওপর রাখা রেডিওটা। পাশে আরেকটা ইলেকট্রনিক যন্ত্র। ফিশ ফাইন্ডার। সাগরতলে মাছ কোথায় আছে খুঁজে বের করার জন্য ব্যবহার হয় এই যন্ত্র।
ডেস্কে ছড়ানো গেইটর সোয়াম্পের একটা ম্যাপ। সমস্ত দ্বীপের ওপর লাল 'ক্রস' চিহ্ন দেয়া। রাস্টি কালাহানের ফিশিং ক্যাম্প ঘিরে কালো কালির দাগ।
রেডিওর সুইচ অন করল রবিন। তীক্ষ্ণ চিৎকারের মত শব্দ বেরোতে থাকল স্পিকার থেকে। তাড়াতাড়ি ভলিউম কমিয়ে দিল ও। রবিনকে চুপ থাকতে ইশারা করে কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল কিটি। মুহূর্ত পরেই ফিরে এল আবার। ইশারাতেই জানাল, সব ঠিক আছে।
হ্যান্ড রিসিভার তুলে নিয়ে ট্র্যান্সমিট করার বোতাম টিপল মুসা। 'মুসা কলিং কালাহান'স ফিশিং ক্যাম্প,' নিচু স্বরে কথা বলল মুসা। সাড়া পেল না। কণ্ঠস্বর সামান্য উঁচু করে আবার চেষ্টা করল। এবারও সাড়া এল না। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে ভেবে যখন হাল ছেড়ে দিতে যাচ্ছিল, কথা বলে উঠল স্পিকার, 'হাই, মুসা। তুমি আবার রেডিও কিনলে কবে?'
হ্যারিসের কণ্ঠ চিনতে পারল মুসা। 'হ্যারিস, ভীষণ বিপদের মধ্যে আছি আমরা।'
'সে তো বোঝাই গেছে। কড়া ঘুম থেকে আমাকে ডেকে তুলেছ। কোথায় তুমি? ওভার।'
'ফক্স ডেনভারের ফিশিং বোটে।'
'ফিশিং বোট! ঝড় আসছে জানো না?'
'আস্তে বলুন! জাহাজটায় ডাকাতদের সঙ্গে রয়েছি আমরা। মায়ামিতে ব্যাংক ডাকাতি করেছে যারা। ওভার।'
'বলো কী!' চেঁচিয়ে উঠল হ্যারিস।
'আস্তে! আস্তে! কিশোরকে বলুন, জাহাজ নিয়ে মরিস মরিসনকে তুলে নিতে যাচ্ছে ডাকাতগুলো।'
'কিশোর তো এখানে নেই...' কথা শেষ হওয়ার আগেই আচমকা থেমে গেল হ্যারিসের কণ্ঠ। রেডিওতে গোলমাল হয়েছে না অন্য কিছু, বোঝা গেল না।
'তাই তো বলি, কথা বলে কে!' পিছনে পরিচিত কণ্ঠ শুনে পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল মুসা। বার্নারকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। স্লিপিং কোয়ার্টারের দরজা দিয়ে ঢুকেছে।
'ঘুমানোর চেষ্টা করছিলাম। তোমার কথা কানে গেল...আরও আস্তে বলা উচিত ছিল তোমার।'
'দেরি করে এসেছেন,' মুখে হাসি ফোটানোর চেষ্টা করল রবিন। 'পুলিশকে এস ও এস পাঠিয়ে দিয়েছি।'

চোখের পাতা সরু হয়ে এল বার্নারের। ‘গুড। ভালই করেছ। তোমাদের লাশ খুঁজে পেতে আর বেশি কষ্ট করতে হবে না ওদের। যদি ততক্ষণে হাঙরে খেয়ে না ফেলে।’
এক পা এগিয়ে এল বার্নার। আচমকা ওকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে ডেকে বেরোনোর দরজার দিকে দৌড় দিতে গেল মুসা। পারল না। ওকে ধরে ফেলল বার্নার। হাত মুচড়ে পিঠের ওপর নিয়ে এসে অসহায় করে ফেলল। গর্জে উঠল, ‘বহুত জ্বালান জ্বালিয়েছ। এবার বোঝাব মজা!’
কিন্তু মুসাকে ‘মজা বোঝানোর’ আগেই কেবিনের দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকল কিটি। ঘুসি মারল বার্নারের চোয়ালে। পিছনে ছিটকে পড়ল বার্নার। নাক চেপে ধরেছে। আঙুলের ফাঁকে রক্ত। ঘুসি খেয়ে নাক ভেঙে গেছে। রক্ত বেরোচ্ছে।
ক্ষুধার্ত বাঘের দৃষ্টিতে কিটির দিকে তাকাল বার্নার। কিন্তু আক্রমণ করতে দ্বিধা করছে। ও এখন একা। শত্রুরা দুজন।
‘খবরদার! নড়বে না!’ মুসার পিছন থেকে ধমক শোনা গেল।
চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল মুসা ও কিটি। শটগান হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল ডেনভারকে। বন্দুকের নল ওদের দিকে তাক করা। তাড়াতাড়ি ডেস্কের ড্রয়ার খুলে একটা রিভলভার বের করে নিল বার্নার। তুলে ধরল মুসার দিকে।
কেবিনের দরজার দিকে ফিরে হাঁক দিল ডেনভার। ‘এই, এসো তোমরা, ভিতরে এসো! কোন চালাকি করবে না, যদি তোমাদের বন্ধুদের সুস্থ দেখতে চাও!’
ভিতরে ঢুকল রবিন ও ক্যানার।
রক্তাক্ত নাকের ভিতর থেকে ঘোঁৎ-ঘোঁৎ শব্দ বেরিয়ে এল বার্নারের। ‘বাহ্, চমৎকার! হাঙরের ভোজ আজ ভালই জমবে।’
‘হ্যারিস! রাস্টি!’ চিৎকার করছে কিশোর। অন্ধকারে ফিশিং ক্যাম্পের কেবিনের দিকে দৌড়াচ্ছে। ঘরে ঢুকে সুইচ টিপে দিল। আলো জ্বলল না।
বাইরে বেরিয়ে এল ও। বোট থেকে একটা টর্চ থাবা দিয়ে তুলে নিয়ে দৌড় দিল বিল। কিশোরের কাছে চলে এল।
‘আলো জ্বলছে না। মেইন কেবিনে কেউ নেই। আমাদের কেবিনে গিয়ে দেখি।’ দৌড় দিল কিশোর 1
চাবুকের মত আঘাত হানছে বাতাস। চোখেমুখে সুচ ফুটাচ্ছে বৃষ্টি। সব কিছু উপেক্ষা করে খুঁটিতে বসানো কেবিনের সারির পাশ দিয়ে ছুটছে দুজনে।
‘এটাই।’ থামল না কিশোর। সিঁড়ি বেয়ে দৌড়ে উঠতে শুরু করল।
‘রবিন!’ কেবিনে ঢুকে চিৎকার করে ডাকল কিশোর। বিলও ঢুকল। টর্চের আলো ফেলল অন্ধকার কেবিনে। অদ্ভুত দৃশ্য ফুটে উঠল চোখের সামনে। মেঝেতে পানি জমে আছে। কাদার চিহ্ন সরে গেছে পানির কাছ থেকে। বিছানার পাশ থেকে

নড়ে উঠল বিশাল একটা জীব। মাথা দিয়ে দরজা আটকাল, লেজ দিয়ে জানালার দিকটা।
‘কি-কি-কিশোর!’ ভয়ে তোতলানো শুরু করল বিল। ওর ট আলো প্রতিফলিত হচ্ছে মস্ত একটা সরীসৃপের দুধসাদা চোখে।
‘অ্যালিগেইটরটা এখানে এল কীভাবে!’ কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করছে কিশোর। বিল, আস্তে আস্তে সরতে থাকো। পিছন দিকে চলে যাও। সাদা চোখটা কানা। ওটা দিয়ে দেখতে পায় না।’
‘আমার পা অবশ হয়ে গেছে!’ কম্পিত কণ্ঠে বিল বলল।
‘তাহলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকো। ধীরে ধীরে সরতে আরম্ভ করল কিশোর। অ্যালিগেইটরের লেজের দিকে চলে আসছে। অ্যালিগেইটর এমনিতেই চোখে ভাল দেখে না, ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক চ্যানেলে বিশেষজ্ঞদের মুখে শুনেছে; তার ওপর এটার একটা চোখ নষ্ট। সেই সুযোগটাই নিতে যাচ্ছে ও।
‘বিল, অ্যালিগেইটরের পিঠে চড়ব আমি।’
‘কী করবে?’
‘পিঠে চড়ব। আটকানোর চেষ্টা করব। আমি পিঠে চড়লে আর এক মুহূর্তও দেরি করবে না, সোজা দৌড় দেবে দরজার দিকে।’
বিলের দিকে কয়েক ফুট এগোল অ্যালিগেইটর। যা করার দ্রুত করতে হবে, বুঝতে পারছে কিশোর, একেবারে সময় নেই। আরেকটু এগোল ও। তারপর লাফ দিয়ে গিয়ে বসল অ্যালিগেইটরটার পিঠে দুই হাতে ওটার নাকের ওপর চাপ দিয়ে ওপরের চোয়াল নামিয়ে মুখটা মেঝেতে ঠেসে ধরার চেষ্টা করল।
এভাবেই চোয়াল চেপে ধরে অ্যালিগেইটরকে আটকানো হয়, ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকে দেখেছে। চাপা গর্জন করে উঠল অ্যালিগেইটর। মাথা ঝাড়া দিয়ে হাত সরানোর চেষ্টা করল। মুখটা সরে গেল দরজার কাছ থেকে।
‘কিশোর!’ রাস্টির চিৎকার শোনা গেল। ঝটকা দিয়ে খুলে গেল কেবিনের দরজা। ঘরে ঢুকল ও।
ভয়ঙ্করভাবে লেজ দোলাচ্ছে তখন অ্যালিগেইটর। মাথাটা এপাশ ওপাশ ঝাঁকি দিচ্ছে। বহু কষ্টে ওটার পিঠ আঁকড়ে রয়েছে কিশোর।
আর কোন উপায় না দেখে রাস্টিও এসে বসল অ্যালিগেইটরের পিঠে। মেঝেতে চেপে ধরে রাখতে চাইল। কোনভাবে যদি উল্টে যেতে পারে ওটা, পিঠের নীচে ফেলে ভর্তা বানিয়ে ফেলবে দুজনকেই।
‘পালাও!’ বিলের উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে উঠল কিশোর।
মাথা দিয়ে বাড়ি মেরে দরজার পাল্লা লাগিয়ে দিয়েছে অ্যালিগেইটর। ওখান দিয়ে বেরোনোর উপায় নেই। জানালার দিকে ছুটল বিল। মাথা নিচু করে ডাইভ দিল।

পর্দা ছিঁড়ে ডিগবাজি খেয়ে গিয়ে পড়ল বাইরের অন্ধকারে।
মারাত্মক ভঙ্গিতে মাথা নাড়ছে অ্যালিগেইটর। দুজন লোক পিঠে চেপে বসে চোয়াল চেপে ধরেও কিছুই করতে পারছে না।
'আর পারব না!' হাঁপিয়ে গেছে কিশোর। চেপে ধরে রাখতে রাখতে অবশ হয়ে আসছে হাত।
'আমিও না!'
লেজ আছড়াচ্ছে অ্যালিগেইটর। যা নাগালে পাচ্ছে তাতেই বাড়ি মারছে। একটা চেয়ার বাঁধল লেজের ডগায়। ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল।
'আমি এক দুই তিন গোনার সাথে সাথে গিয়ে জানালায় ঝাঁপ দেবেন! ঠিক আছে?' চেঁচিয়ে বলল কিশোর।
'আমি না, তুমি!' গুণতে আরম্ভ করল রাস্টি, 'এক...দুই...তিন!'
'দুজনে একসঙ্গে!' কিশোর বলল।
আচমকা অ্যালিগেইটরের চোয়াল থেকে হাত সরিয়ে আনল দুজনে। জানালার দিকে দৌড় দিল। চোখের পলকে দেহটাকে বাঁকিয়ে কামড় মারল দানবটা। ভয়ানক শব্দে বন্ধ হলো চোয়াল। এক ইঞ্চির জন্য ফসকে গেল কিশোরের ডান গোড়ালি।
মাথা নিচু করে ডাইভ দিয়ে জানালার বাইরে চলে এল রাস্টি। ডিগবাজি খেল শূন্যে। বেমক্কাভাবে কাঁধটা পড়ল মাটিতে। গড়ান দিয়ে সোজা হলো।
কিশোর দুই হাতে জানালার কিনার ধরে ঝুলছে। একটা সেকেন্ড ঝুলে থেকে ছেড়ে দিল হাত। পড়ল খাড়া হয়ে, পায়ের ওপর। নিরাপদে।
মাটিতে বসে হাঁপাচ্ছে বিল। কিশোরকে দেখে বলল, 'আমি ভাল আছি!'
'রাস্টি, আপনার খবর কী?' জানতে চাইল কিশোর।
'পঞ্চাশটা খেপা ষাঁড়ের পিঠে চড়েছি আমি, একশোটা বুনো ঘোড়া, কিছুই হয়নি,' রাস্টি জানাল। 'কিন্তু একটামাত্র কানা অ্যালিগেইটরের পিঠে চড়েই হাতটা ভাঙলাম।'
হ্যারিস এসে হাজির হলো। বিড়বিড় করে গাল দিচ্ছে কাউকে। 'পন্টুন বোটটা নড়ছে না। ইঞ্জিনের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে। আটকা পড়লাম। দ্বীপ থেকে আর বেরোতে পারব না।'
কী ঘটেছে, সংক্ষেপে হ্যারিসকে জানাল কিশোর। তিনজনে মিলে রাস্টিকে দাঁড় করাল। ধরে ধরে মেইন কেবিনের দিকে নিয়ে চলল।
'শর্ট-সার্কিট করে জেনারেটরটাও অচল করে দিয়েছে!' রাস্টি জানাল। 'মেরামত করতে বসেছিলাম আমি আর হ্যারিস, এ সময় তোমাদের চিৎকার শুনলাম।'

‘জেনারেটরটা নষ্ট হওয়ার আগে রেডিওতে কথা বলছিলাম রবিনের সাথে,’ হ্যারিস বলল। ‘কথা বলতে বলতেই পাওয়ার চলে গেল, রেডিও অফ। রবিন আর মুসা ফক্স ডেনভারের ফিশিং বোটে আটকা পড়েছে। জাহাজটা কোথায় আছে, রবিনের কাছ থেকে জানার সুযোগ পাইনি, তার আগেই বিদ্যুৎ চলে যাওয়াতে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।’
‘জাহাজের অবস্থান জানতে হবে না,’ কিশোর বলল। ‘মরিস মরিসনকে অনুসরণ করলেই আমাদেরকে জাহাজের কাছে নিয়ে যাবে।’
‘কীভাবে অনুসরণ করবে?’ বিল জানতে চাইল। ‘তুমিই তো তখন বললে, ওকে ধরার একমাত্র উপায় এখন আরেকটা এয়ারবোট জোগাড় করা। ইতিমধ্যেই দশ মিনিট সময় নষ্ট করে ফেলেছি আমরা। আমাদের চেয়ে দশ মিনিটের পথ এগিয়ে আছে ও।’
‘তা ঠিক!’ চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল কিশোর।
‘রাস্টিকে পাঁচ মিনিট সময় দাও,’ বিল বলল। ‘জেনারেটরটা ঠিক করে ফেলুক। রেডিওতে কোস্ট গার্ডকে খবর দেয়া যাবে।’
এ ছাড়া আর কোন উপায়ও দেখল না কিশোর। চুপ হয়ে গেল। হই-হট্টগোলে অন্য অতিথিদেরও ঘুম ভেঙে গেছে। কেবিন থেকে বেরিয়ে আসছে তারা। হাতে লণ্ঠন। গায়ে রেইন কোট।
রাস্টির ভাঙা হাতটা পরীক্ষা করল টনি ওয়াকার। ‘হাড্ডিটা ঠিকমত বসিয়ে দিতে পারব আমি। পেইন কিলার আছে?’
‘আছে,’ হ্যারিস জানাল।
হাসপাতালে নিতে সময় লাগবে। তাই টনির কথায় রাজি হয়ে গেল রাস্টি।
প্রবল গতিতে ঝাপটা মারছে বাতাস। সেইসাথে ভারি বৃষ্টি। যেন মার্বেলের মত আঘাত হানছে চোখেমুখে। প্রচণ্ড দুশ্চিন্তায় সেসব উপেক্ষা করছে কিশোর। ওর বন্ধুরা মারাত্মক বিপদের মধ্যে আছে। ওদের সাহায্য করা দরকার। কিন্তু কীভাবে?
‘তোমার জন্যে আমার খারাপ লাগছে, কিশোর,’ বাইরে এসে বলল বিল।
‘থ্যাংকস।’
ঠিক এই সময় বাতাসের শব্দকে ছাপিয়ে আরেকটা শব্দ ক্ষণিকের জন্য কানে এল কিশোরের। ইঞ্জিনের। ভুল শুনেছে ভেবে গুরুত্ব দিল না। কিন্তু আবার শোনা গেল শব্দটা। বাড়তেই থাকল। না, ভুল শোনেনি ও। বুকের মধ্যে লাফ দিয়ে উঠল হৃৎপিণ্ডটা। চিৎকার করে উঠল, ‘হাইড্রোপ্লেন!’
ওপর দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। প্লেনের ছোট্ট রানিং লাইটটা চোখে পড়ছে। ঝোড়ো বাতাসকে উপেক্ষা করে কালাহান’স-কী’তে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

ঢেউয়ে উত্তাল পানিতে নামতে গিয়ে কেঁপে উঠল হাইড্রোপ্লেন। ডকের দিকে দৌড়ে গেল কিশোর। ককপিট থেকে নেমে এলেন রাস্টির বন্ধু ব্রেক জনসন। 'এই তুফানের মধ্যে প্লেন ওড়ানো! মনে হচ্ছিল রোডেও খেলছি।'
'তারমানে মজাই পেয়েছেন,' চোখ থেকে বৃষ্টির পানি মুছল কিশোর। 'কিন্তু এ সময় এখানে কেন আপনি? ঝড়ের মধ্যে শুধু শুধু প্রাণ হাতে করে উড়াল দেননি নিশ্চয়?'
'না। আজ বিকেলে এমন কিছু খবর পেয়েছি, না এসে স্বস্তি পাচ্ছিলাম না।'
'কী খবর?'
'বিগ সাইপ্রেসে আমার এক বন্ধু মরিসের ব্যাপারে কতগুলো তথ্য দিয়েছে। আমার ফার্ম থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর অবৈধভাবে অ্যালিগেইটর শিকারের অপরাধে নয় মাস জেল খেটে সবে বেরিয়েছে ও। আমার এক কর্মচারীর সঙ্গে সহযোগিতা করে আমার কানা অ্যালিগেইটরটাকে চুরি করেছে। জেলে থাকতে এমন একটা লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে ওর, যে তালা খোলার ওস্তাদ।'
'গুজ বার্নার।'
'হ্যাঁ। তুমি জানলে কী করে?'
'সে-এক লম্বা কাহিনী,' কিশোর বলল। 'এখন ওসব বলার সময় নেই। দুজন খুনে ডাকাতের সঙ্গে একটা জাহাজে আটকা পড়েছে আমার বন্ধু রবিন আর মুসা। ওদের কথা আপনাকে বলেছিলাম।'
'এই আবহাওয়ায় প্লেন নিয়ে ওড়ার চিন্তা কোরো না,' সাবধান করে দিল ব্রেক। 'আমার মাথা খারাপ, সেজন্যে বেরিয়েছিলাম। তা- ও তো তুফান একটু কম ছিল। এখন আরও বাড়ছে।'
'বাড়ুক। আমি কেয়ার করি না।'
কিশোরের দিকে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে জনসন জিজ্ঞেস করলেন, 'রাস্টি কোথায়? এখন ওই প্লেন নিয়ে যদি কেউ উড়তে পারে, তো ও পারবে।'
'রাস্টির হাত...' জবাব দিতে যাচ্ছিল বিল।
তাকে থামিয়ে দিয়ে কিশোর বলে উঠল, 'মেইন কেবিনে।'
বিলের কথা বুঝতে পারেননি জনসন। দৌড় দিল কেবিনের দিকে।
'বলতে দিলে না কেন?' বিল বলল, 'তুমি জানো, ভাঙা হাত নিয়ে প্লেন ওড়াতে পারবে না রাস্টি।'
'জানি। এ-ও জানি, রাস্টি আর জনসন কোনমতেই আমাকেও এখন প্লেন ওড়াতে দেবেন না।'
ককপিটে চড়ল কিশোর। ইগনিশনেই লাগানো রয়েছে চাবিটা। 'ওটা তুমি ওড়াবে?' বিল অবাক।

‘আর কোন উপায় নেই। মরিসের আগেই আমি জাহাজটায় পৌঁছতে না পারলে মুসা ও রবিনের বাঁচার আশা শেষ।’
‘আমিও তোমার সাথে যাব।’
‘প্লেন ওড়াতে জানো?’
‘না। তবে আমি সঙ্গে থাকলে তোমার সুবিধে হবে।’ কিশোর বাধা দেয়ার আগেই কো-পাইলটের সিটে উঠে বসল বিল
বাতাসের অনুকূলে প্লেনের নাক ঘোরাল কিশোর, বাতাসের ধাক্কাটাকে কাজে লাগানো গেলে ওপরে উঠতে সুবিধে হবে। ফুল থ্রটল দিল। গতিবেগ যতটা সম্ভব বাড়িয়ে দিল। ঝোড়ো বাতাসে জলাভূমির বদ্ধ পানিতেও উত্তাল ঢেউ। তার ওপর দিয়ে ছুটতে গিয়ে মোচার খোলার মত দুলতে লাগল প্লেন।
‘শক্ত হয়ে বসে থাকো,’ বিলকে বলল কিশোর। আস্তে করে কন্ট্রোল ধরে টান দিল। পানি থেকে উঠে পড়ল প্লেন। বাতাসের স্রোতে ভর করে দ্রুত ওপরে উঠতে থাকল।
তুমি চোখ রাখো,’ ইঞ্জিন আর বাতাসের গর্জনকে ছাপিয়ে চিৎকার করে বলল কিশোর। ‘মরিসের বোটটা দেখা যায় নাকি দেখো।’
‘দেখেছি!’ একটু পরেই চেঁচিয়ে উঠল বিল। ডানে হাত তুলল।
মোহনার কাছে পৌছে গেছে বোট। উত্তাল সাগরের ঢেউ এসে জলার পানিতেও বড় বড় ঢেউ সৃষ্টি করছে। মরিসের হালকা এয়ারবোটকে এগোতে দিচ্ছে না। সামনে আধমাইল দূরে আলো দেখা যাচ্ছে। একটা জাহাজ। রানিং লাইট জ্বেলে দিয়েছে। মরিসের লক্ষ্য ওই জাহাজটাই, বুঝতে পারল কিশোর। চেঁচিয়ে বলল, ‘শিওর, ওটাই ডেনভারের জাহাজ!’
জাহাজটার কাছে পৌঁছতে সময় লাগল না। ভালমত দেখার জন্য প্লেন নিচুতে নামিয়ে আনল কিশোর। জাহাজের ডেকে কয়েকজন মানুষ। দুজন লোক বন্দুক দেখিয়ে চারজন মানুষকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে জাহাজের পিছন দিকে। মুহূর্ত পরেই ওই চারজন মানুষকে উত্তাল সাগরে ফেলে দিল বন্দুকধারীরা।
‘মুসাদেরকেই ফেলেছে!’ কিশোর বলল। ‘ওদের তুলতে হবে!’
‘ঠিক আছে। আমি রেডি,’ জবাব দিল বিল।
প্লেনের পিছন দিক থেকে এখন বাতাস বইছে। চক্কর দিয়ে ধীরে ধীরে নীচে নামতে শুরু করল কিশোর। প্লেনের তলায় লাগানো পন্টুন দুটো আলতো করে রাখল দুটো ঢেউয়ের মাঝখানের খাঁজে। কিন্তু একটা ঢেউয়ের চূড়া ভেঙে পড়াতে সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠতে বাধ্য হলো আবার। সময়মত উঠতে না পারলে ঢেউটা প্লেনের ওপরই ভাঙত। ধাক্কায় কাত হয়ে গেলে আর সোজা হবার সাধ্য ছিল না প্লেনটার।

শক্ত হাতে কন্ট্রোল চেপে ধরে রেখেছে কিশোর। আবার প্লেন নামাল। পন্টুন ছোঁয়াল দুটো ঢেউয়ের মাঝখানে। এবার সফল হলো।
ক্রমাগত এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে ঢেউ। প্লেনের একপাশে আঘাত হেনে ওটাকে কাত করে ফেলার চেষ্টা চালাচ্ছে যেন। কিন্তু পন্টুনে ভর করে ভেসে থাকায় ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্লেনটাও দুলছে; ওপরে উঠছে, নীচে নামছে।
ককপিটের হ্যাচ খুলে বাইরে বেরোল ও। একটা পন্টুনের ওপর নামল। পঞ্চাশ গজ দূরে পানিতে হাবুডুবু খেতে দেখল রবিন, মুসা, কিটি ও ডেপুটি ক্যানারকে। পানির ওপর মাথা ভাসিয়ে রাখতেই হিমশিম খাচ্ছে ওরা, সাঁতরে এগোনো তো দূরের কথা।
‘আমার মনে হয় হাত বেঁধে ফেলেছে,’ বিলকে বলল কিশোর। ‘আমি যাচ্ছি।’
‘আমিও যাব!’ অন্য পন্টুনটায় নেমে পড়ল বিল।
পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল দুজনে। বন্দিদের কাছে পৌঁছতে যেখানে পাঁচ মিনিট লাগার কথা, প্রতিকূল ঢেউয়ের বিরুদ্ধে লড়াই করে এগোতে সেখানে লাগল তিন গুণ বেশি সময়।
‘আমি ঠিক আছি,’ কিশোরকে বলল মুসা। ‘আগে রবিনের দড়ি খোলো।’
ওদের কাছ থেকে বিশ ফুট দূরে রয়েছে রবিন। পানির নীচে মাথা ডুবে যাচ্ছে। তুলতে পারছে না। প্রচুর পানি পেটে যাচ্ছে।
কাছে এসে রবিনকে ধরল কিশোর।
রবিন বলল, ‘হাতের দড়িটা শুধু কেটে দাও, কিশোর, তাতেই চলবে। ওদের বাঁচাও।’
ব্যাক পকেটে হাত দিল কিশোর। পেননাইফটা হাতে লাগতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। রবিনের হাতের দড়ি কাটতে শুরু করল। বেশির ভাগটাই কেটে যাবার পর সামান্য একটু যা লেগে রইল, টান দিয়ে ছিঁড়ে ফেলল রবিন।
ফিরে তাকাল কিশোর। ডেপুটি শেরিফকে প্লেনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে বিল। অর্ধেক পথ চলে গেছে। সাঁতরে মুসার কাছে ফিরে এল কিশোর। দড়ি কাটতে কাটতে জিজ্ঞেস করল, ‘কিটি কোথায়?’
চারপাশে তাকাল মুসা। কিটিকে দেখতে পেল না। অথচ খানিক আগেও ছিল। বাঁধন কেটে যেতেই প্লেনের দিকে সাঁতরাতে শুরু করল ও। পিছনে কিশোর। সাঁতরানোর সময় চারপাশে কিটিকে খুঁজছে ওদের চোখ।
কিশোরের কাঁধ চেপে ধরল মুসা। ‘পানিতে তলিয়ে গিয়ে থাকলে আর ভাসতে পারবে না! ডুব দিয়ে দেখব নাকি?’
মুসার হাত ধরে টান দিল কিশোর। ‘পাগল! এই ঢেউয়ের মধ্যে ডুব দিলে আর ভাসতে পারবে?’

মুসাও সেটা জানে। মনে একটা খুঁতখুঁতি নিয়ে প্লেনের দিকে সাঁতরে চলল ও। পৌছে গেছে বিল আর ডেপুটি ক্যানার। পন্টুনে উঠে ক্যানারের বাঁধন খুলে দিয়েছে বিল। দুজনে হাত বাড়িয়ে দিল কিশোরকে উঠতে সাহায্য করার জন্য।
প্লেনের প্যাসেঞ্জার সাইডের পন্টুন থেকে আরেকটা হাত বাড়িয়ে দেয়া হলো মুসাকে তোলার জন্য। হাঁ হয়ে গেল মুসা। 'কিটি! তুমি কী করে এলে?'
'সেমিনোল ম্যাজিক,' হেসে জবাব দিল কিটি। 'একে আমরা বলি ডলফিন-সাঁতার। অনেকটা বাটারফ্লাই সাঁতারের মত, হাত বাঁধা অবস্থায় সাঁতরানো। '
হেসে উঠল মুসা। ওপরে উঠে কিটির কাঁধ চাপড়ে দিল। হঠাৎ বন্দুকের গুলির শব্দ হলো। ওদের কয়েক ফুট পিছনে পানি ছিটাল গুলি।
পঞ্চাশ গজ দূরে এয়ারবোটের গলুইয়ে বসে থাকতে দেখা গেল তাকে। হাতে একটা দোনলা বন্দুক। দ্বিতীয় নল থেকে আবার গুাণ করল ও। বাঁয়ের পন্টুনে এসে লাগল গুলি।
'ভিতরে ঢোকো!' চিৎকার করে বলল কিশোর।
হাইড্রোপ্লেনের ছোট্ট ককপিটে গাদাগাদি করে বসল সবাই। সবার শেষে প্লেনে উঠল মুসা। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'এত বোঝা নিয়ে এখন এটা উড়তে পারলে হয়!
'আরও বিপদ আসছে!' হাত তুলে দেখাল ক্যানার। উইন্ডশীল্ডের ভিতর দিয়ে তাকিয়ে আছে। ডেনভারের জাহাজ 'শার্ক' ছুটে আসছে ওদের দিকে।
'কী করছে?' ভয় পেয়ে গেল মুসা।
চোখ বড় বড় হয়ে গেছে রবিনের। 'প্লেনের গায়ে গুঁতো মারবে!'
এক মুহূর্ত দেরি না করে ইঞ্জিন স্টার্ট দিল কিশোর। থ্রটল খুলে গতি বাড়ানো শুরু করল।
ডানে ঘুরে গিয়ে ওদের পথ আটকানোর চেষ্টা করল শার্ক।
'কোনভাবেই সময়মত ওড়া সম্ভব না,' ক্যানার বললেন।
ভারি দম নিল কিশোর। জবাব দিল না। নিজের কাজ করে গেল।
মরিসকে শটগানে আবার গুলি ভরতে দেখল রবিন। নাক বরাবর সামনে চলে গেছে এখন শার্ক। চেঁচিয়ে বলল, 'কিশোর, জলদি করো!'
মাথা ঝাঁকাল কিশোর। আলতো করে টান দিল কন্ট্রোলে। নাক উঁচু করল প্লেন। শটগানের গুলি ওদের ঠিক নীচ দিয়ে চলে গেল।
জাহাজের দিকে উড়ে যাচ্ছে প্লেন। উঁচু! আরেকটু উঁচু! জাহাজের গায়ে গুঁতো লাগে লাগে অবস্থা। ককপিটে বসা সবাই চেঁচিয়ে উঠল। জাহাজের ডেকের মাত্র কয়েক ফুট ওপর দিয়ে উড়ে গেল প্লেন। শেষ মুহূর্তে জাহাজের ডেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল গুজ বার্নার। নইলে প্লেনের পন্টুনের বাড়ি খেত মাথায়।

‘ইয়াহু!’ রোডেও-চিৎকার দিয়ে উঠল কিটি। ‘মনে হচ্ছে হারিক্যানের পিঠে চড়েছি!’
নীচে তাকিয়ে আছে রবিন। এয়ারবোট থেকে মরিসের বাড়িয়ে দেয়া একটা বস্তা জাহাজে টেনে তুলতে দেখল বার্নার আর ডেনভারকে। ‘মোহরের বস্তা! ওদের এই পালানো দেখতে ভাল লাগছে না আমার!’
‘পালাতে পারবে না,’ কিটি বলল।
ভুরু নাচাল মুসা। ‘ভবিষ্যৎ দেখারও ক্ষমতা আছে নাকি আপনার?’
‘না। ওই দেখো, কোস্ট গার্ডের বোট।’
কোস্ট গার্ডের কাটার জাহাজটাকে কিশোরও দেখল। শক্তিশালী ইঞ্জিনওয়ালা ওই জাহাজের সঙ্গে পাল্লা দেয়ার সাধ্য নেই ফিশিং বোটের। আনন্দে হই-চই শুরু হলো হাইড্রোপ্লেনের ছোট্ট ককপিটে। এত বোঝা না থাকলে ফিশিং বোটটাকে পাকড়াও করার দৃশ্যটা না দেখে যেত না কিশোর।
ফিশিং ক্যাম্পের আলো দেখা গেল। শক্ত হয়ে বোসো সবাই। আমি এখন ল্যান্ড করব!’
একটু পর পানিতে আঘাত হানল প্লেনের একপাশের একটা পন্টুন। সাগরের ঢেউয়ের খাঁজে নামার চেয়ে জলাভূমির অপেক্ষাকৃত স্থির পানিতে নামাটা কঠিন হলো। প্রচণ্ড ঝাঁকি লাগল। দ্বিতীয় পন্টুনটাও পানি ছুঁলো। আবার প্রচণ্ড ধাক্কা। ডকের দিকে ছুটে যাচ্ছে তীব্র গতিতে। আর রক্ষা নেই। চোখ বুজে ফেলল সবাই। কিন্তু ভাসমান ডকের ওপর উঠে পড়ল পন্টুন দুটো। পিছলে ছুটল।
মনে হলো যেন অনন্তকাল পর অবশেষে থামল প্লেনটা। এক এক করে চোখ মেলল সবাই। ভারি নিঃশ্বাসের শব্দ। আবার শুরু হলো গুঞ্জন। বেঁচে গেছে এবারকার মত।
কোথায় আছে বুঝতে পেরে হেসে উঠল রবিন। হাসিটা সংক্রমিত হলো মুসার মাঝেও। প্লেনের দুদিকে দুটো খুঁটি। ওদের কেবিনটার ঠিকনীচে এসে থেমেছে প্লেন।
‘একেবারে বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছে।’ প্লেনের গা চাপড়ে দিয়ে বলল রবিন, ‘সাবাস বেটা!’
‘কিন্তু কেবিনের ভিতর কে আটকা পড়ে আছে শুনলে আনন্দের সীমা থাকবে না তোমাদের,’ হেসে জবাব দিল কিশোর। বিলও ওর হাসিতে যোগ দিল। রবিন, মুসা, কিটি আর ক্যানার এ-ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগল। কিছু না বুঝে বোকার হাসি হাসল।
.

রাতে ঝড়ের মধ্যেই অ্যালিগেইটরটাকে বাইরে বের করার ব্যবস্থা করল কিটি আর ব্রেক। ওটাকে কেবিনে আনা হয়েছিল কীভাবে, রহস্যটা ভেদ হলো। ডিমগুলো নিয়ে এসে রেখে দিয়েছিল মরিস। ডিমের আকর্ষণেই উঁচু সিঁড়ি বেয়ে উঠে কেবিনে ঢুকে পড়েছিল অ্যালিগেইটরটা। বোঝা গেল, ওই ডিম দেখিয়েই বিগ সাইপ্রেস থেকে জলাভূমি দিয়ে ওটাকে সোয়াম্প ল্যান্ডে টেনে এনেছিল মরিস। এখন ওই ডিমের সাহায্যেই আবার ওটাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে বিগ সাইপ্রেসে, অ্যালিগেইটরের খামারে, ওর পুরানো বাড়িতে।

পরদিন সকালে ঝড় থামল। দুপুর একটা নাগাদ মেঘ কেটে গিয়ে রোদ হেসে উঠল। আকাশ ঘন নীল। দেখে মনেই হয় না এতবড় একটা ঝড় বয়ে গেছে।

রোডেও গ্রাউন্ডের গ্র্যান্ডস্ট্যান্ডে বসে খেলা দেখছে কিশোর ও রবিন। একের পর এক কাউবয় এসে রিঙে ঢুকছে, প্রতিযোগিতা করছে। মারাত্মক বিপজ্জনক এক খেলা। সেদিকে তাকিয়ে রবিন বলল, 'নিজে বিপদে পড়ার চেয়ে অন্যের বিপদ দেখে মজা পাওয়া সহজ!'

হাসল কিশোর। 'ডাকাতের সাথে টক্কর লাগার কথা বলছ তো?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'এই জলার অঞ্চল আর আমার ভাল লাগছে না। রকি বিচে ফিরে যেতে পারলে বাঁচি। আগামী একশো বছর শাওয়ার ছাড়া অন্য কোন ধরনের পানিতে ভিজতে রাজি নই আমি।'

বুল-রাইডিঙের খেলায় ব্ল্যাক ডেভিলের পিঠে চড়ে কিটিকে ঢুকতে দেখা গেল। সফল খেলা দেখিয়ে চলে গেল।

তারপর যাকে ঢুকতে দেখল, চোখ কপালে উঠে গেল কিশোর- রবিনের। রাস্টি কালাহান। সাথে ওর সহকারী হ্যারিস। রাস্টির এক হাত স্লিঙে ঝোলানো। ভাঙা হাত নিয়েই খেলতে চলে এসেছে। ল্যাসো হাতে স্টিয়ার রোপিং খেলা শুরু করল। হ্যারিসের এক হাতে ল্যাসো, আরেক হাতে ঘোড়ার লাগাম ধরা। রাস্টির ভাল হাতটায় ল্যাসো, ভাঙা হাত দিয়ে লাগাম ধরতে পারছে না, কোন কিছু না ধরেই বসে আছে ঘোড়ার পিঠে। বিস্ময়কর দক্ষতায় এক হাতেই ল্যাসো ছুঁড়ে গরুর শিঙে আটকে ফেলল। হ্যারিস গরুর পিছনের পায়ে ল্যাসো আটকে দিল। হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল গরু।

রুদ্ধশ্বাসে এই খেলা দেখছিল দর্শকরা। তুমুল করতালিতে ফেটে পড়ল। হাততালি দিতে দিতে কিশোর বলল, 'আরিব্বাপরে, কী খেলা! গিনেস রেকর্ড বুকে নাম উঠে যাওয়া উচিত। ভাঙা হাত নিয়ে স্টিয়ার রোপিং!'

এক হাতেই ল্যাসো খুলে নিল রাস্টি। গরুটাকে মাটি থেকে উঠতে সাহায্য করল রোডেও ভাঁড়, এবার আর নকল নয়, আসল ডিক টোম্যান। দর্শকদের দিকে হ্যাট নেড়ে ধন্যবাদ জানাল রাস্টি।

মাইকে শোনা গেল মিস্টার গিবসনের ঘোষণা, ‘এবার খেলা দেখাতে আসছে বিল ওয়াটমোর আর মুসা আমান।’
রবিনের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে কিশোর বলল, ‘আমাদের মুসা রোডেও খেলছে, ভাবতে পারো?’
‘নাহ্, সত্যিই পারি না,’ রবিন বলল। ‘কিন্তু আমার অবাক লাগছে, যে বাবার ভয়ে এত কাণ্ড করল বিল, তিনি তাকে খেলতে দিতে রাজি হলেন কী করে?’
‘এতবড় একটা ডাকাতির কেসের সমাধান করতে পুলিশকে সহযোগিতা করেছে বলে এতই খুশি হয়েছেন মিস্টার ওয়াটমোর, ছেলের এই আবদার তিনি পূরণ করেছেন।’
‘তুমি জানলে কীভাবে?’
‘বিল আমাকে বলেছে।’
শূটের দরজা খুলে দিল টোম্যান। ঘোড়ায় চড়ে রিঙে ঢুকল মুসা। প্রথমেই ল্যাসো না ছুঁড়ে সোজা গিয়ে টারজানের মত গরুর দুই শিং চেপে ধরল। ষাঁড়টাও নাছোড়বান্দা। এত সহজে পরাজিত হতে রাজি নয়। হ্যাঁচকা টানে ঘোড়ার পিঠ থেকে তুলে নিয়ে এল মুসাকে। মুসাও ছাড়ল না। দুই শিং ধরে ঝুলে রইল।
মুসার ওজনের কারণেই বোধহয় শেষ পর্যন্ত মাথা নোয়াতে বাধ্য হলো ষাঁড়। তা ছাড়া এত নাছোড়বান্দা বেয়াড়া খেলোয়াড়ও বোধহয় এই প্রথম পেয়েছে। ষাঁড়ের দ্বিধাকে কাজে লাগিয়ে ওটাকে মাটিতে শুইয়ে ফেলল মুসা।
আবার করতালিতে ফেটে পড়ল উত্তেজিত দর্শক। এ সময় রিঙে ঢুকল বিল। কয়েকটা গরু ছেড়ে দেয়া হলো রিঙে। ঘোড়ার পিঠে চড়ে রিঙের এক মাথা থেকে আরেক মাথায় ছুটে বেড়াতে লাগল মুসা। বিল ওর সহকারী। একের পর এক গরুকে ল্যাসোয় আটকে ধরাশায়ী করতে থাকল দুজনে।
করতালির পর করতালি!
উত্তেজনায় কখন সিট থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে কিশোর ও রবিন, বলতে পারবে না। দর্শকদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চেঁচিয়ে যাচ্ছে ওরাও। চেঁচিয়ে গলা ফাটাচ্ছে। হাততালি দিচ্ছে। মনে রাখার মত একটা দিন ওদেরকে উপহার দিচ্ছে ওদের বন্ধু মুসা আমান।
***

তিন গোয়েন্দা ভলিউম ১১৬/২ – ভুতুড়ে দুর্গ – শামসুদ্দীন নওয়াব – সেবা প্রকাশনী – প্রথম প্রকাশ : ২০১০

গুড়ুম! অন্ধকার, ঝোড়ো রাত ভেদ করে গুম-গুম করে উঠল বাজের শব্দ।
‘খাইছে! কীসের শব্দ ওটা?’ ভ্যানের পিছনে বসা মুসা প্রশ্ন করল।
‘বাজ, মুসা। ভয়ের কিছু নেই,’ সামনের আসন থেকে বলল রবিন।
‘ভয়ের কিছু নেই? শুনলি, রাফি? আকাশ যে কোন মুহূর্তে আমাদের মাথায় ভেঙে পড়বে অথচ ভয়ের নাকি কিছু নেই।’ বলল মুসা।
‘ঘাবড়িয়ো না, মুসা,’ চালকের আসন থেকে বলল কিশোর। ‘আমরা সময় মতই সিনেমা হলে পৌঁছে যাব। একটু ঝড় উঠেছে শুধু।’
‘তোমার কথা ঠিক হলেই ভাল, কারণ আমার খিদে পেয়েছে। তোর কী খবর, রাফি?’
রাফি লেজ দুলিয়ে সম্মতি জানাল।
আঁকাবাঁকা রাস্তা ধরে সাবধানে এগিয়ে চলেছে ভ্যান। মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে, তবে মুভি থিয়েটার আর মাত্র ক’মাইল দূরে।
কিশোর’ বলল জিনা। ‘এই শর্টকাটটা সুবিধের ঠেকছে না।’
‘হ্যাঁ, ভীষণ অন্ধকার,’ যোগ করল রবিন। ‘তুমি ঠিকমত রাস্তা দেখতে পাচ্ছ তো, কিশোর?’
‘একদম পরিষ্কার,’ জবাবে বলল কিশোর।
দুম!
প্রচণ্ড ঝাঁকি খেয়ে ভ্যানটা হড়কে গেল রাস্তা থেকে।
‘আকাশ ভেঙে পড়েছে!’ চেঁচিয়ে উঠল মুসা।
ওর কোলে লাফিয়ে উঠে পড়ল রাফিয়ান।
ভ্যানটা থেমে দাঁড়িয়েছে।
চা সবাই ঠিক আছ তো?’ কিশোরের প্রশ্ন।
‘আমি ঠিক আছি,’ বলল রবিন। ‘জিনা?’
‘হ্যাঁ, ধন্যবাদ। ভাগ্যিস সিট বেল্ট লাগিয়েছিলাম,’ বলল জিনা কিশোর পিছন দিকে ঘুরে চাইল।
‘তোমাদের কী খবর?’
মুসা আর রাফিয়ানকে কোথাও দেখা গেল না।
‘মুসা? রাফি?’ ডাকল জিনা।
‘আমরা ভাল আছি,’ পিছনের সিটের তলা থেকে শোনা গেল মুসার গলা। ‘আমরা, মানে, দেখছিলাম আরকী মেঝেটা ঠিক আছে কিনা।’
‘হুম…’ বলল রবিন। ‘ব্যাপারটা কী ঘটল বুঝতে পারছি না।’

‘শব্দ শুনে তো মনে হলো টায়ার ফেটেছে,’ বলল জিনা।
‘দেখি,’ বলল কিশোর। গ্লোভ কম্পার্টমেন্ট থেকে একটা ফ্ল্যাশলাইট বের করে নিয়ে টায়ারগুলো দেখতে গেল।
‘তোমরা এখন বেরিয়ে আসতে পারো,’ মুসার উদ্দেশে বলল
জিনা। ‘মেঝে নিশ্চয়ই ঠিকই আছে।’
‘কে জানে, অতটা শিয়োর হতে পারছি না,’ বলল মুসা।
রাফিয়ান ঘেউ করে উঠল। মনে হয় সায় জানাল।
কিশোর ভ্যানে ফিরে এল।
টায়ার ফেটেছে। মনে হয় কোন পাথর-টাথরে লেগে ফেঁসে গেছে। সবাই বসে থাকো। আমরা সময় মতই হলে পৌঁছে যাব। মুসা, স্পেয়ারটা নিয়ে আমার সাথে এসো।’
‘সম্ভব নয়,’ বলল মুসা।
‘কেন?’ প্রশ্ন করল কিশোর। ‘এখনও ভয় কাটেনি?’
‘আমি ভয় পাইনি,’ জবাবে বলল মুসা।
গুড়ুম!
‘খাইছে! আকাশ ভেঙে পড়েছে!’ চেঁচিয়ে উঠল মুসা। ওর কাণ্ড দেখে হেসে ফেলল কিশোর, রবিন আর জিনা।
‘হেসো না,’ বলল মুসা। ‘এসব ঝোড়ো রাতে ভূত বেরোয়!’
‘অনেক হয়েছে,’ বলল কিশোর। ‘এবার এসো তো চাকাটা বদলে ফেলি।’
‘আগেই তো বলেছি, কিশোর, সম্ভব নয়। কোন বাড়তি চাকা নেই,’ বলল মুসা।
‘তারমানে?’ কিশোর, রবিন আর জিনা পরস্পর মুখ তাকাতাকি করে নিল। এবার মুসার দিকে চাইল। ‘কেন নেই?’ কিশোরের প্রশ্ন।
‘আমার আর রাফির ইমার্জেন্সি সারভাইভাল কিটের জন্যে জায়গা দরকার ছিল। ইমার্জেন্সিতে টিকে থাকার মত জিনিস আছে ওখানে। তাই না রে, রাফি?’ জিজ্ঞেস করল মুসা।
রাফি ঘেউ করে উঠল।
‘সারভাইভাল কিটে না জানি কী আছে,’ বলল রবিন।
‘আমি ধারণা করতে পারছি,’ বলল জিনা।
মুসা স্পেয়ার টায়ার কম্পার্টমেন্ট খুলল। ভিতরে কুকি, চিপস, কেক, সোডা পপ, আর সাবমেরিন স্যাণ্ডউইচ।
‘ঝড়ের মধ্যে আটকা পড়েছি আমরা, সঙ্গে বাড়তি টায়ার নেই, ‘ বলল কিশোর।
‘শুনে ইমার্জেন্সি সিচুয়েশন মনে হচ্ছে,’ বলল মুসা।
হাত বাড়িয়ে স্ন্যাক্স তুলে নিল ও। রাফিকেও দিল।

‘অ্যাই, ওটা কী?’ বলল রবিন। উইণ্ডশিল্ড ভেদ করে তর্জনী তাক করল। আকাশ আবারও চিরে দিল বিজলীর রেখা। আলোকিত হলো বিশাল এক দুর্গ। রাস্তার ঠিক ও মাথায়। ‘দেখে মনে হচ্ছে কারও বাড়ি।’
‘অট্টালিকা বলাই ভাল,’ যোগ করল কিশোর।
‘দুর্গের মত,’ জিনা বলল।
‘ভুতুড়ে দুর্গ,’ বলল মুসা।
‘চলো সাহায্যের জন্যে যাই ওখানে,’ বলল কিশোর।
‘আমরা ওদের ফোন ব্যবহার করতে পারি,’ বলল জিনা। ‘হয়তো ছবিটা মিস করতে হবে না আমাদের।’
মুসা এক চুল নড়ল না।
‘যাবে না?’ রবিন জানতে চাইল।
‘না,’ মাথা নেড়ে বলল মুসা। ‘ঝড়ের রাতে কোন ভুতুড়ে দুর্গে ঢোকার ইচ্ছে আমার নেই।’
লেজ নেড়ে যেন সায় জানাল রাফিয়ান।
‘বোকার মত কথা বোলো না। এটা মোটেও ভুতুড়ে দুর্গ নয়,’ বলল জিনা।
মুসা স্যাণ্ডউইচে কামড় বসাল। ‘আমরা এখানেই ভাল আছি।’
‘থাকো তা হলে,’ বলল কিশোর।
বন্ধুদেরকে ভ্যান থেকে নামতে দেখল মুসা। জিনা সবার সামনে, ফ্ল্যাশলাইট জ্বেলে পথ দেখাচ্ছে। মুহূর্ত দুয়েক পরে দৃষ্টিসীমার আড়ালে চলে গেল ওরা।
‘ওরা বৃষ্টিতে ভিজছে, আর আমরা রয়েছি শুকনো ভ্যানের ভিতরে-সাথে ইমার্জেন্সি সারভাইভাল কিট। এখন বল তো, রাফি কারা বোকা?’
কড় কড়! গুড়ুম!
ভ্যানের পাশের এক গাছে বাজ পড়ল। মাটিতে উপড়ে পড়ল গাছটা। গোটা ভ্যান কেঁপে উঠল থরথর করে। মুখ পাংশু হয়ে গেল মুসার।
দাঁড়াও! আমরা আসছি!’ চিৎকার ছাড়ল ও।
তারপর ভ্যান থেকে লাফিয়ে নেমে দুর্গটার দিকে ছুটল। ওকে অনুসরণ করল রাফিয়ান।
রাফিকে পিছনে নিয়ে মন্টগোমারি দুর্গের আঁকাবাঁকা ড্রাইভওয়ে ধরে ছুটে চলল মুসা। রাস্তা খাড়া হয়ে উঠে গেছে, বৃষ্টির কারণে চড়াই বাওয়া কষ্ট সাধ্য হলো আরও। শেষমেশ মুসা আর রাফি চূড়ায় উঠতে পারল। সদর দরজার কাছে যখন পৌছল, দস্তুরমত হাঁফাচ্ছে।
‘ওরা সব কোথায়,’ বলে চারধারে নজর বুলাল মুসা।
‘বু!’

আর্তচিৎকার ছাড়ল মুসা।
কিশোর। রবিন আর জিনার সঙ্গে দাঁড়িয়ে।
‘সাবাস! দারুণ দৌড় দিয়েছ,’ বলল কিশোর। হেসে উঠল।
‘তো, মুসা, তুমি ভ্যান ছেড়ে এখানে কেন?’ রবিনের প্রশ্ন।
‘ভ্যানটাকে আর নিরাপদ মনে হলো না,’ বলল মুসা।
‘ঘেউ,’ ডাক ছেড়ে সায় জানাল যেন রাফি।
‘অনেক ফাজলামো হয়েছে। আমরা এখানে ফোন ইউয করতে এসেছি,’ বলল কিশোর। ডোর লকারের দিকে হাত বাড়াল ও। ‘লোক থাকলেই হয়,’ যোগ করল।
‘উপরে আলো জ্বলছে, লোক থাকার সম্ভাবনাই বেশি,’ বলল জিনা। তিন তলায় বড় বড় জানালাগুলো আঙুল ইশারায় দেখাল।
দরজাটা ককিয়ে উঠে খুলে গেল। ছেলে-মেয়েরা ভিতরে উঁকি দিয়ে কিছুই দেখতে পেল না। এবার আঁধার ফুঁড়ে একটা মুখ উদয় হলো। বয়স্ক এক লোকের মুখ। হাতে ধরা মোমবাতির আ মুখের চেহারায় ভুতুড়ে ছায়া পড়েছে।
‘একটা কথা ভুলে গেছিলাম,’ বলল মুসা। ‘এখন মনে পড়েছে।’
‘কী?’ জিজ্ঞেস করল রবিন।
‘ভ্যানে থাকলেই ভাল হত!’ জবাবে বলল মুসা।
‘প্লিজ,’ বলল বৃদ্ধ। কুঁচকোনো একটা হাত রাখল মুসার কাঁধে। ‘প্লিজ, ভেতরে এসো।’
ঢোক গিলল মুসা।
‘রাফি, তুই আগে যা,’ বলে ঠেলা দিল রাফিকে।
দলটা রাফিকে অনুসরণ করে দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল অন্ধকারাচ্ছন্ন ফ্রন্ট হল-এ। দরজাটা ওদের পিছনে লেগে গেল দড়াম করে।
‘আমার নাম ক্লাইভ,’ বৃদ্ধ জানাল।
গ্রিক ‘মাফ করবেন,’ বলল কিশোর, ‘আমাদের ভ্যানের চাকা ফেটে গেছে আপনাদের বাসার সামনে আর-’
‘কার সাথে কথা বলছ, ক্লাইভ?’ অচেনা এক কণ্ঠস্বর বলল। আরেকজন লোক উদয় হলো। এর হাতেও মোমবাতি। ‘আমি ক্লিফটন মন্টগোমারি। এ আমার খানসামা ক্লাইভ। বাজে একটা রাত, তাই না?’
‘হ্যাঁ, মিস্টার মন্টগোমারি,’ জবাব দিল কিশোর।
‘আমাকে ক্লিফট বলে ডেকো। এসো, গা শুকিয়ে নাও,’ বলে চললেন ক্লিফট। ‘আলোর জন্যে দুঃখিত। মেরামতের কাজ চলছে তো তাই আমাদেরকে মোমবাতি ব্যবহার করতে হচ্ছে।’
‘মাফ করবেন, মিস্টার মন্টগোমারি, কিন্তু-’ বলতে শুরু করেছিল কিশোর।

‘আহ-আহ-আহ-আমাকে ক্লিফট বলে ডাকো।’
‘ঠিক আছে, ক্লিফট। আমরা কি আপনার ফোনটা ইউয করতে পারি? আমাদের ভ্যানের চাকা ফেটে গেছে। সাথে এক্সট্রা টায়ারও নেই।’ জ্বলন্ত চোখে মুসার দিকে চাইল কিশোর।
‘সরি, ফোন লাইন নষ্ট। ঝড় থেমে গেলে ক্লাইভ মেরামতের চেষ্টা করবে। এখন এসো। আমাদের সাথে ডিনার করবে।’
‘ধন্যবাদ, ক্লিফট, কিন্তু-’ শুরু করেছিল জিনা।
ওর কথা কেড়ে নিলেন ক্লিফট।
‘আমি না শুনব না।’
রাফির দিকে চাইল মুসা।
‘মানুষটার কথা তো শুনলি। উনি না শুনবেন না। এ জায়গাটা হয়তো ততটা খারাপ নয়, বলল ও।
ক্লাইভ ওদেরকে পিছনে নিয়ে, ফ্রন্ট হল পেরিয়ে বিশাল, বাঁকা এক সিঁড়ি ধরে ওপরে উঠতে লাগল। ওপরে উঠছে সবাই, এসময় মুসা বাতাসে নাক টানল। সুস্বাদু, তাজা রোস্ট বীফের সুঘ্রাণ।
‘বলেছিলাম না, রাফি, এখানে ভয়ের কিছু নেই,’ খোশমেজাজে বলল মুসা।
সিঁড়ির মাথায় পৌছে নিজেদেরকে গ্রেট হল-এ দেখতে পেল ছেলে- মেয়েরা। এত বড় কামরা ওরা এর আগে দেখেনি। ঘরটার সব কিছুই প্রকাণ্ড। দেয়ালগুলো দেখে মনে হলো পঞ্চাশ ফুট উঁচু আর পাথরের চাঁই দিয়ে তৈরি। এক দেয়াল জুড়ে প্রাচীন ঢাল, তরোয়াল আর অন্যান্য মধ্যযুগীয় অস্ত্রপাতি। আরেক দেয়ালে দেখা গেল দশটি বর্মের এক সারি, প্রতিটা সাত ফুট লম্বা। তিনটে অতিকায় ঝাড়বাতিদান শত-শত মোমবাতির আলোয় উদ্ভাসিত।
‘কে ওটা?’ জিনা জবাব চাইল। এক লোকের পেল্লায় এক তৈলচিত্রের দিকে ইঙ্গিত করল। লোকটির মুখের চেহারায় কঠোরতার ছাপ।
‘উনি ওয়ার্ড মন্টগোমারি, আমার পরদাদা,’ বললেন ক্লিফট। ‘অদ্ভুত সুন্দর,’ বলল রবিন
‘বাহ্,’ বলল কিশোর।
‘আমরা কখন খেতে বসব?’ মুসার প্রশ্ন।
ক্লাইভ হেঁটে এসে মুসার পিছনে দাঁড়াল।
‘এদিকে এসো,’ পিছন থেকে বলল ও।
আঁতকে উঠল মুসা।
‘আমাদেরকে এভাবে চমকে দিয়েন না, বলল ও। ‘বেচারী রাফির আরেকটু হলে হার্ট অ্যাটাক হয়ে যেত। তুই ঠিক আছিস তো, রাফি? রাফি?’ মুসা চারধারে নজর

বুলিয়ে রাফিকে কোথাও দেখতে পেল না। রাফি ইতোমধ্যেই গরুর মাংসের রোস্টের সুগন্ধ অনুসরণ করছে।
‘তোমার কুকুর দুর্দান্ত ব্লাডহাউণ্ড হতে পারবে,’ বললেন ক্লিফট। ‘ও এরমধ্যেই ডাইনিং রুমের হদিস বের করে ফেলেছে। এসো।’ রাফিকে অনুসরণ করার জন্য হাতছানি দিয়ে সবাইকে ডাকলেন তিনি।
বৈদ্যুতিক ঝাড়বাতি আলোকিত করে রেখেছে ডাইনিং রুমটাকে। বেশ ক’জন মানুষ ইতোমধ্যেই লম্বা টেবিলটিতে বসে আছে, কিন্তু মুসা তাদেরকে খেয়াল করল না। শুধুমাত্র খাবারের দিকে নজর ওর।
‘একেই বলে ডিনার টেবিল,’ সমীহের সুরে বলল মুসা। লম্বা টেবিলটির মাঝখানে এক সারি রুপোলী থালা। প্রতিটি থালায় উঁচু হয়ে আছে খাবার।
‘রাফি, দেখতে পাচ্ছিস?’ প্রশ্ন করল মুসা।
ঘেউ করে উঠল রাফি।
ওরা দু’জন টেবিলের কাছে হেঁটে গেল। এত খাবার দেখে ওদের চোখ ছানাবড়া। রোস্ট বীফ, চিকেন, মাছ, নানা ধরনের সব্জী, লম্বা রুটি, পাতলা রুটি, গোল পাঁউরুটি আর স্তূপাকারে স্প্যাঘেটি-কী নেই।
‘প্লিজ, বসে পড়ো,’ বললেন ক্লিফট। হাত নেড়ে কটা খালি চেয়ার দেখিয়ে দিলেন। টেবিল ঘিরে বসল ছেলে-মেয়েরা।
‘দারুণ একটা খবর আছে, তোমাদের সবার সাথে শেয়ার করতে চাই,’ টেবিলের মাথা থেকে বললেন ক্লিফট। ‘তবে শুরু করার আগে পরিচয়-পর্বটা সেরে নেয়া যাক। অচেনা লোকের চাইতে বন্ধু- বান্ধবদের সঙ্গে খেতে বসা অনেক স্বস্তিকর ব্যাপার।’
‘ক্লিফট, এটা কি তোমার আরেকটা সিলি গেম?’ তাঁর পাশে বসা মহিলা প্রশ্ন করলেন।
কিশোর শ্রাগ করে মুখ খুলল।
‘আমি শুরু করি। আমি কিশোর, আর এরা হচ্ছে রবিন, জিনা, মুসা আর রাফি। দুর্গের ঠিক বাইরেই ভ্যানের চাকা ফেটে গেছে আমাদের। আমরা ফোনটা ব্যবহার করতে এসেছিলাম শুধু।’
‘আর আমি ওদেরকে জোর করে ডিনারে বসিয়েছি। আমি সব সময় বলি, মানুষ যত বেশি আনন্দও তত বেশি। বারবারা, তোমার পালা।’
‘আমি বারবারা রেডিং,’ ক্লিফটের পাশে বসা মহিলা বললেন। ‘তোমরা হয়তো জানো আমি এ শহরের মেয়র। আমি ক্লিফটকে বহুদিন ধরে বোঝানোর চেষ্টা করছি ও যাতে এই দুর্গটা জাদুঘরের জন্যে দান করে।’

জিনার পাশে বসা বৃদ্ধ লোকটি সামনে ঝুঁকে বসে কাশি দিলেন। ‘সানি ডিপেস্টো। রিয়েল এস্টেট, শপিং মল, পার্কিং গ্যারেজ। আমি অনেক বছর ধরে এই জায়গাটা চাইছি। মধ্যযুগীয় ভাবধারার এক বিনোদন পার্ক বানাব। আমি এর নাম দিতে চাই নাইটল্যাণ্ড।’
তাঁর উল্টোদিকে বসা লালচুলো মহিলা মাথা নাড়লেন অননুমোদনের ভঙ্গিতে।
‘আমি স্যালি ম্যাকিনটায়ার, স্কটল্যাণ্ডের রয়্যাল মিউজিয়াম থেকে এসেছি। আমরা চাই এখানে স্কটল্যাণ্ডের ইতিহাস ঐতিহ্য নিয়ে একটা জাদুঘর হোক। এটার মালিক একসময় একজন স্কটিশ ছিলেন।’
ক্লিফট চেয়ারের পাশে দাঁড়ালেন।
‘আপনারা অনেকেই হয়তো মন্টগোমারি পরিবারের ঐতিহ্য সম্পর্কে জানেন না। আমার পরদাদা এই দুর্গটা কিনেছিলেন এক স্কটিশ জমিদারের কাছ থেকে। মন্টগোমারি পরিবার এখানে বহু বছর ধরে বাস করছে। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, আমার নিজের কোন পরিবার নেই। কাজেই আজ মাঝরাতে আমি এই দুর্গটা শহরের মানুষকে দান করে দেব। জাদুঘর এবং পার্ক হিসেবে ব্যবহার করার জন্যে।’
মেয়র রেডিং চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন।
‘অসাধারণ!’ চেঁচিয়ে উঠলেন।
সানি ডিপেস্টো পানির গ্লাসের দিকে হাত বাড়ালেন।
‘এই শহরে জাদুঘর কদ্দিন টেকে দেখব,’ শ্বাসের নীচে আওড়ালেন তিনি।
‘স্কটল্যাণ্ডের মানুষ বঞ্চিত হলো,’ স্যালি বললেন রবিনকে I
‘ক্লিফটন মন্টগোমারির উদ্দেশে টোস্ট হয়ে যাক,’ বললেন মেয়র রেডিং। সবাই যার যার গ্লাস তুলল।
‘আমার ভাল লাগে মাখন আর জ্যাম দিয়ে দারুণ দারুণ টোস্ট,’ বলল মুসা।
‘উলস্!’ জিভে পানি টানল।
ওর কথা শুনে লেজ নাড়ল রাফি।
‘হিপ, হিপ, হুররে!’ সবাই হর্ষধ্বনি করে উঠল। ‘হিপ, হিপ, হুররে!’
চাচা এবং পরমুহূর্তে, আচমকা সব কটা আলো নিভে গেল।
‘খাইছে, সবাই কোথায়?’ জানতে চাইল মুসা।
‘সবাই শান্ত থাকুন,’ গলা চড়িয়ে বললেন ক্লিফট। ‘খানিকক্ষণের জন্যে কারেন্ট গেছে। ক্লাইভ এখুনি মোমবাতি নিয়ে আসবে। ক্লাইভ!’
কেউ একজন দিয়াশলাই জ্বালল। আঁধারে জ্বালা হলো একটা মোমবাতি। ধীরে ধীরে আলোকিত হলো একটি মুখ।
‘আরি, একদম ওয়ার্ড মন্টগোমারির মত দেখতে!’ চেঁচিয়ে উঠল জিনা।

ভূতটার মুখের চেহারা ফ্যাকাসে। গায়ের চামড়া কুঁচকানো, রুক্ষ। কোন ভুল নেই। এটাই ওয়ার্ড মন্টগোমারি!
‘খাইছে! আগেই বলেছিলাম জায়গাটা ভুতুড়ে!’ ককিয়ে উঠল মুসা।
ভূতটা খসখসে গলায় কথা বলতে শুরু করল।
‘মণ্টগোমারি দুর্গ আমাদের পরিবারেই থাকতে হবে। এই দুর্গের প্রতিটা পাথরকে অভিশাপ দিচ্ছি আমি। আরও অভিশাপ দিচ্ছি এখানে যারা মাঝরাতের পরে থাকবে তাদেরকে। এখুনি সবাই এখান থেকে চলে যাও। আর এসো না। আমার প্রপৌত্রের ভাগ্যে যা ঘটার ঘটবে। আমি তোমাদেরকে সতর্ক করে দিলাম।’
মোমবাতিটা ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিল ভূতটা।
আচমকা আর্তনাদ ছাড়লেন ক্লিফট। এবার দড়াম করে একটা দরজা বন্ধ হলো।
‘কী হচ্ছে এসব?’ চেঁচিয়ে উঠলেন মেয়র রেডিং।
এক মুহূর্ত পরে, আলো ফিরে এল। ক্লিফট নেই। সবাই তাঁর নাম ধরে ডাকল। কিন্তু জবাব পেল না। মুসা চারদিকে চোখ বুলিয়ে রাফিকে খুঁজল। রাফিও নেই।
‘খাইছে! ভূতটা রাফিকেও ধরেছে। রাফি? রাফি, কোথায় তুই?’ চিৎকার করে ডাকল ও।
‘ঘেউ,’ রাফির গলা শোনা গেল টেবিলের তলা থেকে।
টেবিলক্লথ ওঠাল মুসা। রাফি টেবিলের নীচে। সামনে থালায় বিশাল এক স্প্যাঘেটি।
‘ঠিক কাজ করেছিস, রাফি। খালি পেটে ভূতের ভয় পাওয়ার কোন মানে হয় না,’ বলে রাফির সঙ্গে টেবিলের নীচে যোগ দিল মুসা।
‘সানি,’ মেয়র রেডিং বললেন, ‘আপনি ওখানে কী করছেন?’
অতিকায় গ্র্যাণ্ডফাদার ক্লকের সামনে দাঁড়িয়ে সানি, হাতে মোমবাতি।
‘ভূতটা মোমবাতি নিভিয়ে দেয়ার পর এখান থেকে কীসের যেন শব্দ পেয়েছি,’ ব্যাখ্যা করলেন সানি। ‘চট করে এখানে চলে আসি আমি, কিন্তু পাই শুধু এই মোমবাতিটা।’
‘আমাদের সাহায্য দরকার,’ সিদ্ধান্ত নিলেন মেয়র। ‘ফোন লাইন যেহেতু নষ্ট, শহরে গাড়ি নিয়ে ফিরতে হবে।’ মেয়র রেডিং, সানি ডিপেস্টো আর স্যালি ম্যাকিনটায়ার ডাইনিং রুম ত্যাগ করলেন। কিশোর, জিনা আর রবিন তাঁদেরকে অনুসরণ করে গ্রেট হল-এ চলে এল।
সবাই গ্রেট হল পার হচ্ছে, এসময় প্রকাণ্ড এক ট্রাঙ্কের ভিতর থেকে টোকার শব্দ কানে এল। সবাই জমে গেল।
‘বাঁচাও!’ ভিতর থেকে একটি কণ্ঠস্বর বলল।

কিশোর, রবিন আর জিনা পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। ওটা ক্লিফটের গলা নয়। ট্রাঙ্কটার কাছে দৌড়ে গিয়ে ডালা খুলল কিশোর।
‘ক্লাইভ?’ সানি ডিপেস্টো বললেন।
‘ফোনগুলো পরীক্ষা করার জন্যে যাচ্ছি এসময় আলো নিভে গেল,’ ব্যাখ্যা দিতে শুরু করল ক্লাইভ। বেরিয়ে এল ট্রাঙ্ক থেকে। ‘কোথায় যাচ্ছি দেখতে পাইনি। হোঁচট খেয়ে ট্রাঙ্কের ভেতরে পড়ে যাই। ডালাটা পড়ে গেলে আটকা পড়ি।’
মেয়র রেডিং বললেন, ‘ভাগ্য ভাল ভূতটা আপনাকেও ধরেনি।’ কিশোর, রবিন আর জিনার দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন। ‘আমার গাড়িতে মনে হয় সবার জায়গা হয়ে যাবে। তোমরা শহরে যেতে চাও?’
‘না, ধন্যবাদ,’ জবাবে বলল কিশোর। ‘আমাদেরকে, আ-’
‘বন্ধুদের খুঁজে বের করতে হবে,’ জুগিয়ে দিল রবিন।
‘আমি এখানে থাকব না,’ সতর্ক করলেন স্যালি ম্যাকিনটায়ার। ‘স্কটল্যাণ্ডে ভূতকে আমরা খুব সিরিয়াসলি নিই। তোমাদেরকেও সাবধান করছি।’
‘আমাদের জন্যে ভাববেন না,’ বলল জিনা।
‘আমি তা হলে একটা টো ট্রাক পাঠিয়ে দেব,’ মেয়র রেডিং বললেন। ‘গুড নাইট।’ তিনি, সানি আর স্যালি বিশাল সিঁড়ি ভেঙে নামতে লাগলেন।
ক্লাইভ কিশোর, রবিন আর জিনার দিকে ঘুরে দাঁড়াল।
‘তোমাদের মিসেস ম্যাকিনটায়ারের কথা শোনা উচিত। এখান থেকে চলে যাও,’ সাবধান করল ও। আমি এখানে বহু বছর ধরে আছি। ভূতটা বাজে কথা বলেনি। আমার মনিবের ভাগ্যে যা ঘটেছে আমি চাই না তা আমার ভাগ্যেও ঘটুক।’
ক্লাইভ ঘুরে দাঁড়িয়ে দুদ্দাড় করে সিঁড়ি ভেঙে নামতে লাগল। দু’মুহূর্ত পরে, সদর দরজা সশব্দে লেগে গেল।
রাফিকে নিয়ে এবার বন্ধুদের সঙ্গে গ্রেট হল-এ যোগ দিল মুসা। এখনও গলায় ন্যাপকিন বাঁধা ওর।
‘খাইছে, আর সবাই কোথায়?’ প্রশ্ন করল মুসা।
‘সাহায্য আনতে গেছে,’ জানাল রবিন।
‘ভাল করেছে,’ বলল মুসা।
‘আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে,’ বলল গোয়েন্দাপ্রধান।
নীচের ঠোঁটে চিমটি কাটল।
জিনা মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল।
‘আমাদের এর তল দেখা উচিত,’ বলল।
‘খাইছে, ভয় পাচ্ছিলাম তোমরা এমন কিছুই বলবে,’ গুঙিয়ে উঠল মুসা।

‘এসো, আমরা ভাগ হয়ে যাই,’ বলল কিশোর। ‘জিনা, তুমি, মুসা আর রাফি এই গ্রেট হলে খোঁজো। আমি আর রবিন ডাইনিং রুমে দেখছি।’
‘আমি আর রাফি না হয় ডাইনিং রুমে খুঁজে দেখি, তোমরা তিনজন এখানে দেখো,’ প্রস্তাব করল মুসা।
রাফি লেজ নেড়ে সায় জানাল।
‘সময় নষ্ট না করে,’ বলল জিনা, ‘কাজে লেগে পড়ো। আগে কাজ শুরু করলে আগে শেষ হবে।’
কিশোর আর রবিন ডাইনিং রুমে ফিরে গেল। জিনা বর্মগুলো আঙুল-ইশারায় দেখিয়ে দিল।
‘তোমরা ওদিকে দেখো। আমি এদিকটা দেখছি।’
মুসা আর রাফি একটা বর্মের দিকে এগিয়ে গেল।
‘লোকে এটার ভিতর থেকে বেরোয় কীভাবে রে?’ প্রশ্ন করল মুসা।
রাফি নিঃশব্দে লেজ নাড়ল।
ঘরের ওপ্রান্তে, জিনা দেয়ালে ঝোলানো অস্ত্রগুলো পরখ করছে। হাত বাড়িয়ে বিরাট এক ঢাল স্পর্শ করল ও। ঢালটার মাঝখানে এক সিংহ। বড় বড় পান্নার চোখ নিয়ে তৈরি খাঁটি সোনার সিংহটা। দাঁতগুলো রুপোর, আর সামনের থাবাটা আক্রমণের ভঙ্গিতে উদ্যত।
‘নিশ্চয়ই মন্টগোমারি পরিবারের ক্রেস্ট, আপন মনে বলল জিনা। হাত বুলিয়ে সিংহটার নকশা অনুভব করল ও। এবার কিছু একটা দৃষ্টি কেড়ে নিল ওর। সিংহটার নখরগুলো রুপোর তৈরি এবং ঢালটা থেকে বেরিয়ে রয়েছে। নখরগুলো স্পর্শ করল জিনা। হঠাৎই, পাথুরে দেয়ালের মাঝখানে এক দরজা খুলে গেল।
‘আরি, গোপন প্যাসেজ, বিড়বিড় করে বলল ও। পকেট থেকে ফ্ল্যাশলাইট বের করল। ওটা জ্বেলে প্যাসেজে ঢুকে পড়ল। গোপন দরজাটা পিছনে লেগে গেল ওর।
ওদিকে, মুসা ধাতব এক শিরস্ত্রাণ মাথায় চড়াচ্ছে। একটা তরোয়াল তুলে নিয়ে নাইটের পোজ দিল।
‘আমি সার লইন অভ বীফ! বুঝতে পেরেছিস? সার লইন? সার লইন?’ হেসে উঠল। ‘তুই হতে পারিস সার রাফিয়ানালট।’
রাফি লেজ নেড়ে সায় জানাল।
‘আমরা শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে হলেও শেষ রোস্ট বীফের টুকরোটার দখল চাই। এজন্যে ডুয়েল লড়ব আমরা,’ বলল মুসা। তরোয়াল বাগিয়ে ধরে তেড়ে গেল রাফির দিকে। রাফি মাথা নুইয়ে কোনমতে এড়াল।

‘আমি আপনাকে ছাড়ব না, সার রাফিয়ানালট!’ চেঁচিয়ে উঠে বর্মগুলোর চারপাশে রাফিকে তাড়া করে বেড়াতে লাগল মুসা। রাফিকে শেষমেশ কোণঠাসা করার পর বলল, ‘শেষ প্রার্থনা করে নিন!’
রাফি মুখ তুলতেই মুসার পিছনে ওয়ার্ড মন্টগোমারির ভূতকে দেখতে পেল।
তারস্বরে ঘেউ-ঘেউ শুরু করল ও।
‘বুঝেছি, সার রাফিয়ানালট, আপনি হার মেনে নিচ্ছেন। স্বীকার করছেন রোস্টের শেষ টুকরোটা আমার, তাই না?’
রাফির গর্জন থামল না।
ব্যাপার কী দেখার জন্য ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল মুসা। ‘খাইছে!’
চেঁচিয়ে উঠল ভূতটাকে দেখে। ‘ভূত! ভূত!’
ভূতটার দু’পায়ের ফাঁক গলে বেরিয়ে দৌড় দিল মুসা আর রাফি।
‘এদিকে, রাফি!’ চিৎকার ছাড়ল মুসা। বর্মগুলো ঘিরে পাক খেয়ে চলল। ওকে অনুসরণ করল রাফি। একই কাজ করল ভূতটাও। ‘জোরে, রাফি!’ মুসা আর রাফি শেষ বর্মটার পিছনে গা ঢাকা দিল।
ওয়ার্ড মন্টগোমারির ভূত হল-এর মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইল। মুসা আর রাফিকে দেখতে পাচ্ছে না।
‘বুঝলি, রাফি, এই ভূতটা আমাদের চাইতেও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে!’ ফিসফিস করে বলল মুসা।
ভূতটাকে ভাল মত দেখার চেষ্টা করল রাফি। উঁকি দিতেই দুর্ঘটনাক্রমে মাথা ঠুকে গেল বর্মটার সঙ্গে। ক্যাঁচকোঁচ শব্দ তুলে ওটা আস্তে করে ঢলে পড়ে গেল পাশের বর্মটার উপরে।
এভাবে একটার পর একটা বর্ম পড়ে যেতে লাগল মেঝেতে। ভূতটা বোঁ করে ঘুরতেই রাফি আর মুসাকে দেখে ফেলল।
‘জলদি, রাফি-এখানে!’ মুসা ওদের পিছনের ট্রাঙ্কটার ভিতরে লাফিয়ে পড়ল। রাফি ওকে অনুসরণ করল। মুসা দড়াম করে লাগিয়ে দিল ডালাটা।
ভূতটা ট্রাঙ্কের কাছে দৌড়ে এসে ছিটকিনি মেরে দিল।
‘শব্দটা আমার ভাল লাগল না,’ বলল মুসা। ‘বাঁচাও!’
ট্রাঙ্কে থাবড়া মারতে শুরু করল।
‘বাঁচাও! কিশোর! রবিন! জিনা! কে আছ!’
মুসা আর রাফি তখনও ট্রাঙ্কে বন্দি।
‘খাইছে, আমরা শেষ,’ বলল মুসা। ‘ভূতটা মনে হয় কিশোর, রবিন আর জিনাকে ধরেছে। আমি আগেই বলেছিলাম এ জায়গাটা ভাল না।’
হঠাৎই পায়ের শব্দ শুনতে পেল ওরা।

‘খাইছে, মনে হচ্ছে ভূতটা!’ চেঁচিয়ে উঠল মুসা। ‘বিদায়, রাফি!’
রাফি ঘেউ করে উঠল
টিক করে একটা শব্দ হলো। চোখ বুজে ফেলল মুসা। রাফি গর্জে উঠল। ঢাকনাটা উঠে যেতেই, মুসা ডান চোখটা সামান্য খুলল।
‘কিশোর! রবিন! তোমাদেরকে দেখে কী যে খুশি লাগছে!’
ট্রাঙ্ক থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এল ওরা। মুসা কিশোরকে জড়িয়ে ধরল। রাফি রবিনের পা চেটে দিল। মুসা এবার রবিনকে জড়িয়ে ধরল। রাফি কিশোরের পা চেটে দিল। এবার রাফিকে জড়িয়ে ধরল মুসা।
‘জিনাকে দেখেছ?’ প্রশ্ন করল কিশোর।
‘আমরা তো ভেবেছি ও তোমাদের সাথে আছে,’ জবাব দিল মুসা।
‘আর আমরা ভেবেছি তোমাদের সাথে,’ বলল রবিন।
‘খাইছে, ব্যাপারটা কেমন যেন ভুতুড়ে হয়ে যাচ্ছে,’ বলল মুসা। ‘প্রথমে ক্লিফট। এখন জিনা। আগেই তো বলেছিলাম এ দুর্গটা ভাল নয়।’
ঘেউ করে উঠে সমর্থন জানাল রাফি।
‘অ্যাই! তোমরা সব কোথায়?’ জিনার কণ্ঠ। ডাইনিং রুম থেকে আসছে।
ওরা সবাই ডাইনিং রুমে দৌড়ে গেল। টেবিলের মাথায়, ক্লিফটের চেয়ারে বসে জিনা।
‘এই যে,’ বলল জিনা। ‘কী খবর তোমাদের?’
‘তুমি ঠিক আছ তো?’ রবিনের প্রশ্ন।
‘অবশ্যই। আমি ইতিমধ্যে কিছু ব্যাপার জেনেছি যা দিয়ে এই রহস্যটার সমাধান করা যাবে।’
‘খাইছে, যেমন?’ মুসার প্রশ্ন।
‘সবার আগে আমি কোথায় ছিলাম জানতে চাও না?’ বলল জিনা।
‘আমরা সেটাই জানার চেষ্টা করছিলাম,’ বলল কিশোর।
‘মুসা যখন রাফির সাথে নাইট-নাইট খেলছে, বলল জিনা, ‘আমি তখন গ্রেট হলের অন্য পাশে। মন্টগোমারিদের ঢালটা দেয়ালে দেখতে পাই। একটা সুইচ আবিষ্কার করি, যেটা দিয়ে গোপন এক দরজা খোলে।’
‘গোপন দরজা!’ প্রায় চেঁচিয়ে উঠল কিশোর।
‘একটা নয়,’ বলল জিনা। ‘এক গাদা গোপন পথ। দুর্গের সবখানে গেছে এগুলো।’
‘যে সব গোপন পথ দিয়ে ভূতটা দুর্গের সবখানে দ্রুত ঘুরে বেড়ায়,’ যোগ করল রবিন।
‘ভূতটা যদি পথ চিনে থাকে আরকী,’ বলল জিনা।

‘ভূতটা সম্পর্কে তোমাদেরকে একটা কথা বলি,’ বলল মুসা। ‘চট করে হয়তো ঘুরে চলে আসে, কিন্তু স্বাস্থ্য খুব একটা ভাল নয় ওর।’
‘তার মানে?’ রবিনের প্রশ্ন।
‘দম পায় না, জবাবে বলল মুসা।
কিশোর আর জিনা পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করে মাথা ঝাঁকাল।
‘কে আমাদের ভূত মনে হয় বুঝতে পারছি,’ বলল জিনা।
‘আমি যা ভাবছি তুমিও যদি তা-ই ভাবো তা হলে আমাদের একটা ফাঁদ পাততে হবে,’ বলল গোয়েন্দাপ্রধান। চিমটি কাটল নীচের ঠোঁটে।
ডিনার টেবিলের মাথায় জড় হলো ছেলে-মেয়েরা।
‘আচ্ছা, সবাই শোনো। প্ল্যানটা হচ্ছে এরকম,’ শুরু করল কিশোর। ‘আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি একটা ভূত সবাইকে এই দুর্গ থেকে তাড়াতে চায়। কিন্তু কেন?’
‘যাতে একাই সব খাবার খেতে পারে?’ বাতলে দিল মুসা। ডিনারের জন্য সাজানো টেবিলটার দিকে চাইল ও।
‘তুমি কাছাকাছি গেছ,’ জবাবে বলল জিনা। ‘এই দুর্গে এমন কিছু আছে যেটা ভূতটার দরকার।’
‘ঠিক,’ বলল কিশোর। ‘কাজেই আমরা কোথাও যাচ্ছি না এমন ভান করে ভূতটাকে পাকড়াও করতে হবে। কিন্তু এটাই যথেষ্ট নয়। ওকে আমাদের ভয় দেখাতে হবে। তো, একটা ভূতকে কীভাবে ভয় দেখানো যায়?’
‘পা টিপে টিপে ওর পিছনে গিয়ে ‘ভউ!’ করে উঠতে হবে, বলল রবিন।
‘ঠিক’ জবাব দিল জিনা।
‘খাইছে, কিন্তু আমরা আরেকটা ভূত পাব কোথায়?’ মুসার প্রশ্ন।
সবাই রাফির দিকে ঘুরে চাইল।
‘খাইছে!’ বলে উঠল মুসা।
‘ভয়ের কিছু নেই,’ বলল কিশোর। ‘আমরা রাফিকে সাজিয়ে দেব। ভূতটা এলে শুধু রাফিকে ‘ভউ!’ করে উঠতে হবে।’
জিনা রাফিকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিল।
রাফি লেজ নেড়ে সায় জানাল।
জিনা পকেট থেকে তিনটে স্ন্যাক বের করল। একটা একটা করে ছুঁড়ে দিল রাফির দিকে।
খুশিতে আত্মহারা রাফি লেজ নাড়তে লাগল। ঝাঁপিয়ে পড়ল খাবারের উপর।
‘রবিন, তুমি আর জিনা টেবিলে বসে ডিনার করার ভান করো, বলল কিশোর।
‘খাইছে, আমি টেবিলে বসে খাওয়ার ভান করলে হয় না?’ প্রশ্ন করল মুসা। ‘আমি ভূত ধরার চাইতে খেতে অনেক বেশি ওস্তাদ।’

‘মুসা, তুমি রাফিকে কস্টিউম পরতে সাহায্য করো। তারপর ওখানে গিয়ে গ্র্যাণ্ডফাদার ক্লকটার পিছনে দাঁড়াও। রাফি পর্দার আড়ালে দাঁড়াবে আর আমি থাকব ওর পাশে। রাফি ভূতটাকে ভয় দেখানোর পর টেবিলক্লথটা তুলে নেবে। ভূতটাকে ধরতে আমি তোমাকে হেল্প করব,’ একনাগাড়ে বলে গেল গোয়েন্দাপ্রধান।
‘ঠিক আছে, কী আর করা,’ বলল মুসা। রাফিকে বর্ম পরতে সাহায্য করল। রবিন আর জিনা ডিনার টেবিলে যার যার জায়গা নিল। দেয়াল থেকে ঝোলা এক পর্দার পিছনে লুকিয়ে পড়ল রাফি। কিশোর দাঁড়াল পর্দাটার সামনে। অপরদিকের দেয়ালের গ্র্যাণ্ডফাদার ক্লকটার পাশে দাঁড়াল মুসা।
‘ভাগ্যিস আমরা সারা রাত থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম,’ বলল রবিন।
‘হ্যাঁ, কোন ভূতকে আমি ভয় পাই না,’ বলল জিনা।
‘বিশেষ করে ওয়ার্ড মন্টগোমারির মত নিরীহ ভূতকে,’ গলা চড়িয়ে বলল রবিন।
খাবার মুখে দিতে শুরু করল ওরা। হঠাৎই, আলোগুলো সব নিভে গেল। আলো ফিরে এলে, ওয়ার্ড মন্টগোমারির ভূতকে ওখানে দেখা গেল।
‘আমি তোমাদেরকে মাঝরাতের আগে চলে যেতে বলেছিলাম। কিন্তু তোমরা শোননি। এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। এই দুর্গ আর এখানে যারা রয়েছে তারা চিরদিনের জন্যে অভিশপ্ত হয়ে পড়েছে।’
কিশোর রাফির দিকে চকিতে চেয়ে মাথা নাড়ল।
রাফি ঢোক গিলে গলা খাঁকরে নিল। এবার পর্দার আড়াল থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এল।
‘ভউ! ভউ!’ চেঁচিয়ে উঠল।
চরকির মতন ঘুরে দাঁড়াল ভূতটা। বর্ম পরা উদ্ভটদর্শন রাফিকে দেখে লাফিয়ে উঠল।
‘মুসা, এখনই!’ কিশোর চেঁচাল 1
গোপন জায়গাটা থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এল মুসা। বিশাল টেবিলটার টেবিলক্লথটা আঁকড়ে ধরে টান দিল। হুশ!
প্লেটগুলোর নীচ থেকে উড়ে এল পেল্লায় কাপড়টা। ও আর কিশোর ওটা ছুঁড়ে দিল ভূতটার উপরে। রবিন আর জিনা ভূতটাকে চেপে ধরে বসিয়ে দিল চেয়ারে।
‘তোমাদের সবার উপর অভিশাপ পড়বে!’ টেবিলক্লথের নীচ থেকে চেঁচাল ভূতটা।
পরমুহূর্তে দেয়ালের ওপাশ থেকে ধুপ! ধুপ! শব্দ কানে এল ওদের।
‘খাইছে! আসল ভূতটা!’ চেঁচিয়ে উঠল মুসা।
রাফি ঘেউ-ঘেউ শুরু করল। ঘাবড়ে গেছে।

টেবিলের নীচে ঝাঁপিয়ে পড়ল মুসা।
‘কী পাগলামি করছ!’ বলল জিনা। ‘এখানে কোন ভূত-টুত নেই!’ গ্র্যাণ্ডফাদার ক্লকটার কাছে হেঁটে গেল ও। ঘড়িটার উপরে হাত বুলিয়ে কিছু একটা খুঁজে পেল। এবার একটা বোতাম টিপে দিতেই একটা দরজা খুলে গেল। বেরিয়ে এলেন ক্লিফট মন্টগোমারি। হাতজোড়া বাঁধা। মুখে টেপ সাঁটা। কপাল ফুলে রয়েছে। তবে এ ছাড়া তাঁকে দেখে মনে হলো বহাল তবিয়তেই আছেন।
‘ক্লিফট!’ বলে উঠল রবিন। ‘আপনি ঠিক আছেন তো?’ ভদ্রলোকের মুখ থেকে টেপটা ধীরে সুস্থে সরিয়ে নিল।
‘একটু ভড়কে গেছি শুধু, এ ছাড়া আর কোন সমস্যা নেই, ধন্যবাদ,’ বললেন তিনি
কিশোর একটা চোখ রাখল ভূতটার উপরে। ওদিকে, জিনা আর রবিন ক্লিফটের বাঁধন খুলে দিল। ভদ্রলোক বসে পড়ে কপালে হাত বুলালেন।
‘কী ফোলাটাই না ফুলেছে,’ বলল জিনা।
‘হ্যাঁ,’ বলে এক গ্লাস পানির দিকে হাত বাড়ালেন ক্লিফট
‘কী হয়েছিল মনে আছে?’ জিনার প্রশ্ন।
‘মনে আছে আমি সবাইকে দুর্গের খবরটা দিচ্ছিলাম। তখনই বাতি চলে গেল আর আমার পরদাদার ভূত এসে হাজির হলো। এরপর যা মনে পড়ে তা হলো আমাকে ছোট কোন এক ক্লজিটে ভরে রাখা হয়।’
টেবিলের নীচে ইঙ্গিত করল রবিন।
‘মুসা, তুমি বেরিয়ে এসো। এটা ভূত না, ক্লিফট।’
মুসা উঁকি দিল। ওর সঙ্গে রাফিও।
‘আমি আগেই জানতাম। আমি শুধু একটু—’
‘দেখছিলে মেঝেটা ঠিক আছে কিনা,’ জুগিয়ে দিল কিশোর।
হঠাৎ এসময় অদ্ভুত এক টোকার শব্দ উঠল। সবাই কাঠ-পুতুল হয়ে গেল।
‘আবার আরেকটা ভূত নাকি?’ ককিয়ে উঠল মুসা।
‘না, সামনের দরজা,’ বললেন ক্লিফট।
দরজা খোলার এবং হলওয়েতে লোকজনের কথা-বার্তার শব্দ শোনা গেল।
‘হ্যালো? কেউ আছে এখানে?’
‘এই যে, এখানে,’ চেঁচিয়ে বললেন ক্লিফট।
মেয়র রেডিং ক’জন পুলিস নিয়ে কামরায় প্রবেশ করলেন।
‘ক্লিফট! তুমি সুস্থ আছ! খুব খুশি হলাম। সরি, আসতে দেরি হয়ে গেল। রাস্তায় ঝড়ের কারণে সমস্যা হয়ে গেছিল।’
‘এখন দেখলে কেমন হয় ভূতটা কে,’ বলল কিশোর।

‘নিশ্চয়ই,’ বললেন ক্লিফট।
কিশোর ভূতের মাথা থেকে টেবিলক্লথটা তুলে নিল।
‘আপনি খুলবেন, ক্লিফট?’ বলল।
‘খুশি মনে। বলে ভূতের মুখোশ খুললেন ক্লিফট। পর মুহূর্তে, ঢোক গিললেন। ‘ক্লাইভ, তুমি! কিন্তু কেন?’
ক্লাইভ ব্যথিত চোখে ক্লিফটের দিকে চাইল।
‘কারণ, স্যর, আমি এখানে থাকি। সবাইকে ভয় দেখাতে চেয়েছিলাম যাতে আমাকে এখান থেকে চলে যেতে না হয়। জীবনের বেশিরভাগ সময় এই দুর্গে কেটেছে আমার। আপনার মত, স্যর, আমার তো আর সামার হোম বা থাকার অন্য কোন জায়গা নেই। মণ্টগোমারি দুর্গ ছাড়তে হলে আমি গৃহহীন হয়ে পড়ব, স্যর।’ চোখে অশ্রু বিন্দু দেখা গেল ওর।
‘ওহ, ক্লিফট,’ মেয়র রেডিং বললেন, ‘তুমি বেচারী ক্লাইভকে দোষ দিতে পারো না। ওর বিরুদ্ধে তুমি কোন অভিযোগ দায়ের কোরো না, প্লিজ।’
জিনা এগিয়ে এল এসময়।
‘মাফ করবেন, মিস্টার মন্টগোমারি,’ বলল, ‘কিন্তু কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে আপনার উচিত ক্লাইভকে গুপ্তধনের কথা জিজ্ঞেস করা।’
‘খাইছে, গুপ্তধন?’ বলে উঠল মুসা।
‘হ্যাঁ, মন্টগোমারিদের পারিবারিক গুপ্তধন,’ বললেন ক্লিফট। ‘কিন্তু তুমি সেটা জানলে কীভাবে?’
‘আমি গোপন পথগুলোয় খানিক ঘুরেফিরে বেড়িয়েছি,’ জানাল জিনা।
‘বাহ, চমৎকার, জিনা,’ বলে উঠলেন ক্লিফট। ‘তুমি তার মানে পারিবারিক গুপ্তধনের সিন্দুকটা খুঁজে পেয়েছ?’
‘হ্যাঁ,’ সগর্বে জবাব দিল জিনা।
ক্লাইভ, তুমি কী বলতে চাও? ক্লিফট প্রশ্ন করলেন।
ক্লাইভ পুলিসদের দিকে তারপর ক্লিফটের দিকে চাইল।
‘এটা সত্যি। আমি মন্টগোমারিদের গুপ্তধন চেয়েছিলাম। সেজন্যেই ওয়ার্ড মন্টগোমারির মুখোশ অর্ডার দিয়ে বানাই। এত বছর এ পরিবারকে সেবা দেয়ার পরে এটুকু আমার প্রাপ্য হয়। এই ঠাণ্ডা, জঘন্য জেলখানার মত বাসার জন্যে আমি থোড়াই পরোয়া করি। আমি গুপ্তধনের সিন্দুকটা নিয়ে সটকে পড়ার জন্যে যথেষ্ট সময় চেয়েছিলাম। ওটা হাত করতে পারলেই এ দেশ ছেড়ে চলে যেতাম।’
ক্লিফট কিশোর, রবিন আর জিনার দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন।
‘ক্লাইভকে তোমরা সন্দেহ করলে কেন?’ জিজ্ঞেস করলেন।
সবার আগে মুখ খুলল কিশোর।

‘প্রথমটায় আমরা মিস্টার ডিপেস্টোকে সন্দেহ করি। আলো ফিরে এলে দেখা যায় ভূতের মোমবাতিটা তাঁর হাতে।’
‘কিন্তু কাজটা তাঁর পক্ষে করা সম্ভব নয়,’ যোগ করল রবিন। ‘কেননা উনি আমার পাশে সারাটা সময় বসে ছিলেন।’
‘আমরা ক্লাইভকে ট্রাঙ্কের ভিতরে পাওয়ার পর যোগসূত্র পেতে শুরু করি,’ বলল জিনা। ও আমাদেরকে বলে আঁধারে হোঁচট খেয়ে ট্রাঙ্কে আটকা পড়ে। নিখুঁত এক অ্যালিবাই।’
‘কিন্তু ট্রাঙ্কটা গ্রেট হল-এ,’ বলে চলল কিশোর। ‘এবং কামরাটায় আলো দিচ্ছে মোমবাতি, বিদ্যুৎ নয়। ডাইনিং রুমের আলো নিভে যাওয়ার পরও গ্রেট হলে মোমবাতি জ্বলছিল। ভূতটা যখন দেখা দেয় তখন একমাত্র ক্লাইভই আমাদের সাথে ছিল না।
‘ও এখানে বহু বছর ধরে আছে,’ যোগ করল রবিন। ‘এবং সেজন্যেই সম্ভবত গোপন প্যাসেজগুলো সম্পর্কে জানে।’
‘কিন্তু মুসা ব্যাপারটা কনফার্ম করে,’ বলল জিনা। ‘ভূতটা ওদেরকে গ্রেট হলে তাড়া করে বেড়ানোর পর মুসা বলে ভূতটার দম ফুরিয়ে গিয়েছিল!’
‘সত্যিকারের ভূতের দম ফুরানোর কথা নয়,’ ব্যাখ্যা করল কিশোর। ‘কিন্তু বুড়ো মানুষদের ফুরোতে পারে।’
ক্লাইভ ওদের দিকে মুখ তুলে চাইল।
‘এই বিচ্ছুগুলো আর শয়তান কুকুরটার জন্যে ধরা পড়তে হলো, নইলে ঠিকই পার পেয়ে যেতাম।’
‘এই লোকটাকে নিয়ে যান, অফিসার্স,’ বললেন মেয়র রেডিং। ‘টো ট্রাক শীঘ্রি এসে পড়বে, ছেলে-মেয়েদের উদ্দেশে বললেন। ‘আবহাওয়ার জন্যে একটু দেরি হচ্ছে। রহস্যটার সমাধান আর ক্লিফটকে সাহায্য করার জন্যে তোমাদেরকে ধন্যবাদ। গুডবাই, ক্লিফট, তোমার মহত্ত্বের জন্যে আবারও ধন্যবাদ। কাল সকালে আমার অফিস থেকে তোমাকে ফোন করা হবে।’
‘ইউ আর ওয়েলকাম, মেয়র। ইট’স মাই প্লেজার।’
মেয়র পুলিস অফিসারদের আর ক্লাইভকে নিয়ে চলে গেলেন। ছেলে-মেয়েদের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন ক্লিফট।
‘আমি তোমাদের প্রত্যেকের কাছে কৃতজ্ঞ। তোমাদের ভ্যান ঠিক হতে তো দেরি আছে, আমরা ততক্ষণে সাপারটা সেরে নিই, কেমন?’
‘সে আর বলতে, খোশমেজাজে বলল মুসা।
‘আর তোর জন্যে,’ রাফির উদ্দেশে বললেন ক্লিফট, ‘বিশেষ এক খাবারের ব্যবস্থা আছে।’ টেবিলের কাছে হেঁটে গেলেন তিনি। মাথায় ছোট্ট এক হাতল নিয়ে

তৈরি রুপোলী এক গম্বুজের দিকে হাত বাড়ালেন। একটানে গম্বুজটা খুলে দিলেন তিনি। ‘রোস্ট বীফের শেষ টুকরোটা!’ চেঁচিয়ে উঠলেন।
‘স্যর রাফিয়ানালট জিন্দাবাদ!’ চিৎকার ছাড়ল মুসা। সবাই হেসে উঠল। তারপর খেতে বসল।
***

ভলিউম ১১৭ – আমাজানের গহীনে – তিন গোয়েন্দা – রকিব হাসান – সেবা প্রকাশনী

গরমের এক দিনে, ফ্রগ ক্রীক পেনসিলভেনিয়ার বনভূমিতে উদয় হয় রহস্যময় এক ট্রী হাউস।

তিন গোয়েন্দা দড়ির মই বেয়ে ট্রী হাউসে ওঠে। ওরা আবিষ্কার করে ওটা বই-পত্র দিয়ে ভর্তি।

ওরা শীঘি টের পায় ট্রী হাউসটা জাদুর। বইয়ে উল্লেখ করা বিভিন্ন জায়গায় ওদেরকে নিয়ে যেতে পারে। ওদেরকে শুধু একটা ছবিতে আঙুল রেখে সেখানে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করতে হয়।

ওরা এখন পর্যন্ত নানান জায়গায় ভ্রমণ করেছে। এক পর্যায়ে জানতে পারে ট্রী হাউসটার মালিক মরগ্যান লে ফে। রাজা আর্থারের সময়কার এক জাদুকরী লাইব্রেরিয়ান সে। টাইম আর স্পেসে অবাধ বিচরণ তার, বই সগ্রহের বাতিক।

এবার আবার অভিযানে বেরোচ্ছে কিশোর, মুসা, রবিন।

জলদি এসো! কিশোর আর মুসার উদ্দেশে বলল রবিন।

ফ্রগ ক্রীক উডসে দৌড়ে ঢুকে পড়ল ও।

কিশোর আর মুসা ওকে অনুসরণ করল। এখনও আছে! উত্তেজিত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল রবিন।

রবিনের নাগাল ধরল কিশোর আর মুসা। উঁচু এক ওক গাছের পাশে দাঁড়িয়ে রবিন।

মুখ তুলে চাইল কিশোর। বিকেলের রোদে ঝিকোচ্ছে জাদুর ট্রী হাউসটা।

আমরা আসছি, জেরি! চেঁচাল রবিন। দড়ির মইটা ধরে উঠতে শুরু করল।

ওকে অনুসরণ করল কিশোর আর মুসা। ওরা উঠছে তো উঠছেই। শেষমেশ ঢুকতে পারল ট্রী হাউসের ভিতরে।

জেরি? ডাকল মুসা।

কিশোর ব্যাকপ্যাক খুলল। দৃষ্টি বুলিয়ে নিল চারধারে।

এক গাদা বইয়ের উপর তেরছাভাবে রোদ পড়েছে।

কাঠের মেঝেতে চমকাচ্ছে এম অক্ষরটা। এম মানে মরগ্যান লে ফে।

জেরি মনে হয় এখানে নেই, বলল কিশোর। গেল কোথায় তাই ভাবছি, বলল মুসা।

কিঁচ!

হেসে উঠল রবিন। দেখো, দেখো!

ছোট, গোলাপি এক মোজা মেঝের উপর দিয়ে চলে বেড়াচ্ছে। গতকাল রবিন ওর মোজাটাকে জেরির বিছানা বানিয়ে দিয়েছিল।

খুদে পিণ্ডটাকে হাতে তুলে নিল রবিন। আমাজানেরগহীনে
কিঁচ।
মোজার ভিতর থেকে বাদামি-সাদা এক ইঁদুর উঁকি দিল। বড় বড় চোখ ঘুরিয়ে একে একে তিন বন্ধুকে দেখে নিল।
হেসে উঠল কিশোর।
কী রে, জেরি? বলল ও।
তুই কি আজকেও আমাদের হেল্প করবি? রবিনের প্রশ্ন।
এর আগে বিভিন্ন অভিযানে জেরি ওদেরকে সাহায্য করেছে।
মরগ্যানের জন্যে আমাদের আরও কটা জিনিস খুঁজে পেতে হবে, বলল মুসা।
কিশোর নীচের ঠোটে চিমটি কাটল। কোথা থেকে শুরু করব আগে সে সূত্র দরকার, বলল।
বলল তো কী? বলল রবিন।
কী?
আমাদেরকে বেশি দূর খুঁজতে যেতে হবে না, ট্রী হাউসের এক কোনার দিকে ইশারা করল রবিন।
ছায়ার আড়ালে খোলা এক বই।
আরি, বলে বইটা তুলে নিল কিশোর। কে খুলল এটা?
বইটা বন্ধ করে প্রচ্ছদ দেখল ও।
সবুজ এক অরণ্যের ছবি। গাছগুলো লম্বা-লম্বা আর জড়াজড়ি করা।
প্রচ্ছদে লেখা: দ্য রেইন ফরেস্ট।
বাহ, বলল কিশোর।
না, বলল রবিন।
খাইছে, বলল মুসা।
সমস্যা কী? রবিনকে প্রশ্ন করল কিশোর।
স্কুলে রেইন ফরেস্ট সম্পর্কে পড়েছি। ওখানে বড় বড় পোকা আর মাকড়সা থাকে।
জানি, বলল কিশোর। তাদের অর্ধেকের এখনও নামকরণ হয়নি।
খাইছে, বলে উঠল মুসা।
ভয়ঙ্কর জায়গা, বলল নথি।
ভয় পাচ্ছ কেন? বলল কিশোর। রেইন ফরেস্ট সম্পর্কে নোট নিতে চায় ও। হয়তো অচেনা কয়েকটা পোকাকে নামও দিতে পারবে।
ভয় পাব না? শিউরে উঠে বলল রবিন।

আমরা তো আগেও কত জায়গায় গেছি, বলল মুসা। তখন তো ভয় পাওনি। এখন এত ভয় পাওয়ার কোন মানে হয় না।
কিশোর দীর্ঘশ্বাস ফেলল।
আমাদেরকে ওখানে যেতে হবে। মরগ্যানকে হেল্প করার জন্যে। সেজন্যেই বইটা খোলা পড়ে ছিল।
জানি, বলে ভ্রু কুঁচকাল রবিন।
তা ছাড়া, রেইন ফরেস্ট কেটে ফেলা হচ্ছে, বলল কিশোর। উজাড় হওয়ার আগেই দেখতে চাও না?
রবিন গভীর শ্বাস টেনে ধীরে ধীরে মাথা ঝাকাল।
ঠিক আছে, চলো তবে, বলল কিশোর।
বইটা আবারও খুলল ও। নীল আকাশ, সবুজ গাছ-পালা আর রঙিন ফুল নিয়ে এক ছবি। তাতে আঙুল রাখল।
আমরা ওখানে যেতে চাই, বলল।
বাতাস বইতে শুরু করল।
কিঁচ।
তুই এখানে থাক, জেরি, বলে জেরিকে তুলে পকেটে রাখল রবিন।
বাতাস জোরাল হলো। ঘুরতে আরম্ভ করল ট্রী হাউস। চোখ বুজে ফেলল কিশোর।
শিসের শব্দ তুলে বয়ে যাচ্ছে বাতাস। বন-বন করে ঘুরছে ট্রী হাউস।
এবার সব কিছু স্থির।
একদম নিথর।
বুনো শব্দ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করল।
তীক্ষ্ণ, কর্কশ ডাক।
গুঞ্জন।
কিচিরমিচির।
চোখ মেলল কিশোর।
বাতাসে গরম ভাব আর বাষ্প।
মনে হচ্ছে আমরা কোন ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে নেমেছি, বলল রবিন।
ট্রী হাউসের জানালা দিয়ে উকি মারছে ও। ওর পকেট থেকে মুখ। বের করেছে জেরি।
কিশোর আর মুসাও বাইরে তাকাল।
চকচকে সবুজ পাতার সাগরে নেমেছে ওরা। বাইরে ফুল, রঙবেরঙের প্রজাপতি, আর পাখি। ঠিক বইতে যেমন ছিল।

খাইছে, বলল মুসা। আমরা কোন গাছে নামলাম না কেন তাই ভাবছি। যেমনটা সব সময় নামি।
কে জানে, বলল রবিন। এখন চলো তাড়াতাড়ি মরগ্যানের জিনিসটা খুঁজে বের করি। বিরাট বড় কোন মাকড়সার খপ্পরে পড়ার
আগেই যাতে বাড়ি ফিরতে পারি।
দাঁড়াও। ব্যাপারটা অদ্ভুতই বটে, বলল কিশোর। ঝোপের মধ্যে নামলাম কেন বুঝছি না। একটু পড়ে দেখি।
ধুর, এসো তো, বলল রবিন। আমাদের এমনকী মইও লাগবে না। স্রেফ জানালা দিয়ে বেরিয়ে গেলেই হবে।
পকেটে জেরিকে ঢুকিয়ে রাখল রবিন। জানালা দিয়ে বের করে দিল এক পা।
দাঁড়াও! কিশোর রবিনের আরেক পা চেপে ধরল। ও পড়ল:
রেইন ফরেস্টের তিনটি স্তর। ঘন বৃক্ষশীর্ষ
সবচেয়ে উপরের স্তর তৈরি করে। প্রায়ই এর
উচ্চতা হয় ১৫০ ফীট। একে বলে অরণ্যের
শামিয়ানা। তারপর দ্বিতীয় স্তর
এবং তারপর বনতল।
ফিরে এসো! চেঁচাল কিশোর। আমরা সম্ভবত মাটি থেকে দেড়শো ফীট ওপরে! এটা বনের শামিয়ানা!
বলো কী! বলল রবিন। সাত করে ঢুকে পড়ল ট্রী হাউসের ভিতরে।
আমাদেরকে মই ব্যবহার করতে হবে, বলল কিশোর। হামাগুড়ির ভঙ্গিতে বসল। মেঝের গর্ত থেকে পাতা সরাল। নীচের দিকে চাইল।
মইটা বিশাল এক গাছের ডাল-পালা ভেদ করে নেমে গেছে। কিন্তু অতদূর কিশোরের দৃষ্টি গেল না।
নীচে কী আছে কে জানে, বলল। সাবধান!
ব্যাকপ্যাকে রেইন ফরেস্টের বইটা ঢুকিয়ে রাখল ও। এবার পা রাখল দড়ির মইতে।
নামতে শুরু করল। রবিন আর মুসা অনুসরণ করল।
পাতা ভেদ করে নামতে হচ্ছে।
শামিয়ানার নীচের স্তরে চলে এল ও।
বনতলের দিকে চাইল। অনেক দূরে।
বাব্বা, ফিসফিস করে বলল।
বৃক্ষ শীর্ষের পৃথিবীর সঙ্গে এই পৃথিবীর বিস্তর ফারাক।
সূর্য আড়ালে, তাই এখানে বেশ ঠাণ্ডা। স্যাঁতসেঁতে আর নিস্তব্ধ পরিবেশ।

শিউরে উঠল কিশোর।
নড়ল না ও। বনতলের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল।
কী হলো? উপর থেকে প্রশ্ন করল মুসা।
জবাব দিল না কিশোর।
বিরাট বড় কোন মাকড়সা দেখনি তো? রবিনের জিজ্ঞাসা।
না…তা না। কিশোর গভীর শ্বাস টানল।
আমাদেরকে নামতে হবে, ভাবল ও। মরগ্যানের জন্য বিশেষ জিনিসটা খুঁজে বের করতে হবে।
মাকড়সা নেই। ভয় পেয়ো না, গলা চড়িয়ে বলল কিশোর। মই বেয়ে আবারও নামতে শুরু করল।
দ্বিতীয় স্তর ভেদ করে নেমে চলল তিন বন্ধু। শেষমেশ মাটিতে পা রাখল।
জঙ্গলের ভিতরে আলো-আঁধারি পরিবেশ।
গাছগুলো যেমন উঁচু তেমনি মোটা। চারদিকে লতা আর শ্যাওলা ঝুলে রয়েছে। মাটি মরা পাতায় ছাওয়া।
কিছু করার আগে বইটা খুলে দেখি, বলল কিশোর।
রেইন ফরেস্টের বইটা বের করল ও। বৃক্ষশীর্ষের নীচে আঁধার দুনিয়ার এক ছবি খুঁজে নিল। পড়ল ও।
রেইন ফরেস্টে অনেক প্রাণী পরিপার্শ্বের
সঙ্গে মিশে থাকে। একে বলে ক্যামোফ্লেজ।
বাপ রে, বলল কিশোর। বইটা বন্ধ করে চারধারে নজর বুলাল। এখানে অসংখ্য প্রাণী রয়েছে। আমরা যদিও দেখতে পাচ্ছি না।
খাইছে, তাই? ফিসফিস করে বলল মুসা।
নিঃশব্দ বনভূমির চারদিকে চাইল ওরা। কিশোর অনুভব করল অসংখ্য অদৃশ্য চোখ লক্ষ করছে ওদেরকে।
মরগ্যানের জিনিসটা ঝটপট খুঁজে বের করি এসো, ফিসফিস করে বলল রবিন।
পেলেও কি বুঝতে পারব যা খুঁজছি পেয়েছি? কিশোর বলল।
মনে হয় পারব, বলল রবিন। আঁধার ভেদ করে পা বাড়াল।
ওকে অনুগমন করল কিশোর আর মুসা। বিশাল সব গাছ আর ঝুলন্ত লতার মাঝখান দিয়ে সন্তর্পণে এগোচ্ছে ওরা।
হঠাৎই থমকে দাঁড়াল রবিন। দাঁড়াও-কী ওটা?
কীসের কথা বলছ? মুসা বলল।
শোনো-অদ্ভুত একটা শব্দ।

কান পাতল ওরা। শুকনো পাতা ভাঙার খড়-মড় শব্দ। মনে হচ্ছে কেউ পাতার উপর দিয়ে হাঁটছে।
কিশোর চারধারে চোখ বুলাল। কাউকে দেখতে পেল না।
কিন্তু শব্দটা ক্রমেই জোরাল হচ্ছে।
কোন জানোয়ার? বিশাল কোন পোকা?
ঠিক এসময় নীরব অরণ্য জীবন্ত হয়ে উঠল।
পাখিরা বাতাসে ডানা মেলল। পাতার উপর দিয়ে লাফ দিল ব্যাঙেরা। গাছের গুঁড়ি বেয়ে তরতর করে উঠে গেল গিরগিটির দল।
অদ্ভুত শব্দটা ইতোমধ্যে আরও জোরদার হয়েছে।
বইতে হয়তো জানা যাবে, বলল কিশোর। বইটা খুলল ও। বিভিন্ন জাননায়ারের ছুটে পালানোর এক ছবি খুঁজে পেল। পড়ল ও :
জানোয়ারেরা খড়মড় শব্দ
শুনলেই ভয়ের চোটে পালায়।
শব্দটার অর্থ তিন কোটি
মাংসাশী ফৌজী পিঁপড়ে মরা
পাতা ভেদ করে এগিয়ে আসছে।
ফৌজী পিঁপড়ে! চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। তিন কোটি!
খাইছে, কোথায়? চিৎকার ছাড়ল মুসা।
বুনো দৃষ্টিতে চারপাশে চাইল তিন বন্ধু।
ওই যে! আঙুল নির্দেশ করল রবিন।
ফৌজী পিঁপড়ে–কয়েক কোটি–পাতার উপর দিয়ে পিলপিল করে আসছে।
ট্রী হাউসের দিকে দৌড় দাও! চেঁচাল রবিন।
কোথায় ওটা? বলে চরকির মতন ঘুরল কিশোর। সব কটা গাছ দেখতে একইরকম। দড়ির মইটা কোথায়?
দৌড়াও! চেচাল রবিন।
তিন বন্ধু কালবিলম্ব না করে ঝেড়ে দৌড় দিল।
মরা পাতার উপর দিয়ে ছুটছে ওরা।
চওড়া গাছের গুঁড়ির মাঝখান দিয়ে দৌড়চ্ছে।
দৌড়চ্ছে ঝুলন্ত লতা আর শ্যাওলার পাশ দিয়ে।
মোটা মোটা শিকড় টপকাল ওরা।
কিশোর সামনে একটা ফাঁকা জমি দেখতে পেল। সূর্যের আলোয় আলোকিত।
ওদিকে! চেঁচিয়ে বলল ও।
আলো লক্ষ্য করে দৌড়ল তিন গোয়েন্দা। পথ করে নিল ঝোপঝাড় মাড়িয়ে।

এক নদীর তীরে হুড়মুড় করে বেরিয়ে এল ওরা।
ধীর গতির বাদামি পানির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল তিনজন।
তোমার কি মনে হয় পিঁপড়েবাহিনী এদিকে আসবে? হাঁফাতে হাঁফাতে বলল রবিন।
জানি না, বলল কিশোর। কিন্তু আমরা যদি নদীর পানিতে গিয়ে দাঁড়াই, তা হলে সেফ। পিঁপড়েরা পানিতে নামবে না। এসো।
দেখো! হঠাই বলে উঠল মুসা।
নদীর কিনারে একটা ক্যানু দোল খাচ্ছে।
দূরে খড়-মড় শব্দ।
উঠে পড়ো। জলদি! বলল কিশোর।
কিশোর বইটা ঢুকিয়ে রাখল ব্যাকপ্যাকে। এবার সাবধানে তিন বন্ধু উঠে পড়ল ক্যানুতে।
রবিন ঝুঁকে পড়ল ক্যানু থেকে। হাত দিয়ে তীর থেকে ঠেলে সরাল ক্যান।
দাঁড়াও! বলল কিশোর। বৈঠা নেই!
খাইছে! অস্ফুটে বলে উঠল মুসা।
ওদেরকে নিয়ে, কর্দমাক্ত নদীর পানি ভেদ করে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল ক্যানু।
কিঁচ।
রবিন পকেটে আলতো হাত বুলিয়ে আদর করল জেরিকে।
ভয় পাস না, জেরি। পিঁপড়েরা নদীতে হামলা করতে পারবে না। আমরা নিরাপদ।
পিঁপড়েদের ভয় নেই ঠিক, কিন্তু ক্যানুটা যাচ্ছে কোথায়? প্রশ্ন করুল কিশোর।
তিন বন্ধু নদীর দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। পানির উপরে ছড়িয়ে রয়েছে ডাল-পালা। তা থেকে ঝুলছে লতা আর শ্যাওলা।
দেখে নিই বইতে কী বলে, বলল কিশোর। ব্যাকপ্যাক থেকে রেইন ফরেস্টের বইটা বের করল ও। দ্রুত পাতা উল্টে চলল।
শীঘি এক নদীর ছবি খুঁজে পেল। পড়ল:
আমাজান নদী ৪০০০ মাইলের বেশি
লম্বা। পেরুর পর্বতশ্রেণী থেকে শুরু
করে, ব্রাজিল পেরিয়ে, আটলান্টিক
মহাসাগরে পড়েছে। নদীর অববাহিকা
পৃথিবীর রেইন ফরেস্টের অর্ধেকের
বেশি ধারণ করে।
বন্ধুদের দিকে চাইল কিশোর।
আমরা আমাজান নদীতে, বলল। এটা চার হাজার মাইলের বেশি লম্বা।

দুনিয়ার সবচাইতে বড় নদী, বলল মুসা।
রবিন নদীর দিকে চাইল। হাত রাখল পানিতে।
আমি কিছু নোট নেব, বলল কিশোর। প্যাক থেকে নোটবই বের করে লিখল:
আমাজান রেইন ফরেস্ট হচ্ছে…
কিশোর, দেখো! সভয়ে বলে উঠল রবিন। পিরানহা!
কিছু নীল রঙের মাছ নৌকার কাছে সাঁতরাচ্ছে। লাল পেট আর তীক্ষ্ণধার দাঁত ওদের।
সাবধান! সতর্ক করল কিশোর। একবার বাগে পেলে আর রক্ষে নেই।
আমাদের তীরে ফেরা উচিত, বলল মুসা।
কিশোর বইটা ব্যাকপ্যাকে রেখে দিল।
কীভাবে? বলল রবিন। পানিতে নামা যাবে না। আর আমাদের কাছে বৈঠাও নেই।
কিশোর মাথা ঠাণ্ডা রাখার চেষ্টা করল। একটা প্ল্যান দরকার, বলল।
নদীর দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল ও। ক্যানুটা শীঘ্রি কিছু লতার নীচ দিয়ে যাবে।
আমি একটা লতা চেপে ধরব, বলল কিশোর। তারপর নিজেদেরকে টেনে তীরে নিয়ে যাব।
ঠিক আছে, সায় জানাল রবিন।
ডালগুলোর নীচ দিয়ে ভেসে যাচ্ছে, সটান উঠে দাঁড়াল কিশোর।
দুলে উঠল ক্যানু। আরেকটু হলেই পড়ে যাচ্ছিল ও।
ক্যানুটার ব্যালেন্স ঠিক রাখো, বলল কিশোর।
মুসা একপাশে হেলে পড়ল। রবিন আরেক পাশে। কিশোর হাত বাড়াল-কিন্তু ধরতে ব্যর্থ হলো!
ক্যানুটা কয়েকটা ডালের নীচ দিয়ে ভেসে যাচ্ছে।
কিশোর আরেকটা মোটা লতার উদ্দেশে হাত বাড়াল।
এবার ধরতে পারল!
লতাটা ঠাণ্ডা আর আঁশযুক্ত। সহসা কিলবিল করে উঠে ঝাঁকি দিল ওটা!
আহহহ! কিশোর আর্তচিৎকার ছেড়ে ক্যানুতে পড়ে গেল।
লতাটা জীবন্ত।
ওটা একটা লম্বা, সবুজ সাপ!
গাছ থেকে খসে পড়ল সাপটা। ছলাৎ করে পানিতে পড়ে সাঁতরে চলে গেল।
খাইছে! বলে উঠল মুসা।
আরেকটু হলেই গেছিলাম, বলল কিশোর।
তিন বন্ধু পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করল।
এখন কী? রবিন জানতে চাইল।

দেখি... নদীর দিকে চাইল কিশোর। সামনে কোন লতা নেই। তবে প্রকাণ্ড এক গুঁড়ি ভাসছে পানিতে।
ওই ডালটা ধরো, বলল কিশোর। ওটাকে বৈঠা হিসেবে ব্যবহার করা যাবে।
ডালটার কাছে ভেসে এল ক্যানু। রবিন হাত বাড়াল।
হঠাৎই ডালটা শূন্যে মাথা তুলল।
কুমির!
বাঁচাও! আর্তচিৎকার ছেড়ে ক্যানুতে চিতিয়ে পড়ে গেল রবিন।
কুমিরটা বিশাল হাঁ করল। এবার ক্যানুর পাশ দিয়ে সাঁতরে চলে গেল।
বাপ রে, ফিসফিস করে বলল কিশোর।
এসময় তীক্ষ্ণ এক শব্দ বাতাস চিরে দিল।
তিন বন্ধু আঁতকে উঠল।
খাইছে, চেঁচাল মুসা।
আবারও ভয়ঙ্কর কোন জানোয়ার দেখবে ভেবেছে।
কিন্তু তার বদলে দেখতে পেল ছোট্ট বাদামী এক বানর। গাছে লেজ বেঁধে ঝুলছে।
কিঁচ-কিঁচ!
জেরি মাথা বের করে দিল রবিনের পকেট থেকে। মনে হলো বানরটার উদ্দেশে চেঁচাচ্ছে।
ভয় পাস না, জেরি। ও আমাদের ক্ষতি করবে না, অভয় দিল রবিন।
কিন্তু আচমকা বানরটা গাছ থেকে ঝোলা বড়, লাল এক ফল আঁকড়ে ধরল। তারপর ছুঁড়ে দিল ক্যানু লক্ষ্য করে।
দেখো! সাবধান করল কিশোর।
ফলটা ছলাৎ করে পানিতে পড়ল।
বানরটা খিচিয়ে উঠল আরও জোরে।
আরেকটা ফল পেড়ে নিল।
ছুঁড়িস না! চেঁচাল রবিন।
কিন্তু বানরটা লাল ফলটা সোজা ছুঁড়ে দিল ওদের উদ্দেশে।
আবারও মাথা নোয়াল তিন বন্ধু। পানিতে ছলাৎ করে পড়ল ফলটা।
করিস কী! চেঁচিয়ে উঠল রবিন।
কিন্তু বানরটা দুহাত নেড়ে তীক্ষ্ণ ডাক ছাড়ল আবারও।
খাইছে! বানরটা তিন নম্বর ফলটা পেড়ে নিয়ে ওদের দিকে ছুঁড়ল। ধুপ করে ক্যানুর ভিতরে পড়ল ওটা। আম।
মুসা আমটা তুলে নিল। এবার উঠে দাঁড়িয়ে পাল্টা ছুঁড়ে মারল বানরটার উদ্দেশে।
লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। দুলে উঠল ক্যানু। প্রায় পড়ে যাওয়ার দশা হলো মুসার।

আরও জোরাল ডাক ছাড়ল বানরটা।
চলে যা বলছি! চেঁচাল রবিন। এমন দুষ্টু বানর আর দেখিনি!
ডাক ছাড়া বন্ধ করল বানরটা।
রবিনের দিকে চাইল। তারপর দোল খেয়ে ঢুকে পড়ল জঙ্গলের ভিতরে।
মনে হয় মনে চোট পেয়েছে, বলল রবিন।
পাকগে, বলল কিশোর। আম ছুঁড়বে কেন?
খাইছে, বৃষ্টি হচ্ছে, বলল মুসা।
কী? কিশোর মুখ তুলে চাইল। এক ফোঁটা পানি ওর চোখে পড়ল।
হায়, হায়, বলে উঠল রবিন।
হায় হায় করার কিছু নেই, বলল কিশোর। এর নাম রেইন ফরেস্ট।
দমকা বাতাস দুলিয়ে দিল ক্যানুটাকে। আকাশে বাজের গুড়-গুড় শব্দ।
ঝড়ের মধ্যে নদীতে থাকা বিপজ্জনক, বলল কিশোর। আমাদেরকে তীরে ফিরতে হবে। এখুনি।
কিন্তু কীভাবে? বলল রবিন। পানিতে নামা যাবে না। পিরানহা, সাপ আর কুমির ধরবে।
এসময় তীক্ষ্ণ চিঙ্কার বাতাস চিরে দিল আবারও।
খাইছে! বানরটা আবার ফিরে এসেছে।
ওটা এখন লম্বা এক লাঠি তাক করেছে ক্যানুর দিকে।
মুসা ঝুঁকে বসল। বানরটা কি লাঠিটা ছুঁড়ে মারবে ওদের দিকে? বর্শার মত?
রবিন তড়াক করে দাঁড়িয়ে বানরটার মুখোমুখি হলো।
সাবধান! ওর কিন্তু মাথা খারাপ, সতর্ক করল মুসা।
কিন্তু বানরটা সরাসরি রবিনের দিকে চেয়ে রয়েছে। আর রবিন চেয়ে রয়েছে বানরটার দিকে।
দীর্ঘ দুমুহূর্ত বাদে, বানরটা যেন হেসে ফেলল।
রবিনও পাল্টা হাসল।
কী হচ্ছে এসব? কিশোরের জিজ্ঞাসা।
ও আমাদেরকে হেল্প করতে চায়, বলল রবিন।
কীভাবে করবে? প্রশ্ন করল কিশোর।
লম্বা লাঠিটা বাড়িয়ে দিল বানরটা।
অপর প্রান্ত চেপে ধরল মুসা।
বানরটা লাঠি ধরে টানছে। ক্যানু ভেসে যেতে লাগল ওর দিকে।
নদীর তীরে ক্যানুটা টেনে নিয়ে গেল বানরটা।
তিন বন্ধু লাফিয়ে নেমে পড়ল ক্যানু থেকে।

বৃষ্টির তেজ বেড়েছে ইতোমধ্যে।
বানরটা বিদায় নিল। গাছ থেকে গাছে দোল খেয়ে, নদী তীর ধরে এগিয়ে চলল।
ডাক ছেড়ে তিন বন্ধুকে হাতছানি দিচ্ছে। আমাদেরকে ওর সাথে যেতে বলছে, বলল মুসা।
না! আমাদেরকে বিশেষ জিনিসটা খুঁজে বের করতে হবে। তারপর বাড়ি ফিরে যাব! বলল কিশোর।
ও আমাদের হেল্প করতে চায়! বলল রবিন। বানরটার পিছন পিছন দৌড় দিল।
রেইন ফরেস্টের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল ওরা দুজন।
রবিন! ডাকল কিশোর।
আকাশ কেঁপে উঠল বাজের শব্দে।
খাইছে! ও গেল কোথায়? বলল মুসা।
ওরা দুজন দৌড় দিল রবিন আর বানরটার পিছু পিছু। ঢুকে পড়ল অন্ধকার অরণ্যের ভিতরে।
বনভূমি আশ্চর্যজনকভাবে শুকনো।
মুখ তুলে চাইল কিশোর, এখনও বৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু বৃক্ষশীর্ষ বিশাল
এক ছাতার মত কাজ করছে।
রবিন? ডাকল কিশোর।
কিশোর! মুসা! রবিনের কণ্ঠ।
তুমি কোথায়? মুসা গলা চড়িয়ে বলল।
এখানে!
ওর কণ্ঠস্বর অনুসরণ করে তড়িঘড়ি এগোল কিশোর আর মুসা।
শীঘ্রি বানরটাকে খুঁজে পেল ওরা। দাঁত-মুখ খিচিয়ে ডাক ছেড়ে দোল খাচ্ছে গাছ থেকে।
বনের মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে রয়েছে রবিন। বিড়ালছানার মত দেখতে খুদে এক জানোয়ারের সঙ্গে খেলা করছে।
খাইছে, এটা তো জাগুয়ারের বাচ্চা! বলে উঠল মুসা।
জাগুয়ার আমাজানের সবচাইতে বড় বাঘ।
ছানাটার থাবায় হাত বুলোচ্ছে রবিন। সোনালী পশম আর কালো ফুটি-ফুটি দাগ ওটার গায়ে।
বলো কী? বলে উঠল রবিন।
গররর! হঠাই ভয়ঙ্কর এক রক্তজমাট করা গর্জন উঠল।
পাঁই করে ঘুরে দাঁড়াল কিশোর।

এক গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসছে মা জাগুয়ার। মরা পাতার উপর দিয়ে পা টিপে টিপে এগোচ্ছে-সোজা রবিনকে লক্ষ্য করে।
নোড়ো না! ফিসফিস করে বলল কিশোর।
কাঠ-পুতুল হয়ে গেল রবিন। জাগুয়ারটা সন্তর্পণে এগোচ্ছে ওর দিকে।
খাইছে!
আচমকা গাছ থেকে সাঁ করে নেমে এল বানরটা। চেপে ধরল জাগুয়ারের লেজ!
বাঘটা গর্জে উঠে চরকির মতন ঘুরে দাঁড়াল।
রবিন লাফিয়ে উঠল।
বানরটা জাগুয়ারের লেজ ধরে আবারও টানল। এবার ছেড়ে দিয়ে পালাল।
জাগুয়ারটা লাফ দিল বানরটার পিছনে।
দৌড়াও, রবিন! চেঁচাল কিশোর।
রেইন ফরেস্ট ভেদ করে ছুটল তিন বন্ধু। জান নিয়ে পালাচ্ছে ওরা!
দাঁড়াও–হাঁফাতে হাঁফাতে বলল কিশোর। মনে হয় বেঁচে গেছি।
থেমে দাঁড়িয়ে শ্বাস ফিরে পেল তিন গোয়েন্দা। আমরা কোথায়? কিশোরের জিজ্ঞাসা।
বানরটা কই? বলে জঙ্গলের দিকে চাইল রবিন। জাগুয়ারটা কি ওকে ধরতে পেরেছে মনে কর?
না, বানররা খুব ফাস্ট হয়, বলল মুসা।
জাগুয়ারও খুব ক্ষিপ্রগতিসম্পন্ন, ভাবল ও। কিন্তু এ কথা রবিনকে বলতে চায় না।
খোদা, ও যেন ভাল থাকে, বলল রবিন।
কিঁচ। রবিনের পকেটের ভিতর থেকে উঁকি দিল জেরি।
জেরি! তোর কথা তো ভুলেই গেছিলাম! বলে উঠল নথি। তুই ঠিক আছিস তো?
বড় বড় চোখ মেলে একদৃষ্টে রবিনের দিকে চেয়ে রইল ইঁদুরটা।
মনে হয় ভয় পেয়েছে, বলল মুসা। বেচারী।
বেচারী বানরটার যে কী হলো খোদাই জানে, বলল রবিন। জঙ্গলের চারধারে দৃষ্টি বুলিয়ে নিল।
বইটা দেখা যাক, বলল কিশোর।
বইটা টেনে বের করল ও। পাতা উল্টাল। সাহায্য খুঁজছে।
ভয়ঙ্কর এক প্রাণীর ছবি।
ভ্যাম্পায়ার বাদুড়-রক্তচোষা, বলল ও।
খাইছে! ছবির নীচের লেখাটা পড়ল কিশোর:
আমাজান রেইন ফরেস্টে ভ্যাম্পায়ার
বাদুড় বাস করে। রাতের বেলা নিঃশব্দে

শিকারকে কামড় দিয়ে রক্ত পান করে।
রাতের বেলা বেরোয়, বলল কিশোর।
তিন বন্ধু চারধারে দৃষ্টি বুলাল। বনভূমিতে আঁধার ঘনাচ্ছে।
আমাদের বাড়ি ফেরা উচিত, বলল রবিন।
কিশোর মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল।
কিন্তু আমাদের মিশনের কী হবে? প্রশ্ন করল মুসা। আর মরগ্যানের?
আমরা ফিরে আসব, বলল কিশোর। তৈরি হয়ে।
কাল এলে হয় না? রবিনের প্রশ্ন।
হয়। এখন বলো ট্রী হাউসটা কোন্ দিকে? বলল কিশোর।
এদিকে, বলে আঙুল তাক করল রবিন।
ওদিকে, উল্টো দিক দেখাল কিশোর।
পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করল দুজনে।
আমরা হারিয়ে গেছি, বলল একসঙ্গে।
আমিও চিনতে পারছি না, বলল মুসা।
কিঁচ।
ভয় পাস না, জেরি, ইঁদুরটার গায়ে আলতো চাপড় মারতে শুরু করল রবিন। কিন্তু পরক্ষণে থেমে গেল।
কিঁচ। কিঁচ। কিঁচ।
ও মনে হয় আমাদেরকে হেল্প করতে চায়, বলল রবিন।
কীভাবে? কিশোরের প্রশ্ন।
আগে যেভাবে করেছে। পাতাবহুল বনতলে ইঁদুরটাকে ছেড়ে দিল রবিন।
আমাদেরকে ট্রী হাউসে নিয়ে যা, জেরি।
ইঁদুরটা রওনা হলো।
কোথায় যাবে ও? বলল রবিন। আমি তো ওকে দেখতে পাচ্ছি না!
ওই যে! বলল মুসা। মাটিতে পাতার খসখস শব্দ। সেদিকে তর্জনী নির্দেশ করল।
সাদা কিছু একটা পিলপিল করে ছুটে যাচ্ছে পাতার উপর দিয়ে।
হ্যাঁ, ওই যে! বলল রবিন।
চলন্ত পাতা অনুসরণ করল তিন বন্ধু। সাদা দেহটা একবার উদয় হচ্ছে, পরমুহূর্তে উধাও।
সহসা থমকে দাঁড়াল কিশোর।
বনতল স্থির। জেরির চিহ্ন নেই।
কোথায় ও? প্রশ্ন করল কিশোর।
মাটির দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ ওর।

কিশোর! মুসা!
ঘাড় ঘুরিয়ে চাইল কিশোর। উল্টো পাশে এক গাছের কাছে দাঁড়িয়ে রবিন। উপর দিকে আঙুল তাক করেছে।
মুখ তুলে চাইল কিশোর আর মুসা।
ট্রী হাউস।
খাইছে! অস্ফুটে বলে উঠল মুসা।
ও আবার আমাদেরকে বাঁচিয়েছে, বলল রবিন। কীভাবে মই বেয়ে উঠছে! দেখো, দেখো!
দড়ির মইটার দিকে আঙুল তাক করল রবিন।
দড়ি বেয়ে তরতর করে উঠে যাচ্ছে জেরি।
চলো, বলল কিশোর।
রবিন উঠতে শুরু করল। ওকে অনুসরণ করল মুসা আর কিশোর।
জেরিকে অনুসরণ করে রেইন ফরেস্টের চাঁদোয়ায় উঠে এল ওরা।
কিশোর, মুসা, রবিন ট্রী হাউসে উঠে পড়ল।
জেরি বসা এক গাদা বইয়ের উপর।
রবিন জেরির খুদে মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। ধন্যবাদ, মৃদু কণ্ঠে বলল।
রেইন ফরেস্ট সম্পর্কে নোট নিতে হবে আমার, বলল কিশোর। পেনসিলভেনিয়ার বইটা বের করো, রবিনের উদ্দেশে বলল।
রবিন পেনসিলভেনিয়ার বইটা খুঁজতে শুরু করল-ওদেরকে সব সময় যেটা বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যায়।
কিশোর নোটবইটা বের করে নিল।
ও অনেক তথ্য টুকতে চেয়েছিল। কিন্তু লিখতে পেরেছে শুধু :
আমাজান রেইন ফরেস্ট হচ্ছে…
এখানে নেই! বলল রবিন।
কী বলছ? মুখ তুলে চাইল কিশোর। ট্রী হাউসের চারপাশে দৃষ্টি বুলাল।
রবিন ঠিকই বলেছে। পেনসিলভেনিয়ার বইটা নেই।
এখানে আসার আগে কী ছিল? মুসা জিজ্ঞেস করল।
মনে নেই, বলল রবিন।
খাইছে, আমরা এখন আর ফ্রগ ক্রীকে ফিরতে পারব না, বলে উঠল মুসা।
এর মানে রক্তচোষা বাদুড়েরা আমাদেরকে ধরবে, বলল রবিন।
কিছু একটা উড়ে এল ট্রী হাউসের খোলা জানালা দিয়ে।
আহ! মাথা লুকাল ওরা।
ধুপ।

মেঝেতে পড়ল কিছু একটা। আম।
মুখ তুলে চাইল কিশোর। জানালায় বসে সেই বানরটা। মাথা এক পাশে কাত করে রেখেছে। দেখে মনে হলো ওদের দিকে চেয়ে হাসছে।
তুই বেঁচে আছিস! বলে উঠল রবিন।
আমাদের জীবন বাঁচানোর জন্যে ধন্যবাদ, বলল কিশোর।
বানরটা শুধু দাঁত বের করে হাসল।
একটা প্রশ্ন, বলল রবিন। আমটার দিকে ইশারা করল। তুই খালি আমাদের দিকে আম ছুঁড়ে মারিস কেন?
আমটা তুলে নিল বানরটা।
না! ছুঁড়িস না! বলল কিশোর, মাথা নোয়াল।
কিন্তু বানরটা আমটা ছুঁড়ল না।
বাড়িয়ে দিল রবিনের দিকে। ঠোট নেড়ে কী সব বলার চেষ্টা করল।
রবিন বানরটার চোখে চোখে চাইল। আবারও ঠোট নাড়ল জানোয়ারটা।
হুঁ, এবার বুঝতে পেরেছি, বলল রবিন।
কী বুঝতে পেরেছ? প্রশ্ন করল মুসা।
আমটা বানরটার হাত থেকে নিল রবিন।
এটাই আমাদের দরকার ছিল, বলল। মরগ্যানের জাদুর মায়া কাটানোর জন্যে যে সব জিনিস দরকার এটা তার একটা।
খাইছে, তুমি শিয়োর? বলে উঠল মুসা।
রবিন জবাব দেওয়ার আগেই কিশোর পেনসিলভেনিয়ার বইটা দেখতে পেল।
দেখো! দেখো! আমাদের বই! তর্জনী তাক করে বলল।
আমরা জিনিসটা পেয়েছি। এখন বইটাও দেখতে পাচ্ছি। এভাবেই ওটা কাজ করে, মনে নেই? বলল রবিন।
মাথা কঁকাল কিশোর। যেটা খুঁজছে সেটা না পাওয়া পর্যন্ত পেনসিলভেনিয়ার বইটা অদৃশ্য থাকবে, এমন কথাই বলা হয়েছিল ওদেরকে।
বানরটা এসময় তীক্ষ্ণ স্বরে হেসে উঠল।
তিন বন্ধু ওর দিকে চাইল। হাততালি দিচ্ছে জানোয়ারটা।
রবিন ওর সঙ্গে গলা মিলিয়ে হেসে উঠল।
তুই জানলি কীভাবে আমটা আমাদের দিতে হবে? বলল। কে বলেছে তোকে?
ওদের উদ্দেশে স্রেফ হাত দোলাল বানরটা। এবার ঘুরে দাঁড়িয়ে দোল খেয়ে বেরিয়ে গেল ট্রী হাউসের জানালা দিয়ে।
দাঁড়া! ডাকল কিশোর, জানালা দিয়ে বাইরে চাইল।
অনেক দেরি হয়ে গেছে।

বানরটা উধাও, হারিয়ে গেছে বৃক্ষশীর্ষের নীচে।
বিদায়! গলা ছেড়ে বলল রবিন।
নীচের রহস্যময় জগৎ থেকে উৎফুল্ল এক ডাক ভেসে এল।
দীর্ঘশ্বাস ফেলল কিশোর। নোটবইটা তুলে নিল আবারও। নিজের লেখাটার দিকে চাইল:
আমাজান রেইন ফরেস্ট হচ্ছে চলে যাওয়ার আগে কিছু লিখতে হবে। ঝটপট যোগ করল ও।
অসাধারণ এক জায়গা
নোটবইটা সরিয়ে রাখল কিশোর। পেনসিলভেনিয়ার বইটা তুলে নিল রবিন।
এবার সত্যি সত্যি যাওয়ার সময় হলো, বলল ও।
পাতা উল্টে ফ্রগ ক্রীক বনভূমির ছবিটা বের করল।
আমরা ওখানে যেতে চাই, বলে ছবিতে আঙুল রাখল।
বাতাস বইতে শুরু করল।
কাঁপতে লাগল গাছের পাতা।
ট্রী হাউসটা ঘুরছে।
বন-বন করে ঘুরতে লাগল।
এবার সব কিছু নিথর। একদম স্থির।
কিঁচ।
চোখ মেলল কিশোর। ট্রী হাউসের জানালার ধারিতে বসা জেরি।
আমরা ফিরে এসেছি, বলল রবিন।
স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস ফেলল কিশোর।
বিকেলের আলোয় আমটা তুলে ধরল রবিন।
ওর হাত থেকে আমটা নিয়ে এম খোদাই করা মেঝেতে রাখল মুসা। মুনস্টোনটার পাশে।
মুনস্টোন…ম্যাংগো, আওড়াল রবিন। অনেকটা জাদুমন্ত্রের মত শোনাল।
আর দুটো অভিযান, বলল কিশোর। তারপরই আমরা মরগ্যানের জাদুর মায়া কাটাতে পারব।
শুনলেন, মরগ্যান? বলল রবিন, যেন মরগ্যান কাছেপিঠেই রয়েছে। শীঘ্রি আপনি মুক্তি পাবেন।
খাইছে, ও এখানে আছে নাকি যে শুনতে পাবে? প্রশ্ন করল মুসা।
আমার মন বলছে আছে, জানাল রবিন।
মৃদু হাসল কিশোর।
কিঁচ। ওদের দিকে চেয়ে রয়েছে জেরি।

আমরা এখন তোকে ছেড়ে চলে যাব, ইঁদুরটার উদ্দেশে বলল কিশোর।
কিঁচ।
ওকে সাথে করে নিয়ে গেলে হয় না? বলল রবিন।
না, ও এখানেই ভাল থাকবে, জবাবে বলল কিশোর।
ঠিক আছে, বলল রবিন। জেরির মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। যাই। আমাদের জন্যে এখানে অপেক্ষা করিস, আমরা কাল আবার আসব।
কিশোর আর মুসাও জেরিকে আদর করল।
বাই, জেরি। তোর সাহায্যের জন্যে ধন্যবাদ, বলল কিশোর।
কিঁচ।
রেইন ফরেস্টের বইটা অন্যান্য বইয়ের উপরে রেখে দিল কিশোর।
এবার ব্যাকপ্যাক পিঠে তুলে নিল। ট্রী হাউস ছাড়ল ওরা তিনজন।
দড়ির মই বেয়ে নামতে লাগল ওরা। কিছুক্ষণ পরে পা রাখল মাটিতে।
বনভূমি ভেদ করে এগিয়ে চলল তিন বন্ধু।
আবছায়ায় চোখে পড়ল আলোর নাচন।
কোথাও একটা পাখি ডেকে উঠল।
রেইন ফরেস্টের সঙ্গে এই জঙ্গলের অনেক তফাৎ, ভাবল কিশোর।
এখানে কোন জাগুয়ার কিংবা ফৌজী পিঁপড়ে নেই, বলল ও। ছোট বানরও না।
বানরটা আসলে দুষ্টুমি করছিল না, বলল রবিন। আমাদেরকে আমটা দেয়ার চেষ্টা করছিল শুধু।
জানি, সবাই স্বাভাবিক আচরণই করছিল, বলল মুসা। ফৌজী পিঁপড়েরা নিজেদের মত মার্চ করছিল। জাগুয়ারটা তার বাচ্চার ভালমন্দ দেখছিল।
একটু পরে ফ্রগ ক্রীক উডস থেকে বেরিয়ে এল তিন বন্ধু।
রাস্তা ধরে হেঁটে চলল ওরা। রাস্তাটা সোনালী আলোয় আলোকিত।
রেস ইউ! বলে উঠল রবিন।
তিন বন্ধু দৌড় দিল।
এক দৌড়ে ইয়ার্ড পেরোল ওরা।
দৌড়তে দৌড়তে উঠে গেল সিঁড়ি ভেঙে।
সেফ! তিনজনে চেঁচিয়ে উঠল একসঙ্গে।
দরজার হাতলের দিকে হাত বাড়াল কিশোর।
***

ভলিউম ১১৭ – আমিই কিশোর – তিন গোয়েন্দা – রকিব হাসান – সেবা প্রকাশনী

চোখ মেলে বিছানায় উঠে বসলাম। আড়মোড়া ভেঙে হাই তুললাম।

আউ! বাঁ কাঁধ ব্যথা করছে! কাঁধ ডলে দেয়াল ঘড়ির দিকে চাইলাম।

সকাল সাতটা পঁচিশ? চাচা-চাচী আমাকে ডাকেনি কেন? স্কুলে তো দেরি হয়ে যাবে আমার! বিছানা থেকে লাফিয়ে নেমে বাথরুমের দিকে এগোলাম। আয়নায় কাঁধটা দেখে নিলাম। জখমটা গুরুতর, কালশিটে পড়ে গেছে। কীভাবে হলো এটা? গতকালকের ফুটবল প্র্যাকটিসের সময়? নাকি দুএকদিনের মধ্যে বাইক থেকে পড়ে গেছিলাম? মনে করতে পারলাম না।

কাঁধ নিয়ে ভাবতে ভাবতে নীচে নেমে এলাম। রাশেদ চাচা, মেরি চাচী আর ডন টেবিলে ব্রেকফাস্ট করতে বসেছে।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। আমার চেয়ারটা নেই। আমার জন্য খাবারও দেওয়া হয়নি।

আজব তো! বললাম, ফাঁকা জায়গাটার দিকে চেয়ে রয়েছি। ডন, ঠাট্টা করছ আমার সাথে? আমার চেয়ার কোথায় সরিয়েছ? এখন মজার সময় নয়। স্কুলে দেরি হয়ে যাবে।

হঠাৎই অনুভব করলাম ঘরে কীরকম পিনপতন নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে। চাচা-চাচী আর ডনের দিকে চাইলাম।

চাচা চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াচ্ছে। চাচী সরে গিয়ে ডনের পিছনে দাঁড়াল। ভাবখানা এমন যেন ওকে রক্ষা করছে! ওরা তিনজন আমার দিকে এমনভাবে চেয়ে রয়েছে, আমি যেন…অচেনা কেউ।

এখানে কী ঘটছে? বলতে শুরু করলাম।

আমরাও সেটাই জানতে চাই, ইয়াং ম্যান, ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল চাচা। গম্ভীর শোনা তার কথাগুলো।

থমকে গেলাম আমি, চোখ পিটপিট করলাম, হাসার চেষ্টা করলাম।

আগে বলল আমার চেয়ার কই? বললাম।

চাচী ঝুকে পড়ে ডনের কানে কানে কী যেন বলল। মনে হয় ওকে নিজের কামরায় যেতে বলছে।

আমরা যতক্ষণ না আসি ঘরেই থাকিস, চাচীকে বলতে শুনলাম।

ও কি খারাপ লোক, আণ্টি? আমার দিকে আঙুল তাক করে বলল ডন।

হ্যাঁ, আমি খুব খারাপ লোক, বলে কটমট করে চাইলাম ওর দিকে। আমি কিশোর পাশা, খুনে দানব।

ডন, চলে যা! চাচী বলল, এবং ডন চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে বেরিয়ে গেল কিচেন থেকে।

চাচা ঘুরে দাঁড়িয়ে চাইল আমার দিকে। মুখের চেহারা কঠোর। সরাসরি চোখ রেখেছে আমার চোখে।
শোনো, ইয়াং ম্যান, বলল, আমরা এখানে কোন ঝামেলা চাই। তুমি এক্ষুনি চলে যাও এবাড়ি ছেড়ে। দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাও, আমরাও ভুলে যাব ঘটনাটা, নইলে-
নইলে কী? কী বলছ তুমি এসব, চাচা?
নইলে, চাচী চাচার কথাগুলো শেষ করল, আমরা পুলিস ডাকতে বাধ্য হব। আর আমাদেরকে চাচা চাচী বলা বন্ধ করো। আমরা তোমার চাচা-চাচী নই এবং কোন কিশোর পাশার নামও আমরা শুনিনি!
ঠিক আছে, শ্রাগ করলাম। তোমরা যা বলো। স্বীকার করতেই হবে এটাই এখন অবধি আমাদের সেরা পারিবারিক কৌতুক। কিন্তু আমাকে এর শেষ দেখার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। কারণ এখন বাজে পৌনে আটটা, আর পনেরো মিনিট পর প্রথম ঘণ্টা পড়বে।
ভাবতেই পারছি না আমাকে ব্রেকফাস্ট মিস করতে হচ্ছে, বলে কিচেনের দরজার দিকে এগোলাম। স্কুলে ক্যাফেটেরিয়া থেকে দুই পিরিয়ডের ফাঁকে একটা আপেল খেয়ে নেব।
দরজার কাছে বইয়ের র্যাক। স্কুল ব্যাগ নেওয়ার জন্য দাঁড়ালাম ওখানে। ব্যাগটা নেই। আরেকটা ঠাট্টা?
অনেক হয়েছে, বললাম, কিন্তু আমার স্কুল ব্যাগ কোথায়?
তোমাকে চলে যেতে বলা হয়েছে, কথা কানে যায়নি? চাচা বলল।
বই ছাড়া স্কুলে যাব কীভাবে, চাচা? বললাম।
আর নয়। আমি এবার পুলিস ডাকছি, চাচী বলল, কিচেন ফোনের দিকে পা বাড়াল।
এখুনি বেরিয়ে না পড়লে দেরি হয়ে যাবে। না হয় একদিনের জন্য কোন ক্লাসমেটের বই ধার নিয়ে নেব।
ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি, বললাম। রকি বীচ পুলিস ডিপার্টমেন্টকে আমার শুভেচ্ছা। গত বসন্তে সার্জেন্ট কলিন্স আমাকে স্কুল প্রজেক্টে সাহায্য করেছিল। সবাই ভাল থেকো, চলি।
স্কুলে পৌঁছতে আমার যতক্ষণ সময় লাগে, আজকে এসব মশকরার জন্য তার চাইতে আগেভাগে পৌঁছে যেতে হবে।
বাপ রে, চাচা-চাচীকে আগে কখনও এমন করতে দেখিনি। আজকে কি এপ্রিল ফুল? নাহ্, এখন অক্টোবরের মাঝামাঝি। তা হলে ওরা এমন করল কেন?

এর তল বের করতে হলে আমাকে সন্ধে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এখন আমার সামনে সারাদিনের ক্লাস এবং তারপর দুঘণ্টার ফুটবল প্র্যাকটিস। সামনে বড় ম্যাচ আমাদের, দলের সেরা পাস রিসিভার হিসেবে অনেক দায়িত্ব আমার। প্রচুর খাটতে হবে।

এসব ভাবছি এসময় এক মিনিভ্যান স্টপ সাইনে এসে দাঁড়াল। ভ্যানটাকে সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারলাম। আমাদের ফুটবল কোচ হেনরির। উনি আমাকে লিফট দিলে দুমিনিটের মধ্যে স্কুলে পৌঁছতে পারব।

হাই, কোচ হেনরি! চেঁচিয়ে উঠে হাত নাড়লাম।

আজকের আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ। সামনের জানালা খোলা তার। আমার গলা শুনতে পেয়ে ঘাড় ফিরিয়ে চাইলেন। কোচ হেনরি শুধু যে ভাল কোচ তা-ই নয়, ভাল মানুষও। সব সময় শিষ্যদের সাহায্য করতে একপায়ে খাড়া।।

আমাকে লিফট দেবেন? আমার একটু দেরি হয়ে গেছে।

আমাকে অবাক করে দিয়ে কোচ হেনরি আমার দিকে চেয়ে রইলেন দুমুহূর্ত। চিনতে পারার কোন লক্ষণ নেই তাঁর দৃষ্টিতে। মুখে চিরাচরিত হাসি নেই। আমি আবারও গলা ছাড়ার আগেই অ্যাক্সিলারেটরে পা দাবিয়ে রওনা হয়ে গেলেন তিনি।

আমি ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলাম। ভ্যানটা রাস্তা ধরে দূরে স্কুলের দিকে চলে গেল।

আমি কমিনিট দেরি করে স্কুলের মাঠে পৌঁছলাম। ছেলে-মেয়েরা সামনের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে, প্রথম ঘণ্টা পড়ার অপেক্ষা করছে। রকি বীচে এখনই সম্ভবত আমি সেরা সময় কাটাচ্ছি। আবহাওয়া, ফুটবল মৌসুম, বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গ- অসাধারণ।

মুসাকে দেখলাম উপরের ধাপে। ও স্কুল টিমের কোয়ার্টারব্যাক।

আমাদের কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছে ও, তাদের মধ্যে জোয়ান জেনসেনও রয়েছে, সে প্রধান চীয়ারলিডার। মুসা নিশ্চয়ই মজার কিছু বলেছে, কারণ সবাই হাসছে।

অ্যাই! চেঁচিয়ে উঠে সিড়ি ভেঙে দৌড়ে উঠতে লাগলাম। কী খবর তোমাদের?

কেউ আমার দিকে চাইল না। মুসা কথা চালিয়ে যাচ্ছে।

শনিবার হ্যামিল্টনদের মজা দেখাব, বলল মুসা। আমাদের পাস রিসিভাররা ওদের মত ভাল না হলেও আমরা ওদেরকে হারাতে পারব।

পাস রিসিভাররা ওদের মত নয়? মুসা আমাকে ছোট করছে কেন? আমি হ্যামিল্টনদের যে কোন পাস রিসিভারের চাইতে কোন অংশে কম নই।

মুসা, আমি এবছর আটবার টাচডাউন করেছি। সেটা নিশ্চয়ই খুব খারাপ নয়, বললাম।
এই প্রথমবারের মত দলটা ঘুরে দাঁড়িয়ে আমার দিকে চাইল।
অপেক্ষা করলাম মুসা কিছু একটা বলবে। দলের সবাই আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে। একটু নার্ভাস বোধ করতে লাগলাম আমি।
কেউ কিছু বলছ না কেন? বললাম।
আমি বলছি, বলল মুসা। এক কদম আগে বেড়ে সরাসরি আমার চোখে চোখে চাইল। ওর চোখের দৃষ্টি দেখে মেরুদণ্ড বেয়ে হিমস্রোত নেমে গেল আমার। তুমি আমাদের চেনো দেখা যাচ্ছে, বলল ও। কিন্তু একটা প্রশ্নের জবাব দাও তো...তুমি কে?
হাসিতে ফেটে পড়লাম। ঠেকাতে পারলাম না।
তোমরা সবাই মিলে মজা করছ! বললাম।
কীসের মজা? প্রশ্ন করল জোয়ান। কে এ?
ওর এবং অন্যদের মুখের চেহারা দেখে মনে হচ্ছে ওরা আমাকে চেনে না।
মুসার দিকে ঘুরে দাঁড়ালাম।
শোনো, মুসা, বাসাতেও মশকরা করে আমার বইয়ের ব্যাগ লুকিয়ে ক্লান্ত হয়েছে। কাজেই ইংরেজি আর বায়োলজি ক্লাসে তোমার বইগুলো আমাকে ধার দিয়ো, কেমন?
মুসারমুখের চেহারায় ব্যঙ্গ ফুটল। এক পা পিছু হটল ও।
কী বলতে শুরু করেছিল, কিন্তু এসময় স্কুলের ঘণ্টা বাজল।
মুহূর্তে সবাই স্কুল বিল্ডিঙের দিকে পা বাড়াল। আমি প্রথমে যাব তিনতলার হোমরুম ক্লাসে। সিঁড়ির দিকে এগোচ্ছি, দেখা হয়ে গেল রবিনের সঙ্গে।
অ্যাই, রবিন, পাশ কাটানোর সময় বললাম। ও আমার দিকে চেয়ে ভ্র কুঁচকাল, কিন্তু চলা থামাল না। কী ব্যাপার, রবিন? কিছু হয়েছে?
রবিন পিছু ফিরে আমার দিকে চাউনি বুলাল। ভ্রূ কুঁচকানো এখনও।
কী আবার হবে? পাল্টা বলল ও। তোমাকে চিনতে পারলাম। সিঁড়ি ভেঙে নেমে গেল ও।
চিনতে পারল না মানে? আজব তো। সিঁড়ির মাথায় থেমে দাঁড়ালাম। মনে হচ্ছে সেভেন্থ গ্রেডের সবাই আমার সঙ্গে তামাশা করছে।
ছেলে-মেয়েরা দ্রুতবেগে আমার পাশ কাটাচ্ছে, শেষ ঘণ্টা পড়ার আগেই পৌঁছতে চাইছে হোমরুমে। উপলব্ধি করলাম আমারও তাই করা উচিত।
রুম নম্বর ২০৩-এ প্রবেশ করলাম। জানালার পাশে, আমার ডেস্কের উদ্দেশে পা বাড়ালাম। ওখানে পৌছে দেখি জো লেমন আমার সিটে বসা।

তুমি মনে হয় ভুল সিটে বসেছ, ডেস্কের পাশে দাড়িয়ে বললাম। জো বিশালদেহী ছেলে, মোটেই বন্ধুভাবাপন্ন নয়। নোটবইতে কী সব টুকছিল।
জো মুখ তুলল। কয়েক মুহূর্তের জন্য আমার দিকে চোখ পিটপিট করে চাইল। এবার ধীরে সুস্থে উঠে দাঁড়াল। ও আমার চাইতে পাক্কা চার ইঞ্চি লম্বা। আমার মুখের উপর আস্তে আস্তে গর্জন ছাড়ল, তুমি...আমাকে...কী...বললে?
গলাটা কেমন শুকনো ঠেকল। কাঁধের ব্যথাটা আবারও শুরু হলো।
বললাম তুমি আমার সিটে বসেছ। তুমি সবসময় আমার এক সিট পিছনে বসো। এটা কোন ব্যাপার না, কিন্তু তুমি সরে গেলে আমি আমার সিটে বসতে পারতাম।
কে এ? বলে চারধারে নজর বুলাল জো। অন্যান্য ছেলে-মেয়েরা আমাদের দিকে চেয়ে রয়েছে। বেশিরভাগ শ্রাগ করল। কেউ কেউ হেসে উঠল।
বিরক্ত লাগতে শুরু করেছে আমার। বাসায় আর ক্লাসের বাইরে ঠাট্টা-ইয়ার্কি মেনে নেয়া যায়। কিন্তু ক্লাস বসতে চলেছে, এখন এসব ভাল লাগছে না। তা ছাড়া জো লেমন আমার বন্ধু নয়। ও কেন মশকরা করবে আমার সঙ্গে? আমি এমনকী ওকে পছন্দও করি না।
দেখো, জো, মশকরা করছ বুঝতে পারছি, কিন্তু আমি এখন আমার সিটে বসতে চাই। তুমি পিছনে গিয়ে-
এসময় শেষ ঘণ্টা পড়ল। মিসেস ফিশার, আমাদের হোমরুম টিচার সবাইকে চুপ করে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে বললেন।
সবাই যার যার সিটে বসে পড়ো, বললেন তিনি। পিছনের দিকে চাইলেন। জো আমার সিটে বসা। আমি ডেস্কের পাশে বোকার মত দাঁড়িয়ে। ওখানে কী হচ্ছে? মিসেস ফিশার প্রশ্ন করলেন।
মিসেস ফিশার, জো লেমন আমার সিটে বসে আছে, ছাড়তে চাইছে না, বললাম।
মিসেস ফিশার করিৎকর্মা মানুষ। আমি জানি এ সমস্যার সমাধান এখুনি হয়ে যাবে।
কিন্তু তুমি কে, ইয়াং ম্যান? প্রশ্ন করলেন তিনি।
চারপাশে নজর বুলিয়ে নিলাম। কমুহূর্ত লেগে গেল উনি কী বলছেন বুঝতে।
আমি কে? বলতে গিয়ে গলা চড়ে গেল সামান্য। মিসেস ফিশার ফিফথ গ্রেড থেকে আমার হোমরুম টিচার।
হ্যাঁ, তোমার নামটা প্লিজ, সাড়া দিলেন তিনি।
মিসেস ফিশারও তামাশায় যোগ দিয়েছেন! ভাল ফ্যাসাদেই পড়া গেছে। কিন্তু মিসেস ফিশার তো কখনও ঠাট্টা করেন না। ঠিক করলাম আমিও খেলে যাব।
আমার নাম কিশোর পাশা, মিসেস ফিশার। মিসেস ফিশার ডেস্কে বসলেন, কিছু কাগজ-পত্র পরীক্ষা করলেন তিনি। এবার মুখ তুলে আমার দিকে চাইলেন।

এই হোমরুমে নতুন কোন স্টুডেন্ট নেয়া হয়েছে এমন কোন ননাটিশ দেয়নি হেড অফিস। তুমি বরং মেইন ফ্লোরে গিয়ে ব্যাপারটা তাদেরকে চেক করে দেখতে বলল, বললেন মিসেস ফিশার।
ইয়েস, ম্যাম, বললাম। দরজার দিকে এগোলাম। রব মিশেলের পাশ কাটাতে হলো। সামনের দিকে বসা সে। আমাদের ফুটবল টিমের সেন্টার। আজকে প্র্যাকটিসে দেখা হবে, রব, বললাম। রব এমনভাবে আমার দিকে চাইল, আমি যেন মঙ্গলগ্রহ থেকে এসেছি।।
হলওয়ে এখন নির্জন, ছেলে-মেয়েরা সব তাদের হোমরুমে। সিঁড়ি ভেঙে নেমে যাওয়ার সময় মাথায় খেলে গেল এক ঘণ্টা আগে আমি ঘুম থেকে ওঠার পর থেকে কী কী ঘটেছে।
আমি যাদেরকে চিনি তারা সবাই নাটক করছে। তারা আমাকে কেন বেছে নিয়েছে বুঝলাম না। এর শেষ কোথায় তাও জানা নেই আমার। কিন্তু আমাকে ব্যাপারটা জানতে হবে। স্কুল ফ্রন্ট অফিসটা আমার ঠিক সামনে।
অফিসে প্রবেশ করে দেখি মিসেস পোর্টার তাঁর সেক্রেটারি ডেস্কে বসা, কম্পিউটারে কাজ করছেন। মিসেস পোর্টার আমাকে ছোটকাল থেকেই চেনেন।
হাই, মিসেস পোর্টার, বললাম। তিনি মুখ তুলে চেয়ে মৃদু হাসলেন। আমি অনেকখানি স্বস্তি বোধ করলাম।
গুড মর্নিং, বললেন তিনি। আমি তোমার জন্যে কী করতে পারি?
ঠিক জানি না…ব্যাপারটা বেশ মজার। আমার প্রথমে প্রশ্ন করা উচিত-আপনিও কি এই জোকটার সাথে জড়িত?
আমার দিকে চেয়ে রইলেন তিনি।
জোক? কীসের জোক?
ভাল! ওরা মিসেস পোর্টারকে এরমধ্যে জড়াতে পারেনি। মিসেস পোর্টার আমাকে এই রহস্যের সমাধানে সাহায্য করতে পারবেন।
মানে আজ সকাল থেকে দেখছি চাচা-চাচী থেকে শুরু করে যার সাথেই দেখা হচ্ছে তারা সবাই আমাকে না চেনার ভান করছে। মিসেস ফিশার এমনকী আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন ব্যাপারটার জট খোলার জন্য। হাসির ব্যাপার না?
মাথা ঝাঁকালেন মিসেস পোর্টার, আমার দিকে চাইলেন।
তোমার নাম কী?
আমি একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম তার দিকে। ঠিক শুনেছি তো?
আহ, মিসেস পোর্টার, আমি ভেবেছিলাম আপনি এই তামাশাটার সঙ্গে নেই, বললাম।

আমি কোন তামাশা করছি না, বললেন মিসেস পোর্টার। কিন্তু তুমি তোমার নাম না বললে আমি তোমাকে কোন সাহায্য করতে পারব না–
আমি কিশোর পাশা, মিসেস পোর্টার, আপনি কে মনে করেছেন? আমি সেভেন্থ গ্রেডার, হোমরুম ২০৩-এ আছি, ফুটবল টিমের প্লেয়ার–
চেঁচাচ্ছ কেন? বললেন মিসেস পোর্টার, কম্পিউটারের কি টিপতে লাগলেন।
আমি একটু আপসেট হয়ে পড়েছি, বললাম, প্রথমে বললেন আপনি জোকটার মধ্যে নেই, কিন্তু এখন দেখছি আছেন।
জোক হচ্ছে এখানে, বললেন মিসেস পোর্টার, কম্পিউটার স্ক্রীনের দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে। কিন্তু জোকটা করছ তুমি।
তার মানে? প্রশ্ন করলাম। কম্পিউটার ফাইলে কিশোর পাশা নামে কারও রেকর্ড নেই। এখন তো নেইই, আগেও ছিল না।
এই প্রথমবারের মত সামান্য আতঙ্ক বোধ করলাম।
কম্পিউটার পারফেক্ট নয়, ভুল করে, বললাম। ঘুরে তাঁর চেয়ারের কাছে এলাম। কম্পিউটার স্ক্রীনের দিকে দৃষ্টি আমার।
নিজেই দেখো, বললেন মিসেস পোর্টার। এখানে K অক্ষরের মধ্যে কোথাও তোমার নাম নেই।
কম্পিউটারের কথা বাদ দিন, মিসেস পোর্টার। আমার দিকে তাকান-আমি কিশোর পাশা, আমাকে আপনি ছোটকাল থেকে দেখছেন! ঠাট্টাটা অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে না, আপনিই বলুন? আমি ক্লাসে ফিরে যেতে চাই, আমার বইগুলো ফিরে পেতে চাই, এবং চাই এই ননসেন্স বন্ধ হোক!
ঘন-ঘন শ্বাস নিচ্ছি এবং আমার কাঁধ এখন রীতিমত টাটাচ্ছে। ইতিকর্তব্য ঠিক করতে পারছি না। কাউকে বিশ্বাস করার উপায় নেই। সবাই আমার সঙ্গে তামাশা করছে। এর চাইতেও খারাপ ব্যাপার...আমার সন্দেহ হচ্ছে এটা আসলেই তামাশা কিনা। কিন্তু এ ছাড়া আর কীই বা হবে। আমি এক সকালে ঘুম থেকে উঠলাম আর তারপর কেউ আমাকে চিনতে পারছে না এটা কীভাবে সম্ভব!
আহ, কিশোর... পিছন থেকে কে যেন বলল।
ঘুরে দাঁড়ালাম। গভীর ভাবনায় এতটাই ডুবে ছিলাম, টেরই পাইনি মিসেস পোর্টার কখন বেরিয়ে গিয়েছিলেন কামরা ছেড়ে এবং এখন ফিরেছেন। তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে মিস্টার লাউয়ি, স্কুলের সাইকোলজিস্ট। সব ছাত্রের সাধারণ পরীক্ষা নেন তিনি, এবং কারও বিশেষ কাউন্সেলিঙের দরকার পড়লে তাও করেন।
মি. লাউয়ি আমার নাম ধরে ডেকেছেন।
বলুন, মিস্টার লাউয়ি? বললাম। অনুভব করলাম বড় ধরনের বিপদের মুখোমুখি হতে পারি। স্কুলের সাইকোলজিস্টকে ডেকে এনেছেন কেন মিসেস পোর্টার?

তুমি আমার নাম জানো? বিস্মিত শোনাল মি. লাউয়ির কণ্ঠ।
অবশ্যই জানি, জবাব দিলাম। আপনি স্কুলের সাইকোলজিস্ট, ছাত্র-ছাত্রীদের ইন্টেলিজেন্স টেস্ট নেন।
ঠিক বলেছ, বললেন মি. লাউয়ি। তা ছাড়া যে সব ছেলে-মেয়ে সামান্য... আপসেট ফীল করে আমি তাদেরকেও হেল্প করি। তুমি কি আপসেট, কিশোর?
ভীষণ আপসেট, মিস্টার লাউয়ি। সবাই বলছে তারা আমাকে চেনে না। আপনি হলেও আপসেট হতেন।
মি. লাঙলিঙের মরবের সাধারণীড়িয়ে মন মরালাম, স্ট্রেই
হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানি। কিন্তু, আহ্, মিসেস পোর্টার বলছেন তুমি নাকি নিজেকে এ স্কুলের ছাত্র হিসেবে দাবি করছ। কিশোর, আমরা দুজনই জানি সেটা সত্যি নয়।
আচ্ছা, ওরা এবার স্কুলের সাইকোলজিস্টকেও এ খেলায় জড়িয়েছে।
আমি সিদ্ধান্ত নিলাম নিজের যুক্তি দিয়ে পাল্টা লড়াই করব।
মিস্টার লাউয়ি, আমি যদি এখানকার ছাত্র না-ই হব তা হলে সবার নাম... এমনকী আপনারও নাম জানলাম কীভাবে?
আমরা সেটাই ভাবছি, কিশোর, ঠাণ্ডা গলায় বললেন তিনি। তুমি আমাদের নাম জাননা কীভাবে? আমি তোমার বয়সী এক ছেলের কেসের কথা জানি। সে মরিয়া হয়ে উঠেছিল বিশেষ একটি স্কুলে অ্যাটেও করার জন্যে। সেজন্যে সে সমস্ত ফ্যাকাল্টি মেম্বার আর কিছু ছাত্র-ছাত্রীর নাম মুখস্থ করেছিল। বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে স্কুলটাতে অ্যাটেও করার চেষ্টা করেছিল ও। তবে প্রথম দিনই সে ধরা পড়ে যায়। ব্যাপারটা আসলেই দুঃখজনক।
আপনি বলছেন আমার মাথা খারাপ এবং আমি এখানকার ছাত্র নই।
ঠিক তা না, মৃদু কণ্ঠে বললেন মি. লাউয়ি। কিন্তু, কিশোর, আমরা কখনও কখনও কোন কিছু এত বেশি করে চাই যে কল্পনার লাগাম ছেড়ে দিই।
এটা কি আমার কল্পনা, আমি এবছরের ফুটবল টিমের স্টার্টিং মেম্বার? বলতে গিয়ে গলা চড়ে গেল আমার। মি. লাউয়ি আর মিসেস পোর্টার পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করে আমার দিকে চাইলেন।
তুমি ফুটবল টিমে আছ? মি. লাউয়ি প্রশ্ন করলেন। কণ্ঠস্বর শান্ত। সান্তনা দেয়ার চেষ্টা টের পাওয়া যায়।
হা! টিমের ফটো ঝুলছে এই অফিসের বাইরের দেয়ালে, বললাম আমি।
তা হলে গিয়েই বরং দেখা যাক, বললেন মি. লাউয়ি।
হল ফাঁকা আর চুপচাপ এখনও, তবে শীঘি সরগরম হয়ে উঠবে। প্রথম ক্লাসের ঘন্টা পড়বে যে কোন মুহূর্তে। আমি সোজা এগোলাম ফুটবল টিমের ফটোটার দিকে, ফ্রেমে বাঁধিয়ে যেটা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে মেইন হলওয়েতে।

আমি রোজ ছবিটার সামনে এসে দাঁড়িয়ে থাকি। গর্ব বোধ হয় আমার। ফুটবল টিমের সদস্য হিসেবে আলাদা এক অনুভূতি কাজ করে, কেননা গায়ে-গতরে অন্যদের মত শক্তিশালী নই কিনা। আমি সামনের সারিতে। সেন্টার রব মিশেল আর কোয়ার্টার ব্যাক মুসার ঠিক মাঝখানে।

মিস্টার লাউয়ি, আমি যদি এ স্কুলের ছাত্র না হই তবে এর কী ব্যাখ্যা দেবেন

কথা বন্ধ হয়ে গেল আমার। ফটোটার দিকে চাইলাম। সামনের সারিতে রয়েছে রব মিশেল। তার পাশে দাঁড়িয়ে মুসা আমান। কিন্তু আমি নেই। ফটো থেকে আমি উধাও!

মি. লাউয়ি উকি মেরে ছবিটা দেখলেন।

তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না, কিশোর। তুমি ছবিতে কোথায় দাঁড়িয়েছ?

এক পা পিছু হটলাম।

ওরা-ওরা ছবিতে কারসাজি করেছে। আমি টিমে আছি। আমি স্টার্টিং রাইট এণ্ড। যাকে খুশি জিজ্ঞেস করুন!

কিশোর, তুমি আমার সাথে এসো। আমাদের আরও কথা বলা দরকার, মি. লাউয়ি বললেন। হাত বাড়িয়ে আমার কাঁধে রাখলেন, যে কাঁধটা টাটাচ্ছে।

আউ! চেঁচিয়ে উঠে, সত করে সরে গেলাম। সে মুহূর্তে ঘন্টা বাজল এবং হলগুলো ভরে গেল ছাত্র-ছাত্রীতে। শশব্যঙে ক্লাসরুমের দিকে চলেছে তারা।

মি, লাউয়ির কাছ থেকে সরে পড়ার জন্য ছেলে-মেয়েদের স্রোতকে কাজে লাগালাম। লাউয়ির মনে কী ছিল কে জানে, কিন্তু আমি এতে জড়াতে চাই না।

আমি জানি একজন ফ্যাকাল্টি সদস্য আছেন যিনি অদ্ভুত এই খেলায় নিজেকে জড়াবেন না। মি, হালবার্ট, আমার বায়োলজি টিচার। তিনি আমাদেরকে সব সময় সত্য আর জ্ঞানের শিক্ষা দেন, বায়োলজির পাশাপাশি। মি. হালবার্টের কাছে আমাকে যেতে হবে।

ভাগ্যক্রমে, বায়োলজি আমার প্রথম ক্লাস, তাই দ্রুত পায়ে সায়েন্স ডিপার্টমেন্টের দিকে এগোলাম। কোনা ঘুরতেই দেখতে পেলাম মি. লাউয়ি স্কুলের এক দারোয়ানের সঙ্গে কথা বলছেন।

ঝট করে সরে গেলাম। আমাকে যাতে দেখতে না পায়। আমার ধারণা মি. লাউয়ি লোকটিকে আমার উপর নজর রাখতে বলছেন।

মি. লাউয়ি আর দারোয়ান দুদিকে চলে যেতেই, ক্লাসরুমের দিকে পা বাড়ালাম আমি। শেষ ঘণ্টা পড়ে গেছে ইতোমধ্যে, সুতরাং সবাই এখন যার যার ক্লাসে বসে পড়েছে।

দরজাটা বন্ধ। টান মেরে খুলে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়লাম ভিতরে।

মিস্টার হালবা–বলতে শুরু করেছিলাম, কিন্তু শব্দটা আটকে গেল আমার গলায়।

মি. হালবার্ট সামান্য স্থূলকায়। মাথায় পাতলা, সাদা চুল, বয়স রাশেদ চাচার মত। কিন্তু ক্লাসের সামনে যিনি দাঁড়িয়ে তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন এক মানুষ। বছর পঁচিশেকের এক মহিলা টিচার। ভদ্রমহিলা হালকা-পাতলা, তেমন লম্বা নন-সম্ভবত চাইনিজ। আমার দিকে চাইলেন তিনি।

কী চাই? আমার ক্লাসে ডিস্টার্ব করছ কেন? মিস্টার হালবার্ট কোথায়? প্রশ্ন করলাম। কে? মহিলা বললেন। মিস্টার হালবার্ট...যিনি এই ক্লাসটা নেন! বললাম।

অ্যাই, সেই পাগলটা আবার এসেছে, যে বলছিল ফুটবল টিমে আছে, রুমের মাঝখান থেকে একটি কণ্ঠ শোনা গেল।

কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করে চাইলাম। মুসা এ কথা বলেছে।

মুসা, আমাকে সাহায্য করো, আমরা না বন্ধু? চেঁচিয়ে উঠলাম। ওরা এমনকী হলওয়ের ছবি থেকেও আমাকে বাদ দিয়েছে।

মিস লি, এর মাথার স্ক্রু ঢিলে।

জোয়ান জেনসেন। জোয়ান! ক্লাসে ও আমার স্টাডি পার্টনার। ও এমন কথা বলতে পারল!

মিস লি আমার দিকে এগিয়ে এলেন।

তুমি ভুল ক্লাসরুমে এসেছ, ইয়াং ম্যান।

আমার মনে হয় ও ভুল গ্রহে এসেছে! বলল মুসা। গোটা ক্লাস হেসে উঠল। আমার বিশ্বাস হলো না। ওরা এমনভাবে আমাকে নিয়ে হাসছে, আমি যেন ভাড়, সঙ!

হাসো, হাসো! চেঁচিয়ে উঠলাম, চোখ জ্বালা করছে অনুভব করলাম। কে তোমাদের চায়! দৌড় দেয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়ালাম।

শোনো, মিস লি মৃদু কণ্ঠে বললেন। ঘুরে দাঁড়িয়ে তার দিকে চাইলাম।

বলুন।

আজকে নিজেকে তোমার একদম নতুন মানুষ মনে হচ্ছে, তাই না?

বিস্মিত হলাম। দ্রমহিলা কী বলছেন জিজ্ঞেস করতে চাইলাম। কিন্তু উনি মুহূর্তের জন্য আমার দিকে চেয়ে হাসলেন। এবং তারপর, যেন বাতাসের ধাক্কায়, ক্লাসরুমের দরজাটা দড়াম করে লেগে গেল আমার মুখের উপর। হলওয়েতে একাকী দাঁড়িয়ে রইলাম আমি।

ওই যে ও! আমার উদ্দেশে কে যেন চেঁচিয়ে উঠল। ঘুরে চাইলাম। দারোয়ান আমাকে দেখে ফেলেছে। হঠাৎই সে আর মি. লাউয়ি দৌড়ে আসতে লাগল আমার দিকে। আমাকে পালাতে হবে!

আমি ওদের চাইতে সিঁড়ির কাছাকাছি, তাই এক দৌড়ে দুটো করে ধাপ ভেঙে উঠে গেলাম। একটু পরেই মেইন ফ্লোরে ফিরে এলাম।

মুহূর্তের মধ্যে সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলাম।
ফিরে এসো! আমরা তোমাকে কিছু করব না, আমরা তোমাকে সাহায্য করতে চাই! মি. লাউয়ি আমার উদ্দেশে চেঁচালেন। স্কুল এন্ট্রান্সের সবচাইতে উঁচু ধাপে দাঁড়িয়ে তিনি, চেয়ে রয়েছেন আমার দিকে।
আমি এখন রাস্তার দিকে হাঁটা দিয়েছি। স্কুলের খেলার মাঠ পেরিয়ে গেছি, কাজেই ওরা কার্যত আমাকে আর ধরতে পারে না।
আপনাদের কাছ থেকে আমি আর সাহায্য চাই না! পাল্টা চেঁচালাম। সাহায্য করতে চাইলে আপনারা এই তামাশাটা বন্ধ করতেন! ব্যাপারটা হয়তো আপনাদের কাছে মজার কিন্তু আমার কাছে!
কীসের তামাশা? বললেন মি. লাউয়ি। সত্যি বলছি তুমি কী বলছ আমি বুঝতে পারছি না।
ওঁর মুখের চেহারা আর কণ্ঠস্বর অত্যন্ত আন্তরিক। উনি কি অন্যদের মত অভিনয় করছেন? আমাকে যেটা খোচাচ্ছে...যদি ওটা অভিনয় না হয়? সত্যিই যদি ওঁরা আমাকে না চেনেন! কিন্তু সেটা তো অসম্ভব...তাই না?
ঘুরে দাঁড়িয়ে দৌড় দিলাম মেইন স্ট্রীটের দিকে। একটু পরে শ্বাস ফিরে পেতে থামলাম। দস্তুরমত হাঁফাচ্ছি।
কাঁধ ডললাম। ভীষণ ব্যথা করছে এমুহূর্তে। মিস লি-র কথা ভাবলাম। ওঁর মধ্যে কী যেন আছে যেটা খুব পরিচিত লেগেছে। তার কথা যত বেশি ভাবছি কাঁধের ব্যথাটাও বাড়ছে। ওঁকে আগে অন্য কোথাও দেখেছি...কিন্তু কোথায়?...কোথায়?
হা-হা-হা-হা! আমার কানে কার যেন জোরাল খলখল হাসি বাজল। এতটাই চমকেছি, পড়েই যাচ্ছিলাম প্রায়। ঘুরে দাঁড়ালাম।
সরাসরি চোখাচোখি হলো ম্যাকের সঙ্গে।
ম্যাক ভবঘুরে ধরনের লোক। কারও ক্ষতি করে না, কিন্তু ওকে দেখলে আমার ভয়-ভয় করে।
কী, ছেলে, স্কুল পালিয়েছ, না? সামনে ঝুঁকে পড়ে বলল ও। চোখজোড়া লাল। কতদিন গোসল করে না কে জানে। পরনের কাপড়চোপড় ময়লা।
ন-না, তুতলে বললাম। আমি...আহ....
আমার কণ্ঠ মিলিয়ে গেল। মিথ্যে ভাল বলতে পারি না আমি। আর সত্যি কথাটা হচ্ছে, আমি তো আসলেই স্কুল পালাচ্ছি।
কোন চিন্তা নেই, আমি কাউকে বলব না, ম্যাক অস্পষ্ট কণ্ঠে বলল। একটা বাদামি ব্যাগ বাড়িয়ে দিল। ভিতরে খাবার-টাবার কিছু আছে। টেস্ট করবে?
না! বলে এক পা পিছু হটলাম। ঘুরে দাঁড়ালাম। এর কাছ থেকে পালাতে চাই।

এই দুনিয়ায় সবচাইতে কঠিন ব্যাপার কি জাননা? প্রশ্ন করল ম্যাক। হঠাৎই পরিষ্কার হয়ে গেল ওর কণ্ঠস্বর। আমি ঘুরে দাঁড়িয়ে ওর দিকে চাইলাম। ওর চোখজোড়া যেন দীপ্তি ছড়াচ্ছে, দেহ কাঁপছে।
না, কী? প্রশ্ন করলাম।
আমরা আসলে কে সেটা জানা। হ্যাঁ, এটাই। তুমি কি জাননা তুমি আসলে কে? বলে জানো? পাগলের মত হাসতে লাগল আবার ও।
এবং আচমকাই দেখতে পেলাম আমি আর ম্যাকের দিকে চেয়ে নেই। ও মিস লি হয়ে গেছে! তিনি ম্যাকের হেঁড়াখোড়া পোশাক পরে আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসছেন!
কাঁধের ব্যথাটার কী অবস্থা, কিশোর? নরম কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন। স্মিত হাসলেন আমার দিকে চেয়ে। আশা করি শীঘ্রি তোমার ব্যথা কমে যাবে।
মৃদু শব্দে হাসতে লাগলেন তিনি। এবার আমি আবার ম্যাকের মুখের দিকে চেয়ে! হাসছে, কাশছে-ওর মুখের চেহারা টকটকে লাল। হাসতে হাসতে আমার দিকে তর্জনী নির্দেশ করছে।
ঘুরে দাঁড়িয়ে দৌড় দিলাম। কোথায় যাচ্ছি নিজেও জানি না। মেইন স্ট্রীটের সামনে গাছ-পালায় ঘেরা এক টুকরো জমি আর তারপর খোলা মাঠ। সেখানে দৌড়ে চলে গেলাম। কেউ দেখতে পাচ্ছে না নিশ্চিত না হওয়া অবধি ছুটে চললাম।
খোলা মাঠের কাছে এক জায়গায় এসে পৌঁছলাম। প্রকাণ্ড এক গাছের গায়ে হেলান দিয়ে বসে পড়ে চোখ বুজলাম। কতক্ষণ ওখানে ছিলাম জানি না, আচমকা চটকা ভেঙে গেল।
ঘড়ি দেখলাম। ১১:৩৫! নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। চোখ ঘষলাম। আউ! কাঁধের কথা ভুলে গিয়েছিলাম। ব্যথার জায়গাটায় হাত বুলিয়ে চারধারে নজর বুলালাম।
দৃষ্টিসীমার মধ্যে কেউ নেই। শুধু বিশাল, ফাঁকা মাঠটা-বাঁ দিকে গাছ-পালার দঙ্গল আর তার পিছনে মেইন স্ট্রীট।
পেটের ভিতরে গুড়-গুড় করে উঠল। সকালে নাস্তা খাইনি এবং এখন প্রায় লাঞ্চের সময়। এতসব অদ্ভুত ঘটনার মধ্য দিয়ে গেলেও খিদে ঠিকই পেয়েছে আমার। কিছু খাওয়া দরকার।
উঠে দাঁড়ালাম। পেটে কিছু গেলে হয়তোবা এই রহস্যের সমাধান খুঁজে পাব। হয়তো সব কিছুই এখন ঠিকঠাক হয়ে গেছে। আমি স্কুলে ফিরে গেলে হয়তো সবাই আমাকে চিনতে পারবে। আর কোন সমস্যা হয়তো থাকবে না!

আমার জন্য নিশ্চয়ই সবার খারাপ লাগবে। ফলে কেউ আর তামাশা করবে না। আমি নিশ্চিত চাচা-চাচী আর ডন আমার জন্য উদ্বেগ বোধ করছে।
এসব ভেবে মনটা একটু ভাল হলো। প্যান্টের ধুলো ঝেড়ে স্কুলের দিকে রওনা হলাম।
কিশোর পাশা! পিছন থেকে কে যেন ডাকল।
আগে কখনও নিজের নামটা এত মধুর শোনায়নি আমার কানে! দুঃস্বপ্নটা তারমানে কেটে গেছে। সব কিছু আবার স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। ঘুরে দাঁড়ালাম কে ডেকেছে দেখার জন্য।
আমার পুলিস ডিপার্টমেন্টের বন্ধু, সার্জেন্ট কলিন্স। স্কুটারে চেপে আমার পিছনে এসে থেমেছে।
হাই, সার্জেন্ট কল–শুরু করতে গেছিলাম, কিন্তু উনি ত্বরিত আমাকে থামিয়ে দিলেন।
গাছে হাত দিয়ে দাঁড়াও। একদম নড়বে না! গর্জে উঠলেন তিনি। এবং হঠাত্র আমি আমার অসহায় বিভ্রান্তির মধ্যে ফিরে এলাম।
সার্জেন্ট কলিন্স যখন নিশ্চিত হলেন আমার কাছে বিপজ্জনক কোন অস্ত্র নেই, তখন আমাকে ঘুরিয়ে তার মুখোমুখি দাঁড় করালেন।
সার্জেন্ট কলিন্স, এমন করছেন কেন? প্রশ্ন করলাম।
আমার দিকে চাইলেন তিনি।
তুমি আমার নাম জানলে কীভাবে?
একদৃষ্টে তাঁর দিকে চেয়ে রইলাম। ওঁর নাম জানলাম কীভাবে!
গত টার্মে আমরা একসাথে স্টুডেন্ট সেফটি ক্যামপেইনে কাজ করেছি। সার্জেন্ট, আমি কিশোর পাশা। একটু আগেই আপনি আমাকে নাম ধরে ডেকেছেন!
নাম ধরে ডেকেছি কারণ তোমার সাথে এক ছেলের বর্ণনা মিলে যাচ্ছে। আজ সকালে রকি বীচ স্কুলে গিয়ে অদ্ভুত আচরণ করে এসেছে সে।
বর্ণনা মিলে যাচ্ছে? মিলবেই, কারণ ওটাই আমি। আর আমি মোটই অদ্ভুত আচরণ করিনি, করেছে অন্যরা!
তাই বুঝি? বললেন কলিন্স। তুমি বলছ আমরা স্কুল সেফটি প্রোগ্রামে একসাথে কাজ করেছি? সত্যি কথাটা হচ্ছে আমি এই একটু আগে প্রথম তোমাকে দেখলাম। এর আগে জীবনেও দেখিনি।
হাঁটুজোড়া কাঁপতে লাগল আমার। বিশ্বাস হচ্ছে না এমনকী পুলিসও এর সঙ্গে জড়িত!
সার্জেন্ট কলিন্স, আস্তে আস্তে বললাম। প্রোগ্রামে ছিল বাইক চালানোর সময় ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে কিছু সেফটি রুল মেনে চলে। রাস্তা পার হওয়ার সময়, কিংবা

অচেনা লোকের সাথে কথা বলার সময়। এবার মনে পড়েছে?
হ্যাঁ, প্রোগ্রামটা এমনই ছিল। কিন্তু প্রোগ্রামে আমাকে সাহায্য করেছিল মুসা আমান আর জোয়ান জেনসেন।
মুসা আমান কখনোই এটার সাথে ছিল না! প্রায় আর্তচিৎকার ছাড়লাম। জোয়ান আর আমি আপনার সাথে কাজ করেছি।
কলিন্স চোখ সরু করে আমার দিকে চেয়ে রইলেন।
তোমার কোন আইডেন্টিফিকেশন আছে?
নেই। আমি স্কুলে কখনও ওয়ালেট নিয়ে যাই না, নিই শুধু বইয়ের ব্যাগ আর লাঞ্চের টাকা। আর আজকে তো এমনকী বইয়ের ব্যাগও নেই!
সঙ্গে নেই, তবে বাসায় আছে।
হ্যাঁ, মিসেস পোর্টার বলেছেন তোমার বাসার ঠিকানা। ওখানে পাশা পরিবার থাকে, কিন্তু কিশোর নামে কাউকে তারা চেনে না।
রাশেদ পাশা আমার চাচা, আর মেরি পাশা চাচী।
দেখো, ছেলে, তুমি কোন আইন ভাঙনি। তাই আমি তোমাকে ধরছি না, কলিন্স বাধা দিয়ে বললেন, ধৈর্য হারাচ্ছেন পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু আমি তোমাকে সাবধান করছি। তোমার কোন আইডি নেই, অস্তিত্ব নেই এমন একজন বলে নিজেকে দাবি করছ, এবং তোমার ব্যাপারে রিপোর্ট এসেছে তুমি পাবলিক নুইসেন্স, বললেন তিনি। কাজেই পরিষ্কার করে একটা কথা বলে দিই। তোমাকে যদি চব্বিশ ঘণ্টা পর রকি বীচে দেখি, তা হলে তোমার প্রমাণ করতে হবে তুমি কে। বোঝা গেছে?
জি; সার, গোমড়া মুখে বললাম। এরচেয়ে অসহায় আর কখনও লাগেনি।
ভাল, বললেন তিনি। কথাটা মনে থাকে যেন। আমার কিন্তু মনে থাকবে।
ঘুরে দাঁড়িয়ে থপথপ করে স্কুটারের কাছে ফিরে গেলেন। কমুহূর্তের মধ্যেই মেইন স্ট্রীটের দিকে রওনা হলেন।
কলিন্সের অপসৃয়মাণ দেহের দিকে চেয়ে রইলাম। এখন কী করব আমি? এটা কি সম্ভব...যে কোনভাবে...আজ সকালে জেগে ওঠার পর থেকে...মিস লি যা বলেছিলেন আমাকে? আমি এক নতুন মানুষ?
এমন কিছু কি ঘটতে পারে?! অসম্ভব। আমি রকি বীচের কিশোর পাশা। সার্জেন্ট কলিন্স কিংবা অন্য কেউ যদি আমার আইডেন্টিফিকেশন দেখতে চায়, আমি জানি কোথায় পাওয়া যাবে। রকি বীচ জেনারেল হাসপাতালে, আমার যেখানে জন্ম, এবং যেখানে আমার বার্থ রেকর্ড রয়েছে।
শশব্যস্তে গাছ-পালা ভেদ করে ফিরে চললাম। শীঘ্রি বেরিয়ে এলাম মেইন স্ট্রীটে। হাসপাতালটা তিন ব্লক পরে।

ঘড়ি দেখলাম। প্রায় দুপুর। আমি একটার মধ্যে আমার পরিচয়ের প্রমাণ দিতে পারব, এই ফালতু তামাশাটার ইতি টেনে, শেষ কটা ক্লাস করে, সাড়ে তিনটায় ফুটবল প্র্যাকটিসে ঠিকই যোগ দিতে পারব।
মেইন স্ট্রীট ধরে সাবধানে হাঁটছি। কারও সন্দেহ জাগাতে চাই। কিছু ক্রেতা বেরিয়েছে। বেশিরভাগই মহিলা এবং বাকিরা রকি বীচের বয়স্ক বাসিন্দা।
বয়স্ক বাসিন্দা! মি. জেসাপের কথা মনে পড়ল। কোনার দিকে তার দোকান। ওখান থেকে আমি প্রায় প্রতিদিন ক্যাণ্ডি কিনি।
উনি আমাদের নাম জানেন না, কিন্তু কে কোন্ ক্যাণ্ডি খাই তা জানেন। তাকে বলে দিতে হয় না। ভিতরে ঢুকলেই কাউন্টারে পছন্দের ক্যাণ্ডি রেখে দেন। উনি জানেন আমার পছন্দ চকোলেটে মোড়া রেইসিন। সপ্তাহে অন্তত পাঁচদিন তাঁর কাছ থেকে এগুলো কিনি।
জেসাপের ক্যাণ্ডি স্টোরের দিকে এগোলাম। এটা হাসপাতালের এক ব্লক আগে। চকিতে ভিতরে উঁকি দিলাম। দিনের এসময়টায় দোকান প্রায় ফাঁকা।
ভিতরে ঢুকলাম। মি. জেসাপ কাউন্টারের পিছনে বসা। চোখে চশমা। কোলের উপর সকালের খবরের কাগজ।
মুখ তুলে আমার দিকে চেয়ে হাসলেন।
হ্যালো, ইয়াং ফেলো, বললেন। এর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু নেই। উনি সব সময়ই এটা বলেন।
আমরা পরস্পরের দিকে চেয়ে রইলাম। পেটের ভিতরে কেমন জানি গুলিয়ে উঠল। উনি আমাকে চেনেন না! আমার ইচ্ছে হলো এক দোকান প্রায় ফাঁকা কিতে ভিতরে এগোলাম। এটা দৌড়ে দোকান থেকে বেরিয়ে, মেইন স্ট্রীট ধরে ছুটতে ছুটতে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করি: বন্ধ করুন.এসব। আপনারা আমাকে এভাবে। কষ্ট দিচ্ছেন কেন?
যেটা সব সময় নাও সেটাই নেবে তো? চওড়া, বন্ধুত্বপূর্ণ হেসে প্রশ্ন করলেন।
মনটা খুশি হয়ে উঠল। উনি আমাকে চেনেন! ওরা মি. জেসাপকে নিজেদের ষড়যন্ত্রে জড়াতে পারেনি। দ্রলোক সাধারণ এক ক্যারি দোকানদার, কিন্তু আমাকে তিনি সাহায্য করতে পারবেন। আমাকে উনি চেনেন!
হ্যাঁ, মিস্টার জেসাপ, যেটা সব সময় নিই, বলে পকেটে হাত ভরে দিলাম পঞ্চাশ সেন্টের জন্য।
দিচ্ছি, বললেন তিনি। তার আগে বলো সবসময় কোটা নাও।
জমে গেলাম আমি। উনি আমাকে চেনেন না! ঘুরেই দৌড় দিলাম।
হাসপাতালে পৌঁছনোর আগ পর্যন্ত ছুটে চললাম আমি। এখানে কয়েকটা এন্ট্রান্স। একটায় লেখা: ইমার্জেন্সি। অনুভব করলাম এটাও একটা ইমার্জেন্সি,

কিন্তু জানি এখন মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে।
মেইন এন্ট্রান্স দিয়ে ভিতরে ঢুকলাম। ওয়েটিং এরিয়ায় বেশ কিছু মানুষ-জন বসা। জনাকয় ডাক্তার আর নার্স চলাফেরা করছে। ইনফর্মেশন ডেস্ক দেখে এগিয়ে গেলাম।
এক ইউনিফর্ম পরা নার্স বইতে কী সব টুকছে।
মাফ করবেন, বললাম। রেকর্ড ডিপার্টমেন্টটা কোথায় বলতে পারেন?
পাঁচতলায়, ডান দিকে এলিভেটর, আমার দিকে মুখ তুলে চেয়ে বলল।
এলিভেটরের জন্য অপেক্ষা করছি, নানা চিন্তা ঘুরতে লাগল মাথার মধ্যে।
এলিভেটরের দরজা খুলে গেল। মুখোমুখি পড়ে গেলাম সার্জেন্ট কলিন্সের। এক লোককে সাহায্য করছেন তিনি। লোকটির বাহুতে কাস্ট করা।
আপনাকে ধন্যবাদ, সার্জেন্ট, লোকটি বলল। আপনি না থাকলে কে আমাকে হাসপাতালে আনত আর ওই ছিনতাইকারীগুলোকে শায়েস্তা করত!
এটাই তো আমাদের কাজ, মিস্টার লেন, আইনকে উপরে তুলে ধরা, কলিন্স জবাবে বললেন। লোকটিকে কথাগুলো বললেও পুরোটা সময় তার দৃষ্টি স্থির রইল আমার উপরে।
মাফ করবেন, বলে, তার পাশ ঘেঁষে এলিভেটরে উঠলাম।
শরীর খারাপ? কলিন্স আমাকে প্রশ্ন করলেন। এলিভেটর থেকে ঝটপট বেরিয়ে গেলেন।
না, ঠাণ্ডা স্বরে জবাব দিলাম। এক অসুস্থ বন্ধুকে দেখতে এসেছি।
কলিন্স একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন আমার দিকে।
চব্বিশ ঘণ্টা, বললেন তিনি। এলিভেটরের দরজা লেগে গেল। এলিভেটর পাচতলায় উঠে এলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। রকি বীচ পুলিস ডিপার্টমেন্টকে আমি বন্ধু মনে করতাম। নিজেকে অপরাধী ভাবতে ভাল লাগছে না!
দরজা খুলে গেল। বেরিয়ে এলাম আমি। চারধারে নজর বুলালাম। বড্ড চুপচাপ এখানে। লম্বা হলগুলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আর উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত। দেয়ালে এক ডিরেক্টরি দেখলাম।
ওতে নির্দেশ করছে হাসপাতাল রেকর্ড, রুম ৪৩৬। কামরাটা খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত হেঁটে চললাম। বন্ধ এক দরজা দেখলাম। নক করতেই ভিতর থেকে শোনা গেল, কাম ইন।
প্রবেশ করলাম। কাউন্টার ডেস্কের পিছনে সাদা কোট পরা এক লোক বসা।
বিরক্তির ছাপ তার চোখে-মুখে। এক স্পোর্টস ম্যাগাজিনের পাতা উল্টাচ্ছে।
হ্যাঁ, তোমার জন্যে কী করতে পারি? প্রশ্ন করল।
আমি কিছু রেকর্ড খুঁজছি, বললাম।

কী ধরনের রেকর্ড?
উম, বার্থ রেকর্ড।
কার? প্রশ্ন করল। এই প্রথম তাকে আগ্রহী মনে হলো। আমার অস্বস্তি লাগছে, কেননা লোকটা গভীর মনোযোগে আমাকে দেখছে।
আমার নিজের, বললাম। আমি আমার বার্থ রেকর্ড জানতে চাই। এই হাসপাতালে আমার জন্ম।
আমার নাম এবং জন্মতারিখ বললাম।
ঠিক আছে, কোন সমস্যা নেই, বলল লোকটা।
স্বস্তির শ্বাস ফেললাম। ভয় হচ্ছিল কোন সমস্যা হবে।
দেখানো যাবে,যোগ করল লোকটা। একুশ বছরের বেশি বয়সী কাউকে নিয়ে এসো আমরা তোমার ফাইল দেখিয়ে দেব। পত্রিকার পাতায় আবারও ডুব দিল সে।
কী? বলে উঠলাম, কেন?
কারণ এটা স্টেট ল, জানাল লোকটা। একুশ বছরের কম বয়সী কেউ অফিশিয়াল বার্থ রেকর্ড দেখতে কিংবা কপি করতে পারে না। কথা শেষ।
লোকটার দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম। লোকটা অহঙ্কারী এবং রূঢ়, এ দুটো স্বভাবই অপছন্দ করি আমি। কিন্তু তারচাইতেও বড় কথা ও আমাকে তথ্য পাওয়া থেকে বঞ্চিত করছে।
ওর নেম ট্যাগ দেখলাম।
বিন, জে, পড়লাম।
আপনার সাহায্যের জন্যে ধন্যবাদ, বললাম। বিন ঘোত করে উঠল। আমার দিকে তাকাল না পর্যন্ত।
আমি ঘুরে দাঁড়িয়ে ঘর ছাড়লাম। এলিভেটরে চড়ে নেমে এলাম রিসেপশন ডেস্কে। অন্য এক নার্স এখন ডিউটিতে। আত্মবিশ্বাসী অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করলাম মুখের চেহারায়। ভিতরে ভিতরে পাতার মতন কাপছি।
মাফ করবেন, বললাম।
ইয়েস, মহিলা বলে আমার দিকে চাইল।
আপনাদের রেকর্ড সেকশনে মিস্টার বিন নামে একজন আছে, তাই না?
এক মিনিট, বলে কম্পিউটার অন করল মহিলা, কটা বাটন টিপে পর্দায় চোখ রাখল। হ্যাঁ, জেমস বিন। রেকর্ডস, পাঁচ তলা। কেন?
এক ডাক্তার আপনাকে বলতে বললেন তাকে এখুনি এক্স-রে রুমে দরকার।
আমার দিকে চেয়ে রইল নার্স।

রেকর্ডের লোককে এক্স-রেতে দরকার? এমন কথা কখনও শুনিনি। কেন দরকার?
জানি না। হয়তো এক্স-রের রেকর্ড নেয়ার জন্যে কাউকে তাদের দরকার, বললাম, নিজেও জানি না কী বলছি।
মহিলা মুহূর্তের জন্য ভ্রূ কুঁচকে শ্রাগ করল। রিসিভার তুলে ডায়াল করল কোন নম্বরে।
হ্যালো, মিস্টার বিন? ফ্রন্ট ডেস্ক থেকে বলছি। আপনাকে এক্সরেতে ডেকেছে। জানি না কেন। মনে হয় গেলেই জানতে পারবেন।
রিসিভার রেখে দিল সে। চারপাশে চোখ বুলিয়ে আমাকে খুঁজল। কিন্তু আমাকে পাবে কোথায়। আমি তখন এলিভেটরে চড়ে পাঁচতলার দিকে উঠে যাচ্ছি।
রেকর্ড রুমের দরজায় তালা মারা নেই, কাজেই ভিতরে ঢুকতে কষ্ট হলো না।
আমার জানা নেই কতক্ষণ সময় পাব। ডিরেক্টরীতে দেখেছি সাততলায় এক্স-রে। বিন এলিভেটরে করে ওখানে যাবে, কাউকে জিজ্ঞেস করবে কে ডেকেছে, জানবে কেউ ডাকেনি, এবং তারপর এলিভেটরে করে নেমে আসবে।
বড়জোর তিন কি চার মিনিট সময় পাব, উপলব্ধি করলাম।
বিনকে রেকর্ডস রুম ত্যাগ করতে দেখে এক দরজার আড়াল নিলাম।
এলিভেটরের জন্য অপেক্ষা করল বিন। সে ভিতরে ঢুকতেই, আমি রেকর্ডস রুমে সেঁধিয়ে পড়লাম। বিনের ডেস্কের পাশ দিয়ে গেলাম। ফাইল ক্যাবিনেটগুলো বছরওয়ারি সাজানো। আমার জন্মসাল খুঁজে নিতে কয়েক সেকেণ্ড মাত্র লাগল। ফাইল হ্যাণ্ডল ধরে টানলাম। খুলল না!
ক্যাবিনেটে এক কি-হোল দেখতে পেলাম। চাবি দরকার! চারধারে নজর বুলিয়ে নিলাম, দস্তুরমত হাঁফাচ্ছি। চাবি, চাবি চাই। চাবি কোথায়? নিশ্চয়ই বিনের কাছে আছে!
ওর ডেস্কের কাছে ফিরে গেলাম। ডেস্কের ড্রয়ারে কয়েকটা কিচেইন। প্রথমটা খপ করে চেপে ধরলাম। প্রতিটা চাবিতে একটা করে বছর।
বুক ধড়ফড় করছে, চাবি হাতড়াতে লাগলাম। অল্প-অল্প কাঁপছে আঙুল। এক ফোঁটা ঘাম টপ করে পড়ল শার্টে। আমার জন্মসাল পাওয়া গেছে! ঘুরেই এক দৌড়ে ফিরে এলাম পিছনের কামরায়।
জ্ঞান হারানো চলবে না-অনুভব করলাম আমি দুবেলা খাইনি-সুটে ঢুকিয়ে দিলাম চাবিটা। ঘুরালাম। ফাইলটা খুলে গেল।
অক্ষর অনুযায়ী সাজানো হয়েছে রেকর্ডগুলো। ঝটপট ফাইলের মাঝখানে চলে গেলাম, খুঁজে পেলাম কে, কিশোর পাব যেখানে।

সামনে একটা শব্দ হলো! গলার কাছে উঠে এল যেন হৃৎপিণ্ড। বিন কি এত তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছে? ধীরে ধীরে মাথা ঘুরিয়ে চাইলাম। ডাক্তাররা হলওয়েতে কথা বলার জন্য থেমেছিলেন। এবার আবার হাঁটা ধরেছেন। চেপে রাখা খাসটা ছেড়ে, ফাইলে ফের মন দিলাম।
হুড়োহুড়ি করে কে অক্ষরটা দেখে নিলাম। প্রতিটা ফাইলে বাবামার নাম, এবং শিশুর নাম, ওজন, লিঙ্গ এবং জন্মের সময় দেয়া রয়েছে।
আমার ফাইলটা এখুনি দেখতে পাব। আপন মনে কথা বলতে লাগলাম।
কেনি… কেভিন…কেনেথ…
আমার নাম কোথায়? আবারও প্রথম থেকে দেখলাম। হাত কাঁপছে এখন। বিন যে কোন মুহূর্তে ফিরে আসবে। আমাকে আমার ফাইল খুঁজে পেতে হবে। এবং ওটা এখানেই থাকবে, হাসপাতাল বার্থ রেকর্ড হারিয়ে ফেলে না।
কে অক্ষরের আদ্যোপান্ত আবারও দেখে নিলাম। কোন কিশোরের নাম নেই। কিন্তু আমার তো এই হাসপাতালে জন্ম! রেকর্ড
এখানে থাকতেই হবে। নেই কেন?
তুমি যা খুঁজছ তা মনে হয় এক্স-রেতে পাবে,বলল একটি কণ্ঠ।
মুখ তুলে চাইলাম। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে বিন। আমার দিকে হেঁটে আসছে।
দ্রুত চিন্তা করতে হবে। বিন কমবয়সী এবং চটপটে ধরনের। এবং নিঃসন্দেহে আমার চাইতে শক্তিশালী।
ফাইল চাবিগুলো তুলে ধরলাম।
বিন, এগুলো ধরুন! চেঁচিয়ে উঠলাম। চাবিগুলো হঠাৎই ছুঁড়ে দিলাম ভোলা এক জানালা লক্ষ্য করে।
না! চিৎকার ছাড়ল বিন। জোরে চুঁড়িনি, এমনভাবে ছুঁড়েছি বিন যাতে জানালা দিয়ে পড়ে যাওয়ার আগেই লুফে নিতে পারে।
বিন চাবিগুলো ধরার জন্য ঝাপ দিতেই, ডেস্কের উপর দিয়ে লাফিয়ে এক দৌড়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলাম আমি। আমি জানি মুহূর্তের মধ্যেই নীচে ফোন করে ওদেরকে সতর্ক করে দেবে সে, জানাবে আমি কী করেছি।
কারও চোখে ধরা না পড়ে হাসপাতাল ত্যাগ করতে হবে আমাকে। হলের ওপাশে একটা সাপ্লাই ক্লজিট দেখতে পেলাম। দরজা খুলতেই ভিতরে অ্যাটেনডেন্টের সাদা উর্দি চোখে পড়ল। ওটা হুক থেকে তুলে নিয়ে পরে ফেললাম।
এলিভেটরে চেপে নেমে এলাম মেইন ফ্লোরে, বেরিয়ে আসার পর মেইন ডেস্কের পাশে লোকজনের ছোটাছুটি লক্ষ করলাম। নার্স লরি কথা বলছে সার্জেন্ট কলিরে সঙ্গে।

ও টীনএজার, কালো চুল, কালো চোখ, পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি মত লম্বা, আমি তাকে বলতে শুনলাম। আমার বর্ণনা দিচ্ছে কলিন্সের কাছে।
কলিন্সকে মাথা ঝাকাতে দেখলাম। তিনি ঘুরে দাঁড়িয়ে আমাকে চিহ্নিত করার আগেই এক্সিটের দিকে দ্রুতপায়ে এগোলাম আমি। একটা পত্রিকা তুলে নিয়ে খুলে মুখের কাছে ধরলাম, আমার মুখ যাতে লোকেরা দেখতে না পায়।
এবার সদর দরজা দিয়ে হেঁটে বেরিয়ে এলাম। মেইন স্ট্রীটে পৌঁছনোর পর উর্দি খুলে ফেললাম। ওটা আর পত্রিকাটা ছুঁড়ে ফেলে দিলাম ফ্রন্ট লনে। তারপর শশব্যস্ত রাস্তা ধরে এগিয়ে চললাম।
এখন কোথায় যাব? হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এসেছি আমি, কিন্তু আমার সমস্যা আরও জটিল হয়েছে। হাসপাতালে আমার জন্ম রেকর্ড নেই কেন? চাচা-চাচী কি এত বছর ধরে আমাকে মিথ্যে বলে এসেছে? আমি কি অন্য কোথাও জন্মেছিলাম? যদি তাই হয়, তা হলে আমাকে বলেনি কেন?
মাথা গুলিয়ে গেল। পেটের ভিতরে আতঙ্ক বাসা বাঁধছে। আমার মনে হয় পুলিশে ধরা দেয়া উচিত।
কারণ আমি হয়তো সত্যিকারের কিশোর পাশা নই। আমি হয়তো অন্য কেউ। আমি হয়তো মি. লাউয়ির বর্ণনা করা সেই ছেলেটির মত, চেষ্টা করছি আমি নই এমন কারও ভূমিকা নিতে।
কিন্তু তা-ই যদি হবে, তবে আজ সকালে নিজের বাসায় আমার ঘুম ভাঙল কীভাবে? এবং কেউ আমাকে না চিনলেও আমি সবাইকে চিনছি কী করে?
সবচাইতে বেশি ভয় লাগছে, এখন আর এটাকে নিছক তামাশা মনে করতে পারছি না। ব্যাপারটা তার চাইতে অনেক জটিল আর বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে।
আমি কে প্রমাণ করার নিশ্চয়ই কোন উপায় আছে। স্কুলে লাভ হবে না। হাসপাতালেও না। কোথায় যাব আমি?
বাসায় যাব! জোরে বলে উঠলাম। বাসায় চাচা-চাচীর সঙ্গে আমার প্রচুর ছবি রয়েছে। বই রয়েছে যাতে আমার নাম লেখা। প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট, আমি কে।
ঘড়ি দেখলাম। ১:৩০। চাচা-চাচী আরও কয়েক ঘণ্টা বাইরে থাকবে। নিশ্চয়ই ডনকেও সঙ্গে নিয়ে যাবে। মেইন স্ট্রীট ধরে বাসার দিকে হেঁটে চললাম।
আকাশ হঠাৎই গোলাপী হয়ে গেল। সব কিছু যেন কাঁপছে, এবং কোথায় যেন জোরাল বাজনা শুরু হলো। অদ্ভুত বাজনা, রেডিওতে এমনটা বাজে না।
এক দোকানের সামনে টলতে টলতে গিয়ে দাঁড়ালাম। মেইন স্ট্রীটে আমি ছাড়া কেউ নেই! দু মুহূর্ত পর পর রং বদলাচ্ছে আকাশের। গোলাপী, হলুদ, কমলা, নীল, গোলাপী।

প্রচণ্ড ব্যথা শুরু হলো কাঁধে। দোকানের জানালার দিকে ঘুরে দাঁড়ালাম। সাহায্য আশা করছি। জানালায় চোখ রাখলাম। চকচকে কালো পোশাক পরে, জানালায় দাঁড়িয়ে, আমার দিকে চেয়ে মৃদু হাসছেন-মিস লি!
কী চান? কে আপনি? চেঁচিয়ে উঠলাম।
এবং হঠাই সব কিছু স্বাভাবিক হয়ে এল। মেইন স্ট্রীট আবারও নিজের নির্জন রূপ ফিরে পেল।
ঘুরে জানালাটার দিকে চাইলাম, আমি যেখানে মিস লিকে দেখেছি কিংবা কল্পনা করেছি। এটা নতুন এক চাইনিজ রেস্তোরা, কম দামে ভাল ফাস্ট ফুড পরিবেশনের জন্য নাম কামাতে শুরু করেছে।
মিস লিকে এখন আর দেখা যাচ্ছে না। অন্ধকার জানালা দেখে অনুমান করা যায় এখনও খোলেনি রেস্তোরাঁটা।
রাস্তার দিকে চাইলাম। আমার দিকে ধীরে-ধীরে এগিয়ে আসছে রকি বীচ পুলিশের এক গাড়ি। হাসপাতালের ঘটনাটার পর সার্জেন্ট কলিন্স হয়তো আমাকে খুঁজছেন।
কেটে পড়ব সিদ্ধান্ত নিলাম।
এক গলিতে সাত করে ঢুকে পড়ে মেইন স্ট্রীটের পিছনের গাছগাছালির উদ্দেশে দৌড় দিলাম। মাঠ পেরিয়ে পৌঁছতে হবে বাসায়।
লম্বা পথ পাড়ি দিতে হবে এভাবে গেলে। কাঁধের ব্যথায় মরে যাচ্ছি, এবং খিদেও মরে গেছে। কিন্তু কলিন্সকে এড়াতে হলে এটাই নিরাপদ রাস্তা।
দশ মিনিট বাদে বাসার সামনে এসে দাঁড়ালাম। চারধারে দৃষ্টি বুলিয়ে প্রতিবেশীদের কাউকে দেখতে পেলাম না।
সদর দরজার চাবি ঢোকাতে যাব, এসময় পাশের বাসার মিসেস বার্টন দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলেন। হাতে প্লাস্টিকের ময়লা ভরা ব্যাগ।
হাই, মিসেস বার্টন? খোশমেজাজে ডেকে উঠলাম। স্কুল থেকে কেন আগে বাড়ি ফিরেছি তার কারণ জানানোর জন্য মাথা খেলালাম।
কিন্তু এবার ওঁর মুখের চেহারায় যে দৃষ্টি ফুটল সেটি গত কঘন্টা ধরে দেখে আসছি আমি। উনি আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে ভ্রূ কুঁচকালেন।
আহ, হ্যালো, বললেন তিনি, কণ্ঠে বিস্ময়। আমি তোমাকে চিনি?
কী বলব জানি না। আমরা কি কোন খেলা খেলছি? আমি কি পাগল হয়ে যাচ্ছি? নাকি অন্য কিছু? কীভাবে জবাব দেব ওঁকে?
আমি অন্য পথ ধরলাম।
আমি পাশা পরিবারের পরিচিত, বললাম। ওঁরা আমাকে এখান থেকে কিছু জিনিস নিয়ে যেতে বলেছেন।

এর বেশি সে মুহূর্তে আর কিছু মাথায় এল না। গত কঘণ্টার কথা ভাবলে, আমি যে আদৌ চিন্তা করতে পারছি সেটাই এক বিস্ময়।
ওহ, বললেন তিনি, তবে তাকে খুব একটা সন্তুষ্ট মনে হলো না। ডিসপোসাল বিনের দিকে হাঁটতে শুরু করে হঠাৎই ঘুরে দাঁড়ালেন। আমার দিকে চেয়ে রয়েছেন। আচ্ছা, তুমি আমার নাম জানলে কীভাবে?
দীর্ঘ এক মুহূর্ত তাঁর দিকে চেয়ে রইলাম। আমার চোখ মরিয়ার মত একটা জবাব খুঁজছে। ওঁদের মেইলবক্স দেখতে পেলাম। ওটার দিকে তর্জনী নির্দেশ করলাম।
আপনার নাম ওখানে আছে। বার্টন। তাই ভাবলাম আপনিই তিনি।
বক্সের দিকে দুমুহূর্ত চেয়ে থেকে আমার দিকে চাইলেন তিনি। মাথা ঝাঁকিয়ে ঈষৎ হাসলেন। এবার বিনে ব্যাগটা ফেলে সোজা বাসায় ঢুকে পড়লেন।
আমি শ্বাস নিয়ে, চাবিটা তালায় ঢুকালাম। ঘুরালাম। খুলল না। আমার চাবিতে সদর দরজা খুলছে না। এ কীভাবে সম্ভব? সব সময় খুলেছে, কিন্তু এখন খুলছে না কেন?
চাচা-চাচী কি আমাকে ঢুকতে না দেয়ার জন্য তালা পাল্টেছে? সেটা কি সম্ভব? নাকি আমি যে নিজের বাসায় একজন আগন্তুক এটা তার আরেকটা উদাহরণ?
আমাকে বাসায় ঢুকতে হবে। ওখানে আমার প্রশ্নের জবাব রয়েছে। জানালা ভাঙা সম্ভব নয়। মিসেস বার্টন টের পেয়ে পুলিস ডাকবেন।
জানালা! হ্যাঁ, বেসমেন্টের জানালাটা গত ছমাস ধরে ভাঙা চাচা ঠিক করতে চেয়েছিল, কিন্তু করা হয়নি। আশা করছি ওটা এখনও ওভাবেই রয়েছে।
বাড়ির পিছনে দৌড়ে গেলাম। জানালাটা এখনও ভাঙা, ভিতরে ঢুকতে বেশ কষ্টই হবে, তবে ঢোকা যাবে। একটু পরে শরীর গলিয়ে দিয়ে বেসমেন্টে লাফিয়ে নামলাম।
প্রথমে কিচেনে ছুটে গিয়ে, নিজের জন্য একটা বেলনি আর পনিরের স্যাণ্ডউইচ বানালাম লেটুস আর সর্ষে দিয়ে, সঙ্গে পান করলাম আধ-কোয়ার্ট দুধ।
নিজের পরিচিত কিচেনে বসে চাচীর খাবার খাচ্ছি, খানিকটা নিরাপত্তা বোধ এল। বাসার তুলনা আর কিছুতে হয় না।
কিচেনের দেয়ালের ছবিটায় চকিত চাউনি বুলালাম। গত সামারে ভোলা। সান্তা মণিকা বীচে চাচী, আমি আর ডন। চাচার তোলা ছবি।
স্যাণ্ডউইচটা মাটিতে ফেলে দিলাম। ধীরে সুস্থে উঠে দাঁড়িয়ে দেয়ালের কাছে হেঁটে গেলাম।
ছবিতে চাচী আর ডনকে সৈকতে দেখা যাচ্ছে। আমি নেই। আমি জানি ছবি তোলার সময় আমিও ছিলাম। এতে কোন ভুল নেই। কিন্তু এখন, স্কুলের ফুটবল টিমের ছবিটার মত...আমি স্রেফ উবে গেছি। উধাও।

মাথা ঝিমঝিম করছে। ব্যালান্স বজায় রাখতে দেয়ালে হাত রাখলাম। কাঁদব না আর্তনাদ করব ঠিক করতে পারছি না।
না, মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে, নিজেকে বললাম। এসবের নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে।
যা-ই হোক না কেন, আমাকে এই রহস্যের সমাধান বের করতে হবে।
লিভিং রুমে গেলাম। এখানে দেয়ালগুলো পারিবারিক ছবি দিয়ে ভরা, আমি অনেকগুলো ছবিতে রয়েছি। বাতি জ্বেলে, বিশাল পিছনের দেয়ালের কাছে হেঁটে গেলাম।
ছবিগুলোর দিকে চেয়ে রইলাম। কোনওটাতেই আমি নেই। চাচা আমার অনেক ছবি তুলেছিল। তার মধ্যে ফুটবল জার্সি পরে তোলা ছবিও ছিল। আরও কিছু ছবি ছিল টিমমেটদের সঙ্গে।
গোটা বিভাগটা উধাও। ফুটবলের ছবিগুলোর বদলে ওখানে শোভা পাচ্ছে ডনের পিউই সকার খেলার ছবি। সেইলবোটে চাচীর ছবি। চাচা-চাচী, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে। আমার কোন ছবি নেই।
আত্মীয়-স্বজন! ডেস্কে রাখা ফোনটার কাছে টলতে টলতে গেলাম। হয়তো শুধুমাত্র রকি বীচে আমার অস্তিত্ব নেই। অন্যান্য জায়গার মানুষ-জন হয়তো আমাকে চেনে।
রিসিভারটা তুলে নিয়ে শিকাগোতে হিরু চাচাকে ফোন করলাম।
হিরন পাশার অফিস, কানে ভেসে এল হিরু চাচার সেক্রেটারি মিস ক্রেনের পরিচিত কণ্ঠস্বর।
মুহূর্তের জন্য থমকালাম। এটা বড় ধরনের পরীক্ষা। হিরু চাচা যদি আমাকে না চেনে, তা হলে কী করব জানি না আমি।
মিস কেন? প্রশ্ন করলাম।
হ্যাঁ।
মিস ক্রেন, আমি কিশোর। কিশোর পাশা।
ও প্রান্তে বিরক্তি।
কে?
কিশোর পাশা। হিরন পাশার ভাতিজা…গলা বুজে এল আমার।
ওহ, বললেন তিনি। চিনতে পারলাম না। একটু ধরো, তাঁকে দিচ্ছি।
ভয়ে বুকের ভিতরটা জমে গেল। মিস ক্রেনের সঙ্গে বছরের পর বছর ধরে কথা বলেছি আমি। আর এখন তিনি কিনা আমাকে চিনতে পারছেন না।
মুহূর্ত পরে, হিরু চাচার গমগমে কণ্ঠস্বর ভেসে এল।
হ্যালো, হিরন পাশা বলছি। কার সাথে কথা বলছি?

হিরু চাচা? ফিসফিসানির মত শোনাল আমার কণ্ঠ। ভয় পাচ্ছি এরপর না জানি কী শুনব।
কথা বলল, আমি শুনতে পাচ্ছি না, বলল হিরু চাচা। আমি জানি কথা বলা অনর্থক। আমার প্রিয় চাচা আমাকে চিনবে। হয়তো আমার কথা কখনওই শশানেনি। হিরু চাচার মুখ থেকে এ কথা বলে সইতে পারব না আমি।
আমি দুঃখিত, বললাম। আ…আমি মনে হয় রং নম্বরে ফোন করেছি।
ফোন কেটে দিলাম।
কমুহূর্ত নীরবে ডেস্কে বসে রইলাম। এবার আচমকা ঘুষি মারলাম ডেস্ক টপে।
কে আমি? ছাদের উদ্দেশে চেঁচালাম।
কে? কেউ কি বলে দেবে আমাকে? আমার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে! পাগল হয়ে যাচ্ছি আমি!
দরজায় চাবি ঘোরানোর শব্দ পেলাম। এবার সদর দরজা খুলে যেতে লাগল। কে যেন বাসায় এসেছে।
কে হতে পারে? ঘড়ির দিকে চাইলাম। দুটো বেজে পাঁচ। চাচা-চাচী হতে পারে না। তবে কি ওরা একজন এসে নিশ্চিত হতে চাইছে অচেনা ছেলেটি-আমি-এখানে নেই?
পায়ের শব্দ। প্রথমে মেইন হল-এ, তারপর কিচেনে। কে যেন গুনগুন করছে। গুন-গুন? আজকে বুধবার!
মিসেস ওয়েসলি প্রতি বুধবার আসে অল্প-স্বল্প হাউসকীপিঙের কাজ করতে। কিছুদিন ধরে সে আমাদের হাউসকীপার। মিসেস ওয়েসলি সব সময় গুনগুন করে।
মিসেস ওয়েসলির মত নরম স্বভাবের, ভাল মানুষ দুনিয়ায় কম আছে। অন্যের কষ্ট দেখার চাইতে বরং নিজের হাত কেটে ফেলবে সে।
আমি যদি কোন রসিকতার স্বীকার হয়ে থাকি তবে মিসেস ওয়েসলি হতে পারে তার চূড়ান্ত পরীক্ষা।
দরজার কাছে গিয়ে ধীরে ধীরে ওটা খুললাম।
মিসেস ওয়েসলির পরনে প্যান্ট, সোয়েটার আর অ্যাপ্রন। প্রকাণ্ড এক ব্যাগ থেকে ক্লিনিং সাপ্লাই বের করছে। পুরানো এক লোকগীতির সুর ভাজছে সে।
আমি তাকে ভয় দেখাতে চাই না। কিন্তু আমি নিজেই ভয় পাচ্ছি। ।
এটা আমার জীবনের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত। এক ধরনের বাজি ধরতে হচ্ছে আমাকে।
সাবধানে কিচেনের দিকে এগোলাম। মিসেস ওয়েসলি তার সাপ্লাই বিছিয়ে রাখছে কিচেন টেবিলের উপরে। পুরানো সুরটা গুন-গুন করে চলেছে।

মিসেস ওয়েসলি, মৃদু কণ্ঠে বললাম।
উ করে চেঁচিয়ে উঠে আমার দিকে ঘুরে দাঁড়াল সে। চোখাচোখি হলো আমাদের। মুখের চেহারা স্বাভাবিকের চাইতে লাল হয়ে গেল তার। কিছু বলতে শুরু করেছিল, কিন্তু হাতজোড়া উঠে এল বুকে।
মিসেস ওয়েসলি! আপনি ঠিক আছেন তো? চেঁচিয়ে উঠলাম আমি।।
জবাব দিল না সে। সভয়ে আঁতকে উঠে ধপ করে পড়ে গেল মেঝেতে। তার পাশে দৌড়ে গেলাম। কব্জি তুলে নিয়ে পালস দেখলাম। দুর্বল আর দ্রুত। মিসেস ওয়েসলির হার্ট অ্যাটাক হয়েছে এবং এর জন্য আমি দায়ী!
এক ছুটে ফোনের কাছে গিয়ে ৯১১ ডায়াল করলাম। বাসার ঠিকানায় তখুনি অ্যাম্বুলেন্স পাঠাতে বললাম। এবার দৌড়ে উপরে গিয়ে, একটা বালিশ খুঁজে নিয়ে নেমে এলাম। মিসেস ওয়েসলির মাথার তলায় খুঁজে দিলাম ওটা।
মহিলার চোখ বোজা। শ্বাস-প্রশ্বাস অনিয়মিত। দূরাগত অ্যাম্বুলেন্সের সাইরেন কানে এল, নিশ্চিত হলাম মিসেস ওয়েসলি শীঘি চিকিৎসা সেবা পাবে।
কিন্তু ওরা যখন আসবে তখন আমার থাকা চলবে না। আমাকে চলে যেতে হবে।
সদর দরজা খুলে দুদ্দাড় করে বাইরে বেরিয়ে এলাম। রাস্তা ধরে দৌড় দিলাম। অপর দিক থেকে আসা অ্যাম্বুলেন্সের পাশ কাটালাম।
মিসেস ওয়েসলির যত্ন নিয়েন, বললাম, সাইরেনের শব্দে চাপা পড়ে গেল আমার কথাগুলো উপলব্ধি করলাম এটা অনেকটা প্রার্থনার মত শুনিয়েছে।
রাস্তা ধরে দৌড়চ্ছি, এটা গিয়ে মিশেছে মেইন স্ট্রীটে। আর কোথায় যাব জানি না আমি, কী করব তাও জানা নেই।
স্কুলের ফুটবল মাঠের দিকে এগোলাম। আমার কজন টিমমেট, তাদের মধ্যে রব মিশেলও রয়েছে, প্রি-প্র্যাকটিস ক্যাচ করছে।
ওদেরকে দেখার জন্য থেমে দাঁড়ালাম। হঠাৎই ওদের একজন দেখতে পেল আমাকে। ওরা খেলা থামিয়ে চেয়ে রইল আমার দিকে। রব আমার দিকে আঙুল তাক করল। ও কিছু একটা বলতেই হেসে উঠল সবাই।
সেই পাগলটা, হয়তো এটাই বলেছে।
মেইন স্ট্রীটের দিকে দৌড়ে চললাম। জানি না কেন। কিন্তু কিছু একটা ওদিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে আমাকে। অবাক হয়ে লক্ষ করলাম জোরে ছুটছি না, জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছি না, কিন্তু দুগাল বেয়ে ঘাম গড়াচ্ছে।
একটু পরেই টের পেলাম ওটা ঘাম না, অশ্রু।
আমি কাঁদছি এবং সেজন্য লজ্জাও পাচ্ছি না। কাঁদছি কারণ আমার সঙ্গে যে এই মস্ত রসিকতাটা করেছে সে জিতে গেছে। কিংবা কেউ হয়তো কিছু করেনি। আমি নিজেই হয়তো কাজটা করেছি।

আমি হয়তো আমার পাপের শাস্তি পাচ্ছি। কিন্তু কী করেছি আমি? এবং এর শেষ কোথায়? আমি যে আর সইতে পারছি না।
সামনেই মেইন স্ট্রীট। একটু পরেই শেষ ঘণ্টা বাজবে এবং স্কুল ছুটি হয়ে যাবে। শদুয়েক ছেলে-মেয়ে বেরিয়ে আসবে হাসতে হাসতে, ছুটতে ছুটতে বাড়ির দিকে যাবে।
কিন্তু আমি কোথায় যাব? আমি যাদেরকে চিনি তারা তো আমাকে চেনে না। কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই আমার। কোন কিছু আঁকড়ে ধরার উপায় নেই।
আমার হয়তো রকি বীচ ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত। অন্য কোন শহরে। না, তা হয় না! আমি যেতে চাই না!
আমি আমার পরিবারকে ফেরত চাই। চাই চাচা-চাচী আবার আমাকে ভালবাসুক। আমি চাই ডন যেন আমাকে ভয় না পায়।
আমি চাই বন্ধুরা আমাকে স্বাগত জানাক এবং আমাকে আবার তাদের জীবনের অংশ করে নিক।
আমি বায়োলজি ক্লাসে বসে মি. হালবার্টকে আবারও দেখতে চাই।।
সার্জেন্ট কলিন্সের সঙ্গে আবারও বন্ধুত্বের সম্পর্ক চাই।
আমি চাই ক্যাণ্ডির দোকানে ঢোকার পর বুড়ো জেসাপ জানুক আমার পছন্দের ক্যাণ্ডি কী।
আমি চাই মিসেস ওয়েসলি সুস্থ হয়ে উঠুক।
কিন্তু আমি এ-ও অনুভব করছি একদিনের মধ্যে যদি আত্মপরিচয় প্রমাণ করতে না পারি তবে সার্জেন্ট কলিন্স আমাকে গ্রেপ্তার করাবেন।
মুখ তুলে চাইলাম। লক্ষ করিনি কখন মেইন স্ট্রীট পেরিয়ে শহরের দূর প্রান্তে চলে এসেছি।
চারধারে চোখ বুলালাম। আশপাশে কেউ নেই। না রাস্তায়, না কোন দোকানে।
ব্যাপারটা অদ্ভুত। হঠাৎ করেই চারদিক নির্জন হয়ে গেছে।
এক ঘণ্টাধ্বনির মৃদু শব্দ কানে এল। ঘুরে দাঁড়ালাম। নতুন চাইনিজ রেস্তোরাঁ থেকে আসছে। রেস্তোরার জানালার দিকে চেয়ে রয়েছি, ঘণ্টাধ্বনি যেন জোরাল হলো।
টলমল পায়ে মেইন স্ট্রীট পেরিয়ে রেস্তোরাটার দিকে এগোলাম। এখনও কাউকে আশপাশে দেখতে পেলাম না। এমনকী রাস্তা দিয়ে কোন গাড়িও যাচ্ছে না।
এই রেস্তোরাটা আমাকে টানছে কেন? চিন্তাটা মাথায় এল। কেন জানি এটাকে পরিচিত লাগছে। কিন্তু কেন?
ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটা ধরব, কানে তালা লাগিয়ে দিল জোরাল ঘণ্টাধ্বনি।

কানে দুহাত চাপা দিয়ে জানালার দিকে চাইলাম-জানালার ওপাশে দাঁড়িয়ে, আমার দিকে চেয়ে মৃদু হাসছেন মিস লি! আমাকে হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকলেন তিনি!

চুম্বকের টানে যেন রেস্তোরার জানালায় সেঁটে গেলাম আমি। মিস লি তখনও আমার দিকে চেয়ে মুচকি হাসছেন।

কী ব্যাপার! আপনি আমার কাছে কী চান? চেঁচিয়ে উঠলাম।

ঘণ্টাধ্বনি সহসা থেমে গেল। পিনপতন নিস্তব্ধতা। দৃষ্টিসীমার মধ্যে কেউ নেই।

তুমি কেন এখানে এসেছ তুমি জাননা, কিশোর, বললেন মিস লি। অন্তত আমার তাই মনে হলো। আমি ওঁর কণ্ঠ শুনেছি, যদিও ঠোট নড়তে দেখিনি এবং তার হাসি বন্ধ হয়নি এবং কাচের জানালার ওপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তিনি।

কিশোর? আপনি আমাকে কিশোর বললেন? প্রশ্ন করলাম।

সময় হয়েছে, কিশোর, বললেন তিনি। আবারও গলা শুনলাম তার, কিন্তু ঠোট নড়েনি। মৃদু হাসি ধরে রেখেছেন মুখে।

কীসের সময় হয়েছে? প্রশ্ন করলাম। এই খেলা শেষ হওয়ার সময়? নাকি কী ঘটছে তা জানার সময় হয়েছে?

তোমার ভাগ্য জানার সময় হয়েছে, কিশোর।

সাদা এক ন্যাপকিন খুললেন তিনি। ভিতরে এক ফরচুন কুকি। ন্যাপকিনটা ফেলে দিয়ে কুকিটা তুলে ধরলেন মিস লি।।

ওটার দিকে চাইলাম। দুনিয়ার সবখানে চাইনিজ রেস্তোরায় এরকম ফরচুন কুকি দেখা যায়।

এসব কিছুর পিছনে একটা ফালতু ফল কুকি? জিজ্ঞেস করলাম।

দেখো, কিশোর, জবাব এল। মিস লিক কণ্ঠ আমার মাথার ভিতরটা ভরিয়ে তুলল। ফরচুন কুকিটা ভাঙলেন তিনি। গোটা ঘটনাটা যেন স্লো মোশনে ঘটছে।

কুকিটা খসে পড়ল মেঝেতে। মিস লি ছোট, সাদা কাগজের টুকরোটা তুলে ধরলেন। ওটার দিকে চেয়ে স্মিত হাসলেন। এবার আবার আমার দিকে চাইলেন।

এখানে তোমার ভাগ্য লেখা আছে, কিশোর। পড়ো। পড়ে দেখো।

কাগজের টুকরোটা কাঁচের জানালায় তুলে ধরলেন তিনি। ছোট ছোট অক্ষরে লেখা পড়া কঠিন। প্রথমটায় পড়তে পারলাম না।

চোখ পিটপিট করে পড়ার চেষ্টা করছি, দূরে একটা ঘণ্টা বাজার শব্দ হলো। স্কুল ছুটি হয়ে গেছে।

ফরচুনটা অস্পষ্ট। আমি মর্মোদ্ধার করতে পারলাম না। এবার হঠাই চোখের সামনে পরিষ্কার হয়ে গেল।

ওতে লেখা: আজ তুমি সম্পূর্ণ নতুন একজন মানুষ হিসেবে দিন শুরু করবে।
নতুন মানুষ! উনি তো আগেও এটা আমাকে বলেছিলেন। কী মানে এর?
ওঁর দিকে চাইলাম।
কী বলছেন আপনি? এর মানে কি আমি সম্পূর্ণ নতুন মানুষ? কীভাবে...সেটা কীভাবে সম্ভব?
আমরা আমাদের নিয়তিকে এড়াতে পারি না, কিশোর, আমার মাথার মধ্যে মৃদু কণ্ঠে বলল মিস লির কণ্ঠ। চেষ্টা করলে শয়তান আমাদের পথ আগলে দাঁড়াবে।
এবার আলোর ঝিলিকের সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে গেলেন তিনি। জানালাটা আবারও অন্ধকার, এবং ফাঁকা হয়ে গেল।
রাস্তার দিকে ঘুরে দাঁড়ালাম। এটাই কি জবাব? এটাই কি আমার নিয়তি যে আমি একদম নতুন মানুষে পরিণত হব? কিন্তু আমি তো তা চাইনি! আমি পুরানো কিশোর পাশাই থাকতে চেয়েছি।
অনেক দেরি হয়ে গেছে, কিশোর।
ঘুরে দাঁড়ালাম।
মিস্টার হালবার্ট! চেঁচিয়ে উঠলাম। কোথায় ছিলেন আপনি?
তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি, কিশোর। তোমার এখন সম্পূর্ণ নতুন মানুষ হওয়ার সময় এসেছে। পুরানো কিশোর পাশা এখন...হারিয়ে যাবে। এবং তিনি কর্কশ কণ্ঠে হেসে উঠলেন।
কী? কী বলতে চান? জবাব চাইলাম। এবার মেইন স্ট্রীটের দিকে চাইলাম।
এখনও নীরব, তবে হঠাই রাস্তাটা ভরে উঠল মানুষ-জনে। সবাইকে আমি চিনি। হাঁটছে। রাস্তা ধরে। আমার দিকে। নিঃশব্দে।
একটা বৃত্ত তৈরি করে আমার দিকে এগিয়ে আসছে তারা। আমার চাচা। আমার চাচী। ডন। আমার বন্ধু মুসা, রবিন, টিমমেটরা। হাসপাতালের লোকেরা, মি. জেসাপ, সার্জেন্ট কলিন্স, মিসেস ওয়েসলি (মিসেস ওয়েসলি?), মিসেস বার্টন, মি. লাউয়ি, মিসেস পোর্টার, আমার হিরু চাচা, এবং আরও অনেকে।
বৃত্তটা ক্রমেই কাছিয়ে আসছে। নিঃশব্দে, ধীরে ধীরে ঘিরে ফেলছে আমাকে। বন্দি হয়ে পড়ছি আমি।
সবাই হাসছে, দুহাত বাড়িয়ে রেখেছে, আমাকে ছুঁতে চাইছে, আরেকটু হলেই ছুয়ে দেবে, এবং আমার কাঁধ প্রচণ্ড ব্যথায় দপ-দপ করছে। হঠাৎই সবার মুখ হয়ে গেল মিস লি-র মত! আর্তচিৎকার ছাড়লাম আমি!
সোজা হয়ে বসলাম। আমি আমার বিছানায়, নিজের কামরায়।
কাঁধে সাঙ্ঘাতিক ব্যথা। সারা দেহ ঘামে ভিজে গেছে।
ঘড়ির দিকে চাইলাম। সকাল ৭:২৫।

আচমকা চাচা-চাচী হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকল।
কিশোর, কিশোর, তোর ঘুম ভেঙেছে, তুই ঠিক আছিস, আল্লাকে হাজারও শুকরিয়া! চাচী প্রায় ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল।
কেমন ফীল করছিস? রাশেদ চাচা প্রশ্ন করল। ডাক্তার ঠিকই বলেছিল। জ্বরটা শেষমেশ কাটল।
জ্বর? ডাক্তার? বালিশে মাথা রাখলাম। কাঁধের ব্যথায় গুঙিয়ে উঠলাম।
ব্যথাটা কয়েকদিন থাকবে। বিশ্রীভাবে পড়ে গিয়েছিলি কিনা, চাচা বলল।
চাচা, চাচী...কী ঘটছে বলো তো? মনে হচ্ছে আমি...কিছু জিনিস...মিস করছি...।
তবে শোন, বলল চাচী, কালকে ফুটবল প্র্যাকটিসের পর টিমমেটদের সাথে তুই নতুন চাইনিজ ফাস্ট ফুডের দোকানটায় গিয়েছিলি।
ফু লিং? প্রশ্ন করলাম, জানি জবাবটা কী হবে।
হ্যাঁ, চাচা বলল। তোরা কটা এগ রোলের অর্ডার দিয়েছিলি, সস সহ তোদেরকে সেগুলো সার্ভ করা হয়। তুই তোর এগ রোলটায় সস মাখিয়ে দুটো কামড় দিয়েছিলি, তারপরই শুরু হয়ে যায় অ্যালার্জিক রিঅ্যাকশন।
তুই জ্ঞান হারাস, চাচী বলল। পড়ে গিয়ে বাঁ কাঁধে ব্যথা পাস, যে জন্যে ওটা এত টাটাচ্ছে।
ওরা হাসপাতাল থেকে তখুনি অ্যাম্বুলেন্স আনায়। ডাক্তার বলেন ভর্তি করার দরকার নেই। বাসায় শুয়ে ঘুমোলেই ঠিক হয়ে যাবে। উনি বলেন রাতটা হয়তো খারাপ কাটবে, কিন্তু সকালে সব স্বাভাবিক হয়ে যাবে।
চাচী আমার ভ্রূ ঘষল, এখনও ভেজা রয়েছে।
রাতটা কি খারাপভাবে কেটেছে, বাপ? দেখে তো তাই মনে হচ্ছে।
চাচীর দিকে চাইলাম।
চাচী, এত ভাল আমার এর আগে আর কখনও লাগেনি, বলে তাকে জড়িয়ে ধরলাম। তুমি ভাবতেও পারবে না কতটা ভাল লাগছে!
চাচী হেসে উঠে পাল্টা জড়িয়ে ধরল আমাকে।
যা ভয় পাইয়ে দিয়েছিলি! বলল।
আমি নিজেও কম ভয় পাইনি, বললাম।
সত্যিই? কীভাবে? তোর তো জ্ঞানই ছিল না, চাচা বলল।
ওসব কথা থাক, চাচা। এগ রোল সসের অ্যালার্জিক রিঅ্যাকশন অদ্ভুত সব স্বপ্ন দেখায়। আমার শরীর আউট হয়ে গেলেও মন হয়নি।
মাথা ঝাকাল চাচা।
যাক, জ্বরটা কেটে গেছে। দুঃস্বপ্ন আর নেই। বাস্তব দুনিয়ায় ফিরে এসেছিস তুই।

ফিরতে পেরে খুব ভাল লাগছে, বললাম। আমি ক্লান্ত, কিন্তু এত খুশি জীবনে আর কখনও হইনি।
চাচা ঘড়ি দেখল।
অফিসে যাওয়ার সময় হলো। টেক ইট ইযি, চ্যাম্প। ডাক্তার বলেছেন পুরোপুরি সেরে না ওঠা পর্যন্ত ফুটবল বন্ধ।
ঠিক আছে, বলে কাঁধ ডললাম। চাচা বেরিয়ে গেল। চাচী দরজার দিকে এগোল।
আরেকটু ঘুমিয়ে নে, তারপর তোকে নাস্তা দেব, চাচী বলল। বেডরুমের দরজায় থমকে দাঁড়িয়ে আমার দিকে ঘুরে চাইল। ওহ, ভুলেই গেছিলাম। ফু লিঙের লোকেরা এই ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেছে। চিকিৎসার সমস্ত খরচ ওরা দিতে চেয়েছে আর আমাদেরকে যে কোন সময় ডিনারের দাওয়াত দিয়ে রেখেছে।
ভাল। তবে এর পরেরবার আমি আর এগ রোল সস খাব না, বললাম।
হ্যাঁ, চাচী বলল, ওরা খুব ভাল মানুষ। ওরা এমনকী একটা গেট-ওয়েল গিফটও পাঠিয়েছে। তোর ড্রেসারে রয়েছে।
চাচী বেরিয়ে গিয়ে পিছনে দরজা লাগিয়ে দিল। আমি উঠে বসে চারধারে নজর বুলালাম। গোটা ব্যাপারটাই স্বপ্ন ছিল। কিন্তু এতই বাস্তব যে আমি আর অমন স্বপ্ন দেখতে চাই না।
ড্রেসারের দিকে চাইলাম। চাচী সাদা এক ন্যাপকিন রেখেছে ওটার উপরে। উপহারটা কী কে জানে।
আস্তে আস্তে বিছানা ছেড়ে ড্রেসারের কাছে গেলাম।
ন্যাপকিনটা খুললাম। ভিতরে এক ফরচুন কুকি।
ন্যাপকিনটা মেঝেতে পড়তে দিলাম। কুকিটা তুলে ধরলাম। ভেঙে খুলে ফেললাম ওটাকে। কুকিটা মেঝেতে পড়ে গেলে কাগজটার দিকে চাইলাম।
ওতে লেখা, আজ তুমি সম্পূর্ণ নতুন একজন মানুষ হিসেবে দিন শুরু করবে।
অনুভব করলাম নাড়ির গতি দ্রুততর হলো। অস্পষ্ট হাসির শব্দ কানে এল। সরাসরি বেডরুমের আয়নার দিকে চাইলাম। নিজের প্রতিবিম্বটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম।
এসময় তাঁকে দেখতে পেলাম। আমার দিকে চেয়ে মৃদু হাসছেন। মুহূর্তের জন্য। কিন্তু কোন সন্দেহ নেই এটি তিনিই। আয়না থেকে আমার দিকে পাল্টা চেয়ে ছিলেন মিস লি। মুখে স্মিত হাসি।
এবার উধাও হয়ে গেলেন তিনি। হাসির শব্দটা মিলিয়ে গেল।
নড়তে সাহস পাচ্ছি না আমি। আয়নায় নিজের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছি। দুঃস্বপ্নটা কি সত্যি শুরু হতে যাচ্ছে? এই ঘর থেকে বেরনোর পর কেউ কি আমাকে চিনবে না?

বেডরুমের দরজা খুললাম। নীচে, কিচেনে চাচী আর ডন কথা বলছে, হাসছে।
ধীরে সুস্থে সিড়ি ভেঙে নেমে গেলাম। নীচে এখন আমি, কিচেনের দরজার কাছে। ভিতরে পা রাখলাম। চাচী আর ডন কথা থামিয়ে আমার দিকে চাইল। চেয়ে রয়েছে একদৃষ্টে।
হাই, আমি বললাম। সামান্য বিরতি, কেউ কিছু বলল না। এবার চাচীর মুখে হাসি ফুটল।
খিদে পেয়েছে? প্রশ্ন করল। ডন দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরল আমাকে।
সে আর বলতে! বললাম। হাতে শক্ত করে ধরে থাকা ফরচুনটা দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে মারলাম ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে। দারুণ লাগছে আমার, চাচী, বলে প্রাণ খোলা হাসি দিলাম। মনে হচ্ছে আমি নতুন একজন মানুষ, বলতে গিয়ে চেপে গেলাম। আমার আসলে পুরানো কিশোর পাশার মতই অনুভূতি হচ্ছে। এবং আমার জন্য সেটাই যথেষ্ট।
***

ভলিউম ১১৭ – আলাস্কা অভিযান – তিন গোয়েন্দা – রকিব হাসান – সেবা প্রকাশনী

বাঁয়ে তীক্ষ্ণ মোড় নিল বুশ প্লেন। ফায়ারওয়ালে বুট চেপে ধরে নিজেকে সামলাল পাইলটের পাশের সিটে বসা মুসা। থাবা দিয়ে ধরে ফেলল মাথার ওপরের হাতলটা। জানালা দিয়ে তাকাল হাজার ফুট নীচে।

পাইলট ডিউক আইকহ্যাম বুড়ো আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, ওই, যে গ্লিটার টাউন।

শহরটাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে মুসা। যেদিকেই তাকায়, শুধু গাছ আর গাছ। সাদা রঙের চওড়া একটা কাস্তে চলে গেছে যেন গাছের জঙ্গলকে ভেদ করে। ওপর থেকে মহাসড়কের মত লাগছে কাস্তেটাকে। কিন্তু মুসা জানে, ওটা রাস্তা নয়, নদী। ইউকন রিভার। বছরের এ সময়টায় নদীর পানি জমাট বরফ। দশ ফুট পুরু হয়ে বরফের স্তর পড়েছে। শহরটা চোখে পড়ল হঠাৎ। নদীর দিকে মুখ করা। দূর থেকে বাড়ি-ঘরগুলোকে খেলনার মত লাগছে। ওখানেই চলেছে কিশোর ও মুসা।

দারুণ! চিৎকার করে বলল মুসা। সাংঘাতিক!

হাসল ডিউক। এটা সত্যিকারের বুশ কান্ট্রি। নির্জন। বিশাল এলাকা জুড়ে কোন মানুষের দেখা পাবে না।

বিগ কান্ট্রি আলাস্কা! বিড়বিড় করে বলল পিছনের সিটে বসা কিশোর। এয়ারস্ট্রিপটা কই, ডিউক? শুরুতে মিস্টার ডিউক বলেছিল, কিন্তু ডিউক জোরে হাত নেড়ে বাতাসে থাবা মেরে জানিয়ে দিয়েছে, শুধু ডিউক। মিস্টার-ফিস্টার ভাল্লাগে না আমার।

ডিউকের হাসিটা চওড়া হলো। আছে তো। ওই যে নীচেই। এক মাইল চওড়া, দুই হাজার মাইল লম্বা।

তারমানে নীচের ওই বরফে ল্যাণ্ড করবেন? অবাক হলো মুসা।

এত অসমান…

আগে আরও খারাপ ছিল, ডিউক জানাল। গেল শীতে এখানকার লোকে সমান করে দিয়েছে। আমার নামার সুবিধের জন্য। আচমকা সামনের দিকে নিচু হয়ে গেল প্লেনের নাক। গাছের ওই সারি দুটো দেখছ? ওগুলোই রানওয়ের নিশানা। দুটোর ঠিক মাঝখানে নামালে আর কোন ভয় নেই।

থ্রটল অ্যাডজাস্ট করল ডিউক। ফ্ল্যাপ নামিয়ে, গতি কমিয়ে নামার জন্য তৈরি হচ্ছে।

শূন্য থেকে পাথর পড়ার মত ঝপ করে অনেকখানি নীচে নেমে এল প্লেন। এয়ার পকেটে পড়েছে। পেটের মধ্যে পাক দিয়ে উঠল মুসার। ডিউকের সঙ্গে কথা

বলাটা এখন নিরাপদ নয়। কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে তাকাল কিশোরের দিকে। দারুণ একটা অ্যাডভেঞ্চার হবে, কী বলো? জোসিও আমাদের দেখলে খুশি হবে। বিশ্বাসই করতে পারবে না, ওর দাওয়াতে সাড়া দিয়ে সত্যি সত্যি চলে আসব আমরা।

তা ঠিক, মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

জোসি মানে জোসেফ টিনুক। ওদের বন্ধু। অ্যাথাবাস্কান। গ্লিটারের স্থানীয় অধিবাসী। জন্মের পর থেকেই নীচের ওই খুদে শহরটায় বাস করছে। ব্যুরো অভ ইণ্ডিয়ান অ্যাফেয়ার্সের স্পন্সর করা খেলাধূলার প্রোগ্রামে ফুটবল খেলতে কিছু দিনের জন্য লস অ্যাঞ্জেলেসে যাবার সুযোগ পেয়েছিল। কয়েক হপ্তা কাটিয়ে এসেছে তিন গোয়েন্দার সঙ্গে, রকি বিচে। ফিরে আসার সময় গ্লিটার টাউনে ওদেরকে দাওয়াত করেছিল জোসি। বসন্তের ছুটিতে স্কুল বন্ধ হতেই তাই বেরিয়ে পড়েছে কিশোর ও মুসা। আলাস্কাও দেখা হবে, ভগ জে রেসে বন্ধুকে সাহায্যও করতে পারবে। অ্যাঙ্কারেজ থেকে শুরু হয় ইডিটাররাডের বিখ্যাত এই কুকুর-দৌড়।

বাবা-মার সঙ্গে নিউ ইয়র্কে যেতে হয়েছে রবিনকে, তাই আসতে পারেনি। ওর বাবা মিস্টার মিলফোর্ড ওখানকার একটা বড় পত্রিকায় কাজ নিয়েছেন। যদি ভাল লাগে, ওখানেই থেকে যাবেন, রকি বিচে আর ফিরবেন না। আপাতত ওখানকার কোনও একটা স্কুলে ভর্তি করে দেয়া হবে রবিনকে। বন্ধুদের ছেড়ে যেতে হচ্ছে বলে দুঃখে কাতর হয়ে পড়েছিল রবিন। মুসা তো কেঁদেই ফেলেছিল। মন খারাপ হয়ে। গিয়েছিল কিশোরেরও।

শক্ত হয়ে বসো, ডিউকের কথায় ভাবনার জগৎ থেকে ফিরে এল কিশোর।

প্লেনের নাক আরও নামিয়ে দিল ডিউক।

মাথার ওপরের হ্যাণ্ডেলটায় মুসার আঙুলের চাপ আরও শক্ত হলো। ওপর থেকে নীচে তাকিয়ে ওর মনে হচ্ছে, প্লেনটা নামছে না, বরং বিশাল ধরণীই দ্রুতবেগে উঠে আসছে ওদের দিকে।

আরও গতি কমাল ডিউক। জয় স্টিক টেনে নাক সোজা করল। সামান্য সামনে ঠেলে দিল স্টিকটা। নদীর বরফ স্পর্শ করল প্লেনের স্কি। রিভার্স-এ দিল প্রপেলার। থ্রটল বাড়িয়ে দিল। গর্জন করে উঠল ইঞ্জিন। থরথর করে কেঁপে উঠল প্লেনের শরীর। আঁকি খেল দুতিনবার। নাচতে নাচতে এগিয়ে গেল কয়েক গজ। তারপর থেমে গেল।

হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপে মোটর বন্ধ করে দিল ডিউক। জোরে নিঃশ্বাস ফেলল। হঠাৎ করে নীরবতা এসে ধাক্কা মারল যেন কানের পর্দায়। রীতিমত ব্যথা হচ্ছে কানে।

পার্কার জিপার তুলে দাও, বলতে বলতে দরজা খোলার হ্যাণ্ডেলের দিকে হাত বাড়াল ডিউক। এখানকার ঠাণ্ডা কিন্তু ভয়ানক। বাতাস ছাড়াই তাপমাত্রা নেমে যায় শূন্যের নীচে, আর যখন বাতাস বয়, তখন তো ভয়াবহ অবস্থা।
পার্কার জিপার তুলে দিয়ে প্লেন থেকে নেমে এল কিশোর ও মুসা।
আমরা যে এসেছি শহরবাসী কি জানে? কথা বলার সময় নিজের মুখ থেকে বেরোনো বাতাস মুহূর্তে বরফের কণা হয়ে যেতে দেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল মুসা।
তা তো জানেই, ডিউক বলল। ও, বুঝতে পারনি তা হলে, জানানোর জন্যই তো শহরের ওপর দিয়ে চক্কর দিয়ে এলাম। ব্যাগেজ কম্পার্টমেন্ট খুলে কিশোর-মুসার ডাফেল ব্যাগগুলো বের করে বরফের ওপর নামিয়ে রাখল ও।
গ্লিটার টাউন, চারপাশে তাকাতে তাকাতে বিড়বিড় করে নিজেকেই প্রশ্ন করল কিশোর, আজৰ নাম। নেটিভ আমেরিকান
শহরগুলোর সাধারণত এ রকম নাম হয় না।
ফ্রেইট কম্পার্টমেন্ট থেকে নানা রকম বাক্স আর প্যাকেট টেনে নামাতে শুরু করল ডিউক। সেই গোল্ড রাশের যুগে... গোল্ড রাশ বোবো তো?
যে সময়টায় সোনার খোঁজে খেপা হয়ে গিয়েছিল মানুষ, কিশোর জবাব দিল। পাগলের মত সোনা খুঁজে বেড়াত, স্বর্ণসন্ধানের সেই যুগটাকে বলে গোল্ড রাশ। স্বর্ণসন্ধানীদের বলে প্রসপেক্টরস।
হ্যাঁ, মাথা ঝাঁকাল ডিউক। একশো বছর আগে সেই গোল্ড রাশের যুগে হাজার হাজার খনি-শ্রমিক আর প্রসপেক্টরস এসে হানা দিয়েছিল এখানকার পাহাড়-পর্বতগুলোয়। চকচকে সোনা-বোধহয় এই কথাটার ওপর ভিত্তি করেই ওরা শহরটার নাম রেখেছিল গ্লিটার টাউন। ভীষণ পছন্দের জায়গা ছিল এটা ওদের কাছে। কিন্তু সব কিছুরই শেষ আছে। ধীরে ধীরে এখানকার সোনা শেষ হয়ে এল। চলে গেল বাইরে থেকে আসা খনি-শ্রমিকেরা প্রায় সবাই...।
কিশোর! নদীতীরের দিকে আঙুল তুলল মুসা, দেখো, ও জোসি না?
ওর মতই তো লাগছে, কিশোরের কণ্ঠে উত্তেজনা।
প্রায় এক শ গজ দূরে মাঝারি উচ্চতার একটা গাট্টাগোট্টা মূর্তিকে দ্রুত এগিয়ে আসতে দেখা গেল বরফে ঢাকা নদীতীর ধরে। পার্কার হুড পিছনে নামানো। চওড়া মুখ, উঁচু চিবুক আর কালো চুল দেখে দূর থেকেও বন্ধুকে চিনতে পারল মুসা।
টান দিয়ে যার যার ব্যাগ তুলে নিল কিশোর ও মুসা। প্রায় ছুটতে শুরু করল জোসির দিকে।

কিশোর! মুসা! চিৎকার করতে করতে জোসিও ছুটে এল। কাছে এসে হাত মেলাল। পিঠ চাপড়ে দিতে দিতে জিজ্ঞেস করল, কেমন আছ?
ভাল, জবাব দিল কিশোর।
রবিন আসেনি?
নাহ্, আসতে পারেনি। নিউ ইয়র্কে।
আহহা, তাই। ও এলে খুব ভাল হতো।
তা তো হতোই। কিন্তু কী আর করা।
পথে কোন অসুবিধে হয়নি তো?
হয়েছে কি না টেরই পাইনি, এতই কুঁদ হয়ে ছিলাম। দেখার মত জায়গা।
ডিউকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে জোসির পিছু পিছু শহরের দিকে হেঁটে চলল কিশোর-মুসা। গ্লিটারকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেল। দুই সারি পাহাড়ের মাঝখানে উপত্যকায় গড়ে উঠেছে শহরটা। ছড়ানো ছিটানো কাঠের কেবিনগুলো জড়সড় হয়ে আছে তীব্র শীতে। ধাতব স্টোভের পাইপ বেরিয়ে গেছে কেবিনের ছাত ফুড়ে। সেগুলো দিয়ে সাদা ধোয়া উঠে যাচ্ছে সুমেরুর পরিষ্কার নীল আকাশে।
জোসি বলল, তোমাদের কেবিনের স্টোভটা চালু করা দরকার। ঠিক আছে নাকি কে জানে। অনেকদিন চালু করা হয় না। আগে ওটা আমার কেবিন ছিল। আব্বা-আম্মা ফেয়ারব্যাংকসে জুততার ফ্যাক্টরিতে চাকরি করতে চলে যাবার পর থেকে বহুদিন ঢুকিও না ওখানে, দেখাও হয় না। এখন ওদের বড় কেবিনটায় আমি থাকি। চাচা-চাচীর ওখানে খাই।
জোসি জানাল, ওর চাচার নাম জেফরি, চাচী এরিনা।
চলতে চলতে শহরের একমাত্র দোতলা বাড়িটার দিকে চোখ পড়ল মুসার। এটাও কাঠের তৈরি। সামনের দিকে কাঠের সাইনবোর্ডের লেখাগুলো জোরে জোরে পড়ল ও, জেনারেল স্টোর, প্রোপ্রাইটরলুক স্টার্লিং। বলল, সিনেমায় দেখা পুরানো ওয়াইল্ড ওয়েস্টের মত করে লিখেছে।
হাসল জোসি। তা ঠিক। পুরানো আমলে বুনো পশ্চিমের মতই স্টেজকোচ আর ওয়্যাগন ট্রেন আসত এখানেও, এখন আসে ডিউকের এরোপ্লেন। ফেয়ারব্যাংকসে মালের অর্ডার দেয় লুক। ওর দোকানে যদি কিছু না পাও, গ্লিটারের আর কোথাও সেটা পাবে না, ওই জিনিসটা ছাড়াই চালাতে হবে তোমাকে।
নদীর দিক থেকে ইঞ্জিনের শব্দ শোনা গেল। ফিরে তাকাল তিন কিশোর।
ডিউক চলে যাচ্ছে, জোসি বলল। সপ্তাহে একবার করে মালপত্র আর ডাক নিয়ে আসে ও।

নদীর দুই তীরে প্রুস গাছের সারি। মাঝখানের বরফে ঢাকা নদীর ওপরের অস্থায়ী রানওয়ে ধরে ছুটতে শুরু করল প্লেনটা। হঠাৎ লাফিয়ে উঠল বিশাল রাজহাঁসের মত। মোড় নিয়ে উড়ে গেল পশ্চিমে।
শহরের ভিতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সাদা একটা বাড়ি দেখাল জোসি। ছোট ছোট জানালা। অ্যাসেম্বলি রুম। পুরানো আমলে গোল্ড রাশের দিনে ওটাকে ড্যান্স হল হিসেবে ব্যবহার করা হতো। এখন শহরের লোকে ওখানে সভাটভা করে।
বাড়িটার প্রবেশ পথের একপাশে বুলেটিন বোর্ড। তাতে বড় বড় দুটো পোস্টার লাগানো। একটা পোস্টার ভাল কাগজে মেশিনে ছাপা। গ্লিটার টাউনের ভবিষ্যৎ উন্নতিতে যারা বিশ্বাসী, তাদেরকে হ্যাঁ ভোট দিতে অনুরোধ করা হয়েছে। আরেকটা পোস্টার সস্তা কাগজে, হাতে লেখা। যারা লিখেছে তাদের স্লোগান শহর বাঁচাতে চাইলে না ভোট দিন।
কী ব্যাপার? পোস্টার দুটো দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর, শহরে নির্বাচন নাকি?
নির্বাচন না, জোসি জানাল, থিম পার্ক কর্পোরেশন নামে একটা কোম্পানি গ্লিটারকে টুরিস্ট স্পট বানাতে চায়। এ ব্যাপারে এখানকার জনগণের মতামত যাচাইয়ের জন্য এই ভোটের ব্যবস্থা।
ডিজনি ওয়ার্ল্ডের মত কোন কিছু? জড়সড় হয়ে কুঁকড়ে থাকা কেবিনগুলোর দিকে তাকাল মুসা।
হাসল জোসি। কেন, আইডিয়াটা খারাপ মনে হচ্ছে? এ রকম একটা আদিম জায়গাকে থিম পার্ক বানাবে, বিশ্বাস করতেই কষ্ট হয়, তাই না?
শহরের লোকের প্রতিক্রিয়া কী? কিশোর জিজ্ঞেস করল। তারা কী বলে?
এ সব ক্ষেত্রে সাধারণত যা হয়, মিশ্র প্রতিক্রিয়া। কেউ থিম পার্কের পক্ষে, কেউ বিপক্ষে।
সামনে মূল রাস্তাকে ক্রস করে গেছে আরেকটা রাস্তা। সেটা ধরে দ্রুত এগিয়ে আসছে একজন মানুষ। বড় বড় চুল প্রায় জট পাকিয়ে গেছে। গায়ে সবুজ পার্কা। পরনে উলের ঘন বুনটের ভারী প্যান্ট। দোমড়ানো। ময়লা। নিচুস্বরে জোসিকে জিজ্ঞেস করল মুসা, কে লোকটা?
টেক্স ফেরানি। লোকে ডাকত গোল্ড ফেরানি। ডাকতে ডাকতে এখন গোল্ড হয়ে গেছে ওর ডাকনাম, জোসি বলল। শহরের বাইরে ছোট্ট একটা গোল্ড ক্লেইম আছে ওর। গোল্ড ক্লেইম বোঝো?
মাথা ঝাঁকাল মুসা। সোনা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে এমন জায়গার বৈধ মালিক।
হ্যাঁ। গোল্ড এক বিচিত্র চরিত্র।
সোনা মানে তো বিরাট ব্যাপার, মুসা বলল। কিন্তু এ লোকটাকে দেখে খাবার পায় বলেই মনে হয় না।

আসলেই তা-ই, টাকা নেই ওর। পঞ্চাশ বছর কাটিয়েছে সোনা খুঁজে খুঁজে। এখনও কিছুই করে উঠতে পারল না বেচারা। তবে আশা ছাড়েনি, সোনা খোজায় ওর বিরাম নেই।
জোসির সঙ্গে শহরের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলল কিশোর-মুসা। শহরের অন্যপাশে এসে একটা কেবিন দেখিয়ে জোসি বলল, ওইটা আমার চাচার কেবিন।
তোমার চাচার ছেলেমেয়ে নেই? মুসা জানতে চাইল।
আছে। এক মেয়ে। নাম মুনস্টোন। তোমাদের এগিয়ে আনার জন্য আমার সঙ্গে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু লাকড়ি কেটে আনাটাও জরুরি। সেজন্য বনে গেছে। অসুবিধে নেই, পরেও দেখা করতে পারবে। আর ওই যে কেবিনটা দেখছ, এটা তোমাদের।
চাচার কেবিন থেকে দশ-বারো গজ দূরে আরেকটা ছোট কেবিনে কিশোরদেরকে নিয়ে এল জোসি। দুটো বাংক। একগাদা কম্বল। এ ছাড়া একটা টেবিল, একটা চেয়ার, আর পেটমোটা এক পুরানো চুলা আছে। মাটিতে বিছানো ভালুকের চামড়ায় তৈরি একটা মাদুর। চুলার পাশে একটা কাঠের খোলা বা লাকড়িতে বোঝাই।
এখানে থাকতে তোমাদের কষ্ট হবে না তো? জোসি জিজ্ঞেস করল। তোমাদের বাড়ির মত আরাম পাবে না আগেই বলে দিচ্ছি।
আমার তো খারাপ লাগছে না, হাতের ব্যাগটা একটা বাংকে নামিয়ে রাখল কিশোর। বরং মনে হচ্ছে আরামেই থাকতে পারব। শোনো, আমাদের নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। বহু খারাপ জায়গায় থেকে অভ্যাস আছে আমাদের।
ঠিক, মুসা বলল। ওসব জায়গার তুলনায় কেবিনটা তো পাঁচতারা হোটেল।
স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল জোসি। বন্ধুদের থাকার জায়গা নিয়ে দুশ্চিন্তায় ছিল ও, বোঝা গেল। জিজ্ঞেস করল, আমার জেটানা কুকুরগুলো দেখবে?
নিশ্চয়ই, জবাব দিতে এক মুহূর্ত দেরি করল না মুসা।
কেবিন থেকে বেরিয়ে শহরের সীমানা ধরে এগিয়ে চলল ওরা। এক জায়গায় কতগুলো কেনল চোখে পড়ল। কুকুরের ঘরগুলোর কাছে প্রায় দুই ডজন কুকুর বাধা। ওদের দেখে জোর গলায় চচামেচি শুরু করল ওগুলো। প্রচুর লাফালাফি আর লেজ নেড়ে স্বাগত জানাল।
সবগুলো তোমার কুকুর? অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল মুসা।
হ্যাঁ। এখানে আছে একুশটা। তবে ইডিটারোড রেসে বারোটার বেশি ব্যবহার করব না। হাতে আরও সময় নিয়ে আসা উচিত ছিল তোমাদের। তাহলে রেসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখে যেতে পারতে।

থাকতে পারলে খুশিই হতাম, মাথা ঝাঁকাল কিশোর। কিন্তু কী করব, স্কুল খুলে যাবে।
স্কুল কামাই দিয়ে হলেও থাকতে রাজি আছি আমি, মুসা বলল। রেসের শেষ দেখতে না পারলে মনে খুঁতখুঁতি থেকে যাবে।
নাহ্, রেসের জন্য স্কুল কামাই দেয়া ঠিক হবে না, কিশোর বলল।
বেশির ভাগ দর্শকই রেসের শুরুটা কেবল দেখে, জোসি বলল। অনেক লম্বা পথ। অ্যাঙ্কারেজ থেকে নৌম পর্যন্ত এগারোশো মাইল। এতখানি তো আর সঙ্গে সঙ্গে যাওয়া সম্ভব না।
হাঁ করে তাকিয়ে রইল মুসা। এগারোশো মাইল!
একটা কুকুরের কাছে গিয়ে দাঁড়াল জোসি। ওদের প্রতিটি নড়াচড়া লক্ষ করছে কুকুরটা। ওর নাম ডায়মণ্ডহার্ট।
হীরকহৃদয়, বিড়বিড় করল কিশোর।
কী বললে?
ডায়মণ্ডহার্টের বাংলা করলাম।
আচ্ছা, হাসল জোসি। বাংলা নামটাও শুনতে ভাল লাগছে। সুন্দর একটা ছন্দ আছে। কিন্তু এখন আর বাংলা নামে ডাকলে সাড়া দেবে না ওটা, নইলে রেখেই দিতাম।
বড় একটা হাস্কি কুকুরের পাশে বসে ওটার গলা জড়িয়ে ধরল জোসি। কুকুরটার গায়ের রঙ সাদা আর ধূসরে মিশানো। চোখ টলটলে নীল। আদর পেয়ে জোরে জোরে লেজ নাড়তে লাগল। কিশোর ও মুসার দিকে তাকাল জোসি। ও আমার লিড ডগ।
মানে নেতা কুকুর? মুসা বলল।
মাথা ঝাঁকাল জোসি। হ্যাঁ।
মনিবের গাল চেটে দিতে লাগল ডায়মণ্ডহার্ট। হেসে মুখ সরিয়ে নিল জোসি।
দলের সবচেয়ে মূল্যবান সদস্য লিড ডগ, জোসি বলল। হোয়াইট আউটের মধ্যে পড়লে ওকে ছাড়া নিস্তার পাওয়া কঠিন।
হোয়াইট আউট কী? মুসা জানতে চাইল।
তুষার ঝড়, জোসি বলল। যখন তখন শুরু হয়ে যায়। এতই ঘন হয়ে তুষার পড়ে, নিজের হাতও দেখা যায় না। ভয়ঙ্কর ব্যাপার। তবে ডায়মণ্ডহার্টের মত একটা হাস্কি সঙ্গে থাকলে নিরাপদ। পথের মোড়ে কোনখানে কী বিপদ ওত পেতে আছে, নদীর বরফের স্তর কোথায় অতিরিক্ত পাতলা, ভার সইতে না পেরে ভেঙে যাবে, আগে থেকেই সব বুঝতে পারে। ওকে ছাড়া ইডিটারোড রেসে অংশ নেয়ার কথা ভাবতেই পারি না আমি।

রেস শেষ হতে কতদিন লাগে? জানতে চাইল কিশোর।
সেটা অনেক কিছুর ওপর নির্ভর করে। ঘুরে ঘুরে প্রতিটি কুকুরের মাথা চাপড়ে আদর করে দিতে লাগল জোসি। তবে মোটামুটি এগারো-বারোদিনের মত লাগে। ভীষণ বিপজ্জনক আর উত্তেজনায় ভরা এই রেস।
কুকুরগুলোর ওপর নিশ্চয় খুব চাপ পড়ে? মুসার প্রশ্ন।
তা পড়ে। তবে সেটা ওরা পছন্দও করে। শূন্যের বিশ ডিগ্রি নীচে নেমে যায় তাপমাত্রা। শরীর গরম হতে চায় না। মাশিঙের জন্য অস্থির হয়ে ওঠে ওরা।
মাশিং কী? কুকুরের খাবার?
হাসল জোসি। উঁহু। ডগস্লেজিঙের স্থানীয় নাম মাশিং। ফরাসি শব্দ মার্শা থেকে এসেছে শব্দটা। এর মানে চলো যাই।
কিশোর জিজ্ঞেস করল, রেসের সময় বাইরের সহযোগিতা পাওয়া যায়?
মাথা নাড়ল জোসি। না। ইডিটারোড রেসে যা যা করার রেসারকে একলাই করতে হয়। নিজের খাবার, কুকুরের খাবার, কাপড়-চোপড়, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বয়ে নিয়ে যেতে হয়। টিকে থাকার জন্য যা কিছু প্রয়োজন, সব সঙ্গে নিতে হয়।
মুসা বলল, তারমানে নিয়ম-নীতি খুব কঠোর।
কঠোর না হয়ে উপায় নেই, জোসি বলল। ইডিটারোড রেসটা শুধু খেলা বা প্রতিযোগিতা নয়, রেসার তৈরিতেও এর গুরুত্ব অপরিসীম। সেই উনিশশো পঁচিশ সাল থেকে এ নিয়ম চালু আছে। নৌমে সেবার মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়েছিল ডিপথেরিয়া। সারা শহরে কোথাও এর ওষুধ ছিল না। গাড়ি আসার রাস্তা ছিল না। প্লেন নামতে পারত না। কিন্তু আলাস্কার কিছু বেপরোয়া ডগস্লেজ মাশার প্রচণ্ড তুষার ঝড়ের তোয়াক্কা না করে অ্যাঙ্কারেজ থেকে নৌমে ওষুধ পৌঁছে দিয়েছিল। বাঁচিয়ে দিয়েছিল শহরটাকে। সেই থেকে ইডিটারোড রেসের গুরুত্ব ভীষণভাবে বেড়ে গেছে এই এলাকার লোকের কাছে। নিউ ইয়র্ক সিটির সেন্ট্রাল পার্কের বিখ্যাত কুকুরের মূর্তিটার কথা নিশ্চয় জানো, বাল্টোর মূর্তি। নৌমের সেই উদ্ধারঅভিযানে একটা দলের লিড ডগ ছিল বাল্টো। ওষুধ আনার পর থেকে হিরো হয়ে গেছে। ডায়মণ্ডহার্টের মাথা চাপড়ে দিতে আবার নিচু হলো ও। আমাদের ডায়মণ্ডও বাল্টোর চেয়ে কম নয়, কি বলিস ডায়মণ্ড? এবারের ইডিটাররাডে আমরাই জিতব। পঞ্চাশ হাজার ডলারের পুরস্কার বাড়িতে আনব।
শিস দিল মুসা। ওর মুখ থেকে বেরোনো বাতাসে তুষারকণার লম্বা একটা রেখা তৈরি হলো। পঞ্চাশ হাজার!
বেশি মনে হচ্ছে? হাসতে লাগল জোসি। তবে এতে যে পরিমাণ বিপদ, সেই তুলনায় টাকাটা খুব বেশি না। পদে পদে মৃত্যুর আশঙ্কা। কুকুর ছাড়া একশো গজও যেতে পারবে না।

হাঁটতে হাঁটতে শহরে ফিরে এল ওরা। ওদের বয়েসি আরেকটা ছেলেকে উল্টো দিক থেকে আসতে দেখা গেল। জোসির মত ওর পরনেও চামড়ার পার্কা আর উলের প্যান্ট। মাথার হুড তুলে দেয়া। অন্য দিকে নজর। ওদের যেন দেখেইনি।
ও টেড সিউল, জোসি বলল। গলা চড়িয়ে ডাকল, এই টেড, শোনো। এরা আমার বন্ধু। মেহমান। লস অ্যাঞ্জেলেসের রকি বিচ থেকে এসেছে।
থামল টেড। তবে জোসির দিকে তাকাল না।
টেডও রেসে অংশ নিচ্ছে, জানাল জোসি। ইডিটারোড রেসে এই প্রথমবারের মত প্রতিযোগিতা করতে যাচ্ছি আমরা। গোটা শহর আমাদের নিয়ে উত্তেজিত। অনেকেই বলাবলি করছে প্রতিযোগিতা আমার আর টেডের মধ্যেই হবে। দুজনের যে কোন একজন জিতব।
জ্বলন্ত চোখে জোসির দিকে তাকাল টেড। আমি না জিততে পারলে তোমাকেও জিততে দেয়া হবে না, কথাটা মনে রেখো। তার জন্য যদি আমাকে...
কথাটা শেষ করল না ও। ঝট করে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চলে গেল।
দীর্ঘ একটা মুহূর্ত সেদিকে তাকিয়ে থেকে জোসিকে জিজ্ঞেস করল কিশোর, ও অমন করল কেন?
জানি না, বিষন্ন মনে হলো জোসিকে। সেই ছোটবেলা থেকে আমাদের বন্ধুত্ব। কিছুদিন থেকে কী যে হয়েছে ওর, একেবারেই সহ্য করতে পারে না আমাকে। ডগ রেসে বার বার আমার কাছে পরাজয়টা মেনে নিতে পারছে না বোধহয়।
প্রতিযোগিতায় হারজিত তো আছেই, মুসা বলল। তার জন্য এত শত্রুতা? নিশ্চয় তুমি ওর চেয়ে ভাল মাশার, নইলে জেতো কেন?
মাশার! বাহ, চমৎকার উচ্চারণ, হাসি ফুটল জোসির মুখে। শেখো, শেখো, শিখে ফেললা আমাদের ভাষা। কঠিন কিছু না।
মুসার মনে হলো ওর প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল জোসি।
যে রাস্তা ধরে চলেছে ওরা, সেটা গেছে একটা ভোলা চত্বরের ধার দিয়ে। পঞ্চান্ন গ্যালনের অনেকগুলো বড় বড় ড্রাম রাখা আছে চত্বরে। পাশে একটা ছোট্ট ছাউনি। ছাউনির ভিতর থেকে আসছে ইঞ্জিনের শব্দ।
কীসের শব্দ জানতে চাইল মুসা।
জেনারেটর, জোসি বলল। ডিজেলে চলে। ওই ড্রামগুলোতে ডিজেল ভর্তি। গরমকালে ইউকনে যখন বরফ থাকে না, তখন বার্জে করে নিয়ে আসা হয়। হিসেব করে বিদ্যুৎ খরচ করতে হয় আমাদের। বসন্তে বরফ গলা শুরু হওয়ার আগে তেল ফুরিয়ে গেলে বিপদ। জেনারেটর চলবে না। বিদ্যুৎ বন্ধ। অন্ধকারে থাকতে হবে রাতের বেলা।

চিন্তিত অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে হেঁটে চলেছে কিশোর। শহরটা বড় বেশি নিঃসঙ্গ। অস্বস্তি লাগছে ওর। এখানে সব কিছু ঠিকঠাক মত চললে কোন ভয় নেই। কিন্তু যে কোন অঘটন কিংবা অনিয়ম ঘটলে, তা সে যত সামান্যই হোক না কেন, শহরটাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিতে পারে।
টেড সিউলের কথা ভাবল কিশোর। রহসময় আচরণ করেছে। জোসিকে জিজ্ঞেস করল, জোসি, টেড যে তোমাকে শাসিয়ে গেল, কতটা ক্ষতি করতে পারে?
আগে আগে হাঁটছে জোসি। ফিরে তাকিয়ে জবাব দিল, বাদ দাও ওর কথা। কামড়ের চেয়ে ঘেউ ঘেউ বেশি।
হেসে রসিকতা করল মুসা, হাস্কিগুলোর মত।
হাস্কিরা ভীষণ প্রয়োজনীয় প্রাণী, হাসিটা ফিরিয়ে দিল জাসি। টেডের সমস্যাটা হলো, ও শুধুই ফাস্ট হতে চায়। কিন্তু সব তো আর ওর পছন্দমত চলবে না।
কখনও হেরেছ ওর কাছে? কিশোর জিজ্ঞেস করল।
একবার প্রায় হেরে গিয়েছিলাম।
তারমানে হারনি। বুঝলাম, এ জন্যই জেদ বেড়ে গেছে ওর,মুসা বলল। জেদ থেকে শত্রুতা।
প্রতিযোগিতা যত বড় মাপের হয়, উত্তেজনা তত বাড়ে। কিশোর জানে, ইডিটারোড রেসের মত কুকুর-দৌড়ের এতবড় প্রতিযোগিতা পৃথিবীর আর কোথাও হয় না। তাতে অংশ গ্রহণ করতে পারাটাও বিরাট সম্মানের ব্যাপার। স্বাভাবিকভাবেই গ্লিটারবাসীরা এ নিয়ে উত্তেজিত। দুটো দলে ভাগ হয়ে গেছে তারা। কারও সাপোর্ট জোসির পিছনে, কারও টেডের। হেরে গেলে ভক্তদের কাছে মুখ দেখাতে পারবে না এই দুশ্চিন্তায়ই নিশ্চয় খিটখিটে হয়ে গেছে টেড।
মোড় নিয়ে আরেকটা পায়ে চলা পথে নামল ওরা। লম্বা একজন মানুষকে আসতে দেখল। গায়ে সবুজ পার্কা। পরনে সবুজ টুয়িলের প্যান্ট।
বিগস আসছে, জোসি বলল। ইলকিস বিগস্। কোম্পানির লোক।
কিশোর জিজ্ঞেস করল, কোন কোম্পানি?
থিম পার্ক কর্পোরেশন, বললাম না তখন। গ্লিটারেও একটা থিম পার্ক বানাতে চায়। প্রতি শীতেই গ্লিটারে এসে হাজির হয় ও। কোম্পানির পক্ষে প্রচার চালায়। এবার একেবারে আটঘাট বেঁধে এসেছে। ভোট না নিয়ে আর যাবে না। হা-না একটা কিছু সিদ্ধান্ত জেনে তবেই যাবে।
মুখে ঝলমলে হাসি নিয়ে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে এল বিগস্। হ্যালো, জোসি। কিশোর-মুসাকে দেখাল। এরাই নিশ্চয় তোমার রকি বিচের বন্ধু। কিশোর কোন জন, আর মুসা কোন জন?

ও কিশোর, দেখিয়ে দিল জোসি। আর ও মুসা। ইডিটারোড রেসে আমাকে সাহায্য করবে।
কিশোর ও মুসার দিকে তাকিয়ে আন্তরিক হাসি হাসল বিগস্। আলাস্কায় স্বাগতম। তোমরা আসতে না আসতে কীভাবে জেনে গেলাম ভেবে অবাক হচ্ছ নিশ্চয়? এখানে খবর খুব দ্রুত ছড়ায়। আচ্ছা যাই, পরে কথা হবে। জরুরি কাজ আছে আমার।
চলে গেল বিগস্।
লোকটা কিন্তু খুব আন্তরিক, মুসা বলল। কাজের প্রতি ভীষণ সিরিয়াস।
মনে হয়, জোসি বলল।
মনে হয় মানে? তোমার সন্দেহ আছে নাকি?
বাদ দাও, হাত নেড়ে যেন বিগসকে উড়িয়ে দিল জোসি। চলো।
আবার পা বাড়াল ওরা। কিছুদূর এগোতে জোসির কেবিনটা চোখে পড়ল। এটাতেই কিশোরদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তিন পাশে বন, একপাশে নদী। নদীর দিকটা ভোলা থাকায় রোদ পাওয়া যাবে।
চাচা-চাচীর কেবিনের দিকে তাকাল জোসি। জানালার পর্দা টানা দেখে বলল, ও, এখনও আসেনি। এত দেরি করছে কেন? তোমরা এখন বিশ্রাম নেবে?
মুসা বলল, ঘরে যেতে ইচ্ছে করছে না। তবে তোমার জরুরি কাজ থাকলে…
আমার কাজ নেই, জোসি বলল। স্লেজে চড়ে ঘুরবে?
চেঁচিয়ে উঠল মুসা, নিশ্চয়ই!
চলো, চলো! জবাব দিতে এক মুহূর্ত দ্বিধা করল না কিশোরও।
কুকুরগুলোর কাছে ফিরে এল ওরা। স্টোরেজ শেড অর্থাৎ মালপত্র রাখার ছাউনি থেকে ওক কাঠে তৈরি স্লেজটা বের করতে জোসিকে
সাহায্য করল দুজনে।
স্লেজের আকার দেখে মুসা অবাক। এত লম্বা?
প্রচুর খাবার আর জিনিসপত্র সঙ্গে নিতে হয়, জোসি বলল। চলার পথে ঘুমানোর কাজটাও গাড়িতেই সারতে হয়। বড় করে তো বানাতেই হবে।
গাড়ির সঙ্গে লম্বা এক সারি লাগাম জুড়ে দিতে লাগল জোসি। কী ঘটতে যাচ্ছে বুঝে ফেলল কুকুরগুলো। আগ্রহ আর উত্তেজনায় প্রচণ্ড চিৎকার আর লাফালাফি শুরু করল।
গাড়িতে জোতা শিখবে? জিজ্ঞেস করল জোসি।
এতে শেখার কি আছে? মুসা বলল, লাগাম পরিয়ে দিলেই হয়।
না, হয় না। উল্টোপাল্টা লাগালে হবে না। এরও নিয়ম আছে। গাড়ির কাছ থেকে সারি দিয়ে নিয়ে যেতে হবে। গাড়ির একেবারে কাছে যে কুকুরগুলোকে বাঁধা হবে,

ওগুলোকে বলে হুইল ডগ। আগের কুকুর পিছে, আর পিছের কুকুর আগে বাঁধলে ঠিকমত টানতেই পারবে না।
একটা কুকুরের বাঁধন খুলে স্লেজের একেবারে কাছের সুটটার সামনে নিয়ে এল জোসি। প্যাড লাগানো লাগামটা পরিয়ে দিতে লাগল। বাধা দিল না কুকুরটা।
ওদের মনিব কে, সেটা ওদেরকে ভালমত বুঝিয়ে দিতে হবে, জোসি বলল। দুর্বলতা প্রকাশ করা চলবে না কোনভাবেই। বাঁধন খুলে কীভাবে কুকুরকে নিয়ে আসতে হয়, দেখলে। এখন যাও। মুসা, তুমি রেড লাইটকে নিয়ে এসো। আর কিশোর, তুমি হোয়াইট ক্লাউডকে।
কোনটা রেড লাইট আর কোনটা হোয়াইট ক্লাউড, আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল জোসি। বাঁধন খুলে কলার ধরে কুকুর দুটোকে স্লেজের কাছে টেনে নিয়ে এল কিশোর ও মুসা। সেগুলোকে লাগামের সঙ্গে জুড়ে দিতে লাগল জোসি। ডায়মণ্ডহার্টের পালা এল সবশেষে। চোখের আন্দাজে মেপে দেখল কিশোর। টানার সময় গাড়ি থেকে প্রায় চল্লিশ ফুট দূরে থাকবে এই নেতা-কুকুরটা। কুকুরের এই স্লেজ চালানোর জন্য অনেক জায়গা লাগে।
প্রচণ্ড শক্তি ও আত্মবিশ্বাসে ভরা একটা পাওয়ার হাউসে পরিণত হয়েছে যেন হাস্কি কুকুরের সম্মিলিত দলটা। ক্রমাগত লেজ নেড়ে নেড়ে লাফানো শুরু করেছে কুকুরগুলো। ছোটার জন্য অস্থির। যেন শুধু এ কাজটা করার জন্যই বেঁচে আছে ওরা। গাড়ি টেনে নিয়ে দৌড়ানোটা যেন ওদের নেশা।
ভালমত দৌড় করিয়ে আনতে হবে ওদের, জোসি বলল। গাড়িতে ওজন দরকার। মালপত্র তো নেই, সে-জায়গাটা তোমরা পূরণ করো। গাড়িতে গিয়ে বসো।
উঠে বসল মুসা। মুখোমুখি বসল কিশোর। স্লেজের পিছনে রানারের ওপর উঠে দাঁড়াল জোসি।
দারুণ গাড়ি। স্টিয়ারিং হুইল নেই। অ্যাক্সিলারেটর নেই, মুসা বলল।
সিটবেল্ট নেই। এয়ারব্যাগ নেই, বলল কিশোর।
হাসাহাসি করতে লাগল তিনজনে।
কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে তাকাল ডায়মণ্ডহার্ট। উত্তেজনায় কাঁপছে। কিশোরের মনে হলো, কুকুরটাও যেন মজা পাচ্ছে ওদের রসিকতায়।
কুকুরগুলোর উদ্দেশ্যে চিৎকার করে উঠল জোসি, হাইক! হাইক!
জমাট তুষারে পা বসিয়ে টান দিল কুকুরগুলো। একসঙ্গে ঝাঁপ দিল সামনের দিকে। অসমতল বরফের ওপর দিয়ে ঝাকি খেতে খেতে নদীর দিকে ছুটল স্লেজ। আচমকা এই তীব্র গতিবেগ অবাক করল কিশোর ও মুসাকে।
হাইক! হাইক! আবার চিৎকার করে উঠল জোসি। বাঁ পায়ের ভর রানারে রেখে ডান পা নামিয়ে লগি দিয়ে নৌকা বাওয়ার মত করে ঠেলা মারছে, গতি বাড়াতে

সাহায্য করছে কুকুরগুলোকে।
পার্কার গলার কাছের ফিতে বাধল কিশোর। মাথার হুড তুলে কান ঢাকল। বাতাসে বরফের ছোঁয়া। হাঁটার সময় এত গতিও থাকে না, এত বাতাসও লাগে না। কনকনে ঠাণ্ডা ইতিমধ্যেই ওর নাক-গাল অসাড় করে দিয়েছে।
নদীর পাড়ে পৌঁছল গাড়ি। জমাট বরফের ওপর গাড়িটা লাফিয়ে ওঠার সময় থাবা দিয়ে গাড়ির ধার খামচে ধরল কিশোর। ওর মনে হলো, আকাশে উড়াল দিয়েছে স্লেজ।
মহা আনন্দে চিৎকার করে উঠল মুসা, ইয়াহু!
পিচ্ছিল বরফে উঠে আসায় গতি বেড়ে গেল স্লেজের। আরও জোরে টানতে লাগল কুকুরগুলো। গতি বাড়ানোর জন্য ওগুলোরও যেন রোখ চেপে গেছে।
চিৎকার করে বলল জোসি, আরে থাম, থাম!
শীতের রৌদ্রালোকে ঝকঝক করছে সাদা বরফ। চোখে লাগে। চোখের পাতা সরু করে চারপাশে তাকাতে লাগল কিশোর। দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত সীমাহীন আলাস্কার বরফে ঢাকা এই আদিম প্রকৃতিতে কিছুই নড়ছে না, কোন শব্দ নেই, একমাত্র বরফের ওপর দিয়ে ছুটে চলা স্লেজ ও একপাল কুকুরের নিঃশ্বাসের শব্দ ছাড়া।
সামনে দুই ভাগ হয়ে গেছে পথটা। চিৎকার করে ডায়মণ্ডহার্টকে নির্দেশ দিল জোসি, জি! ডায়মণ্ড, জি!
মুহূর্তে ডানে মোড় নিল ডায়মণ্ডহার্ট।
ডানে ঘোরার জন্য জি, কিশোর বলল, বাঁয়ে ঘোরাতে হলে?
হউ! জোসি বলল। স্লেজ ডগকে প্রথম যে দুটো শব্দ শিখতে হয়, তা হলো এই জি আর হউ।
ভীষণ ঠাণ্ডা! মুসা বলল।
হ্যাঁ।
তাপমাত্রা এখন শূন্যের বিশ ডিগ্রি নীচে।
নদীর ওপর দিয়ে কোণাকুণি ছুটছে স্লেজ। বহু ব্যবহৃত পথটা দেখে বোঝা যায় মাত্র একটা স্লেজ চালিয়ে এই রাস্তা তৈরি করা সম্ভব নয়। শহরের অন্য মাশাররাও নিশ্চয় এই পথ ব্যবহার করে। লাকড়ি আনতে নদী পেরিয়ে বনে যায়। ইউকন নদীটা শীতকালে হয়ে যায় গ্লিটারবাসীর মহাসড়ক।
কে আসে দেখো! জোসি বলল।
একসঙ্গে ফিরে তাকাল কিশোর-মুসা দুজনেই।
ওদিকে নয়, বাঁয়ে তাকাও, জোসি বলল।
গলা লম্বা করে বাঁয়ে তাকাল কিশোর। নদীর তীর ধরে আরেকটা কুকুর-বাহিনীকে এগিয়ে আসতে দেখল। জোসিকে জিজ্ঞেস করল, কে, টেড নাকি?

তোমার সঙ্গে রেস খেলতে আসছে?
নাহ্, প্র্যাকটিস করছে।
দৌড়াচ্ছে তো খুব জোরে, বিড়বিড় করল মুসা। পালাচ্ছে নাকি?
পালাবে কেন? টেডের দিকে তাকিয়ে আছে জোসি। গাড়িতে মালপত্র নেই, বোঝা নেই, সে-কারণেই গতি বেশি। এভাবে প্র্যাকটিস করাটা ভুল। তাতে আসল রেসের সময় যখন বোঝা নিয়ে দৌড়াবে কুকুরগুলো, অনভ্যস্ততার কারণে অসুবিধে হবে ওদের। যা ইচ্ছে করুকগে, আমার কী।
টেডকে ভাল করে দেখার জন্য অনেকখানি ঘাড় ঘোরাল কিশোর।
আচমকা চেঁচিয়ে উঠল, জোসি, এত ধোয়া কেন শহরে?
কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে তাকাল জোসি। চমকে গেল সে-ও। হুয়া! হুয়া! বলে উত্তেজিত চিৎকার করে থামতে বলল কুকুরগুলোকে। এত জোরে ব্লেড-ব্রেক চেপে ধরল, তুষারে বসে গেল ব্রেকের ব্লেড। নৌকার মত দুলে উঠল স্লেজ। প্রচণ্ড ঝাঁকি লাগল।
দাঁড়িয়ে গেল ডায়মণ্ডহার্ট সহ বাকি কুকুরগুলো।
কিছু একটা হয়েছে, চিন্তিত ভঙ্গিতে ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে আছে জোসি। শহরের একধারে কালো ধোয়ার মোটা একটা রেখা আকাশে উঠে যাচ্ছে।
কীসের ধোঁয়া? জানতে চাইল মুসা।
চাচার কেবিনে আগুন লেগেছে! জোসি বলল।
স্লেজ থেকে নেমে পড়ল জোসি। চেঁচিয়ে বলল, নামমা! নামো! গাড়ি ঘোরাতে হবে!
লাফিয়ে নামল কিশোর-মুসা। দৌড় দিল জোসির পিছনে। রুক্ষ বরফ। লাগাম পরা অবস্থায়ই কুকুরগুলোকে টেনে নিয়ে এল ওরা। গ্লিটারের দিকে মুখ করাল। স্লেজের মুখও ঘুরিয়ে দিল একই দিকে।
লাফ দিয়ে আবার স্লেজে গিয়ে উঠল কিশোর-মুসা। লাগাম ধরে চিৎকার করে উঠল জোসি, ডায়মণ্ডহার্ট! হাইক! হাইক!
সামনে ঝাঁপ দিল কুকুরটা। বরফে নখ বসাল। ওর পেশীবহুল শক্তিশালী বুকে চেপে বসল চামড়ার লাগাম। দেখাদেখি বাকি কুকুরগুলোও একই কাজ করল। ছুটতে শুরু করল স্লেজ।
নদীর ভাটির দিকে চলেছে এখন ওরা। জেফরি টিনুকের কেবিনের ওপর কুণ্ডলী পাকিয়ে উড়ছে কালো ধোঁয়া।
ফুল স্পিডে কুকুরগুলোকে ছুটিয়ে নিয়ে চলল জোসি। চিৎকার করে ক্রমাগত নির্দেশ দিতে থাকল, টান, ডায়মণ্ড, টান! টেনে যা!

লাগামের সঙ্গে গা মিলিয়ে দেহটাকে টান টান করে ফেলেছে ডায়মণ্ডহার্ট। জরুরি অবস্থা আঁচ করে ফেলেছে কুকুরগুলো।
জোসি, কী হয়েছে বলো তো? এতক্ষণে জিজ্ঞেস করার সুযোগ পেল কিশোর।
বুঝতে পারছি না, চিন্তিত ভঙ্গিতে জবাব দিল জোসি। অনেক কিছুই ঘটতে পারে। তবে আগুন লাগাটা এখানে ভয়ানক ব্যাপার। পুরো শহরটাই কাঠের তৈরি।
টেডের দিকে তাকাল কিশোর। শহর থেকে দ্রুত দূরে সরে যাচ্ছে ওর স্লেজ। অবাক হলো কিশোর। আগুন দেখেনি নাকি? ওকে বলা দরকার।
চিল্কার করে ডাকল জোসি, টেড! এই টেড!
ফিরেও তাকাল না টেড। যেন জোসির ডাক ওর কানেই ঢোকেনি।
আবার ডাকল জোসি। এবারও তাকাল না টেড। কুকুর-বাহিনী নিয়ে ছুটতে ছুটতে সরে যেতে লাগল শহর থেকে দূরে।
থামল না কেন? মুসার প্রশ্ন।
এতদূর থেকে বোধহয় আমার ডাক শুনতে পায়নি, জবাব দিল জোসি।
কিন্তু কিশোরের যথেষ্ট সন্দেহ হলো। সমতল জমাট বরফের ওপর দিয়ে এমনিতেই শব্দ চলে বহুদূর। তা ছাড়া এখানে বাধা দেবার মতও কিছু নেই। জোসিকে উপেক্ষা করার জন্য শুনেও না শোনার ভান করেছে টেড। জরুরি কাজে সহায়তা করার জন্য ওকে ডাকা হয়েছে, সেটা নিশ্চয় বুঝতে পারেনি।
ওদেরকে নদীতীর পার করিয়ে আনল ডায়মণ্ডহার্টের দল। কেবিনের কাছের সমতল জায়গাটায় পৌঁছল স্লেজ। গাড়ি থামাল জোসি। লাফিয়ে নামল কিশোর ও মুসা।
ইতিমধ্যে শহরের লোক জড় হয়ে একটা স্বেচ্ছাসেবী অগ্নিনির্বাপক-বাহিনী গঠন করে ফেলেছে। নারী-পুরুষ সবই আছে তাদের মধ্যে। সবার হাতে বালতি। কেবিনের কাছ থেকে লম্বা সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে ওরা। সারির এক মাথা একটা পানির ট্যাংকের কাছে, অন্য মাথা কেবিনের কাছে। হ্যাণ্ড পাম্প লাগানো একটা লম্বা হোস পাইপ নিয়ে দৌড়ে এল তিনজন লোক।
দমকল নেই? চারপাশে তাকিয়ে দমকলের গাড়ি খুঁজতে লাগল মুসার চোখ।
নাহ, জোসি জানাল।
ট্যাংক থেকে পানি নিয়ে বালতি এগিয়ে দিতে থাকল অগ্নিনির্বাপকদের বালতি-বাহিনী। কেবিনের সবচেয়ে কাছে দাঁড়িয়েছে চওড়া কাঁধওয়ালা একজন শক্তিশালী পুরুষ। পাশের লোকটার হাত থেকে বালতি নিয়ে পানি ছুঁড়ে দিচ্ছে আগুনের ওপর। খালি বালতিটা পাশের লোকটাকে ফিরিয়ে দিয়ে আরেকটা ভরা বালতি নিচ্ছে ওর হাত থেকে। হাতে হাতে খালি বালতিটা চলে যাচ্ছে ট্যাংকের

কাছে, পানি ভর্তি হয়ে আবার ফিরে আসছে প্রথমজনের হাতে। পানি বহনের কাজ দ্রুত চলছে এভাবে।
তুষার সরানোর একটা বেলচা তুলে নিয়ে কিশোরের দিকে ছুঁড়ে দিল জোসি। আরেকটা দিল মুসাকে। তৃতীয় আরেকটা নিজে নিয়ে চিৎকার করে বলল, আগুনে তুষার ফেলতে থাকো। বেলচা তুলে দেখাল, ওই যে আমার চাচা-চাচী।
বেলচায় করে তুষার তুলে নিয়ে কেবিনের খোলা জানালা দিয়ে ভিতরে ছুঁড়ে দিল কিশোর। ফেলতে থাকল এভাবে। কঠিন কাজ। অল্পক্ষণেই হাঁপিয়ে গেল। মুখ দিয়ে বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে বরফ-কণায় রূপান্তরিত হচ্ছে বাতাস। বিচিত্র আকৃতি। কোনটা রিঙ, কোনটা লম্বা। মুসাও পাল্লা দিয়ে তুষার ফেলছে ঘরের ভিতর। ঘোঁৎ-ঘোৎ শব্দ বেরোচ্ছে মুখ দিয়ে। এখন ওদের সঙ্গে এসে যোগ দিয়েছে আরও অনেকে। জ্বলন্ত কেবিনটা ঘিরে ফেলেছে অগ্নিনির্বাপক-বাহিনী।
তুষার ফেলার দিকেই কিশোরের নজর ছিল এতক্ষণ, এখন খেয়াল করে দেখল, আগুনের শিখা আর দেখা যাচ্ছে না। শুধু ভলকে ভলকে উঠে যাওয়া সাদা ধোঁয়া। আগুনের কারণে দূরে সরে থাকতে বাধ্য হয়েছিল এতক্ষণ মেরুর ঠাণ্ডা। সুযোগ পাওয়ামাত্র কামড় বসাল আবার। গায়ে। কিশোরের মেরুদণ্ড বেয়ে শীতল শিহরণ বয়ে গেল।
আগুনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জেতা মানুষগুলো উল্লাসে চিৎকার করে উঠল। চওড়া হাসি ফুটল কিশোর-মুসা-জোসির মুখেও। একে অন্যের পিঠ চাপড়ে দিয়ে আনন্দ প্রকাশ করল ওরা।
চাচা-চাচী আর চাচাত বোন মুনস্টোনের সঙ্গে কিশোর ও মুসাকে পরিচয় করাতে টেনে নিয়ে গেল জোসি। স্তব্ধ হয়ে গেছে টিনুক পরিবার। সহায়-সম্পত্তি বলতে যা ছিল ওদের, কেবিনটার সঙ্গে সঙ্গে সব গ্রাস করে নিয়েছে আগুন।
খুব খারাপ লাগছে আমার, মিস্টার টিনুক, সহানুভূতির সুরে কিশোর বলল।
জোর করে মুখে দুর্বল হাসি ফোটালেন জোসির চাচী। জবাবটা তিনিই দিলেন। থ্যাংক ইউ। মিস্টার বলা লাগবে না, ওকে শুধু জেফরি বললেই চলবে। আমাকে এরিনা। আমরা এখানে অত সৌজন্য আর ফর্মালিটির ধার ধারি না। তোমাদের জন্য আমারও খারাপ লাগছে। গ্লিটারে এলে বেড়াতে, আর এ সময়ই এ রকম একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। খাতির-যত্নও করতে পারব না ভালমত। আজ রাতটা কোথায় কাটাব, সেটাই জানি না।
অত চিন্তা করছ কেন, চাচী, জোসি বলল। আমাদের বড় কেবিনটাতেই থাকো। ধীরে সুস্থে তোমাদের কেবিনটা আবার বানিয়ে নিয়ো।
নিজেদের কেবিনের পোড়া দরজার কাছে গিয়ে ভিতরে উকি দিলেন জোসির চাচা। দেখে, ফিরে এলেন আগের জায়গায়।

মুন জিজ্ঞেস করল, কী দেখলে, বাবা?
মুনকে দেখছে মুসা। বয়েসে ওদের চেয়ে বছরখানেকের ঘোট। সুন্দরী। গভীর নীল চোখ।
পিছন দিকটাতেই ক্ষতি বেশি হয়েছে, জেফরি জানালেন। কিছু জামা-কাপড় আর ফার্নিচার বোধহয় বাঁচানো যাবে।
বাঁচানো গেলেও সাফ করতে জান বেরোবে, মুন বলল। যে পরিমাণ কালিঝুলি আর ছাই পড়েছে।
স্টোভটা জ্বেলে দিয়ে আসি, জোসি বলল।
মুসা জিজ্ঞেস করল, আমরা কোনও কাজে লাগতে পারি?
মাথা নাড়ল জোসি, না। আমিই পারব।
যে কেবিনে কিশোরদের থাকতে দিয়েছে, তার পরের কেবিনটার দিকে এগোল জোসি।
জেফরির দিকে ফিরল কিশোর। আগুন লাগল কীভাবে?
জানি না, মাথা নাড়লেন জেফরি। লাকড়ি আনতে বনে গিয়েছিলাম আমরা। ফিরে এসে দেখি জানালায় আগুনের আলো। দেখেই বুঝে গেলাম, চিমনির আগুন না।
কী করে বুঝলেন? জিজ্ঞেস করল মুসা।
জবাব দিতে যাচ্ছিলেন জেফরি, বাধা দিল মুন। ফিসফিস করে বলল, বাবা, আস্তে। ব্রিণ্ডল জ্যাক আসছে।
শক্ত হয়ে গেল জেফরির চোয়াল। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, আসতে দাও!
ঘুরে তাকাল কিশোর। ব্রিণ্ডল জ্যাককে দেখল। চেহারা আর ভাবভঙ্গি সন্দেহ জাগায়। মুখে বিচিত্র বাঁকা হাসি। ঠোটের এক কোণ বাঁকিয়ে হাসে। চোখে কুটিল দৃষ্টি।
দুঃখই লাগছে, জেফ, জ্যাক বলল। অবশ্য এমনিতেও পুরানো হয়ে গিয়েছিল কেবিনটা, নতুন আরেকটা বানাতে হতই। দেরি না করে শুরু করে দাও, বানাতে সময় লাগবে না। যে কাজটা ভাল, পারো, সেটা বাদ দিয়ে কেন যে জানোয়ার ধরতে যাও বুঝি না। ওসব তোমার কর্ম নয়। একটা পরামর্শ দিই শোনো, এখনও সময় আছে, জানোয়ার ধরা বাদ দিয়ে কেবিনের ব্যবসায় লাগো। গ্লিটারকে যদি সত্যিই থিম পার্ক বানানো হয় কখনও-এবং আমার বিশ্বাস, হবে-তাহলে কাজের অভাব হবে না তোমার।
তোমার পরামর্শ ছাড়াই এতকাল কাটিয়েছি, বাকি দিনগুলোও কাটাতে পারব! কঠিন কণ্ঠে বললেন জেফরি।

জ্যাকের ঠোটের কোণে হাসিটা বাড়ল। এই একটিবার অন্তত আমার পরামর্শ তোমাকে শুনতেই হবে, জেফ, নইলে শীতে জমে মরবে। যদি চাও তো তোমার কেবিন বানানোয় সাহায্য করতে পারি আমি।
ব্যঙ্গ করছে কি না জ্যাক বোঝা গেল না।
ভুরু কুঁচকে গেল জেফরির। চোখের পাতা সরু হয়ে এল। এত হাসি কেন তোমার মুখে, ব্রিণ্ডল? আগুন লাগানোয় তোমার হাত ছিল না তো?
না, ছিল না, সহজ কণ্ঠে জবাব দিল জ্যাক। থাকলে নিভানোয় সাহায্য করতে আসতাম না। তুমি তোক ভাল না, জেফ, তাই অন্যের জায়গায় ফাঁদ পেতে শয়তানি করতে পারো, কিন্তু আমি তো আর তোমার মত নই। যাক, কেবিনটা পুড়ে যাওয়ায় কিছুদিন শান্তিতে থাকতে পারব। এখানে তোমাকে কেবিন বানানোয় ব্যস্ত থাকতে হবে, বনে গিয়ে আমার ফাঁদ পাতায় বাগড়া দিতে পারবে না। টেনে টেনে হাসতে লাগল ও।
মুঠোবদ্ধ হয়ে গেল জেফরির হাত। শঙ্কিত হলো কিশোর। হাতাহাতি না বেধে যায়। মুসাও চোখের পাতা সরু করে জ্যাকের দিকে তাকিয়ে আছে।
আগুনটা কীভাবে লেগেছে বলে তোমার ধারণা? জেফরি জিজ্ঞেস করলেন।
এটা কোনও প্রশ্ন হলো? জ্যাক বলল, ম্যাচের কাঠি, মশালের আগুন, ঘরের মধ্যে হ্যারিকেন উল্টে পড়া... কাঠের কেবিনে আগুন ধরানোটা কোন ব্যাপারই না। যেভাবেই ধরুক, তোমার কেবিনটার জন্য আমার দুঃখ হচ্ছে, জেফ। কিন্তু কী আর করবে। অ্যাক্সিডেন্ট তো আর বলে কয়ে আসে না।
ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল জ্যাক। ওর পিছু নিতে যাচ্ছিলেন জেফরি। ধরে ফেললেন এরিনা। না না, যেয়ো না।... বাইরে ঠাণ্ডা লাগছে। ঘরে চলো। চা খাই। রাতের খাওয়ার ব্যবস্থাও করতে হবে।
বাবা-মা চলে গেলে কিশোরদের দিকে ফিরল মুন। ফাঁদ পাতা নিয়ে বাবা আর ব্রিণ্ডল আঙ্কেলের ঝগড়াটা চিরকালের। দেখা হলেই শুরু করে। ঝগড়া না করে ওই সময়টা যদি থিম পার্ক নিয়ে মাথা ঘামাত, ভাল করত। থিম পার্কের কথা জোসি তোমাদের কিছু বলেছে নাকি?
বলেছে, জবাব দিল মুসা। পার্ক বানানোর ব্যাপারে তোমার বাবার কী মত?
বাবা পুরোপুরি এর বিপক্ষে, মুন বলল। বাবা বলে, থিম পার্কটা হতে দিলে আমরা হয়ে যাব সার্কাসের জানোয়ার। টুরিস্টরা আসবে, এমন ভঙ্গিতে তাকাবে আমাদের দিকে, যেন আমরা অদ্ভুত কোন জীব। প্রকৃতির মাঝে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার অধিকারও হারাব আমরা।
কিশোর জিজ্ঞেস করল, ব্রিণ্ডল জ্যাক কী বলে? সে কোন্ পক্ষে?

কীভাবে বলি? ও একটা অদ্ভুত চরিত্র। বাবা যদি কিছু করে, সে করবে ঠিক তার উল্টো। জেদ করেই যেন করে এ সব। হয়তো এ ক্ষেত্রেও বিপক্ষেই যাবে।
সেজন্যই কি তোমাদের কেবিনে আগুন ধরাল? হেসে বলল মুসা।
মুসার দিকে তাকাল মুন। না, এত পাগল না! শহরের বাড়িঘর যে সব কাঠের তৈরি, তা তো নিশ্চয় দেখেছ। শীতকালে শুকিয়ে ঠনঠনে হয়ে থাকে। বাতাস বইছে না বলে আজ বেঁচে গেছি। একটু বাতাস থাকলেই আমাদের কেবিনের আগুন সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ত। পুড়ে ছাই হতো গোটা শহর। পাগল হয়ে না গেলে এখানকার কোন লোক কারও ঘরে আগুন দেবে না, সেটা যার ঘরই হোক।
দুজনকে নিয়ে জোসিদের কেবিনে ঢুকল মুন। ঘরের ভিতরটা এখনও ঠাণ্ডা। তবে স্টোভের আগুনের উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ছে ধীরে ধীরে। ঘর গরম হতে দেরি হবে না। গায়ের পার্কা খুলে ফেললেন এরিনা। ঝুলিয়ে রাখলেন দরজায় গাঁথা হুকে। পাঁচ গ্যালনের একটা ক্যান থেকে কেটলিতে পানি ঢেলে চুলায় চাপালেন।
দুটো খালি ক্যান তুলে নিতে নিতে মুন বলল, আরও পানি লাগবে। ঝর্না থেকে নিয়ে আসিগে।
একটা ক্যান দাও আমার হাতে, হাত বাড়াল মুসা। আমিও তোমার সঙ্গে যাই।
হাসল মুন। দরকার নেই। তুমি ভাবছ আমার কষ্ট হবে? এ সব আমাদের দৈনন্দিন কাজ, জন্মের পর থেকে করে আসছি। স্লেজ নিয়ে চলে যাব। কোনও অসুবিধে হবে না।
মুন বেরিয়ে গেলে জোসি ঢুকল। মলিন হাসি হেসে বলল, খুব বিরক্ত লাগছে, না? আমাদের জীবন এমনই। বিপদে ভরা। নানা
প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করে আমাদের টিকে থাকতে হয়।
জোসি, এরিনা বললেন, তুমি চলে যাওয়ার পর ব্রিণ্ডল এসেছিল। আরেকটু হলেই হাতাহাতি বেধে যাচ্ছিল দুজনে।
কী নিয়ে? থিম পার্ক?
ঝগড়া তো করল ফাঁদ পাতা নিয়ে, তবে আমার মনে হয় থিম পার্কের পরিকল্পনাটাই আসল কারণ। তোমার চাচা যেহেতু পার্ক বানানোর বিপক্ষে, জানা কথা ব্রিণ্ডল যাবে পক্ষে, সব সময় উল্টো, এটাই তো হয়ে আসছে। ভোটটা শেষ হলে বাঁচি। এদিক ওদিক কিছু একটা হয়ে যাক। শহরটাকে দুই ভাগ করে ফেলেছে ওই থিম কোম্পানি। সবার ওপর সবাই খেপা। এমন তো কখনও হয়নি। এ কী গজব নেমে এলো!
কোন দল জিতছে? জানতে চাইল কিশোর।
মুখ বাঁকাল জোসি। বোঝা যাচ্ছে না। আগামী হপ্তায় ভোটাভুটি শেষ হওয়ার আগে বুঝতে পারবও না কিছু। কেউ মুখ খোলে না। কে যে কাকে সাপোর্ট করছে,

বোঝা কঠিন।
লুক স্টার্লিঙের কথাই ধরা যাক। সে কাকে সাপোর্ট দিচ্ছে, কিছুতেই বুঝতে দেয় না, এরিনা বললেন। চালাক তোক তো। ওর দোকান থেকে মাল কেনা বন্ধ করে দেবে এই ভয়ে কাস্টোমারদের বুঝতে দেয় না কোন পক্ষ সমর্থন করে ও। সবার মন রক্ষা করে চলতে চায়।
অকারণ ভয়, জেফরি বললেন। লোকে ওর দোকান থেকে জিনিস কিনতে বাধ্য, কেউ ওকে পছন্দ করুক বা না করুক।
টেডের ব্যাপারটা কী? জিজ্ঞেস করল মুসা।
হাসল জোসি। টেডের এখন একটাই ভাবনা, ইডিটারোড রেসে আমাকে পরাজিত করা। এ ছাড়া ওর মগজে আর কোন চিন্তা খেলে না। ওর বাবা মিস্টার সিউল থিম পার্কের পক্ষে। শুনলাম, ব্রিণ্ডলও গিয়ে তার সঙ্গে খাতির জমিয়েছে।
সিউলকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি আমি, জেফরি বললেন। চুপ করে থাকে, কোন জবাব দেয় না। মুশকিল। ওদের ধারণা, পার্ক হলে শহরের ক্ষতি না হয়ে বরং লাভ হবে, আয় বেড়ে যাবে লোকের।
জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল কিশোর। মাত্র কয়েক গজ দূরে মাথা তুলে রেখেছে কালোবন। জেফরি, জোসি, জোসির বাবা-সবার কেবিনই এই বনের মধ্যে। কেউ আগুন লাগাতে চাইলে বনের ভিতর দিয়ে এসে সহজেই কাজটা সেরে যেতে পারে। জেফরিকে কথাটা বলতে যাচ্ছিল কিশোর, কিন্তু তার আগেই জানালায় এসে পড়ল একটা ভারী জিনিস। ঝনঝন করে ভেঙে পড়ল কাঁচ।
লাফ দিয়ে সরে গেল মুসা। কাঁচের টুকরো থেকে বাঁচাতে দুই হাত ঝটকা দিয়ে উঠে এল মুখের সামনে। কেবিনের মেঝেতে এসে পড়ল একটা মোটা আধপোড়া লাকড়ি। সময়মত মাথাটা সরিয়ে ফেলায় অল্পের জন্য লাগেনি মাথায়। জানালা দিয়ে ওকে সই করেই বোধহয় ছুঁড়ে মেরেছিল কেউ।
এক টানে হুক থেকে পার্কাটা খুলে নিয়ে দরজার দিকে দৌড় দিল মুসা। ছাড়বে না লোকটাকে।
কিন্তু বাইরে এসে মুনস্টোনকে ছাড়া আর কাউকে চোখে পড়ল। জে নিয়ে আসছে মুন। বিশ গজ দূরে রয়েছে এখনও। তার পক্ষে এত তাড়াতাড়ি লাকড়ি ছুঁড়ে আবার স্নেজের কাছে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। তা ছাড়া সে ছুঁড়তেই বা যাবে কেন?
মুন চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল মুসা, এদিক দিয়ে কাউকে যেতে দেখেছ?
না! জবাব দিল মুন। কী হয়েছে?
কিশোরও বেরিয়ে এল। মুসাকে জিজ্ঞেস করল, লোকটাকে দেখেছ নাকি?
মাথা নাড়ল মুসা। না!

তারমানে পালিয়েছে, চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর।
কাছে এল মুন। ততক্ষণে জেফরি আর জোসিও বেরিয়ে এসেছে। জেফরির হাতে একটা লাকড়ি। লাঠির মত করে ধরেছেন।
ওদের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল কিশোর। নেই। আমার মনে হয় বনের ভিতর দিয়ে পালিয়েছে।
সব শুনে মুখ কালো হয়ে গেল মুনের। জ্বলে উঠল চোখ। কী শুরু হলো আমাদের শহরটায়!
হাতের দিকে তাকালেন জেফরি। লাকড়ি দেখে অবাক হলেন। ওটা কীভাবে এসেছে তার হাতে, মনে করতে পারলেন না। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, এখানে দাঁড়িয়ে থেকে আর লাভ নেই। কেবিনে চলো। ভাঙা জানালাটা বন্ধ করা দরকার। ঘরে ঠাণ্ডা ঢুকবে।
সারি দিয়ে ঘরে ঢুকল সবাই।
কালো রঙের একটা প্লাস্টিকের চাদর খুঁজে বের করল জোসি। কাঁচভাঙা জানালার ফোকরটা বন্ধ করতে ওকে সাহায্য করলেন জেফরি। ঝাড়ু দিয়ে কাচের টুকরোগুলো মেঝে থেকে সরিয়ে ফেললেন এরিনা। তারপর চা ঢাললেন। চা খাওয়ার জন্য সবাই এসে টেবিলে বসল।
জোসির দিকে তাকালেন এরিনা। তোমার ঘর তো শূন্য। কোনও খাবারই নেই। আমাদেরগুলোও পুড়ে ছাই। দোকানে যেতে হবে।
আমি লিস্ট বানাচ্ছি।
চামচ দিয়ে নেড়ে চা ঠাণ্ডা করছে কিশোর। বলল, আগুন লাগার কারণ এখনও জানি না আমরা। আপনাআপনি লেগেছে, না কেউ লাগিয়ে দিয়েছে জানি না। তবে কড়িটা আপনাআপনি উড়ে আসেনি। কেউ জানালা দিয়ে ছুঁড়ে মেরেছে। নীচের ঠোট কামড়াল। তারপর চামচটা রেখে মুখ তুলে তাকাল। কে?
সেটা তো আমিও বুঝতে পারছি না! ধরতে পারলে আজ...দাঁত কিড়মিড় করলেন জেফরি।
এ সব ঘটনা এখন ডালভাত হয়ে গেছে গ্লিটারে, মুন বলল। থিম পার্ক বানানো নিয়ে ঝগড়া করে শহরটাই ধ্বংস হয়ে যাবে মনে হচ্ছে।
মুনের কথা সমর্থন করল জোসি। ইদানীং প্রায়ই ছোটখাট দুর্ঘটনা ঘটে যাচ্ছে শহরে। আগেও যে একেবারে ঘটত না তা নয়, তবে এখনকার মত এত বেশি না।
তারমানে তোমরাই একমাত্র লক্ষ্য নও? কিশোরের প্রশ্ন। কিশোরের দিকে তাকাল মুন। কিশোর, তোমাদের কথা সব আমাকে বলেছে জোসি। তোমরা গোয়েন্দা। অনেক জটিল রহস্যের সমাধান করেছ। আমাদের গ্লিটারের রহস্যটার সমাধান করতে পারবে?

কেন, পুলিশ কিছু করতে পারছে না?
দমকল বাহিনী যেমন নেই-আগুন লাগলে আমাদের নিজেদেরকেই আগুন নিভাতে হয়-দেখলেই তো, পুলিশও নেই আমাদের শহরে, কথাটা বলে আবার মুদির লিস্ট দেখায় মন দিলেন এরিনা।
পুলিশ না থাকলেও দরকার পড়লে স্টেট ট্রুপারদের ডাকতে পারি আমরা, মুন বলল। তবে কখনও ওদের ডাকার প্রয়োজন পড়েনি। এবার মনে হয় পড়বে।
হুঁ, মাথা ঝাঁকাল কিশোর। আমাদের সাধ্যমত চেষ্টা আমরা করব।
এখানে, আলাস্কার এই দুর্গম অঞ্চলে জীবনযাত্রা মোটেও সহজ নয়, কিশোর, জোসি বলল। সব সময় কোন না কোন বিপদ লেগেই আছে। তোমাদের রকি বিচের মত নিরাপত্তা আর সুযোগ-সুবিধা পাবে
এখানে। কলের চাবিতে মোচড় দিলে সাপ্লাইয়ের পানি আসে না, হাসপাতাল নেই, একশো মাইলের মধ্যে একজন ডাক্তারও নেই।
সে-কারণে সাধারণ ছোটখাট দুর্ঘটনাকে আমরা তেমন কিছুই মনে করি না, এরিনা বললেন। সব কিছু নিয়ে ভাবতে গেলে টিকতে পারতাম না। অনেক কিছুই মনে রাখি না আমরা। কিন্তু কেউ আমাদের কেবিনে আগুন দিলে, সেটা আমরা ভুলতে পারি না।
আপনাদের বিরুদ্ধে কার এমন আক্রোশ থাকতে পারে? জিজ্ঞেস করল মুসা।
ব্রিণ্ডল জ্যাক, একসঙ্গে বলে উঠলেন এরিনা ও মুন। এরিনা বললেন, শিকারের ওই জায়গাটা নিয়ে দশ বছর হলো জেফরির সঙ্গে ঝগড়া। এখনও মিটমাট হলো না।
অস্বস্তি বোধ করছেন জেফরি। জ্যাক বদমেজাজী, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ঘরে আগুন দেয়ার মত এতবড় একটা অন্যায় কাজ সে করবে বলে আমি মনে করি না। কিন্তু আমি ভাবছি আরেকজনের কথা। ইডিটারোড রেসে জিততে পারলে ভাল টাকা পাওয়া যায়। এ সময় আমাদের ঝামেলায় ফেলে দিতে পারলে রেসে মনোযোগ দিতে পারবে না জোসি।
তাই বাধা দিয়ে আমাকে রেসে যাওয়া থেকে বিরত রাখতে চাইছে, এই তো বলতে চাও? ভুরু নাচাল জোসি। তুমি কি টেডকে সন্দেহ করছ, চাচা? ঝামেলা পাকিয়ে আমাকে যদি ঠেকাতে চায়, লাভ হবে না, আমি ওকে ছাড়ব না...।
জেফরির দিকে ফিরল কিশোর। আঙ্কেল, থিম পার্ক বানানোয় আপনি বিরোধিতা করছেন। আপনি দলের নেতা। এ নিয়ে আপনার সঙ্গে শত্রুতা করছে না তো বিপক্ষের কেউ?
জানি না। তবে ইলকিস বিগস মরিয়া। ওর পরিকল্পনা বাস্তবায়নের যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। তবে তাই বলে কারও ঘরে আগুন দেয়ার মত খারাপ লোক না ও।

ভাবছি, আমি আর কিশোর গিয়ে একটু ঘোরাঘুরি করে খোজখবর নিয়ে আসব কি না, মুসা বলল। আমরা এখানকার বাসিন্দা নই। লোকে আমাদের সঙ্গে মন খুলেই কথা বলবে।
তা ঠিক, হাসল জোসি। দুজন চিকাকোকে সন্দেহ করবে না লোকে।
কিশোর জিজ্ঞেস করল, নতুন কেউ এলে তাকে চিকাকো বলে নাকি?
জোসি বলল, হ্যাঁ। এক শীত কাটানোর পর চিকাকোর বদলে তোমরা হয়ে যাবে সাওয়ার-ডো, অর্থাৎ টক হয়ে যাওয়া ময়দার তাল। শব্দটা চালু করেছিল পুরানো আমলের স্বর্ণসন্ধানীরা। রুটি বানাতে ময়দার সঙ্গে ঈস্টের বদলে সাওয়ার-ডো ব্যবহার করত ওরা...
রুটি, রুটি! মনে করিয়ে দিয়ে ভাল করেছ, এরিনা বললেন। ময়দা দরকার। আরও কিছু টুকিটাকি জিনিস। মুসা, যদি জেনারেল স্টোরের দিকে যাও তোমরা, জিনিসগুলো নিয়ে এসো। পারবে?
পারব,মুসা বলল।
এই যে লিস্ট।
ভালই হলো, কিশোর বলল। জিনিস কেনার ছুতোয় সহজেই স্টোরের মালিকের সঙ্গে কথা বলতে পারব।
কেবিন থেকে বেরিয়ে হেঁটে চলল দুজনে। কিছুদূর যেতে সামনে পড়ল গোল্ড ফেরানি। মাথায় এখন লাল ঘেঁড়া টুপি। গায়ে একটা সবুজ পার্কা।
থাকতে এসেছ নাকি এখানে? রুক্ষ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল বুড়ো।
না, রেস দেখতে এসেছি, মুসা বলল। ইডিটারোডের ডগ রেস।
বাঁকা চোখে ওদের দিকে তাকাল গোল্ড। নাকি সোনা খুঁজতে?
না, সোনা নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা নেই। আমাদের আগ্রহ ডগ রেসে।
সত্যি কথা বলল।
সত্যি কথাই বলছি।
ভাল। শোনো ইডিটারোডের সব খবর আমার জানা। টেড আর জোসি রেসে অংশ নিতে যাচ্ছে, তা-ও জানি। এটা গ্লিটারের জন্য একটা বড় খবর। তারচেয়েও বড় খবর আছে এখানে, যার দেখার চোখ আছে সে ঠিকই দেখতে পাবে।
কী খবর? কিশোরের প্রশ্ন।
নাকের একপাশে টোকা দিল গোল্ড। তা বলব না। গোপন ব্যাপার। চলি। কয়েক পা গিয়ে ফিরে তাকাল লোকটা। সোনার ব্যাপারে আগ্রহ দেখাতে যেয়ো না, তাহলে বিপদে পড়বে।
কিশোরের দিকে তাকাল মুসা। ও কী বলল, কিছুই তো বুঝলাম। সোনার খনিটনি পাওয়া গেছে নাকি এখানে? যেটা এখনও গোপন রয়েছে?

কী জানি! চিন্তিত ভঙ্গিতে কিশোর বলল। তবে আমার মনে হয় না। এখানে কোন কথা গোপন থাকে না। সোনার খনির মত এতবড় একটা খবর... সময় হলেই জানা যাবে। চলল।
শহরের ভিতর দিয়ে হাঁটার সময় চারপাশে নজর রেখে চলল মুসা। অনেক কিছুই দেখার আছে। একটা কেবিনের ছোট্ট জানালার কাছে বসে আছে দুটো ছোট ছেলে। মার্বেলের মত গোল কালো চোখ। খানিক দূর গিয়ে একজন বুড়ো মানুষের সঙ্গে দেখা। চেহারায় বয়েসের ভঁজ। পিঠে বাঁধা লাকড়ি, বোঝার ভারে কুঁজো। আরেকটা কেবিনের পাশ কাটানোর সময় ঘরের দরজায় বসা দুটো হাস্কি কুকুর লাফ দিয়ে উঠে দুজনের দিকে দাঁত খিচানো শুরু করল।
জেনারেল স্টোরের দিকে হাঁটতে হাঁটতে মুসা বলল, অকারণে থিম পার্ক করতে চাইছে না ওরা। টুরিস্ট এখানে সত্যি আসবে। দেখার অনেক কিছু আছে।
স্টোরের সামনে এসে দাঁড়াল দুজনে। ঠেলা দিয়ে দরজার পাল্লা খুলল। ওপরে লাগানো একটা ঘণ্টা টুং-টাং করে বেজে উঠল। ঘরে ঢোকার পর পাল্লা লাগানোর সময় আবার বাজল ঘণ্টা।
জেনারেল স্টোরের চেহারাটা মুসার অনুমানের সঙ্গে মিলল না। এত কিছু দেখবে আশা করেনি। ঘরের মাঝখানে পেটমোটা বিরাট একটা কালো রঙের লোহার স্টোভ বসানো। সামনে রাখা দুটো পুরানো কাঠের চেয়ার। দেয়ালের অসংখ্য তাক জিনিসপত্রে বোঝাই। টিনের খাবার থেকে শুরু করে ঘড়ি, হাতুড়ি, হারিকেন, সব আছে। কাপড়ের বস্তায় ভরা ময়দা, চাল আর পোষা জানোয়ারের খাবার ঘরের কোণে স্তূপ করে রাখা। কাঠের একটা কেবিনেট আছে, তাতে ভর্তি উলের শার্ট, প্যান্ট, দস্তানা, মোজা আর লাল রঙের প্লেইড ক্যাপ। ঘরের পিছনে বুনো জানোয়ারের রোমশ চামড়ার স্তূপ। শিকারিদের কাছ থেকে কেনা।
কাউন্টারের ওপাশ থেকে বেরিয়ে এলেন যিনি, একেবারে খাপে খাপে মানিয়ে গেছেন এই পরিবেশের সঙ্গে। বয়েস পঞ্চাশ। হাড্ডিসর্বস্ব লম্বা শরীর। মস্ত টাক। শার্ট আর টাইয়ের ওপরে নীল-সাদা ডোরাকাটা অ্যাপ্রন।
জোসেফ টিনুকের বন্ধু তোমরা, দোকানী বললেন, লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে এসেছ। আমি লুক স্টার্লিং। আমাকে মিস্টার স্টার্লিং ডেকে জিভে ব্যথা করার দরকার নেই। শুধু লুক বলবে।
এখানে কি কেউ মিস্টার শব্দটা সহ্য করতে পারে না নাকি? প্রশ্ন না করে পারল না মুসা।
না, পারে না। এই বুনো প্রকৃতির মধ্যে ওই শব্দটা খুব বেমানান, রীতিমত কানে পীড়া দেয়। তো, কী কী জিনিস দরকার?
এরিনার দেয়া লিস্টটা বের করে দেখাল কিশোর।

নিজেরাই তুলে নাও, লুক বললেন।
মুসাকে ইশারা করল কিশোর। লিস্ট মিলিয়ে তাক থেকে জিনিসগুলো তুলে নিতে লাগল মুসা।
সাংঘাতিক কাণ্ড, বুঝলে, ওই আগুন লাগার কথা বলছি, ওপরের তাকে রাখা কিছু টিনের খাবার নামিয়ে আনার জন্য একটা মই বেয়ে উঠে গেলেন লুক। সে-কারণেই বলি, নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকা দরকার। এমনই দরিদ্র অবস্থা শহরটার, ছোটখাট একটা দমকলবাহিনী পোরও সামর্থ্য নেই। তবে, থিম কোম্পানি যদি আসে...
আপনি কি ওদের আসা চান, মিস্টার স্টার্লিং? মুসা জিজ্ঞেস করল।
বলেছি না মিস্টার বলার দরকার নেই। শুধু লুক। হ্যাঁ, তোমার প্রশ্নের জবাব হলো, আমি নিরপেক্ষ। আমি হলাম দোকানদার। আমার জন্য সব সমান। পক্ষপাতিত্ব করে কাস্টোমারদের বিরাগভাজন হতে চাই না। দলাদলিটা ওরাই করুক। শহরবাসী যে সিদ্ধান্ত দেবে, সেটাই আমি নির্দ্বিধায় মেনে নেব। তবে ইলকিস বিগৃসের কথায়ও যুক্তি আছে, অস্বীকার করতে পারব না। ওর কোম্পানি আলাস্কার বহু জায়গাতেই এ ধরনের টুরিস্ট স্পট বানিয়েছে। লোকে কী চায় ওরা জানে...
দরজার ঘণ্টা বাজল। থেমে গেলেন তিনি। ঘরে ঢুকল একটা লোক, এখানকার রোদ আর বরফের সঙ্গে লড়াই করে টিকে আছে, দেখেই বোঝা যায়। গায়ে পুরানো মলিন পার্কা। কাউন্টারে রাখা বড় একটা বয়েম দেখিয়ে পঁচিশ সেন্ট দামের ক্যাণ্ডি চাইল।
ক্যাণ্ডি বের করে দিলেন লুক। লোকটার হাত থেকে পাঁচ সেন্টের পাঁচটা মুদ্রা নিয়ে ঝনাৎ করে ড্রয়ারে ফেললেন। লোকটা বেরিয়ে গেলে বললেন, ওর নাম জো সারটন। চার ছেলেমেয়ের বাপ। ওদের মুখে খাবার যোগাতে হয়। কাপড়ের অবস্থা দেখেই তো বুঝলে নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। থিম পার্ক হলে ভাল চাকরি পাবে। টাকা আসবে। অবস্থা ফিরে যাবে।
তারমানে থিম পার্কের পক্ষে ভোট দিচ্ছে ও? কিশোর বলল।
অন্যদিকে চোখ ফেরালেন লুক। উঁহু। জো স্পষ্ট করেই বলে দিয়েছে হ্যাঁ ভোটের মধ্যে সে নেই। কিন্তু ভাল থাকতে চাইলে ওর হ্যাঁ ভোটই দেয়া উচিত।
এরিনার লিস্টের সমস্ত জিনিসপত্র দুটো কার্ডবোর্ডের বাক্সে প্যাকেট করে দিলেন লুক। একটা কাচের বাক্স ভর্তি অ্যাথাবাস্কান হস্তশিল্পের দিকে মুগ্ধ চোখে কিশোরকে তাকিয়ে থাকতে দেখে বললেন, অনেক দামি ওগুলো। নেবে?
মেরিচাচীর জন্য একটা শো-পিস নেয়ার কথা ভাবছে কিশোর। হাসল। এখন না। পরে। জিনিসগুলো খুব সুন্দর।

ক্যালকুলেটর বের করে জিনিসের দাম হিসেব করলেন লুক। বিল বানালেন। টিনুকদের বাকির খাতায় লিখে রাখব। তোমরা এসো আবার। বাড়ি ফেরার আগে এসো। সস্তায় ভাল কী দেয়া যায়, চিন্তা করে দেখব।
অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, লুক, কিশোর বলল।
দুটো বাক্স নিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে এল মুসার পিছন পিছন।
বাইরে আসতেই বিগসের সঙ্গে দেখা। বলল, এমন কোনও জিনিস নেই যা লুকের দোকানে পাবে না। সব ধরনের খবরাখবর আর মন্তব্যও পাবে, বিনে পয়সায়। সম্ভব হলে এর জন্যও পয়সা নিত। মুখে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে, কিন্তু ভীষণ লোভী। থিম পার্কের কথা কিছু বলল নাকি? পক্ষে না বিপক্ষে?
পক্ষে-বিপক্ষে বোঝা গেল না, মুসা জানাল। তবে থিম পার্ক হলে শহরের গরিব মানুষদের দুঃখ ঘুচবে, এ কথাটা জোর দিয়েই। বললেন।
বিগ বলল, আমাদের নিজেদের স্বার্থ তো আছেই। তবে সত্যি সত্যি আমরা গিটারের মানুষকে সাহায্য করতে চাই। বাইরের সাহায্য ওদের প্রয়োজন।
কিন্তু আপনার কোম্পানি থিম পার্ক বানাতে গেলে তো অনেক কিছু বদলাবে, তাতে জায়গাটার মৌলিকত্ব নষ্ট হবে, কিশোর বলল।
হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে উন্নতি যে হবে, এটাও তো ঠিক। যে কোনও পরিবর্তনের কথা শুনলেই ভয় পায় লোকে, নতুন কিছুকে গ্রহণ করতে শঙ্কিত হয়। আমার কাজ হলো ওদের বুঝিয়েশুনিয়ে ভুল ভাঙাননা, থিম পার্কের পক্ষে ভোট দিতে রাজি করানো; বোঝননা, এখানে থিম পার্ক হওয়াটা ওদের জন্য কতটা জরুরি।
কিন্তু কী করে বোঝাবেন?
কেন, ভাল ভাল কথা বলব। ওদের উন্নতির কথা শোনাব, ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখাব। আচ্ছা, এখন যাই। সময় নেই, পরে কথা বলব। হোম অফিসের সঙ্গে কথা বলা দরকার। টেলিফোন-টেলিগ্রাফ কিছুই তো নেই গ্লিটারে, লুকের টু-ওয়ে রেডিওটাই একমাত্র ভরসা। আমাদের থিম পার্ক হলে টেলিফোন সুবিধা পাবে এখানকার মানুষ। আদিমতা বর্জন করলে আমরা আধুনিকতার সুযোগ-সুবিধা পৌছে দেব ওদের কাছে।
দোকানে ঢুকে গেল বিগস্।
হাঁটতে লাগল কিশোর ও মুসা। কিছুদূর এগোতেই চিৎকার শুনে পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল দুজনে। নদীর ধারে লম্বা একটা নৌকার কাছে। বসে বরফ চাপড়ে বিলাপ করতে দেখল জো সারটনকে।
তাড়াতাড়ি বাক্স দুটো মাটিতে নামিয়ে রেখে দৌড় দিল কিশোররা। বরফে ঢাকা পিচ্ছিল নদীর ঢালে বসে রয়েছে জো সারটন। পাশে পড়ে আছে একটা

দোমড়ানো তেরপল। নৌকার ওপর থেকে তুলে এনেছে।
পাড়ের ওপর থেকেই জিজ্ঞেস করল কিশোর, কী হয়েছে?
ফিরে তাকাল জো। আঙুল তুলে নৌকাটা দেখাল।
নৌকার তলায় চোখ পড়তে থমকে গেল কিশোর। অসংখ্য ফুটো।
বিলাপ করতে করতে জো বলল, এখন আমার কী হবে! এমনভাবে ফুটো করেছে, এই নৌকা আর মেরামত করা যাবে না। আমি এখন মাছ ধরব কী দিয়ে! ছেলেপুলে নিয়ে না খেয়ে মরব!
কিশোর জিজ্ঞেস করল, কে করল এই ফুটো?
তা কী আর দেখেছি? দেখলে কি আর করতে দিতাম?
জোর চিৎকারে লোক জমায়েত শুরু হলো। নৌকার অবস্থা দেখে সবাই থ। কীভাবে ফুটো হয়েছে জানতে চায় সবাই।
এদিক দিয়েই যাচ্ছিলাম, জো বলল। তেরপলটা নৌকার ওপর থেকে সরানো দেখে টেনে দিতে গিয়েছিলাম। দেখি এই অবস্থা। বলেই আবার বিলাপ শুরু করল, হায়রে! কে আমার এতবড় সর্বনাশ করল রে!
ফুটোগুলো পরীক্ষা করল মুসা। কিশোরকে বলল, গজাল দিয়ে করেছে।
কিশোর জিজ্ঞেস করল, কখন ফুটো করল? রাতে? কিন্তু গজালের মাথায় হাতুড়ি দিয়ে পিটানোর শব্দ তো শোনা যাওয়ার কথা।
চারপাশে তাকাল ও। কোথায় কী আছে দেখল। জেনারেল স্টোরটা বাদ দিলে কাছাকাছি দুটো কেবিন আছে। একটা বন্ধ। লোক থাকে কি না বোঝা গেল না। অন্যটার চিমনি দিয়ে হালকা ধোঁয়া উঠছে।
মিস্টার সারটন, কিশোর জিজ্ঞেস করল, শেষ কখন নৌকাটা ভাল দেখে গেছেন আপনি?
জবাব দিল না জো। যেন কিশোরের কথা শুনতেই পায়নি। আসছে বসন্তে মাছ ধরার মৌসুমে কী ভয়ানক অসুবিধেয় পড়বে লোকটা অনুমান করে কষ্ট হলো কিশোরের। আবার জিজ্ঞেস করল, শেষ কখন নৌকাটা ভাল দেখে গেছেন?
জো বলল, মনে নেই। সম্ভবত রোববারে।
সেদিন নৌকাটাকে ভাল দেখেছিলেন?
দেখেছি।
আপনাকে বিপদে ফেলার জন্যই কি কেউ নৌকাটা নষ্ট করে দিয়েছে, কি মনে হয় আপনার?
জানি না, জানি না, আমি কিছু জানি না! অস্থির ভঙ্গিতে দুই হাত নাড়তে নাড়তে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল জো। প্রশ্ন শুনতে শুনতে বিরক্ত হয়ে গেছি আমি, আর ভাল লাগে না। সবারই খালি প্রশ্ন আর প্রশ্ন! ইডিটাররোডে কে জিতবে-জোসি না টেড?

এ বছর স্যামনের মৌসুমে কেমন মাছ পড়বে? কাকে ভোট দেব? এখন শুরু হয়েছে নৌকা নিয়ে প্রশ্ন। অসহ্য!
এত প্রশ্ন কারা করে আপনাকে?
এই যে, তুমিই তো করছ। তোমার মত এমন অনেকেই আছে। অধৈর্য ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল জো। তেরপল তুলে নৌকাটা ঢেকে দিল আবার। যদিও এ নৌকা ঢেকে রাখার আর কোন যুক্তি দেখতে পেল না কিশোর।
দর্শকরা চলে যাচ্ছে। বেশির ভাগই শহরের দিকে। সবচেয়ে কাছের কেবিনটাতে গিয়ে ঢুকল এক মহিলা।
চলো তো, মুসাকে বলল কিশোর, একটু গোয়েন্দাগিরি করে আসি।
মুসাকে নিয়ে ছোট কেবিনটার কাছে এসে দাঁড়াল ও। দরজায় টোকা দিল।
খুলে দিল এক মহিলা। কী চাই?
নিজেদের পরিচয় দিয়ে কিশোর বলল, জো সারটনের নৌকাটা কে নষ্ট করেছে জানার চেষ্টা করছি আমরা। গত কয়েক দিনে কখনও হাতুড়ি পিটানোর শব্দ কানে এসেছে আপনার? বিশেষ করে রাতের বেলা?
হাতুড়ির শব্দ শুনিনি, তবে দুই রাত আগে লুক স্টার্লিং লাকড়ি কাটছিল।
সেটা কি অস্বাভাবিক? মুসার প্রশ্ন।
অস্বাভাবিকই তো, মহিলা বলল। সব সময় দিনের বেলায়ই লাকড়ি কাটে ও। ইলেকট্রিক করাত দিয়ে।
লাকড়ি কাটতে দেখেছেন তাঁকে? না শুধু করাতের শব্দ শুনেছেন?
শুধু করাতের শব্দ, ভুরু কোঁচকাল মহিলা। কেন, তোমাদের কি ধারণা করাত দিয়ে জোর নৌকার তলা ফুটো করেছে?
উঁহু! জবাব দিল মুসা। করাত দিয়ে ওভাবে ফুটো করা যায় না।
মহিলাকে ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে এল ওরা।
যাওয়ার পথে লুকের দোকানে থামল দুজনে। লাকড়ি কাটার কথা জিজ্ঞেস করল। লুক জানালেন, তিনি লাকড়ি কাটেননি। রাতের বেলা কাটেনও না। মহিলা করাতের শব্দ শুনে থাকলে ভুল শুনেছে। হতে পারে মুজ হরিণের ডাক শুনেছে, হেসে বললেন। ভুল করে বোকা মুজটা হয়তো লোকালয়ে ঢুকে পড়েছিল।
আপনি ওই বোকা মুজটার ডাক শুনেছেন?
না। আমার বেডরুমটা দোতলার এমন জায়গায়, রাস্তায় খুব জোরে কোন শব্দ না হলে শোনা যায় না।
দ্বিতীয়বার লুকের দোকান থেকে বেরিয়ে এল কিশোর ও মুসা। দোকানের বাইরে ফেলে যাওয়া টিনুকদের বাক্স দুটো নিয়ে কেবিনে ফিরে চলল।

তুষারে ঢাকা নির্জন পাহাড়ী রাস্তা। দুই পাশে কেবিন। ঠাণ্ডার ভয়ে দরজা লাগানো। মুসা বলল, দিনের বেলায়ই লোক চলাচল নেই। রাতে অত ঠাণ্ডার মধ্যে কে বেরোবে? লুকের বোকা মুজের ধারণাটাই বোধহয় সত্যি।
কিন্তু মুজ তো আর গজাল ঠুকে নৌকা ফুটো করতে পারবে না, কিশোর বলল। জোর নৌকাটা যে নষ্ট করেছে সে মানুষ। জানে, রাতে বেরোলে কারও চোখে পড়বে না। সহজেই কাজ সেরে চলে যেতে পারবে।
আচ্ছা, জোর নৌকা নষ্ট করা, টিনুকদের কেবিনে আগুন লাগানো আর জোসির ঘরে লাকড়ি ছুঁড়ে মারার মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই তো?
থাকতে পারে, চিন্তিত ভঙ্গিতে জবাব দিল কিশোর। কাকতালীয় ঘটনা আমি বলব না একে। কী রকম প্রতিকূল পরিস্থিতিতে এখানে বাস করে মানুষ, দেখেছ? একটানা দীর্ঘ শীত। সারা দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন। কর্মহীন ঘরে বসে থাকা। স্নায়ুতে ভীষণ চাপ পড়ে। মাথায় গোলমাল হওয়াটাও অস্বাভাবিক নয়। আর পাগল হয়ে গেলে কী না করে মানুষ। যাদের দেখতে পারে না তাদের ওপর আক্রোশ মেটানোর চেষ্টা যদি করে থাকে এ রকম কোনও পাগল, আমি অবাক হব না।
ভাবছি, ব্রিণ্ডল জ্যাকের সঙ্গে জো সারটনের সম্পর্কটা কেমন? নিজেকেই প্রশ্ন করল মুসা। জোসি হয়তো বলতে পারবে।
অর্ধেক পথ এসে জোসির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ওদের। জোসি বলল, এলে। আমি তো আরও ভাবলাম, হারিয়েই গেলে বুঝি তোমরা।
জো সারটনের নৌকাটার কথা জোসিকে জানাল মুসা। তারপর জ্যাক আর জোর সম্পর্ক নিয়ে যে কথাটা ওর মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল এতক্ষণ, সেটা বলল।
বহু বছর ধরেই ওদের সম্পর্ক ভাল না, জোসি জানাল। তবে তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। জ্যাকের সম্পর্ক কারও সঙ্গেই ভাল না, একমাত্র টেডের বাবা মিস্টার সিউল ছাড়া।
কিশোরের মনে পড়ল, জো বলছিল ইডিটারোড নিয়ে নানারকম প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হচ্ছে ওকে। ডগজে রেসের সঙ্গে জো কোনভাবে জড়িত কি না, জোসিকে জিজ্ঞেস করল।
ও একজন প্রথম শ্রেণীর রেসার, জোসি বলল। আশপাশের পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে ওর মত মাশার নেই। হাস্কি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান। তবে এখন আর মাশিং করতে পারে না। কয়েক বছর আগে ছেলের অপারেশনের টাকা জোগাড়ের জন্য বাধ্য হয়ে গাড়িসহ কুকুরগুলোকে বিক্রি করে দিয়েছিল। বেচারা!
দুঃখজনক! আফসোস করল মুসা। কিন্তু সে যদি আর রেসে অংশ গ্রহণ না-ই করে, লোকে ইডিটাররোড রেসের ব্যাপারে ওকে প্রশ্ন করে কেন?

করবেই তো। সে রেস বিষেশজ্ঞ। সম্ভবত, কার ওপর বাজি ধরা উচিত সেটা বুঝতে চায় লোকে। ইডিটারোডের ডগ রেস এ অঞ্চলের সবচেয়ে বড় রেস। বহু টাকার জুয়া চলে। প্রতি বছর বহু লোক ধনী হয়, আবার বহু লোক সর্বস্বান্তও হয়। আমার আর টেডের ওপরও গ্লিটারের লোকে এবার বাজি ধরবে, জানা কথা।

কথা বলতে বলতে কেবিনে পৌঁছল ওরা। বাক্স নিয়ে ভিতরে ঢুকল। জোসি জিজ্ঞেস করল, আরেকবার প্র্যাকটিস রানে গেলে কেমন হয়? পরিশ্রম না করালে চর্বি জমে যাবে কুকুরের গায়ে, অলস হয়ে পড়বে ওরা।

ভালই তো হয়,মুসা বলল। আমি রাজি।

কিশোর বলল, আমারও কোন আপত্তি নেই।

কুকুরের গলায় লাগাম পরাতে জোসিকে সাহায্য করল দুজনে। নদীতে উঠে গতি বাড়াল কুকুরগুলো। লেজ উঁচু করে দিয়েছে। হাঁ করা চোয়ালের এক কোণ দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে লাল জিভ।

যাচ্ছি কোথায়? কিশোরের প্রশ্ন।

মিঙ্ক রিভারে, জোসি জানাল। স্লেজের পিছনের রেইলে দাঁড়িয়েছে ও। বার বার পা নামিয়ে ঠেলা দিচ্ছে স্লেজের গতি বাড়ানোর জন্য। বেশি দূরে না।

কত দূর? মুসা জানতে চাইল।

এই পাঁচ মাইল। হাস্কির জন্য এটা কোন দূরত্বই না।

তা তো বুঝতেই পারছি, কিশোর বলল। ইডিটারোড রেসে এগারোশো মাইল দৌড়াবে যারা, তাদের জন্য পাঁচ মাইল আর কী। কটা দল অংশ নিচ্ছে এবার?

নদীর ওপরের বরফের স্তর মসৃণ নয় মোটেও। অসমতল। এবড়ো-খেবড়ো। টিলা-টক্করও আছে। লাফিয়ে উঠল স্লেজ। টিলা পেরিয়ে আসার পর কিশোরের কথার জবাব দিল জোসি, সত্তরআশিটা দল হবে।

হিসেব করল মুসা, সত্তর-আশিটা দলে অন্তত হাজারখানেক কুকুর। অ্যাংকারেজে একটা দেখার মত দৃশ্য হবে

নদীর ওপাড়ে তাকাল ও। পাহাড়ে তো তেমন তুষার দেখছি না। গলে যায় নাকি?

থাকলে তো গলবে, জোসি বলল। শুনে অবাক হবে, আমাদের এদিকটা আসলে এক ধরনের মরু অঞ্চল। বছরে বারো ইঞ্চির বেশি তুষারপাত হয় না। এই বরফ তো তৈরি হয়েছে নদীর পানি জমে।

সামনে রাস্তাটা দুই ভাগ হয়ে গেছে। চেঁচিয়ে উঠল জোসি, জি, ডায়মণ্ড, জি!

দলের কুকুরগুলোকে নিয়ে ডান দিকের পথটা ধরে ছুটল ডায়মণ্ডহার্ট।

আরও মাইল দুই এগোনোর পর ইউকন থেকে সরে এল জোসি, অপেক্ষাকৃত সরু আরেকটা নদীর ওপর দিয়ে স্লেজ ছোটাল। বন্ধুদের জানাল, মিংক রিভারে

যাবার এটা শর্টকাট।
মিনিট দশেক পর গতি কমিয়ে দিল কুকুরগুলো। চিন্তিত মনে হলো জোসিকে।
কী হয়েছে? জানতে চাইল কিশোর। দ্বিধা করছে জোসি। সামনে নরম বরফ।
বকের মত গলা বাড়িয়ে দিয়ে সামনে তাকাল কিশোর। ওর চোখে বরফের স্তরে কোন তফাৎ ধরা পড়ল না।
নদীর তলায়ও ঝর্না আছে এখানে, জানো বোধহয়। বরফের স্তর পাতলা হয়ে যাওয়ার কারণটা ব্যাখ্যা করল জোসি, সেগুলো থেকে গরম পানি বেরিয়ে নীচের দিকের বরফ গলিয়ে দেয়। বছরের এ সময়টাতেই এ ঘটনা বেশি ঘটে।
সামনে তো আর এগোনো যাবে না বোঝা যাচ্ছে, মুসা বলল। কী করবে এখন? গাড়ি ঘোরাবে?
এমন একটা জায়গায় চলে এসেছে, ঘোরানোটাও আর সহজ নয়, বুঝে গেছে কিশোর। এখন কুকুরগুলোকে ঘোরাতে হলে পাতলা বরফে উঠতেই হবে।
ইজি, ডায়মণ্ড, ইজি! মোলায়েম স্বরে আদেশ দিল জোসি।
দৌড়াননা বাদ দিয়ে হেঁটে চলেছে কুকুরগুলো। চোখে অস্বস্তি। এদিক ওদিক তাকাচ্ছে।
ইজি, ডায়মণ্ড, সাবধান করল জোসি।
থেমে গেল ডায়মণ্ডহার্ট। চারপাশে তাকাতে লাগল।
হাইক! হাইক! চিৎকার করে উঠল জোসি। নদীর কিনারের দিকে সরে যেতে চায়।
কিছু যদি ঘটে... বলতে গেল জোসি।
বন্দুকের গুলি ফোটার মত শব্দ হলো। ঝট করে ফিরে তাকাল কিশোর। স্লেজের ডান পাশের বরফে চওড়া একটা ফাটল চোখে পড়ল। তীরের কাছে নিরাপদ জায়গায় পৌছে গেছে কুকুরগুলো। কিন্তু নদীর মাঝখানের পাতলা বরফ স্লেজের ভার সইতে পারছে না।
জোসি, কী করব আমরা? চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। নেমে যাব?
না-না! চেঁচিয়েই জবাব দিল জোসি। বসে থাকো, যেভাবে আছ!
জমাট বাতাসে প্রতিধ্বনি তুলল যেন তীক্ষ্ণ একটা শব্দ। অনেকটা বন্দুকের গুলির মত, তবে আরও জোরে। বরফের স্তর ভেঙে গেছে। লাফিয়ে নামল জোসি। রেইল চেপে ধরে স্লেজটাকে আটকানোর চেষ্টা করল।
বরফের ভাঙা স্তরের সঙ্গে সঙ্গে ডান পাশে কাত হয়ে যাচ্ছে, স্নেজু। পিছলে নেমে যেতে শুরু করল পানির দিকে।
উঠে দাঁড়াল মুসা। দুই হাত দুই পাশে ছড়িয়ে দিয়ে ভারসাম্য বজায়ের চেষ্টা করল। কাজ হলো না। স্লেজের রেইল এসে ওর গোড়ালি ধরে টান মারল। পিছনে উল্টে

পড়ল ও। ফুসফুসের সমস্ত বাতাস বেরিয়ে গেল। বরফ-শীতল পানি যেন গিলে নিল ওকে।
বরফের কিনার খামচে ধরার চেষ্টা করল ও। বরফের নীচে আটকে পড়ে বাস্তবে কাউকে মরতে দেখেনি, তবে সিনেমায় দেখা ভয়ঙ্কর দৃশ্যগুলো ফুটে উঠল চোখের সামনে। নদীর তলায় জুতো ঠেকল। পানি বেশি না। সোজা হয়ে দাঁড়ালে বুক পানি হয়। দশ ফুট চওড়া একটা ফোকর তৈরি হয়েছে বরফে। কিশোর আর জোসির নাম ধরে চিৎকার করে ডাকতে লাগল।
ভয় নেই, দাঁড়িয়ে থাকো, জবাব দিল কিশোর। তোমাকে তুলে আনার ব্যবস্থা করছি আমরা।
বরফের মত ঠাণ্ডা পানি মারাত্মক বিপজ্জনক। দেহের অতি মূল্যবান উত্তাপ শুষে নিয়ে দ্রুত শীতল করে ফেলছে দেহটাকে। মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে, নিজেকে বোঝাল মুসা। ওপরে ওঠার জন্য দাপাদাপি করলে আরও দ্রুত ফুরাবে জীবনীশক্তি।
ধীরে ধীরে পানি আর ভাঙা বরফের টুকরো বুক দিয়ে ঠেলে কিনারের দিকে এগোতে পারে, কিন্তু সাহস করল না। স্রোতের টানে বা অন্য কোনভাবে যদি ডুবে গিয়ে বরফের স্তরের নীচে চলে যায়, আর বেরোতে পারবে না।
দাঁড়িয়ে রইল ও। গায়ের চামড়ায় সুচ ফুটাচ্ছে ভীষণ ঠাণ্ডা পানি।
ওদিকে জেটাকে আটকে ফেলেছে কুকুরের দল, পানিতে পড়তে দেয়নি–স্লেজের মধ্যে পাগলের মত কী যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে কিশোর ও জোসি। অমন করে কী খুঁজছে ওরা, বুঝতে পারছে না মুসা। অবশেষে সোজা হয়ে দাঁড়াল জোসি। হাতে একটা কুড়াল। দৌড় দিল বনের দিকে।
ও এখন যাচ্ছে কোথায়? আমি এদিকে জমে মরছি! চিৎকার করে বলল মুসা।
তোমাকে বাঁচানোর জিনিস আনতে গেছে, কিশোর বলল। নড়াচড়া কোরো না। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকো।
পা অবশ! সাড়া পাচ্ছি না! দাঁতে দাঁতে বাড়ি খাচ্ছে মুসার।
হামাগুড়ি দিয়ে মুসার দিকে এগোতে শুরু করল কিশোর। দূরত্ব মাত্র কয়েক ফুট, কিন্তু এই পরিস্থিতিতে সেটাও অনেক। চড়চড় শব্দ করে উঠল বরফ।
ফিরে যাও, কিশোর! চিৎকার করে উঠল মুসা। বরফ তোমার ভার সইতে পারছে না।
চুপ করে থাকো। আমার কাজ আমাকে করতে দাও।
তুমিও যদি পানিতে পড়ে যাও, তাতে আমার কোন উপকার হবে। তারচেয়ে জোসির জন্য অপেক্ষা করো। ও জানে, এখন কী করা দরকার, আমরা জানি না।

ঠিকই বলেছে মুসা। অনিচ্ছাসত্ত্বেও পিছিয়ে গেল কিশোর। বার্চের একটা লম্বা ডাল হাতে ছুটে বেরোতে দেখা গেল জোসিকে। দৌড়ে আসতে লাগল।
কিশোর, নদীর পাড়ে পা রেখে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ো, জোসি বলল। শক্ত করে আমার গোড়ালি চেপে ধরে রাখবে।
কী করতে চাও?
বরফের স্তরে দেহের ওজন সমানভাবে ছড়িয়ে দেয়া গেলে সহজে ভাঙবে না বরফ। উপুড় হয়ে শুয়ে খুব সাবধানে ইঞ্চি ইঞ্চি করে মুসার দিকে এগোতে শুরু করল জোসি। ডালটা সামনে বাড়িয়ে দিল। মুসা, দেখো তো নাগাল পাও নাকি?
ডান হাত যতটা সম্ভব লম্বা করে দিল, মুসা। আঙুলের মাথা থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে রয়েছে ডালের মাথা। কিন্তু এখন এটাকেও বিশাল দূরত্ব মনে হচ্ছে। পারছি না তো!
আরেকটু আগে বাড়ল জোসি। বিপজ্জনক জায়গায় চলে এসেছে। এখন?
আবার হাত বাড়াল মুসা। ডালের মাথা এখনও ওর নাগালের বাইরে।
প্রাণপণে জোসির গোড়ালি চেপে ধরে রেখে প্রায় ককিয়ে উঠল কিশোর, চেষ্টা করো, মুসা। ডালটা ধরো।
বড় করে দম নিল মুসা। দেহের শক্তি নিঃশেষ হয়ে আসছে।
ডালটা আরও ইঞ্চি দুয়েক ঠেলে দিল জোসি। এবার?
ডালের মাথায় লক্ষ্য স্থির করল মুসা। তারপর প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়ে ঝাপ দিল। হাত ফসকালে সোজা চলে যেত বরফের তলায়, কিন্তু শেষ মুহূর্তে ধরে ফেলল ডালের মাথা। পা উঠে গেল ওপরে। তাতে দেহটা পুরোই ডুবে গেল বরফ-শীতল পানিতে। শরীর অবশ হয়ে যাওয়াতে ঠাণ্ডাও আর অতটা টের পাচ্ছে না। বুঝতে পারছে, মোটেও ভাল লক্ষণ নয় এটা।
এই তো পেরেছ! ধরে রাখো! খবরদার, ছাড়বে না! চিৎকার করে উঠল কিশোর।
দুই হাতে ধরো, জোসি বলল।
বড় করে দম নিল মুসা। নদীর পিচ্ছিল মাটিতে পা ঠেকাল আবার। ভালমত ধরতে না পারলে ডাল থেকে হাত ছুটে যাবে। অন্য হাতটাও বাড়িয়ে দিল। ডালের গায়ে শক্ত হয়ে চেপে বসল ওর আঙুল।
গুড! ধরে রাখো! ছাড়বে না! জোসি বলল। ইঞ্চি ইঞ্চি করে পিছানো শুরু করল। ডালের সঙ্গে মুসাকেও টেনে নিয়ে আসতে লাগল।
জোসিকে আরও তাড়াতাড়ি পিছাতে সাহায্য করল কিশোর। মুসার মনে হলো অনন্তকাল ধরে টানার পর অবশেষে পানি থেকে তুলে আনা হলো ওকে।
আনন্দে চেঁচিয়ে উঠে মুসার পিঠ চাপড়ে দিল কিশোর।

জোসি বলল, এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করা যাবে না। ডায়মণ্ডহার্টকে দাঁড়িয়ে থাকতে বলে কিশোর-মুসাকে নিয়ে শক্ত জায়গায় চলে এল ও।
কম্বল দরকার, কিশোর বলল।
থরথর করে কাঁপছে মুসা। ভীষণ শীত থেকে বাঁচার জন্য কুঁকড়ে ফেলেছে শরীর।
সবার আগে ওর কাপড় খোলা দরকার, জোসি বলল।
এই ঠাণ্ডার মধ্যে! কিশোর অবাক।
যা বলছি, করো। ভিজে কাপড় গায়ের উত্তাপ শুষে নিচ্ছে। যত দেরি করবে ততই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। কিশোর; স্লেজে ইমারজেন্সি কিট আছে, জলদি আনো। ওটার মধ্যে স্পেস ব্ল্যাঙ্কেট পাবে। স্পেশাল কম্বল। ওর কাপড়-চোপড় সব খুলে ফেলে গায়ে কম্বল জড়াও। আমি আগুন জ্বালানোর ব্যবস্থা করি।
মুসার আঙুল অবশ। জিপার, বোতাম, কিছুই খোলার ক্ষমতা নেই। কাপড় খুলতে ওকে সাহায্য করল কিশোর। তারপর আলট্রাথিন মেটালিক কম্বলটা জড়িয়ে দিল গায়ে।
দাঁতের কাঁপুনি বন্ধ করতে পারছে না মুসা। এর মধ্যেও জোক বলে শীত ভুলে থাকার চেষ্টা করল। হাসল কিশোর। কথা বোলো না।
না বলে পারছি না তো…
বাদামি রঙের এক গুচ্ছ ঘাস নিয়ে ফিরল জোসি। একটা সমতল পাথর থেকে বরফ সরিয়ে ঘাসগুলো রাখল তার ওপর।
কী ঘাস? জানতে চাইল কিশোর।
মেঠো ইঁদুরের বাসা, জোসি বলল। জ্বলে কী রকম দেখো।
শুকনো ডাল ভেঙে ঘাসগুলোর ওপর ছড়িয়ে দিল ও। তারপর পানি নিরোধক একটা হোল্ডার থেকে দিয়াশলাই বের করে আগুন ধরাতে ব্যস্ত হলো।
চোখের পলকে আগুন ধরে গেল ঘাসে। তাতে ডালপাতা ফেলে আগুনটা বাড়াল জোসি। তৈরি হয়ে গেল অগ্নিকুণ্ড। আগুনের ধার ঘেঁষে বসল তিনজনে। ওদের দেহ যেন শুষে নিতে লাগল প্রাণদায়ী সেই উত্তাপ। হাত-পায়ের সাড় ফিরতে মুখ তুলে তাকাল মুসা। হাসি ফুটল মুখে। কিশোর আর জোসির মাঝেও সংক্রামিত হলো ওর হাসি।
মুসার ভিজা কাপড় আগুনের আঁচে শুকাতে দিয়ে নাস্তা খেতে বসল ওরা। ইমারজেন্সি কিট থেকে বের করল পিচফল আর হার্ডট্যাক ক্র্যাকার অর্থাৎ লবণ মাখানো শুকনো গরুর মাংসের টুকরো। একটা ক্যানে কিছু তুষার গলিয়ে নিয়ে স-নিডলের চা বানাল জোসি। অবশেষে শহরে ফিরে যাওয়ার মত বল পেল মুসা শরীরে। আগুন নিভিয়ে, স্লেজ ঘুরিয়ে, শহরে যেতে তৈরি হলো ওরা।
একদিনের জন্য যথেষ্ট প্র্যাকটিস হয়েছে, কি বলল? হেসে ভুরু নাচাল জোসি।

একদিন না, তিন দিন, কিশোর বলল।
উঁহু, মাথা নাড়ল মুসা, তিন মাস।
যে পথে এসেছিল, সে-পথেই ইউকনে ফিরে এল ওরা। নদীর মাঝখান দিয়ে চলল। আর কোন বিপত্তি ঘটল না। নিরাপদেই ওদেরকে পার করে আনল ডায়মণ্ডহার্ট। হঠাৎ গোঁ গোঁ করে উঠল কুকুরটা। বার বার ফিরে তাকাচ্ছে জোসির দিকে।
জোসি বলল, হ্যাঁ, আমিও দেখেছি!
কাকে? কিশোরের প্রশ্ন।
ডায়মণ্ডহার্টের সঙ্গে কথা বলছি আমি, জোসি বলল। আমাদের দিকেই আসছে দলটা। ডায়মণ্ড আগে দেখেছে। দেখে আমাকে জানিয়েছে।
কী করে বুঝলে তুমি? জিজ্ঞেস করল মুসা।
প্র্যাকটিস আর অভিজ্ঞতা দিয়ে, জবাব দিল জোসি।
কই, আমি তো কিছু দেখছি না, কিশোর বলল। আকাশ আর বরফ ছাড়া।
গতি কমাল না ডায়মণ্ডহার্ট। তবে অন্য দলটাকে দেখার জন্য সারাক্ষণ মাথা উঁচু করে রাখল।
এ পথেই আসছে এখনও? জোসিকে জিজ্ঞেস করল মুসা।
হ্যাঁ, জোসি জবাব দিল। চিনতে পেরেছি ওকে। টেড।
এত দূর থেকে চিনলে? মুসা অবাক। শুধু ওই কালো বিন্দুগুলো দেখে?
হ্যাঁ, মাথা ঝাঁকাল জোসি। এ সব আমাদের শিখতে হয়। এখানে দূর থেকে যে চিনতে পারবে না, যে কোন সময় ভয়ানক বিপদ হতে পারে তার। আমি এখান থেকেই বলে দিতে পারব দলটা কত বড়, কত গতিতে ছুটছে, কত দক্ষ মাশার।
কিন্তু টেড এখানে কী করছে? কিশোরের প্রশ্ন।
প্র্যাকটিস, জবাব দিল জোসি।
পঞ্চাশ গজের মধ্যে চলে এল টেড। ভঙ্গিতেই বোঝা যাচ্ছে রাস্তা ছাড়ার কোন ইচ্ছেই নেই ওর। ঝামেলা করতে চাইল না জোসি। ডায়মণ্ডহার্টকে থামতে বলে ব্রেক চাপল। জেটা রাস্তা থের্কে নামাতে জোসিকে সাহায্য করল কিশোর ও মুসা। জোসি কুকুরগুলোকে রাস্তা থেকে সরিয়ে এনে চুপ থাকতে বলল।
সোজা ওদের দিকে ছুটে এল টেড। গতি কমাল না। দ্রতা করেও একটা কথা বলল না কারও সঙ্গে।
জোসি চুপ। তাকিয়ে আছে কিশোর-মুসা। রাস্তা দখল করে রেখে নিজেকে শক্তিমান প্রমাণের চেষ্টা করছে টেড। তবে জোসি বুদ্ধিমান। এ মুহূর্তে কিছু বলার অর্থ ঝগড়া বাধানো। সেটা এড়াতে চাইছে ও। ইডিটারোড রেসের আগে মারামারি করে কুকুরগুলোর ক্ষতি করতে রাজি নয়।

বারো ফুটের মধ্যে চলে এল টেড। হাত তুলে ওকে থামার ইশারা করল জোসি। সামনের দিকে নজর টেডের। জোসিকে দেখেও না দেখার ভান করল। শ্লেজের হুস হুস শব্দ তুলে পাশ কেটে বেরিয়ে গেল।
এত অভদ্র তো দেখিনি! রেগে গেল মুসা।
সাবধান করতে চেয়েছিলাম ওকে, যাতে পাতলা বরফে না ওঠে, গম্ভীর শোনাল জোসির কণ্ঠ।
উঠুক। ঠাণ্ডা পানিতে পড়লে বুঝবে মজা, কিশোর বলল। মরবে, কি বলো? মুসা তো বেঁচে গেল।
এখনও পুরোপুরি বাঁচিনি, পরিস্থিতি হালকা করার জন্য হাসল মুসা। কাপড়ই শুকায়নি ঠিকমত। আরাম পাচ্ছি না।
স্লেজটা রাস্তায় তুলল জোসি। আবার ছুটল।
শহরটা নজরে আসতেই গতি বেড়ে গেল কুকুরগুলোর। লেজ নাড়াও বেড়েছে। শক্তিশালী পেশিতে নতুন শক্তি সঞ্চারিত হয়েছে।
নদীতীরের রাস্তা ধরে দলটাকে ছুটিয়ে নিয়ে এল ডায়মণ্ডহার্ট। কেনলের কাছে এসে থামল।
লাগাম খুলতে জোসিকে সাহায্য করল কিশোর ও মুসা। কুকুরগুলোকে খাবার আর পানি দিল জোসি। তারপর কিশোরদের নিয়ে ঘরে ফিরে চলল।
কেবিনের কাছাকাছি প্রায় চলে এসেছে ওরা, হাত তুলল মুসা, মুন না?
জোসি বলল, কিছু হয়েছে!
মুন ওদের দেখে দৌড়ে আসতে শুরু করল।
জোসি, কয়েক গজ দূরে থাকতে চেঁচিয়ে উঠল মুন, জলদি চলো! বাবার শরীর খুব খারাপ।
কী হয়েছে?
জানি না। খাওয়ার পর থেকে কেমন করছে। চোখে পানি এসে গেছে মুনের। জোসি, আমার ভয় লাগছে। বাবা যদি মরে যায়!
একটা মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে মুনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল জোসি। পরক্ষণে ঝটকা দিয়ে ঘুরে কেবিনের দিকে ছুটল। পিছনে ছুটল কিশোর ও মুসা। হুড়মুড় করে কেবিনের দরজা দিয়ে ঢুকে থমকে দাঁড়াল।
বিছানায় কুঁকড়ে পড়ে আছেন জেফরি। দুই হাতে পেট চেপে ধরে গোঙাচ্ছেন। পাশে বসা এরিনা। ভিজা কাপড় দিয়ে বার বার জেফরির কপাল মুছে দিচ্ছেন।
এগিয়ে গিয়ে জেফরির কাঁধে হাত রাখল জোসি। চাচীকে জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে?

মাথা নাড়লেন এরিনা। জানি না। হঠাৎ করেই বলল পেটে ব্যথা। তারপর থেকে বেড়েই চলেছে। বিছানায় থাকতে পারছে না।
আমার ভয় লাগছে, বলে কিশোর-মুসার দিকে তাকাল মুন। কিছু একটা করা দরকার।
উঠে দাঁড়ালেন এরিনা। জোসি, এ অবস্থায় তোমার চাচাকে আমার একা রেখে যাওয়া উচিত হবে না। বনে যাবে? কী আনতে হবে জানোই তো।
দরজার দিকে পা বাড়াতে গিয়ে ফিরে তাকাল জোসি।
কিশোরদের বলল, তোমরাও এসো। আমাকে সাহায্য করবে।
পায়ে চলা পথ ধরে বনের দিকে হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞেস করল কিশোর, কোথায় যাচ্ছ?
বনে, জোসি বলল।
তা তো বুঝলাম, মুসা বলল। কী আছে ওখানে?
ভেষজ ওষুধ। চাচীর মা আর নানী খুব ভাল কবিরাজ ছিলেন। চাচী তাঁদের কাছ থেকেই কবিরাজি শিখেছে।
আর তুমি?
চাচীর কাছে।
ইণ্ডিয়ানদের অসাধারণ কবিরাজি জ্ঞানের কথা শুনেছে কিশোর। শত শত বছর নানারকম গাছ, পাতা আর শিকড়-বাকড় দিয়ে কঠিন কঠিন রোগের সফল চিকিৎসা করে আসছে তারা। ইদানীং বড় বড় ওষুধ কোম্পানিগুলোও ইণ্ডিয়ানদের এ সব ওষুধের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেছে। এ সব ভেষজ সম্পর্কে বিশদভাবে জানতে গবেষক দল পাঠাচ্ছে ইণ্ডিয়ান অঞ্চলে।
বনের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মিনিট বিশেক পরেই কিশোর লক্ষ করল, গাছপালার চেহারা বদলে যাচ্ছে। পিছনে ফেলে এসেছে প্রুস গাছের ঘন জঙ্গল। সামনের জায়গাটা মোটামুটি পাতলা। বার্চ আর অ্যাসপেন গাছ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। স্নান সূর্যালোক চিকচিক করছে পাতাঝরা গাছগুলোর ডালে জমে থাকা বরফে।
বড় একটা ওক গাছ দেখাল জোসি। ওটার গোড়ার তুষার চেঁছে ফেলে দিলে এক ধরনের শ্যাওলা পাবে। তুলে নিয়ে এসো।
দৌড়ে গিয়ে কাজ শুরু করে দিল কিশোর ও মুসা। তুষার ফেলে দিতেই বেরিয়ে পড়ল বিচিত্র চেহারার শ্যাওলা। ভিজা মাটির গন্ধে ভরা। জোসি তখন অন্য জিনিস জোগাড়ে ব্যস্ত। বরফ খুঁড়ে এক জাতের চিরসবুজ উদ্ভিদ খুঁজে বের করল। উপড়ে নিল কয়েকটা গাছ। কালো রঙের চেরি-বার্ডের এক টুকরো বাকল

কেটে নিল। এলডার ঝোপের শিকড় নিল। আর নিল দুই ধরনের গাছের দুটো নরম ডাল। এ গাছগুলো কিশোরের অচেনা।
কাজ শেষ করতে দশ মিনিট। দৌড়ে গ্লিটারে ফিরে চলল তিনজনে। ফেরার পথে গতি বেশি, কারণ ঢাল বেয়ে নামছে। কেবিনে ঢুকতে বিচিত্র সুবাস নাকে ঢুকল ওদের। স্টোভের ওপর কালো রঙের একটা কেটলিতে পানি ফুটছে, তাতে কিছু মিশিয়েছেন এরিনা, সেটার গন্ধই বেরোচ্ছে। জোসির হাত থেকে ব্যাগ নিয়ে ডাল-পাতা, শিকড়, বাকল, শ্যাওলাগুলো বের করে কেটলির পানিতে মিশানো শুরু করলেন।
কিশোর জিজ্ঞেস করল, জেফরি আঙ্কেল কীজন্য অসুস্থ হয়েছেন, আপনি বুঝতে পেরেছেন?
মাথা ঝাঁকালেন এরিনা। মনে হয়। আপেলটাতে বোধহয় খারাপ কিছু ছিল। ওটা খাওয়ার পর থেকেই পেটব্যথা শুরু।
আপনারা খাননি? আপনি আর মুন?
না। ও একাই খেয়েছে।
জোসি বলল, ঘরে আপেল আছে তাই তো জানতাম না।
ছিলও না, মুন জানাল। ইলকিস বিগ এক ঝুড়ি তাজা ফল উপহার দিয়ে গেছে।
মুসার দিকে তাকাল কিশোর। চোখে চোখে কথা হয়ে গেল। দুজনের মনে একই ভাবনা। জেফরিকে উপহার পাঠাল কেন বিগস? সে জানে বিরোধী দলের নেতা জেফরি। ফল পাঠানোটা ঘুষ না তো? ঘুষ হোক আর যা-ই হোক, মারাত্মক বিষে ভরা এই উপহার।
আপেলের মধ্যে বিষ ঢুকিয়ে দেয়নি তো বিগস? বিশ্বাস হতে চাইছে না কিশোরের। তবে উদ্দেশ্যটা বোঝা যাচ্ছে। জেফরি সহ তার পরিবারের লোকেরা অসুস্থ হয়ে পড়লে থিম পার্কের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলায় মনোযোগ দিতে পারবেন না তিনি। তাঁর কেবিন পোড়ানো, জো সারটনের নৌকা নষ্ট করা, সব এই পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের অংশ। ধরে নেয়া যায়, পার্কের সপক্ষের কেউ এই অকাজগুলো করেছে।
বছরের এ সময়ে তাজা ফল পেল কোথায় বিগস্? জোসির প্রশ্ন।
কেটলিতে চাপানো ওষুধ নাড়তে নাড়তে ফিরে তাকালেন এরিনা। নিশ্চয় প্লেনে করে এনেছে। আমরা মনে করেছিলাম আমাদের কেবিনের শোক ভোলাতে, আমাদের খুশি করতে ফলগুলো উপহার দিয়েছে বিগস্।
দেয়ার সময় কিছু বলেছে? জানতে চাইল মুসা।
ও নিজে নিয়ে আসেনি, এরিনা জানালেন।
টেডকে দিয়ে পাঠিয়েছে, মুন বলল।

এক মিনিট এক মিনিট, ভুরু কুঁচকে গেছে কিশোরের। টেড সিউল? ও আনতে গেল কেন?
মুন বলল, লুক স্টার্লিঙের অনুরোধে।
এরিনা বললেন, লুকের কাছ থেকে অর্ডার পেলে খাবার আর অন্যান্য জিনিস ফেয়ারব্যাংকস থেকে নিয়ে আসে ডিউক আইকহ্যাম। লুক তখন সেগুলো নিজেই যার যার ঠিকানায় পৌছে দেয় কিংবা টেডের মত কাউকে দিয়ে পাঠানোর ব্যবস্থা করে।
আরও প্রশ্ন করার জন্য মুখ খুলতে যাচ্ছিল কিশোর, হাত তুলে বাধা দিলেন এরিনা। মোটা একজোড়া দস্তানা পরে নিয়ে গরম কেটলিটা ধরে উঁচু করলেন। একটা মাটির পাত্রের মুখে পরিষ্কার এক টুকরো কাপড় রাখল মুন। তাতে কেটলির তরল পদার্থ ঢালতে লাগলেন এরিনা। কাপড়টা ছাঁকনি হিসেবে কাজ করল। মাটির পাত্র থেকে সেই তরল পদার্থ আবার বড় হাতায় করে চিনামাটির মগে নিলেন তিনি। তাতে সামান্য ঝর্নার পানি ঢেলে, অল্প একটু মধু মিশিয়ে ঠাণ্ডা করে নিয়ে গেলেন জেফরির কাছে।
বাবাকে বিছানায় উঁচু করে ধরল মুন। মগটা জেফরির ঠোটের কাছে ধরলেন এরিনা। ওষুধ খেয়ে আবার বিছানায় শুয়ে পড়লেন জেফরি।
এরিনাকে জিজ্ঞেস করল কিশোর, আচ্ছা, আন্টি, ফলের যে ঝুড়িটা দিয়ে গেল, তার মধ্যে কি নাম লেখা কোন কার্ড বা নোট ছিল?
ড্রেসারের ওপর থেকে একটা কার্ড নিয়ে এলেন এরিনা। কিশোরের হাতে দিলেন। দেখার জন্য কাত হয়ে এল মুসা। লেখা রয়েছে ইলকিস বিগস, ফিল্ড রেপ্রেজেনটেটিভ, থিম পার্ক। কার্ডের উল্টো দিকের সাদা অংশে হাতে লেখা কথাটার বাংলা মানে করলে দাঁড়ায়: অনেক শুভেচ্ছা। ইলকিস।
হ্যাঁ, কার্ডটা বিগসেরই, কোন সন্দেহ নেই, কিশোর বলল। কিন্তু জেফরি আঙ্কেলের নাম তো নেই কোথাও। এমনও তো হতে পারে কার্ডটা অন্য কাউকে দিয়েছিল বিগস। বিগসই উপহার পাঠিয়েছে বোঝানোর জন্য সেই লোক কার্ডটা ফলের ঝুড়িতে ভরে দিয়েছে।
টেড সিউলের মত কেউ? মুসার প্রশ্ন।
হতে পারে।
কিশোরের দিকে তাকাল জোসি। তুমি বলতে চাও ফলগুলোতেই গোলমাল?
ল্যাবরেটরি টেস্ট না করে শিওর হওয়া যাবে না। কিন্তু কোন কিছুর বিনিময়েই ওই আপেলে কামড় বসাতে রাজি নই আমি।
রাগে লাল হয়ে গেল জোসির মুখ। টেড যদি ভেবে থাকে আমার পরিবারের ওপর হামলা চালিয়ে, তাদের ক্ষতি করে ইডিরাটোড রেসে আমার অংশ নেয়া বন্ধ

করাবে, মস্ত ভুল করছে ও। ওকে আমি ছাড়ব না।
ওর বাহুতে হাত রাখল মুন। জোসি, না জেনে কাউকে দোষারোপ করা ঠিক না। অন্য কেউও তো এ সব শয়তানি করে থাকতে পারে? টেড সিউলকে দোষী বানানোর জন্য।
ওর কথায় যুক্তি আছে, মনে মনে স্বীকার করল কিশোর।
পারলে কিছু একটা করো, এরিনা বললেন। আরও খারাপ কিছু ঘটে যাবার আগেই।
টেবিল থেকে ওষুধের মগটা তুলে নিয়ে আবার জেফরির কাছে গেলেন এরিনা। কেমন লাগছে এখন?
কোলাব্যাঙের স্বর বেরোল জেফরির গলা দিয়ে, ভাল।
আরেকটু দেব?
চোখ-মুখ কুঁচকে জেফরি বললেন, তোমার ওই ভয়াবহ জিনিস!
হাসলেন এরিনা। স্বাদটা খারাপ, তবে ওষুধ হিসেবে খুবই ভাল, অস্বীকার করতে পারবে না।
উঠে বসার চেষ্টা করলেন জেফরি। কাঁধ চেপে ধরে শুইয়ে দিলেন এরিনা। রেস্ট নাও। তোমার এখন বিশ্রাম দরকার।
সন্ধ্যার পর এরিনা বললেন, মুজের মাংসের কাবাব বানাব। আনতে পারবে?
উঠে দাঁড়াল মুসা। পারব।
কোথায় রেখেছেন? জানতে চাইল কিশোর।
আমাদের কেবিনের পিছনের ছাউনিতে, এরিনা বললেন। হুকে ঝোলানো আছে, আস্ত একটা রান। ছুরি, করাত সবই পাবে ওখানে।
লণ্ঠন জ্বেলে দিল জোসি। বাতি হাতে বাইরের অন্ধকারে বেরিয়ে এল কিশোর ও মুসা। উজ্জ্বল বড় বড় তারা মেরুর আকাশে ঘন হয়ে ফুটে আছে। কাছেই একটা পেঁচা ডাকল। মানুষের সাড়া পেয়ে ঝোপের মধ্যে ছুটে পালাল ছোট কোন জানোয়ার।
এ রকম সাধারণ একটা ছাউনির মধ্যে মাংস রাখে! মুসা বলল।
হাসল কিশোর। ভয় নেই। শীতকাল। নষ্ট হবে না। ছাউনির ভিতরের তাপমাত্রা এখন ডিপ ফ্রিজের চেয়ে কম নয়।
তারমানে মাংস জমাট বেঁধে বরফের মত শক্ত হয়ে গেছে। করাত ছাড়া কাটা যাবে না।
পোড়া কেবিনটার কাছে পৌঁছল ওরা। এখনও ধোয়ার গন্ধ বেরোচ্ছে। পাশ দিয়ে ঘুরে আসতে ছাউনিটা চোখে পড়ল। দরজা খুলল মুসা। ভিতরে ঢুকল দুজনে।

লণ্ঠন উঁচু করে ঘরের মধ্যে খুঁজতে লাগল কিশোর। বাঁয়ে একটা কাঠের বাক্স। তার ওপর রাখা চামড়ার স্তুপ, ফাঁদ পেতে ধরা হয়েছিল বুনো জানোয়ারগুলোকে। জমে শক্ত হয়ে গেছে। পিছনের দেয়ালে ঝোলানো কাঠ চেরাই করার একটা অনেক বড় করাত। চালাতে দুজন লাগে। বড় একটা বেতের ঝুড়িতে রাখা প্রয়োজনীয় নানারকম যন্ত্রপাতি।
সবই তো আছে দেখছি, কিন্তু মাংস কোথায়? চারপাশে তাকিয়ে খুঁজতে লাগল মুসা।
লণ্ঠনটা আরও উঁচু করে ধরল কিশোর। বিম থেকে বড় একটা হুক ঝুলছে। নিশ্চয় ওটাতেই ঝোলানো ছিল মাংসের টুকরো।
তাহলে এখন গেল কোথায়... কিশোর, দেখো!
মুসার কণ্ঠস্বর চমকে দিল কিশোরকে। চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল। ছাউনির কাঠের দেয়ালে কালো রঙ দিয়ে আঁকা একটা হৃৎপিণ্ড। মাঝখানে একটা ছুরি গাঁথা।
স্তব্ধ হয়ে ছুরিটার দিকে তাকিয়ে আছে দুজনে। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কেটে গেল। অবশেষে মুখ খুলল মুসা, মাংসের টুকরোটা হুক থেকে খুলে নিয়ে গেছে কেউ।
গম্ভীর হয়ে মাথা ঝাঁকাল কিশোর। মনে হয়।
কোন বুনো জানোয়ার অত ওপরে নাগাল পাবে না। নেকড়ে তত্তা পাবেই না, ভালুকেও পাবে না। তাহলে মানুষের খাবার চুরি করতে এল এ কোন জানোয়ার?
মানুষ-জানোয়ার, জবাব দিল কিশোর। খাওয়ার জন্য চুরি করলে মাপ করে দেয়া যেত। কিন্তু আমি শিওর, টিনুকদের ভয় দেখানোর জন্য করেছে। বোঝাতে চেয়েছে, দেখো, কত সহজেই আমি কত বড় ক্ষতি করে দিতে পারি। বসন্তকাল না আসা পর্যন্ত এখন না খেয়ে থাকো।
দেয়ালের কাছে গিয়ে ছবিটা শুকে দেখল কিশোর। তাজা রঙ। ঘণ্টা দুয়েক আগে এঁকেছে।
এক মুহূর্ত ভাবল মুসা। বলল, দুই ঘণ্টা আগে ফল নিয়ে এসেছিল টেড। ফলের ঝুড়ি রেখে ফিরে যাওয়ার সময় মাংসের টুকরোটা বের করে নিয়ে যাওয়া ওর জন্য সহজ।
যে কারও জন্যই সহজ। মাত্র কয়েক পা দূরে বন। ভিতর দিয়ে এলে কারও চোখে পড়বে না।
কিন্তু নিল কীভাবে? মুসার প্রশ্ন। মুজের একটা আস্ত রান কাঁধে করে বয়ে নিতে পারবে না। অনেক ওজন।
কম করে হলেও পঞ্চাশ কেজি। কিন্তু আমি ভাবছি টিনুকরা এখন খাবে কী? শিকারের মৌসুমের তো এখনও অনেক দেরি। কী যেন ভাবল কিশোর। চলল

তো, বাইরে গিয়ে দেখি। কোন সূত্র পাই কি না।
কেরোসিন-লণ্ঠনের কাঁপা কাঁপা অতি সামান্য আলো। তবে চিহ্নটা খুঁজে বের করতে বেগ পেতে হলো না ওদের। এক ইঞ্চি চওড়া দুটো গভীর রেখা চলে গেছে বরফের ওপর দিয়ে। রেখা দুটোর মাঝখানের দূরত্ব দেড় ফুট।
ডগশ্রেজের দাগ না, মুসা বলল। তাহলে দাগের মাঝখানের দূরত্ব আরও বেশি হতো।
ঝর্না থেকে পানি আনতে গিয়েছিল মুন, মনে আছে? হাতে টানা একটা স্লেজ নিয়ে গিয়েছিল সে…
নীচের চোয়াল স্কুলে পড়ার অবস্থা হলো মুসার। কিশোর, তুমি মুনকে সন্দেহ করছ?
না না, তা করছি না, কিশোর বলল। তবে পানি আনার পর ছাউনির বাইরে রেখেছিল হয়তো স্লেজটা। আর তাতে করে মাংস বয়ে নিতে পারে চোর।
মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে ভালমত দাগগুলো দেখল মুসা। হ্যাঁ, স্টেজে করেই নিয়েছে। দেখো, ডানের রেখাটার চেয়ে বায়ের রেখাটা বেশি গভীর। বোঝার ভারে হয়েছে। আর বোঝা মানে মাংস। ভারী দিকটা রাখা ছিল গাড়ির বাঁ পাশে।
অন্ধকারে জোসির ডাক শোনা গেল, কিশোর? মুসা?
জোসি, আমরা এখানে, জবাব দিল মুসা।
জোসি এলে ওকে সব জানাল ওরা। অ্যাথাবাস্কান ভাষার তুবড়ি ছোটাল জোসি। একটা বর্ণও বুঝল না দুজনে।
এই দেখো, স্লেজের দাগ, লণ্ঠনটা উঁচু করে ধরল কিশোর।
ওকে অবাক করে দিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল জোসি। একটা রেখার ওপর গাল চেপে ধরল। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, চাচার স্লেজ। চুরিটা করেছে সূর্য ডোবার ঠিক পর পর।
কী করে বুঝলে? কিশোরের প্রশ্ন।
রেখা ছুঁয়ে, জোসি বলল। চলো, দেখি চোরটা কোনদিকে গেছে।
বনের ভিতর দিয়ে পঞ্চাশ গজ মত এগিয়ে হাত তুলল জোসি। দাঁড়াও। ঝোপের মধ্যে কী যেন পড়ে আছে। কিশোর, লণ্ঠনটা বা দিকে উঁচু করো তো।
উঁচু করে ধরল কিশোর। চোখের পাতা সরু করে তাকাল মুসা। অন্ধকারে একটা কালো কী যেন পড়ে থাকতে দেখল।
হাসল জোসি। ওটাই আমাদের মুজের মাংস। যাক, রাতে আর খেয়ে থাকতে হবে না।
আস্ত একটা রান সহ এক পাশের অনেকখানি মাংস। টুকরোটা ছাউনিতে বয়ে নিল এল ওরা।

তোমরা কাটতে থাকো, আমি আসছি, ছাউনি থেকে বেরিয়ে গেল জোসি। দাগ ধরে ধরে চোরের সন্ধানে এগোল। কয়েক মিনিট পর ফিরে এসে জানাল, ওর কাছে যেতে পারলাম না। ভীষণ চালাক। স্লেজটা নেয়নি। ঝোপের মধ্যে মাংস ফেলে দিয়ে জেটা এনে রেখে গেছে আবার ছাউনির কাছে।
কিশোর বলল, আমি জানতাম, চুরির উদ্দেশ্যে চুরি করেনি চোর। ভয় দেখাতে চেয়েছে।
হ্যাঁ, জোসিও কিশোরের সঙ্গে একমত। চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল, প্রথমে আমাদের কেবিনে আগুন, তারপর জানালা দিয়ে লাকড়ি ছুঁড়ে মারা, তারপর আপেলে বিষ দেয়া, আর সবশেষে এই মাংস চুরি। কেউ একজন আমাদেরকে প্রচণ্ড ঘৃণা করে।
পরদিন সকালে জোসি ওর কুকুরগুলোকে দেখতে গেল, কিশোর ও মুসা চলল শহরে, রহস্যের তদন্ত করতে। প্রথমেই যার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, সে ইলকিস বিগ্‌স্‌।
হাই, বয়েজ, দেখেই হাসিমুখে চেঁচিয়ে উঠল বিগ। তারপর? গ্লিটারে কেমন কাটছে সময়?
ভাল, জবাব দিল কিশোর। এই ফলের ঝুড়ির ব্যাপারে কিছু কথা ছিল।
বলে ফেলল। কীসের ফল?
ওই যে গতকাল আপনি যেটা পাঠিয়েছিলেন টিনুকদেরকে, মুসা বলল।
আমি ফল পাঠাইনি। তবে মনে করিয়ে দিয়ে ভালই করলে। ওদের তো সবই পুড়ে গেছে। কিছু খাবারটাবার পাঠানো উচিত। শুনলাম, কাল রাতে নাকি ওদের খাবারও চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিল। এ সময়ে কারও মাংস চুরি যাওয়ার মানে ভয়ানক বিপদ। স্রেফ না খেয়ে মরতে হবে।
কিন্তু আপনি জানলেন কীভাবে? কিশোরের প্রশ্ন।
তোমাদেরকে তো আগেই বলেছি, এখানে খবর খুব দ্রুত ছড়ায়। ফলের ঝুড়ির কথা কী যেন বলছিলে?
এক ঝুড়ি তাজা ফল দিয়ে আসা হয়েছিল টিনুকদের বাড়িতে, তাতে আপনার কার্ড ছিল, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বিগসের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। চেহারার কোন পরিবর্তন দেখল না। ওই ঝুড়ির আপেল খেয়ে অসুস্থ হয়ে গিয়েছিলেন জেফরি আঙ্কেল। প্রায় মরার দশা।
কঠিন হয়ে গেল বিগসের দৃষ্টি। তোমরা কী বলতে চাও, বুঝতে পারছি। কিন্তু কাল কাউকে ফল পাঠাইনি আমি
তাহলে ঝুড়িতে দেয়া কার্ডটা? মুসার প্রশ্ন।
গ্লিটারের অর্ধেক লোকের কাছেই আমার কার্ড আছে, বিগ বলল। যে কেউ আমার কার্ড ঝুড়িতে রেখে দিতে পারে। যা-ই হোক, আমাকে এখন যেতে হবে।

জরুরি কাজ আছে।
তাড়াহুড়া করে চলে গেল বিগস্।
কিশোর বলল, অন্য কেউ পাঠিয়েছিল আপেলের ঝুড়িটা।
কে পাঠিয়েছিল জানি আমরা, মুসা বলল। জোসির বিরুদ্ধে যার প্রচণ্ড আক্রোশ। জোসির রেস জেতা যে বন্ধ করতে চায়। প্রয়োজনে তার আত্মীয়-স্বজনের ক্ষতি করে হলেও।
চলো, লুককে জিজ্ঞেস করে দেখি তিনি কী বলেন। তাঁর টুওয়ে রেডিওটাও লাগবে। থিম পার্কের ব্যাপারে মিস্টার সাইমনকে একটু খোঁজ-খবর করতে বলব।
বিখ্যাত গোয়েন্দা মিস্টার ভিকটর সাইমন, খোড়া গোয়েন্দা বইতে তিন গোয়েন্দার সঙ্গে তাঁর পরিচয়। এরপর থেকে তার সঙ্গে বহু কেসে কাজ করেছে তিন গোয়েন্দা। কখনও তিনি ওদের সহায়তা চেয়েছেন, কখনও তিন গোয়েন্দা ওঁর সাহায্য নিয়েছে।
ভালই হয়, কিশোরের কথায় মুসাও একমত। চলো।
দোকানেই পাওয়া গেল লুককে। রেডিও ব্যবহার করতে চাইল কিশোর। ওদেরকে দোকানের পিছনের ঘরে নিয়ে গেলেন লুক। ফেয়ারব্যাংকসে যোগাযোগ করা হলো প্রথমে। সেখান থেকে লাইন দেয়া হলো রকি বিচে। একটা টেলিফোন রিসিভার কিশোরের হাতে ধরিয়ে দিলেন লুক।
মাইক্রোফোনে হাত চাপা দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিশোর। লুকের দিকে তাকাল।
বুঝতে পারলেন তিনি। অ, একা কথা বলতে চাও। তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।
গ্লিটারে কী ঘটছে, সংক্ষেপে মিস্টার সাইমনকে জানাল কিশোর। তবে ওর সন্দেহের কথা চেপে গেল। কারণ একটা ছোট শর্ট ওয়েভ রেডিও সেট-এর সাহায্যে যে কেউ ওদের গোপন কথা শুনে নিতে পারবে।
সবশেষে বলল, সার, একটা কোম্পানি এখানে থিম পার্ক বানাতে চায়। কোম্পানিটা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই। ব্যাপারটা খুব ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে আমার কাছে। এ ব্যাপারে আপনি কিছু জানেন নাকি?
আলাস্কার গ্লিটারে থিম পার্ক? না, জানি না তো, মিস্টার সাইমন বললেন। তবে ইন্টারেস্টিং বলছ যেহেতু, খোঁজ নেয়া যেতে পারে। ঘণ্টাখানেক পরে আবার যোগাযোগ কোরো এই নম্বরে।
স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। মিস্টার সাইমন ওর ইঙ্গিত বুঝতে পেরেছেন। মুসাকে বলল, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই জানাবেন। ফলের ঝুড়িটার কথা আর আপাতত জিজ্ঞেস করব না লুককে। মিস্টার সাইমন কী বলেন আগে শুনি। তারপর।

দোকান থেকে বেরিয়ে এল দুজনে। পরের পঁয়তাল্লিশ মিনিট টেডকে খুঁজে বেড়াল ওরা। রাস্তায় কয়েকজন জানাল, সকালে টেডকে দেখেছে। কিন্তু কিশোর-মুসা ওর দেখা পেল না।
দোকানে ফিরে এল ওরা। আবার মিস্টার সাইমনের সঙ্গে যোগাযোগ করল কিশোর। কথা শেষ করতে মিনিটখানেকের বেশি লাগল না এবার। লাইন কেটে দিয়ে মুসাকে জানাল, কোম্পানিটার কোন বদনাম নেই, তবে টাকার টানাটানিতে পড়েছে। থিম পার্কের প্ল্যান কার্যকর করতে না পারলে টিকে থাকাই কঠিন হয়ে যাবে ওদের পক্ষে।
মাথা দোলাল মুসা। হু। তারমানে ভোটে জিততেই হবে ওদের, যেভাবেই হোক। আর জেতার জন্য হয়তো বিষ খাইয়ে মানুষ মারতেও পিছ-পা হবে না। খুবই জোরাল মোটিভ।
খোলা দরজার দিকে তাকিয়ে দেখে নিল কিশোর, কাছাকাছি। লুক আছে কি না। কণ্ঠস্বর নামিয়ে বলল, কিন্তু বিগ তো ফলের ঝুড়ি পাঠানোর কথা স্বীকার করল না।
অপরাধী কি আর সহজে কিছু স্বীকার করে? মুসা বলল, চলো, লুকের সঙ্গে কথা বলি।
দোকানের মূল ঘরে ফিরে এল ওরা। চকচকে পালিশ করা কাউন্টারের ওপাশে তাকের ওপর কনডেন্সড মিল্কের টিন সাজাচ্ছেন লুক। ফিরে তাকিয়ে হাসলেন। কি, কথা হলো?
হ্যাঁ। থ্যাংক ইউ, জবাব দিল কিশোর। আচ্ছা, লুক, কাল আপনি টিনুকদের বাড়িতে ফলের ঝুড়ি পাঠিয়েছিলেন?
মাথা নাড়লেন লুক। আমি না, বিগ দিয়েছিল। আমি টেডকে দিয়ে জেফরির বাড়িতে পাঠিয়েছি। কেন?
আশ্চর্য! মুসা বলল। আপনার দোকানে আসার আগে বিগসের সঙ্গে দেখা হয়েছে আমাদের। স্বীকারই করল না।
তাই নাকি? আমার এই কাউন্টারের ওপর পেয়েছি ঝুড়িটা। তাতে বিগৃসের একটা কার্ড আর একটা নোট ছিল। নোটে অনুরোধ করে লেখা ছিল, ঝুড়িটা যাতে টিকদের কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা করি। আমি ভাবলাম বিগসই রেখে গেছে।
কিশোর জিজ্ঞেস করল, নোটটা আছে?
না। ফেলে দিয়েছি। কী যেন মনে পড়তে মাথা দোলালেন। মনে হচ্ছে, শুধু বিস্ না, গোল্ডও এতে জড়িত। ওকে দিয়েই করিয়েছে।
বুড়ো প্রসপেক্টর?

মাথা ঝাঁকালেন লুক। কাউন্টারের দিকে চোখ নামালেন। মানুষের গোপন কথা অন্য কাউকে জানাতে ভাল লাগে না আমার। চোখ তুলে বিব্রত হাসি হাসলেন। কিন্তু মনে হচ্ছে তোমাদের বলা উচিত। কাল রাতে বিগসকে গোল্ডের হাতে টাকার তোড়া দিতে দেখেছি। চুপি চুপি দিচ্ছিল। এত টাকা কেন দিল গোল্ডকে? শুধু শুধু নিশ্চয় নয়? কিছু করানোর জন্য দিয়েছে।
কীভাবে দেখলেন? জানালা দিয়ে। কি জানি কি মনে হলো, রাতে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিলাম, তখন দেখলাম।
লুককে ধন্যবাদ দিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে এল দুই গোয়েন্দা। রাস্তায় নেমে কিশোর বলল, গোল্ডের সঙ্গে কথা বলা দরকার।
একটা কেবিন দেখে থামল ও। গোল্ডকে কোথায় পাওয়া যাবে জিজ্ঞেস করে জেনে নিল।
পাহাড়ী রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগল ওরা। শহরকে পিছনে ফেলে এগিয়ে চলল। পায়ে চলা সরু পথটা পুরানো দিনের গোল্ড রাশ যুগের কথা মনে করিয়ে দেয়।
গোল্ডের সোনার খনিটা শহর থেকে বিশ মিনিটের হাঁটা পথ। বরফ জমে থাকা সরু নালার ওপাশে মলিন একটা কুঁড়ে, প্রথম চোখে পড়ল কিশোরের। মুসাকে দাঁড়াতে বলে এগিয়ে গিয়ে গলা চড়িয়ে ডাকল, হাই, গোল্ড?
জবাব পেল না।
আরেকটু কাছে গিয়ে আবার ডাকল।
মৃদু পদশব্দ শুনে ঘুরে তাকাতে গেল। পারল না। পিছন থেকে ওর গলা পেঁচিয়ে ধরল একটা বাহু। চাপ বাড়াতে বাড়াতে শ্বাসরুদ্ধ করে দিল।
জটিল কিছু যন্ত্রপাতি দেখে কৌতূহল হয়েছিল মুসার, দেখার জন্য আগের জায়গা থেকে সরে চলে এসেছিল, সে-কারণেই কিশোরকে আক্রান্ত হতে দেখেনি। চাপা চিৎকার শুনে ফিরে তাকাল। গোল্ডের সবুজ পার্কা আর লাল ক্যাপ চিনতে পারল। কিশোরের গলা জড়িয়ে ধরে রেখেছে গোল্ড।
বন্ধুকে সাহায্য করতে ছুটল মুসা।
তবে ওর সাহায্যের প্রয়োজন হলো না। গোল্ডের কনুই আর কব্জি চেপে ধরে হঠাৎ ঝটকা দিয়ে পাশে সরে গেল কিশোর। জুজুৎসুর প্যাচ হ্যামারলক-এ আটকে ফেলল বিস্মিত গোল্ডকে।
ছাড়ো ছাড়ো! ব্যথা দিচ্ছ তো আমাকে! চেঁচিয়ে উঠল গোল্ড। আমি বুড়ো মানুষ!
আমাকে ধরার আগে কথাটা ভাবা উচিত ছিল আপনার। গোল্ডকে ছেড়ে দিয়ে দ্রুত দুই কদম পিছিয়ে গেল কিশোর। গোল্ড যদি আবার কিছু করতে চায়, পাল্টা ব্যবস্থা নিতে প্রস্তুত ও।

ভুরু দুটো কুঁচকে রেখে বাহুর ওপরের অংশ ডলতে লাগল গোল্ড। আমার ওপর নজর রাখছিলে তুমি। এ সব আমার ভাল লাগে না।
নজর রাখতে আসিনি, আপনার সঙ্গে কথা বলতে এসেছি, জবাবটা দিল মুসা। আপনাকে ঘাবড়ে দিতে চাইনি। বলেই বুঝল ভুল কথা বলে ফেলেছে।
ঘাবড়ে দেবে! চিৎকার করে উঠল গোল্ড, আমাকে? কেউ আমাকে ঘাবড়ে দিতে পারে না!
না না, তাড়াতাড়ি বলল মুসা, আসলে চমকে দিতে চাইনি।
মাটিতে থুতু ফেলল গোল্ড। আমাকে কেউ চমকেও দিতে পারে। পিছন থেকে এসে টেক্স ফেরানিকে অবাক করবে, এত সহজ। আমি তোমাদের আসার শব্দ শুনেছি। তোমাদের গন্ধ পেয়েছি…
ওকে থামিয়ে দেয়ার জন্য কিশোর বলল, আমরা এসেছি আপনার সঙ্গে কথা বলতে।
গোল্ডের ঝোপের মত ভুরুজোড়া কুঁচকে গেল। চোখে সন্দেহ। কী কথা?
থিম পার্ক সম্পর্কে আপনি কী ভাবছেন জানতে এলাম। গ্লিটারবাসীদের কাকে ভোট দেয়া উচিত?
উজ্জ্বল হলো গোল্ডের চেহারা। জরিপ চালাতে এসেছে, আগে বলবে তো। আমার মনে হয় সবারই হ্যাঁ ভোটে ভোট দেয়া উচিত। না দিতে যাবে কেন?
থিম লাইফের আইডিয়াটা তারমানে আপনার পছন্দ হয়েছে?
না হওয়ার কোন কারণ আছে? টাকা আসবে, প্রচুর টাকা! পকেট ভর্তি করে আনবে টুরিস্টরা। আমার খনি দেখতে আসবে। এখানকার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হয়ে উঠবে এটা। পুরানো গোল্ড রাশের দিনগুলোর একটা চিত্র পাবে লোকে। বছর দুএকের মধ্যেই
অবসর নেয়ার মত টাকা কামিয়ে ফেলতে পারব আমি। ফ্লোরিডায় চলে যাব।
প্যান্টের পকেটে হাত ঢোকাল গোল্ড। বের করে এনে সামনে বাড়িয়ে দিল। দেখো।
দুর্বল সূর্যালোকে চকচক করে উঠল হাতের তালুতে রাখা মটরদানার সমান একটা সোনার নুড়ি।
সোনা! চেঁচিয়ে উঠল মুসা।
দাঁত বের করে হাসল গোল্ড। একটা ভাঙা দাঁতের গোড়া দেখা গেল।
এখানে পেয়েছেন? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
হ্যাঁ। ঘুরে দাঁড়িয়ে বরফে ঢাকা একটা খাঁড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করল গোল্ড। ওর সঙ্গে তাল রেখে হাঁটতে হিমশিম খেয়ে গেল কিশোর ও মুসা।

খাড়িতে পেয়েছি এই নুড়ি, অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে গোল্ড। মহা শয়তান ওই খাড়ি, ভীষণ চালাক। কিন্তু আমি ওটার চেয়েও চালাক। আমার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারবে না। হাজার হাজার বছর ধরে ওপরের ওই পাহাড় থেকে নালা বেয়ে খাড়িতে এসে পানি পড়ে। বয়ে নিয়ে আসে সোনা। খাড়ির পানি ইউকনে গিয়ে পড়ে। একবার বড় নদীতে সোনা চলে গেলে সেটা আর পাওয়া যায় না। তার আগেই খাড়ি থেকে বের করে নিতে হয়। সেটাই করছি আমি।
আপনি কি প্যান করে সোনা বের করেন? কিশোর জানতে চাইল।
সিনেমায় প্যান করতে দেখেছে ও। বড় বড় চালনির মত জিনিস নিয়ে সোনার খনির ধারে নালার অগভীর পানিতে দাঁড়িয়ে থাকে স্বর্ণসন্ধানীরা। চালনি দিয়ে পানি থেকে নুড়িপাথর, মাটি, কাদা, বালি সব ঘেঁকে তোলে। চালনি নেড়ে নেড়ে সোনার ডো আবর্জনা থেকে আলাদা করে ফেলে। পাথরের চেয়ে সোনা ভারী। তাই আলাদা করতে অসুবিধে হয় না।
প্যান করে বোকারা, গোল্ড বলল। আমি প্রেসার মাইন ব্যবহার করি।
কাঠের একটা লম্বা সরু সেচযন্ত্রের মত জিনিস দেখাল ও। ওটা দেখছ? গরমকালে নালার বুক থেকে চেঁছে তুলে আনা কাদাপানি আমি ঢেলে দিই ওটাতে। পানি, কাদা, সব গড়িয়ে পড়ে যায়। আর সোনা ভারী বলে তলানি হয়ে বাক্সে পড়ে থাকে। গুঁড়ো, নুড়ি, টুকরো, সব।
মুসা জিজ্ঞেস করল, সোনা কতটা পাওয়া যায় এখানে?
বলব না, ওদের দিকে চোরা চাহনি দিল গোল্ড। তবে একটা তথ্য জানাতে পারি। এখনকার দিনে সোনা পেতে চাইলে খনিতে খুঁজে লাভ হবে না, তাতে খাটনিই বাড়বে। আসল সোনা এখন টুরিস্টদের পকেটে।
হাসল কিশোর। আপনার কথায় কিন্তু মনে হচ্ছে থিম পার্ক কোম্পানির কাছে ঘুষ খেয়েছেন।
ধূর! একটা আধলাও দেয় না, জবাব দিল গোল্ড।
কিন্তু আমরা যে শুনলাম, আপনি নাকি ইলকিস বিগসের হয়ে কাজ করেন? মুসা বলল, আপনাকে নাকি অনেক টাকা দিতে দেখেছে।
মুঠোবদ্ধ হয়ে গেল গোল্ডের হাত। কে দেখেছে?
লুক স্টার্লিং, মুসা বলল।
ওর কথা! আস্ত মিথুক! ভঙ্গি দেখে মনে হলো সামনে লুককে পেলে এখনই ঘুসি মেরে বসত গোল্ড। ওর অবর্তমানে বাতাসে মারল। ও আমাকে দেখতে পারে না। যেদিন থেকে বুঝে গেছে, আর সবার মত আমাকে ঠকাতে পারবে না, সেদিন থেকেই আমার পিছে লেগেছে। আজ পর্যন্ত ইলকিস বিগ আমাকে কিছু দেয়নি, বকবকানি ছাড়া।

কথা বলতে যাচ্ছিল কিশোর। থামিয়ে দিল গোল্ড। যাও এখন। আর কোনদিন যেন আমার এলাকায় না দেখি। শুরু থেকেই সন্দেহ হচ্ছিল তোমরা কারও স্পাই, এখন দেখছি ভুল করিনি।
গোল্ডের কাছ থেকে আর কিছু জানা যাবে না। শহরে ফিরে চলল কিশোররা।
কিশোর বলল, লুক আর গোল্ড, দুজনের মধ্যে একজন মিথ্যে বলছে। কোনজন?
গোল্ড যদি ইলকিস বিগসের হয়ে প্রচারের কাজ করেই থাকে, সেটা অন্যায় নয়, লুকানোর দরকার কী?
জবাব দিতে যাচ্ছিল মুসা। দূর থেকে আসা শব্দ শুনে থেমে গেল। ঘাড়ের নোম দাঁড়িয়ে গেল। কিশোর! নেকড়ে!
হাসল কিশোর। হ্যাঁ, ডাকটা নেকড়ের ডাকের মতই। গোল্ড আমাদের ভয় দেখাচ্ছে।
কিন্তু মেনে নিতে পারল না মুসা। শহর এখান থেকে কতদূর?
কেন? ভুরু নাচাল কিশোর। তুমি ভাবছ নেকড়েরা শহরের সীমানায় ঢোকে না?
দেখো, কিশোর, ইয়ার্কি না! ফিরে তাকাল মুসা। নীরব কালো গভীর বন। বনের ভিতর কিছু ছায়ার নড়াচড়া। ওগুলোকে শুধু ছায়া ভেবেই সান্ত্বনা পেতে চাইল ও।
লুকও মিথ্যে বলে থাকতে পারেন, আগের প্রসঙ্গে ফিরে গেল কিশোর। গোল্ডের সঙ্গে তাঁর শত্রুতা। বুড়োর বিরুদ্ধে বলতেই পারেন।
শহরে সীমানার বাইরের শেষ ঢালটা পেরোচ্ছে ওরা, এমন সময় শহরের প্রান্তের একটা কেবিন থেকে বিগত্সকে বেরোতে দেখল। মুসা বলল, ভোটর প্রচার করতে বেরিয়েছে। যাই বলল, ভীষণ পরিশ্রমী লোক। চলো, গোল্ডকে টাকা দিয়েছে কি না জিজ্ঞেস করি।
বিগসও ওদের দেখেছে। দাঁড়িয়ে গেল। ওরা কাছে গেলে জিজ্ঞেস করল, খনি দেখতে গিয়েছিলে নাকি?
কী করে জানলেন? কিশোরের প্রশ্ন।
অনুমান। ওদিক থেকেই এলে তো।
গোল্ড ফেরানির প্রেসার মাইন দেখতে গিয়েছিলাম, কিশোর জানাল।
ভালই করেছ, বিগ বলল। এখানকার একটা দর্শনীয় জায়গা। ঠিকঠাক করে নিয়ে টুরিস্ট আকৃষ্ট করার উপযুক্ত করা গেলে গোল্ড রাশ টাউন হিসেবে কদর বেড়ে যাবে গ্লিটারের।
মুসা বলল, আপনাদের থিম-প্ল্যান নিয়ে গোল্ড কিন্তু খুব আশাবাদী।
মাথা ঝাঁকাল বিগ্স। হবেই। ওর ওই খনি ওকে স্টার বানিয়ে দেবে। হলিউডের ছবিতে যে সব স্বর্ণসন্ধানীদের দেখো, সবাই অভিনেতা, ওর মত আসল

স্বর্ণসন্ধানী ওরা কোথায় পাবে? গ্লিটারে থিম পার্কের সবচেয়ে বেশি বেতনভোগী কর্মচারী হয়ে গেলেও অবাক হব না।
আমি তো ভেবেছিলাম, এখনই বেতন পাওয়া শুরু করেছে গোল্ড, বিগৃসের প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য বলল কিশোর।
তীক্ষ্ণ হয়ে গেল বিগসের দৃষ্টি। কার কাছে শুনলে? শুনেছি, যার কাছেই হোক, কিশোর বলল। কথাটা ঠিক কি বলুন।
গ্লিটারে থিম পার্কের একমাত্র বেতনভোগী কর্মচারী আমি, বিগস জবাব দিল। আরও কেউ যদি নিজেকে গ্লিটারের কর্মচারী বলে দাবি করে থাকে, কেন করছে আমি জানি না। যাই, অনেক কাজ। এখনও বহু লোককে বোঝননা বাকি।
চলে গেল বিগস।
ও ছাড়া গ্লিটারে থিম পার্কের আর কোন কর্মচারী নেই, হয়তো ঠিকই বলেছে, বিড়বিড় করল কিশোর, কিন্তু কোম্পানির কাছ থেকে কারও ঘুষ খেতে তো কোন অসুবিধে নেই। কোম্পানির হয়ে যদি কাউকে ঘুষ দিয়ে থাকে বিগস্…
নোংরা কাজ করানোর জন্য, কথাটা শেষ করল মুসা। তারমানে, এখন থেকে বিগসের ওপর নজর রাখতে হচ্ছে আমাদের।
এগিয়ে চলল ওরা। পায়ে চলা যে পথটা ধরে চলেছে, সেটা দিয়েই জোসির কুকুরের কেনলগুলোর কাছে যেতে হয়। মোড় পেরোলেই দেখা যাবে। কুকুরের উত্তেজিত চিৎকার শোনা গেল।
মোড়ের অন্যপাশে এসে জানা গেল উত্তেজনার কারণ। চিৎকার করে বলল কিশোর, মুসা, দেখো, একটা কুত্তা দড়ি ছিড়ে পালিয়েছে।
ঘরের কাছে খুঁটিতে বাঁধা থাকে কুকুরগুলো। একটা খুঁটির দড়ি ছেড়া। মুসা বলল, কামড়ে কেটে ফেলেছে।
দৌড়ে আসতে দেখা গেল জোসিকে। কাছে এসে হেঁড়া দড়িটা দেখে মুখ কালো হয়ে গেল। সর্বনাশ! রেড লাইট পালিয়েছে!
প্রতিটি কুকুরের কাছে গিয়ে কানের কাছে মোলায়েম স্বরে কথা বলে বলে ওগুলোকে শান্ত করতে লাগল ও। চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল কিশোররা। কুকুরগুলো শান্ত হলে জোসি বলল, সাংঘাতিক ক্ষতি হয়ে গেল। রেড লাইট ডায়মণ্ডহার্টের সহকারী। ডায়মণ্ড অসুস্থ হলে কিংবা অন্য কোন কারণে স্লেজ টানতে না পারলে রেড লাইট নেতৃত্ব দেয়। ইস, নেকড়েগুলোর ডাক শুনেই কেন যে চলে আসিনি!
নেকড়ের ডাক আমরাও শুনেছি, মুসা বলল।
দলের শক্তি বাড়ানোর জন্য পোষা কুকুরকে লোভ দেখিয়ে ডেকে নিয়ে যায় নেকড়েরা, জোসি বলল। জ্যাক লণ্ডনের কল অভ দি ওয়াইল্ড পড়নি? আবার

কুকুরগুলোর কাছে গিয়ে মৃদু স্বরে ওগুলোর সঙ্গে কথা বলতে লাগল ও।
কী মনে হতে রেড লাইটের খুঁটির কাছে গিয়ে দাঁড়াল কিশোর দড়ির ছেড়া মাথাটা হাতে নিয়ে পরীক্ষা করতে লাগল। ফিরে তাকিয়ে ইশারা করল মুসাকে।
মুসাও দেখল দড়িটা। সুতোর ছেড়া মাথাগুলো এত মসৃণ কেন? দাঁত দিয়ে কাটলে কিংবা টানাটানি করে ছিড়লে তো এত সমান হয় না।
ঠিকই বলেছ, মাথা ঝাঁকাল কিশোর। ধারাল ছুরি দিয়ে কাটার মত। মানে বুঝতে পারছ? দড়ির বেশির ভাগটাই কেটে রেখেছিল কেউ। কুকুরটা দুই-চার টান দিতেই বাকিটুকু ছিড়ে গেছে।
দূর থেকে আবার শোনা গেল নেকড়ের ডাক। সঙ্গে সঙ্গে চেঁচানো শুরু করল কুকুরগুলো। জোসি বলল, ইজি, বয়েজ, ইজি।
তুমি ওদেরকে শান্ত করো, জোসিকে বলল কিশোর। আমি আর মুসা গিয়ে রেড লাইটকে খুঁজে আনি।
বাধা দিতে গিয়েও কী ভেবে দিল না জোসি।
রেড লাইটের পায়ের ছাপ অনুসরণ করে বনের মধ্যে এসে ঢুকল কিশোর ও মুসা।
কুকুরটা অনেক বড়। থাবাও বড়। তুষারে গভীর হয়ে ডেবে গেছে। অনুসরণ করা সহজ।
নীচের দিকে চোখ নামিয়ে হাঁটছে দুজনে। কিশোর বলল, আমরা যখন মোড়ের অন্যপাশে, কুকুরগুলো তখন চেঁচাননা শুরু করেছিল। মনে আছে?
মাথা ঝাঁকাল মুসা। হ্যাঁ।
আমার ধারণা, ওই সময়ই দড়ি ছিড়ে বনের দিকে দৌড় দেয় রেড লাইট। আর তাই যদি হয়ে থাকে, বেশি দূরে যায়নি ও।
পায়ের ছাপ ধরে এগোতে থাকল ওরা। বন থেকে বেরিয়ে ছোট্ট এক টুকরো খোলা জায়গা পেরিয়ে আবার বনে ঢুকে গেছে কুকুরটা।
কাঁপা কাঁপা তীক্ষ্ণ চিৎকার থেমে থেমে ভেসে এল বনের ভিতর থেকে। পরস্পরের দিকে তাকাল কিশোর-মুসা। সাবধান হয়ে গেল।
কাছেই নেকড়েগুলো, কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে বলল মুসা। তারমানে কুকুরটাও আছে।
বনের ভিতর দিয়ে এগোতে এগোতে গাছপালার ফাঁক দিয়ে সামনে ছোট্ট আরেক টুকরো খোলা জায়গা চোখে পড়ল ওদের। ওরা বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল ডাকাডাকি।
বরফের মত জমে গেল যেন দুজনে। বাতাস স্তব্ধ। কোথাও কোন শব্দ নেই। ভূতুড়ে লাগল এই হঠাৎ নীরবতা। গায়ে কাঁটা দিল।

আস্তে করে গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল বাদামি-ধূসর একটা মাদী নেকড়ে। বড় জাতের কুকুরের সমান। দাঁড়িয়ে গেল ওদের দিকে তাকিয়ে।
একটু পর আরও তিনটে নেকড়ে বেরোল বন থেকে। পাশাপাশি প্রায় গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ক্ষুধার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কিশোর-মুসার দিকে। নেকড়েগুলোর হাঁ করা মুখের ভিতর থেকে লম্বা জিভ বেরিয়ে ঝুলে পড়েছে। কিশোরের মনে হলো, শিকারের অসহায়ত্ব দেখে নীরব হাসি ফুটেছে ওদের মুখে। খুব সামান্য লেজ নড়ানো বাদ দিলে একেবারেই মূর্তি।
কিশোর, কী করব? বিড়বিড় করল মুসা।
ওদের বলল, আমরা যুদ্ধে বিশ্বাসী নই, শান্তি চাই। ওদের নেতার কাছে নিয়ে যেতে বলো, বিড়বিড় করেই জবাব দিল কিশোর।
রসিকতা ছাড়ো। বাঁচার কোন বুদ্ধি আছে?
আছে। নড়বে না। ওদের মতই মূর্তি হয়ে যাও। আমরা ওদের হামলা করতে পারি, এ ধারণাটা যাতে কোনমতেই ওদের মাথায় না ঢোকে। আমরা যে ভয় পেয়েছি, সেটাও বুঝতে দেবে না।
বুঝলাম।
পিছিয়ে গিয়ে দেখতে পারি ওরা কী করে, কিশোর বলল। খুব ধীরে।
সাবধানে এক পা পিছনে সরল দুজনে। আরেক পা ফেলল। ওদের সঙ্গে যেন অদৃশ্য সুতোয় বাঁধা রয়েছে নেকড়েগুলো, টান লেগে ঠিক ততখানিই এগোল, ওরা যতখানি পিছিয়েছে। তারপর দুই পাশের দুটো নেকড়ে ডানে-বাঁয়ে একটুখানি করে সরে গেল।
চলে যাবে? মুসার প্রশ্ন।
ভুলেও ভেবো না, সতর্ক করল কিশোর। আমাদের ঘিরে ফেলার চেষ্টা করছে। এভাবেই হামলা চালায় নেকড়েরা।
বাহ্, দারুণ একটা খবর শোনালে। কিন্তু তুমি তো নেকড়ে গবেষক নও। ওরা কী করবে জানলে কীভাবে?
বই পড়ে আর ন্যাশনাল জিওগ্রাফি দেখে।
নেকড়েগুলো আকারে হাস্কি কুকুরের চেয়ে বড়। দূর অতীতে কোনও এক সময় বোধহয় একই গোত্রের প্রাণী ছিল ওরা, রক্তের সম্পর্ক রয়েছে। কুকুরের তুলনায় নেকড়েগুলো অনেকটাই রোগাটে, ছিপছিপে। চোখে রাজ্যের খিদে। কিশোর জানে, কুকুরের চোয়ালের চেয়ে নেকড়ের চোয়াল দ্বিগুণ শক্তিশালী।
কিশোর, মুসা জিজ্ঞেস করল, ওরা যেভাবে আমাদের ঘিরে ফেলতে চাইছে, একেই কি সাঁড়াশি আক্রমণ বলে?
জানি না। তবে ওরা যা চাইছে, সেটা ঘটতে দেয়া যাবে না।

ঠেকাব কীভাবে?
ভাবছে কিশোর। ভোলা জায়গায় রয়েছে ওরা। বনের ভিতর কি নিরাপদ? না বিপদ আরও বেশি? বনে ঢোকা ছাড়া আর কোন উপায়ও দেখছে না। বন পেরিয়ে শহরের সীমানায় চলে যেতে হবে। কিন্তু তাতেও কি রক্ষা পাবে? সত্যিই কি শহরের সীমানায় ঢোকে না নেকড়েরা? সন্দেহ আছে কিশোরের।
মুসা, ডানে দেখো! ফিসফিস করে বলল মুসা।
ডান দিকের বন থেকে বেরিয়ে এসেছে একটা বড় হাস্কি। দুলকি চালে হেঁটে আসতে লাগল ওদের দিকে।
ওটাই বোধহয় রেড লাইট, কিশোর বলল।
মনে হয়, মুসা জবাব দিল। রেড লাইট হোক বা না হোক, ওটা আমাদের পক্ষে থাকলেই আমি খুশি।
নেকড়েগুলোর কাছাকাছি এসে থেমে গেল কুকুরটা। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গরগর শুরু করল। চাপা, ভয়ঙ্কর শব্দ। থেমে গেল নেকড়েগুলো। তুষারে ঢাকা বনের এই মরণ-নাটকের নতুন অভিনেতার দিকে নজর দিল।
এটাই সুযোগ, কিশোর বলল। পিছাতে থাকো। বনের মধ্যে ঢুকেই দেবে দৌড়।
কয়েক সেকেণ্ডেই বনে ঢুকে পড়ল দুজনে। একটা মুহূর্ত আর দেরি করল না। দৌড়ানো শুরু করল। বুটের চাপে ভাঙছে পাতলা তুষারের স্তর। জুতো ডেবে যাওয়াটা একটা অসুবিধে। আরেক অসুবিধে, দৌড়ালে হাঁপাতে হয়। দ্রুত শ্বাস টানার সময় নাক দিয়ে ঢুকে যায় কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস। এ রকম আবহাওয়ায় এভাবে দ্রুত বাতাস টানার কারণে ফুসফুস জমে গিয়ে মানুষ মারা যাওয়ার গল্প শুনেছে কিশোর। তবে সেটা পরের ভাবনা। আপাতত নেকড়ের আক্রমণ থেকে বাঁচতে হবে।
পাতলা হয়ে এল বন। পায়ে চলা একটা পথের ওপর এসে পড়ল দুজনে। শহরের দিকে মুখ করে দৌড়াতে থাকল। দূরে একটা টিলার মাথায় উঠে আসতে দেখল জোসি আর ওর কুকুরের দলকে। থেমে গেল কিশোর। ওর প্রায় ঘাড়ের ওপর এসে পড়ল মুসা। তবে ধাক্কাটা লাগল না। ধপ করে পথের ওপরই বসে পড়ল দুজনে। হাঁপাতে লাগল বিপজ্জনকভাবে।
কাছে এসে স্লেজ থামাল জোসি। গাড়ি থেকে নেমে এল। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে?
ভারী দম নিল কিশোর। ঢোক গিলে বলল, নেকড়ে।
আমাদের ঘিরে ফেলা শুরু করেছিল, মুসা জানাল। রেড লাইট আমাদের বাঁচিয়েছে।

অসীম সাহসে নেকড়েগুলোর মুখখামুখি হলো কুকুরটা, কিশোর বলল। ধমকানো শুরু করল। সুযোগ পেয়ে দৌড় দিলাম। ভুল করেছি। ওকে এভাবে ফেলে আসাটা উচিত হয়নি।
না, ভুল করনি। এটাই চেয়েছিল ও, জোসি বলল। তোমাদের পালানোর সুযোগ করে দিয়েছে। তোমরা যাও। আমি রেড লাইটকে আনতে যাচ্ছি। নেকড়েগুলো যেই বুঝবে কুকুরটা ওদের দলে যোগ দিতে চায় না, ধরে মেরে ফেলবে।
একা যাবে? কিশোর বলল। আমরা আসি?
দরকার নেই, জোসি বলল। নেকড়ে আমাদের কিছু করতে পারবে না। দেখছ না, কত কুকুর নিয়ে যাচ্ছি। গম্ভীর হয়ে গেল ও। আমি ভয় পাচ্ছি রেড লাইটের কথা ভেবে। ওকে জ্যান্ত পেলে হয়! ওকে হারালে…
স্লেজে ধাক্কা দিল জোসি। কুকুরগুলোকে বলল, হাইক! হাইক!
ছুটতে শুরু করল কুকুরের দল। মুহূর্তে টিলার ওপাশে অদৃশ্য হয়ে গেল।
সেদিকে তাকিয়ে থেকে চিন্তিত ভঙ্গিতে কিশোর বলল, কিন্তু কুকুরটার দড়ি কাটল কে? অবাক লাগছে আমার!
শহরের দিকে রওনা হলো দুজনে।
দড়ি কাটার খবরটা কি জোসি জানে? মুসার প্রশ্ন।
মনে হয় না। তবে জানার পর কী খেপা যে খেপবে সেটা আন্দাজ করতে পারছি। এই কুকুরগুলোই ওর সব।
শহরের কেবিন আর কাঠের ছাউনিগুলো নজরে এল। খপ করে মুসার হাত চেপে ধরে কিশোর বলল, দেখলে?
কী? এদিক ওদিক তাকাল মুসা।
আস্তে কথা বলো! ওই ছাউনিটার দিকে তাকাও।
একটা ছাউনির দরজা ফাঁক হয়ে আছে। সেটা দিয়ে চুপি চুপি বেরিয়ে এল একটা ছায়ামূর্তি।
কী করছে ও? মাংস চুরি?
জানি না, তাকিয়ে আছে কিশোর। তবে ওর ভাবভঙ্গি সুবিধের মনে হচ্ছে না। শয়তানি মতলব আছে। চলো তো দেখি।
ওদের দেখে ফেলল লোকটা। ছুটতে শুরু করল। ছাউনির পাশ ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল।
ঢাল বেয়ে যত দ্রুত সম্ভব ছাউনির কাছে নেমে এল কিশোর ও মুসা। কোথাও দেখল না লোকটাকে।
বুঝলাম না, চারপাশে তাকাতে তাকাতে বলল বিস্মিত মুসা, কোথায় উধাও হলো?

ফিরে তাকাল কিশোর। দেখল লোকটাকে। পাহাড়ের ওপরের বনে ঢুকে যাচ্ছে। ওই যে যাচ্ছে! বলেই দৌড় দিল ও। মুসা ছুটল ওর পিছনে।
পাঁচ মিনিট পর হাল ছেড়ে দিল ওরা। ওদের চেয়ে অনেক এগিয়ে রয়েছে লোকটা। পিছু নিয়ে এখন ধরা অসম্ভব। তা-ও যদি নেকড়েগুলোর কাছ থেকে পালাতে গিয়ে শক্তি খরচ করে না ফেলত, এক কথা ছিল।
ধূর, গেল চলে! হাঁপাতে হাঁপাতে বলল মুসা। ছাউনিতে কী করছিল?
কিছু একটা কুমতলব তো নিশ্চয় ছিল, নইলে পালাল কেন? জবাব দিল কিশোর। ভালমত দেখেছ?
দেখেছি। সবুজ পার্কা। সামান্য এই সূত্র দিয়ে ওকে চিনতে পারব বলে তো মনে হচ্ছে না। কী করতে ঢুকেছিল, ছাউনিটাতে ঢুকে দেখা দরকার।
মাথা নাড়ল কিশোর। চুরি করে অন্যের ঘরে ঢোকাটা ঠিক হবে। তবে ছাউনিটা কার, সেটা জানা যেতে পারে। জেফরি আঙ্কেলকে জিজ্ঞেস করব।
কেবিনে ফিরে শুধু মুনকে পেল ওরা। মুন জানাল, বাবার শরীর ঠিক হয়ে গেছে। ঘরে বসে থাকতে ভাল লাগছিল না, মাকে নিয়ে তাই মিটিঙে গেছে। আমিও রওনা হচ্ছিলাম। যাবে নাকি?
কীসের মিটিং? জানতে চাইল মুসা।
ভোটের আগের শেষ মিটিং। শহরের সব লোক যাবে অ্যাসেম্বলি হলে, থিম পার্ক নিয়ে আলোচনার জন্য। জোসি কই? সে-ও তো যেতে চেয়েছিল।
রেড লাইট দড়ি ছিড়ে পালিয়েছে। ওকে খুঁজতে গেছে, কিশোর জানাল।
সর্বনাশ! কুকুরটাকে না পেলে মস্ত ক্ষতি হয়ে যাবে। রেড লাইট ওর দলের সবচেয়ে ভাল কুকুরগুলোর একটা। ইডিটারোড রেসেরও আর দেরি নেই। এ সময় রেড লাইটকে খোয়ালে খুব বেকায়দায় পড়ে যাবে।
পার্কা পরে বেরিয়ে এল মুন। অ্যাসেম্বলি হলে রওনা হলো তিনজনে। হাঁটতে হাঁটতে বন্ধুকে বলল মুসা, ওকে কি ওখানে পাওয়া যাবে?
কাকে? বুঝতে পারল না কিশোর।
যাকে আমরা তাড়া করেছিলাম।
কী জানি। যদি যায়ও ও, চিনতে পারব না। শহরের অনেকেই সবুজ পার্কা গায়ে দেয়। কোনজন আমাদের লোক বুঝব কীভাবে?
অ্যাসেম্বলি হলে এসে দেখল লোকে ভরে গেছে। পিছনের সারিতে সিট পেল ওরা। নেতা গোছের একজন সভা আরম্ভ করার নির্দেশ দিলেন। তাঁকে চেনে না কিশোররা।
মিস্টার সিউল, টেডের বাবা, ফিসফিস করে বলল মুন।
প্রথমে বিগসকে কিছু বলার অনুরোধ জানালেন মিস্টার সিউল।

গ্লিটারে থিম পার্ক হলে শহরবাসী কী কী সুবিধে ভোগ করবে, তার ওপর বক্তৃতা দিল বিগস্। ঘুম পাচ্ছে কিশোরের। হাততালির শব্দে চমকে জেগে গেল। দেখে বিগ বসে পড়েছে। গোল্ড ফেরানি উঠে দাঁড়িয়েছে। বক্তৃতা শুরু করল। পুরো সজাগ এখন কিশোর। কান খাড়া করে শুনতে লাগল।

গ্লিটারে আমাদের স্বাভাবিক কাজকর্ম আমরা করে যেতে পারব, কোনটাই বন্ধ হবে না, গোল্ড বলছে। আমি খনিতে কাজ করতে পারব, শিকারীরা শিকার করতে পারবে, জেলেরা মাছ ধরতে পারবে। অমানুষিক পরিশ্রম করেও কোনমতে টিকে আছি এখন আমরা। অবস্থা যা দেখা যাচ্ছে, আর কিছুদিন পর না খেয়ে থাকতে হবে। খনিতে এখন আর সোনা মেলে না। সোনা এখন টুরিস্টের পকেটে, ডলার হয়ে ঢুকে গেছে। ওদের পকেট থেকে ওগুলো বের করে আনতে না পারলে আমাদের উন্নতি হবে না। কিন্তু বের করার জন্য গ্লিটারে ওদেরকে ডেকে আনা দরকার। থিম পার্ক কোম্পানি নিজেরাও টাকা কামাতে চাচ্ছে, আমাদেরও ভাগ দিতে চাচ্ছে, তাহলে সমস্যাটা কোথায়? এ সুযোগ আমাদের হাতছড়া করা উচিত হবে না।

অর্ধেকের মত শ্রোতা জোর করতালি দিয়ে স্বাগত জানাল গোল্ডের বক্তব্যকে। যারা দিল না, তাদেরও অনেককেই এই বক্তৃতা শোনার পর দ্বিধান্বিত মনে হচ্ছে। থিম পার্কের পক্ষে ভোট দেবে কি না সেটা ভাবছে বোধহয়।

জেফরি উঠে দাঁড়ালেন। গোল্ড ঠিকই বলেছে।

অবিশ্বাসের গুঞ্জন উঠল শ্রোতাদের মাঝে। পার্কের পক্ষ নিয়েছেন ঘোর বিরোধী জেফরি! অবাক হলো কিশোর।

ঠিক বলেছে গোল্ড, আবার বললেন জেফরি, অন্তত একটা ব্যাপারে। আমাদের আয় কমে গেছে। আর কমলে না খেয়ে থাকতে হবে। আমরা সেটা জানি। আয়ের নতুন পথ খোঁজা উচিত আমাদের, তা-ও জানি। কিন্তু আমার মতে থিম পার্কই এর সমাধান নয়।

পাশে বসা মুনকে জোরে নিঃশ্বাস ফেলতে শুনল কিশোর। স্বস্তির।

শত শত বছর ধরে, জেফরি বলে চলেছেন, এখানকার মাটি আর প্রকৃতির সঙ্গে মিলে-মিশে বাস করেছেন আমাদের পূর্বপুরুষরা, আমরাও করছি। শীতের আগে আমরা বনে গিয়ে মুজ শিকার করি, গরমে স্যামন ধরি নদীতে। দীর্ঘ শীতের মাসগুলোতে আমরা কুকুরের ট্রেনিং দেই। আমাদের হস্তশিল্পের কদর দুনিয়াজোড়া। আমাদের ইতিহাস, আমাদের ঐতিহ্য, সব আমরা নষ্ট করব টাকার লোভে টুরিস্ট ডেকে আনলে। আমাদের স্বকীয়তা বলতে আর কিছু থাকবে না তখন। আমাদের শহর আমাদের থাকবে না। হাজার হাজার মাইল দূরের অফিসে বসে এ শহরটাকে নিয়ন্ত্রণ করবে এমন কিছু মানুষ, গ্লিটারবাসীর কাছে যারা

পুরোপুরি অচেনা। আমরা কি ওদের ডেকে এনে নিজের সর্বনাশ করতে চাই? ভালমত ভেবে দেখা দরকার।
বসে পড়লেন জেফরি। আবার অর্ধেকের মত শ্রোতা জোর করতালি দিয়ে তাঁকে সমর্থন করল।
বিগস উঠে দাঁড়িয়ে বলল, জেফরি, আপনার বক্তব্যকে আমি যথেষ্ট সম্মান করি। আপনার উদ্বেগের কারণও আমি বুঝি। কিন্তু একটা কথা কি আপনি জানেন, থিম পার্ক কোম্পানি আপনাদের প্রতি আকৃষ্টই হয়েছে আপনারা আপনাদের ঐতিহ্য বজায় রাখতে পেরেছেন বলেই? আপনার কি মনে হয় সে-সব ধ্বংস করে দিতে চাইব আমরা? তাতে নিজের পায়ে নিজেরা কুড়াল মারব। পুরানো সব কিছু ধ্বংস করে দিলে টুরিস্টদের কী দেখাতে আনব? আমি আপনাকে পরিষ্কারভাবে বলে দিতে চাই…
কথা শেষ হলো না ওর। প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে উঠল অ্যাসেম্বলি হল।
তুমুল শোরগোল। অ্যাসেম্বলি হলের অনেকেই সিট থেকে মেঝেতে ঝাঁপ দিয়েছে। বহু প্রশ্ন আর চিৎকার-চেঁচামেচির স্রোত বয়ে গেল জনাকীর্ণ ঘরটায়। কে যেন একজন চেঁচিয়ে উঠল, এই চলো চলো, বেরোও! মরবে নাকি এখানে থেকে! দরকার নেই আমাদের থিম পার্কের!
হুড়াহুড়ি করে দরজার দিকে ছুটল বহু লোক। বাইরে থেকে চিৎকার শোনা গেল, আগুন! আগুন!
এই থামুন থামুন! শান্ত হোন! সব হট্টগোলকে ছাপিয়ে শোনা গেল মিস্টার সিউলের কণ্ঠ। অহেতুক ঠেলাঠেলি করবেন না। ঘরের মধ্যে কোন বিপদ নেই। বাইরে থেকে এসেছে বিস্ফোরণের শব্দ।
আতঙ্কিত জনতার কাছ থেকে মুনকে টেনে সরাল কিশোর ও মুসা। তারপর দুজনে হাতে হাত ধরে ওকে মাঝখানে রেখে একটা ব্যারিকেড তৈরি করল উন্মত্ত জনতার ধাক্কাধাক্কি থেকে বাঁচানোর জন্য। শহরের গণ্যমান্য কয়েকজন নানাভাবে বুঝিয়ে জনতাকে থামানোর চেষ্টা করছে। দরজার কাছ থেকে ওদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে এসে চেয়ারে বসাতে চাইছে। দ্রুত কমে এল আতঙ্ক।
জেফরির চিঙ্কার শোনা গেল, দরজার কাছ থেকে সরে আসুন। বাতাস ঢোকা বন্ধ করে দিচ্ছেন তো।
ঘুরে তাকাল মুসা। একটা চেয়ারের ওপর দাঁড়ানো দেখতে পেল জেফরিকে। দুই হাত মুখের কাছে জড় করে চিৎকার করে আবার বললেন তিনি, যারা আগুন নেভাতে পারে তাদের বেরোতে দিন আগে। সরুন। সরে যান দরজার কাছ থেকে।
কেমন বোকা বোকা লাগছে মানুষগুলোকে। কী করবে বুঝে উঠতে পারছে না। ধীরে ধীরে সরে যেতে শুরু করল দরজার কাছ থেকে। ডজনখানেক লোক,

যাদেরকে জেফরির কেবিনের আগুন নিভাতে দেখেছিল মুসা, এক দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। তাদের পিছু পিছু আরও অনেকেই বেরোনো শুরু করল।
চলো, আমরাও যাই, কিশোরকে বলল মুসা।
জনতার লম্বা সারিতে একটা ফাঁক দেখে তার মধ্যে নিজেদের ঢুকিয়ে নিল ওরা। মনে হলো সারিটা আটকে গেছে। আগেও যায় না, পিছেও যায় না। তারপর আচমকা স্রোতের ধাক্কায় কুটোর মত বেরিয়ে চলে এল সরু দরজাটা দিয়ে। ঠাণ্ডা বাতাসে দম নিতে লাগল হাঁ করে।
এমনিতে বাইরের বাতাস তাজাই থাকে, তবে এখন পুরোপুরি তাজা বলা যাবে না। ধূসর ধোয়ার চাদর ছড়িয়ে পড়েছে। কোনখানে ওই ধোয়ার উৎপত্তি, বুঝতে সময় লাগল না।
হায় হায়, আমার দোকান! চিৎকার করে উঠলেন লুক স্টার্লিং। আমার দোকানে আগুন লেগেছে।
দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে দৌড়ানো শুরু করলেন তিনি। তাঁর ঠিক পিছনেই রইল কিশোর ও মুসা। অর্ধেক পথ এসে কিশোর বলল, দোকান না, দোকান না, আগুন লেগেছে পিছনের কোন কিছুতে।
মুসাও দেখল। আগুন আর ধোঁয়া উঠছে দোকানের পিছনে বেশ খানিকটা দূরের একটা কাঠের ছাউনি থেকে। অবাক হলো। এটাই সেই ছাউনি, যেটা থেকে একজন লোককে বেরোতে দেখে তাড়া করেছিল ওরা।
কাজে লেগে গেছে অগ্নিনির্বাপক বাহিনী। বালতি বালতি পানি ছুঁড়ে দিচ্ছে ভাঙা জানালা দিয়ে ভিতরে। কিশোররা ওদের কাছে পৌঁছতেই ধুড়স করে বিকট শব্দে ছাত ধসে পড়ল। ফাঁকা পেয়ে লাফ দিয়ে গাছের মাথার কাছে উঠে গেল আগুন।
ফ্যাকাসে মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল লুক স্টার্লিংকে। কাছে গিয়ে দাঁড়াল মুসা। বলল, ভাগ্যিস দোকানে লাগেনি।
ওই ঘরে কী আছে? পিছন থেকে জিজ্ঞেস করল কিশোর।
জঞ্জাল আর আজেবাজে বাতিল জিনিস, লুক জবাব দিলেন। পুড়ে গেলেই ভাল।
আপনার দোকান থেকে দূরেই আছে ওগুলো, কিশোর বলল। ওখান থেকে আগুন ছড়াবে না।
কিন্তু লাগল কীভাবে? মুসার প্রশ্ন। বিস্ফোরণের শব্দ শুনে তো মনে হলো বোমা ফেটেছে।
এমন অনেক জিনিস আছে ফাটলে বোমার মত শব্দ হয়, লুক বললেন। গোটা দুই পাঁচ গ্যালনের জেরিক্যান ছিল ভিতরে। যদি সামান্য পেট্রলও থেকে থাকে ওগুলোর কোনটাতে, আর গরম করা হয়, ভিতরে যে বাষ্প তৈরি হবে, তাতে বোমা ফাটার মতই শব্দ হবে।

তারমানে আপনি বলতে চাইছেন প্রথমে আগুন লেগেছে, জেরিক্যানগুলোকে গরম করেছে, তারপর বিস্ফোরণ? কিশোরের প্রশ্ন।
কী করে বলি? দেখার জন্য আমি তো আর এখানে ছিলাম না। সবার সঙ্গে মিটিঙে ছিলাম। তোমরা জিজ্ঞেস করলে, তাই কীভাবে আগুন লাগতে পারে ধারণা দিলাম মাত্র। অস্থির হয়ে উঠেছেন লুক। কিশোরদের কাছ থেকে সরে গেলেন।
আগুন নিভানোর পর নিজেদের কেবিনে ফিরে এল গোয়েন্দারা। আলোচনায় বসল।
এই প্রথম একটা দুর্ঘটনা ঘটল, মুসা বলল, যা জোসির রেসকে কোনভাবে প্রভাবিত করবে না। থিম পার্কের বিরোধিতা যারা করছে, তাদেরকে ভয় দেখানোর জন্যও ঘটানো হয়ে থাকতে পারে এটা।
কিন্তু লুক তো থিম পার্কের বিপক্ষে নন, কিশোর বলল। তাহলে তাঁর ঘর পোড়ানো হলো কেন?
সেটাই তো বুঝতে পারছি না। ক্রমেই জটিল হয়ে উঠছে রহস্য!
কিশোর বলল, তবে, আগের রহস্যগুলোর সঙ্গে এই ছাউনি পোড়ানোর সম্পর্ক আছে। সন্দেহভাজনদের সংখ্যা এখন কমিয়ে আনা সম্ভব। মিটিঙের সময় আমাদের জানামতে কে কে টাউন হলের বাইরে
ছিল?
টেডকে দেখিনি ওখানে, মুসা বলল।
জোসিও ছিল না।
তারমানে তুমি জোসিকেও সন্দেহ করো?
এখনও করছি না, কিশোর বলল। টাউন হলের বাইরে কে কে ছিল সেটা মনে করার চেষ্টা করছি আপাতত। লুকের কথাই ঠিক মনে হচ্ছে। আগুনটা আগে লেগেছে, তারপর বিস্ফোরণ। আর যদি বোমা ফাটিয়ে আগুন লাগানো হয়, ফাটানো হয়েছে টাইমার দিয়ে। তখন আবার সন্দেহভাজনদের সংখ্যা বেড়ে যাবে। যে কেউ ঘটাতে পারে এ রকম দুর্ঘটনা, মিটিঙে সে-লোক থাকুক বা না থাকুক।
দমে গেল মুসা। কিশোরের কথায় প্রথমে মনে হয়েছিল, রহস্য সমাধানের দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছে। এখন মনে হচ্ছে, এ রহস্য ভেদ করা এত সহজ নয়।
দরজায় টোকা শুনে উঠে গিয়ে খুলে দিল ও। জোসি দাঁড়িয়ে আছে।
ঘরে ঢুকল জোসি। পার্কাটা খুলে নিতে নিতে বলল, রেড লাইটকে পাওয়া গেছে।
ভাল আছে ও? চেঁচিয়ে উঠল মুসা।

আছে। কিন্তু ভীষণ দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছে আমাকে। ওকে কেনলে রাখতে গিয়ে ছেঁড়া দড়িটা দেখলাম। কেউ কেটে রেখেছিল।
মাথা ঝাঁকাল কিশোর। আমরাও দেখেছি। তোমাকে বলার সুযোগ পাইনি।
টেড যে এতদূর যাবে তা কল্পনাও করতে পারিনি, ছোট্ট ঘরটার মধ্যে পায়চারি শুরু করল জোসি। কী করতে চাইছে ও? যুদ্ধ? ও কি বুঝতে পারছে না ও যতটা ক্ষতি করছে আমার, আমিও ততটাই করতে পারি? এ ভাবে দুজনে ঝগড়া আর একে অন্যের ক্ষতি করতে থাকলে লাভ কিছু হবে না, বরং ক্ষতি, রেসে আর অংশ নিতে পারব না।
টেডকে দেখেছ নাকি? মুসা জিজ্ঞেস করল। ওর সঙ্গে কথা আছে আমাদের।
মাথা নাড়ল জোসি। দেখিনি। হয়তো কুকুরগুলোকে প্র্যাকটিস করাতে নিয়ে গেছে। এখন তো ওর একমাত্র কাজই হলো প্র্যাকটিস। আমিও অবশ্য তা-ই করতাম। কিন্তু দুর্ঘটনাগুলো বাধা দিচ্ছে আমাকে। ভয় লাগছে, প্র্যাকটিস করাতে না পারলে চর্বি জমে যাবে কুকুরগুলোর গায়ে। তাতে ক্ষিপ্রতা হারাবে ওরা। আমাকে আটকে ফেলে এটাই করাতে চাইছে কি না টেড, কে জানে!
পরদিন খুব সকালে লুকের ছাউনিটা দেখতে চলল কিশোর ও মুসা। বাতাসে ছাই আর পোড়া কাঠের ঝাঁঝাল গন্ধ। প্রচণ্ড তাপে গলে বিকৃত, কালো হয়ে গেছে বড় বড় ক্যান। বিছানার একটা গদি পুড়েছে, প্রিংগুলোই শুধু অবশিষ্ট আছে, কাপড়, রবার সব পুড়ে ছাই। পুরানো একটা সোমোবাইল, আগেই হয়তো ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, এখন পোড়া দেহটা পড়ে আছে।
কী খুঁজছ? কিশোরকে ছাতের একটা কড়িকাঠ সরাতে দেখে জিজ্ঞেস করল মুসা।
অস্বাভাবিক কিছু, জবাব দিল কিশোর।
হাসল মুসা। এখানে স্বাভাবিক কোটা? সবই তো অস্বাভাবিক।
মিনিট বিশেক খোঁজার পর হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল কিশোর, মুসা, দেখো!
পুরানো মডেলের একটা অ্যালার্ম ঘড়ি দেখাল ও চাবি ঘুরিয়ে দম দেয়া হতো।
সোমোবাইলটার মতই আরেকটা জঞ্জাল, আগ্রহ দেখাল না মুসা।
তা ঠিক। কিন্তু আসল জিনিসটাই চোখে পড়েনি তোমার। বারো নম্বর লেখাটার ঠিক মাঝখানে একটা পিন ফুঁড়ে বেরিয়ে আছে। ঘণ্টার কাঁটা আর মিনিটের কাঁটা দুটোকেই এক জায়গায় আটকে দিয়েছে।
আরে তাই তো! এতক্ষণে উৎসাহ দেখা গেল মুসার। ব্যাটারিতে দুটো তার লাগিয়ে তারের এক মাথা মিনিটের কাটায়, আরেক মাথা ঘণ্টার কাঁটায় লাগিয়ে দিলে, বোমার টাইমার বানিয়ে ফেলা যায়।

এ ধরনের ঘড়ি কোথায় দেখেছি আমি, তা-ও মনে পড়ছে, কিশোর বলল। লুক স্টার্লিঙের দোকানের তাকে। পোড়া ঘড়িটা দেখিয়ে বলল, এটা কার কাছে বিক্রি করেছিলেন, মনে করতে পারবেন নিশ্চয়।
চলো, জিজ্ঞেস করি।
দোকানে ঢুকে ওরা দেখল দোকানের মেঝে ঝাড় দিচ্ছেন লুক।
পেলে কিছু? মুখ তুললেন না তিনি, নিজের কাজে মনোযোগ। দেখলাম, পোড়া ছাইয়ের গাদায় কী যেন খুঁজে বেড়াচ্ছ।
এই যে, এটা পেলাম, পোড়া, বাতিল ঘড়িটা দেখাল কিশোর।
ও, ওটা। দশ বছর আগে ফেলে দিয়েছিলাম।
হতাশ হলো মুসা। কিছুদিনের মধ্যে কেউ কিনেছে এ রকম ঘড়ি?
কিনলে তো বেঁচেই যেতাম, তাকের দিকে আঙুল তুললেন লুক। ওই দেখো, কত ঘড়ি পড়ে আছে। বড় শহর হলে কবে বেচে ফেলতাম। ওসব জায়গায় সময়ের খুব দাম। আর এখানে লোকের অফুরন্ত সময়। অ্যালার্ম ক্লক কারও কাজে লাগে না।
দোকান থেকে বেরোতেই বিগসূকে দেখতে পেল ওরা। হনহন করে হেঁটে চলে যাচ্ছে শহরের বাইরে। বার বার ফিরে তাকাচ্ছে। কেউ পিছু নিল কি না দেখছে বোধহয়।
কোথায় যায়? মুসার প্রশ্ন।
চলো, দেখে আসি।
বিগস্ এখনও ওদের দেখেনি। বেশ অনেকটা দূর থেকে ওকে অনুসরণ করে চলল দুজনে। মিনিট পাঁচেক পর মুসা বলল, এ রাস্তা দিয়ে একমাত্র গোল্ডের বাড়িতেই যাওয়া যায়।
ওখানে যাচ্ছে কেন? নিজেকেই যেন প্রশ্ন করল কিশোর। গোল্ডের কাছে তো আর থিম পার্কের উপকারিতা বয়ানের দরকার নেই। গোল্ড এমনিতেই ওর পক্ষে।
সেটাই তো ভাবছি।
গোল্ডের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল বিগস্। টোকা দেবার আগেই খুলে গেল দরজা।
তারমানে বিগস্ আসবে গোল্ড জানে, ফিসফিস করে বলল মুসা। আরেকটু কাছে যেতে পারলে ভাল হতো। কী বলে শুনতে পারতাম।
পা টিপে টিপে এগোল দুজনে। কেবিনের পাশ ঘুরে এসে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে কান পাতল। বিগসকে বলতে শুনল, আগুন লাগানো, বোমাবাজি, এ সব কিন্তু মোটেও পছন্দ হচ্ছে না আমার!
এ সব আমাকে বলছ কেন? রেগে গেল গোল্ড।

কোম্পানির বদনাম হয়ে যাচ্ছে, বিগস বলল। এই শয়তানি বন্ধ করা দরকার।
গোল্ডও চেঁচিয়ে উঠল, আমাকে ধমকানোর তুমি কে? আমার যা খুশি আমি করব। আগুন লাগাতে ইচ্ছে করলে লাগাব, বোমা মারতে ভাল লাগলে মারব। তোমার গা জ্বালা করলে ইউকন নদীতে ঝাঁপ দিয়ে ঠাণ্ডা করোগে।
মুসার দিকে তাকাল কিশোর। এক ভুরু উঁচু করল। গোল্ডের কথায় মনে হচ্ছে অপরাধগুলো সে-ই করেছে।
তুমি ভাবছ এ সব করে কোম্পানির মস্ত উপকার করছ? বিগসের ঝাঁঝাল কণ্ঠ। এমনিতেই পরিস্থিতি ভীষণ নাজুক। শহরের লোকের মানসিকতা এই ভাল তো এই মন্দ। কোন সিদ্ধান্তই নিতে পারছে না। এখন এ সব দুর্ঘটনা ঘটতে থাকলে পরিস্থিতি কোনদিকে মোড় নেবে বুঝতে পারছ না? আমি এ সব বন্ধ করাব। বুঝলে, করিয়ে ছাড়ব?
আমার বাড়িতে এসে আমাকেই ধমক! গর্জে উঠল গোল্ড।
বিগও কম যায় না। আমি তোমাকে এ সব করতে বলিনি। পাগলামি করে কোটি ডলারের প্রোজেক্ট ধ্বংস করবে, আর আমি হাত গুটিয়ে বসে থাকব যদি ভাবো, ভুল করছ।
হঠাৎ শক্ত হয়ে গেল কিশোর। ওদের পিছনের ঝোপে কী যেন নড়ছে। বড় কোন জানোয়ার হতে পারে। ফিরে তাকাল ও। ভয়ের শীতল শিহরণ বয়ে গেল মেরুদণ্ডে।
ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল বিশাল এক বাদামি ভালুক। কিশোরদের দেখে যেন হোঁচট খেয়ে থেমে গেল। পিছনের দুই পায়ে ভর দিয়ে মানুষের মত সোজা হয়ে দাঁড়াল। হাঁ করা মুখের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছে টকটকে লাল জিভ আর হলুদ রঙের মারাত্মক দাঁত।
ওর দিকে তাকিয়ে রাগে গোঁ-গোঁ করল জানোয়ারটা।
দিশেহারা হয়ে পড়ল কিশোর। কী করবে, বুঝতে পারছে না।
ভিতরের কথা ভালমত শোনার জন্য জানালায় কান পেতে দাঁড়িয়েছিল মুসা। ভালুকের গোঁ-গোঁ শুনে চমকে গেল। কেবিন থেকে শোনা গেল বিগ্‌সের কথা, কীসের শব্দ!
ভালুক, গোল্ডের জবাব। দাঁড়াও, আসছি।
আঙুলের ইশারায় মুসাকে একটা পাথরের চাঙড় দেখাল কিশোর।
মাথা ঝাঁকাল মুসা। মুহূর্ত পরেই কেবিনের দরজা খুলে গেল। শব্দ শুনে দরজার দিকে মুখ ফেরাল ভালুকটা। এই সুযোগে এক দৌড়ে গিয়ে পাথরের আড়ালে লুকাল কিশোর ও মুসা। ভালুক আর গোল্ডকে দেখতে পাচ্ছে এখান থেকেও।

এই ব্যাটা, বন্দুক চিনিস? হাতের রাইফেল দেখিয়ে হুমকি দিল গোল্ড। জলদি ভাগ। নইলে দুনিয়া থেকে ভাগাব।
গর্জে উঠল ভালুক। নড়ল না।
রাইফেল নেড়ে আবার চেঁচিয়ে উঠল গোল্ড, ভাগ! ভাগ! জলদি ভাগ! হোল্কা হাঁদা কোথাকার। কথা কানে যাচ্ছে না? ভাগ বলছি।
আবার গর্জে উঠল ভালুক। তবে গলার জোর কমে গেছে।
ও, ভাল কথায় যেতে ইচ্ছে করে না! রাইফেলের নল আকাশের দিকে তুলে গুলি করল গোল্ড।
আর সাহস ধরে রাখতে পারল না ভালুকটা। ঝোপঝাড় ভেঙে ছুটে পালাল। বনে যাওয়ার আগে থামল না আর।
স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মুসা। ভয় পাচ্ছিল, তাড়া খেয়ে ভালুকটা ওদের দিকে ছুটে আসে।
গুলি করলে না কেন? গোল্ডের পিছন থেকে কথা বলল বিগ।
অকারণে মেরে লাভ কী? পরক্ষণে হেসে উঠল গোল্ড। ও, ভালুকের মাংস খেতে চেয়েছিলে? আগে বললে না কেন…
আমি যাচ্ছি, বিগৃস্ বলল। যা বললাম, মনে রেখো।
আমি যা বললাম, তুমিও মনে রেখো, গোল্ডও পাল্টা জবাব দিল।
দরজা লাগানোর শব্দ হলো। বিগসের পায়ের শব্দ ক্রমশ দূরে চলে গেল। আর বসে থেকে লাভ নেই। উঠে দাঁড়াল কিশোর। চলো, যাই।
শহরে ফেরার পথে মুসা বলল, গোল্ডকে কিন্তু বিগসের লোক মনে হলো না।
কী জানি! আমি ঠিক বুঝতে পারছি না!
আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে পুরো ব্যাপারটাই একটা নাটক, মুসা বলল। আমাদেরকে দ্বিধায় ফেলার জন্য করেছে। নিশ্চয় আমাদেরকে পিছু নিতে দেখেছিল বিগস্। কেবিনে ঢুকে ইশারায় কোনভাবে গোল্ডকে বুঝিয়ে দিয়েছে আমরা পিছু নিয়েছি। তারপর দুজনে ঝগড়ার নাটক করেছে।
মাথা নাড়ল কিশোর। উঁহু, আমার তা মনে হয় না। কেন এ সব করছে অপরাধী, আসল কারণটা না জানলে ওকে ধরা কঠিন হবে। এখনও আমরা জানি না, এ সবের মূলে থিম পার্ক, না অন্য কিছু। দড়ি কেটে রেড লাইটকে ছেড়ে দেয়ার সঙ্গে ভোটেরই বা কী সম্পর্ক?
জবাব না পেয়ে চুপ হয়ে গেল মুসা।
শহরে ঢুকল ওরা। মুনকে দেখল। ঢাল বেয়ে নেমে আসছে। কাঁধে ময়দার বস্তা। দূর থেকে ওদের চিনতে পেরে হাত নাড়ল মুন। বস্তাটা নামিয়ে রেখে ওদের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। ওরা কাছে গেলে বলল, মনে মনে তোমাদেরকেই

খুঁজছিলাম। একটা জিনিস দেখে এলাম। জরুরি কি না জানি না, তোমরা শুনলে হয়তো বুঝবে।
কী জিনিস? জানতে চাইল কিশোর। দ্বিধা করতে লাগল মুন। তারপর বলল, পোস্ট অফিসে গিয়েছিলাম, আমাদের নামে কোন চিঠি এসেছে কি না দেখতে। ইলকিস বিগসও গিয়েছিল চিঠি নিতে।
এত তাড়াতাড়ি পোস্ট অফিসে চলে গেল? ভুরু কোঁচকাল মুসা। একটু আগে তো দেখে এলাম।
কোথায় দেখেছ?
গোল্ডের ওখানে।
আমি দেখেছি কয়েক মিনিট আগে, মুন জানাল। বহু চিঠি এসেছে ওর নামে। ওর একটা চিঠির ঠিকানা দেখে ফেলেছি।
কিশোর জিজ্ঞেস করল, কী দেখলে?
অন্যের চিঠি চুরি করে দেখাটা অভদ্রতা, জানি, মুন বলল, কিন্তু চোখ চলে গেলে কী করব?
কার ঠিকানা? অধৈর্য হয়ে হাত নাড়ল মুসা।
চোখের পাতার বড় বড় পাপড়ি নাচাল মুন। নীল চোখে অস্বস্তি। ডিনামাইট!
মানে?
খামের গায়ের ফিরতি ঠিকানাটা ফেয়ারব্যাংকসের নর্থফিল্ড ডিনামাইট কোম্পানির। ডিনামাইট কোম্পানি থেকে বিগসের নামে কেন চিঠি আসে? খটকা লাগে না?
মাথা ঝকাল কিশোর। লাগে।
তথ্যটা কাজে লাগবে তোমাদের?
লাগতে পারে।
খুশি হলো মুন। আমি যাই। ময়দার ভারী বস্তাটা অবলীলায় কাঁধে তুলে নিয়ে স্বচ্ছন্দ গতিতে পাহাড়ী রাস্তা ধরে হেঁটে চলল।
কিশোরের দিকে ফিরল মুসা। ভুরু নাচাল। ডিনামাইট কোম্পানিকে বিগসের কী দরকার?
ডিনামাইট দিয়ে ঘরবাড়ি ওড়ানো যায়, ঠোট কামড়াল কিশোর।
ছাউনি পোড়ানো যায় না?
চিন্তিত ভঙ্গিতে মুসার দিকে তাকাল কিশোর। চলো। বিগসকে পেলে জিজ্ঞেস করব।
শহরের মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলল দুজনে। গ্লিটার এতই ছোট শহর, কেউ রাস্তায় বেরোলে দেখা হবেই। ঠিকই পেয়ে গেল বিগৃকে। একটা কেবিন থেকে বেরোচ্ছে।

হাই, বয়েজ, ওদের দেখে উল্লসিত গলায় হাঁক ছাড়ল ও। গ্লিটার তোমাদের কেমন লাগছে?
ভালই লাগত, জবাব দিল কিশোর। কিন্তু এত উত্তেজনা, আগুন, বোমাবাজি, ডিনামাইট... আচ্ছা, নর্থফিল্ড ডিনামাইট কোম্পানির নাম শুনেছেন?
রাগ দেখা গেল বিগসের চোখে। সামলে নিয়ে হাসল। শুনেছি, তবে আজই প্রথম। খবরটা এত তাড়াতাড়ি কে দিল তোমাদের? পোস্ট অফিস থেকে কেউ চুরি করে খামের ঠিকানা দেখে গেছে নিশ্চয়?
আপনিই তো বলেছিলেন এখানে কোন কথা গোপন থাকে না, হেসে বলল কিশোর। হঠাৎ করেই আপনার কাছে চিঠি লিখে বসল কোম্পানিটা?
হ্যাঁ। প্রাইস লিস্ট পাঠিয়েছে।
কেমন কাকতালীয় না ঘটনাটা? লুক স্টার্লিঙের ঘরে বোমা ফাটার একেবারে পরদিনই বিস্ফোরক কোম্পানির প্রাইস লিস্ট এসে হাজির।
কাকতালীয়ই, জবাব দিল বিগস। আমি ওদের কাছে প্রাইস লিস্ট চাইনি। ডিনামাইটের কোন প্রয়োজন নেই আমার। লাগলে
তো লুকের কাছ থেকেই নিতে পারতাম।
কুঁচকে গেল মুসার ভুরু। লুক ডিনামাইটও বিক্রি করে?
করে। খনির কাজে লাগে ডিনামাইট। তা ছাড়া গাছের বড় বড় গুঁড়ি উপড়ানো থেকে শুরু করে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয়। প্রয়োজনীয় জিনিস, চাহিদা আছে, লুকের দোকানে পাওয়া না যাওয়ার কোন কারণ নেই। চলি। পরে দেখা হবে। পা বাড়িয়েও ফিরে তাকাল বিগস্। তোমাদেরকে একটা উপদেশ দিই, যদিও শুনতে ভাল লাগবে না; সেই পুরানো প্রবাদটা জানো তো, বেশি কৌতূহলে বিড়াল মরে?
চলে গেল বিগ। কিশোরের দিকে তাকাল মুসা। ও কি হুমকি দিয়ে গেল আমাদের?
তাই তো মনে হলো।
ওর কথা বিশ্বাস করেছ?
করা কঠিন, কিশোর বলল। কিন্তু দোষীই যদি হবে, প্রাইস লিস্ট পাঠানোর কথা স্বীকার না করলেও পারত।
চালাকি করেছে। স্বীকার না করলেই বরং বেশি সন্দেহ করতাম ওকে। ও সেটা জানে। কিন্তু আমি ভাবছি শেষ কার কাছে ডিনামাইট বিক্রি করেছেন লুক, জানতে পারলে ভাল হতো।
চলো না গিয়ে জিজ্ঞেস করি।

দোকানের কাছাকাছি এসে লুককে দেখতে পেল মুসা। নদীর ধারে একটা অদ্ভুত মেশিনের সামনে দাঁড়ানো। ওই যে।
তার দিকে এগোল দুজনে।
কয়েক গজ দূরে থাকতে বলল কিশোর, কী করছেন?
আচমকা ডাক শুনে ভীষণ চমকে গেলেন লুক। ফিরে তাকালেন। তোমরা! উফ, হার্ট অ্যাটাক করিয়ে দিয়েছিলে। ছায়ার মত হাঁটো। একটু শব্দ হয় না।
ঝরঝরে পুরানো মেশিনটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল মুসা, কী মেশিন? চাঁদ থেকে আনালেন নাকি?
না, বৃহস্পতি গ্রহ থেকে, হাসলেন লুক। সামলে নিয়েছেন। এর নাম ফিশহুইল। গরমকালে নদীর বরফ গলে গেলে স্রোতের মুখে বসিয়ে দেয়া হয়। স্রোতের টানে চাকা ঘোরে। চাকায় লাগানো এই যে তারের থলিগুলো দেখছ, এগুলো ডোবে আর ভাসে। ডুবে যাওয়া থলিগুলো স্যামন মাছে ভর্তি হয়ে ওপরে উঠে আসে, ওপরেরগুলো তখন নীচে চলে যায়। মাছগুলো আপনাআপনি একটা বাক্সে পড়তে থাকে। খালি থলি নীচে নামে, ভরা থলি ওপরে ওঠে। এভাবেই চলতে থাকে মাছ ধরা।
দারুণ মেশিন তো, মুসা বলল। আপনার?
না, জো সারটনের। একটা লোককে এটার কাছে ঘুরঘুর করতে দেখে সন্দেহ হয়েছিল। দেখতে এসেছি, এটাও নষ্ট করে দিল কি না, বেচারার নৌকাটার মত। নৌকাটা নষ্ট করে খুব খারাপ কাজ করেছে।
লোকটাকে চিনতে পেরেছেন?
দ্বিধা করলেন লুক। পিছন থেকে দেখেছি তো, ঠিক চিনতে পারিনি। তবে হাঁটার ভঙ্গি গোল্ড ফেরানির মত। তোমরা কোথায় যাচ্ছিলে?
আপনার কাছেই এসেছি। কথা ছিল।
দোকানে চলো।
কয়েক সেকেণ্ড নীরবে ফিশহুইলটার দিকে তাকিয়ে থেকে ঘুরে দাঁড়াল কিশোর। লুকের সঙ্গে তার দোকানের দিকে এগোল। হাঁটতে হাঁটতে ডিনামাইটের কথা জিজ্ঞেস করল।
নাহ, দুচার দিনের মধ্যে কারও কাছে বিক্রি করিনি, লুক বললেন। শেষ বিক্রি করেছি শীতের শুরুতে। আমার ছাউনিটার কথা ভুলতে পারছ না তোমরা, তাই না? তবে লিখে দিতে পারি, ডিনামাইট দিয়ে পোড়ায়নি। ডিনামাইটের দাম আছে। মাছি মারতে কামান দাগতে যাবে না। আমি শিওর, আগুন লাগার মূলে ওই জেরিক্যানের পেট্রল। দোকানের বারান্দায় উঠে গেলেন তিনি। ফিরে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ডিনামাইটের কথা মাথায় এল কেন তোমাদের?

বিগসের কাছে ডিনামাইট কোম্পানি চিঠি দিয়েছে, ফস করে বলে ফেলেই বুঝল মুসা, গোপন তথ্য ফাঁস করে দেয়াটা ভুল হয়ে গেছে।
তাই নাকি? তাহলে তো চিন্তার কথাই... দোকানে ঢুকে গেলেন লুক।
নিজেদের কেবিনে ফিরে চলল দুই গোয়েন্দা। মুসা বলল, আমাদের চোখ এড়িয়ে ফিশহুইলটার কাছে কীভাবে গেল গোল্ড, বুঝতে পারছি না। রাস্তা তো মোটে ওই একটা। এমন নির্জন রাস্তা দিয়ে একজন লোক হেঁটে গেল আর আমাদের চোখে পড়ল না, এত কানা তো এখনও হইনি।
লুক তো বললেনই পিছন থেকে দেখেছেন। গোল্ড কি না শিওর নন তিনি। চিন্তিত ভঙ্গিতে জবাব দিল কিশোর। আচ্ছা, গোল্ডকে বিপদে ফেলার জন্য মিথ্যে কথা বলেননি তো?
তা কেন বলতে যাবেন?
কারণ, তিনি গোল্ডকে দেখতে পারেন না।
তা নাহয় বললেন। কিন্তু ফিশহুইলটার কাছে তো কেউ একজন নিশ্চয় গিয়েছিল। নইলে দেখতে যেতেন না লুক। সেই লোকটা কে?
বিগ নয়, এটা ঠিক। লুকের রহস্যময় লোকটা যখন ফিশহুইলের কাছে, বিগ তখন আমাদের সামনে। আমাদের সঙ্গে কথা বলছিল।
রাস্তার মোড়ের কাছে আসতে ওপাশ থেকে কুকুরের চিৎকার কানে এল। হুকুম শোনা গেল, হাইক! হাইক!
মোড় ঘুরে ছুটে এল টেড সিউলের কুকুরবাহিনী।
হাইক! হাইক! বলে চেঁচিয়ে কুকুরগুলোকে গতি বাড়ানোর নির্দেশ দিতে থাকল টেড। স্লেজ নিয়ে ছুটে আসছে ঢাল বেয়ে। কিশোর-মুসা সেই পথের ওপরই দাঁড়ানো। ওদের দেখেও দেখল যেন টেড।
দাঁত বেরিয়ে গেছে সামনের নেতা-কুকুরটার। বিকট মুখভঙ্গি। কিশোরের কাছ থেকে মাত্র কয়েক গজ দূরে রয়েছে। থামার কোন লক্ষণই নেই।
স্লেজটা গায়ের ওপর এসে পড়বে।
এক ধাক্কায় কিশোরকে রাস্তা থেকে সরিয়ে দিল মুসা। লাফ দিয়ে নিজেও সরে গেল একপাশে। বেরিয়ে থাকা বরফের টুকরোয় হোঁচট খেল কিশোর। সামলাতে পারল না। বরফে ঢাকা ঢাল বেয়ে গড়ানো শুরু করল। মুসা দাঁড়িয়ে রইল। চেঁচিয়ে বলল, টেড, দাঁড়াও, তোমার সঙ্গে কথা আছে...
জবাবে দস্তানা পরা হাত তুলে ঘুসি দেখাল টেড।
রেগে গেল মুসা। থাবা দিয়ে টেডের বাড়ানো হাতটা ধরে ফেলল। কব্জিতে মোচড় দিয়ে মারল হ্যাচকা টান। এটা আশা করেনি টেড। রানারের ওপর দাঁড়িয়ে

থাকতে পারল না। স্লেজ থেকে উড়ে এসে পড়ল রাস্তার ওপর। সতর্ক হয়ে গেল বুদ্ধিমান কুকুরগুলো। কয়েক গজ এগিয়ে দাঁড়িয়ে গেল।
ধীরে ধীরে উঠে বসল টেড। মাথার পিছনে ব্যথা পেয়েছে, হাত বোলাচ্ছে সেখানে। বিমূঢ় দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মুসার দিকে।
কিশোরও উঠে এসেছে।
রাগ যায়নি মুসার। চিৎকার করে উঠল, কী মনে করো তুমি নিজেকে, টেড? আমাদের ওপর কীসের রাগ তোমার? গ্লিটারে যখনই কোন দুর্ঘটনা ঘটছে, তার আশপাশে দেখা যাচ্ছে তোমাকে। টিনুকদের কেবিনে যখন আগুন লেগেছিল, তোমাকে স্লেজ নিয়ে ছুটে পালাতে দেখেছি। বিষ মেশানো আপেল এনে দিয়েছ তুমি ওদেরকে। কাল যখন লুকের ছাউনিতে বোমা ফাটানো হলো, টাউন হলের মিটিঙে ছিলে
তুমি। আমি আরও জানতে চাই, জোসির রেড লাইটের দড়ি কাটল কে?
কথা শেষ হয়েছে তোমার? রুক্ষ কণ্ঠে জবাব দিল টেড। তাহলে শোনো, আমিও জানতে চাই, আমার কেনলে বিষ মাখানো মাংস ফেলেছিল কে। কে আমার লাগামের অর্ধেকটা কেটে রেখেছিল। আমার রানার ওয়্যাক্সে বালি দিয়ে রেখেছিল কে।
মুসা জিজ্ঞেস করল, কে?
উঠে দাঁড়াল টেড। কে আবার? তোমাদের প্রিয় বন্ধু জোসি। একা শয়তানি করে মন ভরেনি। তোমাদেরকে লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে ডেকে নিয়ে এসেছে সাহায্য করার জন্য। তবে আমি তোমাদেরকে আমার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে দেব না। কখনই না!
টেডের কথায় স্তম্ভিত হয়ে গেছে কিশোর ও মুসা দুজনেই। ধোকা দিচ্ছে না তো টেড? নাকি জোসির মত টেডও একই ষড়যন্ত্রের শিকার?
এ সব ঘটনা কবে ঘটেছে? আমরা গ্লিটারে আসার পর? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
টেড বলল, না, আগে। জোসি আমার এত প্রিয় বন্ধু হওয়া সত্ত্বেও ওর ওপর রাগ কেন আমার বুঝতে পারছ না? কেন ওকে এখন দেখতে পারি না? স্বার্থপর হিংসুক বন্ধু থাকার চেয়ে না থাকা ভাল।
মুসা জিজ্ঞেস করল, জোসিই যে দোষী, কী করে বুঝলে?
ও ছাড়া আর কে? আমার ওপর আর কার এমন আক্রোশ থাকবে?
ও তোমার বন্ধু, টেড।
ছিল। এখন নেই।
কণ্ঠস্বরে যতটা সম্ভব আন্তরিকতা ফুটিয়ে তুলে কিশোর বলল, টেড, জোসি এ সব করছে না। কারণ, কেউ একজন জোসিরও ক্ষতি করতে চাইছে। তোমাদের

পুরো শহরটাকেই ধ্বংস করে দিতে চাইছে ওই লোক। জোসি, ওর চাচা-চাচী, চাচাত বোন, সবাই চাইছে রহস্যটার সমাধান করি আমরা। যে এ সব করে বেড়াচ্ছে, ওকে খুঁজে বের করি।
আমরা গুণ্ডাপাণ্ডা নই, টেড, যা তুমি ভাবছ, মুসা বলল। আমরা গোয়েন্দা।
জ্বলে উঠল টেডের চোখ। তাহলে বলো, লোকটা কে? দেখো ওর কী করি!
এখনও জানি না আমরা, জবাব দিল কিশোর। এতদিন তো তোমাকেই সন্দেহ করে এসেছি।
আমি কিছু করিনি। নিজের শহর ধ্বংস করে দেব, এত বোকা আমাকে ভাবলে কী করে?
জোসিও চায় না শহরটা ধ্বংস হয়ে যাক।
চুপ হয়ে গেল টেড। নীরবে দেখতে লাগল কিশোর ও মুসাকে। সন্দেহ যাচ্ছে না ওর। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল। চলে গেল ওর জেটার কাছে, যেখানে অসীম ধৈর্য নিয়ে অপেক্ষা করছে কুকুরগুলো।
কিশোর-মুসাও. হাঁটতে শুরু করল আবার। উল্টো দিকে। টিনুকদের কেবিনের কাছে এসে থামল। দরজায় টোকা দিল কিশোর। খুলে দিলেন এরিনা। হাতে একটা ডোরাকাটা স্কার্ফ। তোমরা। আমি মনে করেছি গোল্ড। স্কার্ফটা ফেলে গেছে তো, ভাবলাম ফেরত নিতে এসেছে বুঝি। দাঁড়িয়ে কেন, এসো।
ঘরে ঢুকে পার্কা খুলতে খুলতে মুসা জিজ্ঞেস করল, গোল্ড কখন এসেছিল?
মিনিট পনেরো আগে। এইমাত্র গেল। কেন?
স্টোভের কাছে চেয়ারে বসে আছেন জেফরি। থিম পার্কের পক্ষে ভোট দেয়ার জন্য আমাকে বোঝাতে এসেছিল গোল্ড। হাসলেন তিনি। টুর গাইডের চাকরির অফারও দিয়ে গেছে আমাকে।
দরজা খুলে গেল আবার। হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকল গোল্ড। বাতাসের ঝাপটা লাগল। ওর বুটে লেগে থাকা তুষার গলে গলে
পড়ছে।
গোল্ড বলল, গলার কাছে ঠাণ্ডা লাগতে মনে পড়ল স্কার্ফটা ফেলে গেছি। আরেকটু হলে গলাটাই বরফ হয়ে যাচ্ছিল।
এরিনার হাত থেকে স্কার্ফটা নিয়ে গলায় পেঁচাল গোল্ড। বেরোনোর জন্য ঘুরে দাঁড়াল।
কিশোর জিজ্ঞেস করল, গোল্ড, জো সারটনের ফিশহুইলটার কাছে গিয়েছিলেন কেন?
ঝটকা দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল গোল্ড। কে বলেছে?
লুক। একটু আগে নাকি ওটার কাছে দেখেছেন আপনাকে।

জেফরিকে সাক্ষী মানল গোল্ড। শুনলে! শুনলে মিথুকটার কথা! আমি নাকি নদীর ধারে জো সারটনের ফিশহুইলের কাছে গেছি! কিশোরের দিকে ফিরল ও। কখন দেখেছে বলল?
আধঘণ্টা আগে, মুসা বলল।
লাল হয়ে গেছে গোল্ডের মুখ। আধঘণ্টা আগে যদি নদীর ধারে গিয়ে থাকি, তা হলে এখানে ছিল কে? আমার ভূত?
অবাক মনে হলো জেফরিকে। গোল্ড এখানেই ছিল, আমাদের সাথে। লুক নিশ্চয় ভুল করেছে।
শীতকালে এ ধরনের ভুল হতেই পারে, এরিনা বললেন। কাপড়-চোপড় দিয়ে গা ঢেকে শরীরটাকে পুটলি বানিয়ে রাখে সবাই। দূর থেকে চেনা কঠিন।
তাই হবে! বিড়বিড় করল কিশোর। তারমানে লুক ভুল করেছেন।
সারটনের ফিশহুইলটারও কিছু হয়েছে নাকি? শঙ্কিত মনে হলো গোল্ডকে।
তা তো জানি না। জো গিয়ে ওটা দেখলে বুঝতে পারবে।
ফিশহুইলটাও যদি নষ্ট হয়ে থাকে, চিবিয়ে চিবিয়ে বলল গোল্ড, কার কাজ, আর সন্দেহ থাকবে না আমার। সোজা গিয়ে ওই চামারটার ঘাড় চেপে ধরব, সব বেরিয়ে যাবে।
কার কথা বলছেন?
কার আবার? ওই অর্থপিশাচ লুক স্টার্লিংটার। টাকার জন্য পারে না ও, এমন কাজ নেই।
গটমট করে বেরিয়ে গেল গোল্ড। পিছনে দড়াম করে লাগিয়ে দিয়ে গেল দরজার পাল্লা।
প্রথমে কিশোরের দিকে তাকালেন জেফরি। তারপর মুসার দিকে। বললেন, গোল্ডের আচরণে মনে হয় না জানি কী ভয়ঙ্কর লোক। কিন্তু আমি জানি, ওর ওই বদমেজাজ আর রুক্ষতার আড়ালের মনটা খুব নরম। আর মোটেও অসৎ নয়। মাঝে মাঝে ওর কথাবার্তায় আমারও রাগ লাগে। তবে ওকে আমি অবিশ্বাস করি না।
দরজা খুলে গেল আবারও। লাকড়ির বোঝা নিয়ে ঘরে ঢুকল মুন কিশোর-মুসাকে দেখে জিজ্ঞেস করল, ডিনামাইটের খোঁজ নিয়েছিলে?
অবাক মনে হলো জেফরি ও এরিনাকে। বিগৃসের চিঠির কথা জানানো হলো ওঁদের।
কিশোর বলল, বিগসকে জিজ্ঞেস করেছি। ডিনামাইট কোম্পানির চিঠির কথা স্বীকার করেছে ও।

ডিনামাইট দিয়ে ও কী করবে? কপাল ডলতে লাগলেন জেফরি। কী যে সব কাণ্ড শুরু হলো গ্লিটারে, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। কাকে সন্দেহ করব, তা-ও বুঝতে পারছি না। কিশোর, কিছু একটা করো তোমরা জলদি! শহরটাকে বাঁচাও!

পরদিন সকাল সকাল কেবিন থেকে বেরোল কিশোর ও মুসা। শহরের প্রান্তে একটা পাহাড়ের গোড়ায় জেফরি ও এরিনাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হাত নাড়ল কিশোর। জেফরিও হাত নাড়লেন।

এগিয়ে গেল দুজনে। পাহাড়ের গোড়ার এক টুকরো খোলা জায়গা লোহার রেলিঙ দিয়ে ঘেরা। তুষার ভেদ করে মাথা তুলে রেখেছে। অসংখ্য কবরফলক। শহরের গোরস্থান এটা, বুঝতে পারল ওরা।

কেউ মারা গেল নাকি?

জিজ্ঞেস করে জানা গেল, মারা যায়নি, তবে আজ পটল্যাচের দিন। পটল্যাচ হলো আলাস্কার আদিবাসীদের একটা বিশেষ উৎসব। সকালে কবরস্থানে ফুল দিতে আসে মৃতের আত্মীয়রা। বিকাল থেকে শুরু হয় উৎসব-অনুষ্ঠান।

ব্রিণ্ডল জ্যাককে দেখা গেল ওখানে। জেফরিকে দেখেই বেরিয়ে গেল গোরস্থান থেকে। কিশোরের মনে পড়ল, সন্দেহভাজনদের সে-ও একজন। অথচ বেমালুম ভুলে গিয়েছিল ওর কথা, আশ্চর্য!

জোসিকে একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে জ্যাকের কথা জিজ্ঞেস করল কিশোর।

শহরেই ছিল না ও, জোসি বলল। মিঙ্ক রিভারের ওপারের জঙ্গলে ফাদ পেতে জানোয়ার ধরতে চলে গিয়েছিল। গ্লিটার থেকে বহুদূরে। ওই জায়গা নিয়ে চাচার সঙ্গে ঝগড়া নেই ওর। আজ এসেছে পটল্যাচে যোগ দিতে। পটল্যাচ না থাকলে আসত না।

মুসা বলল, তারমানে জ্যাকও সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ। কমতে কমতে তো শেষ! কাকে সন্দেহ করব এরপর?

সে-কথাই তো ভাবছি, চিন্তিত ভঙ্গিতে জবাব দিল কিশোর। সন্দেহভাজনই যদি কেউ না থাকে, সন্দেহ করব কাকে?

সেদিন বিকেলে শহরবাসীদের সঙ্গে অ্যাসেম্বলি হলে গিয়ে পটল্যাচে অংশ নিল দুই গোয়েন্দা। স্থানীয় ভাষায় গান গাইছে কয়েকজন অ্যাথাবাস্কান। একঘেয়ে ভঙ্গিতে হাত ওঠাচ্ছে আর নামাচ্ছে। কিছু লোক গানের তালে তালে নেচে চলেছে।

এক সময় শেষ হলো নাচ। শহরের সবচেয়ে প্রবীণ মানুষটি শহরবাসীদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিলেন। দিনটার বিশেষত্ব নিয়ে আলোচনা করলেন। তারপর নিজেদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরা দুজন অ্যাথাবাস্কান মহিলা এগিয়ে এল। একজনের হাতে একটা বড় কড়াই, আরেকজনের হাতে ছোট ছোট অনেকগুলো

বাটি ও একটা হাতা। ঘরের প্রতিটি মানুষের কাছে যেতে লাগল ওরা। বাটিতে করে ধূমায়িত ঘন ঝোল খেতে দিল।
কী খাচ্ছে? নিচুস্বরে জোসিকে জিজ্ঞেস করল মুসা।
মুচকি হাসল জোসি। সুপ। সবাইকেই খেতে হবে। এটাই নিয়ম।
কীসের সুপ? ভালুকের মাংস?
আরে নাহ্। দুর্ভিক্ষ না লাগলে ভালুক কে খায়, জোসির হাসিটা চওড়া হলো। মুজের মাথা।
আস্ত মাথা হাঁড়িতে ফেলে সিদ্ধ করেছে?
হ্যাঁ, করেছে। চোখ, কান, দাঁত কিছুই ফেলেনি।
চামড়া?
সিদ্ধ হওয়ার পরে ফেলেছে।
এই সুপ খেতে হবে ভেবে নিজের অজান্তেই মুখটা বিকৃত হয়ে গেল কিশোরের। এমন জানলে অনুষ্ঠানেই আসত না।
ওর মুখের অবস্থা দেখে হাসল জোসি। অত মুখ বাঁকাচ্ছ কেন? খেতে খারাপ লাগে না।
প্রথমে মুসার কাছে এসে দাঁড়াল দুই মহিলা। বাটিতে করে ঝোল খেতে দিল। ঢোক গিলল ও। ঠোটে লাগিয়ে চুমুক দিল। ওর দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচাল কিশোর। নীরবে জানতে চাইল, কেমন।
ভাল বলতে পারব না, তবে যতটা খারাপ ভেবেছিলাম ততটা লাগল না, মুসা জবাব দিল। আর অতিরিক্ত লবণ।
বাটি হাতে নিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল কিশোর। কোন ফাঁকে ফেলে দেবে সেই সুযোগ খুঁজছে। পারল না।
কোনমতে ঘন তরল পদার্থটা গিলে নিয়ে বাটিটা ফিরিয়ে দিল মুসা। ঘরের চারপাশে তাকাল। সবাই সুপ খেতে ব্যস্ত। চোখ আটকে গেল দরজার দিকে। কিশোর, ফিসফিস করে বলল ও, লুককে বেরিয়ে যেতে দেখলাম। চোখে চোরা চাহনি। দেখব নাকি কোথায় যান?
চলো।
জোসির দিকে তাকাল কিশোর। জোসি, আমরা বাইরে যাচ্ছি। কাজ আছে। বলে জোসি কিছু বুঝে ওঠার আগেই নিজের হাতের বাটিটা ওর হাতে ধরিয়ে দিল।
খেলে না? সুপটা কি এতই খারাপ? নাকি বাথরুমে যাচ্ছ? হেসে জিজ্ঞেস করল জোসি।
কিশোর হাসল, না, বাথরুমে যাচ্ছি না। পরে বলব। মুসার হাত ধরে টান দিল। এসো।

লুককে অনুসরণ করে শহরের পশ্চিম প্রান্তে চলে এল দুজনে। তাকে একটা কেবিনে ঢুকতে দেখল।
কেবিনটায় কেউ আছে বলে মনে হলো না। নিশ্চয় পটল্যাচ অনুষ্ঠানে চলে গেছে। চারপাশে তাকাল কিশোর। একটা উঁচু টিলা চোখে পড়ল। ওখানে উঠে বসলে কেবিনের ভিতরটা দেখতে পারব। চলো।
টিলাটাকে ছোটখাট একটা পাহাড় বলা চলে। প্রচুর গাছপালা জন্মে আছে। ওগুলোর ভিতর দিয়ে ওপরে উঠতে লাগল দুজনে। চূড়ায় উঠে আবার কেবিনটা চোখে পড়ল। লুককে দেখা যাচ্ছে জানালা দিয়ে।
কী করছেন লুক? বিড়বিড় করল কিশোর।
চোখের পাতা সরু করে তাকাল মুসা। কেবিনের পিছনের ঘরে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন লুক। চারপাশে তাকাচ্ছেন। হঠাৎ হাত বাড়িয়ে টান দিয়ে হুক থেকে দুটো স্নে–পেড়ে বা বগলের নীচে চেপে ধরলেন। পার্কা থেকে কী যেন বের করে ছুঁড়ে দিলেন মেঝেতে।
জুতো চুরি করছেন! বলল অবাক কিশোর। কী কাণ্ড!
মেঝেতে কী ফেললেন? মুসার প্রশ্ন।
ভালমত দেখার জন্য আরেকটু এগোতে গেল কিশোর। উত্তেজনায় খেয়ালই রইল না, খাড়া দেয়ালের কিনারে রয়েছে ও। হাত ফসকাল। ডিগবাজি খেয়ে উল্টে পড়ে গেল।
কিশোরের চিৎকারে ফিরে তাকাল মুসা। বরফে ঢাকা ঢাল বেয়ে গড়িয়ে পড়তে দেখল কিশোরকে। থাবা দিয়ে ধরে ফেলল ওর বাঁ পায়ের গোড়ালি। কিশোরের ওজন ওকেও নীচে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে। বুটের ডগা তুষারে গেঁথে ফেলে নিজের পতন ঠেকানোর চেষ্টা করল। পারল না। পড়ে যেতে শুরু করল সে-ও কিশোরের সঙ্গে।
তিরিশ ফুট নীচের পাথরে পড়লে কী ঘটবে আর ভাবতে চাইল না। মরিয়া হয়ে পা দিয়ে কিছু একটা আঁকড়ে ধরতে চাইছে। পা ঠেকল একটা সিডারের চারায়। ছোট্ট ওই গাছটাকেই পা দিয়ে পেঁচিয়ে ধরল। ভারের চোটে বাঁকা হয়ে গেল গাছ। তবু শিকড় উপড়াল না।
ঝুলে থাকো, মুসা বলল। একটুও নড়বে না। আমি তোমাকে টেনে তুলছি।
ডান হাতে কিশোরের গোড়ালি ধরে আছে ও। গাছের চারায় পা আটকে নিয়ে বাঁ হাতটাও বাড়িয়ে দিল। দুই হাতে এখন কিশোরের গোড়ালি ধরল। এক হাতের ওপর চাপ কিছুটা কমল। পেটের পেশীকে ব্যবহার করে ইঞ্চি ইঞ্চি করে পিছাতে শুরু করল ও। সঙ্গে কিশোরকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ডান পা উঁচু করল কিশোর এক হাতে বা পাটা ধরে রেখে অন্য হাতে কিশোরের ডান পাটাও ধরল মুসা। ধীরে

ধীরে টেনে তুলে আনতে লাগল কিশোরকে। বরফে ঢাকা দেয়ালের কিনারে আঙুল বাধানোর অবিরাম চেষ্টা চালাচ্ছে কিশোর। সুবিধে করতে পারছে না।
অবশেষে বহু কসরত করে ওকে আগের জায়গায় নিয়ে এল মুসা। বরফের ওপর চিত হয়ে শুয়ে পড়ল দুজনে। ভয়ানক পরিশ্রমে হাঁপাচ্ছে।
গেছিলাম আজ! হাঁপাচ্ছে কিশোর।
হ্যাঁ, মুসাও হাঁপাচ্ছে। লুক মেঝেতে কী ফেলেছেন?
জানি না। তোমার কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো?
না। উঠে দাঁড়াল মুসা। চলো, কাছে গিয়ে দেখি।
সাবধানে ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল দুজনে।
চলে গেছেন লুক। কেবিনে ঢুকল ওরা। মেঝেতে একটা হাতুড়ি পড়ে থাকতে দেখে তুলে নিল কিশোর। হাতলে খোদাই করা দুটো ইংরেজি অক্ষর: টি এফ।
টি এফ, আনমনে বলল ও। টেক্স ফেরানির নামের আদ্যাক্ষর।
নিজে জুতো চুরি করে ঘরে গোল্ডের হাতুড়িটা ফেলে গেছেন লুক, যাতে দোষটা গোল্ডের ঘাড়ে গিয়ে পড়ে, কিশোর বলল। কেবিনটা কার জানতে পারলে ভাল হতো।
নিশ্চয় এমন কেউ, যে থিম পার্কের বিপক্ষে।
হ্যাঁ!
তারমানে লুকই অপরাধী! বিশ্বাস হতে চাইছে না মুসার। এখন বুঝলাম, ফিশহুইলের কাছে কেন গিয়েছিলেন তিনি। আমরা সময়মত চলে গিয়েছিলাম বলে রক্ষে, নইলে ওটাও যেত। নষ্ট করে দিতেন। সর্বনাশ হয়ে যেত জো বেচারার।
এখন বোঝা গেল, নৌকার তলাও লুকই ফুটো করেছেন। রাত দুপুরে নিজের বাড়িতে ইলেকট্রিক করাত চালিয়ে রেখে গিয়েছিলেন, যাতে ওই শব্দে গজালের ওপর হাতুড়ি পিটানোর শব্দ চাপা পড়ে যায়। কেবিনে থেকে মহিলা তাই শুধু করাতের শব্দই শুনেছিল।
কিন্তু তাঁকে ধরার মত কোনও প্রমাণ নেই আমাদের কাছে, নীচের ঠোট কামড়াল কিশোর। জুতো চুরি করতে দেখলেও হাতেনাতে ধরতে না পারলে তার মত প্রভাবশালী টাকাওয়ালা একজন মানুষকে জেলে পাঠানো কঠিন। শুধু আমাদের মুখের কথায় হবে না।
কী করা যায় বলো তো?
চিবুকে টোকা দিল কিশোর। একটা বুদ্ধি আসতে আরম্ভ করেছে মাথায়। দেখি, আরেকটু ভাবি।
অ্যাসেম্বলি হলে ফিরে এল ওরা। পটল্যাচ শেষ। লোকজন চলে যেতে শুরু করেছে। ইলকিস বিগ আছে এখনও। ওকে একপাশে ডেকে নিয়ে এল কিশোর।

নিচুস্বরে বলল, আপনার সঙ্গে কথা আছে। এখানে বলা যাবে না।
দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কিশোরের দিকে তাকিয়ে থেকে মাথা ঝাঁকাল বিগস। ঠিক আছে, আমার কেবিনে চলো।
কেবিনে ঢুকে কিশোর বলল, আপনি জানেন, গ্লিটারে গত কয়েক দিন ঘরে যে সব দুর্ঘটনা ঘটছে, তার জন্য আপনাকে আর আপনার কোম্পানিকে দায়ী করছে লোকে?
অন্যায় করছে, বিগ বলল। আমি কিছু করিনি। আমার কোম্পানি কিছুই জানে না।
আপনার কোম্পানির কোন দুর্নাম নেই, খবর নিয়েছি আমরা। তবে টাকার টানাটানিতে আছে। যা-ই হোক, আমরা আপনাকে দোষী ভাবছি না। গ্লিটারবাসীর কাছে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার একটা সুযোগ আপনাকে দিতে পারি। তাতে আপনার লাভই হবে। অপরাধীকে ধরতে আমাদের সাহায্য করুন।
কিন্তু তোমরা তো ছেলেমানুষ…
বয়েস কম বলতে পারেন। তাতে কী? আরও অনেক কম বয়েস থেকেই গোয়েন্দার কাজ করছি আমরা, শখের গোয়েন্দা। অনেক জটিল কেসের সমাধান করেছি। পুলিশকে অপরাধী ধরতে সাহায্য করেছি। বিশ্বাস না হলে জোসিকে জিজ্ঞেস করুন। সে সব জানে।
জোসি ভাল ছেলে, চিন্তিত ভঙ্গিতে ঠোট কামড়াল বিস্। পরিবারটাও খুব ভাল, যদিও আমাদের থিম পার্কের বিপক্ষে। তবে বিরোধিতা করলেই মানুষ খারাপ হয় না। যাই হোক, আমিও এ সব দুর্ঘটনা বন্ধ করতে চাই। বদনাম হয়ে গেলে আমার ক্যারিয়ার শেষ।
মুসার দিকে তাকাল কিশোর। স্বস্তি বোধ করছে। অপরাধীকে ধরতে বিগস্ সাহায্য করতে রাজি না হলে ওকে সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দিতে পারত না। লুক আর বিগস যুক্তি করে দুর্ঘটনাগুলো ঘটাচ্ছে, এই ভাবনাটা জোরাল হতো।
চলুন এখন, অপরাধীকে ধরতে যাই, মুসা বলল।
হাঁ হয়ে গেল বিগস্। কে অপরাধী, জানো নাকি?
মাথা ঝাঁকাল মুসা। লুক স্টার্লিং।
কী বলছ? চেঁচিয়ে উঠল বিগস্।
বিশ্বাস করলেন না তো?
না, করেছি। ওর যা টাকার লোভ, ওকে দিয়ে সব সম্ভব এখানকার হস্তশিল্পের বাজারটাকে ও কোণঠাসা করে ফেলেছে। মানুষকে বাকিতে জিনিস দেয়, কেউ কিছু চাইলে কখনও না করে না, যে যা চায় দিয়ে দেয়। ঋণের বোঝা বাড়তে থাকে। তারপর সুযোগ বুঝে চাপে ফেলে ঋণ শোধ করার নামে খুব কম দামে

ওদের ঠকিয়ে দামি দামি জিনিসগুলো আদায় করে নেয়। এভাবে প্রচুর জিনিস জমিয়েছে। সেগুলো যে কোন মিউজিয়ামের কাছে চড়া দামে বেচতে পারবে।
কিন্তু বিক্রি করবেন না, কিশোর বলল। তার উদ্দেশ্য এখন আমার কাছে পরিষ্কার। মানুষকে হ্যাঁ ভোটে বাধ্য করার জন্য রাজ্যের শয়তানি করে বেড়াচ্ছেন তিনি। জো সারটনের মত দিন-আনা দিন-খাওয়া মানুষগুলোর সহায়-সম্বল ধ্বংস করে দিয়ে ওদের অসহায় করে ফেলতে চাইছেন, যাতে টাকার অভাবে থিম পার্কের পক্ষে ভোট দিতে বাধ্য হয় ওরা। গ্লিটারে থিম পার্ক হলে সবচেয়ে বেশি লাভ তার। টুরিস্টদের কাছে জিনিস বিক্রি করবেন। যত ইচ্ছে দাম নেবেন। গ্লিটারে আর কোন দোকান নেই, ভবিষ্যতেও বসতে দেবেন না–একচেটিয়া ব্যবসা করবেন। স্থানীয়দের কাছ থেকে ঠকিয়ে নেয়া অ্যান্টিক দেখিয়ে টুরিস্টদের আকৃষ্ট করবেন। ওসব জিনিসের নকল তৈরি করে সুভনিয়ার হিসেবে চড়া দামে বিক্রি করবেন। হস্তশিল্পের ব্যবসাটাকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে তুলবেন এখানে, তবে শুধুই নিজের জন্য। কী সাংঘাতিক প্ল্যান!
একটু থেমে দম নিয়ে আবার লল কিশোর, বিগ, শুনুন, আপনাকে একটা কাজ করতে হবে। আপনার প্যাডের কাগজে লুককে একটা চিঠি লিখুন। তাকে বলুন, তাঁর কাজ আপনার পছন্দ হয়েছে। আপনি এবং আপনার কোম্পানি সেটা প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখছেন। তাকে নানারকম সুযোগ দিতে চান। এ নিয়ে আলোচনার জন্য তাঁর সঙ্গে মিটিঙে বসতে চান।
মাথা নেড়ে বিগস বলল, উঁহু, আমি তা করতে পারব না। ওই চিঠি অন্য কারও হাতে পড়লে ভীষণ বিপদে পড়ব। আমার চিঠি প্রমাণ করে দেবে, আমিও লুকের সহযোগী। না, আমি পারব না।
বিপদে পড়বেন কেন? মুসা বলল। চিঠির কোথাও তো দুর্ঘটনার কথা লেখা থাকছে না। শুধু লিখবেন ওর কাজ আপনার পছন্দ হয়েছে। কাজ তো কত রকমেরই হতে পারে।
আর কেউ না বুঝলেও লুক ঠিকই বুঝবে কোন কাজের কথা আপনি বলেছেন, কিশোর বলল।
মস্ত ঝুঁকি নেয়া হয়ে যাবে, দ্বিধা যাচ্ছে না বিগসের।
দেখুন, আজ হোক কাল হোক লুককে আমরা ধরবই, দৃঢ় কণ্ঠে বলল কিশোর। ওকে ধরতে সাহায্য করে গ্লিটারবাসীর কাছে ভাল হওয়ার এই সুযোগটা আপনি ছাড়বেন কেন? বলা যায় না, কাজটা করলে আপনার পক্ষে ভোটও বেড়ে যেতে পারে।
ভ্রূকুটি করল বিগস্। কথাটা মন্দ বলনি। বেশ, আমি তোমাদের সাহায্য করব। তবে এই চিঠি লেখার ব্যাপারটা আমার একটুও ভাল লাগছে না। লুক কী করবে,

কিছু জানি না। আমাদের ফাঁদে যদি সে পা না দেয়?
ভোটে জেতার জন্য কিছুটা ঝুঁকি তো নিতেই হবে আপনাকে।
আর আপত্তি করল না বিগস্। প্যাড বের করে লিখতে তৈরি হলো। কোথায় দেখা করতে বলব?
বিগৃসের কেবিনটা ভাল করে দেখল কিশোর। ছোট ঘর। একটা অংশকে অফিস বানিয়েছে বিগস্। ছোট একটা রান্নাঘরও আছে এক কোণে। জানালাগুলো ছোট ছোট, ভারী কাঁচ লাগানো, যাতে ঠাণ্ডা ঢুকতে না পারে। ওপরে একটা চিলেকোঠা আছে। ওটা দেখিয়ে বিগকে জিজ্ঞেস করল, ওখানে জায়গা আছে?
থাকতে পারে, জবাব দিল বিগস্। দেখিনি।
ওপরে ওঠার সরু একটা মই আছে। বেয়ে ওপরে উঠে গেল কিশোর ও মুসা। পুরানো কিছু বাক্স আর পিপা রাখা। ওগুলো সরালে কিছুটা জায়গা বেরোবে।
ওখান থেকেই বিগসকে বলল কিশোর, ওকে জানিয়ে দিন, দেড় ঘণ্টার মধ্যে ওর সঙ্গে এখানে দেখা করতে চান আপনি। আশা করি, ততক্ষণে তৈরি হয়ে যেতে পারব আমরা।
ঘণ্টাখানেক পর। চিলেকোঠার সঙ্কীর্ণ জায়গায় ঠাসাঠাসি করে বসেছে কিশোর, মুসা, টেড, জোসি ও জেফরি। উত্তেজিত চারটে মুখের দিকে একে একে তাকাল কিশোর। সাক্ষী হওয়ার জন্য জেফরি, জোসি আর টেডকে ডেকে নিয়ে এসেছে। এখনও নিজেদের মধ্যে আচরণে সহজ হতে পারেনি জোসি ও টেড। তবে মনে মনে দুজনেই খুশি। পুরানো বন্ধুত্বটা জোড়া লাগতে যাচ্ছে আবার।
বিগস নীচে অপেক্ষা করছে। ওর কাশি শোনা গেল। কাগজপত্র ঘাটাঘাটির খসখস শব্দ। নিশ্চিন্ত হলো কিশোর। এত মৃদু শব্দও যখন কানে এসে পৌছাচ্ছে, লুক আর বিগসের সমস্ত কথাবার্তা চিলেকোঠা থেকে শোনা যাবে।
অবশ্য যদি আসে লুক!
চুপচাপ বসে অপেক্ষা করতে লাগল ওরা। বার বার ঘড়ি দেখছে কিশোর। বিগসের চিঠি লুকের মত ধড়িবাজ লোককে টেনে আনতে পারবে কি না নিশ্চিত হতে পারছে না। ঘুণাক্ষরেও যদি সন্দেহ করে বসেন ফাঁদ পাতা হয়েছে, তাহলে কেবিনের ত্রিসীমানা মাড়াবেন না। বরং বিগকে ফাঁসিয়ে দেয়ার চেষ্টা করবেন। সোজা চিঠিটা নিয়ে হাজির হবেন আদালতে।
গড়িয়ে কাটছে সময়। ভাবনার ঝড় বইছে কিশোরের মাথায়। লুক চিঠি পাওয়ার পর গোপনে এসে আড়াল থেকে চোখ রাখেননি তো কেবিনের ওপর? কিশোর-মুসা আর অন্যদেরকে দল বেঁধে বিগসের কেবিনে ঢুকতে দেখলেই বুঝে যাবেন, তাঁকে ফাঁদে ফেলার জন্য ওই চিঠি লেখা হয়েছে। তুষারে পাঁচ জোড়া জুতোর ছাপ পড়েছিল। সেগুলো মুছে ফেলা হয়েছে জেফরির নির্দেশে। সতর্ক লোক।

সতর্ক না হলে এই বুনো অঞ্চলে টিকতে পারতেন না। তাড়াহুড়ো করে জুতোর ছাপগুলো মোছা হয়েছে। হয়তো কিছু চিহ্ন রয়েই গেছে। চোখে পড়ে যাবে না তো লুকের?
একই কথা মুসাও ভাবছে। ভাবতে ভাবতে মাথা গরম হয়ে যাবার জোগাড়। সময় কাটাতে বিড়বিড় করে কবিতা আবৃত্তি শুরু করল। কাঁধে হাত পড়তে চমকে গেল ও। ঠোঁটে আঙুল রেখে ওকে শব্দ না করতে ইশারা করছে টেড।
অপেক্ষা করছে ওরা। লুক আর আসেন না। সবাই যখন ভাবতে আরম্ভ করেছে, লুক আসবেন না, অত সাধারণ একটা চিঠির ফাঁদে ধরা দেবেন না তাঁর মত চতুর লোক, ঠিক তখনই দরজায় শোনা গেল টোকার শব্দ। মুহূর্তে বরফের মত জমে গেল যেন চিলেকোঠার সবাই।
নীচে কাঠের মেঝেতে জুতোর শব্দ।
দরজার দিকে এগোচ্ছে বিগস্।
দরজা খোলার শব্দ হলো।
এসেছেন। আন্তরিক কণ্ঠে বিগ ডাকল, আসুন। রাইফেল এনেছেন কেন? শিকারে বেরোবেন নাকি?
সঙ্গীদের দিকে তাকাল মুসা। গম্ভীর হয়ে আছে সবাই। লুক রাইফেল নিয়ে আসবেন ভাবেনি।
গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিলেন লুক, ঝুঁকি নিতে চাইনি।
বিগস বলল, আমার কোম্পানির জন্য ক্ষতির কারণ হয় এমন কোন ঝুঁকি আমিও নিতে চাই না। তবে মনে হচ্ছে একসঙ্গে কাজ আমরা করতে পারব। দাঁড়িয়ে কেন, বসুন না।
বিগস ও লুকের কথাবার্তা টেপ করার জন্য পকেট থেকে একটা মাইক্রো ক্যাসেট রেকর্ডার বের করল কিশোর। অন সুইচ টিপল। খুব সামান্য শব্দ হলো। অতি মৃদু। কিন্তু লুকের কান এড়াল না।
কীসের শব্দ? চাবুকের মত শপাং করে উঠল যেন তাঁর কণ্ঠ।
রাইফেলের বোল্ট টানার শব্দটা যেন বোমা ফাটাল শ্রোতাদের কানে।
ধড়াস করে উঠল কিশোরের বুক। স্থির হয়ে গেল ও। লুক এখন চিলেকোঠায় উঁকি দিলেই সর্বনাশ। ওদের পরিকল্পনা বরবাদ। তা ছাড়া একজন খেপা লোকের মুখোমুখি হতে হবে, যার হাতে আছে গুলিভর্তি রাইফেল। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল কিশোর। লুককে ওপরে উঠতে দেয়া যাবে না। মইয়ের ধাপে পা রাখা মাত্র তাঁকে ফেলে দিতে হবে। গুলি করার আগেই তাকে কাবু করে ফেলতে হবে।
কী করছেন? তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল বিগসের কণ্ঠ। নামান ওটা। নামিয়ে রাখুন। রাইফেল-বন্দুক দেখলে আমার ভয় লাগে।

কিন্তু শব্দ যে শুনেছি তাতে কোন সন্দেহ নেই, লুক বলল। ওপর থেকে এসেছে।
শুনতেই পারেন, বিগস বলল। কেবিন ভর্তি ইঁদুর। ইদুরের জ্বালায় মরলাম। ভাবছি, বাড়িওলাকে বলব। ইঁদুর না তাড়ালে ভাড়া দেব না।
রাইফেলের সেফটি ক্যাচ অন করার শব্দ শোনা গেল। মেঝেতে বাটের শব্দ শুনে বোঝা গেল চেয়ারের কিনারে রাইফেলটা ঠেস দিয়ে রেখেছেন। চেপে রাখা দমটা আস্তে আস্তে ছাড়ল কিশোর। নীরবে চলছে টেপরেকর্ডার। যন্ত্রটা পাটাতনে নামিয়ে রাখল ও। অসময়ে টেপটা শেষ না হলেই হয়।
কী করতে চান? লুক জিজ্ঞেস করলেন। চিঠিতে কোন কিছুই স্পষ্ট করে লেখেননি।
ভূমিকার কোন প্রয়োজন দেখছি না, বিগৃস্ বলল। সোজাসাপ্টা কথাই আমার পছন্দ। আপনি কী করে বেড়াচ্ছেন, সব আমি বুঝে ফেলেছি। আমার সুবিধে করে দিয়েছেন। লোকে হা-ভোট দিতে বাধ্য হবে। সেজন্যই ভাবলাম আপনাকে দলে নেয়া যায় কি না আলোচনা করে দেখি।
শুনে খুশি হলাম, কণ্ঠস্বরে কোন পরিবর্তন নেই লুকের।
আশঙ্কা মাথা চাড়া দিচ্ছে কিশোরের মনে। লুককে সন্দেহ করে ভুল করল না তো? হয়তো তিনি অপরাধী নন।
থিম পার্কের পক্ষ থেকে আপনাকে নতুন কোনও কাজ দেয়া যায় কি না ভাবছি। যা আপনি ইতিমধ্যেই করে ফেলেছেন তার জন্য অবশ্যই খরচাপাতি আর মোটা অঙ্কের বোনাস পাবেন।
কবে?
বোনাস পাবেন আমরা ভোটে জেতার পর, বিগ বলল। তবে খরচাপাতির টাকা এখনই দিয়ে দিতে পারি।
আমি রাজি, জবাব দিতে এক মুহূর্ত দ্বিধা করলেন না লুক।
আশঙ্কা দূর হলো কিশোরের। মুসার দিকে তাকাল। হাসি দেখতে পেল। টোপ গিলেছে অতি ধূর্ত রাঘব বোয়াল। বিগস্ এখন ওটাকে খেলিয়ে তীরে তুলতে পারলেই হয়।
আপনি তো রাজি হলেন, বিগ বলছে, কিন্তু আপনিই দুর্ঘটনাগুলো ঘটিয়েছেন, এ ব্যাপারে আমি শিওর হব কীভাবে?
তাহলে আমাকে ডাকলেন কেন?
কানদিন একজ। পুরানো গুড়ে, সেজন্য
ডেকে নিশ্চয় ভুল করিনি? অনেক ভেবেছি। দুর্ঘটনাগুলোর পিছনে আর কারও হাত আছে বলে মনে হয়নি।
নেইই তো। আমিই করেছি সব! একা।

শুধু একটা কথা বুঝতে পারছি না, নিজের ঘরে আগুন দিলেন কেন?
হাসি শোনা গেল লুকের। এই সহজ কথাটা বুঝলেন না? লোকের সন্দেহ যাতে আমার ওপর না পড়ে, সেজন্য। সবাই ভাববে, আমি নই, অন্য কারও কাজ। পুরানো ওই ছাউনিটা এমনিতেই ভেঙে পড়ত যে কোনদিন। একটা ভাল কাজে লাগালাম।
আর জেফরি টিনুকের কেবিন? ওটাতে আগুন লাগালেন কীভাবে?
কিশোর দেখল, কঠিন হয়ে গেছে জেফরির চেহারা। হাত মুঠোবদ্ধ। ইশারায় তাঁকে শান্ত থাকতে অনুরোধ করল ও।
এটা কোন কাজ হলো? পিছনের জানালা দিয়ে স্টোভের কাছে একটা পেট্রলের ক্যান ফেলে, একটা জ্বলন্ত ম্যাচের কাঠি ছুঁড়ে দিলাম, ব্যস, লুক বলল। জোসির বাবার কেবিনে লাকড়ি ছুঁড়লাম ওদের ভয় দেখানোর জন্য। ওই জেফরিটা থিম পার্কের বিপক্ষে বহুত গলাবাজি করে। লোকে মানেও ওকে। ভাবলাম, ওকে অন্য কাজে ব্যস্ত রাখতে পারলে সুবিধে।
মুজের মাংসটাও আপনিই চুরি করেছিলেন? বিগ জানতে চাইল।
তো আর কে? গর্ব করে বললেন লুক। জো সারটনের নৌকাটাও আমিই নষ্ট করেছি, বুঝতেই পারছেন। রাতের বেলা ইলেকট্রিক করাত চালু করে রেখে হাতুড়ি আর গজাল নিয়ে চলে গেলাম। তারপর নৌকার তলায় গজাল বসিয়ে ধ্যাচাং-ধ্যাচাং! ব্যস, গেল বাতিল হয়ে নৌকাটা।
বিগ বলল, কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, টেডের কুকুরগুলোর পিছনে লাগলেন কেন আপনি? ওর বাবা তো আমাদের বিপক্ষে নয়।
অট্টহাসি হাসলেন লুক। মুসার মনে হলো, উন্মাদের হাসি। গায়ে কাঁটা দিল ওর।
ওটাই তো আসল চালাকি, লুক বলছেন। জোসির ক্ষতি করে ওর চাচার মনোবল ভাঙতে চেয়েছি। কুকুরের দড়ি কেটেছি টেডের ওপর জোসির সন্দেহ বাড়ানোর জন্য। টেডকে ওর ওপর খেপিয়ে তুলেছিলাম আরও আগেই। কুকুরের ঘরে বিষ মাখানো মাংস ফেলে রেখে, স্লেজের লাগাম কেটে দিয়ে, রানার ওয়্যাক্সে বালি ফেলে। পরম বন্ধুকে চরম শত্রু বানিয়ে দিয়েছিলাম। বুঝতে পেরেছিলাম, আমি অঘটন ঘটানো শুরু করলে লোকের সন্দেহ ওদের ওপর গিয়ে পড়বে। ঘোলাজলে মাছ শিকার করতে সুবিধে হবে আমার। কেউ আমাকে সন্দেহ করবে না।
আর সহ্য করতে পারল না টেড। কিশোর বা মুসা বাধা দেয়ার আগেই লাফ দিয়ে নীচে পড়ল। চিৎকার করে উঠল, শয়তান! ছুঁচো! আমার কুকুরকে বিষ খাইয়ে মেরেছিস! আজ আমি তোকে খুনই করে ফেলব!

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। আর চুপ করে থেকে লাভ নেই। নীচে উঁকি দিল কিশোর। টেডের দিকে রাইফেল তাক করেছেন লুক। খবরদার! ঝাঝরা করে ফেলব বলে দিলাম! আর বিগস, তুমি আমার জন্য ফাঁদ পেতেছিলে! তোমাকেও ছাড়ব না
আমি!
রক্ত সরে গেল বিগসের মুখ থেকে। দেয়ালের দিকে পিছিয়ে গেল। আমাকে মেরে আপনিও বাঁচতে পারবেন না।
পারব। খুব পারব। একবার টেডের দিকে, একবার বিগৃসের দিকে নলের মুখ সরাচ্ছেন লুক। গুলি করে মারব আমি তোমাদের। তারপর এমন করে সাজাব, মনে হবে একে অন্যকে খুন করেছ তোমরা। সবাই তখন জানবে, টেডের কুকুরকে বিষ দিয়েছিলে তুমি, রাগে পাগল হয়ে গিয়ে প্রতিশোধ নিতে ছুটে এসেছিল ও।
লুকের কথা শুনে চোখ বড় হয়ে গেল কিশোরের। লোকটা আসলেই উন্মাদ। লুক এখনও ভাবছেন ঘরে বিগস্ ও টেড ছাড়া আর কেউ নেই। মুসা, জেফরি ও জোসির দিকে তাকাল কিশোর। ইশারা করল।
এখন বলল, মজা পাচ্ছেন যেন লুক, কে আগে মরতে চাও? বিগস, তোমারই আগে মরা উচিত। আমার সঙ্গে বেইমানি করার শাস্তি। বিগসের দিকে নিশানা করলেন তিনি।
চিলেকোঠার কিনার থেকে ঝাঁপ দিল কিশোর। মার্শাল আর্ট এক্সপার্টদের মত ইয়া-হু! বলে তীক্ষ্ণ চিৎকার দিয়ে মুসাও লাফিয়ে পড়ল নীচে।
চমকে গেলেন লুক। রাইফেলের নলের মুখ ঘুরে যেতে শুরু করল কিশোর-মুসার দিকে।
বাঘের মত লুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল মুসা। মেঝেতে ফেলে দিল লোকটাকে।
গুলি ফোটার প্রচণ্ড শব্দ। মুসার কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল বুলেট। সময় নষ্ট করল না ও। লুকের কলার ধরে টেনে তুলে দশ মনি একটা ঘুসি বসিয়ে দিল চোয়ালে। আবার মেঝেতে পড়ে গেলেন লুক।
রাইফেলটা কেড়ে নিল কিশোর। লুকের বুকের দিকে ধরে রেখে মুসাকে জিজ্ঞেস করল, গুলি লেগেছে?
না, জবাব দিল মুসা।
মই বেয়ে দ্রুত নেমে এল জোসি ও জেফরি।
জেফরির দিকে তাকাল কিশোর। লুকের কথা সবই তো শুনলেন?
শুনেছি, মনেও রেখেছি। মেঝেতে পড়ে থাকা লুকের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন জেফরি। প্রতিটি শব্দ আদালতকে জানাতে পারব আমি।
কেউ বিশ্বাস করবে না... বিড়বিড় করলেন লুক।

টেপরেকর্ডারটা তুলে দেখাল মুসা। এটার কথা তো বিশ্বাস করবে? আপনি হেরে গেছেন, লুক।
হাসল জোসি। এভাবে কারও পরাজয়কে লস অ্যাঞ্জেলেসে বলে, ইয়োর গৃজ ইজ কুকড। আর আমরা অ্যাথাবাস্কানরা বলি, ইয়োর মুজ ইজ কুকড।
হেসে উঠল মুসা।
পরদিন সকালে প্লেনে করে ফেয়ারব্যাংকস থেকে উড়ে এল আলাস্কান পুলিশ। নদীর জমাট বরফের ওপর নামল প্লেন। দুজন পার হাতকড়া পরিয়ে দিল লুকের হাতে। সাক্ষীদের বক্তব্য শুনল। কিশোরের রেকর্ড করা টেপটা পকেটে ভরল।
কিশোর ও মুসাকে ধন্যবাদ দিলেন অফিসার। ওদের গোয়েন্দাগিরির প্রশংসা করলেন।
আসামীকে নিয়ে চলে গেল পুলিশ।
সেদিন অ্যাসেম্বলি হলে একটা মিটিং ডাকল বিগস। গত কয়েক মাসে অনেক কিছু জেনেছি আমি, অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে। আপনাদের অহঙ্কার, আপনাদের ঐতিহ্য আমাকে মুগ্ধ করেছে। সেসব নষ্ট করার কোন অধিকার আমার নেই তারপরেও আমি বলব, আমার কোম্পানিকে কাজ করার একটা সুযোগ দিয়ে দেখুন। আমি কথা দিচ্ছি, আপনাদের জীবনযাত্রায় কোনরকম বাদ সাধা হবে না। বরং, আপনাদের এই সংস্কৃতি আর ঐতিহ্যই আমাদের পুঁজি। এগুলো দেখতেই তো টুরিস্ট আসবে। আমাদের নিজেদের স্বার্থেই এ সব ধ্বংস হতে দেব না আমরা।
জেফরি, এরিনা, জোসি ও মুনের দিকে তাকাল ও। পাশাপাশি বসেছে গোটা পরিবার। আজ সকালে থিম পার্কের হোম অফিসের সঙ্গে কথা বলেছি আমি। গত কয়েক দিনে এখানে যার যা ক্ষতি হয়েছে, যদিও সেগুলোর জন্য কোনভাবেই দায়ী নয় আমাদের কোম্পানি, তবুও ক্ষতি পূরণ দেবার অঙ্গীকার করেছে কর্তৃপক্ষ। টিনুকদের কেবিন নতুন করে তৈরি করে দেবে, জো সারটনকে একটা নৌকা কিনে দেবে।
ঘরের মধ্যে জোর গুঞ্জন। হাততালি। থামতে সময় লাগল।
বিগস বলল, ফেয়ারব্যাংকসের সবচেয়ে বড় ফলের দোকানটায় অর্ডার পাঠিয়েছি আমি। বাক্স ভর্তি করে তাজা ফল আনাব। এলে, সবার আগে আমি নিজে খেয়ে দেখব, বিষ মেশানো আছে কি না।
বিগ্‌সের রসিকতায় আরেক দফা হাসাহাসি, হুল্লোড়।
উঠে দাঁড়ালেন জেফরি। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, বিগস্‌। আপনি অনেক করেছেন আমাদের জন্য। লুককে ধরার জন্য মস্ত ঝুঁকি নিয়েছেন। অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যেতে পারত আপনার। আমাদের ধারণায় চিড় ধরিয়ে দিয়েছেন।

আমরা বুঝেছি, গ্লিটারের ক্ষতি নয়, মঙ্গলই চাইছেন আপনি। সত্যিই গ্লিটারের উন্নতি দরকার। টাকা ছাড়া কিছু হয় না। পূর্বপুরুষের ঠুনকো আভিজাত্য আর অহঙ্কার আঁকড়ে থেকে না খেয়ে মরারও কোন মানে হয় না। তাদের যুগ চলে গেছে। এখন আমাদের যুগ। বর্তমানকে বুঝে সে-মত চলতে না পারলে অস্তিত্বই টিকিয়ে রাখতে পারব না আমরা।

জোরাল গুঞ্জন। জনতাকে চুপ করাতে হাত তুললেন জেফরি। এত উত্তেজিত হওয়ার কিছু নেই। এখনই ভোট দিচ্ছি না আমরা। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করব। ভাবনা-চিন্তা করব। নিজেদের কোনরকম ক্ষতির আশঙ্কা দেখলে থিম পার্কের পক্ষে ভোট দেব না।

যা বললেন, তাতেই আমি খুশি, বিগৃস্ বলল। পরে আরও মিটিং দরকার হবে আমাদের।

হ্যাঁ, হবে। এতবড় একটা সিদ্ধান্ত, এক মিটিঙেই নেয়া যায় না, জেফরি বললেন। তবে এখন আমি সমস্ত গ্লিটারবাসীকে অন্য একটা অনুরোধ জানাব। কিশোর ও মুসাকে আপনাদের থ্যাংকস-ভোট দিতে অনুরোধ করব, কারণ ওদের সহযোগিতা না পেলে লুক-দানবের হাত থেকে রক্ষা পেতাম না আমরা। শহরটাকে ধ্বংস করে দিত ও। ওর কাছ থেকেও একটা শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত আমাদের। অতিরিক্ত লোভ করা ভাল না। আমরাও করব না। অতি লোভ একটা জাতিকে। ধ্বংস করে দিতে পারে। হাত তুলে বললেন তিনি, এখন, কিশোর ও মুসাকে থ্যাংকস-ভোট।

মুহূর্তে ঘরের সমস্ত চোখ ঘুরে গেল দুই গোয়েন্দার দিকে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে কোনদিন পড়েনি ওরা। অস্বস্তি বোধ করতে লাগল দুজনে।

সবাই উঠে এসে ঘিরে ফেলল ওদেরকে। পিঠ চাপড়ানো, হাত মেলানো আর ধন্যবাদ জানানোর পালা চলল। মুসা নিশ্চিত, এত আন্তরিক আর গর্বিত একটা জাতির উন্নতি হতে বাধ্য।

শুক্রবার সকাল। কুকুরের দল, স্লেজ আর রসদ গোছাতে জোসিকে সাহায্য করল কিশোর ও মুসা। জোসির সঙ্গে ওর স্লেজে করে নদীর ওপর গিয়ে উঠল। মুনও রয়েছে ওদের সঙ্গে। দলবল নিয়ে ওখানে অপেক্ষা করছে টেড।

ডায়মণ্ডহার্টকে দেখে দাঁত বের করে গজরানো শুরু করল টেডের নেতা-কুকুরটা। তবে ডায়মণ্ডহার্টের মেজাজ শান্ত। প্রতিপক্ষের গজরানোতে কান দিল না। পুরোপুরি উপেক্ষা করল। হেসে ফেলল জোসি। আদর করতে লাগল কুকুরটাকে। মুনও ওটার মাথা চাপড়ে আদর করে দিল।

হই-চই শুনে ফিরে তাকাল মুসা। দলে দলে লোক আসছে।

জোসি! মুসা বলল, এত লোক!

ভয় নেই, বরফের স্তর ভাঙবে না। অনেক পুরু।
বরফের কথা বলছি না। আমি ভাবছি, প্লেনে এত লোকের জায়গা হবে?
হেসে ফেলল জোসি। এত লোক তো যাচ্ছে না। আমাদের বিদায় জানাতে এসেছে। তোমাদের জানানো হয়নি, থিম কোম্পানি আমাদের স্পন্সর করছে। বড় দুটো প্লেন পাঠাচ্ছে ওরা। আমার আর টেডের দুটো কুকুরবাহিনী, দুটো স্লেজ আর ওগুলোর সমস্ত মালপত্র যাতে বহন করতে পারে।
দূর থেকে ইঞ্জিনের শব্দ ভেসে এল। আকাশের দিকে তাকাল মুসা। বহুদূরে একটা কালো বিন্দু দেখে বলল, প্রথম প্লেনটা আসছে।
জনতার সঙ্গে জেফরি আর এরিনা রয়েছেন। নদীর বরফের ওপর উঠে এলেন দুজনে।
টেডের দিকে তাকাল জোসি। বলল, ইডিটারোড রেসে যাদের সঙ্গে আমরা প্রতিযোগিতা করছি, তারা সবাই অভিজ্ঞ, বড় বড় রেসার।
হ্যাঁ, মাথা ঝাঁকাল টেড। তাদেরকে হারিয়ে প্রথম হওয়ার চেষ্টা করতে হবে আমাদের।
খুব কঠিন কাজ, তবে হাল ছাড়ব না আমি। প্রথম হওয়ার চেষ্টা করব।
আমিও করব।
ঠিক, পিছন থেকে বলল বিগস্। গ্লিটারবাসীর মুখ উজ্জ্বল করতে হবে তোমাদের।
জনতার দিকে ফিরল ও। শুনুন, জোসি আর টেডের জন্য দোয়া করবেন আপনারা। ওরা যেন প্রথম ও দ্বিতীয় হতে পারে।
সবাই হাততালি আর উৎসাহ দিল দুই রেসারকে। নিজেদের শহরের গর্ব জোসি ও টেডকে।
দুই রেসারের কাঁধে হাত রাখলেন এরিনা। আমার ছেলেরা ফার্স্ট হবেই।
দুজনেই ফাস্ট হতে না পারলে তো আবার একজনের মন খারাপ হবে, হাসল বিস্। যা-ই হোক খেলা খেলাই। ব্যাপারটাকে সেভাবেই দেখতে হবে ওদের। এবার কিশোর-মুসাকে থ্রি চিয়ার্স দিন।
ঘনঘন আনন্দধ্বনি, থ্রি চিয়ার্স আর করতালিতে মুখরিত হলো নদীতীর। আবেগে চোখে পানি এসে গেল মুসার। হাত তুলে নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল, প্রিয় গ্লিটারবাসী, আমার ও কিশোরের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। যে আদর আর অভ্যর্থনা আপনারা আমাদের দিয়েছেন, কোনদিন ভুলব না। আরেকটা কথা, ইডিটারোড রেসে অবশ্যই আমাদের সমর্থন থাকবে গ্লিটারের পক্ষে। মুনের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল। মুন, তোমাকেও ভুলব না আমরা।
অনেক আনন্দ, অনেক কিছু, কিন্তু একটা কাঁটা রয়েই গেল কিশোরের মনের কোণে–এই আনন্দের মুহূর্তে রবিন নেই ওদের মাঝে। নিজের অগোচরেই দীর্ঘশ্বাস

পড়ল ওর।

***

ভলিউম ১১৭ – বড়দিনের ছুটি – তিন গোয়েন্দা – রকিব হাসান – সেবা প্রকাশনী

টেলিফোনে কথা বলছেন রবিনের আম্মা মিসেস মিলফোর্ড। কিশোরের চাচীর সঙ্গে। এবারকার বড়দিনে বড় করে একটা পার্টি দিতে চান কয়েক জন বান্ধবী মিলে।

হ্যাঁ হ্যাঁ, শখানেক মাংসের বড়া হলেই

চলবে, মেরিচাচীকে বললেন মিসেস মিলফোর্ড।মুসার আম্মাকে বলেছি অ্যাপল পাই আর কেক আনতে। মুরগী-টুরগী আর বাকি যা যা দরকার, আমি ব্যবস্থা করব।

ফোনে কথা বলতে বলতে অবচেতন ভোবই তার আঙুলগুলো খেলা করছে। বসার ঘরের কোণে বসানো ক্রিস্টমাস ট্রীর একটা ডেকোরেশন নিয়ে।

রবিন তো বলছে, গায়ের সব লোককে দাওয়াত করতে।

বিরাট ডেস্কটার ওপাশে বসে থাকা ছেলের দিকে তাকিয়ে স্নেহের হাসি হাসলেন তিনি। কিন্তু সেটা কি আর সম্ভব? যাই হোক, যত বেশি সম্ভব মানুষকে দাওয়াত করব। চেনাজানা কাউকে বাদ দেব না। ঠিক আছে, রাখি এখন। মুসার আম্মার সঙ্গে কথা বলতে হবে।

লাইন কেটে দিয়ে মুসাদের নম্বরে ডায়াল করলেন তিনি। কে, মিসেস আমান? …

লম্বা নিঃশ্বাস ফেলল রবিন। বসে আছে বাইরে বেরোনোর অপেক্ষায়। কিন্তু সেই যে তখন থেকে বলেই চলেছেন মা, চলেছেনই। থামাথামি আর নেই।

তারপর রবিনের মতে অনন্তকাল পার করে দিয়ে রিসিভার রেখে যেই সরে আসতে যাবেন, ওর দুর্ভাগ্য-আবার বাজল টেলিফোন। ছো মেরে তুলে নিলেন তিনি। কে? ও, মিসেস ডানকান হ্যাঁ হ্যাঁ, দিচ্ছি তো পার্টি..

আবার চলল কথা। রবিন অপেক্ষা করছে বাজারে যাওয়ার জন্যে। পার্টির জন্যে প্রচুর জিনিসপত্র কিনতে হবে। লম্বা লিস্ট করেছেন মা। টাকাও দিয়ে দিয়েছেন। টেবিলে পড়ে আছে ওগুলো। তালিকায় কিছু বাদ পড়ল কিনা শেষ মুহূর্তে আরেকবার চেক করতে হবে। মা না বললে আর বেরোতে পারছে না রবিন।

মিসেস ডানকানের সঙ্গে কথা বলা শেষ করে আসার জন্যে পা বাড়িয়েছেন।এই সময় আবার বাজল টেলিফোন। রিসিভার কানে ঠেকিয়ে হাতের ইশারায় রবিনকে অপেক্ষা করতে বললেন তিনি।

আর কোন কাজ না পেয়ে বিরক্ত হয়ে টেবিলে রাখা একটা কয়েন তুলে নিয়ে দাঁড় করিয়ে ঘোরানো শুরু করল রবিন। কতটা বেশি সময় ধরে ঘোরাতে পারে সেই চেষ্টা। অবসরপ্রাপ্ত বুড়ো-বুড়ি যারা দাওয়াতে আসবেন, তাদের কাকে কি উপহার দেয়া যায়, মা এখন সেই আলোচনা করছেন ফোনে।

আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে ওজন মাপার ছোট যন্ত্রটার দিকে নজর দিল রবিন।

টেবিলের একপাশে রাখা আছে ওটা। বাবার জিনিস। পোস্ট করার আগে চিঠিপত্র কিংবা পার্সেল মেপে দেখে নেন ওজন কত। সময় কাটানোর জন্যে প্রথমে একটা পেন্সিল মাপল রবিন, অ্যাডেসিভ টেপ মাপল, তারপর একের পর এক কয়েনের ওজন দেখতে শুরু করল বাজারে নেয়ার জন্যে যেগুলো দিয়েছেন তাকে মা।

সব ধরনের মুদ্রাই রয়েছে, দোকানদারকে ভাঙতি দেয়ার সুবিধের জন্যে।

পাঁচ, দশ, বিশ, পঞ্চাশ পেন্স-একেকটার ওজন একেক রকম। মাপতে মাপতে হঠাৎ থেমে গিয়ে স্কেলের দিকে তাকিয়ে রইল ভুরু কুঁচকে। দুটো পঞ্চাশ পেন্সের মুদ্রা মাপতে গিয়ে তফাতটা লক্ষ্য করেছে।

ঘটনাটা কি! আনমনে বিড়বিড় করল সে। এটার ওজন বাকিগুলোর চেয়ে কম কেন?

নিশ্চিত হবার জন্যে পঞ্চাশ পেন্সের অন্য মুদ্রাটা আবার মেপে দেখল সে। কোন সন্দেহ নেই। দুটোর ওজন দুই রকম। প্রথমটার চেয়ে দ্বিতীয়টা চার গ্রাম কম। এ ছাড়া আর কোন পার্থক্য নেই। দুটোই অবিকল এক রকম দেখতে। একই রকম নতুন চকচকে।

বিস্মিত ভাবটা প্রকাশ পেতে দিল না মুখে। মার দিকে ফিরে তাকাল। আশা করল, যেখানে দাড়িয়ে আছেন, সেখান থেকে তার ছোট্ট এই পরীক্ষাটি নজরে পড়বে না তার। মিসেস ডানকানের সঙ্গে পার্টি নিয়ে আলোচনায় অতিশয় মশগুল।

তার দৃঢ় বিশ্বাস, অদ্ভুত কিছু রয়েছে মুদ্রা দুটোর মধ্যে। কোন রহস্য।

সেদিন বিকেলে কিশোরদের বাগানের ছাউনিতে জমায়েত হলো সবাই। কিশোর, মুসা, রবিন, ফারিহা টিটু তো রয়েছেই-দলে নতুন যুক্ত হয়েছে আরও তিনজন: বব, অনিতা ও ডলি। গ্রীনহিলস স্কুলে পড়ে। মুসা আর রবিনের বন্ধু।

গোয়েন্দাগিরির বেজায় শখ। বহুদিন ধরে চাপাচাপি করছে মুসা আর, রবিনকে। ওদের অনুরোধে প্রথমবারের মত ওই তিনজনকে দলে নিতে রাজি হয়েছে কিশোর। তবে শর্ত আছে, ওদের আচরণ বা কাজকর্ম তার পছন্দ না হলে কোন রকম কৈফিয়ত ছাড়াই দল থেকে বাদ দিয়ে দেবে। বব, অনিতা আর ডলি শর্তে রাজি।

সকাল বেলা রবিনের আম্মা ফোন সেরে বাজারের লিস্টে শেষবারের মত
চোখ বুলিয়ে রবিনকে ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে বেরিয়ে পড়েছিল কিশোরের সঙ্গে
দেখা করার জন্যে। মুদ্রা সম্পর্কে তার দুর্দান্ত আবিষ্কারের খবরটা জানাতে।

দলের সবাইকে খবরটা জানানোর দায়িত্ব নিয়েছে এরপর কিশোর, রবিন চলে গেছে বাজারে। খবর জানিয়ে বিকেল বেলা জরুরী মীটিং ডেকেছে কিশোর। সেই

মিটিঙেই হাজির হয়েছে এখন ওরা।
শীতকালে ছাউনির মধ্যে আরাম নেই। ঠাণ্ডা থেকে বাঁচার জন্যে গরম কাপড়-চোপড় পরে জবরজং সেজে বসেছে একেকজন। সবাই এসে গেছে, একজন বাদে, নতুন সদস্য ডলি।
ডলি! মুখ বাকাল বব। জীবনে কোনদিন সময় ঠিক রেখেছে? বাকি সবার মতই অধৈর্য হয়ে উঠেছে সে। আলোচনা শুরু করার জন্যে তর সইছে না।
এই সময় থাবা পড়ল দরজায়।
কে? ডেকে জিজ্ঞেস করল বব।
ডলি! ফিসফিস করে এমন ভঙ্গিতে বলল, যেন সাংঘাতিক কিছু ঘটে গেছে।
অকারণে এমন করছে। হাত নাড়ল বব, দেখবে, কিছুই হয়নি।
হু! তার কথায় মনে হলো কান নেই কিশোরের। পঞ্চাশ যোগ পঞ্চাশ
সমান আটাশ! নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল সে।
সেরেছে! শুরু হলো ল্যাটিন ভাষা! মুখ বাকাল মুসা। বলা যায় না, এখুনি হয়তো বলে বসবে পঞ্চাশ মিনিটে এক ঘণ্টা হয়।
কি বললে? মুসার মন্তব্য শুনে যেন বাস্তবে ফিরে এল কিশোর। আসলেই
তো তাই-পঞ্চাশে পঞ্চাশে আটাশই তো হওয়ার কথা।
অঙ্ক ভুলে গেলে নাকি তুমি?
দরজা খুলে দিয়েছে বব। ঘরে ঢুকল ডলি।
এত দেরি করলে যে? জিজ্ঞেস করল বব।
ইশারায় তাকে কথা বলতে নিষেধ করে ডলিকে বসতে ইশারা করল কিশোর।
হঠাৎ চিৎকার করে উঠল রবিন। কিশোরের কথা বুঝে ফেলেছে। ঠিকই
বলেছে ও! পঞ্চাশে পঞ্চাশে তো আটাশই হওয়ার কথা। কারণ পঞ্চাশ পেন্সের একটা মুদ্রার ওজন যদি চোদ্দ গ্রাম হয়, দুটোর হবে আটাশ। কিন্তু আজ সকালে একটা মুদ্রা পেয়েছি, যেটার ওজন চার গ্রাম কম, অর্থাৎ দশ গ্রাম। ওরকম দুটো হলে দশে আর দশে দাড়াবে বিশ। এতক্ষণে বুঝেছ নিশ্চয় সবাই?
খাইছে! কপাল চাপড়াল মুসা। এটার ভাষা তো আরও ভারী, প্রাচীন গ্রীক। কিছুই বুঝিনি আমি।
আমিও না! ফারিহা বলল। রবিন, একটা বর্ণও বুঝিনি আমি তোমার
কথা।
আমিও না, ফারিহার সঙ্গে সুর মেলাল অনিতা। আমার বিশ্বাস টিটুও কিছু বোঝেনি। কি রে, টিটু?
খোলসা করে বলো না সব, মুসা বলল, তাহলেই তো হয়ে যায়। এত কথা বলা লাগে না আর।

বলছি, বলছি, কিশোরের দিকে তাকাল রবিন। কিশোর, তুমিই বলো না।
ঠিক আছে নাটকীয় ভঙ্গিতে সবার দিকে তাকাল কিশোর। সকাল বেলা এক অদ্ভুত জিনিস রবিন লক্ষ করেছে।
সেটা কি? অধৈর্য হয়ে হাত নাড়ল মুসা। তাই তো জানতে চাচ্ছি। অত
ভূমিকা না করে বলে ফেলো না।
কিশোরের পায়ের কাছে বসেছে টিটু। মাথা চাপড়ে তাকে আদর করে দিল
সে। সবাই শোনার জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে।। ঘরে পিনপতন নীরবতা। সবাইকে একটা অস্থিরতায় রাখার জন্যে যেন ইচ্ছে করে সময় নিচ্ছে কিশোর।
হ্যাঁ, শোনো, অবশেষে মুখ খুলল সে। সকাল বেলা বাজারে যাওয়ার জন্যে রেডি হয়ে বসে ছিল রবিন। আন্টি তখন টেলিফোনে কথা বলছেন। ও শুনছে আর অপেক্ষা করছে। সময় কাটছে না দেখে শেষে কতগুলো মুদ্রা নিয়ে ওজন মাপতে শুরু করে ওজন মাপক যন্ত্রে। বুঝলে কিছু? মাথা নাড়ল সবাই।
গুড, বলল কিশোর। না বোঝাতে গুড-এর কি হলো বোঝা গেল না।
অনেকগুলো মুদ্রা মেপেছে সে। আন্টি ওকে বাজার করার জন্যে দিয়েছিলেন ওগুলো। তার মধ্যে পঞ্চাশ পেন্সের মুদ্রা ছিল দুটো। মজার ব্যাপারটা হলো, দুটোর ওজন এক রকম নয়।
বলো কি! এমন ভঙ্গি করে বলল ডলি, যেন কি ভয়ঙ্কর অঘটন ঘটে গেছে।
হ্যাঁ, তাই,! মাথা ঝাকাল রবিন।
সে-জন্যেই তোমাদেরকে এখানে ডাকলাম, কিশোর বলল। জিজ্ঞেস করার জন্যে তোমাদের কার কাছে কয়টা পঞ্চাশ পেন্সের মুদ্রা আছে।
যাতে ওগুলো নিয়ে মেপে দেখতে পারি আমরা কিশোরের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল রবিন।
এই যে আমার কাছে দুটো আছে, সঙ্গে সঙ্গে বের করে দিল ফারিহা। আর নেই। আমার মানি-বক্সে দুটোই ছিল।
আমার পাঁচটা আছে, গর্বের সঙ্গে বলল অনিতা।এখনও কাছে কাছে। ক্রিস্টমাসের বাজার করিনি তো, তাই রয়ে গেছে।
বাকি সবাইও তাদের যার কাছে যতগুলো পঞ্চাশ পেন্সের মুদ্রা আছে বের করতে লাগল। মহা হই-চই, হট্টগোল। একসঙ্গে কথা শুরু করে দিয়েছে সব।
আরে আস্তে, আস্তে! তাড়াতাড়ি সাবধান করল কিশোর। এত চেঁচামেচি, করলে চাচী চলে আসবে দেখতে..রবিন, তোমার গবেষণাটা আরেকবার চালাও তো দেখি আমাদের সামনে।
সঙ্গে সঙ্গে কাজে লেগে গেল রবিন। একটা কমলার বাক্সের ওপর ওজন

মাপক যন্ত্রটা রাখল সে। বাক্সটাকে টেবিল হিসেবে ব্যবহার করে ওরা। পকেট থেকে মুদ্রা দুটো বের করে দেখাল সে। মায়ের বাজারের পয়সা থেকে সরিয়ে ফেলেছি এ দুটো। অবশ্য মেরে দিইনি, এক ডলারের একটা নোট দিয়ে দিয়েছি তাকে।
ছোট মাপক যন্ত্রটার থালায় একটা মুদ্রা রাখল সে। কাটার দিকে তাকিয়ে বলল, দেখো, ওজন ঠিক চোদ্দ গ্রাম। প্রথমটা তুলে নিয়ে দ্বিতীয়টা রাখল
থালায়। এবার এটা দেখো। দশ গ্রাম। চার গ্রামই কম।
হ্যাঁ, তাই তো দেখছি, কাটাটার দিকে তাকিয়ে আছে মুসা। এদিক ওদিক
কেঁপে কেঁপে আস্তে করে স্থির হলো এক জায়গায়।
এখন ফারিহারগুলোর অবস্থা দেখা যাক, রবিন বলল।
মুদ্রা দুটো তার হাতে তুলেদিল ফারিহা।
দুটোই দেখা হলো।
চোদ্দ গ্রাম এবং চোদ্দ গ্রাম, কাটার দিকে তাকিয়ে থেকে মুসা বলল।
দেখি, তোমারগুলো দাও তো এবার, বব, হাত বাড়াল কিশোর।
তিনটে মুদ্রা তার হাতে ফেলে দিল বব।
চোদ্দ, চোদ্দ, এবং চোদ্দ, ওজন দেখে ঘোষণা করল রবিন।
এরপর অনিতার পালা। তার কাছে আছে পাঁচটা মুদ্রা। সবগুলো চোদ্দ গ্রাম।
কিশোরের চারটে আর মুসার দুটোর একই ওজন।
কি ডলির তিনটে মুদ্রার শেষটাকে ওজন দিয়েই চিৎকার করে উঠল। রবিন,দেখো, ওজন কম। আমার দ্বিতীয়টার সমান!
কান পেতে শব্দ শুনল সবাই।
তারপর মুসা হঠাৎ তার একটা ভারী মুদ্রা আছড়ে ফেলে দিয়ে শুনে বলল
শুনলে? এক রকম না কিন্তু।
একমত হয়ে মাথা নাড়াল সবাই।
ভেতরে কি আছে দেখা দরকার, মুসা বলল তখন।
কি করে? ডলির প্রশ্ন।
অবশ্যই একটাকে কেটে ফেলে। জবাব দিল রবিন।
ওহ, মাথা নাড়ল কিশোর, একটা নয়, দুটোকে। বেশির ভাগ মুদ্রাই যেহেতু
চোদ্দ গ্রাম ওগুলোকেই স্বাভাবিক ধরব আমরা। স্বাভাবিক একটাকে কাটব প্রথমে, তারপর হালকা একটাকে। দুটোর তুলনা করতে পারব তাহলে।
মুহূর্ত দেরি না করে দেয়ালের ছকে ঝোলানো একটা লোহাকাটা করাত খুলে নিয়ে এল সে। আরও বেশ কিছু প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ঝোলানো রয়েছে ওখানে।

ওগুলো রাখার সময় কিশোর বলেছিল, কোনটা যে কখন দরকার হয়ে যাবে, কেউ বলতে পারে না। সে-জন্যেই রাখলাম।
প্রথমে ভারীটা কেটে দেখা যাক, বব বলল।
ভাইসে আটকে নেয়া উচিত না? রবিন বলল। ধাতব জিনিস। হাত দিয়ে ধরে কাটা বিপজ্জনক হয়ে যাবে।
ভাইসও একটা আছে। কোন অসুবিধে নেই। রীতিমত একটা ওঅর্কশপ এই ছাউনিটা। চোদ্দ গ্রামের একটা মুদ্রা ভাইসে আটকে নিয়ে কাটা শুরু করল কিশোর।
জোরাল ঘ্যাচর ঘ্যাচর আওয়াজ। ঘুমিয়ে পড়েছিল টিটু। চমকে একটা কান খাড়া করে ফেলল। কিন্তু চোখ মেলল না সে। খাওয়ার আগে আর মেলবে বলেও মনে হয় না।
অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে বাকি সবাই। কিশোরের হাতের দিকে তাকিয়ে আছে।
মিনিটের পর মিনিট পার হয়ে যাচ্ছে। কাটা আর শেষ হয় না।
করাতের দাতের ঘষায় ধোয়ার মত উড়ছে ধাতুর সূক্ষ্ম কণা।
শেষ হয়ে এসেছে, তাই না? তর সইছে না আর রবিনের।
হঠাৎ সবাইকে চমকে দিয়ে মুদ্রাটা দুই টুকরো হয়ে একটা টুকরো মাটিতে। পড়ে ঠন করে উঠল।
যাক, হলো শেষ পর্যন্ত! উত্তেজিত ভঙ্গিতে মাটি থেকে টুকরোটা তুলে নিয়ে দেখতে লাগল কিশোর। তারপর বাড়িয়ে দিল রবিনের দিকে। হাতে হাতে ঘুরতে থাকল ওটা। সবাই দেখল। করাতে কাটা সমান, মসৃণ ধারটায় আভুল বোলাল ডলি।
কিশোর, কি বোঝা যাচ্ছে এতে? আমার তো মনে হচ্ছে খামোকা কাটা হলো, মাঝাখান থেকে পঞ্চাশ পেন্স গরীব হয়ে গেলাম আমি।
একটু ধৈর্য ধরো, মুসা বলল, বাকিটারও একই গতি করা যাক। তারপর বোঝা যাবে লাভটা কি হলো। কি বলো কিশোর?
মাথা ঝাকাল কেবল কিশোর।
নিজের দুটো মুদ্রার মধ্যে হালকা মুদ্রাটা বের করে ডলিকে দেখাল রবিন।
এই যে, তোমার মত আমিও পঞ্চাশ পেন্স গরীব হতে চলেছি। মুদ্রাটা নিজেই ভাইসে লাগিয়ে কাটা শুরু করে দিল সে।
এবার আর আগেরটা কাটার মত এত শব্দ হলো না, কাটাও অত কঠিন হলো না। যে রকম তাড়াতাড়ি কেটে ফেলছ, ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে মুসা, মনে হচ্ছে ধাতুটাই নরম, তাই না?

মাথা ঝাকাল রবিন। কোন সন্দেহ নেই তাতে। আগেরটার চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি এটা কেটে ফেলল রবিন। কিশোর যেটা কেটেছে তার অর্ধেক সময় লাগল।
ভাইসে আটকানো টুকরোটার দিকে এক নজর তাকিয়েই চিৎকার করে উঠল দেখো, ধাতুর দুটো স্তর!
হাঁ, তাই তো, মাটিতে পড়ে যাওয়া টুকরোটা তুলে নিয়ে বলল অনিতা।
বাইরের আস্তরটা একেবারে পাতলা। ভেতরেরটা পুরু, তবে অন্য রকম, কালো রঙের।
হালকা, সস্তা কোন ধাতু দিয়ে তৈরি, গম্ভীর মুখে কিশোর বলল।
কেন, সস্তা কেন? প্রশ্ন করল ফারিহা।
কারণ, এই মুদ্রাগুলো জাল! জবাব দিল কিশোর। আসল মুদ্রার মত দামী ধাতু দিয়ে তৈরি করে জালিয়াতদের কোন লাভ নেই, সেজন্যে সস্তা ধাতু ব্যবহার করে।
জালিয়াত স্তব্ধ হয়ে গেল ডলি। কিন্তু আমার কয়েনটা জাল হতেই পারে না। নিজের হাতের হালকা মুদ্রাটার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল সে, আমার আপা এটা দিয়েছে আমাকে।
তোমার আপার কোন দোষ নেই, ডলি, তাকে বোঝাল রবিন। এটা তো আর তিনি নিজে বানাননি। অন্য কেউ তাকে দিয়েছে। যে দিয়েছে সে আবার কারও কাছ থেকে পেয়েছে, সেই জন আবার অন্য কারও কাছ থেকে-এ ভাবেই। হাত বদল হতে থাকে কয়েন। আমার প্রশ্ন, প্রথম কার হাত থেকে বেরোল এটা?
হ্যাঁ, ঠিক আমারও প্রশ্ন সেটা, উত্তজিত স্বরে কিশোর বলল। এবং প্রশ্নটার জবাব খুঁজে বের করতে হবে আমাদের। রবিন আর ডলির প্রথম কাজ হলো এখন মুদ্রা দুটো কার কার হাত ঘুরে এসেছে যতটা সম্ভব সেটা জানার চেষ্টা করা। আমরাও ঘুরে ঘুরে খোজ-খবর নিয়ে দেখব কিছু জানা যায় কিনা। আপাতত এটাই আমাদের প্রথম কাজ।
মীটিং শেষ হলো। ছাউনি থেকে বাগানে বেরিয়ে এল সবাই। চারটেও বাজেনি, কিন্তু এখনই দিনের আলো মুছে যেতে আরম্ভ করেছে। ধূসর আকাশটা যেন অনেক নিচে নেমে এসে খুলে রয়েছে। তুষার পড়া শুরু হবে মনে হচ্ছে।
হ্যাঁ, পড়বে, কিশোর বলল।
সাইকেলে চেপে সবার উদ্দেশে হাত নেড়ে চলে গেল বব।
একে একে সবাই চলে গেল বিদায় নিয়ে। বাগানের গেটটা লাগিয়ে দিল কিশোর। রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আনমনে নিচের ঠোঁটে চিমটি

কাটল একবার সে। বিড়বিড় করে বলল, মনে হচ্ছে রহস্য আরেকটা পেয়ে গেলাম!
বাড়ি ফিরে সোজা মার দিকে এগিয়ে গেল রবিন। আগের দিন যে যুদ্রাটা তাকে দিয়েছেন তিনি, সেটার কথা জিজ্ঞেস করার জন্যে। কার কাছ থেকে নিয়েছেন, বলতে পারলেন না। তবে তার আগের দিন কোন কোন দোকানে জিনিস কিনতে গিয়েছিলেন, সেটা মনে করতে পারলেন। যত্ন করে নোটবুকে তালিকাটা লিখে নিল রবিন।
ডলিও একই কাজ করল। তার বড় বোনকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিল গত চব্বিশ ঘণ্টায় কোথায় কোথায় গিয়েছিল। ডলির বড় বোন জানাল, পাশের শহরটাতে হেয়ারড্রেসারের দোকানে গিয়েছিল চুল ঠিক করতে। তারপর গিয়েছিল একটা পোশাকের দোকান আর কেমিস্টের দোকানে। গায়ে ফিরে যায় পোস্ট অফিসে, সেখান থেকে মুদীর দোকান আর বেকারিতে।
পাঁচটার সময় ডলির সঙ্গে দেখা করল রবিন, তালিকা দুটো মিলিয়ে নেয়ার জন্যে। কিন্তু দুজনের তালিকায় একটা দোকানের নামও পেল না যেগুলো মিলে। অর্থ্যাৎ,,রবিনের আম্মা যেখানে যেখানে গিয়েছেন, তার কোনটাতেই যায়নি ডলির বোন। এর দুটো মানে হতে পারে। হয় ভিন্ন ভিন্ন দিনে যে কোন এক জায়গা থেকে মুদ্রা দুটো তাদের হাতে এসেছে, নয়তো দুই জায়গা থেকে ওগুলো পেয়েছে তারা। কোখান থেকে এসেছে, বের করা অসম্ভব বলে মনে হলো ওদের কাছে।
বাকি গোয়েন্দারাও চুপ করে বসে রইল না। যার যার মানি-বক্স খালি করে টাকা-পয়সা যা আছে সব নিয়ে বেরিয়ে পড়ল সেগুলো ভাঙিয়ে পঞ্চাশ পেলের মুদ্রা জোগাড়ের জন্যে। ভাগ্যিস স্কুল এখন ছুটি, নইলে এসব করার সময়ই পেত না কেউ। রহস্যটা হাতছাড়া হয়ে যেত।
কিশোর, ফারিহা আর টিটু গেল পোস্ট অফিসে। কাউন্টারে বসা মেয়েটা উৎসাহের সঙ্গেই ওদের টাকা-পয়সা ভাঙিয়ে পঞ্চাশ পেন্সের মুদ্রা দিয়ে দিল।
বব দাড়িয়ে রইল রাস্তায়। পথচারী দেখলেই একটা করে ডলার বাড়িয়ে ধরে অনুরোধ করতে লাগল পঞ্চাশ পেন্সের দুটো মুদ্রা দেয়ার জন্য।
মুসা করতে গেল বাজারে,টুকিটাকি জিনিষ কিনতে লাগল। এমন করে কিনল, যাতে প্রচুর পঞ্চাশ পেলের মুদ্রা জোগাড় হয়। যেমন, এক টিউব পেপারমিট লজেন্স কিনলে দিতে হবে বিশ পেন্স, দোকানিকে এক ডলার দিলে খুশি হয়েই সে বাকি পয়সার সঙ্গে একটা পঞ্চাশ পেন্স দিয়ে দিল। প্রতি দোকান থেকে একটার বেশি জিনিস কিনল। আর এই কাজটা করতে গিয়েই একটা মজার আবিষ্কার করে বসল সে।
মুদী দোকান থেকে এক প্যাকেট বিস্কুট কিনে, টাকা দিয়ে দোকানির বউকে

জিজ্ঞেস করল পঞ্চাশ পেন্সের মুদ্রা দিতে পারবে কিনা।
পারব। তারপর মাথা নাড়তে নাড়তে যোগ করল মহিলা, বুঝলাম না
লোকের কি হয়েছে আজ। সবাই এসে খালি পঞ্চাশ পেন্সের মুদ্রা চাইছে।
খানিক দূরে একটা বেকারিতে অনিতার বেলায়ও প্রায় একই ব্যাপার ঘটল।
একটা লোক কেক কিনে দাম মিটিয়ে দেয়ার পর মহিলাকে কয়েকটা ডলার দিয়ে জিজ্ঞেস করল, এগুলোর বিনিময়ে তাকে পঞ্চাশ পেলের মুদ্রা দিতে পারবে কিনা।
লোকটা অনেক লম্বা, উত্তেজিত কণ্ঠে বলল অনিতা। মাথার হ্যাটটা চোখের ওপর নামিয়ে রেখেছিল। কোটের কলার তুলে দিয়ে চিবুক ঢেকে দিয়েছিল এমন ভাবে, যাতে তার চেহারা বোঝা না যায়। কিন্তু তার বা গালের কাটা দাগটা ঠিকই দেখে ফেলেছি আমি।
বেকারিতে যা যা শুনে এসেছে, সবাইকে জানাচ্ছে সে। ছটা প্রায় বাজে। কে কি করে এসেছে, বলার জন্যে আবার জমায়েত হয়েছে গোয়েন্দারা। মুসা আর অনিতা জরুরী খবর জেনে এসেছে। বাকি সবাই তেমন কোন খবর আনতে না পারলেও পঞ্চাশ পেলের মুদ্রা নিয়ে এসেছে অনেকগুলো। তবে দুঃখের কথা, ওগুলোর কোনটার ওজনই চোদ্দ গ্রামের নিচে নয়।
খড়ের গাদায় সুচ খুঁজছি আমরা, মুখ কালো করে ডলি বলল।
জাল মুদ্রা পাইও যদি আরও, তার সঙ্গে, সুর মেলাল বব, তাহলেই বা
জালিয়াতদের খুঁজে বের করব আমরা কিভাবে? টাকা সর্বক্ষণ হাত থেকে হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে-কার কাছ থেকে কখন কি ভাবে কার কাছে গেল, কিছুই বলার উপায় নেই।
তা ঠিক, একমত হলো কিশোর। আজ, বিকেলে যে ভাবে গায়ের পথে
পথে ঘুরে বেড়ালাম আমরা, এ রকম করে ঘুরে কোন লাভ নেই।
তাহলে কি করব? রবিনের প্রশ্ন। রহস্যটার ব্যাপারে তার আগ্রহই যেন
সবচেয়ে বেশি। তার আশঙ্কা হচ্ছে বাকি সবাই ভোটাভুটি করে রহস্য উদ্ধারের চেষ্টাটাই না বাদ দিয়ে দেয়।
পুলিশকে জানাতে পারি আমরা, মুসা বলল।
পুলিশ জানে না কি করে বুঝলে,রবিন বলল। আমাদের আগেই হয়তো জেনে বসে আছে ওরা।
হ্যাঁ, তা ঠিক, বব বলল। বেকারিতে যে লোকটাকে দেখে এসেছে ডলি
লোকও হতে পারে। সাদা কাপড়ে তদন্ত করে বেড়াচ্ছে হয়তো।
উঁহুঁ, ওকে আমার মোটেও ডিটেকটিভ বলে মনে হয়নি, মাথা নাড়ল ডলি। বরং কেমন রহস্যময় ভাবভঙ্গি। পুলিশ ওরকম করে না।

তারমানে তদন্তটা চালিয়েই যেতে হচ্ছে আমাদের, কিশোরের দিকে তাকাল রবিন। তাই না?
কিশোর জবাব দেবার আগেই চিৎকার করে উঠল টিটু, খুফ। খুফ।
হেসে ফেলল কিশোর, আমি আর কি বলব? টিটুই তো যা বলার বলে দিল।
যাই হোক, গায়ে যা দেখার দেখে নিয়েছি আমরা। এখানে আর কিছু দেখার নেই। শহরে গিয়ে চেষ্টা করে দেখতে হবে। ভাগ্য ভাল হলে কিছু পেয়েও যেতে পারি ওখানে।
ওর কথা যে কতখানি সত্যি, তখন যদি সেটা জানত!
পরদিন সকালে পাশের শহরে যেতে তৈরি হলেন ববের আম্মা। ববকে বললেন সঙ্গে যেতে। ববের ছোট বোন জুলিয়াও সঙ্গে যেতে চাইল। আপত্তি করলেন না তিনি। গেলে ররং ভালই। বড়দিনের বাজার করবেন। জিনিসপত্র প্রচুর। বহন করার জন্যেও লোক দরকার।
শহরের বড় রাস্তা ধরে হেঁটে যাচ্ছে তিনজনে। ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের সামনে এসে দাড়িয়ে গেল জুলিয়া।
দেখো, দেখো, মা, উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল সে। দুজন ফাদার দোকানের দরজায় দাড়িয়ে থাকতে দেখা গেল দুজন লাল কাপড় পরা লোককে। লম্বা, সাদা বড় বড় দাড়ি। ওদের সঙ্গে দাড়িয়ে ছবি তুলছে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা। ক্রেতা করার নতুন কায়দা। ভালই। দোকানের ভেতর ফাদার ক্রিস্টমাস সেজে মূর্তির মত দাড়িয়ে থাকাটা পুরানো হয়ে গেছে।
মা, আমি ফাদার ক্রিস্টমাস দেখব! ফাদার ক্রিস্টমাস দেখব! মার হাত ধরে টানাটানি শুরু করল জুলিয়া।
শিকারীর চোখ মেলেই ছিল ফাদাররা। দেখে ফেলল একজন। এগিয়ে এসে বলল, আপনার মেয়েকে নিয়ে একটা ছবি তুললে কেমন হয়, ম্যাডাম মাত্র এক ডলার দশ পেন্স লাগবে। চমৎকার একটা বাঁধানো ছবি পেয়ে যাবেন। যখন ইচ্ছে দেখে স্মরণ করতে পারবেন এবারের বড় দিনটাকে। কি বলেন?
ববের আম্মা জবাব দেবার আগেই জুলিয়াকে টেনে নিয়ে গিয়ে পোজ দিয়ে দাড়িয়ে গেল দ্বিতীয় ফাদারের সামনে।
অনুমতি না দিয়ে আর পারলেন না ববের আম্মা। ঠিক আছে, তুলুন, তবে মাত্র একটা, তার বেশি না।
খুব খুশি জুলিয়া। পেছন থেকে তাকে জড়িয়ে ধয়ে পোজ দিয়ে। দাড়াল ফাদার। সামনে দাঁড়িয়ে ছবি তুলল তার সঙ্গী। হেসে বলল জুলিয়াকে, হয়ে গেছে।
মা আর ভাইয়ের কাছে ফিরে এল জুলিয়া। ছবি ডেভেলপ হতে দেরি হলো না। সেটা বাড়িয়ে ধরে প্রথম ফাদার ববের আম্মাকে বলল, এই যে ম্যাডাম

নিন। মাত্র এক ডলার দশ পেন্স।
ছবি দেখে খুশি হলেন ববের আমা। বাহ, ভাল হয়েছে তো! ছবিটা ববের হাতে রাখতে দিয়ে ব্যাগ থেকে দুই ডলার বের করে দিলেন তিনি লোকটাকে। দশ পেন্স রেখে নব্বই পেন্স ভাঙতি দিল তাকে লোকটা। তার মধ্যে একটা পঞ্চাশ পেন্সের মুদ্রাও রয়েছে।
পঞ্চাশ পেন্স। আরেকটু হলে হাত থেকে ছবিটাই ফেলে দিচ্ছিল বব। শুরুটা চমৎকার! পঞ্চাশ পেন্সের মুদ্রাটা কি ভাবে মায়ের কাছ গেকে নেয়া যায় সেই চিন্তা করতে লাগল সে।
হঠাৎ করে নিতান্ত কাকতালীয় ভাবেই সমস্যাটার সমাধান হয়ে গেল। মিনিট দশেক পর বব আর জুলিয়া একটা খবরের কাগজের ট্যান্ডের সামনে অপেক্ষা করছে। মা গেছেন ভেতরে, কাগজ কিনতে। খানিক পর বেরিয়ে এসে ববকে জিজ্ঞেস করলেন, বব, তোর কাছে ভাঙতি পয়সা আছে? পঞ্চাশ পেন্স ভাঙিয়ে দিতে পারবি? তোর বাবার জন্যে একটা পত্রিকা কেনা দরকার। দোকানদার ভাঙতি দিতে পারছে না।
হাতে যেন চাঁদ পেয়ে গেল বব। তাড়াতাড়ি পকেট থেকে ভাঙতি পয়সা বের করে গুঁজে দিল মায়ের হাতে। তবে মায়ের পঞ্চাশ পেন্সের মুদ্রাটা নিয়ে নিজের পকেটে ভরতে ভুলল না। বাজিয়ে শোনার প্রবল ইচ্ছেটা চাপা দিল সে। শোনার জায়গা নয় এটা। লোকজনের অভাব নেই। কে কোনখান থেকে নজর রেখেছে বলা বাড়ি ফিরে আর একটা মুহূর্ত দেরি করল না সে। সিড়ির রেলিঙের ধাতব হাতলে বাড়ি মারল। উত্তেজনায় কেঁপে উঠল বুক, যখন শুনল শব্দটা আসল মুদ্রার মত মিষ্টি নয়। অন্য রকম। কেমন ভোঁতা ভোঁতা।
খোদা! কি কপাল আমার! ভাবল সে। গতকাল এ রকম একটা জিনিসের জন্যে পুরো গ্রীনহিলস গ্রামটা চষে বেড়িয়েছে ওরা। কিন্তু পায়নি।
দশ গ্রাম। হুঁ, আরেকটা জাল মুদ্রা এটা, কোন সন্দেহ নেই তাতে, মাপক যন্ত্র দিয়ে মেপে দেখে বলল কিশোর।
কোথায় পেলে এটা? ববকে জিজ্ঞেস করল অনিতা। আজকেও সারাটা সকাল ঘুরে বেড়িয়েছি গায়ের মধ্যে, কিছুই পাইনি। আর তুমি শহরে একবার গিয়েই পেয়ে গেলে!
হেনরির ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের বাইরে পেয়েছি, বব বলল। ফাদার ক্রিস্টমাস দুজনের কথাও ওদের জানাল সে।
দাঁড়াও, দাঁড়াও! হঠাৎ বলে উঠল রবিন। ফাদার ক্রিস্টমাস! সেদিন আমাদের পাশের বাড়ির মিসেস ডগলাসও গিয়েছিলেন শহরে। সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন তার ছেলেকে। ওই ছেলেটাও নাকি ফাদার ক্রিস্টমাসের সঙ্গে ছবি

তুলেছে। মিসেস ডগলাস মাকে বলছিলেন। আমার মুদ্রাটা যেদিন পেয়েছি তার আগের দিন।
মজার ব্যাপার তো! মুসা বলল। তারমানে খোঁজ-খবর পাওয়া যেতে শুরু করেছে।
কিন্তু আমি এ কথা মেনে নিতে পারছি না ডলি বলল। আমার বড় বোন তো আর ওদের সঙ্গে পোজ দিয়ে ছবি তুলতে যায়নি।
তারমানে তুমি বলতে চাও, ফাদার ক্রিস্টমাসরা ওই কয়েন দেয়নি? এই মুদ্রা রহস্য নিয়ে খুব উত্তেজিত হয়ে আছে সে।
হয়তো দিয়েছে, চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। পয়সা তো হাতে হাতেই ঘোরে। স্বাভাবিক ভাবে চোখে না পড়লে কে আর গবেষণা করে দেখতে যায় কোনটা আসল কোনটা নকল। রবিন যদি ওভাবে হঠাৎ করে আবিষ্কার না করে ফেলত, ওটাও চলে যেত বাজারে, অন্য কারও কাছে। ডলির কয়েনটাও অন্য কারও কাছ থেকে ফাদার ক্রিস্টমাসের হাত ঘুরে, ডলির আপার হাত ঘুরে তার হাতে চলে এসেছে।
তা ঠিক, ফারিহা বলল। তাছাড়া ফাদার ক্রিস্টমাসরা পয়সা জাল করবে এটাও ভাবা যায় না।
তার দিকে তাকিয়ে হাসল কিশোর।
যদিও সবাই জানে, আবার বলল ফারিহা, দোকানের ফাদার ক্রিস্টমাসরা আসল হয় না।
কিন্তু একটা কথা ভেবে দেখো, জাল কয়েন পাচারকারী যদি হয়ও ওরা, বব বলল, অত বড় বড় দাড়ির আড়ালে কেউ চিনতে পারবে না ওদের।
হ্যাঁ, তাই তো।দুজন ফাদার ক্রিস্টমাস বাচ্চাদের সঙ্গে এ ভাবে হেসে হেসে কথা বলে, কে সন্দেহ করবে তাদের! রবিন বলল।
আমরা করব! দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিল কিশোর। এবং সেটা পরীক্ষা করে দেখার জন্যে আজই শহরে যাব আমরা।
বাসে করে বিকেল চারটের সময় এসে ডগলাসের ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের সামনে নামল ওরা। বড় দিনের সময় এখন, সকালে যেমন ক্রেতার ভিড় ছিল, বিকেল বেলাও একই রকম ভিড়।
ওই যে ওরা!, উত্তেজিত ভঙ্গিতে দুই ফাদার ক্রিস্টমাসকে দেখাল বব।
এ ভাবে চেঁচিও না, সাবধান করল কিশোর। এসো আমার সঙ্গে।
সবাইকে নিয়ে চলে এল এক ক্রিস্টমাস ট্রী বিক্রেতার দোকানের কাছে। তৈরি করা ক্রিস্টমাস গাছের ছোটখাট একটা জঙ্গল হয়ে আছে। তার আড়ালে এসে দাড়াল ওরা কি করা যায় পরামর্শ করার জন্যে।
ওই যে ওই লোকটা জুলিয়ার ছবি তুলেছিল, গাছের ফাঁক দিয়ে হাত তুলে

দেখাল বব।
সাথে পিস্তল-টিস্তল নেই তো? অনিতা বলল।
হ্যাঁ, তা তো আছেই, মুসা বলল। দাড়ির মধ্যে লুকানো।
বাজে কথা একদম বলবে না আমার সঙ্গে! রেগে উঠল অনিতা। ছাগল পেয়েছ নাকি আমাকে কিছু বুঝি না মনে করেছ?
চুপ করে থাকা কিংবা আস্তে কথা বলার কথা ভুলে গিয়ে চিৎকার করে উঠল সে।
চুপ! আস্তে। ধমক লাগাল কিশোর। কাজের কথা শোনো এখন, সমস্ত বিকেল এখানে দাড়িয়ে থাকার জন্যে আসিনি আমরা। কিছু করতে হবে। ভাগ ভাগ হয়ে যাব। তোমরা গিয়ে দাঁড়াও উল্টোদিকের ওই চত্বরটাতে। খবরের কাগজের স্ট্যান্ডটার আড়ালে দাড়াবে, ওরা যাতে দেখতে না পায়। সাথে করে টিটুকে নিয়ে যাও। ফারিহা আর ডলিকে নিয়ে আমি যাচ্ছি দোকানের কাছে জানালা দিয়ে চোখ রাখব লোকগুলোর ওপর।
বলার পর আর এক মুহূর্তও দেরি করল না কেউ। ঘুরতে বেরোনো অতি সাধারণ কয়েকটা ছেলের মত ভঙ্গি করে রইল ওরা। যার যার জায়গায় থেকে নজর রাখতে লাগল ফাদার ক্রিস্টমাসদের ওপর।
অন্য দোকানের ফাদারদের মতই এই দুজনও স্বাভাবিক আচরণ করছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের দিকে তাকিয়ে হাসছে, তাদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছে। ছবি তোলার জন্যে অনুরোধ করছে তাদের বাবা-মাকে। বাচ্চাদের কোলে নিয়ে আদর করছে। চওড়া হাসি হাসছে তুলার তৈরি দাড়ি-গোঁফের আড়াল থেকে।
নাহ, কোন কিছুই সন্দেহ করার মত নয়, চাপা স্বরে মুসাকে বলল রবিন।
জোরে নিঃশ্বাস ফেলল মুসা। সে-রকমই তো লাগছে। আসার সঙ্গে সঙ্গে এত তাড়াতাড়ি কিছু একটা দেখে ফেলব, সে-আশাও আমি অবশ্য করছি না। তা ছাড়া কিশোর তো বললোই ফাদারদের কোন দোষ না-ও থাকতে পারে; হতে পারে। ওদের অজান্তেই ওদের হাত দিয়ে হয়তো কেউ পাচার করে দিচ্ছে নকল মুদ্রাগুলো।
হ্যাঁ, তা পারে, কিছুটা হতাশ কণ্ঠেই জবাব দিল রবিন। আর ববের আম্মা যে কয়েনটা ববকে দিয়েছেন, সেটাও ফাদারদের কাছ থেকেই পাওয়া, সেটাও তো ঠিক না হতে পারে। বাজার করেছেন। আরও অনেকে পঞ্চাশ পেন্সের কয়েন তাকে দিয়ে থাকতে পারে।
কিশোররা তখন দোকানের বাইরে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে উঁকি দিচ্ছে। ভঙ্গিটা যেন দোকানের উইন্ডোতে সাজানো খেলনা আর অন্যান্য জিনিস দেখছে।

রাস্তার দিকে পেছন করে আছে, উইন্ডোর কাছে দাঁড়ানো অন্যান্য ছেলেমেয়েদের মত। উইভোর কাচে চত্বরের লোকজনকে দেখা যাচ্ছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাদেরকে দেখছে ওরা। ফাদার ক্রিস্টমাসদেরও দেখা যাচ্ছে, কাজেই ওই দুজনকে দেখার জন্যেও সরাসরি তাকানো লাগছে না ওদের।
দুই ঘণ্টা ধরে একই জায়গায় দাড়িয়ে থাকল ফারিহা আর ডলি। বাজার করতে আসা ছেলেমেয়েরা দোকানে ঢুকছে বেরোচ্ছে, উত্তেজিত কলরব করছে। অস্বাভাবিক কোন কিছুই চোখে পড়ল না ওদের। কিছুই করতে না পেরে বিরক্ত হয়ে গেল টিটু। লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। ঘটনাটা ঘটল তখনই। তার থাবা মাড়িয়ে দিল একজন লোক। চিৎকার দিয়ে উঠল টিটু।
প্রায় একই সময়ে চিৎকার দিয়ে ববের হাত খামচে ধরল অনিতাও।
আরে কি করছ। হাতে নখ বসে যেতে চেচিয়ে উঠল বব।
স্বপ্ন দেখছি নাকি আমি! অনিতা বলল।
তা কি করে বলব? কিন্তু আমার হাতের চামড়া যে তুলে দিচ্ছ এটা ঠিক।
ওই যে লোকটা-কালো ওভারকোট পরা, ববের কথা যেন কানেই যায়নি অনিতার, রাস্তা পার হয়ে গেল এইমাত্র-দেখলে না?
কাচের দিকে এমন করে তাকাতে লাগল বব, যেন পারলে কাচ থেকে খামচি দিয়ে বের করে আনে লোকটাকে। কালো কোট পরা একজন লোককে চত্বর থেকে নেমে যেতে দেখল সে-ও।
ওই লোকটাকেই দেখেছিলাম আমি বেকারিতে, গালে কাটা দাগ, উত্তেজিত স্বরে বলল অনিতা। ও গিয়ে কথা বলেছিল ফাদার ক্রিস্টমাসদের সঙ্গে। বুঝতে পারছি না কি ঘটবে এখন!
উত্তেজনায় টানটান হয়ে কাচের দিকে তাকিয়ে রইল দুজনে। আশেপাশে ঘোরাফেরা করছে ছেলেমেয়ের দল, হই-চই হাসাহাসি করছে: কোন কিছুই যেন কানে ঢুকছে না বব বা অনিতার।
কই, কিছুই তো করছে না! হতাশ কণ্ঠে বলল বব। লোকটা থামছে না।
রাস্তার ধার দিয়ে সোজা এগিয়ে চলেছে।
আরে না না! হঠাৎ দম আটকে ফেলল অনিতা। দেখো, কি করছে–যুরে গেল…এগিয়ে যাচ্ছে সিড়ির দিকে!.-আরে, কি কাণ্ড!
জোরে চিৎকার দিয়ে নিজের অজান্তেই ঘুরে সরাসরি তাকিয়ে ফেলল লোকটার দিকে। তার চিৎকার শুনে অন্য ছেলেমেয়েরাও ফিরে তাকাল। হাসির রোল উঠল। চত্বরে লম্বা হয়ে পড়ে গেছে কোটওয়ালা লোকটা। সঙ্গে নিয়ে পড়েছে একজন ফাদার ক্রিস্টমাসকে।
আরি দেখো না অবস্থা বব বলল। চত্বরে কয়েনের ছড়াছড়ি। ফাদারের

পকেট থেকে পড়েছে। কম করে হলেও দশটা পঞ্চাশ পেন্সের মুদ্রা আছে ওর মধ্যে।
প্রায় ছোঁ দিয়ে দিয়ে পঞ্চাশ পেন্সের কয়েকটা মুদ্রা তুলে নিল কোটওয়ালা লোকটা।
চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে উঠে বসল ফাদার ক্রিস্টমাস। ছড়িয়ে থাকা পয়সাগুলো তুলে তুলে পকেটে ভরতে শুরু করল। তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে গেল ছেলেমেয়েরা। এই হট্টগোলের মধ্যে সবার অলক্ষে উধাও হয়ে গেল কোটওয়ালা লোকটা।
আপনাআপনি পড়েনি ফাদার, বব বলল। তাকে ফেলে দিয়েছে কোটওয়ালা লোকটা। পঞ্চাশ পেন্সের কয়েনগুলো হাতানোর জন্যে।
আমারও তাই ধারণা, অনিতা বলল।
কিশোর, ফারিহা আর ডলি পুরো ঘটনাটাই ঘটতে দেখেছে। ওরাও পড়ে যেতে দেখেছে কোটওয়ালা লোকটাকে, দেখেছে তার গালের কাটা দাগ।
গতকালের বেকারির সেই লোকটা বলেই তাকে চিহ্নিত করেছে ডলি।
কয়েকটা কয়েন তুলে নিয়ে গেছে সে! ঘন ঘন দম নিতে নিতে বলল ডলি। চট করে পঞ্চাশ পেন্সের কয়েনগুলো তুলে পকেটে ভরে ফেলেছে।
তারমানে আমাদের মত একই ব্যাপারে তারও আগ্রহ দেখা যাচ্ছে, কিশোর বলল।
গুড। তারমানে সত্যি সত্যি এগোনো শুরু করেছি আমরা।
কিন্তু লোকটা গোয়েন্দা না জালিয়াত? ফিসফিস করে বলল ফারিহা।
জানি না, জবাব দিল কিশোর। তবে একটা ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই আমার, ওই দুজন ফাদার ক্রিস্টমাসের মধ্যে গোলমেলে কিছু একটা রয়েছে।
আমি ভাবছি পড়ে যাওয়া পঞ্চাশ পেন্সের মুদ্রাগুলো আসল ছিল, না নকল, ডলির প্রশ্ন।
জেনে নিলেই তো পারি, কিশোর বলল। পকেট থেকে টাকা বের করে দিল ফারিহাকে। ফারিহা এই নাও দুই ডলার। একটা ছবি তুলে এসোগে ফাদার ক্রিস্টমাসদের সঙ্গে।
আমি! আঁতকে উঠল ফারিহা।
অসুবিধে কি? কিশোর বলল। ফাদারদের পয়সা দরকার। তোমার ছবি তুললে পয়সা পাবে। তুলবে না কেন? তা ছাড়া তোমাকে মানাবেও। কারণ তুমি এখনও ছোট আছ। আমি তুলতে গেলে মানাবে না।
বাচ্চাদের মত করে কোলের কাছে জড়িয়ে ধরে রেখেছে একজন ফাদার ক্রিস্টমাস, আরেকজন তার ছবি তুলছে-দৃশ্যটা কল্পনা করেই হেসে ফেলল ডলি। কিন্তু ফারিহা হাসল না। ফাদার ক্রিস্টমাসদের সঙ্গে ছবি তুলতে

মোটেও ভাল লাগছে না তার। কিন্তু উপায় নেই। গোয়েন্দাগিরিতে অত বাছবিচার করলে চলে না। অনিচ্ছা সত্তেও মুখে হাসি ফুটিয়ে ছবি তুলতে গেল সে।
উল্টো দিকের উইনডোতে দাড়িয়ে ফারিহাকে ফাদার ক্রিস্টমাসদের দিকে এগিয়ে যেতে দেখল বব আর অনিতা। টিটু ওকে দেখেই ছুটে যাওয়ার জন্যে টানাটানি শুরু করল। এক জায়গায় বসে থেকে মহা বিরক্ত হয়ে উঠেছে সে।
ফারিহাকে ফাদারদের সঙ্গে ছবি তুলতে দেখে কাগজের স্ট্যাভের ওপাশে দাড়িয়ে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না মুসা আর রবিন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ফারিহার হাতে তার ছবিটা ধরিয়ে দেয়া হলো
টাকা বের করে দিল ফারিহা।
আড়ালে দাড়িয়ে একজন ফাদার ক্রিস্টমাসের হাত থেকে ফারিহাকে ভাঙতি পয়সা নিতে দেখল গোয়েন্দারা সবাই।
বেচারি ফারিহা!আষাঢ়ের আকাশের মত মুখ কালো করে তাকে ফিরে আসতে দেখল ওরা। কাছে এসে কিশোরকে জানাল সে, একটা পঞ্চাশ পেন্সের কয়েনও দেয়নি।
হুঁ, মোটেও হতাশ মনে হলো না কিশোরকে। যাই, দেখি, আমার ভাগ্যটা পরীক্ষা করে আসি।
দোকান থেকে বেরিয়ে গেল কিশোর। খানিক আগে পড়ে গিয়েছিল যে লোকটা তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। পকেট থেকে একটা ডলার বের করে বাড়িয়ে। দিয়ে অনুরোধ করল সে, আমাকে দুটো পঞ্চাশ পেন্সের কয়েন দিতে পারেন? আমার ছোট বোনকে পঞ্চাশটা পেন্স দিতে হবে কার্ড কেনার জন্যে। আমার কাছে
ভাঙতি নেই।
নিশ্চয়ই, হাসিমুখে জবাব দিল ফাদার ক্রিস্টমাস। পকেট থেকে খুচরা বের করে কিশোরকে দিয়ে দিল। কিশোর সে-দুটো পকেটে ভরে, লোকটাকে ধন্যবাদ জানিয়ে, ফিরে এল দোকানের ভেতর।
ডলি আর ফারিহার কাছে এসে মুদ্রা দুটো বের করে বাজিয়ে শোনাল ডলি আর ফারিহাকে। নিজেও শুনল। তারপর বলল, শুনলে তো? আরও দুটো নকল কয়েন।
মিনিট পনেরো পরে আবার ক্রিস্টমাস গাছগুলোর পেছনে জমায়েত হলো গোয়েন্দারা। সাবধান রইল যাতে কারও চোখে না পড়ে।
ওরা এখন নিশ্চিত, ফাদার ক্রিস্টমাসের ছদ্মবেশের আড়ালে লুকিয়ে আছে ভয়ানক দুজন অপরাধী। কিন্তু দুটো বড় প্রশ্নের উত্তর অজানা রয়ে গেল।এক, কি

করে প্রমান করবে লোকগুলো অপরাধী। দুই, এদের সঙ্গে গালকাটা লোকটার সম্পর্ক কি?
কি করা যায় সেটা নিয়ে আলোচনা করছে ওরা, এই সময় ঘণ্টা বেজে উঠল। হেনরির ডিপার্টমেন্টাল স্টোর আর অন্য সব দোকানপাট বন্ধ করার সময় হয়েছে। বড়দিনের সময় বলে এখন অনেক দেরি করে বন্ধ হয়, যাতে অফিস ফেরতা লোকজন বাজার করে যেতে পারে। দোকানগুলো থেকে ঝাঁক বেঁধে বেরিয়ে আসতে শুরু করল ক্রেতার দল। চত্বর পেরিয়ে রাস্তায় নেমে যেতে লাগল। বিক্রি না হওয়া ক্রিস্টমাস গাছগুলো দোকানের ভেতর নিয়ে যেতে শুরু করল দোকানদার।
শেষবারের মত একটা বাচ্চার ছবি তুলল ফাদার ক্রিস্টমাসরা। তারপর যখন দেখল, আর একজন ক্রেতাও অপেক্ষা করছে না কোথাও, রাস্তা ধরে হটিতে শুরু করল দুজনে।
আজকের মত কাজ শেষ ওদের, মুসা বলল।
হ্যাঁ, কাজ মানে তো মুদ্রা পাচারী একদিনের জন্যে যথেষ্ট পাচার-টাচার করে এখন গোপন আস্তানায় ফিরে যাচ্ছে, বব বলল।
তাহলে ওদের পিছু নিলেই পারি, ফারিহা বলল।
চমৎকার প্রস্তাব! লুফে নিল রবিন।
কেউ আপত্তি করল না। লোকগুলোর পেছন পেছন রওনা হলো।
মোড় নিয়ে মিলরোডে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল লোকগুলো।
জলদি এসো? কিশোর বলল। কোন বাড়িটাড়িতে ঢুকে পড়লে আর দেখতে পাব না।
দৌড়াতে শুরু করল ওরা। আগে আগে ছুটছে টিটু। মাটিতে নাক নামিয়ে গন্ধ নিছে। এতক্ষণ পর একটা কাজের মত কাজ পেয়ে গিয়ে মহাখুশি।
কিন্তু মোড় নিয়ে অন্য পাশে এসে হতভম্ব হয়ে গেল ওরা।
লোকগুলো উধাও!
খাইছে। হাপাতে হাপাতে বিমূঢ়ের মত এদিক ওদিক তাকাচ্ছে মুসা।
আমরা যে পিছু নিয়েছি নিশ্চয় বুঝে ফেলেছে, অনিতা বলল।
কিংবা হয়তো গাড়িটাড়ি কিছু রাখা ছিল এখানে। তাতে উঠে চলে গেছে, ডলি বলল।
কিংবা হরিণে টানা স্লেজ, ব্যঙ্গ করে বলল রবিন। যে গাড়িতে চড়ে চলাফেরা করে ফাদার ক্রিস্টমাস।
কিন্তু এ মুহূর্তে এ রসিকতায় হাসতে পারল না কেউ। ভীষণ হতাশ হয়ে বব বলল, তারমানে ওদের সাক্ষাৎ পাওয়ার জন্যে কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে

আমাদের। হেনরির দোকান যখন খোলে।
কিন্তু হঠাৎ করেই জোরে হাত নেড়ে বন্ধুদের সাবধান করে দিল কিশোর। ঠেলে, ধাক্কা দিয়ে সবাইকে নিয়ে চলে এল একটা পার্ক করে রাখা গাড়ির আড়ালে। ওই যে ওরা! কয়েক মিনিটের জন্যে ওই অফিস বাড়িটায় ঢুকেছিল।
তাই তো মনে হচ্ছে নিচু স্বরে বলল বব। পোশাক খোলার জন্যে হবে। হয়তো।
দেখলে? চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে ফারিহা। মোটেও অপরাধী মনে হচ্ছে না এখন ওদেরকে।
অনিতাও হা হয়ে গেছে। বয়েসও তো আমাদের চেয়ে তেমন বেশি না।
খানিক দূরে একটা অফিস বিল্ডিঙের সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসেছে দুজন তরুণ। বগলে দুটো লাল-সাদা রঙের পোশাক।
ওখানে ঢুকেছিল পরনের ফাদার ক্রিস্টমাসের আলখেল্লা খোলার জন্যে, মুসা বলল। নিচে তো একেবারে সাধারণ পোশাক।
কিন্তু ওই পোশাক এ ভাবে খোলাখুলি নিয়ে যাচ্ছে কেন? মানুষে দেখলে যে চিনে ফেলবে সেই পরোয়াও করছে না নাকি? আনমনে বিড়বিড় করল কিশোর। ব্যাপারটা মাথায় ঢুকছে না আমার।
পিছু নেব নাঁকি ওদের? জিজ্ঞেস করল রবিন। তাহলে হয়তো আরও কিছু জানা যাবে। কি, নেব?
অতএব রওনা হয়ে গেল ওরা। পার্ট করে রাখা গাড়িগুলোর আড়ালে আড়ালে বেশ কিছুটা দূরত্ব রেখে অনুসরণ করে চলল লোকগুলোকে।
একের পর এক রাস্তা পেরিয়ে যেতে লাগল ওরা। শহরের ভেতর দিয়ে চলে যাওয়া নদীটার পাড় ধরে এগোল খানিক। তারপর একটা বাগানওয়ালা চত্বরে চুকল। এক সারি সামনে গিয়ে কথা বলতে লাগল দুজনে।
বাগানে ঢুকে পড়া উচিত আমাদের, কিশোর বলল। পাতাবাহারের আড়ালে আড়ালে ওদের অনেক কাছে চলে যেতে পারব।
দ্রুত একটা ঝোপের আড়ালে এসে লুকাল ওরা, লোকগুলোর খুব কাছে।
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলে বলেই রাত কাবার করবে নাকি? ফিসফিস করে বলল ডলি। উফ, ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছি আমি!
বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না ওকে। হাত মেলাল লোকগুলো, তারপর দুজন দুদিকে হাটতে শুরু করল।
সবে পা বাড়াতে যাবে ওরা, এই সময় বড় একটা কালো গাড়ি এসে ঘ্যাচ করে থামল ওদের পাশে। পাকা চত্বরে রবারের চাকা ঘষার শব্দ মিলানোর আগেই লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে এল দুজন লোক।
আরে, সেই গালকাটা! দম বন্ধ করে ফেলল অনিতা।

এতটাই চমকে গেল দুই ফাদার ক্রিস্টমাস, বাধা দেয়ার কথাও যেন মাথায় এল না। সহজেই ওদের কাবু করে ফেলা হলো।
স্তব্ধ হয়ে গেছে গোয়েন্দারা। হা করে তাকিয়ে দেখছে পাতাবাহারের ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থেকে।
এত দ্রুত ঘটে গেল ঘটনাটা, টু শব্দটি করার সুযোগ পেল না ফাদার ক্রিস্টমাসেরা। তাদের একজনকে ধাক্কা দিয়ে তুলে দেয়া হলো গাড়িতে। কিন্তু দ্বিতীয়জনকে তোলার আগেই হঠাৎ ঝাড়া দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিয়েই দৌড় মারল সে। পালিয়ে গেল। দোকানের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ফটো তোলে যে লোকটা, এ সে-ই।
এক দৌড়ে গিয়ে ফ্ল্যাটগুলোর মাঝে ঢুকে হারিয়ে গেল সে। ওর আক্রমনকারীরা দ্বিধা করল। বুঝতে পারল, আর তাড়া করে লাভ নেই। গাড়িতে বসল দুজনে। ইঞ্জিন চালু করেই রেখেছে ড্রাইভার। ওরা উঠে বসতেই গাড়ি ছেড়ে দিল।
পুরো ঘটনাটা ঘটতে মিনিটখানেকের বেশি লাগল না। আশেপাশে আর দ্বিতীয় কোন লোক নেই যে দেখবে। গোয়েন্দাদের চোখের সামনে নির্বিবাদে একজন ফাদার ক্রিস্টমাসকে কিডন্যাপ করে নিয়ে চলে গেল ওরা।
দুই হাতে চেপে ধরে আছে কিশোর টিটুর চোয়াল।
চিৎকার করার জন্য পাগল হয়ে উঠেছে কুকুরটা।
গাড়ি চত্বর থেকে বেড়িয়প যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঝাড়া দিয়ে কিশোরের হাত থেকে মুখ ছুটিয়ে নিল টিটু।
হউ! হউ! হউ। হউ! টানাটানি করে শিকল ছুটানোর চেষ্টা করছে। পাকা চত্বরে তার নখ ঘষা লাগার শব্দ হচ্ছে।
থাম, টিটু! চুপ কর! শান্ত হ! তুই গিয়ে আর এখন কিছু করতে পারবিনে!
কোনমতেই ছাড়ল না ওকে কিশোর। তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল মুসা আর বব। অবশেষে শান্ত হলো টিটু।
ঘটনাটা নিয়ে আলোচনার সুযোগ পেল গোয়েন্দারা।
কোথায় নিয়ে গেল লোকটাকে? মুসার প্রশ্ন।
লোকটা কে? রবিন জানতে চাইল।
কিন্তু কেউ ওদের কথার জবাব দিতে পারল না।
অন্ধকার হয়ে আসছে। চত্বরটা এখনও নির্জন। দুটো ষ্ট্রীট ল্যাম্পের আলো পড়ছে রাস্তায়। দিনের আলো পুরোপুরি শেষ হয়ে যায়নি বলে উজ্জল হতে পারছে না আলোটা। অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে ঠাণ্ডা।
ধস্তাধস্তিটা হয়েছে যে জায়গায়, সেখানে এসে দাঁড়াল গোয়েন্দারা। ফাদার ক্রিস্টমাসের একটা লাল-সাদা পোশাক পড়ে থাকতে দেখল ফারিহা পানি

নিষ্কাশনের ড্রেনের মধ্যে। বাতাসে উড়ছে তুলোর তৈরি সাদা লম্বা দাড়ি। তুলে নিল সে।
ডলির দাঁতে দাঁতে বাড়ি খাচ্ছে। শীতে না যতটা, তারচেয়ে বেশি ভয়ে।
আরেকজন ফাদার ক্রিস্টমাসের খোঁজে যেতে হবে এখন আমাদের, কিশোর বলল। বিল্ডিঙের দিকে পালিয়ে গেছে যে লোকটা। লাল-সাদা আলখেল্লাটা তুলে নিল সে।
কি ভাবে খুঁজে বের করব? ববের প্রশ্ন। দরজায় দরজায় গিয়ে তো আর নক করে জিজ্ঞেস করা যাবে না-এই ভাই, একজন নকল ফাদার ক্রিস্টমাস আছে নাকি এখানে।
তা ছাড়া লোকগুলোর আসল পরিচয়ও জানি না আমরা, ববের কথা সমর্থন করল মুসা।যারা ওদের আক্রমণ করল, তাদের সম্পর্কেও কিছুই জানি না। ওরা কি অপরাধী না পুলিশের লোক, তা-ও জানা নেই। রহস্যটা বড়ই জটিল মনে হচ্ছে আমার কাছে। অন্ধকারে ছায়া ঢাকা অপরিচিত বাড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল, সবচেয়ে ভাল হয় যদি এখন আমরা ..
বাড়ি না গিয়ে বরং লোকটাকে খুঁজতে যাই, মুসাকে বাধা দিয়ে বলে উঠল রবিন।
আমিও রবিনের সঙ্গে একমত, কিশোর বলল। সবে জমে উঠতে আরম্ভ করেছে রহস্যটা, এ সময়ে এটাকে বাদ দেয়ার প্রশ্নই ওঠে না আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকাল ফারিহা। ঠাণ্ডা, মোলায়েম কি যেন গালে লেগেছে। চিৎকার করে উঠল, আরি! তুষার পড়ছে!
বলতে না বলতেই আরেক কণা তুষার উড়ে এসে পড়ল তার নাকে।
তুষারই তো! অনিতাও চিৎকার করে উঠল।
তুষার! তুষার! সমস্বরে কেঁচাতে শুরু করল সবাই। হঠাত করেই উত্তেজিত হয়ে পড়ল ওরা। আনন্দে অস্থির। মনে হচ্ছে এবারের বড় দিনটা প্রচুর তুষার-পড়া সাদা বড় দিন-এ পরিণত হবে। সেটা খুব মজার।
আকাশের দিকে জন্যে মুখ এটা উঁচু করে, হাত তুলে, উন্মাদ নৃত্য জুরে দিল ওরা। মুসা অার কিশোরের জন্য এটা ধর্মীয় উতসব নয়।কিন্তু সাময়িকভাবে তাতে আনন্দ করায় কোন বাধা নেই। সবার খুশি দেখে টিটুও চুপ করে থাকতে পারল না। প্রবল লাফালাফি জুড়ে দিল। পেঁজা তুলোর মত ভেসে ভেসে নেমে আসছে হালকা তুষার কণা। লাফিয়ে উঠে সেগুলৌ ধরার চেষ্টা করতে লাগল সে।
কয়েকজন পথচারীকে দেখা গেল এতক্ষণে কাজ শেষে করে বাড়ি ফিরছে।
ছেলেমেয়েদের দিকে বিরক্ত চোখে তাকাল। তুষার ওদের কোন আনন্দ দিতে পারল না। থুতনির কাছে অল্প কিছু দাড়িওয়ালা একজন লোক তো

দাঁড়িয়েই গেল জ্ঞান দেয়ার জন্যে, তোমাদের কাছে যতই ভাল লাগুক, তুষার জিনিসটা মোটেও ভাল নয়। ঠাণ্ডা, পিচ্ছিল, প্যাঁচপেঁচে! অতি জঘন্য।
ঠান্ডা দূর করাটা তো কঠিন কিছু না, জবাব দিল অনিতা। আমাদের মত নাচাকুঁদো করুন। দেখবেন গা গরম হয়ে গেছে।
যেন তার কথায় সমর্থন জানাতেই আরও জোরে লাফানো শুরু করে দিল টিটু।
ওপর দিকে চোখ পড়তেই থেমে গেল রবিন। কেঁচিয়ে উঠল, দেখো দেখো।
ওই বাড়িটার একেবারে ওপরতলার জানালাটা-ডান দিকের!
হাত তুলে একটা আলোকিত জানালা দেখাল সে কেন; তোমার কি মনে হচ্ছে ওই লোকটাই জানালাটার দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। জানালার কাছে দাড়িয়ে আছে কেউ। হঠাৎ করেই আলো নিভিয়ে দেয়া হলো। অন্ধকারে কোন কিছুই আর চোখে পড়ল না।
ওই লোকটাই, কোন সন্দেহ নেই আমার, রবিন বলল। ওকে চিনতে পেরেছি আমি। যে লোকটা ছবি তুলছিল। জানালার কাচে নাক ঠেকিয়ে মনে হয় দেখছিল সে।
তারমানে আমাদের ওপর নজর রাখছিল, ডলি বলল। উদ্দেশ্যটা কি তার?
কি করতে চায়? ভীত মনে হচ্ছে তাকে।
অত ভয় পাছ কেন? মুসা বলল। আমাদের চেঁচামেচি শুনে সাধারণ কৌতূহল হয়েছিল, দেখতে এসেছিল। অন্য কিছু না।
ছাড়া আরেকটা কথা ভুলে যাচ্ছ, বব বলল, ভয় পাওয়ার মত যথেষ্ট কারণ রয়েছে আরও।
অনিতা ভয় পায়নি। রহস্যময় এই ঘটনাগুলো সম্পর্কে জানার ইচ্ছে তার কৌতূহল সামলাতে পারছে না। বলল, ওপরে গিয়ে দেখা যায় না?সবার যাওয়া ঠিক হবে না।রবিন-মুসা তোমরা আমার সঙ্গে এসো। ববের সঙ্গে মেয়েরা সব এখানেই থাকো।
তারমানে এ ক্ষেত্রেও মেয়েদের বেলায় অন্য বিচার রেগে উঠল অনিতা তোমরা গিয়ে মজা করবে আর আমরা দাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আঙুল চুষি। বড় অন্যায়।
আমি তো মেয়ে নই, নাকি? অনিতার কথার প্রতিবাদ করল বব। আমি তো থাকতে আপত্তি করছি না। অন্যায়ের কি দেখলে?
জবাব খুঁজে না পেয়ে চুপ হয়ে গেল অনিতা নাও, ধরো, টিটুর শিকলটা বাড়িয়ে দিল কিশোর। এর দায়িত্ব তোমার।
অনিতার কথায় কিছু মনে করেনি সে। দলে নতুন এসেছে আস্তে আস্তে শিখে যাবে। কিন্তু কোনমতেই হাসি ফুটল না অনিতার মুখে। মুখ গোমড়া করে রইল। কিশোরদের সঙ্গে যাওয়ার একান্ত ইচ্ছে তার।

বাড়িটায় ঢুকে লিফটে উঠল কিশোর। ড্রেনে পড়ে থাকা ফাদার ক্রিস্টমাসের পোশাকটা সাথে নিয়ে এসেছে।
বোতাম টিপে দিল মুসা। টপ ফ্লোরে লিফট থেকে নামল ওরা। এখন, কোনদিকে যাবে?
ডানে যেতে হবে, রবিন বলল। ভাল করে দেখে রেখেছি আমি।
তা তো বুঝলাম, কিশোর বলল। কিন্তু দরজা তো দুটো। কোনটায় টোকা দেব?
প্রথম দরজাটায় গিয়ে কান পাতল মুসা। রেডিও বাজছে, জানাল সে।
পায়ের শব্দও শোনা যাচ্ছে।
হঠাৎ মেয়ে মানুষের কণ্ঠ শুনতে পেল। দরজার একেবারে কাছে। চমকে গিয়ে লাফ দিয়ে পিছিয়ে এল।
জন, তোমার ওষুধ রাখলে কোথায়? বৃদ্ধার কাপা কাঁপা কণ্ঠ। টেবিলেই রেখেছিলে? ঠিক মনে আছে?
এ ঘরে থাকবে না, ফিসফিস করে বলল কিশোর। সরে এসে দ্বিতীয় দরজাটায় গিয়ে কান রাখল মুসা। খানিকক্ষণ কান লাগিয়ে রেখে জানাল, কোন শব্দই আসছে না।
তারমানে আছে এটাতেই, মাথা দোলাল রবিন। হয়তো ভয় পাচ্ছে কিডন্যাপকারীরা ফিরে আসবে আবার। আলো নিভিয়ে চুপ করে আছে।
বেল বাজালেই বোঝা যাবে, কিশোর বলল। এমন করে হাতে নিল পোশাকটা, যাতে শুরুতেউ লোকটার চোখে পড়ে। তারপর টিপে দিলু বেলপুশ।
তীক্ষ্ণ স্বরে বেজে উঠল বেল।যেকোন মুহূর্তে খুলে যেতে পারে এখন।
কিন্তু ভেতর থেকে সাড়া বা কোন রকম শব্দ এল না।।
রবিন, এ তলাটাই তো? মুসার প্রশ্ন। ভুল হয়নি তোমার?
আবার বেল টিপল কিশোর। আবার শোনা গেল বেলের শব্দ।
বাজাতেই থাকো, রবিন বলল। থেমো না। দেখা যাক কতক্ষণ না খুলে থাকতে পারে। ঘণ্টা বাজানো থামাতে হলে দরজা তাকে খুলতেই হবে। ও এই ঘরেই আছে।
হাসল কিশোর। রবিনের পরামর্শটা পছন্দ হয়েছে তার। বাজাতেই থাকল।
অন্তত বিশবার বাজানোর পর দরজার ওপাশে হুক থেকে শিকল খোলার শব্দ পাওয়া গেল।
বললাম না আছে,উত্তেজিত স্বরে রবিন বলল। টিপতে থাকো।
অবশেষে, খুব ধীরে সামান্য ফাঁক হলো দরজা। দেখা গেল ওকে। কিশোর ভেবেছিল রেগে যাবে। কিন্তু শান্তকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল তরুণ, কি ব্যাপার?

কিশোর জবাব দেবার আগেই তার হাতের ফাদার ক্রিস্টমাস পোশাকটা দেখে ফেলল সে। বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে গেল চোখ। দ্রু নড়ে উঠল সে। এগিয়ে এসে একটানে পোশাকটা কিশোরের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে মুহূর্তে লাগিয়ে দিতে গেল আবার দরজা।
কিন্তু তৈরি ছিল কিশোর। চোখের পলকে পাটা ঠেলে দিল দরজার ভেতরে।
পায়ে শক্ত জুতো ছিল বলে রক্ষা। নইলে পাল্লার চাপে প্রচন্ড ব্যথা পেত।
মরিয়া হয়ে আবার দরজা লাগানোর চেষ্টা করল ফাদার ক্রিস্টমাস।
সরো! চিৎকার করে উঠল সে। সরে যাও দরজার সামনে থেকে। ভাগো!
এর একটা ব্যাখ্যা না শুনে যাচ্ছি না আমরা, জবাব দিল কিশোর।
সব জানি আমরা, মুসা বলল।
কি জানো তোমরা? রেগে উঠল ফাদার ক্রিসমাস।ভাল চাও তো যাও বলে দিচ্ছি।
আমাদের আপনি ভয় দেখাতে পারবেন না, জবাব দিল কিশোর। নিচে আমাদের বন্ধুরা অপেক্ষা করছে। বলে দিয়ে এসেছি দশ মিনিটের মধ্যে আমরা ফিরে না গেলে ওরা যেন পুলিশের কাছে চলে যায়।
পুলিশ! চমকে গেল ফাদার ক্রিস্টমাস।
অসুবিধে কি? ভুরু নাচাল কিশোর। জাল মুদ্রা পাচার, কিডন্যাপিং-আরও কি কি করছেন সেটা আপনারাই ভাল জানেন। আমার ধারণা, বিশ বছরের কমে জেল থেকে বেরোতে পারবেন না।
হ্যাঁ, ঠিক, মাথা ঝাকাল রবিন, ততদিনে বুড়ো হয়ে যাবেন। চান সেটা?
ফ্যাকাসে হয়ে গেল ফাদার ক্রিস্টমাসের চেহারা। মনে মনে হাসল কিশোর।
ধাপ্পাতে কাজ হয়েছে।
এই সময় লিফটের শব্দ কানে এল। ওপরতলায় উঠে আসছে।
এসো। ভেতরে চলে এসো, জলদি! গোয়েন্দাদের বলে আবার দরজা ফাঁক করে দিল ফাদার ক্রিস্টমাস। বোঝা গেল, পড়শীদের দেখতে দিতে চায় না।
কিশোররা ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে দরজা লাগিয়ে দিল। তারপর জানতে চাইল ওরা কেন এসেছে। আধঘণ্টার মধ্যেই আমার বাবা-মা চলে আসবে। তোমাদের দেখলে খুশি হবে না।
ঠিক আছে কিশোর বলল, তার আগেই চলে যাব আমরা। অবশ্য যদি আমাদের বলেন, কেন করছেন এ কাজ।
কি কাজ করছি বলব? তোমাদের কথা কিছু বুঝতে পারছি না আমি, জবাব দিল ফাদার ক্রিস্টমাস।
সত্যি বলছে! না ভান?

পারছেন না মানে? রেগে উঠল মুসা। জাল কয়েন পাচার করে বেড়াচ্ছেন আর এখন বলছেন কিছু জানেন না? ওসব চালাকি বাদ দিন!
জাল কয়েন? কি বলছ? আমার কাছে কোন জাল কয়েন নেই।
তাহলে এগুলো কি? পকেট থেকে দুটো মুদ্রা বের করে দেখাল কিশোর আজ বিকেলে এগুলো আমাকে দিয়েছে আপনার দোস্ত।
আমি বিশ্বাস করি না।
তাহলে শুনুন কি ঘটেছে, কিশোর বলল, বিকেল বেলা তাকে গিয়ে একটা ডলার দিয়ে ভাঙতি চাইলাম। বানিয়ে বানিয়ে বললাম, আমার বোনকে পঞ্চাশ পেল দেব একটা কার্ড কেনার জন্যে। মাকে উপহার দেব। শুনতে পাননি? কাছেই তো ছিলেন
হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন মনে পড়েছে, জবাব দিল লোকটা। কিন্তু ওগুলো জাল, কে বলল তোমাকে?
কয়েন দুটো লোকটার কানের কাছে নিয়ে গিয়ে একটার সঙ্গে আরেকটা বাড়ি দিয়ে শব্দ করল কিশোর। শুনুন শব্দটা। কি মনে হচ্ছে? স্বাভাবিক।
এখনও বিশ্বাস না হলে আরও ভালমত প্রমাণ করে দিতে পারি, রবিন বলল। একটা লোহাকাটা করাত নিয়ে আসুন। কাটলেই দেখতে পাবেন ভেতরে কি আছে।
ঠিক আছে, ঠিক আছে, বিশ্বাস করলাম, হাল ছেড়ে দিল লোকটা। করতাম না। কিন্তু যা সব কাও ঘটতে আরম্ভ করেছে, জাল কয়েন হলে আর অবাক হওয়ার কি আছে।
ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল সে। হাতে রয়ে গেছে এখনও ফাদার ক্রিস্টমাসের পোশাকটা। হয়তো তোমাদের কথাই ঠিক, বলল সে। খানিক আগে আমাদের ওপর কেন হামলা চালিয়েছিল লোকগুলো, এতক্ষণে বোঝা যাচ্ছে। হঠাৎ এমন ভাবে আক্রমণ করে বসল.... ভাবতেই পারিনি....
আসলে কির্ডন্যাপ করতে চেয়েছিল আপনাদের, রবিন বললু। দুজনকেই।
আপনি পালিয়ে আসাতে বেঁচে গেছেন। আপনার বন্ধুকে কোথায় নিয়ে গেল ওরা, কিছু আন্দাজ করতে পারেন?
জানলে কি আর এখানে বসে থাকতাম মনে করেছ? জবাব দিল লোকটা।
টাকার ব্যাপারটা কি বলুন তো? পঞ্চাশ পেন্সের জাল মুদ্রা কোত্থেকে আসছে? জানতে চাইল কিশোর.
কাস্টোমারদের দেয়ার জন্যে প্রচুর ভাঙতি রাখতে হয় আমাদের, লোকটা জানাল। ছবি তুলে অনেকেই দুই ডলার দেয়। এক ডলার দশ পেন্স রেখে বাকিটা

ভাঙতি দিতে হয়। কয়েন রাখা ছাড়া উপায় কি। কিন্তু আমরা জাল কয়েন পাচার করছি এ ধারণা হলো কি করে তোমাদের?
আপনি নাহয় রাখেন না, লোকটার প্রশ্নের জবাব দিল না কিশোর। কিন্তু আপনার বন্ধু?
তার কথা তাকেই জিজ্ঞেস কোরো, বিষন্ন কণ্ঠে জবাব দিল লোকটা।
প্রশ্ন খুঁজে পেল না আর কিশোর। রহস্যটা জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠছে।
রবিন আর মুসাও বুঝতে পারছে না আর কি প্রশ্ন করা যায়। আগুপিছু বিবেচনা না করে হুট করে লোকটাকে অভিযুক্ত করে বসায় লজ্জা পাচ্ছে এখন তিনজনেই। মনে হচ্ছে, দুই ফাদার ক্রিস্টমাস-যাদেরকে ওরা সন্দেহ করেছে, দুজনেই নির্দোষ
বুঝতে পেরেছি! ওদেরকে চমকে দিয়ে হঠাৎ চিৎকার করে উঠল লোকটা।
চেয়ার থেকে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। এতটাই উত্তেজিত হয়ে পড়েছে, একসঙ্গে সব বলতে গিয়ে কথাই বেরোতে চাইল না।
শান্ত থেকে ধীরেসুস্থে বলার অনুরোধ করল তাকে কিশোর।
পঞ্চাশ পেন্সের মুদ্রা, না? গত হপ্তায় বনের মধ্যে কি পেয়েছি, কল্পনাও করতে পারবে না। বনের মধ্যে দিয়ে একটা রাস্তা চলে গেছে ডগলাস ফার্মের দিকে। সেই রাস্তার এক জায়গায় দেখি অনেকগুলো কয়েন পড়ে আছে। রাস্তার ধারে ঘাসের মধ্যে। তুলে নিলাম ওগুলো। তারমানে ওগুলোই ছিল তোমাদের এই জাল মুদ্রা। আমরা কল্পনাই করতে পারিনি। কে হারিয়েছে সে-খোঁজ নেয়ারও প্রয়োজন মনে করিনি। পরের দিন হেনরির দোকানে কাজে গেলাম। কুড়িয়ে পাওয়া পয়সাগুলো দিয়ে লোকের ভাঙতি শোধ করতে লাগলাম।
আমরা মানে কে কে? জিজ্ঞেস করল রবিন।
আমি আর আমার বন্ধু টনি। একটু আগে যাকে কিডন্যাপ করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।
দম নেয়ার জন্যে থামল সে। তারপর বলল, আমার নাম রোভার।....এখন বুঝতে পারছ তো, কোনও ধরনের অপরাধের সঙ্গে জড়িত নই আমরা?
পয়সাগুলো পুলিশকে দিয়ে আসা উচিত ছিল আপনাদের, গম্ভীর মুখে কিশোর বলল। তাহলে আজকে আর এই ঝামেলার মধ্যে পড়তে হত না।
জানি! কিন্তু নিজেকে আমাদের জায়গায় কল্পনা করলেই আমাদের সমস্যাটা বুঝতে পারবে। রোভার বলল। খুব কঠিন অবস্থার মধ্যে দিয়ে চলতে হচ্ছে আমাদের। আমরা ছাত্র। বড়দিনের এই ছুটিতে কাজ করছি কলেজে পড়ার টাকা রোজগারের জন্যে। খদ্দের আকৃষ্ট করার জন্যে আমাদের ভাড়া করেছে হেনরি।

ছবি তোলার টাকার লাভ সে নেয় না, সব আমরাই পাই। কাজেই সব খরচ খরচাও আমাদের। ফিল্মমের দাম, দামী ক্যামেরার ভাড়া ইত্যাদির খরচ মিটানোর পর লাভ খুব কমই থাকে আমাদের।
টাকার দরকার কার না আছে? রোভারের এ সব কৈফিয়তে মন ভিজল না মুসার। তাই বলে রাস্তায় পাওয়া টাকা তুলে নিতে হবে? ক্ষতি যা করার করে ফেলেছেন। এখন পস্তানো তো লাগবেই।
চুপ করে রইল রোভার।
কিশোর বলল, আমরা এখনও জানি না ওই মুদ্রাগুলো এল কোত্থেকে? ওগুলোর সঙ্গে গালকাটা লোকটার সম্পর্ক কি?
গালকাটা? বোকা হয়ে তাকিয়ে রইল রোভার।
যে লোকটা আপনার বন্ধু টনিকে কিডন্যাপ করেছে। যে তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিল হেনরির দোকানের সামনে যতই শুনছে, বিমূঢ় হয়ে যাচ্ছে রোভার। জিজ্ঞেস করল, রহস্যটার সন্ধান অনেক আগেই পেয়েছ মনে হচ্ছে?
মাত্র গতকাল, জবাব দিল কিশোর।
দেখো, একটা অনুরোধ করব, কাতর কণ্ঠে বলল রোভার, দয়া করে পুলিশের কাছে যেয়ো না। গেলে হয়তো টনির সাংঘাতিক ক্ষতি হয়ে যেতে পারে।
ঠিক আছে, যাব না, কথা দিল কিশোর। আমরা নিজেরাই এটা সমাধানের চেষ্টা করব।
কিন্তু বাড়ি ফিরে না গেলে টনির বাবা-মা যদি পুলিশে খবর দেন? প্রশ্ন তুলল মুসা।
তুলবে না, রোভার বলল। কারণ ওরা এখানে নেই। ছুটি কাটাতে চলে গেছে হলিডে কটেজে। হেনরির দোকানে আমাদের ক্রিস্টমাস ইভের কাজ শেষ হয়ে গেলে টনিও চলে যাবে।..তা তোমরা এখন কি করার কথা ভাবছ?
রীতিমত অসহায় বোধ করছে এখন রোভার। কাচুমাচু ভঙ্গিতেই বোঝা যায়।
কয়েনগুলো যেখানে পেয়েছেন আপনারা, প্রথমে সেখানে যাব, কিশোর বলল। আকাশ থেকে তো আর পড়েনি ওগুলো। কোন না কোন সূত্র পেয়েই যাব জায়গামত যেতে পারলে।
হুঁ, উদ্বিগ্ন ভঙ্গিতে চোয়াল ডলল রোভার। কাল যে কি হবে বুঝতে পারছি না। টনিকে ছাড়া হেনরির দোকানের কাজটা চালাব কি করে? হেনরির সঙ্গে আমাদের চুক্তি হয়েছে-বড় দিন শেষ না হওয়া পর্যন্ত তার ওখানে কাজ করব আমরা। কলি যদি দুজনের একজন হাজির হতে না পারি, কি বলবে সে?
সেটা নিয়ে ভাববেন না, সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল কিশোর। টনির বদলে আমাদের কাউকে দিয়ে দেব। রবিন যেতে পারে।
রবিন। ভুরু কুঁচকে ফেলল রোভার।

কিশোরের কথা শুনে মুসা আর রবিনও চমকে গেল।
হ্যাঁ, আমার এই বন্ধুটি, রবিনকে দেখাল কিশোর। টনির চেয়ে সামান্য খাটো হবে। হাই হিল জুতো পরে নিলেই লম্বা হয়ে যাবে অনেকটা। বাকিটা পরণ করে নেবে ফাদার ক্রিসমাসের পোশাক দিয়ে।আলখেল্লা আর দাঁড়ি-গোঁফের আড়ালে কেউ চিনতে পারবে না ওকে।
সত্যিই পারবে না, মুসা বলল।
আমি কি তোমাদের তদন্তে কোন সাহায্য করতে পারি? জিজ্ঞেস করল রোভার।
আপাতত লাগবে না, কিশোর বলল। আপনি বরং খেয়েদেয়ে শান্তিতে একটা ঘুম দিন। তাজা না হয়ে কাল সকালে চাকরিতে যেতে পারবেন না।
রোভারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে, তাকে গুড নাইট জানিয়ে রওনা হলো তিন গোয়েন্দা।
বেরোনোর আগে দরজার কাছ থেকে রবিন বলল, কাল সকালে দেখা হবে।
সকাল সাড়ে আটটায় আপনার এখানে চলে আসব আমি। ফাদার ক্রিস্টমাস সেজে আপনার সঙ্গে দোকানে যাব।
আহ, বাঁচালে আমাকে, ভাই! অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাদেরকে, কৃতজ্ঞ স্বরে বলল রোভার। তোমরা না এলে কি যে করতাম!
কথা শেষ। ঘর থেকে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা। লিফটের কাছে ওদেরকে এগিয়ে দিয়ে গেল রোভার।
ভাবছি, লিফটে করে গ্রাউন্ড ফোরে নামতে নামতে বিড়বিড় করল কিশোর, আগামী কাল কি ঘটবে?
বাপরে, বহুত সময় লাগিয়ে দিলে! তিন গোয়েন্দাকে লিফট থেকে বেরোতে দেখেই বলে উঠল বব। আমরা আর পাঁচ মিনিট দেখেই দেখতে যেতাম কি হয়েছে তোমাদের এত দেরি করলে কেন?
কি বলল লোকটা জানতে চাইল ডলি।
জাল পয়সাগুলো কি ওরাই বানাচ্ছে? অনিতার প্রশ্ন।
অন্য লোকটার খবর কি? জিজ্ঞেস করল ফারিহা।কোথায় ধরে নিয়ে গেল ওকে?
সব প্রশ্নের জবাবই দিল কিশোর। জানাল আগামী দিনের পরিকল্পনা।
এখন আমাদের বাড়ি ফেরা দরকার, বলল সে। ভাগ্যিস বাড়িতে বলে এসেছিলাম দেরি হতে পারে
সবাই বাড়িতে বলে এসেছে, বড়দিনের বাজার দেখতে যাচ্ছে ওরা।
তুষারপাতের বিরাম নেই। রাস্তাঘাট, বাড়ির ছাত, সব তুষারে ঢেকে দিচ্ছে।
বাস স্টপে যাওয়ার পথে অনবরত তুষারকণাকে ধাওয়া করে যেতে লাগল টিটু।
পরদিন সকালে যখন ঘুম ভাঙল ওদের, সারা গ্রাম সাদা তুষারে ঢেকে গেছে।

গরম কাপড়-চোপড়ে গা মুড়ে, মাথা ঢেকে ঘর থেকে বেরোল সবাই।কিশোরদের বাগানের ছাউনিতে মিলিত হয়েছে সকাল সাড়ে আটটায়।রবিন বাদে।
সকালের বাসে শহরে চলে গেছে সে এত তুষার দেখে আনন্দে ফেটে পড়ার কথা ছিল ওদের। কিন্তু মগজে এখন
অন্য চিন্তা তুষারের বল বানিয়ে ছোঁড়াছুড়ি খেলা, কিংবা তুষারমানব বানানোর আগ্রহ নেই।
চিন্তিত ভঙ্গিতে কিশোর বলল, ভাবছি, এত তুষারের মধ্যে ডগলাস ফার্মটা খুঁজে পাওয়া না কঠিন হয়ে দাঁড়ায় আমাদের জন্যে।
কথা বলার সময় মুখ থেকে বেরোনো বাতাস সাদা ধোঁয়ার মত হয়ে যাচ্ছে।
তোমাকে আগুন বের করা ড্রাগনের মত লাগছে, কিশোর, হেসে বলল ফারিহা।
কিন্তু তার দিকে তাকিয়ে ভ্রকুটি করল কিশোর। হাসল না। কেউই হাসল না। রসিকতা করার মত মানসিক অবস্থা নেই এখন কারও।
কিশোর ঠিকই বলেছে ডলি একমত হলো তার সঙ্গে। ফার্মটা খুঁজে পাব
তো? তুমি বলার আগে ভাবিইনি। কি করে পাব? এই এত তুষারের মধ্যে রাস্তার মধ্যে আরও কয়েন যদি পড়ে থাকে, থাকবে তুষারের নিচে ঢাকা। খুঁজে পাওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই। তারমানে কোন সূত্রও চোখে পড়বে না।
আগেভাগেই অত চিন্তা করে লাভ নেই.মুসা বলল। আগে গিয়ে তো দেখি। পাওয়া না পাওয়া সে তো পরের ব্যাপার।
টিটুর চিৎকারে ফিরে তাকাল ওরা। ছাউনির দরজার বাইরে চলে এসেছে সে। দৌড়ে চলে এল ওদের কাছে।
টেনে-হিঁচড়ে তাকে নিয়ে গিয়ে আবার ঘরের ভেতর ঢোকানোর চেষ্টা শুরু করল ফারিহা।
ও বুঝে গেছে, আমরা অভিযানে বেরোচ্ছি। টিটুর দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়াল কিশোর,উঁহুঁ, নেয়া যাবে না রে তোকে, টিটু। তুষারে ভিজে সর্দি বাধাবি।মরবি তখন।
তা ছাড়া যাবি কি করে? অনিতা বলল। আমরা তো যাব সাইকেলে।
সাইকেলে যেতে পারব কিনা সন্দেহ আছে, বব বলল।
মেশিন যদি আসে, রাস্তা সাফ হয় তাহলে পারব; না হলে হাঁটা ছাড়া গতি নেই।
টিটুকে ভেতরে নেয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে ফারিহা। কিন্তু নিতে আর পারে না।করুণ আর্তনাদ শুরু করে দিল টিটু।ওকে নিয়েই যাই না কেন, মুসা বলল। একটা টবোগান নিলে তাতে চড়ে দিব্যি চলে যেতে পারবে টিটু। ভিজবেও না। ঠাণ্ডাও লাগবে না।
হ্যাঁ, বুদ্ধিটা মন্দ না, ডলি বলল।

বেশ, রাজি হলো অবশেষে কিশোর। কিন্তু সারাক্ষণ একা তো আমার পক্ষে টেনে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় ভারী জিনিসটা।
তোমার একা টানার দরকার কি? সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল বব। পালা করে টানব আমরা সবাই।
টিটুকে সবাই ভালবাসে ওরা। ওকে ফেলে যেতে মন চাইল না কারোরই।
কয়েক মিনিটের মধ্যেই রওনা হলো গোয়েন্দাদের বিচিত্র মিছিলটা। ছয়টা সাইকেল, আর কিশোরের সাইকেলের সঙ্গে বাধা ছোটখাট স্লেজের মত একটা টানা গাড়ি।তাতে চড়ে আরামছে চলেছে টিটু।
তুষার কাটার গাড়ি এসেছে। মেইন রোডটা পরিষ্কার করার পর গলিগুলো সাফ করছে এখন। আগে আগে গেছে গাড়িটা। সুতরাং রাস্তা সাফ। এগোতে অসুবিধে হচ্ছে না গোয়েন্দাদের।
বিশাল যন্ত্রটার দুই পাশে একনাগাড়ে ছিটকে পড়ে উঁচু হয়ে পাড়ের মত জমে যাচ্ছে তুষার।যতই গাঁয়ের ভেতর দিকে এগুচ্ছে, পুরু হচ্ছে তুষারের স্তর।
সবাই বেশ সতর্ক রয়েছে। কড়া নজর রেখেছে। কোনমতে ডগলাস ফার্মের রাস্তাটা চোখ এড়িয়ে যেতে দেবে না।
চিন্তা নেই একমাত্র টিটুর। টোবোগানে পা ছড়িয়ে বসে মহানন্দে ভ্রমণ করছে।
রবিন ততক্ষণে পৌঁছে গেছে রোভারদের ফ্ল্যাটের দরজায়।
হাতে দুটো ফাদার ক্রিস্টমাসের পোশাক, আর কাঁধে ঝোলানো ক্যামেরা নিয়ে বেরিয়ে এল রোভার।
কোন খবর নেই নিশ্চয়? জিজ্ঞেস করল সে।
না, মাথা নাড়ল রবিন। সবে তো সকাল হলো। তবে এতক্ষণে নিশ্চয় ডগলাস ফার্মের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেছে সবাই।
রাস্তায় নেমে হেনরির দোকানের দিকে হাটতে শুরু করল দুজনে। মিল রোডের সেই অফিস বিল্ডিংটায় ঢুকে পোশাক পাল্টে ফাদার ক্রিস্টমাসের পোশাক নিল, আগের দিন যেখানে খুলেছিল টনি আর রোভার।
বেরিয়ে যখন এল, সম্পূর্ণ নতুন মানুষ। একেবারেই চেনা যাচ্ছে না। আর কে-ই বা খেয়াল করতে যাচ্ছে যে একজন ফাদার ক্রিস্টমাস আগের দিনের ফাদার ক্রিস্টমাসের চেয়ে সামান্য খাটো?
অবশেষে সেই জায়গাটায় পৌঁছে গেল গোয়েন্দারা, যেখানে ডগলাসের ফার্মটা পাওয়া যাওয়ার কথা। একপাশে খোলা মাঠ, আরেক পাশে বন। বন আর মাঠের মাঝখান দিয়ে রাস্তা চলে যাওয়ার চিহ্ন দেখা যাচ্ছে।
মেঘে ভারী হয়ে আছে আকাশ। সীসার মত রঙ। দিনের আলোটাও কেমন বিচিত্র। চারপাশে ছড়িয়ে থাকা তুষারের কারণে। শামুকের গতিতে তুষার সাফ

করতে করতে চলেছে তুষার কাটার যন্ত্রটা। সোজা চলে যাচ্ছে। পাশের গলিপথে নামার কোন ইচ্ছে নেই।
খোলা মাঠে অনেক বেশি পুরু হয়ে পড়েছে তুষার। তার মধ্যে সাইকেল।
নামানোর চেষ্টা করল মুসা। মুহূর্তে অর্ধেক চাকা দেবে গেল। মজা করার জন্য তার মধ্যেই প্যাডাল করে সাইকেল চালানোর চেষ্টা করল সে। কিন্তু গেল কাত হয়ে তুষারের মধ্যে পড়ে। সবাই হাসতে লাগল। উঠে দাঁড়িয়ে কাপড় থেকে তুষার ঝেড়ে ফেলল মুসা।
সাইকেল থেকে নেমে পড়ল কিশোর। একটা গাছের নিচে রেখে, সৰাইকে রাখুতে বলল। মুসার অবস্থা দেখেই বোঝা গেছে, গলিপথে সাইকেল চালানো কঠিন ব্যাপার হবে।
গাছের নিচে থাকলে অন্তত ভিজবে না সাইকেলগুলো। আকাশের দিকে তাকাল কিশোর। চেহারা দেখেছ? আবার শুরু হবে তুষারপাত।
তার কথা শেষ হতে না হতেই এক কণা তুষার এসে পড়ল নাকের ডগায়।
চলো, যাওয়া যাক! হাটতে শুরু করল সে।তুষার মাড়িয়ে হাটতে লাগল ওরা। রাস্তার চিহ্নও চোখে পড়ছে না। গাছের ডালপালা সব নুয়ে পড়েছে তুষারের ভারে। নিচ দিয়ে যাওয়ার সময় ওদের মাথায় খসে পড়ে, শব্দ করে ভেঙে ছিটকে যাচ্ছে চতুর্দিকে। দেখতে দেখতে পা থেকে মাথা পর্যন্ত সাদা পাউডারের মত তুষারে সাদা হয়ে গেল ফারিহা।
আজকে আর কিছুই খুঁজে পাওয়া যাবে না। খড়ের গাদায় সুচ খোঁজার সামিল! ডলি বলল। সবার পেছনে পড়ে গেছে সে। ক্লান্তি আর ঠাণ্ডায় কাহিল।
আরে এত তাড়াতাড়িই হতাশ হয়ে যাচ্ছ কেন? বব বলল। কি ঘটবে।
আগে থেকে কেউ বলতে পারে না। ফার্মটা পাবই আমরা।
ডলিকে উৎসাহ জোগানোর চেষ্টা করলেও কথাটা নিজেই বিশ্বাস করতে পারল না বব।
কিন্তু কিশোর সহজে দমার পাত্র নয়। এগিয়েই চলল সে ঘন হয়ে পড়ছে এখন তুষার। সীমিত করে দিচ্ছে দৃষ্টিশক্তি। সামনে কয়েক হাতের বেশি নজরে আসছে না। সেজন্যেই গাড়িটাকে দেখার অনেক আগেই ওটার ইঞ্জিনের শব্দ কানে এল ওদের।
খাইছে! বলে উঠল মুসা। এ রাস্তা দিয়েই আসছে মনে হচ্ছে? মিছিলের আগে আগে হাটছে সে। আমাদের দিকেই আসছে!
জলদি লুকাও! সাবধান করে দিল কিশোর, গাড়িতে যে-ই থাক, আমাদেরকে তার দেখে ফেলা চলবে না।

সবাই একমত হলো তার সঙ্গে। ওদের মনে হতে লাগল গাড়িটার মধ্যে বিপদ রয়েছে। কিন্তু কেন, সে-প্রশ্নের জবাব দিতে পারল না কেউ। তুষারের মধ্যে দিয়ে যত দ্রুত পারল, দৌড়ে ঢুকে পড়ল আবার জঙ্গলে। গাছের নিচে ঘাপটি মেরে বসে রইল। বাড়ছে ইঞ্জিনের শব্দ।

অবাক কাণ্ড! মুসা বলল। আসার পথে চাকার দাগ তো কোথাও দেখলাম না। আর এ রাস্তাটা থেকে অন্য কোন দিকে কোন রাস্তা বেরোয়নি।সোজা চলে গেছে-ডগলাস ফার্মই হোক, বা অন্য যে কোনখানেই হোক।

নজরে এল গাড়িটা। বড় কাল একটা গাড়ি। একজন আরোহীকে দেখেই চিনে ফেলল অনিতা গাছের গোঁড়া আরও সেঁটে গেল। লোকটার চোখে পড়তে চায় না। তুষারের জন্যে ধীরে চলতে বাধ্য হচ্ছে গাড়িটা। চলে গেল পাশ দিয়ে।

ধরা পড়ার ভয়ে তুষারের মধ্যে উপুড় হয়ে পড়ে থাকল গোয়েন্দারা। টিটুর মুখ চেপে ধরে রাখল কিশোর, যাতে শব্দ করতে না পারে। ইঞ্জিনের শব্দ পুরোপুরি মিলিয়ে যাবার পর খুব সাবধানে মাথা তুলল।

গেছে!উঠে দাঁড়াল সে। দেখলে? কাল যে তিনজনকে দেখেছিলাম, ওরাই গেল কোথায়? ফারিহার প্রশ্ন।

নিশ্চয় হেনরির দোকানে, একসঙ্গে বলে উঠল বব আর অনিতা।

সর্বনাশ! আঁতকে উঠল ডলি। রবিন আছে না ওখানে।

আছেই তো! অত ভয় পাবার কিছু নেই! কিশোর বলল। এ সব কাজে নতুন নয় সে। নিজেকে রক্ষা করার ক্ষমতা তার আছে। আমাদের কাজ আমরা করতে থাকি। ফার্মে গিয়ে জালিয়াতদের গোপন আস্তানা খুঁজে বের করা দরকার।

টনিকেও উদ্ধার করে আনতে হবে।

হ্যাঁ, একমত হয়ে মাথা দোলাল মুসা। ওদের এই শয়তানি খেলা যত তাড়াতাড়ি পারা যায় বন্ধ করা দরকার।

তারমানে বলতে চাইছ কিশোরের দিকে তাকাল বব, ডগলাস ফার্মের দিক থেকেই ওরা এসেছে?

মাথা ঝাকাল কিশোর।

এবং তারমানে, অনিতা বলল, গাড়ির চাকার দাগ অনুসরণ করে গেলেই পেয়ে যাব ফার্ম হাউসটা? কপালটা খুলতে আরম্ভ করেছে মনে হয়!

কিন্তু আমাদের পায়ের ছাপের কি হবে? মনে করিয়ে দিল ফারিহা। ওদের চোখে পড়ে যাবে না সেগুলো?

তা তো পড়তেই পারে, জবাব দিল মুসা। কিন্তু যে হারে তুষার পড়ছে, দেখতে দেখতে ঢেকে যাবে। তা ছাড়া গাড়ি চালানোর সময় সর্বক্ষণ ওয়াইপার চালাতে

হয়। সামনে হাতি দাঁড়িয়ে থাকলেও এর মধ্যে দিয়ে দেখাটা কঠিন। তাছাড়া দাগ থাকতে পারে সন্দেহ করলে তবে তো দেখার চেষ্টা করবে।
হ্যাঁ, একমত হয়ে মাথা দোলাল কিশোর। হয়তো তোমার কথাই ঠিক। কিন্তু সাবধানের মার নেই। সুতরাং কোন রকম ঝুকি নিতে আমি নারাজ। রাস্তা ছেড়ে এখন থেকে বনের ভেতর দিয়েই এগোব।
যাত্রা শুরুর ইঙ্গিত পেয়ে লাফ দিয়ে গিয়ে আবার টবোগানে চড়ল টিটু। তাকে টেনে নেয়ার পালা এখন ববের। বনের ভেতর দিয়ে চলতে রাস্তার চেয়ে খাটনি কম লাগল। তুষার কম। গাছপালা থাকায় রাস্তার মত পুরু হয়ে পড়তে পারেনি। প্রায় মাইল দেড়েক এগোনোর পর খামারবাড়িটার চালা চোখে পড়ল ওদের।
ডগলাস ফার্ম। বুঝতে পারল, তার কারণ, রাস্তায় গাড়ির চাকার যে দাগ রয়েছে, সেটা শুরু হয়েছে বাড়িটার গেটের কাছ থেকে।
দাঁড়াও, হাত তুলে সবাইকে থামতে ইশারা করল কিশোর। শুনতে পাচ্ছ?
বনের কিনারে যে যেখানে ছিল, মূর্তির মত দাঁড়িয়ে গেল। কান পাতল।
ফার্মের ভেতর থেকে গুঞ্জনের মত একটা শব্দ কানে আসছে। অথচ বাড়িটা নির্জন মনে হচ্ছে। কাউকে চোখে পড়ছে না
তিনজন লোককে গাড়িতে করে চলে যেতে দেখেছে। তাহলে ভেতরে শব্দ হচ্ছে কিসের?
কোন ধরনের মেশিন-টেশিন হবে, বব বলল অবশেষে।
ফার্মের ভেতর থেকেই আসছে শব্দটা, অনিতা বলল।
আমি যাচ্ছি, কিশোর বলল। দেখে আসিগে। তোমরা সব এখানেই থাক।
আমি আসি, মুসা বলল।
না, তুমিও থাকো। লোক তো নিশ্চয় আছে। আমাকে ধরে ফেলতে পারে।
দুজন ধরা পড়ার চেয়ে একজন পড়া ভাল।কেঁপে উঠল ডলি।ঠান্ডায় না ভয়ে বুঝা গেল না। রবিনের কথা মনে পড়ল তার। টনিকে যে ভাবে কিডন্যাপ করা হয়েছে, রবিনকেও করবে না তো? বলা যায় না, কিশোরকেও আটকে ফেলতে পারে। তখন কি হবে?
কিশোর, সাবধানে থেকো, ফারিহা বলল।
টিটু কি বুঝল কে জানে, চাপা স্বরে গরগর করে উঠল। কিশোরের সঙ্গে যেতে চায় বোধহয় সে-ও তোর যাওয়ার দরকার নেই, হেসে বলল কিশোর। সবার সঙ্গে থাক।
আদর করে মাথা চাপড়ে দিল কুকুরটার।
পা বাড়াল সে। বনের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল খোলা জায়গায়। দৌড় দিল খামারবাড়িটার দিকে। যত তাড়াতাড়ি পারল ছুটে এসে গা ঠেকিয়ে দাঁড়াল বাড়ির

পাথরে দেয়ালে। কান পেতে শুনতে শুনতে অপেক্ষা করতে লাগল। কেউ দেখে ফেললে বেরিয়ে আসবে। কিন্তু এল না কেউ। কানে আসছে একটানা গুঞ্জনের মত শব্দ। কাছে থেকে জোরাল শোনাচ্ছে। মেশিনই।
কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে পা টিপে টিপে, দেয়াল ঘেষে জানালার দিকে রওনা দিল সে। তুষারে চাপা পড়ে যাচ্ছে জুতোর শব্দ। ভালই। মনে মনে তুষারকে ধন্যবাদ দিল সে কয়েক পা এগিয়ে আবার থেমে গেল। সতর্ক হয়ে উঠেছে প্রতিটি ইন্দ্রিয়।
সামান্যতম বিপদের গন্ধ দেখলেই দেবে দৌড়।
পার হয়ে গেল কয়েক সেকেন্ড। কিছুই ঘটল না।
আবার পা বাড়াল সে। জানালার কাছে এসে সাবধানে গলা বাড়িয়ে উঁকি দিল ভেতরে।
প্রথমেই চোখে পড়ল টনিকে। হাত-পা বাধা অবস্থায় পড়ে আছে মেঝেতে। একটা লোক বসে আছে তার কাছে। জানালার দিকে পেছন করে। কিশোরকে দেখতে পেল না।
ঠোঁট গোল করে শিস দেয়ার ভঙ্গি করল কিশোর। কিন্তু শব্দ বের করল না।
আরেকটু কাত হয়ে তাকাল ভাল করে দেখার জন্যে।
গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে স্থির দৃষ্টিতে এদিকে তাকিয়ে আছে বাকি সবাই।
কিশোরের প্রতিটি নড়চড়া লক্ষ্য করছে। বুকের মধ্যে প্রবল বেগে লাফাচ্ছে তাদের
হৃৎপিণ্ড।
নিশ্চয় কিছু দেখেছে! হঠাৎ বলে উঠল মূসা।
কি দেখল, উত্তেজনায় চিৎকার করে উঠল উলি। আস্তে কথা বলার কথা ভুলে গেছে।
তাকে সাবধান করে দিল মুসা।
কি দেখেছে, এখুনি জানা যাবে, অনিতা বলল। ওই যে, ফিরে আসছে।
দৌড়ে আসছে কিশোর।
সামান্য সময়ের জন্যে থেমেছিল, আবার পুরোদমে পড়তে আরম্ভ করেছে তুষার।
টনিকে দেখে এলাম! কাছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল কিশোর। বেধে মেঝেয় ফেলে রেখেছে।
এই ঠাণ্ডার মধ্যে! ওরা মানুষ না! দত কিড়মিড় করল মুসা।
মাত্র একজন লোক আছে পাহারায়, জানাল কিশোর। ওকে সরিয়ে দিতে হবে, যাতে টনিকে মুক্ত করতে পারি বলা সহজ, করা কঠিন, বব বলল! গিয়ে বললেই তো আর সরে যাবে।

তা তো যাবেই না, হেসে বলল কিশোর। তবে আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। ছোট ছোট কিছু পাথর জোগাড় করা দরকার।
তুষারে ঢেকে আছে সব, পাব কোথায়? অনিতা বলল, আর কোন বুদ্ধি বের করতে পারো না?
না, পারি না। এটাই একমাত্র বুদ্ধি। সময় আছে আমাদের হাতে। পাথর জোগাড় করা অসম্ভব হবে না। কিছুটা কর্কশ কণ্ঠেই জবাব দিল কিশোর, তুমি পারলে অন্য কোন বুদ্ধি বের করোগে। আমি পাথর দিয়েই কাজ সারতে চাই।
এক মুহূর্ত দেরি না করে গাছের গোঁড়ার তুষার সরাতে শুরু করল সে।
নিচের মাটি পাথরের মত কঠিন। পাথর খুঁড়ে তোলার চেষ্টা করতে গিয়ে গলদঘর্ম হলো, কিন্তু বের আর করতে পারল না।
নাহ, খোঁড়ার জন্যে দিনটা আজ বড়ই প্রতিকূল! বিরক্ত কণ্ঠে বলে টিটুকে ডাকল। টিটু আয় তো এদিকে।
দুই লাফে কাছে চলে এল টিটু।
পাথুরে জায়গাটা দেখিয়ে দিয়ে হুকুম দিল কিশোর, খোড়।
কিশোর কি চায়, এক কথাতেই বুঝে ফেলল বুদ্ধিমান কুকুরটা। খোঁড়ার কাজে মানুষের আঙুলের চেয়ে তার নখ যে কত বেশি দক্ষ, বুঝিয়ে দিল পলকে।
একের পর এক পাথর খুঁড়ে তুলে ফেলতে লাগল সে।
পাথর তোলার পর তাকে থামতে বলল কিশোর। হয়েছে।
অনেক ধন্যবাদ তোকে। এনে ভালই করেছি। বাড়ি গিয়ে দুটো বড় বড় হাড় পাবি।
হাড়ের কথা শুনে আনন্দে হাঁক ছাড়তে গেল টিটু। সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ চেপে ধরল ফারিহা। না না, টিটু না! বব পাথরগুলো দেখিয়ে বলল কিশোর।তুমি পাথর ছুড়বে। ওই যে কুড়াঁটা দেখছ, লোকটাকে ওদিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করো। এই সুযোগে আমি আর মুসা গিয়ে টনির বাঁধন খুলে দেব।
ঠিক আছে।খুশি মনে রাজি হয়ে গেল বব। আশা করি মেয়েরাও আমাকে সাহায্য করতে পারবে। যত বেশি লোককে কাজে লাগানো যায়, তত ভাল। কি বলো?
ডলি, ফারিহা আর অনিতা একেক জন একেক দিকে সরে যাক। সবাই মিলে ছুঁড়তে থাকলে বোকা হয়ে যাবে লোকটা। বুঝতে পারবে না কোনদিক থেকে আসছে।
বুদ্ধিটা মন্দ না, স্বীকার করল কিশোর। বেশ রসদ ভাগ করে নাও তোমরা। প্রথম পাথরটা ছোড়ার সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকশনে যাব আমি আর মুসা।
খামারবাড়িটার চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলল ডলি, ফারিহা, অনিতা আর বব।
ঠকাস করে গিয়ে প্রথম পাথরটা পড়ল জানালার কাঠের ফ্রেমে।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না গোয়েন্দাদের। দরজায় দেখা দিল লোকটা। ডানে-বাঁয়ে তাকাতে লাগল। প্রবল তুষারপাতের মধ্যে কিসের শব্দ হলো, বোঝার চেষ্টা করছে।
আরেকটা পাথর গিয়ে পড়ল। লোকটার কাছাকাছি। চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল সে। এগিয়ে এল পাথরটার দিকে।
ঠকাস! গোলাঘরের ঘুণে ধরা দরজায় গিয়ে লাগল তৃতীয় পাথরটা।
ঠকাস! ঠকাস!
আরও দুটো পাথর।
অবাক হয়ে ঘুরতে থাকল লোকটা। কুকুরের লেজের গোড়ায় মাছি বসে বিরক্ত করলে সেটাকে ধরার জন্যে যেমন করে ঘুরতে থাকে কুকুর। হয়তো ভাবছে, তুষারপাতের সঙ্গে সঙ্গে পাথর-বৃষ্টিও শুরু হলো বুঝি! দেখতে যাচ্ছে না কেন? অধৈর্য হয়ে উঠল মুসা। যাবে না নাকি?
ওরা বেশি কাছাকাছি পাথর ফেলছে, বিরক্ত হয়ে বলল কিশোর। ওদের বলে এলাম কুয়াটার দিকে নিয়ে যেতে।
ঠকাস!
যষ্ঠ পাথরটা গিয়ে লাগল কুয়ার দেয়ালে।
এইবার পড়তে দেখল প্রহরী। সাধারণ পাথর। তারমানে আকাশ থেকে পড়ছে না। ভাল করে দেখার জন্যে এগিয়ে গেল।
চলো! ফিসফিস করে মুসাকে বলে দৌড় দিল কিশোর।
তুষারপাতের মধ্যে পুরু তুষারের আস্তরণ মাড়িয়ে তাড়াতাড়ি দৌড়ানো সহজ ব্যাপার নয়। তা ছাড়া শব্দ করা যাবে না। ভাগ্য ভাল, পাথরটার দিকে গভীর মনোযোগ রয়েছে লোকটার। তাই অন্য কিছু খেয়াল করল না।
খোলা দরজা দিয়ে ছুটে ভেতরে ঢুকে পড়ল দুই গোয়েন্দা। টনির কাছে চলে এল।
কিছু বলার সময় নেই এখন, তাকে বলল কিশোর। আপনাকে ছাড়াতে এসেছি আমরা।
পকেট থেকে পেন্সিল কাটার ছুরি বের করে লোকটার বাঁধন কেটে দিল।
টনির চোখে সতর্কতা দেখে আবার বলল, আমরা আপনার বন্ধু রোভারের বন্ধু।
দড়ি কেটে বসা লাল হয়ে যাওয়া জায়গাগুলো উলতে শুরু করল টনি। বলল, এই লোকগুলো জালিয়াত। কয়েন জাল করে। খুব খারাপ লোক। সব করতে পারে। ওরা আমাকে বলেছে, ওদের কয়েন ছড়িয়ে বেড়াচ্ছি আমি। ওদেরই একজন কয়েনগুলো কোথাও দিয়ে আসতে যাচ্ছিল, রাস্তায় ব্যাগ ছিড়ে পড়ে যায়।
হাতড়ে হাতড়ে যা পারে তুলে নিয়েছিল। তখন সব খুঁজে পায়নি অন্ধকার ছিল বলে। গোণা ছিল বোধহয়। পরে গুনে দেখে কম। আবার যায় তুলে আনতে কিন্তু

গিয়ে আর পায়নি একটাও। আমি আর রোভার তুলে নিয়ে গিয়েছিলাম।
সেগুলো খোঁজার জন্যে তখন লোক লাগাল ওরা। হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াতে লাগল। জানি আমরা, বাধা দিয়ে বলল কিশোর। গত হপ্তায় রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়েছিলেন আপনি আর রোভার।
ও, জানো! টনি অবাক।
গত তিনদিন ধরে এই জাল কয়েন নিয়ে তদন্ত করছি আমরা। কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছি না, কাল আপনাকে ধরে নিয়ে এল কেন ওরা?
বললামই তো, ওদের কয়েন মানুষকে দিয়ে ফেলেছি আমরা। সত্যি বলছি, একেবারে না জেনে। ওরা চায় না ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যাক। এখানে কয়েনগুলো বানাচ্ছে ওরা, কিন্তু বাজারে ছাড়বে দূরের কোন শহরে নিয়ে গিয়ে। যাতে সূত্র ধরে ধরে পুলিশ ওদের খুঁজে না পায়।
তাই।
কেন, মেশিনের শব্দ শুনছ না? আঙুল তুলে মাটির দিকে দেখাল টনি।
সেলারে বসে বানাচ্ছে এতক্ষণে বোঝা গেল শব্দটা কম কেন। মেশিনটা রয়েছে মাটির নিচের ঘরে।
রক্ত চলাচল বন্ধ থাকায় উঠে দাড়াতে কষ্ট হলো টনির। তিনজন লোক আছে ওখানে। ওই যে দেখো, ট্র্যাপডোর। সেলারে নামার দরজা। এত লোকের কথা শুনে সতর্ক হয়ে উঠেছে কিশোর। সোজা থানায় গিয়ে পুলিশকে জানাতে হবে।
না না, আর যা-ই করো, পুলিশের কাছে যেয়ো না! কাতর অনুনয় শুরু করল টনি। লোকগুলো ভয়ঙ্কর। কাল ধরে এনেছে আমাকে। আজ আনতে গেছে টনিকে। এতক্ষণে হয়তো ধরে ফেলেছেও ওকে!
সর্বনাশ! চমকে গেল কিশোর। টনিকে ধরলে রবিনকেও ধরবে ওরা, ছাড়বে না।
ওদিকে সমস্ত রসদ শেষ করে ফেলেছে বব বাহিনী। খামারবাড়ির দরজার দিকে তাকিয়ে অস্থির হয়ে উঠল। বেরোচ্ছে না কেন এখনও কিশোররা? কুয়োর কাছে দাঁড়িয়ে আছে প্রহরী। এদিক ওদিক তাকাচ্ছে।
ঝট করে বুদ্ধিটা উদয় হল অনিতার মাথায়। বিপজ্জনক। কিন্তু কার্যকরী বলল, যে কোন ভাবেই হোক, লোকটাকে দরজার কাছ থেকে সরিয়ে রাখতে হবে, কিশোররা না বেরোনো পর্যন্ত।
বলে আর দেরি করল না। ঝোঁপ থেকে বেরিয়ে সোজা হাঁটা দিল লোকটার দিকে।
স্তব্ধ হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে বব, ডলি আর ফারিহা। কি করতে যাচেছ অনিতা!
তাজা বাতাস চাইছেন, তাই না? হেসে বলল অনিতা।

ভীষণ চমকে গিয়ে পাক খেয়ে ঘুরে গেল লোকটা। হা করে তাকিয়ে রইল দীর্ঘ একটা মুহূর্ত। ধমকে উঠল, এই মেয়ে, এখানে কি করছ।
না, কিছু করছি না। এমনি হাটতে বেরিয়েছি।
হাটতে বেরিয়েছে। এই তুষারপাতের মধ্যে! জবাব খুঁজে পেল না লোকটা।
আচমকা ফেটে পড়ল, মিথ্যে বলার আর জায়গা পাওনি। চাবকে তোমার চামড়া ছাড়াব।
কে ভয় পায় তোমাকে? বুড়ো আঙুল দেখাল অনিতা। ও কি করতে চায়, বুঝে গেছে এতক্ষণে বব। ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে বাড়িটার দিকে দৌড় মারল।
লোকটার অলক্ষে বাড়ির পাশ ঘুরে এসে দাড়াল জানালার সামনে। চাপা স্বরে ডাক দিল, কিশোর, জলদি বেরোও! অনিতা লোকটাকে ব্যস্ত রেখেছে! বেশিক্ষণ পারবে না। জলদি করো।
ট্র্যাপডোরটা দেখিয়ে মুসা বলল, নিচে আরও তিনজন রয়েছে।
থাক, কিশোর বলল। ওদের ব্যবস্থা পরে করব। আগে গার্ডটাকে ঠেকানো দরকার।
জানালার কাছে এসে দাঁড়াল সে।পেছন পেছন এল মুসা আর টনি।
কুয়ার কাছ থেকে সরেনি লোকটা।জানালার দিকে পেছন করে দাঁড়িয়ে আছে।
তার সামনে খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে গোঁয়ারের মত তর্ক জুড়ে দিয়েছে অনিতা।
সুযোগটা কাজে লাগাল কিশোররা। টনিকে সহ বেরিয়ে এল দরজা দিয়ে।
ওদের বেরোতে দেখেছে অনিতা। বুঝতে পারছে, আরও কিছুক্ষণ ব্যস্ত রাখতে হবে লোকটাকে।
স্বর নরম করে বলল, এমন করছেন কেন আপনি? আমি তো ক্ষতি করিনি।
হাঁটতে বেরিয়েছিলাম…
এই তুষারপাতের মধ্যে নেকড়েরা হাঁটতে বেরোয় না, আর তুমি বেরিয়েছ, এ কথা বিশ্বাস করতে বলো আমাকে? নিশ্চয় কোন মতলব আছে তোমার।
সত্যি বলব? যেন কত গোপন কথা ফাঁস করে দিচ্ছে অনিতা, এমন ভঙ্গিতে বলল, তাহলে শুনুন কেন এসেছি। সেদিন হাটতে হাটতে চলে এসেছিলাম এদিকে। কুয়াটা দেখে কৌতূহল হলো। ঝুকে দেখতে গিয়ে আঙুল থেকে একটা আঙ্গটি খসে পড়ে গেল কুয়ার মধ্যে।মার আঙ্গটি। অনেক দামী হীরা বসানো।
লোভে চকচক করে উঠল লোকটার চোখ। মনে মনে হাসল অনিতা। টোপ গিলেছে হাদাটা। কুয়ার দেয়াল ঘেষে দাঁড়িয়ে ঝুকে নিচে তাকাল।
কাছে চলে এসেছে ততক্ষণে কিশোররা।
কই, কিছু তো দেখছি না, লোকটা বলল। টর্চ নিয়ে আসিগে।

তার আর দরকার হবে না, বলেই পেছন থেকে তাকে জোরে ধাক্কা মারল টনি। কুয়ার দিকে আরও ঝুকে গেল লোকটার দেহের ওপরের অংশ। দুই পা ধরে হ্যাচক টান মারল কিশোর আর মুসা।
কুয়ার মধ্যে উল্টে পড়ে গেল লোকটা। কুয়ার মুখ দিয়ে বেরোনো তার চিৎকারটা কেমন অপার্থিব শোনাল।
দারুণ দেখালে, অনিতা উচ্ছসিত প্রশংসা না করে পারল না কিশোর।
মাথা উঁচু করে একটা বিশেষ ভঙ্গিতে দাঁড়াল অনিতা। ভাবখানা, গোয়েন্দা হিসেবে তোমার চেয়ে কম নই আমি।
তাতে কিছু মনে করল না কিশোর। হাসল কেবল তার দিকে তাকিয়ে।
দৌড়ে এল ডলি আর ফারিহা। এ কি করলে? শঙ্কিত স্বরে বলল ডলি। যদি মরে যায়?
মরবে না, কুয়ার দেয়াল ঘেষে দাঁড়িয়ে নিচে উঁকি দিল কিশোর। পানি নেই। গভীরতাও কম। তবে সাহায্য ছাড়া উঠে আসতে পারবে না আর।
নিচ থেকে চিৎকার শুরু করল লোকটা। তুলে আনার জন্যে অনুনয় বিনয় করতে লাগল। বার বার কাতর কণ্ঠে জানাতে লাগল, তার পা ভেঙে গেছে।
তুলে অবশ্যই আনা হবে, কিশোর বলল। তবে আমরা নই। পুলিশে আনবে।
ওপরে উঠে আসার ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগল লোকটা। কিন্তু ভাঙা পা নিয়ে কিছুই করতে পারল না।
ঘুরে দাঁড়াল কিশোর। বাকি তিনটার ব্যবস্থা করতে হয় এখন। চলো যাই।
তিনজনকে নিয়ে বিশেষ বেগ পেতে হলো না। জানলই না ওরা আটকা পড়েছে। ওপর থেকে হুড়কো আটকে দেয়া হলো ভারী কাঠের ট্রাপডোরটার। তার ওপর চাপিয়ে দেয়া হলো ঘরের মধ্যে যত ভারী, ভারী জিনিসপত্র আছে, সব। কোনমতেই যাতে দরজা ভেঙ্গে উপরে উঠে আসতে না
পারে লোকগুলো।
হাত ঝাড়তে ঝাড়তে কিশোর বলল, এখানকার কাজ শেষ। বাকি তিনজনকে ধরতে হবে এবার। রবিন আর রোভার বিপদের মধ্যে রয়েছে। জলদি।
আবার তুষার মাড়িয়ে দল বেঁধে ফিরে চলল ওরা। বনের মধ্যে দিয়েই এগোল এবারও। দুটো কারণে। এক, তুষার এখানে কম। দুই, গাড়ি নিয়ে যদি ফিরে আসে গালকাটা লোকটা, তাহলে যাতে ওর চোখে না পড়ে।
রাস্তার মাথায় যেখানে সাইকেলগুলো রেখে গিয়েছিল, তার কাছাকাছি আসতে ইঞ্জিনের শব্দ কানে এল। তাড়াতাড়ি গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে ফাঁক দিয়ে তাকাল কালো গাড়িটাই। ফিরে যাচ্ছে খামারবাড়িতে। তুষারপাতের মধ্যে দূর থেকে গাড়ির আরোহীদের চোখে পড়ল না। তবে ওরা শিওর রবিন আর

রোভারকে কিডন্যাপ করে নিয়ে ফিরে এসেছে গালকাটা আর তার দুই সহকারী। মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল কিশোর। জরুরী কণ্ঠে ববকে বলল, বব, সোজা থানায় চলে যাও। যত তাড়াতাড়ি পারো, পুলিশ নিয়ে ফিরবে। আমরা খামারবাড়িতে ফিরে যাচ্ছি আবার। রবিনদের উদ্ধার করতে হবে।
সময়মতই পুলিশ নিয়ে ফিরে এল বব। তার বন্ধুদের সবাইকে পেল ওখানে, কেবল রবিন বাদে। রোভারও নেই।
মাটির নিচ থেকে তিন জালিয়াতকে তুলে আনল পুলিশ। হাতকড়া লাগাল। কুয়া থেকেও তুলে নিল আহত লোকটাকে। আরও একজনকে পেল, হাত-পা বাঁধা অবস্থায়: টনিকে যেখানে ফেলে রাখা হয়েছিল, সেখানে। তাকে কাবু করতে বিন্দুমাত্র বেগ পেতে হয়নি কিশোরদের। এতজনের বিরুদ্ধে একা কিছুই করতে পারেনি লোকটা।
তার মুখেই জানা গেল সব ঘটনা। গালকাটা আর তার আরেক সঙ্গীকে নিয়ে হেনরির দোকানে গিয়েছিল সে। রোভারকে ধরে আনার জন্যে। কল্পনাই করেনি, ফাঁদ পেতে রাখা হবে ওদের জন্যে। তাতে পা দিয়ে বেমক্কা ভাবে ধরা পড়েছে গালকাটা আর তার সহকারী। গাড়িতে ছিল তৃতীয় লোকটা। দুজনকে বন্দি হতে দেখে গাড়ি নিয়ে পালাল। তবে শেষ রক্ষা করতে পারল না।
ঘটনাটা কি ঘটেছে পরে রবিনের মুখে জেনেছে কিশোররা। দোকানের দরজায় ফাদার ক্রিস্টমাস সেজে ছবি তুলে যাচ্ছিল ওরা। ভালই করছিল রবিন।
কিন্তু রোভারের চেয়ে খাটো দেখে সন্দেহ করে বসেন দোকানের মালিক মিস্টার হেনরি। অগত্যা সব কথা খুলে বলতে হয় তাকে। গালকাটারা এলে ওদের ধরার জন্যে তার সাহায্য চায় রবিন।
মিস্টার হেনরি আর কর্মচারীদের সহায়তায় ধরে ফেলা হয় দুই জালিয়াতকে।
পরদিন কিশোরদের ছাউনিতে আন্ডায় বসেছে সবাই। গ্রীনহিলসের পুলিশ কনষ্টেবল ফগর্যাম্পারকটের কথা উঠল। বড়দিনের ছুটি কাটাতে অন্য শহরে আত্মীয়ের বাড়িতে চলে গেছে ফগ।
বেচারা ফগ! জিভ করে আফসোস করল ফারিহা। দারুণ একটা রহস্য থেকে বঞ্চিত হল।এসে যখন শুনবে, আফসোসের আর সীমা থাকবে না তার।
ফগের নাম শুনেই কান খাড়া করে ফেলেছে টিটু। কাকতালীয় ভাবে ঠিক এই সময় গেটের কাছে সাইকেলের ঘণ্টার শব্দ শোনা গেল। টিটু ভাবল, ফগ। আর ঠেকায় কে তাকে। ফগের গোড়ালি কামড়ানোর লোভে ঘেউ ঘেউ করে গলা ফাটিয়ে চিৎকার দিতে দিতে বেরিয়ে চলে গেল।
হুড়মুড় করে তার পেছন পেছন ছুটে বেরিয়ে এল সবাই।

টিটুর মতই হতাশ হতে হলো ওদেরকেও। ফগ নয়, গায়ের মুদী দোকানের ছেলেটা এসেছে মেরিচাচীর কাছ থেকে জিনিসপত্রের অর্ডার নিতে।
*** সমাপ্ত ***

ইমতিয়াজ মাহমুদ রচিত ‘সবুজ আতঙ্ক’ কাহিনিটি তিন গোয়েন্দা সিরিজে রূপান্তর করেছেন শামসুদ্দীন নওয়াব।

তিন গোয়েন্দা ভলিউম ১১৮/২ – আমাজনের ভয়ঙ্কর! – শামসুদ্দীন নওয়াব – সেবা প্রকাশনী – প্রথম প্রকাশ : ২০১০

এ কাহিনি তখনকার, যখন মুসা ভূত ছাড়া আর কিছুকে একটুও পাত্তা দিত না।

.

‘আর কতদূর, আণ্টি?’ জিজ্ঞেস করল মুসা।

‘হ্যাঁ, আর কতদূর, আম্মু?’ একই প্রশ্ন ফায়েজারও।

‘এই তো এসে পড়েছি,’ জবাব দিলেন শাহানা। গভীর মনোযোগে স্পিড-বোট চালাচ্ছেন তিনি।

‘একদম একা হয়ে যাব আমরা!’ বলল মুসা। ‘সত্যিই দারুণ হবে!’

সায় দিল ফায়েজা, ‘সত্যিই তা-ই।’ কণ্ঠস্বর শুনে মনে হলো একটু যেন দ্বিধায় পড়েছে।

ঝিরঝিরে বাতাস। সে হাওয়ায় দুলছে বিশাল আমাজনের জল। ঘোলাটে পানির নীচে রয়েছে মানুষখেকো কুমির আর পিরানহার ঝাঁক, ভাবলে যে-কারও গলা শুকিয়ে আসবে। ঢেউয়ের মাথায় নাচতে নাচতে চলেছে স্পিড-বোট।

বোটে মানুষ বলতে তিনজন আরোহী – প্রখ্যাত উদ্ভিদ বিজ্ঞানী শাহানা আক্তার, তাঁর মেয়ে পাঁচ বছরের পিচ্চি ফায়েজা তাবাস্সুম ও বড় বোনের ছেলে, মুসা আমান।

বোটে আরও রয়েছে কিলার, বিশাল এক অ্যালসেশিয়ান। পাটাতনে আরাম করে বসে এদিক-ওদিক দেখছে ও, ফায়েজার কোলে থুতনি রেখে মাঝে মাঝে ‘হাউফ্’ বলে মনোযোগ আকর্ষণ করছে।

দেখতে দেখতে ম্যানুয়াস শহর পিছনে পড়ে গেল। চারপাশে সবুজ বাঁকা রেখা। ওটাই ভয়ঙ্কর আমাজন জঙ্গল। স্পিড-বোট ওদিকে চলেছে। শাহানা আক্তার লস অ্যাঞ্জেলেস ইউনিভার্সিটির একটা বিশেষ অ্যাসাইনমেণ্ট নিয়ে আমাজনে এসেছেন।

এ সুযোগে তাঁর সঙ্গে জুটে গেছে মুসা। স্কুল ছুটি। রবিন গেছে আয়ারল্যাণ্ডে আত্মীয়-বাড়ি বেড়াতে, কিশোর গেছে চাচা-চাচীর সঙ্গে বাংলাদেশে। রকি বিচে মুসা একা কী করবে? আব্বু-আম্মুও আফ্রিকায় একটা কনফারেন্সে গেছেন। বাড়িতে শুধু কাজের মেয়েটি আর ও। শেষে মুসা আণ্টিকে বলেছে, উনি যেন ওকে সঙ্গে নেন।

ছোট বোন ফোনে অনুরোধ করছে বলে মুসাকে ছেড়েছেন মিসেস রাফাত। তবে পই-পই করে বলে দিয়েছেন, ও যেন জঙ্গলে একা একা না ঘোরে।

গতকাল শাহানা আক্তার ফায়েজা ও মুসাকে নিয়ে প্লেনে করে ম্যানুয়াস এয়ারপোর্টে নেমেছেন। হোটেলে রাতটা কাটিয়ে সকালে রওনা হয়ে গেছেন আমাজন জঙ্গলের উদ্দেশে।

অধ্যাপিকা শাহানা আক্তার দু'বছর আগে বিমান দুর্ঘটনায় স্বামীকে হারিয়েছেন। তারপর মন-প্রাণ ঢেলে দিয়েছেন বিজ্ঞান- চর্চায়। বড় মেয়েটি স্কুলের হোস্টেলে থেকে, ছোটটাকে সারাক্ষণ সঙ্গেই রাখেন। ' স্বামীর মৃত্যুর পর এখন তাঁর বেঁচে থাকার প্রেরণা—শুধুই কাজ!

আমাজনে বিশেষ এক ধরনের ঘাস নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করবেন শাহানা। তিনি ধারণা করছেন ওই ঘাস দিয়ে অতি কম খরচে অত্যন্ত উন্নত মানের সার তৈরি হবে।

ব্রাজিল ও স্বদেশের উচ্চ পর্যায়ের সরকারী অনুমোদন পেয়েছেন শাহানা। এক্সপেরিমেন্ট করতে হলে যেতে হবে আমাজাদের বিশেষ এক দুর্গম অঞ্চলে। সেজন্য স্পিড-বোট চালনা শিখতে হয়েছে তাঁকে, সঙ্গে নিতে হয়েছে অস্ত্র—একটা থ্রিটু পিস্তল। এ ছাড়া বেশ কিছুদিন চলবার মত খাবার ও পানি রয়েছে বোটে।

বনের গভীরে একটা ফরেস্ট বাংলো রয়েছে, মাঝে মাঝে ওখানে ফোর্স নিয়ে অবস্থান করেন ফরেস্ট অফিসার। এখন কেবিনটা বসবাসের উপযোগী রাখবার কথা দুঃসাহসী ইয়ারুনাদের।

পনেরো দিন সেখানে কাটাবেন শাহানা।

একটা মানচিত্রে বাংলোর অবস্থান দেখানো হয়েছে, তাই ওটা বারবার দেখছেন তিনি।

একঘণ্টা পর আমাজন নদীর একটা শাখা-নদীতে ঢুকল স্পিড- বোট। ঢেউ অনেক কমে গেল। তারওপর এখন ভাটার সময়। পানির গভীরতা বেশি নয়।

একটু পর সরু হয়ে গেল শাখা-নদী, দু'দিক থেকে চেপে এল আমাজনের ঘন গাছপালা। দু'তীরে সবুজের সমারোহ। নানান সুরে ডাকছে হরেক জাতের বিচিত্র সব পাখি। গাছের ডালে ডালে অসংখ্য বানর। মুসা একবার একটা হরিণ দেখল, পানি খেতে এসে স্পিড- বোটের আওয়াজ পেয়েই পালিয়ে গেল জঙ্গলের ভিতর। কিলার পারলে বোট থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে পিছনে ছোটে, কিন্তু মুসা ওকে ঘাড় ধরে জোর করে বসিয়ে রাখল।

এগিয়ে চলেছে স্পিড-বোট। শাহানা গতি অনেক কমিয়ে দিলেন, মানচিত্র দেখলেন। দু'পাশে কিছু খাল। ওগুলো জঙ্গলের ভিতর গিয়ে ঢুকেছে। কয়েকটা খালের মুখ পার হয়ে অপেক্ষাকৃত চওড়া একটা খালে ঢুকল বোট।

এ এমন এক এলাকা যেখানে লোকবসতি নেই। অবশ্য মাঝে মাঝে বনের এত বিজনেও ঢোকে টাপাজো, কোয়াহিয়া আর ইয়ারুনা উপজাতির লোক। ওরা আসে গাছ কাটতে, শিকার করতে বা মধুর খোঁজে। অনেকে মারাও পড়ে জাগুয়ার বা কুমিরের আক্রমণে।

আমাজন এমন এক অরণ্য যেখানে একমুহূর্ত অসতর্ক হলে স্রেফ মৃত্যু।

ভাইয়ের পাশে গুটিসুটি মেরে বসে আছে ফায়েজা, কিলারের পিঠে হাত রেখে অবাক বিস্ময় নিয়ে চারপাশের ঘন জঙ্গল দেখছে। ভয় পেয়েছে, নইলে এতক্ষণে প্রশ্নের খই ফুটত ওর মুখে। নিশ্চয়ই ভাবছে, এখুনি হালুম করে ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে মানুষখেকো জাগুয়ার। তার পর তো…

ছোট একটা ঘাটে ঠেকল স্পিড-বোট। উঠে দাঁড়ালেন শাহানা, দড়ি নিয়ে নেমে গেলেন। খুঁটির সঙ্গে বোট বেঁধে বললেন, ‘এসে পড়েছি। কাছেই আমাদের বাংলো। মুসা, মালপত্র নামাতে আমাকে সাহায্য করো। আর, ফায়েজা, চুপটি করে কিলারকে নিয়ে বসে থাকো।’

মাথা নাড়ার সুযোগও পেল না ফায়েজা, তার আগেই একটা খরগোশ দেখে বোট থেকে নেমে পড়ল কিলার, ঘেউ-ঘেউ করে তেড়ে গেল। কে ধরে কাকে! এ হলো আমাজনের অভিজ্ঞ পাখোয়াজ খরগোশ, কয়েক লাফে গিয়ে ঢুকে পড়ল গর্তে।

কিছুক্ষণ গর্তটা পাহারা দিল কিলার, তারপর লাজুক চেহারা নিয়ে ফায়েজার পাশে এসে বসল। চোখ তুলে চাইল না, যেন গভীল চিন্তায় ডুবে গেছে। ফায়েজা হাসছে দেখে কয়েকবার ঘেউ-ঘেউ করল, নিজের সম্মান ফিরে পাওয়ার চেষ্টায়।

এদিকে শাহানা আণ্টি আর মুসা মালপত্র নামাতে শুরু করেছে। কয়েকটা বড় পুটুলি নামাল মুসা। খাবার আর রাঁধবার সরঞ্জাম নামল বোট থেকে। অপ্রশস্ত একটা পথ এঁকেবেঁকে চলে গেছে বনের ভিতর, সেটা ধরে এগোলেন শাহানা। কিছুদূর যেতেই চোখে পড়ল কাঠের তৈরি বাংলো। খুব বড় নয়, তবে সুন্দর। নিরাপদও মনে হলো।

কাঠের বাংলোটা অনেকগুলো খুঁটির উপর মাটি থেকে ছ’ফুট উঁচুতে তৈরি। চওড়া একটা মই বেয়ে সামনের বারান্দায় উঠতে হয়। দেখে মনে হলো মাঝে মাঝে এখানে আসেন ফরেস্ট রেঞ্জাররা। ইয়ারুনারা বাড়িটা পরিষ্কার করে দিয়ে গেছে।

এটাই আগামী পনেরো দিনের জন্য শাহানা আণ্টি, মুসা ও ফায়েজার একমাত্র আশ্রয়।

শাহানা আণ্টি ও মুসা পাঁচবার যাওয়া-আসা করল, তারপর বোট খালি হলো। চারপাশ দেখে নিলেন শাহানা। হাতের ইশারায় বললেন, এবার সবাইকে নিয়ে বাংলোয় গিয়ে উঠবেন। তাঁর সঙ্গে চলল মুসা ও ফায়েজা। পিছনে কিলার।

থমথমে নীরবতা বিরাজ করছে বনে। একটা পাখিও ডাকছে না। বাঁদরগুলো হুল্লোড় করছে না। মুসা শিকারের বইয়ে পড়েছে জঙ্গলে অস্বাভাবিক কিছু ঘটলে এমন হয়।
তেমন কিছু কি ঘটতে চলেছে?
চা গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা গেল জলাভূমি। ওখানে অগভীর পানি। সাগরে জোয়ার এলে আমাজনের এদিকে পানি বাড়ে। অসংখ্য নলখাগড়া জন্মেছে। বিপজ্জনক। কুমির থাকতে পারে ওখানে। মুসা জানে, ভয়ানক, বিপদের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করবেন আন্টি। ওর দায়িত্বও কম নয়। ফায়েজার উপর চোখ রাখতে হবে। কোনও বিপদ হলে সাধ্যমত মোকাবিলা করতে হবে। তবে ভরসার কথা যে কিলার রয়েছে। দরকার পড়লে হিংস্র জাগুয়ারের সঙ্গেও লড়াই করবে। ফায়েজাকে খুব ভালবাসে কুকুরটা, ওর কোনও বিপদ হলে ঝাঁপিয়ে পড়বে।
আর ও নিজে তো আছেই, ভাবল মুসা।
কিন্তু ও কি জানে কীসের মোকাবিলা করতে হবে ওকে?
জানে না, গোটা পরিবারের দায়িত্ব ওর একার কাঁধে এসে চাপবে।
‘এসে পড়েছি,’ বাংলোর প্রথম ঘরে ঢুকলেন শাহানা।
‘দারুণ জায়গা, তা-ই না?’ বলল মুসা। ‘দু’সপ্তাহ এখানে থাকছি
আমরা। দারুণ মজা হবে, তা-ই না?’
‘এই আমাজনের গভীরে মজা?’ মৃদু হাসলেন শাহানা। ‘ক’জন এই বয়সে এরকম সুযোগ পায়, আন্টি?’
‘তা ঠিক,’ শুকনো গলায় বললেন শাহানা।
ফায়েজা বলল, ‘আম্মু, আমি ইয়ে করব।’
‘বাইরে টয়লেট পাবে,’ বললেন শাহানা। ‘একটা বেড়া দিয়ে ঘেরা। নীচে গামলা থাকবে। চলো, ব্যবস্থাটা তোমাকে দেখিয়ে দিই।’
‘কমোড নেই?’ আপত্তির সুরে বলল ফায়েজা।
‘আহ্, ফায়েজা,’ বিরক্ত হলেন শাহানা। ‘এমন নাক উঁচু ভাব করে না তো।’
মনে মনে বলল মুসা, কয়টা মেয়ে আমাজনের এত গভীরে এসেছে, ফায়েজা? একবার ভাবো, কুমির আর জাগুয়ারের সঙ্গে মোলাকাত হবে!’
আন্টি ফায়েজাকে নিয়ে বারান্দা হয়ে নেমে গেলেন। এক পাশে বেড়া দিয়ে ঘেরা টয়লেট, ওখানে গিয়ে ঢুকলেন।
মুসা বাংলোর ভিতরটা ঘুরে দেখতে লাগল। সামনে ছোট একটা বারান্দা। দরজা খুললে মাঝখানে বড় একটা ঘর। ওটাই বোধহয় লিভিংরুম। আসলে ওটাই একমাত্র বড় ঘর। এ ছাড়া আছে একটা কিচেন আর ছোট দুটো বেডরুম।

লিভিংরুমে পুরানো একটা ছেঁড়া সোফা সেট। মাঝখানে একটা টেবিল। ওটার উপর হারিকেন। কারেন্টের কোনও ব্যবস্থা নেই। হাত-মুখ ধোওয়ার পানি বাইরে থেকে যোগাড় করতে হবে। নিজেদের বাড়িটার সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে মুসার মনে পড়ল, এখানে ফোনও নেই। ওরা যেন এক পলকে আদিম যুগে ফিরে গেছে।
বেডরুমের জানালা দিয়ে টয়লেট দেখা যায়, ছোট আর নড়বড়ে। ঘরে একটা ছোট ড্রেসার আছে, সেখানে দু' ভাই-বোনের কাপড় রাখার ব্যবস্থা। দু'পাশে দুটো চৌকি, তাতে একটা করে তোশক। এটাই শোবার ব্যবস্থা। মাঝখানে একটা টেবিল। তার উপর একটা মোমবাতি রাখা। সন্ধের পর আলোর ব্যবস্থা বলতে এ-ই!
মুসার মনে হলো অন্তত একশো বছর পিছনে ফিরে গেছে। ও আছে গভীর অরণ্যে, কোনও পর্তুগিজ জলদস্যুর হাতে বন্দি!
এলাকাটা সত্যিই জনমানবহীন। বনের মাঝে কুটির। জলাভূমিতে কুমির, ডাঙায় জাগুয়ার আর সাপ!
জঙ্গলের গাছগুলো দেখলে মনে হয়, কেমন যেন অন্যরকম!
বাংলোর ছাদে সূর্যের আলো পড়ে না। ওরা যে পথ দিয়ে বাংলোয় এসেছে, অন্ধকার সেখানেও থাবা পেতে আছে। জলাভূমির উপর সূর্যের আলো পড়ে চকচক করছে। দুটো জায়গার আলোর তফাৎ এত বেশি যে কী রকম যেন লাগে।
শাহানা আণ্টি আসবার পথে নানান গাছের ব্যাপারে মুসাকে অনেক তথ্য দিয়েছেন। জঙ্গল মুসার ভাল লাগে, কিন্তু গাছের নাম ওকে মোটেই কৌতূহলী করে না। বিশেষ করে ঘাসের কথা শুনলে মন খারাপ হয়ে যায়। পড়া না করলে টিচাররা গরু-টরু আর ঘাস- টাস নিয়ে যা সব বলেন...
'শোনো, মুসা,' শেষে অন্যপথ ধরেছেন শাহানা। 'সাধারণ গাছ বাদ যাক, কিন্তু এই ঘাস থেকে যদি উন্নত মানের সার তৈরি করতে পারি, আমাদের অনেক টাকা হবে। তখন তোমাকে একটা দারুণ ফেরারি গাড়ি কিনে দেব।'
'সত্যিকারের?' জানতে চেয়েছে মুসা। 'আমার নিজের গাড়ি?'
'নিশ্চয়ই!' জোর দিয়ে বলেছেন শাহানা। পরমুহূর্তে আগের প্রসঙ্গে ফিরেছেন, 'তো এই যে ঘাস, এটাতে এমন কেমিকেল আছে যে দারুণ সার হবে। অনেক ফসল ফলানো যাবে। মানুষের খাবারের অভাব দূর হবে। দুনিয়ার বিরাট উপকার, বুঝলে তো?'
দুনিয়ার উপকার, কথাটা মুসার ভাল লেগেছে। জিজ্ঞেস করেছে, 'বিশেষ ঘাস আপনি পাবেন কোথায়? কোথায় জন্মেছে সে ঘাস?'
'এখানেই, আশপাশেই। এই জলাভূমিতে ওই ঘাস পাব আশা করছি। যদি পাই, গোটা আমাজনের চেহারা পাল্টে যাবে। ঘাসের চাষ করবে তখন মানুষ। এই

এলাকা আর বিরান পড়ে থাকবে না। লোকজন মেশিনপত্র নিয়ে আসবে, ঘাস কাটা হবে, আবার চাষও চলবে।'
'তাতে এই এলাকা নষ্ট হয়ে যাবে না? মেশিন আমাজনের ক্ষতি করবে না?'
'বড় ধরনের কোনও ক্ষতি হবে না তাতে। এটা বিরাট বড় অঞ্চল, কিন্তু ক্ষতি একেবারে হবে না, তা-ও নয়। তবে কিছু পেতে হলে বদলে কিছু দিতে হয়। এই ক্ষতিটা মেনে নিতে হবে। মনে রেখো, মুসা, আমি যদি সফল হই, দুনিয়ার মস্ত উপকার হবে। এখনকার মত মূল্যবান গ্যাস খরচ করে সার তৈরি করতে হবে না। অতি কম খরচে পাওয়া যাবে উন্নতমানের অফুরন্ত জৈবিক সার।'
আণ্টি পৃথিবীর উপকারের কথা ভাবছেন, খুশি হয়ে হেসেছে মুসা। শাহানাও হেসেছেন।
দু'জনকে হাসতে দেখে ফায়েজাও।
কিন্তু ওরা জানে না আমাজনকে কলুষিত করতে চাইলে মহাবিপদ নেমে আসবে!

.

আধঘণ্টা পর রাবারের বুট পরে জলাভূমির দিকে চলে গেলেন শাহানা। ফায়েজাকে মুসার দায়িত্বে রেখে গেলেন। সঙ্গে এক গাদা টেস্ট টিউব আর যন্ত্রপাতি নিয়েছেন তিনি। দেখতে দেখতে গাছের আড়ালে চলে গেলেন। তাঁকে আর দেখা গেল না।
অসহ্য গরম পড়েছে। বাংলোর ভিতরে বসেও দরদর করে ঘামছে মুসা ও ফায়েজা। বিরাট জিভটা বের করে হ্যাহ্-হ্যাহ্ করে হাঁপাচ্ছে কিলার।
কিছুক্ষণ পর মুসা আর বসে থাকতে পারল না। ফায়েজা আর কিলারকে নিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। শাহানা যেদিকে গেছেন সেদিকে এগোল ওরা। জলাভূমির কিনারায় এসে দাঁড়াল। শাহানাকে দেখা গেল, হাঁটু পানিতে দাঁড়িয়ে।
ঠিক তখনই মুসার নজরে পড়ল ওটা।
জলাভূমির পানিতে ছোট ছোট কুতকুতে দুটো চোখ! চোখের পিছনে বিরাট সরু এক মাথা! তার পিছনে ওটার লম্বাটে শরীর! শেষে লম্বা লেজ!
কুমির!
বিরাট!
আন্টির ঠিক পাঁচ গজ পিছনে!
সোজা এগিয়ে আসছে!
'শাহানা আণ্টি, পালান!' সম্বিৎ ফিরে পেয়ে চিৎকার করে উঠল মুসা, 'কুমির, আন্টি!'
পালাতে চাইলেন শাহানা, কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে!
শাহানার পায়ের কাছে চলে এসেছে কুমির! ঘেউ-ঘেউ করে উঠল কিলার।

আর বড়জোর এক সেকেণ্ড, তারপর কুমিরের খাবার হবেন শাহানা আণ্টি!
জলাভূমির পানিতে দ্রুত এগিয়ে আসছে ওটা!
‘কুমির!’ চেঁচিয়ে উঠল মুসা। আঙুল তুলে ওটা দেখাল।
ফায়েজা ভালমত বুঝতে পারছে না কী ঘটছে। তবে এটুকু বুঝেছে, মুসা ভাই খুব উত্তেজিত। আম্মু পানি ভেঙে ছপছপ করে ছুটে আসছেন তীরের দিকে। কাঁদতে শুরু করল ফায়েজা।
একটানা ঘেউ-ঘেউ করছে কিলার।
শাহানাকে দেখে মনে হলো দিশে হারিয়ে ফেলেছেন
কী করবেন বুঝছেন না। তারপর কুমিরটা দেখতে পেলেন। আতঙ্কে চোখ বড় বড় হয়ে উঠল।
আণ্টিকে দেখছে মুসা। কুমিরটার গতিপথ থেকে সরে যাওয়ার চেষ্টা করছেন শাহানা। কিন্তু কুমিরটা ততক্ষণে তাঁর পায়ের কাছে চলে এসেছে।
শাহানার পায়ে নাক দিয়ে গুঁতো দিল। এবার যা করল সেটা কোনও কুমির করতে পারে বলে ধারণা ছিল না মুসার।
ধাক্কা মেরে স্রেফ সরে গেল এক পাশে। ভাসতে ভাসতে সামনের দিকে চলল।
বড় করে দম নিলেন শাহানা। স্বস্তির শ্বাস ফেলে হাসতে শুরু করলেন। ‘সত্যিই বড় মজার কাণ্ড!’ বললেন।
‘আণ্টি, আপনি কী বলছেন?’ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল মুসা। ‘পানি থেকে উঠে আসুন! আপনি হাসছেন, কুমিরটা আরেকটু হলে আপনাকে খেয়ে ফেলত। আবার আসতে পারে!’
হাসির ফাঁকে বললেন শাহানা, ‘ওটা কুমির নয়, মুসা, ওটা পুরানো একটা কাঠের গুঁড়ি। পানিতে ভাসতে ভাসতে কোত্থেকে যেন এসেছে।
‘কিন্তু দেখতে তো একদম কুমিরের মত!’
‘আমিও বোকা বনে গিয়েছিলাম,’ স্বীকার করলেন শাহানা। ‘পানির ভেতরে সত্যি কুমিরের মত লাগছিল। কিন্তু ওটার চোখ দুটো নকল। কাঠের গুঁড়ির গায়ে দুটো গুটলি। ডালগুলো দেখতে ঠিক লেজের মত মনে হয়েছে।’
ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল মুসা। আন্টির মত হাসতে পারছে না। গলার ভিতরটা শুকিয়ে কাঠ। ভাবতেও গায়ে কাঁপুনি ধরছে। ওটা সত্যি করেই তো কুমির হতে পারত। তা হলে এ চোখের সামনে আণ্টির মৃত্যু দেখতে হতো, কিছুই করতে প খারাপ কিছু হয়নি দেখে কান্না থামাল ফায়েজা। কিলারও চুপ করল। ঘাসের নমুনা নিয়ে ধীরেসুস্থে তীরে উঠলেন শাহানা। বললেন, ‘কুমির সাধারণত মানুষকে আক্রমণ করে না। তবে হ্যাঁ, ক্ষুধার্ত কুমির কী করবে, তা বলা যায় না। সেজন্যই অত ভয় পেয়েছি। বড়দের বিপদের ভয় কম। সহজে ওরা আক্রমণ করে না

বলেই জানি। ওদের তো এখানে খাবারের অভাব নেই। প্রচুর মাছ আছে। হরিণও ধরে খায় মাঝে মাঝে।'
'তা হলে কি কুমির আমি ভয় পাব না?' জিজ্ঞেস করল ফায়েজা। 'কুমির আমার কিছু করবে না?'
'তা ঠিক নয়, তাড়াতাড়ি করে বললেন শাহানা। 'খুব সাবধানে থাকতে হবে আমাদের। ক্ষুধার্ত কুমির সাঙ্ঘাতিক চালাক হয়।'
মুখ শুকিয়ে গেল মুসার। আণ্টি যে-কোন সময় জলাভূমিতে কুমিরের খপ্পরে পড়তে পারেন! ও নিজে একটু অসতর্ক হলে? ছোট্ট ফায়েজা কী করতে কী করে বসবে, তার ঠিক নেই! ওকে চোখের আড়ালে যেতে দেয়া যাবে না। গভীর এই জঙ্গলে যে-কোনও সময় যে-কোনও বিপদ ঘটতে পারে।
কুমির ছাড়াও জাগুয়ার আর সাপের ভয় তো আছেই!
মুসার মনে হলো, ফায়েজার দায়িত্ব ওর উপর বর্তেছে। আণ্টি থাকবেন তাঁর এক্সপেরিমেন্ট নিয়ে। তিনি জন্তু-জানোয়ারের হামলা থেকে ওদেরকে রক্ষা করতে পারবেন না।
নিজেকে মুসার বিরাট একজন অভিযাত্রী বলে মনে হলো। ও এই দুর্গম গহীন অরণ্যে অনেকের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছে। সবাইকে নিরাপদে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া যেন ওরই কর্তব্য।
শাহানা আণ্টি এক্সপেরিমেন্ট করতে আবারও জলার দিকে চলে গেলেন।
গরম পড়েছে অসহ্য। দম বন্ধ করা পরিবেশ। শ্বাস আটকে আসতে চায়। ক্লান্তি বোধ করছে মুসা। জীবনে কোনওদিন এত গরম লাগেনি। সূর্যের আলো জঙ্গলে যেখানে পড়েছে, সেসব জায়গা থেকে রীতিমত ভাপ উঠছে।
জলাভূমি যেখানে দিগন্তে গিয়ে মিশেছে, ওখানে চোখ রাখলে বোঝা যায় না, কোথায় পানির শেষ, আর কোথায় আকাশের শুরু!
ফায়েজাকে নিয়ে সোজা বাংলোয় ফিরল মুসা। এরপর থেকে বাইরে তেমন একটা বেরল না। কড়া নজর রাখল কিলার আর ফায়েজার উপর।
আণ্টির জন্যও দুশ্চিন্তা হচ্ছে ওর। কী হতো যদি ওই কাঠের গুঁড়ি সত্যি সত্যি কুমির হতো?
ওই জলাভূমিতে যখন তখন বিপদ ঘটতে পারে।
এমন বিপদ ঘটতে পারে, যেটা ওদের শেষ করে দেবে।
আমাজনে মুসার প্রথম রাত এল নীরব বিভীষিকার মত। সূর্য ডুবে যেতেই ঝপ্ করে ঘনিয়ে এল অন্ধকার। সেইসঙ্গে শুরু হলো নানারকম আওয়াজ। এত রকমের জন্তুর ডাক মুসা আগে কখনও শোনেনি। একটা আওয়াজ ভয় ধরিয়ে দিল। মনে হলো, তীব্র ব্যথায় কাঁদছে মানুষের বাচ্চা। ফেউ ডাকছে। মুসা শুনেছে,

জাগুয়ার কাছাকাছি থাকলে ওগুলো ওভাবে ডাকে। নিরীহ প্রাণীদের সতর্ক করে দেয়। নইলে যে-কোন সময়ে ভয়ঙ্কর মৃত্যু ঘটতে পারে।
জাগুয়ার কি বাংলোর ধারেকাছে এসেছে?
একেকটা অদ্ভুত আওয়াজ শোনে আর চমকে যায় মুসা। ফায়েজা নিশ্চিন্তে আছে। এতই ক্লান্ত, সন্ধ্যা নামতেই ঘুমিয়ে পড়েছে।
কুকুরটা মাঝে মাঝে ঘেউ-ঘেউ করে উঠছে।
'চুপ কর, কিলার,' ধমকে কুকুরটাকে চুপ করাতে চাইছেন শাহানা, কাজ হচ্ছে না।
ওটার গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে শান্ত করল মুসা।
বাইরে থেকে প্যাচার অশুভ ডাক ভেসে আসছে।
বড় ঘরটায় বসে আছে ওরা। ফায়েজা সোফায় কাত হয়ে ঘুম। একটা বই থেকে শেক্সপিয়ারের কবিতা পড়ছেন শাহানা। কেরোসিনের আলোয় ঘরের অন্ধকার পুরোপুরি দূর হয়নি। দেয়ালে পড়ছে অদ্ভুত সব ছায়া। মনে হয় ভুতুড়ে কিছু নড়ছে বুঝি।
রাত নামার পরও গরম কমেনি মোটেও। ঘামছে ওরা দরদর করে।
একটু পর মুসা বলল, 'চারপাশে এত আওয়াজ! মন দমে যায়।'
শাহানা ভাবলেন মুসা ভয় পেয়েছে, বললেন, 'দুশ্চিন্তা কোরো না, মুসা, এগুলো বনের স্বাভাবিক শব্দ। আমরা সভ্যতা থেকে অনেক দূরে বটে, কিন্তু ভয় পাবার কিছু নেই। বুকে সাহস রাখো।'
'ভয় পাইনি,' বলল মুসা। 'মনটা কেমন যেন করছে। আমরা বাড়ি থেকে কত দূরে!' আণ্টির দিকে চাইল ও। 'রাতে জাগুয়ার আক্রমণ করলে?'
'করবে না,' জোর দিয়ে বললেন শাহানা। 'বাংলোর ভেতরে আমরা নিরাপদ।' আরেকটা বই হাতে নিলেন তিনি। বিখ্যাত ইংরেজ কবি উইলিয়াম ব্লেকের কবিতা। পড়তে শুরু করলেন।
স্বর্গের বাগানে গিয়েছিলাম আমি!
সেখানে দেখেছি, যা আগে কখনও দেখিনি!
সেখানে সেই সেথায় প্রার্থনালয় উঠেছে!
যেখানে সবুজের মাঝে আমি খেলতাম শৈশবে...
হঠাৎ করে পড়া থামিয়ে দিলেন শাহানা। বাংলোর ছাদে উপর ধুপ করে কি যেন পড়ল। চমকে গেলেন তিনি, বইটা বন্ধ করে রাখলেন।
টিনের চালে জোরে আওয়াজ হয়েছে। খুব জোরে। যেন ভারী কোনও জন্তু লাফ দিয়ে চালের উপর উঠেছে। হয়তো এখনই ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করবে!
দম! দম! দড়াম! দমাদম!

‘আণ্টি, কী হতে পারে ওটা?’ ঢোক গিলে বলল মুসা। আস্তে করে শাহানার কাছ ঘেঁষে বসল।
‘বুঝতে পারছি না, মুসা!’ গলা কেঁপে গেল শাহানার। ‘কী হতে পারে?’
‘ভারী কিছু। ভেতরে ঢুকতে চাইছে! বড় কোনও জন্তু!’
কিলার উত্তেজিত হয়ে ঘেউ-ঘেউ করে উঠল। ঘুম ভেঙে চোখ পিটপিট করে চাইল ফায়েজা। শাহানার কোলে মাথা রেখে শুয়ে ছিল। উঠে বসল। কাঁদতে শুরু করল।
‘ও কিছু না, ফায়েজাকে অভয় দিলেন শাহানা। মুসার দিকে তাকালেন। ‘তোমরা ভয় পেয়ো না, কোনও বিপদ হবে না আমাদের।’ হাত তুলে শাসালেন। …কিলার, চেঁচানি থামা, নইলে দেব এক চড়!’
শুনল না কিলার। ছাদের দিকে মুখ তুলে ঘেউ-ঘেউ করতে লাগল।
‘কোনও জন্তু হঠাৎ করে ছাদে উঠে পড়েছে, এখন নামার চেষ্টা করছে,’ বললেন শাহানা। ‘আমরা যতটা ভয় পেয়েছি, তার চেয়ে কম ভয় পায়নি ওটা। দাঁড়াও, আমি টর্চ নিয়ে বাইরে বের হয়ে দেখি।’
আণ্টির কথায় আপত্তি জানাল মুসা, ‘বাইরে? সেটা কী ঠিক হবে? বিপদ হতে পারে। জন্তুটা হয়তো আপনার উপর হামলে পড়বে।’
টিনের ছাদে আওয়াজ বন্ধ হয়নি, যেন টিন ভেঙে ফেলবে।
ধম! ধম! ধমাৎ! ধমাধম!
‘খামোকা ভয় করছ, মুসা,’ ভীত স্বরে বললেন শাহানা। টর্চের দিকে হাত বাড়ালেন। ওটা হাতে নিয়ে ধীর পায়ে এগোলেন দরজার দিকে। ‘দেখছি আমি কী এমন আওয়াজ করে!’
‘তা হলে আমিও যাই,’ বলে সোফা ছাড়ল মুসা। আন্টির বিপদ হবে, আর ও বসে থাকবে? সেটা হতে পারে না। একা আণ্টিকে কিছুতেই যেতে দেবে না ও। শাহানার হাত ধরল মুসা। ‘কই, চলুন বাইরে।’
‘চলো তা হলে ‘
দীর্ঘশ্বাস ফেলল মুসা। ‘ঠিক আছে, দেখা যাক কী আছে।’
দরজা খুললেন শাহানা, তবে আগে বের হলো মুসা। ওর হাতেও ছোট একটা পেন্সিল টর্চ।
দরজা বন্ধ করার আগে শাহানা বললেন, ‘যেখানে আছ সেখানেই থাকবে, ফায়েজা। আমরা এক্ষুণি আসছি। কিলার, চিৎকার থামা!’
দরজা বন্ধ হয়ে যাবার পর পাশাপাশি বারান্দায় দাঁড়াল দু’জন, তারপর মই বেয়ে নেমে উঠানে। অন্ধকারে টর্চের আলো একটা সরু রেখা তৈরি করল। এ আলোয় সামান্য জায়গা দেখা গেল।

বাংলোর কাঠের দেয়াল দেখা গেল। নোংরা, ছাতা পড়া, পুরানো। টর্চের আলো টিনের চালে পড়ল। জং-পড়া টিনের জং না ধরা অংশগুলো চকচক করে উঠল।
জন্তুটাকে শীঘ্রি দেখা যাবে, ভাবল মুসা। উত্তেজিত। ভয় চলে গেছে। একবার মনস্থির করলে ভূত ছাড়া আর কিছুকে ভয় পাবার বান্দা নয় সে।
বোধহয় জাগুয়ার চালে উঠেছে। অন্য কিছুও হতে পারে। যা হয় হোক, ভয় পায় না মুসা।
চালের উপর আলো পড়তেই হঠাৎ করে আওয়াজটা বন্ধ হলো। কিছু দেখতে পেল না মুসা। শাহানার চোখেও পড়ল না কিছু। জাগুয়ার নেই। অন্য কোনও জন্তুও নেই। কিচ্ছু না!
ভুতুড়ে কাণ্ড?
ব্যাঙের ডাক ছাড়া চারপাশে কবরের নিস্তব্ধতা।
অন্ধকার চারপাশ। আকাশের তারাও দেখা যায় না। টর্চের আলোয় কিছুই দেখা গেল না। বাংলোর উপরে ঝুঁকে থাকা গাছের ডালগুলোতেও কিছু নেই।
খালি ডাল। অন্তত দশটা হবে। ঝুঁকে আছে বাংলোর চালের উপর। অন্ধকারে ওগুলো দেখতে কেমন রহস্যময় লাগছে, যেন অশুভ কিছুর প্রতিনিধিত্ব করছে।
মুসার দিকে তাকালেন শাহানা, কিন্তু কিছু বললেন না।
কোনও কথা হলো না, সোজা বাংলোর ভিতরে এসে ঢুকল দু'জন। ভিতরে ঢুকে টর্চ নেভালেন শাহানা। মুসা লক্ষ করল, আন্টির হাত কাঁপছে।
ফায়েজাকে তিনি এক গ্লাস দুধ খাইয়ে শান্ত করলেন। একটু পরই ঘুমিয়ে পড়ল ফায়েজা। ওকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে এল মুসা।
এদিকে শাহানা কিলারের জন্য একটা পাত্রে পানি ঢেলেছেন। পরিবেশ এতই গরম যে অ্যালসেশিয়ান দানব সর্বক্ষণ হাঁপাচ্ছে, একটু পর পর চুকচুক করে পানি খাচ্ছে। আজ রাতে মুসার খাটিয়ায় একবার উঠবার সুযোগ পেলে নির্ঘাত পেশাব করে বিছানা নষ্ট করবে।
মুসাকে এতদিনে এই প্রথম বড় হবার স্বীকৃতি দিলেন আণ্টি। কিছু বললেন না ওকে। সান্ত্বনা নয়, অভয় নয়, কোনও কথাই না। তিনি বুঝে গেছেন, ওকে কিছু বলতে হবে না, ও নিজেই জানে কোথায় কী বিপদ হতে পারে। মুসাকে শুধু বললেন, 'চিন্তা করে ছুটির মজা নষ্ট কোরো না। বলো দেখি কী অত ভাবছ?'
'আমি বুঝতে পারছি না চালের ওপর ওটা কী হলো,' বলল মুসা। 'কী ওরকম জোর আওয়াজ করল? কেনই বা তাকে দেখা গেল না? চালের ওপর তো কিছুই ছিল না!'
'নিশ্চয়ই কোনও জন্তু। বাঁদর হতে পারে। আমরা যখন আলো ফেললাম, হয়তো ওটা গাছের ডালগুলোর আড়ালে লুকিয়ে নেমে গেছে। এমন কী আমাজনের

জাগুয়ারও মানুষখেকো হয়ে না পড়লে মানুষকে আক্রমণ করে না।'
'আমার তা মনে হয় না, আণ্টি। চালের ওপর যদি কোন জন্তু থাকত, ওটার পালানোর আওয়াজ পেতাম। অন্য কিছুতে করেছে অমন আওয়াজ।'
'অন্য কিছু? অন্য কিছু কী? অমন আওয়াজ কে করবে?'
'জানি না,' স্বীকার করল মুসা। ওর মাথায় কিছু খেলছে না। মনের কথাটা বলল, 'এখানে ভুতুড়ে কিছু আছে, আণ্টি। জায়গাটা আমার পছন্দ হচ্ছে না। এক কাজ করা যায়, আমরা যদি ঘাসের নমুনা নিয়ে এখান থেকে চলে যাই? অন্য কোথাও এক্সপেরিমেন্ট করলে ফলাফল, মিলবে না? '
মাথা নাড়লেন শাহানা। 'কয়েকটা এক্সপেরিমেন্ট করতে হবে আমাকে। তার জন্যে তাজা ঘাস দরকার। চেষ্টা করে দেখেছি, অন্য জমিতে লাগালে ঘাসগুলো মারা যায়। এখান থেকে যাওয়া চলবে না আমাদের, মুসা। খারাপ যতই লাগুক, আমাদের মাথায় রাখতে হবে আমরা পৃথিবীর জন্যে কাজ করছি। আমি সফল হলে... না, মুসা, এখান থেকে যাওয়া চলবে না আমাদের।'
চুপ করে রইল মুসা। আণ্টি এমনই, মনস্থির করে ফেললে তাকে আর ফেরানো যায় না।
'ওটা বিড়াল জাতীয় প্রাণী,' বললেন শাহানা, 'নিশ্চয়ই ভুল করে চালের ওপর উঠে পড়ে। ওটা নিশ্চয়ই বারবার এমন ভুল করবে না। আগামীকাল আমি প্রায় সারাদিন কাজে ব্যস্ত থাকব। তুমি সাবধানে থেকো। ফায়েজা আর কিলারের দায়িত্ব তোমার ওপরই 'থাকল। আমার কাজের চাপ কমে গেলে তোমাদের সঙ্গে সময় কাটাতে পারব। তখন আমরা স্পিড-বোট নিয়ে ঘুরতে বেরুব। অনেক জায়গায় যাব, পিকনিক করব, মজা করব।'
খুশিতে হেসে ফেলল মুসা। 'আন্টি, আমাকে স্পিড-বোট চালাতে দেবেন?'
'যদি আস্তে চালাও,' রাজি হয়ে গেলেন শাহানা। 'এখন যাও, শুয়ে পড়ো, রাত অনেক হলো। অনেক ভোরে উঠতে হবে কিন্তু। তখন আমি জলাভূমিতে যাব। ... আর ...দুশ্চিন্তা কোরো না। বাংলোর ভেতর কিছু হবে না। আশা করি বনের ভেতরেও বিপদ ঘটবে না আমাদের। আল্লাহ্ আছেন, যাও, ঘুমিয়ে পড়ো, মুসা।'
আন্টির কপালে চুমু দিয়ে শোবার ঘরে এসে ঢুকল মুসা। ভাবনা ওকে পেয়ে বসেছে।
কী ওরকম আওয়াজ করল? কিছুই তো দেখা গেল না! আন্টি ভয় পেয়েছেন। তিনি কী কিছু লুকাতে চাইছেন? সরকারী সংস্থা কয়েকবার তাঁকে মিটিঙে ডেকেছে। তারা কী তথ্য দিয়েছে? ভীতিকর কিছু? কেন এই দুর্গম অঞ্চলে আসতে হলো ওদের? আন্টির মুখে একবার শুনেছে, টাপাজো, কোয়াহিয়া ও ইয়ারুনারা এই এলাকা এড়িয়ে চলে।

বেশ। কিন্তু কেন?
এখানে ভয়ের কী আছে?
মুসার কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না বেড়াল জাতীয় প্রাণী চালে উঠেছে। অমন আওয়াজ করবে? মন থেকে শঙ্কা দূর করতে চাইল। হয়তো দুশ্চিন্তার কারণেই দরদর করে ঘামছে।
দাঁত ব্রাশ করল ও, ড্রেসারের উপর হাতঘড়ি রেখে শুয়ে পড়ল। বাইরে ঝিঁঝি পোকা ডাকছে, সেই সঙ্গে তান জুড়েছে কয়েকটা কোলা ব্যাঙ। ওদের ঘ্যাঙর-ঘ্যাং আওয়াজে কেমন যেন অলসতা আছে। একটা জোনাকী জানালা দিয়ে ভিতরে ঢুকল। মিটমিট করে আলো জ্বেলে উড়ে বেড়াল কিছুক্ষণ, তারপর বেরিয়ে গেল। সরু মোমবাতি জ্বলছে। হলদে ভৌতিক আলো ছড়িয়ে আছে। দূরে ডেকে উঠল শেয়াল। চিৎকার ছাড়ল একটা বানর, তারপর ভেসে এল জাগুয়ারের হুঙ্কার। তারপর সব চুপচাপ। এমন কী ঝিঁঝি আর ব্যাঙের ডাকও থেমে গেছে। চারদিকে নিঃসীম নীরবতা কিছুক্ষণ এপাশ-ওপাশ করে একটু পর ঘুমিয়ে পড়ল মুসা।
পরদিন ভোরে ঘুম ভাঙতে মনটা ফুরফুরে লাগল ওর। দিগন্তে লালচে আলো ছড়িয়ে উঠছে সূর্য। সে-আলো গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে চুরি করে ঘরে এসে পড়েছে। মনেই হয় না জঙ্গলটা ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক।
রান্নাঘর থেকে আণ্টির নাস্তা তৈরির শব্দ ভেসে আসছে। ভউ- ভউ করে দু'বার ডেকে উঠল কিলার। মুসা চেয়ে দেখল, ফায়েজা এখনও ঘুমে কাদা। ড্রেসারের দিকে চোখ পড়তেই ভ্রূ কুঁচকে উঠল ওর।
ড্রেসারের উপর ঘন সবুজ কী যেন লেপ্টে আছে। ঘড়িটা নেই! জিনিসটা সবুজ আঠালো কিছু।
রাতে জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকেছে কিছু! ঘড়িটা নিয়ে গেছে।
কী সেটা?
কিলার আঠালো জিনিসটার দিকে এগোল। বিষাক্ত কিছু হতে পারে!
'কিলার, ওখান থেকে সর্,' চিৎকার করল মুসা।
ঘরঘর আওয়াজ করছে কিলার। তাকিয়ে আছে সবুজ পদার্থটার দিকে। রাতের সেই আগন্তুক এসেছিল বলে প্রচণ্ড রেগে গেছে। শোঁকার জন্যে এগোতেই, মুসার চিৎকারে ফিরে তাকাল।
'আণ্টি!' ডাকল মুসা।
পরের হাঁকে ঘুম ভেঙে গেল ফায়েজার। ঘেউ-ঘেউ করে উঠল কিলার। মুসার ডাকে আতঙ্কের ছোঁয়া চিনতে ভুল হয়নি শাহানার, তিনি দৌড়ে ঘরে এসে ঢুকলেন।

ঘরের ভিতর হুলস্থুল লেগে গেল।
শাহানা সবুজ জিনিসটা পরীক্ষা করতে এগোতেই, কিলার খেপে উঠল! এগোতে দেবে না।
এদিকে ফায়েজা জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে, আম্মু? কী হয়েছে?' সবুজ জিনিসটার দিকে তাকিয়ে আছে ও। 'ওটা কী, আম্মু?'
'এখনও জানি না, সোনা,' জবাব দিলেন শাহানা। কিলারের কলার ধরে আটকে ধরলেন। 'ওটা এক্ষুণি দেখছি। ...কিলার! চুপ কর্ বলছি!'
'আঠালো কিছু,' বলল মুসা। 'রাতে ঘরে ঢুকেছিল। আমি যখন ঘুমাতে যাই, তখনও জিনিসটা ছিল না। ড্রেসারের ওপর ঘড়িটা ছিল, নিয়ে গেছে।' নিজেকে প্রশ্ন করল ও, 'কী ঢুকেছিল যে কিলারও টের পেল না?'
'কিলারকে ধরে রাখো, মুসা, নির্দেশ দিলেন শাহানা, 'ওটা কি দেখছি।'
কিলারের কলার পাকড়ে ধরল মুসা, সামনের ঘরে নিয়ে এল। ওকে রেখে এক দৌড়ে আবারও ঘরে ঢুকল, ভিতর থেকে দরজা আটকে দিল। পিছনে কিলারের প্রতিবাদ শোনা গেল। কুকুরটা একটানা ঘেউ-ঘেউ করছে, দরজায় আঁচড় কাটছে।
'কোন্ প্রাণী এরকম সবুজ আঠা রেখে যেতে পারে, আণ্টি?' জিজ্ঞেস করল মুসা।
'জিনিসটা কেমন যেন গন্ধ ছড়ায়। শুঁকলে মনে হয় কাটা গাছের কাঠের গন্ধ!'
'জিনিসটা কী, আম্মু?' জিজ্ঞেস করল ফায়েজা।
ড্রেসারের উপর ঝুঁকে পড়লেন শাহানা, সাবধানে জিনিসটা পরখ করে দেখলেন। দু'তিনবার গন্ধ শুঁকলেন, তারপর হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখলেন।
'ইয়াক্!' মুখ বিকৃত করল মুসা। 'ছোঁবেন না, আণ্টি! ওটা কী আল্লাহ্ জানে!'
ভাইয়ের অনুকরণে চেহারা বিকৃত করল ফায়েজা।
'জানি না এটা কী,' চিন্তিত স্বরে বললেন শাহানা। 'নিশ্চিত হতে হলে পরীক্ষা করে দেখতে হবে।' হাবভাব দেখে মনে হলো তাঁর বিজ্ঞানী মনটা কৌতূহলী হয়ে উঠেছে। 'তবে এগুলো বিপজ্জনক নয়। বিষাক্ত তো নয়ই। অর্গানিক সাবস্ট্যান্স। কোনও জানোয়ার এ জিনিস ফেলে যায়নি।'
'কী করে জানলেন, আণ্টি?' জিজ্ঞেস করল মুসা।
'কম্পোজিশনটা দেখে। এক ধরনের গাছ থেকে এসেছে। খুবই ইন্টারেস্টিং!' সবুজ আঠালো তরলটা কাছ থেকে দেখলেন তিনি। 'আগে কখনও এমন জিনিস দেখিনি। একটু স্যাম্পল পরীক্ষা করলে কোন্ গাছ থেকে এসেছে জানা যাবে।' মুসার দিকে চাইলেন। 'চিন্তার কিছু নেই।'
চিন্তা না করে উপায় কি, মনে মনে বলল মুসা। রাতে সবার অজান্তে ঘরে ঢুকেছে রহস্যময় জিনিস, ঘড়ি চুরি করে নিয়ে গেছে। যাবার আগে এই সবুজ আঠা

ফেলে গেছে। পরেরবার ফায়েজাকে তুলে নিয়ে যাবে না, তার ঠিক কী!
মুসাকে নিশ্চুপ দেখে শাহানা বললেন, 'আমার ধারণা খাবারের খোঁজে রাতে খরগোশ জাতীয় প্রাণী ঘরে ঢুকেছিল। ওটার মুখে সম্ভবত কোন গাছ ছিল। আবার এমনও হতে পারে, ঘরে ঢোকার আগে এই সবুজ জিনিসগুলোর ওপর গড়াগড়ি করে এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে এসেছে এই আঠালো জিনিস। জন্তুটা বোধহয় কৌতূহলী হয়ে তোমার ঘড়ি মুখে তুলে নিয়ে গেছে। বিশ্বাস হতে না চাইলেও বন্য প্রাণী অনেক অদ্ভুত কাণ্ডই করে।'
'কিন্তু তা-ই যদি হয়,' যুক্তি খুঁজছে মুসা, 'জন্তুটা যখন ঘড়ি নিয়ে গেল তখন মুখের গাছটা ফেলে গেল না কেন?'
'ভাল বলেছ,' প্রশংসা করলেন শাহানা। 'তোমার কথায় যুক্তি আছে। কিন্তু ধরো, ওটা যদি ডাল মুখে না নিয়ে আসে? হয়তো এটার ওপর গড়াগড়ি করে তারপর ঘরে ঢুকেছে। আবার এমনও হতে পারে, ঘরে দুটো জন্তু ঢুকেছিল। একটা তোমার ঘড়ি নিয়ে গেছে, আরেকটা গাছ নিয়ে ফিরেছে? ...ঘটনা যা-ই হোক, দুশ্চিন্তা করার মত কিছু ঘটেনি।'
আণ্টি নিজে চিন্তিত, তা ঠিকই বুঝতে পারল মুসা। ও নিজেও রহস্যের জবাব খুঁজছে। ভাবছে কিশোর হলে এখন কী করত? নিজের দুশ্চিন্তা প্রকাশ করল না ও। ওকে বিচলিত দেখলে আণ্টি চিন্তা করবেন, তাতে কাজের ক্ষতি হবে।
শাহানা নিজের ঘরে চলে গেলেন, একটু পর ল্যাবরেটরির যন্ত্রপাতি বোঝাই একটা ব্যাগ নিয়ে এলেন। সবুজ জিনিসটা একটু তুলে নিলেন, একটা টেস্ট টিউবে ভরে রাখলেন। সাবান পানি দিয়ে ড্রেসারটা মুছলেন। পুরোপুরি পরিষ্কার হলো না উপরটা। এখনও জায়গায় জায়গায় সবুজ আঠা লেগে রইল। মেঝেতে যেটুকু পড়ল সেগুলোও সেঁটে গেল।
'মেঝের ওখানে পা দিয়ো না,' সাবধান করলেন শাহানা, 'এখনও জিনিসটা খুবই আঠালো।'
ফায়েজা পোশাক পাল্টাতে পাশের ঘরে চলে গেল। এই ফাঁকে নিজের গেঞ্জিটা পাল্টে নিল মুসা। একসঙ্গে রান্নাঘরে বসে নাস্তা সারল ওরা। মুসা শোবার ঘরের দরজাটা বন্ধ করে রেখেছে, নইলে কিলার আঠায় আটকে যেতে পারে।
ওরা সবাই ডিম ভাজা, রুটি, পনির আর চা শেষ করে বাংলোর বাইরে চলে এল। আগে আগে চলল কিলার। সরু রাস্তাটা ধরে হাঁটতে হাঁটতে চলে এল ওরা খালের পাড়ে। ওদের স্পিড-বোট ঘাটে বাঁধা, মৃদু ঢেউয়ে অল্প অল্প দুলছে। মুসার মনে হলো, এক্ষুণি যদি এখানকার পাট চুকিয়ে চলে যেতে পারত ওরা, খুব ভাল হতো। এখানে থাকতে ওর মনটা কিছুতেই সায় দিচ্ছে না। মন বলছে, কী যেন একটা বিপদ মাথার উপর ঘনিয়ে আসছে।

খালের পাড় ধরে অনেক দূর হাঁটল ওরা। শাহানা নানা পাখি চেনালেন মুসা আর ফায়েজাকে। দেখালেন কীভাবে গাছ বেয়ে পালিয়ে যায় কাঠবিড়ালী আর গিরগিটি

‘ওই গাছটা দেখছ?’ ফেরার পথে একটা লালচে গাছ দেখালেন। ‘ওটা একটা চিরহরিৎ গর্জন গাছ। সাধারণত এধরনের গাছ দেখা যায় লবণাক্ত অঞ্চলে। গাছের কাণ্ডের কাছে মাটি থেকে যে কাঠির মত জিনিসগুলো বেরিয়ে আছে, ওগুলো আসলে গাছের শেকড়। …আর ওইটা দেখছ? ওটা ট্র্যাভেলার্স পাম ট্রী। আসলে পাম গাছ নয়, কিন্তু পাম গাছের মত দেখতে। আসলে কলা গাছের জাত। এটার পাতা দিয়ে ঘরের ছাউনি দেয়া যায় না। মজার ব্যাপার জানো, পাতাগুলোর ভেতরে মিষ্টি পানি থাকে। তৃষ্ণার্ত পথিক এ গাছের পাতা ছিঁড়ে তেষ্টা মেটাতে পারে।’

‘তা-ই!’ আসলে বলার জন্য বলা, কিছুই ভাল লাগছে না মুসার। কখন কী বিপদ ঘটে যায় সে আশঙ্কায় মনটা সতর্ক হয়ে আছে ওর। এখন যদি একটা জাগুয়ার জঙ্গল থেকে বেরিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে? যদি গাছের ডাল থেকে ঝুলন্ত কোনও বিষাক্ত সাপ ছোবল মারে?

একঘণ্টা পর বাংলোতে ফিরল ওরা। কোনও বিপদ ঘটেনি বলে স্বস্তির শ্বাস ফেলল মুসা। শাহানা জানালেন, বাকি দিন মুসার দায়িত্বে ফায়েজা থাকবে, উনি জলাভূমিতে উনি জলাভূমিতে এক্সপেরিমেন্ট করতে যাবেন।

ব্যাপারটা ভাবতে ভাল লাগল না মুসার, কিন্তু কিছু বলল না। সর্বক্ষণ বিপদের চিন্তা করে মনটাই কেমন যেন গেছে ওর। তাই কিছু বলে আণ্টিকে বিরক্ত করল না।

মুসার মনোভাব শাহানা ঠিকই বুঝেছেন। যাবার আগে বললেন, ‘মনে রেখো, তুমি যদি লক্ষ্মী ছেলের মত থাকো, কালকে তোমাকে স্পিড-বোট চালাতে দেব। সারাদিন ঘুরব আমরা, পিকনিক করব।’

‘ঠিক আছে, আণ্টি, আপনি কোনও চিন্তা করবেন না,’ মুখে জোর করে হাসি টেনে আনল মুসা। ‘আমরা বাংলো ছেড়ে কোথাও যাব না।’

‘ফায়েজার উপর চোখ রেখো,’ বললেন শাহানা।

মুসা ও ফায়েজা দরজায় দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে শাহানাকে বিদায় জানাল। কিলার শাহানার পিছন পিছন ছুটে জলাভূমির তীর পর্যন্ত গিয়ে ফিরে এল। আণ্টি চলে যেতেই বড় একা লাগল মুসার। ভয়ও লাগছে এতোবড় দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে। মনটাকে শক্ত করল ও।

পিচ্চি ফায়েজার সমস্ত দায়িত্ব এখন ওর একার। ভয় পেলে চলবে কেন। বিপদ এলে বুদ্ধি দিয়ে তার মোকাবিলা করতে হবে।

কী করবে কিছুক্ষণ ভেবে পেল না মুসা, তারপর বুদ্ধি করে ফায়েজাকে একটা ছবির বইয়ে রং করার দায়িত্ব দিল। ও ব্যস্ত থাকুক। ছবিতে রং করতে খুব ভালবাসে ফায়েজা। একবার মন বসে গেলে দুনিয়ার আর কিছু খেয়াল থাকে না ওর। সময়টা ওর ভালই কাটবে। আণ্টির কবিতার বই নিয়ে বারান্দায় চলে এল মুসা, পাশে কিলার। চেয়ার টেনে বসে গরমে ঘামতে ঘামতে কবিতা পড়তে শুরু করল মুসা। বাপরে! কবিতার মধ্যে দাঁত ফোটানো যায় না! কিন্তু সময় পার করবে এমন কিছুই তো আর নেই!

আজকে গতকালের চেয়ে গরম বেশি পড়েছে। সূর্য যতই উপরে উঠছে, তাপের প্রকোপ বাড়ছে তত। গোটা জঙ্গল যেন তাতানো কড়াই! মাটি থেকে ভাপ উঠছে! এক ফোঁটা বাতাস নেই। একটা গাছের পাতাও নড়ছে না। থমথম করছে পরিবেশ। মাঝে মাঝে একটা গানের পাখি টুই-টুই করে ডাকছে।

বিশাল অ্যালসেশিয়ানটা মুসার পাশে বসে জিভ বের করে হাঁপাচ্ছে, একটু পর পর বাংলোর ভিতরে গিয়ে পানি খেয়ে আসছে। একমনে ছবিতে রং করছে ফায়েজা। এরই মধ্যে একবার ওকে টয়লেট করিয়ে এনেছে মুসা।

উইলিয়াম ব্লেক, রবার্ট ফ্রস্ট আর এডগার অ্যালান পো'র কবিতা পড়তে গিয়ে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে মুসা। মনটা তেতো হয়ে গেল কিছু বুঝতে না পেরে। এ কী রকম কবিতা! খানিকক্ষণ কসরতের পর ঘুম চলে এল চোখে, চেয়ারে কাত হয়ে শুয়ে পড়ল।

একটু পর চমকে উঠল। বাংলোর পিছন থেকে খচমচ করে আওয়াজ আসছে। ক্রমেই এগিয়ে আসছে শব্দ। জঙ্গলের শুকনো পাতা মাড়িয়ে কে যেন' আসছে!

মানুষ না আর কিছু?

বিপজ্জনক কোনও জন্তু নয় তো?

হৃৎপিণ্ডের গতি বেড়ে গেল মুসার। ঘাড়ের কাছের চুলগুলো দাঁড়িয়ে গেছে। অজানা আশঙ্কায় ভরে উঠেছে মন।

সভ্য জগৎ থেকে অনেক দূরে আছে ওরা। এখানে তো মানুষ থাকার কথা নয়!

তা হলে কী ওটা?

বন্য কোনও জন্তু? বড় কিছু?'

হঠাৎই দেখা গেল তাকে। বাংলোর কোনা ঘুরে বেরিয়ে এসেছে লোকটা। ভয়ানক কুৎসিত চেহারা। মুখভরা দাড়ি। এক চোখের উপর কালো কাপড়ের পট্টি। এক হাতে দুলছে এক মস্ত কুঠার। কোমরে চকচকে ভোজালি গোঁজা। হাসতেই তার বড় বড় হলুদ দাঁতগুলো বেরিয়ে এল। সারির মাঝখানে উপর-নীচে দুটো করে দাঁত নেই, মুখের চৌকো কালো গহ্বরটা দেখা যাচ্ছে।

মুসাকে দেখেই শয়তানী হাসি ফুটল লোকটার মুখে! এমন ভাবে তাকাল যে গলা শুকিয়ে গেল মুসার। কসাইরা গরু জবাই করবার আগে গরুর দিকে ওভাবে তাকায়। যেন দেখছে, গায়ে মাংস আছে কি না!
ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, 'যাক, খাবার পাওয়া গেল!'
ভয়ে মুসার মুখ দিয়ে অজান্তে অস্ফুট চিৎকার বের হলো, লাফ দিয়ে কিলারের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল।
গলা ফাটিয়ে চিৎকার শুরু করল কিলার। দাঁত আর মাড়ি বের হয়ে এসেছে। ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত।
কী করা উচিত এখন? ব্যস্ত হয়ে ভাবতে চাইল মুসা।
দৌড়ে গিয়ে বাংলোর ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেবে? কিন্তু ওই দরজায় ছিটকিনিই তো নেই!
ফায়েজার হাত ধরে বনের ভিতর দৌড় দেবে? পালানোর চেষ্টা করবে?
ফায়েজা বেশিক্ষণ দৌড়াতে পারবে না। তা ছাড়া, ওর দৌড়ের গতিও কম। ওকে কোলে তুলে বেশিক্ষণ ছুটতে পারবে না ও।
উন্মাদ লোকটাকে বলবে নাকি যে ওর মাংস তেমন ভাল না? মোটেই স্বাদ নেই! তাতে লাভ হবে কোনও? পাগলটাকে দেখে জন্ম- জন্মান্তরের বুভুক্ষু মনে হয়!
পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে!
মুসাকে ভীত চোখে তাকিয়ে থাকতে দেখে হাসি আরও চওড়া হলো।
'ভয় পেয়ো না,' অবশেষে বলল সে। 'গত তিনবছরে আমি কোনও বাচ্চা খাইনি। তুমি বড় বেশি ঢ্যাঙা। তা ছাড়া আমার এমন পাকা ছেলে খাওয়ার ইচ্ছে নেই। কচি পেলে অবশ্য...'
চট্ করে পিছনে তাকাল মুসা। ঘরের মধ্যে ফায়েজা আছে!
এবার সশব্দে হেসে উঠল লোকটা। গলার গভীর থেকে ঘড়ঘড়ে আওয়াজ বেরিয়ে এল। মনে হলো কুলকুচি করছে। হাসি দেখে মনে হলো এই মাত্র দুনিয়ার সেরা কৌতুকটা বলেছে সে!
'অ্যাই ব্যাটা কুকুরের বাচ্চা, চিৎকার থামা!' নোংরা একটা পুরুষ্টু হাত বাড়িয়ে দিল সে কিলারের দিকে।
কী আশ্চর্য, কিলার হাতটা একবার শুঁকেই ঘেউ-ঘেউ বন্ধ করে লেজ নাড়তে শুরু করল!
'এই তো, লক্ষ্মী ছেলে,' বলল পাগল। 'আমি তোমার কোনও ক্ষতি করব না। নাকি করব? অ্যা? হাহ্ হাহ্ হাহ্!'
'কি-কি... কে আপনি?' জিজ্ঞেস করল মুসা। ভয়ে বুক কাঁপছে। কিলারও এখন আর সাহায্যে আসবে না। কোনও মিথ্যে বলে পাগলটার হাত থেকে পার পাওয়া

যাবে কি না, ভাবার চেষ্টা করল।
এমন একটা কিছু বলতে হবে যাতে ওদের ক্ষতি না করেই চলে যায়। গলা খাঁকারি দিল মুসা, তারপর গম্ভীর চেহারা করে বলল, 'আমার আণ্টি পুলিশ আনতে গেছে। গতরাতে এখানে ঝামেলা হয়েছিল। এক্ষুণি চলে আসবে সবাই।'
ফিক করে হেসে দিল লোকটা। 'আচ্ছা! তা হলে তোমার আন্টি পুলিশ ডাকতে গেছে, না? তবে তো তাকে বহুদূর যেতে হবে। স্পিড-বোট না নিয়ে গেল কী করে? জেনে রাখো, পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে কোনও পুলিশ নেই। চাপা ছাড়ো হে খোকা, তোমাদের ওসব জারিজুরি আমার ভালই জানা আছে।' কুঠারটা কাঁধে ঝোলাল সে। 'শোনো খোকা, ভয় পেয়ো না। আমি তোমাদের কোন ক্ষতি করতে আসিনি।'
'কে আপনি? এখানে কী করছেন?'
'আমি? আমি কানা ক্যানারেঞ্জ। মানে রেভারেও ক্যানারেঞ্জ স্টিভেনসন। যাজক। আদিবাসী মানুষগুলোকে ধর্মের দিকে টেনে আনা আমার কাজ। ম্যানুয়াস শহরে সবাই কানা ক্যানারেঞ্জ বলেই চেনে। আমার আরেকটা পরিচয়, আমি জীববিজ্ঞানী। নানা প্রাণীর স্বভাব নিয়ে গবেষণা করি।' একটু থামল সে, তারপর বলল, 'গবেষণা করতে গিয়েই চোখটা গেছে আমার। একটা ভালুক খুবলে নিয়েছিল।'
'ভালুক? খুবলে নিয়েছে?'
'হ্যাঁ, ভালুক। খুবলেই তো নিল। সে এক বিরাট কাহিনি। মন ভাল থাকলে কোনওদিন সে কাহিনি তোমাকে বলতেও পারি।' ক্যানারেঞ্জ স্টিভেনসন হাত তুলে বাংলোর পিছন দিকটা দেখালেন। 'আমি ওদিকে থাকি। তিন মাইল দূরে আমার ছাপরা।'
মাথা চুলকাল মুসা, কী বলবে ভেবে পেল না।
'দশ বছর ধরে আমি আমাজনে গবেষণা করছি,' বললেন যাজক। 'গতরাতে দেখলাম এই বাংলোয় মানুষ এসেছে, তা-ই চলে এলাম। হাজার হলেও তোমরা আমার প্রতিবেশী।'
'এই বনের মাঝে থাকেন আপনি?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল মুসা। 'খারাপ লাগে না? এত বিপদ চারধারে। বনের জাগুয়ার, পানিতে কুমির, গাছে সাপ!'
'কী যে বলো হে, খোকা,' একগাল হাসলেন স্টিভেনসন। 'দুনিয়ায় এর চেয়ে দারুণ জায়গা আর আছে নাকি! তবে সেটা বুঝতে হলে তোমাকে আগে চিনতে হবে বনের সৌন্দর্য। আমি তো সভ্যতার ওপর বিরক্ত হয়ে গিয়েছিলাম। ভার্সিটিতে একই বিষয়ে দিনের পর দিন ক্লাস নিতে নিতে মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল। শেষে চাকরি ছেড়ে দিলাম, যাজক তো আগেই ছিলাম, এবার এখানে এসে প্রাণে বেঁচে

গেলাম। এখানে ফালতু মানুষ এসে জ্বালাতন করে না। সভ্যতা মানেই ধ্বংসের শুরু।'

'সভ্যতা মানে ধ্বংসের শুরু? অবাক হলো মুসা। 'সভ্যতা তো সবকিছু সুন্দর করে গড়ে তোলার জন্যেই!'

আন্টির এক্সপেরিমেন্টের কথা মনে পড়ল ওর। সভ্যতার জন্যই গবেষণা করছেন তিনি। তাঁর গবেষণা সফল হলে এই বন আর বন থাকবে না। মানুষ আসবে, ঘাস চাষ হবে, বিরাট বিরাট ফ্যাক্টরি তৈরি হবে, সেসব ফ্যাক্টরিতে সার তৈরি হবে, পৃথিবীর উন্নতি হবে—মানুষ উপকৃত হবে।

'এই সভ্যতা প্রকৃতিকে শেষ করে দেয়, তা জানো?' বললেন প্রফেসর। মাথা নাড়লেন দুঃখের সঙ্গে। 'এই যে বন, এর কত গুরুত্ব বোঝো? এই বন না থাকলে দেশ মরুভূমি হয়ে যাবে—তখন মানুষ চাষবাস করতে পারবে না, দুর্ভিক্ষে না খেয়ে মরবে। স্বয়ং ঈশ্বর সেজন্যে গাছপালাকে নিজেদের রক্ষা করার ক্ষমতা দিয়েছেন। যদি কেউ ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যায়, আখেরে তাকে পস্তাতেই হবে। ... যা বলছিলাম,' বলে চললেন তিনি, 'দুনিয়ার মানুষের অবিবেচনায় বিরক্ত হয়ে শেষে আমি জঙ্গলে চলে এসেছি। দিনগুলো সুন্দর কাটছে এখানে, বিরক্ত করবে এমন কেউ নেই। ...মানুষ শুধু কী চেনে জানো? টাকা আর টাকা। আর কিছু নয়। প্রকৃতিকে ধ্বংস করে, নিজের সর্বনাশ করে, তার পরও তার চাই শুধু টাকা! কী হবে এত টাকা টাকা করে? খেয়ে পরে সুখে-শান্তিতে বাঁচতে হলে মানুষের খুব বেশি কিছু লাগে না। কিন্তু বেশিরভাগ মানুষের চাহিদার শেষ নেই। অভাব তা-ই কোনদিন মেটে না মানুষের। আসল ব্যাপার কি জানো? মানুষ আসলে সভ্য হয়নি। সভ্য হলে মানুষ অল্পে সন্তুষ্ট থাকত।'

চমৎকার করে কথা বলেন প্রফেসর। হাঁ করে শুনছে মুসা। বারবার ওর মনে হলো, আন্টির এক্সপেরিমেন্ট আমাজনকে বদলে দেবে। সেটা বোধহয় ঠিক হবে না। প্রকৃতি তার ভারসাম্য হারালে তাতে মানুষের মঙ্গল নেই।

প্রফেসর যেন ওর মনের কথা পড়ছেন। বললেন, 'আমি জান দিয়ে দেব, কিন্তু মানুষের হাতে এই অরণ্য নষ্ট হতে দেব না। কেউ যদি এই জঙ্গলের ক্ষতি করার চেষ্টা করে, তার চরম সর্বনাশ করতেও বাধবে না আমার। স্রেফ খুন করে মাটিতে পুঁতে ফেলব।'

কথা বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে উঠছেন তিনি। চোখ গরম করে মুসার দিকে তাকালেন, যেন মুসাই আসল কালপ্রিট, বন ধ্বংস করতে এসেছে। 'আমার অনেক বন্ধু আছে। তাদের অনেকে সরকারী বড় বড় পদে আছে। আমি খবর পেয়েছি, শীঘ্রি আমাজনকে বদলে দেবার পরিকল্পনা করা হবে। তা-ই যদি হয়, আমি একাই সবার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করব।' স্টিভেনসন কোমরে হাত দিয়ে

ভোজালি স্পর্শ করলেন। ওটার ফলা এতই ধারাল যে, এক পলকে ওটা দিয়ে মানুষকে কুচি কুচি করা যাবে।
মুসার মনে হলো মানুষটার রক্তলাল চোখ থেকে আগুন বেরিয়ে আসছে। সে দৃষ্টি স্বাভাবিক মানুষের মত নয়। বদ্ধ উন্মাদের দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন তিনি। মুসা ঢোক গিলল, উনি কি জানেন আণ্টি আমাজনকে বদলে দেবার পক্ষে কাজ করছেন?
এই লোক যদি সত্যিই টের পেয়ে যান, ওরা কেউ এই জঙ্গল থেকে জীবিত ফিরবে না!
স্টিভেনসন ভোজালি বের করে ধারালো ফলায় হাত বুলালেন, তারপর মৃদু গলায় বললেন, 'আমি এটা সব সময় সঙ্গে রাখি। বলা যায় না কখন কী কাজে লেগে যায়।' তাকিয়ে আছেন তিনি মুসার চোখে, যেন মনের ভিতরটা পড়ছেন!
'আশা করি এখানে আপনার ওটা ব্যবহার করতে হবে না,' ঢোক গিলে বলল মুসা, বুকের ভিতরটা শুকিয়ে কাঠ।
'এখানে? এই বাংলোয়? না, বাছা, এখানে এটার দরকার পড়বে না।' হাসলেন যাজক। 'এখানে এমন কেউ নেই যাকে আমি কেটে মাটিতে পুঁতে ফেলতে চাইব।'
ভোজালিটা আবার কোমরে গুঁজলেন তিনি। 'তুমি এই বয়সেই বড় বেশি চিন্তা করো,' মুসাকে বললেন। 'তোমার বয়সে বাচ্চাদের ছুটোছুটি করা উচিত। অন্য কেউ হলে হয়তো ব্যাং তাড়া করত, বা গাছে উঠে মজা করত। মাছও ধরত হয়তো। এমন রোদেলা দিনে কেউ ঘরে বসে থাকে নাকি! যাও, বাইরে থেকে এক চক্কর ঘুরে এসো, মজা পাবে।'
'ভাল লাগে না,' স্বীকার করল মুসা নির্দ্বিধায়। 'আপনি যে কী করে এই বনে একা পড়ে আছেন, অবাক লাগছে। আমার তো আসার পর থেকেই দম বন্ধ হবার জোগাড়। মনে বলছে কবে ফিরব, আর কবে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হবে।'
'আর আমি মানুষের ওপর বিরক্ত হয়ে জঙ্গলে চলে এসেছি,' হাসলেন প্রফেসর। 'এই মুক্ত আকাশ, এই মুক্ত বাতাস, এই বন্য নিষ্কলুষ প্রকৃতি—চমৎকার লাগে আমার কাছে। ভার্সিটির কোয়ার্টারে যখন থাকতাম, মনে হতো দম বন্ধ হয়ে মরব। তা-ই চলে এসেছি।'
'আপনার আর কেউ নেই?'
'নাহ্!' আপন মনে হাসলেন স্টিভেনসন। বোঝা গেল এই বিপজ্জনক এলাকায় থাকতে পেরে তিনি ভীষণ আনন্দিত।
লোকটাকে এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না মুসা। পাগল না হলে জঙ্গলে থাকে কেউ! হয়তো বদ্ধ উন্মাদ, কিন্তু বোঝা যায় না সহজে। হয়তো যে-কোন সময় রূপ পাল্টে ঝাঁপিয়ে পড়বে। ফায়েজা ঘরের ভিতর একা ছবিতে রং করছে। লোকটা যদি সত্যিই আক্রমণ করে? আণ্টি ওকে ফায়েজার সম্পূর্ণ দায়িত্ব দিয়ে গেছেন!

চট্ করে একবার বাংলোর দরজার দিকে চাইল মুসা। ফায়েজা মনোযোগ দিয়ে রং করছে। স্টিভেনসন হয়তো জানেও না ও ছাড়াও বাংলোর ভিতর আরেকজন আছে। মুসা ঠিক করল, যত দ্রুত সম্ভব লোকটাকে বিদায় করার চেষ্টা করবে।
‘খুব খুশি হয়েছি আপনি দেখা করতে এসেছেন,’ বলল মুসা, ‘কিন্তু…’
‘না, না, এ কিছু নয়।’
‘আসলে হয়েছে কী, আণ্টি আসার আগে আমাকে কিছু কাজ সেরে রাখতে হবে। আমি যদি এখন যাই, তা হলে কি সেটা অভদ্রতা হয়ে যাবে?’ মিথ্যে বলল মুসা।
‘আন্টি শীঘ্রি চলে আসবে।’
‘তোমার আণ্টি তা হলে শীঘ্রি আসবে, না?’ ভ্রূ কুঁচকালেন তিনি। উদাস একটা ভঙ্গি। ‘হয়তো আসবে, হয়তো আসবে না। প্রতিবেশী হিসেবে দেখা করতে এসেছি, কিন্তু বুঝতে পারছি তুমি চাও আমি তাড়াতাড়ি চলে যাই। মাত্র তো পরিচয় হলো। আমার ইচ্ছে ছিল তোমার সঙ্গে বেশ করে আরও অনেক গল্প করব। তা ছাড়া, এখানে এসেই আমার ভাল লাগতে শুরু হয়েছে।’
এ দেখি কিছুতেই যেতে চাইছে না, চিন্তিত হয়ে ভাবল মুসা।
‘না, না, আসলে আমি আপনাকে বিদায় করতে চাইছি না, ‘ মিথ্যে বলল আবারও। ‘আসলেই কিছু কাজ জমে আছে। তা ছাড়া, এই গরমে কেমন যেন অসুস্থও লাগছে। মাথাটা খুব ধরেছে। কেমন যেন. বমি-বমি লাগছে। মনে হয় জ্বরও আসছে। এখন একটু শুয়ে থাকলে ভাল লাগবে।’
‘বোধহয় আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারব,’ বললেন স্টিভেনসন। ‘একটা পুটুলিতে আমি গাছগাছড়া রাখি। ছোটখাটো অসুখ সারিয়ে দিতে এসবের জুড়ি নেই। থাকছি তা হলে আমি। তোমার পাশে এখন কারও থাকা দরকার।’ পকেট থেকে কাপড়ের একটা পুটুলি বের করলেন তিনি।
আগেই মুসা বলল, ‘অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, কিন্তু আমি বরং এখন একটু শুয়ে থাকি, তা হলেই ভাল লাগবে।’ একটু থেমে বলল, ‘থাকতে চাইছেন বলে অনেক ধন্যবাদ, কিন্তু আমি আপনার সময় নষ্ট করতে চাই না। কত কাজ ফেলে এসেছেন আপনি! চিন্তা করবেন না, একটু বিশ্রাম নিলেই আমি সুস্থ হয়ে যাব।’
গোমড়া মুখ করলেন স্টিভেনসন। বোঝা গেল মনে বেশ চোট পেয়েছেন। বললেন, ‘প্রতিবেশীর প্রতি ন্যায্য আচরণ করছ না তুমি, খোকা। বলো, এখানে কথা বলার মত মানুষ আমি পাই? ইংরেজি জানা মানুষ হিসেবে তোমাকে অনেক দিন পর পেয়েছিলাম। ইচ্ছে
অনেক গল্প করব, কিন্তু তুমি যখন আমাকে ভাগিয়ে দিতে চাহছ…. ঠিক আছে, তোমাকে আর বিরক্ত করব না। তা হলে চললাম আমি।’ পা বাড়িয়েও আবার থামলেন। ‘যাব, না থাকব?’

‘আমার শরীরটা ভাল লাগছে না,’ বলল মুসা। ‘পরে না হয় আপনার সঙ্গে জমিয়ে গল্প করব। তখন অনেক সময় পাওয়া যাবে। আমরা এখানে সারা সপ্তাহ আছি। এখন একটু বিশ্রাম না নিলে মরেই যাব।’
কাঁধ ঝাঁকালেন প্রফেসর। ‘তা হলে যাই। যেখানে আমার উপস্থিতি কেউ পছন্দ করছে না, সেখানে থাকা ঠিক নয়। ... সত্যি, তুমি আমাকে অবাক করলে। জঙ্গলের ভেতর তোমার বয়সী ছেলে আমার মত জীববিজ্ঞানীকে পেলে কত প্রশ্ন করত, আর তুমি সত্য- মিথ্যা বলে আমাকে তাড়িয়ে দিতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছ।’ বাংলোর কোনার কাছে গিয়ে ঘাড় ফেরালেন তিনি। ‘সাবধানে থেকো, এলাকাটা বিপজ্জনক। আমিও কয়েকদিন আশপাশেই থাকব। যদি কোন সাহায্য দরকার হয়, গলা ছেড়ে ডাকতে লজ্জা কোরো না।’ বাংলোর পিছনের জলাভূমির তীর নির্দেশ করলেন আঙুল তুলে। ‘ওদিকে আধ মাইল দূরে আমার আরেকটা ছাপরা আছে। গেলেই আমাকে পাবে। চেঁচিয়ো। আশপাশেই থাকি আমি।’
‘অনেক ধন্যবাদ আপনাকে,’ মনে মনে হাঁফ ছেড়ে বলল মুসা। ওর বুকের উপর থেকে ভারী একটা পাথর নেমে গেল। বাংলোর দরজার দিকে পা বাড়াল। জানে, একা ও কোনদিনও স্টিভেনসনের ধারেকাছে ভিড়বে না। কোন সাহায্যের দরকার হলেও না।
প্রফেসরের পায়ের আওয়াজ দূরে চলে গেল। লোকটা চলে যেতে এতক্ষণ পর স্বস্তির শ্বাস ফেলল মুসা, ‘কিলার, আমার সঙ্গে আয়,’ বলে দরজার দিকে এগোল। ঘুরে দেখল পিছনে কোনও শব্দ নেই।
কিলার নেই! কোথায়?
‘কিলার!’ গলা চড়িয়ে ডাকল মুসা। বুড়ো লোকটার সঙ্গে চলে গেল? ওর তো কোথাও যাওয়ার কথা নয়!
‘কিলার!’
ঘেউ-ঘেউ করে ছুটে আসার কথা কিলারের। কিন্তু দেখা নেই। ফায়েজার হাত ধরে বাংলোর চারপাশ একবার ঘুরে এল মুসা। শিস বাজাল।
ডাকল ফায়েজাও।
‘কিলার!’
আসছে না কুকুরটা।
কিলারের স্বভাব মোটেই এমন নয়। দূরে কোথাও যাওয়ার কথা নয় ওর। তা ছাড়া, যেখানেই থাকুক, ডাকলেই ছুটে আসে।
ভয় পেল মুসা। মনের মাঝে কু ডাকছে। আণ্টির আসতেও অনেক দেরি।
নিশ্চয়ই কিলারের কিছু হয়েছে!

স্রেফ গায়েব হয়ে গেছে কুকুরটা এই গহীন জঙ্গলে। পনেরো মিনিট পার হলো চরম উৎকণ্ঠায়, ফিরল না কিলার।
জাগুয়ার খেয়ে নিল?
কুমির?
সাপে কেটেছে?
যা-ই ঘটুক না কেন, আওয়াজ তো হওয়ার কথা। কোনও সাড়াশব্দ না করেই অদৃশ্য হয়ে গেছে কিলার!
ফায়েজা কাঁদতে শুরু করল।
'আম্মু কই! আম্মু কোথায় গেল! আম্মু! আম্মু!'
মুসা বুঝতে পারছে, ও যে ভয় পেয়েছে, সেটা স্পষ্ট টের পেয়েছে ফায়েজা। সেজন্যই আরও বেশি কাঁদছে। নিজেকে শান্ত করল মুসা। এখন মাথা গরম করার সময় না। ফায়েজাকে বলল, 'কিচ্ছু হয়নি, ফায়েজা। আমরা কিলারকে খুঁজে পাব। ও বোধহয় মজা করে ব্যাং তাড়া করছে।' নিজের কথা নিজেই বিশ্বাস করতে পারল না মুসা। 'আণ্টি এখন নেই, কিন্তু একটু পর চলে আসবে। ততক্ষণ এসো, আমরা কিলারকে খুঁজি। মনে করো আমরা কিলারের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছি, কেমন?'
মাথা দুলিয়ে সায় দিল ফায়েজা, মুসার কথা পছন্দ হয়েছে।
হাত ধরাধরি করে সরু পথটা ধরে কয়েক শ' গজ এগিয়ে গেল ওরা। কিলারকে ডাকল। কুকুরটার দেখা নেই।
বাংলোয় ফিরে এল ওরা। মুসা বারবার ডাকতে লাগল।
কিলারের কোনও জবাব নেই।
মুসা বুঝল, মাত্র একটা জায়গা খোঁজা বাকি আছে। সেখানে ও যেতে চায় না, কিন্তু না গিয়ে আর কোনও উপায় নেই।
জঙ্গলের ভিতর ঢুকতে হবে। ঘন এই জঙ্গল। মোটা মোটা গাছ আর লতা-পাতা দিয়ে বোঝাই। সূর্যের আলো মাটিতে এসে পড়তে পারে না। আছে নানা হিংস্র জন্তু।
কিলার বোধহয় জঙ্গলে ঢুকেছে। তারপর পথ হারিয়ে ফেলেছে, ফিরতে পারছে না। ওকে খুঁজে বের করতে হবে।
বাংলোর ভিতর ফায়েজাকে নিয়ে এল মুসা, ভাবছে ভাগ্যিস ফায়েজার কিছু হয়নি। ছবি রং করার বই ধরিয়ে দিল ও ফায়েজাকে। অনেকক্ষণ এগুলো নিয়ে ব্যস্ত থাকবে ফায়েজা, সে সময়ে কিলারকে খুঁজে বের করবে মুসা।
'এখানে বসে থাকবে, ফায়েজা,' নির্দেশ দিল মুসা। 'যা-ই ঘটুক, বাংলো ছেড়ে বেরবে না। আণ্টি বা আমি না আসা পর্যন্ত চুপ করে বসে থাকলে কী হবে,

জানো? বাড়ি ফিরে তোমাকে চকলেট কিনে দেব।'
ঘাড় দোলাল ফায়েজা। চকলেট ওর খুব প্রিয়। চকলেট যখন পাওয়া যাবে, কথা মত বসে থাকবে ও।
মুসা জঙ্গলের দিকে পা বাড়িয়ে মনে মনে একটা সুরা আউড়ে নিল। ইচ্ছে করছে না যেতে, কিন্তু মনের ইচ্ছের বিরুদ্ধে হলেও যেতে হবে। যেতে হবে কিলারের জন্য।
গহীন জঙ্গল। পথ নেই কোনও। গাছের মাঝ দিয়ে ঝোপঝাড় ভেঙে এগোতে হলো। চারপাশে শুধু সবুজ আর সবুজ। মাইলের পর মাইল এই একই জঙ্গল।
জঙ্গলের ভিতর গরম আরও বেশি। দরদর করে ঘামছে মুসা, শ্বাস আটকে আসছে।
হিংস্র জন্তুর মুখোমুখি হতে পারে, সে-ভয় তো আছেই। বেশি ভয় সাপের কথা ভেবে।
এখনও বেশি ভিতরে ঢোকেনি মুসা। জঙ্গলে ঢুকবার আগে শেষবারের মত কিলারের নাম ধরে ডাকল। মনে আশা: বিশাল কুকুরটা এক্ষুণি লেজ নাড়তে নাড়তে ছুটে আসবে।
'কিলার!'
সাড়া নেই কোনও। চারপাশে বিরাজ করছে থমথমে নীরবতা। সেই স্তব্ধতা ভেঙে ডেকে উঠল একটা ডাহুক পাখি। জবাব দিল একটা তক্ষক সাপ।
এগিয়ে চলেছে মুসা, জানে না কোনদিকে চলেছে। ফিরে যেতে পারবে কি না, সেটাও নিশ্চিত নয়। কী হবে যদি ও নিজেও হারিয়ে যায়? চিন্তাটাকে প্রশ্রয় দিল না মুসা। ভয় পেলে মনের জোর নষ্ট হয়। পুরুষ মানুষদের ভয়কে জয় করা উচিত।
যতই ভিতরে ঢুকছে, ততই ঘন হচ্ছে জঙ্গল। ভিতরে আলো প্রায় ঢোকেনি বললেই চলে। চারপাশে আবছা অন্ধকার। সূর্যের রশ্মি গাছের পাতার সামান্য কয়েকটা ফাঁক দিয়ে নীচে নেমেছে। সে- আলো স্পষ্ট দেখবার জন্য যথেষ্ট নয়।
দু'হাতে সামনে থেকে ডাল সরিয়ে এগোতে হচ্ছে। মুসার মাথার চারপাশে ভিনভিন করে উড়ছে মাছির দল। এক ঝাঁক মশাও এসে হাজির। পিনপিন আওয়াজ করছে, ঘুরে ঘুরে উড়ছে ওর মাথার চারপাশে।
কিলারের নাম ধরে বারবার ডাকছে মুসা। মোটা একটা গাছ পাশ কাটিয়ে থমকে দাঁড়াল মুসা। কিলারের গলায় বাঁধা কলার একটা লতাগাছের সঙ্গে আটকে আছে!
ওটা হাতে নিয়ে এগোল ও। মন বলছে সামনেই কোথাও আছে কিলার। কলার যখন পাওয়া গেছে, কিলারও ওদিকে আছে।

কুকুরটার হলোটা কী! এতক্ষণে ওর সাড়াশব্দ পেয়ে ছুটে আসার কথা। আসছে না কেন?
সূর্যের আলো এক জায়গায় জঙ্গলের ভিতর এসে পড়েছে। ওখানে চোখ পড়তেই থমকে দাঁড়াল মুসা। আগে কখনও এমন দৃশ্য দেখেনি।
কিলারকে আর খুঁজবার দরকার নেই। যা দেখেছে তাতে ঘাড়ের চুল দাঁড়িয়ে গেল মুসার, অজান্তেই আটকে ফেলল শ্বাস।
একটা গাছের গোড়ায় পড়ে আছে অ্যালসেশিয়ান কুকুরটা। নিথর। কোনও নড়াচড়া নেই। বুকটা ফুলে ফুলে উঠছে না।
'কিলার!' অস্ফুট স্বরে ডাকল মুসা।
নড়ল না ওটা একচুল। বন্ধ চোখ খুলল না।
মারা গেছে কিলার। কাত হয়ে মাটিতে পড়ে আছে। গলায় পেঁচিয়ে আছে এক মোটা লতা-গাছ।
শ্বাস আটকে মারা গেছে কিলার!
কে মারল?
সে কোথায়?
সে কি মুসাকেও শেষ করে দেবে?
কাছেই অপেক্ষা করছে?
সন্ত্রস্ত চোখে চারপাশ দেখল মুসা। থমথমে পরিবেশ।
কোথাও কোনও নড়াচড়া নেই।
কিলারের পাশে গিয়ে বসল মুসা, এখনও নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। হাত দিয়ে স্পর্শ করল। শরীরটা এখনও গরম। বেশিক্ষণ হয়নি খুন হয়েছে।
চোখের পানি ধরে রাখতে পারল না মুসা। হাতের উল্টোপিঠে চোখ মুছল। বুঝতে পারছে না এমন কি ঘটল যে কিলারকে খুনই করতে হলো? জঙ্গলের ভিতর কে খুন করল কিলারকে?
কেন?
আণ্টি হলে এখন কী করতেন, ভারবার চেষ্টা করল মুসা। নিজেকে প্রশ্ন করল। জবাবও পেল। আণ্টি হলে চিন্তা করতেন, আগে এ বিষয়ে আরও তথ্য দরকার।
মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। নিজেকে বলল মুসা, মাথা ঠাণ্ডা করো! দিশেহারা হলে চলবে না। যুক্তি দিয়ে পরিস্থিতি বিচার করতে হবে।
কিলারের শরীরটা ভাল করে দেখল মুসা।
মুখের ভিতর কিছু নেই। লতা-গাছটা সরিয়ে দেখল। লতা পেঁচিয়ে যাওয়ায় গলায় গভীর দাগ বসেছে। কে লতা পেঁচিয়ে শ্বাস ক মারল কিলারকে? প্রচণ্ড শক্তি ছিল কিলারের। ওকে যে মেরেছে সে নিশ্চয়ই বিশালদেহী।

প্রফেসর স্টিভেনসনের কথা মনে পড়ল মুসার। লোকটার গায়ে বোধহয় কিলারকে মারার মত জোর আছে। এই জঙ্গলের ভিতর সে ছাড়া আর কেউ নেই। এটা তারই কাজ, স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছল মুসা। কিন্তু কেন করল, তার কোনও জবাব খুঁজে পেল না।
হয়তো এই স্টিভেনসন বদ্ধ উন্মাদ, নইলে প্রফেসারি ছেড়ে একা এই গহীন বনে বাস করে? হয়তো একে একে ওদের সবাইকে শেষ করবে! হয়তো সেই পরিকল্পনাই এঁটেছে! হয়তো সে জানে আণ্টি আমাজনকে বদলে দিতে এক্সপেরিমেন্ট করছেন!
একটা কথা মনে করে শিউরে উঠল মুসা।
বাংলোয় ফায়েজা একা!
একেবারে একা!
উন্মাদটা হাসতে হাসতে ওকে খুন করতে পারবে!
চোখের পানি মুছল মুসা, মনটা শক্ত করে নিল। উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল। যেদিক থেকে এসেছে, সেদিকে ফিরে চলেছে। কিছুদূর যাওয়ার পর অন্যরকম একটা অনুভূতি হলো ওর। মন বলল, এটা ভিন্ন কোনও দিক! যেদিক থেকে এসেছে, সেদিকে যাচ্ছে না!
ঝোপঝাড়ের মাঝ দিয়ে ঠাহর করার চেষ্টা করল। কিছু বোঝা গেল না। পরিষ্কার বুঝল মুসা, পথ হারিয়েছে ও। ঠাণ্ডা ঘাম নামতে শুরু করল পিঠ বেয়ে।
এখন?
ভাঙা ডাল বা ছেঁড়া পাতা দেখে দিক ঠিক করতে হবে। কিন্তু কিছুই চোখে পড়ল না।
হাঁটতে শুরু করল মুসা। একটু পর মনে হলো, একই জায়গায় ঘুরপাক খাচ্ছে। সবদিকই দেখতে এক রকম। বড় বড় সব গাছ। সূর্যের আলো নীচে নামছে না। সামান্য আলোয় জঙ্গলটাকে ভুতুড়ে লাগছে। একটা আওয়াজ নেই কোথাও। একটা পাখিও ডাকছে না।
হারিয়ে গেছে মুসা।
কোনদিকে বাংলো, তা ওর জানা নেই। ঘোর জঙ্গলের মাঝে ও একা। ফায়েজার জন্য কী করবে ও? নিজের জন্যই তো কিছু করতে পারবে না!
ওদিকে খুনের মত্ত নেশায় বিনা বাধায় ঘুরছে বদ্ধ উন্মাদ এক প্রফেসর। সে হয়তো এতক্ষণে বাংলোর কাছে পৌঁছে গেছে। আস্তে আস্তে নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছে! ফায়েজাকে খুন করবে!
আবার এমনও হতে পারে, লোকটা এখনও জঙ্গলের ভিতর, এগিয়ে আসছে ওর দিকে!

খুন করতে!
গলা ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে হলো মুসার। জোর করে কান্না আটকে রাখল। বুঝতে পারছে, হয় ফায়েজা সাঙ্ঘাতিক বিপদে পড়েছে, নয়তো ও নিজে বিপদের মুখে পড়েছে।
যে করে হোক বাংলোয় ফিরতে হবে। ফিরতে হবে দ্রুত। কিন্তু কী করে? কোন্‌দিক থেকে জঙ্গলে ঢুকেছিল, তার কোনও চিহ্ন নেই! চোখে কিছুই পড়ছে না।
চারপাশে আবছা অন্ধকার। পাতার ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে চিকন সূর্যরশ্মি মাটিতে পড়ছে। জঙ্গলের ভিতরটা এত অন্ধকার কেন? এত গরম লাগছে যে মনে হয় ওকে সবুজ এক আভেনে ঢুকিয়ে সেদ্ধ করা হচ্ছে।
একটা গাছের ডালে বসে মুসার দিকে তাকিয়ে ভেঙচি কাটল এক বাঁদর, ডাল ধরে ধরে চলে গেল অন্য গাছে। দূর থেকে পাখি ডাকল। ওগুলো নিশ্চয়ই জলাভূমির কাছে। ওদিকে যেতে পারলে হয়তো পথ খুঁজে পাবে ও। আওয়াজ লক্ষ্য করে এগোল।
পিছনে একটা শুকনো ডাল ভাঙার আওয়াজ পেল। ডালটার উপর ভারী কিছু পা দিয়েছে।
ঘাড়ের কাছটা শিরশির করে উঠল মুসার। সাহস করে ফিরে চাইল। কাউকে দেখতে পেল না। নেই কিছু ওদিকে। তা হলে আওয়াজটা করল কে?
সোজা দৌড় দিল মুসা, জানে না কোনদিকে চলেছে। শুধু বুঝতে পারছে, এখান থেকে সরে যেতে হবে।
সামনের জঙ্গল আরও গহীন। গাছগুলো গায়ে গায়ে লেগে আছে। যেখানে একটু জায়গা পেয়েছে সেখানেই গজিয়েছে ঝোপঝাড়। কোনও কোনওটায় তীক্ষ্ণ কাঁটা! শার্টের কাপড় আটকে যাচ্ছে কাঁটায়! ছাড়াতে গিয়ে সময় নষ্ট হচ্ছে।
এদিকে এগিয়ে আসছে আততায়ী!
নিজেকে সবুজের মাঝে বন্দি বলে মনে হলো মুসার।
যেন সবুজ একটা খাঁচায় পুরে দেয়া হয়েছে ওকে।
সবুজ কবর!
এতই গরম যে শ্বাস নিলে গলা জ্বলে উঠছে। মন বলছে দম আটকে মরেই যাবে ও।
হঠাৎ ওর মনে হলো, একটা গাছের ডাল ওর দিকে এগিয়ে আসছে! ঘাড়ের কাছে পাতার স্পর্শ পেল। গাছগুলো কি সত্যি নড়ছে? কিলারের মত মরতে হবে ওকেও?
কী ভাবছে এসব পাগলের মত? জঙ্গলের আটকা পড়ে, বা গরমে মাথা খারাপ হয়ে গেল ওর?

খুব ক্লান্ত লাগছে ওর। মন বলছে, আর এক পাও এগোতে পারবে না। ধপ করে বসে পড়তে ইচ্ছে হলো। মনের জোরে সামনে বাড়ল মুসা। ওকে এগিয়ে যেতেই হবে।
ডানদিকে আরেকটা ডাল ভাঙল না? কোনও বন্য জন্তু?
সামনে হয়তো ফাঁকা জায়গা আছে। জঙ্গল থেকে বেরতে পারলে বাঁচা যায়। পথ খুঁজে না পেলেও ভাল লাগবে। অন্তত দম বন্ধ হয়ে আসবে না। তা ছাড়া, কপাল ভাল হলে বাংলোয় ফেরার পথও পাওয়া যেতে পারে।
ঝোপঝাড় ভেঙে এগোল মুসা। মনে হলো ঝোপগুলো ওকে এগোতে বাধা দিচ্ছে। গায়ের জোর খাটিয়ে সামনে বাড়ল ও।
বেশ কিছুক্ষণ পর জঙ্গল পাতলা হয়ে এল। সামনে সূর্যের আলো বেশি। সত্যি, সামনে একটা ফাঁকা জায়গা আছে। স্বস্তির শ্বাস ফেলে চলার গতি বাড়াল মুসা। পরক্ষণে স্বস্তি উবে গেল মন থেকে। বুঝতে পেরেছে এখানে ও একা নয়।
লাফ দিয়ে ঠিক সামনে এসে দাঁড়িয়েছে কানা স্টিভেনসন!
লোকটার ঠোঁটে বাঁকা হাসি। দাঁতের চৌকো ফোকরটা কালো দেখাল। হাতে সেই ক্ষুরধার ভোজালি, সূর্যের আলোয় ঝিকঝিক করছে! লোকটা ওটা মাথার উপর তুলেছে! সরাসরি মুসার ঘাড় লক্ষ্য করে নেমে এল চকচকে ফলা!
উন্মাদটা তার দ্বিতীয় শিকার পেয়ে গেছে!
শিকারটা আর কেউ নয়—মুসা নিজে!
ভীত চিৎকার বের হলো মুসার গলা দিয়ে।
‘না!’
নিচু হয়ে ভোজালির ফলাটাকে এড়াতে চাইল মুসা। বড় বেশি দেরি হয়ে গেছে! সময় মত সরতে পারল না!
ভোজালি বাতাসে শিস কেটে ছুটে আসছে!
ঠিক মুসার কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল!
একইসঙ্গে স্টিভেনসন মুসাকে আঁকড়ে ধরে হ্যাঁচকা টানে নিজের পিছনে নিয়ে গেলেন।
নীচের দিকে চেয়ে থমকে গেল মুসা। প্রফেসর আসলে ওকে লক্ষ্য করে ভোজালি চালাননি! ভয়ঙ্কর এক কেউটে সাপ লক্ষ্য করে চালিয়েছেন। সাপটা মুসার ঠিক মাথার উপরে একটা ডালে ছিল। আরেকটু হলেই ছোবল দিত ঘাড়ে!
শরীরটা দু টুকরো হয়ে গেছে। অল্প অল্প নড়ছে এখনও। মুখ বারবার হাঁ করছে আর বন্ধ করছে!
‘সর্বনাশ!’ বলে উঠলেন প্রফেসর। ‘আরেকটু হলেই মারা পড়তে! আমার তো মনে হয়েছিল তুমি শেষ!’ বড় করে শ্বাস নিলেন তিনি, ভোজালিটা কোমরে গুঁজে

রাখলেন। সাপটার দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘কাল-কেউটে এটা। সাঙ্ঘাতিক বিষাক্ত। এখন থেকে চোখ- কান খুলে রেখে চলবে। যদি ডোরাকাটা রংচঙে সাপ দেখো, ধরে নেবে ওটা বিষাক্ত। সেক্ষেত্রে দশ হাত দূর দিয়ে ভাগবে।’
মুসার মুখে কথা জোগাল না। প্রফেসর ওর জীবন বাঁচিয়েছেন। মানুষটাকে কী না ভেবেছে! কী ভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে, ভেবে পেল না ও। এখন বুঝতে পারছে, প্রফেসর নন, বদ্ধ উন্মাদ সেই খুনী অন্য কেউ!
‘প্রফেসর,’ বলল মুসা, ‘জানি না কী বলে আপনাকে ধন্যবাদ দেব। আপনি আমার জীবন বাঁচিয়েছেন।’
‘ও কিছু নয়, বাছা,’ বললেন স্টিভেনসন। এদিক দিয়েই যাচ্ছিলাম, হঠাৎ জঙ্গলের ভেতর আওয়াজ শুনতে পেয়ে বুঝলাম কেউ আছে এখানে। বুঝলাম তুমি ছাড়া আর কেউ না। হয়তো পথ হারিয়ে বিপদে পড়েছ, তা-ই অনুসরণ করলাম। পথ হারিয়েছ?’
‘জি।’ লজ্জায় মুসার চেহারা বেগুনী হয়ে গেল। ‘আপনি আমাকে বলতে পারেন আমাদের বাংলোটা কোন দিকে?’
‘নিশ্চয়ই! আমার পেছন পেছন এসো, এক্ষুণি তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দেব।’ মুসার কাঁধে হাত রাখলেন তিনি। ‘এই দেখো দেখি আমি কী রকম মানুষ! এখন পর্যন্ত তোমার নামই জানা হয়নি। নাম কী তোমার, বাছা?’
‘মুসা,’ নিজের নাম বলল ও, তারপর যোগ করল, ‘আর আমার ছোট বোনের নাম ফায়েজা।’
‘তা হলে একটা ছোট বোনও আছে তোমার? ভাল। খুবই ভাল। আমার কোন ভাই-বোন ছিল না।’ বুক পকেট থেকে একটা পাতার বিড়ি বের করলেন প্রফেসর। আগুন ধরিয়ে কষে টান দিলেন। এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন। ‘খাবে নাকি একটা বিড়ি?’
‘আমি খাই না,’ বলল মুসা। ‘আপনারও খাওয়া উচিত নয়। জিনিসটা খুব ক্ষতিকর।’
‘তা বটে। একদিন হুটুস করে ছেড়ে দেব। কী বলো? ….ঠিক আছে, চলো তা হলে, তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিই। আমার ঠিক দু’পা পেছনে থাকবে। জঙ্গলে হারিয়ে যাওয়া খুব সহজ। আরেকটা কথা, আমি কিন্তু মাঝে মাঝে তোমাকে বাছা বলে ডাকব। নাম ধরে ডাকতে আমার সব সময় ভাল লাগে না।’
ঘাড় কাত করে সম্মতি দিল মুসা, বুঝতে পারছে প্রফেসর মানুষটা একটু পাগলাটে হলেও আসলে খারাপ নন।
হাঁটতে শুরু করে ভদ্রলোককে জানাল মুসা, কীভাবে ওদের অ্যালসেশিয়ান কুকুর মারা গেছে।

মলি একটু শুনেই থমকে দাঁড়ালেন প্রফেসর, ঘুরে দাঁড়িয়ে লালচে
চোখে মুসাকে দেখলেন। গম্ভীর হয়ে গেছে চেহারা।
একটা লতা পেঁচানো ছিল কুকুরটার গলায়?' ভীষণ চিন্তিত গলায় জিজ্ঞেস করলেন।
'জি। শ্বাস আটকে মেরেছে।'
'খুব খারাপ কথা... খুবই... খুবই খারাপ কথা। যা ভাবছি তা যদি হয়ে থাকে, তো ভীষণ বিপদ আসছে সামনে!'
মাটির দিকে তাকালেন প্রফেসর। খোঁচা-খোঁচা দাড়িতে হাত বুলালেন। কালো পট্টিটা সরিয়ে চোখের কোণের চামড়াও চুলকালেন কিছুক্ষণ, তারপর মুসাকে সঙ্গে আসতে হাতের ইশারা করে পা বাড়ালেন।
এগিয়ে চলল ওরা ঘন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে।
'আমাকে বলুন কিলারের কী হয়েছে,' প্রফেসর চুপ করে আছেন দেখে বলল মুসা। 'কেন বললেন ভীষণ বিপদ আসতে পারে?'
'এই এলাকা সম্বন্ধে একটা গুজব চালু আছে। আমি কখনও বিশ্বাস করিনি, কিন্তু এখন আর ততটা নিশ্চিন্ত লাগছে না।'
'কী গুজব?'
'ইয়ারুনারা বলে। গাছ কখনও কখনও প্রতিশোধ নেয়।'
'প্রতিশোধ নেয়?' অজান্তেই প্রফেসরের গায়ের কাছে সেঁটে এল মুসা। ওদের চারদিকেই অসংখ্য বড় বড় গাছ।
'ওরা তা-ই বলে। অনেকদিন আগে কয়েকজন ইয়ারুনা এই জঙ্গলে গাছ কাটতে এসেছিল। তারা শুধু প্রয়োজনীয় গাছ কাটেনি, মনের আনন্দে যে গাছ সামনে পেয়েছে, সবই কেটেছে। বিরাট একটা এলাকার বন ওরা তছনছ করে দিয়েছিল বিনা কারণে। ওরা জানত না যে গাছ প্রতিশোধ নেবে। যে নৌকো করে ওরা এসেছিল, সেটাও তো গাছেরই তৈরি। ওরা ফেরার সময় ওই নৌকো খালের পানিতে ডুবে গেল। জঙ্গলে এসে উঠল ইয়ারুনারা। তারপর ওরা আর গ্রামে ফিরতে পারেনি। কয়েকদিন পর আরও কয়েকজন ইয়ারুনা ওদের খুঁজতে এসে দেখল, সবাই মারা গেছে। ওদের গলায় পেঁচানো ছিল মোটা মোটা লতা-গাছ। শ্বাস আটকে মারা হয়েছিল ওদের।'বড় গাছের ডালের বাড়িতে থেঁতলে গিয়েছিল সবার শরীর। খুন করার আগে পিটিয়ে লোকগুলোর হাড়গোড় ভেঙে দিয়েছিল। সে নাকি ছিল এক বীভৎস দৃশ্য। পানিতে ভাসিয়ে দেয়া হলো লাশগুলো। খুঁজতে আসা ইয়ারুনারা ফিরে গেল গ্রামে। ওরাই এই গল্প প্রচার করল। তারপর থেকে ইয়ারুনারা পারতপক্ষে এদিকের গহীন বনে আর আসে না।'
'কিন্তু কিলার তো ওদের কোনও ক্ষতি করেনি! ওকে কেন মরতে হলো?'

মুসার প্রশ্নে ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন প্রফেসর। ‘জানি না কেন মরতে হলো। হয়তো ও গাছের গায়ে আঁচড় কাটছিল, বা কামড়ে কোনও ডাল ভেঙেছিল। জানি না। তা ছাড়া আমি এখনও ইয়ারুনাদের ওই কিংবদন্তী পুরোপুরি বিশ্বাস করি না। বিশ্বাস আসে না যে গাছ আক্রোশ ভরে মানুষ বা জীব-জন্তু ধরে খুন করবে।’

হাঁটতে হাঁটতে ইয়ারুনাদের কিংবদন্তী মন থেকে মুছে ফেলবার চেষ্টা করল মুসা। এ সত্যি হতে পারে না। স্রেফ গুজব। মিথ্যে গল্প। গাছ কখনও এমনভাবে আক্রমণ করতে পারে না। কিন্তু বার বার মনে পড়ছে কিলারকে শ্বাস আটকে মারা হয়েছে। ওদের উপরও যে হামলা হবে না, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই।

অনেক ভাবে নিজেকে বুঝ দিতে চাইল মুসা। মন থেকে গুজবটা মুছে ফেলতে পারল না। যদি সত্যি…

একটা মোটা লতা মুসার গলায় পেঁচিয়ে গেল। ওটা ছাড়াতে গিয়ে রীতিমত যুঝতে হলো ওকে। শিউরে উঠল মুসা। মনে মনে বলল, এটা কাকতালীয় নয়। লতাটা সত্যি ওর গলা পেঁচিয়ে ধরেছিল।

আরেকটা লতা ওর হাতে আটকে গেল।

এবার ভীত স্বরে প্রফেসরকে ডাকল মুসা।

ফিরে তাকালেন তিনি, আস্তে করে লতাটা ওর হাত থেকে ছাড়িয়ে দিলেন।

‘ভয় পেয়ো না, মুসা, ও কিছু নয়। বড় বেশি চিন্তা করো তুমি। গাছপালা তোমাকে মারতে পারবে না। জঙ্গলে এলে এমনভাবে লতাপাতা তো গায়ে লাগেই। সাবধানে এগোও।’

লজ্জা পেল মুসা। ও যে ভয় পেয়েছে, বুঝে গেছেন প্রফেসর।

প্রফেসরের এক পা পিছনে থাকল ও। মনে হলো হাঁটছে তো হাঁটছেই, পথ আর শেষ হবে না।

শেষপর্যন্ত জঙ্গল শেষ হলো। সামনে সূর্যের আলো দেখা গেল।

স্বস্তিতে ছেয়ে গেল মুসার মন। ভাবল, ও যেন নতুন জীবন ফিরে পেয়েছে।

গরম আরও বেড়েছে। সেইসঙ্গে বেড়েছে বাতাসে পানির পরিমাণ। তবুও মুসার মনে হলো, এতক্ষণ পর ও সত্যি করে শ্বাস নিতে পারল। এখনও বেঁচে আছে বলে স্রষ্টাকে ধন্যবাদ দিল। ভয়ঙ্কর এই আমাজন আরেকটু হলে ওর কবরস্তান হতো।

মুসা স্পষ্ট বুঝল, প্রফেসর আরেকবার ওর জীবন বাঁচালেন। ‘আমরা এসে পড়েছি,’ বললেন তিনি। ‘ওই সামনেই তোমাদের কুটির। ভয় কমেছে তোমার?’

‘অনেক ধন্যবাদ আপনাকে,’ বলল মুসা। ‘সত্যি আপনি না থাকলে কোনওদিনও ফিরতে পারতাম না। আমার জীবন বাঁচিয়েছেন আপনি। আমার সঙ্গে আসুন। আমাদের সঙ্গে প্যাকেট করা দুধ আর কমলার রস আছে, আমার সঙ্গে খাবেন।’

‘আবার তাড়িয়ে দিতে চাইবে না তো?’
‘না-না, ছিহ্! তা ছাড়া আপনার গল্প শুনতে ইচ্ছে করছে।’
প্রফেসর খুশি হয়ে হাসলেন। বাংলোর সামনে পৌঁছে বললেন, ‘আজ নয়, হয়তো কালকে গল্প করতে আসব। আজকে বিকেলে আমার মাছ ধরতে যেতে হবে। বাড়িতে আর মাছ নেই। যাই তা হলে।’ হাত নাড়লেন ভদ্রলোক। ‘সাবধানে থেকো, মুসা। আমি জলাভূমিতে চলেছি, কাজেই তোমার ওপর নজর রাখতে পারব না।’
‘জি, সাবধানে থাকব,’ লজ্জা পেয়ে মাথা নামাল মুসা।
বাংলোর কোনার দিকে পা বাড়ালেন প্রফেসর, কোমরে দুলছে রক্তাক্ত ভোজালি। জলাভূমির পাড় দিয়ে নিজের ছাপরার দিকে চলেছেন। ওখান থেকে নৌকো নিয়ে বেরিয়ে পড়বেন মাছ ধরতে। পিছন থেকে হাত নেড়ে বিদায় জানাল মুসা, প্রফেসর দেখলেন না।
মুসা ভাবল, প্রফেসর বড় ভাল মানুষ। মই বেয়ে বারান্দায় উঠে দরজার কাছ থেকে ডাকল ও, ‘কই, ফায়েজা, আমি এসে গেছি।’
জবাব দিল না ফায়েজা। হয়তো ছবির বই নিয়ে বেশি ব্যস্ত।
লিভিং রুমে ঢুকে ফায়েজাকে খুঁজল মুসা। এখানে নেই। মাটিতে ছেঁড়া কার্পেট। ওটার উপর ছবি রং করার বই।
ব্যস্ত হয়ে এক এক করে সব ঘর খুঁজল মুসা। ফায়েজা কোনও ঘরে নেই!
ভয়ে গলা শুকিয়ে গেল মুসার।
কিলার মারা গেছে সেটাই যথেষ্ট খারাপ! এখন ফায়েজা গেল কোথায়?
ফায়েজা। ওর ছোট্ট মিষ্টি বোন!
বাইরে বেরিয়ে এল মুসা, বাংলোর চারপাশ দেখল।
নেই ফায়েজা!
‘ফায়েজা! ফায়েজা!’
জোরে জোরে ডাকল মুসা, গলা কাঁপছে।
কোনও সাড়া নেই।
জলাভূমিতে ডুবে গেল নাকি! কুমিরে নিল? ওর পিছন পিছন ফায়েজাও জঙ্গলে ঢোকেনি তো!
কিলারের করুণ পরিণতি মনে আসতেই শিউরে উঠল মুসা।
ফায়েজাও কি…
অন্তত দশবার বাংলোর ভিতর-বাইরে খুঁজল মুসা। মনে মনে প্রার্থনা করছে, হঠাৎ দেখবে ফায়েজা ফিরে এসেছে।
বৃথা আশা। ফায়েজা ফিরল না।

ছবি রং করার বইটার দিকে তাকাতেই নতুন একটা জিনিস চোখে পড়ল মুসার। আগে খেয়াল করেনি।
বইয়ের দু'পাতার মাঝখানে পড়ে আছে ওটা। সবুজ! আঠালো! একটা লতার ডগাও ছিঁড়ে পড়ে আছে!
গাছ!
চোরাগাছ ঢুকেছিল বাংলোর ভিতর!
ফায়েজাকে গাছ নিয়ে গেছে?
কিলারকে ওই লতা-গাছই শ্বাস আটকে মেরেছে?
ফায়েজাকেও সেজন্যেই নিয়ে গেল?
বুকের ভিতরটা ধকধক করছে মুসার।
কোথায় এখন ফায়েজা?
বাংলো থেকে বেরিয়ে এল মুসা, দৌড়াতে শুরু করল। কী করবে, কোথায় যাবে, বুঝতে পারছে না। শুধু বুঝছে বাংলো থেকে বেরিয়ে ফায়েজাকে খুঁজতে হবে।
'ফায়েজা! ফায়েজা!!'
জঙ্গলের কিনারায় চলে এল মুসা। ফায়েজার কোনও চিহ্ন নেই কোথাও। যে পথে বাংলোয় আসতে হয় সেটা ধরে এগোল ও। গাছ, লতার ঝাড় আর ঝোপের ফাঁকে দেখছে বারবার।
'ফায়েজা! ফায়েজা!!'
দৌড়াতে দৌড়াতে হঠাৎ ডানদিকে খসখস আওয়াজ শুনতে পেল। থমকে দাঁড়াল মুসা, তারপর দ্রুত ঢুকল গাছের ফাঁক গলে। জঙ্গল এখানে ঘন। কয়েক পা এগোতেই সূর্যের আলোর রেখা অদৃশ্য হলো।
আওয়াজটা এখনও আসছে। কিছু একটা নড়ছে জঙ্গলের ভিতর। পাতার সঙ্গে পাতা ঘষা খাওয়ার খসখসে আওয়াজ!
'ফায়েজা!' চেঁচাল মুসা। 'ফায়েজা, তুমি কি ওখানে?
জবাবে অস্ফুট একটা জড়িত কণ্ঠ শুনল মুসা। বুঝতে দেরি হলো না আওয়াজটা ওর বোনই করেছে।
জঙ্গলের ভিতর ফাঁদে পড়ে আটকে গেছে ফায়েজা!
আর কিছু চিন্তা না করে দৌড় দিল মুসা। দুটো গাছের মাঝে ঘন মাকড়সার জাল, সেগুলো জড়িয়ে গেল ওর মুখে। অত্যন্ত আঠালো। চোখ খুলতে পারল না মুসা। দু'হাতে ডলে চোখ থেকে মাকড়সার জাল সরাল। একটা কালো বিরাট মাকড়সা ওর বাম কাঁধের উপর বসেছে। গলা বেয়ে উঠতে শুরু করল। হাতের ঝাপটায় ওটাকে ফেলে দিল মুসা।

ফায়েজা চিৎকার করতে চেষ্টা করছে বোধহয়। গলার আওয়াজটা কেমন চাপা শোনাল, যেন কেউ ওর মুখ চেপে ধরেছে। মনে হলো ওর গলা টিপে ধরেছে কেউ! ঝোপ ভেঙে সামনে বাড়ল মুসা। কাঁটা আটকে গেল শার্টে। হাত-পা ছড়ে গেল। থামল না মুসা। ঝোপ ওকে এগোতে বাধা দিল। সে বাধা তুচ্ছ করে এগোল ও। কাঁটার জ্বলুনি পাত্তা দিল না।

ফায়েজাকে যে করে হোক উদ্ধার করতে হবে।

সামনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে ঘন ঝোপ। যেন ওকে এগোতে দেবে না।

মনে হলো ওগুলো নড়ছে!

মুসার মন বলল, ইয়ারুনাদের কিংবদন্তী আসলে মিথ্যে নয়!

গাছের গায়ে জড়ানো লতা মুসার হাতে জড়িয়ে গেল। মনে হলো আস্তে আস্তে চেপে বসছে লতাগুলো। গায়ের জোরে লতা ধরে টানল মুসা। ছিঁড়ে গেল ওটা। ও সামনে বাড়ল।

একটা ঝোপ পার হতেই ফায়েজার গলা স্পষ্ট শুনতে পেল। 'ভাইয়া, ভাইয়া, বাঁচাও!' চিৎকার করতে চাইল ফায়েজা। আওয়াজ পরিষ্কার হচ্ছে না। সাহায্য চাইছে প্রাণপণে।

লতা-গাছ ওকে আষ্টেপৃষ্ঠে আটকে ফেলেছে। দ্রুত ওকে উদ্ধার করতে হবে, নইলে সব শেষ!

লতায় জড়িয়ে আছে ফায়েজা। ওর কাছে যখন পৌঁছতে পারল মুসা, ততক্ষণে ওর শরীরের সমস্ত শক্তি শেষ। হাঁপাল ও হাপরের মত।

কয়েকটা লতা-গাছ ফায়েজার পা আর কব্জি পেঁচিয়ে ধরেছে। আরেকটা মোটা লতা গলায় জড়ানো। অল্প-অল্প নড়ছে লতাগুলো!

গলা পেঁচিয়ে ধরা লতার বাঁধন আরও শক্ত হচ্ছে! এরপর শ্বাস আটকে দেবে। তখন ফায়েজাকে অসহায় ভাবে মরতে হবে, যেমন মরেছে কিলার!

ভয়ে আতঙ্কে শরীর অবশ হয়ে এল মুসার।

জঙ্গল ফায়েজাকে খুন করছে, অথচ ওর কিছুই করার নেই!

নিজেকে বাঁচানোর চিন্তা এল মুসার। ইচ্ছে হলো ছুটে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে যায়। চিন্তাটা মাথা থেকে দূর করে দিল ও, মনে মনে ধমক দিল নিজেকে। ফায়েজার আতঙ্কে বিস্ফারিত চোখ আর ব্যথায় বিকৃত চেহারা দেখছে ও। হঠাৎ করেই কর্তব্য সচেতন হয়ে উঠল মুসা, সামনে বেড়ে পাগলের মত লতা ছেঁড়ার চেষ্টা করল।

গলায় পেঁচানো মোটা লতাটার গায়ে দাঁত বসিয়ে দিল। শিউরে উঠে ফায়েজার গলা ছেড়ে একটা গাছের গায়ে জড়িয়ে গেল লতাটা, যেন জ্যান্ত সাপ!

ফায়েজা নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করছে। এমন ভাবে হাত-পা ছুঁড়ছে যে মনে হলো জেদ করে কাঁদছে।
মুসা আর ফায়েজা, দু'জনই পাগলের মত লতার বাঁধন থেকে মুক্ত হতে চাইছে। বেশ কিছুক্ষণ লতা ছেঁড়ার পর ফায়েজা কিছুটা ছাড়া পেল। ফায়েজা পা থেকে শেষ লতাটা ছাড়িয়ে নিয়েই বাংলো লক্ষ্য করে দৌড় দিল। মুসা জানত না ফায়েজা এত দ্রুত দৌড়াতে পারে। পিছনে ছুটল ও।
জঙ্গলের ঝোপ আর লতা-গাছগুলো পথের সামনে চলে আসছে! ওগুলো সরিয়ে ছুটে চলল দু'জন! মোটা এক গাছের নিচু ডাল বাড়ি দিল মুসার মাথায়!
পড়ে যেতে যেতেও সামলে নিয়ে ফায়েজার পিছু নিল ও।
দু'মিনিট পেরোনোর আগেই বাংলোর পঞ্চাশ ফুট দূরে পৌঁছে গেল ওরা।
'দৌড়াও, ফায়েজা,' চিৎকার করল মুসা। 'আরও জোরে দৌড়াও। সোজা বাংলোর ভিতর গিয়ে ঢুকবে! দৌড়াও!'
পথের দু'পাশের ঝোপ আর লতা-গাছ চেপে আসতে শুরু করেছে! মোটা গাছগুলো ডাল নামিয়ে আনছে! কয়েকটা লতা-গাছ সাপের মত কিলবিল করতে করতে এল, ওদের পা লক্ষ্য করে আসছে!
ওগুলো এড়িয়ে ছুটল দু'জন।
আর পারছে না ফায়েজা। দৌড় না থামিয়েই ওকে কোলে তুলে নিল মুসা, পথের মাঝখানে সরে এল।
ঠিক মাঝ পর্যন্ত আসছে না লতাগুলো। যে দু'একটা ডাল সামনে চলে আসছে, সেগুলোকে ধাক্কা দিয়ে পাশ কাটিয়ে এগোচ্ছে মুসা।
পথের উপর সূর্যের আলো পড়েছে খানিক। আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে শকুনের দল!
ক্লান্ত হয়ে পড়েছে মুসা। ঘামে ভিজে গেছে ওর পোশাক।
কিন্তু থামছে না ও, গোঁয়ারের মত এগিয়ে চলেছে বাংলোর দিকে। গন্তব্যে পৌঁছাতেই হবে যে করে হোক!
বাংলো আর বিশ ফুট দূরে, কিন্তু পায়ে পা বেধে আছাড় খেল মুসা। ওর হাত থেকে ছিটকে পড়ে গেল ফায়েজা, ব্যথায়-আতঙ্কে কেঁদে উঠল।
গাছের আওতার মধ্যে চলে গেছে ওরা!
আর বড়জোর কয়েক সেকেণ্ড, আবার জড়িয়ে ধরবে লতা গাছ!
মোটা গাছের ডালের বাড়িতে হাড়গোড় ভেঙে যাবে!
ওদের জঙ্গলের গভীরে টেনে নিয়ে খুন করা হবে!
আসবে ভয়ঙ্কর যন্ত্রণাময় মৃত্যু!
লম্বা একটা লতা এগিয়ে আসছে, দেখল মুসা। ওটা একবার ধরতে পারলে ওকে জঙ্গলের ভিতর টেনে নিয়ে যাবে! সেক্ষেত্রে মৃত্যু নিশ্চিত!

শরীরে জোর পেল না মুসা। বামপাশে কয়েক গড়ান দিল। লতার আওতার বাইরে যেতে চাইল। পারলও! উঠে দাঁড়িয়ে ফায়েজাকে তুলে নিতে লাফিয়ে এগোল! একটা ঝোপ ফায়েজাকে আটকে ফেলেছে! ওটা ফায়েজাকে শক্ত করে ধরার আগেই হাত দিয়ে ঝোপ সরিয়ে দিল মুসা, ফারিয়াকে টেনে বের করে নিল। ওকে বুকে তুলে নিয়ে দৌড়াতে শুরু করল আবার। মনে হলো ফুসফুস ফেটে যাবে।
বাংলোর সামনের ফাঁকা জায়গাটায় পৌঁছে আর পারল না মুসা, ফায়েজাকে নামিয়ে দিয়ে বসে পড়ল। ফোঁস ফোঁস করে শ্বাস নিল। কাঁদছে ফায়েজা, বারবার করে খালাকে ডাকছে।
'আম্মু! আম্মু! আম্মু!'
বুড়ো আঙুল মুখে পুরে চুষছে ফায়েজা। ভীষণ ভয় পেলে বা বিচলিত বোধ করলে এমন করে।
মাথার ভারী ভাবটা কেটে যাওয়ার পর আকাশের দিকে তাকাল মুসা। বুকটা শুকিয়ে গেল অশুভ চিন্তায়। মাথার উপর মড়াখেকো কুৎসিত পাখিগুলো ঘুরে ঘুরে উড়ছে। শকুন! অশুভ! মৃত্যুর গন্ধ পায় ওরা! অপেক্ষা করছে অসীম ধৈর্য নিয়ে!
মুসা বুঝতে পারছে পাখিগুলো অপেক্ষা করছে। গলা শুকিয়ে গেল ওর। স্পষ্ট টের পেল, ওরা মরবে সেই অপেক্ষাতেই রয়েছে ওগুলো।
উঠে দাঁড়াল মুসা। 'চলো, ফায়েজা, বাংলোর ভেতরে যাই! জঙ্গল বা জলাভূমির তুলনায় বাংলোর ভেতরে বিপদ কম!'
ফায়েজার হাত ধরে বারান্দায় উঠল ও, সামনের ঘরে ঢুকে পড়ল। ছবির বইটা চোখে পড়ল। এখনও বইয়ের উপর পড়ে আছে সবুজ লতা আর আঠালো পদার্থ।
'ফায়েজা, তোমাকে গাছ ধরল কীভাবে?' জিজ্ঞেস করল মুসা। 'কীভাবে কী হলো বলতে পারবে?'
আস্তে করে মাথা নাড়ল ফায়েজা, কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না। 'আম্মু! আম্মুর কাছে যাব!' বিড়বিড় করে বলল।
'আণ্টি এখনই চলে আসবেন, ফায়েজা,' সান্ত্বনা দিল মুসা। 'সত্যি চলে আসবে একটু পর। এবার বলো কী ঘটেছে। আমার জানা দরকার। বাইরে গেলে কীভাবে? গাছের মাঝে আটকা পড়লে কী করে? একা একা বাইরে গিয়েছিলে, না গাছ ঢুকেছিল ঘরের ভেতর?'
মাথা নাড়ল ফায়েজা।
'তুমি বাইরে যাওনি? তা হলে এমন হলো কী করে? গাছ তোমাকে ধরল কী করে?'

‘গাছ,’ অবশেষে বলল ফায়েজা। ‘গাছই আমাকে টেনে নিয়ে গেছে!’
তা হলে একটা গাছ বাংলোর ভিতরে ঢুকে ফায়েজাকে টেনে নিয়ে গেছে? এটা এখন নিশ্চিত! এখন স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে বাংলোর ভিতরে ওরা নিরাপদ নয়!
দু’এক কথায় ফায়েজা জানাল, লতা-গাছ ওকে ধরে অন্য গাছের কাছে নিয়ে গেছে, তারপর সব গাছ মিলে ওকে মারার চেষ্টা করছিল। স্পষ্ট বুঝতে পারল মুসা, বাংলো ছাড়তে হবে ওদের। এখান থেকে এখনই সরে যেতে হবে।
গাছ যদি একবার ফায়েজাকে নিয়ে যায়, আবারও পারবে না কেন! এবার ওদের দু’জনকেই ধরবে!
কিন্তু যাবে কোথায় ওরা? কোন্ জায়গা নিরাপদ? চারদিকে তো গাছেরই রাজত্ব!
একটা চিন্তা মাথায় আসতে দু’আঙুলে চুটকি বাজাল মুসা। হ্যাঁ
প্রফেসরের কাছে যাওয়া যায়। তিনি ওদের সাহায্য করতে পারবেন।
কাঁদছে ফায়েজা।
মুসা ওর হাত ধরে বেরিয়ে এল বাংলো থেকে, বাংলোর কোনা ঘুরে এগোল।
জলাভূমির তীর ঘেঁষে এগোল ওরা। গাছের আওতার বাইরে থেকে হাঁটছে। গাছগুলো ডাল বাঁকা করছে, কিন্তু আপাতত বিপদের সম্ভাবনা দেখল না মুসা। ভাবতে চেষ্টা করল, প্রথমে কিলার, তারপর ফায়েজা, তারপর ওর ওপর হামলা করেছে গাছগুলো। কিন্তু কেন? কী চায় ওরা? কেন ওদের ক্ষতি করতে চাইছে?
মনের কাছে কোনও জবাব পেল না।
প্রফেসর হয়তো ওগুলোর আচরণের কারণ বলতে পারবেন।
কিছুক্ষণ পর ছাপরার সামনে পৌছে গেল ওরা।
বাইরে দাঁড়িয়ে গলা উঁচিয়ে ডাকল মুসা, ‘প্রফেসর স্টিভেনসন! আপনি কি ভেতরে আছেন? বিপদে পড়ে এসেছি। আপনার সাহায্য দরকার। প্রফেসর স্টিভেনসন!’
ওই তরফ থেকে কোনও জবাব নেই।
তিনি কী বলেছিলেন সেটা এতক্ষণে মনে পড়ল মুসার। মাছ ধরতে যাবেন প্রফেসর। তার মানে তাঁর কাছ থেকে কোনও সাহায্য মিলবে না।
মুসা সিদ্ধান্ত নিল, বাংলোয় না ফিরে ছাপরার দরজার সামনে অপেক্ষা করবে। প্রফেসর ফিরলে তাঁকে জানাবে কী ঘটছে। তিনি ঠিক করবেন কী করা যায়।
প্রফেসরের ছাপরার অবস্থা করুণ। ছাদ বেঁকে ভেঙে পড়ার দশা। ছাপরার তুলনায় ওদের বাংলোটা রাজপ্রাসাদ বলে মনে হলো মুসার।
তবে জায়গাটা নিরাপদ। সবচেয়ে কাছের গাছটাও কয়েকশো গজ দূরে। বেঁচে থাকতে হলে এখন গাছের কাছ থেকে দূরে থাকতে হবে। এ জায়গাটা অপেক্ষা করার জন্য ভাল।

আপাতত বেঁচে থাকার চিন্তা ছাড়া আর কোনও চিন্তা নেই মুসার। ভাবছে, এখান থেকে নিরাপদে চলে যেতে পারলে জীবনে আর কিছু চাওয়ার থাকবে না ওর। মন বলল, স্পিড-বোটে চেপে জঙ্গল ছেড়ে এক্ষুণি চলে যায়। তা সম্ভব না বলে আফসোস হলো। আণ্টি জানলে নিশ্চয়ই ওদের নিয়ে রওনা হয়ে যেতেন। এক্সপেরিমেন্টের চেয়ে মানুষের জীবন অনেক মূল্যবান।
একবার আমাজন ছেড়ে যেতে পারলে জীবনে আর এমুখো হবে না, ভাবছে মুসা। তারপর যা দেখল তাতে মনে হলো এত সহজে জঙ্গল ছেড়ে যেতে পারবে না। ভয়ে শিউরে উঠল ও।
এ কী!
এও কি সম্ভব!
ভয়ঙ্কর!
আসছে বিপদ!
নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে বাধল মুসার।
এগিয়ে আসছে গাছগুলো! ঝোপগুলোও আসছে! শেকড় টেনে টেনে এগিয়ে আসছে!
আসছে ওরা! আসছে! এগিয়ে আসছে! খসখস আওয়াজ করছে
আসছে!
এতো দ্রুত আসছে যে মুসা ভাল করে কিছু বোঝার আগেই ওদের বাংলোর দিকে যাওয়ার পথ জঙ্গলে ছেয়ে গেল!
বাংলোর দিকে যাবার আর কোনও উপায় নেই!
কোনও দিকেই যাওয়ার উপায় নেই! পালাবার পথ নেই কোনও! সবদিক থেকেই আসছে গাছ! শুধু একদিক বাকি। জলাভূমি! ওদিকটা ফাঁকা!
জলাভূমির দিকেই যাবে, দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল মুসা।
আর কোনও উপায় নেই!
ফায়েজা কি পারবে পানিতে নামতে?
পারতেই হবে! আর উপায় নেই! দরকার পড়লে সাঁতরে যেতে হবে! বাড়ির সামনের পুকুরে ফায়েজাকে এই কদিন আগে সাঁতার শিখিয়েছে বাবা। ফায়েজা সাহস করলে ঠিকই সাঁতরাতে পারবে।
ফায়েজার হাত ধরে ছাপরার পিছনে চলে এল মুসা, দ্রুত হাতে ফায়েজার জুতো খুলে ফেলল, নিজেরটাও খুলল, তারপর পানিতে নেমে পড়ল। হাঁটু পানি মাত্র।
‘চলো, ফায়েজা, সাঁতার কাটি আমরা। কী, মজা হবে না?’ মুসার গলা শুকিয়ে গেছে।
মাথা দুলিয়ে পিছনে এগোল ফায়েজা।

তীর থেকে সামান্য দূরে গিয়েই ওগুলো চোখে পড়ল মুসার। ওর মনে হলো বাঁচার কোনও উপায় নেই ওদের।
কুমির!
দুটো!
বিরাট!
দ্রুত পানি কেটে আসছে!
কালো দুটো মাথা আর লেজের খানিকটা ভেসে আছে। সরসর করে চলে আসছে ওদের দিকে! কুমিরগুলোর হিংস্র লোলুপ চোখগুলো জ্বলজ্বল করছে!
পশ্চিমে কুমির, বাকি তিনদিকে খুনে গাছ!
এবার প্রফেসর নেই যে ওদের বিপদে সাহায্য করবেন।
'বাঁচাও!' চেঁচাল মুসা। মনে আশা, কেউ না কেউ হয়তো চিৎকার শুনতে পাবে, এগিয়ে এসে সাহায্য করবে।
কেউ সাড়া দিল না!
নেই কেউ!
'বাঁচাও!'
এত জোরে সাহায্য চেয়েছে যে মুসার মনে হলো, গলা চিরে গেছে।
কেউ এল না সাহায্য করতে।
আশপাশে কেউ থাকলে তবে তো আসবে!
ওদের চারপাশে ঘনিয়ে আসছে নিশ্চিত মৃত্যু!
ভয় পেয়েছে ফায়েজা, কাঁদতে শুরু করল।
মুসা জানে, কাঁদার সময় নেই এখন। বিচলিত হলে চলবে না। মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। জলাভূমিতে থাকা চলবে না। আবার জঙ্গলও ভয়ানক।
কী করবে ওরা?
ফায়েজাকে পিঠে তুলে নিয়ে হাঁটু-পানি ভেঙে সামনে বাড়ল মুসা। ছোট লাঠির মত একখণ্ড কাঠ পেয়ে তুলে নিল হাতে। অস্ত্র বলতে এখন এটাই।
কুমির দুটো এগিয়ে আসছে।
সামনে পানি গভীর। ঝপ্ করে ডুবে গেল ওরা! পরমুহূর্তে ভেসে উঠল। ফায়েজাকে সামনে ঠেলে দিল মুসা। 'সাঁতরাও, ফায়েজা! সোজা সামনে সাঁতরে যাও। আমি আসছি তোমার পেছনে।'
পানি কেটে এগোল ফায়েজা।
এক শ' গজ দূরে একটা ফাঁকা জায়গা দেখা যাচ্ছে। ওদিকে গাছ নেই।
কিন্তু এক শ' গজ এখন চাঁদের চেয়েও দূর!

নলখাগড়ার ভিতর দিয়ে কুমির দুটো এগিয়ে আসছে! গতি ক্রমেই বাড়ছে! এখনও ডুব দেয়নি। ডুব দেয়া মানে সর্বনাশ। শিকার ধরার জায়গা ঠিক করে ফেললে তখনই ডুব দেয় কুমির। তারপর পানির নীচ দিয়ে এসে হামলা করে।
পানিতে কুমিরের সঙ্গে পারবে না, মরতেই হবে! ঘুরে দাঁড়াল মুসা। হাতের দণ্ডটা বাগিয়ে ধরেছে। বিনা যুদ্ধে হার মানতে রাজি নয়!
একটা কুমির ফায়েজার দিকে চলেছে। ওটা পাশ কাটানোর সময় সুযোগ ছাড়ল না মুসা, নাকের উপর দড়াম করে লাঠির বাড়ি দিল। ঝট করে ঘুরে গেল কুমির—ওর দিকে!
হাঁ করে তেড়ে এল এবার। আবার ওটার নাকে বাড়ি দিল মুসা, পরক্ষণে চোখে খোঁচা মেরে বসল।
ব্যথায় শিউরে উঠল কুমির, দেহটা আছড়াল। যেদিক থেকে এসেছিল, সেদিকে ঘুরে সরসর করে রওনা হয়ে গেল। অদ্ভুত শত্রুকে আক্রমণের শখ মিটে গেছে।
দ্বিতীয় কুমির কাছে চলে এসেছে। লেজ নেড়ে গতি বাড়িয়ে আসছে। মুখটা হাঁ করা। বড় বড় হলদে দাঁতগুলো স্পষ্ট দেখতে পেল মুসা।
কুমিরটা একেবারে কাছে চলে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করল ও। ওটার চোখদুটো স্পষ্ট দেখতে পেল। মাত্র এক ফুট দূরে এসে ডুব দিল। মুসাকে পানির নীচে টেনে নেবে।
মুসা পানিতে আধ ডোবা হলো, কাঁপা হাতে কুমিরটার চোয়ালে লাঠিটা ভরে দিল। হাঁ করা চোয়ালে আটকে গেছে লাঠি। মুখ বন্ধ করতে পারল না কুমির। হিসহিস করে উঠল। রাগে লেজ আছড়াল পানিতে। জোর এক কামড়ে লাঠি ভেঙে ফেলল। মড়াৎ!
এক পলকের জন্য ফায়েজাকে দেখল মুসা, তীরের কাছে চলে গেছে ও। ক্ষণিকের জন্য অন্তরে স্বস্তি পেল মুসা।
কুমিরটার মুখ থেকে রক্ত ঝরছে। বোধহয় লাঠির চোখা মাথা গালের মাংস কেটে দিয়েছে। আক্রমণ করল না ওটা, সঙ্গীর পিছু নিয়ে চলে গেল।
মস্ত শ্বাস ফেলল মুসা। সারাশরীর থরথর করে কাঁপছে।
এবারের মত বেঁচে গেছে ওরা!
তীরে উঠে ফায়েজার পাশে কাদার মধ্যে বসল ও, হাঁপিয়ে গেছে। দু'জনের জামাকাপড় থেকে ঝরঝর করে ঝরছে পানি।
'দারুণ দেখিয়েছ, ফায়েজা,' প্রশংসা করল মুসা। 'সত্যি খুব সাহস আছে তোমার। বাড়ি ফিরে তোমাকে চকলেট কিনে দেব।'
'আম্মুর কাছে যাব,' দাবির সুরে বলল ফায়েজা।

ওকে দোষ দিতে পারল না মুসা। ওরও মন বলছে আণ্টি এলে খুব ভাল হতো। এই বিপদ থেকে উদ্ধারের কোনও পথ হতো। একা অসহায় লাগছে ওর।
আকাশের দিকে তাকাল, শকুনগুলো এখনও উড়ছে। খাবারের আশা ছাড়েনি। গোল, রক্তলাল সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে পড়েছে। এখনও প্রচণ্ড তাপ বিলাচ্ছে।
'আণ্টি শীঘ্রি বাসায় ফিরবেন,' সান্ত্বনা দিল মুসা। 'চলো, আণ্টি বোধহয় এরইমধ্যে ফিরে এসেছেন।'
মনে মনে প্রার্থনা করল, ওর ধারণা যেন সঠিক হয়।
জীবনে কোনওদিন এত ক্লান্ত হয়নি ও। ফায়েজার অবস্থাও ভাল নয়। এখনও হাঁপাচ্ছে।
হাত ধরাধরি করে বাংলোর দিকে ফিরল ওরা। পথে কয়েকটা ঝোপ ওদের ধরতে চাইল। ওগুলো ভেঙে এগোতে হলো।
গাছের সারি জলাভূমির দিকে অনেক সরে এসেছে। এখন আর তীর দিয়ে গেলে জঙ্গল খুব দূরে নয়! গাছগুলো ঝুঁকে সামনে চলে আসতে চাইছে।
তীরের কাছাকাছি থাকতে হবে ওদের। মাঝে মাঝে অল্প পানিতেও নামল ওরা। ঝুঁকে আসা গাছ এড়াল।
কুমিরের সঙ্গে লড়াইয়ের পর আত্মবিশ্বাস জন্মেছে মুসার। ওর মনে হলো, লতা-গাছের আক্রমণও ঠেকাতে পারবে। একবার বাংলোর ভিতরে ঢুকতে পারলে আর অসুবিধা হবে না।
তা ছাড়া, আণ্টি শীঘ্রি ফিরবেন। ওরা এই বিপজ্জনক জঙ্গল থেকে চলে যাবে। স্পিড-বোট তো আছেই!
বাংলোর কী পরিবর্তন হয়েছে সেটা এতক্ষণে চোখে পড়ল মুসার।
স্পিড-বোট যে জেটিতে থাকে, সেখান থেকে বাংলোয় যাওয়ার পথ আর নেই! ফাঁকা জায়গাটা ভরে গিয়েছে গাছে! ঝোপ-লতা-গাছ জড়াজড়ি করে মিশে দেয়াল তুলে দিয়েছে যেন!
বাংলোর চাল সবুজ লতায় ঢেকে গেছে।
মা আস্তে আস্তে ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগিয়ে আসছে জঙ্গল! চারপাশ থেকে ওদের ঘিরে ফেলবে!
মুসা বুঝল, জঙ্গল ওদের গিলে নেবে—বাইরের দুনিয়ার কেউ জানবে না ওদের কী হয়েছে। সবাই ভাববে ওরা গহীন গভীর আমাজনে হারিয়ে গেছে।
ওদের লাশও খুঁজে পাবে না কেউ!
সবুজ গাছপালা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে! কোথাও কোন নিরাপত্তা নেই। মুসা ভাবল, বাংলোর চার দেয়ালের ভিতর কিছুটা নিরাপত্তা আশা করা যায়।

অনেক বেশি ক্লান্ত ফায়েজা। দৌড়াতে পারবে না। ওকে কোলে তুলে নিল মুসা, দৌড়ে বাংলোর দিকে এগোল। লতাগুল্মের বাধা এড়িয়ে বারান্দায় উঠল, চলে গেল দরজার কাছে।
হঠাৎ থমকে দাঁড়াতে হলো। মোটা এক লতা ফায়েজার হাত পেঁচিয়ে ধরেছে!
মুসা আর লতা-গাছের মধ্যে টানাটানির লড়াই শুরু হলো। হাতের ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠল ফায়েজা। আরও জোরে টান লাগাল মুসা বোনের কান্নায় কান দিল না।
পিছলে গেল লতার বাঁধন। ফায়েজার হাত মুক্ত হয়ে যেতেই দেরি করল না মুসা, সামনের ঘরে ঢুকে পড়ল। ফায়েজাকে মেঝেতে নামিয়ে দিয়েই দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল। শুনতে পেল, লতাগাছ থ্যাপ্ করে দরজায় বাড়ি খেল।
‘আম্মুর কাছে যাব! আম্মু! আম্মু!’ কাঁদছে ফায়েজা।
‘আসবে আম্মু, ফায়েজা, কেঁদো না,’ সান্ত্বনা দিল মুসা। ‘আমিও চাই আণ্টি তাড়াতাড়ি আসুন। এখন লক্ষ্মী মেয়ের মত শান্ত হও তো। ওই গাছগুলোর সঙ্গে লড়াই করতে হবে আমাদের। আন্টির জন্যে অপেক্ষা করব আমরা। উনি বলতে পারবেন কী করা উচিত।’
চালের উপর গাছ নড়াচড়ার আওয়াজ শুনল মুসা। লতা-গাছগুলো সাপের মত মোচড় খেয়ে দীর্ঘ হচ্ছে! বোধহয় জানালা দিয়ে ভিতরে ঢোকার মতলব!
চাল থেকে ঝুলছে লতা-গাছ। ঝোপগুলো জানালার কাছে চলে এসেছে! একটা লতা জানালা দিয়ে ঢুকতে শুরু করল!
গাছের দল বাংলোটা ঘিরে ফেলছে!
ফাঁদে পড়ে গেছে মুসা আর ফায়েজা। অসহায়! শাহানার শোবার ঘরে কী যেন পড়ে গেল। ঝনঝন করে শব্দ হলো। কাউচে বসে কাঁদছে ফায়েজা। ওকে রেখে দৌড়ে ওই ঘরে গেল মুসা। দরজার কাছ থেকে এক নজর দেখেই বুঝল, বিপদ বাড়ছে ওদের! গাছের আক্রমণের গতি বেড়ে গেছে!
কয়েকটা লতাগুল্ম বাংলোর ভিতরে ঢুকে পড়েছে!
মোটা এক গাছের সরু লতানো ডাল জানালা গলে ঢুকে পড়েছে! ড্রেসারের উপর রাখা মাটির ফুলদানী ধাক্কা খেল, মেঝেয় পড়ে গেল। লতা-গাছ ও মোটা গাছের কয়েকটা ডাল আন্টির ঘর পেরিয়ে এসেছে, সামনের ঘরের দিকে আসছে!
মোটা গাছের ডালগুলো মটমট করে ভাঙল মুসা, লতা-গাছের উপর জানালা বন্ধ করে দিল। লতা-গাছ ছিঁড়ে পড়ে গেল। মনে হলো কেউ কুঠার দিয়ে কেটেছে ওগুলো।
একটা ডাল জানালায় বাড়ি খেল। কিন্তু খুলল না জানালা। মনে হলো গাছ জানালা ভেঙে ভিতরে ঢুকতে পারবে না!

ঠিক তখনই মুসার মনে পড়ল, বাংলোয় আরও জানালা আছে! প্রত্যেকটা জানালা খোলা! ঢুকে পড়তে পারে গাছ!
সামনের ঘরে ফিরল মুসা। সোফায় গুটিসুটি মেরে বসেছে ফায়েজা। লতা-গাছ আসবার আগেই জানালা দুটো বন্ধ করে দিল মুসা।
সমস্ত জানালা বন্ধ করে দেয়ায় বাংলোর ভিতরটা আগুনের মত গরম ঠেকল। গাছের হাত থেকে বাঁচতে হলে ওদের গরম সহ্য করতে হবে। এখন ওদের কাঠের বাংলো গাছের আক্রমণ ঠেকিয়ে রাখতে পারলে হয়!
মুসার মন বলল, ওরা আপাতত নিরাপদ। এতক্ষণে একটু স্বস্তির শ্বাস ফেলল ও।
কিন্তু হঠাৎ বাংলোর পিছন দিক থেকে দড়াম করে আওয়াজ হলো। যেন ভারী কিছু মেঝেতে পড়েছে!
মুসা শিউরে উঠল। ফায়েজা আর ওর শোবার ঘর? ওটার জানালাটা বন্ধ করা হয়নি!
‘ফায়েজা, চুপ করে বসে থাকো, নির্দেশ দিল ও। ‘এখান থেকে নড়বে না।’
দৌড়ে শোবার ঘরে ঢুকল মুসা। তিনটে লতা-গাছ ভেতরে ঢুকে পড়েছে!
বিরাট লতা এগুলো। আরও দীর্ঘ হচ্ছে, ঢুকে পড়ছে ঘরের আরও ভিতরে! প্রতি সেকেণ্ডে এক ইঞ্চি করে সামনে বাড়ছে!
ড্রেসারটাকে পেঁচিয়ে ধরে মাটিতে আছড়ে ফেলে দিয়েছে, সেই শব্দ পেয়েছে মুসা। লতাগুলো এখন ওর দিকে এগিয়ে আসছে!
ওগুলোর সঙ্গে যুঝবে, নাকি দরজা বন্ধ করে সামনের ঘরে আশ্রয় নেবে, ভাবল মুসা। পালাবে, নাকি পালাবে না? বুঝতে পারছে, এরপর ঘরে ঢুকবে বড় গাছের ডাল। ওগুলো শোবার ঘরের পলকা দরজা অনায়াসে ভাঙবে। সত্যি যদি বড় গাছের ডাল ঢোকে, ফায়েজা আর ওর বাঁচার কোনও আশা নেই!
লতাগুলোর বিরুদ্ধে এখনই লড়াই করা উচিত! জানালা বন্ধ করে দিতে পারলে… হাতে বাড়তি সময় পাওয়া যাবে!
বিছানার পাশ দিয়ে দৌড় দিল মুসা, জানালার দিকে এগোল! লতা-গাছ ওকে পেঁচিয়ে ধরলেই সব শেষ! জানালা সজোরে বন্ধ করলে লতা-গাছ কাটা পড়বে!
কিন্তু ওর আশা পূরণ হলো না। জানালার কাছে যেতেই আটকা পড়ল! মেঝেয় পড়ে থাকা সবুজ আঠালো জিনিসগুলো বাম পা আটকে দিয়েছে!
নড়তে পারল না মুসা!
মারাত্মক আঠা!
অজান্তেই চেঁচিয়ে উঠল মুসা।
‘বাঁচাও!’
স্পষ্ট বুঝল, এবার আর রক্ষা নেই!

লতা-গাছগুলো ঘুরতে শুরু করেছে। সরসর করে ওর দিকে আসছে!
ওগুলোর কবল থেকে বাঁচবে সেই সাধ্য মুসার নেই! পা নড়াতে পারছে না!
একটা ট্র্যাভেলার্স পাম গাছ জানালা দিয়ে ভিতরে ঢুকল। অসংখ্য পাতা ওটার ডাল পেঁচিয়ে আছে। আন্টির কথাগুলো মনে পড়ল মুসার। উনি বলেছিলেন প্রতিটা পাতার ভিতরে বিশুদ্ধ পানি থাকে। বাঁচবার আশা জেগে উঠল ওর মনে। পাতা ছিঁড়ে মেঝেতে পানি ফেললে? আঠার হাত থেকে পা ছাড়াতে পারবে? অন্তত চেষ্টা তো করা যায়!
পানি আর সাবান দিয়ে ড্রেসারের উপর থেকে আঠা পরিষ্কার করেছিলেন আণ্টি! ওরও চেষ্টা করে দেখতে দোষ কী! ওকে শ্বাস আটকে মারতে এগিয়ে আসছে লতা-গাছ। হারানোর কিছু নেই ওর।
ট্র্যাভেলার্স পামের বড় একটা পাতা ছিঁড়ে নিল মুসা, পানিটুকু পায়ের পাতার উপর ফেলল। সেই সঙ্গে পা মেঝের সঙ্গে ঘষল। আঠা থেকে সরে আসতে চাইল।
পাম গাছের একটা পাতা ওর গলা পেঁচিয়ে ধরল। হাতের টানে পাতাটা ছিঁড়ে ফেলল মুসা, পা ঘষে চলেছে পাগলের মত। বুঝল, হাতে সময় নেই! লতাগাছ এখনই ওকে পেঁচিয়ে ধরবে!
পানি দেয়ায় কাজ হচ্ছে। পা নাড়তে পারল ও শেষ পর্যন্ত।
কিন্তু হাতে সময় কই?
দেরি হয়ে গেছে!
মোটা একটা লতা ওর বুক পেঁচিয়ে ধরল! ওকে জানালা দিয়ে বাইরে নিয়ে যাওয়ার জন্য জোর টান দিল! পেঁচিয়ে ধরল আরও দুটো লতা! এবার আর রক্ষা নেই!
ওগুলো হিড়হিড় করে মুসাকে জানালার দিকে টেনে নিয়ে চলেছে!
হাল ছেড়ে দিল মুসা। বুঝেছে, বাঁচার আর কোনও আশা নেই!
ঠিক তখনই খচ করে একটা শব্দ হলো!
ঠিক জানালার সামনে পড়ে গেল মুসা।
প্রফেসর স্টিভেনসন! ফিরে এসেছেন তিনি, কুঠারের কোপে লতাগুলোকে কেটে দিয়েছেন!
গাছের ডালে কোপ মারতে মারতে চিৎকার করে বললেন, ‘দৌড় দাও, মুসা! সামনের ঘরে চলে যাও! অপেক্ষা করো ওখানে!’
মুসার বাঁ পায়ে এখনও আঠা, কিন্তু মেঝে থেকে পা ওঠাতে পারল। সামনের ঘরে চলে এল, ফায়েজার পাশে সোফায় এসে বসল। জানালার কাঁচের ওপাশটা প্রায় ঢেকে দিয়েছে লতাগুল্ম!

ওদের শোবার ঘরের দরজাটা হঠাৎ খুলে গেল! কুঠার হাতে প্রফেসর ভিতরে ঢুকলেন, থমথম করছে চেহারা। গম্ভীর গলায় বললেন, ‘বলো তো, মুসা, কী করেছ তুমি? গাছ নষ্ট করছিলে? ডাল ভাঙছিলে ইচ্ছে মত? এমন তো হবার কথা নয়!’
‘আমি কিছু করিনি,’ বলল মুসা। ‘কেন এসব ঘটছে তা-ও জানি না! গাছগুলো হঠাৎ আমাদের ওপর হামলা করেছে! আমি কোনও গাছের ক্ষতি করিনি!’
‘বিনা কারণে এমন হতে পারে না,’ বললেন স্টিভেসন। ‘অনেক দিন ধরে এখানে আছি, এমন বিটে ঘটনা আগে দেখিনি। নিজের চোখে যদি না দেখতাম, কেউ শপথ করে বললেও বিশ্বাস করতাম না। এখন আমাকে জানতে হবে কেন…’
কাচ ভেঙে পড়ার ঝনঝন আওয়াজে থেমে গেলেন প্রফেসর।
প্রথমে ভাঙল মুসাদের শোবার ঘরের জানালার কাঁচ!
একই ঝনঝন আওয়াজ এবার ভেসে এল শাহানার শোবার ঘর থেকে!
কী ঘটছে দেখতে দৌড়ে গেলেন প্রফেসর। মুহূর্ত পরে ফিরে এসে বললেন, ‘গাছ, মুসা! ওগুলো ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ছে! আমি ডাল কাটতে চললাম! তোমরা এখান থেকে নড়বে না!’
‘কিন্তু প্রফেসর,’ প্রতিবাদ করল মুসা। ‘গাছ তো আপনাকেও ধরবে! মেরে ফেলবে! একা আপনি এত গাছের সঙ্গে পারবেন না!’
‘আমি এখনও গাছের এমন বড় কোনও ক্ষতি করিনি যে আমাকে ধরতে আসবে,’ শান্ত গলায় জানালেন তিনি। ‘ওরা আমার ওপর খেপে ওঠার আগে খানিকটা সময় পার। যা বলছি করো। এখানে অপেক্ষা করবে।’
পরবর্তী কয়েক মিনিট প্রফেসরের কুঠারের আওয়াজ শোনা গেল। দুই শোবার ঘরের জানালা দিয়ে যেসব গাছ ঢুকেছে, সেগুলো পাগলের মত কাটলেন তিনি। একটু পর ঘর দুটোর দরজা বন্ধ করে দিয়ে চলে এলেন। হাঁপাচ্ছেন।
‘পাতলা কাঠের দরজা বেশিক্ষণ গাছদের ঠেকাতে পারবে না, জানালেন। ‘এত দ্রুত গাছের ডাল ঢুকছে যে ভয় লেগে গেছে আমার। একটা বুদ্ধি বের করতে হবে, নইলে বাঁচব না আমরা।’
‘আমাদের কী করার আছে, প্রফেসর?’ হতাশ গলায় বলল মুসা। গলা কাঁপছে ওর। লক্ষ করল হাঁটু দুটোও কাঁপছে। পরিশ্রমে, না ভয়ে, তা বুঝল না।
ফায়েজা আবার কাঁদছে।
‘চিন্তা কোরো না, ফায়েজা,’ ভরসা দেয়ার চেষ্টা করল মুসা। ‘কিছু হবে না আমাদের।’
‘আম্মুর কাছে যাব,’ কাঁদতে কাঁদতে বলল ফায়েজা।

‘কিছু একটা ঘটেছে যে-কারণে গাছের দল খেপেছে,’ জোর দিয়ে বললেন প্রফেসর, যেন নিজের সঙ্গেই আলাপ করছেন। ‘এমনিতে এমন হবার কথা নয়।’ মুসার দিকে চাইলেন। ‘চিন্তা করে দেখো তো, মুসা। তুমি নিশ্চয়ই এমন কিছু করেছ যে-কারণে জঙ্গল তোমাদের খুন করতে চাইছে।’

বাইরে একটা শব্দ হলো।

কেউ আসছে!

প্রফেসর লতা-গাছের কারণে জানালা দিকে কিছু দেখতে পেলেন না। দরজাটা খুললেন, সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে ঢুকল এক মোটা গাছের ডাল! ওটার উপরই দরজা বন্ধ করে দিলেন তিনি। ভিতরে যে অংশটা রয়ে গেল, সেটা কুঠারের এক কোপে কেটে দিলেন।

দরজার তলা দিয়ে সরু একটা লতা ভিতরে ঢুকল, সাপের মত এঁকেবেঁকে এগিয়ে এল! মুসা আর ফায়েজা যে সোফায় বসেছে সেটার দিকে আসছে!

ভীত চোখে তাকিয়ে থাকল ফায়েজা, কাঁদতে ভুলে গেছে।

লতাটা এক কোপে কেটে দিলেন প্রফেসর। আরও লতাগুল্ম ঢুকল। ওগুলো কচাকচ কাটলেন। কাঁপা গলায় বললেন, ‘এদের এভাবে কতক্ষণ ঠেকাতে পারব, বুঝতে পারছি না। অবস্থা সুবিধের মনে হচ্ছে না।’

একের পর এক লতা ঢুকছে আর কুঠার চালিয়ে কাটছেন তিনি। ঘেমে নেয়ে গেছেন। কোপ মারার সময় মুখ দিয়ে অদ্ভুত শব্দ করছেন। ‘হুপ্! হুপ্!

শোবার ঘরের দরজার তলা দিয়ে গাছের ডাল ঢুকতে শুরু করেছে! সোফার দিকে এগিয়ে আসছে! সামনের ঘরে একটা জানালার কাঁচ ভেঙে পড়ল! হিলহিল করে ভিতরে ঢুকল একগাদা লতা!

পাগলের মত কুঠার নামিয়ে আনছেন প্রফেসর, তারই ফাঁকে দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, ‘জান নিয়ে দৌড় দেয়ার জন্যে তৈরি হয়ে যাও, মুসা! ফায়েজাকে নিয়ে যেভাবে পারো পালাবে! আমি গাছগুলোকে এখানে ব্যস্ত রাখতে চেষ্টা করব! জঙ্গল জিতে গেছে, এখানে থাকলে আমাদের সবাইকে মরতে হবে!’

পাগলের মত ঘুরে ঘুরে গাছের ডাল কাটছেন প্রফেসর। চারপাশ থেকে গাছের ডাল আর লতা ভিতরে ঢুকছে! এক জায়গার ডাল কাটতে না কাটতেই অন্য দিক থেকে আসছে আক্রমণ! পরিশ্রম করে কোনও লাভ হচ্ছে না!

দরদর করে ঘামছেন প্রফেসর, হাঁপাচ্ছেন পরিশ্রমে।

হঠাৎ দরজার নীচে দিয়ে ভিতরে ঢোকা সমস্ত গাছের নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেল! বাংলোর দরজাটা খুলে গেছে! ভিতরে ঢুকলেন শাহানা আক্তার। তাঁর হাতে তিনটে টেস্ট টিউব। তাতে রূপালি তরল। তারই খানিকটা তিনি লতাগাছগুলোর

উপর ছিটিয়ে দিলেন। ওগুলো সঙ্গে সঙ্গে নিথর হয়ে গেল। জিনিসটা বোধহয় অ্যাসিড জাতীয়। যেখানে পড়েছে সেসব জায়গা শুকিয়ে যাচ্ছে।
'আণ্টি!' মুসা সোফা ছেড়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল।
'আম্মু!' দৌড়ে গিয়ে শাহানাকে জড়িয়ে ধরল ফায়েজা।
দরজাটা বন্ধ করে দিলেন শাহানা, তারপর ফায়েজার চুলে বিলি কেটে দিলেন।
'মুসা, ফায়েজা! তোমাদের জন্যে খুব চিন্তায় ছিলাম। পথ করে আসতে পারছিলাম না বাংলোয়, তা-ই...' টেস্ট টিউব দেখালেন, 'পারদ দিয়ে গাছ মেরে ভেতরে ঢুকতে হলো। এ যেন সত্যিকার একটা দুঃস্বপ্ন। মরে যাওয়া গাছের জায়গায় নতুন গাছ চলে আসছে!'
এতক্ষণে প্রফেসর স্টিভেনসনকে দেখতে পেলেন তিনি। জিজ্ঞেস করলেন কড়া গলায়, 'কে আপনি? আপনিই এসব পাগলামির জন্যে দায়ী? কেন ক্ষতি করতে চাইছেন আমাদের?'
'উনি প্রফেসর স্টিভেনসন,' তথ্য জোগাল মুসা। 'জীব-বিজ্ঞানী। উনি আমাদের বাঁচিয়েছেন। উনি না থাকলে আমরা এতক্ষণে মরে ভূত হয়ে যেতাম।'
শাহানা আক্তার কিছু বলবার আগেই তাঁর দিকে তর্জনী তুললেন প্রফেসর। তাঁর চেহারায় গনগনে রাগের ছাপ।
'তা হলে আপনিই দায়ী!' অভিযোগের সুরে বললেন তিনি। 'আপনিই আমাজন ধ্বংস করতে এসেছেন? কী করেছেন আপনি! নিরীহ গাছগুলো খুনি হয়ে গেল কেন? আপনি নিজেকে বিজ্ঞানী মনে করেন?
'কী যাতা বলছেন,' শাহানা আক্তারকে কিছুটা হতভম্ব দেখাল। 'আমি আমাজনের কোনও ক্ষতি করিনি। খামোকা করব কেন?'
ঠিক তখন গোটা ব্যাপারটা বুঝতে পারল মুসা।
গাছদের এই আচরণের জন্য আসলে আণ্টিই দায়ী! ওঁর গবেষণা দায়ী।
ঠিকই বলেছেন প্রফেসর।
আণ্টির এক্সপেরিমেন্টের কথা মনে পড়েছে ওর। তাঁর এক্সপেরিমেন্ট সফল হলে এই জঙ্গল আর থাকবে না। মানুষ আসবে, ঘাস চাষ করবে, বিরাট বিরাট ফ্যাক্টরি তৈরি হবে, সেসব ফ্যাক্টরিতে সার বানানো হবে, পৃথিবীর উন্নতি হবে—মানুষ উপকৃত হবে... কিন্তু জঙ্গল ধ্বংস হয়ে যাবে!
মুসা বলে উঠল, 'আপনার এক্সপেরিমেন্ট, আণ্টি! ঘাস থেকে সার বানানোর পরিকল্পনা! আমি বুঝতে পেরেছি! আপনি সফল হলে এখানকার জঙ্গল ধ্বংস হয়ে যাবে। গাছগুলো সেজন্যেই আক্রমণ করছে! ওরা লড়ছে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে!'

‘তা অসম্ভব, মুসা,’ বললেন শাহানা। ‘এ স্রেফ অসম্ভব। এর পেছনে কোনও যুক্তি নেই। তা ছাড়া ওরা জানবে কী করে আমি কী কাজে এখানে এসেছি?’
‘আপনিই তো সেদিন বললেন আমাদের। ওরা কোনও ভাবে টের পেয়ে গেছে, বুঝে ফেলেছে আপনার উদ্দেশ্য।’
‘অসম্ভব! তা কী করে হয়? গাছগুলো ইংরেজি জানে? আমার কথা ওরা বুঝবে কী করে?’
‘আপনি কি পাগল নাকি!’ খেপাটে গলায় বললেন প্রফেসর। ‘আপনি ভেবেছেন গাছ কেটে ঘাসের চাষ চালু করবেন? ভেবেছেন লোকজন এসে জঙ্গল নষ্ট করবে, জঙ্গলের প্রাণীদের আবাসভূমি শেষ করে দেবে, আর ওরা তা নীরবে সহ্য করবে? জীবিত সবকিছুরই বংশবৃদ্ধির অধিকার আছে! আজকে কেউ আপনার ছেলে-মেয়েদের মেরে ফেলতে চাইলে আপনি বাধা দেবেন না? গাছরাও ঠিক তা-ই করছে! নিজেদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ ভাল রাখতে মারমুখী হয়ে উঠেছে! জঙ্গল চায় না মানুষ অবিবেচকের মত ধ্বংসলীলায় মেতে উঠুক! এতে আখেরে মানুষেরও চরম সর্বনাশ হবে!’
শাহানা আক্তার কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। কী যেন ভাবছেন। মনে মনে প্রফেসরের কথায় সায় না দিয়ে পারলেন না।
‘এসব গাছের সারের কোনও প্রয়োজন নেই,’ বললেন প্রফেসর। ‘এমনিতেই ভাল আছে। এখন চিন্তা করে দেখুন কীভাবে এই বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। আপনার পারদ তো প্রায় শেষ দেখছি। জঙ্গলে গাছের শেষ নেই। ওগুলোর হাত থেকে কীভাবে বাঁচবেন, কিছু ভেবেছেন?’
কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন শাহানা, তারপর আস্তে করে মাথা নাড়লেন। ‘কোনও বুদ্ধি আসছে না। কী করা উচিত, আপনি বলতে পারেন?’
মাথা নাড়লেন প্রফেসর। ‘আমি জীববিজ্ঞানী। উদ্ভিদের ব্যাপারে তেমন কিছু জানি না।’
বাইরে মরিয়া হয়ে উঠেছে গাছগুলো। ঢুকতে চাইছে ঘরে।
হঠাৎ শাহানা আক্তারের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি বললেন, ‘প্রফেসর, একটু আগেই আপনি কী বলেছেন মনে আছে? আপনি বলছিলেন আমার সন্তানদের কেউ ক্ষতি করতে চাইলে আমি বাধা দেব? মাতৃত্বের কথা বলছিলেন আপনি! এক কাজ করলে কেমন হয়? আমিও তো মা! আমি যদি গাছদের জানাই ওদের সন্তানদের কোনও ক্ষতি করা হবে না? যদি কথা দিই? ওরা কি একজন মায়ের কথা বিশ্বাস করবে না?’
প্রফেসর চুপ করে থাকলেন। কী বলবেন ভেবে পেলেন না। এভাবে উদ্ধার পাওয়া যাবে এমন নিশ্চয়তা কোথায়? তবে এ ছাড়া আর কোন বুদ্ধিও তাঁর মাথায়

আসছে না।
‘চলুন, বাইরে যাই আমরা,’ বলে দরজা খুললেন শাহানা। ফায়েজাকে কোলে তুলে নিলেন।
শাহানাকে অনুসরণ করে বাংলো থেকে বের হলো মুসা। ওর পিছনে কুঠার উঁচিয়ে আসছেন প্রফেসর।
ওদের বের হতে দেখে গাছগুলোর ডাল বাঁকা হতে শুরু করেছে! লতাগুলো নড়েচড়ে উঠল! পকেট থেকে ছোট কয়েকটা টেস্ট টিউব বের করলেন শাহানা। ওগুলোর ভিতরে সবুজ ঘাসের নমুনা। ওগুলো উঁচিয়ে ধরলেন তিনি, বললেন, ‘শোনো তোমরা। আমি তোমাদের জঙ্গল নষ্ট করতে আসিনি। এই ঘাস যে-কোন জমিতে ফলানো সম্ভব। আমাজনকে নষ্ট করতে আসিনি আমি। প্রথমে ভেবেছিলাম আমাজনের কিছুটা ক্ষতি হবে। কিন্তু তার আসলে কোনও প্রয়োজন নেই। বিশ্বাস করতে পারো আমাকে। আমি একজন মা। সন্তানদের ভবিষ্যৎ নষ্ট হতে দেখলে কেমন লাগবে, তা আমি ভালই বুঝি। আমি কথা দিচ্ছি, আমার দ্বারা তোমাদের কোনও ক্ষতি হবে না।’
হঠাৎ করেই গাছের নড়াচড়া থেমে গেল। লতাগুলো স্বাভাবিক লতার মত নিথর! ঝোপগুলো এগিয়ে আসছিল, থেমে গেছে! গরম বাতাসে মৃদু মৃদু দুলছে গাছগুলো। চমৎকার সবুজের সমারোহ চারদিকে।
ফায়েজাকে কোল থেকে নামিয়ে পাশে দাঁড় করিয়েছেন শাহানা। ওর হাত ধরে আছেন শক্ত করে। গাছগুলোর প্রতিক্রিয়ার জন্য অপেক্ষা করছে সবাই, চোখে শঙ্কা।
একটা লজ্জাবতী গাছ শুধু এগিয়ে এল। লজ্জাবতীটা এসে ফায়েজার হাত ছুঁলো। ওটার পাতা গুটিয়ে গেল না। একটুক্ষণ তিরতির করে কাঁপল গাছটা, তারপর ফিরে গেল আগের জায়গায়! ওটাকে নিজের জায়গায় ফিরতে দেখে সামনে বেড়ে আসা গাছগুলো ফিরে যেতে শুরু করল। আধ ঘণ্টার মধ্যেই স্বাভাবিক হয়ে এলো সব, বাংলোর সামনে একটা গাছ, ঝোপ বা লতা থাকল না!
‘আণ্টি, ওরা বিশ্বাস করেছে,’ বলে উঠল মুসা।
‘আমরা জানে বাঁচলাম,’ বললেন প্রফেসর। শাহানার দিকে চাইলেন। ‘আশা করি আপনি বুঝতে পেরেছেন? প্রকৃতি নিজেকে রক্ষা করতে না পারলে মানব জাতিও ধ্বংস হবে!’
আস্তে করে মাথা দোলালেন শাহানা। ‘আমি জঙ্গল পরিষ্কার করার ব্যাপারে যা ভেবেছিলাম, সেজন্যে আসলেই আন্তরিক ভাবে দুঃখিত। ভবিষ্যতে আমি গবেষণা করব কীভাবে গাছের আরও উন্নতি করা যায়।’ ছলছল করে উঠল তাঁর

চোখ। ‘প্রফেসর স্টিভেনসন, আমার সন্তানদের বাঁচিয়েছেন বলে আমি আপনার প্রতি চিরকৃতজ্ঞ হয়ে রইলাম। এই ঋণ আমি কোনদিনও শোধ করতে পারব না।’
ফোকলা দাঁতে হাসলেন প্রফেসর। ‘আপনাকেও ধন্যবাদ। আশা করি আপনার ভবিষ্যৎ এক্সপেরিমেন্ট দুনিয়ার বনাঞ্চলকে রক্ষা করতে সহায়ক হবে।’
প্রফেসর থামতেই শাহানা আক্তারের হাত আঁকড়ে ধরল ফায়েজা। ‘আম্মু, আমি আর এখানে থাকব না।’
মুসার চোখেও অনুরোধ।
আস্তে করে মাথা দোলালেন শাহানা। ‘ঠিক আছে। বিকেল হয়ে গেছে, তবুও জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে আজকেই ফিরব আমরা। মুসা- ফায়েজা, জলদি করে জিনিসপত্র গোছাতে হবে। …প্রফেসর, আপনি দুপুরে খেয়েছেন? আসুন আমাদের সঙ্গে হালকা কিছু খাবেন।’
এক গাল হাসলেন স্টিভেনসন। ‘কতদিন ভালমন্দ কিছু খাই না! নিশ্চয়ই খাব। চলুন, আমি আপনাদের গোছগাছ করায় সাহায্য করতে পারব।’
সবাই ওরা বাংলোর ভিতরে গিয়ে ঢুকল।
পশ্চিমে হেলে পড়েছে সূর্য। সে-আলোয় আমাজনকে অপূর্ব দেখাল! অপরূপ প্রকৃতি, পাখিরা গাছের নীড়ে ফিরছে! কুউ-কুউ করে ডেকে উঠল একটা কোকিল।

.

এক ঘণ্টা পর খালের পাড়ে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে মুসা-ফায়েজা ও শাহানা আক্তারকে হাত নেড়ে বিদায় জানালেন প্রফেসর।
স্পিড-বোট ছাড়তেই ঝিরঝির করে বাতাস বইল। খালের দু’পাড়ে দুলছে গাছগুলো, ওরা যেন প্রশান্ত চিত্তে বিদায় দিল মুসাদের।
ম্যানুয়াস শহরের দিকে এগিয়ে চলল স্পিড-বোট। হুইল মুসার হাতে!
***

তিন গোয়েন্দা ভলিউম ১১৮/২ – জিন্দালাশ ভার্সেস তিন গোয়েন্দা – কাহিনি রচনা: কাজী শাহনূর হোসেন – তিন গোয়েন্দায় রূপান্তর: শামসুদ্দীন নওয়াব – সেবা প্রকাশনী – প্রথম প্রকাশ : ২০১০

প্রথম প্রকাশ: ২০১০

রবিনের টেরেসা নানু হোটেলের সামনে, সাইডওয়কে তাঁর পেইন্ট বক্সটা রাখলেন।

ওরা লুইজিয়ানার নিউ অর্লিয়েন্সে এসেছে। রবিনের নানু পেইন্টিং কোর্সে অংশ নেবেন, এবং তিনি কিশোর, রবিন আর মুসাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তাঁর সঙ্গে যোগ দিতে।

‘তুমি আজকে কী আঁকবে, নানু?’ প্রশ্ন করল রবিন। টেরেসা নানু ওর নানুর বোন। নীল পোশাক পরেছে আজকে রবিন। এমনকী মোজা আর স্নিকার্সও নীল।

‘এখনও জানি না,’ টেরেসা নানু বললেন, ‘আর্ট টিচার বলবেন। এই ব্যালকনিওয়ালা পুরানো বিল্ডিংগুলোর কোনওটার ছবি আঁকতে পারলে ভাল লাগত।’

‘আমাদেরকে সাথে করে এনেছেন বলে আবারও ধন্যবাদ,’ কিশোর বলল।

‘আর আমাদেরকে আশপাশটা ঘুরিয়ে দেখানোর জন্যে জ্যাককে ভাড়া করেছেন বলেও আপনার ধন্যবাদ প্রাপ্য,’ যোগ করল মুসা।

‘ওয়েলকাম,’ টেরেসা নানু বললেন। ‘ও আজ তোমাদেরকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?’

‘আমরা হাইকে যাচ্ছি,’ বলল মুসা।

‘জঙ্গলে বাস করে এমন এক কমিউনিটির সাথে দেখা হবে আমাদের,’ জানাল রবিন। ‘ও বলেছে ওখানকার লোকেরা নাকি কুঁড়েঘরে বাস করে, ইলেকট্রিসিটি ছাড়া!’

‘বাহ, ইন্টারেস্টিং তো!’ টেরেসা নানু বললেন। ‘ওহ, এই যে জ্যাকের ভ্যান। তোরা এনজয় কর। লাঞ্চে দেখা হবে!’

টেরেসা নানু এক বগলের তলায় পেইণ্ট বক্স গুঁজে হাঁটা দিলেন। একটা ভ্যান কার্বে এসে থামল। ওটার সারা গায়ে গাছ-পালা, লতা-পাতা আর ফুল আঁকা। এক পাশে এক এলিগেটরের ছবি। ওটার মুখ দিয়ে চলকে বেরিয়ে আসছে ‘গেটর গাইড’ শব্দগুলো।

বুট, শর্টস আর টি-শার্ট পরা লম্বা এক লোক লাফিয়ে নামল ভ্যান থেকে। মাথার চুল সাদা আর গায়ের চামড়া কালো তার।

‘কি, তোমরা হাইকের জন্যে রেডি?’ জিজ্ঞেস করল।

‘হাই, জ্যাক!’ ছেলেরা বলে উঠল। মুসা আর রবিন ভ্যানের পিছনে উঠে বসল। জ্যাক বসল চালকের আসনে। কিশোর বসল সামনের প্যাসেঞ্জার সিটে।
‘বেল্ট বেঁধে নাও!’ জ্যাক বলল।
ছেলেরা যখন সিট বেল্ট বাঁধছে তখন জ্যাক কিশোরের হাতে একটা বাগ স্প্রে দিল।
‘আমরা যেখানে যাচ্ছি সেখানে অনেক পোকা,’ বলল ও।
ছেলেরা ওদের বাহু আর পায়ে স্প্রে করে নিল, ওদিকে ব্যস্ত শহর ভেদ করে ভ্যান নিয়ে এগিয়ে চলল জ্যাক। কিশোর দেখল অনেক লোক জগিং করছে, কুকুরদের নিয়ে হাঁটছে, কিংবা সাইডওয়কের ছোট ছোট টেবিলে বসে নাস্তা সারছে।
‘আমরা আজকে দারুণ সুন্দর এক বনের ভিতর দিয়ে হাইক করব,’ গাড়ি চালানোর ফাঁকে ছেলেদেরকে বলল জ্যাক। ‘আর আমি যাদের কথা বলেছিলাম তাদের সাথে পরিচিত হব।’
‘ওরা আর সবার মত শহরে থাকে না কেন?’ রবিনের জিজ্ঞাসা। ‘সবাই শহুরে জীবন পছন্দ করে না,’ ব্যাখ্যা করল জ্যাক। ‘যাদের সাথে আজ তোমাদের দেখা হবে তারা মান্ধাতা আমলের জীবন ভালবাসে। তারা নিজেরাই নিজেদের ফসল ফলায়, শিকার করে কিংবা মাছ ধরে।’
‘খাইছে, ওরা টিভি আর কম্পিউটার মিস করে না?’ মুসার প্রশ্ন।
হেসে উঠল জ্যাক।
‘ছেলে-মেয়েরা শহরের স্কুলে যায়, কাজেই তারা হয়তো ওগুলো চেনে,’ বলল ও।
‘কিন্তু ইলেকট্রিসিটি ছাড়া ওরা রান্না করে কীভাবে?’ কিশোর জানতে চাইল।
‘আগুন জ্বেলে,’ জ্যাক বলল। ‘বেশিরভাগই কাদামাটি আর পাথরের তৈরি চুলো ব্যবহার করে।’
কিশোর কল্পনা করল ওর চাচা-চাচী বাড়ির বাইরে রান্না করছে। মৃদু হাসি ফুটল ওর ঠোঁটে।
রাস্তাটা সরু হয়ে এল। মেটে রাস্তায় ঝাঁকুনি খেতে শুরু করল ভ্যান। রাস্তার পাশে লম্বা গাছের সারি। ডাল-পালা থেকে চুইয়ে পড়ছে ধূসর সবুজ স্প্যানিশ শ্যাওলা। খোলা জানালা দিয়ে পাখিদের কলতান কিশোরের কানে আসছে। সে সঙ্গে মিষ্টি, স্যাতসেঁতে গন্ধ টের পাচ্ছে নাকে।
এসময় জ্যাকের সেলফোন বাজতে শুরু করল। ভ্যানটাকে রাস্তার পাশে দাঁড় করিয়ে মিনিট খানেক কথা বলল ও।
‘আমার বেগমসাহেব,’ ফোন ছাড়ার পর ছেলেদেরকে বলল ও। ‘আমাদের প্রথম বাচ্চা যে কোন দিন জন্মাতে পারে।’

‘খাইছে! দারুণ ব্যাপার!’ বলে উঠল মুসা। জ্যাক ভ্যান চালাতে লাগল। ‘আপনি কি ছেলেটাকে হাইকে নিয়ে যাবেন?’
‘বাচ্চাটা মেয়েও হতে পারে, মুসা,’ বলল নথি।
‘ছেলেই হোক আর মেয়ে, ও অবশ্যই হাইকার হবে,’ দাঁত বের করে হেসে বলল জ্যাক।
শীঘ্রি রাস্তার এক টুকরো ফাঁকা জায়গায় ভ্যান পার্ক করল জ্যাক। পিছনে পড়ে রয়েছে রোদ ঝলমলে মেটে রাস্তাটা। সামনে গাছ, শ্যাওলা আর ঘন ঝোপ-ঝাড়ের আঁধার এক দেয়াল।
ছেলেরা আর জ্যাক ভ্যান থেকে বেরিয়ে এল। বাতাস ভাপসা। ওদের মুখের চারপাশে উড়ে বেড়াচ্ছে খুদে খুদে পোকা।
জ্যাক এক কাঁধে ঝুলিয়ে নিল প্যাকটা। এবার এক পিতলের ফলক দেখিয়ে দিল। ধাতব ফলকটায় লেখা: ওল্ড ফরেস্ট ট্রেইল।
ট্রেইল এখান থেকে শুরু হয়েছে,’ বলল ও। ‘মাটিতে গাছের শিকড় আছে। সাবধান!
‘খাইছে, সাপ-টাপ নেই তো?’ প্রশ্ন করল মুসা। চট করে জ্যাকের পিছনে দাঁড়িয়ে পড়ল।
‘থাকতে পারে,’ জ্যাক বলল। ‘কিন্তু আমরা ওদেরকে দেখব না। আমাদের পায়ের শব্দ পেলেই সরে পড়বে ওরা।’
এক সারিতে এগোচ্ছে ওরা। জ্যাক সবার সামনে, ওর পায়ে পায়ে মুসা। রবিন অনুসরণ করছে মুসাকে, আর কিশোর রয়েছে সবার শেষে। ট্রেইলটা সংকীর্ণ, এবং গাছ-পালাকে পাক খেয়ে এগিয়েছে। মুখের কাছে শ্যাওলা ঝুলছে। গাছের শিকড় ওদেরকে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করছে। চারদিকে পোকা-মাকড়ের ভন-ভন শব্দ।
কিশোরের শরীরে ঘাম দেখা দিয়েছে। ও লক্ষ করল ডানে-বাঁয়ে আরও কয়েকটা সরু ট্রেইল চলে গেছে। একটার দিকে চেয়ে রয়েছে এসময় হঠাৎই হোঁচট খেল ও, হাত আর হাঁটুর উপর ভর দিয়ে পড়ে গেল।
‘তুমি ঠিক আছ তো?’ ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল জ্যাক।
কিশোর মুখ তুলে চাইতেই দেখতে পেল ছোট এক সাইন পেরেক দিয়ে গাছের গুঁড়িতে গাঁথা। কে যেন লাল অক্ষরে তিনটে শব্দ লিখে রেখেছে ওটায়:
সাবধান!
জিন্দালাশের এলাকা।
সাইনটার দিকে চেয়ে রইল ওরা। খানিকটা রং চুইয়ে পড়েছে, ফলে শব্দগুলোকে আরও ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে রক্ত ঝরে পড়ছে। বাহুর লোম দাঁড়িয়ে গেল

কিশোরের।
‘খাইছে! জিন্দালাশের এলাকা?’ প্রায় ফিসফিস করে বলল মুসা। ‘এর মানে কী?’
‘কে জানে,’ বলল জ্যাক। ‘এই নোটিশটা আগে দেখিনি। আমি তো প্রায়ই এখানে হাইকারদের নিয়ে আসি।’ সাইনটার দিকে কাছিয়ে গেল জ্যাক। ‘পেরেকটা নতুন,’ বলল। ‘দেখো, এখনও মরচে ধরার সময় পায়নি।’
‘দেখে মনে হচ্ছে রক্ত দিয়ে লেখা, বলল কিশোর।
জ্যাক একটা অক্ষর স্পর্শ করল।
‘না, লাল রং।’
‘কিন্তু কে এখানে লাগাল এটা?’ নথির প্রশ্ন।
শ্রাগ করল জ্যাক।
‘হয়তো কেউ মজা করেছে, টুরিস্টদের ভয় দেখানোর জন্যে, ‘ বলল ও। ‘গুজব শুনেছি গাঁয়ের কাছে গোরস্থানে নাকি কী সব অদ্ভুত ঘটনা ঘটছে।’
ঢোক গিলল মুসা।
‘খাইছে, কী ধরনের অদ্ভুত ঘটনা?’ জিজ্ঞেস করল।
‘কিছু লোক শপথ করে বলছে তারা একটা জিন্দালাশ দেখেছে। জিন্দালাশ, মানে জম্বিরা ভুডু ধর্মের অংশ। এখানে কেউ ভুডু চর্চা করে কিনা জানা নেই আমার, তবে অনেকেই বিশ্বাস করে। এসো, এগোই।’ বলল জ্যাক।
ছেলেরা জ্যাককে অনুসরণ করছে, কিশোর জিন্দালাশ সম্পর্কে বলা জ্যাকের কথাগুলো উল্টেপাল্টে ভেবে দেখল। শরীর শিউরে উঠল ওর।
আরও ক’মিনিট নিঃশব্দে হাইক করল ওরা। অন্ধকারাচ্ছন্ন ট্রেইলটা চওড়া হয়ে এক আলোকিত ফাঁকা জমিতে রূপ নিল। কিনারা ঘিরে প্রায় গোটা বিশেক কুঁড়ে অর্ধবৃত্ত তৈরি করেছে। প্রতিটা কুঁড়ের একটা করে বারান্দা, বাগান, আর অগ্নিকুণ্ড রয়েছে।
কুঁড়েগুলোর দেয়াল কাঠের গুঁড়ি, ডাল-পালা আর কাদার প্রলেপ দিয়ে তৈরি। ছাদগুলো বানানো হয়েছে টিনশীট, ডাল আর চওড়া পাতা দিয়ে।
ফাঁকা জমিটার মাঝখানে বড়সড় এক বাড়ি। অন্যগুলোর চাইতে আকারে এটা প্রায় চারগুণ। কিশোর খোলা দরজা দিয়ে উঁকি দিতেই অসংখ্য বসার আসন দেখতে পেল। ওর মনে হলো এটা গ্রামবাসীদের কোন ধরনের মিলনায়তন।
‘হাহ, আজব ব্যাপার,’ বলল জ্যাক। ‘কেউ এখানে নেই।’
চারধারে চাইল কিশোর। বাগানে কিংবা বারান্দায় কেউ নেই। কুঁড়েগুলোর পিছনের গাছ-গাছালি থেকে শব্দ করছে শুধু পোকা- মাকড় আর পাখিরা।
‘জিন্দালাশ হয়তো সবাইকে ধরে নিয়ে গেছে,’ ফিসফিস করে বলল মুসা। কিশোরের পিঠে খোঁচা দিল।

‘ভয় পেয়ো না,’ বলল রবিন।
কিশোর জ্যাকের বাহুতে আলতো চাপড় দিল।
‘ওখানে কে যেন আছে,’ আঙুল তাক করে বলল।
লম্বা এক মহিলা এক কুঁড়ে থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে। তার ধূসর চুল নেমে এসেছে কোমর অবধি। পরনের পোশাকটা দেখে মনে হলো বাসায় তৈরি। খালি পা।
‘হ্যালো, মির্না,’ চেঁচিয়ে বলল জ্যাক। ‘এরা কিশোর, মুসা আর রবিন। ছুটি কাটাতে এসেছে। আর সবাই কোথায়?’
মির্না নামের মহিলাটি ছেলেদের উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল। তার কুঁড়ের বাঁ দিকে সরু এক ট্রেইল। সেদিকে ইশারা করল। ‘ওরা সবাই ওখানে, কবরগুলো দেখছে,’ জানাল। জ্যাক তার আঙুল লক্ষ্য করে চাইল।
‘গোরস্থানে? কেন?’ প্রশ্ন করল।
মাথা নাড়ল মিনা।
‘নিজে গিয়ে দেখো,’ বলল। ‘খুব খারাপ ভুডু।’ এবার ঘুরে দাঁড়িয়ে হেঁটে ঢুকে গেল কুঁড়ের ভিতরে।
‘কী হচ্ছে এখানে?’ প্রশ্ন করল গোয়েন্দাপ্রধান।
‘জানি না, চলো গিয়ে দেখি,’ বলল জ্যাক।
জ্যাক ছেলেদেরকে পিছনে নিয়ে মির্নার বাগানের পাশ দিয়ে পা চালাল। সূর্যালোকিত জমি ছেড়ে বনভূমির আবছায়া অন্ধকারে প্রবেশ করল ওরা।
ক’মিনিট বাদে, ছোট এক গোরস্থানে এসে পৌঁছল। পুরানো এক লোহার বেড়া ঘিরে রেখেছে ওটাকে। এক গাছের ডাল থেকে ঝুলে পড়া শ্যাওলা বেড়ার একাংশ ঢেকে দিয়েছে। গোরস্থানের ভিতরে জনা ত্রিশ লোক দল বেঁধে দাঁড়িয়ে। কেউ কেউ চেঁচাচ্ছে। ক’জন কাঁদছে।
‘কী করছে ওরা?’ রবিন প্রশ্ন করল।
‘দেখি,’ বলল জ্যাক। দলটার কাছে হেঁটে গেল ও। ওকে অনুসরণ করল ছেলেরা। এক বৃদ্ধের পাশে একগাদা লাল মাটি। তার উপরে হাঁটু গেড়ে বসল জ্যাক। ওদের দু’জনের সামনে, মাটিতে গভীর দুটো গর্ত।
‘এই সপ্তাহে দুটো কবর চুরি গেছে,’ বৃদ্ধ বলল জ্যাককে। ‘আমার বউ আর আমি ভয় পাচ্ছি। ও এখানে আর থাকতে চাইছে না। বলছে জিন্দালাশের আশপাশে বাস করা সম্ভব নয়।’
জ্যাক উঠে দাঁড়াল। হাঁটু থেকে লাল মাটি ঝেড়ে ফেলল।
‘সময়টা ভাল নয়, ছেলেদেরকে বলল। ‘চলো পানির কাছে যাই।’

সরু এক ট্রেইল ধরে ওদেরকে নিয়ে চলল সে। এক উপকূলের কাছে বালিময় এক ফাঁকা জায়গায় শেষ হয়েছে ওটা।
‘লোকটা বলছিল জিন্দালাশেরা কবরগুলো লুট করেছে,’ বলল মুসা। ‘কিন্তু আমি তো জানতাম জিন্দালাশের গল্প সত্যি নয়!’
‘আমি জিন্দালাশ-ফিন্দালাশ বিশ্বাস করি না,’ জ্যাক বলল। ‘এর পিছনে নিশ্চয়ই অন্য কোন ব্যাখ্যা আছে।’
‘কিন্তু কবরগুলো খুঁড়ল কে?’ রবিনের প্রশ্ন।
‘জানি না,’ বলল জ্যাক।
‘কবরচোর আর ওই সাইনটা যে লাগিয়েছে সে হয়তো একই লোক,’ বলল কিশোর।
মাথা ঝাঁকাল জ্যাক।
‘হতে পারে,’ বলল। পানির দিকে একটা হাত দোলাল। ‘খুব সুন্দর সিনারি, তাই না?’
পানি নীল আর স্থির। উপকূলের ওপ্রান্তে, উঁচু-উঁচু দালান, দ্বীপের বুকে দাঁড়িয়ে আছে যেন।
‘ওই নৌকাগুলো কার?’ মুসা জিজ্ঞেস করল জ্যাককে। ক’গজ দূরে, সৈকতে কটা কাঠের নৌকা রাখা।
‘গ্রামবাসীদের,’ জ্যাক বলল। ‘ওরা মাছ আর কাঁকড়া ধরে।’
‘এটা কি আটলান্টিক মহাসাগর?’ রবিনের প্রশ্ন।
‘না, গালফ অভ মেক্সিকোর একটা শাখা,’ বলল জ্যাক। কটা দ্বীপের দিকে তর্জনী তাক করল। ‘গালফ ওদিকে গিয়ে আটলান্টিকের সাথে মিশেছে, ফ্লোরিডার কাছে।’
পানির কিনারা ধরে ছেলেদের নিয়ে হাইক করল জ্যাক। অগভীর পানিতে লম্বা পায়ের নীল হেরন হেঁটে বেড়াচ্ছে। ওদের ছায়া দেখলেই পালাচ্ছে ছোট ছোট মাছ। জ্যাক ছায়ায় শুয়ে থাকা এক হরিণ দেখাল।
‘কী সুন্দর এখানটা,’ বলল রবিন। ‘আর কী নির্জন!’
‘হ্যাঁ,’ বলল জ্যাক। ‘আমি এখানে জমি কিনে বাড়ি বানাতে চাই।’
প্যাক খুলে ছোট চার বোতল পানি বের করল ও। এক গুঁড়িতে বসে পানিতে চুমুক দিল ওরা, হেরনদের মাছের খোঁজে তল্লাশী চালাতে দেখল।
পানির ওপাশে, দূরের বাড়িগুলোর গায়ে যেন আগুন ধরিয়ে দিয়েছে সূর্য।
‘আজ রাতে এখানে ক্যাম্প করলে কেমন হয়?’ জ্যাক জানতে চাইল। ‘আমরা ক্যাম্পফায়ারে সাপার রেঁধে নিতে পারি।’
‘খাইছে! দারুণ হবে!’ বলে উঠল মুসা।

‘নানুকে লাঞ্চের সময় জিজ্ঞেস করব,’ বলল নথি। ‘আমি জানি নানু আপত্তি করবে না!
‘বাহ! তবে তো কথাই নেই। তোমাদেরকে ড্রপ করার পর কিছু সদাইপাতি করতে হবে আমার,’ জ্যাক বলল।
পানি পানের পর, জ্যাক ওদেরকে দেখিয়ে দিল কীভাবে ভিন্ন ভিন্ন পাখিদের বাসা চিনতে হয়। শিখিয়ে দিল কীভাবে পয়জন আইভি চেনা যায়। কিছু উদ্ভিদ থেকে কীভাবে চা আর ওষুধ বানায় তাও জানাল।
ঘড়ি দেখল জ্যাক।
‘তোমাদের নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে,’ বলল ও। ‘চলো, শহরে ফেরা যাক।’
‘আমার পেট জ্বলে যাচ্ছে,’ বলল মুসা। ‘হোটেলে ফেরা পর্যন্ত টিকব কিনা কে জানে!’
হেসে উঠল কিশোর।
‘হেরনদের মত কাঁচা মাছ ধরে খেলেই পারো,’ বলল ও।

.
আধ ঘণ্টা পরে, ছেলেরা টেরেসা নানুর সঙ্গে মিলিত হলো হোটেলের বাইরের রেস্তোরাঁয়। টেরেসা নানু ব্যালকনিতে এক ছাতার নীচে বসে রাস্তার দিকে চেয়ে রয়েছেন।
‘নানু, আমরা আজকে জ্যাকের সাথে ক্যাম্পিঙে যাই?’ রবিন প্রশ্ন করল।
‘নিশ্চয়ই,’ নানু জবাব দিলেন। এসময় ওয়েটার এল ওদের টেবিলে।
সবাই চীযবার্গার আর লেমোনেড অর্ডার দিল। খাবারের জন্য অপেক্ষা করার ফাঁকে টেরেসা নানুকে জিন্দালাশের সাইন আর কবরচোরদের কথা জানাল ওরা।
‘লাশ চুরি করবে কে?’ রবিন প্রশ্ন করল।
‘ইতিহাসে দেখা যায় মানুষ নানান কারণে কবর লুট করে, ‘ টেরেসা নানু ব্যাখ্যা করলেন। ‘কখনও সখনও ডাকাতরা লাশের সাথে কবর দেয়া মূল্যবান জিনিসপত্রের লোভে কবর খোঁড়ে। কয়েকশো বছর আগে এক বিখ্যাত পেইন্টার লাশ চুরি করত, যাতে মাস্‌ল্‌ আর হাড় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পারে। সে চাইত তার পেইন্টিং যেন একদম রিয়েল হয়।’
‘খাইছে!’ বলে উঠল মুসা।
কাছের এক টেবিলে, সুট-টাই পরা দু’জন লোক বরফ চা পান করছিল। কিশোর লক্ষ করল তাদের একজন ওদের টেবিলের দিকে মাঝে মধ্যে তাকাচ্ছে। কিশোরের মনে হলো, লোকটা টেরেসা নানুর কথা শোনার চেষ্টা করছে।
এসময় ওয়েটার খাবার নিয়ে এল। খাওয়ার সময় ওরা কেউ আর লাশ-টাশ নিয়ে কথা বলল না।

এরপর আবার যখন কিশোর মুখ তুলে চাইল, দেখতে পেল লোক দুটো চলে গেছে।
চারটের সময় হোটেলের বাইরে অপেক্ষা করছিল ছেলেরা। ক'মিনিট বাদে উদয় হলো জ্যাকের ভ্যান।
পিছনের দরজাগুলো খুলল জ্যাক।
'বড় দেখে একটা তাঁবু এনেছি, তোমরা তিনজনই এঁটে যাবে,' বলল ও।
'আপনি ঘুমোবেন কোথায়?' রবিনের প্রশ্ন।
'এখানে,' জ্যাক ওদেরকে গোটানো এক দড়ির দোলনা দেখাল।
ওরা সবাই ভ্যানে উঠে পড়ল। জ্যাক রাস্তায় শেষ বিকেলের ট্রাফিকের সঙ্গে যোগ দিল।
'আমরা কোথায় ক্যাম্প করব?' কিশোর প্রশ্ন করল। পিছনে বসেছে ও। সামনে জ্যাকের সঙ্গে মুসা আর রবিন।
'পানির কাছে হলে কেমন হয়?' জ্যাক বলল। 'কাল সকালে তোমাদেরকে এলিগেটরের বাসা দেখাতে নিয়ে যাব।'
'ওরা বাসা বাঁধে?' বলল মুসা। 'পাখিদের মতন?'
'পাখিদের মতন না। মা এলিগেটর মাটিতে ডিম পেড়ে গাছ- পালা দিয়ে ঢেকে রাখে,' ব্যাখ্যা করল জ্যাক।
ট্রেইলের মাথায় ভ্যান পার্ক করল জ্যাক। ওরা চারজনে বইল, তাঁবু, জ্যাকের দোলনা, আর দুটো ছোট ফুড কুলার।
এবার ভিন্ন এক ট্রেইল ধরে উপকূলে পৌঁছল ওরা, এবং শীঘ্রি পৌছে গেল পানির কাছের ফাঁকা জমিটায়।
'নৌকাগুলোর কাছে সব জড় করো,' বলল জ্যাক। 'সন্ধ্যা লাগার আগেই তোমাদের তাঁবু খাটিয়ে ফেলব।'
মুসা উল্টানো এক নৌকার তলা দিয়ে উঁকি দিল।
'এখানে কোন এলিগেটর নেই, ঠিক না, জ্যাক?' প্রশ্ন করল।
'হ্যাঁ, জায়গাটা বেশি খোলামেলা,' বলল ও। 'তবে প্রায়ই রাতে শিকার করে ওরা। আঁধার হয়ে গেলে পানিতে দুটো হলদে স্পট খোঁজ কোরো। এলিগেটরের চোখ আলো রিফ্লেক্ট করে, কাজেই ক্যাম্পফায়ারের আলোয় ওদের দেখা যাবে।'
জ্যাক আর ছেলেরা তাঁবু খাটাচ্ছে, ওদের ছায়া দীর্ঘতর হলো। শীঘ্রি গাছ-পালার আড়াল নিল সূর্য।
তাঁবু খাটানোর পর, দুটো গাছের মাঝখানে দোলনা টাঙাল জ্যাক। ছেলেদেরকে কটা কন্টেইনার দিল ও।
'এগুলোতে পানি ভরো,' বলল।

‘খাইছে! আমাদেরকে লবণ পানি খেতে হবে?’ প্রশ্ন করল মুসা। ‘না, রাত হলে ক্যাম্পফায়ার নেভানোর জন্যে পানি লাগবে,’ ব্যাখ্যা করল জ্যাক। ‘আমি বোতলে করে খাওয়ার পানি নিয়ে এসেছি।’
ছেলেরা পানির কাছে হেঁটে গেল, ওদের তাঁবু থেকে মাত্র বিশ ফীট দূরেই পানি।
মুসা ওর জগ ভরার জন্য ঝুঁকতেই, কিশোর একটা হাত রাখল ওর কাঁধে।
‘ওটা কি এলিগেটর? দুটো চোখ দেখতে পাচ্ছি!’ ফিসফিস করে বলল।
‘নাহ্, ডাল-টাল হবে,’ বলল মুসা।
রবিন যোগ দিল।
‘কিন্তু…কিন্তু ওই ডালটা তো দেখি তোমার দিকে সাঁতরে
আসছে!’
‘হা-হা, ভেরি ফানি,’’ বলল মুসা। জ্যাকের হাতে জগটা তুলে দিল।
‘ওই গাছটার পাশে পানিটা রাখো,’ বলল জ্যাক। বালির বুকে এক গর্ত খুঁড়ল। পাথর আর ভেজা বালি দিয়ে দেয়াল বানাল ওটার পাশে।
ছেলেরা এবার মরা ডাল খুঁজে পেতে সাহায্য করল ওকে। একটু পরেই ওরা আগুন ঘিরে বসে পড়ল। নাচুনে অগ্নিশিখায় প্রত্যেকের মুখের চেহারা ভুতুড়ে দেখাচ্ছে। কিশোর জিন্দালাশ আর এলিগেটরের কথা ভাবল। আগুনের আরেকটু কাছ ঘেঁষে বসল ও।
‘ওকে, কে কে হট ডগ, লেমোনেড আর মার্শম্যালো চাও?’ প্রশ্ন করল জ্যাক।
‘আমরা সবাই!’ চেঁচিয়ে উঠল মুসা।
জ্যাক কুলার দুটো খুলে রাজ্যের খাবার বের করতে লাগল।
ছেলেরা তাদের ডগ গরম করে আগুনের পাশে বসে খাচ্ছে। ওদের যখন মার্শম্যালো খাওয়া শেষ, আকাশে তখন তারা ফুটেছে। গোল থালার মত চাঁদটা খানিক ঢাকা পড়েছে মেঘের আড়ালে। গালফে টিপ-টিপ করে জ্বলছে কিছু আলো।
সবার আগে হাই তুলল কিশোর। এরপর সবাই হাই তুলতে লাগল। বালি দিয়ে জ্বলন্ত অঙ্গার ঢেকে দিল ওরা। গর্তের ভিতরে পানি ঢালল জ্যাক।
‘ঘুমিয়ে পড়ো, বলল ও। ছেলেরা গুড়ি মেরে ঢুকে পড়ল তাঁবুর ভিতরে।
‘তোমরা সামনের দিকে ঘুমাতে পারো,’ বলল মুসা। তাঁবুর দূরপ্রান্তে গুড়ি মেরে চলে গেল ও।
‘কেন?’ প্রশ্ন করল কিশোর। ‘তুমি তো সব সময় দরজার কাছে ঘুমাও।’
মুসা শার্ট খুলে বালিশ হিসেবে ব্যবহার করল।
‘হ্যাঁ, কিন্তু এখানে যদি এলিগেটর ঢোকে,’ বলল ও, ‘তা হলে আগে তোমাকে আর রবিনকে খাবে!’

পরে, কিশোর আচমকা উঠে বসল তাঁবুর ভিতরে। একটা শব্দে জেগে গেছে ও। কান পেতে শুনল, তারপর যিপারের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিল। গাছ-পালার মাঝ দিয়ে চাঁদের আলো ছায়া ফেলেছে ওদের ক্যাম্পসাইটে।
কিশোর এবার খুদে এক বাতি চলে বেড়াতে দেখল বনভূমির ভিতরে। ওর প্রথমে মনে হলো জোনাকি দেখেছে। কিন্তু ও জানে জোনাকিরা সোজাসুজি চলে না। মুসা আর রবিনকে জাগিয়ে দিল ও। দু'জনেই চোখ ঘষে, কিশোরের সঙ্গে হাঁটু গেড়ে তাঁবুর মুখের কাছে বসল।
আলোটা তখনও রয়েছে ওখানে, গাছ-পালার গায়ে লাফাচ্ছে।
'কী হতে পারে ওটা?' ফিসফিস করে বলল রবিন।
'ফ্ল্যাশলাইট,' জবাব দিল কিশোর।
'এই মাঝ রাতে কে চোরের মত ঘুরে বেড়াবে?' মুসার প্রশ্ন।
কিশোর হাত বাড়িয়ে তাঁবুর ফ্ল্যাপটা টেনে খুলল।
'চলো গিয়ে দেখি,' বলল।
'মনে হয় জ্যাককে জাগানো দরকার,' মুসা বলল। 'এটা সেই জিন্দালাশটা হতে পারে!'
'আমার ধারণা জিন্দালাশেরা ফ্ল্যাশলাইট নিয়ে ঘোরে না,' বলল কিশোর।
সরু এক পথ ধরে ধীর পায়ে আলোটা লক্ষ্য করে এগোল তিন গোয়েন্দা। মেঘের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে চাঁদ। এই আলো ঢেলে দিচ্ছে তো এই আবার নেই।
ওদের চোখের সামনে দূরের আলোটা একবার উধাও হচ্ছে, তারপর আবার জ্বলে উঠছে, আবার হারিয়ে যাচ্ছে।
ওরা এখন যেখানে এসে পৌঁছেছে সেখানে তিনটি ট্রেইল পরস্পরকে ভেদ করে গেছে। ওরা ডানে-বাঁয়ে কিংবা সোজা যেতে পারে।
'এখন কোনদিকে?' রবিনের জিজ্ঞাসা।
'মাঝখানেরটা দিয়ে গেলে মনে হয় আলোটার কাছে যাওয়া যাবে,' বলল কিশোর।
'খাইছে, রাস্তাটা সোজা গোরস্থানে গেছে!' ভয়ার্ত কণ্ঠে ফিসফিস করে বলল মুসা।
'আমরা মনে হয় কবরচোরকে ফলো করছি!' ককিয়ে উঠল রবিন।
'তাড়াতাড়ি করলে আমরা ওকে ধরতে পারব!' বলল কিশোর। 'আমি কাউকে ধরছি না!' সাফ জানিয়ে দিল মুসা।
'চলো এগোনো যাক,' বলল কিশোর। আমরা কোন কিছু জানতে পারলে ফিরে গিয়ে জ্যাককে ডেকে তুলব। ও সেলফোনে পুলিস ডাকবে।'

ছেলেরা পা টিপে টিপে এগিয়ে চলল। মুসা ঠিকই বলেছিল। ট্রেইলের শেষে, চাঁদের আলোয় কবরফলক চমকাতে দেখল কিশোর।
ছেলেরা বিশাল এক ওক গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে পড়ল, গোরস্থান থেকে ত্রিশ ফীট দূরে। চাঁদের আলো বেড়া আর কবরফলকগুলো স্পর্শ করেছে। শূন্য কবরদুটোর পাশে স্তূপাকারে মাটি রাখা। কোথাও কোন নড়াচড়া নেই।
'আমি মনে হয় ভুল ভেবেছিলাম, ফিসফিস করে বলল কিশোর। 'আমি শিয়োর ছিলাম-'
হঠাৎই কিশোরের মুখে হাতচাপা দিল মুসা। কিশোর শুনতে পেল সভয়ে আঁতকে উঠল রবিন।
একটা ফাঁকা কবর আলোকিত! ছেলেরা দেখতে পেল, দুটো হাত বেরিয়ে এল, তারপর গর্তের কিনারা চেপে ধরল।
এবার একটা মাথা উদয় হলো। মানুষটা যে-ই হোক মুখে ফ্ল্যাশলাইট ধরা। আলোর রশ্মির পাগলা নাচনের মধ্য দিয়ে এক ছায়ামূর্তি নিজেকে টেনে তুলল কবর থেকে।
নিঃশব্দে মাটিতে বসে পড়ল কিশোর, মুসা আর রবিন।
কবরের প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটা লম্বা। পরনে কালো পোশাক। মুখটা ছায়ার আড়ালে, তবে চাঁদের আলোয় মাথার চুল রূপালী দেখাচ্ছে। লোকটাকে পরিচিত লাগল কিশোরের চোখে।
প্যান্টের পা থেকে লাল মাটি ঝাড়ল লোকটা। এবার কব্জির উপর ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেলল, ক্ষণিকের জন্য আলোকিত হয়ে উঠল ঘড়িটা। এবার ঘুরে দাঁড়িয়ে হারিয়ে গেল গাছ-গাছালির আড়ালে।
'কে-কে ওটা?' প্রশ্ন করল মুসা।
'নিঃসন্দেহে জিন্দালাশ নয়,' বলল রবিন। 'জিন্দালাশ ঘড়ি পরে না। ফ্ল্যাশলাইটও সাথে রাখে না।'
'কবরের মধ্যে কী করছিল তাই ভাবছি,' কিশোর বলল। 'গিয়ে দেখব নাকি?'
'খাইছে, না!' হিসিয়ে উঠল মুসা। 'গোরস্থানে ছোঁক-ছোঁক করছি এ-ই অনেক। কবরে নামা সম্ভব নয়!
'চলো, জ্যাককে গিয়ে বলি,' বলল রবিন।
ক্যাম্পসাইটে ফিরে এল ছেলেরা। জ্যাককে দোলনায় শুয়ে থাকতে দেখে স্বস্তিবোধ করল কিশোর।
'এখন জাগানোর দরকার নেই। সকালে বলা যাবে, কিশোর।
ছেলেরা পা টিপে টিপে জ্যাকের পাশ কাটাল, তারপর গুড়ি মেরে তাঁবুতে ঢোকার জন্য হাঁটুতে ভর দিল।

‘ইন্টারেস্টিং কিছু দেখলে?’ জ্যাক আচমকা প্রশ্ন করল। ওরা তিনজনই চমকে উঠল।
‘আপনি জেগে আছেন?’ কিশোর বলল।
দোলনায় উঠে বসল জ্যাক।
‘আমার ঘুম খুব পাতলা,’ বলল সে। ‘কোথায় গিয়েছিলে তোমরা?’
‘আপনার সাথে কথা আছে,’ রবিন বলল। ‘গোরস্থানে একজনকে দেখেছি!’
‘তাই?’ দোলনা থেকে লাফিয়ে নামল জ্যাক। ওর পরনে কালো সোয়েট পোশাক। হাতা উপরে তুলে ঘড়ি দেখল। ‘এই মাঝরাতে গোরস্থানে কী করছিলে তোমরা?’
‘কেন জানি ঘুম ভেঙে যায় আমার,’ বলল কিশোর। ‘জঙ্গলের মধ্যে একটা আলো দেখে আমরা ঠিক করি ফলো করব।’
কিশোর চেয়ে রইল জ্যাকের দিকে। গোরস্থানে একটু আগে দেখা লোকটার সঙ্গে মিল আছে জ্যাকের। দু’জনেই লম্বা, পরনে কালো পোশাক। দু’জনের চুলই সাদা এবং হাতে ঘড়ি।
‘এক লোককে কবর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেছি!’ মুসা বলল। ‘ওটা জিন্দালাশ ছিল না, কারণ হাতে ঘড়ি ছিল, তাই না?’ বন্ধুদের উদ্দেশে বলল শেষের কথাগুলো।
কিশোরের দৃষ্টি স্থির হলো জ্যাকের মুখের উপর। জ্যাকের উপর গুপ্তচরগিরি করেনি তো ওরা? খালি কবরে জ্যাক কী করবে?
‘আপনার কি মনে হয় লোকটা কবরচোর?’ রবিনের প্রশ্ন।
‘ও কি মাটি খুঁড়ছিল?’ জ্যাক জানতে চাইল।
‘জানি না,’ বলল মুসা। ‘আমরা বেলচা-টেলচা কিছু দেখিনি।’
মুসা কিশোরের দিকে আঙুল তাক করল।
‘ও কবরে নামতে চেয়েছিল, আমি দিইনি!’
‘ঠিক করেছ,’ মুসাকে বলল জ্যাক। ‘কিন্তু আমাকে না জানিয়ে জঙ্গলে বের হওয়াটা বোকামি হয়ে গেছে। এরকম আর কোরো না, কেমন?’
মাথা ঝাঁকাল ছেলেরা।
‘ঠিক আছে, কিন্তু লোকটা কে হতে পারে?’ রবিন জিজ্ঞেস করল।
জ্যাক হাত-পা ছড়িয়ে হেলান দিয়ে বসল দোলনা ঝোলানো দুটো গাছের একটায়।
‘আমার অনুমান? গ্রামের একজন লোক গোরস্থান পাহারা দিচ্ছিল। ওরা মনে হয় পাহারাদার নিয়োগ করেছে, কবরচোররা যাতে আর কবর লুট করতে না পারে,’ বলল জ্যাক।
‘কিন্তু সে কবরে নেমে কী করছিল?’ মুসা জানতে চাইল।

শ্রাগ করল জ্যাক।
‘কোন ধারণা নেই,’ স্বীকার করল ও। ‘এখন এসব বাদ দিয়ে ঘুমালে কেমন হয়?’
জ্যাক নিজেকে টেনে তুলল দোলনায়। ছেলেরা গুড়ি মেরে তাঁবুতে ঢুকল, এবং কিশোর চেইন টেনে বন্ধ করে দিল ওটা। একটু পরে, চিত হয়ে শুয়ে তাঁবুর ছাদের দিকে চেয়ে রইল ও।
কিশোর মনে করার চেষ্টা করল ফ্ল্যাশলাইট অনুসরণ করার আগে জ্যাকের দোলনার দিকে ভাল করে চেয়েছিল কিনা। ওরা যখন বেরোয় তখন জ্যাক ওখানে ছিল কিনা জানে না কিশোর।
ঢোক গিলতে চেষ্টা করল ও, কিন্তু মুখের ভিতরটা কেমন শুকনো ঠেকল। কবরচোর কি ওদের তাঁবুর ঠিক বাইরেই দোলনায় শুয়ে ঘুমোচ্ছে?
সে রাতে ভাল ঘুম হলো না গোয়েন্দাপ্রধানের।
তাঁবুর বাইরে কারও গান শুনে ঘুম ভাঙল কিশোরের। উঁকি মেরে দেখতে পেল জ্যাক কুলার দুটো খুলছে।
সূর্যের আলো পানিতে তেরছাভাবে পড়ে, গালফকে সোনা রঙে রাঙিয়েছে। সূর্যের সঙ্গে মিষ্টি গন্ধ নিয়ে একটা বাতাস এসেছে। চমৎকার এক সকাল। কিশোরের খিদে পেয়েছে।
কিশোর স্নিকার্স পরার সময়, গত রাতের কথা ভাবল। হেসে উঠল ও। কবরে যে নেমেছিল সে জ্যাক হতে পারে না। কোনভাবেই না।
কিশোর মুসা আর রবিনকে কনুইয়ের আলতো গুঁতো দিয়ে জাগাল, এবার ফ্ল্যাপের চেইন খুলে তাঁবু ত্যাগ করল।
জ্যাকের পরনে এখন আবার শর্টস আর টি-শার্ট।
‘অ্যাই,’ কিশোরের উদ্দেশে চেয়ে হাসল সে। ‘আমার কাছে ফল আর জুস আছে। খিদে পেয়েছে?’
‘হ্যাঁ, পেট গুড়-গুড় করছে,’ বলল কিশোর।
‘আমারও!’ বলে ওদের সঙ্গে যোগ দিল মুসা। এরপর বেরিয়ে এল রবিন।
জ্যাক খাবার বয়ে নিয়ে গেল এক ফ্ল্যাট-বটম নৌকার কাছে। ওটাকে টেবিল হিসেবে ব্যবহার করবে। খাওয়ার সময় সাগরের পানির দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করল ওরা।
‘দেখো,’ বলল জ্যাক, তীরের দিকে আঙুল তাক করল। পানির কিনারায় বসে এক মা কাঠবিড়ালি আর দুটো ছানা। হাত-মুখ ধুয়ে ফের গাছে ফিরে গেল ওরা।
‘এলিগেটরের বাসা কখন দেখব আমরা?’ মুসা প্রশ্ন করল।
ঘড়ি দেখল জ্যাক।

‘শীঘ্রি। তবে আগে মির্নার সাথে দেখা করব। কোন অসুবিধে নেই তো?’ প্রশ্ন করল। ‘কালকে ওকে চিন্তিত মনে হলো।’
‘অসুবিধে কীসের?’ বলল কিশোর। ‘কিন্তু তাঁবু আর এগুলো কী করব?’
‘পরে দেখব, বলল জ্যাক।
‘মিনাকে কি বলবেন কাল রাতে আমরা কী দেখেছি?’ রবিন প্রশ্ন করল।
জ্যাক ক’মুহূর্ত নীচের ঠোঁট কামড়াল।
‘আমার ধারণা মত ওটা যদি গ্রামবাসীদের কেউ হয়ে থাকে তবে মির্না জানবে,’ বলল সে। কিন্তু আমি অবশ্যই ঘটনাটা তাকে জানাব।’
ওরা এবার ছোট্ট গ্রামটার দিকে হাইক করে চলল। মির্নাকে পাওয়া গেল, বাগানের আগাছা সাফ করছিল।
জ্যাকের দিকে মুখ তুলে চাইল সে।
‘সবাই গোরস্থানে,’ বলল।
‘দেখতে এলাম তুমি কেমন আছ,’ জ্যাক বলল তাকে। বারান্দার কিনারায় বসল মির্না। পিঠ খাড়া করে হাত থেকে মাটি ঝাড়ল।
‘আমার বন্ধু বো এখান থেকে চলে যেতে চায়। লুট হওয়া একটা কবর ওর বাবার,’ জ্যাকের দিকে চকিতে চাইল ও। ‘আমিও ভয় পাচ্ছি।’
ঠিক এসময় জ্যাকের সেল ফোন বেজে উঠল।
ও জবাব দিল, শুনল, তারপর বলল, ‘ঠিক আছে, আমি একটু পরেই আসছি।’
‘আজকেই বাচ্চা হবে?’ কিশোর প্রশ্ন করল।
‘জানি না, তবে আমার বউ বলছে ওর অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছে, বলল জ্যাক। ‘ডাক্তারের কাছে যেতে চায়। তোমাদেরকে হোটেলে ফিরিয়ে নিয়ে গেলে কোন অসুবিধে নেই তো? পরে তোমাদেরকে তুলে নেব ওই এলিগেটরের বাসা দেখার জন্যে।’
‘ওরা আমার সাথে থাকতে পারে,’ প্রস্তাব করল মির্না। ‘তুমি বউয়ের সাথে দেখা করোগে যাও। তুমি না ফেরা পর্যন্ত ওরা এখানেই থাকুক।’
‘কি, থাকবে?’ জ্যাক প্রশ্ন করল।
‘নিশ্চয়ই,’ বলল রবিন। ‘কিন্তু আপনি আমার নানুকে জানিয়ে দিয়েন। পেইন্টিংয়ের সময় সাথে সেল ফোন রাখেন তিনি।’
মাথা ঝাঁকাল জ্যাক।
‘আমি ভ্যান থেকে তাঁকে ফোন করব,’ বলল।
ট্রেইল ধরে জগিং করে ফিরে চলল সে।
‘এক ঘণ্টার মধ্যে দেখা হচ্ছে!’ কাঁধের উপর দিয়ে চেঁচাল। ‘আমি বরং আগাছাগুলো সাফ করে ফেলি,’ মির্না বলল। পোশাকটা একটু তুলে নিয়ে হাঁটু

গেড়ে বাগানে বসল। পায়ের তলা কালো হয়ে গেছে মাটি লেগে।
‘মিনা, আপনাদের কোন লোক কি গত রাতে গোরস্থান পাহারা দিতে গিয়েছিল?’ গোয়েন্দাপ্রধানের প্রশ্ন।
মহিলা বসে পড়ল।
‘কেন জিজ্ঞেস করছ?’
‘আহ্…জ্যাক জিজ্ঞেস করত, কিন্তু ভুলে গেছে,’ বলল কিশোর।
মাথা নাড়ল মির্না।
‘আমি জানি না। আমি বাগানে কাজ করি, তোমরা না হয় চারপাশটা একটু ঘুরে দেখো,’ বলল সে।
‘যদি হারিয়ে যাই?’ মুসা জিজ্ঞেস করল।
‘তা হলে আমি গিয়ে তোমাদের খুঁজে নেব,’ মির্না বলল। পকেটের গভীরে হাত ভরে ফিতে লাগানো একটা হুইস্ল্ বের করল। ‘আমার নাতি-নাতনীরা এখানে বেড়াতে এলে এটা ব্যবহার করে,’ বলে হুইসলটা ঝুলিয়ে দিল মুসার গলায়।
‘আপনার নাতি-নাতনীরা এখানে থাকে না?’ কিশোর জিজ্ঞেস করল।
মাথা নাড়ল মির্না।
‘আমার ছেলে পরিবার নিয়ে এখান থেকে চলে গেছে,’ নিজের সাদামাঠা কুঁড়ের দিকে তাকিয়ে বলল সে।
এক গোছা লেটুসের ভিতর থেকে একটা আগাছা টেনে বের করল মির্না।
‘যাও, খেলা করোগে,’ বলল।
ছেলেরা মির্নার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফাঁকা জমিটার কিনারে হেঁটে এল।
‘আমি গোরস্থানে যেতে চাই,’ রবিন বলল।
‘খাইছে! কেন?’ মুসার প্রশ্ন।
‘তোমার কৌতূহল জাগছে না?’ জিজ্ঞেস করল রবিন। ‘নাকি তোমার বিশ্বাস কাল রাতে আমরা সত্যিই একটা জিন্দালাশ দেখেছি?’
‘জানি না এবং জানতে চাইও না,’ বলল মুসা। ‘ভীষণ ভয় পেয়েছি আমি।’
‘আরে, এখন তো দিনের বেলা, এত ভয়ের কী আছে? কে কবরে নেমেছিল সে ব্যাপারে আমরা হয়তো কোন ক্লু পেয়ে যেতে পারি, ‘ কিশোর বলল।
‘ঠিক আছে, যাব, কিন্তু আমাকে কবরে নামতে বোলো না!’ বলল মুসা।
গোরস্থানে যাওয়ার পথটা খুঁজে নিল ছেলেরা। ওখানে পৌছে দেখে জনা বারো গ্রামবাসী হাঁটুতে ভর দিয়ে ফাঁকা কবর দুটোর পাশে বসা। সবার মাথা নোয়ানো, এবং কারও মুখে কথা নেই।
‘ওরা মনে হয় প্রার্থনা করছে,’ ফিসফিস করে বলল কিশোর 1 ‘এসো এগোই।’
লোহার বেড়া অনুসরণ করে নিঃশব্দে এগোল ওরা।

সরু আরেকটি পথের সামনে চলে এল, অপর যে পথটা মির্নার কুঁড়ের দিকে গেছে এটি তার উল্টোদিকে।
পথটায় উঁকি দিল মুসা। ওর এক হাতে মির্নার হুইসল।
‘কী আছে ওখানে?’ কাঁপা গলায় প্রশ্ন করল।
‘সেটাই তো জানতে চাই,’ বলল রবিন।
এক সারিতে এগোল ওরা। সবার আগে রবিন, মুসা ওর ঠিক পিছনে-এজন্য রবিন একটু পরে হঠাৎই থেমে দাঁড়ালে প্রায় ওর গায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়তে যাচ্ছিল ও।
‘কী?’ রবিনের পাশে এসে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল কিশোর।
রবিন মুখে কিছু বলল না। মাটির দিকে তর্জনী নির্দেশ করছে।
এবার কিশোর আর মুসাও দেখতে পেল। ভেজা ভেজা লাল কাদার উপরে প্রকাণ্ড এক পায়ের ছাপ আবিষ্কার করেছে রবিন
‘খাইছে!’ গুঙিয়ে উঠল মুসা। ‘জিন্দালাশের পা!’
‘ওই যে দেখো, আরেকটা!’ বলে উঠল কিশোর, পথের সামনের দিকে আঙুল ইশারা করল। ‘আরও একটা!’
‘কার পায়ের ছাপ তাই ভাবছি,’ রবিন বলল। হাঁটু গেড়ে বসে একটা আঙুল রাখল ছাপের মধ্যে। ‘এগুলো পায়ের পাতার ছাপ। কবরের ওই লোকটা খালি পা ছিল কিনা মনে আছে?’
শ্রাগ করল কিশোর। ছাপের পাশে নিজের পা রাখল।
‘আমার পায়ের প্রায় দ্বিগুণ!’
‘এসো এগুলোকে ফলো করি,’ বলল রবিন।
‘খাইছে,’ প্রায় ককিয়ে উঠল মুসা। ‘তুমি পাগল নাকি?’
‘তুমি জানতে চাও না এগুলো কার ছাপ?’ কিশোর প্রশ্ন করল। ‘কবরচোরের হতে পারে!’
‘এসো,’ বলে আবারও আগে বাড়ল রবিন।
ওরা ট্রেইল ধরে হাঁটছে, মাটি গাঢ় লাল থেকে বাদামি হয়ে প্রায় কালো হয়ে এল। নরম মাটিতে পদচিহ্ন খুঁজে পেতে কষ্ট হলো না ওদের।
মুসা হঠাৎই থমকে দাঁড়াল। বাতাসে নেকড়ের মতন নাক উঁচু করল।
‘খাবারের গন্ধ পাচ্ছি,’ বলল ও।
‘কীসের? হট ডগের?’ প্রশ্ন করল কিশোর।
মাথা নাড়ল মুসা।
‘মশলাদার কিছুর,’ বলল ও। ‘চিনির মত!

‘জঙ্গলে চিনি?’ জিজ্ঞেস করল কিশোর। ‘এখানে কোথাও রেস্টুরেন্ট থাকতে পারে।’
এসময় আচমকা থমকে দাঁড়াল রবিন। ঠোঁটে একটা আঙুল রাখল।
‘শশশ! শোনো!’ হিসিয়ে উঠল ও।
ক’সেকেণ্ড পরে ওরা সবাই কুঠার চালানোর শব্দ পেল। শব্দটা হয়েই চলেছে।
ওরা পরস্পর মুখ তাকাতাকি করল। রবিন হেঁটে চলল, অন্যরা অনুসরণ করল।
আলোকিত এক ফাঁকা জমিতে গিয়ে শেষ হয়েছে ট্রেইলটা। তিন গোয়েন্দা দাঁড়িয়ে পড়ে অবাক চোখে চেয়ে রইল। সামনে ছোট এক কেবিন। বাতিল জিনিসপত্র যেমন, পুরানো টিন, বেমানান বোর্ড, প্লাস্টিকের শীট, এমনকী গাড়ির জং ধরা এক হুড দিয়ে তৈরি।
বিশাল এক গাছ ছায়া দিচ্ছে বাড়িটাকে। এক ডাল থেকে ঝুলছে এক টায়ারের দোলনা। এখানে ছোট ছেলেপিলে থাকতে পারে, ভাবল কিশোর।
ওদের দিক পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়ানো লম্বা এক লোক। হাতে কুঠার। মাথার চুল সাদা। পরনে লম্বা প্যান্ট আর লম্বা-হাতা শার্ট। প্যান্টের নীচে লম্বা-লম্বা পা রয়েছে অনুমান করল কিশোর।
লোকটা কুঠার মাথার উপরে তুলে নামিয়ে আনল এক গুঁড়ির উপরে। ভাঙা টুকরো দুটো তোলার জন্য ঝুঁকতেই, দেখতে পেল ছেলেরা লক্ষ করছে ওকে।
কিশোর চমকিত। ও বয়স্ক কোন লোক হবে মনে করেছিল। কিন্তু ওদের দিকে চেয়ে থাকা মুখটা মসৃণ। লোকটার চোখজোড়া বাদামি আর উষ্ণ। বয়স জ্যাকের কাছাকাছি।
‘হ্যালো,’
লোকটা বলল। কণ্ঠস্বর গভীর আর মৃদু। ‘তোমরা কি হারিয়ে গেছ?’
কিশোর মুখ খুলল।
‘না, আমরা… ঘুরে বেড়াচ্ছি,’ বলল ও।
‘কিছু খাবে? খিদে পেয়েছে?’ লম্বা লোকটা প্রশ্ন করল।
কাঠের গাদার পিছনে, গর্তের মধ্যে আগুন জ্বলছে।
অগ্নিশিখার উপরে কালো এক লোহার পাত্র চড়ানো, মশলাদার
খাবারের গন্ধে ম-ম করছে বাতাস।
‘আমরা এইমাত্র নাস্তা করে এসেছি,’ বলল রবিন। ‘তারপরও জিজ্ঞেস করেছেন বলে ধন্যবাদ, মিস্টার। ‘
‘আমার নাম বায়রন,’ লোকটি বলল।
‘আমি রবিন, আর এরা আমার বন্ধু কিশোর আর মুসা,’ বলল রবিন।
এক গাছের নীচে এক ইজেল দৃষ্টি কাড়ল কিশোরের।

‘আপনার আঁকা ছবি দেখতে পারি?’ প্রশ্ন করল ও।
‘ওকে,’ বলল বায়রন, মুখের চেহারা লাল।
ইজেলের কাছে হেঁটে গেল তিন বন্ধু। প্রাচীন এক লোহার বেড়া এঁকেছে বায়রন। বেড়ার উপরে এক গাছের ডাল থেকে ঝুলছে ধূসর স্প্যানিশ শ্যাওলা। চাঁদ আলো ছড়াচ্ছে, মৃদু আভায় আলোকিত করে তুলেছে দৃশ্যটাকে। বেড়ার ওপাশটা ফাঁকা।
‘এখনও শেষ হয়নি,’ বায়রন কিশোরের পিছন থেকে বলে, চমকে দিল গোয়েন্দাপ্রধানকে।
এত লম্বা লোক এতটা নিঃশব্দে হাঁটে কীভাবে? ভাবল কিশোর।
‘আপনার ছবি তো দারুণ!’ বলে উঠল রবিন। ‘আমার টেরেসা নানু ও ছবি আঁকতে ভালবাসে।’
বায়রন মৃদু হাসল। মুখের চেহারা রক্তবর্ণ। ছোট বাগানটার দিকে হেঁটে গেল।
‘তোমরা স্ট্রবেরি ভালবাস?’ প্রশ্ন করল।
‘হ্যাঁ!’ বলল মুসা, এবং ছেলেরা বায়রনকে অনুসরণ করল। বাগানটা পরিপাটি করে সারি দিয়ে সাজানো। ছোট এক গাছের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখা এক বেলচা আর এক আঁকশি। টমেটো, লেটুস, শসা আর অচেনা কয়েক পদের সব্জী দেখতে পেল কিশোর। বাগানের এক কোনা স্ট্রবেরির চারা দিয়ে ঠাসা।
বায়রন তিন গোয়েন্দাকে ফল খেতে বলল। বাগানে সাবধানে ঢুকল ওরা। উজ্জ্বল, লাল বেরি ছিঁড়ে নিতে লাগল।
হঠাৎ ওরা হুস করে এক শব্দ শুনল, এবং প্রকাণ্ড এক পেঁচা উড়ে এল গাছ থেকে। পাখিটা বায়রনের কব্জির উপর বসে হাত থেকে একটা স্ট্রবেরি তুলে নিল।
‘এর নাম বিল,’ বলল বায়রন।
‘খাইছে!’ বলে উঠল মুসা। ‘দারুণ!’
বায়রন ওর বাহু বাড়িয়ে দিল মুসার দিকে।
‘চাইলে আদর করতে পারো,’ সগর্বে বলল।
মুসা যখন বিলের গায়ে হাত বুলাচ্ছে, তখন রবিন কিশোরের বাহুতে খোঁচা দিল। কিশোর ওর দিকে চাইল, ক’ফীট দূরে রাখা বেলচাটার দিকে ভ্রূ দেখাল ও।
বেলচার কিনারাগুলোতে লাল কাদা মাখা।
বায়রন বিলকে বয়ে নিয়ে গেল সুপ পটের কাছে। ছেলেরা ওকে চামচে করে কিছু তুলে নিয়ে পাখিটাকে খাওয়াতে দেখল।
‘লাল মাটিটা গোরস্থানের মাটির মত!’ ফিসফিস করে বলল রবিন।
‘তাতে কী?’ আরেকটা স্ট্রবেরি তুলে নিয়ে বলল মুসা।

‘বায়রন হয়তো কবর খুঁড়ছিল,’ বলল রবিন, গলা খাটো রাখল। ‘এই বাগানের মাটি কালো, লাল নয়!’
মুখের সামনে থেমে গেল মুসার হাত। চোখ বুজে গিয়ে পরমুহূর্তে আবার খুলে গেল।
‘তার মানে…কাল রাতে কবরস্থানে হয়তো ও-ই গিয়েছিল!’
‘আস্তে!’ফিসফিসিয়ে বলল কিশোর। ‘আমি শিয়োর শুধু কবরস্থান নয়, এই এলাকার আশপাশেও লাল মাটি রয়েছে। কাল জ্যাকের ভ্যানের মেঝেতেও একই রঙের মাটি দেখেছি আমি।’
মুসা বায়রনের দিকে চোরা চাউনি হানল, লোকটা এখনও বিলকে খাওয়াচ্ছে।
‘কাল রাতে দেখা লোকটার মাথার চুল বায়রনের মত সাদা ছিল,’ ফিসফিস করে বলল। ‘আর ওর লম্বা লম্বা পাগুলো দেখো। গোরস্থানের কাছে যে পায়ের ছাপগুলো আমরা দেখেছি সেগুলো হয়তো ওরই।’
‘কোন প্রমাণ নেই,’ বলল কিশোর। নীচের ঠোঁটে চিমটি কাটল। কাল রাতে চাঁদের আলোয় দেখা জ্যাকের কথা মনে পড়ল ওর। জ্যাকের মাথার চুল সাদা দেখাচ্ছিল, ঠিক গোরস্থানের রহস্যমানবটির মত।
‘আমি অন্য চিন্তা করছি,’ শান্ত কণ্ঠে যোগ করল কিশোর।
ঠিক এসময় বায়রন মুখ তুলে চেয়ে ওদের উদ্দেশে হাসল।
‘আমার টায়ারে দোল খাবে?’ প্রশ্ন করল।
‘ন-না, ধন্যবাদ,’ রবিন বলল। ‘আমাদের ফিরতে হবে।’
বায়রন বিলকে ছুঁড়ে দিল বাতাসে এবং ওটা গাছ-পালার আড়ালে উধাও হয়ে গেল। এবার বায়রন ছেলেদের দিকে হেঁটে এসে পেল্লায় একটা হাত বাড়িয়ে দিল।
‘তোমাদের সাথে পরিচিত হয়ে খুব ভাল লাগল,’ বলল সে।
কিশোর বায়রনের হাত ঝাঁকিয়ে দিল।
‘আমাদেরও ভাল লেগেছে,’ বলল ও।
ট্রেইলের দিকে পা বাড়াল ওরা। বায়রন আর ওর কেবিন চোখের আড়াল হতেই দৌড় শুরু করল তিনজনে। পাঁচ মিনিট বাদে, থমকে দাঁড়িয়ে হাঁফাতে লাগল মির্নার ছোট্ট কুঁড়ের সামনে।
মির্না বারান্দায় বসে শর্টস ও টি-শার্ট পরা এক মহিলার সঙ্গে কথা বলছিল।
‘ভাল লাগল তোমাদের?’ প্রশ্ন করল মির্না।
‘হ্যাঁ!’ বলল মুসা। ‘বায়রন নামে লম্বা এক লোক আর তার পেঁচার সঙ্গে দেখা হয়েছে আমাদের।’
‘উনি আমাদেরকে ওঁর আঁকা পেইন্টিং দেখিয়েছেন,’ বলল রবিন। ‘উনি খুব ভাল আঁকেন।’

মাথা ঝাঁকাল মির্না।
‘প্রকৃতি থেকে রং তৈরি করে বায়রন,’ বলল। ‘বেরি জড় করে, শিকড় খোঁড়ে, যা পায় আরকী। ওগুলোকে মিশিয়ে আলাদা আলাদা রং তৈরি করে।’
মির্না মহিলার সঙ্গে ছেলেদের পরিচয় করিয়ে দিল
‘লুসি জ্যাকের বন্ধু,’ বলল। ‘ও তোমাদেরকে গাড়িতে করে হোটেলে পৌঁছে দেবে।’
লুসি ছেলেদের দিকে চেয়ে মৃদু হাসল।
‘জ্যাক ওর বউয়ের কাছে হাসপাতালে,’ জানাল। ‘মনে হচ্ছে বাচ্চাটা আজকেই হবে।’
মির্নাকে বিদায় জানিয়ে লুসিকে ট্রেইল ধরে অনুসরণ করল তিন গোয়েন্দা। খানিক দূর যেতেই এক লোককে ওদের দিকে আসতে দেখল। গাঁয়ের দিকে হন্তদন্ত হয়ে আসছে সে।
লুসি আর ছেলেদের দেখে থমকে দাঁড়াল লোকটা। তার মুখের চেহারা ঘর্মাক্ত আর লাল।
‘এপথ দিয়ে কি গ্রামে যাওয়া যায়?’ প্রশ্ন করল।
লোকটির মাথায় স্ট্র হ্যাট, পরনে ড্রেসি প্যান্ট আর স্ট্রাইপড শার্ট। তার ব্রিফকেস আর চকচকে কালো জুতো জঙ্গলে বেমানান দেখাচ্ছে।
হ্যাট পরে থাকা সত্ত্বেও লোকটিকে ঠিকই চিনতে পারল কিশোর। গতকাল হোটেলের রেস্তোরাঁয় ওদের কাছাকাছি বসেছিল সে। জঙ্গলে কী করছে লোকটা?
‘হ্যাঁ, সোজা চলে যান পাঁচ মিনিট,’ বলল লুসি। এবার যোগ করল, ‘কারও সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন?’
‘হ্যাঁ,’ বলে হনহন করে পা চালাল লোকটা।
‘আজব তো,’ লোকটা চলে গেলে বলল লুসি। খলখল করে হাসল। ‘লোকটা সেলসম্যান হলে কিছু বিক্রি করতে জান কাবার হয়ে যাবে ওর!’
হেঁটে চলল ওরা। জিন্দালাশের চিহ্নটা পেরোনোর সময় কিশোর লুসিকে ওটার কথা জিজ্ঞেস করল।
‘আমার কোন ধারণা নেই এর মানে কী, কিংবা কে এটা এখানে পুঁতেছে,’ বলল লুসি।
‘জ্যাকের ধারণা কেউ ঠাট্টা করেছে,’ বলল নথি।
‘ব্যাপারটা মজার নয়,’ বলল লুসি। ‘এখানে যারা বাস করে তাদের অনেকেই জিন্দালাশে বিশ্বাস করে।’
লুসি ছেলেদেরকে নামিয়ে দিলে, ওরা হোটেলে ঢুকে পড়ল।

‘বায়রনের ব্যাপারে কী করব আমরা?’ মুসার প্রশ্ন। ‘ আমার ধারণা ও ওই কবরগুলো খুঁড়েছে, এবং কাল রাতে গোরস্থানে আমরা মনে হয় ওকেই দেখেছি!’
‘চলো উপরে গিয়ে কথা বলি,’ শান্ত কণ্ঠে বলল কিশোর।
এলিভেটরে চড়ল ওরা। ওদের তলায় ওঠার পর, রবিন নানুর সঙ্গে যে রুমটায় থাকছে সেটার তালা খুলল।
‘আমার যা ধারণা তা হলো এই,’ কার্পেটে বসে বলল কিশোর। ‘কাল রাতে গোরস্থানে আমরা যে লোকটাকে দেখেছি সে হয়তো কবর দুটো খুঁড়েছে, কিন্তু শিয়োর তো হতে পারছি না।’
মুসা আর রবিন ধপ করে কিশোরের পাশে বসে পড়ল।
‘আমরা এ-ও জানি না যাকে দেখেছি সে বায়রন কিনা,’ বলে চলল কিশোর।
‘আমার ধারণা বায়রন। আর কে হবে?’ বলল মুসা।
‘যদি জ্যাক হয়?’ কিশোর জবাব চাইল। ‘ও লম্বা এবং ওর মাথার চুল গোরস্থানের লোকটার মত সাদা।’
‘জ্যাক? কিন্তু ও তো দোলনায় শুয়ে ঘুমোচ্ছিল,’ বলল নথি।
‘আমরা যখন বেরোই তখন কি ওকে দেখেছিলাম?’ কিশোর জিজ্ঞেস করল। ‘আমরা যখন ঘুমিয়ে ও হয়তো তখন গোরস্থানে গেছিল এবং আমাদের আগে হয়তো ক্যাম্পসাইটে ফিরে এসেছে।’
মুসা মাথা নাড়ল।
‘জ্যাক কবরে নামতে যাবে কেন?’ জিজ্ঞেস করল।
‘জানি না,’ বলল কিশোর। ‘তবে বায়রন কেন নামবে তাও জানি না।’
‘সাদা চুলের আরেকজনের কথা মনে পড়ছে আমার,’ বলল রবিন।
কিশোর আর মুসা ওর দিকে চাইল।
‘লুসির সাথে থাকার সময় ট্রেইলে যাকে দেখেছি,’ বলল রবিন। ‘মাথায় হ্যাট ছিল, কিন্তু মাথার চুল অনেকটা ধূসর সাদাটে।’
‘আরও একটা ব্যাপার আছে,’ কিশোর বলল। ‘কালকে আমরা যখন টেরেসা নানুর সঙ্গে বসে লাঞ্চ করছিলাম তখন ও আর আরেকজন লোক রেস্টুরেন্টে বসে ছিল!’
‘তো?’ বলল মুসা।
‘আমরা যখন জিন্দালাশ নিয়ে কথা বলছিলাম তখন ওদেরকে খুব আগ্রহী দেখাচ্ছিল,’ বলল কিশোর।
হেসে উঠল মুসা।
‘জিন্দালাশের কথায় সবাই আগ্রহী হবে।’

ঠিক এসময় ছেলেরা হলওয়ে থেকে মৃদু এক থপ শব্দ শুনতে . পেল। জমে গেল ওরা। ডোরনবের দিকে চেয়ে রয়েছে। ধীরে ধীরে ঘুরছে ওটা।
দরজাটা হাট হয়ে খুলে গেল এবং টেরেসা নানু ভিতরে পা রাখলেন।
'কী ব্যাপার রে?' পেইন্ট বক্স রেখে প্রশ্ন করলেন তিনি। 'ভূত দেখেছিস নাকি?'
'নানু, তুমি আমাদের ভয় পাইয়ে দিয়েছ!' চেঁচিয়ে উঠল রবিন। 'আমি? আমি নিরীহ এক বুড়োমানুষ! তো জ্যাকের সাথে রাত কেমন কাটল?' প্রশ্ন করলেন তিনি।
'দারুণ, নানু,' বলল রবিন। 'আমরা জানার চেষ্টা করছি কবরগুলো কে লুট করল।'
টেরেসা নানু বিছানায় বসে পা ঝাড়া দিয়ে স্যাণ্ডেল খুললেন।
'আমি কি কোন সাহায্য করতে পারি?' প্রশ্ন করলেন।
রবিন টেরেসা নানুকে রাতে গোরস্থানে যাওয়া এবং এক লোককে
কবর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখার কথা খুলে জানাল।
'বলিস কী! জ্যাক জানে?' বললেন নানু।
'হ্যাঁ,' জানাল কিশোর। 'ও বলল গাঁয়ের কোন পাহারাদার হবে হয়তো।'
'কিশোরের ধারণা লোকটা জ্যাক,' বলল মুসা।
'আমি বলিনি ওটা জ্যাক,' বলল কিশোর। 'বলেছি হতে পারে। গোরস্থানের লোকটা লম্বা ছিল, মাথায় সাদা চুল, গায়ে কালো কাপড়। ঠিক জ্যাকের মতন।'
'এবং ঠিক বায়রনের মত,' বলল মুসা।
মুসার দিকে চাইলেন টেরেসা নানু।
'এই বায়রনটা কে?' প্রশ্ন করলেন।
'জ্যাক আজ সকালে ওর বউকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর তার সাথে দেখা হয় আমাদের,' বলল রবিন।
'হ্যাঁ, জ্যাক আমাকে ফোন করে জানায় তোরা গাঁয়ে মিনা স্যাঞ্চেজ নামে এক মহিলার কাছে থাকবি,' ওর নানু বললেন। কিন্তু তোরা ঠিক করিস গোরস্থানটা দেখতে যাবি, তাই না?'
'আমরা সূত্র খুঁজতে চেয়েছিলাম,' বলল রবিন। কিন্তু গাঁয়ের লোকজন সব ভিড় করে ছিল ওখানে, তাই আমরা কিছু পায়ের ছাপ ফলো করি। ওগুলো আমাদেরকে জঙ্গলের মধ্যে এক কেবিনের কাছে নিয়ে যায়। ওখানে আমরা বায়রন আর ওর পেঁচার দেখা পাই।'
'আমার মনে হয় আমরা বায়রনকেই গোরস্থানে দেখেছিলাম, ' বাধা দিয়ে বলল মুসা। 'ও মনে হয় কফিনগুলো চুরি করেছে, কারণ গোরস্থানের মত লাল মাটি লেগে ছিল ওর বেলচায়!'

সবশেষে, রবিন পথে দেখা হওয়া লোকটার কথা জানাল ওর নানুকে।
‘ওই লোকটা হতে পারে,’ বলল ও। ‘ওর মাথার চুলও সাদা, এবং লোকটাকে গ্রামের ব্যাপারে খুব আগ্রহী দেখাল।’
কিশোর উল্লেখ করল একটা লোক গতকাল ওদের কাছাকাছি বসে লাঞ্চ করছিল।
‘আমার ধারণা আমরা কী বলি শোনার চেষ্টা করছিল,’ বলল ও। ‘যাকগে। তোমরা তিনজন লোকের কথা বলেছ যারা লম্বা এবং যাদের মাথার চুল সাদা,’ টেরেসা নানু বললেন। ‘তাদের একজন গত রাতে দেখা তোমাদের সেই লোকটা হতে পারে। একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না ওই গোরস্থানে ওদের কারও এত আগ্রহ কীসের।’
‘আমার এই মাত্র একটা কথা মনে হলো,’ বলল কিশোর। ‘আমরা যখন জ্যাকের সাথে হেঁটে পানির কাছে যাই তখন ও বলেছিল ও ওখানকার একটুকরো জমি কিনতে চায়।’
সবার দৃষ্টি কিশোরের উপর স্থির।
‘জ্যাক নিজেই যদি সাইনটা লাগিয়ে থাকে আর কবর খুঁড়ে গ্রামবাসীদের ভয় দেখানোর চেষ্টা করে?’ কথার খেই ধরল কিশোর। ‘ওরা ভয় পেয়ে চলে গেলে ও হয়তো সস্তায় ওদের জমি কিনতে পারবে।
‘আমার এখনও ধারণা কাজটা বায়রনের,’ বলল মুসা। তিনটে আঙুল তুলল ও। ‘এক, ওর বেলচায় লাল মাটি। দুই, বিশাল পায়ের ছাপগুলো হয়তো ওর। তিন, ও একজন পেইন্টার, কাজেই ও হয়তো ওই সাইনটা এঁকে থাকতে পারে।’
‘বায়রন ছবি আঁকে?’ টেরেসা নানু প্রশ্ন করলেন।
‘আমরা একটা মাত্র ছবি দেখেছি,’ বলল রবিন, ‘তবে কাজটা প্রশংসা করার মত।’
টেরেসা নানু স্যাণ্ডেলের দিকে হাত বাড়ালেন।
‘জ্যাক কবর চুরির সাথে জড়িত ভাবতে পারছি না আমি, ‘ বললেন তিনি। ‘কিন্তু আমি এই বায়রনের সাথে দেখা করতে চাই!’
হোটেলের সামনে এক ট্যাক্সি থামাল ওরা। কিশোর ড্রাইভারকে বলল ওরা ওল্ড ফরেস্ট ট্রেইলে যেতে চায়।
‘বসো!’ বলল মহিলা ড্রাইভার, শেষ বিকেলের যানবাহনের ভিড় ভেদ করে মসৃণ গতিতে এগিয়ে চলল ট্যাক্সি।
দশ মিনিট বাদে, টেরেসা নানু ড্রাইভারকে ভাড়া মিটিয়ে দিলেন।
‘আমাদেরকে এক ঘণ্টা পর তুলে নিতে পারবেন?’ প্রশ্ন করলেন।
‘নিশ্চয়ই,’ জানাল ড্রাইভার। হাত নেড়ে চলে গেল।

টেরেসা নানু সামনের অন্ধকার, ঘন বনভূমির দিকে চাইলেন।
‘তোরা শিয়োর এখানে ট্রেইল আছে?’ জিজ্ঞেস করলেন।
মুসা তাঁকে প্লাকটা দেখাল।
‘সাপ নিয়ে দুশ্চিন্তা করবেন না!’ সাহসের সঙ্গে বলল।
‘তুমি না বললে সাপের কথা মাথাতেই আসত না!’ টেরেসা নানু বললেন।
এবার ট্রেইল হাইক করার সময় সবার সামনে থাকল মুসা। জিন্দালাশের সাইনটার সামনে এসে থেমে দাঁড়াল ওরা।
‘ব্যাপারটা অদ্ভুত,’ টেরেসা নানু বললেন। ‘কেউ একজন চায় লোকে ভাবুক এখানে জিন্দালাশ আছে।’
‘কাজটা যে কবর খুঁড়েছে তারই!’ বলল রবিন।
মাথা ঝাঁকালেন টেরেসা নানু।
‘আমারও তাই মনে হয়।’
ওরা হাইক করে শীঘ্রি মির্নার গাঁয়ে পৌঁছে গেল। আশপাশে কাউকে দেখতে পেল না ওরা।
‘দেখো, ওরা সবাই বড় কুঁড়েটায়,’ বলল কিশোর। তর্জনী তাক করল সবচাইতে বড় বাসাটার দিকে।
দরজাটা খোলা। বেঞ্চিতে লোকজনকে বসে থাকতে দেখা গেল। কে যেন জোরাল গলায় কথা বলছে।
‘ওরা মনে হয় মীটিং করছে,’ বলল রবিন। ‘হয়তো খোঁড়া কবরগুলো নিয়ে কথা বলছে।’
‘বায়রনের কেবিন কি এখান থেকে অনেক দূরে?’ টেরেসা নানু জানতে চাইলেন।
‘না,’ বলে আঙুল নির্দেশ করল কিশোর। ‘ওই ট্রেইলটা চলে গেছে গোরস্থানের দিকে, তারপর ছোট এক পথ ধরলে বায়রনের কুটির।’
তিন বন্ধু টেরেসা নানুকে ট্রেইল ধরে নিয়ে চলল। ছোট্ট গোরস্থানটার কাছে থামল তারা।
‘কবরগুলো খুঁড়তে খুব পরিশ্রম করতে হয়েছে,’ মন্তব্য করলেন টেরেসা নানু, ফাঁকা গর্ত দুটোর পাশে লাল মাটির স্তূপ-সেদিকে ইঙ্গিত করলেন।
‘দেখো, নানু, বায়রনের বেলচায় আমরা এই একই মাটি দেখেছি,’ বলল নথি।
‘হ্যাঁ, তবে আমার ধারণা লাল মাটি অন্যখানেও পাওয়া যায়,’ টেরেসা নানু বললেন।
হেঁটে চলল ওরা। ক’মিনিট বাদে বায়রনের কেবিনের পিছনে গাছ-পালার জটলায় থেমে দাঁড়াল সবাই।

‘ওরা কোথায়?’ ফিসফিস করে বলল রবিন। উঁকি দিল এক গাছের গুঁড়ির আড়াল থেকে।
‘ওর দরজায় গিয়ে টোকা দিলেই তো হয়,’ ওর নানু বললেন।
খিলখিল করে হেসে উঠল মুসা।
‘ওর ঘরে দরজা আছে কিনা কে জানে,’ বলল।
‘এসো,’ বলল কিশোর। সূর্যালোকে পা রাখল। কেবিন ঘুরে এগোল ওরা চারজন। হাতে ব্রাশ নিয়ে ইযেলের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল বায়রন। ইয়েলের ট্রেতে ছোট ছোট রঙের জার সারি দিয়ে রাখা।
‘হাই, বায়রন,’ বলল কিশোর।
ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল বায়রন। ওর চিবুকে সাদা রঙের ফোঁটা লেগে রয়েছে। ছেলেদেরকে দেখে মুখে চওড়া হাসি ফুটল।
‘ইনি আমার টেরেসা নানু,’ রবিন জানাল বায়রনকে।
বায়রন একটা কাপড় তুলে নিল রং মোছার জন্য। একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, ‘হ্যালো, আপনার সাথে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম।’
‘আমি আপনার কথা অনেক শুনেছি,’ উষ্ণ হেসে বললেন টেরেসা নানু। ‘আপনার পেইন্টিংটা দেখতে পারি?’
লজ্জা পেল বায়রন।
‘বাসায় আরও ভাল ভাল ছবি আছে,’ জানাল।
ওরা সবাই বায়রনের ছবিগুলো দেখল। আজ সকালের পর থেকে বায়রন আরও কিছু যোগ করেছে। বেড়ার ভিতরে কবরফলক এঁকেছে ও। কিশোর এবার লোহার বেড়াটাকে চিনতে পারল।
ওটা গোরস্থানের বেড়া।
‘আপনি দারুণ ছবি আঁকেন,’ টেরেসা নানু বললেন বায়রনকে।
‘এটা গোরস্থান, তাই না?’ কিশোর জিজ্ঞেস করল বায়রনকে।
লম্বা লোকটি সায় জানাল।
‘আমার ওখানে ভাল লাগে,’ বলল।
‘প্রায়ই যান নাকি ওখানে?’ কিশোরের প্রশ্ন।
‘বিল রাতের বেলা ইঁদুর ধরে,’ বায়রন বলল। ‘আমি কখনও কখনও ওর সাথে যাই। গোরস্থানে গিয়ে চুপচাপ বসে থাকি। কী শান্ত জায়গাটা! খুব ভাল লাগে।’
‘কাউকে কখনও গোরস্থানে খোঁড়াখুঁড়ি করতে দেখেছেন?’ কিশোর জানতে চাইল।
হঠাৎই মুখের চেহারা লাল হয়ে গেল বায়রনের। ব্রাশটা নামিয়ে রাখল সে।
‘আমি ওটা চুরি করিনি,’ বলল ও।

‘কী?’ প্রশ্ন করল রবিন।
বায়রন কেবিনে গিয়ে ঢুকল এবং একটু পরে হাতে কিছু একটা নিয়ে বেরিয়ে এল। ওটা পুরুষদের চামড়ার ওয়ালেট।
‘গত সপ্তাহে গোরস্থানের পাশে বসে ছিলাম। আঁধারে শিকার করছিল বিল,’ বায়রন বলল। ‘দুটো লোক এসে কবর খুঁড়ল। কফিনগুলো বয়ে নিয়ে গেল তারা। ওরা চলে যাওয়ার পর মাটিতে এটা কুড়িয়ে পাই আমি। ওরা ফিরবে মনে করে রেখে দিয়েছি, কিন্তু ওরা আর আসেনি।’
‘খাইছে! তারমানে গত রাতে লোকটা গোরস্থানে তার ওয়ালেট খুঁজছিল!’ বলে উঠল মুসা।
টেরেসা নানু ওয়ালেটটা নিয়ে ভিতরে চাইলেন।
‘বাহ্, বিজনেস কার্ডে লোকটার ছবিও আছে দেখছি,’ বললেন। সাদা কার্ডটার দিকে চাইল ছেলেরা।
জে ফ্রিস্ক নামটা কালো, বড় হরফে লেখা। নামের নীচে লেখা: ল্যাণ্ড ডেভেলপার। সঙ্গে ফোন নম্বর আর ই-মেইল ঠিকানাও রয়েছে।
নামের পাশে ছোট্ট এক ছবি। যে লোকটিকে ওরা পথে অতিক্রম করেছিল তার।
‘বুঝেছি,’ বলল কিশোর। ‘এই লোকটা কবর খুঁড়ে গ্রামবাসীদের ভয় দেখাতে চেয়েছে, তারা যাতে জমি বেচে দেয়!’
‘এবার সব কিছু খাপে খাপে মিলে গেল!’ মুসা বলল। ‘এই ফ্রিস্ক লোকটাই জিন্দালাশ! ও-ই সম্ভবত সাইনটা বসিয়েছে!’
‘এখন কী করা?’ কিশোরের প্রশ্ন।
টেরেসা নানু ঝট করে সেল ফোনটা বের করলেন। ইনফর্মেশনে ডায়াল করে বললেন, ‘নিউ অর্লিয়েন্স পুলিস ডিপার্টমেণ্ট, প্লিজ।’
পরদিন সকালে, নাস্তার পর ছেলেদের তুলে নিল জ্যাক। রবিন আজকে গোলাপী পোশাক পরেছে।
‘দেখে মনে হচ্ছে সূর্য উঠছে,’ জ্যাক বলল ওকে।
‘ধন্যবাদ, জ্যাক,’ রবিন বলল। ‘তোমার বাচ্চা জন্মেছে?’
‘হ্যাঁ!’ গর্বিত বাবা বলল। ‘ছোট্ট সুন্দর এক মেয়ে। রবিনা আর ওর মা এখন ঘুমোচ্ছে, কাজেই আমরা এখন এলিগেটরের বাসা দেখতে যাব।’
আধ ঘণ্টা পরে, পানির কাছে ঝোপটার মধ্যে ঝুঁকে বসে থাকতে দেখা গেল তিন গোয়েন্দাকে। জ্যাক বিনকিউলার নিয়ে এসেছে, এবং ওরা পালা করে মা এলিগেটরকে দেখছে।
লম্বা নাকটা বাসার দিকে তাক করে আধো পানিতে শুয়ে রয়েছে ওটা। গেটরটার রুক্ষ চামড়া কালচে-সবুজ, ট্রাকের টায়ারের মত এবড়োখেবড়ো।

‘কোন বাচ্চা তো দেখছি না,’ ফিসফিস করে বলল মুসা।
‘এখনও ডিম ফোটেনি,’ বলল জ্যাক, গাছ-পালার দিকে তর্জনী নির্দেশ করল। ‘ওই স্তূপটা ওর বাসা। ডিমগুলো ভিতরে লুকানো আছে।’
‘ও বাসায় বসে তা দিচ্ছে না কেন?’ প্রশ্ন করল রবিন। ‘ডিমগুলো তো ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।’
‘পচা গাছ-পালা ডিমগুলোকে গরম রাখে,’ ব্যাখ্যা করল জ্যাক। ‘মা গেটর পানির দিকে লক্ষ রাখছে যদি কোন খাবার সাঁতরে যায়।’
অতিকায় মা গেটর কাঠের গুঁড়ির মত নিথর পড়ে রয়েছে। মুখ সামান্য খোলা, মাঝে মধ্যে চোখ পিটপিট করছে।
‘কবরগুলো কে চুরি করেছে সেটা বের করে কাজের কাজ করেছ তোমরা,’ বলল জ্যাক। ‘গাঁবাসী কফিনগুলো আবার কবর দিয়েছে এবং অনুষ্ঠানটা উদ্‌যাপন করেছে। পুলিসরা দুই ডেভেলপারকে ধরেছে জেরা করার জন্যে। ওরা আর মানুষকে ভয় দেখাতে পারবে না।’
‘আপনার কি ধারণা গ্রামবাসী তাদের জমি বেচবে?’ কিশোর প্রশ্ন করল।
‘শেষ পর্যন্ত হয়তো বেচত,’ জ্যাক বলল। ‘লুট হওয়া কবরগুলো যদি ওদেরকে ভয় দেখাতে না পারত তবে বদমাশরা হয়তো অন্য রাস্তা ধরত। ওরা লোভী লোক। এখানে হাইরাইজ বানাতে চেয়েছিল।’
‘বায়রন যদি ওর পেঁচাকে নিয়ে বের না হত তা হলে লোকগুলোকে দেখতে পেত না,’ বলল মুসা। ‘কিংবা ওই ওয়ালেটটাও খুঁজে পেত না।’
মৃদু হাসল জ্যাক।
‘বায়রন মির্নাকে বলেছে ওর বাবা-মা ওকে আট বছর বয়সে ত্যাগ করার পর থেকেই একা ও। কখনও স্কুলে যায়নি, জঙ্গলেই বেড়ে উঠেছে। মির্নার কুঁড়ের কাছে মিনা আর গ্রামবাসীরা ওকে একটা কুঁড়ে বানিয়ে দিচ্ছে। ও এখন থেকে ওদের সাথে থাকবে।’
‘বায়রন আমার নানুকে ওর একটা পেইন্টিং উপহার দিয়েছে, ‘ বলল রবিন। ‘নানু ওটা এক আর্ট গ্যালারির মালিককে দেখিয়েছে। উনি বলেছেন বায়রন নাকি ছবি বেচে লালে লাল হয়ে যাবে!’
ঠোঁটে আঙুল রাখল জ্যাক।
‘শোনো,’ ফিসফিস করে বলল।
বাসা থেকে চড়া, কর্কশ ডাক আসছে শুনতে পেল ওরা।
‘এবার দেখো,’ বলল জ্যাক।
মা এলিগেটর স্তূপের দিকে সরে যাচ্ছে। ওখানে পৌছনোর পর গাছ-পালার সবচাইতে উঁচু স্তরটা আঁচড়ে সরিয়ে দিল।

পঁচিশ-ত্রিশটা সবুজ-হলুদ এলিগেটর তাদের ডিম ফুটে বেরিয়ে আসছে। নিজেদেরকে কিলবিল করে মুক্ত করার পর, এঁকেবেঁকে মার দিকে এগোল ওরা।
‘ভাল করে দেখো,’ আস্তে করে বলল জ্যাক।
মা এলিগেটর মাটিতে শরীর পেতে দিয়ে মুখ হাঁ করল। ছানাগুলো হাঁচড়েপাঁচড়ে তার নীচের চোয়াল গলে ঢুকে পড়ল সোজা মুখের ভিতরে!
‘খাইছে, খেয়ে ফেলবে নাকি?’ মুসার প্রশ্ন।
হেসে উঠল জ্যাক।
‘না, এভাবেই এলিগেটর আর কুমীররা তাদের বাচ্চাদের রক্ষা করে,’ বলল ও। ‘মার মুখের ভেতরে ওরা নিরাপদ।’
‘কীসের থেকে রক্ষা করে?’ নিজের পালা এলে বিনকিউলারে চোখ রেখে বলল রবিন।
‘এলিগেটরের ছানা খাওয়ার মত অনেক শত্রু আছে,’ বলল জ্যাক। ‘রেকুন, পোসাম, হেরন, আরও অনেক। মা যখন ভাববে এখন নিরাপদ, তখন মুখ হাঁ করে ছানাদের বের করে দেবে।’
ওরা চারজন নিঃশব্দে পিছু হটে ট্রেইলের দিকে পা বাড়াল।
‘উম, লাঞ্চের কথা শুনে আমার খিদে পেয়ে গেছে,’ হাইক করার সময় বলল মুসা।
‘মুসা, কেউ লাঞ্চের কথা বলেনি,’ বলল কিশোর। দাঁত বের করে হাসল মুসা। ‘এই তো বললে!’ বলে উঠল ও।
***

তিন গোয়েন্দা ভলিউম ১১৮/২ – বিভীষিকার প্রহর – রকিব হাসান – সেবা প্রকাশনী – প্রথম প্রকাশ : ২০১০

লম্বা, গা ছমছমে পথটা ধরে হেঁটে চলেছি আমি। চারপাশ থেকে
ঘিরে রেখেছে বড় বড় গাছ।
আমি এখানে একা।
আমার বন্ধুরা কোথায় গেল?
'কিশোর?'
'মুসা?'
চিৎকার করে ডাকলাম।
কিন্তু ফিরে এল শুধু আমার ডাকের প্রতিধ্বনি।
কেউ জবাব দিল না।
মরিয়া হয়ে আবার চারপাশে তাকালাম।
কাউকে দেখলাম না।
নেই ওরা।
গায়ে কাঁপুনি শুরু হলো আমার।
সামনে উজ্জ্বল আলো চোখে পড়ল। মোড়ের কাছে।
কীসের আলো?
জানি না! হয়তো এখান থেকে, এই জঘন্য ভয়াল জগৎ থেকে বেরোনোর পথ।
আলোর দিকে এগোলাম।
হাসির শব্দ শোনা গেল! অট্টহাসি!
'কিশোর! মুসা!' চিৎকার করে আবার ডাকলাম।
এবারও কোন জবাব পেলাম না।
আশ্চর্য! গেল কোথায় ওরা? আমিই বা এখানে এলাম কী করে? ছিলাম তো শহরের সবচেয়ে আধুনিক শপিং মলটাতে! সেখান থেকে এসে পড়েছি এই ঘন বনে! কী করে?
জোরাল একটা কণ্ঠস্বর গমগম করে উঠল, 'রবিন! রবিন মিলফোর্ড! আমার হাত থেকে মুক্তি নেই তোমার। হাহ্ হাহ্ হাহ্!'
'না, ছাড়ো আমাকে! রেহাই দাও! কী চাও তুমি?' আতঙ্কিত চিৎকার দিয়ে চারপাশে তাকালাম।
'রবিন! রবিন! অ্যাই, রবিন!'
আরেকটা কণ্ঠ। বহুদূর থেকে আসছে। তবে অনেক মোলায়েম, স্নেহ আর মায়াভরা পরিচিত কণ্ঠ।
'রবিন, ওঠো!'

চোখ মেললাম। মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। চারপাশে তাকালাম। আমার শোবার ঘরে, আমার বিছানায় শুয়ে আছি। ঘড়ির দিকে চোখ পড়ল। সকাল সাতটা তিরিশ। স্কুলে যাবার সময় হয়েছে।

‘আবার একটা বিচ্ছিরি দুঃস্বপ্ন দেখেছ, তাই না?’ মা বলল।

‘হ্যাঁ।’ বিছানায় উঠে বসে, আড়মোড়া ভেঙে দেহের জড়তা আর মাথা থেকে দুঃস্বপ্নের রেশ তাড়ানোর চেষ্টা করলাম।

মা হেসে বলল, ‘আসলে তোমার মধ্যে সৃজনশীলতা আছে, কল্পনার ক্ষমতা অনেক বেশি। মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, কোন একদিন বড় লেখক হবে, কিংবা চিত্র পরিচালক।’

হাত-মুখ ধুয়ে এসে, স্কুলে যাবার পোশাক পরতে পারতে মা’র কথাটা নিয়ে ভাবলাম। কয়েক দিন থেকে লক্ষ করছি, দুঃস্বপ্নগুলো অতিমাত্রায় বাস্তব হয়ে ওঠে আমার। সব সময়ই দেখি ভয়াল কোনও বিপজ্জনক জায়গায় রয়েছি, আজকের এই শপিং মলটার মত। মা হয়তো ঠিকই বলেছে। আমার অতি কল্পনা হয়তো একদিন আমাকে বিখ্যাত করে তুলবে।

মা, বাবা আর আমার এগারো বছরের খালাত বোন নিনার সঙ্গে টেবিলে নাস্তা খেতে বসলাম। টেবিল ঘিরে বসলাম। আমাদের বাড়িতে বেড়াতে এসেছে নিনা। এবারের জন্মদিনটা আমাদের সঙ্গে কাটাবে। ওর বাবা-মা বিশেষ কাজে দেশের বাইরে চলে গেছে, ফিরতে কিছুদিন দেরি হবে। নিনার মা তাই মেয়েকে বোনের কাছে, অর্থাৎ আমাদের বাড়িতে রেখে গেছেন।

বাবা কাগজ পড়ছে, নাস্তার টেবিলে সবসময় যা করে থাকে। আর মা সবার প্লেটে খাবার তুলে তুলে দিচ্ছে। আমার স্কুলে যাবার তাড়া, তাই গপ্‌প্‌ গিলে চলেছি। অনর্গল কথা বলছে নিনা, একটা মুহূর্তের জন্যও মুখ বন্ধ রাখতে পারে না ও।

‘স্কুলে যদি ম্যাডাম জিজ্ঞেস করেন, বড় হয়ে আমি কী হতে চাই,’ নিনা বলছে, ‘বলব, অ্যারোপ্লেনের পাইলট হব।’

‘আর তোমার সেই প্লেন থেকে দশ হাত দূরে থাকব আমি,’ জবাব না দিয়ে পারলাম না। কোনমতে খাবারগুলো নাকেমুখে গুঁজে, তিন ঢোকে গ্লাসের দুধ শেষ করে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। ‘আমি যাই,’ বলে প্রায় ছুটে বেরোলাম বারান্দায়।

‘রবিন,’ আমার পিছন পিছন বেরিয়ে এল মা।

‘কী, মা?’ পায়ে স্কেটস বাঁধলাম। প্ল্যাস্টিকের হেলমেট মাথায় দিলাম। হাঁটুতে পরলাম নি-প্যাড। তারপর স্কুল ব্যাগটা পিঠে বেঁধে নিলাম। বয়ে নেয়ার সুবিধের জন্য বড় একটা ব্যাকপ্যাককে স্কুলব্যাগ বানিয়েছি। স্কেটিং করতে খুব ভাল লাগে আমার। হাঁটার চেয়ে অনেক দ্রুত চলা যায়। প্রতিদিন তাই স্কেট করেই স্কুলে যাই,

আসি। ‘আগামী কাল কী, মনে আছে তো?’ আমার দিকে তাকিয়ে মা জিজ্ঞেস করল।
‘তা আর থাকবে না,’ জবাব দিলাম। ‘আগামী কাল শনিবার, সারাদিন স্কেটিং করে বেড়াতে পারব।’
‘কাল নিনার জন্মদিন।’
‘তো আমি কী করব?’ জবাব দিলাম। ‘আগামীকাল বারোয় পা দিচ্ছে ও। বড় হয়েছে, এখন থেকে তাই বড়দের মত আচরণ করতে বোলো ওকে।’
‘একটা উপহার আনতে হবে ওর জন্য,’ আমার খোঁচাটা এড়িয়ে গেল মা।
‘উপহার? কী উপহার?
‘পুতুল কী রকম ভালবাসে ও, জানো তুমি। নতুন একটা সুপার কিড এভিয়েটর ডল পেলে ভীষণ খুশি হবে। টিভিতে ওই পুতুলের বিজ্ঞাপন দিলে যেভাবে জুলজুল করে তাকিয়ে থাকে।’
‘কিন্তু আমাকে হাতখরচের টাকা যা দাও, তা থেকে তো এভিয়েটর ডল হবে না।’
‘নাও,’ আমার হাতে কিছু টাকা গুঁজে দিল মা। ‘এবার হবে।’
‘কোথায় পাওয়া যায় ওই পুতুল?’ জিজ্ঞেস করলাম।
‘ওয়েভারলি মলে। দোকানটার নাম ডল এম্পোরিয়াম।’
‘কিন্তু, মা, আজ তো আমার বেসবল প্র্যাকটিস আছে, স্কুল ছুটির পর। পাঁচটার আগে শেষ করতে পারব না। আর তারপর শপিং মলে যেতে তো রাত হয়ে যাবে?’
‘রবিন, তোমার কথা শুনে অবাক হচ্ছি আমি,’ গম্ভীর স্বরে মা বলল। ‘নিনা আমাদের মেহমান। নিজের বাড়ি ফেলে আমাদের এখানে জন্মদিন পালন করতে এসেছে। বুঝলাম, বাধ্য হয়েই। কিন্তু ওর জন্য একটা পুতুল কিনতে যাওয়াটা কি এতই কষ্টের? তোমার জন্মদিনে ও তোমাকে কী পাঠিয়েছিল, ভুলে গেছ?’
‘না, ভুলিনি। আমার স্কেটের চাকার জন্য এক কৌটা তেল।’
‘ও যে তোমার জন্মদিনের তারিখটা মনে রেখেছে, এটা আমার খুব ভাল লেগেছিল।’
‘আমারও লেগেছিল। কিন্তু ওই তেল কেনার জন্য ওকে কষ্ট করে শপিং মলে যেতে হয়নি, তা-ও আবার স্কুল ছুটির পর, বেসবল প্র্যাকটিসের কথা নাহয় বাদই দিলাম; পাড়ার দোকান থেকেই কিনেছিল। স্কেটের চাকায় সেলাই মেশিনের তেল দিলেই হয়, আর এসব তেল যে কোন স্টেশনারি দোকানে পাওয়া যায়।’
‘তোমাকে তো এত কথা বলতে বলিনি,’ রান্নাঘরের দিকে মুখ ফেরাল মা। চুলায় কিছু বসিয়ে এসেছে বোধহয়। ‘পুতুলটা কিনে আনবে, ব্যস। আর হ্যাঁ, কাল একটা জন্মদিনের পার্টি দিচ্ছি আমরা, মনে রেখো। কোথাও আবার স্কেটিং প্রতিযোগিতায় চলে যেয়ো না।’

‘ঠিক আছে,’ অনিচ্ছাসত্ত্বেও বললাম। জানি, একবার যখন পুতুল এনে দিতে বলেছে আমাকে মা, যেতেই হবে আমাকে, না গিয়ে পারব না। উহ্, মা-টা বড় নাছোড়বান্দা!

খারাপ হয়ে গেছে মেজাজটা। সামনের দরজা খুলে ঘরের বাইরে পা রাখলাম। হঠাৎ বিকট এক চিৎকার। ধড়াস করে উঠল বুকের ভিতর। ফিরে তাকিয়ে দেখি, ভয়ঙ্কর চেহারার একটা প্রাণী বেরিয়ে আসছে পাশের ঝোপ থেকে।

এতই ভয় পেলাম, পিছাতে গিয়ে উল্টে পড়লাম।

খিলখিল হাসি শোনা গেল। ঝোপ থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এল নিনা। হাতে ধরা কুৎসিত চেহারার পুতুল। ঝোপের ভিতর থেকে এমনভাবে বাড়িয়ে রেখেছিল, হঠাৎ দেখে আমি ভেবেছি ভয়ঙ্কর কোনও প্রাণী।

‘সুন্দর দেখতে, তাই না?’ পুতুলটা আমার চোখের সামনে নাচিয়ে হেসে বলল নিনা

উঠে দাঁড়ালাম। গম্ভীর হয়ে বললাম, ‘দেখো, এসব বিশ্রী রসিকতাগুলো বাদ দিতে পারলে ভাল হয়। এত হাসির কিছু নেই। যা করলে, সেটা অতিরিক্ত ছেলেমানুষী। মনে রেখো, কাল থেকে বয়েস এক বছর বেড়ে যাচ্ছে তোমার। সত্যি বলতে কী, এই বয়েসে পুতুল নিয়ে খেলাটাও মানায় না আর!’

‘তুমি আসলে আমাকে হিংসে করো, নিনা বলল, ‘এত রকমের পুতুল নেই তো তোমার, তাই।’ ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে রওনা হলো ও। বাড়িতে ঢোকার আগে ফিরে তাকিয়ে বলল, ‘পুতুলের মত ভাল খেলনা আর নেই।’

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে লাগলাম। তারপর প্যান্টে লাগা ময়লা আর কুটো ঝেড়ে ফেলে স্কুলে রওনা হলাম।

আমাদের গেট দিয়ে বেরিয়ে বড় রাস্তায় পড়লাম। দূরে শপিং মলের এগারো তলা বিল্ডিংটা চোখে পড়ল। বড় বড় কালো কাঁচ দিয়ে তৈরি সামনের দেয়াল। দেখলেই কেন যেন গা ছমছম করে আমার। মনে হতে থাকে, এর মধ্যে ঢোকা যায়, কিন্তু বেরোনো যায় না; একবার ঢুকলেই গিলে নেবে চিরকালের জন্য। হয়তো আমার অতিকল্পনা—ওই যে বললাম, কিছুদিন থেকে হচ্ছে; এতদূর থেকে বিল্ডিংটার দিকে তাকিয়েও গায়ে কাঁটা দিল আমার। আগে এরকম হতো না। তবে কখনোই ওখানে যেতে ভাল লাগে না আমার, যদিও ছোটদের আকৃষ্ট করার জন্য নানারকম ব্যবস্থা রয়েছে ওটার ভিতরে, অসংখ্য লোভনীয় জিনিসও কিনতে পাওয়া যায়।

স্কেটিং করে চলেছি। আমাদের স্কুলটা যেমন আধুনিক, তেমনি অনেক বড়। প্রাইমারি, হাই স্কুল, এমনকী কলেজও আছে—এইচ এস সি পর্যন্ত পড়ানো হয়।

স্কুলে পৌছলাম। স্কেটিং করেই ঢুকলাম গেট দিয়ে। স্কুলের প্রধান বারান্দার কাছে এসে থামলাম।
সামনের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতেই দেখা হয়ে গেল আমার বন্ধু কিশোরের সঙ্গে।
'বেসবল প্র্যাকটিসে থাকছ তো?' জিজ্ঞেস করলাম ওকে।
'নিশ্চয়ই,' কিশোর বলল।
একসঙ্গে ক্লাসে ঢুকলাম দুজনে। হাত তুলে ডাকল আমার আরেক বন্ধু মুসা। ওর কাছে গিয়ে বসলাম। আমি মাঝখানে, একপাশে কিশোর, অন্যপাশে মুসা। স্কুল শুরুর ঘণ্টা পড়ল। আমাদের ক্লাস টিচার মিস্টার টমাস ক্লাসে ঢুকে হাজিরা খাতা দেখে আমাদের নাম ডাকলেন।
আমার নাম ডাকা হতেই, 'ইয়েস সার' বললাম। তারপর ফিসফিস করে কিশোরকে বললাম, 'কাল নিনার জন্মদিন। তাই প্র্যাকটিসের পর আমাকে শপিং মলে যেতে হবে। আমার সঙ্গে যাবে?'
'প্র্যাকটিসের পর?' আমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল কিশোর। 'পাঁচটা বেজে যাবে। না ভাই, পারব না, বাড়িতে কাজ আছে। ঠিক সাড়ে-পাঁচটায় হাজির থাকতে বলে দিয়েছে চাচী। সরি।' আরেক পাশ থেকে মুসা জিজ্ঞেস করল, 'ওই শপিং মলে যেতে এখনও ভয় পাও তুমি, তাই না, রবিন?'
'না, ঠিক ভয় না! তবে কেমন অস্বস্তি লাগে,' জবাব দিলাম। 'ঢুকলেই গা ছমছম করে। আগেও তো কতবার গেছি, এমন হয়নি। মাথামোটা গার্ডগুলো চোখ কটমট করে তাকিয়ে থাকে—দেখে মনে হয় যেন শুধু আমার দিকেই।'
কিশোর বলল, 'আসলে ওই স্বপ্ন দেখাটাই তোমার কাল হয়েছে। দানবের দুঃস্বপ্ন।'
'হ্যাঁ, বিড়বিড় করল মুসা। 'রবিনের আর দোষ কী। ওরকম ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখলে আমিও ভয় পেতাম।'
শপিং মলের দানবের কথা ভাবতে ভাবতে কখন যে প্রথম ঘণ্টাটা পার হয়ে গেল, বলতে পারব না। ক্লাসে সার কী পড়িয়েছেন, কিছুই শুনিনি। পিছন দিকের একটা সিটে বসেছি আমি। তাই বোধহয় আমার অন্যমনস্কতা সার খেয়াল করেননি। ঘণ্টা পড়ার শব্দে যেন চমকে বাস্তবে ফিরলাম। এরপর ইংরেজি সাহিত্যের ক্লাস, আমার খুব প্রিয় সাবজেক্ট।
হাতে খাতার বোঝা নিয়ে ক্লাসে ঢুকলেন মিস কলিনস। ধড়াস করে টেবিলের ওপর রাখলেন সেগুলো। পুরো ক্লাসে চোখ বোলালেন একবার। তারপর বললেন, 'আমি তোমাদের খাতাগুলো দেখেছি। সবচেয়ে ভাল রচনা যারা লিখেছ, তার কয়েকটা এখন ক্লাসে পড়ে শোনাতে হবে।'

‘খাইছে, কাকে প্রথম ধরবেন ম্যাডাম?’ আমার কানের কাছে ফিসফিস করে বলল মুসা।
আমি ঘাবড়ালাম না। কারণ, জানি, আমি খারাপ লিখিনি। স্কেটিং-এর ওপর রচনা লিখতে দেয়া হয়েছে আমাকে, আমার প্রিয় বিষয়। খুব ভাল করে মন দিয়ে লিখেছি। স্কেটিং একটা খুব ভাল ব্যায়াম, কীভাবে দেহমনের উন্নতি করে, এসব কথা আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে লিখেছি। তবে মাথায় আর হাঁটুতে নি-প্যাড না পরে কোনমতেই স্কেটিং করা উচিত হবে না, জোর দিয়ে বলেছি একথা। অ্যাক্সিডেন্ট করলে হেলমেট মাথা রক্ষা করবে, আর নি-প্যাড হাঁটু। গল্পের মত করে লিখেছি রচনাটা। একটা কিশোর বয়েসী ছেলে কীভাবে স্কেটিং করে সারা আমেরিকা ভ্রমণ করেছে, সেটার কল্পিত কাহিনি।
যাই হোক, প্রথমেই আমার দিকে তাকালেন মিস কলিনস। ‘রবিন, তোমার লেখাটাই প্রথম পড়ো। তোমারটা সবচেয়ে ভাল হয়েছে।’
উঠে দাঁড়িয়ে সিটের সারির মাঝের সরু রাস্তা দিয়ে সামনে এগোলাম। ম্যাডামের ডেস্কের কাছে এসে তাঁর বাড়িয়ে ধরা খাতাটা হাতে নিয়ে ক্লাসের দিকে মুখ করে দাঁড়ালাম। খাতার ওপর বড় করে একটা ইংরেজি ‘এ’ অক্ষর লিখে দিয়েছেন ম্যাডাম। তারমানে সর্বোচ্চ গ্রেডটাই দেয়া হয়েছে আমাকে।
পাতা ওল্টালাম। খাতার দিকে তাকিয়ে দম বন্ধ হয়ে এল আমার। আমি শিরোনাম লিখেছিলাম : ‘স্কেটিং করে আমেরিকা ভ্রমণ’। কিন্তু আমার হাতে ধরা খাতাটায় লেখা : ‘শপিং মলের দানব’।
রোমশ দেহ ও বড় বড় লাল চোখওয়ালা ভয়ঙ্কর চেহারার একটা দানব কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে আমার দিকে। কালো কাঁচের দেয়ালওয়ালা শপিং মলটার সামনে দাঁড়ানো ওটা!
ক্লাসে পিনপতন নীরবতা। কেউ কথা বলছে না। তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আমার রচনা শোনার অপেক্ষা করছে। আমি তো এদিকে ভয়ে পাথর।
‘কী হলো, রবিন, পড়ছ না কেন?’ ম্যাডাম বললেন। ‘পড়ো!’
‘ম্যাডাম, এই রচনা আমি লিখিনি,’ ঢোক গিলে বললাম।
ভুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকালেন তিনি। ‘তুমি লেখনি মানে? এটা তোমার হাতের লেখা, আমি ভাল করে চিনি।’
‘কিন্তু আমি তো লিখেছি স্কেটিঙের ওপর, একটা ছেলে কীভাবে সারা আমেরিকা ঘুরে বেড়ালো। জঘন্য একটা শপিং মলের গল্প লিখিনি।’
‘রবিন, ভাল করে খাতার দিকে তাকিয়ে দেখো,’ এমন ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকালেন ম্যাডাম, যেন আমি মঙ্গল গ্রহ থেকে নেমে আসা কোনও প্রাণী। ‘স্কেটিঙের গল্পই লিখেছ তুমি।’

খাতার দিকে তাকাতে ভয় লাগছে আমার। জোর করে চোখ নামালাম আবার। অবাক হয়ে দেখলাম, সত্যিই লেখা রয়েছে : 'স্কেটিং করে আমেরিকা ভ্রমণ'। লেখকের নামের জায়গায় আমার নাম—রবিন মিলফোর্ড।
আবার কি আমার অতিকল্পনা আমাকে হ্যালুসিনেশন দেখিয়েছে? আবার জেগে জেগে শপিং মলের দুঃস্বপ্ন দেখেছি? তবে হাতের খাতাটায় আবার স্বাভাবিক শিরোনাম দেখে স্বস্তি বোধ করলাম।
জোরে জোরে পড়তে আরম্ভ করলাম।
পড়া শেষ হলে সবাই প্রশংসা করল।
'সত্যিই খুব ভাল হয়েছে, রবিন,' মিস কলিনস বললেন। 'আমেরিকার সমস্ত জায়গায় নিশ্চয় যাওনি তুমি, অথচ এই লেখার মাধ্যমে সারা দেশ ঘুরিয়ে এনেছ আমাদের। একজন সাংঘাতিক স্টোরি টেলার তুমি, কল্পনাশক্তি অসাধারণ।'
মৃদু হেসে নিজের সিটে ফিরে এলাম।
এরপর বাকি দিনটা নিরাপদেই কেটে গেল, অস্বস্তিকর আর কিছু ঘটল না। স্বস্তি বোধ করতে শুরু করেছি কেবল, তারপরই এমন একটা ঘটনা ঘটল, রীতিমত ঘাবড়ে গেলাম।
বেসবল প্র্যাকটিস সেরে বাথরুমে ঢুকেছি। শাওয়ারে গোসল সেরে, শরীরের ঘাম ধুয়ে নেয়ার জন্য। তাড়াহুড়ো করছি, কারণ এখান থেকে বেরিয়ে শপিং মলে যেতে হবে।
শাওয়ারের নীচে দাঁড়িয়ে পানি ছেড়ে দিয়ে ভিজতে লাগলাম। খানিকক্ষণ শরীর ভিজিয়ে নিয়ে সাবান মাখাচ্ছি, হঠাৎ লক্ষ করলাম, বাষ্পে ভরে যাচ্ছে ঘরটা।
বেসিনে ঠাণ্ডা-গরম, দুই রকম পানিরই ব্যবস্থা আছে। নিশ্চয় গরম পানির কলটা খুলে দিয়েছে কেউ। তবে কখন ঢুকল, কে ঢুকল, কিছু লক্ষ করিনি।
ভীষণ গরম হয়ে গেছে বাথরুমের বাতাস। দম নিতে কষ্ট হচ্ছে। কেশে উঠলাম।
'অ্যাই, কল কে খুলেছ?' চিৎকার করে বললাম, 'বন্ধ করো!'
কেউ জবাব দিল না। বদ্ধ জায়গায় প্রতিধ্বনি তুলল আমার চিৎকার। যেন আবারও দুঃস্বপ্নের মধ্যে রয়েছি। স্বপ্নের সেই জোরাল কণ্ঠটাকে কথা বলতে শুনলাম, কানের কাছে যেন গমগম করে উঠল, 'রবিন! রবিন মিলফোর্ড! আমার হাত থেকে মুক্তি নেই তোমার। হাহ্ হাহ্ হাহ্!'
আরও ঘন হচ্ছে বাষ্প।
দম আটকে আসছে আমার।
মরিয়া হয়ে দেয়াল ঘেঁষে বসানো বেসিনের কাছে এসে দাঁড়ালাম। ততক্ষণে প্রচণ্ড গরম হয়ে গেছে ঘরের বাতাস।
মোচড় দিলাম 'হট' লেখা কলটার চাবিতে।

কিন্তু বন্ধই তো রয়েছে ওটা!
পানিও পড়ছে না!
তাহলে ঘর গরম হলো কীভাবে?
আর বাষ্পই বা এলো কোথা থেকে।
ধীরে ধীরে কমে গেল বাষ্প, পরিষ্কার হয়ে এল বাতাস।
পায়ের শক্তি হারিয়ে ফেলেছি। মেঝেতে বসে পড়লাম। হাঁপাচ্ছি আর দম নিচ্ছি।
চারপাশে তাকালাম। কেউ নেই। মস্ত গোসলখানাটায় আমি একা।
কয়েক সেকেণ্ড বিশ্রাম নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। বড় তোয়ালে দিয়ে শরীর মুছে, গায়ে জড়িয়ে বেরিয়ে এলাম বাথরুম থেকে।
লকার রুমের দিকে এগোলাম।
দৌড়ে আসছেন আমাদের বেসবল কোচ মিস্টার জোনস। 'রবিন!' চিৎকার করে বললেন তিনি। 'তুমি ভাল আছো তো?'
'আছি, সার।' লকার থেকে আমার কাপড়গুলো বের করে পরতে পরতে বললাম।
'সত্যি ভাল আছো?' শঙ্কিত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাচ্ছেন সার।
'কেন, সার, ভালই তো আছি।'
'যাক, বাঁচা গেল!' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন তিনি। 'আমাদের কেয়ার-টেকার বলল, গরম পানি সাপ্লাই দেয়ার পাইপটা নাকি ফেটে গেছে বাথরুমের ভিতর। বাষ্প বেরোনোর কথা। বাইরে থেকে চাবি বন্ধ করে দিয়েছে। এদিকে আমি তোমাকে বাথরুমে ঢুকতে দেখেছি। ওর কথা শুনে তাই ছুটে এসেছিলাম, তোমাকে সাবধান করে দিতে।'
'বাষ্প বেরিয়েছিল, সার, তবে আমার কোন ক্ষতি হয়নি। একটু দমবন্ধ লাগছিল অবশ্য।
'ভাগ্যিস তোমার কোন ক্ষতি হয়নি। নাহ্, এসব ব্যাপারে সাবধান থাকতে হবে এরপর থেকে। কেয়ারটেকারকে ভালমত বলে দিতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা আর না ঘটে। ভাগ্য ভাল, শাওয়ার দিয়ে গরম পানি বেরোয়নি। তাহলে তো পুড়ে মরতে!'
গরম পানির পাইপ ফাটলে বাষ্প বেরোতেই পারে। কিন্তু তার সঙ্গে ওই অদ্ভুত হাসির কী সম্পর্ক, বুঝতে পারলাম না। হাসি আর কথা যে শুনেছি, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আরেকটা কাকতালীয় ব্যাপার, পাইপ ফাটার আর সময় পেল না, আমি যখন বাথরুমে শাওয়ার নিচ্ছি, ঠিক তখন ফাটল কেন?
ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছে কেউ যেন আমাকে নিয়ে খেলা করছে। আমাকে ভয় দেখাতে চাইছে। কিংবা তারচেয়ে খারাপ কিছু করতে চাইছে। ভাবনাটা মনে চেপে

রাখলাম। কোচকে জানালাম না। বললে হয়তো আরও অনেকের মত তিনিও আমার অতিকল্পনাকেই দায়ী করবেন।
আর কিছু না বলে, চুপচাপ কাপড় পরে হাঁটতে শুরু করলাম। বেরিয়ে এলাম স্কুলের সামনের দরজা দিয়ে। সূর্য ডুবছে। পশ্চিম আকাশে বিশাল একটা আগুনের গোলার মত।
আমার স্কেট পায়ে দিলাম। হাঁটুতে নি-প্যাড লাগিয়ে মাথায় হেলমেট পরলাম। ব্যাকপ্যাকটা পিঠে বাঁধলাম। তারপর স্কেটিং করে গেট দিয়ে বেরিয়ে এসে রাস্তায় পড়লাম।
শপিং মলটা নতুন, মাত্র কয়েক বছর আগে বানানো হয়েছে। শহরের একপ্রান্তে, স্কুল থেকে মাইলখানেক দূরে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই চোখে পড়ল বিল্ডিংটা।
দূর থেকেও ভূতুড়ে দেখাচ্ছে। অনেক বড়, ঝকঝকে পরিষ্কার, প্রচুর বাতি, কিন্তু তবু ওটার দিকে তাকিয়ে গায়ে কাঁটা দিল আমার। কালো কাঁচ লাগানো থাকায় দূর থেকে কেমন অবাস্তব লাগছে, আমার কাছে মনে হচ্ছে ভিনগ্রহবাসীদের বিশাল একটা স্পেসশিপের মত। বাইরে থেকে দেখে মনেই হয় না ওখানে খারাপ কিছু ঘটতে পারে। কিন্তু আমি জানি—আমার ধারণা—ওটার গভীরে কোনখানে সাংঘাতিক কিছু ঘটছে। আমি আরও জানি, আমার অপেক্ষায় রয়েছে অশুভ কোনও দানব, যেটা বার বার আমার স্বপ্নে দেখা দেয়। আমার মন বলছে, আমার ক্ষতি ওটা করবেই। তাই তৈরি থাকতে হবে আমাকে, যাতে সময় এলে ওটার মোকাবেলা করতে পারি।
শপিং মলের প্রধান প্রবেশপথের সামনে পৌছে মন থেকে এসব কথা দূর করে দিতে চাইলাম। পা থেকে স্কেট দুটো খুলে নিয়ে ব্যাকপ্যাকে ভরলাম। তারপর ঢুকে পড়লাম গেট দিয়ে ভিতরে।
আমি ঢোকার সময় নীল ইউনিফর্ম পরা একজন গার্ড ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। ওর পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেলাম।
সবখানেই ক্রেতার ভিড়। দোকানের ভিতরে, বাইরে, বারান্দায়, সব জায়গায় আছে। কেউ ঢুকছে, কেউ বেরোচ্ছে, কেউ কেউ এসকেলেটরে চড়ে ওপরে উঠছে, কিংবা নীচে নামছে। গ্রেগ জনসনের ‘ডল এম্পোরিয়াম’টা পাঁচতলায়।
এলিভেটরের সামনে অনেক লোক লাইন দিয়েছে, তাই তাড়াতাড়ি যাওয়ার জন্য এসকেলেটরকেই বেছে নিলাম।
উঠে পড়লাম তাতে। দ্রুত আমাকে দোতলায় পৌঁছে দিল ওটা। নেমে, পরের এসকেলেটরে চড়ে উঠলাম তিনতলায়। আবার নেমে আরেকটায় চড়ে চারতলায়। আবার এসকেলেটর বদল করলাম। এসময় লক্ষ করলাম, এই

এসকেলেটরটাতে আমি একা। আর কেউ নেই। পাঁচ তলায় উঠে যাচ্ছে। হঠাৎ খুব দ্রুত চলতে শুরু করল ওটা।
এটাও কী আমার কল্পনা? না সত্যিই ঘটছে?
ভারসাম্য হারালাম। হাত বাড়িয়ে থাবা দিয়ে একটা পাশ ধরে ফেলার চেষ্টা করলাম। রোলার কোস্টারের চেয়ে দ্রুত চলছে এসকেলেটর।
সামনেই পাঁচতলা। ভয়ঙ্কর গতিতে সেদিকে এগোচ্ছে এসকেলেটর। চিৎকার করে উঠলাম। এত দ্রুত চলছে, নামার সুযোগ দেবে না, আমাকে স্রেফ ছুঁড়ে ফেলে দেবে পাঁচতলার ল্যাণ্ডিং-এ।
শক্ত করে ফেললাম দেহটাকে। এসকেলেটর আমাকে শূন্যে ছুঁড়ে ফেললে ডিগবাজি খেয়ে পায়ের ওপর খাড়া হয়ে নামার চেষ্টা করব। কিন্তু পিঠে বাঁধা ব্যাকপ্যাকটা ঝামেলা করবে, জানি, তবু চেষ্টা করে দেখতে হবে।
ওপরে পৌঁছে গেছি।
দেহটাকে শক্ত করে রেখেছি।
এসকেলেটর আমাকে শূন্যে ছুঁড়ে দেয়ার অপেক্ষায় আছি।
আচমকা কোনরকম জানান না দিয়ে থেমে গেল ওটা! এ রকম কিছু ঘটার জন্য তৈরি ছিলাম না। উড়ে গিয়ে ল্যাণ্ডিং-এর ওপর পড়লাম। দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে, একটা বিজ্ঞাপনের ডিসপ্লের ওপর পড়লাম। স্ট্যাণ্ডের ওপর দাঁড় করিয়ে রাখা বিজ্ঞাপনের বোর্ডটাকে নিয়ে কাত হয়ে পড়লাম বারান্দায়। একটা দোকানের সামনে।
মুখ তুলে তাকিয়ে দেখি, রুক্ষ চেহারার টাকমাথা একজন ছোটখাট মানুষ দোকানের কাঁচের দেয়ালের ভিতর দিয়ে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে রয়েছে আমার দিকে।
হাসার চেষ্টা করে উঠে দাঁড়ালাম। ভান করলাম, যেন কিছুই হয়নি। বিজ্ঞাপনের বোর্ডটাকে তুলে আগের মত খাড়া করে রাখলাম। টেনেটুনে কাপড়-চোপড় ঠিক করতে লাগলাম।
আমার দিকে এমন করে তাকিয়ে আছে লোকটা, যেন আমি একটা আজব প্রাণী। নিশ্চয় গেঁয়ো ভূত ভাবছে আমাকে। হয়তো ভাবছে, এসকেলেটরে চড়তেও জানি না আমি।
ফিরে তাকালাম এসকেলেটরটার দিকে। চলছে ওটা। স্বাভাবিক গতিতে।
মাথা ঝাড়া দিলাম। ফিরে তাকালাম দোকানের কাঁচের ভিতর দিয়ে। লোকটাকে দেখলাম না। দোকানের সাইনবোর্ডের ওপর চোখ পড়ল। লেখা রয়েছে : ডল এম্পোরিয়াম। হয়তো ওই লোকটাই গ্রেগ জনসন, অবাক দৃষ্টিতে যে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল।

লম্বা দম নিলাম। ঢুকে পড়লাম দোকানে। আমি ছাড়া আর দুজন ক্রেতা আছে। একজন মহিলা, সঙ্গে ছোট একটা ছেলে। নতুন কোনও কম্পিউটার গেম এসেছে কি না খোঁজ নিচ্ছেন। আর বছর পনেরো বয়েসের এক কিশোরী গানের সিডি বাছাই করছে।

পুতুল রাখা হয় যেখানে, সেদিকে তাকালাম। হঠাৎ পিছন থেকে কথা শোনা গেল, 'পুতুল লাগবে, ইয়াং ম্যান?'

চমকে গিয়ে চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়ালাম। সেই লোকটাই, সেই টাকমাথা। শার্টের বুকপকেটে একটা ধাতব চৌকোনা প্ল্যাস্টিকের ট্যাগ লাগানো, তাতে লেখা : গ্রেগ জনসন, দোকান মালিক। বুকে এভাবে নিজের নাম-পরিচয় লেখা ট্যাগ ঝোলানো এই শপিং মলের নিয়ম। লোকটার দু'চোখের শাণিত দৃষ্টি চিরে ঢুকে যাচ্ছে যেন আমার মগজে। এবং যতক্ষণ তাকিয়ে রইলাম, একটিবারের জন্য চোখের পলক ফেলতে দেখলাম না লোকটাকে।

'হ্যাঁ,' জবাব দিলাম। 'একটা সুপার কিড এভিয়েটর ডল কিনতে এসেছি।'

আমার ওপর থেকে চোখ সরাচ্ছে না লোকটা। 'কেন, পুতুল তোমার খুব পছন্দ নাকি? পুতুল জমাও?' কথা বলার সময় মুখের ভাবের কোন পরিবর্তন হলো না ওর।

'না, আমার বোন জমায়। আগামীকাল ওর জন্মদিন। ওকে একটা পুতুল উপহার দিতে চাই।'

'ও। তবে তোমার জন্য খারাপ-ভাল দুরকম খবরই আছে, লোকটা বলল। 'খারাপ খবরটা হলো, আজ আমাদের স্টকে একটা এভিয়েটর ডলও নেই। আর ভাল খবরটা হলো, কাল অনেকগুলো পুতুল আসছে, অর্ডার দিয়ে রেখেছিলাম। কাল দুপুর নাগাদ এলে পেয়ে যাবে।'

এই ভয়ানক শপিং মলে কাল আবার আসতে হবে শুনে দমে গেলাম। জবাব না দিয়ে ঘুরে দাঁড়ালাম দরজার দিকে। বেরোনোর আগে ফিরে তাকিয়ে দেখলাম, একভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আছে লোকটা। দোকান থেকে বেরিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। মনে হলো, গ্রেগ জনসন আর ওর দোকানে অদ্ভুত কিছু একটা রয়েছে।

এবার আর ওপরে ওঠার এসকেলেটরটার দিকে না গিয়ে নীচে নামে যেটা, সেটার দিকে এগোলাম। বাড়ি ফেরার জন্য অস্থির হয়ে আছি। প্রায় ছ'টা বাজে। অনেক দেরি হয়ে গেছে। আমার বয়েসী যারা, স্কুলে পড়ে, কখন বাড়ি চলে গেছে, এতক্ষণে রাতের খাবার খেতে বসেও গেছে নিশ্চয় কেউ কেউ।

এসকেলেটরের কাছে এসে থামলাম। পা রাখার আগে ভাল করে দেখে নিলাম। স্বাভাবিক গতিতে চলছে। কিন্তু আমি পা রাখতেই আমচকা ঝাঁকি দিয়ে থেমে

গেল।
‘এসকেলেটর নষ্ট হয়ে গেছে, আপাতত আর চলবে না,’ পিছন থেকে বলল একটা কণ্ঠ। ফিরে তাকালাম। কথা বলল যে লোকটা, ওকে কোথায় যেন দেখেছি। হয়তো আমার কোনও দুঃস্বপ্নে। বড় বড় ধারাল শ্বদন্ত নেই বটে ওর, ঠেলে বেরোনো বড় বড় চোখ, সবুজ চামড়া, কিংবা গা ভর্তি লোমও নেই—কিন্তু চেহারাটা অবিকল আমার স্বপ্নে দেখা শপিং মলের দানবটার মত লাগছে।
গায়ে শপিং মলের ইউনিফর্ম, বুকের কাছে ট্যাগ ঝোলানো। তাতে লেখা : হিরাম স্কারপিনি, মেকানিক, ওয়েভারলি মল।
ওর পরিষ্কার টলটলে চোখ আমাকে দেখছে। এক পা পিছিয়ে গেলাম। যে ব্যাপারটা বেশি অবাক করল, তা হলো খেলনার দোকানের মালিকের মতই এই লোকটার চোখেও পলক পড়ছে না। ‘এলিভেটরে চড়ে নীচে যেতে হবে তোমাকে।’
‘ঠিক আছে,’ বলে এসকেলেটর থেকে উঠে এলাম ল্যাণ্ডিং-এ।
ঘুরে দাঁড়াল লোকটা। আমার দিকে পিছন ফিরে একটা টুল বক্সের ওপর ঝুঁকল। সেটা থেকে একটা রেঞ্চ বের করল। ‘যাও, সাবধানে যেয়ো।’ আমাকে বলল ও। আমার দিকে তাকাল না। হাসল। শিউরে উঠলাম। দুঃস্বপ্নের সেই অদ্ভুত হাসি!
বারান্দা ধরে এগোলাম। এলিভেটরটা রয়েছে আরেক মাথায়। তাড়াহুড়া করে হেঁটে চললাম। শপিং মলের এই ফ্লোরে এখন আমি ছাড়া আর কোন কাস্টোমার নেই। অন্য সময় হলে অবাক লাগত, এত তাড়াতাড়ি সবাই শপিং মল থেকে চলে গেল? কিন্তু এখন বাড়ি ফেরা নিয়ে এত বেশি অস্থির আমি, ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামালাম না।
এলিভেটরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ালাম। এলিভেটর আসার বোতাম টিপলাম। দশ সেকেণ্ড অপেক্ষা করার পর দরজা খুলল। কেউ নামল না। শূন্য এলিভেটর।
আমি একা এলিভেটরে চড়লাম।
বোর্ডের বোতামের সারির দিকে তাকালাম। সবচেয়ে নীচের বোতামটার নীচে লেখা ‘জি’। তারমানে, ‘গ্রাউণ্ড’।
বোতাম টিপতে হাত বাড়ালাম। হঠাৎ করেই যেন অদৃশ্য একটা হাত ধাক্কা দিয়ে আমার হাতটা ‘জি’-এর কাছ থেকে সরিয়ে দিল | অবাক হয়ে দেখলাম, ‘এইচ’ লেখা একটা বোতাম টিপছি, প্যানেলে যে আছে ওটা, চোখেই পড়েনি আগে।
‘এইচ’ দিয়ে কী হয়?
কোথায় যাবে এখন এলিভেটর?
বোতামটা আমাকে দিয়ে কে টেপাল?

তীব্র গতিতে নীচে নেমে চলল এলিভেটর। আমার হৃৎপিণ্ডটা যেন গলার কাছে উঠে চলে এসেছে। প্রতিটি ফ্লোর পার হচ্ছি, আর আরও বেশি শক্ত হয়ে যাচ্ছি। কিছুই করতে পারছি না। আমার হাতটাকে অনড় করে দিয়েছে কে যেন।
'এইচ' বোতামটা টিপেছি আমি। কে, কেন টিপিয়েছে আমাকে দিয়ে, জানি না। গ্রাউণ্ড ফ্লোর পার হয়ে আরও নীচে নামতে লাগল এলিভেটর। 'বি' লেখা বোতামটা টিপটিপ করে জ্বলতে-নিভতে শুরু করল। মনে হলো বেযমেন্ট, অর্থাৎ মাটির নীচের ঘরে নেমে যাচ্ছি।
'জি' দিয়ে 'গ্রাউণ্ড', 'বি' দিয়ে 'বেযমেন্ট', কিন্তু 'এইচ' দিয়ে কী হয়? হঠাৎ কেউ আমার মনের ভিতর যেন ঢুকিয়ে দিল জবাবটা : 'এইচ' মানে 'হোম'। তবে কী অদ্ভুত কোনও উপায়ে এই এলিভেটর দিয়ে ক্রেতাদেরকে ওদের বাড়ি পৌঁছে দেয়া হয়? নাহ্, অসম্ভব! এলিভেটর কখনও কারও বাড়িতে যেতে পারে না।
হঠাৎ করেই এলিভেটরের ভিতরের আলো কমে গেল। গতি কমতে কমতে থেমে গেল এলিভেটর। কিন্তু দরজা খুলল না।
'এই যে, কেউ আছেন!' চিৎকার করে ডাকলাম। 'কেউ শুনছেন?'
সাড়া এল না। দরজা খুলল না। প্রায় অন্ধকার একটা এলিভেটর-কারের মধ্যে একা দাঁড়িয়ে আছি আমি। বেরোব কী করে এখান থেকে?
হঠাৎই 'এইচ' লেখা বোতামটা উজ্জ্বল হয়ে গেল আবার। দম বন্ধ করে অপেক্ষা করছি। ধীরে ধীরে খুলে যাচ্ছে এলিভেটরের দরজা।
হঠাৎ তীব্র আলো ঝাঁপিয়ে এসে পড়ল যেন চোখে। অন্ধ করে দিল আমাকে। দুঃস্বপ্নে দেখা সেই রকম আলো, আজ ভোরেই যা দেখেছি।
'কে ওখানে?' কপালে হাত রেখে তীব্র সাদা আলো আড়াল করে চেঁচিয়ে উঠলাম। চলে গেল আলোটা। চারপাশে তাকালাম।
যা দেখছি, সবই অবাস্তব লাগল। মনে হলো, আবার স্বপ্নের মধ্যে ঢুকে পড়েছি। কিন্তু এটা স্বপ্ন নয়, বাস্তব, আমি ভাল করেই জানি। বাস্তবে ঘটছে ঘটনাটা।
বিষণ্ন, একটা ভূতুড়ে বনের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি আমি। মস্ত বড় একটা বট গাছের কাছে। এলিভেটরটা দেখতে পাচ্ছি না। পিছন থেকে কর্কশ অট্টহাসি শুনে চমকে গেলাম।
ফিরে তাকালাম। টাকমাথা, বেঁটে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। থ্যাবড়া নাক, কোঁচকানো বুড়োটে চামড়া, নিষ্পলক চোখ। চেনা চেনা লাগছে।
'আমাদের স্বর্গে স্বাগতম, রবিন,' বলল আজব মানুষটা।
স্বর্গ! শপিং মলের তৈরি নতুন কোনও থিম পার্ক নাকি এটা? ছোটদের আকর্ষণ করার কৌশল? যেটাই হোক, জায়গাটা ভয় ধরায়, তাতে কোন সন্দেহ নেই।
'শুনুন,' জিজ্ঞেস করলাম লোকটাকে, 'আমার নাম জানলেন কী করে?'

আবার হেসে উঠল অদ্ভুত লোকটা। আমার প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল। একটা বাক্সের দিকে হাত বাড়াল। 'আমি জানি তুমি পুতুল খুঁজছ।' বাক্স থেকে বের করে আমাকে দেখিয়ে বলল, 'চলবে এটাতে?'

আমার নাকের কাছে ধরে রেখেছে জিনিসটা। ভীষণ কুৎসিত চেহারার একটা পুতুল। হঠাৎ জ্যান্ত হয়ে উঠল পুতুলটা। আমার দিকে হাত বাড়াল। অট্টহাসি হেসে বলল, 'স্বাগতম, রবিন।'

পিছিয়ে গেলাম। ধাক্কা খেলাম গাছের গায়ে। পুতুল কথা বলে! জীবনে শুনিনি! তা ছাড়া আমার যে পুতুল দরকার, এই অদ্ভুত লোকটা জানল কী করে? কেন চেনা চেনা লাগছিল লোকটাকে, এতক্ষণে বুঝলাম। ওকে দেখতে অনেকটা ডল এম্পোরিয়ামের মালিক গ্রেগ জনসনের মত লাগছে। দোকানেও ঠিক স্বাভাবিক ছিল না, কিন্তু অনেক বেশি অদ্ভুত আচরণ করছে এখানে।

'কী হচ্ছে বলুন তো?' জিজ্ঞেস করলাম। ভয়ে বার বার কাঁটা দিচ্ছে গায়ে। 'এখানে তো আসতে চাইনি আমি। আমি নামতে চেয়েছিলাম গ্রাউণ্ড ফ্লোরে।'

গ্রেগ জনসনের চেহারার লোকটা এক পা এগোল আমার দিকে। ওর হাতের পুতুলটা হাত থেকে ছুটে গিয়ে শূন্যে লাফিয়ে উঠল। উড়ে এল আমার দিকে।

সমস্বরে কথা বলে উঠল ওই লোক আর পুতুলটা, 'এই স্বর্গটা তোমার ভাল লাগবে, রবিন। আমাদেরকে তুমি সহযোগিতা করবে। তোমাকে যা করতে বলা হবে তা-ই তুমি করবে!'

'না!' চেঁচিয়ে উঠলাম। ঘুরে দৌড় দিয়ে পালাতে চাইলাম। কিন্তু বট গাছটা বাধা হয়ে দাঁড়াল। ওটার মস্ত শিকড়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলাম।

হঠাৎ গাছের গায়ে দরজা তৈরি হলো। খুলে গেল হাঁ হয়ে। ভিতরে এলিভেটর-কারটা দেখলাম। গ্রেগ জনসনের দানব আর পুতুলটা আমাকে ধরার আগেই লাফ দিয়ে এলিভেটরে উঠে পড়লাম। খালি এলিভেটর, আমি ছাড়া আর কেউ নেই। মৃদু আলো জ্বলছে। 'ইমার্জেন্সি' লেখা বোতামটা টিপে দিলাম। কিছুই ঘটল না। তারপর 'জি' বোতামটা চোখে পড়ল। মনে মনে খোদাকে ডাকতে ডাকতে আঙুল রাখলাম ওটাতে। টিপে ধরে রাখলাম। ঝাঁকি দিয়ে চলতে শুরু করল এলিভেটর।

এলিভেটরের দরজা খুলে যেতেই একটা মুহূর্ত দেরি না করে লাফিয়ে পড়লাম বাইরে। শপিং মলে লোকের ভিড়। এটা আরেক আশ্চর্য! কখনও দেখছি, মানুষজন কেউ নেই, আমি একা। আবার কখনও প্রচুর লোকজন। কোনটা স্বাভাবিক?

বেশি ভাবার সময় নেই। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যেতে হবে এখান থেকে। নতুন বিপদ হাজির হবার আগেই। সোজা দৌড় দিলাম গেটের দিকে। বাইরে এসে স্কেট দুটো

বের করে দ্রুত পরে ফেললাম। ছুটলাম বাড়ির দিকে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাড়ি পৌঁছে স্বস্তি পেতে চাই।
বাড়ি ফিরে দেখি রাতের খাওয়া প্রায় শেষ করে এনেছে মা, বাবা ও নিনা।
'এত দেরি করলে যে?' মা জিজ্ঞেস করল। 'আমার তো দুশ্চিন্তা হচ্ছিল। জলদি হাতমুখ ধুয়ে এসো। খাবার এখনও গরম আছে। বেড়ে দিই।'
কিন্তু খেতে ইচ্ছে করছে না আমার। বললাম, 'আমি খেয়ে এসেছি, মা।'
আমার দিকে তাকিয়ে আছে মা। 'খেয়েছ? কোথায়?'
'শপিং মলে হট ডগ খেয়েছি। পেট ভর্তি হয়ে আছে।'
মাথা ঝাঁকাল মা। তবে আমার কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করল বলে মনে হলো না। এতক্ষণে চোখ পড়ল আমার হাতের দিকে। 'পুতুল কোথায়?'
এবার কী জবাব দেব? দোকানে আজ পুতুল নেই। দোকানদার বলেছে, আগামীকাল দুপুরে আসবে। কিন্তু সত্যি কথাটা বললে কাল আবার আমাকে শপিং মলে যেতে হবে, জোর করে পাঠাবে মা, অথচ আমি কোনমতেই যেতে চাই না।
'ওদের কাছে এভিয়েটর ডল নেই,' জবাব দিলাম। 'শেষ হয়ে গেছে।' আগামী দিন আসার কথাটা চেপে গেলাম।
কিন্তু মা এত সহজে ভোলার পাত্র নয়। বলল, 'শেষ হয়ে গেছে, আসবে। এত চাহিদা যে জিনিসের, সেটা না এনে বসে থাকবে না। কাল দুপুরে গেলেই পেয়ে যাবে, আমি বললাম, দেখো।'
'কী জানি, হয়তো পাব,' ভ্রূকুটি করলাম।
আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে মা। 'রবিন, কিছু হয়েছে নাকি? পুতুলের টাকাটা খরচ করে ফেলেছ? নাকি হারিয়ে ফেলেছ?'
'না, মা, টাকা আছে,' বের করে দেখালাম। 'আসলে, কাল আমি শপিং মলে যেতে চাই না।'
'কিন্তু যেতে হবে তো,' মা বলল। পার্স থেকে আরও কিছু টাকা বের করে দিল। 'এই নাও। পুতুল ছাড়াও আরও দুটো জিনিস আনতে হবে।'
'কী?' কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করলাম।
'ফ্রেডসন'স আই কেয়ার থেকে আমার চশমাটা আনতে হবে। ফ্রেম কিনে কাঁচ লাগাতে দিয়ে এসেছিলাম, কাল ডেলিভারি দেয়ার কথা। আর প্রেশার কুকারের একটা ওয়াশারও আনতে হবে, ওখানকার একটা দোকানে ছাড়া পাওয়া যায় না —অনেক জায়গায় খুঁজেছি।'
আমার হাতে আরও কিছু টাকা দিল মা।
'মা, এতগুলো কাজ আমাকে দিয়ে করাবে?'

‘এত কাজ কোথায় দেখলে? একটা পুতুল, একটা চশমা, আর একটা ওয়াশার; ভারিও নয়, ছোট একটা ব্যাগের মধ্যেই ধরে যাবে। এত গাঁইগুঁই করছ কেন? শপিং মলে যেতেই বা এত আপত্তি কীসের?’
‘কী জানি, জানি না!’ বিরক্তকণ্ঠে বললাম। ‘হয়তো শপিং মলে যাওয়া, বাজারসদাই, এসব আমার ভাল লাগে না!’
‘ভাল না লাগলেও যেতে হবে,’ মা বলল। ‘অনেক কাজই ভাল লাগে না আমাদের, তা-ও করতে হয়। বাজার করা নিয়ে এত বিরক্ত হলে চলে না। আমি তো সব সময় থাকব না। কখনও না কখনও তোমার নিজের বাজার নিজেকেই করতে হবে।’
বাসনপেয়ালা ধুতে চলে গেল মা। মনে মনে স্থির করলাম, কাল শপিং মলে যদি যেতেই হয় আমাকে, একা যাব না। কিশোর আর মুসাকে সাথে নিয়ে যাব। ওদের অন্তত বোঝাতে হবে, শপিং মল সম্পর্কে আমার ভয়টা অমূলক কিংবা অতিকল্পনা নয়। ‘এইচ’ লেখা বোতাম, খেলনার দোকানের মালিক গ্রেগ জনসনের মত দেখতে দানবটা, কিংবা জ্যান্ত পুতুল কোনটাই আমার কল্পনা নয়।
ওপরতলায় এসে কিশোর আর মুসাকে ফোন করলাম। পরের দিন দুপুরবেলা আমার সঙ্গে শপিং মলে যেতে রাজি হলো দুজনেই। অনেকটা স্বস্তি পেলাম। বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। রাতের প্রথম দিকটায় ভালই ঘুম হলো। তারপর শুনলাম সেই ভয়ঙ্কর অট্টহাসি!
ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মেলে ঘড়ির দিকে তাকালাম। রাত দুটো বেজে পঁয়তাল্লিশ মিনিট। হাসিটা থেমে গেছে। নিশ্চয় স্বপ্নে দেখেছি। চোখ বুজলাম। আবার শোনা গেল হাসি। না শোনার ভান করে চোখ বুজে পড়ে রইলাম। লাভ হলো না। থেকে থেকেই শোনা যেতে থাকল অট্টহাসি। মনে হলো, বাইরে বা অন্য কোথাও নয়, আমার মগজের ভিতরেই হেসে চলেছে কেউ।
বাকি রাতটা বিছানায় গড়াগড়ি আর ছটফট করে কাটালাম। বুঝে গেছি, শপিং মল রহস্যের একটা কিনারা না করা পর্যন্ত শান্তি পাব না আমি। ভোরের দিকে আবার ঘুমিয়ে পড়লাম। এবং যথারীতি দুঃস্বপ্ন দেখলাম।
দুপুর ঠিক বারোটায় স্কেটিং করে পৌঁছলাম শপিং মলের প্রধান ফটকের কাছে। আজ শনিবার, তাই প্রচুর ভিড়। একেবারে ঠাসাঠাসি অবস্থা। কেন যে এখানে এত ভিড় করে লোকে, বুঝি না। কোনও জিনিসের দাম তো কম নেয় না। জেনেশুনেও বেশি দাম দিয়ে যেন ঠকতে আসে। যেন পতঙ্গের মত এর আলোর আকর্ষণে ছুটে আসে এই মানুষগুলো।
স্কেট দুটো খুলে নিয়ে ব্যাকপ্যাকে ভরলাম। হেলমেটটা মাথা থেকে নামিয়ে ফিতেয় ঝুলিয়ে রেখে দিলাম। বুকের দিকটায় গলার কাছে ঝুলে রইল ওটা।

ভিতরে ঢুকলাম। গার্ডের পাশ কাটালাম, আগের দিনও এই লোকটাই পাহারায় ছিল। একটা মুহূর্ত আমার দিকে তাকিয়ে থেকে অন্য দিকে চোখ ফেরাল। আরকেড এরিয়ায় কিশোর আর মুসা আমার জন্য অপেক্ষা করছে। সময় কাটানোর জন্য কম্পিউটার গেম খেলছে ওরা।
'স্পেশাল কী জিনিস দেখাতে এখানে এনেছ আমাদের?' মুসা জিজ্ঞেস করল। লেজার ম্যান-এর গেমটা সবে শেষ করেছে ও। পয়েন্ট পেয়েছে ১,০০,০০০।
'নিজের চোখেই দেখো,' আমি বললাম।
'এখন এখান থেকে সরলে আর খেলার চান্স পাব না, ফিরে এসে দেখব এক মাইল লম্বা লাইন হয়ে গেছে,' কিশোর বলল।
'আমি যা দেখাতে এনেছি, সেটা দেখলে কম্পিউটার গেমের কথা
আর মনে থাকবে না তোমাদের,' আমি বললাম।
'কোথায় যেতে হবে?' মুসা জিজ্ঞেস করল। 'চলো, এসকেলেটরে করে যাই। এসকেলেটরে চড়তে এলিভেটরের চেয়ে ভাল লাগে আমার।'
'না, যা দেখাতে চাই, সেটা দেখতে এলিভেটরে করেই যেতে হবে,' আমি বললাম।
আগের দিন যে এলিভেটরটায় চড়েছিলাম, সেটার কাছে নিয়ে এলাম ওদেরকে। শপিং মলে এত লোকের ভিড়, কিন্তু এলিভেটরের কাছে কেউ নেই। ব্যাপারটা আমার কাছে আগেও অদ্ভুত লেগেছে, বলেছি।
'ভালই হয়েছে,' মুসা বলল। 'লাইনে দাঁড়াতে হলো না। সেন্টারে তো লাইন ছাড়া কথা নেই।' আবার জিজ্ঞেস করল আমাকে, 'কী দেখাবে, বলো তো?'
'একটু অপেক্ষা করো, দেখতেই পাবে,' আবারও একই জবাব দিলাম।
এলিভেটর এল। দরজা খুলে গেল।
শূন্য এলিভেটর। একজন লোকও নেই ভিতরে।
মুসা বলল, 'আশ্চর্য! এখানে কি সবাই এসকেলেটরে চড়ে? এলিভেটরে কেউ ওঠে না?'
মুচকি হেসে বললাম, 'আশ্চর্যের এখনই দেখেছ কী। আরও কত কিছু বাকি।
কিশোর ও মুসাকে নিয়ে ভিতরে ঢুকলাম। আর কেউ উঠল না। শুধু আমরা তিনজন।
দরজাটা লেগে গেল।
বোতামের সারির কাছে দাঁড়িয়ে আছে কিশোর।
বললাম, 'এইচ লেখা বোতামটা টেপো। তাহলেই শুরু হয়ে যাবে খেল।'
'টিপতে পারলে তো খুশিই হতাম,' কিশোর জবাব দিল। 'কিন্তু এইচ লেখা বোতাম কই?'

প্যানেলের দিকে তাকালাম। বোতামের সারিতে ‘এইচ’ লেখা বোতামটা খুঁজছে আমার চোখ।
কিন্তু নেই!
গেল কোথায়?
আশ্চর্য!
‘বললাম তো, ছিল ওখানে!’ বোতামের সারির ঠিক যেখানটায় বোতামটা ছিল, সেখানে হাত বোলালাম। ‘তোমাদের কী ধারণা, আমি বানিয়ে বলেছি, পুরো ব্যাপারটা আমার কল্পনা?’
‘বানিয়ে গল্প লিখে তুমি ফার্স্ট হয়েছ,’ চিন্তিত ভঙ্গিতে কিশোর বলল। ‘সবচেয়ে বেশি নম্বর পেয়েছ। হয়তো বেশি কল্পনা করতে করতে এমনভাবেই কল্পনার জগতে ঢুকে পড়ো, বাস্তবতার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলো। হতে পারে না এরকম?’
জবাব খুঁজে পেলাম না। এলিভেটরের ভিতরের আয়নায় দেখলাম, মুখ লাল হয়ে যাচ্ছে আমার। রীতিমত একটা গাধা মনে হচ্ছে নিজেকে। কী জবাব দেব, বুঝতে পারছি না।
‘আর এখানে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ কী?’ মুসা বলল। বোতাম টিপল ও।
খুলে গেল এলিভেটরের দরজা। বেরিয়ে এলাম তিনজনে।
‘আমি আরকেডে যাচ্ছি,’ কিশোর বলল। লাইন হয়তো এখনও তেমন লম্বা হয়নি। তাড়াতাড়িই সুযোগ পেয়ে যাব আবার।’
‘তুমি কী করবে, রবিন?’ আমার মুখচোখের অবস্থা দেখে সহানুভূতির সঙ্গে জিজ্ঞেস করল মুসা।
‘মা কয়েকটা জিনিস নিতে বলে দিয়েছে,’ বোতামটা না পাওয়ায়, বন্ধুদের দেখাতে না পারায় খুব হতাশ লাগছে আমার। ‘সেগুলো কিনতে যাব।’
‘ঠিক আছে, যাও। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে রুবিনা’স হট ডগে চলে এসো,’ কিশোর বলল। ‘ওখানে লাঞ্চ খাব। তারপর প্লে এরিয়ায় গিয়ে রাইডে চড়ব। নতুন কয়েকটা রাইড এসেছে শুনলাম।’
ওরা ফিরে গেল ওদের আরকেডে, আমি রওনা হলাম জিনিসপত্র কিনতে। এবার আর এলিভেটরে চড়লাম না। এসকেলেটরের দিকে এগোলাম। ভাবতে ভাবতে চলেছি। হয়তো কিশোরের কথাই ঠিক। অতি কল্পনা করতে করতে এখন কল্পনার জগতেই বেশির ভাগ সময় ঘুরে বেড়াই আমি। মানসিক রোগী হয়ে যাচ্ছি হয়তো। মাকে বলে একজন ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করার কথাও ভাবলাম। তারপর দুশ্চিন্তাটা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে কাজের কথায় মন দিলাম। প্রথমে মা’র চশমাটা নিতে হবে, তারপর প্রেশার কুকারের ওয়াশার, সবশেষে নিনার পুতুল।

দোতলায় ওঠার এসকেলেটরে চড়লাম। চশমার দোকানটা ওখানেই। কোন ঝামেলা করল না এসকেলেটর। নেমে সোজা এসে দোকানে ঢুকে কাউন্টারের সামনে দাঁড়ালাম।

'কি লাগবে, বলো?' জিজ্ঞেস করল কাউন্টারের ওপাশে দাঁড়ানো মহিলা।

রশিদ বের করে বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, 'চশমার কাঁচ লাগাতে দিয়ে গেছে মা, আজ দেয়ার কথা।'

'এক মিনিট,' বলে রশিদটা নিয়ে চলে গেল মহিলা। ফিরে এল ঠিক এক মিনিট পরেই। হাতে একটা ছোট বাক্স। সেটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিল। আমি টাকা দিলাম। কিছু ভাঙতি পাব। ক্যাশ রেজিস্টারে লিখতে লাগল মহিলা। কত টাকা বিল হয়েছে, আমি ওকে কত দিয়েছি, কত টাকা ভাঙতি পাব, সব খুঁটিয়ে লিখছে। ভাঙতি টাকার জন্য অপেক্ষা করছি আমি।

'দেরি হবে?' আমার পিছন থেকে ধমকে উঠল একটা অধৈর্য কণ্ঠ। 'আমার তাড়া আছে, সারাদিন দাঁড়িয়ে থাকতে পারব না।'

'এক মিনিট, সার,' মহিলা বলল। 'এই যে, হয়ে গেছে।' একটা বাক্স থেকে আমাকে ভাঙতি টাকা বের করে দিল মহিলা। টাকা হাতে নিয়ে ঘুরে দাঁড়ালাম। লোকটার ওপর চোখ পড়তে ← থমকে দাঁড়ালাম। পরনে প্যান্ট, শার্ট, জ্যাকেট। চামড়ার রঙ সবুজ, ঠেলে বেরোনো লাল চোখ, আর দুই কান থেকে বেরিয়ে থাকা বড় বড় লোম!

একপাশের দেয়ালের দিকে সরে গেলাম। ওখানে শোকেসে সাজানো চশমা দেখার ভান করলাম। আসলে লোকটার ওপর নজর রাখছি। ও কী করে দেখতে চাইছি। দোকানে আমি ছাড়া আর কোন ক্রেতা নেই। শুধু আমরা তিনজন—আমি, ওই মহিলা, আর লোকটা।

কাউন্টারের ওপর একটা চশমা রাখল ও। ঠিকমত নাকে বসে না, তাই ফ্রেমটা ঠিক করে দিতে হবে। ধমক খেয়েও হাসিমুখে কথা বলছে মহিলা, যেন কিছুই হয়নি।

আজব লোকটা বেরিয়ে গেলে কাউন্টারের সামনে ফিরে এলাম। মহিলাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'উনি কে?'

আমার দিকে মুখ তুলে তাকাল মহিলা। 'ও, তুমি এখনও বেরোওনি। ভাঙতি টাকা তো দিয়ে দিলাম, আর কোনও সমস্যা?'

সমস্যা তো বটেই। বিরাট সমস্যা। জিজ্ঞেস করলাম, ' ওই ভদ্রলোককে দেখেছেন?'

'দেখব না কেন? আমাদের কাস্টোমার। মিস্টার ওয়েভারলি। তা ছাড়া এই শপিং মলের মালিকও তিনিই।'

‘এই শপিং মলের মালিক?’ নিজের কানে প্রতিধ্বনির মত শোনাল যেন আমার কথাগুলো। মনে হলো, পা দুটো রবার হয়ে গেছে আমার। হাঁটু ভাঁজ হয়ে আসছে। দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে। ‘দেখতে কি সব সময়ই ওরকম উনি?’
‘কী রকম? আজ শনিবার, ব্যস্ততা বেশি, তাই সাধারণ কাপড়চোপড় পরেছেন।’
‘আমি তাঁর পোশাকের কথা বলছি না। চামড়ার রঙ এমন কেন? মনে হয় যেন এই পৃথিবীর মানুষ নন, অন্য গ্যালাক্সি থেকে এসেছেন!’
আমার দিকে তাকিয়ে ভুরু কোঁচকাল মহিলা। ‘বেশি বেশি সাইন্স ফিকশন সিনেমা দেখো তুমি, তাই না? সেজন্যই মানুষকে ভিনগ্রহের মানুষ কল্পনা করো। আমি তো তাঁর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু দেখলাম না।’
একজন কাস্টোমার ঢুকল দোকানে। আমাকে মহিলা বলল, ‘তোমার কাজ তো শেষ, এখন তুমি যেতে পারো। হ্যাঁ, শোনো, বাড়ি গিয়ে মাকে বলো, তাড়াতাড়ি যেন ভাল সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে নিয়ে যান। কিংবা চোখের ডাক্তারও দেখাতে পারো। আমাদের এখানেও ডাক্তার বসেন, তাঁকেও দেখাতে পারো। চোখ খারাপ হলেও উল্টোপাল্টা দেখবে।’ তারপর হেসে স্বাগত জানাল নতুন কাস্টোমারকে।
ঘুরে দরজার দিকে রওনা হলাম।
বাইরে এসে চারপাশে তাকালাম। সব কিছুই খুব স্বাভাবিক মনে হচ্ছে। কিন্তু খটকাটা গেল না আমার। বার বার মনে হচ্ছে, কিছু একটা ঘটছে এই শপিং মলকে ঘিরে।
চশমা নিয়েছি। এখন প্রেশার কুকারের ওয়াশার কিনতে হবে। তারপর নিনার পুতুল। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কেনাকাটাগুলো সেরে পালাতে হবে এখান থেকে।
প্রেশার কুকারের দোকানটা চারতলায়। আবার এসকেলেটরে চড়লাম। দুইবার এসকেলেটর বদলে চারতলায় পৌছলাম। প্রেশার কুকারের দোকানে ঢুকলাম। সেলসম্যানকে প্রেশার কুকারের ওয়াশার দিতে বললাম।
সেলসম্যান একজন তরুণ। ওয়াশার এনে দিল। এই লোকটাও রেজিস্টারে বিল লিখতে লাগল। রেজিস্টারটা দেখতে পাচ্ছি। যেখানে সংখ্যাগুলো লেখা হয়, তা-ও চোখে পড়ছে।
তাকিয়ে আছি। আমার চোখের সামনে ক্যাশ রেজিস্টারটা একটা চেহারায় রূপ নিতে শুরু করল। মুখ, চোখ, দাঁত। মাথায় বড় বড় সবুজ লোম গজাচ্ছে। লিখে চলেছে সেলসম্যান। রেজিস্টারের পরিবর্তনটা যেন চোখেই পড়ছে না ওর!
রেজিস্টারটা নড়ছে, জ্যান্ত প্রাণীর মত। তারপর হাসতে লাগল। আমার বহুবার শোনা সেই অট্টহাসি।
এই সময় আমার পিছন থেকে একটা কণ্ঠ বলে উঠল, ‘জোসেফ, কেমন আছো?’
‘আরে, স্কারপিনি, কী খবর?’ তরুণ সেলসম্যান জিজ্ঞেস করল।

ফিরে তাকালাম। দরজায় দাঁড়ানো লোকটাকে দেখে চমকে উঠলাম। সেই লোকটা, শপিং মলের মেকানিক, যার বুকে ট্যাগে লেখা রয়েছে হিরাম স্কারপিনি। কাল আমাকে এসকেলেটর থেকে নামিয়ে দিয়েছিল।
লেখা শেষ করে আমার কাছ থেকে বেল্টের দাম নিল জোসেফ। ওয়াশারটা প্যাকেট করে দিল
আবার তাকালাম হিরাম স্কারপিনির দিকে। এখনও দরজায় দাঁড়িয়ে আছে আমার দিকে তাকিয়ে। ঠোঁটে পাতলা এক চিলতে অদ্ভুত হাসি, আন্তরিক নয় মোটেও। ফিরে তাকালাম ক্যাশ রেজিস্টারটার দিকে। আবার স্বাভাবিক হয়ে গেছে ওটা, সবুজ মুখটা গায়েব।
বেল্টের প্যাকেটটা নিয়ে পা বাড়ালাম দরজার দিকে। হিরাম স্কারপিনির পাশ দিয়ে বেরোনোর সময় ওর হাসি শুনলাম। জোরাল সেই অট্টহাসি!
নিনার পুতুল কেনা বাকি এখনও। ওটা কিনে আর এক মুহূর্ত দাঁড়াব না। সোজা বেরিয়ে যাব এই শপিং মল থেকে। কোনদিন কোনও কারণেই আর ফিরে আসব না এখানে। কিশোর আর মুসাকে বলে যাব, আমার মাথা ধরেছে, বাড়ি চলে যাচ্ছি, ওদের সঙ্গে লাঞ্চ খেতে পারব না। একবার গেটের বাইরে বেরোতে পারলেই হয়—নিজেকে বললাম—স্কেট পরে এমন ছোটা ছুটব, পিছন ফিরে তাকাব না আর।
আবার এসকেলেটরে চড়লাম। উঠে এলাম পঞ্চম তলায়। গ্রেগ জনসনের দোকানে ঢুকলাম। ভয় পাচ্ছি। ‘এইচ’ ফ্লোরে ওকেই কি দেখেছিলাম? পুতুলের দোকানের ছোটখাট এই টাকমাথা মানুষটিই কি নীচতলায় দানবে পরিণত হয়েছিল? নাকি পুরো ব্যাপারটাই আমার কল্পনা?
কাউন্টারের ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে একজন মহিলা। দোকানে গ্রেগ জনসনকে না দেখে তিনি কোথায় জিজ্ঞেস করলাম। মহিলা জানাল, হঠাৎ করেই মিস্টার জনসন অসুস্থ হয়ে পড়ায় দোকানে আসতে পারেননি। আমার কী চাই, জিজ্ঞেস করল।
‘আমি একটা এভিয়েটর ডল চাই,’ মহিলাকে বললাম। ‘কাল এসেছিলাম, পাইনি। মিস্টার জনসন আজ দুপুরে আসতে বলেছেন। আজ নাকি পুতুল আসবে।’
হাসিমুখে মহিলা বলল, ‘এসেছে তো।’
পিছনের দরজা দিয়ে ভিতরের ঘরে চলে গেল ও। ফিরে এল হাতে একটা বাক্স নিয়ে।
‘আজ আমার কাজিনের জন্মদিন,’ মহিলাকে বললাম। ‘উপহার দেব। রঙিন কাগজ দিয়ে প্যাক করে দিলে ভাল হয়।’

‘নিশ্চয়ই,’ মহিলা বলল।
ঠিক এ সময় অতিরিক্ত উজ্জ্বল হয়ে গেল দোকানের আলো। কয়েক মুহূর্ত পর আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল।
‘বাতির আলো এত বাড়ল কেন?’ ভীত চোখে চারপাশে তাকাতে লাগলাম।
‘ও কিছু না, ভোল্টেজ বেড়ে গিয়েছিল,’ মহিলা বলল। ‘শপিং মলের ইলেকট্রিশিয়ান বলেছে ওয়্যারিঙে নাকি গোলমাল হয়েছে। সেটা ঠিক করছে। বলেছে, মেরামতের সময় মাঝে মাঝে এ রকম হতে পারে।’
রঙিন কাগজ দিয়ে পুতুলের বাক্সটা সুন্দর করে মুড়ে দিল ও।
‘কী, আলোর সমস্যা নেই তো আর?’ সামনের দরজার কাছ থেকে জিজ্ঞেস করল একটা কণ্ঠ। পরিচিত মনে হওয়ায় ফিরে তাকালাম। মেকানিক হিরাম স্কারপিনি।
‘না, নেই,’ মহিলা জবাব দিল। ‘হঠাৎ আলো কিছুটা বেড়ে গিয়েছিল, তারপর ঠিক হয়ে গেছে।’
মাথা ঝাঁকিয়ে, আমার দিকে তাকিয়ে হাসল স্কারপিনি, সেই অদ্ভুত হাসি। পুতুলের বাক্সটা নিয়ে তাড়াতাড়ি ওর পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে এলাম।
কিশোর আর মুসাকে কী বলব ভাবতে ভাবতে নীচে নামার এসকেলেটরে পা রাখতে যাব, পিছন থেকে বলে উঠল পরিচিত কণ্ঠ, ‘এসকেলেটর নষ্ট।’
ফিরে তাকালাম। এসকেলেটরের মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছে হিরাম স্কারপিনি। আমার পিছন পিছন এসেছে।
আমি তাকাতেই আবার বলল, ‘চলে না। অচল হয়ে গেছে।’
‘কাল না দেখলাম ঠিক করলেন?’ আমি বললাম।
‘করেছিলাম, কিন্তু পুরোপুরি ঠিক হয়নি। সমস্যা রয়েই গেছে। এসব একদিনে মেরামত করা যায় না,’ শীতল দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে হিরাম স্কারপিনি বলল। ‘এলিভেটরে চড়ে যাও।’
এই একটা কাজই আমি আর করতে চাই না—এলিভেটরে চড়ে নীচে নামা। ‘না, আমি এলিভেটরে চড়ব না, সিঁড়ি দিয়ে নামব।’
‘উঁহুঁ,’ মাথা নাড়ল লোকটা। ‘পারবে না। সিঁড়ির মুখ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। মিস্ত্রিরা রঙ করছে ওখানে।’
অসহায় ভঙ্গিতে ওর দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলাম, নীচে নামতে হলে এলিভেটর ব্যবহার করা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই আমার।
‘এলিভেটরকে তুমি ভয় পাও, তাই না?’ হাসিমুখে জিজ্ঞেস করল লোকটা। যেন আমার ভয় দেখে মজা পাচ্ছে।
জবাব না দিয়ে ঘুরে হাঁটতে শুরু করলাম।

এলিভেটরের কাছে এসে দাঁড়ালাম। একমাত্র আমিই আছি। আর কেউ নেই। অথচ আজ শনিবারের ভিড়ের দিন। দুপুরের খাবার সময়। এলিভেটরের সামনে লাইন থাকার কথা। কারণ খাবারের দোকানগুলো সব নীচে
বোতাম টিপলাম। এলিভেটর এল। দরজা খুলল। কেউ নেই ভিতরে। ঢুকব কি না দ্বিধা করছি, কে যেন আমার পিঠে ধাক্কা দিয়ে এলিভেটরের ভিতরে ঠেলে দিল।
লেগে গেল দরজাটা। দরজা বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আলোও নিভে গেল।
গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে গেছে এলিভেটরের ভিতরটা!
শান্ত, মসৃণ কণ্ঠের কথা শোনা গেল এলিভেটরের স্পিকারে, ভয় পেয়ো না। বৈদ্যুতিক সিসটেমে গণ্ডগোল হয়েছে। এখুনি ঠিক হয়ে যাবে। প্যানেলে এইচ লেখা বোতামটা টিপে দাও, প্লিজ। তারপর পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষায় থাকো।'
হালকা, মৃদু আলো জ্বলে উঠল। কন্ট্রোল প্যানেলের দিকে তাকালাম। ফিরে এসেছে 'এইচ' লেখা বোতামটা।
যত খুশি নির্দেশ দিতে থাকুক স্পিকারে, মরে গেলেও আমি ওই বোতাম টিপব না।
কিন্তু কে যেন আমাকে দিয়ে জোর করেই বোতাম টেপাল। সেই অদৃশ্য হাতটাই হবে হয়তো, যেটা আমাকে ধাক্কা দিয়ে এলিভেটরের ভিতর ঠেলে ফেলে দিয়েছিল।
নড়ে উঠল এলিভেটর। নামতে শুরু করল।
মনে হলো যেন অনন্তকাল ধরে নেমেই চলেছি।
নেমে যাচ্ছি শপিং মলের নীচে, পাতালে।
তারপর হঠাৎ ঝাঁকি দিয়ে থেমে গেল এলিভেটর।
সব কিছু স্তব্ধ। নিথর। অখণ্ড নীরবতা।
তারপর সেই মসৃণ কণ্ঠটা আবার বলল স্পিকারে, 'তোমার শেষ গন্তব্যে পৌঁছে গেছ, রবিন। ভাল থাকো। '
দরজা খুলে গেল। আগেরবারের মতই তীব্র আলো পড়ল চোখে।
দুই হাতে চোখ ঢাকলাম।
আলো কমে এলে আবার যখন হাত সরালাম, দেখি সেই আজব বুনো অঞ্চলে দাঁড়িয়ে আছি। এলিভেটরকার থেকে কখন বেরোলাম, কীভাবে বেরোলাম, জানি না। কী ঘটে দেখার জন্য অপেক্ষা করলাম না। ঘুরে দাঁড়ালাম, বট গাছের ফোকর দিয়ে এলিভেটরে ঢোকার জন্য। এখানে থাকতে চাই না আমি।
কিন্তু কোথায় গাছ?
নেই ওখানে!

‘সর্বনাশ!’ বিড়বিড় করলাম। বনের অন্য কোনও অংশে চলে এসেছি হয়তো আমি। এখান থেকে বেরোনোর একটাই উপায়, বট গাছের ফোকর দিয়ে এলিভেটরে ঢোকা। তবে তার আগে গাছটাকে খুঁজে বের করতে হবে।
সরু কাঁচা রাস্তা দেখে সেটা ধরে হেঁটে চললাম। আমার চারপাশে বড় বড় গাছ, কেমন ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে। সবগুলোই তো দেখতে এক রকম, এর মাঝে সেই বিশেষ গাছটাকে খুঁজে বের করব কী করে? তারপর মনে পড়ল, যে গাছের ফোকর দিয়ে বেরিয়েছি, সেটার গোড়ায় মস্ত শিকড় রয়েছে। যাতে হোঁচট খেয়েছিলাম।
এগিয়ে চললাম। আমার দুই চোখের দৃষ্টি সেই শিকড় খুঁজে বেড়াচ্ছে। আর ওই বিশেষ গাছটাকে। এই ভয়ানক বনে কোনও রাক্ষুসে প্রাণী নেই তো, যে আমাকে ধরে খাওয়ার জন্য ওত পেতে রয়েছে? তবে এখন পর্যন্ত কোনও প্রাণী দেখিনি।
‘কী, রাস্তা খুঁজছ, রবিন?’ চিঁ-চিঁ করে ওপর থেকে কথা শোনা গেল।
থমকে দাঁড়ালাম। ওপরে তাকিয়ে দেখি, গাছের ডালে বসে কী যেন খাচ্ছে গ্রেগ জনসনের চেহারার সেই প্রাণীটা।
‘কী-কী চান আপনি?’ কোনমতে তুতলে বললাম। ‘আমাকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে কেন? এখান থেকে বেরোব কী করে?’
‘হাঁটতে থাকো,’ হেসে বলল ও। ‘ঠিক পথেই এগোচ্ছ। শীঘ্রি তোমার পরবর্তী নির্দেশ পেয়ে যাবে।’ হেসে আবার খাওয়ায় মনোযোগ দিল ভূতুড়ে গ্রেগ জনসন। ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম, কাঁচা মাংস খাচ্ছে ও। ঠোঁটের কোণ বেয়ে লাল রস গড়াচ্ছে। রক্তের মত। শিউরে উঠলাম। তাড়াতাড়ি পা চালালাম ওখান থেকে সরে আসার জন্য।
একটা দোরাস্তার মাথায় পৌছলাম। কোন দিকে যাব এখন? ডানে, না বাঁয়ে?
‘ডানে যাও, ডানে!’ বলে উঠল একটা অদৃশ্য রাগত কণ্ঠ।
অবাক হয়ে চারপাশে তাকালাম, কে কথা বলে দেখার জন্য। যাকে দেখলাম, নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে যাবার জোগাড় হলো আমার।
শপিং মলের সেই দারোয়ান, আমি ঢোকার সময় প্রতিবারেই যে কটমট করে তাকিয়ে থাকে। রাস্তার ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। ভুতুড়ে গ্রেগ জনসনের মত এ-লোকটাকেও ভূতুড়ে লাগছে। হাত, মুখ, আর গায়ের চামড়া ফুলে উঠেছে, বড় বড় ফোঁড়ার মত। চুলগুলো সব জট পাকানো। এমনিতেই চেহারাটা ভাল না ওর, এই আজব ভূতুড়ে জগতে আরও বেশি ভয়ানক, বিকৃত লাগছে।
‘ডানের রাস্তা ধরে এগিয়ে যাও!’ ধমকে উঠল সে। ‘অন্য কাস্টোমারদের পথ আটকিয়ো না!’

কোথায় অন্য কাস্টোমার? একটা লোককেও তো দেখতে পাচ্ছি না। শুধু দেহটাই বিকৃত হয়ে যায়নি লোকটার, মনে হলো মগজটাও বিগড়ে গেছে।
এখানে দাঁড়িয়ে থাকার কোন ইচ্ছেই আমার নেই। দ্রুত ডানের রাস্তাটা ধরে হাঁটতে শুরু করলাম। এঁকেবেঁকে চলে গেছে রাস্তাটা। সামনের একটা পাহাড়ের দিকে।
গাছের দিকে যাচ্ছি, না আরও কোনও ভয়ঙ্কর জায়গায় চলেছি, জানি না। পিঠের ব্যাকপ্যাকটা টেনেটুনে সোজা করলাম।
‘আমার সামনে থেকে সরো!’ হঠাৎ গর্জে উঠল একটা কণ্ঠ। ‘আমি ব্যস্ত মানুষ! আমাকে যেতে দাও!’
রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছি। মুখ তুলে তাকিয়ে দেখি, শপিং মলের মালিক মিস্টার ওয়েভারলি। সারা মুখে বড় বড় লোম। অদ্ভুত চেহারার একটা মোটর সাইকেলে বসে রয়েছে। সামনের পাহাড় থেকে নেমে আসা রাস্তা ধরে এসেছে। কখন এসেছে, বলতে পারব না। আসতে শুনিনি মোটর সাইকেলটাকে।
ভুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকিয়ে আছে মিস্টার ওয়েভারলি। লাফ দিয়ে বাঁয়ে সরে গিয়ে জায়গা করে দিলাম ওকে। আমার প্রায় গা ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল ওর মোটর সাইকেল।
ওর কুৎসিত রোমশ মুখটার দিকে তাকিয়ে গা ঘিঘিন্ করতে লাগল।
‘মনে হয় পথ হারিয়েছ?’ শান্ত, ঠাণ্ডা একটা মহিলাকণ্ঠ কানে এল।
ফিরে তাকালাম। একটা গাছের অন্ধকার, ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে মহিলা।
‘কে আপনি?’ ঢোক গিলে কোনমতে জিজ্ঞেস করলাম। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। থরথর করে কাঁপছে সারা শরীর। কথা বেরোতে চাইছে না গলা দিয়ে।
‘এত তাড়াতাড়িই ভুলে গেলে?’ মহিলা বলল। ‘এই তো, একটু আগেই তো দেখা হলো আমাদের।’
ছায়া থেকে আলোয় বেরোল ও। চিনতে পারলাম। গ্রেগ জনসনের দোকানের সেই মহিলা। একই পোশাক পরা রয়েছে। ঠোঁট দুটো সামান্য ফাঁক হয়ে আছে। বড় বড় দাঁত দেখা যাচ্ছে। চোখা চোখা, ধারাল। দোকানে এমন দাঁত দেখিনি। স্বাভাবিক ছিল। আর চুলের জায়গায় চুলও নেই এখন, অসংখ্য সাপ কিলবিল করছে, রূপকথার মেডিউসার মত। লম্বা সরু সরু আঙুলের মাথায় বড় বড় নখ।
একটা গাছের নীচে পার্ক করে রাখা একটা ছাতখোলা ভ্যান গাড়ি দেখিয়ে মহিলা বলল, ‘ওই গাড়িতে করে তোমাকে তোমার আসল গন্তব্যে পৌঁছে দিতে বলা হয়েছে আমাকে। প্লিজ, ভ্যানে উঠে বসো। যাত্রাটা খুব আরামের হবে, কথা দিতে পারি।
ঘুরে দাঁড়িয়ে দৌড় দিতে ইচ্ছে করল। কিন্তু জানি, কোন লাভ নেই। যে আমার পিছে লেগেছে, সে আমাকে খুঁজে বের করবেই।

দেখা যাক, শেষ পর্যন্ত কী ঘটে। হয়তো পালানোর সুযোগ পেয়েও যেতে পারি। ভেবে, চুপচাপ ভ্যানের পিছনে উঠে বসলাম। মহিলা বসল ড্রাইভিং সিটে। ইঞ্জিন স্টার্ট দিল। 'সিটবেল্ট পরো, প্লিজ। এটা এখানকার নিয়ম। কড়াকড়িভাবে নিয়ম মেনে চলি আমরা।'

বাহ্, দারণ কথা শুনলাম! এরা এখানে নিয়ম মেনে চলে! একটা ছেলেকে বাড়ি যেতে না দিয়ে তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে ধরে নিয়ে আসাটা কোন নিয়মের মধ্যে পড়ে? বেল্ট পরলাম।

চাকায় গড়িয়ে না চলে আচমকা এক লাফ দিয়ে শূন্যে উঠে পড়ল গাড়িটা। হেলিকপ্টারের মত সোজা ওপরে উঠে যাচ্ছে।

চেঁচিয়ে উঠলাম। পড়ে যাওয়ার ভয়ে গাড়ির কিনার খামচে ধরলাম। এতক্ষণে বুঝলাম, কেন সিটবেল্ট বাঁধার জন্য চাপাচাপি করা হয়েছে।

'কোথায় যাচ্ছি আমরা?' ইঞ্জিনের গর্জন আর বাতাসের শোঁ-শোঁ শব্দকে ছাপিয়ে চিৎকার করে উঠলাম। এরোপ্লেনের মত উড়ে চলেছে ভ্যান গাড়িটা।

কিন্তু জবাব দিল না মহিলা। হয় আমার কথা শোনেনি, নয়তো ইচ্ছে করেই জবাব দেয়নি। অনেক ওপরে উঠে নাক সোজা হলো গাড়ির। মাটি থেকে হাজার ফুট ওপর দিয়ে সোজাসুজি উড়ে চলল। কীভাবে ঘটছে এই অদ্ভুত কাণ্ডটা, শপিং মলের মাটির নীচে, মাথায় ঢুকছে না আমার। একমাত্র কল্পনাতেই সেটা সম্ভব। কিংবা ভয়ংকর দুঃস্বপ্নে।

নীচে তাকালাম। বড় বড় গাছে ঢাকা ঘন বন। মাঝখান দিয়ে সরু কাঁচা রাস্তা চলে গেছে। সামনে খানিকটা জায়গা দেখলাম, বন কেটে সাফ করা।

'এক মিনিটের মধ্যেই নামব আমরা, তৈরি হও, প্লিজ, মহিলা বলল। ওকে মহিলা না বলে দানব-মহিলা বলাই ভাল। ওর মাথার দিকে তাকাতে চাইছি না পারতপক্ষে, তবুও চোখ চলে যায়। কিলবিল করেই চলেছে সাপগুলো। হেলান দিয়ে বসলাম। মনটাকে শক্ত করার চেষ্টা করছি। মাথা গরম করে ফেললে কিংবা ভয়কে মগজটা গ্রাস করতে দিলে, ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করতে পারব না। পালানোর সুযোগ পাব না।

হেলিকপ্টারের মত সরাসরি মাটিতে গাড়ি নামাল দানব-মহিলা। এত আস্তে, আর নিখুঁতভাবে, কোন ঝাঁকুনিই টের পেলাম না।

গাড়ি থেকে নামল ও। সিটবেল্ট খোলার চেষ্টা করলাম। পারলাম না। আটকে গেছে ওটা

'নোড়ো না, প্লিজ। তোমার জন্য পরবর্তী আদেশ না আসা পর্যন্ত বসেই থাকতে হবে তোমাকে।' বলে আমাকে একা রেখে তাড়াহুড়া করে চলে গেল দানব-মহিলা। ভয়ানক অসহায় লাগছে আমার। মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে। কেন যে

মরতে শপিং মলে এসেছিলাম! মা যতই বলুক, কোনমতেই আসা উচিত হয়নি আমার। তারপর মনে হলো, আচ্ছা স্বপ্ন দেখছি না তো? দুঃস্বপ্নে ঘটছে না তো ঘটনাগুলো?
নিজের হাতে চিমটি কেটে দেখলাম। ব্যথা লাগল। না, বাস্তবেই ঘটছে এসব। কিন্তু কীভাবে ঘটছে—এসব তো কেবল রূপকথার রাজ্যে কিংবা পরীর দেশেই সম্ভব —হাজার ভেবেও বুঝতে পারলাম না।
ফিরে এল দানব-মহিলা।
'নেমে এসো,' বলল ও।
'পারছি না তো, আমার সিটবেল্ট আটকে গেছে,' জবাব দিলাম।
আমার মুখের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনাআপনি বাকল্স খুলে খসে পড়ল বেল্টটা। উঠে দাঁড়ালাম। পা ঝাড়া দিলাম। লাফিয়ে নামলাম মাটিতে।
'এদিকে, প্লিজ,' দানব-মহিলা বলল। পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল আমাকে খোলা জায়গাটা দিয়ে। দূরে একটা বাড়ি চোখে পড়ল।
'কোথায় যাচ্ছি আমরা?' জিজ্ঞেস করলাম।
'আমাদের মালিকের সঙ্গে দেখা করতে,' দানব-মহিলা জবাব দিল।
'এই মালিকটি কে?'
'ওঁর সঙ্গে দেখা হলেই বুঝবে।'
চুপ হয়ে গেল দানব-মহিলা। আর একটি কথাও বের করতে পারলাম না ওর মুখ থেকে।
নীরবে হেঁটে চলেছি আমরা। মস্ত এক মাঠের ওপর দিয়ে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে, বন কেটে তৈরি করে মাটি সমান করা হয়েছে, ইদানীং।
বাড়িটার দিকে এগোচ্ছি আমরা। সাদা রঙ করা, ছোট একটা বাড়ি। প্ল্যাস্টিক দিয়ে তৈরি। অদ্ভুত এক ধরনের আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে দেয়ালগুলো থেকে, মনে হলো ভিতর থেকে আসছে আলোটা। কোনও দরজা-জানালা দেখলাম না বাড়িটার।
'মালিক, আমরা এসেছি,' বাড়িটার কাছে এসে ওটার দিকে তাকিয়ে দানব-মহিলা বলল।
একটা দরজা খুলে গেল। তারপর দ্রুত মিলিয়ে গেল পুরো বাড়িটা। যেন আলো দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল, সুইচ অফ করে নিভিয়ে দেয়া হয়েছে।
দানব-মহিলা যাকে 'মালিক' বলে ডাকল, সে বসে আছে একটা সিংহাসনের ওপর। পরনে ঢোলা আলখেল্লা। মাথায় সোনার মুকুট। আলোয় ঝলমল করছে। আমার দিকে তাকিয়ে হাসল ও। নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল, 'আমার রাজ্যে, তোমার নতুন বাড়িতে স্বাগতম, রবিন।'

হেসে উঠল ও।
ধড়াস করে এক লাফ মারল আমার হৃৎপিণ্ড। অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি। এই ‘মালিক’ শপিং মলের সেই মেকানিক, ছোটখাট মানুষটি, যার নাম হিরাম স্কারপিনি।
অন্যদের মত হিরাম স্কারপিনির চেহারার কোন পরিবর্তন হয়নি। যা ছিল, তা-ই আছে। ভাবলাম, ওপরের মানুষের জগতের মতই এখানকার জগতেও মনিব কিংবা মালিক হলে তাকে কোন কিছু বদলাতে হয় না। সে নিজের ইচ্ছেয় খেয়ালখুশিমত চলতে পারে।
‘কী ঘটছে ভেবে খুব অবাক হচ্ছ, তাই না? নিশ্চয় ভাবছ, তুমি যা দেখছ, তোমার বন্ধুরা কেন সেসব দেখছে না?’ হিরাম স্কারপিনি বলল।
আমি ওকে স্কারপিনিই বলব, মালিক বলতে রাজি নই।
আবার খোলা জায়গাটা ধরে হেঁটে চলেছি আমরা। কোথা থেকে যেন উদয় হয়েছে শপিং মলের মালিক মিস্টার ওয়েভারলি। আমাদের পিছন পিছন আসছে যেন বডিগার্ড হয়ে। ধমক ছাড়া ওর সঙ্গে কথা বলছে না হিরাম স্কারপিনি। আর বলার সঙ্গে সঙ্গে সেটা পালন করার জন্য পাগল হয়ে উঠছে ওয়েভারলি
‘হ্যাঁ, কী ঘটছে জানার জন্য সামান্য কৌতূহল তো হচ্ছেই,’ কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করলাম।
‘খুব সহজ,’ স্কারপিনি বলল। ‘শপিং মলে আমাকে তুমি কী করতে দেখেছ? মেকানিকের কাজ। ইলেকট্রিশিয়ানের কাজ। যন্ত্রপাতি তদারকির কাজ। অন্যের কর্মচারী, চাকর। অথচ আগে আমি কারও চাকরি করিনি, আমার নিজের দোকান ছিল, ইলেকট্রিকের দোকান।
‘আপনার নিজের দোকান?’ জিজ্ঞেস করলাম। ‘কী হয়েছে ওটার?’
‘ওটা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, জোর করে কেড়ে নেয়া হয়েছে আমার কাছ থেকে। সোজা কথায়, আমাকে আমার জায়গা থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে, রবিন। সব কিছুই করা হয়েছে উন্নয়নের নামে। মিস্টার ওয়েভারলির মত প্রভাবশালী আর টাকাওয়ালা কিছু মানুষ আমাকে তুলে নিয়ে স্রেফ রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলেছে।’
কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে তাকালাম ওয়েভারলির দিকে। আমাদের ঠিক পিছনেই রয়েছে। যন্ত্রের মত হাঁটছে। ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে, মালিক তো দূরের কথা, একেবারে গোলাম বনে গেছে। কোন ক্ষমতাই নেই আর ওর।
‘ওয়েভারলি আর ওর ক্ষমতাশালী চ্যালারা আমাকে আমার জায়গা থেকে তাড়িয়েছে, আমার ব্যবসা বন্ধ করে দিয়েছে। আমি ও আমার মত আরও কয়েক ডজন ছোট ব্যবসায়ীর ভাত বন্ধ করেছে ওরা, পেটে লাথি মেরেছে। আমাদের জায়গা কেড়ে নিয়ে সেখানে বিশাল শপিং মল বানিয়েছে।’

‘ও, আপনাদের জায়গাতেই শপিং মল বানিয়েছে ওরা,’ সহানুভূতির সঙ্গে বললাম।
‘হ্যাঁ, রবিন, তুমিই একমাত্র আমার দুঃখ বুঝলে!’ আমার দিকে তাকিয়ে হাসল স্কারপিনি। ‘এখন আমি প্রতিশোধ নিয়েছি, সমান সমান হয়ে গেছে। কাজ যে আমি শুরু করেছি, সেটা তো দেখতেই পাচ্ছ।’ ওয়েভারলির দিকে ফিরে ধমকে উঠল, ‘ তাই না, ওয়েভারলি?’
‘হ্যাঁ, মালিক, হ্যাঁ,’ তাড়াতাড়ি মুখ কাঁচুমাচু করে হাত কচলে জবাব দিল ওয়েভারলি। ওর কণ্ঠস্বর, ওর চোখের চাহনি, সব কেমন যেন নিষ্প্রাণ। রোবট বানিয়ে দেয়া হয়েছে যেন লোকটাকে। যেন ওর মগজটাকে দখল করে নিয়েছে স্কারপিনি।
‘আমি যা করেছি, রবিন, সেটা করতে বহু সময় লেগেছে আমার। অনেক ধৈর্য ধরতে হয়েছে। কষ্ট করতে হয়েছে। শপিং মলের সমস্ত ওয়্যারিংকে আমি রি-ওয়্যারিং করেছি। নতুন এক ধরনের কারেন্ট সাপ্লাই করেছি সেই নতুন তারের ভিতর দিয়ে, জানা না থাকলে ধরতেই পারবে না কেউ। একমাত্র আমি পারব, আমার বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে। প্রচণ্ড শক্তিশালী ওই কারেন্টের রশ্মি মগজে ঢুকলে ব্রেইনওয়েভ বদলে যায়। বোধবুদ্ধি লোপ পায়, চিন্তার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়, কিছু বুঝে ওঠার আগেই সে আমার গোলামে পরিণত হয়।’ ওয়েভারলির দিকে তাকাল স্কারপিনি। ভুরু কুঁচকে ধমকে উঠল, ‘তাই না, ওয়েভারলি, তুমি এখন আমার কুত্তা না?’
‘হ্যাঁ, মালিক, হ্যাঁ!’ তাড়াতাড়ি মাথা নুইয়ে কুর্নিশ করে জবাব দিল ওয়েভারলি।
বুঝলাম, ক্ষমতা এখন সত্যি সত্যি স্কারপিনির হাতে চলে গেছে। ওয়েভারলির ওপর প্রতিশোধ নিয়েছে। আরও যাদেরকে গোলাম বানিয়েছে ও, তারাও নিশ্চয় ওয়েভারলির পক্ষ নিয়ে ওয়েভারলিকে সহায়তা করেছে, স্কারপিনির ক্ষতি করেছে।
‘হুঁ, বুঝলাম,’ মাথা ঝাঁকালাম আমি। ‘ওদের অফিস আর দোকানের ভিতর বিশেষ কারেন্ট প্রবাহিত করে ওদের মগজ ধোলাই করেছেন, ওদের গোলাম বানিয়েছেন, কিন্তু ওদের চেহারার এই দুর্গতি কেন? সেটা বদলালেন কীভাবে?’
‘এটা আমি ইচ্ছে করে করিনি,’ জবাব দিল স্কারপিনি। ‘ওই কারেন্টের সাইড-এফেক্ট, অর্থাৎ, প্রতিক্রিয়া। আমি জানতাম না এমন হবে। তবে হওয়াতে আমি খুশিই হয়েছি। যেমন শয়তান ওরা, ওদের উপযুক্ত শাস্তি। আমার প্রতি যে ভয়ঙ্কর অন্যায় আচরণ করেছে ওরা, সেটাই এখন ওদের চেহারায় প্রকাশ পাচ্ছে।’
চারপাশে তাকালাম। আবার ঘন বনের প্রান্তে চলে এসেছি। শান্ত থাকার ভান করছি, তবে মনে প্রচণ্ড ভাবনার ঝড় চলেছে আমার। স্কারপিনির জায়গা দখল

করে সেখানে শপিং মল বানানোয় ওর প্রতি আমার সহানুভূতি আছে, কিন্তু বোঝা যাচ্ছে লোকটা উন্মাদ। কারণ, আমাকেও ধরে নিয়ে এসেছে। আমি তো ওর কোন ক্ষতি করিনি। এই উন্মাদটার কবল থেকে মুক্তির উপায় খুঁজছি মনে মনে। পিছনে ছায়ার মত লেগে আছে ওয়েভারলি। ঘুরে যে পিছন ফিরে দৌড় দেব, তারও উপায় নেই। যদিও জানি, এই অদ্ভুত ফ্যান্টাসির জগতে শুধু দৌড় দিয়ে পালাতে পারব না স্কারপিনির হাত থেকে।

'আপনার যুক্তি ঠিকই আছে, মিস্টার স্কারপিনি,' আমি বললাম। জ্বলে উঠল ওর চোখ, বোধহয় আমি নাম ধরে ডাকাতেই। তাড়াতাড়ি শুধরে নিয়ে বললাম, 'সরি, মালিক, আমি আপনাকে রাগাতে চাইনি।' চোখের দৃষ্টি স্বাভাবিক হয়ে গেল আবার স্কারপিনির। বললাম, 'এই লোকগুলো নাহয় আপনার ব্যবসার ক্ষতি করেছে, কিন্তু আমি তো কিছু করিনি। আপনার সঙ্গে কোন শত্রুতা নেই আমার। এমনকী আপনাকে ভাল করে চিনিও না আমি।'

হাসল স্কারপিনি। 'না, রবিন, তোমার সঙ্গে আমার কোন শত্রুতা নেই। বরং তুমি আমার জন্য একটা বিরাট সম্ভাবনা।'

'সম্ভাবনা?' বুঝতে পারলাম না।

'তোমার স্কুলের রেকর্ড দেখেছি আমি, রবিন। তোমার মধ্যে ট্যালেন্ট আছে, গল্প বলার ট্যালেন্ট, খুব ভাল স্টোরি টেলার তুমি। গুছিয়ে গল্প বলতে পারো। বুঝলাম, তুমি আমার কাজে লাগবে। তাই তোমার ওপর নজর রাখতে শুরু করলাম। একদিন সবাই যখন তোমরা তোমাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলে, তোমার বেডরুমে ঢুকে তোমার টেবিল ল্যাম্পের বাল্বটা বদলে আমার তৈরি একটা স্পেশাল বাল্ব্ লাগিয়ে দিয়ে এসেছি। সেটা জ্বাললেই তোমার মগজের ওয়েভলেংথে ঢুকতে থাকে স্পেশাল কারেন্ট, তোমার কল্পনাকে বাড়িয়ে দেয়, অদ্ভুত সব জিনিস কল্পনা করতে থাকো। স্বপ্নে তো বটেই, অনেক সময় জেগে থেকেও ফ্যান্টাসির জগতে চলে যাও। উদ্ভট সব জিনিস দেখতে থাকো।'

এতক্ষণে পরিষ্কার হলো রহস্য। বুঝলাম, কিছুদিন থেকে হঠাৎ করে কেন এভাবে উল্টোপাল্টা স্বপ্ন দেখা শুরু করেছি। জেগে থাকলে হ্যালুসিনেশন দেখি। শপিং মলের আরও কয়েকজনের মত আমিও স্কারপিনির উদ্ভাবিত ইলেকট্রিক যন্ত্রের শিকার। তবে ওদের মত আমাকে রোবট বানায়নি স্কারপিনি, আমার মগজ দখল করে আমার চিন্তাভাবনাকে পুরোপুরি গ্রাস করে ফেলেনি।

'কেন?' জিজ্ঞেস করলাম। 'আমার ওপর আপনার কারেন্ট পরীক্ষা করতে গেলেন কেন?'

হাসল স্কারপিনি। কেমন অস্থির দেখাল হাসিটা। পাগলের হাসি। 'রবিন, একটা জিনিস নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ, আধুনিক যে সব শপিং মলগুলো তৈরি হচ্ছে,

সেগুলোতে জিনিস বিক্রির পাশাপাশি নানারকম ‘আকর্ষণ’ থাকে, মানুষকে বিনোদন দেয়ার জন্য। যে যত বেশি বিনোদনের ব্যবস্থা করতে পারে, তার শপিং মল তত বেশি চলে। আমারটাকে আমি সেরা বানাতে চাই। তুমিও সেখানে অংশ গ্রহণ করবে। তোমার বিনোদন শোটার নাম দেব আমি রবিন শো!’

‘মানে!’ চেঁচিয়ে উঠলাম। ‘আমাকে শপিং মলের আকর্ষণ বানাবেন! লোকের বিনোদনের বস্তু বানাবেন আমাকে! তারমানে পুতুল বানিয়ে গেটের কাছে দাঁড় করিয়ে রাখতে চান?’

‘উঁহুঁ,’ মাথা নাড়ল স্কারপিনি। হাসল। ‘পুতুল না, হিউম্যান স্টোরি মেশিন! ছোটদের প্রধান আকর্ষণ হবে তুমি। বাবা-মা’রা তাদের বাচ্চাদের এই স্টোরি মেশিন দেখাতে নিয়ে আসবে। অনর্গল গল্প বলে যাবে তুমি। দারুণ আকর্ষণীয়, অদ্ভুত সব গল্প। শোনার জন্য ভিড় জমাবে ছেলেমেয়েরা, বাকি শপিং মলগুলোর ব্যবসা লাটে উঠবে!’

‘আপনি পাগল, মিস্টার স্কারপিনি!’ আর না বলে পারলাম না। ‘উন্মাদ!’

আমার কথায় রাগ করল না স্কারপিনি। বোঝানোর চেষ্টা করল আমাকে, ‘তুমি হবে একটা মস্ত হিট, রবিন! ভেবে দেখো। আমার মেশিন থেকে আরও একটু কারেন্ট সরাসরি তোমার মগজে প্রবাহিত করে দিলে দুনিয়ার সেরা গল্পকার হয়ে যাবে তুমি। সারা শহরের ছেলেমেয়েরা ভেঙে পড়বে তোমার গল্প শোনার জন্য। তুমি ওদের ভয়ের গল্প শোনাবে, ভূতের গল্প শোনাবে, ছোটরা যত ধরনের গল্প শুনতে পছন্দ করে, সব শোনাবে। আতঙ্কিত, বিমোহিত করে দেবে ওদের। নেশাগ্রস্ত করে ফেলবে। তোমার গল্প শোনার জন্য পাগল হয়ে যাবে ওরা। রোজ ছুটে চলে আসবে তোমার কাছে। রাতে শপিং মল যখন বন্ধ থাকবে, গল্পগুলো তুমি কম্পিউটারে কম্পোজ করে লিখে ফেলবে। সেসব ছেপে বই বানিয়ে বাজারে ছাড়ব আমি। বিখ্যাত হয়ে যাবে তুমি। আর আমি হব কোটি কোটি টাকার মালিক!’

‘মনে হচ্ছে এখন আমার যাওয়া উচিত,’ স্কারপিনির আমাকে বিখ্যাত বানানোর পরিকল্পনা আমার মনে দাগ কাটতে পারল না। বরং আরও আতঙ্কিত করে তুলল। এক কদম পিছিয়ে গেলাম। ‘মা চিন্তা করবে। জরুরি জিনিস কিনতে শপিং মলে পাঠিয়েছিল। তাড়াতাড়ি বাড়ি না গেলে শেষে পুলিশকেও ফোন করতে পারে।’

পুলিশের কথায় কোনরকম ভাবান্তর হলো না স্কারপিনির। বলল, ‘না, রবিন, অন্য কোথাও আর যাওয়া হবে না তোমার। এখন থেকে এটাই তোমার আসল বাড়ি। এখানেই থাকবে চিরকাল।’ ওয়েভারলির দিকে তাকিয়ে ধমকে উঠল, হাঁ করে দেখছ কী? এদিকে এসো! ঠেকাও একে!’

মুহূর্তে স্কারপিনির পাশে চলে এল ওয়েভারলি। ওর হাতে বেরিয়ে এসেছে একটা পিস্তলের মত জিনিস।'
'বলুন, মালিক,' ওয়েভারলি বলল।
'মনে হচ্ছে, আমাদের এই কিশোর বন্ধুটির আরও খানিকটা মগজ ধোলাই দরকার,' স্কারপিনি বলল। 'অলটার লেখা বোতামটা টিপে দাও!' আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'এটা আমার আবিষ্কৃত ব্রেন-অলটারিং ইলেকট্রিক-গান। অনেক কাজ হয় এটা দিয়ে। তার মধ্যে একটা হলো, মানুষের ইচ্ছাশক্তিকে পরিবর্তন করে দেয়া। যাতে সে আর তার নিজের ভাবনায় চলতে না পারে।'
আতঙ্কিত চোখে ইলেকট্রিক গানটার দিকে তাকিয়ে রইলাম।
গানের পাশে লাগানো কয়েকটা বোতামের একটা টিপল ওয়েভারলি। তারপর নলটা পিস্তলের মত তুলে ধরে তাক করল আমার কপালের দিকে। ট্রিগারে চাপ দিচ্ছে আঙুল!
ঝপ করে মাটিতে বসে গড়িয়ে সরে গেলাম একটা ঝোপের ভিতর। লুকিয়ে পড়লাম।
'মিস করলে তো, গাধা কোথাকার!' প্রচণ্ড রাগে ধমকে উঠল স্কারপিনি। 'জলদি ধরো! কোনমতেই যেন পালাতে না পারে!'
হামাগুড়ি দিয়ে সরে যেতে লাগলাম ঝোপের সারির ভিতর দিয়ে। স্কারপিনি, ওয়েভারলি, গ্রেগ জনসন আর দানব-মহিলা, সবাই খুঁজছে আমাকে। চারজনের হাতেই এখন একটা করে ব্রেন-অলটারিং ইলেকট্রিক গান।
আতঙ্কিত হয়ে কোনমতেই এখন মগজ গরম করা চলবে না, নিজেকে বোঝালাম। পালানোর উপায় বের করতে হবে।
ঝোপের ভিতরে ভিতরে ওদের কাছ থেকে বেশ খানিকটা সরে এলাম। হামাগুড়ি দিতে দিতে ক্লান্তি লাগছে। সামান্য জিরিয়ে নেয়ার জন্য ঘন ঝোপের আড়ালে একটা গাছের গায়ে পিঠ দিয়ে বসলাম। একইসঙ্গে ভাবতে লাগলাম, পালানোর উপায়। বট গাছটার কথা মনে পড়ল। ওটার কাছে যেতে হবে আমাকে, যেভাবেই হোক। ওটা খুঁজে বের করতে হবে। ওটার ভিতরের এলিভেটরে চড়তে না পারলে ওপরের জগতে যেতে পারব না আমি।
ঘাড়ে হাত বোলালাম। ব্যাকপ্যাকের ভিতর স্কেট দুটো চাপ দিচ্ছে পিঠে
হঠাৎ ঝটকা দিয়ে সোজা হয়ে গেলাম।
স্কেট!
তাই তো! এগুলো পরে ছুটতে থাকলে আমার সঙ্গে দৌড়ে পারবে না ওরা। তা ছাড়া দূর থেকে ব্রেন-অলটারিং ইলেকট্রিক গান দিয়ে আমাকে নিশানা করাটা তখন অনেক বেশি কঠিন হয়ে যাবে ওদের জন্য।

স্কারপিনির কথা শোনা যাচ্ছে। কাছে চলে আসছে ওরা। জুতো জোড়া খুলে রাখলাম। ব্যাকপ্যাক থেকে স্কেট আর নি-প্যাড বের করে পরলাম। গলার কাছে ঝুলছে হেলমেটটা। সোজা করে বসালাম মাথায়।
তারপর উঠে দাঁড়ালাম। আমার কাছ থেকে কয়েক গজ দূরে রয়েছে গ্রেগ জনসন। এখনও দেখেনি আমাকে।
জানি, পারব না, তবু ঝোপ থেকে চুপি চুপি ওর চোখ এড়িয়ে বেরোনোর চেষ্টা করলাম।
কিন্তু পারলাম না। ঠিকই দেখে ফেলল আমাকে।
গ্রেগ জনসনের চিৎকার শোনা গেল, 'ওই যে, ওই যে ও, মালিক।'
'ট্রিগার টেপো, ট্রিগার টেপো, গাধা কোথাকার!
মুখ ফিরিয়ে পলকের জন্য দেখলাম, ইলেকট্রিক গান তুলে আমাকে নিশানা করছে গ্রেগ জনসন।
মাটি থেকে টান দিয়ে আমার ব্যাকপ্যাকটা তুলে নিয়ে গ্রেগ জনসনকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারলাম।
থ্যাক করে ওর পেটে গিয়ে লাগল ব্যাগটা। ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠে হাত থেকে ইলেকট্রিক গানটা ছেড়ে দিয়ে মাটিতে বসে পড়ল ও।
'কী, খুব ব্যথা লাগল! আর বদলাতে আসবেন মানুষের মগজ?' রাগে চেঁচিয়ে বললাম।
লাফ দিয়ে ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে গ্রেগ জনসনের পাশ দিয়ে স্কেটিং করে ছুটলাম। আমার দিকে নজর দেয়ার অবস্থা নেই ওর। পেট চেপে ধরে গোঙাচ্ছে। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় নিচু হয়ে ছোঁ দিয়ে মাটি থেকে তুলে নিলাম ইলেকট্রিক গানটা। ব্যাকপ্যাকটা তুলতে যাব, এ সময় কানে এল চিৎকার। তোলার আর সময় পেলাম না। ওটা নিতে না পারলে নিনার পুতুল, মা'র চশমা আর প্রেশার কুকারের ওয়াশারটা যাবে। তবে ওসব জিনিস আবার কিনতে পারব। কিন্তু প্রাণটা খোয়ালে আর ফেরত পাব না।
পাহাড়ের দিকে ছুটলাম। পাশের একটা গাছের আড়াল থেকে লাফ দিয়ে রাস্তায় এসে পড়ল দানব-মহিলা। হাতের ইলেকট্রিক গানটা তুলে ধরে আমি কাছে যাওয়ার অপেক্ষা করতে লাগল।
গ্রেগ জনসনের ইলেকট্রিক গানটা দু'হাতে চেপে ধরে উঁচু করলাম। ছোটা বন্ধ করলাম না।
স্কেটিং করে যত দ্রুত সম্ভব ছুটছি। দানব-মহিলার কাছাকাছি চলে এসেছি। আরেকটু গেলেই গায়ের ওপর পড়ব। আমাকে লক্ষ্য করে বৈদ্যুতিক রশ্মি ছুঁড়তে শুরু করল ও।

মাথা নিচু করে, এদিকে সরে, ওদিকে সরে ওর নিশানা ব্যর্থ করে দিতে লাগলাম। ইলেকট্রিক গানের নল দিয়ে বেরোনো কিছু রশ্মি আমার হেলমেটে লেগে ফসকে গেল। আমার মাথায় ঢুকল না।

দানব-মহিলার পাশ কাটানোর সময় হা-হা করে হাসলাম। স্কেটিং করে চলে এলাম অন্যপাশে। ইলেট্রিক গানের কারেন্ট সামান্যতম প্রভাব ফেলতে পারেনি আমার মগজে। ঢোকেইনি, প্রভাব ফেলবে কী। তাতে সাহস ফিরে পেয়েছি। বাতাসের গতিতে ছুটে চলেছি স্কেটিং করে। আমার মগজ এখন পরিষ্কার। ঠিকমত ভাবতে পারছি। মুক্তির গন্ধ পাচ্ছি।

তবে এখনও অনেক দেরি আছে। প্রথমে সেই বট গাছটা খুঁজে বের করতে হবে আমাকে। হাজারও গাছ রয়েছে এই এলাকায়। সঠিক গাছটা খুঁজে পেতে কয়েক ঘণ্টা লেগে যেতে পারে। কিংবা আরও বেশি সময়। গাছটা না পেলে বেরোতে পারব না।

সরু কাঁচা রাস্তার একটা বাঁক পেরোলাম। আর, হঠাৎ করেই, সামনে দেখা গেল ওটা। মস্ত, ফুলে ওঠা, বড় বড় শিকড়। আমার জন্য এখন সবচেয়ে মনোরম দৃশ্য। ছুটে এলাম গাছটার কাছে। ঠেলা দিলাম গাছের গায়ে। ভাবলাম, আগের বারের মতই খুলে যাবে। কিন্তু কিছুই ঘটল না।

‘এলিভেটরের দরজা তখনই খোলে, রবিন, আমি যখন চাই,’ পিছন থেকে শোনা গেল একটা মোলায়েম, ভীতিকর কণ্ঠ।

ফিরে তাকালাম। এগিয়ে আসছে স্কারপিনি। হাতে একটা যন্ত্র। নিশ্চয় ওর উদ্ভাবিত যন্ত্র। ব্রেন-অলটারিং ইলেকট্রিক গান দিয়ে গুলি করে আমার কিছু করতে পারেনি দানব-মহিলা, নিশ্চয় দেখেছে ও। তাই আরও শক্তিশালী যন্ত্র নিয়ে এসেছে।

‘তুমি কিন্তু মোটেও সহযোগিতা করছ না, রবিন,’ মৃদু অভিযোগের সুরে বলল স্কারপিনি। ‘তুমি আমাকে হতাশ করেছ। কাজেই আমি তোমাকে শাস্তি দেব। এই যন্ত্রের রশ্মি তোমার মগজে সামান্য একটুখানি ঢুকিয়ে দিলেই সারা জীবনের জন্য আমার গোলাম হয়ে যাবে তুমি। আমার প্রতিটি নির্দেশ পালন করে চলবে। যখন যা বলব, নির্দ্বিধায় করবে।’

হেসে উঠল স্কারপিনি। যন্ত্রটা উঁচু করে ধরল। আমার ওপর লক্ষ্য স্থির করছে। গাছের গায়ে জোরে জোরে কিল মারতে লাগলাম। কিন্তু দরজাও খুলল না, এলিভেটরও এল না। নিজেকে বাঁচানোর মাত্র একটা সুযোগ আছে আর, বুঝতে পারলাম। কাজটা করতে যদিও ভাল লাগবে না আমার। কিন্তু করতে হবে। স্কারপিনি আমাকে বাধ্য করে ফেলেছে।

স্কারপিনির যন্ত্রটার গায়ে একটা টেলিস্কোপের মত জিনিস লাগানো। সেটার ভিতর দিয়ে তাকিয়ে আমাকে নিশানা করছে ও।
গ্রেগ জনসনের কাছ থেকে নেয়া ব্রেন-অলটারিং গানটা হাতেই রয়েছে আমার। উঁচু করে ধরলাম। তারপর স্কারপিনি ওর যন্ত্রের বোতাম টেপার আগেই ওকে লক্ষ্য করে ট্রিগার টিপলাম।
পিস্তলের নলের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল এক ঝলক রশ্মি। মুহূর্তে সাদা আভায় ঢেকে গেল স্কারপিনির মুখ। পলকে চোখের দৃষ্টি বদলে গেল ওর, নিষ্প্রাণ শূন্য দৃষ্টি দেখা গেল চোখে। হাত থেকে খসে পড়ল যন্ত্রটা। দুই হাতে মুখ চেপে ধরে প্রচণ্ড এক আর্ত চিৎকার দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল ও। দৌড়ে ঢুকে গেল বনের ভিতরে।
জোরে নিঃশ্বাস ফেললাম। কতক্ষণ যে দম বন্ধ করে রেখেছিলাম জানি না। গাছের গায়ে হেলান দিলাম। আমার কাঁধের চাপ লাগতেই খুলে গেল দরজা। এসে গেছে এলিভেটর। হাতের ইলেকট্রিক গানটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে লাফিয়ে উঠে পড়লাম এলিভেটরে। 'জি' বোতামটা টিপে দিলাম। দ্রুত উঠতে শুরু করল এলিভেটর। বোতামের প্যানেলের দিকে তাকালাম। 'এইচ' বোতামটা নেই। আবার উধাও হয়ে গেছে।
পুরো একটা মিনিট লাগল গ্রাউণ্ড ফ্লোরে উঠতে। থেমে দাঁড়াল এলিভেটর। দরজা খুলল। বেরিয়ে এলাম শপিং মলের নীচতলার বারান্দায়। আর কোন খারাপ অনুভূতি নেই এখন।
চারদিকে লোকের ভিড়।
'এই, রবিন!' পরিচিত কণ্ঠের ডাক শোনা গেল।
ফিরে তাকালাম। হাত নাড়ছে কিশোর। পাশে দাঁড়ানো মুসা। একটা ফাস্টফুডের দোকানের সামনে রয়েছে ওরা। হেসে এগিয়ে গেলাম ওদের দিকে। আর ওদের সঙ্গে লাঞ্চ করতে দ্বিধা নেই আমার।
আরাম করে বসে হট ডগ আর স্যাণ্ডউইচ খেলাম। তারপর বললাম, আমি জিনিস কিনতে যাচ্ছি।
'তখন না একবার কিনতে গেলে?' অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল কিশোর। 'এতক্ষণ তাহলে কোথায় কাটিয়ে এলে?'
জবাব দিলাম না।
আমার পায়ের দিকে আঙুল তুলল ও। শপিং মলের ভিতরেও স্কেট পরে আছো কেন? তোমার ব্যাকপ্যাক কোথায়? তোমার জুতো?'
'নিশ্চয় কোথাও ফেলে এসেছি,' বললাম।
আমার জবাব শুনে ভ্রূকুটি করল কিশোর। মুসার দিকে তাকাল। স্কেট দুটো খুলে নিলাম। 'মুসা, তোমার ব্যাকপ্যাকে বাড়তি জুতো কিংবা স্যাণ্ডেল-ট্যাণ্ডেল আছে?

দাও তো পরি। রাতে যখন নিনার জন্মদিনের পার্টিতে আসবে, তখন ফেরত দেব।'
আমি জানি, মুসা একজোড়া বাড়তি কাপড়ের জুতো রাখে ওর ব্যাগে। ব্যায়াম করার সময় পরে।
জুতো বের করে দিল ও। আমার চেয়ে ওর পা বড়, তবে কাজ চালিয়ে নিতে পারব।
জুতো পরে, আমার দুই বিস্মিত বন্ধুকে হাঁ করিয়ে রেখে, রওনা হলাম। দরজা দিয়ে বেরোনোর আগে ফিরে তাকালাম। এমন ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে ওরা, নিশ্চয় ভাবছে, আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। মুচকি হেসে বেরিয়ে এলাম।
সোজা এগোলাম এসকেলেটরের দিকে। একের পর এক এসকেলেটর বদলে উঠে এলাম পঞ্চম তলায়। পকেটে টাকা আছে। তাই আরেকটা এভিয়েটর ডল কিনতে অসুবিধে হলো না। তবে গ্রেগ জনসনের দোকানে ঢুকে কী অবস্থা দেখতে পাব, সেটা ভেবে কিছুটা ভয় ভয় লাগল। নতুন কোনও বিপদে পড়তে চাই না।
ডল এম্পোরিয়ামের দিকে ঢোকার সময় সতর্ক রইলাম। সামান্যতম বিপদের সম্ভাবনা দেখলেই ছুটে পালাব। আশপাশে কয়েকজন কাস্টোমারকে দেখলাম। আগেরবারের মত নির্জন নয়। পরিস্থিতি স্বাভাবিক মনে হলো আমার কাছে। যা থাকে কপালে ভেবে ঢুকে পড়লাম দোকানের ভিতর।
তাকে রাখা একটা এভিয়েটর ডল দেখলাম।
'কী লাগবে?' জিজ্ঞেস করল একটা কণ্ঠ।
ফিরে তাকালাম। গ্রেগ জনসন! মুখে কথা সরছে না আমার। তাকিয়ে আছি। শেষবার যখন দেখা হয়েছে, আমার ছুঁড়ে দেয়া ব্যাকপ্যাকের আঘাতে ব্যথায় পেট চেপে ধরে কাতরাচ্ছে ও। এত তাড়াতাড়ি স্বাভাবিক হলো কী করে!
'কী খুঁজছ? এভিয়েটর ডল?' আমাকে পুতুলটার দিকে তাকাতে দেখেছে নিশ্চয় গ্রেগ জনসন। হেসে বলল, 'নিতে পারো। এ পুতুলের খুব চাহিদা। প্রচুর বিক্রি হয়।'
গ্রেগ জনসনের আচরণে মনেই হলো না, এর আগে ওর সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার। চিনতেই পারল না যেন আমাকে। ওর ভাবসাবও আমূল বদলে গেছে। আন্তরিক, হাসিখুশি ভঙ্গি। সাবলীল কথাবার্তা।
আমিও হাসলাম। স্কারপিনিকে রশ্মির আঘাত হানার পর নিশ্চয় এমন কিছু ঘটেছে, গোলামদের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে ও। আর তাতে স্বাভাবিক হয়ে গেছে গ্রেগ জনসন।
তবু ভয় গেল না আমার। তাই বেশি দেরি করতে চাইলাম না। তাড়াতাড়ি একটা পুতুল কিনে নিয়ে বেরিয়ে এলাম দোকান থেকে।

তারপর প্রেশার কুকারের ওয়াশার যে দোকানে পাওয়া যায় সেটাতে ঢুকলাম। সেই মহিলা দাঁড়িয়ে আছে কাউন্টারের ওপাশে, একটু আগেও যে দানব হয়ে ছিল। কিন্তু এখন ওর উষ্ণ হাসি দেখে মনেই হলো না, কিছুক্ষণ আগে ইলেকট্রিক গান হাতে আমাকে গুলি করার জন্য তাড়া করেছিল ও। গ্রেগ জনসনের মতই এই মহিলাও যেন চিনতে পারল না আমাকে। আচরণও খুব স্বাভাবিক। আর মাথার চুলের জায়গায় চুলই আছে, সাপ নয়।

একটা ওয়াশার কিনে বেরিয়ে এলাম। তারপর ঢুকলাম চশমার দোকানে। নতুন একটা ফ্রেম নিলাম, অবিকল সেটার মত, মা যেটা রেখে গিয়েছিল। চশমায় কাঁচ লাগাতে সময় লাগবে। আমাকে বসতে বলল মহিলা। বসতে আপত্তি নেই আমার, কিন্তু সমস্যাটা হলো, মা'র চোখের পাওয়ার কত, সেটা জানব কীভাবে? মহিলাকে বললাম, আগের চশমাটা হারিয়ে ফেলেছি। প্রেসক্রিপশন আনতেও ভুলে গেছি। তার খাতায় পাওয়ার লেখা আছে কি না, দেখতে অনুরোধ করলাম।

রেজিস্টার দেখে সহজেই বের করে ফেলল মহিলা। পনেরো মিনিটের মধ্যেই কাঁচ লাগিয়ে দিল চশমার কারিগর। ছোট পলিথিনের ব্যাগে চশমা, বেল্টের প্যাকেট, আর পুতুলের বাক্স ভরে নিয়ে হাতে ঝুলিয়ে বেরিয়ে এলাম।

দুই-দুইবার একই জিনিস কিনতে গিয়ে আমার হাতখরচ থেকে জমানো সমস্ত টাকা খরচ করে ফেললাম। তবে তাতে বিন্দুমাত্র আফসোস নেই আমার। বেঁচে ফেরার আনন্দে মশগুল হয়ে আছি। এসকেলেটরের দিকে এগোলাম।

শপিং মলের ইউনিফর্ম পরা একজন মেকানিক পিছন ফিরে স্ক্রু ড্রাইভার নিয়ে কাজ করছে। স্কারপিনি না তো! পিছন থেকে তো লোকটাকে স্কারপিনির মতই লাগছে!

বুকের ভিতর কাঁপুনি শুরু হয়ে গেল আমার। ঘুরে দৌড় দেয়ার কথা ভাবলাম। কিন্তু প্রচণ্ড কৌতূহল এসকেলেটরের দিকে টেনে নিয়ে গেল আমাকে।

স্কারপিনি কি আমাকে চিনতে পারবে? নাকি আর সবার মতই স্বাভাবিক হয়ে গেছে, আমাকে আর চিনতে পারবে না?

এসকেলেটরের কাছে চলে এসেছি, হঠাৎ আমার দিকে ঘুরে বসল লোকটা। চোখাচোখি হলো আমাদের।

না, ও স্কারপিনি নয়। ইউনিফর্ম পরা অবস্থায় পিছন থেকে স্কারপিনির মত লাগছিল। এ অন্য লোক। বয়েসও অনেক কম। আগে কখনও দেখিনি একে। এসকেলেটর মেরামত করছে।

'এসকেলেটর তো চলবে না এখন,' লোকটা বলল আমার দিকে তাকিয়ে। 'স্ক্রু ঢিলে হয়ে আছে। সেগুলো টাইট করে তারপর চালু করব আবার। এলিভেটর দিয়ে নামো। ইচ্ছে করলে সিঁড়ি দিয়েও নামতে পারো।'

‘আপনি কি এখানে নতুন?’ জিজ্ঞেস করলাম। ‘আগে তো কখনও দেখিনি।’
‘হ্যাঁ, নতুন,’ হেসে জবাব দিল লোকটা। ‘আজই জয়েন করলাম।’
আগের মেকানিক স্কারপিনির কী হয়েছে?’
শ্রাগ করল ও। ‘ওর কোন খবর নেই। কাউকে কিছু না বলে কোথায় চলে গেছে। কিন্তু কাজ তো আটকে থাকতে পারে না। তাই আমাকে খবর দিয়ে আনানো হয়েছে।’
লোকটার বুকে লাগানো ট্যাগে নাম লেখা রয়েছে : জর্জ ডেনভার।
‘নাহ্, সিঁড়ি দিয়েই নামি,’ জর্জকে বলে ঘুরে দাঁড়ালাম। এই শপিং মলের এলিভেটরে চড়ার সাহস আর আমার নেই। যদিও আমি নিশ্চিত, এবার আর কোন বিপদ ঘটবে না। ‘এইচ’ লেখা বোতামটাও আর দেখতে পাব না। তবু এলিভেটরে চড়লাম না। সিঁড়ি দিয়েই চার তলায় নামলাম। সেখান থেকে এসকেলেটরে চড়ে গ্রাউণ্ড ফ্লোরে।
গেট দিয়ে বেরোনোর সময় শপিং মলের গার্ডের সঙ্গে চোখাচোখি হলো। আগেরবারের মত কটমট করে তাকাল না। একবার তাকিয়েই অন্যদিকে চোখ ফেরাল ও।
গেটের বাইরে এসে জুতো খুলে স্কেট পায়ে দিলাম। জুতোগুলো পলিথিনের ব্যাগে রাখতে গিয়ে আরেকটা ব্যাকপ্যাকের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলাম। আগেরটা কোনওদিন আর খুঁজে পাব না। কয়েকদিন পরেই আমার জন্মদিন। মা’র কাছে উপহার হিসেবে একটা ভাল ব্যাকপ্যাকের আবদার করব। আরেকটা পুরানো ব্যাকপ্যাক আছে আমার আলমারিতে, ততদিন সেটা দিয়ে চালিয়ে নিতে পারব।
রোদ ঝলমলে দিন। আকাশের দিকে তাকালাম। সাদা, পাতলা মেঘের ছোট ছোট খণ্ড পেঁজা তুলোর মত ভেসে চলেছে। চমৎকার আবহাওয়া। স্কেটিঙের জন্য আদর্শ দিন।
বাড়ি রওনা হলাম। অদ্ভুত এক আনন্দ মনে। মগজে জোর করে ঢোকানো স্কারপিনির ইলেকট্রিক স্রোতের প্রবাহ কেটে যাওয়ায় আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে ব্রেইনওয়েভ। মনের দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, ভয়, অতিকল্পনা সব কেটে গেছে। অনেক দিন পর আবার শান্তি লাগছে। স্কেটিং করে মহাআনন্দে ছুটে চললাম রাস্তা ধরে, আচরণে কোনরকম অস্বাভাবিকতা নেই, জড়তা নেই; আমার মত একজন কিশোরের যা করা উচিত, তা-ই করছি।
এখন বাড়ি ফিরে প্রথমেই যে কাজটা করতে হবে আমাকে, আমার ঘরের টেবিল ল্যাম্পের বাল্বটা বদলে ফেলা। যাতে আবার ওটা আমার মগজের স্বাভাবিক ব্রেইনওয়েভ বদলে দিয়ে ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখাতে না পারে।
***

তিন গোয়েন্দা সিরিজ

সেবা প্রকাশনী